৩৫শ বর্ষ] ১৩৬৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত [২য় খণ্ড

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

(কাঠ-খোদাই)

ধানভাঙা

বনফুল-এর

শিক্ষার ভিত্তি

দাম: আড়াই টাকা

সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ (বাঙালীর বৈশিষ্ট্য), চন্দ্রিকা-সাহিত্য-পরিষদে সভাপতির অভিভাষণ (কাব্যপ্রসঙ্গ), শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সভায় সভাপতির অভিভাষণ (শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ) ও বুদ্ধ-পূর্ণিমা সভায় ভাষণ (বুদ্ধদেবের জীবনে নারী) এই পাঁচটি প্রবন্ধ পাঠক-মহলে বনফুলের সাহিত্য-চরিত্রের নতুন দিক উদ্‌ঘাটন করবে।

শান্তিদেব ঘোষের

ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি

দাম: এক টাকা

ভারতের দু'জন শিক্ষাগুরু, গান্ধিজী ও রবীন্দ্রনাথ। গ্রামীণ-সংস্কৃতির নবতর সংস্করণের উপর তাঁদের উদ্ভাবিত নতুন শিক্ষার ধারা সংবৃত্তায়িত না হ'লে এদেশের শিক্ষার উন্নতি সম্ভব নয়। গুরুদেবের 'শিক্ষাসত্র' ও মহাত্মাজীর 'নঈতালিমী শিক্ষা', গ্রামীণ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা ও পুনরুজ্জীবনের উপায় এবং গ্রামীণ সংস্কৃতি ও লোকনৃত্য প্রভৃতি প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি লেখক ইতিহাসের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেই সাবলীল গতিতে এগিয়ে নিয়েছেন।

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

অর্পণা দেবীর

মানুষ চিত্তরঞ্জন

দাম: সাড়ে পাঁচ টাকা

"দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কতকগুলো জীবনী আছে, কিন্তু দেশবন্ধু-কন্যা অর্পণা দেবী লিখিত এই বইটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ চিত্তরঞ্জনকে এখানে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানার সুযোগ রয়েছে এবং অনেক ঘটনাও পাওয়া যায় যার উল্লেখ অন্যান্য জীবনীতে থাকার সুযোগ ছিল না।**"
—আনন্দবাজার (১৬. ১. ৫৬)।

গ্রন্থতিথি।

রাসসুন্দরী দাসীর

আমার জীবন

দাম: আড়াই টাকা

"প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা কর্তৃক লিখিত এই গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশ কালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি দিকপালগণের সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছিল। * * * বাঙালী সমাজের অচিরগত যে-যুগটা ইতিমধ্যে বিস্মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে সেই সময়ের হিন্দু পরিবারের ও সমাজের ঘরোয়া চিত্র এই বইখানিতে যেমন আছে অন্যত্র তেমন দুর্লভ। বিশেষ এ' চিত্র সমাজের বহিরঙ্গের নয়, অন্তরঙ্গের, একেবারে অন্তঃপুরের। বাঙালী হিন্দু পরিবারের হাঁড়ির খবর ইহাতে পাওয়া যাইবে, কেননা, সে-খবর একজন পর্দানশীন মহিলা কর্তৃক লিখিত। * * *"—আনন্দবাজার (১১. ৮. ৫৬)।

আমাদের বই

'দিবাকর শর্মা'র

দিবাকরী

দাম: এক টাকা বারো আনা

'দিবাকর শর্মা' খ্যাতনামা লেখক ৺রবীন্দ্র মৈত্রের ছদ্মনাম। প্রায় কুড়ি বছর আগে মারা গেছেন তিনি। কিন্তু এখনও বাংলা সাহিত্যে গল্প ও রসরচনার ক্ষেত্রে তাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'লিপি বিবর্তনী', 'দিবাস্বপ্ন', 'মোগল-মদিরা', 'অভিসার', 'নিত্য-বিলাস কাব্য', 'সম্পাদকের চশমা' প্রভৃতি দশটি রচনার সমষ্টি 'দিবাকরী'। সাহিত্যের মধ্যে রস ও কষের এমন ব্যালেন্স রক্ষা বহুল নয়।

লাবণ্য পালিতের

শরীরম্ আদ্যম্

দাম: আড়াই টাকা

মেয়েদের সচিত্র যোগ-ব্যায়াম শিক্ষা। প্রত্যেকটি আসন অসংখ্য ছবি দ্বারা সহজ বোধগম্য। প্রত্যেকটি আসনের উপকারিতা, বয়স ও স্বাস্থ্যের তারতম্য অনুসারে প্রয়োগ কৌশলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ছাড়াও, 'মাতৃ ও শিশুমঙ্গল' এবং 'খাদ্য সম্বন্ধে পালনীয় ও বর্জনীয়' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দুটি এ বইয়ের বিশেষ আকর্ষণ।

পেয়ে ও দিয়ে

'শ্রীখেলোয়াড়'-এর

বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে স্মরণীয় যাঁরা

দাম: তিন টাকা

ডব্লিউ জি গ্রেস, রণজিৎ সিংজি, পুসকাস, ধ্যানচাঁদ, জো লুই, জ্যাটোপেক, গামা, জনি উইসমুলার, বব ম্যাথিয়াস, জিন থর্প, ম্যাথুওয়েব, আর্মস্ট্রং প্রভৃতি পৃথিবীর কুড়ি জন বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ্‌দের জীবনী। তাঁদের সাফল্য ও দুর্জয় সাধনার পতন-অভ্যুদয়ের বিচিত্র কাহিনী। আর্ট প্লেটে প্রত্যেকের পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি।

সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

যাহা যায়
তাহা পাওয়া যায়না
ধন-ঐশ্বর্য্য
কিন্তু
আপনি ইচ্ছামত একটী সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কেশতৈল অনায়াসে পাইতে পারেন। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত 'হিমকল্যাণ'ই আপনার কেশতৈল নির্ব্বাচন-সমস্যা সমাধানে সক্ষম। ইহার কল্যাণ পরশে যাবতীয় কেশরোগ নিরাময় ও মস্তিষ্ক শীতল হয়। দীর্ঘদিন নিয়মিত ব্যবহারেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।
ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যান
আয়ুর্ব্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ সুরভিত কেশতৈল।
অন্যান্য প্রসাধনী
• পামিকোকো
সুরভিত নারিকেল তৈল
• হিমকল্যাণ
ক্যাষ্টর অয়েল
সুগন্ধিত কেশতৈল
• ভৃঙ্গামলা মহোপকারী কেশতৈল
• যোজনগন্ধা সুরভি নির্য্যাস
HIMAKALYAN
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ
কলিকাতা
UPCO

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

৩৫শ বর্ষ—কার্ত্তিক, ১৩৬৩] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [দ্বিতীয় খণ্ড, ১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। "কামনা থাকৃতে, ভোগ লালসা থাকৃতে মুক্তি নাই। সংসার ভোগের স্থান। এক একটি জিনিষ ভোগ করে ত্যাগ করতে হয়। ভোগ লালসা থাকা ভাল নয়। আমি রাজসিক ভাবের আরোপ কবতাম ত্যাগ করবার জন্য। সাধ হয়েছিল যে খুব ভাল সাঁচ্চা জরির পোষাক পরবো, আঙটী আঙ্গুলে দেব, নল দিয়ে রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাবো। সেজ বাবু নূতন সাজ গুড়গুড়ি সব পাঠিয়ে দিলে। সাঁচ্চা জরির পোষাক পবলাম। খানিকক্ষণ পরে মনকে বললাম—মন, এর নাম সাঁচ্চা জমিব পোষাক। এই সাজ রজোগুণ হয়। তখন সেগুলোকে খুলে ফেলে দিলাম, পা দিয়ে মাড়াতে লাগলাম, আর তার উপর থু থু করতে লাগলাম, আর ভালো লাগলো না। মনকে বললাম,—মন, এর নাম শাল—এরই নাম আঙটী। গুড়গুড়ি নানা রকম করে টানতে লাগলাম,—একবার এপাশ থেকে, একবার ওপাশ থেকে, উঁচু থেকে, নীচু থেকে। তখন বললাম—মন, এরই নাম নল দিয়ে রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া। এই বলে গুড়গুড়ি ত্যাগ হয়ে গেল। সেই যে সব ফেলে দিলাম আর মনে উঠে নাই।"

"বড়বাজারেব রং করা সন্দেশ খেতে ইচ্ছা হলো—এরা আনিয়ে দিলে। খুব খেলাম,—তাবপর অসুখ। ধনেখালির খইচুর, কৃষ্ণনগবের শবভাজা, তাও খেতে সাধ হয়েছিল। ছেলেবেলায় গঙ্গা নাইবার সময়,—তখন নাথের বাগানে—একটি ছেলের কোমরে সোনাব গোট দেখেছিলাম। এই অবস্থাব পব সেই গোট পরতে সাধ হলো। তা বেশীক্ষণ পরবার যো নাই। গোট পরে ভিতর দিলে শিড-শিড কবে উপবে বায়ু উঠতে লাগলো, সোনা গায়ে ঠেকছে কিনা? একটু বেখেই খুলে ফেলতে হোল। তা না হলে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। শম্ভুব চণ্ডীর গান শুনতে ইচ্ছা হয়েছিল। সে গান শোনার পব আবার বাজনারায়ণেব চণ্ডী শুনতে ইচ্ছা হয়েছিল,—তাও শোনা হলো।"

"অনেক সাধুরা সে সময় আসতো। তা সাধ হলো তাদের সেবার জন্য আলাদা একটি ভাঁডাব হয়। সেজ বাবু তাই আলাদা ভাঁড়ার করে দিলে,—সাধুসেবার জন্য। সেই ভাঁড়ার থেকে সাধুদের সিদে কাঠ এসব দেওয়া হতো। গাড়ী পাল্কী যাকে যা দিতে বলেছি, তাকে তা দেওয়া।

মাতাহরি

হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

তাকে দেখতে সুন্দরী ছিল না এবং খুব ভাল নাচতেও সে পারতো না। গুপ্তচরের কাজ সে করতো, কিন্তু গুপ্তচর ছিল না। তবুও লোকে বিশ্ববিখ্যাত গুপ্তচর মাদমোয়াজেল লা দক্তুর, ইরমা ষ্টব, মেরিয়া সোরেল এবং এই রকম আরও অনেকের কথা বিস্মৃত হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের লাস্যময়ী কুহকিনী মাতাহরিকে ভুলবে না।

"গুপ্তচরবৃত্তির বিশেষ গুণাবলীর অধিকারিণী না হলেও মাতাহরি গুপ্তচর হিসাবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল। নৃত্যকলায় সে পারদর্শিনী না হলেও তার নাচে ইউরোপের সমরকেন্দ্রগুলি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকত। সে নাচত সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় এবং সমরনায়কেরা তাতে মোহিত হতেন। সে ছিল আধুনিক ডেলিলা, শত শত স্যামসন তার রূপবহ্নিতে নিজেদের আহুতি দিয়েছিল। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও এই কুহকিনীকে জীবন দিতে হয়েছিল গুলীর মুখে আর সে গুলীবর্ষণের আদেশ দিয়েছিলেন সমরনায়করাই।

১৮৭৬ সালের ৭ই আগষ্ট হল্যাণ্ডের একটি গ্রামে এই বিশ্ববিখ্যাতা মহিলা জন্মগ্রহণ করেন। তার মা আন্তজে যখন তাকে তার পিতা এডাম জেলকে উপহার দেন, তখন জেলের মত সুখী লোক হল্যাণ্ডে আর ছিল না। আদর করে তাঁরা মেয়ের নাম রাখলেন গাট্রুড। স্বাস্থ্য তার বেশ ভালই ছিল এবং অন্যান্য ছেলে-মেয়ের সঙ্গে খেলাধূলো ক'রে তার দিনগুলি বেশ ভালই কাটছিল। কিন্তু এক বার ছুটির সময় হেগে বেড়াতে গিয়ে দেখা হল ক্যাপ্টেন ম্যাকলিওডের সঙ্গে। এই হল তার কাল। তখন তার বয়স আঠারো।

ক্যাপ্টেন ম্যাকলিওড হল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক বাহিনীতে কাজ করতেন। চল্লিশ বছরের এই পরিণত বয়স্ক সামরিক কর্ম্মচারী গাট্রুডের প্রেমে পড়লেন এবং ১৮৯৫ সালে তাকে বিয়ে করে তাঁর কর্ম্মস্থল জাভায় নিয়ে গেলেন। ম্যাকলিওড জাভায় এক রিজার্ভ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। সমুদ্র-পরিবেষ্টিত দ্বীপের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী এবং সুরা ক্যাপ্টেন ম্যাকলিওডকে অধঃপাতের পথে নিয়ে গেল এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি স্ত্রীর উপর অত্যাচার আরম্ভ করলেন। এক এক সময় সুরাপানোন্মত্ত অবস্থায় তিনি গাট্রুডকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করতেন। শেষে সে আর নির্য্যাতন সহ্য করতে না পেরে এক দিন গোপনে হল্যাণ্ডে পালিয়ে গেল।

কিন্তু দু'বছর বেপরোয়া দ্বীপ-জীবন যাপনের পর গ্রামের শান্ত জীবনযাত্রা তার ভাল লাগল না। উদ্দাম জীবন যাপনের আশায় সে চলে গেল প্যারী। বলি দ্বীপে অবস্থান কালে সে সেখানকার নাচের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা শিখে নিয়েছিল। সেই নাচ এখন তাকে প্রেরণা জোগাল। সে আর মার্গেরিটা গাট্রুড জেল রইল না, মাতাহরি নাম নিয়ে সে বাজারে আত্মপ্রকাশ করল। সে ইউরোপের অধিবাসী নয়, দক্ষিণ-ভারতের এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে তার জন্ম, সে 'মাতাহরি', সে 'ঊপর আঁখি'!

প্যারীর বিলাসী ধনকুবেররা তাকে লুফে নিল। দু'-চার জন রাজনৈতিক নেতাও তার মোহজালে আটকে পড়লেন। তাকে পাবার জন্য ধনপতিদের মধ্যে সুরু হয়ে গেল প্রবল প্রতিযোগিতা। সে-ও তার সুযোগ নিতে কসুর করল না, বেপরোয়া ভাবে তাদের লুণ্ঠন করতে লাগল এবং মধু ফুরিয়ে গেলেই তাদের একে একে দূর করে দিতে লাগল বিনা দ্বিধায়।

দু' বছর পরে মাতাহরি গেল বের্লিনে। সেখানে তার প্রথম শিকার হল যুবরাজ। সামরিক তোড়জোড় দেখাবার জন্য যুবরাজ তাকে নিয়ে গেলেন সাইলেশিয়ায়। ব্রান্সউইকের ডিউক এবং কাইজারের পররাষ্ট্র সচিব ফন জাগোকে তার ফাঁদে পড়তে হল। তার পর একে একে তার অভিযান চলল ভিয়েনায়, রোমে, মাদ্রিতে এবং পরে লণ্ডনে।

তার যাতায়াতের কথা গোপন থাকবার উপায় ছিল না। অসংখ্য গুণমুগ্ধের দল তাকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা ও স্বাগত সম্ভাষণের জন্য তৈরী থাকত। কোন দেশের প্রতি তার পক্ষপাত ছিল না, সকলকেই সে সমান চক্ষে দেখত।

প্যারীতে অবস্থান কালে সে বলতো, "আমি ফরাসী নই। ফরাসীরা যেমন আমার বন্ধু তেমনি অন্য দেশের লোকরাও। ফ্রান্সের সঙ্গে যারা যুদ্ধ করছে, তারাও আমার বন্ধু।"

তার এই উক্তি থেকে জার্ম্মাণদের প্রতি তার আকর্ষণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জার্ম্মাণ জেনারেলরা তাকে সুখী করবার জন্য দু'হাতে টাকা ঢালতেন। প্যারীর সামরিক মহলে ঘোরাঘুরি করার সময় সে গোপন সামরিক সংবাদ সংগ্রহ করতো বটে, কিন্তু এতে তার যে বিশেষ কোন কৃতিত্ব ছিল তা নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সে যা শুনতো তাই অপর পক্ষকে জানিয়ে দিত। কিন্তু কৌশলে কোন কথা জেনে নেবার ক্ষমতা তার ছিল না। তা ছাড়া তার প্রদত্ত সংবাদ যে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম বছরে তার কার্য্যকলাপের কোন রেকর্ড নেই। কিন্তু ১৯১৫ সালে সে যখন ফ্রান্সে যায় তখন ইটালীর

গোয়েন্দা বিভাগ থেকে তার আগেই এক টেলিগ্রাম প্রেরিত হয়। তাতে বলা হয়:

"নেপলসে জাপানী জাহাজের যাত্রীদের নামের তালিকায় আমরা মার্সাই থেকে আগত বিখ্যাত হিন্দু নর্ত্তকী মাতাহরিকে চিনতে পেরেছি। সে হিন্দুদের গোপনীয় নৃত্য সমূহের প্রদর্শনী করতে চায়—সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় এই সব নৃত্য করতে হয়। সে নিজেকে আর ভারতীয় বলে স্বীকার করতে চায় না এবং বের্লিনে থাকে। সে জার্ম্মাণ ভাষায় কথা বলতে পারে, তবে একটু পূর্ব্বদেশীয় টান আছে।"

প্রত্যেকটি মিত্রশক্তির গুপ্তচর বিভাগে এই টেলিগ্রামের অনুলিপি প্রেরিত হয় এবং মাতাহরিকে চিহ্নিত করা হয় জার্ম্মাণ গুপ্তচররূপে। ফরাসী গুপ্তচররা দিবারাত্রি তাকে অনুসরণ করতে থাকে, কিন্তু সন্দেহ করার মত কিছু আবিষ্কার করতে অক্ষম হয়। অবশেষে বহু চেষ্টার পর তারা জানতে পারে যে, ওলন্দাজ, সুইডিশ এবং স্প্যানিশ দূতাবাসের কূটনৈতিক রক্ষাকবচের অন্তরালে সে চিঠি পাঠায়। কিন্তু এটা খুব একটা বড় ব্যাপার নয়। অনেকেই এরকম করে থাকে। এক জন গুপ্তচরের পক্ষে এই কৌশল অবলম্বন করা হাস্যকর ব্যাপার! কিন্তু যেহেতু মাতাহরিকে গুপ্তচর বলে সরকারী ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সুতরাং উপেক্ষা করা চলে না। তার চিঠি ট্যাপ করা হল। পাঠ করে দেখা গেল তার মধ্যে কিছু নেই, কোন কোডও আবিষ্কার করা গেল না। কিন্তু এই চিঠি কাজে লেগেছিল তার বিচারের সময়।

আপাততঃ তাকে দেশছাড়া করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। সে যদি এতে রাজী হত তাহলে হয়ত রক্ষে পেত। কিন্তু সে জোর গলায় বললে, সে কখনও জার্ম্মানীর জন্য কাজ করে নি, সে ফ্রান্সের পক্ষে এবং দরকার হলে সে ফরাসী গুপ্তচর বিভাগে কাজ করতে প্রস্তুত আছে।

তার প্রস্তাবে মিত্রপক্ষ রাজী হলেন এবং তাকে তার অন্যতম প্রেমিক জার্ম্মাণ জেনারেল মরিৎস ফন বিসিংকে শিকার করার জন্য বেলজিয়ামে পাঠানো হল। তার কাছে ছ'জন বেলজিয়ান গুপ্তচরের ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য। কিছু দিনের মধ্যে উক্ত ছ'জনের এক জন জার্ম্মাণদের ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিল এবং খবর পাওয়া গেল যে, উক্ত বেলজিয়ানটি জনৈকা নারী কর্ত্তৃক প্রতারিত হয়েছে।

বেলজিয়াম থেকে মাতাহরি হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে গেল স্পেনে এবং সেখান থেকে ইংলণ্ডে। লণ্ডনে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে সার বেসিল থমসনের কাছে তাকে হাজির করা হল। সেখানে সে স্বীকার করলে যে এক জন গুপ্তচর—কিন্তু বৃটেনের ফ্রান্সের মিত্র।

সার বেসিল তাকে গুপ্তচর বৃত্তি পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে স্পেনে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু স্বভাব যায় না ম'লে। মাদ্রিদে সে জার্ম্মাণ নৌপ্রতিনিধি ক্যাপ্টেন ফন কালে এবং সামরিক প্রতিনিধি মেজর ফন ক্রণের সঙ্গে জুটল। কিন্তু সুবিধে হল না। জার্ম্মাণ অফিসাররা তাকে সুখী করবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। জার্ম্মাণ হাই কম্যাণ্ড বললেন, মদ আর মেয়েমানুষের পেছনে বড্ড বেশী খরচ হচ্ছে, ও সব বন্ধ করতে হবে আর অকেজো গুপ্তচরদের বাতিল করতে হবে। মাতাহরিকে ফাঁকি দেবার জন্য তাকে আবার পাঠানো হল প্যারীতে। প্যারীর সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। মাতাহরি ফ্রান্সের মাটিতে পা দেবা মাত্র তাকে গ্রেপ্তার করা হল।

১৯১৭ সালের ২৪শে জুলাই সামরিক আদালতে মাতাহরির বিচার আরম্ভ হল। বিচার চলতে থাকল গোপনে। রুদ্ধ কক্ষের দ্বারে দ্বারে কড়া পাহারা বসল। এই গোপনীয়তার কারণ ছিল।

মাতাহরি কোন কথা গোপন করল না। সাইলোসয়া, ফ্রান্স ও ইটালীতে সামরিক আয়োজন ও সাজসজ্জা পরিদর্শন, কাইজারের পররাষ্ট্র সচিবের কাছ থেকে ত্রিশ হাজার মার্ক গ্রহণ প্রভৃতি সব কথাই সে বললে। সে বললে, "এ সবই আমার সঙ্গলাভ করার মূল্য এবং এ দাম দিতে কেউ কার্পণ্য করেনি।" সে জোর গলায় ঘোষণা করল যে সে ফ্রান্সের জন্য গুপ্তচরের কাজ করেছে। কিন্তু তার সমর্থনে কোন প্রমাণ তার কাছে ছিল না। কি কি সংবাদ সে ফ্রান্সের জন্য সংগ্রহ করেছে তা সে বলতে পারল না। তাছাড়া তাকে বেলজিয়ামে প্রেরণের আগে তার কাছে যে ছ'জন বেলজিয়ান গুপ্তচরের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছিল সেটাও সে ফেরৎ দিতে পারল না। সামরিক আদালতের বিচারকবৃন্দ জানতেন এবং সে নিজেও জানতো যে, সে তালিকা আমষ্টারডামে জার্ম্মাণ অফিসারদের কাছে প্রেরিত হয়েছিল।

মাতাহরি অনেক বড় বড় সাক্ষী মানলে। ফ্রান্সের প্রাক্তন সমরসচিব ও পররাষ্ট্র অফিসের অন্যান্য হোমরা-চোমরাদের। কিন্তু কেউ কিছু করতে পারল না। তার দিন ফুরিয়ে এসেছিল।

সামরিক অফিসাররা একবাক্যে তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন। মাতাহরি অবিচলিত ভাবে দণ্ডাদেশ শ্রবণ করল—তার মুখে ফুটে উঠল এক রহস্যময় হাসি!

সে আশা করেছিল, শেষ পর্য্যন্ত কোন না কোন উপায়ে কেউ না কেউ তাকে রক্ষা করবেই। তাই সেণ্ট লাজেয়ার কারাগারে অবস্থান কালে এক দিনের জন্যও তাকে কাতর হতে দেখা যায়নি।

পিয়ের ত মরিস্যাক এই বিপদের দিনেও মাতাহরিকে ভুলতে পারেন নি। তিনি তাকে বাঁচাবার জন্য এক চক্রান্ত করেছিলেন।

১৯১৭ সালের ১৫ই অক্টোবর ভোর পৌণে ৬টার সময় সহর থেকে খানিকটা দূরে ভিন্সেনের রাইফল রেঞ্জে মাতাহরিকে গুলীতে মারা হবে স্থির হয়েছিল। মরিস্যাকের চক্রান্ত অনুযায়ী ঠিক ছিল যে, ফায়ারিং স্কোয়াডের বন্দুকগুলিতে ব্ল্যাঙ্ক কার্ত্তুজ থাকবে।

যথাসময়ে মাতাহরিকে জেল থেকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল। মাতাহরি নিয়মানুযায়ী এক গেলাস মদ পান করে ধীর ও অবিচলিত পদে নির্দ্দিষ্ট গাছটির তলায় গিয়ে দাঁড়াল। গাছের সঙ্গে তাকে বাঁধা হল, কিন্তু সে চোখ বাঁধতে দিল না। ফায়ারিং স্কোয়াডের সৈন্যরা বন্দুক তুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। মেজর মাসার্ড হুকুমজারি করলেন —ফায়ার। একসঙ্গে বারটা বুলেট ছুটে গিয়ে মাতাহরির দেহ ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। মরিস্যাকের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছিল।

কয়েকটি বৃহৎ খালপথ

শ্রীমিহিরবরণ সেন

মিশরীয় সরকার কর্তৃক সুয়েজ খালপথের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও উহার মালিকানা-স্বত্ব জাতীয়করণ করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা এবং সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ফলে পৃথিবীব্যাপী এক দিন যে তীব্র সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, বিশ্বের শান্তিপ্রিয় জনগণের মিলিত প্রচেষ্টাতে তাহার আংশিক উপশম হইলেও সে অগ্নি সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই। এক্ষেত্রে সুয়েজ খালের প্রয়োজনীয়তা বিশ্বের দেশগুলির নিকট কি জন্য এবং উহার মালিকানা হস্তান্তরে এত যুদ্ধং দেহি মনোভাবেরই বা বিকাশ কেন, তাহা জানিবার আগ্রহ পাঠক-মাত্রকেই উৎসুক করিবে সন্দেহ নাই। আসলে সুয়েজ খাল একটি কৃত্রিম জল-পথ, যাহা মিশরীয় সীমানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই পথটি দৈর্ঘ্যে ১০৩ মাইল, গভীরতায় পয়ত্রিশ ফিট এবং তলদেশে প্রায় এক শত আট ফিট প্রশস্ত। ইউরোপ এবং এশিয়ার দেশগুলির ভিতর অত্যন্ত অল্প সময়ে জল-পথে যাতায়াত এবং ব্যবসাবাণিজ্যে সুব্যবস্থা ও সত্বর আদান-প্রদানের জন্য সুয়েজ জল-পথ বাস্তবিকই অপরিহার্য্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা জানি যে, পূর্ব্বকালে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে জলপথে আসিতে হইলে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া আসিতে যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইত, সুয়েজ খাল খনন করিবার পর সেই দূরত্ব এক-তৃতীয়াংশ কমিয়া গিয়াছে। এ হেন মূল্যবান সম্পদ এই সুয়েজ পথটি কিন্তু এক দিনে তৈরী হয় নি—ইহার খনন কার্য্য কয়েক বৎসরের অপরিসীম যত্ন ও পরিশ্রমের সার্থক পুরস্কার হিসাবে ফার্ডিনাণ্ড ল্যাসেপ নামক জনৈক ফরাসীর তত্ত্বাবধানে ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে বিশ্ববাসীর নিকট উন্মুক্ত করা হয়। বোধ হয় এই কারণেই সে সময় হইতে কিছু দিন আগে পর্যন্তও এক ফরাসী কোম্পানী ও ইংরেজ সরকারের যুক্ত শাসনাধীনে এই খালপথটির রক্ষণাবেক্ষণ, আয় ব্যয়, ও জাহাজ চলাচল ইত্যাদি সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছিল। সামরিক ও বেসামরিক ব্যবসাবাণিজ্যে অপরিহার্য্য এবং মুনাফা সংগ্রহের এক প্রশস্ত পথ এই সুয়েজ খাল আজ মিশর সরকার বিদেশীদের নিকট হইতে ছিনাইয়া নেওয়াতে ইংরাজ, ফরাসী ও মার্কিণ শক্তিগোষ্ঠী গেল গেল রব উঠাইয়াছে। ইহাতে শুধু যে তাহাদের শুল্ক আমদানীর পথই বন্ধ হইয়াছে তাহাই নহে, ইংরেজ ও মার্কিণ সরকারের দৃষ্টি আরও সুদূরপ্রসারী—অর্থাৎ এখান হইতে তাহাদের কর্তৃত্ব ধূলিসাৎ হইলে ভবিষ্যতে সামরিক প্রয়োজনেও যে প্রভূত বিঘ্ন উপস্থিত হইবে সে সম্পর্কে তাঁহারা সম্পূর্ণ সচেতন।

সুয়েজপথ ব্যতীত ইউরোপ এবং এশিয়ার প্রান্তরে হাজার-হাজার মাইলব্যাপী আরও অসংখ্য কৃত্রিম খালপথ ছড়িয়ে রয়েছে। ঐতিহাসিকগণের মতানুসারে ভূপৃষ্ঠে এইরূপ কৃত্রিম খাল ব্যবহারের প্রথম সূচনা ব্যাবিলন এবং মিশর দেশে আনুমানিক খৃঃ-পূঃ ৩৫০০ বছর পূর্ব্বে দেখা দিয়াছিল। তবে ঐ সময়ে প্রধানত সিঞ্চন ব্যবস্থা এবং নদনদীর গতি নিয়ন্ত্রণ করাতেই এই সকল খালপথ অধিক ব্যবহৃত হইত। খৃঃ-পূঃ ছয় শত বছর পূর্ব্বে নীল নদী ও লোহিত সাগরকে সংযোজিত করিয়া যে খাল নির্ম্মিত হইয়াছিল পণ্ডিতগণের সাধারণ হিসেবে উহাই হইতেছে জলপথে যাতায়তের নিমিত্ত তৈরী প্রথম জলপথ। পরবর্তী কালে অবশ্য সম্রাট অলেকজাণ্ডারের শাসনকালে মিশর দেশে এই ধরণের খাল-পথ অনেক খনন করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত রোমীও শাসকগণও এই প্রকার খালপথ খনন যে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন এবং এই কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন, তাহারও প্রভূত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এমন কি, পণ্ডিতগণ খাল-পথ খনন কার্য্যকে ঐ যুগের এক অন্যতম উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। কিংবদন্তী রহিয়াছে যে, ইংলণ্ডে রোমান শাসনকালে দুইখানি কৃত্রিম খাল-পথ তৈরী সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

খাল-পথের ব্যবহার শুধু যে ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন নহে,—এশিয়া ভূখণ্ডে চীন দেশেও এই সুব্যবস্থা অতি প্রাচীন কাল হইতেই সুপরিচিত। পিকিং হইতে দক্ষিণ-ইয়াংসি পর্য্যন্ত প্রসারিত গ্রাণ্ড ক্যানেলের খনন কাজ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সংঘটিত কীর্ত্তি বলিয়া অভিহিত হয়। এই বিরাট খাল-পথটি বর্ত্তমানে যাতায়াত ব্যবস্থা এবং কৃষি-কার্য্যের অনুকূলে ব্যবহৃত হইতেছে।

আপাত দৃষ্টিতে এবং ব্যবহারিক উদ্দেশ্য বিচার করিয়া দেখিলে পুরাতন যুগের খাল-পথ এবং এ যুগের খাল-পথে প্রভেদ সামান্য মনে হইলেও সাংগঠনিক কলা-কৌশল এবং কারিগরী নৈপুণ্যে উভয় যুগে নির্ম্মিত খাল-পথের মধ্যেকার ব্যবধান হিমালয়-সমান বিরাটত্ব ধারণ করে। ইহার কারণ অবশ্য সহজেই বুদ্ধিগ্রাহ্য—সে যুগের বিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের ন্যায় এতটা বিকশিত ছিল না। সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে পুরাতন কালের খাল-পথগুলিতে জলপ্রবাহ সাধারণত এক সমতলে প্রবাহিত থাকিত, ফলে জাহাজ ইত্যাদির চলাচলে নিরাপত্তা সেই সমস্ত খালপথের গভীরতার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে মানুষ তাহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বলে বৃহৎ জলাধার নির্ম্মাণ পদ্ধতি করায়ত্ত করিলে এবং মধ্য যুগের শেষ ভাগে 'লক্' প্রথার প্রচলন সুরু হইলে ঐ সকল পুরাতন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হইল। 'লক্' প্রথার প্রবর্ত্তনে আজ যে কোনও level এ প্রবাহিত বিভিন্ন জলরাশির মধ্যে যাতায়াতের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ খাল ব্যবস্থার দ্বারা সংযোগ সাধন করা এক অতি সহজ সমস্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই প্রথার প্রধান উপকরণ হিসেবে খাল-পথের জলরাশির ভিন্ন ভিন্ন level বা তলার সংযোগ স্থলে একটি করিয়া জলস্রোত প্রতিরোধকারী শক্তিসম্পন্ন দ্বার-পথ থাকা প্রয়োজন। ইহাদেরই সাহায্যে যানবাহনকে জলের এক তলা হইতে অপর তলাতে অনায়াসে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে—কেমন করিয়া, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, নিম্ন তলা হইতে উপরে উঠাইবার প্রয়োজন হইলে ঐ জলযানকে উঁচু ও নীচু তলার দ্বারপথের অন্তর্বর্তী স্থানে আটক করিয়া উভয় দ্বারই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং অতঃপর উঁচু level-এর জলকে ভিন্ন ভিন্ন পথে ঐ আবদ্ধ অঞ্চলে প্রেরণ করলেই ধীরে ধীরে উক্ত অংশের জলরাশি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই ভাবে উহা নির্দ্দিষ্ট উচ্চতা প্রাপ্ত হইলে

উপর তলার দ্বার-পথ উন্মুক্ত করিয়া সেই পথে জলযানকে নিরাপদে চালনা করা হয়। এই অভিনব প্রথার মূল আবিষ্কারক কাহারা, তাহা অবশ্য এখনও সঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই; তবে ওলন্দাজ এবং ইতালী উভয় দেশই এই লক প্রথাকে সর্ব্বপ্রথম বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থিত করিয়াছে বলিয়া খ্যাতি ও গৌরব দাবী করিয়া থাকে। বর্তমানে ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক অংশেই এই প্রকার কৃত্রিম খালপথ সৃজনের অসীম আগ্রহ ও বিশেষ উৎসাহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে জার্মেণীর কিয়েল খাল এবং ইংলণ্ডের Manchestar ship canal দুইটি খুবই উল্লেখযোগ্য। রুশ দেশ বোধ করি এই প্রকার খাল-পথ ব্যবহারে সমগ্র ইউরোপে আজ অগ্রগামীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। এই বিশাল দেশটিতে যে বহু সহস্র মাইলব্যাপী খাল-পথ বিস্তৃত রহিয়াছে তন্মধ্যে White sea Baltic Canal, Moscow Canal এবং volga-Don Canal সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চমৎকার কারিগরী কৌশল ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভার এক অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি এই Moscow Canal-এর সৌজন্যে স্টেলিনগ্রাড এবং মস্কো নগরীর মধ্যেকার দূরত্ব আশাতীত ভাবে সংক্ষেপ করা সম্ভব হইয়াছে। ভল্‌গা হইতে এই খালটিতে প্রবেশমুখে একটি বিরাট জলাধার রহিয়াছে; এই জলাধারের সাহায্যে খালের অভ্যন্তরে জলের পরিমাণ এবং উচ্চতা সর্ব্বদা একই ভাবে থাকিতে পারে অর্থাৎ এখনও উক্ত খালে জলরাশির ন্যূনতা পরিলক্ষিত হয় না। খাল-পথটির গভীরতাও এই স্থানে আঠারো ফিট এবং উচ্চভাগে দুই শত আশী ফিট ও নিম্ন ভাগে এক শত তেতাল্লিশ ফিট পর্যন্ত প্রশস্ত। ভল্‌গা হইতে দশ মাইল দূরবর্তী অঞ্চলে খালপথে পাঁচটি 'লকে'র ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সকল লকের সাহায্যে ভল্‌গা নদীর জলকে সহজেই ১২৫ ফিট ঊর্দ্ধে উঠাইয়া পুনশ্চ ইহা হইতেও অধিক নিম্নভাগে লইয়া আসিয়া মস্কো নদীর জলরাশির সহিত একত্রে মিলিত করা হয়।

আমেরিকার অধিবাসীরাও অবশ্য এই সকল খাল-পথের প্রকৃত মূল্য নিরূপণে পিছনে পড়িয়া থাকে নাই। এই সম্পর্কে তাহাদের প্রচেষ্টার প্রাথমিক সৃষ্টি বলিতে যে খাল-পথ সমূহের নাম মনে আসিবে তন্মধ্যে Cincinnati এবং Eric, Chesapeake এবং Ohio ইত্যাদি প্রধান। বর্তমানে সর্ব্বসাকুল্যে মোট সাড়ে চার হাজার মাইলব্যাপী খাল-পথ মার্কিণ যুক্তরাজ্যে বিস্তৃত আছে। এতদ্ব্যতীত মার্কিণ সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত পানামা খালও পৃথিবী-বিখ্যাত। ছেচল্লিশ মাইল দীর্ঘ এই খাল-পথটি আতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগর দ্বয়ের মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা সুগম করিয়াছে এবং কারিগরী দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরিচায়ক হিসাবে এই খালপথটিও ভূ-পৃষ্ঠে অন্যতম উজ্জ্বল কীর্ত্তির গৌরব দাবী করিতে পারে, সে বিষয়ে তিল মাত্রও সন্দেহ নাই। আতলান্তিক হইতে জাহাজ সকল 'গেটুন' নামক একটি কৃত্রিম অথচ বিশাল হ্রদ অতিক্রম করিয়া এই খালপথে বিভিন্ন লকের সাহায্যে নানাপ্রকার উঁচু-নীচু জলভাগ পার হইয়া অবশেষে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করিতে পারে। এই পানামা খাল আজ এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার বন্দর সমূহকে নিউইয়র্ক হইতে লিভারপুলের চাইতেও আড়াই হাজার মাইল নিকটতর করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাই ইহা আজ শুধু মার্কিণ রাজ্যেরই নহে, পরন্তু সারা ভূখণ্ডের বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধার অন্যতম প্রয়োজনীয় খালপথ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সুয়েজ খালের সুখ-সুবিধা

	কেপ্ অব গুড্ হোপ পথে	সুয়েজ খাল পথে
	মাইল অনুযায়ী	
লণ্ডন থেকে এডেন	১০৫০০	৪৫০০
" " বোম্বাই	১১২০০	৬৩০০
" " কলকাতা	১১৫০০	৭৫০০
" " হংকং	১৩০০০	৯৫০০
হামবুর্গ " জাঞ্জিবার	৯২৫০	৭০০০
" " সাংহাই	১৩১৫০	৯৫০০
আমষ্টারডাম্ " সিঙ্গাপুর	১১৫০০	৮০০০
মার্সেলিশ " সাইগন	১২০০০	৬৫০০
" " টামাটেভ	৮৫০০	৫০০০
জেনোয়া " ম্যাশুয়া	১০৫০০	৩০০০

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

[সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত A. Berriedale Keith, D. C. L., D. Litt. মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের 'কলা-বিলাস' সম্পর্কে বলেন—"ক্ষেমেন্দ্রের বহুবিধ রচনার উৎকৃষ্টতম হ'ল 'কলা-বিলাস'। এর দশটি ভাগে মানুষের বিভিন্ন পেশা ও নির্ব্বুদ্ধিতার আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের নায়ক হলেন বিখ্যাত মূলদেব। ইনি সর্ব্বরকম চাতুরীর একাধারে প্রতীক বললেই হয়। চন্দ্রগুপ্তের পিতার অনুরোধে তিনি তাকে নিজের পেশায় শিক্ষিত ক'রে তুলতে সম্মত হন। তাঁর কাছ থেকেই আমরা দম্ভ বা প্রতারণার প্রেরণা লাভ করেছি। এই মনোবৃত্তি এখন সাধু, চিকিৎসক, বয়স্য, গায়ক, স্বর্ণকার, ব্যবসায়ী, অভিনেতা এবং অপর সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। এমন কি, পশুজগতের মধ্যেও এই মনোবৃত্তি প্রবেশ করেছে—উদাহরণস্বরূপ অসতর্ক মৎস্যের উপর অনুতপ্তের ছদ্মবেশে সারসপক্ষীর আক্রমণের কথা বলা যেতে পারে। উদ্ভিদ-জগতেও যে প্রতারণা প্রবেশ করেনি তা নয়—বৃক্ষগুলি সাধুদের মত বল্কলের ছদ্মবেশ ধারণ করে। ক্ষেমেন্দ্র যেসব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে একটা অদ্ভুত আধুনিকতা লক্ষ্য করা যায়।"

"* * * ক্ষেমেন্দ্রের লেখা খুবই সহজবোধ্য এবং তার ফলে সমাজ-সংসার ও নীতিবিষয়ক মন্তব্যগুলি সহজবোধ্য হয়েছে। কঠিন সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে তিনি যাই বলুন না কেন, মুহূর্ত্তের জন্যও এরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, প্রেম সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যগুলি অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট; তাঁর লেখার মধ্যে সর্ব্বত্র নৈতিক মান উন্নত করার প্রচেষ্টার পরিচয় আছে।"

সুপণ্ডিত উইন্টারনিট্জ বলছেন,—"Kshemendra is a prolific writer and a verse maker of astonishing fertility. His activity is distinguished by iron determination."

কাশ্মীর দেশে শ্রীমৎ অনন্তরাজের রাজ্যকালে (১০২৮-১০৮০) মহাকবির উদয়। কবির আটাশখানি অধুনা-জ্ঞাত গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটির নাম, 'বৃহৎকথামঞ্জরী', 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা', 'সময়মাতৃকা', 'কবিকণ্ঠাভরণম্' ইত্যাদি।—সম্পাদক]

প্রথম স্বর্গ

উজ্জ্বল নগর।···বিশাল নগর।

কমলার ললিত আলিঙ্গনের যেন মঙ্গলায়তন।

কমলাপতির বিশাল বক্ষঃস্থলটির মতই যেন রত্নোজ্জ্বল। ১

ভবনে ভবনে বিহ্বল···এই নগর।

মুক্তার ঝালরের দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়া পড়ে মণিভূমে; আর মনে হয়, নিজেকে যেন বহুধা বিভক্ত করে দিয়ে, ভবনগুলিকে মাথায় ক'রে ধরে রেখেছেন অনন্তনাগ। ২

গৃহে গৃহে স্ফটিকের মণিদীপে জ্বলে অজস্র আলোক।

আলো নয়, যেন তারা ডাকাত, প্রকাশ্যে লুণ্ঠন করে শ্রীমতী রজনী দেবীর তিমির-গুণ্ঠন, বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায় অভিসারিকাদের। ৩

শ্রীমান্ মনসিজ,—যিনি ত্রিলোচনের নয়ন-বহ্নির স্ফুলিঙ্গে পতঙ্গের মত ডানা পুড়িয়েছিলেন,—এই নগরে পৌঁছেই যেন তিনি ফিরে পেয়েছিলেন তাঁর প্রাণ,···কেবল ইন্দু-মুখীদের মুখ-মাধুরীর অমৃত পান ক'রে। ৪

এখানেও বাতাস বয়,—কিন্তু আঃ হাঃ!—

তারা কেবল বয়ে নিয়ে বেড়ান প্রেমের দোলায় দোলায়িতা ক্রীড়াময়ীদের শ্রমজলের কণিকা, আর—

তাঁদের দেহে কেবল লগ্ন হয়ে থাকে শিথিল কবরীর কুসুম-গন্ধ। ৫

এখানকার কমলবন!

সেখানে কলরব ক'রে ভেসে বেড়ায় কলহংসের সঙ্ঘ, কচি মৃণাল, কচি পাতার প্রীতিভোজে কষায় তাদের কণ্ঠ, মনে হয় যেন নূপুরের শিঞ্জিত শুনছি লক্ষ্মীর চরণে। ৬

এখানকার সমস্ত ধারাগৃহ··পান্নার থান দিয়ে তৈরী; যেন এক একটি মূর্ত্তিমান শ্রাবণ। ধারাজলে নৃত্য করে··মুগ্ধ ময়ূর··নিরন্তর; ঘরের মেঘে মেঘে আঁকা হয়ে যায় ইন্দ্রদেবের ধনু। ৭

আর এখানকার, জ্যোৎস্নার ওড়নার মত, স্ফটিক-মণির প্রাসাদ! প্রাসাদে প্রাসাদে চমক্ লাগিয়ে ঘুরে বেড়ান সুন্দরীরা,··শিশু-হরিণের আঁখির মত তাঁদের আঁখি; তাঁরা যেন অপ্সরা, অমৃতসাগরের মুক্ত তরঙ্গ থেকে, এইমাত্র যেন উঠে এসেছেন। ৮

এই-হেন উজ্জ্বল নগরে, বাস করতেন একটি মহা-ধূর্ত্ত। শ্রী"মূলদেব" তাঁর নাম। ধূর্ত্তদের শত-শত মায়া হার মানত তাঁর কাছে। প্রকাশ্য বা গুপ্ত, যেখানে যতগুলি কলা-ভবন ছিল নগরে, তিনি ছিলেন তার ধুরন্ধর। ৯

দেশদেশান্তর থেকে নগরে আসতেন ধূর্তেরা, এবং মূলদেব তাঁদেরি উপজীবিকা-মূলে নিজে করতেন অর্জন। অত্যন্ত বিভবশালী হয়ে উঠেছিলেন। আত্মগুণে তিনি এত সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন, যেন তিনিই একটি সম্রাট্। ১০

একদা আহারাদি সমাপন ক'রে, সভা উজ্জ্বল ক'রে বসে রয়েছেন শ্রীমূলদেব, সহৃদয়েরাও বসে রয়েছেন সেখানে, এমন সময় সভায় উপস্থিত হলেন জনৈক বণিক্। নাম—হিরণ্যগুপ্ত। স্বর্ণ ও মণি-মাণিক্যের মহামূল্য উপহার সম্মুখে স্থাপন ক'রে, তিনি প্রণাম করলেন শ্রীমূলদেবকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পুত্র চন্দ্রগুপ্তও তাঁকে প্রণাম করলেন। আসন-সংকার লাভ ক'রে মুহূর্ত্ত-বিশ্রান্তির পর হিরণ্যগুপ্ত বললেন—১১-১২

"আপনার সমক্ষে আমাদের মত লোকের মুখের বাণী অতি পরিচয়ের দৌলতে, সপ্রতিভ হয়ে উঠতে পারে বটে, কিন্তু কখনও প্রগল্‌ভ হয়ে উঠতে পারে না ;···গাঁয়ের মেয়েদের যেমন হয় নগরে এলে। ১৩

কী অপূর্ব ছটা আপনার প্রজ্ঞার! বৃহস্পতির ধিষণাকেও আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। সেই প্রজ্ঞা, সূর্যের মত সহজেই দূর করে দেয় 'আশা' দেবীদের মুখান্ধকার। ১৪

জন্মকাল থেকেই আমি অর্জন ক'রে চলেছি। বহু স্বর্ণকোষ, বহু মুক্তা মণি-মাণিক্যের আমি অধিকারী হয়েছি। কিন্তু··· আমার এই পুত্রটি জন্মিয়েছে বৃদ্ধ বয়সে। একমাত্র পুত্র। ১৫

বাল্য···মোহস্থান ;
যৌবন···প্রেমের চিন্তায় উন্মাদ,
বৈভব···বাতাসে-নোওয়া পদ্মপাতায়
···এক ফোঁটা জলের মত চপল
ধূর্তেরা···ভোগ-পদ্মের ভ্রমর ;
মৃগাক্ষীরা···মন হরণ করতেই ব্যস্ত।

এই সমস্ত দোষগুলিই একটি একটি ক'রে আমার পুত্রটিতে অর্শেছে। ১৬-১৭

ধনিকদের গৃহজাতা ধূম্রা কন্যাগুলির হাত থেকে মুক্তি নেই ; বারাঙ্গনাদের শ্রীচরণের নূপুরমণি থেকে মুক্তি নেই ; ধূর্তদের হাতের কন্দুক হওয়ার উৎসব থেকেও মুক্তি নেই। ১৮

যারা দেশ-কাল বোঝে না, মুখে যাদের রাশ নেই, তারা পঙ্গু হলেও লাফাতে চায় ; এবং ধূর্তেরা তাদের মস্তিষ্ক চর্বণ করতে লেগে যান ,মুগ্ধ নবীন পক্ষধরদের যেমন চিবিয়ে খায় মার্জার। ১৯

অতএব, আমার এখন আপনার কাছে এই প্রার্থনা, আমার এই ছেলেটিকে আশ্রিতজনের সন্তান ভেবে, নিজের ছেলের চেয়েও অধিক ক'রে, এমন পরা-বুদ্ধি দান করুন, যাতে এ··নষ্ট হয়ে না যায়। ২০

বিনয়ে মাথা নীচু ক'রে হিরণ্যগুপ্ত এই কথাগুলি বললেন।

দবও তাঁর বাণী ও যুক্তির মর্মার্থ গ্রহণ ক'রে, উপরের ঠোঁটটি কিঞ্চিৎ প্রসারিত ক'রে দিয়ে যেন প্রীতি ছড়িয়ে বললেন— ২১

"তাহলে, আপনার পুত্রটি আমার গৃহেই থাকুক্। নিজের ঘর মনে ক'রেই যেন থাকে। মনোযোগের যেন অভাব না ঘটে। আমি তাকে উপদেশ দেব। ধীরে ধীরে আপনার পুত্রটি জানতে পারবে সকল-কলায় পূর্ণ কলা-বিজ্ঞার হৃদয়।" ২২

নিজের পুত্রটিকে শ্রীমূলদেবের শাসনাধীনে রেখে, এবং তাঁর আদেশমত তাঁর গৃহে নিক্ষেপ ক'রে, বুদ্ধিমান বণিক্ হিরণ্যগুপ্ত প্রণামান্তে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলেন স্ব-মন্দিরে, সানন্দে। ২৩

তারপরে দেখতে দেখতে শিথিল হয়ে এল সূর্যের কিরণ-জাল, ধূসর হয়ে এল তাঁর কান্তি ; তাঁর গায়ের কাপড়—ঐ আকাশখানি—কোথায় যেন হারিয়ে গেল :—ধূর্ত্তদের হাতে যেমন ধীরে ধীরে সর্ব্বস্ব হারিয়ে যায় পাশা-খেলুড়েদের। ২৪

অস্ত গেলেন দিনমণি, এগিয়ে এলেন সন্ধ্যা। তিমির-মূর্ত্তি গন্ধ-গজের পৃষ্ঠে তিনি সমাসীনা,···সিন্দুরে সিন্দুরে আরক্ত তাঁর কান্তি। প্রতিদিন পরিত্যক্তা হয়েও দিননাথের অনুগামিনী হল দিবসের আভা-লক্ষ্মী, কিন্তু, কি আশ্চর্য, রক্তা হয়েও সন্ধ্যাদেবী তা করেন না। কে জানে···রমণীদের হৃদয়! ২৫-২৬

আকাশের কমল-বনে যখন প্রসন্ন প্রস্থান করলেন সন্ধ্যারাগ, তখন ধীরে ধীরে, কোথা হতে জানি না, উদয় হলেন "তিমির"-দল। তাঁরা টলছেন, কোথায় যে পা ফেলবেন যেন বুঝে উঠতে পারছেন না। বিকল হয়ে ঘুরতে লাগলেন···ভ্রমরের মত গুন-গুনিয়ে। সূর্য নেই, তাই যেন মোহাভিভূত হয়ে পড়েছেন তাঁরা। তাঁদের তীব্র মিলনে আর্দ্রা হয়ে উঠলেন মেদিনী। যে জন নিত্য আসে, সেই কি কেবল প্রিয় হয়,···কে জানে সুনিশ্চয়? ২৭-২৮

রজনী দেবী এলেন। মুক্তার চেয়েও শুভ্র তার নক্ষত্রের অঙ্গরাজ, তিমির-বরণ ময়ূরচূড় তাঁর মাথায় , যেন শবর-রমণীর প্রতিমা। ২৯

তার পরে ধীরে ধীরে আকাশে ছড়িয়ে পড়ল নিশাকরের জ্যোৎস্না। এই জ্যোৎস্নাই পুড়িয়ে মারেন পথিক-বধূদের। এই জ্যোৎস্নাই প্রবোধ-দূতী হয়ে আসেন কুমুদফুলের রাজত্বে, বিপত্তির গুরুপত্নী হন চক্রবাকীদের মিলনে। ৩০

গগনে বিরাজ করতে লাগলেন যামিনীনাথ। তিনি যেন :—
শ্রীমন্মথের শ্বেতচ্ছত্র
দিগঙ্গনার স্ফটিক দর্পণ ;
রজনী-রমণীর শুভ্র তিলক।

হাতে তাঁর মৃণালের লতা-বলয়। সেই বলয়টিকে বিলসিত করতে করতে শুভ্র সৌন্দর্যে তিনি যেন নৃত্য করে উঠলেন ; গগন-তটিনীর তটপ্রান্তে যেন নৃত্য করে উঠল একটি রাজহংস। ৩২

চাঁদ শোভা হয়ে দাঁড়ালেন···রজনীর ;
রজনী শোভা হয়ে দাঁড়ালেন···মনোভবের ;
মনোভব শোভা হয়ে দাঁড়ালেন···মধূৎসবের ;

এবং তিনিই আবার হরিণনয়নাদের হয়ে দাঁড়ালেন···মাতাল মনের লীলা। ৩৩

ধূর্ত্ত ভ্রমরের দল···তাঁরা সমৃদ্ধি-সচিব···ম্লানচ্ছায়া পদ্মিনীকে পরিত্যাগ ক'রে সানন্দে প্রবেশ করলেন কুমুদিনীর ফুল্ল মন্দিরে। ৩৪

কাপালিকার মত দেখতে হল নিশাকে ;
তাঁর হাসিতে ঝরল জ্যোৎস্নার ভস্ম ;
গলায় দুলল তারার হাড়-মালা ;
হাতে তাঁর সুললিত শশিকলার
সুকুমার করোটি। ৩৫

তারপরে যখন প্রৌঢ় হলেন চাঁদ, জ্যোৎস্নায় ফুটফুট হয়ে উঠল দিগন্ত, নিজের মণিভবনের উদ্যানে, শ্রীমূলদেব স্ফটিকাসনে ধীরে ধীরে উপবেশন করলেন ;···যেন অভিন্নমিত্র চন্দ্রদেবকে সঙ্গে নিয়ে ততক্ষণে তাঁর সমাধান হয়ে গেছে সমস্ত চিন্তার। পাদপীঠের প্রান্তদেশটিকে ঘিরে বসলেন 'কন্দলি' প্রমুখ শিষ্যবৃন্দ···দোলনচাঁপার যেন বাহার। বণিকপুত্র চন্দ্রগুপ্তও সম্মুখে এসে বসলেন। তাঁর দিকে কিছুক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ ক'রে রইলেন শ্রীমূলদেব। তারপর দশনের কিরণজালে জ্যোৎস্নাকে লজ্জালীন ক'রে বললেন :—

৩৬-৩৭-৩৮।

"পুত্র, শোনো। নিখিল কলার যেটি হৃদয় সার, বঞ্চকদের ক্ষেত্রে সেটি অতি কুটিল। সেটিকে জানলেই তোমার জানা হয়ে যাবে। বিদ্যুতের মত চঞ্চলা ও রূপবতী লক্ষ্মী দেবীরাও কেন ও কিসের জোরে অচলা হন। ৩৯

এই নিরালম্ব সংসার-অরণ্যে একটি "কূপ" রয়েছে, তৃণ-পল্লবের বলয়-জাল দিয়ে বেশ ভালো-ভাবে সেটি গোপন ক'রে ছাওয়া। তারি মধ্যে মুগ্ধ কুরঙ্গেরা লাফাতে লাফাতে গিয়ে টপ টপ ক'রে পড়ে। এই মর্ত্যলোকে সেই কূপটিকেই মূর্তিমান "দম্ভ" বলে জেনো। দম্ভ··· তিনি স্বভাবগম্ভীর, সঞ্চিত গুপ্ত ধনের একটি কুম্ভ ; এঁর মুখটিকে ঢেকে থাকেন কুটিল মায়াসর্পের মত কুহকী লম্পটদের দল। ৪০-৪১

দম্ভ-ই মায়ারহস্যের মন্ত্র, ঈপ্সিতার্থ সমূহের চিন্তামণি। তিনিই এনে দেন, প্রভাব প্রতিপত্তি, তিনিই বশে আনেন জোচ্চোরদের লক্ষ্মীশ্রী-কে। ৪২

দম্ভের গতি···জলের মধ্যে মাছের মত কঠিন তার অবধারণা। দম্ভের দুটি হাত নেই, দুটি পা নেই, মাথা-ও নেই, তিনি দুর্লক্ষ্য। ৪৩ অথচ, তাঁরই সাহায্যে মানুষেরা সাপ ধরে···মন্ত্র বলে, বোকা হরিণগুলোকে ধরে···কূট যন্ত্রর পেতে, আকাশের পাখী ধরে···ডাঙায় জাল টাঙিয়ে।৪৪

অতএব জয় হোক সেই "দম্ভে"র।

'তিনি মায়ার স্তম্ভ,

মনুষ্য-হৃদয়ের বিপ্রলম্ভ,

জগৎ-জয়ের প্রারম্ভ।

তিনি—সদা অপ্রত্যক্ষ,

শঠ প্রজ্ঞার উদয়ারম্ভ।

তিনিই ভিতে রয়েছেন। ৪৫

এই বিপুলতর চক্রিকা-চক্রে, ঘূর্ণীর মত যেটি নিত্য ঘুরছে, এবং যার কুটিল চক্র-শলাকাগুলির স্থান নিয়েছে সংস্র সহস্র দুঃসহ মায়া, তার মূল এবং নাভি হয়েছেন "দম্ভ"। ৪৬

দম্ভকে যদি বৃক্ষের সঙ্গে উপমা দেওয়া যায়, তাহলে মনুষ্য-চক্ষুর কৃষ্ণতারাটিকে নিমীলন করানো এঁর মূল কাজ, এঁকে সুচির সিক্ত করে রাখে রূপমতীদের স্নানার্দ্র কেশের সলিল, এঁর কুসুম-রূপে দেখা দেয় শুচিতার বাতিক এবং এঁর শত শত শাখায় ফল হয়ে দেখা দেয় শত শত সুখ। ৪৭

ব্রতাদি পালনের ঘনঘটা থেকে চেনা যায়···"বকদম্ভ"কে।

নিয়মের,···অর্থাৎ সত্য শৌচ তুষ্টি তপঃ ও উপস্থ নিগ্রহাদির,··· সম্বরণ থেকে চেনা যায়···"কচ্ছপ-দম্ভ"কে।

নিভৃত পদসঞ্চারে চলা, মিটি-মিটি নয়নে এদিক ওদিকে চাওয়া, তা থেকে চেনা যায় "বিড়াল-দম্ভ"-কে। বিড়াল-দম্ভ সাংঘাতিক। ৪৮

যিনি বকদাম্ভিক তিনি দাম্ভিকদের প্রভু, যিনি কচ্ছপদাম্ভিক তিনি দম্ভ-রাজ, আর যিনি বিড়াল-দাম্ভিক তিনি দম্ভ-সম্রাট্। ৪৯

"দাম্ভিকে"র লক্ষণ বলি শোনো :—

ছোট্ট নখ, ছোট্ট দাড়ি, ছাঁটা চুল, অথবা মাথায় একটি ছোট্ট মুকুট, অথবা একমাথা জটা, অথবা এক মুখ মানসমনোহর শ্মশ্রু,··· এমন মানুষ দাম্ভিক।

অনেক ঘাটের মৃত্তিকা মেখে পিশাচের মত চেহারা ক'রে বসে আছেন, বা কথা কইছেন মাপা-জোপা, অথবা পাদত্র (জুতা)-টিকে পায়ে গলিয়েছেন কোনোমতে, বা সযতনে,···এমন মানুষ দাম্ভিক। ৫০

বড় বড় গ্রন্থি, অঙ্গুষ্ঠে কুশাঙ্গুরীয়, পিঠের উপর লতিয়ে পড়ে রয়েছে সোনার হার, চাদরের খুঁট্-টি কোমরে গোঁজা, যেন হাতখানি তুলতেই তিনি পারছেন না···এমন চেহারার মানুষ দাম্ভিক ; দেখলেই মনে হবে তিনি যেন বণিকদের মূলধনটিকে হাতের মুঠোয় মধ্যে টিপে রেখেছেন। ৫১

নগরের রাজপথে দাঁড়িয়ে, যিনি প্রকাশ্যে আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এটাও-হয় ওটাও-হয় ইত্যাদি রায় দিয়ে দিয়ে, নানান্ প্রকার বিবাদ স্থলে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন, ওষ্ঠে কাঁপতে থাকে জপমন্ত্রের ভাষা, যেন কত না চিন্তায় তিনি বিভোর,···তিনি দাম্ভিক। ৫২

তীর্থে গিয়ে, ডুব দিচ্ছেনই তো দিচ্ছেন, আচমন করছেনই তো করছেন, অভিনয় ক'রে চুড়োটিকে পাকিয়ে পাকিয়ে বাঁধছেনই তো বাঁধছেন, হটিয়ে দিচ্ছেন অন্য যাত্রীদের সমাগম, বারম্বার কর্ণকোষদুটিকে মলছেন তো মলছেনই···এবং মনুষ্য দাম্ভিক। ৫৩

হেমন্তকালে তীর্থ-স্নান দুঃসহ, অথচ-তিনি পুণ্যস্নান করছেন। এতবড় আত্মনিষ্ঠাটিকে প্রচার করবার জন্যে সে কী তাঁর সির-সিরে দন্ত-নিনাদের ঘটা! সবাই তো শুনতে পাচ্ছে। ততঃপর দীর্ঘকাল ধরে তিলক-চর্চা! সবাই তো দেখতে পাচ্ছে, সর্বোপচারে শুদ্ধ হয়ে কেমন ক'রে তিনি দেবার্চ্চনা করতে চলেছেন। ইনি দাম্ভিক।

মাথায় একটি ফুল ঝুলিয়ে যিনি চলেন, অথচ নয়নে ঘোরে কাকের মত কুদৃষ্টি,···তিনিও দাম্ভিক। ৫৪

জেনে রেখো, দাম্ভিক মাত্রেই বড় ধূর্ত্ত। গুণহীনের কাছে তিনি প্রণাম সংগ্রহ করেন, গুণবানের সম্মুখে তিনি স্তব্ধ। তিনি স্ববন্ধু-বিদ্বেষী, পরজন-করুণাবন্ধু কীর্ত্তির তিনি ভিখারী। ৫৫

জেনে রেখো দাম্ভিক মাত্রেই বড় ক্রূর। কাজ আদায়ের বেলায় মাথাটি নীচু করে থাকেন ; হাজারো প্রশংসা মুখে ; এবং কাজটি সিদ্ধ হয়ে গেলেই তিনি মৌনী, ভ্রূকুটি খেলতে থাকে ললাটে। ৫৬।

পূর্বাকালে "জম্ভ"-নামে এক দৈত্য ছিলেন। তিনি স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন দেবতাদের সমৃদ্ধি। তিনিই অধুনা ধরাতলে জীবমাত্রের অঙ্গে অঙ্গে "দম্ভ" নাম নিয়ে নিবাস করেন। শুচি-দাম্ভিক রয়েছেন ;

আরম্ভ করেন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণেরও বাণিজ্য প্রেরণা তিনিই যুগিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটারির বাণিজ্যিক সাফল্যে তাঁর সহকর্মী বন্ধুরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। সবচেয়ে লক্ষণীয়, এই সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্র লিখেছেন : (১২)

> যে সময়ে পিতৃদেব অর্থোপার্জনের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় বিদ্যাসাগর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। তিনি পিতৃদেবকেও ঐ যন্ত্রের একজন অংশী করিয়া লইলেন। কিন্তু তিন জনের মধ্যে কাহারও সঞ্চিত অর্থ ছিল না, সুতরাং ঋণ করিয়া উক্ত যন্ত্র ক্রয় করিতে হইল; এবং তিনজনেই নূতন নূতন পুস্তক প্রণয়ন বা প্রকাশ করিয়া ঐ মুদ্রাযন্ত্রের কার্য চালাইতে লাগিলেন···
>
> কিছুদিন পরে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় মুরশিদাবাদের জজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কাজেই মুদ্রাযন্ত্র চালাইবার ভার উভয়ের উপর ন্যস্ত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালে সংস্কৃত কলেজের প্রিনসিপাল ছিলেন; সুতরাং তাঁহার হস্তে অনেক কার্যভার ছিল; তিনি কেবল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দিতেন; পিতৃদেব ঐগুলি মুদ্রিত করা, প্রুফ শোধন করা প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন করিতেন। প্রুফশোধন বিষয়ে পিতৃদেবের ঈদৃশী শক্তি ছিল যে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে কোনপ্রকার ভ্রমপ্রমাদই এড়াইয়া যাইত না।···
>
> কালক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত গ্রন্থই অধিক সংখ্যক হইয়া উঠিতে লাগিল; মদনমোহন তর্কালঙ্কারের গ্রন্থ তদপেক্ষা অনেক কম হইল; পিতৃদেবের প্রকাশিত গ্রন্থ ত অতীব অল্প ছিল। পিতৃদেব যৎপরোনাস্তি শারীরিক পরিশ্রম করিয়া মুদ্রাযন্ত্র চালাইতেন বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকেও সমান অংশ দিতেন। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা পিতৃদেবের ন্যায়সঙ্গত বোধ হইল না। তিনি একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন, 'আপনার রচিত গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আমাদের গ্রহণ করা উচিত হয় না; মদনেরও এইরূপ মত হইবে; আপনি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানুন।' বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে ঐ কথায় কর্ণপাত করেন নাই। পরে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে পত্র লিখিয়া যখন তাঁহারও ঐরূপ মত জানিলেন, তখন অগত্যা পিতৃদেবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় ও পিতৃদেব উভয়ে সংস্কৃত যন্ত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই দিলেন এবং তৎকালে তাঁহাদের যাহা কিছু লভ্যাংশ প্রাপ্য হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করিলেন।

এর পর গিরিশচন্দ্র নিজের নামে একটি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করে সা আরম্ভ করেন। তাঁর পুত্র হরিশচন্দ্র পিতার চরিতকথায় এই রিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন-যন্ত্র' স্থাপনের কাহিনীও বর্ণনা করেছেন। কাহিনী বাস্তবিকই রোমান্টিক। তখন গিরিশচন্দ্র গড়পার অঞ্চলে বাস করতেন। সেখানে লালচাঁদ বিশ্বাস নামে এক মুদ্রণব্যবসায়ী তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন। বার্ধক্যের জন্য তিনি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে তখন বাড়িতে বসেই থাকতেন। গিরিশচন্দ্র তাঁকে ছাপাখানা করার পরামর্শ দেন এবং উভয়ে একটি ছাপাখানা করেন, 'সুচারুযন্ত্র' নামে। অল্পকালের মধ্যে লালচাঁদের মৃত্যু হয়। প্রেস বিক্রী করে গিরিশচন্দ্র নিজ অংশ ৮০০৲ টাকা পান এবং তাই দিয়ে এণ্টালি অঞ্চলের একটি মুসলমানের প্রেস নিজে কেনেন। সেই প্রেসে "বাঙ্গালা পাইকা অক্ষরের প্রায় ৪০০ ছেনি ও তাঁবা, দেবনাগর পাইকা অক্ষরের প্রায় ৪০০ ছেনি ও তাঁবা, এবং পার্শী পাইকা ও স্মল-পাইকা অক্ষরের প্রায় ১০০ ছেনি ও তাঁবা ছিল।" ছেনি ও তাঁবা মূল্যবান, তখন টাকায় দু'খানা ক'রে বিক্রী হত। বিক্রী করলে গিরিশচন্দ্র ছেনি ও তাঁবা থেকে প্রায় এক হাজার টাকা পেতেন। "কিন্তু তাহা না করিয়া স্থির করিলেন যে পার্শী অক্ষর ও তাহার ছেনি ও তাঁবাগুলি কোন মুসলমান মুদ্রাকরকে বিক্রয় করিবেন; এবং বাঙ্গালা ও দেবনাগর ছেনি ও তাঁবা দ্বারা অক্ষর ঢালাইবার কারবার খুলিবেন; আর বাঙ্গালা, দেবনাগর ও ইংরাজি অক্ষর দ্বারা ছাপাখানার কার্য চালাইবেন।"

বিদ্যাসাগর সব করেছিলেন, কেবল টাইপ ফাউণ্ডি বা অক্ষর ঢালাইয়ের কোন কারবার করেন নি। ছাপা ও অক্ষর ঢালাইয়ের কাজে মুসলমানরাই তখন অগ্রণী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের মন্ত্রশিষ্য গিরিশচন্দ্র তাতেও পশ্চাৎপদ হননি। গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুদ্রণ বাণিজ্যে তিনি গুরুকে ছাড়িয়েও এগিয়ে গিয়েছিলেন। টুলো পণ্ডিতবংশের একজন সন্তানের পক্ষে, সব বাণিজ্য ছেড়ে, মুদ্রণ-বাণিজ্যের পথে এই দুঃসাহসিক অভিযান বিস্ময়কর মনে হয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও কলকাতা থেকে দক্ষিণে চাংড়িপোতা গ্রামে 'সোমপ্রকাশ' প্রেস ও পত্রিকা স্থানান্তরিত ক'রে নিয়ে গিয়ে যে স্বাধীন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তারও প্রেরণা যুগিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

ইয়োরোপের যাজকশ্রেণী ও ফিউডাল অভিজাতশ্রেণীর একটা বড় অংশ দীর্ঘকাল ধ'রে মুদ্রণযন্ত্রের ও মুদ্রিত বইয়ের বিরোধিতা করেছিলেন। প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করে, লিপিকরদের দিয়ে পুঁথি নকল করিয়ে তাঁরা স্বল্পমূল্যে সেগুলি বিক্রী করে, মুদ্রিত বইয়ের প্রচার বন্ধ করার চেষ্টা করতেও কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু সে অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়নি তাঁদের দ্বারা। জ্ঞানবিদ্যার ভাণ্ডার তাঁরা পুঁথির মধ্যে বন্দী করে রাখতে পারেন নি। মুদ্রণযন্ত্র তাঁদের বিদ্যার 'মনোপলি' ধ্বংস করে সাধারণের সামনে জ্ঞানের প্রদীপ তুলে ধরেছে। বাংলাদেশের জমিদার ও পণ্ডিতদের মধ্যে একটা বড় অংশ মুদ্রণের প্রসার কামনা করতেন না। পণ্ডিত-পুরোহিতদের কুক্ষিগত শাস্ত্রবিদ্যা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়ে জনসমাজে প্রচারিত হলে, তাঁদের বংশগত শাস্ত্রবিদ্যার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে, এই ছিল তাঁদের ভয়। নবযুগের বিদ্যার বণিকদের, মুদ্রক প্রকাশক ও লেখকদের তাই তাঁরা সুনজরে দেখতেন না। মুদ্রণের ঐতিহাসিক শক্তির তাৎপর্য বুঝেই বিদ্যাসাগর অন্য কোন স্বাধীন বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হননি। কারণ আর্থিক আত্মনির্ভরতাই বা প্রতিষ্ঠাই, তাঁর

(১২) গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনচরিত; ৩৬-৩৮ পৃষ্ঠা।

ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল, জীবনের স্বাধীন বৃত্তিকে জীবনের ব্রতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তোলা। শিক্ষা ও সমাজসংস্কার যাঁর জীবনের ব্রত, স্বাধীন মুদ্রক প্রকাশক ও গ্রন্থকারের বৃত্তিই তার শ্রেষ্ঠ উপযোগী বৃত্তি। ব্রতের সঙ্গে বৃত্তির বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে না এক্ষেত্রে। মুদ্রক ও লেখক যিনি, তিনি স্বাধীনভাবেও সারাজীবন শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। চাকুরিজীবনের উত্থান-পতনের মধ্যে বিদ্যাসাগরের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়েছিল তাঁর বিশেষ নির্বাচিত বৃত্তির জন্য।

সহকারী সম্পাদকের কাজ ছাড়বার পর, প্রেসের কাজকর্মে ও গ্রন্থরচনায় তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন। বছর দুয়েকের মধ্যে তাঁর ব্যবসায়ের উন্নতিও হয়েছিল যথেষ্ট। ১৮৪৯ সালের মার্চ মাসে তিনি পাঁচ হাজার টাকা জামিন দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোষাধ্যক্ষের চাকরি পান। ১৮৫০ সালের শেষদিকে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুরশিদাবাদের জজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হয়ে চলে যান। ডক্টর ময়েট সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন। তার অল্প দিন পরেই সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ তুলে দিয়ে কলেজের অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা হয় এবং বিদ্যাসাগর সেই পদে নিযুক্ত হন।

রসময় দত্তের সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় তিনি 'চাকরি কখনও করব না' এরকম কোন প্রতিজ্ঞা করে পদত্যাগ করেন নি। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্রব ত্যাগ করে দেশের কল্যাণের জন্য কোন কাজ করা যে সম্ভব হবে না, তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। কিন্তু তার জন্য আত্মমর্য্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তাই যখনই অবসর পেয়েছেন, তখনই তিনি স্বাধীন ভাবে ছাপাখানা ও গ্রন্থরচনার কাজে মনোনিবেশ করেছেন। মুদ্রক ও লেখকের পেশাই তাঁর এই স্বাধীন মনোবৃত্তির শক্তি যুগিয়েছে। বিদ্যার বাণিজ্যে তিনি ইতিমধ্যে বেশ প্রতিষ্ঠাও অর্জন করেছেন। নবযুগের প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতিয়ার মুদ্রণযন্ত্র ও লেখনী তাঁর আয়ত্তে। তিনি সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটারির মালিক, এবং স্বাধীন লেখক। কোন চাকুরিতেই আর তাঁর কোন ভয় নেই। বিদ্যায়তনে থেকেও তিনি নির্ভয়ে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ব্রত গ্রহণ করতে পারেন। চাকুরি কোন দিন তাঁকে পরাধীন করতে পারবে না। তাঁর স্বাধীন চিন্তার পথে কোন অন্তরায়কেই আর মাথা হেঁট করে স্বীকার করতে হবে না।

[ক্রমশঃ।

শি—ল কু—টা—বে

সৈয়দ হোসেন হালিম

যখন-ই দুপুর-রোদে পীচ-গলা দারুণ উত্তাপ,
সমস্ত জটলা বাঁধা ঘরে-ঘরে ভেজানো দুয়ারে,
যখন-ই বকুল-শাখে-বসা শুধু একজোড়া কাক
কালের অচল ঘণ্টা বার-বার নড়িয়ে-বাজিয়ে
সময় ঘোষণা করে আর শুধু পাক্ মারে চিল,
তখন-ই পাতলে কান, ওর ঠিক ডাক শোনা যাবে—
ক্লান্ত স্বর—টেনে-টেনে : শি—ল কু—টা—বে—

আশ্চর্য্য ওই যে লোক—
পোড়ানো কাঠের মতো যার কালো নিকষ শরীরে
সময় শঙ্খচূড় প্রতিদিন কালকূট করেছে উদ্গার ;
একটু প্রাচুর্য্য চেয়ে যার দুই চোয়ালের হাড়
বেকার ছেলের মতো বার-বার করেছে বিদ্রোহ,
কি আশ্চর্য্য, তার কণ্ঠে প্রতিদিন ঠিক-ই শোনা যাবে—
কান্ত স্বর—টেনে-টেনে : শি—ল কু—টা—বে—

[illegible] আসে,
ঝ[illegible]য়ে দেয়, তাই চলে প্রাত্যহিক জীবনের কাজ ;
জীবন কিংশুক হয়—ফুলে-ফুলে মায়াবী আশ্বিন ;
একটি হাতুড়ি আর একটি ছেনিতে ও কি ভীষণ দারুণ চেষ্টায়
পাথরে নক্সা কাটে, অথচ জীবন ওর কি ভীষণ বৈচিত্র্যহীন—
নিটোল মসৃণ !

কতো রাষ্ট্র, জনপদ, শহর, বন্দর
উত্থান-পতনে ক্লান্ত, ইতিহাস রাখবে স্বাক্ষর ;
কতো গান রেকর্ড হবে, কত ফুল হবে সে আতর,
তবু জানি এর কথা কেউ জানবে না !
কলুর বলদ হ'য়ে দিনে-দিনে শোধ করি জীবনের দেনা
ক্লান্ত পদ, জীর্ণ মন ও তো চ'লে যাবে,
শুধু তার শূন্য স্থানে তারি মতো আর কণ্ঠ ডাক দিয়ে যাবে-
ক্লান্ত—স্বর—টেনে-টেনে : শি—ল কু—টা—বে—

তারপর তার-ও কণ্ঠ মধ্যাহ্নের কাকের মতন
কালের অচল ঘণ্টা নেড়ে-নেড়ে চলবে কখন !

মধ্যে বাণিজ্যবৃত্তি প্রবল ছিল বটে, কিন্তু তাঁরা পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য ছেড়ে কেউ বিদ্যাজাত পণ্যের ব্যবসা করেন নি। বিদ্যাসাগর তাঁর স্বধর্মীদের মধ্যে এই বাণিজ্যের প্রথম উদযোগী বণিক। গঙ্গাকিশোরের অনুগামী হয়েই তিনি প্রথম তাঁর ছাপাখানা থেকে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ছেপে প্রকাশ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্ম মার্শাল সাহেব বইকেনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু কেবল সেই উৎসাহের বশবর্তী হয়ে তিনি অন্নদামঙ্গল ছেপেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর আগে কেবল গঙ্গাকিশোর নন, আরও অনেকে অন্নদামঙ্গল ছেপেছিলেন। ভারতচন্দ্র তখন বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। ছাপাখানার প্রবর্তনের জন্যই এই জনপ্রিয়তা অর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। পুথির যুগের রাজসভার গণ্ডী থেকে তিনি বাইরের জনসমাজের বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা ও তাঁর মোসাহেবরা ছাড়া তাঁর অনুরাগী পাঠকগোষ্ঠী গ'ড়ে উঠেছিল বাইরে। তাঁর কবিতার ও গানের চাহিদা ছিল, বিশেষ করে অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যানের। প্রথম পর্বের বাংলা পুস্তক প্রকাশক-ব্যবসায়ীরা তাই সকলেই প্রায় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য ছেপেছিলেন। বটতলার প্রকাশকরাও 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যাংশের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং মার্শাল সাহেবের প্রতিশ্রুতি ছাড়াও 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশের পক্ষে অন্য বাণিজ্যিক যুক্তিও ছিল। বিদ্যাসাগরের কাছে সে-যুক্তির আবেদনও কম ছিল না।

তা ছাড়া, 'অন্নদামঙ্গল' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সিবিলিয়ান ছাত্রদের পড়ানো হত এবং বিদ্যাসাগর যখন কলেজের পণ্ডিত ছিলেন তখন তিনিই পড়াতেন। বিদ্যাসুন্দর অংশ পড়াতে তিনি রীতিমত সঙ্কোচবোধ করতেন। এ-সম্বন্ধে আচার্য কৃষ্ণকমল লিখেছেন। (৭)

> বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিলিয়ান-দিগকে বাঙ্গালা পড়াইতেন, তখন তাঁহাকে 'বিদ্যাসুন্দর' পড়াইতে হইত। 'বিদ্যাসুন্দরের' খেউড় অংশ পড়াইবার সময় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিতভাব প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু এক এক জন য়ুরোপীয় তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন, 'কেন তুমি কাতুমাতু করিতেছ? আমাদের ভাষাতে কি সেক্সপীয়রের **Venus and Adonis, Rape of Lucrece**, এবং পোপের **January and May**; এই সকল বহি নাই? আর আমরা কি ঐ সকল বহি আদবে পড়ি না; শিকায় তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছি? অতএব ইহাতে আর লজ্জার বিষয় কি?' এই কথা আমি বিদ্যাসাগরের মুখে শুনিয়াছি।

ছাত্রদের পড়াবার জন্যই যে ভারতচন্দ্রের কাব্য পড়তেন বিদ্যাসাগর, তা নয়। তাঁর রুচিবোধ প্রখর থাকলেও, রুচিবায় ছিল না। সাহিত্যবোধ ও রসবোধ ছিল গভীর। বিদ্যাসুন্দরের খেউড় অংশ ছাত্রদের পড়াতে সঙ্কোচ হলেও, ভারতচন্দ্র তাঁর বিশেষ প্রিয় কবি ছিলেন। ভারতচন্দ্রের কবিতা তিনি প্রায়ই আবৃত্তি করে শোনাতেন। কৃষ্ণকমল বলেছেন: (৮)

> বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা অতিশয় পছন্দ করিতেন। আমার বোধ হয়, যখন রসময় দত্তের সহিত অকৌশল হওয়াতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরির পদ পরিত্যাগপূর্বক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত একযোগে ছাপাখানার ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থই তাঁহার ছাপাখানায় সর্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। আমি তাঁহাকে কোনও কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গলের' কবিতা গদগদভাবে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতেছে, একদিন তিনি 'হেথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া' ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—'দেখ দেখি, কেমন পরিষ্কার ঝরঝরে ভাষা!'

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' পুঁথি সংগ্রহের জন্য বিদ্যাসাগর নিজে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ী যান। সেই সূত্রে রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

> নবদ্বীপ রাজবংশের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। সতীশচন্দ্রের পিতা মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বাহাদুরের সঙ্গে ভারতচন্দ্র প্রণীত গ্রন্থসংগ্রহ এবং কৃষ্ণনগর-স্কুলের পরিদর্শন সূত্রে এই সংস্রবের সূত্রপাত হয়। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণগ্রামে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সুদৃঢ় সখ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।...বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রত্ন-সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, পুলকপ্রীতিভরে সেই বেশভূষাহীন দরিদ্র-বেশধারী ব্রাহ্মণকে প্রেমালিঙ্গন দিতে কিঞ্চিৎমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না।

কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এই বন্ধুত্ব পরবর্তী কালে আরও দৃঢ় হয়। কারণ, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে পরে যাঁরা তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণনগরের রাজারা অন্যতম। কেবল রাজবংশের সঙ্গে নয়, তাঁদের দেওয়ান-বংশের সঙ্গেও বিদ্যাসাগরের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, তাঁর সমবয়সী ও বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন। কোনদিক থেকেই কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের সহযোগিতালাভে তাঁর বাধা ছিল না।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রকাশ করবার পর, বিদ্যাসাগর আরও অনেক পুথি-পাণ্ডুলিপি সম্পাদন করে প্রকাশ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য কোন মুদ্রিত সংস্করণ তখন পাওয়া যেত না। অর্ধশিক্ষিত প্রকাশকরা সেগুলি কিছু-কিছু বিকৃত আকারে প্রকাশ করতেন মুনাফার লোভে। বিদ্যার দুর্ভেদ্য গর্ভগৃহ থেকে পুথিবন্দী সাহিত্য দর্শন ইত্যাদির জ্ঞানভাণ্ডার মুদ্রিত গ্রন্থাকারে তিনি জনসমাজে প্রকাশ করে দেন। বিদ্যাসাগরের এই কীর্তি ইয়োরোপের রিনেইস্যান্স যুগের উদ্‌যোগী প্রিণ্টার-প্রকাশকদের সঙ্গে তুলনীয়।

বই ছেপে প্রকাশ করতে পারলে তখন নিশ্চিন্ত হওয়া যেত না।

(৭) পুরাতন প্রসঙ্গ: ১৩৬-১৩৭ পৃষ্ঠা।

(৮) পুরাতন প্রসঙ্গ: ১৩৫ পৃষ্ঠা।

বাণিজ্যক্ষেত্রে তখন মুদ্রক (Printer), প্রকাশক (Publisher) ও পুস্তকবিক্রেতার (Book-seller) স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুদ্রিত গ্রন্থের বিক্রেতারাও তখন দোকান খুলে ব্যবসা করার প্রয়োজন বোধ করতেন না। বিদেশী বই কলকাতা শহরে আমদানি হত, এদেশী ছাপা বইয়েরও কিছু চাহিদা বাড়ছিল পাঠক মহলে। কিন্তু তার জন্য স্বতন্ত্র বইয়ের দোকানের প্রচলন তখনও হয়নি। বটতলার প্রকাশকরা ক্যানভাসার নিয়োগ করে গ্রাম্য মেলায় ও লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বই বিক্রির ব্যবস্থা করতেন। যাঁরা তা করতেন না, তাঁরা ছাপাখানা বা পরিচিত কোন গৃহের ঠিকানা প্রকাশ করে বিজ্ঞাপন দিতেন পত্রিকায় এবং ক্রেতাদের সেখান থেকে বই কিনে নেবার জন্য অনুরোধ করতেন। অল্পসংখ্যক বইয়ের দোকান যা গ'ড়ে উঠেছিল, তা বটতলা ও চীনাবাজার অঞ্চলে, হিন্দুকলেজ সংস্কৃত কলেজের আশে-পাশে (কলেজ ষ্ট্রীট অঞ্চলে) নয়। চীনাবাজারই ছিল বড় বইয়ের কেন্দ্র। (১)

> **Bookshops have attractions all their own, even in the China Bazar—The stock of books in some of these native shops is heavy and the authors are commonly of the first rank in literature and popular science; Shakespeare, Addison, Burns, Chalmers, Scott, Marryatt, indeed almost every author of note with general readers, has a place on the shelves of the bazaar bookseller. If the visitor wishes to have a non-Scientific work recently published in London and already popular, he is certain of obtaining it in the New or Old China Bazaar.**

বাঙালী ব্যবসায়ী যাঁরা বইয়ের দোকান করতেন, বাণিজ্যই তাঁদের প্রধান পেশা ছিল। বিদ্যাসাগরের পেশা ভিন্ন হলেও, বইয়ের দোকান করেছিলেন তিনি, বই প্রকাশ করে বিক্রেতাদের বিক্রি করতে দেন নি। বইয়ের দোকানের নাম ছিল 'সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী'। কেবল নিজের প্রকাশিত বই দোকান থেকে বিক্রি করতেন না, অন্যের প্রকাশিত বইও এজেন্সী নিয়ে বিক্রী করতেন। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ অঞ্চলে কলকাতা শহরের প্রধান বিদ্যাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এই বিদ্যাকেন্দ্রের অনতিদূরেই তিনি এই বইয়ের দোকান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন এ-অঞ্চল গ্রন্থকেন্দ্ররূপে গ'ড়ে ওঠেনি। বিদ্যাসাগরই বোধ হয় প্রথম এই অঞ্চলে বইয়ের দোকান করেন এবং তার পর থেকে ধীরে ধীরে এক শতাব্দী ধ'রে, কলকাতার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র প্রধান গ্রন্থকেন্দ্র হয়ে ওঠে।

বিদ্যাসাগর বিলাসী গ্রন্থব্যবসায়ী ছিলেন না। মুদ্রণ ও প্রকাশনের বাণিজ্যে তিনি সখ বা খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য অবতীর্ণ হননি। শিক্ষা তাঁর জীবনের প্রধান পেশা হলেও, এব্যবসাকে তিনি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন না। মুদ্রণ ও প্রকাশনের ব্যাপারে তিনি যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তা তখনকার দিনে খুব কম ব্যবসায়ীরই ছিল। বিহারীলাল লিখেছেন : (১০)

> ··ছাপাখানার কার্য-সৌকর্যার্থ তিনি যে কি পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং কি উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, পাঠক, তাহা অবগত আছেন কি? ছাপাখানায় ইংরেজী বর্ণাক্ষরে ১০।১২টি ঘর; বাঙ্গালায় ৫০০ ঘর। 'র' ফলা, 'ঋ' ফলা, 'য' ফলা, এমন কত আছে। এই সব অক্ষর-যোজনা সামান্য কষ্টকর নহে। কোথায় কোন অক্ষরটি থাকিলে অক্ষর-যোজকের যোজনাপক্ষে সুবিধা হইবে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া তাহা নির্ধারিত করেন। ইহার পূর্বে অক্ষর-যোজনার এমন সুবিধা ছিল না। তিনি অক্ষরসংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অনেক স্থলেই তাহা অনুকূল হইয়া থাকে। তাহার নাম 'বিদ্যাসাগর সার্ট'।

মুদ্রণের টেকনিক্যাল ব্যাপারেও বিদ্যাসাগরের কতখানি আগ্রহ ছিল, তা তাঁর এই অক্ষরবিন্যাসের প্রচেষ্টা থেকে বোঝা যায়। 'টাইপ-কেসে' বাংলা মুদ্রণাক্ষরের বৈজ্ঞানিক বিন্যাসের জন্য বহু মুদ্রক দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করেছেন। অনেক ভুল ভ্রান্তি ও পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তার ক্রমোন্নতি হয়েছে। যাঁরা মুদ্রণের উন্নতির জন্য এই ভাবে চিন্তা ও চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর অন্যতম। বাঙালী বিদ্বৎশ্রেণীর মধ্যে তিনিই বোধ হয় একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর সজাগ দৃষ্টি বাংলাভাষার মুদ্রণসমস্যার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। শৌখিন মুদ্রণ-ব্যবসায়ী, গ্রন্থকার বা প্রকাশক হলে, মুদ্রণের প্রতি তাঁর এতখানি ব্যক্তিগত অনুরাগ প্রকাশ পেত না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন : (১১)

> বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব পরিশ্রম করিতে পারিতেন, তাঁহার অনেকগুলি বই ছিল। তিনি সব বইয়ের প্রুফ নিজে দেখিতেন এবং সর্বদাই উহার বাংলা পরিবর্তন করিতেন। দেখিতাম প্রত্যেক পরিবর্তনেই মানে খুলিয়াছে। তিনি প্রেসের কাজ বেশ জানিতেন—বুঝিতেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি সংস্কৃত প্রেসের মালিক ছিলেন। তখন সংস্কৃত প্রেসই বাংলার ভাল প্রেস ছিল। তিনি সংসারের কাজ খুব বুঝিতেন; প্রেস হইল, বই ছাপা হইল, বিক্রয় করিবে কে? তাহার জন্য সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি (১৮৪৭) নাম দিয়া এক বইয়ের দোকান খুলিলেন। উহা একরকম বইয়ের আড়ত। বই লিখিয়া ছাপাইয়া লোকে ওখানে রাখিয়া দিবে। বিক্রয় হইলে কিছু আড়তদারী বা কমিশন লইয়া গ্রন্থকারকে সমস্ত টাকা দিয়া দিবেন।

মুদ্রক প্রকাশক গ্রন্থকার ও গ্রন্থবিক্রেতার কাজ বিদ্যাসাগর কি ভাবে একাই করতেন, প্রত্যক্ষদ্রষ্টারা তার পরিচয় দিয়ে গেছেন। একাজে তিনি তাঁর সহযোগী বন্ধুবান্ধবদেরও উৎসাহিত করেছেন। প্রথম থেকেই পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর অংশীদার ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর অনুজতুল্য বন্ধু পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর প্রেসেই কাজকর্ম শিখে, পরে স্বাধীনভাবে মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ব্যবসা

---

(৯) বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, ৪৩৪ পৃষ্ঠা।

(১০) Sketches of Calcutta etc : By A Griffin (Glasgow 1843), P P.98-109

(১১) বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ : ভূমিকা।

বলে তাঁর প্রতিভা সম্যক স্বীকৃতি পায়নি। স্বীকৃতির চেয়েও বড় কথা হল, তর্কালঙ্কারের চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সম্ভব হয়নি, পারিবারিক পরিবেশের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে। মদনমোহনের জীবনের সবচেয়ে বড় 'ট্র্যাজিডি' এইখানে। তা না হলে, চরিত্র ও প্রতিভার দিক থেকে, কোন ক্ষেত্রেই তাঁর সতীর্থ বন্ধু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। বাংলার দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর হবার মতন খনিজ সম্পদ একমাত্র পণ্ডিত মদনমোহনের চরিত্রেই ছিল। কিন্তু পারিবারিক জীবনের বদ্ধ চোরাগলিতে তাঁর চারিত্রিক ঐশ্বর্য চূর্ণরশ্মির মতন চারিত হয়ে গেছে, অগ্নিশিখার মতন বহির্জীবনে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠেনি। একবৃন্তের দুই ফুলের মধ্যে একটি অনাঘ্রাত অবস্থায় ঝ'রে পড়েছে মাটিতে।

দুই বন্ধু মিলে ছাপাখানা ও বইয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন, পত্রিকা প্রকাশে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে, সামাজিক কুসংস্কার নির্মূল করার সঙ্কল্প নিয়ে, দুই বন্ধু নির্ভয়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন। শক্তি দুজনেরই সমান ছিল। চিত্তের বলিষ্ঠতায় ও প্রসারতায় কেউ কারও চেয়ে বড় বা ছোট ছিলেন না। কিন্তু মধ্যবিত্ত জীবনের অভিশাপ অবশেষে দৈত্যের মতন দুজনের মধ্যে অবতীর্ণ হয়ে, উভয়েরই জীবনে গভীর মনোবেদনার কারণ হয়েছে। বন্ধুবিচ্ছেদ হয়েছে, ছাপাখানা ও বইয়ের স্বত্ব নিয়ে। বন্ধুদের জন্য যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি আত্মীয়স্বজনের স্বার্থান্ধতা ও দীনতার জন্য। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ প্রসঙ্গে সে-বিষয় পরে আলোচ্য।

বিদ্যাসাগরের জীবনে মদনমোহনের বন্ধুত্বের বন্ধনটাই বড় কথা, বিচ্ছেদটা নয়। পরবর্তীকালের বিচ্ছেদটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। স্বাভাবিক ঘটনাস্রোতের মধ্যে দুর্ঘটনার পিচ্ছিল পতন নিশ্চয় সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়। বিদ্যাসাগরের জীবনে তাই এই আকস্মিক বেদনার স্থান সামান্য।

বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন যখন ছাপাখানা ও বইয়ের দোকান স্থাপন করেছিলেন, তখন তাঁদের বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় ছিল। ছাত্রজীবন থেকে এই বন্ধুত্ব ক্রমে গভীরতর হয়ে গ'ড়ে উঠেছিল। দু'জনে সত্যই এক বৃন্তের দুই ফুল ছিলেন। কেবল অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন না তাঁরা, সবদিক থেকেই উভয়ে অভিন্নদৃষ্টি ও অভিন্নমনা ছিলেন। উভয়েরই একজন বন্ধুপুত্র তাঁদের অন্তরঙ্গতার চমৎকার কয়েকটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। (৩)

সংস্কৃত কলেজে চাকরি করার সময়, কাজের ফাঁকে ফাঁকে দুই বন্ধু রঙ্গরসিকতায় মশগুল হয়ে থাকতেন মধ্যে মধ্যে। সাহিত্যের অধ্যাপক মদনমোহন পড়াতেন 'কুমারসম্ভব' ও 'মেঘদূত'। দেখতেও তিনি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। রসিকতায় দুই বন্ধুর কেউ কাউকে হার মানাতে পারতেন না। কলেজের উত্তরদিকে ছিল ভদ্রলোকদের বাড়ী (আজও আছে)। একদিন এক ভদ্রলোক নালিশ করেন যে কলেজের ছাত্রদের জ্বালায় সামনের বাড়ীর মেয়েরা ছাদে উঠতে পারে না। কলেজের উত্তরের একটি ঘরে মদনমোহন পড়াতেন। বিদ্যাসাগর একদিন বন্ধুকে ডেকে বলেন: "মদন, ছেলেদের বলে দিও যেন সামনের বাড়ীর দিকে না তাকায়।" উত্তরে মদনমোহন বলেন: "দেখ বিদ্যাসাগর, বসন্তকাল পড়েছে, মেঘদূত পড়ানো হচ্ছে, আর পড়াচ্ছেন কে? স্বয়ং মদন। এখানে কার না মন চঞ্চল হয় বল?"

দুই বন্ধু হাসির অনর্গল ফোয়ারায় ডুবে গেলেন। পরে অবশ্য ছুতোর ডেকে উত্তরদিকের জানলার খড়খড়ি স্ক্রু দিয়ে এঁটে দেওয়া হল, কিন্তু দৃষ্টিনিক্ষেপের অপরাধের জন্য ছাত্রদের তিরস্কার করা হল না। ছাত্রদের বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিত্বকে কোন কারণে তিরস্কৃত করে আপমান করার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন বিদ্যাসাগর। দুরন্ত 'রাখাল তুল্য' ছাত্রদের জন্যও সারাজীবন তাঁর গভীর সমবেদনা ছিল। ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অভিযোগেও তিনি সহজে বিচলিত হতেন না। তাঁর বন্ধু মদনমোহনও একই দৃষ্টিতে ছাত্রদের দেখতেন। প্রতিবেশী গৃহস্থের গুরুতর অভিযোগের উত্তরে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন, তা থেকেই তাঁর চারিত্রিক উদারতার আভাস পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগরের চেয়ে মদনমোহন বয়সে কিছু বড় ছিলেন। সেইজন্য বিদ্যাসাগরকে মদনপত্নী 'ঠাকুরপো' বলে ডাকতেন, এবং বিদ্যাসাগরও তাঁকে 'বৌদিদি' বলতেন। কলেজের ছুটির পর বা অবসরের মধ্যে প্রায়ই বিদ্যাসাগর মদনমোহনের বাসায় যেতেন। একদিন কলেজ থেকে তাঁর বাসায় গিয়ে তিনি মদনপত্নীকে সম্বোধন করে বলেন; 'বৌদি, বড্ড খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও।' তিনি তখন মাধ্যাহ্নিক আহার করতে বসেছিলেন। বললেন; 'কেন ঠাকুরপো, এই তো ভাত রয়েছে, খাও না—খাবে?' বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ অম্লান বদনে তাঁর পাশে বসে এক পাত্র থেকে 'হাম্ হাম' করিয়া ভাত খাইতে লাগিলেন।' এমন সময় তর্কালঙ্কার মশায় এসে উপস্থিত হলেন। ব্যাপার দেখে তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন: 'আরে, আরে, কর কি বিদ্যাসাগর! সবটুকু মহাপ্রসাদ খেয়ে ফেল না, আমার জন্যে একটু রেখ, আমি খাব কি?' এই কথা শুনে তাঁর পত্নী ভাতের থালাখানি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: 'এই নাও, মহাপ্রসাদ খাও'। মদনমোহন সেই থালা চাটিতে লাগিলেন।

বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন, দুই সতীর্থ বন্ধুর মধ্যে এই সম্পর্কটাই ছিল তাঁদের জীবনের বড় সত্য। এই সম্পর্কের আকর্ষণেই তাঁরা দুজনে একত্রে জীবনের অনেক পরীক্ষার পথে দুঃসাহসিক অভিযান করেছেন। তার মধ্যে ছাপাখানা ও বইয়ের বাণিজ্য প্রথম ও অন্যতম। বিদ্যার বাণিজ্যতরীতে দুই বন্ধু একসঙ্গেই ভাগ্যের সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলেন। দুজনেরই লক্ষ্য ছিল, আর্থিক ব্যাপারে আত্মনির্ভর এবং নিজেদের স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্র প্রশস্ত করা। দুজনের কেউই বিত্তবান ছিলেন না, সুতরাং অর্জিত বিদ্যার মূলধন নিয়ে তাঁদের বাণিজ্যের পথে যাত্রা করতে হয়েছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যতদিন পণ্ডিতী করেছিলেন বিদ্যাসাগর, ততদিন স্বাধীন কর্মজীবনের তিক্ততার পূর্বাস্বাদন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সংস্কৃত কলেজের চাকরীও সরকারী। কিন্তু সংস্কৃত কলেজ এদেশের শিক্ষায়তন। সেখানে প্রকৃত আদর্শনিষ্ঠ কর্মীর কাজের সুযোগ আছে। যেখানে সুযোগ আছে, সেখানে বাধাও আছে অনেক। বাধা থাকলে, বিরোধের সম্ভাবনা আছে। সরকারী

(৩) হরিশচন্দ্র কবিরত্ন: সেকালের সংস্কৃত কলেজ (প্রবাসী ১৩৩২, ভাদ্র আশ্বিন)

সম্পাদকের কাজ করতে করতে এই বিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। মুদ্রক প্রকাশক ও পুস্তক ব্যবসায়ী হবার পরিকল্পনা তখনই তিনি করেছিলেন। পদত্যাগের পূর্বেই সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটরী স্থাপিত হয়েছিল।

ছাপাখানা স্থাপনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। সে-অর্থ সঞ্চয় করা তখন মদনমোহন বা বিদ্যাসাগর কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি। সামান্য চাকরী করে, বিরাট পোষ্যসংখ্যা প্রতিপালন করে, অর্থসঞ্চয় করা সম্ভবও নয়। ঋণ করে তাই শেষ পর্যন্ত ছাপাখানা করতে হয়েছিল। এ-সম্বন্ধে তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন।(৪)

> এই সময়ে অগ্রজ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া, সংস্কৃত-যন্ত্র নাম দিয়া একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ৬০০৲ টাকায় একটি প্রেস ক্রয় করিতে হইবে; টাকা না থাকাতে তাঁহার পরমবন্ধু বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট ঐ টাকা ঋণ করিয়া, তর্কালঙ্কারের হস্তে দিলে, তর্কালঙ্কার প্রেস ক্রয় করেন। ঐ টাকা ত্বরায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়কে প্রত্যর্পণ করিবার কথা ছিল। এক দিবস কথাপ্রসঙ্গে অগ্রজ, মার্শেল সাহেবকে বলেন যে, 'আমরা একটি ছাপাখানা করিয়াছি, যদি কিছু ছাপাইবার আবশ্যক হয় বলিবেন।' ইহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন, 'বিদ্যার্থী সিবিলিয়ানগণকে যে ভারতচন্দ্রকৃত অন্নদামঙ্গল পড়াইতে হয়, তাহা অত্যন্ত জঘন্য কাগজে ও জঘন্য অক্ষরে মুদ্রিত; বিশেষতঃ অনেক বর্ণাশুদ্ধি আছে। অতএব যদি কৃষ্ণনগরের রাজবাটী হইতে আদি অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া শুদ্ধ করিয়া ত্বরায় ছাপাইতে পার, তাহা হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য আমি এক শত পুস্তক লইব এবং ঐ একশতের মূল্য ৬০০৲ শত টাকা দিব। অবশিষ্ট যত পুস্তক বিক্রয় করিবে, তাহাতে তুমি যথেষ্ট লাভ করিতে পারিবে, তাহা হইলে যে টাকা ঋণ করিয়া ছাপাখানা করিয়াছ, তৎসমস্তই পরিশোধ হইবে।' সুতরাং কৃষ্ণনগরের রাজবাটী হইতে অন্নদামঙ্গল আনাইয়া, মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। এক শত পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দিয়া ৬০০৲ ছয় শত টাকা প্রাপ্ত হন; ঐ টাকায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের ঋণ পরিশোধ হয়।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' নিয়েই বিদ্যাসাগর মুদ্রক ও প্রকাশকের ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হন। বাংলাদেশে মুদ্রণযন্ত্র ও মুদ্রিত বইয়ের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কবি ভারতচন্দ্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে অন্নদামঙ্গল রচনা করেন ১৬৭৪ শকাব্দে (১৭৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে)। তার পর পঁচিশ বছরের মধ্যে, ১৭৭৮ সালে বাংলাদেশে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়। হাতেলেখা পুথি-পাণ্ডুলিপির যুগ অস্তাচলে যায়। প্রথম দিকে ইংরেজী ভাষাতেও বাংলা ভাষা সম্পর্কিত যে-সব বই ছাপা হয়, তাতেও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল থেকে উদ্ধৃতি ভূমিকায় ও দৃষ্টান্তে ব্যবহৃত হয়। যেমন হলহেডের ব্যাকরণে (১৭৭৮), ফরষ্টারের অভিধানে (১৭৯৯-১৮০২), লেবেডেফের ব্যাকরণে (১৮০১)। রুশদেশবাসী লেবেডেফ বাংলাদেশে প্রথম যে বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানেও প্রথম দিনের অভিনয়ের পর ভারতচন্দ্রের কয়েকটি গান যন্ত্রসহযোগে গীত হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, বাংলাদেশে বাঙালীর পুস্তক-প্রকাশন বাণিজ্যের সূত্রপাত হয় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য মুদ্রিত ক'রে। প্রকাশ করেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ১৮১৬ সালে। গঙ্গাকিশোর কাঠ খোদাই চিত্রসহ সুন্দর সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করেন। আজ পর্যন্ত যা মুদ্রিত বাংলা বই পাওয়া গিয়েছে তাতে গঙ্গাকিশোরের ছাপা এই বই-ই প্রথম বাংলা ছাপা সচিত্র বই। ছাপাখানা ও মুদ্রিত বইয়ের বাণিজ্যের ইতিহাসে দেখা যায়: (৫)

> The central figure of the early book-trade was the pri.ter. He pro.ured the services of an engraver to cut punches specially for him and had them cast at a local foundry; he chose the manuscripts he wished to print and edited them; he determined the number of copies to be printed; he sold them to his customer...

মুদ্রণযুগের আদিপর্বে, রিনেইস্যান্স-যুগের ইটালীতে ও ইয়োরোপে, মুদ্রক প্রকাশক দোকানদার লেখক ও সম্পাদক, প্রধানতঃ একই ব্যক্তি ছিলেন। বই-প্রকাশের ব্যাপারে সমস্ত কাজই প্রায় একজন ব্যক্তিকে করতে হত। একমাত্র কাগজ যাঁরা তৈরি করতেন এবং বই বাঁধাই করতেন, তাঁরা ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। (৬)

> It is only the paper-makers and book-binders who from the beginning to the present have kept their independence: their crafts went back to the times of handwritten book...

বাংলাদেশে গঙ্গাকিশোরের চরিত্রে রিনেইস্যান্স-যুগের আদি মুদ্রক প্রকাশকদের এই প্রতিভা সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসের একজন সামান্য কম্পোজিটর থেকে তিনি বাংলা বইয়ের প্রথম প্রকাশক ও ব্যবসায়ীরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তিনি নিজে বই লিখেছেন, সম্পাদন করেছেন, ছেপেছেন, বিক্রীর ব্যবস্থা করেছেন। নবযুগের বাংলার ইতিহাসে এদিক দিয়ে গঙ্গাকিশোরের কীর্তি চিরস্মরণীয়। এ-পথে বিদ্যাসাগর তাঁরই অনুগামী। কিন্তু বাঙালী বিদ্বৎ-শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যাসাগরই এ পথের প্রথম প্রদর্শক।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত-যন্ত্র প্রেস ও ডিপজিটরী স্থাপন করেন, তার ত্রিশ বছর আগে গঙ্গাকিশোরের আমল থেকে এই ব্যবসায়ের সূত্রপাত হলেও, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক খুব অল্পই এ-পথে এসেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক বিদ্বৎ-জনদের অনেকের

---

(৪). শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন: বিদ্যাসাগর জীবনচরিত, ৩য় সংস্করণ,

(৫) S. H. Steinberg: Five hundred years of Printing, P. 91

(৬) ষ্টাইনবার্গ; ঐ।

শম-দাম্ভিক রয়েছেন ; ৫৭ রয়েছেন স্নাতক-দাম্ভিক ; রয়েছেন সমাধিদাম্ভিক ; কিন্তু তাঁরা কেউই শতাংশেও নিস্পৃহ-দাম্ভিকের সমকক্ষ নন। ৫৮

যে মানুষ শৌচাচার নিয়ে বাদবিচার করেন, যিনি পৃথ্বীধ্বংসী, যিনি কেবল নিজের বান্ধবদেরই পরিতুষ্টির প্রয়াসী শুচি-দাম্ভিকের পাল্লায় পড়লে তিনি বিশ্বামিত্ব লাভ করেন। ৫৯

যিনি শম-দাম্ভিক, তিনি অহরহঃ অহিংসার প্রচার করেন, অথচ তন্মূলেই তিনি ধ্বংস করেন বহুবিধ প্রাণী। তাঁর কাছে বহুলোকে গচ্ছিত রেখে যায় ধন-সম্পত্তি, জলের মত তিনি উদরসাৎ করেন সমস্তই, তবু···তৃষ্ণা তাঁর মেটে না। সর্বগ্রাসী বাড়বাগ্নির তিনি প্রতিমূর্ত্তি। ৬০

যিনি স্নাতক-দাম্ভিক, তাঁর মুণ্ডটি জটিল, এবং সর্বাঙ্গে ভস্মের হাস্য। কখনও বা তিনি আমূল-গায়ে পরে থাকেন কাষায়-চীর। কখনও ছত্রী, কখনও দণ্ডী। সাপের মত, লম্পটের মত, দিশি দিশি তিনি এঁকে-বেঁকে বেড়িয়ে বেড়ান। ৬১

এবং যিনি সমাধি-দাম্ভিক, তাঁর মাথায় বিরাট টাক ; বপুটি স্থূল অথবা তনুটি শুষ্ক, অথবা মুনি-ঋষির মত চেহারা। কখনও দেখবে তাঁর মস্তকটিকে আবেষ্টন ক'রে রয়েছে একফালি কাপড়, আবার কখনও দেখবে, তাঁকেই বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে উঠেছে চৈত্যের উন্নত শিখরগুলি। ৬২ !

দম্ভের পিতা···"লোভ", তিনি অতি বৃদ্ধ ;
মাতা···"মায়া" ;
সহোদর···"কূট" ;
গৃহিণী···কুটিলাকৃতি ;
এবং পুত্রের নাম···"হুঙ্কার"।

পুরাকালে—

[ক্রমশঃ

সুয়েজ খাল সৃষ্টির দিনপঞ্জী

সুয়েজ খাল! সামান্য দু'টি কথা, কিন্তু ঐ খালের জল ঘোলা হওয়ায় পৃথিবীতে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার উপক্রম হয়েছে। সুয়েজ খালকে জাতীয়করণ করলে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইংরাজ জাতি। বাণিজ্য ছাড়া যখন বাঁচার আর কোন উপায় নেই, তখন ইংরাজের পক্ষে সুয়েজ খাল হাতছাড়া করার চেয়ে মরণ বরণ শ্রেয়ঃ। এই খালটির দৈর্ঘ্য সাড়ে সাতাশী মাইল। এই খাল খনন করতে ব্যয় করা হয় ১৮০০০০০০ পাউণ্ড। খৃষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রথম খনন কার্য্য আরম্ভ হয়। এই খনন কার্য্য চলতে থাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে। খনন কাজের দিনপঞ্জী এই—

খৃষ্টপূর্ব্ব ১৩ শতাব্দীতে—ফ্যারোয়া র‍্যামশেশ (২য়) রেড সী থেকে, অর্থাৎ লোহিত সাগর থেকে নাইল পর্য্যন্ত প্রথম খাল খনন করেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে—ফ্যারোয়া নেকো ঐ একই চেষ্টাতে ১০০০০০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮৭ সালে—ড্যারিয়াস (১ম) পারস্যের রাজা খননকার্য্য শেষ করেন।

১০০ খৃষ্টাব্দে—ট্রাজান (রোম সম্রাট) পরিত্যক্ত জলপথের কাজ পুনরায় চালাতে থাকেন।

৬০০ খৃষ্টাব্দে—দ্বিতীয় দফায় পুনরায় কাজ চলে খালিফ ওমর ইবন এল এস-এর অধীনে।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে—শক্তিমান ভিনিস সুয়েজ খালে খনন কার্য্য চালাতে থাকেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে—নেপোলিয়ন বোনাপার্টি, ইজিপ্ট আক্রমণকালে ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে লোহিত সাগর যুক্ত করতে চেয়েছিলেন সুয়েজ ক্যানেলের মাধ্যমে।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে—মহম্মদ সৈয়দ, ইজিপ্টের ভাইসরয়, খাল খননের অনুমতি দিলেন ফার্ডিনাণ্ড দে লেশেপসকে, যেন আসল খাল খনন করা হয়।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে—খাল খননের কাজ শেষ হয় এবং জলযান চলাচল করতে থাকে।

যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর

বিনয় ঘোষ

উনিশ

বিদ্যার বণিক বিদ্যাসাগর (২)

মুদ্রিত বই ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনে মুক্তির প্রতীক। হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি ছিল পাতালের অন্ধকারে শৃঙ্খলিত প্রমিথীউসের মতন। লিপিকরদের পারিশ্রমিক দিয়ে অনেক পাণ্ডুলিপি তিনি তাঁর নিজের পাঠাগারের জন্য নকল করিয়েছেন। কিন্তু সে নিরুপায় হয়ে। মুদ্রণযন্ত্র ও মুদ্রিত বইয়ের ঐতিহাসিক তাৎপর্য জীবনে একদিনের জন্যও তিনি ভোলেন নি। কুসংস্কার ও কূপমণ্ডুকতার কারাগার থেকে জনমানসের মুক্তির যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তা যে মুদ্রিত বইয়ের প্রাচুর্য ও প্রচার ভিন্ন বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব নয়, এ-সত্য তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সবরকমের মুক্তির আগে, মানসমুক্তির প্রয়োজন। তার জন্য শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজন। তা না হলে, সামাজিক সংস্কারের সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। লিপিকরের পাকাছাঁদের হাতেলেখা পুথিপত্রের সাহায্যে শিক্ষার প্রসার অচিন্তনীয়। মুদ্রিত বই নবযুগের শিক্ষার একমাত্র বাহন। মুদ্রণযন্ত্র মুক্ত প্রমিথীউসতুল্য। গুরুগৃহের সঙ্কীর্ণ জীর্ণ দেয়াল ভেঙে, জনসমাজের সুবিস্তৃত অঙ্গনে জ্ঞানবিদ্যার আলোকবর্তিকা বহন করে নিয়ে যাবার প্রচণ্ড শক্তি সে ধারণ করে। মুদ্রিত বইয়ের মুদ্রিত অক্ষরান্তর্গত মুক্ত জ্ঞান সেই আলোক, স্বর্গ থেকে অপহৃত প্রমিথীউসের অগ্নি। সেই যুগাগ্নির আরাধনার জন্যই বিদ্যাসাগর মুদ্রণযন্ত্রের ও বইয়ের বাণিজ্যটি বেছে নিয়েছিলেন। অন্য কোন পণ্যের বাণিজ্য তাঁর মনঃপূত হয়নি।

মুদ্রিত বইয়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানী লুইস মামফোর্ড বলেছেন: (১)

> More them any other device, the printed book released people from the domination of the immediate and the local. Doing so, it contributed further to the dissociation of medieval society...

অবস্থানকেন্দ্রিক পরিবেশের সীমাবদ্ধ জ্ঞান থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করেছে মুদ্রিত বই। এই মুক্তি মধ্যযুগীয় সমাজের সঙ্কীর্ণতাকে ধ্বংস করেছে। একথা যেমন ঠিক, তেমনি এর বিপরীত ফলাফলটাও বড় সত্য। বৃহত্তর জগতের চেতনার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রিত বই মানুষের স্বচেতনাকে জাগ্রত করেছে। এই স্বচেতনা হয়েছে তার স্বাদেশিকতার অগ্রদূত। স্বজাতিচেতনা থেকে নিজের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছে। সংস্কৃতের স্বর্গরাজ্য থেকে বাংলাদেশে মুদ্রিত বই মাতৃভাষার মর্ত্যলোকে নেমে এসেছে। মাতৃভাষায় রচিত ও মুদ্রিত বইয়ের চাহিদা বেড়েছে। সংস্কৃতের রাজতান্ত্রিক একাধিপত্য খর্ব করে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে মুদ্রিত বই। বিদ্যার বণিক বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার এই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মোৎসর্গ করেছেন।

সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের কাজ ছাড়বার আগেই, মনে হয়, বিদ্যাসাগর 'সংস্কৃত প্রেস' ও 'ডিপজিটরী' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৪৬ সালের শেষে, অথবা ১৮৪৭ সালের গোড়ার দিকে। কারণ এ বিষয়ে তিনি নিজেই লিখেছেন: (২)

> যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলাম, তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে, সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানায়, তিনি ও আমি সমাংশভাগী ছিলাম।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছিলেন সাহিত্যের অধ্যাপক। সতীর্থ মদনমোহনকে এই অধ্যাপনার কাজ তিনি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁরই অনুরোধে তর্কালঙ্কার কৃষ্ণনগর কলেজের হেড পণ্ডিতের কাজ ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃত কলেজের চাকরি গ্রহণ করেন। এই সময়, মনে হয়, দুই বন্ধু মিলে ছাপাখানা ও বইয়ের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন।

বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন একবৃন্তের দুই ফুল। বৃহত্তর সমাজজীবন থেকে, দূরে থেক, পারিবারিক জীবনে মদনমোহন বন্দী হয়েছিলেন

---

(১) Lewis Mumford: Technics and Civilisation, P. 136

(২) বিদ্যাসাগর: নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো বাষট্টি

দুপুর বেলা। মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, রোদে ভরা আকাশ, হঠাৎ একটা বাজ পড়ল। আচমকা আওয়াজ শুনে চমকে উঠল লক্ষ্মী। চমকে উঠলেন শ্রীমা।

বিনা মেঘে বজ্রপাত! এ কি অলক্ষণ!

দুজনেই ছুটে গেল ঠাকুরের ঘরে।

ঠাকুর বললেন, 'কি গো, ভয় পেয়ে ছুটে এসেছ বুঝি?'

তা ছাড়া আবার কি! দুজনে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টে। ঠাকুরের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে।

'রাম-অবতারে লীলা অবসানের আগে কালপুরুষ স্বয়ং এসেছিলেন।' বললেন ঠাকুর, 'এবার বজ্রধ্বনিতে সঙ্কেত করে গেলেন দিন তার নেই। খেলাঘর ভেঙে দাও এবার।

লক্ষ্মী বুঝি আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল।

'কিসের দুঃখ, কিসের শোক!' লক্ষ্মীকে সান্ত্বনা দিলেন ঠাকুর: 'এখানকার কত কথাই তো শুনলি, সেই সব কথাই কইবি সবাইকে।' সে তো শুধু আনন্দের কথা, অমৃতের কথা। দেশে রঘুবীর আছে, তাকে নিয়ে থাকবি। আর কত দিনের জন্যেই বা এই তিরোধান। শোন, একশো বছর—মোটে একশো বছর'—

দুজনে তাকাল উৎসুক হয়ে।

'একশো বছর পরে আবার আসব।'

'এই একশো বছর থাকবে কোথায়?' জিগগেস করলেন শ্রীমা।

'থাকব ভক্তহৃদয়ে।'

'আপনি আসুন গে। আমি আর আসছি না।' অভিমান ভরে বললে লক্ষ্মী, 'তামাককাটা করলেও না।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'আমি যদি আসি তো থাকবি কোথায়? প্রাণ টিকবে না যে আমাকে ছাড়া। কলমির দল এক জায়গায় বসে টানলেই সব আসবে।'

লক্ষ্মীকে ঠাকুর শীতলাজ্ঞান করতেন। কামারপুকুরের ঘরে যে মা-শীতলা আছেন লক্ষ্মী তারই প্রতিরূপ।

হৃদয় যখন চলে যায় ঠাকুরকে বলেছিল, 'মামা, এখানে কি করতে পড়ে আছ? গঙ্গার ধারে তোমার জন্যে যে একখানা বাগান দেখে এসেছি সেখানে চলো, তোমাকে নিয়ে গিয়ে বসাই। তারপর দেখাই একবার ভানুমতীর খেল্।'

ঠাকুর বললেন, 'শালা, তুই আমাকে শীতলা পেয়েছিস? শীতলার বামুনের মত তুই আমাকে ফিরি করে বেড়াবি? আমি তোর পয়সা রোজগারের ফিকির? এই হীনবুদ্ধি নিয়ে তুই জীবন কাটাবি? তোর দুঃখ তবে কে ঘোচাবে?'

যে শীতলা বামুনের থালায় চড়ে ঘুরে বেড়ায় না, যে শীতলা ভক্তের হৃদয়পদ্মে স্থির হয়ে থাকে সেই লক্ষ্মী।

ভবতারিণী ও রাধাকান্তের জন্যে কত ভোগসামগ্রী আসে, কত ভালো-ভালো ফল আর মিষ্টি, আহা, আমার কামারপুকুরের শীতলা কিছুই খেতে পায় না, এই ভেবে কষ্ট হয় ঠাকুরের। একদিন মা-শীতলা স্বপ্ন দিলেন ঠাকুরকে: 'গদাই, আমি এক রূপে ঘটে আরেক রূপে তোমাদের লক্ষ্মীতে। লক্ষ্মীকে খাওয়ালেই আমার খাওয়া হবে।'

কাশীপুরে দুবার ঠাকুর পুজো করলেন লক্ষ্মীকে। তার উচ্ছিষ্ট খেলেন।

গিরিশকে বললেন, 'লক্ষ্মীকে মিষ্টিটিষ্টি একদিন খাইও। তা হলেই মা-শীতলাকে ভোগ দেওয়া হবে। লক্ষ্মী মা-শীতলারই অংশ।'

শ্রীমাকে বললেন, 'আমার বড় সাধ, লক্ষ্মীকে একজোড়া বালা ও একছড়া হার দি।'

রাম দত্ত কাছে ছিল, বলে উঠল, 'বেশ তো, আগামী রোববারেই আমি নিয়ে আসব।'

আগামী রোববার আর আসে না।

ঠাকুর বললেন, 'শালা ভেগেছে।'

শ্রীমা বললেন, 'বেশ তো, তোমার যখন এত সাধ, আমার পুরোনো বালা ও হার লক্ষ্মীকে দিয়ে দি।'

'না, না, তোমারটা দিতে যাবে কেন? আমার নতুন গড়িয়ে দেবার সাধ। মা-শীতলা বলে দেব।'

লক্ষ্মীর কানে গেল কথাটা। বললে, 'আমি হার-বালা চাই না। আমি ঐ টাকায় বৃন্দাবনে যাব।'

'সে তো যাবিই। কিন্তু তোর নতুন গয়নাও চাই যে।'

ঠাকুর বেঁচে থাকতে সে গয়না হয়নি। পরে ভক্তরা যখন জানতে পারল ঠাকুরের সাধের কথা, হার বালা গড়িয়ে দিল লক্ষ্মীকে। ঠাকুরের সাধ, লক্ষ্মী তাই হাতে-গলায় পরল সে গয়না। কিন্তু পরামাত্রই খুলে ফেলল। দিয়ে দিল অন্যকে।

শ্রীমা বললেন, 'কাল উনি বীজমন্ত্র আমার জিভে লিখে দিয়েছেন। তুই যা না। তোকেও লিখে দেবেন দেখিস।'

লক্ষ্মী কেমন কুণ্ঠিত হল। বললে, 'আমার বড় লজ্জা করে।'

'সে কি রে? তাঁর কাছে যাবি, লজ্জা কিসের?'

'কি বলে চাইব?'

'মুখে চাইতে হবে কেন? অন্তরে অভিলাষটি নিয়ে দাঁড়াবি, তিনি ঠিক শুনতে পাবেন। একবার শোনাতে পারলে তিনি অস্থির হয়ে উঠবেন, নিজেয় থেকেই ব্যবস্থা করবেন'—

'কারা সব আছে।'

সেদিন গেল না লক্ষ্মী। তারপর এমনি একদিন গিয়েছে প্রণাম করতে. ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'হ্যা রে, তোর কোন ঠাকুর ভালো লাগে?'

লক্ষ্মীর বুকের ভিতরে আনন্দ উথলে উঠল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, রাধাকৃষ্ণ।

'জিভ বার কর।' জিভের উপর বীজ ও নাম লিখে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোর গলায় দেখছি তুলসীর মালা।-কে দিয়েছে?'

লাহা বাবুদের পেসন্ন দিদি।'

'হ্যাঁ, ঐ মালা রাখবি। তোকে বেশ দেখায়।'

শ্রীমা এসে বললেন, 'সে কি গো? লক্ষ্মীর যে আগে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা হয়ে গিয়েছে!'

'সে আবার করে?'

'ঐ যে হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী এসেছিল কামারপুকুরে, নাম পূর্ণানন্দ স্বামী, তার কাছ থেকে।'

'তা হোক গে। লক্ষ্মীকে আমি যে মন্ত্র দিয়েছি ঠিকই দিয়েছি।'

পুরী এসেছে লক্ষ্মী। স্বর্গদ্বারে নেমেছে স্নান করতে। ঢেউয়ের দোলায় কি করে কে জানে ভাসতে ভাসতে চলে এসেছে চক্রতীর্থ পর্যন্ত। গোপবেশী কে একজন হিন্দুস্থানী যুবক জলে নেমে তাকে উদ্ধার করল, টেনে তুলল ডাঙার উপর। সুস্থ হয়ে চোখ মেলে তাকে আর দেখতে পেল না লক্ষ্মী।

ক্লান্ত দেহে মুহ্যমানের মত বাড়ি ফিরে এল লক্ষ্মী। তারপর দেহে আরো একটু বল এলে গেল জগন্নাথ দর্শনে। এ কি! মন্দিরে বলরামের জায়গায় যে সেই গোপবালক!

মাঝে মাঝে বলরামের আবেশ হয় লক্ষ্মীর। তখন গলায় নবমল্লিকার মালা দুলিয়ে উত্তাল কেশ এলিয়ে উদ্দাম নৃত্য সুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে গান ধরে বিভোর হয়ে। পায়ের নিচে মাটি টলমল করতে থাকে। বলে, 'মেয়েছেলে হয়ে এসেছি, নইলে দেখাতাম, কা'কে বলে নৃত্য, কা'কে বা কীর্তন।'

জগন্নাথ-মন্দিরে গিয়ে দেখে, যে জগন্নাথ সেই রামকৃষ্ণ।

ঠাকুর বললেন, 'ঠাকুর দেবতা যদি স্মরণে না আসে তো আমাকে ভাববি। তা হলেই হবে। কি রে, আমাকে মনে হয় তো? কেমন, মনে হয়?'

লক্ষ্মী ঘাড় হেলিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, তা হয়।'

'কি রকম হয়?'

'এই যেমন দেখছি তেমনি।'

লক্ষ্মীকে ভিক্ষেয় পাঠালেন ঠাকুর। বললেন, 'যা বাড়ি-বাড়ি নাম বিলিয়ে আয়।'

'লোকে যদি গালাগাল দেয়?'

'দিক না গালাগাল। তোর পায়ের ধুলো তো তাদের বাড়িতে পড়বে। তাতেই ওদের মঙ্গল।'

কুঠিঘাটা রতন বাবুর বাড়িতে ভিক্ষে করতে গেল লক্ষ্মী। তারা একটা সিকি দিল। লক্ষ্মী তো মহা খুশি। ঠাকুরকে এসে বললে উচ্ছ্বসিত হয়ে।

ঠাকুর বললেন, 'বড়লোকের বাড়ি গেলি কেন? গরিবের বাড়ি যাবি।'

ঠাকুরকে কি ভাবে স্মরণ করবে জানো? লক্ষ্মী প্রণালী বাতলে দিল। প্রথমে ভাববে, ভোরবেলা, ঠাকুর উঠলেন ঘুম থেকে। মুখ-হাত ধুলেন, গেলেন ঝাউতলায়। তারপর তাঁর পা ধুয়ে দিলে। কাপড় ছাড়িয়ে দিলে। তারপর তাঁর গলায় দিলে বেলফুলের মালা। তারপর তাঁকে খেতে দিলে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ, বৃন্দাবনের রস আর গঙ্গাজল। সঙ্গে মাখন-মিছরি। তারপর খেতে দিলে পান-তামাক। তারপর খাবার জিনিস এগিয়ে দিলে হাতের কাছে।

দুপুরবেলা খাইয়ে দিলে, ডাল-ভাত ডুমুর কাঁচকলার ঝোল। তারপর তাঁকে শুতে দিলে। পাখা করতে থাকলে। কখনো বা পা টিপলে।

রাত্রে সামান্য লুচি আর পায়েস দিলে খেতে। তারপর আবার শয়ন দিলে। হাওয়া করলে। বসলে পাদপদ্মের সেবায়।

শ্রীমা আর লক্ষ্মীর দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'বলরামকেও বলেছি আর বেশি দিন কষ্টভোগ করতে হবে না।'

'আহা, বলরামের কি স্বভাব!' বলছেন ঠাকুর, 'রাত-দিন ঠাকুর নিয়ে আছে। যেন মালী ফুলের মালাই গাঁথছে অবিরাম। আমার জন্যে উড়িষ্যায় কোঠারে যায় না। ভাই মাসোয়ারা বন্ধ করেছিল আর বলে পাঠিয়েছিল, তুমি এখানে এসে থাকো, মিছিমিছি কেন এত টাকা খরচ! ও সব কথা কানে তুলল না বলরাম। শুধু আমার কাছে থাকবে বলে। আমাকে দেখবে বলে।'

বলরামের বাড়িতে রথ টানলেন ঠাকুর। সঙ্গে গিরিশ, নরেন, কালী, রাম দত্ত, প্রতাপ মজুমদার, মাষ্টার মশাই, শশধর তর্কচূড়ামণি। সকলেই দড়ি ধরল। গান ধরলেন ঠাকুর, সঙ্গে ভাবস্বচ্ছন্দ নৃত্য। 'নদে টলমল করে, গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে।'

শশধরকে বললেন, 'শশধর, একেই বলে ভজনানন্দ। সংসারীরা বিষয়ানন্দ ভোগ করে, ভক্তেরা ভজনানন্দ। ভজনানন্দ ভোগ করতে করতেই ব্রহ্মানন্দ।'

গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, শশধরের বাড়ি এলেন ঠাকুর। জিগগেস করলেন, 'আচ্ছা, তুমি কি রকম লেকচার দাও?'

বিনীত স্বরে শশধর বললে, 'আজ্ঞে, শাস্ত্রের কথা বোঝাতে চেষ্টা করি।'

ঠাকুর বললেন, 'জানো তো, আজ-কালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রুগীর এদিকে হয়ে যায়। আজ-কাল ফিভার মিকশ্চার।

এত বড় পণ্ডিত, কথাটার মানে যেন ধরতে পারল না শশধর।

'বুঝলে না, শাস্ত্রবিহিত কর্ম করবার মত মানুষের সময় কই, সামর্থ্য কই? আজকাল শুধু নারদীয় ভক্তি। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।' শশধরের দিকে স্নেহচোখে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'বাবা, আরেকটু বল বাড়াও! আর কিছু দিন সাধন ভজন কর। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি কোরো না। তবে, সন্দেহ কি, যেটুকুন করছ লোকের ভালোর জন্যেই সব করছ।' বলে ঠাকুর মাথা নত করে শশধরকে নমস্কার করলেন। ভবতারিণীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'মা সেদিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখালি। তার পর আজ আবার এখানে এনেছিস। দেখলুম শশধরকে।'

আমি কাঁদতাম আর বলতাম, 'মা বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক।'

শশধর বললে, 'তবে আপনারও বিচারবুদ্ধি ছিল ?'

'তা এক সময় ছিল ।'

'তাহলে বলে দিন আমাদেরও একদিন যাবে। আপনার কেমন করে গেল ?'

'অমনি এক রকম করে গেল।' বললেন ঠাকুর, 'এখন এই সার কথা, ভক্তিই সার, ঈশ্বরকে ভালোবাসাই সার।' শুধু শুষ্কজ্ঞান নিয়ে থেকো না! প্রেম ধরো। প্রেমই সচ্চিদানন্দকে ধরবার দড়ি।'

'প্রেমই সর্বসাধ্যসার।' এ হচ্ছে সেই অনুরাগ যা 'অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল।' তদার্পিতাখিলাচারিতা তদ্‌বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা।

শ্রীমাকে বললেন, 'তোমাকে থাকতে হবে, অনেক কাজ করতে হবে, লক্ষ্মী তোমার দোসর হবে। কখনো তাকে কাছছাড়া করবে না। আমার তো হয়ে এল। সে তোমার কাছে থাকলে কত ভালো কথা কয়ে তোমার প্রাণ ঠাণ্ডা করবে।'

কেন শোক করছি, কিসের জন্যে, কার জন্যে শোক? শরীর মন ইন্দ্রিয় দিনে-দিনে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে, তবে মৃত্যুরূপ পরিবর্তনকে ভয় কেন? মৃত্যুরূপ পরিবর্তনের পরেও তো আছে আরেক অস্তিত্ব। লোকবিচ্ছেদ জরামরণবর্জিত অস্তিত্ব। সেই অস্তিত্বই তো অবিনাশী। আত্মস্বরহিত আনন্দরসাশ্রয় অস্তিত্ব। মায়ার জন্যেই দুঃখ, ভ্রান্তির জন্যেই দুঃখ। কিসের ভ্রান্তি কিসের মায়া।

মায়া ঈশ্বরেরই শক্তি, ঈশ্বরেই বর্তমান, কিন্তু নিজে তিনি মায়ায় আবদ্ধ নন। সাপের মুখে বিষ, কিন্তু সে বিষে সাপ নিজে মরে না; সে মুখ দিয়ে সে খাচ্ছে, ঢোঁক গিলছে, তবুও না, কিন্তু যাকে কামড়ায় সেই মরে।

সমস্ত জগৎ মায়ারই বিজৃম্ভণ মাত্র। মায়া পরমেশ্বরাশ্রয়া।

মনই মায়া। যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণই দ্বৈত আছে। মন থাকলেই বিকার আর বিকার থাকলেই বিনাশ। বিকার মিথ্যা, আধারই সত্য। বিশ্ব তাই স্বপ্নমায়ার মত, গন্ধর্বনগরের মত। আসলে জীব সর্বাবস্থায়ই মুক্ত, শুধু অবিদ্যার বশে আত্মস্বরূপবিস্মৃত। কাঁধে গামছা আছে, কপালে-তোলা চশমা আছে, শুধু মনে নেই। হাত যায় না কাঁধে, চশমা ঠিক বসে না চোখের সামনে।

যা তিন কাল ও তিন অবস্থায় সৎ তাই সত্য, যা অবাধিত, অনিরুদ্ধ তাই সত্য। যার বাধ হয়, বোধ হয়, তা মিথ্যে। সত্য চিরকাল সমস্ত অবস্থাতেই সত্য। শুধু দৃশ্য বা বিষয়ের পরিবর্তন। এই সত্য মিথ্যে নিয়েই চলছে লোকব্যবহার। এক বস্তুকে অন্যবস্তু বলে বোধই অজ্ঞান। যথার্থ স্বরূপের বোধই জ্ঞান।

যথার্থস্বরূপকে দেখ।

যা বৃহৎ যা মহান যা বাধারহিত মাত্রারহিত যা নিরতিশয় তাই যথার্থ-স্বরূপ। যার চেয়ে ব্যাপক বা উৎকৃষ্ট কিছু নেই তাই যথার্থ-স্বরূপ। যা নশ্বর তাই দোষযুক্ত। যা দোষলেশশূন্য, নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ নিত্যমুক্ত তাই যথার্থস্বরূপ। তাই ব্রহ্ম। তাই আত্মা, সকলের আত্মা। অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

পুরী থেকে মা ফিরেছেন কলকাতায়, সে 'জোগেশ' এগারো সালের মাঘ মাস। এসেই বললেন, চলো একবার আমার শাশুড়ি ঠাকরুণকে দেখে আসি।

পালকি এসে থামল বোসপাড়া লেনের এক ভাড়াটে বাড়িতে। এখানে মার শাশুড়ি কে? এখানে তো নিবেদিতা থাকে!

নিবেদিতা তার নিজের বাড়িতেই নিয়ে এসেছে অঘোরমণিকে, গোপালের মাকে। হাঁটবার-চলবার শক্তি নেই গোপালের মার, কেউ দেখবার শোনবার নেই, তাই নিবেদিতা নিয়ে এসেছে নিজের কাছে। আর কে না জানে গোপালের মা-ই সারদামণির শাশুড়ি।

শয্যায় মিশে আছে গোপালের মা। বাইরে কি একটা কথা বলেছে সারদামণি, কণ্ঠস্বর ঠিক চিনতে পেরেছে। কে ও? আমার মা কি এলে? আমার বউমা? আমার বউমা এসেছ?

'হ্যাঁ, মা, আমি এসেছি।' কয়েকটি ফল হাতে নিয়ে সারদামণি ঘরে ঢুকল। ফল ক'টি গোপালের মার হাতে দিয়ে প্রণাম করল সারদামণি। চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে একটু আদর করল গোপালের মা। বললে, 'ও বউমা, আমার গোপাল কেমন আছে?'

'তিনি তো ভালোই আছেন।'

'তুমি সময় মত আমার কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিও, মা!'

'তিনি তো আপনার কাছেই রয়েছেন।'

এই গোপালই তো মীরাবাঈএর রণছোড়, তার গিরিধারী নাগর। 'মেরে তো গিরিধর গোপাল, দুসরা ন কোঈ।' আমার আছে শুধু গিরিধারী গোপাল, আর কেউ আমার দোসর নেই। যার মাথায় ময়ূরপুচ্ছের মুকুট সেই আমার স্বামী, আমার সর্বস্ব। বাবা মা ভাই বন্ধু কেউ আমার স্বজন নয়। গিরিধারীই আমার স্বজন। আমি কুলের মর্যাদা ছেড়েছি, আর কে কী আমার করবে? সাধুদের সঙ্গ করে লোকলজ্জা খুইয়েছি। চোখের জল ঢেলে ঢেলে প্রেমলতা পুঁতেছি, সে লতায় ফুল ধরেছে, ধরেছে আনন্দফল। আমাকে দেখে সংসার কাঁদছে কিন্তু ভক্তের দল খুশি। হে ভক্তের ভগবান, তুমিও খুশি হও। হে লাল-গিরিধর, মীরা তোমার দাসী, তাকে তুমি ত্রাণ করো।

মেবারে মেড়তা-তালুকের জমিদার রতনসিংএর মেয়ে মীরাবাঈ ছেলেবেলায় কোন এক প্রতিবেশিনীর বাড়ীতে গিয়েছে বিয়ের নেমন্তন্নে। মাকে জিগগেস করছে, 'মা, আমার বিয়ে কার সঙ্গে? আমার বর কই?'

বাড়িতে কুলদেবতা গিরিধারীলাল, সেই বিগ্রহ দেখিয়ে মা বললেন, 'ঐ তোমার বর, ওরই সঙ্গে তোমার বিয়ে।'

মীরার যখন সত্যি বিয়ে হল, দেখল, সংসার বিলাসে সুখ নেই, 'হরি বিন রহেগ ন জায়।' সখি আর যে থাকতে পারি না হরিহারা হয়ে। শাশুড়ি কাটব্য করে, ননদ গঞ্জনা দেয়, রাণা তো বিরস বিরক্ত হয়েই আছেন। ঘরে বন্দী করেছেন, দরজায় তালা লাগিয়েছেন, রেখেছেন পাহারাওয়ালা। কিন্তু এ তো আমার পূর্বপূর্ব জন্মের পুরোনো প্রেম, এ আমি ভুলি কি করে? হে মীরার গিরিধারী নাগর, তুমি ছাড়া আর কাউকে যে আমার মনে ধরে না।

হে মিঠাবোলা, সাজন-করে একবার এস। পথের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত দিন আর চেয়ে থাকব? আসতে তোমার ভয় কি, তুমি এলেই তো সুখোৎসব। হে শ্যামলমোহন, তোমাকেই তো দেব আমার দেহ মন, তুমি এলেই তো রঙ্গপূর্ণ হবে। আর দেরি কোরো না। 'কাজল-তিলক-তমোলা' সব রঙ্গ ত্যাগ করেছি

তোমার জন্যে, তোমারই রঙে রঙিন হব বলে। তোমার জন্যে বুকের আঁচল আজ খুলে দিয়েছি, তুমি এস।

হে প্রভু, মীরাকে তোমার 'সাঁচী দাসী' করে নাও। মিথ্যা সংসার-মায়ার ফাঁদ ছাড়িয়ে দাও। আমার বিবেকের ঘর এরা লুঠ করে নিল, শত বল-বুদ্ধি খাটিয়েও এঁটে উঠতে পারছি না। হে রাম, কিছুই যে আমার বশে নেই, মৃত্যুর পথে চলেছি বিফল হয়ে, তুমি এস, আমাকে বাঁচাও। প্রত্যহ ধর্মের উপদেশ শুনছি, মনকে ভয় পাইয়ে রেখেছি কুপথ থেকে, সর্বদা সাধুসেবা করছি স্মরণে ধ্যানে চিত্তকে ধরে আছি দৃঢ় করে। তুমি এবার মুক্তির পথ দেখাও। মীরাকে 'সাঁচী দাসী বনাও।'

ননদ এসে বললে, 'ভাবি, সাধুসঙ্গ ছাড়ো, তোমার কলঙ্কে যে কান আর পাতা যায় না, তোমার নিন্দায় শহর-গাঁ তোলপাড়। তুমি রাজকুলের বধূ, তা কি ভুলে থাকবে?'

'আমি গিরিধারীর দাসী। গিরিধারীই আমার যশ, গিরিধারীই আমার নিন্দা।'

'তোমার এই শুষ্ক বেশ আর দেখতে পারি না। পরো তোমার মুক্তাহার, তোমার কেয়ূর-কঙ্কণ। রাজকুল শোভা হয়ে বিরাজ করো।'

মীরা বললে, 'অসার রত্নভূষণ ছেড়ে শীলসন্তোষকেই আমি বরণ করেছি।'

মা গো, আমি রামরতনধন পেয়েছি। আমি তো রামরতনধনই পেয়েছি। এ-ধন খরচ হয় না, চুরি যায় না। দিন-দিনই বেড়ে চলে। এ ধন জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, এত প্রকাণ্ড যে ধরণীও ধরে উঠতে পারে না। নামের তরীতে ভজনের প্রদীপ জ্বেলে বসেছি, হে কাণ্ডারী, হে নাগর গিরিধর, আমাকে ভবসাগর পার করে দাও।

রাণা হরিচরণামৃত বলে বিষ পাঠাল মীরাকে। মীরা সে বিষ খেয়ে ফেলল। মীরার স্পর্শে সে বিষ অমৃত হয়ে গেছে।

'হে প্রিয়, তুমি এ বন্ধন ছিঁড়তে পারো, আমি ছিঁড়ব না। তোমার প্রীতির ডোর ছেড়ে আর কার সঙ্গে বাঁধব? আমার আর কে আছে? তুমি তরু আমি বিহঙ্গ। তুমি সরোবর আমি মীন। আমি চকোর তুমি সুধাংশু। তুমি মুক্তো আমি সুতো। তুমি আমার সোনা আমি তোমার সোহাগা। হে ব্রজবাসী, মীরার প্রভু, তুমি ঠাকুর, আমি তোমার দাসী।

বিয়ের দশ বছরের মধ্যেই বিধবা হল মীরা। সবাই বললে কুলবধূর মত অন্তঃপুরচারিণী হয়ে থাকো। লজ্জাহীনার মত পথে-বিপথে সাধুসঙ্গ করে বেড়িও না। কে কার উপদেশ শোনে! সংসারবিষ পান করে হরিপ্রেমস্পর্শে অমৃতত্ব আস্বাদ করেছি, বলো, কোথায় গেলে সে হরির দর্শন পাব।' সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী সেজে মীরা চলল বৃন্দাবনে।

'তুম বিন সব জগ খারা।' তোমাকে ছাড়া সমস্ত জগৎ বিস্বাদ। আমার দুঃখ কে বোঝে বলো। তোমার বিরহে শূল-শয্যায় শুয়ে আছি, কি করে ঘুম আসে? তোমার শয্যা গগন-মণ্ডলে, সেখানে তোমার সঙ্গে কি করে মিলব? ব্যথিত যে সেই ব্যথা বোঝে আর বোঝে সে, যার জন্যে ব্যথা। রত্নের মূল্য বোঝে আর যে কেনে সেই রত্ন। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি কোথায় সেই বৈদ্য? আমার শ্যামল সুন্দর যখন বৈদ্য হয়ে দেখা দিবে তখনই আমি শীতল হব।

ফাল্গুন যে শেষ হতে চলল, দিন চারেক আর বাকি। ওরে মন, হোলি খেলে নে। করতাল নেই, পাখোয়াজ নেই, শুধু অনাহতের ঝঙ্কার উঠেছে, রোমে রোমে অনুভব করছি সেই পুলক প্রবেশ। প্রেম-প্রীতির পিচকিরি করেছি, শীলসন্তোষের কেশর গুলেছি, গুলালের বাদলে অপার আনন্দ ঝরে পড়ছে। 'ঘটকে সব পট খোল দিয়ে হৈ, লোকলাজ সব ডার রে।' সমস্ত আবরণ খুলে দিয়েছি, জলাঞ্জলি দিয়েছি লোকলজ্জা। ওরে মন, হোলি খেল, ঐ ছাখ মনোহরের চরণকমল, প্রিয়তম ঘরে এসেছেন।

সখি আমি তো প্রিয়তমের রঙে রঙিন। পাঁচরঙে আমার চেলি রঙিয়ে দে, এবার আমি ঝুরমুট খেলতে চাই। ঝুরমুট খেলায় পাব আমার প্রিয়তমকে, দেহের আবরণ ফেলে মিলব আমি তাঁর সঙ্গে। তখন আর কিছুই থাকবে না, চাঁদ যাবে সূর্য যাবে পৃথিবী আকাশ সব যাবে, থাকবে শুধু সেই অটল অবিনাশী। মনের প্রদীপে নিত্যস্মরণের শিখা জ্বালাও, প্রেমের হাট থেকে তেল আনো তার জন্যে, সে দীপের নির্বাণ নেই। আমার বাস বাপের বাড়িতেও না, শ্বশুরবাড়িতেও না, সদগুরুর উপদেশই আমার আশ্রয়। অন্তরসখি, আমারও ঘর নেই তোরও ঘর নেই; শুধু হরির রঙেই রঙে আছি আমরা। হরিই আমাদের ঘরদোর।

বৃন্দাবনে এসে শ্রীরূপ গোস্বামীর দর্শন যাচ্ঞা করল। গোস্বামী বলে পাঠালেন, 'আমি সন্ন্যাসী বৈরাগী, আমি প্রকৃতি সম্ভাষণ করি না।'

মীরা বলে পাঠাল, 'আমি জানতুম বৃন্দাবনে একমাত্র বৃন্দাবন-চন্দ্রই পুরুষ আছেন। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ পুরুষ আছেন তা আমার জানা নেই।'

লজ্জা পেলেন গোস্বামী। বুঝলেন মীরার দিব্যদৃষ্টি কতদূর এসে পৌঁছেচে। দর্শন দিলেন মীরাকে।

নিন্দাকুৎসা নির্যাতন অত্যাচার কিছুই গ্রাহ্য করেনি মীরা। তোমার জন্যে সব ছাড়লাম, তুমি আমাকে কি করে ছেড়ে থাকবে? দিনরাত্রি এই কান্নাই শুধু তার সম্বল। মেবার ছেড়ে বৃন্দাবনের দিকে যেদিন যাত্রা করে মীরা, সেই দিন থেকেই মেবারের দুর্দিনের সূচনা। মেবারবাসীরা বুঝল মীরাই মেবারের রাজলক্ষ্মী, যে করে হোক তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। মীরা তখন দ্বারকায়। সেখানে মেবার দূত এসে অনেক মিনতি-বিনতি করতে লাগল। তুমি ফিরে চলো। মেবারের দুরবস্থা দেখবে একবার স্বচক্ষে। তার রাজলক্ষ্মী আজ ধূলায় নির্বাসিতা।

রণছোড়জীর মন্দিরে গিয়ে ঢুকল মীরা। গান ধরল। 'সাজন, সুধ জ্যোঁ জানে ত্যোঁ লীজে হো।' হে প্রিয়তম, তুমি যদি আমাকে শুদ্ধ বলে জানো তবে তুমি আমাকে তুলে নাও। কৃপা করো, তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই। অন্নে রুচি নেই, চোখে নিদ্রা নেই, দিন নেই রাত নেই, পলে পলে দেহ শুধু ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। হে মীরার প্রভু গিরিধর নাগর, এই যে মিলন তোমার সঙ্গে, এতে আর বিচ্ছেদ করিও না।'

গাইতে গাইতে ঢলে পড়ল মীরা। রণছোড়জীর বিগ্রহে বিলীন হয়ে গেল।

ঠাকুর বললেন, 'সংসারীদের অনুরাগ ক্ষণিক, তপ্ত খোলায় জল যতক্ষণ থাকে। একটা ফুল দেখে হয়তো বললে, আহা, কি চমৎকার ঈশ্বরের সৃষ্টি! ব্যস, হয়ে গেল।'

এতটুকুতে হবার নয়। দুর্দাম ব্যাকুল হও। বন্যার উলঙ্গ উন্মাদনা, আগুনের লেলিহান আনন্দ।

'ব্যাকুলতা চাই।' বললেন আবার ঠাকুর, 'ব্যাকুল হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। তিনি যেকালে জন্ম দিয়েছেন সেকালে তাঁর ঘরে আমাদের হিস্যা আছে। তিনি আপনার বাপ, আপনার মা, তাঁর উপর জোর খাটে। দাও পরিচয়। নয় গলায় এই ছুরি দিলাম।'

সারদামণির দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'তুমিও যা আমিও তা। আমরা অভেদ। আমি যাব তুমি থাকবে।'

দুধে যেমন ধাবল্য, অগ্নিতে যেমন দাহিকা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনি আমিই তোমাতে ওতপ্রোত আছি। আমি অচ্যুতবীজরূপ আর তুমি সৃষ্টির আধারভূতা। সমতুল্য প্রকৃতি-পুরুষ। আমাদের অনশ্বর ঐক্য, শাশ্বত সাযুজ্য।

একশো তেষট্টি

দুই শালতরুর মাঝখানে অমিতাভ বুদ্ধ শুয়েছেন বিশ্রামের জন্যে। আশ্চর্য! অকাল-বসন্তের উদয় হল বৃক্ষশাখে। অমিত পুষ্পভারে বৃক্ষশাখা নুয়ে পড়ল। নুয়ে পড়ল অমিতাভের শয়ন-মঞ্চের উপর। আপনা হতেই ফুল ঝরে পড়তে লাগল। আকাশ থেকে গীতধ্বনি নেমে এল মাটিতে।

আনন্দকে উদ্দেশ করে বললেন তথাগত: 'আনন্দ দেখ, দেখ, এখন ফুল-ফোটবার সময় নয়, তবু গাছ ভরে অজস্র ফুল ফুটেছে। শুধু তাই নয়, সে ফুল ঝরে পড়ছে আমার উপর। আকাশে সুর বাজছে মধুক্ষরা। দেবতারা বুদ্ধপূজা করছেন। তাই না?'

'তাই।' আনন্দ চোখ নত করল।

'কিন্তু আনন্দ, এই ভাবে বুদ্ধের সম্যক পূজা হয় না।' বললেন বুদ্ধদেব। 'সত্যে শ্রদ্ধাবান সকল নরনারী নিজের জীবনে ধর্মের যথাযথ শীলন ও পালন করলেই বুদ্ধের যথার্থ পূজা হয়। তাই তোমাকে বলি ধর্মানুসারে জীবন যাপন করবে। অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ব্যাপারেও ধর্মের পবিত্র বিধি পালন করতে কুণ্ঠিত হবে না।'

আনন্দ কাঁদছে। পাছে তার কান্না দেখে ফেলেন, আনন্দ সরে পড়ল।

আমি এখনো লক্ষ্যে উপনীত হইনি। এর জন্যে আনন্দের কান্না। আমার কাম্যবস্তু পাইয়ে দেবার আগেই চলে যাচ্ছে কাম্যতম। জগজ্জ্যোতি যাত্রা করেছে নির্বাণে।

আনন্দকে ডেকে পাঠালেন বুদ্ধদেব। বললেন, 'আনন্দ, শোক কোরো না, হতাশ হয়ো না। ভেবে দেখ, শোকের বা নৈরাশ্যের কি-ই বা আছে! যা আমাদের প্রীতিকর যা আমাদের ভালোবাসার বস্তু তার থেকে একদিন বিচ্ছিন্ন হবই। যা অচিরস্থায়ী তাকে হারিয়ে শোক কি? যা জাত, গঠিত, তা কি করে অবিনাশী হবে? তা ধ্বংসাপন্ন হতে বাধ্য।'

আনন্দ চোখ ফিরিয়ে নিল।

'আনন্দ, তুমি দীর্ঘকাল আমার সেবা করেছ, বিশ্বস্ত বন্ধুর মত থেকেছ আমার পাশে পাশে, চিন্তায় বাক্যে ও কর্মে তোমার আদর্শ থেকে এক তন্তু ভ্রষ্ট হওনি। এই তো যথার্থ পথ। এই পথ ধরে চলে যাওয়াতেই তো সিদ্ধি।'

যুগ্মশালতরুর নিচে ভগবান বিশ্রাম করছেন এ খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। দলে দলে বুদ্ধকে পূজা করবার জন্যে আসতে লাগল নরনারী।

নিশীথ রাত্রি। বুদ্ধদেবের কাছে এসে বসল আনন্দ। বুদ্ধদেব বললেন, 'আনন্দ, তোমার হয়তো মনে হবে, আমাদের শিক্ষা দিতে আর কেউ রইলেন না! কিন্তু তা মোটেই নয়। ধর্ম রইল, যে ধর্ম আমি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি, এই ধর্মই তোমাকে পথ দেখাবে। এই ধর্মই তোমার একমাত্র রাস্তা।

আবার বললেন, 'যা নির্মিত হয়েছে তা বিনষ্ট হবেই। তার জন্যে শোক করা বৃথা। আনন্দ, তুমি নিজেই নিজের আলোকবর্তিকা হও, নিজেতেই আশ্রয় গ্রহণ করো। অবিশ্রান্ত যত্ন করে নিজের মুক্তির পথ নিজে পরিষ্কৃত করো।'

নিজের খোঁজ নাও। চলো কৃত্রিমকে লঙ্ঘন করে সহজের মধ্যে। যারা বলে তিনি দূরে আছেন তারাই দূরে আছে। অনুভবের রসে মাতাল হও। অনুভবই অগম্যের বাণী।

আমি নিজেই নৌকা, নিজেই মাঝি, নিজেই নদী, নিজেই কূল।

আত্মপূজা করছেন ঠাকুর।

ঠাকুরের সামনে পুষ্পপাত্রে ফুলচন্দন এনে রেখেছে। ঠাকুর উঠে বসেছেন শয্যায়। ফুলচন্দন দিয়ে নিজেকেই পুজো করছেন। সচন্দন ফুল কখনো রাখছেন মাথায়, কখনো কণ্ঠে, কখনো হৃদয়ে, কখনো নাভিদেশে। ফুলের মালা নিজেই নিজের গলায় দোলালেন।

পূজা-অন্তে মনোমোহনকে নির্মাল্য দিলেন। মাষ্টার মশাইকে একটি চাঁপা ফুল। আর সুরেন মিত্তির এলে তার গলায় পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা।

আমি কা'কে পূজা করি? আমার মাঝে মা আছেন সেই শুদ্ধবোধানন্দময়ী মাকে পূজা করি। সর্বকেন্দ্রস্বরূপিণী সুধাসিন্ধুনিবাসিনী মাকে।

তুলসী দত্ত, নির্মলানন্দ স্বামী, যখন প্রথম আসে দক্ষিণেশ্বরে, দেখল ঠাকুর নিজ সাধন স্থান পঞ্চবটীতে প্রণাম করে বসলেন নিচের সিঁড়িতে আর ভাবাবিষ্ট হয়ে জগন্মাতার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কি যে কথা বোঝবার সাধ্য নেই তুলসীর, শুধু মাঝে মাঝে কানে আসতে লাগল হৃদয়-পরিপূর্ণ ধ্বনি, মা, মা!

বাগবাজারে তুলসীর বাড়ি। সে বাড়িরই এক অংশে গঙ্গাধর, অখণ্ডানন্দ স্বামী থাকে, সামনেই হরিনাথ বা তুরীয়ানন্দের বাসা। তিন জনের গলায়-গলায় ভাব।

হরিনাথ আর গঙ্গাধর ঠাকুরকে প্রথম দেখে দীননাথ বসুর বাড়িতে, তুলসী দেখে বলরাম বসুর বাড়িতে। হরিনাথরা শোনে কে একটা পাগল গান গাইছে, যশোদা নাচাতো তোরে বলে নীলমণি, আর তুলসী দেখল কে একটি মাতাল, টলতে টলতে বৈঠকখানায় এসে ঢুকছে। চোখে চোখ পড়ল তুলসীর আর মুহূর্তে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে একটা বিদ্যুৎকম্পন উঠে গেল।

যেন বার্তা পাঠালেন। খাস দক্ষিণেশ্বর। খাস একা-একা! যখন শুধু তোতে-আমাতে।

কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ঠাকুরের ভাষায়, জীবন্ত শিব। তুলসী যখন নিতান্ত বালক মা-বাবার সঙ্গে কাশী এসেছে। খেলবার জায়গা করেছে যেখানটায় মৌনী হয়ে অবস্থান করছেন ত্রৈলঙ্গ। এক দঙ্গল ছেলের সঙ্গে তুলসীও ত্রৈলঙ্গর শান্তিভঙ্গ করছে। এক-দিন খাপ্পা হয়ে সব শিশুগুলোকে তাড়িয়ে দিল, কিন্তু কি মনে করে তারই মধ্যে থেকে তুলসীকে সে ডাকল ইসারায়। কি জানি কেন তাকে একটু প্রসাদ খেতে দিল।

তুলসী বলে, দীক্ষা নানারকমের হয়, কখনো বা হয় উদরের মাধ্যমে। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কাছে আমি উদর-মাধ্যমে প্রথম দীক্ষা পেলুম।

কিন্তু এই দীক্ষা দৃষ্টির মাধ্যমে। যে হয় আপনজনা, সহজেই যায় যে চেনা।

একদিন দুপুরবেলা একা-একা গিয়েছে তুলসী। বলা-কওয়া নেই সটান ঢুকে পড়েছে ঠাকুরের ঘরের মধ্যে। কোনটা যে ঠাকুরের ঘর এও তার জানার কথা নয়। গিয়ে দেখল ঠাকুর খাচ্ছেন। বলা-কওয়া নেই, মেঝের উপর নিচু হয়ে টিপ করে প্রণাম করল। এই কি প্রণাম করবার ছিরি? খাবার সময় কেউ প্রণাম করে! কে জানে! নিয়ম-কানুন শিখলুম কোথায়!

খাওয়া শেষে ঠাকুর খাটে ডেকে নিয়ে গেলেন। মুখ-হাত ধুয়ে খাসে বসেই পান-তামাক খেতে লাগলেন। বললেন, 'জানিস তোর মতন একটা ছেলে সেদিন এসেছিল আমার কাছে—'

'আমার মতন?'

'অবিকল তোর মতন। এমনি মুখ-চোখ, এমনি ছিরি-ছাঁদ।' ধর না, তুই-ই এসেছিলি।'

'বা, আমি আসলুম কখন?'

'তা তুই কি করে জানবি। ধর ঘুমের মধ্যে চলে এসেছিলি।'

'এসে কি বললাম?'

'বললি, আমার মধ্যস্থ হতে পারবেন?'

'বা, আমি কার সঙ্গে ঝগড়া করলাম যে আপনাকে মধ্যস্থ হতে বলব?'

'ওরে ঝগড়ার মধ্যস্থ নয়, মিলনের মধ্যস্থ। বুঝতে পারছিস না?'

'না।'

'তুই এসে আমাকে বললি, আপনি আমাকে ভগবানের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারবেন? তুই যদি আগে এসে না মিলিস তবে তোকে মেলাব কি করে?' ঠাকুর তাঁর বাঁ হাতখানা রাখলেন তুলসীর কাঁধের উপর।

তুলসী চকিতে বুঝল ইনিই হচ্ছেন গুরু, মধ্যস্থ। পরে বুঝল, অনাদিমধ্যান্ত। 'নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপং।'

বরানগরের নারায়ণ শিরোমণি প্রকাণ্ড কথক। ঠাকুরকে দেখতে একবার এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। বলছে, 'আমি দেশবিদেশ ঘুরে কত হরিনাম করে বেড়াই, কত গীতা-ভাগবতের কথা শোনাই, কত লোককে মাতিয়ে দি। শুনতে পাই আপনিও নাকি অনেক উপদেশ দেন, হরিগুণগান করে লোক মাতান। আমাতে-আপনাতে তবে তফাৎ কতটুকু? শুনতে পাই, আপনার নাকি খুব উচ্চ অবস্থা। বলতে পারেন সে অবস্থায় পৌঁছুতে আমার কত দেরি?'

ঠাকুর একটু হাসলেন। বললেন, 'ওগো, বেশি দেরি নেই, বেশি তফাৎও নেই—এই একটুকুন বাকি।' বলে আঙুলের একটি কড় দেখালেন। 'তুমি কি কম লোক গা? তোমার গুণের অবধি নেই। তুমি হরিকথা শুনিয়ে কত প্যালা পাও, আর আমার এখানে কারু প্যালা লাগে না। তোমার মত পণ্ডিতের সঙ্গে কি আমার তুলনা হতে পারে? আমি মুখখু সুখখু মানুষ, লেখাপড়ার ধার ধারি না, মা যা বলান তাই বলি। আর তোমার কত বিদ্যা, কত মুখস্ত কত জ্ঞানগরিমা—'

আবার বললেন, 'মাকে বলি, মা, মুখখুর মত গাল নেই। তুই আমার এই গালটা ঘুচিয়ে দে। কিন্তু মা আমার কথায় কানও দেয় না।'

যোগীনকে ডাকলেন ঠাকুর। 'যোগীন, পাঁজিখানা নিয়ে আয় তো।'

যোগীন পাঁজি নিয়ে এল।

'পঁচিশে শ্রাবণ থেকে প্রতিদিনের তিথি-নক্ষত্র সব পড়ে শোনা তো।'

যোগীন পড়তে লাগল। পঁচিশে, ছাব্বিশে, পড়তে লাগল পর-পর। পড়তে-পড়তে এল শ্রাবণ সংক্রান্তিতে। একত্রিশে শ্রাবণ।

'রাখ, আর পড়তে হবে না।' ইঙ্গিতে পঞ্জিকা রেখে দিতে বললেন।

'কেন?' যোগীনের কণ্ঠ উদ্বেগভারাতুর।

'বেশ রাত্রি, বেশ তিথি। ঝুলনপূর্ণিমা।' [ক্রমশঃ।

শিল্পায়ন

দুর্গাদাস সরকার

গ্যালারির চারি ধারে অনুপম রঙের সুরভি,
তারি মাঝে প্রাণময় ভাষা দু'টি চোখের তারায়।
সে চোখের আকর্ষণে গৃহী আসে; সন্ন্যাসী দাঁড়ায়,
অনুভবে ভাসে তার পুনরায় সংসারের ছবি।

হাসিমুখ: প্রীত মন: ঠিক যেন জীবন্ত মুখর।
শান্ত স্নিগ্ধ মুখে মুখে সে ছবির ছড়ানো আভাস;
তারি মুখ মনে ভেবে ভোলা যায় দূরের প্রবাস।
কেউ বলে: ধন্য শিল্পী, তুলি তার আশ্চর্য সুন্দর।

কেদারায় মৌন শিল্পী: টেবিলে কনুই: গালে হাত।
শূন্য তার দেহাধার। এ ছবিতে সমস্ত চেতনা।
'স্বর্ণ ক্ষুধা লুণ্ঠন-প্রয়াস'—তাতে শিল্পী কতো হাত।
গ্যালারিতে আছে তবু সৌন্দর্যের মহৎ প্রেরণা।

রামমোহন রায়ের চিঠি

মহামহিমান্বিত শ্রীযুক্ত লর্ড আমহার্ষ্ট গভর্ণর জেনারেল
মহোদয় সমীপেষু—

মাই লর্ড,

ভারতবাসী গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজের মতামত প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এরূপ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ পূর্ব্বক নীরব থাকাও অত্যন্ত দূষণীয়। ভারতের বর্ত্তমান শাসনকর্তৃগণ বহু সহস্র মাইল দূর হইতে এমন একটি জাতিকে শাসন করিতে আসিয়াছেন, যাঁহাদের ভাষা, সাহিত্য, আচার, ব্যবহার ও মনোগত ভাব তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন ও অপরিচিত এবং তজ্জন্যই তাঁহাদের প্রকৃত অবস্থা তাঁহারা দেশীয়দিগের ন্যায় সহজে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন না। অতএব যদি আমরা এই বর্ত্তমান প্রয়োজনীয় ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের শাসনকর্তৃগণকে বাস্তবিক কথা না বলি যদ্দ্বারা তাঁহারা এদেশের মঙ্গলজনক উপায় উদ্ভাবন ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, এবং যদি আমাদের স্থানীয় জ্ঞান এবং বহুদর্শিতা দ্বারা তাহাদিগের এই উন্নতি সাধন জন্য সদিচ্ছার অনুমোদন না করি, তাহা হইলে আমরা নিজেদের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে সম্পূর্ণরূপে পরাঙ্মুখ বলিয়া অপরাধী হইব এবং আমরা শাসনকর্তৃগণকে আমাদের বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতে উপযুক্ত সুযোগ প্রদান করিব।

গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে যে শিক্ষা দ্বারা উন্নত করিতে সমুৎসুক, কলিকাতায় একটি নূতন সংস্কৃত স্কুল স্থাপনই সেই মহদিচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছে। এই মঙ্গলজনক কার্য্যের জন্য ভারতবাসী চিরকাল তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। মানবজাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তিই ইচ্ছা করিবেন যে, এই শুভকার্য্যের উন্নতিকল্পে প্রত্যেক চেষ্টা সংস্কৃত জ্ঞান দ্বারা এরূপভাবে পরিচালিত হয় যেন তদ্দ্বারা ভারতবাসীর জনস্রোত উত্তরোত্তর উন্নতির অভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে।

যখন এই বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হয়, তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য বৎসর বৎসর প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে আদেশ করিয়াছেন। তখন আমাদের নিশ্চয় আশা জন্মিয়াছিল যে এই অর্থ দ্বারা ভারতবাসীকে গণিত, প্রাকৃতিক, বিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্র শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য বিজ্ঞ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ নিযুক্ত হইবেন। কারণ এই সকল বিজ্ঞান-শাস্ত্র য়ুরোপে অনেক পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে। তদ্দ্বারা উহার অধিবাসিগণ পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অধিবাসিগণ অপেক্ষা বহুল পরিমাণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।

"আমাদের ভাবী রাজপুরুষদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা উন্নত করা হইবে," এই আশান্বিত প্রতিশ্রুতি শ্রবণে আমাদের হৃদয় আনন্দে এবং কৃতজ্ঞতাতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকট আমরা এই বলিয়া ধন্যবাদ দিয়াছি যে এশিয়াতে আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বীজ রোপণ করিবার জন্য এই উদার ও উন্নত জাতিকে তিনি এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন।

আমরা দেখিতেছি, যে জ্ঞান ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেই জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্ট দেশীয় অধ্যাপকদিগের তত্ত্বাবধানে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিতেছেন। লর্ড বেকনের পূর্ব্বে য়ুরোপে যেরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই বিদ্যালয় তদনুরূপ হইবে। ইহাতে যুবকগণ কেবল ন্যায়ের ফাঁকি ও ব্যাকরণের কূট তর্ক শিক্ষা করিবে। তাহাতে সমাজের ও শিক্ষার্থীর কাহারও কোন উপকার হইবে না। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে শাস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হইত, এখনও যুবকদিগকে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইবে। তৎসঙ্গে তাহারা কল্পনাশীল মনুষ্যগণের কল্পনাপ্রসূত কতকগুলি শূন্যগর্ভ বাকচাতুর্য্য শিক্ষা করিবে, যাহা বর্ত্তমানে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে সচারাচর শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষা এত কঠিন যে, উহা শিক্ষা করিতে একটি জীবন অতিবাহিত হয়। ইহা সকলেই অবগত আছেন, বহুকাল হইতে এই ভাষা দ্বারা জ্ঞান বিস্তারের পথ প্রায় একরূপ বন্ধ হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে জ্ঞান নিবিষ্ট রহিয়াছে তাহা শিক্ষা করিলে পরিশ্রমানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার মধ্যে যে মূল্যবান জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে তাহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য যদি এই ভাষা বিস্তারের প্রয়োজন হয় তবে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন ব্যতীতও অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে ইহা বিস্তার করা যাইতে পারে। কারণ, এই নূতন বিদ্যালয় যে উদ্দেশ্যে স্থাপন করার প্রস্তাব হইতেছে, বর্ত্তমানে দেশের নানা স্থানে যে সকল সংস্কৃতাধ্যাপক এই ভাষা ইহার ন্যায়-দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহাদের দ্বারাই সেই উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতেছে। সুতরাং যদি এই সমুদায় শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন বাঞ্ছনীয় হয়, তবে যে সকল সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর বিজ্ঞতম অধ্যাপকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই ভাষা শিক্ষা দিতেছেন তাঁহাদিগকে মাসিক অথবা বার্ষিক কিছু কিছু বৃত্তি প্রদান করিলেই তাঁহারা অধিকতর উৎসাহিত হইবেন। তাহা হইলেই উল্লিখিত উদ্দেশ্য ফলপ্রদ হইবে।

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমি মহাশয়ের নিকট বিহিত সম্মান পুরঃসর এই প্রার্থনা করিতেছি, যে অর্থ এদেশীয় লোকের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইংলণ্ডস্থ রাজপুরুষগণ প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা যদি নূতন প্রস্তাবিত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তবে উহা দ্বারা ইহার উদ্দেশ্য কখনও সংসাধিত হইবে না! কারণ যদি যুবকেরা বার বৎসর কাল—যাহা তাহাদের জীবনের উৎকৃষ্টতম অংশ—কেবল ব্যাকরণের কূটতর্ক শিক্ষা করিতে ব্যয় করে, তবে তাহাদের দ্বারা কোন উন্নতির আশাই করা যাইতে পারে

না। দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতেছে "খাদ" ধাতুর অর্থ খাওয়া কিন্তু "খাদন্তি" এই শব্দ দ্বারা পুং, স্ত্রী ও ক্লীব এই ত্রিবিধ লিঙ্গবাচক এক বচনান্ত পদার্থের খাওয়া বুঝা যাইতেছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে "খাদন্তি" অর্থাৎ "খাদ" এবং ন্তি এই অংশসমষ্টিই উল্লিখিত ত্রিবিধ লিঙ্গবোধক পদার্থের খাওয়া বুঝাইতেছে। কিংবা শব্দের রূপ ভেদ দ্বারা উল্লিখিত ত্রিবিধ অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। যেমন ইংরেজী ভাষাতে প্রশ্ন হইতে পারে 'Eat' শব্দের কি পরিমাণ অর্থ এবং S এর দ্বারাই বা কি পরিমাণ অর্থ হয়! ঐ শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ তাহার উক্ত দুই অংশ পৃথকরূপে কিম্বা একত্র প্রকাশ করে কি না?

আত্মা ঈশ্বরেতে কি প্রকারে বিলীন হয়, পরমাত্মার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ প্রভৃতি বেদান্ত-প্রদর্শিত জল্পনার আলোচনা দ্বারাও অধিক উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। যে বেদান্তে দৃশ্যমান কোন পদার্থেরই প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি কাহারও সত্তা নাই, সুতরাং তাঁহারা যথার্থ আদরের যোগ্য নহে। যত শীঘ্র পৃথিবী এবং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা যায়, ততই মঙ্গল প্রভৃতি শিক্ষা দেয়, সেই বেদান্ত শাস্ত্রের মত শিক্ষা দ্বারা যুবকগণ সমাজের অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত সভ্য হইতে পারে না। বেদান্তের কোন কোন শ্লোক উচ্চারণ দ্বারা ছাগ হত্যার পাতক নিরাকৃত হয়: এবং বেদের কোন কোন শ্লোকের কি প্রকার প্রকৃতি এবং বল তাহা মীমাংসাশাস্ত্র হইতে শিক্ষা করিলেও কোন প্রকৃত উপকার সাধিত হয় না।

ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ কত প্রকার কাল্পনিক শ্রেণীতে বিভক্ত— আত্মার সহিত শরীরের, শরীরের সহিত আত্মার এবং চক্ষুর সহিত কর্ণের কি প্রকার সম্বন্ধ, ন্যায়শাস্ত্র হইতে এই সমস্ত শিক্ষা করিয়াই বা মনের কি উন্নতি সাধিত হইতে পারে?

লর্ড বেকনের পূর্বে য়ুরোপে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অবস্থা যেরূপ ছিল তৎপ্রণীত গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হওয়ার পর জ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহার সঙ্গে যদি পূর্বোল্লিখিত বিষয়ের তুলনা করেন তাহা হইলেই আপনি ঐরূপ কাল্পনিক বিষয় শিক্ষা দেওয়ার উপযোগিতা বুঝিতে পারিবেন।

যদি ইংরেজ জাতিকে প্রকৃতজ্ঞানে অজ্ঞ রাখাই অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে অজ্ঞানতা বিস্তার করিতে সমধিক উপযোগী প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রকর্তাদিগের প্রবর্তিত পদ্ধতি অতিক্রম করিয়া লর্ড বেকনের দর্শন অনুমোদিত এবং গৃহীত হইত না। সেইরূপ যদি এ-দেশীয়গণকে অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত রাখাই ইংলণ্ডীয় আইন-কর্তাদিগের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত শিক্ষা তদ্বিষয়ে যথেষ্ট উপযোগী হইবে। কিন্তু এদেশীয়গণকে উন্নত করাই যখন গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য, তখন গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরতত্ত্ব, উদার ও কুসংস্কার বিনাশক অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য এবং সেই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য প্রস্তাবিত টাকা দ্বারা আবশ্যকীয় পুস্তক ও নানাবিধ যন্ত্র সম্বলিত একটি কলেজ স্থাপন করা উচিত, ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য য়ুরোপ হইতে পণ্ডিত আনয়ন করা কর্ত্তব্য।

মহাশয়ের নিকট এই বিষয় নিবেদন করিয়া আমি আমার স্বদেশীয়দিগের প্রতি এবং আমার স্বদেশীয়দিগের উন্নতি সম্পাদনেচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যে উদারমনা ভূপতি এবং আইনকর্তাগণ এই সুদূর ভূভাগে তাঁহাদের মঙ্গলজনক হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি এক অতি গভীর কর্তব্য সম্পাদন করিলাম বলিয়া অনুভব করিতেছি।

আমি বিনীতভাবে বিশ্বাস করি যে, মহাশয়ের নিকট আমার মনোভাব ব্যক্ত করিতে আমি যে স্বাধীনতা পাইয়াছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

একান্ত বশংবদ ভৃত্য
শ্রীরামমোহন রায়

রাজা রামমোহনের সময় সাধারণ লোকে সংস্কৃত ভাষার চর্চা করতো না। মুষ্টিমেয় বামুন-পণ্ডিত সংস্কৃতের চর্চা করতেন। আদালতের ভাষা ছিল ফারসি, তাই যারা চাকরির উমেদার তারাই সেই ভাষা শিখতো। এই অবস্থায় বিলাতের শাসনকর্তৃপক্ষ দেশের লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দেন। গবর্ণমেণ্ট এই টাকায় এদেশে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শেখানো সাব্যস্ত করেন। সেই উদ্দেশ্যে কাশীতে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় আর কলিকাতায় একটি মাদ্রাসা খোলা হয়। কলিকাতাতে আর একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের জল্পনাও চলতে থাকে। কিন্তু স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট, ডেভিড হেয়ার এবং রাজা রামমোহন রায় এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। তাঁরা এদেশের লোকেদের সংস্কৃত ফারসির বদলে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টীয় শতকে রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত শিক্ষার বদলে এদেশের লোকেদের ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে এই চিঠি লেখেন। তিনি পরিষ্কার যুক্তি দেখিয়ে প্রমাণ করেন যে, বহু শতাব্দীর কুসংস্কার কখনো ইংরেজী শিক্ষা আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রচার ছাড়া দূর করা যাবে না।

এই চিঠিটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগের কমিটির কাছে ইহা পাঠান। অবশ্য এর ফলে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব একেবারে রহিত হয়নি, তবু ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার জন্যে ১৮২৪ খৃষ্টীয় শতকের ফেব্রুয়ারি মাসে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়।

(চিঠিটি ইংরেজী থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।)

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

১

সমালিঙ্গনপূর্বক নিবেদনমিদং—

গত বৎসরের এই আশ্বিন মাসের এই প্রথম দিবসে আপনাদের পুষ্পকাননে অশোক বৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া মনোহর প্রাতঃকালে আপনার উদার হস্ত হইতে যে কৃপা ও প্রেম আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম, আজি কয়েক দিবসাবধি হইল তাহা মনে আন্দোলিত হইয়া এই পর্বতের অরণ্যমধ্যে অন্তশ্চক্ষুতে আপনাকে দেখিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছিলাম, এমন সময়ে আপনার চিরপরিচিত বর্ণাবলীবিন্যস্ত পত্র আমার হস্তগত হইল। তাহা এমন সময়ে আমার হস্তগত হইবামাত্র আমি একেবারে আশ্চর্য্য ও চমকিত হইলাম, এবং

যারপরনাই আনন্দ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আত্মার সহিত আত্মার কি প্রেমযোগ—সে শরীর-ব্যবধান জানে না। আমি আপনাকে স্মরণ করিবামাত্র আপনার পত্র যেন আমার হস্তে উড়িয়া আসিয়া পড়িল। এই পত্রে আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন, এই সংবাদ লাভ করিয়া আমার মনের হর্ষ আরো দ্বিগুণিত হইল। এমনি শুভ সংবাদ যেন সর্ব্বদা পাই।

মধ্যে আপনি কৃপা করিয়া আমাদের বাটীতে যাইয়া দ্বিজেন্দ্র ও হেমেন্দ্রকে যে উৎসাহ ও আনন্দ প্রদান করিয়া আসিয়াছিলেন, ইহা শ্রবণে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। এই পর্ব্বতের চূড়ার উপরে এই প্রাতঃকালে সূর্য্যকিরণ অতি মধুর বোধ হইতেছে। মনে হইতেছে যে,এই সময়ে আপনার মুখ হইতে এই গানটি শুনিতে পাইলে স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিতাম। "নয়ন খুলিয়া দেখ নয়নাভিরামে! হৃদয়-কমল বিকাশে যাঁর নামে। গগনে ভানু সহস্রকর বিস্তারি জগৎ-মন্দিরে বিরাজেন স্বপ্রকাশ—দেখ দেখ প্রেমাকরে দিবাকর জানিয়া সুন্দর উজ্জ্বল অনুপমে।" কোথায় গত বৎসরের এই আশ্বিন মাসের এই প্রথম দিবসে আপনার সহিত আপনাদের পুষ্প-কাননে—আর কোথায় অদ্য প্রাতঃকালে এই বনে বসিয়া আপনাকে ভাবিতে ভাবিতে এই পত্র লিখিতেছি। আবার আগামী বৎসরে এই সময় যে কোথায় থাকি, তাহার কিছুই বলা যায় না। আপনি মধুর স্বরে আমায় ডাকিতেছেন, 'তু আওরে।' কিছুই বলা যায় না।—হয়ত 'আগল ফাল্গুন মে তুমসে মেলৌঙ্গি'। আওর 'মন কি কমলদল খোলিখা শুনৌঙ্গি'। সম্প্রতি এখান হইতে আমি সমুদয় হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, মনের মত আপনার সাধুসঙ্গ লাভ হউক এবং আপনি পুণ্যপুঞ্জেতে পবিত্র হইয়া ভগবৎ প্রেমধন অধিকাধিক সর্ব্বদা সঞ্চিত করিতে থাকুন। আপনার স্নেহময়ী দুহিতা ও প্রাণতুল্য জামাতা সপরিবারে চিরজীবী হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কুশলে থাকুন এবং আপনার হৃদয়কে আনন্দিত করুন। আর আর সমস্ত মঙ্গল। ইতি।

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ ও
সতত কৃপাপ্রার্থিনঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

এই চিঠিখানি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ধর্মশালা পাহাড় থেকে তাঁর শেষ বয়সের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ শ্রীকণ্ঠ সিংহকে লেখেন। শ্রীকণ্ঠ বাবুর বাড়ী ছিল রায়পুরে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-স্মৃতিতে পিতার এই ভক্ত-বন্ধুটির অতি সুন্দর ছবি এঁকেছেন। কবির ভাষায়—"বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ক বোম্বাই কমিটির মত অম্লরসের আভাস বর্জ্জিত—তাঁহার স্বভাবের কোথাও এতটুকু আঁশ ছিল না। মাথাভরা টাক, গোঁফদাড়ি কামানো, স্নিগ্ধমধুর মুখবিবরের মধ্যে দাঁতের কোন বালাই ছিল না, বড় বড় দুই চক্ষু অবিরাম হাস্যে সমুজ্জল। তাঁহার স্বাভাবিক ভারি গলায় যখন কথা কহিতেন, তখন তাঁহার সমস্ত হাত মুখ চোখ কথা কহিতে থাকিত। ইনি সেকালের পার্সিপড়া রসিক মানুষ। ইংরেজির কোন ধার ধারিতেন না। তাঁহার বামপার্শ্বের নিত্যসঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার এবং কণ্ঠে গানের আর বিরাম ছিল না।

দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে গেলেই শ্রীকণ্ঠ বাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে 'শান্তিনিকেতনের বুলবুল' বলে ডাকতেন। শ্রীকণ্ঠ বাবুর গান আর সেতারের ঝঙ্কার তাঁর শান্তিনিকেতনের নির্জন মুহূর্তগুলি ভরপুর করে রাখতো। শ্রীকণ্ঠ বাবুকে লেখা তাঁর সব চিঠিই এমনি অনুরাগে ভরা এবং রসোচ্ছল।

বাক্রোটা শিখর
৮ বৈশাখ, ১৭১৮ শক

প্রেমাস্পদেষু

নববর্ষের প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বক নমস্কার—

দ্বিজেন্দ্রের কন্যা সরোজার শুভ বিবাহ উপস্থিত। তুমি জ্ঞানচন্দ্র ও গড়গড়িকে লইয়া বেদিতে আসন গ্রহণ করিবে এবং আচার্য্যের কার্য্য সমাধা করিয়া এই শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন করিয়া দিবে। স্ত্রী আচার হইয়া বরকন্যা দালানে আইলে তবে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইবে, তাহার পূর্ব্বে তাহাতে বসিবে না। দ্বিজেন্দ্রের সঙ্গে বরযাত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া দালানে বসাইবে। পরে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইলে বরযাত্রদিগকে দালানের বেদীর পশ্চিমভাগে আদরপূর্ব্বক বসাইবে। এবং বরকে গদি হইতে উঠাইয়া আনিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া দিবে। গদি খালি হইলে সেই গদি বরের জন্য বাটীর ভিতরে পাঠাইয়া দিবে এবং তাহার দুই পার্শ্বে বৈঠকী সেজ বেদীর দুই পার্শ্বে বসাইয়া দিবে। তাহা হইলে বেদীতে আলো কম হইবে না এবং তুমি পুঁথি বেশ দেখিতে পাইবে। সময় আছে বলিয়া এই সকল তোমাকে বলিয়া দিলাম, নতুবা বাহুল্যমাত্র। তোমার বেহালার বাটীতে সকলে কেমন আছেন এবং তোমার নিজের শরীর বা কেমন আছে, জানাইয়া আপ্যায়িত করিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

পুঃ—যদি গড়গড়ি আসিতে না পারেন, তাঁহার কোন ব্যাঘাত হয় তবে তাঁহার স্থানে কোন্নগরের দয়ালচাঁদ ভট্টাচার্য্যকে বসাইয়া দিবে।*

[* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিঠিগুলি অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

মহর্ষি ধ্যানে নিমগ্ন থাকলেও বিষয়কর্মে যে উদাসীন এবং পরাঙ্মুখ ছিলেন না এই চিঠি তার সুন্দর নিদর্শন। কোন ক্রিয়াকর্মে কোন্ জিনিষ কোথায় থাকবে, কোন্ অনুষ্ঠান কখন্ করতে হলে, কে কোন্ দিকে বসবে এ সমস্তই তিনি ভাল করে ভেবে তারপর লিখে পাঠিয়েছেন। তাঁর সমস্ত কল্পনা এবং কাজের মধ্যে এই রকম নিখুঁত শৃঙ্খলা থাকতো, কোথাও এতটুকু ফাঁক বা শৈথিল্য তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এ সমস্ত সাংসারিক খুঁটিনাটি কাজও যেন তাঁর ধ্যানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠেছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠি

অশেষ গুণাশ্রয়

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাশ মহাশয়

পরম কল্যাণভাজনেষু

সাদর সম্ভাষণমাবেদনম্—

* * আপনি অভিপ্রেত বিষয়ের সিদ্ধির নিমিত্ত আন্তরিক যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং অবশেষে সঙ্কল্পিত বিষয়ে যেরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে তাহার সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে। এ বিষয়ে আপনি যে কিরূপ ক্ষোভ ও মনস্তাপ পাইয়াছেন তাহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, এই ক্ষোভ ও মনস্তাপ সহসা আপনকার অন্তঃকরণ হইতে দূর হইবার নহে। কিন্তু সাংসারিক বিষয়ের এইরূপই নিয়ম। সদভিপ্রায় সকল, সকল সময়ে সম্পন্ন হইয়া উঠে না। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" শুভ কার্য্যের নানা বিঘ্ন! আমি যে অবধি এই বিষয়ে জানিতে পারিয়াছিলাম সর্ব্বদা এই আশঙ্কা করিতাম, আপনকার অগ্রজের কর্ণগোচর হইলে সকল চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবেক। অবশেষে তাহাই ঘটিয়া উঠিল। যাহা হউক, এই চেষ্টা বিফল হইয়াছে বলিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হইবেন না। কত বিষয়ে কত চেষ্টা, কত উদ্যোগ করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সে সকল সফল হইয়া উঠিবে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, যাহাদের অভিপ্রায় সৎ ও প্রশংসনীয় এরূপ লোক অতি বিরল এবং শুভ ও শ্রেয়স্কর বিষয়ে বাধা ও ব্যাঘাত জন্মাইবার লোক সহস্র সহস্র। এমত অবস্থায় চেষ্টা করিয়া যতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় তাহাতেই সৌভাগ্য জ্ঞান করিতে হয়। এ বিষয় সম্পন্ন হইলে আমি আপনাকে যেরূপ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করিতাম এইরূপে ব্যাঘাত ঘটাতেও সেইরূপ করিব। কারণ কর্ম্ম সম্পন্ন হউক আর নাই হউক, আপনকার সাহস, মানসিক মহত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান গুণের স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে এবং ইহাও স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, সকল বিষয়ে আপনকার সম্পূর্ণ হস্ত থাকিলে অবশ্যই অভিপ্রেত কর্ম্ম সম্পন্ন হইত। আপনি যেরূপ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন আমার বোধ হয় আর কেহই সাহস করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। ফলতঃ আপনি একজন প্রকৃত পুরুষ বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘজীবী হউন, আপনি দীর্ঘজীবী হইলে অনেক লোক অনেক প্রকারে আপনকার নিকট অনেকবিধ উপকার লাভ করিতে পারিবেক। * *

ভবদীয়স্য

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পিতামহ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল দুর্গামোহন দাশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় তাঁহার বালিকা বিমাতার বিবাহ দেওয়ার জন্তে প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁহার বড় ভাই কালীমোহন দাশ এই বিবাহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁর আপত্তির ফলেই দুর্গামোহন বাবু ব্যর্থ হয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আক্ষেপপূর্ণ একটি চিঠি লেখেন। তার উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের নানা বিপদ ও অসুবিধার মধ্যেও দুর্গামোহন বাবুকে সান্ত্বনা দিয়ে এই চিঠি পাঠান। এই সময়ে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টা করতে করতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিরন্তর বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে কিন্তু তবুও তিনি হতাশ হননি।

২

আমি ক্রমাগত কয়েকদিনই চেষ্টা দেখিলাম কিন্তু তোমার কাগজ খোলসা করিয়া দিবার উপায় করিতে পারিলাম না। সুতরাং সত্বর তোমার কাগজ তোমাকে দিতে পারি এমন পথ দেখিতেছি না। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার কাগজ লই নাই। বিধবাবিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে লইয়াছিলাম, কেবল তোমার নিকট নহে, অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এ সকল কাগজ এই ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবাবিবাহপক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহায্য দান অঙ্গীকার করিয়াছেন তদ্দ্বারা অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। উত্তরোত্তর এবিষয়ের ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু আয় ক্রমে খর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং আমি বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি; সেই সকল ব্যক্তি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলে, আমাকে এরূপ সঙ্কটে পড়িতে হইত না, কেহ মাসিক, কেহ এককালীন, কেহ বা উভয় এইরূপ নিয়মে অনেকে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কোন হেতু দেখাইয়া কেহ বা তাহা না করিয়াও দিতেছে না। অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় তুমিও মাসিক ও এককালীন সাহায্য দান স্বাক্ষর কর। এককালীনের অর্দ্ধমাত্র দিয়াছ, অবশিষ্টার্দ্ধ এ পর্য্যন্ত দাও নাই এবং কিছুদিন হইল মাসিক দান রহিত করিয়াছ। এইরূপে আয়ের অনেক খর্ব্বতা হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই বিষয় উপলক্ষে যে ঋণ হইয়াছে তাহার সহসা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমি এই ঋণ পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি। অন্য উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে তোমার প্রয়োজনের সময় তোমাকে তোমার কাগজ দিতে পারিলাম না, এজন্য অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্ম্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে আশ্বাস করিয়া ধনেপ্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করে দূরে থাকুক, কেহ ভুলিয়া এ বিষয়ের সংবাদ লয়েন না। * *

ভবদীয়স্য

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

এই চিঠিটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশিষ্ট বন্ধু, এবং বাগ্মিপ্রবর স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা। বিধবাবিবাহের খরচ পূরণের উদ্দেশ্যে দুর্গাচরণ বাবুর কাছ থেকে তিনি কিছু টাকা গ্রহণ করেন। কিছুকাল

পরে দুর্গাচরণ বাবু আর্থিক কষ্টে পড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে সেই টাকার জন্তে চিঠি দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তার উত্তরে এই চিঠি লেখেন।

৩

শ্রীশ্রীহরি শরণং

শুভাশিষঃ সন্তু—

২৭ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এই সংবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।

ইতিপূর্ব্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্বমহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম সে বিবাহ স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা আমার পক্ষে কোন মতে উচিত কার্য্য হইত না। আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী-বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পরিতাম না, ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে! বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম, জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই, এবিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি; সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি তুচ্ছ কথা। কুটুম্বমহাশয়েরা আহারব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহই হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।

অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আহারব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবেক, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সে জন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবে, এরূপ বোধ হয় না এবং আমিও তজ্জন্য বিরূপ বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায়, এরূপ বিষয়ে সকলেই স্বতন্ত্রেচ্ছ, অন্যদীয় ইচ্ছার অনুবর্ত্তী বা অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া চলা কাহারও উচিত নহে। ইতি ৩১শে শ্রাবণ।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

এই পত্রটি বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর তৃতীয় সহোদর শম্ভুচরণ বিদ্যারত্নকে লেখেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন: "তিনি বিধবা বিবাহ কিরূপ চক্ষে দেখিতেন এবং তাহার সিদ্ধিকল্পে কতদূর ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন এবং আরও কতটা করিতে পারিতেন তাহার নিখুঁত ছবি ঐ পত্রের বর্ণে বর্ণে অঙ্কিত রহিয়াছে।"

৪

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পিতৃদেব শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্

নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে সাংসারিক বিষয়ে সংসৃষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব, এরূপ বোধ হয় না। এজন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃতভাবে অতিবাহিত করিব। এই সঙ্কল্প করিয়া শ্রীমতী মাতৃদেবী প্রভৃতিকে যে পত্র লিখিয়াছি, তার প্রতিলিপি শ্রীচরণসমীপে প্রেরিত হইতেছে, যদি ইচ্ছা হয় দৃষ্টি করিবেন।

সাংসারিক বিষয়ে আমার ন্যায় হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি, সে বিষয়ে কোন অংশে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। 'যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না।' এই প্রাচীন কথা কোন ক্রমেই অযথা নহে। সংসারী লোকে যে সকল ব্যক্তির কাছে দয়া ও স্নেহের আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁহাদের একজনেরও অন্তঃকরণে যে, আমার উপর দয়া ও স্নেহের লেশমাত্র নাই, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। এরূপ অবস্থায় সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া ক্লেশভোগ করা নিরবচ্ছিন্ন মূর্খতার কর্ম্ম। যে সমস্ত কারণে আমার মনে এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে আর তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে আমার বক্তব্য এই যে, পিতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং আপনকার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি তাহা বলা যায় না। তজ্জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর বচনে শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

কার্য্যগতিকে ঋণে বিলক্ষণ আবদ্ধ হইয়াছি ঋণ পরিশোধ না হইলে লোকালয় পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে যাহাতে সত্বর ঋণমুক্ত হই তদ্বিষয়ে যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছি। ঋণে নিষ্কৃতি পাইলেই কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিব। * * আপনকার নিত্যনৈমিত্তিক

ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যাহা প্রেরিত হইয়া থাকে, যতদিন আপনি শরীর ধারণ করিবেন কোন কারণে তাহার ব্যতিরেক ঘটিবে না।

ইতি ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৬। *

ভৃত্যঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠিগুলি চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

এই চিঠির মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দারুণ মনস্তাপ এবং ক্ষোভের যে প্রকাশ ঘটেছে তাহার কারণ ব্যাখ্যা বাহুল্য মাত্র। তিনি দেশের মঙ্গলের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাই সে কাজে পদে পদে বাধা পেয়ে এবং অনেকের কাছে প্রতারিত হয়েও তিনি নিরুৎসাহ হ'ননি। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কারণ হ'ল তিনি সংসারেও এতটুকু শান্তি পাননি। সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনে কোনদিন তাঁর ত্রুটি হয়নি কিন্তু প্রতিদানে পেয়েছেন ঔদাসীন্য আর পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা। তাই ভগ্নমনে, শূন্যপ্রাণে পিতামাতা, সহধর্ম্মিণী, সহোদরদের কাছে বিনীত ভাবে বিদায় চেয়েছেন। এই বিদায় নেওয়ার সময়ও তিনি কর্ত্তব্যবোধের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন।

অক্ষয়কুমার দত্তের চিঠি

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু—

সবিনয় নিবেদনমিদং—

আমি ৬ই পৌষে এলাহাবাদে পৌঁছিয়া ৯ই পৌষে কীটগঞ্জে লালা বংশীধরের দরুণ শ্রীযুক্ত রামচাঁদ মিশ্রের বাগানে বাসা করিয়াছি। আমার মস্তকের পীড়ার অল্পে অল্পে উপশম বোধ হইতেছে, কিন্তু উদরের দোষ কিছুতেই যাইতেছে না। অম্লরোগ (acidity) অতিশয় প্রবল, সুতরাং সুচারুরূপ আহারাদি করিতে পারি না। এখানেও অগ্নিমান্দ্য ও অম্লরোগ প্রবল থাকিবে, ইহা আমি কখনও মনে করি নাই।

আমি এখানে পদার্পণ করিয়াই বিধবাবিবাহের শুভসমাচার প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইয়াছি। ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণ লোকে এ বিষয়ের নিমিত্ত আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে চিরকাল বদ্ধ রহিল। আমি যে এ সময়ে তথায় থাকিয়া আপনাদিগের সহিত একত্র মনের উল্লাস প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আমার এ দুঃখ কস্মিন্‌কালেও যাইবেক না। মাঘ মাসে কয়েকটি বিধবা বিবাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল শুনিয়াছিলাম, তাহার কি হইয়াছে লিখিয়া বাধিত করিবেন। লাট সাহেব অবিলম্বে বিলাত যাত্রা করিবেন ও আপনি তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন এই শুভ সংবাদ সমূলক কি না অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিবেন। শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ বিশ্বাস ও প্রফুল্লকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়দিগকে আমার সসম্প্রীত সাদর নমস্কার অবগত করিবেন। ইতি—

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত

[চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

অক্ষয়কুমার দত্ত যে বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহের বিশেষ সমর্থক ছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লেখা সেই সময়ের এই চিঠি থেকে তা জানা যায়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৬এ জুলাই বিধবাবিবাহ বিধি প্রচারিত হয় এবং তার তিন মাস পরে প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ঐ বিবাহের তারিখ হ'ল ১২৬৩ সালের ২৩এ অগ্রহায়ণ। নানা স্থানের পণ্ডিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ঐ বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, দ্বারকানাথ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯১৩ সম্বতের ১ই পৌষের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় এই বিবাহের এক বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা হয়। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা স্পষ্টভাষায় এই বিবাহ সমর্থন করেন। পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত সে সময় কলিকাতায় ছিলেন না; তিনি কয়েক দিন পরে এলাহাবাদ থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উক্ত চিঠি লেখেন। পণ্ডিত রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্যের সঙ্গে পলাশডাঙ্গা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যার এভাবে বিবাহ দেওয়া হয়। •

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দ্বারকানাথ মিত্র, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যানিধি, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজনারায়ণ বসু, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, কালীকুমার মল্লিকরায়, হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিত ও সুধিবৃন্দ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা বিবাহের বৈধতা সিদ্ধির অনুকূলে প্রেরিত আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেন। বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হলে রাজনারায়ণ বসু দেওঘর থেকে সাধুবাদ জানিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চিঠি দেন।

তিন

জীবন-নাট্যে কোন্ নেপথ্যে
ঘণ্টা বাজছে ঢং !
একটি রাতের রঙ্গমঞ্চে
কেউ রাজা ; কেউ সং ।
ঘণ্টা বাজছে ঢং-ঢং-ঢং ;
সেয়ানা কিম্বা নেশায় যে টং
শেষের এরাতে সবার বরাতে
বাজে বারোটার ডং !
পাপ ও পুণ্য দুয়েই শূন্য ;
সবার জবাব wrong ।
শুধু নিশীথের নষ্ট চন্দ্র
তখনো মাখছে রং ;
জীবন-নাট্য কোন্ নেপথ্যে
ঘণ্টা বাজছে ঢং ।

* * *

দুঃখ-সুখের দোলনরঙ্গে
জীবন-ঘড়ির কাঁটাব সঙ্গে
এখানে-সেখানে কোথায় কে জানে
পড়ছে কেবলি গং ;
এ-খেলা খতম, পয়সা হজম ;
মিথ্যে এ রং-চং !
সবাইকে নিয়ে কি বল্ বানিয়ে
খেলছে কে পিং-পং ?
জীবন-নাট্যে কোন্ নেপথ্যে
ঘণ্টা বাজছে ঢং !

* * *

ঘণ্টা বাজছে এক, দুই, তিন ;
ষ্টেশন ছাড়ছে মেল ;
মেল্ নয় বুঝি, লম্বা কফিন ;
ক্যালকাটা-ব্যাণ্ডেল ।
যাত্রী ক'জন ? রাত্রি ক'টা যে ?
বলবে কে বলো ? ধোঁয়ার ঘটা যে !
একটি রাতের সঙ্গী সবাই
এক-কামরার যাত্রী ;
তবুও ভাগ্যে ভোর হবে কার,
কার শুধু অমারাত্রি !
প্রথম ফুটবে কার মুখে বুলি,
কার বা swan song ।
জীবন-নাট্যে কোন্ নেপথ্যে
ঘণ্টা বাজছে ঢং !

জীবনকে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তুলনা করা সেক্সপীয়রের যুগে সম্ভব ; সেক্স-এ্যাপীলের যুগে অসম্ভব ! আজকের জীবন এত জটিল যে তার সঙ্গে তুলনা চলে শুধু ষ্টুডিও-ফ্লোরেরই । প্রবেশ ও প্রস্থান নয় ; লং শট, ক্লোস শট, কম্পোসিট শট, ক্লোস আপ, ফেডইন, ফেডআউট । চোখ দিয়ে জল বার করে কাঁদা নয় ; গ্লিসারিনের কৃপায় কাঁদতে বাধ্য

নীলকণ্ঠ

হওয়া । স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতনে কখনো উত্তেজনায় রঙ্গমঞ্চকে উচ্চকিত করে তোলা ; কখনো রহস্যে রুদ্ধশ্বাস । কখনো বেদনায় মূক, আনন্দে উদ্বেল করা নয় ; ছায়াচিত্রে এই সব ক'টি রসই উপস্থিত ; অনুপস্থিত সেখানে শুধু পাত্র-পাত্রীদের ব্যক্তিত্ব । সব কিছুই করিয়ে নেয় ক্যামেরা, সাউণ্ড, লাইট, স্পেশাল ইফেক্ট মেক-আপ, ট্রিক আসলে এদেরই প্রাপ্য কৃতিত্বের স্বীকৃতি । এমন কি, গানের জন্যেও সুরে ঠোঁট নাড়াই যথেষ্ট ; নেপথ্যে সঙ্গীতারোপের কৃতিত্বে জহর গাঙ্গুলীর গলায় হেমন্তকুমারের গান, গানের চেয়েও বেশি ; প্রায় মেশিনগান-সমান !

পশ্চিমবঙ্গের কোনও কলেজের বাংলা সাহিত্যের সভায় একজন বাঙ্গালী লেখককে শ্রোতারা প্রশ্ন করেন যে, বাংলা সাহিত্য বর্তমানে বন্ধ্যা কেন ? কেন বাংলা সাহিত্যে তেমন একটি 'চরিত্র'ও সৃষ্টি হচ্ছে না যা নাকি সকলের টনক নড়াতে সক্ষম ? এই প্রশ্নের সেদিন চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন বক্তা । তিনি বলেছিলেন : দেখুন সাহিত্য হচ্ছে সমাজের দর্পণ । আজকের সমাজে তেমন মানুষ কই ? ডাক্তারের কাছে যান, তিনি রক্ষক কি ভক্ষক বলা শক্ত ; হাসপাতালে যান,—রুগীর খোঁজ নিতে হবে হাসপাতালের ট্যাঙ্কে ; আদালতে যান,—অভিমন্যুর ব্যূহ প্রবেশ হবে ; ঢুকতে পারবেন, বেরুতে পারবেন না আর । ব্যাঙ্কে টাকা রাখুন,—আপনার সর্বস্ব যাবে কিন্তু ব্যাঙ্ক ফেল পড়বার পর তার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আরও বড়ো গাড়ীতে বেড়াবার এবং সেই সঙ্গে আরও বড়ো চৌর্যের সুবিধে পাবে । আপনার বাড়ীর সব চেয়ে বখাটে বাঁদরের নাম ন্যাপলা ; যুদ্ধের

বাজারে আইনকে ফাঁকি দিয়ে ব্ল্যাক মার্কেটিং করে দু'পয়সা গুছিয়েছে : কালোবাজার আলো করা সেই মণিকে আপনি যাই মনে করুন, আপনার বাড়ীর লোকেরা মনে করে 'হীরের টুকরো।' আপনার পিসীমা বলেন : ক্ষ্যাপলা যাই করুক, পয়সা করেছে ত' !

এমন সমাজে 'মানুষ' কোথায় ? মানুষ ছাড়া সাহিত্য দাঁড়াবে কিসের ওপর ? সাহিত্য আকাশ থেকে পড়ে না ; সমাজের ভেতর থেকেই উঠে দাঁড়ায়। যে-সমাজে অমানুষ ছেয়ে আছে, সে-সমাজে সে-দেশে অমানুষিক সাহিত্য হতে বাধ্য ; এবং তাই হচ্ছে !

সাহিত্য সম্বন্ধে সেদিন বাঙালী লেখক যা বলেছেন সিনেমা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। 'বাংলা ছবি কেন ভালো হয় না ?'—এ-প্রশ্ন যারা করে, বুঝি, তারা রূপালী পর্দায় বাংলা ছবি দেখে-দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে হয়ে তবেই এ প্রশ্ন করে। কিন্তু কেবল মাত্র রূপালী পর্দায় ছবি না দেখে, সেই সঙ্গে রূপালী পর্দার অন্তরালে যা হয় তাও যদি দেখতে পেতো, তা হলে তারা ও-প্রশ্ন না করে, বরং এই বক্তব্যই জ্ঞাপন করতো যে, বাংলা ছবি কি করে ভালো হবে ?

ভগবান সব কিছুই জানেন ; কিন্তু তিনিও বোধ হয় বাংলা ছবি কি করে ভালো হবে তা জানেন না ! আজকের বাংলা ছবিতে বাঙালীর রুধির আছে ; কিন্তু রুধিরের বিনিময়ে 'রুচি' আজ আছে, কাল নেই। বাংলা ছবির রসদ আজ অবাঙালীর হাতে ; তার মসনদে আজকে যে আসীন সে কী 'জাত,' এ-প্রশ্ন তোলা আজ আর অনর্থক ; পৃথিবী জুড়ে তারা এক জাত ; একই রকম বজ্জাত। তারা Exploiter ! ওই কথার কোনও প্রতিশব্দ নেই বাঙলায় ; নেই, কারণ বাঙালী কোন দিন Exploiter নয় ; বাঙালী চিরকালই Exploited ! অপহারকের বৃত্তি নয় বাঙালার ; অপহৃত হওয়ারই গৌরব তার। রাজনীতি থেকে ইতিহাসের সকল ক্ষেত্রে বাঙালী চিরকাল মই হয়েছে অবাঙালীর স্বর্গারোহণে। সব চেয়ে শ্রদ্ধেয় ভারতীয় নেতা থেকে সব চেয়ে অশ্রদ্ধেয় অভিনেতা পর্যন্ত বাঙালী এবং বাংলা দেশ সম্বন্ধে এক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাদের সম্মিলিত রণহুঙ্কার হলো : If Bengal dies only then lives India !

বাংলা ছবির বাজারের গদীতে তাই আসীন ধূপচাঁদ আগরওয়াল ! নামে এবং বেনামে বাংলা চলচ্চিত্র ব্যবসার চাবি কাঠি আজ এদেরই কবলে। কখনও প্রোডিউসার ; কখনও ডিষ্ট্রিবিউটার ; কখনও এক্সিবিটর ! কখনও যুগপৎ এক সঙ্গেই সব কটি স্পর্শে সঞ্জীবিত মূর্তিমান ত্র্যহস্পর্শ। এরা বাংলা ছবিকে ভালোবাসে ঠিক তেমনই, যেমন মুরগী পুষতে ভালোবাসে মুসলমান।

এই সব প্রোডিউসাররা আসলে কী চীজ, তা' পুরো রিপ্রোডিউস করতে পারলে তা-ই নিয়েই একখানা 'ছবি' হয়। পুরাকালে পাত্র-মিত্র, সেপাই-সান্ত্রী, অমাত্য-পারিষদ নিয়ে, সভা আলো করে বসতেন রাজারা। এ যুগে ধূপচাঁদ আগরওয়ালরা এয়ারকণ্ডিশাণ্ড ঘরে ডানলোপিলো গদীতে পা নাচায় ; ছুরি শানায় ; যাদের রুধির পান করে তাদেরই আদর করে ডাকে গধ্বে কী বাচ্চা ! বাংলা ফিলমের রাজ্যে সাহেব নেই কিন্তু মোসাহেব আছে। তারা আদরের ডাক শুনে গদগদ হয় ; কোনও কোনও গোপাল ভাঁড় গধ্বে কী বাচ্চা [illegible] হয়ে বলে ; হুজুর, মা-বাপ !

ধূপচাঁদ আগরওয়াল !—কোট, প্যান্ট জুতো নিয়ে গোটা মানুষটার ওজন তিনশো পাউণ্ড। দু'পাশে সর্বদাই দু'জন রক্ষিতা থাকে। কী যে করে তা ওই জানে। ধূপচাঁদেরা শুধু নিজের বুদ্ধিতে চলে না, পরের বুদ্ধিও ধার করে ; এদের প্রত্যেকেরই একজন করে Friend, Philosopher এবং misguide আছে ; তারাই হচ্ছে বাংলা ছায়াচিত্রাকাশের আসল শনি !

ধূপচাঁদ প্রথম জীবনে বেগনী ছিলো ; যুদ্ধের বাজারে লাল হয়ে গেছে। ইংরেজি জানে না কিন্তু মাতৃভাষা ভুলতে চায়। গ্রামের লোকেরা যেমন সব কথা বাংলায় বলে কিন্তু বউ-এর কথা উঠলেই বলে : আমার Wife,—এরাও তেমনি মাঝে মাঝেই ইংরেজির চোরাবালিতে হঠাৎ পা দিয়ে বসে। ডাক্তারকে ডেকে বলে : আমার Wife-এর History আছে ! শুনে ডাক্তারের চোখ কপালে ওঠে, থুতনি ঝুলে পড়ে। History আছে ? কী বলছেন ?—ডাক্তার আবার জিজ্ঞেস করে। আজ্ঞে হ্যাঁ, যা বলছি তাই ; মাঝে মাঝেই ভিরমি যায় ;—ধূপচাঁদ জবাব করে। ওঃ তাই বলুন, হিষ্টিরিয়া আছে !—ডাক্তারের চোখ কপাল থেকে নামে এতক্ষণে। কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে ধূপচাঁদ আবার ইংরেজি ঝাড়ে : আজ্ঞে হ্যাঁ ; একটা ইন্টারজেকশন দিতে হবে ! ডাক্তারের চোখ কপালে ফিরে যায় : ইন্টারজেকশন ? হ্যাঁ, ধূপচাঁদ সমান তোড়ে সমঝায় ; ওই যে ছুঁচ···! 'অঃ' ডাক্তার এবারেও ধাক্কা সামলায় : ইঞ্জেকশন ?

এই ইণ্টারজেকশনরাই (!) বাংলা ছবির পেছনে বসে কলকাঠি নাড়ে। ফুটবল খেলার মাঠে অফসাইডের বাঁশী বাজলে এদের সোল্লাস চীৎকার গগন বিদীর্ণ করে : সুইসাইড ! সুইসাইড !

আজকে যার টাকা আছে পৃথিবীটা তারই ; তবুও কোনও কোনও ক্ষেত্রে টাকাই সব নয়। হলিউডে টাকা থাকলে ফিনান্সিয়ার হতে বাধা নেই ; ফিল্ম প্রোডিউসার হতে আছে। সেখানে প্রযোজনা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ; হরধনুতে শর যোজনার চেয়েও অনেক শক্ত। প্রোডিউসার হলো হলিউডে সেই ব্যক্তি যে বিশেষ ধরণের ছবির জন্যে বিশেষ ধরণের কাহিনী, বিশেষ ধরণের কাহিনীকে বৈশিষ্ট্য দিতে সক্ষম এমন পরিচালক থেকে আরম্ভ করে স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রী নির্বাচন সব কিছু করবার জন্যে শেষ স্বাক্ষর দেবার একমাত্র অধিকারী। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ সাফল্য আছে এই অধিকারের পেছনে।

টলিউডে বিচিত্র পরিস্থিতি ! এখানে যার টাকা তার পিসিমার গল্প নিয়ে, তাকে হিরো এবং তার পঁয়তাল্লিশ বছরের রক্ষিতাকে ষোড়শীর ভূমিকায় নামিয়ে যে ছবি করতে রাজী আছে, সেই ছবির পরিচালক হতে পারে। কাউকে না পাওয়া গেলে প্রোডিউসারেরই বা পরিচালক হতে দ্বিধা কোথায় ? ডাক্তারেরই দ্বিধা থাকে অপারেশন করতে ; নাপিতের ক্ষুর দিয়ে ফোড়া কাটতে এতটুকু ভয় নেই।

এই পরিস্থিতির ফলেই উদ্ভব ধূপচাঁদ আগরওয়ালদের। পরিচালনা থেকে প্রচার পর্যন্ত সব কিছু সম্বন্ধেই ধূপচাঁদের অভিমতই গ্রাহ্য। এরও আগে কাহিনী নির্বাচনেও এর ভালো লাগার দামেই কাহিনীর দাম। শুধু ধূপচাঁদের ভালো লাগলেই হলো না ; অন্তরঙ্গ পারিষদদেরও খুসী হওয়া চাই। বিজ্ঞাপন-সচিব এসেছেন ব্লক

দেখাতে, কেমন হয়েছে। ধূপচাঁদ দেখে বল্লেন: বাঃ বেশ! আবেগে যখন প্রচারকর্তা প্রায় চোখ বুঁজিয়ে ফেলেছেন তখনই ধূপচাঁদের সাগ্রহ জিজ্ঞাসা: একে কী ব্লোক বোলেরে? আজ্ঞে, হাফটোন,—জবাব আসে। 'এঁ্যা? ধড়মড় করে উঠে বসেন ধূপচাঁদ; হাফটোন? পোয়সা দেবো পুরো,—হাফটোন কেন? নিয়ে যাও; ফুলটোন করে নিয়ে এসো!—যাও!

যেতেই হয় প্রচার-সচিবকে! বাংলা ছবির প্রচার-সচিবের অনেক কাজ যে! শুধু 'ব্লক' সামলানোই তার চলে না; অনেক ব্লক-হেডকেও সামলাতে হয় যে তাকে সেই সঙ্গে; সেই একই সঙ্গে!

বাংলা ছবি কেন ভালো হয় না, এবারে সেই গূঢ় রহস্যের আরও ভেতরে প্রবেশ করা যাক! সেই রহস্যের সঙ্গে যার পরিচয় নেই বাংলা ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রির, আসল জায়গার বর্ণপরিচয়ই হয় নি তার এখনও; তাই সে চেঁচায় ভালো ছবি চাই বলে।

ভালো সাহিত্যের মত ভালো ছবিও সৃষ্টি করতে হয় যে! যেখানে সমাজ সুস্থ নয়; স্বাভাবিক নয়, সে-সমাজের সাহিত্যে প্রসন্নচিত্ত চরিত্রবান স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের কণ্ঠস্বর কিছুদিনের জন্যে অশ্রুত থাকতে বাধ্য!

বাংলা ছবি সম্পর্কেও সেই একই বক্তব্য। ছবি ভালো করবার জন্যে কতগুলো কণ্ডিশান দরকার হয়; শুধু এয়ার কণ্ডিশাণ্ড হাউস হলেই হয় না। বাংলা ছবির চরম দুরবস্থা নয়; চরম 'দুরাবস্থা'র জন্যে যারা দায়ী তারা থাকে পর্দার অন্তরালে; তাই তাদের কথা জানে না সাধারণ, যারা বাংলা ছবি খারাপ হলে গাল পাড়ে পরিচালককে, কাহিনীকারকে; অভিনেতৃবর্গকে।

তারা জানে না যে বাংলা ছায়াচিত্রশিল্প তিন চাকার গাড়ী। তার একটি চাকা জোরে চলে; বাকী এক চাকা ঘষটায়; আরেক চাকা অচল। যে-চাকা জোরে চলে তার নাম এক্সিবিটর অর্থাৎ যারা ছবি দেখায় তাদের প্রেক্ষাগৃহে; ঘষটানো চাকা হচ্ছে মিডলম্যান বা দালাল, তাদের বলে ডিষ্ট্রিবিউটর; তারা, ছবির মালিক আর ছবিঘরের মালিকের মধ্যে, অবাঞ্ছিত কিন্তু অপরিহার্য সেতু। আর ছবি যারা তৈরী করে, তাদের আমরা প্রযোজক আখ্যা দিয়েছি অনর্থকই, তারা ছায়াছবি তৈরী করে শুধু ছায়ার পেছন-পেছন ঘুরে হয়রাণ হবার জন্যেই।

প্রেক্ষাগৃহের যে মালিক তার হাউস চালাবার জন্যে যদি খরচা হয় সপ্তাহে দু'হাজার টাকা, ত' সে তার হাউসের জন্যে ভাড়া বাবদ ধরে বসে আছে পাঁচ হাজার টাকা, কিন্তু এ তো গেলো শুধু খরচা, লাভ? তাই ছবি দেখাবার আগে সে সর্ত ঠিক করে নেয় ডিষ্ট্রিবিউটরের সঙ্গে, প্রযোজকের সঙ্গে করে না, কারণ বাংলা ছবির প্রোডিউসার ছবি হয়ে যাবার পর, ছবির আর কেউ নয়! ডিষ্ট্রিবিউটরের সঙ্গে এক্সিবিটর সর্ত করে নেয় যে ছবির সাপ্তাহিক বিক্রীর অর্দ্ধেক অংশ তার। অর্থাৎ ছবির বিক্রীর অংক যখন সপ্তাহে দাঁড়াচ্ছে চোদ্দ হাজার টাকা, তখন এক্সিবিটর পাচ্ছে সাত হাজার, যখন দশ হাজার টাকা, তখন পাঁচ হাজার, কিন্তু যখন ছবির বিক্রী নেমে এসেছে সপ্তাহে পাঁচ হাজার তখন কিন্তু পুরোটাই তার প্রাপ্য; কারণ? কারণ, সে আগেই কড়ার করে নিয়েছে যে তার হাউস চালাবার জন্যে ন্যূনতম খরচ হচ্ছে সপ্তাহে পাঁচ হাজার! যখন পাঁচ হাজার টাকার কম হচ্ছে বিক্রী, তখন প্রেক্ষাগৃহের মালিক ছবি দেখাচ্ছে না আর এবং শুধু তাই নয় ছবির প্রিন্ট আটকে রেখে দিচ্ছে, ঘাঁমতিটুকু পকেটে এলে তবেই ছাড়ছে প্রিন্ট; তার আগে নয়।

ডিষ্ট্রিবিউটর যে টাকাটা হাতে পাচ্ছে তার থেকে সে আগেই সরিয়ে রাখছে প্রযোজককে সে যদি অগ্রিম দিয়ে থাকে কিছু তা'; এবং তার খাটনীর পারিশ্রমিক বাবদ কমিশন, প্লাস প্রিন্টের খরচা, আর পাবলিশিটির গোঁজামিল। এই বিজ্ঞাপন বাবদ টাকার যে হিসেব দেখায় ডিষ্ট্রিবিউটর প্রোডিউসারকে, সেটা অনেকটা সার্বজনীন পূজার হিসাব পরীক্ষায় দেখানো 'মিসলেনীয়াস'-ব্যয়ের মতো; অর্থাৎ যেটুকু মেলবার তা মিলিয়ে দেবার পর, সে হিসেব কোনও দিনই আর মিলবার মতো নয়, তারই গোঁজামিল হল পাবলিশিটি এক্সপেন্স অর্থাৎ কিনা বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয়।

এর পরেও যদি প্রোডিউসারের পকেটে আসে কিছু তাহলে তাকে বলতেই হবে প্রোডিউসারের কুষ্ঠি অসম্ভব জুতের। প্রায়ই অবশ্য আসে না। দুধের বালতি থেকে শুধটুকু নিয়ে নেয় প্রেক্ষাগৃহের মালিক; অল্প একটু দুধ আর বেশীটা জল, পায় ডিষ্ট্রিবিউটর; বালতিটা পড়ে থাকে প্রযোজকের জন্য; কেন? বোধ হয় প্রযোজকের সেই কর্ম সম্পন্ন করবার কারণে, ইংরেজিতে যাকে বলে গিয়ে, ইয়ে, **kick the bucket**!

বাংলা ছবির ডিষ্ট্রিবিউটরের ঘরে গিয়ে ঢুকুন; দেখবেন গদি আগলে বসে আছে ধূপচাঁদ আগরওয়াল। যারা এই ছায়াচিত্রের প্রথম যকৃৎ ছিলো, যাকে বলে পায়োনীয়র, তারা বসে আছে ধূপচাঁদের পায়ের কাছে। জোড়হস্ত হয়ে আছে। ধূপচাঁদ চাইলে গলবস্ত্র হয়ে বসতেও তারা রাজী! কচ্ছদেশ অনেকদিনই মুক্ত হয়েছে ধূপচাঁদের কৃপায়; তাই শেঠজীর সামনে মাথা কামিয়ে গলায় কাছা দিয়ে বসতেও তাদের আপত্তি কোথায়?

ধূপচাঁদ আগরওয়াল হয়তো সদ্য ফিরে এসেছে বিলেত থেকে উড়োজাহাজে। উপবিষ্ট কৃপাপ্রার্থীর দলের সকলের উৎকণ্ঠা দূর করলেন শারীরিক কুশলবার্তা জ্ঞাপনে: কেউ হয়ত জিজ্ঞেস করল; বিলেত দেশটা কেমন দেখলেন? বিজ্ঞের মতো ধূপচাঁদ উত্তর দিলেন: বড় তাজ্জব কী বাত,—ছোট ছোট লেড়কা পর্য্যন্ত কী সোন্দর ইংরেজি বলে বিলেতে? সত্যিই ত! সাহেবদের ছেলেমেয়ে বিলেতে 'সোন্দর' ইংরেজি বলে,—এর চেয়ে আশ্চর্যের আর ভূ-ভারতে কী হতে পারে?

আবার কেউ হয়ত গায়ে পড়ে প্রশ্ন করেছে; মেট্রোতে নতুন ইংরেজি ছবিটা দেখেছেন? কেমন লাগলো?

ধূপচাঁদ তেড়ে উঠলেন! আরে! তোবা! তোবা!—আর বোলো না; পুরোনো ছবি শালা, বিলকুল বেওকুফ বনেছি তোমাদের কথা শুনে—

একজন ক্ষীণ প্রতিবাদ করেন: এ দেশে ত' এর আগে ও-ছবি আসে নি—

ধূপচাঁদ: না, না, কে বললে আসে নি: ছবির শুরুতেই দেখলাম সেই সিংহ চিল্লাচ্ছে! আগে একটা ছবিতেও দেখেছিলাম ছবির শুরুতেই একটা সিংহ ডেকে উঠলো; তখনই বুঝলাম দেখা ছবি আর বসলাম না, চলে এলাম···

বুঝুন! মেট্রো গোল্ডউইন মায়ারের ট্রেড-মার্ক সিংহ দেখেই

ধূপচাঁদ বুঝে নিয়েছিল যে ছবিটা পুরোনো। এদেরই হাতে বাংলা ছবি তৈরীর রসদ এবং এদেরই পায়ে ছবির কর্মীদের রুধির ঢালা; বাংলা ছবি যে রসিকদের জন্তে তৈরী হয় না তার জন্তে আক্ষেপ করে লাভ আছে কিছু ?

ছবি নিয়ে গ্যাম্বাল বা ফাটকা খেলে ধূপচাঁদ আগরওয়ালরা। না লাগলে বলে গ্রহ খারাপ ! লাগলে বলে সোবই হনুমানজীর কৃপা ! ঠিকই বলে। ক্যাপিটালিষ্টরা মানুষকে বিশ্বাস করে না; তাদের আস্থা এখন সুপারম্যানের ওপর। আর সুপারম্যানেরই ইংরেজি বাংলা জগা-খিচুড়ী অনুবাদ দাঁড়ায় : হনুমান ! বাঁদর থেকে মানুষ হয়েছিলাম একদিন; আজ আবার হিউম্যান থেকে হনুমান হবার দিকে এগিয়ে চলেছি; জয় হোক এভলিউসনের !

চার

কিন্তু সব ক্রমেরই ব্যতিক্রম আছে। ব্যক্তি আছে বই কি ব্যক্তিত্ববিহীন বাংলা ছায়াচিত্র রাজ্যের; সেই ব্যক্তি হচ্ছেন ভারতীয় ছায়াচিত্র জগতের প্রথম পুরুষ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার,—সমস্ত দিক দিয়ে First Person Singular। রঙ্গমঞ্চের জগতে 'বড় বাবু' বললেই বোঝায় সরকার সাহেব তথা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকারকে। সাহেব আখ্যা তাকে যেমন মানায় ফিল্ম ওয়ার্ল্ডে আর কাউকে তেমন মানায় না। একথা নির্মম সত্য যে এরাজ্যের একমাত্র সাহেব হলেন তিনি; বাকী সবাই এর-ওর তার মোসাহেব।

শিশির ভাদুড়ী, মোহনবাগান আর নিউ থিয়েটার্স,—এই তিন জনের কাছ থেকে বাঙালী যত পেয়েছে আর যত দিয়েছে এমন আর কারুর কাছ থেকে পায়নি এবং দেয়ও নি।

রোমান সাম্রাজ্যের যে রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত লিখে গেছেন গীবন, নিউথিয়েটার্সের উত্থান-পতনের ইতিচিত্র নয় তার চেয়ে কম উত্তেজক। 'পতন' কথাটা ব্যবহার করে আইন লঙ্ঘন করলাম কি না জানি নে; তথ্যে অপলাপ করবার অপরাধ এখন আর করলাম না নিশ্চয়ই। রাম এবং অযোধ্যা,—দুই-ই হয়তো এক্ষেত্রে আজও আছে; কিন্তু সে 'রাম' এবং সে 'অযোধ্যা' আজ আর এর কোথাও নেই।

ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবীর সন্তান বীরেন্দ্রনাথ: ব্যরিষ্টার কি ডাক্তার কি ইঞ্জিনীয়ার হবেন, এই ছিল স্বাভাবিক এবং সর্বোত্তম প্রস্তাব। সেই সহজ, স্বাভাবিক, নিশ্চিন্ততার, নির্ভরতার পথ পরিত্যাগ করে দেশের মাটিতে ছায়াচিত্র শিল্পের আটচালা তুলবেন কোনদিন, এ বোধ হয় সাহেবের নিজেরও অজ্ঞাত ছিলো। তাতে সাহেবের লোকসান হয়েছে কতটা তার হিসেব এখনও খতিয়ে দেখার সময় হয় নি, কিন্তু লাভ হয়েছে আমাদের অভাবিত। আরেকজন স্যার এন-এন, কিংবা স্যার নীলরতন হলে, বি, এন, সরকার, 'অন্যতম' হতেন কিন্তু 'একক' হতেন না; বিশিষ্ট হতেন কিন্তু অপ্রতিদ্বন্দ্বী হতেন না; আরও বিত্তবান হতেন কিন্তু অদ্বিতীয় হতেন না। বীরেন্দ্রনাথ আজ নিজেই একটি ইনষ্টিটিউট। নিউথিয়েটার্স মানেই তিনি, ফিল্ম ইন্ডাস্টি মানেই 'সাহেব'।

তাঁর প্রতি অনুরাগের চেয়ে অভিযোগ আজ বেশী ! যাঁদের অভিযোগ করবার মতো কারণ আছে তাঁরা সংখ্যায় মাত্র 'কতিপয়।' যাদের অভিযোগ করবার এতটুকু কারণ নেই তারা কিন্তু এই সুযোগে সবচেয়ে উচ্চগ্রামে গলা যোগ করেছে ! অবশ্য নতুন কিছু করছেন না; উভয় তরফই সেই পুরাতন প্রবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছেন; হাতী কাদায় পড়লে যারা আরও বেকায়দায় ফেলবার চেষ্টা করে, তারা কেউ হাতী নয় কোন দিন, চিরকাল তারা ব্যাং।

কিন্তু অনেকদিন আগে না জেনেই সাহেব একদিন এর জবাব দিয়েছিলেন; আন্তর্জাতিক বিলিয়ার্ড খেলায় ভারতের ভূতপূর্ব প্রতিনিধি মিঃ বেগ একসময়ে নিউথিয়েটার্সে কাজ করতেন। একদিন আলাপ পরিহাসের টেবিলে বসে সাহেবকে তিনি জিজ্ঞেস করেন: স্যর, ব্ল্যাক সোয়ানদের বাচ্চারাও কি সব সময়ই ব্ল্যাক হয় ? সাহেব হেসে জবাব দিয়াছিলেন ! "Of course ! if there is no scandal in the family !"

সত্যিই তাই; নিউথিয়েটার্সের ছবি একদিন যা হতো, আজ আর যে তেমন হয় না প্রত্যেক বার, তার কারণ নিউথিয়েটার্সের কর্মীদের স্ক্যাণ্ডাল নয়, স্ক্যাণ্ডালের চেয়েও বেশী; আত্মকলহের পরিণাম হয়েছে more than scandal। পরস্পরকে দাবাবার, সত্যিকারের যোগ্যকে তাড়াবার এবং অকারণ দেরী করে ছবির ব্যয় বিপুল করবার কৃতিত্বে এরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও লজ্জা দিতে পারে; বি, এন সরকার যত বড়ই হন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তুলনায় আর কতটুকু ?

নিউথিয়েটার্সকে যারা তুলে ধরেছিলো, নিউথিয়েটার্সকে ডুবিয়েছে তারাই। নিউথিয়েটার্সের সীলে যে হাতির চেহারা আছে সে হাতী নয়; এরা হচ্ছে শ্বেতহস্তী, white elephant। একদিন এসেছিলো ছুঁচের মতো, তারপর একদিন নাম করেছে, গাড়ী করেছে, বাড়ী করেছে, তারপর বেরিয়ে গেছে ফাল হয়ে; ফাঁকি ফাঁকি করে রেখে গেছে যাবার আগে। তাই হয় ! হরি ঘোষের গোয়ালে যে সব গরু মানুষ হয়, তারা মানুষ হবার পর দুধ দেয় না আর, কিন্তু 'চাঁট' দেয় সাঙ্ঘাতিক !

রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে নিউথিয়েটার্সের তুলনা হাস্যোদ্রেক করতে পারে কোনও কোনও 'উঁচুতুক'র। তাতে কিছু যায় আসে না। নিউথিয়েটার্স সত্য-সত্যই একদিন সাম্রাজ্য ছিলো। বি, এন, সরকার ছিলেন একচ্ছত্র সম্রাট। আসমুদ্র হিমাচল তার বিস্তার ছিলো। মনসবদার, সেনা, সেনাপতি পদাতিক, ব্যতিক্রম ছিলো না কিছুরই। রোমান সাম্রাজ্য টেঁকে নি, নিউথিয়েটার্সও লুপ্ত পাটে বসেছে।

দুঃখ করে লাভ নেই, কেন বি, এন, সরকার রোধ করতে পারছেন না সময়ের গতিকে। কেন ব্যবসাদারের মত গণেশ উল্টে করতে পারছেন না আত্মরক্ষা, এ প্রশ্ন করা যায় কিন্তু উত্তর হয় না এর; হরিশ্চন্দ্র কেন শাইলক হতে পারে না তার জবাব পুরাণেও নেই; সেক্সপীয়রেও না। বীরেন্দ্রনাথ সরকার বিশ্বাস করে ঠকেছেন; ঔরংজেব কাউকে বিশ্বাস না করেও তার চেয়ে বেশী কিছু করে যেতে পারেন নি; ঔরংজেব পর্যন্ত সে টিঁকে ছিলো, কিন্তু নামে মাত্রই টিঁকে ছিলো, তাই রাজা যাবার সংগে সংগেই রাজ্য গেছে। সাহেব শুধু ব্যবসা করতে এলে, ব্যবসাও একদিন যেতো এবং
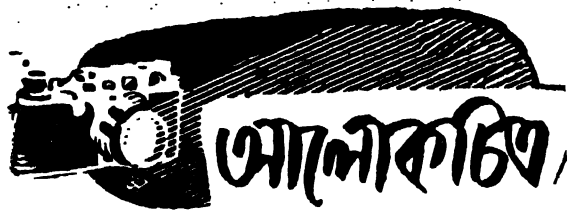
[উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত ছবি ফেরৎ দেওয়া হয় না।]

প্যাটার্ন ?
—রথীন রায়
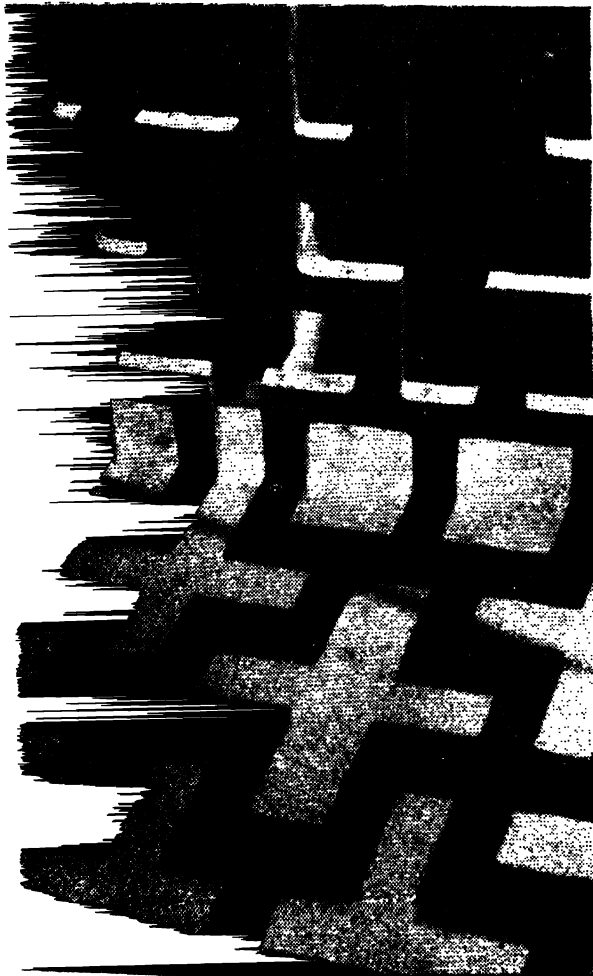
সিকান্দ্রা (আগ্রা)
—অহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শিকারী
শিবু মুখোপাধ্যায়

সন্ধ্যা। —আনন্দ মুখোপাধ্যায়

সাঁওতালী নৃত্য

—রমাদাস বসু

মীনাক্ষী মন্দির (মাদুরা)

—সুনীল ঘোষ

বোঝা
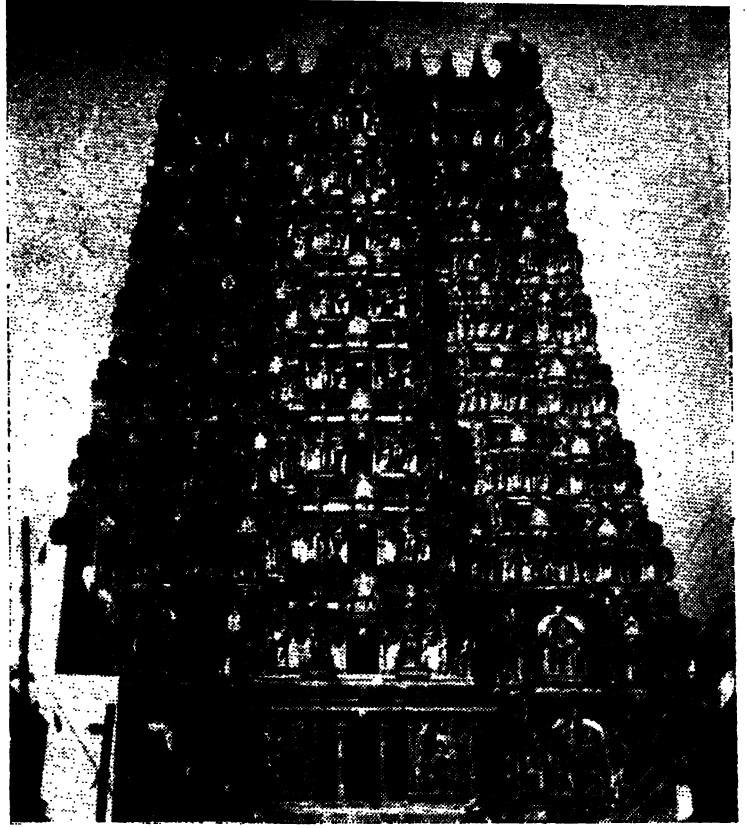
—জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

নিউ থিয়েটার্স'ও হত না। নিউ থিয়েটার্স হয়ত একদিন যেতে পারে কিন্তু ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রি টিঁকে গেছে আজ। টলিউড পেয়ে গেছে দাঁড়াবার জায়গা।

ভুললে চলবে না যে নীতিন বোসের মত ক্যামেরাম্যান তার জন্ম, বৃদ্ধি, এবং বিকাশ এই নিউ থিয়েটার্সে'ই; বাঘিনী আর সিংহীতে এখানে এক ঘাটে জল খেয়েছে। উমাশশী আর চন্দ্রাবতী দুই'ই একান্ত ভাবে নিউ থিয়েটার্সে'রই। মঞ্চ থেকে পর্দায় নব জন্ম দিয়েছে দুর্গাদাসকে এই হাতীর ষ্ট্যাম্পই; সর্বশ্রেষ্ঠ 'টাইপ'-চরিত্রাভিনেতা ইন্দু মুখুজ্জের আবির্ভাব করেছে সম্ভব। চন্দ্র-সূর্য্য একসঙ্গে এক আকাশে বিরাজ করেছে; পঙ্কজ মল্লিক আর রাই বড়াল। রাজকুমারের নির্বাসন নয়; 'মুক্তি' সম্ভব করেছে প্রমথেশ বড়ুয়ার,—এই নিউ থিয়েটার্স'ই। একবার নয়, দু' বার ডার্বি জিতেছে একই জীবনে শুধু এক নিউ থিয়েটার্স'ই, 'দেবদাসে' আর 'উদয়ের পথে'-তে।

নিউ থিয়েটার্স যদি ভাগ্যের বিপুল বিপর্যয়ে একদিন আর না থাকে, তবুও ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রী থাকবে। কল্লোলের কলম যদি আজ থেমে যায় তবুও বাংলা সাহিত্যের প্রাণ কল্লোলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে তার কথা। সেই তার জিত!

নিউ থিয়েটার্সে'র প্রতিদ্বন্দ্বী যত কোম্পানী আজ ছবি করছে, যতবার করছে, আর হারিয়ে দিচ্ছে বি, এন, সরকারকে তত বারই সত্যিকারের জিত হচ্ছে সাহেবের। ততবার তিনি প্রাণ ভরে হাসছেন। বিহ্বল হয়ে যাচ্ছে যারা হারিয়ে দিচ্ছে তারাই; হাসছেন কেন তিনি হেরে গিয়েও, ভাবছে কেবল।

মৃত্যু-শয্যায় শায়িত দ্রোণের মুখেও এমনি হাসি দেখে হয়ত এমনি অবাক হয়েছিলেন অর্জুন!

পাঁচ

সেই হচ্ছে সত্যিকারের সিনেমা জগৎ যার কাছে সেক্সপীয়রের চেয়ে সেক্স এ্যাপীল আজও অনেক বড়। এত বড় মিডিয়াম হয়েও সিনেমা যে আজও শিল্পের পর্যায়ে উঠতে পারে নি তার tragedy এইখানেই। উর্বশী মেনকা রম্ভারা দেহ বিক্রয় করে পতিতালয়ে; সিনেমায় করে দেহ প্রদর্শন। আর্টের নামে তাই কলা দেখানোই হয়েছে এখনও পর্যন্ত চলচ্চিত্রের কাজ; আসল আর্টের বেলায় তাই সর্বদাই অষ্টরম্ভা! যে সব মেয়ে এখানে আজ আসছে তারা প্রায় কেউই পতিতা নয়; কিন্তু তারা প্রায় সবাই অধঃপতিতা; এবং পুরো সত্যের চেয়ে যে সব অর্ধসত্য অনেক মারাত্মক, তেমনি পতিতার ইতিহাস আরও মর্মান্তিক।

ভদ্রঘর থেকে যে সব মেয়েরা সিনেমাতে আসছে তাদের জীবনের গানই হয়েছে রবি ঠাকুরের কবিতার একটি বহু বিখ্যাত পদ: সংসার মিছে সব। সমাজ এবং সংসারকে ভাসিয়ে দিয়ে সিনেমার স্রোতে ভেসে পড়ে তারা বুঝতে পারে কী মিথ্যের সনে তারা ভেসেছে; কিন্তু তখন আর ঘরে ফেরা যায় না; কেঁদে বলা যায়: সে যে মিথ্যা কতদূর? তখনি শুনে কি বোঝনি ঠাকুর? ঠাকুর বুঝেছেন; কিন্তু বুঝলে কি হবে, চৌর রাঁধুনে ঠাকুর, কিছু না পারুক তবু চুরি করতে পারে; কিন্তু সত্যিকারের ঠাকুর, সে হয় মাটির নয় পাথরের। তাঁর কিছুই করার উপায় রাখিনি আমরা।

গীতার চেয়ে যেমন অনেক জটিল গীতার ব্যাখ্যা, তেমনি ফিল্মের চেয়ে অনেক বেশি সর্বনেশে হচ্ছে ফিল্ম্ ম্যাগাজিন। আমাদের দেশে আজকে জর্ণালিজম বস্তুটাই ক্যাপিটলের পায়ে বিক্রীত। খবর কাগজ দেশের যত ক্ষতি আজ করছে কোন ক্ষতিপূরণ দিয়েই তার ঘা আর শুকোবার নয়। খবর কাগজ যদি গোদ হয় তবে ফিল্মের কাগজ সেই গোদের ওপর বিষ ফোড়া! এমনি জর্ণালিষ্ট আর ফিল্ম জর্ণালিষ্টে তফাৎ হচ্ছে একজন বিক্রীত, অপর জন বিকৃত।

আজকের সাংবাদিকদের খুব সুবিধে হয়েছে যে সাধারণ মানুষদের হৃদয় এবং বিবেক এই দুটি বস্তুই তারা বাদ দিতে পেরেছেন এমন অনায়াসে যেমন সহজে শল্য চিকিৎসক রোগীর শরীর থেকে বরবাদ করে এ্যাপেণ্ডিকস! চিত্র সাংবাদিকদের হৃদয় এবং বিবেকের ওপর আবার বুদ্ধি বস্তুটাও মগজে নেই। ত্র্যহস্পর্শযোগে মানুষের যা হয় ত্র্যহস্পর্শহীনতায় ফিল্ম-ম্যাগাজিনের হয়েছে তার চেয়ে ঢের বিপর্যয়।

এখন সেই কথাতেই আসা যাক!

বাংলা ছবি ভয়ের ব্যাপার; তার চেয়েও ভয়াবহ হচ্ছে বাংলা ছবির কাগজ। ফিল্ম-রাজ্যের নরকের সিংহদ্বার হচ্ছে ফিল্ম-ম্যাগাজিন। মলাট থেকে মলাট ছবিতে ছবিতে ছয়লাট সিনেমার কাগজের পাঠক হচ্ছে আট থেকে আটাশী; ভুল বললাম, পাঠক নয়; পাঠিকা নয়; দর্শক। সিনেমার কাগজে পাঠ্যবস্তু কিছু থাকে না; অপাঠ্য বস্তুও নয়; সিনেমা-কাগজে থাকে শুধু ছবি। প্রায়ই মেয়েদের গা-খোলা ছবি; ছেলেদেরও থাকে; ল্যাঙট পরে এক্সারসাইজ করার উত্তেজক চিত্র। তাই নয়নাধঃকরণ করে সবাই। ছবিগুলির pose থেকে বোঝা যায় এর পেছনে আছে সুচিন্তিত purpose। আবালবৃদ্ধগণিকার ছবি ছেপে আবালবৃদ্ধবনিতার কৃতজ্ঞতা ভাজন হ'তে পেয়েছে এই সব কাগজ! এদের জয় হ'ক!

এই সব কাগজ পড়েই ইস্কুল-পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্রে, 'উত্তম' শব্দের বিপরীত কি?—এর উত্তরে ছেলেরা চোখ-কান বুঁজে লিখে আসে 'সুচিত্রা'! অশোকের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তির উল্লেখে লিখিত হয়, 'মহল'! এই সব কাগজ পড়েই ছেলেদের জীবনের আদর্শ হয় না বিদ্যাসাগর; স্বপ্ন দেখে পাহাড়ী সান্যাল হবার। এই সব কাগজেই ছায়াচিত্রের নায়িকারা কেমন আদর্শ গৃহকর্ত্রী তাই জেনে বিমুগ্ধ হয় তারা; পূজার ঘর থেকে রান্নাঘর-এর জন্যে তাদের প্রাণ কেমন করে কাঁদে; বই পড়াই যে তাদের একমাত্র নেশা,—পেশা যাই হ'ক, তারও সচিত্র বিবরণে এই সব কাগজের প্রতিটি পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত!

এই সব কাগজেই তরুণ-তরুণীরা ভীড় করে আসে ছবি তোলাবার জন্যে; ছবি তুলিয়ে ছাপাতে পারলেই যে বাজী মাৎ, সে কথাও বোঝায় ওই কাগজই। বোঝায় যে বাংলা দেশের চিত্রজগতের নায়ক-নায়িকা নির্বাচিত হয় ওই সব ছবির মধ্যে থেকেই। তাই film magazine-এর dark-room থেকেই এদের জীবন অন্ধকার হতে সুরু হয়। সেখানে যে poseএ এরা ছবি তোলাতে বাধ্য হয়, এরা বলতে মেয়েরা, তাতে তাদের বুঝতে বাকী থাকে না এই যে, জর্মন সিলভার যেমন জর্মন নয়, তেমনি Paris picture শুধু প্যারিসে নয়, পৃথিবীর কোন না কোনও জায়গায় কোন না কোনও সময়ে তৈরী হচ্ছেই।

সেই dark-room থেকে যাদের যাত্রা হলো সুরু, তাদের ষ্টুডিওর অন্দর মহল পর্যন্ত কেবলমাত্র প্রবেশপত্র পেতেই কতজনকে কত অন্যায় মাশুল জোগাতে হয় তার না আছে ইতিহাস, না আছে census ; না আছে তার ওপর কোনও censor ! যে-সব মেয়ে এদেশে আজ কোনও রকম কাজ করতে বাধ্য হয় তাদের সম্বন্ধেই আমাদের এক শ্রেণীর লোকের ধারণা সাঙ্ঘাতিক বিকৃত। ধরে নেয় তারা যে এ-সব মেয়ে বিক্রীত হতেই আসে। তারই ফলে নার্স কিংবা স্কুল মিসট্রেস ; অথবা টাইপিষ্ট কিংবা টেলিফোনের মেয়ে কারুর সম্বন্ধেই শ্রদ্ধার ভাব অল্প ; এই অশ্রদ্ধার মধ্যে এ দেশের মেয়েরা এম-এ হয় কিন্তু চাকরী করতে গেলেই এম-এর দামে তাদের মূল্য হয় না ; এদেশে মেয়ে হয়ে জন্মে চাকরী করতে আসার দাম দিতে হয় তাদের তবুও ! চাকরী করতে আসা এই সব মেয়েদের সম্বন্ধেই যদি এই ধারণা হয় তাহলে ফিল্মে নামতে আসা ভদ্রঘরের তরুণ-তরুণীদের সম্পর্কে কী ধারণা হয় তা' বুঝতে কষ্ট হয় না ! অথচ মজা হচ্ছে এই, তরুণী মাত্রেরই বিশ্বাস হ'লো যে এখানে একবার ঢুকতে পারলে অর্থ এবং যশ দুই-ই হাত বাড়িয়ে আছে তাদের লুফে নেবার জন্যে। তরুণ মাত্রেরই আশা হচ্ছে যে একটা চান্স পেলেই তারা সবাই হয় দুর্গাদাস, না হয় অশোককুমার !

এই অদ্ভুত ধারণার জন্ম দিয়েছে ফিল্ম-পত্রিকা ; আর একে লালন করেছে সযত্নে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের নীতিবোধকে যেমন করে অস্বীকার করতে উৎসাহিত করেছে তাতে বলতে দ্বিধা নেই, দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে আসলে অদ্বিতীয় এক অভিজ্ঞতা। এটম বোমায় mass হত্যা দ্রুত করলেও তার অনেক আগেই মানসিক অপমৃত্যু ঘটিয়ে ম্যাসাকার করে গেলো এই সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার,—আসলে যে ঘটনা হচ্ছে উইদাউট এ second !

এই মুহূর্তে যে চুল কাটছে সেলুনে ; আর যে beware of pickpockets নিশানার ঠিক নীচে দাঁড়িয়েই পকেট কাটছে ভীড়ের মধ্যে, তাদের দু'জনেরই লক্ষ্য, ফিল্মষ্টার হবার দিকে। লক্ষ লক্ষ কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণী মেধযজ্ঞে আহুতি দেবার উদ্দেশ্যে যারা সবুজ পোকার মত আগুনের দিকে এগুচ্ছে তাদের উৎসাহের উৎস হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর ট্রাজিডীর তিনটি মূল কেন্দ্র : সিনেমা, খবর কাগজ ও রেডিও। রেডিও একমাত্র সরকারেরই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে, খবর কাগজকে দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা করে দিয়ে এবং সিনেমার ওপর কোন রকম শিক্ষার সর্ত আরোপ না করে আমরা ত্র্যহস্পর্শ দোষে নিজেরাই দোষী।

ফিল্ম-পত্রিকায় ছাপা ছবি এবং চিত্রতারকাদের জীবনী পড়ে দেশ-সুদ্ধ ছেলেমেয়ে ভূমিষ্ঠ হবার পর মা'র চেয়ে সিনেমার দরদ দেখছে বেশী। তাই ফিল্মপত্রিকাই হ'চ্ছে একমাত্র পাঠ্য ; বায়স্কোপই হচ্ছে একমাত্র যাবার জায়গা এবং চিত্রতারকা হওয়াই জীবনের একমাত্র বাসনা।

[ক্রমশঃ

হেমন্ত

আশরাফ সিদ্দিকী

পাতায়-পাতায় পড়ে নিশির শিশির
শীতের মেদুর বায়ু বহে ঝির-ঝির
সোনামুখী কন্যা কোলে বসুমতী বলে, 'ঘুমঘুম'-
সব নিঝঝুম !

ক'টি বালিহাঁস—
অঘ্রাণের পত্র নিয়ে মাঠে-মাঠে ছোটে উর্দ্ধশ্বাস :
···'জাগো জাগো সাত ভাই চম্পারা সব
সোনা-বোন পারুল যে ডেকে হয়রাণ !
ভানুমতী মাঠে-মাঠে শোনো আজ ইমন-কল্যাণ!'

ম্লান মুখে হাসি টানে দুখী দিগ্বলয়-
আর বার হেমন্ত উদয়।

সোবিয়েতের দেশে দেশে

মনোজ বসু

দিগন্তব্যাপ্ত মাঠের ফসলের ভিতর চাষীদের কেমন দিব্যি গাঁ-ঘর। ছিমছাম বাড়িগুলো। বাড়ির মধ্যে ঢুকছি। আপেল-গাছ দরজার ধারে, ফল ফলে আছে। উঠানের প্রান্তে আঙুরের মাচা। কাবুলে অপূর্ব গুপ্তর বাড়ি যেমন দেখেছিলাম। গরু-ছাগল বাঁধা আছে ওদিকটায়। উঠানের অর্ধেকখানি নিয়ে আলুর ক্ষেত: রাক্ষুসে সাইজের আলু—কয়েকটা তুলে ওঁরা আমাদের দেখালেন।

বাড়ির কর্তার নাম রহমৎ। দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকা। চার ছেলে, দু'টা গাই, আট বকরি। অ্যাজবেস্টোজের চাল ঘরের, গরম না লাগে সেজন্য চালের নিচে কাঠের পাটাতন। তার নিচে নক্সাদার চাঁদোয়া টাঙিয়ে বাহার করেছে। সামনের দিকে দুই কুঠুরি পাশাপাশি, পিছনে দরদালানের মতো টানা লম্বা ঘর। কয়েকটা বাড়িতে ঢুকলাম, সবই এক ধাঁচের। ঘরে-ঘরে বিদ্যুতের বাতি, শীতের সময় ঘর গরম করবার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। রেডিও, গ্রামোফোন, আলনা, ছোট খাট। মেজেয় কার্পেট বিছানো। মনে রাখবেন, চাষীর বাড়ি ঢুকেছেন। আঙুরের থোলো ঝুলানো দেয়ালে। কয়েক রকম তারের বাজনা—রহমৎ বলছেন, বাজনা শুনুন না একটু। রঙিন আলখেল্লার মতন পোশাক মেয়েদের, মাথায় ওড়না, কাঁধে-কাঁধ দিয়ে দাঁড়াল এসে কয়েকটি—অর্থাৎ ইঙ্গিত পেলেই লেগে পড়েন গীতবাদ্যে। এবং বুড়ো রহমতের যা গতিক, উনিও বোধ হয় নৃত্য শুরু করে দেবেন নাতনীর বয়সি মেয়েগুলোর সঙ্গে। কিন্তু সময় কোথা বাজনা শুনবার? বেরিয়ে পড়তে হবে এখনই। বেশ খানিকটা দূরে লেনিন-কোলখোজ—সেইটে সেরে তবে বাসায় ফেরা।

রোদ পড়ে এসেছে, বেশ শীত ধরেছে এখন। ওধারে রান্নাঘর—তন্দুর সেঁকা-পোড়ার জন্যে। ঘুঁটে দিয়ে রেখেছে, বড় বড় লাল-লঙ্কা শুকোতে দিয়েছে। বাইরে বড় এক তক্তাপোষ—আমরা আসব জেনেই বের করে দিয়েছে বোধ হয়। ধীরেন সেন মশায়ের কৃষিকর্মেও উৎসাহ। কোথায় নাকি চাষবাস আছে তাঁর। গোটা কয়েক লঙ্কা চেয়ে নিলেন; বড় আকারের টম্যাটো ফলে আছে—পাঁচটা-ছ'টায় সের দাঁড়াবে—তারও বীজ জোগাড় করলেন। মস্কোর বাজারেও ঘোরাঘুরি করেছেন বীজের জন্য। দেশে এসে এই সমস্ত ফলাবেন। বললাম, বেশ হবে। নাম দেবেন 'লেনিনলঙ্কা' 'ষ্ট্যালিন-টম্যাটো'—ঝুড়ি ঝুড়ি কিনবে লোকে।

অনেক পথ ছুটে লেনিন-কোলখোজে পৌঁছলাম, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। কোলখোজের এই অফিস তল্লাটে অন্ধকার বোঝবার জো নেই, আলোয় আলোয় দিনমান। লেনিন-ষ্ট্যালিনের অতিকায় সোনালি মূর্তি সামনে। অপরূপ সাজানো বাগান। কোন ইন্দ্র-তুল্য ব্যক্তির প্রমোদশালায় এসে পড়েছি, মনে হয়। তাই বটে! হিসাব দিচ্ছে, কোন সনে কত মুনাফা পিটেছে। বেড়েই চলেছে। ১৯৫০ অব্দে আঠার মিলিয়ান, ১৯৫৪ অব্দে বত্রিশে উঠেছে। মেয়ে শ্রমিকবীর একজনকে দেখলাম। নাম হালিমা। বারোটা মেডেল আর 'অর্ডার অব লেনিন' পেয়েছে তুলো-চাষের জন্য। সুপ্রীম সোবিয়েতের ডেপুটি। সগর্বে হালিমা আমাদের এটা-সেটা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে।

কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুলে গেলাম। ছোট ছোট টেবিল নিয়ে বাচ্চারা খাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের দিকে আহ্লাদ করে। কাবুলিওয়ালার ধরনে জোব্বা-পরা চাষীর দল—লম্বা দাড়ি, মাথা কামানো, পায়ে বুটজুতা, পাঠানের মতো দশাসই চেয়ারা। কোলখোজের নিজস্ব অনেক রকম মেসিন—এই রাত্রিবেলা মাঠের মধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্বেলে সেই সমস্ত চালিয়ে দেখাচ্ছে। ভয়ানক আওয়াজ, কানে তালা লেগে যায়। টেনেটুনে তারপর খাওয়াতে নিয়ে চলল, না খাইয়ে ছাড়বে না। সহসা বিষম দুঃসংবাদ পেলাম। রেডিওয় ভারতীয় খবর দিচ্ছে—আমাদেরই জন্য দিল্লি ষ্টেশন ধরেছে—রফি আহমেদ কিদোয়াই মারা গেছেন। আর একদিন, লিয়াকত আলির হত্যার খবর পেয়েছিলাম এমনি পথের উপর—কাশ্মীরের পথে বানিয়ান গিরিশঙ্কটের ভিতর। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ক্ষণকাল। কিছু ভাল লাগছে না।

তাজিক সুপ্রীম-সোবিয়েতের সম্বর্ধনা-অনুষ্ঠানে বক্তৃতা

পরের দিন। ওঁরা বেরুলেন, আমি ছুটি নিয়েছি এ বেলাটা। বিশাল এই বাগানবাড়িতে আছি—বাগানটা ঘুরে ঘুরে একটু দেখি। টাসের লোক এসে আমার অভিমত চাইল তাজিকিস্থান ও এই জয়ন্তী উৎসব সম্পর্কে। সোবিয়েতের সংবাদ-প্রতিষ্ঠান টাসের নাম কে না জানেন? অতএব লিখতে হল দু-চার ছত্র। বিকাল-বেলা তাজিকে গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট চা খাওয়াবেন, ওখানেও কথাগুলো বললে মন্দ হয় না। এক ঢিলে দুই পাখী—এই যা লিখেছি, ওখানে আগে পড়ে টাসের লোকের কাছে দিয়ে দেব।

প্রেসিডেন্টের আয়োজন হলের ভিতরে। সোবিয়েতে প্রথম আজ আমি শাল-পাঞ্জাবি চাপিয়ে বাঙালি পোশাকে হাজির হয়েছি। তাবৎ চীনদেশ এই পোষাকে ঘুরেছি, কিন্তু দারুণ ঠাণ্ডার ভয়ে এখানে এতাবৎ হয়ে ওঠে নি। গোড়ায় যেমনধারা হয়ে থাকে—নতুন ব্যবস্থার গুণকীর্তন। গণতন্ত্র চালু হবার আগে পাকিস্তানে ছিল সাকুল্যে চারটা ইস্কুল ষোল জন মাষ্টার—এখন মাষ্টারই হলেন সতের হাজার। ডাক্তার রয়েছেন দু'শ। জারের আমলে ছ'টা সিল্ক-ফ্যাক্টরীতে মোটমাট যত সিল্ক হত, এখন যে কোন একটি ফাক্টরির উৎপাদন তাই। ইচ্ছে করলেই সোবিয়েত-সমবায় থেকে আমরা আলাদা হয়ে যেতে পারি, কিন্তু এত সুখ-সম্পদ পাচ্ছি—আলাদা হতে যাবো কেন? সব ক'টা গণতন্ত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরস্পরের সহযোগিতা করে—এমন অভাবিত অতি দ্রুত উন্নতি সেই জন্য। কোন প্রতিবেশীর ক্ষতি করতে চাইনে আমরা। প্রয়োজন নেই। নিজেদের যা আছে, তাই ভোগ করবার লোক মেলে না।

এক কৌতূহল আমাদের মনে মনে। প্রেসিডেন্টকে কথাটা জিজ্ঞাসা করা হল। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেও শুনতে পাই, মোল্লাদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ—তাঁদের কড়া শাসনে বোরখা তুলে একটুকু বাইরে তাকাবার জো ছিল না মেয়েদের। পায়ে পায়ে বিধিনিষেধ! মোল্লারা ঠাণ্ডা হলেন কি করে?

প্রেসিডেন্ট বলেন, ঝগড়া-বিবাদ করতে যাই নি। আছেন তাঁরা এখনও—শুক্রবারে যে কোন মসজিদে যান, দেখতে পাবেন। কিন্তু রয়েছেন ঐ ধর্মীয় এলাকাটুকুর মধ্যেই। রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই এই ধর্মীয় মানুষদের; শিক্ষা ব্যাপারে পুরোপুরি সরকারি কর্তৃত্ব, জনহিতকর সকল কাজকর্ম সরকার নিজের কাঁধে নিয়েছেন। মোল্লারা এমনিভাবে জনসাধারণ থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়েছেন। সাধারণ মানুষ অত শত বোঝে না। যেখান থেকে উপকার পায়, সেইখানে তাদের গতায়াত—সেখানে ভালবাসা। ধর্ম একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার এখন—তোমার যেমন খুশি ধর্মচর্চা করো, একেবারে না করলেও রক্তচক্ষুর শাসানি নেই।

কবি তুরসুন উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা করলেন। ১৯৪৭ অব্দে আমি ভারতে গিয়েছিলাম। ভাগ্যবশে স্বচক্ষে ভারত দেখেছি। ভারত সম্পর্কে বিস্তর কবিতা আছে আমার। দুই রকমের কবিতা—ভারতের পুরানো গাথা নিয়ে; এবং আমার ভারত-ভ্রমণ। ভারতের প্রতি হৃদয়ভরা প্রীতি সেই থেকে। আকাশের তারার মতো উজ্জ্বল; পার্বত্য নদীধারার মতো প্রখর। একা আমি নই, তাজিক দেশের হাজার হাজার মানুষ ভারতকে চেনে রবীন্দ্রনাথ প্রেমচন্দ প্রভৃতির লেখায়; বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলে যাঁরা আসচেন তাঁদের নাচে গানে। এমনি চেনা-জানার মধ্য দিয়ে আমাদের উভয় দেশ প্রীতির বাঁধনে বাঁধা পড়ুক। আমরা চাই সূর্য-চন্দ্রের আলোর মতো সুখসমৃদ্ধি লাভ করুক সমস্ত ভুবন—কোনখানে কেউ বাদ থাকবে না। আমাদের তাজিকিদের মধ্যে একটা চলতি উপমা—আমার ও মিত্রতমার প্রীতি দুই চোখের মতো; দু'চোখ পরস্পরকে দেখে না, কিন্তু দুই চোখ মিলে জগৎ দেখে।

'প্রত্যাবর্তন' নামে নিজের এক কবিতা পড়লেন তুরসুন। নাম লিখে একটা করে কবিতার বই দিলেন প্রতিজনকে। আমি দু-চার কথা বললাম। হীরেন মুখুজ্জে আশ্চর্য এক বক্তৃতা করলেন—'রাশিয়ার চিঠি'র জবান দিয়ে বক্তৃতা শুরু: এখানে না এলে এ জন্মের তীর্থভ্রমণ অপূর্ণ থেকে যেত···

সন্ধ্যা হয়ে আসে। উৎসবের শেষ, তাজিকিস্তান ছেড়ে যাচ্ছি কাল সকালবেলা। অনেকেই বাজার ঘুরতে বেরুলেন। আমি ছুটেছি ফেরদৌসি লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরিতে একটা পাক না দিয়ে গেলে পাঠকেরা যে আমার জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।

পুরো নাম তাজিক ন্যাশন্যাল ফেরদৌসি লাইব্রেরি। দশম-একাদশ শতকের খোরসান কবি আবুল কাসেম ফেরদৌসির নামে। খোরসান জায়গাটা এই তাজিক গণতন্ত্রের ভিতরে। সামনে বাগান, অজস্র ফুল। প্রাচীন তাজিক পদ্ধতির বাড়ি—তাজিকি লেখক কবি শিল্পী ও জ্ঞানীগুণীদের মূর্তিতে সাজানো। ষ্ট্যালিন-লেনিনের মূর্তি তো আছেই।

লাইব্রেরির ডিরেক্টর মেয়ে। দশ লাখের মতো বই খবরের কাগজ ইত্যাদি বাদ দিয়ে। আড়াই হাজার বইয়ের লেনদেন হয় প্রতিদিন; বারো শো লোক পড়ে। প্রতিষ্ঠা ১৯৩৩ অব্দে।

প্রথমে একজিবিসন-হল। নানান পুঁথিপত্রে ঠাসা। আগে

তাজিকিস্তানের ষ্ট্যালিন যৌথখামারে (কোলখোজ)

তাজিকিস্তানে একটা লাইব্রেরিও ছিল না। এখন ন'শ'র বেশি। • এইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি।

আর একটা খুব বড় হল—তার অপরূপ অলঙ্করণ। 'মাতৃভূমি' নামে দেয়াল-চিত্র—তাজিকিস্তানের নানা দৃশ্য দেয়ালে এঁটে রেখেছে। আঠারোর কম বয়সি ছেলেমেয়েদের পড়বার ঘর এটা। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীরা থিসিস বানাচ্ছে অমনি আর একটা হলে। নিঃশব্দ—সূঁচ পড়ে গেলে তার শব্দ পাওয়া যাবে। সাধারণের পাঠাগার একটা—যারা কারখানার কর্মিক কিম্বা অপিসে কাজ-কর্ম করে, তারা এখানে এসে বসে। মোটমাট পাঁচটা পড়বার ঘর এমনি।

স্থানীয় ঐতিহাসিক বিভাগ। একটা বই দেখলাম—কিতাব মুদজান আল-বুলদান। আরব পরিব্রাজক ইয়াকুত-আল-খামাডির রচনা। যত দেশ তাঁর জানা ছিল সমস্ত বর্ণানুক্রমিক সাজিয়েছেন। কেতাব-আল-ইবের—আরবের নামজাদা ঐতিহাসিক (চোদ্দ শতক) ইবন খালদুনের রচনা, সময়ক্রম অনুসারে বিভিন্ন আরব-খলিফাদের যাবতীয় বৃত্তান্ত। পনের শতকের বই তাজকিরাত-উশ সুয়ারাও—শতাধিক কবির সম্পর্কে নানা বিবরণ। সাদীর বোস্তানের (সতের শতকের পাণ্ডুলিপি) ফোটোগ্রাফিক কাপি। হাজার বছর আগেকার রুদাকীর কবিতার পাণ্ডুলিপি; ষোল শতকের শাহনামার পাণ্ডুলিপি। পুরানো তাজিকি ও উজবেকি পাণ্ডুলিপি—সমস্ত আরবি হরফে। আরবি হরফ তুলে দিয়ে এখন রুশীয় হরফ চালু হচ্ছে। বোম্বাইয়ে ছাপা বিস্তর ফারসি বই আছে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনেক বই দেখলাম। সাত তলা জুড়ে বই সাজানো আছে। লেনিন-লাইব্রেরির মতোই নিচু ছাত বইয়ের ঘরগুলোর।

১৫

ষ্টালিনাবাদ এরোড্রোমে যাত্রীরা সব প্লেনের অপেক্ষায় আছে। দাড়িওয়ালা গ্রাম্য চাষীরা—হাতে মোটা লাঠি। আবার এদের চেয়েও দীন পোশাকের লোক দেখছি। হরদম তবু আকাশে চলাচল। তুরসুন বিদায়-বক্তৃতা করলেন। কবি লোক—ভাবাবেগময়। বন্ধুরা, তোমাদের মহৎ দেশের সুন্দর মানুষদের জন্য আমাদের ভালবাসা নিয়ে যাও। প্লেনে চললে তোমরা মস্কোয়—মস্কো ছাড়িয়ে আরও কত কত দূরে! প্লেনের পাখায় লেখা, ঐ দেখ, শান্তি। শান্তিময় দেশের উপর পাখা বিস্তার করে উড়ে যাবে প্লেন, পাখার নিচে মানুষের শান্ত ঘরগৃহস্থালী। সারা জগতের সমস্ত মানুষের শান্তির উপরে স্থিরলক্ষ্য হোক।

শহর ছাড়িয়ে এলাম। জনালয় কমে আসছে। নদী—বাঁধে বন্দী স্রোত। দিগ্‌ব্যাপ্ত ফসলের ক্ষেত মাঝে মাঝে। তারপরে বালুভূমি। উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠছি—অনেক উঁচু। ভারি মজা—মনে হচ্ছে, পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে উঠছি যেন। পাহাড়ের উপর জায়গায় জায়গায় বিস্তর গাছপালা। নির্জলা ভূমিতে ওরা বিশেষ ধরনের জঙ্গল বানায়—সেই সব গাছ হয়তো এই পাহাড়ে।

পাহাড় ছাড়িয়ে আরও কত দেশ পেরিয়ে বড় নদী নজরে এলো! শিরদরিয়া। তারই কিনার ধরে প্লেন উড়ছে। শহর দেখা যায় ঐ। আর কি—তাসখন্দে এসে পড়েছি আবার। নতুন প্লেন এসে আমাদের এখান থেকে মস্কোয় নিয়ে যাবে। আজকের দিনটা এইখানে স্থিতি। সেই হোটেলে নাকি? এক এক তলায় একটা কল ও এক পায়খানা। সে কথা মনে পড়ে আতঙ্ক লাগে। এয়ারপোর্টে সবগুলিই প্রায় চেনা মুখ, অভ্যর্থনার জন্য এঁরাই এসেছিলেন আগের বারে। আর এসেছে অতি-সুন্দর সেই দোভাষি তরুণী। হাসিয়ানা, হাসিয়ানা—নামটা সবাই ভেবে নিচ্ছি; হাসতে হাসতে সে সংশোধন করে দেয়—উঁহু, হাসিয়াৎ। আর বংশটা হল দোস্ত মহম্মদ—অতএব দোস্ত মহম্মদ হাসিয়াৎ নাম দাঁড়াল পুরোপুরি।

কাল রাত্রে তেজাসিং গোলমালে পড়েছিলেন। সে গল্প শোনেননি বুঝি? ছুটোছুটিতে চোখে অন্ধকার দেখছি, ফাঁক কখন যে দুদণ্ড জমিয়ে একটু রসালাপ করব? সেই যে দলনেতা তেজা সিং, বুড়া মানুষ—শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না—সারাদিন ধরে অনেক রকম আত্মনিগ্রহের সঙ্কল্প করেন, কিন্তু খানা-টেবিলে খাদ্যবস্তুগুলার সামনে আর কোন হুঁস থাকে না। ডিনারে বসে বিঘত প্রমাণ তিনটে আমিষ কাটলেট সেবনের পর জানা গেল নিরামিষ কাটলেটও উত্তম হয়েছে; তখন এর উপরে দুটো নিরামিষ কাটলেটও চাপান দিয়ে দিলেন। ফলে রাত দেড়টায় দম বন্ধ হবার জোগাড়। জ্ঞান মজুমদার ডাক্তার মশায়ের ডাক পড়েছে। কনকনে শীতে হি-হি করতে করতে জ্ঞান মজুমদার রোগী দেখতে ছুটলেন। ব্যাপার গুরুতর বটে! উদরের ভার-মোচনের জন্য বার বার বাইরে বেরুনোর তাগিদ—কিন্তু বিপদ হয়েছে, ভোর বেলায় রওনা হবার তাড়ায় এখন থেকেই লোকে ধর্ণা দিয়ে আছে। বারম্বার দরজা ছেড়ে দিতে চায় না—নেতার খাতিরেও নয়। তেজাসিং অতএব

কোলখোজের এক কৃষক (সেলিমোভ)-পরিবারের সঙ্গে

বেডপ্যান চাইলেন—উল্টো বুঝে ওরা ঐ নিশিরাত্রে তুরতুর করে চা বানিয়ে আনল। ইত্যাদি, ইত্যাদি! এরোড্রোমে গিয়েও তাঁর রাগ পড়েনি—খোঁজ নিচ্ছিলেন, ঐ ষ্ট্যালিনাবাদ থেকে কাবুলে সোজা পাড়ি দেবার উপায় আছে কিনা। বেড়ানোর বিতৃষ্ণা ধরে গেছে, দেশে ফিরতে পারলে বেঁচে যান। ভয়েরও ব্যাপার—আমরা সেইদিক দিয়ে ভাবছি। তাসখন্দে গিয়ে আবার যদি রাতের কাণ্ড শুরু করে দেন, এজমালি একটি শৌচখানা নিয়ে বিষম মুশকিল হবে? সেবারে পনের জন আমরা দিশা করতে পারি নি, এবারে যাচ্ছি তো পঁচিশ।

ছায়া-মোড়া পথ। সেবারে আনাগোনা করেছি, চারিদিক বেশ চেনা লাগছে। গাড়ি চলল—কিন্তু সেই হোটেলের দিকে বোধ হয় নয়। রেলরাস্তার তলা দিয়ে যাচ্ছি, এ তল্লাটে এসেছি বলে মালুম হয় না। তাই বটে! শহর ছাড়িয়ে বাইরে এলাম। রাস্তা আর পিচ-দেওয়া নয়—পাথুরে বটে কিন্তু উঁচুনিচু। অনেক—অনেক দূর, এরোড্রোম থেকে মাইল পঁচিশেক হবে। গাড়ি তার পরে বাঁক নিল ধুলো-ভরা এক গ্রামপথে। বাংলা দেশেরই এক গ্রাম যেন। দিগব্যাপ্ত মাঠ—কোথাও ফসল ফলেছে, ফসল কেটে নিয়েছে কোথাও। কুটির এদিকে-ওদিকে—হাঁস-মুরগি চরছে, গরু-ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। রাস্তার ধারের নয়ানজুলি দিয়ে জলধারা বয়ে যাচ্ছে কলকল বেগে। এক বাংলো-বাড়িতে নিয়ে তুলল। গোলাপ-বাগানে উঠান ভরে আছে। চারিদিকে গাছপালার সমারোহ।

গোটা তিনেক বাড়ি কম্পাউণ্ডের ভিতরে। আমাদের পরের প্লেনে কাণ্টারবেরির ডীন এসে পৌঁচেছেন। ছোট বাড়িটায় তাঁদের তুলল। বড় দোতলা বাড়িতে আমরা। দামি দামি আসবাব-পত্তোরে পরিপাটি সাজানো গোছানো। কোন নবাব-আমিরের বাগানবাড়ি যেন। উঠানে পা দিতে না দিতে বড় টেবিলে ডিনার সাজিয়ে ফেলেছে। উপরের ঘর নেবো না আমরা। সিঁড়ি ভেঙে মালপত্র নিজের তুলতে হবে, কুলি নেই। তা ছাড়া রাত্রি দুটোর এখান থেকে রওনা, সমস্ত আবার নামিয়ে আনো সেই সময়। নিচের ঘরে থাকলে ঝামেলা কম হবে। ঘর উপরের হোক নিচের হোক, ফেলনা কোনটাই নয়। যার নেতা এবং ডেপুটি-নেতাকে যে দুটো ঘর দিল কোন লাটসাহেব তা পান না। অন্তত পক্ষে পশ্চিম-বাংলার ঋষি-লাট হরেন্দ্রকুমার তো ভাবতেই পারতেন না ঐ রকম সাজসজ্জা। ঘরের লাগোয়া বসবার ঘর, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে চোখের মণি দুটো ছিটকে বেরিয়ে আসে। সমাজতান্ত্রিক দেশ হলেও সব মানুষের খাতির সমান নয়। নেতা ডেপুটি-নেতার সঙ্গে অপর দশজনের ফারাকটা বিষম দৃষ্টিকটু লাগে। কড়া আলোচনাও হত এই নিয়ে। খবর নিয়ে জানলাম, এটা হল কর্মিক-সৌধ (Workers' Palace) এই কিছুদিন আগে বানিয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ানের চিঠি নিয়ে কর্মিকরা দিন কয়েক থাকে এসে এখানে, ফুর্তিফার্তি করে যায়। তাদের মধ্যেও শ্রেণীগত রকমফের আছে, বুঝতে পারছেন। নইলে বাছা বাছা কয়েকটা ঘরের অত বাহার কেন?

ক্লান্তিতে লেপ মুড়ি দিয়েছি। ধড়মড় উঠে দেখি, বেলা পড়ে এসেছে। কোন দিকে কেউ নেই—কী মুশকিল, বাড়িতে আমি একলা একটি প্রাণী মনে হচ্ছে। উঁহু, বেরিয়ে এসে রাও সাহেবকে পেলাম। মাদ্রাজের এডভোকেট—কানে খাটো বলে সব সময়ে ছিপির মতো যন্ত্র কানে দিয়ে বেড়ান। "গেঁয়ো রাস্তায় বেরুলাম তাঁকে নিয়ে। পথ ছেড়ে মাঠে নেমেছি; মাঠের প্রান্তে চাষীদের ঘরবাড়ি—কোণাকুণি পাড়ি দিচ্ছি সেইমুখো। এক বাড়ির সামনে এলাম। কৌতূহলে পাড়াসুদ্ধ উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। এক মাঝবয়সি গিন্নি কোথায় ছিল—তাড়াতাড়ি এগিয়ে অভ্যর্থনা করে।

উজবেকি ভাষা এবং এ-তল্লাটের যাবতীয় ভাষার নিকট সম্পর্ক ফারসির সঙ্গে। ফারসিতেও বিষম দিগ্‌গজ আমি; তবু কিন্তু দু পাঁচটা কথা দিব্যি বুঝতে পারি। এবং কথা না বুঝলেও দু-চোখে যে আন্তরিক সমাদর ফুটে উঠেছে, সেটা বুঝতে আটকায় না। ছিমছাম ঘরবাড়ি, মেজেয় গালিচা পাতা। কয়েকটা বাচ্চা খেলা করছে। ধুলো-মাখা পোশাকে ড্যাবডেবে চোখ মেলে তারা এগিয়ে এলো। কাছে ডাকছি হাতের ইসারায়। হাত বাড়িয়ে ছিল একটি, দিয়েই আবার সরিয়ে নেয় লজ্জায়। বড়টি গটমট করে বীরোচিত ভাবে এসে দাঁড়ায়। দেখাদেখি ছোটটিও তখন এগোয়। হাত ধরে একটুকু হাত মলে দিলাম দুজনের, গালে আঙুল ছুঁইয়ে আদর করলাম। গিন্নি ওদিকে চায়ের জোগাড় করতে চায়, ঠারে-ঠোরে বলছে। না-না করে ঘাড় নেড়ে আমরা সরে পড়লাম। এদিক-ওদিক আরও খানিকটা চক্কোর মেরে বাড়ি ফিরে আসি।

এক বা দু-জন কেন হব, আরও কেউ কেউ আছেন বাড়িতে। হীরেন মুখুজ্জে ঘর থেকে বেরুলেন। বিষম বিরক্ত। গিয়েছে ওরা সকলে কনজারভেটরিতে। অর্থাৎ সঙ্গীতের কলেজে। তিনি এক চেয়ারে বসে আর এক চেয়ারে পা তুলে ক্লান্তিতে একটু চোখ বুজেছিলেন, তন্দ্রাও একটু এসেছিল বোধ হয়। কিন্তু যাবার সময় একবার ডেকে যাবে না, এ কেমন কথা?

গ্লোকোভকে পেয়ে গেলাম—আমাদেরই এক দোভাষি, মস্কো থেকে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। শোন হে, আমরাও যেতে চাই কনজারভেটরিতে, গাড়ির জোগাড় দেখ। তেজা সিং নেমে আসছেন। সিঁড়ি থেকে বলছেন, এখন কোথায় যাবে গো? ওরা পাঁচটায় ফিরবে, আমায় বলে গেছে। যেতে যেতেই তো পাঁচটা বাজবে। মিছে কষ্টভোগ। তা হোক, আমরা মরীয়া। গাড়ি দু-তিনটা ঝিমিয়ে রয়েছে উঠানে—কষ্ট করে চড়ে বসা। এই কষ্টে নারাজ হলে বিদেশে আসা কেন? ঘরে বসে থেকেই বা কোন চতুর্বর্গ লাভ হবে? রাও মশায়ের খোঁজ নেওয়া হল। দাবায় বসে গেছেন তিনি টুপি-দাড়িওয়ালা প্রবীণ এক উজবেকির সঙ্গে। দাবা-খেলায় কথা লাগে না। একে কানে কম শোনেন তায় চালের ভাবনায় একেবারে বদ্ধকালা হয়ে গেছেন, কানের যন্ত্রে আপাতত কাজ হবে না। রাও মশায়কে নড়ানো গেল না।

বাড়ির অদূরে যেখান থেকে কাঁচা রাস্তা শুরু, মোড়ের উপর দুটো পুলিশ। কি হে গ্লোকোভ ভায়া, পুলিশ পাহারায় রেখেছ কেন আমাদের? পাড়াগাঁ জায়গা—কেউ যদি কোন বদ্ মতলবে বাড়ির মধ্যে ঢোকে, সেজন্য এই বিশেষ বন্দোবস্ত। শহর হলে এ সব লাগত না। কনজারভেটরির সামনে লোকজন ঘিরে দাঁড়াল। উঁহু, আলাপ-পরিচয় পরে, গান-কনসার্ট শুনে আসিগে, হয়তো বা সাঙ্গ হয়ে গেল এতক্ষণে।

এইমাত্র সেদিন—১৯৩৫-এ কনজারভেটরির প্রতিষ্ঠা।

উজবেকিস্তানের গাঁয়ে গাঁয়ে লোক-সঙ্গীত, কিন্তু রাগসঙ্গীত নিয়ে বেশি কিছু শোনা যায় না। এঁদের কাজ, লোকসঙ্গীতের গবেষণা, বৈজ্ঞানিক স্বরলিপি-রচনা এবং লোক-সঙ্গীতের ভিত্তিভূমির উপর রাগসঙ্গীতের স্থাপনা। একটি মেয়ে গান শোনাল—গানের মধ্যে অনেক বার 'আল্লাহ' কথা পেলাম। পুরানো গান—ঈশ্বরের ভজন। গাইল নতুন গবেষণার উন্নত তানকর্তব। ঈশ্বর নিয়ে মাথাব্যথা নেই এদের—তা বলে পুরানো কোন-কিছু বাতিল করা চলবে না। টাকমাথা শক্তসমর্থ এক ভদ্রলোক এখানকার ডিরেক্টার—তাঁরই বিশেষ অধ্যবসায় এ সমস্ত ব্যাপারে; নিজের মাথার নানা রকম উদ্ভাবনা। এই রকম আল্লাহর গান গেয়ে গেয়েই দু-দুবার তিনি স্তালিন-পুরস্কার পেয়েছেন।

এক বড় হলে নিয়ে ঢোকালেন। ছবিতে ছবিতে এলাহি ব্যাপার—ঘর-বারাণ্ডার দেয়ালে বড় ফাঁক নেই। নামজাদা গীতকার সুরযন্ত্রী এঁরা সব। প্লাটফরমের উপর পঁয়ত্রিশ জন তৈরি হয়ে আছেন, কনসার্ট শোনাবেন। মেয়ে আছেন, পুরুষ আছেন—হাতে রকমারি বাঁশী ও তারযন্ত্র; একজনের কাছে জলতরঙ্গের সরঞ্জাম। বাজনার স্বরলিপি সকলের চোখের সামনে। সাবেকি লোকযন্ত্র—একটু-আধটু সংস্কার করে নতুন কায়দায় বানানো হয়েছে। ডিরেক্টার একটা একটা করে পরিচয় দিচ্ছেন, যন্ত্রীরা উঁচু করে তুলে দেখাচ্ছেন হাতের যন্ত্র। আমি লোকটি নিতান্ত আনাড়ি—তবু শানাই নাগারা দিলরুবা এই নামগুলো না জানার কথা নয়। বাঁশের বাঁশী আছে, আবার বিলাতি ঘোরপ্যাঁচের বাঁশীও আছে কয়েকটা। অনেক-গুলো সুর শোনাল—অতি প্রাচীন সুর একটা, নাম হল কাসগারচা। বলে, বাংলা সুর শুনবেন নাকি? সুর একটু এগোলেই বোঝা গেল, অতুলপ্রসাদের 'ঝমুঝমু নূপুর পায়...।' ভারতের রেডিও ধরে তাই থেকে তুলে নিয়েছেন। আমাদের রেডিও ওঁরা খুব শোনেন, অনেক ভাল ভাল সুর পাওয়া যায়। রবিশঙ্করের একটা বাজনা নিয়ে নিয়েছেন—ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড সেরে চটাপট হাততালির মধ্যে বিষম দেমাকে আমরা তারপর রাস্তায় নেমে পড়লাম।

হাতে সময় আছে, কি করা যায়? দোকানে হামলা দেওয়া যাক না একটু। জিনিষপত্র দেখি, দর শুনি। বিশেষত একটি মেয়ে আছেন, দেহের রং মেরামতে সর্বদা ব্যস্ত—তাঁর বটুয়ায় রসদ ফুরিয়েছে। এদেশের মেয়েরা কি মাখে-টাখে খোঁজখবর নিয়ে দেখবেন তিনি। গাড়ির সারি চলল অতএব ষ্টোরের দিকে। সমস্ত সরকারি দোকান; জিনিষপত্র সরকারের ফ্যাক্টরিতে বানানো। রাস্তাঘাটে অতএব কোন বিজ্ঞাপন দেখবেন না। দরকারের জিনিস পেয়ে যাবেন কোন না ষ্টোরে। মাঝারি, ভালো, আরো ভালো—সব রকমের আছে। দরও বাঁধা। প্রতিযোগিতা নেই, রংদার বিজ্ঞাপনে খদ্দের ভুলোবার চেষ্টাও নেই সেইজন্য।

আরে মশায়, জিনিষ দেখব কি—আমাদেরই দেখবার জন্য মানুষ পাগল। সর্দারজির পাগড়ি, দাড়ি এবং কারের ধার-বুনানি বিচিত্র ওভারকোট। মেয়েদের রকমারি শাড়ি। আমি তবু ধুতি-চাদর পরিনি, চীনে যেমনটা পরে বেড়াতাম—তবে তো রক্ষে ছিল না আর! তিনটে দল হয়ে পড়লাম—ভিড়টা তিনি ভাগ হোক। একত্র থাকলে ষ্টোরের কাজকর্ম নির্ঘাৎ বন্ধ হবে।

শুনে ছিটকে পড়তে চায়। ট্রাভেলার্স-চেকে অনেকেই অনেক টাকা বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম, পুরোপুরি টাকা ফিরিয়ে আনতে হল। এদেশের রোজগারের টাকায় ওদেশের মাল কেনা যায় না। এত ভিড়ের হেতুটা ক্রমশ মালুম হচ্ছে। সেই আর একদিনের মতন ব্যাপার—এই তাসখন্দেই। 'কিচলু' কথাটা কানে গেল। ডক্টর কিচলু মাঝে মাঝে সোবিয়েতে আসেন, তাঁর নাম ওদেশে খুব চালু শান্তি-আন্দোলন সম্পর্কে। দোভাষি মীরা বলল, তোমাকেই কিচলু ঠাউরেছে—সেইটে বলাবলি করছে। জনতা ইংরেজি জানে না, ঘাড় নেড়ে হাবেভাবে বোঝাতে চাই, কিচলু মস্কোয় রয়েছেন—আমি বাজে লোক, ইণ্ডিয়ান পিশাতিয়েল। ভারতের এক লেখক আমি। তাই বা মন্দ কি—দলে দলে এগিয়ে এসে হাত বাড়াচ্ছে সেকহ্যাণ্ডের জন্য—নানান বয়সি—পাকাচুলের প্রবীণ থেকে ইস্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে। মোটরে উঠছি, রাস্তাতেও লোকারণ্য। সে এমন যে দৌড়তে দৌড়তে ট্রাফিক-পুলিশ এসে পড়ল। সিনেমার দল এসে এমন কাণ্ড করে গেছেন যে আমাদের আমাদের সামান্য মানুষের পথ চলা দায়। কমবয়সি মেয়ে বিমলা, বাঙ্গালোর থেকে এসেছেন, পোশাকের বাহার খুব—ভিড়টা তাঁকে ঘিরে জমজমাট। সিনেমা-ষ্টার বলে ধরে নিয়েছে। এবং আশপাশের এই অধমেরা কমিক অথবা দূত-সৈনিকের পার্ট করি, এমনি কিছু ভেবে থাকবে।

বাসায় ফিরে দেখছি অন্ধকার—তারই মধ্যে দাবা খেলে চলেছেন রাও মশায়েরা। বৃত্তান্ত কি? ইলেকট্রিক বিগড়েছে। ওদিকে খানা সাজানো হয়ে গেছে, রাত দুপুরে বেরুনো—সকাল সকাল খেয়ে নিতে হবে। আলোর সুরাহা হয় না কিছুতে। শেষটা করল কি—গোটা দুই মোটরগাড়ি নিয়ে এসে ডায়নামো থেকে তার টেনে ঘরের ভিতর একটা আলো জ্বালিয়ে দিল। কেরোসিনের আলোও এসে পড়ল কয়েকটা। বিদ্যুৎ ঠিক হয়ে গেল এমনি সময়, বাড়িময় আলো। উল্লাসে খানাঘর হৈ-হৈ করে ওঠে।

জ্ঞান মজুমদার শুয়ে পড়েছেন। টেবিলের সামনে বসে দিনের বৃত্তান্ত একটু নোট করে নেওয়ার তালে আছি। হেনকালে আলেকজেণ্ড্রোভ এসে হাজির। সঙ্গে হীরেন মুখুজ্জে মশায়। হীরেন মুখুজ্জে বললেন, তাসখন্দ-রেডিও কিছু বলতে বলছে আমাদের। চলে আসুন। এক্ষুণি—

সে কি! না ভেবে-চিন্তে...তা ছাড়া ইংরেজিতে বলা, একটু লিখে-টিখে না নিলে সাহস পাইনে।

হীরেন্দ্রনাথ বিরক্ত ভাবে বললেন, ওদের দোষ নেই। ডেলিগেশন-সেক্রেটারিকে বলেছিল ওরা বিকালে, সে কিছু করেনি। যাই হোক, বলতেই তো হবে কিছু।

খাওয়ার পরে সবাই ড্রইংরুমে গিয়ে বসেছেন। ডকুমেণ্টারি ছবি দেখানো হবে, তারই তোড়জোড় হচ্ছে। দু-জনে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বাঙালি যে চার জন আছি, সকলেই। আর আছেন অধ্যাপক প্রকাশ গুপ্ত ও অধ্যাপক শকসেনা। রেডিও-র ষ্টুডিও অবধি যেতে হল না। ছোট বাড়িটায় আলেকজেণ্ড্রোভের ঘরে যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছে। ঐখানে বসিয়ে রেকর্ড করে নিল; পরে একদিন শোনাবে। আমি সাংস্কৃতিক-বিনিময় নিয়ে বললাম কিছু, ভারতের সাহিত্যিক হিসাবে ওদের নমস্কার দিলাম। মন্দ

সাড়ে-দশটা। ঘরে এসে দেখি, বক্তৃতা সেরে এসে মজুমদার মশায় অঘোর নিদ্রায় মগ্ন। ঘম হচ্ছে না আমার, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছি। ছেঁড়া-ছেঁড়া নানান স্বপ্ন। রাত দেড়টায় ডক্টর সেন ঢুকে পড়লেন ও ঘর থেকে। আর কি, উঠে পড়ুন এবারে। তিনি তৈরি। সুবিধা হয়েছে—তাড়াহুড়োর মধ্যে কামানোর ক্ষুর ইত্যাদি ষ্ট্যালিনবাদ ফেলে এসেছেন। অতএব ঐ ঝকমারির দায় থেকে বেঁচে গিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

সবাই উঠে পড়ল। প্রকাণ্ড বাক্সটা গলদ্ঘর্ম হয়ে বাইরের বারাণ্ডায় এনে ফেলি। ঐ রাত্রে একটু চায়েরও জোগাড় হয়েছে। ভয়ানক শীত, পশমি কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা বাইরে এসে তবু ঠকঠক করে কাঁপছি। কর্তাদের দু-এক জন এসেছেন বিদায় দিতে। আর দেখি হাসিখুশি মেয়েটা উঠে পড়ে এর ঘরে ওর ঘরে তদারক-তদারক করে বেড়াচ্ছে। খানদানি ঘরের রূপসী যুবতী মেয়ে—রাত্রিবেলা বাড়ি যায় নি, গ্রামের মধ্যে বিদেশিদের খিদমতে পড়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বাড়ির লোক এতে কিছু বলবে না? ঘনপক্ষ্ম চোখ দু'টি তুলে সে অবাক হয়ে তাকাল: কি বলবে? এটা যে কোন আলোচনার বিষয়, এরা ভাবতে পারে না। অথচ এই তাসখন্দের ব্যাপারই তো—ছেলে হারাবার ভয়ে মা বোরখা খুলে পথে ছুটেছেন সেই দোষে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাঁকে মেরে ফেলল।

উজবেকিস্তানের গ্রাম পেরিয়ে শহরের কিনারা ধরে মোটরের কাফেলা চলল। চারিদিক নিশুতি, আকাশে তারা জ্বলছে আর রাস্তার ধারে আলো। হঠাৎ—কলকাতার শহরে নয়, ভারতের ভিতরেও নয়—আরও দূরে পাকিস্তানের ভিতর আমার চিরকালের গ্রামে মন উড়ে চলে গেল, যেখানে ঘুমুচ্ছে আমার চিরকালের প্রতিবেশীরা। সে আকাশে ঠিক এমনিতরো তারকা? তা কি করে হবে? অনেক ফারাক সেখানে ও এখানকার সময়ে। সন্ধ্যাতারা সেখানে হয়তো উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে বাঁশবনের আড়ালে।

ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে। প্লেনে উঠে পড়ে বাঁচা গেল। আর ঝামেলা নেই, সারারাত চলবে, রোদটোদ উঠলে কোনখানে নামিয়ে ব্রেকফাষ্ট খাইয়ে নেবে। শীতও নেই এখন, চলবার সময় প্লেনের ভিতরটা গরম করে রাখে। কম্বল টেনে চোখ বুঁজে পড়া গেল। প্লেন ঘরবাড়ি হয়ে উঠেছে আমাদের। সেদিন হিসাব হচ্ছিল, যা প্রোগ্রাম আছে পুরোপুরি সমাধা হয়ে গেলে হাজার পঁচিশের মাইল অর্থাৎ পৃথিবীটা একবার বেড় দেওয়া হয়ে যাবে।

[ক্রমশঃ।

সুয়েজ খাল এলাকায় দ্রষ্টব্য কি কি আছে?

বেশ কয়েকটি মনোরম দর্শনীয় স্থান ছড়িয়ে রয়েছে সুয়েজ খাল এলাকায়। খালটির পশ্চিম প্রবেশ-পথই হচ্ছে ঐতিহাসিক পোর্ট সৈয়দ। ৫৭০ একর স্থান জুড়ে আছে এই বিরাট বন্দরটি। এখানকার বাসিন্দা প্রায় এক লক্ষ ২০ হাজার। তার ভেতর ২৫ হাজারই ইউরোপীয় বা শ্বেতকায়। বন্দরের গায়েই রয়েছে ১৮০ ফুট উঁচু একটি লাইট-হাউজ। ১০ লক্ষ ক্যান্ডেল পাওয়ারের আলো মাথায় করে এ স্থির দাঁড়িয়ে। সমুদ্রগামীরা এই আলোর নিশানা দেখতে পায় ২০ মাইল পথ দূর থেকেও। বন্দরে ঢুকেই নজরে পড়বে পরিষ্কার—ফার্দিনান্দ দ্য লেসেপ্‌সের একটি প্রস্তরমূর্ত্তি। বিখ্যাত ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার ফার্দিনান্দের নাম ইতিহাসে স্থান পেয়েছে বহু দিন। তাঁরই সক্রিয় তত্ত্বাবধানে এ খালটি কাটা হয়েছিল প্রায় শত বৎসর পূর্বে।

এখান থেকে একটু বাম দিকে তাকালেই দেখা যাবে—কেমন করে গড়ে উঠেছে নয়া সহর পোর্ট ফুয়াদ। সুয়েজ খাল কোম্পানীর কারখানাটিও অবস্থিত এইখানেই। ডান দিকে ঘুরলে চোখে পড়বে আবার খাল কোম্পানীর মনোরম অফিসভবন—যার ছাদের শোভা বর্দ্ধন করছে, তিন তিনটে সবুজ রঙের গম্বুজ।

পোর্ট সৈয়দ থেকে কাঁটরা পর্য্যন্ত বরাবর খাল বয়ে গেছে—উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে। পাশাপাশি চলেছে, দেখা যাবে, রাজপথ, রেলপথ, এসব। যাওয়ার পথে ডানদিকেই পড়ে মেনজালে লেক আর বামদিকে জলাভূমি ও মরীচিকার দেশ। এই কাঁটরা সেতু এলাকাটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এর সঙ্গে বহু ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে। কাঁটরা এক্ষণে প্যালেষ্টাইন রেলওয়ের প্রধান ষ্টেশন। খালের এদিক থেকে ওদিকে যেতে কি

ইসমাইলিয়াও একটি মনোরম সহর সুয়েজ এলাকার। খাল কোম্পানীর নৌ চলাচল ও পূর্ত্ত বিভাগের প্রায় আড়াই হাজার লোক এই সহরের বাসিন্দা। ইসমাইলিয়া থেকেই খালটি বেয়ে ঢুকছে লেক তিমসায়—কুমীরে ভরা এই লেকেরই জলরাশি। খালের সব চেয়ে সুন্দর ও দর্শনীয় স্থান হচ্ছে ইসমাইলিয়া ও বিটার লেকের মাঝামাঝি অংশটি। লেক তিমসা পার হয়ে যেয়েই জাহাজ সব আবার ঢুকে মূল খালে, গেবেল মেরিয়ামের নিকট গেবেল মেরিয়ামের উপরিভাগেই স্থাপিত আছে একটি চমৎকার স্মৃতিসৌধ। মহাযুদ্ধের সময় খাল প্রতিরক্ষায় যারা আত্মাহুতি দিয়েছিল, এ তাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আরও কয়েক মাইল এগিয়ে গেলে মিলে যাবে শেখ আবেদেকের পবিত্র সমাধি। দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে কত যাত্রী এখানে এসে মিলিত হয় বারে বারে। মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে তুর্কীরা আক্রমণ চালিয়েছিল সুয়েজের উপর। দেখতে দেখতে চলে যাবে তৌসুম ও সিরাপিয়াম। চারিদিকে তখন বিস্তৃত কৃষি-জমি ও সুন্দর তালকুঞ্জ। চলবার পথে চোখে পড়বে, লুপ্ত মিশরীয় সভ্যতার বহু চিহ্ন ও পরিচয়। এখানে সুপ্রাচীন মিশরের ফেরাওদের (রাজা) নির্ম্মিত খালের রেখাও খুঁজে পাওয়া যায়।

খালের পূর্ব প্রবেশ-পথের মুখে দাঁড়িয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ সুয়েজ বন্দর। এই বন্দর-সহরটির পাশেই রয়েছে সুউচ্চ আটাকা পর্বতমালা। খালের সর্বশেষ প্রান্ত হচ্ছে পোর্ট তেউফিক। সুয়েজের সঙ্গে রেলপথেরও যোগাযোগ রয়েছে এর। খাল কোম্পানীর বিভিন্ন দপ্তর পোতাশ্রয় ও ডক, সকলই রয়েছে এখানে। পোতাশ্রয়ের প্রবেশ-মুখে দেখতে পাওয়া যায় একটি সমর-স্মৃতিসৌধ—ভারতীয় স্থল-বাহিনীর

নৃপেন্দ্রনাথ সেন

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতের প্রথিতযশা অধ্যাপক)

আন্তরিক চেষ্টার সঙ্গে ঐকান্তিক নিষ্ঠার হাত যিনি মেলাতে পারেন তাঁর সাফল্য ও উন্নতি যে অবধারিত, বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদের আনন্দঋদ্ধ জীবনীসাহিত্য তার জীবন্ত প্রমাণ। বেশি দূরে যেতে হবে না, বিশ্ববিখ্যাতদের সসঙ্কোচ নৈকট্যে যাবারও প্রয়োজন হবে না, যাঁদের আনন্দিত অন্তরঙ্গ সাহচর্যে আসবার সুযোগ আমাদের হয়, সেই সুপ্রিয় শিক্ষক বা অধ্যাপকদের অনেকেরই জীবন-কাহিনী প্রমাণ করে, চেষ্টা আর নিষ্ঠা থাকলে শতবিধ বাধা-বিপত্তি ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মত উড়ে যেতে বাধ্য, আপাত দুর্দিনের অস্থায়ী অন্ধকার ছিঁড়ে সাফল্য আর উন্নতির আশাদীপ্ত আলো-বিচ্ছুরণ অবশ্যম্ভাবী, অপ্রতিরোধ্য।

ছাত্রপ্রিয় সফলব্রত অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ সেনের জীবন-কথা অন্যতম একটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে বড় হয়েছেন তিনি, হয় তো তাই তিনি সত্যিকারের 'মানুষ', যা' নাকি বর্তমান মনুষ্যসমাজে দুর্লভ হতে পেরেছেন। পুষ্পাস্তৃত ছাত্রজীবনের সৌভাগ্য তাঁর ছিল না, হয় তো জীবনে তাই ছাত্রকে মানুষ ক'রে তোলার মহান ব্রতে দীক্ষিত হয়েছেন, উপযুক্ত বিশেষত দরিদ্র ছাত্রের প্রতি তাই তাঁর সহানুভূতি অনুকম্পা অপরিমাণ। ছাত্ররাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, তাঁর আনন্দের সঙ্গী, তাঁর শিক্ষক-জীবনের সার্থকতা।

চট্টগ্রামের কোয়েপাড়া গ্রামে ১৮৯৫ সালের ১লা ডিসেম্বর নৃপেন্দ্রনাথ সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা স্বর্গত রজনীকান্ত সেন চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে ১৯১২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'য়ে প্রথম শ্রেণীর সরকারী বৃত্তি লাভ করেন নৃপেন্দ্রনাথ। গণিতশাস্ত্রেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৪ সালে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে সসম্মানে আই, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুনরায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিলাভ করেন। ১৯১৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে গণিতশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি, এস, সি পাশ করেন এবং বি-এ ও বি-এস-সি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে 'দ্বারকানাথ ঠাকুর' বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১৮ সালে ঐ একই কলেজ থেকে এম, এস, সি পরীক্ষায় Mixed Mathematicsএ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বাংলা সরকারের মাসিক একশো টাকা গবেষণা-বৃত্তি পান। তাঁর এই অসাধারণ সাফল্যে মুগ্ধ হ'য়ে ভারত-সরকার ১৯১৯ সালের প্রথমেই তাঁকে 'ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে' মনোনীত করেন। কিন্তু পরিবারে কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী না থাকার দরুণ তা প্রত্যাখ্যাত হয়। আবার ১৯১৯ সালে Hydrodynamicsএ তাঁর রিসার্চের কথা জানতে পেরে Punjab Drainage Board তাঁকে Irrigation Research Fellowর পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু রিসার্চের কাজ ব্যাহত হবার আশঙ্কায় তিনি তা' গ্রহণ করেন নি।

১৯২১ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতের অন্যতম অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। ১৯২২ সালে Nebular Hypothesis বিষয়ক গবেষণার জন্য তিনি

রায়চাঁদ বৃত্তি' লাভ করেন। ঐ বছরেই Hydrodynamics-এ গবেষণার জন্যে তিনি অর্জন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান—ডি, এস্-সি (ডক্টর অব সায়েন্স)। তাঁর মৌলিক গবেষণা Sir Gilbert Walker, Sc, D. F. R S. প্রমুখ পরীক্ষকগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। এই গবেষণার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বিখ্যাত মোয়াট স্বর্ণপদক দান করেন। নদীতে বান ডাকা (bores in rivers) এবং cycloneএর গতি-স্থিতি বিষয়ই ছিল তাঁর গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ভারতীয় গণিতশাস্ত্র চর্চাকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে। আর এই বিষয়ের আলোচনা, গবেষণা ও শিক্ষাদানে ডক্টর সেনকে অন্যতম বিশেষজ্ঞ বলা হয়। আরো

উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা দেশের সমসাময়িক আর কোন বিজ্ঞানীই এত অল্প সময়ের মধ্যে ডি, এস্‌-সি উপাধি পান নি। বিজ্ঞানজগতে তাঁর এই দান যে বাংলার গৌরবের বিষয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অতঃপর তিনি Calcutta Mathematical Societyর সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হন এবং পরে তার সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। শুধু তাই নয়, তিনি Calcutta Mathematical Societyর Bulletinএরও সম্পাদক হন এবং তাঁরই উদ্যোগে 'সোসাইটি'র রজত-জয়ন্তী পালিত হয়। ১৯২৮ সালে পৃথিবীর প্রথিতযশা গণিতজ্ঞদের রচনায় সমৃদ্ধ 'Commemoration Volume' সম্পাদনা ক'রে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। ১৯৩০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিতশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদে আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু নির্লোভ মানুষ ডক্টর সেন তা প্রত্যাখ্যান ক'রে তাঁর প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁর শিক্ষাতীর্থে স্বল্প বেতনের চাকুরীতেই থেকে যান।

শিক্ষক হিসাবে ছাত্রমহলে ডক্টর সেনের জনপ্রিয়তা শিক্ষক-সমাজের গৌরবের বিষয়। তাঁর শিক্ষাদানের রীতি সকলের চাইতে পৃথক। খুব কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাবে ব্যক্ত করেন তাঁর ছাত্রদের কাছে। পুরানো পদ্ধতি অবলম্বন না ক'রে তিনি সব সময়েই নতুন নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে গণিতশাস্ত্রে ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্যকে রক্ষা ক'রে চলেছেন। তাঁর ইচ্ছা তিনি আরো কাজ করবেন, তৈরী করবেন সত্যিকারের ছাত্র, যারা গণিতশাস্ত্রে দেশের সুনামকে আরো বাড়িয়ে তুলবে।

দেশের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের কথা ভেবে তাদের উপযোগী গ্রন্থ রচনা করার কথা অল্প যে ক'জন শিক্ষাব্রতী ভেবেছেন, ডক্টর সেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ও বিশিষ্ট। বহু শিক্ষাব্রতী এবং বিশেষত প্রেসিডেন্সী কলেজের সুবিখ্যাত গণিত-অধ্যাপক সারদাপ্রসন্ন দাস, আই, ই, এস্‌-এর অনুরোধে সুপাঠ্য একটি গণিতগ্রন্থের অভাব দূর করবার জন্যে তিনি গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন ১৯৩৫ সালে। এ ভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্যে রচিত তাঁর প্রথম পুস্তক 'পাটীগণিত' ছাত্র ও শিক্ষকমহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। এর পর তিনি তাঁর বিখ্যাত 'বীজগণিত,' 'সহজ জ্যামিতি,' 'ত্রিকোণমিতি' প্রভৃতি বইগুলি লেখেন। এগুলি আজ বাংলাদেশের প্রতিটি স্কুলেই পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। আর এই পুস্তকগুলো মৌলিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গণিতের কঠিন নিয়মগুলো খুব সহজ ও সরল ভাবে লেখার ফলে এগুলো ছাত্রদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে না, বরং গণিতশাস্ত্রের প্রতি তাদের আকর্ষণ শক্তিকেই জাগিয়ে তোলে। যা হোক, ভবিষ্যতে ডিগ্রী-কোর্সের জন্যেও তিনি এরকম কয়েকটা বই লিখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শুধু গণিতশাস্ত্রেই নয়, ডক্টর সেন ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যেও যথেষ্ট পারদর্শী! ইংরাজী ভাষার ওপর তাঁর যথেষ্ট দখল আছে, আর সংস্কৃতে তিনি অনেক সময় পণ্ডিতদেরও হার মানান। আরো উল্লেখযোগ্য যে, তিনি সাধু তারাচরণ পরমহংসদেব প্রতিষ্ঠিত মাসিক "সজ্জসাথী" পত্রিকার সম্পাদক।

ভারতবর্ষের বহু প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি জড়িত হয়ে আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও সাংসারিক ব্যাপারে মনোযোগ দিতে পারছেন না। কিন্তু তবুও তাঁর চেষ্টার শেষ নেই, কাজে এতটুকু ক্লান্তি নেই। বর্তমান বয়স তাঁর ষাট বছর, কিন্তু পরিশ্রম করেন পঁচিশ বছরের কর্মঠ যুবকের মতো। জ্ঞান-আহরণ ও জ্ঞান-বিতরণে তিনি নিজেকে সব-সময়েই ব্যাপৃত রাখেন, আর তাতে তাঁর আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু শুধু জ্ঞানী ও পণ্ডিত হিসেবেই নন, ব্যক্তি-মানুষ হিসেবেও তিনি অনেক বড়ো। সকলের সঙ্গেই তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক আর খুবই মিষ্টভাষী তিনি। কোন সময়েই এতটুকু বিরক্তিবোধ করতে দেখা যায় না তাঁকে। উপরন্তু কোন রকম অহংকার ও স্বার্থপরতা তাঁর পবিত্র জীবনকে মলিন করতে পারে নি, বরং পরোপকার করতে পারলে তিনি খুবই আনন্দিত হন। অহংকারশূন্যতা, পরোপকার, আন্তরিকতা, গভীর কর্মনিষ্ঠা আর আদর্শের প্রতি অবিচলিত মনোভাব প্রভৃতি গুণাবলী এই প্রখ্যাতনামা গণিতজ্ঞের জীবনকে করে তুলেছে আরো সুন্দর, আরো মহান্‌।

ডাঃ শ্রীতাপসকুমার বসু

কলকাতার অন্যতম খ্যাতিমান চিকিৎসক

বারাসত কোর্টের উকীল ছোট জাগুলিয়ার স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু নিজে তো উকীল ছিলেনই, উপরন্তু তাঁর পরিবারের প্রায় অনেকেই ছিলেন আইনজীবী। ক্রমশঃই নতুন নতুন আইনজীবীতে ভর্তি হচ্ছিল বসুপরিবার ও তাঁর আত্মীয়বর্গ। এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গেল অমৃতলালের পুত্র তাপসকুমারের ক্ষেত্রে। তাপসকুমার হলেন ডাক্তার। সত্য-মিথ্যার মায়াজালের আকর্ষণ ভেদ করে তিনি ধরলেন রুগ্ন-আর্ত-পীড়িত মানবের প্রতি সেবাব্রত গ্রহণের পথ। আইনের কুহকী প্যাঁচে আর তিনি দেবেন না মানুষকে জড়িয়ে যেতে, অসুস্থ প্রাণে তিনি করবেন সুস্থতার সঞ্চার একজন জনসেবী চিকিৎসকের তকমা এঁটে।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর ডাঃ বসুর জন্ম। হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই-এস-সি পাশ করেন ডাঃ বসু। এর পর একটা দোটানার আকর্ষণ। প্রথমে পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পড়তে শুরু করেন—ছেড়ে দিলেন, ঢুকলেন আর-জি-কর (তৎকালীন কারমাইকেল) মেডিক্যাল কলেজে। কিছুকাল পড়ার পর মেডিক্যাল কলেজ ছেড়ে অর্থশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি-এ পড়া শুরু করলেন—হয়তো আইনজ্ঞ হবার তিরোহিত বাসনা এক বার মনের একটি কোণে উঁকিঝুঁকি মেরে গিয়েছিল এই সময়টিতেই। কিন্তু মানুষকে সেবা করার ব্রত গ্রহণ করেছে যে তরুণ পথিক—কোনো আকর্ষণই আর তার পথ ফেরাতে পারবে না—শত শত দেহে ব্যাধি দূর করে আবার তাতে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার যে দেবতার জীবন্ত আশীর্বাদেরই জলন্ত স্বাক্ষর! শেষে ডাক্তারীই পড়তে লাগলেন তাপসকুমার। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এম, বি ও ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে এম-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাপসকুমার। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকেই আর-জি-করে নানা বিভাগে নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে আসছেন তাপসকুমার। বর্তমানে ওখানে ইনি ভ্রাম্যমান

শ্রীতাপসকুমার বসু

সমাধান। চিকিৎসকজীবনে পশ্চিম-বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে গুরু ও সহায়করূপে পেয়ে ডাঃ বসু বিশেষ গর্বিত। ডাঃ এম, এন বসুর কথাও ডাঃ বসু বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। ডাঃ বসুর সঙ্গে সেদিন আলোচনা হ'ল আজকের দিনের দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে। ডাঃ বসু জানালেন যে, এই শাস্ত্রের যতটা উন্নতি হওয়া উচিত ততটা কিন্তু হয় নি। তা ছাড়া যেখানে মানুষের জীবনের প্রশ্ন সেখানে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি ছেড়ে একটু আন্তরিকতার সুর আনা উচিত নয় কি? আমাদের দেশে হাসপাতাল ব্যবস্থা খুবই খারাপ। সময় মত 'বেড' পাওয়া যায় না—তার উপর ঠিক আশানুরূপ সহানুভূতিরও মাঝে মাঝে অভাব অনুভূত হয় বৈ কি। তার পর ওষুধ-পথ্যও ঠিক সময় মত পাওয়া যায় না—এক-একটির দামও আবার হয় তো ন' টাকা দশ টাকা। ঐ অঙ্কের টাকা দিয়ে ওষুধ কেনার ক্ষমতা বাঙলা দেশে ক'জনের আছে বলুন তো? তার পর আমার মনে হয়, যেখানে রোগীর ঠিক মত সেবার অসুবিধে আছে সেখানে 'রোগী নেওয়ার প্রয়োজন কি? তবে সাধ্যানুযায়ী মূল্যের কিছু কিছু ওষুধ যদি রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা যায়, তবে হয়তো দু' পক্ষেরই কিছুটা সুবিধে হতে পারে।

প্রায় পঁচিশ বছর হ'তে চলল ডাঃ বসু সেবাব্রতে লিপ্ত। দীর্ঘ দিনে হরেক রকমের নানা চরিত্রের রোগীর সংস্পর্শে এসেছেন ডাঃ বসু। তাদের কেন্দ্র করে এঁর জীবনে কত বার ঘটে গেছে কত রকমের ঘটনা। সব এক সঙ্গে মনে থাকার কথাও "নয়—যেগুলি মনে পড়ে সেগুলিও একসঙ্গে আপনাদের সামনে তুলে ধরাও অসম্ভব—তারই মধ্যে থেকে কতকগুলি ঘটনা তুলে ধরছি যা ডাঃ বসু সেদিন বললেন তাঁর চিকিৎসকজীবনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে—

এমন দেখা গেছে স্ত্রীর অসুখ, স্বামী হাতে টাকা গুঁজে দিচ্ছে খোঁজ-খবর নিচ্ছে, অথচ নিজে একবারও স্ত্রীকে দেখছে না—এর থেকেও আশ্চর্য, মায়ের অসুখে ছেলের প্রশ্ন মায়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নয় তার আগ্রহ মা কবে মারা যাবেন সেই তারিখটি জানতে, বাবার অসুখে ছেলে তিতিবিরক্ত হয়ে বলছে—আর কত দিন করে যাব রে বাবা—অর্থাৎ সেও তার পিতৃদেবের আরোগ্যপ্রার্থী নয়—মরণপ্রার্থী! অবশ্য হ্যাঁ, এ-ও যেমন একটা দিক—আবার এর বিপরীত দিকও আছে। বাপ-মায়ের বা স্ত্রীর অসুখে এমন লোকও আছে যার একটি কামনা রোগী বা রোগিণীর আরোগ্যলাভ, এমন কি প্রয়োজন হলে সব কিছুর বিনিময়েও।

ছাত্রজীবনে খেলাধুলার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল তাপসকুমারের। বর্তমানে অন্য কিছু বিষয়ে না লিখলেও চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লিখে থাকেন ডাঃ তাপসকুমার বসু।

শুক্রবারের সকাল। ন'টা বাজে-বাজে। অপেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ ডাঃ বসুর দর্শনার্থী রোগী-রোগিণীতে, এর পর আর আটকে রাখা যায় না ডাঃ বসুকে—আমার থেকেও তাঁর সঙ্গে ঐ সব বিধানার্থীদের সাক্ষাতের প্রয়োজনের মূল্য অনেক বেশী। নিতে হয় বিদায়। দরজার চৌকাঠ পার হব-হব, কানে এল মৃদু হাসির সঙ্গে ডাঃ বসুর কণ্ঠস্বর। ফিরে তাকালুম, আমাকেই বলছেন ডাঃ বসু—রা'শ রাশি বই পড়ে গাদা গাদা ডিগ্রী নিয়ে কোনও লাভ হবে না—সত্যিকারের লাভ হবে তখনই যখন জীবনে আসে জনগণের আশীর্বাদরূপী সার্থকতার মঞ্জুষা।

অধ্যাপক শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে কলিকাতা শহরে দেবজ্যোতি বর্মণের জন্ম হয়। তাঁহার আদিনিবাস ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায়। তাঁর বয়স যখন ৬ বছর তখন তাঁর পিতা অশ্বিনীকুমার বর্মণ ভাস্কর্য্যবিদ্যা শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে যান। কয়েক বৎসরের মধ্যেই চিত্রকর এবং ভাস্কর্য্য-বিদ্যাবিশারদ বলে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। লণ্ডনে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সেখানে তিনি প্রচুর টাকা উপার্জন করেন এবং এখান থেকে পরিবারবর্গকে লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। এমন সময়ে বাধে প্রথম মহাযুদ্ধ, লণ্ডন যাত্রা বন্ধ হয়ে যায় এবং তাঁকেও সৈন্য হয়ে রণক্ষেত্রে যেতে হয়। কারবার নষ্ট হয়ে যায়। এর পর থেকে আবার ব্যবসায় জমিয়ে তোলার অনেক চেষ্টা তিনি করেছেন কিন্তু আর সে রকম সফল হতে পারেন নি; দেশেও আর আসেন নি। গত বৎসর ইংলণ্ডেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে লাগলেন তাঁর মা। তাঁরা ছিলেন তিন ভাই এক বোন। মা সিলেট সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে চাকরি নিলেন। দেবজ্যোতি বাবু ১৯২৩ সালে সিলেট রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে মুরারিচাঁদ কলেজে আই, এস, সিতে ঢুকলেন। পরীক্ষার আগে চক্ষুরোগে আক্রান্ত হয়ে দুই বৎসর ভুগলেন। ১৯২৭ সালে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই, এস সি পাশ করেন। তার পর ভর্তি হলেন সিটি কলেজে বি, এস, সি, ক্লাসে। কেমিষ্ট্রিতে অনার্স ছিল। এবারও

অসুস্থতার জন্য পড়ার ব্যাঘাত হতে লাগল। ঠিক সময়ে বি, এস, সি পরীক্ষা দিতে পারলেন না।

বি, এস, সি পড়ার সময়েই তিনি বৈপ্লবিক সাহিত্য প্রচারে মনোনিবেশ করেন এবং যুগবাণী সাহিত্যচক্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়েই তিনি প্রথম সাপ্তাহিক যুগবাণী প্রকাশ করেন। ১৯৩২ সালের ৭ই জানুয়ারী তিনি সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার হলেন। তখন তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বহরমপুর বন্দিশিবিরে। সেখান থেকে তিনি বি-এস-সি পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি চাইলেন। গভর্ণমেণ্ট জানালেন, সায়েন্স পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না, আর্টস্ দিতে আপত্তি নাই। পরীক্ষার তখন পাঁচ মাস মাত্র বাকী। তিনি অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে পরীক্ষা দিলেন এবং অনার্সসহ পাশ করলেন। সেটা ১৯৩৩ সাল। ১৯৩৪ সালের ২১শে জুলাই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বক্সা দুর্গে। সেই দিন তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। বক্সা থেকে তিনি আইনের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯৩৭ সালে যখন বক্সা দুর্গ উঠে যায়, তখন তাঁকে পাঠানো হয় আরামবাগের গোঘাটে। সেখানে কয়েক মাস অন্তরীণ থাকার পর বদলী হন সন্দ্বীপে। সেখান থেকে ১৯৩৮ সালে কলিকাতায় অন্তরীণ হন।

সেই বছরের শেষের দিকে গান্ধীজি কলিকাতায় আসেন এবং উডবার্ণ পার্কে শরৎচন্দ্র বসুর বাড়ীতে অবস্থান করেন। এক দল মুক্ত রাজবন্দী গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করে অন্য রাজবন্দীদের মুক্তি এবং মুক্ত রাজবন্দীদের কর্মসংস্থানের জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। আর কয়েক জন মুক্ত রাজবন্দীকে সঙ্গে নিয়ে

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

সুভাষচন্দ্রকে বলেন যে, গান্ধীজি রাজবন্দীদের সম্বন্ধে যাতে খারাপ ধারণা নিয়ে না যান, তার জন্য তিনি গান্ধীজির সঙ্গে বাংলার বৈপ্লবিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে চান। আগের রাজবন্দী দলের আবেদন-নিবেদনে সুভাষচন্দ্রও খুসী হন নি, তিনি তাঁকে গান্ধীজির কাছে পৌঁছে দিলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর আলোচনা হল। গান্ধীজি বলেছিলেন—তোমাদের মত কর্ম্মী পেলে আমি অলৌকিক কাণ্ড করতে পারতাম।

১৯৩৯ সালে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় সাব-এডিটরের পদে নিযুক্ত হন। তিন মাসের মধ্যে সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁকে সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখকরূপে নিজের কাছে টেনে নেন। ১৯৪০ সালে মাখনলাল সেন যখন আনন্দবাজার পত্রিকা ছেড়ে চলে আসেন তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে চলে আসেন। মাখন সেন "ভারত" বের করলে তিনি তাতে যোগ দেন। ১৯৪২ সালে ভারত বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে মডার্ণ রিভিউ এবং প্রবাসীর নোটস্ এবং বিবিধ প্রসঙ্গ লেখার ভার দেন। তিনি এই কাজ এত সাফল্যের সঙ্গে চালিয়েছিলেন যে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্টাইল সম্পূর্ণরূপে বজায় ছিল। ১৯৪৩ সালে ডাঃ কালিদাস নাগ যখন এসিয়াটিক সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারী, তখন তিনি তাঁকে সেখানে ডেকে নেন এবং তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা এবং অন্যান্য বই এর পাবলিকেসন অফিসার নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ সালে তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং এসিয়াটিক সোসাইটির চাকরী ছেড়ে দিয়ে তার সদস্য হন। ১৯৪৬ সালে ভারত আবার বের হয় এবং আবার তিনি সেখানে যান। বছর তিনেক বাদে ভারত আবার বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৯ সালে তিনি আবার সাপ্তাহিক যুগবাণী বার করেন। তখন থেকে এই পত্রিকা সাফল্যের সঙ্গে চলছে এবং বর্ত্তমানে বাংলার সংবাদপত্র-জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

১৯৫০ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত বই "বিড়লাবাড়ীর রহস্য" প্রকাশ করেন। এই বই সারা ভারতবর্ষে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। বঙ্গীয় বিধান সভায় দেবেন সেন এই বইটিকে আমেরিকার বিখ্যাত বই টমকাকার কুটীরের সঙ্গে তুলনা করেন। বইটির বাংলা, হিন্দি এবং তামিল অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং ওড়িয়া, মারাঠী ও গুজরাটি পত্রিকায় উহার বহু অংশ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

কলিকাতা ট্রাম আন্দোলনের পর তদন্ত কমিশন নিযুক্ত হলে তিনি সেই কমিশনের সামনে উপস্থিত হন। সেখানে জেরায় এবং সওয়ালে ট্রাম কোম্পানীকে তিনি একেবারে পর্য্যুদস্ত করে দেন এবং কমিশন রায় দেন যে, কোম্পানী ভাড়া বৃদ্ধির যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারে নাই। বিচারপতি প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রকাশ্য আদালতে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ সওয়ালের জন্য তাঁকে অভিনন্দিত করেন।

প্রেস কমিশন কলিকাতায় এলে তিনি নিখিল বঙ্গ সাময়িক পত্র-সঙ্ঘের প্রতিনিধি দলের নেতা হয়ে কমিশনের সামনে উপস্থিত হন এবং সাক্ষ্য দেন। সাময়িক পত্রের অসুবিধার কথা এবং তার প্রতিকারের দাবী সেখানে খুব জোরের সঙ্গে জানিয়ে আসেন।

সীমা কমিশন কলিকাতায় এলে নিখিল বঙ্গ ভাষাভিত্তিক প্রদেশ পুনর্গঠন কমিটির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তিনি যান এবং ডাঃ মেঘনাদ সাহা এবং তিনি বাংলার দাবীর কথা জোরের সঙ্গে বলেন। কমিশনের নিকট তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, ১৪টি ভাষা আঞ্চলিক রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে; তাদের কেন্দ্র করে সারা ভারতে ১৪টি প্রদেশ গঠন করলে এবং হিন্দিভাষী প্রদেশ অতিকায় হবে বলে তাকে ভেঙ্গে দুটো তিনটে প্রদেশ করলে সকলেই সন্তুষ্ট হবেন। শেষ পর্য্যন্ত প্রায় তাই হয়েছে।

১৯৫১ সালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। প্রথম থেকেই তিনি কলিকাতার জল সমস্যার সমাধানের জন্য চাপ দেন ও পথ নির্দ্দেশ করেন। বিরোধীদলের নেতারূপে সংযুক্ত নাগরিক সমিতির দলটিকে কর্পোরেশনের মধ্যে ইনি খুব কার্য্যকরী করে তুলেছিলেন, এমন সময়ে এল বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি আন্দোলন। দেশের লোক ডেকে বলল যে, নির্বাচিত সমস্ত প্রতিনিধিরা যেন তাঁদের আসন ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন। বোম্বাই এবং উড়িষ্যার অনেকে পদত্যাগ করলেন কিন্তু সারা বাংলায় করলেন একমাত্র এই মানুষটি। তিনি প্রমাণ করলেন যে, দেশের ডাকে যেমন তিনি জনপ্রতিনিধিত্ব করতে এগিয়ে গিয়েছেন, তেমনি আবার দেশের ডাকে সে পথ ছেড়ে চলে আসতেও তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন নুতন আইনে পুনর্গঠিত হল, তখন তিনি তার বৃহত্তম নির্বাচকমণ্ডলী থেকে বিপুল ভোটাধিক্যে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হলেন। উচ্চ শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি সেখানে আগ্রহের সঙ্গে কাজ করছেন।

এত কাজের মধ্যেও তিনি কিন্তু নিজের আসল কাজ লেখাপড়া এক দিনের জন্যেও ছাড়েন নি। গোঘাটে অন্তরীণ থাকার সময়ে তিনি রাজনীতিতে এম, এ এবং আইনের শেষ পরীক্ষায় পাশ করেন। তার পরে অর্থনীতি, বাণিজ্য, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, আধুনিক ইতিহাস, দর্শন এবং ইংরাজীতে এম, এ পাশ করেন। তাঁর লেখাপড়া শেষ হয়েছে কিনা এ কথা কেউ জিগ্যেস করলে তিনি জবাব দেন—"আমি তো ছাত্র। সারা জীবনই তো আমি পড়ব আর পরীক্ষা দেব"। বছর তিনেক ধরে তিনি হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হিসাবে প্র্যাকটিস করছেন। অনেক দিন ধরে তিনি দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং নিয়মিত প্রবন্ধ লিখছেন।

তাঁর হবি কি? জিজ্ঞেস করলে একটি মাত্র জবাবই পাওয়া যায়—পড়া এবং লেখা। সারা ভারতে তাঁর শ্রেষ্ঠ তীর্থ—ন্যাশনাল লাইব্রেরী।

মনোজ বসু

বর্ত্তমান বাঙলার অন্যতম খ্যাতিলব্ধ সাহিত্যশিল্পী

মজিলপুরের দত্তদের সেরেস্তার একজন প্রভাবশালী উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন যশোর জেলার ডোঙাভাঙার পরলোকগত রামলাল বসু। জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন বলেই নিজেকে তিনি জাবেদা বা আসামীয়ান বই কিংবা গুজরোত খোদের হিসেব-নিকেশে মিশিয়ে দেন নি, নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন সাহিত্যের সেবায়। এই সাহিত্য-প্রীতি তাঁর পৈত্রিক। পিতৃদেবের লেখা 'মহাভারত' অনেক দিন বর্তমান ছিল—রামলালের সাহিত্যচর্চার নিদর্শনগুলি ধরে রাখত সেদিনকার পত্র-পত্রিকারা। হয় তো কোনো এক সন্ধ্যায় একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পুত্রকে বললেন—'অমুকের ঐ বইটা নিয়ে এস তো বাবা'—শৈশবের দরজা পেরিয়ে সবে সে বালকত্বে প্রবেশপত্র পেয়েছে। বাবার সংলাপের দিকে তার দৃষ্টি পড়ে। চেষ্টা করে তার থেকে কিছু গুরুত্ব উপলব্ধি করতে। করেও। সে বুঝতে পারে যে বাবার সমস্ত বাক্যাংশের মধ্যে 'অমুকের' কথায় জোর আছে সব চেয়ে বেশী। লেখকই এখানে মুখ্য, লেখা গৌণ। বালকের মনে ছাপা হয়ে যায় বাবার এই কথাটি। কে যেন বার বার বলে 'তোমাকে ঐ লেখকই হতে হবে'—'তোমায় লেখক হতে হবে'—'লেখক হতে হবে'—বাল্যকালের সেই স্বপ্ন আজ পরিপূর্ণ বাস্তবে হয়েছে রূপায়িত, ছোট্ট চারাগাছটি আজ হয়েছে মহীরুহ আর সেদিনকার ডোঙাভাঙার সেই বালকটিই আজকের অন্যতম খ্যাতিলব্ধ সাহিত্যিক সাহিত্যকর্মী মনোজ বসু।

বাঙলা ১৩০৮ সালের ৯ই শ্রাবণ (ইং জুলাই ১৯০১) স্বগ্রামে জন্ম হয় মনোজ বসুর। জনক-জননীর একমাত্র পুত্র ও সর্বশেষ সন্তান। আট বছর বয়সে বাবাকে হারান—লেখা তখনই শুরু হয়েছে। গ্রাম্য স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র তখন—লেখা পাঠিয়ে দিলেন কলকাতার তৎকালীন কোন এক বিখ্যাত মাসিক-পত্রের কার্য্যালয়ে। মনে অদম্য আশা, অপরিসীম কৌতূহল, কল্পনা-ঘেরা কত রঙীন স্বপ্ন—সসম্মানে লেখা ফেরৎ এল!
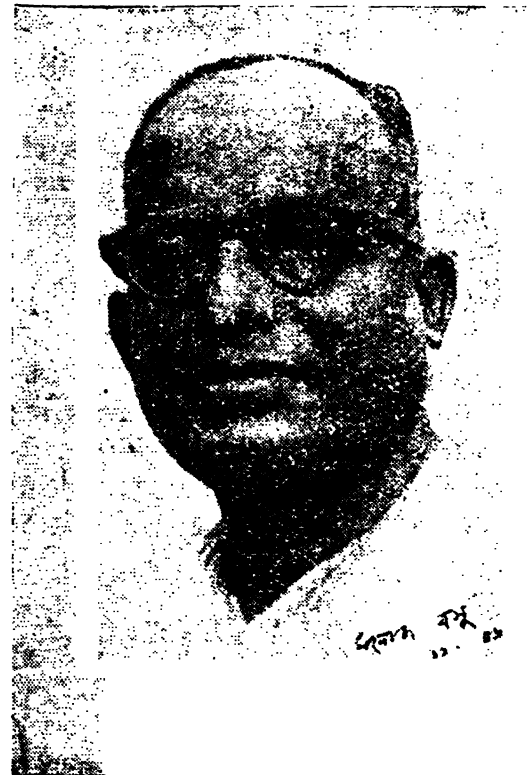
যাত্রীর যাত্রাপথের প্রথম ব্যাঘাত কিন্তু ব্যাঘাতই হোল তাঁর প্রথম পুরস্কার। সামনের দিকে দৌড়তে গেলে দু-এক পা পিছনে আসতে হয়। বাইসাইকেল চালানো হয় প্যাডেলটা সামনের দিকে চালিয়ে কিন্তু সেই চালনা আরম্ভ হয় প্যাডেলকে দু-এক পা পিছনে চালিয়ে। যে ব্যক্তি পিছনে ফিরতে জানে না, সামনের দিকে যাওয়ার মর্যাদা কেমন করে সে অনুভব করবে? অগ্রগমনের অধিকার আছে তারই, যে পিছন ফিরতে জানে। লেখা ফেরৎ এলো মনোজ বসুর। জেদ গেল বেড়ে, এল আরও একাগ্রতা, এল গভীর তন্ময়তা, এল অনির্বাপিত নিষ্ঠা—এরাই নিয়ে যেতে লাগল মনোজ বসুকে সাধনার অভীষ্টলোকে।

এদিকে পড়াশুনা চলছে। কলকাতার রিপণ স্কুল থেকে দিলেন প্রবেশিকা পরীক্ষা। ভর্তি হলেন বাগেরহাট কলেজে। বাঙলা দেশের তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা কি? শাসকের ছদ্মবেশে যারা এসেছিল, শোষকের রূপটিও তাদের প্রকট হয়ে উঠেছে। সোনার ভারত তারা করে তুলেছে শ্মশান, মুষ্টিমেয় কয়েক জন রাজভক্ত সারমেয় ছাড়া সারা দেশ জুড়ে সেদিন চলছে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। বাঙলার বাঙালীই সেই প্রতিবাদের প্রথম বাণী, শুধু তাই নয়, বাঙালীই সেদিন সারা ভারতকে পরিচালিত করছে বুদ্ধিবলে ও মেধায়। পাঁচ সালের প্রভাব তখনও অস্পষ্ট হয়নি। অ-বাঙালীর মধ্যে সবে আবির্ভাব হয়েছে ঝানু ব্যারিষ্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর, তবে তখনও ঠিক তিনি জাতির জনকত্ব লাভ করেন নি—দ্বাদশ আদিত্যের তেজে ভাগ্যগগনে জ্বল-জ্বল করে সেদিন জ্বলছেন বর্তমান যুগের বাল্মীকি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। ওটেনের সর্বদেহে সেদিন হয়তো বিনামার নাগপাশ জড়িয়ে দিচ্ছেন—প্রেসিডেন্সী কলেজের কৃতী ছাত্র অভিজাতবংশীয় সুভাষচন্দ্র বসু। পারলেন না নিজেকে সরিয়ে রাখতে মনোজ বসু—পড়া চলতে চলতেই এগিয়ে এলেন দেশের কাজে—যোগ দিলেন স্বেচ্ছাসেবকের দলে, গ্রামে গ্রামে বেচতে লাগলেন খদ্দর, মাঠে-ঘাটে দিতে লাগলেন বক্তৃতা। এই ভাবেই একদিন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বি-এ পাশ করলেন মনোজ বসু—সাউথ সাবার্বাণ কলেজ (বর্তমানের আশুতোষ কলেজ) থেকে—বি-এ পড়ার সময় এঁর সহপাঠী ছিলেন আজকের দিনের আর এক জন কীর্তিমান সাহিত্যিক, 'কল্লোল যুগের' অন্যতম প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা, সুকবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে কল্লোল প্রসঙ্গে সমানভাবেই যাঁর নাম উল্লেখনীয়)। তারপর আইন পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হলেন মনোজ বসু। ওকালতি শুরু করলেন, তবে হাইকোর্টে নয়—সাহিত্যের কোর্টে কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষ নিয়ে নয়—মানুষের পক্ষ নিয়ে, রচনা করলেন কত কবিতা, কত গল্প, কত উপন্যাস। সাতটা টিউশানী একসঙ্গে করেছেন মনোজ বসু—দীর্ঘ দিন শিক্ষকতাও করেছেন সাউথ সাবার্বাণ স্কুলে।

একটু পিছিয়ে যাই। লেখা চলছে। সব জায়গা থেকেই যখন লেখা ফেরৎ আসে সেই সময়ে স্নেহময়ী জননীর মত 'বিচিত্রা' এগিয়ে এল, কোলে তুলে নিল তার রণক্লান্ত সন্তানকে, মুছিয়ে দিলে তার দেহের ক্লান্তি, রণজয়ী বীরের মুখে ফোটে দীপ্ত হাসি। বাঙলার পত্র-পত্রিকাগুলির ইতিহাস যেদিন রচিত হবে সেদিন তরুণের অখ্যাতের উপেক্ষিতের অন্যতম বন্ধু হিসেবে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবে দক্ষ সাহিত্যিক আদর্শ সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম। বিচিত্রায় বেরোতে লেখার পর লেখা, প্রবাসীও ছাপল। গল্পের নাম বাঘ। যে গল্প পড়ে সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলেন বাঙলা সাহিত্যের একজন পথনির্দেশক—দিকপাল সাহিত্যশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাদরে আলিঙ্গন করে যিনি উৎসাহিত করেছিলেন নবাগত আগন্তুককে।

লোকশিল্পের প্রতিও অসম্ভব আকর্ষণ মনোজ বসুর, বাঙলার আনাচে-কানাচে তিনি ঘুরেছেন, সুদুর্গম পথ মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন—আবিষ্কার করেছেন হয় তো একটি শিবালয়—সুপ্রাচীন ভগ্নপ্রায়। ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্তকে লোকনৃত্যের অনেক হদিশ দিয়েছিলেন মনোজ বসু। মহাচীন ও মহারুশও সাদরে আমন্ত্রণ করে সম্মান জানিয়েছে বাঙলার সাহিত্যিককে। এই দুই মহাদেশ পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন মাসিক বসুমতীতেই প্রকাশিত 'চীন দেখে এলাম' এ ও মাসিক বসুমতীতেই করে রাখছেন, 'সোবিয়েতের দেশে দেশে'তে।

বৈপ্লবিক মনোজ বসুর রচনায় তাঁর নিজের জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ভুলি নাই, সৈনিক, বাঁশের কেল্লা প্রভৃতিতে। গান্ধীবাদকে কেন্দ্র করে লেখা নবীন যাত্রা। গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রচিত হয়েছে 'পৃথিবী কাদের'। তাঁর 'নরবাঁধ' ও 'রায়বায়াণের দেউল' গল্পগুলি ভোলবার নয়।

আজ লেকের ধারে চিত্তহারী বাড়িতে বাস করলেও ঘরের মেঝে মোজেকের, বারান্দা ও জানালা হালফ্যাসানের হলেও মনোজ বসুর মন এখনো ডোঙাভাঙার স্মৃতিতে ভরা। মনে মনে এখনও মনোজ বসু পল্লীজননীর শ্যামল স্নেহের পেয়ে থাকেন আস্বাদ—তাই তো বাঙলা ছোটগল্পে তাঁর স্থান অটল, যে গল্পের মাধ্যমে তিনি শুনিয়ে থাকেন সরস প্রেমের সুমিষ্ট কাহিনী, যেখানে তিনি অদ্বিতীয়, তিনি অনন্যসাধারণ।

মাসিক বসুমতীর পক্ষ থেকে সর্বশ্রী কল্যাণ দাশগুপ্ত, কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিত।]

• • • এ মাসের প্রচ্ছদপট • • •

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে স্বর্গত ভবানীচরণ লাহা মহাশয়ের সংগ্রহশালার একটি কক্ষের আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। চিত্রখানি

টাকা/আনা/পাই

জ্যোতির্ময় রায়

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

মৃগাঙ্ক। কি বিশু, কি খবর—তারপর ভোলারাম—[এগিয়ে কৌচে বসে সিগারেটের টিন খোলে] নে ধরা—[দু'জনকে দেয়, নিজেও একটা ধরায়।]

(বিশু কৌচে পা তুলে আরাম করে এগিয়ে এসে বসে।)

ভোলা। একটু জমিয়ে গল্প করা যাক।—[এগিয়ে সেণ্টার টেবিলে বসে] দাদা তোমার—দাদাকে আজকাল তুমি বলতে কেমন আটকিয়ে যায় রে, বিশু।

মৃগাঙ্ক। যা বাজে বকিস না—কি বলছিলি বল।

ভোলা। সকাল থেকে তোমার সাথে কতো লোক দেখা করতে আসছে—আর ম্যানেজার—সত্যি, ম্যানেজার কিন্তু—

(এমন সময় ম্যানেজারকে দেখা যায় বেরিয়ে আসতে পাশের করিডর থেকে। ম্যানেজারকে দেখে ভোলা ঝটকা টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ায় এবং যেখানটায় বসেছিলো সেখানটা মুছেও দেয়। বিশু নাচানো পা'টা টিপে ধরে নামিয়ে দেয়। মৃগাঙ্ক একটু কেসে সিগারেটে একটা জোর টান দেয়। ম্যানেজার কাছে একটু এগিয়ে আসে। ভোলা ঢোক গেলে।)

ম্যানেজার। মর্ণিং।

মৃগাঙ্ক। মর্ণিং।

ম্যানেজার। আপনার ব্রাদার ইন-ল মিঃ সেন এসেছিলেন।

মৃগাঙ্ক। [সবিস্ময়ে] মিঃ সেন!

ম্যানেজার। হ্যাঁ, আমি পরে কোনো একদিন আসতে বলেছি।

মৃগাঙ্ক [হেসে] বেশ করেছেন।

(ম্যানেজার চলে যায়।)

বিশু। এই, ম্যানেজারকে দেখে তুই ওভাবে দাঁড়িয়ে উঠলি যে?

ভোলা। [বিব্রত অবস্থায়] না দাঁড়িয়ে উঠিনি, এই একটু—

বিশু। [ব্যঙ্গের সুরে] উঠে দাঁড়ালাম।

মৃগাঙ্ক। [বিশুকে] আর তোরই বা পা নাচানোটা থেমে গেল কেন? আরে মালিক হতে অভ্যাস দরকার—আমারই তো গলাটা কেমন শুকিয়ে ওঠে—আর তাছাড়া লোকটাও তো দেখতে হবে। স্যর টি এন-এর নাতি। তোদের বৌদির কিন্তু পরোয়া নেই—খাসা মানিয়ে নিয়েছে। দেখলে মনে হবে, জীবনভর লাখ লাখ টাকার ওপরই বসে আছে।

বিশু। তা হবে না, তুমি উঠলে দাদা, একতলা থেকে সাততলায়—বৌদি উঠেছেন পাঁচ থেকে সাতে।

মৃগাঙ্ক। তা যা বলেছিস [একটু থেমে হেসে ওঠে] [illegible]

ভারি হাসি পাচ্ছে একটা কথা ভেবে—ম্যানেজারকে ডিঙোতে না পেরে মিঃ সেনের মতো ব্যক্তি দেখা না করেই চলে গেল। দেখ বিশু, লড়ায়ের সময় বাড়ির সামনে ব্যাফল ওয়াল দিতে দেখেছিস?

বিশু। দেখেছি।

মৃগাঙ্ক। টাকাও তেমনি ব্যাফল ওয়াল দাঁড় করায়। যার যত বেশী পারচেজিং পাওয়ার, অর্থাৎ যত বেশী কেনার ক্ষমতা তার সামনে তত বেশী ব্যাফল ওয়াল দাঁড়িয়ে যায়। এই দেখ না, আগে কেউ যদি এসে ডাকতো মৃগাঙ্ক বাবু বাড়ী আছেন, নেই বলতে হলেও আমাকেই নাক বাড়াতে হতো। আর এখন? মিঃ সেনকেও ফিরে যেতে হয়—

(এমন সময় রচনা আপিস-কামরার আগের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে। পরনে দামী সাধারণ পোষাক।)

বিশু। (দাঁড়িয়ে উঠে) আসুন বৌদি বসুন।

রচনা। তোমরা বসো, আমি বাগানে মালির কাজটা একবার দেখে আসি।

(রচনা করিডর দিয়ে বেরিয়ে যায়। অফিস-ঘর থেকে এগিয়ে আসে ম্যানেজার।)

ম্যানেজার। সকাল থেকে অনেকেই দেখা করতে এসেছিলো, তাদের আমি পরে আসার জন্যে টাইম দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু দুটো পার্টি অপেক্ষা করছে—এই পাবলিক সার্ভিস সংক্রান্ত, তাই এদের রিফিউজ করিনি। আপনার এখন এ সবের সঙ্গে একটু যোগাযোগ রাখাই বোধ হয় ভালো।

মৃগাঙ্ক। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

ম্যানেজার। আপনি অফিস-রুমে আসবেন, না এখানে নিয়ে আসবো?

মৃগাঙ্ক। এখানেই নিয়ে আসুন।

(ম্যানেজার চলে যায়। মৃগাঙ্ক একটা সিগারেট ধরিয়ে একটু প্রস্তুত হয়ে বসে। ম্যানেজার সঙ্গে নিয়ে ফেরে একজন মধ্যবয়সী এবং দুটি যুবককে। পোষাক-আসাকে সমাজসেবীর ধরণ-ধারণ।)

মৃগাঙ্ক। বসুন।

(সবাই বসে। ম্যানেজার দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে লক্ষ্য করে মৃগাঙ্ক বলে বসুন।)

ম্যানেজার। ঠিক আছে।

মৃগাঙ্ক। [আগতদের] বলুন।

প্রধান ব্যক্তি। আপনি কাগজে পড়েছেন নিশ্চয়ই, ২৪ পরগণার এতগুলো গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে—কি অবস্থা চোখে না [illegible]

ধনী ব্যক্তিরা সবাই যথাসম্ভব সাহায্য করছেন—আপনার মতো ব্যক্তি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে কিছু করবেন, এ আশা নিয়েই এসেছি।

মৃগাঙ্ক। আমি মহাপ্রাণ নই, তবু দুর্ভিক্ষ যখন লেগেছে, তখন কিছু করতে হবে বৈ কি। বেশ, কতো দেবো বলুন? এক লাখ—দু'লাখ—

(আগত ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে ম্যানেজারের দিকে তাকায়. ম্যানেজারও তাদের দিকে তাকায়।)

প্রধান ব্যক্তি। সে আপনার দয়া, দুঃখ-দারিদ্রের চেহারা আপনি দেখেছেন, তাই বোধ হয় বুক দিয়ে এতখানি এগিয়ে আসছেন, আপনি সত্যিই মহৎ।

মৃগাঙ্ক। বেশ তাই হবে—তিন লাখই দেওয়া যাবে।

ম্যানেজার। [বাধা দেবার ভাব নিয়ে] কিন্তু—

মৃগাঙ্ক [হাত তুলে তাকে থামিয়ে, আগতদের লক্ষ্য করে] কি না একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেতে হবে আপনাকে।

প্রধান ব্যক্তি। নিশ্চয়ই, কি বলুন? টাকাগুলো সত্যিকারের প্রয়োজনে খরচ হবে, এই তো?

মৃগাঙ্ক। তা তো হতেই হবে, সে কথা নয়—টাকাটা নেবার সময় প্রমাণসহ এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেতে হবে যে, দুর্ভিক্ষ আর হবে না।

(আগতরা মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে। ম্যানেজার একটু মুখ টিপে হাসে।)

প্রধান ব্যক্তি। এ প্রতিশ্রুতি আমি কি করে দেব বলুন? দুর্ভিক্ষ হওয়া-না-হওয়াটা তো আমাদের হাতে নয়?

মৃগাঙ্ক। তবে খুঁজে বার করুন, দুর্ভিক্ষও আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। চাঁদার জন্যে আপনাদেরও আর ঘুরে মরতে হবে না। দুর্ভিক্ষ তৈরী কলটা চালু থাকবে, আর আমরা চাঁদা দিয়ে দিয়ে, শেষ পর্যন্ত আর একজন দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়ে দাঁড়াবো, এই কি আপনি চান?

প্রঃ ব্যক্তি। না তা চাইনি। বেশ অত না দিয়ে না হয় আপনি অল্প করেই কিছু দিন।

মৃগাঙ্ক না অল্প-টল্প নয়, দিলে আমি বেশীই দেবো, কিন্তু ঐ প্রতিশ্রুতি চাই।

প্রঃ ব্যক্তি। তা তো সম্ভব নয়?

মৃগাঙ্ক। তবে আসতে পারেন—নমস্কার।

(সবাই উঠে এগিয়ে যায়। মৃগাঙ্ক আর বিশুর দৃষ্টি-বিনিময় হয়—মৃগাঙ্ক হাসে। আগতরা এগিয়ে যায় বাইরে যাওয়ার দরজার কাছে, প্রধান ব্যক্তি বলে—)

প্রধান ব্যক্তি [চাপা কণ্ঠে] পাগল!

(সবাই মুখ টিপে হেসে বেরিয়ে যায়। মৃগাঙ্ক উঠে পায়চারী করে। ম্যানেজার অফিস-ঘরের দরজায় দাঁড়ানো চাপরাশীকে ইঙ্গিত করে। সে আরও জনচারেক যুবককে পাঠিয়ে দেয়।)

মৃগাঙ্ক। বসুন।

(মৃগাঙ্ককে দাঁড়ানো দেখে তারাও দাঁড়িয়েই থাকে।)

মৃগাঙ্ক বক্তব্য?

তরফ থেকে, আপনাকে আমাদের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে হবে—আর কিছু আর্থিক সাহায্যও আশা করি।

মৃগাঙ্ক। বেশ, সবচেয়ে মোটা চাঁদা যা পেয়েছেন, তার ডবলই দেবো, কিন্তু কথা দিতে হবে, আমিই হবো উৎসবের সভাপতি আর মণ্ডপে কেবলমাত্র আমার ঢোকার পথটায় থাকবে ম্যাটিং—

[যুবকরা কথাগুলো শুনে হাসে]

হাসছেন কেন আপনারা—এই তো করে থাকেন, আমি নিজে চেয়ে ফেললাম বলে হাসির কথা মনে হচ্ছে, না?

১ম যুবক। [হাসতে হাসতে] না ঠিক তা নয়।

মৃগাঙ্ক। তবে হঠাৎ-বড়লোক বলে—জন্ম-বড়লোক বা ধীরে-ধীরে বেড়ে-ওঠা বড়লোক ছাড়া, চটজলদী এতখানি মেনে নিতে একটু বাধে না! তা বেশ, সরে যাবার জন্যে সময় ছেড়ে দিচ্ছি, আসবেন পরে।

২য় যুবক। কিন্তু আমাদের যে সভাপতি ঠিক হয়ে গেছে।

মৃগাঙ্ক। আমাকে যেদিন ঠিক করবেন, সেদিন আসবেন, এখন যেতে পারেন।

(সবাই বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেরিয়ে যায়। বিশু হা-হা করে হেসে ওঠে। ম্যানেজার ভ্রূ কুঁচকে তাকায় তার দিকে। মৃগাঙ্কও হাসতে হাসতে কৌচের ওপর গা ছেড়ে বসে পড়ে।)

মৃগাঙ্ক। কেমন হচ্ছে রে বিশু?

বিশু। বহুৎ আচ্ছা দাদা! খাড়া নাকের উপর সব বুলিয়ে দিচ্ছ, এই তো চাই, ঐ বস্তির মালিক ব্যাটাকেও ঠিক এমনি করে সমঝে দেবে।

মৃগাঙ্ক। নিশ্চয়ই—(ম্যানেজারকে) এ্যাটর্ণির কাছ থেকে মানহানির চিঠিটা ওর কাছে চলে গেছে তো?

ম্যানেজার। গেছে।

মৃগাঙ্ক। ঠিক আছে। আপনি আর কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন? আপনার ঘরে যান।

ম্যানেজার। না আমি বরং একবার দেখে আসি মিসেস চ্যাটার্জির যদি কোন দরকার থাকে।

(ম্যানেজার চলে যায়)

ভোলা। [সোৎসাহে] এবার তোমার জ্যাঠাশ্বশুরের সাথে একবার মোলাকাৎটা সেরে এসো দাদা!

বিশু। অ—সেই যে সেই [নাক টেনে] তোমাকে না কি বিড়ি খাও কি না জিজ্ঞেস করেছিলো?

মৃগাঙ্ক। [গম্ভীর মুখে] হুঁ, সেই. ঠিক মনে করিয়েছিস্ ভোলা! [একবার নাক টেনে] বিড়ি খাও—নাঃ, জবাবটা দিতে আজই যেতে হবে একবার।

(মৃগাঙ্ক সিগারেটের টিন হাতে উঠে দাঁড়ায়)

মৃগাঙ্ক। উঠি রে বিশু, একটু কাজ আছে ওপরে।

বিশু। [হাই তুলে] হাঁ আমরাও উঠি। চানের আগে আর একবার একটু গড়িয়ে নিই গে—এ ছাড়া খাটনির কাজ আর কিছু তো রাখনি—চল রে ভোলা!

(মৃগাঙ্ক সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়, ভোলা-বিশু চলে যায় তাদের ঘরে)

[১৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

অঘোর প্রকাশ

(স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী)

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

দশম পরিচ্ছেদ

দৈনিক জীবন, ও কন্যা সুসারের বিবাহ

১৮৮৪ সালটা যেন আমাদের জন্য কত বিশেষ ব্যাপার লইয়া আসিতেছিল। এই বৎসর ৮ই জানুয়ারী আচার্য্য কেশবচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিলেন। তুমি শ্রাদ্ধের সময় কলিকাতায় উপস্থিত ছিলে, এবং সেখানকার শোকমিশ্রিত ভক্তির অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলে।

কিছুকাল পরে ভাগলপুর সমাজের উৎসব উপস্থিত হইল। তখন আমার যাওয়া সম্ভব ছিল না। তুমিই আমার প্রতিনিধি হইয়া তথায় গমন করিলে। বিধানচন্দ্র তখন দেড় বৎসরের। তাহাকে লইয়া গেলে। সে সময় তুমি কিরূপ ব্যাকুল হইয়া আধ্যাত্মিক আহার অন্বেষণ করিতে, ও আমার সহিত কিরূপ যোগ অনুভব করিতে, নিম্নের পত্রাংশগুলিতে তাহা দেখিতে পাই। "(২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪)···আজকার উপাসনার সার,—ধ্যানে ঈশ্বরকে ভাল ক'রে দেখা যায়; আর নির্জ্জন সাধন। তোমরা কেমন? তোমার উপাসনা কেমন হয় জানিতে বাসনা করি। তোমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। মন ভাল।" "(২১শে)···তোমার কার্ড পাইলাম। উপাসনা ভাল।··· আজকার উপাসনার সার,—শিশু হইয়া মার নিকটে যাওয়া। তোমার উপাসনা ভাল শুনিয়া সুখী হইলাম। আমার বেশ উপকার হইতেছে। এ পাড়ার সব ভাব দেখিয়া বড় ভাল মনে হয়। আমাদের বাঁকিপুরেও তাই হবে।" বাস্তবিক এ উৎসবে গিয়া তোমার অনেক উপকার হইয়াছিল। কলিকাতায় বা বড় বড় স্থানের বড় বড় উৎসবের উপকার একরূপ; আবার ছোট ছোট মণ্ডলী মিলিয়া যে উৎসব করেন, ও যাহাতে সেই ক্ষুদ্র মণ্ডলীর প্রত্যেকে অনুভব করেন যে এই উৎসবে আমারও কিছু দিবার আছে, সে উৎসবের উপকার অন্যরূপ। তুমি এ উৎসবে গিয়া বিশেষ ভাবে নিজের জন্য কিছু পাইয়াছিলে। তাই এ আকাঙ্ক্ষা মনে আসিল যে ভাগলপুরের পাড়ার মতন বাঁকিপুরেও সুন্দর পাড়া রচনা করিবে। উৎসবের প্রধান দিনে লিখিতেছ,—"(২৪শে) পত্নী-প্রাণ! তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব, ভাবিয়া পাই না। কেন না, মা তোমা দ্বারা আমাকে যে কত সুখী করিলেন তাহা বলিতে পারি না। একদিকে তোমার শরীরের রক্ত জল করিয়া অর্থ উপার্জ্জন, আর একদিকে আমার আজকার সুখ! তোমাকে পরিশ্রম করিতে দেখিয়া আমার যেমন কষ্ট হয়, আজ উৎসবে আমার তার সমান সমান সুখ হইল। সমস্ত উপাসনার সময় তোমাকে পাশে অনুভব করিতেছিলাম। তোমার সঙ্গে যোগ বাড়িতেছে বড় সুখের কথা। আজ বিশ্বাস হইতেছে যে তোমারও উপাসনা ভাল হইয়াছে।"

এইরূপে নানা বিধির মধ্য দিয়া দেবতা তোমাকে গড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠান উপস্থিত হইল। এ ব্যাপারে তোমাকে ও আমাকে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে ব্রহ্মবাণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

সুসারবাসিনীকে বিদ্যাভ্যাসের জন্য কিছুকাল কলিকাতায় রাখিয়াছিলে। বেথুন কলেজে দিতে পারিলে হয় তো সুসারের ভাল বিদ্যাশিক্ষা হইত। কিন্তু সেখানকার ব্যয় অনেক, আর বন্ধুরাও কেহ পরামর্শ দিলেন না, সুতরাং তাঁহাকে বাঁকিপুর ফিরাইয়া আনিতে হইল। এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ের তখনকার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল; ভাল পড়া হইত না। তাই কন্যাকে বাটীতেই শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। শ্রীমান্ বৃন্দাবনচন্দ্র সুর তাঁহার শিক্ষকের কাজ করিতেন। ইনি সচ্চরিত্র, অতিশয় নম্রপ্রকৃতি, আমারই হাতের গড়া ছেলে। আমার চক্ষের উপর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীর প্রাতঃকালের উপাসনায় প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন; সপ্তাহে সপ্তাহে যে "চরিত্র গঠন" সভা হইত, ইনি তাহার প্রধান নায়ক ছিলেন। ইঁহাকে তুমিও খুব ভাল করিয়া চিনিতে। প্রাঙ্গণের দক্ষিণের বড় বারান্দায় বসিয়া সকলের সম্মুখে বৃন্দাবনচন্দ্র পড়াইতেন, সুসারও শান্তভাবে পাঠ শিক্ষা করিতেন। শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে যে সদ্ভাব থাকিবার সম্ভাবনা, উঁহাদের উভয়ের মধ্যে তাহা জন্মিয়াছিল।

এইরূপে সুসার বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন। ক্রমে তিনি যৌবন-প্রাপ্তা হইলে তাঁহার বিবাহের বিষয়ে মনে চিন্তা আসিতে লাগিল। কিন্তু পাত্রের জন্য অন্বেষণ করিতে হইল না। সুসারকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি তোমার কাছে বৃন্দাবনচন্দ্রের নাম লিখিয়া দিলেন।

কন্যার মনের ভাব অবগত হইয়া বিধাতার ইঙ্গিত বুঝিয়া আমরাও এ বিষয়ে অনুমোদন করিলাম। কন্যা আপনা হইতে বর মনোনীত করিলেন. ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ্ধতি আর কি হইতে পারে?

কিন্তু ইহাতে আত্মীয়গণের, বিশেষতঃ হিন্দুসমাজস্থ পরিবারবর্গের খড়গহস্ত হইবার কথা। তুমি কুলীন কায়স্থ পরিবারের কন্যা, প্রতাপাদিত্যের বংশীয় স্বামীর গৃহিণী। প্রস্তাবিত বর মৌলিক সদ্গোপ-বংশজাত। কিরূপে এমন বরে কন্যা পাত্রস্থ করিবে? এমন নয় যে বর ধনী বা বিলাত ফেরত। কিন্তু তুমি ধন, জ্ঞান, বংশ কিছুই দেখিলে না। কন্যার মত বুঝিয়া ও বিধাতার ইচ্ছা বুঝিয়া এ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলে, তাই সকলের নিন্দা ও প্রতিকূলতা বুক পাতিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইলে। এরূপ স্থলে নারীদের মধ্যেই অধিক আন্দোলন ও তোলপাড় হয়; সে সকল তোমাকেই অধিক স্পর্শ করিবার কথা। তুমি সে সকল সহিবার জন্য প্রস্তুত হইলে। প্রথম ব্রাহ্মসমাজে আসিবার কালে দেশে থাকিতে তুমি আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সকল সামাজিক বিরোধ সহ্য করিয়াছিলে। এখন ব্রাহ্মসমাজের জীবনের প্রথম গুরুতর অনুষ্ঠান উপস্থিত হইল।

ভবিষ্যৎ ফল দেখিয়া ব্রাহ্মবন্ধুরাও অনেকে বলেন যে, এ বিবাহে বিধাতার ইচ্ছা ঠিক বুঝা হয় নাই; এবং তুমি ও আমি উভয়েই বুঝিতে ভুল করিয়াছিলাম। দেবি, তুমিও আমাকে চেন, আমিও তোমাকে চিনি। এ বিষয়ে তুমিও ঈশ্বরের ইচ্ছা না বুঝিয়া এক পদ অগ্রসর হও নাই, আমিও হই নাই। ফলাফল তাঁহারই হাতে ছিল, এখনও বলি, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

২৭শে মে ১৮৮৪ সালে সুসারের বিবাহ হয়। এই বিবাহের পূর্ব্বে যখন সব আয়োজন হইতেছিল, তখন দেখিতাম, সমস্ত দিন তুমি দাসীর মত পরিশ্রম করিতে। আবার রাত্রে কিম্বা প্রাতঃকালে সর্ব্বাগ্রে উপাসনার স্থানে আসিতে। সেবাপ্রকৃতি ও সাধুপ্রকৃতি যেন তোমাতে মিশ্রিত হইয়াছিল। বিবাহের লুচি তুমি নিজে ভাজিতেছিলে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় শরীরের শ্রান্তিবশতঃ তোমার নিদ্রা আকর্ষণ হইল। তুমি একজন মহিলাকে বলিলে, "দিদি ৫ মিনিট নিদ্রা যাই।" এই বলিয়া অঞ্চল বিস্তৃত করিয়া উনুনের পার্শ্বেই শয়ন করিলে। অল্পক্ষণ পরেই জাগরিত হইলে, এবং বলিলে, "আঃ বাঁচিলাম!" আবার পূর্ব্বের মত কাজ করিতে লাগিলে।

বিবাহের পর স্ত্রী-আচারের দিনে তুমি কি করিলে? অন্য কোনও বস্ত্র কিম্বা দানসামগ্রী না দিয়া তুমি বরকন্যাকে গেরুয়া ও একতন্ত্রী দিয়া সাজাইলে। কারণ, গেরুয়াই তোমার চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য বস্ত্র, ও একতন্ত্রী তোমার বিচারে সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট বাদ্য যন্ত্র। তাহার পর আশীর্ব্বাদ করিবার সময় পুরস্ত্রীরা একত্রিত হইলে সকলের সঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া তুমি বরকন্যার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিলে। বৈরাগ্য এবং প্রার্থনা ভিন্ন তোমার কোনও কাজ হইত না, এ বিবাহও হইল না। এরূপ প্রার্থনায় কাহারও কাহারও আপত্তি হইয়াছিল। তাঁহাদের মতে তখন প্রার্থনা করিবার সময় নহে। কিন্তু যখন কর্ত্তব্য মনে হইত, তুমি কাহারও কথায় হটিয়া যাইতে না।

এতদিন পর্য্যন্ত বাঁকিপুরে আমরা একঘরে হই নাই। সামাজিক অনুষ্ঠানে সকলের সঙ্গে আমাদেরও নিমন্ত্রণ হইত। এখন হইতে তাহা উঠিয়া গেল। শেষ নিমন্ত্রণের দিনটা এখনও মনে আছে। একজন বন্ধু আমাকে বড় ভালবাসিতেন। ভালবাসার খাতিরে আমাকেও নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু আহারের সময় স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে আমার আসন পড়িল। তাই দেখিয়া স্বর্গগত গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় সেখানেই প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। একজন ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া অপমান করা হইবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। আমি অনেক মিনতি করিয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিলাম।

এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাঁকিপুরে বাহিরের লোকেদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যে সহানুভূতি ছিল তাহা চলিয়া যাইতে লাগিল। এখানে একজন ডাক্তার ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজের চাঁদা দিতেন। তিনি চাঁদা প্রদান ও সর্ব্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন, ও বলিলেন, "ইচ্ছা করে, প্রকাশ বাবুকে horse-whip করি। আমাদের আফিসের বাবুরা বলিতে লাগিলেন, "এ ব্যক্তি ভয়ানক মূর্খ! অকরণীয় ঘরে কন্যার বিবাহ কেন দিল? যদি রাজার ঘর হইত, তাহা হইলেও না হয় বুঝিতাম!"

প্রবোধচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন। দেশেও মহা হুলস্থুল উপস্থিত হইল। তাই প্রবোধচন্দ্র মাতার কথায় চলিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিবাহের সময় আবার উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এইরূপে বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হইল। ক্রমশঃ আন্দোলন নিরস্ত হইল। আমরা আবার দৈনিক ব্রত ও সাধনগুলি লইয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলাম। কিছুকাল পরে নয়াটোলাতে আমাদের নিজের বাটী হইল। ১৫ই নবেম্বর তুমি গৃহ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান করিলে। দোতালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘরটিকে ঠাকুর ঘর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলে। যতদিন পৃথক দেবালয় প্রস্তুত না হইল, ততদিন ঐ উপরের ঘরেই উপাসনা হইত। শয়নের কষ্ট হইত, কিন্তু তুমি তাহা গ্রাহ্য করিতে না। এখানে আসার পর হইতে পল্লীস্থ সমুদয় ব্রাহ্ম-পরিবারগুলির বিশেষ ভার তোমার উপর পড়িল। সকলের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক অভাবের খোঁজ লইতে। প্রচার আশ্রমের সংবাদও তুমি লইতে। তাঁহারা বলিতেন না, সুতরাং নিজেই তাঁহাদের ভাণ্ডারে গিয়া দেখিতে, কিসের অভাব আছে। যাহা জানিতে পারিতে, আমার কাছে বলিতে, ও আপনার ভাণ্ডার হইতে অনেক সময়ে প্রয়োজনীয় বস্তু প্রেরণ করিতে। প্রয়োজন মত প্রতিবেশীদিগকেও আপনার ভাণ্ডার হইতে বস্তু যোগাইতে। তাঁহারা প্রত্যর্পণ করিলেও আনন্দে গ্রহণ করিতে কিন্তু নিজে চাহিতে না, অথবা নিজের অভাব হইলে কাহাকেও জানিতে দিতে না।

দেবি, এই সময়ে আমাদের দৈনিক জীবন কিরূপ তপস্যাময় ছিল, তাহা কি তুমি স্মরণ কর না? প্রতিদিন শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে তুমি আমার সহিত সমস্বরে মাতৃস্তোত্র পাঠ করিতে। তারপর তুমি স্বহস্তে উপাসনার ঘর প্রস্তুত করিতে। এ কাজ অন্যের উপর ফেলিয়া রাখিতে না। নিষ্ঠার সহিত আসন পাতিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতে। উপাসনার পর প্রতিদিন একটি ছোট প্রার্থনা করিতে। তার পরেই রন্ধনশালার কাজে যাইতে। ছেলেদের আহার করাইতে ও পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে। নিজেকেই রন্ধন করিতে হইত; পাচক ব্রাহ্মণের জন্য সকল সময় অর্থে কুলাইয়া উঠিতে পারিতে না। ইহারই মধ্যে কোনও সময়ে প্রতিবেশী দুই তিনটি গৃহস্থের সংবাদ লইতে এবং সাধ্যমতে তাহাদের অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতে। বৈকালে কিছু পাঠ করিতে, ও কোথাও যাইবার হইলে যাইতে। সন্তানদের আহার পরিচ্ছদ তুমি সর্ব্বদা নিজেই দেখিতে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রাত্রির আহারের আয়োজন হইত এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ছোটদের আহার করাইয়া পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে। তারপর আমরা দুজনে নাম গান করিতাম। নূতন যে কোন সাধন করিবার থাকিত, করিতাম। আহারাদির পর আবার প্রসঙ্গ হইত। ইহা ভিন্ন স্নানের বিশেষ নিয়ম ছিল। ১৮৮৫ সালের ২০শে এপ্রিলের দৈনিকে তাহা লেখা আছে। "কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে সমাহিত চিত্তে স্নানাহার করিতে শিখিতেছিলাম। অদ্য স্নানগৃহে নূতন প্রবেশ। প্রাতঃকাল হইতে প্রস্তুত হইয়া বেলা ১২টার সময় সস্ত্রীক স্নানগৃহে প্রবেশ করিলাম; ঈশার অভিষেকের বিষয় পাঠ করিলাম। নবসংহিতার স্নানপদ্ধতি পাঠ করিলাম। জলের ধারে পূত ও নূতন বস্ত্র ছিল। বিধানাঙ্কিত পাত্রের সাহায্যে

করিলাম। তাহার পর স্বপাকে আহার করিবার জন্ম গৃহান্তরে গমন করিলাম। পাকগৃহে গিয়া দেখি, গৃহিণী আমার মনের মত সামগ্রীগুলি যোগাড় করিয়া রাখিয়াছেন। স্বপাক এত মিষ্ট কখনই লাগে নাই। স্নান করিবার পূর্ব্ব হইতে আহার করার শেষ পর্য্যন্ত এক উপাসনার নানা অঙ্গ সম্ভোগ করিলাম। আহারান্তে তাহার শান্তিবাচন পাঠ করিলাম।" প্রত্যহ কিছু একত্রে স্নান ও একত্রে পাক কার্য্য ও আহার হইত না। কিন্তু আমরা দুই জনে কিরূপে মিলিত ধর্ম্মসাধন করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম এই দৈনিকে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

এইরূপে চলিতে লাগিলাম। শরীরের সঙ্গে সংগ্রামও চলিতে লাগিল। এক দিনকার দৈনিকে লেখা আছে: "আড়াই বৎসরের পর শরীরের পশুত্ব দেখিয়া মনে হয়, বুঝি পশুত্ব কখনই যাইবে না। তাই ভাগবতী তনুর জন্য প্রার্থনা করিলাম। এক দিন তোমাতে ও আমাতে এই প্রসঙ্গ হইয়েছিল যে পরলোকে ভালবাসা কি আকারে থাকিবে? আমি বলিলাম, আমরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি তাহাই পরলোকের ভালবাসা স্থায়ী করিবার উপায়। শরীরের সম্বন্ধ ত্যাগ না করিলে ভালবাসা স্থায়ী কি না তাহা কিরূপে বুঝিবে? এখন আমাদের সম্মুখের অবস্থায় চক্ষের ভালবাসা থাকিবে। তারপর দৃষ্টি যখন থাকিবে না তখন কেবল আত্মার ভালবাসা থাকিবে।

কন্যা সুসারের বিবাহের পর আত্মীয়গণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন আবার তাঁহারা অনুকূল হইতে লাগিলেন। বড়দাদা মহাশয় চিকিৎসা করিবার অভিপ্রায়ে বাঁকিপুরে আসিলেন। মাতাঠাকুরাণীও ফিরিয়া আসিলেন, চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ভাই পরেশ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন; তুমি সেবায় নিযুক্ত রহিলে।

এই সময়ে একদিন আমি অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিয়া সংসারের মাসিক আয়ব্যয়ের এষ্টিমেট প্রস্তুত করিতেছিলাম। আমার শ্রম দেখিয়া তুমি বলিলে, "আমাকে এ কাজ দিয়া কি বিশ্বাস করিতে পার না?" আমি বলিলাম, "পারি, কিন্তু পাছে গোলমাল হয় তাই তোমাকে এত দিন দিই নাই।" অতঃপর সমুদয় অর্থব্যয়ের ভার তোমারই হইল। প্রথমে তুমিও লইতে ভীত হইয়াছিলে। আমি আশ্বাস দিলাম। তুমি সেই যে অর্থব্যয়ের ভার লইলে শেষ পীড়া পর্য্যন্ত অম্লান বদনে সে ভার বহন করিয়াছিলে। একদিনের তরেও আমাকে ভাবিতে দাও নাই। আয়ব্যয়ের কোন বিশৃঙ্খলাও ঘটে নাই। অনটন পড়িলে আমাকে কোনও দিন বিরক্ত করিতে না, কিম্বা প্রাণান্তেও বাজার হইতে ধারে দ্রব্যাদি আনিতে না। ইহাতে এই শিখিলাম, নারীকে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিয়া বিশ্বাস করিলে তিনি সে বিশ্বাসের উপযুক্ত হইতে পারেন। সংসারের কঠিন দুর্ভাবনা হইতে আমাকে মুক্তি দিবার জন্য তুমি এই ভার আপনি লইলে। যখনই আমাকে রাজকার্য্য কার্য্যভারে অধিক প্রপীড়িত দেখিতে, প্রায়ই বলিতে, কবে আমার সেই ক্ষমতা হইবে, যে এ সকল বিষয়েও তোমাকে আমি সাহায্য করিতে পারিব।

২১শে জুলাই সংবাদ আসিল আমি ডিপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছি, এবং মতিহারী জেলায় আমার প্রথম কর্ম্মস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সংবাদ তখন অভাবনীয় মনে হইয়াছিল। তুমিও জানিতে না, আমিও জানিতাম না যে আমাদের আবার মতিহারী যাইতে হইবে। বড়দাদা মহাশয় শুনিয়া সুখী হইলেন, এবং যাইতে অনুমতি দিলেন।

৪ঠা আগষ্ট প্রচারাশ্রমে আমাদের বিদায় দিবার উপাসনা হইল। সন্ধ্যার সময় নয়াটোলার বাটীতে শেষ উপাসনা করা গেল। শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় অযাচিতরূপে আসিয়া উপাসনায় যোগ দিলেন। আমি তোমাকে বলিলাম, তুমি কয়েক দিন পরে আসিও, আমি আগে গিয়া সেখানকার সব ঠিক করি।" কিন্তু তুমি সঙ্গেই যাইতে চাহিলে। ৫ই আগষ্ট আমরা বাঁকিপুর পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মতিহারীতে দ্বিতীয় বার ও বিশ্বাসের পরীক্ষা।

মতিহারীতে আসিয়াই এক পরীক্ষা দিতে হইল। নূতন বাসা করিতে হইল। বাঁকিপুরে ও দেশে টাকা পাঠাইতে হইল। মাসের শেষে টাকা কম হইয়া আসিল। কিন্তু বাজারে ঋণ করা অনুচিত। সুতরাং আহারের বরাদ্দ কমাইয়া আনিতে হইল। এ হিসাবে চলিয়া আগষ্ট মাস তো শেষ হইতই, সেপ্টেম্বরের ১লা পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যাইত। কিন্তু দৈবাৎ ১লা সেপ্টেম্বর ছুটির দিন পড়িল, তাই সে দিন বেতন পাওয়া গেল না। ২রা সেপ্টেম্বর এক বেলার আহার কোনওরূপে চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় টাকা আসিল, কিন্তু তাহা তো তখনও দেবালয়ে উৎসর্গ করা হয় নাই; তাই স্পর্শ করা যাইতে পারে না। ৪টি সন্তান, আপনারা দুজন; আহারের সামগ্রীর মধ্যে /২ সের দুধ, ২টি ভুটা, ও কয়েকটি পদ্মচাকা। ছোট ছেলে বিধান যখন ক্রন্দন করিতে লাগিল, তখন তাহাকে পদ্মচাকা আহার করিতে দিলে। দেখি, তুমি অনশনে কাটাইলে; স্বামীকে আধখানি ভুটা খাইতে দিলে; অন্য ছেলেমেয়েদের একটু একটু দুধ দিয়া কোনওরূপে রাত্রি অতিবাহিত করাইলে। তোমার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। সকালে ভাল করিয়া প্রাণ ভরিয়া পদ্মফুলে ঘর সাজাইয়া উপাসনা করা গেল; তারপর বাজার হইতে দ্রব্যাদি আনা হইল। ঈশ্বরের জয়কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার উপরে যে প্রাণ-মন দিয়া নির্ভর করে তাহার সকল দুঃখ দূরে যায়, তিনি তাহাকে সকল পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ করেন।

প্রথমে মতিহারী গিয়া বাসার জন্য কিছু কষ্ট হইতেছিল। তোমার নিজের যে বাড়ী সেখানে ছিল তাহাতে—বাবু বাস করিতেছিলেন। তিনি সে বাটী আর ত্যাগ করিতে চাহিলেন না; সামান্য দাম দিতে চাহিলেন। আমি এভাবে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক ছিলাম না। তুমি বলিলে, যাহা দেন, তাহাই লও। তোমারি জয় হইল। বাটী বিক্রয় করা হইল; শ্রদ্ধেয় প্রচারক অমৃতলাল বসু মহাশয় সপরিবারে এই সময় মতিহারী আইসেন এবং দীর্ঘকাল সেখানে বাস করেন। তোমার সেবায় তাঁহারা দুজনেই মোহিত হইয়া যান। একদিন একখানা প্লেট এক জনার হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। প্লেটখানি অতি সুন্দর ছিল; তোমার বস্তু গেল, কিন্তু তুমি টুঁ হাঁ কোন শব্দই করিলে না। যাঁহারা দেখিলেন, অবাক হইয়া গেলেন।

বাঁকিপুরে থাকিতেই [illegible]

এখন মতিহারীতে তাহা আরও বিকশিত হইতে লাগিল। অপরের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে, অপরের দুঃখ দূর করিতে, তোমার মন ব্যস্ত হইতে লাগিল। ১৮৮৬ সালে হরিগুরু রুদ্র নামক একটি যুবক স্ত্রীবিয়োগে অতিশয় কাতর ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বেড়াইতেছিলেন। আশ্রয় ও শান্তি পাইবার আশায় তিনি অবশেষে মতিহারী আগমন করেন। তাঁহার চিত্ত অতিশয় বিকল হইয়াছিল। রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। একদিন হঠাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন; ব্যাগ হাতে করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তুমি সান্ত্বনা দিতে লাগিলে। তোমার সান্ত্বনার মধ্যে এক প্রকার শক্তি ছিল, তিনি তাহা অতিক্রম করিতে পারিলেন না। তুমি অধিক বাহিরে আসিতে না, কিন্তু এমন একটা ভালবাসার ভাবে ব্যবহার করিতে যাহা সকলের হয় না। তোমার স্নেহের গুণে হরিগুরু তোমাকে মা বলিতে লাগিলেন, এবং আমাদের পরিবারে ৩।৪ বৎসর বাস করিয়া গেলেন। তিনি এখনও তোমাকে ভোলেন নাই।

এই সময়ে একটি বন্ধু বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার মিঃ—র সহিত তোমার দ্বিতীয়া কন্যা সরোজিনীর বিবাহের প্রস্তাব করেন। সরোজিনী তখনও বয়ঃপ্রাপ্তা হন নাই; কিন্তু তিনি বিলম্ব করিতেও প্রস্তুত, এই ভাবে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তুমি অপর একটি কন্যার নাম করিয়া বলিলে, "সরোজিনীর জন্য অপেক্ষা কেন?—র সঙ্গে বিবাহ দাও না কেন? উভয়েই আমার কন্যার তুল্য বয়ঃ আগে—, তারপর আমার সরোজিনী।" তোমার উত্তর প্রস্তাবকারী বন্ধুকে লিখিলাম। যথা সময়ে মিঃ—র সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। ঐ কন্যা তোমার সহিত সাংসারিক কোনও সম্পর্কে সম্পর্কিতা ছিলেন না। কিন্তু তথাপি তুমি তাঁহাকে আপনার কন্যা অপেক্ষা অধিক মনে করিলে। নতুবা এমন বিলাত-ফেরত পাত্রটিকে হাতে পাইয়া কি এমন নিঃসঙ্কোচে কেহ ছাড়িয়া দিতে পারে? তোমার এই নিঃস্বার্থ ভাব দেখিয়া একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলিয়াছিলেন, "আমি দেখিয়াছি, অঘোরকামিনী যথার্থই স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন! অন্য নারী তাহা পারেন না; আপনার গণ্ডা রাখিয়া তবে অপরকে ভালবাসেন"।

১৮৮৬ সালের মে মাসে বাঁকিপুরে ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব হইতেছিল। আমাদের নয়াটোলার বাটীই উৎসবের যাত্রীনিবাস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মতিহারী হইতে বাঁকিপুর আসিতে তখন ১২ ঘণ্টা লাগিত। উৎসবের নিমন্ত্রণ আসিল, আমরা চলিলাম। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবোধচন্দ্র তখন বিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁহাকে লইয়া আসিলে পাঠের ব্যাঘাত হইবে, তাই তাঁহাকে রাখিয়া আসিতে হইল। বামণ ঠাকরুণ খুব বিশ্বাসভাজন ছিলেন, তাঁহার উপরে সুবোধচন্দ্রের ভার দিয়া আসিলাম।

বাঁকিপুরের উৎসবে অনেক লোক হইয়াছিল। বেশ ধুমধাম করিয়া উৎসব সম্পন্ন করা গেল। নয়াটোলার বাড়ীভরা লোক। ভক্ত সঙ্গে ভগবানের নাম করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ অনুভব করিতেছিলাম। উৎসবের শেষ দিনে দ্বিপ্রহরের পর সকলে আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে মতিহারী হইতে তারে সংবাদ আসিল, সুবোধের কলেরা হইয়াছে। কি করিবে? যদি সে দিনই বিকালের ট্রেণে রওনা হও, তাহা হইলে তার পরদিন প্রাতঃকালে মতিহারী পৌঁছিতে পার; হয় তো সন্তানকে জীবিত দেখিতে পাও। উৎসব শেষ হইতে রাত্রি ৮টা কি ৯টা হইবে, তাহার পর যাত্রা করিলে সে রাত্রি মোকামায় থাকিতে হইবে। পরের দিন সকালে রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় মতিহারী পৌঁছিতে পার। অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়াই তুমি মীমাংসা করিলে উৎসব শেষ করিয়াই যাইবে। তোমার বিশ্বাস দেখিয়া আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম। সেই মুহূর্ত্তে এই মীমাংসা করিতে যে বিশ্বাসের পরিচয় দিলে, মা জগজ্জননী মায়ার খেলা খেলিয়া সে বিশ্বাসকে যেন আরও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় উৎসবের শেষ অংশ আরম্ভ হইল, ক্রমে উৎসব শেষ হইল। আমরা রাত্রির ট্রেণে রওনা হইলাম। মোকামায় শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের বাটীতে রাত্রিবাস করিলাম। প্রত্যূষে উঠিয়া সকলে মিলিয়া ভগবানের অর্চ্চনা করিলাম। তারপর সেখান হইতে যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মতিহারী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

ষ্টেশনে আমাদের বাড়ীর বেহারা আসিয়াছিল, আমার জন্য টমটম্ ও তোমার জন্য পালকী আনিয়াছিল। ট্রেণ হইতে নামিয়াই আমি টমটমে বসিলাম, তুমি পাল্কীতে আরোহণ করিলে। একজন "কাহার" আমার কাছে আসিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সুবোধ কেমন আছেন? সে বলিল, ভালই আছেন। তুমি দূরে ছিলে, তাহাদের সে উত্তর শুনিতে পাইলে না, তাহারাও তোমার কাছে গিয়া বলিল না।

এদিকে আমার টমটম আগেই গিয়া বাড়ীর বহির্দ্বারে উপস্থিত হইল। সুবোধচন্দ্র দ্বারের নিকটে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে লইয়া বাহিরের ঘরে বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কেমন করিয়া অসুখ করিল, ও ডাক্তার বাবু কি কি ঔষধ দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে জানিলাম, কলেরা হয় নাই, উদরাময় হইয়াছিল। বন্ধু যদু বাবু আশঙ্কিত হইয়া সুবোধচন্দ্রের নিষেধ সত্ত্বেও ঐরূপ টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন।

আমি যখন সুবোধচন্দ্রের সঙ্গে বহির্ব্বাটীর নীচের ঘরে কথা কহিতেছি, সেই সময় বেহারারা তোমার পালকী একেবারে ভিতর বাটীতে লইয়া গেল। আমার বা সুবোধের সঙ্গে তোমার দেখা হইল না। মা জগজ্জননীর মায়ার খেলা চলিতে লাগিল। আমাদের অনুপস্থিতির সময় বাড়ীতে নূতন চূণকাম করা হইয়াছিল। বাড়ীটিতে প্রবেশ করিয়াই সব যেন তোমার কাছে একটু নূতন নূতন দেখাইতেছিল। তার উপরে বামণ ঠাকরুণের আচরণে তোমার আশঙ্কা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি একাকিনী স্নেহভাজন সুবোধচন্দ্রকে লইয়া এ কয়েক দিন বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। এখন তোমাকে দেখিয়া এতদিনের রুদ্ধ আবেগ প্রকাশ করিতে গিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না, কেবল কাঁদিতেই লাগিলেন। তুমি তখন দৌড়িয়া সুবোধচন্দ্রের শয়নগৃহে গেলে, দেখিলে শয্যা শূন্য। তখন তোমার মতন জননী আর কি করিতে পারেন? শয়নকক্ষের পার্শ্বেই উপাসনার ঘর; ছুটিয়া সেখানে গেলে, ও মা জগজ্জননীর চরণে বেদনার অশ্রু ফেলিলে। কিয়ৎক্ষণ পরেই বাহিরে আসিয়া দেখিলে সুবোধচন্দ্র দাঁড়াইয়া আছেন। বলিতে এতক্ষণ লাগিল, কিন্তু এ সমুদয় অল্পক্ষণের মধ্যে ঘটিল; এই সময়টুকুর মধ্যে তোমার মনের উপর দিয়া কি তুমুল ঝড় বহিয়া গেল, ও তোমার বিশ্বাসের

আলোক তাহার মধ্যে কেমন উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠিল! সুবোধচন্দ্র বলিলেন যে, তিনিও তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরের ঘরে আসিতেছিলেন, কিন্তু তুমি উপাসনার ঘরের দিকে চলিয়া গেল বলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাও নাই। তুমি মা জগজ্জননীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তোমার বিশ্বাসে আমাদেরও বিশ্বাস বাড়িল।

কয়েক মাস হইতে তোমার শরীর অসুস্থ হইতেছিল। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তোমাকে মোকামায় শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিলাম। মতিহারীতে আমি ও সুবোধচন্দ্র রহিলাম। আমাকে এভাবে একা রাখিয়া চলিয়া যাইতে তুমি অতিশয় কুণ্ঠিত হইতেছিলে। কিন্তু চিকিৎসকের আদেশে অগত্যা যাইতে হইল। সে বার আমার উপর অনেক চাপ পড়িতে লাগিল। নূতন কর্ম্ম, অনেক খাটুনি; আবার তুমিও কাছে ছিলে না, তাই সংসারের সব কাজ কর্ম্মও আমাকেই দেখিতে হইত। ডিপার্টমেণ্ট্যাল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে সময় পাইতেছিলাম না। তোমার অসুস্থতা ও ধর্ম্মজীবনের সাধন-ভজনগুলির জন্যও এ বিষয়ে কিছু বাধা হইয়াছিল। তাই প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না। তুমি এ সংবাদ শুনিয়া পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলে,—"দুঃখ করিও না; কারণ আমরা তো ফলবাদী নই। তোমার যে এই বয়সে এই কষ্ট, তা তো মা দেখিতেছেন। আমাদের কাজ তাঁর কথা শোনা। আমি বিশ্বাস করি যে সাধ্যমত তাঁর কথা শুনিয়াছি। আবার পড়িতে হইবে। ভাবিতেছি যে আমি নাই, তোমার বড় কষ্ট হইবে। দুঃখ এই যে, আমি তোমার বিশেষ কোন সাহায্য করিতে পারি না। সংসারের ভারও তোমায় বইতে হয়। তাই বা কি করিব? ইহার মধ্যেও মার ইচ্ছা, দেখিতে ইচ্ছা করে। যে কয় দিন এখানে থাকিব, তাঁহার কাজ করিলেই থালাস।"

এই সময়ে আমার ভ্রাতা প্রবোধচন্দ্র বাঁকিপুরেই কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে তুমি তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর সান্ত্বনার জন্য একাকিনী মোকামা হইতে বাঁকিপুরে চলিয়া গেলে। পুত্র সাধনচন্দ্র ও বিধানচন্দ্রকে মোকামাতেই রাখিয়া গেলে। বাঁকিপুর যাইতে হইবে এ মীমাংসা কিরূপে করিলে? আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া নয়। আমার অপেক্ষাও যাঁহার আদেশ অধিক মাননীয় সেই পরমগুরুর কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া মীমাংসা করিলে। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমাকে পত্রে লিখিয়াছিলে, বাঁকিপুর যাইব কি না, এখনও ঠিক করি নাই। উপাসনার পর ঠিক হইবে।" আমিও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতাম। এইরূপে তুমি স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে শিখিতেছিলে। বাঁকিপুর যাইবার সময় তোমার সঙ্গে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, মোকামায় গাড়িতে চড়া, বাঁকিপুরে গাড়ী হইতে নামা, ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা, সব তুমিই করিলে, তাঁহাকে কিছুই করিতে হয় নাই।

তুমি বাঁকিপুরে গিয়া প্রবোধচন্দ্রকে ও পত্নীকে সান্ত্বনা দান করিলে, ও তাঁহাদিগকে মতিহারীতে আসিতে অনুরোধ করিলে। বাঁকিপুরে যেখানে যেখানে উপাসনা করিলে ও আহার করিলে বন্ধুগণ সুখী হন, তুমি তাই করিলে। তুমি এইরূপে একাকিনী স্বামী ও সন্তানগণকে ছাড়িয়া আসাতে সকলে আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, যেন আর সকল হইতে ভিন্ন।

হয়তো মনে আছে। আমি লিখিয়াছিলাম, "এমনি ক'রে শিখিতে হইবে। একবারে আসক্তি মহাশত্রুকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এমন হইবে যে আর কাহারও জন্য মন কেমন করিবে না। এবার কিছু সঞ্চয় করিয়া আসিতে হইবে; এবার যে তুমি বাহিরে, আমি ঘরে। তোমার কাছে বসিয়া আমি নানা কথা শুনিব ও শিখিব। শিখাইবার উপযুক্ত হইয়া আসিবে।"

তুমি সুস্থ হইয়া মতিহারী ফিরিয়া আসিবার কিছু পরেই তোমার ও আমার জন্য আর একটি পরীক্ষা উপস্থিত হইল। জামাতা বৃন্দাবনচন্দ্রের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। হিন্দু সমাজের আত্মীয়গণের প্রভাবে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যাইতেছিল। তাই কন্যা সুসারবাসিনীর সম্বন্ধেও তিনি ক্রমে উদাসীন হইয়া পড়িতেছিলেন। আমরা ইহার লক্ষণগুলি দেখিতেছিলাম, আর আপনাদের জন্য ও কন্যার জন্য পরম জননীর নিরাপদ চরণ আরও ভাল করিয়া ভিক্ষা করিতেছিলাম। ১৮৮৭ সালের এপ্রিল মাসে বৃন্দাবনচন্দ্র পত্র লিখিলেন যে তিনি সুসারকে পরিত্যাগ করিবেন। তোমার সেদিনকার বিশ্বাস ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাব আমার এখনও মনে আছে। কন্যা সরোজিনীর অসুখের সময় যেমন আমাকে উপাসনাগৃহে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিলে, সেদিনও বেলা তিনটার সময় তেমনি ডাকিয়া লইয়া গেলে। দুজনে খুব প্রার্থনা করিলাম।

বৃন্দাবনচন্দ্র আর একবার দেখা দিলেন। মনটা একবার একটু ফিরিয়াছিল, কিন্তু সে ভাব স্থায়ী হইল না। যখন তিনি আসিলেন, তখন কয়েক দিন গৃহে একটু আনন্দ-উৎসব হইল। যাহাতে বৃন্দাবনচন্দ্রের মনটা আরও কোমল হয়, শরীর সুস্থ হয়, তাই করিবার জন্য তাঁহাকে লইয়া দার্জ্জিলিং ভ্রমণে চলিলাম। পথে কর্সিয়ঙে শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের শৈলাশ্রমে মিষ্ট উপাসনা সম্ভোগ করিলাম। পাহাড়ে গিয়া বৃন্দাবনচন্দ্রের কি উপকার হইল, জানি না, কিন্তু তুমি অনেক উপকার লাভ করিলে। বনের মধ্যে বনদেবীকে লুক্কায়িত দেখিয়া তোমার মন খুলিয়া গেল। যখন বেড়াইতে যাইতে, ছেলেমানুষের মতন পথে পথে কত কি কুড়াইতে। তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানে ছিলেন। এক দিন তাঁহাকে দেখিতে যাইবার প্রস্তাব হইল। তোমার ইচ্ছা ছিল, সকলের সঙ্গে হাঁটিয়া যাইবে। যখন গৃহ হইতে যাত্রা করা হয়, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। অন্যান্য গুরুজনগণ মীমাংসা করিলেন, নারীর পক্ষে পদব্রজে যাওয়া অবিধেয়। তাই তোমাকে ডাণ্ডিতে যাইতে হইল। তাঁহাদের এই আদেশ পালন করিতে গিয়া তোমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল। তুমি ডাণ্ডিতে চড়িয়া কিছুদূর গিয়া পরে হাঁটিয়া চলিলে। মহর্ষির উজ্জ্বল ভাব, তাঁহার উৎসাহ ও আমাদের প্রতিজনের প্রতি সম্ভাষণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলে। আমাকে তোমাদের রাখিয়া কিছু আগেই মতিহারী চলিয়া আসিতে হইল। তোমরা ২২শে জুন ফিরিয়া আসিলে। ইহার পরও কিছুকাল বৃন্দাবনচন্দ্র অনুকূল ছিলেন। তার পর যে তিনি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, আর আসিলেন না।

অক্টোবর মাসে আমি আবার বাঁকিপুর বদলী হইলাম। ৬ই অক্টোবর আমরা মতিহারী ত্যাগ করিয়া আসিলাম। মতিহারীর-শেষ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বাঁকিপুরে দ্বিতীয় বার

বাঁকিপুরে আসিয়া তুমি ১২ই অক্টোবর ১৮৮৭ হইতে ব্রাহ্মিকা সমাজের কাজ আরম্ভ করিলে। একদিকে যেমন সেবা চলিতে লাগিল, অপর দিকে সাধন ও উপাসনাও পূর্ণ উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল। তোমার বাটীর উপাসনার ও উপাসনালয়ের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তোমার নিষ্ঠা ও বৈরাগ্য এবং শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়া তোমাকে "মৈত্রেয়ী" নাম দিয়াছিলেন। যখন তোমার বিষয়ে কিছু বলিতে হইত, তোমাকে ঐ নামে উল্লেখ করিতেন। সংসারের কোনও কার্য্যের জন্য কোন দিন তোমার উপাসনা বন্ধ হইত না; কেবলমাত্র আচার্য্যের প্রার্থনা শ্রবণ করা তোমার ধর্ম্ম ছিল না। জীবনের শেষ দশ বৎসর প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে ভুল নাই। সময় বুঝিয়া ছোট ছোট প্রার্থনা করিতে, কিন্তু স্পষ্টস্বরে কহিতে; কেহ শুনিতে পাইল না, এমন কখনই হইত না। শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু মহাশয় একদিন বলিলেন, "বিধানমণ্ডলী এখনও ভাঙ্গে নাই, ভিন্ন আকার লইয়াছে মাত্র।" কলিকাতায় ঐ সময়ে বিধানমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কেহ কাহারও সহিত মিলিতে পারিতেছিলেন না। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে চাহিতেছিলেন। এমন সময়ে বাঁকিপুরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে একটি ঘননিবিষ্ট দল আছে; পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি অত্যন্ত অধিক; সহোদর সহোদরার মত ব্যবহার। ইহা দেখিয়া তিনি বাঁকিপুরের মণ্ডলীকে স্বীকার করিলেন।

১৮৮৮ সালের ২০শে মে আবার বাঁকিপুরের উৎসব উপস্থিত হইল। অনেক লোক আগমন করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় উমানাথ গুপ্ত মহাশয়ও আসিয়াছিলেন। তোমার সঙ্গে এই তাঁহার প্রথম পরিচয়। তোমার উপাসনার গৃহ দেখিয়া, সেই গৃহ কি সুন্দররূপে সাজান, তাহা দেখিয়া, মেয়েদের উপাসনায় যোগদান দেখিয়া, অনেক প্রশংসা করিলেন, কিন্তু তোমার দোষ ত্রুটি দেখাইতেও ছাড়িলেন না। বলিলেন, অনেক জিনিষ পত্র তাহার যত্ন হয় না। তোমার দোষ দেখিলে আমার কি হইত তাহা তো জানই। সেই দিনও অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম। প্রকৃত পক্ষেই তৈজস পত্রে তোমার কোন যত্ন ছিল না। উমানাথ বাবুর কথা তোমাকে বলিলাম, তুমি চেষ্টা করিতে লাগিলে। কিন্তু যেরূপ যত্ন করিলে সংসারের সব বস্তুর পূর্ণ ব্যবহার হয় ও কিছু অপচয় না হয়, সেরূপ যত্ন করিতে পারিতে না। যখন বর্দ্ধমানে একাকী ঘরকন্না করিতে, ধর্ম্মের কোন ধার ধারিতে না, তখন অল্প ব্যয়ে চালাইতে, ও সর্ব্বদা সংসারের দ্রব্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে; এখন আর তাহা হইবার নয়। এখন যদি তোমাকে সংসারী করিবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে হয়তো তোমার মৈত্রেয়ীর ভাবটুকু পলায়ন করিত। সুতরাং তুমি মৈত্রেয়ীই রহিলে।

কেহ কেহ নিজের উপাসনাগৃহ ভিন্ন অন্যত্র উপাসনা করিয়া সুখী হইতে পারে না। তোমার তেমন ছিল না। নিজের বাটীর ছোট উপাসনাগৃহটি যেমন তোমার মিষ্ট লাগিত, তেমনি খগোলে ভাই যষ্ঠীদাসের বাটীর উপাসনালয়ে গিয়াও সুখী হইতে। এইরূপ লেখা আছে—"অদ্য প্রাতে খালের ধারে যষ্ঠী বাবু, তাহার স্ত্রী, অঘোর ও আমি, হাত মুখ না ধুইয়া উপাসনা করিলাম। উপাসনা বড় ভাল। প্রার্থনা—উঁহাদের অনুরাগের মত আমাদের অনুরাগ হউক।" সে দিন সন্ধ্যার সময় বাটীতে আসিয়া পত্র পাইলাম যে, depertmental পরীক্ষায় পাস হইয়াছি। সংবাদ পাইয়াই উপাসনার ঘরে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সুখী হইলাম। সে যেন এখনও কালকার কথা মনে হইতেছে। পত্র পাঠ সমাপ্ত হইতে না হইতে উপাসনার গৃহে গমন করিলাম। কেমন করিয়া কোথা হইতে তুমিও আমার চিরসঙ্গিনীরূপে আমার পার্শ্বে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে, এবং তদগতচিত্তে তুমিও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিলে। এই পরিণত বয়সে শক্ত আইন পুস্তকের পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন। ধর্ম্মপথে থাকিয়া উত্তীর্ণ হওয়া ততোধিক কঠিন। কেবল তোমার দিল-দরদী সাহায্যকারী ছিল বলিয়া অমন ফললাভ হইল। উপাসনার ঘরটিও সার্থক হইল। খালি মেজের উপর এমন করিয়া হাত পা ছড়াইয়া আর কোনও স্ত্রীপুরুষ ভগবানকে কৃতজ্ঞতা দিয়াছেন কি না, জানি না। ধন্য, উপাসনালয়! তোমাতে ভাল মনে বসিয়া আমরা কখনই বঞ্চিত হই নাই।

এই সময়ে অনুভব করিতে লাগিলে যে, ভগবানের জন্য কিছু সুখ ও স্বার্থ ত্যাগ না করিলে তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রগাঢ় হয় না। শুদ্ধতার পথও সহজ হয় না। আমার ৪ঠা আগষ্টের দৈনিকে লেখা আছে, "অদ্য এক নূতন ব্যাপার হইয়া গেল। গৃহিণী কয়েকদিন হইতে কিছু না কিছু দিয়া আসিতেছিলেন; অদ্য মাথার কেশ দান করিলেন, আপনার কেশ আপনি কর্ত্তন করিলেন।" সেদিন খুব সুন্দর উপাসনা হইয়াছিল। উপাসনার পর একজন ভগিনীকে তোমার কেশ কর্ত্তন করিয়া দিতে অনুরোধ করিলে। তিনি অস্বীকার করিলেন। তাহার পর কন্যাকে অনুরোধ করিলে, তিনিও অস্বীকার করিলেন। অবশেষে অনুরাগভরে আপনার কেশ আপনি ছেদন করিয়া বৈরাগিণী হইলে।

এইরূপে তুমি একে একে আসক্তির সমুদয় বস্তুগুলিকে বিসর্জ্জন দিতে লাগিলে। অলঙ্কার ও মূল্যবান বসন পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছিলে। শেষে রহিল কেবল স্বামী-ধন। এই স্বামী-ধনকেও প্রার্থনাপূর্ব্বক ভগবানের শ্রীকরে অর্পণ করিলে। স্বামীর প্রতি মনের ভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলে। তিনি আসক্তির বস্তু থাকিবেন না, কেবল ধর্ম্মপথের সহায় হইবেন, এই আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলে। আসক্তি থাকিলে নারীর পক্ষে স্বামী ধর্ম্মপথের সহায় না হইয়া মাঝখানের অন্তরালস্বরূপ হন। তোমার পক্ষে ভগবানের ও তোমার মাঝখানে আর স্বামী রহিলেন না।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর হইতে প্রতি বৎসর ৮ই জানুয়ারীতে নিষ্ঠার সহিত উপাসনা ও হবিষ্যান্ন আহার নিজেও করিতে, আমারও সহায়তা করিতে; এবারও ঐ দিনে (১৮৮৯ সালের ৮ই জানুয়ারী) শেষ রাত্রে মাতৃস্তোত্র পাঠ হইল, নাম গান করা হইল, ও অতি প্রত্যূষে উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধেয় উমেশ-চন্দ্র দত্ত মহাশয় সে দিন তোমার অতিথি ছিলেন। তিনি বারান্দায় বসিয়া উপাসনায় যোগদান করিলেন। বাহিরে কেন বসিলেন

ভাই। কিন্তু আহারের সময়ে, তিনিও ধরিয়া বসিলেন, হবিষ্যান্ন ভিন্ন অন্য অন্ন গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং তোমার নিজের অংশ হইতে তাঁহাকে আহার করাইলে, এবং এইরূপে তাঁহাকে চিরদিনের আত্মীয় করিয়া লইলে।

তুমি যখন নিষ্ঠাপূর্ব্বক হরিগুণ গান করিতে, সকলেই যোগদান করিয়া সুখী হইতেন। তোমার উপাসনার গৃহে সকলেরই স্থান হইত। ব্রাহ্ম কি অব্রাহ্ম, যিনিই হউন, ধর্ম্মপিপাসু হইলেই হইল। তোমার উপাসনার গৃহে অবগুণ্ঠন ছিল না। যাহার অত্যন্ত কুদৃষ্টি, সেও স্থান পাইত। তোমার বিশ্বাস ছিল, উপাসনার গৃহ এত উচ্চ স্থান যে এখানে কেহ কাহারও মন্দ করিতে পারে না। তবে যাহারা চঞ্চল তাহাদের লজ্জা রক্ষার্থে স্বতন্ত্র স্থান করিয়া দিতে।

এই সময়ে একটি বাঙ্গালী খৃষ্টান-পরিবারের সঙ্গে তোমার আত্মীয়তা হয়। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক একজন পূর্ব্ববঙ্গবাসী খৃষ্টান দানাপুরে বাস করিতেন। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয়ের সুন্দরী কন্যা বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। বিন্দুবাসিনী জন্ম হইতে খৃষ্টান, কারণ কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় পূর্ব্বেই খৃষ্টান হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে তোমার আলাপ ও ক্রমশঃ সদ্ভাব হইল। তুমি যাহা করিতে তাহা পূর্ণমাত্রায়ই করিতে। যখন আলাপ হইল, তখন আর কেহ বুঝিতে পারিত না যে তাঁহারা খৃষ্টান আর তুমি ব্রাহ্ম। একত্রে আহার, একরূপ বস্ত্র পরিধান, তাঁহাদের মত ভ্রমণ, মেয়েদের সঙ্গে একত্রে শয়ন, উৎসবে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ, গিরজায় গমন, এ সকলই হইতে লাগিল। ইঁহাদের সহিত আলাপ হওয়াতে তোমার সাহস বাড়িয়া গেল। ইঁহাদের আচার-ব্যবহারে কেমন অবরোধশূন্য ভাব! ইঁহাদের অনুরোধে একজন নবাগত ইংরেজ পাদরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে। পাদরী সাহেবের আয় অল্প, কিন্তু তাঁহার বাড়ীটি এমন পরিচ্ছন্ন, তাঁহার স্ত্রীর গুণে সামান্য বস্তুগুলিও এমন করিয়া সাজান যে তাহা দেখিয়া তোমার মন মুগ্ধ হইয়া গেল। পাদরী সাহেবের ও তাঁহার মেমসাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলে। ফিরিয়া আসিবার সময়ে তোমাকে একটু বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। বিলাতের নিয়মানুসারে অতি ভদ্র সেই পাদরী সাহেব তোমাদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে আসিলেন ও বিদায় কালে শেক-হ্যাণ্ড করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন। তুমি কখনও অন্য পুরুষের হস্ত স্পর্শ কর নাই, কিন্তু কি করিবে? পাদরী সাহেব তো আমাদের দেশের আচার ব্যবহার জানেন না; তিনি সরলভাবে নারীর সম্মান করিতে আসিলেন, তুমিও ভগবানকে স্মরণ করিয়া শেক-হ্যাণ্ড করিলে। ইহার পরে তুমি বিলক্ষণ সাবধান হইয়াছিলে; এরূপ স্থলে দূর হইতে প্রথমেই নমস্কার করিতে, হাত বাড়াইবার আর অবকাশ থাকিত না।

এইরূপে চক্রবর্ত্তীদের সহিত এমন আত্মীয়তা হইল যে, অবসর পাইলেই তুমি তাঁহাদের বাটীতে যাইতে, তাঁহারাও তোমার বাটীতে আসিতেন। শেষে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরলোক গমনের পর সান্ত্বনা দানের জন্য তুমি মিসেস চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলে ও অযাচিত ভাবে তাঁহার পুত্রকন্যাগণের শিক্ষার্থে মাসে মাসে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলে।

ও ধৈর্য্য খুব পরীক্ষিত হইয়াছিল। ১৮৮৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী আমরা দানাপুর গিয়াছিলাম, সঙ্গে অনেকে ছিলেন। সেখানে গঙ্গাস্নান ও উপাসনা হইল। চক্রবর্ত্তীরা আমাদের আসিবার কথা আগে জানিতেন না। আমাদিগকে যত্ন করিয়া খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। বৈকালের আহারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তুমি তাহাতে সম্মত হইলে না, কারণ অনেকগুলি ভদ্রকন্যা তোমার সঙ্গে ছিলেন, তাহার মধ্যে এক জনের গায়ে অলঙ্কার ছিল। ফিরিয়া যাইবার পথ তত নিরাপদ ছিল না। তাই শীঘ্র প্রত্যাগমন করাই স্থির করিলে। মিসেস চক্রবর্ত্তী তোমার দৃঢ়তা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং তোমাকে আমার সম্মুখে অনেক শক্ত কথা বলিলেন। ভগবানের কৃপায় তুমি শান্তভাবে সমুদয় সহ্য করিলে। তোমার সহিষ্ণুতা দেখিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া অবশেষে আরও আপনার লোক হইয়া গেলেন।

এই সময় পশ্চিমদেশীয় আর একটি খৃষ্টান-পরিবারের সহিত আমাদের আলাপ হইয়াছিল। মাঘোৎসবের সময় একদিন একজন হিন্দুস্থানী খৃষ্টান ভদ্রলোক আমাদের উপাসনাস্থানে আসিলেন ও হিন্দীভাষায় অতি সুন্দর প্রার্থনা করিলেন ও উপদেশ দিলেন। ইঁহার নাম মিঃ ইউনস। ইনি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাই ইঁহাকে সকলে পণ্ডিতজী বলিয়া ডাকিতেন। ইনি ও ইঁহার স্ত্রী তোমার বন্ধু হইলেন। মিসেস ইউনসকে লইয়া একত্রে আহার করা তোমার পক্ষে আনন্দের কার্য্য হইল। ইউনসের হিন্দি প্রার্থনা তোমার বড় ভাল লাগিত। ইঁহাদের গৃহ তোমার গৃহের অতি নিকটে ছিল; কোনও দ্রব্যাদি আসিলে পণ্ডিতজী ভাগ পাইতেন। ইউনসের সাহায্যার্থ নিজ বাটীর বাহিরের ঘর ছাড়িয়া দিলে, সেখানে ইউনস নাইট স্কুল (নৈশ বিদ্যালয়) খুলিলেন। অনেকগুলি শ্রমজীবী বালককে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। তুমি আপন আয় হইতে তাঁহাকে কিছু কিছু সাহায্য করিতে লাগিলে। আপনার বাটীতে তাঁহাদের স্থান দিবার প্রস্তাবও করিয়াছিলে। কিন্তু মিসেস ইউনস রাজি হইলেন না।

একজন ব্রাহ্মবন্ধু এই সময়ে একটি বিধবার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন। তুমি বিধবা বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলে। কিন্তু এ বিবাহে আমাকেই আচার্য্যের কাজ করিতে হইবে এরূপ স্থির হইয়াছিল। তুমি শুনিয়া প্রথমে ভয়ানক প্রতিবাদ করিতে লাগিলে। কিন্তু যখন শুনিলে যে, এ বিবাহে সাহায্য করিবার আর কেহই নাই, তখন অনুমতি দিলে ও স্বয়ং সমুদয় ভার আপনার মস্তকে লইলে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিবাহবাটীতে উপস্থিত থাকিয়া সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, তাহার পর বরকন্যার জন্য প্রার্থনাও করিলে। বিরুদ্ধ মত থাকিলে যে আর মানুষের প্রতি ভালবাসা থাকে না, ঈশ্বরকৃপায় তুমি এই মানবীয় ভাবের অতীত স্থানে উপনীত হইয়াছিলে। এই বরকন্যাকে চিরদিন নিজ পুত্রকন্যার মত দেখিয়াছ। ইঁহাদের সন্তানের পীড়া হইলে রাত্রি জাগরণ, অর্থাভাব হইলে তাহা দূর করা, এ সকলই অতি সহজে ও সরল ভাবে করিয়াছ। কত বার আপনার বাটীতে স্থান দিয়াছ; একত্রে আহার, উপাসনার তো কথাই নাই। কেহ ভাবিতেও পারে নাই যে, ইঁহাদের বিবাহের তুমি এত বিরোধী ছিলে।

চিকিৎসা ও বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বাঁকিপুরে তোমার বাটীতে আসিলেন। তাঁহাকে তুমি অতি আদর করিয়া সেবা করিতে লাগিলে। কিছুদিন পরে ফণীন্দ্রমোহন স্বয়ং আসিলেন। এই সময়ের একটি রহস্য মনে পড়িল। গোপন করিবার ইচ্ছা নাই, তাই লিখিতেছি। জগত্তারিণী আমার আপনার ভগিনী নহেন, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে ও বিবাহের পরেও তাঁহার শিক্ষার সাহায্য করিতাম, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ হইয়াছিল। জগত্তারিণীর পীড়াতে আমারও কিছু সেবা করা উচিত, এই ভাবিয়া নিজেও কিছু সেবা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। ইহাতে তুমি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলে। তখন এইরূপ, কিন্তু পরে বুঝিতে পারিয়াছিলে যে যতই ভালবাসার বস্তু বাড়ে, ততই হৃদয়ের ক্ষমতা বাড়ে। তখন তুমি বাধা দিলে তোমারই পরিশ্রম বাড়িতে লাগিল।

ইহার মধ্যে আবার তাঁহার কন্যা মৃণালিনীর ভয়ানক রোগ উপস্থিত হইল। চিকিৎসক নিরাশ হইলেন। আর একজন চিকিৎসককে তাঁহার সাহায্যার্থ ডাকা হইল। তিনি অনেক আশা দিলেন, তাহাতে প্রথম চিকিৎসক দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন, ও কঠোর আজ্ঞা প্রচার করিতে লাগিলেন। বলিলেন, বাটী পরিবর্ত্তন করিয়া বড় বাড়ীতে লইয়া যাইতে হইবে। তখনই তুমি প্রস্তুত হইলে। আপনার বাড়ী ঘর ছাড়িলে। নূতন বাটীতে যাইবামাত্র কন্যার রোগ আরাম হইতে লাগিল, কিন্তু তোমার শরীর নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। তবু তোমার সেবার ত্রুটি হয় নাই। কোথায় শোণের জল, কোথায় কলিকাতার মাগুর মাছ, তোমার কাছে কিছুই অসাধ্য রহিল না। নিজ হস্তে রোগীর মলমূত্র পরিষ্কার করিতে। এইরূপে ছয় মাস কাল অসুস্থ শরীরে সেবায় নিযুক্ত ছিলে। "পারি না" এ কথা এক দিনের তরেও বল নাই। কন্যা আরোগ্য লাভ করিলেন, কিন্তু ভগিনী জগত্তারিণীর রোগ নির্ম্মল হইল না। [ক্রমশঃ।

নিশীথে

শ্রীবিভূতিভূষণ বাগচী

কত দিন কত রাত্রি আগে
চাঁদ একা জেগেছিলো রাতে,
থেমেছিলো কোন বাতায়নে !
কিসের ইসারা ছিল তার নয়নে !

নিশীথের শেফালিকা দল
তখনো ঝরেনি,
ঘুমের জড়িমা তার ভেঙে ভাঙেনি ;
বাতাসে অচঞ্চল, রসঘন টলমল,
বৃন্তে বৃন্তে তারা ঝরে পড়েনি।

হে চপল টুল্‌টুল্ চটুল চরণ,
ক্ষণিকের প্রেম নিল, প্রাণ নিল তোমার শরণ !
বিরল আলোকরশ্মি, হে দূর তারকা !
রহ সাক্ষী ক্ষণিক মিলনে ; এই পলাতকা,
এই ভীরু ভঙ্গুর মুহূর্ত্ত থাক অনন্ত সীমায়।

রস দিয়ে, তনু দিয়ে, দিয়ে রঙ, মনের কামনা,
মাটি যারে গড়ে দিনে দিনে—সে রহে উন্মনা।
মৃত্তিকার নাগবন্ধে সহস্র শিকড়ে থাকি বাঁধা—
মন তবু মেলে পাখা ; পিছে রয় ধরিত্রীর কাঁদা।

জানালায় চাঁদ-জাগা রাতে
যত বন, উপবন, শিলাহত ঝরণার ধারে,
কঙ্কর বক্ষের ঘন অরণ্যানী পারে,
বনবিটপীর নিত্য ছায়া ছাঁকা পথে

কত দিন কত রাত্রি আগে
নগরীর নাট্যশালা ছাড়ি,
কত দূর পাহাড়ের ওঠা-নামা পারে
কার আঁখি উৎসুক চেয়েছিলো কারে ?
অধরের উতরোল রক্তসিন্ধু তটে,
অধীর উদ্‌গ্রীব কার হৃদয়ের পটে,
ফুটেছিলো কি বর্ণিল উচ্ছ্বাস আভাস
কামনায় ছেয়ে-যাওয়া অরণ্য-আকাশ।

নিদ্রাহীন ভীরু বিহঙ্গম,
মহুয়া পলাশ আর দেবদারু-বনে
উদাস হাওয়ার এলোমেলো আলাপনে,
রঙীন পাথর ফুল ঝরণার গানে
ক্লান্ত দুটি আঁখি মেলি মধ্যরাত্রে,
স্তব্ধরাত্রে, চেয়েছিলো মোরে।
অরণ্যানী অচেতন ছিল নিদ্রাঘোরে।

সে নিশীথে আর কারো পড়েছিল মনে
চাঁদ ছিল থেমে যবে একা বাতায়নে ?
যে আমারে চেয়েছিল, বেঁধেছিল বাসনা মায়ার,
সে চাঁদ কি ছিল তার সীমন্ত-সীমায় ?
দু'নয়ন তন্দ্রাঘন, ইতস্তত কুন্তলের ভার,
খোলা জানালায় চাঁদ, আর খোলা হৃদয়ের দ্বার।

বনানীর পাহাড়ের ঝরণার গান,
যত মোর আকিঞ্চন—উতরোল প্রাণ
মিলেছিলো তারি স্বপ্ন সাথে,

পঞ্চতপা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

২

রোমাঞ্চকর বটে! কিন্তু মড়াইয়ের এই বিগত একটা বছরের সকল বৃত্তান্ত অনুকূল নয় খুব।

গড়ার কাজে জড় বাধা দূর করার স্ফুলিঙ্গ আছে বিজ্ঞানের মশালে। সে বাধা উড়িয়ে পুড়িয়ে ছাংখার করতে সময় লাগে না। কিন্তু আর একটা বাধাও আছে। যা জড় নয়, কিন্তু অনেক বেশি নিটোল, অনেক দুর্ভেদ্য। শতাব্দী কালের সংস্কার আর অজ্ঞতায় তার ভিৎ নড়ে না। যুগ-যুগান্তের অবিশ্বাস আর অন্ধতায় ওতে আলো পশে না। অনাগত কালের আশ্বাসে তার বাঁধন টলে না।

এই জীবন্ত মানুষদের অসূর্যম্পশ্য আঁধার তপস্যা উদ্‌যাপনের মন্ত্র জানা নেই কারোরই। ওদের সেই সম্মিলিত তমিস্র-প্রাচীর বিদীর্ণ করার মত ছোট একখানি বিশ্বাসের প্রদীপ জ্বালতে পারে এত আলো নেই বিজ্ঞানের আগুনে। সে প্রদীপ অন্তরের স্পর্শ-পিপাসু। বিজ্ঞানের নয়। কিন্তু এই হৃদয়ের স্পর্শ থেকে আজীবন বঞ্চিত ওরা।

মড়াইয়ের ধারে ধারে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে, ঘন জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত যে জনবসতি গড়ে উঠেছিল তার সংখ্যা কম নয়। প্রায় দেড়শ' গ্রাম। প্রায় হাজার পনের নারী-পুরুষ। গ্রামগুলো ছিল ছাড়া-ছাড়া, মানুষগুলোরও অস্তিত্বের আড়ম্বর ছিল না খুব। সাঁওতাল বটে, কিন্তু শহর বা আধ শহরের বাঙ্গালী-ঘেঁষা সাঁওতালদের সঙ্গে তাদের তফাৎ অনেক। তাদের হাবভাব, চালচলন, রীতিনীতিতে সমতলভূমির নরম কমনীয়তার ছোঁয়া লাগেনি তেমন।

কিছু একটা হবে এখানে, অনেক দিন ধরেই তারা তার আভাস পাচ্ছে। তোড়জোড় দেখছে। সাজ-সরঞ্জাম দেখছে। মাতব্বর জাতভাইদের মুখে রূপকথা শোনার মত শুনছেও কিছু কিছু। কিন্তু সঠিক বুঝছে না। যারা বলছে রূপকথা তারাও না, যারা শুনছে তারাও না। তাই হঠাৎ একটা প্রলয় দেখল যেন তারা। আর সেটুকুই বুঝল। এর থেকে সৃষ্টির হদিস ওরা পাবে কেমন করে? যা দেখল তারই আঁচ লাগল মনে। কানাকানি শুরু হল নিজেদের মধ্যে। ছোট থেকে বড় হতে লাগল কানাকানির গণ্ডি। বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা ছাড়াও রূঢ় প্রতিবাদের ছাপ পড়তে লাগল মুখে।

বিজ্ঞানের আসল দূতদের ওরা সামনাসামনি পায় না। চেনেও না। কিন্তু তাদের চেলাচামুণ্ডাদের সাক্ষাৎ পেতে লাগল। চিনতে লাগল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এলো তারাই। কারণ, কাজ চালু করতে হলে ওদের চাই। ওদের বিশ্বাস চাই আর গতর চাই। মড়াইয়ের কাছ থেকে ওদের সরানো চাই।

কিন্তু এই সৃষ্টিমাহাত্ম্য ওদের বোঝানো পাকা কারিগরের পক্ষেও দুঃসাধ্য প্রায়।

—মরা মড়াই তোমাদের কূলে কূলে ফুলে উঠবে, ফেঁপে উঠবে। যতদূর চোখ যায় মড়াইয়ের জলে সব ডুবে যাবে। আশপাশ থেকে, ধারকাছ থেকে তাড়াতাড়ি সব সরতে লাগো তোমরা।

—তোমাদের জায়গা-জমি ঘর-বাড়ি?

কিচ্ছু ভাবনা নেই। সরকার দেবে। ক্ষতিপূরণ দেবে। নতুন করে ঘর-বাড়ি তোলার খরচ দেবে। দেবে কেন, দিচ্ছেই। তোমরা নাওগে যাও। দূরে গিয়ে গ্রাম বসাও, ঘর-বাড়ি তোলো। আর হপ্তায় টাকা পাবে। মেয়ে-পুরুষ সবাই এসো। যার গতর আছে সেই এসো।

জলের কথায় যাদের মন ভিজেছিল তারাও বিগড়ে গেল আবার।

ঘড় বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে!

ঘর-বাড়ি ছেড়ে উঠে যেতে হবে!

এ প্রস্তাবের সঙ্গে ওদের আপস নেই কোন। সৃষ্টির ইতিহাস থেকে অদৃষ্ট ওদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে এই মর্ত্যভূমির দিক্-বিদিকে। অবশ্য মর্ত্যভূমি বলতে যেটুকু ওরা বোঝে তার গণ্ডি খুব বড় নয়। কিন্তু তাদের সেই পৌরাণিক অভ্যুদয়ের প্রথম অধ্যায় থেকে তারা শুনে আসছে এই ঘর-ছাড়ানি দেশ-খোয়ানি বিধিলিপির কথা। সৃষ্টি থেকে বনজঙ্গলের বিভীষিকার সঙ্গে লড়াই করে মাটিকে বাসের উপযোগী করেছে নাকি তারাই। কিন্তু যাযাবর জীবনের অভিশাপ লেখা ওদের কপালে সেই আদি যুগ থেকে। সেটা সত্যি কি মিথ্যে জানে না, কিন্তু বিশ্বাস করে। তাই বসতি ত্যাগের আভাস মাত্রে অসহিষ্ণু ক্ষোভে প্রায় হিংস্র হয়ে ওঠে ওদের মূর্তি।

এই বিক্ষোভের আর একটা কারণ আছে। আর সেটাই বোধ করি সব থেকে বড় কারণ।

অবিশ্বাস।

সভ্য মানুষের প্রতি অবিশ্বাস। সভ্যতার প্রতি অবিশ্বাস। বনের হিংস্র বাঘ-ভালুককে তারা ভয় করে না। কিন্তু এই সভ্যতাকে করে।

তাদের এই নিকষকালো দেহের ভিতরে কোথাও এতটুকু কালোর আভাস মাত্র ছিল না। ওদের ওই কালো বুকের মধ্যেই ছিল খোলা আকাশের বন্য সরলতা। কিন্তু সেই শাদা বিশ্বাসের ওপর আগুন চড়িয়ে চড়িয়ে সেটা ঝাঁঝরা করে দিয়েছে এই সভ্য বুদ্ধিজীবী মানুষ। হিংস্র নখদন্ত মেলে একদা যারা সর্বস্ব গ্রাস করতে চেয়েছিল। যারা সর্বস্ব গ্রাস করেও ছিল।

পূর্বপুরুষদের সেই রক্ত-ঝরা দিনের কথা ওরা আজও ভোলেনি। ওরা কোন দিন ভুলবে না বোধ হয়।

নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য দিয়েই একদিন ভরা প্রাচুর্যের মুখ দেখেছিল তারা। কারো প্রত্যাশায় বসে থাকেনি কোন দিন।

পরদেশী শাসন ব্যবস্থা। তাদের চাষের জমির ওপর আশী হাজার টাকা মাশুল ধার্য করেছিল সেদিনের রাজপ্রতিনিধি পন্টেট্।

সেইখানেই শেষ নয়।

কোথা থেকে এলো তারপর এই সভ্য মানুষের দল। তাদের লোলুপ দৃষ্টির অর্থ তখন দুর্বোধ্য ওদের কাছে। ওরা সরল, ওরা কুটিলতা বোঝে না, তার মাশুলও দিতে হবে বই কি! মহাজনের থলে নিয়ে বন্ধুর নামাবলী পরে আগমন ঘটতে লাগল তাদের। প্রলোভনের সামগ্রীতে তাদের আড়ত ভরা। সেই যূপকাঠে ওরা গলা বাড়িয়ে দেবে না তো দেবে কারা?

—নুণ চাই? নাও না গো, তোমাদের জন্যেই তো। তবে বড় দামী জিনিস—আচ্ছা এক গাড়ি ধানের বদলেই নিয়ে যাও ওই নুণের চাঙটা—কিন্তু বাপু পরের বারে আর অত সস্তায় পাচ্ছনি, এক কলসী ঘি দিতে হবে এর পর।

—কি চাই, এই একজোড়া পায়রা? বদলে দেবে কি, ওই একজোড়া বলদ মাত্র? আচ্ছা, নিয়ে যাও ভাই, নিয়ে যাও।

নিষ্ঠুরতার মাত্রা বাড়তে লাগল।

ঘি মাপার পাত্রটা তলায় ফুটো কি না, সেরের বাটখারা পাঁচ-সেরী হয়ে গেল কি না, সে ওদের কে বলে দেবে?

কিন্তু এ-ও তাদের যথাসর্বস্ব নয়, যথাসর্বস্ব চাই যে!

—কি চাই ভাই, টাকা? ধার নেবে? খুব ভালো, খুব ভালো, দরকার হলে নেবে বই কি টাকা ধার—ওই জন্যেই তো টাকা।

এই শেষের টুকুর জন্যেই বসে ছিল যেন।

বাঘে ছুঁলে আঠের ঘা। কিন্তু এই মহাজনেরা ছুঁলে কত ঘা? বংশ-বংশ ধরে সে ঘা আর শুকোয় না।

—দশ টাকা ধার নেবে? তাহ'লে পনের টাকা লিখতে হবে। টাকা শুধতে এসেছ? কত টাকা দেবে? পনের? দাও, আর সেই সঙ্গে সুদটাও দিও। সুদ কেন? এই যে পনের টাকায় টিপসই দিয়েছ ভাই। আসল দেবে, সুদ দেবে না?

না দিলে আদালত আছে। আর সে দিনের সেই আদালতের শরণাপন্ন হয়ে এই জীবগুলোর কাছ থেকে টাকা কি করে আদায় করতে হয়, সে ওরা ভালই জানে।

পঁচিশ টাকা এক বার যে ধার নিলে, এই মর্ত্ত্য-জীবনে সে আর তার ঋণ পরিশোধ করে যেতে পারল না। তার ছেলেও না, তার ছেলেও না। এই করে ওদের জমি গেল, বাড়ি ঘর, গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া, থালাবাটি সব গেল। নিজেরাও বাঁধা পড়তে লাগল তার পর। বাঁধা পড়তে লাগল চির দাসত্বের শিকলে। দুশ্চিন্তা আর হতাশা হল জীবনের সঙ্গী। অন্যত্র কাজ করে ঋণ পরিশোধ করবে তারও উপায় নেই—মহাজন সঙ্গে সঙ্গে নাকে দড়ি পরিয়ে আদালতে টেনে নিয়ে যাবে। আর সেখানে তাদের পরাজয়ের পরোয়ানা লেখাই আছে।

পালাবে?

পালাবে কোথায়?

কত দূরে?

বাড়তেই লাগল এই দাসের সংখ্যা। আবর্তিত হতে থাকল তাদের মর্মছেঁড়া দীর্ঘনিঃশ্বাস।

বসাচ্ছে সাদা চামড়ার সাহেবরা। অর্থাৎ, রেলপথের মাটির কাজ শুরু হয়েছে। ভাগ্যক্রমে মহাজনদের বেড়ি পায়ে পড়েনি এমন যারা ছিল, মজুরি খেটে কোঁচড় ভরে টাকা নিয়ে আসতে লাগল তারা। শিশু, নারী, পুরুষ সকলেই। সাড়া পড়ে গেল একটা। শ্রম-কাতর নয় তারা।—চল, চল, চল তোরা সব—ঋণ শুধবি তো সবাই চল এবার।

কিন্তু ঋণ পরিশোধ হলে মহাজনদের চলবে কেন? ঋণ-দায়ে আত্মবিক্রীত ক্রীতদাসেরা চলে গেলে এ দিকের ক্ষেত-মজুরী করে কে? মহাজনদের শিকল হিংস্র হয়ে উঠল আরো।

ওদের এত কালের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ আর স্ফুলিঙ্গ দাবানলের মত জ্বলে উঠেছিল তার পর।

ওরা প্রতিবাদ করেছিল। প্রতিবাদ করেছিল মহাজনদের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করেছিল সেই শ্বেত-শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সে প্রতিবাদ রক্তের অক্ষরে লেখা আছে ইতিহাসের পাতায়।

ওরা মরেছিল। আর মেরেছিল। ওরা রক্ত দিয়েছিল। আর রক্তপান করেছিল।

'রাক্ষসী' বটের নীচে কপট দারোগার দেহ উপদেবতা-প্রধান সূর্যদেব 'জমছিম বোঙ্গা'র উদ্দেশে বলিদান দিয়ে রক্ততর্পণ শুরু করেছিল তারা। 'রাখসী থানের বট'; এই একশ' বছরেও নর-রক্তে ভেজা শিকড় কি তার শুকিয়েছে?

এক লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণ দিয়েছে তার পর। পরাজিতও হয়েছে। কিন্তু তাতে কী? বিদ্রোহী ভৃগুর পায়ের চিহ্ন ভগবানের বুক থেকে মুছবে কোন দিন? সভ্যতার বুক থেকে এই বিদ্রোহী কালো মানুষদের পায়ের দাগও মিলাবে না কোন দিন।

হ্যাঁ, শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হয়েছে ওরা। ইতিহাসের সেটা স্থূল অধ্যায়। পরাজিত হয়েছে ওদের অবিনশ্বর নেতা সিদু আর কাহ্নু। জাতির উপাস্য দেবতা 'মারাং বুরু'র আবির্ভাব ঘটেছিল না কি তাদের মধ্যে। তারা নিজেরাই সেদিন প্রচার করেছিল এ কথা। অন্ধবিশ্বাসীর বুকে বিপ্লবের আগুন জ্বালতে হলে এই বজ্র-নির্ঘোষ ছাড়া আর গতি ছিল না কিছু। প্রাণ দিয়েছে সেই 'মারাং বুরু'-প্রতীক সিদু কাহ্নুও। কিন্তু এই নিরক্ষর মানুষদের বুকে দেবতার আবির্ভাব সত্যিই কি ঘটেনি সেদিন? দুরাচারীর বিনাশ সাধনে যুগে যুগে দেবতার আবির্ভাব মানুষের বেশে—সে তবে কী—? সে তবে আর কেমন করে হয়?

সেই শতাব্দী কালের অবিশ্বাসের ধারা আজও তাদের ধমনীতে বইছে।

হঠাৎ একটা সাড়া পড়ে গেল। হঠাৎ একটা জাগরণ এলো। হঠাৎ একটা আলোড়ন এলো। ছাড়া-ছাড়া গ্রামগুলো একটা মিলিত স্বার্থের সংযোগে এক সঙ্গে নড়ে-চড়ে উঠল যেন। স্বার্থে নয় ঠিক; আশঙ্কায়। আশঙ্কায় আর উদ্বেগে।

সমবেত উচ্ছেদের কথাটা শুনে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেল যেন সকলে। তার পর একটু করে সচেতন হতে লাগল তারা। কোন প্রস্তাব নয়, কোন দুঃস্বপ্ন নয়—সরকারের নোটিশ জারী হয়েছে একেবারে। রূঢ়, কঠিন, বাস্তব। মুগুরের ঘায়ে ঘুম ভাঙানোর মত।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল প্রতি গাঁয়ের 'মাঝি' আর 'পারাণিক'রা

প্রধান সহকারী। একদা তারাই ছিল গাঁয়ের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। কিন্তু কালের পরিবর্তনে সে প্রতিপত্তি অনেকটাই স্তিমিত। তাই সুযোগ সুবিধে পেলেই নিজেদের অস্তিত্ব কড়ায় গণ্ডায় জাহির করে থাকে তারা। কিন্তু এমন একটা গুরুতর ব্যাপারের তাড়া খেয়ে একেবারে যেন হকচকিয়ে গেল। পদমর্যাদার মুখোস খসিয়ে নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ, বিভিন্ন গাঁয়ের মুরুব্বিদের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপনের জন্য ছোটাছুটি শুরু করে দিল তারা।

ঝড় যখন আসে শুধু তখনই মিতালি হয় বোধ হয় বনস্পতির সঙ্গে তুচ্ছ তৃণলতারও। এই ঢালা উচ্ছেদ সম্ভাবনার আঁচ লাগল আরো এক দলের গায়ে—যারা এদের দলগত নয় ঠিক। যারা শিক্ষিত এবং আধা-শিক্ষিত। যারা ভদ্রলোক এবং আধা-ভদ্রলোক। সমস্ত পরিবেশ জুড়ে এ রকম গৃহস্থ-বসতিও একেবারে কম নয়! ভিতর থেকে মুরুব্বিদের শলাপরামর্শ দিতে লাগল তারাই। একত্র বসবাসের ফলে এদের ওরা সন্দেহ করে না, অবিশ্বাস করে না। তারা বলল, একসঙ্গে রুখে দাঁড়াও তোমরা, কিছুতে বাস্তুভিটে ছেড়ে যেতে রাজি হয়ো না।

রোজ সাড়ম্বরে মিটিং হতে লাগল এর পর। আজ এই হাটে, কাল ওই হাটে। বাঁধতে দেব না আমাদের মড়াই, মড়াইকে আমরা ভালবাসি, ভক্তি করি—মড়াই বাঁধলে অধর্ম হবে আমাদের। কি উপকার হবে মড়াই বেঁধে? তোমরা কেউ কাজ কোরো না, কেউ তোমরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিও না। কিন্তু দিন গেছে।

যে রাজশাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব-পুরুষেরা অস্ত্র ধরেছিল এক দিন, তার থেকে দিন অনেক বদলেছে। রক্ত ওদের অনেক বদলেছে। রক্ত ওদের অনেক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বিজ্ঞান দুর্গমকে অনেকটাই সুগম করে আনার ফলে ওদের সেই অটুট বিচ্ছিন্নতার সুযোগ-সুবিধেও অনেকটাই ঘুচে গেছে। ওরা রাজনীতি বোঝে না, কিন্তু রাজনীতির অমোঘ গতি উপলব্ধি করে খানিকটা।

তাই গাঁয়ের মাঁঝি মাতব্বরেরা চিন্তিত। চিন্তিত সকলেই। কি হবে? ভাল হবে কি মন্দ হবে? গাঁ ছেড়ে যাব না বলছি, কিন্তু না গিয়ে পারব কেমন করে? বাধা দেব কিন্তু কেমন করে দেব? আর চিন্তিত পাগল সর্দার।

পাগল বলতে পারে না, বলে পাগড় সর্দার। সর্দার পদবী নয় কিছু। ওটা অমনি চলে আসছে। মাঁঝি নয়, মুরুব্বি নয়, পারাণিকও নয়—তবু সর্দার।

'মারাং বুরু' প্রতীক সেই সিদু কান্হুর ডান হাত ছিল নাকি তার কোন পূর্ব-পুরুষ। সেই পুরুষের বংশধর। ওপরওলার রীতি বিচিত্র! সেই তমসাচ্ছন্ন অন্ধ বিশ্বাসের যুগেও দু'টি মানুষের বুকে জেগেছিল যেন চেতনারূপী সূর্যসেনা। আজকের এই কর্তব্য-বিমূঢ় আলোড়নের মধ্যেও একটা শুভ চেতনা বার বার উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল যে মানুষটির অন্তস্তলে সে এই পাগল সর্দার।

ভাবছে পাগল সর্দার।···ভাবছেই।

ওরা বলছে জল হবে। ওরা বলছে জলের অভাব ঘুচবে। হবে কি না কে জানে? ঘুচবে কি না কে জানে? ···কিন্তু চেষ্টা হবে। এই চেষ্টাটা যদি না হয় তা'হলে? মাটি খাঁ-খাঁ করছে, তাই করবে। মাটির নীচে আগুন জ্বলছে, তাই জ্বলতে থাকবে। মাটির দানায় দুর্ভিক্ষ লেগে আছে, তাই লেগে থাকবে। মাটির ফাটলে উপোস বাসা বেঁধেছে, তাই বাঁধা থাকবে। তাহলে? তা'হলে?

তা'হলে কিছু করা দরকার। কিছু না করলে কিছু হবে কি করে? সেই কিছুই তো করতে চাইছে বাবুরা। সেই কিছুর চেষ্টাই করতে চাইছে। তবে আর বাধা দেবে কেন? কি লাভ হবে বাধা দিয়ে। কি পাবে তারা? আজ পাবে না। না, কাল পাবে না, কোন দিনই কিছু পাবে না। ভরসা তো শুধু ঝরণার জল। কিন্তু সে ভরসা কতটুকু তা' তো বছরের পর বছর হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। তবে আর তারা কেন দেবে বাধা?

অনুগতদের ডেকে এই কথাই বললে পাগল সর্দার।

এই সাদাসিধে কথাটাই বোঝালে। দলছাড়া স্বতন্ত্র মানুষ পাগল সর্দার। কিন্তু ভক্তের সংখ্যা কম নয়। বেশির ভাগই তারা ছেলে-ছোকরার দল। একদা ডাকসাইটে শিকারী ছিল মানুষটা। শিকারে বেরোনো অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছে। প্রৌঢ়ত্ব ছাড়িয়ে বার্ধক্যের দিকে পা' বাড়িয়েছে। কিন্তু শিকার করা ছেড়েছে তার অনেক আগেই। অসময়ে ছেড়ে দিয়েছে এই একমাত্র বিলাস। তবু তার শিকারের গল্প তরুণ উদ্যমীদের মুখে মুখে ফেরে আজও। তারা দেখেনি। কিন্তু শুনেছে। শুনে আসছে।

হঠাৎ একটা চাপা উত্তেজনা দেখা দিল প্রায় সর্বত্র।

পাগল সর্দার ভিটেমাটি ছেড়ে দূরে সরে যেতে রাজি হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছে আরো অনেকে—মাথার ওপর যাদের বয়স্ক অভিভাবক নেই বিশেষ করে তারা। শুধু তাই নয়, পাগল সর্দার এদের নিয়ে মড়াই বাঁধার কাজে লাগতেও নাকি রাজি হয়েছে।

ভিটে-মাটি ছাড়তে রাজি না হলেও জোর করে ছাড়ানো হবে হয়ত, এই ক'দিনে প্রায় সকলেই উপলব্ধি করেছে সেটা। কিন্তু তা'বলে ওদের সঙ্গে গিয়ে কাজে লাগা! কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসা না করে, মাঁঝির অনুমতি না নিয়ে!

পাগল সর্দার বেইমান! পাগল সর্দার বিশ্বাসঘাতক! পাগল সর্দার অধার্মিক!

রক্তচক্ষু মাতব্বরেরা এলো কৈফিয়ৎ নিতে। পাগল সর্দার কৈফিয়ৎ দিল। তারা বলল, নদী বাঁধলে অনেক ক্ষতি হবে, অনেক লোক মারা পড়বে। ও বলল, অনেক লাভ হবে, অনেক লোক বাঁচবে।

রুদ্ধ আক্রোশে ফিরে গেল তারা। মাঁঝির পঞ্চাতি বৈঠক বসল অবিলম্বে। একঘরে করা হল পাগল সর্দারকে। কাপড়, চাল, তেল সব বন্ধ। সমাজ বন্ধ।

কিন্তু এই করে পাগল সর্দারকে এঁটে ওঠা যাবে না। এও বোঝে মাতব্বরেরা। সরকারের কাছ থেকে সবই পাবে সে। অনেক বেশি পাবে। আর শায়েস্তাই বা করবে কি করে, সে একা নয়, এক দল জোয়ান মরদ আছে তার দিকে।

মাঁঝির বিষম রাগ পাগল সর্দারের ওপর। এই ব্যাপারে নয়। অনেক আগে থেকেই। কারণও আছে বিশেষ। ও লোকটার জন্য ঘরের শান্তি মান-সম্ভ্রম সবই নষ্ট হচ্ছে তার।

অশান্তির কারণ তার নিজের সন্তান হোপুন আর পাগল সর্দারের মেয়ে চাঁদমণি।

মরদের মত মরদ ছেলে। অমন ছেলের গর্বে বাপের ছাতি ফুলে ওঠার কথা। কিন্তু তাকেও তুক করেছে লোকটা। আর তার মেয়েটা। ফুলমণির মেয়ে চাঁদমণি। 'ছাড়ুই কুড়ী।' ফুলমণি। স্বামী ছেড়ে পালানো মেয়ে ফুলমণি। পরপুরুষের সঙ্গে 'আপাঙ্গির' হয়ে গেছে ফুলমণি। অর্থাৎ, নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। 'আপাঙ্গির কুড়ী'—ঘরছাড়া মেয়ে। ওরা বলে, ঘর ছাড়া মেয়ে সবুজ বুলবুল, হাজার রকম ডাকে। ঘর ছাড়া মেয়ে ময়না পাখী, মাথায় কেবল বাহার। সেই ঘর ছাড়া ফুলমণির মেয়ে চাঁদমণি। যত গোলযোগ, যত আপত্তি, যত বাধা এইখানে। এ সব ঘর ওদের সমাজে হেয়। আর মাঁঝির ছেলে হয়ে কি না হোপুন ওই মেয়ের পিত্যেশে বসে আছে!

এক কালে পাগল সর্দার শ্রদ্ধার পাত্রই ছিল সকলের। গাঁয়ের মাঁঝি না হোক অল্প বয়সেই 'জগমাঁঝি' যে হোত কোন সন্দেহ নেই। কাকে বলে জগমাঁঝি? এক কথায়, গাঁয়ের যুবক-যুবতীদের সর্দার। গ্রামে যাতে লজ্জার কোন কারণ না ঘটে, সুনামের হানি না হয় সেটা দেখার গুরুদায়িত্ব জগমাঁঝির। ছেলেমেয়েরা তাই জগমাঁঝির কথায় ওঠে বসে, সর্বদা তাকে সন্তুষ্ট রাখে।

কিন্তু যার ঘরে অমন কলঙ্ক সে আর জগমাঁঝি হবে কেমন করে? উল্টে সমাজচ্যুত হয়েছিল। নেহাৎ পাগল সর্দার বলেই অল্পের ওপর দিয়ে রেহাই পেয়ে গেল। 'জনজাতি' হল আবার, সমাজে উঠল। কিন্তু ওদের সমাজে 'ছাড়োয়া' পুরুষের 'পরেও লোকে সন্তুষ্ট নয় তেমন। ছাড়োয়া মানে স্ত্রী-পরিত্যক্ত। বাপ-মা মেয়ের বিয়ে দেয় না এদের সঙ্গে। কুমারী মেয়েরাও চায় না এদের ঘরণী হতে। বলে, ছাড়োয়া পুরুষ চাখা হাণ্ডা, কে জানে কয় দিন! কিন্তু সব নিয়মেরই আবার ব্যতিক্রম আছে। পাগল সর্দার সেই মূর্তিমান ব্যতিক্রম।

ব্যতিক্রম বলেই সমাজের রক্ষণশীল মুরুব্বিরা সহ্য করতে পারে না ওকে, বরদাস্ত করতে পারে না। ইচ্ছে করলেই আবার বিয়ে করতে পারত পাগল সর্দার। ছাড়োয়া হওয়া সত্ত্বেও। কুমারী মেয়েই পেত। তালাক দেওয়া মেয়ের সন্ধান করতে হত না। শুধু তাই নয়, যে লোকের ঘরে এত বড় কলঙ্ক, সমাজে উঠলেও আজীবন তার মাথা নীচু করেই থাকার কথা। কিন্তু পাগল সর্দারের বেলায় সকলে যেন সেটা ভুলেই গেছে। জগমাঁঝি না হলেও সোমত্ত ছেলে-মেয়েগুলো তার কথায় ওঠে-বসে। লোকটা যাদু জানে না তো কী? ও ডান্ না তো কী? আগের দিনে ডান্-এর নাগাল পেলে মারপিট করে একেবারে শেষ করে দিত তারা। কিন্তু এখন সেটা করতে গেলে হাকিমের বিচারে উল্টে তাদেরই জেল হয়ে যাবে। হাকিমরা সব বোঝে, কিন্তু ডান্ বোঝে না।

তবু সবই সহ্য হত মাঁঝির। সবই ক্ষমা করত, যদি না নিজের অমন ছেলেটার এমন সর্বনাশ করত ওই লোকটা আর তার নচ্ছার মেয়েটা। বাপ-ছেলের এই নিয়ে বিবাদ লেগেই আছে। ছেলেকে মনে মনে ভয়ই করে সে। জোয়ান ছেলে, কালো পাথরে-কোঁদা বুকচিতানো ছেলে—কথা বেশি বলে না, মরা চোখে মুখের দিকে চেয়ে থাকে শুধু। কিন্তু তাইতেই অস্বস্তি লাগে কেমন। যত নিষ্প্রাণ হয় ওর চোখ, তত বেশি অস্বস্তি।

বিয়ে এত দিনে হয়েই যেত। চাঁদমণিকে এত দিনে কবে ঘরে এনে তুলত হোপুন। কিন্তু কেন যে সেটা হয়নি সেটাই মাঁঝির বিস্ময়। কেন মত দেয়নি পাগল সর্দার! মাঁঝির মত নেই বলে? কিন্তু কার মতামতের ধার ধারে হোপুন! বিয়ে তো একরকম ঠিকঠাক হয়েই আছে। পাগল সর্দার নাকি বলেছে, তোমার বাপ এসে আমাকে বলুক, যথাবিধি মর্যাদা দিক—তারপর হবে বিয়ে। ওদের সমাজে মেয়ের বাপেরই মর্যাদা বেশি। কিন্তু প্রচণ্ড সাহস আর দেমাক লোকটার! আরো বলেছে। বলেছে, মত না দিলেও হবে বিয়ে, কিন্তু সবুর করো, অত তাড়া কিসের—নিজের তাহ'লে আলাদা ঘরবাড়ি তোলো, জোতজমা করো—রোজগারপাতি করো।

সবুর করেই আছে হোপুন। এর বেলায় ছেলের অসীম ধৈর্য। ছেলের বাপ নিজে গিয়ে না বলুক, পরোক্ষ মত দিতেই হয়েছে। গাঁয়ের মাঁঝি সে, প্রধান কর্তা ব্যক্তি, নিজের ঘর নিয়ে গণ্ডগোল হোক একটা, কথা বলুক পাঁচজনে সেটা চায় না। কিন্তু তবু বিধিমত আজও মেয়ে দিচ্ছে না পাগল সর্দার। মাঁঝির ধারণা, কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে এর পিছনেও। নইলে এভাবে ওই সোমত্ত মেয়ে আগলে বসে আছে কেন? হোপুনের হাতে যা হোক করে মেয়ে গছাতে পারলে গাঁয়ের যে কোন লোক বর্তে যেত।

কিন্তু আজ হোক, কাল হোক, এই লোকটাকেই এক দিন বেয়াই বলে ডাকতে হবে মাঁঝিকে। কুটুম্বিতা করতে হবে।

মড়াই বাঁধা নিয়ে এত বড় দুর্যোগ সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে একটু আশান্বিত হয়ে উঠল মাঁঝি। হয়তো এই সুযোগে সব বরবাদ হয়ে যেতে পারে। এ সুযোগ হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবে না মাঁঝি, ছেড়ে কথা কইবে না।

ঘা দেবার সুবর্ণ মুহূর্তও বটে।

অবিশ্বাস আর অনিশ্চয়তায় ছেলে বুড়ো, নারী, পুরুষ সবাই তখন বিচলিত। সকলের মনেই সংশয়। সকলের মনেই ভয়। এরই মধ্যে এক জন সরকারের দলে গিয়ে হাত মেলালো, সেটা সহ্য করা কারো পক্ষেই সহজ নয়। সহকর্মীদের কেউ ধর্মঘট ভাঙলে যেমন হয়, তেমনি নির্মম হয়ে উঠল সকলের মনের অবস্থা। ওরা বাধা দিচ্ছে সরকারকে। কিন্তু সে বাধাটা যেন প্রথম ফুটো করে দিলে পাগল সর্দার।

প্রতিশোধ চাই! নির্মম প্রতিশোধ!

ধমনীর রক্ত ওদের টগবগ করে ওঠে। কিন্তু প্রতিশোধ নিতেও পারছে না। একদঙ্গল ছেলে ঘিরে আছে ওকে। অনেকেই গিয়ে ভিড়েছে ওর দলে। শুধু দলে ভেড়া নয়। বাঁধের কাজেও লেগে গেছে দস্তুর মত। সপ্তাহে মোটা পয়সা রোজগার করছে। তবু চাই প্রতিশোধ! ওরা মন শাণায় আর অস্ত্র শাণায় আর সুযোগ খোঁজে।

ক্রমশ ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলির।

ছক্ মত কাজ এগোচ্ছে না। যাবতীয় সরকারী বিধি-ব্যবস্থা সত্ত্বেও না। প্রথম প্রথম গায়ে মাখেনি। বিক্ষোভ একটু আধটু দেখা দেবে জানতই। নিজের ভালো যদি বুঝতে শিখত ওরা, তাহলে এত কাল ভুগতো না। সরকারী পরোয়ানার জোরেই এসব ছোটখাট বাধাবিঘ্ন নিয়ে মাথা ঘামায় নি সে।

কিন্তু না ওরা এসে কাজে লাগছে, না জায়গা জমি ছেড়ে নড়ছে সকলে।

অবশ্য বাইরে থেকেও হাজারে হাজারে মজুর চালান হয়ে আসবে এখানে। কিন্তু সবার আগে স্থানীয় লোকেরই দরকার। বনজঙ্গল সাফ করে কুলি-কামিনের বসতির একটা ব্যবস্থা হলে তবে বাইরে থেকে যথেচ্ছ লোক চালান নিয়ে আসা যায়। দশ বিশ মাইল এদিক-ওদিক থেকে যারা আসছে তাদের সংখ্যাও খুব কম নয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। তাঁছাড়া ঠিক নির্ভয়ে কাজও করতে পারছে না তারা, হামলার ভয়ে তটস্থ আছে।

গাঁয়ের মুরুব্বিদের প্রথমে ডাকা হল, বোঝানো হল, প্রলোভনও দেখানো হল অনেক। সরকারী নোটিসের ভ্রূকুটিও বাদ গেল না। তারপর, কর্মচারীদের ওপর আস্থা না রেখে বাদল গাঙ্গুলি নিজে গেল তাদের দরজায় দরজায়। স্থানীয় ভদ্রলোকদের অনুরোধ করল মধ্যস্থতা করতে। কিন্তু কিছুতে কিছু হয়ে উঠছে না।

মানুষটা নির্দয় নয় খুব। কিন্তু একটা যান্ত্রিক ঝোঁকে কাজ করে যায় যেন। কাজের বেলায় তার আপস নেই কারো সঙ্গে, কিছুর সঙ্গে। তাই ওদের এই অবুঝপণা বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছে। কাজে বাধা পড়লে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ওড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ওদেরও নিঃশেষ করে দিতে পারে হয়ত! সম্ভব নয় বলেই মেজাজ চড়ছে আরো বেশি।

এমন দিনে দলবল সহ পাগল সর্দারের আগমনে বাদল গাঙ্গুলি ঠাণ্ডা হল কিছুটা। ভাবল, এই করে আস্তে আস্তে সকলেই বশীভূত হবে। আসা মাত্র মোটা মজুরিতে বাহাল করে নিল সর্দারকে এবং তার অধীনে আর সকলকে।

কিন্তু সেদিন লোকটাকে দেখেনি বাদল গাঙ্গুলি, তার আসাটাই বড় করে দেখেছে। দু'দিন না যেতে লোকটাকেও দেখল ভালো করে।

দিন দুপুর।

পাহাড়ের গায়ে গায়ে কাজ করছে মাত্র শ'দেড়েক লোক। প্রথম বারের পাহাড়-টলানো পাথরগুলো নীচে গড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। কর্মকর্তারাও আছেন। তদবীর-তদারক করছেন, মাপজোখ করছেন। ওই পাহাড়ের মাথায় সারি সারি কোয়ার্টার হবে বাবুদের, রাস্তা তৈরি হবে—তার পর আসল কাজ।

দূরে 'দূরে ঝাঁক বেধে এসে দাঁড়াল প্রায় তিন চারশ' গ্রাম্য-লোক। চিৎকার চেঁচামেচি হট্টগোল শুরু করে দিল তারা দূর থেকেই। কাছে আসতে ভরসা পাচ্ছে না খুব। কি অস্ত্র আছে এদের কাছে জানে না বলেই বোধ হয়। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এ দিকের সকলে।

ওদের বিক্ষোভটুকু উপলব্ধি করছে বাদল গাঙ্গুলি, কিন্তু চিৎকার করে কি যে ওরা শাসাচ্ছে কিছুই বুঝছে না! ওদের নিজস্ব ভাষা আলাদা। কেবল পাগল সর্দারের নামটাই কানে আসতে লাগল বার বার। বায়নাকুলারে চোখ লাগালো বাদল গাঙ্গুলি। না, অস্ত্র নেই কারো সঙ্গে।

এক জন এসে জানালো, পাগল সর্দারকে পেলে ওরা ছিঁড়ে খাবে, সেই কথাই বলছে।

অদূরে যেখানটায় পাগল সর্দার কাজ করছে দলবল নিয়ে, বাদল গাঙ্গুলি পায়ে পায়ে সেখানে এসে দাঁড়াল। কোদাল-শাবল-গাঁইতি হাতে তারাও দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। দেখছে চেয়ে চেয়ে। শুনছে। ওদিকের চেঁচামেচি বাড়ছে।

হঠাৎ বাদল গাঙ্গুলি দেখল, এদেরই এক জন ঠক্ করে হাতের কোদাল ফেলে দিয়ে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলল বিক্ষোভকারীদের দিকে। অনেকটাই এগিয়ে গেল। তার পর বেশ উঁচু একটা পাথরের ওপর উঠে দাঁড়াল সে। বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল পাথরের মতই।

হোপুন—!

প্রতিপক্ষের চেঁচামেচিতে আস্তে আস্তে একটা ছেদ পড়ে গেল যেন। কিছু একটা বিস্ময়ের কারণ ঘটল যেন তাদের। ক্রমশঃ একেবারেই চুপ করে গেল তারা। শুধু দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ···। নিজেদের মধ্যে কিছু একটা বলাবলি করতে লাগল তারা। তার পর ফিরে চলল।

হোপুন আস্তে আস্তে দলে ফিরে এলো আবার। কোদাল তুলে নিল।

দলের এক জন বাদল গাঙ্গুলিকে বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। হোপুনকে এই দলের মধ্যে দেখে অবাক হয়েছে তারা। গাঁয়ের খোদ মাঁঝির ছেলে হোপুন। তাই ফিরে গেল। এবারে মুরুব্বিদের বৈঠক বসবে, পরামর্শ হবে, তার পর যা হয় ঠিক করা হবে।

বাদল গাঙ্গুলি নিরীক্ষণ করে দেখল মাঁঝির ছেলে হোপুনকে। পরে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, এখন তোমরা কি করবে?

হোপুন খানিক চেয়ে থেকে ক্ষুদ্র জবাব দিল, কামি—। অর্থাৎ, কাজ করবে।

—কিন্তু ওরা যে তোমাদের ভয় দেখিয়ে গেল?

আবার একটু চুপ করে থেকে হোপুন সাদাসিধে জবাব দিল, কুদালে কোরে উঁদের মাথা কুপায়ে দুব—।

দলের কমবয়সী জোয়ানেরা সব হেসে উঠল। বাদল গাঙ্গুলির চোখ পড়ল সর্দারের ওপর। সর্দার চেয়ে চেয়ে হোপুনকেই দেখছে। তার কালো চোখে স্নেহ ঝরছে। কিন্তু এ কথায় নিশ্চিন্ত হওয়া চলে না বাদল গাঙ্গুলির। এই লোকগুলো ফিরে গেলে কি হবে কে জানে? সর্দারের কাছে গিয়ে বলল, সর্দার কি করবে তোমরা?

পাগল সর্দার বাংলাটা আর একটু ভালো রপ্ত করেছে। হেসে পাল্টা প্রশ্ন করল, কেনে, তোর ডর লেগেছে?

এ-রকম বাক্যালাপে অভ্যস্ত নয় চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। কিন্তু এ তার কেতাদুরস্ত আপিসের পরিবেশ নয়। খারাপ লাগল না। বরং এ পরিবেশে এই যেন ভালো। বলল, তোমরা ফিরে গেলেই তো ওরা তোমাদের ধরবে আবার।

কিন্তু সে আর কোদাল দিয়ে ওদের মাথা কুপিয়ে দেবে বলল না। বলল, ধরে তো বুক চিতায়ে দুব।

বুক চিতিয়েই দিয়েছিল পাগল সর্দার।

ওই ঘটনার পরে এক মাস কেটে গেছে। এর মধ্যে প্রকাশ্য বিক্ষোভ আর কিছু দেখা যায়নি। বরং অনেকেই এসে যোগ দিয়েছে আরো। প্রতিদিনই নতুন লোক আসছে কিছু কিছু। মড়াই-সংলগ্ন জন-বসতিও একটু একটু করে হালকা হয়ে আসছে। ভদ্রলোক আধা-ভদ্রলোকেরা মুখে যে পরামর্শই দিক, মগজ তাদের পরিষ্কার। ক্ষতিপূরণ বুঝে নিয়ে তারাই সবার আগে সরে যাচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন গাঁয়ের মাঁঝিরা সব ভেবে সারা! আজীবন বাঁধাধরা শাস্ত্র আর সংস্কারগত পথ ধরে চলতে অভ্যস্ত তারা। কিন্তু এ সমস্যার সমাধানই বা কি, বিধানই বা কি? আর, তাদের বিধান মানবেই বা

বোঝাবে কি করে? বংশগত নিদারুণ দারিদ্র্যের মাঝে কি করে ঠেকাবে এই কাঁচা-টাকার আকর্ষণ? ওঁরা বিধান দিতে পারে, টাকা দিতে পারে না।

সে বরং পারে ওই পাগল সর্দার। কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই ব্যবস্থা করে দিতে পারে। দিচ্ছেও। একটা ঘর বসতি ছাড়ে তো পাঁচটা ঘর দুর্বল হয়ে পড়ে মনে মনে। ঘুরে-ফিরে আবার সকল রাগ গিয়ে পড়ে ওই পাগল সর্দারের ওপর। নিজে সাত তাড়াতাড়ি সর্দারী না করে গাঁয়ের মাঝি মোড়লদের সঙ্গে পরামর্শ করে যা হোক কিছু ঠিক করলেই তো হত!

কিন্তু পাগল সর্দারের নাগাল আর পাবে কেমন করে তারা? অনেক আগেই ঘর ছেড়ে মেয়ে নিয়ে নিরাপদ এলাকায় উঠে চলে গেছে সে। নতুন করে ঘর বেঁধেছে। সেই এলাকায় ওদের প্রতাপ খাটবে না। গাঁয়ের ঘর-বাড়ি ছেড়ে যারাই মড়াইয়ের কাজে গিয়ে লেগেছে, তারাই ও এলাকায় গিয়ে দল ভারী করেছে।

মনে মনে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিল বাদল গাঙ্গুলিও। পরিবর্তনের গতিটা ধীর বলে মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেও ধৈর্য হারায় নি। সেই দল-বেঁধে চড়াও করার ব্যাপারটাও ভুলেই গেছে। আর তেমন গোলযোগের আশঙ্কা আছে বলেও মনে হয় নি।

কিন্তু আবারও এক দিন থমকে যেতে হল তাকে। নিজে উপস্থিত ছিল না। লোকমুখে আদ্যোপান্ত শুনল।

পাঁচ-সাত জন মাত্র লোক নিয়ে কিছু দূরে একটা জায়গা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিল ড্রাফটস্‌ম্যান নরেন চৌধুরী। বলা বাহুল্য, পাগল সর্দারও সেই পাঁচ-সাত জনের এক জন। এখানকার সব মাটি, সব পাথর চেনে সে।

হঠাৎ এভাবে আক্রান্ত হতে পারে কেউ ভাবেনি। তীরধনু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রায় জন পঁচিশেক লোক অদূরে পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। কখন তাদের লক্ষ্য করেছে, কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ খেয়াল করে নি।

এদিকের সম্বল মাত্র গোটাকয়েক কোদাল, শাবল। নরেন চৌধুরীর গলায় একটা ক্যামেরা আর তার সহকারীর হাতে নোট বই, ফিতে, পেন্সিল।

ওই কালো মানুষদের অটুট সঙ্কল্প আর প্রতিহিংসার একটা হিম স্পর্শে সহসা যেন একেবারে স্থির হয়ে গেল সকলে। বোবা-মৃত্যুর ছায়া পড়ল একটা। তার পরেই সচেতন হয়ে পাগল সর্দারকে ঘিরে দাঁড়াল তার সেই পাঁচ-সাত জন সঙ্গী। নিজেদের ভাষায় চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, কি চায় ওরা?

দূর থেকে তারা জবাব দিলে, পাগল সর্দারকে চায়—তাকে ওদের হাতে ছেড়ে দিলে কাউকে কিছু বলবে না, বাকি সকলকে ফিরে যেতে দেবে। আর যদি বাধা দেয় তো তীর মেরে সকলেরই কলজে ফুঁড়ে দেবে।

কালঘাম ছুটছে নরেন চৌধুরীর আর তার সহকারীর। পালাবার পথ নেই। পরিত্রাণও বোধ হয় নেই আর। হঠাৎ দেখা গেল, ক্ষিপ্ত পাগল সর্দার সঙ্গীদের ঠেলে চিৎকার করে কি বলতে বলতে প্রায় বিশ-ত্রিশ পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল বুক টান্ করে। তার পর ওদের সেই প্রায় দুর্বোধ্য ভাষায় উন্মত্তের মত যা বলতে লাগল তার মর্মার্থ,—নে, কত তীর মারবি মার! আমার কলজে ফুটো করে সব রক্ত তোদের সকলের রক্ত খাবে—তোদের গ্রামশুদ্ধ সকলকে কেটে মড়াইকে রক্ত দেওয়া হবে—এত রক্ত খেয়ে মড়াইয়ের জল ভালো হবে খুব—কত তীর মারবি মার, কত কলজে ফুটো করবি কর।—

পাহাড়ে পাহাড়ে যেন গম-গম করতে লাগল তার কণ্ঠস্বর। কয়েক মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় হয়ে রইল কালান্তক যমের মত যারা দাঁড়িয়ে আছে তারাও। তার পরেই সচেতন হল। ধনুকে তীর লাগানোই আছে। একপা-দু'পা করে এগোতে লাগল তারা। চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ ভদ্রলোক দু'টির দিকে। অর্থাৎ, নরেন চৌধুরী আর তার সঙ্গীর দিকে। যাদের আক্রমণ করেছে তাদের নাড়ী-নক্ষত্র চেনে ওরা, বোঝে। কিন্তু এই এদেরই ঠিক চেনে না, ঠিক বোঝে না—তাই বিশ্বাসও নেই, কোন মুহূর্তে কি করে ফেলবে!

কথায় আছে, পরমায়ুর জোর থাকলে স্বয়ং ভগবান এসে বুদ্ধি যোগান। উত্তেজনার বশেই নরেন চৌধুরী দু'-চার পা দ্রুত এগিয়ে এসে গলায়-ঝোলানো ক্যামেরাটা তাড়াতাড়ি চোখে লাগালো। কেন লাগালো, কি হবে ছবি নিয়ে, সত্যি ছবি নেবে কি-না নিজেও জানে না।

অকস্মাৎ হকচকিয়ে গিয়ে লোকগুলো পিছু হটল খানিকটা। আর বিমূঢ় নেত্রে নরেনও ক্যামেরা নাবালো চোখ থেকে। মাত্র মুহূর্তের জন্য। তার পরেই বিদ্যুৎ-ঝলকের মত একটা চকিত উপলব্ধির বশে আবার ক্যামেরা তুলে নিল চোখে—এগিয়ে গেল আরো পাঁচ-সাত-দশ পা।

ছত্রভঙ্গ হয়ে দ্বিগুণ পিছনে সরে গেল ওরা। ভাবল, আওতার মধ্যে পেলেই বাক্স থেকে লোকটা ছুটন্ত আগুন ছাড়বে। গলায় ঝোলানো ওই কালো বাক্সটার ভয়েই এতক্ষণ তারা কাছে আসতে পারছিল না।

এদিকেও প্রাণের দায় বড় দায়। মুহূর্তে ওদের দুর্বলতার কারণটা বুঝে নিয়েছে সকলে। চিৎকার চেঁচামিচি তর্জন-গর্জন করে উঠল সবাই একসঙ্গে।—দে কর্তা দে, দে পিস্তলের আগুনে সব কটার মাথার খুলি উড়িয়ে!

নরেন চৌধুরী চোখে ক্যামেরা লাগিয়ে পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে এগিয়ে চলল, হাঁক-ডাক ছেড়ে অনুসরণ করল অনুচরেরা।

বেগতিক দেখে ছুটছাট সরে পড়ল সামনের ক্ষুদ্র বাহিনীটি।

ওরা বন্য, দুরন্ত।···কিন্তু তেমনি অজ্ঞ আর তেমনি সরলও।

এলাকায় ফেরামাত্র খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। যে যার কাজ ফেলে এসে জড় হতে লাগল। এ-রকম একটা ব্যাপারে জটলা হবে না তো কি!

শুনল বাদল গাঙ্গুলিও। তাড়াতাড়ি এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখে কলগুঞ্জন বন্ধ হল ওদের। কিন্তু যে দৃষ্টিতে সকলে তাকালো তার দিকে, তার অর্থ সুস্পষ্ট। আমাদের কি সত্যি আশ্রয় দিতে পেরেছ তুমি? সত্যি কি আমরা নিরাপদ?

আবার এ-রকম একটা বিঘ্নের সম্ভাবনা কল্পনাও করেনি বাদল গাঙ্গুলি। জটলার মধ্যে শুধু পাগল সর্দারই বিচলিত হয় নি মনে হল। আর চেনে গোপুনকে। মূর্তির মত এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেও।

বাদল গাঙ্গুলি তাদের কিছু বলা বা আশ্বাস দেবার আগেই আর একটি মূর্তির আবির্ভাব ঘটল সেখানে।

নারীমূর্তি। নিকষ কালো। স্বল্প আচ্ছাদন বিদীর্ণ করে সারা অঙ্গের উদ্ধত যৌবন উপচে পড়তে চাইছে।

পাগল সর্দারের মেয়ে চাঁদমণি।

নির্নিমেষ নেত্রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাপকে দেখে নিল আগে।

হোপুনের দিকে এক ঝলক তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভাঙা বাংলায় বাদল গাঙ্গুলিকে বলল,· হেই বাবু, উই উকে ধর, উর বাপ ডাকু পেঠাচ্ছে—'রনথ' করছে—উকে বল্ বাপের থানে যেয়ে নেবারণ করতে—ইখানে সঙটো হয়ে দেখতে লেগেছে কি—!

—চাঁদমণি! গরজে উঠল পাগল সর্দার।

হোপুনের মুখের ওপর আর এক পশলা আগুন ছড়িয়ে যেমন এসেছিল তেমনি দুমদাম পা ফেলে প্রস্থান করল চাঁদমণি।

নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল বিলেত-জার্মাণী ফেরত চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি।

ড্যামের কাজ এগোলেও তার মন্থর গতিই হয়ত পরোক্ষে একটু আশার কারণ হয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের। হয়ত বা শেষ পর্যন্ত সকলকেই যেতে হবে না, অনেকেই হয়ত বা থেকে যেতে পারবে। অন্তত কিছু দূরে বসতি যাদের আশা তাদেরই বেশি। কি এমন হবে যার জন্য এই এত দূর থেকেও সরতে হবে! ওই তো ফিতের মত পড়ে আছে শুকনো মড়াই, তাকে আর ক'হাজার-গুণ ফোলাবে বাপু যার জন্যে এত বাড়াবাড়ি তোমাদের? অতএব, অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গটুকু জিইয়ে রাখো আর শেষ পর্যন্ত দেখো কি হয়—ষোল আনা চাইছে, যে ক'আনা রাখা যায়। তাই একটা কিছু করো, একটা কিছু করে ড্যামওয়ালাদের বুঝিয়ে দাও তোমাদের ভিতরের জ্বালা।

কি করবে?

কেন পাগল সর্দারকে দেখছ না? তার বিশ্বাসঘাতকতা দেখছ না? জাতিদ্রোহিতা দেখছ না?

কিন্তু ফল বিপরীত দাঁড়াল। দ্বিতীয় বারের এই ঘটনার পর কর্তব্য স্থির করে ফেলল গাঙ্গুলি। দু'-চার মাস পরে যা করত, সব কাজ বাতিল করে সে-দিকেই আগে মন দিল।

ছোটখাট একটা হিল ব্লাষ্টিং দেখেছিল এখানকার লোক। ওটুকু ধ্বংসের রূপ দেখেই স্তব্ধ হয়েছিল। আর এক বার তাই দেখবে তারা। তার থেকে অনেক বেশি দেখবে।

দিন স্থির হল। সপ্তাহ চারেক পরের একটা দিন। শহর থেকে পুলিস এলো, মিলিটারী এলো, কর্মচারী এলো। সর্বত্র ঘোষণা করা হল, চারি দিকে রাষ্ট্র করা হল ওই দিনটির কথা। ঘোষণার আড়ম্বরে হকচকিয়ে গেল দূরের গ্রামবাসীরাও। বিস্তৃত একটা গণ্ডি ধরে বিপদের লাল নিশানা পড়ল সারি সারি।

সরে যেতে হবে। ওই দিনের আগে এই গণ্ডি থেকে সকলকে সরে যেতে হবে। নয়তো গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে যাবে সব, আর চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। হিল্ ব্লাষ্টিং হবে সে-দিন এক বার যা হয়ে গেছে তার দশ গুণ হবে। ওই দিনের আগে যে সরবে না সে মরবে। অবধারিত মৃত্যু।

একটা ত্রাস সঞ্চার করতে চেয়েছিল বাদল গাঙ্গুলি। তাই হল। ওই নির্দিষ্ট দিনটা যেন মগজে বসে গেল সকলের। সমারোহে ওই দিনের বিভীষিকা দিনে দিনে বাড়তে লাগল।

শিথিল হয়ে গেল মাটির বাঁধন। যারা সরতে চায়নি, নড়তে চায়নি, এবারে তারা সরতে লাগল, নড়তে লাগল। কি হবে··· কি না জানি হবে সেদিন! তুমি সরছ কেন, তুমি তো লাল গণ্ডির বাইরে! বাইরে হলেও কাছাকাছি তো বটে! বিপদ

তারপর সেই দিন···।

সমস্ত এলাকাটি পরিদর্শন করে দেখা গেল, জীবনের চিহ্ন দূরের কথা, যে পেরেছে ঘরের ইটমাটিও তুলে নিয়ে গেছে।

সকাল থেকেই নিঃশব্দ উত্তেজনা। একটা গুমোট স্তব্ধতা। সমাজ ছাড়া হয়ে যারা ড্যামের কাজে এসে লেগেছে তারাও থমকে গেছে যেন। নির্দেশ মত পাহাড়ে পাহাড়ে একের পর এক গর্ত করে চলেছে তারা। তার পর ওই সব গর্তের মধ্যে কি সব গুঁজে গুঁজে দেওয়া হচ্ছে। পুরু ফিতের মত কি দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটার সঙ্গে আর একটা। ফিতের আর এক মাথা এসে থেমেছে মড়াইয়ের ধার ধরে আধ মাইল দূরের একটা তাঁবুর মধ্যে। ওখান থেকেই যা কিছু করা হবে। ওখান থেকেই পালাবার জন্যে গাড়ি মজুত রেখেছে বাবুরা।

বিকেল হতেই ছুটি হয়ে গেল সকলের। সন্ধ্যা পেরুলো। রাত্রি হল।

আকাশ-বাতাসের সমস্ত স্তব্ধতা একটানা একটা যান্ত্রিক আর্তনাদে খান-খান হয়ে গেল যেন।

সাইরেণ বাজছে। অনভ্যস্ত কানে শব্দটা একেবারে হাড়ে গিয়ে লাগল।

একটানা দ্বিগুণ স্তব্ধতা তার পর। আধ ঘণ্টার ওপর কেটে গেল প্রায়। যেন আধ যুগ কেটে গেল।

তার পর বসুন্ধরা কেঁপে উঠল বুঝি!

ঘোষণার আড়ম্বরে অত্যুক্তি ছিল না খুব। ভোর না হতে দলে দলে লোক আসতে লাগল দেখতে। সেই বিরাট ধ্বংসের সামনে একেবারে বোবা হয়ে গেল সকলে। তাদের 'বোঙ্গা' অর্থাৎ, উপদেবতা পর্বতদেবই হল তাদের 'মারাং বুরু'। এই উপদেবতার উপাসনা করে আসছে আজন্ম কাল। পর্বতদেবের আসল নাম 'লিটা' অর্থাৎ শয়তান—যে তাদের আদি নারী-পুরুষ 'পিলচু বুড়ী' আর 'পিশচু হারাম'কে সর্বপ্রথম হাড়িয়া খাইয়ে তাদের মধ্যে পাপ ঢুকিয়েছিল, লজ্জা-ভয় ঢুকিয়েছিল। সেই লিটা যেন আজ নিজের দেহ থেকে সহস্র সহস্র অতিকায় পাথর খুলে খুলে পায়ের নীচের মড়াইকে মেরেছে ক্ষিপ্ত আক্রোশে। পাথরে পাথরে মড়াই ছেয়ে গেছে, ঢেকে গেছে।

যথার্থ অনুমান করেছিল চিফ ইঞ্জিনীয়ার বাদল গাঙ্গুলি।

ওদের বাস্ত আগলে থাকার আশা একেবারে নির্মূল হওয়ার পরে আস্তে আস্তে বিক্ষোভের স্ফুলিঙ্গও নিবেছে। এত বড় এক ভাঙনের পরেই যেন একটা গঠনের ছন্দ দেখা যেতে লাগল ধীরে ধীরে। বহু মজুর আসছে বাইরে থেকে। রোজই আসছে।

···এত সব হচ্ছে যখন, কিছু একটা হবেই বোধ হয়। ভিতরে বাইরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল যারা, মলিন মুখে তারাই এসে উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল। কর্মপ্রত্যাশী। একরোখা হলেও দারিদ্র্যের সীমা-পরিসীমা নেই মানুষগুলোর। রোখ গেছে, এখন দারিদ্র্যটাই বড়। মনে মনে হাসলেও পাগল সর্দার নিরাশ করল না কাউকে। সকলকেই দু'হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করে নিল। যে এলো তাকেই। সবই সহজ হয়ে গেল। মাঝি পারাণিকরা পর্যন্ত নতুন করে সেই
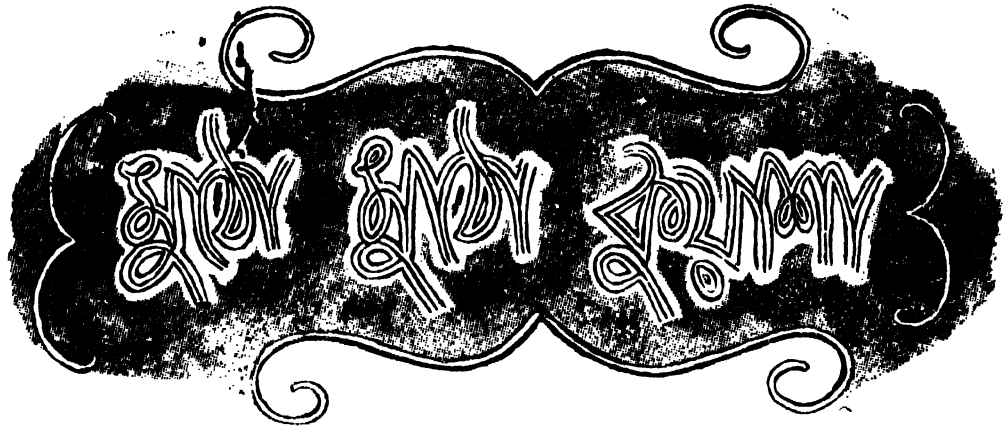
প্রাণতোষ ঘটক

সুবিনয় নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায়। অবাক হয়ে থাকে কত সময়ে। কিছুতেই যেন ভেবে পায় না, কোথা থেকে এসেছে তার এই ভাবপরিবর্তন। কেনই বা এসেছে এই অদ্ভুত অনুভূতি। নিজের কাছে নিজেকে মনে হয় এক বিস্ময়। ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়। কিছু যেন গোপনতা, কিছু লুকোচুরি, কিছুটা আত্মমগ্নতা। সুবিনয় কি যেন লুকিয়ে রাখে। গোপন করে, কারও কাছে প্রকাশ করে না। তার জামার এক পকেটে কি যেন সে লুকিয়ে রেখেছে। এক মহামূল্যের পুরাতত্ত্ব,—দুষ্প্রাপ্য একটি ডাকটিকিট,—লক্ষ্মণসেনের আমলের একটি দুর্লভ স্বর্ণমুদ্রা,—কয়লার স্তূপ থেকে পাওয়া যেন এক টুকরো হীরে। যাই হোক, সেই দুর্মূল্যকে সুবিনয় যেন পকেটে লুকিয়ে রেখে কেমন ভয়ে ভয়ে থাকে। পাছে হারিয়ে যায় অসাবধানে, সেই আশঙ্কায় থাকে। এই ভয় আর আশঙ্কায় সুবিনয় যেন সদাক্ষণ অন্যমনা। এমন কি তার বাবা আর মা—তাঁরাও লক্ষ্য করেছেন ছেলের এই অভূতপূর্ব পরিবর্তন। ছেলে যেন কত দূরে স'রে গেছে। ছেলের নাগাল পাওয়া যায় না। কত সময়ে বাবা আর মা বিরক্ত হন, বিব্রত বোধ করেন।

সুবিনয় যেখানেই থাকে, বাড়ীতে কিম্বা কলেজে, পার্কে, খেলার মাঠে, রাস্তায়—সব সময়েই যেন সে আনমনা। যা দেখছে, যা করছে, যা শুনছে—তাতে যেন তার মন নেই। মন প'ড়ে আছে অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে। চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলেও তার চোখে যেন সে দেখছে অন্য এক পৃথিবীকে। সুবিনয়ের কাছে যাঁরা থাকেন, তাঁরা বিব্রত হ'লেও, সুবিনয়ের কাছে তার নিজের এই গুপ্তবৃত্তি যেন কত সুখের, কত শান্তির, আর কত আনন্দের। তার উদাস মুখে কি এক মূল্যবান সম্পদ অধিকারের খুশী-খুশী হাসি। শুধু অধিকারের আনন্দ নয়, সেই মহামূল্যকে রক্ষা করার আত্মপ্রসাদ তার ভাবভঙ্গীতে। সত্যিই যেন এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর ঘেরা দুর্গের মধ্যে সে লুকিয়ে রেখেছে নিজের সত্তাকে।

কলেজের ক্লাশ-ঘরে সেই প্রথম যেন সুবিনয় বুঝতে পারলো যে সত্যিই যেন সে দিন দিন বড় বেশী আনমনা হয়ে পড়ছে। তার মন আর চোখের বল্‌গা আর যেন ধরে রাখতে পারছে না।

সেদিন ভূগোলের ক্লাশ চলেছে তখন। পার্ক স্ট্রীটের এক মিশনারী কলেজের একটি প্রশস্ত কক্ষ—সারি সারি বেঞ্চিতে ছেলেরা একাগ্র হয়ে শুনছে মিস ডরোথীর লেকচার। কলেজের শিক্ষক আর শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে কড়া প্রকৃতির মানুষ হিসাবে মিস ডরোথীর যথেষ্ট দুর্নাম ছিল। ক্লাশের মধ্যে গোলমাল, গল্প করা, কথা বলা—এ সব আদপেই পছন্দ করেন না। টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন মিস ডরোথী। টেবিলের 'পরে রয়েছে একটি গ্লোব। দুই পৃথিবীর মানচিত্র ছড়িয়ে আছে মানুষের তৈরী ঐ রঙীন পৃথিবীতে। গ্লোবটিকে এক আঙুলের সাহায্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাঠ দিচ্ছেন মিস ডরোথী। পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে আছে আজকের দুনিয়া—জল আর স্থল। জলের কোন রঙ নেই, নীল আকাশের ছায়া পড়েছে, তাই জলের রঙ নীল। স্থলভূমিতে কেবল রঙের বাহার। এক এক দেশ এক এক রঙের। কেউ সবুজ, কেউ হলুদ, কেউ ধূসর, কেউ লাল।

মিস ডরোথীর একটি আঙুলের সঙ্কেতে ধীরে ধীরে ঘুরে চলেছে মানুষের সৃষ্টি ঐ রঙীন পৃথিবী। ঘুরে চলেছে কত দেশ, কত মরুভূমি, পার্ব্বত্য অঞ্চল, নদী আর সমুদ্র। ঘুরে চলেছে ধীরে ধীরে; ঘুরতে ঘুরতে আবার ফিরে আসছে।

মোটা কাচের চশমা মিস ডরোথীর চোখে। চশমার কাচে দূরের আর কাছের দেখার পার্থক্যরেখা। মিস ডরোথীর মুখে কুঞ্চন ফুটে আছে। কপালে বয়স লেখা, বেশ কয়েকটি বলিরেখা ফুটে উঠেছে। কণ্ঠস্বর যেন তাঁর প্রকৃতির মতই অতি বেশী কর্কশ। মিস ডরোথী বললেন,—পৃথিবী যেন তার কোমরে বেল্ট জড়িয়েছে। এই বেল্টের কি নাম দেওয়া যেতে পারে? এমন একটা কিছু জিওগ্রাফিকাল নাম! সুবিনয় তুমিই এই নামকরণ কর'। জাষ্ট টেল্ এ নেম্।

ছাত্র সুবিনয় তখন ক্লাশ ঘরের জানালার বাইরে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে। আকাশ দেখছে না কলেজ প্রাঙ্গণের শিমুলগাছের ঘন লাল ফুল দেখছে কে জানে। মিস ডরোথীর প্রশ্ন যেন তার কানে যায় না। সে তখন দেখছে তো দেখছেই। হয়তো অঘ্রাণের কুয়াশা দেখছে। মুঠো মুঠো কুয়াশা। বরফ-ঠাণ্ডা, হিম-স্নিগ্ধ কুয়াশা। গভীর, গম্ভীর ঘন-কুয়াশা। আকাশ-ছোঁয়া গাছের চুড়োয় আর দূরের ঘরবাড়ীর শীর্ষে কুয়াশার পর্দা পড়েছে।

কুয়াশার স্তূপ। গাছের আর ম্যানশনের কানে কানে যেন ফিস-ফিসিয়ে কি কথা বলছে ঐ কুয়াশাকুণ্ডলী।

কর্কশকণ্ঠ একটু তুলে মিস ডরোথী আবার বললেন,—সুবিনয়, আকাশে পৃথিবী নেই। গ্লোবটা আমার সামনে রয়েছে, এই টেবিলের ওপর।

লজ্জা, অপরিসীম লজ্জা আর ভয়ে যেন ক্ষণেক অধীর হয়ে উঠলো সুবিনয়। জানালা থেকে চোখ ফিরিয়ে দেখলো মিস ডরোথীকে। তাঁর মোটা কাচের চশমায় চোখ রাখলো। লক্ষ্য ক'রলো, ডরোথীর আঙুল ছুঁয়ে আছে পৃথিবীর কোন্ ভাগে। জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকলেও, চোখের দৃষ্টি কোন এক অজানায় আবদ্ধ থাকলেও, সুবিনয় হয়তো মিস ডরোথীর প্রশ্ন কানে শুনেছে। সলজ্জায় সে উঠে দাঁড়ালো। বললে,—ইকোয়েটর, অক্ষরেখা!

—থ্যাঙ্ক ইউ। কর্কশ স্বরে বললেন মিস ডরোথী। সঠিক উত্তর শুনেও একটু প্রসন্ন হ'লেন না।

ব'সে পড়লো সুবিনয়। প্রশ্নের উত্তর যথাযথ দিয়েও অসম্ভব লজ্জা পেয়েছে সে। এখন যেন তার মুখে ভয় আর নেই, শুধু লজ্জা। অমনোযোগী হওয়ার লজ্জা।

আবার ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে পৃথিবী। মিস ডরোথী অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখিয়ে দেন আর বলেন,—কোথাও ধূ ধূ মরুভূমি, কোথাও শুধু জল আর জল। কোথাও দ্বীপপুঞ্জ, কোথাও তটরেখা, কোথাও হিমশৈল, কোথাও মাসের পর মাস শুধু মনসুন, কোথাও শৈলশিরা, সমুদ্র-সৈকত আর কোথাও আগ্নেয়গিরি।

চোখের আর মনের ওপর আধিপত্য চলে না। সুবিনয় আবার জানলার বাইরে চোখ ফেরায়,—তার অবাধ্য মন আবার যেন ছুটতে থাকে ঐ ভেসে-যাওয়া কুয়াশার সপ্তডিঙ্গার পিছনে। কোন্ অদৃশ্য লোক থেকে যেন ভেসে আসছে মুঠো মুঠো আর রাশি রাশি কুয়াশা—কার অকৃপণ দান কে জানে! সুবিনয় আবার চোখ ফিরিয়ে নেয়, আবার দেখতে থাকে। দেখতে থাকে, হিমঠাণ্ডা কুহেলিকা কত শান্ত, কত স্নিগ্ধ, কত নীরব। রাশি রাশি মুঠো মুঠো কুয়াশা—ওদের মধ্যে যেন এক অচ্ছেদ্য মৈত্রীবন্ধন। একে অন্যের বুকে জড়িয়ে পড়ছে ভাবের তুফানে। মনের কথা বলাবলি করছে কানে কানে। হাসছে স্নিগ্ধ আর নীরব হাসি। মুঠো মুঠো কুয়াশা যেন মুঠো মুঠো শান্তির শুভ্র প্রতীক।

পৃথিবীর দেশ-বিদেশের মানুষ 'শান্তি শান্তি' রবে তবে কেন এমন চেঁচামেচি করছে? কুয়াশা দেখতে দেখতে, আপন মনে, অল্প একটু হাসলো সুবিনয়। ব্যঙ্গের হাসি হাসলো যেন। মানুষ এমনই অন্ধ! এমন কোমল শীতল অফুরন্ত মধুর শান্তি থাকতে, মানুষ আবার চেঁচায় কেন শান্তির আহ্বানে! আবার একটু মুচকি হাসলো সুবিনয়। সেই ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের চাপা হাসি।

মিস ডরোথী হয়তো চশমার মধ্যে থেকে লক্ষ্য ক'রেছেন। কথা বললেন তিনি, কাচের কি এক বাসন ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়লো যেন। মিস ডরোথী বললেন,—সুবিনয়, হোয়াট মেকস্ ইউ লাফ? হাসছো কেন অকারণে?

—নাথিং।

উঠে দাঁড়িয়ে বললে সুবিনয়। সেই ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের হাসি চাপতে গিয়ে আরও একটু হেসে ফেললে। বললে,—নাথিং। হাসছি অকারণেই। কয়নাথিং!

—ডোণ্ট লাফ, হেসো না ডিয়ার। আমি যখন পড়া ব'লবো, অন্তত ততক্ষণ।

—অলরাইট। আমি চেষ্টা ক'রবো, যেন না হাসি। আই বেগ ইওর পার্ডন। আমাকে ক্ষমা করুন সিস্টার।

কথায় শেষে সুবিনয় ব'সে পড়লো। জানলার বাইরে চোখ ফেরাতেই একবার যেন চমকে উঠলো। পকেটে কি লুকিয়ে রেখেছে অনেক দামের, হঠাৎ আবার যেন মনে পড়লো। পাছে কেউ দেখতে পায়, কেউ জানতে পারে তার লুকানো মাণিক কেমন, সেই আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠলো। দুর্ভেদ্য প্রাচীরঘেরা দুর্গের তোরণদ্বার যেন কেউ উন্মুক্ত করতে না পারে। সুবিনয়কে যেন কেউ না জানতে পারে, তার লুকানো অস্ত্রটি কেউ যেন না দেখতে পায়।

জানলা থেকে চোখ ফিরিয়ে সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে একবার যেন সে তার বুক-পকেটে চোখ রাখলো। অত্যন্ত সন্তর্পণে দেখলো যেন, আছে না নেই। আছে না হারিয়ে গেছে তার ভোলামনের অসাবধানে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢং ঢং ঢং ঢং শব্দে কলেজের শেষ ঘণ্টা ধ্বনিত হয়ে উঠলো অনেক দূরে। ঘড়ির কাঁটার ইসারায় ঘণ্টা বাজে কলেজের। অঘ্রাণের শীতের দিনের বিরামবিহীন নীরবতায় হঠাৎ পূর্ণচ্ছেদ পড়লো। নিশ্চুপ কলেজ ছুটির আনন্দে কলগুঞ্জন তুললো। দিনশেষে বাসায় ফেরার কালে যেমন পাখীর কাকলী শোনা যায় গাছে গাছে, কলেজেও সেই কলকাকলী। কোন বাধা নেই আর, ঘণ্টা-প্রহরীর শাসন আর মানতে হবে না এমন কুয়াশার মিষ্টি দিনটিতে।

কলেজের বাইরে বেরিয়ে সুবিনয় স্বস্তির শ্বাস ফেললে যেন। চেনা-চেনা মুখের বন্ধুদের দল থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল সে। ক্লাশঘরের জনতা থেকে পার্ক স্ট্রীটের কলরোলে হারিয়ে গেল সুবিনয়। ফুট-পাথ ধ'রে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। হোটেল, পোষাকের দোকান, নীলাম-ঘর, আর মোটরের গ্যারেজ দেখতে দেখতে এগিয়ে চললো।

দিনের আলো পার্ক স্ট্রীটে। ম্লান আর ধূসর আলো। মুঠো মুঠো কুয়াশা যেন কোথায় লুকিয়ে ফেলেছে আকাশের সূর্যকে। কত কোমল আর কত স্নিগ্ধ; হিমের হাওয়া-ঝরানো ঐ মুঠো মুঠো কুয়াশা—আকাশ থেকে নেমেছে এই পৃথিবীতে! কুঁচবরণ কন্যার মেঘবরণ এলোচুলের মত ছড়িয়ে আছে। মৃদুমন্দ হাওয়ায় থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে কুয়াশা-কুন্তল।

ফুটপাথ ধ'রে চলতে চলতে পার্ক স্ট্রীটের কোলাহলকে উপেক্ষা করে পাশ ফিরে দাঁড়ালো সুবিনয়—একটা মোটর গ্যারেজের ঠিক সামনে। গ্যারেজের কাচঘরে উজ্জ্বল রঙের যেন এক প্রদর্শনী। উদাস চোখের শূন্য দৃষ্টিকেও আকর্ষণ করে। কত রঙবেরঙের মোটরগাড়ী কাচঘরে, এই মেঘলা-মলিন দিনেও উগ্র-পালিশে চিকচিক করছে। রঙীন গাড়ীগুলোকে দেখতে দেখতে মনে মনে হাসলো সুবিনয়। কঠোর-কঠিন বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পের মিলন—নিছক যন্ত্রকে রঙের বাহার-বিকাশে সুন্দর ক'রে তোলার কি ব্যর্থ চেষ্টা!

থাকে—উলস্লি,—কনসাল,—হাডসন্‌,—ভি, এইট ফোর্ড,—সিটরন।

হঠাৎ কানে কানে কে যেন কথা বললে। ফিস-ফিস কথায় যেন নম্রমিষ্টি সুর। কুয়াশার কাঁপা-কাঁপা ভয়ভীরু কথা। সুবিনয় আবার চলতে থাকে বাসার দিকে। আবার তু'চোখের বিস্তীর্ণ চাউনিতে ধরা পড়ে আকাশ থেকে নেমে আসা কুয়াশায় ঝর্ণা। রাশি রাশি কুয়াশা নামছে যেন নীরব চরণে।

বুক-পকেটে হাত ছোঁয়ায় সুবিনয়। হঠাৎ যেন মনে পড়েছে তার। হাতের পরশে দেখে নেয় একবার। সেই পরশপাথর আছে না নেই। কুয়াশা দেখার অসাবধানে সেই তুর্লভ মণিরত্ন আছে না হারিয়ে গেছে। স্বস্তির শ্বাস ফেললো সুবিনয়। পথ-চলা থামলো না আর। কুয়াশার পর্দা সরিয়ে সরিয়ে বাসার পথে এগিয়ে চললো! ঠাণ্ডা বাতাসে যেন শীত-শীত করছে অঘ্রাণের এই হিমার্ত বিকালে।

পার্ক ষ্ট্রীটের বুক থেকে ময়রা ষ্ট্রীট—এক নম্বর, তু' নম্বর তিন নম্বরের বাসা পেরিয়েই সুবিনয়দের ঘরবাড়ী। রাস্তা থেকে দেখতে পাওয়া যায়, তার স্নেহময়ী মা, দোতলার এক জানলায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছেন পথের দিকে। সুবিনয় রাস্তা থেকে দেখতে পায়, তার মা যেন কেমন বিমর্ষ বিষণ্ণ। চোখে যেন তাঁর আকুল প্রতীক্ষা।

মুক্ত আকাশের তলা থেকে, কুয়াশার হিমস্পর্শ থেকে, চার দেওয়ালের ঘরের মধ্যে যেতেই মা বললেন,—আজ তোমার জন্যে আমি নিজে হাতে পুডিং তৈরী ক'রেছি। পুডিং আর কড়াই-শুঁটির কচুরী।

কেমন যেন উল্লসিত হয়ে ওঠে সুবিনয়। হাতের বই-খাতা একটা সোফায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খাবারের টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। পুডিংএর রেকাবীটা তুলে নিতে যাবে, এমন সময়ে মা চেঁচিয়ে উঠলেন। বললেন,—তোমার সেই বদ-অভ্যাস! যাও মুখ-হাত ধুয়ে এসো, তারপর—

—ডাক পিওন আসেনি আজ? আমার কোন চিঠি?

কথা বলতে বলতে সুবিনয় বেসিনের দিকে এগোয়। কলের ছিপি ঘুরিয়ে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মুখ হাত ধুয়ে তোয়ালেয় হাত মুছতে মুছতে টেবিলের ধারে বসলো। গরম তুধের পেয়ালা টেবিলে বসিয়ে দিয়ে মা বললেন,—ডাক-বাক্সে চিঠি আছে কি না দেখে এসে না কেন?

—দেখে এসেছি। বাবার নামে তু'খানা চিঠি আছে। আমার চিঠি নেই!

কথা বলতে বলতে সুবিনয়ের মুখে যেন হতাশা ফুটলো। তোয়ালেয় ভিজে হাত মুছতে মুছতে খাবারের টেবিলে এসে ব'সলো।

খাবারের প্লেট টেবিলের পরে বসিয়ে দিতে দিতে মা বললেন,—কিছু ফেলবে না। সব খেয়ে ফেলতে হবে লক্ষ্মী ছেলের মত। আজ আবার উনি তোমার জন্তে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন বলেছেন। ডাঃ বোসকে আনবেন, কোর্ট থেকে ফেরার পথে।

—কেন?

একমুখ পুডিং, তবুও কথা বললে সুবিনয়।

মা কণ্ঠস্বরে তুঃখকরুণ সুর ফুটিয়ে বললেন,—কেন আবার! তোমার জন্তে। তুমি যে দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছো!

—কি আবার হয়ে গেলাম আমি?

সুবিনয় অবাক সুরে কথা বলে। হাতের চামচেটা রেকাবীতে রেখে দিয়ে বললে,—আমার কিছু হয় নি, আমি ঠিক আছি।

—শরীর তোমার ঠিক যাচ্ছে না সুবি, তা না হ'লে তোমার হঠাৎ এই মতিগতি কেন? আমি তো কিছুই ভেবে ঠাওরাতে পারছি না।

—ঠিক আছি আমি। বললে সুবিনয়। ড্রইং-রুমের খোলা জানলা থেকে আকাশে চোখ ফিরিয়ে বললে,—আমার শরীর ঠিক যাচ্ছে কি না আমি জানতে পারবো না, তোমরা জানতে পারবে?

নীল আকাশ নয়, কুয়াশা-ঢাকা শুভ্র আকাশ। রাজহাঁসের ডানার মত সাদা কুয়াশা। অকল্যাণ্ড স্কোয়ারের গাছে গাছে মুঠো মুঠো কুয়াশা। ড্রইং-রুমের জানলা থেকে দেখা যায় অকল্যাণ্ড স্কোয়ারে গাছের সারি, জল-পুকুরের তীরে তীরে দাঁড়িয়ে আছে অবিশ্রান্ত প্রহরীর মত। মাথায় কুয়াশার হেলমেট প'রেছে।

সুবিনয় দেখতে পায়, আকাশের কুয়াশার ঢেউ তাদের বাসা-বাড়ীর সামনের ঘাস-বিছানো লনে এসে মিশেছে। লাল আর হলুদ রঙের ডালিয়া ফুলের আশে-পাশে ছাই-রঙ কুয়াশা।

আবার কথা বললেন মা। স্তিমিত কণ্ঠে বললেন,—কি যে তোমার হয়েছে! ঐ যে বেসিনের কলটা খুলে রেখে এলে, আর বন্ধ করলে না—এত ভুল কেন তোমার? শরীর ঠিক থাকলে এমন মন হয় কারও?

হেসে ফেললো সুবিনয়। বললে,—ক্ষমা কর মা! সত্যিই আমি ভুলে গেছি।

—দেখা যাক ডাক্তার কি বলেন।

মা বললেন হতাশ সুরে। একটু থেমে আবার বললেন,—কচুরীগুলো যে জুড়িয়ে যাচ্ছে, খাবে না আকাশ দেখবে ব'সে ব'সে?

—আকাশ নয়, কুয়াশা দেখছি। তুমিও দেখো না। দেখো, ঐ আমাদের বাগানে চাঁপা গাছের চূড়ায় কেমন মেঘের মত একরাশ কুয়াশা।

—পুডিংে মাছি বসছে! কচুরী জুড়িয়ে যাচ্ছে! তুধ ঠাণ্ডা হয়ে গেল আর তুমি এখন চাঁপাগাছ দেখছো?

মা বললেন ঈষৎ রাগের সুরে। প্রতিবাদের ভঙ্গীতে। কিন্তু যাকে বলছেন তার কানে পৌঁছয় না কথা। সুবিনয় যেন শুনতেই পায় না।

কুয়াশা ঘন হয়ে উঠছে দেখতে দেখতে। মুঠো মুঠো কুয়াশা জমাট বাঁধছে। যা কিছু অসুন্দর, যত কিছু কুশ্রী, তাদের লুকিয়ে ফেলছে ঐ কুজ্ঝটিকা।

রাস্তায় মোটর গাড়ীর হর্ণ বাজলো হঠাৎ। চেনা-চেনা সুর যেন। ব্রেক্-কষার শব্দ এলো।

ঘরের খোলা-জানলার কাছে এগিয়ে গেলেন মা। খানিক চুপ-চাপ দেখতে দেখতে বললেন,—ঐ উনি ফিরেছেন। সঙ্গে ডাক্তারও এসেছেন দেখছি।

কে কার কথা শোনে। সুবিনয় তখনও কুয়াশার জাল দেখছে। অকল্যাণ্ড স্কোয়ারের গাছগুলি অক্লান্ত প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে।

ওদের মাথায় কুয়াশার হেলমেট। দিন-শেষে পাখীরা বাসায় ফিরছে ঝাঁকে ঝাঁকে। কোরাস গান ধ'রেছে যেন পাখীর দল! এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায় চাঁপাগাছের চূড়া কেঁপে উঠলো,—ঘরের জানলার পর্দা দুলে উঠলো। অগ্রাণের সন্ধ্যা, বাতাস-তরীতে ভাসতে ভাসতে আসে কোথা থেকে। ঘরের কোণে কোণে কালিমা ছড়ায়। টেবিল আর দেরাজের তলে তলে আঁধার ছড়ায়।

ডাক পড়লো সুবিনয়ের। বাবা কোর্ট থেকে ফিরেই ডাকলেন ছেলেকে। আদালতের একজন নামজাদা আইনজ্ঞ, যেমন কড়া প্রকৃতি, তেমনি বিচারের কাজে বিচক্ষণ। ব্যারিষ্টার-দের মধ্যে তাঁর নামডাক যথেষ্ট। ছেলের সুখ আর শান্তির জন্যে সব কিছু করতে তিনি প্রস্তুত।

সুবিনয় বাবার ঘরে গিয়ে দেখলো, ডাক্তার এসেছেন। ব'সে আছেন একটি সোফায়। বাবা মুখে চিন্তা ফুটিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছেন। মা কখন এসে একটি সোফা অধিকার করেছেন। মা'ও যেন দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে প'ড়েছেন। গালে হাত দিয়ে তিনি ব'সে আছেন।

ছেলেকে সামনে দেখে বাবা বললেন,—ডাক্তার, এই আমার ছেলে। নাম সুবিনয়। সেন্ট জেভিয়ার্সে'র ছাত্র।

ডাক্তারের চোখে-মুখে যেন বিজ্ঞতা। পৃথিবীর সকল রকম অসুস্থতার প্রতিকার যেন তাঁর নখদর্পণে। মানবদেহের সকল তত্ত্ব আর তথ্য তিনি যেন জেনে ফেলেছেন। সুবিনয়ের হাত ধ'রে বিজ্ঞহাসি হেসে বললেন,—কি হয়েছে তোমার?

—কিছুই নয়। সুবিনয় সামান্য বিরক্তির সুরে কথা বললে। বললে,—কি আর হবে?

—ক্ষিধা হয় না ভাল?

—না না, কে বললে আপনাকে? খুব ক্ষুধা হয়। যাহা পাই তাহাই খাই।

—বুকে কোন' বেদনা? ডাক্তার রোগীর হাত ধ'রে কথা বলেন। হৃদয়ের স্পন্দনগতি পরীক্ষা করেন।

—নাঃ, কোন' বেদনা নেই বুকে।

সুবিনয় কথা বলে, কিন্তু কথায় যেন তার মন নেই। সে একবার ডাক্তারের চোখের অচঞ্চল তারা দু'টো লক্ষ্য করে। একবার বাবার আদালতের কালো পোষাক লক্ষ্য করে। একবার মাকে লক্ষ্য করে। মা গালে হাত দিয়ে আছেন এখনও। তারপর লক্ষ্য করে ঘরের আসবাবের তলায় তলায় আঁধারের জড়তা।

ষ্টেথিসকোপ কানে ঠেকালেন ডাক্তার। বললেন,—দেখি জামাটা তোল' একবার। বুকটা পরীক্ষা ক'রবো।

জামা তুললো সুবিনয়। ডাক্তার রোগীর বুকে-পিঠে যন্ত্র রেখে রেখে বেশ কিছুক্ষণ পরীক্ষা চালিয়ে কেমন এক অস্বস্তির শ্বাস ফেললেন। রোগীর বুকে যেন ডিক্টাফোন কথা বলছে! হৃদয়ের স্পন্দন সহজ স্বাভাবিক।

উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার। পকেট থেকে ফাউন্টেন পেনের মত টর্চ্চ বের ক'রে জ্বালিয়ে ধরলেন, রোগীর ঠিক মুখের কাছে। বললেন,—হাঁ কর।

সুবিনয় হাঁ করলো। ডাক্তার বললেন,—আ কর'।

রোগী যেন ইচ্ছা ক'রেই ভেংচি কাটলো ডাক্তারকে। ডাক্তার ভ্রূ কুঁচকে আবার বললেন,—উঁহু, হ'ল না। আমি যেমন করছি ঠিক এই ভাবে—আ-আ-আ-আ-আ—

আবার ভেংচি কাটলো সুবিনয়। ডাক্তারের কণ্ঠস্বর নকল করলো যেন। কিন্তু ডাক্তার তার মুখে কোন' রোগের সন্ধান পেলেন না! না পেয়ে যেন হতাশ হয়ে পড়লেন।

সুবিনয় একবার জানালার বাইরে তাকায়। সাঁঝের আঁধার, মুঠো মুঠো কুয়াশা কোথায় গেল! ইচ্ছা হয় জানলার কাছে ছুটে যায়! দেখে আসে অকল্যাণ্ড স্কোয়ারের মাথা-উঁচু গাছের সারি। কুয়াশার হেলমেট, আর বোধ হয় দেখা যাবে না অন্ধকারে।

ডাক্তার ভেবে ভেবে বললেন,—চোখের দোষ নয়তো? চোখে ঝাপসা দেখো কখনও কখনও? মাথা ধরে?

হেসে ফেললো সুবিনয়। হাসি চেপে বললে,—কখনও ধরেনি, এখন ধ'রছে মাথা। আপনার কথা শুনে শুনে।

টেবিলের 'পরে ছিল কি একখানি বই। সুবিনয়েরই পাঠ্যপুস্তক হয়তো। ডাক্তার বইখানি চোখের কাছে তুলে ধ'রলেন। বললেন,—আচ্ছা এই পাতার এই প্যারাটা পড়'তো।

সুবিনয় বই টেনে নিয়ে পড়তে থাকলো,—

"অথচ আশ্চর্য্য এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙালী ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। তিনি যে স্থানে যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন সে স্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব তখনও পর্যাপ্ত প্রবেশ লাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা অনেকটা—

ডাক্তার চিন্তিত হয়ে বললেন,—থাক, আর প'ড়তে হবে না।

সুবিনয় বললে,—আমি যাচ্ছি মা! আমার ঘরে যাচ্ছি!

ডাক্তার বললেন,—হ্যাঁ, তুমি যাও। তুমি যেতে পারো।

বাবার আদালতের কালো পোষাকের দিকে একবার লক্ষ্য করলো সুবিনয়। মায়ের বিস্ফারিত চোখের দিকে একবার। আর একবার ডাক্তারকে দেখলো! তাঁর চোখের অচঞ্চল তারা দেখলো।

—কি বুঝলেন ডাক্তার?

বাবা কথা বললেন ক্লান্ত কণ্ঠে। আদালতে সারা দিন কথা ব'লে ব'লে কথার সুর যেন কেমন ঝিমানো!

মা বললেন,—আপনার রোগী যখন ঘরে আর নেই, তখন আর খোলাখুলি বলতে দোষ কি? কি অসুখ বলুন তো?

ডাক্তার চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন। কিশোর এক রোগীকে দেখতে দেখতে এই শীতের দিনেও তাঁর কপালে ঘাম ফুটেছে। কপালে কয়েকটা রেখা ফুটেছে। ডাক্তার কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। যদি ভুল বলা হয়!

বাবা বললেন,—ডাক্তার, আমি আমার ছেলের জন্যে সব করতে পারি। যা বলবেন আপনি। এনি থিং ইউ সাজেষ্ট। চেন্‌জে পাঠাবো কোথাও? কিছুদিন হাওয়া-বদলের পর যদি শরীরটা—

রোগ তো কিছুই দেখতে পেলাম না। চোখে উদাস চাউনি দেখে ভেবেছিলাম, আই ডিফেকটিভ, তা-ও নয়।

মা বললেন,—একটা কিছু টনিক খেতে দেওয়া যায় না সুবিকে ?

ডাক্তার বললেন,—তা ইচ্ছা করলে দিতে পারেন। কডলিভার অয়েল দিতে পারেন। খুব ভাল দেশী শার্কের লিভার অয়েলও দিতে পারেন।

মা মুখ বিকৃত করলেন। বললেন,—না না, সুবি আমার এমনিই থাক। কডলিভার খেতে পারবে না ও।

সুবিনয় ঘরে গিয়ে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দেয়। এক পাশে পড়ার টেবিল, আর এক পাশে খাট-বিছানা। চেয়ারের ওপর সকালের কাগজখানা চোখে পড়লো। কাগজের প্রথম পাতার মাথায় লেখা 'সুয়েজ ক্যানেল উইল বি ন্যাশনালাইজড', কর্নেল নাসের উক্তি ক'রেছেন সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের কাছে।

ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে, পকেট থেকে কি যেন বের ক'রলো সুবিনয়। এক টুকরো কাগজ, একখানি চিরকুট, একটি চিঠি। সুবিনয় রুদ্ধশ্বাসে আর একবার পড়লো সেই চিঠি! সেই চিঠিতে লেখা—

সু,

আশা করি আমার এই চিঠিটা পেয়েও তুমি খুব খুশী হবে। তোমার জন্তে একখানা রুমালে আমি নক্সা তুলছি। ফুল আর প্রজাপতি। ক'দিন ধ'রে কি ভীষণ কুয়াশা জমছে, দেখতে পেয়েছো? তুমি যেন কোন' দিন আমাকে চিঠি দিও না। আমাদের বাসায় 'প্রেম' কথাটি একেবারে বে-আইনী। চিঠি যদি কারও হাতে পড়ে আমাকে আর বাঁচতে হবে না। আজ এই পর্য্যন্ত, পরে আবার তোমাকে চিঠি দেবো। কিন্তু দোহাই, তুমি যেন কোন দিন দিও না, আবার বলছি।

ইতি—কে বল'তো ?

চিঠি আবার রেখে দেয় সুবিনয়। যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দেয়। তারপর ঘরের বিজলী-আলোটা নিবিয়ে দিয়ে জানলার কাছে এগিয়ে গেল। জানলা খুলে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। খোলা জানলার বাইরে দেখলো কুয়াশা, রাস্তার আলোর চতুর্দ্দিকে কুয়াশা। ঘরের জানলার বাধা ভেদ ক'রে হিমার্ত্ত কুয়াশা আসছে, আকাশের মেঘের মত। সুবিনয়ের মুখে-চোখে কুয়াশার ঠাণ্ডা স্পর্শ লাগছে। কুয়াশা যেন তার কানে কানে কথা বলছে। মুঠো মুঠো কুয়াশা, বলছে, —এসো আমরা তোমাকে গল্প শোনাবো। খুব মিষ্টি এক গল্প। খুব মিষ্টি আর খুব মজার এক গল্প। সুন্দর একটি ফুলের গল্প। ফুলফোটার গল্প নয়, একটি কুঁড়ি থেকে একটি ফুলের জন্মকথা নয়, একটি ফোটাফুলের পাপড়ি বন্ধ হওয়ার গল্প। কুঁড়ি থেকে ফুলের গল্প নয়, ফুল থেকে একটি বীজ হওয়ার গল্প। কল্প কথা নয়, আত্ম-সমাধির গল্পকথা।*

[* আকাশবাণী, কলকাতা, সাহিত্যবাসরে পঠিত।]

"তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে।"

শ্রীঅনন্তকুমার দাশগুপ্ত

নরেন্দ্র—দেব! চাই সমাধি নির্বিকল্প।

শ্রীরামকৃষ্ণ— ছিঃ নরেন,—এত হীনবুদ্ধি তুই!
সমাধি নির্বিকল্প নহে তোর তরে।
তুই হবি কর্মযোগী মহাবীর।
মগ্ন হ'বে সমাধিতে পড়ে থাকা
জড়বৎ অকর্মণ্য হয়ে, নাহি সাজে তোরে।
তুই হবি মহা মহীরুহ—বোধিদ্রুম,
লক্ষ লক্ষ জন লভিবে পরম শান্তি তব ছায়ে।
তুই হবি বারিধারা তৃষিতের হৃদয় তুষিতে;
ধর্মতৃষাতুর লভিবে অনন্ত তৃপ্তি
তব ধর্মাদেশে। প্রচারিবি তুই
ধর্মের অমোঘ বাণী দেশ-দেশান্তরে।
ধর্মের যথার্থ তত্ত্ব "যত মত তত পথ"
প্রচারিবি তুই আমার ইচ্ছাতে।
অখণ্ডের ধাম হ'তে আসিনু যখন
ইঙ্গিত করিনু তোরে চলিতে আমার সাথে
মর্ত্যধামে। ভুলে গেলি তুই সেই কথা ?
যুগে যুগে অবতীর্ণ মুই আর তুই।
আমি রে শ্রীরামচন্দ্র, তুই হনুমান্,
আমি রে শ্রীকৃষ্ণ আর তুই রে অর্জুন।
করিতে হইবে তোকে অসাধ্য-সাধন,
ত্যজ বৃথা আশা সমাধির।

নরেন্দ্র— কিন্তু, কিন্তু দেব! মানে না আমার মন।
"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি" আমি চাই
ভূমানন্দ ব্রহ্মজ্ঞান লভি, মগ্ন হ'য়ে সমাধিতে

শ্রীরামকৃষ্ণ— (বিরক্ত ভাবে) পুনঃ পুনঃ সেই কথা ?
আচ্ছা। পূরিবে বাসনা তোর;
দিনেকের তরে লভিবি সমাধি নির্বিকল্প।

তারপর চাবিকাঠি রহিবে আমার
সাথে। যাবি কোথা ?

আশ্বিন-ঝড়

(শেলির 'Ode to the West Wind' কবিতার অনুবাদ)

হে ভয়াল প্রভঞ্জন, আশ্বিনের অশান্ত নিশ্বাস,
যে অদৃশ্য সংগ হ'তে বিশীর্ণ পত্ররা আসে উড়ে,
পলাতক প্রেত সম এড়াইয়া ওঝার-সকাশ,

পীত, কৃষ্ণ, বিবর্ণ, রক্তাভ ক্ষয়-জ্বরে
মহামারী-বিধ্বস্ত জনতা : জানি আজি ঝড়,
প্রেরণ করিছ তুমি আঁধার তুহিনশয্যা 'পরে

বীজের বলাকা, যেথা তারা রবে শীতভর
কবরে শবের মতো স্পন্দহীন—সহোদরা তব
নীলাক্ষি বাসন্তী নহে যত দিন সেথা অগ্রসর

বাজাইয়া জয়-ভেরী, বর্ণে-গন্ধে ভরাব উৎসব
(বিস্তারি মুকুল যেন লক্ষ পাখি আকাশে ওড়ানো)
যাবৎ না সুরু হয়, গিরি-বন জাগে অভিনব :

সর্বত্র গমন তব হে দুর্দম, শঙ্কা নাহি কোনো,
হে স্রষ্টা, হে বিনাশক, শোনো, ওরে, শোনো !

তুঙ্গ নভ আন্দোলনে, হে তুমি যে তটিনী-বক্ষেতে
খণ্ড খণ্ড মেঘ ঝরে, যেন জীর্ণ পত্র পৃথিবীর,
স্বর্গ আর সমুদ্রের কম্পিত গ্রন্থিল শাখা হ'তে—

বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ দূত ধেয়ে চলে : তব বায়ুনীড়
নীল সমতল তার ভরি রাখে মেঘ পত্র দল,
মনে হয়, ওরা যেন দীপ্তকেশ রুদ্র বিধাতৃর !

অই দূরে দিগ্বলয় অতিক্ষীণ আলোক সম্বল
সেথা হ'তে সুরু হয়ে যে মধ্য রেখাটি বিস্তারিয়া
আসন্ন ঝড়ের জটা ওড়ে। তুমি এক শোকোচ্ছল

মহাগীত ওগো বান্ধবী, সমগ্র বাষ্পীয় শক্তি দিয়া
মৃত-বৎসরের লাগি সমাধি করিলে বিরচন
সমাপ্তির রাত্রে এই, মুহূর্তেই পড়িবে ঝরিয়া

দীর্ণ করি এবে তার কঠিনায়িত যে আবরণ
কালান্তক বৃষ্টি, অগ্নি এবং তুষার : ওগো প্রভঞ্জন !

হে তুমি যে জাগায়েছ ভাঙ্গি দিয়া নিদাঘ-স্বপনে
ভূমধ্যসাগরটিতে এত দিন ছিল যে শায়িত,
অতি শান্ত স্বচ্ছতোয়া তটিনীকূলের কলস্বনে

লাভাদ্বীপটির পাশে—আবর্ত যেথায় সমাহিত,
হেরিয়া অতীত স্বপ্ন—মিনারেরা নভ স্পর্শি রয়
কত বার আপনাতে আপনি সে হয়েছে স্পন্দিত।

বক্ষে নীল শৈবালের, কুসুমের সুরভি-সঞ্চয়
ইন্দ্রিয়ের বিবশতা অমিত সে মাধুর্য পরশে।

তাহারও শাসক তুমি। শুনেছি সে সিন্ধুতল দেশে
সমুদ্র-উদ্ভিদে আর ক্লেদাক্ত বনেতে অতীব বিস্মিত
পল্লব সঞ্চার হয়—যাও সেথা ভৈরব হরষে,

গভীর আহ্বানে তব সিন্ধুতল ভয়-সচকিত
টুটে যায় অকস্মাৎ তন্দ্রা তার বহু আয়াসিত।

নহি আমি শুষ্কপত্র কেমনে বহিবে প্রভঞ্জন ;
নহি লঘু বারিবাহ উড়াবে কেমনে সাথে সাথে ;
ঊর্মি নহি, রুদ্ধশ্বাস করিতে করিতে সন্তরণ

ব্যর্থ যে তবুও ধন্য তোমার প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে
'ঝড়-কল্প' এই আখ্যা হে দুর্দম, তবু যেবা পায় !
এবে কৈশোরও নয়—কোথা লঘু-চাঞ্চল্য আমাতে,

সহচর হ'তে নারি ঝড় তব আকাশ-যাত্রায়,
তোমার পবন-গতি জিনিব যা অবহেলা ভরে
সে আজ কল্পনা-বস্তু। নহিলে কি করিতাম হায়,

সকরুণ আর্তি এই জীবনের চরম প্রহরে ?
জাগাও জাগাও ঝড়, মেঘ, পত্র, তরঙ্গের সম
জীবন-কণ্টকে মোর রক্ত স্নান ! বাঁচাও আমারে !

দুর্দিন শৃঙ্খল লয়ে চাহিছে বন্দীর নতি মম,
আমি না ঝড়ের মতো গর্বদীপ্ত, নির্বিশঙ্ক ও অশান্ততম ?

অরণ্যানী বীণা সম বীণা তুমি করহ আমারে :
কোন ক্ষতি মানিব না সব মোর যায় ঝরে যাক !
জাগুক হৃদয়ে আজি কলরোল দীপক-ঝংকারে

একটি শারদতান দোঁহার অন্তর জুড়ে যাক
মধুর গম্ভীর। হে ত্রাস-সঞ্চারি মহাবল,
মোর মাঝে শক্তি ধরো, আমাতে শান্ততা লোপ পাক !

দিগবিদিকে বিস্তারিয়ো মোর পঙ্গু ভাবনার দল
বিবর্ণপত্রের মতো, অচিরাৎ নব জন্ম আশে !
আর এই কবিতার মন্ত্র নিয়ে হে তুমি প্রবল,

ছড়াও আমার বাণী আজি সর্ব নরের নিবাসে
অনির্বাণ কুণ্ড হ'তে যেন ভস্ম, আগ্নেয়-কণিকা
অনাগত ধরণীর হও তুমি মোর কাব্যোল্লাসে

ভবিষ্যের জয়নাদ ! এই শীত জানি গো ঝটিকা,
আসিয়াছে রচিতেই বসন্তের আগমনী-লিখা।

চিত্রলেখা

[উপন্যাস]

শ্রীভগবতীচরণ বর্মা

বিংশ পরিচ্ছেদ

চিত্রলেখার ব্যবহারে কুমারগিরি আশ্চর্য্য হয়ে যায়। তার কাছে আসবার জন্য নর্ত্তকীর যখন আগ্রহ ছিল, সে সময় নর্ত্তকীর প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না, বরং নর্ত্তকীই তার প্রতি আকৃষ্টা হয়েছিল। তাহলে এখন নর্ত্তকীর ভেতর এ পরিবর্ত্তন কেন?

নর্ত্তকীর ব্যবহারের চাইতে তার নিজের ব্যবহার যোগীর বেশী আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছিল। নটীর কাছ থেকে দূরে থাকবার জন্য এক দিন সে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। তবে এখন সে তাকে গ্রহণ করল কেন? এ কি তার নিজের ওপর অবিশ্বাস দূর করবার প্রচেষ্টা? তার জীবনের ক্ষেত্র তো শুধু জয়লাভের জন্য, পরাজয়ের প্লাবন তাকে মলিন করতে পারে না। হয়ত যোগী তার নিজের দুর্ব্বলতা জানতে পেরেছিলেন আর সেই দুর্ব্বলতাকে দূর করবার জন্যই সে নর্ত্তকীকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফলতা লাভ করতে পারে নি। এই অসাফল্যের রূপও বড় অদ্ভুত! নিজের কাছে তো তার পরাজয় হয়-ই, তা ছাড়া এক জন নটীর কাছে তাকে হার মানতে হয়—নিজের কাছে পরাজয়ে সে দুঃখ পায়, কিন্তু নটীর কাছে পরাজয়ে দুঃখের স্থানে তার ক্রোধ হয়। যোগী বলে ওঠে, "না, নর্ত্তকী চিত্রলেখাকে বশে আনতেই হবে! কিন্তু কি উপায়?"···"আচ্ছা, সে আমাকে কেন ভালবাসতে পারে না? হয়ত সে আর এক জনকে ভালবাসে সম্ভব হলেও হতে পারে···না, তখন সে নিশ্চয়ই আমায় কাছে আত্মসমর্পণ করবে। অতএব, সেনাপতিকে নর্ত্তকীর জীবন থেকে সরাতে হবে।"

প্রায় দু'মাস হ'ল যোগীর আশ্রমে চিত্রলেখা এসেছে। যোগীর সংগে যে ঘটনা ঘটেছে তারও প্রায় এক মাস হ'ল। এর ভেতর সে নিজেকে সংযত রেখেছে-একটুও দুর্ব্বলতা সে প্রকাশ করে নি। সে মনে করেছিল যে, নর্ত্তকীকে কাছে রেখে সে ভোগ-বাসনাকে জয় করবে কিন্তু বেশী দিন সে ঠিক থাকতে পারলে না। এক বার যে আগুন জ্বলে উঠেছে সে তো আহুতি চাইবে-ই! সে আপন সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারলে না।

সে দিন রাতে চিত্রলেখাকে কাছে ডেকে বলে, "নর্ত্তকী! এক মাস হয়ে গেছে। নিজেকে উপরে উঠাবার চেষ্টা করেছে। এখন আমার মনে হয় যে আমি দুর্ব্বলতাকে জয় করেছি!"

নর্ত্তকী শুধু হাসে, "বোধ হয়!"

যোগী ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বলে, "শুনলাম যে আর্য্য বীজগুপ্ত কাশী গেছেন। তাঁর সংগে আর্য্য মৃত্যুঞ্জয় ও তাঁর কন্যা যশোধরাও গেছেন।"

নর্ত্তকী চমকিয়ে উঠে বলে, "কি বললেন, যশোধরাও বীজগুপ্তের সংগে গিয়েছে?"

"এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে! তুমি তো বীজগুপ্তকে বলেই দিয়েছ যে সে যেন যশোধরাকে বিবাহ করে ও গার্হস্থ্য-ধর্ম পালন করে—হ্যাঁ, এ তুমি ঠিকই করেছ। তুমিই বল যে যশোধরাকে বিবাহ করা কি বীজগুপ্তের উচিত নয়?"

"আমি জানি না। আর দয়া করে বীজগুপ্ত সম্বন্ধে কোন কথা আমাকে বলবেন না!"

"কেন বলব না! তুমি তাকে ভালবাস বলে! বীজগুপ্ত অন্য এক জন নারীকে ভালবাসে এ তুমি সহ্য করতে পারছ না, তাই না? তবে তাকে ত্যাগই বা করলে কেন? তুমি কি মনে কর যে স্ত্রীলোকেরাই সব কিছু করতে পারে, পুরুষের কিছু করবার কোন অধিকার নেই, তুমি কি চাও যে সে তোমার দাস হয়ে থাকুক—কিন্তু তা কখনও সম্ভব নয়!"

যোগীর স্বরে প্রতিহিংসার এক তীব্র ব্যংগ। যে নারীর কাছে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন তাকে পরাজিত করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

আবেগে কাঁপতে কাঁপতে চিত্রলেখা বলে, "আমি যা কিছু করেছি সবই বীজগুপ্তের মংগলের জন্য। সমাজের দৃষ্টিতে আমি তাকে নীচে নামিয়ে আনছিলাম, তাকে পরিত্যাগ করে আমি তাকে ওপরে উঠাবার চেষ্টামাত্র করেছি।"

"তা কি করে মেনে নি বল? এতে তুমি নিজেকে প্রবঞ্চনা করছ। যে সময় তুমি বীজগুপ্তকে পরিত্যাগ করেছিলে তখন আমার সংগে প্রেম করাই ছিল তোমার লক্ষ্য!" নর্ত্তকী আসবার পর নিজের গুরুত্ব পুরাতন তেজ ও স্ফূর্ত্তি যোগী হারিয়ে ফেলেছিল সে সব শক্তি যেন সে আবার ফিরে পেল। তুমি বীজগুপ্তকে প্রবঞ্চনা করতে পার, কিন্তু আমাকে পার না। বাসনার উন্মত্ততায় তুমি পবিত্র প্রেমকে অস্বীকার করেছ, মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিয়েছ। বীজগুপ্তের জীবন নষ্ট করে দিয়ে তুমি আমার কাছে চলে এলে! ওদিকে বীজগুপ্ত এক সাধারণ নটীর জন্য তার গার্হস্থ্য জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিলে। কিন্তু কেন—শুধু সে তোমাকে ভালবাসত

নর্তকী চিৎকার করে ওঠে, "চুপ কর! আর শুনতে চাই না।"

যোগী নর্তকীর দিকে তাকিয়ে হাসে "চুপ করব, এতেই এত চঞ্চল হয়ে উঠলে, এখনও তো সব বলি নি। আমি সব বলব এবং তোমাকে সব শুনতে হবে। তুমি যা কিছু করেছ তার প্রতিদানও পেয়েছ। তুমি ভাবছ যে বীজগুপ্ত এখনও তোমাকে ভালবাসে, হয়ত এ-ও ভাবছ যে সে এখানে যখন ফিরে আসবে তখন তার কাছে গেলে সে তোমাকে গ্রহণ করবে। যদি তাই মনে কর তাহলে তুমি ভুল করছ। তোমার বিষের প্রভাব দূর করবার অমৃত সে পেয়ে গেছে। তুমি তাকে নিঃশেষ করবার কোন চেষ্টারই ত্রুটি কর নি, কিন্তু যশোধরা তাকে বাঁচিয়েছে। এখন যে সে যশোধরাকে নিয়ে বিবাহিত জীবনের আনন্দ উপভোগ করবে এতে আর আশ্চর্য্য কি?"

"যোগী, তুমি এ-সব সত্যি বলছ? বীজগুপ্ত যশোধরাকে বিবাহ করেছে? না যোগী, এ একেবারে অসম্ভব!"

যোগীর গম্ভীর ভাবে কিন্তু অন্তস্তল-স্পর্শী—তীক্ষ্ণ ব্যংগ করে বলে, "ও; হোঃ, অসম্ভব! কেন? কামনায় উন্মত্ত হয়ে বীজগুপ্তের পবিত্র প্রেমকে অস্বীকার করে তোমার আমার কাছে ছুটে আসা যদি সম্ভব হয় তাহলে বীজগুপ্তের এক স্বর্গীয় প্রতিমার সংগে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হাওয়া কেন সম্ভব হবে না? ওঃ মিথ্যে অহঙ্কার ও নিজের ওপর অটল বিশ্বাস। আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, না? তাহলে যাও, নব-দম্পতি আজ সকালেই এসে গেছে, অভিনন্দন দিয়ে এসো। যাও, নিজের চোখেই নিজের প্রেমিককে না···নিজের দাসকে দেখে এসো যে সে কেমন অপর এক নারীর সংগে প্রণয়লীলায় মগ্ন।"

নর্তকী উঠে দাঁড়ায়, "কি বললে, তারা এসে গেছে?" তার সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে, চেহারায় বিষণ্ণতা ছেয়ে যায়। পাটলিপুত্রের দিকে তাকিয়ে বলে, "তিনি ফিরে এসেছেন? যোগী তোমার কাছে মিনতি করছি, এক বার বল যে যা বলেছ সব মিথ্যে!"

"কি বলব···যে···সব মিথ্যে। কিন্তু সত্যকে মিথ্যা বলব কি করে? বেশ তোমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয় নিজেই গিয়ে না হয় দেখে এসো।"

"না! সব শেষ হয়ে গেছে—আমার যাবার আর প্রয়োজন নেই। আমার সর্বস্ব আজ হারিয়ে গেছে।"

যোগী চিত্রলেখার কাছে সরে এসে বলে, "শেষ হয়ে গেছে? পৃথিবীতে কোন কিছু কি কখনও শেষ হয়ে যায়—একটির শেষ মানে আর একটির আরম্ভ। শেষ হয়ে যাবে কি করে, চিত্রলেখা!" যোগীর স্বর পূর্বাপেক্ষা অনেক কোমল এবং মৃদু কম্পন।···"তুমি জানো যে আমি তোমাকে ভালবাসি। আর তুমি আমাকে ভাল না বাসলেও ঘৃণা কর না। তুমি আমার জীবনে আসতে চাও, এত দিন আসতে পার নি শুধু বীজগুপ্তের জন্ত। তুমি তাকে দুঃখ দিয়েছ কিন্তু সে-ও তোমাকে কম দুঃখ দেয় নি। সে এখন একটা আশ্রয় পেয়ে গেছে, তোমাকেও একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। চিত্রলেখা! আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি।" যোগী সজোরে নর্তকীর হাত চেপে ধরে।

নর্তকীও বিনা বাধায় নিজের হাত যোগীর হাতের মধ্যে দিয়ে দেয়। যোগী বলে যায়, "প্রেম···শুধু প্রেম···এখন প্রেমই আমার ধর্ম। তুমি আমার জীবনে এসেছ, তুমি আমাকে প্রেমমন্ত্রে দীক্ষা দিতে এসেছ। এসো···আমরা দু'জনা এক হয়ে যাই···"

দু'জনার অধর মিলে যায়···নর্তকী কোন আপত্তি করে না।···

যোগী পাগলের মত বকে যেতে থাকে···"এসো, এতে কত সুখ, কত স্পন্দন, কত অনুভূতি। আমার প্রাণেশ্বরী, আজ সব উজাড় করে তোমাকে অর্পণ করব। আজ তোমার যৌবনের অতল সাগরে ডুবে যেতে চাই।" যোগীর চোখ বন্ধ, নর্তকীরও চোখ বন্ধ। দু'জনা পরস্পরকে আলিংগন পাশে আবদ্ধ করে নেয়। চিত্রলেখা বলে ওঠে, "তবে তাই হ'ক।"

* * * *

প্রাতঃকালে চিত্রলেখার ঘুম ভাংগে কিন্তু সে তখনও ভেবে চলেছে বীজগুপ্ত আমাকে ছেড়ে দিয়েছে, না তা কখনও হ'তে পারে না। সে এই চিন্তা একেবারে সহ্য করতে পারে না। তার জগত অন্ধকার, নিজের ওপর তার ভারী রাগ হয়। কিন্তু বীজগুপ্তকে সে ত্যাগই বা করতে গেল কেন?

যোগীর তখনও ঘুম ভাংগে নি। তার চেহারা একেবারে বিকৃত হয়ে উঠেছে, যে কামনা এক মুহূর্ত্তে তার সংযম ব্রতকে ভেংগে দিয়েছে সেই কামনা তার তেজোদীপ্ত চেহারাকে একেবারে মলিন করে দিয়েছে। নর্তকী কিছুক্ষণ একদৃষ্টে যোগীকে দেখতে থাকে, হঠাৎ সে কেঁপে ওঠে। বেশীক্ষণ সেখানে থাকবার তার সাহস হ'ল না, সে বাইরে চলে আসে। যে ব্যক্তির সংগে সে সারা রাত ভোগ-বিলাস করলে তার মুখের চেহারা তার কাছে অত ভয়ানক লাগছে কেন? নর্তকীর খুব আশ্চর্য লাগে।

বিশালদেব উপাসনা শেষ করে চিত্রলেখাকে দেখে নমস্কার করে, "দেবীকে আজ এত অসুস্থ মনে হচ্ছে কেন?"

"সারা রাত ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি!" চিত্রলেখা হেসে বলে, "সেই সব ভয়াবহ স্বপ্নের জন্তই বোধ হয় আমাকে এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

"আচ্ছা, আজ এখনও পর্য্যন্ত গুরুদেব কুটিরের বাইরে এলেন না কেন?"

"তিনি এখনও সমাধিস্থ।"

"সমাধিস্থ?" বিশালদের আশ্চর্য্য হয়ে বলে, "আজ এই প্রথম বার গুরুদেব জীবনের নিয়ম ভংগ করলেন।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে, "দেবী চিত্রলেখা! কাল রাত্রের স্বপ্ন সম্বন্ধে আমি কিছু প্রশ্ন করতে পারি?"

"শুধু এইটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে, সেই সব স্বপ্ন আমার বিগত জীবনের সংগে সম্বন্ধিত।"

"গত জীবনের সংগে সম্বন্ধিত। দেবি, আপনি যদি বলেন তো আর্য্য বীজগুপ্তের খোঁজ করে আসি—তিনি হয়ত এত দিন ফিরে এসেছেন।"

"হ্যাঁ, তিনি এসে গেছেন, তা' আমি জানি। কিন্তু তাতে কি হবে? তার আসা বা না-আসায় আমার কি লাভ?"

"দেবি, তুমি সত্যি বড় অদ্ভুত! তোমাকে বোঝা বড় কঠিন। এই সেদিন তুমি এখান থেকে বীজগুপ্তের কাছে যেতে চাইছিলে আর আজ··"

কিন্তু আজ আর চাই না। আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তোমার এত ঔৎসুক্য কেন?"

বিশালদেব মাথা নত করে ধীরে উত্তর দেয়, "ঠিক বলছ দেবি, কিন্তু তোমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দেখানোর অর্থ হ'ল নিজের গুরুদেবের জীবনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা এবং আমার পক্ষে খুবই উচিত ও স্বাভাবিক। তুমি এটা বেশ জানো যে, তোমার এখানে আসাতে এখানকার সংযমপূর্ণ শান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ আশ্রম এমনই এক স্থান যেখানে এক জন অপরের উচিত ও অনুচিত কার্য্যের যে শুধু সমালোচনা করতে পারে তা নয়, সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করবার অধিকারও তার আছে।" "আমি কিন্তু এ কথা মানতে রাজী নাই।"

"বেশ! কিন্তু তবুও আজ আর্য্য বীজগুপ্তের গৃহে যাব শুধু আমার গুরুভাই শ্বেতাংকের সংগে দেখা করতে। আমি আর এক বার তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে তুমি এ বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করো ও আমাদের মুক্তি দাও, আমাদের দয়া করো।"

নর্তকী হেসে বলে, "দয়া! কার ওপর দয়া করবার কথা বলছ? তুমি নিষ্ঠুরের কাছে দয়ার প্রত্যাশা করো—সংহারকর্তাকে দিয়ে নির্মাণ করাতে চাও? তুমি ভুল করছো, বিশালদেব!"

দ্বিপ্রহরে বিশালদেব নগর থেকে ফিরে আসে, চিত্রলেখা তারই প্রতীক্ষা করছিল। এত কিছু বলবার পরও, সিদ্ধান্ত ঠিক করে ফেলবার পরও বীজগুপ্ত সম্বন্ধে নর্তকী জানতে চায়। কুটিরের বাইরে বটগাছের নীচে নর্তকী শুয়েছিল, বিশালদেবকে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি উঠে বসে।

বিশালদেব সোজা চিত্রলেখার কাছে এসে দাঁড়ায়, "দেবী চিত্রলেখা, ভয় নেই, আমি আর্য্য বীজগুপ্তের সংগে দেখা করিনি, শুধু আর্য্য শ্বেতাংকের সংগে দেখা করেই চলে এসেছি। আমি বেশীক্ষণ সেখানে থাকিও নি। কারণ শ্বেতাংক আর্য্য মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে যাচ্ছিল। তার সংগে আমিও আর্য্য মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহ পর্য্যন্ত গেলাম। এর পর সে গৃহের ভেতর গেল আর আমিও ফিরে এলাম।"

নর্তকী জিজ্ঞেস করে, "শ্বেতাংক আমার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করলে?"

"হ্যাঁ, এই তোমার শরীর কেমন আছে, তুমি ভাল আছ তো! তাড়াতাড়ি ছিল, তা না হলে এখানে এক বার আসত! হ্যাঁ, আর একটা কথা। তোমার হয়ত আশ্চর্য্য লাগবে যে শ্বেতাংক যশোধরাকে ভালবাসে, সে তাকে বিয়েও করতে চায়।"

"কি? শ্বেতাংক যশোধরাকে বিয়ে করতে চায়? আমার তো অনুমান ছিল যে বীজগুপ্তের সংগে যশোধরার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।"

"তুমি কেমন করে ভেবে নিলে যে বীজগুপ্তের সংগে যশোধরার বিয়ে হয়ে গিয়েছে? হ্যাঁ, শ্বেতাংক অবশ্য বলছিল যে যশোধরা বীজগুপ্তের প্রতি আকৃষ্টা—কিন্তু তার স্থির বিশ্বাস যে বীজগুপ্ত যশোধরাকে কখনই বিয়ে করবে না। কারণ তোমাকে সে ভুলতে পারেনি।"

"ধন্যবাদ! বিশালদেব, তোমাকে যে কটু কথা বলেছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা কোর। আমি আজই এখান থেকে চলে যাব, তুমি বিশ্বাস কর।"

কোন অর্থই বিশালদেব খুঁজে পায় না—সে বলে ওঠে, "কি বিচিত্র এই নারী!"

কুমারগিরি শুয়ে শুয়ে চিত্রলেখার কথা ভাবছিল। তাকে দেখতেই পাগলের মত বলে ওঠে—"এতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে, আমার রাণী! এসো, কাছে এসো।" কিন্তু নর্তকীর চোখের দিকে তাকাতেই তার এই পাগলামী এক নিমেষে কোথায় উড়ে গেল। নর্তকীর চোখ জ্বলছিল—ঘৃণা, ক্ষোভ ও গ্লানিতে মেশান তার দৃষ্টি—সে কর্কশ স্বরে বলে ওঠে, "ইতর, নীচ, মিথ্যাবাদী! আমাকে ছোঁবে না!"

যোগী সরে দাঁড়ায়। নর্তকী বলে, "তুমি একটা—একটা কামোন্মত্ত পশু আমাকে প্রবঞ্চনা করেছে। আমাকে মিথ্যা কথা বলে নিজের বাসনা চরিতার্থ করেছ। তোমার সমস্ত তপস্যা নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং যুগ যুগ তোমাকে নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। আমি এখান থেকে যাচ্ছি আর তুমি আমাকে আটকাতে এসো না!"

যোগী সাহস নিয়ে বলে, "আমি যা কিছু করেছি সে সবই তোমার প্রেমে অন্ধ হয়ে!"

"বাসনার নগণ্য কীট! তুমি প্রেমের কি জানো? তুমি নিজের জন্য বেঁচে আছ—তোমার কেন্দ্র হ'ল আমিত্ব ও স্বার্থ—তুমি ভালবাসার কি জানো? প্রেমের অর্থ হ'ল নিজেকে বলি দেওয়া, আত্মত্যাগ, আমিত্ব স্বার্থকে ভুলে যাওয়া। তোমার জ্ঞান, তোমার তপস্যা, তোমার সাধনা তোমার আরাধনা সব ভুল, সব মিথ্যা; সত্য-পথ থেকে তুমি অনেক দূরে। নিজের তুষ্টির জন্য, গার্হস্থ্য জীবনের বাধা এড়াবার জন্য ভীরুর মত সন্ন্যাসীর এই ছদ্মবেশ ধারণ করেছ, সমস্ত জগতকে প্রবঞ্চনা করেছ, নিজের বাসনা তৃপ্ত করবার জন্য আমাকে প্রবঞ্চনা করেছ, তবুও তুমি প্রেমের দোহাই দিচ্ছ—লজ্জা করে না, ইতর, পাষণ্ড, প্রবঞ্চক!"

যোগী এ অপমান সহ্য করতে পারে না, সে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, "যাও নর্তকী, তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। তুমি আমাকে অনেক নীচে নামিয়ে দিয়েছ। তুমি আমাকে পরাজিত করেছিলে, আমিও তোমাকে পরাজিত করেছি। কারণ পরাজয় বলে কোন জিনিষ আমার জীবনে নেই। তুমি কি বলতে চাইছ! প্রথমে নিজেকে দেখবার চেষ্টা কর, নিজের মুখেও যে পশুত্বের ছাপ আছে তা' তো দেখতে পাবে না। এখনি এখান থেকে চলে যাও কিন্তু যাবার সময় নিজের অভিশাপও সংগে করে নিয়ে যাও!" আবেগে যোগী কাঁপতে কাঁপতে বাইরে চলে যায়।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আর্য্য মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহ থেকে ফিরে এসে শ্বেতাংক সেনাপতি বীজগুপ্তকে বলে, "আজ যোগী কুমারগিরির শিষ্য বিশালদেবের সংগে দেখা হ'ল। সে বলল যে, দেবী চিত্রলেখা ভাল আছেন।"

বীজগুপ্ত কোন উত্তর দেয় না।

শ্বেতাংক আবার জিজ্ঞেস করে, "এক বার প্রভুপত্নীর সংগে দেখা করা কি উচিত নয়?"

সেনাপতি বলে, "না, তার কোন প্রয়োজন নেই।"

শ্বেতাংক দেখলে যে চিত্রলেখা সম্বন্ধে বীজগুপ্তের কোন আগ্রহ

পাটলিপুত্রে এসে বীজগুপ্তের উদ্বিগ্নতা তো কমলো না বরং বেড়েই গেল। তার হৃদয়ে দুই বিরুদ্ধ ভাবের তুমুল যুদ্ধ চলছিল—দুই প্রতিমা তার সামনে। চিত্রলেখা চলে যাবার পর তার জীবন একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছিল, সেই শূন্যতা তার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করবার জন্য যশোধরা তার জীবনে এসে দাঁড়ায়। এখন সে যশোধরাকে পেতে চায়, তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু এক বার এই যশোধরাকে সে অস্বীকার করেছে, এখন তার জন্যে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে ভিক্ষা চাওয়া তার পক্ষে পরাজয় এবং তার আত্মা এ পরাজয়কে স্বীকার করতে রাজী নয়।

বীজগুপ্ত মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের সেনাবিভাগের এক জন সদস্য। পাটলিপুত্রে ফিরে আসবার পর রাজ-কার্য্যে তার মন লাগে না। তার কোন কিছুই ভাল লাগে না। সে গৃহের বাইরে যাওয়া ছেড়ে দেয়। নগরের বিশাল জনরব, উৎসব, কোলাহল আমোদ-প্রমোদ বৃশ্চিকের মত তাকে দংশন করে।

আজ শ্বেতাংক তার কাছে চিত্রলেখার প্রসংগ তুলে তার চিত্ত আরও চঞ্চল করে দেয়। সেদিন রাতে তার ঘুম আসে না। চিত্রলেখা সুখে আছে, আনন্দে আছে। আর সে দুঃখী। কত বৈষম্য, কত ভুল! পরাজয় হ'ক, ক্ষতি নেই। যশোধরাকে বিয়ে করতেই হবে। জীবনের শূন্যতা দূর করে জীবনকে উপভোগ করতেই হবে।

বীজগুপ্তের স্বরে ও ভাবে চিত্রলেখার প্রতি এই ঔদাসীন্য শ্বেতাংক এই প্রথম দেখলে। সে প্রভুর এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের কথা ভাবতেই পারে নি। সে-ও রাতে ঘুমাতে পারে না।

সকালে অন্যান্য দিন অপেক্ষা বীজগুপ্ত আজ যেন বেশী প্রসন্ন। সে ঠিক করে ফেলেছে যে আর্য্য মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে যশোধরাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে যাবে। আজ বহু দিন পরে সেনাপতির মুখে স্বাভাবিক হাসি দেখা যায়। জলপান করতে বসে দাসীকে বলে, "শ্বেতাংক কোথায়, তা'কে এক্ষুণি এক বার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

শ্বেতাংক এসে দাঁড়ায়। তার মুখের চেহারা দেখে মনে হয় যে সে কোন গভীর সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত। "শ্বেতাংক, তোমার শরীর কি ভাল নেই?"

মাথা নীচু করে শ্বেতাংক উত্তর দেয়, "না প্রভু, শরীর তো বেশ ভালই আছে, কিন্তু মনের অবস্থা স্বাভাবিক নেই!"

"কেন, কি হয়েছে?"

"প্রভু, আপনি আমাকে অনেক দয়া করেছেন—আপনিই আমার মংগল করতে পারেন।"

শ্বেতাংক, "তুমি তো জানই যে তুমি আমার ভাই-এর মতন। আমার দ্বারা যা কিছু সম্ভব তোমার জন্য তা করতে আমি সর্বদা প্রস্তুত।"

"আমি তো জানি এবং সেই জন্যই প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে সাহস করছি। প্রভু! আমি আর্য্য মৃত্যুঞ্জয়ের কন্যা যশোধরার পাণিগ্রহণ করতে চাই।"

বীজগুপ্ত চমকিয়ে ওঠে, তার মনে হ'ল যেন শ'খানেক বিছে একসংগে তার শরীরে হুল ফুটিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে শ্বেতাংকের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, "কি বললে? যশোধরার পাণিগ্রহণ করতে চাও? তা তা'তে আমার সাহায্যের কি প্রয়োজন?"

"আর্য্য মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে প্রভু যদি এই প্রস্তাব করেন।"

"শ্বেতাংক, তুমি জানো যে আর্য্য মৃত্যুঞ্জয় আমার সংগে তাঁর কন্যার বিবাহ দেবার ঠিক করেছিলেন—আমি সে সময়ে চিত্রলেখার জন্যে সে প্রস্তাব অস্বীকার করেছিলাম। তুমি এ-ও জানো যে, চিত্রলেখা আমার জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে, এবং যশোধরার প্রতি এখন আমি বেশ আসক্ত।"

"সব জানি প্রভু! কিন্তু এ কথা মনে হয় নি যে প্রভুর মনে যশোধরাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করবার বাসনা জাগবে!"

"না শ্বেতাংক—তুমি যা বলছ তা সম্ভব নয়। আমি যশোধরাকে ভালবাসি—আজ রাত্রেই যশোধরাকে বিয়ে করব ঠিক করে ফেলেছি·····শ্বেতাংক, তুমি কি আমাকে দিয়ে—কি কর'তে চাও। এত বেদনা, এত দুঃখ, এত নিরাশা কি আমার জন্য পর্য্যাপ্ত নয়? তুমি কি চাও যে আমি আমার জীবনটা নষ্ট করে দিই? না শ্বেতাংক—এটুকু জেনে রাখো যে, আমি যশোধরাকে বিয়ে করব।"

শ্বেতাংকের চোখে জল ভরে আসে। বীজগুপ্তের সামনে হাত-জোড় করে বলে, "প্রভু! আমাকে ক্ষমা কোর। আমি অপরাধ করেছি, নিজের ওপর কোন অধিকার ছিল না, আমাকে ক্ষমা কোর। প্রভু, তোমার মন অনেক উঁচু, তোমার হৃদয় অনেক বিশাল, তুমি আমার আদর্শ, আমাকে ক্ষমা করে দিও।"

সেনাপতি চিৎকার করে বলে ওঠে, "আমি পাগল হয়ে যাব, শ্বেতাংক! যাও এখান থেকে চলে যাও, আমাকে একটু একলা থাকতে দাও, তোমার কাছে মিনতি করছি তুমি এখান থেকে চলে যাও।"

শ্বেতাংক চলে যায়।

সেনাপতি এক বার বলে, "হায় রে ভাগ্য!" আবার বলে, "না শ্বেতাংক, এ কখনই হ'তে পারে না—আমি যশোধরাকে বিয়ে করব—আমি নিশ্চয় বিয়ে করব। সুখে থাকবার অধিকার কি আমার নেই? আমি এক্ষুণি যাব। আমার সিদ্ধান্তকে কেউ এখন বাধা দিতে পারে না"—দাসীকে বলে, "এক্ষুণি আমি বাইরে যাব, রথ আনতে বল।"

আবার ভাবে, "কিন্তু শ্বেতাংক! সে কোন্ অধিকারে যশোধরাকে ভালবেসেছে? সে কি জানে না যে আমি যশোধরার প্রতি আসক্ত?"···এক গেলাস ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে নিয়ে খায়···"কিন্তু এতে শ্বেতাংকের কি অপরাধ! কোন নারীকে ভালবাসা তার পক্ষে স্বাভাবিক। সে যুবক, রক্তে-মাংসে গড়া তার শরীর, প্রকৃতিগত ইচ্ছা যে তার থাকবে এতে আশ্চর্য্য কি? সে জানবেই বা কি করে যে চিত্রলেখার প্রতি আমার আর কোন আসক্তি নেই?"

বীজগুপ্তের বিচার-ধারা বদলিয়ে যায়। "চিত্রলেখার প্রতি আমার কোন আসক্তি নেই—সত্যি কি তাই? আমি কি এত দুর্বল যে এক বার এক জন নারীকে ভালবেসে এখন আবার অপর এক নারীকে ভালবাসছি। সত্যি প্রেম কি স্থায়ী হয় না?"

সে ভেবে কিছু ঠিক করতে পারে না। সে কিছুতেই মানতে পারে না যে প্রেম স্থায়ী—যদিও এর সত্যতা সে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারছিল—"না, প্রেম অস্থায়ী হ'তে পারে না। তবে আমি

এ সব কেন করতে চলেছি? চিত্রলেখার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য? না।" চিত্রলেখা সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ-ধারণা তার মনে ছিল না।

রথ দ্বারে এসে পৌঁছিলে সে মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহের দিকে রওনা হয়। কিন্তু তার চিন্তার গ্রন্থি ছিন্ন হয় না—"সংযমের অর্থ কি এই—পৃথিবীতে নিজের চিন্তাই কি সব? তাহ'লে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কোথায়? প্রত্যেক প্রাণী নিজের জন্য জীবিত থাকে, স্বার্থ-বোধে সবাই কাজ করে। কিন্তু তাহলে আমার এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? যশোধরার সংগে আমার বিয়ের পরিণাম কি হবে? এক ব্যক্তির জীবন নষ্ট হয়ে যাবে—সে ব্যক্তি আর কেউ নয় আমার প্রিয়, আমার ভাইএর সমান,—শ্বেতাংক! আর সত্যিই কি যশোধরাকে ভালবাসতে পারব? যখন নিজের দুঃখ দূর করবার জন্যে যশোধরাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে চলেছি। কিন্তু পরে? না, তাকে বিয়ে করবার আমার কোন অধিকার নেই। শ্বেতাংকের জীবন নষ্ট করবার কোন অধিকার আমার নেই। এখন জীবনে সাফল্য বা সুখ পাই বা না পাই আপন পথে অটল থাকাই আমার কর্তব্য। আপন সুখের জন্য অপরের সুখ অপহরণ করা কাপুরুষতা, শুধু কাপুরুষতা নয়, নীচতা। আমাদের ভাগ্যে সুখ ও দুঃখ দুই আসবে—আমাদের কর্তব্য হ'ল যে দুইএর ভিতরই সাহসের সংগে জীবনকে উপভোগ করা।"

মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহে রথ পৌঁছলে বীজগুপ্ত ভেতরে খবর পাঠিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে থাকে। আর্য্যশ্রেষ্ঠ বাইরে এসে বীজগুপ্তকে দেখে বলে, "আরে, আর্য্য বীজগুপ্ত যে! কি সৌভাগ্য আমার। সব কুশল তো? তার পর হঠাৎ এই বৃদ্ধকে মনে পড়ল!"

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বীজগুপ্ত বলে, "আর্য্যশ্রেষ্ঠ! আজ আমি আপনার কন্যার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।"

মৃত্যুঞ্জয় হেসে বলেন, "উত্তম! অতি উত্তম!"

বীজগুপ্ত মৃত্যুঞ্জয়ের হাসির অর্থ বুঝতে পারে, সে'ও হাসে। "আর্য্য, আমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই—সব কথা তো প্রথমেই বলেছি। আমার প্রস্তাব হ'ল যে শ্বেতাংকের সংগে যদি আপনার কন্যার বিবাহ দেন। শ্বেতাংক কুলীন, সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, সভ্য এবং শিক্ষিত—বাস্তবিক সে আপনার কন্যার উপযুক্ত পাত্র—বোধ হয় আমার চেয়েও উপযুক্ত।"

মৃত্যুঞ্জয় অনুমান করেছিলেন যে, বীজগুপ্ত যশোধরার সংগে তার নিজের বিয়ের প্রস্তাব করবে—শ্বেতাংকের সংগে বিয়ের প্রস্তাব শুনে অবাক্ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, "আর্য্য বীজগুপ্ত! শ্বেতাংক উপযুক্ত পাত্র সত্য! কিন্তু সে ধনী নয়। এ অবস্থায় তার সংগে আমার কন্যার বিবাহের কথা আমি চিন্তাই করতে পারি না।"

"কিন্তু আর্য্য! আপনার তো অতুল ঐশ্বর্য্য, আপনার কন্যা ব্যতীত আপনার আর কোন সন্তানও নেই।"

"আমার সম্পত্তিতে আমার কন্যার কোন অধিকার নেই, সে সবের অধিকারী হবে আমার দত্তক-পুত্র। আচ্ছা, আর্য্য বীজগুপ্ত, আপনি নিজে কেন যশোধরাকে বিয়ে করছেন না?"

"আমি ঠিক করেছি যে বিয়ে করব না। তাহলে শ্বেতাংকের [illegible] কি আপনার কন্যার বিবাহ একেবারে অসম্ভব?"

"হাঁ, আর্য্য! শ্বেতাংক উপযুক্ত ও কুলীন পাত্র হলেও যতক্ষণ সে নির্ধন ততক্ষণ তার সংগে আমি যশোধরার বিবাহ দিতে পারি না।"

"আচ্ছা, আর্য্যশ্রেষ্ঠ! আমি শ্বেতাংককে আমার দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করছি, সে আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে। বলুন, এখন আপনার কোন অমত নেই?"

"না, আর্য্য বীজগুপ্ত! সে অসম্ভব! তোমার এখন বয়সই বা কত? এমনও হ'তে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে তুমি বিয়ে করবে, তখন তোমার পুত্রই হবে তোমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী!"

"আপনি ঠিক বলেছেন আর্য্যশ্রেষ্ঠ! যদিও এখন আমি ঠিক করেছি, যে বিয়ে করব না কিন্তু মানুষের মনের পরিবর্তন হ'তে কতক্ষণ? কিন্তু আমার ইচ্ছে যে যশোধরা ও শ্বেতাংকের বিবাহ হয়ে যায়, এ বিবাহে ওরা দু'জনাই সুখী হবে। এর জন্য আমি সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত আর্য্য! আমি আমার সম্পত্তি শ্বেতাংককে দান করে দেব।"

"বীজগুপ্ত! তুমি বুঝতে পারছ না যে তুমি কি করতে যাচ্ছ। তোমার চিত্ত এখন বড় চঞ্চল।"

"আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে আমার সম্পত্তি আমি শ্বেতাংককে দান করে দেব। শুধু থাকল সেনাপতির পদবী—এ পদবী ত্যাগ করতে গেলে সম্রাটের আজ্ঞার প্রয়োজন, আজই আমি সম্রাটের সংগে দেখা করে সব ব্যবস্থা করে ফেলব। এখন নিশ্চয় আপনার কোন আপত্তি নেই?"

"কিন্তু এখনও ভেবে দেখ। আর এক বার ভাল করে ভেবে দেখ—এক বার আপন প্রস্তাব স্বীকৃত হয়ে গেলে পুনরায় ফিরিয়ে নিতে পারবে না।"

প্রত্যেকটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে বীজগুপ্ত বলে, "আর্য্য মৃত্যুঞ্জয়! আমি যা বলেছি সে আমার শেষ কথা—আমি সেই ব্যক্তি, যে কথা ফিরিয়ে নিতে জানে না।"

"তাহলে তোমার প্রস্তাব স্বীকৃত হ'ল।" মৃত্যুঞ্জয় কম্পিত স্বরে বলেন।

বীজগুপ্ত উঠে দাঁড়ায়, "তাহলে আমি এখন যাচ্ছি। দানপত্র এবং পদবীর জন্য রাজাজ্ঞার ব্যবস্থা আজই হয়ে যাবে। বিলম্ব করবার কোন প্রয়োজন নেই। বিবাহের দিন আপনি ঠিক করে ফেলুন!"

"আর্য্য বীজগুপ্ত! আমি সারা জীবন পৃথিবীকে দেখেছি। আমি বলছি যে আপনি মানুষ নন, দেবতা!" মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ ছল-ছল করে ওঠে।

গৃহে ফিরে এসে বীজগুপ্ত শ্বেতাংকের ঘরে গিয়ে দেখে যে, শ্বেতাংক ঘুমাচ্ছে—বালিশের ওয়াড় ভিজে গেছে, তার চোখের জল তখনও শুকিয়ে যায় নি। কাছে গিয়ে শ্বেতাংককে ডাকে—শ্বেতাংক ধড়ফড় করে উঠে বলে, "প্রভু! কি আজ্ঞা প্রভু?"

"সেনাপতি শ্বেতাংক, তুমি আজ থেকে আমাকে আর প্রভু বলে সম্বোধন করবে না।"

বিস্ফারিত নেত্রে শ্বেতাংক বলে, "এ আপনি কি বলছেন?"

"আমি ঠিকই বলছি। শোন! আজ আমি আর্য্য মৃত্যুঞ্জয়ের

কাছে তাঁর কন্যার সংগে তোমার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলাম—তিনি প্রথমে আপত্তি জানান। সেই আপত্তিকে দূর করবার জন্য আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি ও পদবী তোমার নামে দান করে দিয়েছি। এখন যশোধরার সংগে তোমার বিয়ে দিতে তাঁর আর কোন আপত্তি নেই।"

কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে শ্বেতাংক বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে বীজগুপ্তের দিকে তাকিয়ে থাকে—তার পর বলে, "না, প্রভু, এ কিছুতেই হ'তে পারে না, আমি অপরাধী, আমি পাপী, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি চলে যাচ্ছি। আমি আপনার জীবন নষ্ট করে দিয়েছি। আপনি আমার মত নরাধমকে দয়া করবেন না—আমি আপনার এ দান স্বীকার করার যোগ্য নই"—বীজগুপ্তের পায়ে সে লুটিয়ে পড়ে।

বীজগুপ্ত শ্বেতাংককে উঠিয়ে নিয়ে বলে, "যা হবার ছিল তাই হয়েছে। এখনও তোমার হৃদয়ে আমার জন্য যদি স্নেহ থাকে তাহলে আমি যা কিছু করেছি স্বীকার করো। পৃথিবীর চোখে আমাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ কোর না। আমি এই ঐশ্বর্য্যকে বহু দিন ভোগ করেছি, এখন এতে আমার কোন লিপ্সা নেই। এ ঐশ্বর্য্যকে এখন তুমি উপভোগ কর। তোমার কাছে আমার শুধু প্রার্থনা যে তুমি আমার দান অস্বীকার করবে না। চলো, দানপত্র ও পদবীর জন্য রাজাজ্ঞার ব্যবস্থা করতে হবে।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

চিত্রলেখা ফিরে আসে বটে কিন্তু বীজগুপ্তের সংগে দেখা করে না। বীজগুপ্তের সংগে দেখা করবার সাহস তার নেই। তার মনে হয় যে বীজগুপ্তের কাছে সে অপরাধিনী।

তার গৃহে অতুল ঐশ্বর্য্য, তারই মাঝখানে সে সাধনা করতে শুরু করে দেয়। সাধনার মধ্যে সে সুখের আস্বাদ পেতে চায়, সে হাসিমুখে অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হ'তে চায়। নিজের জীবনকে সে ঘৃণা করে। রাত-দিন কাঁদা ছাড়া তার আর কোন কাজ নেই।

সে বীজগুপ্তকে ভালবাসত, তার ভালবাসা যে কত গভীর এত-দিনের বিচ্ছেদে সে অনুভব করতে পারে। কিন্তু তার কোন মর্য্যাদা নেই। কারণ কুমারগিরির পাগলামী এবং নিজের মূর্খতার জন্য এক ছোট্ট মুহূর্ত্তে সে যোগীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সে এখনও বীজগুপ্তকে ভালবাসে, তাকে প্রবঞ্চনা করতে চায় না। সে অপরাধ করেছে এবং সেই অপরাধের পরিণামস্বরূপ নৈরাশ্যপূর্ণ অসহ্য জ্বালায় জ্বলাই তার একমাত্র কর্ত্তব্য। বেদনার আঘাতে যতই সে জর্জ্জরিত হয় ততই সে আনন্দ পায়, সুখ পায়। সে যতই কাঁদে ততই শান্তি পায়।

এমনি ভাবে এক মাস কেটে যায়। এক দিন সে বসে বসে কাঁদছে, দাসী এসে বলে, "আর্য্য শ্বেতাংক আপনার সংগে দেখা করতে চান।"

নর্ত্তকী চমকিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, মনে মনে ভাবে যে, বীজগুপ্ত কি তাকে ডেকে পাঠিয়েছে! "কোথায় সে? আমি এখনই যাচ্ছি।"

অতিথি-গৃহে বসে শ্বেতাংক চিত্রলেখার প্রতীক্ষা করছিল। নর্ত্তকীকে দেখে তার খুব আশ্চর্য্য লাগে। মুখে তার সে জ্যোতি নেই, অনুপম সৌন্দর্য্য বিকৃত হয়ে গেছে। তাকে চেনাও যায় না।

"কেন, বেশ ভালই তো আছি!"

কিছুক্ষণ দু'জনাই চুপ করে থাকে। নর্ত্তকী জিজ্ঞেস করে, "আর্য্য বীজগুপ্ত তো ভাল আছেন?"

"হ্যাঁ, এমনি তিনি ভাল আছেন, তবে তার এক বিরাট পরি-বর্ত্তন হয়েছে!"

"পরিবর্ত্তন হয়েছে?" চিত্রলেখার কৌতূহল হয়, "কি রকম পরিবর্ত্তন? তিনি কি বিবাহ করেছেন?"

শুষ্ক হাসি হেসে শ্বেতাংক বলে, "না তিনি বিয়ে করেন নি, বিয়ে তো আমি করতে চলেছি। সেনাপতি মৃত্যুঞ্জয়ের কন্যা যশো-ধরার সংগে আমার বিয়ে, তারই নিমন্ত্রণ করবার জন্য আমি এসেছি। কিন্তু আর্য্য বীজগুপ্ত এক মহান ত্যাগ করেছেন—তিনি মানুষ নন, দেবতা! সেনাপতি মৃত্যুঞ্জয় তাঁর কন্যার বিবাহ আমার সংগে দিতে রাজী ছিলেন না, কারণ আমি গরীব। আর্য্য বীজগুপ্ত তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ও পদবী আমাকে দান করে দিয়েছেন। পাটলিপুত্র ছেড়ে তিনি কোথাও বাইরে চলে যাবেন—শুধু আমার বিয়ে পর্য্যন্ত এখানে আছেন।"

নর্ত্তকীর চোখে জল ভরে আসে, "বীজগুপ্ত এই সব করে ফেলেছে? শ্বেতাংক! এই অদ্ভুত ত্যাগের জন্য দায়ী হলাম আমি। তবুও আজ তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। হ্যাঁ ভাল কথা, তোমার বিয়ে কবে?"

"আগামী সপ্তাহের রবিবার দিন।···সোমবারে প্রীতিভোজ, সেদিন সম্রাট এবং রাজ্যের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সেনাপতিগণও আসবেন। দেবি! প্রীতিভোজের দিন কিন্তু আপনাকে আসতেই হবে।"

নর্ত্তকী বলে, "শ্বেতাংক! আমাকে ক্ষমা কোর। আমি অন্য কোন দিন যাব, প্রীতিভোজের দিন যেতে পারব না। আমি এখন অন্য এক জীবন গ্রহণ করেছি। এ উৎসবে আমার যাওয়া উচিত হবে না।"

"দেবি! তুমি এক দিন আমাকে ভাই বলে গ্রহণ করেছিলে, এ আমার একান্ত অনুরোধ।"

"আমাকে ক্ষমা কোর! শ্বেতাংক! তুমি জানো যে আমার সিদ্ধান্তের কখনও পরিবর্ত্তন হয় না। হ্যাঁ, তোমার ওপর আমার ভালবাসা আছে বৈ কি, কিন্তু বড় বোনের ভালবাসা! আমি অন্য আর এক দিন যাব।"

"যেমন তোমার ইচ্ছে! কিন্তু একটা কথা। সোমবার রাত্রেই আর্য্য বীজগুপ্ত দেশ-পর্য্যটনে যাত্রা করবেন।"

"বীজগুপ্ত সেই রাত্রেই চলে যাবে।" নর্ত্তকী ইতস্ততঃ করে কিন্তু পরক্ষণেই দৃঢ় স্বরে বলে, "কিন্তু তাতে আমার কি আসে যায়? আমার সিদ্ধান্ত বদলাবে না।"

শ্বেতাংক বলে, "আচ্ছা, তাহ'লে আমি এবার চলি।"

শ্বেতাংকের বিয়ে হয়ে যায়। প্রীতিভোজের দিন সম্রাটের সংগে অন্যান্য মান্য অতিথিরা আসেন। সেদিন বীজগুপ্ত সবাইকে অভ্যর্থনা করছিল। সকলের সংগে হেসে কথা বলে, কিন্তু মনে এক অসহ্য বেদনা। নর্ত্তকী চিত্রলেখার অনুপস্থিতি তার একটুও ভাল লাগে না। পাটলিপুত্র ছাড়বার আগে শেষ বারের মত এক বার

ভোজন সমাপ্ত হলে সম্রাট শ্বেতাংককে অভিনন্দন দিলেন এবং তাকে সেনাপতি বলে অভিহিত করলেন। তার পর বীজগুপ্তকে কাছে ডেকে উঠে দাঁড়ালেন, অভ্যাগত অতিথিরা সবাই সম্রাটের উঠবার সংগে উঠে দাঁড়ায়। বনের চারি দিক নিস্তব্ধ, সম্রাট বলেন, "বীজগুপ্ত, তুমি সত্যিই এক মহান ব্যক্তি। তুমি সাধারণ মানুষ নও, তুমি দেবতা! আজ ভারতবর্ষের সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য তোমার সামনে মাথা নত করছে।" এই বলে বীজগুপ্তের সামনে এসে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মাথা নত করে দাঁড়ালেন। সবাইর মাথা নত হয়ে যায়, নারীদের ভিতর থেকে অস্ফুট ক্রন্দনের শব্দ শোনা যায়। বীজগুপ্ত সম্রাটের সামনে মাথা হেঁট করে বলে, "মহারাজ, আমি এ সম্মানের সম্পূর্ণ অযোগ্য, আজ আমি দেশ-পর্য্যটনে যাত্রা করছি এক ভিখারীর মত—আপনি আমায় শুধু আশীর্বাদ করুন ও বিদায় দিন।"

এই বলে বীজগুপ্ত ফটকের দিকে এগিয়ে যায়। অতিথিরা দুই দিকে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে—মাঝখান দিয়ে বীজগুপ্ত চলেছে। তার মুখে এক দৈব হাসি—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে—ঐশ্বর্য্য ও শক্তির ঐ ভীড় থেকে শান্তি ও ত্যাগের গুরুত্ব নিয়ে বীজগুপ্ত বেরিয়ে পড়ে।

বাইরে বীজগুপ্তের সেবকেরা দাঁড়িয়েছিল। তা'কে দেখে সবাই কেঁদে ওঠে, মুহূর্ত্তের জন্ম বীজগুপ্ত থমকে দাঁড়ায়, প্রত্যেককে ভাল করে দেখে বলে, "শ্বেতাংককে আমারই মত মনে কোর এবং আমাকে ভুলবার চেষ্টা কোর।"

কয়েক জন সেবক একসংগে বলে, "আমরা আপনার সংগে যাব।"

বীজগুপ্ত গম্ভীর স্বরে বলে, "না, তোমরা সবাই এখানে থাকবে, কেউ আমার সংগে যাবে না।"

বীজগুপ্ত এগিয়ে চলে। অর্দ্ধরাত্রির প্রায় শেষ—নগরের চারি দিক নিস্তব্ধ। এক ভিখারীর মত বীজগুপ্ত এগিয়ে চলেছে। পরিধানে অতি সাধারণ বস্ত্র, সংগে সামান্য কিছু মুদ্রা। সে আরও এগিয়ে যায়, শুধু পায়ের শব্দ শোনা যায়—সে আর এক বার পিছন ফিরে তাকায়, অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না—

কিছুদূর এগিয়ে গেলে সেই অন্ধকারে হঠাৎ এক আবছা মূর্ত্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে—মূর্ত্তিটি আপাদ-মস্তক কাপড়ে ঢাকা, বীজগুপ্ত চমকে ওঠে, জিজ্ঞেস করে, "কে তুমি? প্রভু আমার প্রাণের দেবতা, আমাকে ক্ষমা কর।" বলেই সেই মূর্ত্তিটি বীজগুপ্তের পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

বীজগুপ্ত কর্কশ স্বরে বলে ওঠে, "কে? চিত্রলেখা? তুমি আমার জীবনের অভিশাপ, তুমি এখানে কেন এসেছ, চলে যাও, আমার কাছ থেকে চলে যাও···এখন সব শেষ হয়ে গেছে, তুমি কেন এসেছ, চলে যাও···"

"প্রাণের দেবতার কাছ থেকে শেষ চরণ-ধূলি পাবার জন্ম। শেষ বারের মত মনের দেবতাকে এক বার পূজা করবার জন্ম!" চিত্রলেখা উঠে দাঁড়ায়, "নাথ! আমি তোমার জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছি, আমি তোমার সব কিছু কেড়ে নিয়েছি। তুমি আমাকে অভিসম্পাত দাও, শাস্তি দাও, আমাকে তাড়িয়ে দাও—শুধু আমাকে

বীজগুপ্তের সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে, রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, "চিত্রলেখা, এখন সব শেষ হয়ে গেছে। তুমিই সব শেষ করে দিয়েছ—আমাকে ছেড়ে দিয়ে, আমার সমস্ত আশা ভেংগে দিয়ে তুমি যোগী কুমারগিরির আশ্রমে চলে গিয়েছিলে। এখন আমাকে আবার বিচলিত করতে কেন এসেছ? এখন আমার কাছে কিছুই নেই—হৃদয়ে উচ্ছ্বাস নেই, কাছে কোন ঐশ্বর্য্য নেই, আমাকে যেতে দাও।"

চিত্রলেখা বীজগুপ্তের হাত ধরে ফেলে, "না, আমি তোমাকে অন্তত—আজকের জন্মও যেতে দেব না। এক দিন তোমাকে আমার অতিথি হয়ে থাকতে হবে, যদি যেতে হয় কাল যেও।"

বীজগুপ্ত হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, "আমার সামনে থেকে সরে যাও নর্ত্তকী! আমাকে তুমি আটকাতে পার না। নিজেই তুমি সব নষ্ট করে দিয়েছ, এখন শুধু তার পরিণাম দেখ—আমাকে যেতে দাও।"

চিত্রলেখা বীজগুপ্তের পা জড়িয়ে ধরে, "আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দেব না—তোমাকে আমার সংগে আমার গৃহ পর্য্যন্ত যেতে হবে। প্রভু, তোমার হৃদয়ে আমার জন্ম কি একটুও স্থান নেই? বল, চুপ করে থাকলে কেন"········চিত্রলেখা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

বীজগুপ্ত নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারে না, সে বলে, "যদি প্রেমই মরে যেত তাহলে এ অতুল ঐশ্বর্য্যই বা ছাড়ব কেন? চিত্রলেখা, আমি চেয়েছিলাম যে, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা যেন মরে যায়। কিন্তু তা হ'ল না, তা' হবেও না" চিত্রলেখাকে উঠিয়ে আলিংগন করতে চায়।

কিন্তু চিত্রলেখা সরে দাঁড়ায়, "না, আমার দেবতা! আমার শরীরকে স্পর্শ করবেন না। আমি অপবিত্রা, পতিতা, পাপিনী! চলুন, আমার গৃহে চলুন, সেখানে আমাকে পবিত্র করে দিন—আমাকে শাস্তি দিয়ে আমাকে পবিত্র করে তুলুন।"

"চলো!" বীজগুপ্ত বলে, "চলো চিত্রলেখা, পৃথিবীতে শুধু তোমার কথাই অগ্রাহ্য করতে পারি না। আমাকে যত অধঃপতনে নিয়ে যেতে চাও, নিয়ে যাও। শুধু কথা দাও যে কাল তুমি আমাকে আটকাবে না!"

"হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি।"

গৃহে পৌছিয়ে বীজগুপ্তের শয়নের ব্যবস্থা করে দিয়ে চিত্রলেখা বলে, "নাথ, তুমি শুয়ে পড়, কাল সকালে কথাবার্ত্তা হবে, কেমন?" এই বলে সে চলে যায়। বীজগুপ্ত অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

সকালে বীজগুপ্তের কাছে এসে বলে, "স্বামী! আপনি আমায় চরণ-ধূলি দিন।"

"কিন্তু কেন?"

"আমি নিজেকে পবিত্র করছি। স্বামী, আমি আমার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছি, রাগে-ক্ষোভে আমি যোগী কুমারগিরির বাসনার উপাদান হয়ে যে দেহকে উপভোগ করতে দিয়েছি সেই দেহকে আমি পবিত্র করতে চাই।"

চিত্রলেখা সমস্ত ঘটনা বীজগুপ্তকে বলে, "এখন আপনি বুঝতে পারছেন যে, কেন আপনার কাছে যাইনি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

বীজগুপ্ত হেসে বলে, "ব্যস্, শুধু এর জন্ম! চিত্রলেখা! তুমি

আমার কাছে ক্ষমা চাইছ, কিন্তু কেন? ভালবাসা হ'ল ত্যাগ, বিস্মৃতি ও তন্ময়তা। প্রেমের জগতে কোন অপরাধ হয় না, তবে ক্ষমা কিসের? কিন্তু আমার মুখ থেকে শুনলেই যদি তোমার শান্তি হয় তো আমি বলছি যে, আমি তোমাকে ক্ষমা করছি।"

চিত্রলেখা বীজগুপ্তের পা জড়িয়ে ধরে মিনতি করে, "নাথ, তুমি আমাকে আবার গ্রহণ কর।"

"সে কি করে সম্ভব? দেবী চিত্রলেখা! আমি যে আজ পথের ভিখারী, সমস্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করেছি—এখন এ কি করে সম্ভব?"

"নাথ, আমার তো ঐশ্বর্য্য আছে, আর আমি তো তোমার! আমার ঐশ্বর্য্যও তোমার, তবে তুমি নির্ধন হ'লে কি করে? নিজেকে ভিখারী কেন বলছ?"

"তোমার সম্পত্তি, তোমার ঐশ্বর্য্য, সে তো আমার কোন কাজে আসবে না! আমি গ্রহণ করবার জন্য তো ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করি নি, ঐশ্বর্য্যকে চিরকালের মত পরিত্যাগ করবার জন্যই সব কিছু ত্যাগ করছি; আমি তোমাকে ভিখারিণীরূপে স্বীকার করতে পারি।"

চিত্রলেখা উঠে দাঁড়ায়, "তাহলে তাই হ'ক—পৃথিবীতে আমরা দু'জন ভিখারীর মত বেরিয়ে পড়ি। প্রেমই হ'ক আমাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। দেবতা! আজই আমি সমস্ত সম্পত্তি দান করে দিচ্ছি—চলুন, আজ রাত্রেই দু'জনা একসংগে প্রেমকে পাথেয় করে এক অজানা পথের দিকে রওনা হই।" চিত্রলেখার মুখমণ্ডল আনন্দে উল্লসিত, চোখে অপূর্ব দীপ্তি, অন্তরে এক নতুন অনুভূতি।

বীজগুপ্ত চিত্রলেখাকে চুম্বন করে, "আমরা দু'জনা কত সুখী!"

উপসংহার

এক বছর পর।

মহাপ্রভু রত্নাম্বর বলেন, "বৎস শ্বেতাংক! তোমার বিবাহ হয়ে গেছে, এখন তুমি এক জন গৃহস্থ। আচ্ছা, এখন বল যে বীজগুপ্ত ও কুমারগিরি এ দু'জনার মধ্যে কে পাপী?"

রত্নাম্বরের সামনে মাথা নত করে শ্বেতাংক উত্তর দেয়, "মহাপ্রভু, বীজগুপ্ত দেবতা! পৃথিবীতে তিনি ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি, বিশাল তাঁর হৃদয়। অন্য দিকে কুমারগিরি পশু। সে নিজের জন্য জীবিত, পৃথিবীতে তার জীবনের কোন দাম নেই। জীবনের নিয়ম লঙ্ঘন করে সে চলেছে, নিজের সুখের জন্য সে পার্থিব বাধার সম্মুখীন হ'তে চায় না। কুমারগিরি পাপী।"

"বৎস বিশালদেব! তুমি যোগীর দীক্ষা নিয়েছ, নিজেও এখন একজন যোগী। তুমি বল যে তোমার মতে কুমারগিরি ও বীজগুপ্তের মধ্যে কে পাপী?"

বিশালদেব উত্তর দেয়, "মহাপ্রভু, যোগী কুমারগিরি অজেয়। আমিত্বকে তিনি সম্পূর্ণ জয় করেছেন, এবং সাংসারিক জগতের অনেক উর্দ্ধে তাঁর অবস্থান। তাঁর সাধনা, জ্ঞান ও শক্তি পূর্ণতা লাভ করেছে। অপর দিকে বীজগুপ্ত বাসনার দাস—সংসারের ঘৃণিত ভোগ-বিলাস তার জীবন। সে পাপী—পাপময় জগতের সে এক প্রধান অংশ।"

রত্নাম্বর বলেন, "দেখ, তোমরা দু'জন বিভিন্ন পরিস্থিতির ভিতর ছিলে—তাই পাপ সম্বন্ধে তোমাদের দু'জনার ধারণাও বিভিন্ন হয়ে গেছে। তোমাদের বিদ্যা সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন যেতে পার। যাবার পূর্বে আমার শেষ বাণী শুনে যাও।"

"পৃথিবীতে পাপ বলে কিছু নেই, মানুষের দৃষ্টিভংগীর বৈষম্যের অপর নাম পাপ। প্রত্যেক মানুষ এক বিশেষ মনঃপ্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়—প্রত্যেক মানুষ এই সংসার-রূপী রংগমঞ্চে অভিনয় করতে আসে। আপন স্বভাবের বশীভূত হয়ে আপনার কথারই সে পুনরাবৃত্তি করে যায়—এই হ'ল মানুষের জীবন। যার যে রকম স্বভাব সে সেই রকম কাজ করে এবং স্বভাব হ'ল প্রকৃতিগত। মানুষ নিজের ওপর কর্ত্তৃত্ব করতে পারে না, কারণ সে পরিস্থিতির দাস—সে নিতান্ত অসহায়। তাহলে দেখছ, পাপ ও পুণ্য এ দু'এর কোন অর্থ নেই।"

"মানুষের ভিতর আমিত্ববোধ প্রধান। প্রত্যেক মানুষ চায় সুখ। শুধু সুখের কেন্দ্র বিভিন্ন প্রকারের হয়। কেউ অর্থের ভিতর সুখ পায়, কেউ সুরার ভিতর সুখকে খুঁজে পায়, ব্যভিচারের ভিতর কেউ প্রকৃত সুখের সন্ধান পায়, আবার কেউ ত্যাগের ভিতর সুখ পায় কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি সুখ চায়; পৃথিবীতে আপন ইচ্ছায় এমন কোন কাজ মানুষ করে না যা'তে সে দুঃখ পায়—মানুষের স্বভাবই হ'ল এই রকম এবং প্রত্যেকের দৃষ্টিভংগীতে বৈষম্য আছে।

"এইজন্য পৃথিবীতে পাপের ঠিক পরিভাষা নেই—কখনও থাকতে পারে না। আমরা পাপও করি না, পুণ্যও করি না, আমরা শুধু তাই করি, যা আমাদের করতে হয়।"

রত্নাম্বর উঠে দাঁড়াল, "এ হ'ল আমার নিজের মত, তোমরা এর সংগে একমত হও বা না হও আমি তোমাদের আমার মত স্বীকার করতে বাধ্য করছি না এবং বাধ্য করতেও পারি না। যাও—আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা যেন সুখী হও।"

সমাপ্ত

ঝোড়ো হাওয়া

আশু চট্টোপাধ্যায়

ঝোড়ো বিকেলটা যখন পাখীর ভীত ডানায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে, মেঘগুলো যখন বুকের নিভৃত ইচ্ছার মত এলোমেলো আর ঈষৎ লাল, সরমার নিঝ্ঞ্ঝাট আয়েসী জীবনের পালে যে দুরন্ত হাওয়া এসে লাগল, তা অবশ্য ওই ঝড়ের নয়। যে কাব্য-গ্রন্থে তখনো সীন-নদীর জলকল্লোল বাজছে আর ফরাসী দ্রাক্ষা-কুঞ্জের আস্বাদ সেটি দুই সুগঠিত আঙুলের মধ্যে ধ'রে দুই চোখের দৃষ্টিকে জানলার বাইরে ঝড়ের মধ্যে উড়িয়ে দিয়ে সে নিঃশব্দে বসেছিল, ভাবছিল এই মাহেন্দ্রলগ্নে নিখুঁত বেশভূষায় প্রিয়ব্রতের আবির্ভাব হলে কেমন হয়? ঠিক সেই সময় চাকর এসে খবর দিল যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটি লোক নিচেকার সাজানো ড্রয়িং-রুমে এসে বসে পড়েছে, আর উঠছে না।

কঠিন বাস্তবে ফিরে এসে সরমা ধমক দিল, "উঠছে না কি বলছিস? তাড়িয়ে দে। একা না পারিস, হরি সিংকেও ডাক। জামা-কাপড় কেমন? ভদ্রলোকের ছেলে?"

চাকর জানাল যে লোকটির পরিচ্ছদ রীতিমত অপরিচ্ছন্ন এবং সে সোফায় নির্বিঘ্নে আসন সংগ্রহ করেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

সরমা বিরক্ত হল। এ গৃহে সে-ই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, মৃত পিতা যথেষ্ট অর্থসঙ্গতি রেখে গেছেন। সামাজিক অসঙ্গতি দূর করবার জন্য এক দূরসম্পর্কীয়া পিসিমা এখানে নামমাত্র উপস্থিত আছেন, অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ম্ম ও রন্ধনাদি নিয়েই থাকেন। সুতরাং এই উদ্ধত-স্বভাব শান্তিভঙ্গকারীর ব্যবস্থা সরমাকেই করতে হয়। সুতরাং আপাতত কাব্যগ্রন্থ এবং প্রিয়ব্রতর চিন্তাকে টেবলের উপর জমা রেখে সরমা নিচে গেল। ঝড়ের বেগ তখন বাড়ছে।

ত্বরিত পদে বাইরের ঘরে ঢুকে লোকটির কাছে গিয়ে সে স্তম্ভিত হল। গৃহস্থের শান্তিভঙ্গ করার মত দুর্দ্দান্ত চেহারা লোকটির মোটেই নয়। গাত্র-বর্ণ গৌর, তবে শীর্ণ মুখে ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। রুক্ষ চুলগুলো এত দীর্ঘ যে তার কতকগুলো মুখ ছাড়িয়ে প্রায় চিবুকে এসে পড়েছে। গায়ে একটা তেলচিটে বাদামি রঙের কোট। লোকটি সোফার মধ্যে যেন কুঁকড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে।

সরমা প্রথমে স্বাভাবিক কণ্ঠে ডাকল, "শুনছেন?" তার পর কণ্ঠস্বর উচ্চ করল, কিন্তু কিছুই ফল হল না, লোকটি নির্ব্বিবাদে ঘুমুতে লাগল। চাকর জানতে চাইল ঠেলে তুলে দেবে কি-না। লোকটিকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল। সরমা বলল, "থাক, তোর আর বীরত্ব দেখিয়ে কাজ নেই। এতক্ষণ তুলতে সাহস হয় নি, আসছি। ফিরে এসেও যদি দেখি লোকটি যায় নি; তখন ব্যবস্থা করব। এর মধ্যে লোকটার ওপর একটু নজর রাখিস। এখন কাউকে বিশ্বাস নেই। এই লোকটিও কোনো মতলবে এসেছে কি-না কে জানে!"

অনতিকাল পরেই সে রেণকোটটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়ল। ঝড়ের বিকেলে আর সকলের মত গৃহের আশ্রয়ে লুকিয়ে থাকা তার স্বভাব নয়। কিছু দূর হাঁটবার পরই বৃষ্টি নামল এবং তখনও সে কোনো ট্রাম বা বাস-এ উঠে বসল না। রেণকোটটা খুলে নিল মাত্র। যখন বৃষ্টি থেমে হাওয়ায় গুঁড়ো-গুঁড়ো জল ভাসছে, কেবল তখনই একটা ভদ্রগোছের রেস্তর্াঁয় বসে কফির অর্ডার দিল। কোনো প্রিয়ব্রতর অভাবে কোনো আধুনিকার একটি বিশেষ বিকালও যে নষ্ট হতে পারে না, এইটা দেখানোই বোধ হয় তার উদ্দেশ্য।

মাথায় নীল রঙের বিশেষ টুপিটির তলায় কাঁধের উপর সরমার অজস্র নরম চুল আলগা এলো খোঁপার শাসনে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। তার দীর্ঘায়ত দু'টি চোখ কুমারী-জীবনের নির্জ্জন পথের দিকে রহস্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ও যখন কফির পেয়ালায় রঙিন পুরন্ত দু'টি ঠোঁট ডোবাল ও বুঝতে পারল রেস্তর্াঁর সব কয়টি পুরুষের দৃষ্টি তার রহস্যময় দেহে আবদ্ধ। রেণকোটের কলারের মধ্যে হাসি লুকিয়ে অর্দ্ধভুক্ত পেয়ালা নামিয়ে রেখে সে উঠে দাঁড়াল এবং দাম চুকিয়ে দিয়ে পথে নেমে এল। বর্ষণক্লান্ত হাওয়ায় তখন একটি স্নিগ্ধ উৎফুল্লতা। এই বার সে একটি বাস-এর দ্বিতলে উঠে বসল।

যখন বাড়ি ফিরল, তখন আলোক-সজ্জায় নগরী নটিনীর রূপ ধরেছে। এইবার আবার সে ফ্রান্সের সুরম্য উপত্যকায় ফিরে যাবে। সদর দরজায় সে চাকরকে প্রশ্ন করল, "সেই আপদটা বিদায় হয়েছে ত?"

চাকর সবিনয়ে জানাল, "না দিদিমণি, এখনো ঘুমুচ্ছে।"

"বলিস কি রে, এ যে কুম্ভকর্ণের ঘুম!" সরমা বিস্মিত কণ্ঠে বলল, "চণ্ডুখোর নয় ত? চ' দেখি।"

রেণকোটটা চাকরের হাতে দিয়ে সরমা ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করল। লোকটি ঠিক সেই ভাবেই চেয়ারের আশ্রয়ে নেতিয়ে পড়ে আছে। তবে এতক্ষণের বিশ্রামের পর তার মুখটাকে আর একটু সজীব বলে মনে হল। পোষাক চোস্ত ধোপদুরস্ত না হলেও লোকটিকে অনাহারী মনে হয় না। সব-কিছু জড়িয়ে সে একটি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত চেয়ারে বসে আছে, অর্থাৎ অর্দ্ধশায়িত হ'য়ে ঘুমুচ্ছে।

সরমার আদেশে চাকর ঈষৎ ধাক্কা দিতেই লোকটি এবার উঠে বসল এবং কিছুক্ষণ বোকার মত তাকিয়ে রইল। তার পর দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়েই অস্ফুট শব্দ করে আবার বসে পড়ল।

সরমা প্রশ্ন করল, "কে আপনি? কি হয়েছে আপনার?"

সে অপরাধীর মত অপ্রতিভ কণ্ঠস্বরে যা বলল, তার মর্ম্মার্থ হচ্ছে এই যে, ঝড়ের সময় একটি বড় সাইনবোর্ড স্থানচ্যুত হয়ে তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে পড়ে। কিছু বরফ দিয়ে যন্ত্রণা কমলে সে পাশেই এই বাড়ির দরজা খোলা পেয়ে এখানে ঢুকে পড়ে এবং চেয়ারে বসেই নিদ্রাভিভূত হয়। এখন একটা রিক্স ডেকে দিলে সে চলে যেতে পারে।

সরমা বলল, "কই জুতোটা খুলুন, দেখি আপনার পায়ের

লোকটি আশ্চর্য্য হয়ে সরমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, "আমার কথায় সন্দেহ করছেন? তাহলে দেখুন।"

এই বলে সে জুতো খোলবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না, একটা যন্ত্রণাসূচক শব্দ করল। কিন্তু তবুও জুতো ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। তার সুন্দর মুখ রক্তোচ্ছ্বাসে লাল হয়ে উঠল।

সরমা বলল, "থাক থাক, ও খুলবে না।"

লোকটি বিব্রত হয়ে প্রশ্ন করল, "তাহলে কি করে আমি প্রমাণ করব যে আমি মিথ্যে বলিনি?"

সরমা মৃদু হাস্যে উত্তর দিল, "প্রমাণ আপনাকে করতে হবে না, আমি সন্দেহ করেও বলিনি। বুঝে দেখা দরকার আপনার বাড়ি যাওয়ার মত অবস্থা আছে কি না। মধু, যা ত, দেখে আয় ডাক্তার বাবু ফিরেছেন কি না? যদি থাকেন, ডেকে আনবি।"

লোকটি বাধা দিতে গেল, কিন্তু চাকর গৃহকর্ত্রীর আদেশ পালন করতে চলে গেল। সরমা একটি চেয়ারে বসে প্রশ্ন করল, "আপনার নাম কি, থাকেন কোথায়?"

"আমার নাম প্রদীপ, প্রদীপ সেন। থাকি শ্যামবাজারের একটি মেসে।"

"শ্যামবাজারে! অত দূরে এই রাত্রে এই পা নিয়ে যাবেন কি করে? তবে যে রিক্স ডাকতে বলছিলেন? রিক্স করে শ্যামবাজার যাবেন নাকি? তাহলে ত কাল ভোরে পৌছবেন।"

সরমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। হয়ত বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল যে লোকটি পাগল কি না। ঝড়ো সন্ধ্যায় প্রিয়ব্রতর বদলে আবির্ভাব হল কি না এক জন অপ্রকৃতিস্থ অদ্ভুত ব্যক্তির!

প্রদীপ মুখ নামিয়ে বসে রইল। মনে হল তার ঠোঁটের পাশে ছোট একটি হাসি কাঁপছে। ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে পড়লেন এবং অনেক কষ্টে জুতো খুলে আবিষ্কার করলেন যে, বুড়ো আঙুলটি স্ফীত হয়ে লাল হয়ে উঠেছে। তিনি তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দিলেন যে হাড় ভেঙেছে কি না তা যখন বোঝা যাচ্ছে না, আপাতত নড়াচড়া ক্ষতিকর হবে। তারপর যথাকর্ত্তব্য উপদেশ দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

তখন প্রদীপ বলল, "এখন বুঝতে পারছেন যে আমি মিথ্যা কথা বলিনি। তবে এখানে থেকে আমি আপনাকে ভোগাতে চাই না। যা বলছিলাম, আপনার চাকরকে একটা রিক্স ডেকে আনতে বলুন। বাস-রুটে পৌছে রিকসওয়ালা আমাকে বাস-এ তুলে দেবে।"

প্রিয়ব্রত এখনো এল না, সরমা ভাবছিল, তার পরিবর্ত্তে ঘাড়ে চাপল এই হাঙ্গামা। একটু প্রশ্রয় দিলে ঘাড় থেকে নামতে অনেক বিলম্ব হবে। অথচ এই অবস্থায় রূঢ় হওয়াও বিসদৃশ। সব চেয়ে মুস্কিলের কথা এই যে, বাড়িতে পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই। তার মনের দিগন্ত থেকে সৌননদীর উপত্যকা মিলিয়ে গেছে, অনতিকাল পূর্ব্বের কলকাতা সহরের ঝড়ের চিহ্নমাত্র নেই। সে চেয়ে দেখল, প্রদীপ মুখ নামিয়ে ব'সে আছে, রোগা দুর্ব্বল শরীরটা সামনের দিকে ঝেঁকে রয়েছে আর বড় বড় চুলগুলো মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে।

সরমা দাঁড়িয়ে উঠে চাকরকে আদেশ দিল, "পাশের ঘরে তক্তাপোষের উপর একটা বিছানা পেতে দে। আর কিছু গরম দুধ আর পাউরুটি এনে দে।" এই বলে সে তর-তর করে' সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল।

স্নানাহার সেরে স্নিগ্ধ শরীরে জানলার ধারে সরমা দাঁড়াল। তখনো জলো হাওয়া দিচ্ছে। মনে একটি চমৎকার আমেজ ঘনিয়ে এল, গোলাপের গন্ধের মত। ঝড়ের পর জীবনের চেহারাটা যেন সাময়িক ভাবে বদলে যায়। চিরাচরিত ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দাবী করে। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সরমা আলমারী থেকে একটি বই নিয়ে বিছানায় এল। বইটি একটি বিলাতি পত্রগুচ্ছ, কোনো স্ত্রী তার নারী-হৃদয়ের অনেক অভিযোগ তার স্বামীকে শুনিয়েছে।

হঠাৎ নিচে থেকে একটা আর্ত্ত চিৎকার ভেসে এল। সরমার চকিতে মনে পড়ে গেল যে, একজন অপরিচিত লোক বাড়িতে রয়েছে, সম্পূর্ণ ভাবে অজ্ঞাতকুলশীল। সরমা সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নিচে কি হচ্ছে কে জানে! রাত তখন প্রায় এগারটা। পাড়া নিশুতি হয়ে এসেছে। এবার একটা গোঙানির শব্দ হতে লাগল। সরমা টর্চটা বের করে সেটা জ্বেলে নিচে নেমে এল।

নিচে এসে সে বুঝতে পারল, যে-ঘরে লোকটিকে শুতে দেওয়া হয়েছে সেই ঘর থেকেই শব্দ আসছে। সে দরজায় টোকা দিয়ে প্রশ্ন করল, "আসতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে।" ভিতর থেকে প্রদীপ উত্তর দিল। তারপর সরমা ঘরে ঢুকলে ক্ষীণ কণ্ঠে টেনে টেনে বলল, "আপনারই ঘর-বাড়ি, আপনাকে অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হবে? আমার চিৎকার শুনে নেমে এলেন বুঝি? আমি দেখেছি চেঁচালে যন্ত্রণা কম থাকে। কিন্তু আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালাম বলে ভারী লজ্জিত বোধ করছি।"

"যন্ত্রণায় একজন কাৎরাচ্ছে আর নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করব, এই রকম লোক ঠাওরালেন নাকি? যাক সে কথা। আপনার কি কষ্ট হচ্ছে বলুন এইবার।" এই বলে সরমা ঘরে যে একটিমাত্র ভাঙা চেয়ার ছিল সেটিতে চেপে বসে পড়ল।

তারপর প্রদীপের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, তার মুখটা যেন রক্তশূন্য। উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করল, "আপনার কি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?"

দাঁতে দাঁত চেপে ঘাড় নেড়ে প্রদীপ জানাল যে, সত্যিই তার অপরিমিত যন্ত্রণা হচ্ছে।

সরমা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি সারিডন আনছি, আমার কাছে আছে।"

এই বলে সে আবার উপরে গেল এবং অনতিবিলম্বেই একটি ট্যাবলেট ও এক গ্লাস জল নিয়ে নেমে এল।

প্রদীপ ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল, "কিন্তু গোটা পা-টায় এত যন্ত্রণা হচ্ছে, আমি কি উঠতে পারব?"

"ওঠবার দরকার নেই, আমি মুখে দিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে সরমা কাছে এসে বসে বলল, "হাঁ করুন।" বড়িটা মুখে ফেলে দিয়ে চিন্তিত ভাবে বলল, "জল দি কি করে? দাঁড়ান একটা চামচে নিয়ে আসি।" তারপর আবার উপরে চলে গেল। ধীরে ধীরে কয়েক চামচ জল মুখে দেবার পর প্রদীপ প্রসন্ন হাস্যে বলল, "আপনার চাকরটা গেল কোথায়?"

"তার এখন নাক ডাকছে।"

"আমাকে নিয়ে কি হাঙ্গামাই পোয়াতে হল আপনাকে ?"

এই অতি সত্য কথাটার কি বা উত্তর দেবে সরমা ? তাই সে নিঃশব্দে বসে রইল। নেহাৎ বিপদে পড়ে তারই বাড়িতে অতিথি হয়েছে, নইলে এই ক্ষান্তবর্ষণ নিভৃত রাত্রিটা আরো মনোরম, আরো মনোমত ভাবে কাটাত। কিন্তু রাত্রি এখনও ত অনাবিষ্কৃত, সরমা নিঃশ্বাস চেপে ভাবল, এই তুচ্ছ লোকটির সঙ্গে সেই আবেগে স্পন্দিত রোমাঞ্চিত রাত্রির মূল্যবান মুহূর্তগুলির অপব্যয় করবার কোনো সঙ্গত কারণ উপস্থিত হয় নি। ঝড়ের সময় পথে এক অপরিচিত পথিকের পায়ে কিছু আঘাত লেগেছে মাত্র। পায়ের আঙুলে একটু আঘাতে যে-ব্যক্তি এতটা বিচলিত হয় তার রাস্তায় বেরুনো কেন ? সে ডি-এল-রায়ের সেই লোকপ্রসিদ্ধ নন্দলালের মত বাড়িতে বসে থাকলেই পারত!

"আপনি শুয়ে পড়ুন গে, অসময়ে ঘুমিয়ে আবার শরীর খারাপ হবে। সারিডন খাওয়া হয়েছে, শীঘ্রই কমে যাবে। চলুন, উঠুন।" প্রদীপ বলল।

তার আগ্রহাতিশয্যে সরমা উঠে দাঁড়াল। বলল, "তাহ'লে বিশ্রাম নিন। রাত্রে কোনো প্রয়োজন হলে ডাকতে সঙ্কোচ করবেন না।"

"একটু দাঁড়ান," প্রদীপ বলল, "কাল সকালে আমাকে হাসপাতালে যাবার অনুমতি দিয়ে যান।"

এক পলক ভেবে সরমা উত্তর দিল, "আপনি হাসপাতালে যাবেন, তাতে আমার অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই। বরং ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখবেন। হয়ত তাঁর অনুমতির দরকার থাকতে পারে।" এই বলে সরমা দরজার পাশে এসে দাঁড়াল।

"আর ডাক্তার যদি আমাকে এখানে আরো পাঁচ-সাত দিন আটকে রেখে দেন ?" প্রদীপ যেন অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করল।

"থাকবেন।" নিশ্চিন্ত ভাবে এই বলে সরমা দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

"তাহলে আর একটা কথা আছে, শুনে যান।" প্রদীপ প্রায় চিৎকার করে উঠল।

সরমা ঘরের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করে ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বলল, হয়ত তার কণ্ঠস্বরে কিছু রূঢ়তাও এসে গিয়েছিল, "দেখুন, আমি অভিভাবক হীন ভাবে থাকি, মাঝরাত্তিরে এমন চেঁচামিচি করবেন না। কি বলছিলেন, বলুন।"

প্রদীপ অত্যন্ত দমে গিয়ে বলল, "তাহলে আমার এই ব্যাগটা আপনার কাছে রেখে দিন। এখানেই থাকি, আর হাসপাতালেই থাকি, যাবার আগে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাব।"

এই বলে সে বালিশের তলা থেকে একটি মানিব্যাগ বের করে সরমার দিকে তুলে ধরল।

সরমা প্রথমটা বিস্মিত হল, তারপর দ্বিধার মধ্যে পড়ল। অপরিচিত লোকটি এই ভাবে কোনো প্যাঁচ খেলছে না ত! তারপর হাসি চেপে ভাবল, কতই বা থাকবে! পাঁচ-দশ টাকা হারাবার ভয়ে হয়ত লোকটা চিন্তিত হয়েছে। সে যেন শ্লেষের স্বরেই প্রশ্ন করল, "কেন এ ভাবে আমাকে জড়াতে চাইছেন ? কত আছে ওতে?"

"কি জানি! হয়ত হাজারখানেক আছে। কিছু কম-বেশী হতে পারে।" প্রদীপ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিল। হয়ত শ্লেষটা তার কানে গেছে, মনে গেছে।

প্রদীপ আবার বলল, "এটা আমার কাছে রাখতে সাহস পাচ্ছি না। এই নিন। আমি একটু ঘুমুবার চেষ্টা করি। আপনার সারিডনে কাজ হয়েছে।"

সরমা যন্ত্রচালিতার মত ব্যাগটা নিয়ে সেটি খুলে টাকা গুণতে গেল।

প্রদীপ অস্থির ভাবে বলল, "ও পরে দেখবেন এখন। যান, যান, বিশ্রাম করুন গে। আমাকে নিয়েই সারা রাত কাটিয়ে দেবেন নাকি ?"

কথাগুলো প্রদীপ এমনি সাধারণ ভাবেই বলেছিল, কিন্তু সরমার সমস্ত মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। লোকটার কি কাণ্ডজ্ঞান বলে কোনো বস্তু নেই নাকি ? না যন্ত্রণায় অর্দ্ধ রাত্রে তা হারিয়ে ফেলেছে! সে ব্যাগটা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি উপরে চলে গেল। একটু পরেই সে প্রদীপের ঘরে আলো নেবাবার শব্দ শুনতে পেল। নিজের ঘরে সে গুণে দেখল, হাজার টাকার কিছু বেশীই আছে।

এইবার আর একটা দুশ্চিন্তা তার মনকে অধিকার করল। লোকটা এই টাকা কোথাও থেকে সরিয়ে আনে নি ত! এখন বেগতিক দেখে সেইটিই তাকে গছিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় হয়ত। হয়ত এগুলির কতকগুলিতে বিশেষ চিহ্ন আছে। কিংবা হয়ত অন্য কোথাও নম্বর লেখা আছে। শেষ রাত্রেই হয়ত পুলিশে বাড়ি ভরে যাবে, আর হাতে-নাতে ধরা পড়বে সরমা। তার ইচ্ছা করল ব্যাগটা প্রদীপকে ফিরিয়ে দিয়ে আসে। তাই সে আবার নেমে এসে প্রদীপের ঘরের দরজার পাশে দাঁড়াল।

তার পদশব্দ নির্জ্জন রাত্রে শুনতে এবং চিনতে পেরেই হয়ত প্রদীপ বলল, "আবার এলেন কেন ? রাত্রে কি ঘুমুবার ইচ্ছে নেই ? এ আপনাকে আমি ভারী মুস্কিলে ফেললাম বলে মনে হচ্ছে। যদি আর কিছু বলবার থাকে কাল সকালে বলবেন। আজ এখন বিশ্রাম নিনগে।"

সরমা দরজায় হাত দিয়ে দেখল, তা ভিতর থেকে বন্ধ। অগত্যা সে উপরে নিজের ঘরে চিন্তিত মনে ফিরে এল। ব্যাগটা ড্রয়ারে রেখে দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে সে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। রাত্রি গভীর হয়েছে, পথে একটি পথচারীরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। হয়ত কাল সকালেই পাড়াটা লাল পাগড়ীতে ভরে যাবে। তখন সরমা মুখ লুকাবে কোথায় ? মুখ দেখাবে কেমন করে ? লোকটাকে তখনি একটা ট্যাক্সিতে তুলে ট্যাক্সি-খরচ দিয়েও ঘাড় থেকে নামাতে পারলে লোকসান ছিল না।

সরমার মনে বৈকালী ঝড়ের ও ফরাসী কাব্যের সব কিছু মাধুর্য্য ফুরিয়ে গেল। একটা নিদারুণ অস্বস্তি তার চেতনার সমস্ত কেন্দ্রে কেন্দ্রে মোচড় দিতে লাগল। অথচ চেহারায় ও ভাবে-ভঙ্গীতে লোকটিকে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। প্রশস্ত কপালে বুদ্ধিমত্তার ছাপ রয়েছে। হয়ত সরমার এ-সব দুশ্চিন্তা সম্পূর্ণ অমূলক। এক জন আশ্রয়প্রার্থী বিপন্ন ব্যক্তি সম্বন্ধে একটু আগের চিন্তার জন্য সরমা রীতিমত লজ্জিত বোধ করল। অর্দ্ধরাত্রি তখন অতীত হয়েছে। সরমা ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দিল। ঘুমের আবেশ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার কানে

বাজতে লাগল প্রদীপের কথাগুলো, "সারা রাত আজ আমাকে নিয়েই কাটাবেন নাকি ?"

পরদিন সরমার ঘুম ভাঙতে কিছু বিলম্বই হয়ে গেল। শরৎকালের সকালে বাতাসে একটি সুস্বাদু উৎফুল্লতা, রক্তে একটি মধুর উত্তেজনা বোধ করা যায়। বিছানায় উঠে বসে জানলার বাইরে রৌদ্রালোকিত আকাশের দিকে তাকিয়ে সরমা ঠিক করল, আজকের সকালে সে আর প্রিয়ব্রতের জন্য অপেক্ষা করবে না, চা খেয়ে নিজেই তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে। তার পর তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে আজকের দিনটি কাটবে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। পূর্ব্বে এই শরৎকালেই রাজারা দিগ্বিজয়ে বেরুতেন, আজ সরমা যাবে কোনো দুঃসাহসিক অভিযানে।

কিছুক্ষণ পরে গরম চায়ের পট‌টি টেবলে তার সামনে নামিয়ে দিয়ে চাকর জানাল যে, কালকের সেই বাবুটির সকাল থেকে জ্বর হয়েছে।

পেয়ালায় চা ঢালতে ভুলে গিয়ে সরমা বলে উঠল, "তার মানেই সেপটিক হয়েছে। মানে, বেশ কিছু দিন ভোগাবে। জ্বর কি বেশী হয়েছে নাকি রে ?"

চাকর জানাল, সে তা পরীক্ষা করে দেখেনি। বাবুটি চুপচাপ শুয়ে আছেন। শুধু এক কাপ চা খেয়েছেন, আর কিছুই খান নি !

সরমার মন থেকে সকালের সমস্ত মাধুর্য্য নিঃশেষে মুছে গেল। এমন ফ্যাসাদ ! ডাক্তার ডাকাতে হবে, প্রয়োজন হলে পেনিসিলিন ইন্‌জেকসনের ব্যবস্থা করতে হবে। পথ্যের ব্যবস্থা আছে। এই ধরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ হাঙ্গামা বাড়িতে পুষে রেখে ফূর্ত্তি করতে বেরুনো চলে না।

সরমা নিচে গিয়ে দেখল, প্রদীপ চোখ বুজে শুয়ে আছে। কপালে হাত দিয়ে দেখল ঈষৎ গরম হয়েছে। প্রদীপ তাকিয়ে একটু হেসে বলল, "ও কিছু না, ব্যথার জন্য হয়েছে।"

"বুঝেছি, পেনিসিলিন দিতে হবে। কিন্তু একটা কথার ঠিক উত্তর দেবেন ?" সরমা প্রশ্ন করল।

"সম্ভব হলে দেব।" প্রদীপ ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল।

"ও-টাকা আপনি কোথা থেকে পেলেন ?"

"কাছে রাখতে ভয় হচ্ছে বুঝি ?" প্রদীপ আবার হাসল। সে হাসি শরৎ-প্রভাতের শেফালি ফুলের মতই ম্লান। বললে, "ও আমার নিজের সম্পত্তি, নিজের রোজগার করা। আমার রিসার্চের জন্য জমানো টাকা। যদি বিশ্বাস না হয়, আমার কাছে দিয়ে যান আর একটা ট্যাক্‌সি ডাকতে বলুন।"

"ট্যাক্‌সি নিয়ে কি করবেন ?" সরমা লজ্জিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

"আপনাকে এই সব অনর্থক হাঙ্গামা থেকে মুক্তি দিয়ে যাব। দয়া করে একটা ট্যাক্‌সি ডাকতে বলুন আপনার চাকরকে।" প্রদীপ ব্যগ্র কণ্ঠে বলল।

"আপনি একটু স্থির হয়ে শুয়ে থাকুন ত, আমি সব ব্যবস্থা করছি।" এই বলে সরমা বাইরে এসে চাকরকে বলল ডাক্তার ডাকতে।

তার পর ড্রয়িং-রুমে ঢুকে দেখল, প্রিয়ব্রত বসে আছে, সঙ্গে আরো অনেকে। তাকে দেখে তারা কলরব করে উঠল। বলল, "সরমাকে আর পাঁচ মিনিটও সময় দেওয়া হবে না, তৎক্ষণাৎ তাদের সঙ্গে তাকে বেরুতে হবে।"

সাফ বলল, তার বেরুনো অসম্ভব, কারণ বাড়ীতে রুগী।

"কার অসুখ করেছে, পিসিমার ?" অনেকে জানতে চাইল।

"না।"

"কোনো আত্মীয় এসেছেন ?"

"তাও না।"

"তবে কার জন্যে আমাদের তোমার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করবে সরমা ?" প্রিয়ব্রত প্রশ্ন করল। মনে হল তার কণ্ঠস্বরে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এবং হয়ত বা প্রচ্ছন্ন ক্ষুব্ধতা।

"যা যা, আর গিন্নিমী করিস না, কাপড়টা বদলে আয়। আমরা তোকে না নিয়ে কিছুতেই যাব না। রুদ্রপ্রসাদের অমন বাগান-বাড়ীটা পাওয়া গেছে, আর খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা সেখানে চলে গেছে। এখন তোকে ছেড়ে আমরা নড়ব ভেবেছিস ?" এক জন বান্ধবী বলল।

সরমা এক বার প্রিয়ব্রতর দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, আমি আসছি।" এই বলে ভিতরে চলে গেল।

চাকর তখনো ডাক্তারকে নিয়ে ফেরেনি। অবশ্য বাড়ির পুরনো ডাক্তার। অবস্থা বুঝে ঠিকই ব্যবস্থা করবেন। সে শুধু পিসিমাকে বলে গেল, রুগীর পথ্যের ব্যবস্থা করতে। যে-জীবনে সে অভ্যস্ত তারই সহচর-সহচরীরা এসেছে ছুটির ডাক নিয়ে, এই শরৎকালের সকালে, শরীরে যখন একটি মিষ্ট উত্তেজনা। তাছাড়া সঙ্গে থাকবে সর্ব্বক্ষণ প্রিয়ব্রত। পল্লবছায়ায় আজকের দিনটি খুসীতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে। বাড়ির পুরানো চাকর রইল, পিসিমা রইল, ডাক্তারবাবু আসছেন। কাজেই রুগীর কাছে তার কর্ত্তব্যে ত্রুটি কোথায় ? আগের দিনের ঝড়ো ধোওয়া বাতাস আজ নির্মল, সজীব। নিজের উপর কর্ত্তব্যে অবহেলা সরমা কেমন করে করবে ? সে তৎপরতার সঙ্গে সাজ-সজ্জা করে নেমে এল।

প্রমোদ-ক্লান্ত সরমা যখন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরল, তখন তার শরীর অবসন্ন কিন্তু মনে একটি ঝিরঝিরে খুসীর হাওয়া বইছে। প্রথমে সে গিয়ে স্নান করে নিল। তার পর চাকরকে ডেকে প্রশ্ন করল, "লোকটি কেমন আছে ?" চাকর জানাল যে, লোকটি বিকেলেই চলে গেছে।

"হেঁটে গেছেন ?"

"আজ্ঞে না। একটা রিক্‌স ডেকে দিলাম।"

"খোঁড়াতে খোঁড়াতে গেল ত ?"

চাকর ঘাড় নেড়ে জানাল যে, সরমার অনুমান অভ্রান্ত।

তার পরই সরমার মনে পড়ল যে, লোকটির অনেকগুলো টাকা সরমার কাছে জমা রয়ে গেল। হয়ত আবার আসতে পারে।

"কোনো ঠিকানা রেখে গেছে ?"

"আজ্ঞে না।"

ঝড়ের হাওয়া ঠিকানা না রেখে এমনি সহসাই বিদায় নেয়। কিন্তু সে মনের প্রান্তে কিছু কি রেখে যায় ? সরমা অন্যমনস্ক ভাবে বসে রইল।

দেখুন!
অর্দ্ধেকটা
সানলাইট
সাবানেই এ সব
কাচা হয়েছে!
সানলাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারণ!
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট
সাবান
দিয়ে কাচলে কাপড়জামা সাদা ও উজ্জ্বল হয়।

বিবেকানন্দ স্তোত্রে
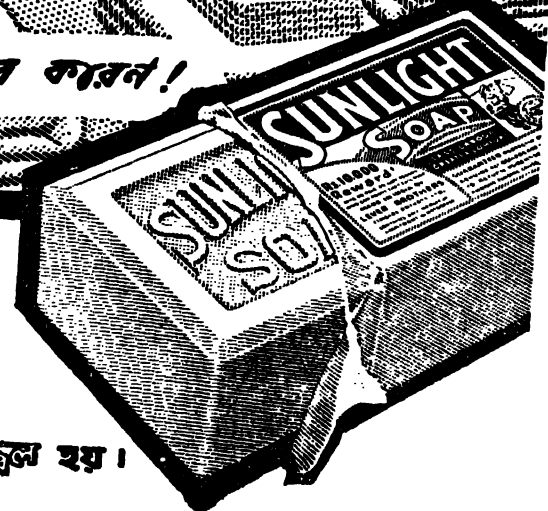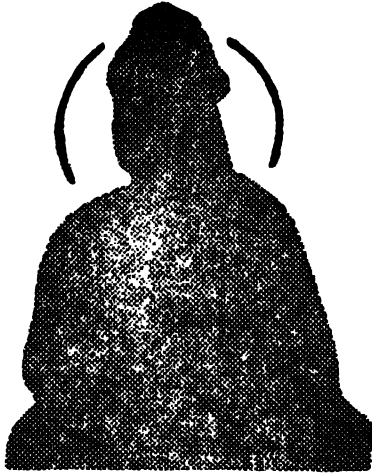
সুমণি মিত্র

৩৮

নির্বিচারে কোনোকিছু মানা
নরেনের ধাতেই লেখে না।
বিশ্বনাথ দত্ত তাই দেখে,
ছেলেবেলা থেকে,
নরেনের মোহমুক্ত শাখায়িত মন
পরিপূর্ণ মহিমায় বেড়ে ওঠে যাতে
তারই দিকে সচেষ্ট হন।

প্রচলিত নীতিবোধ দিয়ে
বিধি আর নিষেধের দড়াদড়ি নিয়ে
কোনোদিন বাঁধেননি তাকে।
স্বাধীন হিসেবি বুদ্ধিটাকে
বিচারের সুবিস্তীর্ণ মাঠে
নির্ভয়ে দিয়েছেন ছেড়ে।
স্বযত্ন পোষণ কোরে তার
চিন্তাশক্তি নেননিকো কেড়ে।
বাধাহীন বিস্তার পেয়ে
সজীব বিবেকীবুদ্ধি তার
আনন্দে বেড়ে ওঠে
অসংখ্য ডালপালা নেড়ে।

তাছাড়াও তর্ক কোরে তার
বেড়ে যায় বুদ্ধির ধার।
কত দিন নরেনের কাছে
যুক্তির প্রবল আঘাতে
বিশ্বনাথ মেনেছেন হার।
সানন্দে পেছু হটেছেন,
মনে মনে গন্ধ পেয়েছেন
ত্রিলোকসন্ত্রাসী ঐ
পাগড়ি-পরা তর্ক-যোদ্ধাটার!

* * *

তাই দেখি এই—
কেউ কিছু বোঝাতে গেলেই
সশব্দে রুখে ওঠে নরেনের মন;
কিছুতেই নেবে না তা'
যুক্তি না বলে যতক্ষণ।
তাই যদি বলো—চাঁপাগাছে
ব্রহ্মদত্যি ওৎ পেতে থাকে,
চাঁপাগাছে মাচা বেঁধে
মাঝরাতে দেখে নেবে তাকে।
যদি বলো—ছুঁলে জাত যায়,
এমন কি হুঁকো ছুঁলে
ম্লেচ্ছে যা খায়,
নরেন তা বেশি কোরে ছোঁবে।
হুঁকো থেকে সশব্দে টেনে নেবে ধোঁয়া;
ট্রাম যায় বাস যায়,
দেখে নেবে জাত যায় কি না।

৩৯

সকলে যে খোঁটা দাও তর্ক করি' বোলে,
বলো দেখি আহম্মক 'তর্ক' মানেটা কি?
তর্ক মানে গলাবাজি নয়,
যুক্তির লাঙ্গল টেনে বুদ্ধির চাষ।
ছাগোলের মত কিংবা তোমাদের মত বুদ্ধি হোলে
যাই পাবো তাই খেয়ে পেট হড়কাবে।
যুক্তি দিয়ে মাজা টেনে বুদ্ধিখানা চাঙ্গা রাখি তাই।
তাতে যদি হই নাস্তিক,
তবু তা'তে খুশি হবো আমি।
তা-বোলে ছটাকে-মাথা তোমাদের মত
তেত্রিশ কোটি ঐ দেবতার পায়ে
নির্বিচারে মাথা কুটে মাথা ফাটাবো না।

*For
It is better
That mankind should become atheist

---

* "বিশ লক্ষ দেবতাকে অন্ধ বিশ্বাস করার চেয়ে যুক্তিকে অনুসরণ কোরে নাস্তিক হওয়া ও ভালো।"
—Practical Vedanta (৫৩পৃঃ)

By following reason
Than blindly believe
In two hundred millions of gods"...

আর তা'ছাড়া,
বুদ্ধির বেড়াটা যদি না দি',
মিথ্যেটা যে সত্যের অভিনয় কোরে
চুরি কোরে নিয়ে যাবে সত্য-সীতাকেই !
সত্য উদ্ধার হবে ঠিকই,
কিন্তু সে কি সোজা কথা নাকি ?
কত কাঠ, কত খড় লাগবে বলতো ?
তাই আমি বোলি আহম্মক,
আগে-ভাগে বুদ্ধির বেড়াটাকে পাকা কোরে নাও।
তাতে যদি হও নাস্তিক
তবু বুঝি বেঁচে আছো তুমি

"I would rather see
Every one of you
Rank atheists
Than superstitious fools,
For the atheist is alive,
And you can make
Something out of him.
But
If superstition enters
The brain is gone"...*

'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু' তা আমিও জানি
পুরোনো nonsense নিয়ে জ্যাঠামি কোরো না।
বিশ্বাসের ছাতি পেলে আমিও তো বাঁচি।
কিন্তু বিনা লোহার কাঠিতে
ছাতাটা কি খুলে রাখা যায় ?
মাথায় কি তুলে রাখা যায় ?
আমি তাই
যুক্তির লোহার কাঠি চাই ;
মাথার ওপরে ঐ বিশ্বাস যে খাড়া কোরে রাখে।
বুদ্ধির সোনার কাঠি চাই ;
তন্দ্রাতুর মনটাকে যে সজাগ রাখে।
তাতে যদি তোমরা আমাকে
'গোঁয়ার-গোবিন্দ' বোলে বদনাম করো,
তাহোলে সত্যিই তোমরা করুণার পাত্র কিনা বলো ?

৪০

'কায়েতের ছেলে' ঐ
বুদ্ধিবাদী নরেন্দ্রনাথ
'ধ্যানসিদ্ধ সপ্তঋষির
অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকেও
একদিনে মানেনি হঠাৎ।
নিঃশব্দে মেনে নেবে সব,
নরেন কি সেই-গর্দভ ?

বুদ্ধিকে সর্বদা জাগ্রত রেখে,
যুক্তির শেষ ধাপে উঠে যদি দেখে
হৃদয়ের অনুভূতি যুক্তির পারে,
তবেই সে নির্ভয়ে মেনে নিতে পারে।
একেই তো ইন্দ্রিয় করে প্রতারণা,
তার ওপরে মানুষের যশের বাসনা
জেনে শুনে তুচ্ছকে প্রশ্রয় দেয়,
তিলটাকে তাল কোরে আনন্দ পায় !
প্রেমাশ্রু ডেকে আনে তেল দিয়ে চোখে,
মূর্চ্ছাতে সমাধির সাইনবোর্ড ঠোকে !
পরকে ঠকাতে গিয়ে চোখে ছানি পড়ে,
মূর্চ্ছিত হোতে হোতে মৃগীরোগ ধরে।
ধর্মের হাটে এই চোরা কৌশলে
নিজেরই পকেট কেটে লালবাতি জ্বলে !

"Never mistake
Hysterical trances
For the real thing.
It is a terrible thing
To claim this inspiration falsely,
To mistake instinct
For inspiration."*

* * *

আমার তো মনে হয় সেই কারণেই
যুক্তিকে কোনোদিন ঠেলেনি নরেন !
সত্যাশ্রয়ী ঐ বিবেকী হৃদয়
যুক্তিরই মাধ্যমে সত্যকে চায়।

"Stick to your reason
Until you reach something higher,
And you will know it to be higher

---

* "আমি বরং চাই তোমরা ঘোর নাস্তিক হও, কিন্তু কুসংস্কারগ্রস্ত আহম্মক হোয়ো না ; কেন না নাস্তিক তবুও বেঁচে আছে, তার দ্বারা কিছু হবার আশা আছে। কিন্তু কুসংস্কার একবার যদি ঢোকে, তবে মাথাটা একেবারে নির্বীর্য হোয়ে যায়।"
—Lectures From Colombo to Almora (১১১ পৃঃ)

* "স্নায়বীয় রোগের তাড়নায় মূর্চ্ছাবিশেষকে খবরদার সম[াধি] বোলে ভুল কোরো না। অনেকে মিছিমিছি সমাধি হোয়ে[ছে] বোলে দাবী কোরে থাকে, সহজাত প্রবৃত্তিকে সমাধি অবস্থা বো[লে] ভুল কোরে থাকে—এ বড় ভয়ানক কথা।"
—Inspired Talks. (পৃঃ ১৩[...]

Because
It will not jar with reason...
Real inspiration never contradicts reason,
But fulfils it."*

সত্য যতই হোক যুক্তির পারে,
যুক্তিই সে কথাটা বোলে দিতে পারে।

"We must follow reason
As far as it leads,
And when reason fails
Reason itself will show us
The way to the highest plane...
All religion is going beyond reason
But
The reason is the only guide to get there."†

যুক্তিকে মেনে যদি ঠ্যাকে, তাই সই।
লাভ যদি নাই হয়, লোকসান নেই।—

"first hear,
Then reason
And find out all
That reason can give...
Let the flood of reason
Flow over it,
Then take what remains.
If nothing remains,
Thank God
You have escaped a superstition."‡

৪১

তাই দেখি নরেনকে ঠাকুর যখন
বোল্লেন—"তুই হলি নর-নারায়ণ,"
অতবড় লোভনীয় পরিচয়টাকে
এক ফুঁয়ে বেমালুম ফেলে দিলে তাকে!

কেশব ও নরেনের প্রসঙ্গে ফের
ঠাকুর বলেন যেই—"এই কেশবের
খ্যাতির মূলেতে আছে যে-শক্তি ওর,
সেরকম আঠারোটা শক্তি আছে তোর।
কেশবের জ্ঞানালোক দীপশিখা হোলে,
তোর জ্ঞান সূর্যের মত বলা চলে।"

এত বড় প্রশংসা শুনে তার মন
খুশিতে ফেনিয়ে উঠে করেনি হজম।
নরবৎ নরেন কি ও-কথায় ভেজে?
"আরে ছি-ছি বলেন কি, লোকে হাসবে যে?
কোথায় কেশব আর কোথায় নরেন!
বলুন কি যুক্তিতে ও-কথা বলেন?
পাঁচজনে শোনে যদি বোলবে কি তারা?
এ-কথা কি বলে কেউ উন্মাদ ছাড়া?"

—"উন্মাদ হবো কেন? মা যে দেখালেন,
অতএব যা বলেছি তা ঠিকই নরেন।"

অমনি ঝাঁঝিয়ে ওঠে নরেন্দ্রনাথ,—
"মার নামে বাজেকথা—একি উৎপাত!"
সশব্দে ছুঁড়ে মারে যুক্তির বাণ,—
"ওটা হোলো আপনার মাথার ব্যারাম।
মাথার খেয়ালে লোকে শোনে কত বাণী,
তাইবোলে ও-কথা কি মেনে নেবো আমি?"

—"কি বল্লি? মা আমায় দেখালেন যে রে।
মার কথা কখনো কি ভুয়ো হতে পারে?"

তবুও নরেন্দ্র কি ছেড়ে কথা কয়?—
"মাথাটা গরম হলে ও-অমন হয়।
ইন্দ্রিয় তাগ বুঝে সেই ফাঁকতালে
বুদ্ধিকে ম্লান কোরে বাজেকথা বলে।
ও-দেশের দর্শনে আছে এ-খবর,
আমাদের ইন্দ্রিয় পাকা জোচ্চোর।
তাছাড়া কাউকে যদি কেউ বেশি ভাবে,
তাহোলে তো কথা নেই, আরোই ঠকাবে।

* "যতদিন না যুক্তি-বিচারের অতীত কোনো তত্ত্বলাভ কোরছো, ততদিন তুমি তোমার যুক্তিকে ধরে থাকো। আর ঐ অবস্থায় পৌছোলে তুমি তার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝে নিতে পারবে, কারণ ও অবস্থা তোমার যুক্তির বিরোধিতা কোরবে না। আসল উদ্দীপনা কখনো যুক্তির বিরোধিতো করে না বরং পূর্ণতা এনে দেয়।"
—Inspired Talks. (পৃ: ১৩৬) Raja Yoga (পৃ: ১৭)

† "আমরা যুক্তিকেই অনুসরণ কোরে যতদূর যেতে পারি যাবো, তারপর যখন আর যুক্তিতে কুলোবে না তখন ঐ যুক্তিই আমাদের চরম অবস্থায় পৌছোবার রাস্তাটা বাতলে দেবে।
—Raj Yoga (পৃ: ১৬)
ধর্মলাভ মানে হচ্ছে যুক্তি-বিচারের বাইরে যাওয়া, কিন্তু তার রাস্তাটা যুক্তি-বিচারের ভেতর দিয়েই।"
—Inspired Talks (পৃ: ১৩৬

‡ "প্রথমে শোনো, তারপর সে-সম্বন্ধে বিচার কর—বিচারের দ্বারা কতদূর জানতে পারা যায় তা দেখ; তার ওপর দিয়ে বিচারের বন্যা বইয়ে দাও—তারপর বাকি যা থাকে তাকে গ্রহণ করো। যদি কিছুই না থাকে, তবে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে তুমি একটা কুসংস্কার এড়ালে।"
—Inspired Talks (পৃ: ১৩৭)

আমাকে যে আপনার ভালো লাগে তাই
গলদটা সেইখানে, মা দেখান ছাই !"

যুক্তির কথা শুনে ঠাকুর ভাবেন—
"সত্যস্বরূপ ঐ শুদ্ধ নরেন
মিথ্যে তো বোলবে না, ও যে তার পার।
তবে যা দেখেছি—সে কি মাথার খেয়াল ?"
এই ভেবে ছুটে যান মার মন্দিরে,—
"নরেন যা বলে তাই সত্যি মা কি রে ?

মা বলেন—"বাজেকথা শুনিস্‌নি ওর,
একদিন সবকথা মেনে নেবে তোর।"

৪২

যে-কথা বোঝাতে গিয়ে এত কথা বলা,
সেটা হোলো নরেনের চোখ চেয়ে চলা।
যুক্তির রাস টেনে বুদ্ধির রথে
সতর্কে যেতে চায় সত্যের পথে।
দড়িকে ও সাপ ভেবে কোরবে না গোল,
সাপকেও দড়ি ভেবে খাবে না ছোবল।
সব কিছু মেনে নেবে, যদি নিজে বোঝে।
অবতার গুরু:কেও মানেনি সহজে।
প্রথমে তো মানেই না অবতারবাদ,
তবু যদি মানে তা ও ঠাকুরকে বাদ!
—"কেউ কেউ বলে নাকি আমি ঈশ্বর ?
আচ্ছা নরেন তোর ধারণা কি বল্‌ ?"

—"বলুক্ যে যার খুশি, বোলি না তা' আমি,
এখনো বুঝিনি যেটা কি কোরে তা' মানি ?" *

* * *

* নরেন। উনি—(ঠাকুর) আমায় বলছিলেন—'কেউ কেউ আমায় ঈশ্বর বলে।'
আমি বললাম—'হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয়, ততক্ষণ বলবো না।'
তিনি বললেন—'অনেকে যা বলবে তাই ত সত্য—তাই ত ধর্ম।'

যাকে অত পরীক্ষা 'দিনে আর রেতে',
একদিন তাকেই সে নেবে মাথা পেতে।
যুক্তির বেনোজল সরে গেলে পর
বোলবে—"আমার গুরু ভুবনেশ্বর।
শাস্ত্রের মর্মটা বুঝে নিতে হোলে
শ্রীরামকৃষ্ণটিকে পড়ো ভালো কোরে।
বেদের ভাষ্য তিনি, আগে বোঝো এঁকে।
ইনিই সত্যযুগ এনেছেন ডেকে।
একটা জীবনে তাঁর এই ভারতের
ধর্মজীবন পাবে সারা কল্পের।
বুদ্ধ ও রামকৃষ্ণ চৈতন্যপ্রভু
যোগ করো, রামকৃষ্ণ হয়নাকো তবু।
কি বোল্লে ? অবতার ? একেবারে হাবা !
ভগবান ? তা-ও নয়, উনি তারও বাবা।" *

[ক্রমশঃ

আমি বললাম—'নিজে ঠিক না বুঝলে অন্য লোকের কথা শুনবো না।' —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৪র্থ ভাগ-৩৮৭ পৃঃ)।

* "ভায়া, রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের বাবা তাতে আমার সন্দেহমাত্র নেই।

দাদা, বেদ-বেদান্ত পুরাণ ভাগবতে যে কি আছে তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বোঝা যাবে না।

He was the living commentary to the vedas and to their aim. He had lived in one life the whole cycle of the national religious existence in India. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলে কিনা জানি না, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংস, the latest and the most perfect." (পত্রাবলী, ১ম, ৩৩৪)

শিষ্য: আপনি তাঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে) অবতার বলে মানেন কি ?

স্বামিজী: তোর অবতার কথার মানেটা কি বল ?

শিষ্য: কেন ? যেমন শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, ঈশা ইত্যাদি পুরুষের ন্যায় পুরুষ।

স্বামিজী: তুই যাঁদের নাম করলি, আমি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁদের সকলের চেয়ে বড় বলে জানি—মানা তো ছোট কথা—জানি।

—স্বামি-শিষ্য-সংবাদ (উত্তরকাণ্ড। ২২পৃঃ)

জাতীয়তায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

সকলেই বুঝলেন অসুখ ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে। নিজের আত্মীয়-স্বজন কাছে এলে ছাড়তে চান না মোটেই। এমন কি, দূরের আপনার জনকেও আনাতে বলেন। শয্যাপার্শ্বে সর্বক্ষণের জন্তই আছেন দু'-চার জন। কেবল বলেন নিজের কথা। সে সব কথা তাঁর ছোটবেলাকার।

ডাক্তার তখনও নিত্য আসেন। বলেন রোগীর ঘরে এত লোক থাকা ভাল নয়। কে শোনে সে কথা।

আপনার জন যাঁরা, মনে করেন সেরে উঠবেন, রোগ যাবে, আবার আগেকার দিনের মত মানুষ হবেন, লিখবেন সর্বদার জন্ম। কিন্তু তার লক্ষণ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ক্রমে যেন বেশি বেশি গল্প বলতে লাগলেন ভগিনীদের ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে।

স্ত্রী এক দিন বললেন—হাঁ গা, তুমি আমার কী ক'রে গেলে? এই যে সব ছোট ছোট মা-মরা ছেলেমেয়ে আমার ঘাড়ে ফেলে গেলে, তাদেরই বা কী ক'রে গেলে? তারা যে একটাও লেখাপড়া শিখে মানুষ হ'লো না, কী হবে তাদের?

মুখে কথা নাই রামেন্দ্রসুন্দরের। প্রশ্নের পর প্রশ্ন চ'লেছে ইন্দুপ্রভা দেবীর।

একটা উত্তর দিয়ে কথার শেষ করলেন। ছাখো, এত দিন পরে তুমি ঠিক করলে সব ব্যবস্থা ক'বার লোক আমি। আমি কী জানো ত। আমি জানি তুমি রাজরাণী, তোমার কোন অসুবিধা হবে না। বিধান যা আছে তার খণ্ডন হবে না, হবার নয়।

সকলেই বললেন—আপনি স্বামীর আশীর্ব্বাদ পেলেন; এখন ওঁকে আর কিছু বলা উচিত নয়।

বুদ্ধিমতী মহিলা তখন চুপ হ'য়ে গেলেন।

বেলা দু'টার পর। শুয়ে আছেন রামেন্দ্রসুন্দর। আশে-পাশে ব'সে রয়েছেন ভগিনীরা, আরও সব আপনার জন। তিনি বলে চলেছেন সব আগেকার দিনের কথা, কথার মাঝে এক বার বললেন—আমাকে বেশী বকতে দেখলে আমার শাসনকর্ত্তা এসে পড়বেন, আমাকে শাসন করবেন।

কে শাসনকর্ত্তা আপনার বাবুদাদা?

কেন, জানো না তোমরা? আমার ভাই দুর্গাদাস। সকলেই শুনে হেসে উঠলেন।

আবার চললো নানা কথা। কথা চলতে চলতে বললেন—আমাদের বাড়ীর পাশেই বাড়ী। তোমরা সকলেই চেন দেবেন্দ্রকে। ছেলেটি খুব ভাল।·আমাকে তার নিজের বড়-দাদার মতই মনে করে। ভক্তি শ্রদ্ধাও করে। তার কথা বলি শোন। ভাল ভাবেই পাস ক'রলো ছেলেটি এন্ট্রান্স পরীক্ষা। ব্রজ রায় মশায়ের ঐ একটি ছেলে। মনে করলাম ঐ ছেলেই মা বাপের দুঃখ ঘোচাবে। কিন্তু একবার কলকাতা থেকে বাড়ী এসে জানতে পারলাম দেবিন থিয়েটার করে। দুঃখ হ'লো। ওর বাবাকে ডাকিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলাম, রায়জী মশায়, দেবিন কি থিয়েটার করে? তাঁর কাছে জানতে পারলাম কথাটা সত্য। রায়জী মশায় নিরীহ ভালো মানুষ। ছেলেকে তিনি ব'লেছিলাম, নিষেধ ক'রে দেবেন তাকে থিয়েটারে যেতে। কেন, জানো? আমি দেখেছি এ সবে যারাই যোগ দেয়, সংসর্গের প্রভাব এড়াতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত মদ খেতে ধরে। তার পরিণতি ত' জানো? বড় লোকদের কথা বাদ দাও ·কিন্তু ওটা হ'য়ে দাঁড়ায় কাঙালের ঘোড়া রোগ। ভাল ছেলেটার পরকাল নষ্ট হবে ব'লেই নিষেধ করেছিলাম। ভাল ছেলে, আমার কথা অমান্ত করে নি। আমার নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। একটা সখের থিয়েটারের দলে ঢুকে, যাদের বংশে কেও কোন দিন মদ খায়নি, তারাও মদ ধরেছিল। আমি কিন্তু একটা মানুষকে দেখেছি, মনোমোহন পাঁড়েকে। তিনি থিয়েটারের ব্যবসায় ক'রে প্রচুর টাকা উপার্জ্জন ক'রেছিলেন। মিশতে হ'তো তাঁকে চরিত্রহীন অভিনেতাদের সঙ্গে, ভ্রষ্টচরিত্রাদের সাথেও। কিন্তু অদ্ভুত তাঁর ছিল মনের বল। ঐ সব লোকের সংস্পর্শে থেকেও এক দিনও মদ্যপান করেন নি। শুনেছিলাম দেবিন বাধা পেয়ে খুব দুঃখিত হ'য়েছিল। লোক লাগিয়েছিল আমার সম্মতি আদায় ক'রবার জন্য। আমরা ভাইরাও তার জন্ম সুপারিশ ক'রে মত আদায় ক'রতে পারেনি। বাধ্য হ'য়ে দেবিনকে থিয়েটার ছাড়তে হ'য়েছিল।

কিছুদিন পরের কথা। লর্ড কার্জ্জন বাঙলা দেশকে দু'ভাগ করায় তখন জোর স্বদেশী আন্দোলন চ'লছে। আমি এখানকার প্রধান পাণ্ডা ছিলাম, তোমরা ত সকলেই জানো। দেবেন্দ্র সব কাজেই আমার অনুগামী, সাহায্যকারী ছিল। সেও আন্দোলনে মেতে গিয়েছিল। আমার আদেশ পালনে সে ছিল অকুণ্ঠ। এক দিন খুব ভোরে, তখনও আমি বিছানায়। কানে এলো মধুর কণ্ঠে এক টহলের সুরে গান। সবটা মনে নেই—শুনলাম বাড়ীর বাইরে "মা যে তোদের দীন দুখিনী, তুলে শীর্ণ হতে দুখানি, ডাকছে যাদু বাছা ব'লে দিতে তোদের স্নেহক্রোড়। এখনো ভাঙেনি কি রে তোদের ঘুমের ঘোর।" শয্যা ছেড়ে নেমে এলাম নিচে, দরজা খুলে তাদের পাশে এসে দাঁড়ালাম। সবই অপরিচিত মুখ। ওদের মধ্যে চিনলাম মাত্র তিন জনকে। কৃষ্ণগোপাল ঘোষ, কান্দী বাড়ী। একজন মহকুমা হাকিম, গোপিকামোহন ঘোষ এরও বাড়ী কান্দী জিবধর পাড়ায় আর দেবেন্দ্র। ওরা আমাকে সকলেই প্রণাম ক'রে গাইতে গাইতে চ'ললো। সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ী পর্য্যন্ত গেলাম। গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

আজও যেন কানে বাজছে সেই মধুর সুর। বৈকালে দেবেন্দ্রকে ডেকে পাঠালাম। জিজ্ঞেস ক'রলাম—সকালে যারা গান গাইতে গাইতে এসেছিল ওরা সব কে? দেবিন বললে—ওরা সব কান্দীর। অনেকেই এনট্রান্স পাস ক'রে চাকরির আশায় ব'সে আছে। আর্য্য নাট্য সমাজ ব'লে একটা থিয়েটারের দল আছে, সেই দলের মেম্বার ওরা। জিজ্ঞেস ক'রলাম, তুমি যে থিয়েটার ক'রতে, ঐ দলেই না কি? উত্তর দিলে সসঙ্কোচে হাঁ—বাবুদাদা।

ওদের মধ্যে মদ খায় না কেও?

না, আর্য্য নাট্য সমাজের কড়া নিয়ম। যদি কেউ মদ খেয়ে স্টেজে নামে, তা হ'লে তাকে দল থেকে বের ক'রে দেওয়া হয়।

এমন উদাহরণ দেখাতে পারো?

হাঁ, আপনি চিনবেন—রূপপুরের উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাক নাম পচা, তা ছাড়া এই জেমোরই ললিত বাবু। নাচতে, গাইতে, ফিমেল পার্ট ক'রতে ওর মত এখানে কেউ নেই। একদিন মদ খেয়ে ষ্টেজে নামায় বহিষ্কার করা হ'য়েছিল।

আর ?

আর যতীন বাবু মোক্তার। জেলখানার কাছে বাড়ী। খুব ভাল এ্যাক্টর। হরিশ্চন্দ্রের পার্ট ক'রে খুব নাম ক'রেছিলেন। মদ খেয়ে ষ্টেজে নামায় তাঁ'কেও বহিষ্কার করা হয়।

খুব খুসী হ'লাম ওদের ঐ রকম কড়াকড়ি ব্যবস্থার কথা শুনে। জিজ্ঞেস ক'রলাম, তুমি কি ঐ দলেই থিয়েটার ক'রতে ? উত্তর পেলাম, হাঁ বাবুদাদা! ব'ললাম অনুমতি দিলাম তোমাকে ঐ দলে থাকবার থিয়েটার ক'রবার। থিয়েটার করতে ত দোষ নাই, তবে প্রায়ই সখের থিয়েটারে দেখতে পাই, কয়েক জন মাতালের সংস্পর্শে এসে যারা ভালো তারাও মদ ধরে। তাকে আর একটা কথা বলেছিলাম, তোমাদের দলের সকলকে ব'লবে তারা যেন বর্ত্তমান আন্দোলনে আমাকে সাহায্য করে। তখন দেবেন্দ্রের খুসী দেখে কে! ভাবে গদগদ হ'য়ে ব'লেছিল আপনার সাহচর্য্য পাওয়া ত আশীর্ব্বাদ। ওরা সকলেই আপনার অনুগামী, আপনার কাজে সহযোগিতা ক'রতে পেলে ধন্য হবে। পেয়েছিলামও আমি ওদের সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা।

রামেন্দ্রসুন্দরের আশীর্ব্বাদে সেই দেবেন বাবু দরিদ্র হ'লেও কান্দীর মধ্যে এক জন বিশিষ্ট লোক। তিনি কান্দী রাজ ইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক। আমাদেরও শিক্ষক, ইস্কুলেরও, বাড়ীরও। আদর্শ শিক্ষক ব'লে খ্যাতিও তাঁর যথেষ্ট। কান্দীর সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র কান্দীবান্ধবের সম্পাদক। দীর্ঘকাল দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রেও কাগজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সুবক্তাও একজন। বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তাঁর মন বৃদ্ধ হয় নি। তাঁর হাতে খড়ি সাহিত্য সাধনার ব'লতে গেলে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছেই। পেয়েছিলেন তাঁর অনাবিল স্নেহ ভালবাসা। ত্রিবেদী মহাশয়ের নাম ক'রতে তাঁর মুখখানা হ'য়ে উঠে প্রফুল্ল উজ্জ্বল।

রামেন্দ্র বাবুর কথা শেষ হ'লে অনেকে বললেন—আমরা ত জানতাম না দেবিনের এত সব কথা !

তা হ'লে আরও কিছু শোন। ঐ দেবিন গিয়ে উপস্থিত হলো আমার কাছে কলকাতায়। যখনই কলকাতা যেতো, উঠতো আমার কাছেই। সে বারে বললো—বাবুদাদা, ঠকঠকি তাঁত চালু করবার ইচ্ছা আছে দেশে। এখানে দেখতে পেলে সুবিধা হয়। ওখানকার মিস্ত্রী দিয়ে তাঁত তৈরী করাব। সেই তাঁতে দিশি সুতোয় কাপড় বোনাব। দেশের লোককে সেই কাপড় প'রবার জন্য অনুরোধ ক'রবো, এই আমার আকাঙ্ক্ষা। শুনে খুব খুসী হলাম। তখুনি ওকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ী ক'রে ঠকঠকি তাঁতে যেখানে যেখানে

কলকাতা সহরে কাপড় বোনা হয় জানা ছিল গিয়ে সব দেখালাম। খুব ভালভাবেই দেখে নিলে সব। বাসায় ফিরে আমার একজন ছাত্র জগদিন্দু রায়, শ্রীরামপুরে বাড়ী, ন্যাশনাল কলেজে অধ্যাপকতা করেন, ডাকালাম তাঁকে। বললাম তাঁকে, দেবেন্দ্রকে শ্রীরামপুরে যে ঠকঠকি তাঁতের বড় কারখানা আছে, আর ঠকঠকি তাঁতে কাপড় বোনার কারখানা আছে সেই সব ভাল ক'রে দেখাবার ভার নিতে হবে তোমাকে। আর বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলটাও দেখাবে ভিতরে ঢুকে সব ভাল ভাবে। জগদিন্দু রাজি হ'লেন আর দেবেন্দ্রকে তাঁর বাড়ীর ঠিকানা জানিয়ে দিয়ে যেতে বললেন। তিন দিন জগদিন্দুর বাড়ীতে থেকে সব দেখে শুনে ফিরে এল, হাতে একটা পিতলের মাকু। জগদিন্দুর নিজে করা সে মাকু। জগদিন্দু একজন স্বদেশীর পাণ্ডা। বাড়ীতে ঠকঠকি তাঁত আছে। ভাইপোদের নিয়ে নিজেরাই কাপড় বোনেন। খুব উৎসাহী এসব কাজে। দেবেন্দ্র জগদিন্দুর প্রশংসা ক'রলে শতমুখে। ওঁর ভাইপোদেরও খুব প্রশংসা ক'রলো। মাকুটি পিতলের ঢালাই করা। উপহার দিয়েছেন জগদিন্দু ওকে। সব দেখে'শুনে আমাকে বললো—বাবুদাদা, তাঁত আমি করাবো, কাপড়ও বোনাবো, তবে টাকা পাবো কোথায়, গোড়ার দিকে সেই এক সমস্যা। লিখে দিলাম একখানা পত্র, আমার বইএর প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে ৫০৲ টাকা দিবার জন্য আমার নামে খরচ লিখে। টাকা নিয়ে এল সে। আমি বললাম, ও টাকা আমি তোমাকে দিলাম, প্রথম প্রথম কিছু লোকসান হবে। আনাড়ি মিস্ত্রী তাঁত তৈরী ক'রতে কাঠ কিছু লোকসান ক'রবেই। সেই লোকসানটা পুষিয়ে নেবে এই টাকায়। পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম ক'রে, দেবেন্দ্র বাড়ী ফিরে এসে কান্দীর মোহন বাগানের একজন মুসলমান মিস্ত্রীকে দিয়ে তাঁত করিয়েছে। হিন্দু মিস্ত্রীকে কেউ সাহস করেনি, ওর কথা শুনে তাঁত ক'রতে। শেষে সেই মুসলমানকে সব বুঝিয়ে দেখিয়ে শুনিয়ে তাঁত করালে। নলি আর মাকু ক'রতে পারেনি ওখানে কেও। দ্বারহাট্টা থেকে মাকু আর নলি আনিয়ে কারখানা খুললে ঠকঠকি তাঁতে কাপড় বোনার। শুনলাম, দুখানা তাঁত নষ্ট হওয়ায় পর ঠিক মত তাঁত তৈরী ক'রতে পেরেছিল সেই মিস্ত্রী। তার পর দু' চার জন হিন্দু মিস্ত্রীও তাঁত তৈরী ক'রতে শিখেছিল। বাড়ী এসে দেখলাম দেবেন্দ্রের কারখানা। দেখে খুসী হলাম। অধ্যবসায় ওর খুব। আমাকে দিয়েছিল সে এক জোড়া ধুতি ৬০নং সুতোর। বলেছিল আশীর্ব্বাদ করুন বাবুদাদা যেন দেশজননীর কাজ ক'রতে উদাসীন না থাকি কোন দিন। প্রাণ খুলে তাকে ক'রেছিলাম আশীর্ব্বাদ। দেবেন্দ্রের কারখানার কাপড় আমি কিনতামও অনেক। দেশের দুর্গতির কথা শুনবে—দেবেন্দ্রের কাপড় আমি কিনতাম, কান্দীর কুঞ্জ দাস ব'লে এক তাঁতি এসে তার নিজে হাতে বোনা ধুতি শাড়ি আমাকে দেখালে। ভাল লাগলো কাপড়গুলো। দামও দেবেন্দ্রের ধুতি শাড়ীর চেয়ে কিছু সস্তা। খুশী হ'য়ে খানকয়েক কিনলাম। দেবেনকে ডাকিয়ে কাপড় দেখিয়ে বললাম কুঞ্জ দাসের কাছ থেকে কিনেছি।

ওর দামও সস্তা। তুমি এমন সস্তা দিতে পারো না কেন? দেবেন কাপড় দেখে বললে—বাবুদাদা, ঐ কাপড় ধোলাই করিয়ে এনে ডাকবেন আমাকে। তখনই দেখাবো সস্তা দিতে পারে কেন। বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞেস করলাম তার মানে? সে বললে এখন আমি কিছু ব'লবো না বাবুদাদা, ধুয়ে আসার পর সব ব'লবো'। আর কিছু না ব'লে কাপড় সব ধুইয়ে আনিয়ে ওকে ডাকলাম। এসে বললে, এই বার দেখুন আপনি সস্তা দিতে পারে কেন। বুঝতে না পেরে বললাম, তোমার কথা মোটেই বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে বলো। তখন ও বললে কী জানো? বাবুদাদা, শঠতা আর প্রতারণায় দেশ ছেয়ে গেছে। পাতলা শানায় কাপড় বোনা। সুতো লাগে কম। ঠুকে বোনে না, তাতে সময়ও লাগে কম। এ কাপড় আপনার পরা চ'লবে না। ওর বহর কত কমে গিয়েছে দেখুন। বিস্মিত হলাম, ঠিকই ত ৪৫ ইঞ্চি বহর, ধোলাই ক'রে দাঁড়িয়েছে ৪০ ইঞ্চি। সত্যিই ত পরা চলবে না ও ধুতি। দেবেনের মুখের কথাগুলো মর্ম্মে গিয়ে বিঁধলো। ভাবলাম হায় রে দেশের মানুষ! ফাঁকি দিতে পারলে আর কিছু চায় না যে জাতি, সে জাতি উঠবে কেমন ক'রে? আশীর্ব্বাদ করলাম দেবেন্দ্রকে প্রাণ খুলে।

দেবেন্দ্র বেশ ভালো ভাবেই তাঁতের কাজ চালাচ্ছিল, তার কারখানায় তৈরী তাঁত টেঞা, গুরুলিয়া, সেরপুর প্রভৃতি অঞ্চলের বহু তাঁতি কিনে নিয়ে গিয়ে বেশ ভাল ভাল কাপড়, ধুতি, সাড়ি, জামার কাপড় তৈরী ক'রতো। তবে দেবেন্দ্রের কারখানায় যে সব তাঁতি কাপড় বুনতো তারা সব টাকা নিয়ে ক্রমশঃ সরে পড়তে লাগলো। অনেক ক্ষতি স্বীকার ক'রে কাপড় বোনান বন্ধ ক'রতে হ'য়েছিল ওকে। দেখছো ত দেশের লোকের মতিগতি কেমন ধারা! জাতি উঠবে কেমন করে!

তার পর শুনলাম, পশ্চিম দেশ থেকে এক জন এসে জিয়াগঞ্জে ষ্টীলট্রাঙ্ক তৈরীর এক ব্যবসায় আরম্ভ করেছেন। তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য গেলাম সদলবলে জিয়াগঞ্জ। তাঁর কারখানা দেখে খুবই খুসী হ'লাম। তখুনি সব ভাল ভাবে জানিয়ে দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে তার করে দিলাম। তিনিও এসে হাজির। বললেন সুরেন্দ্রনাথ—কী পুরস্কার চাও? কারখানার মালিক জঙ্গলী সাঁ বললেন—আপনার একখানা সার্টিফিকেট। তৎক্ষণাৎ তিনি লিখে দিলেন। আজও হয়তো আছে তাঁদের কাছে।

তখন একটা তরঙ্গ উঠেছিল সারা বাংলা দেশে। এখন আর তেমন স্পন্দন দেখতে পাইনে।

তাঁর ছোট বোন—আমার মা বললেন—সে তরঙ্গ ত তুলেছিলেন আপনিই।

খুব হেসে জবাব দিলেন—আমার একার সাধ্য কি? তবে আমিও এক জন পালকীর বাহক ছিলাম।

যাক্‌, এবার আর একটা গল্প বলি শোন তোমরা। একটা মেয়ে খোক্কস ছিল আমাদের বাড়ীতে! তোমরা কেউ ভয় পেয়ো না; সে তোমাদের খুব আপনার জন।

কে বাবুদাদা?

আচ্ছা লোক তোমরা ত'! আগে থেকে গল্পের ডগ কাটতে আছে? ওতে রসভঙ্গ হয়; গল্প জমে না। শোনো গল্পটা। আমার তখন জ্বর হয়, দু'দিন অন্তর এক দিন জ্বর। পালি জ্বর। এতো কুইনাইন খেয়েও জ্বর বন্ধ হয় না। তখন একটি মেয়ে এসে আমাকে ওষুধ দিলে। খাবার ওষুধ নয়, হলদে রঙা ন্যাকড়ায় বাঁধা ওষুধ। বললে—এইটা শোঁকো। এক বার নয়, কাছে রাখো

আজ সারা দিন-রাত মাঝে মাঝে শুঁকতে হবে। জিজ্ঞেস ক'রলাম —কেন? সে বললো—এই নিয়ম। এটা শোঁকার পর কাল সকালে এইটা তেমাথা পথে ফেলে দিয়ে আসবে। যে ডিঙুবে পর দিন থেকে তার হবে জ্বর, আর তোমার জ্বর যাবে ছেড়ে। বয়স তখন আমার কম। তা হ'লেও কথাটা ভালো লাগেনি আমার। আমি বললাম—না, তা হ'তে দেবো না। এ কাজ তুমি ক'রতে পাবে না। ধ্বস্তাধ্বস্তি, মারামারি!

এমন সময় মা এসে হাজির। তিনি বললেন—ছেলে ত ঠিকই ব'লেছে। তুই কেন খোক্কসের মত কথা ব'লছিস? সেই থেকে তার নাম দিলাম আমি খোক্কস। শেষে মা অনেক ক'রে আমার জ্বর সারালেন। আচ্ছা, এবার বলো দেখি তোমরা এই খোক্কসটি কে?

আমার মধ্যম মা সতী দেবী বললেন—বুঝতে পেরেছি বাবুদাদা, ও আমাদের কেষ্ট-মা। হেসে অস্থির রামেন্দ্রসুন্দর।

সতী দেবী আচার্য্যদেবের ভগিনী, মাত্র দু বছরের ছোট।

দুর্গাদাস বাবু এসে বললেন—তোমরা আজ চব্বিশ পহর ক'রবে না কি? বাবুদাদাকে কি আজ ছাড়ান দেবে না?

এই দেখ আমার মাষ্টার মশায় এসেছেন। ওরা কেউ কিছুই বলেনি, কেবল নীরব শ্রোতা।

হাসির রোল উঠলো তখন।

এক এক দিন সন্ধ্যায়ও মিটিং বসতো।

রামেন্দ্র বাবু জিজ্ঞেস ক'রলেন—এখন ত আমার তেমন ঘুম হয় না, শেয়ালের ডাক শুনতে পাই না কেন

অনেকে বললেন—ডাকে ত'?

যখন ডাকবে আমাকে শুনিয়ে দিও ত।

আপনার কি খুব ভাল লাগে শেয়ালের ডাক বাবুদাদা?

লাগবে না কেন, ওরা যে প্রহরী। আমাদের দেখার মধ্যে ঐ যে একমাত্র বন্য জন্তু। ওরা না বন্য না পোষা। বাড়ীর আনাচে-কানাচেই থাকে ধূর্ত্ত জানোয়ারা। খুব ছোটবেলায় যেতাম মায়ের সঙ্গে শিবাভোগ দিতে। আমি দক্ষিণ কালীতলা গিয়ে শিবাভোগ দেখে আসতাম। একটা কথা শুনলে তোমাদের চক্ষু স্থির হবে। বাঘডাঙ্গার রাজারা নিত্য শিবাভোগ দিতেন। আশ্চর্য্য, তারা এসে বেশ আনন্দ ক'রে খেয়েও যেত। আরও আশ্চর্য্য হবে তোমরা, যে দিন ওঁদের সম্পত্তি সব নীলাম হ'য়ে গেল, সে দিন একটা শিবাও এসে ভোগ খেলে না। বনের পশু শেয়াল, সে-ও কেমন বোঝে দেখছো? সাধে কি আর লোকে তাদের শিবা-মা বলে! ওরা যে প্রহরী, তিন ঘণ্টা অন্তর ডেকে মানুষকে সজাগ ক'রে দেয়। শুধু ওরা প্রহরই জানিয়ে দেয় না, ওরা চোর-ডাকাতেরও প্রহরী। তুমি যেন আমাকে ডাক শুনিয়ে দিও সতী।

বিস্ময়-আকুল চোখ তুলে সকলে শোনেন জ্ঞানতপস্বীর কথা।

দু'-চার দিন পরের কথা।

ভয়ানক অসুখে কাতর রামেন্দ্রসুন্দর। সুস্থ হ'য়ে থাকতে পারছেন না। ছটফট ক'রছেন সর্বক্ষণ। গরমও থাকে বলতে হয়। উপরে সারা ছাতে, মেঝেতে জল ঢালা চলছে দস্তুর মত। দেয়ালেও জল ছিটান চ'লছে। তাতে কি আর গরম যায়! কবিরাজ এসে বললেন—কচি কলার পাতা দিয়ে বিছানা মুড়ে দিন, তাহ'লে অনেক ঠাণ্ডা পাবেন। কবিরাজের কথা মতো কলার আঙুরি পাতা দিয়ে বিছানা ঢেকে দেওয়া হ'লো। কলার কচি পাতার উপর শুয়ে বললেন রামেন্দ্রসুন্দর—এবার আমি শকুন্তলা হ'লাম। খুসী ধরে না তখন তাঁর।

গুরুদেব বাড়ীতেই থাকেন। তিনি অনেক ছোট রামেন্দ্রসুন্দরের চেয়ে। দেখা হ'লেই বলেন—গুরুদেব, দয়া কই আপনার? গুরুদেব চলে যান নত মস্তকে।

সেই গল্প আবার সকালে বিকালে চলে ভগিনীদের কাছে। সেদিনও চলেছে। বললেন—কী মধুর, যখন সুর করে শত শত লোক রুদ্র বাবার নাম ধরে চীৎকার করে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনি আমি—"বাবা রুদ্রদেবের নামে প্রীতি পূর্ণ ক'রে একবার হরি হরি বলো"; আরও জোরে শত শত লোক এক সঙ্গে ব'লে উঠে—"বোল্, বলো শিব ও-ও।"—রুদ্রদেব যে এখানকার জাগ্রত দেবতা গো! ওঁর সম্বন্ধে আমি কতো কথা লিখেছি, শোনো নি তোমরা?

সকলেই চুপচাপ। কোন উত্তর নাই।

তখন আবার ব'লতে লাগলেন—এ ঠাকুর রুদ্রদেব বাবা নয়, ইনি হ'চ্ছেন বুদ্ধদেব। বুদ্ধমূর্ত্তি, কিন্তু এঁরই পুজো হ'চ্ছে শত শত বৎসর ধ'রে রুদ্রদেব ব'লে। শুধু এখানেই নয়, গোটা বাঙলায় এমন কতো বুদ্ধমূর্ত্তি পরিণত হ'য়েছে হিন্দুর দেবমূর্ত্তিতে। আগে-কার কালের অনেক রীতিনীতি পাওয়া যায় এই সব পুজোর মধ্যে। তোমরা হয়তো জানো না, ঐ মূর্ত্তি নিয়ে যাওয়া হয় হোমতলায় যে রাস্তা ধরে, তার ব্যতিক্রম হবার উপায় নাই। চিরদিন চলে আসছে একই পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া। সাধারণে যাবেই সেই রাস্তা ধরেই। হয়তো এক বছরের মধ্যে কারো বাড়ী উঠেছে নূতন রাস্তায়; তা হ'লেও ওরা যাবে সেই বাড়ী ভেদ করেই। বাধা দেবার উপায় নেই গৃহস্বামীর। বাধা দিলে ঘটবে বিভ্রাট। হয়তো এই বাধা দেওয়ার ফলে হ'য়ে যাবে রক্তারক্তি। তাদের মনে তখন কী এক অদ্ভুত উন্মাদনা!

এটা কি ভাল বাবুদাদা?

এটাকে আমাদের দেশের লোকের স্বভাবই বলো, আর সংস্কারই বলো, তাই। ওর মধ্যে ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। অন্ধ সংস্কারে দেশ ভরে আছে। একে আমি বলি অন্ধ সংস্কারের মূঢ়তা। আমি সন্ন্যাসীদেরকে মানি না, এই কথাই এত দিন শুনে এসেছ তোমরা। কিন্তু এখন এক নবীন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব দেখছি—তিনি ভারতকে চিনিয়ে দিয়েছেন সারা জগতের কাছে। আমি চাই ঠিক ঐ রকমই সন্ন্যাসী—যিনি বলেন—জাতি আমাদের ভাতের হাঁড়িতে। যিনি বলেন—আমরা পুজো করে চলেছি কুসংস্কারের। যিনি বলেন—মানুষকে আমরা ভালবাসতে শিখিনি। যিনি বলেন—হাড়ী, ডোম, মেথর, মুদ্দোফরাস আমার ভাই, আমার রক্ত! এই ভারতই আমার তীর্থক্ষেত্র। কী সুন্দর তাঁর সব কথা বলো দিকি। এই, ঠিক এইই চেয়েছিলাম আমি। সন্ন্যাসীদের কাজই ত এই। ধুনি জ্বালিয়ে ছাই মেখে গাঁজায় দম দেবেন, আর ঘি আটা ডালের শ্রাদ্ধ ক'রবেন, ওসব ঠিক মতো না পেলে গৃহীর চৌদ্দপুরুষের নরকবাসের ব্যবস্থা ক'রবেন, সে রকম সন্ন্যাসীকে আমি কোনো দিন দেখতে পারি না। ওরা সব সমাজের আবর্জ্জনা। ওরা সব

এক একটি মূর্ত্তিমান শয়তান। ভাবের আবেগে ব'লে চ'লেছেন আচার্য্যদেব তাঁর শ্রোত্রী-মণ্ডলীর কাছে হৃদয়ের নিরুদ্ধ বেদনা উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে।

কিছুক্ষণ থেমে বলতে লাগলেন আবার—প্রকৃত সন্ন্যাসী যাঁরা, তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করি আমি, আমি কেন সারা জগতের লোক। জাতি ভেদ তুলিয়ে দেবেন তাঁরা, ভারতকে গ'ড়ে তুলবেন নতুন ক'রে, তাঁদেরই দ্বারা ভারত হবে আবার সেই সোনার ভারত। জাগিয়ে তুলবেন জাতিকে, মাতিয়ে তুলবেন জাতিকে। প্রচার করবেন প্রেমের বাণী, ভালোবাসার বাণী। ব'লবেন—ওরে ভ্রান্ত, ওরে মূঢ়, জাতিভেদের পাপ থেকে মুক্ত কর তোরা সকলকে, ভাই বলে আলিঙ্গন দে সকলকে, ভালবেসে আপনার ক'রে নে সকলকে। কোথায় থাকবে তখন ইংরেজ! পথ পাবে না এদেশ ছেড়ে পালাতে! আসবে, আসবে এক দিন ঠিক এই রকম এক জন মানুষ, যাঁর দ্বারা আমার ভারত হবে স্বাধীন। তখন কুঞ্জে কুঞ্জে আবার গেয়ে উঠবে পাখী। আবার বেদধ্বনিতে মুখর হবে তপোবন। নতুন নতুন ইস্কুল গ'ড়ে উঠবে সারা দেশে। রাস্তা তৈরী হবে সহর থেকে দূর গ্রামে মানুষের সুবিধার জন্য। অসহায় হ'য়ে প'ড়ে থাকবে না কোনো গ্রাম। মারা যাবে না মানুষ চিকিৎসার অভাবে। ঘৃণা করবে না মানুষ মানুষকে। ক্ষরিত হবে মধু সারা দেশে। মধুময় হবে আমার ভারতের পথের ধূলি পর্য্যন্ত। সেই মধু বিলিয়ে দেবে এই ভারতেরই মানুষ সারা জগতে। কবে, কবে সেদিন দেখবো? অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছি, অধীর প্রতীক্ষায় র'য়েছি—সে দিনের জন্য। তখন তাঁর দুই চোখ সজল। উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ব'লে চলেছেন তাঁর জীবনের স্বপ্ন। ভাবের আবেগে কী মধুর সে উক্তি, সে কণ্ঠস্বর!

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—আর একটা কথা বলি শোন। আমার এই সোনার ভারতের শিক্ষা জানো? হরিনাম লিখে, দুর্গা-নাম লিখে সে কাগজে আর অন্যায়, অসঙ্গত কিছু লিখবে না মানুষ। তাই চিঠি লিখতে হ'লে, ব্যবসাদার তার হিসাবপত্র লিখবার আগেই লেখে শ্রীশ্রীহরি শরণং, শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় এমনি ধারা দেব-দেবীর নাম। দাঁড়ি পাল্লা ধ'রেই প্রথমেই এক—এক না ব'লে বলে রাম—রাম। তার অর্থ রামনাম উচ্চারণ ক'রে চিত্ত শুদ্ধি করার পর আর অন্যায় ক'রবে না, গ্রাহককে ঠকাবে না ওজনে কম দিয়ে। এই শিক্ষাই দিয়েছিল এক দিন ভারত, আমার জননী জন্মভূমি ভারতবর্ষ। এরই নাম ধর্ম্মের ভয়। ধর্ম্মভয়ই মানুষকে অন্যায় থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ঐ যে তোমরা তিলক কাটো, ওর মানে কী জানো? যতক্ষণ ঐ বিভূতি তোমার শরীরে থাকবে ততক্ষণ তুমি সেই। ততক্ষণ তুমি আর তিনি—তোমার উপাস্য দেবতা অভিন্ন। শক্তির উপাসক যারা তারা ধারণ করে ললাটে রক্তচন্দনের তিলক, কি সিন্দূরের তিলক। তখন সে আর শক্তি অর্থাৎ কালী, তারা, দুর্গা অভিন্ন। এ কথা ব'লবে ঐ তিলক, এ কথা ব'লবে তুলসী মাল্য, রুদ্রাক্ষ মাল্য!

ডাক্তার এসে পড়ায় কথা বন্ধ হ'য়ে গেল।

ডাক্তার প্রশ্ন ক'রলেন—আপনি কি ক'লকাতা যেতে চান চিকিৎসার জন্য?

একটু হেসে ব'ললেন রামেন্দ্রসুন্দর—আমার কর্ম্মক্ষেত্র ত কলকাতাই; কর্ম্মস্থান বললেও চলে। আমার নিকটতম আত্মীয় বলতে যাঁরা তাঁরাও ত সব কলকাতাতেই। দেখুন, এখন আপনাদের যা অভিরুচি।

আমি বলছি এই জন্য যে এখানে তেমন ভাল হোমিওপ্যাথ নেই। আপনারা একটা দিন দেখে যাওয়ারই ব্যবস্থা করুন।

ন' রাজার এক প্রিয় বন্ধু, এক রকম সন্ন্যাসীই তিনি। বললেন—রামেন্দ্র বাবুর এ দিনটা ঠিক হয়নি, ব্যাঘাত হ'তে পারে।

আমরা বললাম—আপনি নিষেধ ক'রে আসুন না কেন?

তিনি গিয়ে বললেন রামেন্দ্র বাবুকে। তিনি ত শুনে হেসেই উড়িয়ে দিলেন।

রামেন্দ্র বাবুর স্ত্রী ইন্দুপ্রভা দেবী—গোছগাছ নিয়ে ব্যস্ত। দু' তিন মণ তেঁতুল নেবার জন্য ঠিক ক'রে রেখেছেন। বাঁধা ছাঁদা করবার সময় ভাবলেন, এত তেঁতুল নেবো কিনা, একবার জিজ্ঞাসা করি না স্বামীকে। শুধুলেন—হাঁ গা, তিন মণ তেঁতুল কাঁই ছাড়িয়ে রেখেচি। এখন কিছু হালকাই হবে, নেবো ত?

থাকতে হ'লে খেতে হবে ত।

একে একে পড়শীরা সব এলো দেখা করতে, ইতর ভদ্র সকলেই। তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে বললেন—আমাদের এ জায়গাটা ছিল দেওঘরের মত স্বাস্থ্যকর স্থান। এখন দেখছি ম্যালেরিয়াতে ঘিরে ফেলেছে।

অনেকে প্রশ্ন ক'রলেন—হঠাৎ এ রকম ম্যালেরিয়া হওয়ার কারণ কি?

ঐ যে গঙ্গার এধার দিয়ে ট্রেণ হ'য়েছে। তার জন্য উঁচু রাস্তা ক'রতে হয়েছে। চৌরিগাছার ওখানটার রেলের রাস্তা কত উঁচু দেখছেন ত'? ও জায়গাটা ছিল ফাঁকা। ঐ দিক দিয়ে হিজল বিলের জল বের হ'য়ে গিয়ে প'ড়তো গঙ্গায়। এখন অনেক বাধা পায় কিনা। জল নিকাশ হয় না। বদ্ধ জলেই জন্মে মশা। আর ঐ মশাই ত ম্যালেরিয়ার বাহক। জল জ'মে থাকাতেই ম্যালেরিয়ায় ছেয়ে গিয়েছে দেশ।

গৃহ-দেবতা নারায়ণ। নারায়ণের মণ্ডপে উঠবার সামর্থ্য নাই রামেন্দ্রসুন্দরের। উদ্দেশে প্রণাম ক'রে ব'সলেন গিয়ে পালকিতে।

কী আশ্চর্য্য! এত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, যাগ-যজ্ঞ, আরাধনা ক'রে যে মেঘ দেখা যায়নি আকাশে, আজ প্রকৃতি দেবী যেন মধু বর্ষণ ক'রতে লাগলেন। মুষলধারে আরম্ভ হ'লো বৃষ্টি।

এ ঘটনা সব সময়েই দেখা যেত। বৃষ্টির অভাব হ'লেই গ্রামের চাষীরা ব'লতো—একবার আমাদের বড় বাবুকে আনালে হয় না? আজ মনে হ'লো আকাশ-বাতাস যেন রোদন ক'রছে কী এক অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায়। সাধারণ লোকের চোখও সজল।

[ক্রমশঃ।
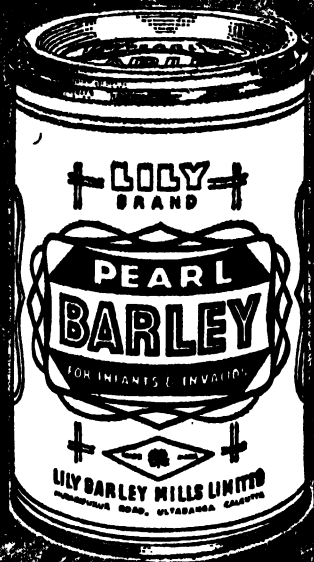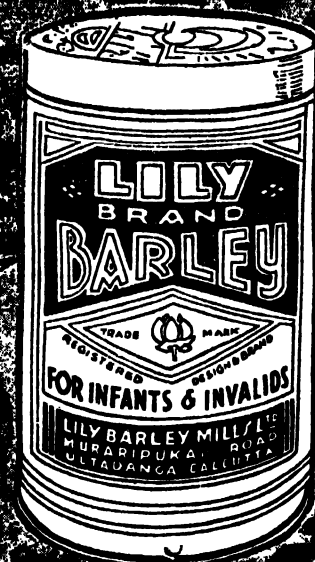
প্রাচীন ও আধুনিক
মতে অনুমোদিত
লিলি
বার্লি
LILY BRAND
PEARL
BARLEY
FOR INFANTS & INVALIDS
LILY BARLEY MILLS LIMITED
খাদ্যপ্রাণযুক্ত
খাদ্য, পথ্য ও পানীয়
LILY
BRAND
BARLEY
TRADE MARK
REGISTERED DESIGN & BRAND
FOR INFANTS & INVALIDS
LILY BARLEY MILLS LTD
MURARIPUKAR ROAD
ULTADANGA CALCUTTA
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

[ফরাসী শিল্পধারায় বিপ্লব এনেছিলেন একদা হেনরী-ম্যারী-রেমণ্ড ত্তে তুলু লোতরেক্। ইং ১৮৬৪ অব্দে দক্ষিণ-ফরাসীতে জন্মগ্রহণ করেন লোতরেক্, এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে। মাত্র তিন বছর বয়সে তাঁর শিল্প-পরিচয় পাওয়া যায়। শৈশব-জীবনের দুর্ঘটনায় শিল্পীর শারীরিক দোষ শিল্পীকে নির্জ্জনে সাধনার পথ দেখায়। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে অর্থাৎ ডেগাস্, রেনোয়া, ম্যানেট প্রভৃতির সমপর্য্যায়ে স্থান লাভ ক'রেছিলেন লোতরেক্। শিল্পীর অন্যান্য কাজের মধ্যে প্রাচীরপত্রে (Poster) বিজ্ঞপ্তিরূপে ছবির ব্যবহারের প্রথম প্রচলন উল্লেখযোগ্য। লোতরেকের জীবনের ভিত্তিতে রচিত এই কাহিনী যেমন চমকপ্রদ তেমনই দুঃখময়। গত সংখ্যায় কাহিনীটির প্রথম প্রকাশ এবং আগামী কয়েকটি সংখ্যা পর্য্যন্ত কাহিনীর বিস্তার। এই সঙ্গে আমরা লোতরেকের অঙ্কিত কয়েকখানি বিখ্যাত ছবির প্রতিলিপি মুদ্রিত করছি।—স]

স্যাটু ডি-ম্যালরোমের পেছনে ছায়াঘেরা বারান্দায় কাউণ্টেস দ্য টুলো লোতরেক নিদ্রিত হেনরীকে লক্ষ্য করছিলেন। হেনরী প্রতিদিনই দুপুরবেলায় এই সময় ঘুমোয়। একটা হাত হেনরীর বুকের ওপর আর একটা হাত পাশে ঝুলছিল। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে তার আর্দ্র রক্তিম ঠোঁটটা কাঁপছিল। ঘুমোবার ঠিক আগেই সে যে বইটা পড়ছিল সেটা খোলা অবস্থায় একটা লেমনেড ভরা গ্লাসের পাশে পড়ে ছিল।

সে আবার বাড়ি ফিরেছে! পৃথিবীতে তার সর্বনাশী অভিযান শেষ হয়েছে। বেচারা রিরি (তিনি এই নামেই তাকে ডাকতেন) তার ব্যর্থতায় নিজেও ব্যথার্ত্ত। তবে দুঃখ কিছুটা কমেছে। দেখলে মনে হয় কিছুটা সুখী তৃপ্ত যেন। সকালে সে বাগানের পুষ্প বীথিতে বেড়ায়—প্রচুর সময় আচ্ছন্ন থাকে গভীর নিদ্রায়।

শিল্পী তুলু লোতরেক্

অপরাহ্নে তারা গাড়ি করে দূরে দূরে ভ্রমণ করে আসে। এইখানে জীবন যাপনের একঘেয়েমি বা বন্ধুদের অভাব সম্বন্ধে কোন অনুযোগ নেই। মনটমার্ট্রের নাম মুখে আনে না। সে আঘাত পেয়েছে—ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে বার বার। বেশ আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে তাই।

বোধ হয়, ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে সে। এই আত্মসমর্পণের মধ্যে যা কিছু শান্তি। পরের বছর বোধ হয় সে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করবে। গ্রন্থই হবে তার রক্ষাকবচ। আর কোন দিক থেকে প্রত্যাঘাত আসবে না।

দ্বিচক্রশকটে হেনরীকে ঘুম থেকে চমকে উঠতে দেখে তিনি চোখ নামিয়ে নিলেন। আরামে ঘুমিয়েছ ত'? আংটিটি ঠিক করতে করতে হাসলেন তিনি।

একটা মাছি ঘুম ভাঙিয়ে দিল, সে-ও হেসে বলল, আশ্চর্য, জগতে এত যায়গা থাকতে মাছিরা আমার

লোতরেক্ অঙ্কিত মে বেলফোর্টের চিত্র

লোতরেক্ অঙ্কিত
শ্রীমতী গুইলবার্টের চিত্র

নর্তকী—মুলাঁ রুজ হোটেলে
ক্যান ক্যান নাচ

নাকের ডগায় কি করে ঠিক ল্যাণ্ড করে! অবশ্য ঘুমিয়েছি অনেকক্ষণ। ক'টা বাজল এখন?

কিছুক্ষণ পড়ার ভাণ করল কিন্তু তার চোখ আকাশের নীলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হেলান দিয়ে বসল আবার। আকাশের গায়ের ঐ মেঘটা কি নতুন অতিথি, না ঐখানেই সারাক্ষণ ছিল?

এ্যাটেলিয়ারে সেদিন সকালে তাকে যেন কিসে ভর করেছিল। অসংখ্য বার উত্তরহীন এই একই প্রশ্ন ফিরে ফিরে মনে আসতে লাগল। কি জন্যে সে করমোনের বিরুদ্ধে স্পর্ধিত উপেক্ষা দেখাল। সে বুঝতে পারে না, এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করাও তার বুদ্ধির অতীত। নৈরাশ্যের চরম মুহূর্তে, অবসাদের

লোতরেকের নিজের আঁকা
নিজের ছবি

শেষ সীমান্তে হয়তো আত্মহারা হয়ে আমরা এমন কিছু বলি যা আমরা বলতে চাই না।

সারা রাত ত্রেসারির সেই মেয়েটির কথা কানে বেজেছে, আপনার মত যদি আমার মুখের চেহারা হতো, আর ঐ রকম বিশ্রী ছোট পা থাকত, তাহলে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকতাম। এ্যাটেলিয়ারে প্রবেশের সময় সে অসুস্থ বোধ করছিল আর কেনই বা সেই সকালে সেখানে গিয়েছিলো তাও অবোধ্য ···এখনও যেন এ্যাবসিনথ-এর তিক্ততা ঠোঁটে লেগে আছে। চোখ দু'টো তার জ্বালা করছিল, শিরা-উপশিরাগুলো যেন সুতোর মতো তার শিথিল ছিন্ন মাংসপেশীকে জড়িয়েছিল।

মুলাঁ রুজ হোটেল

লোতরেক্ অঙ্কিত সার্কাশের দৃশ্য
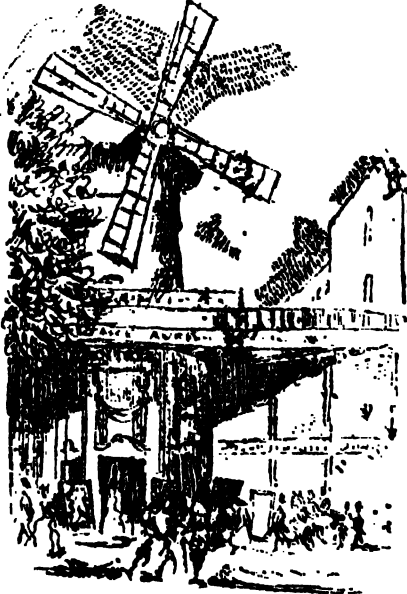
করমোন তার ইজেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে অভ্যস্ত মন্তব্য করেছিল—বাঃ বেশ। দেখতে পাচ্ছি খুব চেষ্টা করছ তুমি। যদিও চিত্রশিল্পে সূক্ষ্ম ভাব তোমার নেই, প্রতিভারও অভাব, তবে সকলেরই ত আর সব রকম ক্ষমতা থাকে না ?

অন্য দিন হ'লে সে নিঃশব্দে ছবি এঁকে যেতো। কিন্তু সেদিন সকালে পারলো না নিরুত্তর থাকতে। বুকের মধ্যে আগুন জলছিল। উত্তপ্ত বিরাগে আত্মহারা হ'য়ে পড়ল। চিত্রশিল্পের জ্ঞান, ক্ষুদ্র চিত্র এবং নগ্নচিত্র সম্বন্ধে তার সমস্ত কথা করমোনের মুখের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল।

পাঁচ মিনিটের জন্যে কি কৌতুক! সে চীৎকার করছিল, অনুযোগ করছিল হাসির ফোয়ারা তুলে।···বেশ মজার দৃশ্য হয়েছিল! সে যে নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই নষ্ট করছে, এ বিষয়ে অবশ্য সচেতন ছিল। বুঝতে পারছিল এ তার শিল্পজীবনের আত্মহত্যা—তবে তখন সে গ্রাহ্য করেনি এক বিন্দু। ক্ষেপামির দমকা হাওয়ায় চরম উচ্ছ্বাসে সে তখন ফেটে পড়ছিল।

ফিরে দেখল, রূপোর ট্রে হাতে নিয়ে জোসেফ আসছে। ম্যাডাম লা কাউণ্টেস, একটা গাড়ি এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে।

তিনি ট্রে থেকে কার্ডটা তুলে নিয়ে পড়লেন—উচ্ছ্বসিত, হয়ে বলে উঠলেন আরে, এ-যে অ্যাঞ্জেলিক!

হেনরীও কার্ডটা তুলে নিয়ে পড়লো ম্যাডাম লা ব্যারোণ আঁদ্রে দ্য ফ্রনটেনাকে। দরজার দিকে অগ্রসর হতে তার মনে পড়ল অ্যাঞ্জেলিক মা-এর স্কুলজীবনের সাথী। নারবনে স্যাকরেড হার্ট কনভেন্টে সহপাঠিনী ছিলেন তাঁরা। তার মায়ের অবিচ্ছেদ্য বন্ধুটির সঙ্গে এক জন নেভি অফিসারের বিয়ে হয়। তার পরই তিনি মার্টিনিক না ম্যাডাগাসকার কোথায় যেন চলে যান।

সিঁড়ির সামনে একটা পুরনো ধরণের ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করছিল। গাড়ীর ফুটম্যান লাফিয়ে পড়ে দরজা খুলে দিল, ফুটবোর্ডটা মাটিতে নামিয়ে দিল।

গাড়ির ভেতরে অবগুণ্ঠনের অস্পষ্ট খস্‌খস্‌ আওয়াজ। গাড়ীর দরজার সামনে একটি কালো রঙের সাপের মত সাবধানী ফণা বার করে এগিয়ে এলো একজোড়া স্লিপার। শোকবসনাবৃতা একটি স্থূলাঙ্গী মধ্যবয়সী মহিলাকে দেখা গেল। তিনি পর মুহূর্তে কাউন্টেসের বাহুবন্ধনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

এ্যাডেল!

অ্যাঞ্জেলিক!

এই মহিলা দুটির সম্প্রীতির আলিঙ্গন এমন নাটকীয় যে, হেনরী গাড়ির দরজায় আর একটি মেয়ের নিঃশব্দ আবির্ভাব লক্ষ্য করল না। মেয়েটি তরুণী—আঠারো বসন্তের। তারও অঙ্গে শোক-পরিচ্ছদ। সাবধানে গোড়ালি পর্য্যন্ত স্কার্ট তুলে গাড়ি থেকে অবতরণ করল সে।

আমার মেয়ে, ডেনিস; পরিচয় করিয়ে দিলেন ব্যারোনেশ। তারপর কান্নায় অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর হ'য়ে হাতব্যাগের মধ্যে থেকে রুমাল খুঁজতে লাগলেন।

ডেনিস যথারীতি সৌজন্য দেখালে। কাউন্টেস তার আরক্ত কপালে চুম্বনের টিপ এঁকে দিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে হেনরী ব্যারোনেসের কাছ থেকে তাঁদের পূর্ব্বস্মৃতি বংশানুক্রমিক ইতিহাস, ফ্রনটেনাক পরিবারের কুড়ি বছরের দুঃখ অনুশোচনার ইতিবৃত্ত সব একে একে শুনলো। ব্যারোনস ক্লান্তিহীন বক্তা।

'এখন আমার স্বামী মারা গেছেন, চোখে জল এসে পড়ল তাঁর'। ডেনিস আর আমি বলতে গেলে পৃথিবীতে একরকম একা! তারপর আত্মসংবরণ করে কন্যার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তুমি যদি এখন একটু পিয়ানো বাজাতে তাহলে মঁসিয়ে ডি টুলো লোতরেক্ শুনতেন। হেনরী বললেন, ও খুব ভালো পিয়ানো বাজাতে পারে।

ডিমাইস পিয়ান বাজাল। বেশ সুরেলা সুন্দর হাত। সোফায় বসে হেনরী তাকে লক্ষ্য করছিল। পিয়ানো বাজান শেষ হতে সে হেনরীর পাশে এসে বসল। দশ মিনিটও লাগল না তাদের ঘনিষ্ঠ হতে। যেন কত কালের পরিচিত বন্ধু! ডাকনাম ধরেই দু'জনে দু'জনকে সম্বোধন করতে লাগল।

ঐ গ্রামের মধ্যে দিয়ে কখনো গেছ? হেনরী জিজ্ঞাসা করলো, পরিবেশটা ভারি সুন্দর, তাই না?

কোথাও প্রায় যাওয়া হয় নি। বললাম তো অল্প দিন হলো এখানে এসেছি। চল না দুজনে একটু ঘুরে আসি। শোকসজ্জায় অবশ্য বেরোনো কি ঠিক হবে?—চোখের পাতায় কম্পিত ইশারা করে বললো, মায়েদের কাছ থেকে একটু দূরেও যাওয়া যাবে। তোমার মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ তাতে আমরা ত একরকম ভাইবোন বললেই হয়।

তারপর থেকে হলো দৈনন্দিন নতুন নিয়ম। প্রত্যেক সন্ধ্যায় ফ্রনটেনেক আসতেন ম্যালোরোমের কাছে আর হেনরী আর ডেনিস দূরে গ্রামাঞ্চলে কোথাও বেড়িয়ে আসতো, যখন তাদের মায়েরা গল্পগুজবে মগ্ন থাকতেন।

ডেনিসের আবির্ভাবে হেনরীর নির্জন গ্রীষ্মদিনের একঘেয়েমী অনেকটা কেটে গেল। আর যে নারীসঙ্গের প্রভাব সে জীবনে অনুভব করেনি অযাচিত তাই মাধুর্য্যলাভ করে সে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়লো। তার দুঃখদীর্ণ হৃদয় আবার আনন্দে উচ্ছল হ'লো। তাছাড়া তার জাগ্রত যৌবনের উত্তেজনায় দেখা দিল একটা স্নিগ্ধ অবলেপ।

ডেনিস, তারই মতো অভিজাত। তাদের ঐতিহ্য, সংস্কার ও রীতিনীতি একই ধরণের। তার ফলে দু'জনের মধ্যে হৃদ্যতা হয়েছিল নিবিড়। হেনরী যে রকম বোনের অস্তিত্ব কল্পনা করতো ডেনিস যেন ঠিক তারই প্রতিমূর্তি।

অক্টোবরে প্রথম বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সান্ধ্য ভ্রমণে ব্যাঘাত ঘটলো। হেনরী তখন শুরু করেছে ডেনিসের ছবি আঁকতে।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় ডেনিস এসে কাচঘেরা বারান্দায় কাউন্টেসের সঙ্গে দেখা করে যেত ওপরে ষ্টুডিওতে। তার মা নীচে বসে গল্প করতেন।

হেনরী, দরজার কাছ থেকেই সে ডাক দিত, তোমার বিখ্যাত ছবি কতদূর এগোল? সিঁড়িভাঙার শ্রমে হাঁপাতো সে। ইতিমধ্যে খোলা হ'য়ে যেত সেনেটটা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ঠিক করে নিত চুল তারপর মডেল ষ্ট্যাণ্ড-এ গিয়ে নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গিমায় দাঁড়াত।

অভ্যস্ত ভ্রূকুটি করে হেনরী নির্দেশ দিত মাথাটা একটু নীচু··· না না অত না···বেশ।" ডান কাঁধ একটু নামাও···ঠিক হয়েছে। ঐ অবস্থায় একটু বসো।

ডেনিস পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়লে পনের মিনিট বিশ্রাম নিতো। চায়ের জন্যে ঘণ্টা বাজাত হেনরী। গল্পে হাসিতে তারা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠত। বাইরে বৃষ্টিধারা শার্সির গায়ে জলতরঙ্গের সুর বাজতে থাকত। বৃষ্টি হোক, বাতাস গর্জন করুক, এই ছোট্ট ঘরে বন্দী থাকা মন্দ কি! যখন পাশে আছে ডেনিস···

নিজের অজ্ঞাতেই হেনরী নিজেকে কৃষাণের মত ভাবতে থাকে, সে যেন ক্ষেতের আয়ে অবসর জীবন যাপন করছে, লক্ষ্য করছে তাকে কে ফাঁকি দিচ্ছে, প্রজাদের দোরে দোরে ঘুরছে, বেড়াচ্ছে পাকা ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে।

একটি কল্পিত বধূর পৌনঃপুনিক চিন্তায় তার মন ডেনিসের দিকে ছুটে যেত। ডেনিসকে আর শুধু বিরক্তিকর গ্রীষ্মদিনের পক্ষে শক্তিদায়িনী সাথী বলে মনে হ'ত না—আর একটু বেশী কিছু বোধ হ'ত। তার চিরজীবনের সঙ্গিনীরূপে বধূবেশে কল্পনা করতো তাকে কিন্তু মনোভাবের এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার মন থেকে সুখ-শান্তি অন্তর্হিত হলো।

ডেনিস যে তাকে পছন্দ করে, সে বিষয়ে হেনরী নিশ্চিন্ত ছিল। তবে সে কি প্রেমে কোন দিন রূপান্তরিত হবে? তা' না হোক, অন্তত তাকে স্বামিরূপে সে কি গ্রহণ করতে পারে? সত্যি সে পঙ্গু, কুৎসিত, তবে এ-ও ত ঠিক, কত নারীই ত' পঙ্গুর পাণিগ্রহণ করেছে।

প্রত্যেক যুদ্ধের পর কত মেয়েরাই তো স্বেচ্ছায় পঙ্গুদের বিয়ে করে। ডেনিস কি তাদের মতো নিঃস্বার্থ ত্যাগী চরিত্রের মেয়ে? না সে সাধারণ মেয়েদের মতই শুধু চায় সুশ্রী মুখ আর সুঠাম স্বাস্থ্য!

সে কি বুঝবে ভালবাসা শুধু রোমাঞ্চকর উত্তেজনা নয়, আরো গভীরতম অর্থ তার। সে কি বুঝবে স্থায়ী সুখ শুধু দুটো লম্বা লম্বা স্বাভাবিক পা আর সুন্দর দেহের ওপর নির্ভর করে না?

আজ রাতে তাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল! কাঁধ দুটো সোজা সাটিনের মত বোধ হচ্ছিল। দু'চোখের তারায় মোমবাতির শিখার আলো জলজল করছিল। ঠিক তাকে যে ভাবে দেখছে সেই ভাবে যদি আঁকতে পারত!

চুলায় যাক ছবি আঁকা। ডেনিসকে চুম্বনে শিহরিত করতে চায় সে, চায়···হ্যাঁ, ডেনিস তারই—একান্ত করে তার। সে ডেনিসের মন জানে তার প্রেমের প্রমাণ সে পেয়েছে। হ্যাঁ, প্রমাণই বলা চলে।

সে যে ভাবে সস্নেহ আদরে তার হাত হাতের মুঠোয় তুলে নিয়েছে। যে ভাবে হেনরীকে বলেছে তোমার মতো ভালো লোক এর আগে কখনও দেখিনি। তার মতো অভিজাত মেয়ে একথা বলত না যদি না ভাষাতিরিক্ত কিছু বলার প্রয়োজন হতো।

এ-বিষয়ে কিছু না বলে সে মৌন হয়ে থাকবে? আর ফিরে এসে মূর্খের মত দেখবে ডেনিস আর এক জনের বাহুলগ্ন হয়ে গেছে? শুধু মুখ ফুটে বলার লজ্জা এড়াতে সে এ-রকম অবস্থা হতে দেবে না। না কিছুতেই না।

হেনরীর মা টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন। হেনরী কাচের গ্লাসে কিছু শ্যাম্পেন ঢেলে নিল। সুন্দর একটা আমেজ সারা দেহে ব্যাপ্ত হলো। ছড়ি হাতে নিয়ে সে যখন চলতে শুরু করল তখন পায়ের তলায় ঘরের মেঝেটা কাঁপছে মনে হলো।

ড্রয়িংরুমে কফিপানের জন্ত তারা উপস্থিত হ'লো। হেনরীর গায়ের কাছে ঝুঁকে পড়ে ডেনিস বলল, সিজার ফ্যাংকস-এর প্রিলুড় পিয়ানোয় বাজাব? তুমি ওটা খুব পছন্দ কর—মনে আছে প্রথম দিন ঐ সুর আমি বাজিয়েছিলাম।

ডেনিস পিয়ানো বাজাতে লাগলো। হেনরী গিয়ে তার পাশেই বসলো। পেছনে ডেনিসের মা অনর্গল কথা বলছিলেন। এই একমাত্র সময়···চলো ষ্টুডিওতে যাই, ফিস-ফিস করে হেনরী বললে।

এখন?

হ্যাঁ, এখন, চাপা স্বরে সে বললে খুব দরকার আছে।

আলো না নিবিয়ে সে বুদ্ধিমানের কাজই করেছিল। শ্যাম্পান তার রক্তে এনে দিয়েছিল উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজনা। সে ছাড়া ডেনিসকে আর কেউ বিয়ে করতে পারে না। এই ষ্টুডিওতেই সে ডেনিসকে এ কথা বলতে পারে। এইখানেই ত' তাদের জীবনের চঞ্চল সুখের মুহূর্তগুলি কেটেছে। কিন্তু বলবে কি, হৃৎপিণ্ড বুকের মধ্যে যা মুখর হয়ে উঠেছে।

কি দেখাতে আবার আনলে এখানে, ডেনিস জিজ্ঞাসা করে।

এসো, সোফায় এসে বসো।

ডেনিস বসলো। হেনরী তাকে সোফার প্রায় একপ্রান্তবর্তী করে খুব কাছ ঘেঁসে বসলো।

তোমায় একটা কথা বলতে চাই, হেনরী একটু দ্রুত আর মৃদু স্বরে বলল, আমি আশা করি না তুমি আমায় ভালোবাস, তবে সারা জীবন আমি তোমাকে সুখী করার চেষ্টা করবো। আমার বিশ্বাস, আমাকে বিয়ে করলে তোমায় অনুশোচনা করতে হবে না। তোমায় আমি সুখী করব। দেখো, তুমি যা চাও আমি তাই করবো। তুমি যেখানে বলবে সেখানে যাবো, যা বলবে তাই করবো। আবেগভরে সে ডেনিসের একটি হাত চুম্বন করল।

ডেনিস একদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। ব্যথা-বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল সে। মুখে ফুটে উঠেছিল বিস্ময়, সমবেদনা আর কৌতুকের মিশ্রভাব।

কিন্তু, হেনরী, আমি ত' তোমায় ভালবাসি না? আমি কোন দিনই ভাবিনি যে তুমি···

বুঝেছি, হেনরী মাথা নেড়ে জানায়, তোমার মা-কে আগে বলাই আমার উচিত। তবে তাঁকে বলার আগে আমি চেয়েছিলাম···

না না, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না! সে তার বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠছিল। কণ্ঠস্বর উঠল উঁচু পর্দায়, তুমি কিছুই বুঝতে পারলে না। আমি তোমায় ভালই বাসি না। এ জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত। তবে উপায় নেই। আমার হাতটা ছেড়ে দাও।

দ্রুত ঘটনাটা ঘটে গেল। তার সমস্ত মন শ্যাম্পানের উত্তেজনায় ঘূর্ণীর মত ঘুরছিল। আমি ত' বলিনি তুমি আমায় ভালোবাস, বলেছি পছন্দ কর। পছন্দ কর না, বল? মনে করে দেখো সেদিন তুমি আমার হাত তুলে নিয়ে বলেছিলে···

তুমি একদম পাগল! হাতটা ছেড়ে দাও, আমার কষ্ট হচ্ছে··· তুমি-যা করেছ। এতে মনে করার কিছু নেই। তবে জানিয়ে দিচ্ছি, কোন দিন তোমায় আমি ভালবাসি নি, বাসতে পারবও না। এ আমার পক্ষে অসম্ভব!

এবার হেনরীকে দেখে ডেনিস ভয় পেয়ে গেল। ধীরে ধীরে সে ভুল বুঝতে পারছে। তার চোখ দুটো আহত জন্তুর মত আরক্ত

জলজলে হ'য়ে উঠেছে। ঠোঁট ছুটো উঠছে থর-থর করে কেঁপে। ল্যাম্পের মৃদু আলোয় তার কদাকার মূর্ত্তি আরো কুৎসিত দানবের মতো মনে হচ্ছিল।

কেন, অসম্ভব কেন? কেন বল? তার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গেল। মূর্ত্ত পাপের মত তার লিকলিকে আঙুলগুলো ডেনিসের মণিবন্ধে আরো চেপে বসল। বোধ হয়, আমি পঙ্গু ব'লে, না? তাই না, বল? আমি পঙ্গু শুধু সেই জন্মে?

ছুঃখের সঙ্গে এবার রাগ হলো ডেনিসের। ভুলে গেল তার বিপদের ভয়। ছ'ফোঁটা বড় বড় অশ্রুর পিছনে তার চোখ ছুটো জ্বলতে লাগল।

হ্যাঁ! চিৎকার করে সে জানাল,, হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই। তুমি পঙ্গু বলে আর তা ছাড়া তুমি শুধু পঙ্গু নয়, কুৎসিত, তোমার মতো কদাকার লোক আমি জীবনে দেখিনি···

তার কথা শেষ হ'লো না। বেশ হেঁচকা টান দিয়ে ডেনিসকে বুকের কাছে টেনে আনল হেনরী। তার বিবর্ণ ঠাণ্ডা ঠোঁটের ওপর নিজের উত্তপ্ত ঠোঁট চেপে ধরলো। থেমে গেল সময় প্রবাহ। বাঁকা ধনুকের মতো ডেনিসের শিরদাঁড়ার স্পর্শ পেল সে, তার উঁচু বুকের চাপ অনুভব করল তার সার্টের ওপর। ডেনিসের ধারালো নখের দাগ বসে গেল তার দু' হাতে।

একটা প্রাণপণ ঝটকা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিল ডেনিস। দরজার দিকে দ্রুত ছুটে গেল। দরজার পাল্লায় এক হাত রেখে ফিরে দাঁড়াল। হেনরী যেখানে ছিল সেখান থেকে একটুও নড়েনি। সোফার ওপর স্তব্ধ মূর্ত্তির মতো বসে ছিল। ক্রোধের কালো কালো রেখাগুলো মিলিয়ে গেছে মুখ থেকে।

তুমি একটা নীচ, মুখ্যু, জানোয়ার। কোন মেয়েই তোমাকে কোন দিন বিয়ে করবে না। কোন দিন নয়, শুনতে পাচ্ছ?

ক্রোধের আতিশয্যে আঘাত করবার নিষ্ঠুর প্রবৃত্তিতে তার নাকটা ফুলে ফুলে উঠছে, ঠোঁটটা উঠছে কেঁপে-কেঁপে। সে তার কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করল। যেন প্রতিটি কথা পেরেকের মত গেঁথে দিয়ে যেতে চায়।

ডেনিস চলে গেলো। হেনরী তাকালো না এক বার। শুধু কার্পেটপাতা সিঁড়ির ওপর মৃদু পদশব্দ, আর নিচের ঘরে উত্তেজনা-পূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। তার পর একটা মৃদু ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলো বালুময় পথের ওপর গাড়ীর চাকার আর্তস্বর। ঘরের মধ্যে একটা বিকট শূন্যতা শুধু হাঁ করে রইল।

আর বাইরে, অশ্রুময়ী রাত্রি।

কয়েক মুহূর্ত্ত যেন হেনরীর অনুভব শক্তি অসাড় হ'য়ে রইল। কিছুই ভাবতে পারছে না সে। যন্ত্রচালিতের মত ছড়িটা তুলে নিল। বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সিঁড়ি থেকে সে মা-কে দেখতে পেলো। ফায়ার প্লেসের পাশে আগুনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছেন। হাত দু'টি কোলের ওপর ধরা রয়েছে। মুখের রেখার কাঠিন্য দেখে বোধ হয় যেন পাথরে গড়া মূর্ত্তি।

সে গিয়ে কাছেই বসল। ছড়িটা মাটিতে রেখে ওয়েষ্ট-কোটটা আঙুলে জড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ দু'জনের কেউ কথা বলতে পারল না।

তুমি সব বুঝতে পারছ, মা, আমি মূর্খের পরিচয়ই দিয়েছি। আগুনের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলে গেল সে। তাকে আরো গভীর ভাবে বোঝা উচিত ছিল, আমি জানি। তবে আমি যেন বিশ্বাস করতে চেয়েছিলুম ডেনিস অন্য মেয়ের মতন নয়। আমার বিশ্বাস এত দৃঢ় হয়েছিল যে আমি মনে করেছিলাম, ডেনিস আমায় ভালোবাসতে পারে। তুমি ত' জান না মা, পঙ্গু হ'লে এই ভাবে নিজেকে ভোলান কত সহজ। একটু একটু করে নিজেকে কম কুৎসিত মনে হতে থাকে, খোঁড়া বলে আর বোধ হয় না। নিজেকে একটা খুঁড়িয়ে চলা যুবকের মত মনে হয়। পঙ্গু বামন বলে নিজেকে ভাবতে আর মন চায় না।

উঃ, চুপ কর হেনরী, ওরকম করে আর বলো না।

কিন্তু আমি ত' তাই মা, তাই নয় কি? নিজের প্রতি একটা ফুলে ওঠা রাগে সে বলতে লাগল, সত্যকথাটার ওপর আমরা এমনি ভাবে হোঁচট খেয়ে পড়ি। এ যেন অনেকটা সাপের মাথায় পা দেওয়া। সেইজন্যে আমি ঠিক করেছি—পূর্ণ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল, যাবো।

সে দেখতে পেলো মায়ের ঠোঁট বেদনায় কেঁপে-কেঁপে উঠছে, হাত ছুটো নিসপিস করছে উপায়হীন উত্তেজনায়।

তোমাকে দুঃখ দেওয়ার জন্যে ক্ষমা কোর মা! এখান থেকে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আজ রাতে যা ঘটল এ রকম হওয়া অবশ্যম্ভাবী। মণ্টমার্ট্রেতে গিয়ে আমি মনের মতো নতুন জীবন আরম্ভ করতে পারি। আর এখানে থাকলে অন্ততঃ তোমাকে আর দুঃখ দেব না, যেমন আজ রাতে ছিলুম।

দু ফোঁটা অশ্রু তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। তোমার মণ্টমাটারে বড্ড একলা মনে হবে, হেনরী!

পৃথিবীর যে কোন জায়গাতেই তা হবে মা।

মাটি থেকে ছড়িটা তুলে নিয়ে হেনরী মায়ের দিকে সরে এলো। মা, কেঁদো না তুমি। আমাদের দু'জনেরই ধৈর্য দরকার। তুমি ত জানো অন্য কোন পথ নেই। তোমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে আসব···নত হ'য়ে মাকে সে ছোট্ট একটা চুমু খেল। এ কথা ভুলো না, তার পর মৃদুকণ্ঠে বললে,·যা কিছু ঘটুক না এ কথা ভুলো না আমি তোমায় ভালবাসি। সারা জীবন সমস্ত মন দিয়ে ভালোবাসব।

হেনরীকে ধরে রাখবার চেষ্টা করলেন না তিনি। হেনরী ঠিকই বলেছে। এ ছাড়া সমস্যার অন্য মীমাংসা নেই। তিনি নির্বাক দৃষ্টিতে দেখলেন, পঙ্গু দেহটাকে টেনে নিয়ে ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার ছড়ির বিলীয়মান ঠক-ঠক শব্দ আর তার পরেই শয়ন কক্ষের দরজা দেওয়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তার ব্যথাতুর দৃষ্টি আবার ফায়ার প্লেসের বহ্নিমান শিখার দিকে স্থির নিবদ্ধ হয়ে রইল।

সে চলে গেল। এবার আর সহজে ফিরবে না সে। দুর্ভাগ্যের কঠিন আঘাত থেকে তিনি পুত্রকে আড়াল করে রাখতে পারবেন না। এ প্রচেষ্টা ভ্রান্তিময়। কিন্তু ওর কি হবে? পঙ্গুতা, কুরূপ, প্রেমের জন্যে বুভুক্ষু হৃদয় আর এক অপরিচিত বাসনা নিয়ে ও কি করবে? শুধু একটি কথা তিনি জানেন, সে তার সন্তান এবং পৃথিবীর চার দিক থেকে তার ওপর অসংখ্য আঘাত এসে পড়বে। আর তিনি তাকে ত্যাগ করবেন না কোন দিন—অপেক্ষা করবেন চিরকাল যত দিন না তাঁর জীবনের অন্তিমলগ্ন উপস্থিত হয়। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ—কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ও তারাপ্রসাদ দে।

স্বাস্থ্যবান লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে
চান করে —
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY SOAP
—এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।

ভ্যাসিলি গ্রসম্যান

[এই আখ্যায়িকাটি প্রখ্যাত রুশ লেখক **Vassili Grossman**-এর একখানি প্রসিদ্ধ যুদ্ধকালীন পুস্তকের একটি কাহিনী অনুসরণে লিখিত। গত মহাযুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট জার্মাণশক্তির বিশ্ব-বিধ্বংসী কীর্তিকলাপের কথা আজকের দিনের শিশুদেরও অজানা নয়। তার মধ্যে আবার রুশ-জার্মাণ সংগ্রামের ভীষণতা ও বীভৎসতা সমগ্র জগৎ বিস্ময় ও বেদনার সঙ্গে বহু কাল স্মরণ রাখবে। যে সোভিয়েৎ শক্তিকে আক্রমণ করে "অপরাজেয়" নাৎসী জার্মাণী তার আপন ধ্বংস ত্বরান্বিত করেছিলো—যাদের অদম্য ও দুর্জয় নৈতিক শক্তি জ্বলন্ত দেশপ্রেম এবং অমানুষিক সহিষ্ণুতা বর্বর রণদুর্মদ শত্রুকেও স্তম্ভিত করেছিলো, তারই সামান্য একটুখানি আভাস এই কাহিনীর মধ্যে সঞ্চারিত। কিন্তু এমন ঘটনা রুশ-জার্মাণ যুদ্ধের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে প্রচুর পাওয়া যাবে। তাই অনন্যসাধারণ হয়েও এ কাহিনী ওদের কাছে একান্তই সাধারণ। —স]

এক ঝিম্‌ঝিম্ বর্ষার সন্ধ্যায় এই কাহিনীটি শুনেছিলাম আমি। যিনি বক্তা, সেই ক্যাপ্টেন, প্যাচপেচে ঠাণ্ডা বর্ষার মধ্যে বর্ষাতি মুড়ি দিয়ে রাস্তার পাশে হাত উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। ট্রাক থামিয়ে আমরা তাঁকে তুলে নিলাম, তাঁর দাঁতে দাঁতে তখন ঠক্‌ঠক্ করে বাজছে—ম্যালেরিয়ায় ধরেছে—বললেন তিনি, যাক্, ট্রাক আবার ছাড়লো। এক রাশ খালি তেলের টিনের ওপর চট্‌চটে নোংরা তেরপল ঢাকা—তারি উপরে সবাই বসে। ফ্রন্ট লাইনের বোমাবিধ্বস্ত পাথুরে রাস্তা, তারি উপর দিয়ে এই রকম ঝড়ঝড়ে গাড়ী চড়ে যাবার আনন্দটা যে কী রকম, তা শুধু তাঁরাই জানেন, যাঁরা চড়েছেন। যা হোক্, সেই এলোপাথাড়ি ঝড়ঝড়ানি, খালি টিনের বাদ্যি, অ্যাক্সিলারেটরের ক্রুদ্ধ গোঙানি, চালক উস্তুরোভের শাপ-শাপান্ত আর তার সঙ্গে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ক্যাপটেনের দাঁত ঠক্‌ঠকানির মধ্যে থেকেও যে কাহিনীর টুকরো-টুকরো শব্দগুলি ছেঁকে বেরিয়ে আসছিলো—তারা আমার ডায়েরির পাতায় ঢুকতে না পারলেও স্মৃতির মলাট থেকে মুছে যাবে না কোনো দিন।

জ্বরে কাঁপতে-কাঁপতে গল্প শেষ করে ক্যাপটেন বললেন—এই যে আমার হাসপাতাল এসে গেছে, এবার আমায় নামতে হবে। বিদায় কমরেডরা—গাড়ি তখন উৎরাইয়ের পথে নামছিলো। উস্তুরোভ ব্রেকের নামে শপথ করতে করতে গাড়ি থামালো।

ক্যাপটেন তাঁর বর্ষাতির দু'প্রান্ত দু'হাতে তুলে ধরে পেছল কাদার মধ্যে আড়ষ্ট পা ফেলে ফেলে এগিয়ে গেলেন দূরের আবছা কুটিরগুলো লক্ষ্য করে। নিছক হতাশার সুরে-ভরা কণ্ঠে একটা পরিচিত গানের দু'কলি আমাদের কানে এলো—

তোমায় আমার দেখা হলো কবে মনে কি আছে?
গোধূলি-ছায়ায় এসেছিলে যবে ঘনায়ে কাছে···

যতক্ষণ তাঁর দীর্ঘ দেহ সন্ধ্যার ছায়ায় মিলিয়ে না গেলো—আমরা চেয়ে রইলাম। তার পর গাড়ী ছেড়েছিলো উস্তুরোভ।—

যে কাহিনীটি তিনি আমদের শুনিয়েছিলেন, তা হলো এই।

১

প্রায় দু'সপ্তাহ যাবৎ লালফৌজের এই বিচ্ছিন্ন ছোট্ট দলটি দনেৎস স্তেপভূমির যুদ্ধবিধ্বস্ত খনিজ এলাকার গ্রামগুলির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলছিলো। তাদের মূল কাহিনীর থেকে তারা বহুদূর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো। দু' দু'বার জার্মাণরা ওদের ঘিরে ফেলেছে—দু'বারই তারা বেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে গেছে এবং পূব দিকে আরো অনেক দূর এগিয়েছে। কিন্তু এবার আর ওদের পরিত্রাণ নেই। জার্মাণরা এবার ওদের চার দিকে পদাতিক গোলন্দাজ ও মর্টার কামানবাহিনীর একটা দৃঢ় বেষ্টনী সৃষ্টি করেছে এবং দ্রুত গুটিয়ে আসছে।

ওরা আশ্রয় নিয়েছিল একটা কয়লাখাদের ছাউনির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। জার্মাণরা দিন-রাত ওদের ওপর কামান আর মর্টারের গোলা দেগে ওদেরকে চূর্ণ করে' ফেলতে চাইলো। কিন্তু, জার্মাণ পদাতিকরা ঐ খাদঘরের দিকে এগোতে পারছিলো না—কারণ তখনো বাড়ভাঙা রাবিশগাদার মধ্যে থেকে সমানে মেশিনগান আর ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানের গুলী মারফৎ লালফৌজের উত্তর আসছে। ওদেরও গোলাগুলী যথেষ্ট আছে বলে মনে হলো।

সোভিয়েট ফ্রন্ট সেখান থেকে কম পক্ষে ৪০ মাইল দূরে। তবু এই একমুঠো সোভিয়েট পদাতিক যে কেন এখনো আত্মসমর্পণ করছে না ভেবে জার্মাণ কর্ণেল রীতিমত বিস্মিত ও বিরক্ত হলেন। এমন নাহক্ বোকামি যুদ্ধের নীতিনিয়মের বিরুদ্ধে। কিন্তু লালফৌজের পক্ষে যতই বোকামি হোক তাঁর পক্ষে ব্যাপারটা মোটেই রুচিকর হচ্ছিল না। কারণ, সেদিন সকালেই আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে তীব্র বিদ্রূপভরা একখানি চিঠি এসেছে এই মর্মে যে—ঐ একমুঠো লালফৌজের সঙ্গে যদি কর্ণেল সাহেব পুরো একটা ডিভিসন নিয়ে পেরে না ওঠেন তবে কি তাঁর জন্যে আরো কামান, ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন পাঠাতে হবে? ইত্যাদি—

কর্ণেল রেগে টং হলেন। চীফ-অফ-ষ্টাফকে ডেকে ধমকালেন, বললেন—এই গুটিকতক বদমাস সকলের মুখে চুণকালি মাখাচ্ছে—খেয়াল আছে কি? আর নয়—কালকের মধ্যেই এস্পার কি ওস্পার একটা কিছু হতেই হবে—

পরদিন সকাল থেকেই ভারী মর্টার কামানগুলো ঐ বিধ্বস্ত খাদবাড়ীটাকে গুঁড়িয়ে সুরকি করতে লেগে গেলো। মনে হলো—ওখানকার প্রতিফুট জমি কামানের গোলায় চষে ফেলা হয়েছে। তার উপর আবার কর্ণেল ভারী দূরপাল্লার কামানও কাজে লাগালেন। কয়লা ওঠাবার যে উঁচু গাঁথনির দেয়ালগুলো তখনো খাড়া ছিলো, তারা গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে পড়তে লাগলো। ধোঁয়া আর ধূলোর বিরাট

ধূসর মেঘ যেন কোড়ো বাতাসের ঝাপটায় পাক খেয়ে খেয়ে আকাশে লাফিয়ে উঠতে লাগলো।

"চালিয়ে যাও"—কর্ণেল বললেন।

চার দিকে বড় বড় পাথরের চাঁই ছুটছে তখন। লোহার বরগাগুলো পর্যন্ত পচা সুতোর মতন ছিঁড়ে কুটি-কুটি হয়ে' যাচ্ছে। কুয়াশার মাতা কংক্রীটের ধূলো উঠছে বাতাসে। চার দিকের মাটি কাঁপছে যেন ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রের মতন। কর্ণেল সাহেব দূরবীণ দিয়ে তাঁর কীর্তি দেখছিলেন।

"গোলাবর্ষণ থামিয়ো না"—কর্ণেল আবার হুকুম করলেন।

"আমরা নিশ্চয় এতক্ষণে ওখানকার প্রতিটি রুশের মাথাপিছু পঞ্চাশটার বেশি ভারী মর্টার বোমা আর ত্রিশটার উপর কামানের গোলা পাঠিয়ে দিয়েছি—"

—চীফ-অফ-ষ্টাফ সাহস করে' বললেন, "না, গোলাগুলী থামিয়ো না"—কর্ণেল একগুঁয়ের মত চেঁচিয়ে উঠলেন।

সেই নারকীয় অগ্নিবাত্যা পূর্ণোদ্যমে চললো। সৈন্যরা ততক্ষণে ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছে—কিন্তু তাদের এক মিনিটের জন্যেও বিশ্রাম দেয়া হলো না। বিকেল পাঁচটার সময় কর্ণেল আক্রমণ করবার হুকুম দিলেন। টমিগান, মেশিনগান, জোরালো আগুন-ছোঁড়া যন্ত্র, হাত-বোমা, ট্যাঙ্কমারা-বোমা, ছুরি, কোদাল সকল রকম অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ব্যাটেলিয়নগুলি চারি দিক থেকে ঐ রাবিশগাদার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঐ অমানুষিক মানুষগুলোর ভয় তাড়াবার জন্যে তারা অস্ত্র ঝনঝন করে চীৎকার করে হুঙ্কার করে—যত রকমে পারে শব্দ করছিলো।

কিন্তু এই বীর আক্রমণকারীদের অভ্যর্থনা করলো মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা। একটা গুলীও না, একটু শব্দও নেই। জার্মাণরা চেঁচাতে লাগলো—"এই রুশ! কোথায় তোরা, রুশ?" কিন্তু ভাঙা পাথর আর তোবড়ানো লোহালক্কড় নিস্তব্ধ হয়ে রইলো।

প্রথমটা ওরা ভাবলো—রুশিয়ানরা সব কটাই মরে গেছে। যে নিদারুণ গোলাবর্ষণ করা হয়েছে—একটা পিপড়েও জ্যান্ত থাকতে পারে না। অফিসাররা তখন হুকুম দিলো—ভালো করে খুঁজে বার করো সব ক'টা মৃতদেহ—আর গুণে ফ্যালো!

বহুক্ষণ ধরে সমস্ত জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজেও যখন একটা মৃতদেহও পাওয়া গেলো না—ওরা ভয় পেয়ে গেলো। ভৌতিক ব্যাপার নাকি! একটা দেহও নেই! খালি কয়েক জায়গায় জমাট-বাঁধা থান থান রক্ত দেখা গেলো, দু'-চারটে ছিন্নভিন্ন রক্ত চিটচিটে জামা আর ব্যাণ্ডেজ। গোটাকয়েক ভাঙা মেশিনগান—এই মাত্র মিললো। এক জন স্কাউট একটা গর্তের মধ্যে থেকে আধ-খাওয়া একটুকরো জৈ-এর রুটি খুঁজে আনলো—তা ছাড়া আর কোনো খাবার-দাবারেরও চিহ্ন নেই।

জার্মাণরা এবার সত্যিই ঘাবড়ে গেলো। রুশরা গেলো কোথায় তবে? অনেক সুতীক্ষ্ণ সন্ধানের পর উত্তর মিললো এর। রক্তের ক্ষীণ দাগ ধরে ধরে ওরা অবশেষে এসে হাজির হলো একটা অন্ধকার কয়লা-তোলা খাদের গহ্বরের মুখে। সেখানে একটা লোহার আংটায় বাঁধা একগাছি দড়ি ঝুলছিলো গহ্বরের অন্ধকারে। স্পষ্ট বোঝা গেলো—রুশরা এখান দিয়েই নেমে গেছে গহ্বরের মধ্যে—তাদের মালপত্র অস্ত্রশস্ত্র আর আহতদের নিয়ে!

ব্যাপারটা ভাল করে জানবার জন্যে তিন জন জার্মাণ স্কাউট কোমরে দড়ি বেঁধে হাতে হাতবোমা নিয়ে খাদে নেমে পড়লো। তারা শ'দুই ফিট পর্যন্ত নামতেই হঠাৎ দড়িগুলো ভীষণ ঝাঁকুনি খেতে লাগলো। তাড়াতাড়ি করে যখন তাদের টেনে তোলা হলো—দেখা গেলো প্রত্যেকে একাধিক গুলী খেয়েছে। রুশরা যে ওখানে আছে তা এবারে স্পষ্টই বোঝা গেলো। তবে তারা ওভাবে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না এটাও সত্যি। তাদের খাবার যে আদৌ নেই—তা ঐ আধখাওয়া জৈ-এর রুটি দেখেই বোঝা যায়।

জার্মাণ কর্ণেল ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষের গোচর করতে গিয়ে আরো মর্মান্তিক উত্তর পেলেন। জেনারেল তাঁর অসামান্য বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন যে অতঃপর কর্ণেল যদি আগামী দু'মাসের মধ্যেও ঐ রুশ দলের প্রতিরোধ ধ্বংস করতে সক্ষম হন, তবে সামরিক কর্তৃপক্ষ ধন্য মনে করবেন।

কর্ণেল এবারে সত্যিই ক্ষেপে গেলেন।

অনন্তর তিনি একটার পর একটা উপায় চেষ্টা করলেন। দু'-দুবার একটা কাগজে আত্মসমর্পণের দাবী জানিয়ে দড়ি বেঁধে নিচে নামিয়ে দেওয়া হলো। কর্ণেল প্রতিশ্রুতি দিলেন—আহতদের যত্ন নেওয়া হবে এবং জীবিতদের কিছু বলা হবে না। দু'বারই কাগজে পেন্সিলে লেখা ছোট্ট উত্তর এলো—"না"। তখন খাদের মধ্যে ধোঁয়ার বোমা ফাটানো হলো পর-পর কয়েকটা। তাতেও বিশেষ সুবিধে হলো বলে মনে হলো না। বোধ হয় জল থাকায় ধোঁয়াটা ছড়াতে পারলো না খাদের তলাকার অলিগলিতে। তখন রাগে অন্ধ হয়ে কর্ণেল হুকুম করলেন, গ্রামের সমস্ত মেয়েমানুষ-গুলোকে খেদিয়ে নিয়ে আসতে এবং তারা এলে তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, যদি ঐ খাদের মানুষগুলো আত্মসমর্পণ না করে তবে গ্রামের সব মেয়েগুলোকে বলাৎকার করা হবে আর বাচ্চাগুলোকে গুলী করে মারা হবে। মেয়েদের বলা হলো—তাদের

দলপতি একটু ম্লান হেসে শুধালেন—"তা, প্রতিনিধিরা কি জন্য এসেছেন?"

মধ্যে থেকে তিন জন প্রতিনিধি হয়ে খাদের মধ্যে নেমে যাক্ এবং লালফৌজের লোকদের বলে-কয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে উপরে নিয়ে আসুক আত্মসমর্পণ করার জন্যে। নইলে বাচ্চাগুলো তো মরবেই, তাছাড়া খাদের মুখও ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে খাদ চিরকালের মতো বুঁজিয়ে দেওয়া হবে—ইঁদুরের মতো পচে মরবে ওরা।

মেয়েরা যে তিন জনকে পাঠাবার জন্যে ঠিক করলো, তারা হলো: নীয়ুশা ক্রামারেঙ্কো; ভারভারা জোতোভা—সবচেয়ে কমবয়সী সে; এবং মারিয়া মৈসেয়েভা—তার সাঁইত্রিশ বছর বয়েস আর পাঁচ সন্তানের মা সে। ওরা তিনজন জার্মাণদের বলে-কয়ে বুড়ো খনি-শ্রমিক কোজলভকে সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করলে। তা নইলে তারা হয়তো খনির তলাকার গলি-ঘুঁজির মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলবে শেষ কালে। বুড়ো তাদের পথপ্রদর্শকের কাজ করবে, সাব্যস্ত হলো।

জার্মাণরা খাদের মাথায় একটা কপিকল খাড়া করে তা থেকে লোহার তার ঝুলিয়ে দিলো—আর তার সঙ্গে বাঁধলো একটা যেমন তেমন কয়লাতোলা লোহার বালতি। এমনি করে খাদে নামবার অভিনব খাঁচা তৈরি হলো।

মেয়ে তিন জনকে খাদের মুখে নিয়ে আসা হলো। তাদের পেছনে সারা গ্রামের মেয়েমানুষ আর ছেলেপুলেরা কাঁদতে-কাঁদতে আসছিলো। ওরাও কাঁদছিলো—চোখের জল মুছতে মুছতেই ওরা ওদের ছেলেপুলে, আত্মজন, আপন গ্রাম আর পবিত্র সূর্যালোকের কাছে বিদায় নিচ্ছিলো।

চার দিক থেকেই কান্নাঝরা মেয়েলি কণ্ঠ ওদের ডেকে ডেকে নানান কথা বলছিলো। বলছিলো—নীয়ুশকা, ভারকা ইগনাতি-য়েভনা, তোমাদের ওপরে ভরসা করেই রইলাম আমরা। ওদেরকে ভালো করে বুঝিয়ে বোলো গো তোমরা। বোলো তাদের—তারা যদি কথা না শোনে তবে ঐ মুখপোড়া নাৎসীগুলো সবাইকে গুলী করে মারবে—বাচ্চাগুলোর ঘাড় মুচড়ে মারবে মুরগীছানার মতো।

এরা তিন জন কাঁদতে কাঁদতেই জবাব দিচ্ছিলো—তা কি আর আমরা জানি না? আমরা শেষ পর্যন্ত দেখবো—দরকার হলে ঐ পাগলাগুলোর চুল ধরে হিড়হিড় করে টেনে উপরে তুলে আনবো। গর্দভদের চোখ খুবলে বার করবো আমরা। ওদের বুঝিয়ে দেবো যে ওদের একগুঁয়েমির জন্যে কতকগুলো নিরপরাধ প্রাণ নষ্ট হতে চলেছে!

বুড়ো কোজলভ তার খনি-লণ্ঠনটি দোলাতে দোলাতে আর খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটু দ্রুতই চলবার চেষ্টা করছিলো। ১৯০৬ সালে খাদের ছাদ ধ্বসে পড়ে তার ডান পা'টা গুঁড়িয়ে গেছলো। তখন তার মাত্র আঠাশ বছর বয়েস। কিন্তু তার পরও কোন দিনের তরে সে তার পেশা ছাড়েনি—বলতে কি, খাদে নেমে কয়লা কাটাই যেন তার কাছে পবিত্র কর্তব্য আর জীবনের পরম আনন্দ বলে মনে হতো। খনির কাছে আসতেই তার মনে এমন একটা ভাব আসতো, যা ধার্মিক লোকদের আসে খৃষ্টমাসের সময় গীর্জায় ঢুকতে গিয়ে। তাই, সে একটু দ্রুতই চলতে চেষ্টা করছিলো যাতে ঐ নির্বোধ মেয়ে-মানুষগুলোর মড়াকান্না তার ঐ পবিত্র মানসিক আবহাওয়াটি নষ্ট করে না দিতে পারে। কিন্তু ঐ সমবেত ক্রন্দন-কলরোল ছাড়িয়ে যেতে পারছিলো না সে কিছুতেই, ওদের কান্নার সুরে সে যেন এই মৃত খনির ধ্বংসস্তূপের শোকই শুনতে পাচ্ছিলো, আর তার নিজের বার বার করে মনে হচ্ছিলো যেন সে সমাধিক্ষেত্রে এসেছে, যেমনটি সেই শরতের বিষণ্ণ অপরাহ্নে তার স্ত্রীর কফিনের কাছে শেষ বিদায় নিয়ে এসেছিলো।

জার্মাণরা খাদের মুখে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গল্প-গুজব হাসি-ঠাট্টা করছিলো আর এমন নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ফুঁকছিলো যেন এই সমস্ত ধ্বংস এবং মৃত্যু আকাশ থেকে ঝরে পড়েছে, তারা এর কিছুই জানে না!

কেবল এক জন সৈন্য, মোটাসোটা, মুখে বসন্তের দাগ, চওড়া চাযাড়ে হাত, সেই শুধু নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে আর বিষণ্ণমুখে তাকিয়েছিলো খাদের ধ্বংসস্তূপের পানে।

—মনে হচ্ছে যেন ওই কেবল একটুখানি অনুভব করছে এই ধ্বংসলীলা। বুড়ো কোজলভ ভাবলো—কে জানে, হয়তো ও এক দিন কাজ করতো এই রকম একটি খাদে—কে জানে, হয়তো ও ছিলো…

লোহার বালতিটার মধ্যে বুড়োই উঠলো সবার আগে। নীয়ুশকা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো—"ওলেচকা, আমার বাছা, আমার সোনা রে"—

বছর চারেকের একটি মেয়ে চীৎকার শুনে ওর দিকে মুখভঙ্গি করে তাকালো, যেন সে মায়ের এই অশোভন চেঁচামেচির জন্যে নীরব ভৎ'সনা করছে তাকে।

"আমি পারবো না, আমি পারবো না যেতে! আমার হাত-পা কাঁপছে"—কেঁদে উঠলো নীয়ুশকা—"ওরা আমাদেরকেও গুলী করে মেরে ফেলবে—অন্ধকারে ওরা চিনতে পারবে না। আমরা মারা পড়বো সেখানে আর তোমরাও মরবে এখানে—"

জার্মাণরা ওকে ধাক্কা মেরে বালতির মধ্যে ঠেলে দিলে, কিন্তু ও বালতির গায়ে পা আটকে ফেললো। বুড়ো তাড়াতাড়িতে ওকে ধরতে চেয়ে টাল সামলাতে পারলো না,—পড়ে গেলো আর মাথাটা সজোরে বালতির কানায় ঠুকে গেলো। জার্মাণরা হেসে গড়িয়ে পড়লো—যেন এমন হাসির নাটক আর কোথাও দেখেনি। কোজলভ রেগে-মেগে চেঁচিয়ে উঠলো—"উঠে পড়ো—খোপানীর গাধা! তোমায় যেতে হবে খাদের মধ্যে—জার্মাণীতে নয়! এমন হাঁউমাউ করে মরছো কেন?"

ভারভারা আলগোছে লাফিয়ে উঠলো বালতির মধ্যে। তার পর জলভরা চোখে এক বার ক্রন্দনরতা নারী আর শিশুদের দিকে চেয়ে জোর করে ফূর্তির ভঙ্গি টেনে এনে বললো—"ভাবনা কোরো না, মেয়েরা! দেখো, আমি মন্ত্র পড়ে বশ করে সবাইকে উপরে এনে হাজির করবো'খন—"

মারিয়া ইগনাতিয়েভনা বালতির কানায় একখানা গোদা পা তুলে দিয়ে গোঙাতে গোঙাতে বললো—"ভারকা, আমার হাতখানা ধর! আমি চাই না জার্মাণরা আমাকে স্পর্শ করুক—"

বালতিটি ছেড়ে দেওয়া হলো। মারিয়া টাল সামলাতে না পেরে বালতির কানায় হুড়মুড়িয়ে পড়লো দেখে ভারকা তাড়াতাড়ি তার কোমর জড়িয়ে ধরলো দু'হাতে—

"তোমার ব্লাউজের নীচে কী নিয়েছো, পিসি?" একটু অবাক হয়ে সে বললো।

মারিয়া কোনো উত্তর না দিয়ে জার্মাণ কর্পোরালটাকে খেঁকিয়ে

উঠলো—"বলি, হাঁ করে দেখছো কি অনামুখো ! আমরা সবাই তো উঠেছি—এবার নামিয়ে দাও না ড্যাকরা—"

কর্ণোয়ালটা যেন তার কথা বুঝেই নামাবার সঙ্কেত করলো—বালতিটি নামতে সুরু করলো। প্রথমে কয়েক বার ওটা খাদের দেয়ালে আঁটা কালো ছাৎলাপড়া তক্তার গায়ে এত জোরে ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে পড়লো যে ওরা কেউ আর দাঁড়িয়ে ছিলো না। তারপর আস্তে আস্তে নামলো বালতিটি। ক্রমে ক্রমে ওরা হারিয়ে গেলো নিকষ আঁধারের মধ্যে। খাদের তলা থেকে কন্‌কনে ঠাণ্ডা আর ভিজে ভ্যাপসা বাতাস উঠছিলো—এবং বালতিটি যতই নীচে নামতে লাগলো—ততই ঠাণ্ডাও যেমন বাড়তে লাগলো, ভয়ও সেই সঙ্গে !

মেয়েরা চুপ করেই ছিলো। যা কিছু তাদের আপন এবং প্রিয়-সবার থেকে তারা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এই দেড়শো ফুট কালো অন্ধকারের স্তর দ্বারা—এই বিচিত্র বোধটাই ওদের মূক করে রেখেছিলো। সমবেত ক্রন্দনরোলের সেই ধ্বনি তখনো যেন তাদের কানে বাজছিলো। তবু তারা চুপ করে এই সুগম্ভীর অন্ধ স্তব্ধতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো। তাদের চিন্তা এবার ফিরলো এই অন্ধকারের বাসিন্দাদের প্রতি। ওরা এখানে রয়েছে তিন দিন হলো। তিন দিন ধরে এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে বসে ওরা করছে কী?···ওরা কী ভাবছেই বা?···ওরা কী রকম অনুভব করছে?···ওরা অপেক্ষা করছে কিসের জন্যে···কিসের আশায়? ওরাই বা কেমন লোক—ছেলেমানুষ না বয়স্ক, শীর্ণ না সবল? ওরা ওখানে বসে কিসের স্বপ্ন দেখছে···শোক করছে কাদের জন্যে?··· এমন ভাবে বেঁচে থাকার শক্তিই বা ওরা কেমন করে পাচ্ছে কোথায় তার উৎস ?···

বুড়ো হঠাৎ তার হাতের আলোটা ঘুরিয়ে ফেললো এক টুকরো শাদা পাথরের গায়ে এবং ফিসফিসিয়ে বললো—"এই যে, খাদের তলা আর মাত্র নব্বুই ফিট দূরে !···তোমাদের মধ্যে একজন বরং চেঁচিয়ে বলো আমরা কারা, নইলে ছেলেরা হয়তো গুলী ছুঁড়তে পারে—" কথাটি ওদেরও মনে ধরলো।

"ভয় পেও না, ছেলেরা, আমরা আসছি, আমরা !"—ভারভারা চীৎকার করে বললো। "আমরা তোমাদেরই লোক, রুশ !"—গলা সপ্তমে তুলে চেঁচালো নীয়ুশা।

"শো—নো, ছে—লে—রা, শুনতে পা—চ্ছো, ছে—লে—রা, গুলী কো—রো না, আম—রা—আ—আ—গুলী কো—রো—না—আ—আ—" শিঙে ফোঁকার মতন শব্দ পাঠালো মারিয়া ইগনাতিয়েভনা !

খাদের তলদেশে দু'জন টমিগানধারী সান্ত্রীকে দেখতে পেলো ওরা। তারা অতিকষ্টে বুড়ো আর তার সঙ্গিনীদের দিকে তাকিয়ে দেখছিলো—প্রথমে চোখ কুঁচকে, হাত আড়াল দিয়ে, শেষ পর্যন্ত আর তাকাতে না পেরে পেছন ফিরে দাঁড়ালো। বুড়োর হাতের তারের জালতিঘেরা ছোট্ট আলোটি, যার ক্ষীণ হলদে শিখাটি একটি ছোট্ট শিশুর কড়ে আঙুলের চেয়ে বড় হবে না—তাই যেন তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিলো জ্যৈষ্ঠদুপুরের তীব্র রৌদ্রের মতনই। অন্ধকারে থেকে থেকে এমনই চোখের দশা হয়েছে তাদের।

তাদের মধ্যে এক জন মারিয়াকে নামতে সাহায্য করবার জন্যে ধ এগিয়ে দিলো। কিন্তু নিজের শক্তির সম্পর্কে বোধ হয় রানো ধারণাটাই রয়ে গিয়েছিলো তার। কারণ, মারিয়া তার বপুর ভার ওর কাঁধে ছেড়ে দিতেই সে বেটাল হয়ে হুড়মুড়িয়ে ড়লো। অন্য সৈনিকটি হাসতে লাগলো—বললো—"কি ভানিয়া? গের মতই গায়ের জোর যে আর নেই, তা বুঝি ভুলে বসে ছো—হে—হে—"

তারা যুবক না প্রৌঢ় তা তাদের চেহারা দেখে কিছুই মালুম ছিলো না। মুখে ঘন দাড়ি চাপ বেঁধে উঠেছে—কথা বলছিলো রা বুড়ো মানুষের মতো আস্তে আস্তে—চলছিলো তারা অন্ধ নুষের মতো সন্তর্পণে।

যে মারিয়াকে নামতে সাহায্য করেছিলো সে ভরসা করে বলে ললো—"তা, মুখে দেবার মতো কিছু বোধ হয় আনোনি কেউ ঙ্গে করে', হ্যাগা?"

অন্য জন তক্ষুণি তেড়ে উঠলো—"তা নিয়ে তোমার ভাবনা কন? কিছু যদি এনেই থাকে তো দেবে কমরেড ক্যাপটেনের হাতে—তোমার হাতে নয়। তিনিই সবাইকে ভাগ করে বেন—"

মেয়েরা শুধু একদৃষ্টে লালফৌজের লোকদের দিকে তাকিয়েছিলো। ড়ো কোজলভ হাতের আলোটি উঁচু করে এক বার ছাতটা দেখে নিয়ে নিজের কানেই বললো সন্তুষ্ট ভাবে—"না, ঠিকই আছে এখনো! লোকগুলো কাজটা খারাপ করেনি নেহাৎ—"

এক জন সৈনিক ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো—অন্য জন রইলো পাহারায়।

কিছুদূর এগিয়ে ওরা দেখলো—খাদের দিকে মুখ করে দুটো মেশিনগান বসানো রয়েছে। সেটা ছাড়িয়ে একটু গিয়েই বুড়ো কোজলভ হঠাৎ থেমে পড়ে আলোটা উঁচু করে ধরলো। দ্বিধার সুরে বললো—"ওরা কি ঘুমোচ্ছে?"

"না, ওরা বেঁচে নেই!"—সৈনিকটি বললো ধীরে ধীরে!

বুড়ো আলোটা ঘুরিয়ে ফেললো এদের উপর। সৈনিকের জ্যাকেট এবং ওভারকোটপরা মূর্তিগুলো পাশাপাশি খুব গায়ে গায়ে চেপে শোয়ানো ছিলো যেন গরম হবার জন্যেই। তাদের মাথা, বুক, কাঁধ হাত—নোংরা ব্যাণ্ডেজ আর ছেঁড়া ন্যাকড়ায় জড়ানো, চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে চটচটে বিবর্ণ হয়ে' রয়েছে। পাথরের মত নিষ্প্রভ চোখ ভেতরে বসা—সারা মুখে দাড়ির আগাছায় ভরা—

"ওঃ! ভগবান!" ওদের দিকে চেয়েই মেয়েরা অস্ফুটে শিউরে উঠলো আর দ্রুত হস্তে নিজেদের বুকে ক্রশ আঁকতে লাগলো।

"চলে এস! চলে এস! এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী লাভ।"—সৈনিক তাড়া দিল কিন্তু বুড়ো এবং তার সঙ্গিনীরা যেন পাথর হয়ে গেছে। ওরা একদৃষ্টে মৃতদেহগুলির দিকে চেয়ে রইলো বিভীষিকা-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে—পচনধরা দুর্গন্ধ ওদের নাকে লাগছিলো। অবশেষে আবার ওরা চলতে সুরু করলো। একটা বাঁক ঘুরতেই কার অস্ফুট গোঙানি কানে লাগলো ওদের।

"আমরা এসে গেছি?"—বুড়ো জানতে চাইলো।

"না। এটা আমাদের হাসপাতাল।"—উত্তর দিলো সৈনিক।

কোজলভ আলোটা ঘিরিয়ে দেখলো—তিন জন আহত সৈনিক তক্তার উপর শুয়ে আছে। এক জনের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে টিনের মগ থেকে জল খাওয়াচ্ছিলো। অন্য এক লাল সৈনিক আর দুজন আহত একেবারে নিশ্চল হয়ে ছিলো।

পরিচর্যাকারী সৈনিকটি এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে জিগেস করলো—"এরা কারা, আসছেই বা কোত্থেকে?" মেয়েদের ভীত দৃষ্টি নিশ্চল দু'জনের দিকে নিবদ্ধ হয়েছে দেখে সে যেন সান্ত্বনার সুরেই বললো—"হ্যাঁ, ওদের সব কিছু কষ্টই আর ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে ঘুচে যাবে' খন!"

যে আহত সৈনিক জল খাচ্ছিল, ক্ষীণ কণ্ঠে বললো সে—"ওঃ! মা গো! এখন যদি একটুখানি গরম কপির ঝোল পেতাম!—"

ভারভারা জোতোভা এবার একটুখানি তিক্ত হেসে বললো—"আমরা প্রতিনিধি হয়ে এসেছি।"

"কী রকম প্রতিনিধি? জার্মাণদের কাছ থেকে বুঝি, অ্যাঁ?"—চোখ পাকিয়ে জিগ্যেস করলো সৈনিক নার্স'টি।

সান্ত্রী সৈনিকটি এবার বাধা দিলো—"থাক ও নিয়ে এখন মাথা ঘামাতে হবে না। যা বলার আছে দলপতির কাছেই বোলো'খন—"

"ঠাকুর্দা, দয়া করে আলোটি একবার দেখাবে?"—আহত সৈনিকটি কাতর কণ্ঠে অনুনয় করলো। একটা বুকফাটা গোঙানি চেপে সে নিজেকে কোনো ক্রমে খাড়া করে বসালো, তার পর কোটটা সরিয়ে ফেলে পাজামা বার করলো। একখানা পা তার হাঁটুর উপর থেকে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।

নীয়ুশা ক্রামারেঙ্কো গুঙিয়ে উঠলো তা দেখে।

"দাদু, আলোটা একটু এদিকটায় ধরো"—শান্তকণ্ঠে বললো আহত সৈনিক।

ভালো করে দেখবার জন্যে দু'হাতে ভর দিয়ে সে আরো উঁচু হয়ে উঠতে চাইলো। এমন শান্ত আর নির্লিপ্ত দৃষ্টি আর অবহেলার ভঙ্গি নিয়ে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো তার আহত প্রত্যঙ্গটি, যেন ওটা অন্য কিছু···যেন ঐ পচে ফুলে ওঠা দুর্গন্ধ রসঝরা বিবর্ণ কালচে থকথকে মাংস কোনো দিনই কোনো কালেই তার এই পরিচিত প্রিয় এবং সুন্দর দেহের জীবন্ত অংশ ছিলো না!

"নাও, এবার দেখো, তোমরাই দেখো কী হালটা করেছে আমার"—খানিকটা ভর্ৎসনার সুরে সে বললো—"দেখছো, পোকা হয়েছে ওর মধ্যে, ঐ দেখো সব নড়ে বেড়াচ্ছে কিল্‌বিল্ করে'।—আমি তখনি বলেছিলাম ক্যাপটেনকে যে আমায় নীচে টেনে এনে কোনো লাভ নেই। উপরে থাকলে আমি তো কতকগুলো হাতবোমা গেলাতে পারতাম নাৎসী রাক্ষসদের—তার পর—মগজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার মতো একটা গুলী অন্তত থাকতো—

গায়ের দিকে তাকিয়ে আবার সে বিড়বিড় করতে লাগলো—"দেখো, দেখো, শালারা কী ফুর্তিতে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে দেখো"।

"মা গো!"—হঠাৎ সারা শরীর ঝাড়া দিয়ে শিউরে উঠে হাত-মুখ ঢাকলো নীয়ুশা!

সান্ত্রীটি আহত সৈনিককে একটু ধমকের সুরে বললো—"দেখো, খালি তোমাকেই টেনে নামানো হয়নি নীচে—এদের দু'জনকে ধরে মোট চোদ্দ জন"—

নীয়ুশা এবার বলে উঠলো—"কিন্তু, কেন মিছিমিছি তোমরা এখানে পড়ে থেকে এমন কষ্ট পাচ্ছো? তোমরা উপরে উঠে এলে,

কিছু না হোক অন্তত ঘা-টাগুলো ধুয়ে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করতো ওরা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে”—

“কারা? জার্মাণরা?” আহত লোকটি বিদ্রূপের কণ্ঠে বললো—“ওই রাক্ষসদের চেয়ে বরং এখানে এই কৃমিপোকাগুলো আমায় খেয়ে ফেলুক—সে অনেক সুখের মৃত্যু হবে আমার কাছে”—

“ওসব কথাবার্তা আর নয়”—সান্ত্রী তাড়া লাগালো—“চলে এস”।

“একটুখানি দাঁড়াও!” বলে মারিয়া ইগনাতিয়েভনা এক টুকরো রুটি তার ব্লাউজের ভিতর থেকে টেনে বার করলো। কিন্তু আহত লোকটির দিকে তা বাড়িয়ে ধরতেই সান্ত্রী বন্দুক তুলে ধরলো।

“খেতে নিষেধ আছে!” সে বললো কঠোর কণ্ঠে—“এই খাদ্যের মধ্যে প্রত্যেকটা রুটির টুকরো দলপতির হাত দিয়ে ভাগ হয়—এটাই আইন। তোমরা চলে এস—অনর্থক হাঙ্গামা করছো।”

ওরা এগিয়ে চললো। সৈনিকদের আড্ডার কাছাকাছি এসে একটা বাঁক ঘুরতেই হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা শব্দ শুনতে পেয়ে ওরা থমকে গেলো। ঐ অপ্রত্যাশিত শব্দটি গানের—কেউ যেন খুব ক্লান্ত কণ্ঠে বিষাদ ঝরা স্বরে একটা অজানা গানের দীর্ঘ চরণ গেয়ে চলেছে ··

ওদের থামতে দেখে পথপ্রদর্শক গম্ভীর ভাবে বললো—“আমাদের নৈতিক বল বজায় রাখবার জন্যে ঐ গানটা গাওয়া হচ্ছে। আজ ক'দিন ডিনারের বদলে ঐ সঙ্গীতটাই পরিবেশন করা হচ্ছে। আমাদের দলপতি আমাদের এটা শেখাচ্ছেন গত তিন দিন ধরে। জারের আমলে জেলে থাকবার সময় তাঁর বাবা নাকি এই গানটা বানিয়েছিলেন”—

গায়কের একক কণ্ঠ এবার আরো স্পষ্ট শোনা গেলো—

“শত্রুও পারবে'না উপহাস করতে
তোমার এ অন্তিম যাত্রায়···
আমরাও এসেছি-তো পাশাপাশি মরতে
বীরোচিত গৌরব মাত্রায়···

নীযুশকা এবার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সবাইকে ডেকে বললো—“শোনো, আমার বুদ্ধি মতো কাজ করো। আমায় আগে যেতে দাও—কারণ কান্নাকাটি জুড়তে, কেঁদে হাট বসাতে আমার মতন তোমরা পেরে উঠবে না। এদের ভাব সাব দেখে তো মনে হচ্ছে—জার্মাণরা আমাদের বাচ্চা-কাচ্চাগুলোকে খুঁচিয়ে মেরে ফেললেও বোধ হয় এরা ভ্রূক্ষেপও করবে না”—

বুড়ো হঠাৎ রাগে গিস্‌গিস্ করতে করতে ওদের দিকে ফিরে দাঁড়ালো। দাঁত কিড়মিড়িয়ে বললো—“হারামজাদি! নচ্ছার মাগীরা! তোরা বুঝি এয়েছিস্ ওদের দল ভাঙাতে, কেমন? শালীদেরই আগে গুলী করে মারা উচিত।”

মারিয়া ইগনাতিয়েভনা নীযুশাকে ঠেলে সরিয়ে এগোলো—“সরো দেখি এবার আমায় বলতে দাও”—

ঘাঁটির মুখে যে সান্ত্রীটি দাঁড়িয়েছিলো সে হঠাৎ বন্দুক তুলে চেঁচিয়ে উঠলো—“থামো! মাথার উপর হাত তোলো!”—

“আমরা—মেয়েরা আসছি—” মারিয়া চেঁচিয়ে উঠলো। এগিয়ে গিয়ে সে বেশ ভারিক্কি চালেই বললো—“তোমাদের দলপতি কোথায়? আমায় তার কাছে নিয়ে চলো—”

অন্ধকারের মধ্যে একটা শান্ত কণ্ঠ শোনা গেলো—"কী ব্যাপার ওখানে ?"

বুড়োর হাতের আলোটা গিয়ে পড়লো এক দল সৈনিকের মাঝে। সবাই প্রায় এদিক-ওদিক ছড়াছড়ি হয়ে শুয়েছিলো—আর তাদের মাঝখানে এক জন দীর্ঘকায় লোক বসেছিলো। তার সুন্দর বাদামী রঙের দাড়ি কয়লার গুঁড়োয় কালো হয়ে গেছে। তার মতই আর সবারও হাত-পা-মুখ কয়লার ধুলোয় কালো ভূতের মতন দেখাচ্ছিলো; কেবল তাদের শাদা দাঁত আর চোখগুলো সেই কালোর মধ্যে অত্যন্ত বেশি রকম ঝক্‌ঝক্ করছিলো।

বুড়ো কোজলভ ওদের দিকে চেয়ে রইলো কেমন একটা মিশ্র ভাবাবেগের অনুভূতির সঙ্গে—শ্রদ্ধা, বিস্ময়, অবিশ্বাস, স্নেহ আর করুণা সব মেশামেশি হয়ে গেছে তার চেতনায়। এই নাকি সে সব সৈনিকরা যাদের বীরত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে আর সারা দনেৎস অঞ্চল জুড়ে! সে যেন এমন বীর সৈনিকদের দেখবার আশা করেছিলো অন্যরূপে—আঁট সাঁট কুবান জ্যাকেট আর টুকটুকে লাল পাজামা পরা···কোমরে ঝুলছে রূপোর হাতল দেয়া তরবারি···উঁচু কসাক টুপি বা চুমকি বসানো শিরস্ত্রাণের তলায় একগুচ্ছ চুল উদ্ধত ভাবে নেমে এসেছে, কপালের উপর—এমনি-তরো একটা কিছু! তা নয় তার বদলে সে দেখতে পেলো কর্মের অভিব্যক্তি আঁকা কতকগুলি শ্রমিকের মুখ—তার এবং তার সঙ্গী সব খনিমজুরদের মতই—সেই হাত পা, সেই কয়লার ধুলো মাখা কালো কালো মুখ!···এবং তাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সেই বৃদ্ধ খনিশ্রমিক যেন অনুভব করলো—মাতৃভূমির এই সব বীর সন্তানের আত্মসমর্পণের চেয়ে শ্রেয়: মনে করে যে তিক্ত ভাগ্য বরণ করে নিয়েছে—সে ভাগ্য আজ এই মুহূর্ত থেকে তারও ভাগ্যবিধি হয়ে উঠেছে।—

"কমরেড দলপতি" মারিয়া ইগনাতিয়েভনা ওদিকে বলতে সুরু করেছে "আমরা আপনার কাছে একটা বিষয়ে প্রতিনিধি হয়ে এসেছি—"

দলপতি উঠে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য সৈনিকরাও সবাই দাঁড়িয়ে পড়লো তাদের সেই খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-ভরা কয়লামাখা শীর্ণ মুখগুলির দিকে চেয়ে মেয়েদের হঠাৎ মনে হলো যেন তাদের ভাইরা, স্বামীরা তাদের সমুখে এসে দাঁড়িয়েছে দিনের কর্মাবসানে কয়লামাখা ক্লান্ত দেহ টানতে টানতে ধুঁকতে, ধুঁকতে এবার বাড়ীর পানে ফিরবে বুঝি······

দলপতি একটু ম্লান হেসে শুধালেন—"তা, প্রতিনিধিরা কি জন্য এসেছেন?"

"কারণটা খুব সোজা!" মারিয়া বললো—"জার্মাণরা সমস্ত মেয়ে আর শিশুদের জড়ো করে এনে হুকুম করলো যে মেয়েদের মধ্যে কয়েক জন নীচে নেমে যাক্ আর সৈনিকদের বুঝিয়ে বলুক আত্মসমর্পণ করতে। নইলে, তারা আমাদের বাচ্চা-কাচ্চাশুদ্ধ গুলী করে মেরে ফেলবে।—"

"ব্যাপারটা তা'হলে এই!" দলপতি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন—"তা, আপনারা এখন আমাদের কী করতে বলেন?"

মারিয়া সোজা দলপতির মুখের দিকে চাইলো। তারপর পেছন ফিরে অন্য দু'জন মেয়েকে নীচু গলায় বললো—"এখন কী বলি, বলো তো বাছারা?"

ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মারিয়া বার করলো কয়েকখানা রুটি আর কতকগুলো সিদ্ধ আলু আর বীট্ গার খানকয়েক বিস্কুট।

লালফৌজের বীর সৈনিকেরা হঠাৎ চোখ নামিয়ে অন্য দিকে ফিরে দাঁড়ালো—খাবারগুলোর দিকে চাইতেও যেন তাদের লজ্জা করছিলো—যার আবির্ভাব এমনই অপ্রত্যাশিত অচিন্ত্যনীয়···যা এমনি সুন্দর অথচ প্রলুব্ধকারী। তারা যেন ওগুলোর দিকে চাইতে গিয়ে ভয় পেয়ে গেছে—ওগুলোর মধ্যেই তো রয়েছে তাদের জীবন! দলপতিই কেবল ঐ ঠাণ্ডা আলু আর রুটিগুলোর দিকে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

মারিয়া একটা রুমালের উপর ওগুলো ধরে এক বার নত হয়ে অভিবাদন করলো দলপতিকে, তারপর তাঁর সামনে নামিয়ে রাখলো। অস্ফুট কণ্ঠে বললো—"বলছি বলে মাপ করবেন—আমাদের মেয়েরা আমার কাছে এগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে আপনাদের দিয়ে যাবার জন্যে! আমি আরো আনতে পারতাম, কিন্তু ভয় ছিলো পাছে জার্মাণরা সার্চ করে দেখে।"

"মারিয়া" নীয়ুশা ক্রামারেঙ্কো বললো ফিস্‌ফিসিয়ে—"ঐ আহত লোকটিকে যখন দেখলাম···দেখলাম তাকে জ্যান্তে খেয়ে খেলছে ঐ পোকাগুলো···যখন শুনলাম তার কথা—তার পর থেকে আমি সব কিছুই ভুলে গেছি—"

ভারভারা জোতোভা এবার হাসিমুখে লালফৌজের সৈনিকদের দিকে ফিরে বললো—"দেখে-শুনে মনে হচ্ছে প্রতিনিধিরা এমনিই একটু বেড়াতে এসেছেন তা'হ'লে—"

সৈনিকরা তার প্রাণোচ্ছল মুখখানির দিকে বার বার তাকাচ্ছিলো। একজন সাহস করে বলে ফেললো—"আমাদের সাথে এখানেই থেকে যাও গো মেয়ে, আর আমায় বিয়ে ক'রে ফ্যালো।—"

ভারভারা চটপট উত্তর দিলো—"হ্যাঁ, একখানা কথার মতো কথা বলেছো বটে! এই অবস্থাতেও একটা বৌ পুষতে পারো তুমি তাহ'লে, অ্যাঁ?"

সবাই হেসে উঠলো।

ওরা আসবার পর প্রায় দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। দলপতি বুড়ো কোজলভের সঙ্গে একান্তে বসে আলাপ করছিলেন। ভারভারার পাশে একজন তরুণ সৈনিক কনুইতে ভর দিয়ে শুয়েছিলো। ঐ আধো-অন্ধকারের মধ্যেও কয়লার আস্তরণের আড়াল থেকেও ভারভারা তার কচি মুখের বিবর্ণ শীর্ণতা লক্ষ্য করতে পারছিলো। শিশুদের মতন মুখ হাঁ করে সে একদৃষ্টে ভারভারার মুখের পানে তাকিয়েছিলো···তার মর্মরশুভ্র গ্রীবার দিকে চাইছিলো। ভারভারার মন কারুণ্যে ভরে উঠেছিলো। সে ওর কাছে সরে বসে ওর হাতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো সস্নেহে। সৈনিকটি হঠাৎ ভাঙা গলায় বলে উঠলো—"কেন, কেন তোমরা আমাদেরও মন চঞ্চল করে দেবার জন্যে এসেছো এখানে? মেয়েমানুষ···রুটি···সব কিছু যে আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে সূর্যালোকের কথা—"

ভারভারা চকিতে দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো তাকে, তার পর ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো।

আর সবাই স্তব্ধ মূক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিলো ব্যাপারটা। কেউ হাসলো না, ঠাট্টা-তামাসা করলো না এ নিয়ে—একটা কথাও ভাঙলো না এ সুগম্ভীর স্তব্ধতা।

অবশেষে মারিয়া উঠে পড়ে বললো—"এবার আমাদের যাবার সময় হলো, কি বলো কোজলভ ?"

"আমি তোমাদের খাদের মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবো"—বুড়ো বললো—"আমি উপরে যাচ্ছি না—সেখানে আমার করার কিছুই নেই।"

নীয়ুশা অবাক হয়ে বললো—"সে কি ! তুমি কি এখানে উপোস করে মরবে ঠাকুর্দা ?"

বুড়ো চটে গিয়ে বললো—"তো তোদের কি ? মরি যদি আমার নিজের দেশবাসীদের সঙ্গেই মরবো—আর যেখানে যে খাদে আমি সারা জীবন কাজ করেছি—"

এমন দৃঢ় কণ্ঠে সে কথাগুলো বললো—ওরা বুঝলো তর্ক করে কোনো ফল হবে না।

দলপতি এবার মেয়েদের দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন—"মায়েরা যেন আমাদের উপর অসন্তুষ্ট না হন এজন্যে। আমার তো মনে হয় জার্মাণরা শুধু আপনাদের ভয় দেখিয়েই দালালি করতে পাঠিয়েছিলো। আপনাদের ছেলে-মেয়েদের বলবেন আমাদের কথা। তারা যেন তাদের ছেলেদেরও বলতে পারে যে আমাদের লোকেরা জানে কী করে মরতে হয় !"

এক জন সৈনিক হঠাৎ বললো—"ওদের সঙ্গে একটা চিঠি পাঠাবার সম্বন্ধে আপনি কী বলেন, কমরেড ? যুদ্ধ বাধবার পর আমাদের পরিবারের কাছে শেষ বাণী—"

দলপতি বললেন—"না। ওরা ওঠবার পর জার্মাণরা নিশ্চয় ওদের সার্চ করবে।"

মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিলো যেমন কাঁদতে কাঁদতে এসেছিলো। কিন্তু সে বার তাদের ছেলে-মেয়ে আর নিরাপত্তার শঙ্কায় আর এবারে যেন তাদের আপন জন স্বামী পুত্র ভাই বন্ধুদের মৃত্যুগ্রাসে রেখে যাবার শোকে···

কিন্তু আরো শোক অপেক্ষা করছিলো তাদের জন্যে। জার্মাণরা যখন তাদের শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হতে দেখলো—সারা গ্রাম জুড়ে নিদর্শন রেখে গেলো তাদের অন্ধ প্রতিহিংসার—মৃত্যু আর অগ্নিস্বাক্ষরের মধ্যে···

হতভাগিনী নারীদের অশ্রুধারায় আরো সিক্ত হয়ে উঠলো দনেৎসের রক্তসিঞ্চিত মৃত্যুধূসর মাটি···!

৩

সে রাত্রে জার্মাণরা দু'-তিন বার খাদের মধ্যে ধোঁয়া-বোমা ফেললো। দলপতি কোস্তিৎসিন আদেশ দিলেন সমস্ত বায়ু-চলাচলের পথ বন্ধ করে দিতে কয়লার চাঙড় চাপিয়ে। সাস্ত্রীরা গ্যাস-মুখোস পরে পাহারায় দাঁড়ালো।

সৈনিক নার্স্‌টি অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে কোস্তিৎসিনের কাছে এলো। খবর দিলো আহতরা কেউ আর বেঁচে নেই !

"ধোঁয়ায় নয় ; তারা এমনিই মরেছে।"

কোস্তিৎসিনের হাতটা ঠাউরে নিয়ে সেখানে এক টুকরো রুটি গুঁজে দিয়ে সে বললো—"মিনায়েভ কিছুতেই খেলো না এটা। বললো—দলপতিকে ফিরিয়ে দিয়ো ওটুকু। আমার আর কোনো রুটির দরকার নেই এখন—অন্যের পেট ভরবে তবু—"

নিঃশব্দে দলপতি রুটিটুকু হ্যাভারসাকে ঢুকিয়ে রাখলেন। সেটাই এখন দলের খাদ্যভাণ্ডারের কাজ করছিলো।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে চললো মৃত্যুমন্থরতায়। বুড়োর আনা আলোটি বার কয়েক দপদপ করে নিবে গেলো—তেল নেই ! ক্যাপটেন তাঁর বিজলীবাতিটি কয়েক মুহূর্তের জন্যে জ্বাললেন—কিন্তু তাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো। নিস্তরঙ্গ অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে বাতির রক্তাভ তারগুলো যেন একটা পৈশাচিক ইঙ্গিতে দাঁত বার করে হাসছিলো।

কোস্তিৎসিন মারিয়া ইগনাতিয়েভনার খাবারগুলো ভাগ করে দিলেন দশ জনের মধ্যে। এক টুকরো রুটি আর একটা করে আলুসেদ্ধ পেলো সবাই।

কোজলভকে ডেকে বললেন তিনি—"ঠাকুর্দা, তুমি কি আমাদের সঙ্গে রয়ে যাবার জন্যে আফশোষ করছো ?"

বুড়ো শান্তকণ্ঠে বললো—"না। কেন করতে যাবো ? আমার আত্মার পরম শান্তির স্থান যে এখানেই !—"

অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা কণ্ঠ শোনা গেলো—"ঠাকুর্দা, চুপ করে থেকে আর পারা যাচ্ছে না—একটা মজার গপ্পো বলো না শুনি—"

অন্য অনেকে সমর্থন করলো সে কথা।

বুড়ো একটু গলাখাঁকরি দিয়ে প্রশ্ন করলো—"তা তোমারা কে কী করতে শুনি—কী কাজ কাম ?"

"সব রকম, সব রকম কাজের লোক পাবে আমাদের মধ্যে, ঠাকুর্দা—" একটা কণ্ঠ চেঁচিয়ে বললো।

"আমি যুদ্ধের আগে একটা শিক্ষক-শিক্ষণালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা পড়াতাম"—বলে ক্যাপটেন কোস্তিৎসিন হো-হো করে হেসে উঠলেন।

"আমরা চার জনে ফিটার ছিলাম, আমি আর আমার তিন স্যাঙাৎ—"

"আর মজার কথা ঠাকুর্দা, আমাদের চার জনেরই এক নাম— আমরা চার ইভান!"

"সার্জেণ্ট লাদিন ছিলো—কম্পোজিটর—আর গ্যাভরিলোভ আমাদের নার্স—সে বোধ হয় এখানেই আছে, নাকি?"

"এখানেই আছি।"—একটা গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেলো— "আমার ডাক্তারি ফুরিয়েছে—"

"গ্যাভরিলোভ ছিলো একটা যন্ত্রপাতির দোকানে—"

"আর ঐ যে মুখিন ও ছিলো নাপিত, কুজিন কাজ করতো রাসায়নিক কারখানায়—"

"এই ক'জনই—বাস্!"

"তাহ'লে তোমাদের মধ্যে খনির শ্রমিক কেউ নেই—এমন কেউ নেই যে মাটির নীচে কাজ করতো?"—বুড়ো বললো এবার।

"আমরা সবাই এখন মাটির নীচে কাজ করছি—সবাই খনি-শ্রমিক।"—একটা কণ্ঠ শোনা গেলো।

"কথাটা কে বললো?"—বুড়ো শুধালো—সেই ফিটার ম'শায় না কি?"

"তিনিই স্বয়ং।"

একটা হালকা ক্লান্ত হাসির তরঙ্গ উঠলো।

বুড়ো কোজলভ এবার তার গল্প সুরু করলো। বুড়ো মানুষদের যেমন স্বভাব—নিজের জীবনের, যৌবনকালের ছোটখাট খুঁটিনাটি ঘটনাও ফলাও করে বর্ণনা করতে ভালবাসে—আর কোথাও বাধা পেলে বা অবিশ্বাসের ইঙ্গিত দেখলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বুড়ো সুরু করলো তার খনির কথা দিয়ে, তারপর সেখান থেকে জারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্যে জেলে যাবার কথা, প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মাণদের হাতে বন্দী হবার কথা—গল্প এগিয়ে চললো গড়গড় করে।

হঠাৎ একজন জিগেস করলো—"আচ্ছা ঠাকুর্দা, ওরা খেতে দিতো কী রকম?"

"খাওয়া? এটাকে খাওয়া বলো! দিনে একপোটাক ভূষির রুটি আর তার সঙ্গে এমন জলবৎ তরল এক ঝোল যে তুমি তার মধ্যে তাকিয়ে বাটির তলায় 'বার্লিন' দেখতে পাবে। এক ফোঁটা চর্বিও নেই—খালি গরম জল।"

"ঐ রকম একটু গরম জল পেলেও এখন আমার চলতো!"

"মের্কুলোভ! আমার আদেশ মনে আছে?"—ক্যাপটেনের কঠিন কণ্ঠ শোনা গেলো।—"খাওয়া সম্পর্কে একটি কথাও নয়—!"

"কিন্তু আমি খালি গরম জলের কথা বলছিলাম। সে তো খাবার নয়, কমরেড ক্যাপটেন!" ক্ষীণ কণ্ঠে অনুযোগ করলো মের্কুলোভ।

বুড়ো আবার সুরু করলো তার কাহিনী। জার্মাণদের হাত থেকে ক'বার পালিয়েছে, ক'বার বন্দী হয়েছে ফের, আবার পালিয়েছে। তার পর বিপ্লবে যোগ দিয়েছে গৃহযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, খনিকে সে এমনি ভালবাসতো এমন পবিত্র মনে করতো কয়লার কাজকে যে যখনি সে ফিরে এসেছে দূর দেশ থেকে কি কোনও বিপদসঙ্কুল অভিযান থেকে—উদ্বিগ্ন ও শঙ্কাকুল স্ত্রীর কাছে না গিয়ে সে আগে গিয়ে বসে থাকতো কয়লার খাদের ধারে—তার দু'চোখ জলে ভরে আসতো তার প্রিয় স্থানে ফিরে আসার আনন্দে। অন্যের কাছে খবর পেয়ে তার বৌ যখন তাকে আবিষ্কার করতো সেখানে সেই অবস্থায় সে ক্ষুব্ধ হয়ে অনুযোগ করতো—'মিনসের বুকের মধ্যে হৃদয় বলে পদার্থটা নেই, তার বদলে আছে এক চাঙড় কয়লা!'……

সবাই হাসতে লাগলো।

বুড়ার গল্প শেষ হলে দলপতি সবাইকে ডেকে বললেন—"এসো তোমাদের র‍্যাশন নিয়ে যাও—"

কেউ আসে না দেখে ক্যাপটেন আবার হাঁক পাড়লেন—"কই, কেউ আসছে না কেন?"

খানিকটা নিস্তব্ধতার পর তিন চার দিক থেকে প্রায় একসঙ্গে শোনা গেলো—"ঠাকুর্দাকে আগে দিন কমরেড ক্যাপটেন—কই যাও না ঠাকুর্দা, তোমার ভাগ নাও—"

বুড়ো কোজলভ এই সমস্ত ক্ষুধিত সৈনিকদের এমন নিঃস্বার্থ প্রীতি দেখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়লো। জীবনে সে অনেক দেখেছে —দেখেছে কেমন করে বুভুক্ষু জনতা এক টুকরো রুটির জন্য কামড়া-কামড়ি করে—কিন্তু এ দৃশ্য দেখতে তার বাকী ছিলো বোধ হয়।

কথায় কথায় এই অন্ধকূপ থেকে মুক্তিলাভের প্রসঙ্গ এসে পড়েছিলো। কোস্তিৎসিন হঠাৎ উঁচু গলায় বললেন—"না, কমরেডরা, আমরা এখান থেকে বেরোবোই বেরোবো। ওদের সাধ্য হবে না আমাদের এখানে আটকে রাখে···ওরা কিছুতেই পারবে না আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে ঐ সূর্যালোকিত পৃথিবীর সম্পদ···তার আকাশ বাতাস···তার সবুজ ঘাস আর রঙীন ফুল— ওরা পারবে না কিছুতেই—"

তাঁর কথা শেষ না হতেই আচমকা সেই কয়লাখোপের মেঝে দেয়াল ছাদ সব কিছুই গুমগুম করে কেঁপে দুলে উঠলো। কাটা কয়লার থামগুলো কটকট করে উঠলো, চড়চড় করে ফেটে গেলো জায়গায় জায়গায়—হুড়মুড় করে কয়লার চাঙড় ধ্বসে পড়লো কয়েক স্থানে। মনে হলো যেন চার দিকের সব কিছুই দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে উঠছে···আবার যেন সব চুপসে এলো—মানুষগুলোকে মাটির সঙ্গে পিষে ফেলতে চাইলো। বহু বছর ধরে যে সূক্ষ্ম কয়লার ধূলোর আস্তরণ পড়ে এসেছিলো কয়লাখনির দেয়ালে ছাতে থামগুলোর গায়—হঠাৎ নাড়া পেয়ে সেই কালো ধূলো এমন ভাবে বাতাস ভরে তুললো যে কয়েক নিমেষের মত মনে হলো—আর নিশ্বাস নেওয়া যাবে না কিছুতেই!

কাশতে কাশতে শাপান্ত করতে করতে কে যেন রুদ্ধ ফ্যাঁসফেঁসে গলায় চেঁচিয়ে উঠলো—"শালা জার্মাণরা খাদের মুখ ধ্বসিয়ে দেছে— এবার সব শেষ—"

সঙ্গে সঙ্গে কোস্তিৎসিনের আবেগকম্পিত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে শোনা গেলো—"না, না, কমরেডরা, ওরা পারবে না আমাদের মাটির তলায় পুঁতে রাখতে। আমরা বেরোবোই, বেরিয়ে যাবোই এখান থেকে।

একরম অস্বাভাবিক বেপরোয়া সঙ্কল্প যেন লোকগুলোকে মরিয়া করে তুললো। হঠাৎ কাশতে কাশতে ধূলারুদ্ধ কণ্ঠের আপ্রাণ শক্তিতে তারা চেঁচিয়ে উঠলো একসঙ্গে—"আমরা বেরোবো, কমরেড ক্যাপটেন আমরা উপরে উঠবো। আমরা এখান থেকে মুক্তি চাই এবং তা আমরা পাবোই—।"

৪

দু'জন সৈনিককে ব্যাপারটা দেখতে পাঠালেন কোস্তিৎসিন। বুড়ো ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। এগোনো সত্যিই কষ্টকর ছিলো। কারণ বিস্ফোরণের ফলে কয়লার চাঙড় ধ্বসে পড়েছিলো; তো বটেই, কয়েক জায়গায় ছাদও নেমে এসেছিলো, তবু তারি মধ্যে দিয়ে কোজলভ সন্তর্পণে এবং অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে এগিয়ে চললো।

খাদের তলদেশে ওরা সান্ত্রী দু'জনকে দেখতে পেলো—রক্তে চারদিক ভেসে যাচ্ছে তখনো একটু একটু গরম রয়েছে তা—চূর্ণবিচূর্ণ টমিগানগুলো তখনও বুকের কাছে ধরা রয়েছে তাদের।

কয়লার চাঙড় দিয়ে ঢেকে ওরা সমাধি দিলো দু'জনকে।

"চার ইভানের মধ্যে আর তিন ইভান রইলো"—একজন সনিশ্বাসে বললো।

ওদিকে বুড়ো কোজলভ অনেকক্ষণ যাবৎ ঐ বিধ্বস্ত কয়লাস্তূপের মধ্যে ক্ষিপ্র হাতপায়ে কাঠবিড়ালির মতন বেড়াচ্ছিলো। একবার এদিকে একবার ওদিকে, একোণে ওকোণে এটা দেখছে সেটা নাড়ছে, আর নিজের মনে গজরাচ্ছে—

"এই হলো সাক্ষাৎ শয়তানের কীর্তি! কয়লার খাদ উড়িয়ে দেয়—কেউ কখনো এমন কাণ্ড শুনেছে কোথাও! এতো ছোট্ট একটা শিশুর মাথায় মুগুর মারার মতনই·····"

নড়াচড়া করতে করতে বুড়ো ক্রমে কোন দিকে সরে গেলো তার আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। সৈনিকরা তার নাম ধ'রে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো।

—"ঠাকুর্দা, ও ঠাকুর্দা! কোথায় গেলে হে? ফিরে এসো—ক্যাপটেন ডাকছেন"—কিন্তু কোন সাড়াও নেই, শব্দও নেই।

"কী হলো হে?" একজন শঙ্কিত কণ্ঠে বললো। "বুড়ো মানুষ শেষকালে কোথাও চাপাটাপা—হো—ঠাকুর্দা—আ-আ! কোথায় তুমি—ই—ই?

"ওহে কোথায় তোমরা?"—কোস্তিৎসিনের গলা শোনা গেলো—" হাতড়াতে হাতড়াতে তিনি এসে পড়লেন—শুনলেন সান্ত্রীদের মৃত্যুর কথা।

"ইভান কোরেন্‌কভ, যে মেয়েদের সঙ্গে চিঠি পাঠাতে চেয়েছিলো···" বললেন ক্যাপটেন। নিস্তব্ধতা থম্‌থম্ করতে লাগলো। অবশেষে ক্যাপ্টেন আবার বললেন—"কৈ আমাদের বুড়ো দাদু কোথায় গেলেন—?"

"অনেকক্ষণ থেকেই তো তার কোনো পাত্তা পাচ্ছি না। চেঁচিয়ে ডেকেছিও বার কয়েক। বরং টমিগানটা একবার চালাই, তাহ'লে হয়তো শব্দ শুনতে পাবে—"

"না, দেখা যাক্"—ক্যাপটেন বললেন।

তারা সবাই চুপচাপ বসে রইলো। তিনজনেই উপর পানে খাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ একটা আলোকরশ্মি খুঁজে পাবার বৃথাই চেষ্টা করছিলো।—অন্ধকারের কালিমা যেন নীরেট নিচ্ছিদ্র এবং দুর্ভেদ্য!···

"জার্মাণরা আমাদের জ্যান্তে কবর দিয়ে গেলো, কমরেড দলপতি!"—একজন আর থাকতে না পেরে বলে ফেললো।

কোস্তিৎসিন সঙ্গে সঙ্গে আস্থাপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—"ওটা কী কথা! জানো না আমাদের কবর দেয়া যায় না? দেখো না, আমরাই ওদের কত জনকে কবর দিয়েছি, আরো কত জনকে দেবো!"—

"হুঁ, সে কাজ করতে পারলে খুশিই হবো"—একজন বললো।

"বলতেই হবে সে কথা"—অন্যজনের স্বীকৃতি।

কিন্তু কোস্তিৎসিন স্পষ্টই ধরতে পারলেন—ওদের কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র আস্থার আভাস নেই। খালি বলতে হয় তাই বলছে।

দূরে হঠাৎ ঝুরঝুর করে কয়লা ঝরে পড়বার শব্দ শোনা গেলো। আবার স্তব্ধতা।

"ইঁদুর বোধ হয়।"—বললো একজন।

মৃত্যুর মতন স্তব্ধ অন্ধকারের সমুদ্রে ওরা যেন হাবুডুবু খাচ্ছে। কথা বলবার ইচ্ছা নেই কারো। যে কঠিন মৃত্যু বিভীষিকাময় রূপ ধরে সমুখে এসে দাঁড়িয়েছে—তারি ধ্যানে মগ্ন চেতনা। শ্যামল ধরিত্রীর আলোবাতাসের সন্তান জীবনের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিচ্ছে এমনি তিস্তরঙ্গ নারকী অন্ধকারে তৃষ্ণার জল নেই, নিশ্বাসের বাতাস নেই, আহার নেই, তিলে-তিলে শুকিয়ে দমবন্ধ হয়ে মরা—এর চেয়ে বড়ো অভিশাপ আর "মানুষের জীবনে কী হতে পারে?"

আবার সেই ঝুরঝুর শব্দ। কান পেতে অন্যজন বললো—"উঁহু! এ ইঁদুর নয়! ঠাকুর্দা না হয়ে যায় না!"

"তোমরা কোথায় গো!"—দূর থেকে কোজলভের গলা শোনা গেলো।

বুড়োর দ্রুত উত্তেজিত নিশ্বাসের শব্দ শুনে ওরা দূর থেকেই বুঝতে পারছিলো যে একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে। ওদের হৃৎপিণ্ডগুলোর সঙ্গে সঙ্গে কী এক অজানিত আনন্দের প্রত্যাশায় উদ্দাম নৃত্য সুরু করলো।

"কই তোমরা? কোন্‌খানে" কোজলভের অধীর কণ্ঠ শোনা গেলো। "তোমাদের সঙ্গে এখানে রয়ে" গিয়ে দেখছি খুব ভালই হয়েছে, এবার চটপট্ করে দলপতির কাছে ফিরে চলো তো বাবারা! আমি একটা বেরোবার উপায় খুঁজে পেয়েছি।"

"আমি এখানেই আছি" কোস্তিৎসিন শান্তকণ্ঠে বললেন।

"ব্যাপারটা হচ্ছে, তাহ'লে শুনুন কমরেড দলপতি! যেই আমি এখানটায় পৌছলাম এক ঝলক ভিজে বাতাস যেন গায়ে লাগলো আমার। আমি সেটা অনুসরণ করে চললাম—এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যে কী তা বুঝতেও পারলাম। বিস্ফোরণের ফলে খাদের মুখ ধ্বসে গিয়ে পয়লা থাক পর্যন্ত একেবারে বুঁজে গেছে। কিন্তু পয়লা থাকটা ফাঁকাই আছে। সেখান থেকে শ' পাঁচেক গজ অবধি একটা নালি কাটা আছে—আর সেই নালির মুখটা আবার একটা ছোট খাদের মুখে গিয়ে পৌছেছে—সেটাই বার হবার রাস্তা। এখন আমাদের ঐ পয়লা থাকে পৌছতে হবে যেমন করে হোক্। বিস্ফোরণের ফলে পয়লা থাকে একটা ফাটল ধরেছে—যেখান থেকে ঐ ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিলো। আমি পয়লা থাকে ওঠবার সিঁড়ি বেয়ে প্রায় ষাট ফুট উঠেছিলাম—কিন্তু তারপর আর সিঁড়ির ধাপগুলো নেই—উড়ে গেছে ঐ সঙ্গে। আমাদের কাজ হবে এখন—ঐ সিঁড়ির মাথায় গোটা দশেক ধাপ লাগানো, কিছু কয়লার চাঙড় সরিয়ে ফেলা আর ঐ ফাটল বরাবর ফুট ছয়েক কয়লার স্তর কেটে পথ করে নেয়া! তা'লেই আমরা পয়লা থাকে উঠতে পারবো।······"

কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না। অবশেষে কোস্তিৎসিন বললেন—"বলিনি, আমি বলিনি তোমাদের যে আমাদের জ্যান্ত কবর দিতে ওরা পারবে না!···"

—শান্তকণ্ঠেই কথাগুলো বলবার চেষ্টা করলেন তিনি, যদিও তাঁর বুক প্রচণ্ডবেগে ধড়াস্ ধড়াস্ করছিলো।—

সৈনিকদের একজন হঠাৎ ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেললো—"সত্যি, সত্যিই তাহ'লে আমরা আবার সূর্যের মুখ দেখতে পাবো?"

"আপনি কি করে জানতেন এ-সব, কমরেড ক্যাপটেন?" আরেক জন স্তম্ভিতকণ্ঠে বললো—"আমি তো ভাবছিলাম আপনি কেবল আমাদের সাহস দেবার জন্যেই ওগুলো বলছেন!"

বুড়োই এবার দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলো—"আমিই বলেছিলাম ক্যাপটেনকে—পয়লা থাকের ঐ পথের কথা। আমিই তাঁকে আশা দিয়েছিলাম। তিনি শুধু আমাকে মুখ বন্ধ রাখতে বলে ছিলেন।

"মরতে কেউই চায় না, হাজার হোক্—" কেঁদে ফেলা সৈনিকটি লজ্জিত সুরে বললো। কোস্তিৎসিন উঠে পড়ে বললেন—"আমি এখন একবার নিজে দেখতে যাবো ব্যাপারটা ঠাকুর্দাকে নিয়ে। তোমরা এখানে থাকো। কেউ যদি এসে পড়ে—এসম্বন্ধে একটা কথাও নয়। বুঝলে?"

একলা হবার পর একজন বললো—"সত্যিই তবে আমরা আবার সূর্যের মুখ দেখবো? একথা ভাবতেও যে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!"

বীরত্ব খুবই ভাল কথা, কিন্তু মরতে কেউই চায় না!"—অন্য জন গজগজ করতে লাগলো। দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলার জন্য সে কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিল না।

৫

অতঃপর কোস্তিৎসিনের দল যে কাজে যে ভাবে নামলো—পৃথিবীতে আর কখনো কোনো কাজ বোধ হয় এতখানি দুঃসাধ্য অথচ এতখানি মারাত্মক রকম মূল্যবান হয়ে ওঠেনি; কাজটুকু বিশেষ কিছু নয়। দিনের আলোয় একজন সুস্থ লোকের পক্ষে যা কয়েক ঘণ্টার কাজ মাত্র—ওদের দশজনের কাছে তা যুগযুগেও সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছিলো না। রুদ্ধ বাতাস আর অতল অন্ধকারের নির্মমতায় ওদের চেতনাকে নিষ্ক্রিয় করে আনছিলো প্রতি মুহূর্তে। কাজের মধ্যে আর ক্ষণস্থায়ী বিশ্রামের মধ্যেও তীব্র ক্ষুধা তাদের সমস্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত করে ফেলছে, দুঃসহ তৃষ্ণা অপমৃত্যুর কঠিন আভাস ঘনিয়ে আনছে প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু, এখনই মুক্তির একটা পথ চোখে পড়ার পরই যেন ওরা ওদের অবস্থার পৈশাচিক ভয়াবহত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারছিলো। তাই হন্যে হয়ে উঠেছে ওরা মুক্তির আশায়। যারা মুক্তির

সম্ভাবনায় প্রথমেই বেশি লম্ফঝম্ফ করেছিলো, তারাই অতি সামান্যতেই ক্লান্ত ও শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। কিন্তু যারা অতটা উল্লসিত হতে পারেনি—তারাই যেন অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে তবু। কেউ কেউ দশ মিনিট কাজের পরেই অবসন্ন হয়ে বসে পড়ে—হাত-পা এলিয়ে আসে···চোখের উপর নাচে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া···আবার যখন অতিকষ্টে উঠে পড়ে, তখন মনে হয়—এ যেন ওর দেহ নয়, অন্য কারো মৃতদেহ টেনে চলেছে নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরেই। সবারই এই রকম দশা—তবে কারো পাঁচ-দশ মিনিট···কারো বা বিশ মিনিট, আধ ঘণ্টা—পর পর—এই যা তফাৎ!

"আলো আলো আলো—এক ঝলক আলো! আলো নইলে আর পারছি না—"

"জল···জল···এক চুমুক জল যদি পেতাম।—"

একটুখানি ঘুমিয়ে নিতে পারতাম যদি! আর পারছি না—"

—মাঝে মাঝে এক একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার আছড়ে পড়ে কালো কয়লার রুদ্ধ দেয়ালে দেয়ালে। ক্যাপটেন কোস্তিৎসিন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যান সেদিকে। দম-দেওয়া যন্ত্রের মত তিনি ছোটাছুটি করছেন এধার থেকে ওধারে। যার যেখানে দরকার, সেখানেই হাজির হচ্ছেন তিনি। অন্ধকারেও লোকগুলোর মুখ দেখতে পাচ্ছেন যেন! যাকে যেমন দরকার—কাউকে গায়ে হাত বুলিয়ে··· কাউকে দুটো সাহস দেওয়া কথা বলে···কাউকে ধমকে ঠেলে তুলছেন তিনি সবাইকে। অমন কোমলপ্রাণ লোকটি যেন এই মুহূর্তে হয়ে উঠেছেন নির্মম···ক্ষিপ্ত বন্যপশুর মত। তিনি খুব ভালভাবেই বুঝতে পারছিলেন—এই সময়ে যদি তিনি সামান্যতম দুর্বলতাও দেখান—তবে সবশুদ্ধ মরতে হবে!

ওদের মধ্যে কুজিন যার নাম, সে আর উঠতে পারছিলো না। ক্যাপটেনকে মরীয়া হয়ে বললো—"আমাকে যা খুশি করুন কমরেড, আমার আর শক্তি নেই উঠবার—"

ক্যাপ্টেন দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—"আমি তোমাকে ওঠাবোই।"

"কি করে' শুনি?"—কুজিনের ক্ষীণ কণ্ঠে যেন প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ!—"আমায় গুলী করবেন? তাই করুন! এই মুহূর্তে তার চেয়ে আর কাম্য নেই কিছু আমার কাছে—"

"না, গুলী করবো না!" কোস্তিৎসিন বললেন—"তোমার যদি খুশি হয় তো শুয়ে থাকো। পথ করে ফেলার পর আমরা তোমাকে টেনে উপরে তুলবো। কিন্তু দিনের আলোয় ফিরে যাবার পর তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক রইবে না। আমি তোমায় 'অযোগ্য' বলে ফেরৎ পাঠাবো আর তোমার নাম শুনলে থুথু ফেলবো—"

শাপান্ত করতে করতে কুজিন কোনোক্রমে নিজেকে টেনে নিয়ে চললো কাজে। এক বার কেবল কোস্তিৎসিনের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছিলো।—

সার্জেণ্ট লাদিন নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে খবর পেয়ে ক্যাপটেন গেলেন সেখানে। ডেকে সাড়া নেই। বেয়াড়া রকম আঘাত পেয়ে রক্তক্ষরণের ফলে খুবই দুর্বল ছিল লাদিন। অজ্ঞান হয়ে গেছে। চোখে-মুখে ক্যাপটেনের ফ্লাস্কের শেষ ঢোক জলটুকু ছিটিয়ে দিতে জ্ঞান ফিরলো।

ক্যাপটেনের কণ্ঠ শুনে সার্জেণ্ট তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে অতিকষ্টে

নিজেকে উঁচু করে তুললো। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বললে—"কমরেড কোস্তিৎসিন! আমার আর বেশি দেরি নেই। এক কাজ করুন। আমায় গুলী করে মেরে লোকগুলোকে আমার দেহটা—"

"চুপ করো!" কোস্তিৎসিন চীৎকার করে উঠলেন।

"কিন্তু কমরেড ক্যাপটেন, এতে ওরা অন্তত মুক্তি পেতে পারতো! না খেয়ে আর ওরা কাজ করতে পারছে না—পারবে না শেষ করতে—"

"চুপ!"—ক্যাপ্টেন গর্জন করে উঠলেন—আমার হুকুম, চুপ করো!"

সার্জেন্টের প্রস্তাবের বীভৎসতা তাঁর লৌহমনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রেও বিভীষিকার শিহর জাগিয়ে তুলেছিলো। দুম্-দাম করে সেখান থেকে চলে গেলেন তিনি।

লাদিনও তাঁর পেছন পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলো—হাতে একটা লোহার ডাণ্ডা টানতে টানতে।

আর এক জন ব্যক্তি চরকিবাজির মতন ঘুরছিলো সবখানে—সে আমাদের বুড়ো কোজলভ। সবাই ভাল করেই জানতো—বুড়ো না থাকলে এ কাজ একপাও এগোতো কি না সন্দেহ! ইঁদুরের মতন অনায়াস গতিতে বুড়ো চলাফেরা করছিলো—যার যেখানে যা কিছু দরকার এনে হাজির করছিলো সঙ্গে সঙ্গে। ধাপের ছেনি আর হাতুড়ি যোগাড় করলো কোত্থেকে সেই জানে। লোহার সিঁড়ির জন্যে লোহার শিকগুলো কোত্থেকে খুঁজে পেতে হাজির করছিলো। চারদিক থেকে কেবলি শোনা যাচ্ছিলো তার নাম—"হেই ঠাকুর্দা!" "ঠাকুর্দা কোথা গেলে?" "ঠাকুর্দা একবার এদিকে এসো না!"

কাজ শেষ হয়ে আসছিলো। সবচেয়ে দুর্বলরাও এমন কি হাল ছেড়ে দেওয়া ক্রাজন আর লাদিনও উৎসাহিত হয়ে উঠলো। এমন সময় উপর থেকে চীৎকার শোনা গেলো—"শেষ ধাপটা লাগানো হয়ে গেছে!"

আশায় আনন্দে সবাই যেন মাতাল হয়ে গেলো। কোস্তিৎসিন যা কিছু দরকারী মালপত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র সবাইকে ভাগ করে দিলেন। তার পর সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন—"কমরেডরা! এবার উপরে ওঠার সময় এসেছে। মনে রেখো, উপরে এখনো যুদ্ধ চলছে—তোমাদের কর্তব্য ফুরোয় নি!······আমরা এসেছিলাম সাতাশ জন, আট জন ফিরে চলেছি। যারা এখানে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন রইলো, তাদের নাম আমাদের স্মৃতিপটে অমর হয়ে থাকুক!"

এবার যাত্রা সুরু হলো।

শ্রান্তক্লান্ত দুর্বল শরীর নিয়েও ঐ নড়বড়ে সত্তর ফুট সিঁড়ি বেয়ে ওঠবার শক্তি পেলো ওরা কেবল মানসিক উত্তেজনার জোরেই। পয়লা থাক পর্যন্ত উঠতে প্রথম ছ'জনের দু' ঘণ্টা লেগে গেলো প্রায়। বাকী রইলো দু' জন—কোস্তিৎসিন আর কোজলভ।

কি করে যে ব্যাপারটা ঘটলো—তা কেউ ঠাহর করতে পারেনি অন্ধকারে। একটা নিষ্ঠুর দুর্ঘটনা ছাড়া আর কী! নইলে পয়লা থাকের কয়েক জনের মধ্যে এসে হঠাৎ ঠাকুর্দার হাত ফসকে যাবে কেন?

"ঠাকুর্দা! ঠাকুর্দা"—এক সঙ্গে অনেকগুলি শঙ্কিত স্বর চীৎকার করে উঠলো। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে একটা অস্পষ্ট ভারী 'ধপ' শব্দই কেবল উত্তর দিলো সে ডাকে।

মুক্তির আনন্দ যেন বিস্বাদ হয়ে গেলো সবার কাছে। নিদ্রাবিহীন ক্লান্ত জ্বালা-ধরা চোখও ছলছলিয়ে এলো সবার।

৬

ওরা যখন খোলা মাটিতে এসে পৌঁছলো তখন রাত্রি। ঝির-ঝির করে বেশ আরামদায়ক বৃষ্টি পড়ছিলো। জামা আর টুপি খুলে সবাই চুপ-চাপ সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো সেই বৃষ্টিধারার মধ্যে···মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে মাটি-মায়ের সন্তান নিবিড় আশ্লেষে অনুভব করতে চাইলো মাতা বসুন্ধরাকে। প্রাণপণে ঘ্রাণ নিলো ভিজে মাটির আর বাতাসের। ঘাসের ভিজে ডাঁটাগুলোর মধ্যে হাত চালিয়ে পেলো অপূর্ব পুলক শিহরণ, বৃষ্টির ছোট ছোট ফোঁটাগুলি যেন কোমল তপ্ত করস্পর্শের মতো তাদের সর্বাঙ্গে আদর করে যাচ্ছিলো···আর ওরা চুপ করে শুনছিলো তাদের ছন্দোবদ্ধ নূপুর নিক্কণ। খনির অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখে এই রাত্রির অন্ধকারও ওদের কাছে ঝকঝকে মনে হচ্ছিলো—তাকিয়ে ছিলো তারা একদৃষ্টি পূর্বদিগন্তের পানে—যেখানে এই প্রিয় মাটির জননী-জন্মভূমির স্বাধীনতা বিপন্ন, শুচিতা পদদলিত কলঙ্কিত। আরো গভীরতর ঔৎসুক্যের সঙ্গে তারা তাকিয়ে রইলো পুবে—সেখানে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের সকলের অন্তরের অন্তরতম কামনার মূর্তি পরিগ্রহ করে উঠবে সূর্য!

"দেখো, যেন রাইফেলগুলো ভিজে না যায়!"—কোস্তিৎসিন বললেন।

যাকে খবর নিতে পাঠানো হয়েছিল—সে চেঁচাতে চেঁচাতে ফিরে এলো—"ওরে, জার্মাণরা নেই, তারা তিন দিন আগে ভেগেছে, ওঠো ওঠো, শীগগির চলো। আমাদের জন্যে খাবার রাঁধা হচ্ছে, খড় বিছিয়ে বিছানা তৈরী হচ্ছে। একটু ঘুমিয়ে বাঁচবো। আজ ছাব্বিশে। আমরা তাহ'লে বারো দিন আটকে রয়েছি।—গাঁয়ের লোকরা বললো—তারা নাকি আমাদের আত্মার জন্যে লুকিয়ে প্রার্থনা করছিলো গির্জায়। ভেবেছিল আমরা সাবড়ে গেছি!—কিন্তু জার্মাণরা শোধ নিতে ছাড়েনি। শুধু আমাদের খাদ ধ্বসিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি তারা—বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে, লুঠপাট করেছে, বেধড়ক কতকগুলো বালককে গুলী করে মেরেছে—"

এক নিশ্বাসে সে বলে গেলো কথাগুলো।

যে বাড়ীতে তারা আশ্রয় নিলো, বেশ গরম তার ঘরটা। দু'জন বুড়ী আর এক জন বুড়ো ওদের খাবার দাবার আর গরম জল এনে দিলো। কিন্তু তারা নির্বাক, আনন্দ করছে না ওদের মুক্তিতে! কেন?—জানা গেলো, ওদের দুটি তেরো চোদ্দো বছরের নাতিকে জার্মাণরা সামান্য অজুহাতে গুলী করে মেরেছে ওদের চোখের সামনেই। আর—ওদের ছোট মেয়েটাকে তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে কী যে করেছে, সন্ধান পাওয়া যায়নি।—

খেয়ে দেয়ে ওরা ভিজেভিজে গরম খড়ের 'পরে জড়াজড়ি করে

শুয়ে পড়লো, কোস্তিৎসিন টমিগান কোলে নিয়ে পাহাবায় বসলেন। এখানে দু'দিন দু'রাত বিশ্রাম নেবার সঙ্কল্প করলেন তিনি।

রাত ফিকে হ'য়ে আসছিলো। অন্ধকাবেব দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল কোস্তিৎসিন। হঠাৎ একটা অদ্ভুত ক্ষীণ শব্দ কানে এলো। না, ইঁদুর নয়। শব্দটা একই সঙ্গে কাছেও মনে হচ্ছে আবাব দূবেও মনে হচ্ছে। কেউ যেন ছোট্ট একটা হাতুড়ি দিয়ে দুর্বল ভাবে অথচ একটানা ঘা মেবে চলেছে পাতলা কিছুতে। একবাব মনে হলো বুঝি মাটির তলায় যে কাজ হচ্ছিলো তাবি হাতুড়িব শব্দ বুঝি তখনো কানে বাজছে। কি জানি। মনে এলো কোজলভেব কথা! আহা! "আমার হৃদয়টি পাথব হয়ে গেছে বোধ হয়—" ভাবছিলেন তিনি— "আর কোনো ভালবাসা করুণা সহানুভূতিব স্থান বইলো না সেখানে—!"

ভোর হয়ে এসেছে। এক জন বুড়ী খালি পায়ে বাবান্দায় বেবিয়ে এসে এটা-ওটা খুটখাট কবছে। একটা মুবগী ডেকে উঠলো কঁক্কঁক্ করে। বুড়ী একটা ঝুড়িব মধ্যে উঁকি দিয়ে কী বললো অস্ফুটে। আবার সেই বিচিত্র শব্দ।

কোস্তিৎসিন থাকতে না পেরে বললেন—"একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছো বুড়িমা? কী ওটা। কিসে যেন ঠুক্‌ঠুক কবে ঘা মারছে কোথায়! নাকি আমাব মনেব ভুল?"

বাবান্দা থেকে বুড়িমাব শান্ত উত্তব এলো—"ওটা এখানে হচ্ছে। মুর্গীর ডিম ফুটে বাচ্ছা বেবোবার সময় হয়েছে। বাচ্ছাগুলো ভেতর থেকে ডিমের খোলা ঠোকবাচ্ছে ঠোঁট দিয়ে—"

মুক্তিব প্রয়াস। অন্ধকাব থেকে আলোয় আসবাব আকুতি! কোস্তিৎসিনের ওষ্ঠাধবে একটি ক্ষীণ হাসিব বেখা ফুটলো।

ঘুমন্ত মানুষগুলোর দিকে এক বার চেয়ে দেখলেন তিনি সস্নেহে। মড়ার মতন ঘুমুচ্ছে ওরা—নড়াচড়া নেই, পাশফেবাও নেই। বুকগুলো এক তালে ওঠানামা করছে। টেবিলেব উপব রাখা এক টুকবো ভাঙা আয়নাব উপব সোনালি বোদ একফালি এসে ঠিকবে পড়েছে—ঠিকবে পড়েছে কুজিনেব তোবড়ানো গালের দাড়ির আগাছাব মধ্যে। হঠাৎ এই অসহায় সঙ্গীগুলোর প্রতি একটা উদ্দাম প্রীতি ও স্নেহ উথালপাথাল হয়ে জেগে উঠলো অন্তবে তাঁব। মনে হলো জীবনে কখনো কারো প্রতি এমন উত্তাল স্নেহ আব প্রীতিব আতপ্ত পবশ পাননি তিনি অন্তবে।...

খোঁচা খোঁচা দাড়ি-জাগা কয়লামাখা কালো বিবর্ণশীর্ণ মুখগুলির দিকে কঠিনতম মৃত্যুব বিভীষিকাও··নীবন্ধ তম অন্ধকাবেব কালিমাও মুছে দিতে পাবে না অনশ্বব জীবনেব অনির্বাণ স্ফুলিঙ্গকে···

তাঁব গাল বেয়ে বড় বড় অশ্রুব ফোঁটা ঝবে পড়তে লাগলো—মুছে ফেলবাব জন্যে হাত তুললেন না তিনি। একফালি শীর্ণ রোদ কোন ছিদ্র দিয়ে চুবি করে এসে মুক্তাভ কবে তুললো একটি অশ্রুবিন্দুকে···

সূর্য উঠেছে···নতুন দিনেব···সূর্য।··

অনুবাদিকা—মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়।
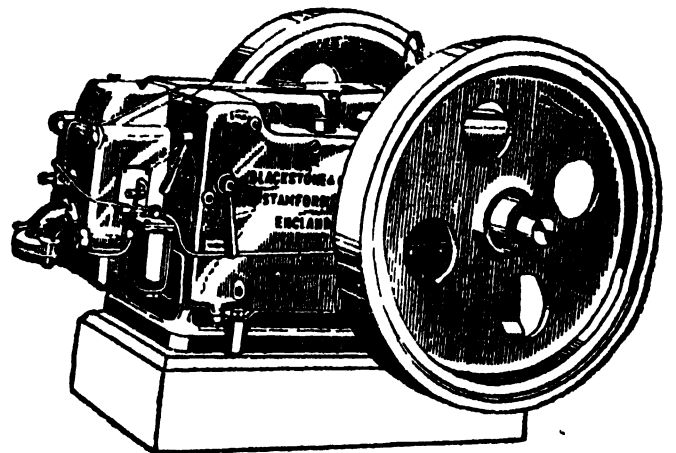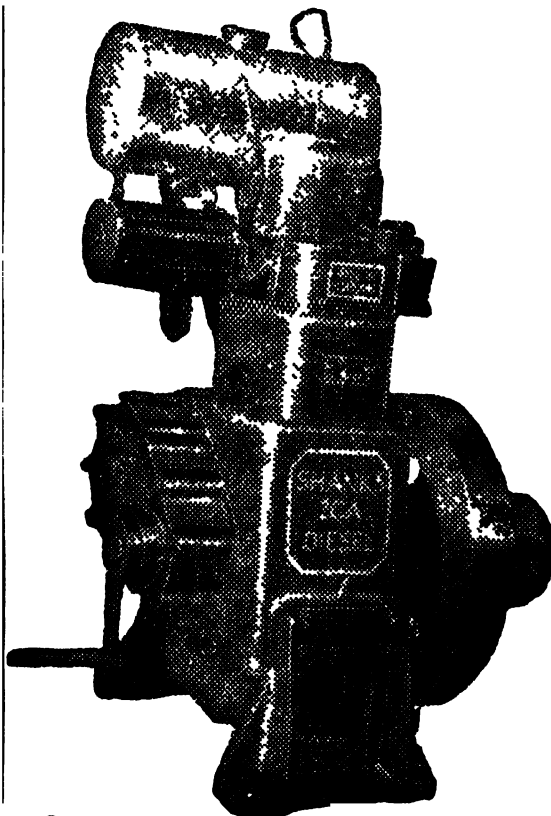
বাঙালীর কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"বাংলা দেশের কাপড়ের কারখানা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন এসেচে তার উত্তরে একটি মাত্র বলবার কথা আছে—এগুলিকে বাঁচাতে হবে। আকাশ থেকে বৃষ্টি এসে আমাদের ফসলের ক্ষেত দিয়েচে ডুবিয়ে, তার জন্যে আমরা ভিক্ষা করতে ফিরচি, কার কাছে? সেই ক্ষেতটুকু ছাড়া যার অন্নের আর কোন উপায় নেই, তারই কাছে। বাংলা দেশের সব চেয়ে সাংঘাতিক প্লাবন, অক্ষমতার প্লাবন, ধন-হীনতার প্লাবন। এদেশের ধনীরা ঋণগ্রস্ত, মধ্যবিত্তেরা চিন্তুশ্চিন্তায় মগ্ন, দরিদ্রেরা উপবাসী। তার কারণ, এদেশের ধনের কেবলই ভাগ হয়, গুণ হয় না।

আজকের দিনের পৃথিবীতে যারা সক্ষম, তারা যন্ত্রশক্তিতে শক্তিমান। যন্ত্রের দ্বারা তারা আপন অঙ্গের বহু বিস্তার ঘটিয়েচে, তাই তারা জয়ী। এক দেহে তারা বহুদেহ। তাদের জন-সংখ্যা মাথা গুণে নয়, যন্ত্রের দ্বারা তারা আপনাকে বহুগুণিত করেচে। এই বহুলাঙ্গ মানুষের যুগে আমরা বিরলাঙ্গ হয়ে অন্য দেশের ধনের তলায় শীর্ণ হয়ে পড়ে আছি।

সংখ্যাহীন উমেদারের দেশে কেবল যে অন্নের টানাটানি ঘটে তা নয়, হৃদয়ের ঔদার্য্য থাকে না। প্রভুমুখ-প্রত্যাশী জীবিকার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ কণ্টকিত হয়ে ওঠে। পাশের লোকের উন্নতি সইতে পারিনে। বড়কে ছোট করতে চাই, একখানাকে সাতখানা করতে লাগি। মানুষের যে সব প্রবৃত্তি ভাঙন ধরাবার সহায়, সেইগুলিই প্রবল হয়, গড়ে তোলবার শক্তি কেবলি খোঁচা খেয়ে খেয়ে মরে।

দশে মিলে অন্ন উৎপাদন করবার যে যান্ত্রিক প্রণালী, তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে যন্ত্ররাজদের কনুইয়ের ধাক্কা খেয়ে বাসা ছেড়ে মরতে হবে। মরতেই বসেচি। বাহিরের লোক অন্নের ক্ষেত্রের থেকে ঠেলে ঠেলে বাঙালীকে কেবল কোণঠেসা করচে। বহুকাল থেকে আমরা কলম হাতে নিয়ে একা একা কাজ করে মানুষ—যারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত, আজ ডাইনে-বাঁয়ে কেবলি তাদের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে চলি, নিজের রিক্ত হাতটাকে কেবলি খাটাচ্চি পরীক্ষার কাগজ, দরখাস্ত এবং ভিক্ষার পত্র লিখতে।

একদিন বাঙালী শুধু কৃষিজীবী এবং মসীজীবী ছিল না; ছিল সে যন্ত্রজীবী, মড়াই-কল চালিয়ে দেশ-দেশান্তরকে সে চিনি জুগিয়েচে। তাঁত যন্ত্র ছিল তার ধনের প্রধান বাহন। তখন শ্রী ছিল তার ঘরে, কল্যাণ ছিল গ্রামে গ্রামে।

অবশেষে আরও বড় যন্ত্রের দানব তাঁত এসে বাংলার তাঁতকে দিলে বেকার ক'রে। সেই অবধি আমরা দেবতার অনিশ্চিত দয়ার দিকে তাকিয়ে কেবলি মাটি চাষ ক'রে মরচি—মৃত্যুর চর নানা বেশে নানা নামে আমাদের ঘর দখল ক'রে বসলো।

তখন থেকে বাংলা দেশের বুদ্ধিমানদের হাত বাঁধা পড়েচে কলম-চালনায়। ঐ একটি মাত্র অভ্যাসেই তারা পাকা, দলে দলে তারা চলেচে আপিসের বড় বাবু হবার রাস্তায়। সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে কলম আঁকড়িয়ে থাকে, পরিত্রাণের আর কোনো অবলম্বন চেনে না। সন্তানের প্রবাহ বেড়ে চলে, তার জন্যে যারা দায়িক তারা উপরে চোখ তুলে ভক্তিভরে বলে, জীব দিয়েচেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

আহার তিনি দেন না, যদি স্বহস্তে আহারের পথ তৈরী না করি। আজ এই কলের যুগে কলই সেই পথ। অর্থাৎ প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডারে যে শক্তি পুঞ্জিত, তাকে আত্মসাৎ করতে পারলে তবেই এ যুগে আমরা টিঁকতে পারবো।

এ কথা মানি, যন্ত্রের বিপদ আছে। দেবাসুরে সমুদ্রমন্থনের মত সে বিষও উদ্গার করে। পশ্চিম মহাদেশের কল-তলাতেও দুর্ভিক্ষ আজ গুঁড়ি মেরে আসচে। তাছাড়া অসৌন্দর্য্য, অশান্তি, অসুখ কারখানার অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যেরই সামিল হয়ে উঠলো। কিন্তু এজন্য প্রকৃতিদত্ত শক্তি-সম্পদকে দোষ দেবো না, দোষ দেবো মানুষের রিপুকে। খেজুর গাছ, তাল গাছ বিধাতার দান, তাড়িখানা মানুষের সৃষ্টি। তালগাছকে মারলেই নেশার মূল মরে না? যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিষদাঁতটাকে সজোরে ওপড়াতে লেগেচে কিন্তু সেই সঙ্গে যন্ত্রকে সুদ্ধ টান মারেনি; উল্টো, যন্ত্রের সুযোগকে সর্ব্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণ সুগম ক'রে দিয়ে লোভের কারণটাকেই সে ঘুচিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু এই অধ্যবসায়ে সব চেয়ে তার বাধা ঘটচে কোন্‌খানে? যন্ত্রের সম্বন্ধে যেখানে সে অপটু ছিল সেখানেই। একদিন জারের সাম্রাজ্যকালে রাশিয়ার প্রজা ছিল আমাদের মত অক্ষম। তারা মুখ্যত ছিল চাষী। সেই চাষের প্রণালী ও উপকরণ ছিল আমাদেরই মত আদ্যকালের। তাই আজ রাশিয়া ধনোৎপাদনের যন্ত্রটাকে যখন সর্ব্বজনীন করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত তখন যন্ত্র-যন্ত্রী ও কর্ম্মী আনাতে হচ্চে যন্ত্র-দক্ষ কারবারী দেশ থেকে। তাতে বিস্তর ব্যয় ও বাধা। রাশিয়ার অনভ্যস্ত হাত দুটো এবং তার মন না চলে দ্রুত গতিতে, না চলে নিপুণ ভাবে।

অশিক্ষায় ও অনভ্যাসে আজ বাংলা দেশের মন এবং অঙ্গ যন্ত্রব্যবহারে মূঢ়। এই ক্ষেত্রে বোম্বাই আমাদেরকে যে পরিমাণে ছাড়িয়ে গেছে সেই পরিমাণেই আমরা তার পরোপজীবী হয়ে পড়েছি। বঙ্গবিভাগের সময় এই কারণেই আমাদের ব্যর্থতা ঘটেছিল, আবার যে কোনো উপলক্ষে পুনশ্চ ঘটতে পারে। আমাদের সমর্থ হ'তে হবে—সক্ষম হ'তে হবে, মনে রাখতে হবে যে, আত্মীয়-মণ্ডলীর মধ্যে নিঃস্ব কুটুম্বের মত কৃপাপাত্র আর কেউ নেই।

সেই বঙ্গবিভাগের সময়ই বাংলা দেশে কাপড় ও সুতোর কারখানার প্রথম সূত্রপাত। সমস্ত দেশের মন বড় ব্যবসায় বা যন্ত্রের অভ্যাসে পাকা হয়নি; তাই সেগুলি চলছে নানা বাধার ভিতর

দিয়ে মন্থর গমনে। মন তৈরি ক'রে তুলতেই হবে, নইলে দেশ অসামর্থ্যের অবসাদে তলিয়ে যাবে।

ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের মধ্যে বাংলা দেশ সর্বপ্রথমে যে-ইংরেজী বিদ্যা গ্রহণ করেচে, সে হ'ল পুঁথির বিদ্যা। কিন্তু যে ব্যাবহারিক বিদ্যায় সংসারে মানুষ জয়ী হয়, য়ুরোপের সেই বিদ্যাই সব শেষে বাংলা দেশে এসে পৌঁছলো। আমরা য়ুরোপের বৃহস্পতি গুরুর কাছ থেকে প্রথম হাতেখড়ি নিয়েছি, কিন্তু য়ুরোপের শুক্রাচার্য্য জানেন কি ক'রে মার বাঁচানো যায়—সেই বিদ্যার জোরেই দৈত্যেরা স্বর্গ দখল ক'রে নিয়েছিল। শুক্রাচার্য্যের কাছে পাঠ নিতে আমরা অবজ্ঞা করেছি—সে হ'ল হাতিয়ার বিদ্যার পাঠ। এই জন্যে পদে পদে হেরেছি, আমাদের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়লো।

বোম্বাই প্রদেশে একথা বললে ক্ষতি হয় না, যে, চরখা ধরো। সেখানে লক্ষ লক্ষ কলের চরখা পশ্চাতে থেকে তার অভাব পূরণ করছে। বিদেশী কলের কাপড়ের বন্যার বাঁধ বাঁধতে পেরেছে ঐ কলের চরখায়। নইলে একটি মাত্র উপায় ছিল নাগাসন্ন্যাসী সাজা। বাংলা দেশে হাতের চরখাই যদি আমাদের একমাত্র সহায় হয়, তাহ'লে তার জরিমানা দিতে হবে বোম্বাইয়ের কলের চরখার পায়ে। তাতে বাংলার দৈন্যও বাড়বে, অক্ষমতাও বাড়বে। বৃহস্পতি গুরুর কাছে যে-বিদ্যা লাভ করেছি, তাকে পূর্ণতা দিতে হবে শুক্রাচার্য্যের কাছে দীক্ষা নিয়ে। যন্ত্রকে নিন্দা ক'রে যদি নির্ব্বাসনে পাঠাতে হয়, তাহ'লে যে-মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সেই নিন্দা রটাই, তাকে সুদ্ধ বিসর্জ্জন দিয়ে হাতে-লেখা পুঁথির চলন করতে হবে। এ কথা মানবো যে, মুদ্রাযন্ত্রের অপক্ষপাত দাক্ষিণ্যে, অপাঠ্য এবং কুপাঠ্য বইয়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তবু ওর আশ্রয় যদি ছাড়তে হয়, তবে আর কোনো একটা প্রবলতর যন্ত্রেরই সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে সেটা সম্ভব হতে পারবে।"

—বিশ্বভারতীর সৌজন্যে।

ছাতা

আজ কাল সময়ে-অসময়ে বৃষ্টির যে-রকম অসহনীয় উৎপাত আরম্ভ হয়েছে, তাতে ছাতার প্রয়োজনীয়তা অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। পুজোর পর যাঁরা ভেবেছিলেন, ছাতা বইবার দায় থেকে বাঁচা গেল, তাঁদের আবার ছাতা কাঁধে করতে হচ্ছে, ছাতা সারাতে হচ্ছে, কেউ কেউ বা নতুন ছাতা কিনতে বাধ্য হচ্ছেন।

জুতোর মত ছাতাও একটি অপরিহার্য্য বস্তু। এই ছাতা আবিষ্কার ক'রতে "উনিশ পিপে নস্য" উড়েছিল কি না তা বলা যায় না, তবে আবিষ্কার-কর্তা যে "চামার কুলপতি"র মত এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেশের মান্যগণ্য পণ্ডিত জ্ঞানীরা হয়ত প্রথমে বৃষ্টি এবং রৌদ্রের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আকাশজোড়া চন্দ্রাতপ নির্ম্মাণের পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত হয়ত এক জন সাধারণ কারিগর ছাতা আবিষ্কার করে ধরা রক্ষে করেছিলেন।

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সংগ্রামে মানুষ অনেক কিছুই আবিষ্কার করেছে বা করতে বাধ্য হয়েছে এবং ছাতা আবিষ্কারও যে সেই চেষ্টার অন্যতম ফল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

নিনেভা ও ব্যাবিলনের সমৃদ্ধির যুগে ছাতার প্রচলন ছিল। প্রাচীন গ্রীস, তুরস্ক, পারস্য, ভারত, চীন এবং মিশরের অধিবাসীরা ছাতার ব্যবহার জানত। কিন্তু ছাতা আবিষ্কারের প্রথম অবস্থায় সাধারণে তা ব্যবহার করতে পেত না, ছাতা ব্যবহৃত হ'ত কেবল রাজছত্ররূপে—অর্থাৎ রাজা-বাদশাহেরই ছাতার উপর একচেটিয়া অধিকার ছিল। ছাতা ছিল তখন রাজার মর্য্যাদার দ্যোতক।

খৃষ্টপূর্ব্ব আনুমানিক দু'হাজার বছর আগে আসীরিয় রাজাদের প্রাসাদে অঙ্কিত চিত্রে দেখা যায়, ক্রীতদাসেরা রাজন্যবৃন্দের মস্তকের উপর বৃহদাকার ছত্রসমূহ ধারণ ক'রে আছে। যুদ্ধের সময়ও রাজছত্র ব্যবহারের প্রমাণ এই সব চিত্র থেকে পাওয়া যায়। আজটেক সম্রাটগণও বৃহদাকার রাজছত্র ব্যবহার করতেন। তাঁদের নির্দ্দেশে একসঙ্গে চার জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পালাক্রমে আজটেক সম্রাটদের মস্তকের উপর রাজছত্র ধারণ করতেন। আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের যুগের তো কথাই নেই।

এই সমস্ত প্রাচীন রাজছত্র একটা দেখবার জিনিষ ছিল। রেশমের আচ্ছাদনের উপর নানা রকমের কারুকার্য্য করা থাকত। সোনার জরি এবং মুক্তোর ঝালর দিয়ে শোভিত এই সমস্ত ছাতা সত্যই একটা দেখবার জিনিষ ছিল। রাজছত্রের বাঁটগুলিও ছিল অতিশয় মূল্যবান। সাধারণত সেগুলি গজদন্ত-নির্ম্মিত হত এবং তাতে সোনার কাজ-করা থাকত।

পারস্যের খলিফা, মোগল সম্রাট, বর্ম্মী রাজা, তুর্কী বে, গ্রীসের পুরোহিত ও ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ বৃষ্টি অথবা রৌদ্র থেকে আত্মরক্ষার এবং রাজ-মর্য্যাদা প্রচারের জন্য এই সমস্ত রাজছত্র ব্যবহার করতেন, তখনও পর্য্যন্ত শ্যামের রাজার বহু উপাধির মধ্যে "চতুর্ব্বিংশ ছত্রপতি" উপাধিটি প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে ছত্রপতি শিবাজীর নাম কে না জানেন?

সাধারণের মধ্যে ছাতার প্রচলন হতে নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছিল। যে ছত্র রাজ-মর্য্যাদার প্রতীক, তা যদি সাধারণে ব্যবহার করে, তবে রাজাকে আর কে মানবে? কিন্তু যেমন করেই হ'ক, পাদুকার মত ছাতা ব্যবহারের অধিকারও জনসাধারণ পেয়েছিল, তবে ভিন্ন আকারে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৃটেনে প্রথম ছাতার প্রবর্ত্তন হয়। ভারতবর্ষ থেকে যে সব পর্য্যটক বৃটেনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁরাই ছাতা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের দেখাদেখি বৃটেনে ছাতা ব্যবহার সুরু হয়। বেন জনসনের "দি ডেভিল্‌স ইজ এ্যান এ্যাস" নামক নাটকে (১৬৩০ সাল) ছাতার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে দুর্ঘটনায় পতিত এক মহিলার অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—And there she lay, flat spread as an umbrella."

ইউরোপের প্রথম যুগের ছাতাগুলি ছিল চীনা প্যাটার্ণের। খুব পাতলা রেশমী কাপড় দিয়ে এই সমস্ত ছাতা তৈরী করা হত। এই ছাতার ভাঁজ থাকত অনেক এবং খোলা ও বন্ধ করা ছিল এক বিরক্তিকর ব্যাপার। তখনকার দিনে ছাতা ছিল মেয়েদের ব্যবহারের জিনিষ। মেয়েদের সুন্দর তনু ও পোষাক-পরিচ্ছদকে বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য তারা ছাতা ব্যবহার করতো। পুরুষদের পক্ষে ছাতা নিয়ে চলা লজ্জার ব্যাপার ছিল।

ইংলণ্ডের লোকে জোনাস হ্যানওয়েকে ছাতার আবিষ্কার কর্ত্তা বলে মনে করে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে হ'লে বলা উচিত যে, তিনি ছাতা আবিষ্কার করেন নি, কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে ছাতার প্রচলন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি চীন পর্য্যটন ক'রে ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে শিখে আসেন ছাতা নির্ম্মাণের কৌশল।

কেবলমাত্র রাজারা ছাতা ব্যবহার করবেন, এ কেমন কথা! তিনি জনসাধারণের মধ্যে ছাতার প্রচলনের জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন এবং এই উদ্দেশ্যে নিজে কতকগুলি ছাতা প্রস্তুত করলেন। ছেলে-বুড়ো সকলের ঠাট্টা-বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করে তিনি লণ্ডনের পথে ছাতা মাথায় দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ত্রিশ বছর ধরে তিনি চালিয়ে গেলেন তাঁর অভিযান। তাঁর একাগ্রতা ও অটুট সঙ্কল্পের কাছে সকল ঠাট্টা-বিদ্রূপ নিস্তব্ধ হয়ে গেল এবং ক্রমে-ক্রমে লোকে ছাতা ব্যবহার করা সুরু করল।

অবশ্য বর্ত্তমানে আমরা যে ধরণের ছাতা ব্যবহার করি, প্রথম অবস্থায় ছাতার রূপ সে রকম ছিল না। তখনকার দিনের ছাতাগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত বড় ও বেঢপ ধরণের এবং সেগুলি খোলা এবং বন্ধ করার ব্যাপারটা রীতিমত বিরক্তিকর ছিল। ইংলণ্ডে ছাতা এখন সভ্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ছাতা রাণী মেরী এবং মিঃ চেম্বারলেনের খুব প্রিয়বস্তু ছিল। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আজ সভ্যসমাজের পক্ষে ছাতা অপরিহার্য্য। তাই তাকে ক্রমশঃ যতদূর সম্ভব সৌখিন করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু যত কায়দা বাঁটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ছাতার প্রধান অসুবিধা হল খোলা এবং বন্ধ করার ব্যাপারটি এবং ভিজে ছাতা নিয়ে ট্রামে-বাসে চলাফেরা। এই দুটি বিষয়ে এখনও কোনও অগ্রগতি হয় নি। যাঁরা ছাতা নির্ম্মাণ করেন, তাঁদের এ বিষয়ে একটু সচেতন হওয়া দরকার।

ভারতবর্ষে বিদেশী মাল কাটতির বহর (১৩৩৮)

সহযোগী 'পল্লীবাসী' ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যত বিদেশী মাল কাটতি হয় তাহার একটা ফিরিস্তি দিয়াছেন—

প্রতি বৎসর আমরা বিদেশী সূচ কিনি ৫০ লক্ষ টাকার আর গুটী সূতা কিনি ২।০ কোটি টাকার। আমাদের মা, বোনদের সধবার চিহ্ন সিঁথির সিঁদুরটুকু বজায় রাখিতে তাঁরা বিদেশকে দেন প্রতি বৎসর একুশ লক্ষ টাকা।

বিলাস ও বাবুগিরির জন্য ব্যয়

সাবান	৭০	লক্ষ	টাকার
সুগন্ধি তৈল	১৬	"	"
স্নো	১৪	"	"
পাউডার	১২	"	"
এসেন্স	১৫	"	"
মাথার ফিতে	৮।০	"	"
চুলের কাঁটা	১৫	"	"
সেপটিপিন	৩।০	"	"
তাস	২১	"	"
চুলের ব্রাস	৩।০	"	"
টুথ ব্রাস	২।০	"	"
পুঁতির মালা ও ঝুটামুক্তা	৭৭	লক্ষ	টাকা
বিদেশী চুড়ী	৭৭	"	"
লজেঞ্জেস	২৭	"	"
বিস্কুট ও কেক	৫৭	"	"

নেশার বহর

সিগারেট	২	কোটি	টাকার
সিগার	৬	লক্ষ	টাকার
চুরুটের মসলা	৬০	"	"
চুরুটের সরঞ্জাম	৪।০	"	"

বিদেশী বাসনকোসন

চীনা বাসন	৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার		
এনামেল	৪।০	লক্ষ	টাকার
এলুমিনিয়ম	২।০	"	"
চায়ের বাসন	১।০	"	"

অন্যান্য বিদেশী জিনিষ

কাপড়	৬২	কোটি	টাকার
বারুণ	৫	লক্ষ	টাকার
বোতাম	৩২	"	"
চিরুণী	২৬	"	"
জুতার ফিতা	১৬।০	"	"
কাপড় কাচা সাবান	১।০	কোটি	টাকার
কাগজ	৩	"	"
চিনি	১৮	"	২০ লক্ষ টাকার
ছাতা	১০	লক্ষ	টাকার
ছাতার সরঞ্জাম	৫১	"	"
হ্যারিকেনের কাচ	২০	"	"
ষ্টোভ	১১	"	"
টর্চ্চ	১০	"	"
ব্লটিংপেপার	৩।০	"	"
চিঠির কাগজ ও খাম	৩৬	"	"
কলপেন্সিল	১১	"	"
শ্লেট পেন্সিল	২।০	"	"
শ্লেট	৬।০	"	"
কলম	১০	"	"
ছুরী	৩৪	"	"
কাঁচি	১০	"	"
জুতার কালি	১৭	"	"
গঁদ	২১	"	"
শাঁক	২।০	"	"
কড়ি	১	"	"
জমাট দুধ হরলিকস্ ইত্যাদি	১ কোটি ৫ লক্ষ টাকার		
বিদেশী শিশুখাদ্য	১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার		
গুড়	২৫	লক্ষ	টাকার
লেসবোনা সূতা	৩০	"	"
তালা	১।০	কোটি	টাকার
লোহার সিন্দুক	৩০	লক্ষ	টাকার
শিশি বোতল	৬৬	"	"

টুকিটাকি

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিয়ন কারবাইড এ্যাণ্ড কারবন কর্পোরেশন স্বভাবজ গ্যাস, বাতাস এবং অ্যামোনিয়া হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এক নূতন তরল রাসায়নিক যৌগিক তৈয়ারী করিয়াছেন। স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ এই তরল পদার্থটির নাম অ্যাক্রিলোনাইট্রাইল (Acrylonitrile)। ভূগর্ভে পেট্রলের সন্ধানকালে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বভাবজ গ্যাস (Natural Gas) পেট্রলের পরিবর্তে বাহির হইয়া আসে। এই গ্যাস সাধারণতঃ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। * * ইউনিয়ন কারবাইডের কৃত্রিম তন্তু ডাইনেল (Dynel) অ্যাক্রিলোনাইট্রাইল হইতে তৈয়ারী করা হয়। ডাইনেল তন্তু পেঁজা তুলার ন্যায় নরম, কিন্তু খুবই দৃঢ়। সর্বপ্রকার বস্ত্র বয়নে এই তন্তু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মহিলাদের পশুলোমে (Fur) নির্মিত কোটের নকল কোটগুলিতে ডাইনেল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। * * অ্যাক্রিলোনাইট্রাইল হইতে তৈয়ারী কৃত্রিম রবার জুতার সোল, পেট্রোল সরবরাহের হোস এবং শিল্পে ব্যবহৃত হয় বিবিধ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এই দ্রব্যগুলি দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে। অ্যাক্রোনাইট্রাইলের সহিত কয়েক প্রকার প্ল্যাষ্টিক মেশান হইলে, নূতন প্ল্যাষ্টিক পদার্থটি 'শক্' বা ঝাঁকুনি সহ্য করিতে পারে। ইহা আরও সুদৃঢ় হয় বলিয়া বেশী দিন টিকে। * * এই বৎসরের এপ্রিল মাস হইতে এই পর্য্যন্ত নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদ ভারতের বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া সংঘ এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারত খেলাধূলার উন্নয়নের জন্য মোট ১,৫৫,৩০৭ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন (ক্রীড়া) শিক্ষণ শিবির স্থাপনের জন্য ৫৫,৮০৪, মঞ্জুর করা হইয়াছে। * * ভারতীয় চিনিকল সমিতির হিসাবে প্রকাশ যে, গত সেপ্টেম্বর মাসে যে মরশুম শেষ হইয়াছে সেই মরশুমে ভারত মোট ১৮,৫৯,৭৮৪ টন চিনি উৎপন্ন হয়। পূর্ববর্তী মরশুমে মোট উৎপাদন ছিল ১৫,৮৮,৪০০ টন। গত সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন চিনি কল হইতে ১,৫৫,০০ টন চিনি চালান করা হব। গত বৎসর একই সময় ১,২৮,০০০ টন চিনি চালান করা হইয়াছিল। সেপ্টেম্বর মাসান্তিক মরশুমে মোট ১৫,৯৯,৮০০ টন চিনি (গত মরশুমে ১১,০১,০০০ টন) চালান হয়। ১৯৫৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে চিনি কলগুলিতে মোট ৭,৭৭,৫০০০ টন চিনি মজুদ ছিল। গত মরশুমে একই তারিখে মজুদ চিনির পরিমাণ ছিল ৫,৩৬,৩০০ টন? * * ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী সম্প্রতি ডর্সেটের অন্তর্গত সোয়ানজ ও লুলওয়র্থ কোডের অনতিদূরে সমুদ্রতলে জরীপকার্য চালান। বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম সমন্বিত 'সিসলিস' নামক ব্রিটিশ জাহাজ হইতে উক্ত জরীপকার্য চালানো হয়। জরীপের উদ্দেশ্য ছিল সমুদ্রতলের ১০,০০০ ফুট গভীরে অবস্থিত শিলা প্রস্তরাদির প্রকৃতি নিরূপণ করা। * * ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী গত ২০ বৎসর ধরিয়া ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের নানাস্থানে তৈলের অস্তিত্ব নিরূপক শিলাবিন্যাস আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টার ফলে কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ পূর্ব মিডল্যাণ্ডস অঞ্চলে কিছু কিছু তৈল উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। * * হায়দরাবাদে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ কলটি স্থাপিত হইবে ভারত সরকার তাহা স্থাপন করার দায়িত্ব জাতীয় শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের উপর অর্পণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা সরকারী সংস্থা হইবে। ইক্ষুর ছিবড়া হইতে এই কলে কাগজ প্রস্তুত হইবে। এই পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার জন্য কর্পোরেশন হয়ত বিদেশী ফার্মের কারিগরী সাহায্য গ্রহণ করিবেন। * * ভারত সরকার হস্তচালিত তাঁতশিল্পীদের অর্থ সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁতিরা যাহাতে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে পারে এবং তাহাদের কার্যকরী মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারে, সে জন্যই সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তাছাড়া উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা স্থাপনের জন্য ভারত সরকার মাদ্রাজ সরকারকে ১৪·৫ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছেন। * * ১৯৫৬-৫৭ সালে আনুমানিক ৪৭,১৭,০০০ একর জমিতে আখ-চাষ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পূর্ববর্তী মরশুমে আখ-চাষ জমির পরিমাণ ছিল ৪০,৬০,০০০ একর। * * ভারত সরকারের আমন্ত্রণে এবং ফোর্ড ফাউণ্ডেসনের উদ্যোগে বস্ত্র শিল্প অভিজ্ঞ তিন জন আমেরিকানের একটি দল শীঘ্রই ভারত পরিভ্রমণে আসিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁতশিল্পের রপ্তানি বাণিজ্য কি করিয়া বৃদ্ধি করা যাইতে পারে সে সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্যই তাঁহারা আসিতেছেন। * * ১৯৫৪ সালে ভারতে মোট সাবানের কারখানা ছিল ৫৩টি এবং তাহাতে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ৬৪২০। তাহাদের বেতন ও মজুরী হিসাবে দেওয়া হইয়াছে ১,২৫ কোটি টাকা। ঐ সব কারখানায় ১৫,৮৫ কোটি টাকা মূল্যের মোট ৭৮,৭৭৭ টন সাবান উৎপন্ন হইয়াছে। * * যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম ও বাণিজ্য দপ্তরের এক রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার কারখানা শ্রমিকগণ প্রতি ঘণ্টায় দুই ডলারেরও বেশী মজুরী হিসাবে পাইয়াছেন। ইতিপূর্বে আর মজুরীর হার এতটা উঠে নাই। ঐ দপ্তরের রিপোর্ট হইতে আরও জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা ২০ লক্ষের নীচে নামিয়া গিয়াছে। সেখানে চাকুরীজীবীর সংখ্যা ৬·৬০ কোটিরও বেশী। * * কাপড়ের কল, সুতাকাটা কল, পাইপের কারখানা তারের দড়ির কারখানা প্রভৃতি কতকগুলি মাঝারী শিল্পের সম্প্রসারণ করিয়া উদ্বাস্তুদিগকে স্থায়িভাবে কর্মে নিযুক্ত করিবার সুবিধা সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আরও ১৬, ৭৪, ০০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকা হইতে পশ্চিমবঙ্গের ৭টি শিল্পসংস্থাকে ঋণ দেওয়া হইবে।

ছোটদের আসর

কাঠের খেলনা-শিল্প

নির্মল দত্ত

তোমরা অনেক রকমের খেলনা দেখেছো হয়তো। আমাদের দেশী, অর্থে বাঙলার কাঠের খেলনা যে বাংলা দেশের কুটির শিল্পের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ, তা কি জানো? শিশুদের কাছে এর সমাদর খুবই। বিভিন্ন মেলা-উৎসবে আজও কাঠের খেলনা বিক্রী হয়ে থাকে। এককালে কাঠের খেলনার প্রধান বাজার ছিল পূর্ববঙ্গের মেলা-উৎসবগুলো এবং বিক্রীও হ'ত যথেষ্ট। সহর অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলেই এর বাজার ছিল প্রধানত। কিন্তু লোকের আর্থিক দুরবস্থার সাথে সাথে বিশেষ ক'রে প্লাষ্টিক বা সেলুলয়েডের খেলনার ব্যাপক প্রসারের ফলে কাঠের খেলনার চাহিদাও গিয়েছে কমে।
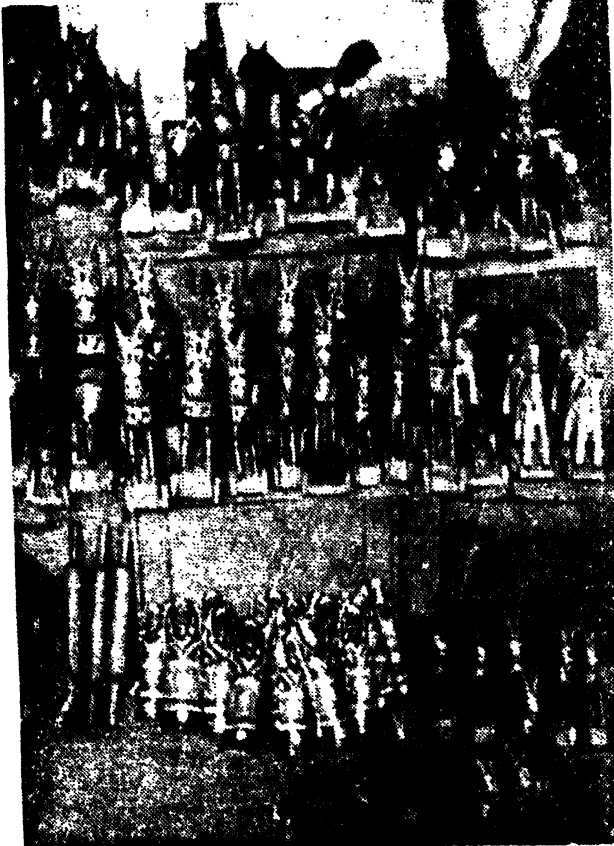
বিক্রীর জন্যে প্রস্তুত

তার ওপর প্লাষ্টিক বা সেলুলয়েডের খেলনা দামেও সস্তা। ফলে, কাঠের খেলনা-শিল্পীদের শুধু অর্থসঙ্কটই দেখা দিয়েছে তা নয়, এই শিল্পটি ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হ'তেও চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, বর্ধমান, নদীয়া; দাক্ষিণাত্যের বাঙ্গালোর, মহীশূর ও মাদ্রাজ; উত্তরাঞ্চলের কাশী প্রভৃতি বহুস্থানেই কাঠের খেলনা তৈরী হয়ে থাকে। এর মধ্যে কাশীর কাঠের খেলনারই খ্যাতি বেশী। এককালে ঢাকাতেও অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাঠের খেলনা তৈরী হত। কুটির-শিল্পে এই খেলনা একটি বিশিষ্ট স্থানও অধিকার করে ছিল এবং বহু ব্যক্তি এই শিল্পটি থেকে জীবিকানির্বাহ করত। বাংলার সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় কাঠের খেলনার একটি বিশিষ্ট স্থানও ছিল।

বঙ্গ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে বহু কাঠের খেলনা-শিল্পী পশ্চিমবঙ্গে চ'লে এসেছেন। এই সকল উদ্বাস্তু-শিল্পীরা কলকাতা, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করছেন এবং কাঠের খেলনা তৈরী করে নিজেদের জীবিকানির্বাহ করছেন। অভিযোগ পাওয়া যায় যে, এই সব শিল্পীদের এই বৃত্তি থেকে সুষ্ঠ জীবিকার ব্যবস্থা হয় না। অনেককে এইজন্যে এই কাজ ছেড়েও দিতে হয়েছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে এই খেলনার বাজার খুব ভাল নয়। এর ওপর কাশীর কাঠের খেলনাও কলকাতার বাজারে আমদানী হয়ে থাকে। উদ্বাস্তু-শিল্পী ছাড়াও স্থানীয় শিল্পীরাও আছেন। এঁদের উভয়ের মারফৎ যে কাঠের খেলনা তৈরী হয় তা সকল সময়েই যে বিক্রী হয় তাও নয়। কোন বিশেষ মেলা-উৎসবের জন্যে নির্মাতাদের বিক্রীর জন্যে অপেক্ষা করতে হয়।

বর্তমানে কাঠের খেলনা উন্নততর যন্ত্রপাতির দ্বারাও তৈরী হচ্ছে। হাতে কুঁদে তৈরী খেলনার চেয়ে এগুলির পড়তা খরচ অনেক কম হয়। ফলে, হাতে-কুঁদে যাঁরা খেলনা তৈরী করেন, তাঁরা প্রতিযোগিতায় সুবিধা করতে পারছেন না। অনেকের এই খেলনা তৈরীই একমাত্র বৃত্তি। এই কাজ ছেড়ে জীবিকার জন্যে অন্য কিছুও করতে পারেন নি। এঁদের পক্ষে এই কাঠের খেলনা তৈরী করে অন্নসংস্থান করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

এবার কাঠের খেলনা তৈরীর প্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু বলা যাক্। শিমুল ও পিটুলি গাছের কাঠ থেকে এই সব খেলনা তৈরী করতে হয়। প্রধানত ছোট-বড় কাঠখণ্ড থেকে কুঁদে ও কেটে খেলনাগুলি তৈরী হয়ে থাকে। কুঁদে তৈরী করার জন্যে যন্ত্র সাহায্যে নির্মিত খেলনার চেয়ে এগুলি টেঁকসইও হয় অনেক বেশী। শিমুল ও পিটুলি গাছের কাঠ নরম হওয়ায় খেলনা তৈরী করতে বিশেষ সহজসাধ্য ও সুবিধাজনক। যে সব খেলনা তৈরী হয় তার মধ্যে হাতী, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, উট প্রভৃতি বিভিন্ন পশু, বিভিন্ন পাখী, পুরুষ ও নারী প্রভৃতির বিভিন্ন মূর্তিই প্রধান। এগুলি নানান্ আকারেরও হয়ে থাকে।

যে সাইজ বা যে আকারের খেলনা তৈরী হবে, আন্দাজ করে, সেই ধরণের একটা কাঠের টুকরো প্রথমে কেটে নিতে হবে। তার পর সেই কাঠকে কুঁদে ও কেটে খেলনার আকারে নিয়ে আসতে হয়। এই ভাবে প্রয়োজনীয় খেলনার আকার হয়ে গেলে, এগুলো রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হয় এবং কাঠের গায়ে (খেলনার আকার তৈরী হবার পর) কোন ছিদ্রাদি থাকলে তা পুটিং দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। ছুতার মিস্ত্রীরা কাঠের জিনিষ তৈরী করতে

যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে, কাঠের খেলনা তৈরী করতে ঠিক সেই সেই যন্ত্রপাতিই প্রয়োজন হয়।

খেলনাগুলো রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে রং লাগাতে হয়। রৌদ্রে কাঁচা কাঠের রসটা ম'রে যায় বলে রৌদ্রে দেওয়ার নিয়ম। রৌদ্রে শুকিয়ে গেলে মাটির পুতুল রং করার মত এরও রং করতে হয়! প্রথমে এক রঙা করে নিতে হয়। এক রঙা হ'য়ে গেলে খেলনার বিভিন্নতা অনুযায়ী চোখ, মুখ, গায়ের রং প্রভৃতি চিত্রিত ক'রে তোলা হয়। তার ওপর রং যাতে খেলনার গায়ে ঠিকমত লাগে তার জন্যে লাক্ষার বার্ণিশও খেলনার গায়ে লাগানো হয়ে থাকে। খেলনা তৈরী করতে পুরুষদের সাথে মেয়েরাও কাজ করে থাকেন। অর্থাৎ পুরুষরা কাঠ কেটে ও কুঁদে পুতুল বা খেলনার আকারটা করে দেন, আর মেয়েরা খেলনাগুলো শুকোবার পর পুটিং প্রভৃতি লাগিয়ে এক রঙা করে ফেলেন। উভয়ে এক সাথে কাজ করার ফলে এতে শ্রম লাঘব হওয়ায় পড়তা খরচটাও কম হয়! আবার কাঠ কেটে ও কুঁদে যাঁরা খেলনাটা তৈরী করেন, তাঁরাই যে সব সময় পুতুলের রং করতে পারেন তাও নয়। যাঁরা মাটির পুতুল রং ক'রে থাকেন, তাঁদের দ্বারাও কাঠের খেলনা রং করা হয়ে থাকে।

কাঠের খেলনা তৈরী করে শিল্পীরা পারিশ্রমিক বাবদ যা পেয়ে থাকেন তার একটা বিশ্লেষণ নীচে দেওয়া গেল:—ধরা যাক একটা হাতী তৈরী করতে হবে একটু বড় ধরণের। এই হাতীটি তৈরী

রঙ করার আগে

কাঠের খেলনা শিশুদের কাছে কম প্রিয় নয়

করতে কাঠ লাগে প্রায় ১৲ টাকা, রংও লাগে প্রায় ১৲ টাকার মত। আর হাতী রঙে চিত্রিত করতে মজুরি বাবদ লাগে প্রায় ।০ আনা। এই মোট খরচ আড়াই টাকা। হাতীটি বিক্রী হ'তে পারে মোট ৩।০ সাড়ে তিন টাকা। হাতীটি তৈরী করতে পুরো একটি দিন সময় লাগে। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, খেলনা শিল্পীরা মোটামুটিভাবে পারিশ্রমিক বাবদ দৈনিক এক টাকা রোজগার করতে পারেন। তা হলে বোঝাই যাচ্ছে, আর্থিক দিক থেকে শিল্পীদের কি অবস্থা!

পশ্চিম বাংলার এই খেলনা-শিল্পটির তথা শিল্পীদের উন্নতিবিধান করতে হলে এই সব শিল্পীদের সরকারী আর্থিক সাহায্য ও ঋণ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে খেলনা তৈরীর ব্যবস্থা হলে পড়তা খরচ ও শ্রম অনেক কম পড়তে পারে। শুধু কুঁদে-খেলনা তৈরীর প্রণালীকে আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে নিয়ে আসতে হবে। পশ্চিম বাংলার বাইরে কি ধরণের খেলনা চলে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ও সেই ধরণের খেলনা তৈরী করে সেই সব অঞ্চলে বিক্রীর জন্যে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ বাজারের প্রসারতা ঘটাতে হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কুটির-শিল্পের বিশেষ উন্নতি বিধান করা হবে, যাতে কুটির-শিল্পের মারফৎ অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। কাঠের খেলনা-শিল্পটিও সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই বিষয়েও অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

সত্য কাহিনী

শ্রীকালীপদ কোঙার

রাণীখেত। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার ভারবাহী রাণীখেত নয়—১৮৬১ সালের রাণীখেত।

প্রশস্ত পর্ব্বতোপত্যকা। বৃক্ষলতাগুল্মে আচ্ছাদিত সুশোভিত জনবিরল স্থান। উন্নত, মহান্ হিমালয়ের অন্তর্গত ছোট একটি পাহাড়। গাছের আর সবুজ পাতার সঙ্গে অসিত পর্ব্বতের গভীর মিতালি। ছোটো ছোটো দু'একটি কুটীর—পাহাড়ী লোকেদের বাসস্থান।

ইঞ্জিনিয়ারীং অফিসের সেকেণ্ড ক্লার্ক এক যুবক। কতো জায়গায় যে তাঁকে বদলি হতে হল তার ঠিক নেই। মির্জ্জাপুর, গোরখপুর দানাপুর ···এবারে রাণীখেত। সরকারী কাজের রীতিই এই। বদলির পর বদলি—উপায় নেই। নৈনিতাল থেকে উত্তরে হল রাণীখেত। ওখানে সেনানিবাস হবে। বন-জঙ্গল কেটে জায়গাটি সৈন্যদের উপযোগী করে তুলবার জন্য তাঁকে যেতেই হল।

কিন্তু হাতে কাজ খুবই কম। কি করা যায়? নিকটে হিমালয় পাহাড়ের আহ্বান—শান্ত, স্তব্ধ, গম্ভীর অথচ সুন্দর। প্রকৃতির অনবদ্য অনবগুণ্ঠিত রূপ। মুগ্ধ যুবক বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন পাহাড় থেকে পাহাড়ে।

আচ্ছা, এখানে কোন সাধু-টাধু থাকেন কি?—স্বভাবধার্ম্মিক যুবকটি এই প্রশ্ন তুললেন। খুবই স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে এ প্রশ্নোত্থাপনা। ছেলেবেলায় এই যুবকটি পদ্মাসন করে নদী তীরে বসে থাকতেন। এই সেই যুবক। বহু ঋষি পদরজে ধন্য, সাধনার স্বর্গভূমি নগরাজ হিমালয় তাঁরই সম্মুখে।

ভৃত্য উত্তর দিল, আছেন। আমাদেরই বাড়ীর পাশে পাহাড়। ঐ পাহাড়ের গুহায় কতো সাধুই তো থাকেন। আমাদের রোগে তাঁরা দেন ওষুধ; ক্ষুধায় দেন অন্ন।

কৌতূহল উদ্দীপিত হল। স্থির হল সাধু দর্শনের দিন। যুবকটিকে পাহাড়ের পথ দেখিয়ে দিয়ে বাড়ী চলে গেল ভৃত্য।···এগিয়ে চললেন যুবক। গন্তব্যস্থলে যখন পৌঁছলেন তখন শরীর আর মন দুই-ই ক্লান্ত! গুহার নিকট বসে পড়লেন তিনি।

হঠাৎ চমকে উঠলেন যুবক। এ কি? এই নির্জ্জন অপরিচিত স্থানে কে তাঁকে নাম ধরে ডাকছে?···আশ্চর্য্য। তাঁর সমুখে দাঁড়িয়ে এক সন্ন্যাসী। কেমন করে তিনি তাঁর নাম জানলেন? আকাশে তখন দু'-একটি নক্ষত্র উঠতে সুরু করেছে। সন্ধ্যার সেই আলো-আঁধারেতে সহাস্যবদন সন্ন্যাসীর দিকে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইলেন যুবক। কিন্তু মনে তৎক্ষণাৎ সংশয় এল—না, না এ সন্ন্যাসী নয়, এ ভণ্ড, বুজরুক, দস্যু।

এবার সন্ন্যাসী যুবকটির পিতার নাম উচ্চারণ করলেন। আর বললেন, তুমি আমাকে চিনতে পারছো না? আমি তো ভণ্ড নই, বুজরুক নই।"

আবার সেই বিহ্বল করা স্বর। আবার বিস্ময়। কেমন করে মনের কথা জানলেন ইনি? যুবক উত্তর দিলেন, না, মনে পড়ছে না। কখনই দেখিনি আপনাকে। চিনি না, জানি না। কে আপনি?

—কে আমি? এসো দেখবে। এসো গুহার মধ্যে। চিনবে, জানবে।—যুবকটিকে গুহার মধ্যে নিয়ে গেলেন বিরাট সেই সন্ন্যাসী-পুরুষ। বললেন, চিনতে পারছো এই আসন? এই দণ্ড, কমণ্ডলু, এই ধুনী, এই বাঘছাল? আসনি কখনও এখানে?

—না আসি নি। জানি না।

সন্ন্যাসী তখন স্পর্শ করলেন যুবকটির মস্তক। সারা শরীরে যেন তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হয়ে গেলো। তিনি চিনতে পারলেন, এই তাঁর পূর্ব্ব জন্মের সাধনার আসন, এই ধুনী, দণ্ড কমণ্ডলু সকলি তাঁরই। তাঁর অতি পরিচিত এই গুহা। আর সম্মুখেই তাঁর চির-বাঞ্ছিত, চির-পরিচিত গুরুদেব। যুবকটির বর্ত্তমান জন্মের আর পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি মিশে সব একাকার হয়ে গেল।

অধীর আনন্দে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে লুটিয়ে পড়লেন যুবক। তারপর গুরুর নিকট থেকে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা লাভ করলেন তিনি। লুপ্তপ্রায় যোগধর্মের পুনরুদ্ধার ও প্রচারের এক নবতম অধ্যায়ের সূচনা হল।

—তোমাকে এই জন্যেই এখানে আনা হয়েছিলো। সাত দিন পরে আবার তোমাকে ফিরে যেতে হবে।

সাত দিন পরে সত্যিই তাঁকে পূর্বকর্মস্থল দানাপুরে ফিরে যেতে হয়েছিলো।

তোমরা চেনো এই মহাপুরুষদের?—এই তরুণ হলেন "কাশীবাবা" যোগাবতার শ্রীশ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী, আর এই সন্ন্যাসী তাঁর গুরুদেব ত্র্যম্বক বাবা বা বাবাজী মহারাজ! এঁদেরই কৃপায় ভারত, আমেরিকা ও ইউরোপ আজ দেবদুর্লভ ক্রিয়াযোগ লাভে ধন্য হয়ে উঠছে।

"রামধনু"

সন্ধ্যা বসাক

তোমরা সকলেই নিশ্চয় 'রামধনু' দেখেছ। কিন্তু এই রামধনু কি; বা কেন ওঠে এটা কি তোমাদের জানতে ইচ্ছে করে না? যাই হোক আজ তোমাদের এই রামধনু সম্বন্ধেই কিছু বলব।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত শুনে থাকবে যে সূর্য্যরশ্মি সাতটা রঙের সংমিশ্রণে গঠিত। এই রঙগুলির নাম হল, বেগুনী, ঘননীল, নীল হরিৎ, পীত, নারঙ্গ আর লোহিত। সূর্য্যের এই সাতটা রঙকে ত্রিফলক কাচ 'প্রিজমের' ভিতর দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়।

অনেকে হয়ত এটাও লক্ষ্য করে থাকবে যে, বৃষ্টি হওয়ার কিছু আগে বা পরেই সাধারণতঃ 'রামধনু' দেখা যায়। এটা হয় কেন? এর কারণ হচ্ছে এই যে, বায়ুমণ্ডলের ভাসমান জলকণাগুলি এখানে ত্রিফলক কাচ 'প্রিজমের' কাজ করে। সুতরাং জলকণাগুলির আকার বেশ বড় হওয়া প্রয়োজন। বৃষ্টির আগে বা পরে, এই জলকণাগুলি আকারে বেশ বড় থাকে। সেই জন্যেই 'রামধনু' এই সময়টাতে দেখতে পাওয়া যায়। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। সেটা হল এই যে, সূর্য্য দিগন্ত থেকে খুব উঁচুতে থাকলে, 'রামধনু' দেখা যায় না।

এখন দেখা যাক্ 'রামধনু' কেন দেখা যায়। সূর্য্যরশ্মি বায়ুমণ্ডলের ভাসমান জলকণাগুলিতে প্রবেশ করে প্রতিসরিত ও বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। প্রতিসরণ কি? তুমি জলের মধ্যে একটা লাঠি বাঁকা ভাবে ডোবালে দেখবে যে, ওটা জলের মধ্যে প্রবেশ করছে, সেখান থেকে জলের ভিতরের অংশটুকু উপর দিকে বেঁকে আছে বলে মনে হবে। এটা হয় কেন? এখানেও আলোকের সেই প্রতিসরণ।

জল আর বায়ু হচ্ছে ভিন্নতর মাধ্যম। আলোকরশ্মি এক মাধ্যম থেকে আর এক মাধ্যমে প্রবেশ করে। আর মাধ্যম দুটোর ঘনত্বও সমান নয়। সেজন্য মাধ্যমে যেখানে আলোকরশ্মি প্রবেশ করে, অর্থাৎ দিক পরিবর্তন করে অন্য সরলরেখায় গমন করে এলেই আলোকের প্রতিসরণ বলে। রামধনুর বেলাতেও আলোকরশ্মি জলকণার মধ্যে ঠিক এই ভাবেই

প্রতিসরিত হয়। আলোকরশ্মির বিশ্লেষণের কারণ এই যে, সূর্য্যরশ্মি তির্য্যক ভাবে জলবিন্দুর উপর পড়লে সূর্য্যরশ্মিতে যে সাতটা রঙ আছে, তাদের মধ্যে লাল আলোর পথ সব থেকে কম ও বেগুনী আলোর পথ সব থেকে বেশী পরিবর্ত্তিত হয়। প্রতিসরণ ও বিশ্লেষণের পর বিভিন্ন রঙের রশ্মিগুলি জলবিন্দুর ভিতর পূর্ণ প্রতিফলিত হয়। দেখা যাক পূর্ণ প্রতিফলন কি?

ঘনতর মাধ্যম থেকে লঘুতর মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি প্রতিসরিত হতে হতে এমন অবস্থায় এসে পড়ে, যখন আলোকরশ্মি আর প্রতিসরিত না হয়ে, প্রতিফলিত হয়। আলোকরশ্মির এই প্রত্যাবর্ত্তনকেই পূর্ণ প্রতিফলন বলে।

এই পূর্ণ প্রতিফলনের পর সূর্য্যরশ্মি আবার বায়ুতে ফিরে আসে এবং ফিরে আসবার সময় জলবিন্দুতে আবার প্রতিসরিত ও বিচ্ছুরিত হয়। সূর্য্যরশ্মি জলবিন্দুতে পূর্ণ প্রতিফলিত হলে, এতে সূর্য্যরশ্মির মধ্যে যে রঙগুলি আছে তাদের ক্রমবিন্যাস উল্টে যায়।

জলবিন্দুগুলি থেকে প্রতিফলিত রশ্মি এবং সূর্য্য থেকে আগত রশ্মির সঙ্গে একটা কোণ উৎপন্ন করলে রামধনু দেখা যায়। আর যে বিন্দুগুলি এই কোণ উৎপন্ন করে তারা একটা বৃত্তের ওপর সাজান থাকে বলে 'রামধনু' বৃত্তাকার।

শিল্প-বিচার

শ্রীসুধারাণী গোস্বামী

বহুদিন আগের কথা। পারস্য দেশে দু'জন চিত্রকর ছিল। তারা দু'জনেই এত ভাল ছবি আঁকতে পারত যে, কোন জন যে শ্রেষ্ঠ তা কেউই স্থির করতে পারত না। এক বার দেশের লোকেরা, জনকয়েক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করল,—কে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর সাব্যস্ত করবার জন্য।

এই অভিজ্ঞ ব্যক্তির দল, দু'জন চিত্রকরকেই ডেকে বললেন, "শুনলাম তোমরা খুব ভাল ছবি আঁকতে পার। আচ্ছা, সাত দিন সময় দেওয়া গেল—দু'জনেই ছবি আঁকতে আরম্ভ করে দাও। আমরা ছবি দেখে ঠিক করব তোমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। রাজী ত? বুঝতেই পারছ শুধু পুরস্কারই নয় উপরন্তু যশ এবং শ্রদ্ধাও পাবে।"

চিত্রকররা রাজী হয়ে চলে গেল। বাড়ী গিয়ে তারা দু'জনে নাওয়া-খাওয়া ভুলে, মন-প্রাণ ঢেলে ছবি আঁকতে সুরু করল। দু'জনেরই শ্রেষ্ঠ হবার সমান ইচ্ছা······

ক্রমে এক-দুই করে সাত দিন কেটে গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে এক প্রান্তরে তাদের দু'জনের আঁকা দু'খানা ছবি নিয়ে আসা হ'ল। লোকে-লোকারণ্য।

এক চিত্রকর এঁকেছেন, একটি আঙ্গুর গাছ। তাতে সুপক্ক আঙ্গুরের থলো ঝুলছে। শুনে মনে হচ্ছে এটা ত সাধারণ ছবি। কিন্তু তা নয়। ছবিটা দেখতে এত স্বাভাবিক হয়েছিল যে, বনের পাখীগুলো এসে আঁকা অঙ্গুর ফল ঠোকরাতে লাগল; কারণ তাদের কাছে গাছ আর ফলগুলো জীবন্ত মনে হয়েছিল। এই দৃশ্য দেখে সবাই ভাবল এই ছবিখানার চিত্রকরই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে। কোন সন্দেহ নেই এতে।

তারপর এল অন্য চিত্রকরটির ছবি দেখাবার পালা। অভিজ্ঞরা অগ্রসর হবার আগেই প্রথম চিত্রকরটি দৌড়ে গেল তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ছবিখানা দেখবার জন্য। ভালভাবে দেখবার জন্য, ছবির সামনে টাঙ্গানো অতি সূক্ষ্ম পর্দাখানা সরাতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু এ কি! পর্দা যে এক চুলও নড়ে না! পরে বোঝা গেল—আসল ব্যাপার হচ্ছে ছবির ওপরের পর্দাটা মোটেই আসল পর্দা নয়। ওটা হচ্ছে আঁকা পর্দা। কিন্তু এত সুন্দর ভাবে আঁকা হয়েছে যে মনে হচ্ছিল যেন ছবির ওপরে ঝুলছে একটি সূক্ষ্ম সত্যিকারের পর্দা।

দর্শকরা বিস্ময়ে স্তব্ধ। এও কি সম্ভব! অভিজ্ঞ বিচারকদেরও মনের অবস্থা তথৈব চ। বিচার করবেন কি, কিছুক্ষণের জন্য মুখের হাঁ বন্ধ করতেই ভুলেই গেলেন।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে সম্বিৎ ফিরে এলে, বিচার করা সাব্যস্ত করলেন যে দ্বিতীয় চিত্রকরটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, কারণ প্রথম চিত্রকর ভুলিয়েছেন বনের পাখীকে কিন্তু দ্বিতীয় জন ভুলিয়েছেন মানুষকে। মানুষ হচ্ছে সমস্ত জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠ জীবকে যে চিত্রকর চিত্র দিয়ে ভোলাতে পারে—সে যে কত উঁচুদরের চিত্রকর তা না বললেও বোধ হয় সকলে বুঝতে পারবে। সুতরাং দ্বিতীয় চিত্রকরটিই শ্রেষ্ঠ বলে তার দেশের লোকের কাছে গণ্য হ'ল। যথার্থ বিচার হয়েছিল, কি বল?

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডি. এচ. লরেন্স

পল দেখল ডয়েস, শক্ত হাতে পাইপটা ধরে ছাই সাফ করছে, ভাব দেখে মনে হয় যেন ওর রিক্ততার সীমা নেই। বলল, 'কত বয়স হ'ল তোমার?'

ডয়েস ওর চোখে চোখ রেখে বলল, 'উনচল্লিশ।'

ওর পিঙ্গল দুটি চোখে ব্যর্থতার জ্বালা, সে যেন করজোড়ে জীবনে আবার প্রতিষ্ঠালাভের জন্যে ভিক্ষা চাইছে। তার অন্তরের মানুষটিকে আবার নিজের জায়গায় নিয়ে বসিয়ে দেবে এমন বন্ধু কি তার কেউ আছে? কে তাকে দেবে আপন হৃদয়ের উষ্ণতা, কে তাকে শেখাবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের গোপন মন্ত্র? পলের মন ব্যথাতুর হয়ে উঠল। বলল, 'তুমি ভেব না। এখনও তোমার বড়ো রকমের কিছু ক্ষতি হয়নি। আবার জীবনের গোড়া থেকে শুরু করে দাও দেখি।'

ডয়েসের চোখ ঝকমকিয়ে উঠল। সে বলল, 'না, আমার জীবন এখনও শুকিয়ে যায়নি। চলবার বেগ এখনও অনেকটাই রয়ে গেছে।'

পল হেসে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ। এখনও আমাদের মন কানায় কানায় ভরা। আবার আমরা জীবনের পথে পথে ছুটে চলতে পারি।'

এবার চোখাচোখি হ'ল দু'জনার। এক বার দৃষ্টি-বিনিময় করেই তারা চোখ নামিয়ে নিল। দু'জনার মনের উদ্দাম আবেগ ধরা পড়ল দু'জনার কাছেই! তারপর তারা মদের গ্লাসে চুমুক দিল। এক টান টেনে নিয়ে ডয়েস বলল, 'খুব খাঁটি কথা বলেছ এবার।'

তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। পরে পল বলল, 'তুমি যেখান থেকে ছেড়ে এসেছিলে সেইখান থেকেই অনায়াসে আবার শুরু করতে পারো। আমি কিছু অসুবিধে দেখি না।'

ডয়েস হঠাৎ বুঝতে পারল না, বলল, 'তার মানে তুমি কি বলছ—?'

'হ্যাঁ, বলছি তোমার ভাঙা ঘর আবার জোড়া দিয়ে নাও না কেন।'

ডয়েস হাতে মুখ লুকিয়ে মাথা নাড়ল। তারপর মুখ তুলে অদ্ভুত এক ধরণের হাসি ফুটিয়ে তুলল মুখে। বলল, 'না, তা হয় না।'

—'কেন? তুমি নিজে চাও না, তাই বলে?'

—'তাই হবে।'

দু'জনে নীরবে পাইপ টানতে লাগল। ডয়েস দাঁত দিয়ে পাইপটাকে কামড়াচ্ছিল। পল বলল, 'তুমি কি তাহলে বলতে চাও ওকে তুমি আর চাও না?'

ডয়েস মুখে অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে একটা ছবির দিকে চেয়ে বসে রইল। বলল, 'আমি কিছুই জানি না।'

পল বলল, 'কিন্তু আমার বিশ্বাস ও তোমাকে ফিরে চায়।'

'ও, তোমার বিশ্বাস!' ডয়েস যেন দূর থেকে বিদ্রূপ করে উঠল।

'হ্যাঁ। কারণ ও সত্যি সত্যিই কোন দিন আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারে নি—ওর মনে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিলে তুমি। সেই জন্যেই ও কোন দিন বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাবে রাজী হয় নি।'

ডয়েস নিঃশব্দে চেয়ে রইল ছবিটার দিকে, মুখে অবিশ্বাসের ছাপ। পল বলে চলল, 'সব মেয়েই এমনি ব্যবহার করে আমার সঙ্গে। তারা পাগলের মত ঝুঁকে পড়ে আমার দিকে, কিন্তু আমার হয়ে থাকতে চায় না। ক্লারা চিরকালই আমার রয়ে গেছে, আমার কাছে এলেও সে তোমারই।'

শুনে ডয়েসের মধ্যেকার বিজয়ী পুরুষটি গর্ব্বের হাসি হাসল। খুশিতে তার দাঁতের পাটি যেন ঝকমক করে উঠল। বলল, 'এখন মনে হচ্ছে আমি হয়ত বোকামিই করেছিলাম।'

'হুঁ, একটু-আধটু নয়, বেশ বড় রকমের বোকামি।'

'হুঁ! কিন্তু তাহলে বলতে হয়, তুমি আমার চেয়ে বড় বোকা ছিলে।' ওর কথায় এক দিকে অনুযোগ, অন্য দিকে আত্মপ্রসাদ।

পল বলল, 'তুমি তাই মনে কর বুঝি?'

আবার দু'জনে চুপচাপ। তারপর পল বলল, 'যাক যা হবার হ'ল। কাল থেকে আমি ত' কেটে পড়ছি।'

ডয়েস বলল, 'বুঝতে পারছি তোমার মতলব।'

এর পর আর কোন কথা হ'ল না দু'জনে। দু'জনারই মনে আবার খুন চেপে উঠবার উপক্রম দেখা দিল। এক জন অন্য জনকে প্রায় এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগল।

একই ঘরে ঘুমোত দু'জনে। সেদিন রাত্রে শুতে গিয়ে ডয়েসকে মনে হ'ল ভারী চিন্তামগ্ন। পায়জামা খুলে শুধু সার্ট গায়ে বিছানার ধারে বসে সে তার নিজের পা দুটো পর্য্যবেক্ষণ করছিল। পল জিজ্ঞাসা করল, 'শীত লাগছে না তোমার?'

ডয়েস জবাব দিল, 'আমি পাগুলোকে দেখছি।'

পল বিছানায় শুয়ে শুয়ে বলল, 'পায়ের আবার কি হ'ল? ঠিকই ত' রয়েছে দেখতে পাচ্ছি।'

—'বাইরে থেকে তাই দেখায় বটে। ভিতরে কিন্তু এখনও জল রয়েছে।'

—'তাতে কী হ'ল?'

—'দেখই না এসে।'

সুন্দর কেশগুচ্ছের গোপন কথা
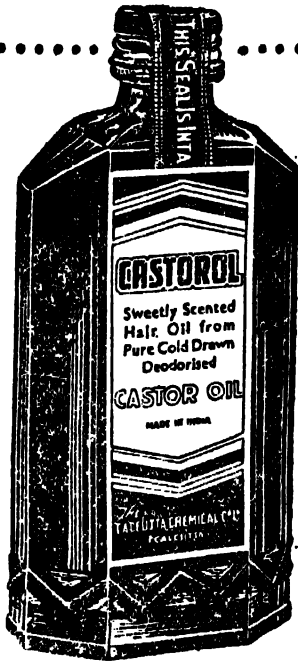
সুন্দর কেশগুচ্ছ লাভ করতে হলে শুধু কেশের যত্ন নিলেই হবে না সঙ্গে সঙ্গে ভাল তেলটিও বেছে নিতে হবে।

ক্যালকেমিকো'র ক্যাষ্টরল নিয়মিত ব্যবহারে কেশের শ্রীবৃদ্ধি করে, কেশগুচ্ছ বাড়ায় এবং কেশপতন নিবারণ করে।

এই মনোরম গন্ধযুক্ত আদর্শ কেশ তৈল পরিশ্রুত ক্যাষ্টর অয়েল থেকে প্রস্তুত এবং কেশের ঐশ্বর্য বাড়াতে অদ্বিতীয়।

৫ ও ১০ আউন্স সুদৃশ্য আধারে পাওয়া যায়।

ক্যাষ্টরল

অতুলনীয় কেশ তৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯

CAS. 1/56 BEN

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পলকে বিছানা ছেড়ে উঠতে হ'ল। গিয়ে দেখতে হ'ল ডয়েসের পা। সুন্দর গড়ন পায়ের, ঘন সোনালী লোমে ছাওয়া দু'টি পা।

ডয়েস পায়ের গোছটা দেখিয়ে বলল, 'এই দিকে চেয়ে দেখ। এর নীচে সব জল।'

'কোথায়?'

ডয়েস আঙুল দাবিয়ে পা টিপল। পায়ের চামড়ায় ছোট ছোট গর্তের সৃষ্টি হয়ে আবার আস্তে আস্তে তা মিলিয়ে গেল। পল দেখে বলল, 'ও কিছু নয়।'

—'তুমি নিজের হাতে পরখ কর।'

পল তাই করল। তেমনি টোল পড়ল পায়ে। বলল, 'তাই ত'!'

—'একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে শরীরটা, নয়?'

—'না, না, এ আর এমন কি হয়েছে?'

—'পায়ে এমনধারা জল হলে মানুষটার আর রইল কি?'

পল বলল, 'কেন? এতে কী আর হ'ল? আমারও ত' বুক দুর্ব্বল, তাতে কী এমন হয়েছে?' বলে শুয়ে পড়ল গিয়ে বিছানায়।

ডয়েস বলল, 'এ ত' যা হবার হয়েছে। এখন শরীরের বাকী জায়গাগুলো ঠিক মত থাকলে বাঁচি।' বলে বাতি নিবিয়ে দিল।

সকালে বৃষ্টি হচ্ছিল। পল তার জিনিসপত্র ব্যাগে ভর্ত্তি করল। সমুদ্রের রূপ তখন ধূসর, বিক্ষুব্ধ, ভয়ঙ্কর। পল যেন ক্রমেই জীবনের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে বিবাগী হতে চলেছে।' এতেই তার একটা অস্বাভাবিক উল্লাস।

ষ্টেশনে দু'জনেই গেল একসঙ্গে। ক্লারা ট্রেণ থেকে নেমে দৃঢ় পদবিক্ষেপে সোজাসুজি এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। পরনে একটা লম্বা কোট, আর শক্ত কাপড়ের টুপি। ওর এই অদ্ভুত শান্ত ঔদাস্য দেখে এরা দু'জনেই মনে মনে ওর উপর বীতরাগ হয়ে উঠল। পল ষ্টেশনের বেড়ার ধারে ওর করমর্দ্দন করল। ডয়েস দাঁড়িয়ে রইল দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে, দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। বৃষ্টির জন্যে ওভারকোটের সবগুলো বোতাম সে গলা পর্য্যন্ত এঁটে দিয়েছে। মুখ পাংশু, চালচলন সাদাসিধে হলেও ওরই মধ্যে একটু যেন আভিজাত্যের ছাপ। পায়ে তখনও সম্পূর্ণ বল পায়নি, তাই কষ্টেসৃষ্টে এসে সামনে দাঁড়াল। ক্লারা বললে, 'কই, এখনও ত' ঠিক সেরে ওঠ নি দেখছি।'

ডয়েস বলল, 'নয় কেন? চমৎকার আছি আমি এখানে।'

এর পর তিন জনের কারও মুখেই কথা জোগাল না। দু'টি পুরুষ ক্লারার সামনে পড়ে যেন হতভম্ব হয়ে গেল। পল বলল, 'এখন কি সোজাসুজি বাড়ি যাবে, না অন্য কোথাও যাবে?'

ডয়েস বলল, 'চলো, বাড়িতেই ফেরা যাক।'

রাস্তায় পল রইল এক পাশে, মাঝখানে ডয়েস, ক্লারা ওপাশে। পথ চলতে চলতে নেহাৎ মামুলি কথাবার্ত্তা হ'ল খানিকটা। তারপর পলের বসবার ঘর। সামনেই একটু দূরে উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গের অশ্রান্ত গর্জ্জন।

পল বড় চেয়ারটা ডয়েসের দিকে ফিরিয়ে দিল। বলল, 'বস হে তুমি।'

ডয়েস বলল, 'আমার চেয়ার চাই না।'

পল শুনলো না, আবার বলল, 'তুমি বস এখানে।'

ক্লারা নিজের জিনিষপত্র খুলে কোচের উপর সাজিয়ে রাখল। দেখে মনে হয় ও একটু যেন ক্ষুণ্ণ। চেয়ারে বসল, তাও কেমন আলগোছে, কোনও ভাব প্রকাশ হবার সুযোগই যেন সে দিতে চায় না। পল নীচে ছুটলো বাড়িওয়ালীকে খবর দিতে।

ডয়েসই কথা বলল প্রথম। বলল, 'তোমার ঠাণ্ডা লাগছে বোধহয়। আগুনের কাছে এসে বোস না কেন।'

ক্লারা জবাব দিল, 'না, না, বেশ গরম লাগছে আমার।'

জানালা দিয়ে চেয়ে চেয়ে সে বাইরের বৃষ্টি আর সমুদ্রের রূপ দেখতে লাগল। তারপর প্রশ্ন করল, 'তুমি ফিরে যাচ্ছ কবে?'

'বোধ হয় কাল। ঘরগুলো কাল পর্য্যন্ত ভাড়া-করা হয়েছে কি না; তাই আমাকে থাকতে বলেছে ও। ও নিজে অবশ্য আজ রাত্রেই ফিরে যাচ্ছে।'

'তুমি বোধ হয় শেফিল্ডেই যাবে?'

'হাঁ, তাই ত' ভাবছি।'

'গায়ে জোর পেয়েছ? কাজ করতে পারবে ত?'

'কাজে লাগব বলেই ত' যাচ্ছি।'

'কাজ ঠিক হয়ে গেছে নাকি?'

'হাঁ। সোমবার থেকে গিয়ে লাগতে হবে।'

'তোমাকে দেখে ত' খুব সুস্থ-সবল বলে মনে হয় না?'

'কেন? কি দেখে বলছ?'

ক্লারা এ কথার কোন জবাব না দিয়ে, জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক ঠিক সব চালাতে পারবে?'

'পারব না কেন? পারতেই হবে।'

পল ফিরে এসে দেখল ওরা চুপচাপ বসে আছে। বলল, 'আমি চারটে কুড়ির গাড়িতে বেরুচ্ছি।

কেউ কোন জবাব দিল না।

পল ক্লারাকে উদ্দেশ করে বলল, 'তোমার জুতো-জোড়া খুলে ফেল এবার। আমার চটি আছে এক জোড়া, তাই পরো।'

ক্লারা বলল, 'ধন্যবাদ! আমার জুতো কিন্তু ভেজে নি।'

পল চটি-জোড়া বের করে রাখল ওর পায়ের কাছে। ক্লারার অনুভবে জাগতে লাগল পলের চটি-জোড়ার কথা।

এবার পল গিয়ে একটা চেয়ারে বসল। দু'টি পুরুষই আজ নিরুপায় দিশেহারা। দু'জনারই চোখে বিহ্বল দৃষ্টি। ডয়েস তবু অনেকটা হাল ছেড়ে দিয়েছে; সে নির্ব্বিকার, কিন্তু পল ক্রমশই নিজের মনের তার আরও চড়া সুরে বেঁধে নিচ্ছে। ক্লারার মনে হ'ল পলকে এত ক্ষুদ্র, এত সাধারণ করে সে আর কোন দিন দেখে নি। ও যেন নিজেকে এক কোণে সরিয়ে নিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারলে বাঁচে। ও হাঁটছে, চড়ছে, জিনিসপত্র গোছগাছ করছে—কিন্তু সর্ব্বদাই কেমন একটা অস্বাভাবিক ধরণে। নিজেকে ঢেকে রাখতে ওর চেষ্টার যেন অন্ত নেই! পলের অজ্ঞাতসারে ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ক্লারার মনে হ'ল লোকটার মধ্যে গভীরতা নেই, তাই চিরকাল ও এক দিকে কিম্বা অন্য দিকে হেলে পড়ে। এক দিক দিয়ে ওর স্বভাবের তুলনা নেই, অমন আবেগ-ভরা মন ক'জনার থাকে? সময়ে সময়ে খুশি হলে ওর জীবনের পূর্ণপাত্র থেকে ও ক্লারাকে যে অঞ্জলি ভরে দিয়েছে সে কথা ক্লারা ভোলেনি। কিন্তু

এখন ওর তুচ্ছতা বড় বেশী ক'রে চোখে পড়ে, ওকে মানুষ বলে গণনা করতেই ইচ্ছে হয় না। তার চেয়ে জয়েসের মধ্যে পুরুষালি ভাব অনেক বেশী। আর যাই হোক, জয়েস কোন দিন ওর মত হালকা নয়, যে দিক থেকেই বাতাস আসুক সেই দিকেই ঢলে-পড়া ওর স্বভাব নয়। পলের দোষ হ'ল এই যে, ওর কোন ভারকেন্দ্র নেই, ও যেন সর্বদা নিজের সঙ্গে লুকোচুরি করে বেড়ায়, দেখে মনে হয় ও বড় চপল, ভারি মিথ্যাচারী। ওর উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না কোন মেয়ে—কখন পা ফসকে যায় তার স্থিরতা নেই। ক্লারা ভেবে পায় না ও এমন গুটিসুটি হয়ে নিজেকে ছোট ক'রে রাখতে চায় কেন। মনে মনে তার রাগ হয়। জয়েস হাজার হলেও একটা পুরুষ মানুষ, হেরে গেলেও হার মানতে তার লজ্জা নেই। কিন্তু পল যে কী ধরণের, পরাজিত হয়েও ও কোন দিন তা স্বীকার করবে না। সরে সরে যাবে, লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াবে, নিজেকে মুছে ফেলতে চাইবে, তবু হার স্বীকার করে নেবে না। পলের উপর ঘেন্না ধরে যায় ক্লারার। তবু চেয়ে থাকে ওর দিকেই। মনে হতে থাকে যেন এই লোকটির হাতেই তাদের তিন জনের ভাগ্যবিধানের ভার। কেন, কেন ছোট হয়েও ও এত শক্তিমান? দুঃখে, ক্ষোভে ক্লারার চোখ ফেটে জল আসতে থাকে।

ক্লারা ভাবে, আজকাল পুরুষ মানুষদের সে ভাল ক'রে বুঝতে শিখেছে। আগে ওদের কথা ভেবে যেমন ভয় হ'ত, এখন আর তা হয় না। এখন নিজের শক্তিতে তার বিশ্বাস জন্মেছে। আগে ভাবত পুরুষরা বুঝি শুধু নিজেদের নিয়ে মত্ত থাকে। সে ধারণা কেটে যাওয়াতে এখন সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। জীবনে অনেক কিছু শিখে নিয়েছে সে—আর বেশী শেখবার আকাঙ্ক্ষা তার নেই। তার জীবনপাত্র কানায় কানায় ভরে গিয়েছে। নিজের উপর এর বেশী বোঝা চাপাবার সামর্থ্যও তার নেই। এখন পল যদি বিদায় নিয়ে চলে যায়, তা'হলে খুব বেশী দুঃখ তার হবে না।

খাওয়া-দাওয়ার সময় বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হ'ল না। তবু ক্লারার বুঝতে বাকী রইল না, পল আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে তাদের গণ্ডী থেকে। ক্লারাকে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছে যাতে সে ইচ্ছে করলে তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারে। এতেই ক্লারার রাগ হ'ল বেশী। লোকটার মন এত ছোট সে জানত না। নিজের যতটুকু নেবার সব নিয়ে এখন সে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছে! রাগে তার চোখ জ্বালা করতে লাগল। একটি বারের জন্যেও মনে পড়ল না যে তার নিজের কামনাও এতে পরিতৃপ্ত হয়েছে, আর মনে মনে নিজেই সে চেয়েছে যেন পল তাকে ফিরিয়ে দেয়।

পলের মনটা যেন পাকানো কাগজের মত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে; নিজের দুর্ব্বহ একাকীত্ব পীড়ন করছে তাকে। এতদিন মা ছিলেন তার প্রাণের প্রহরী। মায়ের দিকেই ছিল তার প্রাণের টান। দু'জনে যেন একযোগে পৃথিবীর পথে ভ্রমণ করছিলেন। এখন মা নেই, পলের জীবনে তাই ফাটল ধরেছে, সেই ফাটলের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুর টানে সে আস্তে আস্তে জীবনের কাছ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হচ্ছে। সাহায্যের তার বড় প্রয়োজন, কিন্তু নিজে থেকে কে তাকে সাহায্য করতে আসবে? মৃত্যুর এই দুর্ব্বার আকর্ষণে মায়ের পথ

ধরে পাছে তাকে চলে যেতে হয়, সেই ভয়ে পল আজকাল সর্ব্বদা সচেতন হয়ে থাকে, ছোটখাটো জিনিসগুলি আগের মত আর তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। পল জানে, ক্লারা তার উপর নির্ভর করতে পারে না। ক্লারা তাকে কামনা করে, কিন্তু তাকে বুঝতে চায় না। সে চায় তার বাইরের খোলোসটাকে, তার ভিতরের যে মানুষটা যন্ত্রণায় আকুলিবিকুলি করছে, তার সঙ্গে ক্লারার কোন পরিচয় নেই, পরিচয় করতে সে চায়ও না। এত ভার ক্লারা সইতেই পারবে না। ক্লারার উপর নিজের বেদনার বোঝা চাপাতে দ্বিধা হয় বলেই পল সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। সে জানে, যে-মুঠি দিয়ে জীবনকে সে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল, সে-মুঠি তার শিথিল হয়ে এসেছে, তাকে ধরে রাখবার কেউ নেই, সে যেন ছায়ার মত অবাস্তব, এই প্রতিদিনকার জগতে বেঁচে থাকবার কোন অধিকারই তার নেই। সেই জন্যেই তার লজ্জা। সেই জন্যেই নিজেকে সে আড়াল করে রাখতে চায়। তাই বলে সে হার মানে নি। এত সহজে জীবনকে ছেড়ে যাবার ইচ্ছে তার নেই। অথচ মৃত্যুকেও সে ভয় করে না। কেউ তাকে সাহায্য করতে আসুক আর না আসুক, সে একাই পথ ধরে এগিয়ে চলবে।

ডয়েস এক সময়ে গড়াতে গড়াতে জীবনের প্রান্তে গিয়ে পড়েছিল, আতঙ্কে তার মন কেঁপে উঠেছিল তখন। মৃত্যুর কিনারা থেকে সে ফিরে এসেছে ভয় পেয়ে, সব অসম্মান শিরোধার্য্য করে, যে তাকে যখন এক মুঠো দিতে চেয়েছে, তার কাছ থেকেই হাত পেতে নিতে তার বাধে নি। অবশ্য এর মধ্যেও এক ধরণের পৌরুষ আছে। ক্লারা তা দেখেছিল। দেখেছিল হেরে গিয়ে হার স্বীকার করতেও লজ্জা পায়নি। দু'হাত মেলে সাহায্য চাইতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি কোন দিন। সেই সাহায্যটুকু ওকে দিতে পারবে ক্লারা, এ তার সাধ্যাতীত নয়।

দেখতে দেখতে বেলা বাজল তিনটে। পল আবার ক্লারাকে গিয়ে বলল, 'আমি চারটে কুড়ির গাড়িতে যাচ্ছি। তুমি কি সেই সঙ্গে যাবে, না পরে আসবে?'

ক্লারা বলল, 'জানি না।'

পল বলল, 'আমাকে নটিংহামে সওয়া সাতটার সময় বাবার সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

ক্লারা বলল, 'তা'হলে আমি পরেই যাব।'

ডয়েস যেন এতক্ষণ খাড়া হয়ে বসে শুনছিল, এবার নড়েচড়ে বসল। সমুদ্রের দিকে চোখ ফিরিয়ে বসে রইল বটে, কিন্তু তার মন পড়ে রইল ঘরের দিকে।

পল বলল, 'কোণের টেবিলে বই আছে দু'-একখানা। আমার পড়া হয়ে গেছে, তুমি পড়তে পার।'

চারটে বাজতে পল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। বলল, 'পরে আবার দেখা করব তোমাদের সঙ্গে।'

ডয়েস বলল, 'তা ত' করবেই। আর তোমার টাকাটা—সেটা একদিন ফেরত দিতে পারব—দেখা যাক কী হয়।'

পল হেসে বলল, 'তার জন্যে আমি নিজে থেকেই এসে তাগিদ দেব, দেখো।' তারপর ক্লারাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গেল পল। ক্লারা করমর্দ্দন করে শেষ বারের মত চোখ তুলে চাইল ওর দিকে। বোবা দু'টি চোখে নিজের দীনতার স্বীকৃতি।

পল চলে গেল। স্বামি-স্ত্রী দুজনে ঘরে এসে বসল। ডয়েস বলল, 'এমনি দিনে কেউ ঘর ছেড়ে বেরোয়? যা জল-কাদা হয়েছে আজ!'

ক্লারা সংক্ষিপ্ত 'হুঁ' দিয়ে স্বামীর কথার সমর্থন করলে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে গল্প হ'ল দু'জনার। বাড়িওয়ালী চা দিয়ে গেলেন। ডয়েসকে না ডাকতেই সে চেয়ার নিয়ে উঠে এলো টেবিলের ধারে, সে আজ একাধারে স্বামী এবং গৃহকর্ত্তা। টেবিলে বসে উৎসুক নেত্রে নিজের পেয়ালাটির জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগল। ক্লারা খাবার সাজিয়ে দিল ওকে, একবার জিজ্ঞেস করল না কী সে খায়, কী সে খেতে চায়। সে যে স্ত্রী, খাবার সাজিয়ে দেওয়াটা যেন তার নিত্যকার ব্যাপার।

চায়ের পর ডয়েস আবার গিয়ে বসল জানালার ধারে। তখন ছ'টা বেজেছে। বাইরে সব অন্ধকার। দূরে সমুদ্রের ডাক শোনা যাচ্ছে। বলল, 'দেখেছ, এখনও বৃষ্টি থামবার নাম নেই।'

'তাই তো।' ক্লারা বলল উত্তরে।

ডয়েস পরের কথাটা বলতে একটু ইতস্তত করল। বলল, 'তা' হলে—আজ রাত্রে তুমি আর যাচ্ছ না ত'?'

ক্লারা জবাব দিল না। ডয়েসের আকুলতা বাড়তে লাগল। বলল, 'এতো বৃষ্টিতে আমি অন্তত পথে বেরুতাম না।'

ক্লারার মুখ ফুটল। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি চাও আমি থেকে যাই?'

ডয়েসের সারা শরীর কেঁপে উঠল যেন। বলল, 'হ্যাঁ, চাই।'

ডয়েস সামনের দিকে চেয়ে বসেছিল। ক্লারা উঠে আস্তে আস্তে ওর কাছে গেল। ডয়েসও মুখ ফিরিয়ে অনেক ইতস্তত করে দাঁড়াল এসে ওর সামনে। ক্লারার হাত দুটি পেছনের দিকে; দাঁড়িয়ে সে অপলক চোখে ডয়েসকে দেখতে লাগল। তার চোখে কী যেন নাম-না-জানা রহস্য। বলল, 'সত্যি তুমি আমাকে চাও বাক্সটার?'

ডয়েসের গলা কেঁপে গেল। ভারী গলায় সে বলল, 'তুমি ফিরে আসতে চাও আমার কাছে?'

ক্লারার গলা থেকে বেরুল শুধু একটা আর্ত্তনাদের স্বর। দু'হাত মেলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডয়েসের বুকে। ডয়েস ওর কাঁধে মাথা রেখে নিজের বুকে আঁকড়ে রাখল ওকে। ক্লারা ওর কানে গুঞ্জন করে উঠল, 'এবার তুমি নাও আমাকে। নাও, ওগো নাও।' ওর ঘন [illegible] ক্লারার সংজ্ঞা হারাবার উপক্রম

হ'ল। ডরেস ওকে টেনে নিল, আশ্রয় দিল, ছল-ছল চোখে ভাঙা গলায় বলল, 'আবার তুমি এলে আমার কাছে ?'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
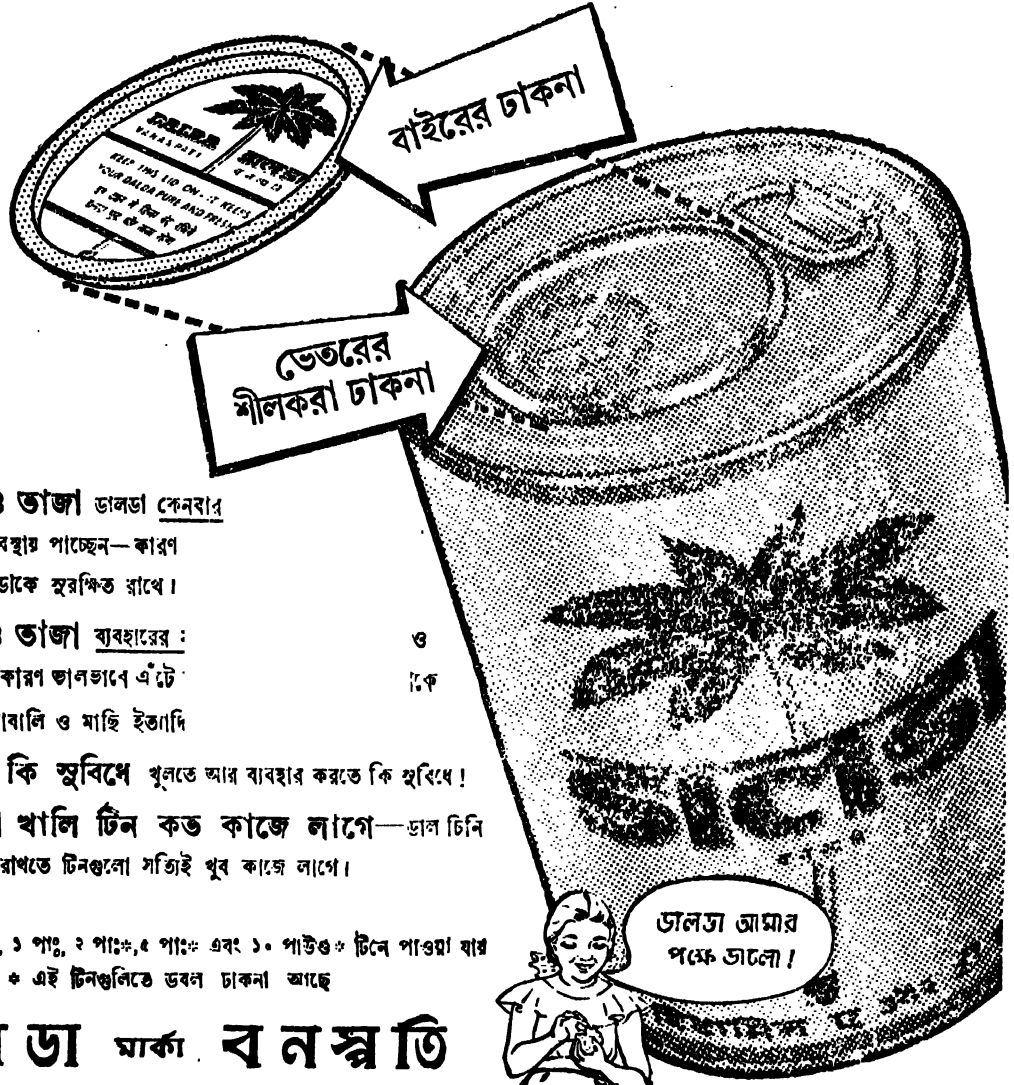
ক্লারা স্বামীর সঙ্গে শেফিল্ডে ফিরল। এর পর তার সঙ্গে পলের আর দেখা হয়নি বললেও চলে। মোরেল আবার আগের মতই, এত যে বিপদ তার উপর দিয়ে গেছে তাতেও তার কোন পরিবর্তন হয়নি। বাপ আর ছেলের মধ্যে সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। শুধু দু'জনেই এইটুকু চায় যেন বড় রকমের কোন অভাব তাদের কাউকে না বোধ করতে হয়। বাড়িতে সংসার চালাবার লোক কেউ নেই। তাছাড়া বাড়িটাকে খুব ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। সেইজন্যে পল নটিংহামেই বাসা ক'রে চলে গেল। মোরেল বেষ্টউডে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আস্তানা গাড়ল।

পলের সব স্বপ্ন যেন চুরমার হয়ে গেছে। ছবি আঁকতে ইচ্ছে হয় না। মায়ের মৃত্যুর দিন যে ছবিটি এঁকেছিল, সেই তার শেষ ছবি। ছবিটি এঁকে তৃপ্তি হয়েছিল তার।···যখন কাজে যায় ক্লারার কথা মনেও পড়ে না। বাড়িতে এসে তুলি হাতে তুলে নিতেও বিরক্তি লাগে। জীবনে আর কিছুই তার রইল না।

কাজেই সারা দিন টো-টো করে ঘুরে বেড়ানোই এখন তার কাজ। মাঝে মাঝে মদের দোকানে যায়, পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে হৈ-চৈ করে। কিন্তু এতে তার শ্রান্তি আরও বাড়িয়ে দেয়। দোকানের পরিচারিকাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে, মেয়েদের দেখলেই গিয়ে যেচে কথা বলে, তবু তার কালো চোখে একটা তীব্র আলো, যেন কী একটা জিনিস সে অনবরত খুঁজে বেড়াচ্ছে!

চারি দিকের পৃথিবীই যেন বদলে গেছে। সব কিছু নিরর্থক বলে মনে হয়। কেন এই লোকগুলো রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে, কেন পথের দু'ধারে সারি সারি বাড়ি মাথা তুলে উঠেছে, কেন সারা জগৎটাই শূন্য, ফাঁকা হয়ে রইল না, এই সব বস্তুপুঞ্জ কার কি কাজে লাগছে, এই নিয়ে মাথা ঘামাতে তার ভাল লাগে। বন্ধুবান্ধব যারা আসে, তারা ওর সঙ্গে গল্পসল্প করে। পল শব্দগুলো শোনে, জবাবও দেয়। কিন্তু এই আওয়াজগুলো কোন দিন যদি না থাকত তা'হলে কার কী ক্ষতি হ'ত পল ভেবে পায় না।

নিজেকে সে ফিরে পায়; হয় যখন একা থাকে নয়ত যখন কারখানার কাজের মধ্যে একেবারে ডুবে যায়। কারখানায় নিজের কথা ভুলে যেতে হয়, চৈতন্যের এক বিন্দুও তার অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু এই বিস্মৃতি স্থায়ী হবার নয়। দেখে তার দুঃখ লাগে, চার পাশের সব জিনিস যেন অস্পষ্ট ধোঁয়ার মত হয়ে উঠেছে। প্রথম যেদিন শিশির পড়তে আরম্ভ করল পল দেখল ধূসর কুয়াসার বুকে মুক্তার মত বিন্দু-বিন্দু শিশিরকণা। এক সময়ে এই দৃশ্যে তার বুক দুলে উঠতে চাইত। কিন্তু আজ এদের অর্থও তার কাছে হারিয়ে গেছে। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই শিশিরবিন্দুগুলি শুকিয়ে যাবে, তাদের জায়গায় জেগে থাকবে শুধু চিরন্তন শূন্যতা।···বড় বড় ট্রামগাড়িগুলো অনবরত যাওয়া-আসা করছে—রাত্রের বেলা আলোয়-আলোয় ঝলমল। পল ভাবতে থাকে, আশ্চর্য্য! কেন এরা একবার আসছে একবার যাচ্ছে? কী দরকার এদের যাওয়া-আসার? এগুলো না থাকলেই বা কী হ'ত, আর থেকেই বা কী হচ্ছে!

শুধু রাত্রির গাঢ় অন্ধকারটিকেই পল সত্য ব'লে অনুভব করতে পারে। এ যেন সব কিছু ব্যেপে দিগন্ত জুড়ে এসে দাঁড়ায়, এর বুকে কী সুগভীর শান্তি! এর হাতে আপনাকে তুলে দেওয়া কিছু কঠিন নয়, এই সব চেয়ে কঠিন পথ। হঠাৎ এক টুকরো কাগজ তার পায়ের কাছে উড়ে আসে, আবার বাতাসে উড়ে চলে যায়। পল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তার মুঠি আপনা থেকেই পাকিয়ে ওঠে, তীব্র বেদনার দাহনে আপাদমস্তক জ্বলতে থাকে। চোখে ভেসে ওঠে সেই পরিচিত ঘরটি, তার মায়ের ছবি, সেই দু'টি নীল চোখ। নিজের অজ্ঞাতেই কখন যে সে মায়ের কথা ভাবতে শুরু করেছিল। এই কাগজের টুকরোটি তার সুখস্বপ্ন ভেঙে দিয়ে মনে করিয়ে দিল, মা আর নেই। কিন্তু এই ত' সে মায়ের সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত কাটিয়ে এল। কোন মায়ামন্ত্র বলে মুহূর্তগুলোকে কি ধরে রাখা যায় না? মনে মনে চাইতে লাগল সময়ের স্রোত যেন রুদ্ধ হয়ে যায়, যেন মায়ের সঙ্গ ফিরে পাওয়া আবার তার ভাগ্যে ঘটে।

দিন কেটে যেতে থাকে। সপ্তাহগুলো গড়িয়ে চলে। সব কিছু যেন দুঃখের আগুনে পুড়ে একাকার হয়ে গেছে, তাদের স্বতন্ত্র সত্তা বলে কিছু নেই। একটি দিন অবিকল আর একটি দিনের মত। একটি সপ্তাহ ঠিক আর একটি সপ্তাহের মত। একটি জায়গার সঙ্গে অন্য একটি জায়গার কী তফাৎ তাও আর তার চেতনায় ধরা পড়ে না। একটা ছবি যেন লেপে-পুঁছে একাকার হয়ে গেছে, কোন একটি রেখাকে আলাদা করে ধরা অসম্ভব! মাঝে মাঝে একসঙ্গে অনেকক্ষণ অবধি তার চেতনা লুপ্ত হয়ে থাকে, তখন কি ক'রে যে কাটিয়েছে তাও তার মনে থাকে না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা পল বাসায় ফিরে এলো একটু দেরি করে! ঘরের আগুন অল্প-অল্প জ্বলছে; অন্য সবাই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছে। পল আরও কিছু কয়লা আগুনে চাপিয়ে টেবিলের দিকে একবার চেয়ে স্থির করল, রাত্রে আর খাবার-দাবার দরকার নেই। তার পর বসল এসে হাতলওয়ালা চেয়ারটাতে। চারি দিক নিস্তব্ধ। পলের চেতনাও অবলুপ্ত-প্রায়। তবু তার মধ্যে দেখল চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। একটু পরে দুটি ইঁদুর বেরিয়ে এসে রুটির টুকরোগুলো নিয়ে কামড়াকামড়ি শুরু করল। পল সব কিছু দেখছে, দেখেও সে যেন এ রাজ্যে নেই, সে যেন বহু দূরে। ক্রমে গির্জের ঘড়িতে দুটো বাজল। অনেক দূরে খট্-খটা-খট্ আওয়াজ ক'রে একটা রেলগাড়ি চলে গেল। গাড়িগুলো গেল অবশ্য খুব দূর দিয়ে নয়—বরাবর যে পথ দিয়ে যায় সেই পথেই গেল। কিন্তু পল নিজেই যে আজ বহু দূরে?

রাত বাড়তে লাগল। ইঁদুর দুটো স্বচ্ছন্দে তার চটি-জোড়ার উপর দিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে। পলের ভ্রূক্ষেপও নেই। হাত তুলে ইঁদুরগুলোকে তাড়াবে, সেটুকু ক্ষমতাও যেন নেই তার। সে যে কিছু ভাবছিল তাও নয়। তবু এমনি ভাবে থেকেই যেন একটু স্বস্তি বোধ করছিল। কোন কিছু জানতে হলে, বুঝতে হলে, তার অনেক অসুবিধা। এরই মধ্যে থেকে থেকে আর একটা চিন্তা মনের দোরে এসে হানা দিচ্ছিল, আর এক একবার বিড়-বিড় করে সে ব'কে উঠছিল, 'এ কি! এ আমি বকছি কী?'

তার পরে সেই আধ-ঘুমন্ত অবস্থার মধ্যেই উত্তর আসছিল, 'নিজকে তিলে তিলে হত্যা করছ তুমি।' [আগামী বারে শেষ হবে।

অনুবাদক—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য

বিজ্ঞান বার্তা

পক্ষধর মিশ্র

ভারতবর্ষে প্রথম পরমাণু-চুল্লী নির্ম্মাণ করার সংবাদ পত্রিকা মারফৎ আপনাদের নিশ্চয়ই দৃষ্টিগোচর হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে সামান্য কিছু সংবাদ পরিবেশন করছি।

গ্রেট ব্রিটেনের পরমাণু শক্তি বিষয়ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষ ভাবে প্রস্তুত ইউরেনিয়াম—২৩৫এ তে সমৃদ্ধ ধাতু, এই পরমাণু-চুল্লীতে ব্যবহার করা হয়। এই ইউরেনিয়াম ধাতু অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে মিশ্রিত করে প্রস্তুত করা হয় একটি বিশেষ ধরণের মিশ্র ধাতু। ঐ মিশ্র ধাতুর (এক সেণ্টিমিটারের গড়ে প্রায় এক-পঞ্চমাংশ চওড়া) নির্ম্মিত পাত, কার্ব্বণ কাঠামোয় বসিয়ে সবশুদ্ধ ডুবিয়ে দেওয়া হয় জলে। জলের এখানে দু'টি কাজ,—পরমাণু-চুল্লীর প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ এবং বিচ্ছুরিত নিউট্রন ও গামা রশ্মির হাত থেকে কর্ম্মরত বিজ্ঞানীদের রক্ষা করা। এই পরমাণু-চুল্লীকে কার্য্যকরী করার জন্য ৩ কিলোগ্রামের সামান্য কিছু বেশী ইউরেনিয়াম—২৩৫ প্রয়োজন হয়। যে ইউরেনিয়াম এতে ব্যবহার করা হয় তাতে শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ ইউরেনিয়ামে ২৩৫ থাকে। এই পরমাণু-চুল্লী চালানোর শক্তির উপরই নির্ভর করবে, পরমাণু জ্বালানীর উপর জলের উচ্চতা কতোখানি রাখতে হবে। ঠাণ্ডা রাখার জন্য সর্ব্বদাই জলের সঞ্চালন প্রয়োজন। পরমাণু-চুল্লীর জ্বালানী, জলের মধ্যে ডোবান থাকে বলে এই চুল্লীকে 'সুইমিং পুল' শ্রেণীর চুল্লী বলে। সুইমিং পুল শ্রেণীর চুল্লীর বিশেষ সুবিধে এই যে, শতকরা ২ ভাগ বেশী তেজস্ক্রিয়তার সঙ্গে একে যদি ফেলে রাখা হয় তাহলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। বেশী শক্তি সঞ্চারিত হলেই জল তাড়াতাড়ি গরম হয়ে চুল্লীর জ্বালানীর প্লেটের গায়ে বাষ্প সৃষ্টি করে সমস্ত প্রক্রিয়াকেই মন্দীভূত করে দেয়, জল ফোটার সঙ্গেই তেজবিচ্ছুরণকারী প্রক্রিয়াও যায় বন্ধ হয়ে।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম কার্য্যকরী পরমাণু-চুল্লী নির্ম্মাণ, আমাদের জাতির অগ্রগতির ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। পরমাণু-চুল্লীটি নির্ম্মাণ করতে খরচ পড়েছে ২৫ থেকে ৩০ লাখ টাকার মধ্যে। ভারতীয় পরমাণু-বিজ্ঞানীদের প্রথম সাফল্যে

বহু দিন ধরেই বিজ্ঞানীরা সূর্য্যশক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। পরীক্ষার ফলাফল নানা দিক দিয়ে আশার সঞ্চার করলেও নিয়মিত ভাবে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করার মতো সৌরশক্তি সংগ্রহের কোন কেন্দ্র আজ পর্য্যন্ত স্থাপিত হয় নি। সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ যে, আর্ম্মেনিয়ার আরারাট সমতলভূমিতে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম সৌরবিদ্যুৎ শক্তির সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এই স্থানে পতিত সৌররশ্মির প্রাচুর্য্য এবং প্রখরতা সোভিয়েট অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হওয়ার জন্য, বিজ্ঞানীরা এই স্থানটিকেই পছন্দ করেছেন। সৌরবিদ্যুৎ শক্তির কেন্দ্রটি হবে বৃত্তাকার, এই বৃত্তের ব্যাস প্রায় ১৪০০ গজ। সূর্য্যরশ্মি সংগ্রহকারী আয়নাতে যাতে ধূলাবালি না পড়ে তাই সমস্ত অঞ্চলটি গাছপালা দিয়ে ঢাকা থাকবে। অঞ্চলটির কেন্দ্রে অবস্থিত প্রায় ১৩০ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভ বাষ্পীয় বয়লারের সাহায্যে ঘোরান হবে। বাষ্পীয় বয়লারের জন্য প্রয়োজনীয় বাষ্প সূর্য্যরশ্মির দ্বারাই গরম করা হবে। প্রতি ঘণ্টায় বাষ্প প্রস্তুত হবে প্রায় ১১ টন এবং এর চাপ হবে ৩০ অ্যাটমসফিয়ারের কাছাকাছি। বাষ্প প্রস্তুত হওয়ার পর পাইপের সাহায্যে যাত্রা করবে ১২০০ কিলোওয়াটের একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের টারবাইনের দিকে।

* * * *

এই সৌরবিদ্যুৎ শক্তির কেন্দ্রে কার্য্যকরী আয়োজন কি হবে, তার সামান্য পরিচয় এখানে দিচ্ছি। স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে প্রায় ২৩টা গোলাকার রেলপথ থাকবে এবং তাতে স্বয়ংক্রিয় ট্রেনসমূহ বহন করবে প্রায় ১২১৩ খানা বড় আয়না। সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার আলো পড়বে এসে ফটোসেলের উপর, ফটোসেল স্বয়ংক্রিয় ট্রেনের সুইচ দেবে টেনে এবং তৎক্ষণাৎ গাড়ীগুলি চলতে আরম্ভ করবে। চলন্ত গাড়ীর মধ্যে আয়নাগুলি সর্ব্বদাই সূর্য্যের দিকে মুখ করে থাকবে এবং তাদের সকলের প্রতিফলিত কেন্দ্রীভূত আলো পড়বে তলাকার ঐ বাষ্পীয় বয়লারের উপর। সমস্ত আয়নাগুলিতে মোট ২ লক্ষ ১৫ হাজার স্কোয়ার ফুট স্থানের সূর্য্যালোক কেন্দ্রীভূত হবে। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে, কেবলমাত্র পরীক্ষামূলক ভাবে দেখবার জন্যই নয়, কৃষিশিল্পে ব্যবহারের জন্য সৌরবিদ্যুৎএর এই কেন্দ্রটি নির্ম্মাণ করা হচ্ছে। এই শক্তি দিয়ে নীচু জমির মাটির তলাকার জল কৃষিক্ষেত্রে সেচন করা হবে। বিজ্ঞানীরা আশা করেন, জলসেচনের ফলে ঐ অঞ্চলের প্রায় ১০ হাজার একর জমিকে কৃষিযোগ্য করা সম্ভব হবে। সমস্ত পরিকল্পনাটি রচনা করেছেন সোভিয়েট দেশের অ্যাকাডমি অফ সায়ান্সেস-এর পাওয়ার ইনজিনিয়ারিং ইনসটিটিউট,—তাঁরা আশা করেন, এই বিদ্যুৎ শক্তি সাধারণ নাগরিকদের বাস করার জন্য সুখকর পরিবেশ রচনায়ও সহায়তা করবে।

* * * *

গভীর সমুদ্রে স্রোতের গতিবেগ নির্দ্দিষ্ট ভাবে নির্ণয় করা এক কঠিন সমস্যা। সম্প্রতি ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অফ ওসানোগ্রাফির বিজ্ঞানী ডাঃ জে, সি, সোয়ালো সর্ব্বপ্রথম গভীর সমুদ্রে নির্দ্দিষ্ট ভাবে স্রোতের গতিবেগ নির্দ্ধারণকল্পে এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন বলে জানা গিয়াছে। একটি বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত কারেণ্ট মিটার নির্দ্দিষ্ট উপায়ে জলমধ্যে সংস্থাপনের সাহায্যে গভীর সমুদ্রে স্রোতের গতিবেগ নির্দ্ধারণ করা হয়।

পরমাণুকে কি আপনি দেখতে চান? এত দিন যন্ত্রের দ্বারা বড় আকারের পরমাণুর ঝাপসা ছবি তোলা যেত, কিন্তু এখন সব পরমাণুই পরিষ্কার ভাবে দেখা যাবে। পেন্সিলভানিয়া ষ্টেট্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক আরউইন মুলার, পদার্থের কাঠামোর মধ্যে পরমাণুর সংস্থাপন পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্য একটি নূতন শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ নির্ম্মাণ করেছেন। যন্ত্রটি সম্পূর্ণ ভাবে কাচ দ্বারা প্রস্তুত এবং এ প্রতি সেণ্টিমিটারে ৫০ লক্ষ ভোল্ট ফিল্ড ষ্ট্রেংথ এ-তে কাজ করে। দুটো থারমস্ বোতল, একটার মধ্যে অপরটিকে রাখলে যেমন দেখায়, শক্তিশালী যন্ত্রটি ঠিক সেই রকম দেখতে। নিম্ন উত্তাপে কাজ করবার জন্য এই মাইক্রোসকোপে তরল বাতাস সরবরাহ করার ব্যবস্থাও আছে। বাতাস-শূন্য স্থানে থাকে একটি টাঙ্গষ্টেন তার, এবং যে বস্তুটির পরমাণুর সংস্থাপন পর্য্যবেক্ষণ করা হবে তা অবস্থান করে ঐ তারটির ডগায়। ডগাটির উপরিভাগের ছায়া গিয়ে পরে একটি উদ্ভাবী পর্দায়। হিলিয়ামের সহায়তায় ঐ উদ্ভাবী পর্দার উপর বস্তুটির পরমাণু কাঠামোর ছায়ার সৃষ্টি ঘটে।

ফ্রেডারিক সডি

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্রেডারিক সডি, ৭৯ বছর বয়সে গত ২১শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডে ব্রাইটনের হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা এই চিরস্মরণীয় বিজ্ঞানীর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করছি।

বিজ্ঞানী সডি, ১৮৭৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বর, সাসেক্সের ইষ্টবার্ণে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়েছিল সাসেক্স, ওয়েলস এবং সর্ব্বশেষে অক্সফোর্ডের শিক্ষায়তনগুলিতে। ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে ফ্রেডারিক সডি, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে ডেমনষ্ট্রেটরের পদ গ্রহণ করেন।

ম্যাকগিল এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পরই সডির বিজ্ঞান গবেষণার জীবনে এক বিরাট পরিবর্ত্তন এলো, এইখানেই তিনি পৃথিবী-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ডের সহকর্ম্মী হবার সুযোগ পেলেন। বেকরেল এবং মাদাম কুরির আবিষ্কৃত তেজস্ক্রিয়তা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমূহ তখন বিজ্ঞান-জগতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, পরমাণুর অখণ্ডতার বিষয়ে সকলের মনে জেগেছে প্রশ্ন,—রাদারফোর্ড ও সডি এক যোগে এই নবাবিষ্কৃত বিষয়ের গবেষণায় মনোযোগ দিলেন। উভয়ের যুগ্ম প্রচেষ্টায় বর্ত্তমান পরমাণু যুগের সেই অতি শৈশবে প্রমাণিত হলো যে, তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমূহ সর্ব্বদাই আলফা রশ্মি, বিটারশ্মি প্রভৃতি বিচ্ছুরণ করে ভেঙ্গে যাচ্ছে।

এর পরই বিজ্ঞানী সডির নাম সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লো। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি রাদারফোর্ডের সঙ্গ পরিত্যাগ করে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বনামধন্য বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম র‍্যামজের সঙ্গে গবেষণা করবার জন্য লণ্ডন চলে আসেন। এইখানেই তিনি পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা থেকে হিলিয়াম পরমাণু আবিষ্কার করেন যার ফলে জানা যায় যে আলফা কণা এবং হিলিয়াম পরমাণু অভিন্ন বস্তু।

লণ্ডনে আসার পর সডির সঙ্গে তেজস্ক্রিয়তার বিষয়ে একটি পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের সামান্য মনোমালিন্য হয়। যাই হোক, পরে রাদারফোর্ডের বই প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত সডি তাঁর বই প্রকাশ করেন নি।

মৌলিক পদার্থগুলির পরমাণুর ওজন বিচার এবং গুণাগুণ সমূহের সমব্যবহার বিবেচনা করে তাদের সকলকে একটি বিশেষ নক্সায় সাজান হয়েছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহের আবিষ্কারের কিছু দিন পরে দেখা গেল, ঐ নক্সার মধ্যে এদের সাজাবার কোন স্থান নেই। উপরন্তু মৌলিক পদার্থ সমূহের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের সমব্যবহার হওয়ার জন্য তাদের পৃথক করাও সম্ভব নয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানী সডি 'আইসোটোপের মতবাদ' সৃষ্টি করলেন। পরমাণু কেন্দ্রে একই শক্তি সমন্বিত পদার্থগুলির পরমাণু কেন্দ্রের পর পৃথক হওয়া সত্ত্বেও ঐ নক্সা অথবা পিরিওডিক টেবল্ এর মধ্যে একই স্থানে বসান হলো। এই অসাধারণ কাজের জন্য বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক সডি ১৯২১ সালে রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ইতিমধ্যে ১৯০৪ সালে এবং ১৯১৩ সালে ফ্রেডারিক সডি যথাক্রমে গ্লাসগো এবং এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অজৈব এবং পদার্থ-রসায়নের লী-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত ঐ পদ তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন। বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক সডি, বিজ্ঞান শিক্ষার ও বিজ্ঞান চেতনার প্রসারেও খুব উৎসাহী ছিলেন। এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা কালীন তিনি তাঁর বক্তৃতাবলী সংকলন করে 'বিজ্ঞান ও জীবন' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। ব্রাইটনের উপকণ্ঠে এই বিজ্ঞানীর শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত নির্ব্বিবাদী এবং শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

কোন এক ছেঁড়া ডায়রির ক'টি পাতা

উমা মিত্র

"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী"

খোলা জানলার দখিণ হাওয়ার পরশের সঙ্গে বেতারে ভেসে আসা এই রবীন্দ্র-সঙ্গীতটির যেন অদ্ভুত মিল আছে। গানটি শুনতে শুনতে সত্যিই মন ভেসে চলে যায় কোন সুদূরে। কোন অজানা সুদূর যেন হাতছানি দেয় মনের গভীর কন্দরে। আজ আমার মনে এ কিসের ছোঁয়াচ লেগেছে? এ কি স্বপ্ন! না সত্য? এ কি আনন্দ, না দুঃখ? একি অদ্ভুত অনুভূতি আমার মনে-প্রাণে এক সাড়া জাগিয়ে তুলেছে? এক অপূর্ব রোমাঞ্চকর পরিবেশের সৃষ্টি করছে? এক নতুন প্রাণের আলোড়ন আনছে আমার অন্তরের গভীর তলদেশে!

আজকের দিন আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছে আমার জীবনের আর একটি স্মরণীয় দিনের কথা। সেদিনের সেই রোমাঞ্চকর পরিবেশ আগে কখনও ঘটেনি আমার জীবনে, পরেও কোন দিন ঘটবে কি না সন্দেহ! সেই রোমাঞ্চকর পরিবেশের মধ্যে ছিল কোন্ এক অসীম সুদূরের আকুল করা আহ্বান। যে বস্তু কোন দিন চোখে দেখিনি কিম্বা পরেও কোন দিন দেখব না, কিন্তু যার স্মৃতি প্রতিটি মর্মর প্রস্তরে জড়িত, সেই বস্তু অনুভব করার মধ্যে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ আছে যেন। সেই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রতিটি অনু-পরমাণু এক অপূর্ব প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে ওঠে। তাই আজ যে রোমাঞ্চকর পরিবেশের বর্ণনা করতে চলেছি সেই মর্মর প্রস্তরে অতীত সুদূরের স্মৃতি জড়িত নালন্দা আমার মনে-প্রাণে জাগিয়ে দিয়েছে নতুন প্রাণের আলোড়ন!

ইতিহাসের ছাত্রী আমি, শুধু তাই না, অতীত ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণ আমার বংশের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে যাবার আগে ইতিহাসের মণিকোঠায় ভাল ভাবে ঘা মারার পর থেকেই এক প্রবল আকর্ষণ ছিল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলো ঘুরে দেখে উপলব্ধি করব। দেখব সেই সব জায়গা যেখানে দেশের কত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি একবার থেকে গেছেন—আজ যাঁরা কালের কপোলতলে বিলীন হয়ে গেছেন, তাঁদের সেই সব বাসস্থানের সঙ্গে আজকের এই দিনের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় কি না।

আমার অনেক দিনের স্বপ্ন বিধাতা পুরুষ এক দিন সত্যে পরিণত করলেন। সত্যিই একদিন পাড়ি জমালাম অতীত ইতিহাসের স্মৃতি-বিজড়িত স্থান নালন্দার উদ্দেশ্যে। নিজেদের বাড়ীর গাড়ী করেই যাত্রা করেছিলাম তখন, যখন সূর্য্যদেব ভাল ভাবে পৃথিবী দেবীর কাছে নিজেকে প্রকাশিত করেন নি। আমাদের গন্তব্য স্থানের কাছে গাড়ী যতই এগিয়ে যেতে লাগল মন ততই পিছিয়ে পড়তে লাগল। অতীতে সুদূর অতীতে এ পথ দিয়ে আগেও কত বার যাওয়া-আসা করেছি কিন্তু আজ কেবলই মনে হোতে লাগল, শুধু আমি নয়, কত হাজার দু'হাজার বছর আগেও হয়ত কত ছাত্র এইখান দিয়ে তাদের শিক্ষার স্থান নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করবার জন্যে দলে দলে চলে গিয়েছিল।

গাড়ী যখন গন্তব্য স্থানে গিয়ে থামল, তখন আমার মন চলে গেছে ইতিহাসের শেষ করে আসা পাতাগুলোর মধ্যে। যার ওপর লেখা আছে নালন্দার পুরান ইতিহাস, যার ওপর লেখা আছে নালন্দা ছিল একটি বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে আমাদেরই মতন ছাত্রেরা কত ধরণের শিক্ষা লাভ করেছে।

ধীরে ধীরে টিকিট করে ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। আমাদের মতন আরো অনেক দর্শকেরই ভীড় জমেছিল সেদিন। ভেতরে প্রবেশ করতেই দু'টি বস্তুর তফাৎ চোখ এড়াল না। একটি হচ্ছে হাজার বছর আগেকার মানুষদের হাতের কারসাজি, আর এক হচ্ছে হাজার বছর পরের মানুষদের নিজেদের পুরাণ স্মৃতি বজায় রাখার এক প্রাণবন্ত চেষ্টা আর অতীতের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে ধরিত্রীর কোল থেকে টেনে তোলার এক আকুল প্রয়াস! মানুষের জীবনে কৌতূহলের অন্ত নেই। মানুষ জানতে চায় মানুষের কথা। দেবতা বা অতিমানবের অলৌকিক কাহিনী শুনে এই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না। মানুষ জানতে চায় তাদেরই মতন যারা একদিন পৃথিবীর কোলে বাস করে, কালের কপোলতলে মিলিয়ে গেছে, সেই সব মানুষের মর্মকথা। সেই জন্যেই ত পুরান ফেলে-আসা দিনের ফেলে-আসা মানুষের মর্মকথা জানবার প্রয়াসেই নালন্দাকে পৃথিবীর কোল থেকে তুলে আনার চেষ্টা চলছে। আমাদের দেশের পক্ষে সব চেয়ে লজ্জার বিষয় হচ্ছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপকে লোকচক্ষুর সামনে যিনি প্রথম তুলে ধরেন তিনি ভারতবাসী নন্। অর্থাভাবে যদিও খননকার্য্য বন্ধ রয়েছে তবু যতটুকু মাত্র খনন করা হয়েছে ততটুকু দেখতে কিছুক্ষণ সময়ের প্রয়োজন হয়।

ধ্বংসাবশেষ দেখতে দেখতে ক্রমশ এগিয়ে চললাম। ছাত্রদের পড়বার সুব্যবস্থা আজও বিদ্যমান রয়েছে। চারি দিকে ছাত্রদের পড়াবার ঘর—একই মাপের আর একই ধাঁচের তৈরী। তখনকার দিনেও রৌদ্রতপ্ত ইটের সাহায্যে ভিত্তিটাকে খুব দৃঢ় করা হয়েছে। প্রতিটি ছাত্রের ঘরে একটি করে কুলুঙ্গি আর দেওয়ালের গায়ে পুঁথি রাখবার সুব্যবস্থা। অধ্যাপকের থাকবার ঘরগুলি অপেক্ষাকৃত বড়। বিরাট বিরাট রান্নাঘরের চার পাশে ঘরগুলি সার বেঁধে তৈরী করা হয়েছে। রান্নাঘরের উনুনগুলোতে পোড়া দাগ এখনও মিলিয়ে যায় নি। তারা যে আমাদেরই মতন রক্তমাংসের মানুষ ছিল, উনুনের কালির দাগগুলো যেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ বিরাজমান। চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল সৌম্য, শান্ত গেরুয়াধারী

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের চেহারা। তারা তাঁদের এই নির্জন স্থানের পবিত্র বিদ্যালয়টিকে আরো পবিত্র এবং সুন্দর করে রেখেছেন গম্ভীর সংস্কৃত শ্লোকের উচ্চারণে। দিনের কাজ আরম্ভ করার আগে তাঁরা প্রবেশ করছেন তাঁদের গুরুদেব গৌতম বুদ্ধের মন্দিরে। বুদ্ধদেবের মন্দিরটি অপূর্ব কারুকার্য্যে খচিত। দেওয়ালের গায়ে সুন্দর খোদাই করা মূর্ত্তিগুলি হাজার বছর আগেকার শিল্পের এক নিদর্শনস্বরূপ এখনও বিদ্যমান।

এখানে আর একটি বিষয় চোখে পড়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টির তিনটি স্তর। প্রতি বার নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী হবার পর, মুসলমানদের ভেঙ্গে ফেলার জন্যেই হোক, কিম্বা বিহারের ভূমিকম্পের জন্যে ভেঙ্গে যাবার ফলেই হোক, এক একবার নালন্দা যখন ধ্বংসে পরিণত হয়েছে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাঁদের শিক্ষা বিস্তারের সুপ্রসিদ্ধ ভূমিকে থেমে থাকতে দিতে চান্ নি। আবার তাঁরা সেই ধ্বংসস্তূপকে ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন তাঁদের শিক্ষা বিস্তারের কেন্দ্রকে। আবার হয়ত তাঁরা বাধা পেয়েছেন, আবার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু বাধা পেয়ে থামবার জন্যে ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করেন নি, বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে এগিয়ে যাবার জন্যেই তার সৃষ্টি, কাজেই আবার পুরান ধ্বংসের উপর ভিত্তি করেই আবার গড়ে তোলা হোল শিক্ষা-কেন্দ্রকে। প্রতিবার একই ধাঁচে তৈরী করলেন তাঁরা তিনটি স্তর। কোন কোন জায়গায় পাঁচটা স্তরও দেখতে পাওয়া যায়! সবশুদ্ধ নাকি সাত বার তৈরী করা হয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে যে স্থানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল—যে স্থান ছাত্রদের কলধ্বনিতে মুখরিত থাকত সদাসর্ব্বদা, যে স্থানে দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্রেরা আসত ভারতবর্ষের তত্ত্বকথা, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র আলোচনা করতে, যে স্থানে সদাসর্ব্বদা এক সৌম্য পবিবেশের সৃষ্টি হোত সেখানে আজ কিছুই অবশিষ্ট নেই—কিন্তু সেখানকার প্রতিটি ইট, পাথর নিশ্চুপভাবে বহন করে আসছে হাজার বছরের ধূলায় জীর্ণ হওয়া ইতিহাসকে। ধ্বংস-স্তূপের ইট-পাথরগুলি পর্য্যন্ত যেন বহন করে আনছে হাজার বছর আগেকার সৌম্য, শান্ত, গম্ভীর পরিবেশটিকে। যারা চলে গেছে এখানে এলে তাদের দেখা মিলবে না ঠিক, কিন্তু এখানে এলে বিগত দিনের পারিবেশকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারা যাবে। মনে হবে এদেরও একদিন প্রাণ ছিল—এখানেও একদিন নানা জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতরা এসে আলোচনা করতেন তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি। সুদূর চীন থেকে হুউয়েন সান

একদিন এখানে এসেছিলেন শিক্ষালাভ করতে। সেদিন নালন্দার ধ্বংসস্তূপের কাছে কতক্ষণ ছিলাম তার ঘড়ি ধরে নির্দ্দেশ করি নি, আর সেই ভাবে সময় নির্দ্দেশ করবার মতন মনের অবস্থাও আমাদের ছিল না। শুধু জোর করে এইটুকুই বলতে পারি, যতক্ষণ ছিলাম এক অপূর্ব্ব, রোমাঞ্চকর, মধুর আনন্দদায়ক ভাবের আবেশে তলিয়ে গিয়েছিলাম। এরকম দিন আর জীবনে কোন দিন আসবে কি না জানি না, যদি আসে তবে মনে করব আমার নালন্দা দেখার দিনটিকে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে স্বাবলম্বিনী নারী

রেখা বসু

'পিতা রক্ষতি কৌমারে
ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে
পুত্রাঃ রক্ষন্তি স্থবিরে
ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।'

সৌভাগ্যের বিষয়, 'মনুসংহিতা'র এ উপদেশ আজকাল আর মানা হয় না। বাধা-নিষেধের সমস্ত আগল খুলে ফেলে আজ আমাদের মেয়েরা কর্ম্মজীবনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে,—আজ তারা মুক্ত, স্বাবলম্বিনী। সারা জীবন পুরুষের ঘাড়ে ভর দিয়ে জীবন-যাপনের প্রতি এই যে ঘৃণা, স্বার্থপর পুরুষদের নির্লজ্জ চোখ-রাঙানিকে তুচ্ছ ক'রে, কঠোরতম কাজকে সবলে আঁকড়ে ধরার এই যে উন্মাদনা— এ' আজকের নয়। এর মূল রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতায় আর বৈদিক যুগে। তখন থেকেই মেয়েরা নানা রকম কাজ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে। হয়ত ওদের আগেই চলেছে— অজ্ঞ উপার্জ্জনক্ষমহীন বিরাট সংসার!

মাটি খুঁড়ে মহেঞ্জোদারোতে যে বিরাট সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে, পণ্ডিতদের মতে তা' আনুমানিক খৃঃ-পূঃ চার হাজার বৎসর আগের। এখানে ভগ্নস্তূপের মধ্যে পাওয়া গেছে, ব্রোঞ্জের তৈরী একটি নগ্ন নর্ত্তনশীলা নারীমূর্ত্তি। নাচ যে তখন অনেক মেয়ের পেশা ছিল, এ থেকে তা অনুমান করা বোধ হয় খুব অসঙ্গত হ'বে না। কারণ নটী-সম্প্রদায়ের কারুর না হলে এ রকম মূর্ত্তি নিশ্চয়ই সে যুগে নির্মাই হ'ত।

ঋগ্বেদের যুগেও নারীকর্ম্মী ছিল অজস্র। এরা অধিকাংশই ছিল বয়নশিল্পে পারদর্শিনী। এদের প্রধান কাজ ছিল, নানা রকম সেলাইয়ের কাজ, মাদুর প্রস্তুত প্রভৃতি। এর পরবর্ত্তী যুগেও (Later Vedic Civilization) মেয়েরা সূচীশিল্প রঙের কাজ ইত্যাদিতে নিযুক্ত থাকত। উপনিষদের যুগে 'উপাধ্যায়া' প্রভৃতি শব্দের সাথেও সাক্ষাৎ ঘটে আমাদের। সুতরাং শিক্ষিকারাও সে যুগে ছিলেন এর মস্ত প্রমাণ এগুলো। এ ছাড়া বৈদিক যুগে শিক্ষিকারা নাচ-গানও শেখাতেন, এর প্রমাণও আছে।

বৌদ্ধযুগেও পুরুষদের পাশে থেকে হাটে-বাটে-মাঠে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেছেন ভিক্ষুণীরা। অবশ্য এর জন্যে বেতন নেননি তাঁরা। মেয়ে-চাষীদের অস্তিত্বও ছিল এ সময়। এরা নিজেরাই, ধান বুনত, কাটত এবং রোদে শুকিয়ে নিত। আবার কেউ কেউ তত্ত্বাবধান করত তুলার ক্ষেতের। তুলা থেকে সুতো প্রস্তুতও ওরাই করত। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে শ্মশান রক্ষার ভারও থাকত মেয়েদের ওপর।

'ধম্ম পদটীকায়' একটি মেয়ে যাদুকরের উল্লেখ আছে। সে নাকি, তার অজস্র সহচরীসহ লোমহর্ষক খেলা দেখাত। দণ্ড বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে শূন্যে তুলে দিত পা দু'টো। আবার দণ্ডটির অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে নিজেকে আশ্চর্য্য ভাবে সামলে নাচ-গান করত। এরকম খেলা দেখিয়ে মেয়েটি রোজগার করত অজস্র।

ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা না থাকলে পতিতাবৃত্তিই বেছে নিতে হ'ত মেয়েদের।

পাণিনিও (খৃঃ-পূঃ ৫ম বা ৭ম শতাব্দী?) ওঁর ব্যাকরণে এমন কতকগুলো কথার উল্লেখ করেছেন যা থেকে নারী কর্ম্মীদেরও সন্ধান পেতে পারি আমরা। ওঁর ব্যবহৃত 'শাক্তীকী' কথার অর্থ— বর্শাধারিণী। মনে হয় সে যুগে বা তারও আগে মেয়েরা রাজার দেহ-রক্ষার কাজে নিযুক্তা থাকত। 'নর্ত্তকী' কথাটা তখন বোঝানো হ'ত নটী বা এ্যাকট্রেসকে (Actress.) 'তারিকা' বোঝাত পরিচারিকাদের। 'উপাধ্যায়রাও ছিলেন তখন। গরু চরিয়েও হয়ত জীবিকা নির্ব্বাহ হ'ত অনেকের। এদের বলা হ'ত 'গাবংপতি'। 'জীবিকা প্রাপ্তা' বা 'প্রাপ্তজীবিকা' কথা দু'টি দিচ্ছে নারী কর্ম্মীদের দিকে স্পষ্ট ইংগিত।

মৌর্য্যযুগে নারীকর্ম্মীর ছড়াছড়ি। রাজার দেহরক্ষার ভার সে নারীদের ওপর থাকত—এ' কথা মেগাস্থিনিস বলে গেছেন তাঁর "Ta Indika" নামক পুস্তকে। রাজা শিকারে বেরুলেও ওরা ঘিরে রাখত ওঁকে। রথ, হাতী, ঘোড়া এই তিনটিই বাহন ছিল ওদের। এ' ছাড়া সৈন্য বাহিনীতেও মেয়েরা যোগ দিত— এ' কথাও বলে গেছেন মেগাস্থিনিস। তবে মৌর্য্য যুগের কথা এ নয়। মৌর্য্য ভারতের কিংবদন্তী ছিল এটি। অনেক কাল আগে Dionysos নামে এক বিদেশী রাজা ভারত জয় করে ভারত থেকেই কিছু সংখ্যক নারীসৈন্য সংগে করে নিয়েছিলেন। সৈন্যদলের পুরোভাগে থাকত এরা। শত্রুসৈন্য মেয়েদের দেখে কৌতুক ভরে অনেকটা এগিয়ে আসত বোকার মত। এই ফাঁকে অন্যান্য সৈন্যরা ওদের ঘিরে ধরে নষ্ট করে ফেলত। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধক্ষেত্রেও মেয়েদের দান নেহাৎ কম ছিল না সে সময়ে। এ ছাড়া স্ত্রীশাসিত পাণ্ড্য (Pandoe) দেশেরও উল্লেখ করেছেন তিনি।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও নারীকর্ম্মীর উল্লেখ আছে। বিধবা স্ত্রী (অতএব অসহায়), অঙ্গবিকল স্ত্রী, অবিবাহিতা কন্যা, পতিতাদের ধাত্রী, বৃদ্ধা রাজপরিচারিকা ও দেবতার পূজাকার্য্য হ'তে নিবৃত্ত বা অযোগ্যা দেবদাসী (এ-ও এক ধরণের জীবিকা), দণ্ডিতা স্ত্রী প্রভৃতির দ্বারা মেষের লোম, কার্পাস তুলা শণ ও রেশম থেকে সুতো তৈরী করাতে রাজ কর্ম্মচারীদিগকে নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন কৌটিল্য। ওদের বেতন দেওয়া হ'বে কাজের গুণানুসারে। যাঁরা বাড়ীর বাইরে আসতে চান না অথচ কাজ করে খেতে চান, রাজকর্ম্মচারী দাসী দিয়ে তাঁদের বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন তুলা প্রভৃতি! বাড়ীতে বসেই সুতো তৈরী করবেন ওঁরা। প্রোষিতভর্ত্তৃকাদের জীবিকানির্ব্বাহের এ ছিল সেরা উপায়। এ ছাড়া গুপ্তচরের কাজও করত মেয়েরা। অসহায় বিধবা মেয়েরাই এ কাজ করত বেশী। অন্তঃপুরে রাণী এবং রাজপুত্রদের উপর কড়া পাহারা দেওয়া থেকে প্রত্যেক অমাত্য, সংঘমুখ্য এবং সাধারণ লোকের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের খুঁটিনাটি

বিবরণ পর্য্যন্ত এদের রাখতে হত। চোর-ডাকাত ধরবার কাজেও এদের সাহায্য নেওয়া হ'ত। শত্রুরাজার সেনাপতি প্রভৃতিকে ভুলিয়ে হত্যা করার কাজেও এদেরকে লাগানোর কথা কৌটিল্য বলেছেন। এ'ছাড়া দেব-দেবীর পট পয়সার বিনিময়ে লোককে দেখিয়েও জীবিকা নির্বাহ করত অনেকে। এদের বলা হ'ত 'কৌশিকস্ত্রী।' বোধ হয় এখনকার বেদেনীদের মত ছিল এরা। এ'ছাড়া নাচ গানও পেশা ছিল অনেকের।

মৌর্য্যযুগে পতিতাদের সংখ্যাও ছিল অজস্র। এমন কি, রাজা রাজদরবারে বেছে বেছে নিয়োগ করতেন ওদের। এর জন্যে মোটা বেতনও দেওয়া হ'ত ওদের। (এক হাজার থেকে তিন হাজার পণ পর্য্যন্ত)। গণিকারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকত। বৃদ্ধাদের পাঠিয়ে দেওয়া হত রাজার পাকশালায়। রঙ্গোপজীবিনীদের (Actresses) কথাও আছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। গণিকাদেরও পরিচারিকা ছিল। এদের বলা হত—রূপদাসী। ওদের কাজ ছিল ফুলের মালা তৈরী করা।

রাজার প্রহরীদের মধ্যে নারীরাও ছিল। ঘুম থেকে উঠলেই ওঁকে অভ্যর্থনা জানাত সশস্ত্র নারী-বাহিনী। এ ছাড়া আধুনিক যুগের নার্সের (Nurse) কাজও করত মেয়েরা। যুদ্ধক্ষেত্রে ডাক্তারদের সংগে আহত সৈনিকদের জন্যে ওরা নিয়ে যেত খাদ্য আর পানীয়। ক্লান্ত সৈন্যদের উৎসাহ দেওয়াও ছিল ওদের অন্যতম প্রধান কাজ।

'মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকেও নারী-কর্মীর কথা আছে। প্রথমতঃ 'এ্যাকট্রেস' (Actress) বোঝাতে গিয়ে 'নটী' কথাটি ব্যবহার করেছেন তিনি। রাজার সশস্ত্র দেহরক্ষিণীর কথাও আছে ওতে। দ্বিতীয় অংকের প্রারম্ভেই বিদূষক বলছে :

'বাণাসনহস্তাভির্যবনীভিঃ বনপুষ্পমালাধারিণীভিঃ পরিবৃতঃ ইত এব আগচ্ছতি প্রিয় বয়স্যঃ।' (অর্থাৎ তীর ধনুকে হাতে, বুনো ফুলের মালা-পরা যবন মেয়েদের দ্বারা প্রিয় বয়স্য (রাজা) এদিকে আসছেন)

উদ্যানপালিকা এবং চেটী অর্থাৎ পরিচারিকার কথাও আছে নাটকটিতে।

অশোক-লিপিতেও উল্লেখ রয়েছে নারীকর্মীর। বৌদ্ধ ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের মতই রাজ্যের নানা স্থানে প্রচার করতেন অশোকের 'ধর্ম্ম'। 'ধর্ম্মমহামাত্রদের মতই ছিল স্ত্রী-অধ্যক্ষ মহামাত্র। রাজনির্মিত বিহারে এঁরা থাকতেন। রাজার অন্তঃপুরে গিয়ে রাণীদের দানশীলা করে তোলাই এঁদের প্রধান কাজগুলির একটি।

রামায়ণ ও মহাভারতেও পরিচারিকাদের কথা আছে। বিশেষ করে মহাভারতের 'বিরাট পর্বে' আছে :

'লোকসমাজে 'সৈরিন্ধী' নামে যাঁরা বেতন ছাড়া দাসী ভাবে থাকে।' এ থেকেই কি অনুমান করা যায় না যে, বেতন না নিয়েও সেকালে কাজ করত মেয়েরা ?

গুপ্তযুগ এবং তার পরবর্ত্তী যুগেও শাসন কার্য্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিত মেয়েরা। গুপ্তযুগের পরবর্ত্তী কালেও কাশ্মীর, উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রভৃতি দেশের শাসনকার্য্য রাণীরাই চালাতেন। বগনাড়ায় প্রদেশপাল এবং গ্রাম-মুখ্যও হ'তেন মেয়েরা।

মেয়েরা যে নানারকম রাজকার্য্যে নিযুক্তা হ'ত এ' কথা 'মনুসংহিতায়'-ও আছে। ৭ম অধ্যায়ের ১২৪ নং শ্লোকে আছে :

"রাজকর্মসু যুক্তানাং স্ত্রীণাং প্রেষ্যজনস্য চ।
প্রত্যহং কল্পয়েদ্বৃত্তিং স্থানকর্মানুরূপতঃ।।"

(অর্থাৎ রাজকর্মে নিযুক্ত স্ত্রীগণের এবং অন্যান্য ভৃত্যগণের পদ ও কর্মানুসারে প্রত্যহ (রাজা) বেতন নির্দ্ধারণ (ও প্রদান) করিবেন। অনুবাদ :—অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন) ১২৬ নং শ্লোকেও আছে :

"পরীক্ষিতাঃ স্ত্রিয়শ্চৈনং ব্যজনোদকধূপনৈঃ।
বেষাভরণ-সংশুদ্ধাঃ স্পৃশেয়ুঃ সু সমাহিতাঃ।"

(অর্থাৎ গূঢ় চর দ্বারা পরীক্ষিত বেশ ও আভরণ বিষয়ে সংশুদ্ধ স্ত্রীসকল ব্যজন উদক এবং ধূপন (গন্ধদ্রব্যাদি ?) দ্বারা ইহার (রাজার) পরিচর্য্যা করিবে।' অনুবাদ : অধ্যাপক সেন।)

'মুসলমানী যুগে'ও নারী কর্মীদের উল্লেখ পাই অনেক জায়গায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন বীর রমণী রিজিয়া—এ'কথা তো সবাই জানেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মালবাধিপতি সুলতান ঘিয়াসউদ্দিনের হারেমে মেয়েদের শিক্ষার জন্যে শিক্ষয়িত্রী রাখা হ'ত।

বিজয়নগরেও মেয়েরা নিযুক্ত হ'তেন রাজকার্য্যে। পর্য্যটক নুনিজ এ'সম্বন্ধে এক চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়েছেন। মল্লযুদ্ধ থেকে জ্যোতিষী, হিসাবপত্র রাখা প্রভৃতি নানা কাজেই দক্ষ ছিল মেয়েরা। রাজ্যের দৈনিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার কাজও ওরা করত। সংগীতজ্ঞাদেরও বেতনের বিনিময়ে রাখা হ'ত রাজদরবারে। এমন কি, বিচারকের পদে পর্য্যন্ত নিযুক্ত হ'ত মেয়েরা। রাজপ্রাসাদের পাহারা দেবার কাজেও থাকত মেয়ে-প্রহরী।

মোগল যুগেও অভাব ছিল না স্বাবলম্বিনী নারীর। আকবরের সময়েই দু'জন শাসনকর্ত্রীর নাম জানি আমরা,—দুর্গাবতী আর চাঁদ বিবি। তা'ছাড়া—শাহজাদীদের লেখা-পড়া শেখাবার জন্যে 'আতুন' বা গৃহশিক্ষয়িত্রীদের নিয়োগ করা হ'ত তখন। এমন কি, মোগল-দরবারে বাদশাহের কাছে বেতনভোগী মহিলারা পাঠ করে শোনাতেন দৈনন্দিন সংবাদলিপি।

এ ছাড়া সে যুগে নর্ত্তকী, সংগীতজ্ঞা এবং পরিচারিকাদের সংখ্যাও যে যথেষ্ট ছিল আশা করি সে আর বলে দিতে হবে না।

চিকিৎসকের বিপত্তি

পুষ্প দেবী

সেই যে কথায় আছে না, ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড় ? তাই হয়েছে। এই ত' সেদিন সকালে উঠেই দেখি, ড্রইংরুমে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, রায়বাহাদুর আমায় পাঠিয়েছেন। পূর্ণিয়া থেকে আসছি আমি, শুনলুম আপনারা দু'জনেই অসুস্থ।

কথাটা সত্যি, ওঁর এ্যালবুমেন আর ডায়বেটিস। আর আমার গল্-ব্লাডার আর গ্যাস্ট্রিক-আলসার। এই বিপরীতধর্ম্মী দু'টি অসুখ নিয়ে দু'জনে আজন্ম ভুগছি। শুনেছি, বিয়ের সময় নাকি আমাদের রাজযোটক মিল হয়েছিল। তার লক্ষণ শুধু এইটুকুতেই

কথা আলোচনা করতে ভালবাসেন, কিন্তু পুরোনো রোগী মাত্রই বিরক্ত হয়ে ওঠেন সেই বিরক্তিকর ও কষ্টকর অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে করে। যাক্ মনের রাগ মনেই চেপে মুখে ভদ্রতা বজায় রেখে বসলুম। দেখলুম ভদ্রলোক অত্যন্ত কেতা-দুরস্ত। একটু পরেই কথা প্রসঙ্গে বললেন, দেখুন আমাদের বার আনা অসুখই মন-গড়া, সর্ব্বদা মনে করতে হবে আমাদের কিছু অসুখ নেই। বলি পেটের যন্ত্রণা কিছুতেই সে তা মনে থাকতে দেয় না। জোয়ানে-মুণে খান সেরে যাবে।

পরদিন বাবা এলেন। দু'-একটা কথা বলার পর বলি—অমল বাবু বলে একজন ডাক্তার এসেছিলেন। বাবা বলেন তাই নাকি? সর্বনাশ করেছে, বেজায় বাজে বকে ভদ্রলোক তোদের পাগল করে ছাড়বে, মাথার গোলমালের জন্য ওর চাকরী গেছে। সরকারী ডাক্তার ছিল পূর্ণিয়ার। মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠি।

এর পর প্রতিদিন ঠিক দুপুর দু'টোর সময় অত্যন্ত মিহি সুরে গলার আওয়াজ পাই "মিষ্টার মুখার্জ্জি আছেন কি?" ভাল এক জ্বালা হয়েছে! রোজই বলি, না উনি বাড়ী নেই ৫টায় ফেরেন অফিস থেকে। তবু রোজই সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি। আমার স্বামী অবিশ্যি বলেন, বাঁচা গেছে দুর্ভোগটা তোমার ওপর দিয়েই যায়, সারাদিন খাটুনির পর কাঁহাতক আর পাগলের সঙ্গে বকা যায়?

প্রথমত অমল বাবু আমার নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারে তৎপর হলেন, যখন দেখলেন মুণ আর জোয়ানে কোনো ফল আমি স্বীকার করছি না। তখন বললেন "দেখুন মিসেস মুখার্জ্জী, ও বিষয়ে মেমসাহেবরা অদ্ভুত বুদ্ধিমতী, আমি দেখেছি ১০৩ জ্বর এক মেমসাহেবের সে আমায় ডেকে পাঠিয়েছে, তার স্বামী তখন অফিসে। আমার কাছে তার রোগের যাতনার কথা সব বললে কিন্তু যেই স্বামীর শব্দ পেলে র‍্যাকেট হাতে করে টেনিস খেলতে আরম্ভ করলে। কে বলবে অসুখ করেছে! আর আপনি যদি রোজ এই হট-ওয়াটার ব্যাগ নিয়ে পড়ে থাকেন মিঃ মুখার্জ্জীর মনের অবস্থা কি হয় বলুন দেখি?" না দেখে সেই মেমটিকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। ১০৩° জ্বরে ছুটোছুটি করে টেনিস খেলা সহজ নয়। কিন্তু আমি যে এ-রকম যন্ত্রণা চেপে ওর উল্লসিত হয়ে ওঁকে অভ্যর্থনা করতে পারব তা তো ভরসা হয় না।

এর পর থেকে নানা কথায় তিনি আমায় আনন্দিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু কারণগুলি সব সময় আমার পক্ষে আনন্দকর হয়ে ওঠে না। হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন আমি ফুল ভীষণ ভালবাসি। সেই দিন থেকে প্রায় প্রতিদিন কখোনো গন্ধরাজ কখনও মাধবীলতার গুচ্ছ বা যা হোক কিছু ফুল তিনি প্রায়ই নিয়ে আসতেন। এক দিন ছাতে দাঁড়িয়ে আছি, দেখি আমার দেওর ও তার এক বন্ধু গেট দিয়ে ঢুকল। লেটার বক্সের ওপর একটা ফুলন্ত অ্যান্টিগোনাসের লতা দেখে দু'জনে কি কথা হল জানি না! তার পর সেটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তখন সেটা মনে বিশেষ কোন রেখাপাত করেনি কিন্তু বুঝলুম পরদিন। অমল বাবু এসেই বললেন, কাল কত কষ্ট করে যে আপনার জন্যে ঐ ফুলটুকু সংগ্রহ
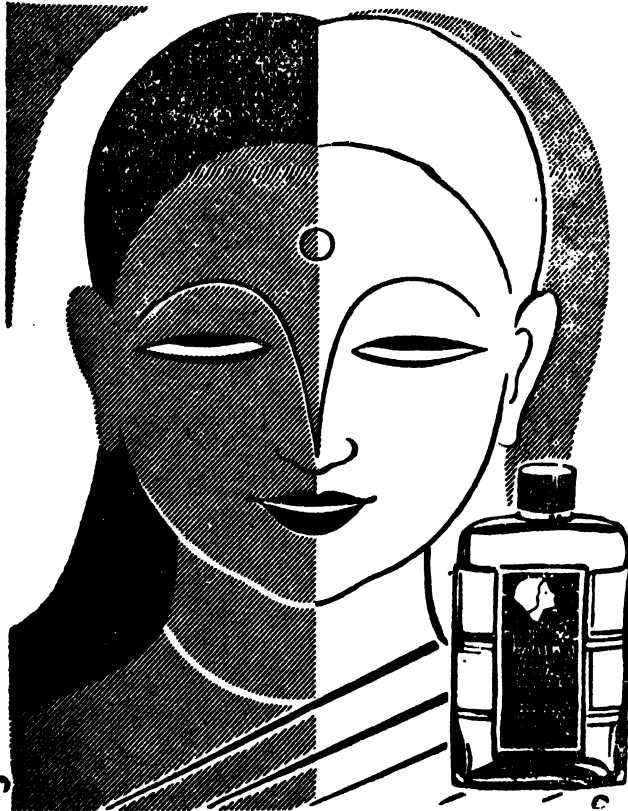
করেছিলুম তা আপনি ধারণাই করতে পারবেন না মিসেস মুখার্জী! কই সেই ফুল দেখছি না ত আপনার ঘরে—তখন বুঝলুম সেই ফুলই সদগতি লাভ করেছে বন্ধুযুগলের হাতে—হেসে বলি, "সত্যি ভারি চমৎকার ফুল! আমার এক বন্ধু এসেছিল সে নিয়ে গেল"—ভ্রূ কুঁচকে ম্লান হেসে অমল বাবু বললেন "এ কিন্তু ভারী অন্যায়?" আমি মনে মনে বললুম কিন্তু কেটারবক্সের ওপর ফুল রাখার কি দরকার ছিল? যাক ভাগ্যে দেখেছিলুম নইলে আজ মহামুস্কিলে পড়তে হত।"

এর পরদিন এসে আমার ছোট মেয়ে তপুকে বলেন, আজ একটা তোমায় ম্যাজিক দেখাব। একমাত্র ভরসা ছোট্ট চাকর রামদীন সকাল থেকে কাজ ছেড়ে চলে গেছে অথচ সত্যিই ছেলেটা অতি ভাল ছিল, কেন যে হঠাৎ এমন দুর্মতি হল তার বুঝতে পারি না—আর ঠিক চোখে না দেখে মানুষকে চোর বলতেও ইচ্ছে করে না। তাই সদ্য হারান পার্কারটা একটু খুঁজে দেখতে বলতেই তার কেমন ধারণা হল আমি তাকে সন্দেহ করছি। আমারও অত সখের দামী কলমটা হারিয়ে মেজাজটা ভাল ছিল না। কাজেই সামান্য কথার পর যখন বলেছি "কলমটার কি ডানা গজাবে যে ঘর থেকে উড়ে গেল?" ব্যস আর যায় কোথা? সঙ্গে সঙ্গে রামদীন বলল—"হামারা তলব দে দিজিয়ে হাম মুল্লুকমে যায়গা।" তারপর অনেক বোঝানর পরও সে রইল না—কাজেই সংসারের কাজ তো অনেকই ছিল তার ওপর কলম খোঁজার দরুণ সোফাসেটির কভার খোলা বিছানার তোষক উল্টে-পাল্টে দেখা ইত্যাদি হাঙ্গামায় কাজ আরও যথেষ্ট বেড়েইছিল। কাজেই সময়ও ছিল না, অমল বাবুর কাছে বসার। ভাগ্যে তপুটা ছিল তাকে বসিয়ে আমি কাজ সারতে গেলুম। বিছানা ঠিক করছি এমন সময় তপু ছুটতে ছুটতে হাজির। তার হাতে আমার সদ্য হারানিধি "পার্কার ফিফটি-ওয়ান"—তপু বললে 'মজা দেখাবার জন্যে অমল বাবু কলমটা কাল নিয়ে গিয়েছিলেন আমায় চোখ বুঁজতে বলে আমার মাথার রিবণে কলমটা গুঁজে দিয়ে বলছেন, মাথায় তোমার ওটা কি-ধরণের ক্লীপ? ও মা হাত দিয়ে দেখি তোমার কলম? দেখ দেখি শুধু শুধু রামদীনটা চলে গেল—ও কিন্তু মা আমাদের খুব ভালবাসত—মনে আছে তোমার সে বার যন্ত্রণার সময় সারারাত ঘুমোয় নি আর সেই ব্লাক আউটের রাতে বাপীর জন্যে ডাক্তার বাবুর বাড়ী গেছলো অন্য কেউ হলে পারতো না—"

তার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে বলি, "শুধু কি তাই? অমন লোক আর পাব না—। অথচ বিনা অপরাধে ছেলেটা চুরির অপবাদ মাথায় নিয়ে গেল।" যত ভাবি অমল বাবুর ওপর রাগটা প্রবল হয়ে ওঠে। অথচ ভদ্রলোক অত্যন্ত আশা করে ড্রইংরুমে বসে আছেন আমায় খুসী করেছেন মজা দেখিয়ে মনে করে।

এরও চেয়ে বিরক্তিকর ঘটনা ঘটলো এর পর। দীর্ঘ দিন কার্ডিয়াক এজমায় উনি কষ্ট পাচ্ছিলেন। নলিনী বাবু এসে বললেন, হিমোপ্রোটিন ইনজেকশান দিতে হবে। তখন যুদ্ধের সময়, হিমোপ্রোটিন পাওয়া সহজ নয়। অনেক কষ্টে যোগাড় করা হয়। এমন সময় অমল বাবুর আবির্ভাব। টেবিলের ওপর ওষুধের শিশিটি দেখেই হঠাৎ যেন বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, খুব চড়া গলায় ডাকেন "মিসেস মুখার্জ্জী"—আমি অবাক হয়ে তাকাই, দেখি ভদ্রলোকের চোখ লাল, মাথার শিরা ফুটে উঠেছে। সেণ্টাল টেবিলের কাচের ওপর এক প্রবল ঘুসি মেরে তিনি বলেন, "এই আমি বলে যাচ্ছি—এই ইঞ্জেকশান মিঃ মুখার্জ্জিকে দিলে, তার পর আধ ঘণ্টার বেশী তিনি বাঁচবেন না। বাঁচতে পারেন না। এখনও বলছি, সাবধান! এখনও বলছি, নিজের সর্ব্বনাশকে ডেকে আনবেন না।" অত্যন্ত বিব্রত হয়ে আমি বলি, "এ ইঞ্জেকশান তো তপুকেও এক বার দেওয়া হয়েছিল।" বাধা দিয়ে অমল বাবু বলে ওঠেন, "তপুর ডায়েবেটিস্ ছিল? তপুর হার্ট ডামেজ ছিল? ছিল কিডনির দোষ? আমার যা বলার তা বললুম, এবার আপনার কর্ত্তব্য আপনার কাছে।" তিনি সবেগে প্রস্থান করেন। বুঝি সবই পাগলের কাণ্ড, তবু মন সায় দেয় না। কেউ মঙ্গল হবে বললে যদি বা সে কাজ না করি, অমঙ্গল হবে বললে করতে সাহস হয় না। বিকেলে বাড়ীর ডাক্তার ভৌমিক এলে বলি, "আচ্ছা ও ইঞ্জেকশানটা এখন থাক, ভালই ত' আছেন"—ভৌমিক সব শুনে হেসে উঠে বলে, "তবে নলিনী বাবুকে আনবার কি দরকার ছিল? আচ্ছা কাণ্ড পাগলের!"

এর পর হঠাৎ একদিন উনি কলেজ থেকে ফিরলেন ১০৫° জ্বর নিয়ে। সর্দ্দি নেই, কাশি নেই হঠাৎ অতটা টেম্পারেচার দেখে ডাক্তার ম্যালেরিয়া সন্দেহ করে রক্ত নিয়ে গেলেন কিন্তু অমল ডাক্তার এসে হৈ-চৈ বাধালেন। তিনি জোর গলায় প্রমাণ করলেন অসুখটা প্লেগ, নিমোনিয়া, ইরিসিপ্লাস এমন কি টি, বি-ও হলে হতে পারে। তবু ম্যালেরিয়া কক্ষনো নয়। সেদিন ওঁর জ্বর খুব বেশী, রোগের যাতনার চেয়ে পাগলের প্রলাপ কম অসহ্য নয়—অথচ ডাক্তার এই দাবী নিয়ে তিনি গ্যাঁট হয়ে রুগীর মাথার কাছে বসে আছেন। তাঁর আইন অনুযায়ী সব করতে হবে, অন্য ডাক্তারদের নির্দ্দেশ মানার উপায় নেই।

ওঁর খুব ঘাম হতে লাগল, বোধ হয় জ্বরটা ছাড়বে—তখন বড় মেয়েকে বললুম, "মস্তি, তোমার বাবার গা-টা তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে জামাটা বদলে দাও।" সে বেচারা যেতেই অমল বাবু হুঙ্কার ছাড়লেন, "মিসেস মুখার্জ্জি আপনি করুন, মিস্ মুখার্জ্জির এ কাজ নয়। শুধু মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলেই যথেষ্ট হয় না প্রাকটিকাল হন একটু।" আমি তখন ওঁরই জন্যে বেদানা ছাড়াচ্ছিলুম—এক জন ভদ্রলোক শোবার ঘরে বসে, সে সময় মেয়ের সেবাটাই যে শোভন হবে মনে করে কুণ্ঠায় নিজে না গিয়ে মস্তিকে পাঠিয়েছিলুম মস্তি বেচারা থতমত খেয়ে ফিরে আসে। আমিই জামা বদলে দিই।

দীর্ঘ সাত দিন বাদে প্রচুর কুইনাইন ইনজেকশানের পর সেদিন অত্যন্ত দুর্ব্বল শরীরে উনি অফিস গেছেন। একেই শরীর ভাল নয়। আর লো ব্লাডপ্রেসার, এর জন্য মাথা ঘোরায় প্রায়ই কষ্ট পান। কাজেই মনটা আমার বেশ চিন্তাগ্রস্ত। তিনটে বাজলো, বারে বারে ছাদে গিয়ে দাঁড়াই ওঁর ফেরার আশায়। এমন সময় সিঁড়িতে জুতো পরা পায়ের আওয়াজ। যদিও ওঁর পায়ের পরিচিত শব্দ নয় তবুও আশায় এগিয়ে যাই, দেখি অমল ডাক্তার আসছেন। আমায় দেখেই হেসে বললেন "বলুন ডেকে পাঠিয়েছেন কেন?" আমি সবিস্ময়ে বলি "কই ডেকে পাঠাইনি তো?" বলেন—"তাতে লজ্জার কি আছে? এ ডাকার অধিকার তো আপনার প্রচুরই আছে। ছাদে

দেখলুম দাঁড়িয়েও আছেন আমার প্রতীক্ষায়, তবে অস্বীকার করে লাভ কী ?" বলেই টেবিলে রাখা ওঁর জন্যে কমলা লেবুর রসটা এক চুমুকে খেয়ে ফেলে বলেন "আচ্ছা কি করে জানলেন আমি লেবুর রস খেতে ভালোবাসি ?" এবার আর নিজেকে দমন করে ভদ্রতা রাখার চেষ্টা কষ্টকর হয়ে ওঠে—দুপুরে বাড়ীতে চাকর-বাকর কেউ নেই আর কমলালেবুও ঘরে নেই যে ওঁর জন্যে রস করে রাখবো। হয়তো রাগে মুখটা লাল হয়ে উঠে থাকবে। পকেট থেকে একটা ব্ল্যাক প্রিন্সের কুঁড়ি বার করে অমল বাবু বলেন "দেখুন কি সুন্দর ফুল—রং কালো হলে কি হবে, সুগন্ধে নিজের পরিচয় লুকোনো নেই, তাই আমি এই ফুলটিই সব চেয়ে ভালোবাসি।" ব্ল্যাক প্রিন্সের সঙ্গে তাঁর বা আমার কার রং-এর তিনি উপমা দিতে চান বুঝতে না পারলেও আমি রেগে উঠে বলি—"দেখুন ঠিক মাথায় ফুল গুঁজে ড্রয়িং রুমে বসে আপনার সঙ্গে গল্প করার মত মনের অবস্থা আমার নয়। বিশ্বাস করুন, আপনাকে ডেকেও আমি কোনও দিন পাঠাইনি। আমার স্বামী অসুস্থ"—

বাধা দিয়ে অমল বাবু বলেন—"ও কিছু নয়—মিঃ মুখার্জ্জী বড় বাড়াবাড়ি করেন—অসুখ নিয়ে; সহ্য শক্তি ওঁর মোটেই নেই।" এবার আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে আমি হাত জোড় করে বলি "থামবেন আপনি ? নেহাৎ আমার বাড়ী নইলে আপনাকে বেরিয়ে যেতে বলতে পারলে আমি সুখী হতুম। যথেষ্ট হয়েছে, অন্ততঃ আমার স্বামীকে চেনবার জন্যে আপনার প্রয়োজন হবে না আমার।"

এবার আমায় আরও অবাক করে অমল বাবু বলেন, "কেন, সে কী আপনিও জানেন না ? নইলে নলিনী বাবু বলার পরও আমার কথা শুনে আপনি কি হিমোপ্রোটীন বন্ধ করেন নি ? আমি আসলে অত খুশী হয়ে ওঠেন কেন আপনি ? আমি কি আজো বুঝি না ? কি দারুণ বিশ্বাস নির্ভরতা আপনার আমার ওপর ? দেখু তো পিসীমা বলতে অজ্ঞান—অতটা স্নেহ পরের ছেলেকে দেয়া কি সহজ ? আমি অবাক হয়ে যাই মিসেস মুখার্জী আপনার মত একজন অদ্ভুত বুদ্ধিমতী ধৈর্য্যশালিনী মহিলার জীবন এভাবে—"

এবার আমার চরম ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়ে আমি বলি, "চুপ করুন, এসব মানুষ আজো লোকের বাড়ীতে আসে কি করে ! রাঁচী যান আপনি—সত্যিই মাথা আপনার একেবারে খারাপ।" কটমট করে আমার দিকে চেয়ে অমল বাবু বলেন "আমারও ঢের কাজ আছে, এভাবে বাড়ীতে ডাকিয়ে অপমান করবার কি দরকার ছিল আপনার ?" এমন সময় উনি এসে পৌছান। আমি হাত জোড় করে বলি, "আপনি আজ বাড়ী যান বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। আর কখনও এ-বাড়ীতে না এলে আমি অত্যন্ত বাধিত হব।"

ওঁর হাত থেকে পোর্টফোলিও নিয়ে আমি টেবিলে রেখে এসে দেখি অমল বাবু দিব্যি শান্ত হয়ে জাঁকিয়ে বসে ওঁকে বলছেন "অদ্ভুত অসম্ভব সহ্য আপনার মিষ্টার মুখার্জী, এই দীর্ঘকাল রুগী নিয়ে কাটিয়ে এলুম আপনার মত ধৈর্য্য ও সহ্য কোন রুগীর আমি দেখিনি—মিসেস মুখার্জী—মিঃ মুখার্জীকে কিছু স্নিগ্ধ পানীয় এসময়ে দিলে ভালো হয়।"
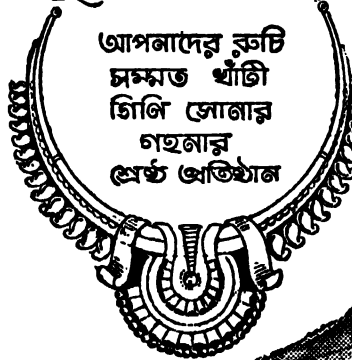
(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৬

রঞ্জন অবাক হয়ে গেল।

মালা যে এমন হুট্ করে এসে হাজির হবে, তা সে ভাবতেও পারে নি। হাসতে হাসতে বললে, এসো।

বলেই সে মালার মুখের দিকে একবার তাকালে। দেখলে, সে হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে আছে শুধু। মুখে কথা নেই, হাসি নেই।

যে-মালার সঙ্গে তার এত পরিচয়,—মুখুজ্যে-পুকুরে যে-মালার সঙ্গে তার নিত্য দেখা হ'তো,—এ যেন সে মালা নয়!

রঞ্জন বললে, তোমাদের বাড়ীতে এলাম অতিথি হয়ে। আর তুমি কি না—

মালা জবাব দিলে না। ঢলঢলে চোখ দু'টি একবার রঞ্জনের দিকে তুলে ধরলে।

রঞ্জনকেই কথা বলতে হ'লো। বললে, অতিথিকে আমরা কি বলি জানো?

মালা তখনও কথা বলছে না। রঞ্জন বললে, অতিথিকে আমরা নারায়ণ বলি।

বলেই আবার কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মালার মুখের পানে তাকিয়ে কথা বলবার উৎসাহ তার হঠাৎ যেন কমে গেল। —এ কি! মালা চুপ করে আছে কেন?

রঞ্জন এদিক-ওদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখলে। কেউ কি দাঁড়িয়ে দেখছে নাকি?

কিন্তু দেখবার মধ্যে তো বাড়ীতে একমাত্র মালার মা ছাড়া আর কেউ নেই?

রঞ্জন বললে, কি হ'লো তোমার? মালা! কথা বলছো না কেন?

কথা কেন যে সে বলছে না তা সে নিজেই জানে না। যে-কথা সে বলতে এসেছিল, এত চট্ করে সে-কথা বলাও যায় না। বলতে এসেছিল তার বাবার কথা। বলতে এসেছিল—আজ তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছে বলেই কি তার চাটুজ্যে? খুনী অপবাদ দিয়ে জেল-হাজতে পুরে রাখলে তার বাবার মত একজন নিরীহ ভাল মানুষকে? এইটুকু বিচার-বুদ্ধি যাঁর নেই, তাঁরই পুত্রবধূ হয়ে তাঁরই বাড়ীতে সে যাবে কেমন করে?

এই সব কথা রঞ্জনকে বলবার জন্যই সে এসেছিল। বলতে এসেছিল—লাঞ্ছিত অপমানিত তার বাবা ফিরে এসে যদি বলে—বিনা দোষে যে-লোক তাকে এই রকম ভাবে অপমান করতে পারলে, আজ আবার তারই কাছে মাথা হেঁট করে তার একমাত্র কন্যাকে তার হাতে তুলে দিতে পারবে না। যদি বলে, মেয়ে তার চিরকুমারী থাকবে, তাও ভালো, তবু···তবু···

মালা আর ভাবতে পর্য্যন্ত পারলে না। তার বাবার মুখখানা মনে পড়তেই দু'চোখ তার জলে ভরে এলো। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলেই কি সে তার বাবার মান-সম্মান আত্মমর্য্যাদার কথা একটি বার ভেবেও দেখবে না?

রঞ্জন উঠে দাঁড়ালো। ডাকলে, মালা!

মালা মুখ তুলে তাকাতেও পারলে না।

রঞ্জন এগিয়ে আসছিল মালার দিকে। এবার সে না তাকিয়ে পারলে না।

কিন্তু এ কি? তুমি কাঁদছো মালা?

রঞ্জন বললে, কেন? কি হয়েছে?

মালা আঁচল দিয়ে তার চোখ দু'টো মুছে ফেললে।

রঞ্জন বললে, কাঁদে না, ছি! এই তো আমি ফিরে এসেছি।

রঞ্জন ভাবলে বুঝি সে তারই জন্যে কাঁদছে। তাই আবার বললে, কেঁদো না মালা, চুপ কর। কথা বল। আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কেন আসনি।

মালা মনে মনেই বললে, ছাই বুঝেছো।

কিন্তু মুখ ফুটে তখনও পর্য্যন্ত একটি কথাও সে বলছে না দেখে রঞ্জন বললে, কথা যদি তুমি না বল মালা, তাহ'লে আমি বুঝবো—আমার এখানে আসা তুমি পছন্দ করছো না।

এখন

রেক্সোনা

আগের চেয়ে অনেক বেশী সুগন্ধী!

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটরী লিমিটেড এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

RP. 144-X52 BG
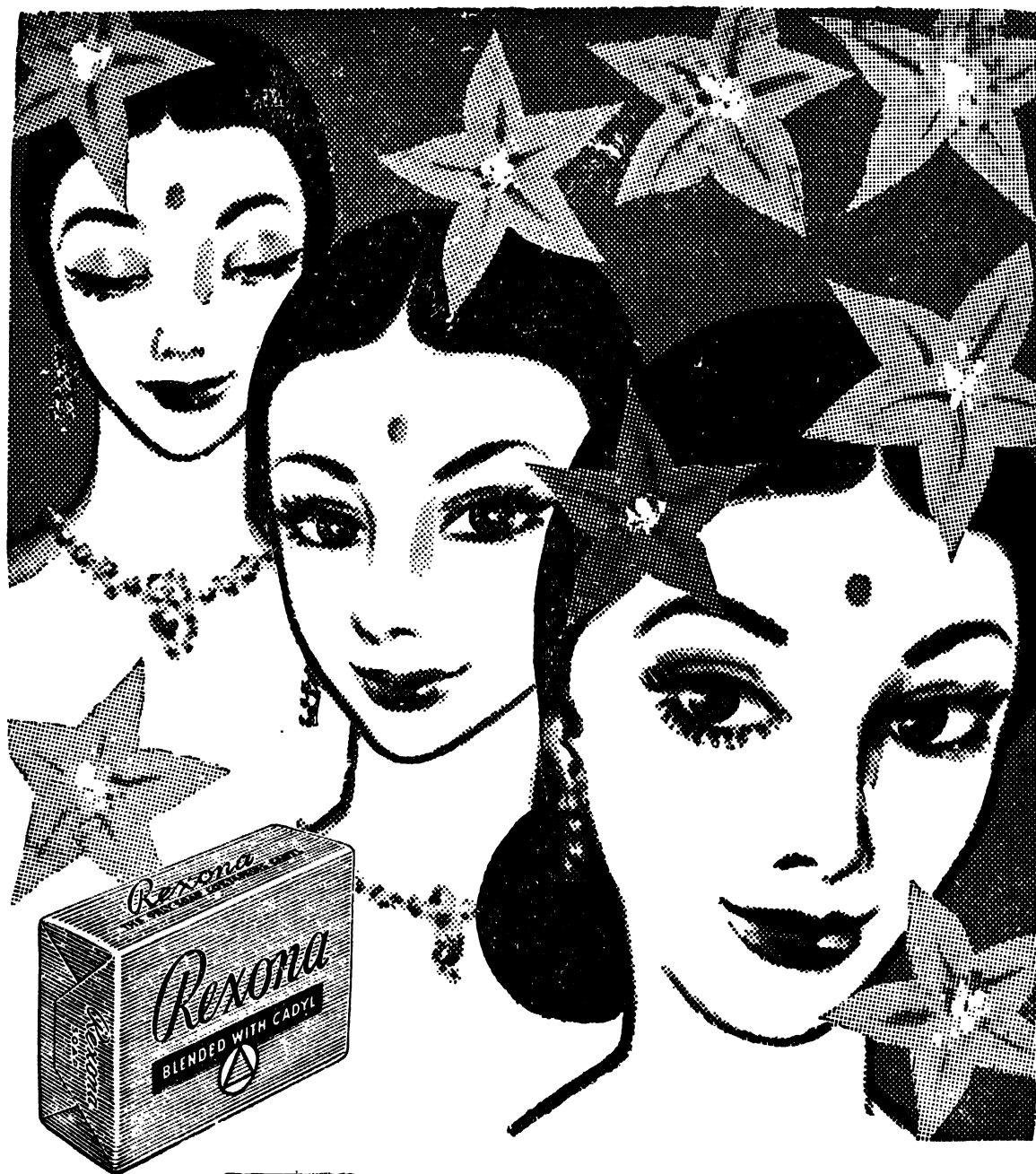
রইলো মালার মুখের পানে। তার পর বললে, তাহ'লে আমি যাই ?

এতক্ষণ পরে মালা কথা বললে, হ্যাঁ, যাও।

রঞ্জন বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হয়ে গেল। চোখের সুমুখে বজ্রপাত হ'লেও বুঝি সে এতটা বিস্মিত হ'তো না।

ভুল শুনলে না তো ?

রঞ্জন আবার জিজ্ঞাসা করলে, যাব ?

মাথাটা একটু কাৎ করে মালা বললে, হুঁ।

লজ্জায় রঞ্জনের মাথা কাটা গেল। মুখ দিয়ে সে আর একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলে না। কোটটা ছিল খাটের এক পাশে পড়ে। তাড়াতাড়ি সেটা সে তুলে নিলে! জুতো পায়ে দিয়ে মনে হলো যেন সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচে।—ছি, ছি, এমন করে বুড়োশিবের কথা শুনে এখানে আসা তারা উচিত হয়নি।

কিন্তু মালা তার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করলে কেন ? সে তাকে চলে যেতেই বা বললে কেন ? তাহ'লে এত দিন ধ'রে মালা সম্বন্ধে যে কথা সে ভেবেছে—সব ভুল, সব মিথ্যা ?

রঞ্জন কোথাও দাঁড়ালো না, মা'র সঙ্গে একটি বার দেখাও ক'রে গেল না। এক পা এক পা ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে উঠানটা পার হচ্ছে, হঠাৎ তার কানে এলো মালার কণ্ঠস্বর। মার সঙ্গে তার কথাকাটাকাটি চলছে।

রঞ্জনকে দাঁড়াতে হ'লো।

মালাকে রঞ্জনের ঘর ঢুকতে দেখে খুশীই হয়েছিল তার মা। কাঞ্চন ভেবেছিল এক বার আড়ালে গিয়ে শোনে তাদের কথাবার্ত্তা, কিন্তু না, মালা যদি টের পায়, লজ্জায় সে হয়ত ভাল করে কথাই বলবে না রঞ্জনের সঙ্গে। তার চেয়ে কাজ নেই সেখানে গিয়ে। কাঞ্চন তার ঘরে ফিরে এসে বসে বসে পান সাজছিল।

হঠাৎ সিঁড়ির ওপর জুতোর শব্দ পেয়ে উঠে দাঁড়ালো। মনে হ'লো জুতো পায়ে দিয়ে কে যেন নেমে যাচ্ছে।

কাঞ্চন তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে দেখলে, জানলার কাছটিতে একা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মালা। রঞ্জন নেই।

কাঞ্চন বললে, মালা, কি হলো ? অমন করে একা দাঁড়িয়ে আছিস যে ?

মালা কথা বলছে না দেখে মা তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় গেল সে ? রঞ্জন ?

মালা বললে, বাড়ী।

কাঞ্চন যেন আকাশ থেকে পড়লো।—বাড়ী গেল ? কেন ?

মালা বললে, আমি বললাম যেতে।

—তুই যেতে বললি !

মালা চীৎকার করে উঠলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বললাম।

কাঞ্চনও কম চীৎকার করলে না। বললে, কেন ? কেন ? কেন যেতে বললি ? তুই কি পাগল হয়ে গেছিস ?

মালা এবার সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে বললে, আমি পাগল কেন হব মা, পাগল হয়েছো তোমরা।

কাঞ্চন বললে, এ কী বলছিস মালা ! আমরা পাগল হয়েছি ?

মালা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মা তার হাতখানা চেপে ধরলে। বললে, বল, কি হয়েছে বলে যা।

মালা বললে, কিছুই হয়নি মা, হাত ছাড়ো।

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মালা বললে, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি—তোমরা আমার বাবার কথা কেউ একটি বার ভেবেও দেখছো না !

কাঞ্চন বললে, কি আর বলবো তোকে ! তোর বাবার কথা আমরা ভাবছি না ? শুনলি না, কাল তোর শিব জ্যেঠা কি বললে ?

মালা বললে, সব শুনেছি, সব জানি। তবু বলছি, বাবার কথা তোমরা কেউ ভাবছো না। তুমি শুধু আমার বিয়ের জন্যে ক্ষেপে উঠেছো।

—ক্ষেপেছি কি সাধে! বয়েসটা কত হলো সেদিকে খেয়াল আছে ?

মালা বললে, আছে, আছে। খুব আছে।

কাঞ্চন বললে, তা যদি আছে তো রঞ্জনকে বাড়ী যেতে বললি কেন ?

মালা বললে, বাড়ী যেতে বলবো না ত' কি বলবো—তুমি একেবারে বিয়ে করে বাড়ী যাও ?

—ফাজলামি করিস্ নি। করতো কি না দেখতিস।

—তা যদি সে করতে পারতো, তাহ'লে এর পরেও পারবে না, তুমি ভেবো না।—আমি চললাম।

মালা চলে যাচ্ছিল, কাঞ্চন বললে, যাসনে মালা, শোন।

মালা ফিরে দাঁড়াল।—কি শুনবো ? বল।

—তোর বাবার কথা কি বল ছিলি বল্।

—বলছিলাম—এই যে বাবাকে খুনী ব'লে ধরে নিয়ে গেল, এই যে এত দিন ধরে জেলে পুরে রাখলে, এর পেছনে কে আছে বল দেখি ?

কাঞ্চন বললে, মুখপোড়া পুলিশ আছে, আবার কে থাকবে ?

মালা বললে, না, না মা, তুমি কিচ্ছু জান না। পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে সত্যি, কিন্তু তার পেছনে আছে—এক্ষুণি যাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম, তার বাবা।

কথাটা কাঞ্চন এত দিন তলিয়ে বুঝেনি। এতক্ষণ পরে মনে হলো যেন মালা যা বলছে তা' সত্যি। কিন্তু তাই বলে বৃথা একটা ঝগড়াঝাঁটি করে রঞ্জনের মতন পাত্র তো হাতছাড়া করাও চলে না ! কাঞ্চন একটু থেমে কি যেন ভেবে বললে, রঞ্জন ফিরে যখন এলো তখন সবই তো চুকেবুকে গেল।

মালা বললে, না মা, চুকে যায়নি। ছেলে ফিরে এলো, ছেলের বাপের দুঃখ-কষ্ট ভাবনা-চিন্তা চুকেবুকে গেল সত্যি, কিন্তু খুনের অপবাদ দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে এত বড় অপমান যাকে করলে, সে কি ভুলতে পারবে এই কলঙ্কের কথা ? না—লোকে ভুলবে ? বল সত্যি কি না ?

কাঞ্চনের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না।

মালা বললে, আচ্ছা তুমিই বল মা, বাবা যখন মুখখানি শুকনো করে এসে দাঁড়াবে, তখন কি বলে সান্ত্বনা দেবে তাকে ? কি বলবে ? বলবে—তা হোকগে। তুমি এখন গরীব হয়ে গেছ, এখন যদি তোমার মুখে কেউ লাথি মারে তো মারুক।

কাঞ্চন বললে, আমি বুঝেছি। তুই চুপ কর মা, চুপ কর।

মালা কিন্তু চুপ করলে না, আবার বলে যেতে লাগলো, বাবা এসে দেখবে হয়ত তাঁর হেঁট মাথা আরও যাতে হেঁট হয়, আমরা তার

নিয়ে ধেই-ধেই করে নাচছি। আমার ওপর বাবার কি ধারণা হবে একবার ভেবে ভাখো? আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই কি—

কথাটা মালাকে শেষ করতে দিলে না কাঞ্চন। বললে, তাহ'লে কি হবে তাই বল। ও আপনার ছেলে ফিরে পেয়ে আনন্দে মেতে থাকবে, তোর বাবার কথা কি তার মনে থাকবে? দেবু চাটুজ্যের মত লোক কি তোর বাবার কাছে এসে ক্ষমা চাইবে?

মালা বললে, ত' যদি না চায় তো বিয়ে হবে না।

কাঞ্চন বললে, ও মা, সে কি কথা! তোর বিয়ে হবে না আর রঞ্জন অন্য জায়গায় বিয়ে করবে?

মালা বললে, তা যদি সে করতে পারে মা, তাহ'লে তার হাতে তুমি মেয়ে দিয়েই বা কি করবে?

তাও তো সত্যি!

কাঞ্চন বললে, আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না মা, আমার মাথার ভেতরটা কেমন যেন করছে। তোর শিবু জ্যেঠাও তো এখনও এলো না! সে এলেও-বা তাকে এই সব কথা বলে দেখতাম সে কি বলে। চাকরটাকে একবার পাঠাবো তার বাড়ী?

মালা বললে, সে কি আর বাড়ীতে আছে? আজ মামলার দিন—তুমি ভুলে যাচ্ছ মা?

কাঞ্চনের মনে পড়লো—বুড়োশিবকে কলকাতা পাঠিয়েছিল ব্যারিষ্টার আনবার জন্য। রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হতেই ফিরে এলো।

কাঞ্চন বললে, তাহ'লে তোর শিবুজ্যেঠা আজই তো বলবে—রঞ্জন ফিরে এসেছে।

মালা বললে, না। বোধ হয় বলবে না।

কাঞ্চন বললে, না বললে তো ছাড়বে না তোর বাবাকে!

—আর না ছাড়ুক, এক দিন ছাড়তেই হবে।

কাঞ্চন বললে, তোর শিবুজ্যেঠা রঞ্জনকে ছেড়ে দিতে বারণ করে গিয়েছিল। কি করবো বল, এখনও পথ আছে।

কথাটা মালা বুঝতে পারলে না। বললে, কি আবার করবে? সে তো চলে গেছে।

কাঞ্চন বললে, না যায়নি। যাবে কেমন করে? কাল থেকে আমি যে বাইরের দরজায় তালা বন্ধ করেছি।

—চাকরটা খুলে দেবে।

কাঞ্চন বললে, পারবে না। চাবি আমার কাছে।

—দিদিমণি!

তাকিয়ে দেখলে হিন্দুস্থানী চাকর এসে দাঁড়িয়েছে।

কাঞ্চন বললে, কি রে, কি বলছিস?

—না মা, আপনাকে নয়, দিদিমণিকে।

মালা জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে বলছিস? কি বলবি?

—নতুন বাবু চাবি মাগছে। আমি বললাম—চাবি মা'জির কাছে। বাবু বললে, না তুই দিদিমণিকে বল। মাকে বলিস না।

মালা মুখ টিপে একটু হেসেই আবার গম্ভীর হয়ে গেল। মা'র মুখের পানে তাকিয়ে বললে, দিয়ে দাও না চাবিটা।

কাঞ্চন বললে, আমি চললাম নীচে। তুই থাম দেখি।

কাঞ্চন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মালা ডাকতে লাগলো, মা! মা!

কাঞ্চন ফিরেও তাকালে না। জবাবও দিলে না। [ক্রমশঃ।
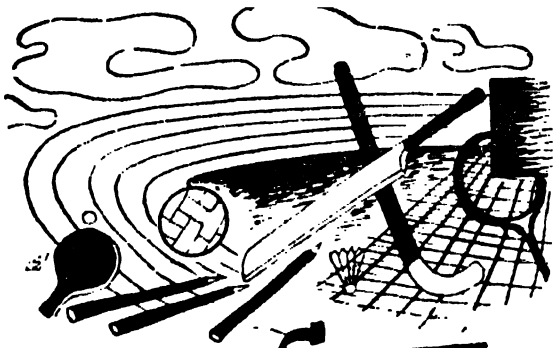
খেলাধুলা

অলিম্পিক প্রসঙ্গ

আর কয়েক দিন বাদেই অলিম্পিকের আসর সুরু হবে। অলিম্পিকের প্রস্তুতিপর্বে এ লেখাই আমার শেষ লেখা। আবার ১৯৬০ সালে এ পর্য্যালোচনা সুরু হবে সংবাদপত্র, মাসিক, সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায়।

ষোড়শ অলিম্পিকের জন্য নগর নির্মাণ, ষ্টেডিয়ামের উন্নতি সাধন, রাণিং ট্রাক, সাইকেল কোর্স, সুইমিং পুল প্রভৃতি নির্মাণ খাতে খরচ হয়েছে আনুমানিক চার কোটি টাকা। মেলবোর্ণের পুরানো ক্রিকেট ষ্টেডিয়ামই অলিম্পিকের প্রধান অনুষ্ঠান কেন্দ্র। অলিম্পিকের জন্য সেই পুরানো ষ্টেডিয়াম সংস্কার করা হয়েছে। এক তলার পরিবর্ত্তে সে ষ্টেডিয়াম তিন তলায় পরিণত হয়েছে। এ ষ্টেডিয়ামে প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার দর্শকের স্থান সঙ্কুলান হবে।

সুইমিং, ডাইভিং, সাইক্লিং, ফুটবল ও হকি খেলার প্রাথমিক খেলাগুলি অলিম্পিক পার্কে অনুষ্ঠিত হবে। ষ্টীল কংক্রিট আচ্ছাদিত সুইমিং পুলের গ্যালারীতে আনুমানিক সাড়ে পাঁচ হাজার দর্শকের স্থান সঙ্কুলান হবে।

হকি মাঠের চারি দিকের পাড়ের উপর প্রায় কুড়ি হাজার দর্শকের স্থান সঙ্কুলান হবে। তবে কিছু দর্শক যাতে আরামে বসে খেলা দেখতে পারেন, তার জন্য গ্যালারী নির্মাণ হয়েছে।

অলিম্পিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে ষোড়শ অলিম্পিকের সময় মেলবোর্ণে চিত্রাঙ্কন, তৈলচিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের এক প্রদর্শনী খোলা হবে। এ ছাড়া অর্কেষ্ট্রা এবং সঙ্গীত, নৃত্যের আয়োজন হয়েছে।

মেলবোর্ণের ষোড়শ অলিম্পিকের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের জন্য ডিউক অব এডিনবরা রাজকীয় জাহাজযোগে অষ্ট্রেলিয়া অভিমুখে যাত্রা করেছেন। ২২শে নভেম্বর মেলবোর্ণের ঐতিহাসিক ক্রিকেট মাঠে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন।

দেশ-বিদেশের এ্যাথলীট, খেলোয়াড়, মুষ্টিযোদ্ধা, সাঁতারু মেলবোর্ণ অলিম্পিক অনুষ্ঠান কালে যাতে নিজ নিজ দেশের খুঁটিনাটি সংবাদ জানাতে পারেন, সেজন্য বিশ্বের সমস্ত জায়গা থেকে মেলবোর্ণে সংবাদপত্র সরবরাহের আয়োজন হয়েছে।

* * * *

নভেম্বর মাসের দু' তারিখে গ্রীস দেশের ঐতিহাসিক "অলিম্পাস" পর্ব্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে প্রাচীন পোষাকে সুসজ্জিত গ্রীক তরুণী ষোড়শ অলিম্পিক মশালের জন্য সূর্য্যরশ্মি থেকে অতসী কাচের সাহায্যে পুতাগ্নি অষ্ট্রেলিয়ার অভিমুখে। অলিম্পিকের পবিত্র অগ্নিশিখা এখন ফিরছে অষ্ট্রেলিয়ান এ্যাথলীটদের হাতে হাতে। এ মশাল অষ্ট্রেলিয়ার তিন হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে নির্দিষ্ট দিনে অষ্ট্রেলিয়ার সম্মানিত এ্যাথলীটের পুণ্য ক্রীড়াভূমিতে প্রবেশ করবেন।

ফুটবল

আই, এফ, এ, শীল্ড—দীর্ঘ দিন বাদে আই, এফ, এ, শীল্ড পর্য্যালোচনা করার মত সময় নেই। কারণ এ খবর পুরানো হয়ে গেছে। তবুও অল্পের মধ্যে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল আই, এফ, এ, শীল্ড বিজয় করে দ্বি-মুকুট জয়ের গৌরব অর্জন করল। আই, এফ, এ, শীল্ডের ফাইন্যালে এবার ছিল একাদশ অভিযান। অপর দিকে এরিয়ান্স দলের শীল্ড ফাইন্যাল খেলার তৃতীয় পদক্ষেপ। মোহনবাগান ও এরিয়ান্স ক্লাবের পিছনে ছোট এক ইতিহাস আছে। দীর্ঘ ১৬ বৎসর আগে ১৯৪০ সালে দুই দলের ফাইন্যাল খেলায় এরিয়ান্স ক্লাব মোহনবাগান ক্লাবকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে শীল্ডবিজয়ী হয়। সে দিনের সেই খেলা স্মরণ করে এবারের ক্রীড়ামোদীরা এই খেলা দেখতে বেশ ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৫৬ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যাল খেলা রেখে গেছে এক ব্যর্থ স্মৃতি। ফাইন্যাল খেলাটি এত নিম্নস্তরের হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, মাঠের অবস্থা, অস্বাভাবিক রোদের তেজ, কয়েক দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ফলে মাঠের যে অবস্থা হয়েছিল তাতে স্বাভাবিক খেলা আশা করাই বৃথা। তিনটের সময় ইতিপূর্ব্বে কখনও ফাইন্যাল খেলা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। শেষ পর্য্যন্ত খেলায় মোহনবাগান দল ৪-০ গোলে এরিয়ান্স দলকে পরাজিত করেছে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল

নিখিল ভারত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ২-১ গোলে পরাজিত করে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষ ট্রফি লাভ করেছে।

এবার উত্তরাঞ্চলের ফাইন্যাল খেলায় ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে, তা সত্যই মনকে পীড়া দেয়। অযথা ফাউল করার জন্য পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধী খেলোয়াড়কে রেফারী মাঠ ত্যাগ করার নির্দ্দেশ দেন, কিন্তু খেলোয়াড় মাঠ থেকে বাহির না হওয়ার জন্য রেফারী খেলা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। পরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অসৎ আচরণের জন্য টীমকে 'স্ক্র্যাচড' করে দেওয়া হয়।

ছাত্র-খেলোয়াড়ের এ মনোভাব কোন ক্রমেই ক্ষমার যোগ্য নয়।

ক্রিকেট

অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল পাকিস্তানের সংগে টেষ্ট খেলায় ৯ উইকেটে পরাজয় স্বীকার করে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত প্রথম টেষ্ট খেলায় এক ইনিংস ৫ রাণে ভারতকে পরাজিত করেছে।

প্রথম টেষ্ট—প্রথম টেষ্ট ম্যাচ অষ্ট্রেলিয়ার তিন জন সেরা খেলোয়াড় মিলার, ডেভিডসন ও আর্চারের অনুপস্থিতিতে এক ইনিংস ও ৫ রাণে জয়লাভ কৃতিত্বের পরিচায়ক বিনাউড ও লিণ্ডওয়ালের প্রশংসনীয় বোলিং-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা আশাপ্রদ ব্যাট করতে পারেন নি।

এ টেষ্টে ফাষ্ট বোলার বাদ দিয়ে শুধু স্পিন এবং সুইং বোলার

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পেছনে নাম, ঠিকানা ও বিষয়বস্তু লিখতে ভুলবেন না।]

পার্ব্বতী (তাঞ্জোর)
—ভবেশ ভট্টাচার্য

পদ্মপুকুর
—প্রিয়গোপাল সেন
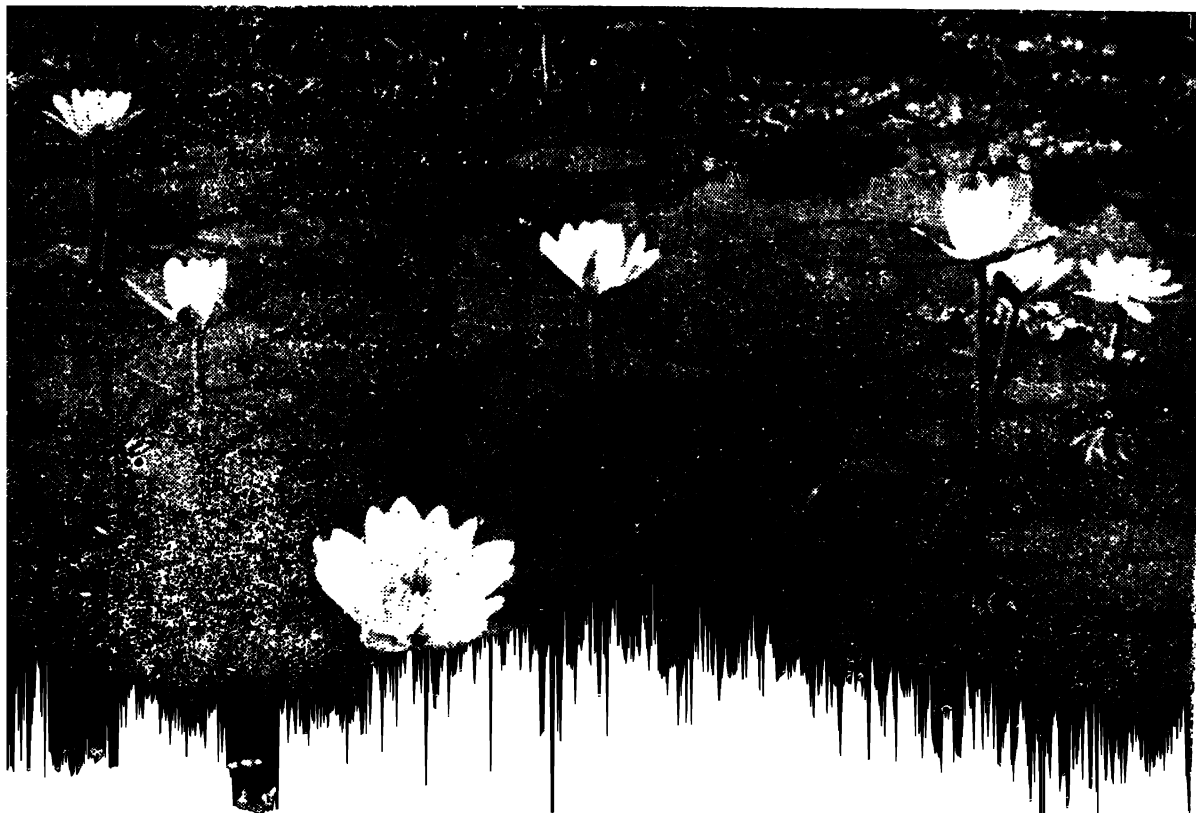
ব্রেবোন পার্ক (দার্জিলিং)

—স্বপনকুমার ঘোষাল

গ্রীষ্মের দিনে

—অরুণকুমার চক্রবর্তী

জন্মাষ্টমীর দিনে

—মদন মজুমদার

ক শিকারী ?

—সন্তোষ ভট্টাচার্য্য

পাখীর বাসা

—শঙ্কর দত্ত

নর্ত্তকী

—দুর্গা দেবী

ধান শুকানো —সুনীল জানা

নিয়ে দল গঠন করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। এ টেষ্টে পরাজয় একমাত্র ফাষ্ট বোলার না গ্রহণ করারই ফল। তার উপর প্রবীণ খেলোয়াড় অধিকারীর কাছ থেকে কিছু আশা করা যে অন্যায় তা কর্তৃপক্ষদের বোঝা উচিত ছিল। বিনাউড ও লিগুওয়ালের মারাত্মক বোলিং অষ্ট্রেলিয়ার জয়লাভের প্রধান কারণ হলেও অধিনায়ক জনসনের ৭৩ রাণ উল্লেখযোগ্য।

ভারত—১ম ইনিংস—১৬১ (ভি. মঞ্জেরকার ৪১, উম্রিগড় ৩১, মানকড় ২৭, পি. রায় ১৩, কৃপাল সিং ১৩, বিনাউড ৭২ রাণে ৭ উইঃ, ক্রফোর্ড ৩২ রাণে ৩ উইঃ)।

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৩১৯ (জনসন ৭৩, ক্রেগ ৪০, বার্জ ৩৫, ক্রফোর্ড ৩৪, হার্ভে ৩৭, ম্যাকডোনাল্ড ২৯, ম্যাকে ২৯, মানকড় ৯০ রাণে ৪ উইঃ, গুপ্তে ৮৯ রাণে ৩ উইঃ, গোলাম আমেদ ৬৭ রাণে ২ উইঃ)।

ভারত—২য় ইনিংস—১৫৩ (রামচাঁদ ২৮, উম্রিগড় ২৫, কৃপাল সিং নট আউট ২০, মঞ্জেরকার ১৬, লিগুওয়াল ৪৩ রাণে ৭ উইঃ)।

অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও পাঁচ রাণে বিজয়ী

দ্বিতীয় টেষ্ট—বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় টেষ্ট অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। এ খেলায় অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব সর্ব্বজন-বিদিত। বোম্বাই টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক জনসন ও সহ-অধিনায়ক কিথ মিলার খেলতে পারেন নি। এ ছাড়া উইকেট-কিপার ল্যাংলে ও আয়ান ক্রেগ ও চৌকস খেলোয়াড় রন আর্চার অসুস্থ থাকায় খেলায় যোগদান করতে পারেন নি। খেলার সময় ডেভিডসন এবং ক্রফোর্ড আঘাত পান। এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাট্সম্যানরা নিজ কৃতিত্বের সঙ্গে খেলেন। শেষ পর্য্যন্ত খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

ভারত—১ম ইনিংস—২৫১ (রামচাঁদ ১০৯, মঞ্জেরকার ৫৫, অধিকারী ৩৩, পি. রায় ৩১, ম্যাকে ২৭ রাণে ৩টি, ক্রফোর্ড ২৮ রাণে ৩টি, বিনাউড ৫৪ রাণে ২ উইঃ)

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৫২৩ (৭ উইঃ ডিক্লেঃ) (বার্ক ১৬১, হার্ভে ১৪০, বার্জ ৮৩, লিগুওয়াল নট আউট ৪৮, রাদারফোর্ড ৩০, কেন ম্যাকে, ২৬, গুপ্তে ১১৫ রাণে ৩টি, জেসু প্যাটেল ১১১ রাণে ২ উইঃ)।

ভারত—২য় ইনিংস—২৫০ (৫ উইঃ) (পি. রায় ৭৯, উম্রিগড় ৭৮, মঞ্জেরকার ৩০, অধিকারী নট আউট ২২, বিনাউড ১৮ রাণে ২ উইঃ, রাদারফোর্ড ১১ রাণে ১ উইঃ)।

তৃতীয় টেষ্ট—ইডেন উদ্যানের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছিল। এ টেষ্ট ম্যাচকে ক্রিকেট খেলার মান অনুসারে 'লো-স্কোরিং গেম' বলে আখ্যাত করা যায়। কারণ, কোন দলই তাদের কোন ইনিংসে দু'শ রাণ করতে সমর্থ হয় নাই।

অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংস ১৭৭ রাণে শেষ হলে, ভারতীয় দল ব্যাট করতে নামে। ১৩৬ রাণে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়া দলকে ১৮৯ রাণের মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করতে হয়। কারণ ল্যাংলে অসুস্থ ছিলেন। তৃতীয় দিনের খেলাটির এমন এক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল যাতে অনেক ক্রীড়ামোদী আশা করেছিলেন এ টেষ্টে ভারতীয় দলের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী।

পর পর দুটি টেষ্টে মানকড় ও রায় ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান হিসাবে সুবিধা করতে না পারায় অনেকে মনে করেছিলেন, ভারতীয় দলের সূচনা আশাপ্রদ না হওয়া দলের অবস্থা এখন এক বিপর্যয়মুখী। তৃতীয় টেষ্টে তরুণ খেলোয়াড় নরী কণ্ট্রাক্টরকে রায় এর সংগে পাঠান হয়। এই প্রথম জুটি মোটামুটি ভালই খেলেছেন বলতে পারা যায়। নরী কণ্ট্রাক্টার মানকড়ের উল্টো সংস্করণ বলা যায়। ইনি বাঁ হাতে ব্যাট করেন ও ডান হাতে বল করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় দলের ব্যাটসম্যানদের নিদারুণ ব্যর্থতার জন্য ভারতীয় দল এ টেষ্ট ম্যাচ ৯৪ রাণে পরাজিত হয়েছে। এই জয়লাভের জন্য অষ্ট্রেলিয়ার দুই খ্যাতিমান বোলার বিনাউড ও বার্কের কৃতিত্ব বেশী।

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—১৭৭ (বার্জ ৫৮, ক্রেগ ৩৬, গোলাম আমেদ ৪৯ রাণে ৭ উইঃ মানকড় ৩৬ রাণে ২ উইঃ)

ভারত—১ম ইনিংস—১৩৬ (মঞ্জেরকার ৩৩, কণ্ট্রাক্টর ২২, বিনাউড ৫২ রাণে ৬ উইঃ লিগুওয়াল ৩২ রাণে ৩ উইঃ)

অষ্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস—১৮৯ (৯উইঃ ডিক্লেঃ) (হার্ভে ৬৯, লিগুওয়াল ২৮, ম্যাকে ২৭, বার্জ ২২, বিনাউড ২১, মানকড় ৪৯ রাণে ৪ উইঃ গোলাম আমেদ ৮১ রাণে ৩ উইঃ)

ভারত—২য় ইনিংস—১৩৬ (পি. রায় ২৪, কণ্ট্রাক্টর ২০, উম্রিগড় ২৮, মানকড় ২৪, মঞ্জেরকার ২২ বিনাউড ৫৩ রাণে ৫ উইঃ বার্ক ৩৭ রাণে ৪ উইঃ)

[অষ্ট্রেলিয়া ৯৪ রাণে বিজয়ী]

ভারতীয় সঙ্গীত

সঙ্গীত একটি বিদ্যা, এবং শ্রেষ্ঠ বিদ্যা নামে পরিচিত, আমি বাল্যকাল হইতে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের উপর আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। কারণ, আমাদের বাড়িতে বংশপরম্পরায় সঙ্গীতের আলোচনা ও সাধনা চলিয়া আসিতেছে প্রায় ১২৫০ খৃঃ-অঃ হইতে। আমার পিতা ছিলেন শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী সঙ্গীতকেশরী ৺হারাধন চট্টোপাধ্যায়। বাঁকুড়া জেলান্তর্গত বিষ্ণুপুর সেই জন্যই সঙ্গীতের পীঠস্থান। আমিও জানিয়া আসিয়াছি "ক্লাসিক্যাল" বা প্রাচীন, শাস্ত্রবিধি সম্মত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ বা তন্নিম্নস্তরের ধামার, যাত্রা, প্রভৃতিকেই বুঝায়। সঙ্গীতের বিষয়গত গ্রন্থাদি কিছু সূক্ষ্ম অনুশীলনের ফলে আজ আমার সুদৃঢ় সরল একান্ত বিশ্বাস, ভ্রান্তিমূলক প্রতিপন্ন হইতেছে। আমি ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা সুইজ্যারল্যাণ্ড, জেনাভা, চীন বা পিকিংএ এবং আরও বহু স্থানে করিয়াছি। যতই আলোচনা করি, বিশ্বাস ততই হারাই। জীবনব্যাপী এই দৃঢ় সংস্কারটিকে ভ্রমাত্মক বলিয়া বর্জ্জন করিতেও অন্তরে বড়ই ব্যথা অনুভব করি।

ভাবিয়া দেখিতেছি ভ্রমাত্মক ধারণার মূলোচ্ছেদই কর্ত্তব্য। দেশের বহু সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত অনুশীলনকারী আজও ভ্রমাত্মক ধারণা অসঙ্কোচে ও বিনা দ্বিধায় অন্তরে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, ভ্রান্ত ধারণার মূলোচ্ছেদ করিয়া সত্যকে উপলব্ধি করা প্রত্যেক সঙ্গীত-সাধকের কর্ত্তব্য ও তাহা জনসাধারণের নিকট পরিবেশন করাও কর্ত্তব্য। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও তাহার ইতিহাস এ দেশের সকলেই জানেন, উহার স্বতন্ত্র পরিচয় অনাবশ্যক। প্রাচীন বা শাস্ত্র এই দুইটির ভাষার কিছু ব্যাখ্যার দরকার মনে করি। প্রাচীন বলিতে আমরা প্রাগৈতিহাসিক বা পৌরাণিক কাল বা যুগ বুঝি। শাস্ত্র বলিতে আজকাল নানারূপ অর্থ হইতেছে। যে কোন পদ্ধতি বা ব্যাকরণ, কিন্তু শাস্ত্র শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে শাসন বা অনুজ্ঞা। যাহা দেবতা বা মুনি-ঋষি প্রবর্ত্তিত। যেমন—বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, দর্শনাদি। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা এমন কোন সঙ্গীত-বিষয়ক নিয়ন্ত্রক মুনি-ঋষির গ্রন্থ পাই না, যাহাকে শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

আমরা 'ভারতের নাট্যশাস্ত্র' নামে একখানি প্রাচীন গ্রন্থ দেখিতে কিছু পূর্বে লিখিত বলিয়া মনে হয়। কারণ, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাই অনুমান করেন। এই গ্রন্থে সেই কালের অভিনয়কলার বিশদ বিবরণ বা বর্ণনা এবং সঙ্গীতের (গীত, বাদ্য, নৃত্য) নিতান্ত স্থূল বিবরণ পাওয়া যায়। তাহার দ্বারা সঙ্গীত নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবহার মোটেই চলে না। সে গ্রন্থের জন্মকাল মাত্র ১৪ কি ১৫ বৎসর বলিয়া মনে হয়, তাহাকে কি করিয়া শাস্ত্র মনে করিব? এই গ্রন্থটির রচয়িতা ভরত। কিন্তু এই ভরতটি কে? ব্রহ্মণেস্থধীত্য ভরতঃ সঙ্গীতং মার্গসঙ্গীতং। অপসরোভিশ্চ গন্ধর্বৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তবান।" (সঙ্গীতপারিজাত) এই শ্লোকে যে ঋষি ভরতের উল্লেখ করা হইয়াছে, ইনি কি সেই ভরত? নিশ্চয় নয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ভরতের নাট্যশাস্ত্র, প্রাগৈতিহাসিক যুগের নয়। এবং উহা পদ্ধতি নির্ণায়ক সঙ্গীতশাস্ত্র নয়। তার পর আমরা মতঙ্গ, কোহল, দত্তিল, পার্শ্বদেব, শার্ঙ্গদেব, নারদ, সোমনাথ, অহোবল, দামোদর প্রভৃতির যে গ্রন্থ দেখিতে পাই, তাহা ক্রমশঃ আধুনিকতর ও আধুনিকতম। নারদ—কিন্তু কোন্ নারদ তাহা জানি না। কোন কোন গ্রন্থকার বর্ণিত রাগ-রাগিণী ও মতবাদ পরস্পরের মধ্যে বিরোধ যুক্ত। কোন কোন গ্রন্থে আমরা ব্রহ্মমত, শিবমত, নারদমত, ভরতমত, হনুমন্মত, কল্লিনাথমত ইত্যাদি কতকগুলি মতের উল্লেখ পাই। কিন্তু ঐ মতের কোন বিশদ বিবরণ বা বর্ণনা তদ্‌বিষয়ক জ্ঞাপক তাহার কিছু সন্ধান কোন গ্রন্থেই পাই না। কোন কোন গ্রন্থে মতগুলির সামান্য কিছু বর্ণনা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সঙ্গীত নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবহার সম্বন্ধে কোন চিহ্নমাত্র ইঙ্গিত নাই। অতএব দেখিতে গেলে ঐগুলি কার্য্যতঃ আমাদের কোন উপকারে আসে না। মুসলমান রাজত্বের কিছু আগে, হিন্দু নরপতিগণের রাজত্বকালে এমন একটা সময় গিয়াছে বা যুগ গিয়াছে, যখন দেবতা বা ঋষি-প্রবর্ত্তিত ভারতীয় সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব এবং বিবিধ তথ্যের সন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র কবিযশঃস্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ও কবিত্বসম্পন্ন কতিপয় সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি ও ক্রিয়াসিদ্ধির সম্যক উপলব্ধিহীন হইয়াও গতানুগতিক রীতিতে কতকগুলি সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ স্বভাবসুলভ সারল্য বশতঃ নিজের নিজের সঙ্গীতে সম্যক্ জ্ঞানাভাব স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হননি। কারণ, তাঁহারা সত্যাশ্রয়ী। আবার অনেকেই তদানীন্তন প্রচলিত সঙ্গীতের (যাহার সহিত ঋষি প্রবর্ত্তিত সঙ্গীতের কোন সম্পর্ক নাই) কল্পিত বা অবোধ্য যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজ নিজ বুদ্ধিপ্রসূত নানা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যাহার সমাধান করা অসম্ভব। তাঁহারা যে সকল বিধি-নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার কোন প্রণালীর সন্ধান কিন্তু পাওয়া যায় না। এবং কোন গ্রন্থের সহিত কোন গ্রন্থের ব্যাখ্যার কার্য্যোপযোগী অর্থসামঞ্জস্য দেখা যায় না। সামগানের উল্লেখ বেদাদি গ্রন্থে অনেক পরিমাণেই পাওয়া যায়। কিন্তু উহার গাহিবার পদ্ধতি আজ সম্পূর্ণ লুপ্ত। কাশীধামে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ও ৺বিশ্বনাথজীর মন্দিরে যে বেদপাঠ হয়, তাহা গীতপদবাচ্য নয়। গাহিবার কোন শৃঙ্খলাযুক্ত পদ্ধতিও বড় একটা দেখা যায় না। বর্ত্তমানে যাঁহারা বেদপাঠ করেন, তাঁহারা পাঠ কালে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী ও সুর সহযোগে যাহা উচ্চারণ করেন, তাহা ... কিন্তু গীত নয়। মার্গসঙ্গীতের

নাম অনেক স্থানেই শুনা যায়। কিন্তু তাহার পরিচয় লাভের চেষ্টা করিলে মাত্র কয়েকটি শ্লোকের সন্ধান পা' যায়। আমার মনে হয়, মার্গীয় সঙ্গীত মর্ত্ত্য লোকবাসিগণের শুনিবার সৌভাগ্য কখন ঘটে নাই এবং ঘটিবার সম্ভাবনাও নাই। একটি শ্লোকের উল্লেখ করিতেছি। "মার্গদেশী বিভাগেন সঙ্গীতং দ্বিবিধং মতম্। স্বর্গে মার্গাশ্রিতং দেশ্যাশ্রিতং ভূতলরঞ্জকং।" (সঙ্গীতভাষ্য) দেখা যায় প্রাচীন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আজও লোকচক্ষুর অগোচর। আমরা কোন বিশেষ ঠিক মত সন্ধান পাই না। প্রাচীন সঙ্গীতের চিত্র মধুর কল্পনার মোহজালও ছিন্ন করিতে পারি না। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রথম সূচনা করেন প্রগানত সঙ্গীতসাধক "আমীর খসরু" (পারস্য দেশী) মহম্মদ টোগলগের সময় (খৃঃ-অঃ ১২৫৬ আন্দাজ) ইনি সম্রাট আলাউদ্দিনের মন্ত্রী ও সেনাপতির কাজ করিতেন। ইহাদের পর আজ প্রায় ২০০ শত বৎসর আর কোন সঙ্গীতের বিশেষ উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখিতে পাই না। ইতিহাসে দেখা যায়, গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহের একান্ত যত্নে ধ্রুপদ গানের বিশেষ সম্যক্ সংস্কৃতিপূর্ণ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এবং শুনা যায়, হরিদাস স্বামীর শিষ্য "রামতনু পাঁড়ে" বা তানসেন প্রথমে রাজা মানসিংহের দরবারে ছিলেন। এবং ঐখান হইতেই তিনি সম্রাট আকবরের দরবারে আহূত হন। আরও দেখা যায়, সম্রাট আকবর সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় মিঞা তানসেন কর্ত্তৃক যে রাগসঙ্গীত প্রবর্ত্তিত ও লিপিবদ্ধ হয়, সেইগুলিকে অধুনা পণ্ডিতগণ কিছু রূপান্তর করিয়া সেই স্বরূপের হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইহারও বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে প্রকৃত ভারতীয় সঙ্গীতের কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সঙ্গীতের আলো অতি ক্ষীণভাবে দেখা যায়। সঙ্গীতের প্রাচীন লিখিত শাস্ত্র নিশ্চয় আছে, আজ আমাদের অজ্ঞতায় ও সঙ্কীর্ণ মনের আওতায় আজ তাহা লুপ্ত। সাধনার প্রয়োজন আজ শুধু লুপ্তশাস্ত্র উদ্ধারের।

আরও একটি কথা বলিতে চাই। আজকাল দেখা যায় এক শ্রেণীর লোক বৈপ্লবিক চিন্তাধারার জন্য সঙ্গীত-জগতে আর একটি নূতন শিবির গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য সাধারণ মানুষ এবং মেহনতি জনতা নাকি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বুঝে না এবং শুনিতেও চাহে না। সেই জন্য তাঁহারা আধুনিক সুরের বিকল্পে অন্য কোন সুরে জনসাধারণের, সাধারণ দুঃখ-দুর্দ্দশার এবং তৎসঙ্গে গণজাগরণের গীত গাহিয়া থাকেন। তাহাকে চারণ গীত বলা যায়। আমিও স্বীকার করি তাহার প্রয়োজন আছে ও থাকিবেও। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জগতে মৃত হইয়াছে বা যাইবে। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কোন দিনই মৃত্যু হইবে না। হইতে পারে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জনসাধারণ বুঝে না বা বুঝিবার চেষ্টাও করেন নাই। কিন্তু তাহা জনসাধারণের দোষ নহে। কারণ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সঙ্গীতজ্ঞরা ইহা প্রচারে কৃপণতা করিতেন এবং রাজা, বাদশার মহলে তাঁহারা নিজ নিজ জীবন সুখনিদ্রায় কাটাইয়া গিয়াছেন। রাষ্ট্রের কাঠামো ওর জন্য কিছুটা দায়ী। জনসাধারণ উদরের জন্য উদয়াস্ত খাটিয়া এই মহান বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্র অনুশীলন করিতে পারে না। এবং তাহা অবসর।' [illegible] লালিত পালিত হইতেছে ধনীর প্রাসাদে এবং মুষ্টিমেয় সঙ্গীত-বিলাসীদের মধ্যে। সাধারণ জনতা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পছন্দ করেন, কারণ কয়েকটি বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রতেই বুঝা যায়। যদু ভট্ট, তানসেন, বৈজুবাওরা, টুনী, ইত্যাদি। ইহা প্রচারের ও প্রসারের চেষ্টা প্রত্যেকের করা উচিত।—ডাঃ শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

মার্কি রেডিও ও মেট্রো গোল্ডেন মেয়ার-এর যুক্ত প্রচেষ্টায় একটি সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতার তারিখ ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭। ঐদিন 'এম-জি-এম'-এর 'হাই সোসাইটি' ছবিটি বোম্বাই ও কলকাতায় একসঙ্গে মুক্তি পাবে। মার্কি মেট্রো সঙ্গীত প্রতিযোগিতার গায়িকাদের মধ্যে যিনি প্রথম স্থান অধিকার করবেন, তিনি ২৫০০৲ টাকার পুরস্কার লাভ করবেন; আর গায়কদের মধ্যে যিনি প্রথম হবেন তিনি ২০০০৲ টাকা অর্জন করবেন। প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশিত হবার এক বছরের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকাদের পাঁচটি ভারতীয় ছায়াচিত্রে একটি করে নেপথ্য সঙ্গীত গাইবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। গায়ক-গায়িকারা এই ভাবে তাঁদের পুরস্কারের টাকা লাভ করবেন। প্রতিযোগিতায় যোগদানেচ্ছু গায়ক-গায়িকাদের দরখাস্ত ১৫ই ডিসেম্বর সকালের মধ্যেই বোম্বাই-এর মেট্রো সিনেমার ম্যানেজারের হাতে আসা চাই। * * * আলী আকবর কলেজ অব মিউজিকের উদ্যোগে ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণের সাহায্যকল্পে একটি সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে যোগদান করবেন : আলী আকবর খাঁ, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা, পান্নালাল ঘোষ, বাহাদুর খান, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিষকুমার, কণ্ঠে মহারাজ, মহাপুরুষ মিশ্র প্রভৃতি। * * * ৭ই হইতে ১১ই ডিসেম্বর অবধি দক্ষিণ-কলিকাতার ইন্দিরা সিনেমা হলে পাঁচদিনব্যাপী সারা ভারত তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন হইতেছে, এবং আশা করা যাইতেছে, এই সম্মেলনে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য বিখ্যাত শিল্পিগণ অংশ গ্রহণ করিবেন। এই সম্পর্কে উক্ত সম্মেলনের উদ্যোগী তানসেন সঙ্গীত-সঙ্ঘের পক্ষে উহার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ নরেন দত্ত কারপোর আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উক্ত সংবাদ পরিবেশন করিয়া বলেন, সাধারণের মার্গ-সঙ্গীত শিক্ষার জন্য তাঁহারা ইন্দ্র রায় রোডে একটি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন। ১৯৪৩ সালে সঙ্ঘের উদ্ভব হয়। সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্র ব্যানার্জি জানান যে, "সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ'তে ফ্যাকাল্টি অব মিউজিক এবং আই-মিউজ পরীক্ষা দিবার জন্য এই তানসেন মিউজিক কলেজটিকে (তানসেন সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়) অনুমোদন করিয়াছেন।" তিনি বলেন, পাঁচদিনব্যাপী সম্মেলনে তিনটি অধিবেশন সারারাত্রি একটি সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি ও একটি সকালে হইবে। বাহির হইতে যে-সব শিল্পী আসিবেন তন্মধ্যে আছেন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, প্রঃ ভীমসেন যোশী, প্রঃ সোহন সিং, প্রঃ গুলাম সাদ্দাক হুসেন, পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজ, শ্রীমতী মাণিক বর্মা, শ্রীমতী সরস্বতী রাণে, কুমারী লীলা গাড়কার (নৃত্য), ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁন, ওঃ বিলায়েৎ খান, ওঃ আলি আকবর খান ওঃ শান্তাপ্রসাদ, প্রঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রঃ নিখিল ব্যানার্জি, প্রঃ ইমারাৎ খান এবং প্রঃ গুলাম জাফর খান। সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীকানাইলাল বসু দুঃখ করিয়া বলেন যে, প্রখ্যাত শিল্পিগণ বাবদ এই ধরণের সম্মেলন-উদ্যোক্তাদের অত্যন্ত ব্যয়াধিক্য বহন করিতে হয় বলিয়া এই সব সম্মেলন জনসাধারণের পক্ষে সুলভ করা যায় না। ইহার উপায় নির্ধারণে উদ্যোক্তাদের একটি ফেডারেশন গঠন করা যায় কি না তৎসম্পর্কে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ভাবিয়া দেখিতে বলেন।

রেকর্ড-পরিচয়

পূজায় অনেকগুলি রেকর্ড প্রকাশের পর স্বভাবতই কিছুটা অবকাশ চাই, তবু সম্প্রতি 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস' যে দু'খানি বিশিষ্ট রেকর্ড প্রকাশ করেছেন, তার বিষয় আমরা জানাচ্ছি :

N 87538—পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ-এর নাম পৃথিবী বিখ্যাত। এই দু'জন শ্রেষ্ঠ যন্ত্রী, সেতার ও স্বরোদ যন্ত্রে 'সিন্ধু-ভৈরবী' এবং 'সারাং' পরিবেশন ক'রেছেন একটি রেকর্ডের দুইটি দিকে। N 80119—মস্কো প্রত্যাগতা, ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের অন্যতমা কুমারী মীরা চট্টোপাধ্যায় দু'খানি শ্রেষ্ঠ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন ক'রেছেন। প্রথমখানি 'গুর্জরী-টোরী', দ্বিতীয়খানি 'ঠুমরী'। এমনি শ্রেষ্ঠ রেকর্ড উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতপ্রিয়দের সংগ্রহে রাখবার উপযুক্ত।

'অম্বপালী' N 82721—N 82723 স্বয়ংক্রিয় সেট্ রেকর্ড

বুদ্ধ-জয়ন্তীর স্মারক হিসেবে সম্প্রতি 'অম্বপালী' নামে একটি চমৎকার সেট বেরিয়েছে। মাত্র ৩ খানি রেকর্ডে সম্পূর্ণ হ'লেও সেট্‌টি গানে ও সংলাপে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যা সকলেরই ভালো লাগবে। রচয়িতা মুরারিমোহন সেন যে আঙ্গিকে এই নাটিকাটি রচনা করেছেন, সেটা রেডিও-নাটকের মতো এবং যেহেতু রেকর্ড-নাটকও কেবল শ্রাব্য—দর্শনীয় নয়, তাই সূত্রধারের মুখের জবানিতে গল্পটির বর্ণনা এবং মাঝে মাঝে চরিত্রচিত্রণে, সংলাপ ও সঙ্গীত প্রয়োগ বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। প্রাচীন বৈশালীতে বাস করতেন রাজনটী অম্বপালী, স্বয়ং মহারাজ তার অনুগ্রহপ্রার্থী, রূপ-যৌবনে উচ্ছল, ঐশ্বর্য-সম্পদে বিহ্বল এই নর্তকীর জীবনেও বুদ্ধের শান্ত পবিত্র প্রভাব কি পরিমাণে কার্যকরী হ'য়েছিল, তারই চমৎকার বিবরণ এই চিত্তাকর্ষক নাটিকা 'অম্বপালী'। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেছেন :—শ্রীমতী উৎপলা সেন (অম্বপালী), কুমারী আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় (শুভদা)। সমবেত সঙ্গীতে :—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর সেন, নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র ও অন্যান্য। সংলাপে :—বাণী চক্রবর্তী (অম্বপালী), গীতালি বসু (শুভদা), চন্দ্রশেখর দে (মহারাজ), পবিত্র মিত্র (আনন্দ) ও মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (সূত্রধার)।

বেতারের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান

২রা কার্তিক—ধীরেন্দ্র মিত্র—ঠুংরি। ৩রা—চরণকুমার বসু—গীটার, মঞ্জু রায়চৌধুরী—রবীন্দ্রসংগীত। ৪ঠা—এ দাগার—ধ্রুপদ, পান্নালাল ভটাচার্য্য—আধুনিক। ৫ই—চিন্ময়ী মুখোপাধ্যায়—খেয়াল, মহম্মদ সাগিরুদ্দিন—সারেংগী। ৬ই—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়—আধুনিক। ৭ই—সুবিনয় রায়—রবীন্দ্র সংগীত। ৮ই—অখিলবন্ধু ঘোষ—আধুনিক। ৯ই—অশোক সরকার—রবীন্দ্র সংগীত, ক্ষমা গুপ্ত—রবীন্দ্র সংগীত। ১৫ই—আলি আহম্মদ খাঁ—সেতার। ১৮ই—কাজী অনিরুদ্ধ—গীটার। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্র সংগীত। ২১শে—সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়—অতুলপ্রসাদের গান ও রবীন্দ্র সংগীত, সত্যেন ঘোষাল—খেয়াল। ২২শে—শ্যামলকুমার মিত্র—আধুনিক গীত, হিরণ্ময় পণ্ডিত—ঠুংরি। ২৩শে—নজির

আমার কথা (২২)

অধ্যাপক শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র

বলতে চলেছি অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন স্বরোদশিল্পী অধ্যাপক শ্রীরাধিকামোহন মৈত্রের জীবনের কয়েকটি কথা। রাধিকামোহন শিল্পী, বড় অপূর্ব বৈচিত্র্যে ঘেরা তাঁর জীবন। জন্মেছেন জমিদারবংশে, পাশ করলেন আইন, হলেন দর্শনের অধ্যাপক, জনসেবা করলেন পৌরসভার কর্মপরিচালক-রূপে, খ্যাতি অর্জন করলেন স্বরোদবাদক হিসেবে। বাঙলাদেশের রাজসাহী জেলা। তার মধ্যে তালন্দ গ্রাম। সেই গ্রামের স্বনামধন্য জমিদার, জেলাবোর্ডের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সদস্য শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্রের কৃতী পুত্র রাধিকামোহন জন্মগ্রহণ করলেন ১৯১৭ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখটিতে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে তের শ' তেইশ সালের বসন্তের প্রথম দিবস থেকে রাধিকামোহনের জীবনাট্যের সূত্রপাত। কেটে গেল শৈশব, বাল্যকাল, কৈশোর। রাজসাহী থেকে বি-এ পাশ করে দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে উত্তীর্ণ হলেন আইন পরীক্ষাতেও। ১৯৪০-৪১ রাজসাহী কলেজে দর্শনশাস্ত্রে পাঠ দিতেন আইনের ছাত্র রাধিকামোহন। আইন পাশ করার পর রাজসাহী পৌরসভার কর্মপরিচালনার (Commissioner) দায়িত্বভার গ্রহণ করেন রাধিকামোহন (১৯৪৩-৪৭)। কিছুকাল ঐ পৌরসভার শিক্ষাবিভাগের সচিবরূপেও দেখা গিয়েছিল রাধিকামোহনকে।

সঙ্গীতজ্ঞ রাধিকামোহনের সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত একটি কথাও বলা হয় নি। সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ কোন ঘটনাকেন্দ্রিক নয় বা হঠাৎ গজিয়ে ওঠাও নয়—ছেলেবেলা থেকে। পিতামহ ৺ললিতমোহন মৈত্র নিজে বাজাতেন তবলা—সেই সময় বাড়ীতে বহু বেতনভুক সঙ্গীতজ্ঞ থাকতেন। তাঁদের মধ্যেই অন্যতম ছিলেন ওস্তাদ আমীর খাঁ। ১৯২৯-৩৪ পর্যন্ত রাধিকামোহন গ্রহণ করেন এঁর শিষ্যত্ব। ঐ সময় খাঁ সাহেবের তিরোধান ঘটলে তখন থেকে ১৯৪৮ খৃঃ পর্যন্ত রাধিকামোহন শিক্ষালাভ করেছেন ওস্তাদ দবীর খাঁর কাছ থেকে। মামা স্বর্গীয় মদনমোহন রায় সেতার শিক্ষা করতেন ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁর কাছে—রাধিকামোহন অনুধাবন করে যেতেন সেই শিক্ষাদান পর্ব। নিখিল বঙ্গ-সঙ্গীত সম্মিলনীর এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগদান করে দু'টিতেই প্রথম হলেন রাধিকামোহন (১৯৩৪)। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখের সহযোগিতায় এঁরা প্রতিষ্ঠিত করলেন সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র 'ঝঙ্কার'। 'ঝঙ্কার' এর নাম আজ আর কারোরই অজানা নেই। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দের নেতৃত্বে এক সরকারী সাংস্কৃতিক অভিযানে রাধিকামোহন চীনে যান। আজ রাধিকামোহনের ছাত্রদের মধ্যে শ্রীবুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ও শ্রীমতী সন্ধ্যা ঘোষের নাম অনায়াসে উল্লেখ করা যেতে পারে। তা ছাড়া নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, পাটনার সেতারী অরুণ চট্টোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীরাও মাঝে মাঝে পাঠ নিয়ে থাকেন রাধিকামোহনের কাছ থেকে। সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে অধ্যয়নও সমভাবেই বজায় রেখেছেন শ্রীমৈত্র। ইনি বর্তমানে 'Psychology of Music' এবং 'Esthetics of music' বিষয়ে গবেষণা করছেন। সফল হউক এঁর শ্রম স্বীকার।

আজকের দিনের সঙ্গীতের সম্বন্ধে রাধিকামোহন বলেন যে, এই বিরাট শিল্পের প্রতি আজ আক্রমণ হয়েছে দলাদলির। অন্যান্য জায়গায় বছরে একটি করে সঙ্গীতাধিবেশন বসে, কিন্তু এখানে দেখুন বছরে কতগুলি হয়—বলা হয় আমরা এতে করে সঙ্গীতের প্রচার করছি এবং তা তাকে ভালবাসি বলেই—এইটে খাঁটি মিথ্যে কথা—ভালবাসি বলে নয় রেষারেষির খাতিরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান সম্বন্ধে অধ্যাপক মৈত্রের অভিমত যে, এ ব্যবস্থা সুফলদায়ী মোটেই নয়। সঙ্গীত একটি বিরাট শাস্ত্র। চার বছরে তা শেখানো অসম্ভব আর গণ্ডীধরা বাঁধাধরা পঞ্চাশ মিনিটের ক্লাসে কখনও এ জিনিষ পরিপূর্ণ ভাবে শেখানো সম্ভব নয়। হবে না কেন? শিক্ষার্থীরা দেখবেন ডিগ্রীই পাবে কিন্তু শিল্পী হবে না। টোলের ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত—বিশ্ববিদ্যালয়ে হোক পরীক্ষা গ্রহণকেন্দ্র —আর কয়েকটি ছোট ছোট শিক্ষাকেন্দ্র হোক প্রতিষ্ঠিত তাঁরা বছর বছর যাদের যাদের বুঝলেন যোগ্যতা অনুসারে তাদের পাঠাবেন পরীক্ষা দিতে। এক-এক জনকে যত দিন করে দরকার হয় শিক্ষা দিতে হবে, তার মধ্যে আনতে হবে পূর্ণতা, তবেই তো শিক্ষাদানে সার্থকতা। ছাত্রদেরও দিতে হবে স্বাধীনতা। তারা যাঁর কাছে শিখতে ইচ্ছুক তাঁদের কাছেই তাদের শিক্ষা দিতে দেওয়া হোক। অনেক গুরু মনে করেন যে তাঁরই রাগ-রাগিণী বুঝি তাঁর ছাত্র মেরে দিলে—এ হতে পারে না, যদিও তা মারে কিন্তু গুরুর দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা সে যত বুদ্ধিমানই হোক তা কেমন করে মারবে? সরকারের সহানুভূতির আশা খুবই কম। তাঁরা চান যে তাঁদের হুকুমে সঙ্গীতশাস্ত্র চলুক। জিজ্ঞাসা করি, চীনে গিয়ে কি অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন? অধ্যাপক রাধিকামোহনের কাছ থেকে উত্তর আসে—ওদের সঙ্গীত আমাদের মত উন্নত নয়, ওখানকার সঙ্গীত দুই ভাগে বিভক্ত প্রাচীন ও আধুনিক। শেষেরটি হুবহু পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুকরণ, নিজস্বতা তাতে বিন্দুমাত্র নেই। অর্কেস্ট্রায় অবশ্য ওরা আমাদের থেকে এগিয়েই আছে।

শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র

আবার মামুলী কথাবার্তা। ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা। তারপর বিদায়ের পালা। নমস্কারান্তে শিল্পীর তিলজলাস্থ ভবন থেকে বেরিয়ে আসেন। লেভেল ক্রসিং বন্ধ। দাঁড়াতে হয় কিছুক্ষণ। যথাসময়ে ছাড়পত্র পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে এগোতে থাকি শহর কলকাতার দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে। অপরাহ্ণের আভাস একটু একটু করে হচ্ছে অনুভূত। কর্ণকুহরে ভেসে আসছে কোনো দূরগামী ট্রেনের হুইসলের সুতীক্ষ্ণ শব্দ।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন সম্প্রতি আগ্রায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সম্মেলন সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করবার আগে "যুগান্তর" পত্রিকার প্রত্যক্ষদর্শী চীফ রিপোর্টার যা লিখেছেন, তাই উদ্ধৃত করে আরম্ভ করছি। লিখেছেন: "গত কয়েক বছর যাবতই দেখা যাচ্ছে, বাঙ্গালীদের এই বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মধ্যে সাহিত্যের ভাগটুকু ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং সম্মেলনের অংশটুকু বড় হচ্ছে। এটাকে ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের বাঙ্গালীদের মিলনের একটা অবসর বলে গণ্য করলে অবশ্য কোন খেদ থাকে না। কিন্তু সাহিত্য সম্মেলনের নামে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে তার সঙ্গে আধুনিক কালের বাঙ্গলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণকে যুক্ত করার জন্ম উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে যে আরও বেশী চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন, এটা সম্মেলনে পা দিয়েই অনুভব করা যায়। আর একটা জিনিষ যা চোখে লাগে তা হল, সম্মেলনের পিছনে যেন একটা 'সিরিয়াসনেসের' অভাব, কেমন যেন একটা গা-ছাড়া ভাব। যেন আসতে হয় তাই আসা। প্রথম দিন সকালে যখন অধিবেশনের উদ্বোধন হল, তখন প্রতিনিধিদের অনেককেই সেখানে দেখা গেল না। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বেরিয়েছেন 'সাইটসিংয়ের' অর্থাৎ দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখতে।"

চমৎকার সম্মেলন! সাহিত্য সম্মেলন হিসেবে আরও চমৎকার! কন্‌সেশনে ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায় বলে কিছু বাঙালী ভদ্রলোক হাওয়া-বদলের জন্য দেশ ঘুরে আসেন। যাঁরা প্রতিনিধি হয়ে যান, তাঁদের মুখেই আমরা একথা শুনেছি। তাঁরা নিজেরাই বলেন: "এমনি তো চেঞ্জে যাওয়া হয় না, কয়েক দিন একটু ঘুরে আসা যাক্"। অথচ এককালে প্রবাসী বাঙালীর এই সাহিত্য সম্মেলন বাঙালীর গৌরবের অনুষ্ঠান ছিল। এখন সেই সম্মেলন এক দল হতাশ সাহিত্যপ্রেমিকের বাৎসরিক গুলজারের ব্যাপার হয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র গতি ও প্রকৃতি, নবীন উদ্যম পরীক্ষা-নীরিক্ষা, বিপুল জটিলতা ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণত যাঁরা কোন খোঁজখবর করার, অথবা চিন্তা করার প্রয়োজনবোধ করেন না, এবং যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের যুগেই বাস করছেন, আধুনিকতার প্রতি স্বভাবসুলভ বিদ্বেষভাব পোষণ করেন, তাঁরাই প্রধানত ঘুরে-ফিরে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে যান। আধুনিক বাংলা সাহিত্য যাঁদের বিচিত্র দানে সব দিক দিয়ে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে, অনেক ভুলভ্রান্তির ভিতর দিয়ে, সেই সাহিত্যিকগোষ্ঠীর তের হাত নাম 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' এবং প্রতি বছরই তা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সাড়ম্বরে। সাহিত্যের 'vested-interest' এর এরকম হাস্যকর ব্যঙ্গোৎসব বাঙালীর মর্যাদাবৃদ্ধি করবে বলে আমাদের ধারণা নেই। শ্রীকুমার-কালিদাস প্রমুখ 'ডক্টর'-সভাপতিরা বারোয়ারী দুর্গোৎসবের উদ্বোধনে আজও হয়ত কাজ চালাতে পারেন, কিন্তু আধুনিক বঙ্গসাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির কোন 'serious' সম্মেলনে তাঁদের অমৃতবাণী যে কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে অত্যন্ত শ্রুতিকটু মনে হয়। 'ডক্টরদের' diagnosis একেবারে ভুল। যেমন শ্রীকুমারের শ্রীমুখের সাহিত্যরচন, তেমনি শ্রীকালিদাসের সাংস্কৃতিক কথামৃত! শ্রীকুমারের মার্কিষ্ট ফরোয়ার্ড-ব্লকপন্থী সাহিত্যবিচার (অধুনা কংগ্রেসী) "প্রবাসী" বাঙালীদের মনে যে-রসেরই সঞ্চার করে থাক, "বঙ্গীয়" বাঙালীদের মনে তা রীতিমত বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। সাহিত্য-বিচার আর ইলেকশন-প্রপাগাণ্ডা যে এক নয়, একথা শ্রীকুমার বাবু আর কবে বুঝবেন? আর সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্যোক্তারাই বা কবে বুঝবেন যে সম্মেলনের নামে সাহিত্যের এই 'গ্র্যাণ্ড সার্কাস' বাঙালীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণই করবে, বৃদ্ধি করবে না?

বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশকের কাহিনী

'পেঙ্গুইন' কোম্পানীর বইয়ের কথা জানেন না বা শোনেননি, এমন কোন শিক্ষিত লোক আজ পৃথিবীর কোন দেশে আছেন কি না সন্দেহ! এই বিশ্ববিখ্যাত প্রকাশকরা সম্প্রতি "Penguin story" নাম দিয়ে তাঁদের প্রকাশন-ব্যবসায়ের কাহিনী প্রকাশ করেছেন। সহজবোধ্য সরল ভাষায় এই ছোট বইখানির মধ্যে বিরাট একটি প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাহিনী যে ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রত্যেক প্রকাশক ও পুস্তক-ব্যবসায়ীর অবশ্য-পাঠ্য বলে আমরা মনে করি। বাংলাদেশে প্রকাশন-ব্যবসায়ের ক্রমোন্নতি খুবই আশাপ্রদ। সম্প্রতি অনেকে এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও কি ভাবে একটি প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হয়, কি ভাবে পাণ্ডুলিপির স্তর থেকে মুদ্রণের 'ফাইন্যাল' স্তর পর্যন্ত একটি বই সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিকল্পনা করতে হয়, এত কথা আমাদের দেশের প্রকাশকরা বিশেষ চিন্তা করেন না। কিন্তু চিন্তা করার প্রয়োজন আছে এবং চিন্তার পর্যাপ্ত খোরাক তাঁরা পেঙ্গুইনের এই কাহিনী থেকে পেতে পারেন। সামান্য মূল্যের এই অতি মূল্যবান ছোট বইখানি আমরা তাই বাঙালী প্রকাশকদের পাঠ করতে অনুরোধ

পূর্ব-পাকিস্তানে বঙ্গভাষার সমাদর

সম্প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানের রাজস্ব-বিভাগ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বাংলাভাষায় সমস্ত সরকারী চিঠিপত্র লেখা হবে। রাজস্বমন্ত্রী জনাব মামুদ আলী বলেছেন যে, অন্তর্বর্তীকালে ফাইলে ও চিঠিপত্রে ইংরেজী ভাষা মধ্যে মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে চিঠিপত্র লেখার সময় অবশ্যই বাংলা ভাষায় লিখতে হবে। পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের এই সিদ্ধান্তে বাংলা ভাষভাষী প্রত্যেকে গৌরববোধ করবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এদিক দিয়ে এখনও কিছুটা পিছিয়ে আছেন, লজ্জার কথা! সাধারণ লোকের কাছে ইংরেজীতে চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস তাঁরা এখনও ছাড়তে পারেননি। যাঁরা চিঠিপত্র লেখেন, তাঁরা কি বাঙালী নন? যদি তা না হন, তাহলে বাংলাদেশের সরকারী দফতরে চাকরি করতে হলে কি বাংলা ভাষা জানবার প্রয়োজন হয় না? বাংলা ভাষায় চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারেও তো পরীক্ষা নেওয়া উচিত তা হলে? এ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও বেশি সচেতন ও অবহিত হবেন আশা করি। ইংরেজী ভাষা তুলে দিয়ে হিন্দীভাষা চালু করার পক্ষপাতী আমরা নই, অনেকেই নন। কিন্তু বঙ্গীয় সরকারের সঙ্গে বাঙালী জনসাধারণের পত্রের আদান-প্রদান সব সময় বাংলা ভাষায় হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

শিল্পচর্চা

শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু এখনও পূর্ব্বের মতই নিরলস সাধনায় আত্মমগ্ন। রেখার রূপ আর রাগের গান গেয়ে চলেছেন অবিরত। বর্তমানে যখন আমাদের শিল্পধারায় পিকাশো, মাতিশ, ড্যালী, হেনরী মুর আর এপষ্টিনকে অনুকরণ করবার অক্ষম প্রচেষ্টা চলেছে, তখন 'শিল্পচর্চা' গ্রন্থ প্রকাশ ক'রে আচার্য্য নন্দলাল আমাদের দেশবাসীর যথেষ্ট উপকার ক'রেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, চিত্রাঙ্কনের রীতি নীতি, পদ্ধতি আর ছবি আঁকার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের পরিচয় পাওয়া যাবে, এমন ধরণের বই বাঙলা ভাষায় ছিল না। 'শিল্পচর্চা' সেই প্রকট অভাব পূরণ করলো এত দিনে। আচার্য্য নন্দলাল শিল্পজগতে বিশেষ এক ধারার সৃষ্টি করলেও, তিনি নিজে চিরকালই দেশী প্রথা আর পদ্ধতি পালন ক'রেছেন। অর্থাৎ ইটালী, ফ্রান্স, স্পেন দেশীয় শিল্প পরীক্ষায় কখনও মত্ত হন নি। শিল্পচর্চা গ্রন্থটিও যেন বাঙলা দেশের বিশেষ শিল্পধারার পরিচয় বহন করেছে। শিল্পী মাত্রেই আঁকেন, কিন্তু ভবিষ্যতের শিল্পীদের জন্যে কে আর ভাবতে বসেন! বহু চিত্রে শোভিত 'শিল্পচর্চা'য় সেই চিন্তা আর দিকনির্দ্দেশের সন্ধান পাওয়া যায়। শিল্পানুরাগীদের কাছে শুধু নয়, প্রত্যেকের কাছেই এই মূল্যবান গ্রন্থ সমাদৃত হবে। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট। কলিকাতা মূল্য পাঁচ টাকা ও সাড়ে ছ' টাকা।

রূপযানী

শিল্পী ও শিল্প সম্পর্কে বাঙলায় যে ক'খানি 'প্রামাণিক' বই আছে তাদের অধিকাংশই বড় বেশী গুরুভার এবং দুষ্পাচ্য আদপেই নয়। শিল্প-সমালোচক বা 'আর্ট ক্রিটিক' যে ক'জন আছেন, তাঁরা আবার অন্যের লেখা থেকে ভূরি ভূরি উদ্ধৃতি (uation) না তুলে কোন কথাই বলতে পারেন না। আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল ব্যতীত শিল্প বিষয়ে সহজ কথায় কা'কেও কিছু বলতেই শোনা যায় না। কিন্তু সুখের কথা, বর্তমানে কয়েক জন সত্যিকার শিল্পসমালোচকের লেখা মিলছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, আলোচ্য গ্রন্থের লেখক রমাপদ চৌধুরী আধুনিক সাহিত্যে গল্প এবং উপন্যাস রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মন্দির এবং মূর্তি-ভাস্কর্য্যের পটভূমিকায় রচনা করেছেন এই মূল্যবান গ্রন্থ। চিত্তাকর্ষক ভাবামাধুর্য্য, অপূর্ব বাচনভঙ্গীর সঙ্গে তিনি একত্র ক'রেছেন বহুবিধ অজ্ঞাত তথ্য—যা অনেকেই জানেন না। পাকা সমালোচকের মত কঠিন দৃষ্টিকোণে না দেখে শিল্পিমনের দরদভরা সহানুভূতির সঙ্গে লেখক 'রূপযানী'র রূপ দিয়েছেন। বহু দুষ্প্রাপ্য ছবি এই বইটির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। মনোরম প্রচ্ছদ। 'রূপযানী' উপহারের পক্ষে অতুলনীয়। ছাপা ও বাঁধাই উল্লেখযোগ্য। সরস্বতী গ্রন্থালয়। ১৪৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

দশকুমার চরিত

বর্তমানে সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যের প্রচার এবং প্রসারের কাজে দেশনেতাদের কা'কেও কা'কেও কথা বলতে শোনা যাচ্ছে। এই প্রচারের কাজে শুনেছি, একটি সরকারী সমিতিও গঠিত হয়েছে। ফল কি হবে এখনই বলা না গেলেও একটি কথা সহজেই বলা যায়, সরকারী এই প্রচেষ্টায় দেশবাসী যদি জেগে না ওঠে, তবে কি ফল হবে সমিতি গঠনে আর অর্থব্যয়ে? বাঙলা সাহিত্য কিন্তু দিনে দিনে আত্মপুষ্ট হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ কাজে। রূপকের রাজা মহাকবি দণ্ডীরচিত 'দশকুমার-চরিত' মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার অপরিচিত নয়। কিছুকাল আগে ধারাবাহিক পাঠ করেছেন তাঁরা। সমাজের বিকারগ্রস্ত অধোগতি দেখে অধীর হয়েই যেন দণ্ডী দশকুমার-চরিত রচনা ক'রেছিলেন। হীন সমাজ-ব্যবস্থার মূলে যেন আঘাত হেনেছেন কবি; প্রতিবিধানে উদ্যত হয়েছেন। দণ্ডীর চিত্র-সরল ভাষা-নৈপুণ্যের রসিক সংস্করণ এই আলোচ্য গ্রন্থ। অনুবাদের কাজে প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর যে পরিমাণ দক্ষতা দেখিয়েছেন, তজ্জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থটির ছাপা ও বাঁধাই উল্লেখযোগ্য। শনিরঞ্জন প্রেস। ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

শ্যামাপ্রসাদের কয়েকটি রচনা

গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় অতুল গুপ্ত বলছেন, "শ্যামাপ্রসাদের ব্যক্তিত্বের পৌরুষ ও তাঁর একাগ্র নিরলস কর্মজীবন দেশের গৌরবের বস্তু। শক্তি ও কর্মোদ্যমের মধ্যাহ্নে স্বাধীন ভারতবর্ষে এই দেশকর্মীর রাজবন্দিদশায় মৃত্যুর শোক দেশের মনে অনির্বাণ রয়েছে। শ্যামাপ্রসাদের জীবনের স্পর্শ যাতে আছে, দেশের লোকের তা প্রিয়। এই রচনাগুলি তাঁর জীবনের গতির বেগে স্পন্দমান।" গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে, 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'শরৎচন্দ্র ও ভারতচন্দ্র', 'পঞ্চাশের মন্বন্তর', 'শিক্ষা-সম্প্রসারণ', 'দিল্লীর অভিভাষণ', 'কটকের অভিভাষণ',

'স্বামী প্রণবানন্দজী', 'একখানি চিঠি' এবং 'বাঙলার রঙ্গালয়'। কতকগুলি লেখার তর্জমা করেছেন অধ্যাপক বিভাস রায়চৌধুরী। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ। ১৪, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

Eight Years Of D. V. C.

সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং সংগ্রাহক হিসাবে শ্রীঅমল হোমের নাম আমাদের কাছে সুপরিচিত। বর্তমানে তিনি দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের প্রচার অধিকর্তার পদে অধিষ্ঠিত। ডি, ভি, সি কোথায়, এবং কি ধরণের—তারই পরিচায়ক আলোচ্য ইংরাজী পুস্তিকাটি। বহু রকমের তথ্য আর তত্ত্ব সম্বলিত। শুধু লেখায় মন ভরে না, তাই আছে পাতায় পাতায় নানারকমের ছবি। জহরলাল নেহেরু থেকে কুলীকামীন—সকলেরই সচিত্র পরিচয় পাওয়া যাবে। একখানি প্রচার পুস্তিকা যে কি পরিমাণ হৃদয়গ্রাহী হ'তে পারে, শ্রী হোম অক্লান্ত পরিশ্রমে তাই-ই প্রমাণ করেছেন তাঁর স্বভাব-সুলভ সম্পাদনা কৃতিত্বে। প্রকাশক দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন।

ভারতের সাধক

ভারতবর্ষের সাধক আর সাধনার কথা পৃথিবীর সকল দেশেই বিখ্যাত। এই সাধুখ্যাত দেশে আসল এবং নকল সাধু যে কত আছেন তার কোন সীমা-সংখ্যা নেই। আসল সাধুদের মধ্যে সাধনমার্গে যে কে কতটা উঠেছেন, আমরা কেউ জানতে পারি না। যাই হোক, সাধু যত আছেন তত আছে সাধক-সম্প্রদায়। নানা সাধুর (মুনি?) নানা মত। আবার যত মত তত পথ। অনেক সন্ন্যাসী'ত শুধু যে গাজনই নষ্ট হয় তা নয়, অনেক সাধুতে ধর্মকেও বিনষ্ট হ'তে দেখা গেছে দেশে-বিদেশে। তবুও অনুচররা যে যাই করুন, সাধুই হোন আর ভস্করই হোন, ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু সাধকের আবির্ভাব হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে সর্ব্বশ্রী আচার্য্য রামানুজ, মধুসূদন সরস্বতী, ভক্ত দাদূ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ভগবানদাস বাবাজী, ভোলানন্দ গিরি, প্রভু জগবন্ধু, সন্তদাস বাবাজী প্রভৃতি বিভিন্ন সাধকদের জীবন এবং জীবনদর্শন সম্পর্কে একেকটি পৃথক আলোচনা আছে। সাধকজীবনের অন্তর্গূঢ় তথ্যাদির নির্ণয়ে লেখক যে মনোজ্ঞীর পরিচয় দিয়েছেন, তাতে বিচার-ও যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে মিলেছে শ্রদ্ধা ও অন্তর্দৃষ্টি। রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

ব্যালেরিনা

বিদেশের পটভূমিতে গল্প এবং উপন্যাস রচনায় খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। 'ব্যালেরিনা' তাঁর সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস। নায়ক সুশোভন সংছাত্র, হঠাৎ প্রেমে পড়লো এক জর্মণ-কন্যার সঙ্গে। তার নাম গিজলা। প্রথম আলাপ থেকে ক্রমেই ঘনিষ্ঠতা হয় পরস্পরে। উপন্যাসও জ'মে উঠতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য নিজের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখতে গিজলা ত্যাগ ক'রে যায় সুশোভনকে এবং বিয়ে করে একজন ইংরেজকে। সুশোভনের লেখাপড়ার উদ্যোগে ইতি পড়ে। শেষ কালে এক হোটেলে তাকে কাজ নিতে হয়। 'ব্যালেরিনা'য় অনেক চমকপ্রদ ঘটনা আছে। বিলেতে গেলে ভারতীয়দের সুবিধা-অসুবিধার কথাও অনেক আছে। লেখকের

ভবঘুরের চিঠি

'দৈনিক বসুমতী'র প্রাক্তন সম্পাদক ৺উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার নূতন পরিচয় দেবার প্রয়োজন করে না। ভবঘুরের চিঠির রচনাগুলি প্রধানতঃ 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন সময় এবং সেই সময়ই পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রচনাগুলি সম্পাদককে পত্রাকারে লেখা। সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম্ম—সব কিছুই এসেছে আলোচনার মধ্যে, অথচ এমন সরস ও জীবন্ত রচনা বিরল বললেও অত্যুক্তি হবে না। এই গ্রন্থের শেষাংশে 'সুভাষচন্দ্র' সম্বন্ধে লেখকের ব্যক্তিগত পরিচয়ের কয়েকটি অপূর্ব্ব স্মৃতিচিত্র স্থান পেয়েছে—যা পাঠককে মুগ্ধ করে। এক কথায়—সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত বাঙলা বই-এর মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলেই গণ্য হবে আশা করা যায়। ছাপা বাঁধাই ভালো। শ্রীঅন্নদা মুন্সীর আঁকা প্রচ্ছদটি অভিনব। ন্যাশনাল পাবলিশার্স। বিক্রয়-কেন্দ্র পুঁথিঘর, ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি—৬। দাম ২।০

তুমি যেয়ো না

আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকা বাণি দেবীর রচনার সঙ্গে মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার অপরিচয় নেই। বসুমতী ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখিকার গল্পগুলির পুস্তকাকার 'তুমি যেয়ো না।' লেখিকা বিয়োগান্ত গল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত। সমাজের বৃহৎ সমস্যা নয়, সাধারণ কতকগুলি সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে, ঘরোয়া কাহিনীর পরিবেশে লেখিকা গল্প পরিবেশন করেন। গল্পগুলির মধ্যে ব্ল্যাকব্রিজ, ভ্রান্তপথিক, দরবারী কানাড়া সত্যিই উল্লেখযোগ্য। লেখিকার ভাষানৈপুণ্য দক্ষতার পরিচায়ক। ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ। ৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

ক্রিকেট খেলার অ, আ, ক, খ

ক্রিকেট খেলা নাকি সাধারণের খেলা নয়, লর্ডস গেম। শীত পড়তে না পড়তে প্রায় সকল বাড়ীর শিশু এবং কিশোররা আজকাল ক্রিকেটের ব্যাট নিয়ে মাঠের দিকে ছোটে। বিখ্যাত খেলোয়াড়দের নাম তাদের মুখে মুখে ফেরে। যাই হোক, যে কোন খেলাই যে খেলতে হ'লে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়, আশা করি তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। বিখ্যাত খেলোয়াড় ডন ব্র্যাডম্যানের লেখা 'ক্রিকেট খেলার অ, আ, ক, খ.' সেই কারণেই শিশু এবং কিশোরদের পক্ষে মূল্যবান গ্রন্থ। অনুবাদক 'পরীক্ষিৎ' অনুবাদের কাজে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বইখানিতে প্রচুর ছবি আছে শিক্ষানির্দেশের প্রয়োজনে। আর্ট এ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, কলিকাতা। মূল্য উল্লেখ নেই।

বিদেশী রূপকথা

আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকা ইন্দিরা দেবীর 'বিদেশী রূপকথা'য় ভিন্ন ভিন্ন দেশের পনেরোটি রূপকথার গল্প আছে। গল্পগুলির প্রায় অধিকাংশই ইতিপূর্ব্বে বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছে। বর্ত্তমানে বাঙলা শিশুসাহিত্যে সব কিছুকে 'ন্যাকামি'র সঙ্গে ব্যক্ত করার একটা রেওয়াজ প্রকট হয়ে উঠেছে—যার ফলে শিশু-সাহিত্যের হালের হাল প্রায় ভাঙতে বসেছে। রূপকথার গল্প লেখার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ এক ভাষাজ্ঞানের এবং কবিত্বসুলভ অনুভূতির —যা বিরল হলেও এই গ্রন্থের লেখিকা তাদের থেকে বঞ্চিত নয়; বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি। অশোক পুস্তকালয়, ৬৪
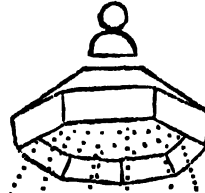
নিম তৈল থেকে
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে
প্রস্তুত সুগন্ধি
মার্গো সোপের প্রচুর
ফেনা যেমন
নির্মলকর তেমনি
জীবাণুনাশক।
মার্গো সোপ দেহের
কান্তি উজ্জ্বল করে।
কোমল ত্বকের
পক্ষেও ব্যবহার করা
সম্পূর্ণ নিরাপদ।
স্নানের সময়
ব্যবহার করতে ভুলবেন না
MARGO
SOAP
HYGIENIC TOILET SOAP
মার্গো
সোপ
ক্যালকাটা কেমিক্যাল
কোম্পানি লিমিটেড
কলিকাতা ২৯

মঞ্চ-পর্দ্দা ও যাদুর কথা

যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার

বাংলা রঙ্গমঞ্চের গোড়ার কথা থেকে সুরু হোক। যে সময় পাবলিক থিয়েটার গড়ে উঠেছে—তখনকার যুগের এক শ্রেণীর দর্শক সারা রাত থিয়েটার দেখা এবং ভোরে গঙ্গাস্নান করে ইলিশ মাছ নিয়ে ঘরে ফিরে আসার প্রোগ্রাম করে থিয়েটার দেখতে যেতেন। থিয়েটারের দোতলা অথবা তেতলায় জেনানা-সিটে যাঁরা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বসে "প্লে" দেখতেন, ড্রপ-সিন পড়ার পর জেনানা-মহলের তদ্বিরকারিণীই বলুন আর 'ঝি'ই বলুন, তাঁদের কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে "ওগো হাটখোলার মুখুজ্জ্যে বাড়ীর কাদম্বিনী—গো—" এখনও যেন কানে ভাসছে। সেই পাবলিক থিয়েটারের প্রথম পর্য্যায়ে সেই গঙ্গাস্নান ও ইলিশ মাছের যুগে কর্ত্তারা অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তারা মানুষের ভাবাবেগকে কেন্দ্র করে নাটকীয় রসধারাকে সঞ্জীবিত করতেন। এর সঙ্গে সিনসিনারীতে দর্শকদের আশ্চর্য্য করার মতন আয়োজন পর্য্যায়ে পেছন দরজা দিয়ে ম্যাজিকের কলাকৌশল খানিকটা নিয়ে আসা হয়েছিল। সল্মা-চুমকির কাজকরা ভেল্‌ভেটের পোষাক, ঝুটোহীরে বসানো মাথায় তাজ, চকচকে পালিশকরা তরোয়াল কোথায়ও বা জীবন্ত অশ্বে আরোহিণী নায়িকার মঞ্চে আত্মপ্রকাশ, উড়ন্ত উর্ব্বশী, ডুবন্ত প্রেমিকা প্রভৃতির চিত্তাকর্ষক ও লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখে দর্শকগোষ্ঠী খুসী হয়ে বলতেন—"পয়সা উশুল হয়েছে।" মাইকেল যুগ, গিরিশচন্দ্রের যুগ, অমৃতলালের যুগ পার হয়ে রবীন্দ্রোত্তর ও শিশির ভাদুড়ীর যুগ এসে থিয়েটারী আর্টে যা পরিবর্ত্তন ঘটে গেল তা কেউ ভাবতেই পারে নি! কিন্তু কি পরিবর্ত্তন হল? চুমকি-লাগানো ভেলভেটের পোষাক 'অখাদ্য' রূপে বর্জ্জিত হলো, রোলারে বাঁধা ক্যানভাসে আঁকা আলগা বাঁধা সিনের বদলে সেটসিন্, রিভলভিং ষ্টেজ এবং কোথাও কোথাও রঙ্গীন সিন বর্জ্জন করে শ্রেফ স্নিগ্ধ সবুজ রংয়ের পর্দা পিছনে টাঙিয়ে—অভিনয়ের ব্যবস্থা হল। বিদগ্ধ সমাজের মার্জ্জিত রুচির সঙ্গে তাল রেখে নাট্যকারকে সংলাপ তৈরী করতে হল—বিষয়বস্তু খিস্তিবর্জিত শোভন ও সভ্যতার আদর্শে রূপায়িত করতে হল।

এ তো গেল রঙ্গমঞ্চের কথা। ছায়াচিত্রের বয়স অপেক্ষাকৃত কম বটে—কিন্তু 'ডেঁপোমি'তে চলচ্চিত্র থিয়েটারকে হার মানিয়েছে! কিন্তু কলারসিকদের চাপে পড়ে বাংলাদেশের ফিল্মে ডেঁপোমি বাড়তে পায় নি যেমনি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে হিন্দী ফিল্মে। সারা ভারতের মধ্যে বাংলার কৃষ্টির একটা বিশেষ রূপ আছে। সূক্ষ্মরসবোধ, শালীনতা এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে চিন্তাশীল বাঙ্গালীজাতি আজও অগ্রগামী। তাই আজ মুমূর্ষু রঙ্গমঞ্চ অথবা ফিল্মে আমরা যেটুকু আনন্দ পাই তার দাম অনেক।

ঠিক এই কথা ম্যাজিক সম্পর্কে প্রসঙ্গত এসে পড়ে। মোগল আমলে অথবা এদেশে ইংরেজ আসার যুগ-সন্ধিক্ষণ পর্য্যন্ত যাদুবিদ্যার যে সংমিশ্রিত চেহারা ছিল এবং আনন্দ পরিবেশনের ব্যাপারে তখনকার যাদুকরগোষ্ঠী যে পন্থা বেছে নিয়েছিলেন, আজ তার চিহ্নমাত্র নাই। এঁর পরবর্ত্তীকালে অর্থাৎ যে যুগে থিয়েটার 'পাবলিক' লেবেল গায়ে এঁটে আনন্দ পরিবেশন করছিল ঠিক সেই যুগেও ম্যাজিকের চেহারা যা ছিল তার সঙ্গেও এই বিশ শতকের পঞ্চাশোত্তর যুগের ম্যাজিকের চেহারার বিরাট ব্যবধান আছে। ঐ যুগেও মড়ার মাথা, চণ্ডালের হাড় দেখিয়ে লোককে আতঙ্কিত করা হোত এবং ভূতের কাণ্ডকারখানার ভণিতায় লোককে স্তম্ভিত করার অপচেষ্টাই চলত। তথাকথিত ঐ চাঁড়ালের হাড় পরবর্ত্তীকালে কাঠের অথবা ধাতুনির্মিত 'ম্যাজিক ওয়াণ্ডে' রূপান্তরিত হলো এবং যাদুকর 'ম্যাজিসিয়ান' এই আখ্যায়—এই উপাধিতে ভূষিত হয়ে 'টেইল কোট' এবং তদুপযোগী উঁচু কানাওয়ালা 'হ্যাট' পরে ষ্টেজে এলেন! পেছনে থাকত কালোপর্দ্দা এবং পরনে কাল পোষাক—এই ছিল ম্যাজিকী পরিচিতি!

বহু পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়েও ম্যাজিক মঞ্চ ও পর্দ্দার সাথে তাল রেখে চলতে পারে নাই। তার অনেক কারণ আছে। পাদপ্রদীপকে সামনে রেখে নটনটীদের অভিনয়-কৌশল দেখাতে হয় আর ম্যাজিসিয়ানকেও একই ভাবে তাঁর ম্যাজিক দেখানোর ব্যাপারে অভিনয়ের আশ্রয় নিতে হয়। নাটকের কোন নট বা কোন নটী একক ভাবে ষোল আনা রসের অবতারণা করতে পারে না—তাদের যৌথ চেষ্টা পারস্পরিক সহযোগিতা আনন্দকে ফুটিয়ে তোলে। এই ব্যাপারে ম্যাজিসিয়ান একা—নিঃসঙ্গ! এ তফাৎ সাংঘাতিক! নাটকের পূর্ণতা হচ্ছে—সমবেত ভাবে নাটকীয় বিষয়বস্তুকে পরিবেশনে। কিন্তু ম্যাজিসিয়ানের দায়িত্ব অনেক বেশী। যা অলীক—যা সৃষ্টিছাড়া সেই সব বিষয়বস্তুকে সংলাপের জোরে খাড়া রাখতে হয়—তার সঙ্গে ম্যাজিকের মূল সিক্রেট যাতে অসতর্ক মুহূর্তে ফাঁস না হয় তার জন্য সতর্ক থাকতে হয়। ম্যাজিকের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের যে নিয়ম পদ্ধতি আছে তার ধারাবাহিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সর্ব্বদা মনকে জাগিয়ে রাখতে হয়। এর পর সব চাইতে কঠিন পর্য্যায় "প্যাটার" বা গল্প রচনা আঙ্গিকভঙ্গী পরিমাণমাফিক চলাফেরা এবং সময়জ্ঞান, একটু উনিশ-বিশ হলেই সব পণ্ড! ঠিক এই সমস্ত ব্যাপারে নাটকের অভিনেতা বা অভিনেত্রী কোন ধার ধারেন না। তাছাড়া নাটকের মহড়ার সুরুতে প্রযোজক ও পরিচালক মহাশয়রা সব কিছু করে নেন, ম্যাজিক সৃষ্টির যা কিছু কাজ যা কিছু পরিকল্পনা ও প্রযোজনা মুখ্যতঃ একা ম্যাজিসিয়ানকেই করে নিতে হয়। তাঁর সহকারীরা আজ্ঞাবাহক মাত্র,—পরিচালক একজন যাদুকর স্বয়ং।

অনেকের মতে থিয়েটার ও সিনেমার প্রতি লোকের আকর্ষণের প্রধান হেতু—এ দুই-এ যৌন আবেদন আছে—ম্যাজিকে তার যথেষ্টই অভাব। এ ছাড়া থিয়েটার ও সিনেমা দেখে ছেলেমেয়েরা প্রেম শেখে. "বাগাদুর ডাকু" হয়। ম্যাজিকে এ সব শেখার 'চান্স' কই? তাই ম্যাজিক—নিরামিষ যাদুবিদ্যা এক পাশে পড়ে থাকে—আর থিয়েটার ও ফিল্মী আর্ট সাড়ম্বরে, সদম্ভে সোনার রথে চেপে—রাজধানীর দিকে রওনা হয়।

যুদ্ধোত্তর যুগে—থিয়েটার ও ফিল্মের এই জয়যাত্রা ম্যাজিকী আর্টের দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিবর্ত্তনে বাধ্য করেছে। বিদগ্ধ সমাজকে নিজের দলে টানবার জন্য 'ইন্দ্রজাল' পাততে হয়েছে। বহু চিন্তা বহু গবেষণা এবং আলোচনার মাধ্যমে ম্যাজিকের নবরূপের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা হয়েছে। আজকের ম্যাজিকের 'শো'-তে কাল পর্দ্দা এবং কাল পোষাককে বিদায় দেওয়া হয়েছে। আজকের ম্যাজিকে 'ওয়াণ্ড' অপরিহার্য্য বলে একে যত্ন করার তেমন প্রয়োজন আর নেই। বিজ্ঞান ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলাবিদ্যাকে ম্যাজিকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ শক্তি, রঞ্জন রশ্মি, বিচিত্র রং-এর সেট সিন, আধুনিক রুচিজ্ঞানসম্পন্ন সাজ-পোষাক চমৎকার ও সুশ্রাব্য আবহ-সঙ্গীত এবং চটুলনয়না সদাহাস্যময়ী মহিলা শিল্পীদের সহায়তা ও মঞ্চাবতরণ ম্যাজিকে প্রাণের জোয়ার এনে দিয়েছে। ম্যাজিকের 'শো' আর নাট্যশালার অভিনয় কলার মধ্যে এত কাল যে ব্যবধান ছিল আজ তা অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়েছে। আজকের ম্যাজিসিয়ান আর পথের মাদারী নয়—বিদগ্ধ সমাজের দরবারে তাঁর ঠাঁই হয়েছে। কিন্তু তবুও বলবো ম্যাজিক এ দেশে অপাংক্তেয় হয়ে আছে।

ভারত সরকার সঙ্গীত নৃত্যনাট্য আকাডেমী সৃষ্টি করে শিল্পীদের উৎসাহিত করেছেন এবং সম্মানিত করছেন। এই আকাদেমীতে ম্যাজিক স্থান পায়নি। ভারতে অসংখ্য গুহ্যবিদ্যা আছে—যার জন্য সারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষ "The Land of Mystery" বা 'যাদুকরের দেশ' নামে পরিচিত। ম্যাজিকের সমগোত্রীয় অথবা এককালে যে সমস্ত গুপ্তবিদ্যা যাদুবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল—যেমন জ্যোতিষ বিদ্যা, সামুদ্রিক বিদ্যা বা হস্তরেখা পাঠ, হস্তাক্ষর দেখে মানুষের চরিত্রপাঠ প্রভৃতি বিষয়গুলি একত্র করে একটি নতুন 'আকাডেমী' সৃষ্টি করা কি অসম্ভব? সংস্কৃতির যাঁরা ধারক ও বাহক—তাঁরা কি এ সম্পর্কে আলোকপাত করবেন?

যন্ত্র

এত দিন আমাদের ধারণা ছিল যে, লোকে পয়সা খরচ করে ছবি তৈরী করেন পয়সা পাবারই আশায় কিন্তু এখন দেখছি যে না—লোকে পয়সা খরচ করে ছবি তৈরী করে পয়সা খরচ করবার জন্যে—আর তা আবার নিজেকে নায়িকা সাজিয়েই—অন্ততঃ বহুকাল বাদে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে অমিতা দেবী তো সেই কথাই প্রমাণ করলেন যন্ত্র ছায়াচিত্রে লেখিকা, প্রযোজিকা ও নায়িকারূপে দেখা দিয়ে। যেমনই নিকৃষ্ট ছবি তেমনই ব্যর্থ পরিচালনা—সোনায় সোহাগা একেবারে কোনো কুশলীর মধ্যেই (লেখিকা ও পরিচালক) এতটুকু নাট্যবোধের আভাস পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। সমবেত প্রার্থনা-সঙ্গীত শুনছি, কারুর ঠোঁটের সঙ্গে কারুর মিলছে না। সন্ন্যাসীদের মঠের সেট দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো জজ-ব্যারিষ্টার বা মন্ত্রী মহোদয়ের বাড়ীর ড্রইং রুমের সেট দেখছি, দেবানন্দ চরিত্রটি সৃষ্টি করার কোন তাৎপর্য্যই তো দেখছি না—অমন কাঠের পুতুলের ভূমিকায় রবীন মজুমদারকে নামানোর কি প্রয়োজন ছিল? জাহাজে যে চাঁদ দেখানো হয়েছে ও রকম হাতে পাওয়া চাঁদ বোধ হয় পাকিস্তান সরকারও ভাবতে পারেন না। তবে হাঁ, শেষ দৃশ্যটা আমরা বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছি—কয়েক জন বাহক একটি মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে মণিকর্ণিকার দিকে—এর অর্থ জলের মত স্বচ্ছ—বর্তমানে আমাদের টলিউড তথা বাঙলার ছায়াছবি যে কোন দিকে যাচ্ছে ও তার কি গতি হচ্ছে, তারই বোধ হয় কিছুটা আভাস অমিতা দেবী দিয়ে রাখলেন। অভিনয়াংশে প্রত্যেকেই কাজ চালিয়ে নিয়েছেন তবে তারই মধ্যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সন্তোষ সিংহ ও শিখা বাগ। ছবিটা এত পস্তাতো না, যদি অমিতা দেবী নিজে না নায়িকা হতেন। প্রচারবিদ ফণীন্দ্র পাল পুস্তিকা প্রণয়নে ও স্তোত্র সংকলক প্রমথ কুমার প্রশংসার দাবী করতে পারেন। আরও শুনছি যে, এই মহানায়িকাটি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী তুলতে যাচ্ছেন—ঋষির উপন্যাসগুলি উপসংহার করেছেন দামোদর, চিত্রসংহার করেছেন ছায়াদানবের দল, এইবার জীবনী সংহার করবেন অমিতা দেবী। গ্রহটাই খারাপ। হায় বঙ্কিমচন্দ্র!

মা

বহু প্রতীক্ষিত 'মা' মুক্তিলাভ করেছে। একটি দম্পতির সুখী পরিবার। ঘনিয়ে আসে দুর্য্যোগের কালোমেঘ। স্ত্রী হারিয়ে

ফেলে তার দুটি পা, মোটর য়্যাকসিডেন্টে, স্বামী শিক্ষিত তরুণ, বিত্তবান। ভাগ্যচক্রের হয় পরিবর্তন—শ্যালী আসে সংসারে—স্বামীর মন একটু একটু করে আকৃষ্ট হয় তার দিকে, স্ত্রী সবই বোঝে আর অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুমরে গুমরে মরে—চরম পরিণতি হ'ল স্ত্রীর বিষপানে মৃত্যুতে। কে দিলে এই বিষ—যা তার নাগালের বাইরে ছিল—কণিকা ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে মাতৃস্নেহেই যাঁর কাছে মানুষ হয়েছিল, মা বলতে সে যাঁকে চিনেছিল—তার সেই শাশুড়ীই তাকে বিষ দিয়ে সকল যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। এই গল্প। অলকা দেবীর লেখা। আমরা কখনও এ লেখিকার নামই শুনিনি। বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে। কিন্তু কোন্ গল্পের বা কার গল্পের, তার কোন জবাব নেই কেন? গল্পে বাস্তবতা কোথায়? প্রাচ্যদেশে কি ঠিক এ ঘটনা ঘটে থাকে? বার বার দেখছি চন্দ্রা দেবী গৃহদেবতার পাদপদ্মে বার বার কামনা করেছেন সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের; অথচ ঘটে যাচ্ছে সর্বাঙ্গীন অমঙ্গল—এতে যেন পৌত্তলিকতার অসারত্বই পরিচালক প্রমাণ করতে চেয়েছেন। (ঠিক এই মর্মেই আমাদের জনৈকা পাঠিকা শ্রীযুক্তা দেবদত্তা রায়ের একটি চিঠি আমরা পেয়েছি, তাঁকে ধন্যবাদ।) পরিচালনা খুব পরিচ্ছন্ন একথা অনস্বীকার্য। গানগুলি বিশেষ করে প্রথমটি হুবহু রবীন্দ্রসুরের অনুকরণ। অশোকের মত শিক্ষিত বিচক্ষণ ছেলে রাস্তায় অমন অসতর্ক হয়ে গাড়ী চালাবে কেন? হাজার হাজার স্বামি-স্ত্রী তো গাড়ী চালিয়ে বেরোয় কিন্তু ততগুলোই দুর্ঘটনা কি ঠিক ঘটে থাকে—চৈতন্য আসবার পরও কণিকা কি বুঝতে পারছে না যে তার পা নেই, হাত দিয়ে অনুভব করবে কেন?—কণাকে অশোক যখন অমিতার আসার খবর দিচ্ছে—প্রশ্ন এই—অশোক সে সংবাদ তখন পেলে কি করে—আসা থেকেই তো তার মা কণাবই সম্বন্ধে তার সঙ্গে কথা বলছিলেন—অমিতার বিষয়ে তো কোনও কথা তখনও হয় নি। অমিতা গান গাইছে অশোক বাড়ী এসে তা শুনতে পেয়ে উৎফুল্ল হচ্ছে—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে অশোক যখন উৎফুল্ল হচ্ছে সে সময় যন্ত্রসঙ্গীত চলছে, গান তখন বন্ধ। অভিনয়াংশে চন্দ্রা দেবী, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও বিনতা রায় সত্যিই যথেষ্ট পরিমাণে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অসিতবরণ ও শিশির বটব্যালও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন নিজেদের সুনাম।

দানের মর্যাদা

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর গল্প আগেকার দিনের গল্প সন্দেহ নেই। ঘর-সংসারের খুঁটিনাটি মান-অভিমান ছাড়া প্রভাবতীর গল্পে আর কিছুই পাওয়া যায় না। সমগ্র গল্পের মধ্যে আবেদনের সূক্ষ্মতা কই? বক্তব্যের অভিনবত্ব বা কোথায়? কুকো-রায়বাহাদুর প্রসন্ন মৈত্র টাকার লোভে বিলেত-ফেরত ডাক্তার ছেলে মৃন্ময়ের বিয়ে দিলেন গ্রাম্য জমিদার অমরনাথ চৌধুরীর মেয়ে উষার সঙ্গে—উষা একেবারে ভিন্ন পরিবেশে পড়ল—এখানে ইঙ্গ-বঙ্গ ব্যাপার সব, পদে পদে ঠকে উষা, ব্যাপার শুনে অমরনাথও ভেঙ্গে পড়েন—মনে সংশয় জাগে এই নাস্তিক-জামাতার ঔরসজাত সন্তান তো তাঁর ধর্মজীবনের এতটুকু অংশও গ্রহণ করবে না—তিনি উইল করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নিজের বড় মেয়ে বালবিধবা উমার নামে দিয়ে যান। এই নিয়ে রায়বাহাদুরের সঙ্গে বাধল প্রচণ্ড বিরোধ—ইতোমধ্যে উষার নবজাত সন্তানকে দেখতে গিয়ে অমরনাথ হলেন অপমানিত। উষার মনও বিরূপ হয় বাবার উপর। উমার নামে হয় মকদ্দমা, হার হয় রায়বাহাদুরের—দেনার দায়ে আত্মহত্যায় রায়বাহাদুর উদ্যোগী হলে উমা জানতে পারে সে খবর—উমা মিটিয়ে দেয় সমস্ত দেনা। সপরিবারে রায়বাহাদুর যান অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে, ততক্ষণে উমা চলে গেছে বৃন্দাবনে। এরি মধ্যে আছে সতী—মৃন্ময়ের বোন ও মনীশ অধ্যাপক—অমরনাথের অনুগত ও মৃন্ময়েরও বন্ধু। প্রকাশ্য আদালতে উমার প্রতি মনীশের স্নেহে অপর পক্ষ কুৎসিত ইঙ্গিত করলে সতীই নিজেকে মনীশের বাগদত্তা স্ত্রী বলে প্রকাশ করে তাকে বাঁচায় অপমানের হাত থেকে, মনীশও স্ত্রী বলে তাকে স্বীকার করে নেয়। অভিনয়ে ছবি বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, অসিতবরণ, ছায়া দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, আরতি মজুমদার, প্রভৃতি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নমিতা সিংহ, শুক্লা সেন, নিভাননী দেবী ও শান্তা দেবীর অভিনয়ও ভাল লাগলো। রেখা মল্লিক একটু কেটে-কেটে কথা বললে ভালো হয়—তিনি যেন একটু এক নিঃশ্বাসে কথা বলতে চেষ্টা করেছেন। অন্যান্যাংশে আছেন জীবেন বসু, বীরেশ্বর সেন, অমর মল্লিক, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, তারাকুমার ভাদুড়ি, ডাঃ হরেন, প্রীতি মজুমদার ও করালী প্রভৃতি। পরিচালক সুনীল মজুমদার কিন্তু বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি এই ছবিতে।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

'পুত্রবধূ'র সাফল্যের পর উত্তম-মালাকে দেখা যাবে 'সুরের পরশ' কথাচিত্রে। এরও কাহিনী ও পরিচালনায় যথাক্রমে সলিল সেনগুপ্ত ও চিত্ত বসুকে দেখা যাবে। রূপায়ণে থাকছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবেন বসু, বাণুয়া, মালা সিন্হা, যমুনা সিংহ, অপর্ণা দেবী ও রেণুকা রায়। সঙ্গীতের ভার পেয়েছেন অনুপম ঘটক।...ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নানা তথ্য পাওয়া যাবে সুরছন্দ ছবিটিতে। ছবিটির পরিচালনার ভার পেয়েছেন ধীরেন পাল। ছবিতে বিলায়েৎ খাঁ, পান্নালাল ঘোষ, হীরাবাঈ, ইমারৎ হোসেন খাঁ, নিখিল ঘোষ তা ছাড়া নবাগত ডাঃ আর বি মুখোপাধ্যায়, শিখা মুখোপাধ্যায়, মাষ্টার আমীর প্রভৃতি শিল্পীদের দেখা যাবে।...'চলাচল'এর সাফল্যের পর চলচ্চিত্র মহলে খ্যাতিমান সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম আর অজানা নেই। আশুতোষের নবতম উপন্যাস 'পঞ্চতপা' মাসিক বসুমতীতে গত সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ঐ 'পঞ্চতপা'ও দেখা যাবে চলচ্চিত্রাকারে 'চলাচল' খ্যাত অসিত সেনেরই পরিচালনায়। জাতির প্রগতির পথে বাঁধের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা নিয়েই রচিত হয়েছে এর কাহিনী। সঙ্গীতে ভি বালসারার সহযোগিতায় নির্মল ভট্টাচার্যকে দেখা যাবে। রূপ দিচ্ছেন পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রা দেবী, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, শুক্লা সেন প্রভৃতি। নীহার গুপ্তর 'নূপুর' গল্পটি

পরিচালনা করছেন দিলীপ নাগ। জি কে মেহতার চিত্রগ্রহণের সাহায্যে ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, রবীন মজুমদার, জীবেন বসু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অনিল, সুনীল, সন্ধ্যারাণী, শিপ্রা মিত্র, জয়শ্রী সেন, শীলা পাল প্রভৃতি শিল্পীদের পর্দার বুকে দেখা যাবে।···মাসিক বসুমতীতেই কিছুকাল আগে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল যাত্রা হোল শুরু। অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এই কাহিনীই বিশিষ্ট চিত্র সম্পাদক সন্তোষ গাঙ্গুলীর পরিচালনায় চিত্রাকারে গৃহীত হচ্ছে। সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণে আছেন পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, দীপক মুখোপাধ্যায়, আশীষ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য ও সবিতা চট্টোপাধ্যায়।

শুক্রবারের বেতারনাট্য

২রা কার্তিক—অন্যতমা, কাহিনী—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নাট্যরূপ—মন্মথ চৌধুরী, পরিচালনা—শ্রীধর ভট্টাচার্য। রূপায়ণে—ধীরাজ ভট্টাচার্য, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দুলাল সেনগুপ্ত, মোহনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রথীনকুমার ঘোষ, অমরেশ ঘোষ, তৃপ্তি মিত্র, অপর্ণা দেবী, আরতি মৈত্র, অরুণপ্রভা চট্টোপাধ্যায়। * * ৯ই কার্তিক—অধিকার, কাহিনী—মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় নাট্যরূপ ও পরিচালক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। রূপায়ণে—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপতি চৌধুরী, দুলাল মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা মিত্র, ব্রততী মুখোপাধ্যায়, রত্না গোস্বামী ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। * * ১৬ই কার্তিক—কালরাত্রি, কাহিনী ও নাট্যরূপ—তারাশঙ্কর, পরিচালক—শৈলজানন্দ। রূপায়ণে—নির্মল চক্রবর্তী, প্রমোদকুমার চক্রবর্তী, তড়িৎ রায়, চন্দন রায়, অনাদি গাঙ্গুলী, নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রেণু বিশ্বাস, লিলি গুহ, শান্তা ঘোষ, লীলাবতী দেবী (করালী), নীলিমা সান্যাল ও প্রেমাংশু বসু। * * ২৩এ কার্তিক—বিন্দুর ছেলে, কাহিনী—শরৎচন্দ্র, নাট্যরূপ ও পরিচালনা—শ্রীধর ভট্টাচার্য। রূপায়ণে—সন্তোষ সিংহ, প্রদীপকুমার, জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, সুবলচন্দ্র বসু, শান্তি সেন, মঞ্জু দে, অপর্ণা দেবী, বাণী গাঙ্গুলী, বেলারাণী দেবী। * * ৩০এ কার্তিক—এই দিনকার নাট্যানুষ্ঠানে রবীন্দ্রভারতীতে অনুষ্ঠিত 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যটিই বেতার মারফৎ শোনানো হয়। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা করেন সন্তোষ সেনগুপ্ত। গ্রন্থিকের মর্যাদা লাভ করেছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। অংশ গ্রহণ করবেন দেবব্রত বিশ্বাস চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় অনীতা মজুমদার, পূরবী চট্টোপাধ্যায়, পূরবী সরকার ও মীরা রায় প্রমুখ শিল্পিবর্গ।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

মিশর আক্রমণ—

আলাপ-আলোচনার শান্তিপূর্ণ পথেই সুয়েজ খাল সমস্যার সমাধান হইবে, এই আশা জাগ্রত হওয়ায় বিশ্ববাসী যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছিল, ঠিক সেই সময় গত ৩১শে অক্টোবর (১৯৫৬) ভোর সাড়ে চারিটায় (জি. এম. টি) বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী সুয়েজ খাল অঞ্চলে সম্মিলিত অভিযান আরম্ভ করে। ইহার দুই দিন পূর্ব্বে ২৯শে অক্টোবর মিশরের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করে ইসরাইল। ইহার কয়েক দিন আগে গত ২২শে অক্টোবর ছয়খানি ফরাসী বিমান আকাশপথে একখানি যাত্রীবাহী বিমান আটক করিয়া ঐ বিমান হইতে ৫ জন বিদ্রোহী আলজিরীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করে। বিদ্রোহীদের পাঁচজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়ত একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কিন্তু এই ঘটনায় এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে যে অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, মিশরের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী যৌথ সামরিক অভিযানের মধ্যে উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপ হইয়া যায়। রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডে বিপুল বিক্ষোভের প্রতি সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টি যখন আকৃষ্ট হইয়াছিল, সেই সময় ফ্রান্স উড়ন্ত বিমান নামাইয়া আলজিরিয়ার ৫ জন বিদ্রোহী নেতাকে গ্রেপ্তার করে। পোল্যাণ্ডের বিক্ষোভ প্রশমিত হইতে না হইতেই হাঙ্গেরীতে রাশিয়া ও কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে আরম্ভ হয় প্রবল বিক্ষোভ। ব্যাপকতা ও গভীরতায় এই বিক্ষোভ পোল্যাণ্ডের বিক্ষোভকেও ছাড়াইয়া যায় এবং উহা পরিণত হয় রুশ সৈন্যদলের সঙ্গে হাঙ্গেরীয়ানদের তীব্র সংঘর্ষে। পোল্যাণ্ড এবং হাঙ্গেরীতে বিক্ষোভ যখন রাশিয়াকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, সাধারণ নির্ব্বাচন লইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যখন ব্যাপৃত, আলজিরিয়ার বিদ্রোহী নেতাদের গ্রেপ্তারের ফলে ফ্রান্সের প্রতি আরব রাষ্ট্রগুলির অসন্তোষ যখন প্রবল বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িতেছিল, সুয়েজ সমস্যা লইয়া মিশরের প্রতি বৃটেন ও ফ্রান্সের গভীর অসন্তোষ যখন তীব্রতর, সেই সময় ইসরাইল মিশরকে আক্রমণ করিয়া বসিল। উহাকেই একটা অজুহাত করিয়া বৃটেন ও ফ্রান্স সাইপ্রাসের ঘাঁটি হইতে মিশরের বিরুদ্ধে আরম্ভ করিল সামরিক অভিযান।

গত ১৯শে অক্টোবর (১৯৫৬) সোভিয়েট রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটাইয়া এবং উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। গত ২৩শে অক্টোবর ৮২টি রাষ্ট্রের সম্মেলনে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য আন্তর্জ্জাতিক এজেন্সী গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই দুইটি ঘটনা এবং সুয়েজ খাল সমস্যা সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ পথে মীমাংসার আশা বিশ্বশান্তির পথ প্রশস্ত করিয়াছে, এই ধারণাই বিশ্ববাসীর মনে সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু এই ধারণা মরীচিকায় পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। পোল্যাণ্ডে বিক্ষোভ, হাঙ্গেরীতে প্রতি-বিপ্লব, সিঙ্গাপুরের হাঙ্গামা, জর্ডানের সাধারণ নির্ব্বাচনে মিশর সমর্থনকারীদের জয়লাভ সমস্তই মিশরের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণের সম্মুখে ম্লান হইয়া গিয়াছে। মিশর সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর হইতে বৃটেন ও ফ্রান্সের সামরিক প্রস্তুতি যে নিছক ধাপ্পা ছিল না, তাহা আজ ভালভাবেই বুঝা যাইতেছে। বৃটেন ও ফ্রান্স আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও একটা সুযোগ খুঁজিতেছিল। ইসরাইল মিশর আক্রমণ করিয়া এই সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্সের উস্কানীতেই যে ইসরাইল মিশর আক্রমণ করিয়াছে, এইরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আরব-ইসরাইল সীমান্ত সংঘর্ষ নূতন ঘটনা নয়। কিন্তু গত ২৯শে অক্টোবর (১৯৫৬) ইসরাইল মিশরের উপর যে হানা দিয়াছে তাহা পুরাপুরি সামরিক আক্রমণ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ইসরাইল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই মিশর আক্রমণ করিয়াছে এবং এই-রূপ আক্রমণের পক্ষে যুক্তিও তাহার আছে। রাজনৈতিক ও সামরিক উভয়দিক হইতে বিবেচনা করিয়া ইসরাইল মিশর আক্রমণ করিয়াছে, এরূপ মনে হওয়াও খুব স্বাভাবিক। ইসরাইলের সহিত মিশরের সীমান্ত সংঘর্ষগুলি সিনাই-উপদ্বীপের মিশরীয় ফেদাইম (কম্যাণ্ডো) ঘাঁটিগুলি হইতে পরিচালিত হইয়া থাকে। এই-গুলিকে ধ্বংস করাই ইসরাইলের উদ্দেশ্য। আরব রাষ্ট্রগুলি পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়া আসিতেছে যে, ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তাহারা সহ্য করিবে না। কম্যুনিষ্ট দেশ হইতে মিশরের অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তিতে আরব রাষ্ট্রগুলি কর্ত্তৃক চারিদিক হইতে প্রবল ভাবে আক্রান্ত হওয়া আশঙ্কা ইসরাইলের মনে জাগ্রত হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। ইসরাইলে একদল লোক আছে যাহারা আরব রাষ্ট্রগুলির সহিত 'প্রিভেণ্টিভ ওয়ার' বা প্রতিষেধাত্মক যুদ্ধ করিবার পক্ষপাতী। গত নভেম্বর (১৯৫৫) মাসে মিঃ ডেভিড বেন গুরিয়ন যখন প্রধান মন্ত্রীর পদগ্রহণ করেন তখন হইতেই প্রতিষেধাত্মক যুদ্ধের সমর্থকদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠে। আরব রাষ্ট্রগুলির ইসরাইল আক্রমণের আশঙ্কা অমূলক ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। আরব রাষ্ট্রগুলির উপর মিশরের প্রেসিডেণ্ট কর্ণেল নাসেরের প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইসরাইলকে ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহার নেতৃত্বে আরব রাষ্ট্রগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কাও ইসরাইল উপেক্ষা করিতে পারে নাই। গত ২১শে অক্টোবর (১৯৫৬) জর্ডানে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হয় তাহাতে মিশর সমর্থকরাই জয়লাভ করে। অতঃপর মিশর, জর্ডান ও সিরিয়ার মধ্যে সম্মিলিত সামরিক কম্যাণ্ড গঠনের জন্য এক সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই শেষোক্ত ঘটনাই
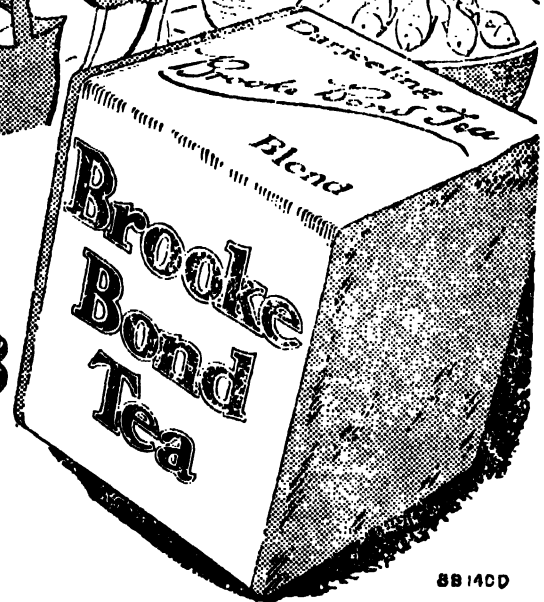
তড়িৎ গতিতে মিশর আক্রমণ করিতে ইসরাইলকে প্ররোচিত করিয়াছে, এইরূপ মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিশেষতঃ সময়টাও সব দিক দিয়াই যে এই আক্রমণের অনুকূল হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা মনে করিলেও ভুল হইবে না। সুয়েজ খাল লইয়া মিশর বিব্রত। মিশর ও সিরিয়াকে অস্ত্র সরবরাহকারী কম্যুনিষ্টরা পোলাণ্ড ও হাঙ্গেরীর সমস্যা লইয়া বিব্রত। মিশরের উপর ক্রুদ্ধ বৃটেন ও ফ্রান্স ইসরাইলের মিশর আক্রমণকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিবে, সকলের পক্ষেই এইরূপ মনে করা স্বাভাবিক।

ইসরাইলের মিশর আক্রমণের পক্ষে উল্লিখিত উৎকৃষ্ট যুক্তি সত্ত্বেও উহার মূলে বৃটেন ও ফ্রান্সের প্ররোচনা রহিয়াছে, এই সন্দেহ অনেকের মনেই না জাগিয়া পারে নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের জরুরী অধিবেশনে (২রা নবেম্বর) রুশ প্রতিনিধি মঃ সেফোলভ স্পষ্টই অভিযোগ করেন যে, "the Anglo-French aggressin was pre planned and Israel had been used as the tool of Britain and French..." বৃটেন ও ফ্রান্সের প্ররোচনায় ইসরাইল মিশর আক্রমণ করিয়াছে, এই অভিযোগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করা অবশ্য সম্ভব নয়। কিন্তু কতকগুলি ঘটনা হইতে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। সুয়েজ খাল সমস্যা সমাধানের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া ফরাসী মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মঃ মলে তাঁহাদিগকে আরও কিছুকাল ধৈর্য্য ধারণ করিতে অনুরোধ করিয়া বলেন যে, শীঘ্রই এমন এক ঘটনা ঘটিবে যাহার ফলে পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে। কূটনৈতিক গোপনতা রক্ষার প্রয়োজনে ইহার অতিরিক্ত আর কিছু বলিতে তিনি অস্বীকার করেন। ফরাসী পর-রাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ পিনেও বলিয়াছেন যে, বৃটেন ও ফ্রান্সের অনেক হাতের পাঁচ আছে। এই হাতের পাঁচ যে ইস্রাইল তাহা পরে বুঝিতে পারা গিয়াছে। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী গত ১৬ই অক্টোবর আকস্মিক ভাবে প্যারীতে গিয়াছিলেন। ইহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে মঃ পিনে হঠাৎ লণ্ডনে যাইয়া উপনীত হন। এই দুইটি আকস্মিক সাক্ষাৎকারের কি কারণ ঘটিয়াছিল? ২১শে অক্টোবর বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে এক বিবৃতিতে বলা হয় যে, পশ্চিম এশিয়ার অবস্থা গুরুতর এবং তথায় শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে। ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ইস্রাইল কর্ত্তৃক মিশর আক্রমণের ১৫ মিনিট পূর্ব্বে এই বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। ইস্রাইল কর্ত্তৃক মিশর আক্রান্ত হওয়ার পর বৃটেন ও ফ্রান্স যেরূপ তড়িৎ গতিতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তাহা বিবেচনা করিলেও ইহা অনুমান করিতে পারা যায় যে, মিশরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান আরম্ভ করিবার অজুহাত সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই বৃটেন ও ফ্রান্স মিশর আক্রমণের জন্য ইস্রাইলকে প্ররোচিত করিয়াছে।

মিশরের বিরুদ্ধে ইসরাইলের আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পরেই ফরাসী প্রধান মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিমানযোগে লণ্ডনে উপনীত হন। ৩০শে অক্টোবর প্রাতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ফরাসী প্রধান মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সহিত আলোচনা করিয়া উভয় গবর্ণমেণ্ট একযোগে মিশর ও ইসরাইলের নিকট চরমপত্র প্রদান বিমানপথে আক্রমণ বন্ধ করিবার, (২) মিশর ও ইস্রাইলের সৈন্য-বাহিনীকে সুয়েজ খাল হইতে ১০ মাইল দূরে অপসারিত করিবার এবং (৩) পোর্ট সৈয়দ, ইস্মাইলিয়া ও সুয়েজের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলিকে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর দখলে ছাড়িয়া দিতে মিশর সরকারকে রাজী হইবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। উক্ত চরমপত্রে ইহাও জানাইয়া দেওয়া হয় যে, ১২ ঘণ্টার মধ্যে উভয় গবর্ণমেণ্ট বা তাহাদের কোন এক গবর্ণমেণ্ট সম্মত না হইলে ঐ সকল দাবী পূরণে রাজী করাইবার জন্য বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী প্রয়োজনীয় যে-কোন শক্তিপ্রয়োগে হস্তক্ষেপ করিবে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধ বিরতির এই দাবী মিশর যদি গ্রহণ করে, তবে ইস্রাইল গ্রহণ করিতে সম্মত হয়। বলা বাহুল্য, মিশর গবর্ণমেণ্ট উক্ত চরমপত্রের দাবী অগ্রাহ্য করেন। ইহার পর ৩১শে অক্টোবর মিশরে কোনরূপ বলপ্রয়োগ না করিবার বা বলপ্রয়োগের হুমকী না দিবার জন্য সমস্ত রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানাইয়া নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে বৃটেন ও ফ্রান্স ভেটো প্রদান করে। মিশরে অবিলম্বে যুদ্ধ থামাইয়া ইস্রাইলী বাহিনীকে যুদ্ধবিরতি সীমারেখার পিছনে সরিয়া যাইতে নির্দ্দেশ দিয়া নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, বৃটেন ও ফ্রান্স তাহাতেও ভেটো প্রদান করে। রাশিয়ার প্রস্তাব সম্পর্কে আর একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাপার এই যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়ম ভোট দানে বিরত ছিল নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিণ ও রুশ প্রস্তাবে ভেটো প্রদানের অব্যবহিত পরেই সম্মিলিত বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী মিশর আক্রমণ করে। নরওয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রী নরওয়ের পার্লামেণ্টে বলেন (৩১শে অক্টোবর) যে, ঐদিন সকাল সাড়ে পাঁচটায় মিশরে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যের অবতরণ আরম্ভ হইয়াছে।

সুয়েজ খালের উপর বৃটেন ও ফ্রান্সের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই যে ইস্রাইলকে দিয়া মিশর আক্রমণ করান হইয়াছে, উল্লিখিত আলোচনা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইস্রাইলের আক্রমণের ফলে সুয়েজ খাল বিপন্ন হইয়াছে, এই যুক্তিটার সারবত্তা স্বীকার করা অসম্ভব। তাই যদি হয়, তবে নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিণ ও রুশ প্রস্তাবে বৃটেন ও ফ্রান্স ভোটো প্রদান করিল কেন? সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের মাধ্যমে ইস্রাইলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইত। বৃটেন ও ফ্রান্স সে-পথে বাধা সৃষ্টি করিল কেন? দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য ইসরাইলকে আক্রমণ না করিয়া আক্রমণ করিয়াছে মিশরকে। ১৯৫০ সালের ত্রিপক্ষীয় ঘোষণায় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা লঙ্ঘিত হইলে উহা নিরোধের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে বা উহার বাহিরে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। রাশিয়ার ভেটো প্রয়োগের আশঙ্কা করিয়াই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিরে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে রাশিয়ার ভেটো প্রয়োগের কোন আশঙ্কা দেখা দেয় নাই। বরং রাশিয়া ব্যবস্থা গ্রহণেরই পক্ষপাতী। বৃটেন ও ফ্রান্সই বরং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি অনুযায়ী বৃটেন সুয়েজ অঞ্চলে সৈন্য অবতরণ করাইতে অধিকারী এই যুক্তিও টিকিতে পারে না। ঐ চুক্তিতে বলা হইয়াছে যে, মধ্যপ্রাচ্যের বাহিরের কোন রাষ্ট্র দ্বারা তুরস্ক কিম্বা কোন আরব

সুয়েজ অঞ্চলে প্রবেশ করিতে অধিকারী। ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্যের বাহিরের কোন রাষ্ট্র নয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বলপ্রয়োগে সুয়েজ অঞ্চল দখলের জন্য বৃটেন ও ফ্রান্স অনেক পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। এ ব্যাপারে আমেরিকার সম্মতি কতখানি ছিল তাহা বলা কঠিন। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে, পরোক্ষ সমর্থন রহিয়াছে অবস্থা দেখিয়া এইরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। মিশরে ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণের পূর্ব্বে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বলিয়াছিলেন, যে পক্ষই আক্রান্ত হউক আমেরিকা তাহাকেই সাহায্য করিবে। কিন্তু মিশরের উপর ইঙ্গ-মার্কিণ আক্রমণ সুরু হওয়ার পর এক বেতার বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, মিশরের যুদ্ধে আমেরিকা অংশ গ্রহণ করিবে না। ইহার অর্থ আক্রমণকারীদিগকেই পরোক্ষভাবে সাহায্য করা।

মিশর আক্রমণ সমগ্র ভাবে বৃটিশ জাতি সমর্থন করে নাই, একথা সত্য। কিন্তু এই আক্রমণের ফলে বিশ্ববাসী বিশেষ করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির মনে এই আশঙ্কা জাগিয়াছে যে, যে কোন শক্তিশালী পশ্চিমী রাষ্ট্র তাহাদের উপর যে কোন সিদ্ধান্ত বলপ্রয়োগে চাপাইয়া দিতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছে তাহা মোটেই আশ্বস্ত হইবার মত নহে। ৩১শে অক্টোবর বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী মিশর আক্রমণ করে। ২রা নবেম্বর সুয়েজ খাল এলাকায় বৃটেন, ফ্রান্স ও ইসরাইলের সামরিক অভিযানে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া এবং অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানাইয়া উত্থাপিত মার্কিণ প্রস্তাব ৬৪—৫ ভোটে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত হয়। বৃটেন, ফ্রান্স, নিউজীল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও ইসরাইল বিরুদ্ধে ভোট দেয়। বেলজিয়ম, কানাডা, লাওস, নেদারল্যাণ্ডস্, পর্ত্তুগাল ও দক্ষিণ আফ্রিকা ভোট দেয় নাই। ৩রা নবেম্বর বৃটেন ও ফ্রান্স কৌশলপূর্ণ উপায়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী কমন্স সভায় বলেন যে, মিশর ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তি-রক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করিতে হইবে, মিশর ও ইসরাইলের এই বাহিনীকে মানিয়া লইতে হইবে এবং যতদিন না সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী গঠিত হইতেছে ততদিন যুযুধান দেশদ্বয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ সংখ্যক ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য রাখা সম্পর্কে মিশর ও ইসরাইল উভয়কেই সম্মতি দিতে হইবে, এই সর্ত্তে বৃটেন যুদ্ধ বন্ধ করিতে রাজী আছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে বিনা যুদ্ধে সুয়েজ খাল দখল করাই এই সর্ত্ত তিনটির উদ্দেশ্য।

গত ৪ঠা নবেম্বর মিশরে যুদ্ধ বিরতির উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বাহিনী নিয়োগের জন্য উত্থাপিত কানাডার প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত হয়। ৫ই নবেম্বর বৃটেন ও

ফ্রান্স দাবী করে যে, সুয়েজ খাল অঞ্চলে ইঙ্গ-ফরাসী প্যারাসুট বাহিনী অবতরণ করিয়াছে এবং বৃটিশ বাহিনী পোর্ট সৈয়দ বিমান ঘাঁটি দখল করিয়াছে। ঐ দিনই অর্থাৎ ৫ই নবেম্বর মঙ্গলবার রাত্রে সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ বুলগানিন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ও ফরাসী প্রধান মন্ত্রীকে এক বার্তা প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে আক্রমণ পর্যুদস্ত ও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে রাশিয়া বদ্ধপরিকর। মিশরের যুদ্ধ অন্য দেশেও ছড়াইয়া পড়িতে পারে এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেও পরিণত হইতে পারে, এই হুঁসিয়ারীও উক্ত বার্তাতে আছে। এই সতর্ক বার্তাতে ইহাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আধুনিক মারণাস্ত্র নৌ ও বিমান-যোগে প্রেরণ করা চলিতে পারে না, রকেটের সাহায্যেই প্রেরণ করা চলে। রাশিয়ার এই সতর্ক বাণীর জন্যেই হউক, অথবা ইঙ্গ-ফরাসী প্যারাসুট বাহিনী মিশরে অবতরণ করিয়াছে বলিয়াই হউক, বুধবার ২৩-৫৯ মিনিটের (জি এম টি) সময় (ভারতীয় সময় ভোর ৫-২৯ মিনিট) বৃটিশ ও ফরাসী গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দেন। ফরাসী গবর্ণমেন্টর জনৈক মুখপাত্র ৭ই নবেম্বর ঘোষণা করেন যে, সুয়েজ খাল এলাকার অধিকাংশ অঞ্চল দখল করা হইয়াছে। বস্তুতঃ বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়ার পর যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দেওয়া হয় এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্লীবত্বও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার পর মিশর হইতে অবিলম্বে বৃটিশ, ফরাসী ও ইস্রাইলী সৈন্য অপসারণের নির্দ্দেশ দিয়া এশিয়া-আফ্রিকা রাষ্ট্র-গোষ্ঠির উত্থাপিত প্রস্তাব ৭ই নবেম্বর সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। ঐ দিনই আন্তর্জ্জাতিক পুলিশ বাহিনী গঠন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মিশরে আন্তর্জ্জাতিক পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করাটাই বড় কথা নয়। প্রধান প্রশ্ন হইল বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যদল মিশর ত্যাগ করিবে কি না? যদি তাহারা মিশর ত্যাগ না করে তবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তথা আন্তর্জ্জাতিক পুলিশ বাহিনী কি করিবে? আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীতে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যদল স্থান না পাইলে মিশর হইতে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য অপসারণ করা হইবে না বলিয়া বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার এন্টনী ইডেন যাহা বলিয়াছেন তাহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক। যদি আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীতে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য গ্রহণ করা হয় কিম্বা গ্রহণ করা না হইলেও মিশরে যদি বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য থাকিয়াই যায় তবে যুদ্ধ বিরতির অর্থ দাঁড়াইবে মিশরের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর জয়লাভ। এই জয়লাভ হইবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের দ্বারা। পররাজ্য আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে না। সুয়েজ খাল বৃটেন ও ফ্রান্সের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে। সুয়েজ অঞ্চল আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রুশ-মার্কিণ যুক্তবাহিনী নিয়োগের যে প্রস্তাব রাশিয়া করিয়াছিল, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহাতে রাজী হয় নাই। বরং ইহাই জানাইয়া দিয়াছে যে, রাশিয়া ঐরূপ কোন চেষ্টা করিলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও বৃটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করিবে। সিরিয়ায় রুশযুদ্ধ বিমানসমূহ অবতরণ করিয়াছে বলিয়া ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ পিনে ৮ই নবেম্বর স্বীকার করিয়াছেন। হঠাৎ মার্কিণ স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীকে সতর্ক থাকিতে এবং সেনাপতিদিগকে দেশরক্ষার প্রস্তুতি বৃদ্ধি করিতে নির্দেশ দে[ও-]
হইয়াছে। ইহা কি সিরিয়ায় রুশযুদ্ধ বিমানসমূহ অবতরণের [...]
জবাব? রুশ গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, মিশর হইতে বি[...]
সৈন্য অপসারিত না হইলে রুশ নাগরিকদের স্বেচ্ছাসেবকরূপে মি[...]
দেশরক্ষা বাহিনীতে যোগদানে বাধা দেওয়া হইবে না। মার্কি[ন...]
দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, আমেরিকা যে[...]
অবস্থাতেই মিশরে রুশ স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণে বাধা দিবে। মিশ[...]
বৃটেন ও ফ্রান্সের বলপ্রয়োগের নীতি সাফল্যলাভ করে, তবে কো[...]
শক্তিশালী রাষ্ট্র অন্যান্য দুর্বল দেশের উপর বলপ্রয়োগে কুণ্ঠিত হই[...]
না। এই ধরণের যুদ্ধ আঞ্চলিক সীমায় আবদ্ধ থাকিলেও ক্ষুদ্র ক্ষু[দ্র]
রাষ্ট্র স্বাধীনতা হারাইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্লীবত্ব ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। মিশরে যদি রুশ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও হস্তক্ষেপ করিবে। ফলে, উহা বিশ্বসংগ্রামের ক্ষুদ্র সংস্করণে অথবা বিশ্বসংগ্রামের মহড়ায় পরিণত হইতে পারে। উহা শেষ পর্য্যন্ত প্রকৃত বিশ্বসংগ্রামে পরিণত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। হয় দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলি স্বাধীনতা হারাইবে, না হয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবে, মিশরে ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ এই আশঙ্কাই সৃষ্টি করিয়াছে।

পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী—

সুয়েজ সমস্যা সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রতিটি কথা, প্রতিটি কর্ম্মনীতি, প্রতিটি পাদক্ষেপের প্রতি বিশ্ববাসীর একাগ্র দৃষ্টি যখন নিবদ্ধ, সেই সময় গত অক্টোবর মাসের শেষার্দ্ধে প্রথমে পোল্যাণ্ডে এবং তারপর হাঙ্গেরীতে ডি-ষ্ট্যালিনিজেশন বা ষ্ট্যালিনবাদ অবসানের নীতির পরিণতি সোভিয়েট রাশিয়ার সম্মুখে এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে। ষ্ট্যালিনবাদ অবসানের অর্থ কি, উহার অবসান কি পদ্ধতিতে হইবে সে-সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার ষ্ট্যালিনোত্তর নেতৃবৃন্দ স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। ষ্ট্যালিনবাদ অবসানের পক্ষে ইহা যে এক কঠিন সমস্যা, একথা অনস্বীকার্য্য। ষ্ট্যালিনবাদের শক্তিও দুর্দ্ধর্ষ। পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর ভিতরে এবং পশ্চিম ইউরোপে কমিউনিজম বিরোধী শক্তিগুলিও যথেষ্ট প্রবল। এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে পোল্যাণ্ডে ও হাঙ্গেরীতে ষ্ট্যালিনবাদ অবসানের প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় প্রবল বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের কারণ কি এবং উহার যথার্থ স্বরূপই বা কি তাহা বাহির হইতে বুঝিতে পারা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কম্যুনিজম বিরোধী বিক্ষোভ কতখানি স্বতঃস্ফূর্ত্ত, কতখানি পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর বাহিরের কম্যুনিজম বিরোধী শক্তিগুলির প্ররোচনা ও সাহায্যের ফল তাহাও বুঝিয়া উঠা কঠিন। প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া ষ্ট্যালিনবাদের অপ্রতিহত শাসনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের যে কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কোন চেষ্টা যে করা হয় নাই পোজনানের হাঙ্গামার মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহৎশিল্পকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়ার ফলে নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যের অভাব সৃষ্টি হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে, একথাও অস্বীকার করা যায় না। কম্যুনিজম-বিরোধী শক্তিগুলি এই অসন্তোষের সুযোগ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এইরূপ মনে করাও

খুব স্বাভাবিক। ষ্ট্যালিনবাদ গণতন্ত্রীকরণের বিরোধী। ষ্ট্যালিনবাদ অবসানের প্রয়োগ একদিকে যেমন উহার প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছিল, আর একদিকে তেমনি কম্যুনিজমবিরোধী শক্তিগুলি ষ্ট্যালিনবাদ অবসানের প্রয়াসকেই কম্যুনিজমবিরোধী রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের সুযোগে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতেই পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন।

পোল্যাণ্ডে ষ্ট্যালিনবাদ বিরোধী গণবিক্ষোভের পরিণতিস্বরূপ মিঃ গোমুলকা পোল কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব পদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৪৯ সালের পূর্বে তিনিই ছিলেন পোল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারী। যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটোর মত তিনিও ষ্ট্যালিনের বিরোধিতা করিবার দুঃসাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্ম পোল্যাণ্ড তাহার নিজের পথই গ্রহণ করিবে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মস্কো-প্রদর্শিত পথই একমাত্র পথ, তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই। ইহার পরিণামে ১৯৪৯ সালে তাহাকে পোল কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারীর পদ হইতে চ্যুত করা হয়। দুই বৎসর পর তিনি গ্রেফতার হন এবং চারি বৎসর কাল তাঁহাকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। তাঁহাকে যে হত্যা করা হয় নাই ইহা তাঁহার পরম সৌভাগ্য, বোধ হয় পোল্যাণ্ডেরও সৌভাগ্য। পোল্যাণ্ডে ষ্ট্যালিনবাদ-বিরোধী বিক্ষোভের আর একটি প্রধান ফল মার্শাল রকোশোভস্কীর পদচ্যুতি। ১৯৪৯ সাল হইতে তিনিই পোল্যাণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। সাত বৎসর পূর্ব্বে পোল্যাণ্ডের দেশরক্ষা মন্ত্রী এবং পোল সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণের জন্ম ষ্ট্যালিন তাহাকে প্রেরণ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি পোল্যাণ্ডের সহকারী প্রধান মন্ত্রী হন এবং পলিট ব্যুরোর সর্ব্বময় কর্ত্তার পদে নির্ব্বাচিত হন। জাতিতে তিনি পোল হইলেও তাঁহাকে পোল্যাণ্ডে মস্কোর এজেণ্ট বলিয়াই গণ্য করা হইত। পোল্যাণ্ডের তৃতীয় আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা পোল কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণের পর মিঃ গোমুলকার বেতার বক্তৃতা। এই বক্তৃতায় তিনি শুধু পোল্যাণ্ডের কৃষি ও শিল্পনীতিরই কঠোর সমালোচনা করেন নাই, শুধু পোজনানের হাঙ্গামাকারীদের প্রতি সহানুভূতিই প্রকাশ করেন নাই, তিনি বলেন যুগোশ্লাভিয়া কিম্বা রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদের ন্যায় নানা প্রকারের সমাজতন্ত্রবাদ থাকিতে পারে। তিনি এই বক্তৃতায় সমান ও জাতীয় সার্ব্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত মৈত্রী সম্পর্ক দাবী করেন। উল্লিখিত তিনটি ঘটনার তাৎপর্য্য এবং প্রতিক্রিয়া বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক।

কম্যুনিজম বিরোধীদের দৃষ্টিতে মিঃ গোমুলকা 'kerensky in reverse' রূপেই প্রতিভাত হইয়াছিল। অর্থাৎ তাহারা মনে করিয়াছিল যে, মিঃ গোমুলকা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রতি বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হইবে। পোল কম্যুনিষ্টপার্টির পলিট ব্যুরোতে মার্শাল রকোশোভস্কী স্থান না পাওয়ারও সম্ভাবনা দেখা দেয়। হয়ত উক্ত দুইটি কারণেই গত ১৯শে অক্টোবর (১৯৫৬) শুক্রবার, পলিট ব্যুরোর সদস্য নির্ব্বাচনের জন্ম পোল কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন চলিতে থাকার সময় মঃ ক্রুশেভ, মঃ মলটভ, মঃ মিকোয়ান এবং মঃ কাগানভিচ আকস্মিকভাবে ওয়ারশতে আসিয়া উপস্থিত হন। এমন কি এরূপ কথাও শোনা যায় যে, নয়া পলিট ব্যুরো হইতে রকোশোভস্কীকে বাদ দেওয়া হইলে রুশ সৈন্য আমদানী করা হইবে, মঃ ক্রুশেভ এইরূপ হুমকীও দিয়াছেন। পোল্যাণ্ডে রুশ সৈন্য প্রেরণের গুজবও শোনা যায়। মঃ ক্রুশেভ প্রভৃতি রুশ নেতাকে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তৎক্ষণাৎ অধিবেশন বন্ধ রাখা হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটির একদল প্রতিনিধি রুশ নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারের পর যে ইস্তাহার প্রচার করা হয় তাহাতে বলা হইয়াছে যে, বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে এবং খোলাখুলী ভাবে আলোচনা হইয়াছে। ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে গভীরতর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্পর্কে আলোচনার জন্য পোল কম্যুনিষ্ট পার্টির একদল প্রতিনিধি মস্কো যাইবেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ওয়ারশ হইতে ২০শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ পোল্যাণ্ডের বাল্টিক তীরবর্তী ডিনিয়া বন্দরে একটি রুশ ক্রুজার এবং তিনটি ডেষ্ট্রয়ার আসিয়া নোঙ্গর ফেলিয়াছে।

রুশনেতৃবৃন্দ সত্যই যদি ষ্ট্যালিনবাদ অবসানের পক্ষপাতী হ'ন তাহা হইলে মিঃ গোমুলকার প্রতি তাঁহাদের বিরূপ মনোভাবের কোন কারণ থাকিতে পারে না এবং ষ্ট্যালিনবাদের প্রতিনিধি রকোশোভস্কীকে পলিট ব্যুরো হইতে বাদ দেওয়ার বিরোধিতা করিবারও কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ষ্ট্যালিনবাদ বর্জ্জনের পরিণতিতে পোল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট শাসন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ এবং পোল্যাণ্ডে রুশ প্রভাবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রুশ নেতৃবৃন্দ চিন্তিত না হইয়া পারেন নাই। পোল্যাণ্ড রাশিয়ার তাঁবেদার অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে চায়। এ সম্পর্কে পোল্যাণ্ডের সকলেই একমত হইলেও এই মতৈক্যের আবরণে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। কম্যুনিজম ও কম্যুনিজম বিরোধী মতবাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ষ্ট্যালিনবাদ বর্জ্জনের ব্যবস্থায় কোনটি প্রাধান্য লাভ করিবে তাহা তখনও বুঝিতে পারা যায় নাই। বিশেষতঃ কম্যুনিজম বিরোধী ধারার শিকড় যে পোল্যাণ্ডের ইতিহাসের গভীরতম প্রদেশে নিহিত একথা বিবেচনা করিলে পোল্যাণ্ডের ষ্ট্যালিনবাদ বিরোধী এবং রুশ বিরোধী আন্দোলন কম্যুনিজম বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা উপেক্ষার বিষয় ছিল না। এ দিক দিয়া পোল শ্রমিকরা যে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার সহিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। তাহারা শিল্প ব্যবস্থায় কম্যুনিষ্ট আমলাতন্ত্রের ঘোর বিরোধী হইলেও আবার ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা তাহারা চায় না। এই জন্যই কম্যুনিজম বিরোধীরা পোল্যাণ্ডে কোন সুবিধা করিতে পারে নাই। এই দিক দিয়া মিঃ গোমুলকাও যে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন একথাও অনস্বীকার্য্য। রকোশোভস্কী পদচ্যুত এবং মঃ গোমুলকা পোল কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বপদ লাভ করিলেও রুশ নেতৃবৃন্দ ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন পোল্যাণ্ডের জাতীয় অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব করিয়াছে কম্যুনিষ্টরা, কম্যুনিজম বিরোধীরা নয়। কিন্তু হাঙ্গেরীতে ঘটিয়াছে উহার ঠিক বিপরীত।

পোল্যাণ্ডের সঙ্কট পার হইতে না হইতেই হাঙ্গেরীতে আরম্ভ ব্যাপক এবং রক্তাক্ত অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানের প্রথম হইতে

ষ্ট্যালিনবাদ-বিরোধী এবং কম্যুনিজম-বিরোধী দুইটি ধারা বেশ সুস্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট পার্টি পোল কম্যুনিষ্ট পার্টির ন্যায় ষ্ট্যালিনবাদ বিরোধী ধারার সহিত হাত মিলাইতে পারে নাই। বস্তুতঃ, হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট পার্টি ষ্টালিনবাদ অবসানের বিরোধিতা যথাসাধ্যই করিয়াছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত পারিয়াছে রাকোসিকে পার্টির কর্ত্তার আসনে রাখিয়াছিল। পোল্যাণ্ডে কারখানাগুলিকে কর্তৃত্বাধীনে আনিবার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়া ষ্ট্যালিনবাদ অবসানের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট পার্টি অনুরূপ কোন আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে নাই। উহাই হইয়াছিল হাঙ্গেরীর রীতি ষ্ট্যালিনবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তথাপি ২৩শে অক্টোবর (১৯৫৬) ষ্ট্যালিনবাদ-বিরোধী এবং কম্যুনিজম-বিরোধী আন্দোলন একই সঙ্গে চলিয়া এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করে যে, সঙ্কটত্রাণের জন্য ইম্রে নজেকে (Imre Nagy) কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হয়। উহার একমাত্র ফল হইল এই যে, কম্যুনিজম-বিরোধী আন্দোলন প্রবল ভাবে মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। উহা সম্ভব হইল কেন এবং কি রূপে তাহা না জানিলে হাঙ্গেরীর পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠা সম্ভব নয়। কিন্তু বাহির হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মঃ বুলগানিন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট হাঙ্গেরীর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে এক বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন। উহা গোপনীয় ব্যাপার। কাজেই সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া উঠা খুবই কঠিন।

২৩শে অক্টোবর বুদাপেস্তে যে শোভাযাত্রা বাহির করা হয় উহার উদ্দেশ্য ছিল কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রাক্তন নেতাদের ভুল ও ক্ষতিকর নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন। তদানীন্তন পার্টি-সম্পাদক জেরো (Gero) উহাকে প্রতিবিপ্লবীদের কাজ বলিয়া বেতার বক্তৃতায় অভিহিত করেন এবং হাঙ্গেরীর নিরাপত্তা পুলিশ নিরস্ত্র শোভাযাত্রাকারীদের উপর গুলী চালায়। ফলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। আন্দোলনের কম্যুনিজম বিরোধী অংশ প্রাধান্য লাভ করে, আরম্ভ হয় কম্যুনিষ্ট-বিরোধীদের আক্রমণাত্মক কার্য্য। তাহাদের সমস্ত আক্রমণ কম্যুনিষ্টদের উপর যাইয়া পড়ে এবং নির্ব্বিচারে কম্যুনিষ্ট হত্যা আরম্ভ হয়। এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া ইমরে নজে (Nagy) যে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করিতেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পোল্যাণ্ডে গোমুলকা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া প্রথমে রুশ সৈন্য অপসারণের দাবী করিয়াছিলেন। নজে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া সামরিক আইন জারী করিলেন এবং আন্দোলন দমনের জন্য রুশ সৈন্য আহ্বান করিলেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইল যে, জনগণের জাতীয়তা-বোধে তীব্র আঘাত লাগিল এবং কম্যুনিজম বিরোধীরা উহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল, জনগণের বিক্ষোভকে পরিচালিত করা হইল শুধু রাশিয়ার বিরুদ্ধেই নয়, নজে সরকারের বিরুদ্ধেও। এই সময় হইতে হাঙ্গেরীর ঘটনাবলীর গতি লক্ষ্য করিলে ইহা বুঝা যায়, কম্যুনিজম-বিরোধী আন্দোলন শুধু সুসংবদ্ধ এবং যথেষ্ট 'শক্তিশালীই ছিল না, উহাদের শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতেছিল। এই শক্তির মূল উৎস কোথায় তাহা শুধু ঘটনার গতিধারা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ যে পূর্ব্ব-ইউরোপকে মুক্ত করিতে উৎসুক তাহা অজানা নয়। কিন্তু ইহার জন্য তাহারা কি কি করিয়াছে তাহা অবশ্য জানিবার উপায় নাই। চীনের সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'সিনহুয়া'র সংবাদদাতা ৩১শে অক্টোবর জানান যে, "নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে সকল ফ্যাসিষ্টরা বিদেশে বিশেষ করিয়া পশ্চিম জার্ম্মাণীতে পলাইয়া গিয়াছিল তাহারা অষ্ট্রীয়া-সীমান্ত দিয়া দলে দলে হাঙ্গেরীতে প্রবেশ করিতেছে। প্রতি-বিপ্লবীরা জেলে হানা দিয়া চোরগুণ্ডা ডাকাত প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দিতেছে।" পশ্চিমী শক্তিবর্গ সাহায্য করিয়া থাকিলে তাহা গোপনেই করিয়াছে। বাহির হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। বিশ্বযুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা না থাকিলে পশ্চিমী শক্তিবর্গ কি করিতেন, তাহা বলা কঠিন! মিঃ ডালেস বলিয়াছিলেন, (২৭শে অক্টোবর) হাঙ্গেরীর বিদ্রোহীরা মার্কিণ সাহায্যের উপর ভরসা রাখিতে পারে।

২৭শে অক্টোবর ইম্‌রে নজে এক নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠন করেন। এই গবর্ণমেণ্ট গঠনের পর এক বেতার ঘোষণায় বলা হয় যে, নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবার পর লড়াই চলিবার আর কোন সঙ্গত কারণ নাই। এখন যাঁহারা হাঙ্গামা চালাইতেছেন তাঁহারা পুঁজিবাদীদের চর, তাঁহারা পুঁজিবাদী শাসন চান। কিন্তু ইহার পর হইতেই নজে কম্যুনিজম বিরোধী আন্দোলনের প্লাবনে ভাসিয়া চলিতে আরম্ভ করেন এবং তিনি 'Kerensky in reverse'-এর ভূমিকা গ্রহণ করেন। ৩০শে অক্টোবর তিনি আবার এক নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। উহাতে পেজেণ্টস পার্টি ও স্মল হোল্ডার্স পার্টির প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয় এবং তাঁহারাই মিলিত ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হন। ইহার পরদিনই নজে সরকারের পদত্যাগ দাবী করিয়া পার্লামেণ্ট ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ৩০শে অক্টোবর মস্কো হইতে ঘোষণা করা হয় যে, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া ও পোল্যাণ্ড হইতে সোভিয়েট সরকার সৈন্য অপসারণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তবে একপক্ষীয় আলোচনা দ্বারা সৈন্য অপসারণ করা যায় না। কারণ, ওয়ারশ চুক্তি অনুযায়ী ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সকল দেশের সহিত আলোচনা করা প্রয়োজন। ৩১শে অক্টোবর হইতে রুশ সৈন্য হাঙ্গেরী ত্যাগ করিতে আরম্ভ করে। এই জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া কম্যুনিজম বিরোধীরা নজের উপর এমন চাপ দিলেন যে, তিনি বাধ্য হইয়া ওয়ারশ চুক্তি একতরফা বাতিল করিয়া দিলেন। ঘোষণা করিলেন, হাঙ্গেরীর নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স ও চিয়াং সরকার এই চতুঃশক্তির নিকট আবেদন জানাইলেন। অতঃপর ৩রা নবেম্বর কম্যুনিষ্টদের বাদ দিয়া শুধু পেজেণ্টস্ পার্টি ও স্মল হোল্ডার পার্টির সদস্য লইয়া তিনি নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠন করেন এবং এই গবর্ণমেণ্টে বিদ্রোহীদের নেতা মালেটার হইলেন দেশরক্ষা মন্ত্রী। এই ভাবে নজে হাঙ্গেরীতে কম্যুনিজম বিরোধী গবর্ণমেণ্ট গঠনের সহায় হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নূতন আর একটি ঘটনাস্রোতের আবির্ভাব হইল। ১লা নবেম্বর জানোস কাদারের নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের অনুরোধে রুশ-বাহিনী হাঙ্গেরীতে প্রবেশ করে, নজেও তাঁহার অন্যান্য মন্ত্রীদিগকে গ্রেফতার করা হয়। রুশ-বাহিনীর আক্রমণে

প্রতিবিপ্লবীরা বিধ্বস্ত হয়। তবে এখনও প্রতিবিপ্লবীদের সহিত ছোট-খাটো সংঘর্ষ চলিতেছে।

হাঙ্গেরীতে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা কম্যুনিষ্ট এবং কম্যুনিজম বিরোধীদের মধ্যে লড়াই। কম্যুনিজম বিরোধীদের শক্তি দেখিয়া এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তাহারা পশ্চিমী-শক্তিবর্গের পরোক্ষ সাহায্য পাইয়াছে। কিন্তু এই লড়াইয়ের পরিণামের সহিত পূর্ব্ব-ইউরোপের কম্যুনিষ্ট রাজ্যগুলির ভবিষ্যতেই শুধু নয়, এই অঞ্চলে সোভিয়েট রাশিয়ার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার ক্ষমতা গৌরবের ভবিষ্যৎও উহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, একথা অস্বীকার করা যায় না। পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীতে যাহা ঘটিয়াছে তাহার ফলে রাশিয়ায় ষ্ট্যালিনবাদ বিরোধীদিগকে নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ষ্ট্যালিনপন্থীরা ঐ সকল ঘটনার জন্য ষ্ট্যালিনবাদ বর্জ্জনের নীতিকেই দায়ী করিবে। উহার ফলে রাশিয়ায় আবার ষ্ট্যালিনবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে কি না তাহা বলা কঠিন। পোল্যাণ্ডে ও হাঙ্গেরীতে কম্যুনিজম বিরোধিতাকে যদি পরাজিত করিতে পারা যায় তবেই রাশিয়ায় ষ্ট্যালিনবাদ অবসানের সমর্থকরা শক্তিশালী হইবেন। পূর্ব্ব ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সমস্যা শুধু রাজনৈতিকই নয়, অর্থনৈতিক বটে। পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর ঘটনাবলীর মূলে রহিয়াছে ব্যবহার্য্য পণ্যের অভাব। রাশিয়া এই অভাব পূরণ করিতে পারে নাই। ব্যবহার্য্য পণ্যের অভাব রাজনৈতিক অসন্তোষকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল। কম্যুনিজম বিরোধীরা গ্রহণ করিয়াছিল উহারই সুযোগ।

মার্কিণ নির্ব্বাচন—

সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গেল তাহাতে মিঃ আইসেনহাওয়ার বিপুল ভোটাধিক্যে পুনরায় প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি যে জয়লাভ করিবেন, এসম্পর্কে কোন সন্দেহ কাহারও ছিল না। মিঃ আইসেনহাওয়ার পাইয়াছেন ২ কোটি ৬১ লক্ষ ১১ হাজার ৫০ ভোট। তাঁহার ডেমোক্রাটিক প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ ষ্টিভেনসন পাইয়াছেন ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮২০ ভোট। ১৯০০ সালে উইলিয়ম ম্যাকফিন্‌লে তাঁহার দ্বিতীয় বার প্রেসিডেণ্টশিপের সূচনায় নিহত হওয়ার পর মিঃ আইসেন হাওয়ারই প্রথম রিপাবলিকান প্রেসিডেণ্ট যিনি দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচিত হইলেন। ১৯৫২ সালে কোরিয়া যুদ্ধের মধ্যে তিনি প্রথম মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি নির্ব্বাচিত হইলে সম্মানজনক সর্ত্তে কোরিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার চেষ্টা করিবেন। এবারের নির্ব্বাচন হইয়াছে মিশরের যুদ্ধের মধ্যে। নির্ব্বাচনের প্রাক্কালেই মিশরের সঙ্কট দেখা দেয় এবং প্রেঃ আইসেনহাওয়ার আমেরিকাকে বৃটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধায়োজন হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন।

মিঃ আইসেনহাওয়ার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার রিপবলিকান দল কি সিনেট কি প্রতিনিধি পরিষদ কোনটাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে ডেমোক্রাটিক দল। ইহাতে বিশেষ কিছু অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। দুই বৎসর পূর্ব্বে মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনে ডেমোক্রেটিকরাই সিনেটে ও প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে গত দুই বৎসর শাসনকার্য্য পরিচালনায় কোন অসুবিধা হয় নাই! ডেমোক্রাটিক দল হইতে একজন ভারতীয় জজ দিলীপ সিং সৌন্দ ক্যালিফোর্ণিয়ার একজন কোটিপতিকে পরাজিত করিয়া প্রতিনিধি পরিষদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১৫ই নবেম্বর, ১৯৫৬।

তোমার ছায়ার দর্পণে

রত্নাবলী সেনগুপ্ত

বাইরে দামাল হাওয়ায়
তুমুল মাতন
হৃদয়ে প্রকম্পিত, এলোমেলো
দিশাহারা ঝড়,
যদিও বিচূর্ণিত
কামনার সে উত্তপ্ত মন
তথাপি দাবাগ্নি জ্বলে
মনোবনে ওঠে মর্ম্মর।

আমিও অস্থির আজ
হেমন্তের হিমাক্ত বাতাসে,
তুমি নেই
তোমারই তো প্রতিবিম্ব
স্মৃতির উন্মেষে শুধু ভাসে,—
আজ এই সাতরঙা দিনের দর্পণে
অস্থির—অস্থির আমি
তোমার ছায়ার দর্পণে।
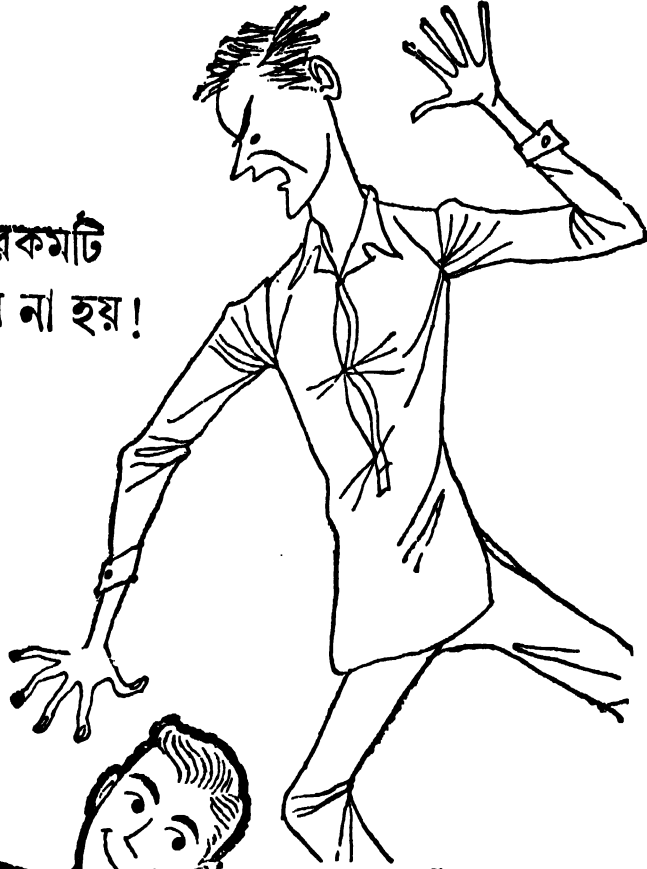
এ রকমটি
যেন না হয়!
আপনার নতুন সার্ট
যাতে কুঁচকে খাটো না
হয় তার জন্যে
● SANFORIZED ●
স্যানফোরাইজ্‌ড্‌
ছাপ দেখে নিন
সাধারণ কাপড়ের তৈরী হ'লে ভালো সার্টও
কুঁচকে খাটো হয়ে যেতে পারে, আর
তা একটুখানি খাটো হ'লেই
বরবাদ! কিন্তু এই খাটো হওয়ার
ঝঞ্ঝাট আপনাকে পোয়াতে
হয় না যদি আপনি পোশাক কেনবার সময়
স্যানফোরাইজ্‌ড্‌ ছাপ দেখে কেনেন।
স্যানফোরাইজ্‌ড্‌ ছাপ দেওয়া কাপড়
আগে থেকেই সম্পূর্ণ খাপী ক'রে দেওয়া
হয়। তাই বার বার কাচার পরেও আর
কুঁচকে মাপের চেয়ে খাটো হয় না।
সব সময়েই স্যানফোরাইজ্‌ড্‌ ছাপ
দেখে কিনুন!
SANFORIZED
SHRUNK FABRIC
REGD TO MK
স্যানফোরাইজ্‌ড্‌ সার্ভিস 'পারিজাত', নেতাজী সুভাষ রোড,
মেরিন ড্রাইভ, বোম্বাই—২
রেডিও সিলোন থেকে প্রচারিত 'স্যানফোরাইজ্‌ড্‌-কে-মেহমান' শুনুন—
রবিবার দুপুর ১২-৪৫এ ৩১-মিটারে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭-৩০এ ৪১-মিটারে

টাকা আনা পাই

[৪৮ পৃষ্ঠার পর]

(রচনা ও ম্যানেজার কথা বলতে বলতে করিডর দিয়ে ঢোকে)

রচনা—আপনি ঠিকই বলেছেন, ক'দিন ধরে আমিও লক্ষ্য করছি, অভাবের যে লাঞ্ছনা উনি ভোগ করেছেন, তা থেকে একটা প্রতিশোধের স্পৃহা ওঁর ভেতর জমেছে।

ম্যানেজার—সেটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক, তবে এখন তো আর উনি একজন সাধারণ লোক—'হি বিলংগস্ টু আপার মোষ্ট সোসাইটি,' নানা লোক এবং তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে না চটিয়ে তাদেরই একজন হয়ে টিঁকে থাকতে হবে। এই ভোলা, বিশু, যাদের উনি ছাড়তে পারছেন না আজ আর তারা কেউ নয় ওঁর, হতেও পারে না। সাধারণ লোক এখন আপনা থেকেই ওঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাবে—ওরাও থাকবে না, আবার এদেরও উনি চাইছেন না, তবে সমাজে থাকবেন কাকে নিয়ে—ম্যান্ মাষ্ট হ্যাভ এ সোসাইটি অব হিজ ওন, উঁচুতলার সমাজই আজ আপনাদের সমাজ, এটা উনি না বুঝলেও আপনাকে তা একটু বুঝিয়ে দিতে হবে।

রচনা। [চিন্তিত মুখে] কিন্তু কি করে বোঝানো যায়, সেখানেই ভাবনা। এসব যুক্তি দেখাতে গেলে হয়তো বা ক্ষেপেই উঠবেন।

ম্যানেজার। না না, আমি আপনাকে যে ভাবে খোলাখুলি বললাম, তা ওঁর কাছে বলাই চলে না। এটা একটু ট্যাক্টফুলি ম্যানেজ করতে হবে।

রচনা। [সাগ্রহে] বেশ তো আপনি বলুন না, কি ভাবে কি করা যায়?

ম্যানেজার। আমি অবশ্যি মতলব একটা স্থির করে রেখেছি, ভরসা দেন তো বলি।

রচনা। হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলবেন বই কি। এবিষয়ে আপনার সাহায্য না পেলে আমি তো ভাবতেই পারছি না কি করে কি করবো।

ম্যানেজার। আমার প্ল্যানটা হলো, একদিন খুব বড় রকমের একটা পার্টির ব্যবস্থা করা। তাতে টপ মোষ্ট সোসাইটির—আই মীন, সহরের সমস্ত ধনী মানী লোকদের ডেকে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। অবিশ্যি খরচটা কিন্তু এক সন্ধ্যায়—এই ধরুন, আট-দশ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে।

রচনা। [একটু ভেবে নিয়ে] ও খরচের কথা আপনি ভাববেন না। আপনার এ আইডিয়া আমার তো খুব ভালো লাগছে। এক রাতে বাড়ী বসে সবার সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাবে।

ম্যানেজার। [সোৎসাহে] হ্যাঁ, সোসাইটির সবার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মৃগাঙ্ক বাবুর জড়তাটা একবার কেটে গেলে তিনি নিজেই দেখবেন ভোলা-বিশুকে আর আঁকড়ে থাকতে চাইবেন না।

রচনা। অবিশ্যি বিশু-ভোলার কথা আলাদা—ওদের কাছে আমরা নানারকমে কৃতজ্ঞ।

ম্যানেজার। [সামলে নিয়ে] না না, বিশু-ভোলা বলতে আমি মৃগাঙ্ক বাবুর এই গুটিয়ে থাকার কথাটাই মীন করেছি। এখন প্রধান সমস্যা হলো মৃগাঙ্ক বাবুর মত—

রচনা। [চিন্তিত মুখে] মত না হয় নেওয়া গেল—কিন্তু আমি ভাবছি, এত বড় ব্যাপার 'ম্যানেজ' করবে কে, আমি তো এসব ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি—ভরসা একমাত্র আপনি।

ম্যানেজার। আপনি যদি মৃগাঙ্ক বাবুকে রাজি করাতে পারেন তাহলে 'ম্যানেজ' করবার জন্যে ভাবতে হবে না। আমার স্ত্রী এসব বিষয়ে একেবারে এক্সপার্ট, তাঁকে এনে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

রচনা। ওঃ, তাহলে তো গ্র্যাণ্ড হয়—ওঁর মতের জন্যে আপনি ভাববেন না। আজ রাতেই আমি ওঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করে রাখবো। সত্যি একা-একা একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি, নিজেদের অনুযায়ী মেলামেশা করবার জন্যে দশ জনকে না পেলে কি সময় কাটতে চায়—মিসেস চৌধুরীকে কাল সকালেই আপনি নিয়ে আসুন।

ম্যানেজার। ওহ, শুয়র।

রচনা। আচ্ছা, তাহলে এই কথা রইলো, আমি যাই এখন।

(ম্যানেজার সাহেবী কেতায় মাথা মৃদু নুইয়ে সসম্মান সম্মতি জানায়, রচনা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়।)

ম্যানেজার। [সাফল্যের তৃপ্তি নিয়ে] যাক, এ ব্যাপারটা উৎরে গেলে খানিকটা অন্তত—[একটা হাতে মুঠোয় আনার ভঙ্গী করে।]

[ক্রমশঃ।

শুধু কথা!

শমিতা গুপ্ত

কথার মালা সাজিয়ে এত আনন্দ পাও মনে?
তাই ত অকারণে
কথার জালে জড়িয়ে ফেলে হানলে
আঘাত প্রাণে।
তোমার কাছে কথা শুধুই কথা
তাকে অনেক মূল্য দিয়ে শুধুই পেলাম ব্যথা।
তাবার মায়া-ডোরে, তুমি বাঁধলে মোরে,
তাবার মায়া কাটবে যখন, রহিবে শূন্যতা।

দোহাই তোমার একটুকু চুপ করো,
হৃদয়খানি একটু মেলে ধরো,
নীরবতার মাঝেই আছে গভীরতা
সেটা কেন বুঝতে নাহি পারো?
চমকলাগা শব্দ চয়ন করে
আর কত দিন ভুলিয়ে রাখবে মোরে?

উদয়ভানু

ভোর-রাতে তন্দ্রা নেমেছে চোখে। গভীর সুখনিদ্রা নয়, ঘুমের আমেজ।

আলো জাগার আশায় এক মুক্ত জানলার ধারে যেন প্রতীক্ষায় বসেছিলেন চন্দ্রকান্ত। বিনিদ্রায় রাত্রি যাপন করবেন, এই ছিল প্রতিজ্ঞা। রাত্রির শেষাশেষি সেই অবাধ্য ঘুম নামলো চোখে। ক্লান্তি আর অবসাদে নিজের অজ্ঞাতেই যেন কখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। চিন্তা আর তন্দ্রার দ্বন্দ্বযুদ্ধে, প্রথমারই জয় হয়। চন্দ্রকান্ত চোখ মেলতেই দেখলেন আকাশের এক প্রান্তে যেন আলোর চিকণ। সাদা আর লাল রঙ যেন ছড়িয়ে আছে এখানে-সেখানে। অদৃশ্য শিল্পী যেন এই দুই রঙের রেখা টেনেছে আকাশের পটভূমিতে। কিম্বা কা'রা যেন তীর ছুঁড়ছে, কাঁচা রক্তের চিহ্ন দেখা দিয়েছে আকাশের বুকে। দিনের প্রথম আলো পুব-দিগন্তে, দেখে কেমন শিউরে উঠলেন চন্দ্রকান্ত। আলোর রূপালী ঝর্ণা, দেখে কোথায় উৎফুল্ল হবেন। আলোর বসন্তোৎসব দেখে যেন ভয়ার্ত হয়ে পড়লেন। শিউরে শিউরে উঠলেন। রাতে যেন কি এক বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। নরকের নাটক দেখেছেন যেন! বীভৎস দৃশ্য!

পাখী ডাকছে গাছে গাছে। কাক আর শালিক। ঘুম-ভাঙা ডাক ডাকছে। তাদের আপন ভাষায় প্রার্থনার গান গাইছে যেন এক সঙ্গে। ঈশ্বরের শান্তস্নিগ্ধ হাসির মত, থেকে থেকে আলো ফুটছে শূন্যমার্গে। আসমান দীঘির তীরে ভ্রমরের গুঞ্জন ভাসছে। আধ-ফোটা গন্ধরাজের কুঁড়িতে চুমা খায় কালো-ভ্রমর; সুখ আর আনন্দে পাপড়ি ছড়ায় ফুল। ভোরের হাওয়ায় গন্ধ ছড়ায়। মানুষের মত স্বার্থ নেই ফুলের, তাই সুগন্ধ বিতরণ করে যেন।

আসমানের তীর থেকে এক ঝলক বাতাস উড়ে আসে। কনক-চাঁপার সৌরভ ভাসিয়ে আনে। আলো ফুটলো, পাখী ডাকলো—ফুল ফুটলো—তবুও খুশী হ'লেন না চন্দ্রকান্ত! চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি তাঁর। পলাতকের মত ভয়ে ভয়ে দেখছেন ইতি-উতি। কোথায় আশ্রয় মিলবে এই দিনের আলোয়, তারই সন্ধান করছেন সভয়ে।

এমন সময়ে মনুষ্যকণ্ঠের অস্পষ্ট কলরোল শুনলেন যেন কানে। একদল মানুষ, যেন যুদ্ধ করতে চলেছে। মত্তকণ্ঠে চিৎকার করছে থেকে থেকে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া কেঁপে উঠছে যেন কলধ্বনিতে।

দিগন্তের আলোকপরিধি ধীরে ধীরে বর্দ্ধিতায়তন ও উজ্জ্বলতর হ'তে থাকে। কক্ষের জানলা থেকে দেখা যায়, খরস্রোত আমোদরের জলরাশিতে যেন লালের আভা। আমোদর গতিশীল, দূর থেকে বোঝা যায় না। নদীতীরের বালিয়াড়ির ধবলশিখরে আলোর স্পর্শপ্রভা।

চন্দ্রকান্ত সহসা দেখলেন, এক গগনচুম্বী তালগাছের শীর্ষ দুলে উঠলো। গাছের পাতার মর্মরধ্বনি শোনা যায়। চন্দ্রকান্ত দেখেন, গাছের চূড়া থেকে এক জোড়া শকুনি উড়লো। তাদের চাঞ্চল্যে গাছটি দুলছে। চন্দ্রকান্ত স্থিরদৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন, শকুনি দু'টি উড়তে উড়তে নদীর তীরে নামলো। হয়তো তৃষ্ণায় কাতর হয়েছে, নদীর জল পান করবে তাই। চন্দ্রকান্ত আবার দেখলেন, আমোদরের তীরে একটি শবদেহ প'ড়ে আছে। কোথা থেকে ভাসতে ভাসতে এসেছে কে জানে! ব্রাহ্মণের স্মরণে আসে কাল রাত্রির ঘটনা! চৌধুরাণীর পত্রপুটার মাঝিদের একজন হয়তো, মৃত অবস্থায় নদীর চড়ায় আটকেছে। ম্যানেটের বন্দুকের বারুদের জ্বালা সহ্য করতে পারে নি আর। শকুনিদের মোচ্ছব চলবে আজ, ঐ দেহকে ঘিরে। যাই হোক, চন্দ্রকান্ত আরও যেন ভীত হ'লেন। মনুষ্যকণ্ঠের চিৎকার যেন নিকটতর হয়।

কক্ষের এক দুয়ারে মৃদু করাঘাত হয়। চমক লাগে যেন। চন্দ্রকান্ত অস্ফুটস্বরে সাড়া দেন। বলেন,—কস্ত্বং? কে তুমি?

—আমি রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী।

জমিদারপত্নীর কথায় মিষ্টি সুর, কিন্তু যেন ঈষৎ ভীত কণ্ঠ! দুয়ারে আবার করাঘাত পড়ে। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোরালো আঘাত।

অগত্যা চন্দ্রকান্ত বন্ধ দ্বারের অর্গল মোচন করলেন। দ্বার মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন, এক দৈবী মূর্ত্তি যেন। লজ্জানম্র, কিন্তু যেন কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন। ব্রাহ্মণ দেখলেন ভোরের আলো-আঁধারে, রমণী সুন্দরী বটে। সৌন্দর্য্যের সকল সুলক্ষণ যেন ঐ দৈবীমূর্ত্তিতে একত্র দেখা যায়। রাজকন্যার পরিধানে লাল পাড় পট্টবস্ত্র। মাথায় অল্প গুণ্ঠন। আলুলায়িত কেশরাশি তৈলহীন ও রুক্ষ। বিশাল চক্ষুর দৃষ্টিতে যেন বিশেষ উদ্বেগ।

—কিছু বক্তব্য আছে কি?

চন্দ্রকান্ত বিস্ময় থেকে যেন মুক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন। বললেন,—এত কলরোল কেন? কাদের এই চিৎকারধ্বনি?

বিন্ধ্যবাসিনী গুণ্ঠন টানলেন আরও। সীমন্ত থেকে কপালে। বললেন,—আপনি অবিলম্বে এই স্থান ত্যাগ করুন। বিপদের আশঙ্কা, তাই এই অনুরোধ। চৌধুরীমশাইয়ের লেঠেলরা এসেছে আনন্দকুমারীর খোঁজে। তাদের প্রত্যেকেই অস্ত্রসজ্জিত। কথা বলতে বলতে ক্ষণেক থেমে আবার বললেন,—হয়তো এই ভগ্নপুরী তল্লাস করতে চায়।

বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হ'তে থাকে চন্দ্রকান্তর। আসন্ন বিপদের

আশঙ্কায় কিংকর্ত্তব্য স্থির করতে পারেন না। বিচলিত সুরে বললেন,—আমার তো সমূহ বিপদ! আপনি বিপমুক্ত হোন, এই প্রার্থনা জানাই।

নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছেন রাজকুমারী। উদ্বেগের উপশম হয় যেন; মৃদু হাসির সঙ্গে বিন্ধ্যবাসিনী বলেন,—আমার আর বিপদ কি? আমি তো সর্ব্বহারা। মৃত্যুকে ভয় করি না। দুঃখ পাই আনন্দকুমারীর কথা ভেবে। সে সত্যই আপনাকে—

—বিদায়। বললেন চন্দ্রকান্ত। কথার শেষে আর একবার যেন দেখলেন রাজকন্যাকে। বললেন,—হয়তো আর সাক্ষাৎ হবে না কখনও। অনাগত ভবিষ্যতে কি দশা হবে জানি না। বিদায়!

বিন্ধ্যবাসিনী আর বাক্যব্যয় করেন না। অপলক চোখে চেয়ে থাকেন। ব্রাহ্মণ বিদায়কালে দেখলেন, রাজকন্যার চক্ষু অশ্রুসিক্ত। ছলছল আঁখিপ্রান্ত। বস্ত্রাঞ্চলে চোখ ঢাকলেন বিন্ধ্যবাসিনী।

আসমানের ঘাটে পৌঁছে চতুর্দ্দিক একবার নিরীক্ষণ করেন চন্দ্রকান্ত। পরমুহূর্ত্তেই আসমানের জলে ঝাঁপ দিলেন। দীঘির জল আলোড়িত হয়ে ওঠে সশব্দে। দীঘির তীর থেকে ফললোভী পাখীর ঝাঁক সভয়ে উড়ে পালায়। এক ঝাঁক শালিক ডাকতে ডাকতে উড়লো আকাশে।

কৃষ্ণরামের ভগ্নপুরীর সমুখে এক ক্ষুদ্র জনতা জমায়েৎ হয়েছে। তারা যেন ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। কারও হাতে তৈলাক্ত লাঠি, কারও হাতে বর্শা, কারও হাতে ভল্ল। প্রথম সূর্য্যালোকের রূপালী কিরণে অস্ত্রসমূহ আলোকচ্ছটা ছড়ায়।

আঁচলে চোখ মুছে মুছে চোখ দু'টি ঘোর লাল হয়ে ওঠে। বিন্ধ্যবাসিনী এত বিপদেও ধৈর্য্যহারা হন না। শুধু অশ্রুপাত হয় তাঁর। অবাধ্য ক্রন্দনের বেগ যেন সামলাতে পারেন না কোন মতে। আবার চোখ মুছলেন। তারপর ধীরে ধীরে দ্বিতলে গেলেন। সোপানশ্রেণী অতিক্রমণের ক্লান্তিতে ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে ফেলতে দ্বিতলের ছাদে গিয়ে দেখা দিলেন জনতাকে। ফটক তোরণের একদিকে একা পাঠান প্রহরী, অন্যদিকে প্রায় বিশ-পঁচিশ জন কৃষ্ণকায় মানুষ। তাদের হাতে হাতে উদ্যত অস্ত্র। তাদের কণ্ঠ শোনা যায়, কিন্তু ভাষা বোঝা যায় না এত দূর থেকে।

পাঠান প্রহরী, বন্দুক উঁচিয়ে আছে। সাফ কথা জানিয়ে দিয়েছে প্রহরী, জনতা আর এক পা এগোলেই বন্দুক দাগবে সে।

গৃহের ছাদে গৃহকর্ত্রীকে দেখে জনতা আবার চিৎকার করলো। প্রহরী দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলো জমিদারনন্দিনীকে। বিন্ধ্যবাসিনী সঙ্কেতে ডাকলেন প্রহরীকে। ভোরের হাওয়ায় রাজকন্যার রুক্ষ এলো চুলের রাশি উড়ছে কৃষ্ণপতাকার মত।

পাঠান ছুটতে ছুটতে আসে। আরবী ঘোড়ার মত লাফাতে লাফাতে আসে যেন। পর পর ক'টা কুর্নিশ ঠুকে বলে,—বন্দেগী বেগমসাহেবা! হুকুম দেন, কাফেরের বাচ্চা ক'টাকে বন্দুকের তোপে বেহেস্তে পাঠিয়ে দিই।

গুণ্ঠনে ঢাকা মাথা দোলালেন জমিদারণী। অসম্মতি জানালেন। বললেন,—না, বন্দুক নামিয়ে রাখো। ওদের আসতে দাও। আমিই কথা বলবো ওদের সঙ্গে।

—বরখিলাপি বরদাস্ত ক'রবো না বেগমসাহেবা!

লৌহ শিরস্ত্রাণে লুকানো মুখ থেকে কথা ভেসে আসে পাঠান প্রহরীর।

—ওদের বক্তব্য আগে শুনতে দাও। ওদের বাধা দিও না তুমি।

ছাদ থেকে কথা বলেন বিন্ধ্যবাসিনী। মনিবানী হুকুমের সুরে কথা বলেন না, বরং বিনম্র সুরে বলেন:—বিপদে পড়েছে ওরা, তাই এসেছে। ওদের মেয়ে যে হারিয়ে গেছে।

আবার কুর্নিশ ঠুকতে থাকে প্রহরী। একবার, দু'বার, তিনবার। টাট্টু ঘোড়ার মত ছুটতে ছুটতে এগোয় ফটকের দিকে। তার নাগরার নাল খটাখট শব্দ তোলে।

একদল বাগদী। মিশ কালো রঙ, পেশীবহুল বলিষ্ঠ আকৃতি। মাথায় বাবরি চুল। খাটো কাপড় এঁটে বাঁধা। কোমরে কোমরে লাল গামছা জড়ানো। বাঙলা দেশের লড়াইয়ে জাতের মধ্যে বাগদীদের নামডাক খুব। বন্দুকের বারুদ আর কামানের তোপকেও ভয় করে না। সামনাসামনি লড়তে পারে, আবার গুপ্তযুদ্ধেও ওয়াকিবহাল। বাঙলার নবাবরা পর্য্যন্ত তাদের সাহায্য চান মধ্যে মধ্যে। মাইনে দিয়ে পোষেণ, শত্রুদের সায়েস্তা ক'রতে।

ওদের দলকে দল এগিয়ে আসে দ্রুত পদক্ষেপে। ছাদের 'পরে

প্রতিমার মত এ নারীমূর্তিকে দেখে হাতের অস্ত্র নামিয়ে নেয় সসম্ভ্রমে। মন্দিরের চূড়া দেখছে যেন, চোখে চোখে দৃষ্টি উঁচিয়ে আছে তেমনি।

রাজকুমারী মিহি মিষ্টি সুরে বলেন,—তোমরা কি আনন্দকুমারীর খোঁজে এসেছো?

দলের সকলে একই সঙ্গে বলে,—হাঁ হুজুরণী!

—রাতে সে ঘরে ফিরে যায় নি?

—না। আমাদের মশাইয়ের মেয়েকে ফিরিয়ে দেন, আর আমরা কিছু বলতে চাই না। ভালয় ভালয় ফিরে যাই।

দলের একজন বললে উচ্চকণ্ঠে! বললে,—মশাই তো ঘরে নাই, বাণিজ্য করতে গেছেন গ্রামের বাইরে। ঠাকরুণ আমাদের কেঁদে কেঁদে হয়রাণ হচ্ছেন।

চোখ ছলছলিয়ে ওঠে রাজকুমারীর। কি উত্তর দেবেন, ভাবতে পারেন না। বুক দুরদুরিয়ে ওঠে। কণ্ঠ শুকিয়ে যায়। ভোরের আবছা আলোয় অন্ধকার দেখতে থাকেন। কত কষ্টে যেন কথা বললেন। বললেন,—তোমাদের মেয়ে তো রাতের বেলায় গেছে এখান থেকে। প্রথম প্রহরেই চ'লে গেছে! তার পর—

—তার পর হুজুরণী? তার পর কোথায় গেলো মেয়ে? ঘরে তো ফেরে নাই!

—তার পর কোথায় গেল জানি না তো!

বিন্ধ্যবাসিনী হতাশ সুরে বললেন। মিথ্যাকথনে অনভ্যস্ত তিনি, তবুও বাকীটুকু চেপে গেলেন না জানার অছিলায়।

—কি উপায় হবে হুজুরণী? গুমখুন করলে না তো কেউ?

—তোমরা নদীতে খোঁজাখুঁজি কর, হয়তো সন্ধান পাবে। আনন্দর নৌকা যাবে কোথায়?

দলকে দল নিরাশায় ভেঙ্গে পড়লো যেন! ওদের মিশ কালো শরীরে হলুদ রঙের কাঁচা রৌদ্র ছড়িয়েছে। রাজকন্যা দেখলেন, ওদের মুখে মুখে যেন হতাশা! অবিশ্বাসের চাউনি যেন চোখে চোখে।

কেউ বললে,—আমরা ঘরে ঘরে তল্লাস চালাবো, অনুমতি দেন।

কেউ বললে,—যাবে আর কোথায়, আছে এই ভূতের বাসায়।

কেউ বললে,—ডানা তো আর গজায় নাই যে উড়ে পালাবে!

দুঃখের হাসি হাসলেন বিন্ধ্যবাসিনী। ক্ষণেক ভেবে বললেন,—ভাল কথা, আপত্তি নাই আমার। তবে তোমাদের এখানে তল্লাস করাই সার হবে, আগে ভাগে জানিয়ে দিই। তার চেয়ে নদীতে যদি খোঁজ করতে হয়তো আনন্দর সন্ধান মিলতো। নৌকা যাবে কোথায়! নৌকার মাল্লারাই বা যাবে কোথায়?

দলের চাঁই বললে,—আগে আপনার চৌহদ্দীটা একবার দেখে নিই, তার পর নদীতে যাবো আমরা। আপনি অনুমতি দেন হুজুরণী।

—বেশ কথা। তোমাদের যেমন ইচ্ছা তেমনই হোক। দেখো এসে, কোথাও যদি দেখা পাও তোমাদের মেয়ের।

রাজকুমারী কথার শেষে ছাদ ত্যাগ করলেন। একবার যেন বিরক্তির দৃষ্টি হানলেন জনতার প্রতি। পরিচারিকা এক পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারও মুখে বিরক্তি। মনিবনীকে অনুসরণ করলো সে। চাপা গলায় কথা বলে নিজের মনে। বলে,—মেয়ের ডানাই গজিয়েছিল, তাই উড়ে পালিয়েছে। খুঁজে মর' এখন তন্ন তন্ন ক'রে। সাহেবের বুক থেকে কি আর ছিনিয়ে আনতে পারবে তোমাদের মেয়েকে!

তিরস্কারের সুরে বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—সাবধান যশোদা, মুখে কুলুপ এঁটে থাকবি। মুখ থেকে তোর যেন কথা না খসে। রক্ষে থাকবে না তবে!

যশোদা মুখ খিঁচিয়ে বলে,—আমাকে কেটে ফেললেও কথা বেরুবে না মুখ থেকে। আমার বলার দায়টা কি তাই শুনি। চল' তুমি ঘরে চল' বৌ। বলা কি যায়, ওদের কার মনে কি আছে!

দলের সকলে নয়। দলপতির সঙ্গে আরও জনা পাঁচ ছয় একতলার ঘরে ঘরে হানা দেয় আর বেরিয়ে আসে ব্যর্থ মনে। একতলা থেকে দোতলায় ওঠে দুপদাপিয়ে। এ ঘরে সে ঘরে তল্লাসী চালায়। এটা সেটা নাড়াচাড়া করে। তক্তাপোষ তোলা-পাড়া করে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে যশোদা। মনে মনে গাল পাড়ে। গজরাতে থাকে রাগে। তার পর এক সময়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে,—ভোজবাজী তো আর নয়! ভানুমতীর খেলাও নয় যে তোমাদের মেয়ে আর অতগুলো মাঝিকে লুকিয়ে ফেলবো আমরা আঁচলের তলায়।

দলপতি বললে—আমাদের মা ঠাকরুণ যেমন হুকুম দিয়েছেন, আমরা কি করতে পারি! ঠাকরুণ যে কান্নাকাটি ক'রতে লেগেছেন মেয়ের বিহনে। মশাই শুনলে হয়তো আর বাঁচবেন না। দম আটকেই মারা যাবেন।

যশোদা তবুও একটু নরম হয় না এমনই নির্মম সে। ভর্ৎসনার সুরে কথা বলে। রাগের সুরে বলে,—আমাদের জমিদারণী বললে, তোমরা তো কানই দিলে না তাঁর কথায়। নদীতে এতক্ষণ দেখলে হয়তো খোঁজ পেতে মেয়ের।

—আমোদর নদী তো আর খালবিল নয় যে এক লহমায় দেখতে পাবো! কোথা থেকে কোথায় ছুটেছে নদী! দামোদরের সঙ্গে যোগ হয়েছে, মা গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে।

কথার শেষে দলপতি কপালে যুক্তকর ঠেকালো। অদৃশ্য মা গঙ্গার উদ্দেশে হয়তো প্রণাম জানালো। নদীমাতৃক দেশের মানুষ, তাই নদীকে মাতৃজ্ঞান করে।

ঘরের মেঝেয় রোদ প'ড়েছে, ত্রিকোণ আর চতুষ্কোণ আকারে। পুবের গবাক্ষপথে সূর্য্যকিরণ এসেছে হলুদ রঙের। বিন্ধ্যবাসিনী দাঁড়িয়ে থাকেন পাষাণমূর্তির মত। জলে ভারী আঁখিপল্লব। অপলক তাকিয়ে আছেন রাজকন্যা। তাঁর মুখে আর বুকে সোনার প্রলেপ যেন, কাঁচা রোদের নিস্তেজ আলো। কূলপ্লাবী আমোদরকেই দেখছেন হয়তো। নদীর জলের গতি ধরা পড়ে না চোখে, দূর থেকে। ব'য়ে চলেছে, না গতি হারিয়েছে। আর একবার আঁচলে চোখ মুছলেন রাজকুমারী—কান্নায় লাল চোখ। যখন তখন জল ঝরছে চোখ থেকে—চৌধুরাণীর দুঃখে। ম্লেচ্ছর হাতে না জানি তার কত ভেনস্তা হবে। হেফাজতে থাকবে কি না কে জানে। রক্ষণাবেক্ষণ হবে না হয়তো তার। দিনকতক থাকবে হয়তো ভোগের সুখে, তারপর পুরানো পোষাকের মত বাতিল হয়ে যাবে। কে ঠাঁই দেবে তখন! ঘরে আস্তানা পাবে না সমাজের শাসনে, পরেও আশ্রয় দেবে না। কেঁদে কেঁদে মরতে হবে তখন ধনীর ঘরের মেয়েকে। রূপের ডালি আনন্দকুমারী। সেই রূপই তার শত্রু হয়ে দাঁড়ালো।

তুলনা করাটা কোন কাজের কথা নয়

আর বিজ্ঞাপনে অতিশয়োক্তি থাকেই

তবুও

যেমন বারনার্ড শ'র লেখার কথায় বলে না

"Not to have read shaw is to be behind
the times
as far as he has always been before
them."

তেমনি……

আপনি যদি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যাকে একটি "বিশেষ সুপাঠ্য বই" বলেছেন; ডাঃ কালিদাস নাগ যাকে 'A very welcome book' বলে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন; শ্রীরাজশেখর বসু যার 'অনেক পাঠক হবে' বলে আশা করেছেন; শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় যাকে 'সার্থক রচনা এবং প্রাসঙ্গিক ভাবে 'বলার ঢং, বলার ভাষা, বলার বিষয়'কে…মোগলাই বা মজলিসী বলেছেন'; শ্রীনরেন্দ্র দেব যাকে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আরব্য উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকবে চিরদিন…' বলে বিশ্বাস করেছেন; শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যা 'বুদ্ধির দীপ্তি ও কৌতুকের ছটায়… ঝলমল করছে আর যাকে রমণীয় রচনা হিসাবে…নিঃসন্দেহে উল্লেখ-যোগ্যতার পর্যায়ে পড়ে' বলেছেন, তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত সেই অভিনব রম্যরচনা **'পরিক্রমা'** বইখানি আপনি যদি না পড়েন, বঙ্গসাহিত্যের বিপুল অগ্রগতির সংবাদ আপনার কাছে থেকে যাবে অজ্ঞাত।

বিখ্যাত দার্শনিক লাওৎসে একদিন তার এক বন্ধুর সঙ্গে লেকের ধারে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি জলে মাছদের খেলা করতে দেখে বললেন "মাছগুলো জলের মধ্যে কি সুখেই না আছে"। তাতে তার বন্ধু তক্ষুণি জবাব দিলেন যে, "তুমি তো আর মাছ নও যে তুমি জানবে মাছেরা জলের মধ্যে সুখে আছে কি না?" তাতে লাওৎসে জবাব দিলেন, "তুমি তো আর আমি নও, যে জানবে, যে মাছেরা জলের মধ্যে সুখে আছে কি নেই, আমি তা জানতেই পারি না"।

তেমনি

অপরের মুখে আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স কর্তৃক প্রকাশিত **এমিল জোলার**
বহ্নি—৩॥০, রেণীর প্রেম—৪৲, স্বপনচারিণী—২৸০, বৈদেহী—৩॥০, ব্যায়নার দ্যাঁ দে স্যাঁ পীয়ারের—পল ও ভির্জিনি—৩৲, মোপাসাঁর—মোপাসাঁর একাদশ—৩॥০—এগুলি সম্বন্ধে আপনি কত লোকের কাছে কত প্রশংসাই শুনেছেন, কিন্তু বইগুলি যে সত্যি কত ভাল তা আপনি নিজে যতক্ষণ না পড়ছেন, ততক্ষণ বুঝতে পারবেন না।

ইজিপ্তের লোকেরা বলে SHOKR
সুইডেনের লোকেরা বলে TACK
ফিনল্যাণ্ডের লোকেরা বলে KIITOS
ইটালিয়ানরা বলে GRAZIE
গ্রীকরা বলে EFCHAREESTO
রুশরা বলে SPASSIVA
ফরাসীরা বলে MERCI
উচ্চারণ বিভিন্ন হলেও সব কথাগুলোর মানেই হচ্ছে 'ধন্যবাদ'।
বিভিন্ন দেশের ভাষা শিখতে গেলে বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষা মন দিয়ে পড়তে হয়

কিন্তু

বিশ্ববিশ্রুত কিরোর 'Secrets of the hands'র রমণীয় বাংলা অনুবাদ।

'হাতের গোপন কথা'—৩৲

আপনি যদি মনোযোগ দিয়ে পড়েন তবে শুধু যে হাতের সব রেখাগুলিই আপনার জানা হয়ে যাবে তা নয়, ভবিষ্যতে কি হবে তাও বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারবেন।

দুটি বিমুগ্ধ আমাকে…………

মারী স্টোপসের-

বিবাহিত প্রেম-৪৲

Marie Stopes-এর বিশ্ববিশ্রুত
Married Love-এর বাংলা অনুবাদ

আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২।

ডন
ব্র্যাডম্যানের
ক্রিকেট
খেলার
অ, আ, ক, খ
দাম—৪৲

রূপের আগুন যখন নিবে যাবে, তখন ? ফুল আর ফলে নম্র রসালো গাছ যখন শুকিয়ে যাবে। চৌধুরীমশাইয়ের টাকার আণ্ডিল কে পাবে কে জানে ? মেয়ের অভাবে তিনি কি আর বেঁচে থাকবেন ? তাঁর একমাত্র মেয়ে, যেন চোখের মণি।

—বৌ ! হঠাৎ কথা বললে যশোদা। শব্দহীন পদক্ষেপে কখন ঘরে এসেছে পরিচারিকা। শুষ্ককণ্ঠে বললে,—কি হবে বৌ ? ম্যাও সামলাবে কে ? অমন সমস্ত মেয়েটা নিখোঁজ হয়ে গেল !

বিন্ধ্যবাসিনী যেন পাষাণে পরিণত হয়েছেন। কথা নেই মুখে, যেন বাক্যহারা। চোখের পলক পড়ছে না তাঁর। ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় শুধু রুক্ষকেশ উড়ছে। মুখের লাল অধর যেন বর্ণহীন মনে হয়। চোখের কোলে কালিমা দেখা দিয়েছে।

—কথা কও না কেন বৌ ? আবার কথা বললে পরিচারিকা। বললে,—নদীতে চৌধুরীর মেয়ের নৌকা কি দেখতে পাও ? চোখে পড়ছে ?

জমিদারকন্যার নিষ্পলক চাউনি অনুসরণ করে যশোদা। সেও দেখলো দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, যতটুকু দেখা যায়। পরিচারিকার চোখে পড়লো নদীর বুকে কয়েকখানি গহনা নৌকা, এখানে সেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। জেলেরা মাছ ধ'রতে বেরিয়েছে রাত থাকতে। জাল ফেলছে জলে। দূরের হাট-বাজারে চালান দেবে, আমোদরের মাছ।

—চৌধুরীমশাই মাদ্রাজে থাকলেও একটা কিছু বিহিত ক'রতে পারতেন। কোতোয়ালের সাহায্য পেতেন। রাজকুমারীর কথায় যেন কাঁপা-কাঁপা স্বর।

হতাশ হাসি হাসলো যশোদা। বললে,—তাঁর আসতে আসতে এখন এক পক্ষ। তদ্দিনে পগার পেরিয়ে যাবে চোর। তখন কি আর নাগাল পাওয়া যাবে !

—কি জানি কি হবে শেষ পর্য্যন্ত ! বিন্ধ্যবাসিনী ফিসফিস বললেন। অদৃশ্য ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে যেন কথা বলছেন। বললেন,—চন্দ্রকান্ত কি রেহাই পাবেন ? তিনিও যে ছিলেন আনন্দের সঙ্গে, একই নৌকায়।

কথার শেষে রাজকন্যা গবাক্ষ ত্যাগ করলেন। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ঘরের দুয়ারের কাছে গিয়ে বললেন,—কাচা কাপড় একখানা দাও যশো, পাটের কাপড়টা ছেড়ে ফেলি।

—সে কি কথা ! পুজোর জোগাড় আছে যে। ফুল বাচবে, নৈবিদ্যি সাজাবে। এখনও কিছুই তো হ'ল না। পরিচারিকা বাকী কাজের তালিকা পেশ করে মুখে। বলে,—স্নান করতে দীঘিতে যেতে হবে না ? চন্দন বাটতে হবে, দুর্ব্বো বাচতে হবে, ফুলের মালা গাঁথতে হবে—

—না যশোদা, পারবো না আমি। শরীরে কুলাবে না।

—কি আবার পারবে না ? পরিচারিকা শুধালে অবাক চোখে। বললে,—দেবদেবীকে উপোসে রাখবে ?

—হাঁ, তাই থাকবেন।

—অবাক করলে যে বৌ !

—আমি পারি না আর পুজার ঘরে যেতে। শরীর ব'য় না।

—চন্দ্রকান্ত আজ আর পুজায় আসতে পারবেন, কেমন মনে হয় না। এখন ভালয় ভালয় তিনি ঘরে ফিরতে পারেন তো বেঁচে যান। কথা বলতে বলতে শ্বাস নেয় পরিচারিকা। আবার বলে,—নিষ্কর্ম্মার মত চুপচাপ ব'সে থাকবে তুমি ?

ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দেয় রাজকন্যার মুখে। বললেন,—পুঁথি নকলের কাজ করবো আমি, যাতে দু'দশ কড়ি ঘরে আসবে।

—পুজো-পাব্বণ সেরে তোমার কাজ কর' না, আমি বলতে আসবো না। নারায়ণের মাথায় তুলসী পড়বে না, আশ্চর্য্যি করলে বৌ।

কথায় হতাশার ধ্বনি ফুটলো যেন। বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—তুমি নদীর জলে শালগ্রামকে দিয়ে এসো যশোদা। কাজ নেই আমাদের নারায়ণ প্রতিষ্ঠায়।

—অমঙ্গল হবে যে বৌ ! তোমার সোয়ামীর অকল্যাণ হয় যদি !

আবার অল্প একটু হাসলেন রাজকুমারী। শ্লেষের হাসি হাসলেন যেন। বললেন,—তাই যদি হয়, আমি আর কি করতে পারি ? অমঙ্গলের আর বাকী আছে কি ?

—দয়ামায়া নেই তোমার। দেবদেবীকে ভয় কর'না ?

—নাঃ, কিছুই আর নাই। সব জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমার কপালটাই যে পোড়া যশোদা ! খানিক থেমে রাজকন্যা আবার বললেন,—আমার কথা রাখো। নদীতে দিয়ে এসো পাষাণের দেবতাকে।

—শুনলে না কথা, আমি আর কি ব'লবো ! আমরা একেই মূর্খ মানুষ ! হুকুমের দাসী আমরা, যা হুকুম ক'রবে তাই শুনতে হবে।

কথা বলতে বলতে যশোদা একখানি ধোয়া শাড়ী এগিয়ে দেয় রাজকন্যার হাতে। সুতোর কাপড়, তাঁতের লালপাড় শাড়ী। ফরাসডাঙ্গার তাঁতবস্ত্র।

পট্টবস্ত্র ছেড়ে সুতোর কাপড় পরেন বিন্ধ্যবাসিনী। শুভ্র শাড়ীতে আরও যেন বিষণ্ণ দেখায় তাঁকে। মুখের মালিন্য যেন প্রকট হয়ে ওঠে। রাজকুমারী বললেন,—নদী থেকে ঘুরে এসো তাড়াতাড়ি। তোমাকে একবার বেণের দোকানে যেতে হবে। কালি আর কলম কিনে আনতে হবে। তুলট কাগজ আনতে হবে।

—মুখে জল দেবে না তুমি ? কিছু দাঁতে কাটবে না ?

—আগে তুই ঘুরে আয় যশো, তারপর। রুচি হয় না কিছু খাই।

—সত্যি সত্যিই যাই তবে, নারায়ণকে দিয়ে আসি আমোদরের জলে ? ভেবে-চিন্তে দেখো এখনও।

—হাঁ গো হাঁ। ভাবনার কিছু নাই আর। তুমি কিন্তু যাবে আর আসবে।

—হুকুমের দাসী আমি। যেমন হুকুম করবে তেমন ক'রবো আমি। কথার শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পরিচারিকা। চোখে তার ক্রোধের চাউনি। সশব্দ পদক্ষেপ !

দেহমনে যেন অবসন্নতা। রাজকুমারী পালঙ্কে ব'সে পড়লেন। ক্লান্ত দেহ যেন অবশ হয়ে পড়ছে ক্রমেই। কি এক চাপা কষ্ট যেন গুমরে গুমরে উঠছে বক্ষমাঝে। চোখে শূন্য দৃষ্টি ফুটিয়ে নীরবে বসে থাকেন বিন্ধ্যবাসিনী। এ জীবনে তিনি অনেক কিছুই হারিয়েছেন। স্বামী, সংসার, সুখ, শান্তি—কিছুই তাঁর নেই

এখন। বাঘের মত প্রতাপশালী দুই ভাই আছেন, বৃদ্ধা মা আছেন—কিন্তু তাঁদের আদর-যত্ন থেকে তিনি বঞ্চিতা। কৃষ্ণরামের দুর্ব্যবহারে দুই ভাই হয়তো রুষ্ট হয়েছেন রাজকন্যার প্রতি। বৃদ্ধা মা আছেন, রাজমাতা বিলাসবাসিনী—তিনিই বা আর কত কাল বেঁচে থাকবেন?

আনন্দকুমারীর কথা যেন কানে ভাসছে এখনও। তার তোড়জোড়পূর্ণ কথার ধরণ; ভয়ের বালাই নেই। যা মন চায় বলে। যা মন চায় করে। মুক্ত বিহঙ্গের মতই স্বাধীন যেন সে। কার্পণ্য নেই মনে, মুঠো মুঠো টাকা খরচা করে। তারও ভাগ্য পুড়লো। বেহাত হয়ে গেল চৌধুরাণী, পথহারার মত নিরুদ্দেশ। আর হয়তো কখনও তার দেখা মিলবে না।

বিন্ধ্যবাসিনীর ক্লান্ত মনে কত কি চিন্তার উদয় হয়। প্রায় বিনিদ্রায় রাত কেটেছে, তাই যেন তন্দ্রা নামে। চোখে জ্বালা ধরে থেকে থেকে। চোখ মেলে তাকাতেও কষ্ট হয়। তবুও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন রাজকুমারী। গবাক্ষের বাইরে, আকাশে চোখ। বিন্ধ্যবাসিনীর চাউনিতে ধরা পড়ে আকাশের উড়ন্ত পাখী। চিল আর শকুনি পাক খাচ্ছে আকাশে!

মাঝিদের একজনের ভাসমান মৃতদেহ আমোদরের চড়ায় আটকেছে। চিল আর শকুনিদের মধ্যে তাই যেন মোচ্ছব লেগেছে! বিরলবসতি, অজ্ঞাত দেশে মিলে গেছে সুস্বাদু নরমাংস। গোটা একটা মনুষ্যদেহ। শিয়াল আর কুকুরদের তাড়া খেয়ে খেয়ে উড়ে পালায় কাক, চিল, শকুনি। ডানার ভর উড়িয়ে উড়ে পালায়, আবার আসে দেখতে না দেখতে। গলিতশবের আস্বাদ ভুলতে পারে না যেন।

চমকে শিউরে ওঠেন রাজকন্যা! আকাশচারী পাখীদের চোখে চোখে যেন দেখতে পেয়েছেন উগ্র লোভের খর দৃষ্টি। আকাশে উড়ছে, কিন্তু চোখ রয়েছে মাটিতে।

একা থাকতে কত সময়ে ভয় হয়। শ্বাস রোধ হতে থাকে যেন শূন্যতার চাপে। আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে পালঙ্কে এলিয়ে পড়ছেন বিন্ধ্যবাসিনী। চৌধুরাণীর দুঃখে যেন জ্বরের জ্বালা ধরে শরীরে।

ম্যানেটের বজরায় আনন্দকুমারী। বজরা আমোদর পেরিয়ে দামোদরের জল ছুঁয়েছে তখন। অরণ্যে রোদন কেউ শুনতে পায় না। অথৈ জলের মাঝেও কাঁদলে কারও কানে যায় না সেই কান্নার সুর। দিনের আলো নজরে পড়তেই চৌধুরাণীর চোখে জল দেখা দিয়েছে। হতাশায় ভেঙে পড়েছে যেন। ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে কখন থেকে। বজরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে গঙ্গানদীর দিকে। দামোদরের মাঝ-দরিয়া ধ'রে এগিয়ে চলেছে।

সারা রাত কত প্রেম জানিয়েছে ম্যানেট। সান্ত্বনা দিয়েছে কত। এ দেশের ভাষা জানে না ম্যানেট, তাই ইসারা আর ইঙ্গিতে কত বুঝিয়েছে। তবুও তিলমাত্র খুশী হ'ল না চৌধুরাণী। ম্যানেট যত বার তার কাছে এগিয়ে যায় তত বার প্রত্যাখ্যান করে অনিচ্ছায়; হাতের আঘাতে সরিয়ে দেয় বিদেশীকে! লাথি মা'র ক'বার। ম্যানেট রাগ করে না ক্ষণেকের তরেও, বরং হাসে। নির্লজ্জ বেহায়ার মত হো হো শব্দে হাসে। এক মজার খেলায় যেন মেতে উঠেছে ম্যানেট। খেলায় বারে বারেই হার হয় তার, কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি নেই যেন। হেরেই যেন আনন্দ পায়।

তাজা ফলের ডালি এগিয়ে ধ'রেছিল ম্যানেট। অনাহারে রাত কাটাতে চায়নি সে! তার প্রেয়সীকে অভুক্ত রাখতে চায়নি। দুধের পাত্র এগিয়ে দিয়েছিল, মুখে তোলেনি চৌধুরাণী। মাছের রেকাবী দিয়েছিল—সিদ্ধ মাছ আর লবণ। ফিরেও দেখেনি বণিক-কন্যা। ব্যাঞ্জো শোনাতে চেয়েছিল ম্যানেট, কর্ণপাত করেনি আনন্দ-কুমারী! মূক আর বধিরের অভিনয় ক'রেছে যেন রাতের আঁধারে।

শেষ রাতে নিদ্রা এসেছিল চোখে। ভয় আর উত্তেজনায় কাহিল হয়ে সত্যিই ঘুমিয়ে প'ড়েছিল চৌধুরীর মেয়ে, বজরার বদ্ধ ঘরে। তখন জ্বলন্ত লণ্ঠনটা কাছে এগিয়ে নিয়েছিল ম্যানেট। সেই লণ্ঠনের আলোয় কতক্ষণ যে ঘুমন্ত প্রিয়াকে দেখেছে ম্যানেট, কেউ জানে না। স্পর্শ করেনি, শুধু দেখেছে চোখের তৃপ্তিতে! স্পর্শ নয়, শুধু মাত্র দর্শন। মনের চোখে দেখা! দেখতে দেখতে স্বর্গলাভ হয় যেন। সজীব সৌন্দর্য্য—রাশি রাশি টাটকা ফুলের মত। জড়পদার্থ নয়, রক্তমাংসের জীবন্ত নারীমূর্ত্তি। সুন্দর প্রকৃতির মত বোবা নয়, কথা আর গান আছে সেই অনিন্দ্য সুন্দরের বুকে, কণ্ঠে। দৃষ্টিহীন নয়, ভাষাভরা চোখ আছে। গতিহীন নয়, চলায় আছে ছন্দ। বিরস গদ্য নয়,—রঙে রূপে রসে সিক্ত ছন্দোবদ্ধ কবিতা যেন।

সেই লুপ্তকাব্যকে উদ্ধার করতে চায় ম্যানেট। মূকমুখে কথা ফোটাতে চায়। রুদ্ধকণ্ঠে গানের সুর জাগাতে চায়।

কিন্তু কে জাগে কে! আনন্দকুমারী ধীরে ধীরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়। গভীর রাতের গভীর ঘুমে ডুবে যায় যেন। সাড় থাকে

না তার, মনে পড়ে না জলে ভেসে চলেছে সে। রাতের নদীর বুকের ঠাণ্ডা বাতাসে নিদ্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে। কালরাত্রি—খেয়াল থাকে না চৌধুরাণীর। ভুলে যায় যেন, অতীতকে মুছে ফেলতে হবে তাকে। এখন শুধু অজানা ভবিষ্যৎ সমুখে। অন্ধকারের গর্ভে লুকানো না-জানা ভবিতব্য।

শেষ রাতে স্পর্শ ক'রলো ম্যানেট। সংযমের ভিত্তিহীন বাঁধ ভেঙে ফেললো।

বাহুশাখার বলিষ্ঠ বন্ধনে গাছ জড়িয়ে ধ'রলো লতাকে। আকাশে তখন শুকতারা জ্বলছে মিটি মিটি। জলে-ভাসা বজরার সঙ্গে সঙ্গে যেন চলেছে ঐ দূর আকাশের শুকতারা আর শুক্লা পক্ষের ভরাট চাঁদ। সোনার একটি বিন্দু আর একটি গোলক।

চৌধুরাণীকে বুকে টেনে নেয় ম্যানেট। লণ্ঠনটা এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে ম্যানেটও হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে উগ্র নেশায়। পাছে হারিয়ে যায় আবার, তাই বাহুপাশ যেন শিথিল হয় না ম্যানেটের।

চোখ মেলতেই আবার যে কে সেই। জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিজমূর্তি ধরেছে আনন্দকুমারী। বশ মানছে না কিছুতেই, অবাধ্যতা করছে কথায় কথায়! ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে শেষে, নিরুপায়ের মত। অরণ্যে রোদনের মত মাঝদরিয়ার কান্না—কারও কানে যায় না।

সেই কান্নার ধ্বনি, এত দূরে থেকেও যেন অন্তরের কানে শুনতে পেয়েছেন একমাত্র বিন্ধ্যবাসিনী। স্থৈর্য্য হারিয়েছেন তিনি, জ্বরের জ্বালা ধ'রেছে যেন তাঁর কোমল অঙ্গে। চোখ জ্বলছে থেকে থেকে, তাই জল ঝরছে যখন তখন। শাড়ীর আঁচল ভিজে গেছে।

—তোমার কথাই পালন করেছি বৌ, মঙ্গল অমঙ্গল তোমার।

কতক্ষণ পরে ফিরে আসে পরিচারিকা। আমোদরে ডুব দিয়ে এসেছে। তাই সিক্তকেশ। অবগাহনের স্নানে যেন যশোদার রুক্ষতা ধুয়ে গেছে। চোখের পাতায় এখন জলের আভাব।

কথা শুনে উঠে বসলেন, বিন্ধ্যবাসিনী। বীতস্পৃহের মত শূন্য দৃষ্টিতে দেখলেন একবার। বললেন,—হাঁ তাই। তোমার কোন অপরাধ নেই। মঙ্গল অমঙ্গল আমার।

—নদীর তীরে মরা মানুষ উঠেছে, ভাসতে ভাসতে এসেছে কোথা থেকে। আবার কথা বললে পরিচারিকা। ভিজে চুল মুছতে মুছতে বললে,—ভাগাড়ের মত শকুনি উড়ে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

শুনে যেন একবার চমকালেন রাজকুমারী। মুখে তাঁর রৌদ্ররেখা, তাই দুই ভুরু বেঁকে উঠলো। শুভ্রলাল মুখ, আরও যেন লাল হয়ে উঠেছে সূর্য্যের আলোয়। পরিচারিকার কথা শেষ হ'লে কাতরকণ্ঠে বললেন,—কাল রাতে যে খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে নদীতে। আনন্দর মাঝিরা ম'রেছে হয়তো কেউ কেউ। আমি যেন ঘুমের মাঝে মাঝে শুনেছি বন্দুকের গুম গুম আওয়াজ। রাতে ভেবেছিলাম স্বপ্ন দেখেছি! দুঃস্বপ্ন দেখেছি!

—গাঁয়ের মানুষ জড় হ'য়েছে শবটার আশপাশে। পরিচারিকা কথা বললে ভিজে চুল মুছতে মুছতে। বললে,—চৌধুরী মশাইয়ের বাগদী লেঠেলরাও গিয়ে হাজির হয়েছে। মাছ আর হাঙর হয়তো খেয়েছে, তাই শব চেনা যাচ্ছে না।

রাতে মাছ আর হাঙরের আক্রমণ। জলচরের দংশন। এখন দিনের আলোর পক্ষীভোজন চলেছে। শাস্ত্রে আছে, আমাদে[র] দেহনাশের পর দেহাংশ দান করতে হয় পক্ষী আর নীরকে। আর আহুতি দিতে হয় অগ্নিকে।

বেওয়ারিশ শব, মুখে এখন আগুন দেবে কে! শেষকাজ করবে কে! তাই হয়তো শেষকৃত্যের কাজে লেগেছে কুকুর আর শিয়াল। কাক চিল আর শকুনি।

—কি হবে কে জানে!

আপন মনে কথা বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কোথায় যেন ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলছে বুকের কোণে, তাই হা-হুতাশ করছেন। চোখে শূন্য চাউনি ফুটে আছে।

—আমার গলা টা টা করছে। মাথায় জল প'ড়েছে কি না। পেছনের চুলে গামছার ঝাপটা দেয় পরিচারিকা, সমুখ চিতিয়ে। জল ঝাড়ে আর কথা বলে; বললে,—বৌ, তুমি খাওতো খাই নয়তো যাই এখন ক্ষিধেতেষ্টায় জ্ব'লতে জ্ব'লতে সেই বেণের দোকানে, কাগজ-কলম কিনতে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে রাজকুমারী বললেন,—আমিও খাই, তুমিও খাও। কিছু দাও, খেয়ে জল খাই এক ঘটি।

খুশীর হাসি হাসলো যশোদা। বললে,—লক্ষ্মী মেয়ে, আমি এনে দিই জল-খাবার!

—তৃষ্ণায় আমারও কণ্ঠ শুকিয়েছে।

রাজকুমারী কথা বলতে বলতে আবার বসলেন পালঙে! পা মু'ড়ে বসলেন। ক্লান্ত শরীর, পায়ে যেন বল নেই; সর্ব্ব অঙ্গ অবশ যেন। শান্ত চোখে ঘুমের ঘোর। ঘরের মেঝেয় দৃষ্টি আবদ্ধ। কি এক অজানা ভয়ে বক্ষস্পন্দন যেন দ্রুত। ভোরের আবছা আলোয় কাকে দেখেছেন বিন্ধ্যবাসিনী, মানসস্মৃতি যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে এখনও। সমাজের শাসনের ভয়ে মনের কল্পনাবিলাস থেমে যায় মধ্য পথে। চন্দ্রকান্তকে দেখেছিলেন রাজকন্যা। দু'টো কথাও বলেছিলেন। তাঁরই চিন্তা বারে বারে উদয় হয় মনে। কখনও বিরক্তি আসে, আত্মতৃপ্তিতে কখনও বা প্রসন্নতা।

কৃষ্ণরাম কখনও সমাদর করেন নি! একটা মিষ্টকথা, তাও বলেন নি। স্বামীর স্নেহ প্রেম ক'াকে বলে, বিন্ধ্যবাসিনী জানেন না। খরবাতাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, বসন্তসমীরণের স্বাদ মেলেনি কখনও। তাই দিনে দিনে রাজকুমারী যেন রুক্ষ হয়ে উঠেছেন; মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। কতকাল পরে, আজ এতদিনে জেগে উঠেছে যেন সুপ্ত মন। শুষ্ক উদ্যানে সহসা ফুলের সমারোহ যেন!

কোথা থেকে ঝড়ের মত উড়ে আসে আনন্দকুমারী। মূর্তিমতী ঝঞ্ঝা যেন সে। ঝড়ের দাপটে যেন তছনছ হয়ে যায় সব কিছু। বিন্ধ্যবাসিনীর মনের শান্তি নষ্ট হয়।

—ফল মিষ্টি যা খুশী খাও।

কথা বলতে বলতে পরিচারিকা পাত্র নামিয়ে দেয় ঘরের মেঝেয়। বলে,—পালঙ থেকে নেমে এসো বৌ। যা মন চায় মুখে দাও।

রাজকুমারী দেখলেন পাত্রে আহার্য্য প্রচুর। বললেন,—আগে তুমি নাও যশো, তোমার যা খুশী তুলে নাও।

—তা হয় না বৌ; তুমি আগে খাও, এঁটো কাঁটা যা থাকবে আমাকে দিও।

জলের ঘটি বসিয়ে দেয় আর বলে যশোদা। আসন পেতে দেয় একখানি। খানিক থেমে আবার বলে,—তুমি তো আর অজাত কুজাতের মেয়ে নও। তোমার এঁটো খেতে আর দোষ কি!

—না, তা হয় না। কথা বলতে বলতে পালঙ থেকে নেমে আসনে বসলেন বিন্ধ্যবাসিনী। আলুলায়িত রুক্ষ চুলের এলো খোঁপা জড়াতে জড়াতে বললেন,—তুমিও ব্রাহ্মণী, বয়েসেও ছোট নও, তবে?

তৈলহীন কেশ, এলো চুলের খোঁপা থাকে না মাথায়। খ'সে পড়লো আবার পিঠের প'রে। রাজকুমারী বললেন,—আঁচল পাতো দেখি।

পরিচারিকা আঁচল মেলে ধ'রলো দু'হাতে। বললে,—যতই হোক বৌ, তোমরা সম্ভ্রান্ত ঘরের, রাজাদের ঘর নয়তো। তোমাদের নজরই আলাদা।

আঁচলে পড়লো কদমা আর নারকেলের ছাঁচ। কড়া পাকের মিষ্টি। জাম আর লিচু কয়েকটা!

হাসি ফুটেছে যশোদার তৈলাক্ত মুখে। কেমন হৃষ্টচিত্তে কথা বলে যেন। বললে,—তোমাদের ঘরে কত ভাল-মন্দ খাওয়া, আমি কি আর জানি কিছু! সামান্য যা জানি, তোমার তরে তৈরী করি। তোমাদের সোনা-দানা খাওয়া মুখ। রাজার মেয়ে তুমি!

বিন্ধ্যবাসিনীর ভুরু বেঁকে উঠলো ক্ষণেক। রাজাকে মনে পড়লো হয়তো, পরিচারিকার কথায়। স্বর্গগত রাজা, রাজকন্যার ছেলেবেলায় দেখা সেই সিংহমূর্তি। রাজা যখন কথা বলতেন, তখন সত্যিই যেন সিংহনাদের মত শোনাতো। বিনা অস্ত্রে বাঘের সঙ্গে না কি লড়াইয়ে জিতেছিলেন রাজা। রাজকুমারীর বেশ মনে পড়ে, রাজার জানুর নিম্নভাগে বাঘের থাবার চিহ্ন ছিল। ক্ষতচিহ্ন।

ম্লান হাসি হাসলেন রাজকুমারী। বললেন,—রাজা একটা গোটা পাঁঠা একাই খেতেন। প্রতিদিন আট থেকে দশ সের দুধ। পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে ভাত খেতেন প্রত্যহ। রাজমাতা নিজে রাজার রান্না রাঁধতেন। রান্নায় মা আমার খুব দড় ছিল। আমিষ নিরামিষ কিছু তার অজানা ছিল না। মিষ্টিও খুব ভাল পাক করতেন। মায়ের হাতের মনোহরা, তার স্বাদ ভুলে গেছি এখন।

মেয়ের খেলনাপাতি গোছাতে ব'সেছিলেন রাজমাতা বিলাসবাসিনী। এ যেন তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। মেয়ের হাতের স্পর্শমাখা পুতুলের রাশি। তাদের সাজসজ্জা। রাজকন্যার পুতুলের সাজ সোনা-জহরতের, হাতীর দাঁতের খাটে কিংখাপের বিছানা। মুক্তার ঝালর খাটের চতুর্দিকে। পোড়ামাটির পুতুলের আদর-কদর কত!

গঙ্গায় স্নান সে'রে এসেছেন বিলাসবাসিনী।

রক্তচাপের রোগিণী তাই মাথায় জল পড়তেই চক্ষু যেন রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। নিজের মহলে আছেন তাই আর লজ্জার বালাই নেই। মটকার থান কাপড় আলুথালু হয়ে আছে। মেয়ের খেলার স্মৃতি কোলে ছড়িয়ে যেন খেলতে ব'সেছেন কিশোরীর মত। একজন দাসী এগিয়ে দিচ্ছে এটা সেটা। আর একজন দাসী হাতীর দাঁতের খাট পরিষ্কার করছে অতি সাবধানে। অলঙ্করণ আছে অনেক, তাই অতি সাবধানে মোছামুছি করছে।

বিলাসবাসিনী আজ যেন বেশ খুশী খুশী। না বলতেই মুখে জল দিয়েছেন পূজার ঘর থেকে এসে। কতদিন মুখে পান তোলেন নি, আজ ছাঁচা পান খেয়েছেন। রাঙিয়ে আছে হাসি-মাখা ওষ্ঠাধর। পোড়ামাটির পুতুলের মুখে চুমা খেলেন রাজমাতা। যেন নিজের মেয়ের গালে চুমা খেলেন। সাজানো পুতুলকে কোলে শুইয়ে রেখে বললেন,—আমার মেয়ে পুতুলের চেয়েও দেখতে মিষ্টি। কুমারবাড়ীর প্রতিমা হার মেনে যায় আমার বিন্ধ্যর মুখের কাছে।

—রাজকন্যে আসছেন, শুনছি লোকমুখে। রাজবাড়ীতে কাণাঘুষো চলছে কাল থেকে।

একজন দাসী কথা বললে ভয় ভেঙে। সুখের কথা, আনন্দের কথা, তাই বললে নিশ্চিন্তায়। কথাটি সত্য না মিথ্যা, ঝালিয়ে নেয় যেন একবার।

রাঙা মুখে হাসি ফুটলো। রাজমাতা শব্দহীন হাসি ফোটালেন মুখে। বললেন,—তোদের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। মা জগদ্ধাত্রীর কাছে প্রার্থনা জানা তোরা, যেন আমার মেয়ে আমার কাছে আবার ফিরে আসে। কথার শেষে কিছুক্ষণ থেমে থাকলেন কেন কে জানে? আবার কথা বললেন,—আমার কাশীশঙ্কর যাবে বিন্ধ্যকে আনতে। আমার পা ছুঁয়ে শপথ ক'রে গেছে আজ।

দাসীদের একজন বললে,—কুমারবাহাদুরকে আসতে দেখে আমরা তো ভয়ে মরি। সামনাসামনি দেখতে পাই নি কখনও, আজ দেখেছি। মানুষের মত মানুষ দেখেছি, মনে মনে পেন্নাম জানিয়েছি।

হাসি হাসি মুখ রাজমাতার। শিশু সরল হাসি যেন। বললেন,—কাশীশঙ্কর শতায়ু হোক। মান্দারণে যাওয়াই কি সুখের কথা! কাশী বললে যে এই বাবদে অনেক যোগাড়যন্ত্র করতে হবে! অনেক লোকলস্কর সঙ্গে নিতে হবে। বজরায় যাবে আসবে। হাঁটা পথেই না কি বিপদ বেশী।

অশান্তির আগুন ধিকিধিকি জ্বলবে, অস্বস্তির কাঁটা বিঁধবে যখন তখন। নিশ্চিন্তে সুখে থাকবে না! খেয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটবে না। মুখের হাসি মিলিয়ে যাবে! এই সকল কিছুতে পূর্ণচ্ছেদ না টানলে রাজকর্মে মন বসবে না। দুশ্চিন্তা পুষে রেখে স্বচ্ছন্দে কাজ করা চলে না। অন্ততঃ কুমারবাহাদুর তাই চান। এক কাজ শেষ না ক'রে অন্য কাজে যেন হাত দিতে পারেন না।

টাকা দিয়ে টাকা খাটানোর কাজে নেমেছেন কাশীশঙ্কর। শুধু টাকা খাটানো নয়, মাথা খাটানোর কাজ। মাল কিনে মাল বিক্রী করতে হবে চড়া দামে,—কাশীশঙ্করের একটি চোখ এখন ওজনের মানদণ্ডের তীরে, অন্য একটি চোখ টাকার অঙ্কে। কড়াক্রান্তির ভুলচুক না হয় হিসাবে। এই দুরূহ কাজে অন্য চিন্তার অবকাশ নেই। বাণিজ্যের কাজে শুধু লক্ষ্মীর চিন্তা।

কাশীশঙ্কর এখন বদ্ধপরিকর। একবার শেষ চেষ্টা করবেন, যদি উদ্ধার করা যায় রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীকে।

দক্ষিণমুখী বৈঠকখানার ফরাসে বসেছিলেন কুমারবাহাদুর।

মাতৃদর্শন হয়েছে আজকের সুপ্রভাতে, প্রাতরাশ শেষ হয়ে গেছে, তাই একটু বিশ্রামে বসেছিলেন কাশীশঙ্কর। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ব'সেছিলেন। ফরাসের এক পাশে বৃদ্ধ লালাভাই, আলবোলায় তামাক খেতে খেতে তিনি হাস্যপরিহাস করছেন কথায় কথায়। মজার মজার কথা বলছেন যত। কুমারবাহাদুর অট্টহাসি হাসছেন থেকে থেকে।

লালাভাই বলছেন,—আসবপানের সুখ তুমি কোথা থেকে পাবে কুমারবাহাদুর! তোমরা তো কমলবনের ভেকের মত।

—কেন? কেন? সহাস্যে প্রশ্ন করলেন কাশীশঙ্কর। সাগ্রহে [illegible]।

শুভ্র শ্মশ্রুতে হাত বুলাতে থাকেন লালাভাই। পাকা গোঁফের প্রান্ত থেকে ধোঁয়া ছাড়তে থাকেন। কুমারের আগ্রহ যাতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় তাই নীরব হয়ে থাকেন।

কাশীশঙ্কর বললেন,—কেন তা তো বললেন না লালাভাই! আমরা ভেক হ'তে যাই কেন?

লালাভাই বললেন,—হাঁ হাঁ তোমরা ভেক আর আমরা ভ্রমর।

—তথাস্তু! কিন্তু কি কারণে এই ভেদাভেদ তাই শুনি?

লালাভাই হাসলেন, কৌতূহলী হাসি। বললেন,—আসবের নেশার মজা তুমি তো জানো না কুমারবাহাদুর। কথায় [illegible], বনভূমি থেকে আইল যে ভ্রমর, সে পাইল কমলবাস, আর দিব্য নিকটে বিরাজমান যে ভেক, সে তো গন্ধটুকুও পাইল না।

কাশীশঙ্কর আবার অট্টহাসি হাসলেন। বৈঠকখানা গমগমিয়ে উঠলো যেন। অনেকক্ষণ ধ'রে হাসলেন কুমার। লালাভাইয়ের যুক্তি যেন খণ্ডন করতে পারলেন না।

—হুজুর সেলাম!

দ্বারে কার ছায়া। দেখা যায় না, শুধু তার কথা শোনা যায় মাত্র।

কাশীশঙ্কর হাসি থামিয়ে বললেন,—কে? কামতার না কি?

—জী হাঁ। হুজুরের গোলাম।

—কামতার খাঁ! কাশীশঙ্কর ডাকলেন।

—জী হুজুর!

—আমি কাল মান্দারণে যাত্রা ক'রবো কামতার। সেই বাবদে কিছু কথা আছে তোমার সহ। শলা-পরামর্শ আছে। তরোয়াল-খেলা জানা আছে, না ভুলেছো?

—পয়দা হওয়ার পর থেকে হুজুর আজও ঐ তরোয়াল ধ'রেই খেলা করছি। কার গর্দ্দান চাই, হুকুম দেন?

—তুমি আমার সঙ্গে যাবে কামতার খাঁ। অপেক্ষা কর সদরে, আমি লালাভাইয়ের সঙ্গে ততক্ষণে দু'টা রসালাপ করি।

—যো হুকুম হুজুর।

সেলাম জানিয়ে বিদায় নেয় কামতার খাঁ। সেলাম জানাতে জানাতে কক্ষ ত্যাগ করে। কামতার কুমারবাহাদুরের দেহরক্ষী। কুমারের শৈশব থেকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই আছে। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী কামতার, তরবারিযুদ্ধে ওস্তাদ। কত লোকের জান নিয়েছে, সে নিজেই জানে না!

কামতারের ছায়া অদৃশ্য হয়। রসালাপে আবার মগ্ন হ'লেন কাশীশঙ্কর। লালাভাইকে বললেন,—আর এক কলকে তামাক দিক লালাভাই?

—তা দিক। তামা দিক বা তামাকই দিক, আপত্তি কিসে?

আবার হাসলেন কাশীশঙ্কর। লালাভাইয়ের মজার মজার কথা শুনে। দক্ষিণমুখী বৈঠকখানা যেন কেঁপে উঠলো হাসির শব্দে।

[ক্রমশঃ।

জীবন-দর্শন

বিভা সরকার

জীবন-মধ্যাহ্নে বসি করিতেছি জীবন দর্শন
নিরীক্ষণ নিত্য মনে মনে
শৈশব কৈশোর গেল বেপথ উন্মনা
ধন্য কি ফাল্গুনে?
শিমুলে কণ্টক ছিল, ফুটিল সে স্তবকে স্তবকে
যৌবনের হয়োদ্যানে প্রভাতের প্রথম আলোকে
ভুবনের বনে বনে বাজিল ভৈরবী
কি বলিব? অপূর্ব সে ছবি!

আশাবরী তানে, সূর্য্য মোর উঠিল গগনে
খরবায়ু বহিল কি মধ্যাহ্নের তাপে?
মৃত্তিকায় ঝরাপাতা কাঁপে?
কুসুমিত কুঞ্জ মোর হল কি বন্ধুর?
মানস অতিথি পরে বৈরাগ্যের টীকা
সে-ও ভ্রান্তি মায়া-মরীচিকা!
ফোটে ফুল—ফুল ঝরে আলো অন্ধকার
জীবন-দেবতা মোর খেলা সে তোমার।

চেয়ে দেখি, পূর্ণ বসুন্ধরা
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অপূর্ব মাতনে
বিশ্ব-মনোহরা!

ন্যায্য মূল্যের দোকান

"সম্প্রতি খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্য ভারতে ন্যায্য মূল্যের দোকানের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। চৌদ্দটি রাজ্যে ন্যায্য মূল্যের দোকানের সংখ্যার যে সর্বশেষ হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ঐ চৌদ্দটি রাজ্যে ন্যায্য মূল্যের দোকানের সংখ্যা ১৭ হাজার ৫ শতেরও অধিক। অন্ধ্র, রাজস্থান এবং হিমাচল প্রদেশের হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। ন্যায্য মূল্যের দোকান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বোম্বাই রাজ্যে। বোম্বাই রাজ্যে মোট ৩৭১৭টি ন্যায্য মূল্যের দোকান আছে। উহার পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। পশ্চিমবঙ্গে আছে ৩৩৮৭টি ন্যায্য মূল্যের দোকান। কেরলে ২৭৭৪টি, উড়িষ্যায় ২৩৫৬টি, মাদ্রাজে ১১২৩টি, আসামে ৮৮৪টি, বিহারে ৭১১টি, উত্তরপ্রদেশে পাঁচ শতের অধিক, নয়া মধ্যপ্রদেশে ৪ শতের অধিক, মহীশূরেও ঐরূপ সংখ্যায় এবং ত্রিপুরায় ৮২টি ন্যায্য মূল্যের দোকান আছে। এতগুলি ন্যায্য মূল্যের দোকান সত্ত্বেও খাদ্যশস্যের দাম কিন্তু কমে নাই, ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়! কেন কমে নাই, তাহা শাসকবর্গের বিবেচনার বিষয়ই শুধু নহে, ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলির অবস্থা সম্বন্ধেও তদন্ত করা আবশ্যক। কলিকাতায় এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পাইয়াছে যে, কতগুলি ক্ষেত্রে ন্যায্য মূল্যের দোকানে সরবরাহ করা চাউল চোরাবাজারে প্রবেশ করিয়াছে। চোরাবাজারে অর্থাৎ অধিক দামে বিক্রয় করে অথচ ধরা পড়ে নাই, এরূপ ন্যায্য মূল্যের দোকান কতগুলি আছে তাহা জানিবার উপায় নাই। অন্যান্য রাজ্যে ন্যায্য মূল্যের দোকানের অবস্থা কি, তাহা অবশ্য জানা যায় নাই। ন্যায্য মূল্যের দোকানে যে চাউল বা গম সরবরাহ করা হয়, তাহার একটা বৃহৎ অংশ চোরাবাজারে প্রবেশ করে বলিয়াই খাদ্যশস্যের দাম কমিতেছে না, এইরূপ আশঙ্কা করা অস্বাভাবিক নয়। উহা নিরোধ করিতে না পারিলে ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে বাধ্য।"

—দৈনিক বসুমতী

ভারতীয় চিকিৎসার প্রচার

"পাতিপুকুর হাসপাতালে আধুনিক ধরণের একটি শল্যকক্ষের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য-মন্ত্রী ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় আয়ুর্বেদসেবিগণকে আশার কথা শুনাইয়াছেন। আয়ুর্বেদসেবী কবিরাজগণ এই চিকিৎসা প্রণালী যাহাতে সরকারী সমর্থন পায়, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের উক্তিতে দেখা যায়, শীঘ্রই তাহার উপায় হইবে। আগামী ডিসেম্বর মাসে রাঁচীতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের চিকিৎসা-মন্ত্রিগণের এক সম্মেলনে এ বিষয় আলোচিত হইবে। তার পর সম্মেলনের আলোচনা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ভারত সরকার একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত যে আয়ুর্বেদসেবিগণের অনুকূল হইবে এ কথাই পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালী ভারতের নিজস্ব সম্পদ। কিন্তু নানা কারণে অধুনা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালী পশ্চাতে পড়িয়াছে। সরকারী আনুকূল্যের অভাবই তাহার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ। অনেকের বিশ্বাস, যথোচিত সরকারী সমর্থন পাইলে ভারতের এই নিজস্ব চিকিৎসা প্রণালী আবার স্বকীয় মহিমায় দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে। তবে আমাদের মনে হয়, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালী উপযুক্ত চর্চা ও গবেষণার অভাবে যতখানি পশ্চাৎপদ হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিয়া এ দেশীয় কবিরাজগণের এখন আয়ুর্বেদের যুগোপযোগী সংস্কার সাধনে যত্নবান হইতে হইবে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা

সাহিত্য ও সরকার

"দিল্লীতে এশিয়ার সাহিত্যিকদের সম্মেলন হইবে। বৃহৎ এশিয়ার ভাবুক ও চিন্তাশীলদের এই মন জানাজানির আয়োজন শুভ সন্দেহ নাই। কিন্তু এশিয়ার বিভিন্ন দেশই কি ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পরিচয় কিছু পাইয়াছেন? বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, তামিল, তেলেগু, প্রভৃতি ভাষায় বিশিষ্ট লেখকদের কাহারো কথা কি তাঁহারা শুনিয়াছেন? বিশিষ্ট শিল্পী, গায়ক ও মনীষীদের কর্মের কোন বার্তা কি তাঁহাদের কাছে পৌঁছিয়াছে? এ অবস্থায় তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, প্রত্যয় ও উপলব্ধিকে আশ্রয় করিয়া সম্মেলন হইবে না, হইবে নিছক সৌজন্য ও সামাজিকতা আশ্রয় করিয়া। ঠিক একই জিনিস হইবে এশিয়ার নানা দেশ হইতে আগত গুণীদের সম্বন্ধেও। অথচ ইহুদী ম্যানুহিন, ল্যো, আলডাস হাক্সলে বা এরিয়া এরেনবুর্গ এদেশে আসিলে আমাদিগকে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিতে হয় না। ইহার কারণ প্রতীচ্য তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধ্যান-ধারণাকে সার্থক ভাবে আমাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়াছে, আমরা তা পারি নাই। কিন্তু এই সব বৃহৎ ব্যাপার ছাড়িয়া দিলেও নিরূপিত গণ্ডীর মধ্যেও আমরা লক্ষণীয় কাজ কতটা পর্যন্ত করিতে পারিয়াছি, তাহার একটা হিসাব করা যাইতে পারে। সেক্ষেত্রে সদ্য সাক্ষর বা স্বল্পাক্ষরদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান

প্রচারের জন্যে রচিত সহজ সাহিত্যকে ভারত সরকার গত কয় বৎসর হইতে যে পুরস্কার দিতেছেন, তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। আশা করি, অনেকেই জানেন যে, সরল ভাষায় সর্বজনবোধ্য করিয়া লেখা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পাঁচখানি বইকে তাঁহারা হাজার টাকা এবং পঁয়ত্রিশখানিকে পাঁচ শত টাকা করিয়া পুরস্কার দিতেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের যে সমস্ত পুরস্কার দিতেছেন, তাহাও কম প্রশংসনীয় নয়। কিন্তু দেশের আপামর জনসাধারণ যাহাতে আপন আপন ভাষায় অবিস্মরণীয় বইগুলি সস্তায় কিনিয়া পড়িতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা কোথায়? একদিন বাংলা দেশের লোক বটতলা ও বসুমতীর কৃপায় সুলভ সাহিত্য পাইয়া প্রভূত উপকৃত হইয়াছিলেন। আজিকার ব্যয়বহুল মুদ্রণের দিনে ব্যবসায়ী প্রকাশকের পক্ষে আর একাজ করা সম্ভব নয়। তাহার ফলে পুরানো সাহিত্য, বিগত দিনের বিখ্যাত লেখকদের রচনাবলী আজ হয় অলভ্য হইয়াছে, নয় মূল্যবান রাজ-সংস্করণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া সাধারণের নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। অনেক বিখ্যাত ও মূল্যবান বইয়ের আর পুনর্মুদ্রণই হয় না। এই সঙ্কটের প্রতিকার সম্ভব একমাত্র সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ হইলে। কি ভাবে ও কোন্ পথে এই পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া যাইতে পারে, তা এস্থলে আলোচনা করা অনাবশ্যক। তবে সাহিত্যের পুষ্টি ও প্রচার যদি সরকারের নীতি হয়, তাহা হইলে শুধু জীবিত লেখকদের মধ্যে ভাগ্যহত কয়েক জনকে মাসোহারা ও যশস্বী দুই-একজনকে মর্যাদার শিরোপা দিলেই অন্যান্য দেশের মতো সাহিত্য হইবে না। অন্যান্য দেশের মতো সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রকৃত রক্ষক হইতে হইবে। সেই সংগঠনের পথেই সরকারী উদ্যম পরিচালিত হউক।"

—যুগান্তর।

বিধান সভার তৈলচিত্র

"সমগ্র তালিকায় কোন মুসলমান নেতার নাম নাই। তালিকাটি দেখিয়া প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম, স্বয়ং পণ্ডিত নেহরু যে প্রতিকৃতি সারি উন্মোচন করিতেছেন, সেখানে এ ব্যাপার ঘটে কেমন করিয়া? পরে দেখিলাম, চোখ ভুল করে নাই। সত্যই কোন মুসলমান নেতার ছবি টাঙানো ছবিগুলির মধ্যে ত নাই-ই, যেগুলি দ্বিতীয় কিস্তিতে টাঙানো হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যেও নাই। যে নলিনীরঞ্জন সরকার বিশ বৎসরের জন্য কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন এবং গান্ধী-জওহরলাল-আজাদ সহ সমগ্র কংগ্রেস নেতৃত্ব কারারুদ্ধ হইলে যিনি নির্লজ্জ ঔদ্ধত্যে বড়লাটের পারিষদ হইয়া বসিয়াছিলেন, প্রতিকৃতির তালিকায় তাহার নাম শোভা পাইতেছে, অথচ এই পশ্চিম বাংলা ও কলিকাতার অধিবাসী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নাম ছবির তালিকায় নাই। হাকিম আজমল খান, ডাক্তার আন্সারী, বদরুদ্দীন তায়েবজী, রফি আহমদ কিদোয়াই, আবদুল রসুল প্রমুখের কথা ত ছাড়িয়াই দিতেছি। এই প্রসঙ্গে নজরুল ইসলামের নামটিও কাহার না মনের পটে ভাসিয়া উঠিবে? আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র; অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিকতা আমাদের ঘোষিত লক্ষ্য। হিন্দু অথবা ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ফলে আমরা স্বাধীন হইয়াছি। পরিষদ ভবন অলঙ্করণের প্রতিকৃতি নির্ব্বাচনে আমরা ইহারই প্রতিফলন দেখিতে চাহিয়াছিলাম, ইহাই জাতির ও জনসাধারণের দাবী। কিন্তু নির্ব্বাচকেরা নিশ্চয়ই অন্য দৃষ্টিতে, ধর্মসাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে জাতির মুক্তি-অভিযানকে দেখিতে ও দেখাইতে চাহিয়াছেন।"

—স্বাধীনতা।

পুলিশের কাজের প্রশংসা

"এ বৎসর দুর্গাপূজা এবং কালীপূজায় পুলিশের অস্থায়ী কমিশনার উপানন্দ মুখোপাধ্যায় যাহা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। স্বাধীনদেশে পুলিশ সমাজসেবায় বেশী মন ও সময় দিবে, ইহাই আশা করা উচিত। পুলিশ এখন যে অবস্থায় আসিয়াছে তাহাতে চুরি-ডাকাতি খুনের কিনারাও করিতে পারে না, সমাজেরও কাজে লাগে না। ট্রাফিকের ডি-আই-জি প্রণব সেন যানবাহন চলাচলের উন্নতি করিয়া দেখাইয়াছেন যে কাজ করিবার ইচ্ছা থাকিলে করা যায়। এনফোর্স ব্রাঞ্চের সত্যেন মুখার্জ্জি ভেজাল ও চোরা কারবার দমনের চেষ্টা প্রাণপণে করিতেছেন, কিন্তু সফল হইতে পারিতেছেন না উপযুক্ত আইনের অভাবে। বাঙ্গালা সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার এই দশ বছরে ইহার প্রতিকার করিতে পারেন নাই। ভেজাল নিবারণের যে আইনটি কেন্দ্রীয় সরকার তৈরি করিয়াছেন তাহার অযোগ্যতার কথা আইনের প্রণয়িত্রী নিজেই ঘোষণা করিতেছেন। উপযুক্ত আইন এবং শক্তিশালী গোয়েন্দা বিভাগ ও পুলিশ প্রসিকিউটার থাকিলে অল্প লোকের দ্বারাই পুলিশের আসল কাজ চলিতে পারে, অবশিষ্ট বাহিনী সমাজসেবায় বেশী সময় দিতে পারে। থানার গায়ে চুরি যে গোয়েন্দা বিভাগ ধরিতে পারে না সেরূপ অপদার্থ গোয়েন্দা বিভাগ পুষিতে গিয়া কলিকাতা পুলিশের অযোগ্যতা এবং দুর্নাম চরমে উঠিয়াছে। চোর, ডাকাত, খুনী, জুয়াচোর যদি ধরা না পড়ে এবং ধরা পড়িলে মামলা চালানোর দোষে যদি রেহাই পায়, তাহা হইলে পুলিশের কোন প্রয়োজনই আর অবশিষ্ট থাকে না।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)

বন্যা প্রসঙ্গে

"যে সব জমির ফসল বন্যায় নষ্ট হইয়াছে, দ্বিতীয় ফসল সেই সব জমিতে চাষ করিতে পারা যায় তাহার জন্য বীজ সরবরাহ করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ বীজ সংগ্রহ করা আবশ্যক, সেই পরিমাণ বীজ সংগ্রহ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। এই প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু সেদিন পশ্চিমবঙ্গের বন্যার্ত্তদের উদ্দেশ্যে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আমরা এখানে করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন, আত্মপ্রত্যয় লইয়া বন্যার্ত্তদিগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য আগাইয়া আসিতে হইবে। বীজ সংগ্রহ কার্যে তাহাদিগকেও উৎসাহী হইতে হইবে। যে অঞ্চলে বন্যা হয় নাই সেই অঞ্চল হইতে প্রয়োজনীয় বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে। আলুর বীজ চাষীদের ঘরে বড় থাকে না এবং ঘোরো-বীজে আলুও ভাল ফলে না বলিয়া চাষীরা টুকরি, কাটনি, নৈনীতাল প্রভৃতি আলুর বীজ কিনিয়াই চাষ করিয়া থাকে। অন্যান্য বৎসর চাষীদিগকে যে ভাবে আলুর বীজ, খইল, সার সংগ্রহ করিতে হইত সেই ভাবে এবারেও বন্যাপীড়িত অঞ্চলের চাষীদিগকেও চাষ করিবার জন্য

উৎসাহী হইতে হইবে। সরকার যাহা পারিতেছে তাহা করিতেছে, এই চেষ্টার সহিত সহযোগিতা করিয়া দেশবাসীকে সরকারের প্রচেষ্টা সার্থক ও সফল করিতে হইবে।" —বৰ্দ্ধমানবাণী।

ছিনিমিনি

"দ্বিতীয়তঃ চালা করিতে ৩০ খানি বাঁশের দাম ৪৫৲ টাকা, দড়ি ২৷০ টাকা ৪৭৷০ টাকা পড়িবে। ৮ জন মজুর স্বচ্ছন্দে দুই দিনে এই চালা করিয়া দিবে সুতরাং মজুর ৮৲ টাকা বা ১০৲ টাকা একুনে ৫৭৷০, টিন আনা ও বাঁশ আনার খরচা ধরিলে গাড়ী ভাড়া ১০৲ সর্ব্বসাকুল্যে ৬৭৷০ টাকায় এই চালা নির্ম্মিত হইবে। যাহাতে প্রকৃত খরচা ৬৭৷০ টাকা সরকারী হিসাবে সে কাজের জন্য ৩৩০৲ টাকা এষ্টিমেট ধরা হইল কেন? প্ল্যানে আছে ঠিকাদার দ্বারা এ কাজ করা অভিপ্রেত নয়, কিন্তু কাহার দ্বারা করান হইবে তাহা বলা হয় নাই? যাহারা এই ঘরে বাস করিবে তাহাদের হাতে ৩৩০৲ টাকা নগদ দিলে তাহারা অনেকে ঐ টাকায় চালা ছাড়াও নিজের ঘর করিয়া লইতে পারিবে। এখন রানিং ফুট হিসাবে বাঁশ সরবরাহের টেণ্ডার চাওয়ার ব্যাপারটা আর ঘোলাটে নাই। বাঁশের রানিং ফুট কেহ দিবে হয়ত আট আনা কেহ হয়ত সঙ্কোচ করিয়া ।৵০ আনা দর দিবে এবং তাহাই 'ড্যাম চীপ' বলিয়া গৃহীত হইবে। যে সকল নাগরিকের বাঁশের ঝাড় আছে তাহারা ৭৷৮৲ করিয়া বাঁশের দাম চাহিলে এই হিসাবে তাহাও পাইবেন। সেদিন কমিশনার মহাশয়কে সমস্ত হিসাব বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয় এবং বরাদ্দ মত টাকা ও টিন বিধ্বস্ত চারিটি পরিবারকে দিতে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। অস্থায়ী আচ্ছাদন নিৰ্ম্মাণ পরিকল্পনায় ১,৮৫,৫০,০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে বলা হইয়াছে। এই ভাবে কাজ হইলে ৮৫৷০ লক্ষ টাকাই দুর্নীতিপরায়ণ ও মুনফাখোরদের পকেটে ঢুকিবে। এই অপব্যয় রোধ করিবে কে?"

—বীরভূম বাণী।

ধূলা খাইব কেন?

"শীত আসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সহরের রাস্তাগুলিতে ধূলার রাজত্বও আরম্ভ হইয়াছে। কার্ত্তিক মাসেই ধূলার জন্য রাস্তায় চলাচল করা মুস্কিল হইয়া পড়িয়াছে। রাস্তায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা এখন হইতেই আরম্ভ করা উচিত। মিউনিসিপ্যালিটি তো এখন খাস সরকারের পরিচালনাধীনে। সুষ্ঠুভাবে পৌরকার্য্য পরিচালনা করার অজুহাতে সরকার মিউনিসিপ্যালিটীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধূলাই যদি খাইতে হয় তবে মিউনিসিপ্যালিটীর কাজ সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইতেছে বলিয়া মনে করা যায় না।" —সেবক (আগরতলা)।

সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকো

"১লা নভেম্বর বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল আংশিক ভাবেও পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে। যদিও বাংলার পূর্ণ দাবী গণতান্ত্রিক বলিয়া পরিচিত কংগ্রেস সরকার মানিয়া লন নাই, তবুও যে অংশটুকু আসিয়াছে, তাহা সংগ্রাম করিয়াই আসিয়াছে। বাঙ্গালীর এই আত্মদান ও নির্য্যাতনলব্ধ অঞ্চল বঙ্গভুক্তির দিনে মানভূম লোকসেবক সংঘ এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। আমরা লোকসেবক সংঘকে তাঁহাদের ঐতিহাসিক বঙ্গ অভিযানের সাফল্যের জন্য অভিনন্দিত করিতেছি। ইহার সহিত কংগ্রেসের এই বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় পুনরায় স্মরণে রাখিয়া বাঙ্গালীর শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকিতে অনুরোধ করিতেছি। বাঙ্গালীর এই ক্ষত শত প্রলয়ঙ্করী বন্যা ও প্রাবৃটে মুছিয়া যাইবে না।"

—দামোদর (বৰ্দ্ধমান)

পাকিস্থানের জাগরণ

"আজ সমগ্র পাকিস্থানেই ইংরাজ ও ফরাসীর বিরুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভ ফুটিয়া উঠিতেছে। যে সকল মুসলেম লীগের নেতা ইংরাজকে ইসলামের বন্ধু বলিয়া হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার করিয়াছেন, আজ তাঁহাদিগকেই মত বদলাইতে হইতেছে। পাকিস্থানের এই নব জাগরণ অন্ধকারে আলোর মতই ফুটিয়া উঠিতেছে। ইংরাজের তাঁবেদার নেতাদের প্রভাব এত দিনে চূর্ণ হইল। ইহা ভগবানের অভিপ্রেত। কিন্তু কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রই আজ আর একা থাকিতে পারিবে না, সেজন্য পাকিস্থানকেও তাঁহার প্রকৃত বন্ধুর সহিত হাত মিলাইতেই হইবে। শয়তান ইংরাজ যে কপট বন্ধুর মুখোস পরিয়াছিল, মিশরে আজ নির্লজ্জ ভাবে তাহা ধরা পড়িয়াছে। এ সময় পাকিস্থান যদি ভুলপথ পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে মিশরকে সহায়তা করিতে প্রস্তুত হয়, ভারতও তাহাকে বুকে জড়াইয়া লইতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ভারত ও পাকিস্থানের মিলিত শক্তি বিশ্বে এমন দুর্ব্বার হইয়া উঠিবে যাহাতে ইংরাজ ও ফরাসী তো দূরের কথা, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার চালাইয়া বিশ্বশান্তি ব্যাহত করিতে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই সাহসী হবে না। মিশরের এই বিপদ দেখিয়া আমাদের ভুল বুঝাবুঝির ঘরোয়া বিরোধ অচিরে আপোসে মিটাইয়া ফেলাই উচিত।" —পল্লীবাসী (কালনা)।

বন্যার পরে

"বন্যায় যে নির্ম্মম অত্যাচার সংঘটিত হইয়া গেল, তাহা ভুলিতে চাহিয়া, চোখের জল মুছিয়া গৃহস্থ আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। আশ্রয়ের আশায় দু'টি উদরান্ন সংস্থানের চেষ্টায়। শুধু উদরান্ন নয়, কৃষিজীবী অঞ্চলের সব কিছুর সংস্থান হয় কৃষিকর্ম্ম হইতে। সেই কৃষিকর্ম্মের প্রধান উপাদান সকল প্রকার বীজই এই বন্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বীজ চাই অথচ উপযুক্ত পরিমাণ বীজ নাই—সরবরাহ দিতে পারা যাইতেছে না—আলুর বীজ সামান্য পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে। রবি শস্যের বীজ কিছুই এখনও দেওয়ার ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া শুনিতেছি। কতকগুলি রবিশস্যের বীজের প্রয়োজন এখনই। বিলম্ব হইলে ঐ সকল ফসল এতদঞ্চলে হইবে না, বা খুবই কম হইবে। আশা করি সরকার এই গুরুতর পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া যথাকর্ত্তব্য সত্বর ব্যবস্থা করিবেন।" —মুর্শিদাবাদ পত্রিকা।

পূজার পর

"পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বন্যা লক্ষ লক্ষ মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ ও ও দুর্গতির কারণ হইয়া দেখা দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গেও সহস্র সহস্র মানুষ বন্যার প্রকোপে গৃহহীন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এরূপ ব্যাপক ভয়াল ও ভয়াবহ বন্যার কথা ইতিপূর্ব্বে শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

ইহা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রকৃতি যদি দেশের উপর বিরূপ হন তবে তাহা রোধ করা মানুষের সাধ্যাতীত। মানুষের বিরূপতাও আজ মানুষকে কম বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত করিতেছে না। পূর্ব্ববঙ্গত্যাগী হাজার হাজার উদ্বাস্তু আজ জাল মাইগ্রেসন-সার্টিফিকেটের আওতায় পড়িয়া মরিতে বসিয়াছে। এই জাল মাইগ্রেসন সার্টিফিকেটের রহস্যটা কি এবং এই জাল সার্টিফিকেট কোথা হইতে কি ভাবে প্রস্তুত হইয়া সর্ব্বত্যাগী হতভাগ্য এই সকল নরনারীর অসীম দুঃখ দুর্দ্দশার কারণ হইতেছে তাহা দেখিবার কেহ নাই। দান খয়রাত বন্ধ করা সহজ এবং গলদ দূর করা কঠিন। সেই জন্য সহজ পন্থাই বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, পূর্ব্ববঙ্গে আর ফিরিয়া যাইবে না মনে করিয়া যাহারা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া আসিতেছে তাহাদের জন্য মাইগ্রেসন সার্টিফিকেটের মূল্য কতটুকু? সংখ্যালঘু হিসাবে দীর্ঘকাল তাহারা ঐ দেশে ছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত যে কারণেই হউক ঐ স্থানে বাস করা যাইবে না মনে করিয়াই তাহারা বাস্তু ত্যাগ করিয়া আসিতেছে। তাহারা আশ্রয় চায়, আহার চায় এবং দ্বিখণ্ডিত বঙ্গের এক খণ্ডে বসবাস করিতে চায়। এখন সেখান হইতে প্রকাশ্যে আসিতে হইলে সার্টিফিকেট চাই। সার্টিফিকেট তাহারা আনিতেছে কিন্তু তাহা জাল। সুতরাং তাহাদের রেহাই নাই। জানি না ওই ভাবে কত কাল চলিবে।"

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)

আলো চাই, আলো!

"আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, তমলুক মিউনিসিপ্যালিটি পথগুলির দুরবস্থা মোচনে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা এজন্য আমাদের প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনাও সুযোগ লইতে উদ্যোগী হইবেন শুনিতেছি। কিন্তু আর এক বিপদ উপস্থিত। রাত্রিতে রাস্তার আলো লইয়া অসুবিধা ঘটিতেছে। পৌরসভা নাকি খরচ কমাইতে শুধু বিজলী বাতিগুলির শক্তি কমান নাই, তাহাদের জ্বলার সময়ও খুব কমাইয়া দিয়াছেন। ফলে রাত্রি ১২টা একটার সময়ই আলো নিবিয়া সব রাস্তা অন্ধকার হইয়া যায়। এদিকে সহরে চুরি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। গত রাত্রিতে ব্রহ্মা-বারোয়ারী সংলগ্ন এক গৃহে এই অন্ধকারের সুযোগে এক দুঃসাহসী চুরি হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কি ভাবে এই আলোর একটা সুব্যবস্থা হয় তাহা মিউনিসিপ্যালিটির অবশ্য বিবেচ্য।" —প্রদীপ (তমলুক)

কমনওয়েলথ ছাড়ো

"প্রতি ব্যাপারেই সহিষ্ণুতার একটা সীমারেখা আছে। ভারত ইতিপূর্ব্বে নিতান্ত শান্তির ইচ্ছায়, মাউণ্টব্যাটেনের কথায় কশ্মীর যুদ্ধে জয়ের মুখে ইস্তফা দিয়াছে এবং দিয়া গত ৮ বৎসর ধরিয়া নানা দুর্বিপাকে ভুগিতেছে! সে গোয়ার ন্যায় ক্ষুদ্র রাজ্যের আস্ফালন সহ্য করিয়াছে, অপমান পকেটে পুরিয়াছে এবং পর্ত্তুগীজকে তথা আংলো-আমেরিকাকে ভারত মহাসাগরে নৌবলে শক্তি সঞ্চয়ে পরোক্ষে সহায়তা করিয়াছে। ইংরাজের স্বার্থে, স্বাধীনতার পরেও, আমরা তাহাকে এ দেশে অধিকতর মূলধন নিয়োগ করিতে দিয়াছি এবং তাহাদের স্বার্থে ভারতীয় বাণিজ্য-স্বার্থের হানি করিয়াছি। তাই বলিতেছিলাম যে, ধীরতার দ্বারা, সহিষ্ণুতার দ্বারা আমরা পাইয়াছি কি? সামরিক শক্তিতে দেশকে উন্নত করিতে আমরা পারি নাই, কমনওয়েলথে থাকা সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্যের এবং দূর প্রাচ্যের বাজার হইতে আমাদিগকে ব্যবসায় গুটাইয়া লইতে হইতেছে। ইংরাজ আমাদের উন্নতির জন্য কি করিয়াছে? কোনও সাহায্য, কোনও সহায়তা সে করিয়াছে কি? যেমন পরিকল্পনা যখন সুয়েজ সমস্যার মীমাংসা প্রায় করিয়া ফেলিয়াছিল, তখনই ইংরাজ তাহার উগ্র কর্ম্মের দ্বারা বিশ্বকে মহাযুদ্ধের মুখে আগাইয়া দিয়া ভারতের সর্ব্বনাশের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে! সুতরাং চতুর চূড়ামণি ইংরাজের সহিত আর সম্পর্ক রক্ষার প্রয়োজন কি? ভারতের সার্ব্বভৌমত্বের দিক হইতেও কমনওয়েলথ ত্যাগের প্রয়োজন আছে। সোনার পাথরবাটি যেমন হয় না, তেমনি বৃটিশ কমনওয়েলথে থাকিয়া সার্ব্বভৌমত্ব অর্জিত হয় না। শ্বেত জাতির কমনওয়েলথের সম্পদ শ্বেত জাতিরই।—কৃষ্ণকায়ের বা অন্য কাহারও নহে—কখনও হইতে পারে না—ভূগোল ও ইতিহাস তাহার বিরুদ্ধে। ৺শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় বহুকাল পূর্ব্বে এই সম্পর্ক ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন। এখন আমরা সেই তিক্ত, নিতান্ত অপমানকর সম্পর্ক বজায় করিয়া চলিব কেন? বিশ্বযুদ্ধ বাধিলে নিরপেক্ষ থাকিতে গেলেও কমনওয়েলথ ত্যাগের প্রয়োজন আছে।"

—মেদিনীপুর হিতৈষী।

● মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান মূল্য ●

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিঃ ডাকে .... ২৪৲

ষাণ্মাসিক „ „ .... ১২৲

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিঃ ডাকে

(ভারতীয় মুদ্রায়) .... ২৲

চাঁদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকাগণ মণিঅর্ডার কুপনে বা পত্রে অবশ্যই গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

ভারতবর্ষে

ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক ১৫৲

„ ষাণ্মাসিক সডাক ৭৷৷০

প্রতি সংখ্যা ১৷০

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে ১৸০

(পাকিস্তানে)

বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ .... ২১৲

ষাণ্মাসিক „ „ „ ১০৷৷০

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা „ „ ১৸০

জুয়া খেলার আধিক্য

"জুয়া এখন সহর ছাড়িয়া মফঃস্বলে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ইতিপূর্বেও কয়েক বার লিখিয়া কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা পাইয়াছি। ব্যক্তিগত ভাবে পুলিশ কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ আলোচনায় জানিয়াছি যে, জুয়া খেলা বন্ধ করা বা জুয়াড়ীকে ধরিয়া চালান দেওয়া বা মোকর্দ্দমা দায়ের করা সাধারণ পুলিশ আইনে নাই। সেজন্য তাঁহারা ইহার তেমন প্রতিকার করিয়া উঠিতে পারেন না। জুয়ার যেমন ভয়াবহ প্রসার হইতেছে তাহা যে কোন আইনে হয় সেইরকম আইন প্রণয়ন সংশোধন বা প্রয়োগের ক্ষমতা লাভ করিয়া উহার দমনে সর্বশক্তি প্রয়োগের সময় নিশ্চয় উপস্থিত হইয়াছে। প্রকাশ, ইহা এতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে, সাধারণ গ্রাম্য নিরক্ষর চাষী মজুর পর্য্যন্ত উহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। সত্বর ইহার প্রতিবিধানে তৎপর হইতে মাননীয় মহকুমাধ্যক্ষ তথা পুলিশ কর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

—নারায়ণ (কাঁথি)

অসমীয়াভাষী 'অফিসার'দের পৃথক সংস্কৃতি ?

"করিমগঞ্জে Assamese Officers Cultural Association কাছাড়ের জেলা ও দায়রা জজ শ্রী এস, কে, দত্তকে সার্কিট হাউসে এক চা-চক্রে আপ্যায়িত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। সংবাদটি ত্রিবিধ কারণে আমাদের (এবং নিশ্চয়ই অন্যান্য অনেকেরও) বিস্ময় সঞ্চার করিয়াছে। প্রথমতঃ অসমীয়াভাষী সরকারী কর্ম্মচারীদের পৃথক সাংস্কৃতিক সমিতি গঠন, দ্বিতীয়তঃ ও তৃতীয়তঃ অসমীয়াভাষী জজ বাহাদুরের সরকারী কার্য্যোপলক্ষে পরিভ্রমণ কালে উক্ত সমিতি কর্ত্তৃক তাঁহাকে স্থানীয় সার্কিট হাউসে চা-চক্রে আমন্ত্রণ এবং জজ মহোদয়ের তাহাতে সম্মতিদান—সমগ্র ব্যাপারটি কেমন বিসদৃশ ঠেকিতেছে না কি ?

সরকারী কর্ম্মচারীদের বেসরকারী সমিতি নিজ প্রয়োজনে 'সার্কিট হাউস' ব্যবহার করিবার অধিকারী কি না এবং বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সরকারী কর্ম্মচারী সমবায়ে গঠিত কোন সংস্থা কর্ত্তৃক বিবিধ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ হইতে (সংবাদে যেরূপ প্রকাশ) অর্থাদি গ্রহণ করাও সমীচীন কি না তাহাও এখানে বিবেচ্য।"

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)

দীঘার সঙ্কট

সরকারী উন্নয়ন প্রচেষ্টায় রামনগর থানার দীঘা স্বাস্থ্য নিবাসটির অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং প্রত্যহ যেরূপ বিদেশীয় লোকের সমাগম ঘটিতেছে তাহাতে শীঘ্রই একটি মহানগরীতে পরিণত হইবে মনে হয়। পান্থনিবাস, অতি আধুনিক ধরণের হোটেল ও বৈদ্যুতিক আলো এবং নলকূপ আদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এখন যাত্রী সাধারণের অনেকটা অসুবিধা দূর হইয়াছে। নগর পরিকল্পনার কেন্দ্র করিয়া সমুদ্র-সৈকতে বালুকারাশির উপর এক সুন্দর পীচ রাস্তার নির্মাণকার্য্য চলিয়াছে এবং দীঘা উন্নয়ন জন্য সরকারী উদ্যোগ আয়োজন বিপুল ভাবে নিয়োজিত হইতেছে জানা যায়।

কিন্তু এই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যশালিনী দীঘার সমুদ্রতীর যে ভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে যে দীঘার কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহাই চিন্তার বিষয়। সমুদ্রতীরে যে সকল সুউচ্চ বালিয়াড়ি ছিল বাৎসরিক কালের মধ্যে তাহার অস্তিত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছে। যদিও কর্তৃপক্ষ ক্ষয় নিবারণের জন্য ঐ বালিয়াড়ির পার্শ্বে ও সমুদ্রতীরে বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া বহু ঝাউ চারা রোপণ করিয়াছিলেন তাহাও এবৎসর অনেক স্থানে সমুদ্র গর্ভে পতিত হইয়াছে এবং কিয়া জঙ্গল আদিও উৎপাটিত হইয়া সাগরগর্ভে লীন হইয়াছে। পর্য্যটকগণের চক্ষে এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা সত্যই দীঘার ভবিষ্যৎ অবস্থিতি সম্বন্ধে এক সন্দেহের উদ্রেগ করিয়াছে। প্রকৃতির সম্পদ—দীঘার অনুপম সৌন্দর্য্য, সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গমালা ও শ্যাম বনানীর শোভা উপভোগের জন্য সর্বোপরি দীঘার শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যনিবাস রচনায় মানুষ অগ্রণী হইলেও সমুদ্রের ক্ষয় নিবারণে মানুষের শক্তি কতটুকু !"

—নীহার (কাঁথি)

শোক-সংবাদ

ডাঃ ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ডাঃ ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত ২৮এ কার্ত্তিক, ৬৩ বছর বয়সে লোকান্তর গমন করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনি আশুতোষ-অধ্যাপক ছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। শিখ ইতিহাস ও আধুনিক বাংলার ইতিহাসে এঁর পাণ্ডিত্য সর্ব্বজনস্বীকৃত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলেরও ইনি অন্যতম সদস্য ছিলেন।

জ্ঞান মুখোপাধ্যায়

প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক জ্ঞান মুখোপাধ্যায়, গত মঙ্গলবার ২৭এ কার্ত্তিক মাত্র ৪৭ বছর বয়সে কলকাতার এক নার্সিং-হোমে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এম-এস-সি পরীক্ষায় রসায়নে ইনি প্রথম শ্রেণীর প্রথম হন ও মেঘনাদ সাহার প্রিয় শিষ্যে পরিণত হন। হিমাংশু রায়ের প্রচেষ্টায় ইনি প্রথমে চিত্রনাট্যকারের দায়িত্বলাভ করেন, পরে পরিচালনভার গ্রহণ করেন। 'ঝূলা', 'কিসমৎ', 'শতরঞ্চ' এবং আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছায়াচিত্র এঁর প্রতিভার পরিচায়ক ও মৃত্যুকালে 'সিতারো সে আগে' নামক চিত্রের পরিচালনকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। অকালে এঁর তিরোধান চিত্রজগতের পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি। বম্বেতে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন জ্ঞান মুখোপাধ্যায়।

আশু বসু

বর্ষীয়ান হাস্যরসাভিনেতা শ্রীআশু বসু গত ২৩এ আশ্বিন (১ই অক্টোবর) পঞ্চমীর দিন বাহাত্তর বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। অসংখ্য চিত্রে অভিনয় করে দর্শক-সাধারণের শুভেচ্ছা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন আশু বসু। মঞ্চেও ইনি বহু বার দেখা দিয়েছেন। তাঁর অভিনীত কয়েকটি ছবি এখনও মুক্তির দিন গুণছে।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

(অণুষ্ঠ)

রাজকন্যা
—গোপাল ঘোষ অঙ্কিত

যাহা চাওয়া যায়
তাহা পাওয়া যায়না
ধন-ঐশ্বর্য্য
কিন্তু
আপনি ইচ্ছামত একটী সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কেশতৈল অনায়াসে পাইতে পারেন। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত 'হিমকল্যাণ'ই আপনার কেশতৈল নির্ব্বাচন-সমস্যা সমাধানে সক্ষম। ইহার কল্যাণ পরশে যাবতীয় কেশরোগ নিরাময় ও মস্তিষ্ক শীতল হয়। দীর্ঘদিন নিয়মিত ব্যবহারেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।
ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যান
আয়ুর্ব্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ সুরভিত কেশতৈল।
অন্যান্য প্রসাধনী
• পামিকোকো
সুরভিত নারিকেল তৈল
হিমকল্যান
ক্যাষ্টর অয়েল
সুগন্ধিত কেশতৈল
ভৃঙ্গামলা মহোপকারী কেশতৈল
• যোজনগন্ধা সুরভি নির্য্যাস
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ
কলিকাতা
UPCO

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

৩৫শ বর্ষ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব। "এর ভেতর কে আছেন, আমার বাবা জানতেন। আমার বাবা গয়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে স্বপন দেখেছিলেন,—রঘুবীর বলছেন,—আমি তোমার ছেলে হব! বাবা স্বপন দেখে বললেন—ঠাকুর আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কেমন কোরে তোমার সেবা কোরবো? রঘুবীর বললেন,—"তা হয়ে যাবে।" এর ভেতর তিনিই রয়েছেন!"

"এর ভেতর কে একটা আছে, সে-ই আমাকে নিয়ে এই সব করছে। মাঝে মাঝে দেবভাব প্রায় হতো। আমি পুজা না করলে শান্ত হতাম না। দিদি—হৃদের মা, আমার পা পুজো করতো—ফুল চন্দন দিয়ে! একদিন তার মাথায় পা দিয়ে বললে, তোর কাশীতেই মৃত্যু হবে!"

"ঈশ্বর কোটি অবতারাদি না হলে সমাধির পর ফেরে না। জীব কেউ কেউ সাধনার জোরে সমাধিস্থ হয়, কিন্তু আর ফেরে না। তিনি যখন নিজে মানুষ হয়ে আসেন—যখন অবতার হন, যখন জীবের মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে, তখন সমাধির পর ফেরেন—লোকের মঙ্গলের জন্য! এর ভিতর একজন আছে—তা না হলে সমাধির পর ভক্তি ভক্ত লয়ে কেমন কোরে আছি!"

"এর ভেতর তিনিই আছেন! নিজে থেকে মা, স্বয়ং ভক্ত লয়ে লীলা করছেন। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ এ কি আমার কর্ম্ম! স্ত্রী সম্ভোগ স্বপ্নেও হলো না। চারিদিকে কামিনীকাঞ্চন, ঐহিক লোক চারিদিকে—এর ভেতর এমন অবস্থা! সমাধি ভাব লেগেই রয়েছে।"

"সেদিন হরিশ কাছে ছিল,—দেখলাম খোলটি (শরীর) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাইরে এলো। এসে বললে—আমি যুগে যুগে অবতার! তখন ভাবলাম,—বুঝি আমি মনের খেয়ালে ঐ সব কথা বলছি! তারপর চুপ করে থেকে দেখলাম, তখন দেখি আবার বলছে—শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিল!—দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব—তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য্য!"

"আর দেখলাম—তিনি আর হৃদয়মধ্যে যিনি আছেন, এক ব্যক্তি! তবে একটা রেখা মাত্র আছে সম্ভোগের জন্য!"

"এই ব্যায়রাম হয়েছে কেন? এর মানে ঐ—যাদের সকাম ভক্তি, তারা ব্যায়রাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে!"

"শরীরটা কিছুদিন থাকতো তো লোকেদের চৈতন্য হতো, তা রাখবে না। সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে! একে কলিতে ধ্যান জপ নাই।"

"মনে করছি—চৈতন্য হোক সকলকে বলবো না। কলিতে পাপ বেশী—সেই সব পাপ এসে পড়ে!"

"তিনি ভক্তের জন্য দেহ ধারণ কোরে যখন আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে ভক্তেরাও আসে—কেউ অন্তরঙ্গ, কেউ বহিরঙ্গ, কেউ রসদ্দার।"

মুরারি ঘোষ

নাস্তিকপ্রবর দিদেরো (১৭১৩-১৭৮৪) একবার মহামুস্কিলে পড়েছিলেন। গণিতজ্ঞ অয়লারের (১৭০৭-১৭৮৩) সংগে রাশিয়ার রাজসভায় তাঁকে এক তর্কযুদ্ধে নামতে হয়েছিল। আসলে যুদ্ধটা যুদ্ধ নয়—যুক্তিহীন একটা ভাঁওতা মাত্র। কিন্তু সূচনাতেই দিদেরো কাত হয়ে গিয়েছিলেন। বীজগণিতের একটা অসম্পূর্ণ প্রস্তাবনা সামনে রেখে অয়লার বলেছিলেন যে, এটা যদি সত্য হয়, তা হলে প্রমাণিত হবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব। দিদেরো পালিয়ে গিয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ রাজসভা ছেড়ে। কয়েক দিন বাদে রাশিয়া পরিত্যাগ করে ফ্রান্সে গিয়ে বাঁচলেন। এ এক মজার ঘটনা! আসলে অয়লার কোনো সমস্যা বা প্রশ্নই তুলে ধরেন নি। একটা ভুয়ো ফাঁকা আওয়াজে দিদেরোকে ঠকিয়ে দিলেন। দিদেরো বীজগণিত জানতেন না। জানলে পরে অয়লারের সাহসই হোতো না বীজগণিতের উদাহরণ তুলে জামাই-ঠকানো প্রশ্ন দেওয়া। আজকের বিজ্ঞান আর অর্থনীতির জগতে আমাদের অবস্থা অনেকটা দিদেরোর মতনই। অবশ্য আমাদের সমস্যা ঈশ্বর আছে কি নেই—তা নয়। আসল সমস্যা খেয়ে পরে বেঁচে থাকার। নানান প্রশ্নের উত্তর চাইতে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছে অনেক সময়ে যে উত্তর পেয়ে থাকি, তাতে আমাদের অন্ধকার মনে কোনো আলোকপাত করে না।

যদি প্রশ্ন করা হয়: দেশের অর্ধেক লোক দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না কেন? উত্তরে হয়তো সংখ্যাতত্ত্বের এক হিসেব দেওয়া হোল। বলা হোল: কেন পাবে না! আমাদের জাতীয় আয় গড়ে এত। এতে দেখা যায়, গড়পড়তা প্রতিটি মানুষের দুবেলা না খাবার মতো অবস্থা নয়। জোর গলায় ঘোষণা করা হলো এই উত্তর। এই উত্তর শুনে আপনার আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া কী হবে? সংখ্যাতত্ত্ব হোক বা গণিতের কায়দা-কানুন বলুন, এ সব অজানা থাকলে তখন হয়তো দিদেরোর মতই পালিয়ে বাঁচতে হবে।

সংখ্যার রাজত্বে আমরা বাস করছি। তাই গণিতের জ্ঞান অপরিহার্য হয়ে উঠেছে আমাদের জীবনে। আমাদের চলতে ফিরতে সংখ্যা, গণনা আর পরিমাপ। দৈনন্দিন জীবনের তাগিদেই এই পরিমাপের ভাষা (Language of Size) আয়ত্ত করতে হয়। গতানুগতিক ভাবে বাজার হিসেব করার মত শেখা নয়। আরেকটু বিশেষজ্ঞ হওয়া। কেন না: "The modern Diderot has got to learn the language of size in selfdefence, because no society is safe in the hands of its clever people." (L. Hogben: Mathematics for the million) চালাক লোকের হাত থেকে বাঁচার রাস্তা কই!

সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই খবরের কাগজে খুঁজবো—বোলিং এভারেজ, টেম্পারেচার চার্ট, কিংবা লীগ খেলার পয়েন্ট। বাজার হিসেব ছাড়াও, চাকরের মাইনে, ধোপার পাওনা, ঝিয়ের কামাই, বাচ্ছা ছেলেটার দৈহিক ওজন, ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম, ব্যাঙ্কের স্থায়ী আমানতের সুদ, রেলের টাইম টেবল, ওভারটাইম খাটার পাওনা, বেকারীর সংখ্যাতত্ত্ব, উৎপাদন বৃদ্ধির হার, এরোপ্লেনের স্পীড রেকর্ড, রেডিওতে খবর বলার সময়, বার্ষিক জন্ম-মৃত্যু হার, এ রকম সাত-সতেরো। অঢেল সংখ্যার ভিড় কাটিয়ে আমাদের প্রতিনিয়ত চলতে হচ্ছে। এতো হিসেব রাখতে হতো না আমাদের পূর্ব-পুরুষদের। আজ আমাদের না রাখলে চলে না, কেন না হিসেবের আদত ভূতই আমাদের ঘাড়ে চেপে রয়েছে। এডমণ্ড বার্ক তাই সখেদে বলেছিলেন: "The Age of Chivalry has gone. That of sophists, economists and calculators has succeeded and the glory of Europe is extinguished for ever......" হিসেবের রাজ্যে ইউরোপের আজ সব গর্ব-দর্প চূর্ণ হয়েছে, এতটা হাহাকার কিন্তু নিশ্চয়ই আমরা করি না। সংখ্যা, গণনা আর হিসেব পরিমাপ, এ সব স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছি। তাই অবাক লাগে ইতিহাসের পুরোনো পাতায় যখন দেখি সেন্ট অগাষ্টিন বলছেন: "The good Christians should beware of mathematicians and all those who make empty prophecies. The danger already exists that the mathematicians have made a covenant with the devil to darken the spirit and to confine man in the bonds of hell."

এতটা সাবধান-বাণী উচ্চারিত হলেও সংখ্যা, গণনা আর গণিতের বিকাশ অব্যাহত রয়ে গেল, আসলে মোহমুক্ত বুদ্ধির পথই হলো গণিতের পথ। ইতিহাসে দেখা গেছে এই সোজাবুদ্ধির রাস্তায় চলার অনেক বিপদ। এ বিপদ কোপার্নিকাস, গ্যালিলিওকেও মুক্তি দেয়নি, রোমান আইনজ্ঞেরা তো সামাজিক অনুশাসনই বেঁধে দিয়েছিলেন: "To learn the art of Geometry and to take part in public excercises, an art as damnable as mathematics, are forbidden". এর উল্টোটাও দেখি। গ্রীক ইতিহাসের স্বর্ণযুগে প্লেটোর একাডেমীর প্রবেশ পথের খোদাই: "Let no man without the knowledge of Geometry enter this place." গণিতের প্রতি এই মমতা, মোহমুক্ত বুদ্ধির এতখানি সম্মানই যুগে যুগে জয়ী হয়ে এসেছে। সাধু অগাষ্টীন বা রোমান আইনজ্ঞেরা এখানে পরাজিত।

গণিতের ভাষা

আজকে বিজ্ঞানের জগতে গণিতের রাণীর আসন (Queen of the Sciences)। বিজ্ঞানের ভাষাই হল গণিতের ভাষা। গণিতের ভাষায় বিজ্ঞান বিচার ব্যক্ত করা হয়। দুটো কারণে গণিতের এই প্রাধান্য। এক—গণিতের ভাষায় অল্প কথায় অনেক কিছুই বলা চলে। দুই—এ ভাষার সাবলীলতা। অনেক অবোধ্য দুর্বোধ্য জ্ঞান কেবল গাণিতিক ভাষাতেই ব্যক্ত করা যায়—অন্যত্র যায় না।

অল্পকথায় অনেক কিছু বলা মানে প্রতীকের সাহায্যে বলা। গণিতের ভাষা হোল প্রতীক-সর্বস্ব। অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়।

যদি বলি: "সমকোণী ত্রিভুজের দুই বাহুর বর্গের যোগফল অতিভুজের বর্গের সমান।"—একথার অর্থ বুঝতে গেলে প্রতীকী শব্দগুলির অর্থ ভেঙে নিতে হবে—সমকোণ, ত্রিভুজ, সমকোণী ত্রিভুজ, অতিভুজ, বর্গ। এগুলো হচ্ছে গাণিতিক শব্দ। কিংবা যদি বলি এভারেষ্ট ২৯১৪০ ফুট উঁচু—এখানে '২৯১৪০ ফুট উঁচু' এই শব্দটিতে একটা বিশেষ ক্রিয়া ও সেই ক্রিয়াসঞ্জাত জ্ঞানের সমাবেশ রয়েছে। বিশেষ কোন কর্মের সাহায্যে যদি ওপরের দিকে এভারেষ্টের দৈর্ঘ্য মাপতে পারি, তবে এই ২৯১৪০ ফুটের সন্ধান পাব। বিশেষ স্থানে বিশেষ ক্রিয়ার সাহায্যে আমরা এই সত্যে উপনীত। ২৯১৪০ ফুট, এটা একটা গাণিতিক শব্দ ও প্রতীক। বিজ্ঞানের ব্যক্তব্য প্রকাশ করতে হলে এই গাণিতিক শব্দগুলো একান্ত অপরিহার্য্য। এই শব্দগুলোর ক্ষমতাও অসীম। এরা বিজ্ঞানের ভাষাকে অসম্ভব সাবলীল রেখেছে—বহু দুর্বোধ্য চিন্তা সরল হয়েছে গণিতের ভাষায়।

গণিত ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব, অনেক থিয়োরী আবিষ্কৃত হবার আগেই গণিত তার প্রকাশের রাস্তা তৈরী রাখে। বিজ্ঞানীর মানসে কোন 'হাইপথেসিস্' বা 'থিয়োরী' উদ্ভব হলে, গণিত তাকে সংগে সংগেই পৌঁছে দেয় হাজারো মনের দুয়ারে। বহু ক্ষেত্রেই এই উদাহরণ দেখা গেছে। রীমানীয় জ্যামিতি (Riemannian Geometry) যদি আবিষ্কৃত না হতো কিংবা 'থিয়োরী অব ইনভ্যারিয়ান্স' যদি অজ্ঞাত থাকতো, তাহলে আইনষ্টাইনের 'আপেক্ষিকতা-বাদ' বা 'মহাকর্ষের প্রকল্প' এতদিন অপ্রকাশিত ও দুর্বোধ্যই থেকে যেত।

ম্যাট্রিক্স গণিতে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার (Quantum mechanics) প্রকাশ। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার তত্ত্ব প্রকাশ করার আগে হাইসেনবার্গের ম্যাট্রিক্সের (Matrix) তত্ত্ব জানা ছিল না। তিনি নিজেই গণিতের ভাষা সৃষ্টি করে পৃথিবীকে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার কথা জানালেন। আসলে তাঁর ঐ নতুন তৈরী করা ভাষা ম্যাট্রিক্সেরই একটা রূপ। আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান (Mechanics) গণিতেরই বিশিষ্ট শাখা। আধুনিক সভ্যতার বহু উপকরণ এই যন্ত্রবিজ্ঞানের দান। জ্যামিতি, ক্যালকুলাস, বীজগণিত, ত্রিকোণোমিতির ভাষায় যন্ত্রবিজ্ঞান গ্রথিত। বিজ্ঞানের সমস্ত প্রযুক্ত (Applied) আর বিশুদ্ধ (Pure) তত্ত্বের একমাত্র আশ্রয় হলো গণিত। ডারউইনের ভাষায়: "Every new body of discovery is mathematical in form because there is no other guidance we can have." তাই বিজ্ঞানের জগতে তার বাণীর আসন।

উপকরণ ও ধর্ম

বিজ্ঞান চিন্তা প্রকাশে গণিতের এই কার্যকারিতার সন্ধান পাওয়া যাবে গণিতের উপকরণে। সংখ্যা ও প্রতীক গাণিতিক ভাষার প্রধান উপকরণ। সংখ্যা ও প্রতীকের দু'টি বিরাট গুণ বা ধর্ম আছে। বস্তু-নিরপেক্ষতা (Abstraction) আর সরলীকরণ (Generalisation)। স্বাভাবিক ভাবেই গণিতের ভাষাতেও বস্তু-নিরপেক্ষতা ও সরলীকরণ দুয়েরই সাক্ষাৎ মিলবে। সাক্ষাৎ মিলবে আরো এক ধর্মের। গণিতের কাঠামো হলো যুক্তিবিন্যাস। সংখ্যা, প্রতীক ও যুক্তিবিন্যাসে গ্রথিত হলো গণিতের রাজ্য। প্রতীক ও যুক্তি-বিন্যাসযোগে, গণিতের রাজ্যে বাড়তি আকর্ষণ হলো গণিতে 'সম্ভাব্যতার বিস্তার'। গাণিতিক ভাষার এ-ও আরেকটা ধর্ম। বস্তু নিরপেক্ষতা, সরলীকরণ আর সম্ভাব্যতার বিস্তার (Extension of Possibilities) এই তিনের সমাবেশে গণিতের ভাষা হয়েছে অপরিসীম সাবলীল।

বস্তু-নিরপেক্ষতা

সংখ্যাকে আমরা পাই কি ভাবে? সাধারণত কোনো পরিমাপ বোঝাতে গিয়ে। বস্তু-জগতের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের সংবাদ বয়ে আনে এই সংখ্যারা। যেমন, আমরা বলি, ৫ সের চাল, কিংবা ১ ডজন কমলা লেবু, কি ১০ হাত ধুতী। এখানে চাল, কমলা লেবু, ধুতীর সঙ্গে তাদের পরিমাণগত সংখ্যার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এই সংখ্যাগুলো বস্তু-জগতের সংগে অঙ্গাঙ্গী সম্পৃক্ত। তবু এই সংখ্যারা বস্তু সম্পৃক্ত হয়েও বস্তু-অতীত ধারণা বহন করে। বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এরা স্বতন্ত্র, একক।

১ থেকে ৯ পর্যন্ত এই নটা সংখ্যার প্রত্যেককে আমরা বস্তু-নিরপেক্ষ অস্তিত্বে কল্পনা করতে পারি। শুধু ৫ বলতে বস্তু-জগতের কোন কিছুই আমরা বুঝি না—বুঝি কেবল বস্তু-নিরপেক্ষ এক প্রতীক মাত্র। তা ৫ মণ চাল হতে পারে, ৫ হাত কাপড় হতে পারে, কিংবা বিকেল ৫টা হতে পারে অথবা ৫ ডিগ্রী উত্তাপ হতে পারে—কী না পারে! পৃথিবীতে পরিমাপের যতগুলি ইউনিট আছে প্রত্যেকের সংগে যুক্ত হতে পারে। যুক্ত হতে পারে পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর ধারণার সংগেও। সংখ্যাতীত উপায়ে এরা ভাব প্রকাশ করে। সেজন্য এদের বস্তু-নিরপেক্ষ রূপটাই প্রধান। আবার এই বস্তু-স্বাতন্ত্র্য আরো কয়েক মাত্রা চড়েছে বীজগণিতে। সেখানে সংখ্যার রাজত্ব নেই। সংখ্যার ধারণার (Idea of a number) রাজত্ব। X, Y, Z সেখানে সংখ্যার বদলে ব্যবহার করা সংখ্যার পরিবর্ত (Substitute) মাত্র। বলা হয় যে কোনো একটা সংখ্যা ধরা যাক—এই যে কোনো একটা সংখ্যা কোনো একটা অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$: উদ্ধৃত এই সূত্রটা আমাদের জ্ঞাত অজ্ঞাত প্রত্যেক সংখ্যার বদলে বসানো চলে। সমান চিহ্নের বাঁ দিকের অঙ্কটার a ও b এর পরিবর্তে আমরা যে কোন দুটো সংখ্যা কল্পনা করে নিয়ে গাণিতিক যুক্তি সাজিয়ে ডান দিকের অঙ্কে ফিরে আসতে পারি। এখানে গাণিতিক ক্রিয়ায় বস্তু-জগতের অস্তিত্বের লেশমাত্র নেই। সম্পূর্ণ বস্তু-নিরপেক্ষ রাস্তায় ও চিন্তায় এই গণিতের অগ্রগতি ও পরিণতি। পাটিগণিতের চারটি সূত্রে (যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগে) এই বস্তুনিরপেক্ষতার চূড়ান্ত রয়েছে। বস্তুর অতীত এই একক স্বাতন্ত্র্য গণিতের প্রধান আশ্রয়। আর স্বাতন্ত্র্যের মূল্যেই বস্তু জগতের ওপর গণিতের অগাধ দখল। কারণ বস্তু জগতেরই এক দিকের মুখ্য পরিচয় গণিতের ভাষাতেই ব্যক্ত হয়।

সরলীকরণ ও সম্ভাব্যতার বিস্তার

আমরা জানি বীজগণিতের সূত্র ও নিয়মাবলী সাধারণ ভাবে পাটিগণিতের পক্ষেও প্রযোজ্য। বীজগণিতে যে কোন একটা সংখ্যার

বদলে কোন একটা অক্ষরের ব্যবহার (যথা X, Y, Z) গণিতের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়। এই কার্যকারিতাই (Effectiveness) সরলীকরণের প্রসার ঘটিয়েছে বীজগণিতে। পাটিগণিত থেকে বীজগণিতে ব্যাপকতার প্রসার বেশী। বীজগণিতের গাণিতিক সূত্র ও নিয়মাবলী সংখ্যা ছাড়াও অন্যবস্তুর ওপর প্রয়োগ করা যায়। পাটিগণিতেও সরলীকরণের যথেষ্ট উদাহরণ আছে। একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যায়। খুব সাধারণ নিয়ম: ৫ আর ৩ আলাদা দুটো সংখ্যা। এই সংখ্যা দুটোর যোগে: ৫ + ৩ = ৮ একটা আলাদা সংখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু ধরা যাক আমরা এখানে কেবল যোগফলটাই জানি। আর জানি ৩ সংখ্যাটি। এখন মাঝের সংখ্যাটিকে (৫) জানবার দরকার পড়লো যার সংগে ৩ যোগ করলে যোগফল ৮ হবে। পাটিগণিতের প্রাথমিক জ্ঞানে আমরা চট করে বলে দিতে পারি সংখ্যাটি কত? এখানে আমাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যাটি (৮ − ৩ = ৫) তখনই পাব যখন আমরা ধনাত্মক সংখ্যার সংগে সংগে ঋণাত্মক সংখ্যা ও চিহ্নের ব্যবহার কোরবো। ঋণাত্মক সংখ্যা ও চিহ্নের ব্যবহার ধনাত্মক সংখ্যা ও চিহ্নের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই ভাবে ক্রমাগত অনুশীলনের ফলে বিভিন্ন প্রস্তাবনা থেকে নতুন নতুন সিদ্ধান্তজাত নিয়মের উদ্ভব হচ্ছে। তাতে কিন্তু অনেক সময়ে পুরোনো প্রস্তাবনা আর তার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয় না। সূত্রের ক্ষেত্র আরো বর্ধিত হয়। ফলে গণিতের বিভিন্ন নিয়ম ও সূত্রের যেমন ব্যাপক প্রসার বাড়ছে তেমনি তার ঘটছে Generalisation.

সংখ্যা ও প্রতীকের সাধারণ সমাবেশে গণিতের প্রস্তাবনা (Premise) গঠিত। যুক্তিজাল সাজিয়ে প্রস্তাবনার কাঠামোয় উপরিতল (super structure) নির্মিত হল গণিতের সিদ্ধান্তে। উপরিতল গঠনের উপকরণ হল সংখ্যা, প্রতীক ও যুক্তির অবরোহ (Sequence of Logic)। গণিতের শিল্পকর্মে অজস্র কথার, অপরিমেয় চিন্তার সংহত রূপ ব্যক্ত। গণিতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হল চিন্তার এই মিতব্যয়িতা: ইকোনমি অব থট্। গণিতজ্ঞ সাটনের ভাষায়: "Mathematics is economy in thought carried to extremes, it is devoid of all the emotions and associations which affects most other acts of thinking." (Mathematics in Action: O. G. Sutton). গণিতের চিন্তায় কোনো ভাবাবেগ বা অলস কল্পনার স্থান নেই। শিল্পের কমনীয়তা গণিতের প্রস্তর-কঠিন ভাস্কর্যে পরাজিত। তবু শিল্পসৃষ্টি ও রসবিচারের মহত্তম আনন্দ গণিতেও বর্তমান। তাই গণিত ও শিল্পের তুলনামূলক রূপ-বিচার এখানে উল্লেখ্য।

গণিত ও শিল্প

গণিতের মস্ত বড় সুবিধে তার Sequence বা অবরোহ। যুক্তির নির্দিষ্ট ধাপে পা ফেলে যেতে তার নিশ্চিন্ত অগ্রগতি। গণিতের নষ্ট সোপানের ধাপ পূর্ব আঙ্গিক মতই নিখুঁত গড়া যায়। কিন্তু স্বাভাবিক শিল্পকলায় তা চলে না। গণিত ও শিল্পের প্রভেদ এখানেই। কবি কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্য চরিতামৃত' যদি সত্যই সেদিন হারিয়ে যেত, তা হলে চিরতরেই *তার অক্ষয় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য থেকেই আমরা বঞ্চিত হতুম। নতুন করে 'চৈতন্য চরিতামৃত' লেখা কি কোনোদিন সম্ভব হতো?* কিন্তু নিউটনের ক্যালকুলাস যদি পৃথিবী জানবার আগেই হারিয়ে যেত—যদি নিউটনের সেই প্রিয় কুকুরটার হঠকারিতায় ক্যালকুলাসের সমস্ত প্রস্তাবনা ও সিদ্ধান্ত আগুনেই পুড়ে যেত, তবে অন্তত সেদিন না হোক আর একদিন এই ক্যালকুলাসের সংগে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটতোই। অপর কোন মনীষার প্রাজ্ঞতায়। নিউটন বা লেবনিৎসের অনেক আগেই ক্যালকুলাসের ধারণা আরো একজন পণ্ডিতের মাথায় এসেছিল। তিনি হলেন আর্কিমিডিস। দেকার্তের আলোক না পেয়েও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই কার্টেসীয় জ্যামিতির উদ্ভাবনা করতে পেরেছিলেন ফর্মাট সাহেব। অথচ দেকার্তের নামেই অ্যানালিটিক জ্যামিতির উদ্ভাবনা জড়িত। কিন্তু সাহিত্যের দিকে যদি তাকাই, এর উল্টোটাই দেখবো। শিল্প সৃষ্টির 'ডুপ্লিকেট' হয় না। দেশে দেশে এত অনুবাদ সাহিত্যের প্রসার লাভ ঘটছে, কিন্তু মূলের রস তাতে অক্ষুন্ন থাকে কি? সেক্সপিয়ার কি রবীন্দ্রনাথের না হোক, অন্তত ভারতচন্দ্রের "ডুপ্লিকেট"ও আর জন্মাবে না। বরঞ্চ নবরূপায়ণে নতুন অনাস্বাদিত রসের আবির্ভাব ঘটে অনেক সময়ে। শিল্পে নবজাতীয়করণ হল অবনী ঠাকুরের তুলিকায়। তবু অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পধারায় একক সূর্য। অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টি দ্বিতীয় কলাবিকাশ নয়—অদ্বিতীয়, অননুকরণীয় ও অতুলনীয়। তাই শিল্পের সংগে সমাজের যোগ, তা কোনো এক বিশেষ যুগের মধ্যেই প্রত্যক্ষ ভাবে সীমাবদ্ধ। কারণ নতুন শিল্প আগেকার সম্রাটের স্থান অনায়াসে দখল করে বসে। এ হল যুগের দাবী।

কিন্তু গণিতের রাজ্যে তা হবার নয়। গণিতের প্রত্যেকটি বিকশিত সৃষ্টি চিরকালের জন্যে সমাজের চলমান রথের সারথি হবে। গণিতের এক একটা আবিষ্কার বা এক একটা সিদ্ধান্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় নিখুঁত যুক্তির সোপান গড়ে তোলে। এক এক ধাপ পেরিয়ে তবে শীর্ষদেশে আরোহণ সম্ভব। মাঝের কোন ধাপ হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলে তাকে গড়ে নিতেই হবে। ডিঙিয়ে বা লাফিয়ে ওপরে ওঠা চলবে না। ওঠার সময়ে প্রত্যেকটি ধাপের সংগে আমাদের যোগ হবে প্রত্যক্ষ। গণিতের সংগে বিজ্ঞান এবং বুদ্ধির মুক্তির সরাসরি যোগ রয়েছে। দেকার্তের গাণিতিক মন দর্শনে সন্দেহবাদের (Philosophic Doubt) স্রষ্টা। নিউটনের মেকানিক্স জড়বাদের ভিত্তি-প্রস্তর দৃঢ় করেছে; সমাজের সংগে গাণিতিক চিন্তার যোগাযোগ শিল্পের থেকেও প্রত্যক্ষ। লিওনার্দোর 'লাষ্ট সাপার' হারানোর ক্ষতির থেকে ইউক্লিডের প্রতিপাদ্য সাময়িক ভাবে ভুলে থাকার ক্ষতি সমাজের একদিনও সইবে না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গণিতের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সংযোগ দৃঢ়তর। খৃষ্ট জন্মাবার কবে সেই তিনশো বছর আগে ইউক্লিডের জন্ম। তবু ইউক্লিড আজকের জীবনে অপরিহার্য। আসলে আমাদের এই সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে ওঠার জীবনে ইউক্লিড অপরিহার্য একটি ধাপ।

এই হল গণিত ও শিল্পের বিষয়বস্তু বা উপকরণগত বৈশিষ্ট্য। আঙ্গিকের প্রশ্নেও আর এক বৈচিত্র্যের সাক্ষাৎ মেলে। সাহিত্য ও শিল্পে জাতীয় চেতনার ছাপ স্পষ্টতর। গণিতের বেলায় তা হবার নয়। গণিতের সৃষ্টি জাতিগত বৈশিষ্ট্যের বাইরে ও উর্দ্ধে। এখানে

বৃহৎ পৃথিবীর সামগ্রিক প্রয়োজন গণিতের বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। স্থিতপ্রজ্ঞ গণিতজ্ঞের মানসে জাতীয় চেতনা কোনো সীমারেখা টানে না। বুদ্ধির মুক্তির প্রত্যক্ষ উপকরণে তার সৃষ্টির আঙ্গিক গড়ে ওঠে। আসলে সমগ্র পৃথিবীর সামাজিক মানসিক অগ্রগতির ছাপ থাকে গণিতজ্ঞের সৃষ্টিপূর্ব মানসিক প্রতিক্রিয়ায়।

শিল্পের সংগে তফাৎটা বড় হলেও গণিতের সংগে শিল্প-চেতনার মিলও অনেকখানি। মুক্ত চিন্তার রাস্তা বাতলে দেওয়াই কেবল বিশুদ্ধ গণিতের কাজ নয়। বুদ্ধির মুক্তি ঘটিয়ে সৃষ্টিশীল চেতনার (Creative endeavour) সঞ্চার গণিতের দ্বারাও সম্ভব। শিল্পই কেবল মানুষের বিচিত্র সৃষ্টির অধিকারী নয়। শিল্পজ্ঞান সৃষ্টির জটিলতার দুয়ার খোলে সত্য, কিন্তু গাণিতিক মনেও উচ্চাংগের রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সৃষ্টিশীল মানসে গণিতের মোহমুক্ত আবেদন নতুন সৃষ্টির অনবদ্য গভীরতায়ও সম্পদশালী হয়ে ওঠে। কেপলার ও নিউটনের উদাহরণ তো রয়েছেই। আরো এক বিস্ময়কর উদাহরণ হোল লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি। গণিতজ্ঞ বৈজ্ঞানিক মনের অধিকারী এই মানুষটির সৃষ্টির বিচিত্র সম্ভার আজও আমাদের বিস্ময়ের বস্তু। এঁরা কেবলমাত্র পুরোনো পৃথিবীর নির্বুদ্ধিতার নাগপাশ থেকে আমাদের মুক্ত করলেন তা নয়, মুক্তবুদ্ধির বৈপ্লবিক চেতনায় আমাদের যাত্রাপথ উজ্জ্বল করে তুললেন।

মহৎ শিল্পের যে উপকরণ-বৈচিত্র্যে পৃথিবীতে নব নব ধারণার বিকাশ ঘটে, তার উৎসমুখের সন্ধান মোহমুক্ত বুদ্ধির দুয়ারেই সম্ভব! বুদ্ধির এই মুক্তি একান্ত গণিতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উজ্জ্বলতর পথে যে যাত্রা সুরু হয়েছিল—কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও ও নিউটনের রাস্তা ধরে সে পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে পেছন দিকে যাত্রা করা আর চলবে না। আপাত সত্যের সন্ধান একমাত্র গণিতের রাজ্যেই মেলে। এই সত্যসন্ধানের পন্থাতেই গণিতের স্বরূপ নিহিত।

প্রত্যক্ষ সামাজিক প্রয়োজনে গণিতের উদ্ভব ও বিকাশ। ব্যবসা-বাণিজ্যগত প্রশ্নে, গৃহ-নির্মাণে, সেতুবন্ধনে, দিন-রাত্রি-সপ্তাহ-মাস-বর্ষ গণনায় আর আমাদের প্রতিদিনের অসংখ্য কর্মপ্রচেষ্টার অজস্র জটিলতার মুক্তি-সাধনে গাণিতিক সমাধান উদ্ভাবিত। গণিতের এই উদ্ভব ও বিকাশের মধ্যেই গণিতের স্বরূপ গঠিত।

গণিতের সংজ্ঞা

সূর্যের আলোর স্বরূপটা বোঝাতে গিয়ে আমরা যদি কেবল রামধনুর সাতটা রঙের কথাই বলি, তবে কিন্তু অনেক কথাই না বলা থেকে যায়। আসলে ঐ সাতটা রঙ ছাড়াও এমন অনেক আলোকস্পন্দন সূর্যের দেহ থেকে ছড়িয়ে পড়ে যা আমাদের চোখে সরাসরি ধরা পড়ে না। এ অনেকটা অন্ধ-হস্তি ন্যায়ের যুক্তির মতই। তবু কাজচলা গোছের একটা ধারণা আমাদের গড়ে নিতে হয়। এর সাহায্যে সব না হোক অনেক জটিলতা থেকেই সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়া যায়। গণিতের সংজ্ঞা নিরূপণে আমাদের অনেকটা সেই পথ ধরতে হবে। অতএব বেঞ্জামিন পিয়ার্স (১৮০৯—১৮৮০) কথিত সংজ্ঞার কথাই ধরা যাক: "Mathematics is the Science of drawing conclusions from given premises."—প্রস্তাবনা থেকে সিদ্ধান্তে আগমনের উপায় হলো গণিত।

সহজবুদ্ধিতে যে ধারণা সঠিক বলে মনে হয়—সব সময়ে তা অভ্রান্ত নয়। সূক্ষ্ম বিচারে সকল সময়ে এ ভ্রান্তি ধরা পড়ে। গণিতের রাজ্যে আপাতত কোনো ভ্রান্তির স্থান নেই। এর কারণ গণিতের আশ্রয় হলো যুক্তিবদ্ধতা। সংখ্যা থেকেই গণিতের সুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু সংখ্যাই গণিতের শেষ কথা হয়ে রইলো না। সংখ্যা বা প্রতীকের সাহায্যে কোনো প্রস্তাবনা (Premise) গঠন করে যুক্তির পথ বেয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানোই গণিতের লক্ষ্য। প্রস্তাবনা থেকে সিদ্ধান্ত—মাঝের পথটা হলো বিশুদ্ধ চিন্তার—এখানে সহজবুদ্ধির (Common Sense) স্থান নেই তবু গণিতের স্বরূপে আসতে গিয়ে অপ্রকাশ্য থেকে যায় তার আসল অর্থ। পৃথিবী ছাড়া যখন জ্ঞানের অস্তিত্ব নির্মাণ সম্ভব নয়—পার্থিব প্রয়োজনে ও উপলক্ষেই তার উদ্ভাবনা, তখন গণিতের স্বরূপ ব্যাখ্যায় বস্তু-জগতের সংগে তার যোগাযোগ, সংশ্লেষ ও বিরোধের স্বরূপটাও বোঝা দরকার।

গণিত ও বস্তুজগৎ

বস্তুজগতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না বিশুদ্ধ গণিতের (Pure Mathematics) চিন্তা নির্মাণে। এ তবু গণিতের বস্তুহীনতা নয়। আসলে বস্তু-জগতের সঠিক ধারণা নির্মাণেই বস্তুর অতীত জগতে গণিতের পরিক্রমা। বস্তু-জগতের সাক্ষ্য যখনই অস্বীকৃত হয়েছে গণিতের রাজ্যে কিংবা গণিতের রাজ্য যখন বিচ্যুত হয়েছে বাস্তব জগতে তার নির্দিষ্ট কেন্দ্র-বিন্দু থেকে, ইতিহাস তখনই তার নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছে। মানুষের সমাজে, সভ্যতার চিন্তা বন্ধ্যাত্বে ও যুক্তির অন্ধতায় নিদারুণ অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে আসলে গণিতের সাফল্য তার সুযুক্তি-নির্মাণে। এই সুযুক্তি অনুসরণেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অগ্রগতি। আজকের সুস্থ সবল সমাজ গঠনে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করতে হয় বিশুদ্ধ গণিতের রাজ্য প্রযুক্ত হয় সমাজ বিকাশের সহজ নিয়ন্ত্রণে।

সংখ্যাতত্ত্বের অপরিহার্য হিসাব বর্তমান সভ্যতার বাঁধুনি, বিজ্ঞানে প্রয়োগ আধুনিক জীবনের ভিত্তি—এ সমস্তই সম্ভব বস্তুজগতের সংগে গণিতের সংযোগে। গণিতের সংগে বস্তুজগতের বিরোধটা কেবল গণিতের যুক্তি নির্মাণ পদ্ধতিতে। গাণিতিক যুক্তি নির্মাণে বাস্তব জগতের অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে, কিন্তু বস্তুজগতের ঐতিহ্য-আশ্রয় হলো গণিতের যুক্তি বিজ্ঞান। এই সুযুক্তি যখন আমরা হারাই—সভ্যতার তখনই অধঃপতন। মধ্যযুগব্যাপী ভারত-ইতিহাসে অনগ্রসরতা—ইউরোপীয় ইতিহাসে প্রাক্ রিফর্মেশন যুগের অন্ধকার এরই জ্বলন্ত স্বাক্ষর। গণিতের তাই অপর এক যোগ্য আখ্যা হোল 'সভ্যতার দর্পণ' (Mirror of Civilization).

Ref:

Hyman Levy: The Universe of Science
L. Hogben: Mathematics for the Million
Morris Klein: Mathematics in Western Culture
Eric Bell: Math. the Queen of Sciences
গগন বন্দ্যোপাধ্যায়: গণিতের কথা। বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ।

অধ্যাপক

অজিতকুমার ভাদুড়ী

নামটার মধ্যে একটা গ্লামার আছে। প্রথম তাপিতের কাছে এই নামে পরিচিত হবার সময় মনের কোণে একটা ক্ষীণ আত্মপ্রসাদের ঝিলিক খেলে যায়। সে আত্মপ্রসাদ বুদ্ধিজীবীর মননশীলতার অহমিকা-প্রসূত হয়তো বা অর্থের কৌলীন্যের কাছে হার স্বীকার করার যে গ্লানি মনের মধ্যে থেকে থেকে একটা আত্মক্ষয়ী জ্বালার সৃষ্টি করে—পরিচয়ের মাধ্যমে সেই গ্লানি ক্ষালনের একটা সুযোগ তবু তো পাওয়া যায় !

একদিকে প্রাকৃত সমাজ যেখানে আর্থিক মান সামাজিক মর্য্যাদার মাপকাঠি আর একদিকে পড়াশুনার মূল্য সংশয়ী উদ্ভিন্ন ছাত্রসমাজ, তারা প্রশ্ন তোলে—সাহিত্যপাঠের সার্থকতা সম্বন্ধে, পাঠোত্তর জীবনের পথে চলার জন্যে বর্তমান শিক্ষার সার্থকতা সম্বন্ধে তাদের জিজ্ঞাসা। ব্যবহারিক উপযোগিতা আর অর্থনৈতিক উদ্বেগের ছায়া তাদের মুখে চোখে। তার থেকে এড়ানোর উপায় কোথায় ? তাই মুক্তি খুঁজি শিপ্রা বেত্রবতীর তটে। তাই কল্পনা-বিহার চলে পেরীর এপিপার্সিডিয়নের রম্য উদ্যানে,—যেখানে জীবনের জটিলতা অনেক সহজ হয়ে গেছে, সেখানে জানা-না-জানার প্রদোষের ছায়ায় রহস্য খোঁজে সমস্যা-পীড়িত মন। মাঝে মাঝে ক্লাসে সহকর্মীর সাক্ষাৎ পাই, মনের দুয়ার খুলে যায়, কাব্যের সৌন্দর্য্যস্বর্গ ক্ষণিকের জন্য ধরা দেয়, অভিনেতার জীবন আমাদের। রঙ্গমঞ্চে যতক্ষণ নট অভিনয় করে, সে ভুলে যায় তার সামাজিক পটভূমিকা, অভিনেতা আর অভিনীত চরিত্র এক হয়ে যায় অনুভূতিতে, আনন্দে বেদনায়। যবনিকা নামে, পাদপ্রদীপের আলো একে একে নিবে আসে। প্রশংসার গুঞ্জন স্তিমিত হয়ে আসে।

তারপরে যেখানে যবনিকা ওঠে, সেখানে শুধু নিরন্ধ্র অন্ধকার, শুধু অভাব দৈন্য, শুধু চাওয়া আর চাওয়া। সমাজে স্বীকৃতি নেই। সেখানে অধ্যাপক স্কুল-মাষ্টারের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ; বেতনের উল্লেখে কনিষ্ঠ কেরাণীর সমগোত্রীয়, স্কুল আর কলেজের ধাপে ধাপে সোনার পদকে মোড়া পথে গৌরবের শিখর থেকে মনে হয়েছিল জীবনটা বোধ হয় শুধু সাফল্যের মালা গাঁথা ! তাই শেষের ফুল কুড়োতে অভ্যস্ত মন বিরাট ধাক্কা খেল যখন দেখল যে এ সমাজে গুণের মর্য্যাদা নেই, যোগ্যতার স্বীকৃতি নেই, আছে শুধু আর্থিক সাফল্যের মাধ্যমে কৃতিত্বের বিচার। ম্যাথু আর্নল্ডের মতো শুধু একটি কথা মনে পড়ে গেল—'ফিলিষ্টাইন্'।

সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এই অধ্যাপক-গোষ্ঠী। সমাজের উৎসবের আনন্দ-অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার যোগ বড় ক্ষীণ; যতটুকু না থাকলে নয়। "ছুঁয়ে থেকে দোলে শিশির যেমন শিরীষ ফুলের অলর্কে।" প্রতিনিয়ত যেখানে রুচির স্থূলতা, ধনের দম্ভ, রাজনীতির বিষ আঘাত হানতে থাকে, সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মনের পক্ষে, সেখানে আত্ম-মুখিনতা একমাত্র বাঁচবার পথ। হয়তো সুনীল দত্তের "উটপাখীর" পলায়নী মনোভাব এতে প্রকাশ পায়। কিন্তু এছাড়া নিরীহ অধ্যাপকের গত্যন্তর কি ? আত্ম-গরিমা প্রচারের জয়ঢাকে দিগ্বিদিক নিনাদিত করার মতো স্থূল চর্ম সকলের নেই।

যে, সমাজ-জীবনের অন্য সব দিক তার তাঁবেদারি করা ছাড়া অন্য কোন পথ খুঁজে পায় না। রাজনীতির শীর্ষে আছেন যাঁরা তাঁরাই শিক্ষাসংস্কৃতির কর্ণধার হয়ে বসেছেন। যে ভারসাম্য (Justice) প্লেটো সমাজজীবনের মূলসূত্র বলে মেনে নিয়েছেন, তা আজ বিলুপ্ত, তাই শিক্ষাসংস্কৃতি আর রাজনীতির মধ্যে সীমারেখা খুঁজে পাওয়া দুরূহ, রাষ্ট্রশাসনের সম্মান আর মর্য্যাদার আকর্ষণে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে অধ্যাপনার গৌরব, শক্তির মাদকতা আর অর্থের কৌলীন্য নিরন্তর পরিহাস করে অধ্যাপনার সাদামাটা জীবন। তার সরলতা, নিষ্ঠার চেয়ে বড় হয়ে চোখে পড়ে তার বেশের নিরাড়ম্বরতা—দৈন্যের নামান্তর, জীবনের মূল্যায়ন বদলে গেছে। আগেকার দিনে শিক্ষকের দক্ষিণা হয়তো লোভনীয় ছিল না কিন্তু সমাজে তাঁর দান স্বীকৃত হতো। তাঁর ত্যাগ, তাঁর সরলতা অর্থের দৈন্যের চেয়ে মনের ঐশ্বর্য্যের গৌরবে অনেক বেশী প্রোজ্জ্বল ছিল, যে সব ছাত্র তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়ে যেতো—ভবিষ্যৎ-জীবনে কৃতী পুরুষের স্থান নিতো—তারা মুক্ত কণ্ঠে তাঁর দান স্বীকার করতো। শেষ জীবন পর্য্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের কাছে তাঁর দান স্বীকার করতো। কালে-ভদ্রে কখনো পুরোনো অধ্যাপক প্রাক্তন ছাত্রদের বাড়ীতে পদার্পণ করলে রীতিমত সাড়া পড়ে যেত অভ্যর্থনার ব্যাপারে।

আজকে অধ্যাপনার না আছে সম্মান, না আছে দক্ষিণা, মোটা মাইনের লোভ ছেড়ে দেওয়া হয়তো কিছু নয়, কিন্তু তার অবদান যদি সমাজে স্বীকৃতি না পায়, যদি প্রাপ্য সম্মানটুকু বঞ্চনায় এসে ঠেকে, তবে কি নিয়ে আজ অধ্যাপকের সান্ত্বনা ? এই ব্যর্থতার বেদনা (frustration) আজ অধ্যাপকের জীবনে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন তুলেছে—তার নিজের বৃত্তির প্রতি আস্থার মূলেই ধরেছে ভাঙন, তার মধ্যে যে অনাস্থার সুর বাজছে—যে সংশয়ে সে নিজে দ্বিধাগ্রস্ত—সেই সংশয়-দ্বিধা নিয়ে বাইরের বিশ্বের ঔদাসীন্য, অবহেলা কি করে জয় করবে ?

মাঝে মাঝে মনে অদ্ভুত ক্লান্তি আসে। মাঝারি ছাত্রের স্পর্শে দিনের পর দিন থাকতে থাকতে চিন্তার ধার যায় কমে, মৌলিকতা বিসর্জ্জন দিতে হয়। ছাত্রেরা চায় না জানতে, চায় পরীক্ষা পাশ করতে, তাই পাশ করানোর পাশে বদ্ধ হয়ে যাই। নিছক যতটুকু পরীক্ষার জন্যে না হলে নয়—তার বাইরে কিছু পড়বার, জানবার বা শোনবার দরকার নেই। স্নাতকোত্তর শ্রেণীর মানেতেও এর হেরফের চোখে পড়ে না। বদ্ধমনের জানলা খুলে দিয়ে উদার দিগন্তের আভাস দেওয়ার মধ্যেই অধ্যাপনার আসল সার্থকতা। শুধু পুঁথিগত বিদ্যে পরিবেশনের মধ্যেই কি সব শেষ হয়ে যায় ? পুঁথির বাইরে যে বিরাট জীবন—তার স্বরূপ, তার রহস্য মানুষের মনে যে অনুভূতি জাগায়, তার সঞ্চার কি ক্লাসের চার দেওয়ালের মধ্যে নিষিদ্ধ ? পড়াশোনার বাইরে যে জগৎ যে জীবন, তার স্বপ্ন দেখা আর দেখানোর অবকাশ কতটুকু মেলে ? গণিতের সংখ্যা দিয়া মার্কা মারা রোল-নম্বরেই তার পরিচয়ের সুরু আর শেষ। উচ্চতর শিক্ষার মধ্যে বুদ্ধির যে অনুশীলন, বোধের যে উৎকর্ষ, তার অভাব দেখি অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর জীবনে। অর্থনৈতিক উন্নতির সোপান হিসেবে উচ্চশিক্ষার মূল্য, কাজেই নিষ্ঠা নেই, আগ্রহ নেই, জানবার কৌতূহল নেই, ক্লাসে বার বার অনুভব করি—আত্মাহীন সত্তা (soulless entity), এদের অস্তিত্ব আছে, প্রাণ নেই—

যে প্রাণের আগুনে আগুন জ্বলে উঠে অধ্যাপকের মনে—আসে উদ্দীপনা—নতুন করে জানা আর জানাবার আগ্রহ যদি প্রাণে প্রাণে সঞ্চার না হোল, তবে নিত্য এই মাঝারিয়ানার সঙ্গে আপোষ করে থাকা যায় কি করে ? আমার এক অধ্যাপক বন্ধু বলেন—ক্লাসকে যদি মৌলিকতা প্রকাশের মুখ্য স্থান মনে করো, ভুল করবে। কিন্তু দিনের বিরাট অংশ যেখানে কাটে সেখানে কাজ আর প্রাণের মধ্যে যোগ না রইলো যদি, তবে সে অস্তিত্বের জের টেনে চলে কত দিন ? জীবিকা আর জীবনের এই জরাসন্ধ-ভাগ আত্মহত্যার নামান্তর ছাড়া আর কি ?

পড়বো কি ? পড়ানোর চেয়ে চিন্তার প্রয়োজন ? ভাবানুসরণের চেয়ে ভাবসৃজনের প্রয়োজন বেশী। তা না হ'লে অধ্যাপক তো তথ্যের ভারবাহী পুরুষ। সে কল্পনায় জারিত হয়ে তথ্য তত্ত্ব হয়ে উঠে, তার জন্যে অবসর তার চেয়ে বড় স্বস্তির প্রয়োজন, ক্লাস, টিউটোরিয়াল, সাপ্তাহিক উত্তর-পত্র পরীক্ষা—এর মধ্যে নিশ্বাস ফেলার অবসর কই ? গ্রীষ্মের বন্ধে বড় ছুটি মেলে, তা কাটে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা দেখে, অত্যন্ত নির্বোধ সাধারণ মানের খাতার পর খাতা দেখা, মনটা যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তেমনি হয় বিস্বাদ। কেরানীর খাতা লেখা আর আমাদের অধ্যাপনার মধ্যে যে রুটিন বাঁধা যান্ত্রিকতা, সে বৈচিত্র্যহীনতা মূলতঃ এক, নতুন নতুন আলোয় সৃজনধর্ম্মী কল্পনার লীলা-বিলাস বা অধীত বিষয়ে আত্মসাৎ করে আবার নতুন করে তার ব্যাখ্যা, সে সবের ক্ষেত্র নে সময় নেই, সুযোগ নেই। যে মনের আবহাওয়ায় চিন্তাগুলো দা বাঁধে, ব্যস্ততা আর ক্লাসে পড়ানোর জন্যে নোট করতে করতে সে আবহাওয়া কেটে যায়।

তবু মাঝে মাঝে একটা উদার প্রসন্নতা জীবনের সব দৈ ক্লান্তির উপর স্বপ্নাঞ্জন বুলিয়ে দেয়। আশা-উদ্দীপনা আর শ্র ভালবাসায় মেশা তরুণ হৃদয়ের ছোঁয়া লাগে মনে। বন-ভোজ ঐতিহাসিক তীর্থপর্যটনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ব্যবধানের ঘো খসে যায়, হাসি-হল্লোড়, ছুটোছুটি মাতামাতি সমস্ত গাম্ভীর্যে আবরণ সরিয়ে দেয়। মনে হয় আমরা এক গোষ্ঠীর এক পরিবারে ঘুচে যায় অপরিচয়ের ব্যবধান, ভুলে যাই বয়সের দূরত্ব। আর আলোয় এদের চিনি, জানি, বহু হৃদয়ের ধারা স্নানে অনুভব ক অদ্ভুত তৃপ্তির আনন্দ, ভাবি—

> "এই যে দেখা এই যে ছোঁওয়া, এই ভালো, এই ভালো।
> এই ভালো আজ এই সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায়
> ঢেউ দিয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।"

বহু হৃদয় নন্দিত এ জীবন হয় সার্থক।

চৌ-এন-লাই

সৈয়দ হোসেন হালিম

অবাক ক'রেছো
সারা পৃথিবীকে তুমি,
অবাক ক'রেছো
যুদ্ধ-পাশায় শকুনে মিত্র কবি'
যারা বার-বার হারাতে চেয়েছে
শান্তি-যুধিষ্ঠিরে ;
অবাক ক'রেছো
যারা ছলে ধরা-দ্রৌপদীরে বাঁধা রাখি'
কুরু-সভা-মাঝে
চেয়েছিলো তার লজ্জাকে হরিবারে !

অবাক ক'রেছো
মানুষকে যারা মানুষ ভাবেনি কভু—
ভেবেছে শুধু-ই যুদ্ধজয়ের অণু-পরমাণু ছোট,
লোকালয়ে যারা বসাতে চেয়েছে নর-মুণ্ডের খেলা,
তুমি ব'লে দিলে : মানুষ নহেক অতোটুকু—অতো ছোট!

কতদিন আর অগ্নি-আগরে দুঃশাসনের সেনা
মানুষের মহা-মনুষ্যত্বে পাঠাবে নির্বাসন ?
কতোদিন-আর অন্যায় রণে জয়ী হবে তুমি বলো ?
বাধবে-ই কুরুক্ষেত্র, শান্তি আসবে ফের !

ধরা-দ্রৌপদীর লাজ-রক্ষক, পার্থ-রথের রথী,
শান্তির লাগি' সারাটি জনম তব এই অভিযান ;
তাহার গর্বী নহে কো চীনের ক্ষুদ্র ভূখণ্ডটি—
তোমার গর্বী শান্তিকামী সারা লোক দুনিয়ার !

প্যারীচরণ সরকারের চিঠি

এডুকেশন গেজেট অফিস
১৬ই জুন, ১৮৬৮

মান্যবর এচ্. এল, ডাম্পিয়ার,

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের জুনিয়ার সেক্রেটারী মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়,

আপনার ২৭০০ নং ২রা তারিখের (১৩ই তারিখে প্রাপ্ত) পত্রপাঠে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে দুর্ঘটনা বিষয়ক, এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধটি মাননীয় ছোটলাট বাহাদুরের অপ্রীতিকর হইয়াছে অবগত হইয়া আমি যারপরনাই দুঃখিত হইলাম।

২। যদিও কোন কৈফিয়ৎ চাওয়া হয় নাই, তথাপি আমার নিজের প্রতি কর্ত্তব্যানুরোধে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর মহাশয়ের গোচরার্থে আমি নিম্নলিখিত বিষয় নিবেদন করা আবশ্যক বিবেচনা করি।

৩। যখন আমি সেই প্রবন্ধটি লিপিবদ্ধ করি তখন আমার মনে ধারণা ছিল যে, হিন্দু পেট্রিয়ট, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ইংলিশম্যান, ইণ্ডিয়ান মিরর, সোমপ্রকাশ, প্রভাকর ও চন্দ্রিকা পত্রসমূহে যে সকল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যে বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া ঐ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, তাহা প্রধানতঃ নির্ভুল এবং নিজের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসযোগ্য সূত্র অনুসন্ধানে আমার মনে ঐ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল।

৪। আমি মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবি নাই যে, আমি দেশীয় জনসাধারণের মনে ভীতি বা ভ্রম উৎপাদন করিতেছি। কারণ এডুকেশন গেজেটে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তদপেক্ষা অধিকতর ভীতিপ্রদ সংবাদ পূর্ব্ব হইতেই লোকমুখে ও সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহে দেশময় প্রচারিত হইতেছিল।

৫। যে নিয়মে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এডুকেশন গেজেট প্রতিপালিত হইয়া থাকে, আমি সেই নিয়মাবলী পাঠ করিয়া সেগুলির মধ্যে আমার বুদ্ধিতে এমন কিছুই দেখিতে পাই নাই, যাহা সাময়িক ঘটনা সমূহের উপর আমার নিজের ধারণা ও বিশ্বাস ব্যক্ত করিবার প্রতিবন্ধকস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে। এবং যে নিয়মটিকে সেই নিয়মাবলীর প্রধান বলিয়া আপনার পত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই নিয়মটিও মদীয় প্রবন্ধে ভঙ্গ করা হয় নাই, কারণ উহা বিনা অনুসন্ধানে পত্রস্থ করি নাই।

৬। যৎকালে এই প্রবন্ধটি লিখিত হয়, তখন অনেকেই অবগত হইয়াছিলেন যে, ঐ দুর্ঘটনা সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য একটি 'কমিশন' অচিরে নিযুক্ত হইবে। সেই কারণে আমার মনে স্বতঃই এই ধারণা জন্মে যে, গবর্ণমেণ্ট, কর্ত্তৃপক্ষগণের সরকারী রিপোর্টকে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ বা সর্ব্বপ্রকারে সন্তোষকর বলিয়া বিবেচনা করেন

৭। গবর্ণমেণ্ট যে উদ্দেশ্যে এডুকেশন গেজেট পত্রকে সাহায্য করেন, তাহার প্রতিকূলগামী হইতে পারে, এরূপ কোন প্রবন্ধ আমি ঐ পত্রে স্থান দিব, এরূপ অভিপ্রায় কখনই আমার ছিল না, এবং আমি ওরূপ প্রবন্ধ কখনও পত্রস্থ করি নাই। কিন্তু সেই বিষয়েই বর্ত্তমান স্থলে আমার কার্য্য দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, জ্ঞাত হইয়া আমি সন্তপ্ত হইয়াছি। আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, কোন প্রকাশ্য পত্র পরিচালন কার্য্যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এইরূপ কোন না কোন অসন্তোষকর কারণ উপস্থিত হইতে পারে এবং সকল সময়েই উহা অতিক্রম করা আমার পক্ষে দুরূহ হইবে। সেইজন্য আমি বিহিত সম্মান পুরঃসর প্রার্থনা করিতেছি যে, মাননীয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে এডুকেশন গেজেটের পরিচালন কার্য্য হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন।

ভবদীয় একান্ত আজ্ঞাবহ সেবক
শ্রীপ্যারীচরণ সরকার

[নবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত 'প্যারীচরণ সরকার' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

প্যারীচরণ সরকার ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ, এডুকেশন গেজেট, পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হ'ন এবং প্রায় দু'বছর ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই হডসন্ প্র্যাট্ সাহেবের প্রস্তাবে সরকারী ব্যয়ে এডুকেশন গেজেট প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় প্রথমে কোন প্রবন্ধ বা অভিমত প্রকাশিত হ'ত না। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সরকার এই পত্রিকাটিকে সরকারী মুখপত্ররূপে পুনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু স্থির হয় যে, সম্পাদকের ওপরেই প্রবন্ধ নির্বাচন ও অন্যান্য বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের গোড়া থেকে এডুকেশন গেজেট পরিবর্ধিত আকারে ও নতুন নিয়মে পরিচালিত হ'তে থাকে। প্যারীচরণ সরকার এই পত্রিকার প্রথম বাঙ্গালী সম্পাদক হ'ন এবং তাঁর সুষ্ঠ পরিচালনা গুণে পত্রিকার বিশেষ উন্নতি হয় ও গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে যায়।

প্রায় দু'বছর পরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের (Eastern Bengal Railways) শ্যামনগর ষ্টেশনের কাছে এক দুর্ঘটনার ফলে অনেক লোক মারা যায়। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ মৃত ও আহতদের যে সংখ্যা প্রকাশ করেন, তা অনেকের মনে সংশয়ের উদ্রেক করে এবং সংবাদপত্রে প্রচারিত হয় যে, কর্ত্তৃপক্ষের বিবরণ সত্য নয়। প্যারী বাবু এই সংবাদের সত্যতা নির্ধারণের জন্যে ঘটনাস্থলে গিয়ে সরজমিনে অনুসন্ধান করেন। তাঁহারও এই বিশ্বাস জন্মে, রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ শুধু যে হতাহতের সংখ্যা গোপন করেছেন তা নয়, স্থানীয় কর্মচারীরাও আহতদের সম্পর্কে অত্যন্ত উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এই অনুসন্ধানের এক বিবরণ ১২৭৫ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ করেন। সেই সংবাদ প্রকাশিত হ'লে

তৎকালীন ছোটলাট স্যার উইলিয়াম গ্রে অসন্তুষ্ট হয়ে প্যারী বাবুকে এক চিঠি পাঠান। তার উত্তরে প্যারী বাবু উপরিধৃত চিঠি দেন।

প্যারী বাবুর আত্মসম্মান-জ্ঞান কত প্রখর ছিল এবং তিনি কতদূর স্বাধীনচেতা ছিলেন, এই চিঠিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর পর শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর অ্যাটকিনসন সাহেব তাঁকে পদত্যাগ না করার জন্যে বিশেষ অনুরোধ জানান, কিন্তু প্যারী বাবু আর তা'তে স্বীকৃত হন নি। অতঃপর ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঐ কার্যভার গ্রহণ করেন।

রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখের চিঠি

রেভারেণ্ড জে, লং সমীপেষু ;—

মহাশয়, দেশের এই অংশে নীল চাষ সম্পর্কে দেশবাসীর মনোভাবের পরিচায়ক 'নীলদর্পণ' নাটকের সহিত আপনার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করিয়া সম্প্রতি যে বিবৃতি আপনি দিয়াছেন, আমরা (নিম্নস্বাক্ষরকারিগণ) তাহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি।

এদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি এবং শাসনতান্ত্রিক ও সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপারে দেশীয় লোকদিগের মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য আপনি যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন এবং দেশীয় সংবাদপত্র মারফৎ আপনার যে মতামত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আপনি ধর্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে এদেশের সকল মানুষের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই মনোভাব শাসনকর্তাদিগের এবং স্থানীয় ইউরোপীয়দিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার যে আপ্রাণ চেষ্টা আপনি করিয়াছেন, তাহাতে সুশাসনের কাজ কম প্রশস্ত হয় নাই।

বর্তমানে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে গঠিত রহিয়াছে, তাহাতে শাসনব্যবস্থা এবং আইন প্রণয়ন সম্পর্কে যে ভাবেই দেশবাসীর মনোভাব এবং মতামত প্রকাশিত হউক না কেন, সে সম্বন্ধে অবহিত হইবার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জোর দেওয়া আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একথা জানাইতে আমরা বাধ্য হইতেছি যে, ভারতের মঙ্গলের জন্য দেশের জনসাধারণের সন্তোষের উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তি একান্ত প্রয়োজন এবং দেশী সংবাদপত্রগুলি যে সকল সতর্কবাণী উচ্চারণ করে, তাহার প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা নিতান্ত মূর্খতা বলিয়া আপনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

মহাশয়, 'নীলদর্পণে'র অনুবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিবার ব্যাপারে আপনি যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের সুদৃঢ় ধারণার সম্পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে। দেশীয় সংবাদপত্রগুলির প্রকাশিত মতামত সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগকে অবহিত করিবার গুরুত্বের প্রতি আমরা বরাবর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। সেইজন্যই এই প্রশংসনীয় উদ্যমের ফলে সংবাদপত্রে যে তিক্ত ব্যক্তিগত বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আমরা অত্যন্ত দুঃখ এবং বেদনার সহিত লক্ষ্য করিয়াছি।

আমরা দৃঢ়তার সহিত একথা জানাইতে পারি যে, নীল চাষ সম্বন্ধে দেশবাসীর মনোভাব 'নীলদর্পণে' সঠিক ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরা ইহা জানি যে, আসল নাটকে স্ত্রীলোকদিগের এবং অন্যান্য চরিত্রের মুখ দিয়া এমন অনেক কথা বলানো হইয়াছে, যাহা মার্জিত রুচির লোকদিগের কর্ণে পীড়াদায়ক হইতে পারে। কিন্তু যে সমাজের চিত্র এই নাটকে অঙ্কিত করা হইয়াছে, সেই সমাজের প্রচলিত চিন্তাধারা এবং ভাবাদর্শ এই অংশগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশের অতি প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলিকে গুনিয়াব সকলেই অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ভাবে অতি মূল্যবান মনে করেন। কথাসাহিত্যের অংশবিশেষের মধ্যে মধ্যে অমার্জিত কথাবার্তা থাকার জন্য তাহা যদি দমন করা হয়, তাহা হইলে আমাদিগের আশঙ্কা আছে যে, সেই সুপ্রাচীন গ্রন্থগুলিও জনসাধারণের দৃষ্টি হইতে চিরকালের জন্য দূরে রাখিতে হইবে। এই একই মানদণ্ডে বিচার করিলে ইউরোপের আধুনিক ও প্রাচীন প্রতিভাশালী লেখকদিগের রচনারও সেই দশা হইবে। আমাদিগের কিন্তু আশঙ্কা হয় যে, আপনার এই প্রয়াসের যে প্রকাণ্ড নিন্দাবাদ হইতেছে, তাহা শুধু স্বার্থান্বেষী এবং কুচক্রীদিগের অপচেষ্টার ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

"এ দেশের লোকদিগের মনোভাব নীলদর্পণের মধ্যে প্রতিফলিত হয় নাই" এবং "যে উদ্দেশ্য লইয়া এই বইয়ের বক্তব্য ইউরোপীয়দিগের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা এদেশের লোক তারিফ করে না" ইত্যাদি যে সকল ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, আমরা তজ্জন্য দুঃখিত। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার উদ্দেশ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্বন্ধে আমরা আমাদিগের মতামত আপনার নিকট উপস্থাপিত করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। ইহা অপেক্ষা ভ্রান্তি আর কিছু হইতে পারে না এবং আমরা একান্ত ভাবে আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে, এই চিঠি সেই মর্মান্তিক ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবে।

ইতি—

আপনার একান্ত বশংবদ ভৃত্যগণ
রাজা বাহাদুর রাধাকান্ত
রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর
রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ
বাবু রমানাথ ঠাকুর এবং কলিকাতার আরও ৪৩ জন ভারতীয়।
[রেভারেণ্ড জেমস্ লংকে লেখা ইংরেজী পত্রের অনুবাদ]

শিবনাথ শাস্ত্রী "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" নামক গ্রন্থে 'নীলদর্পণ' সম্বন্ধে লিখেছেন—"একদিকে যখন ইণ্ডিগো কমিশন ও পেট্রিয়টের সহিত বিবাদ প্রভৃতির উপক্রম, তখন অপর দিকে ১৮৬০ সালের আশ্বিন মাসে দীনবন্ধু মিত্রের সুবিখ্যাত নীলদর্পণ নাটক প্রকাশিত হইল। এই আর এক ঘটনা যাহাতে বঙ্গসমাজে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিল। কোন গ্রন্থ বিশেষে যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে, তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না। 'নীলদর্পণ' কে লিখিল, তাহা জানিতে পারা গেল না। কিন্তু বাসাতে বাসাতে 'ময়রাণী লো সই নীল গেঁজেছ কই ?' ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চলিল।"

মধুসূদন এক রাত্রিরের মধ্যে এই গ্রন্থটি অনুবাদ করেন এবং রেভারেণ্ড জেমস্ লং নিজের নামে ইহা প্রকাশ করেন। তখন সে আন্দোলনের ঢেউ গিয়ে ইংলণ্ডেও পৌঁছয়। 'হরকরা' ও অন্যান্য কয়েকটি জাতীয়তাবাদী দেশী সংবাদপত্র এই গ্রন্থটির বিরুদ্ধে অপপ্রচার করতে থাকে। নীলকরগণ 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদককে মুখপাত্র দাঁড় করিয়ে ১৮৬১ সালের ১৯ জুলাই লং সাহেবের নামে নালিশ করেন। লং সাহেব তাঁর জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি বিদ্বেষবশে একাজ করেন নি। তিনি বহুকাল থেকে যেমন দেশীয়

সংবাদপত্র আর দেশীয় ভাষায় লেখা গ্রন্থের মর্মার্থ গবর্ণমেন্টকে জানিয়ে আসছেন, নীলদর্পণের অনুবাদও সেই ভাবে করেছেন। কিন্তু রেভারেণ্ড লং বিচারে 'ইংলিশম্যান' ও 'হরকরা'র সম্পাদক ও নীলকরগণের মানহানি করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন এবং এক হাজার টাকা জরিমানা ও এক মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎক্ষণাৎ ঐ টাকা জমা দেন। রাজা রাধাকান্ত দেব, রমানাথ ঠাকুর প্রমুখ ৪৩ জন কলিকাতাবাসীর লং সাহেবকে লেখা চিঠিখানিতে 'নীলদর্পণ' সম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ আছে।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চিঠি

১

মহাশয়েষু—

আপনার পত্র পাইয়া পরম উপকৃত হইলাম। পত্রের লিখিত বিষয়গুলি পরম উপকারজনক। আপনি শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া আমার জন্য যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, এতন্নিবন্ধন বিশেষ বাধিত হইয়াছি। জগন্নাথের মস্তকের কথা মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহাই প্রকৃত, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আমি আপনার লিখিতানুসারে সমস্ত বর্ণন করিব। গুণ্ডিচা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী, তবে আপনি অনুমান করিয়াছেন যে গুণ্ডিচা গুঁড়িকার্ষ্ঠ, ইহা হইলেও হইতে পারে।

নীলাদ্রি মহোদয়ে ভদ্রার হস্তের পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু দর্শনকালে ভদ্রার হস্ত নাই বলিয়া প্রতীতি হয়। অতএব যাহারা ভদ্রাকে বস্ত্র পরিধান করাইয়া দেয়, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন ভদ্রার হস্ত আছে কি না ?

কোনারকের মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারে অশ্বমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। আমার বোধ হয় তদৃষ্টান্তেই পূর্ব্বে জগন্নাথের দক্ষিণ দ্বারে অশ্বমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। পরে কোন কারণ বশতঃ ঐ অশ্বমূর্ত্তি উত্তরপূর্ব দ্বারে লইয়া থাকিবে। অধুনা সেখানেও সে মূর্ত্তি নাই। আপনি লিখিয়াছেন, জগমোহন ও নাটমন্দিরের মধ্যে দ্বার আছে, এক্ষণে উহাকেই জয়াবিজয়া দ্বার বলে, কিন্তু উহাতে অধুনা কোন মূর্ত্তি নাই, ইহাতে এইরূপ বোধহয় যে, পূর্ব্বে উক্ত দ্বারেই জয়াবিজয়ার মূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। আমার অনুভবানুসারে ভোগমন্দির ও নাটমন্দিরের মধ্যবর্ত্তী দ্বারে যে দুইটি মূর্ত্তি আছে, উহাই এক্ষণে জয়াবিজয়ার মূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিতে হইবে। মাধবীকুঞ্জে প্রতি দ্বাদশ বৎসরেই কি জগন্নাথের মূর্ত্তি সমাহিত হইয়া থাকে ? কিন্তু আমি শুনিয়াছি উক্ত কার্য্য ৫০।৬০ বৎসর অন্তর সম্পাদিত হয়। আপনি এই বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া লিখিবেন। আপনার ব্যবহারের জন্য পুরী ও শ্রীমন্দিরের মানচিত্র প্রেরণ করিলাম। জগন্নাথের মূর্ত্তির বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে, তাহা এই যে, জগন্নাথের করযুগল ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত অথবা সম্মুখ দেশে প্রসারিত। আপনি এই সংশয়টির অপনোদন করিবেন। প্রেরিত চিত্রে হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত দেখিতেছি। ইতি—

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

২

মদাত্মীয়েষু—

তিন দিবস হইল আমি বোম্বাই হইতে প্রত্যাগমন করিয়া [illegible] এই শিরোনামে পত্র প্রাপ্ত হই। উক্ত পত্র পুরীর ডাকে ১৭ই প্রেরিত হইয়াছিল। আমার অনুপস্থিতি প্রযুক্ত উড়িষ্যার মুদ্রণ কার্য্য স্থগিত ছিল। অদ্য কোণার্কের প্রথম শোধনীয় আদর্শ পাইয়াছি।

বোধ হয় এক মাস মধ্যে মুদ্রাকার্য্য সমাধা হইবে। ইতিমধ্যে আপনি কোণার্কের বিষয়ে যে কোন সংবাদ দিতে পারেন, তাহা বিশেষ উপকারজনক হইবে।

মন্দির সমাপ্ত হয় নাই বলিয়া যে আমার প্রথম' অনুমান হইয়াছিল তাহা বহুদিন পরিত্যক্ত হইয়াছে। মন্দির সমাপ্ত হইয়াছিল ও দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু পরে জমি বসিয়া তাহা পড়িয়া যায় ; এই এক্ষণে আমার মত। এ মতের বিশিষ্ট কারণ আবুল ফজল এবং জগমোহনের অন্তঃস্থিত স্তম্ভের পতন। শেষোক্ত ঘটনাটি জমি না বসিলে ঘটিতে পারিত না। ইংরাজী প্রবাদে বলে To build on sand, সেটি মিথ্যা নহে। পুরীর মন্দির বালুকার উপর নির্ম্মিত নহে। নীলাদ্রি নামে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বালুকা হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অট্টালিকার ভারে ভূমি দৃঢ় হইলে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়, সুতরাং বসিবার কারণ ছিল না।

আমার মতে লাঙ্গুলীয় নরসিংহই বর্ত্তমান মন্দিরের নির্ম্মাতা। এবং তাঁহার সময় হাণ্টার সাহেব নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ঐ নির্দ্দেশের মূল মাদলা পাঁজী এবং তৎকালে মাদলা পাঁজী অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য। আপনি মাদলা পাঁজীতে কি আছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া অথবা সেই অংশটির প্রতিলিপি করিয়া পাঠাইলে বিশেষ উপকৃত হইব। ঐ অংশে দেখিবেন, আপনি জানিতে পারিবেন যে, নরসিংহ দেবের পূর্ব্বে তথায় প্রাচীন মন্দির ছিল। নরসিংহ ঐ প্রাচীন ও ভগ্ন মন্দিরের পরিবর্ত্তে নূতন প্রস্তুত করেন।

বহিঃপ্রাচীরের ভিত্তি আমি দেখিয়াছিলাম কিন্তু তাহার বিস্তার নিরূপিত করিতে পারি নাই, স্থানে স্থানে চিহ্ন নাই, অপর স্থানে কর্ষিত হইয়াছে, সুতরাং সমস্ত প্রাচীরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ নিরূপিত হয় নাই। বোধ হয় আপনিও এ-বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই।...*

মানিকতলা শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

২২শে নভেম্বর

[* রাজেন্দ্রলালের চিঠি দু'টি 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র ৩য় খণ্ড থেকে উদ্ধৃত]

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বাংলা পত্রের প্রসঙ্গে লিখেছেন, "পুরী-স্কুলের হেড মাষ্টার ক্ষীরোদচন্দ্র রায়কে লিখিত রাজেন্দ্রলালের অনেকগুলি পত্র ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ সংখ্যা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রগুলি ১৮৭৮-৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত। 'উড়িষ্যার ইতিহাস গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ-উদ্দেশ্যে রাজেন্দ্রলাল এগুলি লিখিয়াছিলেন।' রাজেন্দ্রলালের পত্রাবলী নানা জ্ঞাতব্য ও আকর্ষণীয় তথ্যে পূর্ণ। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্রকে লেখা একটি ইংরেজী পত্রে তিনি তামাকের উল্লেখ কোন্ সংস্কৃত কাব্যে (কুলার্ণব তন্ত্রে) প্রথম করা হয়, কৃষি বিষয়ে সংস্কৃতে কি নিবদ্ধ আছে, স্মৃতি ও তন্ত্রে কৃষির নিয়মাবলী সমন্বিত যে দীর্ঘ আলোচনা আছে, সেই সব তথ্য সরবরাহ করেছেন।

মধুসূদন দত্তের চিঠি

12, Ruedes Chantlers, Varsailles
France,—26th January, 1865.

প্রিয় গৌর,

তোমার প্রীতি ও হৃদ্যতাপূর্ণ পত্র পাইয়াছি। ইহা পুরানো দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বাবা ও আমি যদিও গুলবাঘের মত গোঁফ রাখিতাম—আমাদের মধ্যে এখনও সেই একই হৃৎপিণ্ড ধুক ধুক করিতেছে। প্রিয় বন্ধু, তাই নহে কি? তোমাকে অনুরোধ করি, যখনই কোন 'রাস্কেল' তোমার বন্ধুর সম্বন্ধে অসম্মানজনক কিছু বলিবে, নীরব ঘৃণার সহিত তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিও। আমি নির্বোধ নহি, পাগলও নহি—ইংলণ্ডে যেমন বলিয়া থাকে—'আগে জ্ঞান কোনটা কি।' য়ুরোপে আসিয়া আমার আচরণ, রুচি, ধারণা, এমন কি আকৃতিরও কতখানি পরিবর্তন হইয়াছে, তুমি কল্পনাই করিতে পারিবে না। বন্ধু, বোধ হইতেছে, সে দিন খুব দূরে নহে, যেদিন তুমি নিজেই তাহা বিচার করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইবে। আমি আর পূর্বের ন্যায় অসাবধান, অবিবেচক, আবেগময় নহি। তাহার পরিবর্তে আমি এখন একজন শ্মশ্রুমণ্ডিত পণ্ডিত ব্যক্তি—যে ছয়টি য়ুরোপীয় এবং অনেকগুলি এশীয় ভাষায় বন্ধুদের সহিত পত্র আদান-প্রদান করিতে পারে। তুমি ধারণাই করিতে পারিবে না আমার কেমন চমৎকার দাড়ি-গোঁফ গজাইয়াছে। শীঘ্রই আমার একটি ফটো পাঠাইয়া দিব। অবশ্য এখনো আমি তেমনই রোমাণ্টিক আছি, জানই ত ইহাই আমার স্বভাব। আমি একটু কবি-প্রকৃতির মানুষ এবং এই কল্পনাবৃত্তির আতিশয্য মানুষকে সাংসারিক জগতে অনুপযুক্ত করিয়া ফেলে। আমার মনে নানা স্বপ্ন, উচ্চাভিলাষ—দুর্জ্ঞেয় বাসনা। কিন্তু ক্রমশঃই আমি বিজ্ঞ হইয়া উঠিতেছি। এই আত্মপ্রচার ক্ষমা করিও। সোদর-প্রতিম পুরাতন বন্ধুর নিকট ব্যতীত আর কাহার নিকটই বা হৃদয়ের কথা খুলিয়া বলিব? লোকে আমার নিন্দা করিবে, আমার সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করিবে, বিশেষতঃ আমি যখন বহু দূরে, সেখান হইতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারিব না—ইহাতে আমার অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হয়। সত্য যেন মিথ্যাকে ভ্রূকুটির সহিত নির্বাক করিয়া দেয়। বন্ধু, যেমন উচিত তেমন ভাবেই এই কাপুরুষোচিত ঈর্ষার প্রতিবাদ করিও।

কবে দেশে ফিরিব জানিতে চাহিয়াছ? মাধব চ্যাটার্জী এবং দিগম্বর মিত্র কর্তৃক যদি নির্দয়ভাবে উপেক্ষিত না হইতাম, এই মাসেই আমি বারে যোগ দিতে পারিতাম। কিন্তু এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে হয়ত আমাকে এক বৎসর কিংবা তাহারও বেশি অপেক্ষা করিতে হইতে পারে।

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাকে হাত ধরিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও জানিতে পারিবে, আমার প্রতি কিরূপ জঘন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই ইহা লইয়া আমি আর আলোচনা করিতে চাহি না। মাসের পর মাস আমি ফ্রান্সে নোঙরবদ্ধ জাহাজের ন্যায় অচল হইয়া আছি; কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এত দুঃখের মধ্যেও ইতালীয়, জার্মাণ ও ফরাসীয় এই তিনটি প্রধান সাহিত্যসমৃদ্ধ এবং শিক্ষণীয় ভাষা শিখিবার মত মানসিক বল ও স্থৈর্য অটুট ছিল। জান গৌর, প্রধান য়ুরোপীয় ভাষায় জ্ঞানলাভ করিবার গৌরব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিশাল এবং সমৃদ্ধ রাজ্য জয়ের সমতুল্য। যদি প্রত্যাবর্তন-কাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে আশা রাখি, আমার শিক্ষিত বন্ধুদের মাতৃভাষার মধ্য দিয়া সেই সকল ভাষার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে পারিব। মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও অনুশীলন করিবার মত সাধনা আর কিছুই নাই। তোমার কি মনে হয়, ইংলণ্ড বা ফ্রান্স, জার্মাণী বা ইতালীয় এখন কবি ও প্রাবন্ধিকের প্রয়োজন? ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, মিল্টনের ন্যায় স্বদেশ এবং মাতৃভাষার জন্য কিছু করিবার মহৎ উচ্চাভিলাষ যেন আমাদের দেশের ধীমানদেরও উৎসাহিত করে। আমাদের মধ্যে যদি কেহ মৃত্যুর পর নাম রাখিয়া যাইতে উদ্‌গ্রীব হয় এবং পশুর মত বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইতে না চায়, তাহা হইলে তাঁহাকে মাতৃভাষার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার প্রকৃত অধিকারের ক্ষেত্র—যথার্থ উপাদান। য়ুরোপীয় সাহিত্যে পাণ্ডিত্য লাভ করা ভাল, ইহা আমাদিগকে পৃথিবীর সুসভ্য দেশের জ্ঞান-ভাণ্ডারের অধিকারী করিয়া তুলিবে, কিন্তু আমরা যখন বিশ্ববাসীর উদ্দেশে কিছু বলিব, তাহা যেন মাতৃভাষাতেই বলিতে পারি। যাঁহারা নিজেদের মৌন চিন্তার অধিকারী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যেন মাতৃভাষার শরণাপন্ন হন। যাঁহারা নিজেদের কৃষ্ণকায় মেকলে, কার্লাইল, থ্যাকারে বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের উদ্দেশে তোমার কাছে আমার এই ক্ষুদ্র বক্তৃতা। একথা জোর করিয়া বলিতে পারি, তাঁহারা সেরকম কিছুই নহেন। যে ব্যক্তির নিজের ভাষার উপর অধিকার নাই, তাঁহার শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত হইবার প্রবঞ্চনাকে আমি ধিক্কার দিই।

তোমার কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য দুঃখিত। আশঙ্কা হইতেছে, তোমার বাবা মায়ের ভ্রান্ত স্নেহ তাহাকে মানুষ হইতে দিবে না। অবশ্য একথা মনে করিও না যে, আমি তাঁহাদের মনোভাবের প্রতি তোমার পুত্রোচিত শ্রদ্ধাকে নিন্দা করিতেছি।

তুমি আবার ভগীরথের ঠিকানা দিয়া চিঠি লিখিয়াছ। এই ভগীরথ কি আমার জন্মভূমির নদীতীরস্থ ভগীরথ? সম্প্রতি আমি ইতালীয় কবি পেত্রার্কের কাব্য পাঠ করিতেছি এবং তাঁহার অনুকরণে কয়েকটি সনেটও লিখিয়াছি। সেগুলির মধ্যে একটি এই কপোতাক্ষ নদীকেই উদ্দেশ করিয়া লেখা। সেইটি এবং আরো একটি কবিতা তোমাকে পাঠাইলাম। আমার কয়েকজন য়ুরোপীয় বন্ধু দ্বিতীয়টির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, কবিতাটি তাঁহাদের অনুবাদ করিয়া দিতেছি। জোর করিয়া বলিতে পারি, তোমারও ভাল লাগিবে। অনুগ্রহ করিয়া সনেটগুলির প্রতিলিপি যতীন্দ্র এবং রাজনারায়ণকেও পাঠাইও এবং তাঁহাদের মতামত আমাকে জানাইও। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, সনেট অর্থাৎ "চতুর্দশপদী" কবিতা আমাদের ভাষাতেও সুন্দর হইবে। অদূর ভবিষ্যতে চতুর্দশপদী কবিতার একখানি গ্রন্থ রচনা করিব আশা আছে। আমি আর একটি কবিতা পাঠাইলাম, এইজন্য এইটুকু আত্মশ্লাঘা করিতে পারি যে, মৃত্যুর পর দিন হইতে আজ পর্যন্ত ভারতচন্দ্র রায় এমন মার্জিত প্রশংসা কখনই লাভ করেন নাই। তোমাদের জন্য নানা ভাবের কবিতা পাঠাইলাম। আমার ইচ্ছা যে, তুমি যতীন্দ্রকে এইগুলি

দেখাও, কারণ সে উত্তম বিচারক। কবিতার এই নূতন ষ্টাইল সম্বন্ধে তোমাদের সকলের মতামত আমাকে জানাইবে। প্রিয় বন্ধু, একথা বিশ্বাস করিও যে, আমাদের বাংলা অতি চমৎকার ভাষা—অভাব শুধু প্রতিভাবান পুরুষের—যিনি এই ভাষাকে মার্জিত করিয়া তুলিবেন। আমাদের মত যাহারা শৈশবের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার জন্য এই ভাষা অল্পই জানি এবং ইহাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি, তাহারা বিষম ভ্রান্ত। ইহাই কিংবা ইহার মধ্যে মহত্তী ভাষার উপাদান আছে। আমার আন্তরিক ইচ্ছা, বাংলা ভাষার চর্চায় আত্মনিয়োগ করি; কিন্তু তুমি ত জান সাহিত্যিক জীবন যাপন করিবার মত সঙ্গতি আমার নাই এবং জীবিকা নির্বাহের উপযোগী প্রকৃত কাজের মত আমি কিছুই করি না। আমি অতি দরিদ্র, হয়ত এত গর্বিত যে চিরদিন দরিদ্র থাকিতে চাহি না। আমাদের দেশে অর্থ ছাড়া সম্মান পাইবার কোন উপায় নাই। তোমার অর্থ থাকিলেই তুমি বড়মানুষ, যদি না থাকে কেহই তোমাকে আমল দিবে না। জাতি হিসাবে আমরা আজও নিকৃষ্ট। আমাদের মধ্যে কাহারা বড়মানুষ? চোরবাগান আর বড়বাজারের 'কেউ নয়'-রা? রোজগার করিও বন্ধু, টাকা রোজগার করিও। যদি আমার প্রতিভা থাকে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে কিছু না করিয়া থাকি, সে আমার প্রতিভা বিকাশের পক্ষে পূর্ণ আর্থিক সঙ্গতিরই অভাবে, এবং আমি যতটুকু করিতে পারিয়াছি, দেশকে তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

যাক্, বিষয়ান্তরে আসা যাক্। আইন শিক্ষার জন্য যদি সত্য সত্যই এবং গভীরভাবে য়ুরোপে আসিবার সঙ্কল্প করিয়া থাক, আট হইতে দশ হাজার টাকার মধ্যেই সব সঙ্কুলান হইবে। অবশ্য যদি সব কিছু তোমার উপরেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তুমি পারিবে না। কিন্তু আশা করি, আমি তোমার অনেক উপকার করিতে পারিব। তুমি সত্যই আগ্রহান্বিত, এ কথা জানাইলে আমি তোমাকে দীর্ঘ পত্র পাঠাইব। তাহা যে কোন গাইডের চেয়ে মূল্যবান হইবে।

প্রতি ডাকে তোমাকে চিঠি লিখিতে বলিয়াছ। কিন্তু বন্ধু, তাহা করিলে আমাকে প্রতি মাসে কমপক্ষে চারখানি চিঠি লিখিতে হইবে, ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? আমি অলস নহি, তাহা ছাড়া কি সংবাদই বা তোমায় পাঠাইব? যাহা হউক, পুরাতন বন্ধুকে আমি একেবারে বিস্মৃত হইব না, মাঝে মাঝে তাহাকে সম্বোধন করিব।

আমাদের পুরাতন বন্ধুদের সকলকে আমার কথা মনে করাইয়া দিবে আর আমার কার্যকলাপের কথা বলিবে।

রাজেন্দ্রের পুত্রের জন্ম উপলক্ষে তাঁহাকে আমার অভিনন্দন জানাইতেছি। ছোট ছেলেটি যেন তাহার বাবার মত বড় হইয়া উঠে। তোমার পরের চিঠিতে কোচবিহারের হতভাগ্য মহারাজা ও ত্রৈলোক্যমোহন ঠাকুরের সংবাদ চাই। ত্রৈলোক্যমোহন ঠাকুরের সাত বছর দ্বীপান্তর হইয়াছে শুনিয়াছি। তাঁহার হতভাগিনী মায়ের জন্য দুঃখ হইতেছে। হয়ত সেই হতভাগিনী এতদিনে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মিসেস ডি ও ছোটরা ভালই আছে। আগামী এপ্রিলে লণ্ডনে ফিরিব আশা করি। কাজেই আগের ঠিকানাতেই পূর্বের মত চিঠি লিখিও। ইতি—

তোমার চিরানুরক্ত
মাইকেল এম এস দত্ত

[নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত ইংরেজী চিঠির অনুবাদ]

গৌরদাস বসাককে লেখা মধুসূদনের এই চিঠি থেকে শুধু তাঁর ফ্রান্স প্রবাসের কথাই নয়, তাঁর চিন্তাধারা এবং আদর্শের পরিবর্তনের কথাও জানা যায়। যিনি প্রথম বয়স থেকেই ইংরেজী সাহিত্যে মহাকবি হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বিভোর থাকতেন এবং ইংলণ্ড যেতে না পারলে জীবন ব্যর্থ বলে মনে করতেন, তিনিই পরে মাতৃভাষার প্রতি কতখানি অনুরক্ত হ'ন, এই চিঠিতেই তার সুন্দর এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই চিঠিতে মধুসূদন বিপ্লবী ত্রৈলোক্যমোহন চক্রবর্তী সম্পর্কে যে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, তাও লক্ষণীয়। রাজেন্দ্র এবং যতীন্দ্র হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চিঠি

২৮শে মার্চ, ১৮৭২
চুচুঁড়া

পরমপ্রণয়াস্পদ

শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয় মহোদয়েষু—

ভাই,

তুমি স্বপ্রণীত হেক্টর-বধ কাব্য গ্রন্থে আমার নামোল্লেখ করিয়া আমাদিগের পরস্পর সতীর্থ সম্বন্ধের এবং বাল্য প্রণয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছ, আমি কখনই সে সম্বন্ধ এবং সেই প্রণয় বিস্মৃত হই নাই, হইতেও পারি না। যৌবনসুলভ প্রবলতর আশা প্রণোদিত হইয়া মনে মনে যে সকল উন্নত অভিপ্রায় সঞ্চিত করিতাম, তোমার দৃষ্টান্তই তৎ-সমুদয়ের উত্তেজক হইত। তোমার যৌবনকালের ভাব আমার জীবনের একটি মুখ্যতম অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। তখন আমাদিগের পরস্পর কত কথাই হইত—কত পরামর্শ হইত,—কত বিচার ও কত বিতণ্ডাই হইত। এখনও কি তোমার সে সকল কথা মনে পড়ে? তুমি বিজাতীয় প্রণালীর কিছু অধিক পক্ষপাতী ছিলে, আমি স্বজাতীয় প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। এই মতভেদ নিবন্ধন আমার যে যন্ত্রণা হইত, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? আহা! তখন কি একবারও মনে করিতে পারিতাম যে, তুমি বিজাতীয় মহাকবিগণের সমস্ত রত্ন আহরণ করিয়া মাতৃভাষার শোভা সম্বর্দ্ধনপূর্ব্বক বাঙ্গালার অদ্বিতীয় মহাকবি হইবে? সেই সময়ে তুমি যে সকল সুন্দর ইংরাজী পদ্য রচনা করিতে, তাহা পাঠ করিয়া আমার পরম আনন্দ হইত। আমি তখন হইতে জানিতাম যে, তুমি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু সেই কাব্য মেঘনাদ বধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা অথবা হেক্টর বধ হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। তুমি ইংরাজীতে কোন উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়া ইংরাজ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমি মনে করিতাম। ফলতঃ তোমার শক্তির প্রকৃত গরিমা তখন অপ্রকাশিত এবং আমার বোধাতীত ছিল। তুমি ম্রিয়মাণ মাতৃভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিলে, তুমি ইহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিলে। তাই তোমার এই বিজাতীয় ভাষা অধ্যয়নের পরিশ্রম সার্থক, তোমার এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ সার্থক।

কোন বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজী ভাষায় উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা যদি সঙ্গত হইতে পারে, তাহা তোমার পক্ষেই সঙ্গত হয়। তুমি

অল্প বয়সেই ইংরাজী ভাষায় মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছিলে, যৌবনাবধি ইংরাজদিগের সহবাস করিতেছ, বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষার মূল ভাবা সমস্তের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মিয়াছে। ফলতঃ তোমার প্রণীত যে কয়খানি ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ আছে, তত্তুল্য ইংরাজী গ্রন্থ বোধ হয় কোন বাঙ্গালী কর্তৃক বিরচিত হয় নাই। কিন্তু তোমার সেই গ্রন্থ আর তোমার মেঘনাদ বধ প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থে কত অন্তর। তোমার বাঙ্গালা কাব্যগুলি তোমাকে এতদ্দেশীয় শিক্ষিত দলের মুখস্বরূপ, তাহাদিগের গৌরবস্বরূপ, এবং তাহাদিগের পথপ্রদর্শক-স্বরূপ করিয়া স্থাপন করিয়াছে।

অধিক কি লিখিব? তোমার শরীর নিরাময়, তোমার মন স্বচ্ছন্দ, তোমার সাংসারিক শ্রী বর্দ্ধনশীল এবং তোমার কবিত্বশক্তি চিরপ্রভাবশালিনী থাকুক, এই আমার প্রার্থনা।

তদীয় শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়

[নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধু-স্মৃতি' থেকে উদ্ধৃত]

মধুসূদন তাঁর হেক্টর-বধ কাব্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। সেই উৎসর্গ-পত্র পড়ে ভূদেব এই চিঠিখানি লেখেন।

রাজনারায়ণ বসুর চিঠি

১

দেওঘর, ৪ আষাঢ়, ১২৯০

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারস্বত-সমাজ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত 'ভৌগোলিক-পরিভাষা' বিষয়ক মুদ্রিত প্রস্তাব পাইয়াছি। ব্যবহার উন্মত্ত মাতঙ্গ; তাহা অঙ্কুশ মানে না, ব্যাকরণ ও শব্দশাস্ত্র বসিয়া বসিয়া নিয়ম করেন; সে তাহা না মানিয়া হাস্যকরত প্রচণ্ড বেগে চলিয়া যায়। বিদ্যারূপ দেশের লোক সাধারণতন্ত্রের লোক; কেহ কাহারও কথা শুনে না। তাহাদিগকে বশে আনা মুস্কিল। "Irritabile vates trition" আমার অনুরোধ এই আমাদিগের সমাজকে ব্যবহারের নিকট অপমানিত না হইতে হয়। যে সকল পারিভাষিক শব্দ চলিয়া গিয়াছে তাহার প্রতি হস্তার্পণ করা উচিত নহে, যথা উপদ্বীপ, প্রণালী, যোজক, অম্লজান, উদজান প্রভৃতি, যেহেতু তাহার প্রতি হস্তার্পণ করিলে কেহ শুনিবে না। যে সকল অপপ্রয়োগ ভাষায় সবে ঢুকিতেছে অর্থাৎ দুই-তিনখানি বহিতে সবে মুখ বাহির করিয়াছে, তাহার প্রতি ক্ষমতা চালানো কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত যে সকল ইংরাজী বৈজ্ঞানিক শব্দ আমাদিগের ভাষায় ঢুকে নাই কিন্তু পরে ঢুকিবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিশব্দের অভিধান এই বেলা করিয়া রাখিলে ভাল হয়, তদ্দ্বারা ভাবী গ্রন্থ-কর্ত্তাদিগের বিশেষ উপকার হইবে। আপনার প্রেরিত প্রস্তাবটিতে যে সকল নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে কোন সুবোধ ব্যক্তি কিছুমাত্র আপত্তি করিতে পারে না—সেগুলি এত পরিপাটী হইয়াছে। কিন্তু তাহা অত্যন্ত প্রচলিত শব্দের প্রতি না খাটাইয়া অল্পপ্রকার শব্দের প্রতি খাটাইলে ভাল হয়। যখন ব্যবহার দাঁড়াইয়াছে তখন আমরা কি করিব? এ বিষয়ে আমাদিগের হাত-পা বাঁধা। কোন কোন শব্দ উপযুক্ত নহে, তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কি করা যাইবে? English Channel একটি উপসাগরের নাম; Channel শব্দে কেবলমাত্র জল যাইবার রাস্তা বুঝায়, তাহা এরূপ উপসাগরের প্রতি কখনও খাটিতে পারে না। কিন্তু কি করা যায়? তাহা ইংরাজীতে পারিভাষিক হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর উপায় নাই। সেইরূপ যোজক প্রভৃতি শব্দ জানিবেন। যোজক শব্দের পরিবর্ত্তে এখন "স্থলসঙ্কট" ব্যবহার করিতে গেলে লোক বিদ্যাড়ম্বরসূচক (pedantic) মনে করিবে।

ইতি—

বশংবদ

রাজনারায়ণ

পুনশ্চ—উপরে যে নূতন বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধানের উল্লেখ আছে, তাহাতে ইংরাজী Grammar, Rhetoric, Philosophy Painting, Architecture, Logic প্রভৃতি শব্দও থাকিবে ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। Passion, Emotion শব্দে বাঙ্গালায় অদ্যাপি উপযুক্ত প্রতিশব্দ হয় নাই। উহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ হইলে ভাল হয়।

২

মান্যশ্রেষ্ঠ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর বঙ্গ-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

অদ্য Bengal Academy of Literature পত্রিকার পঞ্চ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে দেখিলাম লিওটার্ড সাহেব পরিষদে কার্য্য বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য—আমার এই মত খণ্ড করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যদি বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত রূপ উন্নতি সাধন করিতে চাহেন এবং তাহাই পরিষদের উদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য তাহা হইলে সেই মত ঘোষণা করা কর্ত্তব্য যে, কোন গবর্ণমেণ্ট কোন বিশেষ ইংরাজের সহিত কথোপকথন অথবা পত্র লিখিবার সময় ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করা উচিত আর অন্য কোন উপলক্ষে ইংরাজী ভাষায় কথা কহা অথবা লেখা উচিত নহে। আমি ইহা দ্বারা ইংরাজী শিক্ষা অথবা ইংরাজী সাহিত্য পাঠের, ইংরাজীতে সংবাদপত্র সম্পাদনে আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছি না, তাহা আপনারা অনায়াসে প্রতীতি করিবেন। কেবল বাঙ্গালা ভাষায় পরিষদের কার্য্য সম্পাদিত হইবে—এই নিয়ম করিলে আপাততঃ কতকগুলি সভ্য ছাড়িয়া যাইবে বটে কিন্তু ক্রমে ক্ষতিপূরণ হইবে, এবং এক্ষণে যাঁহারা কেবল ইংরাজীতে প্রবন্ধ লিখিতে বা বক্তৃতা করিতে পারেন, বাঙ্গালা পারেন না, তাঁহারা বাঙ্গালায় লিখিতে অথবা বক্তৃতা করিতে চেষ্টা করিবেন। বঙ্গ পরিষদের কার্য্য বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোন দেশ সম্বন্ধীয় নহে, অতএব উহার কার্য্য কেবল বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত হইবে না কেন বুঝিতে পারি না। যদি সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিবার কাহারও ইচ্ছা থাকে, তবে মাতৃভাষা অনুশীলন না করিলে সে খ্যাতি লোভনীয় নহে। অধিক লেখা বাহুল্য।*

বশংবদ

রাজনারায়ণ বসু

[* ঋষি রাজনারায়ণের চিঠি দু'টি 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র চতুর্থ খণ্ড থেকে উদ্ধৃত]

উনিশ শতকের অষ্টম দশকে কলিকাতা "সারস্বত সম্মিলন বা সমাজ" বাংলা পরিভাষা রচনার কাজে হস্তক্ষেপ করেন

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমাজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার সভাপতি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতর সম্পাদক ছিলেন। ভৌগোলিক নামের পরিভাষা রচনা করে সমাজ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণ বসু সেই পুস্তিকাটি দেখে এই পত্রটি লেখেন।

দ্বিতীয় পত্রখানি "বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার" এর সভাপতির উদ্দেশে লেখা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রথমে এই নামে অভিহিত হ'ত। এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ (২৩শে জুলাই ১৮৯৩)। সভার কার্য বিবরণ ও প্রবন্ধ প্রভৃতি ইংরেজীতে লেখা হ'ত। রাজনারায়ণ বসু সভার কাজ বাংলায় সম্পাদন করার অনুরোধ জানিয়ে এই পত্র পাঠান।

গৌরদাস বসাকের চিঠি

কলিকাতা, খিদিরপুর
১লা ডিসেম্বর, ১৮৫৫

প্রিয় মধু,

অনেক বৎসর পর তোমায় চিঠি লিখিতেছি। দুইজনের মধ্যে এই সুদীর্ঘ নীরবতা আমাদের উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত গুরুতর এবং অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বলিয়া মনে করি। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, কতবার আমি তোমার কথা ভাবিয়াছি। আমার সেই চিন্তা নীরবতায় সমাধিস্থ হইয়াছে, মুক্তির পথ পায় নাই। কারণ আমি তোমার ঠিকানা জানিতাম না এবং তুমি কোথায় ও কি ভাবে আছ তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। প্রত্যেকের নিকট তোমার সংবাদ লইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছি। তুমি কোথায় থাক এবং কি কর, কেহই বলিতে পারে নাই। অবশেষে এই ভদ্রলোক আমার এই ক্ষুদ্র পত্রটি তোমার নিকট পৌছাইয়া দিবার দায়িত্ব লইয়া আমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। কিভাবে ব্যাপারটি ঘটিয়াছে তাহা ইঁহার নিকট শুনিও এবং ইনি যে তোমার জন্য কষ্ট স্বীকার করিলেন, সেজন্য ইঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইও।

চিঠির ঠিকানা ও তারিখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিবে, যে স্থান হইতে আমি চিঠি লিখিতেছি, সেই স্থানেই তোমায় শৈশব এবং বাল্য—না, বরং বলা উচিত তোমার যৌবনের শ্রেষ্ঠতম অংশ অতিবাহিত হইয়াছে। আমি কোথা হইতে এবং কি জন্য এখানে আসিয়াছি, তাহা এই চিঠির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তোমায় জানাইতে চাহি না। ইহার পূর্বে এইভাবেই তোমায় চিঠি লিখিতে পারিতাম কিন্তু আমার উদাসীনতা এবং নিষ্ক্রিয়তার জন্য আমিই দায়ী। তুমি হয়ত মনে করিবে বিস্মৃতির জন্য কিন্তু তাহা নহে, তোমার ঠিকানা না জানিবার জন্যই এইরূপ হইয়াছিল। কোন দিনই আমি তোমায় ভুলিতে পারি না, কারণ তোমার প্রতি চিরদিনই আমার গভীর ভালবাসা রহিয়াছে। সেই ভালবাসা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তাহার উজ্জ্বল্য নাই বটে কিন্তু অগ্নি এখনও জাজ্বল্যমান। আবার সেই অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া তোল, তাহা হইলে দেখিবে সময় ও দূরত্ব তোমাকে তোমার ঘরবাড়ি, পরিবার, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং আমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলেও প্রীতির উত্তাপে সেই অগ্নিশিখা দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিবে। আমার অজুহাত ক্ষীণ হইলেও যুক্তিযুক্ত, কিন্তু তুমিও নিজেকে দোষমুক্ত বলিতে পার না। নিজেকে তুমি যতখানি জান, ঠিক ততখানি আমাকে এবং আমার ঘরবাড়ি, আত্মীয়স্বজন সব কিছুকে। ইচ্ছা করিলেই যে কোন মুহূর্তে তুমি আমায় চিঠি লিখিতে পারিতে কিন্তু তাহা তুমি কর নাই। আমি মৃত না জীবিত তাহাও কখনও জানিবার চেষ্টাও কর নাই। কিন্তু এখন আর দোষারোপের সময় নাই, অতীত অতীতই। এবং আজ যখন আমরা পরস্পরকে কল্পনার আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে যাইতেছি তখন ঝগড়া বিবাদ করিয়া লাভ নাই। আজ আমার অন্তঃকরণ পূর্ণ এবং মন ভাবাবেগে অভিভূত। আশা করি, এই পৃথিবীতেই আবার আমরা মিলিতে পারিব। এখনও সব শেষ হয় নাই। তাহাই যেন হয়। ঈশ্বর করুন যেন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে।

তোমার মুখের কথা শুনিবার প্রত্যাশায় আমি যে তীব্র উদ্বেগ এবং যন্ত্রণাদায়ক অস্থিরতা ভোগ করিতেছি তাহা আমি তোমার নিকট ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। তোমার স্বাস্থ্য এবং সুখের আনন্দদায়ক সংবাদ হইতে বঞ্চিত করিয়া আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিবে না বলিয়াই বিশ্বাস করি। আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী স্বর্গগতা হইয়াছেন। তাঁহার আত্মার শান্তি হউক!

বড়ই দুঃখিত যে, তোমার অর্থাৎ তোমার পিতার পরিবারের কোন সুসংবাদই তোমাকে দিতে পারিলাম না। তুমি বহু পূর্বেই হয়ত শুনিয়াছ যে, তোমার পিতা-মাতা উভয়েই মারা গিয়াছেন এবং তোমার খুল্লতাতের পুত্রগণ তাঁহাদের সম্পত্তি লইয়া মারামারি করিতেছে। তোমার দুই বিমাতা এখনো জীবিত কিন্তু তোমার লোভী ও স্বার্থপর আত্মীয়েরা তোমার পিতার সম্পত্তি হইতে তাঁহাদের প্রায় বঞ্চিত করিয়া ফেলিয়াছে। সময় থাকিতে ফিরিয়া আসিলে সকল বে-আইনী দাবীদারদের ব্যর্থ করিয়া তুমিই তোমাদের জমিদারীর মালিক হইতে পার এবং সর্বনাশা মামলা হইতে পরিবারকে রক্ষা করিতে পার। তুমি কি আসিবে? বর্তমানে তুমি কি কর? আশাকরি তোমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিবার অধিকার আমার আছে এবং তুমিও উত্তর দিতে দেরী করিবে না। তোমার নিকটেই শুনিয়াছিলাম, তুমি বিবাহ করিয়াছ। ক্রমবর্ধমান এবং আনন্দপূর্ণ সাংসারিক পরিবেশে সুখেই আছ, আশাকরি!

তোমারই একান্ত—
গৌরদাস বসাক

[নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি'তে উদ্ধৃত ইংরেজী চিঠির অনুবাদ]

গৌরদাস বসাকের এই চিঠির প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ সোম "মধুস্মৃতি"তে লিখেছেন—"১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী মধুসূদনের পিতা স্বর্গারোহণ করেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুসংবাদ কেহই তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন নাই। মধুসূদনের পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার সংসারে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল। মধুসূদনও ইহলোকে নাই, এই অলীক ধারণায় আত্মীয়েরা তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি হস্তগত করিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া, গৌরদাস তাঁহাকে সকল কথা জ্ঞাত করিবার একটি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রেভারেণ্ড কে, এম, ব্যানার্জী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজ ভ্রমণে যান; গৌরদাস এই সুযোগে মধুসূদনের পিতার মৃত্যু, বৈষয়িক বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি বিবৃত করিয়া...পত্রখানি 'কৃষ্ণ-বন্দ্যো'-র হস্তে প্রদান করিয়া মধুসূদন যেখানেই থাকুন, তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। "কৃষ্ণ-

মোহনও তাঁহার কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া প্রবাসী মধুসূদনকে দেশে ফিরাইয়া আনিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।"

গিরিশচন্দ্র ঘোষের চিঠি

কলিকাতা, ২রা আগষ্ট, ১৮৫৭

প্রিয়বরেষু,—

ক্রমেই গোলমাল পেকে উঠছে। আমাদের পথে পথে সৈন্য টহল দেবে, ভলান্টিয়ারদেরও খবর্দারির শেষ থাকবে না। আসচে মহরমকে ওরা বোমা বা শেল মনে করেছে। এই বোমা বা শেল যদি ফাটে, তাই ওদের দুশ্চিন্তার শেষ নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, বারাকপুরের সৈন্যদলের যখন হাতিয়ার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তখন এই আশঙ্কা ভিত্তিহীন। বডিগার্ডরা একটু চঞ্চল হলেও সংখ্যায় মাত্র দু'শ। আমাদের কর্ণেল গোল্ডী ছুটিতে ফতেপুর গিয়েছিলেন, সেখানে বেচারাকে মেরে ফেলেছে শুনতে পেলাম। সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহ'লে এক অমূল্য মিত্র হারালাম। শয়তান বিদ্রোহীদের উপর দশ হাজার বজ্রাঘাত হোক। একথা সত্যি কেউ বলতে পারে না, যারা প্রকৃত বিশ্বাসী সৈন্য, তারাও কত শীগগির তাদের উপরিওয়ালা অফিসারদের গুলী করবে এবং নির্দয় পাষণ্ডদের দলে ভিড়ে যাবে। আশা করি, তোমার ও ছোট ষ্টেশানে কোন ভয়ের কারণ নেই।

অনেক আয়োজন ও পাল্টা আয়োজনের পর আমাদের ঝুলন হচ্ছে। মনে হচ্ছে; বাবা এখানে কাকাকে লিখেছেন যে, উৎসবের সব খরচটা (আমাদের অংশ বাদে) তিনি গোপনে কাকার হাতে দেবেন। কাকার অবশ্য এতে কোন আপত্তি নেই। দেখ, তাহ'লে এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমাদের সব মতলব ফাঁসিয়ে দিলেন।... কাজেই বুঝতে পারছ, আইরিশ ক্যাপ্টেনের পিস্তলের সামনে দাঁড়িয়ে—"Night thoughts"-এর লেখক যেমন নাচ নেচেছিলেন, আমাদের আনন্দ প্রায় তেমনি দাঁড়াবে। কিন্তু আমি ও গ্রাহ্যই করিনে। আমার চণ্ডীর খুব জ্বর—মনে হচ্ছে, কার্তিক ঘোষের যাত্রা আর শুনতে পেলাম না।

তোমার গিরিশচন্দ্র ঘোষ

[শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত 'The life of Girish Chandra Ghose' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত ইংরেজী চিঠির অনুবাদ]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর ভাই শ্রীনাথ ঘোষকে এই চিঠি লেখেন। শ্রীনাথ ঘোষ সে সময় বালেশ্বর এবং ভদ্রকের ডেপুটি কালেক্টর। গিরিশচন্দ্র তাঁর ভাইকে যখন এই চিঠি লেখেন, সে সময় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদক।

এই চিঠিতে গিরিশচন্দ্র কর্ণেল গোল্ডীর মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন। কর্ণেল গোল্ডী সে সময় অডিটার জেনারেল। তিনি দেশীয় কর্মচারীদের ঘৃণা করতেন না, বরং তাদের শুভার্থী ছিলেন। কর্মদক্ষতাই ছিল তাঁর প্রশংসার মাপকাঠি। এই উদার-স্বভাব রাজপুরুষ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কানপুর বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হ'ন।

সিপাহী বিদ্রোহের সংবাদে কলিকাতার বিদেশী অধিবাসীরা যে কতদূর সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন, গিরিশচন্দ্রের এই চিঠিতে তার উল্লেখ আছে। বিদ্রোহীদের ভয়ে ইংরেজরা দেশীয় লোকেদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার জন্যে গবর্ণমেন্টকে চাপ দিতে থাকেন মুসলমানদের মহরম এসে পড়ায় তাঁরা আরও শঙ্কিত হয়ে ওঠেন সুপ্রীম কোর্টের গ্র্যাণ্ড জুরী তাঁর 'Power of Presentation' বলে গবর্ণর জেনারেলের কাছে এই মর্মে এক প্রস্তাব করেন যে, মহরমের আগেই যেন দেশীয় লোকেদের নিরস্ত্র করা হয়। গিরিশচন্দ্র এবং হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র এর বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা প্রকাশ করেন। তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংও সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। বিদ্রোহের সময় গিরিশচন্দ্র "হিন্দু পেট্রিয়টে" ভলান্টিয়ারদের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চিঠি

প্রিয় মহাশয়,

কবির স্বহস্তলিখিত তিলোত্তমা কাব্যের পাণ্ডুলিপিখানি উপহার পাইবার পর কি ভাবে ধন্যবাদ দিলে যথাযথ হইবে জানি না! আমি পরম যত্নে এটিকে আমার গ্রন্থাগারে রক্ষা করিব। কারণ ইহা আমাদের সাহিত্যে এক মহান যুগের স্মারক। এই পাণ্ডুলিপিখানিতেই সেই পরম ক্ষণটি বন্দী হইয়া আছে, যখন সর্বপ্রথম মিত্রাক্ষরের বন্দীদশা কাটাইয়া বাংলা কবিতা ঊর্দ্ধলোকে তাহার আপন মহান রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া গেল। একদা এই কাব্য তাহার যথাযথ মর্যাদা পাইবে এবং স্বমহিমাতেই আগামী যুগের রসিকচিত্তে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিবে। আমার স্থির বিশ্বাস যে, যদি আমার বংশধারা অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে একদা আমার বংশধরগণ এই কথা ভাবিয়া গর্ববোধ করিবে যে, তাহাদের মাতৃভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থের যে পাণ্ডুলিপিখানি সর্বাঙ্গে কবির আপন হস্তাক্ষর বহন করিতেছে—তাহা তাহাদেরই অধিকারে রহিয়াছে। সেই সঙ্গে তাহারাও তাহাদের এই পূর্বপুরুষকে এই কথা ভাবিয়া আরও সম্মান করিবে যে, এই ব্যক্তি এমনই ভাগ্যবান ছিলেন যে, কবি স্বয়ং তাঁহাকে এমনই অমূল্য একটি উপহার প্রদানের যোগ্য পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া অপরিমেয় রচনা-সম্পদে আমাদের মাতৃভূমির সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিতে থাকুন।

ইতি—

বশংবদ

জে এম ঠাকুর

২২ মে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ

মধুসূদন 'তিলোত্তমা' কাব্যের পাণ্ডুলিপি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উপহার দেন। এই পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ মধুসূদনের স্বহস্তে লেখা। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম গ্রন্থের সেই পাণ্ডুলিপি পেয়ে যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে যে চিঠি লেখেন, তার কিছু অংশ নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি'তে উদ্ধৃত হয়েছে। তার অনুবাদ এখানে দেওয়া হ'ল।

কেশবচন্দ্র সেনের চিঠি

দার্জিলিঙ,
৭ জুলাই ১৮৮২

ভক্তিভাজন মহর্ষি,

হিমালয় হইতে হিমালয়ে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পাঠাইতেছি, গ্রহণে কৃতার্থ করিবেন। আমি আপনার সেই পুরাতন ব্রহ্মানন্দ, সন্তান ও দাস। আপনি আমাকে অতি উচ্চ নাম দিয়াছিলেন। বহুমূল্য রত্ন 'ব্রহ্মানন্দ' নাম। যদি ব্রহ্মেতে আনন্দ হয় তদপেক্ষা অধিক ধন মানুষের ভাগ্যে আর কি হইতে পারে? ঐ নাম দিয়া আমাকে আপনি মহাধনে ধনী করিয়াছেন, বিপুল সম্পত্তিশালী করিয়াছেন। আপনার আশীর্ব্বাদে ব্রহ্মের সহবাসে অনেক সুখ এ জীবনে সম্ভোগ করিলাম। আরো আশীর্ব্বাদ করুন যেন আরও অধিক শান্তি ও আনন্দ তাহাতে লাভ করিতে পারি। ব্রহ্ম কি আনন্দময়; হরি কি সুধাময় পদার্থ! সে মুখ দেখিলে কি দুঃখ থাকে? প্রাণ যে আনন্দে প্লাবিত হয় এবং পৃথিবীতে স্বর্গসুখ ভোগ করে। ভারতবাসী সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন সকলেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারেন। আপনার মন তো ক্রমশঃ স্বর্গের দিকে উঠিতেছে, ভক্তমণ্ডলীকে সঙ্গে রাখিবেন, প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবেন, যেন সকলে আপনার সঙ্গে উঠিতে পারেন।* *

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

[অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রণীত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ ও কাজ নিয়ে দু'জনের মধ্যে এক সময় খানিকটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বরাবর কেশবচন্দ্রকে স্নেহ ও সম্মান করতেন। কেশবচন্দ্রর অন্তরেও তাঁর পবিত্র মর্যাদা রক্ষিত ছিল। এই চিঠির মধ্যে সেই শ্রদ্ধার ভাব ব্যক্ত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি

১

মহাত্মন্,—

ঘণ্টা ঠন্‌ঠনায়মান। গঙ্গাতীরে, ধীর সমীরে, বসতি সুখং দ্বিজনাথঃ। আপনার শরীরাদির ভাবগতি কিরূপ? একটু নিভৃত হইবার ইচ্ছা হয় কি? গাছগাছালির স্নিগ্ধ ছায়ায় ঠাণ্ডা হইবার ইচ্ছা হয় কি? বিস্তৃত এবং বক্রায়মান গঙ্গা দর্শনের ইচ্ছা হয় কি? যে গঙ্গায় নৌকা কখন কখন এমনি ভাবে অবস্থিতি করে যে, যেন এক প্রসারিত কুঞ্চিত রূপার পাতে কোন কারিগর নৌকাটিকে বসাইয়া রাখিয়াছে। যে গঙ্গা প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে, দ্বিপ্রহর কালে, রাত্রিকালে, অপরাহ্ণ কালে, সকল কালেই রমণীয়। যে গঙ্গার সমীরণে শরীর গতজ্বর হয়। যে গঙ্গার দর্শনে শরীরের পাপ ও নয়নের তাপ দূরীভূত হয়। যে গঙ্গা প্রশস্ত। যে গঙ্গা বিশালা। যে গঙ্গার তীরতরু অস্তগামী তপনদেবকে ঢাকিয়া রাখিতে গিয়া উজ্জ্বল হয়। এবম্ভূতা যে গঙ্গা, ইহা 'ব্রহ্মসাধন'কারীর মনকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে, ইহা যেন আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কিন্তু এই মানস প্রত্যক্ষ কবে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে পরিণত হইবে, ইহাই একণে জিজ্ঞাস্য। —শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

২

দীন দ্বিজের রাজ-দর্শন না ঘটিবার কারণ।
টঙ্কাদেবী কর যদি কৃপা
না রহে কোন জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই কিছু না
খালি ভস্মে ঘি ঢালা।
ইচ্ছা সম্যক তব দরশনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্‌লী মন উড়ু উড়ু
একি দৈবের শাস্তি।

শান্তিনিকেতন ১৭ ফাল্গুন

৩

প্রীতিভাজনেষু,—

আপনার দ্বিতীয় পত্র এইমাত্র পাইলাম। আপনাকে ইহা বলা বাহুল্য যে, বিবাহের পাত্রনির্ব্বাচনের কষ্টিপাথর—প্রেম, জহুরীজ্ঞান। দুয়ের যোগ মণিকাঞ্চনের যোগ। যে বিবাহ প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং জ্ঞান দ্বারা অনুমোদিত, তাহা সর্ব্বথা অনুষ্ঠাতব্য। আইন রক্ষার্থে যাহা আবশ্যক তাহা দেশকালপাত্র-বিবেচনা-মতে অনুষ্ঠাতব্য। কিন্তু এটাও দেখা উচিত যে, আইন যদি বর'কে জোর করিয়া বলাইতে চায় "আমি হিন্দু নহি", তবে আইনের সেই বলগর্ব্বিত কথার জোয়ালে ঘাড় পাতিয়া দেওয়া অধম নীচত্বের চিহ্ন। বিবাহের ন্যায় অত বড় একটা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অমন ধারা একটা কাপুরুষোচিত নীচত্ব স্বীকার করা বরের পক্ষে কোন ক্রমেই শোভা পায় না—ব্যথার ব্যথী শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এই পত্রগুলি 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' ষষ্ঠ খণ্ড থেকে উদ্ধৃত]

[আজকের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইটালী নয়। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত আর সংস্কৃতির পীঠস্থান, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইটালীর ভিনিশ শহরে জন্মগ্রহণ করেন ক্যাসানোভা. ইং ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তারিখে। এই বিখ্যাত ব্যক্তির স্মৃতিকথা পৃথিবীর সাহিত্যে বিশেষ এক স্থান দখল ক'রে আছে, যদিও একদা দেশে দেশে ক্যাসানোভার স্মৃতিকথাকে অশ্লীল-সাহিত্যরূপে গণ্য করা হয়। ১৮শ শতাব্দী যেন স্মৃতিকথার যুগ! রেষ্টিফ দ্য লা ব্রেটোন, রুশো, মাদাম রোলাও; ডুক্লশ এবং হ্যামিল্টন প্রভৃতি বিখ্যাতদের আত্মস্মৃতি এই সময়েই লিখিত হয়। ক্যাসানোভার জীবনও খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। ত্যাগ নয়, ভোগ! পানপাত্রের শেষ বিন্দুটুকু পর্য্যন্ত পান করাই ক্যাসানোভার আদর্শ। একের পর এক নারীর সাহচর্য্য পাওয়ার মধ্যেই ক্যাসানোভার ভোগের তৃপ্তি। পৃথিবীর বহু দেশে তিনি ঘুরেছিলেন। যথা, রোম, টুরিন, নেপলশ, জেনোয়া, ত্রিয়েষ্ট, করফু, কনষ্টানটিনোপল, লণ্ডন, প্যারিশ, মাড্রিদ, পিটার্সবার্গ, বের্লিন, ভিয়েনা এবং ওয়ারশ। বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। যেমন, ফ্রেডারিক (২য়); ক্যাথারিণ দি গ্রেট; পোপ বেনিডিক্ট (১৪শ); জর্জ (৩য়); মার্কুই ডো পম্পাডোর প্রভৃতি। ভবিষ্যতের বহু সাহিত্যিক ক্যাসানোভার ভক্ত হয়েছিলেন। ষ্টিফান জুইগ তন্মধ্যে অন্যতম। ক্যাসানোভার স্মৃতিকথার অংশবিশেষকে বাতিল করায় তিনি ঘোর আপত্তি জানিয়েছিলেন। পৃথিবীখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক হ্যাভেলক এলিশ এই স্মৃতিকথাকে অশ্লীল সাহিত্য হিসাবে ধার্য্য করতে পারেন নি। এলিশ বলেছেন: "Casanova has been described as a psychological type of instability. That is to view him superficially....Casanova chose to live. A crude and barbarous choice it seems to us." ক্যাসানোভা নিজে ব'লেছিলেন তাঁর আত্মস্মৃতি প্রসঙ্গে: "My story is that of a bachelor whose chief business in life was to cultivate the pleasures of the senses." ইন্দ্রিয়াসক্ত ক্যাসানোভার অভিজ্ঞতা ছিল বহুবিধ—ভবিষ্যতের নরনারীর কাছে যাদের মূল্য খুবই কার্য্যকরী হ'য়েছে। হ্যাভেলক এলিশ আরও বলেছেন: "He sought his pleasure in the pleasure, and not in the complaisance of the women he loved, and they seemed to have gratefully and tenderly recognized his skill in the art of love making. Casanova loved many women."... আনন্দের মধ্যে আনন্দ পাওয়ার ভয়লেশহীন আত্ম-বিবরণের এই বিখ্যাত স্মৃতিকথা এ যাবৎ বাংলা ভাষায় অপ্রকাশিত ছিল। মাসিক বসুমতীর প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক-পাঠিকাদের জন্য এই আত্মস্মৃতি বর্তমান সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে।—সম্পাদক]

প্রথম অধ্যায়

বেটিনা—বেটিনা—হাস্যমুখরা লীলাচঞ্চল কিশোরী।

ওকে ঘিরেই সেদিনের সেই অপরিণত কিশোরটির মনে প্রথম স্বপ্ন নেমে এসেছিলো—জেগে উঠেছিলো সুপ্ত অনুভূতি—কামনার রক্ত গোলাপের স্পর্শে—তার পাপড়ির পেলবতায়—তার কাঁটার তীব্র ঝঙ্কারে।

স্মৃতির পটে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে—বেটিনার খুশিভরা দু'টি চোখ—ভোরের আলোর সঙ্গে ঘরে এসে ঢোকে. আমার ঘুম ভাঙার আগেই। সুরু হয় আমার চুলের পরিচর্য্যা—কি ভালোই না বাসে আমার চুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে! শুধু তাই? আমার মুখ হাত ধুইয়ে চুল আঁচড়ে দেবে—সাজিয়ে গুজিয়ে আদরে আদরে ভরে তুলেও যেন আশ মেটে না ওর। কিন্তু—সেদিনের সেই কিশোরটি সহজ হতে পারতো না কিছুতেই ওর ওই নির্দোষ আদরের অত্যাচারে—কি এক অদ্ভুত অস্বস্তি আর উত্তেজনায় ভরে উঠতো ওর দেহ মন।

* * *

ধীরে ধীরে সরে যায় বিস্মৃতির যবনিকা। পিছনের পটভূমি মিশে গেছে নিকষ কালো অন্ধকারে—একটি আলোর বিন্দুও দেখা যায় না। শুধু পাদপ্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—বছর আষ্টেকের একটি ছেলে—রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর মুখ।

* * *

ভয়ে, যন্ত্রণায় বিহ্বল হয়ে দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে আছি, নাক থেকে অজস্র ধারায় রক্ত ঝরে ঘরের মেঝে ভেসে যাচ্ছে। বুড়ী দিদিমা মার্জিয়া ফারুসী কাঁপা কাঁপা হাতে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিচ্ছে চোখে মুখে। কিন্তু কিছুতেই বন্ধ করা গেল না রক্ত ঝরা। শেষে আমাকে নিয়ে দিদিমা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো। একটা গণ্ডোলাতে চড়িয়ে নিয়ে এলো মুরানাতে। মুরানা হলো ভেনিসের খুব কাছেই ছোট্টো একটা দ্বীপের মতো ওখানে নেমে একটু হাঁটবার পরই পৌছলাম—একটা ভাঙা কুঁড়েঘরের সামনে। টুলের উপর একটা বুড়ী বসেছিলো কালো রঙের একটা বিড়াল কোলে নিয়ে—চার পাশে আরও অনেকগুলো বিড়াল। বুড়ীকে দেখেই আমার ধারণা হোলো নিশ্চয়ই ও একটা ডাইনী। দিদিমা চাপা গলায় ওর সঙ্গে কি সব

কথাবার্তা বলে ওর হাতে একটি রূপার টাকা গুঁজে দিলেন। তখন বুড়ী আমাকে ঘরের ভিতর ডেকে নিয়ে গেল—অনেক সাহস আর আশ্বাস দিলে, আমার অসুখ নিশ্চয়ই সারিয়ে দেবে। ছোটো নীচু খুপরীর মত ঘর—আমাকে শুইয়ে ফেলে বুড়ী সুরু করলে ওর ঝাড়ফুঁক তুকতাক আরও কত অদ্ভুত রকমের প্রক্রিয়া। আর বার বার আমাকে সাবধান করতে লাগলো যা দেখছি, শুনছি, এসব যেন কখনও কারো কাছে না বলি, তাহলে অসুখ তো সারবেই না—রক্ত ঝরে ঝরে মরেই যেতে পারি একেবারে। যাই হোক, বাড়ী ফিরে অসীম ক্লান্তি আর দুর্বলতায় বিছানায় শুতে না শুতে ঘুমে ঢুলে পড়লাম। ভোরবেলা আমাকে কাপড় জামা পরাতে এসে দিদিমার মুখেও সেই একই কথা, কালকের কথা যেন কারো কাছে না বলি, তাহলেই কপালে অনেক শাস্তিভোগ আছে। ভয় দেখানোর প্রয়োজন ছিল না—এমনিতেই দিদিমার কথা না শোনার মত সাহস তখন আমার মোটেই ছিল না। কেমন যেন বোকাটে, গোবেচারা, ভালোমানুষ ধরণের ছিলাম—সবাই দূর থেকে করুণাই করতো, কাছে এসে মিশতে চাইতো না।

কিন্তু মাঝে মাঝে সেই বোকাটে মাথাতেও দুষ্টুবুদ্ধি খেলে যেতো। বাবার টেবিলে রাখা বড় একখণ্ড স্ফটিকের উপর আমার ভারী লোভ ছিলো। বাবার ভারী সখের জিনিষ সেটি। একদিন বাবার ঘুমের সুযোগে ওটি পকেটস্থ করলাম। ঘুম থেকে উঠে সেটি না দেখে বাবা খোঁজ করতে করতে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন। ছোটো ভাই ফ্রাঁসোয়ার দেখাদেখি আমিও বললাম, জানি না। কিন্তু বাবার সন্দেহ আমাদেরই উপর। তল্লাসীর ফাঁকে কান্না করে সেটি ফ্রাঁসোয়ার পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম—বেচারা টেরও পেল না—অথচ ধরা পড়ার ফলে যথেষ্ট মার খেলো। কিন্তু কী যে দুর্বুদ্ধি আমার! কয়েকবছর পরে নিজেই ফ্রাঁসোয়ার কাছে একদিন বলে ফেলি সেই হাত সাফাইয়ের কাহিনী—আশ্চর্য্য! সেই থেকে আজও ফ্রাঁসোয়া আমাকে ক্ষমা করেনি, সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ নিয়েছে।

এর কিছুদিন পরই বাবার মৃত্যু হয়, মাত্র ৩৬ বছর বয়সে। মা বাবার সঙ্গ জীবনে নিবিড় ভাবে কোনো দিনই পেলাম না। এক বছর বয়স থেকেই দিদিমার কাছে আমাকে রেখে ওঁরা থাকতেন লণ্ডনে। দু'জনারই পেশা ছিলো অভিনয়। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর মা ছেড়ে দিলেন অভিনেত্রী-জীবন—ফিরিয়ে দিলেন রূপমুগ্ধ অসংখ্য পাণিপ্রার্থীকে। মায়ের সঞ্চিত অর্থে আমার শিক্ষা সুরু হোলো।

পিতৃবন্ধু, অভিভাবক আবে গ্রিমানী আর মা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন পাডুয়াতে। তখন আমার বয়স নয় বছর। আমার থাকার ব্যবস্থা হলো একটি বৃদ্ধার বোর্ডিং-হাউসে আর শিক্ষার ভার নিলে ডাঃ গাংসি—ছাব্বিশ বছরের প্রিয়দর্শন তরুণ যাজক। অসাধারণ মেধা আর পড়াশোনায় দ্রুত উন্নতির ফলে প্রথম থেকেই শিক্ষকের সবটুকু স্নেহ আদায় করে নিয়েছিলাম। এমন কি পরে আমার সহপাঠীদের পরীক্ষা নেবার ভারও আমি পেয়েছিলাম।

কিন্তু বোর্ডিংএ আমার দুরবস্থা চরমে উঠেছিলো। প্রথম রাতেই তো খাবার টেবিলে কাঠের চামচ দেখে চেঁচিয়ে উঠলাম আমার রূপার চামচটা দেবার জন্যে। বলা হোলো এখানে সবাই যা করে তাইই করতে হবে। মস্ত একটা কাঠের গামলায় স্যুপ ঢালা থাকতো। সবাই তাই থেকে কাঠের চামচ ডুবিয়ে খেতো। যার হাত যত দ্রুত চলতো তার ভাগ্যেই তত বেশী জুটতো। ঐ স্যুপের সঙ্গে একটুকরো নোনা কড় মাছ আর একটি করে আপেল—ব্যস্! রাতের খাওয়া ছিলো আরও চমৎকার! জলের গ্লাসের বদলে জুটেছিলো মাটির ভাঁড়।

নোংরা বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে মস্ত মস্ত ইঁদুরের লাফালাফির শব্দে ভয়ে কাঁটা হয়ে বুকে বালিস চেপে জেগে থাকতাম। সকালে পড়তে গিয়ে ঘুমে ঢুলে আসতো দুই চোখ। ক্ষিদের জ্বালায় শেষটায় চুরি করেও খেতাম—রান্নাঘর থেকে উড়ে যেত তাকের উপর সাজানো হেরিং আর সসেজ। পড়াশোনায় উন্নতির জন্যে সহপাঠীদের হিংসে তো ছিলোই—তারা শিক্ষকের কাছে নালিস করলে—কিন্তু ফল হলো উল্টো—দিনের পর দিন আমার এই অবস্থা দেখে বিচলিত হোয়ে ডাঃ গাংসি নিজের বাড়ীতে আমাকে নিয়ে এলেন—আমার অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে।

ইতিমধ্যে আমার উপর পক্ষপাতিত্বের ফলে অনেকগুলি ছাত্রই ছেড়ে দিয়েছিলো—এবার উনি নিজেই একটা স্কুল খোলার ঠিক করলেন—আর ইতিমধ্যে আমাকে উজাড় করে দিতে লাগলেন নিজের অধীত সমস্ত বিদ্যা—এমন কি বেহালা বাজানো সুদ্ধ।

বোর্ডিং-এ কয়েকটি দিনের নিদারুণ অভিজ্ঞতার পর এতদিনে সত্যিকারের আশ্রয় মিললো এঁদের ছোটো পরিবারে। পরিচয় হোলো স্বল্পভাষী বাবা—আর পুত্রগর্ব্বান্বিতা মায়ের সঙ্গে—আরও পেলাম—উপন্যাসের নেশা লাগা, রোমান্সের স্বপ্ন বিভোর বেটিনা—ডাঃ গাংসির কনিষ্ঠাকে।

* * * *

আমি যে বেটিনার চেয়ে তিন বছরের ছোটো—ওর আদর ওর ঘনিষ্ঠতার আড়ালে যে আর কোনো অর্থই থাকতে পারে না, একথা মনে হলেই কোথায় যেন ঘা লাগতো—জ্বালা ধরে উঠতো সমস্ত মনে। বিছানায় পাশাপাশি বসে বেটিনা যখন আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে মাসলগুলি টিপে বলতো, আমি দিন দিন বলিষ্ঠ হয়ে উঠছি, তখন কি এক বিচিত্র অনুভূতির তীব্রতায় আমি অস্থির হয়ে উঠতাম। কিন্তু কোনো কথা না বলে চুপ করে থাকতাম, কেমন যেন ভয় হোতো পাছে বেটিনা টের পায় আমার এই অনুভূতির ক্ষীণতম আভাস।—আলতো ভাবে আঙুলগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ও যখন বলতো কী নরম, মসৃণ আমার চামড়া—শিরশিরিয়ে উঠতো সারা দেহ—আর জ্বলে উঠতো সারা মন। কেন? কেন? আমিই বা পারি না কেন ওর মত সহজ হোতে!—ওর মত অবলীলায় ওর কাছে এগোতে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরামও পেতাম এই ভেবে যে, আমার মনের এই ক্ষোভ, এই জ্বালার কথা ও জানতে পারেনি।

কাপড় জামা পরা শেষ হলে ভারী মিষ্টি করে আমায় চুমা খেতো—আদর করে বলতো—'আমার ছোটো খোকা'—আর ঐ চুমাগুলি ওকেই ফিরিয়ে দেবার জন্যে ছটফট করে উঠতো আমার মন।

আরও কিছু দিন পরে—যখন আরও খানিকটা সাহসী হয়ে উঠেছি তখন বেটিনা আমাকে লাজুক বলে ঠাট্টা করলেই আমি ওর

চুমাগুলি ফিরিয়ে দিতাম আরও গভীর আরও মধুর আবেগে—যেই মনে হোতো অনেকটা এগিয়েছি, অমনি থেমে যেতাম—কি যেন খুঁজছি, এমনি ভাবে সরে আসতাম—আর বেটিনাও তখনি চলে যেতো ঘর থেকে। আর ও চলে গেলেই প্রচণ্ড ধিক্কারে জর্জ্জরিত করতাম নিজেকে—কেন সাড়া দিলাম না? ক্ষুব্ধ কামনাকে এমন জোর করে রুদ্ধ করলাম কেন?—কেন?

অথচ বেটিনা কত সহজ—কত স্বাভাবিক। ও যা কিছু করে কেমন অনায়াসেই করে—ওকে তো এমন কঠিন প্রয়াসে নিজেকে সংযত করতে হয় না?

শরতের প্রথম দিকেই ডাঃ গাংসি আরও তিন জন ছাত্র পেলেন। তাদের মধ্যে কর্ডিয়ানীরই বয়স হবে বছর পনেরো। মাসখানেকের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম কর্ডিয়ানী আর বেটিনার মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

এই দেখে আমার মনে যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো সেটা ভালো কোরে বোঝার ক্ষমতা সেদিন ছিল না। কিন্তু পরে বিশ্লেষণ করে দেখেছি সেটা না ছিলো হিংসা—না ছিলো বিতৃষ্ণা—ছিলো শুধু প্রচণ্ড ঘৃণা। সেটা সংযত করে রাখাও সেদিন আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কিছুতেই আমি ধারণা করতে পারছিলাম না যে, কর্ডিয়ানী—একটা মূর্খ, বংশমর্য্যাদাহীন, স্থূল প্রকৃতির চাষার ছেলে—আমার চেয়েও বেটিনার বেশী প্রিয় হোলো—শুধু একটু বয়স বেশীর দাবীতে? আমার সুপ্ত পৌরুষের অভিমানে কোথায় যেন ঘা লাগলো—মনে হোলো আমি অনেক যোগ্য, আমার স্থান অনেক উঁচুতে—বেটিনাকে স্পষ্টই ঘৃণা করতাম—যদিও অবচেতন মনে ওকেই তখন ভালোবাসি।

কিন্তু অবচেতন মনের সে প্রেম গুপ্ত থাকে নি—বেটিনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছিলো—ধরা পড়েছিলো ভোরে এসে আমার চুল আঁচড়ে দেবার সময়—ধরা পড়েছিলো আমার নীরব উপেক্ষায়।

আমি ঠেলে দিতাম ওর উদ্যত হাত দু'টি—মধুভরা ঠোঁট দু'খানিতেও দিতাম না কোনো প্রতিদান। বেটিনা নিজেই একদিন জিজ্ঞাসা করলে, আমার এমন ব্যবহারের কারণ কি?

আমি বললাম কিছু না। আমার উত্তর শুনে অদ্ভুত এক ভঙ্গীতে হেসে বেটিনা বলল, আমি নাকি কার্ডিয়ানীকে হিংসা করি—কি করুণায় ভরা স্বর? রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে গেল—প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে জানালাম কর্ডিয়ানীর মত ছেলেই ওর মত মেয়ের উপযুক্ত; ওদের যোগ্য ওরাই···বেটিনা হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কিন্তু সেদিন মনে মনে বেটিনা প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা করেছিলো—চেয়েছিলো আমাকে টের পাওয়াতে হিংসার জ্বালা কি? আরও চেয়েছিলো—আমার চোখে আঙুল দিয়ে আমাকেই বুঝিয়ে দিতে যে, বাইরে ঘৃণার আবরণের আড়ালে আমার সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে যে আছে সে—বেটিনাই।

* * * *

একদিন সকালে ডাঃ গাংসি যখন উপাসনায় গেছেন, তখন বেটিনা এসে আমার বিছানার ধারটিতে দাঁড়ালো। ওর হাতে এক জোড়া সাদা পশমের মোজা। আমার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বেটিনা বললে, মোজা জোড়া আমার জন্তে ও বুনেছে, পায়ে ঠিক না হলে আবার বুনে দেবে। সেদিন গোড়া থেকেই আমার মন কেমন যেন লুব্ধ হোয়ে উঠছিলো—সাহস করে একটু বেশী অগ্রসর হবার চেষ্টা করলাম, ফলে কথা কাটাকাটি হতে হতে শেষটায় ঝগড়ায় দাঁড়ালো। বেটিনা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে—আর আমি চুপ করে বসে রইলাম, মনের মধ্যে ঝড় বইতে লাগলো চিন্তার।

সে যে কী যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা! মনে হলো আমি বুঝি অসম্মান ঘটিয়েছি! বিশ্বাসঘাতকতা করেছি এঁদের কাছে—সুযোগ নিয়েছি এঁদের অতিথেয়তার! ভাবতে ভাবতে মনে হোলো আমার এত বড় অন্যায়ের একমাত্র প্রতিকার হোলো—বেটিনাকে বিয়ে করা—অবশ্য ও যদি রাজী হয় আমার মত অযোগ্যকে বিয়ে করতে।

সমস্ত দিন রাত মনের উপর চেপে রইলো এক পাষাণভার। তার উপর যখন বেটিনা আমার ঘরে আমার কাছে আসা একেবারেই বন্ধ করে দিলে তখন যেন আমার দুঃখের আর সীমা রইলো না।

প্রথমটা মনে হোলো ঠিকই করেছে বেটিনা নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে—কর্ডিয়ানীর সঙ্গে ওর যে ব্যবহার তা যদি আমার মনে অমন জ্বালা না ধরাতো, তবে হয়তো আমার এই বেদনা রূপান্তরিত হোতো প্রকৃত প্রেমে।

চিন্তা—চিন্তা—চিন্তা। ক্রমাগত এই একই চিন্তার ফলে আমার বিশ্বাস হোলো আমার সঙ্গে বেটিনার এই যে নিষ্ঠুর কৌতুক, সবই ওর ইচ্ছাকৃত—এখন নিশ্চয়ই ও অনুতপ্ত তাই আর কাছে আসতে পারে না সঙ্কোচে, দ্বিধায়। ভেবেই যথেষ্ট আনন্দ পেলাম। তখনি ঠিক করলাম একটা চিঠি লিখবো ওকে, যাতে কেটে যায় ওর এই সঙ্কোচ, আবার আগের মত সহজ হয়ে উঠতে পারে ও। লিখলাম চিঠি—স্বল্প কথায়—তবে যাতে ওর অভিমানে আঘাত না লাগে সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক ছিলাম।

আমার নিজের ধারণা যে চিঠিটা রীতিমত উঁচুদরের হয়েছিল। একথাও মনে হোলো যে এমন একখানা চিঠি পেয়ে এবার বেটিনা নিশ্চয়ই অবাক হবে যে কেমন করে আমাকে আর কর্ডিয়ানীকে একই পর্য্যায়ে ফেলার কথা ও মুহূর্ত্তের জন্তেও ভাবতে পেরেছিলো।

চিঠিটা পাবার আধঘণ্টা পরেই বেটিনা জানালে পরদিন ভোরে ও আসবে আমার কাছে—আবার আগের মতো।

বৃথা—বৃথা—বৃথাই অপেক্ষা!

রাগে দুঃখে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। খাবার টেবিলে বসে বেটিনা যখন বললে আমাদের প্রতিবেশী ডাঃ অলিভোর বাড়িতে ক'দিন পরেই একটা বল নাচের পার্টি আছে—তাতে যোগ দেবার জন্তে ও আমাকে মেয়েদের পোষাকে সাজিয়ে দিতে চায় নিজের হাতে—আমি সাজবো তো?—শুধু ওই বলার ভঙ্গীটুকুতেই আমার সমস্ত ক্ষোভ শান্ত হোয়ে গেলো। সবাইকে উৎসাহিত হতে দেখে আমিও রাজী হয়ে গেলাম। আরও মনে হোলো এই সুযোগে পরস্পরের মধ্যে একটা মিটমাট হওয়াও অসম্ভব নয়।

* * *

ডাঃ গাংসির ধর্ম্মপিতা যথেষ্ট ধনী ছিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর গ্রামের বাড়ীতেই থাকতেন। একদিন তাঁর কাছ থেকে খবর এলো যে তিনি মৃত্যুশয্যায়; ডাঃ গাংসি আর তাঁর বাবাকে যাবার

জন্য অনুরোধ জানিয়ে গাড়ী পর্য্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছেন। শেষ সময় ওদের দেখে একটু আনন্দ পেতে চান।

আমার মনে হোলো এও একটা সুযোগ। আসলে আমার নিজেরই আর ধৈর্য্য থাকছিল না কবে সেই বল নাচের রাত আসবে তার আশায় বসে থাকায়।

বেটিনাকে আমি বললাম ঘরের দরজা খুলে রাখবো রাতে। সবাই শুতে গেলে ও যেন আসে আমার কাছে। একতলায় একটি ঘরেই ছোটো পার্টিশান দিয়ে একদিকে বেটিনা আর অন্যদিকে ওর বাবা শুতেন। অন্য একটা ঘরে ঐ তিন জন ছাত্র শুতো। তাই কোনো বাধাই ছিল না বেটিনার আসার—আর আমার আশার পথে।

সেদিন রাত্রে শুধু ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। শুধু বারান্দার দিকের একটা দরজা এমন ভাবে ভেজিয়ে রেখেছিলাম যাতে বেটিনা এসে আস্তে একটু ঠেললেই খুলে যায়। মনের চাঞ্চল্যে কাপড় জামা না বদলেই এক ফুঁয়ে আলোটা নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। আর মুহূর্ত্তগুলি কাটতে লাগলো অধীর প্রতীক্ষায়।

কিন্তু ঘড়ীতে বেজে গেল পরপর এক—দুই—তিন—চার; প্রহর গুণে গুণে শেষ হয়ে এলো বিনিদ্র রাত। প্রতীক্ষার আকুলতা তখন জ্বলে উঠেছে ব্যর্থতার তীব্র রোষে। তখন আমার দিশাহারা অবস্থা। বাইরে তখন হিমের রাতে বইছে তুষার ঝড়—আর অপমানের জ্বালায় দেহের সমস্ত রক্ত তখন টগবগ করে ফুটছে।

পারলাম না শেষ অবধি ধৈর্য্য ধরতে; তখনও সূর্য্য ওঠার ঘণ্টাখানেক বাকী, ভাবলাম নিজেই যাবো নীচে, দেখবো কি ব্যাপার। পাছে কুকুরটার ঘুম ভেঙে যায়, চেঁচিয়ে ওঠে, এই ভয়ে জুতো খুলে পা টিপে এসে দাঁড়ালাম একতলায় বেটিনার ঘরের সামনে। ও যদি বেরিয়ে এসে থাকে, তাহলে দরজা তো খোলাই থাকবে এই ভেবে এগিয়ে গিয়ে দরজায় হাত দিয়ে দেখলাম দরজা ভিতর থেকেই বন্ধ। তাহলে নিশ্চয়ই বেটিনা ঘুমোচ্ছে। ভীষণ ইচ্ছা হোলো দরজাটা ঠেলতে—কিন্তু কুকুরটা যদি জেগে ওঠে? একটা ভয়ে, সঙ্কোচে একবার আমার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠলো—যদি চাকরটা হঠাৎ আমাকে এই অবস্থায় দেখে ফেলে?—কি ভাববে সে?—ভাববে কি আমি পাগল হয়ে গেছি? না, শেষ অবধি প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত করলাম—ফিরে যাওয়াই ভালো—এমন ভাবে সবার সামনে নিজেকে ধরা দিতে পারবো না।

সবে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ একটা শব্দ শুনলাম ঘরের ভিতর থেকে। নিশ্চয়ই ও বাইরে আসছে—আবার যেন সাহস ফিরে এলো—এগিয়ে গেলাম দরজার সামনে—

খুলে গেল দরজা—বেরিয়ে এলো বেটিনা নয়—কর্ডিয়ানী—

আমাকে সামনে দেখেই প্রথমটা চমকে উঠলো, পরক্ষণেই আমার পেটের উপর সজোরে এমন লাথি মারলো যে আমি ছিটকে গিয়ে পড়লাম বাইরে—তুষারপাতের মধ্যে। আর কর্ডিয়ানী দ্রুতপদে ঢুকে গেল ওদের তিন জনের সেই নির্দ্দিষ্ট ঘরটাতে, আর ঢুকেই দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলে।

আমিও উঠে পড়লাম ঝেড়েঝুড়ে—পাগলের মত ছুটে গেলাম বেটিনার ঘরের দিকে, এর সমস্ত শোধ ওর উপর তুলতে।

কিন্তু দরজা বন্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণে। দিগবিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে সজোরে এক লাথি মারলাম দরজায়···দরজা খুললো না। শুধু কুকুরটা আচমকা শব্দে জেগে উঠে তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দিলে। ছুটে পালিয়ে এলাম উপরে। ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে কম্বলের তলায় ঢুকে বালিসে মুখ গুঁজে পড়ে রইলাম। অসহ্য যন্ত্রণায় আর অপমানের বেদনায় আমি তখন অর্দ্ধমৃত;

এমন শোচনীয় ভাবে প্রতারিত, লাঞ্ছিত, পরাজিত হ'তে হোলো? সুদীর্ঘ তিনটি ঘণ্টা কেটে গেলো মনের আগুনে জ্বলে জ্বলে। চরম প্রতিশোধ নেবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞা করলাম। উঃ! শেষে জয়ী হোলো কর্ডিয়ানী। আর আমি কি না তার করুণার, তার উপহাসের পাত্র হলাম!—সে যে কী কষ্টকর, কী জ্বালাভরা অনুভূতি; সে সময় ওদের দু'জনকেই বিষ খাওয়াতে পারতাম একটুও দ্বিধা না করে। প্রতিশোধ নেবার জন্যে পাগল তখন আমি। কত উপায়ই না মাথায় এলো—একবার ভাবলাম দিই জানিয়ে সব কীর্ত্তি ওর দাদাকে।

সবই কেবল অপরিণত দুর্ব্বল মনের ভীরু চিন্তা। মাত্র বারো বছর বয়স তখন আমার। এসব বিষয়ে না ছিলো কোনো ধারণা, না ছিলো কোনো অভিজ্ঞতা—কোথায় পাবো পরিণত মনের সেই ধৈর্য্য, সেই সংযম যাতে আত্মসম্ভ্রম বজায় রেখে 'বীরে'র মত প্রতিশোধ নেওয়া যায়?

মনের এই উন্মত্ত অবস্থায় হঠাৎ কানে গেলো বেটিনার মায়ের তীব্র আর্ত্তনাদ—বেটিনা নাকি মারা যাচ্ছে। রাগের জ্বালায় মনে হলো আমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হবার আগেই ও মরে যাবে? তখনি উঠে পড়ে এক ছুটে নীচে নেমে এলাম। বাবার খাটের উপর বেটিনা শুয়ে আছে—প্রবল স্নায়বিক আক্ষেপে ছটফট করছে, অর্দ্ধ-আবৃত অবস্থা, একবার এপাশ একবার ওপাশ করছে—চেপে ধরতে গেলে এমন ভাবে লাথি, ঘুঁষি ছুড়ছে যে, কাছে এগোয় কার সাধ্য!

চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম—সেদিনের সেই অপরিণত বয়সের সরল বুদ্ধিতে এই মূকাভিনয়কে যে কি বলবো বুঝতে পারলাম না—তখনও মনের ভেতর কাঁটার মত বিঁধে আছে গত রাতের স্মৃতি।

অবশ্য মনে মনে আশ্চর্য্য হলাম নিজের এই আত্মসংযমে! যে দুজনের একজনকে অপমানিত আর অন্যজনকে খুন করবার জন্যে আমার হাত নিসপিস করছে, তাদের দুজনকেই হাতের এত কাছে পেয়েও নীরব দর্শকের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম তো!

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধস্তাধস্তি করার পর বেটিনা ঘুমিয়ে পড়লো। ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকলেন ডাঃ অলিভো একজন ধাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। ধাত্রীটি সব দেখে শুনে বললে এ হিষ্টিরিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়—কিন্তু ডাঃ অলিভো সেকথা মানলেন না—সম্পূর্ণ বিশ্রাম আর ঠাণ্ডা জলে স্নানের ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। আর আমি দু'জনের মন্তব্য শুনলাম আর মনে মনে খুব হাসলাম। আমি তো জানি, অন্ততঃ আমার ধারণা ছিলো তাই, যে আমিই একমাত্র জানি এ রোগের মূল কারণটি কি?

গত রাত্রের অনিদ্রা আর ক্লান্তি তো আছেই তার উপর আমার কাছে কার্ডিয়ানীর ধরা পড়ে যাওয়ার আতঙ্কই কি কম? যার জন্যেই

হোকগে যাক ওর এই অবস্থা—আমি আপাতত ডাঃ গাৎসির না আসা অবধি প্রতিশোধটা মুলতুবী রাখলাম। আমার ধারণা ছিলো না যে অমন ভীষণ হিষ্টিরিয়ার ফিটের ভান বেটিনা করতে পারে এমন নিখুঁত ভাবে। ওকে দেখলে ধারণা করা যায় না অত জোর আছে ওর।

ওপরে নিজের ঘরে ফিরে যাবার সময় বেটিনার ঘরের ভিতর দিয়ে আমায় আসতে হোলো। যেতে গিয়ে দেখি ওর বিছানার উপর ছোট্টো পকেট বইটা পড়ে আছে। চট্ করে তুলে নিলাম—কি লেখা আছে পড়বার লোভ সামলাতে পারলাম না। ওর সঙ্গে দেখি একটুকরো কাগজও রয়েছে, তা'তে কর্ডিয়ানীর হাতের লেখা মনে হলো—সোজা তুলে নিয়ে ঘরে চলে এলাম। নির্জ্জন অবসরে বসে পড়তে হবে।

অবাক হলাম আমি অতটুকু মেয়ের অত সাহস দেখে। সহজেই তো মায়ের চোখে ঐ কাগজের টুকরোটা পড়তে পারতো। আর তিনি নিজে না পড়তে পেরে সোজা নিয়ে যেতেন ছেলের কাছে পড়ে দেবার জন্যে। আমার মনে হলো নিশ্চয়ই বেটিনার মাথার ঠিক ছিল না, কিন্তু চিঠিটা পড়ে আমার মাথার ঠিক ছিলো কি?

"যখন তোমার বাবা এখানে থাকবেন না তখন তো আমি ইচ্ছে করলেই যখন খোক আসতে পারি। তুমি ঘরের দরজাটা খুলে রেখো, তাহলে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। রাতে খাবার পর আমি এই ছোট্টো ঘরটায় লুকিয়ে থাকবো"—

মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হোয়ে পর মুহূর্ত্তেই হেসে উঠেছিলাম—ইশ কি বোকাই না বনেছি আমি। যাক্ ভালোবাসার নেশা থেকে রেহাই পেলাম। সারা জীবনের মত শিক্ষা হলো ভেবে নিজেকেই নিজে ধন্যবাদ দিলাম। এমন কি এত দূরও মনে হলো যে, বেটিনা ঠিকই করেছে কর্ডিয়ানীকে বেছে নিয়ে—হাজার হোলেও ওর বয়স পনেরো আর আমি তো নিতান্তই একটা বালক। সেই সঙ্গে একথাও মনে হোলো যে আমাকে লাথি মারার প্রতিশোধ আমি কর্ডিয়ানীর উপর তুলবোই।

দুপুরবেলা অসম্ভব ঠাণ্ডার জন্যে রান্নাঘরের টেবিলে সবাই মিলে খেতে বসেছিলাম। এমন সময় আবার বেটিনার ফিট সুরু হোলো। সবাই ছুটলো ওর পরিচর্য্যায়—আমি ছাড়া। ধীরে সুস্থে খাওয়া দাওয়া সেরে আমি সোজা উঠে এলাম ঘরে পড়তে বসবার জন্য।

রাতে খাবার সময় দেখতাম ওরা বেটিনার বিছানাটা রান্নাঘরেই টেনে এনেছে যাতে সব সময় মা ওকে দেখা শোনা করতে পারেন। তা ছাড়া সাধারণত উনি রান্না ঘরেই শুতেন। এসবে আমি নজরও দিতাম না, এমন কি রাতে, আর পরদিন সকালে আবার যখন বেটিনার হিষ্টিরিয়ার চীৎকার শুনলাম তখনও তাতে কান দিলাম না।

সেইদিনই সন্ধ্যায় ডাঃ গাৎসি ফিরে এলেন। মনে ভয় ছিলো বৈকি কর্ডিয়ানীর—তাই এবার এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আমি কি করবো ঠিক করেছি—আমি কলমকাটা ছুরীটা নিয়ে ওকে এমন তাড়া করলাম যে ও ছুটে পালিয়ে গেলো।

না—ওদের কুৎসা রটিয়ে বেড়াবার কোনো ইচ্ছাই আর আমার ছিল না—সে প্রচণ্ড বিদ্বেষ তখন শান্ত হয়ে গেছে।

পরদিন ভোরবেলা আমাদের পড়ানোর মাঝখানে হঠাৎ এসে মা ডাকলেন ডাঃ গাৎসিকে। অনেক ভূমিকা করার পর বললেন যে, ওঁর বিশ্বাস বেটিনার এই অসুখের মূল হলো ওর উপর ডাইনীর দৃষ্টি পড়া—আর ডাইনী যে কে, তাও জানেন।

—"হতে পারে, কিন্তু মা ভুল করছো না তো? কাকে সন্দেহ করছো তুমি?"

—"পুরানো ঝিটাকে। হাতে হাতে প্রমাণও পেয়েছি আমি"—

—"কি রকম?"

—"আমার ঘরের দরজায় দুটো ঝাঁটাকে ক্রশ চিহ্নের মত করে পথটা এমন ভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলাম যে, ঢুকতে হলে ঝাঁটা দুটোকে সোজা করে তবে ঢুকতে হবে। কিন্তু ঝিটা ওই দেখে আর ঢুকলো না, সরে গিয়ে অন্য দরজা দিয়ে এলো—তবে? ডাইনীই যদি না হবে তবে ঝাঁটা সোজা করে এলো নাই বা কেন?"

—"তার কোনো মানে নেই মা—আচ্ছা ডাকো তো ওকে?"—ঝি আসতেই জিজ্ঞাসা করলেন,—"যে দরজা দিয়ে রোজ ঢোকো, সে দরজা দিয়ে আজ তুমি ঢোকনি কেন?"

—"আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না তো।"

—"দরজার উপর সেন্ট এণ্ড্রুজের ক্রশ চিহ্ন কি দেখনি?"

—"কি রকম ক্রশ সেটা?"

—"না-বোঝার ভান করিস না"—ধমকে উঠলেন মা—"গত বৃহস্পতিবার রাতে কোথায় শুয়েছিলি?"

—"আমার বোনঝির বাড়ী—তার ছেলে হলো কি না"—

—"সে আমার খুব জানা আছে কোথায় গিয়েছিলি, আসলে তুই একটা ডাইনী, মেয়েটার উপর তোরই দৃষ্টি লেগেছে"—

ঝিটা একথায় ক্ষেপে গিয়ে ওঁর মুখে থুতু ছুঁড়লো। রাগে দিশাহারা হয়ে মা ছুটলেন লাঠি আনতে। ডাঃ গাৎসি তাড়াতাড়ি উঠে মাকে থামাতে গেলেন, তারপর ঝিটার দিকে এগোবার আগে সে উর্দ্ধশ্বাসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে প্রাণপণ চেঁচিয়ে প্রতিবেশীদের ডাকতে সুরু করলে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ওকে ধরে এনে হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে তবে ঠাণ্ডা করা গেল।

এই সব কাণ্ডকারখানা আর কেলেঙ্কারীর পর ডাঃ গাৎসি উঠে নিজের ধর্ম্মযাজকের পরিচ্ছদ পরে বেটিনার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তাকে ঝেড়ে দেবার জন্যে। সত্যিই যদি কোনো দুষ্ট আত্মা ভর করে থাকে ওর উপরে। এই সব নতুন নতুন অদ্ভুত ব্যাপার কিন্তু সেদিন আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিলো—যদিও বেটিনার উপর ভূতে ভর হয়েছে ভাবতে খুবই মজা লাগছিলো।

বিছানার ধারে আমরা যখন গেলাম তখন বেটিনার নিঃশ্বাস পড়ছে কি না বোঝাই যাচ্ছিল না। যাজক দাদার ঝাড়ফুঁকে কিছু মাত্র উন্নতি দেখা গেল না। ডাঃ অলিভো এই সময় এসে পড়েছিলেন। ঐ সব ব্যাপার দেখে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর আর থাকার প্রয়োজন আছে কি না? বলা হলো যদি বিশ্বাস থাকে তবে থাকতে পারেন। বলা বাহুল্য উনি বিদায় নিলেন, বলে গেলেন টেষ্টামেন্টের বাইরে কোনো অলৌকিক ব্যাপারই তিনি বিশ্বাস করেন না।

কাজ সেরে ডাঃ গাৎসি যখন নিজের ঘরে চলে গেলেন সে সময় বেটিনার কাছে আমি ছাড়া কোনো দ্বিতীয় প্রাণী ছিলো না। সেই সুযোগে চট্ করে বিছানার কাছে গিয়ে ওর মুখের উপর ঝুঁকে ফিশফিশ করে বললাম—"ভয় পেও না, স

হোয়ে সেরে ওঠো। আমি মুখবন্ধ করেই আছি। কাউকে কোনো কথা বলে দেবো না। কোনো ভয় নেই তোমার"—

বেটিনা ধীরে ধীরে মাথাটা আমার দিকে ফিরিয়ে চুপ করে চেয়ে রইলো। একটি কথাও বললে না। কিন্তু সে রাতে ও ভালোই ছিলো, আর ফিট হয়নি।

মনে করেছিলাম আমি বুঝি ওকে সারিয়েই তুললাম। কিন্তু পরদিন আবার ফিট সুরু হলো, সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক আর লটিন ভাষায় অনর্গল অসংলগ্ন প্রলাপ। নিশ্চয়ই ওকে কোনো খারাপ আত্মায় পেয়েছে, এ বিষয়ে কারো আর কোনো সন্দেহ রইলো না। মা বেরিয়ে গেলেন আর ঘণ্টাখানেক পরে এক অত্যন্ত কুৎসিত ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। তিনি নাকি পাদুয়ার বিখ্যাত রোজা—ফাদার প্রস্পেরো ছ'ভেভোলেন্টো।

রোজাকে দেখেই বেটিনা চীৎকার করে হেসে উঠলো। পরক্ষণেই অশ্রাব্য ভাষায় অনর্গল গালি দিতে লাগলো তাঁকে। যারা দাঁড়িয়েছিলো সবাই ভাবলে যাক, এতক্ষণে টাকা খরচ করা সার্থক হলো, রোগ ঠিক ধরা পড়েছে—ও কোনো দুষ্ট আত্মা ছাড়া কিছুই নয়, নইলে রোজাকে অমন করে গালাগাল দেবার সাহস কি মানুষের হয়?

মূর্খ পরচর্চাকারী, ইতর ইত্যাদি বিশেষণে অভিষিক্ত হতে হতে হঠাৎ ফাদার প্রস্পেরো তাঁর হাতের কাঠের ক্রশ দণ্ডটা নিয়ে বেটিনাকে মারতে সুরু করলেন। বললেন বেটিনা নয় এ মার খাচ্ছে ওর ভিতরের শয়তান আত্মাটা। হঠাৎ একসময় থেমে গেলেন মারতে মারতে—যেই দেখলেন ওঁর মাথাটা তাক করে বেটিনা ঘরে রাখা প্রস্রাবের জায়গাটা তুলে ধরেছে—আর তারস্বরে গাল দিচ্ছে—"গাধা কোথাকার—কথায় হারাতে না পেরে মারতে এসেছো? আমার ঘাড়ে কোনো শয়তানই চাপেনি—অসভ্য, ছোটলোক, চাষা ভদ্র ব্যবহার করতে না পারো তো দূর হয়ে যাও"—

চেয়ে দেখলাম ডাঃ গাৎসির মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু বেটিনার রোজার তা'তে কিছুই এসে যায়নি। নিরাপদ দূরত্ব রেখে তিনি ততক্ষণে ভূত ঝাড়া মন্ত্র পড়া সুরু করেছেন। শেষে এক সময় সেই দুষ্ট আত্মাকে তার নাম বলতে আদেশ করলেন—

—"আমার নাম বেটিনা।"

—"না। সে নাম হলো খৃষ্টধর্মে দীক্ষিতা একটি বালিকার"—

—"তা হলে শয়তানটাও হলো একটি বালিকা—যে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিতা হয়নি। শোনো—মূর্খ রোজা এটুকু জানো না যে, শয়তানের কোনো লিঙ্গভেদ নেই? তোমার যখন বিশ্বাস যে আমার মুখ দিয়ে শয়তানটাই কথা বলছে, তবে তার প্রশ্নের যদি ঠিক ঠিক উত্তর দাও তবেই শয়তানটা বেরিয়ে আসবে—"

—"বেশ, আমি কথা দিচ্ছি—"

—"তুমি কি নিজেকে আমার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান মনে কর?"

—"না, তবে আমি নিজেকে তোমার চেয়ে শক্তিমান মনে করি এইজন্যে যে, আমি ঈশ্বরের নাম করেছি আর এই পবিত্র পরিচ্ছদ পরেছি তাই—"

—"বেশ, বেশী শক্তিশালী যদি তবে আমার এই সত্যি কথাগুলো বলা থামাতে পারো কিনা দেখি—তোমার যত গর্ব্ব সব তো ঐ দাড়িটি নিয়ে—দিনে দশবার তো ওটা আঁচড়াচ্ছো। আমাকে এর দেহ ছেড়ে বার করবার জন্যে ঐ দাড়ির একটা চুলও কি ছিঁড়তে পারবে, উঁহু অতখানি ত্যাগ তোমার পক্ষে সম্ভবই নয়। আচ্ছা ঐ দাড়িটা যদি কামিয়ে ফ্যালো, তবে আমি ঠিক বেরিয়ে যাবো—"

—"মিথ্যাবাদী, কি শাস্তি করি তোর ছাখ—"

—"আমি একটুও মানিনা তোমাকে—"

বলার সঙ্গে সঙ্গে বেটিনা এমন উদ্দাম হাসিতে ফেটে পড়লো যে, থাকতে না পেরে আমিও হেসে উঠলাম। রোজা তৎক্ষণাৎ ডাঃ গাৎসির দিকে ফিরে বললেন, আমার মত অবিশ্বাসীর থাকা চলবে না ঘরে। একথা সত্যি স্বীকার করেই বেরিয়ে এলাম। আর সেই মুহূর্তেই দেখলাম বেটিনা রোজার প্রসারিত হাতখানির উপর সজোরে থুতু ছুঁড়লো, এ দৃশ্যে কি আনন্দই না পেলাম!

সেদিন ফাদার প্রস্পেরো খেতে বসে অনর্গল বাজে কথা বকে গেলেন। পরে বেটিনাকে আশীর্ব্বাদ জানাবার জন্যে ওর ঘরে ঢুকলেন। ওঁকে দেখেই বেটিনা গ্লাসে ভরা কালো রঙের কি একটা তরল পদার্থ ছুঁড়ে মারলো ওঁর মুখে। ঠিক পাশেই কর্ডিয়ানী দাঁড়িয়েছিলো, তার গায়েও বেশ খানিকটা লাগলো। আর এইসব দেখে আমি একেবারে খুশীতে ফেটে পড়লাম। এবার বিদায় নিলেন ফাদার প্রস্পেরো। যাবার আগে বলে গেলেন অন্য রোজা ডাকতে—কারণ দেখাই যাচ্ছে ঈশ্বর চান না যে ওঁর শয়তানের মুক্তি ঘটে।

উনি চলে যাবার পর থেকেই বেটিনা স্বাভাবিক সুস্থ হোয়ে উঠলো, এমন কি, রাত্রে আমাদের সঙ্গে খেতেও বসলো। মাকে বাবাকে বারবার আশ্বাস দিলে এখন আর কোনো কষ্ট নেই, বেশ সুস্থ বোধ করছে। আমার দিকে ফিরে বললে ভোরে আসবে আবার আমার চুল আঁচড়ে দিতে। আর রাতে নিজের হাতে সাজিয়ে দেবে মেয়েদের পোষাকে নাচের জলসায় যাবার জন্য। ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আপত্তি করলাম, রুগ্ন দেহে বিশ্রামের প্রয়োজনই বেশী ওর। কিছু না বলে সকাল সকাল উঠে ও শুতে চলে গেল। একটু পরে আমরাও উঠলাম। ঘরে গিয়ে শোবার আয়োজন করছি, দেখি, একটুকরো কাগজ পড়ে আছে, তুলে নিলাম—লেখা আছে—

"হয় আমাকে নিজের হাতে তোমাকে সাজিয়ে দিতে দেবে আর নাচের জলসায় আমার সঙ্গে আসবে—নইলে যা দেখাবো তাতে তোমাকে কাঁদতে হবেই—"

চিঠিখানা নিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। ডাঃ গাৎসির ঘুমিয়ে পড়ার পর উঠে এসে একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখলাম—

"ভালোবাসি তোমাকে—ভালোবাসি সহোদরা বোনের মতই। বেটিনা, আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি, আমি চাই সব ভুলে যেতে। একটা চিঠি এইসঙ্গে ফিরিয়ে দিচ্ছি—জানি ফিরে পেয়ে তুমি কত নিশ্চিন্ত, কত খুসী হবে। এ চিঠি পকেট বইয়ের সঙ্গে বিছানায় ফেলে গিয়ে কতখানি বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলে বলো তো? ফিরিয়ে দিলাম—

এইসঙ্গে প্রমাণও দিলাম না কি—আমি তোমার বন্ধু—"

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

পুরাকালে—ভগবান স্বয়ম্ভূ একদা ভুবনগুলি ও জীবসমূহ সৃষ্টি ক'রে দেখলেন—তাঁর হাতে আর কাজ নেই। কী যে করবেন, ভাবতে ভাবতে দীর্ঘকাল তাঁর কেটে যায়। ৬৫

দিব্যদৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখতে পান,—মর্ত্ত্যলোকে, মনুষ্যেরা নিরালম্বের মত ঘুরছে, সরলভাবে তারা যোগ-সাধনা করছে, ধনাদি সম্ভোগ তাদের নেই; তারা পায় নি। ৬৬

নয়ন মুদ্রিত ক'রে তিনি রইলেন। সত্বর হল এক মায়াময় সমাধান। মনুষ্যদের বিভূতি লাভের জন্য ব্রহ্মা সৃষ্টি ক'রে ফেললেন—"দম্ভ"কে; সম্ভাবনার যিনি আধার। ৬৭

সৃষ্টি হলো "দম্ভে"র;—কুশগুচ্ছ ও দু'খানি পুস্তক তার হাতে; শূন্য কমণ্ডলু, পাণিতে পুণ্যসলিল; নিজের হৃদয়ের মত কুটিল··· শৃঙ্গ, দণ্ড, কৃষ্ণাজিন ও খনিত্র তাঁর সাথে; ৬৮

কর্ণে,—স্থূল শণসূত্রের জাল; একগাছিও চল নেই মাথায়; মস্তকে, কুশের মুকুট; মুকুটের মূলে শ্বেতপুষ্পের আনন্দ। ৬৯

ব্রহ্মার সম্মুখে উঠে দাঁড়ালেন "দম্ভ", কাষ্ঠের মত স্তব্ধ গ্রীবা, জপ-চপল ওষ্ঠ, সমাধি-লীন চক্ষু, মণিবন্ধে রুদ্রাক্ষের বলয়। ব্রহ্মলোকেও তিনি শুচি-বায়ু-গ্রস্ত। ঘৃৎ-পরিপূর্ণ একটি পাত্র বহন ক'রে, অন্যের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচাতে বাঁচাতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

মৌন তাঁর মুখ; কিন্তু তাঁর হৃদয়ের কদর্য আকাঙ্ক্ষার কথাগুলিকে যেন প্রকাশ করে দিতে লাগল তাঁর নেত্রাঞ্চলসম ভ্রূকুটির সকোপ হুঙ্কার। ব্রহ্মা কর্তৃক উত্থিত হয়েই তিনি চেয়ে বসলেন ব্রহ্মার আসন। ৭০—৭২

অঙ্গ-ভূষণের মত তাঁর এই সাহস, এই সুমহৎ শক্রঞ্জয় বল, বশীভূত ক'রে ফেলল উপস্থিত বরেণ্যদের। সপ্তর্ষির দল কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। ৭৩

আত্ম-লীলার মোহনীয়তায় যিনি সৃষ্টি করেন বিশ্ব, সেই-হেন পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাও···আন্দোলিত হয়ে উঠলেন,—গৌরবে, বিস্ময়ে, হর্ষে। ৭৪

"দম্ভে"র তীব্রাতিতীব্র নিয়মে সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়লেন অগস্ত্য। অতিবিস্ময়ে, স্বল্প-তপস্যার লজ্জায় পৃষ্ঠ সঙ্কুচিত হয়ে গেল বশিষ্ঠের। ৭৫

"কৌৎস" মুনি, যিনি নিজের অতি-সরল মুনিব্রতের আবেষ্টনীর মধ্যে বিরাজ করেন, তিনিও সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন। অনাড়ম্বর আত্ম-তপস্যায় অনাদর ঘটল "নারদের"। ৭৬

হাঁটুর মাথায় মুখ গুঁজে বসে রইলেন "জমদগ্নি"। ত্রস্ত হয়ে উঠলেন "বিশ্বামিত্র"। ঘাড় ফিরিয়ে রইলেন "গালব"। ভেঙ্গে পড়লেন "ভৃগু"। ৭৭

চতুর্মুখ বিস্ফারিত ক'রে ব্রহ্মা দেখতে লাগলেন "দম্ভ"কে। সুচিরোত্থিত দম্ভের তখন ব্রহ্মার আসন-কমলটির উপরেই স্থির-নিবদ্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে কোপ-কটাক্ষ; শূলগ্রথিতের মত তিনি নিস্পন্দ, গৌরবে স্ফীত তাঁর গাত্র। ৭৮

চতুর্মুখে ব্রহ্মা দেখতে লাগলেন দম্ভকে। বুঝতে পারলেন "দম্ভ" দাবী করছেন তাঁরি আসন। তারপরে দশন দীধিতির বিকাশ-প্রীতিতে স্ব-বাহন হংসকে যেন বিহসিত ক'রেই, ব্রহ্মা বললেন— ৭৯

"পুত্র, আমার কোলে এসে বোসো। তোমার যথেষ্ট গুণ, গুণের গৌরবও যথেষ্ট। সেই গৌরবের নিয়মও বড় বিচিত্র। তুমি উপযুক্ত হয়েই উঠেছ।" ৮০

বিশ্বস্রষ্টার বাণী শুনে শঙ্কাহীন হলেন দম্ভ। হবেনই বা না কেন। তাঁর উপর তখন অভিসিঞ্চিত হয়েছে ব্রহ্মার মুষ্টি মুষ্টি কল্যাণ-বারি। তিনি তখন কষ্টেসৃষ্টে, সসঙ্কোচে, কোনক্রমে উপবেশন করলেন ব্রহ্মার উৎসঙ্গে। ৮১

দম্ভ বললেন— "উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবেন না। অবশ্যই যদি বলতে হয়, তাহলে হস্ত-পদ্ম দিয়ে মুখের ঐ হাঁ-টিকে আচ্ছাদিত করে রাখুন; রেখে কথা বলুন। আপনার মুখের বাতাসে জল আছে, যেন আমার গায়ে না লাগে।" ৮২

দম্ভের অতুলনীয় শুচিতা লক্ষ্য ক'রে ঈষৎ হাসলেন ব্রহ্মা। তারপরে কর-পদ্মের পাপড়িগুলিকে ঈষৎ কাঁপাতে কাঁপাতে বললেন—"তুমি "দম্ভ"। দম্ভই বটে। এখন উত্থান কর। নিম্নে রয়েছেন অখিলা পৃথিবী আর তাঁর ঐ মেখলা—সমস্ত সাগর, সমস্ত পরিখা। বৎস, সেখানে অবতরণ কর।

উপভোগ কর তথাকার ভোগ। স্বর্গের দেবতারাও তত্ত্বতঃ জানেন না সেই ভোগরাশি।" ৮৩-৮৪।

সাদরে "দম্ভ"কে বিদায় দিলেন ব্রহ্মা। বিসর্জ্জিত হয়ে "দম্ভ" তখন কণ্ঠে শিলা বন্ধন ক'রে, অবতরণ করলেন পৃথিবীতে, সংসার-সাগরে ভাসমান এই পৃথিবীতে। ৮৫

দম্ভের আবির্ভাব হল মর্ত্ত্যলোকে। তার পরে কানন-কান্তার,

নগর-নগরী পরিভ্রমণ করতে করতে "দম্ভ" নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন "গৌড়ে" এবং দিগ্বিদিকে পাঠালেন নিজের জয়ধ্বজা। ৮৬

বৎসগণ,—বাহ্লীকদের বচনে রয়েছে দম্ভ, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্যদের, ব্রত ও নিয়মে রয়েছে দম্ভ, কাশ্মীরীদের রাজ্যশাসনে রয়েছে দম্ভ; কিন্তু গৌড়ীয়দের সর্বত্রই দম্ভ। ৮৭

এঁরাই "দম্ভের" সহায়। যাঁর কাছ থেকে হোক, বা যেদিক থেকেই হোক, প্রতিগ্রহ-লব্ধ বা শ্রাদ্ধ-লব্ধ সৈন্ধব-লবণ পুড়িয়ে, এঁরাই প্রতি প্রভাতে রচনা করেন ভস্ম-তিলক। ৮৮

তারপরে এই পৃথিবীতে, প্রাণীদের সত্বর, সংবিভাগ ক'রে দিয়ে স্বমূর্তিতে দম্ভ নিত্য-নিবাস করতে লাগলেন মাননীয় ন্যায়াধীশদের মুখে। ৮৯

"দম্ভ" স্বয়ং প্রথম প্রবেশ করেছিলেন গুরুদের হৃদয়ে, বালকদের হৃদয়ে, তপস্বীদের হৃদয়ে, নিয়োগ-কর্তাদের কুটিল হৃদয়ে, দীক্ষিতদের হৃদয়ে। ৯০

তারপরে তিনি প্রবেশ করেছিলেন,···গণক, চিকিৎসক, সেবক, বণিক, স্বর্ণকারদের হৃদয়ে; প্রবেশ করেছিলেন নট, ভট, গায়ক, বক্তা ও চরদের হৃদয়ে। ৯১

নানান্ বিকারের মধ্য দিয়ে, আংশিক ভাবে 'দম্ভ' প্রবেশ করেছিলেন সমস্ত জন্তুদের হৃদয়ে। তারপরে তিনি প্রবেশ করলেন পক্ষী ও বৃক্ষের অন্তরে। ৯২

তীর্থে তীর্থে বক-তপস্বী একপায়ে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তপস্যা করে, মৎস্যের প্রতি তার লোভ, নড়েও না চড়েও না। তার মাধ্যমে দম্ভ প্রবেশ করেন পক্ষীদের অন্তরে। ৯৩

বিপুল-জটা-বল্কল ধারী ঐ বৃক্ষেরা, যারা হিমে, রৌদ্রে ও ঝঞ্ঝায় শীর্ণ হয়েও কেবলমাত্র জল-প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের বিকাশের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় দম্ভেরি প্রকাশ। ৯৪

অতএব, বৎসগণ, দম্ভ আমাদের বিচারের বস্তু। তিনি সর্বগত হয়েও সকলের হৃদয়। এই বহু-বিধা দম্ভকে তোমরা বিশেষ করে জেনে রেখো। এঁকে জানলেই বিফল হবে মায়াবীদের মায়া। ৯৫

ঐ যে কল্পবৃক্ষের কাহিনী তোমরা শুনেছ, জোচ্চোর-চক্রের সামনে তিনিও দম্ভের একটি বিকার-মাত্র। পুরাকালে বামন-দম্ভেই শ্রীহরি আক্রমণ করেছিলেন ত্রৈলোক্য,···এ কথা তো আজ কারো কাছে অবিদিত নেই। ৯৬

ইতি দম্ভাখ্যান-নামক প্রথম সর্গ

দ্বিতীয় সর্গ

"লোভ"!—লোভ যে কে, সে কথা সর্বদা আমাদের বিশেষ ভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। সংসারে দেখা যায়, যাঁরা লুব্ধ, তাঁরাই নিতান্ত ভয়ের বস্তু। 'লোভ' যাঁকে একবার আকর্ষণ করেছেন তাঁর থাকতেই পারে না কার্যাকার্যের বিচার। ১

মায়া, বিনিময়, বিভ্রম, অপলাপ ও চিত্ত-বিক্ষেপ,—এইগুলির মাধ্যমে যে সমস্ত কূটত্ব বা কাপট্যের আমরা খেলা দেখিয়ে থাকি, তাদের মূল কারণ হচ্ছেন সর্বস্ব-চোর ঐ লোভ। সঞ্চয়-দুর্গের তিনি পিশাচ। ২

যারা শাস্ত্রবিৎ, সাত্বিকতাই যাঁদের ঐশ্বর্য্য, তাঁরা যখন একদা সত্বগুণ, প্রশান্তি ও তপস্যার দাক্ষিণ্যে জয় ক'রে ফেললেন লোভকে, তখন বিপদ ঘটল লোভের। নিরুপায় হয়ে তিনি তখন প্রবেশ করলেন "কূপে"। সেই কূপ·····ঐ কিরাটদের (বৈশ্যজাতি) কুটিল হৃদয়। ৩

বৎসগণ, জেনে রেখো—এই বৈশ্যেরাই, এই বণিকেরাই দিবস-চোর; সানন্দে লুট করেন জনসাধারণকে। বহু পথ লুণ্ঠনের। ক্রয়, বিক্রয়, কূটনীতি, তুলা-লাঘব, ন্যাসরক্ষা, সুদ-আদায়—এইগুলিই ছল-পথ। ৩ (ক)

কূট-মায়ার নানান খেলা খেলে সারাদিন জনসাধারণের ধন হরণ ক'রে বৈশ্য-বণিক ঘরে ফিরে আসেন, সংসার-খরচ-বাবৎ তিনি কিন্তু অতিকষ্টে ছাড়েন··তিনটি কড়ি। ৪

বণিকের অসীম অনুরাগ··আখ্যায়িকা শ্রবণে। ইনি সর্বদাই দৌড়োন ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা শুনতে। দান-ধর্মের ত্রিসীমাও তিনি মাড়ান না। পালান। যেন কালসাপ তাঁকে দংশেছে। ৬

দ্বাদশীতে, পিতৃদিবসে, সংক্রান্তিতে, চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণে তিনি স্নান করেন, বহুক্ষণ ধ'রে; কিন্তু দান? এক কপর্দকও তিনি করেন না। ৭

ঐ বুঝি ভিখিরীরা এসে ধরল, সচকিত নয়নে তাই এদিকে ওদিকে দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে, মাথায় চাদর মুড়ি দিয়ে কুটিল-চরণ চোরের মত তিনি অলিগলি দিয়ে পালান। ৮

কথা কইলে উত্তর দেন না, বিক্রীর সময় শঠ-বণিক্ মৌনী হয়ে থাকে। কিন্তু যেই দেখলেন, গচ্ছিত রাখবার জন্য কিছু দ্রব্য হাতে নিয়ে কোনো নরবর উপস্থিত হয়েছেন, তখন তাঁর সঙ্গে ও সে কী তাঁর কথা বলবার ঘটা! ৯

বণিক তখন গা নাড়া দিয়ে উত্থান করেন, নত হয়ে নমস্কার করেন, কুশল প্রশ্ন করেন, বসবার আসনখানি এগিয়ে দেন। নিঃক্ষেপ-পাণি পুরুষটিকে দেখেই, ভাবান্তর হয়, ধর্মের কথা আওড়াতে থাকেন। ১০

কেউ যদি তাঁর কাছে কিছু বন্ধক রাখতে এসে বলেন—

"আর ভাই, সকালেই চলে যাচ্ছি। তোমার কাছেই সব রেখে গেলুম। ভদ্রা পড়তে কতক্ষণ? আজ এখন কি করি বল"। ১১

তখনি কুসুমের মত বিকসিত হয়ে ওঠে বণিকের চক্ষু, বদনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে ওঠে মিথ্যা খেদ। পুনঃ পুনঃ এ পাশ ও পাশ দেখতে দেখতে, কাজের মধ্যে হঠাৎ চোখ সেঁধিয়ে দিয়ে তিনি বলে ফেলেন—১২

"তোমারি ভাই এ ঘরবাড়ী; কিন্তু চিরটা কাল ন্যাস-রক্ষা করা কঠিন। দেশ কালের অবস্থা বড় মন্দ। তা, তুমি ভাই সাধু পুরুষ, তা হলেও আমি তোমার দাস হয়েই রইলুম। ১৩

ভদ্রার কথা বলছ, কিন্তু ভাই দেবীটি দূষিতা নন, তিনি প্রশস্তব। গচ্ছিত ধনের মঙ্গল সাধনই করে থাকেন। যাঁরা এ কাজের কাজী, তাঁদের মুখেই এ সব কথা শোনা। তাঁরা ঠেকে শিখেছেন কি না। তুমিও তো তাই জানো। ১৪

কিছুদিন আগে আমারি এক বন্ধু··ভদ্রার আশঙ্কায় কিছু বন্ধক রেখে গেলেন। আমি ধীরে সুস্থে সেটিকে কৌশলে খাটিয়ে খুটিয়ে আবার বাড়িয়ে দিই। তারপর বন্ধু এলেন, আর নিলেন।" ১৫

বুঝেছ, বৎসগণ, ইত্যাদি প্রকারের নানান্ অসমঞ্জস বর্ণনা

ক'রে নিভৃতে সেই পাপ…মোটা-বুদ্ধিদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন সোনা-দানা। নাচতে থাকে তাঁর মনের ময়ূর। ১৬

বন্ধকী দ্রব্য তিনি ভাঙান। ক্রয়-বিক্রয়মূলে অনন্ত করেন লাভ। মূলধন আরো ধন বেড়ে ওঠে। তিনি তখন উপহাস করতে থাকেন ধনাধিনাথ কুবেরকে। ১৭

এই সমস্ত কার্যে বণিকদের ধনকুম্ভগুলি সর্বদাই থাকে পূর্ণ, কিন্তু সম্ভোগ করবে কে? বালবিধবাদের দুঃখফল স্তনতটের মত সেই ধনকুম্ভ বৃথাই পড়ে থাকে। ১৮

দান নেই, উপভোগ নেই। হিরণ্যরক্ষা করতে করতেই, এই বেণিয়ার দল নিরবকাশ জীবনযাপন করে যান। সংসার জীর্ণ মন্দিরের তাঁরা খরস্পর্শ মহামূষিক ডাকাত। ১৯

এই ধরাধামে এক নিৰ্বিসর্প ছিলেন। তাঁর নাম "পুরপতি"! রাজগোখরো যেমন গুপ্তধন পাহারা দেয়, তিনিও তেমনি আঁকড়ে থাকতেন নিজের বিপুল ধনরাশি। কুটিল। ছোবল মারতে মহা-ওস্তাদ। মাথায় শোভা পেত বিকট এক কাপড়ের পাগড়ী,—উৎকট তার বেষ্টনী; সাপের বিরাট ফেণার মত। ২০

দিক ভ্রমণ করতে করতে হঠাৎ দৈবযোগে তাঁর ধনরাশি নষ্ট হয়ে যায়। বিদেশে নির্ধন হয়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেল সাঙ্গোপাঙ্গ। কী ক'রেন? নিজের দেশে তিনি অতি সত্বর ফিরে এলেন। তাঁকে যে পৌঁছতেই হবে তাঁর মহাপ্রাণ মহাজন বন্ধুটির কাছে। ২১

কিন্তু কোথায় সেই মহাজন? শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। শেষে এক দেশবাসীকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাশয়, বলতে পারেন মহাজনটি গেলেন কোথায়?"

তখন উত্তরে শুনলেন—

"সখে, তাঁর আজ বিভূতি—অন্য-প্রকারের। "খটক-মুখ"-মুদ্রায় তিনি দুটি মুঠি বন্ধ ক'রে এখন ব'সে থাকেন। মৃগমদ, চন্দন, নবাগুরু, কর্পূর, মরিচ ও সুপারীর ব্যবসা কেঁদে তিনি এখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গুণছেন কোটি কোটি মুদ্রা। ২২—২৩

তাঁর 'বর-ভবন' মেরুর মত বিশাল, ঘরের দেয়ালে দেয়ালে চিত্রের ছড়াছড়ি। চমকাচ্ছে। আমাদের এই দেশে "পুরপতি" বলে এক বৈভবশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁকেও হার মানিয়েছেন এই মহাজন। সুখে বসবাস করছেন।" ২৪

পথিকের কথা শুনে অতুল বিস্ময়ে কাঁপতে কাঁপতে ঝুঁকে পড়ল পুরপতির মুণ্ড। অবিলম্বে তিনি উপস্থিত হয়ে গেলেন মহাজনের বরভবনে। বাধা পেলেন দ্বারে। নিষ্প্রতিভের মত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। বাতাসে উড়তে লাগল তাঁর মলিন জীর্ণবাস! ২৫

তুঙ্গ ভুবনের চিলে-কুঠরীতে বসেছিলেন মহাজন। জানালার জালিকাজের ফাঁক দিয়ে বণিক তাঁকে দেখতে পান। চিনতে পারেন পুরপতিকে। চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর যেন দম বন্ধ হয়ে আসে, হাতে পায়ে খিল ধরে যায়, যেন বজ্রপাত হয় মাথায়। ২৬

পুরপতি তখন ধীরে ধীরে কোনক্রমে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে গেলেন। নির্জন অবসর বুঝে, নিজের পরিচয় দিয়ে প্রার্থনা করলেন…নিজের গচ্ছিত দ্রব্যধন। ২৭

মহাজনের চোখ কিন্তু অন্যদিকে চেয়ে রইল। চোখের মাথায় বেঁকে উঠল ভ্রূ; শেষে হাতের পাতা কাঁপাতে কাঁপাতে বললেন—

"জীবিকার সংস্থান নেই, ঠগ মিথ্যেবাদী পাপ আবার কোথা থেকে এসে জুটল! কে তুই, কোথা থেকে এসেছিস? কার কাছ থেকে এসেছিস? কোনোদিন তোকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না। কী আবার তোর সঙ্গে কথা হল? আশ্চর্য ব্যাপার, কোথায়, কখন, বল, কার কোন জিনিষ আমার কাছে রেখে গেছিস? ভাখো একবার, উঃ কী কষ্ট, ঘোর কলি! এতটুকুও কোথাও ইষ্ট নেই। আমার কাছে এসে বলে কি না, গচ্ছিত ধন ফিরিয়ে দাও! আশ্চর্য, জগৎ জানে।—"হরগুপ্তে"র বংশে আমার জন্ম। এই বংশে বন্ধকী-তমসুকের কারবার ভাবতেও পারা যায় না। তার উপর বলে কি না আমি চোর, সত্যের অপলাপ করেছি! ঘোর মহাপাতকের স্পর্শ।

না, না। তাহলেও, যাঁরা মহান তাঁরা প্রত্যাখ্যান ক'রে দূর করে দেন না সেই পাপকেও, যে দয়া করে মহতের সততা-সম্বন্ধে মিথ্যা দোষারোপ করে। বলো কত তারিখ, সে তারিখে কী লেখাপড়া হয়েছিল, বলো। এবার নিজেই ভাখো। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, ছেলের হাতে সমস্ত ভার ন্যস্ত করেছি; আমার সমস্ত ব্যাপারই লেখাপড়ার মধ্যে থাকে। ২৮-৩২

বাক্যবাণে বিনষ্ট হয়ে গেল পুরপতির ধৈর্য্য, ধারণা, অধ্যবসায়। বিতাড়িত, বিসর্জ্জিত হয়ে তিনি তখন দৌড়লেন মহাজনের পুত্রের নিকটে। ৩৩

বাপও জানেন, ছেলেও জানেন, পিতাই সব কিছু দলিলাদি সম্পাদন করেন। অতএব পুরপতি একবার পিতার কাছে, একবার পুত্রের কাছে অনেকক্ষণ ধরে কন্দুকের মত চালাচালি হয়ে ফিরতে লাগলেন। ৩৪

শেষে রাজদ্বারে উপস্থিত হলেন, অভিযোগ করলেন প্রবাস থেকে ফিরে এসে তিনি তাঁর গচ্ছিত ধন ফিরৎ চান। কিন্তু মহাজন! তিনি রাজকোপ সহ্য করতে প্রস্তুত হলেন, রূপোর একটি চাকতিও তার হাত থেকে কিন্তু খসল না। যন্ত্রণা শব্দের বহুবিধ প্রয়োগ হল, রাজাজ্ঞায় পরিপীড়নের অভাব হল না। কিন্তু মহাজনের এক কথা—"আমার হাতে গচ্ছিত একটি জিনিষও নেই, একটি কণাও না।" ৩৫-৩৬

এই রকমেরই হয় ধনের সোণা জলের বিরাট পিপাসা! যাঁরা স্বভাবলুব্ধ তাঁদের। একগাছি তৃণের মত তাঁরা বিসর্জ্জন দেন দেহ, কিন্তু লক্ষ্মীর কড়ির একটি দানাও তাঁরা ছাড়েন না। ৩৭

সে আজ অনেক যুগের কথা।

[ক্রমশঃ।
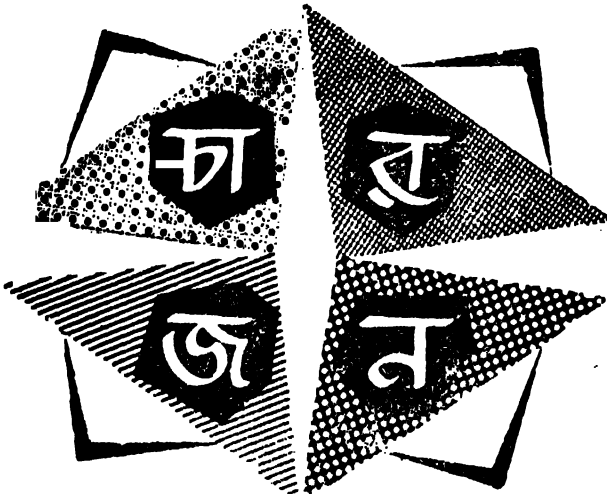
শ্রীসুশীলকুমার দে

[উন্নয়ন পরিকল্পনা, সমাজ কল্যাণ ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ]

"দেশের ও জাতির কল্যাণ সাধনই আমার একমাত্র কাম্য। যত দিন বেঁচে থাকবো তত দিন জন-কল্যাণ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করাই আমার জীবনের মূল মন্ত্র। সমাজ ও জাতির কল্যাণকর কার্য্য করেই আমি আনন্দ পাই, তাই যখনই এ কাজের জন্য আমার আহ্বান আসে, আমি তখনই তা গ্রহণ করি। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও আমি জনসমাজের সেবা-ব্রতই গ্রহণ করবো।" এ কথা কয়টি আমাকে বললেন কলকাতার রাজভবনে বসে যেদিন আমি দেখা করতে গিয়েছিলুম—পশ্চিম-বঙ্গের প্রাক্তন উন্নয়ন কমিশনার এবং বর্ত্তমানে নিউ ইয়র্কস্ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমাজ-কল্যাণ বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রীসুশীলকুমার দে, আই-সি-এস! নিরহঙ্কার, সদালাপী এ মানুষটির ব্যবহার সত্যিই হৃদয়ে দাগ না কেটে পারে না। জীবনে কর্ম্ম করে যাওয়াই যেন তাঁর একমাত্র কাম্য। আমি যেদিন তাঁর জীবনের ঘটনাবলী জানতে চাইলাম, তিনি অমনি আমাকে দেশ ও জাতির সেবার কথাটাই বিশেষ করে বললেন।

শ্রীসুশীলকুমার দে

১৯০৭ সালে কলকাতা মহানগরীতে সুশীলকুমারের জন্ম হয়। কলকাতার স্কুল ও কলেজেই তাঁর শিক্ষা। ১৯২৭ সালে অর্থনীতি শাস্ত্রে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি চলে যান বিলেতে উচ্চ শিক্ষালাভের আশায়। বিলেতে গিয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে লণ্ডন স্কুল অফ একোনমিকস পাঠ এবং গবেষণা করেন। কিন্তু দেশের কাজে আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করেন এবং সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৯৩০ সালে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে শাসন বিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন কিন্তু দেশের ও জাতির জনকল্যাণকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। সে ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে তিনি ছিলেন সর্ব্বদাই সচেষ্ট। শ্রী দে যখন নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখনই পল্লী উন্নয়নের জন্যে নদীয়া জিলায় সমবায়ের ভিত্তিতে একটি ফার্ম্ম গঠন করেন। সেই সময় ভারতে এই প্রকার কার্য্য ছিল অতি বিরল।

তার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সুশীলকুমার বাঙ্গালা দেশের অসামরিক লোকদের রক্ষার এবং বিমান আক্রমণে সাবধানতা অবলম্বন বিভাগের চাকুরী গ্রহণ করে জনসমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তারপর তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ মহানগরীর এ, আর, পি'র কণ্ট্রোলার নিযুক্ত হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে শ্রী দে দুর্ভিক্ষ-কবলিত বাঙ্গালায় সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হন। বাঙ্গালার এই দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে জীবন বিসর্জ্জন দেয়। জনসাধারণের অপরিসীম দুঃখ-দুর্দ্দশায় শ্রী দে সেদিন এগিয়ে আসেন বাঙ্গালা সরকারের আহ্বানে এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনসাধারণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত ক'রবেন বলে বাঙ্গালার সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হন। তারপর একে একে চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য এবং স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সেক্রেটারীর গুরুদায়িত্ব বহন করে চলেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর শ্রী দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি, বন, মৎস্য এবং সেচ বিভাগের সেক্রেটারীর কার্য্যভার গ্রহণ করে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত শ্রী দে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন বিভাগের কমিশনারের কার্য্য গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনাকে রূপায়িত করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুশীলকুমারের অবদান সামান্য নয় তাঁরই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ নতুন নতুন পরিকল্পনা বাস্তব রূপ দান করে। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন কার্য্য অসামান্য সাফল্য-মণ্ডিত হয়। শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র জগতে শ্রী দের এই অসামান্য সাফল্য প্রসিদ্ধি লাভ করে।

শুধু সরকারী ও জনহিতকর কার্য্যের মধ্যেই শ্রী দের কার্য্যকলাপ সীমাবদ্ধ নেই। লেখক হিসেবেও তিনি এরই ভেতর একটি বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করেছেন। সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় সমূহের উপর তিনি বহু মৌলিক প্রবন্ধ এবং পুস্তিকা রচনা করেছেন এবং সহযোগিতা, পরিকল্পনা এবং শিল্প ও বাণিজ্য উন্নয়ন বিষয়ক তিনখানি গ্রন্থ লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি-স্বরূপ শ্রী দে পশ্চিম-ইউরোপের বহু স্থান পরিভ্রমণ করে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

শ্রী দে সরকারের প্রতিনিধিস্বরূপ ১৯৫১ সালে কৃষি এবং সমবায় কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান করেন। তার পর ১৯৫৩ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কাউন্সিলে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে গমন করেন। তিনি বহু বার পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ বিভিন্ন সম্মেলনে যোগদান করে ভারতের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন। ১৯৫৭ সালে কানাডায় অনুষ্ঠিত সমাজতত্ত্ব সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। সম্মেলনের পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান এবং জাপান পরিদর্শন করেন। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সহকারী ডিরেক্টার হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি ডেপুটি ডিরেক্টারের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শ্রী দে এখনও কর্ম্মক্ষম। তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের হ'য়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মকুশলতা নিয়োজিত হচ্ছে জনমানবের সেবায়। তিনি আজীবন এই সেবাব্রতেই কাটিয়ে দেবেন, এই তাঁর একান্ত ইচ্ছা। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করে দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করুন।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র

[কীর্তিমান কর্মীপুরুষ। বুক-কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী]

সারা কলকাতার গ্রন্থজগৎ বলতে কলেজ ষ্ট্রীটকেই বোঝায়। কলেজ ষ্ট্রীট, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ লেন ও কিয়দংশ হ্যারিসন রোড। অসংখ্য জনমানবের ভিড় আসা-যাওয়া, ওঠা বসা, খোঁজ-খবরের বিরাম নেই। সাহিত্যিক, বিক্রেতা, পরিবেশক, ক্রেতা, ছাত্র কেউই এখানকার আগন্তুক নয় বরং প্রতিদিনের অতিথি। বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীটের কথা ধরা যাক। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট থিয়োসফিকাল সোসাইটি হল, মহাবোধি, ষ্টুডেন্টস হল প্রভৃতি সর্বসাধারণের আসা-যাওয়ার সৌধগুলি সর্বদাই কোলাহলে মুখর। এরই পাশাপাশি অবস্থিত বাড়ীগুলির মধ্যেই আছে আর একটি বাড়ী, যেখানে দেখা যাবে 'বুক-কোম্পানী'র সাইনবোর্ড। বুক-কোম্পানীর ভিতর দিকের একটি কক্ষ। এ কক্ষে বসে বোঝাই যাবে না— যে কোন অঞ্চলে বসে আছি, শান্ত, নিস্তব্ধ, কোলাহল শূন্য। কাজ করার চমৎকার জায়গায়। সেই কক্ষে বসে আলাপ করছি শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে। বুক-কোম্পানীর স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে, একটি সহজ, সরল, অনাড়ম্বর অথচ অসামান্য দৃঢ়তাসম্পন্ন কর্মীর সঙ্গে।

বাহ্যিক বাহুল্য বর্জিত, অগাধ পাণ্ডিত্যের আধার, সদালাপী নিরহঙ্কারী শ্রী মিত্রের আদি নিবাস বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে। পিতৃদেব স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র সরকারী উকীল ছিলেন ও অসাধারণ স্মৃতি-শক্তিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁর স্মৃতি-শক্তির দু'-একটা উদাহরণ যা তাঁর পুত্রের কাছে পেলুম, তা তো ভাবাই যায় না। সারা দিনের মধ্যে কোর্টে যাবার সময় গাড়ীতে পড়তেন দেবেন্দ্রনাথ ছাত্র-জীবনে যা-যা পড়ে এসেছেন বা কর্মজীবনে যে সব আইন-গ্রন্থ ঘাঁটতে হয়েছে তার কোন বইতে কোন পৃষ্ঠায় কোন লাইনে কোন কথাটি লেখা রয়েছে, কোন টাইপে তা ছাপা, কতটি জায়গা ঐ লেখাটি নিয়েছে, তা যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থায় তিনি মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করে বলে দিতে পারতেন। এ যেন তাঁর কাছে জলের মত স্বচ্ছ। কিছুই নয় যেন। যাঁরা এঁর সহপাঠী পর্যায়ভুক্ত ছিলেন তাঁরাও ভবিষ্যতে আপন-আপন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করে গেছেন, সার্থকনামা আইনস্রষ্টা ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, কলকাতা পৌরসভার কোষাধ্যক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়-গণের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ স্বর্গারোহণ করেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন, ৭ই আষাঢ় ১২৯৬ সালে গিরীন্দ্র-নাথের জন্ম হ'ল মাতুলালয়ে পিপলন গ্রামে। মাতামহের অপরিসীম স্নেহের মধ্যে জীবননাট্য শুরু। সমগ্র বর্ধমান অঞ্চলে মাতামহ বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ একজন সার্থকনামা ব্যক্তি ছিলেন। বারোশ' ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দৈনিক এক হাজার লোককে এগারো মাস যাবৎ অন্ন দিয়েছিলেন বৈকুণ্ঠনাথ। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ১০৮ বছর বয়সে একদিন গঙ্গার তীরে জপ করতে করতে পরলোক গমন করেন বৈকুণ্ঠনাথ। আজও তাঁর প্রভাব অমলিন দীপ্তিতে বিরাজ করছে দৌহিত্র গিরীন্দ্রনাথের মধ্যে। স্কুলের পাঠ গিরীন্দ্রনাথ নিলেন পৌর বিদ্যালয় থেকে। তারপর যোগ দিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে, এখানে অসুস্থতা বশতঃ পর পর দু'বার আই-এ পরীক্ষা দেওয়া হ'ল না গিরীন্দ্রনাথের। মন গেল ভেঙে, কলেজী শিক্ষার ওইখানেই ইতি। শুরু হ'ল জীবনের শিক্ষার। এর কিছু পরেই ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সোডার ব্যবসায়ে যোগ দেন গিরীন্দ্রনাথ। কিন্তু সে টেকে না। তারপর এক সন্ন্যাসী বন্ধুকে সন্ন্যাসের পথ থেকে ঘুরিয়ে এনে একটি কর্মে' মধ্যে তাঁকে ডুবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বুক-কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র

আজ আটত্রিশ বছরে পড়েছে বুক-কোম্পানী। দিনেকের জন্যেও স্থানচ্যুত হয়নি। এই ঘরটিতেই তার প্রথম দিনের যাত্রাও সুরু হয়েছিল। এর প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গিরীন্দ্রনাথ আর এই প্রতিষ্ঠান অঙ্গাঙ্গীভাবে এক হয়ে গেলেন। আজও বুক-কোম্পানী মানেই গিরীন্দ্রনাথ আর গিরীন্দ্রনাথ মানেই বুক-কোম্পানী। সারা দিন এখানেই পাওয়া যাবে গিরীন্দ্রনাথকে। তাঁর সমস্ত কর্মশক্তি, তাঁর যা-কিছু জৈবিক সঞ্চয় সকলই নিয়োজিত হচ্ছে এরই কল্যাণে। গিরীন্দ্রনাথের জীবনীই আজ রূপান্তরিত হয়েছে বুক-কোম্পানীর জীবনীতে আর বুক-কোম্পানীর যা কিছু পরিচয় তা পাওয়া যাবে গিরীন্দ্রনাথেরই পরিচিতিতে।

পাঁচ বছরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল বুক-কোম্পানীর নাম সারা বিশ্বে। বাঙালীর প্রতিষ্ঠানের এই গৌরবে প্রত্যেক বাঙালীরই অংশ আছে। লীগ অফ নেশনস্-এ প্রকাশিত পুস্তকসমূহের সমগ্র প্রাচ্যে সোল এজেন্ট ছিলেন বুক-কোম্পানী। ভারতে মার্কিণ মুল্লুকের এক-এ-ডেভিস কোম্পানীরও এজেন্ট এঁরাই ছিলেন। বুক-কোম্পানী নিজেও বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন—তার মধ্যেই ওডেনবার্গের বুদ্ধ (পুনর্মুদ্রণ), ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের "মিলিটারী সিসটেমস অফ দি মারহাট্টাস এবং ফরেন বায়োগ্রাফিক্‌স্ অফ শিবাজী." সতীশ মিত্রের রিকভারী প্ল্যান ফর বেঙ্গল, জাহ্নবী ভৌমিকের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তুলসীদাস, লেঃ কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের হিন্দুসমাজের ইতিহাস প্রভৃতির নাম প্রণিধানযোগ্য।

বাঙলার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যালের অন্যতম পরিচালকের পদ বর্তমানে অলঙ্কৃত করছেন গিরীন্দ্রনাথ। ন্যাশানাল ব্যাঙ্কেরও পরিচালকের পদ অলঙ্কৃত হয়েছে গিরীন্দ্রনাথের দ্বারাই।

শুধু পুস্তক নিয়ে বুক কোম্পানীর কর্মশক্তি সীমাবদ্ধ নয়। ব্রিটিশের যুগে এটি একটি ছিল তার মুখোস, সে মুখোসের অন্তরালে গ্রন্থ-ব্যাপারী ছাড়া লুকিয়ে ছিল আরেকটি মুখ। সে মুখ দেশকর্মীর। বহু পলাতক বিপ্লবী যাদের মাথার দাম হাজার হাজার টাকা তাঁরা অকুতোভয়ে গিরীন্দ্রনাথের পক্ষপুটে কাটিয়ে গেছেন মাসের পর মাস। কত বৈপ্লবিক নিষিদ্ধ দ্রব্য গিরীন্দ্রনাথ নিজের জিম্মায় রাখতেন। এ জন্যে বহু বার তাঁর উপর সার্চের আদেশ এসেছে।

এখানকার দৈনিক সান্ধ্য আড্ডাটিও সেদিন কম বিখ্যাত ছিল না। হেন সাহিত্যিক বা সাহিত্যসেবী ছিলেন না, যিনি উপস্থিত হতেন না এই আসরে। এখানে দেখা যেত বিপিনচন্দ্র পাল, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আইন কলেজের অধ্যক্ষ সতীশ বাগচী, জাতীয় গ্রন্থশালার তত্ত্বাবধারক সুরেন্দ্রনাথ কুমার (ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের ভাগনা) প্রভৃতি সুধিবৃন্দকে। এখানে পদধূলি পড়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মতিলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ ভারতপুরুষদের। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে দেখা দিতেন শরৎচন্দ্র। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে গিরীন্দ্রনাথের অনুজ ৺সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র পরলোক গমন করায় পর শরৎচন্দ্র জীবনে আর এখানে পদস্পর্শ করেন নি।

বুক কোম্পানীর পূর্বগৌরব আজ লুপ্তপ্রায়, হারিয়ে গেছে অতীতের সেই কলমুখর মজলিশ, মিলিয়ে গেছে সেদিনকার প্রাণচাঞ্চল্য কিন্তু এখনও বর্তমান এর কর্ণধার সত্তরের পাদপ্রান্তে, হয়তো আজই সন্ধ্যায় মনে ভেসে উঠবে তাঁর হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর স্মৃতি আর হয়তো সেই মুহূর্তেই তাঁর মনে পড়বে মুরের বিখ্যাত কবিতা 'লাইট অফ দি আদার ডেস্'-এর অংশবিশেষ—

'হুস লাইটস্ আর ফ্লেড
হুস গার্লাণ্ডস আর ডেড
য্যাণ্ড অল বাট দি ডিপার্টেড'।

ডাঃ কুমারকান্তি ঘোষ

[কলকাতা মেডিকেল কলেজের সার্জ্জারীর অধ্যাপক]

"আর্ত মানবতার সেবাই আমার জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছি ছাত্রজীবন থেকে এবং আজও পর্যন্ত আর্ত্ত রুগ্নের সেবাই করে চলেছি এবং যত দিন বাঁচব এ মহান ব্রত পালন করে যাবো।"

উপরের এ মন্তব্যটি করলেন সেদিন কলকাতা মেডিকেল কলেজের শল্য-বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ কুমারকান্তি ঘোষ এম, বি, এফ, আর, সি, এস। ডাঃ ঘোষ মেডিকেল কলেজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার্জ্জন। কর্ম্মে অবিচলচিত্ত, সদা হাস্যময়। অমায়িক ডক্টর ঘোষ সর্ব্বদাই রোগীদের কল্যাণ কামনায় উদ্বিগ্ন। হাসপাতালের কর্ম্মের মধ্যেই তিনি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। বয়স তাঁর এখনও পঞ্চাশের কোঠা পেরোয় নি। এরই ভেতর সার্জ্জন হিসেবে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন। ভারতের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব প্রথম 'ব্রেণ টিউমার' অপারেশন করে সাফল্যলাভ করেছেন। তাঁর পূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় হাসপাতালে 'ব্রেণ টিউমার' অপারেশন হয় নি। এযাবৎ অপারেশন করে তিনি বহু দুরারোগ্য রোগীকে রোগমুক্ত করেছেন এবং অনেকের জীবন রক্ষা করেছেন এবং এখনও করছেন। এদিক দিয়ে ডাঃ ঘোষের অবদান অনস্বীকার্য্য।

ডাঃ ঘোষের ডাক্তার হওয়ার মূলেও রয়েছে এক বিস্ময়কর ঘটনা। কলকাতা সিটি কলেজ থেকে আই, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হবার আবেদন করেন। কিন্তু এর পূর্ব্বেই ডাঃ ঘোষের পরমারাধ্য পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করায় তিনি স্কটিশে বি, এস, সি, ক্লাসে ভর্ত্তি হন—কেন না, মেডিকেল লাইনে পড়া বিশেষ ব্যয়সাধ্য। তিনি তাঁর পিতার মাতুল লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহের সহিত দেখা করতে গিয়ে তাঁর পরামর্শ চান। লর্ড সিংহই তাঁকে অনুপ্রেরণা দেন মেডিকেল লাইনে পড়তে। শুধু অনুপ্রেরণাই নয়, তাঁকে মেডিকেল লাইনে পড়বার জন্য অর্থ সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। কেন না, এই ব্যবসায়ের মাধ্যমে দেশ ও জনসেবা করার প্রচুর সুযোগ থাকে এ মনে করে। তাঁর উপদেশ ও অনুপ্রেরণায় ডাঃ ঘোষ উদ্বুদ্ধ হয়ে মেডিকেল কলেজেই ভর্ত্তি হলেন এসে। ডাঃ ঘোষের আর বি, এস, সি, পড়া হলো না।

এ ঘটনাটির সঙ্গে আর্ত্ত মানবতার সেবার প্রেরণা আর একটি ঘটনা জড়িয়ে আছে ডাঃ ঘোষের জীবনে। সেটি হ'লো তিনি যখন কলকাতা মেডিকেল কলেজের ৫ম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সেই সময় ডাঃ ঘোষ বিখ্যাত গঙ্গাসাগর মেলায় স্বেচ্ছাসেবক হয়ে গমন করেন। সে সময় একটি লোক জলে ডুবে

যায়। তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে লোকটিকে উদ্ধার করে তার জীবন রক্ষা করেন। এজন্য ভারতীয় জীবন-রক্ষা সমিতি তাঁকে একটি স্বর্ণপদক প্রদান করেন এবং বাঙ্গালার তদানীন্তন গভর্ণর একটি সভায় তাঁকে তাহা প্রদান করেন। পদকপ্রাপ্তি ছাড়াও তিনি লোকটির জীবনদান করে যে প্রেরণা পেলেন, পরবর্ত্তী জীবনে তাঁর সেই প্রেরণা হ'লো পাথেয় এবং আজও পর্য্যন্ত তিনি সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে কাজ করে চলেছেন আর্ত্ত মানবতার সেবায়।

মুর্শিদাবাদ জিলার কান্দীতে ডাঃ ঘোষ ১৯০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণগোপাল ঘোষ ছিলেন ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বাল্যকাল থেকেই ডাঃ ঘোষকে পিতার সঙ্গে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়েছে। ১৯২৩ সালে বিষ্ণুপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে ডাঃ ঘোষ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ সময় তাঁর পিতা ছিলেন বিষ্ণুপুর মহকুমার এস. ডি. ও। কৃষ্ণগোপাল বাবুই ছিলেন বিষ্ণুপুর ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠার একজন প্রধান উদ্যোক্তা। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তিনি চলে এলেন কলকাতায় এবং ভর্ত্তি হ'লেন সিটি কলেজে। ১৯২৫ সালে এ কলেজ থেকেই আই. এস. সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লেন। কিন্তু এসময় তাঁর জীবনে এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। বিষ্ণুপুরের সদর মহকুমা হাকিম থাকাকালে তাঁর পিতা কৃষ্ণগোপাল ঘোষ পরলোক গমন করেন। আই. এস. সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'বার পর তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু মেডিকেল কলেজে পড়া ব্যয়সাধ্য মনে করে তিনি স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে বি. এস. সি ক্লাসে ভর্ত্তি হলেন। এরই ভেতর একদিন মেডিকেল কলেজ থেকে তাঁর ভর্ত্তি হবার আবেদন মঞ্জুর হ'য়ে এলো। ডাঃ ঘোষ মহা সমস্যায় পড়লেন। পিতার মৃত্যু হয়েছে, সংসারের আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল নয় যে দীর্ঘ দিন মেডিকেল কলেজের পাঠ তিনি চালিয়ে যেতে পারেন। এ অবস্থায় কোন কিছু ঠিক না করতে পেরে তিনি তাঁর পিতৃদেবের মাতুল স্বর্গতঃ লর্ড সত্যেন্দ্র-প্রসাদ সিংহের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁর কাছে কর্ত্তব্য সম্পর্কে উপদেশ চাইলেন।

লর্ড সিংহ তাঁকে ডাক্তারী পড়ার উৎসাহ দিলেন, কেন না, উহাতে তিনি স্বাধীন ব্যবসা করতে সক্ষম হবেন। শুধু উৎসাহই নয়, তিনি আর্থিক আনুকূল্য করবেন বলে সেদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। লর্ড সিংহ তাঁর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। লর্ড সিংহের আর্থিক আনুকূল্যেই ডাঃ ঘোষ মেডিকেল লাইনে পড়তে সুযোগ পেয়েছিলেন একথা আজও তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। ১৯৩১ সালে মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে তিনি হাউস সার্জ্জন হন। তার পর বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিস গ্রহণ করে বিভিন্ন জিলার হাসপাতালে কাজ করেন। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত তিনি মেডিকেল কলেজের রেসিডেণ্ট সার্জ্জন হন। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের সার্জ্জারীর শিক্ষকের কার্য্য করেন। তারপর চলে যান চট্টগ্রামে ১৯৪৩ সালে—সার্জ্জারীর শিক্ষক হিসেবে। সেখানে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত ছিলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে (বর্ত্তমানের এস. কে. হাসপাতাল) প্রথম ভারতীয় রেসিডেণ্ট সার্জ্জন হিসেবে
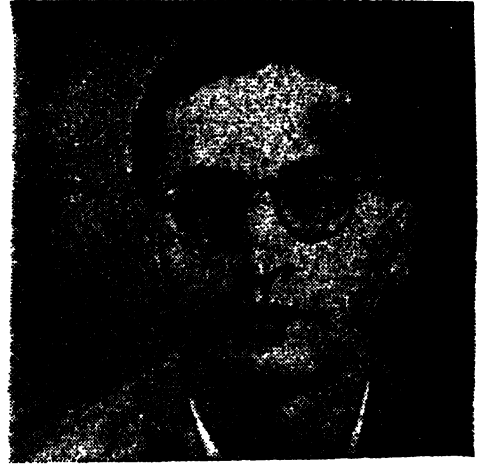
কুমারকান্তি ঘোষ

যোগদান করেন। এভাবে সার্জ্জন হিসেবে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ১৯৪৯ সালে ইংলণ্ডে গমন করেন এবং এফ. আর. সি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে ১৯৫০ সালে পুনরায় প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে আর.এম.ও. হয়ে যোগদান করেন। ১৯৫২ সালের আগষ্ট মাসে কলকাতা মেডিকেল কলেজের সার্জ্জারীর সহকারী-অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। অবিচল নিষ্ঠা ও দক্ষতা প্রদর্শন করে তিনি ১৯৫৪ সালে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মেডিকেল কলেজের সার্জ্জারীর অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত এ দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ডাঃ ঘোষ আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার্জ্জন। ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে তিনি একনিষ্ঠভাবে আর্ত্ত মানবতার সেবা করে চলেছেন। তিনি দীর্ঘায়ু হয়ে মানবসেবায় আত্ম নিয়োগ করে দেশের ও সমাজের কল্যাণ করুন, এ প্রার্থনাই করি।

সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ বসু

['রবিবাসর'-সম্পাদক]

বাংলা দেশে সাহিত্যিকের অভাব নেই, কিন্তু ছোট-বড়-মাঝারি সব শ্রেণীর সাহিত্যিকের মধ্যে সমভাবে সমাদৃত, সকল দলগত স্বার্থদ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধেস্থিত অজাতশত্রু সাহিত্য ও সাহিত্যিকপ্রেমী মানুষ বিশেষ বিরল। সেই বিরল গোষ্ঠীর মধ্যমণি হিসাবে গণ্য হন 'রবিবাসর' নামক বিখ্যাত সাহিত্যসভার সম্পাদক শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বসু। তিনি সাহিত্য সাধনায় যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, সাহিত্যিকদের অকৃত্রিম দরদী বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠাও তার চেয়ে কম নয়। সে হিসাবে তিনি জ্যেষ্ঠ জলধর দাদার সুযোগ্য উত্তর সাধক এবং বয়ঃকনিষ্ঠ পবিত্রদা'র উপযুক্ত পুরোধা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র হ'তে সুরু করে বাংলাদেশের গত অর্দ্ধ শতাব্দীকালের সকল সাহিত্যিকেরই তিনি আপন জন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পরস্পর বিবদমান দলের প্রত্যেক সদস্যের কাছেও তিনি সমাদর পান, তাঁদের কেবল সাহিত্য সাধনার নয়, ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের সন্ধান নেন।

'রবিবাসর' বাংলা কেন, সমগ্র ভারতের সাহিত্যসভার ইতিহাসে অগ্রণী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, হ'তে বাংলা দেশের
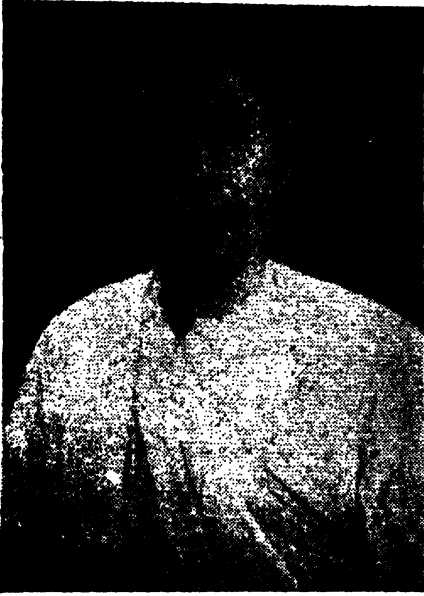
নরেন্দ্রনাথ বসু

বিখ্যাত মনীষী ও সাহিত্যসাধক বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি এই সভার সদস্যপদ গ্রহণ করে এই সাহিত্যসভাকে গৌরবান্বিত করেছেন। রবিবাসরের সদস্য-সংখ্যা ৫০ জনে সীমাবদ্ধ থাকায় অনেকে চেষ্টা করেও আসতে পারেন নি। তবু ১৩৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিগত ২৭ বৎসর কাল রবিবাসর পরিচালিত হচ্ছে। কোনও একটি সাহিত্যসভার এত দীর্ঘ জীবন লাভও বাংলা দেশে ইতিপূর্বে সম্ভব হয়নি। এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে যার ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন ও নিষ্ঠার বলে—তিনি নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথ বিশ বৎসরেরও বেশি রবিবাসরের সম্পাদনার কাজ অতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছেন। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে রবিবাসরের অনুষ্ঠান, শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতির আনুষ্ঠানিক সম্বর্দ্ধনা-উৎসব প্রভৃতি নরেন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালের স্মরণীয় ঘটনা। রবিবাসরের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় আছে এমন বহু মনীষী নরেন্দ্রনাথের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে বহু প্রসঙ্গে বলেছেন। স্বর্গত সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেন এবং বর্তমান সর্বাধ্যক্ষ অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে নূতন পুরাতন সকল সদস্যই একথা স্বীকার করেন—যে 'রবিবাসর' যেন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

কিন্তু 'রবিবাসর' তার একমাত্র পরিচয় নয়। এখানে তার জীবনকথা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

১২৯৭ সালে ৪ঠা চৈত্র তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে বালক বয়সেই যোগদান করেন। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্র নরেন্দ্রনাথ "ছাত্রসখা" নামক স্কুলের ছাত্রদের উপযোগী মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিনা অনুমতিতে পত্রিকা প্রকাশের জন্য কুখ্যাত কিংসফোর্ডের আদালতে তিনি অভিযুক্ত হন। এবং 'ছাত্রসখার' প্রকাশ বন্ধ হয়। ইণ্ডিয়ান সায়ান্স এসোসিয়েশনে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে অধ্যয়নকালে ১৯০৯ সালে তিনি "বিজ্ঞান-দর্পণ" নামক একখানি বাংলা বৈজ্ঞানিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিজ্ঞান-অধ্যয়ন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জীবনের আরম্ভ হলেও সাহিত্যসেবায় তাঁর উৎসাহ বরাবরই নিত্য নূতন পথে ধাবিত হয়েছে। "গল্পলহরী" পত্রিকায় রসরচনা লিখে তিনি অল্পদিনেই রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৩২৭ সালে 'বড় অবতার' নামে তাঁর সচিত্র রসরচনার বই বের হয়—ছবি আঁকলেন শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন—পরশুরামের 'গড্ডলিকা' প্রভৃতি গ্রন্থে যিনি 'নারদ' নামে ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন। 'বড়-অবতার' 'গড্ডলিকা' প্রকাশের পাঁচ বৎসর আগে বেরিয়ে রসিক সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। ১৩৩০ সালে নরেন্দ্রনাথ 'বাঁশরী' নামে একটি বৃহৎ আকারের সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। তিনিই এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। অধুনাখ্যাত প্রবোধকুমার সান্যাল প্রমুখ বহু সাহিত্যিক 'বাঁশরী'তে লেখা সুরু করেন। ১৩৩২ সালে তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'মানসকমল' প্রকাশিত হয়। এর বহু গল্প নানা ভাষায় অনূদিত হয়। তাঁর সম্পাদিত 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র' এবং 'জলধর সেনের আত্মজীবনী' বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ। ১৩৫০ সালে খুলনায় দৌলতপুরে 'বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনে'র তৃতীয় অধিবেশনে নরেন্দ্রনাথ "কথাসাহিত্য" শাখার সভাপতিত্ব করেন। চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত আছেন। ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের কার্যনির্ব্বাহক সমিতিতে তিনি দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি, হাওড়া পারিজাত সমাজ ও বোম্বাই-এর বঙ্গ-সাহিত্য-সভার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অতি অমায়িক ও সদালাপী। এই নিরভিমান জ্যেষ্ঠ সাহিত্যিককে সম্প্রতি পর পর স্ত্রীবিয়োগ ও ভ্রাতৃবিয়োগের গভীর বেদনায় মুহ্যমান করে ফেলেছে। বয়সের ভারে দেহ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, কিন্তু মুখের হাসি ঠিকই আছে। এই বয়সেও পূর্ণ উদ্যমে তিনি 'স্মৃতি-কথা' লিখছেন, মনীষীদের জীবনী আলোচনা করছেন আর নিয়মিত ভাবে সাহিত্য-সভায় যোগদানও করছেন। ভগবান তাঁকে সুস্থ ও শতায়ু করুন।

[মাসিক বসুমতীর পক্ষ থেকে সর্ব্বশ্রী রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী, শতাব্দী সামন্ত, ও কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।]

ছয়

যুদ্ধের সময়কার কথা বলছি।

ঘোড়ার গাড়ী-চালকের আসন থেকে নেমে এসে একজন কানের পাশে গোঁজা বিড়িটা টেনে নিয়ে ফুঁকবার চেষ্টা করতে-করতে বলছে: জানিস সেলিম?—একটা ছোবি এসেছে শহরে, সে বোড়ো জোব্বর ছোবি রে! নাচ-গানের! লেকিন পাবলিক পোসন্দ কোরছে না একেবারে—!

যার কর্ণগোচর করবার জন্যে কথাগুলো বলা সে বিড়ি বাঁধছিলো একমনে। বিড়ি বাঁধতে-বাঁধতেই সে মুখ না তুলেই বললো এবারে: জানি; জানি দোস্ত! নাচ-গানের হাই-ক্লাস পিকচার! লেকিন mass-এ লিচ্ছে না একেবারে!

বাংলা ছবি না লাগলেই mass-এ নেয় না।

এদেশে কে যে mass আর কারা যে আঁতেলেকচুয়াল, কে বলবে? গাড়োয়ান আর বিড়িওলা,—তাদেরও আক্ষেপ: ছোবি mass-এ লিচ্ছে না!

বাংলা ছবি কেন লোকে নেবে, এ-প্রশ্ন কিন্তু কেউ করে না!

বাংলা ছবির প্রোডিউসাররা গ্যাবাডিন পরে; গাড়ী চড়ে; গোল্ডফ্লেকের টিন থেকে বিড়ি ফোঁকে। বানের জলের সঙ্গে আসে; বানের জলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। টাকা এরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে নি; তাই টাকা চলে গেলে এরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে না; পরের মাথায় হাত বুলিয়ে আবার টাকা করবার 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ'—এই বিশ্বাসে ফিরে যায়। পড়ে থাকে এসিষ্টেন্টরা; পড়ে থাকে সামান্য মাইনের মিস্ত্রী-কুলীরা; পড়ে থাকে Crowd-Scene-এ গা দেখানোর জন্যে সুপারের রোলের আশায় সেই সব মেয়েরা, যারা সারা দিন অভুক্ত থাকবার পর শোনে, পাঁচ টাকার পেমেণ্ট, তাও আজ নয়, কাল! কালও নয়; সে টাকার পেমেণ্ট কবে তারা পাবে, বলতে পারেন শুধু 'মহাকাল'।

এই সব প্রযোজকদের টাকা শেষ হয়; ছবি শেষ হয় না।

ছবি শেষ হয় না, কারণ ছবি তৈরী করতে এরা আসে না। এরা আসে আনন্দ করতে। মদ আর মেয়েমানুষ; লক্ষ্য এরাই; ছবিটা উপলক্ষ্য মাত্র! তাই মারা পড়বার জন্যেই থেকে যায় শুধু চলচ্চিত্র-শিল্পের কর্মীরা, সামান্য মাইনে যাদের একমাত্র সম্বল।

সামান্য মাইনে সম্বল এই সব সহকারীরা প্রায়ই শহরে থাকবার সাহস করে না; থাকে শহরতলীতে। এদেরই কেউ কেউ যখন সারা মাস কাজ করবার পর মাইনে না পেয়ে আটের-বি বাস ধরে, যাদবপুরের রাস্তায় তখন হয়ত তাদেরই কেউ কেউ যৌবনের স্বপ্ন সেক্সপীয়র আওড়ায়: **T. B. or not T. B. that is the Question!**

সাত

এতক্ষণ নীরস তত্ত্বকথা শুনিয়েছি, এবারে একটি সরস গল্প বলি।

এ-গল্প হাসির কি কান্নার বলা শক্ত। এ-গল্প গোবিন্দলালের গল্প; 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' গোবিন্দলাল নয়; ফিল্ম-কোম্পানীর সহকারী পরিচালক গোবিন্দ ঢোলের জীবনের গল্প। যদিও গল্প বলছি তবুও ঠিক গল্প নয়। যেমন বিদ্যাসাগরের ভুবন এবং তার মাসীর গল্প গল্প হলেও, ত্রিভুবনে তার চেয়ে নির্মম সত্য আর নেই কিছু, যেমনি গোবিন্দলালের গল্প একজনের সত্য ঘটনা। না; ঘটনা নয় দুর্ঘটনা।

নীলকণ্ঠ

এবং কোনও একজনেরও নয়; এ-দুর্ঘটনা ফিল্ম লাইনে সমস্ত বিভাগের সহকারীদেরই মর্মন্তুদ বেদনার বিরস অভিজ্ঞতা; তিক্ত সঞ্চয়।

গোবিন্দলালের এ-যাত্রা আর রক্ষে নেই।

শেষ ভরসা ছিলো ট্রাম ষ্ট্রাইক, তা-ও তেমন জুতের হলো না। জমতে না জমতেই মিটে গেলো। এমন কি গোবিন্দ তার ট্যাঁক থেকে শেষ ব্যাং-এর আধুলিটা দিয়ে বলেছিলো ষ্ট্রাইকওলাদের; পুজোর ষষ্ঠীর দিন পর্যন্ত অন্তত যদি দোকান-টোকান বন্ধ না রাখতে পারো তাহলে জীবনে আর তোমাদের ঝুলিতে কিছু দিচ্ছি না: এই বারের এই আধুলিটাই আমার শেষ দান (শেষ কথাটা বলতে গিয়ে গোবিন্দ যেন সুর করে লাইনটা গেয়েও দিলো)।

যারা ষ্ট্রাইক করতে বেরিয়েছিলো, তারা অবাক হয়ে শুনছিলো।

তবে যতই অবাক হোক আধুলিটা নিতে তাদের ভুল হয় নি। এবং একবার আধুলিটা দেওয়া হয়ে গেলে তারা আর দোকান বিশেষ করে কাপড়ের দোকান কেন বন্ধ রাখতে হবে, সে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবাটা সময়ের অপব্যয় মনে করে এগিয়ে পড়েছে: ট্রামের ভাড়া বাড়ানো চলবে না! চলবে না!

এই চলবে না কথাটা গোবিন্দর ভারি মনে ধরেছে।

সত্যিই আর চলবে না। কী করে চলবে! মুদির দোকান ধার পাওয়া যেতো; এখন র‍্যাশান! তখন শুধু বউ ছিলো; এখন বউ প্লাস চারটি ছেলেমেয়ে। সম্বলের মধ্যে ফিল্ম কোম্পানীর একটি চাকরী। ফিল্ম কোম্পানীর আবার অদ্ভুত ব্যবস্থা! বছরে তিনবার মাইনে। বাকী ন'বারের মধ্যে তিনবার মাইনে বাকী থাকে; এ বছর ও বছরে

brought forward হয়। বাকী হু'বার আজ দু'টাকা কাল চার টাকা করে (রবীন্দ্রনাথের সেই : সে কি এলো, সে কি এলো না, বোঝা গেলো না) মাইনেটা শেষ পর্যন্ত পুরো আদায় হয় কি না মনে থাকে না! এর ওপরেও আছে ; শ্রীচৈতন্তের 'এহ বাহু'র মতো তার আর ইয়ত্তা নেই। ইুডিওতে প্রায়ই গোবিন্দকে ম্যানেজ করতে হয়। গোবিন্দ হচ্ছে সহকারী ; তাই ম্যানেজ করাটাই তার একমাত্র কাজ, এই ম্যানেজ করার ইতিহাস-ভূগোল দুই-ই আছে। ইুডিওতে গোবিন্দর যিনি স্তর অর্থাৎ যিনি একাধারে পরিচালক এবং প্রযোজক তার টাকা সব সময়ে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছয় না। তার আবার কারণ আছে। প্রযোজক-পরিচালক যেখান থেকে টাকা আনেন তার সেই ডিষ্ট্রিবিউটর আবার একা নন, তার পার্টনার আছে। পার্টনারের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় না। কাজেই একটা সই কখন হয়ে যায়, কিন্তু আরেকটা সই কখনই হতে চায় না। ডিষ্ট্রিবিউটর প্রায়ই বলে: ভেরি সরি! আজকের দিনটা চালিয়ে নিন ; সোমবার ফার্ষ্ট আওয়ার ডেফিনিট (এ-সব ক্ষেত্রে মাঝের দিনটা প্রায়ই রোববার পড়তে দেখা যায়) ; সোমবার ফার্ষ্ট আওয়ার মানেই মঙ্গলবার লেট আওয়ার্সে বেস্পতিবারের একটি পোষ্টডেটেড চেক পাওয়া ; যেটি জমা দেবার আগে ডিষ্ট্রিবিউটরকে একবার ফোন করে যেন জেনে নেওয়া হয় যে, জমা দেওয়া যাবে কিনা, কারণ চেক বার বার ফেরত যাওয়াটা প্রেষ্টিজে লাগে। অতএব গোবিন্দর 'স্তর'কেও ফিরে এসে গোবিন্দকে বাধ্য হয়েই বলতে হয়: গোবিন্দ, আজকের দিনটা ম্যানেজ করে নিতে হবে। অনেক সময়েই অবশ্য বলতেও হয় না ; মুখ দেখেই গোবিন্দকে আঁচ করে নিতে হয়। গোবিন্দ তারপরেও দাঁড়িয়ে থাকলে 'স্তর' রুষ্ট হন। এত বড় একটা আশু কর্তব্যের ভার অন্য কারুর ওপর না দিয়ে তার ওপর দেওয়া সত্ত্বেও কেন গোবিন্দ নিজেকে এখনও কৃতার্থবোধ করছে না। প্রোডিউসার-ডিরেক্টরের চোখে সেই রক্তিম জিজ্ঞাসা। এবং গোবিন্দকে এগিয়ে পড়তেই হয়।

পাঁচ টাকার এক্সট্রা রোলের মেয়েকে আসছে ছবিতে নায়িকার রোল নির্ঘাত,—এই আশ্বাস বাণীতে ভুলিয়ে, খাবারওলাকে এখনও হিসেব হয়নি বলে ধমকে, ড্রেস এবং সেটের টুকিটাকি সাপ্লায়ারকে 'কাল সকালেই যাচ্ছি'র প্রতিশ্রুতিতে নিরস্ত করে, আর কথা বলবার সময় দেয় না গোবিন্দ। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ফিল্ম কোম্পানীর এসিষ্টেন্টের চাকরীর লাঞ্ছনা ছোট গল্পে খতম হবার পাত্র নয় ; আধুনিক বাংলা বইয়ের মতো ওপরে ফাঁকা-নীচে ফাঁকা, আঠারো লাইনে এক পাতা, পরিচ্ছেদ সুরুতে আধপাতা খালি শেষে ঁ পাতা শূন্যে ছোট গল্পকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে একশো আটাশ পাতার উপন্যাস নয় এই লাঞ্ছনার ইতিহাস। এ একেবারে যাকে গিয়ে বলে থান ইট ; সুবল মিত্রের অভিধান।

তাই এতো সবের পরেও ডিরেক্টরের দশ বছরের ছেলেকে রাতের বেলায় অঙ্কটা একটু দেখিয়ে দিতেই হয়। এবং সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই ছাত্রের সোজা প্রশ্ন: তোমাদের রাতে আবার শুটিং আছে বুঝি! গোবিন্দর অবাক উত্তর: কই না!—হ্যাঁ আছে ; তুমি জানো না। মাষ্টারকে ছাত্র সংশোধন করে (বাবার এসিষ্টেন্ট মাষ্টার মশাই হলে তাঁকে তুমি বলাই নিয়ম কি না!) : এই ত' বাবা গাড়ী করে অঞ্জনাদীকে নিয়ে গেলো ; মাকে যাবার সময় বলে গেলো—শুটিং আছে ; ফিরতে দেরী হবে। অগত্যা গোবিন্দকে বলতেই হয়: হ্যাঁ! হ্যাঁ! একটু বাকী ছিলো কিনা! ও তুমি বড় হ'লে বুঝবে ; ওকে বলে প্যাচ শট!

এ-সব ভাবনা চুলোয় যাক ; এখন সবচেয়ে বড় ভাবনা গোবিন্দর: সামনে দুর্গাপুজা। এই মুহূর্তে যাঁর ওপর গোবিন্দর সব চেয়ে রাগ হয় তিনি হলেন শ্রীরামচন্দ্র। কী দরকার ছিলো তাঁর মাকে অকালে জাগাবার! তিনি ত' না হয় চোখ উপড়ে একরকম বেঁচে গেছেন। এখনকার এই পুজা বাজারের দুশ্চিন্তা তাঁকে করতে হয় নি। হার্ট উপড়ে ফেললেও এ বাজারে কেউ এক পয়সা উপুড় হস্ত করবে না। ওদিকে বাড়ীতে দিনের পর দিন উপোস করে কাটাও ; দাঁতে কাঠি গোঁজো ; তবুও পুজা বাজার করা চাই-ই। তুমি নিজের জন্তে কিছু যদি না কিনতে পারো, ছেলেমেয়েদের গায়ে অন্ততঃ ওঠা চাই ; না উঠলে তোমার বউ-এর সঙ্গে ওঠা-বসা ঘর করা অসম্ভব ; পাড়ায় বেরুনো লজ্জাকর। বুড়ো বাপ টিঁকে থাকলে তোমাকে একথা শুনতে হতোই যে তিনি পুজোর সময় সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে উজাড় করে দিতেন ; উজাড় করে যে দিতেন একথা কে অস্বীকার করবে? উজাড় করে না দিলে আজ তাঁর ছেলের এ হাল হবে কেন?

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠলো গোবিন্দ অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে। ঘুম থেকে উঠে দেখলো, বউ খবর-কাগজ পড়ছে। খবর-কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বউ জিজ্ঞেস করল: এবারে পুজায় তাহলে কাপড় কেনা হচ্ছে না?

বোধ হয় না—গোবিন্দর স্বর প্রাত সময়েই যা হয়, বউএর সামনে তেমন মিইয়ে পড়া নয় কিন্তু।

আমি জানতাম!—গোবিন্দপ্রিয়া বললো: কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যে টাকা রেখেছিলাম, সেগুলোও যদি তুমি না নিতে ত' পুজা-বাজার আমি চালিয়ে দিতাম। আজ বিয়ের পর এই ক'বছর তোমায় কত টাকা দিয়েছি জানো? নিজে ত' ঝিয়ের অধম ছেঁড়া কাপড় পরে চালাচ্ছি ; তার জন্তে তোমায় কিছু বলেছি কোনদিন? কিন্তু ছেলে-মেয়ে? সারা বছর এই দিনটার মুখ চেয়ে তারা বসে আছে ; তাদের কী বলব?

আ-হা-হা—গোবিন্দ যতটা সম্ভব বাঘের মুখে পড়েও চেঁচিয়ে ওঠে: তুমি বুঝবে না ; শুনবে না ; শুধু-শুধু চেঁচাবে। পুজার কাপড় কেনা হবে না, টাকার অভাবে নয় ; দোকানপাট বন্ধ থাকবে বলে।

'কেন'? ছোট প্রশ্ন ও-তরফের। আর কেন? ট্রাম ষ্ট্রাইক চলছে না? তাদের লোকেরা নিজে আমায় বললে, দোকান পাট সমস্ত বন্ধ করিয়ে দেবো—

তাই নাকি?

তবে আর কী বলছি! এবারে একটু আগে থেকেই, এখনই কাপড়-চোপড়গুলো কিনে রাখবো ভেবেছিলাম ; দাম কম থাকতে-থাকতেই সারতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এই ষ্ট্রাইকই তার দফা সারলো। একদমে কথা বলে গোবিন্দ একজনে তার স্ত্রীর

অজন্তার পথে

—সুধাংশু পাইন

বহরমপুর কলেজ —চন্দন চক্রবর্ত্তী

আলোকচিত্র

অজযুদ্ধ —তৃপ্তিশেখর দত্ত-রায়

রামেশ্বরম্ (মাদ্রাজ)

—ভুবনেশ্বর পাণ্ডে

ক্যাথিড্রাল (ময়দান, কলিকাতা) —মাখনলাল সাহা

পরিতোষ মিত্র
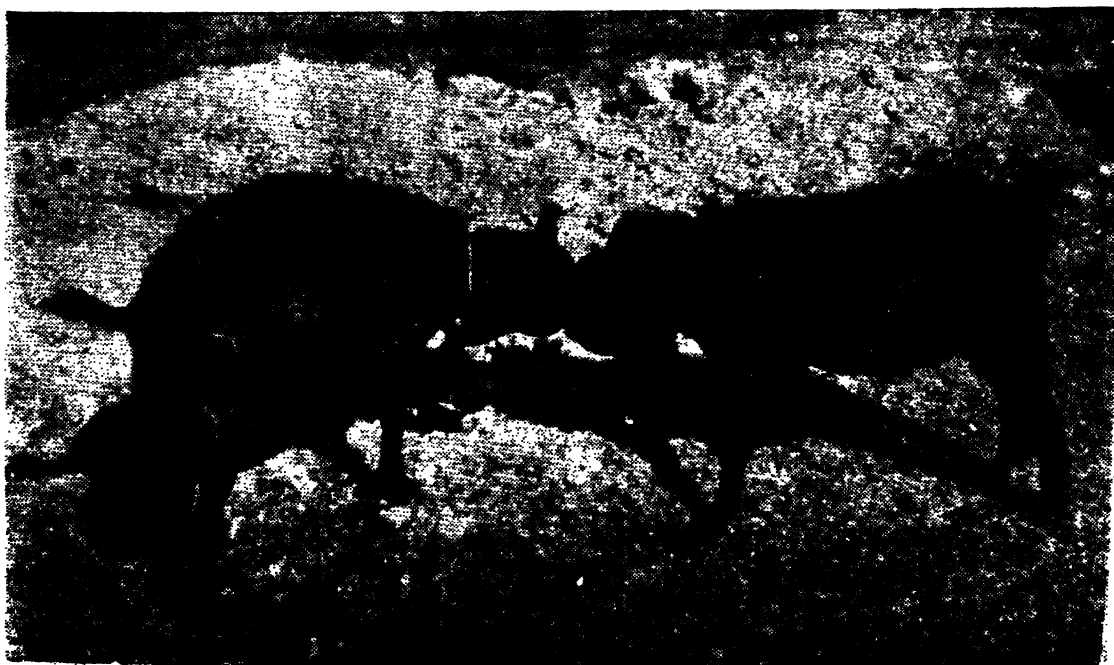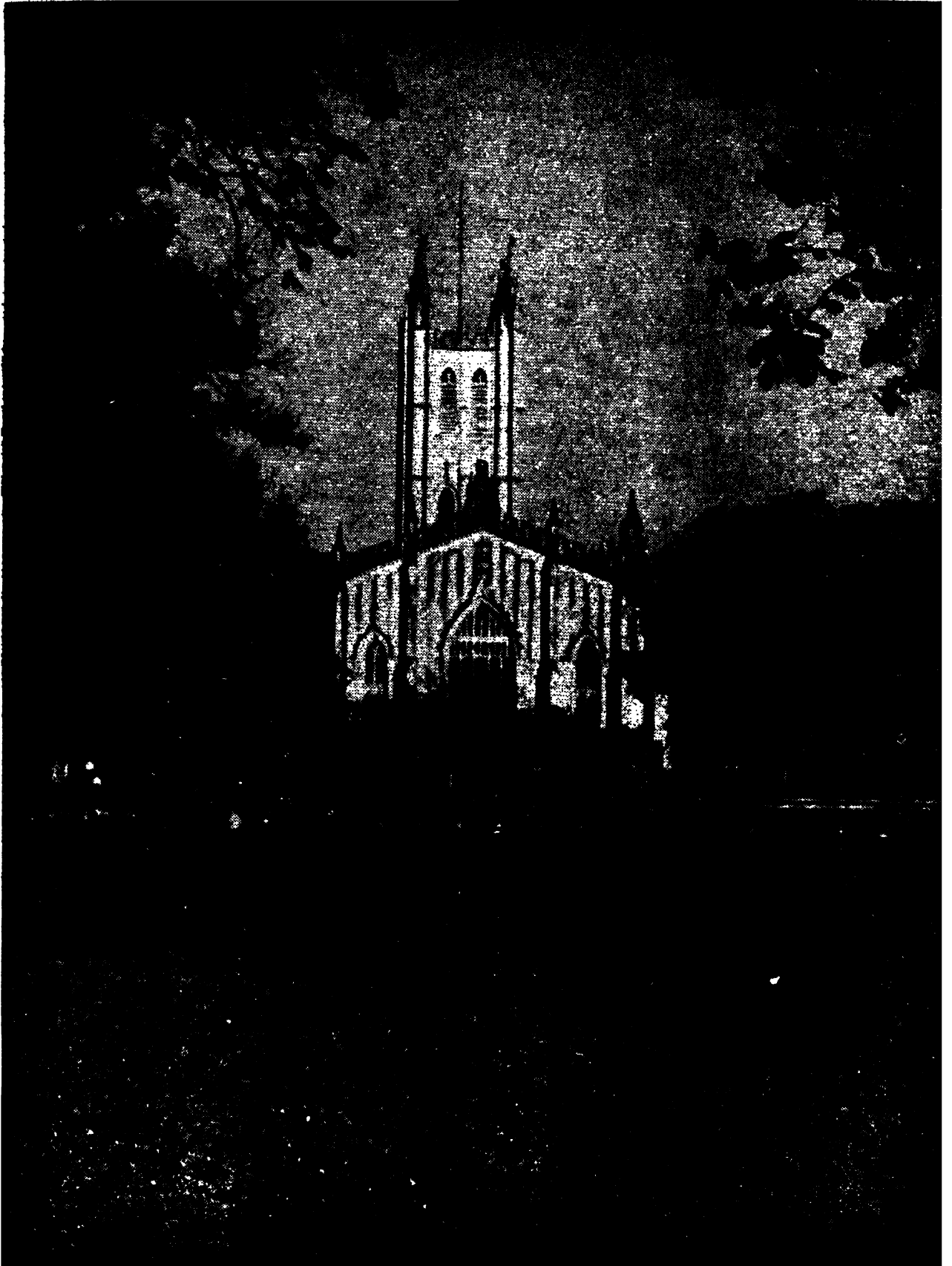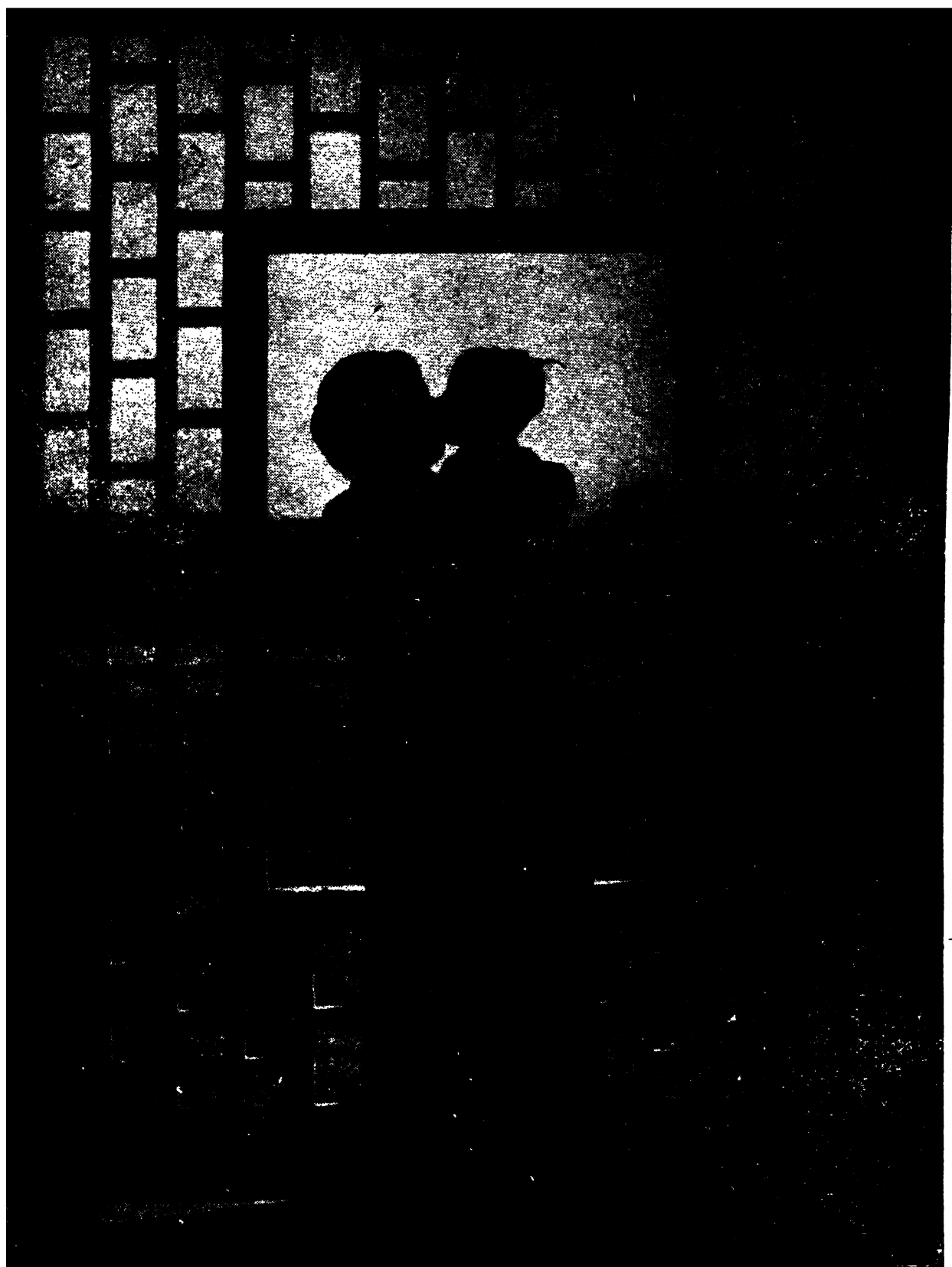
মুখের দিকে তাকায়; লক্ষ্য করতে থাকে। কিন্তু সেখানে বাংলা ছবির নায়িকার নয়, স্থাকাবিকার মতোই কোনও এক্সপ্রেশন নেই।

কিন্তু ষ্ট্রাইক হচ্ছে ত' ট্রামভাড়া কমানোর জন্যে; তাতে কাপড়ের দোকান বন্ধ থাকবে কেন?

সে কথা কে বলে? ওকে বলে চাপ দেওয়া; কাপড়ের দোকান বন্ধ করো, ব্যস! লোকে গভর্ণমেন্টকে বাধ্য করাবে ট্রাম কোম্পানীকে শায়েস্তা করতে। তবে যতই করুক ষষ্ঠীর দিন দোকান খোলাতে না পারলে সরকারেরও সাংঘাতিক বিপদ আছে; এত বড়ো পুজো, সে ত' আর কাপড়ের জন্যে আটকে থাকতে পারে না?

তাহলে ষষ্ঠী পর্যন্ত কোন উপায়ই নেই?

তাইত' দেখছি।

দেখো; আমি তোমার চা নিয়ে আসি।

গোবিন্দ খবর-কাগজ দেখতে বসলো। প্রথম পাতার প্রথম খবর: কোলকাতা ট্রামভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন প্রত্যাহার!

এর পর আর খাটে বসে থাকা যায় না। ফুটপাথে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বার আগে শেষ চেষ্টা করে দেখবার মহৎ উদ্দেশ্যে গোবিন্দ তার পরের দিন ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে পড়ে 'স্যরের' বাড়ীর দিকে। সূর্য উঠবার এবং কাক-পক্ষী টের পাবার আগেই। কারণ, কাকে পক্ষীতে টের পাবার আগেই 'স্যর' কেমন করে না জানি টের পান যে পাওনাদার আসছে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ে যায় এখন আর হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে! ব্যস! তারপর সারাদিন আর 'স্যরে'র পাত্তা কে পায়। আজ দশ বছরের অভিজ্ঞতায় তার খাড়া হয়ে যাওয়া চুলে গোবিন্দ তা' ভালো করেই জানে। 'স্যর'-এর বাড়ী পৌঁছে শুনলো তিনি ঘুমোচ্ছেন। যাক! নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো তবু; স্যর বাড়ী আছেন। গোবিন্দও বাইরের ঘরের চেয়ারে একটু গা হেলালো। এবং সেই তার কাল হলো। ঘুম থেকে উঠে শুনলো 'স্যর' বেরিয়ে গেছেন। 'স্যরে'র ছেলে বললো: বাবা তাকে ঘুম থেকে তুলতে বারণ করেছিলেন; গোবিন্দ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এই জন্যে। গোবিন্দ যেন আপিসে দেখা করে। স্যর বুঝতে পেরেছেন গোবিন্দ কি জন্যে এসেছে।

বুঝতে যখন পেরেছেন গোবিন্দও তখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলো, স্যর আর যেখানেই থাকুন আপিসে নেই। কাজেই বেলা তিনটে নাগাদ হাইকোর্ট পাড়ার এক মিষ্টির দোকানে গিয়ে স্যরকে গোবিন্দ ঠিকই পাকড়াও করলো। 'স্যরে'র একটা গুণ হচ্ছে, গোবিন্দ বরাবরই লক্ষ্য করেছে, স্যর কোনও অবস্থাতেই, কিছুতেই অপ্রতিভ হন না। তাই গোবিন্দকে দেখেই স্যর সাদর অভ্যর্থনা জানাতে কিছুমাত্র কসুর করেন না; আপিসে বলে এসেছিলাম তুমি গেলেই এখানে পাঠিয়ে দিতে; বলেনি কিছু? গোবিন্দ হ্যাঁ-না কিছুই না বলে চুপসে গিয়ে বসে পড়ে: সামনে যে আসন পায় তাতেই।

নাও, নাও খাও কিছু;—স্যর সদয় হ'ন। গোবিন্দ খায় বটে কিন্তু খেতে খেতে কুঁকড়ে যায়; এর পরের অধ্যায় তার মুখস্থ। স্যর পান চিবুতে চিবুতে মূক-বধির মুদ্রায় জিজ্ঞেস করেন: কত? তিন টাকা বারো আনা বিল হয়েছে মোট।

গোবিন্দ, আমার কাছে এখন খুচরো নেই—ওটা দিয়ে এসো। স্যর মোটে দাঁড়ানই না। রাস্তায় নেমে জিজ্ঞেস করেন: তোমার কত দরকার? আজ্ঞে! দেড়শো!—গোবিন্দর গলা দিয়ে কোনও রকমে এইটুকু বেরোয়। কবে দরকার?—আজই; না হলে বাড়ী ঢুকতে পারবো না!—এসো, দেখি কত দূর কি করা যায়?—স্যরের মুখে মাভৈঃ শুনে যদিও গোবিন্দ তেমন ভরসা পায় না, তবু এগোয়।

স্যরের পেছন-পেছন সারাদিন। প্রথমে স্যর বড়ো ট্যাক্সী করে বেরুলেন বেবী ট্যাক্সী ধরবার জন্যে। বেবী ট্যাক্সী যখন পাওয়া গেলো তখন বড়ো ট্যাক্সীতে ভাড়া উঠেছে তিন টাকা কত যেন; গোবিন্দ বিমূঢ়। কিন্তু স্যর কিংকর্তব্যবিমূঢ় নন মোটেই। গোবিন্দ ষতক্ষণে ভাবছে তার কাছে চার আনা; স্যরের কাছে কিছুই নেই; এবারে তাহলে?—ততক্ষণে স্যর বেবী ট্যাক্সীওলাকে বড়ো ট্যাক্সীর ভাড়া চুকিয়ে দিতে বলে সীটে বসেছেন। সারাদিন এ-আপিস ও-আপিস। রাত এগারোটায় বাড়ী পৌঁছলেন যখন তখন সতেরো টাকা চার আনা উঠেছে ভাড়া। স্যর ওপরে উঠে গেলেন গোবিন্দকে নিয়ে, বার করলেন একটা থলি। দেখে গোবিন্দের ধড়ে প্রাণ এলো। থলিটা খুলে ধরতেই প্রাণ আবার উড়ে গেলো; ধড়টা আগের মতোই ছটফট করতে লাগলো। থলিতে শুধু দু'পয়সা এক পয়সা! স্যর বললেন ওর থেকে গুণে ট্যাক্সীর ভাড়া দিয়ে আসতে। গুণে শেষ করতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে। নীচে ভাড়া দিতে গিয়ে দেখে মীটারে ভাড়া উঠেছে আরো বেশ কিছু।

অতঃপর স্যর একটা দেড়শ' টাকার চেক লিখে গোবিন্দের হাতে দিয়ে বললেন: এটা জমা দিও না। তবে?—গোবিন্দর অন্তিম জিজ্ঞাসা! স্যরের জবাব সঙ্গে সঙ্গে: ওটা এখন তোমার কাছে রেখে দাও; পঞ্চমীর দিন সকালে আমার কাছে এসো; টাকা এখান থেকেই পাবে; ওটা ফেরৎ দিয়ে দিও তখন।

গোবিন্দ রাত একটায় বাড়ী পৌঁছে স্ত্রীকে জানালো; টাকা পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত চেক ভাঙাবার চেষ্টাও করবে না ঠিক করে নিয়েছে সে। স্যরের কাছেও আর যাবে না। গোবিন্দ তার কিংকর্তব্য এত দিনে জেনেছে। তার মুখে এখন বুদ্ধের প্রশান্তি! গোবিন্দর বউ ঘাবড়ে গেছে। গোবিন্দর মাথা খারাপ হয়ে যায়নি ত'? নাঃ! দূর সে কি যা-তা ভাবছে! গোবিন্দর মাথা খারাপই ত' ছিলো বরাবর; মাথা তাহলে ঠিক হয়ে যায়নি ত' হঠাৎ! মুখ দেখে মনে হয় যেন ব্যাঙ্কে কি সিন্দুকেও নয়; টাকাটা ট্যাঁকেই গোঁজা আছে, বললেই বার করে দেবে। অথচ এ-ক'দিনের বাজারও পুরানো কাগজ বেচে; ধার করে; বাকী রেখে চালাতে হচ্ছে! তবুও গোবিন্দর মুখে নেই কোনও দুশ্চিন্তা! নেই এতটুকু ভয়ের আভাস! এমন কি এতটুকু তাড়াহুড়ো, ছুটোছুটির প্রচেষ্টা পর্যন্ত নেই টাকা জোগাড়ের! তাহলে?

পঞ্চমীর দিন বিকেল বেলায় গোবিন্দ বেরুলো বউ ছেলেমেয়ে সমেত। রাস্তায়ও গোবিন্দর সেই এক ভাব। গোবিন্দর বউ আর থাকতে পারলো না।

কী গো! কোথায় যাচ্ছ? বাজার ত' এদিকে নয়?

না; গোবিন্দর ছোট জবাব। ঠিক আছে; এসো।

সামনেই চার্চের ছোট গেট। সটান গোবিন্দ তার ভেতরে। পাদরী বাবা সেখানে চোখ বুঁজেই টের পাচ্ছেন সব।

তাহলে যীশু তোমাদের প্রেম করেছেন ?

না।

তবে ? খৃষ্টধর্মে গৃহীত হইতে আস নাই ?

হ্যাঁ।

তবে কেন বলছ যীশু প্রেম না করেছেন ?

এবারে গোবিন্দ ব্যাপারটা খোলসা করে; খোলসা করে বলতে বাধ্য হয়; যীশুর প্রেমে নয়; পুজো-বাজারের হাত থেকে বাঁচবার জন্তেই আসা। আমাদের পুজো না করলেও চলে কিন্তু পুজো-বাজার না করলে অচল! তারপর গোবিন্দ বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে: তবে আমাদের এই ধর্মান্তর টেম্পোরারী মাত্র! ডিসেম্বরে যীশুকে ভালোবাসার জ্বালাও কম নয়! তখন আবার বড়দিনের বাজার: কাজেই আবার কেঁচে গণ্ডুষ! তখন আবার প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু হওয়া।

কিন্তু ও কি? গোবিন্দ বলতে বলতেই দেখে, পাদরী বাবা ঢলে পড়েছেন চেয়ারে; আর খাড়া নেই। কী যেন বলছেন!—কান পেতে শুনলো গোবিন্দলাল; বুকের ওপর কান পেতে।

শুনলো, তিনি বলছেন: আমেন! আমেন! আমেন!—ইহলোকে সেই বুঝি পাদরী বাবার শেষ কথা।

আট

গোবিন্দর সম্পূর্ণ ইতিহাসটুকু পড়বার পরও যারা একে নিছক গল্প বলে হেসে উড়িয়ে দেবে, তাদের অবগতির জন্তে উদ্ধার করে দিচ্ছি এখানে একখানা চিঠি। এই চিঠিটা লিখেছেন ভারত-বিখ্যাত এক পরিচালকের সেদিন পর্যন্ত সহকারী ছিলেন, বর্তমানে নিজে পরিচালনা করছেন এমন একজন ভূতপূর্ব সহকারী পরিচালক। চিঠিটা লেখা ফিল্মজগতের পয়লা নম্বরের একজন প্রচারবিদকে। চিঠিটা যেমন বানানো নয়, তেমনি এর একটি লাইনও অদলবদল করা হয়নি। হুবহু তুলে দিলাম:

'সু'—দা',

আপনার দু'খানা চিঠিই পেয়েছি। এখানে এই একাকীত্ব এবং অজস্র দুর্দশার মধ্যে ওখানকার কোন চিঠি এলেই খুব ভালো লাগে। যে কাজটার কথা লিখেছেন—আমি গিয়ে যেন সেটা পাই,—একটু লক্ষ্য রাখবেন। টাকা পয়সার ব্যাপারে আপনি যা করবেন তাতে আমার কোনও আপত্তি হবে না। কারণ কাজ পাওয়াটাই এখন আমার কাছে বড়ো কথা। আমার যেতে বোধ হয় আরো ৭।৮ দিন হবে।

এরকম ঘোরপ্যাঁচের পাল্লায় জীবনে কখনো পড়িনি। এক মাসের ওপর এডিটিং শেষ করে বসে আছি। Re-recording বাকী আছে; সে যে Producer কবে শেষ করবেন ভগবান জানেন! কিম্বা ভগবানও জানেন না মিঃ 'বি'-এর সঙ্গে এতদিন কাজ করে এত রকম প্রোডিউসার দেখলাম; কিন্তু এমনটি আর দেখিনি কখনো। কোট-প্যান্ট জুতো নিয়ে গোটা মানুষটার ওজন হবে খুব বেশী হলে ৫৫ পাউণ্ড। অথচ সর্বত্র সর্বদা দু'জন রক্ষিতা থাকে দু'পাশে। কী যে করে তা ঐ জানে!

এ তো গেলো ভূগোল। লোকটার ইতিহাস সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, যথাযথ লিপিবদ্ধ করতে হ'লে শরৎ বাবুর মতো লোকও হালে পাণি পেতেন না; আর তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ব্যাপারে সে ফ্রয়েড সাহেবকেও মাথা চুলকোতে হতো, এ আমি হলফ করেই বলতে পারি। এই তো হচ্ছে আমাদের প্রোডিউসার।

মিঃ বি, এখান থেকে চলে যাবার পর Marine Drive থেকে দাদার যে বাড়ীতে আমরা এসে উঠলাম—সে বাড়ীটা এক কাঠা জমির ওপর দাঁড়িয়ে! বাড়ীটা সত্যিই কেউ তৈরী করেছিলো—না কোন এক সময়ে ব্যাঙের ছাতার মতো আপনিই মাটি ফুঁড়ে গজিয়েছে তা' বাস্তবিকই একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকদেরই জোরালো গবেষণার বিষয় হতে পারে। বাড়ীটার shape কোনও জ্যামিতিক চৌহদ্দীর মধ্যে আনতে হলে Euclid সাহেবকে ডাকার দরকার। সমস্ত বাড়ীটার আগাপাছতলা বগল-কুঁচকীতে মিলিয়ে প্রায় ছ'সাত ঘর ভাড়াটে। এরই মধ্যে দুটো খুপরীতে আমি আর সস্ত্রীক 'বিজ' থাকি। এখানে পণ্ডিত ভি যুদ্ধের বাজারে film co-র অফিস খুলেছিলেন। তারপর অফিস উঠে যায়; চোরা'বাজার থেকে কেনা নারকোল ছোবড়া বের করা furniture সমেত ঘর দু'খানা পণ্ডিতজীর হেফাজতেই থেকে যায়। আমার ঘরটার কথাই বলি।

সাধারণতঃ স্বাভাবিক ঘরের সীমারেখা ৪টি সরলরেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকে; কিন্তু এর আয়তন নির্দেশ করা হয়েছে ৭টি সরল এবং ২টি বক্র রেখায়। ৮'×২'×৪।'×৮'×১২'······অনেকটা এই রকম। বিলিয়ার্ড টেবলের চারদিকে যেমন গর্ত থাকে, ঘরের মেঝের চারদিকে তেমনি অনেকগুলো গর্ত আছে। ইঁদুর আর ছুঁচোর underground highway! দেওয়ালের সর্বত্র relief ম্যাপের নদীর মতো উইপোকার কর্মতৎপরতার স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানা পেতে শোয়া একটা বিচিত্র অনুভূতি! নব-বিবাহিতের ফুলশয্যাতেও এত কাণ্ড কারখানা করতে হয় না। ঘরের মেঝেতে আমার ছোট বিছানা পাততে হলে যেটুকু জায়গার প্রয়োজন তার জন্য ঘরের স্খলিতপায়া, গলিত কভারওলা ফার্নিচারগুলোর কাউকে দাঁড় করিয়ে, কাউকে পাশ ফিরিয়ে, হাঁটু গাড়িয়ে, উপুড় করিয়ে সুরাহা করতে হয় তবে! অন্ধকারের মধ্যে মনে হয় সব যেন বিচিত্র যোগাসনে ধ্যানমগ্ন। এত কাণ্ড কারখানা করে শোবার পরেও শান্তি নেই; ঘুমের ঘোরে যদি বেকায়দায় কোথাও পা বা হাতের ধাক্কা লাগে তবে ধ্যানরত ক্রুদ্ধ ঋষির মতো যে কোনও একটা চেয়ার বা টেবল আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আপনি আলো নিবিয়ে শোবার একটু পরই দেখতে পাবেন, আপনার বুকের ওপর মাকড়শা আর আরশোলায় হাডুডু খেলছে; ছুঁচো রেফরীর কাজ করছে! দেওয়াল থেকে একজোড়া টিকটিকি ল্যাজ ঝামড়া মেরে বলে উঠছে: বাহবা! বহুৎ আচ্ছা! এ সবের পরেও যদি আপনার চোখের পাতা ঘুমে ঢুলে আসে তাহলে তখুনি তা আবার খুলে যাবে ভগবৎ নামকীর্তন শুনে: রামনাম সাচ হ্যায়! (chorus) বাড়ীর কাছেই শ্মশান। পাঁচ মিনিট অন্তর রামনাম স্মরণ করিয়ে দেয়! জীবন অনিত্য!

এর পর আজ পনেরো দিন থেকে সুরু হয়েছে বৃষ্টি; বিরামবিহীন বৃষ্টি! বৃষ্টির জলো হাওয়ায় রসস্থ হয়ে ছাতাটার বাঁট ফুলে গেছে; ছাতা আর খোলা যায় না। তা না যাক! দুঃখ ছিলো না! হঠাৎ পরশু দিন বিকেল পাঁচটায় আমাদের এই ঐতিহাসিক বাড়ীটার

অর্ধেক ধ্বসে গেলো। আমাদের বাথরুমের দেওয়ালে তিন ইঞ্চি ফাঁক। corporation-এর লোক এসে নিরাপদ জায়গায় উঠে যেতে বলেছে! তিন দিন পায়খানা-স্নান বন্ধ। আমার ঘরে আমাদের মাল-পত্তর সমেত আমি আর সস্ত্রীক 'বিজ' রাত কাটাচ্ছি! কবে যে এ রাত শেষ হবে?—ইতি 'অ'। বোম্বাই।

যে-জগতে একদল লোক উড়োজাহাজে স্বাস্থ্য বদলাতে যায়; এয়ারকণ্ডিশাণ্ড ঘরে ঘুমোয়; মদ খায়; মেয়েমানুষ রাখে নগদ মূল্য না দিয়ে; মাননীয় রাজ্যপালের বাড়ীতে জলসা করে; ক্রিকেট খেলার নামে body parade; সে রাজ্যেরই আরেক দলের লোক কেমন করে বেঁচে মরে আছে,—এ চিঠি তার স্বাক্ষর নয় শুধু—রক্তাক্ত দলিল!

নয়

সুস্থমস্তিষ্কে একথা কল্পনা করাও কি সম্ভব যে মোহনবাগানের গোলে খেলছে মান্না, ব্যাকে সাত্তার, হাফে কে পাল, সেণ্টারে রতন সেন কি গুহ? ভাবা অসম্ভব। কিন্তু এমনটা ভাবা শুধু দুরূহ নয়, হাস্যকরও। অথচ বাংলা ছবির রাজ্যে এই হাস্যকর পরিস্থিতিই এত স্বাভাবিক যে তার উল্লেখ করাটাই হাস্যকর; আসল ব্যাপারটা সর্বজনগ্রাহ্য। যিনি গল্প লিখতে পারেন তিনি হন পরিচালক; যিনি পরিচালনায় পারদর্শী তিনি গল্পলেখক এবং চিত্রনাট্যকার ত' বটেই, কখনও কখনও প্রধান ভূমিকাভিনেতাও বটে। চিত্র-সম্পাদক অথবা আলোক-চিত্রকর হিসেবে যৎকিঞ্চিৎ নাম করতে পারলেই আর পরিচালক হতে কিছুমাত্র আপত্তি ওঠারই কথা নয়। এমন কি, কেবলমাত্র অভিনয়-প্রতিভা সম্বল করে পরিচালনা করতে এগিয়ে আসার মহৎ দৃষ্টান্ত বিরল নয় এ-রাজ্যে। শুধু এগিয়ে আসা নয়, কখনও কখনও তার আকর্ণ দন্তবিকাশও ইদানীং আমাদের দৃষ্টির অগোচর নেই। আর প্রোডিউসার-পরিচালক? সে যার টাকা আছে সে-ই হতে পারে; যার টাকা নেই তারই বা হতে বাধা কোথায়?

এই সব কথা তুলতে গেলেই শুনতে হয় কেন চার্লি চ্যাপলিন কি একাধারে সব নয়? যেমন নাকি এদেশে যেই ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে না তারই সান্ত্বনা, 'রবীন্দ্রনাথ'। বাংলা ছায়া-চিত্রশিল্পের সঙ্গে তার জন্মকাল থেকে জড়িত ধীরেন গাঙ্গুলী যার আরও পরিচিত নাম হলো ডি-জি;—একবার হাত ভেঙ্গে হাসপাতালে ছিলেন। কেন কে জানে, তাঁকে অজ্ঞান না করেই তাঁর হাতের ভাঙ্গা হাড় জোড়া হচ্ছিলো। যিনি জুড়ছিলেন তিনি আজকালকার হাসপাতালের ডাক্তার নন; তাই সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞেস করছিলেন, আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে মিঃ ডি-জি? আজ্ঞে না! হাস্যরসিক ডি-জি 'ডায়ালগ' বলেন কাঁদতে-কাঁদতে: এ আর এমন কি কষ্ট? আমাকে বাংলা দেশের ফিল্ম-ষ্টুডিওতে কাজ করতে হয় যে রোজ; তার তুলনায় এ আর এমন কি?

ঠিক। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন; রবীন্দ্রনাথ বিদেশে বক্তৃতা দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পেয়েছেন সম্মান-উপাধি। তবুও যে বাঙালী নয়, সে বুঝবে না রবীন্দ্রনাথ একটা গোটা দেশ এবং জাতের জন্যে কি মনুষ্য-অসাধ্য কাজ এক-জীবনে করে গেছেন! কোন পঙ্ককুণ্ড থেকে হাত ধরে তাকে জগত-সভার কোন আসনে বসিয়ে গেছেন, প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন কোন পৃথিবীতে তাঁর একক প্রচেষ্টায় এ-বাংলা ভাষা কারুর মাতৃভাষা না হলে বাঙালী কারুর স্বজাতি না হলে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

ঠিক যেমন সম্ভব নয় কলকাতার কোনও ফিল্ম ষ্টুডিওর সঙ্গে দীর্ঘকালের প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলে পুরোপুরি উপলব্ধি করা সেই অবিশ্বাস্য অসম্ভব অলৌকিক 'সত্য ঘটনা'; অর্থাৎ অসংখ্য ব্যর্থ ছবির গড্ডলিকা-চ্যুত হয়ে কোনও ছবি যখন সত্যি-সত্যি 'ছবি' হয়ে ওঠে, যখন সে জীবন্ত মানুষের মতো কথা কয়; গান গায়, হাসায়, কাঁদায়, আমাদের দিনরাত্রির সত্তাকে করে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন, পারিপার্শ্বিককে বিস্মৃত, আনন্দের তুরীয়লোকের আবরণকে হঠাৎ উন্মোচিত, তখন সেই অলৌকিক অথচ অলীক নয় এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতায় কলকাতার ফিল্ম ষ্টুডিওর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কারুর পক্ষে ছাড়া হতবাক হওয়া শক্ত। তাই, বাংলা সাহিত্যে 'পথের পাঁচালী' যত বড় সৃষ্টিই হ'ক বাংলা ছায়াচিত্রের ইতিহাসে 'পথের পাঁচালী' শুধু সৃষ্টি নয়, এমনই এক বিস্ময় বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।

তবুও গণমানসে 'মা'য়ের ওপরে আজ সিনেমার জায়গা। স্বর্গের চেয়ে অনেক গরীয়সী ছায়াচিত্রগৃহ। ঘরের রমণীর চেয়ে অনেক রমণীয় আজ ফিল্ম-ষ্টার। আবালবৃদ্ধগণিকার ধ্যান-জ্ঞানে আবালবৃদ্ধবনিতার আজ ঘুম নেই ঘরে ঘরে। বিয়ের পিঁড়ে থেকে পূজার মণ্ডপ পর্যন্ত এদের আসন আজ সর্বত্র। 'বালা'দের 'দেবী' বানিয়েই নিস্তার নেই। 'দেবী'দের মুখচোখও আজ 'বালা'দেরই মুখের আদলে গড়ে তবেই তৃপ্তি। পূজার মন্ত্র নয়; সিনেমার গান। আরতির নয় কাঁসর, ঘণ্টা নয়। লাউড স্পীকার সহযোগে রেকর্ড। বারোয়ারী পূজা নয়। বারনারী বন্দনা। যা দেবী সর্বভূতেষু নয়। যা 'বালা' 'দেবী' রূপেণ সংস্থিতা। তালিস্তস্যৈ। তালিস্তস্যৈ; তালিস্তস্যৈ, তালি, তালি!

চট্ করে বললে বিশ্বাস করা হয়ত শক্ত হয়, যে পৃথিবীতে আজকে আমাদের বাস সে হলো বিজ্ঞাপনের দুনিয়া। শুধু ভারতবর্ষই ভাগ হয় নি, সারা দুনিয়াটারই সুস্পষ্ট বিভাগ হয়ে গেছে। একটি দুনিয়া দুঃস্বপনের, দুর্দিনের, বাস্তবের; আরেকটি দুনিয়া স্বপ্নের, রঙীন, অবাস্তবের, আরব্যোপন্যাসের পাতা থেকে তুলে নেওয়া। একটি পৃথিবীতে কয়েক জনের বিলাসে বসবাস; আরেক পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষের অর্ধাহার-উপবাস। প্রথম পৃথিবী কার সৃষ্টি, তা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। দ্বিতীয় পৃথিবী নিঃসংশয়ে বিজ্ঞাপনের সৃষ্টি। এই দ্বিতীয় পৃথিবীই আসলে অদ্বিতীয়; এ হলো Film World! ছায়ার বিজ্ঞাপন দিতে দিতে এই ছায়ারাজ্য আর মায়ারাজ্য নেই; বাস্তবের চেয়েও সত্য বিজ্ঞাপন সৃষ্ট এই ফিল্ম ওয়ার্ল্ডে হাসা-কাঁদা-ভালোবাসা, বেশবাস, আহার-বিহার, কথাবার্তা, হাঁটা-চলা, রাগ-অনুরাগ কিছুই সত্য বলে বিশ্বাস করা শক্ত; এখানে জীবন নেই, পুরোটাই আর্ট! Make-believe Art!

রাস্তা দিয়ে ছেঁড়া, ফুটো-ফাটা জামা-কাপড় পরে কাউকে আজ চলে যেতে দেখলে যদি আপনি মনে করেন যে, লোকটা গরীব, ভিখারী অথবা পাগল, তাহলে বুঝতে হবে আপনি গতজন্মে ব্যাসকাশীতে মারা গেছলেন; বুঝতে হবে আপনি বিদ্যাসাগরের আমলের লোক, পাহাড়ী সান্যালের যুগের নয়; জানা যাবে যে আপনি হচ্ছেন একটি

প্রথম জলের বোকা, ইংরেজিতে যাকে বলে A fool of the first water! কারণ ওই ফুটো-ফাটা, ছেঁড়া-খোঁড়া জামা দারিদ্র্যের চিহ্ন নয়; Fashion-এর ঝাণ্ডা! ওই জামা-কাপড়ের নাম নাকি: 'বহুৎ দিন হুয়ে'! নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নতুন জামা-কাপড়ে সর্ব অঙ্গে কৃত্রিম ছেঁড়া-খোঁড়ার জন্ম; বহুৎ দিন হুয়ে গেলে জামা-কাপড় যেমন হয়, সেই অবস্থাকে বোঝাবার জন্যেই নতুন অবস্থাতেই ওর এই হাল!

পড়ে হাসবার আগে আপনার গায়ে হাত দিয়ে ভাববার আছে অনেক কিছু। আপনার বাড়ীর মেয়েদের অঙ্গেও আপনি জানেন না মানে-না-মানা শাড়ী, নার্গিস-হাতা ব্লাউস; অঙ্গাভরণে সন্ধ্যারাণী কানপাশা; অঙ্গমার্জনায় চিত্রতারকাদের প্রিয় সাবান; কেশতৈলেও কামিনীকৌশলের সার্টিফিকেট। গাড়ী, বাড়ী, গয়না, হোটেল, রেস্তোরাঁ এ সবেরই নির্বাচনে চিত্ররাজ্যের প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান। কিন্তু এখানেই শেষ নয়; অঙ্গের কতটুকু আবৃত থাকবে এবং কতখানি অনাবৃত, তাও ফিল্মস্টারের শরীর-নির্ভর। ব্লেডের বিজ্ঞাপনে বার্ণার্ড শ' অথবা বিশ্বকবির কল্পিত সার্টিফিকেট ছিলো একদিন পরিহাসের বিষয়; কিন্তু এখন আর সেটা পরিহাস নয়; সত্যি সত্যি সিগারেটের বিজ্ঞাপনের তলায় ফিল্মস্টারের লিপষ্টিকৃড লিপের সুখটান দিতে পারার আনন্দে অস্পষ্ট স্বাক্ষর দেখাটা আশ্চর্য নয়!

ভয় এতে শুধু সমাজের নয়; ভয় এতে দর্জির; ভয় এতে কাপড়ের মিলওলার; ভয় আছে জামা-কাপড়ের দোকানেরও। কিসের ভয়? কিসের আবার? কোনও এক অশুভ মুহূর্তে যদি ফিল্মস্টারেরা স্থির করে যে তারা আর জামা-কাপড় পরবে না, 'হায়'লেই ত', পর মুহূর্তেই বিশ্ব-সমাজের নিউডিষ্ট কলোনীতে রূপান্তরিত হতে আর বাধা কোথায়? কাপড়ওলাদেরও তখন শুধু বিবস্ত্র হয়ে গান গাওয়া; মনে কর শেষের সেদিন কি ভয়ঙ্কর? সবাই বিবস্ত্র যে! তুমি আর নিয়ে করবে কি বস্তর?

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে; বিজ্ঞাপনের বিষ নিঃশ্বাসে ছড়ায়। এ-বি আজ রক্তে মিশে গেছে। সমুদ্র-মন্থনের পর অমৃত ও গরল দুই-ই ওঠে। গরল পান করে শিব হন নীলকণ্ঠ। কিন্তু এই বিজ্ঞাপনের বিষ নীলকণ্ঠের পক্ষেও পুরো গলাধঃকরণ করা অসম্ভব। ফিল্মের বিষ বিষের চেয়েও কিছু বেশি; এরা শুধু বিষ নয়; এরা চারশো বিশ।

অথচ দেশের যত তরুণ, আর যতেক তরুণী তাদের সকলেরই তীর্থযাত্রা টলিউডে। নটীরা সমাজের অঙ্গ; নটও তাই। তবুও সবাইকেই নট-নটী হতে হবে, এমন কোনও কথা পরশুরামের মহাভারতেও নেই। সেদিন নটীরা জানতো তাদের সিন্দুকে কাঞ্চন আছে; নয়নে কটাক্ষ। কিন্তু তবুও কোথায় যেন সমাজের সবার সঙ্গে একাসনে বসতে আছে বাধা। তাদের নেশা পয়সার; পেষা ভালোবাসা। তাই তাদের সমাজ আলাদা। আজও নটী আছে। সিনেমার কল্যাণে আজ তারা আর অভিনেত্রী নয় শুধু; তারা সমাজ-নেত্রীও হতে চলেছে। সেদিন ঘরের বউ বেরিয়ে নটী হতো। আজ নটী আস'ছ ঘরের বউ হয়ে।

জানি ভীষণ ছিঃ ছিঃ উঠবে এ কথা পড়বার পর। উঠবেই; উঠবে, কারণ আজকের বিশ্বসমাজের slogan হলো: সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে। একথা কাজে সত্যি করে তুলতে চাইলে, সবার wrong-এ wrong মিশানো যায় বটে, কিন্তু সবার রঙে রঙ মিশানো যায় না। কিছুতেই যায় না। ঘরের বউ-এর যেমন অভিনয় করবার প্রয়োজন নেই; তেমনি দায় নেই অভিনেত্রীর ঘরের বউ হবার। প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে সমাজে; পতিতারও। প্রয়োজন নেই শুধু ঘরের বউ-এর অধঃপতিতা হবার; আর প্রয়োজন নেই পতিতাদের হাফ-গেরস্থ সাজবার। মিলে আপত্তি নেই; আপত্তি গোঁজামিলে।

কিন্তু কেন হলো এমন? আগেও ত' ছবি ছিলো; আগেও ত' ছিলো দুর্গাদাস-উমাশশী-কানন-চন্দ্রা? তখনও তাদের ফ্যান ছিলো; তখনও ছিলো সিনেমার দর্শক; তখনও ছিলো সিনেমার কাগজ, ফিল্মল্যাণ্ড, নাচ-ঘর, বাতায়ন। কিন্তু আজকের মত পাগলামি ছিলো কি? আজকের মত পার্ভাসন? সেদিনও মানুষ মেয়েমানুষ রেখেছে; কিন্তু রক্ষিতাকে রক্ষিতার চেয়ে বেশি দাম দেয় নি; রূপোর দামেই রূপোপজীবিনীর দাম হয়েছে। ঘরের বউ ছিলো বাড়ীতে; রক্ষিতা বাগান-বাড়ীতে। বাড়ী আর বাগান-বাড়ীতে আজ আর তফাৎ নেই। বউ আর মেয়েমানুষ আজ এক। আজ আর মিষ্টার এণ্ড মিসেস নয়, আজ হচ্ছে মিষ্টার এণ্ড মিষ্ট্রেস·····

[ক্রমশঃ।

খেলাধূলায় মহিলা

ইদানীং খেলার মাঠে মহিলাদের দেখা যায় হামেশাই। দেখা যায়, কত মহিলা সোৎসাহে খেলা-দেখার দর্শক হয়ে মাঠে যান। পুরুষদের মতই তাঁদের সমান উত্তেজনা, সমান উৎসাহ, সমান সমান মন্তব্য। শুধু তাই নয়, খেলা দেখার দর্শক হিসাবে মাঠে গিয়েই মেয়েরা ক্ষান্ত থাকেননি। অনেক মহিলা খেলা দেখাতেও মাঠে যাচ্ছেন ইদানীং। কলকাতার খেলার মাঠে ছায়াচিত্রতারকাদের খেলা এখনও অনেকের কাছে এক স্মরণীয় ঘটনা। দৌড়ে প্রথম হওয়া, লাফ দেওয়ায় প্রথম হওয়া আজকাল মেয়েদের কাছে কিছুই নয়। ক্রিকেট খেলায় মেয়েরা (কল্পনা করতে পারবেন কেউ?) একশো বছর আগেই নেমেছেন। সম্প্রতি বড লিয়ান লাইব্রেরীতে (Bodleian Library) একটি বই পাওয়া গেছে। ইং ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দের ছাপা এই বইয়ে লেখা আছে: মেয়ে-সাধ্বীরা (Nun) পুরুষ-সাধুদের (Monk) সঙ্গে ক্রিকেট খেলেছিলেন। ইং ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে ব্রামলের (Bramley) এগারো জন চাকরাণী হাম্বলডনে (Hambledon) একটি ক্রিকেটের দল গঠন ক'রেছিল। লেডী বলডুইন (Boldwin) ক্রিকেট খেলায় সবিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ইং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হোয়াইট হিদার (White Heather) মহিলা ক্রিকেট ক্লাবের অন্যতমা সদস্যা ছিলেন। বর্তমানের Women's Cricket Association (মহিলা ক্রিকেট সঙ্ঘ) ইং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এই সঙ্ঘের সঙ্গে দু'শো মহিলাদের ক্রিকেট ক্লাব ও স্কুল যুক্ত আছে। বাঙালী মহিলারা খেলার দর্শক হ'লেও ক্রিকেট খেলার ক্লাব গঠনের কথা কি চিন্তা করতে পারবেন?

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নরেনকে ডাকলেন কাছে। শশী ছিল দাঁড়িয়ে, তাকে বললেন, 'নিচে যা। কেউ যেন না থাকে ধারে-কাছে। শুধু আমি আর নরেন।'

ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। নরেনকে বললেন, 'চার দিক ভালো করে দেখে আয় উঁকি দিয়ে, কেউ যেন না উপরে আসে।'

নরেন দেখে এল। বললে, কেউ নেই।

'বোস আমার কাছটিতে।'

শান্ত হয়ে তন্ময় হয়ে পিপাসু হয়ে বসল নরেন।

আরেক দিনের কথা মনে পড়ল নরেনের। বলছে মাষ্টার মশাইকে, 'আমাকে একদিন একলা একটি কথা বললেন। কাউকে বলবেন না যেন সে কথা।'

'না। কি বললেন ?'

'বললেন আমার তো সিদ্ধাই করবার জো নেই। তোর ভেতর দিয়ে করব।'

'তুমি কি বললে ?'

'আমি তাঁকে এক কথায় হটিয়ে দিলুম। বললুম, না, তা হবে না। তিনি চুপ করে গেলেন।' স্বগতোক্তির মত বলছে নরেন, 'ওঁকে মানতুম না, ধরতুম না, ওঁর সব কথা উড়িয়ে দিতুম। তিনি বলতেন, ওরে, আমি কুটির উপর থেকে চেঁচিয়ে বলতাম, ওরে কে কোথা আছিস তোরা আয়, তোদের না দেখে যে আর থাকতে পারি না। মা বলে দিলেন ভক্তেরা সব আসবে। ঠিক ঠিক মিলল। তোরা সব এলি একে-একে।'

কত আপনার জন, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ, এমনি ঘনতম অন্তরঙ্গতায় বসেছে নরেন। দয়াঘন স্নেহপূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন ঠাকুর।

সেই মধুর ভাবের পাগলিনী, যাকে দেখে ঠাকুরের ভয়, তারও প্রতি ঠাকুরের কি করুণা !

থেকে-থেকে চলে আসে ফটক খুলে। কারু বাধা-নিষেধ মানে না, একেবারে সোজা দোতলায় উঠে আসে। উঠে এসেই মায়ের গান ধরে। কি মিষ্টি গলা! গান শুনেই ঠাকুরের সমাধি হয়ে যায়।

আমার সন্তানভাব। মধুর ভাবের পসারিণীকে আমার এখন বড় ভয়।

'ওরে পাগলীকে বাগান থেকে বের করে দে। ওকে এখানে আসতে দিস না।'

নিরঞ্জন লাঠি নিয়ে তাড়া করে, তবু সরে না পাগলী। কালীপ্রসাদ তো একদিন হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে থানায়ই রেখে এল। আবার কখন থানা থেকে সরে পড়ে চলে এসেছে বাগানে। আবার গান ধরেছে। গান শুনে ঠাকুরের আবার ভাবাবেশ।

এবার আর তাড়া নয়, এবার রীতিমত প্রহার।

তবুও নিবৃত্তি নেই। দিগম্বর বালক হয়ে ভক্তসঙ্গে বসে আছেন ঠাকুর, পাগলীর সাড়া পাওয়া গেল বাইরে।

শশী বললে, 'উপরে উঠলে ধাক্কা মেরে ফেলে দেব।'

ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'না, না, আসবে আবার চলে যাবে।'

'না, আসবে না।' নিরঞ্জন হুমকে উঠল।

রাখাল দুঃখ করতে লাগল, পাগলের উপর আবার আস্ফালন !

'তোর মাগ আছে কি না তাই তোর মন কেমন করে।' নিরঞ্জন গর্জে উঠল, 'আমরা তাকে বলিদান দিতে পারি।'

'কি বাহাদুরি !' রাখালও পালটা বললে, 'কিন্তু জিগগেস করি ঠাকুর কি শুধু তোর আমার ? শুধু এই ঘরের লোকেদের ? বাইরের লোকেদের নন ? তিনি কি শুধু আমাদের এ কয় জনের জন্যেই এসেছেন ? আপামর সকলের জন্যে আসেন নি ? উনি কি শুধু সদ্গুরু ? উনি জগদ্গুরু। সদ্গুরুই জগদ্গুরু। উনি সকলের। পাগলেরও।'

'তাই বলে অসুখের সময় কেন ?' শশী প্রতিবাদ করল : 'উপদ্রব করে কেন ?'

'উপদ্রব সবাই করে। আমরা করিনি ? গিরিশ ঘোষ করেনি ? নরেন-টরেন আগে কি রকম ছিল, কত যন্ত্রণা দিত, কত তর্ক করত। কষ্ট কি আমরাই কিছু কম দিয়েছি ? ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছে। বলেনি ? ধরতে গেলে কেউই নির্দোষ নয়, নিরুপদ্রব নয়।'

ঠাকুর বললেন, 'রাখাল, কিছু খাবি ?' রাখালের প্রতি তাঁর স্নেহ উচ্চারিত হয়ে উঠল।

রাখাল বললে, 'খাবো খন।'

পাগলী সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

আজ আর কোনো উপদ্রব করল না। শুধু প্রণাম করে চলে গেল।

কিন্তু ঠাণ্ডা থাকবার পাত্র নয় পাগলী। আবার হৈ-চৈ সুরু করে দিয়েছে। আবার গান জুড়েছে। আবার ভাবাবেশে ঠাকুরকে ক্লিষ্ট করা।

এখন শুধু মন নিচে নামিয়ে রাখবার প্রয়োজন।

নরেনকে একদিন বলেছিলেন, 'আচ্ছা, তোর কি মনে হয় ? এখানে সব আছে না ? নাগাদ মুশুর ডাল, ছোলার ডাল, তেঁতুল পর্যন্ত।'

নরেন বললে, 'সব আছে। আপনি সব অবস্থা ভোগ করে নিচে এসে রয়েছেন।'

'সব অবস্থা ভোগ করে ভক্তের অবস্থায়।' মাষ্টার মশাই বললে।

'কে যেন নিচে টেনে রেখেছে।' বললেন ঠাকুর।

পাগলীকে নিরঞ্জন একদিন একটা খালি ঘরে বন্ধ করে রাখল। যদি এমনিতরো শাস্তিতে শিক্ষা হয়। কতক্ষণ পরে দরজা খুলে দিতেই আবার সিঁড়ি বেয়ে উপরে। আবার সেই গান।

তখন নিরঞ্জন কাঁচি দিয়ে পাগলীর মাথার চুলগুলি কেটে দিল। তারপর পাগলী আর এল না।

নিরঞ্জনের যা কিছু করা তার মূলে গুরুসেবা।

'দেখ না নিরঞ্জনকে।' বলছেন ঠাকুর, 'কিছুতেই লিপ্ত নয়, নিজের টাকা দিয়ে গরিবদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়। বিয়ের কথায় বলে, বাপ রে, ও বিশালাক্ষীর দ। নিরঞ্জনকে দেখি, একটা জ্যোতির উপর বসে আছে।'

আহা, এই তো চাই! কোনো লেনা-দেনা নেই। যখন ডাক পড়বে তখনই যেতে পারবে।

'লোক বাছা যা বলছ তা ঠিক।' মাষ্টারকে বলছেন ঠাকুর, 'এই অসুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে তারা অন্তরঙ্গ। আর যারা একবার এসে কেমন আছেন মশাই, জিগগেস করে, তারা বহিরঙ্গ।'

নীলকণ্ঠের গানেই বা কত মধু, কত ভক্তি। কৃষ্ণলীলায় বৃন্দা-দূতী সেজে কেঁদে ভাসিয়ে দেয় সকলকে। হাটখোলায় বারোয়ারি-তলায় শ্রীকৃষ্ণ-যাত্রাগান করবে, ঠাকুর বালকের মত মেতে উঠলেন তিনি যাবেন। একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আয়। লাটু আর কালী, চল আমার সঙ্গে।

লোকে লোকারণ্য ভিড়। ভিতরে ঢোকেন এমন সাধ্য নেই। সুতরাং স্বয়ং নীলকণ্ঠকে ধরো। খবর পৌঁছুলো তার কাছে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব এসেছেন। শোনামাত্র গান থামাল নীলকণ্ঠ। নিজে গিয়ে ভিড় সরিয়ে ঠাকুরকে নিয়ে এল আসরে।

শ্রীরাধার প্রেমে মত্ত হয়ে গান ধরল নীলকণ্ঠ: "পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে।" ঠাকুর নিজের থেকে আখর দিতে সুরু করলেন। গান ভীষণ জমে উঠল। কতক্ষণ পরে ঠাকুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে সমাধিস্থ দেখে নীলকণ্ঠ বারে বারে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে লাগল। সমাধি ভাঙবার পর আবার চুপ করে বসে গান শুনতে লাগলেন। গানে আর শোভায় সারা বারোয়ারিতলা গমগম করতে লাগল।

সেই নীলকণ্ঠ আবার এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরকে বলছে, 'আপনিই সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ।'

'ওগুলো কি বলছ? আমি সকলের দাসের দাস। গঙ্গারই ঢেউ। ঢেউয়ের কখনো গঙ্গা হয়?'

'যাই আপনি বলুন, আমরা আপনাকে তাই দেখছি।'

'বাপু হে, আমার আমিই তো খুঁজে ফিরছি, কিন্তু পাই কই?'

'আমরা কি অতশত বুঝি? নীলকণ্ঠ হাত জোড় করল: 'আমাদের শুধু কৃপা করবেন।'

'কি বলো! তুমি কত লোককে পার করছ, তোমার গান শুনে কত লোকের উদ্দীপন হচ্ছে!'

'পার করছি বলছেন?' নীলকণ্ঠ হাসল। 'কিন্তু আশীর্বাদ করুন যেন নিজে না ডুবি!'

'যদি ডোবো তো, ঐ সুধা-হ্রদে।' বললেন ঠাকুর। 'তোমার এখানে আস', যাকে অনেক কিনা সাধ্য-সাধনা করে তবে পাওয়া যায়। বেশ, তবে একটা তুমি গান শোন।' বলে গান ধরলেন ঠাকুর। গান শেষ করে বললেন, 'আমার ভারি হাসি পাচ্ছে। ভাবছি তোমাদের আবার গান শোনাচ্ছি।'

'আমরা যে গান গেয়ে বেড়াই তার আজ পুরস্কার হল।' ঠাকুরকে আবার প্রণাম করল নীলকণ্ঠ।

নরেন একবার বলেছিল ঠাকুরকে, 'আমি শান্তি চাই, ঈশ্বর পর্যন্ত চাই না।'

আহা, ঈশ্বরই তো শান্তি।

ঠাকুরের পাশটিতে বসে সেই শান্তিই যেন এখন আস্বাদ করছে নরেন।

নরেন তাকিয়ে আছে ঠাকুরের দিকে। ঠাকুরের নিষ্পলক দৃষ্টি। সর্বসংশয়চ্ছেদী অভয়-আশ্বাসে পরিপূর্ণ। চেয়ে থাকতে-থাকতে নরেনের মন হল কি একটা আশ্চর্য স্পন্দন তার সমস্ত দেহে আলোড়িত হচ্ছে। মনে হল, ঐ দুটি পুণ্যচক্ষুর আভা ছাড়া সংসারে আর তার কোনো অনুভূতি নেই।

হঠাৎ চমক ভাঙল নরেনের। দেখল ঠাকুর কাঁদছেন।

'এ কি, কাঁদছেন কেন?'

'নরেন, আমার যা কিছু ছিল, আমার যথাসর্বস্ব, তোকে আজ দিয়ে দিলুম।' নরেনের একটা হাত ঠাকুরের একখানি হাতের মধ্যে ধরা: 'দিয়ে আমি আজ ফকির হয়ে গেলুম, ফতুর হয়ে গেলুম। তুই রাজরাজেশ্বর হয়ে গেলি।'

নরেন অনুভব করল এ কান্না আনন্দের নির্ঝর। এ কান্না তার রাজাভিষেকের পুণ্যবারি।

নরেনও কাঁদতে লাগল।

ঠাকুর বললেন, 'তুই সবাইকে আঁকড়ে থাকবি, সকলের আশ্রয় হবি। সকলের ভার তোর হাতে দিয়ে গেলুম। তারপর তোর যখন কাজ ফুরুবে, যখন একদিন বুঝতে পারবি তুই সত্যি কে, ফিরে যাবি স্বধামে।'

নরেন গুরুবলে বলীয়ান হয়ে উঠল। অয়মহং ভোঃ। ওঠো জাগো যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈপ্সিততমকে অর্জন করতে পারছ ততক্ষণ নিবৃত্ত হয়ো না।

ঠাকুর বললেন, 'তিনিই সব হয়েছেন। কেন? সবই আবার তিনি হবে বলে। তুই এই হওয়ার বার্তাটি পৌঁছে দে ঘরে-ঘরে। পৌঁছে দে জনে-জনে।'

একশো চৌষট্টি

'আমরা গোরার সঙ্গে থেকেও ভাব বুঝতে নারলাম রে!' চৈতন্যলীলায়ও এ আক্ষেপ করেছিল পার্ষদরা, এবারও বুঝি সেই মনস্তাপ।

ঠাকুর তাই ঠিক করলেন, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যাবেন।

'এখানকার যা কিছু সব নজির-স্বরূপ।' বললেন ঠাকুর।

কিসের নজির ?

জীব মাত্রেই ব্রহ্মের প্রতিভাস। তুমিও তাই "তদ্‌গতান্তরাত্মা" হয়ে ওঠ। ঈশ্বরলাভের জন্তেই মানব-জীবন। তাই এখানে দেখ সেই মানব-জীবনের চরম সার্থকতা। 'আমি ষোল টাং করে গেলাম যদি তোরা এক টাং করিস।' যদি ষোল দেখে অন্তত এক হতে চাস। যদি মহৎকে দেখে অণু হবারও প্রেরণা জাগে।

'কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ!' নরবপু যে তাঁর স্বরূপ এটুকু অন্তত বুঝে যাও। একই অগ্নি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে রূপে রূপে রূপায়িত, প্রাণে প্রাণে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। ঠাকুর বললেন, 'নরলীলায় মন কুড়িয়ে আনলেই হয়ে গেল। আরশুলা কুমরেপোকা হয়ে গেলেই হয়ে গেল।'

সেই মহত্তম পরমতম হয়ে-ওঠাকে দেখ। 'নরলীলা কেমন জানো?' আবার বললেন ঠাকুর: 'যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড় হুড় করে পড়ছে। সেই সচ্চিদানন্দ—তাঁরই শক্তি একটি প্রণালী দিয়ে, নলের ভিতর দিয়ে আসছে।'

তুমি আমি হয়ে ওঠ। অর্জুনকে তাইতো বললেন শ্রীকৃষ্ণ। 'মদ্‌ভাবমাগত' হও।

'সকলের চেয়ে গুহ্যতম পরমকথা এবার শোনো।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন অর্জুনকে, 'তুমি আমার প্রিয় হতে প্রিয়তর, তাই তোমাকে বলছি এ গোপন কথা। সব ভুলে আমাকে ভাবো, আমার দিকে চোখ ফেরাও, আমাগতপ্রাণ হয়ে ওঠ। তুমি আমার প্রিয়, তাই প্রতিজ্ঞা করে তোমাকে বলছি, তোমাকে আমি হয়ে উঠতেই হবে। "বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্‌ভাবমাগতাঃ" অনেকে শুধু আমার হাত ধরে আমা-সম হয়ে উঠেছে।'

অরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বললেন, 'এই সুবিশাল বটবৃক্ষ দেখছ, এর থেকে একটি ফল আহরণ করো।'

বটফল আহরণ করল শ্বেতকেতু।

'ভাঙো।'

ভাঙল বটফল।

'কি দেখছ?'

'ছোট ছোট বীজকণা।'

'একটি কণাকে ভাঙো। আরো ভাঙো। কি দেখছ?'

'এখন আর কিছুই দেখছি না।'

'যা এখন আর দেখছ না, সেই সূক্ষ্মাংশ থেকেই উৎপন্ন হয়ে এই মহাবল বটবৃক্ষ বিদ্যমান আছে।' অরুণি বললেন, 'বৎস, শ্রদ্ধান্বিত হও। শ্রদ্ধা না থাকলে এই তত্ত্ব বুদ্ধির অগম্য।'

'কিন্তু সত্যই যদি জগতের মূল হয়, তবে তা প্রত্যক্ষ হয় না কেন?' জিগগেস করল শ্বেতকেতু।

অরুণি বললেন, 'এই নুণ নাও, জলে ফেলে দিয়ে এস। কাল প্রাতঃকালে দেখা কোরো।'

প্রভাতে দেখা করতে এল শ্বেতকেতু। অরুণি বললেন, 'বৎস, রাত্রে যে নুণ জলে ফেলে দিয়েছিলে, সেই নুণ নিয়ে এস।'

অনেক অনুসন্ধান করেও সে নুণ পাওয়া গেল না। যদিও সে নুণ বিলীনরূপে বিরাজমান। জলপাত্র নিয়ে উপস্থিত হল শ্বেতকেতু।

অরুণি বললেন, 'বৎস, এই জলের উপরিভাগ থেকে আচমন কর। কেমন বোধ হচ্ছে?'

'লবণাক্ত।'

'মধ্যভাগ থেকে আচমন কর। কেমন বোধ হচ্ছে?'

'লবণাক্ত।'

'অধোভাগ থেকে আচমন কর। কেমন বোধ হচ্ছে?'

'লবণাক্ত।'

'এবার জল ফেলে দিয়ে আমার কাছে বোস।'

বসল শ্বেতকেতু। অরুণি বললেন, 'শোনো, ঐ লবণ জলের মধ্যেই সর্বদা বিদ্যমান ছিল। এই জলের মধ্যে বিদ্যমান থেকেও যেমন তুমি লবণকে দেখতে পাওনি, তেমনি এই দেহমধ্যেই সেই সত্য সেই ব্রহ্ম অপ্রত্যক্ষরূপে বিদ্যমান আছেন।'

আগে নুণ যখন হাতে করে নিয়ে এসেছিলে তখন তাকে স্পর্শ করে জেনেছিলে, চোখ দিয়ে দেখেছিলে। কিন্তু যেই জলে মিশে গেল অমনি চক্ষু আর স্পর্শের বাইরে চলে গেল। তখন সেই নুণকে জানবে কি করে? সেই জানার উপায়ান্তর আছে। সেই উপায়ান্তর হচ্ছে জিহ্বা। তখন তুমি জিহ্বা দিয়ে আস্বাদ করে জানবে এই সেই নুণ।

তেমনি জগতের মূল সৎব্রহ্ম এই দেহে বিদ্যমান থাকলেও ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য। কিন্তু তাকেও জানবার উপায়ান্তর আছে।

আছে? কি সেই উপায়ান্তর?

অরুণি বললেন, 'যদি কাউকে চোখ বেঁধে গান্ধারদেশ থেকে নিয়ে এসে তারও চেয়ে নির্জন জায়গায় এনে ছেড়ে দেয়, তার কি দশা হয়? সে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পুবে কখনো উত্তরে কখনো দক্ষিণে কখনো বা পশ্চিমে ছুটাছুটি করতে থাকে। আর এই বলে আর্তনাদ করে, আমাকে চোখ বেঁধে নিয়ে এসেছে, আর দেখ, বদ্ধচক্ষু অবস্থায়ই ফেলে গেছে এখানে। তখন কেউ যদি তার বন্ধন মোচন করে দিয়ে বলে, এই দিকে গান্ধারদেশ, এই দিকে যাও তখন সেই আলোকপ্রাপ্ত উপদেশপ্রাপ্ত লোক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কথা জিগগেস করতে-করতে সেই গান্ধারদেশে এসেই উপস্থিত হয়। তেমনি সংসার-প্রবিষ্ট ব্যক্তি আচার্যবান পুরুষ গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে।

'অবতারই সেই মানুষরতন। যিনি তরণ করে তারণ করেন।'

'অবতারের ভিতরেই ঈশ্বরের শক্তির বেশি প্রকাশ।' বললেন ঠাকুর, 'অবতারের আমি-র মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে সর্বদা দেখা যায়।'

কে একজন ভৃত্য ভক্ত বললে, 'আজ্ঞে আপনাকে দেখাও যা ঈশ্বরকে দেখাও তা।'

'ও কথা আর বোলো না।' বলে উঠলেন ঠাকুর, 'গঙ্গারই ঢেউ ঢেউয়ের গঙ্গা নয়। আমি এত বড় লোক, আমি অমুক, আমি শম্ভু মল্লিক বা আমি মহিম চক্রবর্তী, আমি ধনী, আমি বিদ্বান, এই আমি ত্যাগ করতে হবে। আমি-ঢিপিকে ভক্তির জলে ভিজিয়ে সমভূমি করে ফেল।'

সেই বার ঠাকুরের যখন হাত ভাঙা, হাতে বাড়-বাঁধা, উত্তরগীতা পড়ে শোনাচ্ছে মহিমাচরণ। 'ব্রাহ্মণদের দেবতা অগ্নি, মুনিদের দেবতা হৃৎস্থ অর্থাৎ হৃদয়মধ্যে, স্বল্পবুদ্ধি মানুষের দেবতা প্রতিমায় আর সমদর্শী মহাযোগীদের দেবতা সর্বত্র।' 'প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনা

সর্বত্র সমদর্শিনাম্।' সর্বত্র সমদর্শিনাম্—কথা কয়টি শোনামাত্র ঠাকুর আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ! হাতে সেই বাড় ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ভক্তেরা নির্নিমেষে দেখছে সমদর্শী মহাযোগী।

আকীটপতঙ্গ-পিপীলক ব্রহ্ম। সকলেই তাঁর অবতার। 'তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে'। পরও অবর, উৎকৃষ্টে ও অপকৃষ্টে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করো। সেই দর্শনেই হৃদয়বন্ধন ভিন্ন, সংশয়জাল ছিন্ন ও কর্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত।' 'মোমের বাগানে সবই মোম।'

চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছেন ঠাকুর। সিংহ দর্শন করেই সমাধিস্থ।

'ঈশ্বরীর বাহনকে দেখেই ঈশ্বরের উদ্দীপন হল।' বললেন ঠাকুর।

আবার বললেন ঠাকুর, 'আমি একবার মিউজিয়মেও গিয়েছিলুম। দেখলুম ইট পাথর হয়ে গেছে, জানোয়ার পাথর হয়ে গেছে। দেখ, সঙ্গের গুণ কি। তাই সর্বদা যদি সাধুসঙ্গ করো সাধু হয়ে যাবে।'

উপনিষদের ভাষায় ঐটিই উপায়ান্তর।

'নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে, ভবনদী পার হতে জানা দরকার।' বললেন ঠাকুর, 'সাঁতার জানা দরকার।'

নৌকো করে ক'জন গঙ্গা পার হচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল পণ্ডিত, সর্বদা বিদ্যা জাহির করতে ব্যস্ত। পাশের লোককে জিগগেস করল, বেদান্ত জানো? সে বললে, আজ্ঞে না। সাংখ্য-পাতঞ্জল জানো? আজ্ঞে না। ষড়দর্শন? তাও না। এমন সময় ঝড় উঠল নদীতে। নৌকো প্রায় ডোবে। তখন পাশের লোকটি ভীতত্রস্ত পণ্ডিতকে জিগগেস করলে, 'পণ্ডিতজী, আপনি সাঁতার জানেন?' পণ্ডিত মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, না। পাশের লোকটি বললে, 'পণ্ডিতজী, আমি সাংখ্য পাতঞ্জল জানি না, কিন্তু সাঁতার জানি।'

ষ্টার-থিয়েটারে 'বৃষকেতু' অভিনয় দেখছেন ঠাকুর। গিরিশকে শুধোলেন, 'এ কার থিয়েটার? তোমার, না, তোমাদের?'

গিরিশ বললে, 'আজ্ঞে আমাদের।'

'আমাদের কথাটিই ভালো, আমার বলা ভালো নয়। কেউ কেউ বলে আমি নিজেই এসেছি, নিজেই করেছি।' বলছেন ঠাকুর, 'এ সব হীনবুদ্ধি অহঙ্কেরে লোকের কথা।'

নরেন বললে, 'সবই থিয়েটার।'

'হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক কথা।' বললেন ঠাকুর, 'তবে কোথাও বিদ্যার খেলা কোথাও অবিদ্যার।'

নরেন জোর গলায় বললে, 'সবই বিদ্যার।'

'হ্যাঁ, তবে ওটি ব্রহ্মজ্ঞানে হয়। ভক্তের পক্ষে দুই আছে, বিদ্যামায়া আর অবিদ্যামায়া। খোসাটি আছে বলেই আমটি আছে। মায়া হচ্ছে খোসা, আম হচ্ছে ব্রহ্ম। মায়ারূপ ছালটা আছে বলেই ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব।'

নরেনের হঠাৎ মনে হল, এখন যদি প্রকাশ করে বলেন, বলতে পারেন, তা হলে বুঝি। তবেই বিশ্বাস করি।

কি বলবেন? কি শুনতে চাস?

অনেক সময় বলেন তিনিই সেই, ছদ্মবেশে রাজ্যভ্রমণে এসেছেন। তিনিই ভগবানের অবতার, তিনিই পুরুষোত্তম। এখন সে কথা কি তিনি ঘোষণা করতে পারেন? এই অসহন রোগক্লেশের মধ্যে, এই মৃত্যুশয্যায় শুয়ে? বলতে পারেন, তিনিই আদিদেব, পুরান পুরুষ, সমস্ত বিশ্বের নিলয়-নিধান? বলতে পারেন তিনিই বেত্তা, তিনিই বেদ্য, তিনিই সেই অব্যয়-অক্ষর? বলতে পারেন, তিনিই ভগবান?

'এখনো তোর জ্ঞান হল না?' নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে কমল-বিশদ প্রসন্ন চোখ মেলে ঠাকুর তাকালেন নরেনের দিকে। বললেন, 'এখনো তোর সংশয়? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ। তবে তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়।'

থমকে দাঁড়াল নরেন। অপরাধের গ্লানিতে দুই চোখ জলে ভরে উঠল। ভুবনমঙ্গল স্বরূপানন্দ ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল অপলকে। তোমার চরণে শাশ্বতী স্থিতি দাও। বৈরাগ্যবলসম্পন্ন জ্ঞান দাও। ভয়প্রদা গৃহাসক্তি ছেদন করো।

এই অসুখ হবার প্রায় চার-পাঁচ বছর আগে শ্রীমাকে এক দিন বলেছিলেন ঠাকুর, 'যখন দেখবে যার-তার হাতে খাচ্ছি, কলকাতায় রাত কাটাচ্ছি আর খাবারের অগ্রভাগ কাউকে দিয়ে বাকিটা নিজে খাচ্ছি, তখনই বুঝবে দেহরক্ষার আর বাকি নেই।'

কত দিন থেকেই তো কলকাতায় নানা ভক্তের বাড়ীতে অন্ন ছাড়া অন্য ভোজ্য খাচ্ছেন, বলরামের বাড়িতে তো অন্নই খেয়েছেন রীতিমত, আর রাতও কাটিয়েছেন মাঝে মাঝে। তবে দিন কি ঘনিয়ে এল? তবু খাবারের অগ্রভাগ তো এখনো কাউকে দেননি?

কিন্তু সে বার কি হল? নরেনের পেট খারাপ হয়েছে, ক'দিন আসছে না দক্ষিণেশ্বর। কেন আসছে না রে? দক্ষিণেশ্বরে তার উপযুক্ত পথ্য হবে না। কিন্তু বল গে, আমি তাকে ডেকেছি। সকালবেলা তার কাছে লোক পাঠালেন ঠাকুর। নরেনকে আসতে হল।

ঠাকুরের নিজের জন্যে ঝোল-ভাত তৈরি হয়েছে, তারই অগ্রভাগ নরেনকে খেতে দিলেন। বললেন, 'যা বাকি আছে তাই আমার জন্যে নিয়ে এস।'

সারদামণি বুকের মধ্যে ধাক্কা পেলেন। বললেন, 'না না, আমি তোমাকে ফের নতুন করে বেঁধে দিচ্ছি।'

কিন্তু ঠাকুর শোনবার পাত্র নন। বললেন, 'নরেনকে দিয়ে খাব তাতে দোষ কি? নিয়ে এস যা আছে।'

ঠাকুর কি বলেছিলেন তা যেন মন থেকে মুছে দিতে চাইলেন শ্রীমা। ভাবলেন, নরেনের সঙ্গে কার কথা! নরেন যেন সব কিছুর ব্যতিক্রম।

কিন্তু আজ, ১২৯৩ সালের শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন মা এত চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন? ঠাকুরের মহা-সমাধির দিন কি তবে সমুপস্থিত?

একখানি দিশি শাড়ি শুকোতে দিয়েছিলেন ছাদে, খুঁজে পেলেন না। জলের কুঁজোটা তোলবার সময় হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। সেবক-সন্তানদের জন্যে খিচুড়ি রাঁধছেন, তলাটা ধরে গেল।

সারা দিনই ভাববিভোর হয়ে আছেন। ঘন ঘন সমাধি হচ্ছে। কিছুই খাওয়ানো যাচ্ছে না।

অতুলের নাড়ীজ্ঞানের প্রশংসা করতেন ঠাকুর। সে এসে নাড়ী দেখল। মুখ অন্ধকার করে বললে, 'আলো নিবতে আর দেরি নেই।'

বিকেলের দিকে অবস্থা আরো খারাপ হল। শ্বাসক্লেশ দেখা দিল। ডাক্তার আর কি করবে, তবু শশী ছুটল ডাক্তারের সন্ধানে। যে ডাক্তার দেখছিল শেষ দিকে, তার বাড়ি এখান থেকে সাত মাইল। সাত মাইল পথ প্রায় এক নিশ্বাসে পার করে দিল শশী। ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসল, ডাক্তার বাড়ি নেই।

কোথায়, কত দূর যেতে পারে? কি করে বলব, দেখুন এদিক-সেদিক। এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। আরো এক মাইল ছুটে ধরল ডাক্তারকে। চলুন শীগগির কাশীপুর। ডাক্তার বললে, জরুরি কল আছে অন্যত্র। এর চেয়েও জরুরি? ডাক্তারের হাত ধরে শশী হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

দেখে-শুনে ডাক্তার বললে, যেমন বলে, ভয় নেই।

সন্ধ্যের দিকে চোখ খুললেন ঠাকুর। নিশ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে এল। ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সারা দিন দেবতাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তাই তোদের সঙ্গে কথা কইতে পারিনি। আমি এখন খাব। ভারি খিদে পেয়েছে।'

সারা দিন কিছু মুখে তোলেননি, সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিছু তরল পথ্য নিয়ে এল। কিন্তু গিলতে পারলেন না। অগত্যা জল দিয়ে মুখ মুছে দিল আস্তে-আস্তে। পায়ের নিচে দিল ক'টা বালিশ গুঁজে। হে আত্মারাম, কি আরাম তোমাকে আমরা দিতে পারি?

হরি ওঁ তৎসৎ—মুখে উচ্চারণ করে ঠাকুর ঘুমিয়ে পড়লেন।

মধ্যরাত্রের দিকে আবার সমাধি হল ঠাকুরের। সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠল। পাখা করছিল শশী, তার মনে হল, এ সমাধি যেন অন্য রকম। শিশুর মত কাঁদতে লাগল ফুলে ফুলে।

গিরিশ আর রামকে খবর পাঠাও।

কোনো ভয় নেই, এস, হরি ওঁ তৎসৎ কীর্তন করি। নরেন ডাকল সবাইকে। ঠাকুরকে ঘিরে বসল। শোক-গদগদ কণ্ঠে কীর্তন সুরু হল, হরি ওঁ তৎসৎ।

রাত প্রায় একটার সময় ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। স্পষ্ট, সুস্থস্বরে বললেন, 'আমি খাব। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

সবাই আনন্দচকিত হয়ে উঠল। কি খাবেন?

'ভাতের পায়স খাব।'

ভাতের পায়স আনা হল। ঠাকুর বললেন, 'বসে খাব।'

যে শয্যাবিলীন দুর্বল, সে কি না উঠে বসতে চায়! ছেলেরা ধরাধরি করে সন্তর্পণে ঠাকুরকে বসিয়ে দিল বিছানায়।

শশী খাওয়াতে লাগল ভাতের পায়স।

আশ্চর্য, স্বাভাবিক অনায়াসে খেতে লাগলেন। গলায় যেন ঘা নেই, যন্ত্রণা নেই। বললেন, 'এত খিদে, যে ইচ্ছে হচ্ছে হাঁড়ি-হাঁড়ি খিচুড়ি খাই।'

সবাই অবাক হয়ে গেল। কেন এই খিচুড়ি খাবার ইচ্ছে?

শ্রীমা সকালে যে খিচুড়ি রেঁধেছিলেন, তিনি কি তার গন্ধ পেয়েছেন? আরো কি টের পেয়েছেন, তলাটা ধরে গিয়েছিল তার? উপরের ভাল অংশ সন্তানদের দিয়ে নিচেকার সেই পোড়াখোড়া নিজে খেয়েছেন শ্রীমা?

না কি আর সব অবতারের যেমন বিশেষ প্রিয়ভোজ্য থাকে, ঠাকুরের তেমনি খিচুড়ি! রঘুনাথের প্রিয়ভোজ্য রাজভোগ, বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রিয়ভোজ্য ক্ষীরসর, বুদ্ধদেবের প্রিয়ভোজ্য ফাণিত বা ফেণী বাতাসা। তেমনি নবদ্বীপচন্দ্রের মালসাভোগ, শঙ্করপন্থীদের পুরি-লাড্ডু আর রামকৃষ্ণের খেচরান্ন।

খেয়ে খানিক সুস্থবোধ করলেন। নরেন বললে, এবার তবে একটু ঘুমুন।

কালী, কালী, কালী,—স্বচ্ছ স্পষ্ট কণ্ঠে তিন বার উচ্চারণ করলেন ঠাকুর। জগজ্জনকে বরাভয় দেবার ইচ্ছায় দু' হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে দিলেন। ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

রাত তখন একটা বেজে গেছে, ঠাকুরের সর্বদেহ কাঁপল দু-একবার, গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি নাসাগ্রভাগে এসে স্থির হল। মুখের উপর ভেসে উঠল অম্লান আনন্দজ্যোতি।

এই সমাধি বুঝি আর ভাঙে না!

হরি ওঁ, হরি ওঁ, আবার সবাই কীর্তন সুরু করল। বিগতমেঘ আকাশের মত এই বুঝি আবার চক্ষু উন্মীলন করবেন। কত বার গভীর সমাধি থেকে উঠে এসেছেন, এবারও উঠবেন বোধ হয়।

দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণুঘরের রকে বসিয়ে ঠাকুরের একবার ফোটো তোলা হয়েছিল। তাঁর যে পদ্মাসনস্থ ধ্যানমূর্তি, যে মূর্তি ঘরে-ঘরে পটে-পটে বিরাজমান, সেই ফোটো। ফোটো তোলাতে বসে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে যান। ফোটো তোলা শেষ হয়ে যাবার পরেও সমাধি ভাঙে না। ফোটোওয়ালা ভয় পেয়ে যন্ত্রপাতি ফেলে চম্পট দেয়। তার পর সমাধি ভাঙলে পরে ঠাকুর বললেন, 'দেখবি, কালে ঘরে-ঘরে এই ছবিরই পূজো হবে।' সে-ছবি পরে তাঁকে দেখানো হলে তিনি তাকে প্রণাম করলেন, পূজা করলেন।

এই বুঝি জাগেন এই বুঝি ওঠেন, সর্বক্ষণ সকলের মনে এই ঔৎসুক্য।

বুড়ো গোপালকে ডাকল নরেন। বললে, 'একবার রামলালকে ডেকে আনতে পারো?'

লাটুকে নিয়ে বুড়ো গোপাল চলল দক্ষিণেশ্বর।

আকাশে পূর্ণ চাঁদ লাল হয়ে উঠল। ক্রমে হলদে হল। শেষে নীল হয়ে অস্ত গেল।

রাতেই চলে এসেছে রামলাল। বললে, 'ব্রহ্মতালু এখনো গরম আছে। তোমরা একবার কাপ্তেনকে খবর দাও।'

ভোর হয়ে গেল, তবু ঠাকুর তখনো ঘুমে।

বাগান থেকে ফুল তুলল ছেলেরা। দিবাতনুর শেষ পূজার আয়োজন করল। শ্রীপদে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিল। গলায় পরিয়ে দিল ফুলের মালা। এ কি, শ্রীঅঙ্গে যে এখনো তাপ! এখনো দিব্যদ্যুতি!

কে খবর দিয়েছে কে জানে, ভোর হতে না হতেই ডাক্তার সরকার এসে হাজির। তিনি দেখে-শুনে বললেন, এ মহাসমাধি ভাঙবার নয়। লীলা সম্বরণ করেছেন ঠাকুর।

কাপ্তেন, বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, এসে ঘি মালিশ করতে বললে। দেহে যখন এখনো তাপ আছে, তখন, বলা যায় না, এ মহাসমাধি ভাঙতেও পারে। যোগশাস্ত্রে বিধি আছে, সমাধিস্থ যোগীর গ্রীবা-বক্ষ ও শুলকে যদি কোনো ব্রাহ্মণ গব্যঘৃত মালিশ করে তাহলে সমাধিভঙ্গের সম্ভাবনা। ঘি আনা হল। শশী গ্রীবায় শরৎ বক্ষে ও বৈকুণ্ঠ সান্যাল পায়ে মালিশ করতে লাগল। তিন ঘণ্টায়ও উপর মালিশ করা হল একনাগাড়ে। কিন্তু হায়, কিছুতেই কিছু হল না।

সমস্ত অবরোধ ভেঙে নদীর উচ্ছ্বাসের মত শ্রীমা ছুটে এলেন। পড়লেন মাটিতে লুটিয়ে। কণ্ঠে শুধু এক বুকভাঙা আর্তনাদ: আমার কালীমা কোথায় গেলে গো?

যোগীন আর বাবুরাম ছুটে গেল মার কাছে। গোপাল-মা এসে মাকে তুলে নিল। মা একবার কেঁদে সেই যে চুপ করলেন তাঁর গলার আওয়াজ আর শোনা গেল না।

বাতাসের মুখে খবর ছুটল। নানাধারায় আসতে লাগল জনস্রোত। ডাক্তার সরকার বললেন, 'এই দিব্যাবস্থার ছবি নেওয়া দরকার। আমি যাই, কলকাতায় গিয়ে এর একটা ব্যবস্থা করি।'

উদ্ধব বললে, 'হে অচ্যুত, যোগচর্যা অতি দুশ্চর। মানুষ যাতে সহজে সিদ্ধিলাভ করতে পারে তাই বলুন।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'আর কিছু নয়, আমাকে ও আমার জন্যই তোমার কর্ম এ ভাবটিকে সর্বদা মনে রেখে কর্ম করা অভ্যাস করবে। সকল ভূতের অন্তরে ও বাইরে আমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখবে না। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-সাধু-তস্কর সূর্য-স্ফুলিঙ্গ ক্রূর-অক্রূর সকলকে যে সমান দেখে সেই পণ্ডিত। মন বাক্য ও শরীর দ্বারা সর্ব বস্তুতে মদ্ভাব অনুভব করাই আমাকে লাভ করার শ্রেষ্ঠ উপায়।'

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম মাথায় নিল উদ্ধব। বললে, 'হে অজ, হে আদ্য, আপনার সান্নিধ্য গুণেই আমার মোহজাল ছিন্ন হয়েছে। আর কিছু চাই না, আপনার শ্রীচরণে আমার অনপায়িনী রতি হোক।'

'উদ্ধব, তুমি আমার প্রিয়ধাম বদরিকায় চলে যাও। সেখানে আমার পাদতীর্থোদকে স্নান ও আচমন করে শুচি হও। বল্কল পরিধান করে বন্য ফল ভোজন করে অলকানন্দা দর্শন করে বিধৌতকলুষ হয়ে বিরাজ করো। সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বভাব ত্যাগ করে মন আমাকে সমর্পণ করে আমারই প্রদত্ত জ্ঞান স্মরণ করো।'

বদরিকায় চলে গেল উদ্ধব।

বাসুদেব চলে এলেন প্রভাসে। সেখানে যদুকুল একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হতে লাগল। কৃষ্ণ ও বলরামকেও তারা আক্রমণ করলে। বলরাম আর কৃষ্ণের হাতে যাদবদের কেউ আর অবশিষ্ট রইল না।

তখন সমুদ্রবেলাতে বসলেন বলরাম। যোগ অবলম্বন করে পরমাত্মাতে আত্মাসংযুক্ত করে মনুষ্যলোক ত্যাগ করলেন। বলরামের নির্বাণ দেখে বাসুদেব একটি অশ্বত্থ-বৃক্ষতলে এসে বসলেন। চতুর্ভুজ মূর্তি ধরে দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করে বিধূম পাবকের মত বিরাজ করতে লাগলেন। দক্ষিণ-উরুর উপর কমলকোরকসন্নিভ বামপদতল স্থাপিত। তুষ্ণীম্ভূত সমাহিত মূর্তি।

সেই পদতলকে মৃগ মনে করে জরা-ব্যাধ শর ছুঁড়ল। শর বিদ্ধ করল পদতল। ব্যাধ এগিয়ে গিয়ে দেখল চতুর্ভুজ বিভ্রাজমূর্তি। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হে অনঘ উত্তমশ্লোক, বুঝতে পারিনি, আমার এই অনপনেয় পাপ ক্ষমা করুন।

'তুমি আমার অভিলষিত কাজই করেছ।' বললেন শ্রীকৃষ্ণ। 'সুকৃতীদের পদ স্বর্গলোক লাভ করো।'

কৃষ্ণসারথি দারুক এল রথ নিয়ে। 'রথে চড়ে নয়, আমি লোকাভিরাম ধ্যানমঙ্গল নিজদেহ নিয়েই স্বধামে প্রবেশ করব। ভুবনে এই প্রতিষ্ঠিত করে যাব যে মর্ত তনু দ্বারাই দিব্যগতি লাভ করা যায়। আমি কি ব্যাধের শরশর থেকে আত্মরক্ষায় অক্ষম ছিলাম? না, দারুক, এইটুকু শুধু জেনো যে আমিই সত্য আর সমস্তই আমার মায়ারচনা।' [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

লুই ব্রেইলি

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে প্যারিস থেকে ৪০ মাইল দূরে কুপত্রে নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে লুই ব্রেইলি নামে এক ফরাসী বালক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঘোড়ার সাজ-সজ্জা নির্মাতা ছিলেন। যখন লুই-এর বয়স তিন বছর তখন এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটে।

তিনি তাঁর পিতার দোকানে খেলা করছিলেন এবং ছোট ছেলেরা যেমন করে তেমনি ভাবে তাঁর পিতার কাজ অনুকরণ করছিলেন। তিনি বাঁ হাতে একটি বীরশূল ও ডান হাতে একটি কাঠের ছোট মুগুর নিয়েছিলেন। তিনি বীরশূলের অগ্রভাগ এক টুকরো চকচকে চামড়ার ওপর চেপে ধরলেন এবং তাঁর পিতা যেমন করেন তেমনি ভাবে মুগুর দিয়ে বীরশূলের মাথায় যেমনি আঘাত করেছেন অমনি বীরশূলের অগ্রভাগ তাঁর চোখে বিঁধে যায় ও তিনি যন্ত্রণায় চীৎকার করে মাটিতে পড়ে যান।

কয়েক দিন পরে তাঁর চোখ বিষিয়ে যায় ও অপর চোখটিও সংক্রামিত হয়। তিন বৎসর বয়স্ক লুই শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হয়ে যান।

যখন তিনি বাড়ীর বাইরে যেতে সক্ষম হলেন তখন তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে প্যারিসে নিয়ে এলেন ও অন্ধ শিশুদের এক বিদ্যালয়ে তাঁকে ভর্তি করে দিলেন। তখন অন্ধ-শিশুদের যেভাবে লেখা-পড়া শিখান হত তা' অত্যন্ত অমার্জিত ও জটিল ছিল। কাগজের পাতার ওপর বড় বড় অক্ষর চাপ দিয়ে পিছন দিকে উঁচু উঁচু দাগ বুলোতে বলা হত। ইহা ধীর, কঠিন ও নিরুৎসাহজনক কাজ ছিল এবং মাসের পর মাস চেষ্টা করে লুই ব্রেইলি পড়তে শিখেন। তিনি উনিশ বছর বয়স অতিক্রম করার পূর্বে কেউ একজন তাঁকে ম'সিয়ে বারবিয়ারের কথা বলেন, বারবিয়ার অক্ষরের প্রতীক হিসাবে ফুটকি ব্যবহার করতেন। এই পরিকল্পনাটি লুই-এর মনকে আকৃষ্ট করে ও তিনি কাজ সুরু করে দিলেন। ফুটকিগুলি নানাভাবে সাজিয়ে এমন ভাবে অক্ষর তৈরী করতে হবে যাতে ছোট শিশুরাও অনুভূতি-সম্পন্ন আঙুলের দ্বারা সহজে তা বুঝতে পারে।

এই ভাবে একটি অন্ধ-বালকের মনে ব্রেইলি বর্ণমালার উদ্ভব হল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যখন লুই-এর বয়স ২০ বছর তখন বর্ণমালা সর্বাঙ্গসুন্দর করে ব্যবহার করা হতে লাগলো।

এক শত বছর পরে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের জনসাধারণ লুই ব্রেইলির সম্মানার্থে এক উৎসবের আয়োজন করেন। উৎসবের সময় ক্ষুদ্র কুপত্রে গ্রামে লুই-এর একটি প্রস্তরমূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়, এই গ্রামেই লুই শৈশবকালে দৃষ্টিশক্তি হারান।

আবরণ উন্মোচনকালে এক নাটকীয় ঘটনা ঘটে। অসংখ্য অন্ধ-লোক মূর্তির পাদদেশে সমবেত হয় ও আবরণ উন্মোচিত হলে তারা হাত উঁচু করে এগিয়ে যায় ধীরে ধীরে এবং অনুভূতিসম্পন্ন আঙুল দিয়ে মূর্তিটির মুখে হাত বুলোতে থাকে। এই তো লুই ব্রেইলি,

জ্যোতির্ময় রায়

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সময় সন্ধ্যা। রচনার বাপের বাড়ীর ঘর। ঘরে রচনার জ্যাঠামশাই, মা বসে আছেন, এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলো মিঃ সেন।]

সুরমা। এই যে অদিতি, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি সবাই, এসো—গিয়েছিলে একবার ?

মিঃ সেন। হ্যাঁ আজ সকালেই গিয়েছিলাম। ওঃ কি এলাহী ব্যাপার! ঐ তো বিশ্বপতি ঘোষদের বাড়ীটা কিনেছে, ও বাড়ী তো আপনারা দেখেছেন।

[এমন সময় ঘরে এসে ঢোকেন রচনার বাবা অবিনাশ। কথা চলতে থাকে, তিনি এসে পিছনে দাঁড়ান।]

হ্যাঁ, বাড়ীর চেয়েও বড় খবর হচ্ছে ম্যানেজার, 'নিউলি এ্যাপয়েন্টেড' ম্যানেজার।

[এমন সময় স্বপ্নাও এসে মার পেছনে দাঁড়ায়।]

প্রকাশ। এমনি একটা সেদিন কে যেন বলছিল—কত কথাই তো শুনছি।

সুরমা। ম্যানেজার! লোকটা কে ?

অবিনাশ। [শান্ত কণ্ঠে] রচনা, মৃগাঙ্ক ওরা কেমন আছে অদিতি ?

মিঃ সেন। শুনলাম তো ভালোই আছে, আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

[দায় সারা জবাব দিলে সুরমাকে] ম্যানেজার হলো—ঐ যে স্যর কে পি,'র নাতি নিখিলেশ চৌধুরী।

সুরমা। এ্যাঁঃ তাই নাকি!

প্রকাশ। ও আবার এসে জুটলো কি করে ?

মিঃ সেন। টাকাটা যেখান থেকে পেয়েছে, সেই অর্গানিজেশনের লোকাল রিপ্রেজেন্টেটিভ নিখিলেশের খুব বন্ধু। নিখিলেশ আমেরিকা থেকে কি নাকি বিজনেস ট্রেনিং নিয়ে বসে ছিল তো আজ ক'বছর হলো। মৃগাঙ্ক বাবুকে ভজিয়ে ভাজিয়ে ঐ বন্ধুই কাণ্ডটি করেছে—বাড়ী কেনা। ব্যবসায় টাকা খাটানো। সবকিছুর এবসল্যুট চার্জ নাকি ওর হাতে—অবিশ্যি মৃগাঙ্ক বাবুর পক্ষে সত্যিই অতগুলি টাকার ধাক্কা সামলানো—

প্রকাশ। তা ধাক্কা সামলানোর ব্যাপারে লোকের তো অভাব ছিলো না—তা বলে এর হাতে গিয়ে পড়া তো ঠিক হলো না। স্যর কে, পি, দের যে কি অবস্থা তা তো আমি জানি—ঘরে নেই পয়সা অথচ চালটি আছে লম্বাই-চওড়াই। এ ছোকরা তো দু'দিনেই সব লুটে-পুটে নেবে।

সুরমা। (অধীর হয়ে) না দাদা, এ তো হতে পারে না, ওদের যত রাগই আমাদের ওপর থাক, এমন সর্বনাশ দেখলে, আমাদের ছুটে যেতেই হবে—আপনি কালই একবার যান, এই ম্যানেজারটাকে আগে তাড়ান দরকার।

প্রকাশ। যেতে তো হবেই।

অবিনাশ। কি দরকার, ওরা যেমন আছে থাক না। ওদের যখন কিছু ছিল না, তখনও খোঁজ নিইনি। আজও না হয় না-ই নিলাম।

সুরমা। তুমি চুপ করো।

প্রকাশ। বুঝে কথা বলতে শেখ অবিনাশ! ওদের কিছু ছিল না বলেই তো দুর্ভাবনারও কিছু ছিল না, আজ আছে বলেই সামলানোর কথা ভাবতে হবে না ?

(অবিনাশ ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।)

স্বপ্না। (মিঃ সেনের কাছে এগিয়ে এসে) তা জামাই বাবু, আপনি সেই সকালে উঠে ছুটে গেলেন ভাব করতে, আপনার সঙ্গে দেখাই করলে না!

মিঃ সেন। দেখা করলে না তা নয়, আমিই আর ওপরে গেলাম না।

স্বপ্না। ও! কার্ড পাঠাতে হয় বুঝি ?

মিঃ সেন। কার্ড না পাঠালেও ম্যানেজারকে ডিঙোতে হয়। আর হবেই বা না কেন, সে এখন একটা কেউ-কেটা লোক।

[এমন সময় বাইরের দিককার দরজা দিয়ে ব্যস্ত ভাবে ঢোকে ভৃত্য]

ভৃত্য। নতুন জামাই বাবু এসে বড় বাবুর খোঁজ করছেন।

প্রকাশ। (ব্যস্ত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে) মৃগাঙ্ক আমাকে খোঁজ করছে ? আমি জানতাম সুরমা, শেষ পর্যন্ত আমাকে দরকার হবেই—আচ্ছা তোমরা সব ভেতরে যাও, আগে ব্যাপারটা আমি বুঝে দেখি। (ভৃত্যকে) যা নিয়ে আয় এখানে।

[ভৃত্য বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়। সুরমা, স্বপ্না, অদিতি চলে যায় বাড়ীর ভেতরের দিকে। একটু পরেই ঈষৎ স্খলিত পদে এসে ঘরে ঢোকে মৃগাঙ্ক।]

জ্যাঠা। আরে মৃগাঙ্ক, এসো এসো, বসো।

মৃগাঙ্ক। (খানিকটা জড়িতকণ্ঠে) বসছি—আপনি ভালো আছেন ?

জ্যাঠা। অ-তুমি—তা তুমি (মুখচোখের অভিব্যক্তিতে বোঝা যাবে যে মৃগাঙ্কর অপ্রকৃতিস্থতা সে বুঝতে পেরেছে) বসো বসো, স্থির হয়ে বসো, আমি স্বপ্না—ওদের ডেকে দিচ্ছি।

[ব্যস্ত হয়ে প্রকাশ ভেতরে চলে যায়। প্রকাশ বেরিয়ে

যেতেই মৃগাঙ্ক সহজ ভাবে পায়চারী করতে থাকে—চোখে-মুখে চাপা হাসি। একটু পরেই পর্দা সরিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে উঁকি দেয় স্বপ্না, মৃগাঙ্ক তা দেখতে পেয়ে।]

মৃগাঙ্ক। (সহজ সুরে) কে স্বপ্না, এসো, এদিকে এসো, অমন উঁকি-ঝুঁকি মারছো কেন—এসো ?

[স্বপ্না একটু বিব্রত ও বিস্ময়ের ভাব নিয়ে ঢোকে।]

মৃগাঙ্ক। তা তোমরা সব ভালো আছ, বাবা ভালো আছেন, বাবা কোথায় ?

স্বপ্না। (বিস্মিত ভাবে) ওপরে।

মৃগাঙ্ক। এসো, বসো।

স্বপ্না। বসছি—কিন্তু জ্যাঠামশায় যে বললেন—

মৃগাঙ্ক। কি বললেন—খুব চটেছেন নাকি ?

স্বপ্না। না তো চটেননি, বলছিলেন—

মৃগাঙ্ক। ও, চটেননি ! বেশ বেশ।

[বলে হাসতে হাসতে মৃগাঙ্ক ঘরের অন্য দিকে এগিয়ে যায়। ঠিক এমনি সময় ঘরে ঢোকে সুরমা, মৃগাঙ্ক তখন অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে। সুরমা ঘরে ঢুকেই চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন করে স্বপ্নাকে। স্বপ্না মুখভঙ্গীতে জানায় সে কিছু বুঝতে পারছে না—ঠিক এমনি সময় মৃগাঙ্ক ঘুরে দাঁড়ায়।]

সুরমা। তুমি এসেছো, এত খুশী হলাম !

মৃগাঙ্ক। হ্যাঁ অনেক দিন আমাদের দেখেননি তো, রচনাও ভালো আছে।

[সুরমা একটু বিব্রত বোধ করে। এমন সময় ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘরে ঢোকে অবিনাশ।]

অবিনাশ। এই যে মৃগাঙ্ক, এসো এসো, তোমরা সব ভালো আছো ? রচনা ভালো আছে ?

মৃগাঙ্ক। (এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতে করতে বলে) রচনা ভালোই আছে।

অবিনাশ। থাক থাক। তোমরা সুখী হও। তোমাদের মঙ্গল হোক, বসো বসো, দাঁড়িয়ে কেন ?

সুরমা। (অবিনাশকে) হ্যাঁ তুমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলো, আমি জলখাবারটা নিয়ে আসছি—আয় তো স্বপ্না !

[বলে ত্রস্তে বেরিয়ে যায়, সংগে স্বপ্না]

অবিনাশ। থাক্ বসো বসো। কেমন এবার দেখলে তো যা বলছি ঠিক কি না, ও তোমার পুরুষকার টুরুষকার কিছু না, ভাগ্য—একমাত্র ভাগ্যই হলো সত্য।

মৃগাঙ্ক। (হেসে) যে সমাজে একটা ঘোড়া একজন নগণ্য মানুষকে রাতারাতি মহা গণ্যমান্য করে তুলতে পারে, সেখানে ভাগ্যকে মানতে হয় বৈ কি।

অবিনাশ। না হে সর্বত্র, সর্বকালে। পারে তোমার পুরুষকার ভূমিকম্পে একটা দেশ ধ্বসে যেতে থাকলে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে ? পারে একটা গ্রহ বেচালে গেলে আর একটাকে ঠুকে দিলে তাকে রুখতে ?

মৃগাঙ্ক। অমন বিরাট প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে জয় করতে না পারলেও স্বাভাবিক জীবনের অনেক ভাগ্যকেই মানুষ সমষ্টিগত ভাবে প্রকৃতিকে এনেছে আয়ত্তে—জয় করেছে হিংস্রজন্তুর আক্রমণ, পরাজিত করেছে অসংখ্য রোগ আর মহামারী—তাই ইচ্ছে করলে মানুষ অন্নবস্ত্র বাসস্থানের দৈনন্দিন সমস্যাকেও সকলের জন্য অনায়াসে জয় করতে পারে—যার অভাবে অসংখ্য মানুষের জীবন ভাগ্যের বিড়ম্বনায় লাঞ্ছিত। এই ধরুন না আপনার মেয়ে রচনা, আজ হঠাৎ একটা ঘোড়ার কল্যাণে বড়লোক হয়ে না গেলে, কি হতো তার এবং তার অনাগত সন্তানদের ভবিষ্যৎ ? হয়তো দেখা যেত একটি স্ত্রীলোকের কয়েকটি রুগ্ন সন্তান, খাদ্যের অভাবে, শিক্ষার অভাবে একদিন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর ভাগ্যকে দিচ্ছে ধিকার—আপনারা দেখে হয়তো চিনতেও পারতেন না।

অবিনাশ। (দাঁড়িয়ে উঠে) থামো—থামো মৃগাঙ্ক, এ-সব আর তোমাকে বলতে হবে না—আমি স্বীকার করছি, বিশুদ্ধ তত্ত্ব হিসাবে আমার বক্তব্য যতখানি সত্য, দৈনন্দিন জীবনের দিক থেকে বিচার করতে গেলে, তোমার কথাও অবহেলা করবার মতো নয়।

[এমন সময় সুরমা ছুটি ট্রেতে দু'জন ভৃত্যের হাতে বহুবিধ খাবার সাজিয়ে এনে ঘরে ঢোকে। পেছনে স্বপ্না। ভৃত্য ট্রেটা টেবিলে রাখে।]

সুরমা। বসো মৃগাঙ্ক একটু—

মৃগাঙ্ক। অসময়ে তো আমি কিছু খাই না।

অবিনাশ। হঠাৎ আয়োজনটা আমরা করতে পারলেও তোমার চোখে একটু বাধছে না ? (নিজের হাতে তুলে) এই সরবতটা খেয়ে নাও।

মৃগাঙ্ক। আহা হা আপনি কেন—দিন। (সরবতটা এক চুমুকে খেয়ে নেয় এবং বিশেষ করে অবিনাশকে লক্ষ্য করে) আচ্ছা আমি আসি—একদিন আপনাকে এসে নিয়ে যাবো।

অবিনাশ। নিশ্চয়, নিশ্চয় যাবো বৈ কি।

[মৃগাঙ্ক সুরমাকে এক রকম অস্বীকার করেই দরজার দিকে এগিয়ে যায়। সংগে চলে স্বপ্না। দরজার কাছাকাছি গিয়ে, থেমে জিজ্ঞেস করে মৃগাঙ্ক স্বপ্নাকে।]

মৃগাঙ্ক। জ্যাঠামশায় !

স্বপ্না। (চাপা তিরস্কারের সুরে) গুরুজনের সঙ্গে এমন একটা পরিহাস না করলেই হতো না ?

মৃগাঙ্ক। পরিহাস ! কি যে বলো !

[এমন সময় ভেতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে মিঃ সেন।]

মিঃ সেন। (মৃগাঙ্কর কাছে এগিয়ে এসে) এ কি, আপনি চললেন ?

মৃগাঙ্ক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মিঃ সেন। (অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মৃগাঙ্কর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে) আফটার অল্ ওয়ান মষ্ট এডমিট, ইউ আর রীয়ালি এ্যান্ একস্ট্রীমলি লাকি পার্সন—সত্যি আপনি ভাগ্যবান !

মৃগাঙ্ক। না—না ভাগ্য-টাগ্য নয়—ঐ যে আপনি বলেন চান্সেস আর ইকোয়াল্। এখানেও ঠিক তাই—সুযোগ সবার সমান ছিল। (নিজেকে দেখিয়ে) এফিশেন্সি—টিকিট কেনার কৃতিত্ব—(বলে হা-হা করে হেসে ওঠে) চলি—(একটু এগিয়ে গিয়ে ফিরে) শুনলুম আপনি একদিন গিয়েছিলেন, আসবেন আর একদিন।

মিঃ সেন। (ব্যঙ্গের সুরে) নিশ্চয়ই দশটার পর।

মৃগাঙ্ক। (ব্যঙ্গ-মেশানো বিনয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ, তার আগে তো আমি নাবি না।

[বেরিয়ে যায় মৃগাঙ্ক]

তৃতীয় দৃশ্য

[মৃগাঙ্কর বাড়ীর লবি। পরের দিন সকাল। ভোলা বিশু দুটো কৌচে বসে।]

ভোলা। দেখ বিশু, এই এ্যাদ্দিনেও পা ঝুলিয়ে বসাটা কি রকম অভ্যাস হলো না রে!

বিশু। তা তুলে বসলেই পারিস।

ভোলা। বসবো—বসি। (দু'পা কৌচে তুলে উটকো হয়ে বসে) আরাম করেই যখন বসলাম তখন একটা কথা বলি শোন—এই সিগারেটগুলোতে শানায় না রে, একটা বিড়ি খেতে ইচ্ছে করছে।

বিশু। আছে তোর কাছে?

ভোলা। হ্যাঁ আজ কিনেছি।

বিশু। দে একটা।

[ভোলা বিড়ি বার করে দেয়। বিশু একটা ধরায়। সাহস পেয়ে ভোলা নিজে একটা ধরিয়ে হাতের মুঠোয় চেপে টানতে থাকে। এমন সময় হাই হিলের খুট-খুট শব্দ করে এগিয়ে আসে উগ্র আধুনিকা তরুণী মিসেস চৌধুরী, নাম মীরা। বিস্মিত বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে লোক দু'টির দিকে তাকিয়ে দেখে সে। ভোলা বিড়িটা নামিয়ে নেয়। বিশু টানতে থাকে।]

মীরা। (কথা বলতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না এমন ভঙ্গীতে) এই, ম্যানেজার মিঃ চৌধুরীকে ডেকে দাও তো।

বিশু। (উঠে দাঁড়িয়ে বিরক্তির সুরে) দাঁড়ান ডেকে দিচ্ছি। ভোলা, ম্যানেজারকে ডেকে দে তো।

[বিশু কোনো দিকে না তাকিয়ে চলে যায় নিজের ঘরে। ভোলা গিয়ে অফিস-ঘরে ঢোকে। একটু পরেই বেরিয়ে আসে ম্যানেজারের সঙ্গে। ম্যানেজার মৃদু হাসি হেসে এগিয়ে যায় মিসেস চৌধুরীর কাছে। ভোলা চলে যায় নিজের ঘরে।]

মীরা। হু আর দোজ স্কামস্—কৌচের ওপর উটকো হয়ে বসে বিড়ি ফুকছিলো।

ম্যানেজার। হাস্‌স্—ওরা বসের পেয়ারের লোক, একটি বিশু, একটি ভোলা—একজন ঠেলাওয়ালা, একজন কাপড়েওয়ালা।

মীরা। ইম্পসিবল। আই ওন্ট টলারেট দীজ ন্যুইসেন্স!

ম্যানেজার। ধীরে ডিয়ার ধীরে, এ আবার একটা সমস্যা নাকি! দু'দিন বাদে টুসকি দিয়ে সরিয়ে দিতে পারবে। তুমি বসো, আমি মিসেস চ্যাটার্জিকে খবর দিচ্ছি।

[ম্যানেজার পা বাড়ায়। মীরা ডাকে—]

মীরা। শোনো, আমি যা করবো তার উপর ম্যানেজারি করতে এসো না—দু'-চারদিনের মধ্যে দেখবে সব হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছি। আঃ এতগুলো দিন ধরে ঈভনিংটা এমন কাটছে, সো ড্রাই এণ্ড ডাল—ফার্ষ্ট গ্যারাণ্টি আই গিভ ইউ—এমন ব্যবস্থা আমি করবো যাতে প্রতিটি সন্ধ্যা সোনার টুকরো হয়ে উঠে—তারপর? তারপর সে দেখতেই পাবে। আচ্ছা যাও—

ম্যানেজার। (ঝুঁকে পড়ে) মাই ঈভিল জীনিয়াস

মীরা। (গালে টোকা দিয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ, ইয়র ওনলি হোপ—একমাত্র ভরসা।

[ম্যানেজার দু'পা এগিয়ে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থেমে পড়ে। রচনাকে দেখা যায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।]

ম্যানেজার। এই যে মিসেস চ্যাটার্জি, নিজেই এসে গেছেন!

রচনা। (এগিয়ে এসে মিসেস চৌধুরীকে) ওপর থেকে আপনার গাড়ী দেখে নেবে এলাম।

ম্যানেজার। (পরিচয় করানোর ভঙ্গীতে) মিসেস চ্যাটার্জি—মিসেস চৌধুরী—মাই বেটার থ্রি-ফোর্থ!

[রচনা ও মীরা হাসে। নমস্কার-বিনিময় হয়।]

রচনা। বসুন, ওঁকে বলে এসেছি, উনিও আসছেন।

ম্যানেজার। আসছেন না, ঐ যে এসে গেছেন।

[সিগারেটের টিন-হাতে এগিয়ে আসে মৃগাঙ্ক]

রচনা। (পরিচয় করিয়ে দেয়) মিসেস চৌধুরী—মিঃ চ্যাটার্জি।

মৃগাঙ্ক। (নমস্কার-বিনিময় সেরে) আসুন এখানেই বসা যাক।

[সবাই বসে]

ম্যানেজার। ব্যয়া—

[ভেতর থেকে ছুটে আসে বেয়ারা।]

চা লাও।

[বেয়ারা চলে যায়।]

(মীরাকে) মিঃ চ্যাটার্জিকে তুমি বুঝিয়ে বলো, কি ভাবে কি করতে চাও।

মৃগাঙ্ক। (মিসেস চৌধুরীকে) আমাকে বুঝিয়ে বলবার কিছু দরকার নেই, ও-সব আমার মাথায় ঢুকবেও না। মোটামুটি রচনার কাছ থেকে আমি সব শুনেছি। ভালোই, দেখা যাক—মধ্য আর নীচের তলার লোকগুলোকে তো দেখলাম আর চিনলাম, উচ্চতমদের সংগেও পরিচয়টা একবার হয়ে যাক।

মীরা। ও ইউ স্পীক সো ইণ্টারেষ্টিং—আপনি এমন চমৎকার করে বলেন—

[বেয়ারা ঢুকে চায়ের ট্রেটা রচনার সামনে রেখে চলে যায়]

রচনা। (চা ঢালতে ঢালতে ম্যানেজারকে লক্ষ্য করে) নিমন্ত্রিতদের লিষ্টটা একবার ওঁকে দেখান না—(মৃগাঙ্ককে) তুমি দেখ না একবার কাদের সব বলা হবে।

মীরা। এই যে লিষ্ট আমার কাছে। (ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বার করতে যায়)

মৃগাঙ্ক। ও দেখে আমি কি করবো, অধিকাংশকেই চিনবো না—দু'-চারজন হয়তো বেরুবে, যাদের নাম শুনেছি মাত্র।

মীরা। আপনার কোনো বন্ধু থাকলে নামগুলো—

মৃগাঙ্ক। আমার বন্ধু বলতে তো দু'টি। তারা আমার বাড়ীতেই থাকে, নিমন্ত্রণ করবার দরকার নেই।

রচনা। তুমি কি বিশু আর ভোলার কথা বলছো?

মৃগাঙ্ক। হ্যাঁ।

মীরা। বিশু—এ্যাণ্ড ভোলা!

মৃগাঙ্ক। আপনি দেখেছেন ওদের?

মীরা। হ্যাঁ ছবিতে দেখলাম—তা ওরা তো সোসাইটির এটিকেট, আই মীন্ দশজনের সঙ্গে মেলামেশার নিয়মকানুন ঠিক জানে না।

মৃগাঙ্ক। জানে না, শিখে নেবে—পুরো ব্যাপারটাই খাঁটি দিশি যখন নয়, তখন শিখতে একদিন সবারই হয়েছে—জন্ম থেকে যে পেয়েছে, তারও বাপঠাকুর্দা কেউ একজনকে শিখতে হয়েছে কোনো দিন।

মীরা। কিন্তু—

ম্যানেজার। (চোখের ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে) তা বেশ তো, ওরা থাকবে—হ্যাঁ এ সব শিখে নিতে কতক্ষণ—তাহলে আসছে রবিবারই দিন স্থির হলো।

[বলে দাঁড়িয়ে ওঠে—অন্য সকলেও]

রচনা। (মিসেস চৌধুরীকে লক্ষ্য করে) আমি এখন থেকেই নার্ভাস ফীল্ করছি, আপনাকে কিন্তু আজ থেকেই এর পেছনে লেগে পড়তে হবে।

মীরা। আপনাকে কিচ্ছুটি ভাবতে হবে না মিসেস চ্যাটার্জি—আই উইল ম্যানেজ এভরিথিং—তাছাড়া আপনাকেও এ দু'দিনের মধ্যে এমন শিখিয়ে পড়িয়ে নেবো যে দেখবেন ইউ ইওরসেল্ফ আর ম্যানেজিং দি হোল শো—আপনাকে সে দিন যা সাজাবো (ঝটকা মৃগাঙ্কের দিকে মুখ ফিরিয়ে কণ্ঠস্বর নীচু করে) আপনিও বাদ পড়বেন না।

মৃগাঙ্ক। আমাকেও সাজাবেন? (হেসে ওঠে)

[মীরা নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেয়]

ম্যানেজার। (রচনাকে) চলুন, হলঘরটা কোথায় কি ভাবে সাজানো যায় একবার দেখা যাক।

রচনা। তুমিও এস না।

মৃগাঙ্ক। না তোমরাই যাও। আমি ততক্ষণ বরং ব্রাদারদের নিয়ে একটু গল্প জমাই। (গলা ছেড়ে হাঁক দেয়) বিশু—

[ম্যানেজার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে রচনার দিকে তাকায়। রচনা একটু সঙ্কোচবোধ করে দু'জনে করিডোর দিয়ে বেরিয়ে যায়। গম্ভীর মুখে এসে ঢোকে বিশু।]

মৃগাঙ্ক। ভোলারাম কোথায়?

বিশু। (বসে) এই বাইরে কোথায় না জানি গেল—

মৃগাঙ্ক। তা তুই মুখটা অমন গোমড়া করে আছিস কেন?

বিশু। (একটু চুপ করে থেকে) অনেক দিন তো রাজার হালে তোমার এখানে থাকলাম দাদা, এখন নিজের কাজে ফিরে যেতে দাও। ক'দিন আর এভাবে বসে বসে কাটাবো বল তো?

মৃগাঙ্ক। (ভারী গলায়) কথাটা মাথায় ঢোকালে কে, শুনি?

বিশু। কেউ ঢোকায় নি দাদা, আমি নিজে থেকে বলছি। যাই বল, তোমার বন্ধু-বান্ধব বাড়বে, তখন কেবলই আমাদের নিয়ে মুস্কিলে পড়তে হবে তোমাকে—তাই আমি ঠিক করেছি, কালই আমরা আমাদের ওখানে ফিরে যাবো।

মৃগাঙ্ক। (চটে ওঠে) ঠিক করবার মালিক তুমি না আমি—যাও দেখি এখান থেকে, পুলিশ দিয়ে পাকড়াও করে এনে আটকে রাখবো—যাবো বললেই যাওয়া হলো আর কি? (সিগারেট-টিন হাতে উঠে দাঁড়ায়) আমার বাড়ীটা চিড়িয়াখানা, এখানে মানুষ মানায় না, এই তুমি বলতে চাও? নচ্ছার কোথাকার—

[বলে ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে যায়। বিশু সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হাতে মাথা রেখে বসে থাকে। এমন সময় মধুকে নিয়ে ব্যস্তভাবে এসে ঢোকে ভোলা।]

ভোলা। দেখ বিশু, কা'কে নিয়ে এসেছি।

বিশু। আরে মধু, আয় আয়।

[নোংরা পোষাক, অপরিচ্ছন্ন খালি পা নিয়ে কার্পেটের ধার ঘেঁষে এগিয়ে আসে মধু। বিশুও কৌচ-কার্পেটগুলোর ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিজেই উঠে যায় মধুর কাছে।]

বিশু। (ভোলাকে) ওকে কোথায় পেলি?

ভোলা। গেট দিয়ে ঢুকছি, দেখি ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ভেতরের দিকে। অনেক খুঁজে-পেতে গেটে এসে আটকে গেছে, দরওয়ান বেটা ঢুকতে দেয়নি।

বিশু। (ভ্রূ কুচকে একটু চুপ করে থেকে) বিন্দুদি' ভালো আছে রে মধু?

মধু। হ্যাঁ—মায় তোমার কথা কেবলই কয়। কই তুমি তো আর আস না আমাগো বাড়ি? (কথা বলে বটে তার চেয়েও অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে এদিক ওদিক) কি সুন্দর, বিশু মামা, তোমরা এইখানেই থাকো না?

[মধু বিহ্বল অবস্থায় বিশুর গা ঘেঁষে তার অপরিচ্ছন্ন হাত দিয়ে মুঠো করে ধরে বিশুর ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবীটা।]

বিশু। (মধুর হাত ছাড়িয়ে, একটু সরে গিয়ে) এঃ, দিলি তো পাঞ্জাবীটা নোংরা করে—

[অপ্রস্তুত মধু ভীত চোখে তাকায়। মুহূর্তের ভগ্নাংশে বিশুর খেয়াল হয় এই জামাকাপড়ের খাতিরেই মধুকে এতক্ষণ এভাবে সে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এ অন্যায় উপলব্ধি করামাত্র মধুকে দু'হাতে তুলে সজোরে সে বুকে চেপে ধরে।]

(আবেগ ভরা রুদ্ধকণ্ঠে) মধু, তোর মাকে গিয়ে বলিস, আমি তার সেই বিশুই আছি—আমি তার কাছেই চলে যাবো—আমি তার কাছেই চলে যাবো।

[ক্রমশঃ।

শূদ্র

শুদ্ধসত্ব পাবকের মত
জগতের গ্লানি ক্ষুদ্র দহে
মহামানবের গতি সে মূর্ত
শূদ্র কখনো ক্ষুদ্র নহে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৭

রঞ্জনের মৃত্যুরহস্য যে রকম চাঞ্চল্য জাগিয়েছিল সারা সুলতানপুরে এখন আর সে রকমটি নেই। সবই যেন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে।

আসবার কথাই। কারণ—গ্রামের লোক বেকার বসে থাকে না বড়-একটা কেউ। আশ-পাশের কলিয়ারীতে অধিকাংশ লোক চাকরি করে। এই নিয়ে বসে বসে গুলতানি করবার সময় কোথায়?

তবে দক্ষিণপাড়ার কয়েক জন ছেলে-ছোকরা কাজকর্ম কিছু করে না। কয়লার জায়গা-জমি ছিল তাদেরই বেশি। সারফেস্-রয়েলটির টাকা কেউ কেউ মন্দ পায়নি। লোকে বলে নাকি তারা সেই টাকা ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে আজও খাচ্ছে।

কিন্তু কথাটা বোধ হয় সত্যি নয়।

বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরিয়ে যায়। কলসীর জল গড়াতে গড়াতেই শেষ হয়।

তবে বসে-খাওয়া কুঁড়েমির একটা নেশা আছে। এ-নেশা যার ধরেছে, সে আর সহজে তা' পরিত্যাগ করতে পারে না।

হাবু, নারাণ, শিবু আর ফটিককে দেখলেই সে-কথা বুঝা যায়। টাকা কিছু কিছু পেয়েছিল তাদের বাপ-জ্যেঠারা। সে টাকা কবে ফুরিয়ে গেছে। তারা এখন আড্ডা মারে পরাশরের জ্যোতিষ-আশ্রমে।

ফটিককে তার বাবা সেদিন বললে, বেরো তুই বাড়ী থেকে। বিধবা মেয়ে তো নোস্ যে, বাড়ীতে বসে বসে খাবি।

ফটিক বললে, চাকরির চেষ্টা তো করছি। কোথাও কিছু না পেলে কি করবো!

এত লোক চাকরি পায় আর তুই পাস্‌নে! চাকরি খুঁজবার সময় কোথায় তোর!—ফটিকের বাবা বললে, পরাশরের ওখানে সারাদিন তো আড্ডাই মারিস শুনি!

ফটিক রেগে উঠলো। বললে, বেশ করি। এই বলে সে তার বাইকটি নিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

বাবা তার মিথ্যা বলে না।

যাহোক কিছু রোজগার করবার কথা ফটিকের বাবা তাকে বলছে অনেক দিন থেকে। ফটিকের তখন বিয়ে হয়নি। বিয়ের সময় ফটিক তাই বললে, চাকরি জোগাড় করতে হ'লে ছুটে বেড়াতে হবে যেখানে-সেখানে। আমার একটা বাইক চাই। এই বলে শ্বশুরের কাছ থেকে নতুন একটা বাইক সে আদায় করেছে।

সেই বাইকের সদ্ব্যবহার হচ্ছে এত দিন পরে।

সুলতানপুর থেকে আসানসোল! আদালত।

এমন কি সীতারাম মুখুজ্যেকে পুলিশ যেদিন ধরে নিয়ে যায় গ্রাম থেকে, সেদিন একমাত্র ফটিকের বাইকটাই ছুটেছিল সেই জিপ গাড়ীটার পিছু-পিছু।

মামলার দিন যেদিন থাকে, ফটিককে সেদিন আদালতে যেতেই হয়। আজও সে সেইখানেই গিয়েছিল তার বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে। আদালত থেকে ফিরে এলো। পরাশরের আশ্রমে। ফিরে এলো নিদারুণ দুঃসংবাদ নিয়ে। বললে, সর্ব্বনাশ হয়েছে!

কি সর্ব্বনাশ? কিসের সর্ব্বনাশ?

ফটিক বললে, সীতারাম মুখুজ্যের ফাঁসী হলো না।

যারা বসেছিল সবাই যেন একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলো—যা যাঃ! ফাজলেমি করিসনি! কোত্থেকে একটা উড়ো খবর নিয়ে চলে এলো!

ফটিক বললে, বাইকের ধুলো মুছিনি এখনও। ওই দ্যাখ্—আদালত থেকে আসছি।

সত্যি বলছিস?

ফটিক বললে, হাকিম নিজে বলেছে আমি শুনে এলাম।

কি বলেছে?

মুখুজ্যেই যে রঞ্জনকে খুন করেছে—তার কোনও প্রমাণ নেই।

তুই নিজের কানে শুনলি?

ফটিক বললে, না ভাই মিছে বলবো না, যেতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল। একজন উকিলকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে বললে।

তাই বল্!

তারা যেন এতক্ষণ পরে নিশ্চিন্ত হ'লো। মনে হ'লো ফটিককে যেন অবিশ্বাস করতে পারলে তারা বাঁচে। বললে, মুখুজ্যে তাহ'লে জামিনে খালাস পেয়েছে, তুই জানিস না।

আর এক জন বললে, এ বাবা তোমার আমার কেস্ নয়, পুলিশ-চালানী কেস্, সহজে ছাড়বে না।

ফটিক খুঁজছিল পরাশরকে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, দাদা কোথায়?

দাদা আজকাল দিবা-রাত্রির প্রায় অধিকাংশ সময় ঘরে খিল বন্ধ ক'রে ভেতরেই কাটায়। ভক্তের দল বলে, অতি গুহ্য কি একটা যোগ অভ্যাস করছেন তিনি। আবার কেউ কেউ বলে, তিনি আজকাল দিবানিদ্রার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছেন একটুখানি। শীতের আমেজ লেগেছে কয়লাকুঠির দেশে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। আহারাদির পর লেপ চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লে সন্ধ্যার আগে আর উঠতে পারেন না।

সেদিন কিন্তু উঠলেন।

ফটিকের কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল কিনা কে জানে! দরজা খুলে পরাশর বেরিয়ে এলো। মাথার চুল আর দেহের মেদ দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে। চোখ দু'টি লাল।

বললে, এই যে, অনেকেই রয়েছিস এখানে। শোন্।

সবাই অবহিত হ'লো।

পরাশর বললে, আজ দু'দিন ধরে ক্রমাগত একটা ছবি আমি দেখছি চোখের সামনে। তোদের এই সুলতানপুর গ্রামে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছি। সীতারাম মুখুজ্যের সতী-লক্ষ্মী সাধ্বী স্ত্রী সঙ্কটাভৈরবীর আশীর্ব্বাদ লাভ করলে। সাবিত্রী যেমন সত্যবানকে ফিরে পেয়েছিল সেও যেন তেমনি তার মৃত স্বামীকে ফিরে পেলে।

ফটিক বললে, হ'লো তো? আমার কথাটা এখন বিশ্বাস হলো তো তোদের?

পরাশর বললে, তোর আবার কি কথা ফটিক?

ফটিক বললে, আমি আজ আদালতে গিয়েছিলাম। শুনে এলাম সীতারাম মুখুজ্যেকে ছেড়ে দিয়েছে।

পরাশর বললে, দেবেই। মায়ের আশীর্ব্বাদ। জয় মা সঙ্কটাভৈরবী! জয় বাবা রুদ্রেশ্বর!

হাত দু'টি জোড় করে পরাশর তার কপালে ঠেকালে। চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ সে তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

প্রণাম শেষ হ'লে বসলো সেইখানে। বললে, দেখলি? মানুষ কি করবে রে! মানুষের কোনও শক্তি নেই। শক্তি সব সেই শক্তিময়ী মায়ের।

ফটিক এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, এবার সে বসলো গিয়ে পরাশরের পায়ের কাছে। বললে, আচ্ছা দাদা, মুখুজ্যের আর কিছু হবে না তা'হ'লে? তুমি যে গণনা করে বলেছিলে ফাঁসি হবে, সে সব তা'হ'লে ভুল হয়ে গেল?

পরাশর বললে, হ'লো। হ্যাঁ, সব ভুল হয়ে গেল!

বলেই কি যেন সে ভাবলে। ভেবে বললে, মনে মনে খুব অহঙ্কার হয়েছিল আমার—বুঝতে পারছি। তাই সে অহঙ্কার আমার ধুলোয় লুটিয়ে দিলে। মা আমার দর্প চূর্ণ করে দিলে। —কই রে, তোরা যে তামাক-টামাক খাচ্ছিস না কেউ? পচু একবার কল্‌কেটা সাজ বাবা!

পচু তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে তামাক সাজতে বসলো।

পরাশর বললে, শনিবার আর মঙ্গলবার আমার কাছে লোকজন আসে গণনা করাবার জন্যে। আগামী দু'মাস আমি গণনা করবো না।

পচু চমকে উঠলো।—সে কি দাদাঠাকুর! দু'মাস কারও হাত দেখবে না? কত লোক এসে এসে ফিরে যাবে—

পরাশর বললে, তা যাক্। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্।

এর ওপর আর কথা চলে না।

শনি মঙ্গলবার আজ-কাল লোকজন কম আসে না। কত দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে মেয়েরা আসে গরুর গাড়ীতে চড়ে। কত ভাগ্যবিড়ম্বিত ধনী আসে ছদ্মবেশে। কত অকালপক্ব হতাশ-প্রেমিক যুবক আসে। কত রকমের কত বিচিত্র মানুষের হয় সমাবেশ।

তারা আসবে আর হতাশ হয়ে ফিরে যাবে।

লোকসানও পরাশরের কম হবে না।

যিনি তাঁর সামান্য ভুলের জন্য এতগুলো টাকার মমতা অনায়াসে পরিত্যাগ করতে পারেন, তিনি যে অসামান্য ব্যক্তি, তাতে কোনও সন্দেহই নেই।

ফটিক এসেছিল সীতারাম মুখুজ্যের খালাস পাওয়া নিয়ে পরাশরকে একটু অপ্রস্তুত করবার বাসনা নিয়ে।

কিন্তু হঠাৎ কি যে তার হ'লো সে নিজেই বুঝতে পারলে না। পরাশরের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার পায়ের কাছে বসে পড়লো। তার পর হঠাৎ এক সময় তার ডান হাতখানা পরাশরের চোখের সামনে বাড়িয়ে ধরে বলে উঠলো, হাত দেখা বন্ধই কর আর যাই কর দাদা, আমার হাতটা তোমাকে দেখে দিতেই হবে।

[ক্রমশঃ।

মৃত ও জীবিত

"It is a common saying that all the land a man requires is three yards. But only a dead man needs three yards. A living man needs not three yards of land, and not a manor, but the entire earth, all of nature, where he can give full play to all the qualities and characteristics of his untramelled spirit." —Anton Checov.

সোবিয়েতের দেশে দেশে

মনোজ বসু

(১৬)

সেই প্লেন—কাবুল থেকে যেটায় হিন্দুকুশ পার হয়েছিলাম। অক্সিজেনের নল রয়েছে, যদিচ অক্সিজেনের গরজ নেই এই মেঠো অঞ্চলে। হোস্টেসও সেই মেয়েটি—দেহ কিছু ভারিক্কি এবং দাঁতগুলোও। শুয়ে পড়লাম চেয়ারটা নিচু করে দিয়ে কম্বল টেনে গায়ের উপর চাপিয়ে। পাইলট যথারীতি গোড়ায় একটু বক্তৃতা ছেড়েছে—রাতের মধ্যে কোন ঝামেলা নেই—প্রাতঃরাশ কোন এক শহরের কিনারে, বেলা হবে যেখানে নামতে। শ্রীমতী হোস্টেস চা-কফি সাণ্ডউইচের জোগান দিয়ে যেতে পারবেন তো—হোকগে বেলা, কী আর করা যাবে! দিব্যি লাগছে, আরামে ঘুম এসে গেল। মিষ্টি স্বপ্ন দেখছি। চারিদিকে শুধু অনন্ত অবাধ প্রীতি—মানুষের সকল দুঃখ-অশান্তি বিলীন হয়ে গেছে। কী ভালো যে লাগে! এদের এই আজব দেশের চিন্তা-চেষ্টা এই ক'দিনে মনের যেন ঝুঁটি ধরে নাড়া দিচ্ছে।

স্বপ্ন ভেঙে ভেঙে জেগে উঠছি। সবাই ঘুমে অচেতন। আলো নিবিয়ে দিয়েছে, হোস্টেসের ডান পাশে শুধু একটা কমজোরি আলো জোনাকির মতন। বই পড়ছে সে একমনে। ঘুমন্ত নভোলোকের একটি মাত্র পাহারাদার ঐ মেয়েটি। আর জেগে আছে পাইলট ও অফিসারেরা। ককপিটের মধ্যে তারা, দেখতে পাচ্ছিনে। মেশিন চালিয়ে দিয়ে তারাও ঢুলছে কিম্বা কি করছে, কেবা জানে!

তার পরে এক সময় আর কিছু জানিনে। অনেক নিচে মাটির দেশে কত পাহাড় মাথা তুলে উঁকি দিচ্ছে, কত শহর দীপ উঁচু করে দেখছে, কত নদী ছুটছে পাল্লা দিয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে—কিছু জানি নে একেবারে। অনেকক্ষণ কেটেছে, আবার একটু যেন সাড় হল। স্বপ্ন দেখছি, বয়সে ছোট্ট হয়ে গিয়ে এবারে নাগরদোলায় দুলছি। নীলপুজোর মেলায় হরিহরের তীরে বাঁশতলা সাফসাফাই করে নাগরদোলা বসিয়েছে, মোক্ষম পাক খাচ্ছি নাগরদোলায় চড়ে যেন। ঘুম ভেঙে চোখ মেললাম। সত্যি তো, কী বিষম দোলানি! হু-হু করে প্লেন নামছে। জানলা দিয়ে দেখবার চেষ্টা করি। কুয়াশায় আকাশ-ভুবন মুছে গিয়েছে। বেলাটেলা হলে তো নামবার কথা। ঘড়ি দেখলাম, পৌনে চারটা। তবে? যা ভেবেছিলাম, হয়তো বা তাই—ঘুমের ঘোরে পাইলট এটা টিপতে ওটা টিপে বসেছে। কী করা যায়, ডেকে তুলব নাকি সকলকে? ও মশায়রা, আরামসে নাসাগর্জন করছেন, প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত এদিকে। পাকা আমের মতো প্লেন ভুঁয়ে পড়ে যাচ্ছে। পরমায়ু মিনিটখানেক বড় জোর—তারপর হাড়ে-মাসে সবসুদ্ধ তালগোল হয়ে আছি।

চেঁচাবার ইচ্ছে—কিন্তু ঘুম জড়িয়ে আছে, গলা খোলে না। ঘস্‌স্‌ করে আওয়াজ হেন কালে, ভূমির গায়ে প্লেন লাগবার সময় যেমনটি হয়। প্লেন অতএব পড়ে যায় নি, ধীরে-সুস্থে নামিয়ে এনেছে। জানলা দিয়ে প্রাণপণে নজর হানি। যতদূর ঠাহর হয়, দিকহীন তেপান্তরের মাঠ। সারবন্দি আলো দেখা যায় মাঠের প্রান্তে। এ কোথায় নিয়ে এলো, কথা ছিল না এমন তো! থমথমে রাত্রিবেলা প্লেন দৌড়তে দৌড়তে আলোর সারির ভিতর এসে পড়ল। দৌড়চ্ছে—আর দেখলাম, যে-আলো পার হয়েছি, সেগুলো নিবছে সঙ্গে সঙ্গে; সামনের দিকে নতুন আলোর সারি জ্বলে উঠছে।

থামল প্লেন। থেমে দাঁড়িয়ে গর্জাচ্ছে। দরজা খুলে দিল: নামুন, নেমে পড়ুন। মালপত্র যেমন আছে থাক, মানুষগুলি নেমে যান শুধু।

লণ্ঠন ধরে এয়ার-অফিসার কয়েকজন। হ্যারিকেন নয়, ঐ জাতীয় অন্য ধরণের কেরোসিনের বাতি। প্লেন থামতে চক্ষের পলকে মাঠের সমস্ত আলো নিবিয়ে দিল, অনেক দূরে শুধু কয়েকটা টিমটিমে আলো। সিঁড়ি দিয়ে নেমে দাঁড়াতে সর্বশরীরে কাঁপুনি ধরে গেল। কী শীত, কী শীত! কনকনে হাওয়া বইছে। প্যাচপেচে কাদা, বরফ গলে জল জমে আছে এখানে-ওখানে। তারই মধ্যে জুতো ডুবিয়ে ডুবিয়ে চলেছি। মোজা ভিজে গেছে। শীত ঐ ভিজে মোজা দিয়ে পা বেয়ে পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে কনকনিয়ে ব্রহ্মতালু অবধি গিয়ে পৌছুচ্ছে। যাচ্ছি কোথায় গো, কেনই বা নিয়ে যাচ্ছে?

পৌছান গেল অবশেষে আলোর ধারে। এয়ার-অফিস। বৃত্তান্ত জানা যাচ্ছে এবার। কাজাকিস্তানে স্তেপ-অঞ্চলের মধ্যে নেমে পড়েছি, জায়গাটার নাম জুশালি! এ জায়গা ম্যাপে খুঁজে পাওয়া দুর্ঘট। এয়ারফিল্ডও তেমনি—দিগব্যাপ্ত পোড়ো মাঠের মধ্যে গোটা চার-পাঁচ বাড়ি বানিয়ে রেখেছে। এক লহমা ঐ যে আলোর সারি দেখলেন—ডিজেলে চালিত বিদ্যুৎ-বানানোর কল আছে। প্লেন আসছে খবর হলে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে পথ দেখায়; নেমে পড়লে নিবিয়ে দেয় তাড়াতাড়ি। এখনকার এ আলোগুলো কেরোসিনের। হিসাবি গৃহস্থের মতো, তিলেকের অপব্যয় ধাতে সয় না। লড়াইয়ের সময়টা হাসপাতাল বানিয়েছিল এখানে, প্লেন ওঠানামার ব্যবস্থা করেছিল কাজ চালানো গোছের। হাসপাতাল চালু নেই, এয়ার-ফিল্ড রেখেছে দায়ে-বেদায়ে যদি কাজে আসে। যেমন এই আজকে। ঘোরতর কুয়াসা—তার মধ্যে উড়তে সাহস করল না। বিষম সাবধানি এরা—একটু বিপদের ভয় থাকলে প্লেন ভুঁয়ে নামিয়ে ফেলবে (ব্যাপার জরুরি হলে অবশ্য আলাদা কথা)। সেজন্যে, দেখুন, আকাশক্ষেত্রে প্লেনের মহা-মহোৎসব—কিন্তু দুর্ঘটনা একেবারে নেই। কুয়াসা দেখে ওরা শ-দেড়েক মাইল উল্টো এসে বিচার-বিবেচনা করে এইখানে এনে নামাল।

রাত তিনটের রওনা হচ্ছি। পাকা তিন ঘণ্টা চলে এসে এয়ার-অফিসের ঘড়িতে দেখছি চারটা। অঙ্কটা বুঝলেন তো—তিন আর তিনে চার। অতএব ঘণ্টা আড়াই রাত এখনো বাকি। নেমে যখন পড়া গেছে, প্রাতরাশ এখানে। রওনা হতে অতএব সেই আটটা।

ছোট্ট অফিস-ঘর। ঘর বেশ গরম করে রেখেছে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আপাতত যোলজন আমরা হাজির এই ঘরটুকুর ভিতর। ঘেঁসাঘেঁসি দাঁড়াবার ঠাঁই হয়েছে। কী মতলব, ওরে বাবা! দাঁড়িয়েই থাকতে হবে নাকি এই চার চার ঘণ্টা?

দোভাষিণী মীরা বলল, ঘুমিয়ে থাকতে হবে। স্প্রীংয়ের খাট ও গদি-তোশকের উপরে লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে। নয়তো এত জায়গা থাকতে এইখানে এসে পড়লাম কেন?

বলো কি হে! তেপান্তরের মাঠে এতগুলো খাট-বিছানা জুটিয়েছ?

মীরা বলে, পিছনের প্লেনে আর যাঁরা আসছেন, তাঁদের জন্যেও।

চায়ের পিপাসা পেয়ে গেল কোন এক বাবুর। চাইলেই যখন এসে যায়, পিপাসার আর দোষ কি? কিন্তু এই রাত্রে এ সময়টা সুবিধা হল না। এমনি তো প্লেনের চলাচল নেই—খানাপিনার জোগাড় সকালের আগে হয়ে উঠবে না। দাঁতে দাঁত চেপে রাতটুকু কোন গতিকে পিপাসা সামলে থাকুন, কী আর করা যাবে!

পিছনের প্লেন এসে পড়ল। মাঠে নেমে আবার চলেছি শোওয়ার বাড়ির দিকে। আগে পিছে লণ্ঠন ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই বাড়ি যেখানটা মিলিটারি-হাসপাতাল ছিল। রোগি নেই, কিন্তু খাটবিছানাগুলো আছে। খান ষাটেক—অর্থাৎ প্রতিজনে আমরা এক খাটে মাথা এক খাটে পা রাখলেও কতকগুলো বাড়তি থেকে যাবে।

স্প্রীঙের খাট, ধবধবে তোষক-বালিশ, পরিচ্ছন্ন মোলায়েম কম্বল—জুতো-জামা খোলার সবুর সয় না, গড়িয়ে পড়ে আরামে চক্ষু বুঁজেছি। ঘরটা চার জনের—বিদেশ-বিভুঁয়ে মাঠের মধ্যে একা একঘরে থাকা ঠিক নয়। আলোটা চোখে লাগছে, হাত বাড়িয়ে আলোর জোর কমিয়ে নিবু-নিবু করে দিলাম।

ঘুমও এঁটে আসছে। হেন কালে দরজায় টোকা। আস্তে খুব আস্তে। চোখ মেলেছি কিন্তু সাড়া দিই না। ভেজানো দরজা একটুখানি খুলে গেল। করিডরের আলোর একফালি এসে পড়েছে। সেই আলোর উপরে লঘু পা ফেলে এক তরুণী সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল। এদিক-ওদিক তাকায়, আমার মুখের উপর গভীর দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। শীতের মধ্যেও গা ঘেমে উঠেছে। তারপর আমাকে ছেড়ে আর একজনের দিকে তাকাচ্ছে ঐ রকম। সেখানে সাড় মিলল না তো সরে গেল পরের জনের দিকে। সর্বনাশ, রাত্রিশেষে পুরুষমানুষদের ঘরে কি মতলবে ঢুকেছে ফুটফুটে মেয়েটা?

আন্দাজ করুন তো কেন? ক্ষণপরে গ্লোকোভ ঢুকে পড়ে আলো বাড়িয়ে দিল। আঙুল দিয়ে দেখায় প্রিন্সিপ্যাল দোগুর খাটের দিকে। তখন মালুম হল। যা ভেবেছিলাম, সে-সব কিছু নয়—মেয়েটা হল ডাক্তার। প্রিন্সিপ্যালের গলায় বিচি উঠেছে, ঠাণ্ডা লেগে টনসিলে ব্যথা হয়েছে। কিছু খানটান নি সন্ধ্যা থেকে। রওনা হবার মুখে ওরা টের পেয়েছে। তখন সময় ছিল না, বাগে পেয়ে এবারে ডাক্তার নিয়ে হাজির হয়েছে। রাতটুকুও পোহাতে দিল না।

কত রকমে দেখল প্রিন্সিপ্যালের গলা—দেখেশুনে চলে যায়। বাঁচা গেল রে বাবা! তাই কি অত সহজে ছাড়বে? অষুধ ও যন্ত্রপাতি নিয়ে পুনশ্চ এসেছে। স্ট্রেপটোমাইসিন ও পেনিসিলিন জাতীয় কি কি খেতে দিল, ফুঁকতে দিল। ডিস্পেনসারি এই বাড়িতেই—সাধ মিটিয়ে ডাক্তারি করার বাধা নেই। জোরালো আলোয় ঘুম ভেঙে গিয়ে উসখুস করছি সকলে। ভালমানুষ প্রিন্সিপ্যালের লজ্জার অবধি নেই। বারম্বার বলেন, আপনাদের কষ্ট হচ্ছে—কিন্তু আমার কোন হাত নেই। সামান্য একটু ব্যাপার, তা এরা মহা-মহোৎসব জমিয়ে তুলল যে একেবারে।

তাই দেখা গেল, রোগী না থাক, মাঠের মধ্যে ডাক্তার-নার্সেরা আছে কিন্তু। এরোড্রোমের নিয়ম এটা। যে তল্লাটে যখন নামুন, অফিসে ঢোকবার মুখে দেখতে পাবেন একটা-দুটো মেয়ে সতৃষ্ণ চোখে দেখছে আপনার দিকে। আপনার রূপমাধুরী দেখছে না—আঘাত আছে কি না অঙ্গে, নিশ্বাস ঘন হচ্ছে কি না, বমিটমি করে কাহিল হয়েছেন কিনা—এই সমস্ত দেখছে ঠাহর করে। তা আমরাও স্বদেশের তেলে-জলে পুষ্ট এক-একখানা ইস্পাতের শরীর নিয়ে গেছি। মেয়েগুলো নিশ্বাস ফেলে নিষ্কর্মা হয়ে আবার নিজ নিজ টেবিলে বসে পড়ে।

অখ্যাত অজ্ঞাত জুসালির মাঠের রোদ কাচের জানলা দিয়ে আমার বিছানায় পড়েছে, তখন ঘুম ভাঙল। আর দেরি নয়, রওনা এবারে। মুখ ধোওয়ার জল পাওয়া গেল বটে, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপার? একজনে সন্ধান দিলেন—পিছন দিকে মাঠের মধ্যে কয়েকটা বালখিল্য ঘর দেখা যাচ্ছে, বাকি প্রাতঃকৃত্যের ব্যবস্থা ওখানে হওয়া সম্ভব। তাই বটে! কিন্তু নজর করা গেল, ঘরের সঙ্কীর্ণতায় স্থানীয় লোকের মন ওঠে না—পিছনের বিমুক্ত মাঠের উপর নানা পরিচয় চিহ্ন। দিনের আলোয় ভাল করে দেখছি—এদিকে তেপান্তর মরুভূমি, ওদিকটায় ফসল ফলাতে শুরু করেছে। মরু-বিজয় করতে করতে এগুচ্ছে—তারই অগ্রকেতন যত্নলালিত ক্যাকটাস ও রকমারি কাঁটাগাছ।

গরম কোকো ও উৎকৃষ্ট বিস্কুটের ব্যবস্থা করেছে। শীতার্ত সকালে আহা-মরি লাগল। প্লেন কেমন সহজে ওঠায় নামায় এরা, এয়ারফিল্ডে এক হাত পরিমাণ কংক্রিটও নেই। মরুপ্রায় ভূমির খানিকটা বালি সাফসাফাই করে নিয়েছে। ওরই উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে দিব্যি উপরে উঠে গেলাম। যাচ্ছি আস্কবিনস্কে—বড় বিমানঘাঁটি, দুপুরের লাঞ্চ সেখানে।

আরল-হ্রদের পূর্বতীর দিয়ে আছি। অনেকক্ষণ ধরে চলল। আস্কবিনস্ক আর একবার দেখেছেন আপনারা। আজকে দেখি, আর এক চেহারা। জল জমে চতুর্দিকে পায়ের পাতা ডুবে যাওয়ার মতন কাদা হয়েছে। ভুঁয়ে নেমে সেই কাদা-জল ছিটকাতে ছিটকাতে প্লেন চলল। গরুর গাড়ির চেয়ে প্লেনের যে বেশি আভিজাত্য, এমন মনে হয় না। সেদিন এখানে এসেছিলাম, তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আজ প্রসন্ন রোদ। ওভারকোট প্লেনে রেখে নেমে পড়েছি। ঘরে যাব কি—নানান গাছে ভরা উঠানে ঘুরে ঘুরে রোদ

পোয়াচ্ছি সকলে। রেলস্টেশন কাছাকাছি কোথাও, ইঞ্জিনের আওয়াজ আসছে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে রওনা হবার মুখে শোনা গেল, আমাদের প্লেন আগে এসেছে বটে কিন্তু ছাড়বে পিছনে। কি বৃত্তান্ত? না, দোশুকে নিয়ে পড়েছে আবার—নামবার সঙ্গে সঙ্গে এরোড্রোমের হাসপাতালে নিয়ে পুরেছে। বিছানায় শুইয়ে আলো ফেলে নানান কায়দায় পরীক্ষা করছে। পেনিসিলিন কোঁড়াফুঁড়ি করছে মনের সুখে। ওঁরই জন্যে আটকা পড়ে গেলাম আমরা। দোশু মশায়ের লজ্জার অবধি নেই। কাতর হয়ে বলছেন, কী ঝকমারি বলুন তো! এটুকু ব্যাপারে আমাদের দেশে ডাক্তাররা তাকিয়েই দেখত না। এত যত্ন অসহ্য লাগছে।

প্লেন উড়ল আবার মস্কো মুখো। মধ্য-এশিয়ায় ঘোরাঘুরি এত দিনে সারা। বলল, পাঁচ ঘণ্টা লাগবে আবহাওয়া যদি ভাল থাকে। মস্কোর পথ সেদিন কুয়াসায় আচ্ছন্ন ছিল; আজ রোদে হাসছে। বিস্তীর্ণ জলধারার উপর এসে হোস্টেস দেখিয়ে দেয়—ভলগা, ভলগা! ক্ষুদে ক্ষুদে হলেও জাহাজ বেশ বুঝতে পারছি। তারপরে যত এগোই, আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে। পুরোপুরি কুয়াসার মধ্যে এবার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধোঁয়ায় নিশ্চিহ্ন, তার মধ্যে বাংলাসে ভাসছি ক'টি প্রাণী আমরা। প্লেন বড্ড দুলছে। আমার এ পুঁথির বেশির ভাগ খসড়া প্লেনে বসে বসে। যখন কাজকর্ম থাকে না, ছুটোছুটি নেই, অচ্ছিন্ন অবসরে ছড়ানো মনকে গুটিয়ে নিয়ে আসা যায়। কিন্তু নাগরদোলার মতো এমন দুলতে লাগলে লেখা যাবে কেমন করে? এই হুস্ করে নিচে নামছে, আবার সাঁ করে উঠে যাচ্ছে উপরে—খেলাচ্ছে মানুষগুলো নিয়ে। দিকচিহ্নহীন কুয়াসার উত্তাল সমুদ্রে অসহায় মনে হচ্ছে আজ নিজেদের।

১৭

মস্কোর মেট্রোপোল হোটেলে সেই আগের কামরাই দখল করেছি। আজ সকালে তলস্তয়-মিউজিয়াম। সেখান থেকে তারপর তলস্তয়ের বাড়ি। শীত কমে গেছে হঠাৎ, আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে উঠেছে। ওঁরা অবাক হয়ে গেছেন—কী আশ্চর্য, অন্য বছর বরফ পড়ে যে এসময়! দেমাক করে বলি, এবারে পড়বে না, ভালবাসার উষ্ণতা নিয়ে এসেছি আমরা ভারত থেকে। তোমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর তখন বরফ পড়বে।

যেখানে আছি, শহরের কেন্দ্রদেশ এটা। বড় বড় বাড়ি, প্রশস্ত রাস্তা, বিশাল স্কোয়ার। দু-চারটে প্রাচীন বাড়িও আছে, যেমন স্কোয়ারের ওধারে বলসই থিয়েটারের বাড়ি। কিন্তু আগে বুঝতে পারিনি, খুব কাছাকাছি পুরাণো শহরও আছে এই সব বড়-রাস্তা পিছন করে। সেই পাড়ার মধ্যে ঢুকেছি। একটা ছোট পুরাণো ধাঁচের বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। ঘরগুলো ছোট ছোট। প্রতি ঘরের ছাত ভিতর থেকে কতকটা গম্বুজের মতো। তাতে বিচিত্র কারুকর্ম। ১৮৭০ অব্দে বাড়িটা তৈরি।

ঢুকেই সকলের আগে ব্রোঞ্জে-গড়া তলস্তয়ের আধা-মূর্তি। মূর্তি হয়তো আদৌবেই বলা চলে না, তাঁর খানিকটা আদল। কতকগুলো রেখা ছড়িয়ে রয়েছে এবড়োখেবড়ো একতাল ধাতুর উপর। শতবার্ষিকী উৎসবের সময় এই বস্তু বসানো হয়েছে, অ্যানিসিমভ চীনে আমাদের যে উৎসবের নিমন্ত্রণের আশ্বাস দিয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্ব ভাষায় তলস্তয়ের বইয়ের অনুবাদ হয়েছে, একটা ঘরে সেই সমস্ত সাজানো। সংগ্রহে বাংলা বই একখানা মাত্র—আনা কারেনিনা। কিন্তু আমারই জানা তো বিস্তর অনুবাদ—বিশের কাছাকাছি হবে। আধা-বয়সি মেয়েটা ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন—তিনি বললেন, আর কেউ তো পাঠান নি কোন বই, পাঠালে আমরা সংগ্রহে যত্ন করে রেখে দেব। ভরসা দিয়ে এলাম, আমি বলব পাঠিয়ে দেবার জন্য (এবং যথারীতি ভুলে গেলাম পরক্ষণে)।

বিপ্লবের পরে নতুন আমলে এই মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা। লেনিন বলেছিলেন, তলস্তয় হলেন রুশ-বিপ্লবের মুকুর। স্তালিনও তলস্তয়ের ভক্ত ছিলেন। তাঁদের দু'জনের মূর্তি পাশের ঘরে। তলস্তয় সম্বন্ধে লেনিনের হাতে-লেখা মূল পাণ্ডুলিপি কিছু কিছু রয়েছে কাচের ডেস্কে। তলস্তয় সম্পর্কে লেনিনের বইয়ের সংগ্রহও আছে।

এক ঘরে তলস্তয়ের ঠাকুরদাদা ও দাদামশায়ের, এবং তাঁর পৈতৃক বাড়ির ছবি। সেই পৈতৃক বাড়ির চিহ্ন নেই, বিক্রি করেছিলেন সেবাস্টোপোল গল্পের বই প্রকাশের প্রয়োজনে। তলস্তয়ের বাপ সেনাদলে ঢুকে নেপোলিয়নের আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তলস্তয়ের মা'র ছবি পাওয়া যায় না—কুমারী বয়সের একটা সিলোট-ছবি মাত্র জোগাড় হয়েছে। কতকগুলো পুরানো কৌটা—তাতে তাঁর পূর্ব-পুরুষদের ছবি। কাজান-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন, তখনকার ছবি। এক অজ্ঞাত সহপাঠী সেই সময়ে তাঁর ছবি এঁকেছিল, সেটা জোগাড় করে রেখেছে। ছোট্ট বয়সে একখানা ক্ষুদে-তলোয়ার ইস্কুলের পারিতোষিক পেয়েছিলেন; ছাত্র অবস্থায় লিখতেন, নিজের হাতের সেই সব পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডুলিপির উপরে ছবিও আঁকতেন আবার; একটা ছোট পত্রিকায় প্রথম যে গল্প বেরিয়েছিল; সাজিয়ে-গুছিয়ে সমস্ত রেখে দিয়েছে।

সিবাস্টোপোল-লড়াইয়ের পর সেন্টপিটার্সবার্গে গেলেন তিনি। সাহিত্য-কর্ম শুরু করলেন। নানান জায়গা থেকে অজস্র উৎসাহ পেলেন। যে কাগজগুলোয় লেখা বেরুত, তাদের সম্পাদকবর্গের মিলিত ছবি। তলস্তয় দেশ ছেড়ে বেরুলেন, তার পাশপোর্ট।

ফিরে এসে চাষীদের ইস্কুল বসালেন—সেই ইস্কুলের ছবি। তাদের গণিত শেখাতেন কতকগুলো কাঠের ঘুঁটি লোহার তারে গেঁথে। এই চাষীদের উপর কবিতা লিখেছিলেন। শিক্ষা নিয়েও বিস্তর লেখেন এই সময়। সমস্ত পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

ককেশাস অঞ্চলে গেলেন, সেখানকার ছবি। তাঁর স্ত্রী সোফিয়ার নয়নাভিরাম এক ছবি। ওয়ার এণ্ড পীস যেখান থেকে লেখা হয়, সেই তল্লাটের ছবি। এ ঘরে আরও বিস্তর ছবি রয়েছে নামজাদা আর্টিষ্টদের আঁকা। নেপোলিয়নের আক্রমণের সময়কার—মানুষ দলে দলে মস্কো ছেড়ে পালাচ্ছে, পথের ওপরে তাদের বিপন্ন অবস্থা। উপন্যাসে অনেক সত্যি মানুষের নাম দেওয়া হয়েছিল—তাদেরও অনেক ছবি।

পাণ্ডুলিপি দেখতে মজা লাগে—কী কাটাকুটি রে বাবা! আমাদের এই দেখে ছাপাখানার বন্ধুরা বেজার হন; তলস্তয়ের হলে কি করতেন বলুন দিকি আপনারা? ওয়ার অ্যাণ্ড পীস-উপন্যাসের রসদ নিজচোখে দেখে সংগ্রহ করবার মানসে একবার ফ্রন্টে চলে গিয়েছিলেন, তার ছবি। প্রুফে বিস্তর কাটকুট করতেন, কম্পোজ-করা পাতার পর পাতা বাতিল করে দিতেন

—সেই সমস্ত কাটা-প্রুফের গাদা। মাসিক পত্রে ধারাবাহিক ভাবে রিসারেকসন বেরিয়েছিল, সেই মাসিকের সংখ্যাগুলো। আশী বছর বয়সে এক আর্টিষ্ট বন্ধুর আঁকা প্রতিকৃতি। তলস্তয়ের মৃত্যুশয্যা ও মৃত্যুর পরের ছবি। মৃত্যুর পর মুখের যে ছাঁচ তুলে নিয়েছিল। যে সব বন্ধু হামেশাই যাতায়াত করতেন, তাঁদের সকলের ছবি। যেখানে মারা যান, সেই বাড়ির পুরো মডেল।

চারিদিকে কুয়াসা, আকাশে মেঘ। কনকনে হাওয়া দিয়েছে, পশমের মোটা জামা ও দেহচর্ম ভেদ করে হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি ধরে যায়। তা হোক—হাতে সময় কম, ক'টা দিন মস্কোয় থেকে লেনিনগ্রাড মুখো বেরিয়ে পড়ব। তাড়াতাড়ি এর ভিতরে যত-কিছু দেখে যাওয়া যায়।

তলস্তয় মিউজিয়াম থেকে তখনই ছুটলাম তলস্তয়ের বাড়ি। পল্লীবাস নয়, মস্কো শহরে যে বাড়িটায় থাকতেন। কী যত্নে রেখেছে—দেবমন্দিরও লোকে অমন করে রাখে না।

জুতোয় যে পথের ধুলো নিয়ে ঢুকবেন, সে হবে না। এদেশ হলে জুতো খুলতে বলত। ওখানে শীতের দেশ ও সাহেবি পোশাক বলে জুতো খোলা চলে না—কাপড়ের জুতো দিয়েচে, আপনার পায়ের উপরে সেইটা পরে ফিতে এঁটে ঢুকুন। অর্থাৎ জুতোর ময়লা ঐ কাপড়ের জুতোর ভিতরেই থেকে যাচ্ছে।

এক বৃদ্ধা ঘরে ঘরে আমাদের দেখাচ্ছেন। আশী বছরের উপর বয়স—ধবধবে চুল, গায়ের রং পরনের কাপড়চোপড় সাদা ধবধবে। পুণ্য পবিত্র। তাঁকে ধকল দিতে চাইনে—অন্য লোক যারা আছে, তারা আসুক। তিনি এই বয়সে এঘর-ওঘর উপর-নিচে করবেন কেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে? কিন্তু মানা শুনবেন না তিনি। তলস্তয়ের জীবন-কাল থেকে আছেন, কত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখা! বিদেশের মানুষগুলোকে দেখিয়ে বুঝিয়ে আনন্দ পাচ্ছেন।

ছোট ছেলে মারা গিয়েছিল, বাচ্চার সেই খেলনাগুলো অবধি সাজানো আছে। তলস্তয়ের ভ্রু-কোঁচা চোখের জলও জমে আছে নাকি পরিপাটিরূপে এই খেলনা সাজানোর মধ্যে?

ভীষণ হাঁটতে পারতেন তলস্তয়। গ্রামের বাড়ি পায়ে হেঁটে চলে যেতেন এখান থেকে। বৃদ্ধা সেকালের সেই ছবিটা দিচ্ছেন—হাঁটবার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে তীরবেগে ছুটতেন তিনি। গোর্কি আসতেন এই বাড়িতে—এসে চুপচাপ কথা শুনতেন ঐ জায়গাটায় বসে।

বড্ড পুরানো বাড়ি, ১৮০৮ অব্দে তৈরি। ১৮৮২ অব্দে তলস্তয় এখানে এসে উঠলেন। বাড়িটা সেই সময় আগাগোড়া মেরামত হয়। দোতলার ঘরগুলো ছোট ছোট আর বড্ড নিচু—দেয়াল ভেঙে ঘর বড় করলেন, ছাত ভেঙে উঁচু করে তুললেন। খুব সরল সাধারণ জীবন যাপন করতেন তিনি—বড়ঘরের লোক তা বুঝবার জো ছিল না। সকালবেলা উঠে ঘরবাড়ি সাফ করতেন সন্ধ্যাবেলা কাপড়চোপড় গুছিয়ে রাখতেন। লেখা-পড়া করতেন বেলা ন'টা থেকে বিকাল চারটা অবধি। সাতটা থেকে বন্ধু-বান্ধব ও অনুরাগীদের আনাগোনা চলত। লিখবার ঘরে নিচু চেয়ার, দু-পাশে বাতিদান, দোয়াত-কলম, যে জুতোজোড়া পরতেন ঘরের মধ্যে। এ সব তো ভালই—মুশকিল ছিল গিন্নিকে নিয়ে। বড়ঘরের ঘরণী তিনি, আদর্শবাদ ইত্যাদি বেশি আমল দিতে চাইতেন না। তাঁর ঘর দেখলাম—ঘর দেখেই কর্তা-গিন্নির মনের ফারাক বুঝতে পারা যায়। বড় দুই ছেলের ঘর দেখছি—কেরোসিনের আলো, খাট-চেয়ার, রকমারি খেলার সরঞ্জাম। শীত আর বসন্ত কালটা তলস্তয় এই বাড়ি থাকতেন। ছেলেদের ছুটি হয়ে গেলে গাঁয়ে চলে যেতেন।

১৯০১ অব্দে ছেড়ে যান এই বাড়ি। তারপরে ১৯০৯ অব্দে মাত্র দুই রাত্রি থেকে গিয়েছিলেন। বলতেন, মস্কোয় লোকে যে কি করে থাকে বুঝতে পারিনে। সেই অশীতিপর বৃদ্ধা বলছেন আমাদের—তাঁর সঙ্গেও তলস্তয়ের কত কথাবার্তা! বলছেন, আর পুরানো স্মৃতিতে কোটরগত চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠছে।

বললেন, আপনারা কিছু লিখে দিয়ে যান—বিশেষ করে আপনি শিশাতিয়েল যখন, তলস্তয়ের স্বগোত্র। বছরের পর বছর অনেকে লিখে এসেছিলেন। আমি বাংলায় লিখলাম। অনেক দূরের তীর্থযাত্রায় এসে বিনত শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিচ্ছি—এমনি গোছের কিছু। পাশে ইংরেজি করে দিলাম বাইরের লোকে যাতে বুঝতে পারে।

ডিনারের পরে দেখি, 'আওয়ারা' পালা হচ্ছে হোটেলের টেলিভিশনে। আওয়ারা নিয়ে বিষম মাতামাতি—অন্য সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল করে এই পালা দেখানো হয়। অনেক লোকে তিন-চার বার দেখেছে (যেমন, আমাদের দোভাষিণী মীরা) তার পরেও আবার টেলিভিশনে দেখতে চায়। গুটি পাঁচেক বাচ্চা এসে জুটেছে—হোটেলেরই কোন কোন ঘরের তারা—টেলিভিশন দেখবে কি, আমাদেরই মুখ দেখে দেখে সুখ হয় না যেন। বড়রাও তাকান অমনি,—তাঁরা রেখে ঢেকে শিষ্টাচারসম্মত পদ্ধতিতে। বাচ্চারা অত শত বোঝে না, ফ্যালফ্যাল করে সোজাসুজি তাকিয়ে সুন্দর মানুষ দেখে। আজ্ঞে হ্যাঁ, বললে বিশ্বাস করবেন না—আমরা অতি-সুন্দর এখানকার চোখে। কন্দর্পকে রূপে ছাড়িয়ে যাই। এই এক দেশ, দেহবর্ণ নিয়ে যেখানে হেনস্থা নেই। বরঞ্চ কালোরই কদর। তার উপর ভারতীয় হওয়ায় সোনায় সোহাগা হয়েছে। ভারতীয়দের সাত খুন মাপ। বিনয়ের স্ত্রী জয়া দেবী বললেন, শাড়ি পরে বেড়ানোয় আমাদের বড় সুবিধা—ট্রামে-বাসে পথে-বাজারে সর্বত্র খাতির। পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থবাড়ির একটা চেহারা পেলাম জয়া দেবীর মুখে। জারিতসিন গাঁয়ে ওঁদের এক বন্ধু আছে—এক রবিবার গিয়েছিলেম সেখানে। বুড়ি মা, ছেলে, ছেলের বউ আর গোটা দুই বাচ্চা। ছেলে আর ছেলের বউ চাকরিবাকরি করে, বাচ্চা দুটো ঠাকুর-মা'র ন্যাওটা। বউ-ছেলে কম্যুনিষ্ট—নতুন কালের ধরণ-ধারণ তাদের। বুড়ি ওদিকে ছোট এক ঘরে আইকন রেখেছেন, পুজোআচ্চা করেন। বন্ধুটি প্রীতি ও প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলে, মা'র পুজোর ঘর—অনাচারী আমরা ওদিকে যাবো না। যে-বস্তু এদেশের নব্যদের বাড়িতেও হামেশাই দেখে থাকেন—টেবিলে মুর্গি খেয়ে সেই কাপড়-চোপড়ে মায়ের ঠাকুরঘরে যাইনে যেমন আমরা। তাই দেখি, সাধারণ মানুষের জীবন-ধারা মোটামুটি এক—শিক্ষা ও নতুন ব্যবস্থা পরিবর্তনটা কিছু ক্ষিপ্র করে, এই মাত্র। বহু লোকই ওদেশে রাজনীতির ধার ধারে না—কম্যুনিষ্ট সকলকে হতে হবে, তার কোন মানে নেই। [ক্রমশঃ।

উদয়ভানু

গড়-মান্দারণের ঘরে ঘরে মেয়ে হারানোর অশুভ বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে। অবিশ্বাস্য এক দুর্ঘটনার কথা কানে কানে ভেসে চলেছে কাল-বৈশাখীর হাওয়ার মত। কেউ হতাশার শ্বাস ফেলছে, কেউ টিটকারি কাটছে। কারও মুখে সহানুভূতির করুণ-কথা, কারও কণ্ঠে অট্টহাসি। বিপদের দিনেই নাকি মানুষ চেনা যায়; ধরা যায় কে আসল আর কে নকল। অন্তর কার সাদা, কার কালো। দশটা নয়, পাঁচটা নয়,—মাত্র ঐ একটি। চৌধুরী মশাইয়ের গৃহে কান্নার রোল উঠেছে। রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পরে দিনমানেও যখন মেয়ের দেখা মিললো না তখন কেউ আর স্থির থাকতে পারে না। বিশেষতঃ চৌধুরী-মা যেন কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেলেন। ধর্ম্মকর্ম্ম আর গৃহস্থালী কাজে সদাক্ষণ মেতে থাকেন চৌধুরী-গৃহিণী; সখ-সাধ বলতে কিছুই তাঁর নেই। তিনিও আজ জপ-তপ ভুলে কাঁদতে বসেছেন, শিশুর মত পা ছড়িয়ে। চৌধুরীর পালিতজন আর অন্নদাসেরা এখানে সেখানে ছুটেছে মেয়ের খোঁজে। সিপাই আর পাইকরা ঘোড়া ছুটিয়েছে যেদিকে চোখ যায়। বাগদী লেঠেলরা ছুটেছে দলে দলে। কোমর বেঁধে।

কূল-ছাপানো আমোদরের বালিয়াড়ি ধ'রে এগিয়ে চলেছিল লেঠেলরা। হাতে হাতে শাণানো-অস্ত্র, ঝলমল করছে রৌদ্রকিরণে। তীক্ষ্নধার অস্ত্র গাছ কাটে, মাটি কাটে, মানুষের গলা কাটে—কিন্তু জলের বুকে আঘাত করতে পারে না। তাই হয়তো বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে ছুটে চলেছে আমোদরের স্বচ্ছ-স্নিগ্ধ জল। অপেক্ষা নেই, পিছুপানে তাকানো নেই—নদীর গতি যেন বিরামবিহীন। দুই তীরে বৃক্ষরাজি, আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অক্লান্ত দর্শকের মত। শাখাবাহু মেলে কত ডাকাডাকি করছে বাতাসনম্র গাছের সারি। এই আকুল আহ্বানেও সাড়া দেয় না আমোদর। দর্পিতা রঙ্গিণীর মত হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে যেন। ঘূর্ণাবর্ত্ত যেন নর্ত্তকীর ঘাঘরার মতই বৃত্তাকারে ঘুরপাক খায়।

হঠাৎ উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে লেঠেলরা। অকূলে কূল দেখলো যেন। পারাপারহীন অথৈ জলে ভাসতে ভাসতে যেন পারের সবুজ রেখা চোখে পড়েছে সহসা।

—জয় মা রক্ষাকালীর জয়!

বহুজনের মিলিত কণ্ঠের সজোর প্রতিধ্বনি ভাসলো আমোদরের তীরে। আকাশমণ্ডল থেকে যেন বাজের শব্দ ভাসলো। ক'জন লেঠেল হাতের অস্ত্র আর লাঠি ফেলে দিয়ে একে একে নদীতে ঝাঁপ দিলো সশব্দে। [illegible] তীরে একপাল চকাচকী আসর জমিয়েছিল—পাল-পাল মানুষের চীৎকারে উড়ে পালালো [illegible]।

—জয় মা মনসার জয়!

শক্তির একেক প্রতিমূর্তি; শক্তির উপাসক; পরমানন্দে ডাকছে শক্তির দেবীদের। সন্তানের দল ডাকছে শক্তিদায়িনী মাকে। আকাশের উড়ন্ত কাক-চিল চমকে চমকে উঠছে।

—জয় মা শীতলার জয়!

উদাত্তকণ্ঠ আবার বজ্রপাতের শব্দ তুললো যেন। বালিয়াড়ির ধারে কাছে ফণীমনসার ঝাড়। কাঁটাগাছের প্রাকৃতিক বেড়া। দু'জোড়া হায়না লুকিয়েছিল ফণীমনসার ঝোপে। এক জোড়া মর্দা, আর এক জোড়া মাদী। ঠিক মানুষের হাসির মত হা হা হেসে উঠলো তারা। ব্যঙ্গের হাসি হাসতে হাসতে যেন তী[illegible] ছুটলো চকিতের মধ্যে। গভীর জঙ্গলে মিলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল সেই অট্টহাসির সুর।

বুক-সাঁতরে এগিয়ে চলেছে ক'জন লেঠেল। স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে। মাঝ-দরিয়ায় নৌকাডুবির পর যেন হঠাৎ তীরের রেখা দেখতে পেয়েছে।

ঐ যে অদূরে নোঙরবিহীন নৌকা ভেসে চলেছে জলের স্রোতে। আনন্দকুমারীর চিত্রবিচিত্র ও বাহারী পত্রপুটা, চোখে পড়েছে লেঠেলদের। তাই পরিত্রাহি চীৎকার করছে অতিমাত্রা উৎফুল্লতায়। শক্তির দেবীদের ডেকে চলেছে একে একে।

মান্দারণের মন্দিরে মন্দিরে আরাধ্যা দেবীরা হয়তো মুচকি হাসেন ভক্তদের ব্যর্থ ডাকে। চৌধুরীগৃহ থেকে মঙ্গল উপচার আসে আজ। পুষ্প, সিন্দুর, বস্ত্র, মিষ্টান্ন আর প্রণামী আসে। প্রার্থনা এই, চৌধুরীকন্যা যেন বিপন্মুক্ত হয়। যেন ফিরে আসে ভালয় ভালয়,—সুস্থ শরীরে, অক্ষত দেহে। পুরোহিতের দল নারায়ণের মাথায় তুলসীপত্র চাপায় আশায় আশায়।

কিন্তু পত্রপুটা জনশূন্য। নৌকা যদিও মিললো, নৌকার আরোহীকে মেলে না। নৌকার সাজসজ্জা তছনছ হয়ে আছে। লেঠেলের দল দেখলো, নৌকামধ্যে কারা যেন খণ্ডযুদ্ধ চালিয়েছে। নৌকাগাত্রে বন্দুকের বারুদের কালো দাগ। দগ্ধচিহ্ন যেন। সন্ধানী মানুষের দল হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে আবার। বৃথাই জয়ধ্বনি দিয়েছে তারা। শূন্য পত্রপুটা, আনন্দকুমারী তবে কোথায়! নৌকার গায়ে বারুদের চিহ্নই বা কেন? কোন্ শত্রুর অপকীর্তিতে আহত হ'য়েছে নাগমুখী পত্রপুটা, কে জানে! চৌধুরীকন্যা হয়তো আর জীবিত নেই।

একজন মাঝি, অতি কষ্টে চৌধুরীগৃহে হাজির হয় দিনের আলো ফুটতে। অব্যর্থ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে সে। পালিয়ে

বেঁচেছে। নৌকা থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে রক্ষা পেয়েছে। নদীতীরের এক বৃক্ষশীর্ষে উঠে রাত কাটিয়েছে কাঁপতে কাঁপতে।

—মাঠাকরুণের জয় হোক, আমি তাঁর সাক্ষাৎ চাই।

মাঝি তার আর্জি পেশ ক'রলো সদরের জনমানুষকে।

—আমাদের মেয়ে গেল কমনে? বেঁচে আছে না ম'রে গেছে?

চৌধুরীমশাইয়ের নায়েব আর গমস্তারা সোৎসুক প্রশ্ন করেন একে একে। পাইকরা মাঝির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়। বলে,—বন্দী থাকো এখন। মেয়ের খোঁজ পাওয়া যায়তো দেখা যাবে তখন।

কেউ বললে,—আমাদের হুজুরের মেয়েকে তোমরা খুন ক'রেছো। তাই যদি না হবে তো পাত্তা মেলে না কেন? যেমন কর্ম তেমনি ফল ভোগ কর এখন।

মাঝি বললে কাতর সুরে,—আমরা খুন করতে যাবো কেন? এমন কথা মুখে আনবেন না আর।

—তবে কার হাতে তুলে দিয়েছো তাই শুনি? কে সেই দুষ্টজন?

মাঝি বললে,—মাঠাকরুণের দেখা পাইতো বলতে পারি সকল বৃত্তান্ত। হুজুর যখন মান্দারণে নাই, তখন হুজুরণীকেই বলবো।

নায়েব আর গমস্তারা একে অন্যের মুখের দিকে তাকায়। একজন বললেন,—ব্যাটার যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! সিপাই, ব্যাটার কোমরে দড়ি লাগাও! থামের সঙ্গে বেঁধে রাখো! ব্যাটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চায়!

ঢোঁক গিললো মাঝি। চোখে ব্যথাতুর দৃষ্টি ফোটালো। তার কোমরে দড়ি পড়ছে, তবুও সে কোন রকম আপত্তি জানালে না। বললে,—জান থাকতে বলতে পারবোনি আমি। গোপন কথা কি সকলের সমুখে বলা যায়?

—দু'-চার ঘা পড়লেই বাপ বাপ ব'লে বলবি তখন। তাই তোর বরাতে আছে দেখছি।

—না মশাই, কোন'মতেই বলবোনি। ম'রে যাই যদি তবুও নয়। মরণকে আমরা ডরাই না, তা তো জানেন?

আনন্দকুমারীর পত্রপুটার একজন মাঝি ফিরেছে। নায়েব আর গমস্তারা যৎপরোনাস্তি অত্যাচার চালিয়েছে তার 'পরে—অন্দরে থেকেও চৌধুরী-মা শুনতে পেয়েছেন দাসীদের মুখে মুখে। চৌধুরী-মা তাই আর অন্দরে থাকতে না পেরে সদরে এসে হাজির হন। উন্মাদিনীর মত রূপ হয়েছে তাঁর। লাজলজ্জা যেন ভুলে গেছেন বিপদের দিনে। একজন দাসী সঙ্গে আসে। তার হাতে বাঁশকাটির পর্দা! চৌধুরীমার সামনে চিক ধ'রলো সে।

মা বললেন,—আমার মেয়ে কোথায়? মাঝির বাঁধন খুলে দেওয়া হোক।

দাসী বললে,—মা বলছেন যে মেয়ে কোথায়? হাতের হাতকড়া আর কোমরের বাঁধন খুলে দেওয়া হোক মাঝির।

মৃত্যুকে যার ভয় নেই, সেই মাঝিও ডুকরে কেঁদে উঠলো হঠাৎ। কাঁদতে কাঁদতে বললে,—মেয়েকে হুজুরণী ম্লেচ্ছ ডাকাত ধ'রে নিয়ে গেছে। রাত্তিরেরাতে নদীতে সে কি তুলকালাম কাণ্ড! ম্লেচ্ছ ডাকাতরা গোলাগুলী চালিয়েছিল। আমাদের ক'জন মাঝি ঘা খেয়ে মারা প'ড়েছে। আমি পালিয়ে বেঁচেছি।

—তারপর?

চৌধুরী-মা কম্পিতকণ্ঠে শুধোলেন। রুদ্ধশ্বাসে কথা বললেন।

মাঝি ইদিক সিদিক দেখে বললে,—চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত সবই জানেন। তিনিও ছিলেন আমাদের নাওয়ে।

—চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত! আপন মনেই চৌধুরী-মা বললেন,—নৌকায় তিনি ছিলেন কেন? কি কারণে?

—তা তো হুজুরণী জানি না। সেই পণ্ডিতকে পরে আর দেখি নাই।

চৌধুরী মশাইয়ের দর-দালান ইট-চুণের। বাঁধানো উঠান। টালির সিঁড়ি। চুণারের পাথরের মন্দির-মণ্ডপ। মন্দিরে সারি সারি দেবীমূর্ত্তি। শুক্রশাস্ত্রসম্মত গঠিত প্রতিটি মূর্ত্তি। সোনা-জহরতের অলঙ্কারে সাজানো। রেশমের পোষাক।

চৌধুরী-মা একবার মন্দিরের দিকে চোখ ফেরালেন। অশ্রুপূর্ণ দুই চোখে কাতর দৃষ্টি। প্রদীপের আলোয় মূর্ত্তিগুলি সজীব দেখায় যেন। চোখে চোখে যেন স্থির চাউনি। চামরের হাওয়ায় মূর্ত্তির লাল চেলীর বস্ত্রাঞ্চল দুলে দুলে উঠছে।

মাঝি বললে,—হুজুর এখানে থাকলে একটা বিহিত ক'রতেন। ডাকাতদের ধরাধরি করাতেন। আপনার নায়েবমশাইরা দেখি শুধু বিনা দোষে শাস্তি দিতে পারেন। গাল-মন্দ করতে পারেন। মুখ ছোটাতে পারেন।

চৌধুরী-মা লুটানো আঁচল তুলে সিক্ত চোখ মুছলেন। বললেন,—দাসী, তোমাদের গমস্তাদের বল' চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের কাছে পাল্কী পাঠাবে। তিনি যদি না আসেন আমিই যাবো।

দাসীর মুখ থেকে কথাগুলি শুনে নায়েব-গমস্তারা একে একে স্থানত্যাগ করে।

চৌধুরী-মা আবার কথা বললেন,—দাসী, মাঝিকে সদরে অপেক্ষা করতে বল'। মাঝিকে যেন বকশিশ দেওয়া হয় সদর থেকে। আমি অন্দর থেকে চিঁড়ে-মুড়ি পাঠাই, মাঝিকে খেতে দেওয়া হোক।

গমনোদ্যত নায়েবদের উদ্দেশে পুনরুক্তি করে দাসী। মাঝি ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে ভক্তিভরে। বলে,—তোমার মেয়ে আগে আসুন, তখন বকশিশ যত পারো দিও।

চৌধুরী-মার কানে যায় না মাঝির আবেদন। তিনি নীরব পায়ে অন্দরের দিকে ফিরে চ'লেছেন চোখে আঁচল চেপে। অনেক ভেবেছেন চৌধুরী-মা, কিন্তু ভেবে যেন কোন কূল-কিনারা খুঁজে পাওয়া যায় না। চৌধুরী-মা অন্দরে থাকেন পর্দ্দার আড়ালে, বহির্জগতের কিছুই তিনি জানেন না। জানতে পারেন না।

দাসী বললে,—কি হবে ঠাকরুণ? আর কি খুঁজে মিলবে আমাদের মেয়েকে? হুজুরও এই দুঃসময়ে নেই এখানে।

—আমার পোড়াকপাল!

চৌধুরী-মা কান্নার সুরে বললেন। আবার চোখ মুছলেন আঁচলে।

—মেয়েকে পাওয়া গেলেও তোমাদের সমাজ কি তাকে ঠাঁই দেবে? কেমন যেন ভয়ার্ত্ত সুরে কথা বললে দাসী। ভয়ে ভয়ে বললে যেন।

চৌধুরী-মার চোখ থেকে দরদরিয়ে অশ্রুপাত হয়। তিনি চোখে আঁচল চেপে বললেন,—আর ব'ল না, আর শুনিও না এই সব কথা। আমি জানতে চাই না, শুনতে চাই না। খানিক থেমে আবার বললেন,—আমার সোনার মেয়েকে যদি ফিরে পাই, তাই যথেষ্ট।

সমাজের ভয় আমি করি না। যদি না পাইতো কুয়োয় ঝাঁপ দেবো আমি। আর বেঁচে থাকবো না। আমার সব সাধ-আহ্লাদ ঘুচে গেছে। মেয়ে কত কষ্টে আছে কে জানে! বেঁচে আছে না ম'রে গেছে তাই বা কে বলতে পারে!

দ্বাদশ জন কাহারে পাল্কী ব'য়ে নিয়ে যায়। চৌধুরীর গৃহ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামে রূপার পাতে-মোড়া পাল্কী। বারো জন বাহক, যেন হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায় শূন্য পাল্কী।

যেদিকে চোখ পড়ে, দেখা যায় শুধু জল আর জল। গৈরিকবর্ণা ভাগীরথী।

ম্যানেটের বজরা আমোদর ছেড়ে গঙ্গায় পড়েছে। হাল টেনে টেনে কাহিল হয়েছে মাঝিরা। তবুও ক্ষণেকের তরে থামে না তারা। বৈতরণীর যাত্রী যেন, স্বর্গে না পৌঁছে থামবে না হয়তো। হাল টানার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ শোনা যায় শুধু। বৈশাখের বেলা, মাঝিরা ঘামছে তাই। বজরার মাস্তুলে মাছ-রাঙা পাখী উড়ে এসে ব'সেছে।

ম্যানেট কাগজ-কলম টেনে নিয়ে কি করছে কে জানে! একেকবার দেখছে চৌধুরাণীকে। সাগ্রহে লক্ষ্য করছে যেন। বিস্তীর্ণ জলরাশিতে চোখ রেখে আনন্দকুমারী ব'সে আছে চুপচাপ! প্রতিবাদ, বাধাদান, আপত্তি—কিছুতেই যখন কিছু ফল হয়নি, তখন চৌধুরাণী নীরবতা অবলম্বন ক'রেছে। গাম্ভীর্য্যে যেন মূক হয়ে গেছে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে তো দেখছেই। যে দিকে চোখ পড়ে শুধু অথৈ জল।

ছবি আঁকছে ম্যানেট। তার মানসপ্রতিমার মূর্ত্তি আঁকছে অন্তরের দরদে। বিরস গণিতের কারবারী ম্যানেট, শিল্পচর্চ্চা করছে আপন প্রেরণায়। বিবদমানা প্রেয়সীর ছবি আঁকছে অতি সন্তর্পণে। আনন্দকুমারীর সকল শক্তি যেন লুপ্ত হয়ে গেছে বাদ-প্রতিবাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে। উত্তপ্ত ও জ্বলন্ত অঙ্গার যেন হিম হয়ে গেছে সহসা!

ম্যানেটের নীলাভ চোখে শিল্পীর দৃষ্টি ফুটেছে। অর্জ্জুন যেমন মৎস্যচক্ষু ছাড়া আর কিছু দেখতে পাননি, ম্যানেটের চোখে তেমনি কেবল আনন্দকুমারীর আয়তআঁখি। চোখ আঁকছে ম্যানেট; চক্ষুদান করছে অতি সাবধানে। শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টিতে দেখছে যেন থেকে থেকে। মানসীকে যদি হারিয়ে ফেলে কখনও, তাই তুলট কাগজের বুকে এঁকে রাখছে তার অনিন্দ্য আকৃতি।

চৌধুরাণী হঠাৎ আছড়ে প'ড়লো ম্যানেটের পায়ে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে,—আমাকে মুক্তি দাও সায়েব! আমার জন্যে কত কষ্ট পাবেন আমার মা! হয়তো আর বাঁচবেন না। তোমার পায়ে ধ'রছি আমি।

কাগজ-কলম পাশে রেখে দেয় ম্যানেট। শুষ্ক হাসি হাসে। বলে,—ডার্লিং, মাই বিলাভেড, আই উইল নট্‌ লেট্‌ ইউ গো।

কথা বলতে বলতে ম্যানেট দুই বাহুর আলিঙ্গনে চৌধুরাণীকে বক্ষে টেনে নেয়। বুকে চেপে ধরে। আনন্দকুমারীর মুখে আর চোখে চুমু খায় ঘন ঘন।

চৌধুরাণী সজল চোখে বললে,—তোমার নেশা কেটে গেলেই তো আমাকে ত্যাগ ক'রে যাবে, তখন আমার কি হবে? ক দখবে আমাকে? কোথায় যাবো আমি?

—আই উইল ম্যারী ইউ। আমি টোমাকে সাদি ক'রবো।

—সাদি করবে! চোখ বড় করে আনন্দকুমারী। বলে,—আমার সাদি যে হয়ে গেছে? তবে?

—ডুসরা সাদি হোবে টোমার। খুশীর হাসি হেসে কথা বলে ম্যানেট। তার বাহুপাশ আরও যেন দৃঢ় হয়। বলে,—হোয়াই ডু ইউ ওয়রী? ঘাবড়াও কেন টুমি?

কেমন যেন হতাশ চোখে তাকায় চৌধুরাণী। অনন্যোপায়ের মত কি বলতে যায়, কিন্তু বলতে পারে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে। তার জলভরা চোখ বন্ধ করে। ম্যানেটের বুকে মুখ রেখে কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

চোখ মেলে তাকায় না চৌধুরাণী। বলে,—আমি একটু জল খাবো। বড় তৃষ্ণা আমার। বুক শুকিয়ে যায়।

সহজস্বরের কথা শুনে খুশীর অন্ত থাকে না ম্যানেটের। মনে মনে উল্লসিত হয়ে ওঠে। হাসিমুখে বললে,—পানি পিয়েঙ্গী?

মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানায় আনন্দকুমারী। তৃষ্ণায় কাতর যেন সে। ভয় আর উত্তেজনায় তার কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে গেছে। মুখ থেকে যেন কথা স'রছে না। এক অব্যক্ত কষ্টের ব্যথা ধ'রেছে বুকে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। চোখে আর মুখে যেন ক্লান্তি ফুটেছে!

কাগজ আর কলম সরিয়ে রেখে উঠে প'ড়লো ম্যানেট। শান্তি ফুটেছে মুখে! চৌধুরাণীর চোখে পড়লো কাগজের ছবি। দেখেই দেখে বুঝলো যে তারই প্রতিকৃতি—কত যত্নে এঁকে চলেছে ম্লেচ্ছ ডাকাত। ঠিক যেমনকার তেমনি। দেখে যেন বিস্মিত হয় আনন্দকুমারী। একদৃষ্টে দেখে তার নিজের ছবি।

বজরার জানলা থেকে ঝুঁকে পড়েছে ম্যানেট। হাতে তার জলের পাত্র। নদীর জল তুলছে পাত্র জলে ডুবিয়ে। খুশীর হাসি হাসছে থেকে থেকে। জলপূর্ণ পাত্র ধ'রলো সহযাত্রিণীর সামনে। যেন পুষ্পার্ঘ্য ধরেছে এক দেবীপ্রতিমার সম্মুখে। পরম ভক্তিভরে।

পাত্র হাতে ধরে চৌধুরাণী। খানিক পান করে। এক আঁজলা জল মুখে আর চোখে ছিটিয়ে নেয়। মুখে কালিমা। চোখে এখনও ঘুমের জড়তা। আসমানী ঢাকাই শাড়ীর আঁচল চেপে চেপে মুখখানি মুছলো ধীরে ধীরে। তারপর বললে,—কোথায় আমাকে নিয়ে চললে সায়েব?

ম্যানেট বাঙলা ভাষা বোঝে না। হিন্দুস্থানী আর উর্দ্দু ভাষা বোঝে যৎসামান্য। জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইলো সে। ক'জন মাঝি হেসে উঠলো হঠাৎ, হয়তো সাহেবের দুরবস্থা দেখে।

চৌধুরাণী আবার বললে,—কোথায় যেতে হবে সায়েব? যমপুরীতে?

ম্যানেট সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। দেশী কথা দুর্বোধ্য ঠেকে তার কানে। বলে,—মাই ডার্লিং, মাই বিলাভেড্‌!

—তোমার মুখে আগুন লাগে না কেন! মর'না কেন তুমি!

চৌধুরাণী যেন নিরুপায়ের মত কটুকথা বলে। মাঝিরা আবার হেসে উঠলো তার কথা শুনে। ম্যানেট অবাক চোখে দেখে আনন্দকুমারীকে। দিনের আলোয় তার আসল রূপ যেন দেখতে পেয়েছে ম্যানেট। যেমন দেহগঠন, তেমনি অপূর্ব্ব মুখশোভা। কাজলকালো

চোখ দু'টিতে কি গভীর দৃষ্টি! কালো পশমের মত রাশি রাশি চুল মাথায়।

চৌধুরাণী আবার বললে,—একখানা শাড়ী দাও, বাসি কাপড়খানা ছেড়ে ফেলি। সঙ্গে এনেছো, ভাত-কাপড়ের ভার নিয়েছো, খেতে-পরতে দাও।

বজরার মাঝিদের মধ্যে সর্দার মাঝি এগিয়ে আসে। ম্যানেটের কানে কানে কথা বলে। চৌধুরাণীর অবোধ্য কথাগুলি হয়তো বুঝিয়ে দিয়ে যায়।

কেমন যেন লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে ম্যানেট। মাঝিকে যা বলে তার সারমর্ম এই যে,—বজরা তীরে লাগাও, আমি সব কিছুর ব্যবস্থা করছি।

বজরার গতি ফিরলো। সোজা চ'লেছিল, আড়াআড়ি চললো এখন।

চোখে দূরবীণ তুললো ম্যানেট। নদীর তীরে চোখ রাখলো। দেখলো কি যেন বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে। তারপর হঠাৎ সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো আপন মনে।

গঙ্গানদীর তীরে হয়তো মানুষের পদচিহ্ন দেখতে পেয়েছে ম্যানেট। বসতি আর ঘরবাড়ী দেখতে পেয়েছে। হাট-বাজার দেখতে পেয়েছে। দূরবীণে দেখা যায়, গাছের ছায়ায় ছায়ায় বাজার ব'সেছে। বাজারে মানুষের ভীড়। ঝিকিঝিনি চলছে।

—বাজার!

ম্যানেট চেঁচিয়ে কথা বললে, যেন নিজেকে শোনাতেই।

মাঝির দলও চীৎকার করলো সানন্দে। বজরার হাল টেনে টেনে তারাও শ্রান্ত হয়ে আছে। আর যেন পারে না এই গুরুভার বজরার ভার টানতে। এক নাগাড়ে।

মানুষের কলরোল কানে আসে। কাকের কা কা শোনা যায়। দূর নিকটে আসে, তীরের কাছাকাছি তরী এগোয়। হাল চলছে না আর ডাঙ্গার কাছে। দু'জন মাঝি লাফিয়ে জলে নামলো। বজরার দড়ি ধ'রে টানতে টানতে তীরের দিকে চ'ললো।

টাকার থলি হাতে নিয়ে ম্যানেট তীরে নামলো এক লাফে। একজন মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে তীর ধ'রে এগিয়ে চললো দ্রুত পায়ে। অন্য মাঝিদের চোখের ইশারায় সজাগ থাকতে ব'লে গেল। খাঁচা থেকে পাখী না উড়ে পালিয়ে যায়! হাতের শিকার যেন না ফসকে যায়।

—সাহেব বহুৎ আচ্ছা আদমী আছে বিবিজান!

[৩৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

মাণিক মনোময় ঃ ১৯১০-১৯৫৬

বিমলচন্দ্র ঘোষ

॥ এক ॥

একই বৎসরে জন্ম দু'জনের
ছিল না অভিলাষ ভজন-পূজনের
গভীর আকুলতা
ছিল যে কত ব্যথা
ছিল না অবসর কোকিল-কূজনের।

পদ্যে পদাবলী দুখের দীপাবলী
জ্বেলেছি একা-একা নিবিড় তমসায়।
গদ্যে তুমি প্রিয়
কামনা কমনীয়
রচনা ক'রে গেছো অশ্রু-বরষায়।

নীরবে মরণের দরোজা খুলে রেখে
আর্ত বন্ধুকে জানি হে গেছো ডেকে,
ক্লান্ত দেহ-মন
কাঁপে যে সারাক্ষণ
সহসা এ জীবন আঁধারে যাবো ঢেকে।

॥ দুই ॥

তোমার রচনাকে বিশাল উত্তাল অন্ধ ঢেউ ভেবে
তীব্র দুঃসহ রাত্রি মন্থিত ব্যথায় অনলস
একক মন দিয়ে দেখেছি বিস্মিত :
হে ঋজু গিরিচূড়া
তুষারমৌলী!
কুহেলি আবরণে স্তিমিত গম্ভীর,
অঙ্গে প্রচ্ছদে প্রজ্ঞা মেধা যার তীব্র ঝংকার
রক্ত ঘাম-ঝরা সে তুমি বেদনার নিঝুম হাহাকার
স্তব্ধ জনতার
শপথ ক্ষুরধার।

তোমার রচনাকে ক্ষুব্ধ বৈশাখে শান্ত ফাল্গুনে
চৈত্রে বাউলের নাচের তাল গুণে,
পলাশে কিংশুকে
প্রতিটি দিন বুকে
ছন্দে গেঁথে যাই তারার মণিহার;
খুঁজেছি অবসান আর্ত কলগান ভ্রান্তি-তমসার।

তোমার রচনাকে তাইতো ভালোবেসে
কালের কোল ঘেঁষে
ঘুরেছি দেশে-দেশে
সহরে জনপদে দেখেছি মনোময় রাখো নি কোনো ভয়।
বিজনে বসে থাকা
রূপালী চাঁদে রাকা
পাহাড়ে হিম ঢাকা দিলে কী পরিচয়!
তোমার রচনাকে ধূসর সবিতাকে দেখেছি মনোময়।

জাতীয়তায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

কলকাতায় এলেন রামেন্দ্রসুন্দর আত্মীয়-স্বজন আর সব ভগিনীদেরকে নিয়ে। এসেই হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা আরম্ভ হলো। দু'-চার দিন ভাল থাকার পর আবার রোগের বৃদ্ধি। বুঝবার উপায় নেই তাঁকে দেখে কিছুই। সর্ব্বদা গল্পে গুলজার ক'রে রেখেছেন তাঁর ঘর। যেন কিছুই হয়নি। এত বড় বিরাট ঘৃতের প্রদীপ যে নিবতে চ'লেছে, মনেও হয়নি সে কথা কারও।

দুর্গাদাস বাবু এসে বললেন—বাবুদাদা আপনার হোমিওপ্যাথি যে কিছুই ক'রতে পারলো না, এবার একজন এ্যালোপ্যাথকে ডাকাবো?

চারি দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন, তার পর স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মৃদু হাসি হেসে ব'ললেন—ভাই, মৃত্যু-রোগের কী চিকিৎসা আছে ব'লতে চাও? নিয়তিরই জয় হয়।

চমকে উঠে দুর্গাদাস বাবু বললেন—কে বললে আপনার মৃত্যুরোগ?

হেসে বললেন—আমাকে সাহস দিতে হবে না ভাই, সবই বুঝি আমি।

সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী—তখনকার দিনের একজন নামকরা চিকিৎসক—অনেকক্ষণ দেখে রামেন্দ্র বাবুকে ব'ললেন—এ কঠিন রোগ—ব্রাইটস ডিজিজ।

দুর্গাদাস বাবু শুনে মর্ম্মাহত হলেন। জানেন এ রোগে কারও নিস্তার নাই। ভাবলেন দাদা ঠিকই বলেছেন—এই রোগেই তাঁর মৃত্যু!

ডাক্তার বাবু এসেই দাস্ত ও প্রস্রাব প্রচুর পরিমাণে করালেন। তখন অনেকটা সুস্থ রামেন্দ্র বাবু। চলতে লাগলো আবার সেই অফুরন্ত পুরাতন দিনের স্রোত অব্যাহত গতিতে।

দেখো, আমার প্রথম প্রথম জানবার খুব আগ্রহ ছিল। জিজ্ঞেস ক'রতাম মাষ্টারদেরকে, নিজের মাকে; তাঁরা উত্তর দিতে পারতেন না। তখন গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রতাম বাবাকে। তিনি ব'লতেন—ভালো ক'রে পড়ো, নিজেই বুঝতে পারবে সব।

কী জিজ্ঞেস ক'রতেন বাবু দাদা?

গাছের পাতার রঙ সবজে কেন হয়? এমনি ধারা নানা প্রশ্ন।

জানো, আর একটা হাসির কথা বলি—কতো সমবয়সী ছেলে এসে বলতো—চল, গিয়ে জালি বাগানে খেলা ক'রে আসি। আমি বলতাম, ওখানে যাবো কেন? তখন বন্ধুরা বলতো—ওখানে না গেলে লুকান কোন কাজ ত হবে না। আমি বলতাম—বাবা অতো দূরে যেতে যে নিষেধ ক'রেছেন। তা ছাড়া লুকিয়ে কোন কাজ করতে গেলে যে পাপ হয়! আমি পারবো না ভাই তোমাদের সঙ্গে যেতে। কী রাগ তখন তাদের! তাড়া দিয়ে তারা বলতো—তুই একের নম্বরের হাঁদারাম। যা—আমাদের সঙ্গে খেলতে আসতে হবে না তোকে, গোপনে কাজ করার নাম পাপ! কে এ বুদ্ধি দিলে তোকে হাঁদারাম?

ভগিনীরা ব'লতেন—কারা বাবুদাদা, এ সব বন্ধু আপনার বলতেই হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলতে লাগলেন—ছাড়বিই না যখন শোন—আমার ছোট মামা, অন্নদা চৌধুরী, অন্নদা পণ্ডিত মশায়ের ভাই শশী, এই সব। আর একটা কথা শুনেছিস হয়তো, তোদের ভাজের নিশ্চয় মনে আছে,—জিজ্ঞেস কর দেখি। কত সময় অন্নদা চৌধুরী রাত্রে আমার শোবার বিছানায় শুয়ে থাকতো শুটি সুটি মেরে আমি হ'য়ে। কখনো বা তোদের ভাজ ডাকতো আমি মনে ক'রে চৌধুরীকে। সে কি হাসি সমবয়সীদের! সে হাসি আর থামে না।

আমার কোন লজ্জা নাই, তোদের কাছে বলতে। আমি কখনো যৌন আনন্দ ক'রতে পাইনি তোদের ভাজের সাথে। জিজ্ঞেস কর না তোদের ভাজকে। একা শুতেই পেতাম না। একজন না একজন পাহারা দিয়েই আছেন। মা না হয় ছোট মা, না হয় চুণি মা—মানে কর্ত্তা মা। ঝিও কেউ না কেউ এক জন থাকবেই। একা আমি স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়ে শুতে পেতাম না। অনেক রাত্রে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লে আমি গায়ে হাত দিয়ে চ'লে যেতাম বাইরে। কথা হতো আমাদের পায়খানার ছাদে দু'জনায়। আজকালকার তোমরা এ শাসন মানতে কী? ছাদে দাঁড়িয়ে কেবল কথা কইতে আরম্ভ ক'রেচে, এমন সময় আমার চুণি মা ডাক দিতেন—ও পদ্ম বৌ—ঐ ছাখো, রাম তোমার বৌমাকে ডেকে নিয়ে গেল। শুনে কি আর থাকা যায় সেখানে! আসতে হ'তো ভয়ে ভয়ে লজ্জায় মাথা নামিয়ে। কখন কখন তোদের ভাজকে ব'লতাম—দু-তিন শো টাকা মাইনে কী আর হবে না? চলো আমরা এখান থেকে যাই। তখন দেখতাম তোদের ভাজ খুসী হয়েই আবার ম্লান হ'য়ে বলতেন—হ'লে ত ভালই হয়, কিন্তু ছোট শ্বশুর কী ভাববেন! আমার বাবারও যে মাথা কাটা যাবে! তিনি যে তোমার উপর খুব ভরসা রাখেন। আমার দিকে একটু চেয়ে প্রশ্ন করতেন—কী গো, তুমি আমার মন নিচ্ছ, না মন থেকে বলচো? ঠিক করে বলো। আমি তখন বলতাম—তোমার কী মনে হয়? উত্তরে বলতেন তোদের ভাজ—আমার এত বয়স হ'লো, তোমার মন পেলাম না। আমার হাসি দেখে বুঝতেন—কিছুই বলবো না আর।

তখন ভগিনীরা পেয়ে ব'সেচেন রামেন্দ্রসুন্দরকে, জিজ্ঞেস করেন—আপনাকে ব'লতে হবে বাবু দাদা, আপনার কি ভাজকে নিয়ে যাবার মত হ'তো?

হেসে ব'ললেন—আমিও মানুষ, রক্ত মাংসের শরীর আমার। ছেলে আসতে চাইতো আমার কোলে আমাকে দেখলেই; আমি নিতে পারতাম না লজ্জায়, দমন করতে হতো আগ্রহ। বাবা-মা কেউ দেখতে পাবেন এই আশঙ্কায়। তার পর সেই ছেলে যখন এক বছরের হয়ে মারা গেল, তখন কী দুঃখ আমার, তাকে একটি দিনের জন্যও নিতে পারিনি ব'লে। তবে আমাদের আমলের শিক্ষা ছিল, গুরুজনকে ভক্তি করা, সমীহ করা। নিজের ছেলেকে নেওয়া পাপ বলে মনে করতাম, নিজের স্ত্রীর কাছে

দিনে খাওয়াত একটা মহাপাপ ব'লেই বিবেচনা করতাম। আমাদের দু'জনের কথাবার্ত্তা বলাও যেন পাপ! গুরুজনদের চোখে প'ড়লে লজ্জায় মুখ চাওয়া যেত না। মনে হতো মহাপাপ করে বসেচি।

মধ্যম বাবু এসে পড়ায় সে দিনের মিটিং ভঙ্গ হ'লো।

রামেন্দ্র বাবু বললেন—দেখ দুর্গাদাস, তুমি এলেই এরা ভয় পায় কেন বল তো? কাগজ কলমের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই এখন আমার; একটা কাজ ত কিছু চাই! না হ'লে যে হাঁফিয়ে মারা যেতে হবে।

আমি ত কিছু বলি না বাবু দাদা! জিজ্ঞেস করুন ওঁদেরকেই, মিথ্যা ওঁরা ভয় পান কেন জানি না।

ক'লকাতার বড় বড় সব ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে যায়। ওষুধ খান না কারও রামেন্দ্রসুন্দর। সেই হোমিওপ্যাথি ওষুধই চলে। ডাক্তারও মনের মত সেই ক্ষেত্র বাবুই। ডাক্তাররা আসেন, দেখেন কিন্তু 'ভিজিট' নেন না কেউ কোন দিন। তাঁরা বলেন—আমরা এত বড় মানুষের কিছু ক'রতে পারবো, সে ভরসা ত রাখি না। না এসে পারি না তাই আসতে হয়।

এতো অসুখ রামেন্দ্র বাবুর! অথচ বোঝবার উপায় নাই। ধীর, শান্ত মানুষ, সকল সময়েই সেই হাসি-খুসী। যেন কিছুই হয় নি। আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে রাত দিন আপনার কথাতেই মশগুল! এতো বড় কঠিন রোগ! একদিনও কেউ হতাশার কিছু দেখতে পান নি।

এবার আবার নূতন উপসর্গ, হিক্কা দেখা গেল। তার শব্দে আত্মীয়স্বজন সব ভেবে কূল পান না। তখনো রামেন্দ্র বাবু বলেন হাসিমুখে—তোমাদের বোধ হয় শঙ্কা হ'চ্ছে আমার হিক্কার শব্দ শুনে? কিন্তু আমার ত কিছুই হয় না। এ না হ'লে হয়তো এতক্ষণ আমি নেতিয়ে প'ড়তাম।

দু'দিন যাওয়ার পর অসুখের বেগ ক্রমশঃ বেড়ে গেল। তখন মানুষ কেউ কাছে না থাকলে যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে প'ড়তেন। নিজের আত্মীয়স্বজন কেউ নিকটে এলে কিন্তু বেশ শান্ত। আমার মা গৌরী দেবী জিজ্ঞেস ক'রতেন—আপনি অস্থির হ'য়েছিলেন এতক্ষণ!

—না ভাই! পাঁচ জন আহা-উহু ক'রবার লোক থাকলে এই রকম ছেলেমানুষী ক'রবার ইচ্ছা হয়। তোরা কাছে এসেচিস্, আর কোন রোগ নাই।

আপনি বোধ হয় আমাদের দেখলে লজ্জায় চুপ ক'রে থাকেন বাবু দাদা।

না ভাই, পাঁচ জন আহা-উহু করবার লোক কাছে থাকলে আমি বেশ ভাল থাকি। তোমাদের দেখলে সব রোগের কথা আমি ভুলে যাই।

দুই-এক দিন পরের কথা। রামেন্দ্রসুন্দর আর নিজেকে সংবরণ ক'রতে পারলেন না, রোগের যন্ত্রণা তখন অসহনীয় হয়ে পড়েছে। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে অত বড় ধীর স্থির মানুষও কাঁদতে থাকেন, আর মুখে বলেন, আমার মা বেঁচে থাকতে কখনও এমন যন্ত্রণা আমাকে সহ্য করতে হয়নি। তিনি আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেই আমার সব রোগ-যন্ত্রণার উপশম হ'তো। হায়! হায়! আজ আমার সেই মা নেই। ছেলের এত যন্ত্রণা তিনি কখনই দেখতে পারতেন না। সব যন্ত্রণা তাঁর হাতের স্পর্শ পেলেই কোন দিকে চ'লে যেত। সেদিনও আমার মা ছিলেন। আজ আমি একবারে অসহায়।

একটা বিরাট মহীরুহ যেন প্রবল ঝটিকায় ভেঙে প'ড়ছে। আত্মীয়স্বজন সকলেই বড় বাবুর যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ শুনে এসে হাজির! কেউ চোখের জল মুছিয়ে দেন কেউ মাথায় বাতাস দেন। ঘরভর্ত্তি লোক দেখে রামেন্দ্র বাবু নিজেকে সামলে ক'রে নিয়ে একটু স্থির হ'য়ে ব'সলেন। যেন কিছুই হয় নি।

বাবু দাদা, এখন কেমন আছেন? জিজ্ঞেস করলেন দুর্গাদাস বাবু।

বেশ ভাল তো! আমার ত এমন কিছুই হয় নি।

তবে আপনি কাঁদছিলেন কেন বাবু দাদা?

অসুখ-বিসুখ হ'লে ছেলেরা বায়না করে না মায়ের কাছে? মাকে মনে প'ড়ে গেল আমার, মনে হ'লো মা যেন কাছে এসে ব'সেচেন। তাই বায়না ক'রছিলাম মায়ের সাথে।

আবার সেই আগেকার দিনের হাসি। বেশ সুস্থ মানুষের মত ব'লতে লাগলেন—১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে যখন জেমো রাজবাটীর নতুন দালান ভেঙে পড়ে, সেই ভাঙা ইঁট-কাঠের স্তূপ থেকে অনেক পুরোনো কাগজপত্র পেয়েছিলাম। রাজবাড়ীর কয়েক পুরুষ আগেকার সকলের বেশ ধারাবাহিক একখানা ইতিহাস, আরও অনেক দলিলপত্র যা সব পেয়েছিলাম সেগুলো আমাকে অনেক কিছু লিখতে সাহায্য ক'রেছিল। যা আমি লিখেছিলাম, তোমরা সবই প'ড়েছো। এই দেখ কেমন সুন্দর লেখা একশো বছর আগের। এর কালিও দেখো। মনে হ'চ্ছে ঠিক যেন আজকের লেখা।

কী আছে বাবু দাদা এতে?

হাসতে হাসতে ব'ললেন—ঠাকুরদের কথা, এই পর্য্যন্ত জেনে রেখো। কালি, কাগজ, লেখা দেখতে ব'লছে একশো বছর আগের অনেক কিছু।

বিছানায় শুয়ে ছটফট করেন যন্ত্রণায়। ঘুম আসে না তাঁর। সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে ঘুম নাই। কী অসহ্য যন্ত্রণা।

দুর্গাদাস বাবু ডেকে আনলেন হাইকোর্টের উকিল যদুলাল কাঞ্জিলালকে। দুর্গাদাস বাবুর সহপাঠী ছিলেন তিনি। এসেই ব'সলেন ত্রিবেদী মশা'য়ের মাথার কাছে। হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন তাঁর মাথায় ধীরে ধীরে। ঘুমিয়ে প'ড়লেন রামেন্দ্র বাবু।

বেরিয়ে গেলেন কাঞ্জিলাল রোগীর ঘর থেকে। যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আবার ঘুম ভেঙে গেল। আবার সেই যাতনা, সেই ছটফটানি। ডাকলেন কাঞ্জিলালকে। তিনি এসে হাত বুলোতেই সব যেন সেরে যায়, ঘুম আসে। তিনি চ'লে গেলেই আবার সেই। কাঞ্জিলাল আবার যখন এলেন, তখন রামেন্দ্র বাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি টেনে এনে বললেন—এখন আপনাকে হাইকোর্টের কাজ ছেড়ে আমার কাছে ব'সে থাকতে হয় দেখচি।

উকিল বাবু ব'ললেন—সে তো আমার ভাগ্য! আপনার কিছু ক'রতে পারলে ধন্য মনে করবো নিজেকে।

দু'-এক দিন পরের কথা।

ছোট জামাতা শীতল বাবু—বাড়ী যশোহর জেলার কায়বা গ্রামে। এসে উপস্থিত হ'লেন শ্বশুরের শয্যাপার্শ্বে। কিছুক্ষণ ব'সে থেকে প্রশ্ন ক'রলেন—বাবা, একজন লোককে দেখলাম, মনুমেন্টের তলায় দাঁড়িয়ে র'য়েছেন। হাজার হাজার বললেও ঠিক হবে না; লক্ষ লক্ষ লোক ব'ললেই ঠিক হয়। এক জায়গায় এত লোক জীবনে

দেখিনি। বক্তৃতা করছেন জনতার সামনে নীরবে শুনছে সবাই। কী যে তাঁর আকর্ষণ বলার! নাম শুনচি গান্ধী।

নাম শুনেই রামেন্দ্রসুন্দরের দু' চোখ দিয়ে জল প'ড়তে লাগলো। সেই মানুষটি উদ্দেশে মাথায় হাত ঠেকালেন নমস্কারের ভঙ্গীতে।

বিস্মিত শীতল বাবু জিজ্ঞেস ক'রলেন—কে বাবা ও মানুষটি?

ভাবগম্ভীর কণ্ঠে ব'ললেন রামেন্দ্রসুন্দর—ভারতের মুক্তিদাতা এবার এসেচেন।

কী ক'রে বুঝলেন বাবা?

ওঁর অস্ত্র যে অহিংসা! ওঁর অস্থিমজ্জায় ভারতের ভাবধারা! প্রকৃত সাধু যে উনি! সকল মানুষকে দেখেন প্রেমের চোখ দিয়ে! আমি যা চাইছিলাম এতকাল, তিনি যে আমার সেই জীবনের স্বপ্নের সাধু! আর আমার কোনো দুঃখ নাই। বুঝতে পেরেছি ভারতের মুক্তি আসন্ন।

এত কথা গান্ধী সম্বন্ধে আপনি জানলেন কি ক'রে বাবা?

অতি কষ্টে হেসে বললেন—এতদিন যুদ্ধ ক'রে এলেন উনি ইংরাজদের সাথে আফ্রিকায়। সকল মানুষের মুক্তিই তাঁর কাম্য। কী সুকঠিন ওঁর আত্মত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য সাধন! অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব তাঁর আত্মোৎসর্গ। এই ভারতের এক আদর্শ মহামানব গান্ধী! তিনি এসেছেন এবার ভারতকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত ক'রতে। এবার আমার ভারতের মুক্তি আসন্ন নিশ্চিত। তাঁর কথা ব'লতে ব'লতে দু চোখ জলে পূর্ণ হ'য়ে যায় আর বার বার হাত তোলেন মাথায় আচার্য্যদেব।

মনে হ'লো যেন এক অপূর্ব্ব স্বপ্নের আবেশে বিভোর রামেন্দ্রসুন্দর! সে স্বপ্ন তাঁর চিরজীবনের কামনার স্বপ্ন, ভারতের মুক্তিবিধাতাকে প্রত্যক্ষ করার স্বপ্ন।

সকালের দিকে একটু ভাল থাকেন রামেন্দ্রসুন্দর। একটু বেলা হ'তেই অবসাদ এসে ঘিরে ফেলতো তাঁকে। তখন দেখা যেত তাঁকে তন্দ্রাচ্ছন্ন। ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না।

সকালের দিকে ইংরাজি ও বাঙলা সব কাগজ প'ড়ে শোনান হ'তো তাঁকে। প্রথমে শয্যা থেকে উঠেই ব'লতেন—গঙ্গার স্তোত্র শোনাও আমাকে।

ছেলেমেয়ের দল পাঠ ক'রতো শঙ্করাচার্য্য-রচিত গঙ্গাস্তোত্র সুর ক'রে। তিনি ব'সে থাকতেন চুপ ক'রে। স্তোত্র আবৃত্তি শুনতে শুনতে চোখ তাঁর সজল হ'য়ে উঠতো। স্তোত্র পাঠ শোনার পর খবরের কাগজ প'ড়ে শোনান হ'তো তাঁকে।

কাগজ শুনতে শুনতে এক দিন সহসা চ'মকে উঠলেন, ব'ললেন—আর একবার পড়ো ত ঐ জায়গাটা শুনি। শোনা হ'য়ে গেলে ব'ললেন—দুর্গাদাসকে ডাকো ত একবার।

তখুনি দুর্গাদাস বাবু এসে হাজির। ব'ললেন—তুমি এখুনি একবার যাও ত জোড়াসাঁকো, রবীন্দ্রনাথের কাছে। যদি থাকেন এখানে, আসতে ব'লবে একবার আমার কাছে। ব'লবে আমি অসুস্থ, শয্যাশায়ী তাই নিজে যেতে পারলাম না তাঁর কাছে। তাঁকে বিশেষ ক'রে বলবে—যেন দয়া করে একবার আসেন।

তখন যেন একটা প্রবল ঝড় বইছে তাঁর অন্তরে। মনে হ'লো একে একে রবীন্দ্রনাথের কত দিনের কত সব কথা। একদিন কবিগুরু ব'লেছিলেন—অতো অধীর হবেন না স্বাধীনতার জন্য। বাজান আপনি বিজ্ঞানের সঙ্গীত—যাতে টেনে আনে স্বাধীনতা, আর আমি চারণ—সঙ্গীতে দেশকে জাগিয়ে তুলি। বাগ্মী যাঁরা তাঁরাও ধ্বনি তুলুন দেশের অভ্যন্তরে হাটে-মাঠে-পথে সর্ব্বত্র। সে আহ্বানে এসে দাঁড়াক সকলে দেশকে স্বাধীন ক'রবার পণ নিয়ে। তখন দেখবেন আবির্ভাব হ'বে এমন একজন মানুষের যিনি তাঁর সব শক্তি নিয়ে এই প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশকে বাধ্য ক'রবেন ভারতকে বর্জন ক'রে চলে যেতে। সেদিন এমন শক্তিধর কেউ থাকবে না যে তাঁকে ধ'রে রাখবে, সঙ্কল্পচ্যুত ক'রবে। সময় এখনও হয়নি। উতলা হবেন না আপনি। সেই শুভ মুহূর্ত্ত আসবেই, আর বিলম্বও নাই তার। প্রতীক্ষা করুন, উতলা হবেন না।

এ বাণী যেন অহরহ শুনতে পান তিনি। এ যে মহাপুরুষের বাণী। সংবাদপত্রে আজ প্রকাশিত হ'য়েছে সেই মহাপুরুষেরই ত্যাগের কথা। বহু লোক যা' পাবার জন্য লালায়িত—সেই গৌরব—উপাধির গৌরব—আভিজাত্যের অহঙ্কার-প্রমত্ত ব্রিটিশের প্রদত্ত "নাইট" উপাধির গৌরব তিনি ত্যাগ ক'রেছেন ঘৃণায়, ক্ষোভে, বেদনায়।

তাঁর মনে হ'লো ভারতের স্বাধীনতা অদূরাগত। তিনি হয়তো দেখে যেতে পারবেন না ভারতের সেই পুণ্যগৌরবে প্রতিষ্ঠা! শুনে যাবেন রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে সেই স্বাধীনতা আবাহনের সুমধুর বংশীধ্বনি! তাই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন তাঁর উপস্থিতির।

দুর্গাদাস বাবু পবিত্র বাবুকে নিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ী।

দুর্গাদাস বললেন রবীন্দ্রনাথকে—রামেন্দ্র বাবু অত্যন্ত অসুস্থ, শয্যাশায়ী, তিনি একবার আপনাকে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

ব'লতেই রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন—রামেন্দ্র বাবু কে?

পবিত্র বাবু ব'ললেন—ত্রিবেদী মহাশয়, শুনতে চান আপনার কাছ থেকে নাইটহুড ত্যাগের—

আর কিছু ব'লতে হ'লো না। চমকে উঠে বললেন রবীন্দ্রনাথ—ত্রিবেদী ম'শায় অসুস্থ! আমি এখুনি যাচ্ছি, খবর দিনগে আপনারা।

খবর পাওয়া মাত্র রামেন্দ্রসুন্দর বললেন—সব ছেলেমেয়েদের যেন ভাল জামা কাপড় পরান হয়, সিঁড়ি যেন বেশ ভাল ভাবে পরিষ্কার ক'রে রাখা হয়।

অল্পক্ষণ পরেই এসে প'ড়লেন রবীন্দ্রনাথ। চেয়ে দেখলেন তাঁর প্রিয় সুহৃদের শেষ দিন আগতপ্রায়। সেই চরম মুহূর্ত্তেরই প্রতীক্ষায় শয্যালগ্ন হ'য়ে রয়েচে এক বিরাট পুরুষ; কেবল চোখ দুটি জ্বল জ্বল ক'রে দ্যুতি দিচ্ছে মাত্র।

গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ব'ললেন—খবর কী ত্রিবেদী ম'শায়?

ভাবে আত্মহারা ত্রিবেদী ম'শায় উঠে ব'সবার চেষ্টা ক'রতেই তাঁকে ধ'রে শুইয়ে দিয়ে ব'ললেন—আপনি অসুস্থ দুর্ব্বল, ওঠবার চেষ্টা করবেন না। কী আদেশ বলুন।

আপনি নিজের মুখে শুনিয়ে দিন আমাকে ব্রিটিশের সাথে আপনার বিচ্ছেদের কথা।

তখন নিজের মুখে শুনালেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাণী।

সে বাণীতে আছে—কেন অস্ত্রধারী আপনারা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র আমার দেশবাসীর বুকে গুলীর আঘাত দিলেন? এ বেদনা আমার পক্ষে অসহনীয়। যাঁরা পশুর মতো নৃশংস হ'য়ে নিরস্ত্র মানুষকে গুলী ক'রে হত্যা ক'রে আনন্দে উন্মত্ত হ'তে লজ্জা বোধ করে না, তাঁদের এই বর্ব্বর আচরণের প্রতিবাদে আমি তাঁদের প্রদত্ত সম্মানের ভার বহনে অসমর্থ হ'য়ে বর্জ্জন ক'রতে বাধ্য হ'লাম নাইটহুড। এ আমার পক্ষে দুর্ব্বহ হ'য়ে প'ড়েছে। তার পর প'ড়ে শুনালেন নাইট-হুড ত্যাগ সম্পর্কে তিনি যে পত্র লিখেচেন গভর্ণরকে সেই পত্র।

ভাবাবেগে কাঁদতে কাঁদতে বিছানা থেকে উঠে ব'সে পায়ের ধুলো নিতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথের। থামাতে পারেন না রবীন্দ্রনাথ। সে দৃশ্য অপূর্ব্ব, অদ্ভুত, মর্ম্মস্পর্শী। ভাবাবেগে রামেন্দ্রসুন্দর তখন যেন নীরোগ সুস্থ সবল মানুষ। শান্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে ক্ষীণ কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্তে জেনে গেলাম ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ আসন্ন। আঃ—কী আনন্দ!

তখন রামেন্দ্রসুন্দরের মুখে সুগভীর প্রশান্তি, চোখে এক অপূর্ব্ব দীপ্তি। নেতিয়ে প'ড়লেন কিছুক্ষণের জন্য রামেন্দ্রসুন্দর উত্তেজনার উচ্ছ্বাসের আবেগের প্রাবল্যের পর দারুণ অবসাদে। কিন্তু আধ ঘণ্টাও লাগেনি সে অবসাদ কাটিয়ে উঠতে। তার পর তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। গায়ের সে চুলকানির যাতনা নাই, কোনও অস্বস্তি নাই। যেন একবারে সম্পূর্ণ নীরোগ।

ডাক্তার এসে জিজ্ঞেস ক'রলেন—আজ আপনাকে এমন প্রফুল্ল দেখাচ্ছে কেন?

খুব হাসির সাথে ব'ললেন—আমার ভারতের সুদিন যে সমাগত!

ডাক্তার তাঁর নাড়ী দেখে গম্ভীর মুখে চ'লে গেলেন নীরবে। ডাক্তার চ'লে গেলে বাড়ীর লোক সব একে একে এসে উপস্থিত হলেন রোগীর পার্শ্বে। সকলেই বিস্মিত, তাঁকে বহু দিন পূর্ব্বের মত বেশ সুস্থ প্রফুল্ল অবস্থায় দেখতে পেয়ে।

রামেন্দ্রসুন্দর সকলের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। জিজ্ঞেস ক'রলেন—নিচে কোন ভদ্রলোক কী আছেন?

তাঁর কথার উত্তরে সকলেই ব'ললেন—আপনাকে দেখতে আসা ভদ্রলোকের ত বিরাম নাই। সর্ব্বদাই আসচেন অনেকে নিচে থেকেই খবর নিয়ে ফিরে যান।

নিচে যাঁরা আছেন এখন, আসতে বলো আমার কাছে।

সুধীজন সব এসে দাঁড়াতেই চোখ মেলে একবার চেয়ে দেখলেন সকলের দিকে। মুখে এক অপূর্ব্ব প্রশান্তি! ধীরে ধীরে চ'লে গেলেন সকলেই প্রণাম ক'রে পদধূলি নিয়ে সেই মহাপুরুষের। তার পরই দেখা গেল, মহাসমাধি আসতে আর বিলম্ব নাই সেই বিরাট পুরুষের।

তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা জিজ্ঞেস ক'রলেন—আপনার ভয় হ'চ্চে কী বাবা?

চোখ মেলে ব'ললেন—ভয়! আমার ভয়?

ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়লেন। ডেকে কেউ আর সাড়া পায় না তাঁর।

ভগিনীরা আর্ত্তকণ্ঠে ডাকেন—বাবু দাদা! স্ত্রী কেঁদে আকুল। এতো দিন যিনি এতো হাসি-পরিহাস ক'রে এসেচেন সকলের সঙ্গে কত কৌতুকের সঙ্গে, সে কণ্ঠ আজ নীরব! মহা-সমাধিতে সমাচ্ছন্ন! কোন উত্তর নাই, শত প্রশ্নেও।

১৩২৬ সাল, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ঘুমিয়ে গেলেন সারা ভারতের সাধ আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রেখে আচার্য্যদেব।

নিচেকার ঘরে ব'সে র'য়েচেন বহু সুধী সুপণ্ডিত জন। তাঁদের মধ্য হ'তে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় ব'লে উঠলেন—বিদ্যার জাহাজ একটা ডুবে গেল!

সকলেই ব'ললেন দুর্গাদাস বাবুকে—আজকের রাতটা রেখে কাল সকালে সমারোহ ক'রে নিয়ে যাওয়া হবে মৃতদেহ।

দুর্গাদাস বাবু ব'ললেন—আমার দাদার সে মত ছিল না। তিনি আমাকে ব'লে গিয়েছেন, সমারোহ তিনি কোন দিনই ভালবাসেন নি। তাঁর মৃত দেহ নিয়েও যেন কোন সমারোহ করা না হয়। প্রতিষ্ঠা—শূকরী বিষ্ঠা, এই কথাই তিনি বিশেষ ক'রে বলে গিয়েচেন।

তবুও বহু ছাত্র, বহু বন্ধু সুধীজন তাঁর বিয়োগ সংবাদ শুনে এসে প'ড়েচেন পটলডাঙার বাসভবনে। শবানুগমন ক'রলেন তাঁরা সকলে।

যখন ভূমিষ্ঠ হন, খুল্লপিতামহ ব'লেছিলেন—এ ছেলে একজন দিক্‌পাল হবে। তার পরও তিনি মাঝে মাঝে ব'লতেন ঐ কথাই।

তিন বছর বয়স যখন রামেন্দ্রসুন্দরের, প্রশ্ন ক'রেছিলেন তাঁর মাকে—মাটির জন্ম হ'লো কী ক'রে বল ত মা? তখন তাঁর খুল্লপিতামহ আনন্দ-গদ্‌গদ্ স্বরে পুনরায় ব'লেছিলেন—দেখ, আমার কথা ঠিক কি না। এ ছেলে একজন দিক্‌পাল হবেই আমি ব'লে রাখলাম? তাঁর সেদিনের বাণী সার্থক হ'য়েছিল উত্তরকালে।

ঘৃতের প্রদীপ একবার ক্ষণেকের জন্য জ্বলে উঠে নিবে গিয়েচে! বর্ষাকাল, শুক্লানবমীর মহানিশার সমাগমের পূর্ব্বেই সব শেষ!

কোথায় গেলেন রাঢ়ের রামেন্দ্রসুন্দর! কোথায় গেলেন সাহিত্য-পরিষদের সারথি রামেন্দ্রসুন্দর! কোথায় গেলেন রিপণ কলেজের প্রাণকেন্দ্র রামেন্দ্রসুন্দর! কোথায় গেলেন সারা দেশের গৌরব রামেন্দ্রসুন্দর!!!

দৈনিক পত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে আচার্য্য ত্রিবেদীর বিয়োগ-বার্ত্তা! সকালেই ছড়িয়ে প'ড়লো সর্ব্বত্র আচার্য্য ত্রিবেদীর অমৃত-লোক যাত্রার সংবাদ।

হাহাকারে ভরে উঠলো সারা দেশ।

মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হ'লো আচার্য্য দেবের জীবনের বহু কথা, তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বিশ্লেষণ।

অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল তাঁর ক'লকাতার বাসভবন। নিবিড় অন্ধকারে ঢেকে গেল জেমো-কান্দী সেই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের তিরোধান সংবাদে।

হায়! হায়! হায়! আবার কী জেমো-কান্দীতে আবির্ভাব হবে কোন দিন অমনি এক জন বিরাট মহাপুরুষের! মনীষার দীপ্তিতে যিনি আবার আলোকিত ক'রবেন অন্ধকারাচ্ছন্ন জেমো-কান্দীকে?

কত দিন কত যুগ পরে আসবে সে শুভ দিন, জানি না!!!

সমাপ্ত

পঞ্চতপা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সান্ত্বনার স্বপ্নরাজ্যের সঙ্গে মিল নেই।

তার থেকে অনেক স্থূল, অনেক বেশি অপরিচিত। পুরোপুরি এক অনাবিল সৃষ্টির ছবিই কল্পনা করেছিল। সৃষ্টির এ কঙ্কালও তাই বলে রমণীয় নয় খুব। যে পর্যন্ত হয়েছে, কঙ্কালের আভাসও নেই। শুকনো মড়াইয়ের একটা দিকে খুঁড়ে খুবলে দগদগে ঘায়ের মত করে চলেছে এরা।

একেবারে তলা থেকে দুই পাহাড়ের খানিকটা পর্যন্ত অতিকায় এক মাটির দেওয়াল তুলে মড়াইকে দু'আধখানা করে ফেলা হয়েছে! ওই অদূরে পাথরের পাকা দেয়াল তোলা হলে এটা ভেঙ্গে ফেলা হবে। মাটির দেয়ালের ওধারে এক বর্ষার জল জমেছে খানিকটা। কিন্তু সেও কল্পনার মন্দাকিনী নয়। হাত ছোঁয়ালে গা ঘিন-ঘিন করার মত। কোথাও মাটি দেখা যাচ্ছে, কোথাও পাথর, কোথাও গাছ ভাসছে, কোথাও জঙ্গল পচছে, কোথাও বা ভাঙা আটচালার মাথা ভেসে উঠেছে জলের ওপরে।

অন্য দিকটা খট্‌খটে শুকনো। কাজ সেদিকটাতেই হচ্ছে। এদিক দিয়েই নাকি জল যাবে। কিন্তু সেদিকে চেয়েও সান্ত্বনার ভিতরটা শুকিয়ে যায় কেমন। যতদূর চোখ যায়, সেই হাঁ-করা মাটি, সেই পাথরের স্তূপ আর সেই জঙ্গলের অবরোধ। বন্ধ্যা, নীরস। ওখান দিয়ে জল চলা দূরের কথা, বাতাস চলাচলের অভাবে যেন দমবন্ধ হয়ে পড়ে আছে কতকাল ধরে।

কিন্তু স্বপ্নরাজ্য না হোক এত বড় বাস্তবেরও আবেদন আছেই। উত্তেজনা আছে, রোমাঞ্চ আছে। তার থেকেও বেশি আছে দুর্বোধ্যতার বিস্ময়। এক সঙ্গে কাজ করে প্রায় আট-দশ হাজার লোক। এত উঁচু থেকে খুদে খুদে দেখায়। ওপারের পাথুরে জঙ্গল সাফ করে কুলি বসতি গড়ে উঠেছে একটা। এ পাড় থেকে সারি সারি ব্যাঙের ছাতার মত দেখায় ওদের তাঁবুগুলো। সকাল না হতে যে যার সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে আসে পিল-পিল করে।

যন্ত্রপাতির সমারোহও তেমনি। পাহাড়ের ওপর থেকে নয়, সান্ত্বনা সেই নীচে নেমে গিয়েই দেখে এসেছে। কড়কড় করে মাটি ফুঁড়ে চলেছে না যেন জমাট-বাঁধা মাখনের তাল ফুঁড়ে চলেছে। বিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ মণের এক একটা পাথর তুলছে না তো যেন এক একখানা পল্‌কা ইঁট তুলছে অবলীলাক্রমে। এরকম অজস্র ব্যাপার।

প্রথম দিনকতক স্তব্ধ বিস্ময়ে শুধু দেখেই গেল সান্ত্বনা। তারপর একদিন বলে ফেলল, কি হচ্ছে না হচ্ছে আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না বাবা, বিচ্ছিরি লাগছে।

অবনী বাবু তার বিচ্ছিরি লাগাটাই শুনলেন শুধু। বললেন, আমি তো আগেই জানি, তখন অত করে আসতে বারণ করলাম, না শুনলে কি করব। আর ক'টা দিন থাক, ফাঁকমত রেখে আসব'খন তোকে—।

—বেশ, আমি কি বললাম আর তুমি কি শুনলে! বললাম, কি দিয়ে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিচ্ছু বুঝছি না বলে ভালো লাগছে না —না ফাঁকমত রেখে আসব'খন তোকে! তুমি বললেই আমি গেলাম আর কি।

সকালের রাউণ্ডে বেরুবার তোড়জোড় করছিলেন অবনী বাবু। খুব খেয়াল করে শোনেন নি আগে। এবারে শুনলেন। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের কি হচ্ছে না হচ্ছে বুঝছিস না?
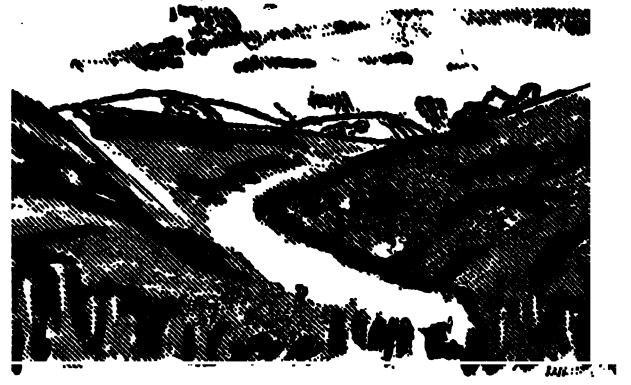
সান্ত্বনা লজ্জা পেয়ে গেল একটু।—এই কি ক'চ্ছ না ক'চ্ছ তোমরা মাথামুণ্ডু তাই। দাঁড়াও, তোমার খাবারটা নিয়ে আসি—।

প্রস্থান করল। মেয়ের বিচ্ছিরি লাগার হেতু শুনে অবনী বাবুর কি জানি কেন ভালো লাগল না খুব।

সান্ত্বনা তার দু'ঘরের ক্ষুদ্র গৃহস্থালি বেশ কায়েমী ভাবে গুছিয়ে নিল। মাসি চিঠিতে তাড়া দিলেন ফেরার জন্য। সান্ত্বনা উল্টে আমন্ত্রণ জানালো তাঁকে, চমৎকার লাগবে মাসিমা, দু'দিন এসে থেকে যাও—।

বাঁধাধরা আপিস-টাইম বলে কিছু নেই এখানে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাজ চলছে। আপিস বা যাবতীয় কাজ সবই পাহাড়ের নীচে। ওপরে শুধু কোয়ার্টার। পায়ে হেঁটে ওপর-নীচ করাটা রীতিমত পরিশ্রমের ব্যাপার। সারাক্ষণ একটা ট্রাক মজুত আছে এই জন্যে। দিনের মধ্যে কতবার ওটা লোক নিয়ে ওঠা নামা করে ঠিক নেই। পাহাড় ঘেঁষে ঘুরে ঘুরে এঁকে বেঁকে পাকা রাস্তা চলে গেছে একমাথা থেকে আর এক মাথায়। ট্রাকটা অবশ্য মজুত থাকে মেন কোয়ার্টার্স-এ। যে দিকটায় হোমরা চোমরা কর্তাব্যক্তিদের আবাস, যেখানে গেষ্ট-হাউস ইত্যাদি। সান্ত্বনাদের কোয়ার্টার সেখান থেকে অনেকটা দূরে, অনেকটা বিচ্ছিন্ন। সাধারণ চাকুরেদের জন্য কিছু দূরে দূরে মাত্র তিন-চারটে কোয়ার্টার হয়েছে সেখানে, নতুন আরো দু'তিনটে হচ্ছে।

সকালে স্নানাদি সেরে অবনী বাবু মেন কোয়ার্টার্সে চলে আসেন। নীচে নামতে হলে এখান দিয়েই একমাত্র পথ। সেখান থেকে ট্রাকে করে নীচে নেমে যান। আর ওঠেন সেই সন্ধ্যায়। বেয়ারা এসে টিফিনক্যারিয়ারে করে দুপুরের খাবার নিয়ে যায়। বাড়ি ফিরতে একেবারে রাতও হয় প্রায়ই। আফিসের পর গেষ্ট-হাউসের হল ঘরে কর্তাকর্তাদের মিটিং বসে, নয়তো কিছু না কিছু আলোচনা থাকে।

. . .

অখণ্ড অবকাশ সান্ত্বনার।

দুর্বিবহ লাগার কথা। কাছাকাছি কোয়ার্টার ক'টাতে কোন মেয়েছেলের নামগন্ধও নেই। পাঁচ-ছ'জন করে পুরুষ কর্মচারী মেসের মত করে আছে। কিন্তু মাঝখানের মাসির বাড়ির ক'টা বছর বাদ

দিলে এরকম অবকাশে অনেকটাই অভ্যস্ত সে। আর অবকাশই বা কোথায়? চোখের খোরাক যেখানে এত অফুরন্ত আর মনের কৌতূহল যার এত সজাগ, সময় তার আপনি কাটে।

প্রথম প্রথম অবশ্য একলা ঘোরাফেরা করতে সাহস পেত না খুব। স্তব্ধ, নির্জন পরিবেশে দিনে দুপুরেও কেমন লাগত যেন। হাজার হোক অজানা অচেনা জায়গা। কিন্তু সে অস্বস্তি কাটতে ক'টা দিন আর। আজ এদিকে খানিক দূর উঁকিঝুঁকি দেয়, কাল ওদিকে। তাছাড়া যে বেয়ারা দুপুরে বাবার খাবার নিতে আসে তার কাছ থেকে শুনেছে, ভয়ের নাকি কোথাও কিছু নেই। সাঁওতালরা সব মাটির মানুষ—ঘরদোর খোলা ফেলে রাখলেও কুটোটি সরাবে না। এই মানুষদের খবর বৃত্তান্ত সান্ত্বনা ভালই জানত। তবু শুনলে সাহস বাড়ে।

মেয়েছেলে আছে মেন কোয়ার্টারস্-এ। শাড়ীর আভাস পেলেই সান্ত্বনা বিনা দ্বিধায় হানা দেয় একবার দু'বার। কিন্তু বয়েস যাই হোক, কর্তাদের পদমর্যাদায় সকলেই বিশিষ্ট মহিলা এঁরা। পাশাপাশি বসবাসের ফলে নিজেদের মধ্যেই পাল্লা দিয়ে চলেন একটু আধটু। এই সাদাসিধে মেয়েটা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ঠিকই। ওভারসিয়ারের মেয়ে শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন তাঁরা।

—ও, অমুক ওভারসিয়ার বাবুর মেয়ে তুমি? জেনারেল কোয়ার্টারে থাকো বুঝি? আর কে আছেন? শুধু বাবা, আর কেউ না? তাহলে তো বড় কষ্ট তোমার···মাঝে মাঝে চলে এসো, গল্পগুজব করা যাবে—।

কেউ না থাকার কষ্টটা সান্ত্বনার থেকে এঁদেরই বরং বেশি। কিন্তু ওভারসিয়ারের মেয়ের কাছে তো আর দুঃখ প্রকাশ করা চলে না। গল্প গুজবের আকর্ষণে ওভারসিয়ারের মেয়ে যদি মাঝে সাজে আসতে শুরু করে, অপরাপরদের চোখে সেটাই বিসদৃশ ঠেকবে কি না, তাই বরং ভাববার কথা।

নাকের ডগায় এত বড় এক সৃষ্টির মহড়া চলেছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে এতটুকু কৌতূহল নেই তাঁদের। সাগ্রহে হয়ত সান্ত্বনা বলে উঠেছে, বাঃ, আপনাদের এখান থেকে তো সুন্দর দেখা যায় সব কিছু!

জবাব, আর বোলো না, দেখে দেখে চোখ পচে গেল। সকাল-সন্ধ্যা তো ওই দেখছি।

নির্বাক নেত্রে চেয়ে থাকে সান্ত্বনা। দেখে দেখে চোখ পচে যায় কি করে বুঝে ওঠে না। বরং সকাল সন্ধ্যা দেখছে শুনে ঈর্ষা হয়।

মেন কোয়ার্টারস্ এর মহিলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল না সান্ত্বনার। নিজেই কেটে পড়ল সে। কিন্তু এদিকটায় আনাগোনা বেড়ে গেল। মেন কোয়ার্টারস্ থেকে একটা রাস্তা এসেছে পাহাড়ের একেবারে শেষপ্রান্তে। দুপুরের নিরিবিলিতে যে কোন একটা পাথর বেছে নিয়ে বসে পড়ো হাত পা ছড়িয়ে। নীচে মড়াই। আর তার ভাবী বন্ধন-সমারোহ। এত উঁচু থেকে ছবির মত দেখায়। যন্ত্রের কাজ থেকেও ওই কুলিকামিনদের কাজ দেখতে ভালো লাগে বেশি। পুরুষেরা মাটি কাটে, পাথর ভাঙে। মেয়েরা সেগুলো মাথায় করে বয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এটুকুর মধ্যেই কোথায় যেন বেশ একটা ছন্দ আছে। মনে মনে আস্বাদন করার মত কিছু একটা।

এক একদিন নিজের কাছেই লজ্জা পেয়ে যায় সান্ত্বনা···ভাবছে কি না, ওই মেয়েগুলোর মত সেও যদি অবাধে কাজে লেগে যেতে পারত! ওদের মত, ওদের সঙ্গে। দৃশ্যটা কল্পনা করতে চেষ্টা করল। মাথায় মাটির ঝুড়ি বা পাথরের বোঝা! একা একাই হেসে কুটিকুটি তার পর। মা গো মা, কি বেয়াড়া সাধ।

সেদিন দুপুরে বেয়ারা বাবার খাবার নিতে এলে কি ভেবে সান্ত্বনা বলল, চলো আমিও যাই তোমার সঙ্গে।

টিফিন ক্যারিয়ার গুছিয়ে নিজেই সেটা হাতে করে বেরিয়ে পড়ল। এই পাহাড়ী পরিবেশে কিছুই যেন বেমানান নয়। এই মুক্ত আবাদনটুকুই সব থেকে ভালো লাগে।

অবনী বাবু অবাক হলেন, তুই যে?

—এলাম। রোজ রোজ এই লোকটাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি, মাঝে মাঝে আমিই তো নিয়ে আসতে পারি তোমার খাবার।

অবনী বাবু কি আর বলবেন। ঘরে আরো পাঁচ-সাত জন লোক আছে। আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছেও তারা। এই বৈচিত্র্যটুকু তাদের ভালো লেগেছে। কিন্তু বাবার এই খুপরি অপিস-ঘর সান্ত্বনার একটুও ভালো লাগে নি। বলল, এখানে বসে কাজ করো নাকি তোমরা?

ঘরের কাজ কমই। কিন্তু সেকথা না বলে অবনী বাবু বললেন, হ্যাঁ। তোর পছন্দ হচ্ছে না?

—না।

গায়ে গায়ে লাগানো ছোট ছোট টেবিলের সামনে সমাসীন লোক-ক'টিকে সান্ত্বনা দেখে নিল একবার। এখানে এদের সামনে বসে বাবা খাবে কি করে বুঝে উঠছে না। মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় ওদেরও খিদে পেয়েছে। দ্বিধা কাটিয়ে বলেই ফেলল, কোথায় বসে খাবে তুমি?

তার সমস্যাটা স্পষ্টই বোঝা গেল। সকৌতুকে দেখতে লাগল সকলেই। বিব্রতমুখে টিফিন ক্যারিয়ার হাতে করে দাঁড়িয়ে রইল সান্ত্বনা। অবনী বাবু উঠে এক গ্লাস জল গড়িয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলেন। পরে ডাকলেন, আয়—।

বাইরে পাহাড়ের ছায়ায় বড় একটা পাথরের ওপর বসলেন তিনি।—বার কর কি এনেছিস।

এদিক ওদিকে চেয়ে সান্ত্বনা ভারী খুশি হয়ে গেল। অমনি এক একখানা পাথরের ওপর গ্যাট হয়ে বসে অনেককেই নিবিষ্টচিত্তে লাঞ্চ খেতে দেখা গেল। সান্ত্বনার ভালো লাগল খুব। নিজে খেয়ে এসেছে বেশিক্ষণ হয়নি, কিন্তু এরকম জায়গায় বসে খাবার লোভেই আর একবার বসে খেতে পারে বোধ হয়। সানন্দে টিফিন-ক্যারিয়ার থেকে খাবার বের করতে করতে জিজ্ঞাসা করল, তোমার ঘরের ওই ভদ্রলোকেরা খাবে না বাবা?

—ওদের খাবার এলেই খাবে। কিন্তু তুই যে নেমে এলি, এখন উঠতে কষ্ট হবে না? হেঁটে উঠে কাজ নেই, ট্রাক এলে বলে দেব'খন, তুলে নেবে—।

পাহাড়ী রাস্তায় ট্রাকে চড়ার লোভ আছে। কিন্তু তাহলে আসাটাই পণ্ড। এক্ষুণি হয়ত হুস করে উঠে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি বাধা দিল, তোমার ট্রাকে কাজ নেই, পায়ে হেঁটেই খুব উঠতে পারব আমি। তুমি আস্তে সুস্থে খাও বস, আমি একটু ঘুরেটুরে দেখে আসি। খাওয়া হলে বেয়ারাকে সব রাখতে বোলো, আমি নিয়ে যাব'খন।

আসলে এই জন্যেই আসা।

আর কোন কথার অপেক্ষা না রেখে সান্ত্বনা এগিয়ে চলল। খান থেকেও মড়াইয়ের তলদেশ অনেক নীচে। পাথর ভেঙে নামতে গেল। বেশ পরিশ্রমের ব্যাপার। টাল সামলানো দায় এক এক য়গায়। ওই লোকগুলো তরতর করে নেমে যায় কি করে ভেবে বাক হয়। মেয়েগুলো পর্যন্ত। কিন্তু মড়াইয়ের বুকের ওপর য়ে সেও আজ দাঁড়াবেই। অভ্যেস নেই বলে—কিন্তু অভ্যেস হতে 'দিন আর।

সত্যিই ক'দিন আর। বেলা গড়াবার সঙ্গে সঙ্গে উন্মুখ হয়ে ঠে সান্ত্বনা। বাবার খাবারটা নিয়ে কতক্ষণে নীচে নেমে আসবে। র্থাৎ, কতক্ষণে তারপর মড়াইয়ের গহ্বরে অবতরণ করবে। ভয় াবও ভেঙেছে, এখন প্রায় নেমে আসে সেও। তারপর যেদিকে খুশি পা চালিয়ে দাও, সর্বত্রই দেখার উৎসব।

সান্ত্বনা দেখে। আবার তাকেও ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কলে। কালোর তরঙ্গে একটি মাত্র ব্যতিক্রমের দিকে আর চোখ না যায় কার? তার এই নীরব অথচ সজীব কৌতূহলটুকু বেশ লাগে ওদের। মেয়েরা হাসে। সান্ত্বনাও হাসে! পুরুষেরা কোদাল শাবল থামিয়ে সোজাসুজি নিরীক্ষণ করে। নীরব চোখে সান্ত্বনা কৈফিয়ত দেয় যেন, তোমাদের বিরক্ত করতে চাইনে, একটু দেখছি শুধু—।

ফাঁকমত সেদিন আলাপ হয়ে গেল একজনের সঙ্গে। লোকটাকে অনেক সময়েই লক্ষ্য করেছে সান্ত্বনা। মাতব্বর গোছের একজন বেশ বোঝা যায়। ছোট ছোট অনেকগুলো কুলি-কামিনের দল তার আদেশ-নির্দেশমত কাজ করে। মস্ত একটা পাথরের ওপর বসে বোধহয় বিশ্রাম করছিল একটু। পাশ কাটাতে গিয়েও সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই এক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করে তার মেজাজ বুঝতে চেষ্টা করল হয়ত। তারপর বলল, এখানে বসি একটু?

অবাক হয়ে লোকটি চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরে মাথা নেড়ে অনুমতি দিল। অর্থাৎ, বসতে পারো।

শান্তশিষ্ট মেয়েটির মত বসল সান্ত্বনা। লোকটি আবার খানিক দেখে নিয়ে বলল, তু কার বিটি বটে।

বলল।

একটু ভাবল সে।—উ লয়া উবাসির বাবুর কুড়ী বটেটে তু?

—কুড়ী কী? বাংলার বহর শুনে সান্ত্বনা হেসেই ফেলল।

জবাব না দিয়ে লোকটিও হাসল অল্প একটু। পরে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল, লোতুন উবাসির বাবু খুব ভালো নোক্।

পাসপোর্ট পেল যেন। পাথরে পা গুটিয়ে বসল সান্ত্বনা।—তোমার নাম কী?

—পাগড় সর্দার।

অর্থাৎ পাগল সর্দার। সান্ত্বনা আবার প্রশ্ন করল, তুমি বুঝি এই সব লোকদের সর্দার?

—হুঁ।

—এখানে কি হচ্ছে, না হচ্ছে, তুমি সব জানো বুঝি?

পাগল সর্দার সকৌতুকে মাথা নাড়ল, জানে।—

সোৎসাহে আবার কি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল সান্ত্বনা। থামতে হল। অসহিষ্ণু পদক্ষেপে এদিকে আসছে একটি মেয়ে। সান্ত্বনার দিকে ফিরেও তাকালো না। তড়বড় করে সর্দারকে কি সব বলতে লাগল। বিষম রেগে গেছে এবং একটা কিছু নালিশ জানাচ্ছে, এটাই বোঝা গেল। কালো অঙ্গ ঘামে জবজব করছে। টানা দুই চোখে খরখরে রোষবহ্নি।

পাগল সর্দার গম্ভীর মুখে শুনে গেল। পরে হঠাৎ তারস্বরে হাঁক পাড়ল, ই হোপ্-পুন্—!

সেই বাজখাঁই হাঁক শুনে সান্ত্বনা চমকে উঠল একেবারে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে দেখতে লাগল দু'জনকেই। দূর থেকে একটা লোক এদিকে এগিয়ে আসছে, দেখা গেল।

ওই লোকটাকে আগেও দেখেছে সান্ত্বনা। ছোটখাট একটা দলের পাণ্ডা গোছের হবে। আর এই মেয়েটাকেও দেখেছে। কিন্তু কাজের মধ্যে ও তখন অন্য মূর্তি দেখেছে এর। মাথায় করে প্রায় দেড় মণ দু' মণ একটা পাথর বয়ে এনে ধুপ করে দুই যোয়ান লোকটার পায়ের কাছে ফেলেছে। সান্ত্বনাকে দেখেই সম্ভবত ভাঙা বাংলায় রসিকতাও করেছে, লে কেতো বড় 'খিরি' লিবি লে—তুর কলিজা থিকে উ 'খিরি' অনেক লরমছে।

মেয়েটার ওই দুই চোখে তখন ঝিকমিক করে উঠেছিল যা, সেটা রাগ নয়, আর কিছু। এই হোপুন লোকটার মুখেই শুধু তখন কোন ভাবান্তর দেখেনি সান্ত্বনা, নইলে কাছাকাছি যারা ছিল, সকলেই হেসে উঠেছিল। দৃপ্ত ভঙ্গিতে দুই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা, আর দুধ-শাদা দাঁত বার করে হাসছিল। সান্ত্বনা অদূরে দাঁড়িয়ে আড়ে আড়ে ওকে দেখেছে আর পাথরটাকে দেখেছে আর অবাক হয়ে ভেবেছে, ওই অত বড় পাথর মেয়েটা এমন অবলীলাক্রমে মাথায় করে বয়ে নিয়ে এলো কি করে!

হোপুন সামনে এসে দাঁড়াতে পাগল সর্দার কি যেন বলল তাকে। একবর্ণও বুঝল না সান্ত্বনা। কিন্তু শুনেই ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত গজরাতে গজরাতে প্রস্থান করল মেয়েটা। চলনের ঠমকে পায়ে পায়ে সমস্ত আক্রোশ ঝরে পড়তে লাগল যেন।

নিষ্প্রাণ দুই চোখ তুলে হোপুন সর্দারের দিকে তাকালো একবার। সান্ত্বনাকেও দেখল। তেমনি অলস গতিতে ফিরে চলল তারপর।

পাগল সর্দার বলল, উ আমার বিটি চাঁদমণি।

আগ্রহ আরো বাড়ল সান্ত্বনার। কিন্তু সে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে পাগল সর্দার আবার বলল, আর উ হোপুন, বিটির সঙতে উর বিয়ো দুব—জাঁওয়াই কুরব। অর্থাৎ, মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওকে জামাই করবে।

শুনতে বেশ মজা লাগছে সান্ত্বনার। মেয়েটার এই রাগ বিরাগ রোমান্স ঘটিত নিশ্চয়।—তোমার মেয়ে অমন রাগ করে এলো আর রাগ করে গেল কেন?

জবাবে পাগল সর্দার যা বলল তার মর্মার্থ, মেয়েটা ভয়ানক দুষ্টু, কাজ কর্মে মন নেই, কেবল হাসাহাসি ফষ্টিনষ্টি করে। সেই জন্য সর্দার ওকে অন্যের দল থেকে ছাড়িয়ে হোপুনের তত্ত্বাবধানে কাজে লাগিয়েছে। হোপুনকে সকলে সমীহ করে, কিন্তু মেয়েটা এমন পাজী যে তাকেও পরোয়া করে না। তাই হোপুন খুব কষে খাটায় ওকে, রাগ করে মেয়ে তাই বাপের কাছে নালিশ জানাতে এসেছিল—হোপুনের দলে কাজ করবে না। পাগল সর্দার হোপুনকে ডেকে চুলের মুঠি ধরে চাঁদমণিকে কাজে লাগাতে বলে দিল।

ভাবী জামাইয়ের ওপর শ্বশুরের টান দেখে সান্ত্বনা অবাক হল, খুশিও হল। এরকম নিরপেক্ষতা দুর্লভ। দূরের দিকে চেয়ে চাঁদমণিকে খুঁজল একবার। বাপের সাদাসাপটা বিচারের ফলটা কি রকম দাঁড়াল না জানি। কিন্তু এতদূর থেকে সঠিক চোখে পড়ে না।

—শীগগিরই ওদের বিয়ে দেবে বুঝি?

মনে হল, শোনেই নি। কারণ দূরের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল পাগল সর্দার? পরে ক্ষুদ্র জবাব দিল, হুব, সোমর আসলে হুব।

খুব প্রাঞ্জল ঠেকল না। সময়ের আর বাকি কি, তা ত বুঝল না। হোপুনের দীর্ঘায়ত পাথুরে মূর্তিটি চোখে ভাসল একবার। আর যৌবনোচ্ছল চাঁদমণির মূর্তিও। হঠাৎ নিজের কাছেই লজ্জা পেয়ে অন্য দিকে ঘাড় ফেরালো সান্ত্বনা।

এই পাগল সর্দারের সঙ্গেই তার হৃদ্যতা বেড়েছে ক্রমশ। সে ওকে ডাকে দিদিয়া বলে। সান্ত্বনার ভারী মিষ্টি লাগে শুনতে। সর্দারের গোষ্ঠীর সঙ্গেও আলাপ না হোক জানাশুনা হয়ে গেল বেশ। সর্দারের দিদিয়া সকলেরই দিদিয়া। সকলেরই কৌতূহলের পাত্রী। সর্দারের মেয়ে চাঁদমণির সঙ্গেও আলাপের চেষ্টা করেছে সান্ত্বনা। কিন্তু মেয়েটার বেজায় দেমাক। আর মুখেরও আগল নেই। গভীর অবজ্ঞায় সান্ত্বনার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করেছে। তার পর ফিক করে হেসে বলেছে, তু ওজ ওজ মড়াইয়ে নামিস কেনে, তুকে দেখে যে মরদগুলার পেরাণে অড় লাগে।

লাল হয়ে সেই যে ফিরে এসেছে সান্ত্বনা আর তার ধারে কাছে ঘেঁষেনি। আর এড়িয়ে চলে হোপুনকে। চাঁদমণির ভয়ে কি না কে জানে! তবে লোকটার ওই যণ্ডমূর্তি আর মরা চাউনি দেখেও কেমন অস্বস্তি লাগে তার। মুখের দিকে তাকালে লোকটা যেন ভেতর সুদ্ধু দেখতে পায়।

গল্প জমে পাগল সর্দারের সঙ্গে ছুটির দিনে আর অবকাশকালে। শিকারের গল্প, পূর্বপুরুষদের বীরত্বের গল্প, মড়াই-বাঁধা নিয়ে সেই গোড়ার বিভ্রাট—কি হয়েছিল, কি হচ্ছে, কি হবে, সব। দিদিয়ার মত এমন শ্রোতা পাগল সর্দার আর পাবে কোথায়? তার সবেতে কৌতূহল, সবেতে বিস্ময় আর সবেতে বিশ্বাস।

প্রথম যেদিন পাগল সর্দার ওদের বাড়ি এলো, সান্ত্বনা খুশিতে আটখানা। যেন মস্ত গণ্যমান্য কেউ এসেছে। কোথায় বসাবে, কি খেতে দেবে—বাবাকেই তাড়া দিল তিন বার করে। পাগল সর্দার এসেছে, শীগগির এসো বাবা!

সে চলে যেতে অবনী বাবু বললেন, ওদের সঙ্গেই আজকাল বুঝি খুব ভাব তোর?

চোখ বড় বড় করে ফেলে সান্ত্বনা।—পাগল সর্দার কম লোক ভাবো নাকি! কত বড় একটা সর্দার ও জানো? ও না থাকলে তোমাদের মড়াইয়ের কাজ হত কি না সন্দেহ।

প্রতিবাদ না করে অবনী বাবু মুখটিপে হাসলেন শুধু।

সেদিন সন্ধ্যায় একজন অপরিচিতকে সঙ্গে করে অবনী বাবু বাড়ি ফিরলেন। অচেনা লোক দেখে সান্ত্বনা ভিতরের ঘরে চলে যাচ্ছিল। অবনী বাবু বাধা দিলেন, যাচ্ছিস কোথায়, দাঁড়া—এঁকে চিনলি?

লোকটিকে আর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে সান্ত্বনা ঈষৎ বিব্রত মুখে বাবার দিকে তাকালো।

—চিনলি নে তো?—বোসো তুমি বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন। আগন্তুকের দিকে একটা বেতের চেয়ার ঠেলে দিয়ে অবনী বাবু মেয়েকে বললেন, দেশের চৌধুরী-বাড়ির কথা মনে নেই তোর?—কি করেই বা থাকবে, তোর বয়েস তখন পাঁচ বছরও নয় বোধ হয়—তোমরা কত বছর হল দেশ ছেড়েচ নরেন?

নরেন চৌধুরী। ড্রাফট্‌সম্যান। হেসে জবাব দিল, পনের-ষোল বছর হবে বোধ হয়, বছর চোদ্দ বয়েস আমার তখন। সোজাসুজি তাকালো এবার সান্ত্বনার দিকে। বলল, না চিনলেও আমার কিন্তু মনে আছে ঠিক, ফ্রকপরা এতটুকু দেখেছি। অবনী বাবুর উদ্দেশে বলল, তা' ছাড়া আপনিও বিশেষ বদলান নি, দেখেই চেনা চেনা লাগছিল।

অবনী বাবু আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।—তুমি না বললে আমি চিনতেই পারতুম না। আজ বলতেই তোমার ছেলেবেলার চেহারাসুদ্ধ মনে পড়ে গেল—অথচ, এত দিন দেখছি একবারও মনে হয় নি কিছু।

নবাগতকে লক্ষ্য করে সান্ত্বনা এবারে হালকা সুরে বলল, এত দিন একসঙ্গে কাজ করার পর আজ সবে পরিচয়টা বেরুলো!

জবাব দিলেন অবনী বাবু।—একসঙ্গে কি রে, নরেন হল পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার—ড্রাফট্‌সম্যান্—কত বড় চাকরী! ওর নেহাত চোখ আছে বলেই চিনেছে। আমার মত কতজনকে দেখছে রোজ, মনে করে রাখা সহজ নাকি!

সান্ত্বনার ভালো লাগল না কথাগুলো। এ বয়সে তার বাবার ওপরে কাজ করে শুনেই বোধ হয়।—না, দেশের চৌধুরী-বাড়িটারির কথা তার কিছু মনে নেই। একেও কখনো দেখেছে বলে মনে পড়ছে না। ওপর-অলাদের 'পরে মনোভাব খুব প্রসন্ন নয় সান্ত্বনার। তাদের না দেখুক, তাদের বাড়ির মেয়েদের দেখেছে। মাটিতে পা পড়ে না। বাবার সামনে পাগল সর্দারের শ্রদ্ধাবনত মূর্তিটি বরং ভালো লেগেছিল।

ভাবান্তরটুকু নরেন চৌধুরী লক্ষ্য করল কি না বলা যায় না। সান্ত্বনার দিকে চেয়েই বলল, আপনার বাবা কিন্তু আমাকে চা খেতে দেবার লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন।

অবনী বাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, হ্যাঁ-রে সান্ত্বনা, তাই তো—একটু চা দে—আর দেখ, নরেনের বোধ হয় ক্ষিদেও পেয়েছে—

নরেনই গম্ভীর মুখে জবাব দিল, বোধ হয় নয়, নিশ্চয় পেয়েছে।

অবনী বাবু হা হা করে হেসে উঠলেন। সান্ত্বনাও হাসিমুখে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে এলো। কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে ভাবল দু'চার মুহূর্ত।

বড় চাকরী করলেও লোকটা দেমাকী নয় বোধ হয় তেমন। মুখের আদলেও ভালোমানুষ ভালোমানুষ ভাব আছে। নামটাও শোনা শোনা মনে হচ্ছে। কোথায় শুনল? পাগল সর্দার—হ্যাঁ পাগল সর্দারের মুখেই শুনেছে। তাকে ছাড়া আর কাকে চেনে সে। মনে পড়তে নীরব আগ্রহ পরিস্ফুট হল মুখে।

আনন্দে চোখ বড় বড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নরেন চৌধুরী। হাত বাড়িয়ে সান্ত্বনার হাত থেকে ডিশ দু'টো নিয়ে

টেবিলের ওপর রাখল নিজেই, রসনায় একটা সিক্ত শব্দ বার করে বসে গেল আবার।

সান্ত্বনা হেসে ফেলল।

—হাসছেন কি! এই ঘোড়ার ডিমের জায়গায় না খেয়েই মারা গেলাম। এগুলো কি—বেসন দিয়ে আলু-বেগুনের কাটলেট্! মার্ভেলাস—আর এটা মাছের ফ্রাই! মাছ পেলেন কোথায়?

তার হাবভাব দেখে সঙ্কোচ প্রায় কেটেই গেল সান্ত্বনার। হেসে জবাব দিল, চৌবাচ্ছায় পুষছি।

লোকটি ভোজনরসিক বটে। অবনী বাবু নিলেন কি নিলেন না। একাই সে সানন্দে এবং সাড়ম্বরে প্লেট দু'টি খালি করে ফেলল। পরে বড় একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে চায়ের পেয়ালা টেনে নিয়ে অবনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার তা'হলে খাবার কষ্ট নেই কিছু?

স্মিত হাস্যে অবনী বাবু মাথা নাড়লেন, না—এ বিদ্যেটা ও পাকা গিন্নির মত শিখেছে।

—মহাবিদ্যে শিখিয়েছেন, আমাদের ভূতু বাবুকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব, তাকে একটু আধটু শিখিয়ে দেবেন।

সান্ত্বনা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করল, ভূতু বাবু কে?

—ভূতু বাবুকে চেনেন না! ওই যে পাহাড়ের নীচে যার অলফাউণ্ড ষ্টল্—স্নো-পাউডার থেকে মাংস-ভাত পর্যন্ত সবই নাম মাত্র মূল্যে পাওয়া যায়। তার ওখান থেকেই তো রোজ আমার খাবার আসে—দু'বেলা ভাত-ডাল-মাংস—এর বাইরে কিছু চেয়েছেন কি দশ মাইল দূরে যাতায়াতের নাম মাত্র খরচাটা সুদ্ধু ধরে নেবে—এখানকার বেশির ভাগ লোকেরই ভূতু বাবু ভরসা।

ভূতু বাবুর ষ্টল্ সান্ত্বনা দেখেছে। নামটাই জানত না। অবনী বাবু ঠাট্টার ছলে বললেন, তোমাদের ভূতু বাবু ছাড়া গতি কি? পাগল সর্দারের সঙ্গে তো আর ভাব হয়নি তোমাদের—তার লোক প্রায়ই বাড়ি বয়ে সস্তায় মাছ পর্যন্ত দিয়ে যায়। শীগ্‌গিরই আবার গরুও যোগাড় করে দেবে বলেছে।

নরেন চৌধুরী সবিস্ময়ে তাকালো সান্ত্বনার দিকে। গোরু? গোরু কি হবে?

অবনী বাবুই জবাব দিলেন, একটু খাঁটি দুধ না পেয়ে আমার শরীর দিনকে দিন কত খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখছ না?

হাসতে লাগলেন তিনি। নরেন চৌধুরীও। সান্ত্বনা বলল, বেশ যাও, ওই ভূতু বাবুর হোটেল থেকে দু'বেলা মাংস ভাত আনিয়ে খেও এবার থেকে। হেসে ফেলল, মাগো কি নাম, ভূতু বাবু!

হাসিখুশি আমোদপ্রিয় মানুষ নরেন চৌধুরী। পদমর্যাদায় চালচলন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেনি। দেখছে চেয়ে চেয়ে। সেই ফ্রকপরা মেয়েটির সঙ্গে বাইরে মিল নেই বটে। কিন্তু ভিতরে যেন আছে। বলল, না আমাদের ভূতু বাবুর থেকে আপনার পাগল সর্দার অনেক ভালো, মাছের ফ্রাই খাওয়ার পরে সে কথা আমি একবাক্যে বলব। মড়াইয়ে ওদের মধ্যে প্রায়ই আপনাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখি, ওরাই আপনার ফ্রেণ্ডস্ অ্যাণ্ড গাইড বুঝি সব?

—তাই। অবনী বাবু সায় দিলেন, তুমি আর ক'জনকে চেনো, ও সকলকে চেনে।

—চিনিই তো। সান্ত্বনা জোর দিয়ে বলল, ওদের অত অহঙ্কার নেই ভদ্রলোকদের মত, ওরা খুব ভালো।

—সত্যি কথা। নরেন চৌধুরী সমর্থন করল, আর ওই সর্দারটি ভারি খাঁটি লোক।

পাগল সর্দারের প্রশংসা শুনে সান্ত্বনা খুশি হ'ল। বলল, তার মুখে আপনারও খুব সুখ্যাতি শুনেছিলাম একদিন। প্রথম দিকের মড়াই বাঁধার গণ্ডগোলের সময় কারা সব আক্রমণ করেছিল ওকে, আপনি নাকি তখন 'ফুটুক' তোলার মন্ত্র দিয়ে ভয় দেখিয়ে তাদের তাড়িয়েছিলেন।

নরেন চৌধুরী হাসতে লাগল।—সে একটা দিন গেছে, বাদল তো শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে চলেই যাবে কি না ভাবছিল।

—বাদল কে? সান্ত্বনা উৎসুক হল।

অবনী বাবু বললেন, বেশ, এখানকার চিফ-ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলির নাম শুনিস নি?

শুনেছে। অনেক শুনেছে। মানুষটির প্রতিও বিশেষ একটা সম্ভ্রমমেশানো কৌতূহল আছে। এতবড় এক দায়িত্ব যার, এত অজস্র লোক কাজ করছে যার নির্দেশে, কতবড় একজন সে না জানি! তাকে দেখেনি, কিন্তু দেখার আগ্রহ অপরিসীম। তার কাজের গল্প শুনেছে. তার গুরু-গাম্ভীর্যের কথা শুনেছে। বাবাকেও কতদিন হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে দেখেছে চিফ-ইঞ্জিনিয়ার ডাকছে শুনে। সেই বাদল গাঙ্গুলিকে কালু-ভুলুর মত শুধু বাদল বললে সান্ত্বনা চট করে ধরবে কি করে?

অবনী বাবুই বললেন আবার, বাদল গাঙ্গুলি নরেনের খুব বন্ধু জানিসনে বুঝি—সেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ওরা একসঙ্গে পড়েছে, একসঙ্গে কাজও করেছে তারপর। উনিই তো চেষ্টাচরিত্র করে নরেনকে নিয়ে এসেছেন এখানে।

ছন্দপতন ঘটল যেন। সান্ত্বনা নরেনের মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক।—ও মা, তাহলে তাঁর বয়েস কত?

মনে মনে সান্ত্বনা চোখ দিয়ে কল্পনা করেছিল সেই লোকটিকে, তাতে তার বয়েসের হিসেব কোন সংখ্যাতেই হয় না বোধ হয়। দু'জনকেই হেসে উঠতে দেখে লজ্জা পেয়ে গেল। একটু বাদে নরেন বলল, আপনার নিরাশ হবার কারণ নেই, ও লোকটার আসল বয়েসের কোন গাছ পাথর নেই।

সঠিক বুঝল না সান্ত্বনা। চেয়ে রইল। অবনীবাবু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেললেন।—এসব কথা থাক এখন—এ ও সারারাত বসে শুনতে পারে। কিন্তু তুমি সেই থেকে ওকে আপনি আপনি বলছ কি, ও কত ছোট—তুই কি রে সান্ত্বনা!

এতটুকু ফ্রক পরা দেখেছে, আপনি করে বলতে নরেনের কেমন লাগছিল সত্যিই। কিন্তু তুমিও বলে উঠতে পারছিল না চট করে। অবনী বাবুর কথায় এবার সকৌতুকে তাকালো সান্ত্বনার দিকে।

বাবার অনুযোগে বিব্রত হাস্যে সান্ত্বনা জবাব দিল, ডাকলে কি করব—বেশ নতুন নতুন লাগছিল শুনতে, তুমি দিলে বোধ হয় সেটুকু পণ্ড করে।

জোর হাসিতে ঘর ভরে তুলল নরেন চৌধুরী।—বেশ লাগলে সেটুকু আর পণ্ড করি কেন, আপনি—আজ্ঞে করেই বলব'খন, তাহলে—?

সান্ত্বনা টেনে টেনে জবাব দিল, নাঃ, এর পর আর কি করে হয়, বাবা যখন পণ্ড করে দিয়েইছে—।

যাবার আগে নরেন জিজ্ঞাসা করল, আলু-বেগুনের কাটলেট খেতে আবার কবে আসছি ?

—ভারী তো, রোজই আসুন না।

রোজ না হোক, মাঝে মাঝেই এর পর পদার্পণ ঘটতে লাগল নরেন চৌধুরীর। আসলে এই আশাতেই তার প্রথম দিন আসা।

প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা একটি মেয়ে মড়াইয়ের বুকে এক দঙ্গল কালো মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় কে না দেখেছে ?

শুভ্রশ্রী গিরিকন্যার মতই পাহাড়ের গায়ে গায়ে এক মেয়েকে অবাধে বিচরণ করতে কে না দেখেছে ?

পাহাড়ী পথের উঁচু নীচুতে দিনের মধ্যে ক'বার করে নারীদেহ-বন্দিনী এক যৌবন-তরঙ্গের ওঠা নামাই বা কে না দেখেছে ?

এই দেখার খবর শুধু সান্ত্বনাই রাখে না। নরেন চৌধুরীও আর সকলের মতই দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করেছে অনেক দিন। ওই রুক্ষ, নীরস পরিবেশে সে দৃশ্য যেন এক মস্ত ঝিলিক। অন্যথায়, যোগসূত্র পেয়েই ইঞ্জিনিয়ার ড্রাফ্‌ট্‌সম্যান নরেন চৌধুরী সাধারণ এক ওভারসিয়ার অবনী বাবুর সঙ্গে এত আগ্রহে পুরানো পরিচয় ঝালিয়ে নিত কি না বলা যায় না।

ভিন্ন ভিন্ন গাছেরও সবুজ পত্রালীতে একটা মিল চোখে পড়ে। সেটা পাতার নয়, সবুজের। ওদের মধ্যেও তেমনি বোধকরি মিল আছে খানিকটা। সেটা বয়সের নয়, মনেরও নয়, সজীব তারুণ্যের। সেদিক থেকে দু'জনেই এরা অনেকটা সমগোত্রীয় ছেলেমানুষ।

পরিবেশও অনুকূল। এই পাহাড়ী রুক্ষতায় আর যাই থাক, সংকীর্ণতা কম।

অবনী বাবু ঠাট্টা করেন, এবারে যত খুশি ড্যামের গল্প শোন।—

সান্ত্বনা মুখে আগ্রহ দেখায় না কিছু। বরং ঠোঁট উল্টে বলে, ভারী তো হচ্ছে তার আবার গল্প।

নরেন জবাব দেয়, কি হচ্ছে বুঝলে মেয়েরাই ইঞ্জিনিয়ার হত।

সান্ত্বনা বলে, মেয়েরা ইঞ্জিনিয়ার হলে ভুতু বাবুরা রান্নাঘরে ঢুকত।

ছদ্মত্রাস শিউরে ওঠে নরেন, বাপরে বাপ !

এই ভোজন-রসিকতার ভিতর দিয়েই এমন অল্প সময়ে এত অন্তরঙ্গ একজন হয়ে উঠেছে সে। কখনো এসে হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়ে এমন, যে মূর্তি দেখে হেসে ফেলে সান্ত্বনা। নরেন চৌধুরী হাত মুখের ইসারায় জানায়, রসদ কিছু না পড়লে নাড়ী ছেড়ে গেল বলে। কখনো নিজেই আবার হাতে করে নিয়ে আসে কিছু। বিশেষ করে ছুটির দিনে। বলে, এটা করো, ওটা রাঁধে।—

প্রথম প্রথম সান্ত্বনা অনুযোগ করেছে, পরে রাগ দেখিয়েছে।—কিছুই করব না, এসব নিয়ে ভুতু বাবুর কাছে যান, রেঁধে দেবে।

নও রকমের একটা নিঃশ্বাস ফেলে নরেন চৌধুরী।—ওই একটা লোককে মাঝে মাঝে আমার খুন করতে সাধ যায়।

ভিতরের দাওয়ায় মোড়া পেতে দেয় সান্ত্বনা। নরেন গ্যাঁট হয়ে বসে খাবার তৈরী করা দেখে তার। আর নীরব প্রতীক্ষায় সিগারেট টানে। অবনী বাবুর জন্যে পাঁচবার করে লুকোতে হয় একটা সিগারেট। ইঞ্জিনিয়ার নরেন চৌধুরী লুকাতো না, দেশের ছেলে নরেন লুকোয়। ভদ্রলোক আড়াল হলে সান্ত্বনাকে শুনিয়ে টিপ্পনীও কাটে তাঁর উদ্দেশে। সান্ত্বনা কখনো হাসে, কখনো শাসায়, দাঁড়ান বাবাকে বলছি।

সান্ত্বনার হালকা তর্জন হয়ত অবনী বাবুই শুনে ফেলেন। আবার এসে দাঁড়ান তিনি।—কি বলবি ?

জবাবে সান্ত্বনা আবারও হেসেই ফেলে। নয়তো বলে, এই ক'টি খাবার আবার তিন ভাগ হবে বলে নরেন বাবু দুঃখ ক'চ্ছিলেন।

অবনী বাবু হেসে বলেন, তা ওকে দে না বেশি করে—।

চলে গেলে নরেন ভুরু কুঁচকে তাকায় সান্ত্বনার দিকে।—আমাকে কি ভেবেছ শুনি ? আমি রীতিমত উপোস পর্যন্ত করতে পারি জানো ?

—জানি।

—জানো কি রকম ? ঘাবড়েই যায় নরেন।

—মরুভূমির পেটে জল ঢাললেই কি আর মরুভূমি ঠাণ্ডা হয় ! উপোস তো করেই আছেন—।

বৃথাই যুৎসই একটা জবাব হাতড়ে বেড়ায় নরেন। মানুষটার আর এক অভ্যাস দেখে হেসে কুটিকুটি হয় সান্ত্বনা। হাতীর দাঁতের কান-কাঠি দিয়ে তার কান সুড়সুড়ির আয়াস উপভোগ করা। সারাক্ষণ সঙ্গেই থাকে ওই কান-কাঠি। স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়ে করানো নাকি ? হাতে যখন সিগারেট নেই, তখন ওটা আছে। সন্তর্পণে কানের রন্ধ্রে চালান করে দিয়ে একটু একটু নাড়ে, আর গলা দিয়ে কুড় কুড় করে শব্দ বার করে একটা—আমেজে চোখ বুজে আসে।

সান্ত্বনা এ নিয়ে হাসি ঠাট্টা কম করেনি। শাড়ীর আঁচলের কোণ পাকিয়ে সেটা নিজের কানে গুঁজে দিয়ে অনুকরণ করেছে তার সামনেই। গলা দিয়ে ওর মত শব্দ বার করতে গিয়ে হেসে গড়িয়েছে।

নরেন বলে, খুব হাসো, অভ্যেসটি হলে দেখবে কত মজা !

—কি মজা ?

—একটুখানি কানের তদ্বির করেই দুনিয়াটাকে দার্শনিক চোখে দেখার মজা।

—দার্শনিক চোখে মানে ?

—দর্শন বোঝো ?

দু' চোখ টান করে সান্ত্বনা তাকায় তার দিকে।—এই তো আপনাকে দর্শন করছি।

দর্শনতত্ত্ব আর বোঝানো হয় না নরেন চৌধুরীর। অজ্ঞাতে নিজেও সে স্থূল দর্শনেরই পাঠ নেয়। সে দর্শনের স্বাদ ভিন্ন।

কিন্তু ড্যামের কর্মপরিবেশে এই মেয়েরই আবার আর এক ধরণের অবিচ্ছিন্ন শ্রদ্ধা এবং কৌতূহল দেখে নরেন চৌধুরী বিস্মিত হয়েছে। গঠন-যান্ত্রিকতার প্রতি কোন মেয়েরই এ ধরণের আগ্রহ থাকার কথা নয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে। বুদ্ধির অগম্য কিছু দেখলে না জেনে নেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। এই ঘনিষ্ঠতার পরে সান্ত্বনা শুধু সাঁওতালদের এলাকাতে নয়, সর্বত্রই ঘুরে বেড়ায়। হাঁ করে চেয়ে চেয়ে অতিকায় বুলডোজারের মাটি সরানো দেখে, ড্রেজার দিয়ে মাটি ঠেলে ঠেলে লেভেল করার প্রক্রিয়াও নীরস নয় তার চোখে। নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে দুরু দুরু বক্ষে হয়েষ্ট দিয়ে তিন-চার তলা

নান উঁচুতে অতিকায় এক একটা পাথর তোলা দেখে। ওই দড়ির মত বস্তুটা ছিঁড়ে গেলে কি মারাত্মক ব্যাপার হতে পারে ভেবে কণ্টকিত হয় মনে মনে। নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে তার পর, যাক্ ছেঁড়েনি! কিন্তু আবার নেমে আসছে ওটা, আবার একটা তুলবে। প্রত্যেক বারই রীতিমত ভয় হয় তার। চার্নিং মেসিনে করে জল দিয়ে সিমেন্ট বালি আর পাথর-কুচি মেশানোর ব্যাপারটাও যেন এক কৌতুক পর্যবেক্ষণের বস্তু। আর অবাক লাগে, আর্থ-বোয়ার দিয়ে মাটি কোঁড়া দেখে। নদী বক্ষেরও আশি, নববুই, একশ ফুট পর্যন্ত খুঁড়ে পাথরের স্তর বার করতে হবে। সেই স্তরের ওপর দাঁড়াবে পাকা পাথরের দেয়াল। নরেনের মুখে সেই দেয়ালের ফিরিস্তি শুনে সান্ত্বনার বিস্ময়ের শেষ নেই। নদী বক্ষের নীচে থাকবে একশ ফুট, ওপরেও প্রায় তাই—চওড়া হবে পঞ্চাশ ষাট ফুটের মত। ওপরের দিকে সেই দেয়ালের ভিতর দিয়ে চলাচলের পথ থাকবে এপার ওপার—যন্ত্রপাতি থাকবে অজস্র, এক একটা সুইচ টিপলে এক একটা লক্ গেট উঠবে, নামবে—।

লক্ গেট কী?

আগাগোড়া নিটোল দেয়াল দিয়ে জল আটকে বসে থাকলে আর জল পাবে কেমন করে লোকে! গেট থাকবে পনের বিশটা। গেট খুলে দিলে জলে জলময় হয়ে যাবে অন্য দিক, আবার গেট ফেলে দিলেই সব বন্ধ।

সান্ত্বনার যেন বিশ্বাস হয় না। দেয়ালের এদিকে অবরুদ্ধ হয়ে জল উঠবে পঞ্চাশ ষাট সত্তর ফুট উঁচুতে। তারপর এক-একটা গেট খুলে দিলে রুদ্ধ জল আছড়ে পড়বে অন্য দিকের শুকনো অতলে—তার মুখে পড়লে একসঙ্গে হাজার হাতীর হাড়গোড়ও নাকি গুঁড়িয়ে যাবে পলকা খেলনার মতই। নালা কেটে কেটে সেই জল নিয়ে যাও যেখানে খুশি, যেখানে দরকার। শুধু তাই নয়, ওই শুকনো দিকেরই একধারে আবার বিদ্যুৎ তৈরীর ব্যবস্থাও হবে নাকি। জল থেকে বিদ্যুৎ হয় এরকম একটা কথা অবশ্য শোনা ছিল সান্ত্বনার। কিন্তু শোনা কথায় আর চোখে দেখা রোমাঞ্চে রাত দিনের পার্থক্য।

সান্ত্বনা ভাবতে পারে না সবটা। এ যেন এক আজব কারিগরীর রূপকথা। স্বপ্ন-সম্ভবের মহড়া। ওরা কাজ করে। সান্ত্বনার মনে হয় বিশ্বকর্মার দূত বুঝি ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের কথাও মনে হয়। এই গঠন-সমারোহের সর্বপ্রধান যে, এই গঠন-অভিযানের নায়ক যে মানুষ!—চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। দূর থেকে মাত্র একটিবার তাকে দেখার লোভ যে কত, সে শুধু সান্ত্বনাই জানে। হিরো-ওয়ারসিপের যুগ নয় এটা। কিন্তু বড় দুনিয়ায়ও বড়র অর্ঘ্য আছেই। সান্ত্বনার ছোট পরিসরে এত বড় আর কে?—কলের মানুষ। কলের মতই অবিশ্রান্ত কাজ করে নাকি। পরিচিত জনেরা বলে। তার বাবা, নরেন বাবু এমন কি পাগল সর্দারও প্রায় ওই কথাই বলে। তাদের চোখে দেখা, কাছে দেখা মানুষ। সাদা কথা সাদা অর্থেই বলে তারা। কিন্তু শুনে সান্ত্বনার সম্ভ্রম বাড়ে আরো। নৈষ্ঠিক দূরত্ব বাড়ে।

এই ড্যামের কাহিনী শুরু থেকে শুনতে বসলে, বিশেষ করে পাগল সর্দারের মত একজনের মুখ থেকে শুনতে বসলে শুনবে যা, এক কথায় তাকে এ্যাডভেঞ্চার বলা যায়। সান্ত্বনা তাই শুনেছে। বিশ্বাস করেছে। রোমাঞ্চিত হয়েছে। পাগল সর্দারের এ্যাডভেঞ্চারে অত্যুক্তি খুব না থাকুক, আবহাওয়া সৃজনের মালমশলা কিছু থাকাই স্বাভাবিক। দিদিয়ার বিস্ময়বিহ্বল দুই বড় বড় চোখের দিকে চেয়ে তার বলার ঝোঁকে সেই এ্যাডভেঞ্চারের নায়ক বাদল গাঙ্গুলি মড়াই কোন ছার, সাত সাগরের পায়েও শেকল পরাতে পারত। কিন্তু সম্ভ বর্তমানে নিজের অগোচরে এই পাগল সর্দারের মনেই একটুখানি খেদ আছে বোঝা যায়। এখন রাস্তা হয়েছে, কোয়ার্টার হয়েছে, আপিস-ঘর হয়েছে, জিপ-ট্রাক এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবধানও এসেছে খানিকটা। বর্তমানের এই আপিস-আবহাওয়াটাই সর্দারের পছন্দ নয়। পাহাড়ে পাথরে, জলে-জঙ্গলে বিঘ্ন উত্তরণের একাত্মতায় মড়াইয়ের নায়ক ছিল তাদেরই একজন। কিন্তু সে অ্যাডভেঞ্চারের নায়ক আজ আপিসের বড় সাহেব। বড় সাহেব কথাটার তাৎপর্য একটু একটু যেন বুঝতে শিখেছে। তার সাক্ষাতও বড় একটা পায় না আজকাল। হুকুম আসে কাগজে-কলমে পাঁচ হাত ঘুরে। নীরস একটা ছকের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে বলেই পাগল সর্দারের কাছেও কলের মানুষের মতই হয়ে উঠেছে বাদল গাঙ্গুলি। সান্ত্বনা ভাবে, কলের মত কাজ না করলে যন্ত্রযুগের সৃষ্টির অ্যাডভেঞ্চার যে অচল হয়, সে আর বুঝবে কি করে?

কিন্তু নরেনের কথা শুনে সান্ত্বনা তটস্থ। তার আগ্রহ দেখে ভাতের সঙ্গে ডাল মাখার মত করেই বলল, বেশ তো চলো না, বাদলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি আজই—এখন বোধ হয় কোয়ার্টারেই পাওয়া যাবে তাকে।

—আলাপ করিয়ে দেবেন! আমার সঙ্গে?

বিস্ময় দেখেই নরেনও অবাক হয় একটু। হেসে বলে, কেন সে বাঘ না ভালুক?

বাঘ-ভালুক নয়, তবু শুনেই আড়ষ্টপ্রায়। সামনে গিয়ে দু' পায়ের ওপর ভর করে সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে কি না সন্দেহ। হ্যাঁঃ, আমি যাব তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে, আপনি যেন কি?

এ রকম অনেক সময় অনেক কথা হয়েছে আরো। সান্ত্বনা ছেলেমানুষের মতই জিজ্ঞাসা করেছে, আচ্ছা, আপনিও তো তাঁর সঙ্গে একত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছেন, আপনি তাঁর মত হলেন না কেন?

নরেন হালকা জবাব দেয়, সবাই তো স্কুল-কলেজে পড়ে, সবাই প্রাইম মিনিষ্টার হয় না কেন?

বুঝতে চেষ্টা করে সান্ত্বনা বলে, ভিতরে খুব বড় একটা কিছু থাকা দরকার, না—?

ছদ্মগাম্ভীর্যে নরেন চৌধুরী জবাব দেয়, হ্যাঁ, হিমালয়ের মত বড় একটা কিছু।

—যান্, আপনার কেবল ঠাট্টা।

এবারে কিছুটা আন্তরিক ভাবেই বলে নরেন চৌধুরী। পাশ করার পরেও ও হাতে-কলমে কত কাজ করেছে, তা ছাড়া বিলেতে গেছে, জার্মাণীতে গেছে।

—আপনিও গেলেন না কেন?

—গেলে কি হত?

—বেশ হত।

কি বেশ হত, আর না গিয়েই বা কতটুকু হয়েছে, সে সম্বন্ধে সান্ত্বনার সুস্পষ্ট ধারণা নেই কিছু। প্রথম আলাপের সময় বাবার মুখে তার বড় চাকরীর কথা যা শুনেছিল, এ ক'দিনের ঘনিষ্ঠতায়

তার গুলব গেছে। বড় মানে আর কত বড়। তাই সত্যিই ও ভাবছিল, বেশ হত নরেন চৌধুরীও তেমন বড়র মতই বড় একজন হলে। আর বেশ হত, তখনও তার সঙ্গে যদি সহজ আলাপ-পরিচয় থাকত এ রকম।

এই সাদাসিধে মনোভাব জ্ঞাপনের ফলে নরেন চৌধুরীর একটু ক্ষুণ্ণ হওয়ার কথা। কিন্তু স্পষ্ট সততার একটা হালকা দিকও আছে। যা মনকে বিক্ষুপ করে না, বরং টানে। হেসেই জবাব দিল, দুর্ভাগ্য আমার। কিন্তু এখন দেখছি, বাদল গাঙ্গুলির সঙ্গে তোমার আলাপ করতে না যাওয়াই ভালো।

—কেন? না যাক, সান্ত্বনার আগ্রহ কম নয়।

—তারও মাত্র দু'টো হাত, দু'টো পা, একটা মাথা, দু'টো চোখ—।

—প্রায় আপনার মতই? নিরীহ অভিব্যক্তি।

ভুরু কুঁচকে ফেলে নরেন চৌধুরী। প্রায় মানে। আমার কি গুগুলো ঠিক ঠিক সেই নাকি?

জব্দ করতে পেরেই সান্ত্বনা খুশি।

ছদ্ম-কোপে নরেন মাটির কাছে হাত এনে বলল, তোমাকে এতটুকু ফ্রক পরা দেখেছি জানো?

প্রচ্ছন্ন কৌতুকে সান্ত্বনা কয়েক মুহূর্ত দেখল তাকে। পরে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, সেই আপনিও হাফপ্যান্ট পরতেন যখন?

মৃদু মৃদু হাসতে থাকে নরেন। হাফপ্যান্ট তো এখনো পরি।

—আপনার হাফপ্যান্টের বয়েস তাহলে পেরোয় নি এখনো। আমার ফ্রকপরার বয়েস অনেককাল গেছে।

আবারো জব্দ। খুশিভরা চোখে চেয়েই থাকে নরেন চৌধুরী। পরে বলে, জিভের ডগায় যে সরস্বতী ঠাকরোন বসেই আছেন দেখি! লেখাপড়া শিখলে খুব ভালো করতে তুমি।

সান্ত্বনা যথার্থ লজ্জা পেয়ে যায় এবার। লেখাপড়ার প্রসঙ্গ উঠলে মাসির বাড়িতেও সে রান্নাঘরে পালিয়ে বাঁচত। এ ব্যাপারে তার মত লজ্জা তত সংকোচ। অবনী বাবুর সামনে নরেন আর একদিনও কি কথায় ওর লেখাপড়ার প্রসঙ্গ তুলেছিল। সান্ত্বনা তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করেছে সেখান থেকেও। কিন্তু বাবা ওদিকে উৎফুল্ল মুখে তার ছেলেবেলার পড়াশুনার গল্প কেঁদে বসেছেন তাও কানে এসেছে। এক এক সময় হিড় হিড় করে টেনে এনে পিঠে গুমগুম কিল বসিয়ে ওর মা পড়তে বসাতেন ওকে। কিন্তু তিনি আড়াল হলেই চুপি চুপি ও উঠে আসত বাবার কাছে। মুখখানা যতটা সম্ভব করুণ করে বাবার একখানা হাত তুলে নিজের কপালে ঠেকাত। অর্থাৎ, দেখো তো গা টা গরম টরম লাগছে কি না। নয়ত, জিব বার করে দেখাত বাবাকে—কোন রোগের উপসর্গ যদি বার করা যায়। রোগ ঠিক না হোক, রোগ-সম্ভাবনার উপসর্গ অবনী বাবুও অবধারিত দেখতে পেতেন। পড়া-শুনার অনুশাসন তার পরেও আর শিথিল না করে উপায় কি। কিন্তু সান্ত্বনাই বিপদ বাধাতো আবার সব ভুলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দু'চোখ লাল না হওয়া পর্যন্ত পুকুরে ডুবে উঠে। মায়ের খপ্পরে পড়তে হত আবারও। বহ্নি-উদ্গিরণ থেকে তখন রেহাই পেতেন না অবনী বাবুও।

আড়াল থেকে শুনতে শুনতে সান্ত্বনা লাল হয়ে ওঠে এক-একবার। আবার রাগও হয় বাবার ওপর। খুব গল্প করা হচ্ছে এখন। তখন অমন আদর না দিলে আজ এরকম হত!

পরে খেতে বসে নরেন বলে, পড়াশুনার নিকুচি করেছে, রান্নার বিদ্যের তোমাকে ডক্টরেট দেওয়া উচিত।

প্রায় রাগ করেই সান্ত্বনা জবাব দেয়, আর খাওয়ার বিদ্যের আপনাকে মহামহোপাধ্যায় দেওয়া উচিত।

মেঘের ফাটলে রোদের ঝলকের মত রাগের মুখেই হাসি ঝলকে ওঠে আবার।

[ক্রমশঃ।

ভারতীয় রেলপথের ইতিকথা

ভারতের রেলপথসমূহ দৈর্ঘ্যে ৩৪ হাজার ৭ শ' ৫ মাইল। ইহা এশিয়ার বৃহত্তম রেলপথ এবং সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ।

এই রেলপথের মধ্যে মাত্র ৫ শত ৫০ মাইল ছোট রেলপথ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের অধীন। বাকী সমস্ত রেলপথের মালিক ও পরিচালক হলেন সরকার। পৃথিবীতে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন রেলপথসমূহের মধ্যে ভারত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। প্রথম স্থান সোভিয়েট ইউনিয়নের রেলপথগুলির। দৈর্ঘ্যের দিক থেকে চীনের স্থান ভারতের পরে, জাপান তারও নীচে।

এ বিষয়ে নীচে একটি তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হল:—

ভারত—৩৪,৭০৫ মাইল, জাপান—১২,৪৫৬ মাইল, চীন—১১,০০০ মাইল, ব্রহ্ম—১,৭৮৭ মাইল, পাকিস্তান—৭,০৮২ মাইল, বৃটেন—১১,১৫১ মাইল, কানাডা—৪১,১৫৮ মাইল, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—২,২৪,৮১৬ মাইল, দক্ষিণ আফ্রিকা (১৯৫৩-৫৪)—১৩,৪১৩ মাইল, ফ্রান্স—২৫,৬০০ মাইল, অষ্ট্রেলিয়া (১৯৫৩-৫৪)—২৬,৬৩৩ মাইল।

ভারতের আয়তনের তুলনায় কিন্তু তার রেলপথের দৈর্ঘ্য যথেষ্ট নয়। এর আরও সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন দরকার।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তবু ওরাং মঁমার্তের ছোট্ট দোতলার ঘরে সে আবার প্রত্যাবর্তন করল। গভীর অধ্যবসায়ে মগ্ন হ'লো চিত্রাঙ্কনে। একটা, দুটো, তিনটে ক্যানভাসে একসঙ্গে ছবি আঁকতে লাগলো। দিনান্তের শেষ রশ্মি জানলার কাচে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে তার ইজেলের সামনে উপস্থিত থাকতো একনিষ্ঠ সাধকের মতো। ক্রমবর্দ্ধমান বেগ ও নৈপুণ্যের সঙ্গে সে ছবির পর ছবি এঁকে যেতো। ম্যাডাম লুবে সংবাদপত্রের অংশ বিশেষ পড়ে শোনাতেন সেই অবসরে।

অপরাহ্নের নির্জনতা মাঝে মাঝে বেদনাদায়ক হ'য়ে ওঠে। নির্জনতা কি করুণ স্মৃতি দিয়ে গড়া! তমসাচ্ছন্ন ঘরে স্মৃতিরা যেন চার দিকের দেয়াল ডিঙিয়ে এসে চোখের সামনে ভাসতে থাকে, পাকে পাকে ঘিরে ধরে তার সমস্ত চেতনাকে। স্মৃতির হাত থেকে মুক্তি পেতে, টুপি আর কোট পরে সে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। অর্থহীন ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। জনতার মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ অস্তিত্বের তিক্ততায় মন ভরে ওঠে। 'বুলভার্ড ক্লিচির' ব্রসারি তখন তার একমাত্র আশ্রয়স্থল মনে হয়।

প্রায় সন্ধ্যাই সেখানে গিয়ে কাটিয়ে আসে। চোখের ওপর পর্যন্ত টুপিটা নামানো থাকে। চেয়ারে বসলে তার ছোট্ট পা দুটো মাটি স্পর্শ করে না, শূন্যে ঝুলতে থাকে। অবসাদ-ক্লান্ত মনে এইভাবে সে দিনের পর দিন এসে বসে থাকে। তার চিরসঙ্গী ছড়িটা থাকে ঠিক পাশেই। সংবাদপত্র পড়ে, কাগজের ওপর ছোট ছোট স্কেচ করে, গ্লাসের জলে নিজের কুৎসিত মুখের ছায়া দেখে সময় কাটিয়ে দেয়। কি জন্যে এখানে এসে এই সহিষ্ণু প্রতীক্ষা, সে নিজেও জানে না।

তার মা বলেছিল, সে এখানে নিঃসঙ্গতা অনুভব করবে। সত্যিই সে ভারি একা।

একদিন সে কনিয়াক আনতে বললে ভৃত্যকে। পান করল একবার, আরো একবার। আশ্চর্য পরিবর্তন বোধ করলো যেন! বিকৃত পায়ের জন্য খেদ রইল না। অন্তর্হিত হলো সব কষ্টদায়ক চিন্তা। বিকলাঙ্গ! কে বিকলাঙ্গ? কেন, সে তো একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে এই মাত্র নাচছিল। চোখ নিমীলিত করে মেয়েটি তার

মাথা হেনরীর কাঁধের ওপর রেখেছিল। নিজেকে মুক্ত করে দিয়েছিল আবেগ ভরা ছন্দোময় আলিঙ্গনে।

একটা গোপন পুলকে সে আবিষ্কার করলো সে একজন জাত মদ্যপায়ী। আশ্চর্য পরিমাণে এই তরল উত্তেজনা সে নির্বিঘ্নে পান করতে পারে। এই ব্যাপারে অতিরিক্ত খুশি হলো সে। কেউ কেউ পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় আরোহণ করতে পারে,—কেউ বা পারে ছ'ফুট উঁচু ঘোড়ার করে অনায়াসে লাফিয়ে যেতে। আর সে পারে নির্বিঘ্নে অপর্যাপ্ত পান করতে। তাছাড়া এই মাদকতায় অন্য কাজ হতো। তার সচেতন মনের ভয়ের জড়তা কেটে যেতো। নিঃসঙ্কোচে রূপবিলাসিনীদের কাছে গিয়ে আসঙ্গলাভের তৃপ্তি পেয়ে আসতো সে।

মঁমার্তে ফিরে আসার এক বছর পর তার জীবন এই ভাবে কেটে যাচ্ছিলো। এই সময়ে এক সন্ধ্যায় লা মির্লিটন ক্যাবারেতে উপস্থিত হ'লে একটা নতুন গানের জন্যে কভার-ডিজাইন আঁকবার ফরমাস পেলো।

নামপত্রের ওপরে হেনরীর ছবিগুলো মুদ্রিত মূর্তি লাভ করল।

হুত্রেণের সঙ্গে সঙ্গে সেণ্ট ল্যাজার অসাধারণ সাফল্য লাভ করল। শিল্প-জগত এর আগে কখনো গানের বই-এর প্রচ্ছদপট নিয়ে মাথা ঘামায় নি। এবার কিন্তু হেনরীর ছবিগুলো আশ্চর্য আগ্রহ সঞ্চার করে দিলো।

'পতিতাবৃত্তির বহুযুগ প্রাচীন সমস্যার ওপর তিক্ত কিন্তু মহৎ আলোকপাত'—'ছবিগুলির মধ্যে বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টি ও অপরিচিত নিপুণ শিল্পীর অভ্রান্ত স্পর্শ রয়েছে।'

সে নতুন নতুন গানের জন্য, পত্রিকার জন্যে অনেক স্কেচ আঁকতে লাগলো। এখন থেকে অচেনা পথিকও তাকে টুপি তুলে অভিনন্দন জানায়। কু-কলাকুর-এর রঙ্গকিনীরা যখন জানালা থেকে তার সঙ্গে কথা বলে, তখন তাদের কণ্ঠে গর্বিত আনন্দের রেশ তার কানে বাজতে থাকে। আশ্চর্য ভাবে ওয়েটাররা তার নাম জেনে নিয়েছিল। সবিনয়ে কাছে এসে ফরমাস নিয়ে যেতো। তার ছবি লোকে আনন্দের সঙ্গে দেখতো। আর অর্থপ্রাপ্তি না ঘটলেও সকলের আলোচ্য বিষয় হ'য়ে উঠেছিলো সে।

শিল্প-ব্যবসায়ীরা তার সন্ধান করে ফিরতে লাগলো। কাফেতে যে সব লোক তার প্রতি এত দিন নজর দেবার সুযোগ পান নি, তাঁরা টেবিলের কাছে স'রে এসে বলেন—ক্ষমা করবেন, আপনিই ত' ম'সিয়ে ত তুলো লোত্রেক? আপনার শেষ ড্রয়িং-এর জন্যে অভিনন্দন জানাই। অপূর্ব! সত্যি অপূর্ব! কি সূক্ষ্ম কাজ, কম রেখা ব্যবহারের কি আশ্চর্য্য চাতুর্ব! কোন পানীয় লাগবে কি? আসুন না, আনন্দের সঙ্গে খাওয়া যাক। হ্যাঁ যা বলছিলুম, আমি আপনার একজন ভক্ত বলতে পারেন। আমি নিজেও একজন শিল্পী—

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল। হেনরী এখন বেশ সুখী। আগের চেয়ে অনেক, অনেক সুখী।

এক দিন সন্ধ্যায় লা এলিতে বসে সে একটা স্কেচ করছে, এমন সময় এক অপরিচিত ভদ্রলোক তার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে টুপি তুলে অভিনন্দন জানালেন।

আমার নাম জিডলার, তিনি বললেন, চার্লস জিডলার।

হেনরী ভদ্রলোককে দেখে বললে, আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে আনন্দিত হলাম, তারপর স্কেচ করতে করতে বললো, আমার নাম তুলো লোত্রেক। আপনি বসে কিছু পান করবেন নাকি?

আগন্তুক আরাম করে একটা চেয়ারে বসলেন, না ধন্যবাদ আমি এইমাত্র পান করেছি। কিছুক্ষণ তাঁর হাত দুটো ধ্যান তন্ময় কাঁকড়ার মতো টেবিলের ওপর পড়ে রইলো। একদৃষ্টিতে তিনি হেনরীর স্কেচ করা দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন, আপনি ক্যানক্যান নাচের ছবি আঁকতে ভালবাসেন, না? আমারও ঐ ক্যানক্যানের স্কেচ ভারি পছন্দ হয়। এতে টাকাও আসে প্রচুর।

—ক্যানক্যানে টাকা আছে?

—প্রচুর, জিডলার স্বীকৃতি-জ্ঞাপক ভাবে মাথা নেড়ে দিলেন। তবে এর থেকে টাকা রোজগার করতে জানা চাই। প্রয়োজন হ'লে কিছুটা কমার্সালাইজ করতে হবে। ভাববেন না, যে সম্বন্ধে কথা বলছি তার কিছু আমি জানি না। কুড়ি বছর প্রায় এই লাইনে আছি। বর্তমানে 'সারকিউ হিপোড্রোমের' পরিচালক আমি। নাম পরিচয়ের কার্ড বাড়িয়ে দিলেন হেনরীর দিকে। হেনরী বেশ মুগ্ধ হয়েছিলো ভদ্রলোকের কথায়, ব্যবহারে। প্যারিসের মধ্যে হিপোড্রোম হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সার্কাস।

সেই রাতেই ম'মার্তের রেস্তোরাঁর কলকোলাহলের মধ্যে জিডলার তাঁর প্ল্যান হেনরীর কাছে ব্যক্ত করলেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনি তাঁর বিয়ারের গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে আর একহাতে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে বলেছিলেন, প্রায় এক বছর ধরে আমি একটা নতুন কিছুর সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছি। বিচিত্র কিছু একটা যা আমাকে প্রচুর টাকা এনে দিতে পারে।

—ক্যানক্যানই কি সেই টাকা এনে দেবে মনে করেন?

—হ্যাঁ, শান্ত সম্মতিতে জিডলার মাথা নেড়ে জানান, ক্যানক্যানই আমাকে লক্ষপতি করবে।

একসঙ্গে তারা পান করলো।

দ্রুত ভঙ্গীতে জিডলার তাঁর বিয়ারের গ্লাস টেবিলের একদিকে সরিয়ে রাখলেন। বললেন, আগামী বসন্তকালে প্রদর্শনী আরম্ভ হচ্ছে। হাজার হাজার লোক প্যারিসে জমায়েত হবে। তারা সেখানে করবে কি?

—প্রদর্শনী দেখতে যাবে মনে হয়।

হ্যাঁ, তা ত' বটেই। তারা যে উঁচু মীনার তৈরী করছে, তার ওপর উঠবে। বোকার মতো নিগ্রো, চীনাম্যান আর সাপুড়েদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে দেখবে। দেখবে হাতি আর উট। কিন্তু তা ছাড়া কি করবে? তারা সন্ধ্যা কাটাবে কি ভাবে?

পকেট থেকে একটা সিগারেট বার ক'রে অগ্নি সংযোগ না করেই মুখে চেপে ধরলেন।

দেখুন, তিনি বলতে লাগলেন, সাধারণ লোকেরা অদ্ভুত। তারা নিজেদের সঙ্গতে তুষ্ট নয়। তারা কৌতুক সৃষ্টি করতে পারেনা। তাদের জন্যে কৌতুক সৃষ্টি করতে হবে। তারা আনন্দ চায়। কৌতুক চায়। আর কৌতুক মানেই মেয়েছেলে। যদি কুড়ি বছর ধরে এ পথে থেকে আমি কিছু শিখে থাকি তা এই। জনসাধারণের পক্ষে মুখ্যুমি হ'লেও কথাটা সত্যি। তাই বলছিলাম নাচ অর্থাৎ ক্যানক্যানই একমাত্র তাদের কৌতুক দিতে পারে, আর আমাকে দিতে পারে প্রচুর টাকা।

—কিন্তু কি ক'রে?

—কি ক'রে? বলছি এক এক ক'রে সব। প্রথমে আমি সমস্ত মেয়েদের যারা লা এলিতে ক্যানক্যান নাচ করে তাদের টাকা দিয়ে ভাড়া ক'রে আসবো। বিশেষ ক'রে সেই সুন্দর মেয়েটি যে বেশ মজার খোঁপা বাঁধে।

—লা গুল?

—তার নামটা আমি ঠিক জানি না, তবে সে মেয়েটি নাচতে পারে বেশ। মনে হয় সে উত্তেজনা সৃষ্টি করবে। তারপর সকলকে পাওয়া গেলে জায়গা ঠিক করবো। একটা বার থাকবে সেখানে। আর একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবো।

—প্রদর্শনী? নাচঘরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা!

হ্যাঁ, লোক তো আর সারাক্ষণ নাচতে পারে না। অন্য আনন্দও মাঝে মাঝে চাই। নিয়মিত প্রদর্শনী করবো তাই। আর সেটা রঙ্গমঞ্চের ওপর নয়। মেয়েদের পা দেখতে আর টেলিস্কোপ ব্যবহার করতে হবে না। নাচঘরের মাঝখানে কোন জায়গাতে করবো, যাতে সকলেই সহজে দেখতে পায়। প্রথমতই লোকরা যখন

আসতে থাকবে বুড়েট গিলবার্ট তাদের গান শোনাবে। গিলবার্ট-এর নাম শোনেন নি?

হেনরী মাথা নাড়লো।

আচ্ছা, শীঘ্রই শুনতে পাবেন, জিডলার বললেন। আমি তাকে প্রথম আবিষ্কার করি একটা কাফের কনসার্টে। মেয়েটির প্রতিভা আছে। নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। নিমীলিত চোখে সে যখন গান করে তখন মাথার চুল খাড়া হ'য়ে ওঠে। তারপর দর্শকদের কয়েকটা নাচ দেখানো হবে—যাতে নাকি তারা মানে, বেশী উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তৃষ্ণার্ত হ'য়ে যখন পানীয় ফরমাস করতে থাকবে তখন তাদের জন্তে আছে এইচা। আপনি বোধহয় এইচার নামও শোনেন নি?

হেনরীর প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করেই তিনি বলতে লাগলেন, সে একটা ভবঘুরে, বোকার মতো ছিল। কিন্তু এখন সে নাচতে আরম্ভ করলে সকলে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। এর পর থাকবে আরো কিছুক্ষণ নাচের ব্যবস্থা। তারপর অ্যাক্রোব্যাট দেখানো হবে। হিপোড্রোমে ওটা বেশ চলেছিল। এই দড়ির খেলা মহিলা দর্শকদের জন্তে। জানেন ত' তারা কি ধরণের। তারপর আরো কিছুক্ষণ নাচ—তারপর আরো ছু' একটা ক্রীড়াকৌতুক। আর সবশেষে ক্যানক্যান নাচ। এই নাচ দিয়ে শেষ করার চেয়ে ভালো সমাপ্তি আর নেই, এটা স্বীকার করেন ত'?

হ্যাঁ, এটা বেশ আকর্ষণীয়, স্বীকার করে হেনরী, অবশ্য পুলিসের দৃষ্টিও আজকাল আকর্ষণ করতে সুরু করেছে, একটু হেসে বললো।

জিডলার আলোচনা চেপে যাওয়ার জন্তে হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলেন; বললেন, আপাতত আমি একটা পরিকল্পনা করেছি।

আমি আপনার আত্মবিশ্বাসের তারিফ করছি, আর যথাসাধ্য সাহায্যও করব; নাচঘর কোনখানে তৈরী করবেন ঠিক করেছেন?

এই মঁমার্তেই।

কিন্তু ভেবেছেন কি, আরো অনেক এ-ধরণের নাচঘর এখানে আছে?

সেগুলো আমারটার মতো হবে না। আমি আপনাকে জোর ক'রে বলছি, যে নাচঘর তৈরী করবো, সে রকম একটা স্যানফ্রানসিস্কোর বারবারি কোষ্টেও নেই। আমার নাচঘরের পরিকল্পনাই ভিন্ন রকম, অদ্বিতীয়। বাড়িটা পর্যন্ত নতুন রকমের হবে। আকৃতি হবে উইণ্ডমিলের মতো। কারণ কি? শুধু স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্তে। ভেতরে বাইরে লাল রঙ দেওয়া হবে। কেন? না, প্যারিতে একখানাও লাল রঙের বাড়ি নেই বলে। তাছাড়া লাল রঙ রাত্তিরে খোলেও ভালো; মেয়েদের সুন্দর ক'রে তোলে আর পুরুষের বুকে জাগিয়ে দেয় বাসনার জ্বালা। আমেরিকা থেকে আনবো বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম। জ্বেলে দেওয়া হবে রক্তবর্ণ উজ্জ্বল আলো। দশমাইল দূর থেকে তা দেখা যাবে। কি, মনে মনে এই ছবি দেখতে পাচ্ছেন?

এই বলে একটু চুপ করে শূন্তে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন জিডলার। বোধহয় মনের চোখে দেখতে লাগলেন রাত্রির তামস পটভূমিকায় রক্তবর্ণ আলোকমালার ছবি। গ্লাস হাতে নিয়ে অবশিষ্ট পানীয়টুকু পান করে ফেললেন।

তারপর সামনেই যখন এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, তিনি বললেন, আর ইংরেজ ও আমেরিকার ভ্রমণকারীরা যখন প্যারিতে আসছে, এই সময়, আমায় সাত-আট মাস সময় দিন, আমি ফ্রান্সে শ্রেষ্ঠ নাচঘর তৈরী ক'রে দেবো। আর ফ্রান্সেই বা বলি কেন, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে তা। আমি এর নামকরণ পর্যন্ত করে রেখেছি। খুব লাগসই নাম। বুঝতে পারছেন কি নাম দেবো এর?

কনিয়াকের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে হেনরী জানায়, কি নাম হতে পারে আমার ঠিক কল্পনায় আসছে না।

—এর নাম দেবো মুলাঁ রুজ (Red Mill)। নামটা মনে রাখবেন। মুলাঁ রুজ! মুলাঁ রুজ!!

মুলাঁ রুজ খোলবার পর সেটা হেনরীর বাড়ির মতো হ'য়ে উঠলো। সকলের সঙ্গে পরিচিত হ'লো; যা খুশি স্বাধীন ভাবে করার কোন বাধা ছিলো না তার। সে ছিল সব নিয়মের ব্যতিক্রম। যখন খুশি সে পার্টি দিতো। ক্যানক্যান নৃত্যের মেয়েরা তার টেবিল ঘিরে বসতো। তাদের প্রণয়-কাহিনী লীলাচ্ছলে বলে যেতো তার কাছে। বার-রক্ষক সারা মদ্যপানের অনিষ্টতা সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিতো তার কাছে। এই ভাবে' ৮৯ এর আশ্চর্য বছর কেটে গেল।

তখনো ভালো ক'রে ভোর হয়নি, হেনরী বাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছিলো। ঠাণ্ডা বরফের মতো বাতাস হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছিল। ওভারকোটের ভেলভেট কলারটা গলার ওপর তুলে দিল সে। অতি কষ্টে দেহটাকে টানতে টানতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। হাওয়ার বেগে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলো বার বার। টুপিটা চেপে ধরেছিলো এক হাতে। আকাশে ফ্যাকাশে চাঁদ টুকরো টুকরো ঝোড়ো মেঘের মধ্যে ডুব সাঁতার কেটে চলছিল। পথের ধারে একটা গাড়ি খুঁজে ফিরছিল হেনরী। সর্বদা কোলাহলপূর্ণ এই লোকালয় এখন জনমানবশূন্য, নিস্তব্ধ। হঠাৎ সে মৃদু পদধ্বনি শুনতে পেলো। কে যেন পিছন দিক থেকে ছুটে আসছে। দেখুন—একটি মেয়ে পাশে এসে রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করে বললে দেখুন, দয়া ক'রে আপনি বলবেন আমি আপনার সঙ্গে আছি।

পরক্ষণেই অন্য একটা পদধ্বনি শোনা গেল। অন্ধকার থেকে একটা কঠিন হাত মেয়েটির মণিবন্ধ দৃঢ় ভাবে চেপে ধরলো। গম্ভীর কণ্ঠ স্বর শোনা গেল, তোমার কার্ড দেখাও।

মেয়েটি পা ছুঁড়ে, আঁচড়ে কামড়ে আক্রমণ করল আগন্তুককে। পুরুষটি বর্বরভাবে মেয়েটির হাত মুচড়ে ধরলো। যন্ত্রণায় চীৎকার করে মেয়েটি ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে।

হাত ছেড়ে দিন, হেনরী প্রতিবাদ করলো, দেখতে পাচ্ছেন না ওর কষ্ট হচ্ছে?

লোকটি হেনরীর দিকে ফিরে তাকালো, বললো, এ মেয়েটা এক্ষুণি একজনকে প্রলুব্ধ করছিল। এ সব ব্যবসার জন্তে কার্ড থাকা দরকার, জানেন তো? তাছাড়া আপনিই বা এ ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছেন কেন?

কি ক'রে অন্তলোককে প্রলুব্ধ করবে? সারা সন্ধ্যা ও তো আমার সঙ্গেই আছে। মিথ্যা কথা তার মুখে স্বতোৎসারিত হয়ে এলো।

সারা সন্ধ্যা সঙ্গে আছে, প্রতিধ্বনির মতো লোকটি ব'লে ওঠে, ও-কথা আমার কাছে বলবেন না। আমি ওকে নিজে লক্ষ্য করেছি।

সে থামলো, তার কণ্ঠস্বরে এবার পরিবর্তন দেখা গেল, আপনি মঁসিয়ে তুলো লোত্রেক না ?

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি এ-ভাবে মানুষকে জ্বালাতন করলে আপনার নামে পুলিশের কাছে নালিশ করব।

পুলিশের কাছে ? তা ভালো। কিন্তু আমি নিজেই যে পুলিশ।

তার প্রমাণ কি ? পুলিশের পোষাক কই আপনার ? আপনার নিদর্শন-পত্র দেখি ?

অনিচ্ছাসত্বেও লোকটি মেয়েটির হাত মুক্ত করে দিল। তারপর কোটের বোতাম খুলতে খুলতে বললো, আমার নাম সার্জেণ্ট বলথাজার প্যাতো, ভাইস স্কোয়াডের কর্ম্মচারী। আমাদের যে ধরণের কাজ, তাতে পোষাক পরতে হয় না।

সে যাকগে, আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি। আপনার সম্বন্ধে লা এলিতে অনেক কিছু শুনেছি। সকলে বলেন এ অঞ্চলে আপনিই সব চেয়ে বিবেচক কর্মচারী। আপনার মতো কর্মচারী আমাদের আরো দরকার। কিন্তু আমায় বিশ্বাস করুন, এ মেয়েটির সম্বন্ধে আপনি ভুল করেছেন। এ সত্যিই আমার সঙ্গে সারা সন্ধ্যে রয়েছে।

একে কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম।

এই অন্ধকারে সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না। এইতো এ দিকে এখনি একটি মেয়ে দৌড়ে গেলো, হেনরী আঙুল দিয়ে সামনের পথ নির্দেশ করলো। মনে হচ্ছে আপনি তাকেই খুঁজছেন।

যদি সে রু ক্রমেঁকর্টর পথ ধ'রে থাকে তাহলে তার অনুসরণ বৃথা—নিজের মনেই ছদ্মবেশী গোয়েন্দা ব'লে উঠলো। আপনাকে বিরক্ত করার জন্তে দুঃখিত মঁসিয়ে তুলো। আমাদের ওপর এই রকম ধরপাকড়ের আদেশ আছে, বুঝলেন না ? জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা আর এই সব মেয়ের ওপর চোখ রাখা আমাদের কর্তব্য।

নিশ্চয়, নিশ্চয় ! আমি খুব বুঝতে পারছি আপনার কথা। আচ্ছা, চলি মঁসিয়ে প্যাতো। মেয়েটিকে ইঙ্গিত করলো, এসো আমরা যাই, রাত্তির হ'য়ে যাচ্ছে।

চুপ ক'রে দু'জনে পথ চলতে লাগলো। পেছন দিকে সার্জেন্টের দু'টি তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টি অনুভব করতে পাচ্ছিল। যথাসম্ভব দ্রুতপদে হাটছিল হেনরী। পার্শ্বচারিণীর চঞ্চল উদ্দীপনা তার মনে খেদ মিশ্রিত একটা অনুভূতি সৃষ্টি করছিলো। কিসের জন্তে সে এই মিথ্যার জাল বুনতে গেলো ?

আপনি কি আর একটু জোরে চলতে পারেন না ? দ্বিতীয় বার পথের মধ্যে থেমে অনুযোগের কণ্ঠে জানালো সে, আপনার পায়ে কি হয়েছে ? তার কণ্ঠস্বরে সমবেদনা নেই, বিরক্তি নেই, এমন কি কৌতূহলেরও বাষ্পটুকু নেই, শুধু বিলম্ব হওয়ার দরুণ একটা নীরস উদ্বেগ।

মেয়েটির মন্তব্যে ক্রুদ্ধ হয়েছিলো হেনরী। এই কি শুধু তার কৃতজ্ঞতার ভাষা !—আমি যে ভাবে হাটছি তাতে যদি অস্বস্তি হয় এগিয়ে যাও না তুমি। পুলিস চলে গেছে। আমার সঙ্গে আর থাকবার প্রয়োজন কি ? আর কেউ অনুসরণ করবে না।

আপনি কি ঐভাবেই জন্মেছেন, না কি ? একটু পরেই সেই উদাসীন নিরপেক্ষ কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করলো সে ! আমি একজন লোককে জানতুম, তার হাত মেশিনে কাটা গেছলো। তবে তার ভাগ্য ভালো ছিল, ইনসিওর কোম্পানী থেকে প্রায় পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক পেয়েছিলো। পেছনের দিক আবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে বললো, দয়া করে তাড়াতাড়ি চলুন।

রু কলাকঁরের মোড়ে পৌঁছলে হেনরী একটা পথের ল্যাম্পের নিচে দাঁড়াল।—

ভাখো এখানে এই হোটেল আছে, একটা ময়লা বাড়ির দরজার ওপর আলোক, স্তম্ভের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল সে, সারারাত এটা খোলা থাকে, এর একটা ঘর নিয়ে থাকতে পারো আজ রাত্তিরে। কাছে টাকা আছে তো ?

এই প্রথম সে মেয়েটির মুখের দিকে তাকাবার অবসর পেলো। সুন্দরী বলা চলে। সে যতটা বয়স অনুমান করেছিল তার চেয়ে কম মনে হলো। বড় জোর আঠারো কি উনিশ। অন্ধকারে চোখ দু'টো ঘাসের মতো উজ্জ্বল সবুজ দেখাচ্ছিলো, দিনের বেলায় বোধ হয় ফিকে বাদামী রং হবে। ঠোঁট একটু বড় আর কর্কশ মনে হ'লো। টুপি কোটের বালাই ছিলো না তার। আর গাউনের তলায় নগ্ন বলেই সন্দেহ হচ্ছিলো। অন্তর্বাস বোধ হয় ছিলো না কিছু। একটুও শীতকাতর মনে হচ্ছিলো না তাকে। মোটা বহির্বাসে তার উঁচু বুকের গড়ন রেখায় রেখায় পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিলো। অনেকটা গ্রীক মূর্তির মতো। তার চেহারা দেখে অত্যন্ত রূঢ়, হীন আর সাংঘাতিক চরিত্রের মেয়ে ঠাহর হয়। তাকে দেখলেই যেন একটা উদগ্র বাসনা সাপের মতো মনের নিভৃত গহ্বরে ফণা তুলে ওঠে।

আপনি কি এখানে কাছাকাছি কোথাও থাকেন ?

হ্যাঁ, এই পথেই একটু দূরে আমার ষ্টুডিও আছে।

আপনার সঙ্গে আমায় থাকতে দিন। এই প্রথম মেয়েটির কণ্ঠস্বর নরম আর মিষ্টি মনে হলো। একটা খুশির ভাব তার মনে সঞ্চারিত হ'য়ে গেল। কোন অসুবিধে সৃষ্টি করবো না আমি, আর সকাল হ'লেই চলে যাবো।

অর্ধনিমীলিত কটাক্ষ করলো সে হেনরীর দিকে। এর জন্তে আপনার অর্থব্যয় হবে না, ভয় নেই। সিগারেট আছে আপনার কাছে ?

হেনরী তার সোনার সিগারেট কেসটা তার হাতে তুলে দিল। সে কেসটিকে পরীক্ষা ক'রে দেখলো। সস্নেহে হাত বুলিয়ে নিলো একবার। একটা সিগারেট তুলে নিয়ে হেনরীর হাতে ফেরত দিল। —খাঁটি সোনার তৈরী দেখছি। আমাকে একবার এক ভদ্রলোক এক জোড়া সোনার দুল দিয়েছিল, সেটা হারিয়ে ফেলেছি।—দেশলাই আছে ?

হেনরী একটা দেশলাই জ্বালালো। দু'হাতের চেটোয় গোল ক'রে আগুনের শিখাটিকে ঘিরে ঝুঁকে পড়ল মেয়েটি সিগারেট ধরাতে।

আপনি কি কুৎসিত ! ধূম উদ্গিরণের ফাঁকে ফাঁকে বললো মেয়েটি। হেনরীর দিকে একদৃষ্টিতে দেখছিল সে। হেনরীর মুখ থেকে রক্তাভা মিলিয়ে গেল। চীৎকার করে বললে, চলে যাও, তোমাকে আমার কোন দরকার নেই। চলে যাও আমার কাছ থেকে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দরকার আছে। দেশলাই শিখা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে

শান্ত কণ্ঠে বললো, আমাকে আপনার দরকার আছে। আপনার চোখ দেখেই তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

এবার আমাকে যেতে দাও। মেয়েটির কাছ থেকে সরে যেতে চেষ্টা করে হেনরী। আমাকে একলা যেতে দাও, নইলে পুলিসে ধরিয়ে দেবো তোমায়।

অনায়াস পদক্ষেপে সে হেনরীর পাশে এগিয়ে এলো। আপনি চটছেন কেন? আমি শুধু জিজ্ঞেস করেছি আপনার ঘরে আমাকে রাত্তিরটার জন্যে থাকতে দিতে পারেন কি না? আমি আপনার কিছুই চুরি করবো না। আপনি বিকলাঙ্গ ব'লে আমার মনে করার কিছু নেই। আমি আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করবো।

চাঁদের আলোর সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাতের মধ্যে শূন্য নিস্তব্ধ পথে হেনরী নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলো। মেয়েটিও নাক-মুখ দিয়ে ধূম উদ্গিরণ করতে করতে তার পাশে পাশে চলতে লাগলো। আপনার যখন ষ্টুডিও আছে তখন মনে হয় আপনি একজন শিল্পী। বাড়ির কাছাকাছি এসে মেয়েটি মন্তব্য করলো। আমি একজন শিল্পীকে জানতাম তিনি ঝোল রাখার ডিসের ওপর কিউপিডের ছবি এঁকেছিলেন।

তারা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। গ্যাসের আলোয় হিস্‌হিস শব্দ হচ্ছিলো। দেয়ালের গায়ে আলোছায়ার বাঘছাল পাতা যেন।

আপনি কি দরজায় তালা দেন না? হেনরীকে দরজা খুলতে দেখে সে জিজ্ঞাসা করলো।

তালা দেবো কোন দুঃখে? চুরি করবার মতো কিছু ঘরে নেই। এখানে দাঁড়াও, আলোটা জ্বালি।

পরিচিত অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আলো জ্বেলে দিল। মৃত ঘরের জীবন ফিরে এলো যেন। দেয়ালের চারিদিকে বিচিত্র রঙের ছবির সারি। ঘরের মাঝখানে একটা আলো গোলাপ ফুলের মতো দেখাচ্ছিল।

মেয়েটির দু'চোখ অলসদৃষ্টিতে চারি দিক ঘুরে এলো। ঘরটা বেশ বড় তো। একি ষ্টোভটা জ্বলছে যে! আপনি সারাক্ষণ ওটা জ্বেলে রাখেন নাকি?

সে জানালার কাছে ঘুরে এলো। তারপর নরম কোচের ওপর বসে পোষাক খুলতে সুরু করলো। ঘরে কারুর অস্তিত্বে যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। হেনরী তাকে লক্ষ্য করছিল। পোড়া দেশলাই কাঠিটা তখনও তার দু'আঙুলের মধ্যে রয়েছে।

এই মেয়েটিই বোধহয় প্রথম তার ষ্টুডিও-তে রাত্রিযাপন করবে! —বেশ সুশ্রী দেখতে মেয়েটিকে!

—অমন করে প্যাটপ্যাট করে কি দেখছেন? বিড়ালের মতো উজ্জ্বল চোখ তুলে বললো মেয়েটি।—কোনো মেয়েকে কাপড় ছাড়তে দেখেন নি এর আগে?

সিগারেটের টুকরোটা মুখ থেকে নিয়ে ঘরের মেঝেতে বিমর্দিত করলো। শিল্পী হিসাবে আপনি বেশী কথা বলতে পারেন না। হেনরী উত্তর দিতে অপারগ দেখে সে বলে যেতে লাগলো, যে শিল্পীর কথা বলছিলাম তখন, যিনি ঝোলের থালার ওপর কিউপিড এঁকেছিলেন, তিনি খুব সুন্দর কথা বলতেন। ভালো ভালো গল্প বলতে আর হাসি ঠাট্টা করতে ওস্তাদ ছিলেন।

যে অজ্ঞাত শিল্পী একদিন এই মেয়েটিকে কৌতুকে আনন্দিত করেছিল, হেনরী যেন মনে মনে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হলো। কত বার এইভাবে মেয়েটি অপরিচিত ব্যক্তির লোলুপ চোখের সামনে মোজা খুলেছে। কত বিভিন্ন ঘরেই না বিচিত্র শয্যায় এই উনিশ বছরের মেয়েটি শয়ন করেছে!

টেবিলের ওপর ল্যাম্প ঠিক ক'রে নিয়ে মাথার ওপর দিয়ে সেমিজটা খুলে ফেললো সে।—আলো কি জ্বালা থাকবে!

—না, নিবিয়ে দাও।

সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো। একটা অপূর্ব মনোহরণ ভঙ্গিমায় হাত ঘুরিয়ে আলো নিবিয়ে দিল। অদৃশ্য হ'য়ে গেল তার মূর্তি, শুধু একটা অস্পষ্ট ছায়া ঘরের নীল অন্ধকারে দেখা যেতে লাগলো।

—আপনার পা দেখতে পাবো বলে ভয় হচ্ছে?

কণ্ঠ স্বরে ঠাট্টার সুর হেনরীকে ক্রুদ্ধ করে তুলল।—বেরিয়ে যাও, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো সে, বেরিয়ে যাও তোমার কাপড়-চোপড় নিয়ে, এক্ষুণি বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। কোন দরকার নেই তোমাকে। তোমাকে আমি আসতেও বলিনি।

ওঃ! সে যদি লম্বা আর জোয়ান হতো। যদি সার্জেণ্ট প্যাভোর মতো হাতটা মুচড়ে দিতে পারতো কিংবা কষে একটা চড় মারতে পারতো গালে।

আস্তে আস্তে মেয়েটি বিছানার ওপর পাতা গায়ে দেওয়ার চাদরটি তুলে শয্যার মধ্যে প্রবেশ করলো।—অতো চীৎকার করবেন না, নরম হ'য়ে বললো সে। আপনার চীৎকারে বাড়ির আর সকলের ঘুম ভেঙে যাবে। আমি শুধু বলেছি যে, আপনি চান না আমি আপনার পায়ের দিকে তাকাই। আপনার পা নিয়ে আমার মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? আপনি বিকলাঙ্গ ব'লে আমার কিছুই আসে যায় না। আমি ত' আগেই বলেছি যদি থাকতে দেন আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব। আপনি আমাকে মনে হয় থাকতে দিতেই চান, তাই না?

যখন মেরী সার্লেট ঘুম থেকে উঠলো, তখন তুলো লোত্রেক ইজেলের সামনে ছবি আঁকার কাজে ব্যস্ত। সুপ্রভাত, সে বলে উঠল, রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়েছিলো তো?

মেরী উঠে পড়লো। দু' হাত দিয়ে হাঁটু ঘিরে বসলো। মাথা নেড়ে মুখের ওপর পড়া একগোছা সোনালি চুল মাথার পেছনে সরিয়ে দিয়ে বললো, সিগরেট আছে?

আবার বিরক্ত হলো হেনরী। একটু ভদ্র হ'তে পারে না কেন মেয়েটা? যাক্ ও তো এক্ষুণি চলে যাচ্ছে।—আরাম-কেদারার কাছে টলতে টলতে সরে এলো সে। ইচ্ছাকৃত বিলম্বের সঙ্গে সিগারেটের সোনার বাক্সটা বাড়িয়ে দিলো তার দিকে।—এবার উঠে পড়ো। দুপুর হ'য়ে গেছে। আমার এখনও অনেক কাজ বাকি।

—দেশলাই আছে?

ধূমপান করতে করতে সে বললো, আপনি এই সব ছবি এঁকেছেন? তার দু' চোখ দেয়ালে-টাঙানো ছবির ওপর ঘুরতে লাগলো। এ সব এঁকে কি করেন? বিক্রী করেন?

ছড়ির অগ্রভাগ দিয়ে মাটি থেকে মেয়েটির অন্তর্বাস তুলে তার দিকে ছুঁড়ে দিলো হেনরী। এটা পরে উঠে পড়ো। আমায় এখন কাজ করতে হবে।

সে বিছানা ছেড়ে উঠলো না। ধূমপান করতে লাগলো।

দিনের ধূসর আলো তার মুখে এসে পড়েছে। তার চোখ ছ'টি বেশ গাঢ় বাদামী রঙের। যে ভঙ্গিতে সে বসেছিল, সেই ভাবে একটা ছবি আঁকতে ইচ্ছা করছিলো হেনরীর। ভাবলো, বলে ঐভাবে বসে থাকতে খানিকক্ষণ। কিন্তু ইচ্ছা সংবরণ ক'রে নিলো।

—ওখানে ও-ঘরটা কি? সিঁড়ির ওপাশে ব্যালকনির দিকে লক্ষ্য রেখে জিজ্ঞাসা করলো মেরী।

—স্নানের ঘর।

—স্নানের ঘর!

চকিত আনন্দে শয্যাত্যাগ করে উঠে পড়লো মেরী বাথটব দেখে। হেনরী শুনতে পেলো, মেয়েটির আনন্দের অস্ফুট উচ্ছ্বাস। রেলিং-এর দিকে ছুটে গিয়ে ঝুঁকে পড়লো সে।

—দয়া ক'রে আমায় একটু স্নান করতে দিন। তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে ছোট ছেলের পুতুল চাওয়ার মতো আগ্রহ। আমি বাথটব ভালো ক'রে পরিষ্কার করে দেবো, কথা দিচ্ছি।

—বেশ, কিন্তু দেরী করো না। হেনরী অনুমতি দিলো। আমার এখনও অনেক কাজ বাকি।

বাথটবের জলের উষ্ণতায় নিবিড় বিলাসে স্নান করতে লাগলো সে। আপনি যদি চান, খোসামুদির সুরে বললো, আমি আজ রাত্তিরেও আবার আসতে পারি। ভালো হ'য়েই থাকবো আপনার সঙ্গে।

প্রলোভন—চতুর ইঙ্গিত, অভ্রান্ত। গলা শুকিয়ে আসছে, হাড় হিম হ'য়ে যাচ্ছে যেন। ওকে বলো না, বারণ করো আসতে, তার মনের মধ্যে কে যেন বলতে লাগলো, ও শুধু তোমার ষ্টুডিওতে থাকতে চায়, বাথরুম ব্যবহার করতে চায় আর চায় টাকা—তার মধ্যে আরেকটা কণ্ঠ, তার বিদ্রোহী আত্মার কণ্ঠ বলতে লাগলো, আর একটা রাত্রি—শুধু একটা রাত্রি—

তার হৃৎস্পন্দনের দ্রুততালের সঙ্গে সে ছ'টি পরস্পর-বিরোধী কণ্ঠস্বর মনের মধ্যে শুনতে পাচ্ছিলো। চশমা খুলে মুছতে মুছতে সে জানালো, নিজেকে মানিয়ে নাও এখানে। কাঁধ তুলে যে ইঙ্গিত করলো সে, সেটা স্পষ্ট। বললো, আমার কোন আপত্তি নেই।

একটি উজ্জ্বল দ্যুতি মেয়েটির চোখে খেলে গেলো। তুমি তোমার নাম পর্যন্ত এখনো বলোনি আমায়। আমার নাম মেরী। তোমার?

হেনরী।

বাঃ, বেশ সুন্দর নাম তো।

জলে-ধোওয়া ঝকঝকে শাদা হাতটা বাড়িয়ে সে অনুরোধ করল, হেনরী, তোয়ালেটা দেবে আমায়?

হেনরীর স্নানের ঘর মেয়েটির শ্রীহীন চটকদার জিনিসে ছেয়ে গেল। তার চিরুণী, কাঁটা ইত্যাদির সঙ্গে হেনরীর প্রসাধন সামগ্রী গিয়ে উঠলো সেখানে। সে হেনরীর ব্রাস, নরুণ, দামী সাবান ব্যবহার করতে লাগলো। হেনরী লিপষ্টিক মাখা তোয়ালে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হলো। যখন তখন দেখতে পেতো মেঝের ওপর বিস্রস্ত মোজা, কোচের ওপর অন্তর্বাস প'ড়ে আছে। পাউডারের গন্ধ নাকে এসে লাগতো।

এ সব তার ভালোই লাগতো। এই প্রথম সে মেয়েদের গোপন জীবনের সঙ্গে পরিচিত হলো। প্রকৃত পক্ষে প্রসাধনের সময় দেখতে পেলেই মেয়েদের সব থেকে ভালো ক'রে জানা যায়।

এই প্রথম সে একজন গৃহকর্ত্রী পেয়েছে। না—ঠিক তা নয়—

আমাকে আবার আসতে বললে, এবার কিন্তু টাকা দিতে হবে, মেয়েটি সকালবেলায় স্পষ্ট জানিয়েছিল।

সে মেরীকে সাধারণ রূপবিলাসিনীদের মতো গ্রহণ করেনি। তার প্রেম যে টাকা দিয়ে কিনতে হবে ভাবেনি। ওর দেহই রূপ ব্যবসার একমাত্র মূলধন। ওর দেহ অর্থমূল্যেই ক্রয় করতে হবে, মুক্ত আনন্দে উপভোগ করার জন্যে ও নয়।

—যদি সারা রাত আমার থাকতে হয়, সে হেনরীর চোখে যেন উত্তরটা দেখতে পাচ্ছিলো আর মনে মনে একটা অলক্ষ্য মূল্যলিপির ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলো, তাহলে দশ ফ্রাঙ্ক দিলেই হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই হেনরী হতাশ হলো, সে চেয়েছিল মেরীকে কাফেতে নিয়ে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। তাদের ঈর্ষান্বিত প্রশংসা উপভোগ করে। তার এই কল্পনা ভেঙে দিলো মেরী। তোমার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করতে চাইনা আমি। শিল্পের সম্বন্ধে তোমাদের কথার কচকচি শুনে আমার লাভ কি? ও সব আমি একটুও বুঝি না।

হেনরীর সঙ্গে একত্রে মুলাঁ রুজেও সে যেতে চায় না। ভৃত্যরা পর্যন্ত যেখানে তোমার দিকে উপহাসের চোখে চায়, সেখানে

হেনরী বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়লো। মুলাঁ রুজে সন্ধ্যাযাপন একরকম বন্ধ হলো। ছবি আঁকার কাজ থেমে গেলো। পের কোটেলের কাছে যাওয়া বন্ধ করলো, সারাকে যে ছবি এঁকে দেবে বলেছিলো, শেষ করলো না সেটা। জিডলারকে মুলাঁ রুজের জন্যে যে বিজ্ঞাপনের ছবি এঁকে দেবে বলেছিলো তাও ভুলে গেলো। একটা অদৃশ্য হাতের গূঢ় সঙ্কেতে তার জীবনের ধারাই যেন পাল্টে গেলো। তাদের অবৈধ প্রণয়লীলা গোপনতার অন্ধকারে চলতে লাগলো। তাদের গুপ্তকাহিনীর দৃশ্যে কোন তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নেই। অন্তর্মুখী কোন চিন্তা ছিলো না তাদের। বিলাসী বেশভূষা করতো অলস ভাবে। কোন অপরিচ্ছন্ন স্থানে সেরে নিতো দিনের আহার। করমেন বারেই কেটে যেতো দিনের বেশীর ভাগ সময়। ধূমপান করে, মদ খেয়ে, পাশাপাশি চেয়ারে চুপচাপ বসে তারা রাত্রির জন্যে অপেক্ষা করতো। তারপর রাত্রির অন্ধকারে ফিরে আসতো ষ্টুডিওতে।

এই নতুন জীবনের প্রথম সপ্তাহে একশ'বার সে ভেবেছে কি করে সে সহ্য করছে এই মেয়েটাকে, কি ক'রে এর প্রভাবে এ ধরণের জীবনযাপন করছে। কি হলো আমার? সহস্রবার ক্রুদ্ধ ভাবে আত্মপ্রশ্ন করেছে সে। কিন্তু পরিবর্তন তার পক্ষে ছিল আরো অসম্ভব। মেরীকে অতি আপনার মনে হতো। তার একহারা দীর্ঘ-দেহের প্রতিটি কণার ওপর তারই একান্ত অধিকার। প্রতি রাত্রেই সে মেরীর নগ্ননির্জন হাতের স্পর্শে নতুন ক'রে রোমাঞ্চিত হতো।—কখনো রু মোকেটারে গেছে? একদিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো মেরী। ঐখানে আমি জন্মেছি।

তার কথা শুনে হেনরীর মনে জেগে উঠলো একটা পূতিগন্ধময় বস্তির পরিবেশ আর সেখানকার মূর্ত্ত দারিদ্র্যের বিবর্ণ অস্তিত্ব।

মেরী তার ছোটবেলার খেলার কথা বলতে লাগলো। ঠাণ্ডা ক্ষুধার্ত্ত শনিবারের রাতে যখন তার মা-বাবা অতিরিক্ত মদ্যপানে আহারপর্বের কথা বিস্মৃত হতো, তার মায়ের হাতের প্রহার, পিতার কাছে শাস্তি আর পরক্ষণেই আদরের কত কথা সে স্মরণ ক'রে বললো।

—প্রথমে দোষ করলে বাবা আমাকে উত্তম মধ্যম দিতেন। তার পর বিছানায় মুখ গুঁজে যখন কাঁদতুম তখন চুমু খেয়ে আদর করতেন, ক্ষমা করতে বলতেন।

স্মৃতিকথা বলতে বলতে মাঝপথে থেমে যেতো সে। ধনীর প্রতি দরিদ্রের যে বিদ্বেষ, সেইরকম ঈর্ষার বক্রদৃষ্টিতে তাকাতো হেনরীর দিকে।—তোমাকে এ সব কাহিনী কেন বলছি জানি না। তুমি ক্ষুধা কি, কখনো তা অনুভব করোনি, তুমি আমার কথা বুঝবে না—

হেনরীও এ বিষয়ে নিজে থেকে কোন কথা উত্থাপন করতো না। এক ঘণ্টা বা এক সপ্তাহের মধ্যেই মেরী আবার তাকে বিশ্বাস করতো। যৌবন উন্মেষের সময় আশে-পাশের তরুণদের সঙ্গে তার উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাত্রার কাহিনী নির্লজ্জ কুণ্ঠাহীন ভাবে বর্ণনা করতো সে।

—একদিন বেসর্ট-এর সঙ্গে দেখা হলো। একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি তার ছ'চোখে ঘনিয়ে এলো। তাকে দেখতে যথার্থ সুন্দর ছিলো। মেয়েরা তো তার কথায় পাগল বললেই হয়। স্বতোৎসারিত একটা মিথ্যা যোগ করেছিল সে।—আমি কিন্তু তার দিকে একবারও ফিরেও তাকাতুম না। তার পর একটা মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে গ্রাম ছাড়তে হলো আমায়। তখন থেকে ভবঘুরের জীবন। যেখানে সেখানে খাওয়া, পথের বেঞ্চির ওপর শোয়া, পুলিশ-কে ফাঁকি দেওয়া আর বিচিত্র লোকের শয্যাসঙ্গিনী হওয়া। তার পর এই মঁমার্তে এলুম, তুমি না বাঁচালে সেদিন পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলুম আর কি, সেদিন তুমি ওকে খুব উজবুক বানিয়েছিলে!

এই প্রথম তার কণ্ঠস্বরে কৃতজ্ঞতার সুর ফুটে উঠলো। সে হেনরীর দিকে কৌতুক আর বেদনা-মিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখছিলো। —তুমি কুৎসিত আর বিকলাঙ্গ হলেও খুব ভালো।

বসন্তকাল সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে মেরীর মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা গেলো। বন্যজন্তু, যারা শীতের আশ্রয় ছেড়ে শীকারের সন্ধানে বেরিয়ে আসে, তাদের মতোই চঞ্চল হ'য়ে উঠলো সে।

মেরী বোধহয় বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে। শঙ্কিত কল্পনা করে হেনরী। সাধ্যমতো তাকে খুশী করতে চেষ্টা করতে লাগলো। তার জন্যে লাল ফিতে-বাঁধা বাক্সে একটা বোনেট কিনে আনলো। আনলো মূল্যবান পরিচ্ছদ। সে উদাসীন ভাবে বাক্সের ডালা খুলে টুপিটা পর্যবেক্ষণ করলো, তার পর সরিয়ে রাখলো পাশে। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ—কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ও শ্যামাপ্রসাদ দে।

কবির প্রথম প্রকাশিত ইংরেজী রচনা

বাল্যকালে ও যৌবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখাপড়া শিখিতেছিলেন, তখন প্রথমে বাংলা এবং পরে ইংরেজী রচনার অভ্যাসও অবশ্য করিয়াছিলেন। এ লেখাগুলি গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের রচনা নহে। তাঁহার কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের অনেক বাংলা রচনা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎসমুদয়ের মধ্যে কোন কোনটির পুনর্মুদ্রণ ও স্থায়িত্ব তিনি চান না। তাঁহার ইংরেজী যে-সকল রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্তই প্রৌঢ় বয়সের। সেগুলির মধ্যে তিনি কোন্ কোন্‌টি সর্ব্বাগ্রে লিখিয়াছিলেন, কোন্‌গুলিই বা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, তাঁহার ইংরেজী গীতাঞ্জলি তাঁহার প্রথম প্রকাশিত ইংরেজী রচনা নহে। আমরা যতদূর জানি, তাঁহার কবিতার স্বকৃত প্রথম ইংরেজী অনুবাদ মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম যেগুলি ছাপা হইয়াছিল, তৎসমুদয় কোন্ বৎসরের কোন্ মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে ছাপা হইয়াছিল, নীচে তাহার তালিকা দিতেছি।

The Far Off ("সুদূর")—February, 1912.

ইহার হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

Sparks from the Anvil ("কণিকা" হইতে)—April, 1912.

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

The Infinite Love ("অনন্ত প্রেম")—September, 1912.

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

The Small—September, 1912.

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

Youth—September, 1912.

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

Inutile—November, 1912.

Poems ("কণিকা" হইতে)—November, 1913.

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

এই শেষোক্ত কবিতাগুলি ১৯১২ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত ছোট কবিতাগুলির সহিত একই সময়ে অনুবাদিত এবং একখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজেই লিখিত।

১৯১১ সালের শেষে কিংবা ১৯১২-র গোড়ায় আমি কবিকে তাঁহার বাংলা কবিতা অনুবাদ করিতে অনুরোধ করি। তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং ছাত্রাবস্থার পর হইতে যে ইংরেজী রচনার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, পরিহাসচ্ছলে তাহাই জানাইবার জন্য আমাকে লেখেন :—

"বিদায় দিয়েছি যারে নয়ন-জলে
এখন ফিরাব তারে কিসের ছলে?"

কিন্তু তাঁহার প্রতিভার প্রেরণা তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিল না। তিনি "কণিকা" হইতে কতকগুলি ছোট কবিতা অনুবাদ করিয়া তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর পৈত্রিক ভবনের দু'তলার বৈঠকখানার একটি কামরায় আমাকে সেগুলি দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে এই মর্ম্মের কথা বলিলেন, "দেখুন তো মশায়, এগুলো চলে কি না—আপনি তো অনেক দিন ইস্কুলমাষ্টারী করেছেন?" এইরূপ পরিহাস উপভোগ আমার মত অন্য কোন কোন ইস্কুলমাষ্টারের ভাগ্যেও ঘটিয়াছে। এই অনুবাদগুলিই মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর তাঁহার আরও অনেক ইংরেজী কবিতা ও গদ্য রচনা মডার্ণ রিভিয়ু কাগজে ছাপা হইয়াছে। সেগুলি ইংরেজী গীতাঞ্জলির পরের রচনা বলিয়া তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিলাম না।

অঘোর প্রকাশ

(স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী)

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাজগৃহে তীর্থযাত্রা

১৮৮১ সালের ১১ই মাঘের উৎসব আসিল। শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল বসু মহাশয় উপাসনা করিলেন। তার পর দিন নারীসমাজ হইয়া গেল। উৎসবের অনুষ্ঠান আর কিছু ছিল না, তাই তীর্থযাত্রার পরামর্শ হইল। রাজগৃহে তীর্থযাত্রা করা হইবে স্থির হইল। রাজগৃহ কোথায়, তাহা আর কেহ জানিতেন না; আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম। আমি বলিলাম, রাজগৃহে ২২টি কুণ্ড আছে; প্রায় সকল গুলিতেই গরম জল থাকে। স্নান করিতে বড় আরাম। ধ্যান ধারণার পক্ষেও অতি মনোহর স্থান। বর্ণনা করিবামাত্র সকলেই এ তীর্থে যাইতে স্বীকার করিলেন। কাজেই আমাকে পথপ্রদর্শক হইতে হইল।

পথপ্রদর্শক বলিয়া আমাকে তুমি আদর করিয়া "পাণ্ডা ঠাকুর" নাম দিয়াছিলে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরাও "পাণ্ডা ঠাকুর" বলিতেন। তোমার বলাই মিষ্ট লাগিত; কারণ তুমি আমার যাত্রী ছিলে। আর কেহ যাউক আর না-ই যাউক, আমার "ঘোরী" যাত্রী সাজিয়া বসিয়া আছেন; তিনি প্রস্তুত। যাত্রাকালে প্রায়ই নারীরা পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন, শেষ মুহূর্ত্তে একটা না একটা কিছু পড়িয়া থাকে, তাহা লইতে বিলম্ব হয়, আর পুরুষদের কাছে কথা শুনিতে হয়। তুমি কিন্তু সকলের পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইতে। গাড়ীতে বসিয়া কতদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, "কেমন, বিলম্ব হয় নাই তো?" "না, হয় নাই," এ কথা শুনিলেই মুখে হাসি ধরিত না।

বখতিয়ারপুর ষ্টেশন হইতে কতক মেলকার্ট কতক ডুলী, কতক একা আদি যানে বিহার পৌঁছান গেল। সেখানে এক রাত্রি বাস; তৎপর দিবস শকটারোহণে এবং পালকীতে রাজগৃহ যাত্রা হইল। যাহারা কখনও গরুর গাড়িতে চড়ে নাই, তাহাদের পক্ষে প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট হইতে লাগিল। উপাসনা আহারাদির পর যাত্রা হইল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাজগৃহ গ্রামে উপনীত হওয়া গেল। সেই স্থান হইতে আমাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান প্রায় এক মাইল; প্রস্তরময় ভূমি, অন্ধকার রজনী। ভক্তেরা নীরবে শাক্যভাবে পূর্ণ হইয়া চলিলেন। তোমরাও কিছু পরে যোগ দিলে। মকদুম-কুণ্ডে বাসস্থান স্থির ছিল; সে কুণ্ডে পদ ধৌত করিয়া সকলের শ্রান্তি একেবারে দূর হইল। তোমার মনে আছে, রাত্রে শয়নের সময় কিরূপ লাগিতেছিল। ভূমি শয্যা, কেবল মাত্র খড়ের উপর শয়ন, কিন্তু সকলেই সুখে নিদ্রা গেলেন। প্রাতে শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই পাহাড়ের মধ্যস্থল হইতে সুললিত ব্রহ্ম সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি যে মেয়েরা পাহাড়ে, তুমিও তাহাদের মধ্যে একজনা। এমন সুদৃশ্য আর দেখি নাই। সকলেই প্রফুল্ল, সকলেরই হাস্যমুখ, কেহ যেন আর পাহাড় হইতে নিম্ন ভূমিতে আসিতে চাহে না। বেলা হইল, স্নান করিতে গিয়া মকদুম [illegible] ছাড়িতে চাহে না। ইত্যবসরে শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু মহাশয় মস্তক মুণ্ডন করিলেন, বেশ শ্রী হইল। তৎপরে যেখানে মকদুম সাহেব প্রার্থনা করিতেন, উচ্চ পাহাড়ের বক্ষে, সেই নিভৃত স্থানে বসিয়া উপাসনা হইল। সকলের মন মুগ্ধ হইল। বোধ হয় আট জন প্রার্থনা করিলেন। তোমার প্রার্থনাও অতি সুন্দর হইল। শ্রদ্ধেয় মহাশয় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় প্রবাসগৃহে সামাজিক উপাসনা হইল। চব্বিশ ঘণ্টা যেন সকলেই প্রমত্ত। মেয়েদের কিছুই করিতে হইত না। পানটি পর্য্যন্ত প্রস্তুত করার ভার অন্যের উপর দিয়া রাখিয়াছিলাম। সোমবার ২৮শে জানুয়ারী শ্রদ্ধেয় অপূর্ব্ব বাবু মহাশয় সকলের পদধূলি লইলেন। সেই উচ্চভূমিতে দুই ঘণ্টা ধরিয়া উপাসনা হইল। তার পর শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু উপাসকদিগের পদচুম্বন করিতে চাহিলেন, কেহ পদস্পর্শও করিতে দেন নাই। ২৯শে জানুয়ারী শ্রদ্ধেয় অপূর্ব্ব বাবু ও তাঁহার স্ত্রী এবং ভাই ষষ্ঠীদাস মস্তক মুণ্ডন করিলেন। এ দিনও ভাল উপাসনা হইল। ৩০শে জানুয়ারী ব্রহ্মকুণ্ডে উপাসনা হইল।

রাজগৃহ হইতে ফিরিয়া শ্রদ্ধেয় মহাশয় বলিলেন তিনি গয়া গমন করিয়া শাক্যতীর্থের শেষাংশ পূর্ণ করিবেন। আমার জেলা ছাড়িয়া যাইবার যো নাই, তাই যাইতে পারিলাম না। তুমি একাই গেলে; কিন্তু একা গিয়া তোমার মন খোলে নাই। তখনও আত্মার যোগ বুঝিতে ক্ষমতা হয় নাই। শরীর কিম্বা শরীরী আত্মার সঙ্গে যোগ ভিন্ন আর উপায় ছিল না। সুতরাং ঐ দশা হইয়াছিল।

৬ই আগষ্ট আমরা "পুনপুন্" নামক স্থানে গমন করিলাম। এখানে আসিয়া দেখিলাম, জীবনে এখনও কাম ক্রোধ অভিমান এ তিনটি রিপুই প্রবল রহিয়াছে। সেই দিন বুঝিলাম, ব্রত পালন করিলে কি হইবে, যখন প্রলোভন আসে, তখন বলিতেই হয়, "সঙ্গ ছাড়ে না এখনও রিপুগণে।" আমিও বুঝিলাম, তুমিও বুঝিলে। ৮ই আগষ্ট অতি প্রত্যুষে দুজনে স্রোতস্বতী পুনপুন্ নদীতে স্নান করিলাম, ও শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া পুনপুন্ নদীকে সাক্ষী করিয়া দুজনা হাতে হাত রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে; একত্রে এ তিনটি শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিব। শত্রুরা তো একেবারে তিনটি আসে না, এক এক করিয়া আসে। আমরা দুজনে সমবেতরূপে চেষ্টা করিলে, একে একে সকল কয়টি পরাজয় মানিবে।

ইহার পরে মসৌঢ়ি নামক স্থানে "হাজারী" আম্রবনে কিছুদিন বাস করিয়াছিলাম। টিকারী রাজের এক সহস্র আম্রবৃক্ষ ঐখানে আছে বলিয়া এ নাম হইয়াছে। এখানকার একদিনের দৈনিকে লেখা আছে, "প্রাতঃকালে স্ত্রীর সহিত কথোপকথনে মনের শান্তিলাভ ও উদ্বোধন হইল। এখানে সর্ব্বদাই উদ্বোধন হয়। স্ত্রীর মন ভাল হইল, শরীরও ভাল হইবে। ব্রহ্মাগ্নি নির্ব্বাণ যাহাতে হয়, তাহা হইতে দূরে থাকিতে হইবে।" সমস্ত দিন তোমারও অনেক কাজ, আমাকেও ব্যস্ত থাকিতে হইত। শেষ রাত্রিটুকু যেন তোমার কেনা ছিল। রাত্রি তিনটার সময় ঘুম ভাঙ্গিত। তারপর কখনও বা উপাসনা, কখনও নাম গান, কখনও বা সদালাপ,

এইরূপে কাটিয়া যাইত। নির্জ্জন কানন পাইলে এগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত। রাত্রির প্রথম ভাগে তুমি নিকটে আসিতে চাহিতে না, পাছে কোনপ্রকার চিত্তবিক্ষেপ হয়। শেষ রাত্রিতে তুমিও প্রস্তুত, আমিও প্রস্তুত, ভগবানও সহায় হইতেন। লোকে বলে, আমাদের প্রসঙ্গ কখন হইত? কেহ তো জানিত না। সাধ করে, সকল স্বামি স্ত্রী এইরূপে সৎপ্রসঙ্গ করিয়া সুখী হইতে শিক্ষা করেন। আর একদিনকার দৈনিকে লেখা আছে, "স্ত্রীর শরীর ও মন ভাল। প্রথম রিপু বশের পথে আসিয়াছে; এখন ক্রোধ বশীভূত করা চাই। নইলে চলিবে না।" আর একদিন লেখা আছে, "পাপের শেষ রাখিতে নাই; ক্রোধের শেষ এখনও আছে, তাহা নষ্ট হওয়া চাই; আমার ক্রোধ একেবারে জয় হইলে স্ত্রীর ক্রোধও চলিয়া যাইবে। এবার তাই করিতে দাও।" যাঁহারা তোমাকে ভাল করিয়া জানিতেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও হয়তো মনে আছে, যে তোমার কিরূপ ক্রোধের উদয় হইত। শেষকাল পর্য্যন্ত ক্রোধ ছিল; কিন্তু আমার মত তোমার পূর্ব্বজীবন যে জানে, সে বুঝিতে পারিবে যে, যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা তুলনায় অতি সামান্য; ছিল না বলিলেই হয়। পূর্ব্বে ক্রোধভরে কথা বন্ধ হইয়া যাইত; তো তো করিয়া অল্পমাত্র কথা বলিতে পারিতে। শেষ জীবনে কেহ কখনও এ ভাব দেখে নাই। ইদানীং যে অল্পমাত্রায় ক্রোধ হইত, তাহা প্রায়ই অন্যায়ের বিরুদ্ধে হইত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সিমলা শৈল

১৮৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভাই পরেশনাথের সঙ্গে তুমি ও আমি সিমলাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে আগ্রায় তাজমহল দর্শন করিলাম ও যমুনাতে স্নান করিলাম। অম্বালা হইতে দুখানি এক্কা করিয়া যাত্রা করিলাম। একখানিতে ভাই পরেশ ও আর একখানিতে আমরা দুজন। আমাদের এক্কা-চালক গিয়া পরেশের এক্কাতে উঠিল। পথে যাইতে যাইতে তোমার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সারথির কার্য্য করিতেন ও অর্জ্জুনের সঙ্গে সদালাপ করিতেন। যখন কালকার কাছে আসিলাম, তখন পরেশের ঘোড়া ক্লান্ত হইয়া কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের এক্কাখানি তখন উচ্চে উঠিতেছিল। এমন সময়ে একটি বৃহৎ চামড়া-বোঝাই গর্দ্দভ রাস্তার এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে যাইতেছিল। গর্দ্দভের আকার দেখিতে ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন একটা বৃহৎ বাঘ যাইতেছে। যেমন দেখা, অমনি আমাদের এক্কার ঘোড়া ভয় পাইয়া দ্রুতবেগে পশ্চাৎ ফিরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল। দুই দিকে গভীর খদ, সম্মুখে নিম্নভূমি, অশ্বের অদম্য গতি সামলায় কে? আমার সমুদায় শক্তি প্রয়োগ করিয়া রাশ টানিয়া রাখিয়াও অশ্বের গতি রোধ করিতে পারিলাম না। রজ্জুহস্তে এক্কার উপর শুইয়া পড়িলাম, তবু অশ্ব অদম্য বেগে চলিতে লাগিল। তুমি তখন ভয় না পাইয়া আমার সাহায্য করিতে লাগিলে, তুমিও রাশ টানিতে লাগিলে; অশ্বের গতি দমন হয় না। এই ভাবে কয়েক মিনিট চলিল। আমরা মুখে "মা! মা!" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। মনে হইতেছিল, মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। এমন সময় এক্কাওয়ালা আমাদিগের সাহায্য করিতে আসিল। অশ্বের গতি রোধ হইল, আবার আস্তে আস্তে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম।

তারপর দিন অতি প্রত্যুষে টোঙ্গা গাড়ী আমাদের বাসস্থানে আসিল। পরেশ সম্মুখে, তুমি ও আমি পশ্চাতে বসিলাম। এইরূপে সিমলা শিখরে আরোহণ করিতে লাগিলাম। গাড়ীতেই উপাসনা হইল। গাড়ী নাচিতে নাচিতে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, মনে হইল যেন স্বয়ং শৈলেশ্বরী আমাদিগকে কোলে করিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে নিজ ভবনে চলিয়াছেন। খুব ভাল উপাসনা হইল। বেলা ৫ টার সময় শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলাম।

সিমলা পাহাড়ে যে কয়দিন ছিলাম, অতি আনন্দে কাটিল। স্বভাবের শোভা দেখিয়া মন প্রশস্ত হইতে লাগিল। কিন্তু শরীর কাহারও ভাল ছিল না। সেখানে থাকিয়া শরীরে উপকার পাইতে হইলে অনেক বন্দোবস্ত করিতে হয় ও খরচ করিতে হয়।

বেড়াইতে যাইবার জন্য একদিন রিক্‌শা গাড়ী আনিবার কথা হইল, তুমি তাহাতে সম্মত হইলে না। প্রকৃতি দেবীর এমন সুন্দর শোভাময় প্রকাশের মধ্যে আসিয়াও নিশ্চেষ্ট ভাবে গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া বেড়াইতে যাইবে, এ তোমার পছন্দ হইল না। তাই আর সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে ও আমাকে স্বতন্ত্র ভাবে বেড়াইতে যাইতে হইত। আমরা দুজনে নূতন এক প্রকার বেশ প্রস্তুত করিলাম। দীর্ঘাকার গেরুয়া অঙ্গরাখা, মস্তকে হিন্দুস্থানী পাগড়ি, হস্তে লম্বা পাহাড়িয়া লাঠি। আমাদিগকে দেখিয়া বঙ্গবাসী কি বঙ্গবাসিনী বলিয়া মনে হইত না। অল্পদূর গমন করিয়া সিমলার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ "জেকোর পাহাড়" সম্মুখে দেখা গেল। ভাল পথে উঠিতে হইলে অনেক ঘুরিতে হয়, আর সোজা পথ বন্ধুর প্রস্তরময়, কণ্টকময়। কোন্ পথে যাইবে জিজ্ঞাসা করায় বলিলে, "সোজা পথেই চল।" যেমন বলা, অমনি অগ্রসর হওয়া। এই ব্যাপারে বুঝিলাম, পুরুষ হইলেই হয় না, উৎসাহ উদ্যমই সর্ব্বে সর্ব্বা। অল্পক্ষণ পরে জেকোর সর্ব্বোচ্চ প্রদেশে উপস্থিত হইলাম। অনন্ত হিমানী দেখিয়া দুজন পাহাড়ের একপার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। "কি রূপ দেখালি" এই গানটি দুই জনে গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, মহাযোগ কি! কিন্তু এ আনন্দ অনেকক্ষণ ভোগ হইল না। একজন সন্ন্যাসী আমাদের নিকটে আসিয়া হুকার শব্দ করিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। চক্ষু মুদিত রাখিলে কি হইবে? অবশেষে উঠিয়া পলায়ন করিতে হইল। বাবাজী কিন্তু "দর্শন পর্শন" ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। "ধার দীগর হোগা. মহারাজ" (অন্য সময়ে হইবে) এই কথা বলিয়াই প্রস্থান করিলাম। অবতরণ সহজেই হইল। সেইদিনকার দৈনিকে লেখা আছে, "অদ্য পাহাড় দর্শন। পার্ব্বতীর দর্শন এই পাহাড় হইতে সহজেই হয়। অনন্ত হিমানী দেখিয়া যোরীর খুব আনন্দ, আমারও খুব সুখ।" একাকী দর্শনে এরূপ সুখ হইত না।

একরাত্রি আমরা সিমলা সমাজের নিকটবর্ত্তী কুটীরে বাস করিয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে শীতবস্ত্র কম ছিল, তাই কষ্ট হইবে বলিয়া বন্ধুগণ আপত্তি করিতে লাগিলেন। সত্যই এই কুটীরে শীতের প্রখরতা এত অধিক যে, আমাদের "খাটিয়া" ত্যাগ করিয়া

ভূমিতে শয্যা করিতে হইল। চিমনিতে কয়লা যোগাইতে হইল। কিন্তু রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালের আনন্দ আর ভুলিতে পারিব না। যোগের স্থান বটে। সকল বস্তুই যেন যোগের সাক্ষ্য দিতে লাগিল।

এবার ফিরিয়া যে গৃহে আসিলে, আর গৃহিণী হইবার জন্য নয়। এবার গৃহের দাসী হইলে। গৃহকে কুটীর করিলে। শ্রদ্ধেয় হরিসুন্দর বসু মহাশয় আমাদের গৃহকে "অঘোর-প্রকাশ আশ্রম" নাম দিলেন। হিমালয় বাসের ফলে বর্ষশেষের পূর্ব্বে ৪।৫ দিন কিছুক্ষণ ধরিয়া মৌনী হইয়া থাকিতে লাগিলাম। স্নানের পূর্ব্বে উপাসনা পর্য্যন্ত নির্ব্বাক হইতে শিখিলাম। বুঝিলাম, বহু ভাষায় প্রেম ঘন হইতে পারে না। সকল দিন যে সজন উপাসনা সরস হয় না কেন, নীরব চিন্তা দ্বারা তাহাও বুঝিতে পারিলাম। উপাসনার সংখ্যা বাড়িয়া গেল। সকলের সঙ্গে যে পারিবারিক উপাসনা হইত, তাহা ছাড়া আবার স্নানের পর ভগবানের নিকট যাইতে আরম্ভ করিলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রাজগৃহে দ্বিতীয়বার

১৮৯০ সালের মাঘোৎসব উপস্থিত হইল। এবার একটু কষ্টের ব্যাপার হইল। কেহই কাহারও সহিত মিলিত হইতে চাহিতেছিলেন না। এ অবস্থায় দু'বেলাই আমাকে উপাসনা করিতে হইল। শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয়েরা কেহই বাঁকিপুরে ছিলেন না। এরূপ নিরুৎসাহকর অবস্থার মধ্যেও তোমার উৎসাহ খর্ব্ব হইল না। তুমি রাজগৃহ যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলে। তুমি বলিতে, যদি কেহ না যায়, অঘোর-প্রকাশ যাইবেই যাইবে। তোমার প্রতিজ্ঞা বজায় রহিল; তোমার উৎসাহে আরও কয়েকটি নারী যাইতে প্রস্তুত হইলেন। এবারকার রাজগৃহ-উৎসবের বিবরণ প্রধানতঃ ভাই ষষ্ঠীদাসের দৈনিক হইতে তুলিয়া দিতেছি।

"আমরা স্নান, উপাসনা ও আহারাদি করিয়া রাজগৃহাভিমুখে তাড়াতাড়ি যাত্রা করিলাম। গরুর গাড়ীতে যাত্রা। সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রকাশ বাবুর সঙ্গে মখদুম সাহেবের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। কিছু পরে সকল যাত্রী পৌঁছিলেন। রোশনচৌকি বাদ্যের বন্দোবস্ত হইল। রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন ও আলোচনা। মিলনের বিষয় কথা হইল। মিলন কেন হইতেছে না? প্রেমের অভাব। আমরা আপনাদিগকে শত দোষ সত্ত্বেও ভালবাসি; আমরা নিজ গুণের পক্ষপাতী, তাই আপনাদিগকে ভালবাসি। কেবল গুণ দেখিলে অবশ্যই অন্যকেও ভালবাসিব। পরস্পর মিলিবার এই একমাত্র উপায়,—পরস্পরের গুণ দর্শন।"

২৭শে জানুয়ারী রাজগৃহে ঘুম ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিলাম। চক্ষু খুলিয়া দেখি, মেয়েরা এক একটি উচ্চ স্থানে বসিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেছেন। তার পর মখদুম কুণ্ডে ঈশার ভাবে জলাভিষেক হইল। তোমরাও সেই পদ্ধতি করিলে। তারপর যেখানে মখদুম সাহেব নমাজ পড়িতেন, সেইখানে খুব ভাল উপাসনা হইল। এক পার্শ্বে দেবকন্যারা, অন্য পার্শ্বে ভাইয়েরা বসিলেন। পশ্চাতে উচ্চ পর্ব্বতরাজি, সম্মুখে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ, উপাসনা খুব মিষ্ট হইল। স্বার্থত্যাগ না করিতে পারিলে ব্রহ্মকৃপা আসে না, কৃপা আসিলেই আপনার প্রতি শ্রদ্ধা হয়, এইভাবে তুমি প্রার্থনা করিলে।

২৮শে জানুয়ারী সন্ধ্যার সময় তোমরা অগ্নিধারা কুণ্ড দেখিতে গিয়াছিলে। অপূর্ব্ব বাবু নেতা, কুণ্ডটি চারি ক্রোশ দূরে। ঐ কুণ্ড, ঐ কুণ্ড বলিয়া কুলকন্যারা বনকাঁটার মধ্যে চলিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ফিরিবার সময় শ্রদ্ধেয় অপূর্ব্ব বাবু বলিলেন, কেহ ক্লান্তির চিহ্ন দেখাইতে পারিবেন না। তুমি বলিলে যদি ব্রহ্মকুণ্ডে পা ধুইতে পাই, তাহা হইলে হাসিতে হাসিতে আশ্রমে যাইতে পারি। তাহাই হইল। ষোল মাইল কণ্টকপূর্ণ পথ চলিয়া হাসিতে হাসিতে গৃহে ফিরিলে। সকলে আশ্চর্য্য হইলেন। পথে তোমার উৎসাহপূর্ণ মুখ দেখিয়া সকলেই সুখী হইয়াছিলেন।

২৯শের বিষয় ভাই ষষ্ঠীদাস বলিতেছেন, "শেষ রাত্রিতে ৩টার সময় শয্যা হইতে উঠিয়া মখদুম কুণ্ডের ধারে একঘণ্টা ধ্যান ধারণা। প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিনের মত নাম গান, নির্জ্জন চিন্তা; তারপর মেরী মেগডেলীনের তৈল মর্দ্দনের বিষয়ে প্রসঙ্গ; তৎপরে জলাভিষেক। তৎপরে যথা সময়ে পাহাড়ে উপাসনা। জীবন্ত মধুময় উপাসনা। প্রত্যেকে এক একটি স্বরূপের আরাধনা করিলেন। পূজনীয় প্রকাশ বাবু চরিত্রের সমতার জন্য প্রার্থনা করিলেন। মখদুম কুণ্ডের জল যেমন এক প্রকার তাপ রক্ষা করিতেছে তেমনই প্রকৃতি চাহিলেন। একেবারে অনেক হাসিও নয়, আবার হাঁড়ি-মুখও নয়, অর্থাৎ যাহাকে প্রসন্নতা বলে, তাই চাহিলেন। তাঁহার ভার্য্যা প্রার্থনায় বলিলেন, যা ফোড়া লইয়া আসিয়াছেন, তাহা যেন আরাম হইয়া যায়। পাপ লইয়া আসিয়াছেন, যেন শুদ্ধ হইয়া যায়।" মখদুম কুণ্ডের জলে স্নান করিলে শরীরের চর্ম্মরোগ আরোগ্য হইয়া যায়। তুমি পাপরোগ দূর করিতে চাহিলে। পরের দিন প্রার্থনায় তুমি বলিলে, "মা জননী কষ্টি পাথর লইয়া যেন আমাদের মূল্য কষিয়া লইতেছেন। আবার যখন আসিব তখন বুঝি কষিয়া দেখিবেন, খাঁটি আছি কি না। যেন খাঁটি থাকিতে পারি। মূল্য যেন না কমে।"

৩১শে জানুয়ারী বিহারে ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে নামগানের পর উপাসনা লইল। আহারান্তে ঘোড়ার গাড়ীতে বখতিয়ারপুর যাত্রা করিলাম। সেখান হইতে ট্রেনে বাঁকিপুর আসিলাম! নয়াটোলার বাটী ফিরিতে অনেক রাত্রি হইল। কিন্তু ধূলা পায়ে ঠাকুর ঘরে যাইতে ভুলিলে না। সকলে মিলিয়া উপাসনার গৃহে গিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রোগে শোকে সঙ্গিনী

আমার কনিষ্ঠ প্রবোধচন্দ্র ও তুমি এক বয়ঃক্রমের। ছেলে বেলা হইতে তোমাদের সদ্ভাব ছিল। বয়ঃক্রমের বৃদ্ধিতে ও নিজ নিজ সংসারের ভার গ্রহণেও সে সদ্ভাব হ্রাস হইয়া যায় নাই। যখন প্রবোধ বাঁকিপুরে আসিলেন, তখন তুমি তাঁহার ভার গ্রহণ করিয়াছিলে। তারপর যখন তাঁহার বালিকা-বিদ্যালয়ের কর্ম্ম হইল ও যখন তিনি একটু একটু ডাক্তারী করিতে লাগিলেন, তখন পাছে অমিল হয়, তাই তাঁহাকে ভিন্ন বাসা করিয়া দিলে। আমার মা ছোট ছেলের কাছে থাকিতে ভালবাসিতেন, সুতরাং তাঁহাকেও খরচপত্র দিয়া প্রবোধচন্দ্রের নিকটেই রাখিলে। হিন্দু সমাজ ইহাতে ভাল বলিলেন না। মনে করিলেন, তুমি ভিন্ন করিয়া দিলে। কিন্তু প্রবোধচন্দ্র তোমার মন জানিতেন, তোমার অভিপ্রায়ও বুঝিতেন। তিনি

বুঝিতেন যে বড় গাছের ছায়াতে থাকিলে ছোট গাছ বৃদ্ধি পায় না। বড় ভ্রাতার সঙ্গে একত্র থাকিতে আপাততঃ ছোট ভাইয়ের আরাম হইতে পারে, কিন্তু তাহার মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়। কালে আবার সন্তানাদি লইয়া মনোমালিন্যও উপস্থিত হইয়া থাকে। দূরে গেলে যে হৃদয় হইতে দূরে যাওয়া হয় না, তাহা ভাই প্রবোধও বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার কোনও বিপদ হইলেই তোমার নিকট বলিতেন, তুমিও সাধ্যমত সাহায্য করিতে। এইরূপে ৪।৫ বৎসর চলিয়া গেল। তারপর ১১শে মার্চ্চ ১৮৮১ আমি প্রবোধের পরলোকগমনের সংবাদ পাইলাম। তুমি সেদিন অসুস্থ ছিলে। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, কার পত্র? আমি উত্তর দিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ বাহিরে কাজ করিতে গেলাম। তাহাতেও সামলাইতে পারিলাম না। তখনই গাড়ী প্রস্তুত করিয়া কালেক্টরের কাছে কিছু কাজ লইয়া গেলাম। উদ্দেশ্য, তাঁহার সঙ্গে কাজের কথা কহিতে কহিতে মনটাকে সমাহিত করিয়া লইব। অতিক্রম করিতেছি দেখিয়াই তুমি বুঝিলে যে কিছু একটা হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় তোমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আস্তে আস্তে প্রবোধের সংবাদ দিলাম। তোমার মনে ভয়ানক আঘাত লাগিল। মূর্চ্ছা হইল। ডাক্তার ডাকিতে হইল। অনেক যত্নে আবার তোমার সংজ্ঞা হইল। ২৭শে মার্চ্চ প্রবোধচন্দ্রের শ্রাদ্ধ হইল। সে দিন তুমি যে প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা অতি প্রাণভেদী হইয়াছিল।

প্রবোধচন্দ্র অকালে তিরোহিত হইলেন; তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী বলিলেন, "ছোট দিদির যদি ঘর ঝাঁট দিয়া দিনপাত করিতে হয়, তাহাও ভাল; কিন্তু প্রাচীন সমাজে কুটুম্বদিগের নিকট গিয়া আরামেও থাকিতে চাই না।" এই রূপে প্রবোধের স্ত্রী ও কন্যা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তুমিও সাদরে তাঁহাদের গ্রহণ করিলে। সকলেই তখন বুঝিল প্রবোধ তোমার হৃদয় হইতে দূরে যান নাই। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার বিধবা স্ত্রী ও কন্যার ভার সম্পূর্ণরূপে তুমিই গ্রহণ করিলে। যাহা আপনার কন্যাদের জন্য করিতে পার নাই, তাঁহার কন্যাকে এমন সুশিক্ষা দিতে লাগিলে। অবশ্যই পরলোকে এখন প্রবোধের হাসিমুখ দেখিয়া সুখী হইতেছ।

সংসারের খরচ বাড়িতে লাগিল। তোমারই উপরে সম্পূর্ণ ভার দিয়াছি, তোমাকে বড়ই বিব্রত হইতে হইল। তুমি উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রস্তাব করিলে, বাড়ীতে মাকে যে টাকা পাঠান হয়, তাহা হইতে কিছু কমাইয়া দেওয়া যাউক। আমি বলিলাম, তাহা করিও না। ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলাম ও ভগবানকে বলিলাম।

কয়েকদিন পরে আমাকে উচ্চ Standard-এর Departmental পরীক্ষা দিতে হইবে বলিয়া আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। বলিলাম, "আমাকে কিছু দিনের জন্য সংসার হইতে একেবারে ছুটি দাও। তুমি একাই সব সামলাইয়া লও।" তুমি বলিলে, "বেশ।" অর্থাৎ, লোকজন আসিলে তাহাদিগের অভ্যর্থনার ভার, কাহারও অসুখ করিলে শুশ্রূষা ও চিকিৎসক ডাক্তার ভার তোমারই উপর পড়িল। আমাকে একাকী বাঁকিপুর হইতে চারি মাইল দূরবর্ত্তী "কুম্‌হার" নামক স্থানে পাঠাইয়া দিলে। সেখানে গিয়া এক পক্ষ কাল অবস্থিতি করিলাম। সংসারের সমুদয় ভারই তুমি লইলে। কাহারও পীড়া হইলেও আমাকে তোমার এই সাহায্যের গুণে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলাম। ১৫ই জুন পরীক্ষার ফল শুনিলে; আনন্দভরে উপাসনার ঘরে গমন করিলে, আর প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে কৃতজ্ঞতা দান করিলে।

পর বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে আমাকে কার্য্যোপলক্ষে পাটনা জেলার অন্তর্গত হিল্‌সা থানায় যাইতে হইয়াছিল। আমার শরীর সুস্থ ছিল না বলিয়া সেবার জন্য তুমিও যাইতে প্রস্তুত হইলে। যান তো টমটম; খোলা গাড়ী; তবু তুমি সঙ্গে চলিলে, লজ্জা ভয় তোমাকে বাধা দিতে পারিল না। তুমি আমি ও সুবোধ এক গাড়ীতে চলিলাম। তখন সুবোধের বয়ঃক্রম চৌদ্দ বৎসর। কাছে কাছে রাখাতে তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ মিষ্ট হইতে লাগিল। গাছতলায় উপাসনা, কুঁড়ে ঘরে আহার হইতে লাগিল। ২৫শে ফেব্রুয়ারী পালীগঞ্জ বাঙ্গালায় ছিলাম; সেখানে তোমার সঙ্গে সংসারের সরঞ্জাম কিছু ছিল না; পদে পদে বিব্রত হইতে হইতেছিল। কিন্তু তুমি কিছুতেই দমিতে না। যে যে উপকরণ পাইতে না, সাহস করিয়া, যুক্তি খাটাইয়া, অন্য বস্তু দিয়া, তাহার কাজ চালাইয়া লইতে। কত অসুবিধার মধ্যে একা তোমার উপর সব ভার ফেলিয়া রাখিয়া আমি আমার কাজে বাহিরে চলিয়া যাইতাম; আর বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিতাম, তুমি হাসিতেছ। তোমার এ হাসি ছেলেবেলা হইতে দেখিতে পাইয়াছি। বিপদে অসুবিধায় ঝঞ্ঝাটে তোমার এই প্রসন্ন ভাবটি কিছুতেই দমিত না। তোমার এইরূপ সব অসুবিধা কাটাইয়া কাজ সমাপন করিবার শক্তিটি ছিল বলিয়া আমার সংসারে আমি একটি দিনও অন্ধকার বা ভার বোধ করি নাই। কতবার অন্যের সংসারে গিয়া, অসুবিধার স্থলে মুখভার করিবার ব্যাপার দেখিয়া, আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি ভাবিয়াছি, কই আমাকে তো কখনও এমন করিয়া সংসার করিতে হয় নাই! এই স্থান হইতে ফিরিবার সময় কত শ্রান্ত হইয়াছিলে আমারও শরীর খারাপ ছিল, তবু পথে ধর্ম্মবন্ধু ষষ্ঠীদাসকে পাইয়া তাঁহার সঙ্গে উপাসনা করিয়া তবে বাঁকিপুরে ফিরিলে।

মার্চ্চ মাসে তোমার গাজীপুরের উৎসবে যাওয়া ঠিক হইল ভাই নৃত্যগোপাল নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমার তো কোথাও যাওয়া হয় নাই, জেলা ছাড়িয়া যাইবার যো নাই, তুমি আমার হইয়া গাজীপুর চলিলে, তোমার সঙ্গে শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার গেলেন। লোকে বলে, ভূপেনের সঙ্গে তুমি গেলে, আমি বলি ভূপেন তোমার সঙ্গে গেলেন। তোমরা দুইজনাই এখন স্বর্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, কে কার সঙ্গে গেলেন। গাজীপুরে একখানা টেলিগ্রাম দিবার কথা হইল, তুমি বলিলে, তাহাতে প্রয়োজন কি? তোমাকে বিদায় করিয়া দৈনিকে এইরূপ লিখিয়া রাখিয়াছিলাম,—"শ্রীঅঘোর গাজীপুরের উৎসবে গেলেন। আমাকে ছাড়িয়া গেলেন কিন্তু আমারই হইয়া গেলেন। যাহা কিছু করিবেন, আমারই প্রতিনিধি হইয়া করিবেন।" এদিকে ১৭ই তারিখে আমার অসুখ করিল, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, তার পর গলার ভিতরে ফোড়া হইল, গলা বন্ধ হইয়া অনেক কষ্ট পাইলাম। তবু তোমার উৎসাহ পাছে ভঙ্গ হয় তাই দুদিন সংবাদ দিই নাই। ২০শে তারে সংবাদ দিতে হইল তখনও সেখানকার উৎসব শেষ হয় নাই, সুতরাং ভূপেনকে রাখিয়া তুমি সেইদিনই উপাসনার

শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলে। ২১শে ২২শে দুদিন তুমি অনেক সেবা করিলে কিন্তু রোগের যন্ত্রণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। পরীক্ষা ঘোরতম। ২২শে সমস্ত রাত্রি যন্ত্রণায় আমার নিদ্রা হইল না। ধৈর্য্য দাও, এই প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। ২৩শে রবিবার সন্ধ্যার সময় ভয়ানক ছট ফট করিতেছি, তোমার মুখপানে তাকাইয়া দেখি, তোমারও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতেছে, তুমি বলিলে "ডাক্তার ডাকিতে পাঠাই।" আমি বলিলাম, "প্রয়োজন হয় তো আপনি আসিবেন"। ভাই পরেশ কোথা হইতে ঠিক ৭টার সময় উপস্থিত হইলেন। সেই রাত্রে গলার ভিতরের ফোড়া ফাটিয়া গেল। ২৮শে তারিখে চিকিৎসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তুমি যে প্রার্থনা করিয়াছিলে, এবং চিকিৎসকও তাঁহার প্রতি নির্ভরের জন্য যে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, তাহা আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। রোগ তখনও আরাম হইল না। ৫ই এপ্রিল মুখে অস্ত্র করিতে হইল, তুমি পাকা nurseএর মত দাঁড়াইয়া সে কার্য্যে সাহায্য করিলে। ১১ই এপ্রিল কঙ্করবাগের বাঙ্গালায় গেলাম, সঙ্গের সঙ্গিনী তুমিও চলিলে। এইখানে অবস্থিতিকালে তোমার জননীর পরলোক গমনের সংবাদ আসিল। এই সংবাদ শ্রবণের পর তুমি বলিলে, "এখন হইতে তুমি আমার মা হও," আমি বলিলাম, "তথাস্তু।" যেদিন তুমি ঐ সংবাদ শ্রবণ করিলে, সেই দিনই সন্ধ্যার সময় ষষ্ঠী বাবুর ছোট সন্তানের মৃত্যু সংবাদ আসিল। তখনই শোকাতুরা জননীর সান্ত্বনার্থে গাড়ী করিয়া গমন করিলে, সঙ্গে একজন চাপরাসী বই কেহ ছিল না। যখন কর্ত্তব্য উপস্থিত হইত, তখন তুমি লজ্জা, ভয়, নিজের শোক, স্বামীর সেবা সকলই ভুলিয়া যাইতে। রাত্রি আটটার সময় যাত্রা করিয়া রাত্রি দুইটার সময় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে। আমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।

যখন আমার সেবা করিতে, তুমি কখনও দাসীর মত মুখ বুজিয়া যাহা বলিতাম তাহাই করিতে, কখনও বা কর্ত্রীর মত ধমক দিতে। যখন আমি কঙ্করবাগে পীড়িত ও দুর্ব্বল ছিলাম, ডাক্তার পূর্ণ মাত্রায় আহার দিতেন না; রাত্রে দুই তিনবার কর্ণফ্লাওয়ার খাওয়াইতে হইত। বালকের মত অসময়ে ক্ষুধা লাগিয়াছে বলিয়া আমি আবদার করিতাম; তখন শিক্ষিতা মাতার মত বলিতে, "সময় হয় নাই, শোও, সময় হইলেই ডাকিয়া আহার দিব" বলিয়া আশ্বাস দিতে; বালকের মত আবার নিদ্রা যাইতাম। এত যত্ন করিয়াছিলে বলিয়া রোগ আরাম হইল।

শরীরে শক্তি তখনও পাই নাই; সমস্ত দিনই তোমার সেবা দেখিতাম, ও প্রকৃতির শোভা দেখিতাম। এই সময় হইতে তোমার মধ্যে লুকাইয়া যাইতে বড় ইচ্ছা হইল। ভগবানও তো তাই করিয়া থাকেন। তিনি প্রকৃতির মধ্যে লুকাইয়া থাকেন। প্রকৃতি তাঁহাকে প্রকাশ করেন। তেমনি আমার ইচ্ছা হইল, যে আমি লুকাইয়া যাই, তুমি আমার কার্য্য কর। দেখিলাম, অন্যের প্রতি আমার যাহা কিছু করিবার ছিল, আমার অনবসরবশতঃ তুমিই তাহা করিতেছ।

৬ঠা মে কঙ্করবাগ ত্যাগ করিয়া দীঘাঘাটের ষ্টেশনমাষ্টারের বাঙ্গালায় গেলাম। সেখানে থাকিতে থাকিতে ৭ই জুন দুই প্রহর রাত্রে পরেশের কন্যার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তুমি বাঁকিপুর চলিয়া গেলে। আমি পরদিন সকালে গেলাম। তার পর আগষ্ট মাসে তোমার অগ্রজ উপেন্দ্রনাথের পরলোক গমনের সংবাদ পাইলে। আবার তুমি বলিলে, "আজ হইতে তোমাকে দাদা বলিয়া ডাকিব"। আমি স্বীকার করিলাম। এইরূপে আমাকে তোমার সব করিয়া লইয়া তোমার সকল সাধ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দেবী

সাত বৎসর হইল, আত্মিক মিলন ব্রত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সাত বৎসরে এ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আমার যত ক্লেশ হইয়াছে, তোমার ততোধিক হইয়াছিল। বাহিরে কত কাজে আমার শরীর মন নিযুক্ত থাকিত, তোমার সে সুবিধা ছিল না। তাই তুমি মাঝে মাঝে ম্লান হইতে। আমিও বুঝিতে লাগিলাম, এখনও চিত্তের শান্তভাব লাভ হয় নাই। আরও দেখিলাম, সকল সাধনে যেমন, এখানেও তেমনি, অল্প ত্যাগে সিদ্ধি লাভ হয় না। ত্যাগে পূর্ণতা চাই। এবার বুঝিলাম, আলিঙ্গনও ত্যাগ করিতে হইবে। স্পর্শসুখে আবদ্ধ থাকিলেও তো জড়েতেই আবদ্ধ থাকিলাম; শরীর না থাকিলে দুটি আত্মাতে যে যোগ হইবার কথা, শরীর থাকিতে তাহা তো আর হইল না। এই সকল ভাবিয়া যখন মন অন্ধকার হইতেছে, এমন সময় একদিন দেখি, কি করিয়া ব্রহ্মকৃপাতে তুমিও আমার ভাব অন্তরে পাইলে ও বুঝিলে, শরীরকে আরও দূরে না রাখিলে এ সাধনে সিদ্ধ হইবে না। তোমার ভাষায় সেদিন তুমি বলিলে "অদ্য হইতে আমার অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইল।" আত্মা ও শরীর দুই লইয়া যে সম্বন্ধ ছিল, এখন হইতে তাহা কেবল আত্মা লইয়া থাকিবে, অপর অর্দ্ধাঙ্গ থাকিয়াও থাকিবে না। গলা পর্য্যন্ত পরস্পরের শরীর পরস্পরের অস্পৃশ্য হইল। আমিও দৈনিকে লিখিলাম, "এখন অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইল। এমন অবশ করা তোমার শক্তি দ্বারাই হয়। তুমি যাহা করিলে তাহার জন্য তোমাকে কৃতজ্ঞতা দিই। পূর্ব্বে আমি চাহিয়াছিলাম, যে জোর করিয়া স্ত্রীকে আলাদা করিয়া দিই; শরীর অস্পৃশ্য রাখি; কিন্তু তখন তাহা হইল না। জোর করিয়া হয় না, পৃথিবী যেন এই শিক্ষা পায়।"

সেইদিন হইতে, দেবি! তুমি আমার কাছে দেবী হইলে। শরীরের প্রভাব আত্মাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তোমার পক্ষে আর কিছুই অসম্ভব রহিল না। মনে পড়ে, দেবি! সেই দিনের শেষ আলিঙ্গনের উপাসনার কথা? প্রাতঃকৃত্যের পূর্ব্বে শয়ন করিয়া ওষ্ঠে ওষ্ঠে মিলিত করিয়া যাই "সত্যম্" বলিলে, অমনি বুঝিলে, সত্যরূপ ভগবানের শক্তি কেমন! এমন ভয়ানক রিপুও সে শক্তির কাছে পরাস্ত হইল। এ উপাসনা আর কেহ শুনিতে পাইল না, কেবল অঘোর-প্রকাশ শুনিতে পাইলেন। এইরূপ উপাসনা পূর্ব্বে কখনও করি নাই; আর কেহ করিয়াছে কি না, তাহা জানি না। সাক্ষ্য দিবার জন্য অঘোর-প্রকাশ বলিয়া যাইতেছেন, যদি মুখচুম্বন করিতে হয়, যদি ওষ্ঠে ওষ্ঠে মিলিত করিতে হয়, এইরূপেই যেন নরনারী করিতে পারেন।

এখন হইতে তুমি আরও মন খুলিয়া সকল কথা বলিতে লাগিলে; দেখিলাম চিত্তের দুর্ব্বলতার কথা পরস্পরকে বলিতে আরও বল পাই। মনের গতি কোন্ মুহূর্ত্তে কিরূপ হইয়াছিল, পূর্ব্বে সব বলিতে সাক্ষী

হইতাম না। এখন হইতে অবাধে সব বলিতে লাগিলে, আমিও বলিতে লাগিলাম।

এই সময় দৈনিকে লিখিয়াছিলাম, "আলিঙ্গন নিষিদ্ধ হইল। গলা পর্য্যন্ত স্পর্শ বন্ধ হইল। মুখচুম্বনে সুখও হয় না, দুঃখও হয় না, এইরূপ হওয়া চাই। অভ্যাসে ইহাও হইবে।" আর একদিন প্রার্থনা করিয়াছিলাম, "দৃষ্টিসুখ বৃদ্ধি কর।" কারণ দেখিলাম, অন্য একটি উন্নততর সুখ না পাইলে নিম্নতর সুখ ছাড়িতে পারা যায় না। দর্শনে যে কত সুখ সম্ভব, তাহা সহসা বুঝা যায় না, অভ্যাসে ঐ দর্শনানন্দ বৃদ্ধি পাইলে স্পর্শসুখের লালসা হ্রাস হইতে থাকে। স্পর্শের আনন্দ অপেক্ষা দর্শনের আনন্দ উচ্চ; তাহা অপেক্ষা উচ্চ স্মৃতির আনন্দ। মানুষের কখনও কখনও এই তিন অবস্থা পর্য্যায়ক্রমে লাভ হয়। পরীক্ষায় তুমিও দেখিয়াছ, আমিও দেখিতেছি, স্মৃতিই স্থায়ী অবস্থা, কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। স্মরণে যদি আনন্দ হয়, তাহা হইলে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না; সেইরূপ দর্শনের আনন্দ না পাইলে স্পর্শের সম্ভোগ ছাড়িতে পারা কঠিন হয়।

ইহার পর আমাদের ইচ্ছা হইল, আমাদের "আধ্যাত্মিক বিবাহ" অনুষ্ঠান হউক। এ বিষয়ে দুজনের মধ্যে প্রসঙ্গ হইত। ক্রমে এই অনুষ্ঠানটি আমাদের দুজনেরই প্রাণের অত্যন্ত ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইল। ১৮৯১ সালের ৫ই জানুয়ারী তোমার শরীর একটু বেশী খারাপ হয়। তখন তুমি বলিয়াছিলে, "তবে বুঝি আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠান হইল না"। ভয় করিয়াছিলে, পাছে দেহত্যাগ হয় ও পাছে এ লোকে আধ্যাত্মিক বিবাহ অনুষ্ঠান না হয়। অনেক দিন যাহার সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিবাহ হইতেছে না, ক্রমাগতই কোন না কোন ব্যাঘাত হইতেছে, এমন নায়িকার মনের যে অবস্থা হয়, তোমারও যেন সেই অবস্থা হইল। আমি অনেক আশ্বাসবাণী বলিলাম। বলিলাম, "উৎসবের পর রাজগৃহে বিবাহ হইবে, তাহার তো অনেক বিলম্ব আছে, তুমি শীঘ্র শীঘ্র ভাল হইয়া উঠ। বিবাহ হইবে বৈ কি?" এরূপ কথা কহিতে কহিতে সে দিন অর্দ্ধরাত্রি নিদ্রা হইল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিক বিবাহ

১৮৯১ সালের মাঘোৎসব আসিল। বাঁকিপুরে উৎসব করিয়া ২৪শে জানুয়ারী (১২ই মাঘ) রাজগৃহ যাত্রা করিলাম। সকলেই তীর্থ যাত্রায় চলিয়াছেন; কেবল দু'জন যাত্রীর, তোমার ও আমার, ভাব আরও গভীর। আমরা দু'জনাই অনন্ত উৎসবে মিলিত হইতে চাহিতেছিলাম। ভিতরে আত্মা যাহা চাহিতেছিল, বাহিরে বন্ধু-বান্ধবদিগকে কিরূপে তাহা জানাইব, সেই চিন্তা করিতেছিলাম। মনের এই আনন্দের ও গাম্ভীর্য্যের মধ্যে হঠাৎ একটু বাধা হইল; তাহা আমারই দোষে। ২৭শে জানুয়ারী রাত্রিতে বেহার পান্থ-ভবনে অবস্থিতি কালে শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সঙ্গে একটি বিষয় লইয়া আমার তর্ক হয়। তোমার ইচ্ছা ছিল না যে, আমি অত তর্ক করি। শেষে যখন উঠিয়া আসিলাম, তখন আমার মুখ মলিন, মনও বড় খারাপ। আমার মুখ যে অপ্রসন্ন, তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে, জানি না। কিন্তু নিজের ঘরে গিয়া যখন প্রার্থনা করি, তোমার সহানুভূতিপূর্ণ চক্ষের জলে আমার বক্ষ অভিষিক্ত হইয়া গেল। তোমার আশ্বাসে আবার বল পাইলাম।

২৫শে আহারাদির পর রাজগৃহ যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার সময় তথায় পৌছিলাম। সেই তর্কের পর হইতে মন ভাল নাই। কোনও রূপে রাত্রি কাটিয়া গেল। ২৬শে সকালে দেখি, কাহারও মনে স্ফূর্ত্তি নাই, কেহ কাহারও সঙ্গ লইতে চাহিতেছেন না, সকলে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসিলেন। রাজগৃহে আসিয়া তো এমন কখনও হয় না। উপাসনা হইল বটে, কিন্তু সারাদিন যেন অন্ধকারে কাটিল। এদিকে দেখি! তুমি বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত; আমিও প্রস্তুত। ২৭শে ভোরে সেই ধর্ম্মশালার এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রার্থনা করিয়া তোমার মস্তক স্পর্শ করিলাম, এবং ব্রহ্মকুণ্ডের উষ্ণ জলে ধৌত করিয়া স্বহস্তে ক্ষুর দিয়া মুণ্ডন করিলাম। আমার হাত কাঁপিতেছিল,—কখনও তো কাহারও ক্ষৌরকার্য্য করি নাই। তোমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া আমার হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ হইল; তোমাকে এমন সুন্দর আর কখনও দেখি নাই! তোমার বাল্যমূর্ত্তি, যৌবনের মূর্ত্তি, কোনও মূর্ত্তিই ইহার মত নয়। দেব-প্রভা যেন তোমার মুখমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কি চক্ষেই যে তোমাকে দেখিতেছিলাম! স্বর্গে গিয়া যে জড়ভাবমুক্ত পবিত্র দৃষ্টিতে তোমাকে দেখিব, এ দিনের দর্শন যেন তাহারই পূর্ব্বাভাস।

নাপিত ডাকিয়া আমারও ক্ষৌরকার্য্য করা হইল। তার পর উপাসনা। এইবার শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবুকে জানাইলাম, যে, অদ্য আমাদের আধ্যাত্মিক বিবাহ। এতক্ষণ আমাদের মুণ্ডিত মূর্ত্তি কেহ দেখেন নাই। এখন দেখিবামাত্র, দেখি! মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলের মন সম্ভ্রমে বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ম্লান উপাসনা-সভা সজীব হইয়া উঠিল। শ্রদ্ধেয় অমৃতবাবু মহাশয়েরও মনের সেই ভার কোথায় চলিয়া গেল। তিনি অনুপ্রাণনে প্রমত্ত হইয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন। উপাসনার পরে নবসংহিতা অনুসারে আমাদের আধ্যাত্মিক বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। সংহিতায় আছে, ৭ দিনের জন্য এই ব্রত লইবে; আমরা বলিলাম, অনন্ত কালের জন্য।

শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয় "ব্রহ্মকন্যার অবতরণ" বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন, জগতে মহাপুরুষ অনেক আসিয়াছেন, কিন্তু মহানারী অদ্যাবধি আসেন নাই। এইবার তাঁহার আগমন হইল। মহানারীর যে সকল লক্ষণ থাকা উচিত, তাহা তোমাতে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই তোমাকে এ আখ্যা দিলেন। আমি তো আগে তোমার মহানারীত্ব দেখিতে পাই নাই। আমার ঘোরীকে আমি নিজেই আদর করিতাম, পূজা করিতাম; আবার অপূর্ণতা দেখিলে মুখ আঁধার করিয়া থাকিতাম। ঘরে থাকিতে বলিয়া বুঝি তোমায় আগে বুঝি নাই। তুমি যে মহানারী, তাহা এখন আমাকেও স্বীকার করিতে হইল।

সকালের উপাসনার পর সকলের মনে আমাদিগকে আদর করিবার জন্য এক আশ্চর্য আবেগ উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার সময় ভাই অপূর্ব্বকৃষ্ণ তোমাকে ও আমাকে পট্টবস্ত্র পরিধান করাইলেন। উপাসনার পর কন্যা-বরের বরণ হইল। 'কন্যাবর' কেন, 'বরকন্যা' কেন নয়, তাহা বুঝিলে তো? যখন শরীরের বিবাহ হইয়াছিল, তখন 'বরকন্যার' বরণ হইয়াছিল। এখন কনের দিন পড়িল, তিনি বরের পূর্ব্বে গেলেন। কন্যার মান্যে বরের মান্য হইল। তাঁহারা দুই জনে

মাঝখানে ; চারিপাশে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা বাতির ডালা হাতে লইয়া হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে পরিক্রমণ আরম্ভ করিলেন। আমার মনে যে কি অবস্থা হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। এ পৃথিবীর কথা ভুলিয়া গেলাম, অশরীরী আত্মা তুমি এখন আমার কাছে যাহা হইয়াছ, তখন যেন তাহাই হইয়া গিয়াছিলে।

এই দিনের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ভাই ষষ্ঠীদাস তাঁহার দৈনিকে লিখিয়াছিলেন, "উপাসনা স্বর্গের উপাসনা। আজ মহাব্যাপার। ভক্তিভাজন সাধক প্রকাশ বাবু ও তাঁহার ভার্য্যা অঘোরকামিনী আধ্যাত্মিক বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। আহা, আজ কি মনোহর দেবদৃশ্য! বিধাতা আজ স্বয়ং পুরোহিত হইয়া এই উভয় সন্তানকে বিবাহ সূত্রে বাঁধিয়া দিলেন। এ বরকন্যার আর শরীরের সম্বন্ধ নাই। ইঁহারা বার বৎসর হইল সাধন আরম্ভ করিয়া আজ নয় বৎসর কাল ইন্দ্রিয়কে একেবারে দমন করিয়াছেন। তাঁহারা সাক্ষ্য দিলেন, এ নিগ্রহে তাঁহাদিগকে অনেক কাঁদিতে হইয়াছে, অনেক দুঃখ পাইতে হইয়াছে, কিন্তু পরে যে সুখ শান্তি পাইয়াছেন, তাহার সঙ্গে তুলনায় সে কান্না সে দুঃখ কিছুই নহে। এই ব্যাপার সকলের মনে একটা স্বর্গীয় ভাব আঁকিয়া দিয়া গেল। এখন প্রকাশ বাবুর বয়ঃক্রম ৪৪ ও অঘোরকামিনীর ৩৬ বৎসর। রাত্রে বরকন্যার বরণ,—অমরধামের ব্যাপার ; পরে সঙ্কীর্ত্তন। দয়াময়, তোমাকে ধন্যবাদ। রাজগৃহ, না স্বর্গ।"

বল তো, ২৭শে জানুয়ারী কেন "স্বর্গের উপাসনা" হইল ? কেন সে দিন দেবদৃশ্য হইয়াছিল ? তুমি যে দেবী, দেবকন্যা, তাহা সকলেই একবাক্যে কেন স্বীকার করিয়াছিলেন ? যদি মানবী থাকিতে, তাহা হইলে মস্তক মুণ্ডন করার পর ভাল দেখাইত না। বিশেষতঃ নারী যখন সুশোভিতা, সালঙ্কারা, দীর্ঘকেশী হন, তখনই তিনি দেখিতে সুন্দরী হন ; কিন্তু আজ যে তোমার কোন অলঙ্কার নাই, তুমি মস্তক মুণ্ডন করিয়াছ, আজ কেন তোমাকে দেখিতে এত সুন্দর লাগিল ? আজ তুমি অসংসারী, আজ তুমি সন্ন্যাসিনী, আজ তুমি আত্মাময়ী, তাই তোমার স্বর্গের রূপ। তাই ভাই ষষ্ঠীদাস দেবদৃশ্য বলিলেন।

মনে পড়ে, দেবি! ব্রতের প্রথম ছয় মাস কেবল কাঁদিতে কাঁদিতে কাটাইয়াছিলে ? একাকী শয়ন করিতে, আর চক্ষের জলে মাথার বালিশ ভিজিয়া যাইত ? কেন, দেবি! আমাকে বলিতে না ? বলিলে হয় তো তোমার চক্ষের জলের সঙ্গে আমার অশ্রুবারি মিশ্রিত করিয়া তোমার দুঃখভার লঘু করিতাম। অথবা যাহা করিয়াছিলে, ভালই করিয়াছিলে। হয় তো তোমার চক্ষের জল দেখিলে আমার ব্রত ভঙ্গ হইয়া যাইত। আর "বিনা দুঃখে হয় না সাধন," একথাও তো সত্য। সে দুঃখভার বহন না করিলে আজ কি দশা হইত, বল দেখি ? আত্মার বিবাহও হইত না, আর আজ তোমার শরীরে বঞ্চিত হইয়া আমি অন্ধকার দেখিতাম। তাই বলি, ঘোরী, তোমার কষ্ট বৃথা যায় নাই। "অশ্রুসলিল ধৌত হৃদয়ে" আমরা আত্মার সম্বন্ধ ভিক্ষা করিয়াছিলাম। সেই সলিলই আমাদের অভিষেকের জল হইয়াছিল।

অভিষেকের কথায় মনে হইল, রাজগৃহে প্রত্যহই স্নানের সময় অভিষেক হইত। কিন্তু ২৭শে জানুয়ারীর রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তুমি আমাকে বলিলে, "অভিষেক হইবে, কুণ্ডে চল ;" সকলে তখনও নিদ্রিত। দুজনে ব্রহ্মকুণ্ডে আনন্দমনে গমন করিলাম। সেখানে তোমার চরণে ও মস্তকে আমি সুগন্ধি তৈল অর্পণ করিলাম। তুমিও সেইরূপে অর্পণ করিবার পর ব্রহ্মকুণ্ডে উষ্ণ জল দ্বারা আমাদের অভিষেক শেষ হইল। পরিষ্কার জল, আকাশ পরিষ্কার, সময় গম্ভীর। স্বামী স্ত্রীর অভিষেক করিলেন ; আবার স্বামী অভিষেকের জন্য মাথা পাতিয়া দিলেন, স্ত্রী তাঁহার অভিষেক করিলেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে তুমি আমার যাহা ছিলে, আমিও তোমার তাহাই ছিলাম। স্বামী বলিয়া আমার প্রাধান্য কোনও দিন রাখি নাই। এটুকু অন্য হইতে আমাদের প্রভেদ।

২৮শে জানুয়ারী—বাবুর বিধবা ভগিনী মস্তক মুণ্ডন করিলেন ; তিনি যুবতী বালবিধবা। এতদিন বৈধব্য-বেশ ধারণ করেন নাই। তোমার এই মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারও মন প্রস্তুত হইল। তুমি স্বয়ং তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিলে। কখনও ক্ষৌরকার্য্য কর নাই, ঈশ্বরচরণ ভরসা করিয়া এ কার্য্যও সমাধা করিলে। তোমার অনুসরণ করিয়া তিনি তোমার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসায় আবদ্ধ হইলেন, এবং আত্মিক বিষয়ে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারও জীবনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। [ক্রমশঃ।

দু'টি কবিতা

প্রজেশকুমার রায়

শেষ ঘুমে

আকণ্ঠ ফুলের স্তূপে ডুবে আছো তুমি,—
ডুবেছ গভীর ঘুমে ;
এ-ঘুমের আর শেষ নাই।
বিষণ্ণ ফুলের বাসে
কাঁদে তার বিষণ্ণ হৃদয়,
তোমার পাশেই শুধু

দুর্লভ

আজ তুমি নাই,—
তোমারে অন্তর ভরে
তাই বুঝি পাই!
কী দুর্লভ মনে হয়
অশ্রুর স্বাদ,
স্মৃতির সৌরভে ভরা
-[illegible] বিষাদ!

ভয়
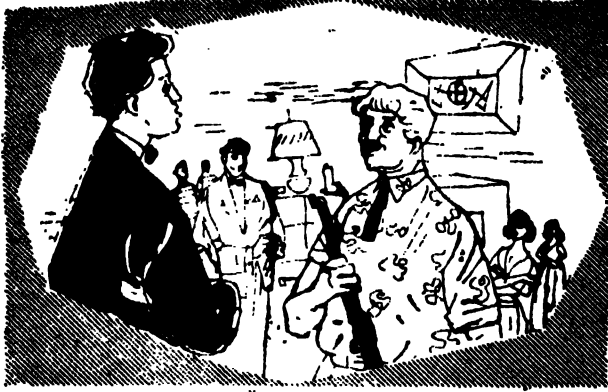
(গী দ্য মোপাসাঁর মূল ফরাসী গল্প La Peur-এর অনুবাদ)

খাবার পর আমরা আবার ডেকে গেলাম। আমাদের সম্মুখে ভূমধ্য সাগরের সলিলরাশির ওপর ছিল না একটুও দোলা—শুধু চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে তার ওপর—বিশাল—স্থির। অতিকায় অর্ণবপোতটা নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে বিশাল কৃষ্ণবর্ণের সর্পের মত ধূম্ররাশি উদ্‌গিরণ করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে। পশ্চাতে ভারী জাহাজটার প্রপেলারের আঘাতে জলপথের শুভ্র-সফেন বারিরাশি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে এবং তার ওপর চাঁদের আলো পড়াতে মনে হচ্ছে যেন ফুটন্ত চন্দ্রকলা।

আমরা ছ'জন কি আট জন সেখানে ছিলাম—নীরবে তারিফ করছিলাম।—দৃষ্টি আমাদের নিবদ্ধ হল সুদূর আফ্রিকার দিকে—আমাদের গন্তব্যস্থল। আমাদের ভেতর কমাণ্ডার 'সিগার' খাচ্ছিল, সে হঠাৎ খাবার সময়ে যা বলছিল, আবার তা বলতে শুরু করল।

: হ্যাঁ, সেদিন আমি ভয় পেয়েছিলাম। সমুদ্রের আঘাতে আমার জাহাজটা একটা পাহাড়ের জঠরে ছ'ঘণ্টা ছিল। সৌভাগ্যবশত বিকেলের দিকে ইংরেজদের একটা কয়লার জাহাজ আমাদের দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

তারপর দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি—মুখটা পুড়ে গিয়েছে—গম্ভীর—মনে হয় যেন অসংখ্য বিপদের ভেতর দিয়ে এসেছে এবং প্রকাণ্ড অজানা দেশ পরিভ্রমণ করেছে—যেন তাদেরই একজন যারা বিপদের মুখে আরও বেশী সাহসী হয়ে ওঠে—এই প্রথমবার কথা বলল।

: তুমি বলছ কমাণ্ডার, যে তুমি ভয় পেয়েছিলে; আমি এটা বিশ্বাস করি না। যে অনুভূতি তোমার হয়েছিল সেটা এবং কথাটাকে তুমি ভুল করছ। একজন উদ্যমশীল মানুষ দারুণ বিপদের সামনেও কখনও ভয় পায় না। সে বিচলিত হয়, উত্তেজিত হয়, অস্থির হয়, কিন্তু ভয়, সেটা অন্য জিনিস।

কমাণ্ডার হেসে জবাব দিল: ফিসৃত্তয়! তোমাকে স্পষ্ট জবাব দিচ্ছি আমি ভয়ই পেয়েছিলাম। তারপর তামাটে রং-এর লোকটি ধীরে ধীরে বলল: আমাকে বুঝিয়ে বলতে দাও! ভয় (সবচেয়ে সাহসী লোকেরাও ভয় পেতে পারে), সেটা হচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর জিনিস, সাংঘাতিক অনুভূতি, যেন আত্মার বিকৃতি, চিন্তা এবং হৃদয়ের এক বীভৎস আক্ষেপ, যার কেবলমাত্র স্মৃতিই যন্ত্রণার শিহরণ জাগায়। কিন্তু যে সাহসী, আক্রমণের সামনে, অথবা অনিবার্য্য মৃত্যুর সম্মুখে অথবা সমস্ত রকম বিপদের সম্মুখেও তার এসব কিছু হয় না। তা হয় অসাধারণ কোন ঘটনায়, অস্পষ্ট বিপদের সম্মুখে রহস্যময় কোন কিছুর প্রভাবে। সত্যিকারের ভয় হচ্ছে বহুকাল আগের ভয়ের স্মরণ। যে ভূত বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে রাত্রে ভূত দেখেছে, সে নিশ্চয়ই এই ভয়ঙ্কর বীভৎস ভয়কে হৃদয়ঙ্গম করেছে।

আমি ভয় পেয়েছিলাম প্রকাশ্য দিবালোকে, প্রায় দশ বছর আগে। গত শীতের সময় ডিসেম্বরের এক রাত্রে আমি আবার তা অনুভব করেছিলাম।

আমি বহু দুঃসাহসিক কাজ এবং মারাত্মক বিপদের ভেতর দিয়ে এসেছি। প্রায়ই আমি মার খেয়েছি। একবার চোরেরা আমাকে মৃত বলে ফেলে চলে গিয়েছিল। আমেরিকাতে আমাকে বিদ্রোহী বলে ফাঁসির দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেকবারই মনে হয়েছিল যেন শেষ হয়ে গেলাম, পর মুহূর্ত্তেই বিনা অশ্রুপাতে এবং বিনা অনুতাপে আমি মন স্থির করে নিয়েছি।

কিন্তু ভয়, সেটা ও-রকম নয়—ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব্ব দিকের একটা বনের ভেতর—বিগত শীতের সময়কার কথা। আকাশ ছিল অন্ধকার তাই দু'ঘণ্টা আগেই রাত হয়ে এল। আমার পথ-প্রদর্শক একজন সহরের লোক ছোট্ট একটা পথ দিয়ে, অর্দ্ধ-বৃত্তাকার ঝাউ-বীথির ভেতর দিয়ে চলেছে—এই ঝাউ-বীথির ভেতর দিয়ে প্রচণ্ডবেগে গর্জ্জন করতে করতে হাওয়া বইছে।—ওপরে দেখতে পেলাম মেঘগুলি বিক্ষিপ্ত ভাবে ছুটছে—পাগলের মত! যেন ভয়ঙ্কর কোনও-কিছুর সামনে থেকে ছুটে পালাচ্ছে। কখনও কখনও সমস্ত অরণ্যাঞ্চলটা যেন প্রচণ্ড ঝড়ের যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করতে করতে লুটিয়ে পড়ছিল। দ্রুত পদক্ষেপ এবং ভারী পরিচ্ছদ সত্ত্বেও আমার শীত করতে লাগল।

অরণ্য-রক্ষকের বাড়ীতে আমাদের নৈশ-ভোজনের কথা এবং তার বাড়ী আমাদের কাছ থেকে আর বেশী দূরে ছিল না। আমি সেখানে শীকার করতে যাচ্ছিলাম।

আমার পথ-প্রদর্শক কখনও কখনও চোখ তুলে বিড়-বিড় করে বলছিল: বিচ্ছিরি আবহাওয়া! তারপর সে আমরা যার বাড়ীতে যাচ্ছিলাম সেই বাড়ীর লোকদের কথা বলল। বাপ্ বিনা অনুমতিতে যারা শীকার করে তাদের একজনকে দু'বছর আগে খুন করেছিল এবং সেই দিন থেকে তাকে বিষণ্ণ দেখাত—যেন একটা স্মৃতি তাকে উৎপীড়ন করত!—তার বিবাহিত দুই পুত্র তার সঙ্গেই থাকত।

অন্ধকার হয়ে এল প্রগাঢ়। আমার সম্মুখে অথবা চতুর্দ্দিকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না; রাত্রি ভ'রে উঠল বনস্পতির শাখায় শাখায় সংঘর্ষের বিরামহীন ধ্বনিতে।—অবশেষে আমি একটা আলো দেখতে পেলাম এবং অনতিবিলম্বে আমার সঙ্গী এক দরজায় আঘাত করল। জবাবে এল নারী-কণ্ঠের তীব্র চীৎকার। পরে একজন পুরুষের কণ্ঠ স্বর—অবরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল: কে? আমার পথ-প্রদর্শক তার নাম বললে আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য!

এক বৃদ্ধ, শুভ্রকেশ—উন্মাদের মত চোখ, বন্দুক-হাতে রন্ধন-শালায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। অপরদিকে

দু'জন বলিষ্ঠ যুবক কুঠারহস্তে দ্বার রক্ষা করছে। অন্ধকার কোণে আমি দু'জন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলাম নতজানু হয়ে রয়েছে—মুখ দেয়ালের দিকে লুকোন।—বৃদ্ধ তার অস্ত্র দেয়ালের গায়ে ঠেসান দিয়ে রাখল এবং আমার জন্য ঘর ঠিক ক'রে দিতে আদেশ দিল। স্ত্রীলোকেরা ছিল একেবারে নিশ্চল।—সে সহসা বলে উঠল: দেখছেন মশাই, আজ রাত থেকে দু'বছর আগে আমি একজন মানুষ খুন করেছিলাম। এই সে বছর সে আমাকে ডাকতে এসেছিল।—আমি তার জন্যে অপেক্ষা করছি আজ রাত্রেও। তারপর সে এমন স্বরে বলল যে আমার হাসি পেল—তাই আমরা শান্ত হতে পারিনি।

আমি আমার যথাসাধ্য তাদের আশ্বস্ত করে বললাম যে, সেই রাত্রেই উপস্থিত হতে পেরেছি ব'লে এবং কুসংস্কার-জনিত ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে পাব বলে আমি খুসী হয়েছি। আমি কয়েকটা গল্প বললাম এবং প্রায় সবাইকেই শান্ত করতে পারলাম।

আগুনের কাছে প্রায় অন্ধ এবং গোঁফওয়ালা একটা বুড়ো কুকুর পায়ের ভেতর নাক গুঁজে ঘুমুচ্ছিল। অনেক কুকুর আছে যাদের মুখের সঙ্গে মানুষের মুখের অনেকটা সাদৃশ্য থাকে, এই কুকুরটা যেন সেই ধরণের।

বাইরে প্রচণ্ড ঝড় ক্ষুদ্র গৃহখানিকে আঘাত করছিল এবং দরজার ওপর শার্সি-যুক্ত সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রের ভেতর দিয়ে দেখতে পেলাম বিদ্যুতের আলোতে স্তূপীকৃত গাছের পাতাগুলি হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে ধাক্কাধাক্কি করছে।

আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম এক প্রচণ্ড ভয় লোকগুলোকে অধিকার করেছে। কথা বলতে বলতে যখন আমি আসছিলাম তখন সবাই উৎকর্ণ হয়ে দূরের কি একটা শুনছিল? মূর্খজনোচিত এই ভয়ে ক্লান্ত হয়ে আমি ঘুমোবার জন্য ব্যবস্থা করে দিতে বললাম।—সহসা বৃদ্ধ রক্ষী এক লাফে চেয়ার থেকে উঠে তার বন্দুকটা আবার তুলে নিল এবং বিমূঢ় ভাবে তোৎলাতে তোৎলাতে বলল: ওই যে! ওই যে! আমি শুনতে পাচ্ছি! স্ত্রীলোক দু' জন আবার নতজানু হয়ে বসে মুখ ঢেকে রাখল এবং ছেলেরা আবার তাদের কুড়ুল তুলে নিল। আমি যখন আবার তাদের শান্ত করবার চেষ্টা করতে যাচ্ছিলাম, তখন নিদ্রিত কুকুরটা সহসা জেগে উঠল এবং মাথা তুলে, গ্রীবা প্রসারিত ক'রে তার প্রায় অন্ধ-হয়ে-যাওয়া চোখ দিয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে এমন করুণ ভাবে চীৎকার করে উঠল যে, সেদিন সন্ধ্যায় সহরের পথচারীরাও শিউরে উঠল।—সবার দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ হল। কোনও একটা দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—যেন অজানা অদৃশ্য এবং নিঃসন্দেহে বীভৎস কোনও কিছুর দিকে তাকিয়ে চীৎকার করছিল। কেন না তার সমস্ত লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছিল।—বিবর্ণ মুখে রক্ষী চীৎকার করে উঠল: ও তাকে বুঝতে পারছে! ও তাকে বুঝতে পারছে! আমি যখন তাকে খুন করি তখন ও সেখানে ছিল। বিমূঢ় স্ত্রীলোক দুটিও কুকুরের সাথে চীৎকার সুরু করল।

কাঁধের ভেতর দিয়ে শির-শির করে কি একটা যেন ব'য়ে গেল।—এই বিমূঢ় লোকদের ভেতর এই স্থানে এবং এই সময়ে জন্তুটার এই দৃশ্য দেখতেও অতি ভয়াবহ ছিল।—তার প জন্তুটা এক ঘণ্টা ধ'রে নিশ্চল হয়ে চীৎকার করল—যে স্বপ্নের ভেতর যন্ত্রণায় সে চীৎকার করছিল। সাংঘাতিক ভ আমার ভেতর ঢুকল। কিসের ভয়?—তা জানি না—ভয়, এই পর্য্যন্ত।

আমরা নিশ্চল হয়ে বিবর্ণমুখে, উৎকর্ণ হয়ে, কম্পিত-হৃদ একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম এবং সামান্য এক শব্দেই চমকে উঠছিলাম। কুকুরটা দেয়াল শুঁকতে শুঁকতে ঘরে চার দিকে আর্ত্তনাদ করতে করতে ঘুরছিল। এই পশুটা আমাদে পাগল ক'রে তুলল। যে সহুরে-লোকটি আমাকে পথ দেখি নিয়ে এসেছিল, সে এক প্রচণ্ড ভয়ের বিকারে কুকুরটার ওপ ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং ছোট্ট একটু উঠোনের দিকের দরজা খু জন্তুটাকে বাইরে ছুঁড়ে দিল।—সে তৎক্ষণাৎ চুপ করল এ আমরা আরও বেশী নিস্তব্ধতার ভেতর নিমজ্জিত হ'লাম।—হঠা আমরা সবাই চমকে উঠলাম—বাইরের দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে একটা প্রাণী ধীরে ধীরে বনের দিকে গেল—তার পর দরজার কা এল—মনে হল ইতস্তত ভাবে তাই সে হাতড়াচ্ছিল—তারপ দু' মিনিট ধ'রে কিছু শোনা গেল না—এই দু' মিনিট যে আমাদের চেতনা ছিল না—আবার ফিরে এল দেয়াল ঘষতে ঘষতে—ছোট্ট ছেলেরা যেমন নখ দিয়ে আঁচড়ায় সেও তেমনি ভা দেয়াল আঁচড়াতে লাগল আস্তে আস্তে—সহসা দরজার শার্সিতে একটা সাদা মাথা দেখতে পাওয়া গেল—বন্য পশুর মত দু'টি জ্বলন্ত চোখ তার—বিড়-বিড় ক'রে বলার মত একটা করু অস্পষ্ট শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

তার পর রান্নাঘরে এক প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেলাম। বৃ রক্ষী গুলী ছুঁড়ছে—এবং তৎক্ষণাৎ ছেলে দু'টি ছুটে গিয়ে দরজা ওপর শার্সি-যুক্ত রন্ধ্রটা একটা বিরাট টেবিল আর আলমা দিয়ে বন্ধ করে রাখল।

আমি তোমাদের শপথ করে বলতে পারি যে এই অপ্রত্যাশি বন্দুকের প্রচণ্ড শব্দে আমার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ যন্ত্রণায় ভ'রে গেল— মনে হচ্ছিল যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছি—ভয়ে যেন মৃতকল্প।

আমরা সেখানে সকাল পর্য্যন্ত রইলাম চলৎশক্তিহীন হ'য়ে— নড়বার ক্ষমতা ছিল না, এক কথায় এই অনির্ব্বচনীয় উন্মত্ততা ভেতর শক্ত-কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম।—ছাদের ফাঁক দিয়ে ভোরে ক্ষীণ আলোর রশ্মি দেখতে পেয়ে তবে প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত করতে সাহ করেছিলাম।

দরজার কাছে, দেয়ালের নীচে বুড়ো কুকুরটা পড়ে রয়েছে—গুলী আঘাতে মুখ থেঁতলে গিয়েছে। কাঠের বেড়ার তলা দিয়ে গর্ত্ত খুঁড়ে সে উঠোন থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

তামাটে-রংয়ের লোকটি একটু থামল, তার পর বলল: সেই রাত্রে আমার আর কোন বিপদ হয়নি, কিন্তু জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটময় মুহূর্ত্তগুলির যদি আবার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাতে আমি রাজী কেবলমাত্র একটি মিনিট ছাড়া—যখন দরজার ওপর লোম মুখটাকে গুলীবিদ্ধ করা হয়েছিল।

অনুবাদক—শ্রীসুধীরকান্ত গুপ্ত।

শরৎ-স্মৃতির টুকিটাকি

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব্বে প্রকাশিত 'টুকিটাকি'র শেষ সংখ্যায় লিখেছিলাম যে, ৪৩ সালের ভাদ্র মাসের একদিন, বেলা ১০টা থেকে রাত ১১টা ন্ত শরৎচন্দ্র ও আমি কোন একটা ব্যাপারে একসঙ্গে কাটিয়েছুম। ব্যাপারটা খুবই মজার। তখনকার একটি অখ্যাত পত্রিকায় াটা প্রকাশিত হয়েছিল। আমার স্বাক্ষরে প্রকাশিত হলেও াটা আমার ও শরৎচন্দ্র উভয়েরই দ্বারা লিখিত। তবে বেশী অংশ মার, অল্প অংশ শরৎচন্দ্রের অর্থাৎ দশ আনা, ছ' আনা। তখন া বছর আগে, সাধু ভাষাতেই সবকিছু লেখবার রীতি ছিল। ৎচন্দ্রও তাই লিখতেন, আমিও তাই লিখতাম। সুতরাং সে-যুগ-লিত সাধু-ভাষাতেই লেখাটি লিখিত এবং লেখাটি যে দু'জনের লিত লেখা, তার প্রমাণ-স্বরূপ, প্রকাশিত 'টুকিটাকি'তে এ সম্বন্ধে ৎচন্দ্রের লিখিত একখানি পত্রাংশের প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে। ণে সেই মূল রচনাটি হুবহু এখানে প্রকাশ করা গেল।]

শরৎচন্দ্রের সহিত একদিন

ভোরে উঠিয়া, নিয়মমত খুব খানিকটা বেড়াইয়া, ফিরিবার পথে নিত্য যেমন করিয়া থাকি, বাজারটা করিয়া আনিলাম। দিন আর মাছ না কিনিয়া সেরখানেক মাংস কিনিলাম। গৃহিণীকে হিলাম, "আজ শুধু মাংসের ঝোল আর ভাত ; শেষ পাতে দই আর ন্দেশ।" গৃহিণী কহিলেন, "আজ না তোমার শরৎ বাবুর বাড়ী মন্ত্রণ ?"

চমকাইয়া উঠিলাম। ঠিকই ত বটে! কথাটা একেবারেই লিয়া গিয়াছিলাম। শরৎ বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণই ত বটে!

শরৎ বাবু মানে—উপন্যাস-সম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আগের বিবার তাঁহার সহিত কোন এক স্থানে আমার দেখা হয় এবং াজ রবিবারে তাঁহার গৃহে মধ্যাহ্নে খাইবার জন্য তিনি আমাকে মন্ত্রণ করিয়া বলেন যে, সকাল-সকালই যেন আমি তথায় য়া হাজির হই। নিমন্ত্রণটা অবশ্য বিশেষ কিছু উপলক্ষে নয় মনিই।

সুতরাং সাধের মাংস, দই, সন্দেশ পড়িয়া রহিল। তাড়াতাড়ি ানটা সারিয়া লইয়া ছুটিলাম—'নর্থ পোল' হইতে 'সাউথ পোল,' র্থাৎ বরানগর হইতে বালীগঞ্জ।

যখন মনোহরপুকুর রোডে তাঁহার নব-নির্মিত বাটিতে গিয়া ৌছিলাম তখন বেলা দশটা হইবে। আমি নিজে তো নিমন্ত্রণের থা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সেখানে গিয়া তাঁর হাব-ভাব দেখিয়া ঝিলাম, তিনিও সম্ভবত ভুলিয়া গিয়াছেন। আমাকে দেখিয়াই থাটা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। মনের লজ্জাটা ঢাকিয়া লইয়া লিলেন, "তা বেশই হোয়েছে, চল, আর বোসে দরকার নেই।" তা সত্ত্বেও আমি বসিলাম এবং প্রশ্ন করিলাম,—"যেতে হবে কোথায় ?"

তিনি কহিলেন, "আজ বোট্যানিকেল গার্ডেনে pen club-এর খুব খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার। চলো, তুমি যাবে আমার গেষ্ট হোয়ে।" ীকার করিতে পারিলাম না। বলিলাম "আপনার সঙ্গে সেখানে যাবো নিশ্চয়, কিন্তু খাবো আমি এইখানেই। এখানে খেয়ে তবে যাবো। কারণ নেমন্তন্নটা আমার এইখানেই।"

সুতরাং সেই ব্যবস্থাই হইল। উভয়েই আহারে বসিলাম। শরৎচন্দ্র বলিলেন,—"অত পেট ঠেসে খেও না, তা হোলে সেখানে গিয়ে কিছুই খেতে পারবে না। ক্লাবটাও যত বড়, সেখানে আজ খাওয়ার আয়োজনও তত বড়। সুতরাং সেখানকার কথা মনে রেখে পেটটা একটু খালি রেখো, দোহাই তোমার।" আমি তাঁর এই সদুপদেশে বিশেষ কিছু মনোযোগ না দিয়া কহিলাম, "আপনি যে কিছুই খাচ্ছেন না ?" তিনি কহিলেন, "আমিও তোমার মত বোকামী করবো না ; আমি ঐখানেই খাব। তোমার সঙ্গে বোসে—নেহাৎ দুটি না খেলে নয়, তাই।" আরো বোধ হয় কি যেন বলিলেন, কিন্তু সে কথায় কাণ দিবার মত তখন আমার মন ছিল না। আমি তখন একবাটি দইয়ের মধ্যে দুইটা সন্দেশ চটকাইয়া উহা গলাধঃকরণ করিবার কাজে তদ্গতচিত্ত। আর দুইটি সন্দেশ রাখিয়া দিয়াছি—'মধুরেণ সমাপয়েৎ'এর জন্য।

অতঃপর আহারান্তে তিনি তাঁহার 'সোফার' কালীকে ডাকিয়া গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিলেন। কালীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার খাওয়া হোয়েছে কালী ?" কালী কহিল—"আজ্ঞে, না।" শরৎচন্দ্র কহিলেন—"ঐখানে গিয়েই একেবারে খাবে'খন ; সেই ভাল।" সুতরাং কালীর আর খাওয়া হইল না। আমরা বোট্যানিক্যাল গার্ডেনের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। আমার যাত্রাটি মন্দ হইতেছে না। উত্তর হইতে দক্ষিণ, দক্ষিণ হইতে পূর্ব, পূর্ব হইতে আবার উত্তর এবং তথা হইতে পশ্চিম। পশ্চিম হইতে আবার পূর্ব ও উত্তর হইলেই আমার সর্বদিক পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয়।

যাহা হউক, পথ নেহাৎ অল্প নয়। গাড়ী দ্রুতগতিতে ছুটিতে লাগিল আর আমরা নানাপ্রকার গল্প-গাছা করিতে লাগিলাম। অবশেষে আমাদের গাড়ী, গার্ডেনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, গঙ্গার ধারে যেখানে ইউরোপীয় হোটেল, সেইখানে আসিয়া থামিল। সেই হোটেলেই আজ Pen Club-এর ভোজের ব্যবস্থা। সুতরাং উভয়েই গাড়ী হইতে নামিলাম। নামিলাম বটে, কিন্তু যাই কোথা ? চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ ; অতবড় একটা ব্যাপার, কিন্তু কোনদিকেই কোন সাড়া-শব্দ নাই। শরৎচন্দ্র চতুর্দ্দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে কহিলেন—"কই এঁদের কাকেও ত দেখতে পাচ্ছি না!" আমি কহিলাম—"এইখানেই ঠিক বটে ত ?" শরৎচন্দ্র কহিলেন—"হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। দশবার কোরে কার্ডখানা আমি পড়েছি।" আমি কহিলাম—"ভাল।"—বলিয়া গঙ্গার ধারে পায়চারী করিতে করিতে, জাহাজ, নৌকা, ঢেউ প্রভৃতি দেখিতে লাগিলাম এবং সময় কাটাইবার জন্য বোধ হয়, ঢেউ গুণিতেও লাগিলাম।

এদিকে শরৎচন্দ্র অনুসন্ধিৎসু চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া Pen club-এর মেম্বরদের খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি হোটেলের একটা চাপরাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুলোক সব আয়া নেহি ?" সে কহিল,

"বাবু লোক ? কোই বাবুলোগ তো নেহি আয়া, হুজুর। উধার দেখিয়ে—ওহি বটগাছকা নীচুমে বাবুলোককা সব খানা-পিনা হোগা মালুম হোতা।"—সুতরাং আবার গাড়িতে উঠিয়া এ-পথ, ও-পথ, ঘুরিয়া সেই বটবৃক্ষতলে যাওয়া হইল। সেখানে কতকগুলি কলেজের ছাত্র মিলিয়া পিক্‌নিক্ করিতেছিল। সুতরাং সেখান হইতে হতাশ হইয়া পুনরায় ইউরোপীয় হোটেলের সম্মুখেই আসা হইল। শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কার্ডে সময়টা কখন লেখা আছে ?" তিনি কহিলেন, "সমস্ত দিনই—বেলা আটটা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।" আমি আমার হাতঘড়িটা দেখিলাম—প্রায় তখন দেড়টা। শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "৮টা বেজে গেছে তো ?" কহিলাম "কিছু বিলম্ব আছে। উঠুন, ততক্ষণ এদের এই গাছতলার চেয়ারে বসে থাকা যাক্ !" খানিকক্ষণ বসিয়া থাকার পর শরৎচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন—"হোটেলের ম্যানেজারকে একবার জিজ্ঞাসা করে এলেই তো সব হাল মালুম হোয়ে যাবে এখন।" বলিয়া তিনি হোটেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। মিনিট পাঁচ সাত পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "সবই ঠিক ; এই হোটেলই বটে, আটটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্তও বটে, রবিবারও বটে, তবে, কি জানি—এরা সব এলো না কেন ?"

আমি কহিলাম, "আমি তো পেট ভরেই খেয়ে এসেছি, আমার জন্যে দুঃখু নেই ; কিন্তু আপনার আর কালীর বরাতেই"—

শরৎচন্দ্র যেন ইচ্ছা করিয়াই আমার কথাগুলি শুনিতে চাহিলেন না। তিনি যেন একটু চিন্তিত মনে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হোটেলের একটা 'বয়'কে ডাকিলেন, বলিলেন—"চা খাবার ত সময় হোল, সেটাতে আবার কোন ব্যাঘাত না হয়"—বলিয়া তিনি 'বয়'কে তিন কাপ চা আনিতে আদেশ দিলেন। আমাদের দু'জনের দু'কাপ আর কালীর এক কাপ। তিন কাপ চায়ের দাম আট আনা হিসাবে দেড় টাকা তিনি 'বয়ে'র হাতে দিয়া বলিলেন—"জল্‌দি লে আও।" জল্‌দিই আসিল। উভয়ে তখন চা খাইতে খাইতে নানারূপ গল্প করিতে লাগিলাম।

চা-পানান্তে আমার সিগারেটের দরকার, কিন্তু আমার সিগারেট ফুরাইয়া গিয়াছিল। শরৎচন্দ্র 'বয়'কে সিগারেটের কথা বলিলে সে কহিল—"এক প্যাকেট হুজুর নেহি মিলেগা, পঁচাশকো এক টীন মিলতা হায়।" আমি শরৎচন্দ্রকে কহিলাম—"সিগারেটের আর দরকার নেই। হয়ত আঠারো আনার এক কৌটো সিগারেট এখানে পাঁচ টাকাই দাম চেয়ে বসবে। কেন না, দু'পয়সা কাপ চা যদি এখানে আট আনা হয়, তাহোলে"—

"আরে, তা ত হবেই, এ আর বেশী কি ? সায়েবের হোটেল, বোট্যানিক্যাল গার্ডেন, গঙ্গার ধার। 'canopy'র নীচে, চেয়ার, 'বয়'—আট আনা কাপ, এ আর বেশী কি" ? তার পর 'বয়ে'র দিকে চাহিয়া কহিলেন—"লে আও এক ডিবিয়া।"

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পাইপ ও টোব্যাকো ছিল ; তিনি অনবরত তাহারই সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সিগারেট—শুধু আমারই জন্য ; যাহা হউক, অনতিবিলম্বে 'বয়' পঞ্চাশটি Gold flake-এর একটা টীন ও তাহার ক্যাশমেমোটি হস্তে লইয়া উপস্থিত হইল। দেখা গেল, চায়ের দামের তুলনায় সিগারেটের দাম খুবই কম ধরা হইয়াছে, অর্থাৎ বাজারের দাম একটাকা দু' আনার স্থলে একটাকা চার আনা মাত্র।

অতঃপর শরৎচন্দ্র তাঁহার 'পাইপে'র এবং আমি 'গোল্ডফ্লেকে'র ধূমপান করিতে করিতে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এ-গাছতলা ও-গাছতলা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কখনো কোন গাছতলায় বসিয়া নানারকম গল্পগুজব করিয়া কাটাইলাম। কখনো বা গঙ্গার ধারে দু'জনে পাইচারী করিতে করিতে নানারূপ আবশ্যক ও অনাবশ্যক আলোচনায় সময় কাটাইতে লাগিলাম। এইভাবে, pen club-এর বিরাট ভোজ আমরা বিরাট ভাবে উপভোগ করিয়া বেলা ৩টা আন্দাজ সময়ে ফিরিবার উদ্দেশ্যে মোটরে উঠিলাম।

আসিতে আসিতে, শিবপুরের পথে একস্থানে শরৎচন্দ্র কালীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কালী ! থামো, থামো।" কালী গাড়ী থামাইলে, তিনি কহিলেন—"কেন থামাতে বললুম, ভুলে যাচ্ছি ত'!······ওহো ! মনে পড়েছে। এক বোতল সোডা ঐ দোকানটা থেকে নিয়ে এস তো কালী, বড্ড তেষ্টা পাচ্ছে।"

মিনিট কয়েক পরে, আবার এক জায়গায় ঐ ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"রাখো—রাখো, কালী—রাখো।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আবার কি ? 'সোডা' ?"

"না। ঐ যে বুড়ো লোকটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে র'য়েছে। ওকে ডেকে আনো কালী,—ঐ যে, ওই ভিখিরি'টা।"

গাড়ী থামাইয়া কালী তাহাকে ডাকিয়া আনিল। ভিখারীই বটে। ছিন্ন মলিন বস্ত্র, জীর্ণশীর্ণ দেহ, দুঃখ-কষ্ট ও অনাহারে, বুড়া না হইলেও, বৃদ্ধত্বের ছাপ তাহার সর্বাঙ্গে। মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট। শরৎচন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি ভিখিরী ?"

"আজ্ঞে, না।"

"না ? আচ্ছা, কিছু খাবে ?"

"কি আর খাব ?"

শরৎচন্দ্র তাঁহার সাটিনের থলিয়ার ভিতর হইতে কিছু পয়সা-কড়ি বাহির করিয়া হাতে লইলেন। তাহার মধ্যে সিকি, দু'আনি, আনি, পয়সা—সবই ছিল এবং সবগুলি হইয়া আন্দাজ গোটা দুই টাকা হইবে। সেইগুলি হাতে ধরিয়া তিনি আবার তাহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিছু খেতে চাও ত বল ?"

তখন লোকটি হাত পাতিয়া বলিল—"তা দিন বাবু, কিছু খাব !"

লোকটি চলিয়া গেলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এটা কি রকম হল, দাদা ? দানটা কি ঠিক উপযুক্ত পাত্রেই করলেন ?"

"দেখে বুঝলে না, লোকটা খেতে পায় না ?"

"বোধ হয়, তা নয়। লোকটা নেশাখোর বলেই মনে হয়। হয়—নেশা, নয়—জুয়ো, নয়ত ঐ ধরণের আর কিছু ; কিন্তু ভিখিরী ও মোটেই নয়।"

সামনের পথের দিকে নজর রাখিয়া কালী বলিল—"খুব সম্ভব লোকটা নেশাখোরই হবে।"

নিজের মনের কাছে বোধ হয় ঠকিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া, শরৎচন্দ্র আর কোন কথা না কহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

হাওড়ার পোল পার হইয়া গাড়ী যখন এ পারে আসিল, তখন শরৎচন্দ্র কহিলেন—"মোটে ত এখন সাড়ে তিনটে, দিনের শেষ

হোতে ত এখনো অনেক বাকী, এ সময়টা কয়া যায় কি ? কিছুতো একটা করতে হবে ?"

আমি বলিলাম—"করবার কাজ ত যথেষ্টই রয়েছে ; আপনি ছুটুন দক্ষিণে, আর আমি পাড়ি দি—উত্তরে।"

"না ; তোমাকে এখন ছাড়া হবে না"—বলিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার ঘড়িটা আবার একবার দেখিয়া কালীকে কহিলেন—"চলো 'রঙমহল'।"

'রঙমহলে' সেদিন 'চরিত্রহীনে'র ম্যাটিনী অভিনয়। সেখানে পৌঁছাইয়া শরৎচন্দ্র কহিলেন—"এখনো ত প্রায় ঘন্টাখানেক দেরি, উপেনকে আনানো যাক। কালী গাড়ী লইয়া উপেন বাবুকে আনিতে গেল। উপেন বাবু হচ্ছেন—'বিচিত্রা'-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,—শরৎচন্দ্রের মাতুল। তাঁহাকে 'বিচিত্রা' অফিস হইতে আনিবার জন্য গাড়ী চলিয়া যাইবার পরক্ষণেই শরৎচন্দ্র বলিলেন—"বড় ভুল হোয়ে গেল ত ? এখানে—"

তাঁহার কথার উপরেই আমি বলিলাম—"আবার কি ভুল হোল ? তবে, আজ ভুলের পর ভুল হওয়াটা কিছুই আশ্চর্য্যের নয়। আজ ত দেখছি, আমাদের ভুলেরই দিন। পয়লা এপ্রিল যেমন ওদের "all fools day," তেমনি আমাদের আজ All ভুলস day ! তা আবার কি ভুল হোল, শুনি ?"

"না, তেমন কিছু নয়। বলছি যে, এখানেই বা একটা ঘণ্টা বসে থাকি কি কোরে ? উপেনের ওখানে গেলেই ত হয়।" সঙ্গে সঙ্গেই একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া উপেন বাবুর বাসায় যাওয়া হইল।

'বিচিত্রা' অফিস এবং উপেন বাবুর বাসা—ফড়িয়াপুকুরে। সেখানে গেলেই তিনি কহিলেন—"এই ত মোটর এল ; তাতে না এসে, ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে পেছন পেছন আসবার কারণ কি ?" কারণ যে কি, তাহা আমি উপেন বাবুকে বুঝাইয়া দিলাম—এবং শুধু তাহাই নহে, সেদিনের সমস্ত ব্যাপারটা গোড়া হইতে তাঁহাকে সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। সমস্ত শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে জানাইলেন যে, Pen Club-এর খাওয়া-দাওয়া আজ রবিবার নয়, তাহা আগামী রবিবারে। তাঁহার কাছেও নিমন্ত্রণের কার্ড ছিল, দেখা গেল—তাহাই বটে। তখন আমার এত হাসি পাইল যে, তাহা আর বলিবার নয় ; কিন্তু সমস্ত দিনের দুর্ভোগ ভুগিবার পর হাসিবার মত অবস্থা তখন আর ছিল না।

যথাসময়ে আবার 'রঙমহলে' আসা হইল, ভিতরে আসিয়া দেখা গেল, লোকে লোকারণ্য, তিলধারণের স্থান নাই। বোধ হয়, রঙমহলের ম্যানেজার তখন—শ্রীসতু সেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া আসিয়া, তিনখানা চেয়ার আনাইলেন এবং তাহা একেবারে সামনের দিকে পাতিয়া দিলেন।

অভিনয় শেষ পর্য্যন্তই দেখা হইল, খুব ভালই হইয়াছিল। অভিনয় ভাঙ্গিয়া গেলে, তরুণ সুদর্শন অভিনেতা শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার অভিনয় কেমন হইয়াছে। তিনি 'দিবাকরের' ভূমিকা লইয়া নামিয়াছিলেন। বাস্তবিকই তাঁহার অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল। আমার প্রশংসা তাঁহাকে খুবই উৎসাহ ও আনন্দ দান করিল।

যাহা হউক, সারাদিনের ঘোরা-ঘুরির পর যখন বাটী ফিরিলাম, তখন রাত ১১টা। আরো আধঘণ্টা আগেই বাড়ী পৌঁছাইতে পারিতাম ; কিন্তু আমি 'বাস' হইতে বরানগরে না নামিয়া ভুলক্রমে 'আলমবাজার' পর্য্যন্ত গিয়া পড়িয়াছিলাম। ফিরতি বাসে আবার বরানগরে আসিয়া নামি। যাহা হউক, সারাদিনের ভুলের মধ্যে ঘুরিয়া গৃহে আসিয়া দেখি, আরও একটা ভুল হইয়া গিয়াছে। Gold Flake-এর সেই কৌটাটা ভুলক্রমে আমার পকেটস্থ হইয়া আমার গৃহে আগমন করিয়াছে। অবশ্য, ৫০টার মধ্যে গোটাদশ আমার দ্বারা খরচ হইয়া গিয়াছিল। স্থির করিলাম, ৪০টি সিগারেট সমেত কৌটাটি কালই শরৎচন্দ্রকে দিয়া আসিতে হইবে। কিন্তু স্থিরীকৃত কার্য্যটি পরদিন সম্পন্ন করা ঘটিয়া উঠিল না ; অধিকন্তু তন্মধ্য হইতে আরো কয়েকটি সেদিন খরচ হইয়া গেল। তাহার পরের তিন দিনও যাইবার অবকাশ করিতে পারিলাম না। পঞ্চম দিনে যখন কৌটাটি পকেটে করিয়া তাঁহার গৃহে গেলাম, তখন তাহাতে ছিল পাঁচটি। তারপর ঘণ্টাখানেক ধরিয়া গল্প-গাছা করিবার পর, যখন টেবিলের ওপর কৌটাটি রাখিয়া বাড়ী ফিরিবার অভিপ্রায়ে উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তখন তন্মধ্যে রহিল—একটি। শরৎচন্দ্র কহিলেন—"ওটা আর ভুলে রেখে যাচ্ছ কেন ? ধরিয়ে টানতে টানতে চলে যাও।"

আমি কহিলাম—"ঠিকই ত ; ভুলে যাচ্ছিলুম—" বলিয়া শেষ সিগারেটটি ধরাইয়া টানিতে টানিতে গৃহের বাহিরে চলিয়া আসিলাম।*

---

* গত ১৩৬১ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে 'শরৎ-স্মৃতির টুকিটাকি' প্রকাশিত হবার পর, আমার বাসা পরিবর্তনের হাঙ্গামা-হট্টগোলে রচনাটির বাকী পাণ্ডুলিপি খোয়া যায়। এ বয়সে নতুন কোরে আবার লেখা যে কতটা কঠিন, তা আমার মত যাঁদের বয়স, তাঁরাই বুঝবেন। অথচ বহু পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে বাকীটুকু লেখার জন্য জোর তাগিদ এসেচে সুতরাং বৎসরাধিক কাল পরে আবার 'শরৎ-স্মৃতির টুকিটাকি' লিখতে বাধ্য হলুম। আমার অনিচ্ছাকৃত এই দীর্ঘ-দিনের বিলম্ব পাঠক-পাঠিকাগণ ক্ষমা করবেন।—লেখক।

লেখকলেখিকার কর্তব্য

A writer naturally must earn money in order to be able to live and write, but under no circumstances must he live and write in order to earn money...The writer in no wise considers his work a *means*. It is an *end in itself*; so little is it a means for him and others that he sacrifices *his* existence to *its* existence, when necessary......The freedom of the Press consists primarily in not being a trade. The writer who degrades it by making it a material means deserves, as a punishment for this inner slavery, outer slavery —censorship ; or rather his existence is already his punishment.

—Karl Marx
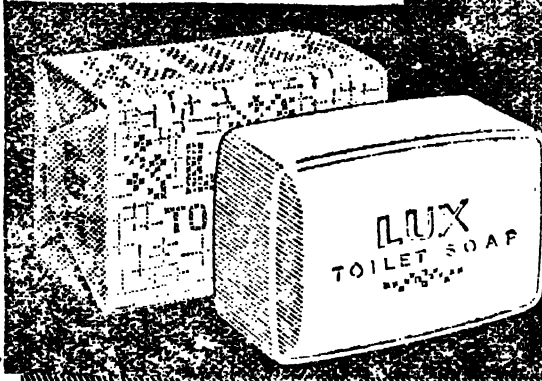
[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

ডি. এচ. লরেন্স

মনের মধ্যে হঠাৎ এক একটা ভাবনার পাখা যেন ঝটপট করে উঠছিল, মনে হচ্ছিল এ পাপ, এ অন্যায়। আবার নিজের মনেই জানতে ইচ্ছে করছিল, 'কেন? অন্যায় কিসে? কোন দিক দিয়ে অন্যায়?' এর কোন উত্তর পাওয়া সম্ভব ছিল না। তবু ধ্বংসের পথে নামতে গিয়ে বুকের মধ্যে কোথায় যেন আগুনের হলকা ছোটে, পল বাধা পায়, ফিরে আসে।

রাস্তা দিয়ে একটা গরুর গাড়ি গোঙাতে গোঙাতে চলেছিল। হঠাৎ বিজলী বাতির 'মিটারে' কী একটা শব্দ হ'ল, বাতি গেল নিবে। পল নড়ল না, এক দৃষ্টে সামনের দিকে চেয়ে বসে রইল। ইঁদুরগুলো ভয়ে পালিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে শুধু চিমনীর আগুনের লাল আভা।

তারপর আবার বুকের মধ্যে সেই প্রশ্নোত্তর শুরু হ'ল। এবার আগের চেয়েও স্পষ্ট, আগের চেয়েও নির্ভুল।

'উনি তো আর বেঁচে নেই। এই যে সারা জীবন উনি সংগ্রাম ক'রে গেলেন, এর ফল হ'ল কী?'

এটা পলের নৈরাশ্যের কথা। এই জন্যেই মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় মায়ের পথ ধরে মৃত্যুর দিকেই পা বাড়ায়।

আবার উত্তর আসে, 'তুমি তো বেঁচে আছ।'

—'তাতে ওঁর কী হ'ল? উনি তো নেই।'

—'আছেন। তোমার মধ্যে বেঁচে আছেন।'

পল এতে সান্ত্বনা পায় না। তার বুকের বোঝা আরও ভারী হয়ে ওঠে। আবার মনের মধ্যে কথা জাগে, 'ওঁর জন্যেই তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে।' ওঁর জন্যে? শুধু ওঁর জন্যে? পলের মন খুঁতখুত করতে থাকে। বাঁচবার আগ্রহ জাগি-জাগি করেও জাগে না। আবার কান পেতে থাকে। শোনে, কে যেন বলছে, 'মায়ের জীবনধারাকে ব'য়ে যেতে হবে তোমায়। তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে তোমাকে।'

না, না, না। পল চায় না বেঁচে থাকতে। সব ফেলে দিয়ে সে ছুটে চলে যেতে চায়।

বাঁচবার ইচ্ছা বলে, 'কেন? তুমি ছবি আঁকতে পার, তাই আঁকো। কিম্বা বিয়ে করে ছেলেপুলের বাপ হও। এই দু'দিকেই তুমি মায়ের সাধনাকে রূপ দিতে পারো।'

'কিন্তু ছবি আঁকা আর বাঁচা এক কথা নয়।'

'তা'হলে বাঁচো। সত্যিকারের বাঁচার মত বাঁচো।'

খুঁতখুঁতে মন প্রতিপ্রশ্ন করে। বলে, 'বিয়ে করব কাকে?'

—'যতদূর সম্ভব ভালো দেখে খুঁজে নাও।'

—'কে? মিরিয়াম?'

পল কান পেতে মনের কথা শোনে, কিন্তু কোন কথাই বিশ্বাস করতে পারে না।

তার পরে এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে, সোজাসুজি চলে যায় শোয়ার ঘরে। শোয়ার ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে পল সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তার হাতের মুঠো পাকিয়ে ওঠে। তার সমস্ত অন্তর নিংড়ে শুধু দু'টি কথা অগ্নিস্রাবের মত বেরিয়ে আসতে চায়—'মা মাগো'। নিজেকে সে সম্বরণ করে নেয়। প্রাণপণ চেষ্টা করে যাতে কথাগুলো তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে না যায়। ও কথা আর সে বলবে না। মৃত্যু-পথের পথিক হতে সে চায় না, চায় না নিঃশেষে ফুরিয়ে যেতে। জীবনের কাছে তার হার হয়েছে এ কথা সে কিছুতেই মানবে না। মৃত্যুর আওতায় কিছুতেই সে পা বাড়াবে না।

এবার পল শয্যায় এলিয়ে দেয় নিজেকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে তার চোখ জড়িয়ে ধরে, ঘুমের কোলে আপনাকে তুলে দিয়ে পল নিশ্চিন্ত হয়।

এমনি করে দিন কাটে। পল যেন জীবন-মরণের দোলায় দুলছে। এক একবার মরণের দিকে ঢলে পড়ে, তার পর আবার নিজেকে টেনে নিয়ে আসে জীবনের দিকে। তার প্রাণের সঙ্গী কেউ নেই। সব চেয়ে দুর্ব্বহ এই যে, কোথায়ও তার যাবার নেই, কিছু করবার নেই, কিছু বলবার নেই, সে নিজেই যেন নিজের মধ্যে নেই। মাঝে মাঝে পাগলের মত শূন্য মনে রাস্তা ধরে ছুটে চলে। মাঝে মাঝে সত্যিই সে পাগল হয়ে যায়, পৃথিবী যেন হারিয়ে যায় তার কাছে, তার পর আবার ধরা দেয় চোখের সামনে। পল হাঁপিয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে মদের দোকানের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে মনে হয় সব কিছু যেন হঠাৎ তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। দোকানের পরিচারিকার মুখখানা, ওখানে গল্পরত মদ্যপের দল, এখানে নিজের টেবিলে রাখা গ্লাসটি—সব কিছুই তার চোখে পড়ছে যেন বহু দূর থেকে। তার আর ওদের মধ্যে কী একটা ব্যবধান! ওদের ধরতে-ছুঁতে সে পায় না। এদের কাউকেই সে চায় না, এমন কি মদের গ্লাসটিতেও তার যেন প্রয়োজন নেই। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সামনের আলোকিত রাস্তাটির দিকে চেয়ে থাকে। সে যেন এখানকার কেউ নয়, এই পথের মেজের মধ্যে তার স্থান নেই। কিসে যেন তাকে আলাদা করে রেখেছে। ওখানে যা কিছু প্রতিনিয়ত ঘটছে, তাদের সঙ্গে কোন যোগ নেই তার। মনে হয় যেন শত চেষ্টাতেও রাস্তার ঐ ল্যাম্প-পোষ্টগুলিকে সে ছুঁতে পারবে না। তবে কোথায় যাবে সে? কী করবে

পলের দম আটকে আসে। মনের উদ্বেগ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। ভয় হয় এই বুঝি বুক ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

তারপর আবার নিজেকে ফেরায় পল। বলে, 'না, না, এমন হলে ত' চলবে না।' ঘরে ফিরে গিয়ে আবার বসে মদের টেবিলে। মাঝে মাঝে মদ খেলে বেশ ভালই লাগে। মাঝে মাঝে ফল হয় খারাপ। রাস্তা দিয়ে ছুটে চলতে ইচ্ছে হয়। এখানে, ওখানে, সেখানে—কত জায়গায় সে যে ছুটে যায়, তার ইয়ত্তা নেই। কাজে লাগবার সঙ্কল্প করে পল, কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসে। কিন্তু দু'এক আঁচড় টানার পরই পেন্সিলটা ছুঁড়ে ফেলে উঠে পড়ে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় কোন একটা ক্লাবে, যেখানে গিয়ে তাস কিম্বা বিলিয়ার্ড খেলতে পারে, অথবা মদের দোকানের পরিচারিকার সঙ্গে গিয়ে একটু রসিকতা করে আসে। অথচ সেই মেয়েটির দিকে এমনিতে তার চোখও পড়ে না, যে কোন নিষ্প্রাণ জিনিসের মত এই মেয়েটিকে বারবার সে দেখে এসেছে।

এ ক'মাসে পল বেশ শুকিয়ে গিয়েছে, চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে। আরশি দিয়ে নিজের চোখের দিকে চেয়ে দেখবার সাহস হয় না। নিজের দিকে নজর দেবার সময়ও তার নেই। নিজের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াবার উপায়ই শুধু খোঁজে, কিন্তু কাকে অবলম্বন করে সে পালাবে? কার হাত ধরে সে মুক্তি পাবে? নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ মিরিয়ামের কথা মনে পড়ে। হয়তো —এখনও হয়তো—

এমনি সময়ে হঠাৎ এক রবিবারে গির্জেয় গিয়ে পল মিরিয়ামকে দেখতে পেল সামনে। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। সবাই আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে স্তোত্র গাইছে। মিরিয়ামও গানে যোগ দিয়েছে। গির্জের বাতিটি তার নীচের ঠোঁটের উপর প্রতিফলিত হয়ে ঝিকমিক করে উঠছে। দেখে পলের মনে হ'ল, ও যেন সত্যি সত্যি আশা করবার মত কিছু খুঁজে পেয়েছে। হয়তো ইহলোকের নয়, পরলোকের আশা—তাহলেও ও কিছু একটা পেয়েছে। একটু শান্তি, একটু প্রাণের স্পর্শ। ওকে দেখে পলের মন সমবেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠল। ও গান গাইছে, সে গানে সুদূরের জন্যে কী করুণ আকুতি। পল স্থির করল এবার ওর উপরেই নিজের আশা-ভরসার ভার ছেড়ে দিতে হবে! কতক্ষণে প্রার্থনা শেষ হবে, ওর সঙ্গে দুটি কথা বলে যেতে পারবে, পল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ভিড়ের চাপে মিরিয়াম ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল পলের একটু আগে আগেই। সামনে একটু দূরে দূরে মিরিয়াম চলেছে, পলের প্রায় নাগালের মধ্যেই বলা চলে। পল যে ওখানে রয়েছে, মিরিয়াম তা জানে না। পল দেখল ওর কোঁকড়ানো কালো চুলের নীচে গলার অগ্রভাগটি যেমন গোলাপী, তেমনি ঈষৎ আনত। মনে হল, তার চেয়ে ও ঢের' বেশী বড়, ঢের বেশী শক্তি ওর মনে। এবার থেকে ওর উপর ভর করেই জীবনের পাড়ি জমাতে হবে।

গির্জে থেকে বেরিয়ে মিরিয়াম নানা লোকজনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে চলেছিল। এ ওর স্বভাব। ভিড়ের মধ্যে ও যেন হারিয়ে যায়, জনতার মধ্যে ওকে মানায় না। পল এগিয়ে গিয়ে ওর হাতের উপর হাত রাখল। মিরিয়াম চমকে উঠল। ভয়ে ওর বড় বড় দু'টি কটা চোখ আরও বিস্ফারিত হয়ে উঠল, তারপর সামনে পলকে দেখে কৌতূহলে ভরপুর হয়ে

উঠল। পল মিরিয়ামের দৃষ্টির সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না।

মিরিয়ামের কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। সে বলল, 'আমি—আমি জানতুম না'—

'আমিই কি জানতুম?' পল বলল। বলে দূরের দিকে চেয়ে রইল। মনের মধ্যে যে আশা জেগে উঠতে চেয়েছিল, সেটা আবার যেন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

পল শুধাল, 'তুমি শহরে কি করছ?'

—'আমার বোনের বাড়িতে আছি। এইখানে থাকেন ওঁরা।'

—'তাই বলো! ক'দিন আছ আর?'

—'বেশী নয়। কাল অবধি।'

—'তোমাকে কি এখুনি বাড়ি যেতে হবে?'

মিরিয়াম প্রশ্ন শুনে ওর দিকে চাইল, তারপর মুখখানা নীচু করে বলল, 'না, এমন কিছু জরুরী কাজ নেই।'

তারা ট্রেণ্ট ব্রিজ-এর ট্রাম ধরল। পল বলল, 'রাত্রে আমার ওখানেই খেও। তারপর তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাব।'

মিরিয়াম আস্তে আস্তে ধরা গলায় বলল, 'আচ্ছা।'

গাড়িতে বিশেষ কোন কথা হ'ল না। সেতুর নীচে ট্রেণ্ট নদীর জল ফুলে ফুলে চলেছে। সামনে যতদূর দু'চোখ যায় সব অন্ধকার। পলের বাসা শহরের এক প্রান্তে, তার সামনে নদী তীরের প্রকাণ্ড মাঠগুলো ধূ ধূ করছে। গাছপালা বড়ো বেশী নেই। নদীতে জল এখন কানায় কানায়। এই নিঃশব্দ জলরাশি আর দিগন্তবিসারী অন্ধকারকে একপাশে রেখে দু'জনে চুপি চুপি লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চললো।

রাত্রের খাবার সাজানো ছিল। পল ঘরে ঢুকে জানালার পর্দা টেনে দিল। টেবিলে ছিল এক গোছা লাল 'এনিমোন'। মিরিয়াম নীচু হয়ে তার গন্ধ নিতে গেল। আঙুল দিয়ে ফুলগুলোর স্পর্শ নিতে নিতে মিরিয়াম চাইল ওর দিকে। বললো, 'চমৎকার ফুলগুলো। নয়?'

—'হ্যাঁ। তুমি কি খাবে? কফি?'

—'তা'হলে ত' ভালই হয়।'

—'তা'হলে বসো একটু।'

পল রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। মিরিয়াম তার টুপি, কোট ইত্যাদি খুলে রেখে ঘরের জিনিসপত্র দেখে বেড়াতে লাগল। জিনিসপত্র বলতে বড়ো বেশী কিছু নেই। ফাঁকা ফাঁকা লাগে ঘরটাকে। দেয়ালে টাঙানো তার নিজের ফটো, ক্লারার ফটো, আর এ্যানির একখানা ফটো। আঁকার টেবিলে ওটা কি? মিরিয়াম কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল। দেখল শুধু কয়েকটা এলোমেলো তুলির টান। আচ্ছা, আজকাল ও কী বইটই পড়ছে? গিয়ে দেখল একটা সস্তা উপন্যাস। রকের উপর চিঠিগুলো খুঁজে দেখতে গেল। চিঠিগুলো হয় এ্যানির নয় আর্থারের। নয়ত কোন নাম না জানা লোকের হাতে লেখা। পল যা কিছু নিজের হাতে স্পর্শ করেছে, যত কিছু জিনিস ওর নিজস্ব, সবের মধ্যেই কী যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করে মিরিয়াম, এরা যেন তাকে বেঁধে রাখে। কত দিন হ'ল পল চলে গেছে তার কাছ থেকে, আজ ওকে নতুন করে আবিষ্কার করতে ইচ্ছে করে, জানতে ইচ্ছে হয় ও আজকাল কী করে, কী ভাবে! কিন্তু তার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করতে পারে এমন কিছু উপাদান এ ঘরে নেই। দেখে দেখে মিরিয়ামের অশান্তিই শুধু বাড়ে। এ ঘরের সব কিছুই যেন অকারণে আঘাত করতে উদ্যত হয়ে ওঠে, সান্ত্বনার বাষ্পও এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

মিরিয়াম পলের আঁকা একটা ছবির বই ঝুঁকে পড়ে দেখছিল, এমন সময় পল কফি তৈরী করে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। বলল, 'নতুন কিছু নেই এতে। একটাও তোমার ভাল লাগবে না।'

কফির ট্রে'টা টেবিলে রেখে মিরিয়ামের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। মিরিয়াম আস্তে আস্তে পাতা ওলটাচ্ছে, যেখানে যেটুকু আছে সবটুকু ভাল করে দেখে না নিলে তার তৃপ্তি হবে না।

এবার খেতে বসল দু'জনে।

পল বলল, 'একটা কথা শুনছিলাম। তুমি নাকি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার জন্যে তৈরি হচ্ছ?'

মিরিয়াম মুখ নীচু করে বলল, 'ঠিকই শুনেছ।'

—'সেটা কি রকম, শুনতে পারি?'

—'কি রকম আবার! তিন মাসের জন্যে ব্রাউটনের কৃষি-কলেজে ভর্তি হতে যাচ্ছি, তার পর হয়ত ওখানেই একটা শিক্ষয়িত্রীর কাজ জুটে যাবে।'

—'তাই বল। তা বেশ ত'। তুমি ত' বরাবরই নিজের মতে চলবার স্বাধীনতা চাইতে।'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু আমাকে জানাও নি কেন?'

—'আমি নিজেই ত' জানলুম গত সপ্তাহে।'

—'কিন্তু', পল বলল, 'আমি ত' শুনেছি মাসখানেক আগে।'

—'হতে পারে, কিন্তু তখনও কিছু ঠিক হয় নি।'

পল অনুযোগের সুরে বলল, 'তা হলেও তুমি যে চেষ্টা করছ, সে-কথাও ত' কই আমায় বল নি।'

মিরিয়াম খেয়ে যাচ্ছিল যেন জোর করে। এ ভঙ্গী পলের পরিচিত। সে জানে মিরিয়ামকে প্রকাশ্যে কোন কিছু করতে বললেই সে এমনধারা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছ, সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক হয়ে যাওয়াতে?'

—'হয়েছি বৈকি।'

—'হ্যাঁ—কিছু একটা করলে বটে তুমি।' কথাটা এ ভাবে বললেও, মনে মনে কিন্তু পল দুঃখিতই হ'ল।

মিরিয়াম প্রতিবাদ জানাল। সোজা হয়ে বসে বলল, 'শুধু কিছু একটা নয়—এ তার চেয়েও বড়ো।'

পল মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। মিরিয়াম জিজ্ঞেস করল, 'হাসলে যে! এ বড়ো কাজ নয়?'

পল বলল, 'আমি ত' অস্বীকার করছি না। এটা বড়ো কাজ নয়, এমন কথা আমি বলতে যাব না। তবে তুমিও দেখবে যে নিজের পায়ে ভর দিয়ে নিজে দাঁড়ানোটাই সব-কিছু নয়।'

খেতে খেতে মিরিয়ামের গলায় যেন খাবারগুলো আটকে যাচ্ছিল। বলল, 'জানি। একেই সব কিছু বলে আমি ধরে রাখিনি।'

পল বলল, 'আমার কি মনে হয় জানো? পুরুষ মানুষের কাছে কাজই জীবনে সব চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে পারে, যদিও আমার কাছে তা নয়। কিন্তু মেয়েদের কাছে কাজ শুধু জীবনের একটা অংশ। তাদের সত্যিকারের রূপ এর মধ্যে দিয়ে ফোটে না।'

মিরিয়াম বলল, 'কেন? পুরুষমানুষই কি তার জীবনের সবটুকু কাজের মধ্যে ঢেলে দিতে পারে?'

—'হ্যাঁ, প্রায় সবটুকু।'

—'আর মেয়েরা যেটুকু দেয়, সেটুকু তাদের জীবনের সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় অংশ, কেমন?'

—'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ তুমি।'

শুনে রাগে মিরিয়ামের দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। বলল, 'এ কথা যদি সত্যি হয়, তা'হলে মেয়েদের লজ্জা রাখবার ঠাঁই নেই।'

পল বলল, 'লজ্জার জানি কথাটা সত্যি। তবে সব কথা আমি নাও জানতে পারি।'

খাওয়ার পরে দু'জনে দু'টি চেয়ার নিয়ে আগুনের পাশে গিয়ে বসল। মিরিয়ামের পরনে ঘন কালো রঙের একটা হাল্কা পোষাক। তার ম্লান রঙ আর সাদাসিধে হাত-পায়ের সঙ্গে জামাটাকে বেশ মানিয়েছে বলতে হবে। কোঁকড়া চুলগুলো এখনও খুলে খুলে উড়ছে, কিন্তু মুখখানা আগের চেয়ে পরিপক্ক, গলাটিও আগের চেয়ে কৃশ। পলের মনে হ'ল ও যেন বুড়ো হয়ে গেছে, বয়েসে ও যেন ক্লারার চেয়েও বড়ো। ওর যৌবনের মুকুল ফুটে উঠে দু'দিনেই ঝরে গেছে। কেমন একটা কাঠিন্য, একটা নিস্তরঙ্গ ভাব এসেছে ওর জীবনে। মিরিয়াম জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন চলছে তোমার?'

—'বেশ ভালই বলতে হবে।' পল জবাব দিল।

মিরিয়াম ওর দিকে চেয়ে রইল, ও আর কিছু বলে কি না। তার পর গলাটা খাটো করে বলল, 'না।'

মিরিয়ামের হাত দু'টি হাঁটুর উপর ন্যস্ত। কি একটা অকারণ চাঞ্চল্য ওর সারা দেহে, নিজের উপর এক বিন্দু বিশ্বাসও যেন তার নেই। দেখে পলের মন কেঁপে ওঠে। মুখে কাষ্ঠহাসি হাসে। মিরিয়াম নিজের আঙুলগুলি রাখে ঠোঁটের উপর। পল চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ে আছে। তার ক্ষীণ, রৌদ্রতপ্ত, বেদনার্ত দেহটিকে এলিয়ে দিয়েছে চেয়ারের গায়ে। হঠাৎ মিরিয়াম মুখ থেকে আঙুল নামিয়ে নড়ে চড়ে বসল, ওর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ক্লারার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে তোমার?'

—'হ্যাঁ।'

চেয়ারের গায়ে পলের দেহটা যেন এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে।

মিরিয়াম বলল, 'জানো, আমি ভাবছি আমাদের বিয়ে হওয়াটাই বোধ হয় ভালো।'

পল চোখ খুলে চাইল। বহুকাল এমন সচেতন ভাবে চোখ সে চায় নি। মিরিয়ামের কথাগুলোকে আর উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা তার রইল না। জিজ্ঞাস করল, 'কেন?'

মিরিয়াম বলল, 'কেন তুমি দেখতে পাও না? জানো না—নিজেকে কেমন করে নষ্ট করছ তুমি? আজ যদি তোমার দেহ ভেঙে পড়ে—তুমি মরে যাও, তা হলেও আমি জানতে পারব না। আমাদের পরিচয়ের কি মূল্য রইল তবে?'

—'আর ধরো যদি আমাদের বিয়েই হয়?' পল প্রতিপ্রশ্ন করল।

—'তাহলে আর যাই হোক, তোমাকে এমন করে নষ্ট হতে যেতে আমি দেব না। এমন ক'রে তুমি নষ্ট হয়ে যাবে যত সব মেয়েদের খপ্পরে পড়ে—এই দুর্গতি থেকে তোমায় বাঁচাতে পারি আমি।'

পলের মুখে হাসি ফুটে উঠল, আপন মনে পুনরুক্তি করল, 'খপ্পরে পড়েই বটে!'

মিরিয়াম জবাব না দিয়ে মুখ নীচু করল। পলের হাত-পা আবার অবশ হয়ে এলো। আস্তে আস্তে সে বলল, 'না। আমার বিশ্বাস হয় না। বিয়ে হলেই কি হবে?'

মিরিয়াম বলল, 'আমি ত' শুধু তোমার কথাই ভাবি।'

—'আমি জানি।' পল বলল, 'কিন্তু আমাকে তুমি এত বেশী ভালবাস যে সর্ব্বদা যেন নিজের গলায় বলিয়ে রাখতে চাও। আমার মন হাঁপিয়ে ওঠে।'

মিরিয়াম মাথা নীচু করে মুখে আঙুল দিয়ে বসে রইল। তার অন্তর ছাপিয়ে তিক্ততার জ্বালা। সে বলল, 'বিয়ে না করে তুমি করবে কি?'

—'জানি না'। পল বলল, 'এমনি করেই চলে যাবে কোন মতে। ভাবছি শীগ্‌গির একবার কোথাও দূর দেশে চলে যাব।'

ওর বুক-ভরা নিরাশা আর এই অকারণ জেদ দেখে মিরিয়াম আর স্থির থাকতে পারল না। আগুনের সামনে ওর পাশটিতে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। মিরিয়াম জানে এখন সে ছাড়া পলের আর গতি নেই। এখন সে যদি উঠে গিয়ে ওকে টেনে নিতে পারে, ওর গলায় বাহু মেলে দিয়ে জোর ক'রে বলতে পারে, 'তুমি আমার,—তুমি আমারই' তা'হলে পল বিনা আপত্তিতে নিজেকে তার হাতে তুলে দেবে। কিন্তু এত সাহস কি তার আছে? নিজেকে সে অতি সহজেই অন্যের কাছে বিসর্জ্জন দিতে পারে, কিন্তু অন্যের উপর নিজের দাবী জানাবার মত জোর কি তার আছে? ওই চেয়ারের গায়ে যে ক্ষীণ দেহটি এলিয়ে আছে, তার কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যেও সে ভুলতে পারে না। কিন্তু না, এত সাহস তার নেই যে কাছে গিয়ে বাহুর বন্ধনে ওকে টেনে নেয়; গিয়ে বলে, 'দাও আমাকে। এই দেহের উপর দাবী শুধু আমার!' কিন্তু মনে মনে চায়। তার নারী-হৃদয়ের সমস্ত কামনা সেই ভাবনাগুলোকে ঘিরে জেগে ওঠে। তবু সাহস হয় না, সঙ্কোচ এসে বাধা দেয়। ভয় হয় পল নিজেই হয়ত ধরা দেবে না। ভয় হয় বুঝি বা বড় বেশী সে চাইতে গিয়েছে। পলের কাছে গিয়েই ওর হাত-পা বুজে আসে কেন? পল ওর কাছে কী এমন জিনিস চাইবে যে ভাবতে গেলেই ওর দেহ অবশ হয়ে আসে? মনের চাঞ্চল্য মিরিয়াম দমন করতে পারে না। তার হাত দু'টি কাঁপতে থাকে। একবার মাথা তুলে চায় পলের দিকে। চোখ দু'টি কেঁপে ওঠে, ভালো ক'রে চাইতে পারে না, শুধু চোখের তারায় ফুটে ওঠে ভীরু, সচকিত মিনতি। পলের হৃদয় করুণায় দ্রব হয়ে আসতে থাকে। হাত দিয়ে ধরে ওকে ওঠায়, কাছে টেনে এনে আদর করে, চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে বলে, 'সত্যি তুমি চাও আমাকে বিয়ে করতে?'

মিরিয়াম ভাবে; হায়, পল তাকে ডেকে নেয় না কেন? তার

জীবনের সব কিছুই ত' পলের। তবু পল হাত বাড়িয়ে তাকে নিতে আসে না কেন? এতদিন পলের এই নিষ্ঠুর অবহেলা সে সয়ে এসেছে, মনে-প্রাণে সে পলের, তবু পল কোন দিন তার উপর দাবী জানায় নি। আবার পল সেই একই হৃদয়হীন অভিনয়ে মেতে উঠেছে। আর কত সহ্য করবে মিরিয়াম? আর সে থাকতে পারল না। দু'হাতে পলের মুখখানা ধরে এক দৃষ্টে চাইল তার চোখে চোখ রেখে। না, বড় কঠিন পলের হৃদয়, ও যেন অন্য কি চায়। মিরিয়াম মিনতি জানায়, বলে এই সঙ্কটের সমাধানের ভার তার উপর যেন পল ফেলে না রাখে। এত ক্ষমতা তার নেই। কোথায় যেন সে বড় দুর্ব্বল। তার বুক চৌচির হয়ে যেতে চায়, মুখ ভার করে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি চাও না?'

'না, খুব বেশী চাই না।' জবাব দিতে গিয়ে পলের সব ব্যথা যেন উথলে ওঠে। মিরিয়াম মুখ ফিরিয়ে উদ্গত অশ্রু রোধ করে। তার পর তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ধীরে ধীরে মাটি থেকে উঠে সে পলের মুখ নিজের বুকে চেপে ধরে, আস্তে আস্তে বুকের দোলায় ওকে দোলাতে থাকে। ওকে পাবার আশা যদি একান্তই না থাকে তাহলেও ওকে অন্ততঃ এটুকু সান্ত্বনা দেবার ক্ষমতা তার আছে। পলের চুলে আঙুল চালাতে চালাতে মিরিয়াম নিজেকে বিলিয়ে দেবার বেদনা-ভরা তীব্র আনন্দ অনুভব করতে থাকে। এইটুকুই শুধু তার পাওয়ার। আর পল বুঝতে পারে জীবনের খেলায় আরও একবার তার হার হ'ল, ক্ষোভে, বেদনায় তার অন্তর মথিত হয়ে ওঠে। এ অবস্থা তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। কারও বুকের উষ্ণতার মধ্যে লালিত হতে সে চায় না, চায় নিজের ভার উজাড় করে ওর হাতে তুলে দিতে। ওর আশ্রয় একান্ত করে চায় বলেই এই আশ্রয়ের ভাণ তার ভাল লাগে না। সে সঙ্কুচিত হয়ে সরে আসে। আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, বিয়ে না করে আর কিছু আমরা করতে পারি না?' ব্যথায় ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। মুখে নিরুপায়ের ভঙ্গী।

মিরিয়াম আবার আঙুল কামড়াতে শুরু করল। চাপা গলায় বলল, 'না। আমার ত' অন্ততঃ মনে হয় না।'

বোঝা গেল এখানেই তাদের সম্পর্কের শেষ। মিরিয়ামের সাধ্য নেই পলকে ডেকে নেয়, ডেকে নিয়ে ওর সব দায়িত্ব তুলে নেয় নিজের হাতে। সে জানে শুধু নিজেকে দিতে, নিজের প্রতিটি মুহূর্তকে সানন্দে সে পলের হাতে তুলে দিতে পারে। কিন্তু পল ত' তা চায় না। পল চায় মিরিয়াম তাকে জোর করে বেঁধে রাখুক, জোর করে এসে হাসতে হাসতে বলুক, 'এই তোমার সামনে এসে দাঁড়ালুম আমি। এবার থামাও তোমার দুরন্তপনা। থামাও মরণের বুকে এই ডানা ঝটপটিয়ে বেড়ানো। আজ থেকে তুমি আমার হলে।' এমন করে বলে উঠবার সাধ্য মিরিয়ামের নেই। বাস্তবিক কি মিরিয়াম তাকে চায়? সে কি সত্যি সত্যি একটি সজীব সন্ধান করে? নাকি নিজেকে উৎসর্গ করবার সেই পুরনো আকাঙ্ক্ষাই এখনও জেগে রয়েছে তার মনে?

পল জানে সে যদি মিরিয়ামকে ছেড়ে চলে যায়, তা'হলে মিরিয়াম কোন দিনই জীবনের আস্বাদ আর পাবে না। কিন্তু ওর
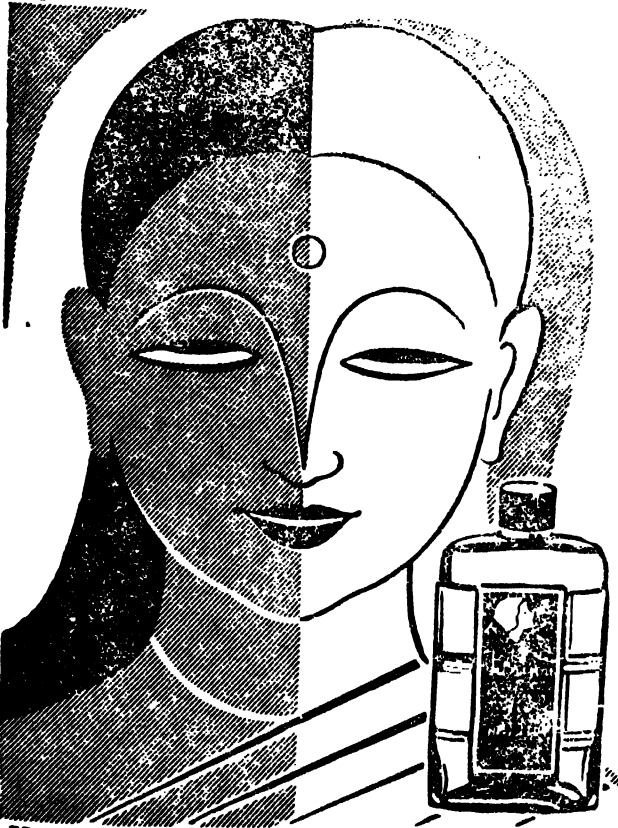
কাছে থাকলেও পলের অন্তরাত্মা বঞ্চিত হয়, সে হাঁপিয়ে ওঠে, নিজের জীবনের দাবী তাকে অস্বীকার করতে হয়। নিজের জীবনকে যথোচিত মূল্য না দিয়ে ওর জীবনকে সে সরস করে তুলবে কেমন করে?

মিরিয়াম স্থির হয়ে বসে আছে। পল একটি সিগারেট ধরাল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। পল ভাবছিল মায়ের কথা, মিরিয়ামের কথা আর মনেও ছিল না। হঠাৎ মিরিয়াম চাইল ওর দিকে। এবার মমতার বদলে জাগল গভীর বিতৃষ্ণা। ভাবল কী হবে এর জন্যে নিজের জীবনকে ডালি দিয়ে? এমন যে উদাসীন, মিরিয়ামের কথা একবারও কি সে চিন্তা করে? স্পষ্টই দেখতে পেল ওর জীবনের কোন শিকড় নেই, চিরকাল ও ভেসে ভেসেই বেড়াবে। অবুঝ, দুরন্ত শিশুর মত নিজের পায়ে নিজেই ও আঘাত করে যাবে। হোক, তবে তাই হোক। ওর পথ নিজেই সে বেছে নিক। আস্তে আস্তে বলল, 'এবার তা'হলে উঠতে হয় আমায়।'

কথার ভঙ্গী থেকেই পল ওর বিতৃষ্ণা অনুমান করতে পারল। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চলো, আমি পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাকে।'

মিরিয়াম আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল টুপিটা পরে নেবার জন্যে। তার মন তখন নিদারুণ ক্ষোভে ফুলে ফুলে উঠছে। কী আশ্চর্য্য, তার এই বিপুল আত্মত্যাগকে একটুও সম্মান দেবে না পল, একে সে অবজ্ঞায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে! মনে হ'ল জীবনের সব কিছু যেন তার শুকিয়ে যেতে বসেছে, সব আলো ঝরে যাচ্ছে জীবন থেকে। একবার টেবিলের ধারে গিয়ে ফুলগুলোর গন্ধ অনুভব করল সে। লাল রক্তের মত 'এনিমোন'ফুল, পলের উপযুক্তই বটে।

পল বলল, 'তুমি নিয়ে নাও এই ফুলগুলো' বলে ফুলদানী থেকে বের করে দিল জলে-ভেজা এক রাশ ফুল। দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল রান্নাঘরে। মিরিয়াম বসে রইল। তারপর পল এলে ফুলগুলো তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওর সঙ্গে। পথে কথা যা বলবার পলই বলল, মিরিয়ামের হৃদয় তখন মৃত্যুর আঘাতে অসাড় হয়ে পড়েছে। এবার পলের কাছ থেকে বহু দূরে সে সরে যাচ্ছে। বেদনায় অধীর হয়ে মিরিয়াম গাড়ির মধ্যে বসেই পলের গায়ে গা এলিয়ে দিল। পল সাড়া দিল না। মিরিয়াম ভাবতে লাগল, ও কোন দিকে, কোথায়, ভেসে যাচ্ছে? না জানি কী দুর্গতি আছে ওর কপালে? এটুকু খেয়ালও কি ওর নেই যে, মিরিয়ামের জীবনটাকে চিরদিনের মত ও নষ্ট করে দিতে যাচ্ছে? ওর জীবনের কোন মূল্য নেই! শুধু ক্ষণিকের টানে ও ঘুরে বেড়ায়, গভীর কোন বস্তু ওকে কোনদিন আকর্ষণ করতে পারে না। বেশ, তবে তাই হোক। মিরিয়ামও দেখবে কী ক'রে ওর জীবন কাটে। একদিন অতৃপ্ত হ'য়ে ওকে ফিরে আসতেই হবে, সেদিন ফিরে আসবে মিরিয়ামের কাছেই।

পল মিরিয়ামকে তার বোনের বাড়ির দরজায় রেখে করমর্দন করে বিদায় নিয়ে এলো। ফিরে আসতে আসতে মনে হ'ল জীবনের শেষ অবলম্বনটুকুও আজ তার হারিয়ে গেল।—পল ট্রাম থেকে নামল। শহরতলীতে এরই মধ্যে সব নিস্তব্ধ। শুধু মাথার উপরে আকাশে ছোট ছোট তারা মিট মিট করে জ্বলছে। নীচে নদীর জলেও একটা নূতন আকাশের সৃষ্টি হয়েছে, তার বুকে তারার দল দুলে দুলে উঠছে। দিগ্‌দিগন্ত ছেয়ে শুধু নিস্তব্ধ নিশীথের বিপুল প্রসার—দিনের বেলায় এর কথা কদাচিৎ মনে পড়ে, তবু সন্ধ্যা হলেই আবার ফিরে আসে, আবার সব ঢেকে ফেলে। এই অন্ধকারটুকুই ত' চিরকালের, এর নিঃশব্দ অতলতায় ডুবে যাওয়াই ত' জীবন। সময়ের বোধ লুপ্ত হয়ে গেছে, শুধু দিগন্তজোড়া এই বিশাল অন্ধকারের কথাই জেগে রয়েছে মনে। আজ কে বলবে যে মা একদিন ছিলেন, আজ নেই? হয়ত এখানে নেই, কিন্তু এই মহাজগতের কোথাও না কোথাও তিনি আছেন। যেখানেই থাকুক না কেন, পলের প্রাণ খুঁজে বেড়ায় তাঁকেই। এই মহারজনীর যে প্রান্তেই মা নতুন বাসা বেঁধেছেন, সেখানেই যেতে হবে তাকে। কেউ তা'দের দু'জনার বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। তবু দেহের অনুভব মনে জেগে থাকে। একেও ত' অস্বীকার করা যায় না। সামান্য একটা মাংসপিণ্ড—গমের খেতে হারিয়ে-যাওয়া একটা গমের দানার চেয়েও ছোট। তবু ত' সহ্য হয় না। চারি দিকে নেমে আসছে বিপুল রাত্রি, নেমে আসছে পলকে গ্রাস করবার জন্যে, তবু নিজেকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিতেও যে সে পারছে না। রাত্রির বুকে সব কিছু হারিয়ে যায়, এই তারার মেলা, এই দীপ্তিমান সূর্য্য, এদেরও ছাপিয়ে ওঠে রাত্রির অন্ধকার। এরা যেন কয়েকটি আলোর কণা, অন্ধকারের ঘূর্ণিপাকে সভয়ে ঘুরপাক খেয়ে মরছে। এরা সব, আর পল নিজেও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, বিপুল শূন্যতা দিয়েই যেন তৈরী এরা, তবু একেবারে যেন শূন্যও নয়। পল আর সহ্য করতে পারে না। আপন মনেই ডেকে ওঠে, 'মা, মাগো!'

এই দুঃসহ বিক্ষোভের মধ্যে মায়ের কথা ভেবেই যেন প্রাণে বল আসে, নতুন করে নিজেকে তুলে ধরতে ইচ্ছে হয়। মা তার সামনে নেই, অন্ধকারের মধ্যে একাকার হয়ে মিশে গেছেন। পলের ইচ্ছে হয়, ডেকে বলে, 'আমাকে তুমি ছুঁয়ে রাখো, মা, ডেকে নাও আমাকে তোমার পাশে।'

না, এত সহজে হার মানবে না সে। দ্রুত বেগে পা চালিয়ে পল আলোকোজ্জ্বল নগরীর দিকে যাত্রা করল। তার হাতের মুঠি দৃঢ় সংবদ্ধ, মুখে দুর্জ্জয় সঙ্কল্প। না, অন্ধকারের পথ ধরে মায়ের উদ্দেশ আর সে করবে না। ওই ত' সহরের আলো চোখে এসে লাগছে! জনতার মৃদু গুঞ্জন দূর থেকে ভেসে আসছে। সেই দিকেই, সেই পথ ধরেই, তাকে এগিয়ে যেতে হবে। পল আরও জোরে পা চালিয়ে দিলো।

অনুবাদক—শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য

সমাপ্ত

সবাই জানেন –
চট্‌পট বিলি করা হয় বলে ব্রুক বণ্ড চা এত তাজা থাকে
প্রতি প্যাকেট ব্রুক বণ্ড চায়ে অনেক বেশী কাপ ভালো চা তৈরী করা যায়
রোজ ২৪,৯০,৪৯৬ প্যাকেট ব্রুক বণ্ড চা বিক্রি হয়
এই জন্যেই অন্য যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে
ব্রুক বণ্ড চা
বেশী লোকে খান !
FINEST TEA
KORA BRAND Tea Dust
Brooke Bond Tea

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিল দেহ-মন, লেখনী ছিল শ্রান্ত। অনেক বিশ্রামের পর আজ ফের ডায়েরী লিখতে বসেছি।

পথে দেখা হ'য়েছিল অতুল চম্পটীর সঙ্গে। চম্পটী নমস্কার জানিয়ে বললে, বড্ড শুকিয়ে গেছেন যে! অসুখ হয়েছিল বুঝি?

আমি মাথা হেলিয়ে বললাম, আপনার খবর ভালো তো?

অতুল চম্পটী বললে, ভালো আর কি ক'রে বলি? মেয়েটা বুকে শেল হেনে চলে গেল।

বললাম, আহা! কি হ'য়েছিল?

—এক ছোঁড়ার সঙ্গে অনেক দিন থেকেই লুকিয়ে গুজুর-গাজুর চলছিল, তারই সঙ্গে চলে গেছে। অবিশ্যি রেজেষ্টারী করে বিয়েটা করেছে। কিন্তু কি নেমকহারামী, সেইটে একবার ভাবুন!

বললাম, মনের মতো বর পেয়েছে, ভালোই তো।

বিস্মিত কণ্ঠে চম্পটী বললে, মেয়েমানুষের আবার মন কি মশাই? বাপকে লুকিয়ে মনের মানুষের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া, এ তো আপনার গিয়ে একেবারে ইয়ের সামিল হলো।

আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় চম্পটী আবার সুরু করলে,—অবিশ্যি এত সাহস মেয়ের হতো না, যদি গোপনে ওর মা'র— মানে আমার সহধর্মিণীর আস্কারা আর উস্কানি না পেতো।

শুধালেম, গিয়ে চিঠিপত্র দেয় নি?

চম্পটী বললে,—আজ্ঞে, তা দিয়েছে। জামাই-ছোঁড়া আবার কেতাদুরস্ত, ম্যাট্রিক ফেল কি না! দু'জনায় মিলে আশীর্ব্বাদ চেয়ে পাঠিয়েছে। দু' ছত্তর আশীর্ব্বাদ পোষ্টা কার্ড ছাড়তেই হবে। নইলে পথে-ঘাটে, রাত-বিরেতে বেরোতে হয়, কোন্ ফাঁকে পেছন থেকে তাক্ করে মাথা দু' ফাঁক করে দেবে, বলা তো যায় না। ডানপিটেমিতে ছোঁড়া আবার বোধিসত্ত্বর সাকরেদ। বোধিসত্ত্বকে দেখেছেন তো? অনাথ চৌধুরীর ছেলে।

প্রজ্ঞাপারমিতার ভাই?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনারা সবাই অমন প্রজ্ঞা প্রজ্ঞা করেন কেন বলুন তো? দেখেছি তো, এমন কিছু ডানাকাটা পরী নয়। ওর চাইতে কতো চোস্ত চেহারা আর চমকা ফিগারের মেয়ে এই অধমের সন্ধানেই আছে। কত চান বলুন না?

ও প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্তে বললাম, দিবাকর দালাল মশায়ের বাগানবাড়ী কি কিনে নিয়েছেন ভুজঙ্গ চৌধুরী?

অতুল চম্পটী হেসে বললে, অনেক খবরই রাখেন না দেখছি। কতো যে ওলট-পালট হয়ে গেল—রীতিমতো একখানা উপন্যাস।

কৌতূহলী হয়ে শুধালেম, কাদের ওলোট-পালোট হলো?

কার হলো না বলুন? ভুজঙ্গ চৌধুরী, দিবাকর দালাল, দময়ন্তী দালাল, রাহুল, সানন্দা সান্যাল—আর সঙ্গে সঙ্গে এই বেচারা অতুল চম্পটী। শুনবেন নাকি সব ব্যাপার?

বললাম, নিশ্চয়।

চম্পটী বললে, তাহলে মশাই একটু চা খাওয়াতে হবে যে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। আর সেই সঙ্গে যদি এক আধখানা কেক, আর সিংগেল বা ডবল ডিমের মামলেট—

অনতিদূরে বিনীত চেহারার একটা ছোট রেস্তোরাঁ। একটি মাত্র শীর্ণ খদ্দের এক কোণে এক পেয়ালা চা নিয়ে বসে বসে কাল হরণ করছে। চেহারায় অতুল চম্পটীর সমদর্শী, শুধু তার চোখের তারায় নেই অতুল চম্পটীর অতুলনীয় শৃগালসুলভ দৃষ্টি। চম্পটীকে নিয়ে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করা গেল।

গিন্নী ক্ষেপে রণরঙ্গিনী হয়েছেন, মেয়ে জামাই নিয়ে ওকে দুটো নেজ্য কথা শুনিয়েছিলুম বলে;—গলা খাট করে বলল অতুল চম্পটী। মেজাজ ঠাণ্ডা না হওয়া তক্ বাড়ী ফেরার রাস্তা বন্ধ। এক ফোঁটা চা-ও মশাই জিভের ডগায় পড়ে নি।

চম্পটীর জন্য কেক আর ওমলেট-সহ এক পেয়ালা চায়ের ফরমায়েস দিলাম। প্রয়োজন হলে পরে আরো ফরমায়েস দিতে আপত্তি হবে না, আভাস জানালেম চম্পটীকে।

চম্পটী বললে, কিন্তু আপনি?

রেস্তোরাঁয় আমি খাইনে। আমি শুধু বসে বসে শুনবো।

খেতে খেতে কাহিনী শোনাতে লাগলো অতুল চম্পটী। বললে, শুনুন তাহ'লে খুলে বলি। দালাল মশাই আমায় বলেছিলেন— ভুজঙ্গকে একবার বাগানবাড়ীটা ভালো করে দেখিয়ে দিয়ে, তারপর আমার কাছে নিয়ে এসো। চৌধুরী মশাইকে তাই বললাম, হুজুর, চলুন একবার বাগান বাড়ীটা ভালো করে দেখে তারপর দালাল মশাইয়ের কাছে। চৌধুরী বললেন, চেক সই করবো আমি, সে চেক হাত পেতে নেবেন দালাল মশাই। দরকার হয়, তিনিই আসবেন আমার বাড়ী। চৌধুরী কখনো দালাল বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াবে না। বললাম, তা তো বটেই হুজুর। একশো বার। আপনার কাছে উনি আসবেন বই কি। কিন্তু তার আগে হুজুর চলুন গোপনে একবার আপনাকে বাগান-বাড়ীটা বেশ করে দেখিয়ে আনি। সহজে কি আর রাজী করাতে পারি চৌধুরী মশায়কে! মেলাই মেহনৎ করে রাজী করানো গেল। বাগানবাড়ী রওনা হয়ে গেলুম চৌধুরী মশাইর গাড়ীতে। আমি আর চৌধুরী মশাই। মালীকে আগেই জানানো ছিল। মালী ওদিকে খানাপিনা আরাম আয়েসের তোফা বন্দোবস্ত করে রেখেছে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাগান বাড়ী আর বাগান দেখাতে লাগলুম। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন চৌধুরী মশাই। বাগানের বাহারগুলো বেশ রংদার করে বোঝাতে গেলুম, চৌধুরী বললেন, থামো চম্পটী। বললুম, কেমন দেখছেন হুজুর, বাগানবাড়ীখানা? বেশ পছন্দসই নয়? হুজুর বললেন, বেশ আর কোথায় হে চম্পটী? তবে, হাতে পেলে বেশ করে নিতে কতক্ষণ? ভাবলুম যাক, এইবারে পথে এসেছেন। বললুম, আজ্ঞে তা তো বটেই। আপনার হাতে পড়লে ওর চেহারাই

পাল্টে যাবে যে। তাহলে হুজুর চলুন একবার দালাল মশাইর ওখানে। কথাবার্তা কয়ে একেবারে—চৌধুরী মশাই গরম হয়ে বললেন, দালাল মশাইকেই একদিন নিয়ে এসো আমার বৈঠকখানায়। বলেছি না দালালের চৌকাঠ মাড়াবে না চৌধুরী?—তার পরে ইংলিশেও কি সব কইলেন—ও সবে৷ মানে বুঝি নে।

শুধালেম, তার পর?

বাগানবাড়ীর পশ্চিম ধারে ফোয়ারার পাশে শুধু উঁচু পাথরের চৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে এক পাথরের তৈরী সুন্দরী। বললে অতুল চম্পটী। তা, সুন্দরীই বটে। পাথরে যে অমন রূপ খোদা যায়, ও জিনিষ চোখে না দেখলে আপনার বিশ্বেস হবে না। ঐ মূর্ত্তি দেখতে গিয়েই চৌধুরী মশায়ের হঠাৎ মতি বদলে গেল।

পাথরের মূর্ত্তি দেখে?

আজ্ঞে, পাথরের মূর্ত্তি বলে তাকে চট্ করে চেনাই যায় না যে! বলিহারি বাহাদুরি খোদাইকারের। আর কি বলবো আপনাকে, লাগবি তো লাগ ঠিক সেই সময় দালাল মশাইর মেয়ে দময়ন্তীও কলেজের মোটা কালো মাষ্টারকে ঐ পাথরে-সুন্দরী দেখাচ্ছেন।

বললাম, মাষ্টার নয়, প্রফেসর।

চম্পটী বললে, ঐ হলো। দময়ন্তী দেখাচ্ছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ঠিক এমনি সময় দেখতে গেলেন চৌধুরী মশাই। পেছনেই আমি। ওদিকপানে চোখ পড়তেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন চৌধুরী মশাই—যেন চোখের সামনে দেখছেন ভূত অথবা হেলেন অব ট্রয়! দেখি হুজুরের জবর নজর প'ড়ে গেছে দময়ন্তী দালালের ওপর—চোখ আর ফেরাচ্ছেন না, পলক পড়ছে না চোখে। বুঝলুম এইবারে হুজুরের হুকুম হবে—চম্পটী, ওকে আমার চাই। হুকুমের নাও চায় শুকনো ডাঙায় চলতে। কিন্তু ওকে আমি কি করে বাগাবো বলুন? লাখোপতি দালাল মশায়ের সবেধন নীলমণি। আমার মতো চুনো-পুঁটির নাগালের অনেক উঁচুতে। এতো আর বাস্তুহারাও নয়, বেওয়ারিশও নয়। ভাবলুম বলি, হুজুর, ওর চাইতে ঢের ভালো মেয়ে আমার হাতেই রয়েছে। কিন্তু হুজুরের চোখের চেহারা দেখে আর ভরসা হলো না। আস্তে আস্তে বললুম, দালাল মশাইর মেয়ে হুজুর। দময়ন্তী দালাল। হুজুরের চোখের তারা দুটো অমনি যেন দপ করে নেচে উঠলো। পাথরে-সুন্দরীর সামনে হুজুরের আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল দময়ন্তী দালালের সঙ্গে। একবার মরজি হলে হুজুর আলাপ জমাতে এক নম্বর। তারপর তিনজনে ঐ মূর্ত্তি দেখতে লাগলেন। আমি পেছনে দাঁড়িয়ে। ঐ পাথরের মূর্ত্তিটে নাকি জ্যান্ত মানুষ সামনে রেখে দেখে দেখে খোদাই করেছিল শ-দেড়েক বছর আগে মস্ত ওস্তাদ এক বিদেশী খোদাই-কার। অনেক টাকা নিয়ে। টাকা যিনি দিয়েছিলেন—মানে এই বাগান-বাড়ীর পত্তনীকার আদি মালিক, মস্ত জমিদার—সোনার মোহরও তাঁর কাছে খোলামকুচি। নাম তাঁর সূর্য্যকিশোর। আর এই সুন্দরীকে নাকি এনেছিলেন বাইরে থেকে। যেমন তার রূপ আর যৌবন—তা ঐ পাথরের মূর্ত্তিটি দেখলেই বুঝতে পারবেন—তেমনি তার অপ্সরার মতো নাচ আর কিন্নরীর মতো
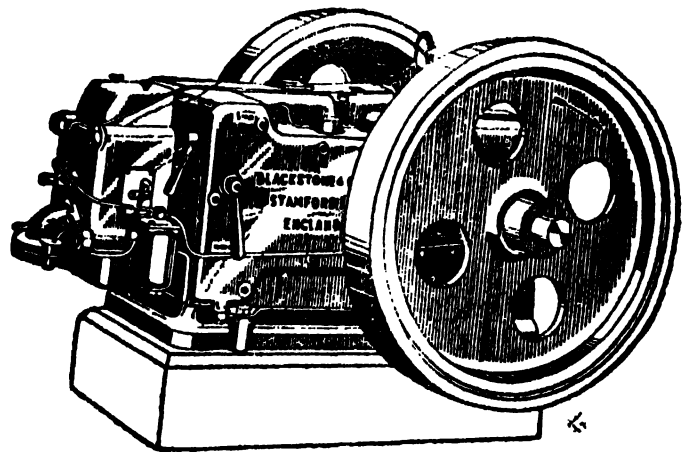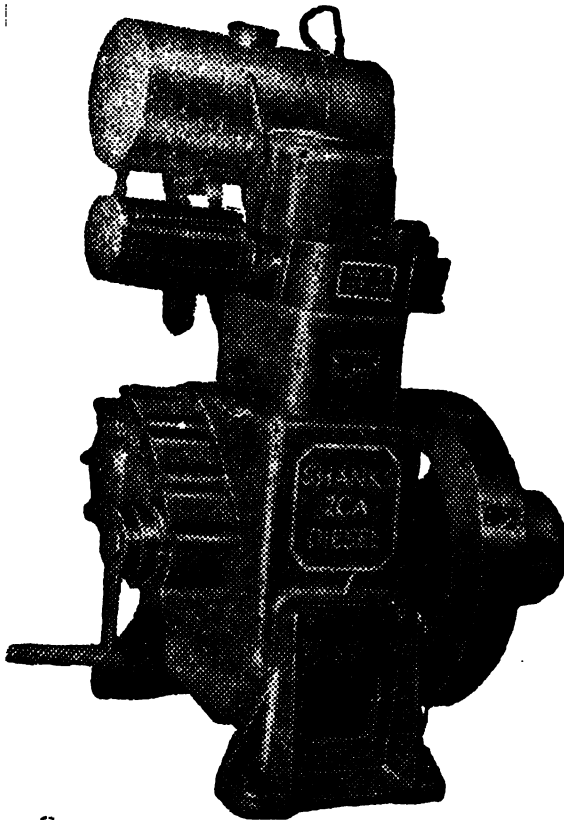
গান। সূর্য্যকিশোর এই সুন্দরীকে নিয়ে মেতে গেলেন। দিনরাত তাকে নিয়ে বাগান-বাড়ীতেই পড়ে থাকেন। মোসায়েবদের আসরও জমে, বোতল গেলাসও চলে। বিষয়কর্ম্ম দেখাশুনো চুলোয় গেল। ঘরে সতীসাধ্বী সহধর্ম্মিনী কাঁদেন কাটেন আর মা কালীর কাছে জোড়ার পর জোড়া পাঠা মানৎ করেন। কিন্তু কাঁদা-কাটা আর মানতে কিছু হলো না। শেষটায় নায়েব মশাইকে পাঠালেন বাগানবাড়ীতে।

তারপর ?

তারপর নায়েব বাগান-বাড়ী গিয়ে মনিবকে বললেন, হুজুর, আপনাকে একবার মহালে বেরোতেই হবে। নইলে আদায়পত্র সব বন্ধ। বিষয় আশয় লাটে উঠবে।

মনিব সূর্য্যকিশোর বললেন—উঠুক। কিন্তু নায়েব ঘুঘু ওস্তাদ। বুঝিয়ে দিলেন, বিষয় আশয় লাটে উঠলে এই সুন্দরীকেও আর রাখা যাবে না। সূর্য্যকিশোর ক্ষেপে উঠে বললেন, বিষয় আশয় নীলেমে উঠলেও সুন্দরী প্রাণের টানে থাকবে, সে বাঁধন এড়াতে পারবে না। নায়েব বললেন, কিন্তু এ হালে তো তাকে রাখতে পারবেন না, হুজুর। স্বর্গের অপ্সরীকে তো আর ঘুঁটে কুড়ুনির হালে রাখলে চলবে না! তাই বলি কি হুজুর, দিন দুয়েকের জন্যে মহালটা ঘুরে আসবেন চলুন। তারপর বাগান-বাড়ীতে ফিরে তো আসবেনই। সৌখীন জমিদার তখন সুন্দরীর কাছ থেকে দুদিনের ছুটি নিয়ে মহালে বেরোলেন। এই ফাঁকে তাঁর সতীসাধ্বী পত্নী এলেন বাগান বাড়ীতে। এসে সুন্দরীকে বললেন,—'আমার স্বামী তোমাকে অনেক দিয়েছেন। আমার যত অলঙ্কার আছে তাও সমস্তই তোমাকে দেবো। তার বিনিময়ে তুমি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও। আমার জীবন তুমি ব্যর্থ করে দিও না। তুমি আমার ছোট বোনের মতো। তোমার দু'টি হাত ধরে আমি আমার স্বামীকে ভিক্ষা চাইছি।' বলে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন সেই পেশাওয়ালী নাচিয়ে-গাইয়ে সুন্দরীর হাত ধ'রে।

সুন্দরী ধীরে তাকে শুধু বললে,—বহিন, যা আমি পেয়েছি তার বেশীতে আমার প্রয়োজন নেই। তোমার স্বামীকে তুমি ফিরে পাবে। তুমি যে আমার কাছে এসেছিলে, একথা গোপন থাকুক।

মহালের কাজ কোন রকমে তাড়াতাড়ি সেরে বাগান-বাড়ীতে ফিরে এলেন জমিদার সূর্য্যকিশোর। এসে দেখেন বদলে গেছে আবহাওয়া। সে হাসি নেই সুন্দরীর চোখ মুখে, সে প্রাণে নেই চলার ছন্দ। সে আনন্দ নেই সংগীতের মুর্চ্ছনায়।

শুধালেন সুন্দরীকে। সুন্দরী বললে, আমার ফিরে যাবার সময় হয়েছে। আপন মুলুকে ফিরে যাবো।

মাথায় যেন বজ্রপাত হলো সূর্য্যকিশোরের। তিনি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না! নিজের জীবনের সঙ্গে এমন নিবিড় করে মিশিয়ে নিয়েছেন সুন্দরীকে, যে,সুন্দরী-বিহীন জীবন কল্পনা করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সেই সুন্দরী চলে যাবে তাঁকে ছেড়ে, তাঁর জীবন শূন্য করে দিয়ে!

তিনি বললেন, এ অসম্ভব। আমায় ছেড়ে তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না।

সুন্দরী দৃঢ় কঠোর কণ্ঠে বললে,—আমায় যেতেই হবে। আমি যাবো। আর আমার এক মুহূর্ত্তও এখানে ভালো লাগছে না। সুন্দরীর এই কঠোর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রূপটি আগে কখনো দেখেন নি সূর্য্যকিশোর। নিঃসংশয়ে অনুভব করলেন চলে যাওয়ার সংকল্প থেকে সুন্দরীকে কিছুতেই টলানো যাবে না। তখন বললেন—যদি যাবেই, মানবে না কোনো মানা, তবে একটি শেষ প্রার্থনা আমার পূর্ণ করো।

সেই একটি প্রার্থনা পূরণেরই ফল এই পাথরের তৈরী অপরূপ নারীমূর্ত্তি। সুন্দরীকে মডেল করে সেরা পাথর খুঁজে খুঁজে সারা দুনিয়ার অন্যতম সেরা ভাস্কর করে গেলেন এই অপরূপ শিল্পসৃষ্টি। বিদায় নিয়ে চ'লে যাবার আগে সুন্দরী বলে গেল সূর্য্যকিশোর যেন তাঁর স্ত্রী এবং শিশুপুত্রের প্রতি কর্ত্তব্যে অবহেলা না করেন। সূর্য্যকিশোর দেখলেন সুন্দরীর চোখে জল। তাঁর নিজের চোখও জলে ভরে উঠলো। শুধালেন—আবার কবে দেখা হবে? সুন্দরী জবাব দিলে, ইহজীবনে আর দেখা হবে না।

অতুল চম্পটীর মুখে কাহিনী শুনতে শুনতে মনে হলো অনাথ চৌধুরীর মুখে শোনা প্রজ্ঞাপারমিতার কবিতা :

"দেহ দিয়ে মোরা দেহেরে বাসি যে ভালো,
আছে তাই ভালোবাসা—
দেহ আছে, তাই আছে দেহাতীত প্রেম!"

হয়তো সূর্য্যকিশোর আর সুন্দরীর দেহগত আকর্ষণ অগ্রসর হয়েছিল দেহাতীত প্রেমে পরিণতির জন্যে, আর দূরে চলে গিয়ে সুন্দরী হয়তো শরৎবাবুর এই কথাটাই প্রমাণ করে গেল যে, ছোট প্রেম কাছে টানিয়া রাখে, বড় প্রেম দূরে সরাইয়া দেয়।

সুন্দরীর বিদায়ের পর তার মর্মর-মূর্ত্তিটা স্থাপিত হলো সেই বেদীর ধারে, যে বেদীর ওপর বসে বহু চাঁদিনী সন্ধ্যায় স্বর্গীয় সঙ্গীতে সূর্য্যকিশোরকে মুগ্ধ করেছে সুন্দরী। তারি পাশে বাগান-বাড়ীর ফোয়ারা। ফোয়ারা তো নয়, সে যেন সূর্য্যকিশোরের অফুরান অশ্রুধারা। সুন্দরীর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি, অথবা নিতে পারেন নি সূর্য্যকিশোর। ইহলোকে তাঁদের আর দেখা হয়নি।

সুন্দরীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন সূর্য্যকিশোর। হয়েছিলেন কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বামী, কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা। কিন্তু ভুলতে পারেন নি সুন্দরীকে। সুন্দরীকে হারাবার পর আর বেশী বছর তিনি বাঁচেন নি। যে কয় বছর বেঁচে ছিলেন, বাগান-বাড়ীতে চলে যেতেন অনেক চাঁদিনী সন্ধ্যায়। গিয়ে নীরবে একা বসতেন শূন্যবেদীতে। তাকিয়ে থাকতেন সুন্দরীর মর্মরমূর্ত্তির মুখের পানে; কল্পনায় শুনতেন স্মৃতির সংগীত।

শোনা গেছে, তাঁর মৃত্যুর পর অনেক চাঁদিনী রাতে সুন্দরীর মর্মরমূর্ত্তির পাশে এসে দাঁড়াত সুন্দরীর বিদেহী মূর্ত্তি, হয়তো বা বিদেহী সূর্য্যকিশোরের দর্শন আশা করে। হয়তো এ সত্য, অথবা হয়তো যারা চেয়েছিলো ভুতুড়ে দুর্নাম রটিয়ে বাগান-বাড়ীটির বাজারদর নামাতে, এ হেন গুজব তাদেরি রটানো।

বাবার ইচ্ছে এ বাগান বাড়িটা বিক্রী করে দেন।—বললেন দময়ন্তী দালাল। তাই একবার ভালো করে দেখতে এলাম, অসম্ভব, এ জিনিষ কখনো বিক্রী করা যায়? আমি তো বাবাকে কিছুতেই দেবো না বেচতে।

খুব ভালো দাম পেলেও নয়!—শুধালেন তুহিন চৌধুরী, চোখের কোণে এক ঝলক চৌধুরী-জনোচিত হাসি।

না, খুব মোটা লাভ পেলেও নয়। দুনিয়ায় টাকার লাভটাই তো একমাত্র লাভ নয় চৌধুরী মশাই। বললেন দময়ন্তী দালাল। তাছাড়া টাকা বাবার যা আছে তার চাইতে আরো বেশীর প্রয়োজন দেখি নে।

ভুজঙ্গ চৌধুরী বললেন, মানুষের আরো বেশীর প্রয়োজন কি কখনো ফুরোয় দময়ন্তী দেবী?

দময়ন্তী বললেন, প্রয়োজন ফুরোয় চৌধুরী মশাই। যা ফুরোয় না, সেটা হচ্ছে খাঁই, প্রয়োজন নয়।

ভুজঙ্গ চৌধুরী কিছু না বলে একটু হাসলেন। ফিরবার পথে চলতি গাড়ীতে বসে ভুজঙ্গ চৌধুরী চম্পটীকে বললেন, এ বাগানবাড়ী আমার চাই-ই চম্পটী। জোরালো জেদের সুর শুনে আনন্দে গদগদ হলো চম্পটী। সবিনয়ে মাথা চুলকে বললে, তাহলে আপনাকে একবার দালাল-বাড়ীতে জুতোর ধূলো দিতে হবে যে।

ভুজঙ্গ চৌধুরী বললেন, দেবো।

দিলেনও। চম্পটীকে নিয়ে গেলেন একদিন দালাল-ভবনে।

কিন্তু ঐ নিয়ে যাওয়াই শেষকালে আমার কাল হলো। বললে অতুল চম্পটী। চৌধুরী মশাইকে ভেতরে নিয়ে গেলেন দালাল মশাই, বৈঠকখানায় এক পেয়ালা চা আর জলখাবার পাঠিয়ে দিলেন আমার জন্যে। এরপর একদিন ওঁরা গেলেন বাগান-বাড়ীতে। ওঁরা মানে তিন দালাল আর এক চৌধুরী। সেদিন আর আমি রইলুম না সঙ্গে। গেলেন দিনের সুরুতে, ফিরলেন দিনের শেষে।

তার পর?

তার পর দালাল-বাড়ীর চৌকাঠ ঘন ঘন মাড়াতে লাগলেন চৌধুরী মশাই। বুঝলুম, বাগানবাড়ী বেচবেন না দালাল মশাই।

বেচবেন না? বললাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম চম্পটীর বলা কাহিনীর নেপথ্যে।

বেচবেন না দালাল মশাই তাঁর বাগানবাড়ী। মেয়ের ইচ্ছে নয়। ভুজঙ্গকে দেখেই অমনি বাৎসল্য রস উথলে উঠেছে দালাল-গিন্নী সৌদামিনীর। মা হয়েছিলেন একটু দেরীতে। সময়মত তিনি মা হলে এবং তাঁর প্রথম সন্তান পুত্র হলে, সেই পুত্র আজ ভুজঙ্গের বয়সীই হতে পারতো—এ কথা ভেবে তাঁর চোখ ছলছলিয়ে উঠলো। মাতৃহীন ভুজঙ্গ চৌধুরীও নতুন করে মা পাবার সম্ভাবনা দেখলেন সৌদামিনীতে।

তার পর একদিন বুড়ো অনঙ্গ চৌধুরী মশাইকে দর্শন করে এলেন দালাল কর্ত্তা-গিন্নী। বললে অতুল চম্পটী। পুরোনো রাগ কোথায় কপ্পুরের মতো উবে গেল। এখন দু' হাত এক হয়ে যাওয়ার কথাবার্ত্তা একরকম পাকা।

বললাম, দময়ন্তী কিসে বিয়ে করতে রাজী হলেন বি-এ ফেল ভুজঙ্গ চৌধুরীকে ?

চম্পটী বললে, কুবেরের ঘরণী হতে কোন্ মেয়ের না সাধ যায় বলুন ? জানেন তো, চৌধুরীরা অমন অনেক দাগলকে ট্যাঁকে গুঁজতে পারেন। আর বি-এ ফেল্ হলে কি হবে, হুজুর যে অনেক বিদ্যের জাহাজকে ওঁর অফিসে-কারখানায় মাইনে দিয়ে খাটাচ্ছেন। বিদ্যেও কিছু কম নয় জানবেন। দুনিয়ার তাজা তাজা খবর ওঁর নখদর্পণে—বাজার-দর বলুন, কাজ-কারবার বলুন, পোলিটিক্স, একানোমি, কি নয় ? কাপ্তান ঢের দেখেছি ; এমন তুখোড় আর চৌকস দেখি নি। তা ছাড়া ভারী মাতৃভক্ত ঐ দময়ন্তী দালাল ! আর দালাল-গিন্নীও ভুজঙ্গ বলতে অজ্ঞান। হুজুরও মা বলে ডেকেছেন দালাল-গিন্নীকে। নিজের মা নেই কি না ! মনও ঝুঁকেছে দময়ন্তীকে ঘরের লক্ষ্মী বানাতে।

ভুজঙ্গ চৌধুরীর অফিসের কেরাণী এবং দালাল-ভবনের গ্যারাজের ওপরকার ঘরের সন্তা ভুতপূর্ব ভাড়াটে কবি রাহুল রায় সম্পর্কে প্রচণ্ড ভীতি ছিল সৌদামিনী দালালের মনে ; বেঁচে গেলেন তিনি আশাতীত ভাবে ভুজঙ্গ চৌধুরীকে পেয়ে। সেরা ধনী, দেখতে কার্তিক না হলেও একেবারে কুপুরুষ নয় ভুজঙ্গ, ভাবও বেশ জমিয়ে নিয়েছে দময়ন্তীর সঙ্গে। ওর দিকে ঝুঁকেছে দময়ন্তীও। বাঁচা গেল রাহুল ছোকরার রাহুগিরি সম্ভাবনার হাত থেকে। মনে মনে ইষ্টদেবতাকে ধন্যবাদ দিলেন দালাল-গিন্নী সৌদামিনী।

চম্পটীকে শুধালেম, রাহুল রায়ের খবর কি ?—কি সুক্ষণেই যে ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়েছিলেন আর সেরে উঠেছিলেন দময়ন্তী দালালের সখের হোমিওপ্যাথির ওষুধ খেয়ে। ব্যাস, সেই থেকে ওঁর নেক নজরে। তারপর যেই ভুজঙ্গ-দময়ন্তী মিলনের কথাবার্তা হয়ে গেল, অমনি দেখতে দেখতে রাহুল রায়ের আঙুল ফুলে কলাগাছ। ছিলেন রোগা মাইনের কেরাণী, এখন মোটা মাইনের অফিসার না সেক্রেটারী কি যেন হয়েছেন। কোম্পানী থেকে পাওয়া খাসা বাংলো-প্যাটার্ণ বাড়ী, চাকর-বাকর, কোম্পানীর হাওয়া-গাড়ীতে যাওয়া-আসা, সায়েবি পোষাক—কোট, প্যাণ্টলুন, নেকটাই। এখন দেখলে তো চিনতেই পারবেন না। সব হয়েছে ভুজঙ্গ চৌধুরীর কলমের এক আঁচড়ে, আর ঐ আঁচড়ের পেছনে হয়তো আছে দময়ন্তী দালালের একটি মুখের কথা। এক ইনফ্লুয়েঞ্জা কি কাণ্ড করে দিয়ে গেল ভেবে দেখুন একবার !

মোটা মাইনের পদের দায়িত্ব সামলাতে পারছেন রাহুল রায় ? শুধালেম আমি।

ছেলেখেলার মতো। বললে চম্পটী। পদ্যলেখার একটু বাতিক ছিল বটে, কিন্তু কোম্পানীর কাজগুলো ছিলো রাহুল বাবুর একেবারে নখদর্পণে। আজকাল তো পদ্য ফদ্যও একেবারে ছেড়ে দিয়ে কাজে মেতে গেছেন। তাছাড়া ঐ যে আপনার গিয়ে সানন্দা সান্যাল।

কি হয়েছে তাঁর ?

চৌধুরী মশাই ওঁকেই এখন রাহুল রায়ের সেক্রেটারী করে দিয়েছেন। অবিশ্যি মাইনেও বাড়িয়ে দিয়েছেন। বললে অতুল চম্পটী। একে রাহুল রায় পোক্ত কাজের লোক, তায় মিস্ সান্যালের মতো অমন সেক্রেটারী। সোনায় সোহাগা। মিস সান্যাল কিন্তু বেশ একটু বদলে গেছেন, এইটে নজর করেছি।

কি রকম ?

সে দাপট আর দেখতে পাই নে মিস সান্যালের। চৌধুরী মশাই সমীহ করে চলতেন তাঁর সেক্রেটারী মিস সান্যালকে, সেই মিস সান্যাল সমীহ করছেন রাহুল রায়কে ! অথচ রাহুল রায় দাপট দূরে থাক্ মিস্ সান্যালের মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়েও কথা বল না। একটু লাজুক ধরণের মানুষ কিনা ! তাছাড়া—

তাছাড়া যে কি, তা আর বললে না অতুল চম্পটী। মুখে পুরে দিলে শেষ কাটলেটের শেষ অংশটুকু। শুধালেম ভুজঙ্গ চৌধুরীর খবর।

চম্পটী বললে, ওঁকে অনেকখানি আওতায় এনেছিলেন সেক্রেটারী সানন্দা সান্যাল। এবারে দময়ন্তী দালালের আওতায় পুরো এসে গেলেন চৌধুরী মশাই। বললেন, কাপ্তানী অনেক করেছি হে চম্পটী, আর নয়। এবারে পাকাপোক্ত সংসারী হতে হবে। বললুম, তা তো হবেই হুজুর। নইলে আমরাই বা কোন্ শান্তি পাবো ? গরীবের ওপর কিন্তু হুজুর দয়া রাখবেন। হুজুর বললেন, দয়া রাখবো বই কি, যদি দয়া পাবার মতো কাজ করো। হেঃ হেঃ হেঃ ! বড় রসিয়ে কথা কইতে পারেন হুজুর। কি—না, দয়া পাবার মতো কাজ করো। তবে হ্যাঁ, মস্ত কাজ একটা করেছি বটে। ম—স্ত এক চাপ জমি কিনিয়েছি চৌধুরী মশাইকে। তারি ওপর নয়া নগর-পত্তনের এলাহি ব্যবস্থা হচ্ছে। ব্যবসাকে ব্যবসা, দেশের কাজকে দেশের কাজ, নাম-কে-নাম। এই নগর-পত্তনের ব্যাপারে হুজুর ডান হাত করেছেন রাহুল রায়কে। আর রাহুলের ডান হাত সানন্দা সান্যাল। চৌকস তুখোড় মেয়ে, সে কথা একশোবার বলবো। নইলে অ্যাদ্দিন ধরে হুজুরের মতো বাঘা কাপ্তান মনিবকে একেবারে—বলে এক চুমুকে পেয়ালার বাকী অংশটুকু অদৃশ্য করে ফেলে তাণ্ডব নিশ্বাস ফেললে চম্পটী। বললে, বড্ড উবগার করলেন মশাই। তার ওপর অনেক দুঃখে মনটা ভারী হয়েছিল, আপনার কাছে প্রাণ খুলে খানিকটা হাল্কা করে নিলুম। নইলে এত কথা আমি মশাই সহজে বলিনে।

'বয়'কে ডেকে রেস্তোরাঁর পাওনা মিটিয়ে দিলাম। কিছুটা খালি হল মণি-ব্যাগ। কিন্তু ভরে উঠলো মন।

হঠাৎ চম্পটী বলে উঠলো—উবগার যে করলাম সেই ঋণের খানিকটা অন্ততঃ উপদেশের মাধ্যমে শোধ দেবার উদ্দেশ্যে বোধহয়—একটি কথা মশাই বলি আপনাকে, মেয়েজাতকে কোনোদিন বিশ্বাস করবেন না। হাড়-বজ্জাত।

আমি বললাম, সে কি ?

চম্পটী বললে, অ্যাদ্দিনের বিশ্বাস ভেঙে আমার চোখে ধুলো দিয়ে ভেগে গিয়ে আমার মেয়েটা সিভিল ম্যারেজ করলে কিনা ঐ এক বোম্বেটে ছোঁড়াকে, যার না আছে ছিরি, না আছে চালচলো। বিজলী আর বেতারের মিস্ত্রি !

বললাম, প্রেম অন্ধ।

চম্পটী বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা কথা আছে বটে, পিরীতের দু'চোখ কানা। কিন্তু পুরুষ জাতও কম হারামজাদা নয় জানবেন। ঐ শয়তান ছোঁড়াও গোপনে গোপনে মেয়েটাকে ফুসলেছে অনেক-

দেখুন!
অর্দ্ধেকটী
সান্‌লাইট্‌
সাবানেই এ সব
কাচা হয়েছে !
সান্‌লাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারন !
SUNLIGHT SOAP
সান্‌লাইট্‌
সাবান
দিয়ে কাচলে কাপড়জামা সাদা ও উজ্জ্বল হয়।
ভারতে প্রস্তুত
S. 242-X52 BG

দিন ধরে। নইলে মেয়ে আমার অমন হুট ক'রে ভেগে যাবার মেয়ে নয়।

আমি বললাম, কিছু কিছু দু'দিক থেকেই—

ব্যাংকে লালবাতি জ্বলে কিছু টাকা আমার গচ্চা গিয়েছিল। বললে অতুল চম্পটী। ঐ কিছুই মশাই আমার মতো ছাপোষা লোকের কাছে বেশ কিছু। তারপর থেকে আমার একটি ফুটো পয়সাও আর ব্যাংকমুখো হয় নি। যা কামিয়েছি তাই দিয়ে কিছু জমি জিরেৎ করেছি, আর বেশীর ভাগ সোনা দানা। ঐ সোনা-দানার কিছু গিন্নীর গায়ে, কিছু মেয়ের গায়ে, বেশীর ভাগ ছিল এক বাকসোয় তালাবন্ধ। মেয়ে আমার উধাও হবার সময় ঐ বাকসো নিয়ে উধাও হলো। বিয়ের যৌতুক।

তারপর ?

তারপর জামাই ছোক্‌রা শুধু মেয়েকে রেখে যৌতুক ফেরৎ দিয়ে গেল—পুরো বাক্‌সো। একরতি সোনাও রাখলে না। আমি বাড়ী নেই, এই ফাঁকে ওর শাশুড়ীকে মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়ে গেল শয়তানীর কামানো পয়সায় সোনা-দানা সে ঘরে নেবে না, ঘর নাকি তার নোংরা হবে। এ সব হলো, ঐ বোধিসত্ত্ব ছোঁড়ার সাগরেদি, বুঝলেন কি না ? বাপের পয়সা-কড়িকে যেমন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে গেছে বোধিসত্ত্ব।

কোথায় ?

কোথায় তা জানিনে। গোটা দুনিয়াই ওর যাবার জায়গা। হুজুরের ভারী নেকনজর ওর ওপর। বলেন, এই আগুনের টুকরোকে আমি কাজে লাগাবো হে চম্পটী। জানিনে কি কাজে লাগাবেন। আচ্ছা, যেতে আজ্ঞা করুন এবার। অনেক বাজে কথা বলা হলো। মনে কিছু রাখবেন না যেন।

চলে গেল শৃগালচক্ষু অতুল চম্পটী। মনে হলো কন্যা সোনা-দানার বাক্‌সো নিয়ে পালিয়ে গিয়ে মর্মে তার তত আঘাত দিতে পারে নি। যত দিয়েছে তার বিজলী ও বেতারের মিস্তিরি ছোক্‌রা জামাই, পরম ঘৃণায় সে বাক্‌সো ফিরিয়ে দিয়ে।

* * * *

ঠিকই বলেছিল অতুল চম্পটী। চমৎকার বাংলো-প্যাটার্ণের বাড়ী, গেটের বুকে জমকালো নাম-ফলকে জ্বল জ্বল করছে রাহুল রায়ের নাম। ইংরিজি হরফে, কিন্তু ইংরিজি কায়দায় সংক্ষেপিত নয়। গারাজে কোলাপসিবল গেটের আড়ালে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে ঝক্‌ঝকে সুদর্শন গাড়ী। গারাজের ওপরের ঘরে বোধ হয় বাস করে গাড়ীর ড্রাইভার।

এ বাড়ীতে একটি মাঝারি আয়তনের পরিবার অসামান্য স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে। বাস করছে রাহুল রায় একা। অবশ্য ভৃত্য আছে, বাবুর্চি আছে। তবু একা বোধ করছে রাহুল রায়, এমন একা বোধ করেনি দিবাকর দালালের গারাজের ওপরের ঘরে একা থেকেও।

বেশ-ভূষা বদলেছে রাহুল রায়ের। নেই সেই আধ অপ্রতিভ আধ-অসহায় ভাব। মনে হলো কেরাণী রাহুলের সঙ্গে সঙ্গে মরেছে কবি রাহুল, এ রাহুল রায় কবিও নয় কেরাণীও নয়, চৌধুরী কোম্পানীর একজন উঁচু পদের কর্মঠ কর্মচারী। কিন্তু না, রাহুল মানে না তা।

এখন আর খাতার বুকে আবেগ ঢেলে কালীর আঁচড় কেটে কথার পর কথা সাজিয়ে কাব্য করিনে ধনপতি বাবু।—বলে রাহুল। এখন রচনা করছি বাস্তব জীবন-কাব্য। মরে নি কবি রাহুল রায়। এবার হয়েছে সত্যিকারের জীবন-কবি। পুঁজিতন্ত্রকে গালি দিয়ে সর্বহারা-জাগানো যে সব কবিতা লিখেছি, তাতে সর্বহারারা কতটা জেগেছে জানি নে, কিন্তু পুঁজিবাদের ইমারত থেকে একখানা ইঁটও খসেছে বলে মনে হয় না। দুনিয়ার কি উপকার করতে পারতুম আমার গারাজ-ঘরে বসে অমন কবিতা লিখে ? কিন্তু এখন ? বিরাট বিস্তীর্ণ পোড়ো জমিকে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলছি দ্রুতবেগে। দেখতে দেখতে সেখানে জেগে উঠবে নতুন জনপদ, যেখানে আশ্রয় পাবে আশ্রয় পাবার যোগ্য দরিদ্র এবং বাস্তুহারার দল, দারিদ্র্য এবং বাস্তুহারানোটাই যাদের একমাত্র গুণ নয়, যারা তাদের শ্রম দিয়ে নতুন সম্পদ উৎপন্ন করে তারি অংশ ভোগ করবে আপন যোগ্যতায়। এ জনপদ হবে না দাতব্য লঙ্গরখানা। এখানে গড়ে উঠবে নানা রকমের, কুটির শিল্প। স্থাপিত হবে বিদ্যায়তন। বসবে নতুন হাট। কত জীবনের কত ধারা এসে মিলবে এইখানে ! এই তো জীবন-কাব্য, ধনপতিবাবু। এ কাব্য রচনার ভার আমারি ওপর দিয়েছেন ভুজঙ্গ চৌধুরী।

হঠাৎ এ ঝোঁক কেন চাপলো ভুজঙ্গ চৌধুরীর মাথায় ?

আমার মনে হয় এ জিনিষ হঠাৎ হয়নি ধনপতি বাবু। সম্ভবতঃ এতে মিস্ সান্যালের অনেকখানি প্রভাব কাজ করছে। নিজের জীবনেই তিনি অনুভব করেছেন বাস্তু হারিয়ে যাযাবর হবার নির্মম বেদনা।

ভুজঙ্গ চৌধুরীর সেক্রেটারী সানন্দা সান্যাল ?

হ্যাঁ, তিনিই। কৃতিত্ব আছে তাঁর, একথা আপনার কাছে বলতে কোনো বাধা দেখি নে। অবশ্য এই জনপদ পরিকল্পনার অংকুর প্রথমে এসেছিল ভুজঙ্গ চৌধুরীরই মনে, কিন্তু সেই অংকুর যে ধীরে ধীরে জলের বুকে বুদ্‌বুদের মতোই মিলিয়ে যায় নি, পরিণত হতে চলেছে মহীরুহে, এর মূলে মিস্ সান্যালের অবদান অনেকখানি। ওঁর ভেতরে প্রাণশক্তির যে কী প্রাচুর্য্য, অথচ উচ্ছ্বাস-চঞ্চলতার বাহুল্য নেই, আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না ধনপতি বাবু।

সানন্দা সান্যালের উচ্ছ্বাস অচঞ্চলতার বর্ণনায় উচ্ছ্বাস—চঞ্চল হয়ে উঠলো রাহুল রায়। ওর ভেতরের সেই পুরাতন কবিটি যেন মাথা উঁচিয়ে নিজের জানানি দিতে চাইছে।

চৌধুরী কোম্পানীতে আমি কাজ করছি মিস্ সান্যালের আগে থেকে। বলতে লাগলেন রাহুল রায়। মনের পটে আজো জ্বল জ্বল করছে সে দিনের ছবি, সানন্দা যেদিন প্রথম এলেন ভুজঙ্গ চৌধুরীর সেক্রেটারী হয়ে। আমরা অফিসের সবাই তখন ভুজঙ্গ চৌধুরীকে জানি, সানন্দা সান্যালকে জানিনে। চিন্তিত হলুম সানন্দার জন্যে। রসময় বাবু— আমাদের এক জন সহ-কেরাণী ছিলেন সাহিত্য-সৌখিন দিলখোলা লোক, অবসর বিনোদন করতেন ইংরিজি কবিতা পড়ে। তিনি একটি বিখ্যাত ইংরিজি ছড়া থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আওড়ালেন কাম ইন্‌টু মাই পারলার, সেইড দি স্পাইডার টু দি ফ্লাই। এসো গো আমার ঘরে, মাছিকে বললে মাকড়সা। কিন্তু দেখা গেল এ মাছি আলাদা ধাতুর, আলাদা ধাতের। মাছি এলো না মাকড়সার আওতায়, মাছির আওতায় এসে অনেক বদলে গেল মাকড়সা। তারপর দেখা গেল সানন্দা-মাছির প্রাণশক্তির বাহুতে বীর অথচ

দৃঢ়-নিশ্চিত গতিতে ভুজঙ্গ-মাকড়সার অসাধারণ পরিবর্তন। উপমাটা বোধ হয় তেমন লাগসই হলো না ধনপতি বাবু। কিন্তু বিনা উপমায় এমন জিনিষ তো বোঝানো সম্ভব নয়। ভয় হচ্ছে উপমা দিয়েও হয়তো ভালো বোঝাতে পারলুম না।

আমি বললাম, বুঝেছি আমি। শুধু বুঝেছি নয়, অনুভব করেছি। আমি তো দেখেছি সানন্দাকে, আলাপ করেছি তাঁর সঙ্গে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রাহুল রায় বললেন, তাহলে আপনি কিছুটা বুঝতে পেরেছেন। সানন্দার মতো সেক্রেটারী পাওয়া বিরাট সৌভাগ্যের কথা ধনপতি বাবু। সৌভাগ্যবান ভুজঙ্গ চৌধুরী।

কি যেন কিছুক্ষণ ভাবলেন রাহুল রায়। তারপর ধীরে ধীরে করুণ আনমনা স্বরে বললেন, সানন্দা সান্ন্যাল এখন আমার সেক্রেটারী।

বিস্ময়ের ভান করে বললাম, ভুজঙ্গ চৌধুরীর নয়?

রাহুল রায় বললেন, না। আমার। কথার স্বরে মনে হলো যে সানন্দা সান্ন্যালের মতো সেক্রেটারী পাওয়া বিরাট সৌভাগ্যের কথা, সেই সানন্দাকে সেক্রেটারী পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতে পারছেন না রাহুল রায়।

ভুজঙ্গ চৌধুরীর জীবনের ইতিহাসে সানন্দা সান্ন্যালের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে: এখন তাঁর জীবনে এসেছেন দময়ন্তী দালাল। ভুজঙ্গ-জীবন-নাট্যে যে ভূমিকা সানন্দার পক্ষে হয়তো অসম্ভব, সে ভূমিকার পক্ষে হয়তো সানন্দা অযোগ্য। ভুজঙ্গ জীবনে সাঙ্গ হয়েছে সানন্দার যুগ, দময়ন্তী যুগ সুরু হয়েছে বুঝি। তাই সানন্দা এখন আর ভুজঙ্গের সেক্রেটারী নয়, রাহুলের সেক্রেটারী।

রাহুল রায়ের হয়তো ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় নেই, পরিচয় হয় নি ধূর্জটী ধারার সঙ্গে, তাই জানে না কমপ্লেক্স্ আর অবচেতনের রহস্য। কিন্তু আমার মনের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ডুব দিয়েছে রাহুল রায়ের অবচেতন মনের গহনে। আমি তাই জানি, জানি হে রাহুল, কোথায় তোমার ব্যথা বাজছে, কোথায় তোমার বাধা, কোথায় দ্বিধা, কোথায় সংশয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভুজঙ্গ চৌধুরী আর তাঁর সেক্রেটারী সানন্দা সান্ন্যালকে মনের চোখে এতদিন সমান উঁচুতেই দেখে দেখে অভ্যস্ত রাহুল, সেই অভ্যাসের ঘোর চোখ থেকে এখনো বুঝি কাটেনি। সেই উঁচু সানন্দার পায়ের তলা থেকে হঠাৎ খামখেয়ালে মাটি সরিয়ে নিয়েছে ভুজঙ্গ, আর তেমনি খামখেয়ালী হাতে হঠাৎ ঠেলে উঁচুতে তুলে দিয়েছে নীচু রাহুলকে। ফলে সানন্দা নেমে গেছে রাহুল রায়ের অধীনে, আর রাহুল হয়েছে তার ওপরওয়ালা—ইংরিজিতে যাকে বলে 'বস'! এই ওপরওয়ালাগিরির লজ্জায় সানন্দার চোখে চোখ ফেলতে পারছে না রাহুল রায়। ভাবছে সানন্দার এই অধঃপতনের জন্যে (পরোক্ষ ভাবে) সে-ই অপরাধী; এই অপরাধ-বোধই একটা কমপ্লেক্স্-এর রূপ নিয়েছে রাহুল রায়ের মনে।

একটা প্রশ্ন করবো ধনপতি বাবু। জবাব দেবেন? শুধালে রাহুল রায়। বললাম, দেবো।

এলোমেলো, ছেলেমানুষি প্রশ্ন। শুনে হাসবেন না তো? মনে করবেন না তো কিছু?

ছেলেমানুষি প্রশ্ন শুনে মনে মনে হেসে বললাম, না। রাহুল বললে, গল্পের শ্রেষ্ঠীকন্যা হৃদয়হারায় বাগানের মালীর ছেলের কাছে। রাজকুমারীর মন জুড়ে থাকে রাখাল ছেলে। এমনটি কি শুধু গল্পেই সম্ভব? বাস্তবে কি এমনটি ঘটে না?

আমি বললাম, এমন হামেশাই ঘটতে পারে রাহুল বাবু। হৃদয় বেহিসেবী, তার গতি তো শুধু সমতলেই আবদ্ধ নয়। নীচে থেকে সে উঁচুদিকেও তাকায়, আর উঁচু থেকেও তাকায় নীচু দিকে। নীচেকার মিটু মিটে প্রদীপ ও কামনা করে আকাশের চাঁদকে। আকাশের চাঁদও যে তুলসীতলার ভীরু প্রদীপের কাছে হৃদয় হারায় না, তাই বা কে জানে? হৃদয় মানে না কোনো বাধা, কোনো কারণ।

আমার কথা শুনে প্রথমে খুশীতে ভ'রে উঠলো রাহুলের মুখ, তার পরেই আবার বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। বললেন, আমিও তাই ভাবি। কিন্তু হৃদয়ের সব আশার তো পূরণ হয় না জীবনে। তাই তো মানুষের জীবনে এত ট্র্যাজেডি, আর সেই ট্র্যাজেডিকে তবু হাসির মুখোস প'রে তার আড়ালে মুখ লুকিয়ে রাখতে হয়। চা নিন ধনপতি বাবু।

চেয়ে দেখি চা এসে গেছে। তুলে নিলেম এক পেয়ালা। এক পেয়ালা তুলে নিলেন রাহুল রায়। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে চোখ বুজে এলোমেলো ভাবতে ভাবতে এলোমেলো ভাবে মনে হলো রাহুল রায়ের হৃদয়-ঘড়ির পেণ্ডুলামে দুলে দুলে বার বার ধ্বনিত হ'চ্ছে একটি নাম: দময়ন্তী রায়। দময়ন্তী রায়। দময়ন্তী রায়। সহসা থমকে থেমে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে রইল পেণ্ডুলাম। করুণ কান্না স্পন্দিত হতে লাগলো পেণ্ডুলামে। সোনালী বোর্ডের বুকে লেখা দময়ন্তী রায় থেকে যেখানে "রায়" মুছে গিয়ে সোনালী রং কালো হয়ে গেল, সেখানে কোন্ এক অদৃশ্য হাতের পরিচালনায় সাদা খড়িতে ধীরে ধীরে লেখা হতে লাগলো চৌধু—

"ধনপতি বাবু!"

রাহুল রায়ের হঠাৎ ডাকে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। রাহুল রায় বললেন, স্যাণ্ডউইচ নিন একখানা। শুধু চা খেতে নেই। আমার ক্ষণস্থায়ী চোখ-বোজা দিবাস্বপ্ন লক্ষ্য করেন নি রাহুল রায়। স্যাণ্ডউইচ নিলাম একখানা।

মেয়েদের সাইকোলজি আপনি কেমন বোঝেন ধনপতি বাবু? রাহুল রায়ের প্রশ্ন। গারাজের ওপরের খুপরি থেকে গারাজওয়ালা বাংলোতে এসে মেয়েদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন রাহুল রায়। অথবা মাথা হয়তো আগেও ঘামতো, শুধু বাইরে ছিল না তার প্রকাশ।

বললাম, বুঝিনে।

ঠাট্টা করছেন? হো হো করে হাসবার চেষ্টা করে বললেন রাহুল রায়। মেয়ে-মনস্তত্ত্বেও আমি একজন বিশেষজ্ঞ, যাকে বলে অথরিটি, এইটেই আপন-খুশীতে আপনি মেনে নিয়ে বলতে লাগলেন "দ্বিজেন্দ্রলাল আশ্চর্য্য গান লিখে গেছেন: পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে। নারীর পতিতোদ্ধারিণী রূপের প্রতীক এই গঙ্গা। নারী শ্রদ্ধা করে পুরুষের পৌরুষকে, কিন্তু ভালোবাসে পুরুষের অসহায় রূপ—রোগে, শোকে, বিপর্য্যয়ে, হীনতার পাঁকে, যে ক্ষেত্রে নারী ভূমিকা নিতে পারে উদ্ধারকর্ত্রীর। সেবা, ত্যাগ, মায়া, সহানুভূতি দিয়ে পুরুষকে সে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্ধার করবার চেষ্টা করে। যাকে সে উদ্ধার

করে তোলে—রোগ থেকে, দুঃখ থেকে, বা নৈতিক অধোগতি থেকে—তার ওপর আপন অধিকার সে মনে মনে প্রতিষ্ঠা করে নেয়। কিন্তু—

কিন্তু ?

মনে মনে প্রতিষ্ঠা করা সেই দাবী বাইরে জাহির করে আদায় করতে হয়তো সংকোচ আসে, দ্বিধা আসে, আসে সংশয়; হয়তো বা মর্য্যাদা-বোধ দাঁড়ায় পথ রোধ করে। বুক ফাটলেও নাকি মেয়েদের মুখ ফোটে না। তাই নয় কি ধনপতি বাবু ?

সে স্বভাবটা মেয়েদেরই একচেটিয়া নয় রাহুল বাবু। পুরুষদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় তাই।

রাহুল রায় একটু ভেবে বললেন, হয়তো তাই ধনপতি বাবু। আবার বললেন, হয়তো তাই !

বুঝলাম আমাকে রাহুল রায় যে কথা বোঝাতে চাইছেন, সে কথা সোজা ভাষায় সোজাসুজি আমায় বলতে তাঁর বাধছে, তাই ইঙ্গিত, উপমা, রূপকের অবতারণা।

মুখে রূপোর চামচ নিয়ে যদি জন্ম নিতুম, বললেন রাহুল রায়, তাহলে আমার জীবনের ইতিহাস আজ অন্য রূপ নিত।

হয়তো তাই রাহুল। তাহলে হয়তো তোমার সেই সোনালী কল্পনার "রায়" মুছে গিয়ে "চৌধুরী" হতো না।

কিন্তু জন্মাই নি বনেদী বড়লোকের ঘরে। জন্মেছি গরীব মধ্যবিত্ত ঘরে, বললেন রাহুল রায়। সে আমার লজ্জা নয়, ধনপতি বাবু; সেজন্য দুঃখও করি নে। বরং সেই আমার গর্ব্ব, —সেই আমার গৌরব। তৈরী তখ্‌তের ওপর এসে অনায়াসে আসীন হওয়াতে কি পৌরুষ আছে ! আমি সুযোগ পেলেই আপন তখ্‌ত তৈরী করে নেবো আপন পৌরুষে। পা দিয়েছি সেই সুযোগের সিঁড়িতে।

সেই সুযোগ দিয়েছেন ভুজঙ্গ চৌধুরী।

তিনি দিয়েছেন তাঁর নিজের প্রয়োজনে। আমি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এইটে প্রমাণ করবো যে, গরীব পরিবারে জন্মালেই সে হেয় হয় না, যোগ্যতায় সে ধনী বংশজাতকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই আমার চ্যালেঞ্জ ধনপতি বাবু।

হয়তো সৌদামিনী দালালের নিদারুণ অবজ্ঞতার আঁচ ভুলতে পারেন নি রাহুল রায়। তাঁকে একদিন আফশোষ করাবার উদ্দেশ্যেই রাহুল রায়ের এই যোগ্যতার সাধনা। কর্মপ্রতিভায় ভুজঙ্গ চৌধুরীর চেয়ে তিনি খাট নন, এইটে তিনি প্রমাণ করবেন।

হ্যাঁ, একটা কথা। বললেন রাহুল রায়। এই সুযোগ, নতুন উঁচুপদের এই দায়িত্ব নিতে হয়তো আমি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতুম। কিন্তু পিছিয়ে যেতে দেন নি সানন্দা সান্যাল। ভরসা দিয়েছেন, ভীরুতাকে ধিক্কার দিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন আমার পৌরুষের গর্ব্ব। বলেছেন, ছিঃ ! দায়িত্ব দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে কেন রাহুল বাবু ? ক্যাপিট্যালিস্টকে ধিক্কার দিয়ে কবিতা লিখেছিলেন না ? সেই ক্যাপিট্যালিস্ট যখন যেচে এলো সোনার সুযোগ দিতে, তখন আপনিই কাপুরুষের মতো পিছিয়ে গেলে কোথায় থাকবে আপনার ধিক্কারের মর্য্যাদা ? ক্যাপিট্যালিস্টের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেই হবে আপনাকে। আর এতে আমার আপ্রাণ সহযোগিতা পাবেন আপনি। সেই অভয়বাণী কাজ করলে আমার ওপরে যাদুমন্ত্রের মতো। আমি মাথা পেতে নিলুম দায়িত্ব, পুঁজিপতির এই মস্ত চ্যালেঞ্জ।

কেন এই আগ্রহ সানন্দা সান্যালের ? রাহুল রায় অনুমান করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন সানন্দার কেন এই আগ্রহ। হৃদয়ের ব্যাপারে সানন্দার প্রতিদ্বন্দ্বিনী দময়ন্তী, তাই দময়ন্তীকে সইতে পারেন না সানন্দা। ভুজঙ্গ চৌধুরী হয়েছেন দময়ন্তী-মশগুল্; তাই ভুজঙ্গ চৌধুরীর প্রতি সানন্দার ক্রোধ, অভিমান; ভুজঙ্গ চৌধুরীর অবহেলা শেলের মতো বিঁধেছে তার বুকে। তাই ভুজঙ্গের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তার উপযুক্ত জবাব দিতে পারে রাহুল, সানন্দার এই কামনা।

কিন্তু তুমি কি ভুল করো নি রাহুল ? প্রতিদ্বন্দ্বিনী রূপে দময়ন্তীর ওপর সানন্দার বিরূপতা আছে, কিন্তু সে কি ভুজঙ্গ চৌধুরীর জন্যে, না তোমার জন্যে হে রাহুল ?

আপনাকে ফাদার কন্‌ফেসর বানাতে চাইনে ধনপতি বাবু, বললেন রাহুল রায়, কিন্তু আরেকটা কথা না বলে পারছি না। সানন্দা সান্যাল যে আমার কত বড় ভরসা আর প্রেরণা, ওঁর ওপর যে আমার কতখানি নির্ভর, তা আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না। ভুজঙ্গ চৌধুরী নিদারুণ ব্যথা দিয়েছে তাঁকে, তাই কর্ম-প্রতিভায় আমি চৌধুরীকে ছাড়িয়ে যেতে পারি—এইটে প্রমাণ করেই তিনি চৌধুরীর ওপর প্রতিশোধ নিতে চান। তাই আমার সেক্রেটারী হয়ে তিনি যেন মরিয়া হয়ে কোমর বেঁধেছেন আমাকে এগিয়ে দেবার কাজে। কিন্তু মাঝে মাঝে দেখতে পাই, বড় উদাস হয়ে পড়েন সানন্দা। যেন আর তাঁর ভালো লাগছে না এ অফিসের কাজ, এখানকার মেয়াদ যেন তাঁর ফুরিয়ে গেছে। হয়তো আমার কাজকর্ম্ম গুছিয়ে দিয়েই তিনি একদিন বিদায় নেবেন। সেদিনের কথা ভাবতেও আমি ভয় পাই ধনপতি বাবু। দায়িত্বময় কর্মজীবনে কর্ম-প্রতিভাময়ী উৎসাহদায়িনী নারী যে পুরুষের কত বড় শক্তি, মিস্ সান্যালকে দেখে আমি তা বুঝতে পারছি।

আমি বললাম, আপনার ভয় নেই রাহুল বাবু। আপনার পাশে থেকে আপনাকে এগিয়ে দেওয়াকেই তিনি যখন ব্রত বলে গ্রহণ করেছেন, তখন আপনাকে ফেলে তিনি চলে যাবেন না। এগিয়ে দেবার আর এগিয়ে যাবার তো কোনো শেষ নেই।

মনে পড়ে গেল ৺প্রজ্ঞাপারমিতার কবিতার দু'টি লাইন :

"রয়েছে সীমান্তপারে আরো কত অন্তহীন সীমা,
দিগন্তের অন্তরালে আরো কত অন্তহীন পথ।"

রাহুলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। ভাবলাম, ভুজঙ্গ-দময়ন্তীর মিলন হয়ে গেলে যথাসময়ে রাহুলের অফিসের সেক্রেটারী কুমারী সানন্দা সান্যাল পরিণত হবে তার জীবনের সেক্রেটারী শ্রীমতী সানন্দা রায়ে। কিন্তু তখনো কি ভুলতে পারবে রাহুলকে দময়ন্তী, সানন্দাকে ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গকে সানন্দা, আর দময়ন্তীকে রাহুল ? হয়তো পারবে না। আর হয়তো এই ভুলতে না পারাটাই তাদের আরো বেশী ভালো লাগবে।

তুলসী চন্দন

শ্রীচরণদাস ঘোষ

মন্দিরের বিগ্রহ হচ্ছেন গোবিন্দজী—কাঠের মূর্তি।

জনশ্রুতি আছে, এই ঠাকুরটি নাকি সেই ঠাকুর যিনি একদা দ্বাপর যুগে বৃন্দাবনে প্রেম বিতরণ করতেন—যে চাইতো, তাকেই। অতঃপর কি মনে কোরে এখানে এসে অবতীর্ণ হয়েছেন—সে কবে, তা কেউ ঠিক কোরে বলতে পারে না। যাঁরা প্রাচীন, তাঁরা বলেন—বর্গীর আমলের পরে তো নয়ই।

বিগ্রহের পূজারী হচ্ছে চন্দন। সে এই গ্রামেরই এক পবিত্র ব্রাহ্মণবংশের ছেলে। ছেলেটি অবিবাহিত—কুমার। বয়স কাঁচা—কুড়ি পেরিয়ে একুশ। মুখ প্রশান্ত, গায়ে রং ফেটে পড়ছে, চেহারা সুশ্রী, আকৃতি সুপুষ্ট—গলায় একগোছা পৈতে, ছোট কোরে চুল ছাঁটা, বড়সড় শিখা—শিখায় বাঁধা ফুল। দেখলেই মনে হয়, ছেলেটি জাত-পূজারীর ছেলে। মিথ্যেও নয় কথাটা। সাতপুরুষ ধরে এরা এই মন্দিরে ব্রতী, কেউ বলে—চোদ্দপুরুষ।

সন্ধ্যার পর আরতি হয়, তারপর হয় বাসর-রচনা, তারপরই মন্দিরে কপাট পড়ে—শ্রীরাধিকা আসেন।

বাসরের মালা গেঁথে এনে গোবিন্দজীর কণ্ঠে তুলে দেয় তুলসী—এই গ্রামেরই এক মালাকরের কিশোরী কন্যা। এই হচ্ছে ব্যবস্থা—এই ব্যবস্থাই চিরাচরিত। যার-তার হাতের মালা গোবিন্দজী কণ্ঠে ধারণ করেন না। বাসর অনুষ্ঠান—অনাঘ্রাত কুসুম-কলিকাসম কুমারী-কন্যারই হাতের মালা চাই। এই কুমারী হবে গঙ্গাজলের মত পবিত্র, জবার ন্যায় শুচি, সূর্য্যের ন্যায় নির্দাগ। নির্বাচনের পরীক্ষায় এই তুলসীই মনোনীতা হয়েছে। এই পদে ব্রতী হয়ে থাকবে সে ততদিন, যতদিন না তার বিবাহ হয়, কিংবা চরিত্রে কোনোরূপ কলঙ্ক না পড়ে। গোবিন্দজীর কণ্ঠে মালা তুলে দেবার মত মেয়েই সে বটে—একটি শ্বেতপদ্ম যেন ফুটতে-ফুটতে আর ফোটেনি।

তুলসী আসে। প্রত্যহ আসে। এসে মালা হাতে কোরে দাঁড়িয়ে থাকে মন্দিরের মুখে। আরতি হয়। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে তুলসী—অপলকনেত্রে। সেই দৃষ্টি গিয়ে পড়ে মন্দিরের ভেতর। কার ওপর পড়ে, তা সেই-ই জানে আর জানেন সেই মন্দির-রক্ষী, যিনি সকলের মনের খবর রাখেন। আরতি শেষ হয়। তারপর সে ধীরপদে এগিয়ে যায় বিগ্রহের কাছে—কাঠ আর কাঠ—কাঠে তৈরী যে মূর্তি—তাঁরই কাছে। দেখে মনে হয়—পা আর উঠছে না, কত বাধাই না পাচ্ছে সে। কিন্তু যায়, এগিয়ে যায়, প্রত্যহই যায়, গিয়ে মালা পরিয়ে দিয়ে ফিরে আসে।

এইভাবে দিন কাটে—দিনের পর দিন।

* * * *

গ্রামখানা পণ্ডিতপ্রধান গ্রাম। বাড়ী-বাড়ী টোল, বাড়ী-বাড়ী পণ্ডিত। বেদ, বেদান্ত, কাব্য, রস, তর্ক, পুরাণ—সকল শাস্ত্রেরই বিস্তর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পুঁটিমাছের মত ইতস্ততঃ সাঁতার দিচ্ছেন এই গ্রামে। এঁদের ব্যূহ ভেদ কোরে তুলসী যখন অপরূপ বেশে কৌতুক-ছন্দে অঙ্গ দুলিয়ে সন্ধ্যার পর মালা হাতে কোরে মন্দিরে আসে, তখন পণ্ডিত-প্রবরদের কেউ কেউ তাকে শ্রীবৃন্দাবনের সাক্ষাৎ শ্রীমতীই কল্পনা কোরে ফেলেন, এবং সেই কল্পনায় আদিরসের দু'একটি শ্লোকও নাকি তাঁদের হাত দিয়ে রচিত হয়ে পড়ে। সে-কথা গোপন থাকে না, জানাজানি হয় তাঁদেরই গৃহ-বৃন্দাবনের শ্রীমতীদের কণ্ঠমহিমায়।

একদিন এক ঘটনা ঘটলো। কুটিল পণ্ডিত ছিলেন এক দিগগজ রসশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত। তাঁর টোলের সুমুখ দিয়েই তুলসীর মন্দিরে আসবার রাস্তা। সেদিন সন্ধ্যার পর যখন সে আসছে পণ্ডিতমশাই তার মনোহর বেশ ও চল-চঞ্চল চলনভঙ্গী দেখে একটু যেন বিহ্বল হয়ে পড়েন। তাকে ডেকে বলেন, "আমার পুঁথির ওপর তোর নামে শ্লোক উঠেছে শুনে যা—"

"আমার নামে শ্লোক?"

"হ্যাঁ! তুই যে কে, তা তুই জানিস্ না! রাধিকা, রে রাধিকা,—বৃন্দাবনের শ্রীমতী! তাই তো তোর হাতেই মালা নেন ঠাকুর!"

"তা'হলে, সে শ্লোক আমাকে তো শুনতে নেই পণ্ডিতমশাই! শুন্‌লে, মাটিতে আমার আর পা পড়বে না!" কথাটা বলেই একটু হেসে তুলসী বিদ্যুতের মত ঠিক্‌রে মন্দিরে চলে আসে।

ক্রমে হাসি তার বেড়েই গেল—হেসে কুটি-কুটি। কেউ তখন ছিল না, ছিল একা চন্দন। একটু পরেই হবে আরতি, তারপরই বাসর। চন্দন অবাক্ হয়ে গেল। বললে, "হাসছ যে!"

"হাসবো না! আমি যে রাধিকা, গো, রাধিকা!"

"মানে?"

"বৃন্দাবনের শ্রীমতী।"

চন্দন কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে তুলসীর মুখের দিকে চেয়েই থাকে। তুলসীর কিন্তু হাসি আর থামে না। বলে, "কি বোকা গো তুমি! তবুও বুঝতে পারলে না? আচ্ছা, শ্রীমতী যে গান গাইতো, সেই গানের একটা জায়গা গাই, তা হলেই বুঝতে পারবে।" বলতে-বলতেই তার গলা কেঁপে গান বেরুলো—"(কবে) অধরে অধর দিয়ে পিব মুখসুধা, জনম-জনমের আমার মিটিবে ভবক্ষুধা—" হঠাৎ থামলো। তারপর সে চন্দনের দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে বলে উঠলো, "তুমি এক কাজ করতে পারো, ঠাকুর এক কাজ করতে পারো?—মন্দিরের ওই কাঠের ঠাকুর—ওই না? ওঁর মতন ঘাড় বেঁকিয়ে, পায়ে পা দিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে আমার সুমুখে দাঁড়াতে পারো? দাঁড়াও না? একটিবার?"

"ধোৎ—"

"ধোৎ—কেন? তা'হলে, আমি কি করি, জানো—দিই ফেলে

এই মালাগাছটা! কোথায় বলো দিকিনি—তোমার গলায়, গো, তোমার গলায়!"

চন্দন ধমক দিয়ে উঠলো—"ছি, তুলসী! ও-কথা বলতে নেই—বললে পাপ হয়।"

"পাপ হয়?"—তুলসীর মুখটা একবার একটু বিবর্ণ হয়েই সহসা কঠিন হয়ে উঠলো, তারপরই অবসন্ন হয়ে ঝুলে পড়লো। মুখ দিয়ে পুনরায় অস্ফুট নির্গত হলো—"পাপ হয়!" কিন্তু, সে এক মুহূর্ত্ত! পর মুহূর্ত্তেই আবার সে মুখ তুললো, মুখ তুলে মুখ রাখলো চন্দনের মুখের ওপর। দপ্-দপ করছে তার চোখ, চোখে নীল আভা। আবার বলে উঠলো, "কি বললে—পাপ হয়?" গলাটা কেঁপে উঠলো, হয়তো কেঁদে ফেলবে। ঠিক সেই সময় একদল লোক এসে পড়লো—আরতির সময় হয়েছে। তুলসী মুখ ফিরিয়ে নিলো। কি কথা তখন তার মনে উঠেছিল কে জানে! বোধকরি, জানেন—মন্দিরের ওই অন্তর্যামী।

শুধু অন্তর্যামীই নয়, চন্দনও যেন কিছু জানতে পেরেছিল। তাই পরের দিন সন্ধ্যায় তুলসী আসতেই বললো "দেখো, মানুষেরই গলায় যদি মালা দিতে চাও, তা'হলে এইবার বিয়ে করো।"

তুলসী চন্দনের দিকে তাকিয়েছিল, মনে হলো—তার চোখের তারা দুটো সহসা স্থির হয়ে গেছে, মূর্ত্তিটাও পাথর হয়ে গেছে, যে পাথরে গেঁথে গেঁথে উঠেছে সারি সারি হিমালয়, যার গহ্বরে-গহ্বরে উপবিষ্টা ধ্যানমগ্না, তপস্যা-মৌনা, প্রেমবিহ্বলা শত সহস্র, লক্ষ কোটি গিরিকন্যা কুমারী উমা।

চন্দন কথাটা আবার গুছিয়ে বললে, "যার গলায় মালা দেবে, তার হবে তুমি বউ।"

তুলসী এইবার চোখ নামালো, নামিয়ে বললে—"আচ্ছা।"

অতঃপর কয়েকদিনের মধ্যেই জানা গেল, তুলসীর বিয়ে—দিন-স্থির পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। বিয়ের পরদিন থেকে সে আর মন্দিরে আসবে না।

দেখতে দেখতে বিবাহের দিন এসে পড়লো। আজ এলেই তুলসীর মন্দিরে আসা শেষ হবে। তাই আজ গ্রামের মেয়ে-পুরুষ সকলে কাতার দিয়ে দেখতে এসেছে। দেখতে এসেছে, ঠাকুরের গলায় তার মালা দেওয়া—মালা দেওয়া এই শেষ দিনটিতে। দেখবার মত দৃশ্যই বটে! মন্দিরে ঢোকবামাত্র রূপ যেন তার উথলে ওঠে, যৌবন যেন চলকে পড়ে, আবেগে লুটিয়ে পড়ে দেহলতা, আর সেই মধু-মুহূর্ত্তে ঠাকুর যেন হেসে হেসে কাছে এসে ভালোবেসে গলা পেতে নেন সেই মালাটি। দর্শনার্থী যারা, তারা সকলেই বিহ্বল হয়ে পড়ে—মেয়েরা ঘনঘন চোখ মোছে, অ-পণ্ডিত পুরুষদের হয়-সমাধি, পণ্ডিতরা মত্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন—"গোবিন্দ গোবিন্দ।" এ যেন সেই দৃশ্য, যে দৃশ্যে বৃন্দাবনের এক পরম দৃশ্য ফিরে আসে। সেই দৃশ্য দর্শন করবার আজ শেষ দিন।

শেষ দিন !

আজ আর নাট-মন্দিরে তিল ধরে না—এতো লোক! পণ্ডিত মহল স্থান অধিকার করেছেন অগ্রভাগে। তাঁদের পরিধানে পট্টবস্ত্র, কণ্ঠে তুলসীর মালা, অঙ্গে তিলক-চন্দন, মস্তকে সুপুষ্ট শিখা। পার্শ্বেই—আপন আপন গৃহিণী, শ্রেণীবদ্ধ। পশ্চাতে দণ্ডায়মান জনসাধারণ গ্রামবাসী—আবালবৃদ্ধবনিতা।

প্রতিদিন তুলসী আসে আরতির পূর্ব্বেই। কিন্তু আজ আসবে —পরে। আজ সন্ধ্যায় তার 'আশীর্ব্বাদ'—কাল বিবাহের দিন। 'আশীর্ব্বাদটা' হয়ে গেলেই সে আসবে—মাথার ধান-দূর্ব্বাগুলো ঝেড়ে ফেলতে যা দেরি। * * * আরতি হয়ে গেল। সকলেই অধীর প্রতীক্ষায় রাস্তার দিকে চেয়ে—এই বুঝি আসে!

এলো তুলসী। এলো এক অন্ধকার মূর্ত্তি! মন্দিরে জ্বলেছে আজ সহস্র বাতি, আকাশেও মস্ত চাঁদ। এতো আলো! তবুও তাকে যেন দেখা যায় না। কোনোদিকেই সে চাইলো না। মুখ নিচু কোরে সোজা মন্দিরে গিয়ে উঠলো—হাতে দুলছে মালাটি, যে মালা সে এখনই পরিয়ে দেবে তাঁর গলায়, যাঁর গলায় প্রত্যহ সে পরিয়ে দেয়। কাঠের বিগ্রহ—সেই তিনি, সেই ঠাকুর। ঠাকুরের প্রাণ আছে, কি প্রাণ নেই, তা তুমিও জানো না, আমিও জানি না। তাঁর গলায় মালা দেওয়া সকারণ কি অকারণ, তা তুমিও বলতে পারো না, আমিও বলতে পারি না। যে পারে, সে পারে। তুলসীও পারে কি, পারে না, তা সেই-ই বলতে পারে।

মন্দিরের রোয়াকে উঠেই সে থমকে দাঁড়ালো—সুমুখেই চন্দন। তুলসী একটু হাসলো। সেই হাসি যেন ঠিকরে গিয়ে পড়লো ভেতরে—বিগ্রহের মুখে। ক্ষণবিলম্ব হলো না—চোখের পলকে তুলসীর হাত থেকে মালাগাছটা ঠক্ কোরে পড়ে গেল চন্দনের গলায়। সঙ্গে সঙ্গে নাটমন্দিরের সুমুখকার পণ্ডিতমহলটি যেন রবারের বলের মত লাফিয়ে উঠলেন। যেন অতর্কিতে সেখানে কোথা থেকে একটা বোমা এসে পড়েছে। কুটিল পণ্ডিত ছিলেন সুমুখেই, তিনি অগ্নিগোলকের ন্যায় এক লাফে মন্দিরের রোয়াকে উঠে বজ্র কণ্ঠে তুলসীকে বলে উঠলেন, "এ তুই কি করলি ?"

তুলসী চন্দনের দিকে মুখ কোরে ছিল, ফিরে দাঁড়ালো। স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, "ঠাকুরের গলায় মালা দিলাম।"

"চন্দনটা তোর ঠাকুর ?"

তুলসীর মুখে একটু হাসির আভা দেখা দিল। তারপর মুখের ভাব পরিবর্ত্তন কোরে জবাব দিল, "ভালোবাসার কথা—ও-কথা আপনারা বুঝবেন না।"

কুটিল পণ্ডিত বিকৃত মুখে বলে উঠলেন, "আমরা বুঝবো না, বুঝবি তুই! আমরা মুখ্যু, তুই পণ্ডিত! বলি, কাল তোর বিয়ের দিন নয় ?"

"হ্যাঁ তো।"

"তবে, এ-সব কি ? বামুনের ছেলের জাত নিয়ে ওকেই বিয়ে কোরে ফেলি,—এই তো তোর মতলব ?"

"বিয়ে ?"—বিস্ময়ে তুলসীর চোখ দুটো ভরে উঠলো, যেন সে এক নতুন কথা শুনেছে।

কুটিল পণ্ডিত তেমনি কোপেই বললেন, "ন্যেকি! কিছুই জানেন না যেন!" তারপর গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে বলে উঠলেন, "নইলে, মালা দিলি কেন—গলায় মালা ?"

তুলসী মুখ টিপে হাসলো। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল সে-হাসি—তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো চোখের দৃষ্টি, কঠিন হয়ে উঠলো মুখ। পরক্ষণেই আবার সে-ভাবটাও অন্তর্হিত হয়ে গেল, যেন তার উদ্যত ফণা সে চোখের নিমেষে মুচড়ে ভেঙে গুঁড়ো কোরে ফেলেছে। নিজেকে স্বাভাবিক মাত্রায় দাঁড় করিয়ে বললো, "লক্ষ্মীর গলায় আপনারা মালা দেন—দেন তো ? তা'হলে লক্ষ্মীকেও আপনারা বিয়ে করেন বুঝি ?"

অগ্নিকুণ্ডে ধুনা পড়লো। এবার সারা পণ্ডিত মহলটাই যেন বোমার মত ফেটে গেল। সকলেই একসঙ্গে গর্জ্জন কোরে উঠলেন—"তুই পাপিষ্ঠা! তুই পাপিষ্ঠা! আমরা তোর সমুচিৎ দণ্ডদান করবো।"

তুলসী তাঁদের দিকে চেয়ে একটু হাসলো। তারপর মুখ নামিয়ে নিঃশব্দে মন্দির থেকে যেমন নেমে আসবে, কুটিল পণ্ডিত বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "পথ রুদ্ধ! তোর দণ্ড গ্রহণের ক্ষণ উপস্থিত"—বলেই নিচে নাটমন্দিরে দণ্ডায়মান একজন প্রৌঢ় পণ্ডিতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। ইনি পণ্ডিত-সমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং এই গ্রামের সমাজপতি—শিরোমণি ঠাকুর।

তিনি একবার চঞ্চল হয়েই দণ্ডবাক্য উচ্চারণ করলেন—'রে তুলসী মালাকর! তোর বিরুদ্ধে অভিযোগ—তুই ভ্রষ্টা, ভ্রষ্টার কুৎসিত কৌশলে এক ব্রাহ্মণকুমারকে অপহরণ করতে উদ্যত হয়েছিস। শাস্ত্রের বিধান মতে ঈদৃশ অপরাধের মৃত্যুদণ্ডই যোগ্য দণ্ড, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তুই নারী, তদ্বিধায়, কিঞ্চিৎ লঘুদণ্ডই তোর অর্থে ব্যবস্থা করা হলো। এক্ষণে, শ্রবণ কর সেই দণ্ড—মস্তক মুণ্ডন করতঃ মুণ্ডিত মস্তকে ঘোল নামক একপ্রকার অম্লাত্মক রাসায়নিক দুগ্ধ পরিত্যাগ করতঃ কুলা নামক ঝাড়নপত্র বিশেষের বাদ্যসহকারে গ্রাম হতে অচিরেই চির-নির্ব্বাসন।"

"সাধু, সাধু"—পণ্ডিতমহলে বিকট হর্ষধ্বনি উঠলো।

শিরোমণি ঠাকুর গ্রামবাসীদের দিকে ফিরে বললেন, "আশা করি, এই দণ্ড তোমরাও অনুমোদন করো—"

গ্রামবাসীরা এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যেন তাদের সুমুখ দিয়ে মর্ত্ত্যটা স্বর্গে উঠে গেছে, আর স্বর্গটা মর্ত্ত্যে নেমে এসেছে। এইবার তাদের চমক ভাঙলো। পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় কোরে তাদের ভেতর একজন অগ্রণী হয়ে বললো, "আমরা ভেবেই পাচ্ছি না, দেব্‌তা, কি আমরা করবো—আপনার দণ্ডটা অনুমোদন করবো, না, তুলসী দেবীর ওপর পুষ্পবৃষ্টি করবো ?"

"তোমরা অর্ব্বাচীন!"—ক্ষেপে উঠলেন শিরোমণি ঠাকুর। চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ কোরে বললেন, "ওই কুলটার পাপ, তা' হলে, তোমাদেরও কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ স্পর্শ করবে!" তার পর তাঁদের গৃহিণীদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমাদের কি অভিমত ?"

বিস্তীর্ণ শণ ক্ষেত্রে অপরাহ্নে মিঠে-মিঠে হাওয়া ধরলে যেমন তাতে মৃদু-মৃদু দোল লাগে, তেমনি ওই কনক-বরণী গৃহিণীদের দলটিও এতক্ষণ এদিক-ওদিক দোল খাচ্ছিল। তদ্দৃষ্টে এটা স্পষ্টই জানা গেল যে, ভয়ঙ্কর কিছু-একটা মন্ত্রণা ওঁদের ভেতর চলেছে। শিরোমণি ঠাকুরের কথাটা লুফে ধরে নিলেন তাঁরই গৃহিণী। তিনি কাছাকাছি এগিয়ে এসে হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলেন, তার পর চোখে কাপড় উঠিয়ে চোখ মুছে ধরা গলায় ব'লে উঠলেন,—"মন্ত্র ব'লে আমাদের সকলকে পাথর কোরে দাও!"

পণ্ডিতমহল ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। শিরোমণি ঠাকুর বিভ্রান্তের ন্যায় বলে উঠলেন, "কেন—কেন ?"

"নইলে, তোমাদের ঘর ছেড়ে ওই কুলটারই সঙ্গ নিতে হবে !"

"এ্যাঁ—"

"ওর পাপ আমাদেরও স্পর্শ করেছে ! কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ নয়—পুরোপুরি !" বলেই শিরোমণি-গৃহিণী কাতরচক্ষে স্বামীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেন, তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "কি জানি কেন, তুলসীর ভালোবাসাকে আমরা সকলেই মনে-প্রাণে সমর্থন কোরে ফেলেছি !" অতঃপর একটু যেন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "পাথর যদি না করো, তাহলে আমরা ওর সঙ্গই নিই—"

কথাটা বলেই শিরোমণি-গৃহিণী যেমন সকলকে হাত নেড়ে ডেকে তুলসীর দিকে পা বাড়াবেন, শিরোমণি ঠাকুর হাঁ-হাঁ কোরে বলে উঠলেন—"তিষ্ঠ, তিষ্ঠ !" বলেই একটা হাত ছড়িয়ে বেড়া দিয়ে স্বীয় দলের দিকে ফিরে নিম্ন কণ্ঠে কি-এক দ্রুত পরামর্শ করলেন। তার পর বললেন, "আমরা যদি দণ্ড প্রত্যাহার করি—"

"তা' হলে—"

"তা' হলে, দণ্ড প্রত্যাহারই করলাম।"

"তা' হলেও, তোমাদের ঘরে আমরা ঢুকতে পারি না !"

"কেন ?"—শিরোমণি ঠাকুরের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল।

শিরোমণি-গৃহিণী স্বামীর প্রতি এক সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরে বললেন, "সকলকার সুমুখে তুলসীকে তোমরা কুলটা বলেছ, ভ্রষ্টা বলেছ। এই অপবাদ আবার সকলকার সুমুখে মুছে যদি না যায়, তা'হলে ওর অঙ্গ তো শুচি হবে না। আর ওর অঙ্গ শুচি না হলে আমাদেরও অঙ্গ অশুচি থেকে যাবে। সে-ক্ষেত্রে এই সব অশুচি অঙ্গে ঘরে ফিরে গিয়ে তোমাদের পবিত্র অঙ্গ যে স্পর্শ করবো, তা' তো হয় না, নাথ !"

শিরোমণি ঠাকুর মস্তবড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। কথাটা স্বীকার করলেন। বললেন, "শাস্ত্রসঙ্গত বাক্য—সেই বাক্যই তুমি বলেছ, প্রিয়ে! এ বাক্য আমরা স্বীকার করি। তা' হলে"—

"উপায় আছে। অনুষ্ঠান আছে একটি—একটি মাত্র, যা সম্পন্ন করলে তুলসীর অপবাদ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় !"

"বলো, বলো"—

"যে-মালা সকলের সামনে তুলসী চন্দনের গলায় এইমাত্র পরিয়ে দিয়েছে, সেই মালা চন্দনও যদি সকলের সামনে তুলসীর গলায় পরিয়ে দেয়।"

"উপযুক্ত প্রতিষেধক !"—শিরোমণি ঠাকুর তৎক্ষণাৎ চন্দনের দিকে ফিরে সুরু করলেন, "আমরা পূজায় বসে মা-লক্ষ্মীর কণ্ঠে মাল্যদান করি, সেই মাল্যদানে এ-অর্থ আসে না যে, আমরা তাঁকে বিবাহ করি, বা তাঁর জাত অপহরণ করি। এই পরম বাক্য এই মাত্র মা-তুলসীর মুখেই প্রকট হয়েছে। তদ্রূপ, তুলসী তোমার কণ্ঠে যে মাল্যদান করেছে, তাতে এটা বোঝায় নি যে, তোমাকে সে বিবাহ করতে চেয়েছে, বা তোমার জাত নেবার অপকৌশল প্রয়োগ করেছে"—

"খুবই সত্য কথা, খুবই সত্য কথা"—অন্যান্য পণ্ডিতরাও একবাক্যে শিরোমণি ঠাকুরের কথা সমর্থন করলে।

সহসা শিরোমণি ঠাকুরের চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি অধিকতর উৎসাহে বলে চললেন, "মা-তুলসীর বক্ষে অপার্থিব কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়েছে, সেই কৃষ্ণ প্রেমই তোমাকে সে অর্পণ করেছে। ওই মাল্যদান তারই অনুষ্ঠান।" এইবার গৃহিণীর দিকে একবার ফিরলেন, ফিরে একটু হেসেই আবার চন্দনের দিকে চেয়ে সুরু করলেন, "বৎস চন্দন, বৃন্দাবনের শ্রীমতীর যে প্রেম, সেই প্রেমই তুমি আজ লাভ কোরে ধন্য হয়েছো। অতএব, সকলের সম্মুখে তুমিও সেই পরম প্রতি-অনুষ্ঠানটি অবিলম্বেই সম্পন্ন করো। তোমার কণ্ঠের মালাটিও প্রেম-পুত্তলিকা মা তুলসীর কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে সকলকে জানিয়ে দাও—তুমিও তাকে শ্রীমতী জ্ঞানেই ভালোবাসো !"

পণ্ডিত মহলে জোর করতালি পড়লো। কিন্তু, চন্দনের দিকে তখন আর চাওয়া যায় না—দারুণ লজ্জায় তার মুখখানা ঝুলে পড়েছে। সে একবার তুলসীর দিকে চাইলো, তার পর সম্মোহিতের ন্যায় তার গলায় ঠিক তারই মত ঠক্ কোরে মালাগাছটা ফেলে দিলে, কেন দিলে তা সে জানে না, যেন দিতে হয় তাই সে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অগণিত গ্রামবাসীরাও আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হর্ষধ্বনি কোরে উঠলো—'তুলসী দেবীর জয়!' তখন তাদের মনে কি ভাব এসেছিল, কি-কথা উঠেছিল—তারাই জানে! তবে দেখা গেল, আকাশে চন্দ্রদেবের অঙ্গে কিরণ আর নেই, সবটুকুই ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছে কুটিল পণ্ডিতের দুই চোখে ! তিনি তুলসীর মুখোমুখী হয়ে হাত দুটো জড়ো কোরে কপালে তুললেন, বুঝি বা তিনিও এবার সকলের সামনেই তুলসীকে জানিয়ে দিতে চান—সে সেই বৃন্দাবনেরই শ্রীমতী।
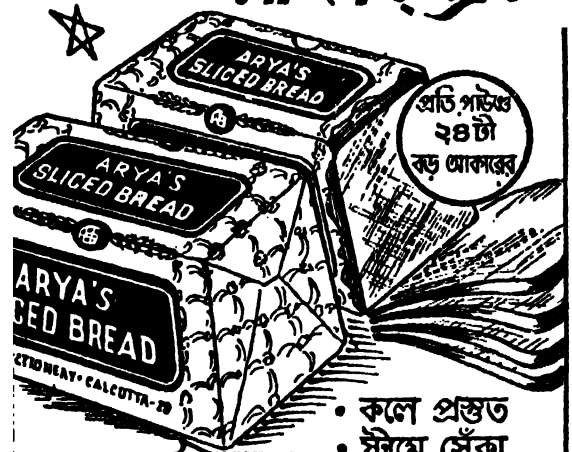
বিবেকানন্দ স্তোত্রে

স্নমণি মিত্র

৪৩

বেফায়দা বুদ্ধির দাসত্ব নয়,
নরেনের মন-প্রাণ সত্যই চায়।
যুক্তির রাস্তাটা পার হোয়ে তবে
একদিন সত্যেই উপনীত হবে।
সে হিসেবে নরেনের তর্ক-প্রিয়তা
দু'-দশজনের মতে নয় বাচালতা।

*   *   *

সমাজের মাথা যারা ভালোবাসে তাকে,
তবু তারা এ-কথাটা শোনাবে তোমাকে।
বুদ্ধির প্রশংসা কোরে নিয়ে শেষে
একটা 'কিন্তু' বোলে সামান্য কেশে,
গলাটাকে খাটো কোরে সামান্য থেমে,
সমান্তরাল রেখা কপালেতে টেনে
সবশেষে বোল্‌বে যা সেটা হোলো এই,—
"অমন গোঁয়ার ছেলে ত্রিভুবনে নেই!
শত্রুও কেউ তাকে বোল্‌বে না বোকা,
তবে বড় বেয়াদপ, ভারী একরোখা,
রুক্ষস্বভাব আর নিদারুণ জ্যাঠা,
তর্ক তো করে না ও, ছুঁড়ে মারে ঝাঁটা!
অপ্রিয়-সত্যকে করে না গোপন,
মুখে শুধু চোখা-চোখা বৃদ্ধবচন!
কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান কিছু নেই তার,
স্থান-কাল-পাত্র সে করে না কেয়ার!
যেমন ঝাঁজালো আর তেমনি দেমাকে,
অমন অহংকেরে দুটো যদি থাকে!
তবে ওর টানা-টানা চোখদুটো ভালো,
চেহারা, বোলতে নেই, বেড়ে জমকালো।"

৪৪

মিথ্যের তালি মেরে জীবনকে ঢেকে,
এদিক-ওদিক চেয়ে তালে তাল রেখে,
থাকে যারা সমাজের কানা-গলিটায়,
—এ তাদেরই বাঁধাবুলি,—তা কি এসে-যায়?
ওদের কি দোষ, ওরা কতটুকু বোঝে?
ওরা শুধু টাকা আর মেয়েছেলে খোঁজে।
ইঁদুর কি বোঝে বলো বাঘের ওজন?
বাঘকে বুঝতে হোলে বাঘই প্রয়োজন।

*   *   *

সূর্যকে বলা চলে—তেজটা কমাও?
পাহাড়কে বলা চলে—মাথাটা নামাও?
কামনা বা কামিনীর ধারে না যে ধার,
তার তেজ হবে না তো তেজ হবে কার?

*   *   *

জীবন বোলতে যারা সম্ভোগ বোঝে,
পরের পকেট আর পরস্ত্রী খোঁজে,
কি সুখে কোরবে তারা সত্যের জাঁক?
অপ্রিয়-সত্যকে তারা চেপে যাক্।

*   *   *

জীবন্মুক্ত যারা, যারা নিষ্কাম,
সত্যাশ্রয়ী হোয়ে করে সংগ্রাম,
মনে যার না-পাওয়ার নেই আফশোষ,
সত্যের সাথে যারা করে না আপোষ,
পরের পকেটে যারা রাখে নাকো মন,
সত্যই জীবনের যার মূলধন,
প্রিয় হোক্, নাই হোক্ সত্য যে চায়,
সত্যের খাতিরেই সত্যে যে যায়,
কি আশায় কোরবে সে মিথ্যে চালাকি?
সত্য গোপন করা মিথ্যে ছাড়া কি?

*   *   *

রাতের অন্ধকারে 'ক্ষুরস্য ধারা'
ত্যাগের কঠিন পথে পা বাড়ায় যারা,
তাদের অহংবোধ থাক বা না থাক,
ত্যাগীদের তেজটাকে ভেবো না দেমাক।

নির্মেঘ সূর্যকে দেমাকে বলো কি?
তেজ ও অহংকার দুটো এক নাকি?
দেমাক থাকলে তার পতন হবেই।
পতন মানেটা হোলো—সত্যে যে নেই।

এ-কথাটা বেশ কোরে ভেবো অন্তত:,
নরেন দেমাকে হোলে স্বামিজী কে হোতো?

৪৫

"I have no time to give my manners a finish.
I have no time to be sweet...
Every attempt of sweetness
Makes me a hypocrite....
—I have to unbreast
Whatever I have to say,
Without caring
If it smarts some
Or irritates others.
...I am a singular man my son...
—Do not try to 'boss' me
With your nonsense....
—What do I care about
What they talk—
The babies,
What ?
I, who have realised the spirit
And the vanity of all earthly nonsense
To be swerved from my path
By babies' prattle ?
Do I look like that ?" ১

*   *   *

ও যদি বিনয় কোরে—ভোলে অহংকার,
হতভাগা দীনতায় লোকসান্ হবে।—

"If I have to please the world,
That will be injuring the world." ২

ঝড়ের বাহার তেজে, স্নিগ্ধতায় নয়।
চাঁদের আলোয় তাকে চুবিয়ে কি লাভ ?

"I do not believe in humility,...
I am too old to change now
Into milk and honey.
Allow me to remain as I am." ৩

শক্তিমান যদি বলে—"আমি কিছু নই,"
সেখানে ও-দীনতাই চরম দেমাক্।

কেউ চাও তালগাছ মাথাটা না তুলে
মাটিতে লতিয়ে হোক মাধবীলতা ?
কেউ চাও রোদ্দুর নিস্তেজ হোয়ে
চাঁদের আলোর মত মাদি বোনে যাক্ ?

"Do not try to drag...down into the mire
With such false nonsense
As compromise
And becoming nice and sweet...
My life is more precious
Than spending it
In getting the admiration of the world." ৪

বাঘ যদি কোনোদিন পাপিয়ার মত
গান গেয়ে ওঠে আর পাকা ফল খায়,
আগুন আঁতকে উঠে খুব সম্ভব
জলে ডুবে প্রাণ দেবে সেই লজ্জায় !

*   *   *

তাই বোলে বোলছি না পাপিয়া খারাপ,
জলকেও রাগ তুলে দিচ্ছি না গাল,
আমার কথাটা হোলো—পাপিয়ার গান
শুনতে না হয় যেন বাঘের গলায়।
আগুনের তেজ যেন জলেতে না থাকে,
আগুনটা স্যাঁতসেঁতে না-হোলেই হোলো।

৪৬

তবে,
শুধু আগুনের কোনো হয়নাকো মানে।
আগুনকে শুভবুদ্ধি দিয়ে
রান্নাঘরে ডেকে এনে তাকে
উনুনেতে বন্দী করা চাই ;
তারপরই 'ডাল-ভাত,' তার আগে নয়।
তার আগে আগুনটা উন্মাদের মত
রূঢ়, রুক্ষ, নির্দয়, শ্রীহীন ;
অকস্মাৎ জীবনের উপকূলে এসে
মানুষের হাহাকার আনে।
তার আগে তার
লেলিহান জীবনটা শুধু মত্ততা,
সুর-তাল-লয়-হীন অসহ্য প্রলাপ !

তাই
আগুনের কাছে সর্বদাই
আগুনের দেবতাটি কাছে থাকা চাই,
যে-দেবতা বেঁধে দেবে জীবনের তার
শক্তিকে সংযত কোরে ঘাড় ধোরে ওঠাবে ঝংকার।

---

১ "আদব-কায়দা পরিপাটি করবার আমার সময় নেই, মন-যোগানো কথা বলবারও নয়···এবং তা কোরতে গেলেই আমি একটি ভণ্ড হোয়ে পোড়বো।···আমার বক্তব্য না চেপেই বোলে যেতে হবে ; ওতে কে আঘাত পাবে বা বিরক্ত হবে—সে বিষয় গ্রাহ্য কোরলে চোলবে না।···বৎস, আমি হোচ্ছি অসাধারণ প্রকৃতির লোক··· তোমাদের আহম্মকি দিয়ে আমায় চালাবার চেষ্টা কোরো না।···লোকে কি বলে না বলে তাতে আমার কি এসে-যায়—ওরা তো খোকা ! কি ? আমি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ কোরেছি, সমস্ত পার্থিব জিনিসের অসারতা প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি কোরেছি—সেই আমি কিনা সামান্য বালকদের কথায় আমার নির্দ্দিষ্ট পথ থেকে চ্যুত হবো ?—আমাকে সেইরকম বোধ হয় নাকি ?"—Letters of Swami Vivekananda. (পৃঃ ১১১, ৩৬৫, ২২৬, ৩৬৪।)

২ "যদি আমাকে জগৎকে সন্তুষ্ট কোরতে হয়, তাতে জগতের অনিষ্টই হবে।"—Letters (পৃঃ ৩৬৫)

৩ "আমি দীনতায় বিশ্বাসী নই।···আমার পক্ষে এ-বয়েসে আর মধুরভাষী হওয়া চলে না। আমি যেমন আছি তেমনিই থাকতে দাও।"—Letters (পৃঃ ১১১)

৪ "আপোস এবং মন-যোগানোর মত মেকি জিনিস দিয়ে পঙ্কমগ্ন করবার চেষ্টা কোরো না। জগৎ-পূজ্য হোয়ে জীবন কাটানোর চেয়ে আমার এ জীবনটার দাম আরও অনেক বেশি।
—Letters (পৃঃ ১১৩, ১৮৩)

যার সুরে অসীম আকাশে
আত্মীয়-বিরোধী ঐ অগ্নিগর্ভ জ্যোতিষ্কের দল,
বিদ্রোহী পরমাণু বুকে কোরে নিয়ে
একে-একে কোনোদিন যায়নাকো ছেড়ে।
যে যার নিজের কাজ কোরে যায় ঠিক,
আপন কক্ষপথে সোজা চোলে যায়।

যার সুরে এই পৃথিবীটা
সেকেণ্ডে উনিশ মাইল
মুখ বুঁজে ছুটে যায় রোজ :
ভুলেও আনে না ঐ
'মঙ্গলে'র কোনো অমঙ্গল,
স্বপ্নাতুর শশাঙ্কের
কোনোদিন ভাঙ্গায় না ঘুম !

জ্যোতিষ্কের যুদ্ধক্ষেত্র ঐ যে আকাশ,
জীবনকে দ্যায় আশ্বাস :
কর্মক্লান্ত মানুষেরা হাঁপ ছাড়ে তাতে।
জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ ভাষায়
কানে কানে বোলে যায়
শুভ্রশির রজনীগন্ধাকে,—
"তোমরা নির্ভয়ে মাথা তোলো।"
সূর্য রোজ ঘাড় ধোরে ঘুম থেকে উঠে
ভেঙ্গে দ্যায় জড়তার বেড়া,
জীবনকে তাপ দ্যায় বিনাপয়সায়,
স্যাঁতসেঁতে মনে দ্যায় আলো।

* * *

এখানেও তাই,
আগুনের দেবতাটি কাছে থাকা চাই,
জীবন-দেবতা হোয়ে বিশ্ববিধাতার
সর্বদা পাশে থাকা চাই।
না হোলেই তাঁর
সৃষ্টির সুষমাটুকু দু'দিনেই হবে ছারখার !

* * *

ভয় নেই, কাছেই আছেন
উনুন তৈরী কোরে খুব সম্ভব
চাল-ডাল কিনতে গ্যাছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

(অবতার-তত্ত্ব)

১

আগুন ও বামুনের দৌলতে যারা
যুগে-যুগে মজা মেরে 'বাড়া-ভাত' খাও, ৫

৫ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বোলতেন,—"আমি ভাত বেড়ে দিয়েছি, তোরা বাড়া-ভাতে বোসে যা।" অর্থাৎ মানুষকে আর খেটে-খুটে ধর্মলাভ কোরতে হবে না। তিনি নিজে কঠোর তপস্যা কোরে আমাদের জন্যে তা' সঞ্চয় কোরে রেখেছেন। এখন একটু কষ্ট কোরে খেতে বোসলেই হোলো, অর্থাৎ ধর্ম চাইলেই হোলো।

মজা এই—অনেকেই জানেনাকো তারা
এই যুগ্মাত্মার পরিচয়টাও।
অতএব সংক্ষেপে বোলি তোমাদের
'নর-নারায়ণ-বাদ' মহর্ষি ব্যাসের।—

জীবের দুঃখ দেখে বিষ্ণু স্বয়ং
নর আর নারায়ণে বিভক্ত হন।
অনন্তকাল ধোরে জীব-কল্যাণে
দুশ্চর তপস্যা করেন দুজনে।
দুজনে অভেদ, তবু দুজনের ভাবে
বিভিন্ন রাগিণীর সন্ধান পাবে।
আকাশ ও সমুদ্র দুজনেই নীল,
তবুও ও-দুজনের যেটুকু অমিল।
আকাশ ও সাগরের তফাৎটা এই—
আকাশের প্রশান্তি সাগরের নেই।
কিসের অভাবে যেন সুনীল সাগর
অনন্তকাল ধোরে তোলে কল্লোল।
জানি না কি দিক্ষে সে দিগন্তে ঠায়
সশব্দে মাথা কোটে আকাশের পায়।
নীলাকাশ নিশ্চল, তার মনে এই
অপূর্ণ জীবনের কোলাহল নেই।
পূর্ণ জ্ঞানীর মত স্নিগ্ধ, মধুর।
অসীমের নীরবতা তার মূলসুর।

* * *

ঊর্মি-মুখর ঐ সাগরের মত
নর-ঋষি যুগে-যুগে হন প্রকাশিত।
নারায়ণ নীলাকাশ উচ্ছ্বাসহীন,
অভাব ও দ্বন্দ্বের পরপারে লীন।

২

পৃথিবীতে জমে যেই ধর্মের গ্লানি
ধর্মের নামে স্রেফ চলে বাঁদরামি,
ম্লান হয় বিশ্বের ধর্ম-জীবন,
তখনি হাজির হন নর-নারায়ণ।
এই যুগ্মাত্মার মিলিত কৃপায়
মুমূর্ষু প্রাণ-পাখি ফের গান গায়।
ভারতের প্রাণ-পাখি ধর্ম যখন
দ্বাপরের শেষাশেষি হোয়েছে জখম,
অমনি এ-ভারতের পুণ্যের গুণে
এঁদের পেয়েছি দ্যাখা কৃষ্ণার্জুনে।
ভারত পুণ্যভূমি মুক্তির দ্বার ;
যুগে-যুগে দ্যাখা পাই যুগ্মাত্মার।

* * *

মহর্ষি ব্যাস্ এই যুগ্ম-লীলার
তথ্য যা দিয়েছেন শোনো এইবার।

৩

নর-ঋষি মানুষের শ্রেষ্ঠবিকাশ।
পৃথিবীতে রীতিমতো আনে সন্ত্রাস।

রুদ্র দীপ্তি দিয়ে গড়া প্রাণমন।
কোনো কাজে বাধা পেলে তোলে গর্জন।
সর্ব অঙ্গে তার অজস্রধারে
শক্তির প্রাচুর্য উঁকি-ঝুঁকি মারে।
শক্তিমানের যেটা থাকে বেশি-কম,
প্রভুত্ব-স্পৃহা তার নেই একদম।
একাই একশো হোয়ে লেগে যায় কাজে।
সহাস্যে পা বাড়ায় বিপদের মাঝে।
সফলতা-বিফলতা বোঝে না সে অত।
কাজের জন্যে কাজ—এই তার ব্রত।
যতই দুর্বলতা, মহত্ত্ব থাক,
কোনোদিন ঢাকে না বা পেটায় না ঢাক।
দুনিয়ার কাছ থেকে চায় না আরাম।
জীবনটা তার কাছে সদাসংগ্রাম।
বহুজনহিতার্থে কেটে যায় দিন।
অসত্য যেই দ্যাখে তোলে আস্তিন্।
জীবের চোখের জল মুছে দিতে চায়;
বাধা পেলে বিধাতারও বিরুদ্ধে যায়।
কিংবা সে উৎকট তপস্যা কোরে
বিধির বিধানকেও খুশিমতো গড়ে।
ভক্তি বা মুক্তি সে চায়নাকো পেতে।
নিজেকে সে নিঃশেষে চায় দিয়ে যেতে।
যেখানে আর্তনাদ তুমি তাকে পাবে।
পরার্থে নরকেও যেতে হোলে যাবে।
নিজেকে সে কোনোদিন রাখে না তফাতে;
একাকার হোতে চায় জীবনের সাথে।
প্রেমের উন্মাদনা অন্তরে যার,
চাহিদার ঢের বেশি আমদানি তার।
কোনো কিছু করে না সে আগু-পিছু ভেবে।
যেখানে যা প্রয়োজন তার বেশি দেবে।
নিঃস্ব জীবন নিয়ে তার কাছে গেলে,
দেখবে যা চেয়েছিলে তার বেশি পেলে।
তবে এক কথা এই—সে তার জীবনে
কোনোকিছু করেনাকো বিনা গর্জনে।
সব কাজে প্রচণ্ড গর্জন তার।
ব্রহ্মরুদ্র তেজে তোলে হুংকার।
সামান্য বাধাতেই ফোলায় কেশর,
মনে হয় ঠিক যেন প্রলয়ের ঝড়।
শক্তির তাণ্ডবমূর্তিটা দেখে
মানুষের সবচেয়ে ভালো লাগে একে।
হৃদয় ও বুদ্ধির বিকাশ এমন,
নর-ঋষি মানুষের বোধাতীত নন্।
এমন প্রকাশ তার ঐশ্বর্যের,
ভক্তি ও বিস্ময় জাগে সকলের।

৪

তবুও নরের এই নর-লীলাটার
কোথায় অপূর্ণতা শোনো এইবার।
মহর্ষি বেদব্যাস্ বোলেছেন ঠিক,
নর হোলো শক্তির রুদ্র প্রতীক্।
শক্তির প্রাচুর্যে গোলযোগ এই—
স্থান-কাল ও পাত্রের ভেদাভেদ নেই।
যেখানে যা প্রয়োজন তাই দেওয়া ঠিক।
চাহিদার বেশি দিলে হিতে বিপরীত।
এক ফোঁটা ওষুধের প্রয়োজন যার,
বিশ ফোঁটা দেওয়া মানে জান্ মারা তার।
সংযত শক্তিতে যত কল্যাণ,
শক্তি অবাধ হোলে তত লোকসান্।
যে-আগুনে রাঁধো, তার দাহিকাশক্তিই
একটু বিপথে গেলে দারুণ ক্ষতিই।
অতএব সকলের হিতার্থে তাই
আগুনের একজন নিয়ন্তা চাই।
নরের সঙ্গে চাই নারায়ণটিকে।
নইলে কে রুখবে ও-মহাশক্তিকে?
তিনি ঐ শক্তিকে ইচ্ছের জোরে
ঠিক পথে চালাবেন সংযত কোরে।

৫

নিস্তরঙ্গ তিনি, তাঁর কাছে এই
নর-ঋষি একদিন মিলিত হবেই।
শুদ্ধসত্ত্ব তিনি, তাঁর কাছে এসে
নিজের সত্তাটাকে জানতে পারে সে।
আত্মার চোখ ফোটে, নিজেকে সে চেনে।
নিজের ইষ্ট বোলে ন্যায় তাঁকে মেনে।
ত্রিভুবনে নর শুধু তাঁরই অনুগত।
আনন্দে কাজ করে তাঁর কথামতো।
আপাতদৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোধ হয়
নারায়ণ নিষ্ক্রিয়, আসলে তা নয়।
হাঁক-ডাক নেই তাঁর, তাঁর ইচ্ছেতে
কর্মের তরঙ্গ ওঠে পৃথিবীতে।
কোত্থেকে একপাল কর্মীরা এসে
একরাশ কাজ কোরে সোরে পড়ে শেষে।
তাঁকে বোঝা সোজা নয়, মনে হয় সোজা।
যখনি বুঝেছি ভাবি হয়নিকো বোঝা।
যতই বুঝতে যাবে তত বোঝা ভার;
ঠিক যেন দিগন্ত—নাগালের পার।
আজ যদি ভাবো তাঁকে অতি সাধারণ,
আজ বাদে কাল তুমি পাল্টাবে মন।
মর্ত্যে যে সব চেয়ে বেশি বোঝে তাঁকে,
নর-ঋষি—তাঁরও মনে সংশয় থাকে।
দারুণ গুপ্তভাব, নেই কোনো ঢেউ,
তাই তাঁকে ষোলো আনা বোঝেনাকো কেউ।
নরের মতন ওঁর রজোগুণ নেই,
তাই তাঁকে ধরবার নেই কোনো খেই।

জীবের দুঃখ দেখে কাঁদে তাঁরও মন,
তবু তাঁর কান্নাতে নেই গর্জন।
তাঁকে বোঝা সোজা নয় সেই কারণেই।
বহিঃপ্রকাশ তাঁর নেইকো কোনোই।

তুমি যে আরামে আছো—হাসিই প্রমাণ।
কাঁদলে বুঝতে পারি—তুমি ম্রিয়মাণ।
বহির্বিকাশ দেখে বোঝাবুঝি ভাই,
সেটা যার নেই তাকে কি বুঝবে ছাই ?

কোনো কাজে তাড়া নেই, প্রায় নিশ্চল।
সব কিছু জানা—তাই নেই কোলাহল।
কোন্‌দিন কতোটুকু দিতে হবে কা'কে,
আগাম যে জানে—তার উদ্বেগ থাকে ?
কে কতোটা নিতে পারে, কবে কোন্‌দিন,
তিনি যে জানেন—তাই উচ্ছ্বাসহীন।
তিনি যে জানেন কার কিসে কল্যাণ,
যার পেটে যেটা সয় তাকে তাই দ্যান।
কার দ্বারা হবে কাজ—তা তিনি বোঝেন।
তাদেরই করেন কৃপা, তাদেরই খোঁজেন।
বাকি যারা আসে তারা পায়নাকো মন।
ভাবে যাঁর হৃদয়ের প্রসারতা কম।
প্রতিভাত হন তিনি শুদ্ধমনেই।
তাই তাঁকে বোঝে শুধু দু-চারজনেই।
বাসনার ছায়া-ঘেরা মানুষের মন
বুঝতে সে যাবে—তার সময় কখোন ?

৬

মাঝরাতে আলো হাতে শ্বেত-সার্জন,
কে তাঁকে দেখতে পায় ? চায় বা ক'জন ?
তাঁর আলোতে পথ দেখে বাড়ি চোলে যাই।
সাহেবের লালমুখ থাকে অদেখাই।
তা না কোরে যদি বোলি—'দেখাও তোমাকে',
ভেবেছো সে প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে ?
দেখি তিনি কৃপা কোরে তাঁরই লণ্ঠন
নিজের মুখেতে যেই ধরেন, তখন।
চিহ্নিত আত্মাই তাঁর কৃপালোকে
মায়ার আঁধার ঠেলে দেখে ন্যায় ওঁকে।

একবার যে দেখেছে লালমুখ তাঁর,
দু'দিনের দুনিয়াটা চায় না সে আর।
সার্জন-নারায়ণ এই পৃথিবীতে
স্বেচ্ছায় ধরা দ্যান নব-ঋষিটিকে।
না দিয়ে উপায় আছে ? ছাড়বে সে তাঁকে ?
অনন্ত ব্যাকুলতা, তাই পেয়ে থাকে।
কৃপা কোরে তার কাছে ধরা দিয়ে তার
মোহ-ঘুম ভেঙ্গে দ্যান্‌ মহাসত্তার।

আত্মার আবরণ সোরে যায় যেই,
নিজেকে জানতে পারে এক নিমেষেই।
তখনি জীবন তার পূর্ণতা পায়।
নিজেকে সে নিবেদন করে তাঁর পায়।
আকাশ ও সমুদ্র এই ভাবে শেষে
একাকার হোয়ে যায় দিগন্তে এসে।

তার আগে নর-ঋষি শুধু ঝংকার ;
শম্‌ নেই, সুর নেই, স্থিতি নেই তার।
প্রচণ্ড শক্তির এমনই প্রতাপ,
একটু বিপথে গেলে আনে সন্তাপ।
নারায়ণ যেই তাকে টেনে ন্যান্‌ কাছে,
জগৎ ও সে নিজেও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে ;
তখনি ও-শক্তিটা সুরে বাঁধা পড়ে।
নারায়ণ যেটা চান্‌—নর তাই করে।

৭

কেন করে জানেনাকো, বোঝে না সে অতো ;
তাঁর কাজে ছুটে যায় উল্কার মতো।
শোয়া-বসা-ওঠা সব তাঁরই ইচ্ছেতে।
নিজের চিন্তাটুকু রাখে না মনেতে।
নর যেন ইঞ্জিন—তেজের আধার ;
কোন্‌ পথে যেতে হবে—জানে ড্রাইভার।
যাঁর হাতে ষ্টিয়ারিং তাঁরই ইচ্ছায়
যুগে যুগে নর-ঋষি পৃথিবী কাঁপায়।
'কুকুরের ব্যাঁকা ল্যাজ' ৬ সোজা হয় ফের,
বিজয় ঘোষিত হয় চির-সত্যের।
পৃথিবীতে বয় ফের ধর্মের স্রোত।
অধর্ম কাছা খুলে দ্যায় চম্পট্।

* * *

এই যুগাত্মারই দৌলতে ভাই
যুগে-যুগে মজা মেরে 'বাড়া-ভাত' খাই।

* * *

সারা হোলো সনাতন এই ভারতের
'নর-নারায়ণ-বাদ'—মহর্ষি ব্যাসের।

* * *

সব শেষে এইটুকু অনুরোধ ভাই—
সনাতন মতবাদ ভুলো না দোহাই।
এ-তত্ত্ব মজ্জায় মিশে গেলে তবে
ঠাকুর ও স্বামিজীকে বোঝা সোজা হবে।

[ক্রমশঃ

---

৬ স্বামিজী বোলতেন,—"This world is a dog's curly tail, and people have been striving to straighten it out, but when they let it go, it has curled up again." Karmayoga (p. 81]

যাকে নিয়ে আমাদের গল্প সুরু, তার জন্ম হয়েছিলো এক আশ্চর্য্য জায়গায়। পুরীতে গেছ কখনো? যদি গিয়ে থাকো, তাহলে নিশ্চয় স্বর্গদ্বারের ঘাট দেখেছ? রাস্তা থেকে ইট-বাঁধানো সিঁড়ি নেমে গেছে বালির ওপর। অনেকখানি বালি পেরিয়ে তবে ত' সমুদ্রের ধার? যেখানে উড়িয়া মেয়েরা সমুদ্রের জল মাথায় ঠেকিয়ে বালির ওপর চৌকো-চৌকো ঘর আঁকছে? আঁকছে পুরীর মন্দির, আর জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা?

সেই বালির ঘাট পেরিয়ে যাও আরো পশ্চিমে। বালির ওপর দিয়েই চলো। পা ব'সে ব'সে যাবে, আস্তে আস্তে চলতে হবে। এঁকে-বেঁকে। কিন্তু হাঁটতে বেশ মজা। পায়ে কাঁটা কিংবা কাঁকর ফোটবার ভয় নেই। ঝিনুক ফুটলে লাগে না। যেখানটা সমুদ্রের ঢেউ এসে বারে বারে বালি ভিজিয়ে দিচ্ছে, সেই ভিজে বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে আরো আরাম। পা তেমন বসবে না। যেন সিমেণ্ট-বাঁধানো রাস্তা। দেখো, হঠাৎ কোনো বড়ো ঢেউ এসে তোমার গায়ে যেন না আছড়ে পড়ে, তোমার কাপড় যেন না ভিজিয়ে দিয়ে যায়! সমুদ্রকে বিশ্বাস নেই। ভারী খামখেয়ালী। কতখানি এলে? অনেকখানি? এখান থেকে কি সমুদ্রের ধারে সারি সারি হোটেলগুলো নজরে পড়ছে?—পুরী ভিউ হোটেল, ওশানভিউ হোটেল, ব্যারনস্ হোটেস, পুরী হোটেল, সীভিউ হোটেল, ভিক্টোরিয়া ক্লাব—? গ্র্যাণ্ড ত' আগেই আড়ালে পড়েছে। তাহ'লে হোটেল সব মিলিয়েছে? শুধু কাশিমবাজারের রাজার বাড়ীটা পূর্ব্ব সীমানায় দেখা যাচ্ছে।

এবার ডান ধারে একতলা একটা বাড়ী পেয়েছ? কি নাম পড়ো ত?—বেনামী। এটা কি বেনামী ক'রে কেনা? কিংবা এরা আর নাম খুঁজে পায় নি? শান্তিকুঞ্জ, শান্তিকুটির, আরাম, বিশ্রাম, অবসর, শ্রীনিকেতন সব শেষ হ'য়ে গেছে। এখন এলো বেনামী। ওধারে র'য়ে গেল হরিদাসের মঠ, তোটার গোপীনাথ, চটক পাহাড়।

তোমাকে কিন্তু আর একটু এগোতে হবে। বালির পাহাড় উঠে গেছে একতলা বাড়ীগুলোর সামনেটা ঢেকে। দোতলা বাড়ীর একতলার বাগানের পাঁচিল চাপা দিয়ে। যে বাড়ীর নাম 'সাগরদৃশ্য', সে বাড়ীর ছাদ থেকেও সমুদ্রের নীল জল দেখবার উপায় নেই, সামনে দেড়তলা সমান বালির স্তূপ। সে বালি সরিয়ে সমুদ্র দেখার চেষ্টা করা মানে অনেক অনেক টাকা খরচ। তার মানে কি একদিন এ-সব বাড়ী মাটির নীচে চ'লে যাবে? তার ওপর হবে জঙ্গল? পাঁচশো বছর পরে নতুন যুগের লোকেরা এসে কাশীর সারনাথের মতন এই সব বাড়ী আবিষ্কার ক'রে বলবে আজকের সভ্যতা কেমন ছিল?

আজই ত এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী যাবার রাস্তা লুপ্ত হ'য়ে গেছে। আজই ত বোঝা যাচ্ছে না এর নীচে মাটি আছে, যেখানে ভিত গেঁথে বাড়ী ওঠে, যেখানে ফুলের বাগান হয়, ফুল ফুটতে পারে। যেখানে সবুজ মাঠ আছে, ছেলেমেয়েদের ছুটোছুটি ক'রে খেলবার জন্যে। তা নয়, খালি মরুভূমির মতন ধূ-ধূ বালি, হলদে বালি, সোনালী বালি, রোদে যা তেতে ওঠে, হিম প'ড়ে যা ঠাণ্ডা হয়, ঝড়ে যা আকাশে ওড়ে, বৃষ্টিতে যা ভিজে যায়। এই রাশি রাশি বালির মধ্যে এখানে-ওখানে লাল, নীল, হলদে, সবুজ, সাদা, গোলাপী বাড়ীগুলি জেগে থাকে, হাওয়া খাওয়ার জন্যে সৌখীন বাঙালীরা যা করে গেছে। আজ জানলা-দরজা খুলে নিয়ে গেলেও কেউ দেখবার নেই। কত গেরস্থর বাড়ী, জমিদারের বাড়ী, রাজা-মহারাজার বাড়ী।

শেষ বাড়ীতে এখনো তোমরা পৌঁছওনি। শেষ বাড়ীর নাম পাতালপুরী। সেই পাতালপুরী, যার দোতলার বারান্দা থেকে দিগন্তবিলীন সমুদ্র দেখা যায়, বেঁকে গেছে গোল পৃথিবীর মতন গোল হয়ে পুরী শহরের পূর্ব্ব-পশ্চিম দুই কূল ছুঁয়ে—সেখানে আমাদের মীরা জন্মায় নি। সে জন্মেছিলো ঐ বাড়ীর সামনে একতলার আউট হাউসের দক্ষিণ দিকের ঘরে। সেদিন কী ঝড় সারা রাত ধ'রে, সমুদ্রের সে কি গর্জ্জন, ঢেউয়ের সে কি আছড়ানি!

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

তেমনি বৃষ্টি। তেমনি মেঘ-ডাকা। ডাক্তার ডাকতে গিয়ে লোক ফেরে না। বাড়ির আলো কেঁপে কেঁপে ওঠে, হারিকেন দপ্-দপ্ করে। ঝড়বাদলের সেই অন্ধকার রাতে মীরা জন্মালো মায়ের কোলে।

তার মা কিন্তু বাঁচলো না। রুগ্না মা ভোরবেলা ডাক্তার এসে পড়বার আগেই মারা গেল।

মীরাকে তার পিসিমা কোলে তুলে নিলো। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মাকে হারানো যে কত বড় কষ্ট, মীরা তা জানলোও না!

থিবীতে সে চোখ চাইলো যেন ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে। রীবের ঘরে বড়লোকের ঘরে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে মাকে াঝু আরামে মানুষ হবার জন্যে। মা যেন পাহাড়, সমস্ত বিপদ াড়াল করে রাখে। মা যেন ভগবান, প্রথম খাবার মুখে তুলে দেবার ন্যে। যাক, মাকে হারানো যে কতখানি হারানো, সেদিন অন্তত: ীরা তা বুঝতে পারেনি। কি ক'রে বুঝতে পারবে? তার কি ান হয়েছে? পিসিমা এলো তার মা হ'য়ে।

জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রথম দেখলে সমুদ্র। গাছ নয়, াহাড় নয়, শহর নয়, গ্রাম নয়, রাস্তা নয়, ঘাট নয়—শুধু নীল মুদ্র। সমস্তক্ষণ যে সমুদ্র আছাড় খেয়ে পড়ছে কূলের ওপর। াকবার, এক মুহূর্তের জন্যেও যার বিশ্রাম নেই।

ছ'বছরের মীরা দেখে—এই সমুদ্রের বুক থেকে রাঙা আভা ছড়িয়ে লাল সূর্য্য ওঠে, আকাশ তখন পরিষ্কার, জল তখন ঘন নীল। াকটু একটু ক'রে লাল সূর্য্য ওপরে ওঠে। তখনই খানিকটা চেয়ে চেয়ে দেখা যায়, একটু পরে আর দেখা যায় না চোখ মেলে—রোদ কড়া য়, তখ। সমুদ্র হয় সবুজ। বিকেলের দিকে যদি মেঘ করে, সমুদ্র য় কালো।

তিঙ্গা বাইয়া আর রাম বাইয়াকে ও চেনে, ওরা নুলিয়া, াপালপুরে ওদের বাড়ী। তিনখানা কাঠ দড়ি দিয়ে বেঁধে পেরেক ুকে ওরা বানায় কাটমারান, অন্ধকার থাকতে কাঠের চামচ বেয়ে ে সমুদ্রে পাড়ি মারে। যাবার সময়ে অনেক কষ্ট, ঢেউয়ের মালা াথা দেয়, বারে বারে ওরা ঢেউ কাটাবার চেষ্টা করে। ঢেউয়ের শেষ াড়িটা পার হ'য়ে গেলে আর ভয় নেই। সকালের মধ্যেই ওরা অনেক মাছ নিয়ে ফিরে, পমফ্রেট, ভেটকি, চিংড়ি, মার্লিন াছকে রূপোলি মাছ, সোনালী বালি মাখানো। ওদের নৌকো ঢেউয়ের ধাক্কায় উল্টে যায়, ওরা জলে নেমে আবার সোজা করে, সহজে নয়, অনেক পরিশ্রম ক'রে; মাছ কিন্তু জলে পড়ে না, জাল-ভর্ত্তি মাছ শক্ত দড়ি দিয়ে নৌকোর কাঠে বাঁধা। তারপর ডাঙ্গায় এসে জলের মাছ জলের দামেই বিক্রি হয়। তিঙ্গা বাইয়া রাম বাইয়ার ধুতি জোটে না, ছেঁড়া গেঞ্জি ছেঁড়াই থাকে। হোটেলগুলোর পেছনে নুলিয়া-বস্তির খড়ের চাল তেমনি ভেঙে পড়ে, যার ওপারে অনেক দূরে জগন্নাথের মন্দির জগমোহন নিয়ে আশ্চর্য্য ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাবার হাত ধ'রে ধ'রে মীরা এই সব জায়গা ঘোরে। কখনো হাঁটে, কখনো কোলে চড়ে। কখনো সমুদ্রের বালির ওপর থেকে ঝিনুক কুড়িয়ে তোলে। কখনো পায় নাভিশঙ্খ। কত রকমের ঝিনুক, গ্রেন, শাঁকচুরা, সবুজ, লাল, হলদে।

একটার পর একটা হোটেল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। রাত্রে হোটেলগুলোর নীল-সবুজ আলো রাস্তার ওপর এসে পড়ে। জলের ধারে জেলেরা জাল শুকোতে দেয়, তার আঁসটে গন্ধ বাতাস ভারী ক'রে তোলে।

একদিন কী ভীষণ ঝড় হল সারা রাত ধ'রে। তার পরদিন ভোরে তিঙ্গা বাইয়া রাম বাইয়া কিছুতেই কাঠমারান নিয়ে যেতে পারলো না, তিনটে ঢেউয়ের সার পার হয়ে। কুড়ি বার তারা চেষ্টা করলো, কুড়ি বারই পারলো না। পঞ্চাশটা ঢেউ তারা পার হয়, আজ আসে একশোটা।

মীরা দেখেছে নুলিয়াদের ছেলেরা কত ছোটবেলা থেকে ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করতে শেখে একখানা কাঠের তক্তাকে নৌকো করে। যে ছেলে ভালো ক'রে দাঁড়াতে পারে না, সে ও জলে সাঁতার কাটে। বারে বারে ডুব দেয়, ডুব-সাঁতার আর দম সমুদ্রে সাঁতার দিতে হ'লে আগে চাই। দেশ-বিদেশের বিখ্যাত সাঁতারুরা এখানে এসে হেরে যায়। হেরে যায় তেলেগু জং বাহাদুরের কাছে। রোগা লম্বা জং বাহাদুর চলেই যেন সাঁতারের ভঙ্গীতে। সে যেন ডাঙ্গার হাওয়ায় জল কেটে যাচ্ছে এমন তার সামনে বেঁকে চলা। জলে নামলে ত' সে মাছ! তিঙ্গা বাইয়া রাম বাইয়া সেই রকম ক'রে সাঁতার শিখেছে, নৌকো বাইতে শিখেছে এদিক ওদিক চামচ বেয়ে। তবু তারা সেদিন সকালে পারলো না। বারে বারে নৌকো উল্টে গেল, বারে বারে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলে সমুদ্র। তাই তারা পারলো না। পারলো না ত' দুপুরে বেরোল। শুনলো না কারুর কথা! মাছ না আনলে চলবে কি করে? মাছ না আনলে খাবে কি?

বিকেলে আবার ঝড় উঠলো। তখনো তারা ফেরেনি। রাত্রে সেই ঝড় কত যে বাড়লো, কে তার হিসাব করে? সারা রাত মীরা চমকে চমকে উঠেছে, যেমনি সমুদ্রের গর্জ্জন, তেমনি ঝড়ের শোঁ-শোঁ, তেমনি ঝাউগাছের কাঁপুনি, তেমনি মেঘের ডাক!

পরদিন দু'জনের মৃতদেহ বালিতে ফিরে এলো। নুলিয়ারা বললে, তারা পুরী কোন্ দিকে ঠিক করতে পারেনি। পুরীতে ত' আলো জলে না অত রাত্রে! মাদ্রাজে আছে লাইট-হাউস, সমুদ্র আর আকাশ আলো ক'রে লক্ষবাতির আলো বারে বারে ঘুরছে। সে হল জাহাজের জন্যে। পুরীর সাগরতীরের গরীব নুলিয়াদের নৌকোর জন্যে কোনো ব্যবস্থাই নেই। দিনের বেলা দেখতে পায় মাঝে মাঝে বাঁশ পোঁতা আছে, তার মাথায় আছে কাগজের নিশান। কিন্তু রাত্রে?

সেদিন থেকে মীরা ব্যবস্থা করলো তাদের বাড়ীর সমুদ্রের দিকের জানলায় একটা হারিকেন রেখে দেবে সারা রাত। বইয়ে পড়েছে কোন্ অর্কনী দ্বীপপুঞ্জের একটি মেয়ে কবে নাকি এমন করেছে। সে-ও করবে, যাতে তিঙ্গা বাইয়া রাম বাইয়ার মতন আর কোনো নুলিয়া মারা না যায়।

কিন্তু ওদের ছেলেগুলো কি কম পাজী নাকি? মীরার তখন আট বছর বয়স। ও গেছে একলা মাছ কিনতে। চার আনার মাছ কিনে আসছে, ওর বয়সী কতকগুলো ছেলে আর ওর চেয়ে কিছু বড়ো ক'টা ঘিরে ধরেছে ওকে, যেতে দেবে না, পয়সা কেড়ে নিয়েছে, আর কি অসভ্য অসভ্য কথা বলছে! ও কাঁদছে, তবু ছাড়বে না, বুনো জানোয়ারের মতন ঘিরে ধ'রে কি তাদের ভঙ্গী! কাপড় খুলে কি নাচ!—ঝং ঝং ঝগা ঝং!

ভাগ্যিস এক ভদ্রলোক হঠাৎ এসে পড়লেন, আর ধমক খেয়ে ওরা পালালো। তিনি ব'লে দিলেন, খবর্দার দুপুরবেলা একলা এদিকে আসবে না খুকি!

আর বৌগুলো? নাকের দু'দিকে গয়না মাঝখানে নোলকের মতন, অল্পবয়সীই কি বুড়িই কি—কি যে আগুামাণ্ডা কথা বলে কিছু বোঝা যায় না!

বৃষ্টির দিনে মীরাদের বারান্দায় উঠছিলো। বসলো, ব'সে শুয়ে

পড়লো। তাই না কথায় বলে—বসতে পেলে শুতে চায়। একটা মেয়ে গুন-গুন ক'রে গান ধরলো। মীরা বললে, বাংলা জানো? সে বললে—বংলা শুনা বুঝব।

সিঁদুর পরো না কেন?

সিন্দর কাম করছি তাই না পরছি।

গান করো না একটা।

গান পয়সা লাগব।

কেন, এই ত গান করছিলে।

ও গান নয়, কথা বলছে।

কি মিথ্যেবাদী মা! গান করছে, তবু বলছে কথা।

এই আবহাওয়ায় মীরা মানুষ হতে লাগলো—যেখানে শুধু বালি আর সমুদ্র—এখানে ওখানে বাড়ী। কিছু লোকের আমদানী হয় গরমে আর পূজার ছুটিতে—কলকাতা শহর থেকে—খুব ঘোরে তারা সাইকেল-রিক্সয়, ট্যাক্সিতে, ঘোড়ার গাড়ীতে—মন্দির, বাজার, ভুবনেশ্বর, কোণারক—তারপর চ'লে যায়, থাকে নুলিয়ারা, উড়িয়ারা—যাদের মেয়েরা আশ্চর্য্য শান্ত, দাও বলে না, বলে দিব, যাব বলে না বলে যিব।

পুরীকেই সে মস্ত শহর ব'লে জানে, যেখানে রাস্তার বালব চুরি যায় ব'লে ভালো করে আলো জ্বলে না, বাজারের কাছটা একটু সরগরম। রথের সময়ে একটু লোকের আনাগোনা।

সমুদ্র বিরাট বটে, আকাশও এখানে অনেকখানি দেখা যায়, কিন্তু জীবনের কাজ করবার জায়গা যে আরো কতদূর ছড়ানো, দুনিয়া যে কত বিচিত্র, তা এখান থেকে বোঝবার উপায় নেই।

চৌধুরীদের বৌ এবার এসে ওকে নতুন কথা শোনালে—পিসিকে মা বলিস্ কেন?

মা ব'লেই ত' চিরকাল জানি।

ভুল জানিস্! তোর মা ম'রে গেছে।

—কেউ ত একথা বলেনি কখনো আমায়?

কে বলবে তোকে? আছে কে তোদের? আর যে নতুন বৌ এসেছে, তাকে কি বলে ডাকিস?

—নতুন মা বলে।

—দূর, ওকে বুঝি মা বলে? ও ত' সংমা তোর!

মীরা বলে, গল্পে পড়েছি সংমারা খুব অত্যাচার করে। ধ্রুবর সংমা ধ্রুবকে যন্ত্রণা দিয়েছে। সুয়োরাণীর-দুয়োরাণীদের ছেলেদের দেখতে পারে নি। সাতভাই চম্পার গল্প জানি আমি। আমার নতুন মা আমাকে কত যত্ন করে। কত ভালোবাসে। সে কেন সংমা হবে?

আ খেলে যা! আমি কি তোকে মিথ্যে কথা বলতে এসেছি?

এমনি করে সরল মেয়ে মীরাকে সকলে জ্ঞান দিতে সুরু করলো।

স্কুলে যায়, সেখানে ঐ কথা। পাড়ায় যে বাড়ীতে বেড়াতে যায়, সেখানে ঐ কথা। তাদের বাড়ীতে দেশ থেকে যদি কেউ আসে সে-ও ঐ কথা বলে। মা নয় সংমা, পিসি তোকে মানুষ করেছে, মা তোর মরে গেছে।

ইস্কুল শুদ্ধ সব মেয়ের মা আছে, শুধু তারই মা ম'রে গেছে, এ খবরে মীরার নতুন করে কাঁদতে ইচ্ছে করলো।

সমুদ্রের ধারে গিয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। কেউ সেখানে নেই। সে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখলো তার মা, ঐ ত' তার মা। কী সুন্দর দেখতে! বললে, পাগলী মেয়ে! আমি মরব কেন? আমি লুকিয়ে আছি। আর একটু বড়ো হলে তোকে দেখা দোব।

জোয়ারের জল বেড়ে বেড়ে হঠাৎ কখন মীরার গায়ের কাছে পৌঁছে গেছে। ঝপাং করে আছাড় দিয়ে পড়লো তার গায়ে প্রকাণ্ড এক ঢেউ। তখনি জল স'রে গেল, কিন্তু জলের ঝাপটায় মীরার ঘুম গেল ভেঙে। মুখে ঢুকছে নোণা জল, ঘুমোবার সময়ে মুখ ত' খোলাই থাকে অনেকের?

ওদিকে বাড়ীতে সবাই তাকে খুঁজছে।

পাতালপুরী বাড়ীটা কলকাতার এক এটর্ণীর। আগে ছিল এক মাড়োয়ারীর। সেই মাড়োয়ারীর মামলা ক'রে অনেক টাকা পাওনা হ'য়ে গেছলো এটর্ণীর। এটর্ণী বাড়ীটা এমনি নিয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু তারা কখনো আসে না। রেখে দিয়েছে মীরার বাবা দে-মশাইকে মাইনে ক'রে—বাড়ীটা দেখাশোনা করবার জন্যে। এরকম কাজকে ইংরেজীতে বলে কেয়ার-টেকারের কাজ—মানে তদারকের কাজ আর কি?

ওখানকার লোকেরা বলে কড়টকাড় বাবু। উড়িষ্যা নামে যেমন ড় আছে, কথায়ও তেমনি ড়। মাড়িকিড়ি পকাড়ি ত তোমরা সবাই শুনেছ। বাংলা দেশের নাম যেমন অনুস্বার, কথায়ও তেমনি অনুস্বার রং, বরং ঢং, সং, টং, জং কত কি। বেহারে সবেতেই হ—কাঁহা; হ্যায়, নেহি, বাহাব!

পাতালপুরীর মালিকরা কখনো-সখনো এলে বেলওয়ে হোটেলে গিয়ে ওঠে, ২২৲ টাকা মাথাপিছু দিন খরচ ক'রে, তবু নিজেদের বাড়ী দেখতে আসে না। যাই হোক্, কেয়ার-টেকার বাবুর মাস-মাইনে ঠিক পৌঁছে যায়।

মীরা দেখে বাড়ীর চারিধারে বালির মরুভূমি, তারপর সমুদ্র দেখে সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা, দেখে সমুদ্রের বুক থেকে সূর্য্যোদয়, দেখে সমুদ্রের ওপরে চাঁদের ভেসে-যাওয়া, তারার ঝিকিমিকি তার জীবন ঘিরে শুধু সমুদ্র, যে সমুদ্র কখনো স্থির নয়, চিরকাল চঞ্চল।

স্থির আছেন শুধু জগবন্ধু, রাত তিনটেয় যাঁর আরতি, শৃঙ্গার বেশ, দন্তধাবন, বাল্যভোগ, নানা পূজার আয়োজন। ছাপ্পান্ন রকম পদের ছড়াছড়ি, ভিতরছ, সূপকার, প্রতিহারী খুঁটিয়া নানা পদবীর নানা পাণ্ডা। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, রাজ্যবদল, ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে কত পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল, জগন্নাথের রথ থামলো না, এক ভাবে তার চাকা চললো বছরের পর বছর। এক ভাবে তাঁর সোনার হাত হীরের অলঙ্কার দিয়ে সজ্জা চললো কত যুগ ধ'রে। কত পুরীর রাজা গেল, কত পাণ্ডার বংশ গেল, জগন্নাথের নিত্যপূজার কোনো অদল-বদল হল না। আনন্দবাজারের আনন্দমেলায় তেমনি ভোগ বিক্রী হয়—বিধবারা একাদশীর হাত থেকে রেহাই পায়—মন্দিরে একাদশী চিরদিনের জন্যে-বাঁধা।

মীরা সমস্ত দেখে। তার বাবার সঙ্গে গিয়ে দেখেছে, হোটেলে একদল ঘর খালি ক'রে চ'লে যায়, আর একদল আসে। যারা আসে, যেন সকলেই বড়ো লোক, চাকর-বামুনদের মুঠো মুঠো টাকা বকশিস দিয়ে যায়।

ভিক্টোরিয়া হোটেলের জং বাহাদুর তাকে কোলে করেছিলো, বলেছিলো, খুকি, তুমি বাবাকে নিয়ে এই হোটেলে থাকো।

চারিধারে অনেক আলো জ্বালা দেখে ওরও থাকতে ইচ্ছে করছিলো। নীলকণ্ঠ ব'লে একজন ওর বাবাকে আর ওকে চা টোষ্ট আর পোচ খেতে দিয়ে গেল। জানে না কত দাম নিলে। ওর কিন্তু পোচটা খেতে বেশ লাগলো।

কিন্তু হোটেলের চেয়ে ওর নিজের ঘরটা অনেক ভালো এই হিসাবে যে, সেখানে খুব ছুটোছুটি করতে পারা যায়। এখানে এরা ছোট মেয়েদের ছুটতে দেয় কিনা ওর জানা নেই।

ওদের বাড়ী যে অত ভালো, সেখানে একদিন এক বিপদ ঘটলো। কালীপূজোর পরে পাড়ার সমস্ত বাড়ী খালি হয়ে গেল। ওদের বাড়ীতে ওরা শুধু একলা।

এক রাত্রে ওদের বাড়ীতে ডাকাত পড়লো। ডাকাত-পড়া কা'কে বলে ও জানত না।

ঘরের দরজায় প্রথমে জোরে ধাক্কা পড়লো। মীরার বাবা আস্তে বললে—সর্বনাশ, ডাকাত! ওর মা বললে, খুলে দিয়ে বলো না, যা আছে নিয়ে যাও, প্রাণে মেরো না।

বাবা বললে, সে কথা ওরা শুনবে না। অনেক অত্যাচার করবে। চলো আমরা খিড়কির দরজা খুলে সকলে বেরিয়ে যাই। বাড়ীশুদ্ধ সকলে পা টিপে-টিপে অন্ধকারে এগিয়ে গেল।

'বেনামীর' বাগানে ঢুকে ওর বাবা মালীর ঘরের জানলার কাছে বললে, ধর্মানন্দ, আমি দে-মশাই, দরজা খোলো।

তারপর সেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে ওরা ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে কাঁপতে লাগলো। মীরা ভাবতে লাগলো, না জানি ডাকাতগুলোর চেহারা কি রকম! ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, রাঙা চোখ, এতখানি জুলপি আর পাকানো গোঁফ, মিশকালো চেহারা—

তখন ও-বাড়ীর দরজায় ধড়াদ্ধড় আওয়াজ হচ্ছে। দরজা ভেঙে-পড়ার শব্দও হল। এবার ওরা মশাল জ্বেলেছে। ঘর খুঁজছে। বাড়ী মেরামত খরচের জন্যে আজই কলকাতা থেকে চারশো টাকার মনিঅর্ডার এসেছে। ট্রাঙ্ক ভেঙে সেইটা নিয়ে যাবে—বললে মীরার বাবা। আপশোষ করতে লাগলো,'আমি কি জবাব দোব বাবুদের?

ওর মা বললে, আগে প্রাণ, পরে টাকা।

হাতের চুড়িগুলো খুলে ঘরের কোণে রাখো।

কেন?

এখানেও আসতে পারে।

মালীর ঘরে কখনো আসে?

কতক্ষণ ধ'রে লুঠ ক'রে ওরা মশাল জ্বালিয়ে জানলার পাশ দিয়েই চ'লে গেল।

একজন বললে, লোকগুলো পালালো কোথায় রে বনমালী? মেয়েছেলের হাতের গয়নাগুলো পাওয়া যেত।

বনমালী বললে, সমুদ্রের ধারে কোথাও লুকিয়েছে। কে খুঁজতে যাবে? তোমরা মশাল নিবিয়ে দাও। ঘোষসাহেবের বন্দুক আছে, গুলী করতে পারে।

আরে, ঘোষসাহেব এখন ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু ঘোষসাহেব ঘুমোন নি। তিনি আওয়াজ শুনে ঘোষভিলার বারান্দায় বন্দুক হাতে বেরিয়ে এসেছিলেন।

দড়াম ক'রে এক আওয়াজ হল। কার যেন প'ড়ে যাওয়ার শব্দ হল। মশাল নিবিয়ে আহত লোককে ওরা তুলতে গেল। তারপর আবার এক আওয়াজ, ঠিক সেই জায়গায়।

সকালবেলায় দেখা গেল, পাতালপুরীর তাড়িয়ে-দেওয়া চাকর বনমালী আর দু'জন ডাকাত জখম হ'য়ে প'ড়ে আছে।

রক্তে বালি ভেসে যাচ্ছে। পুলিশে ওদের হাসপাতালে নিয়ে গেল।

সেই রাত্রে মীরার ঘুম হবার কথা নয়, ভাঙা দরজা মেরামত হয়নি, কোনোরকমে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে।

কিন্তু ও শুনেছে ডাকাত আর আসবে না, পুলিশে তাদের দলবলকে ধ'রে ফেলেছে।

অনেক দিন জগন্নাথের ভোগ খাওয়া হয়নি। ওরা গেল। মছরো বেসরো তরকারীর নাম, কি চমৎকার স্বাদ! আসরে মৌরী আর সরষে দিয়ে তৈরী, কিন্তু সে জিনিষ বাড়ীতে হয় না।

ওখান থেকে দুর্গাবাড়ীতে কালীপূজো দেখতে গেল বালুগণ্ডে। সেইখানে নুলিয়াদের বাড়ী, যারা একটু পয়সাওলা, তাদের বাড়ীগুলি ভালো, লাল লাল থাম, লাল লাল রক। ওরা গঙ্গামাঈর পুজো করে, সমুদ্রের ধারে কাপড়ের পতাকা তুলে মানত করে—সমুদ্রযাত্রা যেন নিরাপদ হয়।

বাবার কাছে মীরা পুরীর রাজার গল্প শোনে। একজন রাজা যখন মারা যায়, তখন তার বড় ছেলে গদীতে বসে। মন্ত্রী এসে বলবে, মহারাজ, একটা মড়া পড়ে আছে। নতুন রাজা হুকুম দেবে—দেয়াল ভেঙে ওদিক দিয়ে বার ক'রে নিয়ে যাও।

সঙ্গে যাবে এক ব্রাহ্মণ-পরিবারের ছেলে, সে-ই মুখাগ্নি করবে। সে-ই শ্রাদ্ধ করবে। রাজার ছেলে নতুন রাজা, বাপের শেষ কাজ করবে না। অথচ এরা বলে সূর্য্যবংশ থেকে এসেছে! সূর্য্যবংশের রামচন্দ্র ত' দশরথের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে অশৌচ পালন করেছিলেন। অযোধ্যার ব্যবস্থা উড়িষ্যায় এসে উল্টে গেল নাকি?

পুরীর মোষের শিং-এর খেলনা, যেগুলো কাল না হ'য়ে একটু সাদা হ'য়ে যায়, সেগুলোকে দোকানদার বলে, গণ্ডারের খড়্গ, বাইসনের শিং থেকে তৈরী, বেশী দাম। মীরা বলে, বাবা, গণ্ডার আর বাইসন কি বোজ মরছে? গণ্ডার আর বাইসন ক'টাই বা আছে পৃথিবীতে!

ওর বাবা বলে, বাজে কথা। পুরীর হরিণের চামড়া, খরগোসের চামড়া, চিতাবাঘের চামড়ার জুতো; মণিব্যাগ, আসন, পুরীর ঝিনুকের খেলনা, জাঁতি, কত কি পুরীর স্মৃতি, কত লোক কিনে নিয়ে যায়, কিন্তু মীরাদের ভাগ্যে একটাও জোটে না। ও ভাবে, যখন বড়ো হবে, পয়সা হবে, তখন লক্ষ্মীবাজারে ঢুকে সব জিনিষ কিনে ফেলবে।

কিন্তু বড় হ'তে আর পয়সা হ'তে এত দেরীই হয়। যাও-বা দু'-একটা বাঁশি-টাঁশি পেত রথের সময়ে, তার সংসার পর পর দুটি ছেলে হওয়াতে তাও বন্ধ হয়ে গেল।

দু'টো ভাইকে কোলে-কাঁখে করে পুতুলখেলা তার বন্ধ হয়ে গেল। আর একলা একলা পুতুলখেলা কতই বা চলে!

এ বছরের কালীপুজোর সময়ে তার মাসী এলো একরাশ ছেলে-পুলে নিয়ে। মন্দির থেকে ভোগ নিয়ে এসে খেলে, খাজা আনলে, ছানার গজা আনলে, তাকে কি একটা দিয়ে বললে—নে খা। বাজী

কত টাকার কিনলে, চরকী বাজী, ফুলঝুরি, বোম পট্‌কা ; হাউই, রংমশাল। একটাও কি তার হাতে দিয়ে বললে, নে মীরা ?

ও যে সাতজন্মে কিছু পায় না, এ কথাটা কেন সে কেউ বোঝে না ! ওর যে মা নেই, নিজের মা যাকে বলে—এ কথা কেন কেউ মনে করে না ?

ও কি একটা ফ্যারফেরে ডুরে শাড়ী পরে চিরকাল কাটাবে ? ন' বছরে পড়লো, ওর যে একটা সায়া সেমিজ নেই, সেদিকে কি কারুর দেখতে নেই ?

বাবাও ইদানীং দেখে না। পিসিও ধর্মকর্ম নিয়ে মেতে উঠেছে, সেও খেয়াল রাখে না। রান্নাঘরে নতুন মাকে সাহায্য ক'রে আর ভাই ছ'টোকে সামলে তার দিন কাটে। তার যে মনে একটুও আনন্দ নেই, এ কথা কেউ বোঝে না ?

তার চ'লে যেতে ইচ্ছে করে, অনেক দূরে সমুদ্রের ওপারে যদি কোনো দেশ থাকে—সেই দেশে।

এ বাড়ী আর তার ভালো লাগে না। শুধু সমুদ্রের জন্যে মায়া লাগে। সমুদ্র ছেড়ে যেতে মন কেমন করে। কিন্তু সমুদ্র ত সব দেশেই আছে, সে ত' পড়েছে পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। মনের যখন তার এই অবস্থা, তখন ওর বাবা বললে, চল ধোবাটাকে তাড়া দিয়ে আসি, আর বাজারটাও অমনি ক'রে আনি। তুই একটা থলি নে, আমাকে একটা দে।

ফকির ধোবার বাড়ী সিদ্ধবকুলের পিছনে। ভক্ত হরিদাসের সাধনার জায়গা, বাঁধানো বেদীর ধার দিয়ে বকুল গাছ উঠেছে, গুঁড়ি নেই, শুধু ছাল প'ড়ে আছে, অথচ বকুল গাছ পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে ভর্ত্তি। মহাপ্রভু জগবন্ধুর দাঁতনকাঠি পুঁতেছিলেন মাটিতে, তাই থেকে গাছ। রাজার লোক এসে বলে, কাটব। তাই পরদিন সকালেই গাছের গুঁড়ি গেল শুকিয়ে, তবু গাছ রইলো বেঁচে চারশো বছর।

সেই মাহাত্ম্য দেখবার জন্যে অনেক লোকের ভিড় হয়েছে। তার মধ্যে খুব লম্বা চেহারার ফর্সা ধরণের রোগা রোগা এক বাঙ্গালী-সাহেব—পরনে হাফপ্যান্ট, গায়ে বুশ সার্ট, বয়স হয়েছে,—সেই লোকটি তার স্ত্রীকে বলছে—দেখো কি আশ্চর্য্য !

মেয়েটিও খুব লম্বা, আর খুব ফর্সা। ফিরে বললে—কি আশ্চর্য্য ?

ঐ মেয়েটি। কি চমৎকার প্রতিমার মতন মুখ। গরীব ঘরের মেয়ে, কিন্তু রূপ দেখো একবার !

সত্যি। ব'লে মেয়েটি মীরাকে কাছে টেনে নিয়ে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো।

মীরাকে ছ'জনে কাড়াকাড়ি ক'রে কোলে নিয়ে যে কাণ্ড করতে লাগলো, তাতে শুধু মীরা নয়, মীরার বাবা পর্য্যন্ত অবাক্।

হাফপ্যান্ট পরা ভদ্রলোক পরিচয় দিলেন কলকাতার মস্ত বড় ব্যারিষ্টার, মাসে চল্লিশ হাজার টাকা আয়। এন, রায়চৌধুরী।

মীরার বাবাও নামটা শুনেছে মনে হল।

ব্যারিষ্টারের ছেলে হয়নি। ছেলের বড় দরকার। দিন যেন কাটে না। বিষয় থাকবে না। এখন মনে হচ্ছে ছেলের চেয়ে একটি মেয়ে পেলেই ভালো। এমনি সুশ্রী একটি মেয়ে—গাটা যার মাখনের মতন নরম, পুরীর সমুদ্রতীরে যেখানে মানুষ কালো কুচকুচে হয়ে যায়, সেখানে যে মেয়ের এমন উজ্জ্বল রং, না জানি সে কলকাতার কলের জলে কত সুন্দর হবে, এমনি একটি শান্ত মেয়েকে যদি পাওয়া যায়, চিরজীবনের ভার নেওয়া যায়, তাকে মানুষ করা, তার বিয়ে দেওয়া।

প্রস্তাবটা ভেবে দেখবার মতন। তবু হঠাৎ কোনো জবাব দেওয়া যায় না। গরীবের ঘরে যে মেয়ে ছবেলা ভালো ক'রে খেতে পায় না, যার লেখাপড়া হচ্ছে না, বিয়ের কথা ত' ভাবাই যায় না, সে যদি এমন ঘরে পড়ে, যেখানে কোনো অভাব নেই, তবে মেয়ের মায়া ত্যাগ করাই ত ভালো।

কিন্তু বাপের প্রাণ ত' ? হঠাৎ কি বলতে পারে, নিয়ে যাও আমার মেয়েকে চোখের আড়ালে চিরকালের মতন ?

বললে, বাড়ীতে পরামর্শ করি। পরামর্শ আর কি ? সৎমা আগেই বললে, ওর ভালোটাই ত' আমরা ভাবব। এখানকার কষ্টের চেয়ে সুখেই ত' থাকবে !

পিসি বললে, মেয়ে মানেই ত' বিয়ে দিয়ে একদিন পর ক'রে দেওয়া। যাক্ না বড়লোকের বাড়ী। আমরা ত' যখন খুসি দেখে আসতে পারব।

রেলওয়ে হোটেল, যেখান থেকে সমুদ্র অনেক দূর, বারান্দায় বসলে দূরে দেখা যায় নীল আকাশে মিশেছে, চক্রতীর্থের মন্দির উঁচু বালির পাহাড়ে চূড়া তুলে দাঁড়িয়ে, চুরি যাওয়া সোনার গৌরাঙ্গের মন্দিরে সোনার কৃষ্ণমূর্তি, তার পাশে বন্দী বজরংবাহাদুর, মহাবীর হনুমান অযোধ্যায় পালিয়ে যাওয়ার শাস্তি পাচ্ছেন—সেইখানে ব্যারিষ্টারের সঙ্গে মীরার বাবার কথা পাকা হল।

কার্ত্তিক মাস থেকে সমুদ্রের নীলাভ কোকিল মাছ এবং নৌকো নৌকো বোঝাই করে, শুঁট্‌কি মাছ তৈরী করার জন্যে বাতাসের আঁসটে গন্ধ। প'ড়ে রইলো পিছনে। নানা রঙের ঝিনুক শাঁখ আর কড়ি বিছানো বালুতট, তোটার গোপীনাথের বেণু হাতে পদ্মাসন মূর্ত্তি, আম্রবন, বটগাছের ঝরি, চটক পাহাড়ের বালি, কানপাতিয়া হনুমান, কেল্লার মতন পাঁচিল পুরীর মন্দিরের, জগবন্ধুর দাঁত মাজা, জিভছোলা আর স্নান, পণ্ডিতের অঙ্গনের মাসীর বাড়ীর সামনে রথ যাওয়ার প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা. চন্দন-সরোবর, আঠারো নালা, জটিয়াবাবার মঠ, যেখানে বরিশালের ভক্তরা সবরকম গাছের প্রকাণ্ড বাগান করেছে. থানকুড়ি থেকে তেলাকুচো শাক যেখানে পাওয়া যায়, মোষের সিং-এর খেলনার দোকান, গোসাপের আর হরিণের চামড়ার জুতোর দোকান, খাজা আর বালুসাই আর 'পুরীর স্মৃতি' লেখা রেকাবি। সব প'ড়ে রইলো, এদের জন্যে এত মন কেমন তার করবে—বাড়ীর লোকেদের চেয়েও বেশী, একথা সে ত' আগে কখনো ভাবতে পারেনি। বাবা, মা, পিসিমা আর ভাই-বোনদের সে দেখতে পাবে কলকাতায় গেলে। কিন্তু মন্দিরের সামনের অন্ধকার চৌরাস্তা, সারা দিন সারা রাত ধ'রে সমুদ্রের গর্জ্জন এ ত' কোনো দিন কলকাতায় যাবে না ?

যেখানে যাচ্ছে সেখানে কেক আর মুর্গীর ডিম, মাংসের কোপ্তা আর সিল্কের ফ্রক ওরা বলছে অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু পাতালপুরীর চারি ধারের সোনালী বালি ত' সেখানে নেই !

নাই থাকুক। তবু তাকে যেতে হল। এক্সপ্রেস ট্রেন ঘস্ ঘস্ শব্দ ক'রে সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর, কটক পার হ'য়ে ক্রমশঃ তাকে

টেনে নিয়ে গেল পুরী থেকে অনেক অনেক দূরে। তার জন্মভূমি তার ছেলেবেলার খেলার জগৎ থেকে নতুন অজানা দেশে।

সকাল বেলায় যেখানে গাড়ী একেবারে থেমে গেল, সেটা যেন কোনো লোকের মস্ত বড়ো বাড়ী। ষ্টেশনে কোনো নাম লেখা নেই; কিন্তু সকলেই সেখানে নামলো। ট্রেনটাই খালি হয়ে গেল সেখানে। সেটা কিন্তু কলকাতা নয়। তার নাম শুনলো হাওড়া।

কলকাতা তবে কোথায়?

ভয় করে দেখলে হাওড়া ব্রীজ!

গোণা যায় না, রিক্স, মোটর, বাসের সংখ্যা। নতুন গাড়ী দেখলো ট্রাম। নতুন নদী দেখলো, গঙ্গা। নতুন জিনিস দেখলো, জাহাজ। নতুন শহর দেখলো, কলকাতা। ওপারে বাড়ীর জানলা সব কত উঁচুতে চ'লে গেছে, এক'টা ত চোদ্দতলা!

তার পর কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে এসে পড়লো রেনি পার্কে। চোখের ওপর দিয়ে বায়স্কোপের ছবির মতন প্রকাণ্ড শহর তার লোক জন বাড়ী-ঘর গাড়ী-পাল্কি নিয়ে সরে গেল, এলো বাগানের মাঝখানে দোতলা বাড়ী, যেন তোটার গোপীনাথের ছোট্ট বনটি হঠাৎ ফিরে এলো।

ও শুনলো, এটা কলকাতা নয়, বালিগঞ্জ।

এর পরে এলো অনেক সকাল, আর অনেক রাত। যারা ওকে নিয়ে এলো, তারা অনেক কাপড়-চোপড় দিলো ওকে, অনেক খাবারের ব্যবস্থা করলো, অনেক খেলনা পুতুল কিনে দিলো, শোবার বিছানা দিলো চমৎকার! বলতে গেলে একটা আলাদা ঘরই দিলো।

সমস্ত বাড়ীর মধ্যে ও যেন একটা নতুন সজ্জা, যেমন খাঁচার মধ্যে জল, জলের ধারে ইলেক্‌ট্রিক আলো, ভেতরে নানা রকমের লাল, নীল, সবুজ মাছ, যেমন দাঁড়ে আর খাঁচায় লালমোহন, সিঙাপুরের কাকাতুয়া, কেনারি আর কোকিল, যেমন ফটকে ফক্সটেরিয়ার আর বিছানায় জাপানী কুকুর, যেমন দরজায় রঙীন পর্দা আর ঘরে মেহগনির আসবাবপত্র—তেমনি এক শোভা হ'ল মীরা।

কেউ তার খোঁজ নেয় না, কেউ তাকে আদর করে না।

ড্যাডি আর মাম্মি তাকে চায়ের টেবিলে বলে গুড্ মর্নিং মীরা, মেমসাহেবের কাছে ঠিক পড়াশোনা করছ? আয়া তোমাকে ঠিক ঠিক স্নান করিয়ে দিচ্ছে, বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে ত?

ও বলে হ্যাঁ। কখনো বলে, ইয়েস্ মামি, ইয়েস্ ড্যাডি, কোয়াইট ওকে, থ্যাঙ্ক ইউ।

ব্যারিষ্টার সাহেবের অনেক মক্কেল, অনেক কাজ, সময় নেই।

মিসেসের অনেক পার্টি, অনেক এন্‌গেজমেণ্ট, সময় নেই।

তার বাবার পাকা চুল তুলতে তুলতে দুপুর বেলা রাক্ষস-খোক্কসের গল্প শোনা—তার পিসির শেয়ালের গল্প আর নেউলের গল্প বলতে বলতে—ঘুমপাড়ানো মাসি-পিসিকে ডাকা পিঠ চাপড়ে চাপড়ে—মনে ক'রে গলার কাছে কান্না ঠেলে ওঠে।

সেখানে দু'খানা শুকনো রুটি, ঢেঁড়স ভাজা আর একটু মুসুর ডাল দিয়ে যেমন অমৃত বোধ হ'ত, এখানকার ডিমের পোচ আর ওভালটিন আর জ্যাম-জেলিতে সে স্বাদ নেই!

সেই ভালোবাসা কোথায়? সেই ভালোবাসা কি পুরীর বাইরে পৃথিবীর কোথাও নেই?

ওর কান্না শুনে লোকজন ছুটে আসে।

এখানে বারান্দার ধারে বসলে রেলিঙে পা তুলে দিয়ে সে পাম-গাছগুলো সীজন ফ্লাওয়ারগুলোর দিকে দেখে না, তার দৃষ্টি চ'লে যায় সমুদ্রের দিকে—যেখানে ঢেউয়ের ওপরে সী-গালরা দল বেঁধে সাঁতার কাটে, মাছ নিয়ে উড়ে যায়; যেখানে নুলিয়া-ছেলে তীরের কাছে তরঙ্গের ওপর ছিপ ফেলে চঞ্চল জল থেকে অনায়াসে মাছ টেনে তোলে মিনিটে-মিনিটে; আর রত্নবেদীর পিছনে একজন মানুষের যাওয়ার মতন সরু পথে পাণ্ডার মন্ত্র উচ্চারণ—অপবিত্র পবিত্রো বা; ঘিয়ের প্রদীপগুলো অন্ধকার মন্দিরে ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার মাথার মণিগুলোকে ঝকমকে ক'রে তোলে।

মিসেস চৌধুরী সেদিন মীরার গাল টিপে বললে—আপনার মেয়ে?

না, আমার পালিতা মেয়ে।

কথাটা শুনতে খারাপ লাগলো মীরার। তার সৎমাও বলে আমার মেয়ে। 'আমার সতীনের মেয়ে' বলে না।

সমস্ত আদর যেন বিষ হ'য়ে গেল মীরার কাছে!

[ক্রমশঃ।

নাগানন্দ

(শ্রীহর্ষ রচিত 'নাগানন্দ' নাটকের গল্প)

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন কালে দেবতা ও মানুষের মধ্যবর্তী এক প্রকার জীব ছিলেন। ইঁহাদের বলা হইত 'দেবযোনি'। যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, সিদ্ধ প্রভৃতি দশ শ্রেণীর দেবযোনির মধ্যে বিদ্যাধরশ্রেণী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

বিদ্যাধররাজ জীমূতকেতু বৃদ্ধ হইয়াছেন। পুত্র জীমূতবাহনের হাতে রাজ্যভার দিয়া তিনি তপস্যা করতে বনে গেলেন। বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করিবার সুযোগ না পাইয়া রাজ্যসুখও জীমূতবাহনের ভাল লাগে না। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই প্রজাদের মঙ্গলবিধানের সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া বন্ধু আত্রেয়কে সঙ্গে লইয়া পিতামাতার নিকট বনে চলিয়া গেলেন। আত্রেয় অবশ্য বাধা দিয়া বলিয়াছিল যে, এখন তাঁহার বনে যাওয়া উচিত নয়। কারণ, গুরুজনের সেবা ছাড়াও তো কর্তব্য রহিয়াছে। তাছাড়া জীমূতবাহনের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া শত্রু মতঙ্গ নিশ্চয় রাজ্য আক্রমণ করিবে। জীমূতবাহন হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "রাজ্যভোগ অপেক্ষা পিতার সেবা করা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। আর, মতঙ্গ আমার রাজ্য নিয়ে যদি সুখী হয় তাহ'লে তাকে বাধা দেব না। পরের জন্য নিজের শরীরও দান করতে পারি, রাজ্য আর বেশী কথা কী?"

অনেক দিন এক জায়গায় থাকিবার ফলে খাদ্য, সমিধ প্রভৃতি ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং জীমূতকেতু পুত্রকে আশ্রমের জন্য নূতন স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে বলিলেন। জীমূতবাহন আত্রেয়ের সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে মলয় পর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চমৎকার জায়গা! অদূরে সমুদ্র; চারিদিকের চন্দনবন হইতে মধুর গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। আশ্রম স্থাপনের ইহাই উপযুক্ত স্থান।

জীমূতবাহনের ডান চোখ অকারণেই হঠাৎ নাচিতে আরম্ভ

ভাবিয়া পাইলেন না। বেড়াইতে বেড়াইতে অদূরে ভগবতী গৌরীর মন্দির দেখিতে পাইয়া তাঁহারা সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। নিকটে আসিতেই বীণার ঝঙ্কারের সহিত নারীকণ্ঠের মধুর গান শোনা গেল। সিদ্ধরাজকন্যা মলয়বতী যোগ্য স্বামী পাইবার আকাঙ্ক্ষায় সঙ্গীত দ্বারা গৌরীকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। জীমূতবাহনের মতো উদাসীন লোকও মলয়বতীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ। মলয়বতীরও জীমূতবাহনের উপর চোখ পড়িতেই মনে হইল, স্বয়ং গৌরীই বুঝি তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য ইঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রথম সাক্ষাতেই দুই জনে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন।

মলয়বতীর পিতা খোঁজ লইয়া দেখিলেন যে, রূপে গুণে জীমূতবাহনই তাঁহার কন্যার একমাত্র উপযুক্ত বর। তিনি যুবরাজ মিত্রাবসুকে বিবাহের প্রস্তাব করিতে পাঠাইলেন। জীমূতকেতু সানন্দে এই বিবাহে মত দেওয়াতে জীমূতবাহন ও মলয়বতীর বিবাহ হইয়া গেল।

এদিকে মতঙ্গ জীমূতবাহনের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে সংবাদ আসিল। মিত্রাবসু এখন জীমূতবাহনের শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়। সে বলিল, "অনুমতি দিন, আমি মতঙ্গকে যুদ্ধে পরাস্ত করে আসি।"

জীমূতবাহন কিন্তু অনুমতি দিলেন না। বলিলেন, "অন্যের উপকারের জন্য আমি নিজের দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে দান করতে পারি; আর রাজ্যের নাম ক'রে নিষ্ঠুর যুদ্ধবিগ্রহে প্রাণনাশ হতে দেবো, এ কি সম্ভব? রাজ্য আমার চাই না।"

মিত্রাবসু এরূপ নির্বুদ্ধিতায় ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু করিবার কিছুই ছিল না। রাজ্যসুখ ভোগ করিবার লালসা জীমূতবাহনের নাই। আশ্রমের সরল অনাড়ম্বর জীবনই তাঁহাকে তৃপ্তি দেয়।

একদিন মিত্রাবসুর সহিত জীমূতবাহন সমুদ্রতীরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। পর্বত, সমুদ্র ও বন মিলিয়া চারি দিকের দৃশ্য বড় মনোরম হইয়াছে। উচ্ছ্বসিত ভাবে জীমূতবাহন মিত্রাবসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, মলয় পর্বতের চূড়া শরৎকালের শাদা মেঘে ঢাকা হিমালয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করেছে।"

মিত্রাবসু কহিল, "ওটা মলয় পর্বতের চূড়া নয়; ওগুলো মৃত নাগদের হাড়ের স্তূপ।"

জীমূতবাহন বেদনায় কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলো কী! এতগুলো একসঙ্গে কি ক'রে মরলো?"

—"একসঙ্গে মরেনি। প্রতিদিন একটি একটি করে মরেছে। বিনতানন্দন গরুড় ডানার ঝাপটায় সমুদ্র তোলপাড় করে নাগদের ধ'রে ধ'রে খেত। নাগরাজ বাসুকী দেখলেন এ তো বড়ো মুস্কিল! নাগ জাতি লুপ্ত হতে বসেছে। তখন বাসুকী গরুড়ের সঙ্গে এই সন্ধি করলেন যে, প্রতিদিন পালা ক'রে একটি নাগকে গরুড়ের আহার্য হিসাবে পাঠানো হবে। সেই থেকে গরুড় প্রত্যহ একটি করে নাগ ভক্ষণ করেই সন্তুষ্ট থাকে, আর কোনো উপদ্রব করে না।"

এই কাহিনী শুনিয়া জীমূতবাহন বড়ই বিস্মিত হইলেন। নাগরাজ বাসুকীর সহস্র মস্তক। তিনি প্রজাদের মৃত্যুর মুখে পাঠাইয়া নিজে নিরাপদে রহিয়াছেন। তাহাদের রক্ষার জন্য তিনি চেষ্টা করিলেন না; এমন কি নিজেকে আহার্যরূপে দান করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বাসুকী না করিলেও তিনি তো নিজের দেহ দান করিয়া অন্ততঃ একটি নাগকেও রক্ষা করিতে পারেন!

এমন সময় প্রতিহার আসিয়া সংবাদ দিল, তাঁহাদের দুই জনকে মহারাজা বিশ্বাবসু অবিলম্বে আহ্বান করিয়াছেন। জীমূতবাহন মিত্রাবসুকে বলিলেন, "তুমি যাও, আমি একটু পরে আসছি।"

একান্ত অনিচ্ছার সহিত মিত্রাবসু জীমূতবাহনকে একাকী রাখিয়া গেল। যাইবার পূর্বে সাবধান করিয়া বলিল, "এ জায়গাটা ভালো নয়; শীগ্‌গির চ'লে আসবেন।"

জীমূতবাহন সমুদ্রের বেলাভূমিতে একা-একা বেড়াইতেছেন। এমন সময় সমুদ্রতীরের নির্জনতা ভেদ করিয়া স্ত্রীলোকের বিলাপধ্বনি শুনিতে পাইলেন। লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল, একটি যুবকের পশ্চাতে এক বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে অগ্রসর হইতেছে। বৃদ্ধার পশ্চাতে রহিয়াছে একজন রাজভৃত্য; তাহার হাতে রক্তবর্ণ বস্ত্র। নিকটে আসিলে জীমূতবাহন শুনিতে পাইলেন বৃদ্ধা বিলাপ করিতেছে, "হায় শঙ্খচূড়, আজ তোমাকে বধ করবে, মা হয়ে তা কেমন করে দেখব?"

শঙ্খচূড় বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিতেছে; কিন্তু মায়ের প্রাণ তাহাতে প্রবোধ মানে না। জীমূতবাহনের মন বড়ই বিচলিত হইল। ইহাদের দুঃখের কারণটা জানিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন।

রাজভৃত্য বলিল, "শঙ্খচূড়, নাগরাজ বাসুকীর আদেশে আমাকে এই অপ্রিয় কাজ করতে হচ্ছে। মার কান্না শুনে আর বিলম্ব করে লাভ নেই। গরুড়ের আসবার সময় হয়ে এলো। এই রক্তবস্ত্র পরিধান করে তাড়াতাড়ি বধ্যশিলার উপর গিয়ে দাঁড়াও। দূর থেকে লাল পোষাক দেখে গরুড় তোমাকে আজকের ভক্ষ্য বলে চিনে নেবে।"

শঙ্খচূড় ভৃত্যের হাত হইতে রক্তবস্ত্র গ্রহণ করিতেই বৃদ্ধা পুত্রের মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। শঙ্খচূড়ের যত্নে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বৃদ্ধা আবার বিলাপ করিতে লাগিল, "তুই আমার একমাত্র পুত্র; তোকে রক্ষা করতে না পারলে আমার বেঁচে থেকে লাভ কি? নাগরাজ বাসুকীই যখন তোকে গরুড়ের মুখে ঠেলে দিয়েছেন তখন আর কে রক্ষা করতে পারবে?"

জীমূতবাহন অকস্মাৎ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "কেন, আমি আছি; আপনার ছেলেকে আমি রক্ষা করব।"

বৃদ্ধার মন গরুড়ের আগমন আশঙ্কায় পূর্ণ। হঠাৎ অপরিচিত ব্যক্তি দেখিয়া তাহার ভয় হইল বুঝি গরুড়ই আসিয়াছে। বৃদ্ধা অঞ্চল দিয়া পুত্রকে আচ্ছাদিত করিয়া জীমূতবাহনের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া কহিতে লাগিল, "নাগরাজ বাসুকী আজ আমাকেই তোমার ভক্ষ্যরূপে পাঠিয়েছেন; আমাকে বধ করো।"

এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া জীমূতবাহনের চোখ অশ্রুসিক্ত হইল। শঙ্খচূড় বুঝাইল ইনি গরুড় নন। আকৃতি দেখিয়াই বুঝা যায় ইনি কোনো মহাপুরুষ। জীমূতবাহন প্রস্তাব করিলেন যে, রক্তবস্ত্র পাইলে তিনি তাহা পরিধান করিয়া বধ্যশিলার উপর গরুড়ের আহার্যরূপে অপেক্ষা করিবেন। ইহাই শঙ্খচূড়কে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়।

কিন্তু এই প্রস্তাবে শঙ্খচূড় কিংবা তাহার মা কেহই রাজি হইল না। জীমূতবাহনের এতদিনের স্বপ্ন সফল হইবার সুযোগ আসিয়াছে। তিনি পরার্থে দেহ ত্যাগ করিতে ব্যগ্র। তা

কিন্তু মাতা-পুত্র বার বারই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। অপরের প্রাণের বিনিময়ে পুত্রের জীবন রক্ষার কথা বৃদ্ধা কল্পনাও করিতে পারে না।

গরুড়ের আসিবার সময় আসন্ন। বধ্যশিলায় আরোহণ করিবার পূর্ব্বে দেবতাকে প্রণাম করিবার জন্য শঙ্খচূড় ও তাঁহার মা কিছু দূরে এক মন্দিরের উদ্দেশ্যে গমন করিল। ইতিমধ্যে রক্তবর্ণ বস্ত্র লইয়া জীমূতবাহনকে খুঁজিতে খুঁজিতে কঞ্চুকী আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মলয়বতীর মা এই বস্ত্র পাঠাইয়াছেন; বিবাহের পরবর্তী স্ত্রী-আচার হিসাবে এই বস্ত্র জীমূতবাহনকে পরিধান করিতে হইবে।

জীমূতবাহন তো লাল কাপড় পাইয়া খুব খুসী। শঙ্খচূড় আসিবার পূর্ব্বে লাল চিহ্ন ধারণ করিয়া বধ্যশিলার উপর গিয়া দাঁড়াইলেন। বধ্যশিলার স্পর্শ তাঁহার নিকট বড় মধুর মনে হইল। অতি প্রিয়জনের স্পর্শও কখনো এমন শান্তি দেয় নাই। পরার্থে জীবন দান করিবার স্বপ্ন আজ সফল হইতে চলিয়াছে। জীমূতবাহন নিজের দেহ দান করিয়া একটি নাগের জীবন রক্ষা করিবেন। এই আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ।

বাতাস কম্পিত করিয়া রক্তপিপাসু গরুড় আসিয়া উপস্থিত। জীমূতবাহনকে ভক্ষ্য নাগ ভাবিয়া গরুড় তাঁহাকে ঠোঁটে করিয়া শূন্যে উঠিল। অমনি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং দুন্দুভি বাজিতে লাগিল। গরুড় ইহাতে একটু আশ্চর্য হইলেও জীমূতবাহনকে লইয়া মলয় পর্বতে গেল। শান্তিতে আহার করিবার ইহাই উপযুক্ত স্থান।

জীমূতবাহনের ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার পিতামাতা উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। মহারাজ বিশ্বাবসুও চিন্তিত হইয়া জামাতার সংবাদ লইতে লোক পাঠাইয়াছেন। সকলে মিলিয়া যখন জীমূতবাহনের বিলম্বের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তখন শূন্য হইতে একটি রক্তমাখা মণি আসিয়া জীমূতকেতুর পায়ের নিকট পড়িল। জীমূতবাহনের মা মণিটি হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এ যে আমার ছেলের মাথার মণি গো!"

মলয়বতী ইহা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু কে একজন সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে শোক করবেন না। গরুড় প্রত্যহ নাগ ভক্ষণ করে। এটা বোধ হয় নাগের মাথার মণি।"

এই কথা শুনিয়া সকলে আশ্বস্ত হইল।

এদিকে শঙ্খচূড় মন্দির হইতে ফিরিয়া দেখিতে পাইল, গরুড় জীমূতবাহনকে লইয়া শূন্যে উড়িয়া যাইতেছে। অপরের প্রাণের বিনিময়ে নিজের জীবন রক্ষা পাইতেছে দেখিয়া তাঁহার মনে বড়ই ধিক্কার জন্মিল। গরুড়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভ্রম বুঝাইতে পারিলে জীমূতবাহন মুক্তি পাইবেন, এই আশায় শঙ্খচূড় মলয় পর্বতের পথে চলিতে লাগিল। দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া জীমূতবাহনের মা বলিলেন, "ঐ লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন কোন মূল্যবান বস্তু হারিয়েছে। এঁর মাথার মণিই বোধ হয় আমরা পেয়েছি।"

জীমূতকেতু আগন্তুককে প্রশ্ন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। জীমূতবাহনের মাতা মলয়বতীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "মা, তুমি বিধবা হওনি, বিধবা হওনি; কোনো ভয় নেই।"

মলয়বতীর মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্তমধ্যেই এই হাসি মিলাইয়া গেল। জীমূতকেতুর প্রশ্নের উত্তরে শঙ্খচূড় কহিল, "কোনো মহাপ্রাণ বিদ্যাধর নিজের দেহ দান ক'রে গরুড়ের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছেন। গরুড়কে বুঝিয়ে যদি নিবৃত্ত করা যায় এই জন্য তাঁর খোঁজে যাচ্ছি।"

জীমূতকেতুর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বিদ্যাধরকুলে জীমূতবাহন ছাড়া এমন পরহিতব্রতী আর কে আছে? তিনি তখনই জীমূতবাহনের অমঙ্গল আশঙ্কায় শোকে আকুল হইয়া উঠিলেন। প্রিয়তম পুত্রকে হারাইয়া বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? জীমূতকেতু চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। পিতা, মাতা ও বধূ চিতায় আরোহণ করিয়া জীমূতবাহনের অনুগমন করিবেন।

শঙ্খচূড় সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "আগে থেকে শোক করে আপনারা জীমূতবাহনের অমঙ্গল ডেকে আনবেন না। গরুড় যখন বুঝতে পারবে যে উনি নাগ নন, তখন হয়তো ওঁকে ছেড়ে দেবে। সুতরাং চলুন, আমরা অনুসন্ধান করতে যাই।"

সকলেরই মনে হইল যে কথাটা ঠিক। জীমূতবাহনের অনুসন্ধান করিতে তাঁহারা শঙ্খচূড়ের অনুগমন করিলেন।

গরুড়ের এই এক নূতন অভিজ্ঞতা। ধারালো ঠোঁট দিয়া দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া অনেক রক্ত পান করিল, কিন্তু নাগের মুখে বেদনার কোনো চিহ্নই নাই। বরং মনে হইতেছে, এ যেন বড় তৃপ্তি পাইতেছে; গরুড় রক্ত পান করিয়া তাহার উপকারই করিতেছে। এই অদ্ভুত ধৈর্য দেখিয়া লোকটা কে, তাহা জানিবার জন্য গরুড়ের বড় কৌতূহল হইল। সে আহার বন্ধ করিল।

জীমূতবাহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনো আমার শিরা থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে, এখনো দেহে মাংস রয়েছে, তবে তুমি খাওয়া বন্ধ করলে কেন?"

প্রশ্ন শুনিয়া গরুড় আরও আশ্চর্যান্বিত হইল। বলিল, "এতক্ষণ আমি তোমার রক্ত পান করেছি, এখন ধৈর্য দ্বারা তুমি আমার বুকের রক্ত শোষণ করছ। তুমি কে, তা আগে আমাকে বলো।"

—"তুমি ক্ষুধায় কাতর। ওসব কথা শোনবার সময় এখন নয়। আগে তোমার খাওয়া শেষ করো।"

সহসা শঙ্খচূড় সেখানে উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "গরুড়, এঁকে ছেড়ে দাও। বাসুকী আমাকে তোমার আহারের জন্য পাঠিয়েছেন। ইনি জীমূতবাহন, নাগ নন। হায়, তুমি কি করলে!"

জীমূতবাহনের বড় ক্ষোভ হইল। শঙ্খচূড় আসিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করিয়া দিল।

গরুড় বুঝিতে পারিল, সে কি মহাপাপ করিয়াছে। যে মহাপুরুষ নিজের প্রাণ দিয়া নাগের জীবন রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প, না জানিয়া তাঁহাকে মৃত্যুর কবলে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত আগুনে পুড়িয়া আত্মহত্যা করা।

দূরে জীমূতকেতুকে আসিতে দেখিয়া শঙ্খচূড় বলিল, "কুমার, আপনার পিতামাতা ও মলয়বতী এখানে আসছেন।"

জীমূতবাহন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "শঙ্খচূড়, তোমার উত্তরীয় দিয়ে শীগ্‌গির আমাকে ঢেকে দাও। আমার শরীরের অবস্থা দেখলে মা এখনই প্রাণত্যাগ করবেন।"

জীমূতকেতু নিকটে আসিবার পূর্বেই শঙ্খচূড় তাঁহার ক্ষতবিক্ষত

দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিল। পুত্রকে জীবিত দেখিয়া জীমূতবাহনের পিতামাতার মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। জীমূতকেতু কহিলেন, "আমাকে আলিঙ্গন করো, বাবা! তোমাকে যে জীবিত দেখব, তা ভাবতেও পারি নি।"

পিতাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য উঠিতে চেষ্টা করিতেই দেহের আচ্ছাদন সরিয়া গেল এবং দুর্বলতার জন্য জীমূতবাহন মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধা মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া গরুড়কে কহিলেন, "তুই আমার ছেলের এ কী দশা করলি? এমন সুন্দর দেহ যার, তাকে অকারণে আঘাত করবার নিষ্ঠুরতা কী ক'রে সম্ভব?"

গরুড়ের ডানার বাতাসে জ্ঞানলাভ করিয়া জীমূতবাহন বলিলেন, "মা, ওকে কেন দোষ দিচ্ছ? আমার শরীর তো এমনি রক্তমাংসের পিণ্ড। এতদিন সত্যকার রূপটা দেখতে পাওনি।"

গরুড় হাতজোড় করিয়া কহিল, "অনুশোচনায় আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। পাপ থেকে মুক্তি পাবার উপায় থাকলে বলুন; না হলে আত্মহত্যা ক'রে নিষ্কৃতি পাবো।"

জীমূতবাহন ধীরে ধীরে বলিলেন, "আত্মহত্যা ক'রে কি হবে? জীব-হিংসা ত্যাগ করো, তাহ'লেই তোমার পাপ যাবে।"

গরুড় প্রতিজ্ঞা করিল, আর কখনো কোনো জীবের প্রাণনাশ করিবে না। বোধ করি গরুড়ের এই প্রতিশ্রুতির জন্যই জীমূতবাহন অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইহার পরই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

জীমূতবাহনের পিতামাতা ও মলয়বতী চিতায় আরোহণ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিবেন। চিতা প্রস্তুত করিতেছে শঙ্খচূড়। অমৃত পাইলে জীমূতকেতু জীবন ফিরিয়া পাইতে পারেন, এই কথা হঠাৎ মনে পড়িতেই গরুড় ইন্দ্রের নিকট ছুটিয়া চলিল। অমৃত দিয়া শুধু জীমূতবাহনের নয়, মৃত নাগদেরও প্রাণ ফিরিয়া পাওয়া যাইবে। অমৃত দিতে অস্বীকার করিলে ইন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও সে দ্বিধা করিবে না।

মলয়বতী জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিবার উদ্যোগ করিতেই দেবী গৌরী স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। কমণ্ডলু হইতে জলসিঞ্চন করিবামাত্র জীমূতবাহন প্রাণ এবং অক্ষত দেহ ফিরিয়া পাইলেন। ঠিক সেই সময় গরুড় আকাশ হইতে অমৃতবৃষ্টি করিতে লাগিল। অমৃতের স্পর্শ পাইয়া মৃত নাগেরা পুনর্জীবন লাভ করিল এবং অস্থিস্তূপ অদৃশ্য হইয়া গেল।

জীমূতবাহনকে আশীর্বাদ করিয়া গৌরী কহিলেন, "বৎস, জগতের কল্যাণ কামনায় তুমি যে নিজের দেহ বিসর্জন করিতেও কুণ্ঠিত হওনি, এজন্য আমি খুবই তুষ্ট হয়েছি। এবার তুমি রাজ্যভার গ্রহণ করে প্রজাদের সুখী করো, এই আদেশ করছি।"

জীমূতবাহন দেবীর আদেশ শিরোধার্য করিলেন। নাগদের রক্ষা করিয়া এবং গরুড়কে হিংসার পথ ত্যাগ করাইতে পারিয়া তাঁহার এত দিনের মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে।

অঘ্রাণের খুশি

মণ্টুরাণী মিত্র

এলো আজ অঘ্রাণ
মাঠে-মাঠে পাকে ধান
ঘাসে-ঘাসে টুপ-টুপ
শিশিরের বৃষ্টি।

শীত-বুড়ি গুড়ি-গুড়ি
এসে দেয় সুড়সুড়ি
উত্তুরে হাওয়া তার
যেন হিমদৃষ্টি।

মিঠে-মিঠে রোদে আজ
ফুলে-ফুলে উল্লাস—
শিউলির স্মৃতি নিয়ে
নেই মিছে কান্না।

কেউ আসে, কেউ যায়
আমাদের দুনিয়ায়—
শরতের হীরে হয়
হেমন্তে পান্না।

সোনা ধান, সোনা ধান
আজ রোদে তারি গান
আজ ঘাসে তাজা রোদে
মরকতী জেল্লা।

কতো পাখি গান গায়
খুঁটে-খুঁটে ধান খায়
মনে হয় এ পৃথিবী
সুখে-গড়া কেল্লা!

LIFEBUOY SOAP
সুস্থ লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে
—এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়।
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোকমাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।
LIFEBUOY SOAP

ভারতে প্রস্তুত
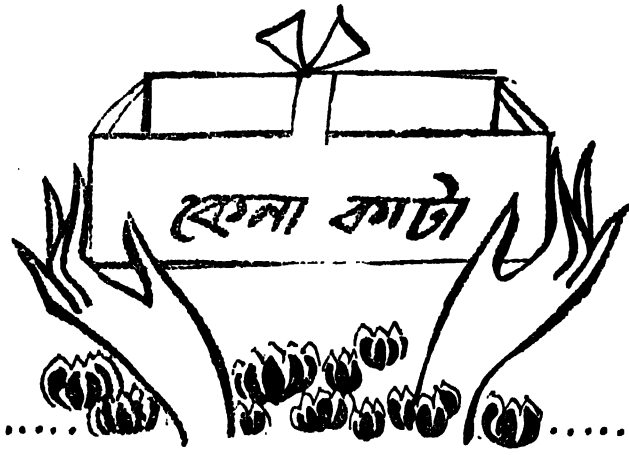
বঙ্গে অবাঙালী রোজগারী

ভারতবর্ষের সব প্রদেশের লোকে সব প্রদেশে গিয়া অবাধে তথায় সব রকম কাজে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়। ইহাও কিন্তু স্বাভাবিক যে, যাঁহারা যে প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা, তাঁহারা সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় তথাকার সকল রকম কাজ করিবেন। বাংলা দেশে ইহার ব্যতিক্রম হইতেছে এবং একপ অভিযোগও শুনা যাইতেছে যে, অবাঙালীরা এখানে যে সব কাজে প্রবৃত্ত হইতেছেন, দল পাকাইয়া তাহা হইতে বাঙালীদিগকে তাড়াইতেছেন। ইহা অবাঞ্ছনীয় এবং এই জন্য বাঙালীদিগকে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে হইতেছে। এরূপ অবস্থা একটি সংহত ভারতীয় জাতি গঠনের অন্তরায়, তাহা স্বীকার করিতে বাধা নাই। কিন্তু বাঙালীরা ভারতীয় জাতি গঠনের কার্য্য কাহারও চেয়ে কম উৎসাহ ও কর্মিষ্ঠতা দেখায় নাই। তাহারাও ভারতকে ও জগৎকে কিছু দিয়াছে এবং টিকিয়া থাকিলে ভবিষ্যতেও দিবে। তাহাদের অধঃপতন, বা বিনাশ, বা আত্মসমর্পণ ভারতীয় জাতিকে শক্তিশালী করিবে না। এই সকল কারণে এই অপ্রীতিকর বিষয়টির আলোচনা বার বার করিতে হইতেছে। এ বিষয়ে "সঞ্জীবনী" যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বাংলা দেশে লেখাপড়া-জানা লোকদের মধ্যে বেকার লোকের সংখ্যা খুব বেশী। অথচ স্বশাসক কলিকাতা মিউনিসিপালিটি পর্য্যন্ত অবাঙালীকে কেরাণীগিরি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা প্রবাসীতে দেখাইয়াছি। বাংলার মুটে-মজুর খাইতে পায় না। অবাঙালী মুটে-মজুর পর্য্যন্ত এদেশে রোজগার করিয়া নিজের খরচ চালাইয়া উদ্বৃত্ত অর্থ বাড়ি পাঠাইতেছে।

বাঙালীর হাত হইতে একটার পর আর একটা ব্যবসায় চলিয়া যাইতেছে। কলিকাতায় পূর্ববঙ্গের সাহাদের হস্তে পাটের ব্যবসায় ছিল। তাহা এখন মাড়ওয়ারী ও ভাটিয়ার হাতে গিয়াছে। কলিকাতার বাসিন্দা বাঙালীই লবণের ব্যবসায় করিত। তাহাও মাড়ওয়ারী ও ভাটিয়ার হস্তগত। কলিকাতার ভৃত্য, কনষ্টেবল, ডাকহরকরা, দরওয়ান, মুটিয়া, সবই হিন্দুস্থানী। কেরাণীর কার্য্য অল্পশিক্ষিত বাঙালীর একচেটিয়া ছিল। আজকাল বাঙালীর অর্দ্ধেক বেতন লইয়া মান্দ্রাজীগণ সেই কেরাণীর কার্য্য হইতেও বাঙালীকে হটাইয়া দিতেছে। কলিকাতায় অবাঙালীর সংখ্যা এত বেশী হইয়াছে যে, বিভিন্ন প্রদেশের লোক কলিকাতায় আপন দেশের ভাষা শিক্ষার জন্য কয়েকটা করিয়া স্কুল স্থাপন করিয়াছে। এইরূপে ভাটিয়া, মাড়ওয়ারী, তামিল, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অনেকগুলি স্কুল কলিকাতায় চলিতেছে।

কলিকাতায় অবাঙালীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। বাঙালা দেশেই এই বিশেষত্ব দেখা যায়। বাঙালার নানা জিলায় অবাঙালী ব্যবসায় করিতেছে। ইহার জন্য বাঙালী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ও করিতে পারে না। কলিকাতায় বাঙালী বড় ব্যবসায়ী না থাকিলে মফঃস্বলে ক্ষুদ্র বাঙালী ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকতা কে করিবে?

কলিকাতায় ৬।৭ সহস্র শিখ আসিয়া বাস করিতেছে। তাহাদের একতা শিখিবার জিনিষ। তাহারা বাঙালীকে অনিবার্য্য বাড়ি ভাড়া দেওয়া ব্যতীত বাঙালীর হাতে এক পয়সাও দেয় না। তাহারা নিজেদের জন্য ভোজনালয় স্থাপন করিয়াছে। নিজের দেশের লোকের দ্বারা দরজীর দোকান স্থাপন করিয়াছে, নিজেরাই সূত্রধরের কার্য্য করে। তাহাদের প্রধান ব্যবসায় মোটর ও ট্যাক্সি চালান। নিজেরাই তাহা মেরামত করে, নিজেরাই মেরামতের কারখানা ও সরঞ্জামের দোকান করিয়াছে। চাউল, ডালের দোকান পর্য্যন্ত পাঞ্জাবী ও শিখগণ স্থাপন করিয়াছে, কেবল বাধ্য হইয়া বাঙালীর কাছে শাকসব্জী কিনিতে হয়। এইরূপে এই কয়েক সহস্র শিখ কলিকাতায় নিজেদের সমাজ স্থাপন করিয়া কেবল নিজেদের সাহায্য করে।

অতঃপর অন্যান্য প্রদেশের লোকেদের কথাও লিখিত হইয়াছে।

কলিকাতার বড়বাজারে গমন করিলে বহু মাড়ওয়ারী ও ভাটিয়াকে দেখা যায়। ইহারাও প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য সকল রকমের দোকান করিয়াছে। ইহাদের নিজেদের চাউল ও ডালের দোকান আছে, নিজেদের হালুইকর আছে, নিজেদের বাড়িও আছে; সুতরাং শিখদের ন্যায় বাঙালীকে বাড়িভাড়াও দিতে হয় না। ইহারা যে সকল দ্রব্যের ব্যবসায় করে তাহার ক্রেতা একমাত্র বাঙালী। প্রায় সকল মাড়ওয়ারী ও ভাটিয়া বহু বৎসর বাঙলায় ধন সঞ্চয় করিয়াও কোনও বাঙালী ব্যবসায়ীকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না।

অর্থাভাবে কলিকাতার বহু ছাত্র সংবাদপত্র বিক্রয় করে এবং ইহা দ্বারা অনেকে মেসের খরচ চালায়। এই সকল উদ্যোগী আত্মনির্ভরশীল ছাত্রদিগকে হিন্দুস্থানী কাগজ-ফেরিওয়ালারা রাস্তার মোড়ে কাগজ বিক্রয় বন্ধ করিতে কি লাঞ্ছনাই না করিয়াছে! এখনও কলিকাতার বহুস্থানে বাঙালী হকার সংবাদপত্র বিক্রয় করিতে পারে না, ইহাদের দাপটে।

বোম্বাই কাপড়ের কলের মালিকগণ কিরূপে বাঙালার অর্থে ও বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলনে ক্রোড়পতি হইয়া, সেই বাঙালার কয়লা ক্রয় না করিয়া সস্তায় এবং অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষায় দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লা ক্রয় করিতেছেন, তাহা সকলেই জানে।

কলিকাতার অবাঙালী বস্ত্র ব্যবসায়ী বাঙালার কলে তৈরী কাপড় বিক্রয়ার্থ রাখে না! অথচ এই বাঙালায় বসিয়া তাহারা অন্য প্রদেশের কাপড় বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থশালী হইতেছে। এইরূপে নানা ব্যবসায়ের দ্বারা বাঙালীর অর্থ লইবার জন্যই সকল প্রদেশের লোকে উন্মুখ হইয়া আছে, কিন্তু বাঙালীর জন্য কেহ কিছু করিতে প্রস্তুত নহে; গবর্ণমেণ্টও বোম্বাইয়ের লবণ ব্যবসায়ীর সুবিধার জন্য বাঙালার লবণের উপর কর বসাইয়া দিয়াছেন। সকলেই বাঙালীকে দমন করিতেছে, বাঙালীর ব্যবসায় কাড়িয়া লইতেছে।

বাঙালীর দ্বারা প্রস্তুত জিনিষ ক্রয় করিতে "সঞ্জীবনী," আমাদের মত, বাঙালীদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাহার পর বাঙালার ছাত্র

ও অন্যান্য যুবকদিগকে যে অনুরোধ করা হইয়াছে, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন ও সমর্থন করি।

১৯০৫ সালে যখন কলিকাতায় ভারতবর্ষের মিলের কাপড় পাওয়া যাইত না, তখন কলেজ স্কোয়ারে কেবল দেশীয় মিলের কাপড়ের দোকান খোলা হয় এবং বহু ছাত্র যুবক তাহাতে সাহায্য করেন। আমাদের মনে হয়, পুনরায় ঐরূপ দোকান খুলিবার ব্যবস্থা করা উচিত, যেখানে কেবল বাঙালার কলের কাপড় বিক্রয় হইবে এবং ১৯০৫ সালের ন্যায় বিনা লাভে তাহা ছাত্র যুবকগণ পারিশ্রমিক না লইয়া বিক্রয় করিবেন। কলিকাতার অবাঙালীর দোকানে বাঙালায় তৈয়ারী কাপড় বিক্রয় হয় না। তাহাদের সহিত বহু বাঙালীর দোকানও বাঙালার তৈয়ারী বস্ত্র বিক্রয়ার্থ না রাখিয়া বোম্বাই ও আহমদাবাদের কলের কাপড় রাখিতেছে। সেজন্য যুবকগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা বাঙালার কাপড় বিক্রয়ের চেষ্টা করুন। বাঙালীকে যদি বাঙালী না রক্ষা করে তবে কে করিবে?

—স্বর্গতঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রত্নের বাজার

দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য চিত্র বা গ্রন্থাদির বেলায় যেমন, মণি মাণিক্যের বেলাতেও তেমনি। উহা পথে বা বাজারে ঢেলে বিক্রী কখনই হয় না। পরন্তু যতই উহা সুদুর্লভ, ততই বুঝি দুর্মূল্য! পান্না, চুণী বা পদ্মরাগ মণির কথাই ধরা যাক। গত দশ বছর আগেও এদের একটি মূল্য ছিল প্রায় এক হাজার পাউণ্ড। কিন্তু এক্ষণে সেইটেই বিক্রয় করলে দেড় হাজার পাউণ্ডের কম পাওয়া যাবে না। হীরক ছাড়া মহামূল্য মণি বলতে তিনটির নাম নিশ্চয়ই করতে হ'বে—পদ্মরাগ, পান্না আর নীলকান্ত মণি। পদ্মরাগ ও নীলকান্ত মণির মধ্যে পার্থক্য যেটুকু সে মুখ্যতঃ ওদের রঙের। এ মণি দুটোকে আলাদা করে দেখবার আর উপায় কি? নীলকান্ত মণি বা নীলার রঙ সাধারণতঃ হয়ে থাকে নীল। তবে উহারা বিচিত্র রঙেরও হ'তে পারে। এর যেটি লাল বা লোহিত বর্ণের হয়ে গেল, সেটিই পদ্মরাগ। পদ্মের মত রাগবিশিষ্ট বলেই এ নামে অভিহিত হয়েছে বোধ হয় এ অমূল্য মণিটি। অবিশ্যি এটা ঠিক, রঙের সামান্য পার্থক্যের দরুণ মণির মূল্য পার্থক্য হ'তে পারে প্রচুর। যেখানে একটি থেকে অপরটির বাছাই-এর প্রশ্ন থাকে না, সেখানেও মূল্যমানের এ ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। লোহিত বর্ণবিশিষ্ট একটি চুণীর মূল্য সমগোত্রীয় অথচ ভিন্ন বর্ণধারী অপর মণির চেয়ে অন্ততঃ আট দশ গুণ বেশী। চুণী বা পদ্মরাগের পরেই আসে পান্না বা মরকত মণি। মূল্য বা মর্য্যাদার দিক থেকে উহা সাধারণত হীরকের পর্য্যায়ভুক্ত।

মণিসমূহের একটি শ্রেণী বিভাগ করা হয়, সে ওদের কাঠিন্যের দিক থেকে। কোন মণি কতখানি শক্ত অর্থাৎ কোনটি কত কাল টিকে থাকবে অক্ষুণ্ণ ভাবে—বিচারের এ মাপকাঠিতে এক হ'তে দশ—এ কয়টি শ্রেণীতে ভাগ চলে এদের। সবচেয়ে কঠিন বলেই হীরকের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে দশম পংক্তিতে। নবম পংক্তিতে রয়েছে পদ্মরাগ আর নীলকান্ত মণি। পান্না বা মরকত মণি প্রতি ক্যারেট যদিও হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত হ'তে পারে, তথাপি উহারা উক্ত দুইটি শ্রেণীতে পড়ে না। তার কারণ আর কিছুই নয়। এ শ্রেণীর মণিগুলো অপেক্ষাকৃত নরম—স্থায়িত্বশক্তি এদের ততখানি নেই। আরও কয়েকটি শ্রেণীতে পীতবর্ণের মণি রয়েছে—ওরাও তেমন শক্ত নয়, অথচ মূল্য যথেষ্ট। এগুলোর এত অধিক মূল্যের কারণ খুঁজলে দেখা যাবে—এদের ভেতরও রয়েছে সুন্দর মরকত মণির ঔজ্জ্বল্য-সম্পদ।

আবার একটি মূল্যবান মণি-শ্রেণী রয়েছে উপল মণি সমূহ নিয়ে। উপলের মধ্যে যেগুলো দেখতে সাধারণত কালো, সেগুলোরই মূল্য অধিক। আজ-কাল আবার হালকা ধরণের উপল ব্যবহারের একটা ফ্যাশন চলেছে। কিন্তু মূলের দিক থেকে অনেকটা নীচেই ওদের স্থান। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ ভাবে বৈদূর্য্য মণিরই সমাদর খুব বেশী। কালো উপল অপেক্ষাও উহাদের অধিক দাম দেওয়া হয় এবং সেই কারণেই মূল্যবান মণিদের সঙ্গে স্থান নির্ণীত হয়েছে ওদেরও। বলতে কি, একটি সুন্দর কৃষ্ণপীতবর্ণ বিশিষ্ট বৈদূর্য্য মণির মূল্য এক হাজার পাউণ্ডও হয়ে থাকে।

মুক্তা যদিও আসলে কোন মণি নয়, তবু মহামূল্য জহরতের পর্য্যায়েই ওকে ধরা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করবার বিষয়, উন্নত শ্রেণীর মুক্তা ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। প্রাচ্যের ভেতর সবচেয়ে সুন্দর মুক্তার সৃষ্টি পারস্য উপসাগরে। কিন্তু বিশ্বের এই অংশটির বাসিন্দারা ভেবে দেখেছে, মুক্তা সংগ্রহের চেয়ে তৈল (পেট্রোলিয়াম) ব্যবসায়ই তাঁদের পক্ষে অধিকতর লাভজনক। মুক্তা দুষ্প্রাপ্য হ'বার মূলে এটি একটি প্রধান কারণ, সন্দেহ নেই। মণিরত্নের ভেতর গোমোমণি, তুর্মলীন; ফিরোজা বা তুরস্কমণি—এগুলোর জনপ্রিয়তাও কম নয়, মূল্যও যথেষ্ট। কৃত্রিম চুণী পাথর বা নীলা তৈরীর অবিশ্যি ব্যবস্থা আছে এবং সে মণিগুলো তৈরী হয় প্রধানত শিল্পগত উদ্দেশ্যে। হাতঘড়ির নির্মাণকার্য্যেই কৃত্রিম মণির ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। গ্রামোফোনের সূঁচ তৈরীর ক্ষেত্রেও উহাদের ব্যবহার আছে—তবে অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায়। আংটি, ব্রোচ প্রভৃতিতেও ক্ষেত্রবিশেষে কৃত্রিম নীলা বা পদ্মরাগমণি ব্যবহৃত হয়।

চাকরীতে উন্নতি করতে চান?

প্রায়শঃ আমরা বলে থাকি—কাজ পেতে হলে যেমন, কাজে উন্নতির জন্যও চাই উপরে শক্ত মুরুব্বী বা ধরবার লোক। সমাজের অবস্থা-ব্যবস্থা দেখে-শুনেই এ ধারণাটি বলবতী হয়েছে আমাদের মনে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু নিবিড় ভাবে ভেবে দেখলে দেখা যাবে, কথাটি সকল ক্ষেত্রেই ষোল আনা খাটে না, অন্য দেশে ত নয়ই, আমাদের দেশেও নয়। বড়দরের সুপারিশ বা 'ব্যাকিং' যদি থাকলো—সে অবশ্য ভাল কথা, কিন্তু না থাকলেই যে কেউ জীবন-পথে এগিয়ে যেতে পারবে না, এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য যদি সত্যি সত্যি থাকলো, তা হ'লে অগ্রগতির পথ, আজ হোক কি কাল হোক, খুলে যেতে বাধ্য। নিছক কাকা-মামা কিংবা দাদা-ভাগনীপতির জোরে কাজ পাওয়া বা কাজে উন্নতির চেষ্টার চেয়ে এদিক অনুসরণই বোধ করি বহুলাংশে শ্রেয়ঃ ও সমীচীন।

ধরাধরি বা সুপারিশের দুর্লভ পথ না খুঁজেও কর্ম্মজীবনে উন্নতির দাবী যখন রাখতে হবে, তার জন্ম নিশ্চয়ই কতকগুলো বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন না করলে নয়। পাশ্চাত্যের প্রায় ৫০টি মহানগরীতে চাকরী প্রসঙ্গে একবার একটি সার্ভে করা হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কর্ত্তৃপক্ষ আলস্য অযোগ্যতা, হামেশা কামাই, কাজে স্বেচ্ছাকৃত অবহেলা—এ সব দোষদুষ্ট লোকদের কর্ম্মচ্যুত করেছেন। এখন যেরূপ কঠিন প্রতিযোগিতার বাজার এবং দেশময় বেকার বিশেষতঃ শিক্ষিত-বেকারে ভর্ত্তি, সে অবস্থায় কর্ম্মপ্রার্থী কর্ম্মোন্নতি প্রয়াসীর চরিত্রে এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অক্ষমতা থাকলে কিছুতেই চলতে পারে না। উদীয়মান ও উত্তমশীল কর্ম্মীদের জন্যে এই চাকরীর মাগগীর দিনেও অধিক অর্থোপায়ের পন্থা হিসাবে বিশেষজ্ঞ-গণ দশটি মূল বা প্রধান সূত্র নির্দ্দেশ করেছেন। এই সূত্র বা সোপানগুলোর গুরুত্বের দিক বিবেচনায় এবং কার্য্যক্ষেত্রে পশ্চিমী দেশগুলোতে কেন, এ দেশেও উহার বহুল প্রমাণিত বলেই এ স্থলে উল্লেখ করতে হচ্ছে পর পর উহাদের।

প্রথম সূত্র :—কর্ম্মজীবনে উন্নতির জন্যে ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধনে সর্ব্ব সময় ও সর্ব্বাবস্থায় প্রয়াস নিতে হবে। এগিয়ে যেতে না পারার একটি প্রধান অন্তরায়ই হচ্ছে আবশ্যক ব্যক্তিত্বের অভাব। অন্যান্য কার্য্যক্ষেত্রে ত বটেই, ইঞ্জিনীয়ারিং জগতেও অপরিহার্য্য ছয়টি গুণের মধ্যে পড়ছে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও স্বতন্ত্র বিচার-বুদ্ধি—যাকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে মানুষের ব্যক্তিত্ব। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত থাকতেই হবে কিন্তু সে যেন নিছক স্বার্থপরতা বা আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তির নামান্তর না হয়। ফাঁকিকে আমল না দিয়ে আত্মবিশ্বাস সহকারে সকল কাজেই অগ্রণী ভূমিকা লওয়ার জন্ম থাকতে হবে প্রচুর তাগিদ বা তৎপরতা। যখন যে কাজের দায়িত্বই নিজের উপর থাকবে, সেটাকে এতটুকু তুচ্ছ জ্ঞান করলে চলবে না। পরন্তু কর্ত্তৃপক্ষ যাতে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মীর উপর নির্ভর করে কাজের সুসমাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, সেটাই হ'তে হবে লক্ষ্য। কাজের সময় কাজ ছাড়া অন্য কিছু করা কিংবা বাজে গল্প-গুজব নিয়ে কাটানো উন্নতির পরিপন্থী। শুধু যিনি 'বস্' বা উপরস্থ তাঁর সঙ্গে সৌজন্য বা শিষ্টাচার রক্ষা করলেই হবে না, সকল সহকর্ম্মী বিশেষ করে অধীনে যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের প্রতিও থাকতে হবে ভাল ব্যবহার। এতে এক দিকে যেমন ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে, অপর দিকে বিভাগীয় কর্ম্মীদের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করার গুণ বা বৈশিষ্ট্যও কর্ত্তৃপক্ষের নজরে না পড়ে পারে না।

দ্বিতীয় সূত্র :—সওদাগরী অফিসে হোক্ বা অন্যত্র হোক্, যেখানেই চাকরী মিলল—বেতনভুক কর্ম্মচারীকে আরও কাজ বেছে নিতে হবে। এটি এমন ভাবে করতে হবে, যাতে কাজের জন্য সত্যি একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত তাগিদ বুঝা যায়। এবং এই পন্থায় কাজ করে গেলে উন্নতির প্রশ্নটিও সহজতর হয়ে উঠবে। মালিক বা কর্ম্মকর্ত্তাদের মুখে একটা কথা শোনা যায়—শতকরা প্রায় ১০ জন কর্ম্মচারীই নাকি একটু অতিরিক্ত কাজেই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এর অন্য কারণ যা-ই থাকুক, কাজ এলে কাজকে ঠেলে দেওয়া ঠিক নয়। মজুরি বা বেতন বাড়িয়ে পেতেই যখন হ'বে—তখন আরও কাজ চাই—এই কার্য্যনীতি অনুসরণই সমীচীন। যাঁরা উপরে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তাঁদের কাজটাও উদ্যোগী হয়ে ক্রমশঃ জেনে নিতে হবে। অর্থাৎ প্রয়োজন হলে সে কাজ করতেও আটকাবে না, কর্ত্তৃপক্ষ যেন এ বুঝতে পারেন স্পষ্টই।

তৃতীয় সূত্র :—প্রমোশন পেতে হলে নিজেকে আগে থেকেই উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষিত ও কর্ম্মক্ষম করে তুলতে হবে। কাজ করতে যেয়ে যে সকল টেকনিক্যাল বিষয় প্রয়োজন হবে জানবার, সেগুলো আয়ত্ত করে নিতে হবে খুব তাড়াতাড়ি এবং বেশ ভাল রকম। কাজটিকে ভাল ভাবে করে দেখতে হবে কোন অংশটি কঠিন ও সম্পাদনে সময়-সাপেক্ষ। এইটিকেই যত্ন ও বুদ্ধি দিয়ে ক্রমে সহজ ও ত্বরান্বিত করার প্রতি সক্রিয় মনোযোগ চাই। কর্ত্তৃপক্ষ এ ধারণা করবার কিছুমাত্র অবকাশও যেন না পান যে, নিযুক্ত কর্ম্মচারী কাজের যোগ্য নয়, কাজ আশানুরূপ জানেন না। পক্ষান্তরে, প্রত্যেক কর্ম্মীই এই মূলমন্ত্রটি জেনে রাখবেন যে, তাঁর ভবিষ্যৎ তাঁর নিজেরই হাতে।

চতুর্থ সূত্র :—যিনি যে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে কাজ করবেন, উন্নতিকামী হলে, উহার সঙ্গে আপনাকে তিনি জড়িত করবেন ওতপ্রোত ভাবে। টাকা দেওয়ার ব্যাপারে মালিক বা কর্ত্তৃপক্ষগণ সাধারণত খুব হিসেবী সত্য, কিন্তু তাই বলে 'মাসমাহিনা য পাই, সে-পরিমাণেই কাজ করি'—এ মনোভাব আঁকড়ে থাক ঠিক নয়। প্রত্যেক কাজেরই একটি বিশেষ ধারা আছে, নিজেকে সর্ব্বতোভাবে এর উপযোগী প্রমাণ দিতে হবে। নির্দ্ধারিত কাজ সম্পর্কে যেখান থেকে যাহাই জানা সম্ভব, সকল উৎসাহ ও আগ্রহ থাকতে হবে তা অবিলম্বে জেনে নেওয়ার জন্ম। মোটের উপর, নিয়োগকারী-সংস্থায় নিজেকে অপরিহার্য্য করে তুলতে হবে এবং সেখানে এর পুরস্কারও একদিন না মিলে পারবে না।

পঞ্চম সূত্র :—নিজের মনোভাব বা বক্তব্য স্পষ্ট করে প্রকাশের দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে হবে অনেকখানি। কেন না, এর অভাবে চাকরীর ক্ষেত্রে উন্নতি বা অগ্রগমনের পথে বড় রকম বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পত্র লেখা বা যে কোন বিবরণ লেখাই হোক্—বক্তব্য বিষয় কতখানি যুক্তিপূর্ণ, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হয়েছে, লক্ষ্য রাখতে হবে সেদিকেই। কাজের অঙ্গ হিসেবে কোথাও কথাবার্ত্তা বা আলোচনা করতে হলেও এই দিকটায় নজর চাই পুরোপুরি। সুন্দর ভাবা লিখিত পত্র ও স্মারক-লিপিসমূহ—যা হাত দিয়ে যেতে পারে সেগুলো বার বার পড়ে উহাদের বিশেষত্ব কোথায়—সঙ্গে সঙ্গেই জেনে নেওয়া ভাল। টেলিফোনে কথাবার্ত্তার কালেও ভব্যতা ও শিষ্টতার দিকে নজর রাখতে হবে। অল্প সময়ের ভিতর সবটা বক্তব্য যেন বুঝানো যায় এবং বুঝে নেওয়া চলে—সেটিও নিশ্চয়ই দেখবার।

ষষ্ঠ সূত্র :—যখন যে বিভাগে ও যে বিষয়ে কাজ থাকবে উহার কি কি ভাবে আরও উন্নতি সম্ভব, সে সম্পর্কে প্রস্তাব করতে হ'বে বুঝামাত্র। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার অধিকারী জানাতে পারলে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না এবং এইখানে স্বভাবতঃই থাকছে কর্ম্মোন্নতি বা অর্থোপায় বাড়াবার নিশ্চিত সন্ধান। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সম্পর্কে প্রস্তাব বা সুপারিশ করতে হলে সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে গভীর পড়াশুনোর প্রয়োজন কিছুমাত্র অবান্তর নয়। বস্তুতঃ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যত বর্দ্ধিত করা যাবে

এগিয়ে যাবার সাহসও বৃদ্ধি পাবে সেই পরিমাণেই। সুযোগ পেলে 'বস্' বা উপরস্থ যিনি, তাঁর কাছে বিভাগীয় প্রশ্ন ও সমস্যা কি, জেনে নিতে হবে। তারপরই মীমাংসার পথ খুঁজে বার করবার জন্যে হয়ে উঠতে হবে একান্ত তৎপর।

সপ্তম সূত্র :—আদবকায়দা যেমন দুরস্ত চাই, তেমনি পোসাক পরিচ্ছদেও ফিটফাট থাকতে হবে, অন্তত যিনি যে পদে আছেন, তার উপযোগী। এ ব্যাপারে কোনপ্রকার গোঁড়ামির মনোভাব রাখলে চলবে না—প্রয়োজনটাকেই বড় করে দেখতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে চুল ও পোষাকের অগোছালো সজ্জার জন্যও প্রমোশন বা পদোন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে রইলো। চাকরী করতে এলে লজ্জা সঙ্কোচ ও ভয়—এ কয়টি পিছুটানা গুণকে ছাড়তে হবে একেবারেই। অপর দিকে যিনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করবেন, সরকারীই হোক আর বেসরকারীই হোক, সে প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা বাড়িয়ে তোলাই হবে তাঁর প্রথম লক্ষ্য। আপনাকে প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা করে দেখবার যেন কোন অবকাশ না থাকে সেখানে।

অষ্টম সূত্র :—যেখানে কাজ করতে হবে, পরিবেশ ও আবহাওয়াটি ভাল করে বুঝে নিতে হবে আগে থেকেই। হয়ত দেখতে পাওয়া যাবে, কিছু সংখ্যক সহকর্ম্মী পিছিয়ে পড়লো, আবার কতক জন প্রমোশন পেয়ে গেল চটপট। কি কি কারণে এমনটি হ'তে পারে, বিশ্লেষণ করে বুঝতে জানতে হবে, যেমন করেই হোক। তা হলেও এগিয়ে যাবার পথগুলো হবে ক্রমশঃ পরিদৃষ্ট এবং কাজ করবার উদ্যমও জুটে যাবে মনের ভিতর প্রচুর। উন্নতির প্রতি যাঁদের লক্ষ্য আছে, যাঁরা সত্যি সত্যি উদ্যোগী—তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুললেও যথেষ্ট কাজেরই হবে।

নবম সূত্র :—নিজের কাজ সত্যি কিরূপ সন্তোষজনক হচ্ছে, তা যাচাই করে নেওয়ার মনোবৃত্তি না রাখলে চলবে না। যেক্ষণে যে-পদে অধিষ্ঠিত, সে-পদে কাজ করতে দ্বিধা বা আপত্তি নেই, এতটুকু অযোগ্যতা বা অক্ষমতা নেই, কর্ত্তৃপক্ষকে যেন এইটি স্বীকার করতে হয়। তারপর এও যেন তাঁরা কাজকর্ম্মের ফাঁকে বুঝতে পারেন যে, উপরের পদের জন্য প্রত্যাশা রয়েছে এবং প্রার্থী এর অনুপযুক্ত নয় কোন দিক থেকেই।

দশম সূত্র :—প্রমোশনের পথে কোন বাধাই নেই, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে হবে। অনেক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানই আছে, যেখানে মালিক বা কর্ত্তৃপক্ষ আপনি হয়ত টাকা বাড়িয়ে দিলেন না কিংবা পদোন্নতি ঘোষণা করলেন না। সেখানেই বিশেষ করে প্রার্থী হবার তথা সঙ্গত দাবী জানাবার প্রশ্ন থাকে। এইটি করতে গেলেও যতটা সম্ভব উত্তেজনা এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করতে হবে এবং প্রমাণ তুলে ধরতে হবে—নিজে সত্যি কতখানি যোগ্য, সক্ষম ও অধিকারী। এ ভাবে অব্যাহত চেষ্টা, উদ্যম ও সঙ্কল্প যাঁর রইলো, ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর প্রতি প্রসন্ন না হয়ে পারেন না, এইটুকু বলতে পারা যায়।
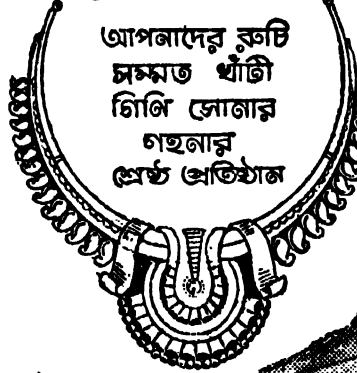
টুকিটাকি

এই বৎসর চীনাবাদাম রপ্তানি দ্বারা ভারতের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতির বৃহদংশ পূরণ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ব্যবসায় মহলের হিসাব অনুসারে এই বৎসর চীনাবাদামের উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসরের অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে। আশা করা যায় যে, বীজের হিসাবে এই বৎসর ২৫ লক্ষ টন উৎপন্ন হইবে। গত মরশুমে আনুমানিক ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টন বীজ উৎপন্ন হয়। ভারতে সাধারণতঃ ২০ লক্ষ টন (বীজ) খরচ হয়। এই বৎসর আভ্যন্তরীণ খরচের পরিমাণ ২১ লক্ষ টন (বীজ) হইতে পারে। সুতরাং প্রায় ৪ লক্ষ টন বীজ রপ্তানি করা যাইবে। তৈল নিষ্কাশন করা হইলে উদ্বৃত্ত বীজ হইতে প্রায় দেড় লক্ষ টন বাদাম তৈল পাওয়া যাইবে। * * * বর্তমান মরশুমে ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত ভারতের চিনিকলগুলিতে চিনি উৎপাদন এবং চালানের পরিমাণ যথাক্রমে ১৮ লক্ষ ৫১ হাজার টন এবং ১৬ লক্ষ ৪১ হাজার টন ছিল। পূর্ব বৎসরে একই সময় পর্যন্ত উহা যথাক্রমে ১৫ লক্ষ ১০ হাজার টন এবং ১১ লক্ষ ৪৮ হাজার টন ছিল। ১৫ই অক্টোবর তারিখে চিনিকলগুলিতে ৬ লক্ষ ৩২ হাজার টন চিনি মজুদ ছিল (গত বৎসরে ৪ লক্ষ ১৫ হাজার টন)। * * * ভারতে যে সকল রাজ্যে নারিকেল উৎপন্ন হইয়া থাকে সেই সকল রাজ্যে সরকারের সহযোগিতায় ভারতের কেন্দ্রীয় নারিকেল কমিটি নারিকেল চারা উৎপাদনের জন্য ২৩টি নার্শারী স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। নারিকেলচাষীদের সরবরাহ করিবার জন্য এই সকল নার্শারীতে সর্বোচ্চ বার্ষিক ৩,৩২,৫০০ বাছাই নারকেল-চারা উৎপাদনের পরিকল্পনা আছে। নার্শারীগুলি মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, অন্ধ্র, মহীশূর উড়িষ্যা, বোম্বাই, পশ্চিম বাংলা এবং আসামে স্থাপন করা হইবে। * * * ভারত হইতে বিদেশে তামাক-পাতা রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে ৭ কোটি ২৮ লক্ষ পাউণ্ড তামাক-পাতা (১৯৫৩-৫৪ সালে ৬ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড) রপ্তানি হয়। ১৯৫৪-৫৫ সালে তামাক-পাতা রপ্তানি হইতে ভারত প্রায় দশ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। আলোচ্য বৎসরে আভ্যন্তরীণ ব্যবহারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য ১৯৫৪-৫৫ সালে ৫৬ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে ৫২ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হয়। আলোচ্য বৎসর ভারতে তামাকের চাষ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে আবাদী জমির পরিমাণ ৮ লক্ষ ৬০ হাজার একর এবং উৎপাদন ২ লক্ষ ৪৮ হাজার টন ছিল। ১৯৫৩-৫৪ সালে আবাদী জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৯ লক্ষ ১০ হাজার একর এবং ২ লক্ষ ৬৮ হাজার টন ছিল। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্যই আবাদী জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। * * * ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতীয় রেলপথগুলিতে প্রতি তের ঘণ্টায় গড়ে একখানি করিয়া নূতন ইঞ্জিন স্থাপন করা হইয়াছে আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় রেলপথে মোট ৬৬৮টি নূতন ইঞ্জি[ন] চালু করা হয়। তন্মধ্যে 'অতিক্রান্ত বয়স' (যতদিন চালু উচিত তদপেক্ষা অধিক দিন চালু) ইঞ্জিন বদলী করিবা[র] জন্য ৬৩৩টি নূতন ইঞ্জিন ব্যবহার করা হইয়াছে। * * * ভারতে যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর জন্য বৃটিশ যুক্তরাজ্যের 'এ সি ভি ভিকার্স' এবং 'বাবকক ও উইলকক্স' প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সম্মিলিত উদ্যোগে দুর্গাপুরে একটি সুবৃহৎ কারখানা শীঘ্রই স্থাপিত হইবে। এই কোম্পানীর মূলধন হইবে কুড়ি কোটি টাকা। * * * ১৯৫৭ সালে সোভিয়েট রাশিয়া হইতে সাড়ে তিন লক্ষ টন ইস্পাত আমদানির জন্য ভারত সরকার কলিকাতাস্থ সোভিয়েট বাণিজ্য এজেন্সির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন। * * * টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানি লিমিটেড-এর এক সংবাদে প্রকাশ যে, অক্টোবর মাসে ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৭১,৮০০ টন হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫৯,৭০০ টন। * * * ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সরকারের প্রয়োজনীয় কয়েক শ্রেণীর দ্রব্য কেবলমাত্র কুটিরশিল্প হইতে ক্রয় করা হইবে। * * * ভারতে তৈল নিষ্কাশন শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত এবং কি ভাবে শিল্পের উন্নতি করা যায় সেই বিষয়ে সুপারিশ করিবার জন্য ভারত সরকার ১৯৫৫ সালে তৈলবীজ পেষণশিল্প তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। কমিটির মূল সুপারিশগুলি নিম্নরূপ—(১) যন্ত্রচালিত তেলকলের তুলনায় ঘানিতে অধিকতর সংখ্যক লোক নিয়োগের সম্ভাবনা আছে। ভারতে সম্ভাব্য মোট উদ্ভিজ্জ তৈল নিষ্কাশনের পরিমাণ সামান্য হ্রাস পাইলেও, ঘানি-শিল্পের সর্বপ্রকার উৎসাহদান প্রয়োজন। (২) কিন্তু ভারতের অর্থনীতিতে তৈলকলগুলিরও গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। ভারতে আর কোন বিদ্যুৎচালিত তৈলকল স্থাপন করিতে দেওয়া সঙ্গত হইবে না। একমাত্র তিসি ব্যতীত অপর সকল ক্ষেত্রে তৈলকলগুলিকে সর্বোচ্চ পরিমাণে তৈল নিষ্কাশনের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। * * * এই বৎসর মে মাসে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংস্থা (ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া) স্থাপিত হয়। সংস্থাটি প্রথম পাঁচ মাসে আমদানি ও রপ্তানি খাতে মোট ১৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার চুক্তি সম্পাদন করে। * * * ভারত সরকার ১৯৫৫-৫৬ সালে কুটিরশিল্প ও ছোটখাট শিল্পে উৎপন্ন প্রায় ৩ কোটি ৪১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করেন। উহার পরিমাণ ১৯৫৪-৫৫ সালে ১ কোটি ৫ লক্ষ এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে ৭৪ লক্ষ টাকা ছিল। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে হোসিয়ারী দ্রব্য, নারিকেল-ছোবড়ার দ্রব্য, কম্বল, তালা, চামড়ার দ্রব্য ও তাঁবুর সরঞ্জাম ইত্যাদি ছিল। * * * ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে মহিলাদের অর্থ সঞ্চয় আন্দোলন সুরু হয়। ১৯৫৬ সালের ১০ই আগষ্ট পর্যন্ত এই খাতে ৪ কোটি ২৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

শ্রীশ্রীসারদা দেবী

শ্রীমালতী গুহ-রায়

বাঁকুড়া জেলার অখ্যাত পল্লী জয়রামবাটীকে বিখ্যাত ও তীর্থস্থান করে তুলতে এবং বঙ্গ ইতিহাসকে সমৃদ্ধ ও সমুজ্জ্বল করতে বঙ্গাব্দ ১২৬০ সালের ৪ঠা পৌষ বৃহস্পতিবার দিন রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাসুন্দরী দেবীর সংসারবৃক্ষের প্রথম অমৃতফলরূপে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদা দেবীর শুভ আবির্ভাব হয়েছিল।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের অন্তরালে সারদা দেবী নিজেকে এমন ভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন যে, ঠাকুরের সহধর্মিণী ছাড়া তাঁর যেন অন্য কোন পরিচয়ই ছিল না। কিন্তু কোন একটা বিরাট ব্যক্তিত্ব অপর একটি বিরাট ব্যক্তিত্বকে কখনই বিলোপ করে ফেলতে পারে না। একদিন না একদিন তার প্রকাশ হয়ই। কাজেই নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিলোপ করে ফেলতে চাইলেও সারদা দেবী তা পারেন নি।

একশো বছর অতীত হয়ে গেছে, সারদা দেবীর শুভ আবির্ভাব হয়েছিল। আজ মানুষের সেই সময়কার সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনধারা আর নেই। তাদের সরল বিশ্বাস হারিয়ে গেছে, তার পরিবর্তে এসেছে নানা জটিলতা, অবিশ্বাস ও সন্দেহ। কিন্তু এ সংশয়ের যুগেও অসংশয়ে মেনে নিচ্ছে মানুষ সারদা দেবীর মাহাত্ম্যকে। ক্রমে ক্রমে আপন মহিমায় প্রকাশিত হচ্ছেন শ্রীশ্রীসারদা দেবী।

সারদা দেবীর নশ্বর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্মৃতি তো মুছে যায়ই নি বরং দিনে দিনে বেশী করেই ফুটে উঠছে। আজ তাঁর সম্বন্ধে শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে অনুসন্ধিৎসা, সারা বিশ্বে তাঁর পূজার আয়োজন। তাঁর দেবী-আসন পাতা হচ্ছে বিশ্বের আনাচে-কানাচে, আর তাঁরই উদ্দেশ্যে মন্ত্রমন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, 'ওঁ হ্রীং ক্লীং সর্ব্বদেবদেবীস্বরূপিণ্যৈ সারদাদেব্যৈ স্বাহা।' শত-সহস্র মস্তক লুটিয়ে পড়ছে ভক্তিভরে তাঁকেই শ্রদ্ধা নিবেদন করতে।

সারদা দেবীর জীবন-কাহিনী আলোচনা করলে আমরা ভারত-নারীর হারিয়ে-যাওয়া আদর্শ সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করতে পারি। যদিও সারদা দেবীর জীবনালেখ্য সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তোলা মনুষ্যসাধ্য নয়, তবু যতটা আমরা সারদা দেবী সম্বন্ধে জানতে পারি, তাতে এটুকুই বোঝা যায় যে, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, ভারত-রমণীর যে আদর্শকে জনসমাজে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, সারদা দেবীর মধ্যে তা সম্পূর্ণ ভাবে ফুটে উঠেছে। আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগই ভারতীয় আদর্শ; সেই আদর্শের বিকাশ দয়া, ধৃতি ক্ষমা, সত্য ও প্রেমে। সারদা দেবীর মধ্যে এই সব কিছুই আমরা প্রস্ফুটিত দেখতে পাই।

সারদা দেবীকে যথার্থ ভাবে বুঝতে হলে তাঁর অতি শৈশব থেকে অতি সাধারণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে যে ভাবে তিনি সাধারণ থেকে অসাধারণত্বে পৌঁছেছিলেন, যে ভাবে জনগণচিত্তে দেবী-আসন গ্রহণ করেছিলেন, তাই আমাদের দেখতে হবে। তবেই আমরা জানতে পারবো যে, অসাধারণত্বে পৌঁছাতে হ'লে ও ঐহিক পারমার্থিক মানব-জীবনে যা কিছু কাম্য তা লাভ করতে হলে মানুষকে ছুটাছুটি করতে হয় না, কোন দৈবী কৃপার অপেক্ষা করতে হয় না; বিদ্রোহ করে বা বলিষ্ঠ দাবী প্রকাশ করেও নিতে হয় না। মানুষের নিজের মধ্যেই থাকে সব কিছু ক্ষমতা। শুধু তার বিকাশ করার জন্য চাই নিজের অনলস চেষ্টা। আদর্শ অনুযায়ী ফুটে ওঠার জন্য আন্তরিক চেষ্টা থাকলে বাইরের কোন বাধাই তাকে ঠেকাতে পারে না। বরং পারিপার্শ্বিক বাধা-বিঘ্ন আপনা হতেই সরে যেতে থাকে।

সারদা দেবী জন্মেছিলেন এক অখ্যাত পল্লী জয়রামবাটীতে। পার্থিব ঐশ্বর্য্য-সম্পদের মধ্যে প্রতিপালিতা না হলেও অন্তরের যে ঐশ্বর্য্য-সম্পদের মধ্যে তিনি লালিতা-পালিতা হয়েছিলেন, তাতে তাঁর দেবীজনোচিত স্বভাবের ক্রমবিকাশে যে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ধার্ম্মিক সদাশয় পিতা, ধর্ম্মপরায়ণা পরদুঃখকাতরা অতিথিবৎসলা স্নেহময়ী মাতাকে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সারদা দেবী দেব-দেবীজ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলেন। কন্যারূপে তিনি তাঁর সাধ্যমত সংসারের কাজ কর্ম্ম নিজ হাতে করে পিতামাতার পরিশ্রম লাঘব করতে সচেষ্ট থাকতেন। শিশু বয়সেই তাঁকে দেখা যেতো উৎসাহের সহিত মাঠে গিয়ে মজুরদের গুড়-মুড়ি দিয়ে আসতে, গলা-জলে ডুবে গরুর জন্য দলঘাস কেটে আনতে, গাছ থেকে তুলো তুলে এনে তা দিয়ে পৈতে তৈরী করতে, আবার পঙ্গপাল এসে ধান খেয়ে গেলে জমিতে পড়ে-থাকা ধানগুলি কুড়িয়ে কচি হাতের মুঠি ভরে ভরে জমা করে রাখতে, এমনি ধারা আরো কত কি! উত্তর জীবনে সেবাময়ী নারীর সেবা কাজ সুরু হয়েছিল যেন এভাবে অতি শৈশব থেকেই।

শৈশব থেকেই অনন্যসুলভ গাম্ভীর্য তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর ধর্ম্মপিপাসা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও মাতৃভাব বিকাশের আভাস অত্যন্ত অল্প বয়স থেকেই পাওয়া যায়। শৈশব-চাপল্য একদিনের জন্যও যেন তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি! খেলতে বসেও তিনি দায়িত্বশীলা গৃহকর্ত্রী সাজতেই ভালবাসতেন। তিনি হতেন মা। আবার খেলার সাথীরা ঝগড়া করলে তিনিই মধ্যস্থ হয়ে মিটিয়ে দিতেন। তাঁর নিজস্ব প্রিয় খেলা ছিল মাটীর 'কালী' 'লক্ষ্মী' ইত্যাদি মূর্ত্তিপুজো করা। ঘরকন্না বা পুতুলখেলা নয়। ফুল বেলপাতা নিয়ে অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে তিনি যখন পুজো করতে বসতেন, তা দেখা একটা উপভোগ্য জিনিষ ছিল। মূর্ত্তির সম্মুখে

ধ্যানস্থ প্রতিমার মত তাঁর নিশ্চল শিশুমূর্ত্তি সকলের মনে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক না করে পারতো না।

এ-হেন সারদা দেবীর বিয়ে হয়েছিল, দেবীর বরপুত্র যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাথে। যখন তাঁর বয়স তেইশ আর সারদা দেবীর মাত্র পাঁচ। বিবাহ অনুষ্ঠান বুঝবার বয়স সারদা দেবীর হয়নি; কাজেই তিনি কিছু বোঝেনও নি। তাই শ্বশুরবাড়ী কামারপুকুর গিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত মনে খেজুরতলায় খেজুর কুড়াতে বসতেন। আর লোকেরা এসে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতো। 'এই মেয়েটিই গদাধরের বৌ না?' সারদা দেবী তখন ছুটে পালাতেন।

বিয়ের পর সারদা দেবী নিজ বাবা-মায়ের কাছে জয়রামবাটীতেই থাকতেন, আর ঠাকুর থাকতেন দক্ষিণেশ্বরে। বিয়ের দুই বৎসর পর কি একটা উপলক্ষে ঠাকুরকে জয়রামবাটী আসতে হয়। সারদা দেবীর বয়স তখন মাত্র সাত বৎসর। কিন্তু দিব্যি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্না বধূর মতই তিনি ঘটি ভরে জল এনে স্বামীর পা ধুইয়ে, নিজের মাথার চুল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন। তখনকার কুলপ্রথাই তাই ছিল। তারপর পাখা হাতে করে এসে আবার স্বামীকে বাতাস করতে থাকলেন। অভীষ্ট দেবতার সেবার সুযোগ পেয়েছেন যেন।

তারপর আবার যখন তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা হল, তখন তিনি একটু বড় হয়েছেন। বয়স তখন তাঁর তেরো বৎসর। বলতে গেলে এই-ই ছিল তাঁর প্রথম স্বামি-সাক্ষাৎকার।

তেরো বৎসর বয়স এমন কিছু পরিপক্ক বুদ্ধি হবার বয়স নয়। কিন্তু সারদা দেবী বয়স অনুপাতে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ছিলেন। স্বামীর আগমন সংবাদে তার মনে নানা রকম বিতর্ক সুরু হল। সব প্রথম তাঁর ভয় হল, এত দীর্ঘ দিন পর স্বামী তাঁকে চিনতে পারবেন কি না! তিনি শুনেছেন, রামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরপ্রাপ্তির চেষ্টায় বিশ্ব-দুনিয়া ভুলে বসে রয়েছেন, কাজেই এতদিন পর স্ত্রীকে চিনতে না পারাই স্বাভাবিক। তাছাড়া তিনি যখন সাধক, তিনি যখন যোগী, ঈশ্বরপ্রাপ্তিই যখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, তখন নিজ সাধনের বিঘ্ন ঘটার ভয়ে তাঁকে অস্বীকার ও বর্জ্জন করাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

কিন্তু পরমহংসদেব ব্রহ্মজ্ঞানী। সর্ব্বজীবে তিনি সমদর্শী। কাজেই তাঁর কি আর আত্মীয় অনাত্মীয়, নিকট দূর সম্পর্ক বা নারী পুরুষের কোন ভেদজ্ঞান আছে? মাতৃভাবের সাধক তিনি, রমণীমাত্রেই যে তাঁর মা। স্ত্রীকে তাঁর ভয় কিসের? আর স্ত্রীকে তিনি সাধনের বিঘ্ন কি করেই বা মনে করবেন?
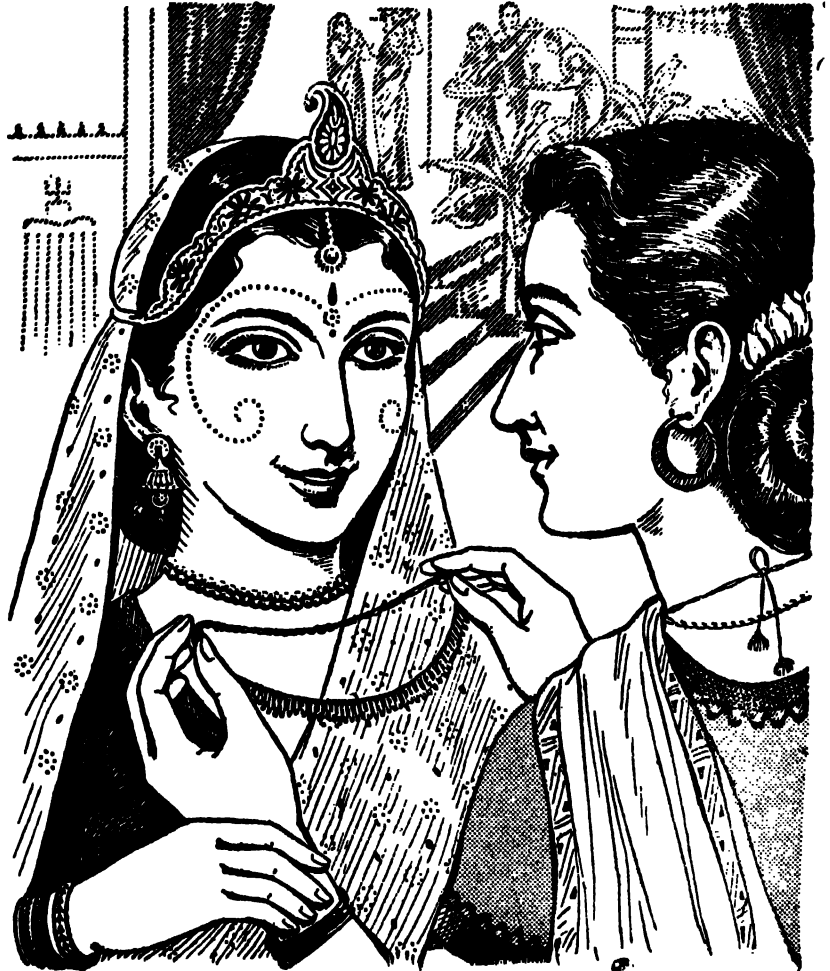
দর্শনমাত্রই সারদা দেবীকে তিনি চিনতে পারলেন। শুধু তাই নয়, পরম স্নেহে তাঁকে গ্রহণও করলেন।

ঠাকুরের প্রথম কাজই হ'ল সারদা দেবীকে আপন আদর্শ মত শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা। সাধন দিয়ে যে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা তিনি অর্জ্জন করেছিলেন, সারদা দেবীর শিক্ষা ব্যাপারে সেই একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা নিয়েই তা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে অগ্রসর হ'লেন। ঠাকুর ছিলেন অন্তরদর্শী। যদি স্ত্রীকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ না করে সাধনে বিঘ্ন হবার ভয়ে দূরে সরিয়ে রাখতেন, তাহলেই হয়তো স্ত্রী তাঁর সাধনপথে বিঘ্ন হতে পারতেন। তা ছাড়া ভালবাসার মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও উপদেশ যতটা কার্য্যকরী হয়, তা শুষ্ক মৌখিক উপদেশে হয় না। কাজেই তিনি সারদা দেবীকে পরম স্নেহে গ্রহণ করে কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

গ্রহণ ও বর্জ্জনের সংশয়দোলায় দোলায়মানা ভীরু কিশোরী বধূ সারদামণি স্বামীর সস্নেহ আহ্বানে সর্ব্বান্তঃকরণেই সাড়া দিলেন ও পরমশুরুজ্ঞানে তাঁর আদর্শে ও শিক্ষায় গড়ে উঠবার জন্ত সচেষ্ট হ'লেন। 'কাজ কর, কর্ত্তব্য কর'। 'শরীরং কেবলং কর্ম'। 'কৃপা হলে তুমিও পাবে ভগবানের সাক্ষাৎ'। এই ছিল তাঁর প্রতি ঠাকুরের উপদেশবাণী।

কিশোরী বধূকে একটুখানি স্নেহপরশ, কিছু উপদেশ ও ভবিষ্যৎ আদর্শের একটা সন্ধান দিয়ে ঠাকুর অল্পদিনেই আবার দক্ষিণেশ্বর চলে গেলেন। সারদা দেবী সত্তপ্রাপ্ত স্বামীর উপদেশ ও শিক্ষার বীজটুকু অন্তরে গেঁথে, ভবিষ্যৎ মহান আদর্শের জন্ত তৈরী হতে থাকলেন। স্বামীর আহ্বান প্রতীক্ষা করেই ধৈর্য্যের সঙ্গে তিনি নিজ পিত্রালয়ে থেকে গেলেন। স্বামীর সঙ্গে যেতে চাইলেন না।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গিয়ে ঠাকুর কিন্তু নিজ সাধনে এমনি মগ্ন হলেন যে, স্ত্রী, সংসার, বিশ্বদুনিয়া সবই ভুলে গেলেন। কিশোরী বধূ সারদা দেবী এ-সব কিছুই জানলেন না। তিনি শুধু তাঁর স্বামীর আহ্বান প্রতীক্ষায় রইলেন। স্বামীর সস্নেহ সদয় ব্যবহার তাঁর সব সময় মনে পড়তো; আর তিনি জানতেন তাঁর স্বামীর আহ্বান আসবেই। কাজেই তাঁর দীর্ঘবিরহের সময়টুকু ঐ স্পর্শ পাওয়া স্বামিসন্নিধানরূপ আনন্দস্মৃতির রস আস্বাদন করেই কাটতে থাকলো।

তাঁর জীবনে যেন একটা আনন্দের প্লাবন এসে তাঁকে ধুইয়ে দিয়ে গেছে। তাই নূতনতর মানুষ হয়ে তিনি স্নেহে, প্রেমে, সেবায়, ত্যাগে মধুর হতে মধুরতর হতে লাগলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, 'সর্ব্ব অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার শিক্ষাই শিক্ষা'। সারদা দেবী সেই শিক্ষাকেই অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। তাই সুদীর্ঘ বিরহকালে তাঁকে একদিনের তরেও অধৈর্য্য হতে দেখা যায়নি।

কিন্তু পরমহংসদেবের ভাবোন্মাদনার সংবাদ যখন ক্রমেই বিকৃত ভাবে প্রচারিত হ'তে হ'তে জয়রামবাটী পর্য্যন্ত পৌঁছাল যে, তিনি নাকি ঘোর উন্মাদ হয়ে গেছেন, সারদা দেবী তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না। প্রথমে অবশ্য তিনি সংবাদটি বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু ক্রমেই প্রতিবেশিনী গ্রামবাসিনীরা যখন তাঁর প্রতি অনুকম্পা, সহানুভূতি ও বেদনায় ভেঙ্গে পড়তে লাগলেন, তখন তিনি অস্থির ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

সারদা দেবীর বয়স তখন আঠারো বৎসর। বিচার-বুদ্ধির বয়স হয়েছে। তিনি নিজেই স্থির করলেন, ঘটনা যদি সত্যই হয়, তবে এসময় স্বামীর কাছে থাকাই স্ত্রী হিসাবে তাঁর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর ৬০ মাইল দূর। তিনি কি করে সেখানে যেতে পারেন ভেবে স্থির করতে পারলেন না। হেঁটে যাওয়া ছাড়া তো কোন উপায়ই নেই, কেন না—পাল্কীতে যাওয়া ব্যয়সাধ্য। অনুপায় হয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলেন এক মনে। কেন না, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবানই অগতির গতি, অসহায়ের সহায়, এবং দুর্ব্বলের বল।

ঐকান্তিক প্রার্থনা বিফলে গেল না। সারদা দেবীর পিতা কয়েক জন স্নানার্থী যাত্রীর সন্ধান পেয়ে সারদা দেবীকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করলেন। পথের অনভ্যস্ত শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে রাস্তায়ই সারদা দেবীর প্রবল জ্বর হ'ল। কিন্তু তিনি দমে যান নি। জ্বর ছাড়তেই আবার হাঁটা সুরু করলেন। সর্ব্বপ্রকার পথের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে অবশেষে এসে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছলেন।

দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে স্বামীকে কি অবস্থায় যে দেখতে পাবেন, এই চিন্তাটি সারদা দেবীর সারা পথ ধরে মনকে অভিভূত করে রেখেছিল। তাই তিনি দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছামাত্রই আর কোন দিকে দৃক্‌পাত না করে সোজা ঠাকুরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। লজ্জাশীলা সারদা দেবীর কোন সঙ্কোচবোধটুকুও রইল না।

স্বামীর ঘরে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ও সুস্থ দেখে তাঁর আর আনন্দের সীমা রইল না। কিন্তু বুদ্ধিমতী সারদা দেবীর আনন্দের সাথে সাথেই ভয় হ'ল যে, স্বামী তো তাঁকে ডাকেন নি! বিনা আহ্বানে তিনি তাঁর সাধনে বিঘ্ন ঘটাতে এসেছেন ভেবে যদি ঠাকুর অসন্তুষ্ট হ'ন? কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার সাথে সাথেই তিনি যে রকম উৎফুল্ল ভাবে তাঁকে গ্রহণ করলেন, তাতে সারদা দেবীর হৃদয়-মন জুড়িয়ে গেল।

অসুস্থা শীর্ণা ও পথিক্লান্তা স্ত্রীকে তিনি চিকিৎসা ও সেবাযত্নের সকল ব্যবস্থা করে দিলেন। নহবতঘরে ঠাকুরের মা থাকতেন। প্রথম দেখা-সাক্ষাতের পর্ব্ব শেষ হলে সারদা দেবী নহবতখানায় গিয়ে থাকতে চাইলে ঠাকুরের কি ব্যস্ততা! 'কতদূর থেকে এসেছ! তাতে আবার এ রকম অসুখ। তোমায় ডাক্তার দেখাতে হবে যে! নহবতঘরে তো ডাক্তার যেতে পারবে না। তুমি বরং এই ঘরেই থাকো। আমিই নিজ হাতে তোমার সেবা করবো, ওষুধ-পথ্য দিয়ে তোমায় সারিয়ে তুলবো। আজ যে মথুরই বেঁচে নেই, কে আর তোমায় আদর-যত্ন করবে?'

রইলেন সারদা দেবী ঠাকুরের ঘরে, ঠাকুরের কাছে। আর সত্যিই ভোলানাথ সন্ন্যাসী চিকিৎসা-যত্নের ব্যবস্থা করে তিন-চার দিনেই ধর্মপত্নীকে সুস্থ করে তুললেন। তারপর সারদা দেবীকে বললেন, 'এবার তো তুমি সুস্থ হয়েছ, এখন তুমি গিয়ে মার কাছে নহবতখানায়ই থাকো।' অনুগতা সারদা দেবী নহবতখানায় চলে গেলেন। নিয়ে গেলেন সাথে বুকভরা তৃপ্তি আর মনভরা আনন্দ। এমন দেবোপম স্বামীর তিনি স্ত্রী!

কিন্তু সারদা দেবী নহবতঘরে চলে যেতেই ঠাকুরের মনে হল, 'সর্ব্বভূতেই যদি আমার মা জননী আছেন, তবে শুধু ওতেই কি তিনি নেই? মাটীর কাঠামোতে দেব-দেবীর আরাধনা হতে পারে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হতে পারে, আর মানুষের কাঠামোতেই কি হয় না?

সারদাকে কি আমি ভয় পেয়ে সরিয়ে দিলাম ? নর-নারীতে কি কোন প্রভেদ আছে ?'

গুরু তোতাপুরীর কথা মনে পড়ে গেল। তিনি একদিন বলেছিলেন, 'স্ত্রীকে দূরে সরিয়ে রেখে যে কামজয়, সে তো অতি সহজ কথা। কামনারূপী স্ত্রীকে পাশে রেখে যদি কামনা জয় করতে পার, তবেই তো আসল কামজয়।' গুরুবাক্য স্মরণ হতেই তিনি সারদা দেবীকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে এসে থাকতে এবং তাঁর পাশে এসে শুতে। সারদা দেবী নিজ থেকেই অযাচিত ভাবে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, তিনি তো তাঁকে ডাকেন নি ? কাজেই গুরুবাক্য প্রমাণ করার সুযোগ নিজ থেকেই আজ এসেছে। এখনই তাঁর আত্মপরীক্ষার পালা। [ক্রমশঃ।

লছমী

কণিকা দাস

একদিকটা বেশীর ভাগই চা-বাগান। বহু দূর থেকে চোখে পড়ে, খালি সবুজ চায়ের থোকা থোকা গাছ গড়িয়ে চলে গিয়েছে দূর-দূরান্তরে। মাঝে মাঝে দূরে লাল ছড়ান দু'একটা বাংলো ও চায়ের কারখানা, চারিদিকে পাহাড় আর মধ্যে কত দূর-দূরান্তরে নাম-না-জানা ছোট-বড় চায়ের বাগান। মধ্যে মধ্যে ঝরণার কল্লোলে রহস্যের সৃষ্টি হয়।

এমনিধারা একটি চায়ের বাগান কিনল সেদিন বিখ্যাত এক ইউ, পি, ব্যবসায়ী। ব্যবসার সব কিছু তার নখদর্পণে। কিছুদিনের মধ্যেই ব্যবসা জাঁকিয়ে বসল। বাগানের ম্যানেজারের পদে ছোট বাংলোতে এলেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী সীতা দেবী। তাঁদের ছোট্ট মেয়ে রিণার দেখাশোনার জন্য ঠিক হোল এক নানী। এই চায়ের কারখানার এক কলওয়ালার মেয়ে সে। প্রথমেই বেগুনী উড়নী গায়ে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল লাল-আভা গালে হাসিখুসী-ভরা মুখখানা দেখে সীতা দেবী এক নিমেষে তাকে আপনার করে ফেললেন। লছমী রিণাকে নিয়ে বাগানে সারাক্ষণ খেলা করে, তাকে ভুলিয়ে রাখে, আবার সন্ধ্যে লাগার আগে রিণা লছমীর কোলে যখন ঘুমে ঢুলে পড়ে, তখন তাকে সন্তর্পণে বিছানায় শুইয়ে দেয়। তার পর সেলাম করে বাড়ীর দিকে পাবাড়ায়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে-ঘেরা এই জায়গাটিতে সীতা দেবীর খুবই ভাল লাগছিল। রিণাও লছমীর একান্ত অনুগত হয়ে পড়েছিল।

এমনি ভাবে প্রায় এক বৎসর কেটে গিয়েছে। কিছুদিন থেকে সীতা দেবী লক্ষ্য করছেন, লছমীর আর আগেকার মত সহজ সরল উচ্ছ্বাস ও হেসে ভেঙ্গে পড়া ভাব নাই। সব সময়ই কেমন যেন তাকে অন্যমনস্ক দেখায়। বাড়ী যাবার জন্য লছমী সর্ব্বদা উন্মুখ। একটা কাজ করতে গেলে প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। কাজেও আগের মত উৎসাহ নাই। দেখে-শুনে সীতা দেবী গম্ভীর হয়ে যান।

চা-বাগানের পাশের এক বস্তীতে থাকে বুড়ো জঙ্গবাহাদুর ও তার ছেলে লালবাহাদুর। শোনা যায়, বুড়ো আগে কোন চা-বাগানে কলওয়ালার কাজ করে কিছু পয়সা রোজগার করেছিল। তার ছেলে লালবাহাদুর কিছুদিন পল্টনে কাজ করত। তার পর নানান জায়গায় ঘুরে সে-বার যখন দেশে ফিরে আসে, তখন তার শরীর খুবই

কাহিল হয়েছে। বুকে কিসের ব্যথা অনুভব করে। মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে অন্যমনস্ক ভাবে চুপচাপ বসে থাকে। দিনের শেষে মেয়ে-কুলি-মজুরের দল সেই পথ দিয়ে যাবার পথে উঁকি মেরে মুচকি হেসে চলে যায়। লালবাহাদুর উদাস নয়নে তাদের পথের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

বুড়ো ওর একমাত্র ভরসার স্থল ছেলের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। কিছুদিন যায়—পূর্ণ বিশ্রাম নেবার পর আগেকার ব্যথা ও দুর্ব্বলতা ভাব দূর হয়ে যায়। শোনা যায় লালবাহাদুরের প্রথম যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের কথা। চা-বাগান অঞ্চলের অনেক মেয়ে ওদের বস্তীর কাছে উঁকিঝুঁকি মারে। এমনি ভাবে যমুনা নামে যে মেয়ে সর্ব্বপ্রথম ওর জীবনে দেখা দেয়, তাকে নিয়ে লালবাহাদুর পালিয়ে যায়। আবার দিনকতক বাদে দু'জনে ফিরে আসে। এমনি ওদের বিয়ের ধারা। প্রথম প্রেমিক প্রেমিকাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে, পরে অভিভাবক তাদের মিলন ঘটায়। যমুনা দু'দিন যেতেই সরে পড়ে তার কাছ থেকে। লালবাহাদুর সন্ধ্যে হলেই নেশায় বিভোর হয়ে যায়। এর পর দু'দিন যেতেই চম্পাকে সাদি করে। চম্পা এই চা-বাগানেই কুলীর কাজ করত। এই রাস্তা দিয়ে যেতেই ওদের ভাব হয়। চম্পা দিনের শেষে কর্ম্মক্লান্ত দেহে যেতে যেতে থমকে লালবাহাদুরের বস্তীর সামনে আসে। লালবাহাদুর তার পল্টনের অনেক গল্প চম্পার সাথে করে, কিসের আবেশে দু'জনে বিহ্বল হয়ে যায়, তার পর দু'দিন যেতে না যেতেই চম্পার মন বিরূপ হয়ে যায় লালবাহাদুরের ওপর, ভুল ভেঙ্গে যায়। পালিয়ে চলে গিয়ে মুক্তি পায় চম্পা।

বেশ কিছু দিন চুপচাপ থাকে লালবাহাদুর। এর পর ধীরে দেখা যায় তার প্রসাধনের চাকচিক্য। মাইল দু'য়েক দূরে একটা চা-বাগানে চৌকিদারির কাজের আশা পায়। এমনি মুহূর্ত্তে একদিন বাড়ী ফেরার পথে লছমীর সাথে দেখা হোল লালবাহাদুরের। লছমী ওর আগেকার ঘটনা সবই জানে; কিন্তু চোখে-মুখে এমন ছেলেমানুষি ও সরলতা ভরা মুখ দেখে লছমী সহজেই লালবাহাদুরকে বিশ্বাস করে ফেলে। রোজই কাজের শেষে লছমীর সাথে লালবাহাদুরের দেখা হয়। তাই ছুটী পাবার জন্য লছমীর মন-প্রাণ সর্ব্বদা চঞ্চল হয়ে ওঠে। বাড়ী ফিরবার আশায় মন তার উন্মুখ হয়ে যায়। লছমী লালবাহাদুরের দেখা পাওয়ার আশায় তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চলে।

এর পর প্রায় কিছু দিন কেটে যায়। এক দিন দেখা গেল লছমী কাজে অনুপস্থিত। পর-পর প্রায় চার-পাঁচদিন কেটে যাবার পর সীতা দেবী তরুণ বাবুর মারফত কারখানার কলওয়ালাকে খোঁজ করলেন। কলওয়ালার কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, লছমী, লালবাহাদুর নামে এক উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব লোকের সাথে পালিয়ে গিয়েছে। কলওয়ালা কেঁদে বলল, হুজুর, আমি কিছুদিন থেকে লালবাহাদুরের স্বভাব চরিত্রের কথা জানতাম। কত লেড়কী ওর কাছে আসে, দু'দিন পরে সবাই সরে পড়ে। আমার ভয় হচ্ছে হুজুর, লছমী ওর সাথে প্রেম করে সাদি করবে, কিন্তু মারা পড়বে হুজুর। লছমী যদি ওকে সাদি করে তাহলে জানব আমার লেড়কী মরে গিয়েছে।

এর পর কিছু দিন যেতেই লছমী ও লালবাহাদুর ফিরে এল লালবাহাদুরের ঘরে। লছমীর মুখে-চোখে যেন স্বপ্নের আবেশ। উপায় নাই দেখে এর পর লছমীর সাদি হয়ে গেল লালবাহাদুরের সাথে। লালবাহাদুর দূরের চা-বাগানে চৌকিদারির কাজ পেল।

সকাল বেলা বেশ সুন্দর রোদ উঠেছে। সীতা দেবী রিণার হাত ধরে বাগানে এসে দাঁড়াতে দেখলেন, সামনে লছমী মহা-অপরাধীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে। রিণা লছমীকে দেখেই 'ওই যে নানী' বলে ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুবাহু বাড়িয়ে লছমীকে আঁকড়িয়ে ধরে। সীতা দেবীর মুখে-চোখে কঠোরভাব এলেও এই দৃশ্য দেখে চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। রিণা লছমীর একান্ত অনুগত জেনে লছমী আবার কাজে স্থায়িভাবে থেকে গেল, এর পর প্রায় ছয় মাস কোন দিক দিয়ে কেটে গেল। সীতা দেবী লক্ষ্য করলেন, লছমী আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে, ওর মুখের হাসি যেন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। মধ্যে মধ্যে তাকিয়ে দেখেন, লছমীর মুখ-চোখ ফোলা, চোখের কোণে কালি পড়ে গিয়েছে।

রাতে বস্তীর ধার থেকে চাপা কান্নার আওয়াজও পাওয়া যায়। এর পর বুড়ো কলওয়ালা কখনও কখনও তরুণ বাবুকে বলে যে, লছমীকে প্রায়ই লালবাহাদুর মারে। বুড়ো বলে যে, লছমী এখনও এলে তাকে নতুন করে সাদি দিতে পারে কিন্তু আর সব মেয়ের মত লছমী তার কথা শোনে না, খালি বসে বসে চুপচাপ মার খায়। সেদিন লালবাহাদুরের নেশাটা খুব জোরালো হয়েছিল। চৌকিদারির ঘণ্টা দিয়ে রাত্রে ঠিক মত সময়ে রান্না হয়নি জেনে লছমীকে বেজায় মারধোর করল। লছমীকে এত বেশী মেরেছিল সেদিন যে নীল কালশিরা পড়েছিল ওর সারা দেহে।

সকালে কাজে দেরী করে গেল লছমী। সীতা দেবী লছমীকে জিজ্ঞাসা করতেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। গতরাত্রের ক্ষতস্থানগুলো দেখা যায় ওর সারা অঙ্গে। সীতা দেবী অনেক বোঝালেন লছমীকে। বললেন, কেন সে এমন ভাবে নিজেকে জেনে-শুনে বিসর্জ্জন করল একজন দুশ্চরিত্র মাতাল লোকের কাছে? লছমীকে তার বাবা বিয়ের আগে কত বারণ করেছিল, তবুও কেন সে লালবাহাদুরকে সাদি করল! লছমী সবই জানে, সবই বোঝে, তবুও উপায়হীন ভাবে চুপ করে ছলছল চোখে তাকায় সীতা দেবীর পানে।

এর পর রোজই লছমী কাজে আসে। আগের হাসি মিলিয়ে গিয়েছে; তার বদলে চোখে-মুখে কিসের আশঙ্কা যেন ফুটে ওঠে। সীতা দেবী বুঝতে পারেন, লছমী ভাবী সন্তানের মাতা। তাই শরীরে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন ফুটে ওঠে, কিন্তু লছমী কাজে জোর পায় না। হাত পা ফুলে, দুর্ব্বলতায় হাঁপিয়ে ওঠে। লালবাহাদুরের দুষ্ট ক্ষয়রোগ কখন ওর শরীরে অতর্কিতে প্রবেশ করেছিল, নিজেও লছমী বুঝতে পারেনি। দেখে-শুনে সীতা দেবী লছমীকে পূর্ণ বিশ্রামের জন্য ছুটী দিলেন। তিনি লছমীকে বললেন—শরীর যখন তার একান্ত খারাপ তখন সম্পূর্ণ ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত আর কাজে আসতে হবে না।

পুরোনো লোক বলে ছাড়াতে খুবই মায়া হচ্ছিল, তবুও সীতা দেবী বললেন, টাকার যখন দরকার হবে, আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও লছমী! বাচ্চা বড় হ'লে আবার কাজে এসো। যদিও তিনি নিজে ভালভাবেই জানতেন এই সংক্রামক ব্যাধির জন্য তাঁর প্রিয় কন্যাকে তিনি আর ওর হাতে দিতে পারবেন

মা—তবুও সান্ত্বনার জন্য তিনি আশ্বাস দিলেন। লছমী রিণাকে একটু আদর জানিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলে যায়। সীতা দেবীও ম্লান মুখে তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ফাগুন মাস। চা-বাগানের চারিদিকে নেসপাতি গাছে সাদা গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ধরেছে। দূরে চাঁপাগাছে সাদা বড় বড় চাঁপাফুল ফুটে তার গন্ধে চারি দিক ভরে গিয়েছে, পাশের বস্তীর বড় গাছটায় লাল থোকা থোকা ফুল ফুটে পাতাগুলো ঢেকে ফেলে গাছটা আলো করে রয়েছে।

ভিতরে দিগন্ত-বিস্তৃত চায়ের বাগান। সকাল হোতেই মেয়ে কুলীর দল রঙ-বেরঙের উড়নী পরে হাসিভরা মুখে পিঠে ঝুড়ি বেঁধে চা পাতি তুলছে। মেঘমুক্ত আকাশ রৌদ্রকিরণে ঝলমল করছে।

সকাল বেলা তরুণ বাবু চায়ের বাগানে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সীতা দেবী প্রাতরাশ প্রস্তুত করতে ব্যস্ত—হঠাৎ কিসের আর্ত্তনাদে দু'জনেই একসঙ্গে চমকিয়ে গেলেন! কলওয়ালা বুড়ো বুক চাপড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, হুজুর, কাল রাতে লছমী একটা মরা ছেলে জন্ম দিয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমি ভগবানের কাছে কি দোষ করেছিলাম যে বুড়ো বয়সে ভগবান আমাকে এমন কষ্ট দিলেন? লালবাহাদুরকে সাদি করেই আমার লছমী এমন ভাবে মরে গেল হুজুর! এই বলে চীৎকার করে মুখ ঢাকা দিয়ে কাঁদতে লাগল। তরুণ বাবু ও সীতা দেবী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, আজ সান্ত্বনার কোন ভাষাই আর তাদের মুখ দিয়ে বেরোল না।

এর কিছুক্ষণ পর সেই বস্তীর ছেলে-বুড়ো চারি দিকের জনতা লছমীর ঘরে ভেঙ্গে পড়ল। কারখানার একজন কুলী এসে তরুণ বাবুকে বলল, হুজুর, বড় বাকস একটা চাই—মাটী দিতে হবে! তরুণ বাবু অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, আচ্ছা বড় বাকস লে যাও।

ধীরে সীতা দেবী বাগান ছেড়ে দূরে বস্তীর দিকে তাকালেন। দূরের গাছটায় লালফুলগুলো যেন শ্মশানের লাল আলোর মত সীতা দেবীর চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। বাকসের কথা মনে হতেই দু-চোখ বেয়ে সবার অলক্ষ্যে অশ্রুধারা নেমে আসে, অন্যমনস্কের মত অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন দিগন্তের পানে—কিছুদিন আগে তাঁর দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে কচি কিশোরী মেয়ের যৌবনদীপ্ত একখানা ফুটন্ত ফুলের মত মুখ—চোখের জলের ঝাপসায় দূরের সব কিছু কাছে মিলিয়ে যায়।

একটি সঙ্গীত

অমিয়া সেন

সারা দিন মেঘ করেছিল। সন্ধ্যার আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। লোক্যাল ট্রেণের যাত্রীরা উর্দ্ধশ্বাসে ষ্টেশন অভিমুখে ছুটেছে। বাড়ী ফিরতে আজ দেরী হয়ে গেল! শীতের বর্ষা, তায় কনকনে হাওয়া দিয়েছে, বাড়ী ফিরতে পারলে বাঁচে সবাই।

অভী রোজ শহরে সব্জী নিয়ে আসে বিক্রীর জন্য, ফেরতা-পথে কিছু কিছু সওদা নিয়ে যায়। আজও নিয়েছে। ঝুড়িতে রয়েছে কিছু কুচো চিংড়ী, পকেটে রয়েছে ছোট বোনের জন্য দু'গজ লাল রিবণ। গাড়ীতে উঠে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখছিল রিবণ দু'টি ভিজেছে নাকি। দুর্গাপদ মুহুরী ওদের গাঁয়ের লোক, সে-ও এই গাড়ীতে উঠেছে। অভীকে দেখে বললে, "এই যে অভীচন্দর, শীত কেমন লাগছে?"

"আর দাদা!" একটা ছেঁড়া হাফসার্ট আর আধময়লা খদ্দরের চাদরে অভীর দেহে শীত বাধা মানছিল না। ঠোঁট দুখানি কালো হয়ে উঠেছে, হাতের আঙুলগুলি যেন আর নিজের আয়ত্তে নেই। তবু বিবর্ণ ঠোঁটে খুশীর হাসি হাসল। বললে, "শীত পড়ুক দাদা, নইলে অসুখ বিসুখ করবে যে—"

দুর্গাপদ নিজের ছেঁড়া গরম চাদরখানি দিয়ে যথাসাধ্য মুড়ি-সুড়ি দেবার চেষ্টা করতে করতে বললে, "আমরা যে শীত পড়লেও মরি, না পড়লেও মরি, আমাদের আর লাভ কি রে"—চলন্ত গাড়ীতে অনেকগুলি আরোহী ফিস-ফাস করে হেসে উঠল। সকলেই গরীব, নিম্ন মধ্যবিত্ত। অনেক মরণ দেখেছে, অনেক বার মরে মরে আবার ঘুরে ঘুরে জন্ম নিয়েছে। তাই জীবনের মত মরণের সঙ্গেও ওদের একটা সহজ আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভয় পায় না, যেমন সহজে কাঁদে তেমন সহজেই হাসে।

ওদের মধ্যেই এক জন বলে উঠল, "তা যা বলেছেন দাদা, এই দেখুন না, হল ট্রাম ধর্ম্মঘট, আমাদেরই প্রাণান্ত দুর্ভোগ, দেশ ভাগ হল, মরছি আমরা। যুদ্ধ হাঙ্গামা হুজ্জুৎ যাই হোক না কেন, প্রথম ধাক্কা ঘাড়ে নেবার জন্য আছি আমরা।"

মাথা নেড়ে সায় দিলে দুর্গাপদ, "ঠিক বলেছেন। শীত না

পড়লে মারীতে উৎসন্ন যাবো আমরা, কারণ ওষুধ-পথ্য জুটবে না। আর শীত পড়লে নিমুনিয়া, কারণ শীত নিবারণের মত খাদ্য বস্ত্র কিছুই নেই আমাদের।"

আবার হাসি। সমস্ত দুঃখ কষ্ট যেন এদের কাছে সমুদ্রের একটি কলোচ্ছাস—ঢেউ আসে, তীর ডোবে, আবার সরে যায় জলরাশি। বেলাভূমিতে পড়ে সূর্য্যকিরণ। নতুন ঘর ওঠে—প্রতারিত মুহূর্ত্তের কথা মনে থাকে না, মায়ামুগ্ধ মানুষের কথায় কথায় কখন ট্রেণ এসে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেছে। গাঁয়ের যাত্রীরা নামল।

ষ্টেশনে মিট-মিট করছে একটা লাইটপোষ্ট। দূরে শীতাচ্ছন্ন গ্রামখানির অস্পষ্ট ছায়া।

সেই দিকে তাকিয়ে আগামী দিনের জন্য বুক ভরে নিশ্বাস নিল মানুষগুলি। আর একদিনের সংগ্রামের জন্য শক্তি সঞ্চয়। অভী ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়েছে।

সবল দেহ, তরুণ যুবক। পায়ে তার এখনো অনেক জোর। তবু সে ধীরে ধীরে হাঁটছে। অগ্রবর্ত্তীরা ক্রমশঃ যে যার বাড়ীর পথে অদৃশ্য হল। অভী এসে একটা বাড়ীর রান্নাঘরের জানালার কাছে দাঁড়াল।—একটু আওয়াজ হল, অস্পষ্ট। টুক করে একখানি মুখ ভেসে উঠল জানালায়—সপ্তদশী। উৎকণ্ঠিত সুর, "এত দেরী যে!"

—"যা বৃষ্টি হল শহরে।"

—"বৃষ্টি? কই এখানে ত' হয় নি!"

—"শহরে হয়েছে।"

—"খুব বুঝি ভিজেছ?"

—"না, তেমন আর কি। তোমার দাদার খবর কি?"

—"কিছু না। ও চাকরী হবে না।"

—"বলছি ওকে, আমার মত ব্যবসা কর"—

—"তুমি ত ছোটলোক, ও যে ভদ্দোর লোক।"

অভী হাসে। অনেকক্ষণ পরে মেঘের ফাঁক দিয়ে তৃতীয়ার চাঁদ ডাক দিয়েছে, আলো এসে পড়েছে ওর মুখে। জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে এসে পড়েছে একখানি সুকুমার হাত, সেই হাতখানি মালার মত জড়িয়ে গেছে ওর হাতে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি কেটে গেছে প্রিয়জন স্পর্শে। গলার স্বরে উপচে পড়ল তরল পরিহাস—"ছোটলোক? আমি?"

—"নয় কেন? আই-এ পাশ করেও তুমি তরকারীর ঝুড়ি মাথায় বয়ে হাটে যাও, তোমার কি মান-সম্মান বোধ আছে? আর আমার দাদা ম্যাট্রিক পাশ হলেও ভদ্রলোক"—

—"আর তুমি কঙ্কাবতী!" (মেয়েটির নাম বুঝি?)

—"রাজরাজেশ্বরী।"

—"কোন্ রাজ্যের?"

—"বলবো কেন"—

—"বলবে না?"—নরম হাতখানায় চাপ পড়ে আস্তে আস্তে।

—"উঃ, হাতখানা গুঁড়িয়ে দেবে নাকি"—

—"না, গুঁড়িয়ে নয়, মিলিয়ে দিতে মিশিয়ে দিতে ইচ্ছা করে নিজের মধ্যে।—সারাদিন কত দূরে থাকি!"

—"শুধু মুখের কথা",—ছলোছলো চোখে মাথা নীচু করে কঙ্কা, থরোথরো দুটি ঠোঁটে উপচে পড়ে অভিমান।

আস্তে একখানি হাত উঁচু করল অভী, দু'টি ঠাণ্ডা হিমে-জমা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল কঙ্কাবতীর একটি কপোল, মৃদুস্বরে বললে, "না, মিছে কথা যে নয়, তা তুমিও জানো।" আবার একটু থেমে, "অপেক্ষা করো, আর একটি বছর পিউ পিয়া রাণী আমার!"

কোমল করপল্লবখানির উপরে একটি উষ্ণ চুম্বন এঁকে দিয়ে অভী পিছন ফিরলো।

আঁকা-বাঁকা উঁচু-নীচু পথ। পিছনের দু'টি জলভরা আঁখির জ্যোতিতে আলোকিত আনন্দিত দিশা—

চলতে চলতে ধীরে ধীরে একটি নিশ্বাস ফেলল অভী। দুঃখে নয়, প্রত্যাশার গভীরতায়।—চারপাশের বাড়ীগুলিতে আলো জ্বলছে,—শিশুকণ্ঠের কলরব, কিশোর-কিশোরীর পড়ার স্বর কানে আসছে, রান্নার সুগন্ধও ভেসে আসছে কোন কোন বাড়ীর হাওয়া থেকে।—একটু থেমে একবার চতুর্দ্দিকে তাকায় অভী, মনে হয়, এই ত সব কেমন জীবন্ত! কত ঝড়—কত দুর্দ্দৈব গেল এই দেশের উপর দিয়ে, কত লোকের ভিটে-মাটি গেল তার মত।···এক এক করে বাংলার প্রিয় নেতারা সব চলে গেলেন··ছোট পশ্চিম বাংলা আপনার চাপে আপনি রুদ্ধশ্বাস—বিবর্ণ। এর মধ্যে আছে দলাদলি, জনতার স্বার্থ নিয়ে দাবার চাল। আছে রিফিউজীদের প্রতি স্থানীয় লোকদের আক্রোশ—বিতৃষ্ণা।—আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সহযোগিতার ভাবও দেখা যায়।

সব কিছু মিলিয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়, "আমরা এখনো মরিনি" এই মুমূর্ষু মাটির বুকে, জীর্ণ গৃহকোটরের ফাঁকে ফাঁকে ভালোয় মন্দয়, আনন্দে বেদনায় পুনরায় সঞ্জীবিত হচ্ছে জীবন। যে জীবন ঘা খায় কিন্তু কখনো মরে না। পৃথিবীর প্রথম আদি থেকে অন্তকাল অবধি বেঁচে থাকে প্রতিটি প্রভাতকে আরতি করার জন্য।

দূর থেকে ওকে দেখতে পেয়েছে ছোট বোন অপু। দৌড়ে এসে হাত ধরল, "এত দেরী কেন দাদা?"

চকিতে অভীর মনে পড়ল, পথে আর একজন এই দেরীর কথা জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু চুপি চুপি। আজো তার এমন জোরে জিজ্ঞাসা করার অধিকার জন্মায় নি। কিন্তু সেই অধিকার পাবার জন্য কঙ্কা অধীর হয়ে আছে। কঙ্কা—তার আদরের কঙ্কাবতী, এ নাম ওর নয়, অভীই দিয়েছে। কানে কানে ডাকার এ নাম।

অবুঝ, প্রেমে অধীর! কিন্তু আর একটু অবস্থা ভালো না হলে ত তাকে অভী ঘরে আনতে পারে না! এই দৈন্যের সংসারে কোথায় বসাবে তার রমা রমণীয়াকে?

—সবুর, কঙ্কা সবুর কর, বুকের উত্তপ্ত রক্তে অসীম ধৈর্য্য সান্ত্বনার কথা কয়।

মা এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে, "ইস্, বড্ড দেরী করলি আজ, খিদেয় নিশ্চয় তোর পেটের নাড়ী হজম হয়ে গেছে। নে, এখন তাড়াতাড়ি কাপড়-জামা ছাড়"—

—"রান্না হয়ে গেছে তোমার?"

—"কখন হ'য়ে গেছে।"

—"বাবার খাওয়া হয়েছে?"

—"না, তোর জন্য বসে আছেন।"

—"তবে এক কাজ কর মা, ঝুড়িতে চিংড়ী মাছ আছে, চট্ করে একটু বাটি-চচ্চড়ি"—

ছেলের বিনয়নম্র মুখভঙ্গী দেখে মা হেসে মাছ নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

পকেট থেকে রিবণ দু'টি বের করে অভী বোনের হাতে দিল।

অপুর আহ্লাদ আর ধরে না, দৌড়ে চলে গেল মাকে দেখাতে। কিছুক্ষণ সেই দিকে চেয়ে রইল অভী। আট বছরের ছোট বোনটি, হাসি-খুশী সুন্দর! কত অল্পেতে তুষ্ট! এই শীতে একটি হাতকাটা ছেঁড়া ফ্রক পরে আছে। দুটিই মোটে ফ্রক ওর। একটি ছেঁড়া একটি আস্ত। আস্তটি স্কুলের জন্য, ছেঁড়াটি বাড়ীর জন্য। এ বাড়ীতে কারোই দু'টির বেশী কাপড় নেই। অদ্ভুত দৈন্য।

অভী নিজেই বিস্মিত হয়, এত দৈন্য তবু কেমন অনায়াসে বেঁচে আছে তারা। বেঁচে থাকে আর ভালোবাসে। এই সংসার, এই পৃথিবী, আর এই জীবন, তবু এত প্রিয়—এত মনোরম! কেন? কষ্ট আছে তাই?

কাপড়-জামা বদলে রান্নাঘরে মার কাছে গিয়ে বসল অভী। বললে,—"মা গো, কি সুখে বেঁচে আছ, এত কষ্ট—"

মা চমকে মুখ ফেরালেন। ছেলের মুখে কী দেখলো কে জানে, হেসে ফেললো। শান্ত সুন্দর মমতা স্নিগ্ধ হাসিমাখা মুখখানি আগুনের আভায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। বললেন, "কী সুখে বেঁচে আছি? তোরা বড় হবি, তাই দেখব, সেই আশায়ই ত বেঁচে আছি। আমরা যা পারিনি তোরা তাই করবি।"

* * *

অভীর শোবার কুঠুরীটি তার বাগানের গায়ে। সবজীর বাগান। —রাত্রে শুয়ে শুয়ে নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থাকে বাগানের দিকে। হাওয়ায় গাছগুলি দুলছে অনাগত দিনের আশায়, সবুজ প্রাণবন্ত। এরা অভীর জীবনের শুধু অবলম্বন নয়, তার আশা আনন্দ ভালোবাসা।

পথে পথে নিঃসম্বল যখন ঘুরছিল, সেই দিনগুলির স্মৃতি কী কষ্টকর! কত কষ্টে তারপরে এই জমিটুকু সংগ্রহ করেছে। আজ এই বাগান তাদের আহার জোগায়, বৃদ্ধ বাপকে জোগায় কর্মের প্রেরণা। তাঁর স্থবির জীবন হয়ে উঠেছে অর্থপূর্ণ। আর মা? মা যেন ধরিত্রীর মত, সব ভার বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, সহিষ্ণু অপার স্নেহময়ী। জন্ম হতে জন্মান্তরের খেয়া পারাপারের কাণ্ডারী।

সবার শেষে অন্তর নিভৃতে আছে একটি উজ্জ্বল ধ্রুবতারা, কঙ্কার প্রেম। পথ দেখাচ্ছে, আলো দিচ্ছে, যৌবনোদ্বেলিত বুকে জোয়ার আসছে, শক্তির উদ্বোধন করছে প্রাণকেন্দ্রে।

চারি দিকে অনেক ভাঙচুর হয়েছে, এখনো হচ্ছে, ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে কত ভগ্নস্তূপ। তবু তা কখনো মানুষকে একেবারে ফুরিয়ে যাবার ইসারা জানায় না। বরং সেখান থেকে অনবরত জাগ' ... ...

প্রতিজ্ঞা কর আর জয় কর।" অন্তর্বর্ষণ বাতাসে কেমন যেন একটা মধুর আমেজ।—অভীর ঘুম আসছে।—ঘরখানা যেন সেই ছোটবেলার দোলনা,—আশায় নিরাশায় দোলা দিচ্ছে তাকে—অসীম ধৈর্য্য অপার সান্ত্বনা বুকে নিয়ে মাটি হয়েছে মায়ের মত,—হাওয়ায় তার স্নেহস্পর্শ লাগছে গায়ে।—গাছের পাতায় পাতায় শনশন আওয়াজ তুলে যেন গাইছে ঘুম পাড়ানী গান—ঘুমাও বাছা, ঘুমাও!

চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী-সাহিত্য

প্রভা দাস

বাংলার কাব্যকুঞ্জ অগণিত বৈষ্ণব মহাজনগণের কলগুঞ্জনে মুখরিত। প্রাক্-চৈতন্যযুগে পদাবলী-সাহিত্য জন্মলাভ করিলেও চৈতন্যোত্তর যুগেই ইহার সমধিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদকে প্রত্যক্ষ করিয়া বাঙ্গালী এমনই মুগ্ধ ও ভাববিহ্বল হইয়াছিল যে, রাধাকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্য তাঁহাদের কাছে এক নূতন তাৎপর্য্য লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যোত্তর যুগের মহাজনগণ রাধাকৃষ্ণের লীলারসে নিমগ্ন হইয়া পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মিলন প্রভৃতি যে রসপর্য্যায়েরই পদাবলী রচনা করিয়া থাকুন না কেন, তাঁহারা যেন শ্রীমতী রাধিকার মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গেরই সাত্ত্বিক ভাবসমূহ মানসচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

চৈতন্যোত্তর যুগের জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনগণ নানা রসপর্য্যায়ের পদাবলী রচনা করিয়া পদাবলী-সাহিত্যকে বিশেষ ভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু সকল পদকর্ত্তাই বিভিন্ন রসপর্য্যায়ের পদ রচনায় সমান উৎকর্ষ লাভ করেন নাই। আমরা বৈষ্ণব-গীতি কবিতাকে শুধু কাব্য হিসাবে বিচার করি না, প্রত্যেক মহাজন যে সমস্ত ভাবরসের পদ রচনা করিয়াছেন, সেগুলি তাঁহাদের সাধনার মধ্যে জীবন্ত হইয়া

উঠিয়াছে। তথাপি একথা সত্য যে, এই মহাজনগণের মধ্যে যেমন রুচিগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল, তেমনই প্রতিভার তারতম্যও ছিল। এইজন্যই এক-জন পদকর্তা এক একটি বিশেষ রসপর্য্যায়ের পদাবলী রচনায় কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও রায়শেখরের পদাবলীর তুলনা করিয়া আমরা বলিতে পারি, জ্ঞানদাস পূর্ব্বরাগ ও রূপানুরাগ, রসোদ্গার ও মাথুর বিষয়ক পদে, গোবিন্দদাস—অভিসারোৎকণ্ঠার পদে এবং রায়শেখর অভিসারোৎকণ্ঠা ও মাথুরের পদে উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের একটি রূপানুরাগের পদে শ্রীমতী রাধিকার ব্যাকুলতা চমৎকার ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে।"

জ্ঞানদাসের একটি পূর্ব্বরাগের পদও ভাবের গভীরতায় ও প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতায় অতুলনীয়।

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ"।

চৈতন্যোত্তর যুগের মহাজনগণের মধ্যে গোবিন্দদাসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি প্রধানতঃ বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেও অনেক বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়াছেন। শব্দচয়ন নৈপুণ্যে, নানাবিধ অলঙ্কারের প্রয়োগে শব্দচিত্র অঙ্কনে ও শব্দসঙ্গীতের সৃষ্টিতে গোবিন্দদাসের সমকক্ষ কবি সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে আর আছে কি না সন্দেহ! তিনি অভিসারের নানারূপ বৈচিত্র্যের বর্ণনা করিয়াছেন যথা—বর্ষাভিসার, দিবাভিসার, হিমাভিসার ইত্যাদি। অভিসারের পটভূমিকায় তিনি ঋতু-বৈচিত্র্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন, উহার মধ্যেও তাঁহার কবিত্ব শক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। গোবিন্দদাসের কয়েকটি অভিসারের পদ উদ্ধৃত হইতেছে যথা—

"মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।
তঁহি অতি দুরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার"।

অথবা— "অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।
কত শত কোটি শবদে জীউ কাঁপ।
তঁহি দিঠি জারত বিজুরিক জ্বালা।
ইথে জনি ছোড়বি মন্দির বালা"।

অথবা—

"মাথহি তপন তপত পথ বালুক
আতপ দহন বিথার
ননিক পুতলি তনু চরণ কমল জনু
দিন হি করল অভিসার"।

গোবিন্দদাসের আর একটি অভিসারের পদ বিশেষ প্রসিদ্ধ—

"কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি
গাগরী বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি
দূরতর পন্থ গমনধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি।"

কবিশেখর ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। গোবিন্দদাসের ন্যায় তিনিও উৎকৃষ্ট অভিসারের পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি অভিসারের পদে বর্ষার চিত্র স্বল্প পরিসরে চমৎকার ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

"গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই।"

রায়শেখরের আর একটি অভিসারোৎকণ্ঠার পদও চমৎকার।

"ঝর ঝর বরিখে সঘনে জলধারা।
দশদিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ারা।
এ সখি কিয়ে করব পরকার।
অবজনি বাধয়ে হরি অভিসার।"

রায়শেখর দুই একটি উৎকৃষ্ট মাথুরের পদও রচনা করিয়াছেন। যদিও কবিশেখরের পদাবলী সংখ্যায় অল্প, তথাপি তাহা কবিত্ব-সম্পদে ও ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ।

বুদ্ধধর্ম্মের অভিনবত্ব

[মজঃফরপুর মহিলা-সমিতিতে 'বুদ্ধ-জয়ন্তী' উৎসবে পঠিত]

উর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে যে মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিল, তিনি করুণায়, প্রেমে, জ্ঞানে ও তেজে যে কত মহান, কত বিরাট, সে পরিচয় দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, তাঁর জোড়া সমগ্র ইতিহাসে মেলে না এবং তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্মপথ একটি সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। সেটি অপূর্ব ও অভূতপূর্ব। বুদ্ধদেবের জীবনী এখানে আলোচনা করার কোনও প্রয়োজন নেই। আপনারা সকলেই মহারাজকুমার সিদ্ধার্থের বাল্যকাল থেকে বুদ্ধত্বলাভ পর্য্যন্ত ইতিহাস ভাল ভাবেই জানেন। তাঁর জীবনের অসংখ্য অলৌকিক ও চিত্তাকর্ষী ঘটনার গল্পও আপনারা শুনেছেন। সেগুলি যেমন বিস্ময়কর ও মনোহর, তেমনি মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক।

ধর্মালোচনার কথা শুনতেই হয়তো অনেকে অস্বস্তিবোধ করছেন। ভাবছেন, এই যে এবার সুরু হলো কচকচি—যত নীরস লম্বা লম্বা কথার বক্তৃতা। আমাদের আলোচনা কিন্তু সেদিকে নয়। বৌদ্ধধর্মের সাধারণ কথাটা আপনাদের শুনিয়ে দিচ্ছি—এতে কোন কচকচি নেই। এইটে শোনবার পর আপনারা নিজেরাই বিচার করবেন যে, বৌদ্ধধর্ম কতখানি নূতন জিনিষ। আমাদের সকলের জীবনে প্রত্যহের প্রতি

কার্যে ঐ ধর্ম নির্দেশ মেনে চলা একান্ত দরকার এবং আমরা না জেনেই তার নির্দেশ কতক কতক মেনে চলেছি। এর জন্য কোন ঘটপূজো বা মন্ত্রতন্ত্রের দরকার নেই।

বৌদ্ধধর্ম বিরাট—তার নানা দিক্ ও নানান ব্যাখ্যা। সে-সব বলার সময়ও নেই আর সাধ্যও নেই।

জগতের অপরিসীম দুঃখ-বেদনাই সিদ্ধার্থকে বিচলিত করে। এই দুঃখ দূর করার জন্যই তিনি সংসার ত্যাগ করে নানা সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করেন, নানান ধর্মমত অধ্যয়ন করেন কিন্তু তিনি যা চাইছিলেন, তার সন্ধান সেখানে পান নি। অবশেষে তিনি 'বোধিবৃক্ষে'র নিচে কঠোর তপস্যায় বসলেন—সেইখানে তিনি চারটি সত্যের সন্ধান পেলেন।

প্রথম সত্য—জগৎ বেদনাময়; জন্মগ্রহণে দুঃখ, রোগের দুঃখ, জরার দুঃখ, মৃত্যুর দুঃখ। আবার কোন জিনিস চেয়ে বা আকাঙ্খা করে না-পাওয়ার দুঃখ, প্রিয়-বিচ্ছেদের অসহনীয় দুঃখ ইত্যাদি। দ্বিতীয় সত্য—এই দুঃখের কারণ তৃষ্ণা। নিজ স্বার্থ ভোগ করার যে তীব্র আকাঙ্খা তাই তৃষ্ণা। ভোগ-বিলাসের আকাঙ্খা মানুষের জীবনে বেদনা আনে।

তৃতীয় সত্য:—দুঃখ যখন আছে এবং তার কারণও যখন পাওয়া গেছে, তখন সেই দুঃখ নিরোধের উপায়ও নিশ্চয় আছে। দুঃখ দূর করার উপায় বিগততৃষ্ণ হওয়া, স্বার্থ ত্যাগ করা। তৃষ্ণা বা আকাঙ্খা থাকলেই অভাববোধ। অভাব ক্রমশঃই বেড়ে যাবে—সব অভাব পূর্ণ হবে না এবং পূর্ণ না হলেই দুঃখ। মানুষের নিত্য নূতন আকাঙ্খা তাই নিত্য নূতন দুঃখ। মানুষের সমগ্র সত্তাই যেন সহস্র অভাবের তাড়নায় একটি অচরিতার্থ পিপাসার মতো।

চতুর্থ সত্য—এই বিগততৃষ্ণ হবার বা আকাঙ্ক্ষা দূর করার উপায় বৌদ্ধমতের অষ্টম মার্গ।

মানুষ নিজেই পারে নিজের দুঃখ দূর করতে। কোনও অলৌকিক শক্তি বা তন্ত্রক্রিয়ার দরকার হয় না। বুদ্ধদেবের মতে দুঃখ দমনের পথ কৃচ্ছ্রসাধনের কঠিন পথ নয়, আবার কামবিলাস সুখের পথও নয়। এ দুই-এর মাঝামাঝি পন্থাই হলো সাধনপথ। কি রকম যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা! কোন বাড়াবাড়ি নেই—সব সময় কঠোরতায় ফল হয় না আর উচ্ছৃঙ্খলতায় তো হয়ই না, তাই ভগবান বুদ্ধ 'মধ্যমপথ' কেই সাধনমার্গ ঠিক্ করে নিলেন। এই সাধনপথে ৮টি নিয়ম মেনে চলতে হয়, তাই হলো অষ্টমমার্গ। এই প্রত্যেকটি 'মার্গ'র সঙ্গে 'সম্যক্' কথাটি বিশেষণের মতো লাগানো আছে। সম্যক মানে অল্প কথায় বলতে গেলে ঠিক—যথার্থ, ন্যায়সঙ্গত ইংরাজীতে Right এখন ৮টি নিয়ম কি তা শুনুন (১) সম্যক দৃষ্টি (২) সম্যক সঙ্কল্প (৩) সম্যক বাক্ (৪) সম্যক কায-কর্ম (৫) সম্যক জীবিকা (৬) সম্যক উদ্যম (৭) সম্যক স্মৃতি (৮) সম্যক সমাধি, মানবের জীবনে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাস থাকা দরকার, অস্থির মন ও অস্বচ্ছ বিবেচনা নিয়ে জীবন চলে না। তার সঙ্কল্প ও লক্ষ্য হবে স্থির এবং সেই যথার্থ সঙ্কল্প তাকে
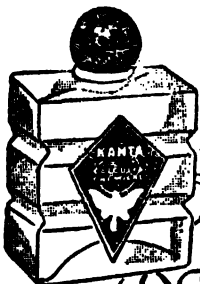
পথ দেখাবে। তার বাক্য হবে মধুর, পরোপকারী কিন্তু অসত্য নয়। তার কর্ম হবে পরার্থে—নিজের স্বার্থের জন্য নয়, কর্ম হবে মহান ও কল্যাণময়। অসৎ উপায়ে সে জীবিকা অর্জন করবে না—ঠগ, জুয়াচুরী, চুরি, মদ মেয়েমানুষ ইত্যাদি কোন অন্যায় ব্যবসা সে অবলম্বন করে জীবিকার্জন করবে না। সম্যক উদ্যম মনকে এই সব অনুশীলনের জন্য প্রস্তুত করে। মনের উৎকর্ষ সাধন হয় ও মনকে শাসিত করা যায়। সম্যক ব্যায়ামের সঙ্গে সম্যক দৃষ্টির সহায়তা প্রয়োজন। চিন্তাশক্তি সাবলীল না হলে ঠিক্ পথে চালিত না হলে সম্যক ব্যায়াম বা উদ্যম অসম্ভব।

এই ভাবে সাধনা করলে মানব দুঃখমুক্ত হতে পারবে, তবেই তার নির্বাণ, সেই হলো সম্যক সমাধি।

প্রত্যেক মার্গটিই বুদ্ধদেব নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে গেছেন। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে সব প্রচলিত নীতি কথা আছে, তা সবই ঐ অষ্টম মার্গের অন্তর্গত। এই অষ্টম মার্গের উপরই বুদ্ধদেব সব আস্থা স্থাপন করেন। এই যে দুঃখ দূরীকরণের উপায় বলা হয়েছে, এর অনুশীলন করতে হয় মানবকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে। তার পর তার আর পার্থিব বেদনার মধ্যে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। সেই মহানির্বাণ বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য। বৌদ্ধধর্মে জন্মান্তরবাদ আছে কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম নির্বাক্। বৌদ্ধধর্মের নির্দেশ মেনে চললে আদর্শ চরিত্র গঠন হবে এবং সে আদর্শ মানলে দুঃখ পাবে না এবং তাঁর কার্য দ্বারা জগতের কল্যাণ হবে। আপনারা এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, পৃথিবীর সমাজে যতগুলি ধর্মমত আছে তাদের পথের থেকে বৌদ্ধধর্মপথের কত তফাৎ।

বৌদ্ধধর্ম এমন একটি ধর্মমত যেখানে ধর্মের কোনও গোঁড়ামি নেই, জাতিভেদ নেই, নেই কোনও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন। এই ধর্মকে এইটি খুব উন্নত রকমের সংস্কৃতি বা culture ও বলা চলে। ভেবে দেখুন, প্রকৃতি সংস্কৃতিবলে বা cultured মানুষের যে সব গুণ থাকা দরকার তা সবই ঐ আটটি পন্থার অনুশীলন দ্বারা অর্জন করা যেতে পারে। ঐ গুলিই সংস্কৃতি বা cultureএর মূল কথা। এই দিক থেকে বৌদ্ধধর্মের অভিনবত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

আজ-কাল বেশীর ভাগ দেশেই রাজশক্তির সঙ্গে ধর্মের কোন সংস্রব নেই। রাজনীতিতে তো নেই-ই। আধুনিক সমাজ ধর্মের নামে নাক সিটকায়। একদল ধর্মের কথা শুনলেই আতঙ্কিত হয় অথবা ধর্মকে এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু Culture বা সংস্কৃতিকে কেউ বাদ দেয় না। সকলেই যে যার দেশের Cultureএর উন্নতি করতে ব্যস্ত। ধর্মকে বাদ দিয়েছে বটে কিন্তু ধর্মবুদ্ধিকে বাদ দিয়ে কোন জাতি গড়ে উঠতে পারে না বা বড় হতে পারে না। কাযেই আজকালকার দিনে বৌদ্ধধর্মই একমাত্র উপযুক্ত ধর্ম। যে ধর্ম মানুষের সু-মনোবৃত্তির অনুশীলন করিয়ে আদর্শ মানুষ গঠন করবে, যার ফলে জাতি ও দেশ হবে আদর্শ। ধর্মের কথা আজকালকার মানুষ হয়তো শুনবে না কিন্তু Cultureএর কথা ঠিক্ শুনবে।

মেয়েদের পক্ষে বিশেষতঃ আধুনিকা শিক্ষিতাদের পক্ষে বৌদ্ধধর্ম উপযুক্ত। আধুনিক শিক্ষিত সমাজেও ধর্মভীতি ও ধর্ম-বিরাগ যথেষ্ট। তার জন্য প্রবীণাদের কাছে নবীনারা মুখনাড়া খান। আর নবীনারা ঘৃণা করেন প্রবীণাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম-আচরণের। কিন্তু নবীনারা প্রবীণাদের নিষ্ঠাটুকু অর্জন করতে পারেন নি, যে নিষ্ঠার বলে সমস্ত দুরূহ কার্য্যই সমাধান হতে পারে, মনেও কোন বিক্ষোভ জাগে না। প্রবীণারাও আশা করতে পারেন না যে, শিক্ষিতা মেয়েরা কতকগুলি অর্থহীন আচার বিনা প্রতিবাদে পালন করবে, অথবা ছোট ছোট অবোধ বালিকার করণীয় প্রচলিত ব্রতগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে আচরণ করবে। এ সব আচার ও ব্রত পার্বণে শিক্ষিত মনের ভক্তি আনা একটু কষ্টকর। আপনাদের কাছে মাপ চেয়ে এ কথাটি বলতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ শিক্ষিত মনে ভক্তির উদ্রেক্ করতে হলে আরও উন্নততর অর্চনা বিধির প্রয়োজন। সেইজন্য দেখবেন নবীনাদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজারিণীই বেশী। হিন্দু পূজা-অর্চনা বিধি বিশেষ উন্নত ও অতি চমৎকার। কিন্তু ওই প্রথমে যে কথা বলেছি ধর্ম বিষয়ে ভীতি থাকার দরুণ আজকালকার একদল লোক ও মেয়ে ও সব এড়িয়ে যেতে চায়। মেয়েদের আজকাল ঘরে-বাইরে কাযে নামতে হচ্ছে। আধুনিক যুগে পুরুষের চেয়ে মেয়ের দায়িত্ব বেশী। তাই তাদের চরিত্র দৃঢ়তর হওয়া দরকার এবং সেইজন্য ঐ অষ্টমমার্গের অনুশীলনই যোগ্য।

তথাগতের অপূর্ব ধর্মের খানিকটা আভাস মাত্র আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত করা গেল। এর পর যদি আপনারা কৌতূহলী হয়ে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করেন, ও তার চর্চা রাখেন তবেই 'বুদ্ধজয়ন্তী' উৎসব সার্থক হয়। তা না করে বছরে একদিন ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করলাম, তার পর সারা বছর তাঁর নামও নিলাম না—তাতে কি লাভ? আগামী সপ্তাহ 'বুদ্ধজয়ন্তী' সপ্তাহরূপে সারা ভারতে পালন করা হবে। এই উপলক্ষে বহু রচনা ও বই প্রকাশিত হবে। আপনারা যাঁরা এ বিষয়ে জানতে চান তাঁরা অনায়াসেই জানতে পারবেন ও এ বিষয়ে চর্চা রাখতে পারবেন। এই ভাবে ধর্মচর্চায় দীক্ষা নিতে হবে না, জাত যাবার ভয় নেই, ব্যক্তিগত ধর্মমত থেকে ভ্রষ্ট হবার ভয় থাকবে না। এই ধর্ম আলোচনা শুধু নিজের মনের সুবৃত্তিগুলিকে উন্নতির পথে চালনা করা ও অপরকে সেই বিষয়ে সাহায্য করা। ভগবান বুদ্ধের সাধনা ক্ষেত্র—প্রচার ক্ষেত্র—এই রাজ্য যার জন্য—এর নামই হলো বিহার (বৌদ্ধ বিহারের অনুসরণে) সেই তথাগতের চরণস্পর্শে ধন্য পুণ্যভূমি বিহারে বসে আজকে এই ধর্ম-চর্চার সঙ্কল্পটি গ্রহণ করলে মন্দ হয় না।

• • • এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি বালিকা-নর্তকীর আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। ছবিখানি শ্রীকুসুমকুমার বাগচী গৃহীত।

সেকাল ও একালের অলিম্পিক

যন্ত্রসভ্যতার করাল ছায়াপাত পড়েছে পৃথিবীর উপর। মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলি আস্তে আস্তে লোপ পেতে বসেছে। প্রকৃতির কোল থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সৃষ্টি হতে চলেছে কলের দানব ফ্রাঙ্কেষ্টাইন। এরই মাঝে শোনালেন আশার বাণী ফ্রান্সের ব্যারণ কুবার্টিন। প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিক খেলার প্রবর্তন করলেন। ভারতীয় সাধনার সেই চিরন্তন পথ ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ! আজ প্রতিটি মানুষের কামনা শান্তির পারাবত উড়ুক প্রতিটি রাষ্ট্রে, নামুক অভাবের উগ্র তাড়নায় নিগৃহীতের দুয়ারে দুয়ারে।

খৃষ্টের জন্ম হওয়ার ৭৭৬ বছর আগে গ্রীস দেশ যখন একাধিক জাতি ও দলে বিভক্ত হয়ে আভ্যন্তরীণ বিবাদে লিপ্ত তখন শান্তির অমৃত বাণী উচ্চারিত হয়েছিল 'ডেলফির' দেবায়তন থেকে। ইতিহাসের মসীলিপ্ত পাতায় আছে এর চেয়ে ঢের বছর আগে অলিম্পিকের সুরু।

কে যে প্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেছিলেন এক জন, কিম্বা দশ জন—কি তাদের নাম, তার কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে অনেক রকম মতামত প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন, দেবরাজ জিয়াস পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব পাবার জন্য ক্রোনাসকে অলিম্পিয়ার মাঠে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করেন, সেই থেকে অলিম্পিকের সুরু। আবার আর একদল বলেন, এ্যাপোলো ও এ্যারিসের মুষ্টিযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবার সংগেই এই খেলা আরম্ভ। অন্য আর একদল বলেন, হেরাক্লিস গ্রীসের যুদ্ধরত বিভিন্ন দল ও জাতিগুলির ভিতর শান্তি আনার জন্য এই খেলার প্রবর্তন করেন। এই শেষোক্ত মত সমর্থন করেন লাইসিয়াম ও পাউসেনিয়াম।

এ ছাড়া আরও একটি উপকথা আছে। পিণ্ডারের অভিমত, অলিম্পিয়ার শাসনকর্তা 'ওয়েনামাসের' অপূর্ব সুন্দরী কন্যা 'হিপোডামিয়ার' পাণিপ্রার্থী হন জাতীয় এক সর্দার 'পেলোপ'। কিন্তু ওয়েনামাসের এক অদ্ভুত পণ ছিল যে বীর তাঁকে রথের দৌড়ে পরাজিত করবেন তিনিই হবেন তাঁর কন্যার উপযুক্ত স্বামী। ১৩ জন রথযুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রাণ দিলো। কিন্তু পেলোপের বুদ্ধির কাছে ওয়েনামাস পরাজিত হলেন। ওয়েনামাসের রথের সারথি মিরটীলাসের সাহায্যে রথ অচল করে তাঁকে পরাজিত ও হত্যা করলেন। এই জয়লাভ স্মরণ করার জন্য পেলোপ 'এ্যালটিসে' এক স্তম্ভ নির্মাণ করেন।

অলিম্পিয়ার মাঠের উত্তর দিকে পাইন গাছে ঘেরা ত্রিকোণ পাহাড়টির নাম ছিল 'ক্রেনিয়ান'। পাহাড়ের তলায় ছিল অলিভ গাছের বাগান। এর নাম 'এ্যালটিস'। জিয়াসের পুত্র ওপিয়াসের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পিতার মৃত্যুর স্মরণার্থে—'এ্যালটিসে'র একটি জায়গায় ঘেরাও করে দৌড়, মল্লযুদ্ধ ও কুস্তির প্রতিযোগিতার পর পঞ্চম বার্ষিক ভোজের আয়োজন করেন। পেলোপের স্মৃতির স্তম্ভের সম্মুখে এই খেলা হয় প্রতি পাঁচ বছর অন্তর।

গ্রীক-জীবনে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান হওয়াই ছিল গ্রীকের পরম কামনা। পুরস্কারস্বরূপ মিলতো অলিভ পাতার মুকুট। অনুষ্ঠানের শেষে অভিনন্দনের মধ্য দিয়ে ফিরতো নিজের দেশে। প্রত্যেকটি সামাজিক অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মানিত অতিথি হিসাবে তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হোত। খৃঃপূঃ ৭৭৬ অব্দে এলিসের পাচক বৃত্তিধারী CORA EBUS সে বার দৌড়ে চ্যাম্পিয়ান হন।

অলিম্পিক এগিয়ে এলে দূত ছুটতো—'যুদ্ধ বন্ধ কর, অলিম্পিকের সময় এসেছে' এই বাণী নিয়ে। খেলোয়াড়রা মিছিল করে রওনা হোত অলিম্পিয়ার ক্রীড়াক্ষেত্রে। প্রথমত শপথ গ্রহণ ও খাঁটি গ্রীসের মানুষ হিসাবে পরিচয় দান সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে—যে তাঁরা খাঁটি গ্রীক রক্তের অধিকারী ও পূত চরিত্রের পুরুষ।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে ছিল সর্বপ্রথম রথ চালনা। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হত পেণ্টাথেলন বা পাঁচটি বিষয়ের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়ে। দৌড়, লংজাম্প, ডিসকাস থ্রো ও জ্যাভেলিন থ্রো এই চারিটি বিষয়ে যারা সব চেয়ে বেশী পয়েণ্ট সংগ্রহ করতো, তারা জিয়াসের বেদীর সামনে কুস্তি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতো। তৃতীয় দিন পূর্ণিমা। ধর্মানুষ্ঠান। বিকেলে ছোট ছেলেদের দৌড়, মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তি। চতুর্থ দিন দৌড়ের প্রতিযোগিতা সকালে। বিকেলে মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তি। শেষ দৌড় হোত বর্মাবৃত সশস্ত্র অবস্থায়। যুদ্ধ নিবৃত্তির শেষ দিন ঘোষণা হয়েছে তারই নিদর্শন-স্বরূপ। পঞ্চম বা শেষ দিন চলতো ভোজ। পরস্পর মেলামেশা। সন্ধ্যার সময় বসতো পুরস্কার বিতরণী সভা।

অলিম্পিকে নারীর প্রবেশাধিকার ছিল না। কেবলমাত্র ডিমিটারের নারী পুরোহিতের জন্য বিশেষ সম্মান ছিল। নারীদের জন্য পৃথক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল।

এর পর আধুনিক অলিম্পিক অর্থাৎ একালের অলিম্পিক। যার তথ্যপঞ্জী সমস্ত কিছুই আছে। ইতিহাসের মসীলিপ্ত পাতায় সম্মানের অধিকারীরা লুপ্ত হয়ে যাবে না। ফ্রান্সের ব্যারণ কুর্বাতিন এগিয়ে এলেন। সাহায্য করলেন গ্রীসের যুবরাজ কনষ্টাণ্টাইন। আলেকজাণ্ড্রিয়ার গ্রীক বণিক দিলেন ২০ লক্ষ ড্রাকমা। অতীত এথেন্সের ষ্টেডিয়ামের ধ্বংসাবশেষের উপর তৈরী হল নূতন ষ্টেডিয়াম। চতুর্থ বার্ষিক চক্র ঘুরে চলেছে বর্তমান যুগে।

আধুনিক অলিম্পিকে প্রবর্তন হোল ম্যারাথন রেস। পারসিক বাহিনী ম্যারাথনের যুদ্ধে পরাজিত হয়, এ সংবাদ পৌঁছে দেবার জন্য ২২ মাইল দৌড়ে আসেন Phidipides। খবর পৌঁছে দিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁরই পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে এ প্রতিযোগিতা।

অলিম্পিয়ার পুণ্য কুঞ্জ থেকে সূর্যালোকে গ্রীক নর্তকীরা মশাল জ্বালিয়ে দেয়। এথেন্সের যাজক সেই মশাল পৌঁছে দেন Propyloca থেকে পার্থেনন পর্য্যন্ত। যত দিন চলে এ অনুষ্ঠান তত দিন শিখা জ্বলতে থাকে অলিম্পিকের অমর আত্মার প্রতীক হিসাবে।

এথেন্স—১৮৯৬

এথেন্সের প্রথম অনুষ্ঠানে বারোটি দেশের খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেছিল। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল—এ্যাথলেটিকস্, সাইক্লিং, অসিচালনা, জিম্‌নাষ্টিকস্, টেনিস, গুলীচালনা, সাঁতার, ভারোত্তোলন ও কুস্তি। ম্যারাথন বিজয়ী গ্রীক মেষপালক Spiridon Loucs যখন ষ্টেডিয়ামে ঢোকেন, তখন দুই রাজকুমার চললেন তাঁর সংগে। ষাট হাজার দর্শকের আনন্দ-হিল্লোলে ফেটে যেতে চায় আকাশ। গ্রীক-জীবনের অবদান অলিম্পিকের প্রথম পুনঃ প্রবর্তনে গ্রীক-জীবনের ঐতিহ্যবাহী ম্যারাথনে জনৈক গ্রীকের জয়লাভ। জীবনে সম্মান, যশ, অর্থ সবই পেলেন Loucs। কিন্তু যথারীতি মেষপালনের কর্মে মন দিলেন, বার্লিন অলিম্পিকে এ্যাটলিস কুঞ্জ থেকে একটা অলিভ শাখা উপহার নিয়ে।

প্যারিস—১৯০০

আধুনিক অলিম্পিকের প্রতিষ্ঠাতা কুর্বার্তিনের দেশ। এবার প্রতিযোগিতার বিষয় অনেক বেশী। সীন নদী থেকে মাছ ধরা এবং বাউলস পর্য্যন্ত চলে। তেরটি দেশ এবার যোগদান করে। এই অলিম্পিকে মার্কিণ এ্যাথলীটদের প্রাধান্য ছিল প্রচুর। Kraenzlein জয়ী হন তিনটি বিষয়ে। একজন মার্কিণ এ্যাথলীট সর্বপ্রথম Cronching ষ্টার্ট (ষ্টার্ট নেওয়ার কৌশল) এবং হাই-জাম্পে Western রোলের কৌশল দেখান।

সেণ্ট লুই—১৯০৪

বিজয়-মুকুটের প্রাধান্যই অলিম্পিককে নিয়ে এল দেশে। বৃটেন এবং ফ্রান্স ব্যয়ভার বহন করতে রাজী নয়। রুশ ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ। তাই মাত্র আটটি দেশ যোগদান করেছিল। এই অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথম একজন নিগ্রো হার্ডলসে জয়ী হন। একজন মাত্র গ্রীক অধিবাসী ভারোত্তোলনে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন। এবারকার ম্যারাথনে যে সর্বপ্রথম পৌঁছলো, সে নিজে স্বীকার করে আধ পথ সে মোটরে চড়ে এসেছে। তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিউবার একজন ডাক-পিওন সাধারণ বুট-পায়ে দৌড়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ইতিপূর্বে ক্লাব, কলেজ থেকে প্রতিযোগী আসতো। এই সময় থেকে জাতীয় সংগঠনের প্রবর্তন হয়। ১৯০৬ সালে এথেন্সে'এক বে-সরকারী অলিম্পিক অনুষ্ঠান হয়।

লণ্ডন—১৯০৮

এ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল রোমে। ইতালি অক্ষমতা জানাল। ইংলণ্ড এগিয়ে এলো। এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্য্যন্ত অজস্র বিষয়ে প্রতিযোগিতা চলল। অনেক খেলাই ইংলণ্ডের দ্বারাই প্রচলিত। তাই বাইশটি দেশের প্রতিযোগী থাকা সত্ত্বেও জয়লাভ হল ইংলণ্ডের। এর পর থেকেই অলিম্পিক অনুষ্ঠানের কর্তৃত্ব আন্তর্জাতিক কমিটির হাতে চলে গেল। ইতালির ম্যারাথন বিজয়ী ডোরাণ্ডাকে বাতিল করা হল, কারণ শেষ মুহূর্তে তাঁকে ঠেলে সীমায় পৌঁছে দেওয়া হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার ১১ বছরের স্কুল-ছাত্র ১০.৮ সেঃ ১০০ মিটার জয়লাভ করে বিস্ময় সৃষ্টি করেন। মার্কিণ ইউরী এখানে তার দশম অলিম্পিক মেডেল লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্যানগান উপর্যুপরি তিন বার হ্যামার থো-তে বিজয়ী হন।

ষ্টকহল্‌ম—১৯১২

এই অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথম শিল্প প্রতিযোগিতা অলিম্পিকের অঙ্গীভূত হয়। ২৬টি দেশ যোগদান করে। দোতলা ষ্টেডিয়াম, ইলেকট্রিক টাইমিং এবং ফটো ফিনিসের প্রথম প্রবর্তন হয়। বৃটেন চরম ব্যর্থতা প্রদান করে। ফিনল্যাণ্ডের দীর্ঘ দৌড়ের শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর Kobhmainen এবার আত্মপ্রকাশ করেন। রেড ইণ্ডিয়ান জিম থর্প 'ডেকাথেলন' ও পেণ্টাথলন বিজয়ী হওয়ায় শ্বেতাঙ্গদের ঈর্ষার কারণ হন। পেশাদারীত্বের ষড়যন্ত্রে তাঁকে এ সম্মান থেকে বঞ্চিত করা হয়। ম্যারাথনে একজন প্রতিযোগীর মৃত্যু ঘটে। সাঁতারে মহিলারা যোগদান করেন এইবার। মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তি বাদ যায়। মর্ডান পেণ্টাথেলন ও ঘোড়সওয়ারী এখানেই প্রথম প্রবর্তন।

এ্যাণ্টুয়ার্প—১৯২০

প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য ১৯১৬ সালে এ অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নি। যুদ্ধবিধ্বস্ত বেলজিয়ামের এই অনুষ্ঠানে ২৬টি দেশ থেকে প্রতিযোগী আসে। জার্মাণী এবং অষ্ট্রিয়াকে বাদ দেওয়া হয়। প্যাভো নুর্মী ১০,০০০ মিঃ দৌড় ও ক্রসকাণ্ট্রি রেসে বিজয়ী হন। যুদ্ধের সময় বিষাক্ত গ্যাসে পীড়িত একজন ফরাসী যুবক ৫০০০ মিটার দৌড়ে জয়ী হয়ে সকলকে বিস্মিত করে। পড়ে গিয়ে আহত না হলে ১০,০০০ মিটারেও জেতা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। বৃষ্টির মধ্য দিয়ে Kobhmainen ম্যারাথনে জয়ী হন। ফিনল্যাণ্ডের জয়। ভারত সর্বপ্রথম এইবার যোগদান করে।

প্যারিস—১৯২৪

৪৫টি দেশের প্রতিনিধিদের এই প্রতিযোগিতায় পুরানো রেকর্ড সমস্ত ভেঙ্গে যায়। মার্কিণ দেশ বেশী পদক পেলেও জয়-জয়কার ফিনল্যাণ্ডের। মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে ১৫০০ মিঃ ও ৫০০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড করেন প্যাভো নুর্মী। ১০,০০০ মিটার ক্রস কাণ্ট্রি রেসে বিজয়ী হন। একজন ফিনিস কুস্তিগীর ম্যারাথন জয়লাভ করেন। সাঁতারে প্রধান বিজয়ী হয়েছিলেন জনি উইসমিলার (টারজান খ্যাত—ফিল্ম)। ফুটবলে জয়লাভ করে উরুগুয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ভারতের বিগ্রেডিয়ার দিলীপ সিং লংজাম্পে সপ্তম স্থান অধিকার করেন।

আমষ্টার্ডাম—১৯২৮

৪৩টি দেশের চার হাজার প্রতিযোগী। ভিড়ের জন্য ফিনিসের প্রতিযোগীরা প্রাচীর টপকে প্রবেশ করেন। মহিলারা সর্বপ্রথম এ্যাথলীট ও দৌড়ে অংশ গ্রহণ করেন। ফিনল্যাণ্ড এবারও প্রাধান্য বজায় রাখে। ম্যারাথন জয়ী হন একজন ফরাসী মোটর মেকানিক। জাপানের ওডা হপ-ষ্টেপ-জাম্পে বিজয়ী হয়ে প্রাচ্য দেশে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সাঁতারে একটি মেডেল পায় জাপান। হকিতে ভারত তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

লস এঞ্জেলস—১৯৩২

এত দূর দেশ। আমেরিকায়। মাত্র ৩৭টি দেশের ১৭০০

তরুণ জাবালা ম্যারাথনে জয়ী হন। মাত্র কয়েকজন প্রতিযোগী পাঠিয়ে আয়ার ৪০০ মিঃ ও হামার থোতে জয়ী হয়। মহিলাদের অসি চালনায় অষ্ট্রিয়া জয়ী হয়। নিগ্রো এ্যাথলেটদের জয়-জয়কার এবার প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের হকিমুকুট অবিচলিত থাকে।

বার্লিন—১৯৩৬

বার্লিনের অনুষ্ঠান সর্ব-বিষয়ে অতীতকে পিছনে ফেলে আসে। ৪২টি দেশের ১০০ জন এ্যাথলীট ১৭টি নতুন রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা করে। সর্বসমেত ৪৮টি নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫০০ মিটার দৌড়ে পাঁচ বার নতুন রেকর্ড হয়। ম্যারাথনে নতুন রেকর্ড করেন জাপানের কিটি সন। জেসি ওয়েন্স রীলে রেস ছাড়াও ব্যক্তিগত তিনটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। আর্যাস্বদম্ভী নাৎসীরা যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো এ্যাথলীটদের আমেরিকার 'কেলে ভাড়াটের' দল বলে অবজ্ঞা করে। হিটলার জেসি ওয়েন্সকে প্রাপ্য মর্য্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। ৫১টি দেশের ৪০৬৯ জন প্রতিযোগী যোগদান করেছিল। এবারেও ভারত হকিতে তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখে।

লণ্ডন—১৯৪৮

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অলিম্পিক অনুষ্ঠান বন্ধ থাকে।

যুদ্ধোত্তর নতুন যুগ। অশ্বেতকায় ও মহিলা এ্যাথলীটদের জয়-জয়কার। সংগঠনের ত্রুটি বার্লিন অপেক্ষা বেশী। তাই চোখে পড়ে। স্বাধীন ভারত এইবার সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা বহন করে যাবার অধিকার পায়। মার্চ পাষ্টের সময় রাজার সামনে ভারতীয় পতাকা অবনমিত না করায় কিছু তিক্ততার সৃষ্টি হয়। জার্মানী ও জাপানকে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেওয়া হয় না। নিগ্রো এ্যাথলীটদের জয় জয়কার। ম্যারাথন জয়ী হয় আর্জেন্টিনার ইঞ্জিন-চালক কার্বেরা। কিন্তু সব কিছুর উপর বড় হয়ে দেখা দেয় দুই সন্তানের জননী ত্রিশ বছরের ডাচ মহিলা ফানি ব্লাঙ্কার্স কোয়েনের কৃতিত্ব। রীলে সমেত চারখানি স্বর্ণপদক লাভ করেন। ভারতের হাতে হকি ফাইনালে ৪—০ গোলে পরাজিত হয় বৃটেন। বৃটেন একটি স্বর্ণপদকও লাভ করতে পারেন নি। ফুটবলে ফ্রান্সের কাছে ভারত ২—১ গোলে পরাজিত হয়।

হেলসিঙ্কি—১৯৫২

নিশীথ সূর্য্যের দেশ। ৭১টি দেশের প্রায় ছ হাজার প্রতিযোগী যোগদান করেছিল। দীর্ঘদিন ব্যবধানের পর রাশিয়া অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করে ২২টি স্বর্ণপদক, ৩০টি রৌপ্যপদক ও ১৭টি ব্রোঞ্জপদক লাভ করে। সর্বাপেক্ষা বেশী পদক পায় যুক্তরাষ্ট্র। সর্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শন চেকোশ্লোভাকিয়ার দৌড়বীর এমিল জেটোপেক। পাঁচ হাজার, দশ হাজার, ও ম্যারাথন দৌড়ে বিজয়ী হয়ে তিনি 'হিউম্যান লোকোমোটিভ' আখ্যা লাভ করেন। জেটোপেক-পত্নী ডানা জেটোপেক বর্শা ছোঁড়ায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রায় প্রতিটি বিষয়ে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এবারেও ভারত হকির গৌরবমুকুট লাভ করে। এ নিয়ে উপর্য্যুপরি পাঁচ বার। ভারতীয় কুস্তিগীর কে, ডি, যাদব ভারতীয় হিসাবে লাভ করেন প্রথম ব্রোঞ্জপদক।

মেলবোর্ণ—১৯৫৬

মেলবোর্ণ—একশো কুড়ি বছরের এক সমৃদ্ধিশালী শহর। গ্রেট-বৃটেনের অধিবাসীরা বসতি স্থাপন করবার জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় আসার ৪৭ বছর পরে এই শহরটি স্থাপিত হয়। এখন প্রায় পনেরো লক্ষ জনসংখ্যা। বর্তমানে ভিক্টোরিয়া ষ্টেটের রাজধানী।

এই অলিম্পিকের প্রস্তুতি নিয়ে বসুমতীর পাতায় গত কয়েক মাস ধরে আলোচনা করেছি। মেলবোর্ণের অলিম্পিক সমাপ্তির পথে। ভারতবর্ষ ফুটবলে সেমি-ফাইন্যালে পরাজিত হয়েছে। হকিতে এবারেও ভারত তার বিজয়-মুকুট লাভ করেছে। আগামী বারে এর পূর্ণ আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

একটি করুণ কাহিনী

অলিম্পিক-ইতিহাসে একটি গ্লানিময় অধ্যায় জুড়ে আছে। আজ বিশ্বের সমস্ত ক্রীড়াবিদরা মেনে নিয়েছেন জিম থর্প একজন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলীট।

যোগ্যতা ও প্রথম প্রকাশের বীরত্বে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলীট জিম থর্প। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সবাই স্বীকার করলেও প্রকৃত যোগ্যতা কোন নথিপত্রে নেই।

শুধুমাত্র আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ বেসবল খেলোয়াড় ও শ্রেষ্ঠ ফুটবলার ছিলেন তাই নয়, সমগ্র এ্যাথলীট জগতের তাঁর প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর।

১৯১২ সালে ষ্টকহলম অলিম্পিকে যোগদান করেন। মোট ৮৪১২ পয়েন্ট পেয়ে থর্প ডেকাথেলন বিজয়ী হন এবং পেণ্টাথেলনে বিজয়ী হয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করেন। ডেকাথেলনে থর্পের কাছাকাছি আজ পর্য্যন্ত কেউ পৌঁছুতে পারেনি।

থর্পের কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে নরওয়ের রাজা গষ্টভ তাঁকে একটি বিশেষ সুবর্ণ-মূর্তি উপহার দিয়ে বলেন—তুমি বিশ্বের সেরা এ্যাথলীট। তৎকালীন শক্তিধর রুশ দেশের তদানীন্তন জার থর্পের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে একখানা রৌপ্যময় ভাইচিং জাহাজ উপহার দেন।

থর্প যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এলে সেখানকার এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন থর্পকে পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে প্রমাণ করায় অলিম্পিকের পদক সমেত সমস্ত পুরস্কার ফেরৎ দিতে হ'ল। অলিম্পিকের সম্মান-তালিকা হতে নাম কাটা গেল।

বিশ বছর বাদে আবার এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন প্রমাণ করলো থর্প নির্দোষ ব্যক্তি। তিনি যে টাকা নিয়েছিলেন সেটা তাঁর কোন এক আত্মীয়ের দান।

তাঁর প্রাপ্য সম্মান হকিয়ে নেওয়ায় থর্প এতটুকু বিস্মিত হননি। মাত্র এক ডলার মজুরীতে রাস্তা খোঁড়ার কাজ করছিলেন, এমন সময় একজন ফিল্ম ডিরেক্টার থর্পকে নিয়ে যান রেড ইণ্ডিয়ান সর্দ্দারের ভূমিকার জন্য। বর্ণ বৈষম্য অর্জিত সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছিল।

থর্পের জীবনের এই করুণ কাহিনীর সংগে ইতিহাসের মিল আছে। মনে পড়ছে জোয়ান অব আর্কের কথা। বিচারের অদ্ভুত প্রহসন।

এখন

রেক্সোনা

আগের চেয়ে অনেক বেশী সুগন্ধী!

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটরী লিমিটেড এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

R.P. 146-X52 BG

পক্ষধর মিশ্র

ভারত ভ্রমণের সময় বিজ্ঞানী ক্রেমো শিল্প-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে ১১৫৬ সালের গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ১৮৫৬ সাল থেকে ১১৫৬ সাল—সংশ্লেষণ শিল্প-বিজ্ঞানের শত বর্ষ পূর্ণ হলো; একটু ব্যাপক ভাবে আমি শতবর্ষ পূর্তির কথা ঘোষণা করলাম, কারণ প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৬ সালে বিজ্ঞানী পার্কিন কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম সংশ্লেষিত রঙ প্রস্তুতকে বর্ত্তমান জৈব শিল্প-বিজ্ঞানের অগ্রদূত বলা যেতে পারে। সভ্যতার নানা প্রয়োজনে বহুপ্রকার জৈব পদার্থ মানুষের প্রয়োজন হয় এবং তাদের প্রধান উৎস ছিল প্রকৃতি। কিন্তু ১৮৫৬ সালে তরুণ বিজ্ঞানী পার্কিন কর্ত্তৃক ঘটনাচক্রে প্রথম সংশ্লেষিত রঙ 'মভ্' আবিষ্কার হওয়ার পর উপলব্ধি করা গেল, প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থ সমূহকে জৈব রসায়ন শিল্প-বিজ্ঞানের সহায়তায় সংশ্লেষিত করে নেওয়া যায়।

গল্পটা একটু খুলেই বলি। ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা ঠিক বলা যায় না। যদিও পার্কিন তাঁর প্রত্যাশিত ফলাফল পান নি, তাঁর পরিকল্পনার মূল সূত্র পরীক্ষার মাধ্যমে বহন করেছিল ব্যর্থতার গ্লানি, তবু সেই অপ্রত্যাশিত ফলাফলই এক নতুন যুগের পথনির্দ্দেশ করলো। মাত্র ১৮ বছরের তরুণ বিজ্ঞানী সংশ্লেষণের সহায়তায় কুইনাইন সৃষ্টি করতে গিয়ে প্রস্তুত করলেন সুন্দর একটি বেগুনী রঙের। ঘটনাচক্রে মানুষের অতি প্রয়োজনীয় একটি জৈব বস্তু সর্ব্বপ্রথম গবেষণাগারে প্রস্তুত হলো,—এই দৈবাৎ আবিষ্কার বর্ত্তমানকালের সর্ব্বপ্রথম সংশ্লেষণ জৈব-শিল্প-বিজ্ঞানের অগ্রদূত। ঔষধি-শিল্প, রঙ-শিল্প, প্লাষ্টিক, রবার ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার শিল্পই সংশ্লেষণ বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারকে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। সংশ্লেষণের মাধ্যমে এই নতুন আবিষ্কারের গুরুত্বটা কি? বেগুনী রঙ কি আগে ছিল না, না পার্কিনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের মানুষ এই রঙ ব্যবহার করে নি? নিশ্চয়ই ছিল, শুধু পার্কিনের সময় কেন—অতি প্রাচীন কালেও এই রঙের ব্যবহারের কথা জানা যায়। কিন্তু তখন উৎপাদন ছিল অতি কম, তাই প্রাচীন কালে সমস্ত রঙটুকুই সংরক্ষিত থাকতো মহারাজা, সম্রাট অথবা ফ্যারাওদের জন্য। যদিও পার্কিনের যুগে রাজা-মহারাজদের অসীম প্রতাপ অনেক কমে গেছে, তবু উৎপাদনের স্বল্পতার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ রঙ পাওয়া যেত না। তাছাড়া গুণাগুণের দিক থেকেও প্রকৃতির দান নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছিল।

রসায়ন-বিজ্ঞানের চর্চ্চা এবং শিক্ষার জন্য ১৮৪৬ সালে ইংলণ্ডে "রয়েল কলেজ অফ কেমিষ্ট্রি" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী 'লিবিগের' ছাত্র 'হফম্যান'। মাত্র ১৫ বছর বয়সে, কিশোর হেনরী উইলিয়াম পার্কিন 'হফম্যানের' অধীনে রসায়নচর্চ্চা করবার জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করলেন। পার্কিনের বাবা ছিলেন একজন গৃহনির্ম্মাতা এবং তাঁর মনের একান্ত ইচ্ছা ছিল ছেলেকে স্থপতিবিদ্যায় পারদর্শী করবেন, কিন্তু লণ্ডন স্কুলে পড়াশুনা করতে করতেই 'হফম্যানের' ছাত্র বিজ্ঞানকর্ম্মী টমাস হলের কয়েকটি বক্তৃতা শুনে কিশোর পার্কিন রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। পার্কিনের বাবা কোনদিনই ছেলের স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করতেন না,—তাঁর সম্পূর্ণ সম্মতি নিয়ে ১৮৫৩ সালে কিশোর পার্কিন 'রয়েল কলেজ অফ কেমিষ্ট্রি'তে শিক্ষার্থী হিসাবে যোগদান করলেন। এর মাত্র তিন বছর পরে ১৮৫৬ সালে ঘটনাচক্রে প্রথম সংশ্লেষিত জৈব রঙ আবিষ্কৃত হয়ে রসায়ন-বিজ্ঞানের চিন্তাধারায় এক নবযুগের সূচনা করলো।

'হফম্যানে'র তত্ত্বাবধানে পার্কিনের রসায়ন বিজ্ঞানের শিক্ষা শুরু হলো। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম মৌলিক গবেষণা শেষ করে ১৮৫৬ সালে কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। গবেষণাগারে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেও তাঁর মন শান্ত হয় না, রাত্রিবেলা অথবা ছুটির দিনেও কাজ করা চাই, তাই নিজের বাড়ীতে ছোট্ট একটি ব্যক্তিগত গবেষণাগার সাজিয়ে নিলেন। 'কলেজ অফ কেমিষ্ট্রি' থেকে ফিরে রাত্রিবেলা, রবিবার অথবা অন্যান্য অবসর সময় বেশ মনের আনন্দে কাজ-কর্ম্ম করা যাবে।

তখনকার দিনে কোন বস্তুর আণবিক কাঠামোর সঠিক পরিচয় জানা ছিল না। বস্তুর অণুর মধ্যে বিভিন্ন পরমাণুর অবস্থিতি এবং আণবিক ওজন অনুসারেই বস্তুর পরিচয় নির্দ্ধারণ করবার চেষ্টা করা হোত। 'হফম্যান'ই পার্কিনকে পরামর্শ দিলেন 'ন্যাপথাইল্যামিনকে' অক্সিডাইজ করে বোধ হয় কুইনাইন প্রস্তুত করা যাবে। আণবিক কাঠামো বিষয়ে কোন বিজ্ঞানসম্মত চেতনাই তখন সৃষ্টি হয়নি, তাই অনুমান করা হোল 'ন্যাপথাইল্যামিনের' দু'টি পরমাণু তিনটি অক্সিজেন অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি কুইনাইনের অণু এবং একটি জলের অণুর সৃষ্টি করবে। কিন্তু ন্যাপথাইল্যামিন প্রস্তুত করা যায় কি করে?—কাছাকাছি আছে টলুইডিন, তার সঙ্গে একটা অ্যালাইল দল যোগ করে দাও,—তাহলে যে বস্তুটি পাওয়া যাবে তার আণবিক ওজন ন্যাপথাইল্যামিনের সমান হবে। অতএব অ্যালাইল টলুইডিন দিয়ে শুরু করো কাজ, তাকে অক্সিডাইজ করে পাওয়া যাবে কুইনাইন। ডাইক্রোমেট দিয়ে অক্সিডাইজ তো করা হোল, কিন্তু কুইনাইনের বদলে পাওয়া গেল একটি ধূসর রঙের পদার্থ। সেই যুগের জৈব-বিজ্ঞানীরা রঙিন পদার্থসমূহকে সর্ব্বদাই পরিহার করে চলতেন। কোন প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ কোন রঙিন পদার্থ উৎপন্ন হলেই তাঁরা ধরে নিতেন তাঁদের প্রক্রিয়া সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। সকলেরই

চেষ্টা ছিল কি করে স্বচ্ছ এবং নির্দিষ্ট আণবিক ওজন সমন্বিত বিশুদ্ধ পদার্থসমূহ প্রস্তুত করা যায়। সুতরাং সাদা কুইনাইনের পরিবর্তে বাদামী রঙের কোন বস্তু উৎপাদিত হলে বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই তা পরিত্যাগ করতেন, কিন্তু পার্কিনের চিন্তাধারা তাঁকে এই পথে নিয়ে গেল না। তিনি ঠিক একই ভাবে অ্যানিলিন অক্সিডাইজ করলেন এবং তা থেকে পাওয়া গেল একটি কাল রঙের পদার্থ। কাল পদার্থটি অ্যালকোহলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখলে, অ্যালকোহল মারফৎ একটি বেগুনী রঙ পৃথক করা যায়। পার্কিন পরীক্ষা করে দেখলেন, নানাপ্রকার কাপড়ে এর দ্বারা রঙ করা চলে—এবং ঐ রঙ সহজে উঠে যায় না। আরও ভালো ভাবে পরীক্ষা করার জন্য তিনি রঙীন কাপড়গুলি পার্থের মেসার্স পুলারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অবিলম্বে জানা গেল, রঙটি চমৎকার এবং এর দাম যদি কম হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সংশ্লেষিত এই নতুন রঙ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার বলে পরিগণিত হবে। অন্যান্য জৈব রঙের চেয়ে এর স্থায়িত্ব অনেক বেশী এবং ঔজ্জ্বল্যও মনোরম।

একটা কথা বলে রাখি, এই আবিষ্কার কিন্তু 'রয়েল কলেজ অফ কেমিস্ট্রি'তে হয়নি। যদিও কুইনাইন সংশ্লেষণের পরামর্শ 'হফম্যান' দিয়েছিলেন তবু কাজটি সম্পূর্ণ ভাবে করা হয়েছিল পার্কিনের বাড়ীতে তাঁর ব্যক্তিগত গবেষণাগারে। গবেষণায় পরস্পরকে সহযোগিতা করেছিল পার্কিনের দু'টি মন,—একটি বিজ্ঞানী মন অপরটি শিল্পী মন; অনেকেরই জানা নেই বিজ্ঞানী হেনরী উইলিয়াম পার্কিন একজন সখের চিত্রশিল্পী ছিলেন। হয়তো এই রঙীন পদার্থটিকে বিজ্ঞানী পার্কিন অবহেলা করতেন, কিন্তু এর বিশেষত্ব ধরা পড়লো শিল্পী মনের কাছে। এই আবিষ্কার বিজ্ঞানীর বিশ্লেষণ এবং শিল্পীর অনুভূতির যুগ্ম সাফল্যের এক জলন্ত নিদর্শন।

আবিষ্কারের পরবর্তী অধ্যায় হলো সকলের জন্য উৎপাদন। পার্কিন এই রঙ সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উৎপাদন করতে মনস্থ করলেন, কিন্তু বাধা দিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু 'হফম্যান'। বিজ্ঞানী গবেষণা করবে, নিত্য নতুন সন্ধান করবে প্রকৃতির অনাবৃত সত্য—তাঁর এই ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কঠোর সমালোচনা করলেন 'হফম্যান'। কিন্তু পার্কিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; তাই অবশেষে বাধ্য হয়ে তাঁকে 'রয়েল কলেজ অফ কেমিস্ট্রির' সঙ্গে সংযোগ ত্যাগ করতে হলো। পার্কিনের সাহায্যে এগিয়ে এলেন তাঁর বড় ভাই,—বাবা তাঁর সমস্ত জীবনের সঞ্চয় তুলে দিলেন ছেলেদের হাতে এই নতুন শিল্প গড়ে তুলবার জন্য। শিল্পগত কোন অভিজ্ঞতাই নেই, তবু তাঁরা বিপদকে মাথায় করে এগিয়ে চললেন এই নতুন পথে।

পাঠকেরা চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, সেই ১০০ বছর আগের অবস্থাটা ছিল ঠিক কি রকম। আজকের দিনে কোন নতুন শিল্প শুরু করতে চাইলে আপনি ঘরে বসে বিশেষজ্ঞদের সব রকম পরামর্শই পেতে পারেন,—উৎপাদনের জন্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কিনে ফেলতে পারেন প্রয়োজনীয় সব রকম যন্ত্রপাতী। কিন্তু সেই যুগে সমস্ত কিছুই মাথা খাটিয়ে পার্কিনদের নির্মাণ করতে হয়েছিল। কারখানা, যন্ত্রপাতি নির্মাণ থেকে সুরু করে উৎপাদনের কাঁচামাল সংগ্রহ—সব কিছুই এক সমস্যা! ফিউমিং নাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া যায় না,

অতএব ব্যবহার করো সোডিয়াম নাইট্রেট এবং কনসেনট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড। অ্যানিলিন প্রস্তুত করবার জন্য নাইট্রোবেঞ্জিনকে রিডিউস করা হতো লোহা এবং অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিয়ে,—অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা হোত সোডিয়াম অ্যাসিটেটের উপর সালফিউরিক অ্যাসিডের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে পার্কিনের 'মভ' রঙ শিল্পক্ষেত্রে প্রচলিত হলো।

অবাক হবার মতোই কথা যে, রক্ষণশীল ইংল্যাণ্ড তাদের বিজ্ঞানীর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারকে প্রথমে সমাদর জানালো না! পার্কিনের পেটেণ্ট ফরাসী দেশে অচল—তারই সুযোগ নিয়ে ঐ দেশের অনেক শিল্পপতি এই বেগুনী রঙের উৎপাদন সুরু করে দিলেন। প্রথমে এই রঙের আদর হলো ফরাসী দেশেই,—এর সুবিধাটুকু শিল্পানুরাগী, সৌন্দর্য্যপিপাসু ফরাসী জাতি অন্তর দিয়ে করলো গ্রহণ। ফরাসীদের দেখেই শিখলো ইংরাজ—ক্রমেই পার্কিনের বেগুনী রং-এর চাহিদা বাড়তে আরম্ভ করলো। ১৮৬১ সালে কেম্‌ব্রিজ ম্যাগাজিনে একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞান নিবন্ধে রয়াল সোসাইটির সভ্য রবার্ট হাণ্ট লিখেছিলেন,—"যখনই কোন মহিলা এই রঙে রঞ্জিত সিল্ক দ্বারা নিজেদের সজ্জিত করেন, তখন তিনি মনে মনে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের কাছে কৃতজ্ঞ না হয়ে পারেন না,—কারণ পূর্ব্বে এতো গভীর এবং মনোরম কোন রঙ প্রস্তুত করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না।"

ব্যবসা ক্ষেত্রে এই বেগুনী রঙের প্রাধান্য কিন্তু খুব বেশী দিন রইলো না। পার্কিন পথ প্রদর্শন করলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন গবেষণাগারে আরও নানাপ্রকার সংশ্লেষিত রঙের হলো সৃষ্টি। ইতিমধ্যে পার্কিন তাঁর ব্যক্তিগত গবেষণাগারে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেছেন। মঞ্জিষ্ঠার লাল রঙ অ্যালিজারিন প্রস্তুত করতে জার্ম্মাণ বিজ্ঞানীরা সমর্থ হলেন কিন্তু খরচ বড় বেশী পড়ে যায়, তাই নতুন কোন সংশ্লেষণের পদ্ধতি আবিষ্কার করতে বিজ্ঞানী মহল সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। রঙশিল্পে পার্কিন আবার দিলেন মনোযোগ—তাঁর চেষ্টায় নতুন এক পদ্ধতিতে অ্যালিজারিন সংশ্লেষণ সম্ভব হলো। কিন্তু এবার বাধলো সামান্য গণ্ডগোল,—জার্ম্মাণ বিজ্ঞানী গ্রাবে এবং লিবারমান সামান্য কিছুদিন পূর্ব্বে এই একই পদ্ধতিতে অ্যালিজারিন সংশ্লেষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই এর স্বত্বাধিকার নিয়ে উভয় দেশের বিজ্ঞানীদের আপোষে রফা করতে হোল। স্থির হলো, পার্কিন তাঁর রঙ ইংল্যাণ্ডে এবং জার্ম্মাণ বিজ্ঞানীরা জার্ম্মাণীতে বিক্রি করবেন। পার্কিন এই পদ্ধতির চেয়ে আরও ভালো সংশ্লেষণের নতুন কোন পদ্ধতি আবিষ্কারে মনোনিবেশ করলেন।

১৮৭৪ সালে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে পার্কিন তাঁর রঙের গ্রীনফোর্ড কারখানা বিক্রি করে দিয়ে আবার বিশুদ্ধ রসায়নের গবেষণায় করলেন মনোনিবেশ,—অবসর সময় কাটাবার জন্য গান-বাজনা এবং বাগান করাই ছিল তাঁর সখ। কারখানার দুর্ঘটনাসমূহ এবং ইংলণ্ডের পেটেণ্ট আইনের দুর্ব্বলতা, তাঁকে বিরক্ত করে তুলেছিল। ফলে 'হফম্যানে'র আদর্শকে সম্বল করে তিনি শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে বিশুদ্ধ গবেষণামূলক বিজ্ঞানচর্চ্চার পরিবেশে সম্পূর্ণভাবে ফিরে এলেন।

প্রথম পথিকৃৎরূপে জৈব রসায়ন-শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পার্কিনের প্রবেশ এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। সমগ্র বিশ্ব তাই ১৯৫৬ সালে পার্কিনের অতুলনীয় আবিষ্কারের শতবার্ষিকী সশ্রদ্ধচিত্তে পালন করছে। যে রঙীন জগৎ এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমরা উপভোগ করছি, তার সূচনা হয়েছিল এক তরুণ বিজ্ঞানীর অনাকাঙ্ক্ষিত গবেষণার ফলাফলের মধ্যে দিয়ে। বিজ্ঞানী হেনরী উইলিয়ম পার্কিনকে সম্মান দেখাতে তাঁর দেশবাসী বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে নি,—মাত্র ২৮ বছর বয়সে তিনি রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৬৯ সাল থেকে ১৮৮৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি কেমিক্যাল সোসাইটির অন্যতম অবৈতনিক সম্পাদক এবং ১৮৮৩ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৯০৬ সালে তাঁর 'মভ' আবিষ্কারের অর্দ্ধ-শতবর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে লণ্ডন ও নিউইয়র্কে বিরাট অনুষ্ঠান হয় এবং সেই সময়েই তিনি 'নাইট' উপাধি পান। স্যার হেনরী উইলিয়ম পার্কিন ১৯০৭ সালে দেহত্যাগ করেন।

যীশুর ভক্ত

আমাদেরও অনেক কাজ

—ত্রিদিব রায়

ওরা কাজ করে

—নীরেন অধিকারী

মাতৃশিক্ষা

—আনন্দ মুখোপাধ্যায়

জবাকুসুম
কেশতৈল

ভাদুর গান

শ্রীজয়দেব রায়

মানভূম ও প্রত্যন্ত বঙ্গের বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত 'ভাদুর গান'। ভাদ্র মাসে ভাদুর মূর্তি গড়িয়া ছড়া গাহিয়া ভাদুপূজা করা হয়। মানভূম হইতে পশ্চিমবঙ্গের নানা অংশেও ভাদুপূজা প্রচলিত হইয়াছে। বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমানের গ্রামে গ্রামে সারা ভাদ্র মাস গান গাহিয়া সাধারণত কুমারী মেয়েরা এই পর্ব পালন করে।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের 'করম' উৎসব হইতে ভাদুপূজার প্রচলন হইয়াছে। মানভূম ও প্রত্যন্ত বঙ্গের সাঁওতালদের 'করম'ও বর্ষাকালেই উদ্‌যাপিত হয়, এই অঞ্চলের বাঙ্গালীরাও শেষ বর্ষায় ভাদুপূজা করিয়া থাকে।

অন্যান্য মেয়েলী পূজার ন্যায় ইহাতে আয়োজন বিশেষ কিছু

তানসেনের আসরে ভরত নাট্যমের একটি ভঙ্গিমায় বোম্বাইয়ের শ্রীমতী লীলা গাড়গাঁকার

লাগে না। মেয়েদেরই পূজা, তাহারাই ফুলফল দিয়া ভাদুর আরাধনা করিয়া থাকে, ভাদুর প্রতিমা দেখিতে অনেকটা লক্ষ্মী প্রতিমার ন্যায়। বালিকারা প্রতিদিন সন্ধ্যায় চিঁড়া, দই, মিষ্টি প্রভৃতি উপচার সাজাইয়া ভাদুপূজা করে।

সকল লৌকিক উৎসবের ন্যায় ভাদুপূজারও একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। মানভূম জেলার পঞ্চকোট রাজ্যের রাজধানী ছিল কাশীপুর। কথিত আছে, সেখানে নীলমণি সিংহ দেববর্মা নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা এক সময়ে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ভদ্রেশ্বরী নামে এক বড় আদরের সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যা যৌবনে পদার্পণ করিলে তাহার বিবাহের আয়োজন হইল, নানা দেশ হইতে রাজপুত্রেরা রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে এক রাজপুত্রের সঙ্গে ভদ্রেশ্বরীর বিবাহও স্থির হইল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের পূর্বে বর্ষার এক ঘনঘোর দুর্যোগময় রাত্রিতে পথের মধ্যে পাণিপ্রার্থী বরের কলেরায় অকাল মৃত্যু ঘটিল। রাজা ভদ্রেশ্বরীর অন্যত্র বিবাহের ব্যবস্থা করিলেও সে আর বিবাহ করিল না, বাগ্‌দত্ত পতির চিতায় আত্মবিসর্জন দিল। শোকে দুঃখে রাজা শয্যাগ্রহণ করিলেন।

রাজ্যে প্রবল বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে মন্ত্রীরা উপদেশ ও সান্ত্বনা বাক্যে রাজার শোক দূর করিতে পারিল না, শেষে তাহারা এক অভিসন্ধি করিল। তাহারা গিয়া রাজাকে জানাইল, প্রজারা ভদ্রেশ্বরীর স্মৃতিরক্ষার জন্য সারা ভাদ্র মাস ধরিয়া পূজানুষ্ঠান করিবে, রাজাকে তাহাদের উৎসাহিত করিতে হইবে। রাজা তখন হইতে আবার সিংহাসনে বসিয়া এই অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে দেশে ভাদুপূজার প্রচলন হইয়াছে।

ভাদুপূজা নাই যেথায় যে গো, কি কাজ তাদের জীবনে।
কাশীপুরের রাজার পূজা গো সে পূজা করে প্রথমে।
সে মনের মত বর পেয়েছে যা ছিল গো তার মনে।
ভাদু, বলি তোমায়, তোমার চরণ দিবে আমার মরণে।

ভাদু-গানের তিনটি ভাগ—প্রথমটিতে ভাদ্রমাসের গোড়ার দিকে তাহার আগমনী গান। কুমারীরা ভদ্রেশ্বরীর মাটির একটি পুতুল গড়িয়া গান গাহিয়া তাহাকে গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠা করে—

ভাদুর আদর পেয়ে ভাদু সে যে রাজার মেয়ে
ভাও জুনার লো।
ওলো আয় লো ভাদু খেতে দিব ডালভাজা
ফুলের মধু গো।

পূজার আয়োজনের জন্য সখীদের আহ্বান জানাইয়া বালিকারা গাহে—

ভাদু নিজগুণে
দয়া ক'রে এসেছ গো এখানে।
কেহ ধারি আনতে চল গো, কেহ যাও ফুলবাগানে।
(আবার) কেহ বা চন্দন ঘষো নৈবেদ্যের আয়োজনে।

এ সকল আগমনী-গানের অধিকাংশই লঘু তরল বিষয় লইয়া রচিত। নানাপ্রকার মেয়েলী ব্যঙ্গবিদ্রূপ, রঙ্গতামাসা এ সকল গানে প্রকাশ পাইয়াছে। বালিকাসুলভ চাপল্যে এগুলি পূর্ণ। যেমন,—

বলি ওলো মকর!
আসছে জামাই নূতন নূতন ফ্যাসান ক'র।

সাবান মেখে ফরসা হয়ে লো রেডি হ,' ওগো সখর।
আসছে ঘোড়ায় চেপে বর, নিয়ে যাবেক্ শ্বশুর ঘর।

ভাদুগান উচ্চনীচ বর্ণনির্বিশেষে সকল স্ত্রীলোকরাই গাহিয়া থাকে। তবে উচ্চবর্ণের বালিকারা সমবেত কণ্ঠে যখন ছড়া গাহে, তখন কোন বাদ্য বাজে না। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর বালিকারা নাচিয়া নানাপ্রকার বাদ্যের সঙ্গে গান গাহে। একজন গাহে আর বাকী সকলে দোহারকি করে। নানাপ্রকার লোভনীয় সুখাদ্যের তালিকাই তাহাদের গানের বিষয়বস্তু—

কলাপাকা আম্রটারা গো, বাজার আন কিনে,
আবো কেহ বা মিষ্টান্ন আনো, ভুবন ময়রার দোকানে।
জিলাপী, খাজা, লেডিকেনি গো, কিনবে যে দেখে শুনে,
ভালো ক'রে পরখিবি, বাসি যেন আনিস্ নে।

আগমনী গানের পর সারা মাস ধরিয়া চলে ভাদুর 'মানভঞ্জন' গান। সখীর মানভঞ্জনের জন্য বালিকারা ফরমাইস করে—

আনলো কাগজ যত লাগে দাম
সাজাই ভাদুর যান গো, সাজাই ভাদুর যান।
ভাদু করে মান, মানে গেল সারানিশি,
সোনার ঝারি এবার করব দান।

মানভূমে কাগজ এক কালে খুব দামী জিনিষ ছিল। আর সাধারণ গ্রাম্য বালিকারা কাগজের ব্যবহার কতই বা করিত! তাই বহুমূল্য দ্রব্যরূপে কাগজের নামই তাহাদের প্রথম মনে পড়িয়াছে।

প্রিয়সখী ভাদুরাণীর মানভঞ্জনের জন্য বালিকারা গান ধরে—

ওলো ভাদু বিধুমুখি!
ধনি, কিবা অভিমান হয়েছে আমারে বল দেখি।
সুখনিশি জাগরণে লো, সকলি যে হয় ফাঁকি।
তুমি বহুদিন পরে এলে নিরানন্দ করো ছিঃ।

কোন কোন দিন, বিশেষতঃ বিসর্জনের পূর্বদিন সারারাত্রি ধরিয়া ভাদুগান গীত হয়। তাহাকে বলে 'ভাদু-জাগরণ'। নানা গার্হস্থ্য ও সামাজিক খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ অবলম্বনে এ সকল গান রচিত হয়।

ভাদু-জাগরণের এক বিরাট অংশ ভাদুর বিবাহের গান। প্রচলিত আখ্যানে আছে, বিবাহের পূর্বদিনে তাহার অকাল মৃত্যু হয়। তাই সেই করুণস্মৃতি বালিকারা বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে বহন করে—

ভাদু আপন ভুলে, কেন বিয়ে করবে না তাই বল খুলে।
নবীনা প্রেমিকা ভাদু লো, কেমনে আছ ভুলে?
নবীন প্রাণে বঁধুর সনে শুভবরণ করে নে।
বর এসেছে কত শত লো, তোরে দেখিবার ছলে।
যদি রসিক দেখে করবি বিয়ে, মনের মতো নে চিনে।

তরলমতি কুমারী বালিকা ও নববিবাহিতা কিশোরী বধূদেরই তা এ সব উৎসব, তাহাদের কণ্ঠ বেশিক্ষণ বাষ্পরুদ্ধ থাকে না, অল্পক্ষণ পরেই তাহারা আবার রঙ্গ-পরিহাসে মাতিয়া উঠে। বাঙলা দেশের চিরন্তন সেই তরজার লড়াই জমিয়া যায়। প্রতিবেশিনী বালিকাদের সঙ্গে নিজেদের পূজা লইয়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। গানের মাধ্যমেই একদল অন্যদলকে আক্রমণ প্রতিআক্রমণ করে। ভাদুকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তরে বাদ-প্রতিবাদের লড়াই জাগিয়া উঠে—

তাই রে, মনে মনে।
আমার ভাদুর রূপ দেখে জ্বলিস কেনে?
আমার ভাদুর রূপটি তোদের চোখে লো বল সইবে কেনে?
সূর্যের আলো দেখলে পেঁচা লুকায় গিয়ে ঘোর বনে।
তেমনি তোরা ভাদুধনে লো, দেখতে নারলি নয়নে।
তোদের ভাদু, আমার ভাদু, তফাৎ লো রাত্রি-দিনে।

বাস্তব জীবন হইতেও ভাদু-পূজা বিচ্ছিন্ন নয়। সরলা সুশীলা বালিকারা ছলাকলা জানে না, তাহাদের মনের সকল কথাই ভাদু-গানের মধ্য দিয়া উজাড় করিয়া দিয়াছে। সমস্যা, ঘটনা সংঘাত অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবন প্রবাহ বহিতে পারে না, তাই প্রতি বৎসরই নূতন নূতন বিষয়ের গান পুরাতন গীতিসূত্রে যোজিত হইয়া চলিতেছে।

ভাদুর মন করেছে বিকুলি, মতিমালার মাঝে মাদুলী।
ভাদু আমার খেলতে যাবে বাঙ্কিমগঞ্জের বটতলা,
খেলতে খেলতে দেখতে পাবে কপিকলের জলতোলা॥
ভাদুর আমার বিয়া দেব ইষ্টিশানের বাবুকে,
যাওয়া-আসা ভালই হবে, চাপব কলের গাড়ীতে।
এক সের চালের মাছ কিনলাম তমালতলে দাঁড়িয়ে,
এ মাছ আমার কে খাবে, ভাদু গেছে চালানে।
ভাদু আমার শিশু ছিল, কে পাঠাল কলকাতা,
কলকাতার ঐ নোণাজলে ভাদু হ'ল শ্যামলতা।

তারপর ভাদ্র-সংক্রান্তির দিনে ভোরবেলায় ভাদুর বিসর্জনের

গান। আনন্দে হাসিতে উৎফুল্ল কণ্ঠগুলি হঠাৎ বাষ্পভারাক্রান্ত ব্যথাতুর হইয়া উঠে— ভাদু তোমা ধনে,

ওগো বিদায় দিব কেমনে।

যেও না যেও না ভাদু গো ধরি তব চরণে।

(তুমি) চলে গেলে আমরা বলো গৃহে রব কেমনে।

দিবানিশি তোমায় ভেবে গো থাকি আনন্দ মনে।

তুমি চলে গেলে প্রাণ ত্যজিব, কাজ কি এ ছার জীবনে।

বালিকারা যেন বুঝিতে পারে না কিসের জন্য সখী ভাদুরাণী এ ভাবে তাহাদের ছাড়িয়া যাইতেছে। অল্পদিনের মধ্যেই হয়তো তাহাদেরও এই ভাবেই অপরিচিত জীবনসাথীর হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিত্রালয় হইতে বিদায়-গ্রহণ করিতে হইবে। সেই আসন্ন বিরহ বেদনা, সেই রহস্যময় ভয়-ভাবনা ভাদুর ভাসান গানে আভাসিত হইয়া আছে। তাহারা ভাদুকে আশ্বস্ত করে—

জলে গেল, জলে গেল, জলে তুমার কে আছে?

আপন মনে ভেবে দেখ জলে শ্বশুর ঘর আছে।

ভাদুর গান আগাগোড়াই তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে এই ভাবেই পরিমূর্ত করিয়াছে।

এ গান তো কেবল সখী-বিরহে ব্যাকুলা বালিকাদের গান নয়, তাহার মধ্যে আছে বিচ্ছেদ-বেদনাতুরা মাতৃহৃদয়ের আকুলতা। বাৎসল্যরসের পরিপূর্ণ কুম্ভখানি উজাড় করিয়া এ সকল গান তাহাদের মায়েরাই রচনা করিয়া দেন। উমাসঙ্গীতের সেই হৈমবতী ধারাই বাঙলার রাঢ়ের রুক্ষ মাটিতে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে বাৎসল্যরসে উর্বরা করিয়াছে।

উমাসঙ্গীতের মা মেনকা যেমন উমাকে আশ্বাস দিবার নাম করিয়া নিজেই নিজেকে আশ্বস্ত করেন। বালিকারা প্রিয়সখীকে বিদায় দিতে আশ্বাস দানের মধ্যেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গান ধরে—

বিদায় দিতে মন সবে না ভাদু তোমারে।

নিশ্চয় যদি যাবি গো ভুলিস না গো আমারে।

যাচ্ছ যদি ভাদুমণি কেঁদো না গো মনমোহিনী।

আর বৎসর থাকি যদি আনব গো আবার তোরে।

স্বরোদ বাদনরত মাইহারের ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গতে রয়েছেন বেনারসের বিখ্যাত তবলাবাদক পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজ, তানসেনের আসরে।

"ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এখন সরকারের অনুগ্রহে সঙ্গীতের প্রতি এবং সঙ্গীতনায়কদের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত ও মার্গসঙ্গীত এখন অনুশীলনের সামগ্রী হইয়াছে—প্রকৃত নিষ্ঠার সহিত অনুশীলনে উত্তরোত্তর উহার উন্নতি অনিবার্য—চাই কেবল ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা।" দক্ষিণ-কলিকাতায় ইন্দিরা চিত্রগৃহে নবম বার্ষিক নিখিল ভারত তানসেন সঙ্গীত-সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিরূপে তাঁহার ভাষণে কলিকাতার মেয়র অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ ভারতের স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গীতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিবৃত করিতে গিয়া উপরোক্ত মন্তব্য করেন। * * * ৮৮ বৎসরের বৃদ্ধ ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর স্বরোদ বাজনার সঙ্গে নিখিল ভারত তানসেন সঙ্গীত-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শেষ হয়। তিনি প্রথমে যেম-বেহাগ ও পরে ভাঙ্কার রাগে প্রায় দুই ঘণ্টা বাজান। শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে গারারাগে একখানি ধ্রুপদ গান করেন এবং পরে রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দ্বারা তাঁহার অনুষ্ঠান শেষ করেন। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর হিন্দোল রাগে খেয়াল গানখানি উপভোগ্য হইয়াছিল। দবীর খান ঝিঁঝিট রাগে বীণ বাজান। শ্রীসুবোধ নন্দী তাঁহার সহিত তবলা সঙ্গত করেন। ত্রিতালে শান্তাপ্রসাদের তবলা বাজনা আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল। * * * সম্মেলনের তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে শ্রোতারা উচ্চ স্তরের গীতরস আহরণ করেন। ঐ দুটি অধিবেশনে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, কণ্ঠে মহারাজ, আলী আকবর খাঁ ও সোহন সিংএর নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতের রাগ-সঙ্গীতের দিকপাল ওঙ্কারনাথ ঠাকুরকে এ বছর এই প্রথম সঙ্গীত-সম্মেলনের আসরে দেখা গেল। ওঙ্কারনাথ সেদিন নট রাগে খেয়াল গেয়েছিলেন। রাগটি প্রাচীন, শুদ্ধ স্বরে বাঁধা এর দ্রুত অংশটি তিনি ছায়ানটে গেয়েছিলেন। ওঙ্কারনাথের সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করেন কানাই দত্ত। আলাউদ্দীন খাঁ শুদ্ধ সারঙ রাগে তাঁর আলাপচারী শুরু করেন। তিনি আলাপের অংশটি দ্রুত সেরে 'গতোড়া'তে মনোযোগ দেন। এই সময়ে কণ্ঠে মহারাজের তবলার সঙ্গে তাঁর স্বরোদের সুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্যে একটি অপূর্ব পরিবেশ রচিত হয়। বলা বাহুল্য, দুই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞের এই সঙ্গীতসমর রসিকজনকে মুগ্ধ করে। আলী আকবর খাঁ স্বরোদে আহীর ভৈরো নট ভৈরো, ভৈরবী ভাটিয়ার ও সিন্ধু ভৈরবী বাজিয়ে শ্রোতাদের তৃপ্ত করেন। আলী আকবরের সুর সৃষ্টিতে নৈপুণ্যের সঙ্গে আবেগের একটি সুন্দর সমন্বয় অনুভূত হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করেন। * * * নিউইয়র্কে ৬ই ডিসেম্বর রাত্রে বিখ্যাত ভারতীয় সেতারী শ্রীরবিশঙ্কর কাউফম্যান কনসার্ট হলে তাঁহার অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। এখানকার সঙ্গীতরসিক ব্যক্তিরা বারংবার হর্ষধ্বনিতে

স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীচতুরলাল তবলা ও শ্রীনন্দু মল্লিক তানপুরায় শ্রী শঙ্করের সহিত সঙ্গত করেন। * * * গত ৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ৪৭নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে নিখিল ভারত শিশু-সঙ্গীত-সম্মেলনের কার্যকরী পরিষদের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগঠনের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীঅসিতকুমার ঘোষ ও শ্রী উৎপল হোম-রায় সম্মেলনের অগ্রগতির বিবরণ দান করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রী উৎপল হোম-রায় বলেন যে, আগামী ১২ই ও ১৩ই জানুয়ারী রবীন্দ্র ভারতী হলে নিখিল ভারত শিশুসঙ্গীত সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের চারটি বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের সেরা শিশু শিল্পীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিবেশন করবে: (ক) কণ্ঠসঙ্গীতে: খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা, তারানা, ধামার, ধ্রুপদ, ভজন, রাগপ্রধান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ, রামপ্রসাদী, কীর্তন, পল্লীসঙ্গীত; (খ) নৃত্যে: ভরতনাট্যম, কথাকলি, কথক, মণিপুরী, পল্লীনৃত্য; (গ) যন্ত্রসঙ্গীতে: সেতার, এস্রাজ, বেহালা, বাঁশী, তবলা, গীটার ইত্যাদি। সাংবাদিক সম্মেলনটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে: জ্ঞানকৃষ্ণ ঘোষ, হেমন্তকুমার লাহিড়ী, শ্রীঅপরেশ লাহিড়ী, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, প্রভৃতি। * * * গত বুধবার তানসেন সঙ্গীত-সংঘ পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের সম্মানার্থে তানসেন সঙ্গীত কলেজে একটি সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করেন। উক্ত সংঘের সভাপতি ডাঃ নরেন দত্ত এবং সম্পাদক শ্রীশৈলেন ব্যানার্জী সভায় বক্তৃতা করেন। সঙ্গীত-সম্রাটকে সংঘের তরফ হইতে একটি স্বর্ণ-অঙ্গুরীয় উপহার দেওয়া হয়। পণ্ডিতজী তাঁর বক্তৃতায় সঙ্গীতের ভাষা কি তা সবিস্তারে বুঝিয়ে দেন এবং বলেন যে, সঙ্গীতের ভাষা কোন গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বলেই তার আবেদন বিশ্বজনীন। * * * দশম বার্ষিক এণ্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন আগামী ৫ই থেকে ১৩ই জানুয়ারী—এই ন' দিন ধরে চোদ্দটি অধিবেশনে সম্পন্ন হবে। সম্মেলনে প্রায় চার হাজার দর্শকের সম্মুখে দু'শোর উপর ভারত ও পাকিস্তানের প্রখ্যাত শিল্পীদের উপস্থিত করা হবে। সম্মেলনে নৃত্য, গীত, নাট্যাভিনয়ের আয়োজন যেমন করা হচ্ছে, তেমনি কুটিরশিল্প এবং গ্রন্থ প্রদর্শনীরও পূর্ণ ব্যবস্থা করা হবে। বহু গুণিসমাবেশে সম্মেলনটি সার্থক হয়ে উঠবে বলে আশা করা যাচ্ছে। * * * আগামী ১২ই ও ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৫৭, রবীন্দ্র-ভারতী হলে (৬ নং দ্বারিকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭) নিখিল ভারত শিশু-সঙ্গীত সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের বিষয়-সূচীতে—(ক) কণ্ঠসঙ্গীতে—(১) খেয়াল, (২) ঠুংরী, (৩) টপ্পা, (৪) তারাণা, (৫) ধামার, (৬) ধ্রুপদ, (৭) ভজন, (৮) রাগপ্রধান, (৯) রবীন্দ্রসঙ্গীত, (১০) অতুলপ্রসাদ, (১১) রামপ্রসাদী, (১২) কীর্তন, (১৩) পল্লীগীতি। (খ) নৃত্যে—(১) ভরতনাট্যম, (২) কথাকলি, (৩) কথক, (৪) মণিপুরী, (৫) পল্লীনৃত্য। (গ) যন্ত্রসঙ্গীতে—(১) সেতার, (২) এস্রাজ, (৩) বেহালা, (৪) বাঁশী, (৫) তবলা, (৬) গীটার প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সম্মেলনটিকে সুসংগঠিত করার জন্য শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষকে সভাপতি, শ্রীউৎপল হোম-রায় ও শ্রীঅসিতকুমার ঘোষকে যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত করে এক শক্তিশালী কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়েছে। বহির্বঙ্গ ও বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে কৃতী শিশুশিল্পীরা অধিবেশনের চারটি বৈঠকে যোগদান করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বিশদ বিবরণ জানার জন্য নিখিল ভারত শিশু-সঙ্গীত সম্মেলন ৪৭, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে যোগাযোগ করতে হবে। * * * গত ১১ই নবেম্বর রবিবার সালকিয়া সঙ্গীত-নৃত্য বিদ্যালয়ের সঙ্গীত উৎসব শালকিয়া অশোক সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত নৃত্য, নাট্য আকাদেমির সঙ্গীত বিভাগের সর্বাধিনায়ক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সভায় সভাপতি এবং সম্পাদক, উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, তার ক্রমোন্নতি এবং কার্য্যসূচির বিবৃতি দেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, "সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি শিল্পের সার্থকতা গতানুগতিক শিক্ষা, ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী-লাভে হয় না। শিল্পানুভূতি, সাধনা ও নিষ্ঠা প্রয়োজন। শিল্পানুশীলন মানুষের রুচিকে মার্জ্জিত করে এবং মানুষকে সামাজিক করে তোলে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই ছোট থেকে বড় হয়ে উঠে সুচিন্তিত ও গঠনমূলক কার্য্য প্রণালী দ্বারা। শিল্পানুশীলন ও শিক্ষা সহরেই কেন্দ্রীভূত করে রাখলে চলবে না। কলকাতার বাহিরে এবং মফঃস্বলে এর যথাযথ প্রচার ও উন্নত প্রণালীর শিক্ষাধারার প্রবর্ত্তন আবশ্যক।" এর পর সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। শ্রী এ কানন, শ্রীবলরাম পাঠক, জনাব কেরামতুল্লা খাঁ প্রভৃতির সঙ্গীত সকলের হৃদয়গ্রাহী হয়।

রেকর্ড-পরিচয়

চিত্রগীতি

এবার নতুন যে সব রেকর্ড বেরিয়েছে, তার মধ্যে আছে 'ঘুম' চিত্রের গান—"এ কি উত্তরোল খুশী হিল্লোল" এবং "ঘুম ঘুম ঘুম"—প্রথমটি গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং পরেরটি কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের—GE 30345. 'মা' কথাচিত্রের গান—"চাঁদ ছিল আকাশ পারে" এবং "ঝরিছে বাদল অঝোর ধারে"—প্রথমটি শ্রীমতী উৎপলা সেন, পরেরটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া—N 76040. 'দানের মর্যাদা' চিত্রের গান—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের

নিখিল ভারত তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনা আসরের বৈঠক। অংশ গ্রহণে আছেন (বাম হইতে দক্ষিণে)—শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, ওস্তাদ দবীর খান, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান ও প্রফেসর সোহন সিং।

কণ্ঠে "চাঁদ জাগা রাত্রি" এবং কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "কানামাছি ভোঁ ভোঁ"—N 76041. শ্রীমতী উৎপলা সেনের কণ্ঠে "মুরলী বাজাও ঘনশ্যাম" এবং অপরেশ লাহিড়ীর কণ্ঠে "কাঁদে শচীমাতা"—N 76042. 'মা' চিত্রের আরো দুটি গান—"হে বিজয়ী বীর" গেয়েছেন শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার এবং "আকাশে উঠেছে পূর্ণিমা চাঁদ"—শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে—N 76043. অরুন্ধতী এখন স্বনামখ্যাত চিত্রতারকা, তিনি একজন সুকণ্ঠী গায়িকা হিসাবেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন—এবারের রেকর্ডে তার প্রমাণ আবার পাওয়া গেল।

অন্যান্য

স্বনামধন্য প্রবাসী শিল্পী মান্না দে 'একদিন রাত্রে' চিত্রের কয়েকটি গানে সম্প্রতি বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নতুন গান—"তীর ভাঙা ঢেউ" এবং "তুমি আর ডেকো না"—N 82724. সনৎ সিংহের নতুন আধুনিক গান দু'খানি চমৎকার—"তোমার সীঁথিতে সিঁদুর" এবং "নূপুর বাজায়ে পায়ে"—N 82725. নির্মলেন্দু চৌধুরীর নতুন গান—"তোমার লাগিয়া রে" এবং "আমার সাধের নাও"—(পল্লীগীতি)—N 82726. লতামঙ্গেশকরের নতুন বাংলা গান—"আকাশ-প্রদীপ জ্বলে" এবং "কত নিশি গেছে"—(আধুনিক)—GE 24813. সমরেশ রায়ের রবীন্দ্র-সঙ্গীত—"ওগো আমার চির-অচেনা" এবং "মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে"—GE 24814. শ্রীমতী ইরা মজুমদারের আধুনিক গান—"দোলে মন দোলে রে" এবং "রূপালী জোছনায়"—GE 24815. অমর সিং যন্ত্রালের ক্ল্যারিওনেটে—'নিউ দিল্লী' চিত্রের দুটি গান—GE 25833.

আমার কথা (২৩)

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

কর্মমুখর কলকাতার কেন্দ্রস্থল হচ্ছে তার মধ্যাংশ। বিশ্ববিদ্যালয় ও গোলদীঘির অনতিদূরে হরলালকার বিপণি। তার উপরে সিসিল হোটেল। পাশ দিয়ে প্রবেশপথ। সামনেই সিঁড়ি। সোজা তিনতলা। দেখা যাবে পরিজনবেষ্টিত এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোককে। স্বপ্নে-ভরা চোখ, মুখে স্নিগ্ধ হাসি, হাতে জ্বলন্ত সিগার। দেখা যাবে এক সঙ্গীতশিল্পীকে, দেখা যাবে বাংলার অন্যতম খ্যাতিলব্ধ সঙ্গীত শিল্পী শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে।

বালীতে বাড়ী। মাতুলালয়ও সেই অঞ্চলেই। মামার বাড়ীতেই ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর বাংলা ২৪শে ভাদ্র ১৩২৯ সালে ধনঞ্জয় বাবুর জন্ম। ৺সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এঁর বাবা। খ্যাতিমান সঙ্গীতশিল্পী শ্রীপ্রফুল্ল ভট্টাচার্য ও শ্রীপান্নালাল ভট্টাচার্য যথাক্রমে এঁর দাদা ও ভাই। শিশু উপনীত হয় বালকত্বের দুয়ারে। সে বলতে শেখে কথা, চলতে শেখে পায়ের সাহায্যে, দেখতে শেখে সে চোখ দিয়ে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে সে পূর্ণত্বের দিকে। জীবনের প্রথম প্রভাতেই মুখোমুখী হতে হয় দুর্যোগের সঙ্গে, সেই দুর্যোগের দমকা হাওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র করেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। সে সময়ে সংসারে যাদের প্রয়োজন ছিল সব থেকে বেশী, তারাই পাড়ি দিল অজানার উদ্দেশ্যে। ফলে সংসার-তরণী যাত্রীসমেত একেবারে মাঝ দরিয়ায় উত্তাল ঢেউ-এর মুখে, কর্ণধার নেই।—এই পরিবেশে বিকশিত হতে থাকে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের জীবন। শৈশব ও বাল্যকাল কেটেছে বালীতেই। বাঙলাদেশের সেই প্রাকৃতিক শোভা, তার পথের মাটিতে মাটিতে মধু, শ্যামল-শোভন আস্তরণ সঙ্গীতের রূপ নিয়ে হাতছানি দেয় বালক ধনঞ্জয়কে। বালকের সমস্ত সত্তা নড়ে ওঠে সেই ডাকে, কিন্তু যে বেড়া ডিঙিয়ে সেখানে যেতে হবে সে বেড়া ভর্ত্তি কাঁটা দিয়ে। এগিয়ে আসেন বালকের মা, বালককে পাঠাতে তার অভীষ্টের সন্ধানে। কবিগুরুর উক্তি দিয়ে বলা যেতে পারে—'সাধ থাকে তো সাধ্য থাকে না।' সেই সঙ্গেই মনে পড়ে তাঁরই আর একটি উক্তি—'আমরা চলি সমুখ পানে কে আমাদের বাঁধবে?'

ধনঞ্জয় পড়ছেন তখন পঞ্চম শ্রেণীতে। তাঁর সুপ্ত প্রতিভা ও মনের অদম্য বাসনা ধরা পড়ে গেল তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীসুধাংশু-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে। তিনিই ধনঞ্জয়ের সঙ্গীতশিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। বিশিষ্ট মার্গসঙ্গীতশিল্পী শ্রীসত্যেন ঘোষালই ধনঞ্জয় বাবুর প্রথম গুরু। ছ' বছর তিনি ছিলেন এঁর শিষ্য। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। এই সময়ে তাঁর সংসার মুখোমুখি হয় চরম অবস্থার সঙ্গে। রেমিংটন টাইপ কোম্পানীতে শিক্ষানবীশ হলেন ধনঞ্জয়। এই সময়েই তিনি পরিচিত হন পরলোকগত তরুণ চিত্র-পরিচালক কর্মযোগী রায়ের সঙ্গে। কর্মযোগীর সুপারিশ পত্র নিয়ে প্রত্যেকটি রেকর্ডিং কোম্পানীতে যান ধনঞ্জয়—সব জায়গা থেকেই আসে প্রত্যাখ্যান। অবশেষে অনেক শ্রম স্বীকারের পর হিন্দুস্থানের তকমায় ওরিয়েণ্টাল মিউজিক্যাল ভ্যারাইটিস লিমিটেডের সহযোগিতায় প্রথম গান রেকর্ড করেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। প্রণব রায়ের লেখা, সুবল দাশগুপ্তের সুর, প্রথম কথাগুলি 'তুমি ভুলে যাও মোরে।' বছরখানেক পরে পরিচিত হলেন ভারত রেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গে। সুধীর গুহ তখন এখানকার কর্মপরিচালক। 'আলেয়া' ছায়াচিত্রে কণ্ঠ দিলেন ধনঞ্জয় (মাটির এই খেলাঘরে), শৈলজানন্দের 'শহর থেকে দূরে' ছায়াচিত্রেও (ভুল করে 'তুই চিনলি না তোর প্রেমের শ্যামরায়')। ঐ বছরেই (১৯৪৩) সুরসাগর হিমাংশু দত্তের সঙ্গে যাত্রা করেন পুণা। সেখানে একটি ছবিতে নায়ক ভারতভূষণ ওষ্ঠ মিলিয়ে যান ধনঞ্জয়গীত একটি গানের সঙ্গে।

তারপর বাঙলাদেশে ফিরে এসে চলল ধনঞ্জয়ের সাধনা, তন্ময়তা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা, তাঁকে নিয়ে গেল সিদ্ধির দরবারে। এল জনগণের সমাদর, আজও যা তিনি তাঁর যাত্রাপথের মহার্ঘ পাথেয় বলে বিবেচনা করেন। জনপ্রিয়তা অর্জনের পর বহু বার বহু সুযোগ এসেছে বোম্বাই যাবার কিন্তু যান নি, কেবলমাত্র কিছুকাল আগে শ্রদ্ধেয় শ্রীরাইচাঁদ বড়ালের ইচ্ছানুসারে 'চৈতন্য মহাপ্রভু' চিত্রে গান গাইবার জন্যে তাঁকে যেতে হয় বোম্বাই। প্রায় দু'শো ছবিতে আজ পর্যন্ত কণ্ঠ দিয়েছেন ধনঞ্জয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকারের ইচ্ছানুসারে 'লেডিজ সীট' নামক ছায়াচিত্রে সঙ্গীত পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন অভিনেতা শ্রীঅরুণ চৌধুরী। নেহাৎ সখেই তিনি দেখা দিয়েছিলেন পাশের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ী, লেডিজ সীট ও নববিধান ছায়াচিত্রে অভিনেতারূপে।

আজকের দিনে সকল ক্ষেত্রের মতই সঙ্গীত-জগতেও এসেছে নানান ধরণের গলদ। এর থেকে মুক্তি পাবার পথও আছে কিন্তু ধনঞ্জয় জানেন না যে, সে পথে যাওয়া কত দিনে সম্ভব হবে? তিনি বলেন—আজকের দিনে শিল্পী ও শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই—এ এক বিরাট ব্যথা। প্রায় পনেরো বছরের শিল্পি-জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর আসে—এ প্রশ্নের উত্তর দ্বিবিধ। একেক সময়ে মনে হয়, হে ঈশ্বর! আমিই বোধ হয় তোমার সমস্ত স্নেহের একমাত্র অধিকারী—আবার কখনও কখনও মনে হয় বৈ কি যে ম্যানহোল পরিষ্কার করে যে লোকটা সে-ও বোধ হয় আমার চেয়ে সুখী। স্রষ্টার যে একটি বিশেষ ধরণের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য থাকে তার পূর্ণ অধিকারী ধনঞ্জয়। বাঙলাদেশের প্রত্যেকটি সঙ্গীত পরিচালকের পরিচালনায় কাজ করেছেন ইনি।

শিল্পীদের মধ্যে ইনি জানালেন, ইনিই একমাত্র জন ঐ বিশেষত্বের অধিকারী।

তাস খেলতে ভাল লাগে ধনঞ্জয়ের। রন্ধন ও ডিটেক্‌টিভ গ্রন্থেও আনন্দ পান ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

প্রথম পরিচয় আমার ভদ্রলোকটির সঙ্গে। নিমেষের মধ্যে করে নিলেন যেন কত পরিচিত অন্তরঙ্গ বন্ধু! প্রয়োজনীয় কথোপকথন সমাপ্ত হল যথা নির্ধারিত সময়েই। তারপর চলতে লাগল হাজারো রকমের ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা নানান বিষয়কে কেন্দ্র করে।

তুমি ঃ আমি

প্রতিভা রায়

বিরহের মাঝে আমি খুঁজি যে তোমায়:

• • • •

কত ব্যথা, কত অশ্রু পুঞ্জীভূত করে
তোমার জন্যে আমি করেছি যে ঠাঁই।
সে স্থান কোথায় জান?—আমার অন্তরে।
তোমাকে পাবো না আমি মধুর মিলনে,
সুখের বাঁধনে তুমি দেবে না তো ধরা;
তাই জেনে ভেবেছি গো আমি মনে মনে:
বিরহের মালা নিয়ে হ'ব স্বয়ম্বরা।

'ব্যথা' শুনে ম্রিয়মাণ হ'ল বুঝি মন?
বেদনাকে ভয় কর—এত ভীরু তুমি?
দুঃখকে শেখোনি বুঝি করিতে বরণ?
ধরায় উদ্যান আছে, আছে মরুভূমি—
সেই শুষ্ক ভূমি আমি; তুমি যে দূরের
ফুলের উদ্যানে পাখী,—নহ বিরহের।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

মিশর যুদ্ধের পরে—

অবশেষে বৃটেন এবং ফ্রান্স মিশর হইতে সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিতে সম্মত হইয়াছে এবং গত ৬ই ডিসেম্বর (১৯৫৬) হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের কাজ আরম্ভও হইয়াছে। মিশর হইতে অবিলম্বে বৃটিশ, ফরাসী ও ইসরাইলী বাহিনীকে অপসারিত করিবার দাবী করিয়া গত ২৪শে নবেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ এক প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের নির্দ্দেশ মানিয়া বৃটেন ও ফ্রান্স মিশর হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে রাজী হইয়াছে কি না, এ বিষয়ে লোকের মনে সন্দেহ থাকিলে বিস্ময়ের বিষয় হয় না। এই প্রস্তাবের উপর বৃটিশ ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কোন গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন বিশ্ববাসীকে একথা তাঁহারা বুঝিতে দিতে রাজী নহেন। ইহা শুধু তাঁহাদের নিজেদের মুখ রক্ষার প্রয়াস, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে বলিয়াই মনে হয়। কারণ, ইহার পূর্ব্বেও আর একবার—গত ৭ই নবেম্বর মিশর হইতে বৃটিশ, ফরাসী ও ইসরাইলী বাহিনী অপসারণের নির্দ্দেশ দিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে এক প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যেই গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর প্রায় দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত বৃটেন ও ফ্রান্স উহাকে মোটেই কোন আমল দেয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারশিল্ডকে গত ২০শে নবেম্বর বৃটেন, ফ্রান্স ও ইসরাইলের নিকট সাধারণ পরিষদের উক্ত প্রস্তাব অনুসারে মিশর হইতে সৈন্য অপসারণ না করার কৈফিয়ৎ তলব করিতে হয়। ২২শে নবেম্বর বৃটেন ফ্রান্স ও ইসরাইল ঘোষণা করে যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাব মানিয়া কিছু সৈন্য তাহারা মিশর হইতে অপসারণ করিবে। ইহার পূর্ব্বদিন অর্থাৎ ২১শ নবেম্বর বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ সেলুইন লয়েড বলেন যে, পোর্টসৈয়দ হইতে এক ব্যাটেলিয়ন বৃটিশ সৈন্য নমুনা হিসাবে অপসারিত করা হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলের কৈফিয়ৎ তলবের ইহা-ই ঘটে পরিণতি।

গত ২২শে নবেম্বর বৃটেনের লর্ডপ্রিভিসীল মিঃ আর এ বাটলার কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, যে-পর্য্যন্ত না আন্তর্জাতিক জরুরী বাহিনী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দ্ধারিত উদ্দেশ্য প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইবে, সে-পর্য্যন্ত সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে বৃটেন তাহার সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিতে রাজী নয়। এই প্রসঙ্গে গত ৩রা নবেম্বর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেন যে তিন সর্ত্তে যুদ্ধ বন্ধ করিতে রাজী হইয়াছিলেন তাহা স্বতঃই মনে পড়ে। উক্ত সর্ত্ত তিনটির মধ্যে অন্যতম সর্ত্ত হইল এই যে, যতদিন না সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী গঠিত হইতেছে ততদিন যুযুধান দেশদ্বয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধসংখ্যক ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য রাখিতে হইবে। স্যার এণ্টনী ইডেনের উক্ত সর্ত্তটিই মিঃ বাটলারের ঘোষণার মধ্যে প্রতিফলিত দেখা যায়। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ সেলুইন লয়েড সাধারণ পরিষদে অবিলম্বে বৃটিশ, ফরাসী ও ইস্রাইলী সৈন্য অপসারণ সংক্রান্ত প্রস্তাবের আলোচনার সময় গত ২৩শে নবেম্বর বলেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী যখনই কার্য্যকরী ভাবে তাহাদের দায়িত্ব পালনে সমর্থ হইবে তখনই বৃটিশ সৈন্য অপসারণ করা হইবে। সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে তাঁহার এই সর্ত্ত-দাবীর একমাত্র তাৎপর্য্য এই যে, তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যাহা কর্ত্তব্য ছিল এবং যে কর্ত্তব্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ করে নাই, মিশর আক্রমণ করিয়া বৃটেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হইয়া সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ এবং বৃটিশ কমন্স সভায় মিঃ লয়েডের বক্তৃতা হইতে ইহা বেশ ভাল ভাবেই বুঝিতে পারা যায়।

মিশর হইতে বৃটিশ, ফরাসী ও ইসরাইলী সৈন্য অপসারণের নির্দ্দেশ দিয়া ২৪শে নবেম্বর সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ৩রা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ লয়েড বৃটিশ সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করিতে পারেন নাই। ৩রা ডিসেম্বর কমন্স সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ লয়েড বলিয়াছেন যে, ইঙ্গ-ফরাসী কার্য্যের ফলে একটা আঞ্চলিক যুদ্ধ বন্ধ হইয়াছে। তিনি বলেন, "আমরা উহার বিস্তারলাভ করা বন্ধ করিয়াছি।" কিন্তু ইহা সকলেই জানে যে, বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য মিশর আক্রমণকারী ইস্রাইলকে আক্রমণ করে নাই, আক্রমণ করিয়াছিল আক্রান্ত মিশরকে। বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য আঞ্চলিক যুদ্ধ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে মিশর আক্রমণ করে নাই, বরং আঞ্চলিক যুদ্ধকেই আরও শক্তিশালী করিয়াছিল। এই আঞ্চলিক যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, ইহা বুঝিয়াই সুয়েজ খাল দখলের জন্য তাহারা মিশর আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ বুলগানিন যখন বৃটিশ ও ফরাসী প্রধান মন্ত্রিদ্বয়কে সতর্ক করিয়া দিয়া জানাইলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে আক্রমণ পর্য্যুদস্ত করিতে এবং পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে রাশিয়া বদ্ধপরিকর, তখন বৃটেন ও ফ্রান্স বুঝিতে পারিল, মিশরের যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। যখন ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল তখনই যুদ্ধ বিরতির নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। মিঃ লয়েড ইহাও বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, বৃটেন ও ফ্রান্সের সামরিক কার্য্যকলাপের ফলে রাশিয়া কতখানি অনুপ্রবেশ করিয়াছে তাহা জানিতে পারা গিয়াছে। এই প্রসঙ্গ ইহা উল্লেখযোগ্য যে, গত ৮ই নবেম্বর (১৯৫৬) পিটার থর্ণিক্রফট বৃটিশ কমন্স সভায় বলিয়াছিলেন যে, রাশিয়া যে মিশরকে খুব ভালরূপে অস্ত্রসজ্জিত করিয়াছে, মিশরে বৃটিশ হস্তক্ষেপের ফলে তাহা জানিতে পারা গিয়াছে। কিন্তু একথাটা মোটেই ঠিক নয়।
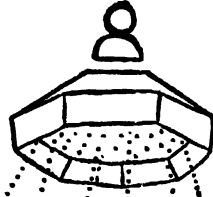
নিম তৈল থেকে
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে
প্রস্তুত সুগন্ধি
মার্গো সোপের প্রচুর
ফেনা যেমন
নির্মলকর তেমনি
জীবাণুনাশক।
মার্গো সোপ দেহের
কান্তি উজ্জ্বল করে।
কোমল ত্বকের
পক্ষেও ব্যবহার করা
সম্পূর্ণ নিরাপদ।
স্নানের সময়
ব্যবহার করতে ভুলবেন না
MARGO
SOAP
HYGIENIC TOILET SOAP
মার্গো
সোপ
ক্যালকাটা কেমিক্যাল
কোম্পানি লিমিটেড
কলিকাতা ২৯
CMC-5 BEN

মিশরকে রাশিয়া যে সকল অস্ত্রশস্ত্র দিয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণ ২১শে অক্টোবর তারিখেই বৃটেন পাইয়াছে। বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে নূতন রাষ্ট্রমন্ত্রী কমাণ্ডার নবোল ১৯শে নবেম্বর একথা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং বৃটেন ও ফ্রান্সের মিশর আক্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মিশরকে রাশিয়া কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র দিয়াছে তাহা জানা নয়, এই সকল অস্ত্রশস্ত্র পাইয়া সামরিক শক্তিতে মিশর যেটুকু শক্তিশালী হইয়াছিল তাহা ধ্বংস করা। এই উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইয়াছে তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাব মানিয়া লইয়া বৃটেন সৈন্য অপসারণ করিতে রাজী হইয়াছে কি না, এবিষয়ে আমরা পূর্ব্বেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছি। বৃটেন ও ফ্রান্স মিশর হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে রাজী হওয়ার কয়েকটি কারণ বিশেষভাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে। প্রথমেই ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মিশর হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারিত করা না হইলে রুশ নাগরিকদের স্বেচ্ছাসেবকরূপে মিশরের দেশরক্ষা বাহিনীতে যোগদান করিতে বাধা দিবেন না বলিয়া রুশ গবর্ণমেণ্ট স্থির করেন। দ্বিতীয়তঃ মিশর আক্রমণ লইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মৈত্রীর মধ্যে ফাটল ধরিতে আরম্ভ করে। তৃতীয়তঃ বাগদাদচুক্তি ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয় এবং চতুর্থতঃ বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যেও ভাঙ্গন ধরিবার আশঙ্কা দেখা দেয়। কমনওয়েলথে ভাঙ্গন ধরার আশঙ্কা বৃটেন খুব গুরুতর মনে করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের কমনওয়েলথ ত্যাগ ভারতীয় জনগণ দাবী করিলেও প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু উহার বিরোধী।

নেহরুজীই কমনওয়েলথকে ভাঙ্গনের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বাগদাদ চুক্তিকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য পাকিস্তান বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মতদ্বৈধ তীব্র আকার ধারণ করাকে বৃটেন বিশেষ ভাবে ভয় করে। মতবিরোধটা বেশীদূর গড়ায়, ইহা অবশ্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও চায় না। লণ্ডন ও প্যারীতে মার্কিণ-বিরোধী প্রবল মনোভাব গড়িয়া উঠে। গত ২৪শে নবেম্বর মিশর হইতে সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও সমর্থন করে। সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরোক্ষ ভাবে বৃটেনের উপর চাপ দিয়াছে, ইহা মনে করিলেও ভুল হইবে না। প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের সহিত বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেনের সাক্ষাৎকারের কোন ব্যব[স্থা] করা সম্ভব হয় নাই। অথচ ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহরুজীর সহি[ত] প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের সাক্ষাৎকারের আয়োজন চলিতেছে আমেরিকার পরোক্ষ চাপ, ইঙ্গ-মার্কিণ মতভেদ আরও প্রবল হওয়া[র] আশঙ্কা এবং মিশরে সোভিয়েট স্বেচ্ছাবাহিনীর আগমনের আশ[ঙ্কা] এই কয়েকটি মিলিত হইয়াই যে বৃটেনকে মিশর হইতে সৈ[ন্য] অপসারণে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, ইহা মনে করিলে বোধ হয় ভু[ল] হইবে না। তা ছাড়া বৃটেনের এই আশাও আছে যে, আন্তর্জাতি[ক] বাহিনী মিশরে উপস্থিত থাকার সময়েই সুয়েজ খাল সম্পর্কে কর্ণে[ল] নাসেরের সহিত আলোচনা হইয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গের দাবী অনুযা[য়ী] একটা মীমাংসা হইবে। মিঃ লয়েড তাঁহার উল্লিখিত বক্তৃতায় এ[ই] আশাই প্রকাশ করিয়াছেন।

মিশর আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিলেও বৃটেনকে বাধ্য হইয়া পোর্ট সৈয়দ হইতে সৈন্য অপসারণের হীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে ইহার উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। কি[ন্তু] মিশর আক্রমণ করার মূলে বৃটেন ও ফ্রান্সের কি [কি] উদ্দেশ্য ছিল এবং উহা কতটুকু সিদ্ধ হইয়াছে, তাহ[া] আলোচনা করা উপেক্ষার বিষয় নয়। মিশর আক্রমণের প্রধা[ন] উদ্দেশ্য ছিল দুইটি, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। প্রথ[ম] উদ্দেশ্য সুয়েজ খাল দখল করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মিশরের শাসন ক্ষমতা এবং আরব-জগতের নেতৃত্ব হইতে কর্ণেল নাসেরকে বিচ্যু[ত] করা। এই দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইতে পারিল না [সে] সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। পোর্ট সৈয়দ দখল করিয়াও বৃটেনকে রিক্ত হ[স্তে] ফিরিতে হইল। কিন্তু রাশিয়ার নিকট হইতে অস্ত্র সাহায্য পাইয়[া] মিশর যে সামরিক শক্তি অর্জ্জন করিয়া ছিল তাহা ধ্বংস করা এব[ং] কর্ণেল নাসেরকে অন্যান্য আরব-রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে দুর্ব্বল প্রতিপন্ন করা[ই] যে মিশর আক্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, ইহা মনে করিলে ভু[ল] হইবে না। শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি যে সিদ্ধ হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য মিশর আক্রমণ পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রতি আরব-রাষ্ট্র সমূহের তিক্ত মনোভাব আরও বৃদ্ধিই শুধু করে নাই আরবসংহতিকে আরও শক্তি[-] শালী করিয়াছে। একথা অবশ্য সত্য যে, মিশরের প্রতি কার্য্যক[রী] সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্য সিরিয়া ও জর্ডান ইসরাইলকে আক্রম[ণ] করে নাই। কর্ণেল নাসের ইহা চাহেন নাই, না, ইহার অন্য আর[ও] কোন কারণ আছে তাহা অবশ্য ভাবিবার বিষয়। কিন্তু ইঙ্গ-ফরা[সী] আক্রমণের ফলে মিশরের সামরিক শক্তি যে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে ই[হা] মনে করিলে ভুল হইবে না। তা ছাড়া এই আক্রমণের ফ[লে] মিশরের আরও বিপুল ক্ষতি হইয়াছে। হাজার হাজার মিশরী গৃহ[-] হীন ও নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। বোমা-বর্ষণের ফলে গৃহাদি ধ্ব[ংস] হওয়ায় এক পোর্ট সৈয়দ হইতেই পাঁচ হাজার নারী ও শিশু[কে] অপসারিত করা হইয়াছে! মিশরের যে সকল সহরের উপর বোমা বর্ষিত হইয়াছে সবখানেই এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বৃটিশ-গবর্ণমে[ণ্ট] অবশ্য ব্যাপারটাকে অত্যন্ত লঘু করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন গত ১৩ই নবেম্বর (১৯৫৬) কমন্স-সভার এক প্রশ্নের উত্তরে মি[ঃ] বাটলার বলিয়াছেন যে, পোর্ট সৈয়দ সর্ব্বপ্রকার সামরিক আক্রমণে[র] ফলে সামরিক ও অসামরিক লোক মিলিয়া মোট ১০০ জন নিহ[ত] এবং ৫৪০ জন আহত হইয়াছে। কিন্তু মার্কিণ সংবাদপত্রে প্রত্যক্ষদর্শী

যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, পোর্ট-সৈয়দে অন্ততঃ দুই হাজার লোক নিহত হইয়াছে। ইহার অর্থ, পোর্ট-সৈয়দের অধিবাসীদের প্রতি ২০ জনে একজন নিহত হইয়াছে। নিহত ও সম্পত্তি ধ্বংস হওয়ার দিক হইতেও মিশরের বিপুল ক্ষতি হইয়াছে। সামরিক ও এই সকল ক্ষয়ক্ষতি মিশর কতদিনে সামলাইয়া উঠিতে পারিবে, তাহা অনুমান করা কঠিন।

আলজেরিয়ায় বিদ্রোহীদিগকে মিশর হইতেই কার্য্যকরী সাহায্য দান করা হইয়া থাকে, ইহাই ফরাসী গবর্ণমেণ্টের ধারণা। মিশর যাহাতে আর এইরূপ সাহায্য দিতে না পারে, ইহাও মিশর আক্রমণের অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম, ইহা মনে করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইয়াছে তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। মিশর আক্রমণের আর একটা উদ্দেশ্য ঝিকে মারিয়া বৌকে শিখাইবার ব্যবস্থা, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে কি? মিশরের নেতৃত্বে আরব রাষ্ট্রগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছিল। ইহাতে মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমী শক্তিবর্গের স্বার্থ বিপন্ন হইয়া পড়িতেছিল। মিশর আক্রমণ করিয়া বৃটেন ও ফ্রান্স অন্যান্য আরব রাষ্ট্রকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহাদের ভাগ্যে মিশরের অবস্থা ঘটিবে। বৃটেন ও ফ্রান্সের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল না ইহা স্বীকার করা যায় না। বৃটেন ও ফ্রান্সের মিশর আক্রমণ নিরপেক্ষ ছোট ছোট শক্তিগুলিকে যে এক নূতন শিক্ষা দিয়াছে তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। মিশর ভারতের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করিয়াছে এবং পঞ্চশীলে বিশ্বাসী হইয়াছে। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্স মনে করে, সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া মিশর তাহাদের ক্ষতি করিয়াছে। বৃটেন ও ফ্রান্সের ন্যায় শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি মনে করে, রাশিয়া হস্তক্ষেপ করিয়া বিশ্বযুদ্ধ বাধাইতে চাহিবে না। যুদ্ধ আঞ্চলিক সীমায় আবদ্ধ থাকিবে এই ভরসায় যে কোন শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র যে কোন অজুহাতে কোন দুর্ব্বল রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিতে পারে। নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি এবং বিশ্বজনমতের নৈতিকশক্তি এই আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। শেষ পর্য্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চাপে আক্রমণকারী রাষ্ট্র যদি তাহার মুখের গ্রাস ফেলিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলেও আক্রান্ত দেশের বিপুল ক্ষতি অপূরণীয় থাকিয়া যাইবে। কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র নিজের ক্ষতি হইয়াছে মনে না করিতে পারে, এইরূপ নীতি অনুসরণ করাই নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আত্মরক্ষা করার একমাত্র উপায়। ইহাও মিশরের যুদ্ধের আর একটি শিক্ষা।

একথা অবশ্য সত্য যে, মিশর আক্রমণ করায় বৃটেন ও ফ্রান্সেরও কম ক্ষতি হয় নাই। বৃটেনের স্বর্ণ ও ডলারের মজুত তহবিল হ্রাস পাইয়াছে। বৃটেন ও ফ্রান্সের শিল্পগুলিতে উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে এবং উহার প্রতিক্রিয়া সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অনুভূত হইতেছে। বৃটেনের বস্ত্রশিল্প ও মোটরশিল্প বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সুয়েজ খাল বন্ধ হওয়ায় খাল পথে তৈলবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ হইয়াছে। ইরাক পেট্রোলিয়ম কোম্পানীর তৈলের তিনটি পাইপ উড়াইয়া দেওয়ায় পাইপ দ্বারা তৈল চালান দেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সৌদী আরব হইতে তৈলের যে পাইপ গিয়াছে তাহা ঠিকই আছে। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্সকে তৈল দেওয়া সৌদী আরব নিষিদ্ধ করিয়াছে। ফলে বৃটেন ও ফ্রান্সে পেট্রলের অভাব দেখা দিয়াছে। বৃটেনকে পেট্রল রেশনিংএর ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য বৃটেন ও ফ্রান্সকে তৈল দিয়া সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছে। এই সাহায্য পাইলেও তৈলের অভাব পূরণ হইবে না। মধ্যপ্রাচ্যের মূল্যবান বাজার সাময়িক ভাবে হাতছাড়া হইয়াছে। আমদানী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থ নৈতিক দিক হইতে সকল প্রকার ক্ষতির তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। মিশর আক্রমণের প্রথম ফল হইয়াছে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেনের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়া। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁহাকে জেমেকায়ে যাইতে হইয়াছিল। মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলির সহিত বৃটেনের সম্পর্কের গুরুতর অবনতি ঘটিয়াছে। সিরিয়া ও সৌদী আরব বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। জর্ডান ফ্রান্সের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। কিন্তু বৃটেনের নিকট হইতে জর্ডান যে সাহায্য পায় তাহা লইয়াই দেখা দিয়াছে প্রধান সমস্যা। আরব রাষ্ট্রগুলি জর্ডানকে এরূপ অর্থ সাহায্য দিতে পারিবে কি না যাহাতে জর্ডানের পক্ষে বৃটিশ সাহায্য প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হইতে পারে, ইহা-ই জর্ডানের এখন প্রধান বিবেচনার বিষয়। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্সের তুলনায় মিশরের ক্ষতিই যে বেশী হইয়াছে সে-কথা বলাই বাহুল্য। এই ক্ষতির ধাক্কা মিশর কতদিনে সামলাইয়া উঠিতে পারিবে, তাহা অনুমান করা কঠিন। তা ছাড়া সুয়েজ খালটিকে পুনরায় জাহাজ চলাচলের উপযোগী করা একটা বৃহৎ সমস্যা হইয়া রহিয়াছে। মিশর আক্রমণের ফলে প্রথমেই অবরুদ্ধ হইয়াছে সুয়েজ খাল। বোমা বর্ষণের ফলে জাহাজডুবী হইয়া সুয়েজ খাল অবরুদ্ধ হইয়াছে। উহাকে আবার মুক্ত করা বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এই ব্যয় বহন করিবে কে? মিশরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী প্রেরিত হইয়াছে। উহার জন্যও ব্যয় বড় কম হইবে না। এই ব্যয়ই বা বহন করিবে কে? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে যদি এই ব্যয় বহন করিতে হয় তাহা হইলে আক্রমণকারী বৃটেন ও ফ্রান্সকেই সাহায্য করা হইবে। বৃটেন ও ফ্রান্সের দুষ্কর্ম্মের জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রকে খেসারত দিতে হইবে কেন তাহার কোন কারণ নাই। এই ব্যয় বৃটেন ও ফ্রান্সেরই বহন করা উচিত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এই ব্যয় বহনের জন্য বৃটেন ও ফ্রান্সকে যদি বাধ্য করিতে না পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এইরূপ আক্রমণের পথ খোলাই থাকিবে।

পোর্ট-সৈয়দ হইতে বৃটেন ও ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী অপসারিত হওয়ার পর সুয়েজ খাল পরিচালন সংক্রান্ত প্রশ্নটি মীমাংসা করিতে হইবে। সুয়েজ খালের উপর পশ্চিমী শক্তিবর্গের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই বৃটেন ও ফ্রান্স মিশর আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। সুয়েজ খালের আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণে মিশর কিছুতেই রাজী হইবে না। তবে সুয়েজ খালপথে অবাধে জাহাজ চলাচল সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা দ্বারা একটা মীমাংসা করিতে কর্ণেল নাসেরেরও আপত্তি নাই। বৃটেন ও ফ্রান্স যদি মনে করে যে, এই আক্রমণের ফলে মিশরের বেশ শিক্ষা হইয়াছে এবং সুয়েজ খালের আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণে কর্ণেল নাসের রাজী হইবেন, তাহ

লাক্মে
ট্যালকাম পাউডার
সতেজ রাখে

হইলে তাহা ভুল ধারণা। মিশরের উপর চাপ দিবার জন্য মিশরে আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীর উপস্থিতিতে মিশরের সহিত আলোচনার ব্যবস্থা করার যে দাবী বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ লয়েড করিয়াছেন, মিশর তাহাতেও রাজী হইবে না। সুয়েজ খাল পরিচালন ব্যবস্থায় মিশরের সার্ব্বভৌম অধিকার যেমন রক্ষা করিতে হইবে তেমনি ব্যবস্থা করিতে হইবে শান্তি ও যুদ্ধের সময়ে সুয়েজ খাল পথে অবাধে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা। ইহা যে সম্ভব ভারতের প্রস্তাব আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। মিশর আক্রমণের প্রাক্কালে ভারত একটি নূতন প্রস্তাব করিয়াছিল। সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে মিশর হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারণই শুধু করিলে হইবে না, সুয়েজ খাল মুক্ত করার এবং আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীর ব্যয় কে বহন করিবে তাহারও ন্যায়সঙ্গত সমাধান করিতে হইবে!

হাঙ্গেরীতে কি ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে—

হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা যে এখনও শান্ত তাহা বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু হাঙ্গেরীতে কি ঘটিয়াছে এবং কি ঘটিতেছে তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। বিশ্ববাসীকে হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিবার সুযোগ দিতে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট এবং কাদার গবর্ণমেণ্টের অনিচ্ছা সত্যই অত্যন্ত বিস্ময়কর। হাঙ্গেরীর বাহির হইতে কম্যুনিষ্ট বিরোধীরা উসকানী দিয়াছে এবং বাহির হইতে বহুলোক হাঙ্গেরীতে প্রবেশ করিয়া হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা স্বীকার করিলেও প্রশ্ন থাকে, ইহারা কাহারা? ইহারা কি হাঙ্গেরীত্যাগকারী উদ্বাস্তু? হাঙ্গেরীতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনের জন্য বাহিরের কম্যুনিষ্ট-বিরোধী শক্তিবর্গের উস্‌কানীতেই কি উহারা হাঙ্গেরীতে প্রবেশ করিয়া হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়াছিল? রেডক্রশ খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহ করিবার অছিলায় অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিবার অভিযোগও উঠিয়াছে। উল্লিখিত অভিযোগগুলি যদি সত্য হয় তাহা হইলে বিশ্ববাসীকে উহা নিঃসংশয়িত ভাবে জানিবার সুযোগ দেওয়া কাদার গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহারা যে নীতিগ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে বিশ্ববাসী এই সকল অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে কিরূপে? হাঙ্গেরীর কাদার গবর্ণমেণ্ট এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে, সেগুলিই অত্যন্ত গুরুতর। রেডক্রশের হিসাব অনুযায়ী হাঙ্গেরীতে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে সাত হাজার। কিন্তু বিদ্রোহীদের বেতারে নিহতের সংখ্যা ৬০ হাজার বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। হাঙ্গেরী হইতে হাজার হাজার লোককে রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করার অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। রুশ গবর্ণমেণ্ট এবং হাঙ্গেরী গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাসনের অভিযোগ পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পরে একথা স্বীকার করা হইয়াছে যে, প্রথম দিকে কিছুসংখ্যক লোককে রাশিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল বটে, তবে পরে তাহাদিগকে হাঙ্গেরীতে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে। ইহাতে লোকের মনের আশঙ্কা ও সন্দেহ দূর হইবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

ইম্‌রে নজে এবং তাঁহার সহযোগীদের সম্পর্কে রুশ গবর্ণমেণ্ট এবং কাদার গবর্ণমেণ্টের আচরণও লোকের মনে কম সন্দেহ সৃষ্টি করে নাই। নজে এবং তাঁহার কয়েক জন সহযোগী বুদাপেস্তে যুগোশ্লাভিয়ার দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে কাদার গবর্ণমেণ্টের নিকট আশ্বাস পাইয়াই তিনি এবং তাঁহার সহযোগীরা স্বগৃহে ফিরিবার জন্য যুগোশ্লাভ দূতাবাস হইতে বাহিরে আসিলে তাঁহাদিগকে গ্রেফতার করিয়া অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণ করা হয়। এই গ্রেফতার সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সত্যই চমকপ্রদ! একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, প্রস্তাবিত কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট গঠন সম্পর্কে মিঃ নজে যখন মিঃ কাদারের সহিত পার্লামেণ্ট ভবনে আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময় একজন রুশ সৈন্য সেখানে প্রবেশ করিয়া মিঃ নজে এবং তাঁহার সহযোগীদিগকে গ্রেফতার করে। তাঁহার গ্রেফতার সম্পর্কে যুগোশ্লাভিয়ার সংবাদপত্র 'বোরবা'র বুদাপেস্তস্থ সংবাদদাতা অন্য রকম বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, গত ২২শে নবেম্বর (১৯৫৬) মিঃ নজে এবং তাঁহার ১১জন সমর্থক ১৫জন মহিলা এবং ১৭জন বালক-বালিকাসহ যুগোশ্লাভ দূতাবাস হইতে বাহিরে আসেন এবং হাঙ্গেরী গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের জন্য যে বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই বাসে চড়িয়া তাঁহারা গৃহাভিমুখে রওনা হন। ঠিক সেই সময়ে একজন রুশ অফিসার লাফাইয়া বাসে উঠেন এবং সোভিয়েট নিরাপত্তা বাহিনী বাসখানিকে ঘিরিয়া ফেলে। অতঃপর বাসখানিকে জোর করিয়া সোভিয়েট কম্যাণ্ডাণ্ট রাতে (Kommandantura) লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহাদের সঙ্গে যে দুই জন যুগোশ্লাভ কূটনীতিবিদ ছিলেন তাঁহারা ইহাতে আপত্তি করিলে তাঁহাদিগকে বলপ্রয়োগে রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া হয়। নজে স্বেচ্ছায় অজ্ঞাত স্থানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মস্কো রেডিওর এই ঘোষণা কেহই বিশ্বাস করিবে না। নিজের ইচ্ছায় নজে রুমানিয়ায় গিয়াছেন, বুদাপেস্ত রেডিওর এই এই ঘোষণাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। নজে সম্পর্কে কোন দায়িত্ব সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট অস্বীকার করিলেও কাদার গবর্ণমেণ্টের স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধেও লোকের সন্দেহ আছে। যুগোশ্লাভিয়া সম্পূর্ণরূপেই কাদার গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু নজের ব্যাপারে যুগোশ্লাভিয়াতেও গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে।

হাঙ্গেরিয়ানদিগকে অবিলম্বে রাশিয়ায় চালান দেওয়া বন্ধ করিতে, সোভিয়েট সৈন্যদের অবিলম্বে হাঙ্গেরী ত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ দিয়া কিউবার এক প্রস্তাব গত ২১শে নবেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষকদিগকেও হাঙ্গেরীতে প্রবেশ করিতে দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। ঐ দিনই ভারত, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়া কর্ত্তৃক উত্থাপিত একটি প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষকগণ যাহাতে হাঙ্গেরীর অবস্থা অবগত হইয়া রিপোর্ট দিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে হাঙ্গেরীতে প্রবেশ করিতে দিবার জন্য ঐ প্রস্তাবে অনুরোধ করা হইয়াছে। হাঙ্গেরী গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রস্তাবে রাজী হন নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলকেও হাঙ্গেরীতে যাইতে দিতে প্রথমে হাঙ্গেরী গবর্ণমেণ্ট সম্মত হন নাই। হাঙ্গেরীর অবস্থা সম্বন্ধে রোমে তাঁহার সহিত আলোচনা করার প্রস্তাব করা হয়। অবশেষে হাঙ্গেরী গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে হাঙ্গেরীতে যাইতে দিতে রাজী হইয়াছেন।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৬

রঙমহলে 'শেষ-লগ্ন'

রঙমহলের প্রগতিশীল কর্তৃপক্ষ সুসাহিত্যিক মনোজ বসুর লেখা 'শেষ-লগ্ন' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন সম্প্রতি। 'শেষ-লগ্ন' বেশ একটি মিষ্টি ও কৌতূহল-উদ্দীপক গল্পের নাট্যরূপ। বিবাহ যে সমাজের মানুষকে কত উঁচুতে তুলতে এবং কত নীচুতে নামাতে পারে, এই নাটকে প্রধানতঃ সেই ঘটনাই বিবৃত করা হয়েছে। গৌরী নামে জনৈকা গ্রাম্য মেয়ে আর তার সঙ্গী কলকাতার কলেজে-পড়া বিভা। পাত্র নিজে দেখতে এসে গেঁয়ো মেয়েকে পছন্দ করলে না, পছন্দ করলে শহুরে মেয়েকে। কিন্তু পাত্রের বন্ধু প্রশান্ত সকল সমস্তার সমাধান করলে ঐ গ্রাম্য কন্যাকে বিয়ে করতে চেয়ে। কিন্তু বিবাহের রাতে ষড়যন্ত্রকারী গ্রাম্য মানুষদের চেষ্টা চ'ললো বর যাতে সময়ে না আসতে পারে। বিবাহ হয় যেন বহুবিবাহকারী নিশির সঙ্গে। নাটকের গল্পাংশ খুবই চমকপ্রদ। অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় দীপক এবং রবীনের। দীপকের অভিনয়ে বাঙলা নাটক সম্পর্কে আশান্বিত হ'তে হয়। গোবিন্দর ভূমিকায় জহর রায় দর্শকদের বিস্মিত করেছেন তাঁর অনন্যসাধারণ নৈপুণ্যে। জীবেন বসুও তাঁর চরিত্রের যথাযথ রূপ দিয়েছেন। মহিলাদের মধ্যে প্রণতি ঘোষ নাটকটিকে পরিপূর্ণতার দিকে টেনে নিয়ে গেছেন অদ্ভুত এক অভিনয়দক্ষতায়। অন্যান্য চরিত্রে সত্য, প্রশান্ত, হরিধন, সৌরেন, অজিত, আদিত্য, গীতা, কেতকী, সন্ধ্যা, শুক্লা, সাধনা, শীলা প্রভৃতি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'শেষ-লগ্ন' অন্যান্য প্রদর্শিত নাটকের ধরাবাঁধা রাস্তায় রচিত হয়নি। মঞ্চ কর্তৃপক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাজ-পোষাকের দিকে এবং দৃশ্য পরিবেশনায় অভিনন্দনযোগ্য। নাটকটিকে সর্বাংশে নিখুঁত বলা যায়, অতি সহজেই। দর্শকরাও দেখে আনন্দ পাবেন রীতিমত।

টাকা-আনা-পাই

'পৃথিবীটা কার বশ?' বললেই আমরা জানি সকলেই তারস্বরে চীৎকার করবেন, "পৃথিবী টাকার বশ!" মধু অপেক্ষা মিষ্টতর কি আছে, এ কথা শুধোলেও অনেকে নিশ্চয়ই চেঁচাবেন, "Money is sweeter than honey." আপাতদৃষ্টিতে টাকাকে এরূপ মনে করা একেবারে বিচিত্র নয়। কিন্তু আমাদের সভ্য মানুষের সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে বিচার করলে, টাকাকে সত্যি কি আমরা এতটা উঁচুতে স্থান দিতে পারি? হয়তো পারি না। কিন্তু সাধারণ মানুষ টাকাকেই শ্রেষ্ঠতম মোক্ষ হিসাবে ধ'রে নেয়। টাকাই সাধারণ মানুষের ধ্যান-জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেচনা, মোক্ষ-মুক্তি। 'টাকা স্বর্গ, টাকা ধর্ম্ম, টাকা হি পরমং তপ।' বাঙলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক জ্যোতির্ময় রায় আবার তাঁর স্বভাবসুলভ বক্রকটাক্ষে দেখেছেন টাকাকে। একজন অতি নগণ্যজন হঠাৎ রাতারাতি লক্ষ লক্ষ টাকা পেয়ে গেলে কি বিচিত্র জীবন ধারণ করতে পারে—টাকা-আনা-পাই ছবিতে তারই সম্যক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। সুখের কথা এই, জ্যোতির্ময় রায় অন্যান্য অনেক পরিচালকের মত শুধু ছবি দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকেন না। তাঁর ছবি দেখা মানে কিছু অন্ততঃ শিক্ষা পাওয়া। অপূর্ব্ব চরিত্রচিত্রণ, বলিষ্ঠ ও জোরালো কথোপকথন, সমাজের নগ্নরূপকে সাধারণ্যে তুলে ধরা—টাকা-আনা-পাই ছবিতে পরিচালকের সর্ব্বদিকে সমান দৃষ্টি দেখে সত্যিই বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এই ছবির চমকপ্রদ কাহিনী মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকা প্রতি মাসেই জানতে পারছেন। 'অভিনয়াংশে ছবি বিশ্বাস, রবীন মজুমদার, বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায় একেক অভিনব চরিত্রের রূপ সৃষ্টি ক'রেছেন তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে। অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় এবং বিনতা রায়ও অনুরূপ দক্ষতা দেখিয়েছেন সম্পূর্ণ নতুন ধরণের অভিনয়পটুত্বে। বর্তমানে চটুল নায়িকার প্রাদুর্ভাব হচ্ছে অনেক ছবিতে, যার পরিণাম অভিনয় দেখা নয়, চাতুরী আর চটুলতা দেখতে যাওয়া দর্শকদের পক্ষ থেকে। এ ছবিতে অরুন্ধতী ও বিনতার অভিনয় দেখলে দেশের ছেলে-মেয়েরা অনেক কিছু শিখতে পারবেন। পরিচালক রায় তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধের সঙ্গে বেশ মিষ্টি কশাঘাত করেছেন বর্তমান সমাজকে। এই ধরণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছবির একটি চিরকালীন মূল্য আছে—সত্যি টাকা-আনা-পাইয়ের মাধ্যমে যার বিচার চলে না। ছবিটি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়েছে।

মিনার্ভায় 'প্রত্যাবর্তন'

মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে সদ্যমুক্ত নাটক 'প্রত্যাবর্তন' গতানুগতিক পন্থায় রচিত মামুলী নাটক নয়—যাতে অন্ততঃ একজনও বিকলাঙ্গ নেই। গ্রাম্য-কাহিনীতে নাটকাংশ বিস্তৃত। অসবর্ণ বিবাহের দ্বারা সমাজে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জমিদার মহিমারঞ্জন এবং তাঁর বন্ধু জনার্দন যৌবনে অসবর্ণ বিবাহ করেন। মহিমারঞ্জন সাহসের অভাবে বিয়ের কথা গোপন রাখেন। বিবাহিতা স্ত্রীকে তিনি কাশীতে লুকিয়ে রেখে আসেন। পিতার মৃত্যুর পর যখন স্ত্রীর খোঁজে যান, তখন স্ত্রী মারা গেছেন। তাঁর একমাত্র ছেলের কোন খোঁজই তিনি পান না। তখন থেকে মহিমারঞ্জনের দুঃখপূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবনের সূত্রপাত। অনুশোচনার দাহে দগ্ধ হ'তে থাকেন। স্ত্রীর প্রতি তাঁর এই অবিচারের জন্য বন্ধু জনার্দন, বন্ধুর মুখ পর্যন্ত আর দেখেন না। পঞ্চাশোর্দ্ধে পৌঁছে মহিমারঞ্জন সহসা অনিদ্রা রোগে আক্রান্ত হন। তখন চিন্ময় নামে একজন ডাক্তার আসেন রোগীর সেবা ও চিকিৎসার্থে। এই ডাক্তারের সঙ্গে জনার্দনের [illegible]

ভালবাসা হয়, কিন্তু বিবাহে সম্মতি দিতে পারে না অজ্ঞাত পিতৃ-পরিচয়ের জন্য। শেষ দৃশ্যে জানা যায়, চিন্ময় মহিমারঞ্জনেরই হারানো ছেলে। অভিনয়াংশে আছেন একদল নবাগত—যাঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ চরিত্রে সু-অভিনয় করেছেন। ভবেন, প্রশান্ত চৌধুরী (নাট্যকার), হারাধন, সলিল, রাধারমণ এবং সুদীপ্তা, লীনা, অণিমা, লীলাবতী ও গীতশ্রী প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য। নাট্যকারের সাবলীল ও সর্বাঙ্গসুন্দর নাটকটি দর্শকদের কাছে সত্যিই উপভোগ্য হয়েছে। 'প্রত্যাবর্তন'এর যথাপ্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিল্পী

এক দরিদ্র গ্রাম্য মৃৎশিল্পী ধীমান ও সম্ভ্রান্ত জমিদার রায়রায়ান-নন্দিনী অঞ্জনার হ'ল হৃদয়-বিনিময়। রায়রায়ান স্থির করলেন, পরলোকগত বন্ধুপুত্র বিলেত ফেরৎ সুশীলের সঙ্গে অঞ্জনার বিয়ে দিতে। শুরু হ'ল সংঘাত, রায়রায়ানের জমিদারসুলভ অত্যাচারের হাত থেকে ধীমানকে বাঁচাতে অঞ্জনাই তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়, যাতে করে ধীমান অন্ততঃ প্রাণে বাঁচে। ধীমান দেশে ফিরে শুধু ছবি এঁকে দিন কাটায়—শুরু করে শরীরের প্রতি অত্যাচার। গোপালপুরে চেঞ্জে গিয়েও অঞ্জনা মানসিক জ্বালা সহ্য করতে না পেরে উদ্যত হয় সমুদ্রের জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে। সুশীল জানতে পারে সব। প্রতিশ্রুতি দেয় ধীমানকে সে খুঁজে আনবেই। অবশেষে বহু প্রচেষ্টায় রায়রায়ানের মন টলল—ভগিনী অঞ্জনার শিক্ষক ও সুশীলকে নিয়ে পিতাপুত্রী যখন ধীমানের বাড়ী পৌছলেন তখন অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় ধীমান মৃত। চিত্রগ্রহণে অভিনন্দনযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন চিত্রকর রামানন্দ সেন। তাঁকে ধন্যবাদ! অভিনয়ে সকলকে অতিক্রম করে গেছেন সুচিত্রা সেন, তাঁকে তিন অংশে দেখা যাচ্ছে—বাপের আদুরে মেয়ে, প্রেমিকা ও ব্যর্থ প্রেমিকা। তিনটি অংশই তিনি সমান কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রেমের প্রথম আস্বাদ এক কিশোরীর মনে কি রকম রেখাপাত করে, সুচিত্রার অভিনয়ে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। সুচিত্রার পরেই ধন্যবাদ পাবেন জলদকণ্ঠ কমল মিত্র। ছোট্ট ভূমিকায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। শিখাবাণীর অভিনয়ও মনে দাগ কাটে। এ ছাড়া পাহাড়ী সান্যাল, উত্তমকুমার, অসিতবরণ, ভূপেন চক্রবর্তী, ডাঃ হরেন, পঞ্চানন ভটাচার্য, গোকুল মুখোপাধ্যায়, অমরকুমার, মলিনা দেবী, শোভা সেন, গীতা দে প্রভৃতিকে দেখা যাবে এই চিত্রে। বিখ্যাত শিল্পী রথীন মৈত্রও এক শিল্পীর ভূমিকায় রূপ দিয়ে আনন্দ দিতে পেরেছেন দর্শক-সাধারণকে।

সীঁথির সিঁদুর

মনোজ আর সুনন্দার হল মন-বিনিময়। কোন কারণে তার শেষরক্ষা হয় না—সুনন্দার বিয়ে হয় এক ধনী অথচ মাতাল লম্পটের সঙ্গে। মনোজের হয় বিবাহ। মনোজ চাকরী নেয় সুনন্দারই স্বামীর অফিসে—একদিন সুনন্দার সঙ্গে আকস্মিক ভাবে দেখা হয়ে যাবার পর সুনন্দা স্বামীর অবজ্ঞায় অস্থির হয়ে পূর্বজীবন পেতে চায় ফিরে। মনোজ প্রত্যাখ্যান করে। প্রতিশোধ নেবার জন্যে সুনন্দা স্বামীকে বলে, মনোজ তাকে অপমান করেছে। তার ফলে মিঃ ঘোষ ক্যাশ ভাঙ্গার অভিযোগ আনেন মনোজকে ... (যে টাকা তিনিই ভুলিয়েছেন মনোজকে দিয়ে) যার ফলে সদ্যপ্রসবা স্ত্রীকে হাসপাতালে ফেলে রেখেই মনোজ গা-ঢাকা দেয়। তারপর ঘটনাচক্রে আবার মিলন, যার কেন্দ্র হল মনোজের আশ্রয়দাতার পুত্রের সঙ্গে তারই কন্যার প্রেম, পরে বিবাহ। মোটামুটি এই গল্পের উপাদান, মামুলি গল্প। কি কাহিনীতে কি পরিচালনায় খুব একটা উঁচুদরের কৃতিত্ব কোনটিই পরিলক্ষিত হয় না। সঙ্গীতাংশ খুব খারাপ নয়। তবে অর্ধেন্দু সেনের কাজে একটা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সুর পাওয়া যায়। এ ছবি আশানুরূপ সাফল্যের বাহক না হলেও অর্ধেন্দু বাবুর ভবিষ্যতের ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধে খানিকটা আঁচ পাওয়া যায় বৈ কি। একটা জিনিষ চোখে লাগে—মনোজ কথা বলতে বলতে এগিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে অথচ তার কথা বলার শব্দ এক রকমই থেকে যাচ্ছে। ক্ষীণ হয়ে আসা উচিত নয় কি? ফ্ল্যাশ ব্যাক করে মনোজ সুনন্দা প্রসঙ্গে না দেখালেই ভালো হত। জলের গ্লাসে অনুশীলার মুখের পরিকল্পনা প্রশংসার্হ। মনোবিজ্ঞান সম্মত দেখলে রেলগাড়ীতে পুলিশ দেখে রীতিমত ভাবান্তর হওয়া উচিত মনোজের, কিন্তু তা সে হল না—আর হল নাই যখন তখন কি প্রয়োজন হ'ল রেলগাড়ীতে পুলিশ দেখাবার? হোটেল বা মেস হলেই কি তার বাসিন্দারা ছ্যাবলা হবে? অন্ততঃ বাঙলা ছবি তো আজ সেই কথাই বলতে চাইছে। অত দিন পেরিয়ে গেল এক মনোজ ছাড়া কারো বয়স বাড়ল না! রমা প্রথম দৃশ্যে যা শেষ দৃশ্যেও তাই। সুনন্দা মনে হল যেন শাড়ীটা ছেড়ে থানটি পরে এল। অনুশীলার নাচ স্থানোপযোগীই হয়েছে। কানিংহাম সাহেবকে স্বাগত জানাই। রূপশিল্পী শৈলেন গাঙ্গুলীকেও একটি দৃশ্যে দেখা গেল।

চোর

বাবা-মা বা অভিভাবকের সতর্ক ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টির অভাবে একটি বুদ্ধিমান সর্বগুণসম্পন্ন বালক কি ভাবে অধঃপতনের দিকে তিলে তিলে এগোতে থাকে এবং তাতে কতখানি সর্বনাশ হতে পারে তারই সার্থক চিত্রায়ণ চোর! বিচারক মণি সিংহের লেখা, সাহিত্যিক প্রবোধ সান্যালের পরিবর্ধন ও কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে সার্থক ও অভিনন্দনযোগ্য। মুকুল একটি বালক, লেখাপড়ায় ভালো, বুদ্ধি আছে। পূর্ববর্ণনানুযায়ী অবস্থায় বংশীর পাল্লায় পড়ে ধীরে ধীরে শেখে চুরি করতে, বংশী নিয়ে যায় তাদের আড্ডায়, তারপর ঘটনাচক্রে মুকুল তার বন্ধুর মামার বাড়ীতেই যায় চুরি করতে, সেখানে বন্ধুর দিদির চীৎকারে ধরা পড়বার আশঙ্কায় সর্দার গুলী ছোঁড়ে মুকুলের উদ্দেশে, সেই গুলীতে প্রাণ দেয় বংশী—পুলিশও ছিল ওৎ পেতে। দলকে দল সকলেই ধরা পড়ে। মুকুলকেও ফিরে পান তার বাবা-মা। দোষত্রুটি অবশ্যই একটু-আধটু আছে যেমন রোল তিরিশ ডাকার পরেই মাষ্টার মশাই পড়া আরম্ভ করলেন, অথচ বোঝা গেল ক্লাসে অন্ততঃ পঞ্চাশটি না হোক চল্লিশটি ছেলে আছে। অতবড় দেওয়াল-ঘড়িটা মুকুল পকেটে পুরছে কি করে? বংশী চরিত্রটি সত্যিই সহানুভূতির উদ্রেক করে। আমাদের আশে-পাশে কাহিনীর উপজীব্য অসংখ্য ঘটনা ছড়িয়ে রয়েছে, তারই একটিকে আহরণ করে ও নিজের অভিজ্ঞতা তাতে মিশ্রিত করে রচিত হয়েছে এর কাহিনী! প্রত্যেকটি অভিভাবকের এই ছবি দেখে সতর্ক হওয়া উচিত। এই সব পকেট ও পেশাদারী ভিখারীদের মুখোসের আড়ালে যে কি কদর্য

প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে তার একটি মনোরম প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে এই চিত্রে। তবে ছবিটিকে যদি আর একটু রহস্যঘন করা যেত তা'হলে ছবিটি আরো ভালো হত। এ ছবিতে চিত্রশিল্পী অমূল্য মুখোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর চিত্রায়ণ ছবিটিকে সাফল্যের পথে অগ্রগমনে প্রভূত সাহায্য করেছে। অভিনয়ে প্রধান অভিনেতা গুম্ সম্বন্ধে কি বলব? অপূর্ব অভিনয় করেছে গুম, প্রত্যেকটি মুহূর্ত সে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। পরিচালকরা দৃষ্টি দিন এই শিশু প্রতিভাধরের উপর। গুমের পরেই ধন্যবাদ পাবেন মাষ্টার সুখেন। দর্শক-চিত্ত জয় করে নিয়েছেন দিলীপ রায়চৌধুরী প্রথম আবির্ভাবেই। প্রেমাংশু বসুকে দেখা গেল মাত্র একটি দৃশ্যে। 'ধূলায়-ধরণী'তে তাঁকে দেখা গেছে নির্বাক চরিত্রে। প্রেমাংশুর অভিনয়শক্তি উপলব্ধি করবার মত শক্তি কি বাঙলাদেশের পরিচালকদের মধ্যে নেই? তা যদি থাকে তাহলে প্রেমাংশুর মত দক্ষ শিল্পী ও রকম ভূমিকা পান কেন? 'চোর' ছায়াছবিতে এঁরা ছাড়া দেখা যাবে বিকাশ রায়, জীবেন বসু, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, তুলসী লাহিড়ী, রঞ্জিত রায়, প্রীতি মজুমদার, সন্ধ্যারাণী, ছন্দা প্রভৃতি আরও বহু শিল্পীকে।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

'রাণী রাসমণি'র অসামান্য সাফল্যের পর পরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষের আগামী অবদান শ্রীশ্রীমা। এতে শ্রীমার বাল্যজীবন খ্যাতনামা ব্যায়ামবীর বিজয় মল্লিকের কন্যা কুমারী মল্লিকা, কৈশোর জীবন রসসাগর ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগিনী কিশোরী অভিনেত্রী লক্ষ্মী গাঙ্গুলী ও তৎপরবর্তী জীবন শ্রীমতী অনুভা গুপ্তা রূপ দিচ্ছেন, ঠাকুরের ভূমিকায় দেখা দেবেন আবার গুরুদাস। অন্যান্যাংশে দেখা দিচ্ছেন পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, মোহন ঘোষাল, জীবেন বসু, নবগোপাল, ভুবন চৌধুরী, চন্দ্রশেখর দে, কার্তিক সরকার, শান্তি ভট্টাচার্য্য, খগেন পাঠক, সরযু দেবী, মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, পদ্মা দেবী, প্রণতি ঘোষ, ভারতী দেবী, অপর্ণা দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি। চিত্রগ্রহণ করছেন বিদ্যাপতি ঘোষ ও সুর দিচ্ছেন অনিল বাগচী। * * * শরৎচন্দ্রের আঁধারে আলোর চিত্ররূপ দিচ্ছেন শ্রীমতী কানন দেবীর অধিনায়কত্বে শ্রীমতী পিকচার্স। ক্যামেরা চালাচ্ছেন জি কে মেহতা। সুর দিচ্ছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। হরিদাস ভট্টাচার্যের পরিচালনায় এই ছবিতে বিকাশ রায়, বসন্ত চৌধুরী, জীবেন বসু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, তুলসী চক্রবর্তী, পদ্মা দেবী, সুমিত্রা দেবী, যমুনা সিংহ, নীলিমা দাস প্রভৃতি শিল্পীদের দেখা যাবে। বহু বছর আগে চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে এই কাহিনী আর একবার চিত্রায়িত হয়েছিল, তাতে রূপ দিয়েছিলেন নটগুরু শিশিরকুমার, নটশেখর নরেশচন্দ্র, প্রখ্যাত শিল্পী ও শিল্প নির্দেশক স্বর্গীয় রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (দেবুবাবু) দুর্গা দেবী প্রভৃতি। * * * সুখ্যাত চিত্রবিদ সুধীর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় চিত্রায়িত হয়েছে 'সিঁদুর', রবেন রায়ের 'মর্তের মৃত্তিকা' কাহিনীটির এই চিত্রায়ণের জন্যে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। সঙ্গীত ও ক্যামেরার ভার পড়েছে যথাক্রমে রবীন চট্টোপাধ্যায় ও দেওজীভাইয়ের উপর। রূপায়ণে পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, রবীন মজুমদার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বেচু সিংহ, সন্ধ্যারাণী দেবী, মঞ্জু দে, রাজলক্ষ্মী দেবী ও নবাগতা শ্রীমতী মনীষা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। * * * মণি বর্মার তাপসীর কাজ চিত্ত বসুর পরিচালনায় এগিয়ে চলেছে। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন নচিকেতা ঘোষ। রূপ দিচ্ছেন—অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, অসিতবরণ, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, শুভেন মুখোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল, অনুপকুমার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বিভু, মালনা দেবী, চন্দ্রা দেবী, সন্ধ্যারাণী দেবী, রেণুকা রায়, বনানী চৌধুরী প্রভৃতি। * * * বেশ কিছুকাল পূর্বে শ্রীখগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের অভয়ের বিয়ে দেখা দিয়েছিল রূপালী পর্দার বুকে। বর্তমানে খগেন বাবু ঐ কাহিনীই আবার চিত্রায়িত করাচ্ছেন পরিচালক সুকুমার দাসগুপ্তকে দিয়ে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন জ্যোতির্ময় রায়। আলোকচিত্র ও সঙ্গীতের বিভাগ দুটির ভার পেয়েছেন যথাক্রমে বিশু চক্রবর্তী ও রবীন চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়াংশে দেখা যাবে—ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, উত্তমকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, প্রণতি ঘোষ, শোভা সেন, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি শিল্পীকে * * * খ্যাতিমান রসায়নাগারিক, শৈলেন ঘোষালের সহধর্মিণী শ্রীমতী লীলা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে 'পুনর্মিলন' ছবিটি তোলা হচ্ছে। জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মিত্র, উত্তমকুমার, প্রেমাংশু বসু, অনুপকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সরযু দেবী, মঞ্জু দে, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি অভিনীত এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন মানু সেন।

শুক্রবারের বেতারনাট্য

৭ই অগ্রাণ—গ্রহচক্র। কাহিনী গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা শৈলজানন্দ। ভূমিকায় বীরেশ্বর সেন, রামকৃষ্ণ রায়-চৌধুরী, গঙ্গাধর সেন, অমরেশ ঘোষ, শিপ্রা মিত্র, আলো দাশগুপ্তা শ্বেতা মৈত্র। * * ১৪ই অগ্রাণ—বিদূষক। কাহিনী সুশীলচন্দ্র রায়চৌধুরী, পরিচালনা শ্রীধর ভট্টাচার্য। ভূমিকায়—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির মিত্র, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, হরিধন মুখোপাধ্যায়, শচীনাথ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব মিশ্র, কালীপদ চক্রবর্তী, মীনাক্ষী দত্ত, (বুদ্ধ প্রতিভা-নন্দিনী), মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা সেন, অমিতা বসু, রমা অধিকারী। * * ২১এ অগ্রাণ—পাণ্ডবগৌরব। কাহিনী গিরিশচন্দ্র, পরিচালনা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। ভূমিকায় অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। মিহির ভট্টাচার্য, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর, চন্দ্রশেখর দে, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, সত্যেন মুখোপাধ্যায়, রাজকুমার মৈত্র, মণি ঘোষ, অরুণকুমার রুদ্র, বিজন রায়চৌধুরী, সরযূবালা দেবী, উষাবতী দেবী, রুবি মুখোপাধ্যায়, শুক্লা দাস, দীপা পালচৌধুরী ও শৈলজানন্দ। * * ২৮এ অগ্রাণ—বিপত্তি। কাহিনী লীলা মজুমদার, পরিচালনা শ্রীধর ভট্টাচার্য। ভূমিকায় প্রেমাংশু বসু, শিশির বটব্যাল, ডাঃ হরেন, মুরারি মুখোপাধ্যায় (বাণীবাবু), রাধারমণ পাল, সুশীল দেব, নমিতা সিংহ, কবিতা রায়, অরুণপ্রভা চট্টোপাধ্যায়।
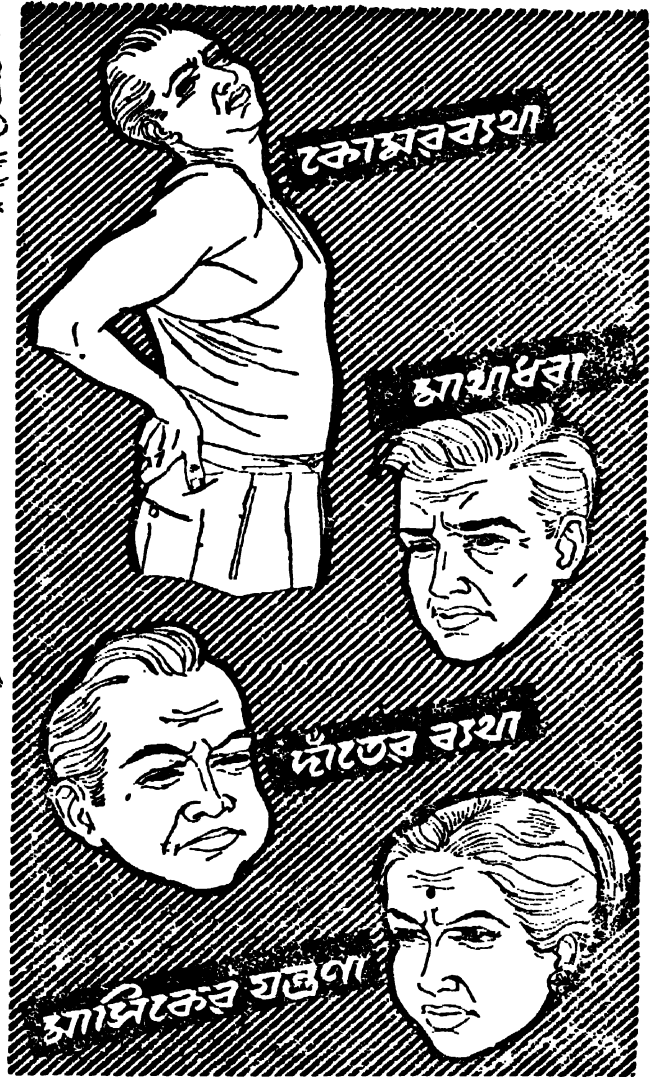
মাথাধরা, দাঁত কন্‌কনানি, কোমর ব্যথা, গা ব্যথা ও গা ম্যাজমেজানিতে সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা কমিয়ে আরাম পেতে চান তো সারিডন খান। সারিডন সব দেশেই ব্যথা কমাবার বিখ্যাত ওষুধ। এতে আশ্চর্য কাজ হয়। এর কাজ তিন রকমের :

ব্যথা কমায় : সারিডন খাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সব রকম ব্যথা কমায়—অথচ এতে পেটের গণ্ডগোল বা শরীরের অবসাদ আসে না।

আরাম দেয় : সারিডন স্নায়ুমণ্ডলীকে শান্ত করে, ব্যথাজনিত স্নায়ুর উত্তেজনা দূর করে—আরাম দেয় ও উৎফুল্ল রাখে।

চাঙ্গা করে : অসহ্য ব্যথা ও তার ফলে ঘুম না-হওয়ার দরুণ যে ক্লান্তি আসে, সারিডন-এর মৃদু উত্তেজক গুণে তা দূর হয়। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই চাঙ্গা হ'য়ে কাজে হাত দেওয়া যায়।

সারিডন যে এত উপকারী তার কারণ, এর ভেতরকার মসলাগুলো মিলেমিশে সমবেতভাবে ব্যথা কমাবার কাজ করে।

- একটি বড়ির দাম ২ আনা
- একটি বড়ি পুরো একমাত্রা
- এতে অ্যাস্‌পিরিন (অ্যাসেটিল স্যালিসাইলিক এসিড) নেই

সারিডন খেলেই উপকার পাবেন!

VT 3305
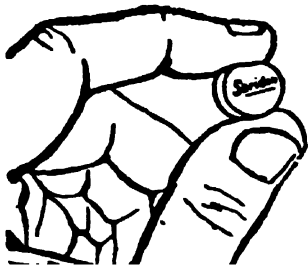
প্রবন্ধ-সাহিত্য

কিছু দিন ধরে বাঙলার প্রকাশকরা গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হয়ে প্রবন্ধ-সাহিত্যের দিকে যে নজর দিয়েছেন তা খুবই আশার কথা। কয়েক জন প্রকাশক সম্প্রতি কয়েকখানি উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ-গ্রন্থ প্রকাশ করে এ সম্বন্ধে পথিকৃৎ হিসাবে অন্যান্য প্রকাশকদেরও দৃষ্টান্তস্থল হয়েছেন। এর দ্বারা ছোটখাটো অন্যান্য প্রকাশকরা নিশ্চয়ই উৎসাহিত হবেন। প্রবন্ধ-সাহিত্য অপেক্ষা গল্প-উপন্যাস-সাহিত্য বেশী বিক্রীত হয় সত্য, কিন্তু অধুনা এর জন্য গভর্ণমেণ্টও যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা লাইব্রেরী প্রভৃতিতে যে অর্থ সাহায্য করে থাকেন, তার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ অর্থ প্রবন্ধ-সাহিত্য ক্রয়ের জন্য সম্প্রতি নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব প্রকাশকরা উপস্থিত যদি বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত, জীবনী প্রভৃতি বিষয়ক কিছু গ্রন্থ প্রকাশ করেন তা'হলে যে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, তা আশা করা যায়।

বিগত শারদীয়-সাহিত্যের পরিণতি

মাটির স্বাভাবিক ধর্ম্ম যেমন অনুর্ব্বরত্ব নয়, তেমনি মগজের ধর্ম্মও বন্ধ্যাত্ব নয়। কাজেই মগজ বা মাটি কিছু না কিছু প্রসব না করে পারে না। তবে, মাটির দোষগুণে ভূমিজ ফসলের স্তরের তারতম্য ঘটে এবং খুলির প্রকারভেদে মগজনিঃসৃত ভাব-বিষয়েরও ঘটে থাকে বিভেদ। কিন্তু এই তারতম্য ও বিভেদেরও একটা মাত্রা আছে, সে মাত্রা ছাড়'লে অবশ্যই চিন্তার বিষয়। বিগত পূজা-সংখ্যার সাহিত্য সম্পর্কে ধীরস্থির ভাবে আমরা এ-যাবৎ যা চিন্তা করেছি এবং এ সম্বন্ধে দু'-চারখানি কাগজেও যা আলোচিত হতে দেখেছি, তাতে এটাই আমাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, আমাদের মাটি ও মগজ অনুর্ব্বর ও বন্ধ্যা না হলেও, তার মধ্যে বিকৃত রূপটিই সমস্ত শারদীয়-সাহিত্যকে কলুষিত করেছে এবং গত বৎসরের তুলনায় তা প্রকাশ পেয়েছে অপেক্ষাকৃত বেশী ভাবেই। আনুষঙ্গিক চিত্রগুলি থেকে অধিকাংশ লেখাগুলির মধ্যেই দেখা দিয়েছে খাঁটি দেশজ মাটির গন্ধের অভাব, আর তাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বীভৎস, বিকৃত, অপকার্য্যের চিত্র। কুৎসিত-আসক্তি প্রবণতা শিল্পের অঙ্গ হিসাবে যেন দেখা দিয়েছে অনেক সাহিত্যিকের মধ্যে। প্রাচীনদের অপেক্ষা নবীনদের মধ্যেই ঘটেছে এর প্রতিযোগিতা। কুষ্ঠরোগী নিয়ে, বারবনিতা নিয়ে আর বস্তিবাসী নিয়ে কেউ কেউ দেশাচারের জীর্ণ দুর্গ-প্রাকার ভেদ করে অত্যাধুনিক হবার ব্যর্থ প্রয়াস করেছেন। কিন্তু বেশীর মধ্যেই ধরা পড়েছে সাহিত্যিকদের পেশাদারী মন। তাগিদ যত এসেছে, দাদন যত নেওয়া হয়েছে, মগজে তত ভাব জন্মায় নি বা মগজ তত গ্রহণ করতে পারেনি! ফলে, গভীর চিন্তাপ্রসূত সাহিত্যপ্রকাশে ঘটেছে ব্যাঘাত—বস্তুবাদের পরিবর্ত্তে বিস্তরবাদই প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। এক এক জনের ডজনখানেক বা তদপেক্ষাও অধিক গল্প প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু ফলং হয়েছে মড়কং! এর জন্য অবশ্য আমরা নূতন কাগজওয়ালাদেরও দোষ কিছু কম দিই না। তাঁদেরও এটা বোঝা উচিত যে, লেখকরা ঐন্দ্রজালিক নন, ট্যাঁকে টাকা গুঁজে দিলেই তাঁদের হাত দিয়ে অবলীলাক্রমে মেশিনের মত গল্প সৃষ্টি হয়ে আসা সম্ভব নয়!

ভাবোন্মত্ত বাঙালীর জীবনে পূজার সময় সকল বিষয়েই যেমন আতিশয্য দেখা দেয়, সাহিত্য বিষয়েও এবার তার ব্যতিক্রম হয়নি, কিন্তু তার ফলে গল্প-সাহিত্যের মান যে অবনমিত হয়েছে, শিক্ষিত পাঠক তা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

কলকাতার পথ-ঘাট

সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে "কলকাতার পথঘাট" বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বইটির প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকা বলছেন, "অতীত ইতিহাসের প্রতি সাহিত্যিকদের সানুরাগ দৃষ্টি বছর-কয়েক যাবৎই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতদিন তা ছিল উপন্যাসের উপকরণ-সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বর্ত্তমানে সাহিত্যের ভাষায় ইতিহাস বিবৃত করার প্রচেষ্টাও চলেছে। এর ফল যে শুভ তার প্রথম এবং প্রধান কারণ, ইতিহাসের শুষ্ক তথ্য রসসাহিত্যিকের হাতের স্পর্শে সরস কাহিনী বর্ণনার রূপ পাওয়ার ফলে একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই ইতিহাস-বিমুখ পাঠকেরাও সে-রসের আকর্ষণ অবহেলা করতে পারছেন না। এমনি করে আনন্দের মধ্য দিয়ে দেশের লোকের শিক্ষার ভিৎও পাকা হচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত "কলকাতার পথঘাট" গ্রন্থে কথাসাহিত্যিক প্রাণতোষ ঘটক তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণার সেই শ্রেণীর সাহিত্যভাত রূপই প্রকাশ করেছেন। আজব শহর কলকাতার পথঘাটও যেমন অগণিত, তাদের পেছনকার ইতিহাসও ততোধিক কৌতূহলপ্রদ। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক উপযুক্ত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গেই সেই সব বিস্মৃতপ্রায় ঘটনাবলী আহরণ করেছেন এবং তা গ্রথণও করেছেন অপূর্ব শিল্পকুশলতার সঙ্গে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই তিনি যে দীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করেছেন, বিদ্যোৎসাহী পাঠকমাত্রই তার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হবেন।" 'যুগান্তর' বলেন, "প্রাচীন দু'চারটে সৌধ আর

শত শত প্রাচীন নামাঙ্কিত পথই. এ শহরকে আজও সেই বিলীয়মান অতীতকে আমাদের নিত্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, নিত্য বর্তমান রেখেছে আমাদের চোখে। এই প্রাচীন পদচিহ্ন ও পথচিহ্নের মধ্যে থেকে ইতিহাসমূলো উল্লেখযোগ্য ৩১টি পথের ইতিহাস ১৬খানি প্রাচীন ইতিহাস বা দলিল ঘেঁটে প্রাণতোষ ঘটক উদ্ধার করেছেন এই বইতে। এ ইতিহাস জানা প্রত্যেক কলকাতাবাসীর তো বটেই, প্রত্যেক বাঙালীরই উচিত। এ শুধু কৌতূহল চরিতার্থ করবে না, জ্ঞান-ভাণ্ডারেও কিছু দান করবে। বইখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।" আমরা এই মূল্যবান গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ; ১৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য তিন টাকা।
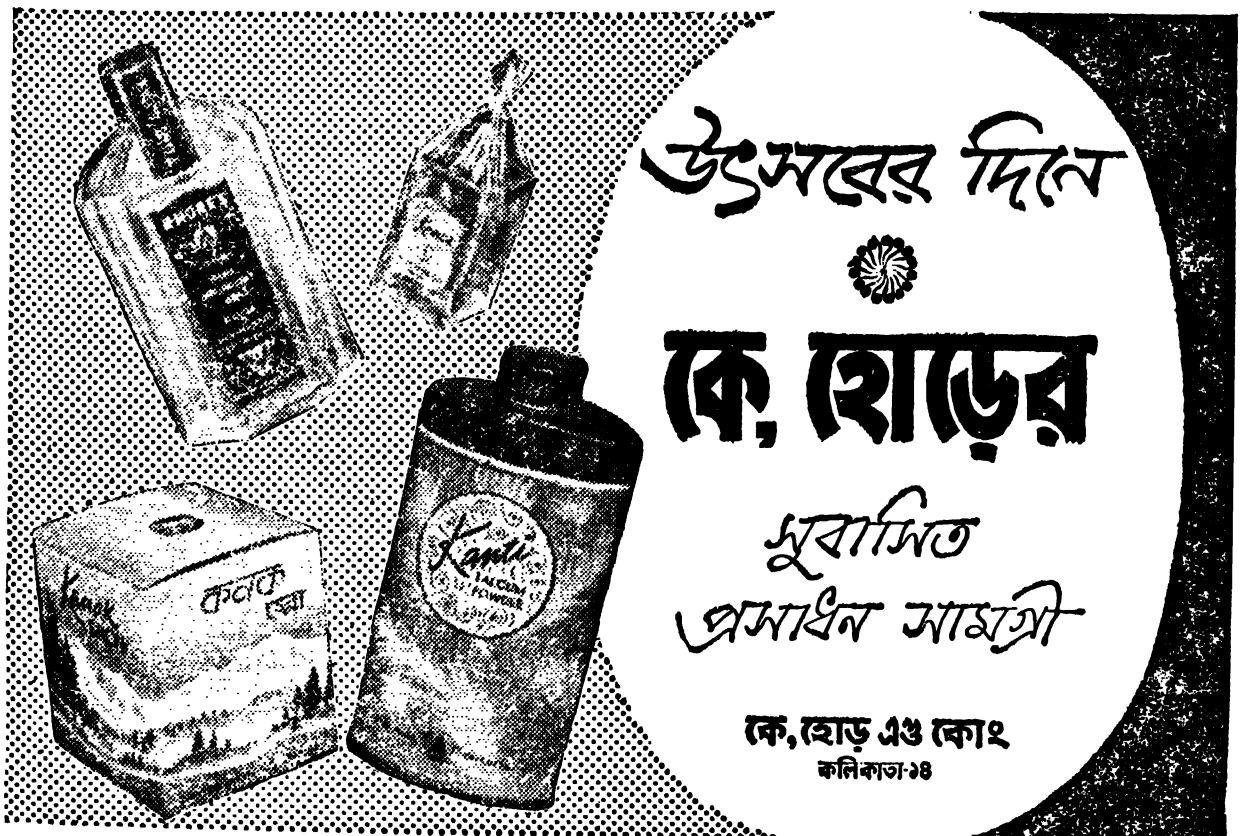
CHOOSING A CAREER

মহামতি বেকন একদা বলেছিলেন : "They are happy men whose natures sort with their vocations." কিন্তু বাঙালী জাতির বরাতে যার যা কর্ম্ম, তা জোটে না সাধারণতঃ। আমাদের দেশের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করলে তাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের উদ্দেশ্য বা কর্ম্ম সম্পর্কে কিছুই জানা যাবে না। এ এক রকম নোঙরবিহীন নৌকার মত অবস্থা। আমরা হয়তো জানি না, আমাদের প্রত্যেকের জন্যই কিছু না কিছু নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আছে—যা আমাদের অন্তরের সঙ্গে করণীয়। আমরা এই সভ্য জগতে কিছু একটা করতে চাই বা পারি, যে-কোন কাজে লাগতে পারি গ্রাসাচ্ছাদন সঞ্চয়ের ইচ্ছায়। আমাদের এই শিশু-স্বাধীন দেশে করবার মত কাজও প্রচুর আছে। কিন্তু কে কি করবে তা কেউ জানে না। অভিভাবকরা জানেন না তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের ভবিষ্যতের কাজকর্ম্মের কথা। কাজ কত রকমের বা পেশা কত প্রকারের হ'তে পারে, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সেই সকল বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন অপূর্ব্ব লিপিকুশলতার সঙ্গে। এই ধরণের একখানি বই বাঙলায় অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। বইখানির ছাপা বাঁধাই মনোরম। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। লণ্ডন ই, সি, ৪। মূল্য তিন টাকা।

সরস গল্প

হাসির গল্প লেখায় আশাপূর্ণা দেবী সুপরিচিত। তাঁর সদ্য-প্রকাশিত এই গ্রন্থে আছে কুড়িটি গল্প। লেখিকা বর্তমান সমাজের পটভূমিকায় হাসি-অশ্রু ব্যথা-বেদনার কাহিনী বেশ রসিয়ে বলতে পারেন—তাই হয়তো এই বইয়ের নাম হয়েছে 'সরস গল্প'। গ্রন্থে সন্নিবেশিত ভবিষ্যদ্বাণী, শাড়ী-মাহাত্ম্য, ডিরেক্টার রাস্তদা, চৌরঙ্গী, কামধেনু, সর্ষে আর ভূত ও রুদ্ধকপাট, দিলদরিয়া প্রভৃতি গল্প সত্যিই উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে সত্যিকার মহিলা লেখিকাদের দেখা মিলছে না আর—যাঁরা সাহিত্যসেবায় পূর্ব্বের মত পুরুষদের সঙ্গে সমান সমান চলতে পারেন। আশাপূর্ণা দেবীর মত লেখা

বিরল ব'লেই তাঁর এই জনপ্রিয়তা। বইখানির প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই বেশ মনোরম। কথামৃত ভবন। ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

কাব্য-কৌতুক

উপভোগ্য ও সারগর্ভ প্রবন্ধ-লেখক ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছেন আমাদের সাহিত্যে। উদ্ধৃতিকণ্টকিত লেখা প'ড়ে প'ড়ে প্রবন্ধের পাঠকও লুপ্ত হ'তে ব'সেছে যেন। আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের রচনা-রীতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য ক'রেই আমরা এই মন্তব্য করছি। লেখক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত ও বাঙলা সাহিত্যের কোন কোন বিষয় সম্পর্কে এমন হৃদয়গ্রাহী ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন সহজ সরল ভাষা ও ভঙ্গিমায় যে, পড়তে পড়তে বিস্মিত হ'তে হয়। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের 'পরে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাবের যে তথ্য তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন তা খুবই বিস্ময়কর। লেখকের বাল্মীকি ও কালিদাস; রবীন্দ্রনাথ রচিত 'শ্যামাজাতক'; 'পরিশোধ' 'বিদায় অভিশাপ' প্রভৃতি লেখার আলোচনা ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। ৩৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা মূল্য পাঁচ টাকা।

ছক ও ছবি

জ্যোতিষী-অভিজ্ঞতার কাহিনী গল্প আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন 'ছক ও ছবি' গ্রন্থের লেখক হরেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য। বাস্তব অভিজ্ঞতা সাহিত্য হিসাবে পরিবেশন করার মধ্যেও যথেষ্ট কুশলতার প্রয়োজন। লেখকের এই লেখাগুলি যদিও ঠিক গল্প নয়, তবে গল্পের মতই চিত্তাকর্ষক। বাঙলা দেশ গুরুবাদী দেশ; দৈবনির্ভরশীলতা এখনও বাঙালীর মজ্জাগত হয়ে আছে। এর ফল শুভ না অশুভ, সে আলোচনা এখানে অবান্তর। জ্যোতিষীর রোজনামচাকে, প্রত্যক্ষদর্শনের আন্তরিক অনুভূতির সঙ্গে লেখক মনুষ্যসমাজের অনেক গোপন তথ্যে উদ্ঘাটিত ক'রে সাহিত্যের উচ্চমানে উঠিয়েছেন। ছক ও ছবির প্রতিটি গল্পই সার্থক রচনা বলা যায়। শাস্ত্রগত আড়ম্বর নেই কোথাও। মিত্র ও ঘোষ। ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা বারো আনা।

সরস গল্প

গ্রন্থের ভূমিকায় রস-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বলছেন: "গল্পের চেয়ে স্কেচের মধ্য দিয়েই বরং লেখক বেশির ভাগ আত্মপ্রকাশ করেন এবং এই বইখানিতেও এই ধরণের লেখাই বেশী স্থান পেয়েছে। যতদূর জানা যায়, এইটি তাঁর আত্মপ্রকাশের একটি বিশেষ ধারা বা Forte. এই পুরানো পৃথিবীটা বৈচিত্র্যে চির-নূতন—সে বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে কোথাও হাসিতে, কোথাও অশ্রুতে—সে হাসি-অশ্রুর রূপও বিচিত্র!" "আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সন্তোষকুমার দে বর্ত্তমান সাহিত্যে পরিচিত, তাঁর এই ধরণের স্কেচ-রচনার কৌশলে। সর্ব্বসমেত আটাশটি স্কেচ আছে এই সরস গল্পে। প্রত্যেকটি গল্পই সুখপাঠ্য। সো-আন বুক্‌স। ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট। কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

মন-বিনিময়

মধুররসের মিষ্টি গল্প-লেখায় যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছেন মন-বিনিময়ের লেখক সুমথনাথ ঘোষ। আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের কয়েকটি অতি চমৎকার গল্প স্থান পেয়েছে। ঘরোয়া পরিবেশ, পুরুষ আর রমণীর প্রেম-অভিসার, দাম্পত্যসুখ গল্পগুলির বিষয়বস্তু। প্রতিটি গল্পের প্রায় প্রতিটি চরিত্র লেখকের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের পরিচালক। এই সব সৃষ্ট চরিত্রের মানুষদের আমরা যেন সকলেই চিনি। আমাদের আশে-পাশে ছড়িয়ে আছে তারা। যাদের দিকে আমাদের চোখ পড়ে না তাদের গল্পের মধ্যে ধ'রে রেখেছেন লেখক। বইখানি উপহারের উপযোগী। প্রচ্ছদ সুন্দর। মিত্র ও ঘোষ। ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা বারো আনা।

মৌনরেখা

পরলোকগতা কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন সময়ে লেখা গল্প কবিতা প্রবন্ধ ও বেতারে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কল্যাণী দেবী ঠাকুরপরিবারের কন্যা, বাল্যকাল থেকেই তিনি সাহিত্য সাধনা ও শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করে গেছেন। তাঁর গল্পগুলি সত্যিই প্রশংসার অধিকারী। গল্প বলার মধ্যে অনেক কিছু ব্যক্ত করায় কল্যাণী দেবীর দক্ষতার সে চিহ্ন মৌনরেখায় বিদ্যমান। তাঁর কবিতার মধ্যে ফুটে ওঠে এক স্নিগ্ধ আন্তরিকতার সুর। কল্যাণী দেবীর সম্পর্কিত দেবর বিখ্যাত শিল্পী শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কল্যাণী-পরিচিতি'ও ভাল লাগবে। ১নং বুড়ঙ্গ পার্ক থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীলোকমোহন চট্টোপাধ্যায়। দাম তিন টাকা।

গোধূলি বাসর

নবীনা লেখিকাদের মধ্যে রাণু ভৌমিকের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্ব্বে গল্প রচনায় তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে। বর্ত্তমানে এঁর উপন্যাস 'গোধূলি বাসর'ও দেখা দিয়েছে যথোপযোগী প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। রাণু ভৌমিকের রচনার মধ্যে একটি জাজ্বল্যমান দীপ্তির আভাস পাওয়া যায়। এর চরিত্র সৃষ্টি, সংলাপ সৌন্দর্যভূষিত বলা যায়। প্রকাশ করেছেন, শতরূপা প্রকাশনী ৬।১ কলেজ রো, দাম তিন টাকা বারো আনা।

কুমারীকন্যা

কিছু কালের মধ্যে 'পাতালে এক ঋতু'র লেখক দীপক চৌধুরীর কয়েকখানি গল্প-উপন্যাসও প্রকাশিত হয়েছে। 'শর্ম্মিষ্ঠ' ও 'ঝড়-এলো'-র পর 'কুমারীকন্যা' তাঁর তৃতীয় উপন্যাস। 'মনের ধর্ম্ম'কে এই উপন্যাস উৎসর্গ করেছেন গ্রন্থকার। সাধারণ ভাবে আমরা মনের যে ধর্ম্ম বুঝি, সেই নারী-পুরুষের মিলন-তৃষ্ণার স্পষ্ট স্বরূপটি ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থের কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে। দার্জ্জিলিং এর পরিবেশে এই কাহিনী প্রসারিত হয়েছে। এসেছে কয়েকটি পাহাড়ী চরিত্র, এসেছে ভালবাসার, ত্যাগের, আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র নিদর্শন। প্রকাশ করেছেন—এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স (প্রাইভেট) লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৫৲ টাকা।

রাজায় রাজায়

[২৪৪ পৃষ্ঠার পর]

মাঝি-সর্দার কথা বললে বজরার গলুই থেকে। হাতে তার খেলো হুঁকা। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে,—আমরা যখন আছি, তখন আর ভয়-ডর কেন?

—ভয়! ম্লান হাসির সঙ্গে বললে চৌধুরাণী। হাসির জের টেনে বললে,—জাত-হারানোর ভয়! কোথাও যে আমার ঠাঁই হবে না মাঝি-সর্দার! ঘরেও নেবে না, পরেও নেবে না। মরণ ছাড়া আর আমার গতি নেই। তা তোমরা দাও না আমার মুক্তি। আমি গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিই।

মাঝি-সর্দার ঈষৎ হাসলো। মুখ থেকে হুঁকা নামিয়ে বললে,—আমরা তো বিবিজান মুক্তি দিতে পারি, তবে ঐ তেলেঙ্গী সিপাইরা হয়তো বাধা দেবে তোমাকে। ওরা নিমখারামি করবে না কখনও। পোষা কুকুরের সামিল ঐ সিপাইরা।

—একটু বিষ দিতে পারো আমাকে? এক চিলতে সেঁকো-বিষ কিম্বা একটুখানি আফিং?

আনন্দকুমারী কেমন যেন করুণ স্বরে ভিক্ষা চাইলো। দুই হাত পাতলো ভিক্ষাপ্রার্থনার মত। শিউরে উঠলো মাঝি-সর্দার। চোখে যেন তার হাসি আর অশ্রু ফুটলো একই সঙ্গে। বললে,—সাহেব যে বড্ড দাগা পাবে তবে! ঐ ফিরিঙ্গী সাহেব সত্যিই তোমার প্রেমে প'ড়েছে বিবিজান! তোমার চোখ নেই তাই দেখতে পাও না।

কাজলকালো চোখ বন্ধ ক'রলো আনন্দকুমারী। চোখে অন্ধকার না আলো দেখলো, কে জানে! বুক কেঁপে উঠলো থরথরিয়ে। অজানা ভবিষ্যৎ, অচেনা অজাতের মানুষ, অপরিচিত পরিবেশ—সত্যিই চোখে অন্ধকার দেখছে চৌধুরাণী। ভাবছে, তার এই পোড়াঅঙ্গে কি রূপ দেখলো ঐ বিদেশী! রূপ ঈশ্বরের আশীর্বাদ না অভিশাপ! আনন্দকুমারীর দেহ পেয়েছে ম্যানেট; মন পায়নি এখনও। হয়তো কখনও পাবেও না। মন অন্য একজনকে দান করেছে অনেক আগে। আর তিলধারণের স্থান নেই তার মনে—সবটুকু অধিকার ক'রে আছে কে যেন।

—তোমাদের সাঁয়েব কোথায় চলেছে তাই শুনি?

চৌধুরাণী মিহি সুরে কথা বলে। বজরার জানলা ভেদ ক'রে একটুকরো রোদ্দুর পড়েছে তার মুখে আর বুকে। মাঝি-সর্দার দেখতে পায়, বিবির বুকে ঘন ঘন ওঠা-নামা। শ্বাসের গতি কত দ্রুত!

—কাছে নয় বিবিজান, যেতে হবে অনেক দূরে। সেই সুতানুটি-গোবিন্দপুরে। হুগলী নদী ধ'রে, এই মা গঙ্গার বুক ধ'রে যেতে হবে সোজা।

—কত দিনের পথ মাঝি-সর্দার? আমার বাবামশাই আছে সেখানে!

—দু'রোজ তো বটে। জোয়ারের ঝপেতে আর বাওন চলবে না।

—সায়েবের ঘর আছে সুতানুটিতে?

—সুতোনুটিতে নয়, গড়-গোবিন্দপুরে। কোম্পানীর কুঠি আছে। সাহেব সেখানেই থাকে।

—কুঠিতে নিয়ে যাবে আমাকে?

—হাঁ গো বিবিজান! এমন ডানাকাটা পরীকে পেয়েছে যখন!

—সাহেবের কাজ কি? পেশা কি?

—সাহেব খাস কোম্পানীর লোক। জরীপের কাজ করে। অঙ্ক কষে, নক্সা কাটে, ছবি আঁকে। তোমার তসবীর এঁকেছে দেখছো না?

—হাঁ দেখেছি। ভালই হয়েছে।

—বেউলে বাজাতে পারে সাহেব! কাল রাতে কত বাজনাই শুনিয়েছে তোমাকে! শোন নাই?

—হাঁ শুনেছি।

—ঐ তো সাহেব ফিরে আসছে। পেছনে মাঝির মাথায় ঝাঁকা। তোমার তরে কত কি সওদা ক'রেছে দেখো।

চৌধুরাণী আবার চোখ বন্ধ ক'রলো। চোখ ফিরালো না! বারেকের তরে। একটা কষ্টকাতর দীর্ঘশ্বাস ফেললো। চোখে আঁচল চাপালো।

পাটাতনে ঝাঁকা নামিয়ে রাখে মাঝি। বজরাখানা একবার সজোরে দু'লে উঠলো। চমকে উঠল আনন্দকুমারী। তার চোখে পড়লো সওদার ঝুড়িতে কত কি রয়েছে। ক'জোড়া শাড়ী। গামছা। আহারের পাত্র। জলের কলসী। মাটির বাসন। চাল, ডাল, শাক সব্জী। ঘি, তেল, দুধ।

ম্যানেট বললে,—তাম্বু লাগাও।

কেমন যেন হুকুমের সুর তার কথায়। মুখে যেন আনন্দের আভাস। খাঁচার পাখী খাঁচাতে আছে দেখে নিশ্চিন্ত হয় যেন। স্বস্তি না তৃপ্তির শ্বাস ফেলে।

চটের তাঁবু তোলাপাড়া করে সিপাইরা। দড়ি আর খুঁটি। বাঁশ আর লোহার হাতুড়ি। সংসার পত্তনের তোড়জোড় চলে। একজন মাঝি মাটির উনানে আগুন দিতে লেগে যায়। গাছের শুকনো পাতা আর ডালে আগুন ধরায় চকমকি ঘষে।

চৌধুরাণীর একটি হাত ধ'রলো ম্যানেট। হাত ধ'রে উঠালো তাকে। বললে,—আও, হামরা সাথ চল'। কাম্, লেট আস্ গো টু দি ব্যাঙ্ক।

নেশা ধরে আছে যেন। আনন্দকুমারীর পা কাঁপছে, দেহ টলছে। চোখের কালো অঞ্জন কালিমা ছড়িয়েছে মুখে। লজ্জা ভুলে গেছে হয়তো বা। কেমন যেন বেহায়ার মত ম্যানেটের হাতে হাত ভিড়িয়ে বজরা থেকে তীরে নামলো টলতে টলতে। ম্যানেট তার কোমর জড়িয়ে আছে এক হাতে।

তবুও যেন রাগ ধরে চৌধুরাণীর। একের প্রাপ্য অন্যকে অনিচ্ছায় দেওয়ার ক্ষোভে ভুরু বাঁকিয়ে থাকে। তীরের ভিজে মাটিতে পা পড়তে কাদামাটিতে পা ব'সে যায়।

ম্যানেট দুই বাহুর ভরে তুলে নেয় চৌধুরাণীকে। বুকে তুলে নেয় একেবারে। কদমাক্ত তীর পেরিয়ে নিয়ে যায় তাঁবুর ভেতর। আনন্দকুমারীর চিবুকে একটি চুমা খেয়ে তাকে পুতুলের মত নামিয়ে রাখে যেন!

—দিস্ ইজ মাই ড্রিমল্যাণ্ড।

ম্যানেট কথায় কবিত্ব ফুটিয়ে বলে।

—তুমি এখন আমার নজরছাড়া হও। আমি নদীতে ক'টা ডুব দিয়ে নিই।

চৌধুরাণী এক পাশে স'রে দাঁড়ায় কথা বলতে বলতে। বিনুণীর ফিতা খুলতে থাকে।

ঘর বাঁধছে, বাসা বাঁধছে, তবুও মুখে হাসি ফোটে না চৌধুরাণীর। ধনুকের মত বাঁকা ভুরু আর সোজা হয় না। থেকে থেকে কটাক্ষ হানে যেন। তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায় ম্যানেট, হাসতে হাসতে। কাব্য আওড়ায় সুরেল ছন্দে। ম্যানেটের মনে পড়ে কবি রুডেলকে। এই কবি শোনা যায় ত্রিপলীর কাউন্টেশের প্রেমে পড়েছিলেন। রুডেল তাঁকে চেয়েছিলেন মন থেকে। কাউন্টেশ কবি রুডেলকে চেয়েছিলেন কি না জানা যায় না। রুডেল ছিলেন রাজপুত্র, ধনীর দুলাল। ব্লেইয়ার রাজার ছেলে রুডেল দ্বাদশ শতাব্দীর অন্যতম কবি ছিলেন। ম্যানেট তাঁরই কবিতা বলে নিজের মনে। আবৃত্তির সুরে ব'লে যায়,—

"God, who hast made all things
that come and go
And hast fashioned me out this love afar,
Give me power, such as I have not
in my heart,
So that in short space I shall see this
love afar,
Verily and in a place set to our need,
Be it room or garden it will alway seem
to me a palace.
He speaketh sooth who calls me covetous
And desirous of this my love afar,
for no other joy
would delight me so greatly, as the
enjoyment of my love afar.
But she whom I desire is so hostile to me!
Thus hath my destiny bewitched
me to love and be unloved."

তাঁবুতে এখন আনন্দকুমারী একা। বিনুণীর বন্ধন খুলতে খুলতে আবার চোখ ফেটে জল আসে। তাঁবুর বাইরে ম্যানেট কবিতা গাইছে, শুনতে পাওয়া যায়। অর্থ বোঝা যায় না কিছুই। চৌধুরাণী কাঁদতে থাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, শিশুর মত। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু শুষ্ক কণ্ঠ যেন সাড়া দেয় না। যাদের ফেলে এসেছে সে, তাদের সঙ্গে আর হয়তো দেখা হবে না ইহজীবনে। রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীকে যেন চোখের সামনে দেখতে পায় চৌধুরাণী। রাজকন্যার মুখখানি ভেসে ওঠে তার মনোমুকুরে!

তাঁবুর ভেতরে খাটিয়া প'ড়েছে। একজন সিপাই আসে তাঁবুর মধ্যে। শাড়ীর স্তূপ রেখে দিয়ে যায় খাটিয়ায়। চৌধুরাণীর চোখে

ম্যানেট শুনতে পায়, কোথা থেকে ফোঁসফোঁসানির শব্দ আসছে। অনুমানে বোঝে, তার প্রিয়তমা কাঁদছে বিয়োগ ব্যথায়! ম্যানেটের মত দুরন্তের চোখও যেন ছলছলিয়ে ওঠে মুহূর্তের জন্য।

মান্দারণের ভগ্নপুরীতে সমব্যথী বিন্ধ্যবাসিনীও থেকে থেকে চোখের জল ফেলেন।

ভিজে চুল শুকাতে ব'সেছেন রাজকুমারী। সূর্য্যের দিকে পিছু ফিরে আছেন। ছাদের এক কিনারায় ব'সে আছেন। ভিজে চুলের রাশি ছড়িয়ে আছে পিঠে। কোন ফাঁকে আসমানে ডুব দিয়ে এসেছেন কে জানে!

রাজকুমারী ভাবছিলেন, হাজার হোক চৌধুরাণীই সুখী। তাঁর মত একা নয় সে। দেশী হোক, বিদেশী হোক, প্রেম আর ভালবাসা পাবে। অবহেলা সহ্য করতে হবে না জীবনভোর, পাবে সেবা-যত্ন। আদর আর কদর হবে তার। ইংরাজরা নাকি প্রেমে কপট নয়। তাদের ভালবাসায় না কি ছল-চাতুরী নেই।

—বৌ!

কোথা থেকে ডাক পাড়লো পরিচারিকা। স্নেহের ডাক নয়, ডাকলো যেন কর্কশ সুরে। কণ্ঠ সপ্তমে তুলে।

ঘাড় ফেরালেন বিন্ধ্যবাসিনী। চোখ ফিরিয়ে দেখলেন। তপ্ত রৌদ্রে রাজকুমারীর শুভ্র মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তৈলহীন রুক্ষকেশের বোঝা শুকিয়ে গেছে কখন।

—এই নাও তোমার কাগজ-কলম আর ভুশোকালি। যেতে আসতে জিভ বেরিয়ে গেছে আমার! পরিচারিকা কেমন যেন ক্ষুব্ধকণ্ঠে কথাগুলি বললে। খানিক থেমে আবার বললে,—সারা মান্দারণে তো টি টি প'ড়ে গেছে! কান পাতা দায় হয়ে উঠলো!

—কেন? কি হ'য়েছে?

সাগ্রহে শুধোলেন রাজকুমারী। কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন।

যশোদা বললে,—আনন্দকুমারীকে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই। দিকে দিকে লোক ছুটেছে। চন্দ্রকান্তর চতুষ্পাঠীতে পাল্কী পাঠিয়েছে আনন্দর মা। হনহনিয়ে পাল্কী ছুটেছে, নিজের চোখে দেখনু যে!

একবার যেন শিউরে উঠলেন বিন্ধ্যবাসিনী। কি যেন বিপদের আশঙ্কায়। খানিক নিথর হয়ে থাকতে থাকতে ফিসফিসিয়ে বললেন, —চন্দ্রকান্ত কি করবেন? তাঁর কাছে পাল্কী ছুটলো কেন?

—নৌকায় তিনিও যে ছিলেন আনন্দর সঙ্গে। তিনি না কি সবই জানেন।

—তোমাকে কে বললে যশোদা? ভয়ের সুরে প্রশ্ন করলেন রাজকুমারী। বললে,—তুমি কোথায় শুনলে এমন কথা?

—দশকর্ম্মার দোকানে শুনেছি, লোকে বলাবলি করছে। পাল্কী ছুটেছে স্বচক্ষে দেখে এসেছি।

—তবে কি হবে যশোদা? আমার যে ভয় করছে!

—কি আর হবে! তুমিই বা ভয় পাও কেন? আমি থাকতে তোমাকে কোন' আঁচ পোয়াতে হবে না, জেনে রাখো।

—আমাকে ধ'রে যদি টানাটানি করে? চিন্তায় যেন আকুল হয়ে কথা বলেন বিন্ধ্যবাসিনী। চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। ছাদ ত্যাগ করেন ধীর পদক্ষেপে।

পরিচারিকা বললে,—তোমাকে কেন টানাটানি করবে? তোমার দোষ কি তাই শুনি? আসুক না কে আসবে! খেঁতো মুখ ভোঁতা ক'রবো না আমি?

দাসীর কথায় মন ওঠে না রাজকুমারীর। কেমন যেন ভয়ার্ত দৃষ্টি ফুটেছে চোখে। ফিস্‌ফিস কথা বললেন। বললেন,—চল্‌ যশোদা, এখান থেকে আমরা পালাই। মানে মানে স'রে পড়ি।

—কোথায় যাবে গো? আমাদের জমিদার তবে কি আর আমাদের ধড়ে মাথা রাখবেন ভেবেছো? আমি বাছা সব করতে পারি, বেইমানী করতে পারি না। যার নিমক খেয়ে ইস্তক বেঁচে আছি তার সঙ্গে শত্রুতা করবো কি! ও সব কথা মুখে এনো না তুমি।

—তবে আসমানে ডুবে যাই চিরজন্মের মত। আসমান আমাকে ঠিক ঠাঁই দেবে।

—আমার দফা সারবে দেখছি তুমি। এমন অলক্ষুণে কথাগুলো আর শুনিও না আমাকে। তোমারই বা এত ভয় ডর কেন? তুমি তো আর চৌধুরীর মেয়েকে চুরি কর'নি?

—আমার মন যেন আঁকুপাঁকু করছে।

কথা বলতে বলতে আপন কক্ষে প্রবেশ করলেন রাজকন্যা। তাঁর মুখে-চোখে যেন ভীতিবিহ্বলতা।

তুলট কাগজ, খাগের কলম আর ভুশোকালি নামিয়ে রেখে দিয়ে যায় পরিচারিকা। ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কথা বলতে বলতে। বলে,—জানি না বাছা এত-শত। জলে ডুবতে যাবে তুমি কোন্‌ দুঃখে?

বিজন ঘরে বিরহের দীপ জ্বালেন যেন রাজকন্যা। ভাবেন, আসমানেই তাঁর ঠাঁই হওয়া উচিত। বেঁচে থাকাই অন্যায়। কত আঘাত আর শ্লেষ হেনেছেন জমিদার কৃষ্ণরাম। আর সব স্ত্রীদের সমুখে কত অপমান ক'রেছেন। কত কটুকথা শুনিয়েছেন। তাতেও যখন মন ভরেনি তখন একজন দাসীকে সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন গড়-মান্দারণের এই ভগ্নপুরীতে। নজরবন্দিনী ক'রে রেখেছেন। এত অসম্মানের চেয়ে আসমানে ডোবাই ভাল। তার ওপর সহোদর ভাইরা রাজা-বাদশাহ হ'য়েও যখন কৃষ্ণরামের দাবী মিটালেন না, তখন মরণ-বরণ ছাড়া গতি কি আর!

শিউরে শিউরে উঠলেন বিন্ধ্যবাসিনী। জলে ঝাঁপ দেওয়ার ভয়ে নয়, কেমন যেন মৃত্যুভয়ে ভীতা হয়ে পড়েন। বুক দুরু-দুরু করতে থাকে।

রাজকন্যার ধারণা সত্য নয়। তাঁর এই দুরবস্থায় রাজগৃহের সকল শান্তিও বিনষ্ট হ'তে চ'লেছে। রাজমাতার চোখে ঘুম নেই। রাজাবাহাদুরের আহারে-বিহারে মন নেই। কুমারবাহাদুর কাশীশঙ্করও সুস্থির হ'তে পারছেন না। রাণীমায়েদের মুখে হাসি নেই। রাজপুরীতে আর কোন' আনন্দ নেই।

কাশীশঙ্কর দস্তরমত শলা-পরামর্শ চালিয়েছেন রুদ্ধকক্ষে। সদরে পাছে জানাজানি হয়, তাই অন্দরের এক গুপ্তকক্ষে বসেছেন গোপন আলোচনায়। কক্ষের মধ্যে কুমারবাহাদুর আছেন। আর আছে কামতার খাঁ। আছে জগমোহন লেঠেল।

মধ্যদিনের রূপালী-শুভ্র আকাশে চোখ তুলে, রুদ্ধ কক্ষের বদ্ধ দুয়ারে হেলান দিয়ে পাষাণমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন মহাশ্বেতা। দীর্ঘ চোখের পলক পড়ছে না। কেমন যেন আশাহতার মত তাকিয়ে আছেন। কম্পিতবক্ষে শুনছেন ঘরের কথা।

জগমোহন বলছে,—পাঠানটাকে হুজুর, ঘায়েল করতে পারলেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে।

কাশীশঙ্কর বললেন,—সেই ভার আমার। আগ্নেয়াস্ত্র আমারও আছে। আমার লক্ষ্য একেবারে অব্যর্থ জানবে। আকাশের উড়ন্ত পাখীও আমার টিপ এড়ায় না।

কামতার খাঁ বললে,—তবে জাঁহাপনা, আমাকে আর সঙ্গে লেবেন কেন? আমার তরোয়াল ফাঁকায় আবার চলে না!

কাশীশঙ্কর হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন। বললেন,—কামতার, তুমিও তরোয়াল চালাবে, আমরা যদি নাচার হই তখন। আগামী কল্য যাত্রা সুনিশ্চিত জানবে।

চমকে উঠলো পাষাণমূর্তি। কেমন যেন বিচলিত হয়ে উঠলেন মহাশ্বেতা। আকাশ থেকে চোখ নামালেন না। চোখের পলক পড়ে না। মহাশ্বেতা স্থির দৃষ্টিতে কি দেখছেন আকাশে কে জানে!

মহাশ্বেতা দেখছেন, একটি উড়ন্ত চিলকে আক্রমণ করেছে আরেকটি চিল। তারস্বরে চীৎকার করছে চিল দু'টি। চরম আক্রোশে চেঁচাতে চেঁচাতে, লড়াই করতে করতে আকাশ থেকে নীচে নেমে পড়ছে দু'টিতে একত্রে। মহাশ্বেতা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছেন। রুদ্ধশ্বাসে। [ক্রমশঃ।

—আগামী সংখ্যায়—

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ও

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

পাঠসমস্যা কেন ?

"স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর ভিড়ের কথা বলিতে যাইয়া একটি অতি খাঁটি কথা ডাঃ রায় বলিয়াছেন। উচ্চশিক্ষা সঙ্কুচিত করা উহার প্রতিকারের উপায় নহে। কারণ তিনি বলিয়াছেন, "অত্যধিক ভিড়ের এবং কলেজ ও উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষা-ব্যবস্থার যত নিন্দাই আমরা করি না কেন, এখনও আমাদের আরও ইঞ্জিনীয়ার, শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃষিবিদ্, ডাক্তার প্রভৃতির প্রয়োজন আছে।" আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতির যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। কাজেই এই অবস্থায় স্কুল-কলেজে অত্যধিক ভিড়ের নিন্দা করা সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। প্রয়োজন স্কুল-কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ডাঃ রায় বলিয়াছেন, জাপানে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা শতকরা ১৫ জন। তুলনামূলক আলোচনা হিসাবে আমাদের দেশে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা কত, তাহা যদি তিনি উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে স্বাধীন ভারত শিক্ষায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। শিক্ষকদের অল্প বেতন যে শিক্ষাদান-ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য দায়ী, ডাঃ রায় এই সত্য স্বীকার করিয়াছেন। শিক্ষক মহাশয়রা যাহাতে অন্নবস্ত্রের চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিয়া শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা না হইলে শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু ব্যর্থই হইবে। শিক্ষকদিগকে পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করিতে হয়। কাজেই তাঁহাদের দায়িত্ব অনেকটা সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থা যাঁহারা রচনা করেন, উহা কার্য্যে পরিণত করিবার দায়িত্ব যাঁহাদের উপর, শিক্ষাব্যবস্থার খবরদারী করিবার দায়িত্বভার যাঁহাদের উপর অর্পিত, প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার 'ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাঁহারাই দায়ী, ইহাই দেশবাসীর বিশ্বাস।"

—দৈনিক বসুমতী।

পথ চলা দায়

"কলিকাতার ষ্টেট বাস সম্বন্ধে গত ৮ই ডিসেম্বর আমরা যে মন্তব্য করিয়াছিলাম, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা তাহারই সূত্র ধরিয়া ষ্টেট বাস সম্পর্কিত অভিযোগ সম্পর্কে সরকারী বক্তব্য জানাইয়াছেন (গত ১১ই ডিসেম্বরের আনন্দবাজারের 'চিঠিপত্রে জনমত' স্তম্ভে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে)। সরকারী বক্তব্যে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে অভিযোগ অস্বীকার করা হয় নাই, বরং 'কোন কোন যাত্রীর ষ্টেট বাসের সময়ানুবর্তিতার অভাব সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করা বিস্ময়কর নয়।'—ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে। কেন যে ষ্টেট বাস 'সময়' রাখিতে পারে না, তাহা যাত্রিসাধারণ অনেক সময় "বুঝিতে পারেন না।"—বুঝিতে না পারার জন্য অপরাধ যাত্রীর নহে, বুঝাইতে না পারার ত্রুটি কর্তৃপক্ষের। আলোচ্য সরকারী বক্তব্যে যে সকল কারণের কথা (মায় লণ্ডনের ষ্টেট বাসের সঙ্গে তুলনা) উল্লেখ করা হইয়াছে, সরকার তাহাই যাত্রিসাধারণকে কি কখনো পূর্বে জানাইয়াছেন? বলা হইয়াছে, প্রাইভেট বাসের চালকরা জরিমানার ভয়ে সময় রক্ষার জন্য অতিরিক্ত জোরে বাস চালায়। কিন্তু ইহা করিলে অনুরূপ বিপদ হইতে পারে বলিয়া ষ্টেট বাসে 'জরিমানা ব্যবস্থা' নাই। ভাল, জরিমানার ব্যবস্থায়, বিপদ হইলে উহা না থাকায় ষ্টেট বাসের দুর্ঘটনা উল্লেখযোগ্যরূপে হ্রাস পাইয়াছে কিনা, তাহার তুলনামূলক হিসাব প্রকাশ পাওয়া প্রয়োজন। নোটিশ না দিয়া রুট বদলের কথা ১ নং রুট সম্পর্কেই মন্তব্যে বলা হইয়াছিল। সরকারী বক্তব্যে নোটিশ না দেওয়ার কথাটি স্বীকৃত হইয়াছে। তবে বলা হইয়াছে যে, নোটিশ না দিয়া এই রুট সরাইয়া আনার ফলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। কারণ ৫ নং ও ৮বি রুট এখান দিয়া চলিতেছে। যাত্রীদের অসুবিধা কেন ঘটে তাহা সম্যক জানা থাকিলে এই কথা বলা চলিত না যে, নোটিশ না দেওয়ায় কারো ক্ষতি হয় নাই। এ সম্পর্কে বক্তব্য নোটিশ না দেওয়ায় পূর্বের মতোই টারমিনাসে মেয়েপুরুষ যাত্রীরা গিয়াছেন, দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিয়াছেন—৫ ও ৮ বিতে ওঠেন নাই ভীড়ের জন্য। বহু বিলম্বে তাঁহারা জানিলেন, ১নং ঐ স্থানে আসিবে না, তখন মহিলা ও পুরুষ যাত্রীদের হাঁটিয়া গোল পার্কে আসিতে হয়, ইহাতে যাত্রীরা নিশ্চয় সুবিধা বোধ করেন না; অহেতুক হায়রাণি মনে করেন। পূর্বে জানিলে তাহা হইত না। যে কোন নম্বরের বাসে উঠিয়া যাইতে পারিলেই হইল ইহা মনে করা ভুল। যাত্রীরা যে কিছুটা সুবিধামতও যাইতে ইচ্ছা করেন, ইহাও কর্তৃপক্ষের মনে রাখা দরকার। তারপর ১নং বাসই যার প্রয়োজন ৫ ও ৮বি বাসে তাহা কি করিয়া মিটিবে?"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

চোর! চোর!! চোর!!!

"পশ্চিমবঙ্গের চোর, ডাকাত, নরহন্তা ও অন্যান্য সমাজ-শত্রুদের বিপদ আসন্ন। স্বাধীন দেশের সদাজাগ্রত পুলিশ তো সর্বদাই তাহাদের পিছনে লাগিয়া আছে, তার উপর উহাদের শক্তি বৃদ্ধি

করিতে দুইটি অ্যালসেশিয়ান কুকুরী আসিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট মোটা মূল্য দিয়া ঐ দুইটি পুলিশ-বান্ধবীকে সংগ্রহ করিয়াছেন। উহারা এখন মাদ্রাজে গোয়েন্দাগিরি শিখিবার জন্য পুলিশ-কলেজে ভর্তি হইয়াছে। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, মাদ্রাজে এক রহস্যময় বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কিনারা করিয়া মাদ্রাজ পুলিশের অ্যালসেশিয়ান কুকুরেরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। মাদ্রাজের দেখাদেখি পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টও দুইটি অ্যালসেশিয়ানের শরণ লইয়াছেন। তাঁহারা ইহাদের নামকরণে যে শালীনতা ও সুরুচিবোধের পরিচয় দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে হয়। বিদেশী কুকুর দুইটির নাম রাখা হইয়াছে, "শান্তা" এবং "মিতা"। মাদ্রাজের যে পুলিশ-কলেজে এই ছাত্রীদ্বয় পশ্চিমবঙ্গের খুনী ও বদমায়েসদিগকে ধরিবার কায়দা শিখিতেছে, পশ্চিমবঙ্গের দুই জন ডিটেক্টিভও নাকি শান্তা ও মিতার সঙ্গে সেই কলেজেই একই ধরণের শিক্ষালাভ করিতেছেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর প্রথমে নাকি শান্তাকে এ রাজ্যের পুলিশবাহিনীতে ভর্তি করিয়া লওয়া হইবে। শান্তার এই নিয়োগ আপাততঃ হইবে "অস্থায়ী", আশা করা যায়, যোগ্যতা দেখাইলে বিদেশিনী কুকুরীদ্বয়কে আমাদের সমাজরক্ষক বাহিনীতে পাকা উচ্চ চাকুরী দেওয়া হইবে। ইহার কত মাহিনা পাইবে, গেজেটেড অফিসার হইবে কিনা, তাহা অবশ্য এখনও জানা যায় নাই। বৃটিশ আমলে বিলাত হইতে কোন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীকে আনা হইলেই তাহাকে নেটিভ অপেক্ষা উচ্চ পদ দেওয়া হইত এবং সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে শ্বেতহস্তী বলা হইত শান্তা ও মিতা হস্তিনী না হইলেও স্বাধীন ভারতের ল এণ্ড অর্ডার রক্ষার অফিসার। সুতরাং মর্যাদা তাহাদেরও কম নয় এবং তাহারা কুকুর হইলেও বিলাতী কুকুর—এ কথা যেন ভবিষ্যৎ-চোরেরা মনে রাখে!"

—যুগান্তর।

প্রেস কাউন্সিল কি?

"ডাঃ কেশকারের ভাবগতিক দেখিয়া একথা সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, ভারত সরকার "প্রেস কাউন্সিল" গঠনের নামে সংবাদপত্রের এক মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অতীতে বৃটিশ সরকার বারংবার আমাদের জাতীয় সংবাদ-পত্রগুলিকে সংবাদের সূত্র প্রকাশ করিতে বাধ্য করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশের সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা কারা-লাঞ্ছনা ভোগ করিতে রাজী হইয়াছেন, তবুও বৃটিশ সরকারের দাপটের সম্মুখে সংবাদের সূত্র প্রকাশ করিতে রাজী হন নাই। ডাঃ কেশকার কি ভুলিয়া গিয়াছেন আমাদের দেশের সংবাদপত্রের সেই গৌরবময় অতীত ও ঐতিহ্যের কথা? তিনি কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সংবাদের সূত্র প্রকাশে সংবাদপত্রকে বাধ্য করিলে স্বাধীন ও নির্ভীক সংবাদপত্রের বিকাশ ও বিস্তৃতি তো দূরের কথা, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়া ওঠে? মুখে গণতন্ত্রের কথা বলিবেন আর সংবাদপত্রের মৌলিক অধিকারগুলিকে পর্য্যন্ত পর্য্যুদস্ত করিবেন, কথা ও কাজের এত-বড় অমিলকে দেশের লোক কিছুতেই বরদাস্ত করিবে না—তাহা যেন মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ কেশকার স্মরণ রাখেন।"

—স্বাধীনতা।

আবার হুমকী

"পণ্ডিত জহরলাল আবার চোরাকারবারীদের ধমকাইয়াছেন, তবে এবার আর ল্যাম্পপোষ্টে ফাঁসি দেওয়ার কথা বলেন নাই। আবার তিনি বলিয়াছেন, চোরাকারবার কিছুতেই তাঁহারা সহ্য করিবেন না। চোরাকারবারীরা আবার মুখ লুকাইয়া হাসিতেছে এবং ভাবিতেছে, ইলেকসন ফাণ্ডে হয়ত এবার সত্যিই আর কয়েকটা টাকা বেশী দিতে হইবে। পণ্ডিতজী দশ বৎসরের মধ্যে একটা উপযুক্ত চোরাকারবার দমন আইন পাশ করিতে পারিলেন না, ভেজাল নিবারণ আইনের নামে এক হাস্যকর প্রহসন সৃষ্টি করিলেন! চোরাকারবার এবং ভেজাল নিবারণের জন্য সব চেয়ে দক্ষ এবং সব চেয়ে শক্তিশালী পুলিশবাহিনী তিনি গঠন করিতে পারতেন। তাহাও তিনি করিলেন না। দেশবাসী এবং চোরাকারবারী দু'জনেই তাঁর কথার দাম বুঝিয়া লইয়াছে। গড়ের মাঠের হুমকীতে আর একবার লোক না হাসাইলেও চলিত।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

সুরাবর্দ্দী সাহেবের স্বরূপ

"পঞ্চম বার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর গদী পরিবর্তন হইয়া সুরাবর্দ্দী সাহেবের ভাগ্যে প্রধানমন্ত্রিত্ব জুটিলে পর আমরা এই আশা ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে, তাঁহার অতীতের ইতিহাস যাহাই হউক না কেন, দেশ বিভাগের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করায় তিনি এখন পাকিস্তানকে অগ্রগতির পথে পরিচালনা করিবেন এবং ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কেরও হয়ত উন্নতি হইবে। কিন্তু আমাদের সেই আশা অসম্পূর্ণই থাকিয়া গেল। অল্পদিন মধ্যেই সুরাবর্দ্দী সাহেব তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ভারতের বিরুদ্ধে জিগির না তুলিলে তাঁহার গদী টিকানোই সম্ভব হইবে না, তাই পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নিতান্ত অকারণে বার বার ভারতকে 'শত্রুপক্ষ' বলিয়া অভিহিত করিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছেন। আওয়ামী লীগ নেতা মৌলানা ভাসানী ও তাঁহাদের সহযোগী রিপাবলিকান বা গণতন্ত্রী দলের অনেক নেতা ও কর্মী যদিও এখন বিশেষ প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন এবং ভারতবাসীর বন্ধুত্ব কামনা করিতেছেন, তথাপি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি সুরাবর্দ্দী সাহেব যে কি উদ্দেশ্যে এই সময়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত এরূপ অশোভন ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা বুঝা কঠিন।"

—যুগশক্তি (আসাম (

নির্ব্বাচনের পরের কর্ত্তব্য

"আজ নূতন ভাবে যাঁহারা পৌরসভায় সদস্য হিসাবে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের হুঁসিয়ার হইতে আমরা অনুরোধ করি। পৌরজীবনে দৈনন্দিন কার্য্যে যে শিথিলতা, লালফিতার যে ঢিলেমী এবং রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে গ্লানি প্রবেশ করিয়াছে তাহার সমূল উৎপাটন-ই প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। নির্ব্বাচনে জয়লাভ করাটাই বড় কথা নয়। নির্ব্বাচনে নামিবার পূর্ব্বে 'সাধারণের কাজে নামিতেছি' বলিয়া স্বীয় অন্তরের কাছে ব্যষ্টি স্বার্থ বিসর্জ্জনের যে শপথ গ্রহণ করা হইয়াছে

সমষ্টির স্বার্থে সেই শপথ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইতেছে কি না, তাহাই সদস্যদের অন্তর দিয়া বিচার করিতে হইবে। বিচারের সেই শক্তিতে সকল সদস্যই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠুন—আরম্ভে এইটুকুই আমরা কামনা করি।" —বীরভূমের ডাক

অযোগ্যতার উদাহরণ

নিজেদের অযোগ্যতা ও অপদার্থতা ঢাকিবার জন্ম কংগ্রেসী শাসকেরা কতই না ছলছুতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন! পাকিস্তান হইতে উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ করিতে তাঁহারা অসমর্থ, কেন্দ্রীয় সরকার বলেন, তাঁহারা পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না আর 'আয়রণম্যান' বিধান রায় বুক চাপড়াইয়া বলেন, একমাত্র 'ভগবান'ই জানেন কবে এই অবস্থার অবসান ঘটিবে। সম্প্রতি তাঁহারা আর একটি নিদর্শন স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব্ব সীমান্তে চাল এবং অন্যান্য জিনিষের চোরা কারবার বেশ জাঁকালোভাবে চলিয়া থাকে। ৪ঠা ডিসেম্বর খাদ্যদপ্তরের ছোট কর্ত্তা (উপমন্ত্রী) শ্রীকৃষ্ণাপ্পা রাজ্য সভায় বলেন, সীমান্তের চোরাই চালান বন্ধ করা অসম্ভব। সীমান্তের উভয় পার্শ্বের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাই উহার প্রধান অন্তরায়। তিনি আরও বলেন, এরূপ দেখা গিয়াছে এক পরিবারের ভাঁড়ার ঘর এক রাষ্ট্রে আর রান্নাঘর আর এক রাষ্ট্রে পড়িয়াছে। আমরা শুনিলাম, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট রাত্রি ১২টার সময় কতকগুলি সীমান্ত অঞ্চলে গরু এমনভাবে বাঁধা ছিল, যেগুলির মুখ ছিল ভারতে আর বাঁট পড়িয়া গিয়াছিল, পাকিস্তানে! ভারত বিভাগের পবিত্র চুক্তি রক্ষার্থ কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠী গরুগুলিকে সেই অবস্থায় সযত্নে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কৃষ্ণাপ্পা সাহেব ভাঁড়ার ও রান্নাঘরের কথাগুলি বলিয়াছেন, সেগুলির ভাঁড়ার আছে ভারতে এবং রান্নাঘর রহিয়াছে পাকিস্তানে। কংগ্রেসী শাসকেরা পাকিস্তানের লোকদের কষ্ট দেখিয়া এইরূপ কিছু কিছু ভাঁড়ার রান্নাঘর তৈরী করিয়াও দিয়াছেন।" —হিন্দুবাণী (বাঁকুড়া)

রেশন কার্ডে দুর্নীতি

"বর্দ্ধমান সহরে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রেশন কার্ড সম্বন্ধে নানারূপ অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। বিশেষ করিয়া বাস্তুহারাগণের মধ্যে রেশন কার্ডভুক্তি সম্বন্ধে নানারূপ দুর্নীতির কথা শোনা যাইতেছে। বাস্তুহারাগণের কয়েকটা সমিতি রহিয়াছে। কোন একটিকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া কখনই সুবিবেচনার কাজ হইবে না। বিষয়টা তদন্তের জন্ম আমরা ডি, আর, ও মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।" —বর্দ্ধমান।

শোক-সংবাদ

সরোজিনী ঘোষ

ভারত-ঋষি শ্রীঅরবিন্দের অনুজা ও বিপ্লবকর্মী বারীন্দ্রের অগ্রজা কুমারী সরোজিনী ঘোষ ১২ই অগ্রহায়ণ হোমিওপ্যাথিক কলেজ, হাসপাতালে ৮১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন।

ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলায় সুপ্রসিদ্ধ বীণকার ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৩ই অগ্রহায়ণ ৯৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। প্রমথনাথের পরলোক গমনে বাঙলাদেশ একজন বর্ষীয়ান সঙ্গীত-শিল্পীকে হারাল। প্রমথনাথের বীণবাদন ভারতের ও ভারতের বাইরে বহুজনের শ্রদ্ধা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। কিছুকাল পূর্বে 'ঝঙ্কার' তাঁকে 'ডক্টর অফ মিউজিক' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিল।

ডাঃ মণীন্দ্রনাথ বসু

স্বনামধন্য চিকিৎসক আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ মণীন্দ্রনাথ বসু ১৪ই অগ্রহায়ণ ৮৩ বছর বয়সে লোকান্তর গমন করেছেন। এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-বি-সি-এম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরে পরলোকগত আর-জি-করের অনুরোধে আর-জি-কর (তদানীন্তন কারমাইকেল) কলেজে অ্যানাটমির অধ্যাপকরূপে যোগ দেন ও স্বীয় কর্ম্মদক্ষতায় পরে অধ্যক্ষের আসন অবধি অলঙ্কৃত করেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ইনি অবসর গ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সিণ্ডিকেটের সভ্য ছাড়া মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির ডীনের পদও এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। মোহনবাগান ক্লাবেরও ইনি সভাপতি ছিলেন।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলার অন্যতম দিক্‌পাল সাহিত্য-শিল্পী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৭ই অগ্রহায়ণ ভোর সাড়ে চারটেয় মাত্র ৪৭ বছর বয়সে নীলরতন সরকার হাসপাতালে তিন দিন অজ্ঞান অবস্থায় থাকার পর পরলোক গমন করেছেন। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণ বাঙলা সাহিত্যে এক মর্মান্তিক আঘাত। প্রথম আবির্ভাবেই তিনি জয় করেছিলেন পাঠকচিত্ত, তাঁর লেখনীর অনুপম বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব যেমনই আকস্মিক তেমনই গৌরবোজ্জ্বল। নিপীড়িত-বঞ্চিত-শোষিত জনতার পক্ষ নিয়ে সাহিত্যের মাধ্যমে সংগ্রামের জন্ম মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় অমর হয়ে থাকবেন সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিনের জন্যে। তাঁর সাহিত্য ছিল বাস্তবতায় ভরপুর। তাঁর পদ্মানদীর মাঝি, প্রাগৈতিহাসিক, অতসী মামী, পুতুলনাচের ইতিকথা, জননী, দিবারাত্রির কাব্য প্রভৃতি বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ-বিশেষ। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি

অনুপম ঘটক

বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক ও কণ্ঠশিল্পী অনুপম ঘটক গত বুধবার ২৬এ অগ্রহায়ণ মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে কিছুদিন রোগভোগের পর পরলোক গমন করেছেন। 'আশুতোষের ছাত্রজীবন' প্রণেতা সম্প্রতি পরলোকগত অতুলচন্দ্র ঘটকের ইনি কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ছায়াচিত্রে কণ্ঠদান করে ইনি খ্যাতিলাভ করার পর সঙ্গীত পরিচালকরূপে দেখা দেন ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে 'পায়ের ধূলো' চিত্রে। এর পর বহু চিত্রে ইনি সুর দেন এবং বর্তমানে ইনি একজন ব্যস্ত-সমস্ত ও সার্থকনামা সুরকার প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। অনুপম ঘটকের এই অকাল প্রয়াণে বাঙলার চিত্রজগৎ ও সঙ্গীত-জগৎ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পত্রিকা সমালোচনা

গদ্য রচনার চেয়ে, কাব্য রচনার কাজে প্রয়োজন অনেক বেশী নিষ্ঠা, সাধনা ও ধৈর্য্যের, তপস্যাও বটে। চেষ্টা করলে লোকে বৈজ্ঞানিক হতে পারে, কিন্তু কবি হতে পারে না। কবির ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদত্ত। 'বিবেকানন্দ স্তোত্রে'র লেখক সুমণি মিত্র আজ সেই আশীর্ব্বাদের অধিকারী। ও যেন স্বামিজীর জীবনী নয়, ও যেন নূতন এক আলোর আবির্ভাব। ও যেন বিবেকানন্দের স্তোত্র নয়, ও যেন বিস্মরণ থেকে স্মরণে আনার চৈতন্য :······

"স্বামিজীর কথাতেই জানা গেল আজ
আমরা বাঁদরও নই জাতে পশুরাজ।"···

* * *

যদি বলো—ছুঁলে জাত যায়,
এমন কি হুঁকো ছুঁলে ম্লেচ্ছে যা খায়,
নরেন তা বেশি কোরে ছোঁবে।
হুঁকো থেকে সশব্দে টেনে নেবে ধোঁয়া ;
ট্রাম যায়, বাস যায়,
দেখে নেবে জাত যায় কি না।"······

ট্রাম যায়, বাস যায়, দেখে নেবে জাত যায় কি না।—কবির কি সুন্দর এই উপমাটুকু, কত গম্ভীর এর তাৎপর্য্য, কি সুন্দর রসপূর্ণ এর ভাবার্থ ? ভাবলে যত বেশী ভাল লাগে, তার চেয়ে আশ্চর্য্য হতে হয় বেশী কোরে। কেন না, কবির কি বিস্ময়কর নিষ্ঠা, কি কঠোর তপস্যা, কি অসাধারণ তাঁর অধ্যবসায়। গদ্য ভাষায় বিবেকানন্দের বাণী থেকে তাঁর জীবনবেদ, যে একাধিক গ্রন্থ-সমুদ্র মন্থন কোরে অমৃতের ছন্দে হচ্ছে রচিত, তার যথার্থ মূল্য ; একদিন যোগ্য মনীষীদের দ্বারাই স্বীকৃত হবে। এর পর আরো বলি,—'মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের কলা-বিলাস', প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের ভাষার যাদু আর এক রঙ ধরিয়ে দিলো, মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার মনে। কেমন যেন সাড়া পড়ে গেলো একটা। মুঠো মুঠো কুয়াশা—সত্যিই এক মহামূল্যের মনস্তত্ব। মন থেকে মুছবে না কখনো। নীলকণ্ঠের 'অন্ত ও প্রত্যহ' আর এক দীপ্ত স্বাক্ষর রেখে যাবে এটুকু অনুমান করতে একটুও কষ্ট হয় না। কিন্তু যথার্থ মহলে গিয়ে তাঁর কথা কোন কাজ কোরবে কিনা —কে জানে! ভ্যাসিলি গ্রসম্যান-এর, 'সূর্য,' অনুবাদও মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রম সার্থক হয়েছে। এমন একটি কাহিনীর নির্ব্বাচন ও অনুবাদের জন্ত তাঁকে ধন্তবাদ জানাই। 'শি—ল কু—টা—বে',.কবিতা, দুপুরে কোলকাতার বাড়ীতে থাকলে কিম্বা পথে বেরুলে নতুন হয়ে উঠছে। সত্যিই অনেকেই শুনছে—ক্লান্ত স্বর—টেনে টেনে : শি—ল কু—টা—বে—। স্বর্গত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ উপন্যাস (অসম্পূর্ণ রচনা) 'কুলির বৌ'—এবং সেই সঙ্গে মাসিক বসুমতীর সম্পাদকের কাছে লেখা তাঁর ব্যক্তিগত পত্রগুলিও মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হ'বে জানতে পেরে, আমাদের ভাগ্য এবং সেই সঙ্গে মাসিক বসুমতীর খ্যাতি-মান সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটককে আন্তরিক অভিনন্দন না জানিয়ে পারি না।—শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, জেঃ হুগলী।

আপনার 'মুঠো মুঠো কুয়াশা' ভালো লেগেছে, কিন্তু তার চেয়ে আরো অনেক বেশী ভালো লেগেছে 'যুগান্তরে' প্রকাশিত আপনার মিষ্টি এবং 'মিষ্টিক' সেই ছোটো-গল্পটা—'আলো-আঁধারি'। এবারে 'চার জনে' মনোজ বসুকে পেয়ে খুশি হলাম। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীর ভাব ও ভাষা—দুই উল্লেখযোগ্য। 'বিবেকানন্দ-স্তোত্রে'র কবি সুমণি মিত্র শুধু কি কবি ? আমার মনে হয় সাধকও। এমন উচ্চাংগের লেখা বাংলা-সাহিত্যে খুব বেশী নেই। স্বামিজীর অসংখ্য ভাবময় ব্যক্তিত্বের এমন সূক্ষ্ম, সরস এবং মৌলিক বিশ্লেষণ তাঁর কোনো জীবনীকারই এপর্য্যন্ত দিতে পারেননি। 'রাজায় রাজায়' 'অন্ত ও প্রত্যহ' খুব আগ্রহের সঙ্গেই পড়ছি। আপনাদের 'পত্রগুচ্ছ'ও আর একটা প্রধান আকর্ষণ।—মৃদুলা মুখার্জী শ্রীরামপুর।

উপন্যাসের মধ্যে 'রাজায় রাজায়' উল্লেখযোগ্য। লেখকের ক্লাসিক্যাল ষ্টাইলটি ভারি সুন্দর। জীবনীর মধ্যে 'বিবেকানন্দ স্তোত্র' চমক লাগিয়ে দিয়েছে। বিবেকানন্দের অন্তর্জীবনের নির্ভীক বিশ্লেষণ, সূক্ষ্ম ও তত্ত্ববিচার, বাস্তবিকই চমকপ্রদ। লেখকের অকাট্য যুক্তির কাছে পাঠকের কোন সংশয়ই দাঁড়াতে পারে না। যদিও গতানুগতিক মতবাদ ও ধারণার বিরুদ্ধতাই কোরে গেছেন তিনি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন ছিল বাস্তবধর্ম্মী। তথ্যের চাপে বিদ্যাসাগরের জীবনী লেখাটা মাঝে মাঝে নীরস লাগছে।—অরুণা সেন। বিড়া-বল্লভপাড়া ২৪ পরগণা।

চার জন

আপনাদের পত্রিকার আশ্বিন, ১৩৬৩ সংখ্যায় আমার অগ্রজ শ্রীসুকুমার সেনের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে পাঠ করিয়া সবিশেষ আনন্দিত হইলাম। উক্ত প্রবন্ধে দু'-চারিটি ভুল উক্তি আছে। নিম্নে তাহা উল্লেখ করিতেছি। আপনার পত্রিকার আগামী কোন সংখ্যায় উক্ত ভুলগুলি সংশোধিত করিয়া দিলে সবিশেষ বাধিত হইব। (১) জন্ম—নোয়াখালী সহরে (অধুনা পূঃ পাকিস্থানে)। ২। ইনি ফরিদপুর জিলা স্কুল হইতে উচ্চস্থান

অধিকার করত: প্রবেশিকা (অর্থাৎ Matriculation Examination) পাশ করেন। ফরিদপুর অধুনা পূ:-পাকিস্থানে। (৩) ইনি বাঁকুড়া Weslyan Mission College হইতে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া I. A. পাশ করেন। (৪) ইনি কলিকাতা Presidency College হইতে গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া B. A. পাশ করেন। (৫) ইংলণ্ডে I. C. S. পরীক্ষায় উচ্চাঙ্গ গণিত শাস্ত্রে (অর্থাৎ Higher Mathematics) ইনি সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়াছিলেন। শ্রীঅজিতকুমার সেন ৫৫ নং লেক প্লেস। কলিকাতা—২১।

'আধুনিকা'য় ভুলভ্রান্তি

আমি একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, প্রশ্নটি এই "আধুনিকা" গল্পটি ধারাবাহিক ভাবে মাসিক বসুমতীতে বেরিয়েছে, সেই গল্পটি আমি পড়লুম ও বাজারে যে "আধুনিকা" নামক বই বেরিয়েছে সে বইখানিও পড়লুম। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি মনঃক্ষুণ্ণ হলুম, কারণ ধারাবাহিক ভাবে পড়ে যতটা আনন্দ পেয়েছিলুম—গোটা বইটা পড়ে ততটা নিরাস হলুম। ধারাবাহিকের সঙ্গে এই বইটার অনেক পার্থক্য আছে। এমন কি, প্রতি পরিচ্ছেদেই ঘটনার কম-বেশী ও ভাষার পার্থক্য আছে। সুতরাং গোটা বইটার ও মাসিক বসুমতীর ঘটনাপঞ্জী তুলে দেওয়া সম্ভব নহে, তবু একটা ঘটনা তুলে দিচ্ছি—বইটাতে নায়িকা দেবীর রাণীকে লিখিত চিঠিতেই লেখক পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। কিন্তু মাসিক বসুমতীতে দেবীর আশীর্বাদের দিন পর্যান্ত ঘটনা-পঞ্জী আছে। এর কারণ কি? এটা কি লেখকের ইচ্ছাকৃত? আমার মনে হয়—এটা হয়তো অনেক পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, বা করবে। মিনতি চন্দ্র, ৫২/১ মলঙ্গা লেন কলকাতা।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

টাকা মনিঅর্ডারে পাঠাইলাম। পত্রপাঠমাত্র পত্রিকা পাঠাইবেন।—অমিতা সান্যাল। অবধায়ক শ্রী এস, সান্যাল নারকাটিয়াগঞ্জ। বিহার।

ষাণ্মাসিক চাঁদা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন।—প্রাঞ্জলি দাশগুপ্তা। মোদীনগর। মীরাট।

Sending Rupees fifteen only as subscription for one year, Please enlist me as a new subscriber.—Sm. Aparajita Ghose. Berhampur Main Rd. Mursidabad. West Bengal.

ছয় মাসের টাকা অগ্রিম পাঠালাম। দয়া করে প্রতি মাসে যথাসময়ে মাসিক বসুমতী পাঠাবেন।—সুষমা বসু। এম ৪১১২৮

Sending half yearly subscription for M. Basumati.—Anjali Paul. Berhampur. Mursidabad.

I am sending Rupees seven and annas eight only in advance for supplying me the M. Basumati. Please send regularly.—Anjali Majumder. The Orissa Road Transport Co.

ছয় মাসের টাকা পাঠালাম। আশা করি মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাবো।—গৌরী মজুমদার। C/o. Bata, Berhampur, Ganjam.

I send herewith Rupees fifteen only being annual subscription of M. Basumati.—Hony. secy. Dimakusi J. S. Club. Darrang. Assam.

Remitted herewith Rupees seven and annas seven only as half yearly subscription of M. Basumati. Please enlist my name.—Mayarani Bhattacharjya (M 50809).

Sending Rupees fifteen only and shall be obliged if you please arrange to send us M. Basumati for a year.—Hony. Secy. Bibhuti Smrity Granthagar. Ghatsila. S. E. Rly.

চাঁদা পাঠাইলাম সাড়ে সাত টাকা। পত্রিকা পাঠাবেন।—নমিতা মিত্র। খামারিয়া। জব্বলপুর।

এই সঙ্গে সাড়ে সাত টাকা পাঠাইলাম। ছয় মাসের জন্য আমাকে গ্রাহিকা করিয়া লইবেন।—শ্রীমায়া দাস। C/o. Power Tools and Appliances Co. Bombay—4

I am sending herewith Rupees seven and annas eight only. Please supply M. Basumati regularly.—Sm. Nirupama Dutt. Katigorah. Cachar.

Sending money for six months. Please supply Magazine.—Beena Dey. Burdwan.

ছয় মাসের চাঁদা বাবদ সাড়ে সাত টাকা পাঠালাম। পত্রিকা নিয়মিত পাঠাবেন।—শ্রীমতী চামেলী দেবী। সাঁওতালপুর, জলপাইগুড়ি।

১৩৬৩ সালের শেষার্দ্ধের জন্য টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দাস (৪৮৩২১)।

Please accept further subscription for six months.—Avarani Debi. 38/102. Meston Rd. Kanpur.

বার্ষিক চাঁদা পনেরো টাকা পাঠাইলাম। গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন।—অনীতা মল্লিক। Motibazar, Nagpur—4.

ষাণ্মাষিক চাঁদা সাড়ে সাত টাকা পাঠাইলাম।—Sm. Sovona Bose. Govt Engineering College, Jabbalpur—4.

সাড়ে সাত টাকা মণিঅর্ডারে পাঠানো হচ্ছে। আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করবেন। শ্রীমতী মালতী মুখোপাধ্যায়। The Mall, Kamptee. Nagpur.

Please arrange to send me M. Basumati. Sending money for one year.—Ashima Sen.

পথের বাঁকে

রক্তরাগ
(সামরিক উপন্যাস)
দাম : ৪৲

আছে। সেই জীবনের উপর এই বই (রক্তরাগ) আলোকপাত করছে। আশা করি যে এতে দেশ এবং বিশেষ করে আমাদের সৈনিকরা কিছু দিক্‌দর্শন পাবেন আর খাঁটি সৈনিকের আদর্শ তাঁদের সামনে প্রতিভাত হবে।"—রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ভারতের সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও রাষ্ট্রপতি। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ভূমিকায় লেখা সামরিক উপন্যাস।

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
অনুষ্টুপ ছন্দ
(উপন্যাস)
দাম : ৪৲

"......মাংসের সঙ্গে মাংসের যে আদিম সম্পর্ক তার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেননি সরোজকুমার, যে প্রেম স্বর্গীয় কলুষতাহীন, সংযত লেখনীতে তারই আলেখ্য রচনা করেছেন।"—দেশ।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
সপ্তপদী
(গল্পগ্রন্থ)
দাম : ১৸৹

"......সাতটি আশ্চর্য গল্পের সংকলন 'সপ্তপদী' প্রেমেন্দ্র মিত্রের সর্বাধুনিক গল্পগ্রন্থ। অনন্য কবিদৃষ্টি ও বহুপ্রাপ্ত জীবনবোধের স্পর্শে এবং বিচিত্র চরিত্র ও অজানা পরিবেশের সুনিপুণ চিত্রণে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর অতুলন মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

প্রাণতোষ ঘটক
আকাশ-পাতাল
(উপন্যাস)
দাম : ১ম—৫৲ : ২য়—৫৸৹

"......এ কলকাতার চেহারাই আলাদা। অপচয়ের যুগ। তু হাতে ছড়িয়ে ছিটিয়েও শেষ হয় না। মুঠো মুঠো টাকাই শুধু নয়, মুঠো মুঠো যৌবন। ঘোড়ায় টানা ট্রাম, চিমে তেতালায় পাল্কীর দোলন, বেলোয়ারী কাচের ঠুং ঠাং ছন্দের তালে তালে সুরা আর নারীর উৎসব।...লেখক যে এই উপন্যাসে ইতিহাসকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেও কালজয়ী হয়েছেন, time ও spaceকে অতিক্রম করে তুলতে পেরেছেন তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের ও গৌরবের...।"—দেশ।

বিমল মিত্রের
কন্যাপক্ষ
(উপন্যাস)
দাম : ২৸৹

নারী চরিত্র উদ্‌ঘাটনে বিমল মিত্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অলকা পাল, সুধা সেন, মিষ্টি দিদি, আমার মাসিমা, কালোজামদিদি, মিলি মল্লিক, সোনাদি প্রভৃতি বিচিত্র মন আর ঘটনা নিয়েই এই উপন্যাস। সাতাশ মাসে এই বই বারো হাজার একশো প্রকাশিত হয়েছে।

মোহিতলাল মজুমদারের
সুনির্বাচিত কবিতা
(কবিতাগ্রন্থ)
দাম : ৪৷৷৹

বর্তমান বাংলা কবিতার স্রোত যখন অনুকরণ বাহুল্যে আবিল, তখন প্রবল প্রাণবন্যার মত আবির্ভূত হলেন মোহিতলাল। আধ্যাত্মিকতার সহজ সান্ত্বনা অনায়াসে অস্বীকার করে অনিন্দিত আনন্দের ছন্দে প্রকাশ করলেন শরীরী সৃষ্টির রসোল্লাস। তারই সুনির্বাচিত সংগ্রহ। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখিত ভূমিকা। রেক্সিন বাঁধাই।

দিলীপকুমার রায়ের
অঘটন আজো ঘটে
(উপন্যাস)
দাম : ৪৷৷৹

বর্তমান বস্তুতন্ত্রবাদের দিনে অঘটন বা মিরাকেল-এর সম্ভাবনায় মানুষের মন সায় দেয় না; কিন্তু অঘটন তবুও ঘটে। স্বনামধন্য সুরসাধক ও সাহিত্যসাধক দিলীপকুমার শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-প্রেরণায় আজ অধ্যাত্ম-সাধকে রূপান্তরিত। তাঁর সেই দিব্য-সাধনার অনুভূতি ও উপলব্ধি রঞ্জিত 'অঘটন আজো ঘটে' সাবলীল ভঙ্গীতে বর্ণিত রহস্যঘন উপন্যাস।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
সাগর থেকে ফেরা
(কবিতাগ্রন্থ)
দাম : ৩৲

"......কবিতাকে তক্ষণশিল্পে পরিণত করার চাইতে গভীর অনুভব ও মহৎ ভাবকে কাব্যরূপ দেবার দিকেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের লক্ষ্য। কৃত্রিম সঙ্কীর্ণ চতুর কোন সভ্য মানুষ নয়, এক সহজ বিশাল নিঃসঙ্গ জীবনের অন্বয় খুঁজে নেবার জন্য তাঁর এই সমুদ্র পরিক্রমা।......"
—শনিবারের চিঠি

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি।

আমাদের বই

পেয়ে ও দিয়ে

সমান তৃপ্তি।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

গ্রাম : কালচার — ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭

যাহা যায়
তাহা পাওয়া যায়না
ধন-ঐশ্বর্য্য
কিন্তু
আপনি ইচ্ছামত একটী সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কেশতৈল অনায়াসে পাইতে পারেন। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত 'হিমকল্যাণ'ই আপনার কেশতৈল নির্ব্বাচন-সমস্যা সমাধানে সক্ষম। ইহার কল্যাণ পরশে যাবতীয় কেশরোগ নিরাময় ও মস্তিষ্ক শীতল হয়। দীর্ঘদিন নিয়মিত ব্যবহারেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।
ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যাণ
আয়ুর্ব্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ সুরভিত কেশতৈল।
HIMKALYAN
অন্যান্য প্রসাধনী
পাসিকোকো
সুরভিত নারিকেল তৈল
হিমকল্যাণ
ক্যাষ্টর অয়েল
সুগন্ধিত কেশতৈল
ভৃঙ্গামলা মহোপকারী কেশতৈল
যোজনগন্ধা সুরভি নির্য্যাস
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ
কলিকাতা
UPCO

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৫শ বর্ষ—পৌষ, ১৩৬৩]　　॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥　　[দ্বিতীয় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। "ভগবান্‌কে জান্‌তে গেলে ভগবতীর মত হতে হয়,—ভগবতী যেমন শিবের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন সেইরূপ তপস্যা করতে হয়। পুরুষকে জান্‌তে গেলে প্রকৃতি ভাব আশ্রয় করতে হয়,—সখীভাব, দাসীভাব মাতৃভাব। তাঁকে নানা ছাঁদে সেবা করা যায়। প্রেমিক ভক্ত তাঁকে নানারূপে সম্ভোগ করে। কখনও মনে করে 'তুমি পদ্ম আমি অলি'। কখনও 'তুমি সচ্চিদানন্দ সাগর, আমি মীন'। প্রেমিক ভক্ত আবার ভাবে, 'আমি তোমার নর্ত্তকী'—আর তাঁর সম্মুখে নৃত্য-গীত করে। বলরাম কখনও সখার ভাবে থাকৃতেন, কখনও বা মনে করতেন আমি কৃষ্ণের ছাতা বা আসন হয়েছি। সব রকম তাঁর সেবা করতেন।"

"ব্যাকুল হয়ে মাটিতে পড়ে যখন কাঁদ্‌তাম,—লোকের ভিড় হতো। কিন্তু আমি দেখ্‌তাম্ জীবজন্তু মানুষ যেন সব পটে আঁকা রয়েছে, মনে লজ্জা ভয় কিছুই হতো না।"

"যখন পঞ্চবটীতে মাটিতে পড়ে পড়ে ডাকৃতাম,—আমি মার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম,—মা! আমায় দেখিয়ে দাও, কর্ম্মীরা কর্ম্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে—আমায় জানিয়ে দাও, আমায় দেখিয়ে দাও। আরও কত কি, তা কি বল্‌বো! আহা! কি অবস্থাই গেছে! ঘুম যায়! ঘ্ম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি; এখন যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।"

"যখন বাইশ, তেইশ, বছর বয়স, (১২৬৪—৬৫ সাল) কালী-ঘরে বললে,—তুই কি অক্ষর হতে চাস্? অক্ষর মানে জানি না,——হলধারীকে জিজ্ঞাসা করলাম। হলধারী বললে,—ক্ষর মানে জীব, অক্ষর মানে পরমাত্মা।"

"মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলিনী শক্তি আছেন। চতুর্দ্দল পদ্ম। যিনি আত্মাশক্তি তিনিই সকলের দেহে কুণ্ডলিনীরূপে আছেন। যেমন ঘুমন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। 'প্রসুপ্তভূজগাকারা আধারপদ্ম-বাসিনী।' ভক্তিযোগে কুলকুণ্ডলিনী শীঘ্র জাগ্রত হন। কিন্তু ইনি জাগ্রত না হলে চৈতন্য হয় না, ভগবান-দর্শন হয় না। কামিনীকাঞ্চনে মন থাকলে যোগ হয় না।

সাহিত্যিকের জীবন, সাহিত্যিকের মৃত্যু

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

"His conduct towards his friends, and especially to those who tried to help him, was cavalier. He made a principle of biting the hands that tried to feed him. And the curious thing is that he loved those friends none the less, while they were grateful to accept his abuse."—*Richard Church on D. H. Lawrence.*

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে সূচনাতেই লরেন্স সম্পর্কে জনৈক ইংরেজ সমালোচকের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছি। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, লরেন্সের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সত্যিই কিছু সাদৃশ্য ছিল।. শিল্পাদর্শে না হক, শিল্পের উপকরণে। এবং জীবনেও।

শিল্প এবং জীবনকে ইংল্যাণ্ডের আর ক'জন সাহিত্যিক অভিন্ন রাখতে চেয়েছিলেন? লরেন্সের মত? শিল্প এবং জীবনকে বাংলা দেশের আর ক'জন সাহিত্যিক একীভূত করতে পেরেছিলেন? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত? এবং এই একীকরণের প্রয়াসে লরেন্স অথবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত এতখানি মূল্যই বা আর ক'জনকে দিতে হয়েছে?

সাহিত্য-জীবনে এই একীকরণের পরিণাম দু'জনেরই পক্ষে ফলপ্রদ হয়েছিল। ব্যক্তি-জীবনে কারও পক্ষেই হয়নি। যেমন লরেন্সের, তেমনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও জীবন এবং মৃত্যু সেই আংশিক অসাফল্যের প্রমাণ হয়ে রইল। কিন্তু তার জন্য আক্ষেপ জানিয়ে লাভ নেই। কেন না, ব্যক্তি-জীবনের স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্বে তাঁর ঈষণ্মাত্র আস্থা ছিল না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল না।

নির্বিচার প্রয়োগের ফলে 'বিপ্লব' কথাটির গুরুত্ব ইদানীং হ্রাস পেয়েছে। অন্যথায় বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাবকে এক বৈপ্লবিক ঘটনা বলে আখ্যাত করা চলত। সত্যিই বৈপ্লবিক। সাহিত্যের আদর্শ না হক, উপায় এবং উপকরণ সম্পর্কে যে-সমস্ত ধারণা এ-দেশে প্রচলিত ছিল, সর্বাংশে না হক, অনেকাংশেই তিনি তার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছেন! তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে। এবং, আদর্শই বা নয় কেন? আদর্শের ক্ষেত্রেও তাঁর বিশ্বাস ত প্রচলিত বিশ্বাসের সমর্থক ছিল না। সে-কথা তিনি ইতস্তত ব্যক্তও করেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধে, ভাষণে, বক্তৃতায়। এ সবই আমরা জানি। কিন্তু সত্যের খাতিরে শেষ পর্যন্ত বলতেই হয় যে, অন্তত এক্ষেত্রে—আদর্শের ক্ষেত্রে—তাঁর বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যে কোনও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেনি। এমন কি, তাঁর আপন সাহিত্যেও না। সাহিত্যের কোন্ আদর্শে তাঁর আস্থা ছিল? মনোহরণের আদর্শে অবশ্যই নয়। হিতসাধনকেই তিনি তাঁর লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যের দ্বারা সমাজের কতখানি হিত সাধিত হয়েছে, সে-বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলবার সময় এখন আসেনি। আপাতত এইটুকুই বলবার যে, শেষ লক্ষ্য যাই হক, মানবজীবনের এক অজ্ঞাতপরিচয় অংশের সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, এবং সেই প্রয়াসের সাফল্য প্রায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই বোধ হয় প্রথম বাঙালী সাহিত্যিক, আমাদের শিক্ষাগত নানাবিধ পূর্বসংস্কার এবং চিন্তাগত নানাবিধ ভাবালুতা সম্পর্কে যাঁর বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না। সমাজের অবহেলিত মানুষকে নিয়ে তাঁর আগে কি আর কেউ সাহিত্যরচনা করেননি? অনেকেই করেছেন। এককভাবে ত বটেই, এমন কি সঙ্ঘবদ্ধভাবেও। ভুলে না যাই, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাবের আগেই কল্লোল-গোষ্ঠীর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য তাতে ক্ষুণ্ন হয় না। হয় না এই কারণে যে, তাঁর অগ্রবর্তী শিল্পীরা যেখানে সাহিত্যের উপকরণ নির্ব্বাচনে চরম দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েও বুদ্ধির আভিজাত্যকে ত্যাগ করতে পারেননি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে ছিলেন সম্পূর্ণ মোহমুক্ত মানুষ। নীচের তলার মানুষকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতেই তিনি অনন্য নন। অনন্য এই কারণে যে, সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বোধ হয় নীচের তলায় গিয়ে দেখেছিলেন।

যাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। তার কারণ তথাকথিত শিক্ষিত এবং সভ্য সম্প্রদায়ের অসার সম্ভ্রমবোধ সম্পর্কে তাঁর অশ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। তাদের চিন্তায় যে কতখানি ভ্রান্তি, আচরণে কতখানি কৃত্রিমতা, এবং এ-দুয়ের মধ্যে যে কত বড় অসঙ্গতি রয়ে গিয়েছে, তা তিনি জানতেন। একমাত্র তিনই বোধ হয় জানতেন যে, শুধু অন্যকেই নয়, নিজেদেরও তারা ফাঁকি দিয়ে থাকে দিতে বাধ্য হয়। কার্নিশের দিকে চোখ দেবার আগে বাড়ি ভিত্‌টাকে যে পাকা করে তুলতে হয়, তা তারা জানে না কিংবা জানলেও হয়ত ভুলে থাকতে চায়।

এদের নিয়ে কি তিনি লেখেননি? এদের নিয়েও লিখেছেন এই ফাঁপা আভিজাত্য নিয়ে তিনি বিদ্রূপ করতে পারতেন তা তিনি করেননি। এমন অনেক ছোটগল্প এবং একাধি উপন্যাস তাঁর আছে, বিকৃতবুদ্ধি অথবা বিভ্রান্ত মানুষরাই যা উপজীব্য। এদের তিনি আঘাত দিয়েছেন, কিন্তু ব্যঙ্গের ল করে তোলেননি। তার কারণ আর অন্য কিছুই নয়, তাঁ সিনিক ছিলেন না। সমাজ-শরীরের নানা বিচ্যুতি এবং সমা মানসের নানা অসঙ্গতি সম্পর্কে তাঁর প্রচণ্ড অশ্রদ্ধা ছিল। কি শুধুই অশ্রদ্ধা ছিল না, বেদনাও ছিল। এবং তারও তীব্র বড় সামান্য নয়। হৃদয়ে বেদনা নিয়ে আঘাত হয়ত করা য ব্যঙ্গ করা যায় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও করেননি। এমন তাঁর অন্যতম স্মরণীয় গল্পের সেই ঠিকেদার নায়কটিকেও না, যু বাজারে যে রাতারাতি বড়লোক হতে চেয়েছিল এবং মোটার একটি কন্‌ট্রাক্ট আদায়ের অভিপ্রায়ে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে ি

মিলিটারী অফিসারের গুহায় ধাওয়া করতে যার বাধেনি। কিংবা সেই নিষ্ঠুর চরিত্রটিকেও না, আপন প্রণয়িনীকে যে গণিকালয়ে নিয়ে তুলেছিল। তারা জানত না যে, তাদের মূর্খতার পরিণাম মাত্র একটিই হতে পারে এবং সেই পরিণামের হাত থেকে কেউ নিষ্কৃতি পায় না। অনায়াসে এদের নিয়ে বিদ্রূপ করা চলত। কিন্তু, বিদ্রূপ যেহেতু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বভাবধর্ম ছিল না, এদেরও তিনি করুণার পাত্র করে তুলেছেন।

সমাজের যারা উপর-তলার মানুষ, লোভের পাত্রে যারা মুখ ডুবিয়ে বসে থাকে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী তাদের ক্ষমা করেনি। মধ্যস্থানে থেকে যারা উপর-তলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, তিনি তাদের করুণা করেছেন। তাঁর মমতা এবং সহানুভূতি শুধু তাদের জন্যই সঞ্চিত ছিল, যারা নীচের তলার মানুষ, জীবনে যাদের বিড়ম্বনার অন্ত নেই। সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্যায়ে সেই বিড়ম্বনার হেতুনির্ণয়ে তাঁর ততটা আগ্রহ ছিল না, যতটা তার প্রকৃত রূপচিত্রণে। বলতে বাধা নেই, তাঁর সেই সময়কার সাহিত্যে ঈষৎ নিয়তিবাদী মনোভাবও পরিস্ফুট হয়েছিল। যেমন "পুতুলনাচের ইতিকথা"য়। এ-বই যে বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তাতে বোঝা যায়, আর্টের দরবারে উদ্দেশ্যের ভূমিকা সত্যিই হয়ত উল্লেখযোগ্য নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎকালীন মনোভাব অবশ্য স্থায়ী হয়নি। পরে তিনি সাম্যবাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সাহিত্যের সামাজিক উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত এবং কী হওয়া উচিত নয়, সাম্প্রতিক কালে সে-বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট মতামতও তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, সামাজিক দাবির তুলনায় আর্টের আপন দাবিকেই তিনি বড় বলে গণ্য করতেন। তাঁর সাহিত্য অন্তত সেই কথাই বলবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকে ভালবাসতে চেয়েছিলেন। তাঁর আপন পন্থায়। কিন্তু জীবন যেহেতু তার প্রেমিককেই সর্বাধিক দুঃখ দেয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সে শুধু দুঃখই দিয়েছে। এ নিয়ে তাঁকে আক্ষেপ করতে শোনা যায়নি। আক্ষেপের কোনও হেতুও হয়ত ছিল না। কেন না, বিরহের স্বস্তিকে নয়, মিলনের যন্ত্রণাকেই তিনি কাম্য মনে করতেন।

চলচ্চিত্র

(Newsreel কবিতার অনুবাদ)

সেসিল ডে লুইস্

ও আমার ভাই-বোন সব !
তোমরা চলে এসো এই স্বপনবাসরে,
সমস্ত ঋণকে পিছনে ফেলে,
ইতিহাসকে রেখে এসো দ্বারপ্রান্তের ও-পাশে।
এ-বাসর বীরের শৌর্যক্ষেত্র, আর অদ্ভুত এই
অন্ধকার তোমাদের অচ্ছেদ্য আচ্ছাদন।

স্বচ্ছ দর্পণের চেয়েও উজ্জ্বল এখানের
জলাশয়ের মাছ, আরও উজ্জ্বল তার নাসিকা ;
তাদের কাছে কেরাণী, গুপ্তচর, নার্স, হন্তারক,
রাজপুত্র, মহৎ ও পরাজিত সবই
যেন দিবাস্বপ্নের মত চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

এই সাধারণের মাঝে অবগাহন করো ;
চেয়ে দেখো তোমার সক্রিয়-জীবন
এতদিন কি চেয়েছে—
রূপালী দেয়ালে ঘুমের ছায়া
ভীষণ রুগ্ন ভীতিমূর্তি, তোমার পৃথিবীর
কল্পিত-স্বপ্ন সবই এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এখানে, ঐ দেখো, মেয়র ওয়েষ্টার ঋতুর
উদ্বোধনে রত ; সামাজিক বিবাহে রত দম্পতি :
হেমন্তের টুপি যেন তাদের ফুলে উঠেছে ;
বুড়ো মোরগের দৌড় সুরু হয়েছে,
আর মৎস্যশিকারী রাজনীতিক প্রমাণ করছেন
পৃথিবীর সবই ঠিক আছে !

ওহো, চেয়ে দেখো, ঐ যুদ্ধবাজ এরোপ্লেনের দিকে !
শক্তিমদমত্ত উড়ন্ত ঝাঁক গগন-বিদারী শব্দে
ছুটে কোথায় চলেছে ?
এদের রূপালী ছায়া তোমার
শান্তি স্বপ্ন কি বারে বারে ভেঙে দিতে চায় ?

চেয়ে দেখো ঐ অগ্নিবর্ষী কামান,
তোমার পৃথিবীর গর্ভে
মৃত্যুর বীজ বপন করেছে !
অগ্নি-কোরক, ধূম্র-স্তবক,
লৌহবীজ বপনে রত এই মারণাস্ত্র—
এরা কি সুদূরে চলেছে ?
না, তারা তোমার স্বপ্নের কাছেই বাসা বেঁধেছে :

তারা বাড়ছে, তোমার স্বপ্ন-গৃহের কাছেই বাড়ছে,
তোমার স্বপ্নগৃহ ধূলিসাৎ হবে
একদা রাত্রে দেখবে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত আকাশে
সব কিছু বজ্রনির্ঘোষে ভেঙে পড়েছে,
তখনই কেবল তোমার মনে হবে—
কত দীর্ঘ দিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম !

অনুবাদক : মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

শ্রীমান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-বাতি দুই প্রান্তে জ্বলিয়া শেষ পর্যন্ত নির্বাপিত হইল। গত ১৭ই অগ্রহায়ণ, ৩রা ডিসেম্বর, সোমবার প্রত্যূষে কলিকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মাত্র পূর্বরাত্রিতে তিনি সেখানে সম্পূর্ণ অজ্ঞানাবস্থায় নীত হইয়াছিলেন ; পরিবেশ-পরিবর্তনের দুঃখ তাঁহাকে সহিতে হয় নাই।

বিভিন্ন গল্পসঙ্কলন-গ্রন্থে ও সাময়িক পত্রে তাঁহার জন্মবৎসর সম্পর্কে দুই ভিন্ন মত প্রচারিত হইলেও (১৯০৮ এবং ১৯১০ সন) তাঁহার মৃত্যু যে অকাল মৃত্যু তাহাতে সংশয় নাই। ৪ঠা ডিসেম্বর 'ষ্টেটসম্যান' সম্পাদকীয় (Obituary") মন্তব্য করিয়াছেন—"...he spent the last years of his life seeking an escape from reality by external means."—তিনি বীরের মত কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হন নাই ; জীবনের শেষ কয় বৎসর বহির্বস্তুর সহায়তায় আত্মবিস্মৃতি খোঁজার মধ্যে তাঁহার পলায়নী মনোবৃত্তি ছিল। দলগত একটা কারণ দর্শাইয়া 'ষ্টেটসম্যান' প্রসঙ্গটাকে ঘুলাইয়া তুলিয়াছেন। আমাদের তাহাতে প্রবৃত্তি নাই। আজ আমরা সকলেই শোকাহত, সকলেই বেদনাবিধুর।

কারণ, মানিক ছিলেন সত্যকার স্রষ্টা, সত্যকার সাহিত্যশিল্পী। যে কক্ষেই তিনি আবর্তন করুন, তাঁহার উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন—সকল অয়নই ছিল সাহিত্য-সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া। সাহিত্য তাঁহার প্রাণ ছিল এবং প্রাণধারণেরও একমাত্র অবলম্বন ছিল। সাহিত্য-সেবার জন্য ছাত্র-জীবন অকালে খণ্ডিত করা অবধি এই সাহিত্য-মার্গেই তাঁহার বিচরণ ছিল। অন্য কিছু তিনি করেন নাই, চেষ্টা করিয়াও করিতে পারেন নাই। বি, এস-সি, পড়িতে পড়িতে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে, ১৯২৮ সনের ডিসেম্বরে মাসিক 'বিচিত্রা' পত্রিকায় তাঁহার সদ্য-রচিত সর্বপ্রথম গল্প (এবং সর্বপ্রথম রচনাও) "অতসীমামী" প্রকাশিত হওয়া ইস্তক গল্প-উপন্যাস-সৃষ্টি তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন তাঁহার বয়স কতই বা হইবে! ১৯০৮ সনের মে-জুন মাসে (১৩১৫, জ্যৈষ্ঠ) জন্ম ধরিলেও সাড়ে কুড়ি বছর। এই সাহিত্যের নেশায় তিনি বুঁদ ছিলেন। অন্য নেশা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেও তাহার আগুন তাঁহার দেহটাকে শুধু পুড়াইয়াছিল, মনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহার প্রমাণ, তাঁহার মাত্র আটাশ বৎসরের সাহিত্য-কর্মের নিম্নলিখিত তালিকার মধ্যে মিলিবে।

মানিকের গ্রন্থগুলির এই কালানুক্রমিক তালিকা সঙ্কলন করিতে গিয়া আমাদের অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছে। গোড়ার দিকের বইগুলির প্রকাশকেরা গ্রন্থে সন-তারিখ দেন নাই, অনেকগুলি বইও আর চোখে দেখিবার উপায় নাই। পরবর্তী সংস্করণ বা সাময়িক পত্রে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন দেখিয়া কালনির্ণয় করিতে হইয়াছে। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, আমাদের এই কাজে প্রকাশকেরা যথাসাধ্য সহযোগিতা করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্সের কর্মচারীরা বিশ বৎসর পূর্বেকার খাতাপত্র ঘাঁটিয়া গোড়ার বইগুলি প্রকাশকাল সম্বন্ধে আমাদের নিঃসন্দেহ করিয়াছেন এবং "সাহিত্য-জগৎ"-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মানিকের শেষ বইগুলি সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত সংবাদ দিয়াছেন। তারকাচিহ্নিত বইগুলি আমরা চোখে দেখি নাই এবং ওইগুলি সম্পর্কে কোনও তথ্যও সংগ্রহ করিতে পারি নাই ; যেখানে-সেখানে বসাইয়া দিয়াছি এই আশায় যে, ভবিষ্যতে কোনও একনিষ্ঠ অনুসন্ধানী তথ্যগুলি সংশোধন ও পূরণ করিয়া দিবেন। মানিকের প্রথম গ্রন্থের প্রকাশ সম্বন্ধে যাবতীয় সঙ্কলন-গ্রন্থে ও সাময়িকপত্রে ভুল লেখা হইয়াছে এবং তাঁহার শেষ গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন কোন দৈনিকপত্র ভ্রান্ত সংবাদ দিয়াছেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে নয়, ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ২৩ ফাল্গুন, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ 'জননী' ছাপিয়া মানিক সর্বপ্রথম গ্রন্থকার-শ্রেণীভুক্ত হন এবং তাঁহার শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ 'মাশুল' "সাহিত্য-জগৎ" হইতে গত আশ্বিন মাসে (১৩৬৩) বাহির হয়। যতদূর জানিয়াছি, তাঁহার দুইখানি বই ছাপা হইতেছে, বেঙ্গল পাবলিশার্স ছাপিতেছেন 'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান' উপন্যাস। এক শো আটাশ পৃষ্ঠার মত আকার লইয়া এই অগ্রহায়ণ মাসেই বাহির হইবে। এই বইখানির মুদ্রণ শুরু হইয়াছিল দুই বৎসর পূর্বে এবং সম্ভবতঃ এইটিরই একটি রূপান্তর আগামী বড়দিন-সংখ্যা কোনও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ডি, এম, লাইব্রেরি ছাপিতেছেন 'মাটি-ঘেঁষা মানুষ' উপন্যাস, ইহাও আকারে ছোট এবং 'মাসিক বসুমতী'তে অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত "একটি চাষীর মেয়ে"র রূপান্তর। ইহাও শীঘ্রই বাহির হইবে। শেষ উপন্যাস 'শান্তিলতা'র পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন "সাহিত্য-জগৎ"—ইহাও যথাসময়ে মুদ্রিত হইবে। মানিকের গ্রন্থপঞ্জীর খসড়া এইরূপ :—

১। জননী, উপন্যাস, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ৭ মার্চ ১৯৩৫, পৃ ২৮৪।

২। অতসীমামী, গল্প, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ৭আগষ্ট ১৯৩৫, পৃ ২৬৭।

লেখকের নিবেদন : "রচনাকাল অনুসারে গল্পগুলি সাজানো হয়েছে। অতসীমামী আমার প্রথম রচনা। তার পর লেখার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেটা স্পষ্টই বোঝা যাবে।"

গল্পের নাম : অতসীমামী, নেকী, বৃহত্তর-মহত্তর, শিপ্রার অপমৃত্যু, সর্পিল, পোড়াকপালী, আগন্তুক, মাটির সাকী, মহাসঙ্গম, আত্মহত্যার অধিকার—মোট দশটি।

৩। দিবারাত্রির কাব্য, উপন্যাস, ডি, এম, লাইব্রেরী, ডিসেম্বর ১৯৩৫, পৃঃ ২০৪।

লেখকের নিবেদন : "দিবারাত্রির কাব্য আমার একুশ বছর বয়সের রচনা। শুধু প্রেমকে ভিত্তি করে বই লেখার সাহস ওই বয়সেই থাকে। কয়েক বছর তাকে তোলা ছিল। অনেক পরিবর্তন করে গত বছর (১৩৪১ বঙ্গাব্দ) বঙ্গশ্রীতে প্রকাশ করি।

দিবারাত্রির কাব্য পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয়, বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক,—তখন মনে রাখতে হবে, এটি গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়, রূপক-কাহিনী। রূপকের এ একটা নূতন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায়, সেইগুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের projection—মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।"

এই "নিবেদন" হইতে অনুমান হয়, মানিকের জন্ম সন ১১০৮ সন। ১১১০ সন হইলে মানিক ১১৩১ সনে ইহা লেখেন। আমরা 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক থাকাকালে, ১১৩৩ সনের শেষে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাই। তাহা হইলে "কয়েক বছর তাকে তোলা" থাকার কথা সত্য হয় না।

শ্রীসজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি' ২য় খণ্ডের ২৬১ পৃষ্ঠায় এই পুস্তক সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—শ্রীমান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গল্প ("সরীসৃপ", আশ্বিন ১৩৪০) লইয়া ('বঙ্গশ্রী'র) আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে একটি বিচিত্র উপন্যাস হস্তে তাঁহার শুভাগমন ঘটিল। এই উপন্যাসের ক্রমপরিণতির কাহিনীও বিচিত্র। আমার যতদূর ধারণা, এই উপন্যাসের ভিত্তিতেই মানিকের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। মানিক তখন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে বলিলেও চলে। মুখচোরা লাজুক ছেলে, কিন্তু "সরীসৃপ" গল্পেই তাঁহার পোক্ত পরিণত মনের পরিচয় পাই ছিলাম, সে মন সরল সাধারণ নহে, কুটিল জটিল অসাধারণ। লেখাটির পরিণতি সম্বন্ধে তখনও অব্যবস্থিতচিত্ত মানিক "একটি দিন" নামীয় একটি সম্পূর্ণ ছোট গল্পের আকারে উপন্যাসটি উপস্থিত করিলেন। পড়িয়াই বলিলাম, করিয়াছ কি? একটা উপন্যাসের সম্ভাবনাকে এমন ভাবে হত্যা করিবে? বিচলিত মানিক বিদায় লইলেন, আমি "একটি দিন" সম্পূর্ণ গল্পাকারেই ছাপিয়া দিলাম (বৈশাখ ১৩৪১)। অনতিবিলম্বে মানিক "একটি দিনে"র উপসংহার "একটি সন্ধ্যা" লইয়া উপস্থিত হইলেন। "একটি সন্ধ্যা"তেই শেষ হইল না, দুই সংখ্যা পরে সন্ধ্যা "রাত্রি"তে গড়াইল এবং আরও দুই সংখ্যা পরে "রাত্রি"—"দিবারাত্রির কাব্য" হইল। এই উপন্যাসের নাম-পরিবর্তনে মানিকের মনের গঠনের ছাপ আছে। এই উপন্যাসটি ব্যক্তিগত ভাবে আমার খুব প্রিয়, কারণ ইহার মধ্যস্থতায় আমি মানিককে জানিয়াছিলাম।"

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং ইহার পরবর্তী সংস্করণ ছাপিয়াছেন।

৪। পুতুলনাচের ইতিকথা, উপন্যাস, ডি, এম, লাইব্রেরি, ১১৩৬ (?)।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রকাশিত ৫ম সংস্করণ চলিতেছে।

৫। পদ্মানদীর মাঝি, উপন্যাস, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২৮ মে ১১৩৬, পৃঃ ২০৮।

বেঙ্গল পাবলিশার্স ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

*৬। জীবনের জটিলতা, উপন্যাস, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স (?), নবেম্বর ১১৩৬।

৭। প্রাগৈতিহাসিক, গল্প, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড স- ১৭ এপ্রিল ১১৩৭, পৃঃ ২২৪।

এম, সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত পুনর্মু- (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১) চলিতেছে।

গল্পের নাম: প্রাগৈতিহাসিক, চোর, মাটির সাকী, যাত্রা, প্রকৃ- ফাঁসি, ভূমিকম্প অন্ধ, চাকরী, মাথার রহস্য—'অতসীমামী'তে প্- প্রকাশিত "মাটির সাকী"কে বাদ দিয়া মোট নয়টি।

৮। অমৃতস্য পুত্রাঃ, উপন্যাস, কাত্যায়নী বুক ষ্টল, জুলা- ১১৩৮, পৃঃ ২২০।

৯। মিহি ও মোটা কাহিনী, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড স- ২০শে সেপ্টেম্বর ১১৩৮, পৃঃ ১৬২।

গল্পের নাম: টিকটিকি, বিপত্নীক, ছায়া, হাত, বিড়ম্ব- রকমারি, কবি ও ভাস্করের লড়াই, আশ্রয়, শৈলজ শিলা, খুক- অবগুণ্ঠিত, সিঁড়ি—মোট বারোটি।

১০। সরীসৃপ, গল্প, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৭ আগ- ১১৩৯, পৃঃ ১৭৬।

গল্পের নাম: মহাজন, মমতা দি, মহাকালের জটার জ- গুপ্তধন, প্যাঁক, বিষাক্ত প্রেম, দিকপরিবর্তন, নদীর বিদ্রোহ, মহাবী- ও অচলার ইতিকথা, দু'টি ছোট্ট গল্প, সরীসৃপ—মোট এগারোটি

১১। সহরতলী—প্রথম পর্ব, উপন্যাস, গুরুদাস চট্টোপাধ্যা- এণ্ড সন্স, ১ই জুলাই ১১৪০, পৃ ২০৮ (?)।

২য় সংস্করণ চলিতেছে।

১২। সহরতলী দ্বিতীয় পর্ব, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড স- ১১৪১ (?), পৃ ১৩৫।

ডি, এম, লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত, ২য় সংস্করণ চলিতেছে

১৩। বৌ, গল্প, এম সি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ (?), ১১৪৩(- ২য় সংস্করণ, ঐ, ১১৪৬, পৃ ২৬৪।

গল্পের নাম: দোকানীর বৌ, কেরানীর বৌ, সাহিত্যিকে- বৌ, বিপত্নীকের বৌ, তেজী বৌ, কুষ্ঠরোগীর বৌ, পূজারীর বৌ- রাজার বৌ, উদারচরিতা নামের বৌ, প্রৌঢ়ের বৌ, সর্ববিদ্যাবিশারদে- বৌ, অন্ধের বৌ, জুয়াড়ীর বৌ—মোট তেরটি।

১৪। সমুদ্রের স্বাদ, গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ১১৪- পৃ ১৫২।

গল্পের নাম: সমুদ্রের স্বাদ, ভিক্ষুক, পূজাকমিটি, আপিম- গুণ্ডা, কাজল, আততায়ী, বিবেক, ট্র্যাজেডির পর, মালী, সা- একটি খেয়া—মোট বারোটি।

১৫। ভেজাল গল্প, সিগনেট প্রেস, ১১৪৪, পৃ ১৪৪।

গল্পের নাম: ভয়ংকর, রোমান্স, ধনজনগৌরব, মুখে-ভা- মেয়ে, দিশেহারা হরিণী, মৃতজনে দেহ প্রাণ, যে বাঁচায়, বিলাসন- বাস, স্বামি-স্ত্রী—মোট এগারোটি।

১৬। দর্পণ, উপন্যাস, বুক এম্পোরিয়াম, জুন ১১৪৫ পৃ ৩২০।

প্রথম সংস্করণের শেষে "সমাপ্ত প্রথম ভাগ" লেখা ছিল- কিন্তু বেঙ্গল পাবলিশার্সের দ্বিতীয় মুদ্রণে তাহা নাই।

"লেখকের কথা"—"প্রায় তিন বছর আগে উপন্যাসটি পাটনা- একটি মাসিকে মাসে মাসে লিখতে আরম্ভ করেছিলাম; অ-

নাম দিয়েছিলাম। কিছুদিন লেখার পর নানা কারণে লেখা বন্ধ করি। আমার বইখানা সম্পূর্ণ করে দর্পণ নাম দিয়ে প্রকাশ করলাম···আষাঢ় ১৩৫২"

অসম্পূর্ণ লেখাটি পাটনার 'প্রভাতী' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।

১৭। সহরবাসের ইতিকথা, উপন্যাস, ডি, এম, লাইব্রেরি, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। ২য় সং. বেঙ্গল পাবলিশার্স, আষাঢ় ১৩৬০, জুন-জুলাই ১৯৫৩, পৃ ১৭১।

লেখকের নিবেদন—"কয়েক বছর আগে একটি দৈনিক পত্রিকার [আনন্দবাজার] শারদীয় সংখ্যায় এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল, ঘষামাজা করার প্রয়োজনও ছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার সময় ঘটনাচক্রে ও সব কিছুই করা হয় নি।···এই সংস্করণে যথাসাধ্য সংশোধন করে দিলাম।···আমি ভূমিকা লেখার জন্যই একটা ভূমিকা জুড়ে দেওয়ার নীতির বিরোধী। দু'চারটি বইয়ে দু'চার লাইন ভূমিকা হয় তো দিয়েছি! 'সহরবাসের ইতিকথা'র কপালেই আমার সব চেয়ে বড় ভূমিকা জুটল।"

১৮। আজ কাল পরশুর গল্প, গল্প, সংকেত-ভবন, এপ্রিল-মে ১৯৪৬, পৃ, ১৬০ (?)।

লেখকের নিবেদন—"···গল্পগুলির প্রায় সমস্তই এক বছরের মধ্যে লেখা।"

গল্পের নাম—আজ কাল পরশুর গল্প, দুঃশাসনীয়, নমুনা, বুড়ী, গোপাল শাসমল, মঙ্গলা, নেশা, বেড়া, তারপর, স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই, শত্রুমিত্র, রাঘব মালাকর, যাকে ঘুষ দিতে হয়, কৃপাময় সামন্ত, নেড়ী, সামঞ্জস্য—মোট ষোলটি।

১৯। চিন্তামণি, উপন্যাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, জুলাই, ১৯৪৬, পৃ, ১০১।

২০। পরিস্থিতি, গল্প, অগ্রণী বুক ক্লাব, অক্টোবর ১৯৪৬, পৃ, ১৬১।

গল্পের নাম—প্যানিক, সাড়ে সাত সের চাল, প্রাণ, রাসের মেলা, মাসিপিসি, অমানুষিক, পেটব্যথা, শিল্পী, কংক্রীট, রিক্সাওয়ালা, প্রাণের গুদাম, ছেঁড়া—মোট বারোটি।

লেখকের নিবেদন—'প্যানিক' 'সাড়ে সাত সের চাল' ও 'রিক্সাওয়ালা' ছাড়া অন্য গল্পগুলি বছর খানেকের মধ্যে লেখা। 'প্যানিক' যুদ্ধের গোড়ার দিকে লেখা, অন্য দুটি তার পরবর্তী সময়ে। চারি দিকে দ্রুত ও বিরাট পরিবর্তনের কতকগুলি ছাড়া ছাড়া দিকের ছাপ গল্পগুলিতে আছে, সব কিছু বদলে যাচ্ছে এইটুকু শুধু গল্পগুলির একতা। সবগুলি গল্প মিলে বিশেষ কোনো অখণ্ড সমগ্রতা বা ধারা কতখানি গড়তে পেরেছে বলা কঠিন। ২১শে ভাদ্র, ১৩৫৩।"

২১। চিহ্ন, উপন্যাস, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, জানুয়ারি ১৯৪৭, পৃঃ ১১৬।

"লেখকের কথা"—"চিহ্ন বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন করেছি। বইখানা নতুন টেকনিকে লেখা, একে উপন্যাস বলা চলবে কি না আমার জানা নেই। এই ধরণের কাহিনী, যার ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে ঘটে চলে, এ ভাবে সাজালেই জোরালো হয় বলে মনে করি। মাঘ, ১৩৫৩।"

২২। আদায়ের ইতিহাস, উপন্যাস, এম সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৯৪৭ (?), পৃঃ ৮২।

২৩। হলুদপোড়া, গল্প, কমলা পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৭ (?)।

গল্পের নাম—হলুদপোড়া, বোমা, তোমরা সবাই ভালো, চুরি চুরি খেলা, ধাক্কা, ওমিলনাইন, জন্মের ইতিহাস, ফাঁদ, ভাঙা-ঘর, অন্ধ ও ধাঁধা—মোট দশটি।

২৪। খতিয়ান, গল্প, প্রকাশক ?, ১৯৪৭, পৃঃ ১৪১।

গল্পের নাম—খতিয়ান, ছাঁটাই রহস্য, চক্রান্ত, গুণামী, কানাই তাঁতি, চোরাই, চালক, টিচার, ছিনিয়ে খায় নি কেন, একান্নবর্তী—মোট দশটি।

২৫। চতুষ্কোণ, উপন্যাস, ডি, এম, লাইব্রেরি, ১৯৪৮, পৃঃ ৭২ (?)।

২৬। অহিংসা, উপন্যাস, ডি, এম, লাইব্রেরি, ১৯৪৮, পৃঃ ৩১২ (?)।

*২৭। ধরাবাঁধা জীবন, উপন্যাস, ফাইন আর্ট প্রিণ্টিং ওয়ার্কস।

২৮। প্রতিবিম্ব, উপন্যাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৪৯, পৃঃ ১৯২ (?)।

২৯। ছোটবড়, গল্প, প্রকাশক ?, প্রকাশকাল ?, পৃ, ?।

গল্পের নাম—ভালবাসা, তথাকথিত, চালক, ছেলেমানুষি, স্থানে ও স্থানে, ষ্টেশন রোড, পেরাণটা, দীঘি, হারাণের নাতজামাই, ধান, সাথী, গায়েন, নব আলপনা, ব্রীজ—মোট চোদ্দটি।

৩০। ছোটবকুলপুরের যাত্রী, গল্প, ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিঃ, ১৯৪৯, পৃ, ৯২।

গল্পের নাম—ছোটবকুলপুরের যাত্রী, বাগদুতারা দিয়ে, মেজাজ, প্রাণাধিক, ঘর করলাম বাহির, সখী, নীচু চোখে দু আনা দু পয়সা, নীচু চোখে মেয়েলি সমস্যা—মোট আটটি।

৩১। জীয়ন্ত, উপন্যাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, জুন-জুলাই ১৯৫০, পৃ, ২৫৬। দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই-আগষ্ট ১৯৫৪।

৩২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স, জুলাই-আগষ্ট ১৯৫০, পৃ, ১৷৵৹ + ২৩৮। দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে-জুন ১৯৫৩, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের ভূমিকা।

গল্পের নাম—প্রাগৈতিহাসিক, টিকটিকি, আত্মহত্যার অধিকার, সরীসৃপ, কুষ্ঠরোগীর বৌ, হলুদপোড়া, সমুদ্রের স্বাদ, বিবেক, আফিম, আজ কাল পরশুর গল্প, যাকে ঘুষ দিতে হয়, নমুনা, দুঃশাসনীয়, কংক্রিট, শিল্পী, হারাণের নাতজামাই, বিচার, ছোটবকুলপুরের যাত্রী—মোট আঠারোটি।

৩৩। মানিক-গ্রন্থাবলী—প্রথম ভাগ, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, জুলাই-আগষ্ট ১৯৫০, পৃ, ২৩৬।

ইহাতে আছে জননী, হলুদপোড়া, চতুষ্কোণ, আজ কাল পরশুর গল্প।

৩৪। পেশা, উপন্যাস, ডি, এম, লাইব্রেরি, ১৯৫১, পৃ, ২০০।

৩৫। স্বাধীনতার স্বাদ, উপন্যাস, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০ জুন ১৯৫১, পৃ, ২৬১।

লেখকের কথা—"এই উপন্যাসটি ১৩৫৬-৫৭ সালে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ বইখানা লেখা হয়েছিল তিন বছর আগে—শেষ হয় ৫৭এর গোড়ার দিকে।"

লেখকের নিবেদনে ভুল আছে। 'মাসিক বসুমতী'তে "নগরবাসী"

নামে ইহা প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ সালের বৈশাখ হইতে। শেষ হয় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে।

৩৬। সোনার চেয়ে দামী (১ম খণ্ড—বেকার) উপন্যাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, মে-জুন ১৯৫১, পৃ ১১৮।

৩৭। ছন্দপতন, উপন্যাস, নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৫১, পৃ, ১৬৬।

৩৮। সোনার চেয়ে দামী (২য় খণ্ড—আপোষ) উপন্যাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, পৃ, ২২৭।

লেখকের কথা—"বিজ্ঞাপিত ডাক নাম 'মালিক' হয়ে গেল 'আপোষ'।"

৩৯। মানিক-গ্রন্থাবলী—দ্বিতীয় ভাগ, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৫২, পৃ ১০৭ + ৩০ + ৬২।

ইহাতে আছে—অহিংসা, ধরাবাঁধা জীবন, ছোট-বড়।

৪০। ইতিকথার পরের কথা, উপন্যাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, আগষ্ট ১৯৫২, পৃ ২৬৫।

লেখকের নিবেদন—"এই উপন্যাসটি 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সময় অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্জন করা হয়েছে। ভাদ্র ১৩৫৯।"

৪১। পাশাপাশি, উপন্যাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ১৯৫২, পৃ ২০৬।

৪২। সার্বজনীন, উপন্যাস, ডি, এম, লাইব্রেরি, অক্টোবর ১৯৫২, পৃ, ২৫২।

"লেখকের কথা"—"এই কাহিনীর মূল ভিত্তি হল সমাজের ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমা ভেঙে গিয়ে সার্বজনীন ব্যাপকতার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার যে নতুন গতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে [তার ওপর]।"

*৪৩। আরোগ্য, উপন্যাস, ক্যালকাটা বুক ক্লাব।

৪৪। তেইশ বছর আগে পরে, উপন্যাস, ক্যালকাটা পাবলিশার্স অক্টোবর ১৯৫৩, পৃ, ২৩৩।

৪৫। নাগপাশ, উপন্যাস, সাহিত্য-জগৎ, এপ্রিল ১৯৫৩, পৃ, ১১৬।

৪৬। ফেরিওলা, গল্প, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, মে ১৯৫৩, পৃ, ১৪৩।

লেখকের নিবেদন—"গত দু বছর ধরে গল্পগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা কিন্তু গল্পগুলির মধ্যে সমসাময়িক সামাজিক জীবনের মূলসূত্রের একটা যোগাযোগ আছে বলেই আমার বিশ্বাস।···বৈশাখ, ১৩৬০।"

গল্পের নাম—ফেরিওলা, সখি, সংঘাত, সতী, লেভেল ক্রসিং, ধাত, ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই, চুরি-চামারী, দায়িক, মহাকর্কট বটিকা, আর না কান্না, মরব না সন্তায়, এক বাড়িতে—মোট তেরোটি।

৪৭। চালচলন, উপন্যাস, ডি, এম লাইব্রেরি, জুন-জুলাই ১৯৫৩, পৃ, ১১৩।

৪৮। লাজুকলতা, গল্প, রীডার্স কর্নার, জানুয়ারি ১৯৫৪, পৃ, ১৬০।

"লেখকের কথা"—"এই সঙ্কলনের অধিকাংশ গল্প তিন চার বছরের মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একটি গল্পসঙ্কলনে মূল একটি সূত্রের ভিত্তিতে, অর্থাৎ সমাজ-জীবনে কোনো একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ অবস্থার ছোট ছোট কাহিনীর মধ্যে যে মিলটা স্বভাবত থাকে, তাকে আশ্রয় করে গল্প চয়ন করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি। এই সঙ্কলনেও সেই চেষ্টা করেছি।··· কোজাগরী পূর্ণিমা ১৩৬০।"

গল্পের নাম—লাজুকলতা, উপদলীয়, এদিক ওদিক, এপিঠ ওপিঠ, পাশ ফেল, কলহান্তরিত, গুণ্ডা, বাহিরে ঘরে, চিকিৎসা, মীমাংসা, সুবালা, অসহযোগী, আপদ, স্বাধীনতা নিরুদ্দেশ, পাষণ্ড—মোট ষোলটি।

৪৯। শুভাশুভ, উপন্যাস, ডি, এম, লাইব্রেরি, অক্টোবর ১৯৫৪, পৃ, ২৬০।

"লেখকের কথা"—"কয়েক বছর আগে একটি অজ্ঞাতনামা ছোট ছোট নূতন মাসিক পত্রিকায় এই উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে লিখিতে সুরু করেছিলাম। কয়েক মাস প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটির অকাল মৃত্যু ঘটে এবং যথারীতি আমারও বইটি শেষ করার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে যায়। এত দিন পরে আবার নতুন করে গোড়া থেকেই বইটি লিখে ফেলেছি। এটি আমার পরীক্ষামূলক উপন্যাস···"

৫০। হরফ, উপন্যাস, সাহিত্য-জগৎ, মে ১৯৫৪ পৃ, ২৪৪।

৫১। পরাধীন প্রেম, উপন্যাস, রীডার্স কর্নার, মে ১৯৫৫, পৃ, ১৮১।

*৫২। ভিটেমাটি, নাটক।

*৫৩। মাটির মাশুল, নাটক।

৫৪। হলুদ নদী সবুজ বন, উপন্যাস, নিউ এজ পাবলিশার্স লিঃ, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬, পৃ, ২৬৮।

"লেখকের কথা"—"হলুদ নদী সবুজ বন আট দশ মাস আগে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আমার শরীর খারাপ, এই দোষে বইটা এত দিন আটক হয়েছিল। দোষ আমার।···"

৫৫। * মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ব-নির্বাচিত গল্প, গল্প, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, জুন ১৯৫৬, পৃ, ২২৯।

স্বহস্তের প্রতিলিপিতে "লেখকের কথা"—"···গল্প নির্বাচনে কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে সে বিচার করিনি। গল্পের বিচারে ধারাবাহিকতার হিসাবটাই নিরর্থক। দশজনে আমার যে গল্পকে যতটা সমাদর করেছেন মোটামুটি সেটাই আমি এই সঙ্কলনের জন্য গল্প নির্বাচনের মাপকাঠি ধরে নিয়েছি।···২৫ বৈশাখ ১৩৬২।"

গল্পের নাম।—বৃহত্তর-মহত্তর, নেকী, চোর, ফাঁসি, ভূমিকম্প, টিকটিকি, বিপত্নীক, সিঁড়ি, মহাকালের জটার জট, হলুদপোড়া, চুরি চুরি খেলা, ফাঁদ, রাঘব মালাকর, প্রাক্‌শারদীয় কাহিনী, রক্ত নোনতা, হারাণের নাতজামাই, ভিক্ষুক, ধান, বিবেক, শিল্পী—মোট কুড়িটি।

৫৬। মাশুল, উপন্যাস, সাহিত্য-জগৎ, অক্টোবর ১৯৫৬, পৃ, ২১৪।

ইহাই মানিকের জীবিত কালের শেষ মুদ্রিত গ্রন্থ।

প্রকাশিতব্য নূতন তিনখানি উপন্যাস ধরিয়াও মানিকের

উপন্যাসের সংখ্যা ৪০, নাটক ২, গল্পের বই ১৫, নির্বাচিত গল্প ২ = মোট ৫৯ খানি বই। গল্পের সংখ্যা ১৭৭।

বাংলা কথা-সাহিত্যের বিপুল আসরে মানিকের যথাযথ স্থান-নির্ণয়ের চেষ্টা পণ্ডিত ও রসিক জন সময় ও অবকাশমত করিবেন। ইতিমধ্যেই মোহিতলাল তাঁহার 'সাহিত্য-বিতানে' ও ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা'য় এই কাজ কতকটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীমান জগদীশ ভট্টাচার্য 'শ্রেষ্ঠ গল্পে'র ভূমিকায় মানিকের গল্পগুলির যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য। আরও অনেকে মানিক-সাহিত্য সম্বন্ধে ক্ষুদ্র-বৃহৎ আলোচনা করিয়াছেন। আমরা এখন এখানে যথাসাধ্য উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কালপ্রবাহে যে সকল উপাদান হারাইয়া গিয়া সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তাহাই ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। অনেক ফাঁক ও অসম্পূর্ণতা থাকিয়া গেল, মানিকের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত অপেক্ষাকৃত তরুণ কোনও সাহিত্যিক যদি আমাদের ত্রুটিপূরণে অগ্রসর হন তাহা হইলে মানিক সম্পর্কিত বাহ্য উপাদান সম্পূর্ণ সংগৃহীত হইতে পারে এবং ভবিষ্যতে রসিক ব্যক্তিরা এই সকল উপকরণের সাহায্যে মানিকের যথাযথ মূল্যবিচারও করিতে পারিবেন। যে পরিশ্রম আমাদের সাধ্যে কুলাইল না, তাহা যে একান্ত প্রয়োজন তাহার কারণ-স্বরূপ বলিতে পারি—১৩৫৩-৫৪ বঙ্গাব্দে 'মাসিক বসুমতী'তে মানিকের "মাটি" নামক যে ক্ষুদ্র অথচ ধারাবাহিক গল্পটি বাহির হইয়াছে তাহার শেষ পরিণতি কি? অর্থাৎ "মাটি" প্রকাশিত কোন্ উপন্যাসে বিধৃত হইয়াছে? ফাল্গুন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ হইতে 'একটি চাষীর মেয়ে' নামক যে উপন্যাসখানি এখন পর্যন্ত অনিয়মিত ভাবে 'মাসিক বসুমতী'তে বাহির হইয়া এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, ডি এম লাইব্রেরীর প্রকাশিতব্য উপন্যাস 'মাটি-ঘেঁষা মানুষ'-এর সহিত তাহার অমিল কতখানি? 'চিন্তামণি' উপন্যাস 'পূর্বাশা'য় বাহির হইয়াছিল কি? হইয়া থাকিলে তাহার কি নাম ছিল? মানিকের লেখা 'চাষী' 'মজুর' প্রভৃতি দুই-তিনখানি নাটকের নাম পরম্পরায় শুনিলাম, কিন্তু কোথাও তাহার কোন সন্ধান মিলিল না। এই গুলিকে খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক। শ্রীমান প্রাণতোষ ঘটকের নিকট সংবাদ পাইলাম, মানিক 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশার্থ 'একটি চাষীর মেয়ে'র উপসংহার 'কুলির বৌ'-এর একটি অধ্যায় মাত্র তাঁহাকে দিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী অংশ লেখা হইয়াছে কি না? মানিকের বিবিধ গল্প-সংগ্রহ গ্রন্থে মুদ্রিত গল্পগুলি ছাড়া নানা সাময়িক পত্রে, বিশেষ করিয়া শারদীয় সংখ্যাগুলিতে পুস্তকাকারে অমুদ্রিত আরও অনেক গল্প ছড়াইয়া থাকা সম্ভব। কয়েকটি বারোয়ারী উপন্যাসেও মানিকের সহযোগিতা ছিল, সেগুলির সন্ধান লইয়া মানিক-লিখিত অধ্যায়গুলি বাছাই করাও দরকার। অনেক বার্ষিক ও সাময়িক সঙ্কলনগ্রন্থে তাঁহার গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যেমন 'কথাগুচ্ছ', 'কথা-শিল্প', 'আমার প্রিয় গল্প', 'মহামন্বন্তর', '১৩৫১ (৫২, ৫৩, ৫৪)-র সেরা গল্প', 'আজকের ছোটগল্প' 'নতুন লেখা' প্রভৃতি। এইগুলিতে প্রকাশিত সব গল্প মানিকের গল্পগ্রন্থ-ভুক্ত হইয়াছে কি না? এইরূপ আরও নানা প্রশ্নের অচিরাৎ সমাধান চাই এবং এখনই তৎপর হইয়া "মিসিং লিঙ্ক"গুলি খুঁজিয়া বাহির করা প্রয়োজন। প্রবন্ধ-সাহিত্য ও কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার দানের পরিমাণও নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক।

মানিকের জীবনীর উপকরণ যৎসামান্য। বিবিধ দৈনিক ও সাময়িক পত্র ও গল্পসঙ্কলন-গ্রন্থ হইতে যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা এই :

মানিকের পৈতৃক নিবাস ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালবদিয়া গ্রাম। পিতা শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এখন অষ্টাশীতিপর বৃদ্ধ, মাতা নীরদাসুন্দরী পূর্বেই গত হইয়াছেন। মানিক ছয় ভাইয়ের মধ্যে চতুর্থ, বোনও চারি জন। বড় ভাইয়েরা সকলেই কৃতী; উচ্চচাকুরীজীবী।

পিতা প্রথমে ছিলেন সেটেলমেন্টের কানুনগো, পরে সাব-ডেপুটি কালেক্টর হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। চাকরি-ব্যপদেশে তাঁহাকে বাংলা ও বিহারের বহু স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। কাজেই মানিক জন্মের পর হইতে কলিকাতা আগমন পর্যন্ত বহু স্থানের ও বহু মানুষের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছেন। ১৯০৮ সনের মে-জুন মাসে মানিকের জন্ম হয় দুমকায়, ১৯২৬ সনে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন মেদিনীপুর হইতে, আই, এস সি, পাস করেন বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ হইতে ১৯২৮ সনে। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এস-সি, পড়িতে পড়িতে সাহিত্য-জীবন শুরু হয়। বি, এস-সি আর পাস করা হয় নাই। জীবনের এই আকস্মিক গতি পরিবর্তনেই সম্ভবতঃ দাদাদের স্নেহবঞ্চিত হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। সামান্য কিছুকালের জন্য সামান্য বেতনে (মাসিক আড়াই শো টাকা নয়!) 'বঙ্গশ্রী'র সহকারী সম্পাদকের এবং ন্যাশনাল ওয়ারফ্রন্টের চাকরি ইহারই ফল। তাঁহাকে প্রধানতঃ নিজের সাহিত্য-কর্মের উপরই নির্ভর করিতে হয়। ১৯৩৮ সনে ময়মনসিংহের কোনও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ৺সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা কমলা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বরাহনগরে আমরা সাহিত্যিকেরাই এই বিবাহে মোড়লি করিয়াছিলাম। মানিক দুই কন্যা, দুই পুত্রের পিতা, কন্যাটি জ্যেষ্ঠ—বয়স আন্দাজ পনের।

তাঁহার পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাকনাম ছিল মানিক। ১৯২৮ সনের ডিসেম্বরে (পৌষ ১৩৩৫) তাঁহার সর্ব-প্রথম গল্প "অতসীমামী"র লেখক হিসাবে এই ডাকনামটাই ব্যবহার করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে সেই নামটাই স্থায়ী হইয়াছে।

নিজের সাহিত্য-জীবনের কথা তিনি যৎসামান্য এখানে-ওখানে বলিয়াছেন। তন্মধ্যে জ্যোতিপ্রসাদ বসু-সম্পাদিত 'গল্প-লেখার গল্পে' (জুলাই ১৯৪৮) ১৯৪৫ সনের ১২ই মে প্রদত্ত তাঁহার বেতার-ভাষণ এবং "ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পি সংঘ" কর্তৃক প্রকাশিত (জানুয়ারি ১৯৪৯) 'কেন লিখি' পুস্তিকায় তাঁহার বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। 'তেইশ বছর আগে পরে' উপন্যাসের গোড়ায় নিজের কথা একটু বলিয়াছেন। তাঁহার জীবন ও আদর্শের বাকি কথা তাঁহার গল্প-উপন্যাসগুলি হইতেই আহরণ করিয়া লইতে হইবে। অন্যান্য লেখক ও মানুষের (তাঁহার সম্বন্ধীয়) স্মৃতিকথাও কম মূল্যবান হইবে না।

মানিক স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার পরিবারকেও এই দারিদ্র্যলাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে কি না

মানিকের জীবিত দাদারা তাহা নির্ধারণ করিবেন। না করিলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধব-দেশবাসীর দায়িত্ব গুরুতর। আমরা প্রস্তাব করি, আপাততঃ এই বৎসরে তাঁহাকে রবীন্দ্র-পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা দিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করুন। এখন পর্যন্ত যাঁহারা এই পুরস্কার পাইয়াছেন মানিক তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা যোগ্যতায় ন্যূন নহেন। তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির ভার কতখানি তাহা আমরা দেখাইলাম। ধারের কথা পণ্ডিত ও রসিকেরা বিচার করিবেন। আমরা শুধু এইটুকু নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, মৃত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ততঃ পক্ষে পাঁচখানি উপন্যাস ও গল্পপুস্তক রচনা করিয়াছেন, যাহা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সাদরে স্বীকৃত হইবে এবং বাংলা দেশের সাহিত্যকে অধিকতর মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

এখানে বলে না কেউ
রাত্রির নিঃশব্দ ভাটায়। সংখ্যাহীন সংগীহীন ঢেউ
অস্পষ্ট ইচ্ছার মতো শাদা-শাদা ফেনা।
আচ্ছন্ন চেতনা মগ্ন এই মন,
জীবনের যত সব দেনা।

ব্যথা-ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ; হাওয়ায়-হাওয়ায়
শব্দহীন জিজ্ঞাসার মত
কি জানি, কি জানি বলে যায়।
সবুজ—সবুজ বনে, গাছের পাতায়।
হাওয়া বয়ে যায়! হাওয়া বয়ে যায়!

সাহিত্যের রাংগা রাখী
হাতে বেঁধে ; জীবনের মৌন পাখি
আর তার আকাংখার ডানা
পাড়ি দিতে অকস্মাৎ হারাল ঠিকানা!

শুধু তার আকাংখার থই থই জলে
রোদ্দুরে সোনার স্বপ্ন
কত না সবুজ দেশ নিমজ্জিত গভীর অতলে!
আঘাতে আঘাতে তরী ভাংগা—ছেঁড়া পাল
ডুবল অনেক রাতে, হল না সকাল।

তবুও কি দুঃসাহসে মন ছুঁয়ে যায়
তার সে নিমগ্ন স্বপ্ন, গভীর ইচ্ছায়।
এদিকে চোখেতে জল
ছল-ছল
অন্য দিকে সামুদ্রিক আকাংখার স্বাদ।
কে যেন কে যেন বলে এখনও সংবাদ
আছে : ফিরে সে আসবেই
তবুও বাতাস বলে, সে নেই, সে নেই!

(অ-প্রকাশিত উপন্যাসের প্রথম অংশ)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[লেখকের "একটি চাষীর মেয়ে" মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়, কিন্তু অসম্পূর্ণ থাকে। এই উপন্যাসের পরবর্তী খণ্ড লেখার পরিকল্পনা করেন লেখক এবং লেখার প্রথম কিস্তী পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পেশ করেন। লেখকের শেষ অপ্রকাশিত লেখা যথা আকারে বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দেওয়া হচ্ছে। এই লেখা সম্পর্কে লেখক পাণ্ডুলিপিতে লিখেছিলেন—"প্রথম খণ্ড ছিল চাষীর মেয়ে রেবতীর কাহিনী। দ্বিতীয় খণ্ড সুরু হল সেই রেবতীই যখন হল কারখানার কুলির বৌ।"—স]

১

ছিল চাষীর মেয়ে।

হল কুলির বৌ!

স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে এল সহরের বস্তিতে।

একলাই এল। সাথী আর সে পাবে কোথায়! গোবিন্দের আপন জনেরাও আছে দেশের বাড়ীতে, সে একলাই খাটতে এসেছে সহরের কারখানায়।

কিছু দিন শ্বশুরবাড়ীতে কাটল রেবতীর, প্রায় প্রাণান্ত হল গোবিন্দের বাড়ীর মানুষদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে—তাদের অকারণ অবহেলা অপমান ও তাড়না সহ্য করতে।

তাকে ছেড়ে একা একা সহরের বস্তির ঘরে দিন কাটাবার ধৈর্য্য গোবিন্দেরও ছিল না। সকলের নিন্দা তুচ্ছ করে অল্প দিনের মধ্যেই সে রেবতীকে নিজের কাছে নিয়ে আসে।

একখানা ছোট ঘর। একটা দরজা এবং নামমাত্র একটি জানালার ঘুপচি।

বস্তি খুব বড়। এলোমেলো ভাবে গায়ে গায়ে লাগানো কাঁচা ঘর, পৃথক পৃথক তিন ফালি উঠান।

ভিন্ন ভিন্ন গোটা চারেক বস্তি গড়ে ওঠাই উচিত ছিল কিন্তু মালিকের মর্জি এবং হিসাবটা অন্য রকম হওয়ায় ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি করে ঘরগুলি তোলা হয়েছে। একরত্তি পরিমাণের তিন ফালি উঠান থাকলেও, সবটা মিলে হয়ে দাঁড়িয়েছে একটিমাত্র বস্তি।

প্রথমটা রেবতী সত্যই দিশেহারা হয়ে যায়।

এমন গাদাগাদি করে এতটুকু ছোট ছোট ঘরে এত জাতের এত রকমের মানুষ বাস করে! রান্নাবান্না, শোয়া-বসা, ঘুমানো সব কিছু। রাস্তার কল থেকে মারামারি করে তোলা জল এনে দিন চালানো।

রেবতী কাতর ভাবে বলে, এ কোথা এনে ফেললে মোকে?

গোবিন্দ বলে, আমি যেথা ঢের দিন থেকে আছি।

: হেথায় রইতে পারব নি।

: কোথা যাবে? এই তো তোমার নিজের ঘর।

: আহা মরি, ঘরের কি ছিরি! এইটুকু ঘর, একটা রোয়াক নেই, কিছু নেই—

গোবিন্দ একটু হেসে বলে, এই ঘরের জন্যে সাত টাকা ভাড়া গুণতে হয়।

রেবতী বলে, রান্না করব কোথা? যে-ঘরে শোব, সে-ঘরেই আখা জ্বালাব, রাঁধাবাড়া করব?

: তা ছাড়া উপায় কি? আরেকটা ঘর ভাড়া নেবার সাধ্যি আমার নেই।

রেবতী রেগে গিয়ে ঝগড়ার সুরে বলে, এমন জানলে আসতাম না।

গোবিন্দ ঝগড়া করে না, শুধু বলে, কেন, সব বলি নি আমি? কোন কথা লুকিয়েছি?

এক ঘরে বসবাস, এক ঘরে রান্না। ঘর সাফ রাখা, আমার সাধ্যিতে কুলোবে না।

: যে ভাবে পারিস চালিয়ে নে।

: রাগারাগি করবে না?

: কখনো করেছি রাগারাগি?

রেবতী চুল খুলতে খুলতে বলে, তা করোনি বটে কিন্তু নতুন অবস্থায় মেজাজ তো বিগড়ে যেতে পারে নানা কারণে, সেই জন্য বললাম। আমার মেজাজ বিশ্রী রকম বিগড়ে গেছে। রাগারাগি করতে বিষম ইচ্ছা হচ্ছিল। গায়ের জোরে চেপে গেলাম, চুপচাপ রইলাম।

গোবিন্দ বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম।

রেবতী বলে, শুধু ভাবলে হবে না, ব্যবস্থা করতে হবে। আরেকটা ঘরের খোঁজ কর। ছোট হলে ক্ষতি নেই, রোয়াক-টোয়াক একটু যেন থাকে, রাঁধা-বাড়া যেন চালানো যায়।

গোবিন্দ একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই তার দিকে তাকিয়ে বলে, খোঁজ করছি গো করছি। নিজে খোঁজ করছি, পাঁচ-সাত জনাকে বলা আছে, তারাও খোঁজ করছে।

তার পর সে জিজ্ঞাসা করে, কলকাতায় এসে ঘরকন্না নিয়েই মেতে রইলি? এদিক ওদিক ঘুরতে সাধ যায় না? যাদুঘর আছে, চিড়িয়াখানা আছে, গড়ের মাঠ আছে—

রেবতী হেসে বলে, জানি, জানি। কলকাতার ট্রাম-বাসও চলবে, ও সব দেখার যায়গাও টিঁকে থাকবে। বেড়াব না তো কি, বেড়ানোর চোটে অতিষ্ঠ করে তুলব তোমাকে। গোছগাছ করে নিয়ে বসি?

গোবিন্দ বলে, তুই যে এ রকম ধীর শান্ত হবি, আমি তা ভাবতেও পারি নি।

রেবতী আবার মিষ্টি করে হাসে।

: গেরস্ত-ঘরের মেয়েরা এমনিই হয়। তোমরা ব্যাটাছেলেরা তড়বড় কর, কোন দিকে তাকাও না, রাস্তায় চলতে সাপের লেজ মাড়িয়ে দিয়ে ছোবল খেয়ে মরতে বসো—ও রকম হলে কি মেয়েদের চলে?

বস্তিবাসিনী মেয়েছেলেদের সংখ্যা কম নয়। নানা বয়সের মেয়েছেলে।

বাচ্চা মেয়ে, বাড়তি বয়সের মেয়ে, কমবয়সী বৌ, নানা বয়সের মা, দিদিমা এবং ঠাকুমা।

জনার্দ্দনের ঠাকুমার মা পর্য্যন্ত আছে। তার বয়সের হিসাব কেউ জানে না। হয়তো একশো পেরিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। ঠিকুজি-কুষ্ঠি কোন দিন তৈরী হয়নি, ওসব ঝঞ্ঝাটের ব্যাপারের ধার ধারত না তার বাপ-দাদা।

আশ্চর্য্য, এই যে বুড়ী এখনো শক্ত আছে, চার বেলা খায় এবং নড়ে-চড়ে বেড়ায়।

লাঠি ধরে খুব কষ্টেই অবশ্য নড়াচড়া করে, একেবারে বাঁকা হয়ে। কিন্তু সে যে জীবন্ত আছে, এটাই আশ্চর্য্য করে দেয় মানুষকে।

রেবতী ঘর গুছিয়ে বসতে না বসতে এই বুড়ী এসে খোঁজ-খবর নিয়ে যায়। ফোকলা মুখে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে যায়, গাঁয়ের মেয়ে, চালচাল কিছু জানিস নে এখানকার—সাবধানে থাকিস বাছা, সাবধানে থাকিস। তারপর আসে জনার্দ্দনের বৌ তারা।

কোলের ছেলেটাকে ঘরে ফেলে আসে। এ ঘর থেকে তার চীৎকার শোনা যায়।

তারা গ্রাহ্যও করে না!

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রেবতীর সব খবর জেনে নেয়—নিজের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর জানিয়ে দিতে দিতে। আদালতী জেরা যে চলে না হঠাৎ এসে নতুন একটা মানুষের সঙ্গে ভাব জমাতে চাইলে—এই অতি সাধারণ বুদ্ধিটুকুর অভাব দেখা যায় অনেক মানুষের মধ্যে।

তারা ঠেকে শিখেছে।

সে নিজের কথা বলে। নিজের কথা বলতে বলতে রেবতীর কথা জেনে নেয়।

গোবিন্দ খাওয়া সেরে কাজে চলে গিয়েছিল। উনানটা রেবতী নেবায় নি। নিজের জন্য সখের একটা রান্না চড়িয়েছিল—আলু-পেঁয়াজের ছেঁচকি!

কাজ সেরে ঘরে ফিরে গোবিন্দও অবশ্য ভাগ পাবে।

ছেঁচকিটা নামিয়ে রেবতী জিজ্ঞাসা করে, কার ছেলে কাঁদছে গো এমন করে?

তারা বলে, মোর মেয়ে কাঁদছে।

রেবতী আশ্চর্য্য হয়ে বলে, সেই তখন থেকে কাঁদছে—তুমি দিব্যি বসে আছো?

: ছেলেপিলে কাঁদলে কিছু হয় না।

: মোর কষ্ট লাগছে গো। নিয়ে আসি—অ্যাঁ?

: সখ হলে আনো!

কচি মেয়ে, দু'-একটা দাঁত উঠেছে। জামাটামার চিহ্নও নেই গায়ে। কোলে করে নিয়ে এসে রেবতী তাকে তারার কোলে তুলে দেয়, হুকুমের সুরে বলে, মাই দাও।

তারা হাসে। মেয়ের মুখে মাই গুঁজে দিয়ে বলে, নিজের গণ্ডাখানেক হোক, তখন আর এত ব্যস্ত হতে সাধ যাবে না।

: ছেলেমেয়ে এমন করে কাঁদলে মানুষের সয়?

: সওয়ালেই সয়। 'কটা দিন কাজে যাই না, ঘরে আছি। কাজে গেলে কে শুনবে ছেলেমেয়ের চেঁচানি? শুনলেই বা পোষাবে কেন?

: কাজ মানে? কিসের কাজ?

: লোকের বাড়ী কাজ। বাবুরা দেওঘর বেড়াতে গেছে, তাই ক'টা দিনের ছুটি মিলেছে। নইলে কি ঘরে রইতাম, না, মেয়ে কাঁদছে কি না কানে শুনতাম?

রেবতীর মুখের ভাব দেখে তারা কথা বলার সুর পালটে দেয়। আঁচল থেকে একটু দোক্তাপাতা খুলে নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে বলে, মানুষটা খাটছে, যা পায় সব এনে দেয়। নেশা-টেশা কিছু নেই—দু'-চারটে বিড়ি শুধু খায়। কিন্তু ও রোজগারে কুলোয় না ভাই—এই জঞ্জাল ক'টার জন্যেই কুলোয় না। এটা তো শুধু মাই টানে—চার পয়সার মিল্ক পাউডার বানিয়ে দিলেই ঢের। বাকী তিনটে পেট পুরে ভাত খায়। নিজে খেটে কিছু না কামালে উপায় কি?

তারার অতি বেশী অন্তরঙ্গতা রেবতীর পছন্দ হয় না।

একাধারে সে যেন শাশুড়ী এবং ননদ ঠাকরুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে!

উপদেশ আর পরামর্শ।

এটা করো ওটা করো—এভাবে চলো, ওভাবে চলো, নইলে ভারি মন্দ হবে, সাবধান!

রেবতীর মন বিগড়ে যায়।

একদিন সে ফুঁসে ওঠে। বলে, এত বেশী বকর-বকর কর কেন বল দিকি? কচি খুকী তো আমি নই? ও-সব আমার জানা আছে।

তারা আহত হয়। চালের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলে, তোর ভালর জন্যই বলছিলাম।

রেবতী বলে, তা তো জানি। এত বেশী বকতে নেই। মনটা বিগড়ে যায়।

বস্তিতে বিদেশী মানুষদের ভিড়টা বড় বিস্ময়কর মনে হয় রেবতীর। ঘরে ঘরে নানা দেশের মেয়ে-পুরুষের ভিড়!

মাদ্রাজ বোম্বাই উড়িষ্যা কর্ণাটক এবং আরও অনেক প্রদেশ থেকে সুরু করে পূর্ব্ব-বাংলার ঢাকা, চট্টগ্রাম, আসামের মেয়েপুরুষ এই বস্তিতে ঠাঁই নিয়েছে।

উড়িয়া রম্ভা এবং মাদ্রাজী সারদার সঙ্গে রেবতীর ভাব গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

ভাব করার জন্য কেউ যেন তারা ব্যস্ত নয়। কিন্তু যেটুকু ভাব জমায় তার আন্তরিকতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

খুব সংযত—কিন্তু প্রাণখোলা মেলামেশা।

এই সংযমের মানে রেবতী তলিয়ে বুঝতে পারে না। তার মোটামুটি একটা ধারণা জন্মায়।

রম্ভা সারদারা মেলামেশার ব্যাপারে সাবধান এই জন্য।

[ক্রমশঃ।

লণ্ডনে কার্ল মার্ক্স

একশ' বছর আগে বিপ্লবের মহাগুরু কার্ল মার্ক্স অতি দারিদ্র্যের মধ্যে লণ্ডনে বাস করতেন। বড়ই বিস্ময়ের কথা এই যে 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের রচয়িতা কখনও ভালভাবে তাঁর পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করতে পারেন নি। তিনি তাঁর বর্তমানকে উপেক্ষা করে ভবিষ্যতের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন।

কার্ল মার্ক্সের নামে ভাবপ্রবণতায় বিগলিত হবার যুগ এটা নয়। তিনি নিজেই এই ধরণের ভাবপ্রবণতাকে ঘৃণা করতেন। তিনি মনে করতেন, যে মনন কোন ক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ করে না, তা বন্ধ্যা নিষ্ফল। পার্থিব অস্তিত্বের বাস্তব সত্য হচ্ছে গতিশীলতা এবং পরিবর্তন।

শরতের পরে আসে শীত। হ্যাম্পষ্টেডের গাছের পাতা সব যায় ঝরে। তখন সেখানকার কোন সাত তলা বাড়ীর জানলা দিয়ে নজরে পড়ে সেই ভিলার ছাদটা, যেখানে মার্ক্স কাটিয়েছেন তাঁর জীবনের শেষ ক'টা বছর। শীতের অপরাহ্ণে মাঝে মাঝে সেখানে যে নীল কুয়াশার আস্তরণ পড়ে তাতে ভাবুক মন রহস্যের চেতনায় আবিষ্ট হবেই।

সত্তর বছর আগে মার্ক্সের বন্ধুরা তাঁর পড়ার ঘরে একখানা গালিচা দেখেছিলেন। টেবল থেকে জানলা পর্যন্ত বিছানো এই শতছিন্ন বিবর্ণ গালিচাখানিতে কয়েক গাছি দড়ি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের শেষ দু'খণ্ড রচনা করবার সময় এই গালিচার উপর তিনি সারাদিন, এমন কি মাঝে মাঝে গভীর রাত্রি পর্যন্ত পদচারণা করেছেন। কিন্তু তবু তিনি 'ক্যাপিটাল' শেষ করে যেতে পারেন নি।

পড়ার টেবল থেকে জানলা পর্যন্ত এই অস্থির পদচারণার আরও অনেক কারণ অবশ্যই ছিল। যখন তিনি ওই বাড়ীতে প্রথম বাস করতে আসেন, তখন তাঁর সামান্য আসবাবপত্র যা ছিল, তা একখানি ভ্যানে করে বয়ে আনার মতও যথেষ্ট নয়। কিন্তু নিজের বুকের মধ্যে তিনি বয়ে এনেছিলেন ব্যর্থতা, হতাশা এবং তিক্ততার এক মহাসাগর।

লজ্জাকর দারিদ্র্যের মধ্যে প্রসূত তাঁর মৃত সন্তানদের কথা কেমন করে ভুলবেন তিনি? তারা যে সব মারা গেছে পুষ্টির অভাবে। তাঁর একান্ত বুকের ধন এডগার তাঁর কোলের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে যে তাঁর আত্মম্ভরিতাকে চরম আঘাত হেনে গেছে। শোকের প্রথম মুহূর্তে তিনি ল্যাসালেকে লিখেছিলেন, "বেকন বলে গেছেন যে মহা মানবরা প্রকৃতি এবং বিশ্বের নানা বিষয়ের মধ্যে এমন ভাবে ডুবে থাকেন যে, তাঁদের কাছে কোন বিয়োগব্যথাই বড় নয়। আমার ভয় হয়, আমি বোধ হয় সেই ধরণের মহা মানবদের একজন নই।"

অপর দিকে ইউরোপে বিপ্লবের ব্যর্থতা তাঁকে এনে দিয়েছিল ব্যক্তিগত লাঞ্ছনা। ভুয়া বন্ধুরা তাকে অপমানের একশেষ করে ছেড়েছে। মার্ক্সের বাদানুবাদমূলক রচনায় এবং ফ্রেডারিস এঙ্গেল্‌সের কাছে লিখিত পত্রে সেই সব ভুয়া বন্ধুদের নাম পাওয়া যাবে।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তখন তাঁর পাশে ছিলেন যৌবনের প্রিয়া এবং জীবনে ভালবাসার জীবন্ত প্রতিমূর্তি জেনি মার্ক্স। সেদিনের সেই জরাজীর্ণ বেশবাসে সজ্জিত দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল গৃহিণী জেনিকে দেখে কে টেরই পেত না যে, ইনি সম্ভ্রান্ত প্রিভি কাউন্সিলর লুডউইগ ভ ওয়েষ্টফ্যালেনের কন্যা এবং ডিউক অফ আর্গাইলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া জীবনের বিরুদ্ধ ঝড়-ঝঞ্ঝা মার্ক্সের চেয়ে তাঁর পত্নী জেনি মার্ক্সের উপ দিয়েই বয়ে গেছে বেশী। অনাহার, অর্দ্ধাহার, ধার, দেনা, সন্তানে মৃত্যু, গৃহ থেকে উচ্ছেদ, বেলিফের চোখ রাঙানী—এ সব সইতে হয়ে জেনিকেই। একবার বাড়ীতে মৃত সন্তান রেখে তার সৎকারের অ সংগ্রহের জন্য জেনি গেছেন সেকরার কাছে। বাপের বাড়ীর গে গহনাখানা বাঁধা দিয়ে টাকাও কিছু সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু এক বাদেই পুলিশ এসে চড়াও হল তাঁর বাড়ীতে। গহনায় জেনির বাপে বাড়ীর যে চিহ্ন আঁকা ছিল, সেই চিহ্নের সঙ্গে বিলেতের এক ধনি পরিবারের পারিবারিক চিহ্নের মিল থাকায় পুলিশ সন্দেহ করেছি গহনাটি চোরাই মাল। কারণ, এই ঘটনার কয় দিন আগেই নাকি সেই ধনিকের গৃহে একটি চুরি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ব্যাপা মার্ক্স বহুদিন আদালতে ছোটাছুটি করে তার পুলিশী হুজ্জোত থেকে মুক্তি পান।

জেনি যখন হ্যাম্পষ্টেড ভিলায় আসেন, তখন তাঁর আ নিঃশেষিত প্রায়। সারা জীবন দুঃখ দুর্দশা এবং দুর্দৈবের মধ্যে তিনি দিনাতিপাত করেছেন। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু এল ক্যান্সা রোগের দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। ইতিমধ্যে কয়েক জন তরুণ বৃটি সোসালিষ্ট মার্ক্সকে বিপ্লবী আন্দোলনের নায়ক বলে অভিনন্দি করেছেন। তাদের মধ্যে বেলফোর্ট ব্যাক্স নামক এক ভদ্রলোক মার্ক্সের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং তাতে মার্ক্সের নামটা ব বড় অক্ষরে ছাপা হয়। হিণ্ডম্যান নামে অপর এক ভদ্রলোক মার্ক্সী তত্ত্বের ভাষ্যকারের ভূমিকা গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি ফয়ারবাকের উপর লেখা মার্ক্সের একাদশ তত্ত্বের খবর রাখতেন না। সেই তত্ত্বে মার্ক্স বলেছেন, "এ পর্যন্ত দার্শনিকরা নানাভাবে বিশ্বের ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আসল কাজ হচ্ছে বিশ্বের পরিবর্তন সাধন করা।" অর্থাৎ কথা নয়, কাজ চাই।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর মার্ক্স মাত্র দু' বছর বেঁচে ছিলেন। গালিচার উপর পদ-চারণা তখন অনেক কমে এসেছে। কারণ একাগ্রমনে কাজ করার ক্ষমতা তিনি ক্রমশঃই হারিয়ে ফেলছেন।

এক সময় তিনি হ্যাম্পষ্টেড হিলে বেড়াতে খুব ভালবাসতেন। তখন তাঁর ছেলে-মেয়েরা সব ছোট ছোট। মার্ক্স তার প্রাণের বন্ধু এঙ্গেলসের সঙ্গে জ্যাক ষ্ট্র'স ক্যাসলের উল্টো দিকের বাগিচায় বসে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের খসড়া প্রণয়ন করতেন। কথায় কথায় দুই-এক বোতল বিয়ার উড়ে যেত। অবশ্য বিয়ার এবং খাবার দাবারের খরচা দিতে হত এঙ্গেলসকেই। এঙ্গেলসের নিয়মিত মাসোহারা না পেলে মার্ক্স-পরিবারকে অনেক দিন আগেই এতিমখানায় জীবন শেষ করতে হ'ত। কারণ মার্ক্সের কোন সুনির্দিষ্ট আয় ছিল না। নিউ ইয়র্কের এক পত্রিকায় লণ্ডন থেকে সংবাদ পাঠিয়ে তিনি মাঝে মাঝে সামান্য কিছু কিছু পয়সা পেতেন মাত্র। অনেক সময় সেই সব সংবাদ মার্ক্সের হয়ে লিখে দিতেন এঙ্গেল্‌স্।

মার্ক্সের জীবিকা অর্জনের ব্যর্থতা নিয়ে এইচ. জি. ওয়েলস প্রচুর

ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন। বড়ই বিস্ময় এবং দুঃখের কথা এই যে, ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের রচয়িতাকে অনেক সময় জামা-কাপড় বন্ধক রেখে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছে। অনেক সময় পাওনাদারের হামলায় তাঁকে বাড়ীতে আটক থাকতে হয়েছে। এঙ্গেলস্ টাকা পাঠিয়ে তাকে পাওনাদারের অবরোধ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এঙ্গেলসের টাকা না এলে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে মার্ক্সকে অনাহারে কাটাতে হয়েছে। একবার তিনি এমন দুরবস্থায় পড়েছিলেন যে, দেড় শিলিং-এ নিজের ওয়েষ্ট কোটটি বাঁধা রাখতে বাধ্য হন।

মার্ক্স চিরকালই তাঁর এই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ ছিলেন কিন্তু সেই ক্রোধ কখনও ফলপ্রসূ হয় নি। সম্ভবতঃ অন্তরের অন্তস্থলে তিনি নিজের সাফল্য সম্বন্ধে নিস্পৃহ ছিলেন না। ল্যাসালে প্রমুখ অন্যান্য যে সমস্ত সমসাময়িক বিপ্লবীরা যথেষ্ট ধন-সম্পত্তির মালিক ছিলেন, মার্ক্স তাঁদের একটু ঈর্ষাও যে না করতেন, তা নয়। এঙ্গেলসের কাছে লেখা চিঠিতে এই ঈর্ষার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

মার্ক্স ছিলেন অতি জটিল মানুষ। সুস্পষ্ট দূরদৃষ্টি এবং ক্ষুরধার যুক্তির অকাট্যতা তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই দু'টি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাঁর লণ্ডনে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটানোর কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। ঘরে ছেলে মেয়ে বউ না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, অথচ মার্ক্স সেদিকে চোখ বুঁজে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন—এ এক অবিশ্বাস্য পরিস্থিতি!

তিনি ভাবতেন, নৈতিক সাধুতা দিয়ে আর যাই অর্জন করা যাক না কেন, টাকা অর্জন করা বড় কঠিন। আর এই নৈতিক মণ্ডলেই মার্ক্সের অসাধারণ চারিত্রিক মহত্বের সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক পরিবেশের ঊর্দ্ধে তুলে মার্ক্সকে দেখলে দেখা যাবে যে, তিনি নিজের দুর্দৈবের প্রতি ঘৃণায় ক্ষুব্ধ কোন সুসভ্য ভিক্ষু নন। তিনি মুক্তির মশালবাহী একজন কালদর্শী। মার্ক্সের এই দিকটা তৎকালীন সহযোগীদের কারও কারও নজরে পড়েছিল, এ কথা সত্য। তবে সেকালের যে সমস্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে মার্ক্সের যোগাযোগ হয়েছিল, তারা তাঁকে "দাড়ীওয়ালা ফ্রককোট-পরা একজন লোক" হিসাবেই দেখেছিল। তারা জানত, "লোকটার নিজের সম্বন্ধে ধারণাটা খুব উঁচু আর যারা ওঁর সঙ্গে মত মেলায় না, তাদের উনি যাচ্ছেতাই ভাবে গাল দেন।"

এঙ্গেলসের কাছে অবশ্য গোপন ছিল না কিছুই। এই অতি-চতুর, হৃদয়বান জার্মাণ ভদ্রলোকটি ম্যাঞ্চেষ্টারে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। মার্ক্সের প্রকৃতি তিনি ঠিক ভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তাঁরা দু'জন ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সত্তর বছর আগে স্থানীয় অধিবাসীরা দেখেছে, লম্বা কৃষ্ণকেশ এঙ্গেলস্ বেঁটে সুগঠিত মার্ক্সের সঙ্গে জার্মাণ ভাষায় আলাপ-আলোচনা করতে করতে পথ চলছেন। চলতে চলতে আলোচনার কোন বিশেষ বিষয়ের উপর জোর দেবার জন্য হঠাৎ হয়ত তাঁরা থমকে দাঁড়িয়েছেন। রাজনৈতিক বাদানুবাদের মধ্য থেকে ইতিহাসের এই মানবিক সরলতাকে এখন খুঁজে বার করার প্রয়োজন।

এই দুই বন্ধু গোড়ায় গোড়ায় টটেনহাম কোর্ট রোডের রেস্তোরাঁয় বসে নিয়মিত বিয়ার খেতেন। তৎকালীন নীতি-বাগীশরা হয়ত এমন দৃশ্য দেখে চোখ বুজে থাকতেন কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, মার্ক্স ছিলেন রাইনল্যাণ্ডার এবং এঙ্গেলস ব্যারেন ছেলে। স্বভাবতই মদ, চুরুট এবং গাল-গল্পে দুজনেই বেশ ওস্তাদ।

প্রথম দিকে এঙ্গেলস মদ চুরুটের দিকে বেশী ঝুঁকতে পারেন নি। কারণ, তাঁর পিতা তাঁকে মাত্র সামান্য বেতন ছাড়া আর কোন খরচ দিতেন না। কাজেই বেচারীদের শুধু বিয়ার খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। কিন্তু দুই বন্ধু গেলাসে চুমুক মারতে মারতে অনেক সময়ই ভুলে যেতেন, কতখানি গলাধঃকরণ করেছেন। শোনা যায়, কোন কোন দিন রাস্তাঘাটে তাদের মাতলামি করতেও দেখা গেছে।

পিতার মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির মালিক হন এঙ্গেলস্। তখন দুই বয়স্ক বন্ধু মনের সুখে মদ এবং চুরুট খাবার সমান সুযোগ লাভ করেন। বাপের সম্পত্তি লাভের পর এঙ্গেলস্ মার্ক্সের দারিদ্র্যও অনেক লাঘব করেছিলেন।

কিন্তু এই বন্ধুত্বের পথ একেবারে নিষ্কণ্টক ছিল না। মার্ক্সের ব্যবহারে অনেক সময় এঙ্গেলসের মত ধৈর্য্যশীল মানুষেরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যেত। এঙ্গেলস মেরি বার্ণস নাম্নী একটি আইরিস বালিকাকে ভালবাসতেন এবং তাকে বিয়ে না করেও তার সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন করতেন। তাঁদের সেই দাম্পত্য জীবন অতি সুখের হয়েছিল। ১৮৬৩ সালে যখন হঠাৎ সেই ভদ্র মহিলার মৃত্যু হয়, তখন দুঃখে কাতর হয়ে সমবেদনা লাভের আশায় এঙ্গেলস্ মার্ক্সের কাছে লেখেন, আমি মূক হয়ে গেছি। হতভাগ্য মেয়েটি সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমায় ভালবেসেছিল।

বিবাহ সম্পর্কে মার্ক্স-দম্পতি ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। বিবাহ বন্ধন বিহীন মিলন তাঁরা পছন্দ করতেন না। সম্ভবতঃ সেই কারণেই মার্ক্স অত্যন্ত নিষ্করুণ ভাবে এঙ্গেলসকে যে উত্তর দিলেন, তাতে মেরি বার্ণসের মৃত্যুর কথাটা হয়ে গেল নিতান্তই গৌণ। শুধু তাই নয়, সেই চিঠিতে মার্ক্স নিজের দুঃখ-দুর্দ্দশার এক বিরাট ফিরিস্তি দিয়ে বন্ধুর কাছে কিছু অর্থও চেয়ে বসলেন। এই চিঠি নিশ্চয়ই এঙ্গেলসকে ব্যথিত করেছিল। তাই তিনি লিখে পাঠালেন যে, আপাততঃ তাঁর কাছে টাকাকড়ি নেই। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই দুই বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যেতে পারত, কিন্তু মার্ক্স নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বেশ কিছুকাল নীরব থেকে শেষে বন্ধুর কাছে ক্ষমা চেয়ে এক পত্র লিখলেন। মেরির মৃত্যুতে জেনি (মার্ক্স) এঙ্গেলসকে কোন সমবেদনা জানান নি বলে দুঃখ প্রকাশ করে মার্ক্স লিখলেন, "মেয়েরা ভারী মজার জীব—খুব বুদ্ধিমতী মেয়েরাও। সকালে মেরির মৃত্যু সংবাদ শুনে আমার স্ত্রীর সে কি কান্না! তোমার দুঃখে তিনি নিজের দুঃখও ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাতেই তার মনে হল, বেলিফের তাগাদা এবং চোখের সামনে সন্তানদের অনাহারে নির্জীব হতে দেখার চেয়ে বড় দুঃখ পৃথিবীতে আর কিছু নেই।"

স্ত্রীর মৃত্যুর পর হ্যাম্পষ্টেড ভিলায় মার্ক্সের শেষ ক'টা দিন কেটেছে আরও মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে। মার্ক্সের শরীর তখন একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। ফুসফুসে হয়েছে ক্যান্সার। এর উপর কন্যা জেনির মৃত্যু এল মর্মান্তিক আঘাতরূপে। এই জেনির বিয়ে হয়েছিল চার্লস লঙ্গেটের সঙ্গে। সুখের কথা এই যে, এলেনর এবং লরার (দুই কন্যা) মৃত্যু তাঁকে দেখে যেতে হয় নি। এলেনর ছিল মার্ক্সের আদরের 'টুসী'। টুসী এভেলিং

নামক একটি যুবকের অবিবাহিত পত্নী হবার জন্ত দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছিল কিন্তু তার দুর্ব্যবহারে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে। লরা বিয়ে করেছিল পল ল্যাফার্গকে। দীর্ঘকাল তারা সুখে দাম্পত্য জীবন কাটিয়ে শেষে ভবিষ্যতের উপর আস্থা হারিয়ে স্বামি-স্ত্রীতে মিলে আত্মহত্যা করে।

মার্ক্সের কাহিনী যিশুকে ক্রুসবিদ্ধ করার কাহিনীরই রূপান্তর বিশেষ। মার্ক্স ছিলেন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। তিনি যে বাণী প্রচার করেছেন তাতে আপোষের কোন স্থান নেই। তাঁর জীবিত কালেই তাঁর তত্ত্বকে সংস্কারবাদের দিকে টেনে নেবার চেষ্টা হয়েছিল। তাই অত্যন্ত তিক্ততার সঙ্গে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি মার্ক্সবাদী নই।"

যখন তিনি মারা গেলেন, তখন তাঁকে তাঁর স্ত্রীর কবরেই সমাধিস্থ করা হয়। শেষ বিদায় বাণীতে এঙ্গেলস্ ঘোষণা করেছিলেন "তাঁর নাম এবং তত্ত্ব যুগ-যুগান্ত বেঁচে থাকবে।" এঙ্গেলস্ এক বিন্দুও মিথ্যা বলেন নি। মার্ক্সের নাম এবং তত্ত্ব এখনও বেঁচে আছে এবং চিরকাল থাকবেও।

ফিরে এলো

শ্রীকরুণাময় বসু

স্মরণের নীল অন্ধকারে
একটি গানের কলি ডানা মেলে, বন্ধদ্বারে
কড়া নাড়ে, সাড়া দেয়, আছি।
কহিলাম, এসো কাছাকাছি।
আধ-চেনা মুখ তার আঁখি ছলোছলো,
ইস্ রায় বলে গেল, পার যদি ভোল ;
হাওয়ার চমক তুলে চলে গেল উড়ে
অন্ধকারে নিঃশব্দ সুদূরে।
তার পর খুঁজে ফিরি দেওদার বন,
জোনাকি-প্রদীপ-জ্বলা সজল শ্রাবণ,
খুঁজে মরি ছলোছলো মন,
কোথায় বাগান ?
স্বপ্ন শূন্য ফুলের বাগান।
তার পর ফিরে এলো ঘুম-ঘুম ফুলঘরে
ফুলের ফাগুন,
সবুজ ভ্রমর করে গুন গুন গুন,
আঁধারে ইথারে বাজে অদৃশ্য নূপুর,
মনে হল ভেসে এল মায়াময় সুর :
কাল এসো, ফের দেখা দিও,
ভুলিও না প্রিয়।
মনে হল একজোড়া ঘন কালো চোখ
রেখে গেল ভালোবাসা-ভরা দুটি শ্লোক।
হঠাৎ হাওয়ায় এলোমেলো
কবে কার গান উড়ে এলো,
যেন ঘন অন্ধকারে পথহারা পাখি
হঠাৎ পেয়েছে খুঁজে কবেকার ভালোবাসা,
জীবনের লতা-পাতা দিয়ে গাঁথা ছোট এক বাসা :
পিছনে এসেছে ফেলে মরুপথ,
পিছনে এসেছে রেখে ঝড়ের বৈশাখী।
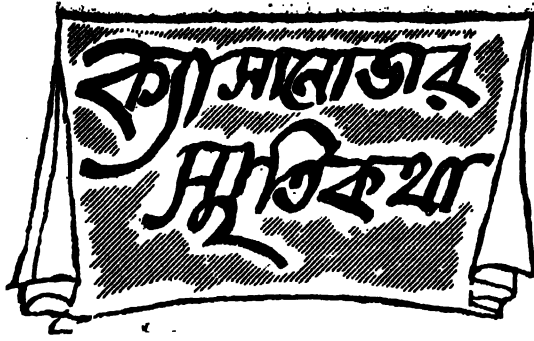
[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

বন্ধু বই কি!

আজও সে বন্ধুত্বের স্মৃতি সগৌরবে বহন করছি—তিনটি ক্ষতচিহ্নে। সেই রাত্রেই প্রবল জ্বরের আক্রমণে বেটিনী আবার শয্যা নিল। দেখতে দেখতে বসন্তের গুটিতে ছেয়ে গেল ওর সারা দেহ। সব অভিমান, সব ভয় তুচ্ছ করে সেদিন ওর বিছানার পাশে এসে বসলাম। ওর রোগক্লান্ত দিনগুলিকে ভরে তুললাম—আশা আর আশ্বাসে, সেবা আর সাহচর্য্যে······

সেই সেবার স্বাক্ষর অক্ষয় হোয়ে রইলো আমার দেহে—তিনটি ক্ষতচিহ্নে।

কিন্তু যাক সে কথা, বছরের পর বছর ঢেউএর পর ঢেউএর মত এসে কত দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে সেই সব দিনগুলিকে······

তখন কে-ই বা জানতো একদিন স্বামীর নিষ্ঠুর অত্যাচারে, দারিদ্র্যের পেষণে রোগগ্রস্তা অকালবৃদ্ধা বেটিনী ফিরে আসবে শৈশবের সেই গৃহটিতে···আর, আর আমারই এই দুটি বাহুর আশ্রয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবে···কিন্তু সে-ও তো অনেক পরের কথা—

আগেই বলেছি ছাত্র হিসাবে মেধাবী ছিলাম—তাই ষোলো বছরেই 'ডক্টর অব ল' ডিগ্রী পেলাম। আমি কিন্তু নিজে চেয়েছিলাম চিকিৎসক হোতে। তার বদলে আমাকে জোর করে আইন পড়ানো হোলো। আইন পড়ার উপর আমার আজন্মের বিতৃষ্ণা। কিন্তু মা আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, আমাকে এডভোকেট তৈরী করবেনই। দিলেই হোতো আমাকে আপন রুচিতে চলবার অধিকার—ফলে না হোলো এদিক না হোলো ওদিক। সারাজীবনে দুটোর একটাও কাজে লাগাতে পারিনি। অবশ্য ও দুটোরই কাজ একই। আইন ঘর গড়ার চেয়ে ঘর ভাঙ্গেই বেশী। আর ডাক্তারী—রোগীকে নিরাময় করার চেয়ে রোগীকে মারেই বেশী।

যাই হোক, এদিকে ছাত্রজীবনের দোষগুলিও বেশ রপ্ত করে নিয়েছিলাম। সহপাঠীদের কাছে দৈন্য প্রকাশের ভয়ে অবস্থার অতিরিক্ত খরচ করতাম। সে সময় ভেনিসে ছাত্রদের নানা রকম স্বাধীনতা আর সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা ছিলো।

বাহ্যিক আড়ম্বর আর বেশী দিন চললো না। শীগগিরই সর্ব্বস্বান্ত হোলাম। তখন জামা-কাপড় অবধি বাঁধা রেখে ঠাট বজায় রাখার চেষ্টা চললো—কিন্তু সে-ই বা ক'দিন! দিশাহারা অবস্থায় দিদিমাকে লিখলাম টাকা পাঠাতে। কিন্তু টাকার বদলে দিদিমা নিজে এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন। অবশ্য যাবার আগে ডাঃ গাৎসিকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিতে ভোলেননি। ডাঃ গাৎসি আমাকে দিলেন অজস্র অশ্রুসিক্ত আশীর্ব্বাদ। পাদুয়াতে এই শেষ নয়। ভবিষ্যতে যখনই এসেছি আতিথ্য নিয়েছি ডাঃ গাৎসির স্নেহের আশ্রয়ে।

দিদিমা যখন মারা গেলেন আমি তখন ভেনিসে। শেষের দিকে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন—আমিও এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাছছাড়া হইনি। দিদিমাকে বড় ভালবাসতাম। জ্ঞান হোয়ে অবধি ওই স্নেহের ছায়ায়ই তো গড়ে উঠেছি। কিন্তু মৃত্যুকালে একটি কপর্দ্দকও রেখে যাননি—তার আগেই যা কিছু সঞ্চয় নিঃশেষিত হোয়েছিলো আমার পিছনে। মা তখন ছিলেন সেন্ট পিটার্সবার্গে। মাসখানেক পরেই মায়ের চিঠি পেলাম। লিখেছেন, ভবিষ্যতে ভেনিসে তাঁর ফিরে আসার কোনোই সম্ভাবনা নেই। তাই তিনি ভেনিসের বাড়ী বিক্রী করে দিতে চান। এ বিষয়ে আবে গ্রিমানীকেও তিনি জানিয়েছেন। আর আমাকে নির্দ্দেশ দিয়েছেন তাঁর মতানুসারে চলতে। আসবাবপত্র বিক্রী করে দেবার ইচ্ছা জানিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে আমার লেখাপড়ারও যাতে ত্রুটি না হয়, সে ব্যবস্থা করার জন্যও তাঁকে জানিয়েছেন।

চিঠি পেয়েই ছুটলাম আবে গ্রিমানীর কাছে। জানালাম, তাঁর আদেশ আমার শিরোধার্য্য।

কিন্তু বিচিত্র এই মন! যেই মনে হোলো এখন থেকে আমি গৃহহারা হোলাম, এমন কি পুরানো স্মৃতিজড়ানো আসবাব-পত্রও বিক্রী হোয়ে যাবে, তখন কি যেন আক্রোশ পাগলামির মত আমার ঘাড়ে চাপলো। নিজেই সব বিক্রী করতে লাগলাম, অন্যের হস্তগত হবার আগেই। কাপড়-জামা, বাসন-কোশন, সৌখীন টুকিটাকি থেকে সুরু করে বিছানা-পত্র, আয়না অবধি। কেমন যেন মনে হোতে লাগলো আমাদেরই অধিকার এই সব পৈত্রিক সম্পত্তিতে, মায়ের কোনো অধিকার নেই তাই থেকে বঞ্চিত করার।

মাস চারেক পর ওয়ার শ' থেকে মায়ের আবার চিঠি পেলাম। লিখেছেন—'এখানে একজন যখনই তিনি আসেন আমার তোমার কথাই মনে হয়। আমি বছরখানেক আগে তাকে বলেছিলাম, আমার একটি ছেলে আছে—ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত হবার জন্যেই যেন তার জন্ম, কিন্তু আমার এমন ক্ষমতা নেই যে তাকে কোনো গির্জ্জায় কাজে লাগাই। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন তোমার সম্বন্ধে রাণীকে অনুরোধ করবেন, তাঁর মেয়ে নেপলস্-এর রাণীকে তোমার বিষয় জানাতে। তাঁর কথা তিনি রেখেছেন, এখন ভেনিস হোয়ে ক্যালাব্রিয়াতে ফেরার পথে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন—ওখানে যাজকের কাজে তোমাকে নিযুক্ত করবেন। ওঁর করুণায় ভবিষ্যতে তুমি অনেক বেশী পদমর্য্যাদাও পেতে পাবো। ভাবো তো, মায়ের

কি আনন্দ ছেলেকে ধর্ম্মযাজকরূপে দেখতে পেলে? এই সঙ্গে উনিও তোমাকে একটি চিঠি দিচ্ছেন। যত দিন না তোমাকে নিয়ে যাওয়া হয়, তত দিন আবে গ্রিমানীই তোমার দেখা-শোনা করবেন…'

চিঠি দু'খানা পেয়ে সত্যিই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠলাম। এবার বিদায়—ভেনিস বিদায়! সামনে স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ! আর যেন এক মুহূর্ত্তও দেরী সহ্য হচ্ছিল না। সেই আনন্দের উত্তেজনায় দেশ ছেড়ে যাওয়ার বেদনা বিন্দুমাত্রও অনুভব করি নি সেদিন।

কিন্তু অপেক্ষা করতেই হোলো বেশ কিছু দিন। আর তারই মধ্যে আমার উপর দিয়ে বেশ কিছু ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে গেল—বিনা অনুমতিতে সব বিক্রী করার ফল, অভিভাবকের অসন্তোষ, নানা চক্রান্ত ইত্যাদি……

শেষে একদিন আবে গ্রিমানী খবর দিলেন ধর্ম্মযাজকটি এসে পৌঁছেছেন। তখনি গেলাম তাঁর কাছে। সুদর্শন তরুণকান্তি—বয়স বছর চৌত্রিশের বেশী নয়। পরিচয়ের পর উনি জানালেন এখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। আমি যেন ওঁর সঙ্গে রোমে গিয়ে দেখা করি। দীর্ঘ তিনটি ঘণ্টা ধরে আমাকে অজস্র প্রশ্ন করলেন সেদিন। কিন্তু স্পষ্টই বুঝতে পারলাম আমার উত্তর ওঁকে সন্তুষ্ট করেনি মোটেই—কিন্তু আমার ভারী ভালো লেগেছিলো।

যাই হোক, এই পরিচয়ের দু'দিন পরেই আমি যাত্রা করলাম—পকেটে মাত্র বিয়াল্লিশটি টাকা। কিন্তু সাহসের একটুও অভাব ছিল না মনে। পথে নিজের স্বভাব-দোষে আর কয়েকটি জুয়াচোরের পাল্লায় পড়ে সর্ব্বস্বান্ত হলাম। কিন্তু পরোয়া না করে হাঁটা পথেই পাড়ি দিলাম। অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার শেষে এসে পৌঁছলাম চিরগৌরবময়ী নগরী রোমেতে। পকেট শূন্য থাকলেও রোমের সৌন্দর্য্য আমার মন দিয়েছিলো পূর্ণ করে। কিন্তু চোখের পিপাসা মেটানোর আগেই সোজা গেলাম ধর্ম্মযাজকের খোঁজে। হা হতোস্মি! কোথায় তিনি? শুনলাম আগেই চলে গেছেন রোম ছেড়ে, তবে আমার জন্য নেপল্সে পৌঁছবার পাথেয় আর পথের নির্দ্দেশ রেখে গেছেন। পরদিনই একটা গাড়ী ছাড়বে জেনে প্রথমেই তাইতে যাবার ব্যবস্থা করলাম—রোমের সৌন্দর্য্যের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে। কিন্তু দুর্ভোগের শেষ তখনও হয়নি। ৬ই সেপ্টেম্বর নেপল্স পৌঁছলাম—শুধু জানতে পারলাম, তিনি আগেই চলে গেছেন মার্টোরানোতে। আমার সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থা দূরে থাক একটি কথাও কাউকে বলে যাননি। আজও মনে পড়ে সেদিন সেই বিশাল নগরীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে কি ভীষণ একাকী অসহায়ই না মনে হোয়েছিল! কিন্তু মনের জোর ফিরতেও দেরী হয়নি। ঠিক আছে মার্টোরানো—বেশ মার্টোরানোই সই। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে আমাকে ওখানে পৌঁছতেই হবে—নাই বা থাকলো পাথেয়…নাই বা রইলো পরিচিত আত্মজন। মাত্র দু'শো মাইল পথ—গাড়ীতে যাওয়া? শূন্য পকেটে? সে তো দুরাশা! হাঁটা পথেই আবার পাড়ি জমালাম।

অনেক ঘটনা আর দুর্ঘটনা, অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর ক্যালাব্রিয়াতে এসে পৌঁছলাম। সেখান থেকে ছোটো একটি গাড়ীতে সোজা মার্টোরানো। পথের অভিজ্ঞতায় তখন সঞ্চয়ও কিছু হোয়েছে বৈ কি!

অবশেষে সেই ধর্ম্মযাজকের খোঁজ মিললো। তাঁর নাম হোলো বার্নার্ড ড বার্নার্ডিস। ঘরের ভিতর ছোটো নড়বড়ে একটা টেবিলে বসে কি লিখছেন। আমি ঢুকেই প্রচলিত রীতি অনুসারে নতজানু হোলাম। উনি তাড়াতাড়ি এসে আমাকে উঠিয়ে আশীর্ব্বাদ জানালেন। পথের দুরবস্থার কথা শুনে ব্যথিত যেমন হোলেন—সব বাধা কাটিয়ে নিরাপদে এসেছি এমন কি কোথাও ধার দেনা কিছুই রাখিনি শুনে তেমনি খুশীও হোলেন।

বাড়ীখানা বেশ বড়। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই, তাছাড়া যেমন অপরিচ্ছন্ন তেমনি অব্যবস্থা। বিশেষ করে খাওয়া-দাওয়া তো জঘন্য। তেলটা অবধি কটুগন্ধে ভরা। সেদিনই আবার উপবাসের দিন ছিলো। কিন্তু যাজকটি শুধু বিচক্ষণ নন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিসম্পন্ন। বাড়ীর বিশৃঙ্খলায় অত্যন্ত বিচলিত, আর অপ্রস্তুত হোয়ে উঠলেন। আমাকে নিজের বাড়ীতে তুলে আমার উপকারের বদলে অপকার করলেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

আমাকে বললেন, এত দুরবস্থা সত্ত্বেও ওঁর একমাত্র সান্ত্বনা যে উনি মঠের সন্ন্যাসীদের কবল থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছেন। ওদের নির্য্যাতনে পনেরোটি বছর ওঁকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হোয়েছে।

পরদিন একটি উপাসনা-সভায় ধর্ম্মযাজকের আসন উনি নিলেন। আমিও ছিলাম সঙ্গে। সেই সভাতে শহরের সমস্ত গণ্যমান্য, বিশিষ্ট ব্যক্তি আর সমস্ত যাজকরাই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমার জীবনে আমি ভণ্ড আর ইতরদের এতবড় সমাবেশ আর দেখিনি! মহিলারাও যেমন বীভৎস নির্লজ্জ পুরুষেরাও তেমনি মূর্খ অথচ অশ্লীল, কুৎসিতভাবাপন্ন। বাড়ী ফিরে এসে আমি বললাম যে, আমাকে ক্ষমা করবেন এই জায়গায় জীবন কাটাবার ইচ্ছা আমার আদপেই নেই। আশীর্ব্বাদ করুন, আমি তাই মাথায় নিয়ে বিদায় হই। কিম্বা আপনিও আমার সঙ্গে আসুন। আমি কথা দিচ্ছি অন্য কোথাও গিয়ে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের ভাগ্য ফেরাতে পারবো।

কিন্তু এই কথায় ওঁর এত মজা লাগলো যে শুনেই সশব্দে হেসে উঠলেন। শুধু তাই নয়, সারাদিন ধরেই মাঝে মাঝে কথাটা মনে পড়লেই হেসে উঠতে লাগলেন। কিন্তু সেদিন আমার কথাটা মেনে নিলে মাত্র দু'বছর পরেই ওঁকে জীবনের মধ্যপথেই যবনিকা টানতে হোতো না। আমাকে এখানে ডেকে এনে যে ভুল করেছেন সে কথা স্বীকার করলেন। আর ওঁর হাতে কিছু না থাকাতে (যদিও তখন ওঁর বাৎসরিক আয় হোলো দু'হাজার ফ্রাঙ্ক) আর আমাকেও কপর্দ্দকহীন ভাবার জন্যে একখানি পরিচয়-পত্র দিলেন নেপলসে ওঁর এক বন্ধুর কাছে। আর তাতে নির্দ্দেশ ছিলো আমাকে ষাটটি মুদ্রা দেবার জন্য।

১৭৪৩ সাল। ১৬ই সেপ্টেম্বর নেপল্স্ এ পৌঁছলাম। পৌঁছেই প্রথম গেলাম চিঠির মালিকের কাছে। সৌভাগ্য আমার! শুধু টাকা দিয়েই ক্ষান্ত হোলেন না তিনি, আমাকে ওঁর ছেলের সঙ্গী করে নিয়ে বাড়ীতেই রাখলেন যাবতীয় খরচপত্র শুদ্ধ। ওঁদের সঙ্গেই দেশভ্রমণে বেরিয়ে আবার এসে পৌঁছলাম রোমে। আমার কল্পরাজ্য রোম!

কিন্তু এবার সেই গৌরবময়ী নগরীতে পথক্লান্ত, হৃতশ্রী, নিঃস্ব

পথিকের বদলে এসে দাঁড়ালো বেশেভূষায়, অর্থে সামর্থ্যে, বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন জন। শুধু অর্থ নয় কিঞ্চিৎ রক্তেরও অধিকারী তখন আমি, আর সঙ্গে বেশ কয়েকটি মূল্যবান পরিচয়-পত্র। তাছাড়া আমার চেহারাটায় এমন একটা বনেদীয়ানার ছাপ ছিলো যাতে সহজেই অন্যের দৃষ্টি আর সম্ভ্রম আকর্ষণ করতাম। আমার ধারণা ছিলো রোম এমন জায়গা যে, এখানে একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় সুরু করলেও শেষে সব সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়।

রোমের বহু বিখ্যাত, সম্ভ্রান্ত, ব্যক্তিদের নামে আমার কাছে পত্র ছিল। তার মধ্যে বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক ফাদার জর্জ্জের নামেও ছিলো। স্বয়ং পোপও তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আর ভক্তি করতেন। তাছাড়া ছিলো পোপের মন্ত্রিসভার সভ্য—'কার্ডিন্যাল একোয়াভাইভা'র নামে। সে সময় তাঁর মত ক্ষমতাশালী রোমে আর দ্বিতীয় ছিল না বললেই চলে। পরিচয় পাবার পর আমাকে তিনি বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। কথাপ্রসঙ্গে যখন শুনলেন যে পোপের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার এখনও ঘটেনি, তখন নিজেই তার ব্যবস্থা করবেন আশ্বাস দিলেন। আর কয়েক দিনের মধ্যেই আমার কাছে আদেশপত্র এলো—পোপের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

মন্টি ক্যাভেলোতে পৌঁছুলাম। আমাকে সোজা উপরে নিয়ে যাওয়া হোলো যেখানে তিনি বসেছিলেন সেইখানে। আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে ওঁর পাদুকার ক্রশ চিহ্নটিকে চুম্বন করলাম। আমার পরিচয় নেবার পর তিনি জানালেন আমার নাম তিনি শুনেছেন। তাছাড়া 'একোয়াভাইভা'র মত বিশিষ্ট একজন কার্ডিন্যালের আশ্রয় পেয়েছি শুনে আনন্দও প্রকাশ করলেন। নানারকম কথাবার্ত্তার মধ্যে আমার পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাও তাঁকে বললাম। মার্টোরাণোর ধর্ম্মযাজকের কাহিনী শুনে তাঁর সে কি প্রাণখোলা হাসি! আমারও তখন সব জড়তা বা সঙ্কোচ একেবারেই কেটে গিয়েছিলো—খুব সহজ ভাবেই গল্প করতে লাগলাম। আর সে সব শুনে ওঁর এত কৌতুক লাগলো যে আমি প্রায়ই আসলে ওঁর খুব ভালো লাগবে, সে কথাও জানিয়ে দিলেন। বাস্তবিকই পোপ চতুর্দ্দশ বেনেডিক্টের মত অমায়িক, নম্র ও মধুর প্রকৃতির লোক খুব কমই ছিলো—তাঁর শত্রুরাও তাঁর স্বভাবের গুণে তাঁকে শ্রদ্ধা আর প্রশংসা জানাতে দ্বিধা করতো না। কথাপ্রসঙ্গে আমি তাঁর কাছে অনুমতি চাইলাম যাতে নিষিদ্ধ বই পড়ায় আমার বাধা না থাকে। অনুমতি তখনি মিললো। যদিও উনি বলেছিলেন একেবারে লিখিত অনুমতি-পত্র দেবেন—সে-কথা কিন্তু পরে ভুলেই গিয়েছিলেন।

আর একবার ওঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় ভিলা মেডিসিতে। আমাকে ডাকলেন সঙ্গে বেড়াবার জন্যে। বেড়াতে বেড়াতে নানারকম গল্প করছিলাম আমরা—সঙ্গে ছিলেন ভেনিসের রাষ্ট্রদূত আর কার্ডিন্যাল এ্যালবানি।

হঠাৎ একটি লোক এলো। চেহারাটা দেখলে মনে হয় অত্যন্ত নম্র সৎ প্রকৃতির লোক। পোপ তাকে কাছে ডাকলেন, জিজ্ঞাসা করলেন কি প্রয়োজন। লোকটি মৃদুস্বরে তাঁকে কি জানালো। পোপ শান্ত ভাবে ওর বক্তব্য শুনলেন। পরে বললেন, "তুমি ভালোই করেছো, ঈশ্বরকে ডাকো তিনি সব ঠিক করে দেবেন"—

লোকটি বিষণ্ণ-মন্থর গতিতে চলে গেলো। পোপ আবার ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে বেড়াতে লাগলেন।

—"পরম পিতা, আপনার স্বর্গীয় মহত্বের কাছে ও যে উত্তর পেলো, তা'তে কিন্তু ওর মন তৃপ্ত হোতে পারেনি।"

—"কেন পারেনি?"

—"স্বভাবতঃই আপনার কাছে আসার আগেই ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলো। আপনার কাছে যখন এলো আপনিও তার আবেদন ঈশ্বরের কাছেই জানাতে বললেন—এখন সে বেচারীর অবস্থাটা ভাবুন তো?"

পোপ সশব্দে হেসে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর আর দু'জন সঙ্গীও। আমি কিন্তু একটুও অপ্রস্তুতের ভাব দেখালাম না। পোপ হেসে বললেন,—"ঈশ্বরের করুণা ছাড়া আমি নিজে কিছুই করতে পারি না—"

—"পরম পিতা, যা বলছেন সেটা ঠিকই। কিন্তু সবাই জানে ঈশ্বরের প্রধান মন্ত্রীই হোলেন আপনি। তাহলে ভাবুন তো লোকটির অবস্থা—আপনিও যদি মধ্যস্থতা না করে সোজা ঈশ্বরের কাছে তাকে পুনঃপ্রেরণ করেন তাহলে বেচারী কি করে? এক রোমের ভিক্ষুকরা ছাড়া তার গতি নেই। কারণ ভিক্ষা পেলেই ভিক্ষুকরা ঈশ্বরের কাছে তার জন্য কল্যাণ কামনা করবে। আমি কিন্তু আপনার মধ্যস্থতাতেই সব চেয়ে খুশী হবো। তাই আমার আবেদন, অনুগ্রহ করে আমাকে আরও বেশী মাংস খাবার অনুমতি-পত্র দিন"—

—"তাই হবে বৎস,"—পোপ হেসে আমাকে আশীর্ব্বাদ জানালেন আর সেই সঙ্গে বলে দিলেন, উপবাসের দিনগুলি কিন্তু আমাকে মানতে হবে।

* * *

ভাগ্যক্রমে আমার রচিত কয়েকটি কবিতা কার্ডিন্যাল এম, সি'র খুব ভালো লেগেছিলো—ফলে তাঁর প্রাসাদেও আমার দ্বার ছিলো অবারিত। সোনার কাজকরা অপূর্ব্ব সুন্দর একটি নস্যদানী আমাকে উনি উপহার দেন। তাছাড়া আরও অনেক মূল্যবান উপহার পেয়েছি ওঁর কাছ থেকে। এই সব দেখে-শুনে আমার বন্ধুরা বলতো, আমার সৌভাগ্যের না কি সীমা থাকবে না। যার চার পাশে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানী-গুণীরা রয়েছেন তার ভবিষ্যৎ তো স্বর্ণোজ্জ্বল। সত্যিই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রোমে আমার পদমর্যাদা আশ্চর্য রকম বেড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ভাগ্যে সইলো না বেশী দিন।

একদিন ভোরবেলা। মনে হচ্ছে ক্রীসমাসের দিন ছিলো সেদিনটা—হঠাৎ আমার একজন ডাক্তার বন্ধু ঝড়ের মত আমার ঘরে ঢুকেই সামনের সোফাটাতে বসে পড়লো। একটু জিরিয়ে নিয়ে বললে যে, আমাকে জন্মের মত বিদায় জানাতে এসেছে—কিন্তু বিদায় নেবার আগেও আমার কাছে একটা শেষ পরামর্শ বা উপদেশ চায়। কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করাতে—পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে আমাকে পড়তে দিলে। চিঠিটা লিখেছে 'বারবারা' ওর প্রণয়িনী। লিখেছে যে তাদের প্রণয়-লীলা গোপন রাখা আর কোনো মতেই সম্ভব নয়। ওর বাবা ওদের মিলনের প্রচণ্ড বিরোধী—আর বাবার ওই প্রচণ্ড জেদের বিরুদ্ধে

দাঁড়ানোর মত সাহসও ওর নেই। তাই বারবারা ঠিক করেছে ও গোপনে রোম ছেড়ে চলে যাবে—যেদিকে দু'চোখ যায়। একা নিঃসম্বল আশ্রয়হীনা হোলেও দ্বিধা করবে না এই নিষ্ঠুর জগতের সমস্ত সংঘাতের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াতে।

"—যদিও সত্যিই তুমি ভদ্রঘরের ছেলে হও তবে কখনই তুমি বারবারাকে পরিত্যাগ করবে না। তার বাবার বিরোধিতা সত্ত্বেও তোমার তাকে বিয়ে করা উচিত—" আমার মত তাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলাম।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে নানা ভাবে আলোচনা করার পর ওর মনটা শান্ত হোলো। স্থির ভাবে শুনলো সব। শেষে যাবার সময় জানিয়ে গেল যে, বারবারাকে কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করবে না।

কয়েক দিন পরই একটি সন্ধ্যায় আমি বিছানাটা ঠিক করছিলাম —এমন সময় হঠাৎ দরজার পাল্লা দুটো সজোরে খুলে গেলো, আর. ঘরে এসে ঢুকলো একটি তরুণী সন্ন্যাসিনী। উত্তেজনায়, শ্রান্তিতে হাঁফাতে হাঁফাতে ঢুকেই আমার পায়ের তলায় আছড়ে পড়লো। তখনি চিনলাম, ডাক্তারের প্রণয়িনী, ফরাসী শিক্ষকের মেয়ে বারবারা। উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে ও বার বার আমার করুণা ভিক্ষা করতে লাগলো।

সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে দুর্ভাগিনী তরুণীর অশ্রুসিক্ত লাবণ্য-ঢলঢল মুখখানির আবেদনে কোন পাষাণ হৃদয়ই স্থির থাকতে পারে না।

—"কিন্তু ব্যাপার কি, ডাক্তারই বা গেল কোথায়?"

—"তাকে পুলিশে ধরেছে। দু'জনে মিলে চলে যাবার ঠিক করেছিলাম। আমি এই ছদ্মবেশে তার কাছে আসছিলাম। যেই দেখলাম পুলিশের গাড়ীতে ওকে টেনে তুললো, তখনি মনে হোলো এবার নিশ্চয়ই আমার পালা। এখন যদি কোনো নিরাপদ আশ্রয় না পাই তা হলে যে বরাতে কি আছে তা ভাবতেও পারি না। সবার প্রথমে আপনার কথা মনে পড়লো—তাই তখনি এখানে চলে এলাম"—

—"কিন্তু এখন তো অনেক রাত! কাল ভোরে কি করবেন কিছু ঠিক করেছেন?"

—"কিছু ভাববেন না। আজ রাতটা আমায় আশ্রয় দিন। কাল ভোরে উঠেই চলে যাবো"—বারবারার অশ্রুরুদ্ধ স্বর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো—"আমাকে এই বেশে কেউ চিনতে পারবে না। আমি রোম ছেড়ে চলে যাবো—কোথায় যাবো জানি না—শুধু জানি যতক্ষণ না মরণ আসে ততক্ষণ আমার চলা ফুরাবে না"—

আমি জোর করে ওকে আমার বিছানায় শুইয়ে দিলাম। সারা রাত কাটলো চিন্তায়। ভোরে উঠেই ওকে কিছু না জানিয়েই বেরিয়ে পড়লাম—ইচ্ছা ছিলো বারবারার বাবার কাছে গিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারি, যাতে ওকে ক্ষমা করে ডেকে নেন। কিন্তু হোলো না। বাড়ী থেকে বেরোতেই মনে হোলো আমার পেছনেও চর লেগেছে। তাই সে পথে আর না গিয়ে সোজা একটা কাফেতে ঢুকে এক গ্লাস চকোলেটের অর্ডার দিলাম। কার্ডিন্যাল একোয়াভাইভার বাড়িতে আমি থাকি। এ অবস্থায় যদি আমার বাড়ীতে পুলিশ সার্চ হয়, তাহলে সেটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর, আর অসম্মানজনক ব্যাপার হবে।

বাড়ী ফিরে এলাম। প্রথমেই কাজ হোলো বারবারাকে জোর করে কিছু খাওয়ানো। কিন্তু এক টুকরো বিস্কিট আর একটু মদ ছাড়া আর কিছুই খাওয়াতে পারলাম না। যাই হোক, একটু সুস্থ হলে ধীরে-সুস্থে ওকে পরামর্শ দিলাম যে সব ব্যাপারটাই কার্ডিন্যাল একোয়াভাইভাকে জানিয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা সব চেয়ে ভালো। আপাততঃ তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়ে একটা চিঠি লেখা দরকার। বারবারা রাজী হোলো। ফরাসী ভাষায় ছোট্টো কয়েক লাইনে লিখলে—'মহাশয়, সম্রান্ত ঘরের মেয়ে আমি। অবস্থা বিপর্য্যয়ে সন্ন্যাসিনীর ছদ্মবেশে ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। সাক্ষাতে আমার নাম আর পরিচয় জানাবার প্রার্থনা করি। আপনি মহানুভব, আমার এই অনুরোধটুকু রাখবেন। আমার আশা আছে, আপনার উদার মহৎ হৃদয় আমার সম্মান বাঁচাবার জন্যে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবেই।'

—"কিছুই লুকিও না, সব কথাই তাঁকে খুলে বোলো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উনি একটা না একটা ব্যবস্থা করবেনই।"

চিঠি পাঠিয়ে দেবার পর, কি একটা কাজে আমি বেরিয়েছিলাম, বোধ হয় এক ঘণ্টার বেশী হবে না। ফিরে এসে দেখি, ঘর শূন্য। বারবারা নেই। খাবার সময় কার্ডিন্যালের সঙ্গে একত্রেই খেতে বসেছিলাম। সারাক্ষণ একটি কথাও আমি বলিনি—নিঃশব্দেই খেয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এধার-ওধারের টুকরো কথা থেকে বুঝতে বাকী রইলো না যে, বারবারা ইতিমধ্যেই ওঁর আশ্রয়ে এসে পড়েছে।

পুরো দু'দিন কেটে গেলো। কোনো খবরই পেলাম না আর। পরে একোয়াভাইভা নিজেই আমাকে জানালেন যে. বারবারাকে সমস্ত খরচ দিয়ে একটি কনভেন্টে ভর্ত্তি করে দিয়েছেন। যত দিন না ডাক্তার ফিরে আসে, ওকে বিয়ে করার জন্যে প্রস্তুত হয়, তত দিন ও ওখানেই থাকবে।

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যে ব্যাপারটা এখানে এসেই থেমে গেল না। যেই ছোট্ট নাটকীয় ব্যাপারটি ঘটছিলো, তাতে নাটকটি ক্ষুদ্র হোলেও তার পাত্র-পাত্রীরা যে কেউই জনসাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার মত তুচ্ছ ন'ন। অতএব কয়েক দিনের মধ্যেই সারা রোম জানলো যে, আমি নিজের কোনো দুরভিসন্ধি সাধনের জন্যেই বারবারাকে একটি রাতের আশ্রয় দিয়েছিলাম। অবশ্য এ-সব গুজবে প্রথমটা আমি কানও দিইনি—কিন্তু মর্মান্তিক ভাবেই দিতে হোলো তখন, যখন লক্ষ্য করলাম কার্ডিন্যাল একোয়াভাইভাও দিন-দিন আমার প্রতি কেমন যেন নিস্পৃহ এড়িয়ে যাবার মত ব্যবহার করছেন। সত্যিই ব্যথা পেলাম সেদিন।

তার পরই একদিন আমাকে উনি ডেকে পাঠিয়ে গম্ভীর ভাবে জানালেন—"ভাখো, এই বারবারা দ্যালাকোয়াদের ব্যাপারটা ক্রমেই বেশ ঘোরালো হোয়ে উঠছে—শুধু তাই নয়, রীতিমত অসহ্যও হোয়ে উঠেছে। সবাই বলাবলি করছে, বারবারার অপরাধ আর ডাক্তারের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তুমি আর আমি নিজেদের কোনো উদ্দেশ্য সাধন করছি। যদিও এ-সব কুৎসা রটনাকে আমি আন্তরিক ভাবে ঘৃণা করি, তবুও খোলাখুলি ভাবে এ-সব সহ্য করাও আমার ক্ষমতার বাইরে। তাই তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তুমি রোম ছেড়ে চলে যাও। যাতে লোকের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ না হয়, তোমার

সম্মান যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে ভার আমার। তা ছাড়া আমার হৃদ্যতা আর শ্রদ্ধা থেকে তুমি কখনও বঞ্চিত হবে না। দুঃখ কোরো না। তোমার এই তো দেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বয়স। বেশ করে ভেবে বলো, কোন্ দেশে তোমার সবচেয়ে বেশী যাবার ইচ্ছা। সারা পৃথিবী জুড়ে আমার বন্ধু, পরিচিত ও আত্মজনের অভাব নেই। যেখানেই তুমি যাবে আমি চিঠি দেবো, যাতে কোথাওই তোমার কাজকর্ম্ম, কিছুরই অভাব না হয়। এখন সপ্তাহের মধ্যেই তুমি রোম ছাড়বার জন্যে তৈরী হও। আজ রাতটা বেশ ভালো করে চিন্তা করে কাল সকালে আমাকে জানিও, কি ঠিক করলে।"

চলে এলাম। সমস্ত মনটা তীব্র ব্যথায় টন্‌-টন্ করে উঠলো এই আকস্মিক আঘাতে। ক্ষুব্ধ, ভারাক্রান্ত মনে কাটলো নিদ্রাহীন রাত—কোনো পথ নেই—কোনো উপায় নেই। সকালবেলা দেখা করতে যাবার সময় অবধি কি বলবো, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না।

ভোরবেলা বাগানে সেক্রেটারীর সঙ্গে উনি বেড়াচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই তাঁকে বিদায় করে দিলেন। আমি যথাসাধ্য ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কি দুঃসহ যন্ত্রণায় আমার সারা রাত কেটেছে। সমব্যথীর মতই সব শুনলেন কিন্তু পরক্ষণেই সেই পুরানো প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি—কোথায় যাবার ঠিক করেছি—

—"কনস্তান্তিনোপল্"—দুঃখে, ক্ষোভে, হতাশায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

—"কনস্তান্তিনোপল্! সে কি!"

—হ্যাঁ মহাশয়!" "কনস্তান্তিনোপলই"—অশ্রুসিক্ত উত্তর আমার।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটলো। তার পর মৃদু হেসে উনি বললেন —"ধন্যবাদ, তুমি যে ইস্পাহান বলনি তাই যথেষ্ট। যাক, আমি তোমাকে পাশপোর্ট দেবো। তাছাড়া এবার তুমি স্বচ্ছন্দে লোকের কাছে বলে বেড়াতে পারো যে আমি তোমাকে কনস্তান্তিনোপল্ পাঠাচ্ছি—আমার মনে হয় কেউই তোমার কথা বিশ্বাস করবে না—"

হোটেলে ফিরে এসে আমার প্রথমেই মনে হোলো, হয় আমি পাগল, নয়তো কোনো অজ্ঞাত অশরীরী শক্তি আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। জানি না, এত দেশ থাকতে কেন কনস্তান্তিনোপল বললাম—জানি না সেখানে গিয়ে আমি কি করবো! শুধু জানি যে সেখানেই আমি যাবো।

দু'দিন পরে কার্ডিন্যালের কাছ থেকে ভেনিসের একটি পাশপোর্ট এলো, সঙ্গে একটি বন্ধ খাম। ঠিকানা লেখা,

Osman Bonneval. Pasha of Caramania. Constantinople.

আরও একটি মোড়কে সাত শ' মুদ্রা!

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু।

ধূসর হৃদয়

শ্রীশঙ্করকুমার মুখোপাধ্যায়

একটি ধূসর হৃদয় সন্ধ্যায় ছায়া মুছে ফিরে,
তুলে ফেলে নিয়ে যায় যত দেখে ফুল;
বুড়ী-মাথা শাদা চুল শোণ নদী ঘিরে
ছড়াতেছে বারে বারে জীবনের অভিশপ্ত ভুল
নিভৃতে সে দেখে নেয় সজীবের দেদার কুহক
সেই ফাঁকে এলোমেলো ডানা মেলে উড়ে চলে বক।

কিছু না চেয়ে সে হৃদয় ফলালো ফসল; আবার
হেমন্তের মাঠে মাঠে শিশিরের জলসেচ করে
দাঁড়াল মাটির 'পরে স্থির চোখ নিয়ে। যাবার
সময় তার চোখ দুটি জলে গেল ভরে,
হারায়ে ফেলেছে আজ অবসরের পরম আহ্লাদ
ম্রিয়মাণ সে ব্যথায় উঁকি দেয় দ্বিতীয়ার চাঁদ;

মেঠো-পথ ধরে কাল গুণে চলে অলসের মত
শাদা কাশফুলে শোণ নদী বালুর রগড়
শুয়ে আছে যেন শাদা শেফালীর বিছানার 'পর
তার ভোঁতা অনুভূতিগুলি মত্ত হয়ে ছোটে যত;
বুনে চলে সেই ক্ষেতে অবসাদময় আশা
তবু সে যে স্থির হয়ে ঝুঁকে থাকে মেটে না পিপাসা

হেঁটে চলে থেমে পড়ে ভাবে আর ভাবে কত কথা
চেয়ে থাকে দূরযানী তারাভরা রাতের আকাশে,
শুধোবার কিছু নেই ভাষা তার শুধু নীরবতা
সুদূর মননে চেয়ে থাকে ব্যাকুল বাতাসে;
তার পরে ধীরে ধীরে জীবনেতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে
থেমে পড়ে হেঁটে চলে নদী-তীরে নিরাশ হৃদয়ে;

ধূসর হৃদয় নিয়ে মোরা জীবনের খুঁজি মানে
সব শেষে বলি তাহা বড় গ্লানিময়,
যত আশা জমা রেখে মরণের অভিধানে
প্রমাণিত হই মোরা নিরাশ নির্ভয়;
পরম সান্ত্বনা তাই বাঁচিয়া র'ব যত কাল
ভুল মোরা করি বটে ধরি নাকো বাঁকা পথে হাল।

শ্রীমতী আর্ভেরএর দিনপঞ্জী

তরু দত্ত (১৮৫৬-১৮৭৭)

[আমাদের ভারত-সাহিত্যে বাংলা দেশের অন্যতমা সুকন্যা স্বর্গতা তরু দত্তর নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। অনেকেই লেখিকাকে ইংরাজী ভাষার কবি হিসাবে জানেন, কিন্তু মূল ফরাসী ভাষাতেও কবির পুরা দখল ছিল এবং ঐ ভাষাতে তিনি একখানি উপন্যাস রচনা করেন, যার নাম "Le Journal de Mm d' Arvcs" বা "শ্রীমতী আর্ভেরএর দিনপঞ্জী।" এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন বিখ্যাত ফরাসী লেখিকা Clarisse বই প্রকাশিত হয় ইং ১৮৭৯ অব্দে, শ্রীমতী দত্তর মৃত্যুর অনতিকাল পরেই। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা আছে, এই উপন্যাসের লেখিকা হিসাবেই তরু দত্ত ফরাসী সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবেন। এই বই ভারতবর্ষের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটনকে উৎসর্গ করেন লেখিকার পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয়। অনুবাদক মূল ফরাসী থেকে এই বিখ্যাত উপন্যাস মাসিক বসুমতীর জন্য তর্জ্জমা করেছেন।

কলকাতার জনৈক খ্রীষ্টসম্প্রদায়ভুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা তরু দত্ত ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য জ্যেষ্ঠা কন্যা অরু এবং কনিষ্ঠা তরু তাঁদের পিতার সঙ্গে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। সেখানে দুই বোন ইংরাজী এবং ফরাসী ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জন করেন। কেম্ব্রিজ ও সেন্ট লিওনার্ডসে তাঁরা শিক্ষাগ্রহণ করেন। কলকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর তরু সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য-চর্চায় পুনরায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে কলকাতার কয়েকটি সাময়িক পত্রে তরু স্বরচিত কবিতা প্রকাশ করতে থাকেন। 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' নামক তৎকালীন পত্রিকায় তাঁর অধিকাংশ কবিতা প্রকাশিত হয়। ইং ১৮৭৪ অব্দে যক্ষ্মাক্রান্ত হয়ে অরুর মৃত্যু হয়। দু' বছরের মধ্যে তরুও ঐ একই রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। বিদেশী পত্র-পত্রিকায় দুই বোনের লেখার প্রচুর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। অরু এবং তরু দু'জনেই সুসঙ্গীতজ্ঞা ছিলেন। দু'জনেই ছিলেন অবিবাহিতা। তরুর মৃত্যুর পর ফরাসী ভাষায় রচিত শ্রীমতী আর্ভেরএর দিনপঞ্জী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

তাঁর মৃত্যুকাল ৩০শে আগষ্ট, ১৮৭৭ অব্দে।—স]

২০শে আগষ্ট ১৮৬০।—আজ আমার জন্মদিন। এখন আমি পঞ্চদশী। পাঁচ বছর বাদেই আমার বয়স হবে কুড়ি। সময় উড়ে চলেছে। আমার মা-মণি আজ বড় ব্যস্ত,—আমার খাতিরে বাড়ীতে আজ বিরাট ভোজ হবে। অতি সুখে কয়েকটা বছর যে কনভেণ্টে কাটিয়েছি, তা অল্প দিন হল ছেড়ে এসেছি। এখানে পৌঁছেছি গত পরশু। কনভেণ্টে সিষ্টাররা সবাই আমাকে কিছু উপহার দিয়েছেন। তাঁদের ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছি বাবার সাথে, তাই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা সবাই, বিশেষত: ভগিনী ভেরোনিক; আমার পাশে বহুক্ষণ তিনি বেদীর সামনে প্রার্থনা করলেন, তারপর আমায় আলিঙ্গন জানিয়ে ছোট একটি রূপোর ক্রুশ দিলেন আমার হাতে।

"এটা তোর সুখেরই পরিচায়ক, বুঝলি?" আমার গলায় একটি কালো ফিতে দিয়ে সেটি বাঁধতে বাঁধতে তিনি বললেন, "অনেক সঙ্কট মুহূর্ত্তে এর কাছে আমি পেয়েছি সান্ত্বনা; তোর প্রয়োজনের সময় তোকেও এ সান্ত্বনা দেবে; সর্বদা তাঁর কথা স্মরণে রাখিস যিনি আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে; আমি জানি কত কোমল তোর অন্তর, আমাদের ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে কত তোর আস্থা। সব বিপদের মাঝে তিনিই তোকে রক্ষা করবেন, তিনিই তোকে ধন্য করবেন তাঁর আশীষে।"

ভগিনী ভেরোনিককে ছেড়ে আসার সময় আমি খুব কেঁদেছিলাম। কারণ, যত দিন আমি কনভেণ্টে ছিলাম, সব সময় তাঁকে আমার বড় বোনেরই মত মনে হয়েছে।—বসবার ঘরে বাবা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর সঙ্গে এই শান্তির প্রবাস ত্যাগ করে এলাম। বাবাকে দেখে যে কী আনন্দ হল! বাড়ী যাবার পথে কত বার যে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম! আমায় দেখার আনন্দে তাঁর মুখেও হাসির বিরাম ছিল না।

"আরে খুকি", তিনি বললেন, "তুই কত বড় হয়েছিস্, কি সুন্দর হয়েছিস্; তোর মা তোকে দেখে চিনতেই পারবে না।"

"আমায় তাহলে ভালই দেখছ?"

"খাসা দেখছি রে খুকি।"

"যাঃ, তুমি শুধুই বানিয়ে বলছ।" শ্রীমতী ল্যামোটন বলেন যে আমার গাল দুটো যেন একটু বেশী লাল, আর আমার গায়ের রং একটু চাপা, কিন্তু জান বাবা, তাঁর রঙ, তিনি গৌর যেন—"

"গৌর যেন পাকা গমের···" বাবা হাসতে হাসতে গেয়ে উঠলেন।

"এ ত ম্যুসের উপমা!"

"সে কি রে, তোদের কনভেণ্টে ম্যুসে পড়ান হয়?"

"হয় না, তবে সেই ইংরেজ মহিলা, শ্রীমতী বার্থা স্মিথ, তাঁর কাছে ত ফরাসী কাব্যের এক সঙ্কলন আছে; তিনিই আমায় দিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ, তা কি বলছিলি সেই গৌরবর্ণা সুন্দরীর কথা?"

"ওহো শ্রীমতী ল্যামোইন!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "সত্যি বাবা, কি সুন্দর তিনি, আর কি ফর্সা, কি তাঁর সোনালী চুলের বাহার! তবু তাঁর চেয়ে আমার ভগিনী ভেরোনিককেই বেশী ভাল লাগে; তাঁর কথাই তোমায় বলব। বয়সে তিনি শ্রীমতী ল্যামোইনের চেয়ে ছোটই, কিন্তু তাঁকেই যেন বড় বলে মনে হয়। খুব ভাল লোক। জান বাবা, যখন শ্রীমতী ল্যামোইন আমার অনভিজ্ঞতা ও বেখাপ আচরণ দেখে হাসি-ঠাট্টা করতেন (অবশ্য তাঁর কোনই দোষ ছিল না, কারণ প্রথম প্রথম সত্যি আমি বড় বেমানান ব্যবহার করতাম), তখন ভগিনী ভেরোনিকই ছিলেন আমার সহায় আর তিনিই আমায় শিখিয়ে দিতেন কি ভাবে কি করা দরকার। জান, প্রথম মাসটা তোমার আর মা-মণির কথা ভেবে এত ব্যাকুল হয়ে পড়তাম যে আমার ছোট্ট ঘরটিতে বসে শুধু কাঁদতাম আর ভগবানকে ডাকতাম; তাই দেখে ভগিনী ভেরোনিক আমার প্রতি খুব সদয় হয়ে উঠলেন। তাঁর বাবা ও মা দু'জনেই মারা গেছেন; আমাকে তাঁদের কথা তিনি বলতেন, আর বলতেন তাঁর ভাইয়ের কথা; যে খুব ছোট বেলাতেই মারা যায়, আর তাঁর এক খুড়তুত ভাইয়ের কথা, যিনি একটা জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন এবং সে বার যখন তাঁর জাহাজ ডুবে যায় তখন আর সবার সঙ্গে তিনিও মারা যান; সেই থেকে ভগিনী ভেরোনিক সন্ন্যাস নেন।"

এই ভাবে আমাদের কথাবার্তা চলছিল। পরদিন সকালে বাড়ী পৌঁছলাম। দেখি, দরজায় মা-মণি আমাদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ছুটে গিয়ে তাঁকে আমি জড়িয়ে ধরলাম।

"মা, মা গো!"

"আয় বাছা!"

এত দিনের বিচ্ছেদের পর আমায় দেখে বাবা খুব সুখী, খুব উৎফুল্ল হয়ে পড়েছেন। মায়ের সঙ্গে আজ আমি রান্নাঘরে বসে আছি দেখে তিনি আমায় বললেন, ও-সব ছেড়ে একটু বিশ্রাম করে নিতে।

আরও বললেন, "আজ যে তোর জন্মদিন!"

মা আর আমি রান্নাঘরে কিছু বিশেষ রকম রাঁধবার আয়োজন করছিলাম। কাছাকাছি ভাল রাঁধুনের হদিশ মেলা ভার। আজ সন্ধ্যায় অনেকেই আসবেন আমাদের এখানে। প্লুয়ারভেন্-এর জমিদার-গিন্নী তাঁর দুই ছেলে নিয়ে আসবেন। বড় ছেলে, যে বর্তমান জমিদার, তার বয়স খুবই অল্প, আর তেরেস কাল সন্ধ্যায় বলছিল যে ছেলেটি "রাজপুত্রের মত দেখতে"। সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু ছিল, কিন্তু কনভেন্টে যাবার পর আর তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নি, তা প্রায় চার বছর হল; আর ছোটদের ত কোন কিছু ভুলতে সময় লাগে না।

আমার মা সাজ-গোজ করতে গেলেন। কারণ ছ'টা বাজে প্রায়, আর আমাদের খাওয়া সাতটায়। ফিরে এসে তিনি দেখলেন, এলো চুলে আমি টেবিলের সামনে বসে আছি।

"সে কি খুকি, কি করছিস এখনো?" আমার চুলে হাত বুলিয়ে তিনি তাড়া লাগালেন। "আর সময় নষ্ট করিস না। সত্যি বলতে কি, মার্গরিৎ, তোর এই চুলের রাশি বাঁধতেই ত দু'ঘণ্টা লাগবে।"

এই বলে তিনি আমার কালো চুলের গোছা দুই হাতে তুলে ধরলেন কন্যার কেশ-প্রাচুর্যে গর্বিত হয়ে! তারপর আমার কপাল চুম্বন করলেন।

"খুব সুন্দর করে সেজে নে ত; তুই নীল রিবণ পরলে তোর বাবা খুব প্রীত হন।"

—"আর যখন সাদা মসলিন পরি—তাই না?"

—"হ্যাঁ মা!"

তারপর আমায় আলিঙ্গন জানিয়ে তিনি চলে গেলেন। ওই যাঃ! ঘড়িটা বেজে উঠল: সাড়ে ছটা। এইবার থামি।

২১শে আগষ্ট, ১৮৬০।—ওঃ, কাল সন্ধ্যাটা কি ভালোই কাটল! আমায় সবাই জানালেন অভিনন্দন, আর আমার স্বাস্থ্য-কামনা করে প্রত্যেকেই শ্যাম্পেন পান করলেন। নাঃ, সুরু দিয়েই সুরু করা যাক। বসবার ঘরে ঢুকে দেখি ইতিমধ্যেই মাদাম গোসরেল আর তাঁর কন্যা উপস্থিত। আমার মার সঙ্গে তাঁরা গল্প করছিলেন। বাবা আমায় কানে কানে বললেন যে যে-ফুলের নামে আমি পরিচিত তারই মত নাকি সুন্দর লাগছে আমায়। শ্রীমতী গোসরেল সাদরে আমার হাত ধরলে।

"এই তো, খুকি এসেছে," সে বলল, "কত বড় হয়ে গেছে, না মা?"

শ্রীমতী য়োফোনী গোসরেল সারা দেশে সুন্দরী বলে খ্যাত। আমার চেয়ে বয়সে বড়; বোধ হয় ছাব্বিশ হয়েছে; দীর্ঘ তন্বী, ঈষৎ লালচে সোনালী চুলগুলি মাথার চার পাশে আলোক-মণ্ডলের মত শোভা পায়; হালকা নীল অথচ অতি প্রখর চোখ দুটি; উন্নত টিকোল নাক; ঠোঁট দুটি যেন একটু বেশী পাতলা, আর দাঁতগুলি সুবিন্যস্ত, সুচারু। মুখে হাসি লেগেই আছে; বাবা বলেন, দন্তরুচি দেখানোই তার উদ্দেশ্য; আমার বাপু তা মনে হয় না; হাসি না পেলে কি হাসা সম্ভব? তা ছাড়া বাবা ত আমার সঙ্গে এমন মস্করা হামেশাই করেন। শ্রীমতী গোসরেলের সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় দরজা খুলে গেল আর শুনলাম প্লুয়ারভেনের জমিদার গিন্নী ও তাঁর ছোট ছেলে গাস্ত এসেছেন। আমার মা তাঁদের কাছে গেলেন ও জমিদার-গিন্নীকে সোফায় বসিয়ে দিলেন।

"কই মার্গরিৎ কই?" সহাস্য প্রশ্ন বেরিয়ে এল।

ইঙ্গিতে মা আমায় তাঁদের কাছে ডাকলেন; উঠে গেলাম। জমিদার-গিন্নী আমার দুই হাত চেপে ধরে পাশে নিয়ে বসালেন, বহুক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে।

"কি সুন্দর, কি অমায়িক!" বলে ওষ্ঠ দিয়ে আমার ললাট স্পর্শ করলেন তিনি। হালকা স্বরে তার পর বলে চললেন, "বুঝলি বাছা, প্রাসাদে তুই এত ঘন ঘন আসতিস আমার হ্যানোয়া ও গাস্ত'র সঙ্গে যে তুই-তোকারি করেই তোর সাথে কথা বলতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম। নিজের সন্তান মনে করেই তোকে আজ দেখতে এলাম। হ্যানোয়াকে দেখলে তুই বোধ হয় চিনতেই পারবি না?"

"না, বোধ হয় না; তখন আমি ত নেহাৎ শিশু ছিলাম।"

"এখন আমার তুই কি হয়েছিস খুকি?" মধুর হাসি ছড়িয়ে তিনি বলেই চললেন, "এই ত সবে পনের বছর হল; আমার হ্যানোয়ার হল তেইশ বছর।"

আবার সেই দরজা খুলে গেল. "ওই দেখ কে এল; কি সুন্দর ওকে দেখতে না?" মাতৃসুলভ গর্বের সঙ্গে তিনি জানতে চাইলেন।

—"হ্যাঁ।"

কথাটা আমার মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে এল, কারণ তার পেছনে অতি বড় সত্য ছিল। অপরূপ সে সৌন্দর্য। সুদীর্ঘ চেহারা, অনেকে হয়ত একহারাই বলবেন; মাথার চুলগুলি কালো, কোঁকড়ান, কাঁধ অবধি লম্বিত। দিব্যি আয়ত গভীর দুটি চোখ; ললাটে আভিজাত্য; সুগঠিত ঠোঁটের ওপর স্বল্প গোঁফের রেখা; গায়ের রঙটা অনেকটা মেয়েলি ধরনের সাদা, যা দেখে বোঝা যায় কোনও সম্ভ্রান্ত বংশেই তার জন্ম। ইসারায় তার মা তাকে কাছে ডাকলেন।

"এই দেখ ছ্যানোয়া, এই যে মার্গারিং। কত বড় হয়ে গেছে না?"

আমায় সে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাল। জমিদার-গিন্নী তাকে নিজের পাশেই বসালেন।

"নাও বাছারা, করমর্দন কর," মৃদু হেসে তিনি বললেন, "এমন দিন ছিল যখন তোমরা বিনা দ্বিধায় পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে।"

আমি লাল হয়ে উঠলাম। তিনি আমার হাতটা নিয়ে জমিদারের হাতে দিতে সে হেসে বলল, "মা-মণি, তুমি যে সন্তদেরই মত বাৎসল্য ও মাধুর্যে গড়া, তাই খেয়াল করনি যে শ্রীমতী গোসরেল আমাদের লক্ষ্য করছেন।"

"দেখছে, দেখুক!" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি ত কিছু অন্যায় করছি না।"—আমি হাতটা সরিয়ে নিতে তিনি একটু যেন চেঁচিয়েই উঠলেন, তার পর আমার শির-চুম্বন করলেন; আমার মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি ছেলের দিকে ফিরে বললেন, "ভারি চমৎকার দেখতে মা আমার, তাই না?"

"হ্যাঁ মা," সে পাল্টা জবাব দিল, "কিন্তু তোমার চেয়েও কি বেশী?"

২২শে আগষ্ট। আজ সকালে বাবা আর আমি বনে গিয়েছিলাম; সেখানে জমিদার ও তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। তুঁত আর জংলী বেরি খেতে খেতে মুখ আমার ফলের রসে রঙীন হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে দেখি ওরা আসছে। আমি পালিয়ে যেতে চাইছিলাম, কারণ এমন আলুথালু চুল ও বেগুনে মুখে ত কারো সামনে যাওয়া চলে না। কিন্তু বাবা আমার হাত ধরে ফেললেন। দুষ্টুমিতে তার চোখ ভরে উঠল।

"এই দেখ ছ্যানোয়া, জংলী এই গেঁয়ো মেয়েটাকে দেখ," হাসিতে তিনি ফেটে পড়লেন।

"না, জেনেরাল, বরং বলুন বনপরী।" ঘনিষ্ঠ তার স্বর।

আমার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। তবে কি ও বলতে চায় যে এই অবিন্যস্ত বেশেই আমি বেশী সুন্দর লাগি?—দুপুর অবধি আমরা গল্প করে বাড়ী ফিরলাম। জমিদার জানতে চাইল কবে আমি তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাব।

"দিন পনেরর আগে নয়," বাবাই আমার হয়ে উত্তর দিলেন। "বুঝলে ছ্যানোয়া," আমার কাঁধে হাত রেখে তিনি বলে চললেন, "এত দিন ও আমাদের কাছছাড়া হয়ে থাকায় এখন এক দণ্ডও ওকে আমি চোখের আড়াল করতে পারছি না। তবে যদি তোমার মা বলেন ত দু'-তিন সপ্তাহের মধ্যেই ও তোমাদের ওখানে যাবে।"

এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে ও ভারী সুখী হল। যাবার সময় তাই বলে গেল যে, তার মা সর্বদাই আমার পথ চেয়ে বসে থাকবেন সাগ্রহে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

চণ্ডী সেনগুপ্ত

পৃথিবীর যতো আবিলতা, যতো মলিনতা ভুল
সব মুছে গেল তোমার পরশে ঋত্বিক,
আলোর দিশারী প্রেমবন্যায় পাষাণে ফোটালে ফুল
সূর্য তোমার জ্যোতিতে স্তব্ধ নির্নিমিখ।

সৌম্য, তোমার জ্ঞানের দীপ্তি ভাস্বর
শাশ্বত চির অনন্ত অবিনশ্বর
বাঁচার মন্ত্রে জাগালে জগৎ চিন্ময়
দিগন্ত আজও বাণী-মুখরিত অক্ষয়।

গোপন হিংসা কপট দীর্ঘশ্বাস
মোছালে রুধির মিথ্যার নাগপাশ
ছিঁড়ে ফেলে দিলে। ত্যাগের মহিমা ছড়ালে জগতময়
রাত্রির শেষে সূর্য উঠল। সত্যের হোল জয়।

তৃতীয় দেবতা তোমার পরশে পবিত্র হোল জরা
স্নিগ্ধ তোমার শরণ মাগিল দিক-দিগন্ত ধরা।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

সে আজ অনেক যুগের কথা—

শুক্রাচার্য একদা বিত্তার্থী হ'য়ে নিখিল সম্পদের নিকেতন তাঁর বাল্যবন্ধু বিশ্রবা-পুত্র ধনাধিনাথ কুবেরের কাছে উপস্থিত হ'য়ে বলেছিলেন— ৩৮

"সখে, পূর্ণ তোমার বৈভব। দেবদৈত্যের নিখিল ঐশ্বর্য্য তুমি জয় ক'রে বসে আছ। তোমার বৈভব সুহৃদ্‌দের দান করে পরমানন্দ, শত্রুদের দান করে শোক। কিন্তু তোমার মত ধনাধিনাথ বন্ধু থাকতেও আমি নিঃস্ব, বহু কুটুম্বের ভারে আমি আর্ত্ত। যে মিত্র দুঃখে দুখী সুখে সুখী, দু পক্ষ স্বাধীন ব'লেই সম্ভব হয় যেখানে মৈত্রীর, বিশ্ব প্রশংসা করে সেই মিত্রকে। ৩৯-৪০

যশোক্ষেত্রে যাঁরা যথাযোগ্য আদর প্রযত্ন বিতরণ করে থাকেন, যাঁদের বৈভব উপজীবিকা হয়ে দাঁড়ায় প্রার্থীদের, আমার মতে, অভিজাত-বংশজন্মাদের মধ্যে তাঁরাই মহৎ। এবং তাঁদের স্ত্রী সৌভাগ্য সুহৃদের উপভোগ্য। ৪১

তোমার ঐ কৌবের ধন,···যেটিকে তুমি সযত্নে রক্ষা ক'রে রেখেছ, স্নেহ-বুদ্ধির পুণ্য বলে যেটি আজ সত্যই সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে;···সেই ধন যেমন সম্পদে বিপদে ত্রাণস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, মিত্রও তেমনি সযত্ন-রক্ষিত হ'লে বা স্নেহে পুষ্ট হ'লে ত্রাণ-স্বরূপ হয়ে ওঠে।" ৪২

দৈত্যাচার্য নির্জ্জনে যখন কুবেরকে এই কথাগুলি বললেন কুবেরের তখন মনে হল,···স্নেহ ও লোভ···দুটিতে মিলে যেন তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে ফেলছে। বসে বসে কিছুক্ষণ তিনি ভাবলেন, তার পরে বললেন—

"তোমায় আমি জানি, তুমি আমার বাল্যবন্ধু; আমার উপরে তোমার স্নেহের আত্যন্তিকতা আমার অবিদিত নয়। কিন্তু বন্ধু, দুঃখের বিষয়, যতটি-কাল আমি বাঁচব ততটি-কাল বিশ্বাকাঙ্ক্ষিত ধনের বা গচ্ছিত দ্রব্যাদির এতটুকুও পরিত্যাগ করবার মালিক আমি নই। ৪৪

স্নেহার্থী বন্ধু-বান্ধব নানান কার্য-সূত্রে মিত্র হয়ে ওঠে। অনেক পত্নী পাওয়া যায়, সন্তান-সন্ততিও পাওয়া যায়, জগতে তারা সুলভ, কিন্তু বন্ধু, ত্রিভুবনে ধনই একমাত্র দুর্লভ। ৪৫

অর্থের দান-খয়রাৎ করা একটি অতিসাহসের ব্যাপার; অতি দুষ্কর, অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। শরীরটিকেও মানুষ দান করতে রাজী হয়, কিন্তু এক কণা বিত্ত কখনও সে হাতছাড়া করতে রাজী নয়।" ৪৬

ঐশ্বর্যের যিনি রাজা, সেই কুবের প্রত্যাখ্যান করলেন শুক্রকে।

আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে ভগ্নমুখ, লজ্জাবক্র, উত্তেজনায় উদ্বেগে বুদ্ধি তাঁর কাঁপছে, প্রস্থান করলেন শুক্র। ৪৭

গৃহে ফিরে এলেন। ভাবতে লাগলেন। সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তার পরে মহাযোগী স্থির করলেন, মায়াবলে হরণ করবেন কুবেরের অশেষ ধনদ্রব্য। এবং প্রবেশ করলেন ধনেশের হৃদয়ে। ৪৮

বিশ্রবার পুত্র কুবের। তাঁর মধ্যে যেই শুক্র-শরীর আবিষ্ট হল, অমনি ঘটে গেল এক অসম্ভব কাণ্ড! কুবের সমস্ত কিছুই ত্যাগ করতে লাগলেন। অদ্ভুত ত্যাগ! শুক্র-সঙ্কেতিত ব্রাহ্মণদের হস্তে তিনি সম্প্রদান করে দিলেন···বিত্ত।

নিখিল কৌবের ধন হরণ ক'রে যখন প্রস্থান করছেন দানবাচার্য তখন জ্ঞান হল ধনাধিনাথের। তিনি প্রণিধান করলেন···মায়ার খেলা। শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। ৫০

আহ্বান করলেন "শঙ্খ" "মুকুন্দ" "কুন্দ" "পদ্ম" প্রভৃতি দিব্য নিধিদের। ললাটে হস্ত ন্যস্ত ক'রে তাঁদের সঙ্গে বসে বসে চিন্তা করতে লাগলেন। শুক্রের বিকৃতি কী অদ্ভুত! তারপরে উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে বললেন— ৫১

"ছলনায় ভুলেছি। আমি প্রতারিত হয়েছি, বিশ্বাসঘাতক। যে আমার মর্মজ্ঞ সুহৃৎ সেই···শুক্রই আমাকে বঞ্চনা করেছে। সে মায়াবী, অতিলোভী, ধূর্ত্ত; দৈত্যদের আশ্রয়ে থেকে সে আজ দুর্জয়। ৫২।

আর আমি এখন দ্রব্য-হীন। এক মুহূর্ত্তে তৃণের মত লঘু হয়ে গেছি। কার কাছে আমি এই দুঃখের কথা কই? কী করি? কোথায় বা যাই? ৫৩

যার ধন নেই, তাকে স্বজনেরা ত্যাগ করে; যার জনবল নেই, তাকে পরাস্ত হতে হয়। পরাস্ত হলে শরীরকে আঘাত করে দারিদ্র···তার নিখিল বিকৃতি নিয়ে। মহাভার সে বিকার। ৫৪

যারা দেহী তাদের প্রিয়জন চলে গেল, ধর্মলতার আলবাল-গুলিই কেবল ভাঙে; কিন্তু জীবদ্দশায় যাদের ধনরাশি উধাও হয়ে যায়, তাদের সব যায়। ৫৫

বিদ্বান সৌভাগ্যবান, মানী, বিশ্রুতকীর্ত্তি, কুলোন্নত, শূর,··· বিত্ত থাকলে সবই হয়; কিন্তু বিত্তহীন হলে সদ্‌গুণও অ-গুণ হয়ে যায়।" ৫৬

বলতে বলতে ঐশ্বর্য-বিরহের দুর্বিবহ যন্ত্রণায় যেন জ্বলতে লাগলেন কুবের। আগুনে খাক্ হয়ে যেতে লাগল তাঁর অন্তর। পার্শ্বচরদের সঙ্গে সুচির পরামর্শ ক'রে তিনি তখন শরণ নিলেন সংহারকর্ত্তা মহেশ্বরের। ৫৭

মহেশ্বর বিশ্বশরণ্য। পূর্ব থেকেই কুবেরের সঙ্গে তিনি সখ্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাঁর কাছে যখন কুবের নিবেদন করলেন ঘটনা, তখন শুক্রাচার্যের কাছে দূত পাঠালেন মহেশ্বর। ৫৮

দূত-মুখে আহ্বান পাওয়া মাত্রই শুক্রাচার্য, শত্রুজয়ী বিক্রমে সহসা উপস্থিত হয়ে গেলেন মহেশ্বরের পুরোভাগে। ধন-প্রভায় শুক্লবরণ তাঁর দেহ। মুকুটে অঞ্জলি রচনা ক'রে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। পুরজিৎ তাঁকে বললেন— ৫৯

"নিখিল প্রাণী যে ধনের ভিখারী মিতময় কুবের রক্ষা করেন, পালন করেন সেই ধন। আপনিও কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনি তাঁকে সম্প্রতি বঞ্চনা করেছেন। যে মানুষ কৃতঘ্ন, সেও কখনো দ্রোহাচরণ করে না মিত্রের। ৬০

অকৃতজ্ঞেরাই যশোধর্মকে গণনার মধ্যে আনে না, বিসর্জ্জন দেয় স্থিতিস্থাপকতা, তারাই দেখা যায় প্রকৃত বঞ্চনা করে। কিন্তু, কুবের আপনার স্নিগ্ধ সুহৃৎ, আপনাকে ভালবাসেন,··· তাঁকে বঞ্চনা করা আপনার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হয় নি। ৬১

আপনি শোভনপ্রজ্ঞ। এই যে কীর্ত্তিটি আপনি অনুষ্ঠান করেছেন, এ কাজ কি আপনার শ্রুত-সদৃশ হয়েছে? আপনার ব্রত-যোগ্য হয়েছে, না, আপনার কুলানুরূপ হয়েছে? কর্ম থেকে যে গুণশক্তির উদয় হয়, এ ক্ষেত্রে সেইটিই হয়েছে পরাস্ত। ৬২

এটি কি নীতিশাস্ত্র-সম্মত শোভন অভ্যাস, না, শাস্তির প্রকাশ? গুরুজনেরা কি এই হেন উপদেশ দিয়ে থাকেন? না, এটি আপনার সহজাত বুদ্ধিবৈভব? আপনার এই বক্রতা আশাতীত। ৬৩

ধনসম্পৎ কারই বা না প্রিয় হয়? ধনের দৌলতে কারই বা না হৃদয় বিমোহিত হয়? কিন্তু যাঁরা যশোধন-লোভী তাঁরা কখনও ভুলেও দুষ্কৃতির মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষা করেন না অর্থ। ৬৪

লোভ মল-সদৃশ। অ-মল আপনার ভৃগু-বংশ। সেই বিমল বংশকে অনুরোধ করছি, মলিন করবেন না। শুভ্র রাজহংসদের শত্রু হচ্ছে লোভের মেঘ। ৬৫

অনন্ত কীর্ত্তিকে বিসর্জ্জন দিয়ে যে ব্যক্তি বাতাস-ব্যাকুল একগাছি তৃণের মত ধন-সম্পত্তিকে আঁকড়ে ধ'রে থাকে, আপনিই বলুন, ধূর্ত্তদের মধ্যে সে কেমনধারা ধূর্ত্ত? ৬৬

সাধু আচরণে জলাঞ্জলি দিয়ে, কুটিল বুদ্ধির বশীভূত হয়ে যে-মানুষ পরকে বঞ্চনা করে,···সে নিজেকেই ঠকায়। নিজের সমগ্র পুণ্যভাগ থেকে বঞ্চিত হয় সেই মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্য। ৬৭

যাঁদের কলঙ্ক পড়ে যশে, তাঁদের ঘরে কিশলয়ের মত স্বভাব-কোমলা লক্ষ্মী দেবী বন্দিনী হয়ে থাকলেও, অপবাদ-বিষবৃক্ষের আমোদে তিনি মূর্চ্ছিতা হয়েই থাকেন। ৬৮

যাঁরা সজ্জন তাঁদের শুদ্ধ যশঃ বিমল স্ফটিক-দর্পণের মত; পরাজয়-ক্লিষ্ট জনতার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে মলিন হয় সেই যশোমুকুর। ৬৯

আপনি মোহাচ্ছন্ন হয়েছেন। তাই আপনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে এই অসমঞ্জস মলিনতম কর্ম্ম। আশা করি, পরের ধন ফিরিয়ে দিয়ে আপনি বিশুদ্ধ করবেন সেই কর্ম্ম। ৭০

স্বহস্তে প্রক্ষালিত ক'রে ফেলুন অপবাদ-ধূলিধূসর আপনার অম্লান যশঃ। আমার কথা রাখুন। পরের ধন ফেলে দিন। ৭১

ত্রিভুবন-গুরু দেবদেব মহেশ্বর সানুনয় এই অক্ষরগুলি উচ্চারণ করা সত্ত্বেও, পরের ধনে নিবদ্ধ হয়ে রইল শুক্রাচার্যের তৃষ্ণা। কৃতাঞ্জলি-করপুটে তিনি বললেন—৭২

"ভগবন্, অমরেন্দ্রের কিরীট-শিখরে বিশ্রান্তি লাভ করে আপনার শাসন। হে সত্ত্বহারি, যে মানুষ মোহবশতঃ সেই শাসন লঙ্ঘন করতে চায়, তার দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। ৭৩

ভগবন, যে মানুষ নির্ধন হয়ে পড়ে, যার গৃহে স্ত্রীপুত্রপরিজন অবসন্ন হয়ে পড়ে দৈন্যে, তার কি কখনো ধনসংগ্রহ বিষয়ে কার্যাকার্য-বিচার থাকতে পারে? ৭৪

আমি চিরদিন জেনে এসেছি, ধননাথ কুবের আমার বন্ধু, বিপদে পড়লে তিনিই হবেন ত্রাণ-কর্ত্তা। আমার হৃদয়ে তাই প্রবৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল সুমহান্ আশাবন্ধ। ৭৫

লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলুম, নির্লজ্জ হয়ে তাঁর কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলুম; কিন্তু সহসা উল্লসিত হয়ে ওঠে বন্ধুর প্রতিষেধশস্ত্র, ছিন্ন হয়ে যায় আমার আশা। ৭৬

তিনি আমাকে অ-শস্ত্র প্রহার করেছেন, নিরগ্নি দহন করেছেন, নির্বিষ মৃত্যু দিয়েছেন। তিনিই শঠ, মোহাচ্ছন্ন হয়ে তিনিই আমার ভেঙে দিয়েছেন আশা। ৭৭

সেই হেতু, তিনি আমার শত্রু। শত্রুকে বঞ্চনা করা পাপ নয়, পুণ্য। যে রিক্ত, অপবাদের ভয় তার থাকে না। ছল ক'রে আমি সত্যই উপার্জ্জন করেছি ধন। সার্থক হয়েছি। ৭৮

আপনি আমাকে আদেশ দিলেও এক কণা ধনও আমার ত্যাগ করা উচিত নয়। ধনই···মুখ্যতম জীবন; ধন-ত্যাগের অর্থই হচ্ছে জীবনের হানি।" ৭৯

এই ধারায় যখন সম্ভাষণ করতে লাগলেন দৈত্যগুরু শুক্র, তখন তাঁকে বার বার বহু বার মিনতি জানালেন মহেশ্বর। কিন্তু বারংবার প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে অবশেষে তিনি ধারণ করলেন রোষণ-মূর্ত্তি। বিরূপ হ'য়ে উঠল তাঁর অক্ষিত্রয়। সহসা···তিনি মুখ-ব্যাদান ক'রে গ্রাস ক'রে ফেললেন শুক্রকে। ৮০

বৎসগণ, ত্রিপুরাসুরের যিনি শত্রু, তাঁর জঠরের মধ্যে, আক্রোশে তখন চীৎকার করতে লাগলেন শুক্র। প্রলয়াগ্নির মত বিপুল-ভীষণ সেই জঠর। সেই জঠরে নিদারুণ ভাবে সিদ্ধ হয়ে যেতে লাগল শুক্রের দেহ। ৮১

শুক্রের কাছে মুহুর্মুহু প্ররোচনা পৌঁছতে লাগল বিরূপাক্ষের—"ধনত্যাগ কর, ধনত্যাগ কর।" কিন্তু শুক্র কেবলি বলতে লাগলেন—

"ভগবন্, নিধন হই তাও স্বীকার কিন্তু ধননাথের ধন একটুও ত্যাগ করব না।" ৮২

নিঃশ্বাস স্তম্ভিত করলেন মহাদেব।

গভীর-ঘোর জঠরের মধ্যে বিকরাল সহস্র জ্বালায় উদ্দাম জ্বলে উঠল অগ্নি।

ভীষণ চীৎকার করতে লাগলেন শুক্র। ৮৩

দেবদেব তাঁকে বললেন—

"ওরে দুর্গ্রহ-দগ্ধ, ত্যাগ কর পরের ধন। নয়ত প্রলয় ঘটে যাবে তোর অস্তিত্বের···এই জঠর-মহাসমুদ্রের বাড়বানলে।" ৮৪

প্রখর তাপে তখন ফাটতে সুরু হয়ে গেছে শুক্রের অস্থি, প্রবাহ বইছে চর্বির। তবু তখনও তিনি সোচ্ছাসে বললেন—

"এখানে মরণ আমার পক্ষে পরম শ্রেয়ঃ।
ধনের একটি কণিকা কিন্তু আমি ছাড়ছি না।" ৮৫

জঠরাধারে পুনর্বার ঘোরতর জ্বলে উঠল কালানল। জ্বলতে জ্বলতে শুক্রের আয়ুষ লেশমাত্র যখন আর কেবল বাকি, তখন তিনি স্তব গান ক'রে উঠলেন···দেবীর। ৮৬।

স্তোত্র-পদে আরাধিতা হলেন গৌরী দেবী ;
গৌরীর প্রণয়ে প্রসাদিত হলেন রুদ্র ;
তাঁর বাক্যে ধৃতি-লাভ করলেন শুক্র ;
এবং শুক্র-দ্বার-পথে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন তিনি। ৮৭।

অতএব বৎস, জেনে রেখো,—এই রকমেরই দশা হয় স্বভাব-লুব্ধদের। এরা তীব্র যাতনা সইতে হয় সইবে, কিন্তু এক কণাও ছাড়বে না ধন, অধমেরা যেমন ছাড়তে পারে না তাদের সহজাত কৌটিল্য। ৮৮

এই 'লোভ' থেকেই সমুত্থিতা হন "মায়া।" তিনি কপট কলাবতী, কুটিল বর্ত্তিনী : তিনি বাস করেন লুব্ধদের, অর্থাৎ অর্থ-গৃধ্নুদের, শিকারীদের বা কামীদের হৃদয়ে হৃদয়ে।

যে লোভী নয়, সে প্রতারণা করে না। ৮৯

ইতি লোভ-বর্ণনং নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

তৃতীয় সর্গ

"কাম",···যেহেতু তিনি কমনীয়,···কী জানি কেমন ক'রে বিপুল একটি সম্মোহ তিনি সৃষ্টি, ক'রে ফেলেন! কেবল মাধুর্য্য দিয়েই···সহসা তিনি হরণ ক'রে নেন জীবন বিষের মত। ১

এই পৃথিবীর কাম-মন্ত্রিত মহিমান্বিত নায়কগণ ঝপ্ ক'রে বাঁধা পড়ে যান অবলাদের শৃঙ্খলে। তাঁরা যেন মদক্ষরা হস্তীর দল, যাদের দান-জলে গন্ধে গন্ধে উড়ে এসে বসে ভোমরার দল, তোলে ঝঙ্কারের ঝঙ্কার। ২

এই কবীন্দ্র,···ইন্দ্রিয়ার্থ যাঁর চুরি হয়ে গেছে···তাঁকে কী না সহ্য করতে হয় কামবঞ্চিত হয়ে! সইতে হয় পদাঘাত, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশের ঘটন, শৃঙ্খল-সংরোধ। ৩

নিত্যনূতন সৌখীন অপ-খেলার কৌশলে মনুষ্যটি বন্দী হয়ে পড়েন, ভ্রূকুর ভঙ্গি তিনি চিনতে শেখেন, পাগল হয়ে যান, বিষয়-সম্বন্ধে বিবশ হয়ে পড়েন ; কেলি-ময়ূরের মত তিনি নাচতে থাকেন স্ত্রীরত্নদের তুড়িতে। ৪

এই সব সরল মূঢ়গুলির হৃদয় হরণ করে ফেলেন স্ত্রীরত্নেরা। অনুরক্তকে তাঁরা আকর্ষণ করেন,···

মায়ায় ভুলিয়ে,
মোহ-দিয়ে-ঘেরা তিমিরময়ী রজনীতে
রক্তশোষিণী পিশাচিকাদের মত। ৫

এই স্ত্রীরত্নেরা—

অনুরাগী হরিণদের গলার ফাঁস,
হৃদয়-হস্তীর বন্ধন-ডোর,
বিলাস-ব্যসনের নব-বল্লরী।

এঁদের অনামিকার নীচে পড়লে···মনুষ্যের মুক্তি নেই। ৬

যে জিতাত্মা সংসারের মায়া জানেন,

"শম্বর" ও "বিচিত্তি" নামধেয় মায়ানিপুণ দুটি দৈত্যের মায়াও যিনি জানেন।

তিনিও জানেন না "যোষিৎ"দের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা প্রেয়সীদের মায়া। ৭

স্ত্রীলোকদের আচার-ব্যবহার চরিত বড় বিচিত্র! তাঁদের হৃদয়ের সদ্ভাবগুলি বজ্রশিলার মত কঠিন ; অথচ ফুলের মত ফুরফুরে তাঁদের দেহ।

কার না অন্তর্মোহ জন্মান্ এঁরা! ৮

যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের উপর বিরক্তিভাব দেখিয়ে বেড়ান এই নারীরা ; যাঁরা নম্র, তাঁদের কাছে হ'য়ে ওঠেন ফেনিলোচ্ছলা ; যাঁরা বিরক্ত হয়েছেন তাঁদের উপর ফলাতে থাকেন অনুরাগিণীর অভিনয়। মুখে সদাই লেগে থাকে শঠতার ভাষা ; আশঙ্কা করেন সদ্ভাব। ৯

এই পৃথিবীতে এমন কি কোনো প্রভু জন্মেছেন···যাঁর গৃহে নেই এমন একটি পত্নী, যাঁর দেহটি নয় বিলাস-কুটিল, যাঁকে বহুলোকে না দেখেছে, ধৈর্যের যিনি ধ্বংস-ধ্বজা নন? ১০

কাম-মদের বিকার-মাধ্যমে স্বামীর দল বিজিত হয়ে যান, জ্ঞান হারান, বোবা বনে যান। আবার তাঁদের মুখের উপরেই স্ত্রীর দল ছুঁড়ে মারেন ঘরের যত জঞ্জাল। ১১

"প্রৌঢ়া"র রকম দেখ। আধো-আধো স্বরে প্রেমের কথা বলেন ; রতিবিদ্যার সব কিছুই যেন তাঁর কাছে অজানা, অপরিস্ফুট, যেন তিনি স্বভাবমুগ্ধা। গোবেচারী স্বামীর কাছে ভিক্ষা চান—

"আকাশের চাঁদ ধ'রে আমার কপালে টিপ দিয়ে দাও।" ১২

"চপলা"র ছলনার অন্ত নেই। বলবেন "তীর্থদর্শনে যাচ্ছি," কিন্তু চলবেন সেখানে যেখানে মনের মত বিহার চলে। ততঃপর খিন্ন দেহে তিনি ফিরে আসবেন, প্রেমের একটু বিলাস দেখিয়ে জয় ক'রে ফেলবেন স্বামীর মন আর মুগ্ধ স্বামীটি দু' হাতে টিপে দিতে থাকবেন সেই চপলারই দুখানি শ্রীচরণ। ১৩

স্ত্রী বহুরূপা। ঐ তাঁর স্বভাব
কাউকে···চোখের ভাষায়,
অন্যকে···মুখের ভাষায়,
অপরকে···দেহের ভাষায়,
আর জনকে···রতির ভাষায়,
তিনি খেলিয়ে নিয়ে বেড়ান। ১৪
নিজের পতির কাছে তিনি চপলকুরঙ্গী,
পরের গাছটিতে···ভৃঙ্গী,
স্বভাবে তিনি···মাতঙ্গী।

ভোমরার মত গুনগুনিয়ে মিথ্যার সৃষ্টি করেন, বিভ্রম ঘটান। এই কুটিল-ভ্রূভঙ্গীটি কোন্ পুরুষের নিজের হয়? ১৫

[ক্রমশঃ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রধান মন্ত্রী বল্লভাচার্যের গৃহের সম্মুখ

শঙ্কর মিশ্র। ও বল্লভাচার্য! বল্লভাচার্য! বাড়ি আছ হে? ও প্রধান মন্ত্রী মশায়!

বল্লভাচার্য। (বেরিয়ে এসে হাসি মুখে) কি আদেশ প্রধান রাজবৈদ্য মশায়? কিছু গোলাগুলী ছাড়বার মতলব আছে না কি? শঙ্করবটিকা কিম্বা মিশ্রগুলী? তার পর, প্রধান মন্ত্রী মশায় ব'লে ডাকটা কি ব্যঙ্গ ক'রেই হচ্ছিল?

শঙ্কর মিশ্র। ক্ষেপেছ! রাজ্যে মহারাজ সূর্যপাল আর মহারাণী চন্দ্রশীলার পরেই তোমার স্থান। তোমাকে নিয়ে ব্যঙ্গও করতে পারিনে, রঙ্গও করতে পারিনে। শোন। কাল দন্তভানুকে ডাকিয়ো, কাল থেকে সেই মহারাজার চিকিৎসা করবে।

বল্লভাচার্য। (উদ্বিগ্ন ভাবে) কেন তুমি? তুমি ছেড়ে দিলে না কি?

শঙ্কর মিশ্র। শোন কথা। ধরলাম কবে, যে ছেড়ে দিলাম? আজ ছ'মাস চিকিৎসা করছি, রোগ ধরতে পারলাম না।

বল্লভাচার্য। কেন?

শঙ্কর মিশ্র। এ এক আশ্চর্য রোগ! আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিদিত কোনো ব্যাধি নয়। লক্ষণ দেখে নিদান করতে পারলাম না।

বল্লভাচার্য। কি লক্ষণ বল ত?

শঙ্কর মিশ্র। লক্ষণ প্রধানত তিনটে। ডান পায়ের একটা শির টন্‌-টন্ করে, বাঁ চোখটা থেকে থেকে জবা ফুলের মতো লাল হ'য়ে ওঠে। আর সেই সময়ে বুক ধড়ফড় করে। দিন দিন কি রকম কৃশ হয়ে যাচ্ছেন তা ত' দেখতেই পাচ্ছ, মেজাজ অসম্ভব খিটখিটে হয়েছে।

বল্লভাচার্য। তুমি যাতে হার মানলে, দন্তভানু তা পারবে?

শঙ্কর মিশ্র। না পারলেও আমার কাছে ত তার হার মানতে হবে না? আর তা ছাড়া, কিছু বলা যায় না ভাই! বনবেড়াল যে ইঁদুর ধরতে পারলে না, কাঠবেড়াল কখনো কখনো তা ধরে দেয়। আর, দন্তভানু যে কাঠবেড়াল নয়, তা তুমিও জান, আমিও জানি। যাই। রোগীরা অপেক্ষা করছে।

বল্লভাচার্য। এসো। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদের অন্দর মহলের প্রমোদ-কক্ষ, সূর্যপাল, চন্দ্রশীলা, নর্তকী সুনন্দা ও গায়িকা চিত্রা—সুনন্দা আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

চন্দ্রশীলা। চমৎকার নেচেছ সুনন্দা! (সূর্যপালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে) সুনন্দা কি আর একটা নাচ নাচবে মহারাজ?

সূর্যপাল। না।

চন্দ্রশীলা। কেন মহারাজ! সুনন্দা ত' প্রোষিতভর্তৃকার নাচটা চমৎকার নাচলে? এবার না হয় তোমার সেই প্রিয় নাচ 'নবানুরাগিণী' নাচটা নাচুক।

সূর্যপাল। না।

চন্দ্রশীলা। আচ্ছা সুনন্দা, তুমি না হয় ততক্ষণ একটু বিশ্রাম নাও, চিত্রা, একটা গান ধর। দেখ, সেই গানটা—দুখ-ব্যথা আজ কর সায়।

চিত্রা। (করজোড়ে মাথা নত ক'রে) যথাদেশ মহারাণী (বীণা হাতে নিয়ে)।

গান

দুখ-ব্যথা আজ কর সায়!
ফুলের রাশিতে ফুলের হাসিতে
ভুলে যাও যত যাতনায়।
দুরাশার তরী লভিয়াছে তীর,
মরু-মাঝে বহে সুখময় নীর,
বিমল আকাশে শশী-তারা হাসে
তোমার নবীন ভরসায়!
দুরাশার তরী—

সূর্যপাল। থামাও তোমার দুরাশার তরী! (গান থেমে গেল)

চন্দ্রশীলা। (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) কেন মহারাজ? ভাল লাগল না?

সূর্যপাল। না, ভাল লাগল না। সুনন্দার তাল কাটছিল, চিত্রার সুর কাটছে। কি ক'রে ভাল লাগবে? (সুনন্দা ও চিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে) না, না, না—তোমাদের কিছু কাটেনি—কাটছিল যা, তা আমার নিজের তাল আর নিজের সুর। যদি কোনো দিন সে-সব দুরুস্ত হয়, আবার তোমাদের গান শুনব, নাচ দেখব। এখন তোমরা আসতে পার।

সুনন্দা ও চিত্রা। (অভিবাদন পূর্বক) মহারাজার জয় হোক! মহারাণীর জয় হোক! [প্রস্থান।

সূর্যপাল। জগতের সমস্ত পদার্থে অরুচি ধ'রে গেছে, ধরে নি শুধু একটিমাত্র পদার্থে। কি সে পদার্থ, অনুমান করতে পার মহারাণি?

চন্দ্রশীলা। (একটু নীরবে অবস্থান ক'রে) কৃপানাথকে ডাকিয়ে পাঠাব মহারাজ?

সূর্যপাল। (গ্রহণ কালের রৌদ্রের মত ফিকে হাসি হেসে) তাহ'লে দেখছি অনুমান করতে ভুল করো নি। ঠিক তাই। একমাত্র যে পদার্থে এখনও অরুচি ধরে নি, তা হচ্ছে মহারাণী

চন্দ্রশীলার শ্রীমুখের হাসি। যেদিন তাতেও অরুচি ধরবে, সেদিন বুঝব—

চন্দ্রশীলা। (আর্ত কণ্ঠে) মহারাজ!

সূর্যপাল। (স্মিতমুখে) কি, বল?

চন্দ্রশীলা। এ প্রসঙ্গ বন্ধ কর।

সূর্যপাল। (স্মিতমুখে) প্রসঙ্গ না হয় বন্ধ করলাম, কিন্তু যা অনিবার্য তা ত' বন্ধ করতে পারব না? তাই যা অনিবার্য নয়, তা বন্ধ করেছি।

চন্দ্রশীলা। কি সে মহারাজ?

সূর্যপাল। রাজবৈদ্য শঙ্কর মিশ্রের চিকিৎসা। আজ আর রাত্রি দেড় প্রহরে সেবনীয় মহাসোম-অরিষ্ট পান করতে হবে না।

চন্দ্রশীলা। (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) শঙ্কর মিশ্রের মতো বিচক্ষণ চিকিৎসক তোমার রাজ্যে ত' দ্বিতীয় কেউ নেই মহারাজ! শঙ্কর মিশ্রের চিকিৎসা তুমি বন্ধ করলে?

সূর্যপাল। আমি বন্ধ করলাম বললে একটু ভুল বলা হয়। খানিকটা তিনি বন্ধ করলেন, খানিকটা করলাম আমি। শঙ্কর মিশ্র খাঁটি মানুষ। যে ব্যাধি তিনি ছ'মাসে আরোগ্য করতে পারলেন না, তাকে আর বেশি জড়িয়ে রেখে অপরের পথ আটক করতে চান না।

চন্দ্রশীলা। কোনো চিকিৎসককে তাঁর স্থানে তিনি মনোনীত করেছেন?

সূর্যপাল। হ্যাঁ, দণ্ডভানুকে মনোনীত করেছেন।

চন্দ্রশীলা। দণ্ডভানু? দণ্ডভানুর ত বয়স বেশি নয়?

সূর্যপাল। তা নয়, কিন্তু শঙ্কর মিশ্র বলেন, বয়স বেশি না হলেও দণ্ডভানুর প্রতিভা আছে। তিনি বলছিলেন, ছ'মাসে যে রোগের তিনি নিদান করতে পারলেন না, তার চিকিৎসা ক'রে চললে ব্যাপারটা হবে দেবতার নাম না জেনে জপ করার মতো, তাতে পুরো ফল পাওয়া যাবে না। দেবতা হয়ত কিছু কিছু ইসারা ইঙ্গিত করতে পারেন, কিন্তু স্বরূপ দেখাবেন না। শঙ্কর মিশ্র বলছিলেন, বৃদ্ধের কানে ব্যাধির যে কথা শোনা গেল না, প্রৌঢ়ের কানে তা হয়ত শোনা যেতে পারে।

চন্দ্রশীলা। (প্রফুল্ল মুখে) আমারও তাই মনে হয়। চিকিৎসকের পরিবর্তনে রোগ ধরাও পড়বে, সেরেও যাবে।

সূর্যপাল। সেটা কামনা কোরো, আশা কোরো না। কিন্তু কৃপানাথকে ডাকিয়ে পাঠাবার কথা কেন বলছিলে?

চন্দ্রশীলা। কৃপানাথকে নিয়ে একটু সতরঞ্চে বসুন না, অন্যমনস্ক হ'তে পারবেন।

সূর্যপাল। সতরঞ্চে বসলে অন্যমনস্ক হ'তে পারব কি-না জানিনে, কিন্তু অন্যমনস্ক হ'য়ে সতরঞ্চে বসলে ভুল চালে মাত হব। কৃপানাথের কাছে হার বরদাস্ত করতে পারব না। তার চেয়ে এস, তোমার সঙ্গে এক হাত বসি। তোমার কাছে হারলেও জিৎ হবে।

চন্দ্রশীলা। কিন্তু আমাকে ত আপনি এগারো চালে মাত করেন। আমার কাছে আপনার হার কেমন ক'রে হবে মহারাজ?

সূর্যপাল। কাঠের সতরঞ্চে হবে কি-না বলতে পারিনে, কিন্তু জীবনের সতরঞ্চে তুমি আমাকে চাল মাত করেছ, দাঁড়াও (অঙ্গুলিতে গুণে) পাঁচটি বলের সাহায্যে। (অঙ্গুলিতে গুণে গুণে) তোমার হাসিতে দাবা, বাক্যে ব'ড়ে, দৃষ্টিতে ঘোড়া, ভঙ্গীতে গজ আর গতিতে নৌকো। তুমি যখন তোমার বক্র দৃষ্টিতে আড়াই ঘরের ঘোড়ার চাল মার, তখন মাত কাছে দাঁড়িয়ে হাসে।

চন্দ্রশীলা। (সানন্দে উৎফুল্ল মুখে) মহারাজ! আবার বহু দিন পরে তোমার কথাবার্তায় রহস্য-কৌতুক ফিরে আসতে আরম্ভ করেছে। লক্ষণ শুভ।

সূর্যপাল। বাইরের লক্ষণ দিয়ে সব সময়ে বিচার করা চলে না চন্দ্রা;—ধর, তৈলহীন দীপের উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলে ওঠা শুভ লক্ষণ নয়! (সহাস্যে) চিন্তিত হয়ো না মহারাণি, আমার জীবনপ্রদীপ তৈলহীন হয়েছে, সে কথা হয়ত বলছিনে।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। (উভয়কে নত হ'য়ে অভিবাদন ক'রে) মহারাজ! কবিরাজ দণ্ডভানু মশায় দর্শনপ্রার্থী হয়েছেন।

চন্দ্রশীলা। (উৎফুল্ল মুখে) কথা হ'তে হ'তেই এসেছেন! এ কিন্তু শুভ লক্ষণ মহারাজ!

সূর্যপাল। (পরিচারিকার প্রতি) কোথায় আছেন তিনি?

পরিচারিকা। তৃতীয় দর্শনাগারের পূর্বদিকের অলিন্দে অপেক্ষা করছেন।

সূর্যপাল। (চন্দ্রশীলার প্রতি) ক্লান্ত বোধ করছি। এইখানেই ডেকে পাঠাই, কি বল চন্দ্রা?

চন্দ্রশীলা। নিশ্চয় মহারাজ, নিশ্চয়। (পরিচারিকার প্রতি) এইখানেই কবিরাজ মশায়কে ডেকে আন্ জানকী।

পরিচারিকা। যথাদেশ মহারাণী! [অভিবাদনান্তে প্রস্থান।

চন্দ্রশীলা। দণ্ডভানুর চিকিৎসা নিষ্ফল হবে না মহারাজ! এবার তুমি সেরে উঠবে!

সূর্যপাল। তা'হলে এরাজ্যে তোমার পরেই আমি সকলের চেয়ে বেশি খুসি হব।

চন্দ্রশীলা। দণ্ডভানুর চিকিৎসা কেন নিষ্ফল হবে না জানো? একটা চমৎকার যোগাযোগ হয়েছে। আর তিন দিন পরে পূর্ণিমা তিথিতে তোমার কল্যাণে চন্দেরী পাহাড়ে বাবা রুদ্রনাথের পুজো দেওয়া হবে। দণ্ডভানুর চিকিৎসা তিন দিন পরে আরম্ভ করলে ওষুধের সঙ্গে দৈবশক্তির যোগ হবে।

সূর্যপাল। কিন্তু চন্দেরী পাহাড় ত অতিশয় দুর্গম স্থান, পথও এখান থেকে পঁচিশ ক্রোশের কম নয়, তিন দিন পরে পুজো কি ক'রে সম্ভব চন্দ্রা?

চন্দ্রশীলা। তোমাকে জানাইনি মহারাজ, পর পর তিন দিন চন্দেরী পাহাড়ের স্বপ্ন দেখে আজ চার দিন হ'ল চৈতমলকে বাবা রুদ্রনাথের পুজো দিতে পাঠিয়েছি।

সূর্যপাল। চৈতমলকে পাঠিয়েছ?···সে ত' একটি বুদ্ধির ঢেঁকি!

চন্দ্রশীলা। তা হোক্ মহারাজ, ভারি খাঁটি মানুষ,—প্রাণ দিয়েও সে পূর্ণিমার দিনে পুজো দেবে।

সূর্যপাল। এই ভয়াবহ পথে সে একা গেল না-কি?

চন্দ্রশীলা। না, মহারাজ, পাঁচ-সাত জনে দল বেঁধে গেছে। সঙ্গে অর্থও যথেষ্ট দিয়ে দিয়েছি।

সূর্যপাল। নদী-নালা-জঙ্গলের পথ। পথ চিনে সে যেতে পারবে ত?

চন্দ্রশীলা। তা পারবে। এর আগে বার দুই সে রুদ্রনাথের মন্দিরে গেছে। চন্দেরী পাহাড়ের অঞ্চলে কিছু দূরে দূরে ওদের জন তিনেকের আত্মীয়-বাড়ি আছে। সে সব জায়গায় কিছু কাল কাটিয়ে সিংহগড়ে ফিরতে মাস তিনেক পরে সেই চৈত্র বৈশাখ মাস হবে। তারা এসে দেখবে, তুমি সেরে গিয়েছ।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। কবিরাজ মশায় এসেছেন মহারাণি!

চন্দ্রশীলা। পাঠিয়ে দে।

(দত্তভানুর প্রবেশ)

দত্তভানু। (নত হ'য়ে অভিবাদন ক'রে) জয় হোক মহারাণী, মহারাজের!

সূর্যপাল। কল্যাণ হোক। তারপর?···কি অভিপ্রায় দত্তভানু?

দত্তভানু। মহারাজকে সম্পূর্ণ সুস্থ ক'রে তোলা ছাড়া উপস্থিত ত' দ্বিতীয় কোনও অভিপ্রায় নেই।

সূর্যপাল। পারবে সুস্থ ক'রে তুলতে?

দত্তভানু। আপনার নাড়ীর কাছ থেকে সংবাদ পাবার আগে সে কথা বললে হঠকারিতা হবে মহারাজ! তবে বাইরে থেকে যতটুকু লক্ষ্য করছি, সুস্থ ক'রে তুলতে না পারার ত' কোনও কারণ দেখছিনে?

সূর্যপাল। তবু ভাল। বৈদ্য হাল ছাড়লে, রোগীর নাড়ী ছাড়ে। কিন্তু বাইরের লক্ষণের উপর বিচার ক'রেই বা কাজ কি? নাড়ী পরীক্ষা করেই দেখ না?

দত্তভানু। এখন দেখব না মহারাজ! আপনি প্রস্তুত হ'য়ে থাকবেন, রাত্রি এক প্রহরের পর আমি আসব, তার পর তিন দণ্ড ধ'রে আপনার নাড়ী পরীক্ষা করব।

সূর্যপাল। (বিস্মিত কণ্ঠে) তিন দণ্ড ধ'রে! এত দীর্ঘ কাল?

দত্তভানু। তার চেয়েও বেশি সময় লাগলে বিস্মিত হবেন না মহারাজ! আমার গুরুদেব (কপালে যুক্তকর স্পর্শ ক'রে) বৈদ্যরাজ ভীমচাঁদ শাস্ত্রী মশায় বলতেন, নাড়ী ঠিক যেন নবোঢ়া বধূ,—সাধারণ সাধ্য-সাধনায় মুখ হয়ত খোলে; কিন্তু মন খোলে সাধ্য-সাধনার পরাকাষ্ঠায়। আর মন না খুললে, মনের কথা শোনা যায় না।

চন্দ্রশীলা। মনের কথা শুনে আপনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন কবিরাজ মশায়! মহারাজ সুস্থ হ'য়ে উঠলে আমি আমার কণ্ঠের এই মুক্তামালা আপনার স্ত্রীর কণ্ঠে ঝুলিয়ে দোব।

দত্তভানু। (করজোড়ে) অত লোভ দেখাবেন না মহারাণি, চিত্ত-স্থৈর্য হারাব। মহারাজ সেরে উঠলে আপনার কণ্ঠের প্রসন্ন বাক্যই আমার যথেষ্ট পুরস্কার হবে।

সূর্যপাল। আজ রাত্রে আমার নাড়ী যদি তোমার কানে ভেতরের অবস্থার ঠিক সংবাদ দেয়, তা হ'লে সে পুরস্কার তুমি কত দিনে আশা কর?

দত্তভানু। (একটু চিন্তা ক'রে) মাস তিনেকের মধ্যে। এখন ত' শীতের মাঝামাঝি, সে অবস্থায় বসন্তের শেষে মহারাজ রোগমুক্ত হবেন।

সূর্যপাল। তা হ'লে কত দিনে উপকার আরম্ভ হবে?

দত্তভানু। দিন দশেকের মধ্যে।

সূর্যপাল। তা যদি না হয়?

দত্তভানু। তা হ'লে অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়ে মহারাজকে একাদশ দিনের দিন শঙ্কর মিশ্রর হাতে প্রত্যর্পণ করব। নিজের হাতে রেখে সময় নষ্ট করব না। কিন্তু এ অশুভ আলোচনার প্রয়োজন কি মহারাজ? আপনাকে আমি অতি অবশ্য নিরাময় করব।··· অনুমতি যদি দেন তাহ'লে এখন আসি।

সূর্যপাল। এস।

দত্তভানু। জয় হোক মহারাণীর, জয় হোক মহারাজার।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রাম্যপথ

(মাথায় বোঁচকা ও বগলে লাঠি নিয়ে সাত জন পথিকের প্রবেশ। খালি গা, কাঁধে গামছা, কাপড় গুটিয়ে পরা।)

সকলে। (উচ্চকণ্ঠে) জয় বাবা রুদ্রনাথ! রাজাকে ভাল কর বাবা! জয় হোক্ মহারাণী চন্দ্রশীলার।

জীবন সিং। (কপালের ঘাম মুছে) নদী ত পেরোনো গেল,—কিন্তু কি গরম রে বাবা! প্রাণ একেবারে বেরিয়ে যাচ্ছে! কি মাস এটা বল দিকিনি টোডর?

টোডর সিং। কি মাস? দাঁড়া, বলছি। চোত সংক্রান্তি ত' এই দিন পাঁচেক গেল, দুর্গাপুরে মাসির বাড়িতে। (জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে) তা হলে?

জীবন সিং। (৩য় পথিক বলবন্ত রাওর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে) তা হ'লে?

বলবন্ত রাও। (৪র্থ পথিক পূরণ দাসের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে) তা হ'লে?

পূরণ দাস। তাহ'লে ভাদ্রই হবে।

চৈতমল। (সহাস্যে) একেবারে পাড়াগেঁয়ে ভূত তুই! ক'টি মাসের হিসেব—তাও ঠিক জানিসনে! আরে ভাদ্র মাস কি চোত সংক্রান্তির পরে হয়?—ভাদ্র মাস ত' পোষ সংক্রান্তির পর হয়। তা হ'লে ভাদ্র মাস কি ক'রে হবে?

পূরণ দাস। তবে?

চৈতমল। তা হ'লে মাঘ মাস হবে না?

ঝনঝর রাও। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ত' হবে! চোত-সংক্রান্তির পরের মাস মাঘ মাসই বটে।

জয়রাম সিং। ওঃ, তাই এত গরম!

পূরণ দাস। ওঃ! তাই এত গরম!

জীবন সিং। ওঃ! তাই এত গরম!

চৈতমল। (বয়সে সকলের বড়) বাবা সব!

সকলে। হাঁ হাঁ হাঁ।

চৈতমল। টিনডিহা ত এখনও তিন ক্রোশ পথ, একটু ব'সে জিরিয়ে নাও এখানে।

সকলে। (সমস্বরে) ঠিক, ঠিক, ঠিক। একটু জিরিয়ে নাও

এখানে। (সাত জন এক লাইনে ব'সে এক ভাবে সাতখানা গামছা নেড়ে হাওয়া খেতে লাগল)

জীবন সিং। যাবার সময়ে নদীটায় ত' এত জল ছিল না চৈত খুড়ো? কি নাম বলেছিলে বটে? ভুলে গেছি।

চৈতমল। তামসী।

জীবন সিং। উঃ! যেমনি নাম তেমনি নদী! তামসী মানে ত' বাঘ, চৈত খুড়ো?

চৈতমল। দূর মুখখু! তামসী মানে সিংহ।

জীবন সিং। হাঁ হাঁ সিংহ। ওই হ'ল, সিংহ বলতে বাঘ বলেছি।

ঝনঝর রাও। সিংহই বটে! জল ত' হাঁটু ভোর, কিন্তু কি স্রোত রে বাবা! যেন সিংহ গরজাচ্ছে!

পূরণদাস। খুড়ো!

চৈতমল। বল?

পূরণদাস। গাঁ থেকে সাত জন বেরিয়েছিলাম, নদী পার হ'য়েও সাত জনই আছি ত?

চৈতমল। সবাই ত আমরা সাঁতার জানি—তবে আর যাব কোথায়?

পূরণদাস। কেন কুমীরের পেটে?

বলবন্ত রাও। এই দেখ, ভাবালে।

ঝনঝর রাও। কেন, কুমীর ও-নদীতে আছে না কি?

পূরণদাস। আহাম্মকের মতো কথা শোন। ও-নদী কি পাহাড় যে, কুমীর থকেবে না, ভালুক থাকবে? সন্দেহে থেকে কাজ নেই, একবার গুণে ফেলা যাক!

চৈতমল। তা বেশ ত' গুণে ফেল।

পূরণদাস। আমরা অত গুণতে জানিনে, আপনি পণ্ডিত মানুষ, আপনি গুণুন।

চৈতমল। (কাঁধে গামছা ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে) তাহ'ল বাবা সব, উঠে প'ড়ে এক দিক হ'য়ে দাঁড়াও, আমি একে একে গুণি।

(সকলে উঠে এক দিক হ'য়ে দাঁড়াল)

চৈতমল। (এক এক জনকে হাত ধ'রে অপর দিকে সরিয়ে দিয়ে দিয়ে) রামে রাম, দুইয়ে দো, তিনে তিন, চারে চার, পাঁচে পাঁচ, ছয়ে ছ, ঐ! সাতে সাত কই? সাতে সাত? (চিৎকার ক'রে) ওরে, সাতে সাত কোথায় আছিস রে? ওরে সাড়া দে না রে? (ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন)।

পূরণদাস। আর সাড়া দিয়েছে! কুমীরের পেটে গেছে!

ঝনঝররাও। ওরে, কে গেলি রে? কার ইস্তিরীর সব্বনাশ হ'ল রে?

জীবন সিং। ওরে, গাঁয়ে ফিরে গিয়ে তার ইস্তিরীর কাছে কি ক'রে মুখ দেখাবো রে!

বলবন্ত রাও। (ক্রন্দনের সুরে) ওরে বাবা!

টোডর সিং। ওরে মা!

পূরণদাস। ভ্যাঁ—

জয়রাম সিং। অ্যাঁ—

জীবন সিং। খুড়ো! (ক্রন্দনের সুরে)

চৈতমল। বল? (ক্রন্দনের সুরে)

জীবন সিং। বলি কি, বাবা রুদরনাথের নাম ক'রে আর একবার গুণে ফেল। প্রথম বারের গোণায় ভুলও ত' হতে পারে।

চৈতমল। আমি আর গুণব না বাবা! আমি গুণলে আবার সেই ছ'য়ে ছয় হবে। তার চেয়ে এবার তুমি গোণো।

জীবন সিং। আমি গুণব? আচ্ছা। তা হ'লে দাঁড়াও সব একধার হ'য়ে। (সকলের তথাকরণ)

জীবন সিং। জয় বাবা রুদরনাথ! (এক একজনকে হাত ধ'রে টেনে টেনে অন্য দিকে সরিয়ে) রামে রাম, দুইয়ে দো, তিনে তিন, চারে চার, পাঁচে পাঁচ, ছয়ে ছয়—

পূরণদাস। ভ্যাঁ—

জয়রাম সিং। অ্যাঁ—

চৈতমল। হায়, হায়! হায়, হায়!

সকলে। (এক শ্রেণীতে ব'সে প'ড়ে এক ছন্দে মাথা নাড়তে নাড়তে) হায়, হায়, হায়, হায়, হায়, হায়, হায়, হায়!

(হরদৎরাম নামক জনৈক গ্রামবাসীর প্রবেশ)

হরদৎরাম। (সকৌতূহলে অবলোকন ক'রে) এ কি! ব্যাপার কি তোমাদের?

পূরণদাস। আর বলেন কেন মশায়! মহারাজা সূর্যপালের কল্যাণের জন্যে বাবা রুদরনাথের পুজো দিতে সাত জনে বেরিয়েছিলাম, বাবার দর্শন ক'রে পুজো দিয়ে মাসির বাড়ি কাটিয়ে সিংহগড় ফিরছি। তামসী পেরিয়ে এ পারে এসে গুণে দেখা গেল ছ জন! অথচ বেরোবার সময় পাকা লোককে দিয়ে গুণিয়ে নিয়েছিলাম সাত জন! হায় হায়! হায় হায়!

সকলে। (মাথা নীচু ক'রে নাড়তে নাড়তে) হায়, হায়, হায়, হায়!

হরদৎরাম। (সেই সুযোগে তাড়াতাড়ি গুণে নিয়ে) কি ক'রে জানলে ছ জন?

পূরণদাস। গুণে মশায়, গুণে। দু'জন গুণেছে; তার মধ্যে (চৈতমলকে দেখিয়ে) উনি ত পণ্ডিত মানুষ।

চৈতমল। অবাক হ'য়ে তাকাচ্ছেন যে? বিশ্বাস করছেন না বুঝি? একবার স্বচক্ষে দেখবেন?

হরদৎরাম। কই দেখাও দেখি?

চৈতমল। (উঠে দাঁড়িয়ে) বাবা সব, উঠে দাঁড়িয়ে এক ধারে হও। (সকলে উঠে দাঁড়িয়ে এক ধারে হ'ল)

চৈতমল। (পূর্বের মত এক একজনকে হাত ধ'রে অপর দিকে সরিয়ে) রামে রাম, দুইয়ে দো, তিনে তিন, চারে চার, পাঁচে পাঁচ, ছয়ে ছয়,—তবে?

পূরণদাস। তবে?

জয়রাম সিং। তবে?

হরদৎরাম। তাই ত'। তা হ'লে সাতমা মানুষ গেল কোথায়?

পূরণদাস। কেন, কুমীরের পেটে।

হরদৎরাম। কিন্তু তামসীতে কুমীর?…তা হ'তেও পারে। এটা শুক্লপক্ষ ত'?

পূরণদাস। আজ্ঞে না, কৃষ্ণপক্ষ।

হরদৎরাম। তা হ'লে ঠিকই হয়েছে; কৃষ্ণপক্ষে তিন দিন

বৃহন্নক্র বুন্দেসা বিল থেকে তামসীতে বেড়াতে আসেন। এখানে পেট ভ'রে মানুষ খেয়ে বুন্দেসায় ফিরে যান।

সকলে। (মাথা নাড়তে নাড়তে) হায় হায়, হায় হায়, হায়, হায়, হায় হায়!

পূরণদাস। (ক্রন্দনের সুরে) বৃহন্নেকড়ে কে বটে মশায়?

হরদৎরাম। নেকড়ে নয়, নক্র অর্থাৎ কুমীর। বৃহন্নক্র মানে কুমীরের সর্দার। বৃহৎ আর নক্র, এই দুইয়ে সন্ধি ক'রে হয়েছে বৃহন্নক্র। তোমরা বুঝবে না, (চৈতমলের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে) আপনি ত' পণ্ডিত মানুষ, আপনি নিশ্চয় বুঝছেন?

চৈতমল। আজ্ঞে হাঁ, জলের মত বুঝছি কিন্তু তা হ'লে ত' সর্বনাশ হ'য়ে গেছে মশায়?

হরদৎরাম। না, এখনো হয়ত' সর্বনাশ হয়নি। বৃহন্নক্র অক্ষত দেহে মানুষকে গিলে পাঁচ দণ্ড পেটে জিইয়ে রেখে নরম করেন। তারপর চিবিয়ে খান। তোমরা কতক্ষণ পার হয়েছ?

পূরণদাস। এক দণ্ডও হবে না।

হরদৎরাম। তা হ'লে তোমাদের সাতমা সঙ্গী এখনও বৃহন্নক্রের পেটে অক্ষত দেহে আছে। বৃহন্নক্র সদাশয় দেবতা, পঞ্চ মুদ্রার পূজা দিলে নিশ্চয় উগরে দেবেন। দেবে পঞ্চমুদ্রার পূজা?

পূরণদাস। নিশ্চয় দোবো। কিন্তু পূজার উপকরণ ফুল বেলপাতা চন্দন এ-সব এই নদীর চরে কেমন ক'রে পাব মশায়?

হরদৎরাম। বৃহন্নক্র জলাশয়ের ভিজে দেবতা, শুকনো পুজোই পছন্দ করেন। পাঁচটি মুদ্রা আমার হাতে দিয়ে মন্ত্র পড়, সাতমা লোক এসে হাজির হ'লে তারপর পঞ্চমুদ্রা তামসীর গর্ভে নিবেদন করলেই হবে।

চৈতমল। এখনি দিচ্ছি। (হরদৎরামের হাতে অর্থ দিয়ে) পড়ান মন্ত্র।

হরদৎরাম। সকলে পিছন ফিরে দাঁড়াও।

সকলে। দাঁড়িয়েছি।

হরদৎরাম। আচ্ছা, এবার সকলে চোখ বোজ।

সকলে। বুজেছি।

হরদৎরাম। আচ্ছা, এবার মন্ত্র পড়। বল ওঁ।

সকলে। ওঁ।

হরদৎরাম। কুমীর কুমীর!

সকলে। কুমীর কুমীর!

হরদৎরাম। মহাকুমীর!

সকলে। মহাকুমীর!

হরদৎরাম। কুম্ভীর!

সকলে। কুম্ভীর!

হরদৎরাম। তামসীবাসী!

সকলে। তামসীবাসী!

হরদৎরাম। তীক্ষ্নদংষ্ট্রা!

সকলে। তীক্ষ্নদংষ্ট্রা!

হরদৎরাম। বিশালোদর!

সকলে। বিশালোদর!

হরদৎরাম। প্রসীদ বৃহন্নক্রেশ!

সকলে। প্রসীদ বৃহন্নক্রেশ!

হরদৎরাম। এবার প্রার্থনা কর। বল, হে বাবা বৃহন্নক্রেশ!

সকলে। হে বাবা বৃহন্নক্রেশ!

হরদৎরাম। গপ্ ক'রে গিলেছ, খপ্ ক'রে ওগরাও।

সকলে। গপ ক'রে গিলেছ, খপ ক'রে ওগরাও।

হরদৎরাম। (উল্লসিত কণ্ঠে) উগরেছেন, উগরেছেন, সাতমা লোক তোমাদের মধ্যে এসে ভিড়েছেন, চোখ খুলে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখ।

সকলে। (চোখ খুলে ফিরে দেখে) কই, কই? কই, নেই ত'!

হরদৎরাম। এই ত' বাবার মহিমা! বাবা যাকে ওগরালেন সেও তা বুঝতে পারলে না, আর কাকে ওগরালেন তোমরাও তা ধরতে পারলে না।

চৈতমল। কিন্তু—কিন্তু—

হরদৎরাম। কিন্তু গুণতিতে সাত জন হ'লেই ত হবে?

চৈতমল। আলবাৎ হবে।

ঝনঝররাও। তামাম হবে।

জীবন সিং। বিল্‌কুল হবে।

হরদৎরাম। তা হ'লে প্রমাণ দিই?

জীবন সিং। দিন।

হরদৎরাম। (চৈতমলের প্রতি) আপনি পণ্ডিত মানুষ, আপনি বুঝতে পারবেন, আপনার কাছে প্রমাণ দিই?

চৈতমল। তাই দিন।

হরদৎরাম। (মাটি থেকে সাতটি ঢেলা কুড়িয়ে চৈতমলকে সম্বোধন করে) আমি একটি একটি ক'রে আপনার বাঁ হাতে ঢেলাগুলো দিই আর আপনি গুনুন। (তথাকরণ)

চৈতমল। রামে রাম, দুইয়ে দো, তিনে তিন, চারে চার, পাঁচে পাঁচ, ছয়ে ছয়, সাতে সাত।

হরদৎরাম। সাতটি ঢেলা হ'ল ত?

চৈতমল। আজ্ঞে, হ'ল।

হরদৎরাম। এখন একটি একটি ঢেলা এক এক জনের মাথায় রাখুন। যদি সাতটি ঢেলা সাতটি মাথায় জায়গা পায় তা হ'লে সাত জনকেই ত' আপনারা পেলেন?

চৈতমল। তা হ'লে পেলাম বই কি। (ঝনঝর রাওর দিকে চেয়ে) কি হে ঝনঝর, ঠিক ক'রে বোঝো, তা হ'লে পেলাম ত?

ঝনঝর রাও। নিশ্চয় পেলাম।

চৈতমল। তোমরা কি বল?

সকলে। নিশ্চয় পেলাম, নিশ্চয় পেলাম!

হরদৎরাম। আচ্ছা তা হ'লে একটা করে ঢেলা এক এক জনের মাথায় রাখুন।

চৈতমল। (সকলের মাথায় ঢেলা রেখে হাতে একটা রয়ে গেল। আর্তকণ্ঠে) এটা? এটার মাথা ত' পেলাম না?

পূরণদাস। ভ্যাঁ—

জয়রাম সিং। অ্যাঁ—

হরদৎরাম। (ধমক দিয়ে) চেঁচিও না, বিপদ হবে। (চৈতমলের প্রতি) ওটার মাথা পেলেন না?

চৈতমল। না, পেলাম না! পেলে ঢেলা হাতে থাকবে কেন?

হরদৎরাম। এই পান (চৈতমলের হাত থেকে ঢেলাটা নিয়ে তার মাথায় স্থাপন)

গান

(অপ্রকাশিত)

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

শৃঙ্খল-ভাঙা সুর বাজে পায়ে
ঝন্ ঝনা ঝন্ ঝন্
সর্বহারার বন্দী-শিবিরে
ধ্বংসের গর্জন।
দিকে দিকে জাগে প্রস্তুত জনসৈন্য
পালাবে কোথায় ? রাস্তা তো নেই অন্য
হাড়ে-রচা এই খোঁয়াড় তোমার জন্য
হে শত্রু দুষমণ !

যুগান্ত-জোড়া জড়রাত্রির শেষে
দিগন্তে দেখি স্তম্ভিত লাল আলো,
রুক্ষ মাঠেতে সবুজ ঘনায় এসে
নতুন দেশের যাত্রীরা চমকালো।
চলতি ট্রেনের চাকায় গুঁড়ায়ে দম্ভ
পতাকা উড়াই : মিলিত জয়স্তম্ভ।
মুক্তির ঝড়ে শত্রুরা হতভম্ব।
আমরা কঠিন পণ।

১৯, ৭, '৪৪

চৈতমল। (বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে এক মুহূর্ত অবস্থান ক'রে) আরে তাও ত' বটে !

হরদৎরাম। তা, হ'লে সাতটা মাথা ঠিক মিলেছে ত ?

চৈতমল। এক শ বার।

জয়রাম। হাজার বার।

পুরণদাস। লক্ষ বার।

সকলে। (উল্লসিত কণ্ঠে) হায় হায়, হায় হায় !

জীবন সিং। জয় বাবা রুদরনাথ !

হরদৎরাম। চুপ চুপ ! খবরদার ও নাম ধ'রে চেঁচিও না।

জীবন সিং। কেন ?

হরদৎরাম। রুদ্রনাথের সঙ্গে বৃহন্নক্রের জোর আকচ। বৃহন্নক্র ডেঙ্গার ওপর এক ক্রোশ দৌড়তে পারে। জয় বাবা রুদরনাথ শুনলে তেড়ে এসে ধ'রে নিয়ে যাবে।

চৈতমল। তবে ? তবে ত' সরে পড়াই ভাল ?

হরদৎরাম। তাড়াতাড়ি।

(ব্যস্ত হ'য়ে সকলে নানা ভঙ্গিসহকারে এগিয়ে চলল)

জীবন সিং। জয় বাবা রুদ্—

চৈতমল। (সজোরে) খবরদার !

টোডর সিং। (সর্বাপেক্ষা স্থূলকায় টোডর সিং লাঠি ঠক্-ঠক্ ক'রে লেংচে লেংচে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে হরদৎরামের দিকে হাত বাড়িয়ে) মশায় পেসাদ ? পূজোর পেসাদ ?

হরদৎরাম। (সতর্জনে) আরে পেসাদ ! প্রাণ বাঁচাও আগে, তার পর পেসাদ।

টোডর সিং। ওরে বাবা রে ! জয় বাবা—খবরদার !

[কতকটা বেগে প্রস্থান।

[ক্রমশঃ।

পরিমল গোস্বামী

[আমার স্মৃতিচিত্র যে এঁকে রাখবার উপযোগী, এ ধারণা আমার মনে কখনও আসেনি। যে জীবনে অপরকে শোনাবার মতো কোনো সাফল্য নেই, ঘটনা-বাহুল্য নেই, সে জীবন শুধু পুরনো বলেই হয় তো কোনো মুহূর্তে শ্রীপ্রাণতোষ ঘটকের খেয়াল হয়েছে—দেখিনা পরীক্ষা করে।

প্রাচীন দলিল-পত্র ঘেঁটে গবেষণা করা প্রাণতোষের একটি প্রিয় কার্য, সম্ভবত এই কারণেই পরিমল গোস্বামীরূপ প্রাচীন গ্রন্থখানাও তাঁর একবার উল্টে দেখবার বাসনা হয়েছে; উদ্দেশ্য: যদি কিছু মেলে।

এই জীর্ণ পাতাগুলো শুধু তাঁর অনুরোধেই মেলে ধরছি, অন্য কোনো কারণে নয়। এর ইতিহাস-মূল্য কিছুই নেই। আমি শুধু পিছনে ফিরে যা কিছু উপকরণ সংগ্রহ করতে পেরেছি তারই সাহায্যে কিছু কিছু ছবি আঁকার চেষ্টা করব মাত্র—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটকের প্রতি আমার প্রীতি স্মরণ ক'রে এবং সে ছবি অন্তত আমার কাছে ভাল লাগলেই আমার দায়িত্ব শেষ হল মনে করব।—লেখক]

প্রথম পর্ব

আমাদের বাড়ি ছিল পাবনা জেলার সাতবেড়ে নামক গ্রামে। এই গ্রামটি একটি বন্দর, পদ্মা নদীর উপর অবস্থিত। পাবনা জেলার মানচিত্রে পাবনা থেকে পদ্মা নদীকে অনুসরণ ক'রে পূব দিকে আসতে নদী যেখানে প্রথম বেঁকেছে, সেই বাঁকের উপর সেই গ্রামখানি; গ্রামের পশ্চিম এবং দক্ষিণে পদ্মা। পশ্চিম দিকে ষ্টীমার-ঘাট। ষ্টীমার গোয়ালন্দ ঘাট থেকে পাটনা যায়, এই পথে।

শুনেছি, এখন আমার পরিচিত সে গ্রাম আর নেই, পদ্মার ভাঙনে গ্রাম সরে গেছে দূরে।

খুব ছেলেবেলার স্মৃতি কিছু কিছু মনে পড়ে। ১১০০ কিংবা ১১০১ সাল হবে, প্রথম ফুটবল খেলার উত্তেজনা। সবাই দলে দলে খেলা দেখতে যাচ্ছে, আমিও কার কোলে উঠে খেলা দেখছি। শৈশবের এমনি সব টুকরো এক-একটা ছবি অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। তখন আমার বয়স দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে।

আমাদের বাড়িতে একটি পাঠশালা বসত, খুব ছোটরা আসত সেখানে। আমার জ্যেঠামশাই ছিলেন পাঁচ টাকা বেতনের পোষ্ট-মাষ্টার, তিনিই সকালে ডাকঘরের কাজ শেষ করে এসে এই স্কুল চালাতেন। সব সুর ক'রে পড়ানো হত। সব পাঠই চিৎকার করে পড়ত সবাই। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ইংরেজী প্রতিশব্দ মুখস্থ [illegible] পরিচয়ের বেলা নাকে হাত দিয়ে নোজ—নাক, বগলে হাত দিয়ে আর্মপিট—বগল, ইত্যাদি সুর করে বলত। দূর থেকে শুনেই আমার সব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল! তখন আমার বয়স চার থেকে পাঁচ।

এখানে চার-পাঁচ বছরের ছেলেরা পড়ত। সৌখীন পাঠশালা, বেতন দিতে হত না। আরও একটু দূরে চার আনা বেতনের একটি পাঠশালা ছিল, সেখানে মাসখানেক আমি পড়েছি। আর এক ছিল মাইনর স্কুল, পরে সেখানেই ভর্তি হয়েছিলাম। স্থানীয় এক জমিদারের বাড়িতে ছিল সে স্কুল।

আমাদের দেশে কলাপাতায় আঁচড় কেটে তার উপর কলম বুলিয়ে প্রথম লেখার সূত্রপাত হত, কিন্তু আমি কখনো কলাপাতায় নিজে লিখি নি, অন্যের জন্য আঁচড় কেটে দিয়েছি।

আমার পিতা বিহারীলাল গোস্বামী সিরাজগঞ্জ মহকুমার পোতাজিয়া হাই স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। জায়গাটি সাহাজাদপুর থানার অন্তর্গত। পিতার হাতেই প্রথম শিক্ষা আমার। তাঁর শেখাবার ধরন ছিল স্বতন্ত্র। তিনি অক্ষর পরিচয়ের আগে গল্প পড়াতে শেখাতেন এবং প্রথমেই কাগজে লিখতে দিতেন। গল্প পড়তে পড়তেই অক্ষর পরিচয় হয়ে যেত আকার ইকার ইত্যাদি সমেত। এতে পড়া শেখা যেত খুব অল্প সময়ের মধ্যে। ইংরেজী বাংলা দুইই এইভাবে শেখা। জ্যেঠা মশাইয়ের হাতের লেখা ছিল ইংরেজী কপিবুকের মতন। বাবার লেখা আরও সুন্দর ছিল। সুতরাং ছাপার মতন লেখা, ইংরেজী ও বাংলা দুইই, খুব অল্প

সেতুবন্ধের ব্রিজ —মানবচন্দ্র মিত্র

মা আর মেয়ে —রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দুর্গম পথে

—অজিত মিত্র

স্বর্ণতৃষা।

—সলিল গোস্বামী

আহ্লাদে আটখানা —শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বয়সে আয়ত্ত হয়েছিল। বাবা ভাল ড্রয়িং জানতেন, অতএব সে দিকেও ঝোঁক পড়েছিল আমার।

আমার অক্ষর পরিচয়ের পর থেকেই বাড়িতে সেকালের যাবতীয় সাময়িক পত্র কত যে দেখেছি নানা আকারের সব। জন্মভূমি, সখী, সখা ও সাথী, বঙ্গদর্শন, বঙ্গভাষা, সমালোচনী, সাধনা, প্রদীপ, ভারতী প্রভৃতি, উপরন্তু মিশনারি কাগজ মহিলা-বান্ধব আসত নিয়মিত। বেশ মনে পড়ে এক মিশনারি মেম মাসে মাসে আসতেন আমাদের বাড়িতে এবং গান গেয়ে শোনাতেন। তাঁর নাম ছিল মিস এ কিং। একটি গানের তুটি ছত্র আমার এখনও মনে আছে—"প্রভু তোমায় ছাড়ি আমি কোথায় যাব, হেন গুণনিধি আর কোথা পাব।"

মাসিকপত্রগুলির চেহারা আজও স্পষ্ট মনে আছে। অজস্র বইয়ের পরিবেশে আমার প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ, বই আর ছবি। আর মনে পড়ে মোটা বোর্ডের চোঙার প্যাকেটে বিলেত থেকে একদিন এলো রঙীন ছবির সব প্রতিলিপি, ল্যাণ্ডসিয়ারের আঁকা; বোম্বাই থেকে একবার এলো রবি বর্মার কয়েকখানি বড় রঙীন ছবি। এই সব ছবি আর ছোটদের ইংরেজী বই অথবা এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার নমুনা পৃষ্ঠা সম্বলিত ফোল্ডারের কয়েকটি রঙীন ছবি আমাকে একেবারে উন্মাদ ক'রে তুলল। হঠাৎ রঙীন ছবির উপর এক তুর্দমনীয় আকর্ষণ জেগে উঠল, যার হাত থেকে আমি সহজে মুক্তি পেলাম না। ঝোপের মধ্যে বাসায়-বসা পাখী ও তার ডিমের রঙীন ছবি ছিল একখানা ইংরেজী বইতে কতদিন সেইটে দেখে দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি। বাজারে কাপড়ের দোকান থেকে বিলেতি কাপড়ে-আঁটা রঙীন ছবি চেয়ে নিয়েছি কত। তারপর যে দিন বাজারের একটি দোকানে জলছবি নামক এক অতি আশ্চর্য রঙীন ছবি ও তার ব্যবহার বিধি আবিষ্কার করলাম সেদিন যেন আমার চোখে এক নতুন জগৎ আবিষ্কৃত হল।

জলছবির দাম জানতাম না, ভীষণ ঠকতাম পরে বুঝতে পেরেছিলাম। একটি ডালে ছোট তুটি পাখী, তার প্রত্যেকটা এক পয়সা। মাঝখানে কেটে আলাদা বিক্রি হ'ত। যে দাম চাইত তাই দিতাম, এবং এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, পয়সার দিক দিয়ে ঠকলেও আনন্দের দিক থেকে আদৌ ঠকিনি।

জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে সকালে ও সন্ধ্যায় ডাকঘরে যাওয়া ছিল আমার একটা বিশেষ আনন্দ। সন্ধ্যার দিকে ডাক আসত, সকালে ডাক রওনা হত। ডাক-হরকরা অনেকগুলো ঘুঙুর-বাঁধা একটি বল্লম হাতে নিয়ে ঝমঝম ঝমর-ঝমর করতে করতে ছুটে আসত, মেলব্যাগ পিঠে নিয়ে। আমাদের বাড়ি থেকে কিছু দূরে শশিভূষণ বাগচীর বাড়িতে ছিল ডাকঘর। সন্ধ্যাবেলা নিয়মিত যেতাম, বিশেষ করে শীতকালে। ডাক নিয়মিত সময়ে আসত না। পাঁচটায় আসবার কথা, কখনো নটা-দশটায় আসত। চার মাইল দূরে সুজা-নগর সাব পোষ্ট অফিস থেকে আসতে এক ঘণ্টার বেশি লাগা উচিত নয়। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, লোকটি পথে কোনো আড্ডায় বসে নেশা-টেশা ক'রে খেয়াল মত আসত এবং ডাকঘরের কাছাকাছি এসে খুব জোর ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ছুটত।

আমার কাজ ছিল চিঠিতে ছাপমারা এবং পরদিন সকালে সীলমোহরের তারিখ বদলানো ও ব্যাগে পোরার আগে ডাকবাক্স খুলে সব চিঠির ঠিকানা লাল কালীতে ইংরেজী করা ও ছাপমারা। ইংরেজীতে নাম ধাম লেখা খুব ছেলেবেলা থেকেই অভ্যাস ছিল,

হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ল পাড়

আমার কাজ খুব নিখুঁত হত এবং পোষ্টমাষ্টার ও পোষ্টম্যান উভয়েই এ বিষয়ে আমার উপর সদয় ছিলেন।

হঠাৎ একদিন পত্রিকার বিজ্ঞাপনে আবিষ্কার করলাম অনেক স্থানেই জলছবি বিক্রি হয়। এবং বারো শীট মাত্র ছ' আনা! তখুনি অর্ডার দিলাম, যথাসময়ে ভিঃ পিঃ এলো। ছবির কত যে বিষয়-বৈচিত্র্য! কত যে আনিয়েছিলাম পর পর! এক একটি শীটে চল্লিশ পঞ্চাশখানা ছবি থেকে চারখানা পর্যন্ত। ভারতীয় দেবদেবীর ছবিও ছিল, তার প্রত্যেকটির নিচে নাম লেখা—কালী, তারা, মহাবিদ্যা ইত্যাদি।

ডাকে আরও নানা জিনিস আনাতাম। নিজের নামে এত জিনিস আসছে এর মধ্যে একটা গর্ব ছিল, রোমাঞ্চ ছিল। শীতকালে সন্ধ্যায় ডাকঘর আমাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করত। এই একমাত্র উপলক্ষ ভিন্ন এত রাত্রে গ্রামের পথে চলার অভিজ্ঞতা ছিল না। রাত্রে হাজার হাজার জোনাকি, অন্ধকার নিস্তব্ধ গ্রামের কালো আকাশের বুকে সহস্র নক্ষত্র। দপ্ দপ্ করছে! তারই মধ্যে দিয়ে, গ্রামে-তৈরি চার দিকে কাচঘেরা লণ্ঠনের মৃদু আলোতে জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে বাড়িতে ফিরছি, আমার নামে-আসা প্যাকেট চিঠিপত্র হাতে নিয়ে। এর মধ্যেকার রহস্যপূর্ণ রোমাঞ্চকর আনন্দটুকু প্রকাশ করি এমন ভাষা আমার জানা নেই।

একবার কলকাতা থেকে ভি, পি, ডাকে জলছবি এলো—খুব ছোট ছোট সিকি দুআনি আধুলি আকারের ছবিতে ভরা। এই ছবিগুলো থেকে রবীন্দ্রনাথের নদী কবিতাটির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে বইয়ের মার্জিনে অনেক ছবি লাগিয়ে দিলাম। জার্মানির কোন্ শহরে তৈরি সেই জলছবি, তার সঙ্গে আমাদের দৃশ্যপট প্রাণী সব মিলবে কেন, কিন্তু যতটুকু মিলল—চখাচখি, কচ্ছপ, ঘাটের সিঁড়ি, উচ্চসৌধ ইত্যাদি—বেশ দেখতে হয়েছিল। নদী বই আকারে বেরোয় প্রথম। রবীন্দ্রনাথ এই বই খানবারো একটি প্যাকেটে বাবার নামে পাঠিয়েছিলেন। বাবা আমাদের দুই ভাইকে সবটাই মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন নিজে পড়ে পড়ে। দু'রকম ছন্দে পড়া যায়—দু'রকমই শিখেছিলাম। এই কবিতাটি আমার খুব ভাল লাগত, হিমগুহা থেকে বেরিয়ে নদী চলেছে সমুদ্রের দিকে। পদ্মানদীর উপরে বাড়ি—আমার বালক মনে নদী কবিতা কত যে কল্পনা জাগিয়ে তুলত। আমি নিজেই যেন সেই নদীর সঙ্গে পর্বত থেকে বেরিয়ে দুধারের সমস্ত দৃশ্য দেখতে দেখতে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছি। নদীর চলা আমার সমস্ত সত্তার সঙ্গে মিশে আমার মনকে আজও চলার মন্ত্রে দীক্ষিত করে রেখেছে।

ইলিশ মাছ ধরা শত শত পাল-তোলা নৌকো

আমাদের বাড়ির কাছেই কলুদের বাড়ি। ঘানিতে সরষে দিয়ে কি ভাবে তেল বেরোয় তা দেখতে খুব ভাল লাগত। একটা বলদ ঘানি ঘোরাত, ঘানির যে অংশটি গোরুর কাঁধে, তার উপর চাপ রাখার দরকার হয় সরষেয় চাপ পড়ার জন্য। কলুদের সেই ঘানিতে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে আমাকেও কত বার বসতে হয়েছে আরও কিছু চাপ বৃদ্ধির জন্য, যদিও সে চাপ সরষে থেকে তেল বের করার পক্ষে কতখানি কার্যকর ছিল তা আমার জানা নেই। মোটকথা অনেক দিন ঘানিতে পাক খেয়েছি। পুষ্ট সরষের টাটকা তেলের গন্ধে ঘর আমোদিত হয়ে থাকত, সে গন্ধ আজও টাটকা আছে আমার মনের নাকে।

কলুরা উঠে গেল কিছুদিন পরে, এলো সেখানে এক কুমোরের পরিবার। তাদের বৃহৎ গোষ্ঠি। তারা নতুন সব ঘর তুলে বেশ জাঁকিয়ে বসল সেখানে। হাঁড়ি, কলসী, মালসা, সরা প্রভৃতি দিনরাত তৈরি হচ্ছে, রোদে শুকোচ্ছে, রুটির মতন অংশ দিয়ে হাঁড়ির তলা কাঠের হাতায় পিটে জোড়া হচ্ছে, হাতুড়ির মতো যন্ত্রে পিটিয়ে পিটিয়ে কাঁচা হাঁড়ি বা কলসীর গায়ে নক্সার ছাপ আঁকা হচ্ছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। তার পর রোদে-শুকানো হাঁড়ি কলসী পোড়াবার পালা। প্রত্যেকটি ধাপ দিনের পর দিন বসে দেখেছি। সব মুখস্থ হয়ে আছে।

আর মনে পড়ে কলের গানের কথা। পয়সা নিয়ে নিয়ে ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ীরা কলের গান শুনিয়ে বেড়াত। গানের লাইনও অনেকগুলোর মুখস্থ আছে। "তোরা মিশি নিবি মিশি নিবি ও বৌয়েরা" বা "পায়ে আলতা পথে কাদা" বা "সৈ লো তোর খবর চমৎকার"—ইত্যাদি।

একদিন আমার দাদা (জ্যেঠতুত ভাই) নলিনীরঞ্জন, বয়সে আমার চেয়ে বছরতিনেক বড়—ছুটে এসে আমাকে বললেন, টীকেদার আসছে। তাঁর মুখে আতঙ্ক। বললেন শীগ্‌গির পালাবি তো চল।—দু'জনে ছুটে পালিয়ে গিয়ে এক ঝোপের মধ্যে এক বেলা কাটালাম। টীকেদার যে কেন ভয়ের তখন জানতাম না। তারপর একদিন টীকে নিতে হল, অবশ্য দাদাই আগে নিলেন, আমি একা পালিয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। টীকে উঠেছে কি না তখন দেখতে আসত টীকেদার, টীকে উঠলে কিছু অর্থপ্রাপ্তি ঘটত। আমাদের বাড়ি থেকে সম্ভবত সবার জন্য চার আনা দেওয়া হয়েছিল। টীকেদার খুব খুশি।

মাইনর স্কুলে ক্লাস টু-তে ভর্তি হয়েছিলাম। মথুরানাথ সাহা চৌধুরী নামক এক ধনী ব্যক্তির দেউড়ি পার হয়ে প্রকাণ্ড আঙিনা জুড়ে আটচালা খড়ের ঘর, তাইতে স্কুল বসত। স্কুল-ঘরটি সম্পূর্ণ খোলা, ভিতরেও ক্লাসে ক্লাসে কোনো ভেদ চিহ্ন নেই, শুধু তিন দিকে বেঞ্চি ও এক দিকে শিক্ষকের চেয়ার টেবিল। এই ভাবে এক একটি ক্লাস সাজানো। প্রথম বই যা একটু একটু মনে আছে সে হচ্ছে ফ্রাঙ্কিস ড্রেকের গল্প, কাক ও কোকিল কবিতা, বর্ষসঙ্গীত। ক্লাস টু থেকে থ্রীতে প্রমোশন পেয়েছিলাম তৃতীয় হয়ে। পুরস্কার পেয়েছিলাম চরিত্রগঠন ও একখানি বাংলা অভিধান। ক্লাসে প্রতিদিন ইংরেজী ও বাংলা হাতের লেখা লিখতে হত। তার জন্য কাগজ যা কেনা হত তা খুব শস্তা ছিল মনে আছে। এক দিস্তা চার পয়সা কিংবা কম। বালী কাগজ নামে কিঞ্চিৎ লালচে আভাযুক্ত কাগজ

খুব চলতি ছিল। জে বি ডি বড়ি বা গুঁড়ো কালি, অথবা দু পয়সা দামের দোয়াত সুদ্ধ তৈরি কালী কিনতাম। এ কালীর গন্ধ, কাগজের গন্ধ আজও আমার স্মৃতিতে অম্লান। স্মরণ করলে সেই ছেড়ে-আসা শৈশবে মুহূর্তে ফিরে গিয়ে সেই কালের মধ্যে বাস করতে থাকি।

কালী অনেক সময় বাড়িতেও তৈরি করে নিতাম। অনেকেই বাড়িতে তৈরি করত। মিশ কালো উজ্জ্বল কালী। দু-চার পয়সা খরচে এক বোতল! কলম ময়ূরের পালকের। এক পয়সায় একটি। নলখাগড়ার কলমেও বেশ লেখা যেত। স্বদেশী আন্দোলনের যুগ সেটি, তার ফলে গ্রামের উৎসাহী এক কুমোর ছাত্র কাচের দোয়াতের অনুকরণে মাটির দোয়াত তৈরি করেছিল। যে দোয়াত ওল্টালে কালী পড়ে না, সেই রকম। কিন্তু বাইরে থেকে ভিতরের কালী দেখা যেত না, সেজন্য খুব জনপ্রিয় হয়নি।

স্কুলের পড়ায় আমার মন ছিল না। হাতের লেখা খাতায় এক পৃষ্ঠা বাংলা ও এক পৃষ্ঠা ইংরেজী, তাও প্রতিদিন লিখতাম না। ওটি বাধ্যতামূলক বলেই ভাল লাগত না। সেজন্য ক্লাসে বেত পড়ত হাতে। শশিভূষণ দাস ছিলেন হেড পণ্ডিত। তিনি একটু হিংস্র ছিলেন, তাঁর ক্লাসে বেতের ব্যবহার একটু বেশি হত।

আর একজনের নাম মনে পড়ে—যোগেন্দ্রকুমার কাঞ্জিলাল। তিনি ড্রিল শেখাতেন। সবার নাম মনে নেই, কিন্তু চেহারা স্পষ্ট মনে আছে। সহপাঠীদের সবার নাম ও চেহারা কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে। প্রায় পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানেও তাদের স্মৃতি আজও অম্লান

সমস্ত দিন স্কুলে থাকা আদৌ ভাল লাগত না। ক্লাসের পড়া কানে যেত কদাচিৎ। যান্ত্রিক নিয়মে তখনকার দিনের এই পাঠ-ব্যবস্থা অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল আমার কাছে। হয়তো বা সবার কাছেই তাই ছিল। তাই স্কুলের পরিবেশ অন্য ভাবে উপভোগ করার জন্য আমরা কয়েক জন বালক অনেক আগে যেতাম স্কুলে। নানা রকম খেলা আবিষ্কার করে নিয়েছিলাম। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, একখানা ইতিহাসের বইতে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা আসাম মিলিয়ে একখানা ম্যাপ ছিল, তা থেকে জায়গার নাম খুঁজে বের করতে বলতাম একজনকে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা বের করতে না পারলে তার হার হত। সে আবার আমাকে ঐ ভাবে ঠকাবার চেষ্টা করত। ছোট ছোট অক্ষরে শত শত নাম, তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করা শক্ত। কিন্তু কিছু দিন পরে সব আমাদের এমন জানা হয়ে গেল যে, কোনো জায়গার নাম বের করতে এক সেকেণ্ডের বেশি দেরি হত না।

একদিন সবার আগে গিয়েছি স্কুলে। আমাদের ক্লাসটি ছিল পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে। বর্ষাকাল। বেঞ্চিতে একা বসে মাটির দিকে চেয়ে দেখি, দীর্ঘ এক সারি পিঁপড়ে চলেছে অবিরাম গতিতে ছুটে। তার পর হঠাৎ দেখি তাদের পাশে বসে রয়েছে একটি মেটে রঙের ব্যাঙ। মাটির সঙ্গে এমন মিলিয়েছিল যে আগে দেখতে পাইনি। পিঁপড়ের চলা দেখতে আমার ভাল লাগত। একা বসে বসে কতদিন দেখেছি এবং ভেবেছি কি ক'রে ওরা কোনো খাবার জিনিসের সন্ধান পেলে অন্যকে খবর দিয়ে ডেকে আনে। আবিষ্কার করেছি ওরা পথ চলার সময়, এমন কিছু চিহ্ন বা গন্ধ রেখে যায় যাতে সবাই ঠিক সেই একই পথে চলে আসে। এটি সত্য কিনা পরীক্ষার জন্য মাঝে মাঝে পথের উপর আঙুল ঘষে দিয়েছি। তখন দেখেছি ওদের গতি ঠিক সেইখানে এসে থেমে যায় এবং সবাই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ভাঙা পথের এপারের সঙ্গে ওপারের যোগ স্থাপন করে। তাই একা আমি সেদিনের সেই ঘনসন্নিবিষ্ট পিঁপড়ে দলের পথের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। ভাবছিলাম, লাইনের মাঝখানে একটু ফাঁক পেলেই মুছে দেব, আর মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম ওদের শাদা শাদা ডিম মুখে নিয়ে ছুটে চলার দৃশ্য। কিন্তু ওদের পাশে একটি ব্যাঙকে আমারই মতো নিবিষ্ট মনে বসে থাকতে দেখে অবাক হলাম। এমন তো কখনো দেখিনি। ওর উদ্দেশ্য কি? সে যুগে অবশ্য পিঁপড়ে নিয়ে গবেষণার কথা কেউ ভেবেছেন কি না জানি না, ভাবলেও বাংলার সুদূর এক পল্লীগ্রামে পিঁপড়ের তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবার কেউ ছিলেন না অবশ্যই। এর সম্ভাবনার কথাও যদি সে বয়সে আমার কল্পনা করার ক্ষমতা থাকত তা হলে অন্তত সেদিন সেই ব্যাঙটিকে আমি বিজ্ঞানীর সম্মান দিতাম। আমি নিজেও যে ওদের চলার দৃশ্যের মধ্যে কোনো কিছু রীতি আবিষ্কার করে, জানবার মতো বা পাঁচ জনকে জানাবার মতো কিছু করছি এ রকম কোনো কল্পনাও আমার মনে ছিল না; আমার উদ্দেশ্য ছিল শুধু মজা দেখা অথবা শিশুসুলভ কৌতূহল চরিতার্থ করা। আমার স্বভাবের সঙ্গে এ ধরনের কাজ বেশ মিলত। নাওয়া-খাওয়া বিষয়ে উদাসীন ছিলাম, পড়াশোনায় মন বসত না, সমস্ত বছরের পড়া তিন-চার দিনে পড়ে শেষ করে রাখতাম, তার পরে আর ঐ একই পাঠ ভাল লাগত না। অঙ্ক শাস্ত্রকে কোনো শিক্ষকই আকর্ষক করে তুলতে পারেননি তখন, তাই ওতে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যাই হোক হঠাৎ একটি অদ্ভুত ঘটনা দেখে আমি ধাঁধায় পড়ে গেলাম। দেখি সেই নিরেট পিঁপড়ের সারির মধ্যে সহসা আধ-ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা একেবারে ফাঁকা এবং পিঁপড়েদের অবিরাম গতি সহসা বিপর্যস্ত। চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। যে জিনিসটি আমি নিজে করব বলে অপেক্ষা করে বসে আছি, তা হঠাৎ নিজে থেকে হল কি ক'রে! অথচ ব্যাঙ আমারই মতো নির্বিকার দ্রষ্টা। বরঞ্চ আমি যেটুকু উসখুস করেছি ব্যাঙ তাও করেনি, তাকে এক চুল নড়তে দেখিনি।

কি ব্যাপার ভাবছি। ইতিমধ্যে বিভ্রান্ত পিঁপড়েরা পথ ঠিক

শীতের গঙ্গা জ্যাম্প
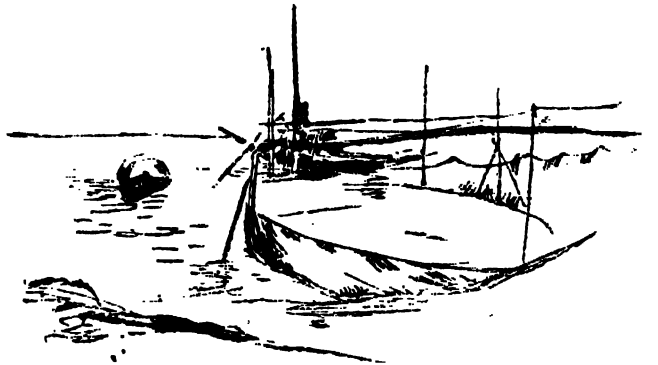
ক'রে নিয়েছে, কিন্তু বিভ্রান্ত আমি এ সমস্যা সমাধানের কোনো পথই পাচ্ছি না। ভাবতে ভাবতেই দেখি, আবার কোন যাদুমন্ত্রে সেই একই জায়গার আধ ইঞ্চি স্থান শূন্য! ব্যাঙ পূর্ব্ববৎ নির্বিকার। বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা পাচ্ছি না, রহস্য ভেদ করা অসাধ্য বোধ হচ্ছে। অথচ সে বয়সে একটি ব্যাঙের কাছে পরাজিত হওয়াও অসম্ভব।

অতএব মনোযোগ আরও ঘনীভূত ক'রে ব্যাঙের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম মাথা নিচু ক'রে। রহস্য ভেদ হল। ব্যাঙ মুখের ভিতর থেকে চকিতে একটি জিভ বের করে কতকগুলো পিঁপড়েকে তুলে নিয়ে মুখে পুরছিল। ক্রিয়াটি এমন আশ্চর্য্য ক্ষিপ্র গতিতে ঘটছিল যে হঠাৎ দেখে বোঝবার উপায় নেই। এতটুকু না নড়ে, তড়িৎ গতিতে একটি সরু কাটির মতো লম্বা জিভ বের করতে পারে, এ তথ্য আমার জানা ছিল না। মনে হয় গাঁয়ের কোনো লোকেরই জানা ছিল না।

আমার মনে এই ঘটনা ছাপ এঁকে গেছে। এমনি ভাবে যত তুচ্ছ হোক, জীবনে যা কিছু নতুন জেনেছি তাই আমার কাছে পরম বিস্ময় বলে মনে হয়েছে। দিনের পর দিন তা নিয়ে ভেবেছি এবং সবাইকে বলে বেড়িয়েছি। এককালে আমার বন্ধু বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে যখন তাঁর বাল্যকালের রোমাঞ্চকর সব তথ্য আবিষ্কারের কথা শুনছিলাম, তখন আমার বাল্যজীবনের এ ঘটনাটিও তাঁকে না বলে পারিনি। আমি যখন বি-এ পড়ি তখন বিজ্ঞানের মহৎ উদ্দেশ্য বিষয়ে একখানি বই (Discovery, The spirit and service of Science) ছিল আমাদের ইংরেজী টেক্সট বুক। তাইতে প্রথম কীট নিয়ে গবেষণার শৈশব কথা পড়ে বিস্মিত হয়েছিলাম। ফাবর দিনের পর দিন কীটদের ব্যবহার লক্ষ্য করছেন পথের ধারে বসে, আর তা দেখে গ্রাম্য মেয়েরা তাঁকে পাগল ভেবে কত করুণা প্রকাশ করছে! এ ঘটনা পড়বার সময় আরও একবার আমার সেই সেদিনের অতি তুচ্ছ উদ্দেশ্যহীন কৌতূহলী বালক-মনের সেই পিঁপড়ে দর্শনের দিনগুলির কথা মনে এসেছিল, ভাল লেগেছিল ভাবতে। এই সময়েই আর একটি অদ্ভুত দৃশ্য আমার চোখে আর এক বিস্ময় জাগিয়েছিল। একটি পতঙ্গ (মথ জাতীয়) এসে বসেছিল আমাদের বাড়ির বাইরের একটি কাঠ-রাখা ঘরের বেড়ায়। মাটির রঙের পতঙ্গ, কিন্তু তার পিঠে সম্পূর্ণ একটি মানুষের মূর্তি আঁকা। দুটি পাখা গুটিয়ে বসলে অদ্ভুত সাদৃশ্য পাওয়া যায় মানুষের মুখের। ঘন কালো রেখার মূর্তি। চোখ নাক মুখ অবিকল মানুষের, চোখে তারা নেই শুধু আউটলাইন। আমি শিশুকাল থেকেই ছবি আঁকায় অভ্যস্ত ছিলাম, কাজেই আমার দেখায় কোনো ভুল ছিল না। পতঙ্গটি একবেলা বসে ছিল, এবং আমি অনেককে তা দেখিয়েছিলাম। এই অদ্ভুত ছবির কথা পঞ্চাশ বছর ধ'রে বলে আসছি কৌতূহলী জনকে। আমি দ্বিতীয় আর একটি দেখিনি। পতঙ্গবিদেরা নিশ্চয় এ রকম দৃশ্য দেখে থাকবেন।

ব্যাঙ দর্শন

বাধাহীন দিগ্বলয়ের ঘেরা খোলা আকাশের সীমাহীন বিস্তার, শস্যক্ষেতের সবুজ সমুদ্রে কখনো বেগুনি, কখনো হলুদ ফুলের ঢেউ, কখনো অবিরাম সবুজ আর সবুজ, এমন পরিবেশে কোথায়ও নিজেকে স্থির রাখতে পারতাম না। মাঠে মাঠে, নদীর ধারে ধারে অকারণ ঘুরে বেড়াতাম। নাওয়া খাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। বাড়িতে বকুনি খেতাম নিয়মিত। ছুটির দিনগুলো এক নিশ্বাসে কেটে যেত। স্কুলে যেতে হবে কল্পনায় মন খারাপ হত।

নদীর যোগাযোগ সমুদ্রের সঙ্গে। সে কোন্ এক অজ্ঞাত হিমগুহা থেকে বেরিয়ে অবিরাম গতিতে চলেছে সেই লক্ষ্যে। কোথায়ও তার ছেদ নেই। তার সঙ্গে কত দেশের সম্পর্ক। এক বিরাট অতল অসীম সমুদ্রের কোলে গিয়ে তার যাত্রা শেষ। এই ছবিটি 'নদী' কবিতায় সঙ্গে আমার মনে শিশুকাল থেকে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। তাই নদী আমাকে এমন টানত। তাই মনে হত একমাত্র নদীই আমার আত্মীয়, ওর সঙ্গে আমার মন ছুটে চলত অজানা দেশে। ওকে আমি চিনি, ওর আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত আমি চিনি।

বদ্ধ কোনো কিছু আমার প্রকৃতি বিরোধী ছিল। যা কিছু নিয়মিত তার সঙ্গে আমার জন্মবিরোধ। এবং যা কিছু নিষিদ্ধ তার প্রতি আমার আকর্ষণ সব চেয়ে বেশি। নদীর মধ্যে দেখতাম এই নিয়ম ভাঙা গতি। সে যে কি রোমাঞ্চ! বর্ষার পদ্মা! উন্মত্ত জলরাশি প্রচণ্ড গর্জনে ছুটে চলেছে। কত ভাঙা গাছের ডাল, কত পাতা, খড় কুটো পাক খেয়ে খেয়ে তীর বেগে ছুটে চলেছে। গেরুয়া-রাঙা জল। পাকে পাকে ফুলে ফুলে উঠছে, মাঝে মাঝে পাড় ভেঙে পড়ছে আর কলকল শব্দ ভেদ ক'রে তার আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছে। আবার পাড়ে ফাটল দেখা দিল, প্রকাণ্ড জায়গা জুড়ে পাড়ের অংশ নিচে বসে গেল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ল স্রোতের উপর। কোনো ফাটল সিকি মাইল জুড়ে। কখন ভেঙে পড়বে ঠিক নেই। তারই ধারে ধারে ছিল আমার গতি। কখনো এক লাফে ফাটলের ওপারে যাচ্ছি, আবার এক লাফে ফিরে আসছি। ওপারে যাবার পর যদি সে ফাটলে-বিচ্ছিন্ন পাড় আমাকে সুদ্ধ তলিয়ে যেত! যায়নি কেন, আজ ভাবলে চমকে উঠি। খেলা আর মৃত্যু—মাঝখানে একটি সরু তার! সেই তারের উপর হাঁটতে তখন কি রোমাঞ্চ। কিন্তু সমস্ত জীবনটাই তো ঐ ভাবে কাটল।

বর্ষার নদী যে কত ভাবে দেখেছি। তার দুর্দমনীয় শক্তি সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করেছি। তার প্রত্যেকটি কলধ্বনি, প্রত্যেকটি আবর্ত, আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

এক দিন ভোর বেলা জেগে উঠে ভয়ার্ত চিত্তে শুনি পদ্মার অতি
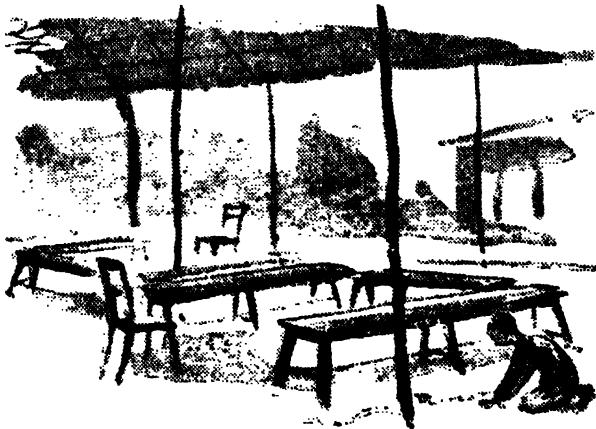
প্রবল গর্জন। বাড়ি থেকে হাঁটা পথে অন্তত ছ' সাত মিনিটের দূরত্বে ছিল বর্ষার পদ্মার শেষ সীমা। শীতের পদ্মায় স্নান করতে যেতাম আধ মাইল হেঁটে। নদী তত দূরেই ছিল আগের দিনও! কিন্তু হঠাৎ এ কি হল। এমন গর্জন তো ভরা বর্ষাতেও আমাদের বাড়ি থেকে কখনো শোনা যায় নি—এমন ভয়ঙ্কর প্রবল গর্জন। সবাই ভীত হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে আরও আগে যাদের ঘুম ভেঙেছে, তারা নদীর ধার থেকে উত্তেজিত ভাবে ফিরে এসে খবর দিল, গ্রাম বোধ হয় গেল। বর্ষার মুখে হঠাৎ এক দিনে জল এমন অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে যে, কেউ তার জন্য আগে থাকতে প্রস্তুত থাকতে পারে নি। পদ্মার এ রকম ব্যবহার এই প্রথম। গ্রাম-সীমান্তের ঢালু পাড় থেকে যে নদী পূর্ব দিন সিকি মাইল দূরে ছিল, সে নদী এখন প্রায় দুকূলহারা। নদী ফেঁপে গেছে। ছুটে গিয়ে দেখি, অসম্ভব কাণ্ড! নদীর ঢালু পাড় কোথায় অদৃশ্য। সেখানে নৌকো বাঁধা ছিল, তা নেই। পাড়ের উপর কাঠের ব্যবসায়ী ছিল, তার শাল কাঠগুলো সাজানো থাকত, তারও একটা অংশ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। লোকেরা প্রকাণ্ড একটা বাঁশ এনে জলে ডুবিয়ে থৈ পাচ্ছে না, সবারই মুখে-চোখে ভয়ের ছাপ। আমি মূঢ় বিস্ময়ে পদ্মার সেই সর্বনাশা মূর্তি দেখছি; গর্জনে কারো কথা কানে আসছে না। সবাই শুধু চেয়ে আছে আর কি হবে, কি হবে, বলে অস্থির হচ্ছে। সৌভাগ্যের বিষয়, গ্রামের উপর সেবারে আর আক্রমণ হয় নি, গ্রাম রক্ষা পেয়ে গেল।

সাধারণত বর্ষার প্রথম জল এসে নদী যখন কানায়-কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, তারই মুখে ইলিশ মাছ ধরার মরশুম। ঝড়-বৃষ্টি তখন কম, ঝড়ের কাল জ্যৈষ্ঠের শেষেই শেষ হয়ে যায়। তার পর মাছ ধরার কাল। তখন শত শত নৌকো একত্র স্রোতের সঙ্গে জলে জাল নামিয়ে ভেসে চলে। নৌকোয় মাত্র দু'জন লোক। একজন হাল ধ'রে বসে আছে, আর একজন জাল ধ'রে। ইলিশ মাছ জালে আটকা পড়লেই হাতের দড়ি কেঁপে ওঠে, বোঝা যায়। তখন জাল টেনে তুলতে হয়। তখন যে মাছ ধরা পড়ল, সেটিকে নৌকোয় রেখে আবার জাল ফেলতে হয়। একসঙ্গে দুটো-তিনটেও ধরা পড়ে কখনো। এই ভাবে দু-তিন মাইল স্রোতে ভেসে গিয়ে নৌকো ফেরাতে হয়। তখন স্রোতের বিপরীত মুখে উজিয়ে আসতে হয়। কিন্তু সুবিধে এই যে, এই মরশুমে বাতাস বয় পুব থেকে পশ্চিমে, তাই নৌকো ফিরে আসবার সময় পাল তুলে দিলেই কাজ হয়। একসঙ্গে দু-তিন শ' পাল-তোলা নৌকো জলের বুকে ফেনা তুলে উজিয়ে আসে। কোনো পাল শাদা, কোনোটা নীল, কোনোটা লাল। সে এক অপরূপ দৃশ্য। এই ভাবে এসে, আবার পাল গুটিয়ে মাছ ধরতে ধরতে যায়, আবার আসে। ছবির মতো দেখায় যখন বিচিত্র রঙীন পাল তুলে অতগুলো নৌকো এক সঙ্গে ফিরে আসে। এদের নৌকোয় উঠে এদের সঙ্গে মাছ ধরা দেখেছি কতবার সেই বর্ষার পদ্মার বিপজ্জনক বুকে।

বর্ষাকালে আর শুনেছি দূরাগত জোড়া কামানের ধ্বনি গুড়ুম গুড়ুম, পর পর দুটি আওয়াজ, গম্ভীর এবং জোরালো, কিন্তু সে যে কিসের আওয়াজ তা কেউ বলতে পারত না। দিন রাত শোনা যেত।

এই নদীর আর এক রূপ শীতকালে। তখন জল বহুদূর সরে গিয়েছে, তীরভূমির বিস্তীর্ণ বালুর বুকে হাজার হাজার জলজন্তুর আঁকা। কাদাখোঁচা পাখী জলের ধারে ধারে কাদায় খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফিরছে। ছোট ছোট ছেলেরা এখানে সেখানে ছাতার আকারের কাঠামোয় বাঁধা জাল অগভীর জলে ফেলে দূরে দড়ি ধ'রে বসে আছে, এক ঝাঁক খরসোলা মাছ তার উপর দিয়ে সাঁতার কেটে যাবার সময় এক হেঁচকা টানে তাদের ডাঙায় তুলে ফেলবে। মাথার উপরে অজস্র গাঙচিল উড়ছে। দূরে নদীর মাঝখানে এখানে সেখানে জল এত কম যে সে সব জায়গায় ষ্টিমার আটকাবার ভয়ে নিশানা পুঁতে দেওয়া হয়েছে। কত চরভূমি জল থেকে মাথা বের করেছে। ক্ষীণ নদীর ওপারের বালুতট দেখা যাচ্ছে—বহুদূর বিস্তীর্ণ সে বালুভূমি পার হয়ে দিগন্তে ঘননীল গাছের সারি—লোকালয়ের নিশানা। গাছের ঘন সবুজ দূর থেকে এমনি নীল দেখায়। এপার থেকে খেয়া নৌকো যাত্রী বোঝাই ক'রে ধীরে ধীরে নদী পার হয়ে যাচ্ছে। নদী পারেই ফরিদপুর জেলার সীমানা। সেখান থেকে দক্ষিণে ছ'সাত মাইল হাঁটলে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের পাংশা ষ্টেশন। সেখান থেকে পুব দিকে প্রথমে কালুখালি, তারপর বেলগাছি, তারপর রাজবাড়ি তারপর পাচুরিয়া জংশন, তার পর গোয়ালন্দ। পরে সূর্যনগর নামক একটি ষ্টেশন হয়—রাজবাড়ির আগে।

ক্ষীণ পদ্মার বুকে ষ্টিমার চলছে জল মাপতে মাপতে 'এ পানি তল মিলে না'—ইত্যাদি ধ্বনি শোনা যায় অনেক সময়। নির্মেঘ নীল আকাশের নিচে প্রশান্ত নীলাভ নদী, জল এখন স্বচ্ছ, গ্রামের শেষে তীরে তীরে যতদূর দেখা যায় সরষে ক্ষেতের হলুদ ফুলে ছাওয়া। চারদিকে কি অপরূপ উদাস করা আলো হাওয়া। এমনি দিনে কতদিন নৌকোয় চড়ে কালুখালি ঘাটে নেমে, সেখান থেকে পালকীতে গিয়েছি রতনদিয়া গ্রামে—আমার মামাবাড়িতে। সে সব আজ স্বপ্নের মতো মনে পড়ে।

১১০৬ কিংবা ৭ সাল হবে, সেই সময়ে থিয়েটারের প্রসার হয়েছে

সুদূর পল্লীতেও। বালককালে দেখেছি থিয়েটার সাতবেড়ের সংলগ্ন নিশ্চিন্তপুর গ্রামে। পালা ছিল হরিশ্চন্দ্র, মনে আছে আজও। আর মনে আছে ড্রপসীনে ঘোড়ায় চড়া শিবজী মূর্তি। সেই রঙীন ছবি আজও স্পষ্ট দেখতে পাই যেন।

পদ্মা নদীর ধারে ধারে আপন মনে ঘুরে বেড়ানোয় যে কি আনন্দ হত তা প্রকাশের ভাষা নেই। কখনো ওপারের ট্রেন চলার শব্দে, কখনো ষ্টিমার যাওয়ার দৃশ্যে মন উধাও হয়ে যেত অদেখা অচেনা দেশ দেশান্তরে।

ষ্টিমারের চেহারা ও নাম মনে আছে। প্রথমে যে ষ্টিমারের নাম আমি ষ্টিমার ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখেছি এবং আজও মনে আছে সে হচ্ছে ওয়াজিরিস্তান। প্রকাণ্ড ষ্টিমার, পেটের দুধারে দুই চাকা বা প্রোপেলার। সেই চাকার আবরণের উপর অর্ধচন্দ্রাকার নামটি দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। এ কিসের নাম, এর অর্থ কি, এ সব তখন সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ছিল। শিশুকালের কথা। কিছুদিনের মধ্যেই এরকম চওড়া ষ্টিমার চলা বন্ধ হল, তার বদলে দেখা দিল লম্বা ষ্টিমার—পিছনে তার চাকা। শুনলাম এ ধরনের ষ্টিমার খুব অল্পজলে যেতে পারে—তাই পদ্মায় চলার পক্ষে খুব সুবিধাজনক। বর্ষা চলে গেলে পদ্মার বুকে বস্তু চড়া জাগে, জল কমে যায়, তখন ভারী ষ্টিমার চলতে পারে না। অদৃশ্য চড়ায় আটকে যাওয়া কত ষ্টিমার দেখেছি। দুদিন তিন দিন পর্যন্ত আটকে থেকেছে কোনো কোনোটা। আটকা পড়লে প্রাণপণে বাঁশি বাজাতে থাকে—উল্টোদিকে চাকা ঘুরিয়ে হাঁসফাঁস করতে থাকে, কখনো বা অন্য ষ্টিমার সে পথে গেলে সে দড়ি বেঁধে তাকে টানতে থাকে।

গোয়ালন্দ ও পাটনার মধ্যে এই ষ্টিমার যাতায়াত করত। পরে যে সব লম্বা ও হাল্কা ষ্টিমার দেখা দিল তাদের নাম সবই মনে আছে। মিনার্ভা, জুপিটার, রোহিনী, সুহাইল, নেপচুন প্রভৃতি। পদ্মার উপরে ছিল সুরেশ ভৌমিকের বাড়ি। আমার সমবয়সী ছিল সে। সে ছিল ষ্টিমার-উন্মাদ। রাতদিন সে ষ্টিমারের স্বপ্ন দেখত, বহুদূর থেকে ষ্টিমারের বাঁশি শুনে বলে দিতে পারত কোন্ ষ্টিমার আসছে। উজান বা ভাটিতে কবে কোন্ ষ্টিমার সাতবেড়ে পার হবে তা সে মুখস্থ ক'রে রাখত। ক্রমে আমারও ঘনিষ্ঠতা হল এ সব ষ্টিমারের সঙ্গে। একে একে সবগুলোতেই চড়লাম। ১৯১৭ সালে শেষ চড়ছি এ লাইনের ষ্টিমারে।

১৯০৫—৬ সালের কথা মনে পড়ে। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ পল্লীগ্রামেও বিস্তৃত হয়েছে। দেশী কাপড় কিনছে অনেকে। পথে পথে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" গান গেয়ে ফিরছেন গ্রামের উৎসাহীরা, তার মধ্যে আমিও সারাদিন ঘুরেছি বেশ মনে পড়ে। কি উদ্দেশ্য, কেন এ আন্দোলন, তা বোঝবার মত বয়স নয়, শুধু এর মধ্যেকার রোমাঞ্চ আর উন্মাদনাটা অনুভব করেছি। সাতবেড়ে প্রকাণ্ড বন্দর! দুটো বাজার ছিল, নাম বড় গোলা, ছোট গোলা। বড় গোলায় বিদেশী বর্জন সম্পর্কে একটি সভা হয়েছিল, এবং সে সভায় বাবা কিছু বলেছিলেন—সেই ঘটনার একটি অস্পষ্ট ছবি মনে জাগে! তখন বা কিছু পরে আমি প্রথম বিড়ি দেখি সাতবেড়ে গ্রামে। কি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে যে দেখেছিলাম বিড়িকে। এই সময়কার একটি ঘটনা যা আমরা খুব উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলাম সে হচ্ছে স্কুলে হিন্দু-মুসলমানদের জন্য পৃথক পৃথক রীতির প্রচলন। বাইরে থেকে ইনস্পেক্টর না কে এসে সব নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরে হেড মাষ্টার আমাদের সবাইকে ডেকে বলেছিলেন, মুসলমান ছেলেরা সবাই টুপি পরে আসবে, তারা শিক্ষককে দেখলে হাত তুলে সালাম জানাবে, হিন্দু ছেলেরা হাত তুলে নমস্কার জানাবে। এই আপাত-নির্দোষ রীতিটি খুব অল্প দিনের মধ্যেই চালু হল এবং মুসলমান ছেলেরা উপরন্তু শুক্রবার বিকেলে নমাজ পরার নির্দেশ ও ছুটি পেল। বহুকাল পরে বুঝতে পেরেছি হিন্দু মুসলমানকে সম্পূর্ণ পৃথক করার মতলব ছিল এর পিছনে, এবং তা তখন থেকেই এইভাবে ঘোরা পথে কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তখন গ্রামে হিন্দু-মুসলমানে শত্রুতা ছিল না, থাকা উচিত বলে কারো মনেও হয়নি, কিন্তু সরল গ্রামবাসীর মনে তার বীজ বপন করা হল এই ভাবে।

অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামে সাইকেল এলো একখানা। এক ডাক্তার এসেছিলেন তাইতে চড়ে বাইরে থেকে। বহু লোকের ভিড় জমেছিল দুচাকার গাড়ি দেখতে। সেই ডাক্তারের অতিমানবত্ব বিষয়ে আমাদের মনে আর কোনো সংশয় ছিল না।

তখনকার দিনে সুদূর পল্লীতে সংসারযাত্রা ছিল খুবই সরল। বাবা মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন পেতেন সে সময়। সংসার খরচ মাসে পাঁচ টাকার বেশি হত না। দৈনিক বাজার খরচ সর্বোচ্চ এক আনা। চাল দু' টাকা আড়াই টাকা মণ। মাছের সময় এক পয়সার মাছ দু বেলার পক্ষে যথেষ্ট। ইলিশের মরশুমে একটা মাঝারি ইলিশ এক পয়সা। একবার মাছের কোনো দামই ছিল না, সেবারে মাছের শুধু ডিম খাওয়া হত মাছ বাদ দিয়ে। তবে ইলিশের এমন প্রাচুর্য আর কখনো দেখিনি। কাঁচা লঙ্কা এক পয়সায় তিন সের, লাউ এক পয়সায় দু'টো-তিনটে, দুধ এক পয়সা দু'-পয়সা সের। ঘি-মাখন সব সময়ে বাড়িতে তৈরি হ'ত, বেশি দরকার হ'লে ঘোষেদের কাছ থেকে কেনা হ'ত আট আনা থেকে এক টাকা সের।

এই ছিল বাজারের সাধারণ অবস্থা। এ সময় নিজে অনেক দিন বাজার করেছি তাই মনে আছে। ইলিশ মাছের সময় গ্রামের দক্ষিণ-পূব প্রান্তে নদীর ধারে বিদেশী পাইকেরদের চালা উঠত। তারা প্রতিদিন প্রচুর ইলিশ কিনে বসত কাটতে। প্রকাণ্ড ঝকঝকে ধারালো বঁটি, ডান-হাতের বুড়ো আঙুলে পাট জড়ানো। মাছের মুড়ো বাদে সবটা মাছ তেরছা ভাবে চাকাচাকা ক'রে কেটে যাচ্ছে এক জন, আর এক জন তাতে নুণ মেখে মেখে জালাতে সাজাচ্ছে। ডিম থাকলে তা নুণ মেখে পৃথক জায়গায় রাখছে। মাছের মুড়োগুলো শুধু তারা সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি ক'রে দিত। জায়গাটা আমাদের বাড়ির অনেকটা কাছে এবং মুড়ো খুব ভোরবেলা পাওয়া যেত ব'লে কিনতে যেতাম মাঝে মাঝে। এক পয়সার কিনলেই দু'বেলা। এক পয়সায় সর্বোচ্চ সংখ্যা ১৬টি মুড়ো কিনেছি অনেক দিন। সেদিন বাড়িতে শুধু মুড়োর ঝোল, আর চচ্চড়ি।

শীতের দিনে যখন ইলিশ কমে আসত তখন অন্যান্য মাছ পাওয়া যেত প্রচুর। কোনো মাছ ওজন দরে বিক্রি নয়। ভোরবেলা পদ্মা নদীর ধারে খরা জালে মাছ ধরা আরম্ভ হয়। নৌকো এক জায়গায় বেঁধে, প্রকাণ্ড ত্রিকোণাকার বাঁশের ফ্রেমে বাঁধা জাল ডুবিয়ে দেওয়া হয় এবং কিছুক্ষণ পরে তার একটি কোণের উপর দাঁড়ালে মাছসুদ্ধ জাল উঠে আসে জল ছেড়ে। ছোট ছোট সুস্বাদু সব মাছ। তখন এখান থেকে কত বার মাছ কিনেছি। সকালে কয়েক বন্ধু মিলে দাঁতন করতে করতে পদ্মার ধারে যেতাম, কুণ্ডু

রোদ পোয়াতে আর মাছ কিনতে। ডাঙা থেকে খরাজালের দূরত্ব বারো-চোদ্দ হাত। বড় রুমালের মতো বস্ত্র-খণ্ডে এক পয়সা বা দু' পয়সা বেঁধে ছুড়ে দিতাম নৌকোর উপরে, জেলেরা পয়সা খুলে রেখে সেই কাপড়ে মাছ বেঁধে ছুড়ে দিত ডাঙায়। পিঁয়েল মাছ (পেট পিঙ্গলবর্ণ, তাই থেকে নাম) বাঁশপাতা মাছ, খয়রোলা প্রভৃতি পাঁচমিশেলি মাছ, অদ্ভুত ভাল খেতে। যে কোনো বাড়িতে আম, জাম, কাঁঠাল, কুল, পেয়ারা, আতা, কলা প্রভৃতি ফল ও বাড়ি-সংলগ্ন ক্ষেতে বেগুন, লঙ্কা, সিম, লাউ, কুমড়োর ছড়াছড়ি। দূর দূর গ্রাম থেকে মুসলমান বিক্রেতারা শাকসব্জী, তরি-তরকারী দুধ বাজারে বয়ে নেওয়ার পথে বাড়ির দরজায় দরজায় বিক্রি করতে করতে যেত। পছন্দ মতো মাছ কিনতেই শুধু বাজারে যাওয়া। গ্রামে তখনও ব্রাহ্মণ বাড়িতে প্রকাশ্যে পেঁয়াজ খাওয়া চালু নয়, সবাই বাজার থেকে ও জিনিসটি ঢেকে ঢুকে বাড়িতে আনত। আমি পেঁয়াজকলি বা পেঁয়াজ প্রকাশ্যে আনতাম, অথচ তার জন্য কেউ কোনোদিন কিছু বলেছে মনে পড়ে না। আমরা ছিলাম বৈষ্ণব—আমার মা শাক্ত পরিবারের। বাড়িতে মাতৃ-শাসনই প্রবল ছিল।

আমাদের বাড়ি ও আরও দু একখানি বাড়ি ভিন্ন সর্বত্র মেয়েদের চিরাচরিত গ্রাম্য সাজ। একখানি শাড়ী মাত্র সম্বল, না সেমিজ-ব্লাউস না জুতো। বডিস সেমিজ প্রচলিত হয়েছিল তখন গ্রামেও, এবং তার ব্যবহার অন্তত: আমাদের গ্রামে দু-তিনটি বাড়িতে আবদ্ধ ছিল। মেয়েদের জুতো পরা একেবারে অচল ছিল। আমার বোনেরা স্কুলে যাবার পর থেকে মেয়েদের জুতো প্রচলিত হল আমাদের বাড়িতে।

গ্রামে দলাদলি ছিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে। রাঢ়ি বারেন্দ্র দলাদলিই বেশি ছিল। কেউ কারো বাড়িতে খাবে না, আবার দেখতাম মাঝে মাঝে একসঙ্গে খাওয়াও হত। বাবা বিদেশে থাকতেন এবং নিজের পড়াশোনা নিয়ে স্বতন্ত্র থাকতেন, কোনো গণ্ডগোলের মধ্যে কখনো তাঁকে যেতে দেখিনি। সাতবেড়ে গ্রাম হিন্দুপ্রধান ছিল, তার কারণ এটি ছিল একটি বিশিষ্ট বন্দর এবং ব্যবসার কেন্দ্র। তাই ব্যবসায়ী হিন্দু সম্প্রদায় ছিল এখানে বেশি। যে সময়ের কথা বলছি সে সময় গ্রামে গ্রাজুয়েট মাত্র দুজন—একজন রাজবংশী সম্প্রদায়ের, এঁরা মৎস্য ব্যবসায়ী—এঁদের মধ্যে সবাংই অবস্থা ভাল এবং তখন শিক্ষাক্ষেত্রে এঁরা এগিয়ে আসছেন। এঁদের সম্প্রদায়ের উমেশচন্দ্র হালদার ছিলেন এম-এ, কৃষ্ণনগর সরকারী স্কুলে ও কলেজে অঙ্ক শিক্ষা দিতেন। আর একজন ছিলেন আমার বাবা। তিনি কলকাতার সিটি কলেজ থেকে বি-এ পাস করেন ১৮৯১ সালে। আর একজন ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী তিনি বার-এট-ল হয়েছিলেন, অতএব গ্রামের সমাজ থেকে চ্যুত ছিলেন বলেই মনে হয়। তিনি দু'একবার এসেছেন গ্রামে মনে পড়ে।

গ্রামে শীতের দিনের নদী ও মাঠের আবহাওয়া বর্ণনা করেছি, কিন্তু ফিরে ফিরে মন কেবলি ছুটে যায় সেই কালের মধ্যে সেই দায়িত্বহীন প্রকৃতির কোলে লালিত শৈশবে। লিখতে লিখতে লেখা থেমে গেছে কত বার, বেদনায় মন আর্ত হয়ে উঠেছে সেই চলে যাওয়া দিনগুলির জন্য। সেই উদার নীলাকাশ, ওপারে ধূধূ করা শাদা বালুচর, সোনালি রোদে সমস্ত স্বচ্ছ নদীটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নৌকো চলেছে দূরে কাছে। সওদাগরি প্রকাণ্ড এক একটা নৌকো ডবল পাল তুলে দিয়ে মন্থর গতিতে চলেছে। কোনো কোনো নৌকো গুন টেনে নিয়ে চলেছে মাঝিরা। আকাশের গায়ে চিল উড়ছে, মাছরাঙা বসে আছে খরাজালের বাঁশের উপর। জলে মাঝে মাঝে হুস ক'রে শুশুক মাথা তুলে ডুবে যাচ্ছে। এরই মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলতাম। মনে হত এমনি মন্থর ভাবে, হাল্কা ভাবে, ভেসে চলি এপার থেকে ওপারে, তারপর আরও দূরে—আরও দূরে। আমি একা ঘর ছাড়া বালক পৃথিবীতে আমার কোনো বন্ধন নেই, সমস্ত আকাশ, বাতাস, শস্যক্ষেতের গন্ধ, পল্লী-জীবন, পল্লীর মাটি, সব যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে একটি গানের সুরের মতো আমার মনে বাজতে থাকত অবিরাম, আমার মাথা একটা অদ্ভুত মাদকতায় ঝিমঝিম করত।

গ্রামের ভিতরে বন্ধন, নদীর ধারে এলে উন্মাদ করা মুক্তির স্বাদ। মন ওপারের অদৃশ্য রেলগাড়ির এঞ্জিন উদ্গিরিত ধোঁয়ার চিহ্ন ধরে অজানা দেশের স্বপ্ন গড়ে তুলত। মনে হত ছুটে চলে যাই দূর দূরান্তে—অবিরাম শুধু ছুটে যাই।

সেদিনের সব তুচ্ছ আজ বড় হয়ে উঠেছে। এক দিনের একটি সামান্য ঘটনা মনে এলো। প্রথম স্কুলে গিয়েছি—সেই সময়কার। আমাদের বাড়ি থেকে হাঁটা পথে প্রায় দশ মিনিট লাগত স্কুলে যেতে। পথের মাঝামাঝি জায়গায় একটা বাঁকের ধারে একটি বাড়ি ছিল। কার বাড়ি মনে নেই, তখনও জানতাম কি না তাও এখন আর মনে পড়ে না। সেই বাড়ির একটি নিটোল স্বাস্থ্যের বউ কলসী কাঁখে জল নিয়ে ফিরছিল পদ্মা থেকে। আমি বই হাতে স্কুল থেকে ফিরছি একা। বৌটি আমার দিকে সস্নেহে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোন্ বাড়ির?

তখন আমি নিতান্তই শিশু। কোন্ বাড়ির আমি, এ প্রশ্নের উত্তর কি ভাবে দিতে হয় জানতাম না; আমি শুধু প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করলাম—ঐ দিকে, ঐ পথে গেলে একটা বাড়ি পাওয়া যায়, সেখানকার ছেলে। সে যদি আমার বাবার নাম বা আমার নাম জিজ্ঞাসা করত তা হলে বলতে পারতাম, কিন্তু তুমি কোন্ বাড়ির ছেলে এই ঘোরা প্রশ্নের সোজা উত্তর কি? সেই বয়েসে তা আমার মাথায় আসেনি। খুব লজ্জা পেয়েছিলাম এবং নিজেকে খুবই ছোট মনে হয়েছিল এজন্য। পরে অনেকবার ঘটনাটা মনে পড়েছে এবং কেন প্রশ্নটি বুঝতে পারিনি এজন্য নিজের উপর ভীষণ রাগ হয়েছে।

আজ এ ঘটনাটা হঠাৎ মনে এলো। আজ তো এর উত্তর জানি কিন্তু আজ সে কোথায়? যদি সে বৌটি আজ বেঁচেও থাকে, তবে তার বয়স সত্তর পার হয়েছে নিশ্চয়। আজ সে স্থবির, একটিও তার দাঁত নেই, চামড়া শীর্ণ, হাতে হরিনামের মালা। আজ যদি তাকে খুঁজে বার করতে পারি তবে কাছে গিয়ে তার চেহারা দেখে চমকে উঠব। তাকে বলব, আমি তোমার সেদিনের প্রশ্নের আজ উত্তর দিতে এসেছি। কিন্তু সে বলবে সে উত্তরে তার আজ আর কোনো প্রয়োজন নেই, কোনো দিনই ছিল না। কিংবা এত কথা বলারও তার দরকার হবে না, আমার কথা তার বধির শ্রবণযুগলে ধাক্কা খেয়ে প্রতিহত হতে ফিরে আসবে, মর্মে প্রবেশ করবে না।

[ক্রমশঃ।

[মাসিক বসুমতীর সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটককে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রাবলী]

১০, ৮, '৪৬

প্রিয়বরেষু,

আপনার ঔদার্য্যপূর্ণ চিঠিখানি পেয়ে যৎপরোনাস্তি খুশী হয়েছি। এমন আন্তরিকতার সঙ্গে কেউ কোনদিন আমাকে লিখতে আহ্বান জানায়নি। বসুমতীতে লিখবো বৈ কি, নিশ্চয়ই লিখবো। বসুমতী যে কি বিরাট প্রতিষ্ঠান তা আমার অজানা নেই। বসুমতী না থাকলে বাঙলা দেশের বহু গুণী সাহিত্যিক আমাদের সাহিত্য-ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে লুপ্ত হয়ে যেতেন। বসুমতী থেকে প্রকাশিত সস্তা মূল্যের বইগুলি না পড়লে আমাদের মত দরিদ্র দেশে পাঠকপাঠিকা সৃষ্টি হ'তে পারতো না। আমি লোকমুখে শুনেছি ও স্বচক্ষে দেখেছি, মাসিক বসুমতীর উন্নতির জন্য আপনি কি অপরিসীম পরিশ্রম করছেন। এই পত্রিকাটি আমার মনে হয়, খুব শীঘ্রই বাঙালীর হৃদয় জয় করতে পারবে। আমার পরিচিত বহু বিশিষ্ট সহযোগী সাহিত্যিকও এই একই কথা বলেন। আপনি যে পথ ধরেছেন সেই পথে এগিয়ে চললে বাঙলা দেশের প্রত্যেক সাহিত্যিকের সাহায্য অবশ্যই পাবেন। আপনি তো নিজেও কলম ধ'রেছেন। সাহিত্যিকরা কি ধরণের সেন্টিমেণ্টাল হ'তে পারেন নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন। 'পদ্মানদীর মাঝি'র মত আবার একটি উপন্যাস লিখতে অর্ডার করেছেন, কিন্তু তখনকার মন আর চোখ এখন আর নেই। সেই পারিপার্শ্বিককে হারিয়েছি বহুকাল আগে। এখন আমি শহরের বাসিন্দা। যান্ত্রিক কলকাতার সংস্পর্শে এসে গ্রামীন সরলতাকে প্রায় ভুলতে বসেছি। তবুও হলপ করছি, আপনাকে এমন লেখা দেব যে আপনি অবশ্যই খুশী হবেন। বসুমতীর বিরাট পাঠকগোষ্ঠী, আমি নিজেও তাই আপনাদের লেখা দেওয়ার আগে বেশ সাত-পাঁচ ভাবছি। অন্তর থেকে কামনা করি, আপনার মঙ্গল হোক। শীঘ্র একদিন আসছি। ইতি

প্রীতিপ্রার্থী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২

১৫. ১০. '৪৬

প্রিয়বরেষু,

আপনার দপ্তরে এসে শুনলাম, সেই মাত্র নাকি আপনি বেরিয়ে গেছেন। বিজয়ার শুভেচ্ছা ও প্রীতি জানাতে এসেছিলাম ; এসে শুনলাম, আপনি নাকি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর কাছে গেছেন। শীঘ্রই আরেক দিন আসছি। 'চিহ্নে'র প্রুফ যদি বেশী তৈরী থাকে, একেবারে দেখে দিতে পারি। তাতে হয়তো সুবিধা হবে। বসুমতীর পুস্তকপ্রকাশ বিভাগ থেকে কয়েকটি গ্রন্থাবলী নিয়ে গেলাম। কয়েক জন লেখকের লেখা প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ আর দামোদর গ্রন্থাবলী আজ নিয়েছি। পরে আরও কয়েক জনের বই নিতে চাই। আশা করি, অমত করবেন না। কিছু টাকার প্রয়োজন, অন্ততঃ আজ পাওয়া গেলে বিশেষ উপকারে লাগতো। আপনার কথামত আমি আমার মাত্রা কমিয়েছি, কিন্তু একেবারে ছাড়তে পারছি না। কি যে এক বদ অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যার পর একটু-আধটু না চললে সারা দিনের ক্লান্তি যেন কিছুতেই মোচন হয় না। লিখতেও বসতে পারি না। আপনি সেদিন প্রশ্ন করেছিলেন, এই বিশেষ অবস্থায় লেখা চলে কি না ? বিশ্বাস করুন, না খেয়ে আমি লিখতেই পারি না। মনের একাগ্রতা আনতে পারি না। তবে ভাল জিনিষ সকল সময়ে মেলে না। ব্যয় অনুপাতে আমার আয় খুবই অল্প। এই দুঃখে চাকরী নিয়েছিলাম সরকারী। সেই চাকরী আমার কাল হয়েছিল। চাকরী পাওয়ার পর থেকেই বদ অভ্যাসটা আয়ত্ত করতে হয়। এ সব অতি গোপন কথা, কা'কেও যেন ব'লে ফেলবেন না ঘৃণাক্ষরেও। আশা করি, কুশল। ইতি—

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

২০, ১২, ৪৬

প্রিয়বরেষু,

ভাই, একটা দিন দেরী হয়ে গেল, সেজন্য ক্ষমা চাইছি। বুধবার বিকেলের বদলে আজ শুক্রবার সকালে পাঠালাম। কারণটা এই যে বুধবার লেখা শেষ হ'লেও কিছুতে মন উঠলো না। উপন্যাসের আরম্ভটা ভাল হওয়া দরকার, তাই আবার গোড়া থেকে লিখে দিলাম। লেখার আরম্ভ নিয়ে চিরকাল আমি ব্যস্ত হই। একবার আরম্ভ করতে পারলে আর কিছু ভাবনার থাকে না। জাল বিস্তার করার কাজই শক্ত, জাল গুটানোর কাজটা আর এমন কিছু নয়। এবারের উপন্যাসের অংশটা কিছু কম হবে, তাতে যদিও কিছু আসবে যাবে না। যাদের পটভূমিকায় এই উপন্যাস তার পূর্ণ সূচনা এতেই পাঠকেরা পাবেন। পরের বার পুষিয়ে দেবো, এখন থেকেই কথা দিচ্ছি। সেদিন কবি-বন্ধু বিমলচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আপনার সম্পর্কে অনেক কথা হ'ল। আপনার মত আমিও তাঁর লেখার খুব ভক্ত! তিনি আপনার অনেক প্রশংসা করলেন। আমিও সায় দিলুম। আগামী সোম কিম্বা মঙ্গলবার আসছি। আশা করি কুশল। ইতি

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪

Tallygunge Place
17. 1. '47

প্রিয়বরেষু,

বেশ একটু আঘাত লেগেছে। কোন এক সূত্রে জানতে পারলাম, পূজা সংখ্যার বসুমতীর কোন কোন লেখক তাঁদের জন্য

এক শো টাকা পেয়েছেন দক্ষিণা। আর আমি আমার 'টিচার' গল্পের জন্য দক্ষিণা বা মজুরি পেয়েছি পঞ্চাশ টাকা। আমার এ অভিমান খুব কম, সমমানের জন্য কোন দিন কাতরাই না। তবে কয়েকজন লেখকের তুলনায় অর্দ্ধেক বনে গিয়ে, বিশেষতঃ বসুমতী এবং আপনার কাছে, একটু অস্বস্তি বোধ করছি। এ আমার অভিযোগ নয়, অনুযোগ। আমি বেশ ভালভাবেই জানি, আপনার কাছে বিচারের তারতম্য হয় না বা হবে না। তবে কি ভুল শুনেছি? এ বিষয়ে সাক্ষাতে কথা হবে। আমি আগামী কাল আবার আসছি আপনার অফিস-টাইমের মধ্যে। মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাচ্ছি জানবেন। এমন অদ্ভুত সমন্বয় ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন পত্রিকায় দেখিনি! সাহিত্যের সঙ্গে শিল্পের মিলন করেছেন আপনি. তাই এত সুন্দর হয়েছে কাগজ। তা ছাড়া আপনি তো দেখছি সকল দলের সাহিত্যিককে একত্র করেছেন। এমন প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই সাফল্য অর্জ্জন করবে। কুশল আশা করছি। ইতি

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[লেখক ঠিকই শুনেছিলেন, কোন' এক বিখ্যাত লেখকের লেখার দরুণ এক শত টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু লেখাটি ছিল দীর্ঘতম রচনা! সেই বছরের শারদীয়া দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত বৃহত্তম গল্প। তাই দক্ষিণার এই তারতম্য।—স]

৫

টালীগঞ্জ প্লেস

(তারিখ নেই)

প্রিয়বরেষু,

বরিশালে গিয়ে ফিরতে দেরি হয়ে গেল। সেখানে নিরালায় বেশ ভালভাবে লিখবো ভেবেছিলাম, কিন্তু সাধারণ সভা, কলেজের সভা ইত্যাদি সব বড় বড় সভা ছাড়াও কত যে সঙ্ঘ সমিতি আর ক্লাবের আসরে গিয়ে সাহিত্যের কথা বলতে হয়েছে! তা ছাড়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল থেকে অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির বাড়ী কয়েক মিনিটের জন্য পদার্পণের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হয়। এখানে একটি দুর্ঘটনার সমুখে পড়তে হয়, সেটা জানাই আপনাকে। এখানে এক আসরে একটি মহিলা আমাকে সঙ্গোপনে ডেকে আমার পায়ের ধূলা নিয়ে প্রণাম করলেন। প্রণাম সেরে উঠতেই দেখি তাঁর চোখ দু'টি অশ্রু-সজল। কান্নার কারণ জানতে চাওয়ায় বললেন, এ না কি তাঁর আনন্দের অশ্রু। আমার লেখার প্রথম থেকে তিনি আমার প্রত্যেকটি রচনা পড়ছেন। আমি তাঁকে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে ব'লেছি, আপনার মত পাঠিকা বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে সৃষ্টি হোক।

আমার জন্য যে কোন কাগজ আটকে থাকবে এত বড় স্পর্দ্ধা যেন কোনদিন না হয়, প্রার্থনা করি। আপনাদের যে অসুবিধার সৃষ্টি করলাম তার গুরুত্ব বুঝে কত দূর যে লজ্জিত হয়ে আছি তা প্রকাশ করতে পারছি না। আমার আরও মুস্কিল হল, বরিশাল থেকে ফিরে দু'দিন চেষ্টা করেও এক লাইন লিখতে পারিনি। কাল বিকেলের দিকে লেখার চেষ্টা স্থগিত রেখে খালের ধার দিয়ে বেশ অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে এক নির্জ্জন জায়গায় বহুক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। ফিরে এসেই লিখতে বসেছি। এখনও লিখে চলেছি। এখন প্রায় রাত তিনটে। এক ফাঁকে একটা সিগারেট ধরিয়ে আপনাকে এই চিঠিখানি লিখছি।

ভবিষ্যতে আর কখনও এমনটি হবে না, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। অন্ততঃ একটা মাসের লেখার কিস্তী আপনাদের হাতে বেশী থাকবেই। আগামী মঙ্গল কিম্বা বুধবার আসছি। আশা করি 'চিহ্ন' দপ্তরীর খপ্পরে গিয়েছে।

ইতি

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৬

Tallygunge Place

8. 2. 47.

প্রিয়বরেষু,

চিঠি পেলাম এই মাত্র। লেখাটা কিছুতেই হল না। কসরত করে হয়ও না সাধারণতঃ। আপনি তো লেখেন, নিশ্চয়ই বুঝবেন এই ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। কাল রবিবার, ছুটি আছে, সোমবার বাস ষ্ট্রাইকের দরুণ হয়তো সব কাজকর্ম্ম বন্ধ থাকবে। আমি সভা করতে যাচ্ছি। সোমবার কিম্বা দেরী হলে মঙ্গলবার ফিরবোই। লেখাও শেষ ক'রে ফিরবো। ভরসা করছি বিশেষ অসুবিধে হবে না। সময়মত খেয়াল ক'রে লেখা না দেওয়ার জন্য লজ্জা বোধ করছি। আপনার ওপর এ সত্যই অত্যাচার করা। ভবিষ্যতে আর এ অপরাধে অপরাধী হবো না। ইতি

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৭

১৮৬এ, গোপাললাল ঠাকুর রোড

আলমবাজার

কলিকাতা-৩৫

১৮. ৮. ৫০

প্রিয়বরেষু,

শারদীয়া বসুমতীতে লেখার জন্য আপনার সোনার জলে লেখা কার্ড যথাসময়েই পেয়েছি। জবাব দিতে বিলম্বের জন্য কিছু যেন মনে করবেন না। আপনি বোধ হয় বর্ত্তমান বাঙলা দেশের বয়ঃকনিষ্ঠ সম্পাদক, শুধু মাত্র সেই কারণেই এ বছরের পূজার লেখা সর্ব্বাগ্রে আপনাকেই দেবো। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই আমার গল্পটি পৌঁছে দিয়ে আসবো। আশা করি অসুবিধা হবে না। মধ্যে মধ্যে কুশল জানাবেন। ইতি

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—কোথায় যেন আপনার সাহিত্যের কিছু নমুনা পড়লাম। আপনাদের কয়েক জনের লেখা পড়লে ভবিষ্যৎ বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে আশা রক্ষা করা যায়।

186A, Gopal Lal Tagore Rd.
Cal-35
27. 6. 51.

প্রিয়বরেষু,

এবার সবার আগে আপনার কাছ থেকে শারদীয়া লেখার আমন্ত্রণ পেলাম। শরীরটা কিছুদিন ধ'রে খুবই বেয়াড়াপনা করছে। এবার যে সবার আগে আপনাকে লেখা দেবো তাতে কোন সন্দেহ নেই জানবেন। গল্প তো নিশ্চয়ই দেবো!

সব মনে আছে। 'ভেজাল' আমার এক রাত্তিরে লেখা। ঠিক ঐ ধরণের লেখা লিখতে যেন আর সাহস হয় না। আপনার প্রস্তাব আমার অন্তর স্পর্শ করেছে। 'কল্লোল-যুগ' সম্পর্কিত লেখার প্রথম কিস্তী নিয়েই একেবারে হাজির হবো। শুধু একটা কিস্তী নিয়ে নয়, বেশ অনেকটা লেখা। কোন' কারণেই কোন' মাসে লেখা বন্ধ রেখে যাতে পাঠক-সমাজ ও আপনাদের কাছে অপরাধী হতে না হয়, তার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত থাকবো। কিন্তু বাংলা দেশে সাহিত্য-সাধনার কত যে অভাবনীয় বাধা-বিঘ্ন, তার কিছু কিছু আপনি তো জানেন! কেবল দারিদ্র্য নয়,—সে তো হিসাবের মধ্যে ধরে নিয়ে মেনে নেওয়াই হয়েছে। সহযোগিতারও অভাব বটে। পয়সাওলা কাগজওলারা আমাকে আবার এক রকম বয়কট করেছেন। আপনাদের মত কিছু মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া যায়, তাই রক্ষা এ যাত্রায়! যাই হোক, শীঘ্রি একদিন আসছি। আশা করি কুশল। ইতি—

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[লেখক কল্লোল-যুগ সম্পর্কে মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক লিখতে সম্মত হয়েছিলেন। কিছু কিছু প্রস্তুতির পরিচয়ও দেখিয়েছিলেন আমাদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেখায় আর আত্মনিয়োগ করেন না।—স]

৯

186/A, Gopal Lal Tagore Rd.
Calcutta-35.
9. 8. 51

প্রিয়বরেষু,

ভুলিনি একেবারেই। মনে আছে ঠিক। আসছি আমি যথাসময়ে। দেহটা কিছুকাল যাবৎ বড্ড শত্রুতা করছে। গিয়ে যেন কবি মুকুন্দদাসের এক খণ্ড গ্রন্থাবলী পাই, ব্যবস্থা করবেন। কুশল তো? ইতি—

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১০

আলমবাজার
২৪, ৮, ৫১

প্রিয়বরেষু,

সোমবার ২৭শে নিশ্চয়ই আসছি। আশা করি দেখা হবে। এই সঙ্গে আমার সদ্য-প্রকাশিত বইয়ের কয়েক কপি পাঠালাম। সমালোচনা আপনি নিজে করলে বাধিত হবো। কাগজে সমালোচনার্থে বই দিতে ভয় করে। আমার ভিন্ন মতের জন্য অনেকে আমার সাহিত্যের প্রতিও বিরাগভাজন হয়ে আছেন। এজন্য ক্ষতিকর সমালোচনা লিখতেও তাঁরা পেছপাও হন না। বেলা তিনটে নাগাদ যাবো। ইতি

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১১

আলমবাজার
২৩, ১০, ৫১

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুবই খুশী হলাম। কার্তিক মাসে বসুমতীতে লেখাটা দিতে পারবো কি না বুঝতে পারছি না দু'খানা বই পূজার আগেই বেরোবার কথা ছিল—নানা কারণে আটকে যায়। প্রকাশকেরা দু'জনেই হঠাৎ একসঙ্গে বই দু'খান তাড়াহুড়ো করে বার করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। এদিকে পারিবারিক ব্যাপারেও একটু বিব্রত আছি। অগ্রহায়ণের বসুমতী জন্য নিশ্চয় সময়মত লেখা দিয়ে আসবো। পুজো কেমন কাটলে জানাবেন কি? আশা করি ভাল আছেন। ইতি

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১২

আলমবাজা
২৬, ৫, ৫

প্রিয়বরেষু,

আমার গল্পের প্রুফ চেয়েছিলাম, পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। আ করি গল্পের শেষাংশের প্রুফ পেয়েছেন। একটু কষ্ট দেবো। মাসি বসুমতীতে 'মাটি' নামে আমার একটি উপন্যাস আরম্ভ হয়েছিল বোধ হয় শেষ করিনি। আমার কাছে দুটি কিস্তীর ফাইল ম আছে। পৌষ ১৩৫৩ এবং বৈশাখ ১৩৫৪। পৌষের কিস্তি 'পূর্বানুবৃত্তি' লেখা আছে, অর্থাৎ আগেও বেরিয়েছে উপন্যাসট এখন অনুরোধ এই, কষ্ট ক'রে যদি বাকী কিস্তীগুলির ফাইল ক আমাকে পাঠিয়ে দেন। বিশেষ উপকৃত হবো। আমি বড়ই ব্যা জুনের প্রথমেই একদিন যাচ্ছি। গল্প করা যাবে! আশা ক ভাল আছেন। ইতি

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্য

১৩

প্রিয়বরেষু,

৫ই শ্রাবণের মধ্যে সম্ভব করা গেল না। আর দিন সাত সময় চাই। আশা করি অসুবিধা হবে না। লেখা নিয়ে আ

বেলা সাড়ে তিন থেকে চারটের মধ্যে। শুনলাম ঐ সময়ে আপনার দেখা করার কোন অসুবিধা নেই। কুশল তো? ইতি

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪

আলমবাজার
২৪, ৩, ৫৩

প্রিয়বরেষু,

সোমবার বিকালে যাবো, স্থির করেছিলাম—কিন্তু উদরটা দুপুরের দিকে বিদ্রোহ করে বসলেন। প্রায় লড়াই করে বিদ্রোহ থামাতে হয়েছে। দু'চারদিনের মধ্যেই যাচ্ছি। প্রুফ পাঠালাম। ক্রমশঃ চলুক। ইতি

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫

আলমবাজার
২৪, ৩, ৫৩

প্রিয়বরেষু,

যাবো যাবো করে যেতে পারছি না। ১লা বৈশাখ বই বার করার জন্য প্রেসের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিলাম। অন্য কাজেও খুব খেটেছি; সব কাজ অবশ্য আজও ফুরিয়ে যায়নি। আগামী বুধবার বিকালের দিকে যাবো। আশা করি কুশল। ইতি

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬

আলমবাজার
১৭, ৮, ৫৩

প্রিয়বরেষু,

সবাই মিলে এত বেশী ভালবাসলে আর উপায় কি? সমস্ত কাজকর্ম চিন্তাভাবনা বন্ধ করে কোমর বেঁধে শারদীয়ার আসরে নামলাম। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত লিখবো। আপনার লেখাটি কাল পাবেন। দেখা হ'লে অনেক কথা হবে। ইতি

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭

আলমবাজার
২৬, ৮, ৫৩

প্রিয়বরেষু,

শরীরটা খুবই বেয়াদপি করছে। মাঝে কয়েক দিন বেশ জ্বরে ভুগলাম। তাই অন্য সব কাজের হিসাব ওলট পালট হয়ে গেছে। আর চার পাঁচ দিনের মধ্যেই গল্প দেবো। কুশল আশা করি। ইতি

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮

আলমবাজার
২৮, ৯, ৫৩

প্রিয়বরেষু,

কি ব্যাপার? লোক পাঠালেন না কেন? আপনার দাবী ফুলস্ক্যাপের বদলে তিনখানা লিখে রেখেছি। নাম দিয়েছি "সাহিত্যের কানমলা"। সাহিত্য সত্যিই এবার আমাকে কান ম নতুন শিক্ষা দিয়েছে। আপনাদের কি এখনও আর সময় আ সম্ভবতঃ ছাপা শেষ। তবুও পত্রপাঠ আমাকে একটু জানাবে আপনি বলার ফলে যে লেখা লিখে তৈরী করেছি সেটি আপনাকে জানিয়ে অন্যত্র দিতেও পারছি না। কুশল জানাবেন।

ইতি

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯

প্রিয়বরেষু,

আজ বেরোবো ভেবেছিলাম, সব গোলমাল হয়ে গেল লেখা তৈরী হয়েই আছে। পাঠাতে বিলম্ব হওয়ার কারণ—এ সংখ্যার বসুমতীর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। প্রুফে যে চার পাঁ খানা নতুন লেখা শ্লিপ দিয়েছিলাম, সেটার সঙ্গে মিলিয়ে না দে লেখাটা পাঠাতে অসুবিধে বোধ করছি। যে ছেলেটি আমার কা আসে তার হাতে এবারের লেখার ফাইলটি পাঠালে উপকৃত হবো প্রেসকে একটু ব'লে রাখবেন যে আমার লেখা ছাপা হলেই যে ডাকে একটা ফাইল পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শীঘ্র আসছি। আ করি কুশল। ইতি

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২০

প্রিয়বরেষু, ২১, ১, ৫

বেরোবো স্থির করি—শারীরিক আর পারিবারিক কারণে সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়। প্রুফে যে কাণ্ড করেছি প্রেস সেটাকে অত্যাচার বলতে পারে। তাড়াতাড়ি লিখে ঘষামাজা সংশোধ না করেই প্রথমে কপিটা দিয়েছিলাম—তাই এই প্রুফের দুরবস্থা এ রকম আর কখনও হবে না—প্রেসকে এই অভয় দেবেন আমা পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যে একদিন যাবো। হ্যাঁ ভাল কথা, আমা গ্রন্থাবলী বাজারে কেমন বিকোচ্ছে জানাবেন কি? আপনা কথানুযায়ী গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যাপারে সম্মত হয়েছিলাম বিক্রী ভাল না হ'লে সে বিপদ আপনাদের। সেদিন রাস্তায় দেখ হ'তেই আপনাকে দু'বাহু বিস্তারে জড়িয়ে ধ'রেছিলাম তাই হয়তো কেউ কেউ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনাকে যে কিছুতেই ভুলে থাকতে পারি না এত দুঃসময়েও। আপনার দেখ পেলেই তাই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ইতি

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[আমাদের আরও অনেক পত্র দেন লেখক, বিভিন্ন সময়ে কিন্তু সেই সকল চিঠি একান্তই ব্যক্তিগত, যে জন্য প্রকাশ করা হ'ল না। এতদ্ব্যতীত লেখকের মৃত্যুর প্রায় দুই বছর পূর্ব্বে থেকে লেখক এমন সব চিঠি দিতে থাকেন যা থেকে অনুমান করা যায় লেখকের মনের স্থিরতা নানা কারণে বিনষ্ট হয়েছিল। সেই সকল
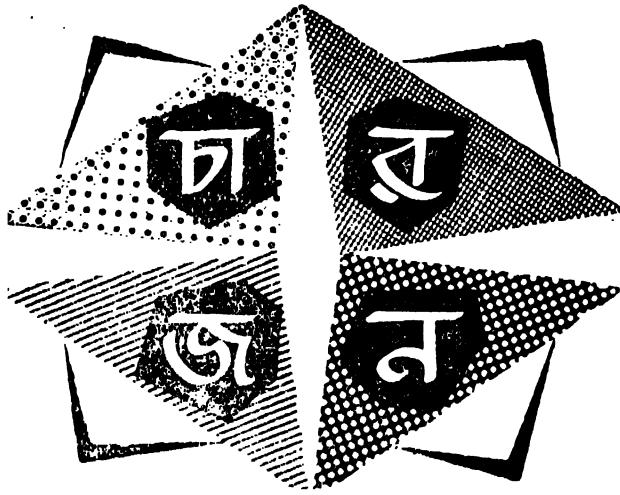
শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় এম-পি

[লোকসভায় বিরোধী দলের নেতা]

বাঙলা দেশের যে সমস্ত ছাত্র লেখাপড়ায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে খ্যাতিলাভ করেছেন, শ্রীহীরেন মুখার্জী তাঁদের অন্যতম। ইনি আই-এ থেকে এম-এ পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে শিক্ষক মহলকে এতখানি অভিভূত করেছিলেন যে, প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল মিঃ ষ্টার্লিং মন্তব্য করেছিলেন, "গত ১৪ বছরের চাকুরী-জীবনে হীরেনের মত মেধাবী এবং চরিত্রবান ছাত্র দ্বিতীয়টি দেখি নাই।" বি-এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ইনি সর্বপ্রথম ইতিহাসে ঈশান স্কলার হন।

মাঝারী দোহারা চেহারা হীরেন বাবুর মাথায় মস্ত টাক। ১৯০৭ সালের ২৩শে নভেম্বর কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। পিতা স্বর্গীয় শচীন্দ্রনাথ মুখার্জী পেশায় আইনজীবী হলেও শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের প্রভাবে রাজনৈতিক আবর্তে এসে মিলিত হন। হীরেন বাবু ছাত্রজীবনে নিজের জন্য কোন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন নি। ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন তিনি। তাঁর ইচ্ছা কলেজী শিক্ষা শেষ করে ভারতের অবহেলিত ইতিহাসের গবেষণায় জীবন কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু জীবনের পথ এমনই বিচিত্র এবং জটিল যে, হীরেন বাবুর মত শান্ত নিরীহ এ্যাকাডেমিক মানুষটি পিতার চেয়ে উগ্রতর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। লোকসভায় কম্যুনিষ্ট দলের ডেপুটি লীডার শ্রী মুখার্জী অক্সফোর্ডের বি-লিট এবং ব্যারিষ্টারী পাশ। ইংল্যাণ্ড থেকে দেশে ফিরে তিনি শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস এবং রাজনীতির সিনিয়র লেকচারার নিযুক্ত হন। সেখান থেকে ফিরে এসে মাত্র ২৮ বছর বয়সে ১৯৩৬ সালে তিনি রিপণ কলেজে ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের লেকচারার নিযুক্ত হন। ইংলণ্ডেই তিনি মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাই এখানে অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে রাজনীতিও চর্চা করতে থাকেন। '৩৮-'৩৯ সালে তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সেক্রেটারী হিসাবেও রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে আসেন। তখন থেকে সুরু হয় তাঁর পুরোদস্তুর রাজনৈতিক জীবন। ১৯৪০ সালে ইনি নিঃ ভাঃ ছাত্র সম্মেলনের নাগপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। কিছুকাল ইনি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্টও ছিলেন। বর্তমানে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র কর্মী-ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট।

শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায়

কলকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য শ্রীমুখার্জী শুধু রাজনীতির মধ্যে নিজের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ রাখেন নি। লেখক, বক্তা এবং সাংবাদিক হিসাবেও তিনি সমধিক খ্যাতিলাভ করেছেন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বিখ্যাত আইন ঘটিত সাপ্তাহিক "ক্যালকাটা উইকলি নোটস" এর সম্পাদনা করেন। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস এবং রাজনীতির উপর ইংরাজি এবং বাঙলায় ইনি প্রায় এক ডজন বই লিখেছেন। এ ছাড়া ইনি বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক শ্রীআবু সৈয়দ আয়ুব দত্তের সঙ্গে একযোগে "আধুনিক বাঙলা কবিতা" নামে একখানি কবিতা সংকলন প্রকাশ করেন। তিনি বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' নামক উপন্যাসখানিকে ইংরাজিতে অনুবাদ করেছেন।

১৯৪৮ সালে এবং ১৯৪৯ সালে তিনি রাজনৈতিক কারণে দু'বার বিনা বিচারে আটক ছিলেন।

দুটি সন্তানের জনক শ্রীমুখার্জী বাস করেন ধর্মতলা ষ্ট্রীটের ছোট একটি ফ্লাটে। তাঁর অতিথিবৎসল আকর্ষণীয় পত্নী শ্রীমতী বিভা মুখার্জী খাস মৈমনসিংহের মেয়ে। এ পর্যন্ত তাঁর কথায় পূর্ববঙ্গের টান যায়নি। বাঙলা ভাগ হবার আগে পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের দুটি পরিবারের মধ্যে এমন বৈবাহিক মিলন ঘটল কি ভাবে, সেই নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী মুখার্জী সলজ্জ হেসে বললেন যে, হীরেন বাবুদের সব ভাই-ই নাকি পূর্ববঙ্গে বিবাহ করেছেন।

দিল্লীর রাজনীতি তথা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙালীর পশ্চাদপসরণ সম্পর্কে হীরেন বাবুর সঙ্গে বহুক্ষণ কথা হল। তিনি মনে করেন যে, বাঙলার শিক্ষা এবং সমাজ-জীবনে একটা আমূল পরিবর্তন না এলে বাঙালীর পক্ষে সকলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। পার্লামেন্টে অধিকাংশ বাঙালী সদস্য মুখ খোলেন না কেন, সেই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমুখার্জী বলেন যে স্পষ্ট করে নিজের বক্তব্য ইংরাজী অথবা হিন্দীতে বলার অভ্যাস না থাকলে পার্লামেন্টে রেখাপাত করা শক্ত। তিনি বলেন যে, হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃত হলেও ভারতের বুদ্ধিজীবী মহলে এখনও ইংরাজীই ভাব এবং বক্তব্য বিনিময়ের মাধ্যম। সে কথা স্মরণ রেখে বাঙালী ছাত্ররা যদি

আগের মত সমান গুরুত্বের সঙ্গে ইংরাজী ভাষা চর্চা করে, তাতে তাদের লাভ ছাড়া লোকসান নেই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, হীরেন বাবু পশ্চিমবাঙলার শ্রমমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখার্জীর ভাতুষ্পুত্র এবং চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীমল্লিনাথ মুখার্জীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। হীরেন বাবুর পিতামহ স্বর্গীয় তিনকড়ি মুখার্জী 'দৈনিক বসুমতী'র সহঃ-সম্পাদক ছিলেন। সেই হিসাবে বসুমতী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

[কলিকাতা হাইকোর্টের বর্তমান শেরিফ ও বিশিষ্ট শিল্পপতি]

বর্ত্তমান বছরের শেরিফ, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, বিদ্যায় উদ্দীপ্ত, কর্ম্মে সুদক্ষ শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় স্বীয় চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা ভাগ্যকে জয় করে নিজেকে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পাবনা জেলার হাটুরিয়া গ্রামে একটি বিশিষ্ট জমিদার-বংশে ১৯০২ খৃঃ-অব্দে তাঁর জন্ম। কলিকাতার হিন্দু স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। কৃতিত্বের সঙ্গে বি, এ এবং এম, এ ও ল' পাশ করেন। সুরু হয় কর্ম্মজীবন। প্রথমে ওকালতি আরম্ভ করেন। কিন্তু ভবিষ্যতে যাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিস্ময়ের কারণ ঘটাবে, আইনজীবীর ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁহার তৃপ্তি কোথায়? দৃষ্টি পড়লো বীমাজগতে। কিছুদিন বীমার কাজ করলেন। বীমাজগতের প্রচুর সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেলেন এই কাজে। চলে গেলেন বিলাত। Prudential, Pearl, Sun Life প্রভৃতি বড় বড় কোম্পানীর অফিসের মধ্যে কাজ করবার সুযোগ পেলেন। শিখলেন তাদের কর্ম্ম-পদ্ধতি ও business technique। দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সে যোগ দিলেন। অক্লান্ত ভাবে সেবা করলেন হিন্দুস্থানের—দীর্ঘ পাঁচ বৎসর। কিন্তু মন ভরলো না। ইস্তফা দিলেন চাকুরীতে। স্থাপনা করলেন আর্য্যাস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী। প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেলেন। অর্থবল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, কর্ম্মবল প্রচুর। বাধা পেলেন, কিন্তু দমলেন না। আঘাত পেলেন, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করলেন না। ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হলেন। আর্য্যাস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। এইবার আরম্ভ হয় কর্ম্ম-জীবনের বিস্তৃতি। ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তাঁর আহ্বান আসে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন।

বীমা ব্যবসায় জাতীয়করণ হওয়ায় তিনি গত সেপ্টেম্বর মাসে বীমাজগৎ হ'তে অবসর গ্রহণ করেন। শ্রীরায় সারা ভারতের বীমা ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে বীমা বিষয়ক আইন প্রণয়নের সময় গভর্ণমেন্ট যে পরামর্শ সমিতি গঠন করেন এবং ১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত বীমা বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত বিভিন্ন কমিটী গঠিত হয়, তিনি তাদের প্রত্যেক কমিটীরই সভ্য ছিলেন। ভারতবর্ষের আর কোন Insurance Executive-এর পক্ষে এত দীর্ঘকাল গভর্ণমেন্টের আস্থাভাজন হওয়ার এবং বীমা বিষয়ে গভর্ণমেন্টকে সুপরামর্শ দেবার সুযোগ ঘটে নি। ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিসেস এসোসিয়েশন-এর সভাপতিরূপে, ইণ্ডিয়ান ইন্সুর্যান্স ইন্‌ষ্টিটিউটের স্থাপয়িতা, জেনারেল সেক্রেটারী ও পরে সভাপতি হিসাবে বীমা ব্যবসায়ে তাঁহার দান দেশবাসী চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। দেশবাসী স্মরণ করবে, Insurance World মাসিক-পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদকরূপে তাঁর নিঃস্বার্থ সেবা। এই পত্রিকাখানি বীমাজগতে প্রামাণ্য Journal হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। এমন কি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইহা সুপ্রচারিত ও সুবিদিত ছিল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

বর্ত্তমানে তিনি নানা ব্যবসায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। এ কথা ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে যে, আইনজীবী হিসাবে যিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'লেন বীমা ব্যবসায়ে যিনি অসাধারণ সাফল্য লাভ ক'রলেন, সেই ব্যক্তি এত কাজের চাপেও বস্ত্র-শিল্প; লৌহশিল্প; জাহাজী কারবার; বড় বড় কলকারখানা পরিচালনা সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জ্জন করেছেন কোথা থেকে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দেশে যখন নিদারুণ বস্ত্রসংকট দেখা দিল, তখন বাংলা গভর্ণমেন্টের Textile Advisory Committee-র চেয়ারম্যান এবং Textile Control Adviser হিসাবে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা সর্ব্বজনবিদিত। ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ম্যানেজিং এজেণ্ট ও চেয়ারম্যানরূপে তিনি এই মিলের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। বাংলা দেশ বস্ত্র ব্যবসায়ে তাঁহার এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁহাকে Bengal Millowners' Association-এর President পদে বরণ করে।

বাংলা ও ভারতের কম-বেশী কুড়ি-পঁচিশটি বৃহৎ ব্যবসায়ের সঙ্গে তিনি এখন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য India Steamship Co. Ltd. National Insulated Cable Co. Ltd. Birkmyre Bros. Ltd. National Rolling & Steel Ropes Ltd. Dhakeswari Cotton Mills Ltd. Annapurna Cotton Mills Ltd. Hindusthan Gas Co. Ltd. প্রভৃতির ডাইরেক্টর। তা ছাড়া শ্রীযুক্ত রায় Industrial Finance Corporation-এর ডাইরেক্টর, State Bank of India-র Calcutta Local Board-এর সদস্য ও Employees' State Insurance Corpn. Govt. of India এবং Employees State Insurance Corpn. Govt of West Bengal-এর সদস্য হিসাবে স্বীয় প্রতিভার পরিচয়
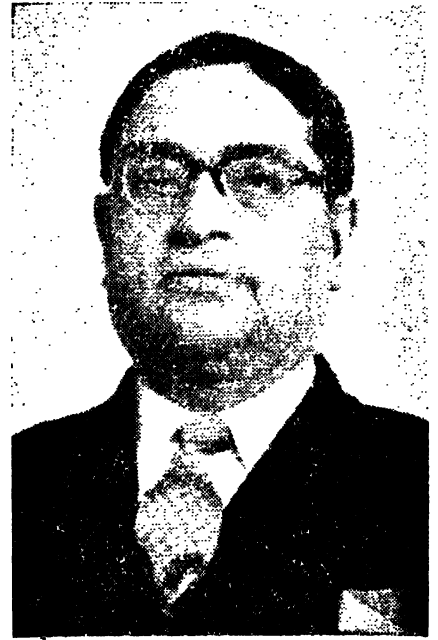
দিয়ে সবাইকে চমৎকৃত করেছেন। সম্প্রতি ভারত সরকার যে একটি Export Credit Committee নিযুক্ত করেন, তিনি তারও সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত রায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা প্রতিমা রায়ের নিকট বহুলাংশে ঋণী। ডায়োসেসন কলেজে পাঠ্যাবস্থায় প্রতিমা দেবীর সহিত শ্রীযুক্ত রায় পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তদবধি শ্রীযুক্ত রায় তাঁহার স্ত্রীর নিকট হ'তে প্রতি কার্য্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা লাভ করে উন্নতির ধাপে-ধাপে অগ্রসর হন। শ্রীযুক্তা রায় নিজেও একজন উৎসাহী সমাজসেবিকা। বর্ত্তমানে তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী সেবা-ভবন নামে একটি আবাসিক শিশু প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্রী। এই প্রতিষ্ঠানে থেকে প্রায় এক শত শিশু শিক্ষা ও নানা রকম কারিগরী কার্য্যে দক্ষতা অর্জ্জন করেছে।

এই কর্ম্ম-জীবনের ব্যস্ততা ও সাফল্যের মধ্যে দেশের অন্যান্য গঠনমূলক কাযেও শ্রীযুক্ত রায়ের সমান উৎসাহ। নানারূপ সামাজিক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত ইনি জড়িত। শিক্ষাক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ তৎপর। কলিকাতা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনি বি-কম ও এম-এ পরীক্ষার পরীক্ষক ; এবং ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিসটিকাল ইন্‌ষ্টিটিউটের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। বস্তুতঃ, সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্ব গুণের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় নিতান্ত বিরল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান কল্যাণীয়া যুঁইকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয় বার ইউরোপ পরিভ্রমণে গমন করেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করে অগাধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশে ফেরেন। এই অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞান দেশবাসীর কল্যাণে বর্ত্তমানে নিয়োজিত। বাংলা দেশ এখন নানা ভাবে দরিদ্র। রাজনীতিক্ষেত্রে নেতার অভাব, ব্যবসায় জগতে বাঙ্গালীর অনগ্রগতি এবং দেশ-বিভাগের ফলে সামাজিক ও জাতীয় জীবনে তার বিশৃঙ্খলা ও ভাঙ্গন। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীযুক্ত রায়ের মত একজন ব্যক্তি যে কোন দেশ ও জাতির গৌরব। দানে মুক্তহস্ত, সামাজিকতায় অকুণ্ঠচিত্ত, সৌজন্য ও শিষ্টাচারে অনবদ্য এই কর্ম্মবীর দীর্ঘজীবন লাভ করে বাংলা ও বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করুন।

কথাশিল্পী প্রবোধকুমার সান্যাল

[জীবন-পরিচিতি]

বাংলা সাহিত্যে প্রবোধকুমার সান্যাল নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর বিষয়-বৈচিত্র্য, সাবলীল বর্ণাঢ্য ভাষা ও বিশেষ ভঙ্গির জোরে। হৃদয়াবেগের দাক্ষিণ্যে তাঁর সাহিত্যে আমরা পাই একটি সুন্দর অন্তরঙ্গ পরিবেশ। ১৯০৭ সালে কলকাতায় প্রবোধকুমারের জন্ম হয়। তাঁদের আদিবাস ছিল পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর। কলকাতায় স্কটিশ চার্চ্চ স্কুল ও সিটি কলেজে তিনি শিক্ষা লাভ করেন।

ছেলেবেলায় স্কুলের খাতা ভরিয়ে নানা হিজিবিজি লিখতেন আর সেই হিজিবিজির মধ্যেই এক একটা এমন চমক-লাগান কথা এসে যেত যে, পরে নিজেই বিস্ময় বোধ করতেন। সেকালে স্কুলের পাঠ্যবই ছাড়া আর কিছু পড়বার হুকুম ছিল না তাঁদের। কিন্তু বাংলার শিক্ষকের কৃপায় ক্লাসে একবার একখানা হাতেলেখা মাসিক পত্রিকা বের হল। মাষ্টার মশাই হুকুম করলেন প্রত্যেক ছাত্রকে তাতে কুড়ি লাইনের মধ্যে একটা রচনা লিখতে হবে এবং তাতে সবচেয়ে দামী মনের কথা থাকবে। সবচেয়ে ভাল লেখার পুরস্কার হিসাবে প্রবোধকুমারকে পরের মাসেই এই পত্রিকার সম্পাদক করে দেওয়া হল। সাহিত্য-জীবনে এই ছিল তাঁর প্রথম পুরস্কার।

খুব অল্প বয়স থেকেই প্রবোধকুমার রীতিমত কবিতা লেখা সুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর দিদিমা রামপ্রসাদের গান ভালবাসতেন। প্রবোধকুমারও লুকিয়ে লুকিয়ে চেষ্টা করতেন রামপ্রসাদের মত শ্যামাসঙ্গীত লিখতে। স্কুলের বৃদ্ধ পণ্ডিত মশাই হঠাৎ মারা গেলে তাঁর শোক-সভায় ছাত্রদের পক্ষ থেকে কিছু লিখে পড়বার দায়িত্ব পড়ল তাঁর ওপর। অমিত্রাক্ষর ছন্দে একটি শোক-গাথা রচনা করে তিনি সেটা সভায় পাঠ করলেন এবং আশাতীত সুখ্যাতিও অর্জ্জন করলেন। গর্ব্বে তাঁর বুক ভরে উঠল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে আরম্ভ করার পর তাঁর কবিতা লেখার অভ্যাস কেটে গেল। ভাবলেন আর যাই হোক, কবিতা লেখার অপচেষ্টা আর কোন দিন করবেন না এবং মনে মনে কামনাও করলেন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর যেন কেউ কবিতা না লেখে।

দেশে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাইরে যখন নানা গণ্ডগোল চলছে, প্রবোধকুমার তখন কতকগুলো গল্পের বই এনে ঘরে বসে পড়তে থাকেন। কিন্তু পড়তে গিয়ে তাঁর মনে নানা প্রশ্ন উঠতো—এটা ওরকম না হয়ে, এরকম হল কেন? গল্পগুলো পড়তে অনেক সময় হয়তো ভাল লাগত, কিন্তু কেমন একটা অভাব বোধ করতেন। ফলে লেখকরা তাঁদের গল্প যেখানে শেষ করতেন, প্রবোধকুমারের কল্পনা আরম্ভ হত সেখান থেকে। এমনি করতে করতেই একদিন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মনেও কিছু কথা আছে, তাঁরও কিছু লেখার আছে।

গোপনে তিনিও এবার লিখতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে কি লেখেন তাই জানবার জন্য বাড়ীর লোকেরও কৌতূহলের আর সীমা নেই। তাঁর মা একদিন জিগ্যেস করলেন, কাগজ-কলম নিয়ে হিজিবিজি কি করিস? প্রবোধকুমার জবাব দিলেন, একটা গল্প লিখছি। গল্প? মা তো একেবারে ভয়েই অস্থির! ছেলেটা বুঝি এবার উচ্ছন্নে গেল। অতএব পরদিনই তিনি গেলেন আনন্দময়ীতলায় ঠাকুরের দরজায় মাথা খুঁড়ে জানালেন—ছেলের সুবুদ্ধি দাও মা! সকালবেলা পাছে

প্রবোধকুমার সান্যাল

তিনি লিখতে বসেন এইজন্য নানা ফাই-ফরমাসে তাঁকে ব্যস্ত রাখা হত। রাত্রে পাছে কাগজ-কলম নিয়ে বসেন, এই জন্য বড় বৌদি হয়তো বলতেন, দু'টো হারিকেনের চিমনিই ভেঙে গেছে।

কিন্তু লিখতে যে তাঁকে হবেই। কারণ, লেখার নেশা একবার যাকে পেয়েছে আর কি তার না লিখে উপায় আছে? অতএব বিকেলের দিকে রোদ একটু কমলে তিনি চলে যেতেন নারকেলডাঙা পেরিয়ে শিয়ালদার রেল-পথের উপর। সেখানে একটা সাঁকোর শান্-বাঁধানো জায়গায় একা বসে লিখতেন বা লেখার কথা ভাবতেন।

প্রবোধকুমার নিজে কিন্তু কোন দিন কোন লেখা নিয়ে সম্পাদক অথবা প্রকাশকের কাছে যান নি। কারণ, ছাপার অক্ষরে নাম বার করার জন্য কোন দৈন্য স্বীকার করতে তিনি রাজী ছিলেন না।

তবে সম্পাদকদের নামে তিনি ডাকে লেখা পাঠাতেন বাড়ীর সবাইকে লুকিয়ে। লেখা অমনোনীত হলে তা ফেরত পাবার জন্য ডাকটিকিটও সংগে দিতেন। আর লেখা পাঠাবার পরদিন থেকেই অধীর অসহ্য আগ্রহ নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতেন পথের দিকে তাকিয়ে, কখন ডাকপিওন আসবে। যথা নিয়মে লেখাটি ফেরৎ এলে সকলের অগোচরে সেটা লুকিয়ে ফেলতেন। তিন চার মাস পরে হয়তো জমান লেখাগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার সামনে চুপ করে বসে থাকতেন। যে-সব মেয়ে পুরুষকে অত যত্নে, অত আগ্রহে বুকের রক্ত দিয়ে গড়েছেন, তারা সবাই চোখের সামনে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, সে দৃশ্য নেহাৎ মন্দও লাগতো না!

কিন্তু তাই বলে লেখা পাঠানরও বিরাম ছিল না। লেখা পাঠান আর তা ফেরত আসে। অনেক লেখা আবার টিকিট দেওয়া থাকলেও ফেরত আসে না। কিন্তু একদিন এক মজার ঘটনা ঘটল। পিওন এসে একখানা মাসিকপত্র তাঁর হাতে দিয়ে গেল। পত্রিকাটির নাম তিনি কোন দিন শোনেন নি। কিন্তু খুলে দেখেন তাতে তাঁর একটা গল্প ছাপা হয়েছে। সমস্ত শরীর ঝিম-ঝিম করে উঠলো তাঁর উত্তেজনায়, রীতিমত কাঁপতে আরম্ভ করলেন তিনি। কোন দিন এই পত্রিকায় লেখা পাঠাননি, অথচ কেমন করে তাঁর গল্প ছাপা হল? তাঁকে গৌরব এনে দিল বটে, কিন্তু বোকা বানিয়ে দিল।

তখন মনে পড়ল, তাঁর এক বন্ধুর কাছে গোটা তিন-চার লেখা বছরখানেক আগে তার বাড়ীর লোকদের পড়তে দিয়েছিলেন, গল্পগুলোর কথা তার পর ভুলেও গিয়েছিলেন। এ লেখাটি তারই একটি। প্রবোধকুমারের জীবন নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। সমাজ ও সংসারের চিরাচরিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন নীতির বিরুদ্ধে তিনি আবাল্য বিদ্রোহী। ফলে আত্মীয়-বন্ধু থেকে অনেক আঘাত, উপেক্ষা ও অবহেলা সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দিনের মধ্যে তাঁর প্রথম জীবন কাটে, অনাহার উপবাস একদা তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন তিনি।

প্রথম জীবনে সামান্য চাকরি করতেন প্রবোধকুমার। ভারত সরকারের অধীনে সীমান্ত সৈন্য বিভাগে চাকুরি করেছেন তিনি, হুগলী ডাক বিভাগে সহকারী পোষ্টমাষ্টারও ছিলেন।

দুর্গম দেশে নানা দুর্যোগে দুঃসাহসিক কাজে, শিকার ও পার্ব্বত্য অভিযানে, সমস্ত রকম ব্যায়াম, খেলাধূলা, নৌকাচালনা ও বন্দুক ব্যবহারেও প্রবোধকুমার আবাল্য অগ্রণী। একাধিক বার সমুদ্রযাত্রা ও চার বার সমগ্র ভারতবর্ষ ও নেপাল পরিভ্রমণ করেছেন তিনি। দেশ ভ্রমণের নেশা তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। ছেলেবেলায় সমুদ্রপথে সুদূর আমেরিকা পাড়ি দিতে গিয়ে তিনি বর্ম্মা পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এই বিশাল পটভূমিকায় প্রবোধকুমারের সাহিত্য বিচিত্র ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। ক্রমে গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও লঘু প্রবন্ধ রচনাতেও অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়ে বাংলা সাহিত্যে তিনি তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ভ্রমণ কাহিনী 'মহাপ্রস্থানের পথে' বাংলা সাহিত্যের একটি অমর স্বাক্ষর।' বাংলা দেশের বহু-বিখ্যাত সাহিত্যিকের মত প্রবোধকুমারকে সাংবাদিক জীবন যাপন করতে হয়েছে। এছাড়া একাধিক পত্রিকার সম্পাদকতাও তিনি করেছেন। কিশোর বয়সে প্রবোধকুমার স্বয়ং একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে নিজের হাতে পথে পথে ফেরি করেছেন। অধুনালুপ্ত 'স্বদেশ' ও 'বিজলী' মাসিক পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'কল্লোল' পত্রিকার সংগেও তিনি যুক্ত ছিলেন। 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য বিভাগও তিনি সম্পাদনা করেছেন।

শশিভূষণ চৌধুরী

[অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ কলিকাতা, ভূতপূর্ব রীডার, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

বরেণ্য এই অধ্যাপক শশিভূষণ চৌধুরী ১৯০৫ সালের ১৭ই অক্টোবর আগরতলায় (ত্রিপুরা) মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কুমিল্লা জেলা স্কুলে তাঁর পড়াশুনার সূত্রপাত এবং ১৯২১ সালে ঐ স্কুল থেকেই প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় ইতিহাসে ভালো নম্বর পাওয়ায় ইতিহাস-অধ্যয়নে তাঁর অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং তখনই তাঁর ঐতিহাসিক হবার সংকল্প জাগে। ১৯২৩ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইতিহাসে অনার্স সহ কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে বি, এ শ্রেণীতে ভর্তি হন। অনার্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ইতিহাস নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ পড়তে শুরু করেন এবং ১৯২৭ সালে এম, এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-কালে তিনি প্রথিতযশা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের সস্নেহ সাহচর্যের সুযোগ লাভ করেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক ও গবেষক হিসাবে যে সুনাম অর্জন করেন, তার মূলে ডাঃ মজুমদারের অনুপ্রেরণা

শশিভূষণ চৌধুরী

ও উৎসাহ বর্তমান। শ্রীযুক্ত চৌধুরী বলেন, রমেশ বাবুর মতো আদর্শ ঐতিহাসিক ও শিক্ষকের সংস্পর্শে আসা, তাঁর ছাত্র হওয়া, সৌভাগ্যের বিষয়; গর্বেরও যে, তা বলাই বাহুল্য।

এম, এ পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে তিন বৎসরের জন্য গবেষণাবৃত্তি প্রদান করে এবং তিনি প্রাচীন ভারতের ভূগোল এবং জাতিসমূহ সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব কারমাইকেল অধ্যাপক ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী গবেষণায় তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেন। এ সময় তিনি Indian Antiquary, Indian Historical Quarterly, Calcutta Review প্রভৃতি বিভিন্ন ঐতিহাসিক পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ সালে অধ্যাপনাবৃত্তি গ্রহণ করায় তাঁর গবেষণা সম্পূর্ণ হয় না। বিভিন্ন কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি কাজ করেন। কিন্তু গবেষণার কথা তাঁর মন থেকে কখনো মুছে যায়নি।

১৯৪৬ সালে তিনি তাঁর গবেষণা সম্পূর্ণ করেন এবং ঐ বৎসরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী 'ডক্টরেট' অর্জন করেন। অধ্যাপক ও গবেষক হিসাবে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ইতিহাস বিভাগের 'রীডার' নিযুক্ত করেন, কিন্তু দেশবিভাগে ও অন্যান্য নানা কারণে তাঁকে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় চলে আসতে হয়। এখানে এসে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে শিক্ষাবিভাগে কার্যগ্রহণ করেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গত সাত বৎসর তিনি উক্ত কলেজে বিশেষ কৃতিত্ব ও সুনামের সঙ্গে অধ্যাপনা করে আসছেন।

ছাত্রজীবনে যেমন তিনি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সাহচর্যলাভে ধন্য হয়েছিলেন, কর্মজীবনে তেমনি তিনি আরেক জনের সংস্পর্শে এসে বিশেষ উপকৃত হয়েছেন। তিনি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব প্রধান ইতিহাস-অধ্যাপক ও অধুনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ইতিহাস-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশোভনচন্দ্র সরকার। শ্রীযুক্ত সরকারের সংস্পর্শে এসে তাঁর অধ্যাপনা ও গবেষণার নানা দিক খুলে যায়। ১৯৫৩ সালে ভারত সরকারের 'স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস' রচনার পরিকল্পনায় তিনি রমেশচন্দ্র মজুমদার ও সুরেন্দ্রনাথ সেনের গবেষণাকার্যে তাঁদের সহকারী নিযুক্ত হন। এ-সময় বৃটিশ আমলের ভারতবর্ষের ইতিহাসের বহু অব্যবহৃত ঐতিহাসিক উপাদান ও কাগজপত্র পড়বার সুযোগ পান। ডঃ চৌধুরী বলেন, ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করবার মতো বহু উপকরণ এখনো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। যে সমস্ত কাগজপত্র পড়বার সুযোগ তিনি পেয়েছেন, সুখের বিষয়, তার সদ্ব্যবহারও তিনি করেছেন। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে বেরিয়েছে তাঁর সাম্প্রতিকতম মনন-ভাস্বর গ্রন্থটি। Civil Disturbances during the British rule in India. তাঁর প্রধান সহকর্মী সুশোভনচন্দ্র সরকার এর একটি সুন্দর পরিচায়িকা লিখে দিয়েছেন।

ডঃ চৌধুরীর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র দু'টি। কিন্তু দু'টিই উল্লেখ্য রকমের মূল্যবান প্রথম গবেষণা-গ্রন্থ Ethnic Settlements in Ancient India বছর দুই হলো মুদ্রিত মূর্তি লাভ করেছে। ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী প্রমুখ দেশীয় এবং জার্মানীর বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ কিরফেল প্রমুখ বিদেশী পণ্ডিতবর্গ ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তাঁর এই গ্রন্থের। প্রাচীন ভারতীয় আদিবাসী এবং বহিরাগত জাতিসমূহ, যারা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল, তাদের সম্পর্কে সুন্দর একটি বিবরণ পাওয়া যায় এই বইতে। সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতের মোটামুটি একটি ভৌগোলিক চিত্রও পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ভারততত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে ডঃ চৌধুরীর এই গ্রন্থ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ডঃ চৌধুরীর অপর গ্রন্থ Civil Disturbances during the British rule in India গ্রন্থে তিনি সাধারণ্যে অপ্রকাশিত বিভিন্ন দলিল-পত্রাদিতে লিপিবদ্ধ ঘটনাবলীর সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের আগেও বৃটিশ-বিরোধী জনবিক্ষোভ বহুল পরিমাণে প্রকাশিত হয়েছিল। বৃটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের বিদ্রোহ-বহ্নি যে সিপাহী বিদ্রোহের অনেক আগে থেকে ধূমায়িত হচ্ছিল, বিশেষতঃ বাংলাদেশ, দাক্ষিণাত্য ও বোম্বাইয়ে, এই তথ্যাবিষ্কার ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে ডাঃ চৌধুরীর অন্যতম দান বলে স্বীকৃত হবে। বৃটিশ শাসনের একটা দিক খুলে যাওয়াতে এই বই সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করবেন ভবিষ্যতে, এই বই তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য। এ দু'টি বই ছাড়া Indian Historical Quarterly, Calcutta Review, Journal of Bihar Orissa Research Society, ইতিহাস প্রভৃতি বিশেষ পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

ছাত্রবৎসল ও ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ চৌধুরীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তিনি বলেন, আদর্শ ছাত্র তৈরী করা। তিনি বলেন, ছাত্ররাই তো আমার গৌরব! ছাত্রদের সুখ-সমৃদ্ধি, উন্নতি দেখলে আমাদের কত আনন্দ হয়। এ শুধু তাঁর মুখের কথা নয়, যাঁরাই তাঁর ছাত্র হবার গৌরব অর্জন করেছেন, তাঁরা তা জানেন, অনুভব করেছেন। বস্তুত, নিরহংকার, অমায়িক, সদালাপী এমন শিক্ষক আজকাল দুর্লভ। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র শশিভূষণ চৌধুরী, তাই হয়তো প্রাচীন ভারতের শিক্ষকের আদর্শকে তিনি রূপ দেবার জন্যে সচেষ্ট এবং প্রাণ-ঢালা অধ্যাপনা কা'কে বলে, তাও তাঁর কাছে যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের তা জানা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে ডঃ চৌধুরী প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন। আগামী-দিনের ছাত্রদের স্বদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে শিক্ষাদান ও সচেতন ক'রে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্তব্য। উদাহরণস্বরূপ মধ্যপ্রাচ্য, মধ্যএশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি দেশের ইতিহাস সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বর্তমান পাঠক্রমে না থাকার উল্লেখ করেন সক্ষোভে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর পাঠক্রমের আশু-পরিবর্তন হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে তিনি মনে করেন।

[মাসিক বসুমতীর পক্ষ থেকে সর্বশ্রী সুনীল ঘোষ, কল্যাণ দাশগুপ্ত ও সুখেন্দু দত্ত সংগৃহীত।]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৪

হোটেলের মালিক ভুতু বাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল সান্ত্বনার। আলাপের পরামর্শ দিয়েছিল পাগল-সর্দার। দিদিয়ার অনুরোধ মত একটা দুধলো গোরু সংগ্রহ করতে না পেরে একেবারে অকর্মণ্য মনে হচ্ছিল নিজেকে। বেচারীর সময় কম, খোঁজ করে কখন! মড়াইয়ের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর রাতে হাড়িয়া টেনে সুষুপ্তির কোলে ঢলে পড়ে। শুধু ও নয়। দলকে দল। মেয়ে-পুরুষ সকলে। আর মড়াইয়ে যারা কাজ করে না, অর্থাৎ যাদের সময় আছে, গায়গতরে প্রায় স্থবির, তারা। তবু এদের অনেককেই বলে রেখেছে সর্দার। সপ্তাহের ছুটির দিনে নিজেই যতটা সম্ভব খোঁজখবর করে। কিন্তু পছন্দমত পেয়ে ওঠে না। নিজের মেয়ে চাঁদমণিকেও বলেছিল। পাঁচ জায়গায় ঘোরে, পাঁচ ঘরের খবর রাখে। যদি কোন সন্ধান দিতে পারে। কিন্তু হতচ্ছাড়ি মেয়ে এমন জবাব দিয়েছিল যে, হাতের কাছে পেলে আচ্ছা করে দু'ঘা কশিয়ে দিত। গম্ভীর মুখে বলেছে, গোরু-টোরুর খবর সে রাখে না, তবে তার সন্ধানে একটা বলদ আছে বটে, হলে সেটাই দিদিয়াকে দিয়ে দিতে পারে। আঙুল দিয়ে ঘরের তৃতীয় ব্যক্তিটিকে দেখিয়ে দিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়েছে।

তৃতীয় লোকটি গোপুন।

এদিকে দেখা হলেই সান্ত্বনা জিজ্ঞাসা করে, আমার গোরু কি হ'ল সর্দার?

সর্দার মুখে আশ্বাস দেয় বটে, গোরুর মত গোরু পেলেই এনে দেবে। কিন্তু মনে মনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

পরের এক ছুটির দিনের সকালে উঠেই হঠাৎ গোরুর কথা আর ভুতু বাবুর কথা একসঙ্গেই মনে হল তার। এত দিন মনে হয়নি বলে নিজের ওপরেই রুষ্ট হল সে। সময় নষ্ট না করে সোজা চলে এলো দিদিয়ার কাছে।

ভুতু বাবু গোরু যোগাড় করে দেবে! সান্ত্বনা অবাক।

তু টুকচি চল না কেনে আমার সঙতে, উ ঠিক দিবে। পাগল-সর্দার নিঃসংশয় প্রায়।

সান্ত্বনা মুশকিলে পড়ল একটু। সকালের দিকটায় রান্নাবান্নার কাজ থাকে। ছুটির দিনে নরেনের এখানে খাওয়া বরাদ্দ বলে একটু বেশিই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু তারই জন্য এত আগ্রহ নিয়ে লোকটি এসেছে, ফেরাতে মন সরল না। ওদিকে এই রোদে নীচে নামবে শুনলে বাবার কাছেও বকুনি খেয়ে মরতে হবে। কিন্তু কি আর করা যাবে? চুপি চুপি রান্নাঘর বন্ধ করে চলে এলো সে। বাবা আপিসের কাগজ-পত্র নিয়ে বসেছেন, টের না-ও পেতে পারেন।

—শীগগির পা চালিয়ে চলো, চট করে ঘুরে আসতে হবে।

কিন্তু ভুতু বাবুর আপ্যায়ন এড়িয়ে চট করে ঘুরে আসাটা অত সহজ নয় জানত না।

কালো বেঁটেখাটো গোলাকৃতি মানুষ। হাত-পা চোখ-মুখ সবেতেই ফুলো-ফুলো একটু গোলাকার ভাব রয়েছে। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস, হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা, গায়ে বগল-ছেঁড়া আধময়লা নেটের গেঞ্জি।

সর্দারের সঙ্গে সান্ত্বনাকে দেখেই হাঁটুর কাপড় যতটা সম্ভব টেনে নামিয়ে ভুতু বাবু ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে উঠে দাঁড়াল। আনত অভিবাদন জ্ঞাপন করল দু'হাত জুড়ে।—আসুন, আসুন, কি সৌভাগ্য, বসুন। ত্রস্তে ময়লা ঝাড়ন এনে একটা বেঞ্চি ভালো করে ঝেড়ে-মুছে দিল। বসুন, এইখেনটায় বসুন।

তার ব্যস্ততায় আরো বেশি ব্যস্ত হয়ে সান্ত্বনা বসে বাঁচল।

প্রবেশ-পথের ধুলো-বালির ওপরেই সর্দার বসে পড়ল। দেয়াল-সংলগ্ন হুঁকোর মুখ থেকে কল্কেটা তুলে নিয়ে ভুতু বাবু তার হাতে দিল। নাও, তামাক খাও।

হৃষ্টচিত্তে সর্দার দু'হাতে কল্কে বাগিয়ে ধরে মুখে ঠেকালো। ভুতু বাবু সবিনয়ে এবং সহাস্যে সান্ত্বনার সামনে এসে দাঁড়াল।—আপনি এলেন, পরম সৌভাগ্য আমার! আপনি তো আমাদের ওভারসিয়ার বাবুর মেয়ে—চিনি চিনি, সকলকে চিনি আমি এখানকার। আর আপনাকে তো সবাই চেনে, এই ড্যামের যত্র-তত্র আপনার মত অত আর কে ঘোরে—বড় ভালো লাগে দেখতে।

লজ্জায় আর গরমে সান্ত্বনা রাঙিয়ে উঠেছে প্রায়। তামাকের কল্কেয় পাগল-সর্দারের নিবিষ্টতা দেখে মনে হল, কি জন্যে এসেছে তাই বোধ হয় ভুলে গেছে ও। হেসে বলল, আপনার কাছে কিন্তু একটা কাজের জন্য এসেছি আমি। সর্দার বলল, আপনি ছাড়া আর কেউ যোগাড় করে দিতে পারবে না।

অমায়িক হাসিতে ভুতু বাবুর গোল মুখ ভরে উঠল প্রায়। ওরা আমাকে জানে যে—দরকার হলে এই রাজ্যে এই ভুতুই বাঘের দুধও যোগাড় করে দিতে পারে। আপনি সে জন্য কিছু ভাববেন না, আগে একটু চা হোক।

—না, না, এখন আর চা নয়।

হাত জোড় করে ফেলল ভুতু বাবু। মা লক্ষ্মী শুধু-মুখে ফিরে গেলে ভুতুর দোকানে ঘুঘু চরবে—এই, শীগগির চা দে না এখানে—সর্দারকেও একটু দিস। কর্মচারীকে আদেশ দিয়ে ভুতু বাবু একটা টুল টেনে বসল।

নিরুপায়! সান্ত্বনা ভুতু বাবুর হোটেল আর দোকান পর্যবেক্ষণে মন দিল। দুটো ছাপরা ঘর। মাঝে দরজা। যেখানে তারা বসেছে সেটাকে হোটেল এবং রেস্তোরাঁ বলা চলে। তিন-চারটে তেলচিটে বেঞ্চি পাতা। সামনে ততোধিক মলিন একটা কাচের আলমারিতে কিছু খাবার সাজানো। কোণের দিকে মস্ত একটা মাটির উনুনে বড় এক হাঁড়ি ভাত চড়ানো হয়েছে। ওদিকের

ঘরটায় মণিহারী এবং মশলাপাতির দোকান। দেয়ালের দিকে একটা খাটিয়ার ওপর বিছানা গোটানো। একজন ছোকরা চাকর বিবর্ণ দু'টো ছোট কাচের গ্লাসে কেটলি থেকে চা ঢালার ব্যবস্থা করছে। ওই গ্লাসে চা খেতে হবে ভেবেই সান্ত্বনার অবস্থা কাহিল! আমতা-আমতা করে বলেই ফেলল, গেলাস দু'টো একটু গরম জলে ধুয়ে নিলে হ'ত—।

—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! টুল ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল ভূতু বাবু। ওরে এই ব্যাটা মুখ্‌খু—গরম জলে গেলাস না ধুয়েই তুই চা ঢালছিস? শীগগির ধুয়ে নে ভালো করে। আচ্ছা, দাঁড়া—

তাড়াতাড়ি এক টুকরো সাবান এনে নিজেই গ্লাস দু'টো ধুয়ে রঙ ফেরালো। পরে গরম জলে আর এক প্রস্থ ধুয়ে বলল, নে এইবার ঢাল চা—একটু জ্ঞানগম্যি যদি থাকত, যেন ওর মতই কেউ খাবে?

সঙ্কোচ সত্ত্বেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সান্ত্বনা। চায়ের গ্লাস এলো। আর একটা গেল পাগল-সর্দারের হাতে। কক্কে যথাস্থানে রেখে দিয়ে সাগ্রহেই চায়ের প্রতীক্ষা করছিল সে।

ভূতু বাবু টুলে ফিরে এসে সবিনয়ে বলল, একটু মিষ্টি বা নোনতা কিছু দিই?

সান্ত্বনা ব্যস্ত হয়ে বাধা দিল, না না, এখন আর কিছু না—

গ্লাস ধোয়ার ব্যাপার থেকেই ভূতু বাবু বুঝে নিয়েছে আর কিছু চলবে না। তাই জোর করল না। ওই চাকরটার ওপরেই ক্রুদ্ধ হল মনে মনে। দিলে ব্যাটা দোকানের প্রেষ্টিজটাই নষ্ট করে। অথচ এরই মধ্যে মনে মনে কত কথাই না ভেবে ফেলেছে। জেণ্টসম্যান' তার দোকানে অনেক আসে। কিন্তু 'লেডি'র পদার্পণ এই প্রথম। দেখাদেখি যদি কিছু কিছু মহিলার সমাগম হয় এমনি করে, তাহলে পর্দার আড়ালে টেবিল আর বেঞ্চি ফেলে একটা ক্যাবিনের মত করা যায় কি না ভাবছিল। কানের টানে মাথা আসে। মা-লক্ষ্মীদের টানে রেস্তোরাঁ জমে উঠতে কতক্ষণ!

—বেশ চা। ভূতু বাবুকে খুশি করার জন্যেই বলল সান্ত্বনা।

খুশিই হল। লজ্জাবিনম্র খুশির হাসি। একটুখানি ভালো জিনিস সংগ্রহ করার জন্য খেটে খেটে হয়রাণ হতে হয় আমাকে। আমার পরিবার তো সারাক্ষণই বলে, তোমাকে দিয়ে ব্যবসা হবে না, তুমি আশ্রম খোলো। আমি বলি, এ-ও তো আশ্রমই, নেহাত দু'টো পয়সা নিতে হয় বলেই নেওয়া।

হাসি চেপে সান্ত্বনা জিজ্ঞাসা করল, কাছেই আপনার বাড়ি বুঝি?

—বাড়ি এখান থেকে চোদ্দ মাইল দূরে। সপ্তাহে কি পনের দিন অন্তর হট করে এক-আধ দিন ঘুরে আসি। আসলে এই আমার ঘরবাড়ি হয়ে গেছে—এক পা নড়ার উপায় আছে? দেখলেন তো, একটু কথা বলছি আপনার সঙ্গে অমনি গরম জলে গেলাস না ধুয়েই চা ঢালতে বসে গেল হাঁদারাম।

গ্লাস ধোয়ার ব্যাপারে লোকটি বেশ আহত হয়েছে বুঝে সান্ত্বনা অপ্রস্তুত হল একটু। পাগল-সর্দার ওদিকে তার কোন চেনা লোকের সঙ্গে গল্প শুরু করেছে। ডেকে বলল, আমরা কি জন্য এসেছি এখনো বললে না তো সর্দার?

ভূতু বাবু বাধা দিলে, আপনি কিচ্ছু ব্যস্ত হবেন না, যে জন্যেই আসুন, এসেছেন যখন, পেয়েই গেছেন—এই ভূতুর কাছে কেউ কখনো না শোনেনি। চা'টুকু খেয়ে নিন আগে—আর একটু চা দিক?

বাকি চা'টুকু তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করে গ্লাসটা সরিয়ে রাখল সান্ত্বনা। না, আর না। আতিথেয়তা প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যই জিজ্ঞাসা করল, আপনি এখানে গোড়া থেকেই আছেন বুঝি?

জাঁকিয়ে বসল ভূতু বাবু। ছুটির দিনে দোকানের খুচরো খদ্দের থাকেই না প্রায়। ঢালা অবকাশ। জবাব দিল, একেবারে গোড়া থেকে। তিন রাত্তির পর নগদা পাঁচশ টাকায় এ জায়গা ডেকে নিতে সকলে হেসেছে। বলেছে, শুকনো পাথর ধুয়ে জল খেতে হবে—এখানে নাকি আবার ব্যবসা হয়! উৎফুল্ল নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা। ভূতুর হোটেল না থাকলে কি যে হ'ত, এখন সকলেই বুঝছে সেটা।

অর্থাৎ, এই হোটেল বিহনে এখানে ড্যামের পরিকল্পনাটাই ব্যর্থ হ'ত বললেও অত্যুক্তি হবে না। এর ওপর সান্ত্বনা উসকে দিল আরো। নরেন বাবুর মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি—তাঁর দু'বেলার খাবারও তো আপনার এখান থেকেই যাচ্ছে।

খুশিতে ভূতু বাবুর গোলাকার দেহ দুলে উঠল যেন। আমাদের ড্রাফটসম্যান্ নরেন চৌধুরী সাহেব? বলেছেন বুঝি?—অতি মহাশয় ব্যক্তি, খুব স্নেহ করেন আমাকে।

পাছে হেসে ফেলে, সেই ভয়ে মুখ বুজে থাকে সান্ত্বনা।

ভূতু বাবু বলে গেলেন, শুধু খাওয়া! প্রথম দিকে এই ড্যাম দেখতে এসে বিপাকে পড়ে কত গণ্যমান্য লোক রাত কাটিয়েছে এই হোটেল-ঘরে ঠিক নেই! দোকানপাট গুটিয়ে রাত্রিতে তাদের শোয়ার জায়গা করে দিতে হয়েছে এই ভূতুকেই। বলতে তো পারিনে, না জেনে-শুনে এসেছ যখন রাতভোর থাকো ওই আকাশের নীচে পাথরের ওপর বসে!

নিজের বদান্যতায় নিজেই গলে গলে পড়তে লাগল ভূতু বাবু। বেশ লাগছে সান্ত্বনার। কিন্তু আর বসা চলে না। বাড়ির কথা মনে হতেই এবারে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।—অনেক দেরী হয়ে গেল, সর্দার আমি চললাম কিন্তু—

তাড়া খেয়ে সর্দার গাত্রোত্থান করল। কাছে এসে সান্ত্বনাকেই জিজ্ঞাসা করল, ভূতু বাবু 'ডাংরা' মিলায়ে দিবে তো?

তার ধারণা আগমনের উদ্দেশ্য সান্ত্বনা এতক্ষণে নিশ্চয় ব্যক্ত করেছে। কিন্তু ভূতু বাবুর সুগোল দুই চোখ সেই অবলা জীবটির মতই হয়ে উঠল প্রায়। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে খানিক চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, ডাংরা—মানে আপনার কি গোরু চাই নাকি?

সান্ত্বনা মাথা নাড়ল, তাই বটে।

সর্দার জোর দিয়ে বলল, দিদিমার 'বেজাঁয়' দরকার, তু একটো 'বেশ ডাংরা' লিয়ে আয়, দিদিয়া কিনে লিবে। আমি দিদিয়াকে বুলেছি ভূতু বাবু ঠিক মিলায়ে দিবে।

ভাবনায় পড়ল ভূতু বাবু। এখানে হোটেল ফেঁদে বসার পর থেকে গোপনে এবং প্রকাশ্যে অনেককে অনেক কিছুই সংগ্রহ করে দিতে হয়েছে তাকে। হচ্ছেও। কিন্তু তা বলে গোরু! বোকার মত জিজ্ঞাসা করল, গোরু কি হবে?

—বাবার জন্যে সব সময় ঠিক মত দুধ পাইনে, তাই ভাবছিলাম বাড়িতে একটা গোরু রাখতে পারলে সুবিধে হত।

ভাবতে লাগল ভুতু বাবু। একটু আগে নিজের মুখে যে বড়াই করেছে তাতে আর পারব না বলা সাজে না। তার থেকেও বড় কথা, যে এসেছে তাকে নিরাশ করতেও মন সরে না। তাছাড়া, পারলে দু'পয়সা লাভের দিকটাও ফেল্‌না নয়। কি-ই বা এমন শক্ত কাজ, গোরু কি এ রাজ্যে নেই নাকি? বলল, আচ্ছা দেখি, এখানে তো আর পাওয়া যাবে না, সেই শহর থেকে আনতে হবে—কিন্তু খরচ তো একটু বেশি পড়ে যাবে?

সান্ত্বনা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, খুব বেশি?

—গেরস্থ বাড়ি থেকে পেয়ে গেলে তত বেশি পড়বে না—আচ্ছা সে যা হয় হবে, গোরু পেলে আপনার বাবার সঙ্গে না হয় কথা বলব'খন।

ব্যস্ত হয়ে বাধা দিল সান্ত্বনা, বাবার সঙ্গে কোন কথা বলতে হবে না, পেলে আমাকে জানাবেন, সর্দারকে দিয়ে খবর দিলেই হবে। আচ্ছা, আমি যাই আজ, কেমন?

চড়াইয়ের পথে যতক্ষণ দেখা গেল তাকে, ভুতু বাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। দিনগত পারম্পর্যের মধ্যে আজকের বৈচিত্র্যটুকু নিঃশব্দে রোমন্থন করতে লাগল।

পাগল-সর্দার তার নিজের কাজে চলে গেছে। পাহাড়ী রাস্তা ধরে সান্ত্বনা একাই উঠে আসছে হন্‌হন্ করে। এত দেরী হয়ে যাবে, কে জানত! সর্দারের ওপরেই তার রাগ হচ্ছে এখন। একটু যদি সময়ের জ্ঞান থাকত। নরেন বাবু এতক্ষণে এসে গেছে নিশ্চয়। —বাবার বকুনির হাত থেকেও রেহাই নেই আজ।

চড়াইয়ের পথে তাড়াহুড়ো করে উঠতে গেলে হাঁফ ধরে যাবে। তার ওপর কড়া রোদ। সান্ত্বনার সমস্ত মুখ তেতে উঠছে।

পিছনে গাড়ির শব্দে ফিরে তাকালো সান্ত্বনা। জিপ আসছে একটা। পথ ছেড়ে এক পাশ ধরে চলতে লাগল সান্ত্বনা। জিপ পাশ কাটিয়ে গেল। চালক এবং তার পাশে আর একজনকে।— ইস, ওকে যদি তুলে নিত···এখনো কতটা পথ—।

বিশ-পঁচিশ হাত এগিয়ে গিয়ে ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল জিপটা। চালকের আসনের লোক ঝুঁকে পিছন দিকে তাকালো। নীল সান্‌গ্লাসে চোখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার দিকেই চেয়ে আছে বোঝা যায়।

সান্ত্বনা ভড়কে গেল। কি সর্বনাশ! ওর মনের কথা শুনেছে নাকি! কাছাকাছি হতে লোকটি জিজ্ঞাসা করল, আপনি ওপরে যাচ্ছেন তো?

নিজের অজ্ঞাতেই সান্ত্বনার পা থেমে গেল। হাঁ না কিছুই বলল না।

প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, এ রাস্তা ধরে ওপরে ছাড়া আর কোথায় যাবে! আসুন, আমরাও যাচ্ছি, রোদ্দুরে আর হেঁটে কষ্ট করবেন কেন?

তার পাশের লোকটি আসন ছেড়ে টপকে পিছনে গিয়ে বসল। জিপ গাড়িতে মেয়েদের পক্ষে পিছনে গিয়ে বসার থেকে সামনে বসা সহজ বলেই বোধ হয়।

আপনারা যান, আমি হেঁটেই যাব। কিন্তু বলা হল না। লোকটি আবার ডাকল, আসুন, আমরা তো যাচ্ছিই ওপরে।

দ্বিধা কাটিয়ে উঠেই বসল সান্ত্বনা। মরুকগে, পাহাড়ের মাথায় উঠে তো নেমেই পড়বে। আলাপ না আছে না-ই আছে।

পাহাড়ী রাস্তায় এঁকে-বেঁকে জিপ চলল আবার। বাঁকের মাথায় ভদ্রলোককে এক একবার ঝুঁকতে হচ্ছে তার দিকে। কিন্তু নীল চশমায় চোখের দৃষ্টি ঠাওর করা যাচ্ছে না। সান্ত্বনা আড়চোখে বার কতক দেখে নিল তাকে। পিছনের লোকটির দিকেও তাকালো একবার। না, কখনো দেখেছে বলে মনে হল না।

কিন্তু কি মনে হতে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল সান্ত্বনা। —চীফ ইঞ্জিনীয়ার বাদল গাঙ্গুলী নয় তো! সে-ও তো জিপে ঘুরে বেড়ায় শুনেছে! সান্ত্বনা ঘেমে উঠল একেবারে। ঘাড় না ফিরিয়ে যতটুকু দেখা যায় দেখল আবার। চকচকে চেহারা, ঝকঝকে বেশবাস, হাতে সোনার ঘড়ি, সোনার ব্যাণ্ড, দু'হাতের আঙুলে একটা করে হীরের আঙটি। নীল চশমা সত্ত্বেও এবার চোখোচোখি হয়ে গেল। সান্ত্বনা কাঠ হয়ে বসে রইল অন্য দিক ঘেঁষে। আর দু'-তিনটে বাঁক পেরুলেই মেন্ কোয়ার্টারস্। নামতে পারলে বাঁচে এখন।

কিন্তু জিপ মেন কোয়ার্টারস্ ছাড়িয়ে যেতেই সান্ত্বনা অস্ফুটস্বরে বলল, আমি এখানে নেমে যাই···।

নীল চশমা ফিরে তাকালো আবার। কিন্তু রাস্তাটা বেঁকে গেছে বলেই সামনের দিকে লক্ষ্য করতে হল তক্ষুণি।—আপনি অবনী বাবুর মেয়ে তো?

মাথা নাড়ল, তাই বটে।

—পৌঁছে দিচ্ছি।

সান্ত্বনা চুপ আবার। ষ্টিয়ারিং-ধরা দুই হাতের হীরের আঙটি থেকে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। ইচ্ছে করছে, ঘুরে বসে লোকটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নেয়। কিন্তু মুখ তুলে তাকাতেও পারছে না।

দোরগোড়ায় জিপ থামতে বাইরের ঘর থেকে নরেন চৌধুরী গলা বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল। সান্ত্বনাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে বিস্মিত নেত্রে দরজার কাছে এগিয়ে এলো সে।

—নমস্কার মিঃ চৌধুরী, ভালো তো?

—নমস্কার, কি আশ্চর্য, আপনি কোত্থেকে?

সহাস্যে জবাব এলো, আপনাদের মেন্ কোয়ার্টারস্-এই যাচ্ছিলাম, ইনি রোদে কষ্ট করে উঠে আসছেন দেখে পৌঁছে দিলাম! চলি, কেমন—?

জিপ ঘুরিয়ে নিল।—প্রত্যাবর্তন। সান্ত্বনা এতক্ষণে সহজ হল যেন। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, কে এঁরা?

নরেন অবাক, তুমি চেন না?

—না তো!

—চেন না, অথচ গাড়ি চেপে চলে এলে?

—পাহাড় ভেঙ্গে উঠে আসছি দেখে গাড়ি থামিয়ে ডাকলেন তো কি করব? বলুন না কে?

—কন্‌ট্রাক্টর ঘোষ-চাকলাদার—একজন রণবীর ঘোষ, পিছনের জন দ্বিজেন চাকলাদার।

সান্ত্বনা মহা অপ্রস্তুত। একেবারে যেন বোকা বনে গেছে। বলেই ফেলল, ধ্যেৎ ছাই!

নরেন চৌধুরী নিরীক্ষণ করে দেখছিল তাকে;—তুমি কে ভেবেছিলে?

সান্ত্বনা আবারও লজ্জা পেল একটু। কে ভেবেছিল বললে এক্ষুণি ঠাট্টা শুরু হবে। কিন্তু গাড়ীতে আসার আনন্দটাই মিছি-মিছি মাটি হল। কে না কে, না জেনেই একেবারে কিনা কাঠ হয়ে বসে রইল সারাক্ষণ! কিন্তু আশ্চর্য্য, ওকে কিন্তু ঠিক চেনে।

এতক্ষণ বাদে বাড়ি ফেরার কথাটা মনে হতেই সচকিত হল। সিঁড়ির কাছ থেকেই ভিতর দিকে উঁকি দিল একবার। পরে প্রায় ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, বাবা কোথায়?

—ভিতরে। যাও এক হাত হবে'খন আজ।

ছোট মেয়ের মতই ভয়ে ভয়ে সান্ত্বনা জিজ্ঞাসা করল, খুব রেগে গেছে বুঝি?

—খু-উ-ব। তোমার মাসিমা না কা'রা সব এসেছেন—সেই থেকে সকলে অস্থির তোমার জন্য।

—মা-সি-মা! মুহূর্তের বিমূঢ়-বিস্ময়ভাব কাটিয়ে নরেনের গায়ের ওপর দিয়েই ছুটল ভিতরের দিকে। বাবার বকুনির ভয় ভাবনা রসাতলে গেল।

নরেন গিয়ে চেয়ারে বসল আবার।—অন্যমনস্ক। ভিতরের হৈ-হুল্লোড় কানে আসছে কিন্তু তার থেকেও বেশি কানে লেগে আছে কনট্রাক্টর ঘোষ-চাকলাদারের জিপের ঘড়-ঘড় শব্দটা।

সত্যিই মাসিমা!

সঙ্গে মাসতুত ভাই আর বোনও। ছুটে গিয়ে সান্ত্বনা গলা জড়িয়ে ধরল মাসির। আচমকা আক্রান্ত হয়ে অবস্থা সঙিন তাঁর। বললেন, খুব দরদ বুঝেছি, ছাড়—এতক্ষণ ছিলি কোথায় তুই?

জবাব না দিয়ে উৎফুল্ল আনন্দে সান্ত্বনা মাসিকে ছেড়ে ভাই-বোনকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করল এক প্রস্থ। তার কাণ্ড দেখে অবনী বাবুরও হাসি চাপা দায় হচ্ছে। কিন্তু হাসলে আর শাসন করা হয় না। বললেন, এই চনচনে রোদে সকাল থেকে কোথায় টো-টো করে ঘুরছিলি শুনি?

মাসির কোল ঘেঁষে বসে এই সব অপ্রিয় প্রসঙ্গ একেবারে বাতিল করে দিতে চাইল সান্ত্বনা।—কোথাও না, যাও। দেখলে মাসিমা, কোথায় তুমি এলে না বাবা আমাকে বকার ফিকির খুঁজছে!

অর্থাৎ, মাসি যখন এসেছে, যাই করে থাকি আর বকাবকির প্রশ্ন উঠতে পারে না। কিন্তু মাসিমাই উল্টো সুর ধরলেন।—হ্যাঁ রে, তুই নাকি দিন-রাত কাঠফাটা রোদ্দুরে আর হিমের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াস, অসুখ-বিসুখ হলে তখন?

সান্ত্বনা তাচ্ছিল্য করে জবাব দিল, হ্যা, অসুখ হলেই হল—।

অবনী বাবু বললেন, আমি বলে বলে হয়রাণ হয়ে গেছি, আপনি ওকে নিয়ে যান এবার—বিদেশে বিভূঁইয়ে ও একটা কিছু বাধিয়ে বিপদে ফেলবে আমাকে।

কিন্তু বোনঝি'র দিকে চেয়ে চেয়ে অসুখ-বিসুখের কোন সম্ভাবনার কথা মনেও হল না মাসির। বরং ফর্সা রঙের ওপর এক পোঁচ কচি শ্যামলের ছোপ লেগেছে। চোখে-মুখে হাসিতে খুশিতে নিটোল গ্রাম্য প্রাচুর্যের ছাঁদ এসেছে একটা।

প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যেই সান্ত্বনা বলল, তুমি সত্যি সত্যি এত শীগ্‌গির চলে আসবে মাসিমা, আমি একবারও ভাবিনি!

মাসিমা জবাব দিলেন, অত করে আসতে লিখেছিলি তাহলে অমনি বুঝি? কি দিয়ে কি করছিস সেই থেকে ভাবছি…। কিন্তু তোর বাবা যে তোকে নিয়ে যেতে বললে শুনলি?

আবার সেই কথাই এসে পড়তে সান্ত্বনা হতাশ নয়নে তাকালো তার বাবার দিকে।—তুমি যাও না বাবা ওঘরে, নরেন বাবু একলা বসে আছেন মুখ বুজে, গল্প করোগে।

সকরুণ অনুনয়ে সকলে হেসে উঠতে উৎফুল্লমুখে নিজেই উঠে দাঁড়াল সে। দাঁড়াও, আমিই ডেকে আনছি ভদ্রলোককে, লজ্জায় আসতে পারছে না, তুমি না থাকলে এতক্ষণে।

কথা শেষ না করেই চলে গেল এবং পরক্ষণে প্রায় জোর করেই নরেন চৌধুরীকে এ ঘরে নিয়ে এলো। হড়বড় করে বলে গেল, এই আমার মাসিমা—এই মাসতুত বোন—বোনের বিয়ের ভাবনায় মাসির চোখে ঘুম নেই—আর এই হল মাসতুত ভাই—খুব ভালো ছেলে, ক্লাসে একদিনও পড়া পারে না।

বাড়িতে পদার্পণ করেই মাসিমা একে দেখেছেন। অবনী বাবু আলাপও করিয়ে দিয়েছেন। এবারে অন্তরঙ্গতাটুকু চোখে পড়ল মাসির। পড়ল বলেই কয়েক নিমেষ নিরীক্ষণ করে দেখলেন তাকে। নরেন হাসছে মুখ টিপে।

—খুব পরিচয় করিয়ে দিয়েছিস, বোন আর ভাই দেখাবে'খন পরে তোকে—এঁকে একটা কিছু পেতে বসতে দে।

তকতকে মেঝের ওপরেই সমাসীন সকলে। নরেন চৌধুরীও খাকী ট্রাউজার টেনে অবনী বাবুর কাছাকাছি পা গুটিয়ে বসে পড়ল। পরে মাসির দিকে চেয়ে হেসে বলল, আপনি আসায় সান্ত্বনার আনন্দ বোধ হয় কড়াই থেকেও শোনা যাচ্ছে।

—যাবেই তো। সান্ত্বনার পরিচয় করানো শেষ হয়নি এখনো—তুমি একদিন রাগ করে আমাকে, বাবাকে, মা'কে, দাদুকে সক্কলকে নিয়ে কি একটা গান দিয়েছিলে না মাসিমা—পঞ্চতপার গুষ্টি? এই দেখো মূর্তিমান পঞ্চতপা! খুশিভরা দুই চোখ নরেনের মুখের ওপর সংবদ্ধ হল।—বুঝলেন না তো? মাথার ওপর সূর্যের তাপ, চারদিকে পৃথিবীর তাপ—এই পাঁচ তাপের মধ্যে বসে—এই! মেরুদণ্ড সোজা করে দু' চোখ বুজে যোগাসনের একটা নমুনা দেখাতে গিয়ে হেসে ফেলল। পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে বলল, শুধু ইনি নয়, মাসিমা, এঁদের চীফ ইঞ্জিনীয়ার থেকে সুরু করে পাগল-সর্দার পর্যন্ত সবাই তাই—সাধনার চোটে এই পাহাড়ী মরুভূমির ওপর দিয়েও তরতর করে জাহাজ চলবে দেখো'খন!

আর এক প্রস্থ হাসি।

অবনী বাবু বললেন, নে খুব হয়েছে এখন, বেলা কত হল খেয়াল আছে, খাওয়া-দাওয়া নেই আজ?

তড়াক্ করে উঠে দাঁড়াল সান্ত্বনা। সত্যিই একেবারে ভুলে বসেছিল। কিন্তু নরেন মাঝখানে ফোড়ন কাটল আবার। নিরীহ মুখেই অবনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করল, সান্ত্বনার খাওয়া হয়েছে?—মানে, বকুনি খাওয়া? সকাল থেকে এ পর্যন্ত কোথায় ঘুরছিল—

সান্ত্বনা তর্জন করে উঠল, ভালো হবে না কিন্তু! ঘর ছেড়ে দ্রুত প্রস্থান করল সে।

মাসতুত বোন আর ভাইও অনুসরণ করল। উঠলেন মাসিমাও, কিন্তু ছেলেটির প্রতি কৌতূহল বশতই উঠলেন না। এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। গ্রামের কথা, বাড়ির কথা, চাকরীর কথাও দু'-চারটে।

রান্নার ফাঁকে ফাঁকে সান্ত্বনা এক-একবার আসছে এ ঘরে। শেষে বাবাকে স্নানে পাঠিয়ে মাসির রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল সে। বলল, আমার রান্নাতেই ওই, মাসিমার হাতের রান্না খেলে একেবারে দ্রৌপদীর শোক উথলে উঠবে আপনাদের।

মাসি হেসে ফেলেও প্রায় ধমকের সুরেই বললেন, মেয়ের কথার ছিরি দেখো!

নরেন টিপ্পনী কাটল, এ কথা বলে আসলে রান্নার ব্যাপারটা আপনার ওপর চাপাতে চাইছে বোধ হয়।

সান্ত্বনা চা'ক বা না চা'ক, সে দু'দিন ছিলেন রান্নার ভার তিনিই নিলেন আর নরেনও যথারীতি দু'দিনই নিমন্ত্রিত হল। হৈ-চৈয়ের মধ্যে কাটল সে দিনটা। পরদিনও প্রায় তাই। আপিস-ফেরতা নরেন চৌধুরীকে বাহন করে, বলতে গেলে সান্ত্বনাই মহা উৎসাহে মাসি এবং ভাই-বোনদের ড্যামের কার্যকলাপ দেখাল শোনাল এবং বোঝাল। পাহাড়ে-পাহাড়ে ওঠা-নামা করিয়ে পায়ে ব্যথা ধরিয়ে দিল সকলের।

কিন্তু পরদিন রাত্রিতে সান্ত্বনার আনন্দ-প্রাচুর্যে একটা ছেদ পড়ে গেল যেন হঠাৎ।

একটু আগে সকলকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নরেন চলে গেছে। রাতের নাম মাত্র রান্না সেরে নেবার জন্য সান্ত্বনা রান্নাঘরে ঢুকেছে। ওদিকের ঘর থেকে বাবা এবং মাসির কথাবার্তা কানে এলো। ইতিমধ্যে সাংসারিক আলাপনের অবকাশ বড় পেয়ে ওঠেন নি মাসি। পরের দিন তাঁর চলে যাওয়ার কথা। তাই অবনী বাবুর সঙ্গে দু'টো কথাবার্তা কইতে বসেছেন।

তাড়াহুড়ো করে হাতের কাজ শেষ করছিল সান্ত্বনা। আর ভাবছিল, কাল মাসির যাওয়া বন্ধ করতে হবে। কাল কেন, পরশুও যেতে দেবে না।

ওদিক থেকে মাসির একটা সাদাসিদে মন্তব্য কানে এলো।—ছেলেটি বেশ, দিব্বি হাসিখুশি, একেবারে আপনার জনের মত।

—খুব ভালো, ভারী ভালো। অবনী বাবু বললেন।—এই বয়সে কত বড় চাকরী করে, একটুও অহঙ্কার নেই, একেবারে ছেলেমানুষ।

—কিন্তু ওরা চৌধুরী না কি শুনলাম, বামুন তো?

—বামুন···? কি জানি—। ভাবলেন একটু, বামুন নয় বোধ হয়···।

কণ্ঠস্বর বদলে গেল মাসির। একটু চুপ করে থেকে ঈষৎ উষ্ণকণ্ঠে বললেন, কোন্ জগতে যে বাস করছ তোমরাই জানো বাপু!

আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে একেবারে অন্য প্রসঙ্গ তুললেন তিনি।—তুমি তো আপাতত এখানেই থাকবে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু এখানে বসেই তুমি মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে মনে করো নাকি?

বিব্রত মুখে অবনী বাবু বললেন, তাই তো ভাবছি।

—কিছুই ভাবছ না। ভাবলে আর অমন নিশ্চিন্তে কাটাতে পারতে না! ভালো চাও তো মেয়েকে কালই আমার সঙ্গে পাঠি[য়ে] দাও, আমি চেষ্টা-চরিত্র করে দেখি। আর···এখানে এসব আমা[র] ভালও লাগছে না।

কি ভালো লাগছে না, সেটা অবনী বাবুর বোধগম্য হল না ঠিক। চেষ্টাও করলেন না বুঝতে। চিন্তিত মুখে বললেন, ও কি যাবে এখন, আপনিই বলে দেখুন না।

এদিকে সান্ত্বনার হাতের কাজ থেমে গেছে। দুই ভুরুর মাঝে কুঞ্চন-রেখা পড়েছে। দুই চোখ শূন্যের মধ্যে এক একবার ঘুরে এসে থেমে যাচ্ছে।

হঠাৎ সমস্ত ভিতরটাই যেন তিক্ত হয়ে গেল তার। মাসতুত বোনের একটু-আধটু চপল ইঙ্গিতের তাৎপর্যও সুস্পষ্ট হল এতক্ষণে। মনে হল, মড়াইয়ের এই উন্মুক্ত মুক্তির মধ্যে মাসিকে মানায় না, মাসতুত বোনকে মানায় না। তারা ভিন্ন গণ্ডীর মানুষ, তার মধ্যে নিয়ে পুরতে চাইছে ওকেও। ওর এই মুক্তি কেড়ে নিতে এসেছে। নরেন বাবুর প্রসঙ্গে কই তার তো কোন দিন কিছু মনে হয়নি! জেদী মেয়ের মত নিজের অধর নিজেই দংশন করতে লাগল একলা দাঁড়িয়ে।

রাতের খাওয়া দাওয়ার পর মাসি কথা পাড়লেন। কাল দুপুরেই কিন্তু যাচ্ছি রে সান্ত্বনা, তুইও এবার যাবি তো আমার সঙ্গে?

সান্ত্বনা প্রস্তুতই ছিল। একরাশ বিস্ময় প্রকাশ করে ফেলল। আমি! তুমি বলো কি মাসিমা, আমি গেলে বাবাকে দেখবে কে?

—তোর বাবাকে তুই চিরকাল আগলে রাখবি ভেবেছিস নাকি?

—ভেবেছি মানে? রাখবই তো।

—ভগবান করুন, রাখিস'খন। এখন তো চল, তোর বাবাই নিয়ে যেতে বলেছে।

সান্ত্বনা বাবার দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জবাব দিল, আমাকে বলে দেখুক একবার।

কিছু বলা দূরে থাক, মেয়ের কথায় বাপকে হাসতে দেখে অসন্তুষ্ট হলেন মাসি। আদর দিয়ে মেয়েকে একেবারে মাথায় তুলেছে। বললেন, বেশ, তোমাদের ভালো তোমরা বোঝো, আমি আর কিছুতে নেই।

এখানে সান্ত্বনাকে প্রথম দেখেই তিনি উপলব্ধি করেছেন ওকে নড়ানো যাবে না এখান থেকে। এ ক'মাসে ওর চেহারা নয় শুধু, ভেতরসুদ্ধু যেন বদলে গেছে।

পরদিন মাসি চলে গেলেন।

আর দু'টো দিন থাকার জন্য সান্ত্বনা মৌখিক অনুরোধও করতে পারল না একবার। উল্টে যেন স্বস্তির মত লাগছে।—এত দিন এত আদরে কাটিয়েছে মাসির কাছে, ভারী অকৃতজ্ঞ মনে হতে লাগল নিজেকে। কিন্তু যা হচ্ছে তা হচ্ছেই। হচ্ছে বলেই স্বস্তির সঙ্গে সঙ্গে এত অস্বস্তিও।

মাসি যাওয়ার পরেও ক'টা দিন গুম হয়ে কাটালো সান্ত্বনা। অকারণ বিরক্তিতে মন ছেয়ে রইল। আগের মত নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া আর ছড়িয়ে দেওয়ার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে ব্যাঘাত ঘটতে লাগল।

কিন্তু শীগগিরই এই গুমোট অসহিষ্ণুতা কেটে গেল আবার। কাটল পাগল-সর্দার আর ঝুনু বাবুর কল্যাণে। অপ্রত্যাশিত

বৈচিত্র্যে মাঝের এই ক'টা দিন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যেন। নিজেকে ফিরে পেল সান্ত্বনা।

সেও ছুটির দিন। তার বিগত ক'টা দিনের আচরণে মনে মনে বিস্মিত হচ্ছিল নরেন চৌধুরী। অবনী বাবুর সামনেই হাল্কা ভাবে বলেছিল, মাসি চলে গেলেন বলে একেবারে যে মুষড়ে পড়লে দেখছি—।

সান্ত্বনা ফস্ করে জবাব দিয়েছে, আনন্দে হাততালি দেব ?

—ও-ব্-বাবা ! তা তুমিও তো গেলেই পারতে মাসির সঙ্গে— দিন কতক না হয় তোমার ড্যাম সুপারভিশান বন্ধই থাকত।

আগে এ ধরণের ঠাট্টায় অনেক হেসেছে সান্ত্বনা। কিন্তু এই লোকের সম্বন্ধেই বিচ্ছিরি ভাবে সচেতন করে দেওয়া হয়েছে তাকে। আগের মত হাসতে পারা সহজ নয়। পারলও না।

এমন সময় দরাজ গলায় হাঁক শোনা গেল বাইরে।—দিদিয়া ! ই দিদিয়া —!

সান্ত্বনা বাইরে এসে দাঁড়াতেই উল্লসিত পাগল-সর্দার বলে উঠল, দিদিয়া, ভুতু বাবু ডাংরা লিয়ে আসলো—আরাঃ ডাংরা—ভাগে ডাংরা —নাওয়া ডাংরা—নাওরা তোয়া দিবে—!

আনন্দাতিশয্যে অনেকগুলি দুর্বোধ্য শব্দ বলে ফেলল পাগল-সর্দার। অর্থাৎ, ওই গোরু নিয়ে আসছে ভুতু বাবু, রাঙা গোরু, খাসা গোরু, নতুন গাইয়ের নতুন দুধ পাবে গো তুমি !

অদূরে বাঁকের মুখে চোখ পড়তেই সান্ত্বনাও সপুলকে বলে উঠল, ও মা তাই তো !

দশ বারো বছরের একটা গ্রাম্য ছেলে দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে গোরুটাকে। রাঙা গোরুই বটে। পিছনে একটা খড়ের বাছুর বুকে করে থপ থপ চরণে আসছে গোলাকৃতি ভুতু বাবু।

এক দৌড়ে ভিতরে চলে গেল সান্ত্বনা।—শীগগির এসো বাবা, কি সুন্দর গোরু এনেছে দেখে যাও—।

তক্ষুণি বাইরে চলে এলো আবার। গোরুটাকে অভ্যর্থনা করে আনার আগ্রহেই এগিয়ে গেল খানিকটা। কিন্তু খুব কাছে যেতে সাহস হল না চট করে। কাছাকাছি গিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপর সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল।

এত পরিশ্রম সার্থক হল যেন ভুতু বাবুর। ঘাম-দরদর মুখে একগাল হেসে বলল, ভুতুর অসাধ্য কম্ম নেই মা-লক্ষ্মী, দেখলেন তো ? পছন্দ হয়েছে ?

হাসিমুখে দুই চোখের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে থমকে গেল সান্ত্বনা —আ হা, ওর বাছুরটা মরে গেছে বুঝি ?

—হ্যাঁ, তাতে কি, এটাকে কাছে পেলেই ও খুশি, ভারী ভালো গোরু। নামও খাসা, সুন্দরী।

ওদিকে নরেন চৌধুরী বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। তার পিছনে অবনী বাবু। মেয়ে গোরু আনাবে করে করে শেষে সত্যিই এনে হাজির করবে এতটা ভাবেন নি বোধ হয়। ফ্যাল-ফ্যাল করে দেখতে লাগলেন তিনি।

বক্ষসংলগ্ন খড়ের বাছুর মাটিতে নামিয়ে দু'জনেরই উদ্দেশে বিনয়াবনত হল ভুতু বাবু। পরে সিঁড়ির ছায়ায় ধপ করে বসে পড়ে ঘাম মুছতে মুছতে বলল, মা-লক্ষ্মী নিজে গিয়ে বলে আসতে সেই থেকে খুঁজছি—তা গোরুর মত গোরুই পেয়ে গেলাম বটে সাক্ষাৎ যেন ভগবতী আশ্রয় করেছেন ওর মধ্যে।

নরেন হাসছে। অবনী বাবু চুপ। এই নতুন ঝামেলায় বিরক্ত হয়েছেন বোঝা যায়। টাকা কত গুণতে হবে সেটাও ভাবছেন !

জিজ্ঞাসা করতে হল না। ভুতু বাবুই বলল, অনেক ঝকাঝকি করে একশ পঁচিশে রাজি করিয়েছি, দিতে কি চায়—সবে প্রথম বিয়ান, এখন তো জীবনভোর দুধ দেবে। প্রসন্ন বদনে সান্ত্বনার দিকে চেয়ে বলল, খুব সস্তায় পেয়ে গেছেন মা-লক্ষ্মী।

কিন্তু মা-লক্ষ্মী তখন শঙ্কিত নেত্রে বাবার মুখভাব পর্যবেক্ষণে রত। খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। একশ পঁচিশ বেশি হল কি কম হল সান্ত্বনার ধারণা নেই। শুধু মনে হল একশ পঁচিশ অনেকগুলো টাকা।

মেয়ের মুখের দিকে চেয়েই বোধ হয় কিছু আর বললেন না অবনী বাবু। টাকা আনতে ভিতরে চলে গেলেন। উৎফুল্ল আনন্দে সান্ত্বনা এবার গোরুটার কাছে এগিয়ে গেল। ছেলেবেলা থেকেই গোরু নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। ভয় বিশেষ নেই। চিনলে দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে। তবু এই মুহূর্তে ওর গায়ে-পিঠে একটুখানি হাত দেবার লোভ সামলায় কি করে। গোরুটা একটু-আধটু নড়ে চড়ে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর গায়ে-পিঠে-কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সান্ত্বনা। নরেনকে বলল, কি ঠাণ্ডা চাউনি দেখেছেন ?

নরেন আর যাই হোক, গোরুর সমঝদার নয়। তবু ভালই লাগছে। ওকে খুশি করার জন্যেই গোরুটার বেশ কাছে গিয়েই দাঁড়াল সে-ও। হাত বাড়িয়ে একটু আদর করতে গেল তার পর।

কিন্তু ঝামেলা বাড়ছে দেখেই হোক বা বেশি আপ্যায়ন পছন্দ নয় বলেই হোক, হঠাৎ সিং নেড়ে অসন্তোষ জ্ঞাপন করে উঠল গাভীকন্যা।

—বাব্-বা ! এক লাফে প্রায় হাত তিনেক সরে এলো নরেন চৌধুরী।

খিল-খিল করে হেসে উঠল সান্ত্বনা। হাসতে লাগল পাগল-সর্দার আর ভুতু বাবুও।

সান্ত্বনা টিপ্পনী কাটলো, দেখলেন, ও লোক চেনে।

পাল্টা জবাব দিল নরেন চৌধুরী, চিনবেই তো, মা-লক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ভগবতীর আর তফাৎ কতটুকু ?

পাগল-সর্দার বুঝল না। কিন্তু প্রায় চার আঙুল জিভ বার করে ফেলল ভুতু বাবু। নিরুপায় রোষের অভিব্যক্তি সান্ত্বনার চোখে।

পথখরচা সমেত টাকা তুলে নিয়ে ভুতু বাবু প্রস্থান করতে অবনী বাবু এবার বললেন, মাসির সঙ্গে তোকে পাঠিয়ে দিলেই ভালো হ'ত দেখছি—তুই একেও গিয়ে ধরেছিলি গোরুর জন্যে ?

এখন কোন জবাব দেবে, এত বোকা নয় সান্ত্বনা। নিরীহ মুখে দাঁড়িয়ে রইল। পরে ইশারায় নরেনকে বলল, বাবাকে নিয়ে ঘরে যান না।

তাঁরা আড়াল হতে পাগল-সর্দারকে তাড়া দিল, ওর ঘর ঠিক না করে দিয়ে যেতে পারে না কিন্তু সর্দার।

সর্দার এক পায়ে প্রস্তুত। বলল, হেঁ, আখুনি হুব—

ঘর এক রকম ঠিক করেই রেখেছিল সান্ত্বনা। পিছনের দিকে ছাপরা-ঘরের মত আছে একটা। হয়ত চাকর বাকর থাকার জন্ত করা হয়েছিল। গৃহসংলগ্ন হলেও বিচ্ছিন্ন, পাশের সরু রাস্তা দিয়ে আলাদা প্রবেশ-পথও আছে।

গোয়ালঘরে পরিণত হল ওটাই। সর্দার খুঁটি পুঁতে দিল। তারপর পয়সা চেয়ে নিয়ে দড়ি টিন বালতি খোল ভুষি ইত্যাদি কিনে নিয়ে এলো। নতুন আলয়ে গৃহপ্রবেশ সম্পন্ন হল সুন্দরীর। যে ছোকরা ওকে টেনে নিয়ে এসেছিল, গোরুর জন্য অবনী বাবু তাকেই বহাল করলেন। দু'বেলা দুইয়ে দেবে, গোয়াল ঘর পরিষ্কার করবে, চরাতে নিয়ে যাবে। সান্ত্বনার মতে কিছুই দরকার ছিল না, সে নিজেই পারে সব। কিন্তু এখন এ সব নিয়ে বাবার কথার ওপর কথা কইলে নির্ঘাৎ বকুনি আছে কপালে। পরে ভেবে দেখল, লোক একজন দরকারও, গোরুর খাবার দাবার তো আর সে বয়ে আনতে পারবে না।

কিন্তু অদৃষ্টে বকুনি আছেই। প্রথম দিন কতক প্রায় আহার-নিদ্রাই ঘুচে গেল তার। ফাঁক বুঝে ছোকরাটাও ফাঁকি দিতে শুরু করল। কিন্তু সান্ত্বনা ওর পরোয়া করে ভারী। চরাতে নিয়ে যাওয়ার সময়েও সে সঙ্গেই থাকে। তার নির্দেশ মত কিছু দূরে পিছনের দিকের একটা খোলামেলা জায়গায় খুঁটিতে বাঁধা হয় গোরুটাকে। ঘাস খুব নেই। কাজেই জাবনার বালতিও আনতে হয় সঙ্গে। ভদ্রলোকের বিশেষ আনাগোনা নেই এদিকটায়। গ্রাম্য পথচারীরা শুধু এই পথে পাহাড় ডিঙিয়ে যাতায়াত করে। সঙ্কোচ এমনিতেই কম, সেটা আরো গেল। ছোকরাটা সময় মত না এলে গোরু আর বালতি নিয়ে এক একদিন নিজেই সে বেরিয়ে পড়ে।

ফলে জল ঘাঁটাও বাড়ছে, রোদের ধকলও যাচ্ছে। অবনী বাবু রীতিমত রেগে গিয়ে বললেন, একটু শরীর খারাপ হয়েছে কি তোকে আমি ঠিক পাঠিয়ে দেব এখান থেকে।

দু'-চার দিন সমীহ করে চলে সান্ত্বনা। তার পর যেই কে সেই। আবার একদিন বকুনি খায়।

কিন্তু অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় ব্যাপারটা ঘটল উল্টো রকম। অবনী বাবু হঠাৎ নিজেই পড়লেন অসুখে। দিন দুই সর্দি এবং জ্বরভাব, তারপর একেবারে শয্যাশায়ী।

সান্ত্বনা শাসন করল, নিশ্চয় ঠাণ্ডা লাগিয়ে আর রোদ লাগিয়ে অসুখটি এনেছ।

অবনী বাবু আর বললেন কি। হেসে ফেলেন।

কিন্তু ভোগালে বেশ। জ্বর সহজে ছাড়তে চায় না। এ সব কাজে বেশি দিন ছুটি নিয়ে বসে থাকাও চলে না। আবার না নিয়েই বা উপায় কি?

সরকারী ডাক্তার রোজ এসে দেখে যান। নরেন নিয়ে আসে সঙ্গে করে। ওষুধপত্রও এনে দেয়। বাবার মুখেই সান্ত্বনা শুনেছে, ছুটিছাটা বেশি চাইলে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের নাকি মেজাজ বিগড়ায়। কিন্তু নরেন থাকাতে এ ব্যাপার নিয়েও মাথা ঘামাতে হল না কিছু।

সেরে উঠলেন। কিন্তু বেশ কাহিল তখনো। বিকেলের দিকে সেদিন সান্ত্বনাকে বললেন, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আয়গে যা না—একেবারে ঘরে বন্ধ হয়ে আছিস। নরেনের উদ্দেশে বললেন, ওর সুন্দরী পর্যন্ত সময় মত দেখা না পেয়ে একেবারে অস্থির হয়ে আছে, খালি ডাকে।

নরেন আর এক প্রস্থ রঙ চড়ালো।—ড্যামের কাজও একদিন প্রায় বন্ধ বললেই চলে। একবার সুপারভাইজ করে আসবে চলো তা'হলে—।

—যাব না, যান। ঝাঁঝ দেখায় সান্ত্বনা, তার থেকে সুন্দরীকে নিয়ে বেরুব আমি।

নরেনের চোখে চোখ পড়তেই মা-লক্ষ্মী আর ভগবতীর ঠাট্টাটা মনে পড়ে বোধ হয়। তার চোখে আবার সেই ঠাট্টারই আভাস দেখে তাড়াতাড়ি সরে পড়ে।

সম্পদের দিন নয়, সান্ত্বনার মনে হল যেন এক যুগ পরে বেরিয়েছে। পাহাড় থেকে নেমে নিরিবিলি গাঁয়ের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেল।

কিন্তু নরেন অত হাঁটায় অভ্যস্ত নয়। বার বার ফেরার তাড়া দিতে লাগল। অগত্যা প্রত্যাবর্তনের পথ ধরে সান্ত্বনা বলল, আপনি এক নম্বরের কুঁড়ে, মোটেই হাঁটতে চান না।

—এইটেই বাড়ি পৌঁছে বাবার কাছে জোড়া থেকে হবে দেখ'খন।

সান্ত্বনা হাল্কা ভাবেই জবাব দিল, যাই বলুক, অসুখ করার কথা বাবা আর মুখেও আনবে না, খুব জব্দ হয়ে গেছে।

লোক হাসাবার জন্যেই নরেন টেস দিল, কিন্তু এই ছোটখাট অসুখটায় তোমার থাকলে কিছুটা সুবিধেই হয়েছে বলো?

কিন্তু সান্ত্বনার মেজাজ অন্যরকম এখন। রাগ-বিরাগের ধার দিয়েও গেল না। শুধু বলল, হাঁ হয়েছে, আপনার যেমন বুদ্ধি!

ফেরার পথে ভড় বাবুর হোটেলের পাশ কাটানো গেল না। নত অভিবাদন জ্ঞাপন করে একগাল হেসে পথরোধ করে দাঁড়াল। নরেনের দিকে চেয়ে সবিনয়ে বলল, একটু বসবেন না স্যার, একটুখানি চা—কাল সবে ফ্রেশ মাল এনেছি—

গম্ভীর মুখে নরেন চৌধুরী মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানাতে থেমে গেল। সান্ত্বনা একা থাকলে টেনে এনেই বসাতো। কিন্তু এই হোমরা-চোমরা মানুষগুলোর ধাত বুঝে চলতে হয় ভড় বাবুকে।

নিস্পৃহ প্রত্যাখ্যানে লোকটার জন্য কেমন মায়া হল সান্ত্বনার। মিষ্টি করে বলল, আজ দেরী হয়ে গেছে, আর একদিন এসে খাব, কেমন? আপনার গোরু কিন্তু চমৎকার হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে, একবারটি গিয়ে দেখে এলেন না তো?

ভড় বাবু হেসে বিগলিত।—খুব ভালো হয়েছে? আমি ভাবছিলাম কেমন না জানি হল। সবাই বলে আর জন্মে ভড় খালি ভালো খোঁজার তপস্যা করেছিল। যাক, নিশ্চিন্দি হলাম, হোটেল ছেড়ে এক দণ্ড নড়তে পারিনে তো, তবু নিশ্চয় যাব।

দু'-দশ পা এগিয়েই নরেন চৌধুরী মন্তব্য করল, ব্যাটা ঘঘু।

সান্ত্বনা বলল, খুব ভালো লোক। কি মনে পড়তেই হেসে সারা তারপর।—সেদিন বলছিল, আপনি নাকি খুব স্নেহ করেন ওকে—অতি মহাশয় ব্যক্তি আপনি।

নরেনও হেসে ফেলল। বলল, ব্যাটা বাস্তুঘুঘু, তোমার গোরুর একশ পঁচিশ টাকার অন্তত পঁচিশ টাকা ওর গহ্বরে গেছে।

—কক্ষণো না, আপনি মিছিমিছি বাড়িয়ে বলেন, বেশ ভালো লোক।

সে-কথার আর জবাব না দিয়ে সামনের চড়াইয়ের রাস্তাটার দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল নরেন চৌধুরী।—ট্রাকটাও যদি ছাই আসত এখন!

শুনেই কি মনে পড়ে যায় সান্ত্বনার। উৎফুল্ল মুখে বলে, ওই ঘোষ-চাকলাদার না কি কণ্ট্রাক্টারদের জিপটা এলেও তো হত—'

ভুরু কুঁচকে নরেন তাকালো একবার ওর দিকে।—এলেও সঙ্গে আমাকে দেখে নিরাশ হয়ে জিপ আর থামাতো না।

—ধেৎ, আপনার খালি ইয়ে! তেমনি হেসেই বলল, কি না জানি ওঁরা ভেবে গেলেন সেদিন, হঠাৎ এমন ঘাবড়ে গেলাম যে একটা কথাও বেরুল না মুখ দিয়ে।

—সেটাও ওদের খুব অপছন্দ হয়নি বোধ হয়?

—ফের! ভ্রূকুটি করে কয়েক পা এগিয়ে গেল সান্ত্বনা।

জিপ বা ট্রাক কিছুই নয়। মাঝামাঝি পথে দু'টি নারীমূর্তি। পাহাড়ের ধার-ঘেঁষা একটা বড় পাথরে সমাসীন। দৃষ্টি মড়াইয়ের দিকে। আবছা অন্ধকারে দূর থেকে ঠিক ঠাওর হল না। কাছে আসতে চেনা গেল। নরেন চৌধুরী অস্ফুট-কণ্ঠে বলে উঠল, এই সেরেছে!

বর্ষীয়সী মহিলাটিকে সান্ত্বনাও চেনে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের স্ত্রী মিসেস চ্যাটার্জী। সঙ্গের মেয়েটি সান্ত্বনারই সমবয়সী হতে পারে, কিছু বড়ও হতে পারে।

কাছাকাছি হতে দু'জনেরই চোখ পড়ল এদিকে। মহিলা দাঁড়িয়ে সানন্দে বলে উঠলেন, আপনার কোয়ার্টারেই যাব ভাবছিলাম মিঃ চৌধুরী, আপনার সঙ্গেই দেখা—! সান্ত্বনার দিকে কটাক্ষপাত করে নিয়ে আবার বললেন, বেড়াতে বেরিয়েছিলেন নাকি? কত দূর গেলেন? আমি নীচে নামলে আর একবারে উঠতেই পারিনে, হাঁপিয়ে পড়ি।

নরেন দাঁড়িয়ে সবিনয়ে হাসতে লাগল শুধু।

—কই রে ঝর্ণা এদিকে আয়, আলাপ করিয়ে দিই। আমার মেয়ে ঝর্ণা এম-এ পড়ে কলকাতায়—ছুটিতে এসেছে।—ইনি এখানকার ইঞ্জিনীয়ার ড্রাফটসম্যান নরেন চৌধুরী—এঁর কাছেই যাব বলছিলাম তোকে।

যথারীতি নমস্কার-বিনিময়। সান্ত্বনা মেয়েটিকেই দেখছে চেয়ে চেয়ে। ছিপছিপে, চকচকে। চশমার নীচে ঝকঝকে চকিত দৃষ্টি।

ঝর্ণা মাকেই জিজ্ঞাসা করল, আর ইনি?

—ও, এই—আমাদের এখানকার একজন ওভারসিয়ারের মেয়ে—কি নাম যেন তোমার?

—সান্ত্বনা।

মেয়েটি এম, এ পড়ে শুনে গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না প্রায়। দু'হাত তুলে মিষ্টি হেসে ওকেও যে নমস্কার জানাবে ভাবেনি। তাড়াতাড়ি হাসি টেনে কোন প্রকারে প্রতি-নমস্কার করল সান্ত্বনা।

—কাল বিকেলে আপনাকে চায়ের কথা বলতে আপনার কোয়ার্টারে যাচ্ছিলাম মিঃ চৌধুরী! মিসেস চ্যাটার্জী বললেন, আসতে হবে—মিঃ গাঙ্গুলিও কথা দিয়েছেন আসবেন।

শুনেই নরেন চৌধুরী হতাশার ভঙ্গি করল একটা। কাল? কি দুর্ভাগ্য, কাল যে এক বিশেষ কাজে আটকে আছি!

—সে কি! না, না—সন্ধ্যের দিকে আসুন তাহলে, তখন তো আর কাজ নেই? মোলায়েম আন্তরিকতা।

—আর বলেন কেন, কাজ একেবারে সেই রাত পর্যন্ত। তাতে কি, আর একদিন হবে'খন। ঝর্ণা দেবীর তো ছুটি আছেই এখনো, যে কোন দিন গিয়ে চড়াও হব। চলি, নমস্কার, নমস্কার! আপনি বসুন, একেবারে অতটা ওঠা নামা হার্টের পক্ষেই ভালো নয় খুব। এসো সান্ত্বনা—

অপেক্ষা না করে হাঁটতে শুরু করে দিল ওরা। খানিকটা এগোবার পর সান্ত্বনার বোবা মুখ খুলল। চীফ ইঞ্জিনীয়ার, ওঁর বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্নে যাবেন কাল?

—নেমন্তন্ন হলে আর যাবে না কেন?

—আর আপনি যাবেন না? বিস্ময় এবং হতাশা।

—কি করে যাই, শুনলে তো কাজ আছে।

—ছাই কাজ, কি এমন কাজ শুনি?

—প্রথম কাজ, রায় মশায় কেমন আছেন না আছেন খবর নেওয়া, দ্বিতীয়, তোমার সঙ্গে আড্ডা দেওয়া—কাল আর বেরুনো হবে না, বাড়ি বসেই আড্ডা দিতে হবে, হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে কেলেঙ্কারী!

পা থেমে গেল সান্ত্বনার। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেও পারল না বোধ হয়। আপনি তাহলে মিছে কথা বলে এলেন ওঁকে?

—কেন এগুলো কাজ নয়? দাঁড়ালে কেন, এসো।

—কি যাচ্ছেতাই লোক আপনি! দাঁড়ান, দেখা হলে বলে দেব। নেমন্তন্ন নিলেন না কেন?

—নিলে কি হত?

—আমি শুনতে পেতাম সব।

নরেন হেসে বলল, সেটা নেমন্তন্নে না গিয়েও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমাকে ঠিক ঠিক শুনিয়ে দিতে পারি।

—ছাই পারেন, আপনি একটি মিথ্যে কথার জাহাজ। দেখা হোক না, ঠিক বলব আমি—ভদ্রমহিলা অত করে বললেন।

জেনারেল কোয়ার্টারের বাঁকা পথে পা বাড়িয়ে নরেন চৌধুরী সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, ভদ্রমহিলা মনে মনে খুশিই হয়েছেন।

—কেন?

—মাথাটি তোমার নীরেট না হলে বুঝতে, চায়ের উদ্দেশ্য মেয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করানো। একলা একজনকে নেমন্তন্ন করলে সদিচ্ছাটা বড় বেশি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাই আমাকে বলা। এখন সব দিক বজায় রইল, বাদল এলেই প্রথমে জানাবেন, মিঃ চৌধুরীকে অত করে বললাম, তিনি আসতে পারলেন না—ব্যস্, নরেন চৌধুরীকে দরকার ওখানেই শেষ—তার পর অখণ্ড অবকাশ। কিন্তু সুবিধে হবে না—মেয়ে জাতটাকেই এখন কি চোখে দেখে লোকটা, জানলে আর এগোতেন না মহিলা।

আভিজাত্যের এ দিকটা সান্ত্বনার জানা নেই খুব। ঘাড় ফিরিয়ে হাঁ করে সে চেয়েই রইল নরেনের মুখের দিকে। শেষের কথাগুলো ভালো করে কানেই গেল না বোধ হয়!

এই মতলব?

বাড়ি ফিরে কাজের ফাঁকে ফাঁকেও বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করছে সান্ত্বনা। ভারী মজা লাগছে ভাবতে! হাতের কাজ ভুলে পার্টির প্রহসনটা সকৌতুকে কল্পনা করতে চেষ্টা করছে এক একবার। কিন্তু মানুষটাকে তো চোখেই দেখেনি, পারবে কি করে। মেয়েটা তেমন সুন্দরী না হলেও বেশ কিন্তু। আবার একটা বিপরীত অনুভূতিও জাগছে থেকে থেকে। এত কালের এত বড় এক মরু অভিশাপ দূর করতে বসেছে যে মানুষ—তার সঙ্গে ওই মেয়ে!—

নাঃ। সে'ও আবার কেমন লাগছে যেন! [ক্রমশঃ

(স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী)

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

চতুর্থ খণ্ড—সেবার্থিনী

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

সেবার উদ্যোগ

রাজগৃহ হইতে বাঁকিপুর ফিরিবার কিছুকাল পরেই উড়িষ্যার শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও তোমার আতিথ্য স্বীকার করিলেন। তোমার গৃহখানি দেখিয়া বলিলেন, "এই তো তীর্থ! গয়া-কাশী ঘুরিয়া আসিলাম, এমন তীর্থ তো আর কোথাও দেখি নাই।" রাওজী প্রাতঃকালে উপাসনায় বসিয়াছেন, উপাসনার পরেই গয়া যাত্রা করিবেন। যাত্রার সময় প্রাতঃকাল ৭টা। এই সময়ের মধ্যে উপাসনার পূর্ব্বে তাঁহাকে কিছু না জানাইয়া রান্না আরম্ভ করিয়া ভৃত্যকে আদেশ দিয়া আসিয়াছিলে, যে আহার প্রস্তুত হইলে তৎপ্রতি যেন দৃষ্টি রাখে। যেমন উপাসনা হইল, অমনি আহারের স্থান প্রস্তুত হইল, ওদিকে ঘোড়ার গাড়িতে দ্রব্যাদি উঠিতে লাগিল। বন্ধু রাওজী আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আহার করিলেন। তাঁহার সন্তোষ দেখিয়া আমরা কত কৃতজ্ঞ হইলাম। তোমার আতিথ্যে সরলতা ও আদর মিশান থাকিত বলিয়া সে আতিথ্য গ্রহণে কাহারও সঙ্কোচ হইত না।

আধ্যাত্মিক বিবাহের পর নানা ভাব হৃদয়ে লইয়া আমরা আপনার কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। তুমি করিবে কি? দেবকন্যা স্বর্গের ধন লাভ করিয়াছ, কি রূপে তাহা অপরকে দিবে, পরস্পরে এ আলোচনা করিতে লাগিলাম। যাহা লাভ করিলে, অন্যে যদি তাহার অংশ না পায়, তোমার পাওয়া তো সার্থক হয় না। ভাবিতে ভাবিতে তোমার "পরিবারের" সূত্রপাত হইল। তখন জানিতাম না যে, উহার নাম "পরিবার" হইবে!

মোকামার ভাই অপূর্ব্বকৃষ্ণের বাড়ীকে তুমি আপনার বাটী মনে করিতে। তেমনি দানাপুরের ভাই ষষ্ঠীদাসের বাড়ীটিও তোমার নিজের বাড়ী ছিল। তুমি ভাই অপূর্ব্বকৃষ্ণের বাড়ীকে পূর্ব্বের ও ভাই ষষ্ঠীদাসের বাড়ীকে পশ্চিমের ঘর বলিতে। এইবার তুমি একবার তোমার পূর্ব্বের ঘরে গিয়া দেখিলে, যে সেখানে গেলাত বাবুর কন্যা সুকুমারীর লেখাপড়া হইতেছে না। পশ্চিমের ঘরেও সেই অবস্থা; ভাই ষষ্ঠীদাসের কন্যার ক, খ শেখা হইয়াছে মাত্র। নারীর অজ্ঞানতা তোমার এত ভয়ানক বোধ হইত, যে তাহা দেখিয়া কখনও তুমি স্থির থাকিতে পারিতে না। গরীব ব্রাহ্মদিগের পক্ষে কলিকাতায় কন্যাদের রাখিয়া লেখাপড়া শেখান এক প্রকার অসম্ভব। তুমি বুঝিলে, এ মেয়ে দু'টির জ্ঞানাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে। তুমি বলিলে, বাঁকিপুরে নিজ বাটীতে বোর্ডিং খুলিবে। তাহাই হইল।

২১শে মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯১) বোর্ডিং স্থাপিত হইল। এই দুই কন্যাকে লইয়া নিজে শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ করিলে। কিন্তু এ অতি কঠিন কাজ। এ তো আর গৃহস্থালী নয়, রান্নাবান্না নয়, যে পিতামাতার বা আত্মীয়স্বজনদিগের নিকট হইতেই ইহার সমুদয় প্রণালী অবগত হইবে। ভিন্ন পরিবারের কন্যাদের একত্র রাখিতে হইলে কি কৌশলে রাখিতে হয়, সে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দিন কয়েক পরিশ্রম করিয়াই বুঝিলে, যে এই কাজটি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিবার জন্য হৃদয়মনের আরও বিকাশ ও চরিত্রের আরও বিশেষ সাধন প্রয়োজন। তাই স্থির করিলে, কিছু কালের জন্য লক্ষ্ণৌ নগরীস্থিত Miss Thoburnএর প্রতিষ্ঠিত Women's Collegeএ যাইবে এবং সেখানে ছাত্রীরূপে শাসনাধীন থাকিয়া কন্যাদের কিরূপে চালাইতে হয় তাহা শিক্ষা করিবে; আর যদি সম্ভব হয়, কিছু ইংরাজীও পাঠ করিবে।

কিন্তু এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা একজন বয়স্কা সন্তানবতী গৃহিণীর পক্ষে সহজ নয়। তুমি স্বামীর পরম সহায়, পাঁচ সন্তানের মাতা, অনেক দাসদাসীর উপরে কর্ত্রী। তোমাকে এ সকল ছাড়িয়া অপরের কন্যার শিক্ষার জন্য গৃহত্যাগ করিতে হইবে, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের নিয়মাধীন হইয়া চলিতে হইবে; সেখানে স্বদেশবাসী অপর ব্রাহ্মব্রাহ্মিকার সঙ্গে থাকিতে পাইবে না, হয়তো ব্রাহ্মসমাজেও যাইতে পাইবে না; এ সকল জানিয়া শুনিয়াও উন্মাদিনীর মত দূরদেশে চলিলে। যাইবার সঙ্কল্প করিবার সময় তোমার গৃহের তত্ত্বাবধান কে করিবে, সেজন্য তোমার আশঙ্কা হইল না। কোথা হইতে এত খরচ আসিবে, তাহারও ভাবনা করিলে না। গৃহে দ্বিতীয় এমন কোনও বয়স্কা নারী ছিলেন না, যিনি তোমার অনুপস্থিতিতে সন্তানদিগের আহারাদির তত্ত্বাবধান করিতে পারেন। মাসিক আয়ে তখনই স্বচ্ছল ভাবে ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না, তোমাকে বিদেশে সভ্য মেমদিগের মধ্যে থাকিতে হইলে কত খরচ হইবে, ও সে খরচ কোথা হইতে আসিবে, তার জন্যও একটুমাত্র চিন্তিত হইলে না। কোনও বাধা তোমায় বাধা দিতে পারিল না। তোমার এ যাত্রার প্রস্তাব শুনিয়া কেহ হাসিলেন, কেহ আশ্চর্য্য হইলেন। যাঁহারা জানিতেন তোমার উদ্দেশ্য কি, তাঁহারা সম্পূর্ণ সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সহানুভূতির দ্বারা এবং কার্য্যতঃ তোমার এই সঙ্কল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন।

সুদীর্ঘ মিলিত জীবনে যে তুমি নিত্য আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতে, যে তুমি কি রাজধানীতে, কি গ্রামে, কি কার্য্যক্ষেত্রে, কি উৎসবে, নিরন্তর আমার ছায়ার মত সঙ্গে ছিলে, কখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারিতে না, সেই তুমি আজ কত দিনের জন্য কত দূরদেশে চলিলে! বনের পাখী অনেক দিন পোষা পাখী হইলে সে কত প্রিয় হয়! তুমি পরের মেয়ে আমাদের ঘরে আসিয়া আপনার গুণে সকলকে মোহিত করিয়াছিলে। তোমাকে দূরদেশে পাঠান আমার পক্ষে কত কঠিন ছিল, তাহা তুমি জানিতে। কিন্তু এখন তুমি আর শুধু আমার নও। আমার জন্য তোমাকে আবদ্ধ রাখিতে চাহিলাম না; উড়াইয়া দিয়া, উড়িতে দিয়া আক্ষেপ করিলাম না; উড়িতে গিয়া তুমিও আক্ষেপ করিলে না। দেখি

এই কি আমরা সেই দুজন, যাহারা বিদায় লইতে হইলে পূর্ব্বে নিরাশ্বাস হইয়া ক্রন্দন করিতাম? এবার অশ্রুজল কোথায় গেল? ব্রহ্মকৃপাতেই ইহাও সম্ভব হইল। হাসিমুখে আমরা বিদায় লইলাম।

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯১ তুমি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলে। সে দিন প্রাতঃকালে খুব ভাল উপাসনা হইল; প্রিয় দামোদর নূতন একটি গান রচনা করিয়াছিলেন। আমি আরা পর্য্যন্ত তোমাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম। সেখানে অনেকে তোমাদের দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি সেখান হইতে বিদায় লইলাম। শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসু মহাশয় তোমাদের সঙ্গ লইয়া লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত যাইবেন; এই স্থির ছিল। সকলে তোমায় প্রণাম করিলেন। আমি কি করিলাম তাহা অবশ্যই তোমার মনে আছে; তোমার মস্তকে চুম্বন করিলাম। পিতা যেমন অবাধে সকলের সম্মুখে কন্যার মস্তক চুম্বন করেন, আমিও তেমনি করিলাম। সকলের সম্মুখে কুলবধূর মস্তক চুম্বন, এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! সকলেই বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কেহ কিছু বলিলেন না। এই পবিত্র চুম্বনে আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। এরূপ যে করিতে হইবে তাহা পূর্ব্বে ভাবি নাই, কল্পনাও করি নাই। যেমন মনে হইল, তোমাকে ইঙ্গিত করিলাম, তুমিও মাথা বাড়াইয়া দিলে, আমি পবিত্র চুম্বনে সুখী হইলাম। আর দুইবার সকলের সম্মুখে চুম্বন করিয়াছি। যখন দেহত্যাগ করিলে, তখন একবার মস্তক চুম্বন করিলাম, আর শেষ শয্যায় গঙ্গাতীরে অগ্নি দিবার পূর্ব্বে ললাট চুম্বন করিয়াছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তোমার চক্ষেও জল আসে নাই, আমিও আক্ষেপ করি নাই। তোমাদের গাড়ী হু হু করিয়া চলিয়া গেল, আমরা ঘরে ফিরিলাম। তোমার অনুপস্থিতিতে ভাই ষষ্ঠীদাস তোমার বালিকাবিদ্যালয়ের ভার লইলেন। সেটি গণ্ডগোলে উঠিয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্ণৌ কলেজে দৈনিক জীবন

লক্ষ্ণৌ কলেজে যখন তুমি উপস্থিত হইলে, তখন গ্রীষ্মকাল। সকালে স্কুল হইত। দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে ছুটী পাইতে। আহারাদি বোর্ডিং-এর ভৃত্যেরা প্রস্তুত করিত। সকল মেয়েরা একত্র আহার করিতে বসিত। বাসন তোমাদিগকেই মাজিতে হইত। আলো জ্বালিবার তেল প্রত্যেককেই ক্রয় করিতে হইত। স্নানের জন্য গরম জল চাহিলে তার জন্য দু'পয়সা অতিরিক্ত দিতে হইত। তুমি নিজের ঘরে আগুনের বন্দোবস্ত করিয়া জল বসাইয়া রাখিয়া অন্য কাজ করিতে যাইতে। গরম হইলে তাহা স্নানের জন্য ব্যবহার করিতে। সেখানে তোমার দৈনিক কাজ এইরূপ ছিল,—৪।০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত উপাসনা। ৫টা হইতে ৬টার মধ্যে খাওয়া, বস্ত্র পরিধান ও ঘর পরিষ্কার করা। ৬টা হইতে ১০।০টা পর্য্যন্ত স্কুল। ১০।০টা হইতে ১২টার মধ্যে স্নান, আহার ও বিশ্রাম। ১২টা হইতে অপরাহ্ণ ৫।০টা পর্য্যন্ত পাঠ। ৫।০টা হইতে ৬টার মধ্যে আহার। ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত নামপাঠ ও গান। ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত পাঠ। ১০।০টা হইতে ১১টার মধ্যে গান ও শয়ন।

মিস থোবর্ণ তোমাকে অন্যান্য ছাত্রীর মতন নিয়মের অধীন করিয়া রাখিতে চাহিতেন না। তুমি কিন্তু পূর্ণমাত্রায় নিয়মের অধীন হইয়াই চলিতে। তোমার সঙ্গে শীঘ্রই তাঁহার অতিশয় বন্ধুত্ব হইল। তিনি তোমাকে ছাত্রীর মতন না দেখিয়া আপনার ভগিনীর মতন দেখিতে লাগিলেন। তোমার পার্শ্বে আসিয়া একাসনে বসিতেন। যতই তিনি বলিতে লাগিলেন, মিসেস রায় এ সকল নিয়মের অধীন নহেন, ততই তুমি নির্দ্ধারিত নিয়মগুলি দৃঢ়তার সহিত পালন করিতে লাগিলে। ইহাতে তোমারও উপকার হইতে লাগিল। তুমি বাল্যাবস্থা হইতে কোনও কাজ কখনও নিয়মাধীন হইয়া কর নাই, কেহ নিয়মের কথা বলেও নাই, এ বিদ্যালয়ে সকলই নিয়ম। নিয়ম যদি পালন করিতে না শিখিতে তাহা হইলে সেখানে হয়তো অত দীর্ঘকাল থাকিতেই পারিতে না; জীবনের মহাব্রতের জন্য যাহা শিখিয়া আসিয়াছিলে, তাহা আর শিখিবার অবকাশ হইত না। তোমার পরিবারের কন্যারাও নিয়ম পালনে সক্ষম হইত না। এই বিষয়ে লক্ষ্ণৌ হইতে পরে তুমি লিখিয়াছিলে, "বাধ্যতা যে কি, বাল্যকালে তাহা কেহ শেখায় নাই। গোপনে সেই জন্য নিজেই কষ্ট পাইয়াছি। বাধ্যতাতে যে এত সুখ, তাহা জানিতাম না। মনে হইত, বাধ্য হইয়া চলিতে হইলে কেবল দুঃখসাগরে ভাসিতে হইবে। এখন দেখিতেছি সে আমার ভুল। এই এক নূতন জিনিষ দেখিতেছি, যাহাকে তিক্ত বলিয়াছিলাম, সেই হইল মিষ্ট, আর যাহাকে মিষ্ট বলিয়াছিলাম, এখন তাহাকে তিক্ত বলিয়া পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

তুমি সেখানে গিয়াই এমন উৎসাহের সহিত নিজের কাজে নিযুক্ত হইলে এবং সেই উৎসাহ ও উন্নত আকাঙ্ক্ষাতে তোমার পত্রগুলি এমন পূর্ণ থাকিত, যে তোমার পত্র পড়া আমার ও আমার বন্ধুদের একটি বিশেষ আনন্দের ব্যাপার হইল। প্রথম প্রথম আমাদের ভয় হইয়াছিল যে খৃষ্টানদের মধ্যে থাকিয়া তোমার নিজ ধর্ম্ম সাধন করিতে, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগদান করিতে, কিছু বাধা উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু তোমার পত্রে সে ভয় দূর হইল। শনিবারে লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়াছিলে; রবিবারে সন্ধ্যার সময় স্বয়ং উদারহৃদয়া মিস্ থোবর্ণ তোমাদের সমাজে যাইতে গাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন। তুমি তোমাদের ঘরের এক পার্শ্বে শালু দিয়া একটি ছোট দেবালয় করিয়া লইয়াছিলে। লাল রঙের আশ্চর্য্য একটু ঘর দেখিয়া মিস্ থোবর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহা কি?" তুমি বলিলে "Prayer room।" মেম সাহেব শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। সকল মেয়েদের বলিয়া দিলেন, "মিসেস্ রায় যখন prayer করিবেন, কেহ যেন তাঁহাকে বিরক্ত না করে।"

উৎসাহের সহিত তুমি পড়িতে লাগিলে। হিন্দী ও ইংরাজী শিখিতে লাগিলে। প্রতিদিন স্কুলের ও বাড়ীর পাঠে প্রায় ১৪ ঘণ্টা অতিবাহিত করিতে। এ আশ্চর্য্য শক্তি কোথা হইতে আসিল! এই পাঠের চাপে তোমার চিরশত্রু নিদ্রা তোমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তুমি যেন নূতন যৌবন ফিরিয়া পাইলে। ভাই ফণী বলিয়াছিলেন, "এ বয়সে বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করিয়া লাভ কি?" আরও অনেকে এরূপ বলিতেন। তুমি তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিলে।

জ্ঞানে যে তুমি আমা অপেক্ষা খাট ছিলে, তাহা আমার ভাল

লাগিত না। আমা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীতে দেখিতে ও জগৎকে দেখাইতে সাধ হইত। অন্ততঃ সমান সমান শ্রেণীতে দেখিতে ইচ্ছা ছিল। সে সাধ পূর্ণ মাত্রায় মিটে নাই, তাই ভগবান স্বয়ং তোমার শিক্ষার ভার লইলেন। আমার সুখের সীমা রহিল না। সকলে পূর্ব্বে মনে করিতেন, যে আমিই বুঝি তোমাকে লইয়া যাইতেছি, এখন তাঁহারা দেখিলেন যে তোমার নিজের যাইবার শক্তি আছে। বিলক্ষণ শক্তি আছে। এ তোমার প্রশংসা নয়, মায়ের প্রশংসা বাড়িল। তাঁহারই নাম জয়যুক্ত হইল।

এপ্রিল মাসের মধ্যেই তোমার একখানি ইংরাজী পুস্তক শেষ হইল। এই সময়ে আমাকে একখানি পত্র লিখিয়া তাহার শিরোনাম ইংরাজীতে লিখিলে। মার্চ্চ মাসে একজন ইংরেজ ও তাঁহার পত্নী তোমাদের কলেজ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তুমি নির্ভয়ে তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলে; করিয়া তোমার নিজের খুব আনন্দ হইল।

মিস্ থোবর্ণ বলিলেন, তোমাকে প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া খেলিতে হইবে। তুমি প্রথমে আশ্চর্য্য হইয়াছিলে। শেষে বুঝিলে শরীরের জন্য ইহাও প্রয়োজন। তিনিও তোমার মত মাথায় রুমাল বাঁধিয়া তোমার সঙ্গে খেলিতেন। এইরূপে তুমি খেলাও শিখিলে। ফিরিয়া আসিলে তোমার পরিবারের বালিকাদের সঙ্গে এমন উৎসাহে খেলিতে যে, তাহারা তোমাকে আপনাদের একজন মনে করিত এবং প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

দূরে না নিকটে?

১৮৯১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথমে তুমি লিখিলে "এ জগৎ একটি প্রকাণ্ড বাঙ্গালা; তাহার এক কামরায় তুমি, অন্য কামরায় আমি।" কোথায় দূরত্ব অনুভব করিয়া ক্রন্দন করিবে, তাহা না করিয়া এত নৈকট্য অনুভব কিরূপে করিতেছিলে? যদি এই নৈকট্য প্রকৃতরূপে বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে বিচ্ছেদের কষ্ট পৃথিবী হইতে একেবারে উঠিয়া যায়। লক্ষ্ণৌ গিয়া এই লাভ হইল, যে মৃত্যু তোমার পক্ষে সহজ হইল, পরকালে বিশ্বাস সহজ হইল।

অনেক সময় আমি প্রার্থনায় বলিতাম, যে আমি একটি আত্মাকেও ফিরাইতে পারিলাম না! তাই তুমি একদিন তোমার পত্রে সাক্ষ্য দিলে, "দুঃখ করিও না, অন্ততঃ একজনকে মায়ের ঘরে পৌছে দিলে।" এ কি কম কথা! স্ত্রীর মত সাক্ষী আর নাই। তুমি যে এ সকল কথা দূর দেশ হইতে লিখিবে, তাহা জানিতাম না। তুমি যে এতদূর গিয়া মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারিবে, আবার নিজের দুটি ও অন্য এক ভাইএর একটি কন্যার ভার গ্রহণ করিয়া সমাহিত চিত্তে নয় মাস কাল অতিবাহিত করিতে পারিবে, তাহা পূর্ব্বে কেহ মনেও করে নাই। নিশ্চয়ই শান্তির আলয় যিনি তাঁহাকে তুমি প্রাপ্ত হইয়াছিলে।

আর এক পত্রে তুমি লিখিয়াছিলে, তুমি যেন পরলোকে গিয়াছ, সেখানে গিয়া আমাদের ব্যবহার দেখিতেছ, দেখিয়া বুঝিতেছ যে আমি নির্ম্মল ব্রহ্মচর্য্য লইয়া থাকিতে পারি, আর তোমার সন্তানদের যত্ন করিতে পারি। লক্ষ্ণৌ থাকিতে থাকিতে বুঝিতে পারিয়াছিলে, একেবারে চিরকালের মত দেহের অন্তরাল হইলেও আমাদের যোগ কাটিয়া যাইবে না, বরং বাড়িবে। যাহা তুমি ভাবিতে, আমিও তাহাই ভাবিতাম। তোমার পত্র পাঠ করিয়া—বাবু বলিলেন, ইহাতে তাঁহার অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ হইতেছে। কুড়ি বৎসর হইল তাঁহার স্ত্রীর পরলোক হইয়াছে। পরলোকের বিষয় তখনও তাঁহার নিকট অন্ধকার। তোমাতে আমাতে যে ব্যবহার হইতেছিল তাহাতে তাঁহার পরলোকগতা স্ত্রী সঙ্গে সম্বন্ধ পরিষ্কার হইতেছিল। আহা কত ভাল কথা! বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি সুখ হইতে পারে, যে, একজনের মৃত স্ত্রীকে নিকটবর্ত্তী করিয়া দিলে।

এই সময়ে একদিন তোমার মনে কি এক ভাব হইল, তুমি আমার জন্মতিথি করিতে চাহিলে। আমি বলিলাম, "একা তো কিছু নই, তুমি আমি যুক্ত হইলে তবে ত জীবনের মূল্য বুঝা যায়। যে দিন আমাদের আত্মার বিবাহ হইল, সেইদিন আমাদের দুজনার যথার্থ জন্মতিথি।" তখন হইতে আমাদের আধ্যাত্মিক বিবাহের তারিখকেই জন্মতিথি বলিয়া স্বীকার করিলে ও করিলাম। যত দিন দেহে ছিলে, তত দিন ঐ তারিখে খুব উৎসব করিতে।

আর একদিন তুমি লিখিলে, "দেখ, মনে হইতেছিল আরও খাঁটি বিশ্বাসী না হইলে জগৎ আমাদের বিশ্বাস করিবে না। হাড়ের পরমাণু সকল যেন এখনও সেই খাঁটি সত্য বলিতে পারে না। কবে আমার হাড় বলিবে, 'সত্যম্ সত্যম্?' যে দিন তাই হইবে, জগৎকে বিশ্বাস করিতেই হইবে। জননি, সেই দিন আনিয়া দাও, এই প্রার্থনা আজ ছিল। মায়ের কার্য্যের জন্য* যে কাহারও নিকট ভিক্ষা কর নাই, শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু ইচ্ছাও করে, মায়ের সেবার জন্য ভাই বোন সকলেই ধন মন প্রাণ দান করেন। আহা, কবে আমি তোমার হইতে পারিব? এখনও, প্রকাশ, তোমার উপযুক্ত হইতে পারি নাই। সত্যই বলিয়াছ, এবার যেন দূর নিকট হইয়াছে; এ যদি না হইত, বিশেষ কষ্ট হইত। আর তো দূর নাই! প্রতিদিন ৪ টার সময় যখন নাম জপ করি, আশ্চর্য্য লীলা দেখি; তোমার নিকটে বসে সত্যই যেন নাম করিতেছি। মনে হয় না যে, তুমি দূরে। এইরূপে যখনই তোমাদের দেখিতে ইচ্ছা করে, তখনি মার কোলে দেখিতে পাই। পূর্ব্বে দেখিতে ইচ্ছা হইলে শরীর দেখিলে যেমন সুখ হইত, তার চেয়ে এখন কিছু কম বুঝিতে পারি না। বড়ই সুখ হয়। আমার বড়ই ভাবনা হইত, তুমি আগে যদি চলে যাও, আমি কি ক'রে থাকিব? মা বুঝি আমার সেই কাতর ভাব লুকাইয়া দেখিয়াছিলেন, তাই তিনি জীবিত থাকিতেই দূরকে নিকট করিয়া দিলেন। আর কখনও যে তোমা হতে আমাকে দূরে থাকিতে হইবে না, এই যখন ভাবি কত যে সুখ হয়, অন্তরই বুঝিতে পারিতেছে। কঠিন সাধনের সমস্ত কষ্ট তখন সুখে পরিণত হয়। তুমি জান, তোমা হইতে দূরে থাকিবার কথা হইলেই কত কষ্ট হইত। তা বেশ হইয়াছে, আমার সাধ মিটিয়াছে। আর এখন কথায় নয়, এখন কার্য্যে পরিণত হইল। আর দুঃখ নাই, আর আমাদের বিচ্ছেদ অসম্ভব। এ বড়ই সুখের সংবাদ। যদি

* এবারকার বাঁকিপুরের মাহোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য।

একজন লোকের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিলাম,—সে জন কে? জ্ঞানী ধার্ম্মিক পুরুষ, আর আমি ক্ষুদ্র একটি প্রাণী,—তবে তাহা অপেক্ষা আমার আর সুখ কি হইতে পারে? এর চেয়ে সংসারে আর ভাল জিনিষ তুমি কি দিতে পারিতে? এখন ভাবি আমি বড়ই চতুর। যদি সংসারের সুখ তোমার নিকট চাহিতাম, এ অমূল্য চিরযোগ পাইতাম না। মার কৃপা ভাবিলে, প্রকাশ, আমার প্রাণ আর স্থির থাকে না, চক্ষে জল আর ধরে না। কেন তিনি এত ভালবাসেন জিজ্ঞাসা করিলে হাসেন, উত্তর দেন না; তারপরে বলেন, 'হইয়াছে কি? আরও বাসিব'। প্রকাশ! আমাদের একি হইল? লোকে যে পাগল বলিবে! আমিও সর্ব্বদা ব্যস্ত, যাহাতে আমার অমনোযোগে মার কার্য্য বন্ধ না হয়।"

আর একদিনের পত্রে লিখিয়াছিলে, "তোমার ঘোরী প্রাণ থাকিতে কিছুতেই পিছুপাও হইবে না। তোমার ঘোরী কিছু জানে না! প্রকাশ! তুমি যাহা বলিয়া দিবে, এ দাসী প্রাণ দিয়া তাহা করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। এতদিন তবু যেন ভিন্ন ছিলাম, এখন যে আমরা বিবাহিত হইয়া* একটি হইয়াছি। আর কি এমন কোন কাজ মা দেবেন যা আমরা পারিব না? না পারি করিতে করিতে তো যাইতে পারিব? মা তো আমাদের এমন কঠিন মা নন, যে যা না পারিব তাই দেবেন। তিনি জানেন যে, আমরা কতদূর পারিব। যদি আমাদের দ্বারা তাঁহার কাজ করাইতে ইচ্ছা হয়, অবশ্যই পারিব। প্রকাশ! তোমার ঘোরীর সমস্ত রক্ত দিলেও কি মার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না? জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তোমার ঘোরী তোমার মার কার্য্য যেন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া করিতে পারে, আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার সাধ পূর্ণ করিবার জন্য মা যে এ জীবন কিনেছেন, যখন ভাবি, তখন যে কি সুখ পাই, তোমাকে কি বলিব! আর বলিতে ইচ্ছাও হয় না। ইচ্ছা হয়, যা আমি ভাবি, সকলই তুমি বুঝিয়া লও। বলিতে অনেক সময় লাগে। যতই নিকট হইতেছি ততই আরও নিকট হইতে ইচ্ছা হয়। নৈকট্যের কি শেষ নাই? তোমার সহিত কথা বলিয়া বড়ই আরাম পাই; উঠিতে ইচ্ছা করে না। যখন আমি বাটী যাবই তুমি আমার সঙ্গে খুব অনেকক্ষণ কথা বলিও। কেমন? চিরদিনই আমরা এইরূপে কথা বলিব, কেমন? তোমার ঐ কথাটি বড় ভাল লাগিল, যে এত দূরে, তবুও আমি যেন তোমায় মন্দ দুগ্ধ খাইতে বারণ করিতেছি, আর তুমি তাহা শুনিলে। অনন্তকাল এইরূপে পরস্পরকে বারণ করিব, আর উভয়ের কথামত উভয়ে চলিব। দেখ দেখি কি সুখ! আমরা কি ঠকিয়াছি? না! এ সুখ যে অমূল্য। মা শেষ জীবনে বড়ই সুখী করিলেন। আমরা এখন প্রাণ দিয়া যাহাতে মার সেবা করিয়া, মার নাম জয়যুক্ত করিয়া মাকে সুখী করিতে পারি তাই করি।"

তুমি ৩রা জুনের পত্রে লিখিয়াছিলে, "আমি যে কি লিখিব, তাহা ভাবি না। যেমন উপাসনার সময় যা মনে আসে তাই বলি, তেমনি তোমার পত্র লিখিবার সময় যা মনে আসে তাহাই লিখি।"

তোমার কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া আমি এই সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, "লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করে কি?" তুমি বলিলে, "না আমার এখন বাটী যাইবার ইচ্ছা হয় নাই, কারণ আমি যে কার্য্য করিতে আসিয়াছি তাহার এখন বিলম্ব আছে। কেবল তো দু'খানি কেতাব পড়িতেছি।"

১৩ই জুন লিখিয়াছ, "এখন রাত্রি ১০টা। দানাপুরের সেই নদীর ধারের বারান্দায় আমার মন চলিয়া গিয়াছে, সেইখানে যে তোমরা উপাসনা করিতেছ।"

আর একদিন লিখিলে, "উপাসনার সময় সেই ঘরখানি, আর সেই লোকগুলি যেন আমার চারিদিকে থাকেন। আমি যেন ঠিক তোমার বামদিকে বসিয়া উপাসনা করি। ভাগ্যে উপাসনা শিখাইলে, নইলে আজকের দিনে কি অবস্থা হইত বল দেখি? উপাসনার পর মনে হইতেছিল, এইরূপে উপাসনা শিক্ষা দেওয়া সকল স্বামীর উচিত।" এই উপাসনার গুণে দূর নিকট হইল, শুধু তাই নয়, সংবাদ না পাইলেও ব্যস্ততা চলিয়া গিয়াছিল। ৬ই, ৭ই আগষ্টের পত্র তুমি ৮ই পাইলে, এবং লিখিলে, "পত্র না পাইলেও মার নিকট সংবাদ পাই, সুতরাং আমার মন কেমন করে না। হয়তো তুমি ভাবিয়া ঠিক করিতে পার না যে, আমি এ কি বলিতেছি। আমিও যখন নিজের অবস্থার কথা ভাবি, নিজেই আশ্চর্য্য হই। তোমার কোন দোষ নাই। মা মধ্যে মধ্যে আমাকে শিক্ষা দিবেন বলিয়া এইরূপ করেন। আমিও এখন সেয়ানা হইয়াছি, পত্র না পাইলে আর ব্যস্ত হই না। এমন কি আজ পাঁচ মাসের মধ্যে কোন দিনও মেমকে জিজ্ঞাসাও করি নাই, আমার পত্র আসিয়াছে কি না? অনেক সময় ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু তোমার আশীর্ব্বাদে ও মার কৃপায় সেই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত হইতে দি না। পূর্ব্বে দুইদিন পত্র না পাইলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তার দিয়াছি; আর আজ এ কি পরিবর্ত্তন?"

পূর্ব্বে দোষ করিলে আমার মুখ ভারি দেখিতে, দেখিয়া তোমার মন অস্থির হইত। এখন আবার মা মুখ ভার করিতে লাগিলেন। একটি বেশী কথা বলিলে অমনি প্রখর দৃষ্টিতে তোমার পানে তাকাইতেন। তোমার ভালই হইল; এক দিকে মা, অন্য দিকে ছেলে, মাঝখানে তুমি। একদিন সমাজে গিয়া—সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথা কহিয়াছিলে। যতগুলি কথা বলা হইল তাহা না বলিলেও হইত, কিন্তু পূর্ব্ব অভ্যাসে পরিচালিত হইয়া অনেক কথা বলিলে। তখন মা কিছু বলিলেন না; কুটীতে আসিয়া শয়ন করিলে, কিন্তু কোন মতেই আরাম নাই। জিজ্ঞাসা করিলে "কি হইয়াছে?" মা ভার মুখে বলিলেন, "তোমাকে বলিয়াছি, ওজন করিয়া কথা বলিও। কেন বে-ওজনে কথা বলিলে?" তৎপর দিবস প্রার্থনা করিলে, আর অনাবশ্যক কথা বলিব না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্ণৌ কলেজে প্রথম ছয় মাস

মার্চ মাসের প্রথম ভাগে তুমি লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলে। যে মাসে শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসু মহাশয় তোমাদের দেখিতে যান ও দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েন। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তোমরা

* আধ্যাত্মিক বিবাহ অনুষ্ঠানের পর।

আশাতীত ফল লাভ করিয়াছ, কিন্তু শরীর বড় খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। অনুসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে আমি সেপ্টেম্বর মাসে যাইতে চাহিলাম। তুমি একেবারে নবেম্বর মাসে (তোমার ফিরিবার সময়) যাইতে বলিলে। তোমার কথাই থাকিল। আমার আর যাওয়া হইল না। তোমার তপস্যা চলিতে লাগিল। গ্রীষ্মের ছুটীতে সকলেই দেশ-দেশান্তরে চলিয়া গেল, আমার তপস্বিনী লক্ষ্ণৌ থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

মে মাস শেষ হইল, আর বাঁকিপুরের উৎসবও শেষ হইল। তুমি দূর হইতে সে উপাসনা সম্ভোগ করিলে। তোমার উপাসনা সম্ভোগের কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। ইঁহারাও তোমার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উৎসব ও সেবা করিলেন। ইঁহারাও অনুভব করিলেন যে তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তোমাকে এক বাস্‌কেট্ লিচি পাঠাইয়াছিলাম। তুমি লিখিলে, "লিচি সন্ধ্যার সময় আসিল; খুলিয়া দেখি, ডাঁট ও পাতা, যেন এখনি পাড়া হইয়াছে। তখনি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে ও তোমাকে ধন্যবাদ দিয়া স্কুলের যতগুলি মেয়ে ও টীচার, দাস-দাসী আছেন, সকলকেই একটি হইতে ২টি, ৪টি, ৬টি করিয়া দিয়াছি। সকলেই বড়ই সুখী হইয়া ধন্যবাদ দিলেন। বড় ভাল মিষ্টি লিচি। মেম দেখিয়া যে কি সুখী হইলেন বলিতে পারি না। পাতা দেখিয়া বলিলেন, 'এই কি ইহার পাতা? ইহার গাছ কত বড় হয়?' আমি একটি গাছ দেখাইয়া বলিলাম 'এত বড়।' আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন 'এমন লাল ও সুন্দর লিচি এখানে হয় না। তোমার জন্য রাখিয়াছ?' আমি বলিলাম 'হ্যাঁ'। আজ উপাসনার সময় উৎসর্গ করিয়া তোমার দান বলিয়া আমরা তিন জনে দুইটি খাইলাম; বড়ই মিষ্ট।" এই সময়ে তোমার কন্যাদের আহারের কষ্ট হইত, তোমার তো কথাই নাই। কিন্তু তোমার মন অবিচলিত থাকিত। ১৬ই জুন নূতন আম্র পাইয়া উপাসনার সময় উৎসর্গ করিলে, মেয়েরা খাইল। কিন্তু আমি দূরে বলিয়া তোমার কোনও ভাল বস্তু গ্রহণে রুচি হইত না, তাই আম্র নিজে খাইলে না।

জুলাই মাসে অতিশয় গ্রীষ্ম বশতঃ ও বৃষ্টির অভাবে সকলের বড়ই কষ্ট হইতেছিল। মৃদু মৃদু হাসিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্রী বলিলেন, "মিসেস রায়ের সম্মুখে 'বড় গরম পড়িয়াছে, বাপ্ রে বাপ, জল হয় না কেন' এ সকল কথা বলিবার যো নাই।" অভিযোগ করা তুমি ভালবাসিতে না, তাই এমন বিদ্যাবতী মিস্ থোবর্ণও তোমাকে শুনাইয়া অভিযোগ করিতে সঙ্কুচিতা হইতেন।

লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজে অনেক সময় তুমি প্রার্থনা করিতে। সেখানকার মেয়েরা গান করিতেন। ১৩ই জুলাই সোমবার ডায়রীতে লিখিয়াছ—"কাল ভুবন বাবুর বাটীতে গিয়াছিলাম। সুসার ।৵০ আনা দিয়া সরোর জন্য ৬টা আম কিনিতে বলিলেন। আমি স্বীকার পাইলাম এবং আম কিনিয়া সমাজে গেলাম, মূল্য ফিরে রবিবার দিবার কথা রহিল। পথে যাইতে যাইতে এবং সমাজে উপাসনার সময় বিবেক এত ব্যস্ত করিয়া তুলিল যে, কিছুতেই তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না। অবশেষে বলিলাম, 'আচ্ছা আম লইব না', তখন বিবেক আমাকে উপাসনা করিতে দিল।" ঋণের এত বিরোধী ছিলে যে, বিবেক তোমার উপাসনা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল!

এক দিন মিস্ থোবর্ণ একটি টী-পার্টি দিয়াছিলেন। তাহাতে তোমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। আহারাদির পর মেয়েরা বলিল যে, টী-পার্টির কোনও খাদ্য-বস্তুতে গো-মাংস ছিল। অজ্ঞানসারে ঐরূপ অনভ্যস্ত বস্তু আহার করিয়াছ জানিয়াও তুমি আপনাকে সম্বরণ করিলে, ও বলিলে, "তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

৯ই আগষ্ট ১৮৯১ সাল, বাঁকিপুরে সুবোধের একটু জটিল রকমের জ্বর হয়। সেই রাত্রে তুমিও ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলে; তবে পরিষ্কার বুঝিতে পার নাই যে, কাহার অসুখ করিল। সেই দিনকার রাত্রে তোমায় সংবাদ দিলাম। তুমি ডায়রীতে লিখিলে, "কাল সুবোধের জ্বরের কথা শুনিয়া নির্ভর আরও বাড়িয়া গেল।" তোমাকে প্রস্তুত থাকিতে বলিলাম, তুমিও প্রস্তুত রহিলে। ১০ই বৈকালে বাঁকিপুরের চিকিৎসকগণ টেলিগ্রাফ করিয়া তোমাকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। রাত্রে উত্তাপ ১০৫° ডিগ্রি হইতে একবারে ৯৭ ডিগ্রিতে দাঁড়াইল। ভাবনা হইল, কিন্তু ধৈর্য্য ধরিলাম। শেষ রাত্রে সুবোধের জ্ঞান হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম "সুবোধ, তোমার কি মাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়? তাঁহাকে কি তার দিয়া আনাইব?" একটু হাসিয়া মাতার অনুরূপ ধৈর্য্যের পরিচয় দিলেন; বলিলেন, "না; অনেক ক্ষতি হইবে।" তোমার ১২ই আগষ্টের দৈনিকে তুমি লিখিয়া রাখিয়াছ, "মা আমাকে আরও নিশ্চিন্ত কর; চিন্তা করিতে আমাকে একটুও সময় দিও না। এখন রাত্রি আটটা; সুবোধের অসুখের কথা মনে হইয়া একটু মন কেমন হইল।" এই "একটু মন কেমন হইল" কথার মধ্যে যে কত বীরত্ব লুক্কায়িত আছে, তাহা যে তোমাকে জানিত, সেই বুঝিতে পারিত। সরোজিনী যখন মুমূর্ষু, তখনও তোমার বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলে, এবারও দিলে। তুমি যে কাঁদিতে জান, তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না। মনের ভিতর যে ভয়ানক তোলপাড় হইতেছিল, তাহা তোমার ১৩ই আগষ্টের দৈনিক পড়িলে বুঝিতে পারা যায়।—"মা, তোমাতে আমাকে জীবিত রাখ, নইলে এ পরীক্ষায় কেমনে উত্তীর্ণ হইব? দিন দিন যে পরীক্ষা ঘন করিতেছ; কৃপা করিয়া মনে বল দান কর।" এমন পরীক্ষার মধ্যেও আমাকে সাবধান করিতে ভুলিলে না। বলিলে, "এ সময় লোকে কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, তুমি যেন ভুলিও না।" ডাক্তার বাবুরা বলিলেন, "মায়ের মতন কেহই যত্ন করিতে পারে না, মাকে আনাও।" তুমি ১৪ই দৈনিকে লিখিলে, "মা, তোমার মত যত্ন আর কেহই তো করিতে পারে না। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে সেই যত্ন শেখাও।—সুবোধের অসুখের সংবাদে মার কোলে লুকাইলাম; বড়ই আরাম।—১১টায় স্কুলে সুবোধের সুস্থ সংবাদ পাইলাম। বাটী আসিয়া আহারের পূর্ব্বে আবার উপাসনা করিলাম। মা-ও হাসিয়া কুটি কুটি, আমিও খুব হাসিলাম।" তৎপর পরদিবসে শুনিলে সুবোধের অসুখ বাড়িয়াছে, মনটা কিছু চঞ্চল হইল, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে খাঁটী বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। মানুষ মাত্রেই এইরূপে পরীক্ষিত হয়। তাহা না হইলে নরশ্রেষ্ঠ আদর্শ সন্তান কেন বলিবেন "পিতা, পিতা, আমাকে ছাড়িলে কেন?" পিতা যে শুধু নিজের মুখ মাঝে মাঝে লুকাইয়া ফেলেন তাহা নয়; জীবের মঙ্গল হইবে বলিয়া আত্মীয়-স্বজনদিগকেও মাঝে মাঝে লুক্কায়িত করেন। সুবোধের সুস্থ সংবাদ পাইলে ১৮ই আগষ্ট মঙ্গলবারে; বুধবারে মিস থোবর্ণ পাহাড়ে চলিয়া

গেলেন। তিনিই সেখানে মানুষের মধ্যে তোমার একমাত্র আশ্রয়, বন্ধু ও নির্ভরের স্থান ছিলেন। তুমি বলিলে, "মেমের উপর একটু নির্ভর করিয়াছিলাম, তাই মা আর সইতে পারিলেন না, সরাইয়া লইলেন বেশ, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

কয়েক দিন পরে আমার পেটের অসুখ হইয়াছিল; সংবাদ শুনিয়া তুমি বলিলে, "মা এ কি রকম বার বার?" মা বলিলেন "আমি আছি, ভয় কি? ভাবনা কি? তুমি আপনার কাজ করিয়া যাও।" তুমি অমনি ভাল মেয়ের মত তথাস্তু বলিয়া পড়িতে বসিলে; আর একটি বারও ভাবনা আসিল না।

প্রবোধের পত্নী বাঁকিপুরে তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার সন্তানদিগের ভার লইয়াছিলেন। তিনিও এ সময়ে দারুণ ক্ষয়কাশে শয্যাশায়ী হইলেন; তোমার মনে ভাবনা হইল, কিন্তু "শির দিয়া তো রোনা ক্যা?" এই বলিয়া ধৈর্য্যধারণ করিলে। দিন কম, কাজ বেশী, শিখিতে হইবে অনেক, মা তাই আর অবকাশ দিলেন না। তুমিও তোমার কর্ত্তব্য ভুলিলে না।

২৮শে আগষ্ট বর্ষাকাল, সেই বিদেশে তোমার পেটের অসুখ হইল। অত্যন্ত যাতনা হইতে লাগিল, তবুও কর্ত্তব্য ভুলিলে না। বিদ্যালয়ের পাঠ দিয়া নিজ কক্ষে আসিলে। শয্যায় শয়ন করিলে, আরাম হইল না, বেড়ান যেন ভাল বোধ হইতে লাগিল। একটু জল পান করিলে, তাহাতে আরাম হইয়াছে বোধ হইল, কিন্তু গেল না। তারপর উপবেশন করিলে। আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিলে, 'এখনই যদি আজ্ঞা হয়, তাহা হইলে দেহত্যাগ করিতে কি প্রস্তুত? কাহারও জন্য কোন আসক্তি আছে কি না?' মন বলিল, 'কোনও আসক্তি নাই, এখনই প্রয়াণ করিতে প্রস্তুত।' অমনি বেদনা কমিতে লাগিল, ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সমুদয় বেদনা পলায়ন করিল। তার পরেই স্নান এবং দ্বিতীয় বারের উপাসনা। তখন তোমার অবস্থা দেখিয়া যত মা হাসেন ততই তুমি হাসিলে। হাসির সঙ্গী আমি, আমাকেও হাস্যের অংশ দিলে; আমিও হাসিলাম। এমন দিন ছিল যখন স্বামি-সর্ব্বস্ব অঘোর অল্পেই কাতর হইয়া পড়িতেন কত আবদার করিতেন; কাহারও সেবা ভাল লাগিত না; একটু সামান্য মাথা ধরিলে স্বামীর আদর ভিন্ন মন উঠিত না। আজ তাঁহার এ দশা কেন হইল, কেমনে হইল? সকলই ভগবৎকৃপা। আমি যাহার জন্য কাঁদিয়াছি, তাহাই তুমি পাইলে। অনাসক্ত হইয়া পরম ধামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে।

মিস থোবর্ণের পাহাড়ে যাত্রার পর নূতন একজন কর্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। তোমার ভয় হইয়াছিল, না জানি নূতন কর্ত্রী কেমন ব্যবহার করিবেন। যাঁহার কৃপায় মিস থোবর্ণ বন্ধু হইয়াছিলেন, তাঁহারই কৃপায় নূতন কর্ত্রীও তোমার পরম বন্ধু ও সহায় হইলেন। এমন কি, রবিবারে তুমি পত্র লিখিতে না, সে বিষয়ও অনুসন্ধান করিলেন, এবং রবিবারেও পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলেন, তুমি স্ত্রী-হাসপাতাল দেখিতে চাহিলে, অমনি অনুমতি দিলেন। শুধু তাহা নয়, মিস্ ডাক্তারকে পত্র লিখিলেন, যেন তোমার প্রতি যত্নের ত্রুটি না হয়। ইনি তোমাকে এমন ভালবাসিতে লাগিলেন যে, তোমাকে নিজের জীবনের কথা সব বলিতেন। একদিন খাবার ঘরে মেয়েদের একটি মিটিং হইয়াছিল। সকলের সম্মুখে তিনি তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে অনুরোধ করিলেন। তুমি ব্রাহ্ম, তিনি খৃষ্টান, মেয়েরাও অধিকাংশ খৃষ্টান, তবু তোমাকে এই অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, যে সকল মেয়েরা কিছু দোষ করেন, তাঁহাদের নিকট মিসেস রায় মধ্যে মধ্যে উপদেশ দেন, এবং শিক্ষা দেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। তুমি এই উচ্চ আদেশ শ্রবণ করিয়া অবাক হইলে। মায়ের লীলা অনুভব করিলে। মেয়েরা তোমাকে বড়ই আদর করিলেন। পরদিন প্রাতে কর্ত্রী আবার বলিলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন যে তুমি মেয়েদের ধর্ম্মোপদেশ দিলে তাঁহাদের উপকার হইবে। তুমি বলিলে, তাঁহারা যেমন ছাত্রী, তুমিও তেমনি ছাত্রী, উপদেশ কি দিবে? তিনি বলিলেন, "না, মেয়েরা তোমায় ভয় করে, এবং ভালবাসে। তুমি মধ্যে মধ্যে একবার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইলেও অনেক উপকার হইবে।" এই সময় তোমার যে শক্তির পূর্ব্বাভাস পাওয়া গেল, পরজীবনে তাহার আরও বিকাশ হইয়াছিল। অধীনস্থ কোনও লোককে কিছু বলিতে হইলে এমনি করিয়া বলিতে, যে কেহ কোন আপত্তি করিতে পারিত না। আর একদিন ঐ কর্ত্রী তোমার সঙ্গে খৃষ্টিয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছিলেন। তোমার সঙ্গে কথা কহিয়া তিনি বড় প্রীত হইলেন ও স্বীকার করিলেন, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান ধর্ম্মে বিভিন্নতা অল্পই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

পত্রত্যাগ

আমি দেখিয়াছি, তুমিও দেখিয়াছ, যে পৃথিবীর ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী; শরীর না থাকিলে কিছুদিন পরে উড়িয়া যায়। তাই সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, শরীরের উপর ভালবাসার ভিত্তি স্থাপন করিব না। প্রথম বয়সে এ ভুল করিয়াছিলাম তুমিও করিয়াছিলে; তাই চক্ষুর আড়াল হইলেই চক্ষের জলে পথ দেখিতে পাইতাম না, আবার নানা কার্য্যের মধ্যে সে জল আর থাকিত না। এ অট্টালিকা পাকা নয়। কোন দিন অল্প ঝড়েই পড়িয়া যাইতে পারে, তাই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দুজনে পরামর্শ করিয়া এই অট্টালিকা ভাঙ্গিতে লাগিলাম। রূপের আকর্ষণ ছাড়িলাম, পরস্পরের প্রতি চরিত্র ও সদ্গুণের জন্য যে শ্রদ্ধা তাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু দেখিলাম শরীরের ভোগ থাকিলে গুণের দিকে দৃষ্টি পড়ে না। তাই শরীরের ভোগ ছাড়িতে হইল। তখনও স্পর্শ-সুখ রহিল। সে অবস্থায় প্রথম প্রথম মনে হইত এই তো স্বর্গে আছি। কিছুকাল পরেই বুঝিলাম এ স্পর্শ-সুখও বন্ধন। তখন কি প্রতিজ্ঞা করিলাম, তা তো জানই। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তুমিও পারিলে, আমাকেও সাহায্য করিলে। তোমার গুণ বুঝিলাম। ভাবিলাম এইবার যদি শরীরের মৃত্যু হয়! দর্শন-সুখ তখনও রহিল। রাজগৃহে কি দর্শনই হইয়াছিল। আপনার স্ত্রীকে সকলেই দেখিতে ভালবাসে, কিন্তু দেবীরূপ ক'জনে দেখিতে পায়? মস্তক মুণ্ডন ও গৈরিক পরিধান দেখিয়া স্বর্গের দেবকন্যা বলিয়া যখন ভ্রম হইতেছিল, তখন দর্শন-সুখের উচ্চ সীমা দেখিতেছিলাম! কিন্তু ইহাও শক্ত জমি নয়। এ দেশের মাটি ও বালি মিশ্রিত "বলথর" জমির মত, ইহাও ভিত্তি স্থাপনের অনুপযুক্ত। ঈশ্বর তাই দর্শন সুখেও আমাদের বঞ্চিত করিলেন। এখন তুমি আমি দূরে দূরে। চক্ষের দর্শনও নাই, কণ্ঠস্বর শুনি না। এ অবস্থা হইতে পরলোকের বেশী কি প্রভেদ? কিন্তু এখনও যে একটি সুখ

বাকি রহিয়াছে। পরলোকে গেলে কেহ কখনও তো পত্র লেখে না। আমাদের এ স্বকৃত-পরলোকে এখনও তো পত্র লেখা চলিতেছে। দেখিলাম, অনেক দিন ধরিয়া কেবল পত্রাসক্তিতেই সুখ সম্ভোগ করিতেছি। পাগলের মত পত্রের প্রতীক্ষা করিতাম। একবার, দুইবার, কতবারই পত্র পড়ি; কত কথাই লিখি, কত পরামর্শ দি, কত আশ্বাস বচন বলি, কত লোককে তোমার পত্রগুলি পড়িয়া শোনাই। এমন সময়ে একবার ডাকের গোলমালে পত্র পাইতে দেরী হইল। এইবার বুঝিলাম, এ ভূমিটাও ছাড়িতে হইবে। পত্র লেখা বন্ধ করিয়া দেখিতে হইবে, পত্রের উপরে উঠিতে পারিয়াছি কি না। এত পারিয়াছি, ইহা কি পারিব না? জীবন দেবতার নিকট হইতে আবার ত্যাগের আহ্বান আসিল। আবার অঘোর-প্রকাশ বলিলেন, "প্রস্তুত!" ১১শে সেপ্টেম্বর আমি পত্র বন্ধ করার প্রস্তাব করিয়া তোমাকে চিঠি লিখিলাম; তুমি ২০শে সে চিঠি পাইলে।

আমি যে সময়ে এইরূপ পত্র বন্ধ করিবার প্রেরণা মনে পাইয়াছিলাম, ও সে প্রেরণার অধীন হইতে সংগ্রাম করিতেছিলাম, সে সময়ে তোমার মনে কি ভাব চলিতেছিল, তাহা তোমার ঐ তারিখের লিখিত পত্রে জানা যায়। তুমি লিখিলে, "আজ তোমার পত্র এখনো পাই নাই। পাইব কি না জানি না। পাই বা না পাই, আমি তোমা ক এখনই দেখিতেছি। এমন সুবিধা তো আর নাই। বড় ভাল পথে আমাকে আনিয়াছ। আমার বড়ই সাধ ছিল কি না, যে তোমা হইতে দূরে কোন দিন থাকিব না; মা আমার সে প্রাণের প্রার্থনা বুঝে শুনিয়াছেলেন; তাই তোমাকে এই সুন্দর পথে যাইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এখন বেলা ৩টা। হয়তো তুমি রাজকার্য্যে ব্যস্ত। আমি সেই ব্যস্ততার পাশে বসিয়া তোমার সাহত কত কথা কাহতেছি, ও কত সুখী হইতেছি। মনে হইতেছে যে, তোমার মুখখানি ঘামে লাল হইয়াছে। কেন এমন হইতেছে জান না। আজ তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে, দেখিব বলিয়া বসিয়াছি। এই যে তুমি, তুমি তো দূরে নও। পরলোকে গেলেও আমরা এইরূপে মার কোলে একে অন্যকে দেখিব; সেই অভ্যাস মা পূর্ব্ব হইতেই করিয়া দিতেছেন।"

এই পত্র লিখিবার পরই বুঝি আমার মনের ব্যাকুলতা তোমার মনে গিয়া লাগিল। নতুবা সে দিনের দৈনিকে কেন লিখিলে,—"মা, আমার মন কেন এমন করিতেছে অঘোর-প্রকাশের জন্য? তুমিই জান।" দেবি, আকুল হইবে, ইহা আশ্চর্য্য কি? দু'জনই আকুল হইতেছিলাম। দু'জনাই মানুষ; দু'জনাই দেবজীবন পাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছিলাম; মানবত্ব ঘুচিয়া দেবত্ব তো একদিনে আসে না। তাই আমি তোমার কাছে পত্র বন্ধ করার প্রস্তাব করিয়া, তারপর লিখিয়াছিলাম—"আমার তো বড় শক্ত বোধ হইতেছে। তোমার সাহায্য ভিন্ন কোন কাজই তো পারি না; সে কথা তো তুমি জান। যদি কেহ বলে, এত মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আবার এ কি কথা, তবে বলি, তোমার তো কিছু অজানা নাই। সে সকল সংগ্রামে কত পরিমাণে তোমার সহায়তা পাইয়াছিলাম, তাহা তুমি জান, আমি জানি, আর অন্তর্যামী জানেন। আগামী মঙ্গলবার ২২শে তারিখে আমি বেহার যাইব। পত্র লেখা না লেখা তোমার হাতে রহিল।"

যখন আমি এই পত্রখানি লিখিতেছিলাম, তখনই হয় তো তোমারও মন আকুল হইতেছিল। ২০শে এই পত্র পাইয়া তোমার মনের ভাব কি হইয়াছিল, তাহা তোমার ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছ। ডায়েরীতে যাহা কিছু লিখিতে আমার সঙ্গে আলাপের আকারে লিখিতে। "বাটীতে আসিয়া তোমার ১১শে তারিখের পত্রখানি পাইলাম। পাঠ করিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া গেলাম। কেন এত চক্ষের জল, জানি না; বুঝি আসক্তিতে টান পড়িল বলিয়া। পত্রের যে এত আসক্তি আছে তাহা জানিতাম না। কোনও রকমে অনেক বার পড়িলাম। পড়িতে বড় ভাল লাগিল। পরে স্নান করিতে গেলাম; আজকার স্নান বড় ভাল হইল। চক্ষের জলের সহিত স্নান করিলাম। যত বার আসক্তিতে বাধা লাগিয়াছে, তত বারই এইরূপ চক্ষের জলে স্নান করিতে হইয়াছে। আজও তাহা হইল। পরে আবার উপাসনায় গেলাম, প্রার্থনা বড় ভাল হইল। চক্ষের যেন বড় দরদ; সে খুব জল ঢালিতে লাগিল। উপাসনা হইতে উঠিয়া তোমাকে ডাকে পত্র লিখিলাম। কত চক্ষের জল যে পড়িল! অনেক সময় ঐ জলে লেখা নষ্ট করিল। সে কথা তোমাকে প্রাণে প্রাণে বলিলাম, কিন্তু লিখিলাম না; আমার চক্ষের জল দেখিলে পাছে তোমার ব্রত ভঙ্গ হয়, এই ভয়। পরে আহার করিলাম। আহারের পর আবার পত্র লিখিলাম। ৩টা পর্য্যন্ত লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময় নাই বলিয়া পারিলাম না। আজ পত্রখানি যাওয়া চাই, নহিলে তুমি যথাসময়ে পাইবে না, বাহিরে চলিয়া যাইবে। ৩টার ১০ মিনিট আগে কুঠিতে গেলাম। পত্র লিখিতে লিখিতে চক্ষের জল শুকাইয়া গেল, যেন অন্ধকারের পর আশার প্রদীপ হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। কুঠিতে গিয়া দেখি, কেহ কোথাও নাই। Hall room এ একাকী বসিয়া মার কোলে তোমাকে দেখিতে পাইলাম। ৩টা বাজিল, অমনি কর্ত্রী বাহিরে আসিলেন। পত্রখানি তাঁহার হাতে দিয়া Meetingএ গেলাম। যাহা শুনিতে লাগিলাম সকলের ভিতরেই তোমাকে মনে হইতে লাগিল। সকাল ৮টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত ৩ মিনিটের জন্যও তুমি আমার হৃদয় হইতে দূরে থাক নাই। বাটী আসিয়া কিছু কাজ করিলাম ও পাঠ করিলাম। কিন্তু হৃদয় কেমন উদাস হইয়া গিয়াছে। বার বার বলের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। এইরূপে ৬টা বাজিল। আজ রবিবার, সমাজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম; ৭টা বাজিতে চলিল, গাড়ী আসিল না। এই ৬ মাস ২০ দিনের মধ্যে আজ কেবল সমাজে যাইতে পারিলাম না। কি করিবে? এখানে আমি অধীন, নিজে কিছু করিবার যো নাই। চুপ করিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করিল, তাই খানিকক্ষণ বেড়াইয়া, যেমন ৭টা বাজিল, অমনি মেয়েদের ডাকিয়া লইয়া নিজের ঘরেই উপাসনায় বসিলাম। কি মধুর যে উপাসনা হইল, বলিতে পারি না। বোধ হয় সকলেরই ভাল লাগিল। প্রার্থনা হইল,—মা, তুমি যাহা দিবে তাহা যেন বহন করিতে পারি; কেবল এই ভিক্ষা চাই, অঘোর-প্রকাশের হৃদয় হইতে ঐ পাদপদ্ম এক মিনিটের জন্যও সরাইও না; তবেই তোমার সন্তানের সাধ পূর্ণ হইবে। আশীর্ব্বাদ কর, তোমার সন্তানের এই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

আমাকে ডাকে যে পত্র লিখিয়াছিলে তাহার কিয়দংশ এই—

"১১শের পত্রখানি পাঠ করিয়া যে কি মনে হইল তাহা আর বলিতে হইবে না। তোমারও যে দশা আমারও তাই। পত্র পাঠ করিয়া নাইতে গেলাম। প্রাণ ভরিয়া মার কাছে প্রার্থনা করিলাম, বলের জন্য। প্রকাশ, আমি তোমার অপেক্ষা আরও দুর্ব্বল, তা কি জান না? অঘোর-প্রকাশ কি পারিবে? কি জানি? ভয়ে যে প্রাণ কাঁপিতেছে—আশা আমার মা, আর আমার চিরসঙ্গী। আজ বিশেষ আশীর্ব্বাদ কর। আর তো পত্র লিখলে না; না লিখিলে, তাতে কি? হৃদয়ের তারে খবর পাইব। সেই তার আমার জন্য আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া আনিবে। ভয় কি প্রকাশ? এখন যে আমরা দু'য়ে এক; আমরা দু'টি এক হইয়াছি বলিয়া মা আমাদের এত কঠিন হইতে কঠিনতর পরীক্ষায় ফেলিতেছেন। ফেলুন, দুঃখ নাই, কিন্তু ভয় যেন না পাই; 'পারিব না' যেন না বলি। কিসের ভয়? প্রাণের আলাপ তো কেহ বন্ধ করিতে পারিবে না; যে ভাবে যেখানে থাকিব সেইখানেই আমরা একত্র থাকিব। পত্র ডাকঘরে দেরী করিত, এখন ভালই হইল, যখন তখন দুই জনে বসিয়া কত গল্প করিব, কত আলাপ করিব। ভোর ৪টা হইতে ৫টা দুই জনে বসিয়া নাম করিব। সমস্ত দিন নানান্ কার্য্যের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া দু'জন দু'জনকে দেখিব আর কত সুখী হইব। আবার সন্ধ্যা ৬টার সময়ে দু'জনে মার কাছে বসিয়া মার কথা বলিব।"

পত্র লেখা বন্ধ হইল, তুমি আপনার মনের ভাব দৈনিক পুস্তকে লিখিতে লাগিলে, আমিও আমার খাতায় লিখিতাম, কিন্তু ডাকে দেওয়া হইত না। তুমি লিখিলে, "কত দিন তুমি পত্র লিখিবে না, তাহা আমাকে বলিও না। আমিও যে কত দিন লিখিব না তাহাও বলিব না; কিন্তু কোন বিষয় ভিক্ষরূপে করিতে তোমারও ইচ্ছা নয়, মারও ইচ্ছা নয়, যখন ইচ্ছা হইবে, মন সায় দিবে, বিবেক সায় দিবে, মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি পত্র লিখিতে পার, আমিও পারি। সে কবে, কখন্, তাহা তুমিও জান না, আমিও জানি না। দেখ, মা এ আবার কি লীলা আরম্ভ করিলেন! যাই করুন, চরণ তো কাড়িয়া লইতে পারিবেন না।"

এ সংগ্রামের মধ্যেও নিজের কর্ত্তব্য ভুলিলে না। ১১টার সময় বিদ্যালয় হইতে ফিরিলে; ঘরে আসিয়া আগুন জ্বালিলে, ঘর ঠিক করিলে; জল গরম হইলে স্নান করিলে। যোগযুক্ত স্নান হইল। সমস্ত কাজ-কর্ম্ম-পাঠ সকলের ভিতর এ দাস মিশিয়া গেল। সর্ব্বদাই যেন তোমার চক্ষের উপর রহিল। স্নানের পর আমার জন্যও প্রার্থনা করিলে। দিলদরদী কি না, তাই আমার দরদ যাহাতে যায় পিতার নিকট সে জন্য নিবেদন করিলে। যখন উপাসনা করিতেছিলে, দিব্য চক্ষে আমাকেও উপাসনা করিতে দেখিলে। দু'জনার চক্ষের জল এক হইয়া মায়ের পদ ধৌত করিল। মা যে দিন স্পর্শ-সুখ কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সে দিনও ঐরূপ মিলিত অশ্রুতে মাতৃপূজা হইয়াছিল।

[ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

এখন থেকে মেরী যেন একটু দূরে দূরে থাকতে লাগলো। হেনরীর প্রতি আর মনোযোগ নেই। হেনরী যা চায় তার উল্টো করে সে। বাইরে বেড়াতে যাবার কথা হ'লে সারা দিন বাড়িতে থাকে। বাড়ি ফিরে হেনরীকে পরিশ্রান্ত দেখলে দূরে কোন বারে যাওয়ার জন্যে জেদ ধরে। হেনরীর কুৎসিত পায়ের দিকে ইচ্ছা ক'রে তাকিয়ে থাকে। নানা কাজে হেনরীকে দূরে দূরে পাঠায়। তার মন্থরতার জন্যে ঘন ঘন বিরক্তি প্রকাশ করে।

বিকলাঙ্গ বললে হেনরী কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ে, মেরী এ কথা ভালো করেই জানতো। এই শব্দটাকে প্রয়োগ করতো তাই তাক্ষণার অস্ত্রের মতো। হেনরীর মুখের রেখায় রেখায় বেদনার প্রত্য ভাব দেখবার অভিপ্রায়ে।

দু' জনের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ হতে লাগলো। মেরীর ক্রুদ্ধ মেজাজের বীভৎস অভিব্যক্তি লক্ষ্য ক'রে হেনরী বিস্ময়-বিমূঢ় হ'য়ে যেতো। চীৎকার করে, বিকৃত অশ্লীল মুখভঙ্গি করে ঝগড়া করতে লাগলো। তার বিকট আর্তনাদ সমস্ত বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হতো। আশে-পাশের ঘরের দরজা খুলে যেতো। অন্যান্য ভাড়াটেরা সিঁড়ির কাছে জমায়েত হ'য়ে তার কর্কশ কণ্ঠস্বরের বক্তৃতা শুনতো। ঘরের মধ্যে ব'সে ম্যাডাম লুবে রুমালে চোখ মুছতেন।

যখন সে বুঝতো হেনরী তার ধৈর্যের শেষ সীমান্তে উপস্থিত হয়েছে, তখন কাছে সরে এসে ক্ষমা চাইতো, মিষ্টি কথায় পরিতুষ্ট করতে চেষ্টা করতো। মায়াবিনীর মতো কথার জাদু মন্ত্রে ঠাণ্ডা করতো হেনরীকে। হেনরী তার বিরক্তি-বিদ্বেষ ভুলে ক্ষমা করতো আবার। তার পর কিছুদিন মেরী আবার শান্ত হতো। হাসি-খুশিতে দিন কাটিয়ে দিতো।

এই রকম একটি অনুতপ্ত দিনের মধ্যাহ্নে হেনরী ছবি আঁকবে ব'লে মেরীকে দাঁড়াতে বললো। আনন্দের সঙ্গে মেরী রাজি হলো।

—আমার ছবি? সুন্দর করে আঁকবে?

—হ্যাঁ, তুমি যদি চাও ছবিটা তোমাকে দিতে পারি।

মেরী তাড়াতাড়ি ওপরে গেলো। স্নানের ঘরে ঢুকে অনেকক্ষণ ধ'রে সাজসজ্জা, কেশবিন্যাস করলো। কালো ভেলভেটের পোষাক প'রে উপস্থিত হলো সে। তার পোষাকের ডান কাঁধের ওপর শুভ্র পালকের গুচ্ছ বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল।

তার স্বাভাবিক লাবণ্যটুকু ঢেকে গিয়েছিলো। তার সুন্দর চেহারা নীরস মডেলে রূপান্তরিত হয়েছিল।

—এই এতক্ষণ ধ'রে চুপচাপ ব'সে থাকা বড় বিশ্রী; একটু পরে সে বলেছিলো। তুমি কি একটু তাড়াতাড়ি আঁকতে পারো না? তার পর হঠাৎ কি ভেবে বলে উঠলো, তোমায় মডেলের জন্যে কত টাকা দিতে হয়?

—পেশাদারী মডেল আমি সচরাচর গ্রহণ করি না। তবে সাধারণত সকালের জন্যে তিন ফ্র্যাঙ্ক আর সারা দিনের জন্যে পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক দিই।

—তাহলে আমাকেও তোমার টাকা দেওয়া উচিত।

আমি তোমাকে ছবিটা দেবো বলেছি, সেটা কি যথেষ্ট নয়?

হেনরী ক্লান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলো। আর তা ছাড়া টাকা তো আমি তোমাকে প্রতিদিনই দিই।

সে মুখ ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে জবাব দিলো, সে তো তোমার সঙ্গে থাকার জন্যে। পাঁচ ফ্র্যাঙ্কে তোমার সঙ্গে সারা দিন কাটাবে, এমন মেয়ে তুমি বেশি খুঁজে পাবে না। যদি আমাকে মডেল হ'তে হয়, তাহলে অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে। অন্তত তিন ফ্র্যাঙ্ক।

—মডেল হ'তে হ'লে তিন-চার ঘণ্টা বসতে হয়। তুমি তো মাত্র এক ঘণ্টার জন্যে দাঁড়িয়েছ।

মেরী মডেলের টুল থেকে নেমে এসে বললো, বেশি টাকা না দিলে আমি দাঁড়াতে পারবো না। সে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালো কিছুক্ষণ। তার পর ব্যাগের মধ্যে থেকে সিগারেট নিয়ে ছবিটা পরীক্ষা করতে লাগলো।—কই, এ তো আমার মতো দেখতে হয় নি! আমি ওর চেয়ে অনেক সুন্দর। আমার মনে হয়, তুমি ভালো আঁকতে পারো না। সেই যে শিল্পী মোলের ডিসে ছবি এঁকেছিল, সে কিন্তু খাঁটি······

—আঃ, সরে যাও। কথাগুলো ক্রুদ্ধ হেনরীর মুখ থেকে সজোরে বেরিয়ে এসেছিলো। আমাকে একা থাকতে দাও। তুমি সেই শিল্পীর কাছে যাও, যেখানে খুশি যাও, চুলোয় যাও! আমার কিছু যায়-আসে না।

—আমায় তা ব'লে আজকের জন্যে তিন ফ্র্যাঙ্ক দিতে হবে। মডেলের জন্যে আমাকে প্রয়োজন না হ'লে অবশ্য তোমাকে আর টাকা দিতে হবে না। তবে আজকের জন্যে তোমার কাছে আমি টাকা পাই।

অভিজ্ঞতা থেকে হেনরী বুঝেছিলো, যুক্তি দিয়ে মেরীকে বোঝানো পণ্ডশ্রম মাত্র। সে তিনটি রূপোলি মুদ্রা বার করে ছুঁড়ে দিয়েছিল মেরীর দিকে। শূন্য পথেই সে লুফে নিয়ে বডিসের মধ্যে মুদ্রা কয়টি পুরে ফেললো! তার পর দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

ঘণ্টাখানেক পরে মেরী অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এলো। মুখে হাসির ইসারা টেনে বললো, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। হেনরীর হাঁটুর ওপর থুতনিটা রেখে, পায়ের কাছে বসে বলতে লাগলো, তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে চাই না। শুধু এই ছোট্ট ঘরে বন্দী হ'য়ে থাকতে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। যদি মাঝে মাঝে বাইরে যেতে পাই, তাহলে বাঁচি।

—একটা পঙ্গুর সঙ্গে সহবাসে কোন কৌতুক নেই, তাই না? হেনরী বেদনাবিদ্ধ চোখে তার দিকে চেয়ে বলেছিলো। আমি বুঝতে পারি। তা বেশ তো, তুমি তোমার বোনের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে যেতে পারো।

মেরী লাফিয়ে উঠেছিল অনুমতি পেয়ে। ওপরে গিয়ে হেনরীর দেওয়া টুপিটা পরে নিয়েছিল। হেনরী ব্যথার্ত ভাবে স্মরণ করেছিল, এর আগে মেরী কোন দিন এ টুপি ব্যবহার করে নি। আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরবো। আর ছাখো, এর পর খুব ভালো হবো আমি, দরজা থেকে সে বলেছিলো,—সত্যিকারের ভালো।

হেনরী কোন জবাব দেয় নি। সিঁড়িতে মেরীর আনন্দিত পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলো। যেন মুক্ত-বিহঙ্গিনীর পাখা ঝাপটানোর শব্দ।

এর পর থেকে মেরী দুপুরের একটু আগে ঘুম থেকে উঠতো।
তাড়াতাড়ি সাজসজ্জা সারতো। তারপর হেনরীর কাছ থেকে দৈনিক বরাদ্দ অর্থ হস্তগত ক'রে বেরিয়ে পড়তো। ফিরতো সন্ধ্যার শেষে। তখন তার গাল দুটো আরক্ত আপেলের মতো, চোখ দু'টো অপরিমিত আনন্দের উত্তেজনায় ঝক্‌ঝক্ করছে।

পোষাক ছাড়তে ছাড়তে সে কি ভাবে অসুস্থ বোনের রোগশয্যায় কি সেবা করে এসেছে, তার একটা মিথ্যা কল্পিত কাহিনী বর্ণনা করতো। কিন্তু বুদ্ধির অভাবে নিজের মিথ্যার জালে অল্পক্ষণেই ধরা পড়তো। তারপর মেলায় যাওয়া, সাঁতার দেখার জন্যে কি ভিড় হয়েছিল, সব একে একে বলে ফেলতো!

তার এলোমেলো কথার সার সঙ্কলন ক'রে হেনরী বুঝতে পারতো মেরী নতুন ক'রে জীবন উপভোগ করছে। পুরোন পরিচিতদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপন করেছে। বোনের কাছে যাচ্ছে। তার দেওয়া টাকা খরচ করছে দু'হাতে। তবু তার প্রতি বিশ্বাসের ভাণ করতে লাগলো সে।

সে ছবি আঁকতে গিয়ে আবিষ্কার করলো, ছবি আঁকায় আর তার রুচি নেই। মুলাঁরুজের বিজ্ঞাপনের জন্যে পরীক্ষামূলক ছবি আঁকতে গিয়ে কয়েকটা অর্দ্ধসমাপ্ত রেখার টান দিয়ে থেমে গেলো।

সে আবার কাফেতে যেতে লাগলো। সেখানে তার বন্ধুরা আগের মতোই ছবির ব্যবসায়ী আর সমালোচকদের সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যস্ত। যা তা ক'রে সময় কাটাতে লাগলো সে; কিন্তু সময় কাটানো কি কঠিন ব্যাপার! ভবঘুরের মতো আবার বেড়াতে লাগলো। সে আবার মুলাঁরুজে যাতায়াত আরম্ভ করলো। জিডলার তার টেবিলে এসে পোষ্টার আঁকবার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলো। মঁসিয়ে তুলো কখন পোষ্টার এঁকে দেবেন বলুন? দেখুন প্রায় অর্দ্ধেক টেবিল খালি।

এই ভাবে দিন কাটতে লাগলো।

মেরী ক্রমশ রাত ক'রে ফিরতে আরম্ভ করলো। তিক্ত বিষাদ ক্লিষ্ট মুখে ঘরে ফেরে ক্লান্ত হ'য়ে। অপরাহ্ণে যে সাঁতার কাটার রঙ্গস্থলে কাটিয়ে আসে, কণ্ঠে সেখানকার অ্যাকর্ডিয়নের সুর, গায়ে বিস্ট্রোর তীব্র গন্ধ। কোথায় গিয়েছিলো জিজ্ঞাসা করলে সে উদ্ধত হ'য়ে ওঠে। না জিজ্ঞাসা করলে কল্পিত কাহিনী ব'লে হেনরীকে উত্যক্ত করতে প্রলুব্ধ হয়।

—আসবার পথে আজ এক ভদ্রলোক আমার পিছু নিয়েছিলো। বেশ সুশ্রী চেহারা। আমাকে চোখের ইসারা করছিল। তার সঙ্গে যাবার ইচ্ছে হচ্ছিলো।

কিংবা হেনরীর পায়ের সম্বন্ধে নিষ্ঠুর ভাবে বিদ্রূপ করতো। আরো টাকা দাবী করতে লাগলো।—দশ ফ্র্যাঙ্কে আমার কুলোয় না। আমাকে এখন কুড়ি ফ্র্যাঙ্ক ক'রে দিতে হবে।

এক সপ্তাহ পরে ত্রিশ ফ্র্যাঙ্কে রফা হলো। তারপর পঞ্চাশে। তার সর্বদা অর্থের প্রয়োজন দেখে হেনরী বুঝতে পারলো, মেরী আবার তার পূর্বপ্রণয়ী রোবের্-এর সঙ্গে মিলেছে।

প্রতীক্ষার বেদনার সঙ্গে ঈর্ষার জ্বালা মিশলো; যা তার কোন দিন ছিল না, তা হারিয়ে এই বৃথা বেদনা কেন? মেরী কি সাধারণের সম্পত্তি নয়? তার কোন প্রণয়ী আছে কি না, এতে কি যায়-আসে? যুক্তি দিয়ে নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেছিলো সে, কিন্তু পারেনি।

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো তার। উচ্ছ্বসিত ফেনিল রাগে ফেটে পড়লো সে। চিৎকার করে মেরীকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো, যতো অপমানিত হলো ততো অপমান করতে লাগলো সে। তাদের সন্ধ্যা মাতালের কলহ দৃশ্যে পরিণত হলো। আর তাদের রাত্রি আনন্দহীন কামকলায় সমস্ত বিদ্বেষের শ্রান্তি নিয়ে আসতো।

একদিন স্নানের ঘরের সেলফে মেরীর ব্যাঙ্কের বইটা দেখতে পেলো হেনরী। দেখলো গচ্ছিত অর্থের সমস্তই তুলে নিয়েছে সে, এক কপর্দকও আর নেই।

—ও সমস্ত টাকা তো আমার। আমি রোজগার করেছি। ও টাকা নিয়ে আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। চিৎকার করে মেরী কথাগুলো হেনরীকে শুনিয়েছিলো।—হ্যাঁ, হ্যাঁ তাকেই টাকা দিয়েছি। তাকে আমি ভালোবাসি! তার জন্যে আমি পাগল। এখন আমি তার কাছেই ফিরে যাবো ঠিক করেছি। তোমার ঐ কুৎসিত মুখ দেখতে কোন দিন আর এ ঘর মাড়াবো না।

দুর্দমনীয় ঈর্ষার আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছিলো হেনরী। মেরীকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলো চিৎকার ক'রে। ছড়ি তুলেছিল তাকে মারবার জন্যে। মেরী পাশ কেটে সরে যাওয়ায় আঘাত লাগেনি। তারপর স্তব্ধ বেদনায় শুনতে পেয়েছিলো মেরী গুনগুন করে গান গেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেলো।

দু'সপ্তাহ পরে হেনরীর রাগ পড়ে গেলো, অনুরাগের বেদনায় ছেয়ে গেলো মন। প্রতীক্ষার যন্ত্রণায় প্রতিমুহূর্তে কেঁপে উঠলো দ্বিধা-থরোথরো বাসনা।

তারপর একদিন ক্ল ভ লা প্লাসেতে মেরীকে দেখলো হেনরী। বেবার্ট-এর পাশে বসে গল্প করছিলো। তার চোখ দুটো কি সকরুণ! সে ভাবতেই পারলো না, তার বিরুদ্ধে মেরীর ঐ সুন্দর চোখ কি ক'রে নিষ্ঠুর কঠিন হতে পারতো!—সে দেখলো ঐ কর্কশ পুরুষ ঠেলে দিলো তাকে। কঠিন কণ্ঠে কি যেন বললো। মারবার জন্যে তার দিকে হাত তুললো যেন। নম্রনত ভাবে সে মাথা নাড়লো, লোকটির দিকে চেয়ে ভীত হাসি হাসলো। প্রেমের কি উপায়হীন হীনতা!

গাড়ির কাছে ফিরে এসে ড্রাইভারকে বললো, ভেতরে গিয়ে মেরী শার্লেট ব'লে একটি মেয়েকে ডেকে আনতে পারো? বলো, তার সঙ্গে এক ভদ্রলোক কথা বলতে চায়।

প্রতীক্ষার মুহূর্ত ক'টি অসীম যেন। অবশেষে আলোকিত দরজার পটভূমিকায় মেরীকে দেখতে পেলো। মেরী, গাঢ়স্বরে সে বলে উঠেছিল।—ওঃ তুমি, তার দিকে এগিয়ে এসে বলেছিল মেরী। কি দরকার তোমার?—তুমি ফিরে চলো মেরী। হেনরী মিনতি করছিলো। অনুতপ্ত লজ্জার রক্তাভা তার চোখের কোলে মেরী লক্ষ্য করেনি ব'লে খুশি হয়েছিল সে।—আমার ভুল হয়েছিল মেরী। ফিরে চলো আমার সঙ্গে।

—তা তো জানি না। তবে এখানে আমার ভালোই কেটে যাচ্ছে। অনেক বড় লোকই এখন আমাকে চাইছে। যদি তোমার কাছে ফিরেই যেতে হয় তাহলে যাট—না না, পঁচাত্তর ফ্র্যাঙ্ক করে প্রতিদিন দিতে হবে। কি দেবে? বেশ তাহলে এক মিনিট অপেক্ষা করো।

পরাজিতের মতো গাড়ির গদীতে বসে রইলো হেনরী। এই দুর্বলতার লক্ষণে নিজের প্রতি ঘৃণা হতে লাগলো তার। দরজার কাছে মেরী তার প্রণয়ীর উদ্দেশে চুম্বনের ইসারা জানাল। তারপর স্কার্টের প্রান্ত চক্রাকারে ঘুরিয়ে গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো।—আমি জানতাম তুমি আসবে। হেনরীর গায়ে হেলান দিয়ে সে মৃদুকণ্ঠে বলেছিল। তুমি এসছ আমি খুশিই হয়েছি। আমিও তোমার অভাব অনুভব করছিলাম।

এ মিথ্যাবচনে কিছু ক্ষতি আছে কি? কিছুই যায়-আসে না। তার পাশে সে এখন উপস্থিত, সমাদরে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হেনরী তাকে।

তারপর আবার পুরোন দিনলিপির পুনরাবৃত্তি। হেনরী তাকে টাকা দিতো। সারা দিন সে কাটিয়ে আসতো বাইরে। ফিরতো রাতে। অবশ্য ভালো হ'য়েই থাকত তার সঙ্গে।

কিন্তু একটা গভীর পরিবর্তন লক্ষ্য করলো হেনরী। যে মেরীকে সে জানতো সে ছিলো স্বাধীন রূপবিলাসিনী ভবঘুরে, খেয়ালী আর নিষ্ঠুর। নতুন মেরীর মধ্যে সে একটি প্রেমিকা নারীর আবির্ভাব আবিষ্কার করলো। হেনরীর নির্দেশ অনুসারে চলতে লাগলো সে।

বোধ হয় সেই সন্ধ্যায় বেবার্ট হাত তুলে মারবার শাসনে এমন কিছু একটা বলেছিলো। পঞ্চাশ ফ্র্যাঙ্ক ক'রে যে দৈনিক দিচ্ছে এমন লোকের আশ্রয় ত্যাগ করার জন্যে মেরীকে হয়তো সে তিরস্কার করেছিলো। তার মঙ্গলের অভিপ্রায়ে হেনরীর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে বলেছিলো।

একদিন সকালে না বেরিয়ে হেনরীর ছবি আঁকবার জন্যে মডেল হতে চাইলো। আর একদিন স্বেচ্ছায় অপরিচ্ছন্ন ষ্টুডিও পরিষ্কার করলো। তার এই দাসীর মতো ব্যবহারে হেনরী সঙ্কুচিত বোধ করছিলো। যখন মেরী তার ছবি দেখে তাকে মুখর তারিফে খুশি করতে চেষ্টা করে, সে তখন মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওকে তোসামোদ কোরো, ব'লো ওর আঁকা ছবি চমৎকার, বেবার্ট নিশ্চয় মেরীকে এ সব বলতে শিখিয়েছিলো। আর মেরী অক্ষরে অক্ষরে তার নির্দেশ পালন করতো, একটা চুম্বন কিংবা একটু আদরের লোভে।

মেরী আগে অনেক কাজ করতো। এই প্রথম সে তার সঙ্গে ঠিক বসবাস করতে লাগলো। পেছন দিকের রান্নাঘরে নিজের হাতে রাঁধতো। হেনরী এত দিন তার কাছ থেকে যে সমস্ত কাজের প্রত্যাশা করেছিল, সমস্তই করে দিতো সে। হেনরীর সঙ্গে বাইরে যেতো, তার বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতো। সারাক্ষণ হেনরীর ছায়ার মতো পাশে-পাশে থাকতো। তার অবাঞ্ছিত মনোযোগে নাছোড়বান্দা ভাবে ঘিরে রাখতো হেনরীকে।

তার ব্যবহারের এই আকস্মিক পরিবর্তনে তাদের যৌন সম্বন্ধেও একটা পার্থক্য দেখা দিয়েছিলো। তাদের মৌখিক কলহ এখন প্রণয়লীলার পূর্বাভাস। মেরী পরিশ্রমী রূপবিলাসিনীদের মতো সর্বদা হেনরীকে খুশী রাখতে চেষ্টা করতো। সবেতেই উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে আসতো মেরী, জোর করে আনন্দ প্রকাশ করতো। প্রেমের দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আর ফিসফিস করে কথা বলে তার রূপ-ব্যবসা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করতো।

তার সব কথা সত্যি হ'লে কি সুন্দর হতো! কিন্তু সবই পরিকল্পিত, মিথ্যা। এ ছলনা শুধু তাকে আঘাতই করে।

ক্রমে ক্রমে হেনরী অনুভব করে, মেরীর প্রতি তার অনুরাগ

উপশমিত-প্রায়। পূর্ববাসনা আর নেই। তাদের এই অবৈধ প্রণয়লীলার একটা পরিসমাপ্তি চাইছিলো সে। চাইছিলো বিচ্ছেদের শেষ মুহূর্ত যেন সুন্দর হয়। এবার সে আবিষ্কার করলো যে কোন রকম সাংসারিক স্নেহ-সম্বন্ধই ছিন্ন করা কি কঠিন! সে সম্বন্ধ যতই অগভীর হোক। মেরীর পোষাক পরিচ্ছদ, তার কয়েকটি জিনিসপত্র, তার প্রসাধনের সাজসরঞ্জাম তার ঘরে, স্নানের ঘরে অতি পরিচিত সামগ্রীর মতো ছড়ানো রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে মেরীর অর্থনৈতিক সমস্যার প্রশ্ন।

মেরীর ভবিষ্যৎ কি হবে! সে তাকে ত্যাগ করছে। যে মুহূর্তে মেরীর আয়ের পথ বন্ধ হবে বেবার্টও তাকে ত্যাগ করে যাবে সেই মুহূর্তে। গৃহহীন অর্থহীন মেরী আবার অসহায় হ'য়ে পড়বে। ভালোবাসবার কেউ থাকবে না তার। সে কি করবে তখন? সে শিক্ষিতা নয়, সুতরাং তার পূর্বজীবনে আবার ফিরে যেতে হবে তাকে। অন্ধকার কানাগলিতে, পথে-ঘাটে আবার সেই দেহবিলাসিনীর নির্মম আত্মহত্যার জীবন।—তারপর সেণ্ট ল্যাজারে দেহ-ব্যবসার জন্যে প্রয়োজনীয় কার্ড, রূপবিলাসিনীর নোংরা ঘর, সবশেষে আস্তাকুঁড়ে আত্মবিলুপ্তি।

সেপ্টেম্বরের এক অপরাহ্নে হেনরী তার পরিকল্পনার কথা জানালো।—মেরী! ধীরে ধীরে সুরু করলো সে, আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমাদের মধ্যে এখন আর দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়াই মঙ্গল। বলো তোমার জিনিষপত্তর কোথায় পাঠিয়ে দেবো?

ঠিক বুঝতে না পেরে মেরী তার দিকে চে[illegible] জিজ্ঞাসা করেছিলো, তার মানে—তুমি আমাকে চলে যেতে বলছো?

হেনরী তার কোটের পকেট থেকে একটা খাম টেনে বার করলো। দেখ তোমার জন্যে একটা উপহার এনেছি!

হেনরী বলতে বলতে থেমে গেল। মেরীর মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেছে। গভীর আশঙ্কায় তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত থরথর ক'রে কাঁপছে। তার দুর্বল মন আসন্ন বিপদের গভীরতা সবটুকু বুঝতে পারেনি। তবে তার দেহ মস্তিষ্কের চেয়ে অনুভূতিপ্রবণ। সে যেন সমস্ত দেহ দিয়ে এই বিপদকে অনুভব করছিল। মুমূর্ষু জন্তুর মতো কেঁপে-কেঁপে উঠছিলো সে।

—তুমি বরং একটু বসো, মেরী হেনরী শান্ত ভাবে বলেছিলো।

—কিন্তু আমি—আমি কি করেছি? কথা আটকে যাচ্ছিলো তার মুখে। তোমার সঙ্গে তো ভালো হ'য়েই আছি। তুমি যা চাও সবই তো করছি। আসবাবপত্র পরিষ্কার করছি। তোমার ছবি আঁকার জন্যে নগ্ন হ'য়ে দাঁড়াতেও রাজি আছি—

আত্মপক্ষ সমর্থন করতে সে রুদ্ধশ্বাসে অনেক কথা বললো। কথার ফাঁকে শুকনো ঠোঁটটা জিভ দিয়ে চেটে ভিজিয়ে নিলো। হেনরী বুঝতে পারছিলো মেরীর মন এই অবিচারের অনুভূতিতে বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছে। প্রাণপণে নিজেকে এই পরিবেশে মানিয়ে নিয়ে যথাসাধ্য কর্তব্য পালনের পরিবর্তে এই অপ্রত্যাশিত শাস্তি!

—না, তোমার কোন দোষ নেই। হেনরী সান্ত্বনার কণ্ঠে বলেছিলো, তুমি বেশ ভালো হ'য়েই ছিলে। তবে কি জানো, আমি আর—

এইবার মেরী বুঝতে পেরেছিল। হেনরী তার ভিজে চোখের মধ্যে তার প্রমাণ পেলো।

—কিন্তু সে কি বলবে?—হেনরীর উপস্থিতি বিস্মৃত হ'য়ে মেরী বলে উঠেছিলো।—সে কি বলবে, যখন জানবে আমাকে তোমার আর দরকার নেই?

সে একবার ওপর দিকে তাকালো, তারপর অনুরোধের ভঙ্গিমায় সকরুণ ভাবে তার দিকে ঝুঁকে পড়লো।

—হেনরী, দয়া ক'রে আমায় তাড়িয়ো না, তুমি যা বলবে আমি তাই করবো—

বেদনায় সে স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠলো। দুটো ফুলের মতো চোখের জলে ভাসছিল যেন।

হেনরীর হাঁটুর কাছে নত হ'য়ে বসেছিলো সে। তার হাত মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে বার বার চুম্বন করছিলো।

—ও রকম করো না মেরী! হেনরী চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এই হীনতার দৃশ্য সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব।

ঘণ্টাখানেক পরেই যে ঘটনা ঘটলো হেনরী তা কোন দিন বিস্মৃত হয়নি। বিস্রস্ত বেশে, চোখের জলে সিক্ত হ'য়ে হেনরীকে কোচের ওপর হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিলো। অনেক অনুনয় বিনয় করছিলো। অশ্রু-ভাঙা কণ্ঠস্বরে বলতে লাগলো যে, সে রান্না করতে, মডেল হতে, জামা-কাপড় ঘর-দোর সমস্ত পরিষ্কার করতে রাজি আছে।

এক হাত চোখের ওপর রেখে হেনরী ইজেলের সামনে মাথা নীচু করে বসে রইলো। মেরী হেনরীকে ম্যাডাম দ্যু বেরীর কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। এই মেয়েটির কাহিনী হেনরী পড়েছিলো। সেও মেরীর মতো সুন্দরী ছিলো। এসেছিলো বস্তি থেকে। সেও নির্দয় আশ্রয়দাতার সামনে নত হয়ে বসেছিলো। চুম্বন করেছিলো তার হাত। ক্ষমাভিক্ষা চেয়েছিলো।

মেরী হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলো।—আমি তোমায় ঘৃণা করি, বুঝলে? তোমাকে চিরদিনই ঘৃণা করেছি, ঘৃণা করেছি তোমার ঐ কুৎসিত মুখ আর পা। তুমি একটা বামন পঙ্গু। ভালো করে হাঁটতেও পারো না। তোমাকে দেখার দিন থেকে তোমাকে ঘৃণা করি। তোমাকে যখন ভালবাসি বলেছি তখন ভেতরে ভেতরে আরো বেশী ঘৃণা করেছি। তোমার স্পর্শে আমার সারা শরীর সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে। বেবার্ট না বললে আমি কখনই তোমার কাছে ফিরে আসতাম না। সে জোর ক'রে আমায়—

বিকৃত মুখভঙ্গি ক'রে হেনরীর কাছে সরে এসে বললো, আর একটা কথা, তুমি খোঁড়া বলে আমি খুশী। শুনতে পেয়েছ? আমি খুশি হয়েছি যে তুমি পঙ্গু।

মেরী বিকৃত-মস্তিষ্ক মেয়ের মতো কথা বলছিলো। হেনরী প্রথমে তার এই দুর্ব্যবহারে কৃতজ্ঞতাই বোধ করছিলো। বিচ্ছেদকে অনায়াসে সম্ভব ক'রে আনছিলো ব'লে। প্রত্যেকটি অপমানের সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্কল্প দৃঢ়তর হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত সে পুলিশের ভয় দেখালো। সার্জেণ্ট প্যাতোর কথা বললো। জানালো, বেশি কথা বললে যাতে প্যাতো এসে তাকে সেণ্টল্যাজারে ধরে নিয়ে যায় তার ব্যবস্থা করবে।

এইবারে সে চেতনা ফিরে পেলো যেন। কোচের ওপর বসে পড়লো। পরাজিত, শ্রান্ত হয়ে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলো। কম্পিত হাতে ব্লাউসের বোতাম এঁটে নিলো।

—আমার সব জিনিসপত্তর আমার বোনের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিও। সেখান থেকে আমি নিয়ে নেবো।

হেনরী ধীরে ধীরে তার পাশে এসে বসলো। তার হাত হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বললো, তুমি কি বেবার্ট-এর কাছে ফিরে যাবে?

মেরী মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো। কিছুক্ষণের জন্যে তার মুখ যেন অসহ্য যন্ত্রণায় একটা মুখোসের মতো দেখাচ্ছিলো। —তার কাছে যাবো না, সে আর একজন মেয়েকে ভালোবাসে। আমার কাছে সে শুধু টাকা চায়—

—যে তোমাকে ভালোবাসে না, তাকে ভালোবাসা বড় শক্ত, তাই না? মৃদুস্বরে হেনরী বলেছিলো। তুমি আর আমি দু'জনেই তা জানি। কিছুদিন পরে আবার একা থাকা অভ্যাস হ'য়ে যাবে —(একথা সত্য নয়, সান্ত্বনা মাত্র। একা থাকা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়—) একদিন কেউ তোমার প্রতি সদয় হ'তে পারে—

মেরী শুনছিলো না। তার কানে একটা কথাও গেলো না। যন্ত্রের মতো চুল ঠিক করে নিলো। হাত দিয়ে মুছে ফেললো চোখের জল। শিশুসুলভ এই ভঙ্গিমা হেনরীর হৃদয় স্পর্শ করলো। তারপর উঠে হেনরীর হাত থেকে খাম তুলে নিলো। কোন ধন্যবাদ জানালো না! যন্ত্রের মতো ঘর থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো। হেনরী তার পায়ের শব্দ সিঁড়িতে শুনতে পেলো।

ষ্টুডিও কি এক রকম নিস্তব্ধতায় ভরে উঠলো। কয়েকটি মাছি ঘরের মধ্যে তির্যক সূর্যের আলোয় উড়ছিলো। মেরীর পাউডারের গন্ধ এখনো ঘরের বাতাসে রয়েছে। হেনরী তার ইজেলের সামনে গিয়ে বসলো। সুরু করলো ছবি আঁকতে।

* * *

ছবিটা দেখেছ? ছবিটা দেখছ? চার দিকে এক রব। সকাল বেলায় মৃদু-মর্মর শব্দে চার দিকে একথা শোনাচ্ছিলো—রাত্রিবেলায় সারা সহরে বিপুল কোলাহলে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

কি দেখার কথা বলছো?

ঐ পোষ্টারটা। একটি মেয়ের ক্যানক্যান নাচের ছবি—

এ যেন একটা বিদ্রোহ!

একটা মহৎ সৃষ্টি!

একটা মাষ্টারপিস্।

একটু আকস্মিক কিন্তু অসাধারণ! সমস্ত প্যারিস চমৎকৃত হয়েছিলো। সমস্ত প্যারিস সেই সঙ্গে পেয়েছিলো আকস্মিকতার আঘাত। সমস্ত প্যারিসে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিলো। সর্বত্র এই পোষ্টার। একে অগ্রাহ্য করা বা বিস্মৃত হওয়া যায় না। প্রত্যেক দোকানে প্রত্যেক প্রাচীরে এই পোষ্টার আঁটা। লোকেরা ভিড় করছে এর সামনে। যানবাহনের চলাচলে বাধা পড়ছে। পুলিশ অনুরোধ করছে সরে যাওয়ার জন্যে। ভয় দেখাচ্ছে, তিরস্কার করছে। অসংখ্য ভিড়ের মধ্যে লোকেরা বকের মতো গলা বাড়িয়ে পোষ্টারের গায়ে লেখা চিত্রশিল্পীর স্বাক্ষরিত নাম পড়তে চেষ্টা করছে। সংবাদপত্রে এর আলোচনা চলতে লাগলো। কেউ কেউ একে দানবীয় সৃষ্টি বলে ঘোষণা করলো। পথপ্রান্ত থেকে এই পোষ্টার সরিয়ে নেওয়ার জন্যে দাবী জানালো। কেউ কেউ বললে, পোষ্টারও যে প্রথম শ্রেণীর শিল্পকর্মে উত্তীর্ণ হতে পারে এই তার প্রথম উদাহরণ। সমাজপতি ও নীতিবিদের দল বলতে লাগলো প্যারির যুবকদের এতে বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মেয়েরা পথ চলতে এই সব পোষ্টার দেখে লজ্জায় আরক্তিম হ'য়ে ওঠে

অপর দিকে একদল শিল্পী ও সমালোচক স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে পোষ্টারটির স্বপক্ষে মত প্রকাশ করলো।

বেশ উঁচুদরের নীতিসম্পন্ন শিল্প।

তথাকথিত নীতিবাদের প্রতি ব্যঙ্গ বলা চলে।

এই পোষ্টার প্রকাশের সঙ্গে লিথোগ্রাফির নতুন যুগের সূচনা হ'ল উচ্চ দরের শিল্পে পরিণত হ'ল। মঁসিয়ে তুলো লোত্রেক শিল্পকে নিয়ে এসেছিল প্রকাশ্য রাজপথে।

সবচেয়ে হতবাক বিমূঢ় হ'য়ে গিয়েছিলো হেনরী নিজে। পাহাড়ের খাতে নুড়ি ছুঁড়ে বিপুল হিমশিলা-প্রপাত ঘটালে মানুষ যেমন বিমূঢ় হয়ে যায়, সেও তেমনি বিস্মিত হ'য় গিয়েছিলো।

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছি না এত উৎসাহের ঠিক কারণ কি? হেনরী তার শিল্প-ব্যবসায়ী বন্ধু মরিস জয়াণ্টকে বলেছিলো।

তোমার ছবি সকলের মনে একটা ধাক্কা দিয়েছে, এ কথা নিশ্চয় মানো?

সে ছেড়ে দাও। পোষ্টারের কাজই তাই। আমি চেয়েছিলুম জিড্লারকে সাহায্য করতে; যাতে করে বেশী লোক মুলাঁ তে হাজির হয়। এর মধ্যে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

কেন, কি হ'ল?

আমি আর ছবি আঁকবার অবসর পাচ্ছি না। লোকরা যে কি কোরে আমার ঠিকানা পায় কে জানে? দলে দলে সব দেখা করতে আসছে। সকলেই পোষ্টার এঁকে দিতে বলে। প্রসাধন-সামগ্রীর ব্যবসায়ী সব ওরা। থিয়েটারের অধ্যক্ষ, অভিনেত্রী, আরো কত লোক। প্রত্যেক দিন সকালে ম্যাডাম লুবে একতাড়া নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে যান। যাদের কাছ থেকে চিঠি আসে তাদের নাম সাত জন্মে শুনিনি।

—তুমি সে চিঠি নিয়ে কি করো?

—কেন, ষ্টোভ জ্বালবার জন্যে তাঁকেই ফেরত দিই। নইলে সেগুলো নিয়ে কি করবো?

—কয়েকটা খুলে দেখা মন্দ কি? কয়েক জনের আমন্ত্রণ তুমি গ্রহণ করতে পারো। এতো বাজে লোকের সঙ্গে না মিশে, কয়েক জন রুচিসম্পন্ন লোকের সংস্পর্শে আসা তো ভালো। শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোকের সঙ্গে না মিশে গোটাকতক ব্যর্থ লোকের সঙ্গে দিন কাটিয়ে লাভ কি? আমি তোমাকে নাতাসাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারি। মিস্ নাতাসাঁ প্যারিসের মধ্যে একজন সুন্দরী আর বুদ্ধিমতী মহিলা। তিনি তোমাকে একদিন নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

—আমি কোথাও যেতে চাই না। আমি মুলাঁতেই খুব সুখে আছি। সকলেই এখানে আমায় চেনে আর আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছিলুম, যে নতুন মেয়েটি আজকাল নাচছে, তার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে চাই। তার নাম জেন এ্যাভ্রিল—...

কিছুদিন পরে মরিস তাকে নাতাসাঁ-পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এখন থেকে হেনরী যেন নতুন করে তার

আত্ম-মর্যাদা আবিষ্কার করলো। সেও এই প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত, অন্যতম একজন। ঘোড়া? ঘোড়া তাকি হ'য়েছে? তার পরিচয় এখন—দুঃসাহসী তরুণ শিল্পী লোত্রেক। সে এখন বিখ্যাত, স্বনামধন্য। প্যারীর সমস্ত ঘরের দরজা তার কাছে উন্মুক্ত। সে যে-কোন জায়গায় যেতে পারে, আলাপ করতে পারে যে-কোন লোকের সঙ্গে। যেখানে খুশি সে যেতে পারে। সর্বত্র সমান প্রবেশাধিকার। সকলেই তাকে অনুসন্ধান করছে।

তার পর পাঁচ বছর ধরে ক্রমান্বয়ে প্যারীতে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার পর্ব। সব দুয়ার তার কাছে উন্মুক্ত। সর্বত্রই সে যেত। রাতে সে বেশি সময় পেত না ছবি আঁকবার, সব নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারতো না, সুতরাং সব কিছু দেখা সম্ভব হ'য়ে উঠতো না। সারা দিন ছবি আঁকতো বলে, রাত্তিরে তাকে নানা কাজে জেগে থাকতে হতো, আর রাতে ঘুমোবার অবসর পেত না বলে অপর্যাপ্ত মদ্যপান করতো।

এই পাঁচ বছরের বিনিদ্র রজনীর ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে স্মরণীয় কিছুই দেখতে পেত না।

বার···মেয়ের দল—সুন্দরী তরুণী। স্বচ্ছ বসনে নিটোল শ্রোণী, আর মুখের ওপর আরক্ত হাসির ইঙ্গিত—বৃদ্ধ তরুণী, প্যারীতে উৎসব-নিশীথে জোনাকীর মতো মেয়েরা। অসংখ্য অভিনেত্রী। রঙ্গমঞ্চের সাজঘর। নীল, লাল, সবুজ চারি দিকে রঙের ফোয়ারা। চারি দিকের আসবাবপত্রের ওপর, পর্দার ওপর বিচিত্র রঙের বাহার সাজঘরের রঙের কাচপাত্রের পাশে দোমড়ানো তোয়ালে······

টুকরো টুকরো অসংখ্য স্মৃতি মনের কোণে ভিড় করে।

নাথান্সা-পরিবারের এক ভোজসভায় সে একটা বিচিত্র রঙের জ্যাকেট আর ইউনিয়ন জ্যাকে তৈরী ওয়েস্ট কোট পরে গিয়েছিলো। সেও অনেক ভোজসভার ব্যবস্থা করেছিল। এই সব ভোজসভায় সে বাঁদরের মাংস পরিবেশন করতো, চিংড়ি মাছ খাওয়াতো অতিথি অভ্যাগতদের।

আরো নানা রকমের অদ্ভুত কাণ্ড করবার নেশা পেয়ে বসেছিলো তাকে। তবু নিঃসঙ্গ জীবনের অন্তর্দাহ তার মধ্যে নিয়ে এসেছিল তিক্ত কাঠিন্য। অপর্যাপ্ত মদ্যপানে মগ্ন হ'য়ে রইলো সে। তার গোলাপী দস্তানা, রক্তবর্ণ জামা, আর বিলিয়ার্ড বোর্ডের ওপরের কাপড় দিয়ে তৈরী সবুজ জ্যাকেট সর্বত্র প্রসিদ্ধ হলো।

এই হলো তার পাঁচ বছরের কাহিনী। এখন সে তার গাড়ি-ঘোড়া বিক্রী ক'রে দিলো। কৌতুকক্লান্ত মন ক্লাউনের বেশে আর ঘুরে বেড়াতে প্রস্তুত নয়। গানের জলসায় হাসির খোরাক জোগাতে মন তার নারাজ। রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে এখনো থাকে, সে শুধু অন্য কিছু কাজ নেই ব'লে। সে এখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সুযোগ পেলে ব'সে ব'সে গাড়ির মধ্যেই ঘুমাতো।

এখনো সে নিঃসঙ্গ। ভালো ক'রেই এখন সে জানে যে কোন মেয়েই কোন দিন তাকে ভালোবাসবে না। তাদের সুন্দর মুখের হাসি তার উদ্দেশ্যে নয়, তার শিল্পখ্যাতির উদ্দেশ্যে। তার বয়স এখন মাত্র ত্রিশ বছর, কিন্তু দেখতে হয়েছে পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ়ের মতন। তার স্বাস্থ্য ক্রমে ভেঙে যাচ্ছিলো। আগেকার তুলনায় অর্ধেক সময়ও সে ছবি আঁকতে পারতো না। মদের পাত্র তুলে পান করতে গেলে হাত কাঁপতে থাকে। অন্য হাত দিয়ে চেপে ধরতে হয় কম্পিত মণিবন্ধ। মদ্যপানে তার পঙ্গু পায়ের কোন সাহায্য হয় না বরং সাংঘাতিক আঘাত পায় মাঝে মাঝে। এই ভাবে আরো কত দিন চলবে? সে জানে না, জানতেও চায় না।—

সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি, জেন এ্যাভ্রিল বলছিল। সে তার ফারের টুপি চেয়ারের পেছনে রাখলো। হাতের দস্তানা খুলতে লাগলো।

—তুমি কি খাবে? আমাকে বেশ কিছু খোল রুটি খেতে হবে। পেঁয়াজ আমি খেতে পারি না। আজ রাত্তিরে আমি—আচ্ছা ডিম আর কফি খাই বরং। আর তুমি—তুমি কি খাবে? তার স্বচ্ছ অবগুণ্ঠন সরিয়ে হেনরীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—তুমি কি নেবে?

হেনরী ফরমাস করলো ভৃত্যকে জেন যা খেতে চাইলো। নিজের জন্যে শুধু ব্রাণ্ডি আনতে বললো। ফারের কাজ-করা কোটের বোতাম খুলতে লাগলো সে।

—দাঁড়াও, হাত দিয়ে জেন ভৃত্যকে থামতে ইঙ্গিত করলো।

হেনরী, তোমার কিছু খাওয়া উচিত। কি হাড়সার চেহারা হয়েছে দেখেছ? তুমি আজকাল খাওয়া ছেড়ে দিয়েছো। ওয়েটারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিলো, ওর জন্যে ডিম নিয়ে এসো।

আর দুটো ব্রাণ্ডি, হেনরী যোগ করে দিলো। তারপর বললো, এখন বল তো কি জন্যে পোষ্টার চাইছ? আমি তোমায় বলেছি, এখন আর ও-সব আঁকি না।

সিগারেটের বাক্স খুলে একটা সিগারেট মুখে দিলো। কম্পিত হাতে আগুন ধরালো।

জেন তার হাতের ঈষৎ কাঁপা লক্ষ্য করলো।—হেনরী, তোমার মদ খাওয়া একদম বন্ধ করা উচিত; এভাবে চলা তোমার উচিত নয়। তুমি কি করতে চাইছ? খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ আর শুধু মদ খেয়ে যাচ্ছ!

—আঃ—তুমিও! আমি দশ মিনিট কোথাও সুস্থির হয়ে বসতে পারি না।—কেউ না কেউ এসে উপদেশ আওড়াতে থাকবে। আমি তোমায় পছন্দ করি, তুমি সুন্দর ব'লে। আমাদের বন্ধুত্বও অনেক দিনের। কিন্তু তুমি মদ খাবার কথা নিয়ে আমায় খোঁচা দিলে, তোমার ঐ মুক্তোর মতো দাঁত গুঁড়িয়ে দেবো বলছি। হ্যাঁ, পোষ্টারের কথা কি বলছিলে। তোমার নতুন পোষ্টারে কি দরকার? পুরোন যেটা আছে সেটাই যথেষ্ট।

—না, না যথেষ্ট নয়।

হাতের ওপর চিবুক রেখে ছলছল চোখে সে হেনরীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

—আমি বসন্তকালে লণ্ডনে যাচ্ছি। প্যালেসে আমাদের প্রোগ্রাম সুরু হবে মে মাসে। এমন একটা পোষ্টার চাই যা কারুর দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না! তুমি সকলের জন্য পোষ্টার তৈরী করে দিয়েছ—আমার জন্যেই শুধু কিছুই করোনি।

—না কিছু করিনি বই কি। বারোটা পোর্ট্রেট আর অসংখ্য স্কেচিং ক'রে দিইনি তোমায়?

—পোর্ট্রেটে কি হবে আমার। পোষ্টার দরকার। হেনরী, কথা রাখো। এই লণ্ডনের সাফল্যের ওপর সব কিছু নির্ভর করছে

আমার। যদি সেখানে জমাতে পারি তাহলে পরের বছর নিউ ইয়র্ক পাড়ি দেবার সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে ম্যানেজার। তাছাড়া দেখেছি তোমার পোষ্টারে ভাগ্য খুলে যায়। গিলবার্টের কথা ভাবো। তুমি প্রথমে তার জন্যে পোষ্টার এঁকে না দিলে সে এতো বড় হতো ভেবেছ? লো ফুলার, মে মিলটন আর ঐ বেঁটে আইরিশ মেয়েটা;—মে বেলফোর্ট—ওরা কেউ সফল হতো ভেবেছ? বেলফোর্ট তো শুধু একটা কালো পোষাক প'রে বেড়াল হাতে রঙ্গমঞ্চের ওপর এসে চিৎকার করে, একটা কালো পুষি বেড়াল আছে আমার! ও কি হাসছ কেন?

এক সস্নেহ খুশিতে হেনরীর চোখ আধা-নিমীলিত হয়ে এলো। বললো, জেন তুমি গত কয়েক বছর খুব দূরে দূরে ঘুরেছ না? বছর পাঁচ-ছয় আগে তুমি মুলাঁতে নাচতে। আর এখন উনত্রিশ বছর বয়সেই বিখ্যাত তারকা হ'য়ে উঠেছ।

খাবার প্লেট থেকে চকিতে মুখ তুলে জেন বললো, আমার উনত্রিশ বছর নয় তো! পঁচিশ বছর। গত চার বছর ধরে আমার বয়স পঁচিশ বছর চলছে—আরও কিছুদিন আমার ঐ বয়স চলবে!

তারা দু'জনে অনেক দিনের বন্ধু। নানারকম হাল্কা গল্প-গুজব করতে লাগলো। মুলাঁ আর ফোলির গল্প ক্যাসিনো দ প্যারির গল্প অন্যান্য গীতি প্রতিষ্ঠানের গল্প যেখানে জেন আগে নাচতো, সেই সব পুরোন অনেক কাহিনী স্মরণ করতে লাগলো।

জেন সিগারেট ধরালো। নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগলো। হেনরী নম্র স্নেহের কণ্ঠে বললো, তুমি এভাবে কনিয়াক খেয়ে নিজেকে নষ্ট করছো কেন?

—আবার জেন! অপ্রগলভ ভাবে হেনরী বলে উঠলো, আমি জানি, আমি একটু বেশি পান করছি। কিন্তু তুমি বা আর কেউ আমায় রক্ষা করতে পারবে না। আমিও ছাড়তে পারবো না। আমি চেষ্টা যে করি না তা নয়, কিন্তু পারি না।

চিন্তান্বিত ভাবে জেন নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছিলো। হেনরীর দাড়িভরা কুৎসিত মুখ, নিষ্প্রভ গাল আর মোটা ঠোঁটের কদর্যতা দেখছিল।

—তুমি বড় নিঃসঙ্গ, না?—জেন বললো চার দিনের কোলাহলের মধ্যেও হেনরী তার কণ্ঠস্বরে সমবেদনার সুর শুনতে পেলো।

—না বলো না। আমি জানি তুমি বড় একা। তোমার মুখেই তার চিহ্ন রয়েছে। আমার ইচ্ছা করে আমি—

তার চোখ দু'টো বড় বড় হ'য়ে উঠলো। একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তার ছোট লাল ঠোঁট অস্পষ্ট কথায় কেঁপে উঠলো যেন। মিরীয়াম! রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলো সে, আহা মিরীয়ামের কথা আগে মনে আসেনি কেন?

—কি ফিসফিস করছ?

—ও কিছু নয়। একটা কথা ভাবছিলুম।

কিছু দিন পরে জেন তাকে নতুন পোষাক কেনবার জন্যে দোকানে নিয়ে গিয়েছিলো। একজন পোষাক-পরা দরওয়ান দরজা খুলে দিলো। তারা একটা ছোট গোল, কার্পেট পাতা, আয় বসানো ঘরে প্রবেশ করলো।

—ম্যাদময়জেল হায়েম যদি ব্যস্ত না থাকেন তা হলে এ বার দয়া করে তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন। জেন একজন ভদ্রলোক বললো।

হেনরী অতক্ষণে সোফার ওপর গিয়ে বসলো। গজগ করছিলো আপন মনে। কালো পোষাকপরা এক অসাধারণ রকমের একটি মেয়ে ঢুকলো। মেয়েটি এব লম্বা। সহজ স্বাচ্ছন্দ্য আছে চলাফেরার মধ্যে। তাকে দে হেনরীর মেরী শার্লেটের কথা মনে পড়লো। চ চক-চকে কালো চুলের মাঝখানে সিঁথি কাটা। ঘাড়ের কা বাঁধা এক গুচ্ছ চুলের মধ্যে তার সুডোল হাতীর দাঁতের মে সাদা মুখখানা সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু সব থেকে আকর্ষণী হলো তার চোখ দুটি। ঠিক কালো নয়, অনেকটা কফি মতো রং, তবে আয়ত আর উজ্জ্বল। চোখের বড় বড় বাঁক রেখা মুখখানাকে ভাবপ্রবণ ক'রে তুলেছে।

—কি খবর জেন? অপ্রত্যাশিত আত্মীয়তার সুরে সম্বোধ করলো সে।

—মিরীয়াম, ইনি হলেন মঁসিয়ে তুলো লুত্রেক।

মেয়েটি হেনরীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো, আপনার চিত্র প্রদর্শনীতে গিয়েছিলাম। তার হাসির ফাঁকে দুধের মতো সুন্দর সাদ দাঁতগুলো দেখতে পেলো হেনরী। সে বললো, কিন্তু ছবি দেখবা সুযোগ পাইনি। যা ভিড় হয়েছিলো।

তাদের দৃষ্টি-বিনিময় হলো। হেনরী মেয়েটির চোখে সমবেদনা ব ব্যঙ্গের চিহ্ন দেখতে পায়নি। সেখানে শুধু নিরাসক্ত প্রশংসা আভাস ছিলো।

—আমি সে জন্যে অত্যন্ত দুঃখিত। আহা, আমি যদি জানতে পারতুম। হেনরী সঙ্গে সঙ্গে ভাবে, তাতে আর কি লাভ হতো! ও হয়তো কোন বিত্তশালী ব্যক্তির সঙ্গিনী হ'য়ে প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলো! নিশ্চয় তার কোন প্রেমাস্পদ আছে—

—আচ্ছা, ওকে কেমন লাগলো। প্লেস ভেনদোমের পথ দিয়ে আসতে আসতে জেন হেনরীকে জিজ্ঞাসা করলো।

—কিছুই ভাবিনি। তবে বেশ সুন্দর মেয়ে মনে হলো। তার সম্বন্ধে কি মনে হলো জেনে তোমার লাভ কি? হেনরী চোখ তুলে জেনের দিকে তাকালো। তার মুখে হাসিমাখা ভ্রূকুটি, বললো, কি বলতে চাও? এবার তোমার মাথায় কি মতলব খেলছে ঠিক করে বলোতো?

—বেশ বলছি। তোমাকে দোকানে নিয়ে গেছলুম তার কারণ যাতে তোমাদের দু'জনের দেখা হয়। আমার মনে হয় তোমরা দু'জনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারো। ও তোমার খুব ভক্ত।

—কি ক'রে জানলে তুমি? [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—কল্যাণ দাশগুপ্ত ও শ্যামাপ্রসাদ দে।

Rexona
Rexona
BLENDED WITH CADYL

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনেক টাকা থাকার একটা ভালো-লাগা ভাব আছে। কলকাতার রাস্তা দিয়ে যখন মীরাদের—এখন মীরাদেরই বলতে হবে—রাজহংসের মতন সাদা মোটর গাড়ীটা চলে যায়—রাস্তায় তখন হেঁটে চলেছে কত লোক, মেয়েরা পর্য্যন্ত সেজে-গুজে আলতা পায়ে লাল রংয়ের জুতো পরে কত মানুষের ভিড়ে ট্রামে বাসে বিপজ্জনকভাবে কাৎ হয়ে কত কারা ঝুলছে, কত কারা কোনো গতিকে একটা পা তুলে দাঁড়াবার জন্যে ছুটেছে, গরুর গাড়ীর মাঝখান দিয়ে ঠুনঠুন রিকশ, আর সাইকেল, কেউ তাদের গ্রাহ্যও করে না; ট্যাক্সি ট্যাক্সি ব'লে কেউ চেঁচাচ্ছে, ট্যাক্সি থামছেও না! আর বদের গাড়ী নিঃশব্দে ঝড়ের মত উড়ে যায়, কোথায় বালিগঞ্জ আর কোথায় পরেশনাথের মন্দির! ক্লান্ত লোক ঘামে, হাঁফায়—ওরা চলে সীটে ঠেসান দিয়ে আরামে! ময়দান, ধর্ম্মতলা আর সার্কুলার রোড আর শিয়ালদা ষ্টেশন, চৌরাস্তার মোড় আর অসংখ্য মানুষের মাথা যেন সিনেমার ছবির মতন গাড়ীর ঝক্‌ঝকে কাচের ওদিকে সামনে আসে আর মিলিয়ে যায়, মনে ছাপ রাখে না। ভালো মোটরে চড়ে কি আরাম আর আয়েস! তাই বা ক'জন জানে বলো? ষ্টেট বাসে চড়ে সেটা আন্দাজ করতে চায়।

কিন্তু গাড়ীতে চড়ে কত দূর মীরা গেল, বুঝতে পারলো না, কলকাতা শহর কোন পর্য্যন্ত! 'বিরাট' কথাটা সে শিখেছে। 'মহানগরী' সে শুনেছে, তবু কল্পনা করতে পারে না কত বড়ো এ শহর! কলকাতার ম্যাপ দেখলো, এক দিকে গঙ্গা হ'য়ে গেছে, এক দিকে লবণহ্রদ! সেই হ্রদ বুজিয়ে কবে শহর বেড়ে যাবে, খাল বুজিয়ে ধানক্ষেত চাপা দিয়ে। কে জানে সে কবেকার কথা!

কিন্তু পরেশনাথ-মন্দির,—রবিবারের বিকেলে লাল নীল হলদে সবুজ বেগুনী কমলা ধূসর সাত রঙের টুক্‌রো টুক্‌রো কাচ প্রতিটি থামে, দেয়ালে, মেঝেয়, সেখানে গোধূলির সোনালী আলো বাঁকা হয়ে এসে পড়েছে, ধূপের গন্ধ, সোনার মূর্ত্তি, স্নিগ্ধ ভিতরটা যেন কোনো স্বপ্নপুরী! এখান থেকে বসে দেখা যায়, দূরে ফোয়ারার ঠাণ্ডা জল, লাল মাছের গোল চৌবাচ্চা, পাথর দিয়ে বাঁধানো পুকুর, কারা গড়েছিলো এমন দেবমন্দির, রঙ নিয়ে তারা যেন খেলা করছে, বিকেলের সোনালী আলোকে মধ্যস্থ রঙীন ক'রে দিতে পারে যে ঘর, এমন ঘর তৈরী করেছে, বিকেলের সোনালী আলোকে পর্য্যন্ত রঙীন ক'রে দিতে পারে যে ঘর, এমন ঘর তৈরী করেছে কত দিনের কত পরিশ্রমে, জলের মতন কত টাকা খরচ ক'রে। কে? কোন্ এক বদ্রীদাস।

ড্যাডি ও মাম্‌মি ওদিকে বেড়াচ্ছে, মীরার সঙ্গে দেখা হল একজন চশমা-পরা রোগা ভদ্রলোকের। তিনি বললেন, খুকু, জানো তুমি পরেশনাথ কে ছিলেন?

মীরা বললো মাড়োয়ারীদের গুরু।

তিনি হেসে বললেন, সব মাড়োয়ারীদের নয়, মাড়োয়ারের মেবারের যে সব লোকের জৈন ধর্ম্ম, তাদের গুরু। দেবতাও বলতে পারো। সব মাড়োয়ারী জৈন নয়, ওদের মধ্যে হিন্দুও আছে অনেকে, যারা দুর্গা কালী মহাদেব কৃষ্ণ মানে। জৈনদের মধ্যে আবার দু'দল, শ্বেতাম্বরী, আর দিগম্বরী। এদের মিছিল তুমি দেখেছ?

মীরা বললে, না তো!

পরের সপ্তাহেই ওদের মিছিল আসবে। এদেরটা আসবে বিডন ষ্ট্রীট দিয়ে, বেলগাছিয়ারটা যাবে গ্রে ষ্ট্রীট দিয়ে। বিডন স্কোয়ারের দক্ষিণে কোনো বাড়ীতে উঠলে তুমি দু'টোই দেখতে পাবে।

—সেদিন এরা সমস্ত মন্দির চূড়ো থেকে ফটক পর্য্যন্ত আলোর মালায় ঢেকে দেবে। সেদিন সওদাগর তার ভাণ্ডার খুলে দেবে আর মিছিল, পরেশনাথের মিছিল, সোনায়, রূপোয়, ঐশ্বর্য্যে সে এক রাজ শোভাযাত্রা। অথচ যাঁর জন্যে এত আড়ম্বর, তাঁর গায়ে এক টুক্‌রো কাপড় পর্য্যন্ত থাক্‌ত না, তিনি খালি গায়ে দীর্ঘ দিন তপস্যা করেছেন এক গহন বনে-ঢাকা দুর্গম পাহাড়ে। তাঁর নামে সেই পাহাড়—পরেশনাথ পাহাড়।

শুন্‌তে বেশ ভালো লাগছিলো মীরার। বল্‌লে, তিনি এখনো আছেন?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, এখনো কি থাকেন? কবে তিনি স্বর্গে গেছেন। তিনি এসেছিলেন চার হাজার বছর আগে।

চা-র হা-জা-র? মীরার চোখ কপালে ওঠে।

হ্যাঁ। বুদ্ধদেবের চেয়েও আগে।

আচ্ছা, আপনি এত খবর জানলেন কি ক'রে?—মীরা হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে ফেলে!

কৌতূহল চাপতে পারে না। তোমরাও চাপতে পারতে না এমন অবস্থায়। না-জানাকে কে না জানতে চায়?

তিনি বললেন, আমি যে লেখক। লেখকদের সব খবর জানতে হয়।

আপনি কি কি বই লিখেছেন?—আবার মীরার ছেলেমানুষী প্রশ্ন।

তোমাদের জন্যে লিখেছি—একখানা লিখেছি "ছবিতে ছড়াতে"।

ওঃ, পড়েছি পড়েছি, কী চমৎকার ছবি, কী সুন্দর ছড়া—

ছবিতে ছড়াতে
এসেছি পড়াতে
হেসেই গড়াতে
মাটিতে।

আপনার তো বেশ মজা! আপনি কত বই লেখেন, কত পয়সা পান!

এইখানে ভদ্রলোকের মুখ গম্ভীর হ'য়ে ওঠে। বলেন, না খুকু, পয়সা আমরা তেমন পাই না। আমরা শুধু খেটেই যাই। তোমাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে আমরা কত পরিশ্রম ক'রেও আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফোটাবার কোনো ব্যবস্থাই করতে পারি না। সে অনেক কথা, তুমি বুঝবে না।

এ নাকি হয়? মীরা ভাবে। লেখকের ছেলেমেয়েরা ক্ষিধের জ্বালায় ধুলোয় লুটোপুটি দিয়ে কাঁদছে, আর তাঁরই রঙীন বই কাড়াকাড়ি ক'রে নিয়ে ছেলে-মেয়ে পড়ছে কত ঘরে, এ নাকি কখনো হ'তে পারে! কী যে অসম্ভব কথা বলেন ভদ্রলোক! অথচ ঠাট্টা উনি করছেন না, চশমার কাচের আড়ালে ওঁর চোখ ছলছল করছে।

কিন্তু নামটা কি? নাম ত' মনে পড়ছে না! বইটা তার আছে। আগাগোড়া মুখস্থও করেছে, কিন্তু নামটা ত' মনে রাখেনি! কী লজ্জার কথা! এখন ত' জিগ্যেস করাও যায় না, আপনার নামটা কি বলুন ত'? একটু একটু মনে পড়ছে—ব্রজমাধব কি যেন!

ড্যাডি মাম্মি ডাকাডাকি করছে—মীরা, কাম্ হিয়ার। মেক্ হেষ্ট্।

কামিং ড্যাডি ব'লে মীরা উঠতে যাচ্ছে, ভদ্রলোক বললেন, তুমি ইংরিজি বলো কেন? শেখবার জন্যে যদি হয়, ভালো। কিন্তু মাতৃভাষার চেয়ে ভালোবেসো না ও-ভাষাকে। হিন্দুস্থানের লোক হাজারই সাহেব সাজুক, সাহেব সে এ জন্মে হবে না, সাহেব যেমন হাজার বাঙালী সাজলেও এ জন্মে বাঙালী হয় না। বাঙালী মেমসাব চিরদিন বাঙালী মেমসাবই থাকে, কোনো কালে খাঁটি মেম হ'তে পারে না।

মীরা বললে, আপনার কথা আমার মনে থাকবে। লেখকদের দুঃখের কথাও মনে রাখব।

লেখকদের দুঃখের কথা তোমায় মনে রাখতে হবে না ছোট মেয়েটি, লেখকদের ভাগ্যের কথা মনে রেখো, তারা অমর। অমর হয় কারা? খুব বড় দাতা, বড় বৈজ্ঞানিক, দেশনেতা, ত্যাগী, সাধু—সেই সব মহামানবদের সঙ্গে লেখকদের নাম থাকে কত দিন পর্য্যন্ত দেশে দেশে। গায়কদের নাম লোকে ভুলে যায়, শিল্পীর নামও ভোলে, হাইকোর্টের জজ, ব্যারিষ্টার, বড়ো ডাক্তার, বড়ো ব্যবসায়ী, ধনী, কোটিপতি, সকলকেই ভোলে, কিন্তু লেখকের নাম থাকে ইতিহাসে, মানুষের মনে, থাকে তার রচনায়, যে রচনা মরে না। এত কথা তুমি বুঝবে না। কিন্তু আমার বই যদি তোমার ভালো লাগে আমি জানি, তুমি আমার নাম মনে রাখবার চেষ্টা করবে, যে নামটা এখন মনে আনতে পারছ না।

মীরা যেতে যেতে বলে, আপনি কি ক'রে জানলেন আমি মনে আনতে পারছি না?

আমরা সব জানতে পারি।

ততক্ষণে মোটরে জোর জোর হর্ণ বাজছে একটানা, ওরা গাড়ীতে উঠে ব'সে আছে।

মিসেস চৌধুরী রাগ ক'রে বললে, কার সঙ্গে এত কথা হচ্ছিল? আমরা ডেকে এলাম, তবু খেয়াল নেই?

মীরা বললো, তুমি সেদিন যে বইটা আমায় কিনে দিলে, ছবিতে ছড়াতে সেটা উনি লিখেছেন।

সত্যি? মামমির চোখ বড়ো হ'য়ে উঠলো। বলতে হয়, আলাপ করতাম।

মিষ্টার চৌধুরী বর্মা চুরুট মুখে দিয়ে ষ্টীয়ারিং হুইল ধ'রে বললো, আমিও সেদিন বইখানা দেখছিলাম উল্টেপাল্টে, বেড়ে লিখেছে বাচ্চাদের জন্যে।

গাড়ী চলেছে চলেছে, ট্রাম বাস পুলিশ পার হ'য়ে নির্জ্জন রাস্তা দিয়ে ফুলের গন্ধ দিয়ে আবার নতুন নতুন বাড়ীর পল্লী দিয়ে, আলোয় আলো বাজারের দোকানের ধার দিয়ে, মানুষ চাপা দিতে দিতে বেঁকে গিয়ে, লাল আলোর সামনে দাঁড়িয়ে থেকে, গীয়ার বদ'ল হর্ণ দিয়ে, হেড লাইট জ্বেলে কমিয়ে নিবিয়ে শোঁ শোঁ শোঁ—ঘুম এসে যায়। গাড়ীর গদিতে ঠেসান দিয়ে ও তো ঘুমিয়ে পড়লো। রং-বেরঙের পাথর-বসানো কাচ-বসানো সোনার পাতমোড়া সিংহাসন সমেত পরেশনাথের মন্দির আর কোথায় পরেশনাথ পাহাড় চার হাজার ফুট উঁচু চার হাজার বছর আগেকার গল্প নিয়ে আসে স্বপ্নের মধ্যে। এক জায়গায় বাচ্চারা সন্ধ্যের পর খেলা করে, আর এক জায়গায় বাঘ ডাকে সন্ধ্যের পর—চার হাজার বছর আগে যেদিন দেশে শুধু আদিবাসীরা রাজত্ব করত, আর কোনো জাত ছিল না। সেদিন কি নিবিড় অরণ্য ঐ পরেশনাথ পাহাড়ে, কি কঠিন তপস্যা পরেশনাথের—ধারণা করতে বলেছেন লেখক-ভদ্রলোক—স্বপ্নের মধ্যে সমস্ত মনে পড়লো মীরার সব কথাগুলি, যেন শুনতে পেলে নিজের কানে।

ঘুম যখন ভাঙলো, দেখে গণেশ ওকে কোলে ক'রে নিয়ে বারান্দা পার হ'য়ে ড্রয়িংরুমের হেলানো সোফায় বসিয়ে দিচ্ছে। মাম্মি বলছেন, বেসিনে সাবান দিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলো। মুর্গীর ষ্টু আর লুচি আসছে, এসো ডাইনিং রুমে। গরম গরম খাও।

মুর্গীর ষ্টু, তার ভাই-বোনেরা এর স্বাদও পায় নি। নামও শোনেনি দো-পেঁয়াজীর! স্যাণ্ডউইচ আর কেক যে এত রকমের হয়, ক'জন জানে পুরীতে! লাল রঙের বাড়ী বীচ হোটেলের সামনে শুঁটকি মাছ শুকোনোর কথা তার মনে পড়লো। কত দিনের বাসি ক'রে কত দেশের লোক তৃপ্তি ক'রে খায় সেই শুঁটকি মাছ। গরম চিকেন ষ্টু কি তাদের ভালো লাগবে? ভালো লাগবে ভাদোয়া ঘিএ-ভাজা লুচি?

গরম লুচিও মীরার গলা দিয়ে গলতে চায় না, তার ভাই-বোনদের মতন দেশের কত ছেলেমেয়ে সকালে একখানি মাত্র আটার রুটি খেয়ে ক্ষিধেয় ছট্‌ফট্ করছে। হাওয়া-ভরা এমন গদির আর পালকের বালিশের বিছানায় শুয়ে মনে হয়—বিছানা ব'লে মীরারই কিছু ছিল না। তক্তাপোষের ওপর মাদুর, তাও ছেঁড়া আর তেল চিটচিটে বালিশ, যার তুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। সেখানেও ত' ঘুম হ'ত, সমুদ্রের অবিশ্রান্ত আওয়াজে! এখানেও ঘুম হয় ক্লান্ত-শরীরে। পুরীতে ঘুম ভাঙতো না, এখানে মাঝরাতে কত বার ঘুম ভেঙে যায় কত দিন!

পরেশনাথের মিছিল দেখা ওর হয়েছিলো। ঐশ্বর্য্য যাকে বলে, রূপোর মন্দির, রূপোর সিঁড়ি, সোনার পাতমোড়া হাতী, আর একেবারে খাঁটি সোনার মন্দিরে সোনার পরেশনাথ। কত না রেশমী ধ্বজা, কত না বিচিত্র বাজনা, কত না রঙীন হাতী, ঘোড়া, গাড়ী, কত না লোকের ভিড়!

গরম প'ড়ে গেল শহরে। এ গরম পুরীতে নেই। ঘরে-ঘরে পাখা ঘুরছে, জানলায়-জানলায় খস্‌খস্ টাঙানো, গ্লাস গ্লাস রেফ্রিজারেটরের ঠাণ্ডা লেমন স্কোয়াস, সাদা সুগন্ধ আইসক্রীম, গরম আর যায় না। সাহেব বললে—চলো দার্জ্জিলিং।

বিছানাপত্র কিছুই বাঁধা হল না, বাসনকোশন কিছুই নেওয়া হল না, শুধু স্যুটকেস-ভর্ত্তি গরম স্যুট। মীরা ভাবলো এই গরমে গরম-স্যুট! আর বিদেশে যাওয়া, অথচ সংসার পাতবার কিছুই নেই, বিছানা পর্য্যন্ত না। পুরীতেও তো সে কত লোককে আসতে দেখেছে, কত মালপত্র বেডিং লাগেজ নিয়ে। এ যেন ঝাড়া হাত-পা।

প্লেনে উঠে সে দেখলে, কলকাতা শহর কা'কে বলে। গঙ্গা নদীর ধারে ধারে বাড়ী বাড়ী বাড়ী কত দূর অবধি, তার পর সব ঝাপ্‌সা, ধোঁয়া—কাচ দিয়ে শুধু দেখা যায়, আকাশ-আকাশ—পাখীরা, যে-সব পাখীরা অনেক উঁচুতে উঠে আসে, তারা নিশ্চয় এই রকম দেখে! রোদ্দুর পর্য্যন্ত এখানে হাল্কা হ'য়ে গেছে।

আধ ঘণ্টাও হয়নি, ওরা এসে বাগডোগ্‌রায় নামলো। এখান থেকে ট্যাক্সিতে উঠতে হবে। শিলিগুড়ি হ'য়ে কার্ট রোড ধ'রে ওরা চললো, আশ্চর্য্য সে পথ! এই প্রথম ও পাহাড় দেখলো, সেই পাহাড়ের বুকে বুকে, মাথায় মাথায়, পাহাড় থেকে পাহাড়ে, উঁচু থেকে আরো উঁচুতে, হাজার রকমের ফুল, হাজার রকমের পাতা, অসংখ্য ঝর্ণা, ষ্টেশন, চা-বাগান, মেঘ, কুয়াসা, ফগ—এত কখনো মানুষ একসঙ্গে দেখতে পারে?

ড্যাডি বললেন—ঐ দেখা যাচ্ছে নীচে চম্পাসুরি চা-বাগান আমার বন্ধুর।

কোথায় চম্পাসুরি? ফগ ত' সব ঢেকে দিলে। চম্পাসুরি হারিয়ে গেল চম্পাবনে।

পথে উঠতে উঠতে ও টের পাচ্ছে, গ্রীষ্মের দেশ নীচে প'ড়ে রইলো, এ কেবল শীতের রাজ্য। বৃষ্টিভেজা রোদ-মেশানো এক রকম ঠাণ্ডা, এক রকম শীত, কুয়াসায় যা মিষ্টি—এমন জল-হাওয়া—ও বুঝলো শুধু হিমালয়েই সম্ভব—নীচে যত শীতই পড়ুক, এমন আরামের শীত পাবার উপায় নেই। পাইন, দেবদারু আর পপ্‌লার গাছের ফাঁকে ফাঁকে ডালিয়া, জিনিয়া, রডোডেণ্ড্রন আর ক্রিশেণ্থিমামের আড়ালে আড়ালে লাল, নীল, হলদে কাঠের অসংখ্য বাড়ী ফগের ঝাপ্‌টায় বারে বারে যা চোখের সামনে থেকে মুছে যাচ্ছে, বারে বারে স্পষ্ট হ'য়ে ফুটছে—এ শুধু দার্জ্জিলিং-এর নিজস্ব। গরীবরা এখানে কোথায়? ভালো ভালো গরম স্যুটপরা বাঙালী সাহেব, লাল নীল ওভারকোটপরা বাঙালী মেমসাব, পাঞ্জাবী মেমসাব, কুকুর, ঘোড়া দশতলা উঁচুতে একটা বাড়ী পাঁচতলা নীচে পরের বাড়ী, এই ত' দার্জ্জিলিং! সমস্ত শহর পার হ'য়ে নীল সবুজ পাহাড়ের ঢেউ, ঢেউয়ের পরে ঢেউ, তার একেবারে ওপারে আকাশের গায়ে গা ঠেকিয়ে সিগারেট-বাক্সর রাংতার মতন চক্‌চকে কাঞ্চনজঙ্ঘা।

হোটেলে বয়রা ধবধবে সাদা চাদর পেতে বিছানা ক'রে দিলে, জানলায় কাচা রঙীন পর্দ্দা দিয়ে গেল, বাথরুমে নতুন দাঁতমাজা, নতুন সাবান—মীরা বুঝলো—তাই লোকে শুধু হাতে এখানে আসে!

রোদ্দুর এত মিষ্টি হয় দার্জ্জিলিং না এলে বোঝা যায় না। ফগ এত আশ্চর্য্য হয় দার্জ্জিলিং না এলে জানা যায় না। এই দেখছ, থাকে থাকে সাজানো লাল নীল হলদে—রামধনু রঙের হাজার গণ্ডা কাঠের বাংলো চেরী পপলার দেবদারু গাছের ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঝিকমিক ঝিকমিক করছে, দেখতে দেখতে কোথা থেকে আকাশছোঁয়া ফগের রাজত্ব এলো—মুছে গেল সমস্ত ছবি—জলছবি বললেই ভালো হয়—মনে হবে তোমার সামনে তিন হাত দূরে আর কিছু নেই, শুধু মাটি থেকে উঠে গেছে আকাশ, কিংবা এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা—পাঁচ সাত মিনিট বাদেই আবার ঝলমল ক'রে ফুটে উঠলো জলছবি শহর দার্জ্জিলিং যেমনটি ছিল ঠিক তেমনি। মিনিটে মিনিটে ঘণ্টায় ঘণ্টায় সারাদিন ধ'রে পৃথিবীর শ্লেটে এই ছবি মুছে মুছে দেওয়া খেলা!

মীরার মনে পড়লো পথে উঠতে উঠতে কোথায় দেখে এসেছে পাগলা ঝোরা ঝর্ণা পাথর থেকে পাথরে, নীচে থেকে নীচে কোথায় নেমে যাচ্ছে পাগলের মতন—তিস্তা মহানন্দা কি সব নাম নদী কোথায় প'ড়ে রইলো নীচে—কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপোর চূড়া দেখতে দেখতে সেই ঝর্ণার কথা মনে পড়ে।

এখানে তার সঙ্গী জুটলো বড়লোকের ছেলেমেয়ে—যারা শুধু চীজ আর চকোলেট খেয়ে মানুষ। ভাত ডাল কাকে বলে জানে না। যারা ইংরেজী স্কুলে মেমেদের কাছে পড়ে। যারা কাঠের পুতুল নিয়ে খেলা করে না—রেলগাড়ী, ষ্টেশন লাইন সারা ঘরে পেতে সিগন্যাল ডাউন ক'রে মজা দেখে। যাদের একটা ফারকোটের দামে গরীবের ছেলের সারা বছরের কাপড়-জামা হ'য়ে যায়।

টাইগার হিলে যেদিন যাবার কথা হল, মীর্যার মাম্‌মি বললে—বাচ্চাটাকে রেখে গেলে হয়। মীরা শুনেই বললে, সেটি হচ্ছে না। স একলা থাকতে পারবে না। মীরা জানে, আব্দার করলে এরা খুসি হয়। রাত তিনটের সময়ে ট্যাক্সি এলো, ওরা সব উঠে বসলো। চারিধারে কাচ তোলা, গায়ে অলেষ্টার র‍্যাগ, তবু যেন ঠাণ্ডা লাগে। এইজন্যেই বুঝি মাম্‌মি বারণ করেছিলো। গরম জলের ব্যাগ দস্তানামোড়া হাতে সবাই ধরে রইলো। তবুও ঠাণ্ডা। ঘুমন্ত দার্জ্জিলিং-এর ইলেক্‌ট্রিক আলোয় সাজানো নির্জ্জন রাস্তা দিয়ে ওদের গাড়ী চললো; কখনো নীচে নেমে গিয়ে কখনো উঁচুতে উঠে, কখনো বাঁয়ে বেঁকে, কখনো ডাইনে। এলো কিন্তু অনেক উঁচুতে উঠে ঘুম ষ্টেশনে। সেইখানে টাইগার হিল। পাহাড়ের গা দিয়ে দিয়ে

ঘুরে ঘুরে গাড়ী উঠতে লাগলো। তখনো চারিদিক অন্ধকার, ওরা যখন ওপরে পৌঁছলো। ইতিমধ্যেই ভিড় লেগে গেছে। কত লোক এসে হাজির হয়েছে সূর্য্যোদয় দেখবার লোভে। মীরা ভেবেছিলো হিমালয়ের পিছন থেকে সূর্য্য উঠবে। সেই দিকে চেয়ে ও বোকার মতন বসেছিলো। ওর ড্যাডি বললে, সূর্য্য কোন্ দিকে ওঠে মীরা?

পূর্ব্বদিকে।

হিমালয় কোন্‌দিকে?

উত্তর দিকে।

তবে ওদিকে সূর্য্য উঠবে কেন? সূর্য্য উঠবে পূর্ব্বদিকে বাংলার দিগন্তে।

তবে যে বলে এভারেষ্টে সূর্য্যোদয়?

তিব্বতের এভারেষ্টে আলো এসে পড়বে বাংলা দেশের সূর্য্যের।

তাই হ'ল। পূর্ব্বদিক্-এর আকাশ অনেক নীচে। সেখানে লাল আভা জাগতেই এভারেষ্টের বরফ রাঙা হয়ে উঠলো, যেন রাঙা একটি চূড়া। ওদিকে যেই সূর্য্য দেখা গেছে, অমনি টক্‌টকে রাঙা হ'য়ে সোনালী—ঝক্‌ঝকে সোনালী, তারপর আস্তে আস্তে কমলা, হলদে, রূপোলী সাদা। ঠিক সূর্য্যোদয়ের মুখটিতেই যত কাণ্ড, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রং বদলে অদ্ভুত একটা ব্যাপার। সূর্য্য উঠে গেলে আর কিছু না। আহা রে, কত লোক এখন আসছে! আর দেখবে কি? সূর্য্যও উঠে গেছে। এইটুকু দেখবার জন্য যারা রাত জেগে এসে ব'সে আছে, গাড়ীতে খরচ ক'রে পায়ে হেঁটে কষ্ট করে উঠেছে হাজার ফুট, তাদেরই পরিশ্রম সার্থক হল।

টাইগার হিল থেকে সূর্য্যোদয়, সমুদ্রে সূর্য্যোদয়, দুটোই তার দেখা গেল, জীবনের সূর্য্যোদয় হবার আগেই। এখন ত কিছুই ঠিক নেই যে, কি হবে আর কোথায় থাকবে!

এমন যে দার্জ্জিলিং তা'ও মীরার ড্যাডির ভালো লাগলো না, বললে—কলকাতায় যাদের এড়িয়ে যেতে চাই, দেখি তারা সবাই এখানে এসেছে। দুবেলা দেখা হচ্ছে, ভালো লাগছে না।

মীরার যদিও ভালো লাগছিলো, কিন্তু তার তো কিছু বলবার উপায় নেই! জোর ক'রে বুঝি কোথাও থাকা যায়? এক একদিনে প্রায় একশো টাকা খরচ হচ্ছে না মাউণ্ট এভারেষ্ট হোটেলে, পথের খরচায়?

যখন শুনলো ওরা শিলং যা'চ্ছে তখন ওর এই ভেবে ভালো লাগলো, তবু ত' আর একটা নতুন দেশ দেখা হবে। এই অল্প বয়সে কে এ সব দেশ দেখতে পায়? গরীবের ছেলেরা হয়ত জীবনেই দেখতে পায় না।

বাগডোগরা থেকে গৌহাটি আকাশপথে। যেন এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী। শিলংএ দার্জিলিংএর ফগ নেই, এখানে রাস্তায় হাঁটতে বেশী উঁচু-নীচু করতে হয় না, এখানকার লেক্, এখানকার ফুল, শিলং পাহাড়, অজস্র ঝর্ণা মন ভুলিয়ে দেয়। ফুলের রং এখানে চোখ ঝলসানো, খাসিয়া বাচ্চারা আপেলের মতন সুন্দর। টাইগার হিলের নীচে সিঞ্চল লেক্ ও ভালো ক'রে দেখতে পায়নি, ঘুমগুম্ফাও না, এখানকার লেকের ধারে অনেক বসতে পেয়েছে, এখানকার কেকেস্ ক্রেস্এ অনেক হাঁটতে পেয়েছে।

আর একটা অদ্ভুত সুযোগ এলো, যাও ভাবতেও পায়নি আসবে বলে। চেরাপুঞ্জির মেঘভর। শিলং থেকে অজস্র ঘুরে অনেক উঁচুতে চেরাপুঞ্জি পাহাড়, যেখানে দক্ষিণ সমুদ্রের সমস্ত মেঘ গিয়ে জড়ো হচ্ছে আর বৃষ্টিঝরা দিন শেষ হ'তে দিচ্ছে না, তার পরে সেই মেঘ ফিরে এসে বাংলা দেশে বর্ষা আনে। সেই চেরাপুঞ্জির পথ মুষলধারে বৃষ্টি আর ফগে ঝাপসা, গাড়ীর কাচ খালি কালো হয়ে আসছে, কিছুতে পরিষ্কার রাখা যাচ্ছে না, এধারে পাহাড় ওধারে খাদ্—পঞ্চাশ তলা সমান নীচু—ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলতে হয়—পাহাড়ী ড্রাইভার গান গাইতে গাইতে গাড়ী চালায়, প্রত্যেকটি বাঁক তার মুখস্থ। সেই বিপজ্জনক পথে যাত্রীরা প্রাণ হাতে ক'রে যেন যায়, শেষ নেই শেষ নেই। নীচে মাঝে মাঝে গড়িয়ে পড়া ভাঙা মোটর দেখা যায়—আরোহীরা যার নিশ্চিহ্ন, হঠাৎ সামনে থেকে কোনো গাড়ী আসে—এই চেরাপুঞ্জির রাস্তা! কন্‌কনে ঠাণ্ডা, শন্‌শন্ বাতাস, ঝমঝম বৃষ্টি, দুর্ভেদ্য কুয়াসা।

চেরাপুঞ্জিতে এসেও বোঝা যায় না, চেরাপুঞ্জিও এসেছি। পোষ্টাফিসটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, ছোট গ্রাম কুয়াসা আর বৃষ্টিতে ঢাকা, মাথার ওপর পুঞ্জ মেঘের মেলা, মসমাই ফল্‌স চোদ্দশো ফিট নীচে ঝ'রে পড়ছে, কোথায় তা কি দেখবার যো আছে? কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি! বৃষ্টির মধ্যেই চেরাপুঞ্জি।

শিলং ছেড়ে ওরা ফিরতে পায়নি শিলেটের পথে, এখন যে পাকিস্তান। মাম্মির কাছে গল্প শুনলো খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, গারো হিলের অসংখ্য ঢেউ পার হয়ে, পাহাড় আর জঙ্গল, ঝর্ণা আর মালভূমি, নদী আর সাঁকো—বিশেষ ক'রে ডাউকি নদী—নীল আর বেগুনী আর সবুজের অফুরন্ত শোভা দেখে রমণীয় সুরমা উপত্যকায়—ঠাণ্ডা থেকে গরম দেশে নেমে মনে হয় যেন জ্বর এলো গায়ে। শ্রীহট্ট—শিলেট্—নদীতে ষ্টীমার চলছে শিলেট চুণ নিয়ে—সেখান থেকে আগরতলা, ত্রিপুরা—রাজার প্রাসাদ কুঞ্জবন, মালঞ্চ কি চমৎকার রূপকথার মতন।

তারপর চাঁদপুর—সেখান থেকে ষ্টীমার, মেঘনা পদ্মা গোয়ালন্দ। দেশ দেখতে হবে। কিন্তু কোথায় ট্রেণ আর ষ্টীমার, আর কোথায় এরোপ্লেন! তুলনা হয়?

এই ওর প্রথম এরোপ্লেন খারাপ লাগলো। পদ্মার বুক চিরে ষ্টীমার চললো না।

এন রায়চৌধুরী বার-এট-ল ট্যাবুলেটমারা রেণিপার্কের নির্জ্জন বাগান-বাড়ীতে আবার ও ফিরে এলো। আবার লরেটোর বাস এসে দাঁড়াতে লাগলো, আবার ফ্রক প'রে ওদের নিয়মিত স্কুল সুরু করতে হ'লো।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, রিচি রোড, হাজরা রোড, লেক রোড, নিউ আলিপুর, ক্যালকাটা ক্লাব, ফার্পো, গ্রেটইষ্টার্ণ, মেট্রো, লাইট হাউস, নিউ মার্কেট এই হ'লো ওর গতিবিধি। ভবানীপুর আর রাসবিহারী এভিনিউএর দোকানের সঙ্গেই ওর পরিচয়। উত্তরে যে আসল কলকাতা রইলো, মনুমেণ্টের ওপারে, চোরবাগান, হালসিবাগান, দর্জ্জিপাড়া, বাগবাজার, পটলডাঙ্গা, ঝামাপুকুর, হাটখোলা, গোয়াবাগান, বাদুড়বাগান, শোভাবাজার, রাজাবাজার, পুরানো বাড়ী আর অসংখ্য গলি আর ট্রামলাইন আর বাজার আর সারি সারি সিনেমা থিয়েটার নিয়ে—তার কথা কানে আসে কিন্তু চোখে দেখা হয় না। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে প্রাচীন কালের ইতিহাস সেখানে

তলিয়ে গেছে, কিন্তু শ্যামবাজার লেখা ট্রাম আর ষ্টেট বাসে বাদুড়-ঝোলা যাত্রী দেখে অনুমান করতে পারে কী কাণ্ড ওদিকে হচ্ছে।

পুজোর সময়ে সে দেখতে পেলে যত আলো যত উৎসব যত হৈ-চৈ ঐ শ্যামবাজারের দিকেই। এই এন, রায়চৌধুরী ঐ বাগবাজারের দিক থেকেই এসেছে। সেখানে নাকি পৈত্রিক-বাড়ীতে একান্নবর্ত্তী পরিবার, কত দোল, কত দুর্গোৎসব। সেখানে আছেন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউ নিত্যসেবা নিয়ে। আর আছে গঙ্গার ঘাট কাছেই।

একদিন মীরা যেতে পেয়েছিলো। বিজয়ার দিন। প্রণাম করতে হ'লো কত লোককে, কাউকেই সে চেনে না। সবাই বলে, এই মেয়েটাকে বুঝি মানুষ করা হচ্ছে? তা ভালো। আমাদের একটাকে নিলে হ'ত! কত টাকা রাখা হ'লো এর জন্তে?

চল্লিশ হাজার ত' রাখতেই হবে আলাদা ক'রে! নিয়েছি যখন! মীরার মাম্‌মির উত্তরে সকলে অবাক্‌। গালে হাত দেয়।

তাহ'লে তো আমাদের একটা ছেলেমেয়েকে গছিয়ে দিলে হ'ত! হায়, হায়, এ বুদ্ধি কেন হ'লো না কারুর!

হরিণ যেমন ক'রে বনের দিকে, নদীর জলের দিকে, আকাশের দিকে দেখে—তেমনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মীরা কলকাতা শহর, কলকাতার সমাজ, কলকাতার হুজুগ, কলকাতার আমোদ-প্রমোদ লক্ষ্য করতে লাগলো। বাংলা দেশের প্রাণ, ভারতবর্ষের লক্ষ্য—কলকাতা শহর।

দোলের আগের দিন ওর মাম্‌মির সঙ্গে এসে এ-বাড়ীতে থাকতে হয়েছিলো। গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউয়ের পুজোর পালা এ-বছর ওদের ঘাড়ে পড়েছে। সকাল থেকে দেখে কী কাণ্ড, দোলনায় বিগ্রহ ফাগ মেখে দুলছেন আর সারা বাড়ীর মেয়ে-পুরুষ আবির, কুস্কুম, ফাগ, পিচ্‌কারী নিয়ে কি হুলুস্থুল বাধালো! রঙে রঙে সারা বাড়ী ছেয়ে গেল, ছোটরা, বড়োরা, বুড়োরা কেউ সং সাজতে বাকী রাখলো না, শুধু মীরা আর তার মাম্‌মি এক পাশে স'রে রইলো। এ নাকি অসভ্যতা। এ নাকি বাঁদরামি। তবু যখন ছোট দেওররা-ননদরা এসে মীরার মাম্‌মির পায়ে গুঁড়ো গুঁড়ো গোলাপী আর লাল ফাগ মাখিয়ে দিয়ে গেল, তখন তাকে মিষ্টি হাসি হাসতেই হল, আর স্বীকার করতেই হ'ল, এক ডিশ খাবার খাওয়াতেই হবে।

আনন্দের এমন হুল্লোড় যেন সমুদ্রের ঢেউএর মতন। এ থেকে কি দূরে থাকা যায়? মীরাদের বাড়ীতে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত রুটিনমাফিক চলাফেরা, ওঠা-বসা, খাওয়া-শোওয়া—কোনো বৈচিত্র্য নেই, চেঁচিয়ে কথা নেই, জোরে হাসি নেই, আছে শুধু বড়োমানুষিয়ানা। [ক্রমশঃ।

একটি বিচার কাহিনী

বিজনকুমার ঘোষ

সমস্যা গুরুতর!

জমিদারের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে চরের প্রজাদের বিবাদ বেধেছে নতুন ভেসে-ওঠা জমির দখল নিয়ে। প্রজারা বলে আমাদের, কর্ম্মচারীরা বলে আমাদের।

সমস্যা জট পাকিয়ে উঠল আস্তে আস্তে।

কোন দলই হঠবার পাত্র নয়। ক্রমে লাঠা-লাঠির জোগাড়।

ইতিমধ্যে হঠাৎ বিদ্যুতের মত খবর পৌঁছুল কলকাতা থেকে বাবুমশায় (সেকালে শিলাইদহের লোকেরা রবীন্দ্রনাথকে বাবুমশায় বলে ডাকত) আসছেন।

অমনি কুস-মন্তরে যেন সব উত্তেজনা নিবে গেল। লাঠি বাঁশ-ঝাড়েই পড়ে রইল। দু' দলই রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল কার কথা ঠিক।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এলে পদ্মায় বোটে চড়েই কাটাতেন অধিকাংশ সময়। সুতরাং বোটেই বিচার-সভা বসল। প্রজারা আর কর্ম্মচারীরা পদ্মার কিনারে সার বেধে দাঁড়াল। আর রবীন্দ্রনাথ বোটের বারান্দায় চেয়ারে বসলেন।

এক জন বৃদ্ধ মুসলমান এগিয়ে এসে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে কর্ম্মচারীদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য কোথায়, তার একটা চমৎকার উদাহরণ দিলেন, "কর্ম্মচারী হল মুখের দাড়ি, কেটে ফেললেই গেল। কিন্তু আমরা হলাম আপনার বুকের লোম। আমাদের ফেলবেন কি করে?"

শুনে রবীন্দ্রনাথ হো-হো করে হেসে উঠলেন।

বুকের লোমের দিকে রায় দিয়েও মুখের দাড়ি তিনি অক্ষুণ্ণ রাখলেন।

দিব্যদৃষ্টির খেলা

যাদুকর এ, সি সরকার

বৈঠকখানায় চারিদিকে দর্শক নিয়ে অর্থাৎ দর্শক-পরিবৃত অবস্থায় যে সব খেলা দেখিয়ে সবাইকে অবাক করে দেয়া যায়, তাদের অন্যতম হচ্ছে আলোচ্য 'দিব্যদৃষ্টির খেলা'।

এই খেলায় যাদুকরের অনুপস্থিতির সময়ে ঘরের মধ্যেকার যে কোনও একটি বিশেষ জিনিষ মনোনয়ন করেন দর্শকদের। যেমন ধরো টেবিল, চেয়ার, ফুলদানী, পিয়ানো, চায়ের কাপ এমনি ধারা কোনও কিছু। এর পরে যাদুকর প্রবেশ করেন ঘরের মধ্যে। এর পরে যাদুকরের সহকারী একটি কাঠির সাহায্যে ঘরের ভিতরকার বিভিন্ন জিনিষ স্পর্শ করতে থাকে। এই কাঠি দর্শকদের নির্দ্দিষ্ট জিনিষটি স্পর্শ করা মাত্র যাদুকর চিৎকার করে ওঠেন 'হয়েছে হয়েছে। এইটিই আপনাদের মনোনীত জিনিষ।' ব্যাপার দেখে তো দর্শকেরা হয়ে যায় হতভম্ব! অনেক বার অনেক আসরে এই খেলা দেখিয়েছি ছেলে-বেলায়—বাহাবাও পেয়েছি প্রচুর এই খেলার দৌলতে।

এবার শোন খেলাটার মূল কৌশল: খেলাটা দেখে যত কঠিন বলে মনে হয় আসলে কিন্তু তত কঠিন নয় এ। খুবই সহজ এর কলা-কৌশল। অল্প অভ্যাসেই এ আয়ত্তে আসবে।

ঘরের মধ্যে যাদুকর থাকেন না বটে, তাঁর সহকারী কিন্তু সেখানে উপস্থিত থাকে বহাল তবিয়তে। এই কারণে দর্শকদের মনোনীত জিনিষ সম্বন্ধে যাদুকরের কোন জ্ঞান না থাকলেও যাদুকরের সহকারী তা জানে খুব ভালভাবেই। এক বিশেষ সঙ্কেতের সাহায্য সহকারী যাদুকরকে এই নির্দ্দিষ্ট জিনিষের কথা জানিয়ে দেয়। কাঠির সাহায্যে বিভিন্ন জিনিষ স্পর্শ করার সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই স্পর্শ

করে সহকারী। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট জিনিষের বেলায় সে তার বাঁ হাত কোমরে রাখে। এই সঙ্কেত থেকে সহজেই যাদুকর বুঝে নেয় যে এইটিই দর্শকদের মনোনীত জিনিষ।

একখানি বিখ্যাত বইয়ের জন্মকথা

যতীন্দ্রনাথ পাল

এক জন ভদ্রলোকের একটা প্রচণ্ড নেশা ছিল। তিনি করতেন কী, বহু পুরানো সব খবরের কাগজ ঘেঁটে ঘেঁটে দেখতেন। দেখতেন আর তা থেকে আলাদা খাতায় অনেক কিছু লিখতেন। এ কাজে আলস্য ছিল না তাঁর। এটি ছিল তাঁর ভারি মনের মতন কাজ।

সমুদ্রের তলায় ডুবে ডুবুরীরা যেমন করে রত্ন খোঁজে, পুরানো খবরের কাগজের পৃষ্ঠাগুলোর মধ্যে তলিয়ে গিয়ে তিনিও তেমনি করে সন্ধান করতেন মহামূল্যবান সব জিনিসের।

বহু পুরাতন খবরের কাগজ তো দূরের কথা, দু'চার বছর আগেকার কাগজও পাওয়া যায় না বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারে। লাইব্রেরীতে প্রায়ই পুরানো খবরের কাগজ রাখা হয় না, কারণ, ওগুলি কেউই পড়তে চান না। পুরানো খবরের কাগজ আবার পড়বে কে! তাই এসব বিক্রী করে দেওয়া হয়।

তাহলে এত পুরানো খবরের কাগজ তিনি পেতেন কোথায়?

খুব পুরানো সংবাদপত্র পাওয়া যায় কোন কোন লাইব্রেরীতে ও কোন কোন লোকের নিজের গ্রন্থাগারে।

তিনি সেই সব জায়গায় গিয়ে রাশি রাশি পুরানো খবর টুকে নিতেন তাঁর নিজের খাতায়।

তাঁর এই নেশার জন্যে তাঁকে খরচও করতে হোত কিছু কিছু প্রায়ই, যদিও তিনি পয়সাওয়ালা লোক ছিলেন না। কিন্তু, নেশা এমনই জিনিস।

দৈবাৎ যদি খবর পেতেন যে, কোন পুরানো বইয়ের দোকানে পুরাতন খবরের কাগজের ফাইল পাওয়া যাচ্ছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তা সংগ্রহ করতেন। অথবা যদি জানতে পারতেন যে, কোন দূরবর্তী জায়গায় কোন গ্রন্থাগারে আছে পুরানো সংবাদপত্রের ফাইল, নিজের পয়সা খরচ করে তিনি তখনই সেখানে যেতেন তা দেখতে।

এই রকম করে অনেক দিন ধরে অনেক পুরানো খবর সংগ্রহ করার পর, আলাদা আলাদা বিষয় অনুসারে খবরগুলি শ্রেণীবদ্ধ করে বই আকারে বার করলেন। বইটির নাম দিলেন "সংবাদপত্রে সেকালের কথা।" এ বই পড়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরা খুব সুখ্যাতি করলেন।

এই বইয়ের সংকলনকারীর নাম তোমরা জান কি? ইনি হলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। ইংরাজী ১৯৫২ সালের রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হয় তিন জনকে। ব্রজেন্দ্র বাবু এই তিনজনের মধ্যে একজন। ব্রজেন্দ্র বাবু পুরস্কারটি পান তাঁর "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" এবং আরও দু'খানি বইয়ের শ্রেষ্ঠতার জন্যে।

গল্প হ'লেও সত্যি

শ্রীদুলালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাইরে ঝর-ঝর ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, চারি দিক কর্দ্দমাক্ত। রাস্তায় বেরুবার উপায় নাই। ফ্রান্সে সে বার দারুণ শীত পড়েছে। তাই দুই ভাই ঘরের মধ্যে উনুনের পাশে বসে আগুন পোয়াচ্ছে।

হঠাৎ তারা দেখলে, উনুনের খানিকটা উপরেই একটা সার্ট ঝুলছে ও গরম ধোঁয়া ওর ভেতরে ঢুকছে আর সার্টটা বার বার ফুলে-ফুলে উঠছে। এই দৃশ্য দেখেই তাঁদের দুই ভাইয়ের মনে "বেলুন" তৈরীর কল্পনা জাগে। প্রথমে দু'ভাই মিলে নানা রকম সাইজের কাগজের বেলুন তৈরী ক'রে পরীক্ষা ক'রতে লাগলেন। পরে বড় বড় বেলুন নিয়ে খোলা জায়গায় পরীক্ষা ক'রতে সুরু করলেন এবং সে পরীক্ষাও সফল হ'ল। শেষে ১৭৮৩ সালের জুন মাসে তারা ঠিক ক'রলে যে, এবারে তাদের কঠোর সাধনার ফলাফল জনসাধারণকে নির্ভয়ে জানানো যেতে পারে।

ফ্রান্সের ছোট একটি সহর "এনোনে"। ১৭৮৩ সালের ৫ই জুন। বেশ গরম প'ড়ে গেছে। ছোট সহরটিতে আজ কর্ম্মচাঞ্চল্য স্তিমিত হ'য়ে এসেছে।···সবাই অলস মধ্যাহ্নে সহরের বড় মাঠের দিকে চলেছে, মনে বিপুল আশা, আকাঙ্খা ও উৎসাহ নিয়ে। ক্রমে-ক্রমে বিস্তর লোক মাঠে জড়ো হ'ল। মাঝখানে কাপড়ের তৈরী বিরাট একটা গোলা। তলায় একটা লোহার ঝুড়ি বাঁধা, তার ভিতরে স্তিমিত আগুন ধূমায়িত। উল এবং খড় সেই আগুনের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। গল-গল ক'রে ধোঁয়া উঠতে লাগল। দেখতে-দেখতে গোলাটা ফুলে উঠল।

···চারি দিক নিস্তব্ধ। হঠাৎ সেই স্তব্ধ জনতা চঞ্চল হয়ে উঠল। বেলুন উপরে উঠছে। ক্রমশঃ উপরে উঠছে। অগণিত লোক রুদ্ধ নিশ্বাসে দেখতে লাগল কেমন ক'রে সেই বেলুন একটু একটু ক'রে উপরে উঠে ক্রমে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

···বেলুনটি সাত হাজার ফুট পর্য্যন্ত উপরে উঠেছিল, তার পর দশ মিনিট পরে যেখান থেকে উঠেছিল তার থেকে দেড় মাইল দূরে মাটিতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

দাবানলের মত এই খবর চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল। নানা দেশ থেকে দলে দলে লোক এসে এই দুই ভাইয়ের গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিয়ে গেল।

এই দুই ভাই কে জান? এঁরা হচ্ছেন বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক যোসেফ মঁগোল ফীয়ে এবং এটিনে মঁগোল ফীয়ে।

শীতের সুখাদ্য নলেন গুড়

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ-রায়

"গুণ দেখে অভিধান-কর্ত্তা গুণধাম।
খেজুর গাছেরে দিলে 'হরিপ্রিয়া' নাম।
গুড়ের নিগূঢ় গুণ কি কহিব আর?
সুবাসে আমোদ করে মধুর আগার।
নূতন খেজুর গুড়ে দেবতার সক্।
নাম শুনে জল সরে নোলা লক্ লক্।
এপ্রকার সুখসেব্য আর নাকি আছে।
নলিনীর মধু কোথা নলেনের কাছে।
মাতে মন সুখদ 'পয়ড়া' গুড় পেলে।
অরুচির রুচি হয় লুচি দিয়ে খেলে।
"ভেজালের পাটালি" যে খায় একবার।
কখনও সে ভুলিতে না পারে তার তা'র।
নূতন নলেন গুড়ে মণ্ডা মনোহর।
পায়স পীযূষ সম অতি প্রেমকর।
দেখ হে খেজুর গাছ কত গুণ ধরে।
গলা কেটে রক্ত দিয়া উপকার করে।
কাঠের ভিতরে রেখে সুমধুর জল।
মানবে শিখান প্রভু করুণা-কৌশল।"

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখা কবিতা হইতে উপরি-লিখিত কয় লাইন উদ্ধৃত করিলাম। বহু কবি খেজুর গুড় সম্বন্ধে বহু কবিতা লিখিয়াছেন কিন্তু অত সুন্দর ও সরল কবিতা খুব কমই চোখে পড়িয়াছে। খেজুর গুড় বিশেষ করিয়া নলেন গুড় শীতের এই কয় মাস অতি উপাদেয় সুখাদ্য। খেজুর গুড় সকলেরই প্রিয়। সকলেরই প্রিয় এবং ভাল জিনিষ বলেই হয়ত খুব অল্প সময়ের জন্যে পাওয়া যায় এবং কয়েক দিনের জন্য ব্যবসাটাও মন্দ চলে না। মরশুমী ফুলের মত এই ব্যবসাকে মরশুমী ব্যবসা বলা যেতে পারে। কারণ, শীতকাল ব্যতীত খেজুর গুড় হয় না, পাওয়া যায় না, এবং বেশী দিন থাকেও না। যার মাস এই গুড় পাওয়া যায় না বলে এই কয় মাস খেজুর গুড়কে কেন্দ্র করে ব্যবসাও চলে বেশ। অনেক জায়গায় অস্থায়ী হাটও বসে খেজুর গুড়ের। এই সব অস্থায়ী হাটে কেনা-বেচা মন্দ হয় না অল্প দিনের জন্যে।

হাটবাজার হতে কিনে এনে আমরা খাই কিন্তু অনেকেই হয়ত জানি না কেমন করে তৈরী হয় এই গুড়। তারই একটা মোটামুটি সচিত্র বিবরণ এখানে দিতে চেষ্টা করছি।

সহরের রাস্তায় ফেরিওয়ালারা হেঁকে যায় "রস চাই—খেজুর রস"—কিন্তু পল্লীগ্রামের টাটকা রস যাঁরা একবার খেয়েছেন তাঁরা কোন আস্বাদই পাবেন না, তৃপ্তি পাবেন না—সহরের ঐ কেনা রস খেয়ে। শীতকালে রস খাওয়া নিয়ে বেশ একটা ধুম পড়ে যায়—বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে। এই রস হতেই খেজুর গুড় প্রস্তুত হয়। খেজুর গুড় খুব সহজপ্রাপ্য অথচ আমাদের সকলের প্রিয়। বাংলা দেশের বাইরেও এর প্রচলন দেখা যায়। শীতকালে আমরা বাঙ্গালীরা খেজুর গুড় ছাড়া অন্য গুড় বড় একটা খাই না। খেজুর রসের মতই খেজুর গুড় সুস্বাদু। কিন্তু গুড় প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে বা যারা রস হতে গুড় করে তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না—চিন্তাও করি না কোন দিন। সেই সব কথাই আলোচনা করব এখন।

যারা রস সংগ্রহ করে গুড় করে, তাদের বলে 'শিউলি'। অল্প অল্প শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'শিউলিরা' গাছ ঝুড়তে আরম্ভ করে। অর্থাৎ গাছের গলার কাছ হ'তে খানিকটা পর্য্যন্ত পাতাগুলি কেটে পরিষ্কার করে, চেঁচে একটি কাঠি গুঁজে দেয়। এই কাঠিটাকে 'নলি' বলে। গাছ ঝুড়বার সময় অর্থাৎ পরিষ্কার করার সময় 'মুড়োমারা দা' এবং পরে চাঁচবার সময় 'চাঁচদা' নামে একরকম দা ব্যবহার করে। এই দায়ের ধার নষ্ট হয়ে গেলে

কাজের পূর্ব্বে 'শিউলি' একখানি 'চাঁচদা': বিলেটে ঘষে ধার করছে

এক জন 'শিউলি' গাছ কেটে ভাঁড় বা ঠিলি বাঁধছে এক মনে

বালি দিয়ে ধার দেওয়া হয়। যে কাঠের জিনিসটার উপর ধার দেওয়া হয় তার নাম 'বিলেট'। এই 'বিলেটে'র ওপর বালি ছিটিয়ে দা' ঘষে ধার দেয়। গাছের গলার কাছে পরিষ্কার করে যে 'নলি' গুঁজে দেয় সেই 'নলি' দিয়ে 'ফোঁটা ফোঁটা' রস পড়তে সুরু করে। সেই 'নলি'র নীচে ঠিলি বা ভাঁড় বাঁধা থাকে। এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে ক্রমশঃ ভাঁড় রসে ভর্তি হয়ে ওঠে। অনেক সময়ে এই রস চুরি হয় বলে ভাঁড়ের মধ্যে ধুতরার ফল ইত্যাদি দিয়ে রাখে শিউলিরা। গ্রামাঞ্চলে এই সব রস খেয়ে অনেক বিপদে পড়ে যায়। শিউলিরা যখন কাজে বার হয় অর্থাৎ গাছ বাঁধতে বা গাছ চেঁচে ঠিলি বাঁধতে ওঠে সেই সময় কতকগুলি জিনিস ব্যবহার করে। যেমন—দু'রকমের দা,' ঠোঙা, দড়া, পাওটা, গলানী, নলি প্রভৃতি। কোমরে একটি পাতার তৈরী ঠোঙা থাকে, সেই ঠোঙার মধ্যে থাকে দা', নলি প্রভৃতি। গাছে উঠে যার উপর পা দিয়ে দাঁড়ায় তাকে 'পাওটা' বলে। এই 'পাওটা' বিচালি দিয়ে মোটা দড়ি দিয়ে পাকিয়ে তৈরী করে। ঐ পাওটা গাছের গায়ে বেঁধে তার ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যে দড়িটি কোমরের সঙ্গে গাছে বাঁধে তাকে 'দড়া' বলে। ভাঁড়ে বা ঠিলির গলায় যে দড়ি বেঁধে গাছের সঙ্গে ঠিলি ঝোলান হয় তাকে 'গলানি' বলে। অনেক সময় শিউলিরা এই 'গলানি' ব্যবহার না করে গাছের পাতা ছিঁড়ে ঠিলি বাঁধে। রাত থাকতে খুব ভোরে উঠে বিভিন্ন গাছ হ'তে ঠিলিগুলি খুলে এনে একত্র করে। যেখানে রস জ্বাল দিয়ে গুড় হয় সেই জায়গাটাকে বলে 'বান'। সেই 'বানের' ধারেই 'শিউলিরা' খেজুরপাতা, তালপাতা প্রভৃতি দিয়ে কুড়ে করে শীতকালটা সেখানেই কোন রকমে কাটিয়ে দেয়। পল্লীঅঞ্চলের সকালে ছেলে-বুড়োর ভীড় জমে এই সব 'বানে' রসের লোভে, আগুনপোয়ানও চলে সেই সঙ্গে আরও চলে নানানতর মুখরোচক গল্প আলোচনা।

'বানে' রসভর্তি ঠিলিগুলি এনে মাটির পাত্রে ঢেলে শিউলিরা জ্বাল দিতে সুরু করে। পাশাপাশি দু'তিনটি মাটির পাত্র থাকে। একটি হাতার মত জিনিস দিয়ে রস জ্বাল দিতে সুরু করে এবং গাদ উঠলে সেই হাতা দিয়ে গাদ ফেলে দেয়। এই হাতাকে শিউলিরা 'ওরুড' বলে। শিউলিরা বসে বসে 'ওরুড' দিয়ে রস নাড়ে, একটি পাত্র হ'তে আর একটি পাত্রে তোলে এবং অবস্থা, প্রয়োজন ও চাহিদামত গুড় করে। গুড় তিন রকমের—সার গুড়, মাত বা ঝোলা গুড় এবং পাটালি গুড়। 'বানে' যখন গুড় জ্বাল দেওয়া হয় তখন গন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়ে ওঠে। মাত বা ঝোলা গুড় প্রয়োজন হলে শিউলিরা অবস্থা বুঝে ঠিলিতে ঢালে আর সার গুড় প্রয়োজন হ'লে আর একটু ঘন হলে ঠিলিতে ঢালে। পাটালি গুড়ের প্রয়োজন হলে ঘন না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থা বুঝে শিউলিরা 'বীজ-কাঠি' দিয়ে ঘাঁটতে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে ঘাঁটার পর সময় বুঝে কাপড়ে বা চাটাইয়ে ঢেলে পাটালি গুড় তৈরী করে। জ্বাল দেওয়ার পাত্রের গায়ে যে গুড় লেগে থাকে সেই গুড় 'ঝিনুক' দিয়ে চেঁচে নেয়। এই ভাবে গুড় প্রস্তুত করে নিজেরা হাটে বা পাড়ায় পাড়ায় খুচরো বিক্রয় করে আবার অনেক সময় দালালরাও কিনে নিয়ে যায়। শিউলিরা সারা বৎসর বসে থাকে এই কয়েক মাসের আশায়। এই কয়েক মাস শিউলিরা পরিশ্রম করে, কষ্ট করে গুড় প্রস্তুত করে বাজারে বিক্রী করে সামান্য কিছু অর্থ পায় বটে কিন্তু আমাদেরও কম আনন্দ দেয় না। এই ব্যবসাটি ছোট হলেও চাহিদা আছে মরশুমী ব্যবসা বলে।

একটি মরশুমীতে অর্থাৎ আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি হ'তে ফাল্গুনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এই কয় মাসে দেখা গেছে, গড়পড়তা এক একটি খেজুর গাছে দু' মণ রস পাওয়া যায় এবং সেই রস হতে আন্দাজ দশ সের গুড় হয়।

গুড়ে জ্বাল দিচ্ছে 'শিউলি', এ-পাশে একটু 'রস' পাবার আশায় ছেলের দল জড়ো হয়েছে 'বানে'

জনৈক খরিদ্দার বাজারে পাটালি গুড়ের দর কষাকষি করছে

বিবেকানন্দ স্তোত্র

সুমণি মিত্র

৮

ধুলোয় ধূসর এই মরু-পৃথিবীতে
মুক্তির চাবি-কাঠি নিয়ে
ভগবান সত্যি আসেন
আমাদের মতো এই একটুকু হোয়ে।
তাঁর এই অবতার-লীলা
অবিকল মানুষের মতো,
তাই তাঁকে চিনে ওঠা দায়।
'সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ,
কখনো বা ভয়···' ১
ঠিক এই আমাদেরই মতো।
'ব্রহ্মপরাৎপর রাম'
'দশরথজী কি বেটা' তাই ; ২
'যে রাম যে কৃষ্ণ—সেই রামকৃষ্ণ'দেব
স্রেফ 'পরমহংস মশাই'! ৩

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।" ৪

অবতার-কল্প যারা, নিত্যসিদ্ধ মহামায়া রথী
পৃথিবীর কুরুক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে,
অতটুকু দেহের ভেতরে
অসীম চৈতন্য দেখে
প্রাণভোরে হাতজোড় করে ;
মনটাকে নতজানু করে
নিজেকে ফুলের মত নিবেদন করে তাঁর পায়।
অমনি প্রচণ্ড 'সল'
রাতারাতি 'পল'৫ হোয়ে যায়!
ঠিক ওরই জাতভাই নরেন্দ্রনাথ
বিবেকানন্দ হোয়ে পৃথিবী কাঁপায়!

এ ভারী মজার,
"Whenever this world of ours,
On account of growth,
On account of added circumstances,
Requires a new adjustment,
A wave of power comes,...
God understands human failings
And becomes man
To do good to humanity." ৬

যখনি ধর্মের গ্লানি পুঞ্জীভূত হোয়ে
সনাতন সভ্যতার কণ্ঠরোধ করে,

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

২। "অবতার যখন আসেন, সাধারণ লোকে জানতে পারে না ; গোপনে আসে, দু'-চারজন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে। রাম যে পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার, একথা বারো জন ঋষি কেবল জানতো। অন্যান্য ঋষিরা বোলেছিল,—'হে রাম, আমরা তোমাকে দশরথের ব্যাটা বোলে জানি।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত। ২য় ভাগ। ২২পৃঃ।

৩। যদিও ঠাকুর নিজের স্বরূপ প্রকাশ কোরে বোলেছিলেন—'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্যে অবতীর্ণ হোয়েছে' তাসত্ত্বেও সে-যুগের লোক তাঁকে 'পরমহংস মশাই' বোলতেই ভালবাসতো।

৪। "আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব এবং সকলের অন্তরাত্মা হোলেও মানুষের দেহ আশ্রয় করি বোলে মূঢ়গণ আমার (আকাশ-কল্প) পরমাত্মতত্ত্ব না জেনে আমাকে অবজ্ঞা করে।"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রাজযোগ। শ্লোক ১১।

৫। আগে 'সেন্ট পল'-এর নাম ছিলো 'সল'। জোয়ান বয়েসে 'সল' এত প্রচণ্ড তেজী ছিলেন যে, যীশুর শিষ্য 'ষ্টিফেন'কে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে থেঁতলে মেরে ফেলেছিলেন ; এমন কি, যীশুর সম্প্রদায়কেও মেরে ফেলবার চেষ্টা কোরেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন ভগবৎদর্শন হোয়ে 'সল' একেবারে বদলে গেলেন। সেই থেকে তাঁর নাম হোলো 'পল'। এই মহাত্যাগী ও মহাপণ্ডিত 'সেন্টপল' যদি খৃষ্টানধর্মে না আসতেন, তাহলে খৃষ্টানধর্ম বহু কাল আগেই জগৎ থেকে লুপ্ত হোয়ে যেতো।

৬। "যখনি আমাদের এই পৃথিবীতে ক্রমাগত পরিবর্তন এবং নোতুন নোতুন অবস্থাচক্রের দরুণ নোতুন নোতুন সামাজিক শক্তি সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়, তখনই এক শক্তি-তরঙ্গ এসে থাকে,"··· My Master (পৃঃ ১) "ভগবান মানুষের দুর্বলতা বোঝেন আর তারই কল্যাণের জন্যে মানুষরূপে অবতীর্ণ হন।" Bhakti-yoga (৪৩ পৃঃ)

নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত সেই মায়াধীশ
ত্রিগুণাত্মিকা তাঁর মহাশক্তি আশ্রয় কোরে
'ব্রজে' কিংবা 'কামারপুকুরে'
অকস্মাৎ দেহবান হন্।
নিত্যযুক্ত আত্মা ঐ 'নিত্য-সিদ্ধ'গণ,
পার্থ কিংবা স্বামিজী, সেন্টপল্
এই সারথির হাতে যন্ত্রবৎ হোয়ে
কুরুক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধে স্তব্ধ হোয়ে শোনে,—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" ৭

*　　　*　　　*

তবু প্রশ্ন জাগে,—
ঊনবিংশ শতাব্দীতে কেন
কোলকাতার কুরুক্ষেত্রে
'পাঞ্চজন্য' মহাশঙ্খ ৮ বাজে ?

১০

জবাব্‌টা শোনো তবে
'নিত্য-সিদ্ধ' স্বামিজীরই মুখে,
'অবতার-কল্প' যিনি
নিত্যযুক্ত আত্মা ঐ
অবতীর্ণ হন যুগে যুগে।—

"To-day,
Man requires
One more adjustment
On the spiritual plane ;
To-day,
When material ideas
Are at the height of their glory and power,
To-day,
When man is likely to forget his divine nature,
Through his growing dependenc on matter,
And is likely to be reduced
To a mere money-making machine,
An adjustment is necessary ;

The voice has spoken,
And the power is coming
To drive away
The clouds of gathering materialism.
The power has been set in motion
Which, at no distant date,
Will bring unto mankind
Once more
The memory of its real nature,...

Now, my brothers,
If you do not see the hand,
The finger of Providence,
It is because
You are blind,
Born blind indeed." ৯

১১

'আঠারো-ছোত্রিশ' সালে
কর্তব্য-বিমূঢ় এই সংস্কার-বিক্ষুব্ধ শতাব্দীকে ১০
প্রকৃতির প্রসববেদনা
নিরুপায় হোয়ে
নাড়ি ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিলে একটি শিশুকে।

৭। "হে ভারত। যখনি ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনি আমি নিজেকে সৃজন কোরি। সাধুদের রক্ষা, পাপিদের দুষ্কৃতিনাশ এবং ধর্মস্থাপনের জন্তে আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই" —শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৪র্থ অধ্যায়, ৭ম ও ৮ম শ্লোক।

৮। কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ এই দিব্যশঙ্খে ফুৎকার দিয়েছিলেন। 'পঞ্চজন' নামক দৈত্যকে বধ কোরে এই শঙ্খ লাভ কোরেছিলেন বোলে এর নাম 'পাঞ্চজন্য'।

৯। "আজ-কাল আবার আধ্যাত্মিক রাজ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন হোয়ে উঠেছে। বর্তমানে দেখছি জড়ভাবগুলোই দারুণ গৌরব ও শক্তির অধিকারী ; আজ-কাল লোকে ক্রমাগত জড়ের ওপর নির্ভর কোরে কোরে নিজের ব্রহ্মভাব ভুলে গিয়ে অর্থোপার্জক যন্ত্রবিশেষে পরিণত হোতে বসেছে, এখন আর একবার সমন্বয়ের প্রয়োজন হোয়ে পোড়েছে। সেই বাণী উচ্চারিত হোয়েছে,—সেই শক্তি আসছে, যা এই ক্রমবর্দ্ধমান জড়বাদের মেঘকে অপসারিত কোরবে। সেই শক্তির খেলা আরম্ভ হোয়ে গ্যাছে, যা অল্পদিনের মধ্যেই মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।"—*My Master* (পৃঃ ১-২)।

"এখন যদি তোমরা বিধাতার মঙ্গল-হস্ত দেখতে না পাও, তবে তোমরা অন্ধ, নিশ্চিত জন্মান্ধ।"—*Lectures From Colombo to Almora* (পৃঃ ১৮৭)।

১০। বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীকে (১৮০০—১৮৭৫) ঐতিহাসিকেরা 'সংস্কার-যুগ' বোলে উল্লেখ কোরেছেন। সংস্কার-যুগের প্রবর্তক রাজা রামমোহন ছাড়া, তাঁর পরবর্তী সংস্কারকগণ সকলেই ধ্বংসনীতির অনুসরণ কোরে এতই শক্তিক্ষয় কোরেছিলেন যে, কোনো কিছু গড়ে তোলা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অনুদার ধর্মমত প্রচার, পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ এবং প্রাচীন সমাজ ও ধর্মের মস্তকে অকারণ অভিশাপবর্ষণ—পরবর্তী কালের শক্তিহীন সংস্কারকদের এই একমাত্র পেশা হোয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

রাজধানী থেকে বহুদূরে
আড়ম্বরহীন ঐ 'কামারপুকুরে'
বাঁশ-বট্-খেজুরের ছায়ায় মানুষ
সেদিনের পল্লীজীবন
আত্মকেন্দ্র ধর্মকে ছেড়ে
ছুটে যায়নিকো ঐ আপাতমধুর
বিজাতীয় সভ্যতার মরীচিকা-মোহে।
বিশ্বাসের শ্যামল-ছায়াতে
পদ্মাসনে বোসেছিলো পূর্ণকাম ক্রোড়ে।

এইখানে ঠাকুর এলেন।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুলে
'সত্যযুগ' ১১ ভূমিষ্ঠ হোলেন।
শঙ্খধ্বনিতে তাঁর জন্মবার্তা বিঘোষিত হোলো;
মৃত্যুবার্তা বিঘোষিত হোলো
'সন্দেহ-যুগের', ১২
তাল-কানা, হাল-ভাঙ্গা, শ্বাস-টানা 'সন্দেহ-যুগের'।

১২

শুধু তাই নয়,
'নিরাকার-বাদী গোপীদের' ১৩
অতৃপ্ত হৃদয়
এতদিনে হোলো পূর্ণকাম;
এতদিনে ভুবনেশ্বর
তাদের ব্যাকুল ডাকে সাড়া দিয়েছেন;
প্রেমের বাঁধন আজ অনাদি অসীম
স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছেন।

'গদাই'কে ঘিরে
'বাল্যলীলা,' সুরু হয় কামারপুকুরে।
গ্রামবাসিনীরা
ননদ ও শাশুড়ীর চোখে ধুলো দিয়ে
গদায়ের কাছে এসে ভাগবত-পাঠ শুনে যায়।
মনে করে কাজ আছে, আসবে না,
তবু
অসীম আনন্দ যেন
হাত ধোরে টেনে নিয়ে যায়!
স্রোতস্বিনীর মত ছুটে এসে তাই
মহাসত্তায় ওরা মিশে যেতে চায়!

১৩

'লাহা'দের 'প্রসন্নময়ী' ১৪
অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততায়
ধর্মাধর্ম, গুরু-শিষ্য, ভক্ত-ভগবানে
একাকার কোরে দিয়ে অম্লানবদনে
অসীমকে নেড়ে-চেড়ে
খুশিমতো আস্বাদ করে।
বেমালুম বোলে বসে তাই,—
"বল্‌তো গদাই,
সময়ে-সময়ে তোকে কেন
ঠাকুরের মতো মনে হয়?
হ্যাঁরে সত্যিই!"
গুপ্তভাবে 'আপ্তলীলা' পাছে ফাঁস হয়
গদাধর অন্য কথা তোলে।
তাতে কি আজন্ম-জ্ঞানী ভোলে?
—"সে যাই বোলিস্,
তুই যে মানুষ নোস্
এটা নিশ্চিত।"

* * *

১১। স্বামিজী বোলতেন,—"যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেই দিন থেকেই Modern India—সত্যযুগের আবির্ভাব।...তিনি যেদিন থেকে জন্মেছেন, সেই দিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ, সব তিনি দূর কোরে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদভঞ্জন—হিন্দু-মুসলমান ভেদ, খৃশ্চান-হিন্দু ইত্যাদি সব চ'লে গেল। ঐ যে ভেদাভেদের লড়াই ছিলো, তা অন্য যুগের; এ সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার।"

—পত্রাবলী (১ম ভাগ। পৃঃ ৪৫৭ ও ২য় ভাগ। পৃঃ ৪৩)

১২। এখানে 'সংস্কার-যুগ'কেই আমি 'সন্দেহ-যুগ' বোলে উল্লেখ কোরেছি। কেন না, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কারের আবর্তে পড়ে কোন্ পথে যাবো, আমরা ঠিক কোরে উঠতে পারি নি, পাশ্চাত্যের প্রখর আলোতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিলো; সমস্ত জাতটার দিগ্‌ভ্রম উপস্থিত হোয়েছিলো; প্রশ্নের পর প্রশ্ন এবং সন্দেহের পর সন্দেহ পুঞ্জীভূত হোয়ে আমাদের জাতীয় জীবনটাকে একেবারে বিভ্রান্ত কোরে দিয়েছিলো। জাতীয় জীবনের এই সংশয়াচ্ছন্ন মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হোয়েছিলেন।

১৩। "এক মতে আছে যশোদাদি গোপীগণ পূর্বজন্মে নিরাকার-বাদী ছিলেন। তাঁদের তাতে তৃপ্তি না হওয়াতে বৃন্দাবন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণকে ল'য়ে আনন্দ।"—এ হোলো ঠাকুরের কথা। 'পদ্মপুরাণে' এ-কথার নজির পেয়েছি।—

"ব্রহ্মানন্দেন পূর্ণাহং তেনানন্দেন তৃপ্তধীঃ।
তথাপি শূন্যমাত্মানং মন্যে কৃষ্ণরতিং বিনা॥"

আমিও ঐ কামারপুকুরবাসিনীদের নিরাকার-বাদী গোপী বোলতে চেয়েছি। ঠাকুরকে অবতার বোলে, কোন্ যুক্তিতে ওদের সাধারণ জীব মনে কোরতে পারি বোলুন? অবতারের বাল্য-লীলা আস্বাদ করার অধিকার যারা পেলো, তাদের খেলো ভাবলে ঠাকুরের অবতারত্বে বিশ্বাস নেই বোলতে হবে। এখন রামকৃষ্ণকে যদি কোনোক্রমে রাম কিংবা কৃষ্ণ ভাবতে পারেন, তাহোলে আপনারাও স্বচ্ছন্দে ওদের গোপী বোলে গ্রহণ কোরতে পারবেন আশা করি।

১৪। কামারপুকুর গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার বিধবা মেয়ে।

নইলে ও-দুধের ছেলেকে
দেবীর নৈবেদ্য দিয়ে পুজো করে কেউ ?
'বিশালাক্ষী'১৫ ভেবে কেউ
গল-বস্ত্রে প্রণিপাত করে ?

১৪

আর ঐ 'চিনু শাঁখারি'ও১৬
কৃষ্ণকান্তবিরহিনী
প্রসন্নের সমগোত্রীয়।
একদিন গদাইকে ধোরে
অতসীফুলের হারে
সজ্জিত কোরে,
একঠোঙা মিষ্টি নিয়ে কিনা
গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণকিশোরের স্তব করে !
সদ্যোজাত সিদ্ধার্থকে দেখে
মহাঋষি 'অসিতে'র ১৭ মতো
অসহ্য আনন্দ-বেদনায়
চিনিবাস হাহাকার করে,—
"বাঁচবো না বেশি দিন,
মোরে যাবো কবে।
মর্ত্যে তোমার কত লীলাখেলা হবে !
—সে-লীলা দেখবে কত লোক !
দেখতে পাবো না শুধু আমি।
তা-সে-যাই-হোক,
তবু যে একটুখানি
চিন্‌তে দিয়েছো তুমি
এইটাই পারের পাথের।"

তাই আজ চিনু শাঁখারির
সমস্যা-সঙ্কুল এই বীভৎস সংসার,
কেন জানি তুচ্ছ মনে হয়!
গদাইকে কাঁধে তুলে
দুর্বহ জীবনকে তার
একেবারে হাল্কা মনে হয় !
"আচ্ছা গদাই,
তুমি যে আমায় বলো চিনিবাসদাদা,
তাহোলে তো আমি চিনু নই,
তাহোলে তো আমি 'বলরাম'।"

প্রেমোন্মত্ত জীবাত্মার
কি মধুর নিষ্পাপ প্রলাপ!
*   *   *
যারা বলে ওটা পাগলামি,
গোলোযোগ তাদেরই মাথায় !
'যাদৃশী ভাবনা যস্য'-নীতি যদি মানি,
প্রলাপ কি সত্যের শৈশব নয় ?

১৫

কে বোলেছে চিনু বোকারাম ?
আসলে তো সেই বুদ্ধিমান।
আমরাই বোকা !
বোধাতীত ভগবান
ছটাকে-বুদ্ধি দিয়ে
আমাদের বোকা বানালেন !
স্বামিজীর মত বিদ্বান,
ভেবে দেখো, এ কথাটা কি খেদে বলেন,—
"He is fooling us with little brains."১৮
প্রসন্ন বা চিনিবাস স্বচ্ছন্দে যেটা বোলে গ্যালো,
অনেক দ্বন্দ্বের পর শেষে,
জীবনের শেষ-ধাপে এসে
বিবেকানন্দ কিনা তাইতেই দাগা বোলালেন !—

১৫। কামারপুকুর থেকে দু'মাইল তফাতে আনুড় আনুড়ে 'বিশালাক্ষী দেবী'র মন্দির। দেবীর পুজো নিয়ে চোলেছেন প্রসন্নময়ী। গদাই তাঁর সঙ্গী হোলো। ফাঁকা মাঠ দিয়ে যেতে যেতে গদাধর 'বিশালাক্ষী দেবী'র মহিমাকীর্তন কোরতে কোরতে হঠাৎ সমাধিস্থ হোয়ে গেল। প্রসন্নময়ীর মনে হোলো, যে-'বিশালাক্ষী'কে দেখতে চোলেছি, তিনিই আগবাড়িয়ে আসেননি তো ?—'ওলো, দেবীর ভর হয়নি তো ?' গদাধরের কানে দেবী-স্তব শোনাতে লাগলেন তিনি। নিঃসঙ্কোচে ওর পায়ের ধূলো নিলেন, দেবীর নৈবেদ্য খেতে দিলেন গদাইকে। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস, গদায়ের মুখ দিয়ে মা'-ই সব খেলেন।

১৬। ঠাকুরের বাল্যলীলার আর একজন অন্তরঙ্গ এই চিনু শাঁখারি। এঁর আসল নাম হোলো শ্রীনিবাস শাঁখারি। ইনি ঠাকুরের চেয়ে বয়েসে অনেক বড়ো হোলেও ঠাকুরকে দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি ও পুজো কোরতেন। ঠাকুর এঁকে চিনিবাসদাদা বোলে ডাকতেন।

১৭। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে' মহর্ষি অসিতের এই হাহাকার লিপিবদ্ধ আছে। সিদ্ধার্থের জন্মের পর মহর্ষি অসিত তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। সদ্যোজাত শিশুকে দেখে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হওয়াতে রাজা শুদ্ধোধন অমঙ্গল আশঙ্কায় বিচলিত হোয়ে প্রশ্ন কোরেছিলেন,—"যার জন্ম জ্যোতির্ময়, তাকে দেখে আপনার দু-চোখে অশ্রু সঞ্চিত হোলো কেন ?" উত্তরে মহর্ষি বোলেছিলেন,—"আমি স্বয়ং বঞ্চিত হোলাম বোলে কাঁদছি, অন্য কারণে নয়। আমার পরলোক যাত্রার দিন ঘনিয়ে এসেছে, এমন সময়ে কিনা ভগবান তথাগত জন্মালেন ! এঁর ধর্ম শ্রবণ কোরতে পারবো না বোলে ত্রিদিববাসকেও আমি বিপত্তি বোলে মনে কোরছি,—তাই কাঁদছি।"

১৮। "ভগবান আমাদের ছটাকে-বুদ্ধি দিয়ে বোকা বানাচ্ছেন।" Letters (পৃঃ ২১৫)

"ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিদ্গুণেড্যঃ
নক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্
মোহঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ১।

ভক্তির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি
গচ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বং।
বক্ত্রোদ্ধৃতন্তু হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ২।

তেজস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ
রাগে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
মর্ত্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্ম্মিনাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ৩।

কৃত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি
ষ্ণান্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ।
যস্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ৪ ।

* * * *

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং কৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ। ৫

স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্"। ৬।১১

১৬

নিজেকে ইঙ্গিত কোরে 'প্রথিত পুরুষ'
ঐ শোনো কি কথা বলেন,—
"মনুষ্যলীলা কেন জানো ?
মানুষের মুখে তাঁর কথা শোনা যায়,
শোনা যায় তাঁর গুণ-গান,
মানুষের কাছে এসে তাই
রসাস্বাদন কোরে যান।
যদিও সর্বত্র ভগবান,
তবু বিনা অবতারে
জীবের মেটে না প্রয়োজন,
ভক্তের ভরে নাকো প্রাণ।
অধর্ম বিনাশ করা ছাড়া
ভক্তকে দিতে হয় সাড়া।
ভক্তেরই ডাকে তিনি চোদ্দোপো' হোয়ে
পৃথিবীতে লীলা কোরে যান।
নররূপে কাছে পেলে
তবে তো ভক্তের
পরিপূর্ণ হয় মনস্কাম।
অনাদি অনন্তকে তাই
ভক্তেরই সুখার্থে
ছোটো হোতে হয়।
দুপুরের সূর্য কি চোখে কারু সয় ?
সূর্যোদয়ের ঐ শিশু-সূর্য কি
মানুষের চোখ ঝলসায় ?
বরং তৃপ্তি ছায় চোখে।
দু'চোখ জুড়োয় যেন প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে।
সূর্যোদয়ের ঐ সূর্য যেমন
নিজেকে নরম কোরে রাখে,
ভক্তের ধাতে সয় যাতে,
অনাদি অসীম তাই
ঐশ্বর্য-রহিত হোয়ে
অবতীর্ণ হন মর্ত্যলোকে।

* * *

১১। "ওঁ হ্রীং তুমি সত্য, স্থির, ত্রিগুণজয়ী, অথচ অগণ্য মনোহর গুণের দ্বারা স্তবের যোগ্য। যেহেতু আমি তোমার অজ্ঞাননিবারক পূজনীয় পাদপদ্ম ব্যাকুলভাবে দিনরাত্রি ভজনা কোরছি না, সেই হেতু হে দীনবন্ধু ! তুমিই আমার আশ্রয়।১ সংসারনাশকারী ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য এবং ভজন—এ-গুলো থাকলেই সেই মহান ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হোয়ে থাকে। কিন্তু এ-কথা মুখে বোললেও আমার হৃদয়ে কিছুমাত্র প্রতিভাত হোচ্ছে না। অতএব হে দীনবন্ধু ! তুমিই আমার আশ্রয়।২ ॥ হে রামকৃষ্ণ ! সত্যের পথস্বরূপ তোমাতে যে অনুরক্ত হয়, তোমাকে পেয়েই তার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়, সুতরাং সে শীঘ্রই রজোগুণকে অতিক্রম করে। মরণশীল এই নরলোকের জীবনস্বরূপ তোমার ঐ পাদপদ্ম মৃত্যুরূপ তরঙ্গকে নাশ কোরে ছায়। অতএব হে দীনবন্ধু ! তুমিই আমার আশ্রয়।৩

হে প্রভু ! তোমার মায়াদূরকারী মঙ্গলময় এবং অতি পবিত্র কান্ত-নাম ('ক্ষ'-যার অন্তে অর্থাৎ রামকৃ'ক্ষ') পাপকেও পুণ্য কোরে ছায়। হে জগতের একমাত্র প্রাপ্তব্য ! যেহেতু আমি নিরাশ্রয়, সেই হেতু হে দীনবন্ধু ! তুমিই আমার আশ্রয়।৪

যাঁর প্রেমস্রোত চণ্ডাল পর্যন্ত অপ্রতিহতবেগ, অর্থাৎ চণ্ডালকেও যিনি প্রেমদান কোরতে কুণ্ঠিত হননি, যিনি অমানুষ-স্বভাব হোলেও লোকের কল্যাণের পথ পরিত্যাগ করেননি, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—এই ত্রিলোকেও যাঁর মহিমার তুলনা নেই, যিনি সীতার পরম প্রেমাস্পদ, যে জ্ঞানস্বরূপ রামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠদেহ ভক্তিস্বরূপিণী সীতার দ্বারা আবৃত।৫। যে কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ভীষণ প্রলয়তুল্য হুহুঙ্কার স্তব্ধ কোরে এবং অর্জুনের স্বাভাবিক ঘোরতর অন্ধতামিস্ররূপ অজ্ঞান-রজনীকে দূর কোরে দিয়ে, শান্ত ও মধুর গীত অর্থাৎ গীতাশাস্ত্র সিংহনাদে গর্জন কোরে বোলেছিলেন—সেই বিখ্যাত পুরুষই ইদানীং রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হোয়েছেন।৬। —শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রাণি।

কে বোলেছে অবতার শুধু দশজন ?
চব্বিশ অবতার আছে 'ভাগবতে'।
সর্বশাস্ত্রময়ী ঐ গীতা মতে
ব্রহ্ম স্বয়ং
প্রয়োজন অনুসারে
অসংখ্য অবতারে
যুগে যুগে অবতীর্ণ হন।
'ধর্মে যেই জমে গ্লানি
তখনি নিজেকে আমি
নররূপে কোরি হে সৃজন।'
দ্বাপরের শেষপাদে
এ-কথা সিংহনাদে
বোলেছেন কৃষ্ণ স্বয়ং।

*   *   *

যদি বলো—রোগ-শোক যার
ক্ষিদে-তেষ্টা আমাদেরই মতো,
কি কোরে বলবো অবতার ?
তবে এ-কথাটা শুনে রাখো,—
পঞ্চভূতের এই ফাঁদে
স্বয়ং ব্রহ্ম পোড়ে কাঁদে !
সীতার বিরহে রাম
কেঁদেছেন কত !
নারায়ণ বরাহাবতারে
নিজের স্বরূপ ভুলে
ছানা-পোনা খাওয়াতেই রত !
শিবের ত্রিশূলাহত হোলে
তবেই স্বধামে যান চোলে !

*   *   *

অবতার চিনে ওঠা দায়।
নিজেকে ঢাকেন তিনি নিজেরই মায়ায় !"

১৭

সন্দেহ-বাদীকে তাঁর পাণ্টা প্রশ্ন এই—
"কি কোরে জানলে তুমি অবতার নেই ?
কামনা-মলিন জীব কি বুঝবে তাঁকে ?
কাম আর কাঞ্চন নিয়ে যারা থাকে,
তারা কি বুঝবে তাঁর দাম ?
'ব্রহ্মপরাৎপর রাম'
তাঁকে কে বুঝেছে বলো সেটা ?
বারো জন ঋষি ছাড়া
সকলে বোলেছে তাঁকে
স্রেফ 'দশরথজী কি বেটা'।
কে তাঁকে বুঝেছে বলো তপস্যাবিনা ?
নররূপে নরবৎ নরলীলা কি না।
তাই বোলে আমাদের এই
অশুভ বুদ্ধি নিয়ে অবতার নেই,
—এ কথাটা জোর কোরে বলা ঠিক নয়।
তাঁকে যে চিনতে হয় তপস্যাবলে।
বড় মাছ চাও যদি চার ফ্যালো জলে।
মাখন চাও তো দুধ মন্থন করো,
মেতী বাটো, তার পর হাত রাঙা কোরো,
সিদ্ধি সিদ্ধি বোলে চ্যাচালে কি হবে ?
সিদ্ধিটা কিনে এনে বেটে খেতে হবে।"

*   *   *

সংক্ষেপে তার মানে স্রেফ—
'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই' 'প্রথিত পুরুষ'
'ইদানীং রামকৃষ্ণদেব'। [ক্রমশঃ

মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিঃ ডাকে .... ২৪৲
ষাণ্মাসিক " " .... ১২৲
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিঃ ডাকে
(ভারতীয় মুদ্রায়).............. ২৲

চাঁদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকাগণ মণিঅর্ডার কুপনে বা পত্রে অবশ্যই গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

ভারতবর্ষে

ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক ১৫৲
ষাণ্মাসিক সডাক ৭৷৷৹
প্রতি সংখ্যা ১৷৹
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে ১৸৹

(পাকিস্তানে)

বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ.............. ২১৲
ষাণ্মাসিক " " " ১০৷৷৹
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " " ১৸৹

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

শ্রীশ্রীসারদা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীমালতী গুহ-রায়

অষ্টাদশী নারী সারদা দেবী। দীর্ঘ বিরহের পর স্বামীর কাছে এসেছেন। তাঁর কাছে এ পরীক্ষা কিছু কম কঠিন ছিল না নিশ্চয়ই। কিন্তু সসম্মানে উত্তীর্ণা হয়েছিলেন তিনি এতে। দীর্ঘ ৭।৮ মাস পর্য্যন্ত স্বামি-স্ত্রী একই ঘরে একই শয্যায় রাত্রিবাস করতে লাগলেন। বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা হতে থাকলো সারদা দেবীর ঠাকুরের ঘন ঘন ভাবসমাধি ও ঈশ্বরোপলব্ধির অনুভূতি দেখে।

ঠাকুর কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে, সারদা দেবীর এতে স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। কেন না—তাঁর ভাবসমাধি প্রায়ই বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় আর সারদা দেবী ভয় পেয়ে ছুটাছুটি করে অপরের সাহায্য নেন। এমন কি, রাতের পর রাত জেগে কাটান। কাজেই সারদা দেবীর স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় তিনি তাঁকে আবার নহবত-ঘরেই পাঠিয়ে দিলেন।

দীর্ঘ ৭।৮ মাস স্ত্রীর সঙ্গে একত্র বসবাস করে ঠাকুরের ছুইটি মহান উদ্দেশ্য সাধন হল। একটি হচ্ছে স্বামীকে অনুক্ষণ কাছে পাওয়ার দরুণ স্ত্রীর তৃপ্তি সাধন এবং তাঁর স্বামী সাধনে কি ভাবে আত্মোৎসর্গ করেছেন তার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, সর্ব্বজীবে ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর নিজেরই ঠিক মত হয়েছে কিনা তার পরীক্ষা। এ ছুই-ই তাঁর সার্থক হ'ল।

এবার ঠাকুরের চেষ্টা হল তেরো বৎসর বয়সে সারদা দেবীকে তিনি যে শিক্ষা দিতে সুরু করেছিলেন, তা শেষ করা। কাজেই তিনি সারদা দেবীর শিক্ষার ভার নিজ হাতে তুলে নিলেন। গৃহস্থালীর ছোটো-খাটো কাজ থেকে সমাজের মেলামেশা, আবার পথে-ঘাটে চলা থেকে ঠাকুরসেবা, জনসেবা—সব। বাড়ীর কে কেমন, কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, পরের বাড়ী নিজ বাড়ী কখন কি ভাবে চলতে হয়, অতিথির সেবা, দেবতার পূজাবিধি ভক্ত বন্ধুদের সন্তানজ্ঞানে পরিচর্য্যা, কিছুই বাদ দিলেন না। এমন কি, হিসেবী হয়ে টাকার ব্যবহার কি ভাবে করতে হয়, গোঁজামিল না দিয়ে হিসেব কি করে পরিষ্কার ভাবে রাখতে হয় তা-ও। তার পর বোঝালেন ঈশ্বর-সংবাদ। কচ্ছপ যেমন জলে চরে বেড়ায় কিন্তু মন থাকে তার ডাঙ্গার দিকে, যেখানে তার ডিম রাখা থাকে তেমনি নিখুঁত ভাবে রান্না, ভাঁড়ার রাখা ও সংসার-সেবার ফাঁকে ফাঁকে মন যেন পড়ে থাকে, ঈশ্বরের পাদপদ্মে। ঈশ্বরের কাছে ঘণ্টা নাড়া, মন্ত্র পড়া, কিছুই নয়, শুদ্ধ পবিত্র অন্তরখানিই সব। সব কাজের ফাঁকেই যদি মনটিকে ঈশ্বরের প্রতি ফেলে রাখা যায়, তবে কাজকর্ম্মের অবসরে যখনই একটু নিবিড় হয়ে বসা যায়, শুকনো দেশলাইয়ের কাঠির মতই তা দপ করে জ্বলে ওঠে। তাঁর আনন্দপরশ পাওয়া যায়। আরো একটি বড় কথা, সেটি হচ্ছে ভগবানকে পেতে হলে অহংশূন্য হতে হবে। ছুঁচে সুতো পরাতে হলে যেমন সামান্য একটু রোঁয়া থাকলে ছুঁচে সুতো ঢোকে না, তেমনি বিন্দুমাত্র অহং থাকলেও ঈশ্বরলাভ হয় না। নিজেকে কর্পূরের মত নিশ্চিহ্ন করে সমর্পণ করে দিতে হবে, কিছুই আপনার বলে রাখলে চলবে না। এই ছিল ঠাকুরের স্ত্রীর প্রতি শিক্ষার বাণী।

তাঁর এ বাণী সারদা দেবীর জীবনে কি ভাবে সফল হয়েছিল, ক্রমশঃ তাঁর জীবনালোচনায় আমরা তা জানবো। ঠাকুরের উপদেশ যে নীরস ছিল না, তার প্রমাণ মা নিজমুখেই বলতেন, 'ঐ কালে হৃদয়ের মধ্যে আনন্দের যেন পূর্ণ ঘট স্থাপিত থাকতো। ধীর, স্থির, উল্লাসে অন্তর যেন সব সময়ই পূর্ণ থাকতো।'

শুধু কঠোর কর্ত্তব্য ও ঈশ্বরোপাসনায় ঠেলে দিলে পাছে সারদা দেবীর জীবন নীরস ও তিক্ত হয়ে ওঠে, তাই পরমহংসদেব স্নেহে, প্রেমে, তাঁর সুখ-সুবিধা ও অভাবের প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। সারদা দেবীর আধ্যাত্মিক, মানসিক, শারীরিক বা ব্যক্তিগত ত্রুটি—কোনটাই তাঁর নজর এড়াতো না। স্ত্রীর প্রতি যেটুকু কর্ত্তব্য তা যথাযথ পালন করে ঠাকুর সারদা দেবীর কাছ থেকে তাঁর কর্ত্তব্যগুলিও পুরোপুরি আদায় করে নিতেন।

উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ বপন করলেই পুষ্ট শস্য হয়। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী ছিলেন মহান আধার, কাজেই ঠাকুরের শিক্ষা ও উপদেশ-বাণী তাঁর অন্তরের মহান বৃত্তিগুলিকে এমনি ভাবে পুষ্ট হতে সাহায্য করেছিল।

অবগুণ্ঠিতা সরলা গ্রাম্যবধূ সারদা দেবীর মধ্যে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঠাকুর যেন কল্যাণময়ী, জ্ঞানদাত্রী, মুক্তিদাত্রীর রূপ দেখতে পেয়েছিলেন। তাই প্রায়ই ঠাকুরের মুখে শোনা যেতো, 'ও সারদা, সরস্বতী, এবার নিজরূপ ঢেকে জ্ঞান দিতে এসেছে।'

সারদা দেবীর অন্তরঢালা সেবা পেয়ে ঠাকুর পরম তুষ্ট ছিলেন। তিনি বলতেন, 'এমন করে সেবা কি আর কেউ পারতো?' কিন্তু স্ত্রীর সেবা নিয়ে যে তিনি তাঁকে ধন্য করেছিলেন, তা নয়। আদর্শ কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বামীর মতই স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন তিনি। একা ঘরে থাকলে পাছে সারদা দেবী ভয় পান, তাই একজন স্ত্রীলোক তাঁর কাছে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। কখনো সেই স্ত্রীলোকটি না থাকলে ঠাকুর নিজের ঘরের দরজাটি খুলে রাখতেন ও মাঝে মাঝে অভয় দেবার জন্য গলায় শব্দ করতেন। আবার ছোট্ট ঘরটুকুতে সারা দিনরাত বন্দী থাকলে পাছে স্বাস্থ্য ও মন খারাপ হয়, তাই কাছাকাছি বাড়ীতে দুপুরে বেড়াবার ও গল্প করবার

ব্যবস্থাও করে দিতেন। বলতেন 'বুনো পাখী—নইলে খাঁচায় থেকে যেতে যাবে।'

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীর সঙ্গে মা একত্র থাকতেন। প্রসাদ বণ্টন করার সময় ঠাকুরের তা লক্ষ্য থাকতো। তিনি কৌতুক করে বলতেন 'ওরে খাঁচায় শুক-শারী রয়েছে, ওদের দুটি ছোলা-টোলা ফল-মূল দিস্।' সকলে ভাবতো, সত্যিই বুঝি পোষা পাখীই রয়েছে। কিন্তু যাঁরা বুঝতেন, তাঁরা ঠাকুরের ইঙ্গিত অনুসারে সারদা দেবীকে প্রসাদ পাঠিয়ে দিতেন। সারদা দেবী এত লজ্জাশীলা ছিলেন যে, ঠাকুরের সজাগ দৃষ্টি না থাকলে কত দিন হয় তো তাঁকে উপবাসেই কাটাতে হ'ত।

সারদা দেবী সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত অক্লান্ত ভাবে স্বামিসেবা, ভক্তসেবা করতেন। তাঁর পরিশ্রম অত্যধিক হয়ে উঠলে ঠাকুরের নজর এড়াতো না। ভক্তরা ধ্যান করতেন, তাদের গিয়ে তিনি বলতেন 'ওরে তোরা যাঁর ধ্যান করছিস, তাঁর যে রুটি বেলারও লোক নেই!'

স্ত্রীলোকদের অলঙ্কার কত প্রিয় হয়, তাও ঠাকুর জানতেন। তাই সারদা দেবীকে কিছু অলঙ্কার গড়িয়ে দেবার ব্যবস্থাও করেছিলেন। কিন্তু শিষ্যামহলে এই অলঙ্কার ব্যবহার নিয়ে নানা রকম সমালোচনা মার কানে যেতে তিনি সব খুলে ফেলে দেন। সে কথা আবার ঠাকুরের কানে গেলে, তিনি বলেছিলেন 'সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে কত কষ্ট করেই ও যে এখানে রয়েছে এরা সব বোঝে না, তাই এসব বলে। এয়োস্ত্রীর লক্ষণ হচ্ছে অলঙ্কার, তা-ও পরবে না?'

সারদা দেবীর অসুখ করলে এমন কি মাথা ধরলেও ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু আবার সাধন-ভজনে শৈথিল্য দেখলে বিরক্ত হতেন। অসময়ে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি জল ঢেলে সারদা দেবীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিতেন।

ঠাকুর খুব কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাঁর কৌতুক বা রঙ্গরস কারুকে হাল্কা করে তুলতো না। তিনি সরসতার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে ঈশ্বর-উপলব্ধির পথেই নিয়ে যেতেন। সারদা দেবীর জন্ত তাঁর কোন ব্যস্ততা বা তাড়াহুড়া ছিল না। কেন না, সারদা দেবী যে কত বড় শক্তির আধার, এ তিনি খুব ভাল করেই জানতেন।

একমাত্র দৈহিক সম্পর্ক ছাড়া সারদা দেবীর সঙ্গে ব্যবহারে ঠাকুর যে স্বামিপ্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন তাঁর সন্ন্যাসী-জীবনে, তা সচরাচর সংসারী জীবনেও বড় একটা চোখে পড়ে না!

পতিপ্রেমে তৃপ্তা স্ত্রী পতির আদর্শকেই নিজ আদর্শে রূপান্তরিত করে, পতিকে সর্ব্বান্তঃকরণেই সাহায্য করে গেছেন। সারদা দেবী ভগবান রামকৃষ্ণের আপন সৃষ্টি। তাঁর ব্যক্তিগত নিজস্ব বলে কোন কিছুই ছিল না। এমন কি, কোন কামনা-প্রার্থনাও নয়। যখনই

প্রার্থনা করতেন, বলতেন 'ভগবান, আমাকে চাঁদের মত শুভ্র নির্ম্মল কর। চাঁদের যেটুকু কলঙ্ক আছে আমাতে যেন তা'ও না থাকে।'

সারদা দেবী যখন দক্ষিণেশ্বর এসেছিলেন, ঠাকুর তাঁকে সর্ব প্রথমে প্রশ্ন করেছিলেন 'তুমি কি আমাকে সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ ?'

দীপ্তকণ্ঠে সারদা দেবী উত্তর দিয়েছিলেন 'না তো ! আমি তোমাকে তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।'

এই মহীয়সী নারী যদি তাঁকে প্রকৃতই তাঁর ইষ্টপথে সাহায্য না করে সংসারপথেই টানতে থাকতেন, তবে হয়তো ঠাকুরের পরমহংসদেব হওয়া হত না। ঊর্দ্ধ থেকে ঊর্দ্ধগতিতে বাধাহীন ভাবে তাঁর মন সহজ স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিতে বিচরণ করতে বাধা পেতো। এই মহীয়সী নারীর আত্মত্যাগ ও অটুট সংযমেই তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের সহজ ঊর্দ্ধগতি কোথাও বিন্দুমাত্রও রুদ্ধ হয়নি। ঠাকুর সারদা দেবীর অপূর্ব্ব সংযমে মুগ্ধ হয়ে নিজমুখে বলেছেন, 'ও যদি এমন না হ'ত তবে আমার সিদ্ধির পথে অন্তরায় হতো। ওর জন্যই আমার সব সম্ভব হয়েছে।'

দক্ষিণেশ্বর আসার কিছু দিন পর সারদা দেবী একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'বল তো—আমি তোমার কে ?'

ঠাকুর উত্তরে বলেছিলেন 'তুমি ? তুমি আমার বিদ্যাদায়িনী জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী।' বলেই আবার বিদ্যা অবিদ্যার অর্থ বিশ্লেষণ করতে বসলেন। কিন্তু সারদা দেবী অতশত বোঝেননি, মন দিয়ে স্বামীর পদসেবাই করতে লাগলেন।

পদসেবা অন্তে সারদা দেবী যখন উঠে দাঁড়ালেন, ঠাকুর ঢিপ করে সারদা দেবীকে প্রণাম করে বসলেন। বিদ্যারূপিণী জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীকে যেন তিনি তাঁর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিলেন।

অনভ্যস্ত সারদা দেবীর সারা অন্তর যেন সঙ্কোচে ছিঃ ছিঃ করে উঠলো। বললেন, 'তুমি এ কি করলে ? আমি যে তোমার শ্রীচরণের দাসী।'

মধুর কণ্ঠে ঠাকুর উত্তর দিলেন 'দাসী কেন গো ? তুমি যে আমার আনন্দময়ী। তুমি আর মন্দিরে ঐ বেদীস্থিতা মা আর আমার নহবতঘরের গর্ভধারিণী মায়েতে যে কোন প্রভেদ নেই। তোমরা যে অভিন্না।'

মন্দিরের দেবী মা আর নহবতের গর্ভধারিণী মায়েতে যেন সারদা দেবীর সাথে কোন তফাৎ নেই, তাই দেখাতে ঠাকুর ঠিক করলেন কালীপূজা করবেন। প্রতিবৎসরই কালীমন্দিরে কালীপূজা হয়। কিন্তু এ পূজার বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, পূজো হবে তাঁর নিজ ঘরে আর ফলাহারিণী কালীপূজার দিন। দেবীমূর্ত্তি হবেন তাঁর বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী ষোড়শীরূপিণী সারদা দেবী। যাঁর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন যে, বেদীস্থিতা মা গর্ভধারিণী মা ও তাঁর মধ্যে তিনি কোন প্রভেদ দেখেন না, সবাই তাঁর অভিন্না মা। আজ তাই পরীক্ষা হবে। মাতৃভাবে স্ত্রীকে অর্চ্চনা করে তাঁর মধ্যে তিনি দেবীত্ব ও বিশ্বমাতৃত্ব আবাহন করবেন।

পূজার যথোচিত সমস্ত উপকরণ দিয়েই জীবন্ত প্রতিমার পূজা হল। এমন কি প্রাণপ্রতিষ্ঠা থেকে আত্মোৎসর্গীকৃত প্রণাম পর্য্যন্ত। বসে রইলেন জীবন্ত ষোড়শীদেবী অনড় অচল সমাবিষ্ট হয়ে পরিধেয় বসন পরিবর্ত্তনেও লজ্জাশীলা ষোড়শীদেবীর হুঁস রইলো না। অন্তরের অন্তস্তল হতে যেন জগন্মাতা ও দেবীভূতা হবার শক্তি অর্জ্জন করতে থাকলেন, পরম শক্তিমান দৈবীশক্তিসম্পন্ন মানবদেহী ভগবান স্বামীর পূজোর অর্ঘ্য থেকে।

তদ্‌গতচিত্তে ভক্তিভরে উচ্চারিত 'ইহ আগচ্ছ' 'ইহ তিষ্ঠ' আবাহিত ঐশী শক্তি, দেবী শক্তি প্রকৃতই যেন সারদা দেবীর মধ্যে আবির্ভূতা হয়ে ও অধিষ্ঠান করে উত্তরজীবনের জন্য তাঁকে অসীম শক্তির উৎস করে তুলেছিলো। তাই অপর্য্যাপ্ত ব্যবহারেও তাঁকে দেউলে হতে হয়নি। এই মাতৃত্ব বা বিশ্বজননীত্ব তাঁকে মহিমান্বিতা শ্রীশ্রীমারূপে ফুটিয়ে তুলেছিল। ভুলিয়ে দিয়েছিল সর্ব্বজগতের জাতিভেদ, ভৌগোলিক সীমারেখা, ধনী, নির্ধনী সব কিছুর ভেদ।

ঠাকুর পূজোর শেষে প্রার্থনা করলেন, যেন সর্ব্বশক্তির অধীশ্বরী জননী কালিকা তাঁর স্ত্রীর মধ্যে আবির্ভূতা হয়ে তার মধ্যেই বিরাজমানা থাকেন। আর তাঁর দ্বারা যেন বিশ্বের সমস্ত কল্যাণসাধন সম্পূর্ণ করান। মনোরমা ভার্য্যা তাঁর চাই না, তিনি চাইলেন মনোবৃত্তি অনুসারিণী ভার্য্যা। তাঁদের বিবাহ দৈহিক না হয়ে যেন আত্মিক হয়। আত্মানন্দই যেন তাঁরা পূর্ণ থাকেন। সারদা দেবী যেন সম্পূর্ণ তাঁর ভাবেই ভাবিত থাকেন।

ঠাকুরের এই প্রার্থনার মধ্যেও পার্থিব স্বার্থগন্ধের লেশ মাত্র ছিল না। নিজের জন্য কোন ভিক্ষা পর্য্যন্ত নয়। জগতের সর্ব্ব-কল্যাণ বিধান সম্পূর্ণ করবার জন্যই আপনার ধর্ম্মপত্নীর মধ্যে মায়ের ঐশীশক্তি বিকাশের প্রার্থনা করলেন তিনি। হলও তাই। সারদা দেবী মানবদেহী দেবী হয়েই গড়ে উঠলেন। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের ভাবেই তিনি ভাবিতা হলেন। জগতের কল্যাণ বিধানই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল।

পূজা অন্তে পরমহংসদেব তাঁর নিজের সমস্ত সাধন-ভজনের ফল, বেশ, বাস, সাধনসিদ্ধির সব কিছু উপচার দেবীরূপে আরাধিতা স্ত্রীর পায়ে অর্পণ করে অঞ্জলি দিলেন। তাই থেকে যেন শক্তিময়ী দেবীঅংশভূতা সারদা দেবী সর্ব্বশক্তিময়ী দেবীত্বেই আরোহণ করলেন। কোটি কোটি কণ্ঠে আজ দেবীস্তুতি, দেবীবন্দনা। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ভগবান রামকৃষ্ণ যাঁকে নিজে পূজা করে গেছেন আজ ঘরে ঘরে তাঁরই পূজার আয়োজন স্মরণ, মনন ভজন ও ধ্যান। শত শত পাপী তাপী তাঁরই নাম স্মরণে উদ্ধার পেয়ে যাচ্ছে। সাধ্য নেই আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, সেই মহিমাময়ী দেবীর গুণ বর্ণনা করি। তবে পরমহংসদেবপূজিতা দেবী সারদা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রচার না থাকায় এবং তিনি নিজেকে অর্দ্ধেক জীবন অবগুণ্ঠিতা ও লোকচক্ষুর অগোচরে লুকিয়ে রাখায়, তাঁর লীলা সম্যক ভাবে প্রকাশ হয়নি। তাই বিশদ ভাবে অনেকেরই তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানা নেই। তাঁর সরল অনাড়ম্বর অথচ গভীর ও উদার ভাবসমৃদ্ধ জীবনাদর্শ থেকে মানুষের অনেক অমূল্য শিক্ষাই পাবার আছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী যে ভাবে জগতের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ছে, তেমনি সারদা দেবীর বাণী ও শিক্ষা যদি চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তবেই উচ্ছৃঙ্খল বিলাসে ভেসে যাওয়া ভারতীয় নারী তার লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধারের পথ খুঁজে পাবে। কেন না, শৈশব থেকে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সারদা দেবীর গোটা জীবনটাই একটি প্রকাণ্ড শিক্ষার আধার।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, রামকৃষ্ণদেবকে পণ্ডিতসমাজ, জ্ঞানী, গুণী ও সুধীসমাজ ভগবান বলে মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু সারদা দেবী—দেবী কেন ?

ঠাকুরের মত পণ্ডিতসমাজ দ্বারা স্বীকৃত না হলেও সারদা দেবীকে ঠাকুর নিজেই দেবীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, অর্চ্চনা করেছিলেন, তাই-ই সারদা দেবীর দেবী হবার যথেষ্ট কারণ। সারদা দেবী তো শুধু ঠাকুরের স্ত্রী হবার সৌভাগ্যলাভ করে বা তাঁর কামজয়ের উপাদান হিসেবে পূজিতা হয়েই দেবীপদবাচ্যা হ'ন নি। দেবতার মত নিষ্পাপ, নির্লোভ ভক্তিমান ভক্তিমতী পিতামাতার ঘরে দৈবমায়ায় তাঁর জন্ম, নরদেহী দেবতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ, নিরন্তর কষ্টে তাঁর সময় অতিবাহিত, অসামান্য স্নেহছায়ায় সর্ব্বজীবে আশ্রয়দানে তিনি অভ্যস্তা, সর্ব্ব অবস্থায় নিরহংকারে প্রতিষ্ঠিতা, বিচিত্র মনোভাবসম্পন্ন অগণিত নরনারীর অন্তরে মাতৃস্নেহসুধা-বিকিরণে মহিমান্বিতা, অসীম ধৈর্য্যশালিনী, অসীম ক্লেশহরণী সদা প্রশান্ত হাস্যবদনী, এই মহীয়সী নারী প্রকৃতই দৈবশক্তিময়ী ছিলেন। তাই তিনি দেবী।

অগণিত ভক্তবৃন্দে তিনি যে রকম আধ্যাত্মিক সাহায্য করেছেন তা কখনো মানুষে সম্ভবে না। তাই তিনি দেবী। দীন দরিদ্রের কুটীরে জন্ম নিয়ে ঐশ্বর্য্যবিলাসকে তিনি যে ভাবে অবহেলার যোগ্য মনে করতেন, বিবাহিতা হয়েও স্বামীর প্রতি নিজ অধিকারকে শত হস্তে যে ভাবে বিলিয়ে দিতে পারতেন তা একমাত্র দেবীতেই সম্ভব, মানুষে নয়। তাই তিনি দেবী। তাঁর দেবীশক্তির প্রকাশে তাঁর ভক্তরা যখন তাঁকে প্রকৃত দেবীরই আসনে বসিয়েছিল, দেবীজ্ঞানেই তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অর্ঘ্য দিতে শুরু করেছিল, তখন তিনি অবিচলিত ভাবেই তাদের পূজা গ্রহণ করেছিলেন। তাদের যেন দেবীর মতই সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করতেন, কারুর কোন দোষ-ত্রুটি অন্যায় বা বা পাপ তিনি গ্রহণ করতেন না। অন্তর তাঁর সদা ক্ষমাময় ছিল, তাই তিনি দেবী।

অলৌকিক দর্শন লাভ করে বহুপূজিত দেবতার স্ত্রী হয়ে এবং নিজেও স্বয়ং দেবীভাবে পূজিতা হয়ে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকতেন অথচ আত্মপ্রকাশকে সর্ব্বপ্রযত্নে লুকিয়ে রাখতে। বিন্দুমাত্র আত্মস্ফীতি বা অহংবোধ এক দিনের জন্যও তাঁর মধ্যে দানা বাঁধেনি, যা নাকি পার্থিব মানুষের পক্ষে এক রকম অসম্ভব—তাই তিনি দেবী।

তাঁর অতিশৈশব পাঁচ বৎসর বয়স থেকে দেহাবসান পর্য্যন্ত যতই খুঁটিয়ে দেখা যায়, তাঁর দেবীভাব যেন ক্রমেই প্রস্ফুটিত হয়ে শতদল-পদ্মের মত বিকশিত হয়ে ওঠে। নিন্দুক বিশ্বতার্কিক বিশ্ব-সন্দেহপ্রবণ বিশ্বেও তিলমাত্র সন্দেহের যেন অবকাশ থাকে না। তাই সারদা দেবী—দেবী।

দেবীকে আমরা দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, সিংহবাহিনী বরাভয়দায়িনী, সংহারকর্ত্রী প্রভৃতি নানারূপে পূজা করলেও তাঁকে আমরা আবাহন করি কন্যারূপে, মাতৃরূপে। আমরা তাঁকে চাই ধনদাত্রী, জ্ঞানদাত্রী, ত্রাণকর্ত্রী, ভক্তিদায়িনী শোক-দুঃখবিনাশিনী মুক্তিদায়িনীরূপে। সারদা দেবীর মধ্যে আমরা প্রায় সবই পাই। এই দেবীজনোচিত গুণবিকাশ শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল বলেই তিনি তাঁকে দেবীভাবে অর্চনা করেছিলেন। সেই ষোড়শী মা'ই শ্রীভগবতীর মত মাতৃরূপে কোটি কোটি ভক্তসন্তানের অন্তরে আধ্যাত্মিক ভাবের ঝড় উঠিয়েছিলেন।

কাজেই সারদা দেবীর নরদেহে মর্ত্যে আগমন হলেও তাঁকে দেবী বলেই আমাদের জানতে হবে, মানতে হবে। তাঁর জীবনচরিত্র যতই আলোচনা করা যাবে, ততই তাঁর দেবলীলা আমাদের চোখে ফুটে উঠবে।

এমন এক দিন ছিল, যখন শুধু ঠাকুরের স্ত্রী বলেই তাঁর পরিচয় ছিল। মানুষ তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে কোন মূল্য দেয়নি, ইতিহাসেও তাঁর কোন স্থান হয়নি। কিন্তু সত্য কখনো চাপা থাকে না। সারদা দেবীর দেবী-মাহাত্ম্য তাই ক্রমেই প্রকাশিত হচ্ছে। কোটি কোটি লোকের অন্তরে আজ তিনি সোনার আসন বিছিয়েছেন।

কথা হতে পারে যে, যিনি দেবী তিনি তো সহজেই দৈবমায়ায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারতেন, তা না করে তাঁকে দেখা যায়, অতি সাধারণ অবস্থার মধ্যে থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। সারদা দেবী, দেবী হলে এ কি করে সম্ভব?

নরলীলায় ভগবানের অবতারকে মানুষের আচরণই করতে হয়। বরাহ-অবতারে স্বয়ং নারায়ণ বরাহ-জীবনেই অভ্যস্ত হয়েছিলেন। অবতার হলেও মানবদেহ ধারণ করলে সুখ, দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, ব্যাধি সব কিছুই মানুষের মত ভোগ করতে হয়। কাজেই অবতারকে সহজে চেনার উপায় থাকে না। এমন কি, তাঁরা নিজেরাও নিজেদের স্বস্বরূপ জ্ঞাত থাকেন কি না, তাও বুঝবার উপায় থাকে না। সময়ে সময়ে বিদ্যুৎ-চমকের মত তাদের লীলার কিছু কিছু প্রকাশ পাওয়া যায় মাত্র।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা জগতে আসেন, যে শিক্ষার ধারা নিজেদের জীবনাদর্শ দিয়ে প্রবর্তন করতে চান, তাঁদের নিজেদের প্রকৃত স্বরূপ সর্বদার জন্য স্মরণে থাকলে তা হতে পারে না। কাজেই সাধারণ মানুষের মতই তাঁদের চলন-বলন, জীবন ধারণ সব কিছুই হয় বটে, কিন্তু তবু সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের একটা তফাৎ থাকেই। তাঁরা ইচ্ছামাত্রই যে-কোন বিষয়ে যেমন নিবিষ্ট হতে পারেন, তেমন আবার ইচ্ছামাত্রেই মনকে তা থেকে তুলেও নিতে পারেন। যা সাধারণ মানুষ পারে না।

সারদা দেবীকে তাঁর এক ভক্ত একদিন প্রশ্ন করেছিলেন—"মা, তোমার কি আপন স্বরূপ মনে পড়ে?"

মা বললেন, "হ্যাঁ বাবা, পড়ে। তখুনি ভাবি, এ কি করছি? এ কি করছি? কিন্তু আবার সংসার সুমুখে এসে যায়, সব ভুলে যাই। এ একটা মায়া বই তো নয়?"

সাধারণ আর দেবমানুষে তফাৎ হচ্ছে এই যে, সাধারণ মানুষের সবই নিজের, আর দেবমানুষের সবই পরের। তাঁদের ব্যক্তিগত কিছুই থাকে না। তাঁরা গরীবের ঘরে জন্মান, রাজা-রাজাধিরাজের সম্মান পান। মান, ঐশ্বর্য্য তাঁদের পায়ে লুটোপুটি খায়। কিন্তু কোন দিকেই তাঁদের ভ্রুক্ষেপ নেই। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা নরদেহে অবতীর্ণ হন, তা তাঁরা ভোলেন না। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীকেও দরিদ্রঘরে সামান্য গ্রাম্য-রমণী হয়ে জন্মেও যে অপর্য্যাপ্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা পেতে দেখি, তিনি যদি সাধারণ মানুষই হতেন, তবে কখনই এ রকম নির্বিকার থাকতে পারতেন না।

আবার নিজের দেবীত্ব বা অভিমানবত্ব সম্বন্ধে যে তিনি জ্ঞাত ছিলেন না তাও নয়। কিন্তু সাধারণত্বের মধ্যেই তিনি আত্মগোপন করে থাকতেন। সাধারণ মানুষও নিজেদের সঙ্গে-মিলিয়েই মাকে গ্রহণ করতো, তারা তাঁকে বুঝতে পারতো না।

ভক্তসন্তানদের দর্শনের মধ্য দিয়ে যখন সারদা দেবীর দেবীরূপ ধরা পড়তো তখনই মাত্র তিনি স্বীকার করতেন, নইলে তিনি আত্মগোপন করবার প্রয়াসই সর্ব্বদা পেতেন। কখনো কখনো হঠাৎ বলে ফেলা দু'চারটি কথায়ও তাঁর দৈবীস্বরূপের প্রকাশ পাওয়া যেতো। তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করলেই এ বিষয়ে স্পষ্ট একটা ধারণা পাওয়া যায়।

একবার সারদা দেবী ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবুর সঙ্গে কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী যাবার পথে শিবুর এক অলৌকিক দর্শন হয়। যে সারদা দেবীকে একবার কালীরূপে আবার খুড়ীরূপে দেখতে পায়। প্রথমে সে তার নিজ চোখের ভ্রম ব'লেই মনে করে। কিন্তু বারে বারে ঐ কালীমূর্তি দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে সারদা দেবীকে প্রশ্ন করে 'খুড়ী, খুড়ী, সত্যি করে বলতো, তুমি কে?' সারদা দেবী তার প্রশ্নকে নানা ভাবে এড়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেন নি। শিবু নাছোড়বান্দা। শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে শিবু যা দেখেছে তিনি তাই-ই। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে মথুর বাবুও ঠাকুর সম্বন্ধে ঠিক এই রকমই এক অলৌকিক দর্শন পেয়ে ঠাকুরকে দেবজ্ঞানে ভক্তি করতেন। ঠাকুর যখন একদিন কালীঘরের বারান্দায় পায়চারী করছিলেন মথুর বাবু তাঁকে একবার ঠাকুর ও একবার কালীরূপে দর্শন করেছিলেন। তিনিও প্রথমে দৃষ্টিভ্রমই মনে করেছিলেন কিন্তু পরে বিশ্বাস করতে বাধ্য হ'ন। কাজেই শিবুর এই দর্শন থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, সারদা দেবী ও ঠাকুর অভিন্ন ছিলেন এবং তাঁরা দু'জনই দেবমানব-মানবী ছিলেন।

তেলোভেলোর মাঠে যে দস্যুদম্পতি মার অসুখে শুশ্রূষা করে তাঁকে নিরাপদে দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে দিয়েছিল, তারাও শোনা যায় সারদা দেবীকে প্রথম কালীরূপেই দর্শন করেছিল।

সারদা দেবীর আবাল্যসঙ্গিনী ভানুপিসী আবার সারদা দেবীকে চতুর্ভুজারূপে দর্শন করেন। আর মা যখন গান করতেন, তখন তিনি ঠাকুরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেতেন। তাঁর এই হতেই ধারণা জন্মেছিল, ঠাকুর আর মা অভিন্ন। যোগীন-মাও সারদা দেবী ও ঠাকুরকে অভিন্নজ্ঞানে পুজো করতেন। স্বামী তন্ময়ানন্দ একবার মাকে নিজে প্রশ্ন করেছিলেন 'মা—ঠাকুর যদি ভগবান, তবে আপনি কে মা?' মা বলেছিলেন 'কেন? আমি ভগবতী'।

মায়ের এসব ভক্তদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত ঘটনাগুলি আলোচনা

করলে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, মা সারদা দেবী সাধারণ মানবী ন'ন—দেবী। একবার কোয়ালপাড়া আশ্রমে মা নিজ হাতেই ঠাকুরের ছবির পাশে বেদীর উপরে নিজের ছবি রেখে নিজেই পূজো করেছিলেন। এতেও বোঝা যায় যে, তিনি আর ঠাকুর যে অভিন্ন তাই তিনি জানিয়ে দিলেন। ঠাকুরের জীবনীতেও আমরা দেখি, নিজের ছবিকে বেদীতে রেখে তিনি নিজেই মুঠো মুঠো ফুল দিয়ে পূজো করেছিলেন। হয়তো বা জনগণের ভাবষ্যৎ পূজাই সূচিত হয়েছিল, ঠাকুর ও সারদা দেবীর আত্মপূজার মধ্য দিয়ে।

আত্মস্বরূপের চকিত দর্শন সারদা দেবী নিজেও পেতেন বলেই তিনি জীবিতাবস্থায় নিজেই পূজার বেদীতে নিজের ছবি বসিয়ে পূজা করতেন। রামনাদের রামেশ্বর-মন্দির দর্শনকালে সারদা দেবীর একটি স্বগতোক্তিও তাঁর ভগবতীস্বরূপের আভাস দেয়!

রামনাদের রাজার শিবমন্দিরে সর্ব্বসাধারণের পূজার অধিকার ছিল না। সারদা দেবী ও স্বামী সারদানন্দ ঐ মন্দির দর্শনের অনুমতি পেয়ে পূজা দিতে যান। শিবলিঙ্গের সম্মুখে বসে সারদা দেবী হর্ষোৎফুল্ল ভাবে বলে ওঠেন, 'আহা তোমায় যেমন রেখে গিয়েছিলাম তেমনই রয়েছ গো, একটুও বদলাও নি?' সারদানন্দ ঐ স্বগতোক্তি শুনতে পেয়েছিলেন এবং অর্থও বুঝতে পেরেছিলেন।

লঙ্কাবিজয়ের পর শ্রীরামচন্দ্র রামেশ্বরকে মনোরম পরিবেশযুক্ত স্থান হিসাবে নির্ব্বাচন করে শিবপ্রতিষ্ঠা করা মনস্থ করেন। হনুমানের উপর শিবলিঙ্গ সংগ্রহের ভার দেওয়া হয়। কিন্তু হনুমান ফিরে আসতে অত্যন্ত দেরী করায় এবং শুভলগ্ন উত্তীর্ণ হবার আশঙ্কায় শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত চিন্তিত হন। সীতা দেবী শ্রীরামচন্দ্রকে বিষণ্ণ দেখে নিজেই মাটি দিয়ে শিবলিঙ্গ গড়ে দেন। আর শ্রীরামচন্দ্র প্রফুল্ল চিত্তে তাই পূজো করতে থাকেন। ঠিক এই সময় হনুমান শিবলিঙ্গ সংগ্রহ করে ফিরে আসেন। ভক্ত হনুমানের আনীত শিবলিঙ্গটিও শ্রীরামচন্দ্র পাশাপাশি স্থাপন করে পূজা করেন। অদ্যাবধি সেই পাশাপাশি দুই শিবেরই মন্দির আছে।

শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাদেবীকে ভগবতী-বিশেষ বলে আমরা জানি। সারদা দেবীও যে ভগবতী ছিলেন, তাঁরই পরিচয় তাঁর স্বগতোক্তি। অর্থাৎ তিনিই যে রামেশ্বর শিব স্বহস্তে গড়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতারূপে, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকেনা। 'তোমায় যেমনি গড়েছিলাম ঠিক তেমনি রয়েছ গো, একটুও বদলাওনি।'

সারা ওলি বুলের গুরুতর অসুখের সময় ভগিনী নিবেদিতা যখন তাঁর আরোগ্য কামনায় গীর্জ্জায় বসে মেরীকে ধ্যান করছিলেন, বারে বারেই মেরীর স্থানে সারদা দেবীর মূর্ত্তি তাঁর চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে। প্রশান্ত পবিত্র সারদা দেবীর মূর্ত্তি ছাড়া তিনি ধ্যানে মেরীকে কোন মতেই স্মরণ করতে অপারগ হয়ে সারদা দেবীকে মেরীর মধ্যে মিলিয়ে দেন। এই থেকে নিবেদিতারও ধারণা হয়, মেরী ও সারদা দেবী অভিন্না। উপরি-উক্ত ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে, সারদা দেবী যে শুধু তাঁর নিজদেশীয় অন্ধভক্তদের হৃদয়েই ভগবতীর আসন বিছিয়েছিলেন, তা নয়। নিবেদিতার মত পাশ্চাত্যদেশীয়া সুমার্জ্জিতা সুশিক্ষিতা মহিলার হৃদয়েও নিঃসন্দেহে দেবীর আসন পেয়েছিলেন। কাজেই সারদা দেবী—দেবী। [ক্রমশঃ।

মঙ্গলকাব্যে নারী

শ্রীমতী কণা দেবী

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি মঙ্গলকাব্যগুলি আমাদের সামাজিক-জীবনে এক কালে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল, গ্রন্থগুলি পাঠ করলেই তা ধরা পড়ে। শুধু দেব-দেবীর মহিমা বা অলৌকিকত্বই এখানে বড় হয়ে ওঠেনি, তৎকালীন সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রায় পূর্ণ পরিচয়ই আমরা পেয়ে থাকি এই সব পুস্তকে। এই কাব্য-কাহিনী নারীদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, দোষ এবং গুণ সবই যেন আমাদের অতি-পরিচিত জগতের বাস্তব-বিষয়। মনসামঙ্গলের নায়িকা বেহুলা, নৃত্যগীত-পটীয়সী সুশিক্ষিতা নারী। কালকে জয় করে মৃত স্বামীর জীবন লাভের জন্য বেহুলার কৃচ্ছ্রসাধন-ব্রত সাহিত্য-জগতে তাঁকে অনন্যা করে রেখেছে। এই অসামান্যা নারী-চরিত্রই আবার অতি-সাধারণ বাঙালী-ঘরের বধূ বা কন্যার চরিত্রের মত সরল সৌন্দর্যে ঘেরা। বেহুলা শুধু নাচুনীই ছিলেন না, তিনি রন্ধনেও নিপুণা ছিলেন। সাতালি পাহাড়ে লোহার বাসরঘরে ক্ষুধায় কাতর লখিন্দরের জন্য বেহুলার রন্ধন, ভারী সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে কবির বর্ণনায়।

"মঙ্গল মাঙ্গল্য ছিল মাঙ্গলিয়া হাঁড়ি,
তিন নারিকেল দিয়ে সাজায় তেঁওড়ি।"

বরণডালার চাল, আর নারিকেলের জল, মঙ্গলহাঁড়িতে পুরে, নেতের

আঁচল ছিঁড়ে বেহুলা সযত্নে রান্না করছেন। তাঁর সেই মূর্তি বড়ই সুন্দর! কিন্তু শীঘ্রই দুর্যোগের ঝড় উঠল; একটু পরেই তার সুখ-স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হল। সর্পাঘাতে মৃত স্বামীকে ভেলায় তুলে অনিশ্চিতের পথে যাত্রা করলেন বেহুলা। এই যাত্রার পিছনে রেখে গেলেন না তাঁর জীবনের কোন ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ, বা কোন অভিযোগ। এই নিরুদ্দেশের পথে যাত্রার পথিক বেহুলা—সঙ্গিবিহীনা—সমাজ-শাসনের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। কিন্তু পরিচিত জগতে ফিরে এলেন তিনি তখনই যখন স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়া গেল। দেবী মনসা বর দিতে চাইলেন বেহুলাকে। তাঁর ঠিক নিজের জন্য কোন প্রার্থনা নেই; ভিক্ষা চাইলেন মৃত ছয় ভাসুরের জীবন আর দেবীর কোপে ডুবে-যাওয়া শ্বশুর চাঁদ সদাগরের 'সপ্ত ডিঙা'। ফিরে পেলো সব-কিছু এক সর্তে—মনসা-বিদ্বেষী চাঁদ সদাগরকে দিয়ে ভারতে মনসা-পূজা প্রচার করতে হবে। বেহুলার আত্মবিশ্বাস প্রবল। ছয় ভাসুর, স্বামী আর ডিঙিগুলি নিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন। নৃত্য-গীতনিপুণা বেহুলার মোহিনী-শক্তি জেগে উঠল আবার। ছদ্মবেশে নিজে ও স্বামীকে সাজালেন। ডোম ও ডোমনীর বেশে উভয়ে অন্তঃপুরে গিয়ে নাচ-গান সুরু করতে সবাই আনন্দ উপভোগ করতে থাকেন। শুধু শাশুড়ী সনকার মনে সন্দেহ জাগে। তাঁর মনে পড়ে—নৃত্যশিল্পী অভাগিনী বেহুলার কথা। যার রূপে-গুণে মুগ্ধ হ'য়ে কত আশায় ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরে এনেছিলেন যাকে; কিন্তু কালবৈশাখীর ঝড়ে ফুল ফুটেই ঝরে গেল অকালে। অনেক দ্বিধা-সন্দেহ-জড়িত করুণ স্বরে সনকা প্রশ্ন করেন—

"চিনিতে না পারি না বোঝার চাতুরী
বেহুলা বট গো তুমি।
দেহ পরিচয় জুড়াক হৃদয়
তোমার শাশুড়ী আমি॥"

তখন বেহুলা ধরা দিলেন নিজেকে; প্রতিষ্ঠিত করলেন সমাজ-জীবনে, বাতাসে ভাসা বিহঙ্গী ফিরে এলো আপন কুলায়ে।

চণ্ডী-মঙ্গল কাব্য দু'টি ঘটনা নিয়ে লেখা। কালকেতু ও ধনপতি সদাগরের কথা। এই দুই কাহিনীর নায়িকা যথাক্রমে ফুল্লরা ও খুল্লনা। প্রথমে ফুল্লরার কথা বলি। অহংকারী প্রবল-মানুষের তৈরী সামাজিক জীবনের নিচু স্তরের মানুষী সে। গ্রন্থে ফুল্লরার রূপের সুস্পষ্ট পরিচয় না পেলেও অনায়াসে ধ'রে নেওয়া যায় যে, এই ব্যাধ-রমণী রূপসীই ছিলেন। আর গুণের পরিচয় মিলে ফুল্লরার বাবা সঞ্জয়কেতুর কথায়। সে গুণের সঙ্গে মেয়ের গৃহকর্ম ও রন্ধনপটুতা সম্বন্ধে উল্লেখ করছে ঘটক সোমাই ঠাকুরের কাছে। যা হোক—ফুল্লরা গুণের মেয়েই ছিল। সেই গুণের জন্য নিদয়া শাশুড়ী তার ওপর বড়ই সদয়। শুধু রান্নায় নয়—শাশুড়ীর নির্দেশ মত মাংসের চুপড়ি নিয়ে ফুল্লরা গোলাহাটের বাজারে যায়, পাকা ব্যবসায়ীর মত বেচা-কেনা করে।

কিছুদিন পরে শ্বশুর ধর্মকেতু, শাশুড়ীকে নিয়ে কাশীতে বসবাস করতে গেল। সংসারে এখন ফুল্লরাই গৃহিণী। কিন্তু তার সাধের সংসারে সুখ মেলে কই? দুঃখ-দারিদ্র্য প্রবল সেখানে। ওরা বড় গরীব। দিন আনে দিন খায়। তার ওপর কালকেতুর খোরাক এত বিরাট পরিমাণের যে, সে নিজের ভাগটা খেয়ে আবার কোন দিন ফুল্লরার ভাগটাও খেয়ে ফেলত। ফুল্লরা হাসিমুখে সেই অবস্থাকে মেনে নিচ্ছে। অভাবের সংসার হলেও কিন্তু স্বামি-স্ত্রীর মনে বড় মিল। স্বামি-সোহাগে সোহাগিনী ফুল্লরা সব কষ্ট সহ্য করে। কালকেতু ছিল চণ্ডীভক্ত। দেবী তাই সদয় হয়ে এলেন কালকেতুর ঘরে, তাকে বর দিতে। একদিন শিকারে বেরিয়ে শিকার মিলল না; ধরা পড়লো একটি সোনালী রংয়ের গোধিকা অর্থাৎ গোসাপ। কালকেতু জাল-দড়া দিয়ে তাকে বেঁধে নিয়ে এল ঘরে। "বাসী মাংস বিক্রী হবে না; ঘরে নেই এক মুঠো চাল, আজ কি খাওয়া হবে?" কাতর ভাবে প্রশ্ন করল ফুল্লরা। কালকেতু বললো—"আজ ওই গোধিকা শিক-পোড়া ক'রে খেয়ে থাকব। তুমি তোমার সখীর কাছ থেকে কিছু খুদ ধার করে আনো, আমি গোলাহাট থেকে লুণ কিনে আনি।"

দু'জনে দু'কাজে বেরিয়ে গেল। এক সের খুদ ধার করে ফুল্লরা দ্রুত পায়ে ঘরে ফিরে চলে। দেবী তখন গোধিকা রূপ ত্যাগ করে পরমাসুন্দরী ষোড়শী কন্যার রূপে কালকেতুর ভাঙা ঘর আলো করে বসে আছেন। পথে ফুল্লরার বাঁ চোখ নাচে। মঙ্গলের চিহ্ন ওটি; কিন্তু ঘরে ফিরে ষোড়শীকে দেখে অকল্যাণের ভয়ে কেঁপে ওঠে সে। অতি সাধারণ নারী ফুল্লরার বুক ভয়ে বিস্ময়ে কাঁপতে থাকে। এ কি অপরূপ মূর্তি—মানুষী না দেবী! হাত যোড় করে প্রণাম করে, ফুল্লরা পরিচয় জানতে চাইল। দেবীর রঙ্গপ্রিয়তা জেগে উঠলো। ভক্তের হৃদয় পরীক্ষা করতে তিনি উত্তর দিলেন—"কালকেতু নিজ গুণে আমাকে বেঁধে এনেছে, এখন এখানে কিছু দিন থাকব।" ফুল্লরার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। দেবীর এই কথার প্রকৃত অর্থটি ধরতে পারার শক্তি সামান্য নারী ফুল্লরার ছিল না। সে ভাবে—স্বামী বুঝি একে এনেছে। আবার ভাবে—আমার স্বামীর বীরত্ব ও রূপ-গুণই বা কম কী? তাতেই ভুলে তো উনি আসতে পারেন? সাধারণ মেয়েদের ব্যবহারিক জ্ঞান প্রবল। প্রথমেই দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা তুলে মেয়েটিকে ভয় দেখায়; এই অভাবের সংসারে কেন সে কষ্ট পাবে? দেবীর উত্তর সেই এক—"তোমাদের এখানেই থাকব।" তখন ফুল্লরা কাঁদতে কাঁদতে চললো স্বামীর সন্ধানে। গোলাহাটে কালকেতু লুণ কিনতে ব্যস্ত। ফুল্লরা যায় তার কাছে। স্ত্রীর রাঙা চোখ দেখে কালকেতু অবাক! প্রশ্ন করে—"ঘরে শাশুড়ী, ননদ বা সতীন নেই, কার সঙ্গে ঝগড়া করে কেঁদে চোখ লাল করেছিস?"

ফুল্লরা বলে—"তুমিই আমার সতীন।
পিপীড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে।
কাহার রূপসী কন্যা আনিয়াছ ঘরে?
এ বোল শুনিয়া ক্রোধে বীর বলে বাণী
পরস্ত্রীকে দেখি যেন নিদয়া জননী॥"

এই দুটি ছত্রে কালকেতুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে অস্বাভাবিক রূপে। জানা গেল, ঘৃণিত যারা, তারাও দেবদুর্লভ চরিত্রের অধিকারী হতে পারে।

দু'জনে ছুটতে ছুটতে এল ঘরে। এসেই চমকিত কালকেতু প্রণাম করল দেবীকে, পরিচয় চাইল। "দেবকন্যা বা দ্বিজকন্যা যেই হও, ব্যাধের ঘরে থাকা শোভা পায় না। চল আমরা

তোমাকে তোমার বাড়ীতে রেখে আসি।" চরিত্রবান্ পুরুষের উপযুক্ত কথা! কিন্তু দেবী নির্বাক্। কালকেতু ভারী চটে গিয়ে দেবীকে বলে, "তুমি যে হ'ও নিজের মান রক্ষার্থে এই স্থান পরিত্যাগ কর।" দেবী কথা কন না। তখন ওই দুষ্টা (?) নারীকে হত্যা করতে, সূর্য্যসাক্ষী করে বীর ধনুকে মার যোড়ে; কিন্তু শর ছোড়ার শক্তি নেই। কালকেতুর অঙ্গ রোমাঞ্চিত, চক্ষে আনন্দের অশ্রু; হতবুদ্ধি হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্বামীর এই ভাব দেখে বীর-নারী ফুল্লরা ভয় পায়নি। নিজের সংসার-জীবনের বাধা দূর করার জন্য বীরের যোগ্য সহধর্মিণীর মত এগিয়ে এল সে। স্বামীকে বলে "—আমাকে ধনুর্বাণ দাও, আমি একে শেষ করে ফেলছি।" হায়, ধনু ছাড়িয়ে নিতে পারল না! তখন দেবী সদয়া হয়ে বললেন—

"আমি চণ্ডী আইলাম তোরে দিতে বর।
লহ বর, কালকেতু, ত্যজ ধনুঃ-শর॥"

দুঃখিনী ফুল্লরার গর্ব করার মত ধন-ঐশ্বর্য কিছুই নেই। আছে শুধু সরলতা আর স্বামীর প্রতি অকুণ্ঠ প্রেম। এই দুটি জিনিষ নিয়েই ফুল্লরার চরিত্র জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের এক অধ্যায়ে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতমা নায়িকা হচ্ছেন খুল্লনা। উজানী-নগরের ধনপতি সদাগরের দুই স্ত্রী—প্রথমা লহনা, দ্বিতীয়া খুল্লনা। খুল্লনার বিয়ের পর থেকেই লহনা তাকে বিষ-চক্ষে দেখেন, তাতে ইন্ধন যোগায় দাসী দুর্বলা। খুল্লনাকে বিয়ে করার পরেই ধনপতিকে কার্যোপলক্ষে বিদেশে যেতে হল। লহনা নানারূপ ফন্দী ক'রে সতীনকে কষ্ট দিতে থাকে। একদিন হারিয়ে-যাওয়া ছাগল-পালকে বনের মধ্যে খোঁজার সময় খুল্লনা দেবী চণ্ডীর দয়া লাভ করেন। দীর্ঘদিন পরে ধনপতি বাড়ি ফিরলেন; খুল্লনার দুঃখের নিশি ভোর হল। সতীন যে দুঃখ-কষ্ট দিয়েছে, সে সব ভুলে খুল্লনা এই আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন। ধনপতি খুল্লনার গুণের পরিচয় কিছুই পান নি। জানতেও পারেন নি তার প্রতি লহনার কঠোর অবিচার-অত্যাচারের কথা। তিনি লহনাকে বললেন,—"আজ অনেক বন্ধু ও আত্মীয়ের নিমন্ত্রণ আমার ঘরে: খুল্লনাকে রান্না করতে বল।" ঈর্ষা-কাতর লহনা বললেন—"খুল্লনা কোন কাজের মেয়ে নয়, সে কী রাঁধবে?"

সদাগর শুনলেন না তাঁর কথা। খুল্লনাও কোন কথা না বলে, সুন্দর বেশে সেজে রান্নাঘরে ঢুকলেন ও রন্ধনবিদ্যার এমন নৈপুণ্য দেখালেন যে, সবাই সে রান্না খেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। লহনার বুক জ্বলে ওঠে হিংসায়; কিন্তু উপায় কি? তিনি স্পষ্টই বুঝলেন, এখন খুল্লনার বরাত খুলেছে। দীর্ঘদিন পরে ধনপতির সঙ্গে শয়ন কক্ষে খুল্লনার সাক্ষাৎ। প্রথমে তিনি কথা বলেন নি। ধনপতি ভাবলেন—অভিমান। তার পর তিনি কথা কইলেন—লহনা যে তাকে দুঃখ-কষ্ট দিয়েছে, সে-কথা চোখের জলে ভেসে, খুল্লনা জানালেন স্বামীকে। সদাগর লজ্জিত ও মর্মাহত হ'য়ে বসে রইলেন। এবার লহনার কথা বলা যাক্। সুন্দরী তরুণী, নব বিবাহিতা সপত্নী ঘরে, স্বামী আবার প্রবাসে; এক্ষেত্রে সাধারণ নারীর মতই খুল্লনার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্না হওয়া লহনার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। লহনার চরিত্র তাই এদিকে

জীবন্ত, আবার অন্য দিকে সন্তানহীনা লহনার ক্ষুধিত মাতৃত্ব, খুল্লনার ছেলে শ্রীমন্তকে করেছে ভাগ্যবান্। লহনা প্রথমে জনমনে ঘৃণার উদ্রেক করলেও পরবর্তী জীবনে তিনি শান্ত, সুন্দর ও কোমল স্বভাবের নারী। অবশ্য এই পরিবর্তনের মূলে নারীর ক্ষুধিত মাতৃত্ব। আর খুল্লনা ছিলেন ভক্তিমতী—তাই স্বামি-পুত্রের সব ভাল-মন্দকে একাগ্র ভাবে সঁপে দিয়েছিলেন চণ্ডীর পদতলে। আরাধ্য দেবতার প্রতি তাঁর আত্মনিবেদনের সাধনার চিত্রখানি খুল্লনার চরিত্রকে করেছে স্মরণীয় ও বরণীয়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়, ময়নাগড়ের রাজা বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে ঘটনাক্রমে বিবাহ হ'ল সুন্দরী রঞ্জাবতীর। সব বাধা-বিঘ্ন জয় ক'রে ধর্মঠাকুরের পূজারিণী রঞ্জাবতী বৃদ্ধ স্বামীর সেবা করেছিলেন আনন্দিত মনে। ধর্মঠাকুরের কৃপায় এক মহাবীর পুত্রও পেলেন রঞ্জাবতী। এই ছেলেই লাউসেন।

মঙ্গলকাব্যের নায়িকারা সংসার ও সমাজ-জীবনে যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, তার মূলে ছিল ধর্ম-বিশ্বাস, আরাধ্য দেবতার প্রসন্নতা সম্পাদনের চেষ্টা ও অকুণ্ঠ স্বামি-প্রেম। এই গুণগুলিই তাঁদের সাধারণ মানবী থেকে কিছুটা অসাধারণ করে তুলতে সাহায্য করেছে। অন্নদামঙ্গল কাব্যে স্বয়ং দুর্গাই নায়িকারূপে অবতীর্ণা। তাঁর লীলায় দেবত্ব থেকে মানবত্বের রূপই সমধিক প্রকাশ পেয়েছে। এই সব মঙ্গলকাব্যে কোথাও মানবী, কোথাও বা দেবীমূর্তিতে যাঁরা নায়িকা-রূপে প্রকাশিতা, তাঁরা আমাদের অতি-পরিচিত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সংসারের বাইরে হারিয়ে যান নি কখনো। সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার সীমার মধ্যে ধরা দিয়েছেন সর্ব্বদা, মঙ্গলকাব্যগুলি তাই বাঙালীর অন্তরের স্বীকৃতিই লাভ করেছিল এবং এক কালের ইতিহাস ও সেই সঙ্গে জাতীয় সাহিত্যও হয়েছিল নিশ্চয়ই। আজও তাদের সেই মূল্য উভয় ক্ষেত্রেই অতি উচ্চ।

সাথী

মালবী ঠাকুর

মিথ্যা হয়নি সেদিন রঞ্জনের স্বপ্ন। শুধু আভরণের ঐশ্বর্য্য নিয়েই আসেনি ছন্দা, হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য নিয়েও এসেছিল। তিন শ' টাকার কেরাণী-জীবনের অবাঞ্ছিত অভাবের রাজ্যে ধন-ধান্যের ললিত-লাবণ্য নিয়ে অগোছালো সংসারটাকে লক্ষ্মীশ্রীতে ভরে তুলেছিল সে। প্রথম মাসেই ব্যাঙ্কের কাজে একটা লিফ্ট পেয়ে গেলো রঞ্জন, ন'বছরের চাকরীতে এমন লিফ্ট কোন দিন কল্পনাই করতে পারেনি সে! কাছে এসে তার গলার উপর দিয়ে নরম নিটোল হাত দু'খানি বাড়িয়ে দিয়ে মুখ চেপে হেসে ছন্দা বললো, আমি ঘরে এলাম, তাই লিফ্ট পেলে। এজন্য আমাকে তোমার খাইয়ে দেওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জন তার মুখখানি ছন্দার ঠোঁট পর্য্যন্ত এগিয়ে আনতেই ছন্দা ছুটে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালো। বললো, অমন খাওয়া আমি চাই না। তারপর এক ছুটে সোজা একেবারে হেঁসেল-ঘর। রঞ্জনও আর অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি আপিস থেকে একটু সন্ধ্যা উত্তরে ফিরে আসতেই অমনি অনুযোগ। এই বুঝি তোমার পাঁচটায় ছুটি? তোমার কি ক্লান্তি বলে কিছু নেই? উত্তরে ছোট্ট করে রঞ্জন বলেছে: এত কালের অভ্যাস, এক দিনেই কি যায়? এবার থেকে ঠিক শুধরে যাবে দেখো।

বন্ধুবান্ধবেরা শুনে হেসেছে, স্ত্রৈণ বলে ব্যঙ্গ করেছে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করেনি রঞ্জন। ভেবেছে এমন যার স্ত্রী তার যে স্ত্রৈণ হয়েও সুখ। স্ত্রীহীন সংসারে এত কাল কাক-শকুন উড়ে বেড়াতো, ঘরের মেঝের সঙ্গে পথের পার্থক্য ছিল না এতটুকুও। পোড়া সিগারেট আর দেশলাই-এর কাঠিতে সারা মেঝেটা আঁস্তাকুড় হয়ে উঠেছিল। ঝাঁট দেবার লোক ছিল না। শাসন করে একথা বলবার এমন কেউ ছিল না। লজ্জায় সেদিন থেকে সিগারেট ছাড়লো সে।

এক সময় কাঁকে দিয়ে লুকিয়ে সিগারেট এনে তার হাতে তুলে দিল ছন্দা। সেই সঙ্গে সঙ্গে কড়া হুকুম। সকালে চা খেয়ে একটা, খেয়ে উঠে আপিসে বেরোবার পথে একটা, আর বিকালে একটা। অনুনয়ের সুরে অনুরোধ তুলে ধরেছে রঞ্জন। অন্ততঃ আর দুটো বাড়িয়ে দাও, দুপুরে অপিসের কাজের ফাঁকে একটা আর রাত্রে খেয়ে উঠে একটা।

চোখের কেমন একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে ছন্দা বলেছে, রাত্রে সিগারেট খেয়ে তুমি কিছুতেই আমার কাছে শুতে আসতে পারবে না। এই বলে রাখছি, তিনটির বেশী আর একটাও সিগারেট পাবে না তুমি। কিন্তু ছন্দা যত সহজে আইন বেঁধে দিল, রঞ্জন তত সহজে নেশা ছাড়তে পারলে না। প্রথম প্রথম ছন্দাকে লুকিয়েই যখন তখন সিগারেট টেনে নিত, বন্ধুদের আতিথ্যে সিগারেটের অভাব হতো না। কিন্তু ছন্দার নাক বড় সাঙ্ঘাতিক! একদিন ধরা পড়ে গিয়ে রঞ্জন একেবারে নাস্তানাবুদ। গিয়ে কেবল ছন্দার পাশে শুয়েছিল, ঠেলে তুলে দিল তাকে ছন্দা। যে আমার কথা রাখে না, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যাও, আর কারুকে নিয়ে থাকো গে। কিন্তু ছন্দার মত আর কে আছে, কে এত নিবিড় করে তাকে ভালবাসবে? কে এমন মধুর সুরে জীবনবীণাখানি বেঁধে দেবে তার?

এক দিন অভাবিত ভাবে ছন্দাকে আশ্চর্য করে দিল রঞ্জন। বন্ধুরা বললো, এ তোর বাড়াবাড়ি। সংসারে বিয়ে সকলেই করে, কিন্তু তোর মত এমন কেও বউকে ভয় করে চলে না, খুব দেখালি যা হোক! রঞ্জন চটলো না, বললো, সব সংসারে কি ছন্দা আছে? তা নেই। যত দিন যাচ্ছে ছন্দাকে নতুন করে চিনছি। চিনতে হলে, নিজেকেও চেনাতে হয়, তাতে তোদের কি আসে-যায়?

কিন্তু বন্ধুদের সে রাগ থাকলেও খুসী হল ছন্দা। রঞ্জনকে বললো, তুমি যে কত বড়, তাই ভাবি। সাদরে ছন্দাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে, তার অধরে জোর করে চুম্বন এঁকে দিয়ে রঞ্জন বললো, বড়র সঙ্গে থেকে থেকেই তো মানুষ বড় হয়। উত্তরে ছন্দা আর কোন কথাই জবাব দিতে পারলো না, শুধু কেমন একটা অদ্ভুত আত্মতৃপ্তিতে রঞ্জনের বুকখানির মধ্যে নীরবে মিশে রইল। এবারে পয়সা বাঁচিয়ে খুব ঘটা করে ছন্দার জন্মদিনের উৎসব রচনা করলো রঞ্জন। ছন্দার যেখানে যত বন্ধু ছিল, সকলকেই নিজে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এলো। কিন্তু ছন্দার কাছে ব্যাপারটা যেন সত্যি কেমন লাগলো। বললো, এমন কি তার জীবন যে, ঘটা করে

পালন করতে হবে রঞ্জনকে! স্মিতহাস্যে রঞ্জন বললো, তোমার একটা জন্মদিন গেলে আর যে তা ফিরে আসবে না। ছন্দা মুখে বাধা দিয়েছে, কিন্তু মনে মনে খুসী হয়েছে ঠিকই। এই উপলক্ষে আমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ও মিষ্টিমুখ করাতে পারব।

হতে পারে তার স্বামী ব্যাঙ্কের একজন সাধারণ কেরাণী, কিন্তু কেরাণীর স্ত্রী হয়ে সমাজে কি ছন্দার কোন স্থান নেই? সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই কেতকী, রমা, রেবা আরও অনেকে এসে পৌঁছালো। কেতকী রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনালো, রেবা আবৃত্তিতে জমাল, এই করে সময়টা বেশ কাটানো গেল। সব কিছুর মধ্য দিয়ে ছন্দার নারীত্বই মহীয়সী হোয়ে উঠল। রঞ্জনের পুরস্কারও কি তাতে কম বিজয়ী হোল? উপহারে ঘর ভরে উঠল ছন্দার। তার মধ্য থেকে একটাকে হাতে তুলে নিয়ে হাসির তরঙ্গে মুখখানাকে উজ্জ্বল করে রঞ্জন বললো, কেতকী কিন্তু খুব ঠাট্টা করেছে তোমাকে, যাই বলো। ছন্দা তাকিয়ে দেখলো, কাগজের বাক্সে মোড়ক করা ছোট্ট একটি ডল-পুতুল, শুইয়ে দিলে চোখ বুজে থাকে, দাঁড় করালে স্ফটিকের মতো চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে ক্ষীণকণ্ঠে মা বলে ডাকে। রঞ্জনকে নতুন করে আর কিছু বলতে হোল না, বিহ্বল চোখ দুটিকে তুলে ধরতে গিয়ে লজ্জায় ঠোঁট দুটি একবার কেঁপে উঠল ছন্দার। ছুটে কোথাও এক দিকে পালাতে চাচ্ছিলো সে, কিন্তু পারল না, পিছন দিক থেকে তার শাড়ীর একটা পাশ আকর্ষণ করে তেমনি হাসতে হাসতেই রঞ্জন বললো, এত লজ্জাই বা কিসে? এই তো সবে তিন মাস, আর ছয় মাস পরে খোকনকে কোলে নিয়ে, কেতকীকে জোর গলায় বলে আসতে পারবে। দেখ, তোর ডল-পুতুলের সঙ্গে মিলিয়ে, কে বেশী সুন্দর! ছন্দা যাও বা দাঁড়াতো, পড়ি কি মরি করে পালিয়ে বাঁচলো। রঞ্জন ভয়েই অস্থির, এ অবস্থায় আছাড় খেলে অনর্থ বাধিয়ে বসবে।

কিন্তু কে জানতো যে, অদৃষ্টে সেই অনর্থই লেখা আছে। দু'দিন পরে ব্যথা উঠল, হাসপাতালে গিয়ে ছন্দাকে ভর্ত্তি করে দিয়ে এলো রঞ্জন, প্রথম বার ভয় করে বৈ কি! ছন্দার চোখের জল সহ্য করতে পারলো না রঞ্জন, সাহস দিয়ে বললো, ভয় কি? পাশের বেডগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, সবাই এখানে তোমার মত। কোন কষ্ট হবে না। কিন্তু ছন্দার কষ্ট কি রঞ্জন এতটুকুও বুঝলো? কোন পুরুষেই বোঝে না। নীরবে নিজের ব্যথা সহ্য করে নিয়ে একদিন নির্ব্বিবাদে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল ছন্দা। সুন্দর একটি খোকনের মা হয়েছিলো সে, নীরবেই মায়া কাটিয়ে চলে গেল ছন্দা, সেই সঙ্গে খোকনও। পিতৃত্বের অধিকারী হয়েও ছেলেকে কোলে পেলো না রঞ্জন! ছন্দার বাকি কান্না রঞ্জনই কাঁদলো। তার পর চোখের জল এক সময় শুকিয়ে গেল, বছর ঘুরে গেলো দেখতে দেখতে। যে ঘরখানিতে একদিন কুসুমসজ্জা রচনা করেছিলো ছন্দা, ধীরে ধীরে আবার তা আবর্জনায় ভরে উঠল। আত্মীয়-স্বজনেরা ধরে বসলো; এবারে দেখে-শুনে আবার তুই বিয়ে কর। সারা জীবন সত্যিই তো আর একা-একা কাটাতে পারবিনে? বয়সটাই বা কি হয়েছে? কিন্তু ছন্দাকে কি ভুলে যাওয়া এতই সহজ? যে প্রেম সে ছন্দাকে দিয়েছে, সে প্রেম কি নূতন করে আবার কাউকে দেওয়া যায়, না দিতে পারবে সে? জীবনটা কি শেষ পর্য্যন্ত তবে একটা অভিনয় হয়ে দাঁড়াবে? দিন কতক বাইরে কোথাও ঘুরে আসা যাক, যা হয় হবে। ছন্দা চলে গিয়ে জীবনটা শ্মশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কাউকে পাশে না পেলে সত্যিই হয়তো পাগল হয়ে যাবে রঞ্জন। সংসারে একা-একা কারুরই কি কাটে? বিয়ে করতেই আবার রাজি হয়ে গেল রঞ্জন। এত কাল নতুন একটা নারীর জন্য সে-ই শুধু প্রতীক্ষা করেনি। একটি পুরুষকেও কামনা করে প্রতীক্ষা করছিলো বুঝি সান্ত্বনা। কিন্তু এ কার জন্য? রামচন্দ্র যে জীবনে একমাত্র সীতাকেই গ্রহণ করেছিলেন। তবে একালের রঞ্জন ও একালের সান্ত্বনা। ভাবতে গিয়ে নিজের মনে একবার হাসলো রঞ্জন, বিয়ের শাঁখ বুঝি আবার বেজে উঠল! বাইরে কি মনে, বোঝা গেল না!

রোববার

মিতা সেন

বকুল গাছের মত ঝর-ঝর গুন-গুন মন,
অথবা লেন-দেন চুকে গেলে শূন্য দরবার।
যেন অনেক বিরহের-পর একটি চুম্বন—
অনেক ঘর্মাক্ত দিন কেটে গেলে এই রোববার।

সময়ের ঘণ্টারা আজ ফিরে গেল বৃথা তোপ দেগে,
একটু মাংসের গন্ধ বাজারের পথে; ফাঁকা-ফাঁকা ট্রাম।
অহল্যা ঘুমের থেকে, মনে হয় উঠেছি যে জেগে
ভুলে গেছি সব মুখ, সব কাজ, পরিচিত সব নাম-ধাম।

দুপুরে কাকের ডাক; ঘি-গলা রোদের নীল-নীল ছায়া;
একটি তুলোর ঘুম, অথবা ম্যাটিনীর আগকোরা ছবি,
বিকেলে লেকের জলে ভেসে-ওঠা মমি মুখ মায়া
মুছে গেলে, আর সব দিনে মনে হবে মিথ্যে যে সবই!

টাকা/আনা/পাই

জ্যোতির্ময় রায়

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মঞ্চের একেবারে সামনে প্যারাপেট-ঘেরা চওড়া বারান্দা। বারান্দায় বেতের একটা গোল টেবিলের দু'পাশে দু'টো সিঙ্গাপুরী বেতের চেয়ার। বারান্দার পেছনে মঞ্চের এপাশ ওপাশ চলে-যাওয়া হলঘরের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। এই বারান্দা ও বাগানের দিকে তার তিন ফুট দেওয়ালের ওপর বাকী পুরো অংশটাই ঘষাকাচের প্যানেল বসান ফ্রেম। পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঘষাকাচের ভিতর দিয়ে দেখা যাবে বহু নর-নারীর ছায়া-মূর্ত্তির ঘোরাফেরা, চাপা আবহ সঙ্গীতের সঙ্গে চাপা কলগুঞ্জন। বারান্দার এক পাশ দিয়ে এসে ঢোকে ম্যানেজার এবং উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত রচনা।]

রচনা। (ঢুকেই চিন্তিত মুখে) এই ভাবে ডাকলেন, কি হয়েছে বলুন তো? কোন বড় রকমের ভুল-ত্রুটি হয়নি তো?

ম্যানেজার। (সরলতা দেখে মৃদু হেসে) না না, ত্রুটি কিছু হয়নি। বরং সব লোকজন এসে গেছে, তাই আপনাকে ডাকলাম জিজ্ঞেস করতে, ব্যবস্থা কেমন হয়েছে, পার্টি কেমন লাগছে?

রচনা। চমৎকার! আমার কি ভাল যে লাগছে—(হেসে) এই সঙ্গে নার্ভাসনেসটাও কম নেই। এক এক জনের সঙ্গে আপনি পরিচয় করিয়ে দেন আর তক্ষুণি একবার শেরীর পুঁচকে পাত্তরটি যখন মুখে তুলে ধরতে হয়, তখন বুক ঢিপ-ঢিপ করে। কেবলই মনে হয়, এই বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাব—আমি তো বাবা ঠোঁটে ছুঁইয়েই নাবিয়ে রাখি।

ম্যানেজার। (বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে) রীয়ালি ইউ আর লুকিং এক্সকুইজিট টু ডে—আপনাকে যে কি অপূর্ব দেখাচ্ছে!

রচনা। (বিব্রত ভাবে হেসে) কি যে বলেন—চলুন, ওঁকে অনেকক্ষণ দেখছি না—দেখি উনি কোথায়।

[কোন উত্তরের অপেক্ষা না কোরে রচনা পা বাড়ায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ম্যানেজার এগোয়। উভয়ে বেরিয়ে যায় উল্টো দিক দিয়ে। মুহূর্ত্ত পরেই মীরা প্রেটি নামে একটি তরুণীকে নিয়ে দ্রুত এসে ঢোকে সেখানে]

মীরা। শোন প্রেটি, (উল্টো দিকে আঙুল দেখিয়ে) ওখানেই গবেট দু'টো আছে, ও দু'টোকে এনে এমন নাজেহাল করে ছাড়বি যেন এখান থেকে পালিয়ে বাঁচে—আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই, মৃগাঙ্ক বাবুকে রেখে এসেছি ওখানে। (আলতো হাতে একট ধাক্কা দিয়ে) যা তুই যা—

প্রেটি। (হাসতে হাসতে) ঠিক আছে, তোমায় কিছু ভাবতে হবে না।

[প্রেটি চলে যায়, মীরা যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিক দিয়েই ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে যায়। একটু পরেই ভোলা-বিশুকে নিয়ে নিষ্ক্রমণের পথ দিয়েই এসে ঢোকে প্রেটি। ভোলার বিগলিত হাতে প্রেসট্রিজের আস্ত একটা কাগজের বাটি, বিশু যেন বেশ একটু বিরক্ত।]

বিশু। হ্যাঁ, কি বলবেন বলুন?

প্রেটি। (অভিমানের ভঙ্গিতে) বা রে, আমি যেন আপনাদের কাজের কথা বলতে ডেকেছি—আপনি যেন কেমন ইয়ে—(বলে হেসে গড়িয়ে পড়ে)

ভোলা। (প্রেটির দিক থেকে মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরিয়ে) সত্যি বিশু, তুই যেন কেমন ইয়ে—

বিশু। (কটমট কোরে একবার ভোলার দিকে তাকিয়ে, প্রেটিকে) বেশ, কাজের কথা না থাকে তো আপনি ওর সঙ্গে বসে রসিকতা করুন, আমি যাচ্ছি।

[বিশু বেরিয়ে যায়। প্রেটি জব্দ হওয়ার ভাবটা সামলে নিতে চেষ্টা করে।]

ভোলা। (পেসট্রিজে একটা কামড় দিয়ে) আপনি বুঝি ডেকেছেন বসে একটু গল্প করতে?

প্রেটি। (নিজেকে পুরো সামলে নিয়ে) সত্যি তাই। আপনি বেশ ভাল, আপনার বন্ধুটা ভারী ইয়ে—চলুন ওখানটায় বসে একটু গল্প করি।

[ভোলা আর প্রেটি দু'টো চেয়ারে গিয়ে বসে] আপনাকে দেখেই আমার এত ভাল লেগেছে—আপনি সত্যিই হ্যাণ্ডসম্।

ভোলা। (বুঝতে না পেরে) হ্যনসম, হ্যনসম—

প্রেটি। আপনি বুঝি ইংরিজী জানেন না?

ভোলা। (সোৎসাহে) বিশু জানে।

প্রেটি। হ্যাণ্ডসম মানে সুন্দর।

[ভোলার মুখ দিয়ে আর বাক্য সরে না। ক্রীম-চকোলেট শুদ্ধ প্রেসট্রিজ ধরা হাতেই গাল রেখে সে স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় তাকায় প্রেটির দিকে।]

আ-হা-হা—আপনার গালে যে চকোলেটগুলো লেগে গেল।

[এমন সময় লোকজনের আসার শব্দ পেয়ে]

চলুন ওখানটায়—ন্যাপকিন দিয়ে আপনার মুখ আমি মুছে দিচ্ছি।

[ভোলাকে নিয়ে প্রেটি বেরিয়ে যায়, ঢোকে এসে তিনটি সুসজ্জিতা মহিলা।]
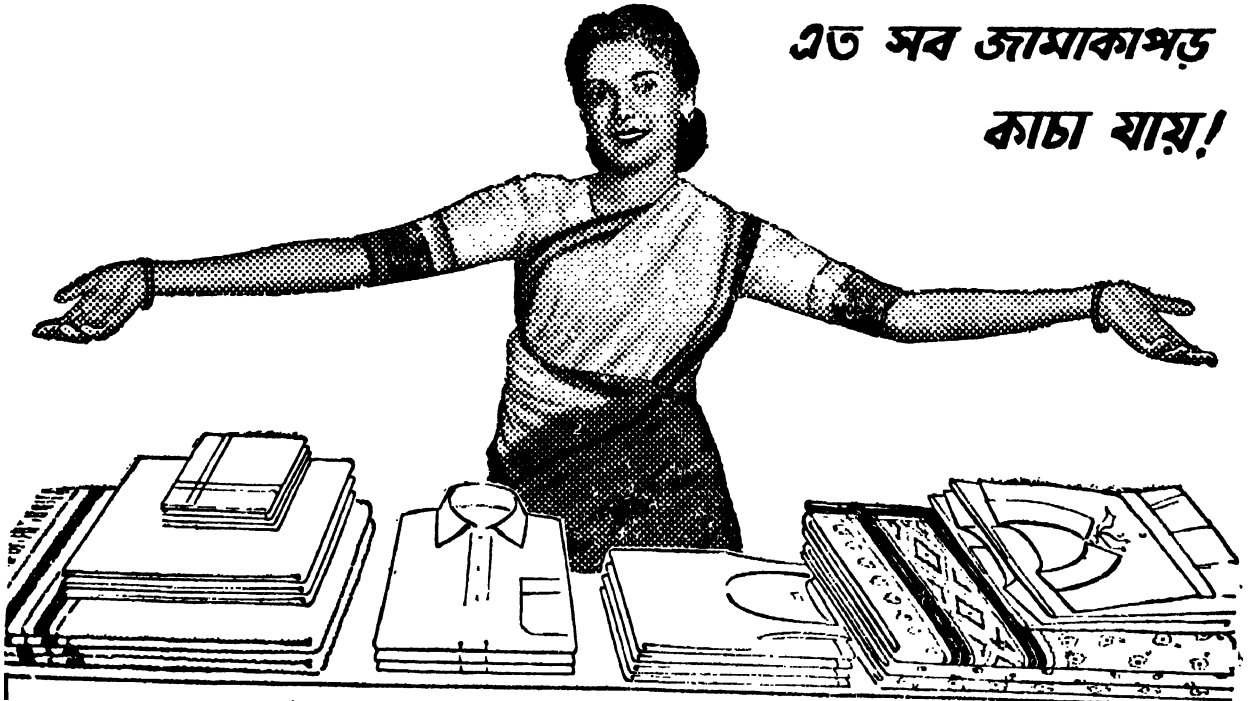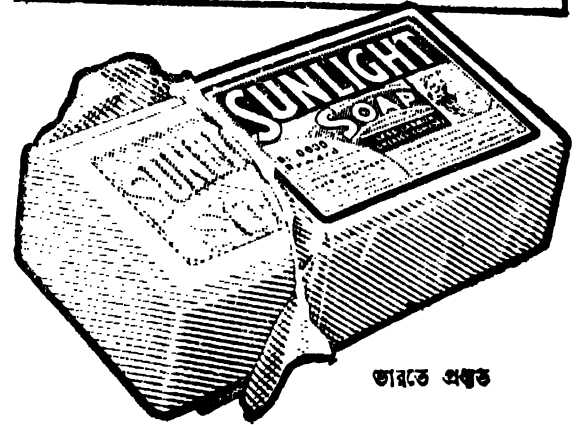
প্রথমা। মিসেস চৌধুরী মৃগাঙ্ক বাবুকে কি রকম আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছে দেখেছো ?

দ্বিতীয়া। সত্যি ভাই, মীরাদি'র ভাবটা যেন উনি ছাড়লেই আর কেউ ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।

প্রথমা। হবে না—যে অবস্থায় পড়েছিল তার ওপর পেয়েছে টাকা-ওয়ালা এত বড় একটা আনাড়ীকে, ছাড়বে কোন্ প্রাণে বল্ ?

তৃতীয়া। যা ছাড়বে না তা নিয়ে আর ভেবে কি হবে ভাই ? তার চেয়ে চল না ভাল-মন্দ দু-একটা খাবারের সঙ্গে আরও দু'-এক বাটি ফরাসী মধু খেয়ে নেওয়া যাক—বছরে ক'টা দিনই বা এমন জোটে ! চল চল—

দ্বিতীয়া। তুমি তো আছ ওই তালে—চল—

[তিন জনেই উল্টো দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। একটু সময়ের জন্তে বারান্দা খালি থাকে। শুধু চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায় হলের ভেতরকায় ছায়ামূর্ত্তি, কানে ভেসে আসে তাদের হাসি আর কথাবার্ত্তা, পেছনে চাপা আবহ সঙ্গীত। ধীরে সেই আবহ সঙ্গীত একটু উচ্চ-গ্রামে ওঠে, সেই সঙ্গে বারান্দায় এসে ঢোকে মৃগাঙ্ক আর মীরা। মীরার হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস।]

মীরা। (মদালস দৃষ্টি তুলে) আর একটা সিপ্ ?

মৃগাঙ্ক। না, এই প্রথম, ভুলে যাবেন না—[মীরা শ্যাম্পেন-গ্লাসটা টেবিলে রেখে প্যারাপেটের দিকে এগিয়ে যায়, মৃগাঙ্ক তার অনুসরণ করে।]

মীরা। হোয়াট এ প্লেজ্যান্ট নাইট !

মৃগাঙ্ক। (প্যারাপেটে হেলান দিয়ে) রীয়্যালি প্লেজ্যান্ট—এমন রাত আমি জীবনে কখনও কল্পনাও করতে পারিনি।

মীরা। (আরও কাছ ঘেঁষে) উঃ, আপনাকে এক এক কোণের মহিলাদের হাত ছাড়িয়ে এখানে এনে ফেলতে কি কাণ্ডটাই না করতে হল! (মুগ্ধ দৃষ্টি তুলে) আপনার মত হ্যাণ্ডসম পুরুষদের নিয়ে এই তো বিপদ !

মৃগাঙ্ক। (বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে) হ্যাণ্ডসম্—আমি—আমি সুপুরুষ—(উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠে)

মীরা। (ঠোঁট বাঁকিয়ে) ইস্, এ কথা যেন আপনি কোন দিন আর কোন মেয়ের কাছ থেকে শোনেননি !

মৃগাঙ্ক। (গম্ভীর মুখে) না শুনিনি। (বক্র হেসে) কারণ হয়তো পোড়া কপালের ছাই দিয়ে এ-রূপ ঢাকা ছিল।

মীরা। (আবদারের সুরে) অ প্লীজ, ডোণ্ট বি সিরিয়স। (ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে সুদৃশ্য সিগারেটটা-কেস বার কোরে) নিন একটা সিগারেট ধরান।

মৃগাঙ্ক। (সিগারেটটা হাতে নিয়ে সবিস্ময়ে) আপনার ব্যাগে সিগারেট—আপনি সিগারেট খান ?

মীরা। (খিল খিল কোরে হেসে ওঠে) আপনি যেন কি—শুনুন, এই 'মিড্‌ল্ ক্লাস সাইনেস'গুলো ছাড়ুন তো, নইলে জীবনের অনে—ক স্বাদ মিস্ করবেন।

মৃগাঙ্ক। (শ্লেষের সুরে অনেকটা আপন মনে) মিড্‌ল ক্লাস সাইনেস—মধ্যবিত্তসুলভ লজ্জা—তা ঠিক, টাকার চাকা জুড়ে দিতে পারলে সব কিছুকেই সাধারণের নাকের ওপর দিয়ে চালিয়ে নেওয়া যায়—

মীরা। এই তো আপনার দোষ, থেকে থেকেই ভারী সিরিয়স হোয়ে ওঠেন।

মৃগাঙ্ক। (হেসে) না না সিরিয়স কোথায় বলুন কি করতে হবে—? আপনার বোঝা উচিত, অনভ্যাসের ফোঁটায় একটু অস্বস্তি হয় বৈ কি। (দ্রব্যগুণ-প্রভাবিত মুগ্ধদৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে থেকে) নইলে আপনার সঙ্গকে ভারী কথায় ভরাডুবি করার মত মূর্খ তো আমি নই ! সত্যি আমার অভিজ্ঞতায় নারী হিসেবে আপনি এক বিস্ময় ! (একটু থেমে) বেশ ভাল লাগছে—একটা কবিতা শুনবেন ?

মীরা। নিশ্চয়ই। (আবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকায় মৃগাঙ্কের দিকে)

"দোলে রে দোদুল দোলে
ডাগর দুটি নয়ন ঢোলে
দোলে রে হিন্দোলাতে
সুষুম কুসুমশয়ন দোলে।
চলে আয় কুঞ্জবনে
স্বপনের গুঞ্জরণে
হৃদয়ের দাদরা তালে
নাচবে চপল ঘুন চরণে।
হারা রা খুসীর নেশায়
আজ আসে না তন্দ্রা চোখে।
(তুড়ির সঙ্গে) পুলকে দোলন চাঁপা
ঝুলন ঝুলায় চন্দ্রালোকে
আমারে চাই বিলাতে
সুরেতে সুর মিলাতে
টানা চোখের—

[তাল কেটে যায় মৃগাঙ্কের। স্তব্ধ হোয়ে যায় সে। চোখ পড়ে এক পাশে দাঁড়ানো রচনার বেদনাবিদ্ধ পাথরের মূর্তির মত নিষ্প্রাণ মুখ। মৃগাঙ্কের দৃষ্টি অনুসরণ করেই মীরাও ঘুরে দাঁড়ায়—রচনার মূর্ত্তি ততক্ষণে সরে গেছে দৃষ্টির অন্তরালে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মৃগাঙ্কের বাড়ীর লবী। সময় সন্ধ্যা। মৃগাঙ্ক ও মীরা মুখোমুখী বসা]

মীরা। আজকে একটা লঙ্‌গ—লঙ্‌গ ড্রাইভ দিতে হবে।

মৃগাঙ্ক। সে আর একটা বেশী কথা কি—কোথায় যাবে বল ?

[ঠিক এমনি সময় হিলের শব্দ তুলে অপ্রত্যাশিত ইঙ্গ-বঙ্গ পোষাকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে রচনা। বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে মৃগাঙ্ক।]

রচনা। আমি একটু বেরোচ্ছি।

মৃগাঙ্ক। কোথায়—কার সঙ্গে ?

রচনা। সঙ্গ একটা ঠিক কোরে নেওয়া যাবে—অ, মিঃ চৌধুরী তো বোধ হয় অফিসেই রয়েছেন ? আচ্ছা—

[রচনা গিয়ে অফিসে ঢোকে।]

মীরা। (মৃগাঙ্কের মুখ-ভাব লক্ষ্য কোরে) ফীলিং জেলাস—হিংসে হচ্ছে ? পেতে হলে একটু ছাড়তেও হয়—দিস ইজ ইভি

লাইফ। নাও চলো—লঙ গ ড্রাইভের কথাটা মাথা থেকে উবে যায় নি তো ?

মৃগাঙ্ক। (নিজেকে সামলে নিয়ে) না তা যায়নি। রাইট—অ—চলো—

[দু'জনে বেরিয়ে যায়। রচনা অফিসঘর থেকে বেরিয়ে ম্যানেজারের অপেক্ষায় একটু পায়চারী করছে—এমন সময় উল্টো দিক থেকে বিশু এগিয়ে আসে।]

বিশু। বৌদি ?

রচনা। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) ডাকছ আমাকে ?

বিশু। হ্যাঁ।

রচনা। (কাছে এগিয়ে) কিছু বলবে ?

বিশু। (বেদনাভরা দৃষ্টি নিয়ে একবার তাকায় রচনার চোখের দিকে, তারপর এদিক-ওদিক চোখ ফিরিয়ে দ্বিধার সঙ্গে) আপনিও বেরোচ্ছেন ?

রচনা। (সজল চোখে জমাট মুখ নিয়ে) কাল রাতে তোমার দাদা ক'টায় ফিরেছিলেন বিশু ?

বিশু। বারোটায়।

রচনা। আমি তারও পরে ফিরব।

[রচনা মুখ ফিরিয়ে চলে যায় অফিসঘরের দরজার সামনে। ম্যানেজার এগিয়ে আসে, দু'জনে বেরিয়ে যায়। বিশু এসে অস্থির ভাবে পায়চারী করতে থাকে। ভোলা ঢোকে। কিন্তু বিশুর মুখভাব লক্ষ্য কোরে প্রথমটায় কথা বলতে ভরসা পায় না।]

ভোলা। (একটু দ্বিধার পর) কি হয়েছে রে বিশু, তুই এমন কোরে গরছিস কেন ?

বিশু। কি আর হবে, সর্ব্বনাশ ঢুকেছে বাড়ীতে—টাকার রোগ যাদের হাড়ে-মাসে, তারা যখন এ বাড়ীতে ঢুকেছে তখনই জানি এ রোগ ছড়াবে। দিনের পর দিন ম্যানেজারের বৌটা দাদাকে নিয়ে খেলিয়ে বেড়াচ্ছে—শেষ পর্য্যন্ত আজ বৌদিও কিনা, যে নাকি দাদার জন্যে বস্তিতে এসে উঠতে পারে—না না আমি ঠিকই বুঝেছি, দাদার ওপর রাগ কোরেই সে বেরিয়ে গেল।

ভোলা। সত্যি রে, ক'দিনের মধ্যে বাড়ীর সব-কিছু কেমন যেন বদলে গেল—দাদা কেমন বদলে গেছে দেখেছিস ? সামনে দিয়ে চলে গেলে তোকেও যেন চিনতে পারে না !

বিশু। দু'দিন আগে আর পিছে, টাকা হলে লোকের জাত বদলাবেই—আর এক দল লোক আছে, যারা সেই জাতের পেছনে জাত দেয়, যেমন তুই—

ভোলা। (কাঁদ-কাঁদ হোয়ে) ও কি রে, তুই আবার আমাকে নিয়ে পড়লি কেন ?

বিশু। যা যা ! হাঁদা কোথাকার, গালে চকোলেট মাখগে যা।

[আলোর ইঙ্গিতে সময় পরিবর্ত্তন। রাত প্রায় একটা বাজে। ঈষৎ স্খলিতপায়ে অস্থির ভাবে একা লবীতে পায়চারী করছে মৃগাঙ্ক। এমন সময় ঢোকে এসে রচনা। মৃগাঙ্কের অস্তিত্বকে অস্বীকার কোরে এগিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ায় সে।]

মৃগাঙ্ক। দাঁড়াও—

[রচনা তাকিয়ে থামে]

কোথায় গিয়েছিলে ? (জবাব না পেয়ে) আমি কি জিজ্ঞেস করেছি শুনতে পেয়েছ ? এত রাত অবধি কোথায় ছিলে ?

রচনা। (শান্ত কণ্ঠে) রাগ করেছো ?

মৃগাঙ্ক। আমার কথার জবাব দাও, এত রাত অবধি কোথায় ছিলে ?

রচনা। কি করছিলাম ? (আস্তে দাঁতে দাঁত চেপে) সব কথা কি বলা যায়—তুমিই বলো ?

মৃগাঙ্ক। (চেঁচিয়ে ওঠে, পাশের টেবিলে চাপড় মেরে) বলতে হবে তোমাকে।

রচনা। 'শাউট্'—যতো পারো চেঁচাও—কিন্তু আমি বলবো না—বলতে পারবো না।

মৃগাঙ্ক। বলতে হবে, না বললে চাবকে তোমার পিঠের চামড়া আমি ছাড়িয়ে নেবো।

রচনা। বাঃ, বাঃ, চমৎকার ! বস্তির ঘরে কাঁধে একটু জোরে চাপ দিয়েছিলে, আমি ভয় পেয়েছিলাম বলে লজ্জায় মাথা নীচু করে বার বার করে বোঝাতে চেয়েছিলে, তুমি আমার গায়ে হাত দিতে আস নি। বস্তিতে যা সম্ভব হয়নি, প্রাসাদে দাঁড়িয়ে, উঁচুতলার লোকদের সঙ্গে মিশে আজ তাই সম্ভব হচ্ছে ! চালিয়াৎ সমাজের চূড়োয় যখন উঠেছো, তখন তার সবটুকু মেনে নাও, সেখানে সাধারণ মানুষের স্বামিত্বের সংস্কারটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে কেন ?—জানাবার মতো কিছু থাকলে তোমাকে জানাবো। এখন তুমি খুব সুস্থ নও, শুয়ে পড়গে।

[রচনা মৃগাঙ্কের হাত ধরে এগিয়ে যাবার সাহায্য করতে যায়, মৃগাঙ্ক ঝট্‌কা দিয়ে হাতটা সরিয়ে দেয়।]

মৃগাঙ্ক। অ—তুমি প্রতিশোধ নিচ্ছ, না ? কিন্তু তুমি জেনো, ভুল করেও আমার যা মানায়, স্ত্রী হয়ে তোমার তা মানায় না।

রচনা। অন্যায় যা, তা কাউকেই মানায় না—সেখানে স্ত্রী-পুরুষ বলে কোনো কথা নেই।

[বলে ধীর পদক্ষেপে সে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়। নীচে দাঁড়িয়ে থাকে স্তব্ধ মৃগাঙ্ক। আলো নিবে যায়। সময় পরিবর্ত্তন। পরের দিন রাত্রি।]

[করিডোর দিয়ে বাইরে যাবার পোষাকে এগিয়ে আসে রচনা, সঙ্গে মিঃ চৌধুরী। লবীর মাঝামাঝি এসে থমকে দাঁড়ায় রচনা, কি একটু ভেবে নিয়ে বসে পড়ে একটা কৌচে।]

ম্যানেজার। (হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে হেসে) দশটা পর্য্যন্ত তো বাগানেই কাটালেন—আবার বসলেন যে ?

রচনা। না, আজ আর বেরোবো না। আসুন, এখানেই একটু বসা যাক।

ম্যানেজার। বেশ তো, বেরোতে ইচ্ছে না হয়, বেরোবেন না। একটু বললে আমি এখানেই তো সব ব্যবস্থা করতে পারি—হোটেলের ওই হট্টগোল আমারও ভালো লাগে না।

রচনা। না থাক, আপনাদের ও-সব ব্যবস্থা আমার ভালো লাগে না। কয়েক দিন খেয়ে তো দেখলাম, আমার কেমন যেন ধাতে সয় না।

ম্যানেজার। বেশ তো, ভালো না লাগলে খাবেন কেন ? কিন্তু আমার কি মনে হয় মিসেস চ্যাটার্জি, জানেন ? আপনার বোধ হয় আমার সঙ্গই তেমন ভালো লাগে না।

রচনা। না—না, ও-কথা বলছেন কেন? ভালোই যদি না লাগবে, তবে আপনার সঙ্গে এতো ঘুরে বেড়াই কেন?

ম্যানেজার। আমার কিন্তু স্বপ্নের মতো কেটে যায়, যতটুকু সময় আপনার সঙ্গে থাকি। আপনার আনন্দ, দুঃখ, রাগ প্রতিটি 'মুড্'ই যেন আশ্চর্য সুন্দর! এই যে আপনাকে আজ একটু 'পেল্' আর অন্যমনস্ক লাগছে, তাও আমি সন্ধ্যা থেকে অবাক হয়ে দেখছি।

রচনা। সত্যি?

ম্যানেজার। সত্যি—শুধু আজ নয়, প্রথম দিন থেকেই মনে মনে মৃগাঙ্ক বাবুর পছন্দকে আমি তারিফ না করে থাকতে পারি নি। তারপরে ক'দিন আপনার সঙ্গে মিশে মুগ্ধ হয়েছি—আপনার কম্প্যানি—'ওহ ইট্‌স্ হেভেন্‌লি!'

রচনা। কেন, মিসেস চৌধুরী?

ম্যানেজার। ও দোজ ভেন্ লেডিজ—আপনার সঙ্গে ওর তুলনা?

রচনা। সত্যি, আপনারা এত সুন্দর করে বলেন—বিশ্বাস করে ফেলতে ইচ্ছে হয়।

ম্যানেজার। (আবেগ ভরে রচনার কৌচের হাতলে রাখা হাতটা হঠাৎ চেপে ধরে) আপনি বিশ্বাস করুন—আই এ্যাম্ টেলিং ট্রুথ।

[ঠিক এমনি সময় বিশু তার ঘরের দিক থেকে এগিয়ে এসে দাঁড়ায়। ম্যানেজার হাত টেনে নেয়, রচনা তেমনি বসে থাকে।]

ম্যানেজার। (বিশুকে) এখানে—কি চাই তোমার?

বিশু। তা আপনাকে বলবো কেন?

ম্যানেজার। ওয়েল্—

বিশু। বৌদি?

রচনা। কিছু বলবে?

বিশু। হ্যাঁ, একটু এদিকে আসতে হবে।

[রচনা উঠে দাঁড়ায়]

ম্যানেজার। (উঠে দাঁড়িয়ে) আপনি যাবেন কেন—আপনি কথা বলুন, ততক্ষণ আমি একটু অফিসঘরে বসছি।

[উঠে দ্রুত অফিসঘরে চলে যায়]

বিশু। (স্থির দৃষ্টিতে রচনার দিকে তাকিয়ে থাকে, তার চোখে দেখা যায় জল) বৌদি, তুমি দাদাকে বাঁচাও। রাগ করে এভাবে সব ভেঙ্গে দিও না তুমি।

রচনা। (চোখ তুলে সস্নেহ সজল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বিশুর মুখের দিকে) বিশু, সত্যি তুমি আমাদের বন্ধু—আপদে-বিপদে এমন বন্ধু আর কোন দিন কেউ হয়তো হবে না—তোমার কাছে কিছুই লুকবো না—একটা কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি, তুমি যে বৌদিকে বস্তিতে দেখেছিলে, সে আজও বদলায় নি।

বিশু। তুমি বদলাতে পারো না বৌদি, সে আমি জানি—আমি জানি, তাই যদি না জানতাম, তবে ঠিক জেনো, তোমাকে যে বদলাতো, তার মাথা ফাটিয়ে আমি জেলে চলে যেতাম।

রচনা। (হেসে ফেলে) তুমি যাও বিশু! কিছু ভেবো না।

[বিশু আস্তে আস্তে চলে যায়। রচনা বসে।]

রচনা। বেয়ারা—

[ছুটে আসে বেয়ারা]

ম্যানেজার সাবকো বোলাও—

বেয়ারা। জী—

[চলে যায়। ম্যানেজার ফিরে এসে বসে]

ম্যানেজার। কি ব্যাপার কি?

রচনা। কিছু না—এই ওর নিজের একটু কথা ছিলো।

ম্যানেজার। তা যাই বলুন মিসেস চ্যাটার্জি—ডোণ্ট মাইণ্ড আপনাদের এই বিশু লোকটা একটু ইম্পার্টিনেণ্ট উদ্ধত স্বভাবের।

রচনা। কিন্তু তবু বলবো, সমাজের ছাদের উপর দিয়ে বড় চালে যারা চলে, তাদের চেয়ে ফুটো চালের তলায় বড় মানুষ বেশী জোটে—মানুষটা কিন্তু বড় খাঁটি।

ম্যানেজার। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না—অব্‌কোর্স—

রচনা। না, ওর কথা আমি কিছুই বলতে চাচ্ছি না। তবে সত্যি আপনাকে বলবার মতো দু-একটা কথা আমার আছে, যা পরিষ্কার করেই বলবো।

[একটু সময় চুপ করে থাকে। এমন সময় মৃগাঙ্ক ও মীরা বাইরের দরজা দিয়ে এসে এক পা ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। রচনা ও মিঃ চৌধুরী এমন ভাবে বসা, যাতে তাদের এ প্রবেশ টের পায় না। মৃগাঙ্ক এক পা এগোতে যায়, মীরা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে এমন ভঙ্গীতে তাকে টেনে নিয়ে একটু পাশে সরে দাঁড়ায়, যাতে বোঝা যায় এদের কথাবার্তা শোনাটাই উদ্দেশ্য।]

ম্যানেজার। কই কি বলবেন বলছিলেন, বলুন?

রচনা। হ্যাঁ বলবো বই কি, বলছি। আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, আপনারা তো ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন?

ম্যানেজার। হ্যাঁ।

রচনা। আমাদেরও লভ্-ম্যারেজ। আজ আপনার কাছে মিসেস চৌধুরী 'ভেন্' লেডি, আমার স্বামীর চোখে তিনি অপূর্ব, অদ্ভুত! মিসেস চৌধুরীর চোখে তিনিও হয়তো তাই—আবার আপনার চোখে আমার মধ্যে পেতে চাচ্ছে এক নতুন অপূর্বতাকে—আজ ওরা দু'জন, আর আমরা দু'জন যদি নতুন করে মনের সম্পর্ক পাতাই তো তাও একদিন পুরনো হবে—তারপর? বলুন—আমার এ-প্রশ্নটার জবাব দিন?

ম্যানেজার। বলছেন যখন, আপনিই বলুন।

রচনা। বেশ আমিই বলছি আবার নতুনের খোঁজে ছোটা, এই তো—তবে এই ছোটার শেষ কোথায়? কোনো একদিন কোথাও গিয়ে তো থামতে হবে—সেদিন হয়তো দেখা যাবে, সমস্ত জীবনটা নতুনের খোঁজেই কেটে গেছে। জীবন গড়বার আর সময় হয়ে ওঠেনি—আর তাছাড়া আর একটা কথা মিঃ চৌধুরী! বিবাহিত জীবনে ভালোবাসাটা মস্ত একটা কথা হতে পারে, কিন্তু একমাত্র কথা তো নয়। তার সংগে জড়িয়ে আছে আরও অসংখ্য কর্তব্য—সেগুলোকেও স্বীকার করতে হবে নাকি? বলুন?

ম্যানেজার। হবে বই কি।

রচনা। অবশ্যি, শুধু নতুনের খোঁজে না হয়ে যদি অনিবার্য কারণে বিচ্ছেদের প্রয়োজন হয়, সে হলো আলাদা কথা। কিন্তু আজ আপনি, আমি, আমার স্বামী, মিসেস চৌধুরী—মনুষ্যত্বের কোন অনিবার্য কারণে আমাদের জীবনকে ভাঙতে চলেছি—এর উত্তর

আমাকে দিতে পারেন ?—কই চুপ করে রইলেন কেন ? আমার কথার উত্তর দিন ?

ম্যানেজার। (নীচু মাথা আস্তে তুলে) আমার কোনো উত্তর নেই মিসেস চ্যাটার্জি—(উঠে দাঁড়ায়) আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

[বলে মাথা নীচু করে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে যায়। রচনা দুই হাতে মুখ গুঁজে বসে থাকে। এগিয়ে আসে মৃগাঙ্ক, পেছনে বিব্রত মীরা। রচনা মুখ তুলে তাকায়]

মীরা। (কি বলবে স্থির করতে না পেরে মুখে চেষ্টাকৃত হাসি টেনে) দাঁড়িয়ে সব কথা শুনলাম—আপনি তো রীতিমতো একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন—আমি তো—

মৃগাঙ্ক। (বাধা দিয়ে জমাট মুখে) তুমি যাও মীরা—আমাদের অন্যায়ের সব দায় একা তোমার ওপরেই আমি চাপাচ্ছি না, তবু বলবো, ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে আর কোনো যোগাযোগ না থাকলেই আমি খুসী হবো। তোমাদের জীবনের এই সর্বনেশে সহজতার মধ্যে জড়িয়ে এ ক'দিন ধরে আমার ভেতরেও চলছিলো একটা প্রচণ্ড সংঘাত—যাও তুমি, যাও মীরা।

মীরা। (নিজের অসম্মান ঢাকতে কাঁধ ঝাঁকুনির সঙ্গে মুখ বাঁকিয়ে) 'স্ট্রেঞ্জ'—

[বলে যেদিক দিয়ে ঢুকেছিলো সেই পথেই বেরিয়ে যায়। মৃগাঙ্ক এসে মাথায় হাত রাখে রচনার। দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে রচনা।]

মৃগাঙ্ক। (মাথায় হাত বুলিয়ে) না—না আজ আর কান্না নয় রচনা ! আজ আমাদের সত্যিকারের হাসবার দিন—কই ? কথা শোন—

[রচনা নিজেকে সামলে নিয়ে চোখ মোছে।]

মৃগাঙ্ক। (পূর্বেকার মতো গলা ছেড়ে হাঁক দেয়) বিশু—বিশু—ভোলা— [বিশু ও ভোলা ছুটে আসে]

আয় অনেক দিন পরে আবার সবাই মিলে একটু বসা যাক—উঃ, ক'দিন বাড়ীর আবহাওয়াটাই কি হয়ে গিয়েছিলো !

বিশু। সত্যি দাদা—যাক—যাক ওসব ভুলে যাও। উঃ, আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে—আয় তো ভোলা, কান মলে তোর ঘুমটা একটু ছাড়িয়ে দি—

ভোলা। (চোখ রগড়ে) আমার আবার ঘুম পেল কোথায় ?

[এমন সময় দারোয়ান ব্যস্ত ভাবে বাইরের দরজা দিয়ে ঢোকে]

দারোয়ান। (সেলাম জানিয়ে দ্রুত বলে চলে) হামার কোনো কসুর নাই হুজুর—হামি গেট খুলে একঠো দেশওয়ালী ভাইয়ের সাথে দুটো কথা বলছি আর এই মেয়ে লোকটা একদম অন্দরে চলিয়ে আসছে। হামি এই দরজা পর রুখে আপনে কো—

বিশু। কে মেয়েলোক—কই—?

['বিশু রে'—'বিশু' বলে করুণ আর্তনাদের সঙ্গে দারোয়ানের পাশ দিয়ে এসে ঢুকে পড়ে বিণুদি'।]

এ কি বিণুদি' ! [ছুটে এগিয়ে যায় তার কাছে]

বিণুদি'। গেইটের কাছে বইসা দুই ঘণ্টা কানতাসি বিশু, দেখা পাই না—একটু পোলা পাইয়া পাগলের মতো ছুইটা আইয়া পড়সি। মধুরে বুঝি আর বাঁচাইতে পারলাম না রে—

রচনা। কেন, কেন মধুর কি হয়েছে?

বিণুদি'। মধুর ওপর মায়ের দয়া অইসে গো, সারা গায় আর তিল ফ্যালনের জাগয়া নাই। পোলাটা যন্ত্রণায় কি ছটফট করতে আসে রে বিশু, তবে কি কমু—ভয়ে বস্তির লোক পর্যন্ত পলাইয়া গ্যাসে।

বিশু। অস্থির হয়ো না বিণুদি,' চলো—

মৃগাঙ্ক। দাঁড়া বিশু (দারোয়ানকে) যা, গাড়ী বার করতে বল্—

[দারোয়ান চলে যায়।]

আমিও যাবো।

বিশু। না দাদা, তোমার ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। আর গাড়ীরও দরকার নেই। আমরা এমনি চলে যেতে পারবো।

মৃগাঙ্ক। না—না, অন্ততঃ গাড়ীটা তো পৌঁছে দিয়ে আসুক। মধু একটু ভালো হলেই ফিরে আসিস কিন্তু।

বিশু। না দাদা, এ অনুরোধ আর আমাকে করো না। আমার জায়গা বস্তি—আত্মীয়-বন্ধু সবাই সেখানে—আজ বিণুদি'কে দিয়ে খুব ভালো করেই বুঝলাম আমার আপনার জনের ডাক তোমার ওই গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকতে পারে না দাদা—(রচনা ও মৃগাঙ্ককে প্রণাম করে) চলি দাদা—যাচ্ছি বৌদি! মাঝে মাঝে আসবো দেখা করতে।

রচনা। নিশ্চয়ই আসবে।

মৃগাঙ্ক। যে রোগের সেবা করতে যাচ্ছিস, একটু সাবধানে থাকিস বিশু!

[বিণুদি'র হাত ধরে বেরিয়ে যায় বিশু।]

ভোলা। দাঁড়া বিশু, আমি যাবো না?

[চটপট প্রণাম সেরে বেরিয়ে যায়। রচনা ও মৃগাঙ্ক তাকিয়ে থাকে সেই দিকে।]

মৃগাঙ্ক। আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু আজ বাড়ী ছেড়ে চলে গেল!

রচনা। বন্ধুর চেয়েও বড়।

তৃতীয় দৃশ্য

[সময় সকাল। রাস্তা। রাস্তার পাশে বড় একটা দোকান। ছ'-ছ' আনার ঠেলা ঠেলে এক পাশ দিয়ে ঢোকে বিশু আর বিণুদি'। ঠেলার জিনিসপত্রের উপর কাগজের ঠোঙার বড় একটা প্যাকেট। বিশুকে দেখলে আজ আর চেনা যায় না। মাথার চুলগুলো প্রায় ঝরে গেছে বললেই হয়, কালো রং, মুখময় বসন্তের দাগ। বাঁ চোখটা গলে গিয়ে অনেকটা বেরিয়ে পড়েছে। তাকে দেখলে বোঝা যায়, এখনও সে বেশ দুর্বল।]

বিণুদি'। এই শরীর লইয়া তরে যাইতে দিতে তো আমার তো মন সরে না—

বিশু। না সরলে তো চলবে না বিণুদি', ভোলা একা আর কতো সামলাবে বলো? আর তাছাড়া আজ না হোক কাল, কাজে তো বেরোতে হবেই।

বিণুদি'। মধুরেও রাখতে পারলাম না, তরও এই সর্বনাশ করলাম। আইচ্ছা, তর মৃগাঙ্ক বাবু তো আর একটা খবরও নিল না রে!

বিশু। আমাদের নূতন বস্তির ঠিকানা সে তো জানে না?

বিণুদি'। কয় দিন যাবৎ কেবলই ভাবি—একবার ভোলারে পাঠাইয়া একটু খবর দিলে হয় না? তরে তো খুবই ভালোবাসে তর দাদায়।

বিশু। না বিণুদি', অমন কাজও করো না। দাদা বৌদি মানুষও খুব ভালো, আমাকে ভালোও বাসে খুবই—কিন্তু আজ ওরা যেখানে—সেখানে বসে আমাদের মত লোককে চাকরের মত ভালোবাসার চেয়ে আর বেশী কিছু করা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়।

[ঠোঙার প্যাকেটটা বিণুদি'র দিকে বাড়িয়ে দিয়ে]

ঠোঙাগুলো দোকানে বুঝিয়ে দিয়ে তুমি ঘরে ফিরে যাও বিণুদি'।

বিণুদি'। (চোখের জল মুছে, ঠোঙাগুলো হাতে নিয়ে) তুইও কিন্তু আইজ বেশী ঘরিস না।

[উল্টো দিক দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যায় বিণুদি'। বিশু ঠেলায় ধাক্কা দিয়ে এগুতে যাবে এমন সময় দেখতে পায় দোকান থেকে বেরোচ্ছে মৃগাঙ্ক আর রচনা, পেছনে একটা প্যাকেট-হাতে দোকানের ভৃত্য।]

বিশু। (সবিস্ময়ে আপন মনে) দাদা—বৌদি—(ঠেলাটা এগিয়ে নিয়ে যায় তাদের সামনে, তার দিকে কেউ লক্ষ্যও করে না।) কিছু কিনবেন?

মৃগাঙ্ক। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে পড়ে। বলে, পেছনের ভৃত্যকে)—গাড়ীতে রেখে এসো। (রচনার দিকে ফিরে একটু হেসে) আমি তো চমকে গিয়েছিলাম। কেমন বিশুর চেহারার সঙ্গে মিল না লোকটার? (বিশুকে) না, কিছু লাগবে না।

[রচনা ও মৃগাঙ্ক গাড়ীর দিকে চলে যায়। বিশু স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়, তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। বিশু ডান হাতের আস্তিনে চোখের জলটা মুছে নিয়ে দুর্বল হাতে ঠেলাটা ধাক্কা দিয়ে হাঁক দেয়—]

বিশু। লে-লে বাবু ছে' আনা—দুনিয়াকা খেল ছে' আনা—দুনিয়াকা খেল ছে' আনা—

য-ব-নি-কা

এ মাসের প্রচ্ছদপট . . .

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে বেলুড় মঠের পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মৃতি-মন্দিরের প্রবেশদ্বারের শীর্ষভাগের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। আলোকচিত্র শ্রীমদন বসু গৃহীত।

প্রফুল্ল রায়

এ বছর আজ প্রথম ও-দিকে রওনা হলো ম্যাকলীন।

অনেক দূর থেকে কতকগুলো সাদা পায়রার মত মনে হয়েছিল। এখন বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। পায়রা নয়, রাশি রাশি তাঁবু।

অঞ্চলটার নাম ভাতারমারীর বিল। বর্ষার সময় কিনারা থাকে না, চিহ্ন পাওয়া যায় না দিকচক্রের। দূরের কাঞ্চন নদী থেকে ফেনায় ফেনায় গড়ে আসে কাজল-জলের বন্যা। এখন পৌষের দিন। ভাতারমারীর বিল থেকে কবে একদিন বর্ষার যৌবন সরে গিয়েছে। অসুরমুণ্ডের মত ঢিবিগুলিতে কঙ্কালের আত্মপ্রকাশ। মাঝে মাঝে স্বল্পজল খাদ। হিজলের ডালে পান্নারঙের মাছরাঙা। চার পাশ থেকে ঘিরে ধরেছে শোলাবন, বেতমোত্রা। লাটাশরের জঙ্গল উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

তারই পাশে পাশে রাশি রাশি তাঁবু। ক্ষণায়ু গৃহস্থালী। সারা বর্ষা ভেসেছে কাঞ্চনে, কাঞ্চন থেকে রূপসায়, রূপসা থেকে নিদ্রাবতীতে। এ ঘাট থেকে সে ঘাটে। নাম না জানা বন্দর থেকে বেনামী-নিরুদ্দেশে। বর্ষার পর শরৎ। তারপর সোনালী হেমন্ত পাড়ি দিয়ে এক ঝাঁক সামুদ্রিক পাখীর মত যাযাবরেরা এসেছে এই বিলে। তাঁবু ফেলেছে। আবার কাজল-মেঘে-মেঘে আকাশ ছেয়ে দিয়ে নতুন বর্ষার নিমন্ত্রণ আসবে। যত দিন না আসে, তত দিন এই বিলেই নোঙর ফেলে থাকবে।

ছু' বছর ধরে দেখছে ম্যাকলীন। এর ব্যতিক্রম নেই।

পায়ের নীচে সবুজ ঘাসের মাদুর। যতদূর চলা যায়, যতদূর নজর ছড়ানো যায়। তাঁবুগুলোর কাছাকাছি এসে একবার পেছন দিকে তাকালো ম্যাকলীন। অনেক, অনেক দূরে চার্চের চূড়োটা আকাশ ফুঁড়ে উঠে গিয়েছে। তার ওপরে পৌষের নরম রোদে ঝলমল করছে কাঠের ক্রশটা। একটা স্থির লাইট-হাউসের মত, একটা উজ্জ্বল শপথের মত মনে হলো ক্রশটাকে। এই দেশের আকাশে আকাশে তুলে ধরতে হবে এই দিগ্বিজয়ী চূড়া। চার্চ, ক্যাথিড্রাল আর ক্রিশ্চ্যানিটি। কত সাগরিক ব্যবধান ডিঙিয়ে সে এসেছে এই দেশের মাটিতে। তার পাদ্রীজীবনে ধরে এনেছে একটি পবিত্র সঙ্কল্প, একটি অকলুষ নির্দেশ। যেশাসের পুণ্য নামবীজ ফসলের মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে এ দেশের মনে মনে। ছু' বছরেই বুঝতে পেরেছে ম্যাকলীন, এ দেশের মন বড় উর্বর। ক্রিশ্চ্যানিটির ফসল সফল হয়ে উঠবে। এ বিশ্বাস তার অকম্পিত। অনড়।

পাশাপাশি আসছিল ডিক। কয়েক বছর আগে ব্যাপটাইজড হয়েছে। ধবধবে সাদা সারপ্লিস্, নিরপেক্ষ ভাবে সমান করে ছাঁটা চুল, মসৃণ কামানো মুখ। কপাল, বুক আর বাহুসন্ধি ছুঁয়ে ছুঁয়ে অদৃশ্য রঙের ক্রশ আঁকছিল ডিক। ঘন ঘন।

কৌণিক দৃষ্টিতে একবার তাকালো ম্যাকলীন। এই ক'বছরে সমস্ত দেহে-মনে ক্রিশ্চ্যানিটির রঙ পাকাপাকি ধরিয়ে নেবার জন্য অনেকগুলি মন্ত্রগুপ্তিই শিখে ফেলেছে ডিক। কিন্তু গায়ের রঙটা সাঙ্ঘাতিক রকমের বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে। নিকষ মুখখানা তাই সব সময় মেঘময়। মনে মনে হাসির ঢেউ ওঠে ম্যাকলীনের।

ম্যাকলীন ডাকলো; "ডিক"—

"ইয়াস্ ফাদার"—

"বর্ণপরিচয় আর শ্লেটগুলো এনেছ ঝোলায়?"

"না।" ডিকের পিঙ্গল চোখ ছু'টো নির্বিকার দেখালো।

"কেন?"

"এই নোংরা লোকগুলোকে, এই ডার্টি সোয়াইনগুলোকে, লেখাপড়া শিখিয়ে কী হবে? এরা হিদেন! ব্ল্যাক বীষ্টস"—

"ডার্টি সোয়াইন্ ব্ল্যাক বীষ্টস্"—কণ্ঠ থেকে বিস্ময় ঠিকরে বেরুলো ম্যাকলীনের। চোখ ছু'টো ছুরির ফলার মত এসে বিঁধলো ডিকের চামড়ায়। কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত। তার পরেই প্রচণ্ড শব্দ করে হেসে উঠলো ম্যাকলীন। ব্ল্যাক বীষ্টস! সোয়াইন্! হোলি বাইবেলের চমৎকার পাঠ আয়ত্ত করেছে তো ডিক!

আশ্চর্য! কয়েক বছর আগেও লোকটার নাম নির্মম ভাবেই ছিল ইদ্রিস মৃধা। সে খবর কানে এসেছে ম্যাকলীনের। ইদ্রিস মৃধা থেকে ডিক্ রোজারিও। নামের বিবর্তনের সঙ্গে আশ্চর্য জন্মান্তর! সহসা চমকে উঠলো ম্যাকলীন। ক্রিশ্চ্যানিটির ডাইসে এ কোন আজব প্রাণী আবার পেলো! যেশাসের শিক্ষা তো এ নয়! বাইবেলের দীক্ষা তো আলাদা। বিকর্ষণ নয় আমন্ত্রণ। ব্ল্যাক বীষ্টস! সোয়াইন্; শব্দ ক'টি মনের মধ্যে বিস্ফোরকের মত ফেটে পড়লো। গম্ভীর হলো ম্যাকলীন। ভয়ঙ্কর হলো তার গলা, "তোমার গায়ের রঙ তো মিল্ক্ হোয়াইট্! তাই না? এরা না তোমার দেশের লোক? যাক্, তোমাকে যা বলছি, তাই করো। এক্ষুণি চার্চে গিয়ে বর্ণপরিচয় আর শ্লেটগুলো নিয়ে এসো। যাও, এ্যাট ওয়ান্স"—

কয়েক বছর আগের ইদ্রিস্ মৃধা। এখন ডিক্ রোজারিও। তার পীতরঙের দেহটায় বর্ণ বদল ঠিক বোঝা গেল না। শুধু মনে হলো, পিঙ্গল চোখের মণি ছু'টো চৌচির হ'য়ে ঝিলিক দিয়ে রক্ত

ছুটবে। কিন্তু ম্যাকলীনের নিষ্ঠুর নির্দেশকে অপমান করার সাহস তার নেই। অনিচ্ছুক পা দু'টো ধূধূ চার্চের দিকে চালিয়ে দিল ডিক্। আর, একটু পরেই ঘাসের মাদুরে শান্ত দু'টি পা ফেলে ফেলে যাযাবরদের তাঁবুগুলোর কাছে চলে এলো ম্যাকলীন।

পৌষের রোদে আশ্চর্য আমোদের আমেজ আছে। জ্বালা কম, প্রীতি বেশী। সূর্যটা আকাশের চক্রপথে অনেকটা পাড়ি জমিয়েছে। কিশোর দিন। রোদের আলোতে ঝলমল করছে ম্যাকলীনের সাদা সারপ্লিসটা। ম্যাকলীন ডাকলো, "রাজা সাহেব—"

"তু আসছিক সাহেব! তু—"অজস্র মানুষ বেরিয়ে এলো তাঁবুগুলো থেকে। অসংখ্য। হিসাবের লেখাজোখা নেই। কালো কালো পাথর-পেশী যাযাবর। মাথায় ভালুকের পালক গোঁজা। কোমরে ঝকঝকে ছুরি। দুই কণ্ঠাস্থির মধ্যে ইমলি পাখীর সাদা হাড় ঝুলছে। মেয়েদের সুঠাম দেহে কামনা-লাল শাড়ী। তুঙ্গ খোঁপার চার পাশে শালের মঞ্জরী। মণিবন্ধে কুঁচিলা সাপের হাড়ের বলয়।

শুভ্র হাসিতে মুখখানা ভরে গেল তরুণ মিশনারীর। ম্যাকলীনের। দু' বছরের পরিচয়। নিবিড় অন্তরঙ্গতা হয়েছে বেদেদের সঙ্গে। এবার যাযাবরদের রাজ্যে এই প্রথম পদক্ষেপ ম্যাকলীনের। ম্যাকলীন বললো, "তোমরা কেমন আছো রাজা সাহেব? কী রে আতর? এই মহবাৎ! এই গহর?" অজস্র নাম ফুটলো মুখে, অজস্র মুখের ওপর দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে এলো ম্যাকলীনের সস্নেহ দৃষ্টিটা।

চার পাশ থেকে নিবিড় হয়ে এসেছে যাযাবরেরা। একখানা জলচৌকি এনে দিয়েছে রাজা সাহেব। রাজা সাহেব এদের দলনায়ক। তার ধূসর রঙের চুল, কপালের রেখাময় আঁকিবুকিতে বহু বছরের ঝড়-তুফান আঁকা রয়েছে। জলচৌকিতে বসে চার দিকে আবার তাকালো ম্যাকলীন। আচমকা একটি মুখের ওপর তার দৃষ্টিটা স্থির হলো। এ মুখ এই বেদেদের তাঁবুতে অপরাজিতার মত ফুটে উঠলো কেমন করে? আকর্ণ চোখ। দূরায়ত ভ্রূরেখা। রাশি রাশি মেঘের মত তরঙ্গিত চুল। এত সমুদ্রের ব্যবধান ডিঙিয়ে, গ্রেভ ইয়ার্ডের মাটি সরিয়ে কেমন করে এই মুখখানায় নেমে এলো আগনীস? আশ্চর্য! ঐ মুখের ওপর দিয়ে ছায়া-মিছিলের মত আর একটা জীবন বয়ে গেল।

আর একটা জীবন। আর একটা অতীত। ম্যাকলীনের মনে পড়লো। সে জীবনটাই জলের মত উদ্দাম; সে অতীত সমুদ্রের মত উত্তাল। মিশনারীর শান্ত ভূমিকার নেপথ্যে একটা নির্বাধ বন্যার মত সেই অপরূপ পঁচিশটা বছর। স্বপ্নের মত। সুখ-স্বাদ একটা অবিশ্বাসের মত।

গ্লাসগো য়ুনিভার্সিটি। ম্যাকলীনের মনে পড়লো; সে দিন পাশে ছিল আগনীস। সামনে ছিল বিশাল পৃথিবীর নিমন্ত্রণ। একই ইয়ারের শিক্ষার্থী তারা। আগনীসের সাহচর্যে মনে হতো, কোনো ঝড়ের রাতে তারা দু'জনে এ্যাট্‌ল্যান্টিককে ভাসিয়ে দিতে পারে গণ্ডোলা। সাহারার ওপর দিয়ে লাইট রাইড, ট্যুগেদার তাদের পক্ষে একেবারেই অবাস্তব নয়। মেরুঘেরা ছোট্ট পৃথিবীটুকু তারা হেঁটে পরিক্রমা করতে পারে অনায়াসে। কিন্তু এক মেরু থেকে জীবনের আর এক প্রান্তে পৌঁছানো হলো না। জীবনের বিষুবরেখায় এসে আগনীস মুছে গেল। মুছে গেল এক দমকা মরুবাতাসে। মাত্র কয়েক দিনের ইয়লো ফিভার। তার পরেই আগাষ্টাইন সেমেটেরি। সবুজ ঘাস আর সাদা মাটির নীচে হারিয়ে গেল আগনীস নামে একটি স্বপ্ন। তার টানা-টানা চোখ, গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুল রাশি রাশি আগুনের শিখা হয়ে বুকের মধ্যে হৃদয় নামক প্রদেশটিতে, স্মৃতি নামে একটি কাচঘরে জেগে রইলো ম্যাকলীনের। অহরহ। জ্বালা ছড়াতে লাগলো নির্বিরাম।

তার পর? তার পর কী আশ্চর্য ভাবেই না জীবনটা আবর্তিত হ'য়ে গেল ম্যাকলীনের! কোথায়, কোন এক অতীতের মধুচক্রে মিথ্যা হয়ে গেল গ্লাসগো য়ুনিভার্সিটির সেই গুন্-গুন্ স্বপ্ন। য়ুনিভার্সিটি থেকে। চার্চের অল্টার। ফিজিক্সের ছাত্র ছিল ম্যাকলীন। আগনীসের সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টির সামনে থেকে মুছে গেল রূপময় পৃথিবীটা। ম্যাটার নামে বিজ্ঞানের একটি প্রাথমিক শব্দ এক রাশ কুয়াশার মত মনে হয়েছিল ম্যাকলীনের।

পায়ের নীচে যেন পৃথিবীর আশ্রয় নেই। বিরালম্বের মত ইথারে ভাসছিল ম্যাকলীন। একটা নিরাপদ বন্দর চাই। চাই কঠিন মাটির বিশ্বাসযোগ্য নির্ভর। সরাসরি সে চলে এসেছিল ক্যাথিড্রালে। হোলি বাইবেল, ভার্জিন মেরী, যেশাস—অতিমানবের গস্‌পেলের দুর্গে আশ্রয় নিল ম্যাকলীন। আশ্রয় পেল মিশনারীর সহজ দিনচর্যায়, শুভ্র সারপ্লিসে। চার পাশে একটা ধূসর বৈরাগ্য

টেনে আনলো ম্যাকলীন, তুলে দিল নির্বেদের খাড়া দেওয়াল। এ দুর্গে আগনীস নামে একটি যন্ত্রণা নিষিদ্ধ। তবু অনেক তুষার-ঝর-ঝর রাত্রে কী আশ্চর্য ভাবেই না চার দিকের দেওয়াল ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে! ম্যাকলীনের জলভরা চোখে থরথর ছায়া ফেলেছে এক-মাথা সোনালী চুল, টানা টানা দু'টি অপরূপ চোখ। আর তখনই, তখনই দূরের কোন চ্যাপেল থেকে গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এসেছে। কোন ক্লার্জিম্যান হয়ত আবৃত্তি করছেন বাইবেলের কোন পবিত্র প্যারাবল্। মুহূর্তে চার দিক থেকে আবার দেওয়ালগুলো উঠে গিয়ে কোন দূরান্তে সরিয়ে দিয়েছে সোনালী চুল, টানা-টানা চোখ, আপেল-লাল ঠোঁট।

তারও পর! দীক্ষার অধ্যায় শেষ করে ইণ্ডিয়ায় এসেছে ম্যাকলীন। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত বিশাল ভারতবর্ষ। এর আত্মায় যেশাসের বাণীকে প্রোথিত করতে হবে। আকাশের দিকে দিকে তুলে দিতে হবে দিগ্বিজয়ী ক্রশ। ক্রুশিফিক্সানের মহিমা দিয়ে, যীশুর রক্তদানের ইতিহাস দিয়ে শুরু করে নিতে হবে এই আইডোলাট্রির দেশকে। বিচিত্র আবেগে হৃৎপিণ্ডটা বেলুনের মত ফুলে ফুলে উঠেছে ম্যাকলীনের।

কিছু দিন ছিল বিলাসপুরে। সেখান থেকে আসানাকুলমের এক চার্চ। তার পর বাংলা দেশ। আশ্চর্য সমতলের দেশ! স্বপ্নের মত। সুন্দরতম একটি গানের কলির মত। গ্রীন আর গ্রীন্। তাল-সুপারীর পাতায় পাতায় বাতাসের মর্মর। আদিগন্ত ধানবন। কবুতরের চোখের মত জল। নির্বাধ প্রান্তর। আকাশের বৃক্ষরেখা পর্য্যন্ত একটানা। অবারিত। মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে কোন অতন্দ্র জ্যোৎস্নার রাতে কত এ্যাটলাণ্টিক পাড়ি দিয়ে ভেসে আসতো একটি মুখ, গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুল, টানা টানা চোখ, দূরায়ত ভ্রূলেখা। ভেসে আসতো একটি স্বপ্নময় কবিতার একটি মধুক্ষরা চরণ, "আই ফেল্ট দি প্রেজেন্স অব হার বাই ইটস স্পেল অব নাইট—"

বিলীয়মান কোন সৌরভের মত তন্ময়তা সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্য থেকে প্রচণ্ড গর্জন শোনা গিয়েছে। রাশি রাশি তর্জনী তুলে তাকে শাসন করেছে একটি নির্মম নির্দেশ। একটি নিষ্ঠুর ঘোষণা। মিশনারীর শুভ্র জীবনে নারী নামে কোন কলঙ্ক-বিন্দুর অস্তিত্ব নিষিদ্ধ। ক্রিশ্চ্যানিটির মহিমা ছড়িয়ে দেবার বিলিয়ে দেবার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে দেবে সে যেশাসের সৌরভ। আর তারই তন্দ্রায় কি না নারী নামে একটি কদর্য শব্দের সঞ্চরণ!

'আই ফেল্ট দি প্রেজেন্স অব হার'—কথাগুলো রীতিমত অপবিত্র। এর আবৃত্তি অপরাধের। কিন্তু চেতনার মধ্যে সেই ধমকটা বিশেষ ক্রিয়া করে না। আশ্চর্য এই দেশ! আকাশের অতসী মেঘে মেঘে, বিলের শাপলা ফুলে, ঘাসের ফলকে শিশিরের হীরায় বার বার সেই মুখখানা ছায়া ফেলে। বার বার বিমনা হয়ে যায় ম্যাকলীন। ঘুরে ঘুরে একটা নিষিদ্ধ ভাবনা রঙে রঙে রেমোরা মাছের মত পিছলে পিছলে আলো ছড়ায়। এই চার্চ যেন মাঝে মাঝে তাকে অক্টোপাশের মত জড়িয়ে ধরে। আর তখনই এখান থেকে ফেরারী হ'তে ইচ্ছা হয়!

যাযাবর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিল ম্যাকলীন। অপলক চোখে। বেদেদের সকলকেই সে জানে। কিন্তু এই মেয়েটিকে সে কোন দিনই দেখেনি। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই চুল, সেই আদলে মেয়েটি যেন আর এক আগনীস। শুধু গায়ের রঙটাই কালো। আগনীস যেন কোন রজনীগন্ধা আর এই মেয়েটি একটি কৃষ্ণকলি। তা ছাড়া প্রতিটি সুঠাম অঙ্গে আগনীসের স্মৃতি ধরে রেখেছে মেয়েটি।

রূপমুগ্ধ গলায় ম্যাকলীন বললো, "এ কে রাজা সাহেব, একে তো আগে আর দেখিনি তোমার দলে?"

রাজা সাহেব বললো, "উ হামাগো শঙ্খিনী। উয়াক ই-বছর দলে আনলেক। আয় লো শঙ্খি! ইদিকে আয়।"

শান্ত পদক্ষেপে কাছে এসে দাঁড়ালো শঙ্খিনী। রাজা সাহেব আবার বললো, "ই হামাগো সাহেব আছেক। রোমের কাত্তিক (রোমান ক্যাথলিক)। তুয়াক কইছিলেক, ফাদার যীশু আর মাদার মেরী! মনে আছেক?"

"হঁ।" গুচ্ছ গুচ্ছ চুলের মাথাটা দোলালো শঙ্খিনী।

"ফাদার যীশু, মাদার মেরী।" চার পাশ থেকে বেদেরা সোরগোল তুলল।

রাজা সাহেব বলতে লাগলো; "তুয়াক কইছিলেক, কপালে কানে আর বুকে আঙুল ঠেকাবেক।" ক্রশ আঁকার প্রক্রিয়াটা দেখিয়ে দিলে রাজা সাহেব, "ঐ সাহেব উই সব শিখাই দিলক হামাগো। তুয়ার মনে নাই হামার কথাগুলান্?"

"হঁ, আছেক তো।" অপরূপ মধুর শোনালো মেয়েটির কণ্ঠ। আর চোখের মণি দু'টো কী এক দুর্বোধ্য আনন্দে চকচক করে উঠলো! রূপালী মাছের আঁশের মত। শঙ্খিনী হাসলো।

"তো সাহেবরে দেখাই দে না তুয়ার সাপখেলাটা। জবর খুশী হবেক।" খুশী খুশী গলায় বললো, রাজা সাহেব।

"দিবক।"

একটু পরেই সাপের ঝাঁপি এলো। একটি মেয়ে পেটফুলো একটা বাঁশীতে পোঁ দিয়ে চলে। ডুগডুগি বাজাতে থাকে আর এক জন। অতন্দ্র নাগকন্যা। ঝাঁপি থেকে একটা শঙ্খচূড় বের করে আনলো শঙ্খিনী। ফণায় সাদা একটি শাঁখের চিত্র। সাঁ করে সাপটা লেজের মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়ালো। শঙ্খিনী হাতের পিঠ নাচাতে থাকে অভ্যস্ত কৌশলে। আর সাপের ফণাটা তীব্র আক্রোশে দুলতে দুলতে আছড়ে পড়ে মাটিতে।

রাজা সাহেব বললো, "একেবারে আনকোরা। পরশু দিন ঐ বিলের পারে ধরছেক বিহান বেলায়; তাই এত তেজ।"

সাপের নাচের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মিলিয়ে দুলছে শঙ্খিনীর শ্রীঅঙ্গ। সমস্ত দেহের ওপর দিয়ে তরঙ্গিত হয়ে যাচ্ছে উচ্ছ্বসিত যৌবন।

শঙ্খিনীর পাশে এসে বসেছে আতরজান, গহরবিবি আর আসমানী। আতরজান তীক্ষ্ণ মিষ্টি গলায় গান তুলে নিল,—

'চান্দ রাজা তোমার অ গ কেমুনতরো ঘর,
কেমুনহরো কারিগরে বানাইলো বাসর,
তোমার মনে নাই কী রাজা বিষহরির ডর!'

গহরবিবি আর আসমানী টেনে টেনে গানের রেশ বুনে চলে:
হায় বিষহরির দোয়া!

'সুজন ! দেখো কান্দে ঐ যে সোনার বেহুলা,
কাইন্দা কাইন্দা পদ্মের চক্ষু হইছে ফুলা ফুলা,
মনসার কানে কে গো দিছে সোয়া সের ধুলা !'
হায় বিষহরির দোয়া !

সাপ নাচাতে নাচাতে কেমন যেন বিমনা হয়ে গিয়েছিল শঙ্খিনী। নিজের অজ্ঞাতে অবাধ্য দৃষ্টিটা এসে স্থির হয়েছে একজোড়া চোখের ওপর। কী আশ্চর্য নীল মণি ! সমুদ্রের মত গভীর। রাশি রাশি সোনালী চুল উড়ছে পৌষের বাতাসে। গড়্গের মত খাড়া নাক। দুধরঙ্‌ দেহ। এমন অপরূপ পুরুষ কোন দিনই দেখে নি শঙ্খিনী। কোন এক মনোরম স্বপ্নের মধ্য থেকে নেমে এসেছে মানুষটা। চোখের পলক বন্দী হয়ে রয়েছে তার। মনে হচ্ছে, চোখের পলক পড়লেই এই দুধদেহ মানুষটা একটা বুদ্‌বুদের মত বাতাসে নিরাকার হয়ে যাবে।

বিষহরি ! সেই হিদেন শয়তানীর নাম ! বেদেনীদের গান থেকে শব্দটা ছিটকে এসে শ্রবণকে আহত করছে ম্যাকলীনের। বার বার। 'হায় বিষহরির দোয়া-' সহসা একটা আশ্চর্য ভাবনায় মনটা প্লাবিত হলো ম্যাকলীনের। ঐ প্যাগান উইচটার কারাকূপ থেকে, তার উইচক্র্যাফ্ট থেকে ক্রিশ্চ্যানিটির প্রসন্ন দিগন্তে কী মুক্তি দেওয়া যায় না এই অনুপমা নাগকন্যাকে ? এই সুতনুকা যাযাবরীকে ?

"ফাদার"—পাশেই মেঘ ডাকলো। মেঘ নয়, ডিক এসে দাঁড়িয়েছে। কাঁধে শার্ক স্কিনের অতিকায় ঝোলা। এই মাত্র দূরের চার্চ থেকে এসেছে। মাথার ওপর পৌষালী দুপুর খরধার। এতটা পথ আসতে আসতে শরীরের বার্ণিশ রঙে ঘাম ফুটেছে ফোয়ারার মত। মুখখানা এই পৌষের ঝকঝকে দুপুরেও নিবিড় মেঘময় মনে হচ্ছে ডিকের।

চমকে ডিকের দিকে তাকালো ম্যাকলীন ; "ও তুমি ? বর্ণপরিচয় আর শ্লেটগুলো নিয়ে এসেছ ?"

"ইয়াশ্‌, ফাদার—"

ইতিমধ্যে সাপ নাচানো শেষ হয়েছে। শঙ্খচূড় সাপটাকে ঝাঁপির মধ্যে বন্দী করলো আতরজান।

ম্যাকলীনের গলা থেকে বিন্দু বিন্দু বিস্ময় ঝরলো। সে বিস্ময়ের সঙ্গে খুশীর খুসবো মেশানো ; "বিউটিফুল ! চার্মিং—বড় সুন্দর রাজা সাহেব—হাউ নাইস্‌—"

স্বপ্নের মানুষটির মুগ্ধ অভিনন্দন। মধুর হাসি মুখময়, মসলিনের মত ছড়িয়ে পড়লো শঙ্খিনীর। সুধাস্বাদ দেহটি বেয়ে বেয়ে একটি সুখ-শিহরণ তরঙ্গিত হয়ে গেল তার। এক সময় একটা তাঁবুর মধ্যে মিলিয়ে গেল শঙ্খিনী।

ম্যাকলীন বললো, "তোমাদের জন্ম বই নিয়ে এসেছি রাজা সাহেব। তোমরা লেখাপড়া শিখবে।"

"হঁ হঁ। হা রে শঙ্খিনী, ইদিকে আয়। লিখাটা শিখবিক—রাজা সাহেবের সোৎসাহ চীৎকারে বিলভূমি চকিত হয়ে উঠলো।

আবার এলো শঙ্খিনী। এতক্ষণ তার দিকে দু'টি নিষ্পলক চোখ স্থির করে রেখেছিল ডিক। মনের মধ্য থেকে একটা বুদ্‌বুদের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল ডান গাল বাঁ গালের নীতিমন্ত্র, নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল মিলিয়েনামের বাণী। অলক্ষ্যে বাইবেলের সেই কালছাপ রক্তে রক্তে বিষ সঞ্চার করছিল। আর দু'টি চোখ দিয়ে শঙ্খিনীর শ্রীঅঙ্গ লেহন করছিল ডিক। মেঘচুলে, বিদ্যুৎ-চোখে, মুক্তাদাঁতের কারাগারে পৃথিবীর সমস্ত রূপ যে সঞ্চিত হয়ে থাকে, আগে কী তা জানতো ডিক !

সূর্য এখন অভ্রংও। জ্বালাদায়ী। বিলভূমিতে ছড়িয়ে পড়ছে ঝকঝকে রোদ, সবুজ শিখার মত জ্বলছে লাটাবন, রক্তপলাশের সারি।

এক সময় ম্যাকলীন বললো, "বইগুলো বিলিয়ে দাও ডিক"—তার পরেই অতসী-নীল চোখ দু'টো পাখীর মত উড়িয়ে দিল সে। শঙ্খিনীর দিকে। ফিস-ফিস গলায় বললো, "আবার আসবো। আবার আসবো।"

মাথা দোলালো শঙ্খিনী। আর তারই পাশে দু' টুকরো রক্তাভ অঙ্গারের মত জ্বলতে লাগলো ডিকের চোখ দু'টো।

দূরের ঐ ধূ-ধূ চার্চ থেকে এই বেদেদের সংসার। দূরত্বময় পথটুকু একটু একটু করে হ্রস্ব হয়ে এলো ম্যাকলীনের পায়ের নীচে। রক্তপদ্মের মত যখন সূর্য ওঠে সকালে তখন বের হয়ে আসে, আবার মোহন বেলাশেষের সোনা সারা গায়ে মেখে চার্চে ফেরে ম্যাকলীন। রোজ রোজ নিয়মিত। একটা অবিশ্রান্ত তন্দ্রার মধ্য দিয়ে ক্ষয়িত হয়ে যায় সমস্তটা দিন। আর এই তন্দ্রার মধ্যে স্বপ্ন হয়ে মিশে থাকে শঙ্খিনী। শঙ্খিনী নয় আগনীস। এ্যাটলান্টিকের ওপারের সেই রজনীগন্ধা এই সমতটের দেশে এসে কৃষ্ণকলি হয়ে ফুটেছে। সাপ নাচিয়ে বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে, রম্যানি গানে গানে সারাটা দিন মধুর করে দেয় শঙ্খিনী। কোন কোন দিন ওদের সঙ্গে দল বেঁধে সাপ ধরতে বের হয় ম্যাকলীন। বের হয় জড়িবুটির ঝাঁপি নিয়ে কোন মহাজনের উঠানে বিষ তুলতে। সারপ্লিসটা এক পাশে ছুঁড়ে বিলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কখনো। শঙ্খিনী হয় সঙ্গিনী। রাত্রে চার্চে ফিরে বাইবেল জপতে মনে থাকে না, ভুল হয়ে যায় হোলি বাইবেলের কোন নির্দিষ্ট অধ্যায়ে মনটাকে শুচিস্নান করিয়ে নিতে। সারা দিনের অবসাদ একটি নিবিড় ঘুমের ঢেউ এসে ধুয়ে নিয়ে যায়। সুখস্বাদ বৃষ্টির মত দেহ-মনের ওপর ঝুর-ঝুর করে ঝরতে থাকে শঙ্খিনী।

চার্চের ঘড়িতে এখন ছ'টা। ঢং ঢং শব্দ করে সকালের ঘোষণা শেষ হলো। এর মধ্যেই উঠে পড়েছে ম্যাকলীন। জানালার ফাঁক দিয়ে চোখ দু'টো ভাতারমারীর বিলের দিকে ছড়িয়ে দিল সে। সমস্ত দিগন্ত জুড়ে নিবিড় কুয়াশার স্তর স্থির হয়ে রয়েছে। অস্পষ্ট কয়েকটা সাদা বিন্দুর মত দেখাচ্ছে বেদেদের তাঁবুগুলো। ধূ-ধূ আকাশে কিছু যাযাবর পাখী এরই মধ্যে চক্র দিতে বেরিয়েছে। আর ঘন কুয়াশার চার পাশ দিয়ে সূর্যের রক্তরেখা ফিনকি দিয়ে বেরুতে সুরু করেছে।

জানালার পাশ থেকে দেওয়ালের সামনে এসে দাঁড়ালো ম্যাকলীন। ব্রাকেট থেকে সারপ্লিসটা নিয়ে গায়ে তুলল। এই সকাল বেদেদের নিমন্ত্রণ নিয়ে আসে। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে নামতে ম্যাকলীন ডাকলো ; "ডিক, হ্যালো ডিক—"

নীচের একখানা ঘরে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে ছিল ডিক। পেশোয়ারী কম্বলের ঢাল দিয়ে পৌষের সকালের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল সে। বিশাল দেহটা পিণ্ডাকার করে কম্বলের মধ্যে একটি নিটোল ঘুমের সাধনা করছিল, আর সেই ঘুমের ওপর একটি মাকড়সা রেশমী

সুতাতন্তু টেনে টেনে একটি স্বপ্নের বৃত্ত আঁকছিল। সে স্বপ্নের নাম শঙ্খিনী। সেই নাগমতী বেদের মেয়ে। সেদিনের সেই দেখার পর থেকে হৃৎপিণ্ডের বাজনার সঙ্গে মিশে গিয়েছে শঙ্খিনী। বুকের প্রতিটি ধুক্‌-ধুকের সঙ্গে তার অনুভব একটা জ্বালার মত সারা দেহে, সারা চেতনায় যেন ছড়িয়ে পড়ে। অথচ—অথচ, তার পর আর একবারও দেখা হলো না। এই শয়তান পাদ্রীটা তাকে ওদিকে যেতেই দেয় না। নানা অছিলায়, নানা অজুহাতে তাকে পাঠিয়ে দেয় দূরের কোন বন্দরে কী গ্রামান্তরে। আর নিজে—একটা অশ্লীল গালাগালি মনের মধ্যে কুণ্ডলিত হয়ে উঠলো ডিকের হিংস্র উত্তেজনায়, কপালের রগ দু'টো দপ দপ করতে সুরু করেছে।

ম্যাকলীন একেবারে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যগ্র গলায় সে ডাকলো ; "ডিক, হ্যালো চ্যাপ, আর কত ঘুমুবে ? রোদ উঠে গেল যে !"

কম্বলের মধ্যে নিঃসাড় পড়ে রইলো ডিক। কিছুতেই সে উঠবে না। দাঁতের ওপর দাঁত চেপে বসলো তার। আরো বারকয়েক ডাকাডাকি করলো ম্যাকলীন। ডিক নিরুত্তর। একেবারেই নিস্পন্দ। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপরেই খাটিয়ার কাছে এসে প্রচণ্ড উৎসাহে কম্বলটা তুলে নিল ম্যাকলীন। সঙ্গে সঙ্গে একটা জ্যা-খোলা তীরের মত সাঁ করে উঠে বসলো ডিক। চোখ দু'টোতে তার ঘাতনের ঝিলিক।

ম্যাকলীনের নীল চোখে কৌতুকের আলো জ্বলছে ; "সান ইজ আপ মাই বয়। উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। মিশনারীর এত ঘুম বে-আইনি। যাক, আজ বাজীতপুরের হাটে যাবে। মথি, লুক, যোহোনের সুসমাচারগুলো বিলিয়ে এসো। ভালো কাজ হচ্ছে না, সিরাজদীঘার চার্চ থেকে বড় পাদ্রী চাপ দিয়েছেন। আরো ক্রিশ্চান চাই। আরো ব্যাপটাইজড করতে হবে। বী আপ! আমি ঐ বেদেদের কাছে যাবো।"

তিন বছর ধরে ব্যাপটাইজড হয়েছে ডিক। এই তিন বছরের সমস্ত শিক্ষা দিয়ে নিজেকে সংহত করেছে সে। অস্বাভাবিক গম্ভীর শোনালো তার কণ্ঠ, "আমার অসুখ করেছে ফাদার! আমি আজ বেরুতে পারবো না অতদূর।"

"ইজ ইট! তবে এক কাজ করো, একটা গরুর গাড়ী করে চলে যাও। তুমি মিশ নারী। সবই তো বোঝ। প্রীচিং বন্ধ রাখলে কী চলে। আমাদের জীবন এরই জন্ত ডেডিকেটেড"—অপরূপ গসপেলের মত শোনালো ম্যাকলীনের কণ্ঠ।

খানিকটা সময় পিট্‌ পিট্‌ করে তাকিয়ে রইলো ডিক। তার পর বিরক্ত গলায় বললো, "মিশনারী হলেও মানুষ তো আমি! আই এ্যাম নো মেশিন্"—

"আচ্ছা এক কাজ করো, তুমি বরং বেদেদের তাঁবুতে যাও। ওদের পড়াশোনা একটু দেখিয়ে দিও। আমিই বাজীতপুরে যাচ্ছি। তোমার যখন অসুখ, সামনেই যাও।"

আস্তে আস্তে দড়ির খাটিয়া থেকে নীচে নেমে এলো ডিক। চোখ দু'টো একটা কুশ্রী খুশীতে মশাল হয়ে জ্বলছে তার। এক সময় ম্যাকলীন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। দু'টি নিকষ ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটি খুশীর শিসকে কাঁপাতে কাঁপাতে মুক্তি দিল ডিক। তার পর নিজেকে তারিফ করতে লাগলো: "আচ্ছা বুদ্ধি খেলেছে তো মাথায়! এই অসুখ আমার আর কোন দিনই ভালো হ'বে না। যাও, বাজীতপুর আর গিরিগঞ্জ করে তুমি মরো পাদ্রী সাহেব! আর আমি"—

ডিকের স্বগতটুকু চারটে দেওয়ালের মধ্যেই বন্দী হয়ে রইলো।

দু' পাশে অঘ্রাণ প্রান্তর। ফসলরিক্ত। তার ওপরে কুয়াশা ঘন হচ্ছে। নিবিড় হচ্ছে। পৌষের বাতাস কাঠের দাঁতের মত নিষ্ঠুর। শরীরের অনাবৃত অংশে অংশে নির্মম ভাবে বসছে শীতের দাঁত। চার পাশে ধূপছায়া সন্ধ্যা। মাঝখানে জেলাবোর্ডের অসমান পথ। চড়াই-উৎরাইএ দোল খেতে খেতে এগিয়ে গিয়েছে। সারপ্লিসটাকে আরো ঘনিষ্ঠ করে শরীরের ওপর চেপে ধরল ম্যাকলীন। আকাশে কৃষ্ণ পঞ্চমীর ক্ষয়িত চাঁদ দেখা দিয়েছে। পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় ভৌতিক দেখাচ্ছে পৌষালী সন্ধ্যা। কোথায়ও মাথা তুলেছে নলখাগড়ার ঝোপ, কোথায়ও বেণাবন। পানের 'বরজে'র মধ্য থেকে উল্কার মত ছুটে গেল একটা শিয়াল। হিজলের ডাল থেকে কর্কশ শব্দ করে উঠল একটা কাল পেঁচা—নিম্-নিম্-নিম্—

কোন দিকে এক বিন্দু ভ্রূপাত নেই ম্যাকলীনের। এই মাত্র বাজীতপুরের বন্দর থেকে ফিরছে সে। এখনও চার্চে গিয়ে পৌঁছায়নি।

আকাশে রাশি রাশি তারার অতন্দ্র বাসর। সে দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বেথলেহেমের সেই অনির্বাণ ক্ষেত্রটিকে সন্ধান করতে লাগলো ম্যাকলীন। মানবপুত্র কবে এই কলুষিত পৃথিবীকে স্পর্শ করেছিলেন। সর্বপাপহর যেশাস। নিজের বিন্দু বিন্দু রক্তের স্নান দিয়ে পৃথিবীকে পবিত্র করে দিয়েছিলেন। একটা বিচিত্র অনুভূতিতে সমস্ত স্নায়ুগুলো পরিপূর্ণ হয়ে গেল ম্যাকলীনের। বেথলেহেমের সেই স্নিগ্ধ প্রদীপ হাজার হাজার বছর ধরে লাইটহাউসের মত ভ্রষ্ট মানুষকে আলো দেখাচ্ছে, সত্যের দিগন্ত নির্দেশ করে চলেছে। এই মাত্র বাজীতপুরের বন্দর থেকে প্রীচিং শেষ করে ফিরছে ম্যাকলীন। এখনও হৃৎপিণ্ডের বাজনায় রিমঝিম করে বাজছে সেই কথাগুলো, "ঐ জলপ্রলয় আসিল, ঐ পৃথিবী রসাতলে যাইল হে পাপাচারীর পুত্রগণ—আইস, আইস আমি তোমাদের আলোকমন্ত্রে দীক্ষা দিব।" জীবনের সমস্ত ডেলুজ, সমস্ত সংহারের মধ্যে একটি প্রাণের অঙ্গীকারে পৃথিবী নিশ্চিন্ত, মানুষ নির্ভয়। সে প্রাণের নাম যেশাস। তন্ময় হয়ে গিয়েছিল তরুণ মিশনারী।

সহসা ঐ সপ্তর্ষির তারার মালায় উঁকি দিল একটি মুখ। সন্ধ্যাতারাদের অক্ষরে অক্ষরে লেখা হলো একটি নাম। আগনীস। কত এ্যাটলান্টিক পাড়ি দিয়ে, অগাষ্টাইন সেমেট্রির সমাধিতল থেকে উঠে এসেছে ইণ্ডিয়ার আকাশে। একটি মুখ, একটি নাম। আগনীস। আগনীস নয় শঙ্খিনী। এ্যাটলান্টিকের ওপার থেকে রজনীগন্ধা এসে এপারের মাটিতে কৃষ্ণকলি হয়ে ফুটেছে। মনের একাগ্র শুচিতা থেকে সরে গেলেন মানবপুত্র। এক রাশ ধোঁয়ার আকারে মিলিয়ে গেল হোলি বাইবেল। সপ্তর্ষির বাসরে শঙ্খিনীকে সন্ধান করতে করতে এগিয়ে চললো ম্যাকলীন।

বিশাল একটা শিমূল গাছের ছায়াতল দিয়ে জেলাবোর্ডের সড়কটা বাঁক দিয়ে চলে গিয়েছে চার্চের দিকে। বাঁকের কাছাকাছি আসতেই চমকে উঠলো ম্যাকলীন। একটি নারীমূর্তি শিমূলের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে আছে। তীক্ষ্ণ গলায় ম্যাকলীন চেঁচিয়ে উঠলো, "হু হুজ দেয়ার?—কে?"

খিল-খিল হাসির শব্দ। রাশি রাশি কলতরঙ্গ একসঙ্গে বেজে উঠল যেন। "হামি রে সাহেব, হামি। দুই এক পহর বেলা থাকতে তুর লেগে খাড়া আছিক হেথায়। তুর দেখাই নাই। দুই শয়তান কালা সাহেবটারে তু পাঠাছিক। উ বড় শয়তান। বড় বখিল।"

শঙ্খিনী। সমস্ত দেহ-মন থেকে চমকটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ম্যাকলীনের। একটা মধুর আবেশে চেতনাটা ভরে গেল; "তুমি! এত রাত্রে এখানে এসেছ কেন? খবর দিলেই তো আমি যেতাম। দরকার আছে বুঝি?"

"হঁ।" গলাটা গাঢ় শোনালো শঙ্খিনীর। ম্যাকলীনের বুকের কাছে আরো নিবিড় হ'য়ে এলো সে। নয়ানজুলি থেকে বেনে-বউ ফুলের বনজ গন্ধ ভেসে আসছে, পৌষের কৃষ্ণ পঞ্চমী আরো রহস্যময়, তারাদের চোখে চোখে কী এক খুশী-খুশী ইঙ্গিত। ম্যাকলীনের তরুণ রক্তে ঝড় ভেঙে পড়েছে। আকাশে ক্ষয়িত চাঁদ, শিমূলের নির্জন ছায়াতলে এক বরাঙ্গী যাযাবরী। শঙ্খিনীর উত্তাল নিঃশ্বাস এসে পড়ছে বুকে। ধরা-ধরা গলায় শঙ্খিনী বললো; "তু কেনে যাইস নাই সাহেব? তু না গেলে হামার পরাণটা কেমুন জানি করেক।"

ফিস্-ফিস্ গলায় ম্যাকলীন বললো, "বাজীতপুরে গেছিলাম। প্রীচিং করতে হবে তো। তা ছাড়া ডিকের অসুখ ছিল। তাই তোমাদের ওখানেই পাঠিয়েছিলাম।"

"হামি কিছুক শুনতে চাই না। তু রোজ রোজ হামাদের উখানে যাবিক। তুরে দেইখে হামি মজছিক। তু না গেলে হামি গলায় দড়ি দিবক। উ কালা সাহেবটা বড় শয়তান, হামার দিকে খালি ড্যাব ড্যাব কইর‍্যা তাকাইয়া থাকেক। একবার তো হাত ধরলক।" শঙ্খিনীর কণ্ঠে রাশি রাশি অভিযোগ।

"ইজ ইট। রাসকেল!" গর্জন করে উঠলো ম্যাকলীন; "আমি স্কাউণ্ডেলকে একেবারে খুন করে ফেলব।" ম্যাকলীনের দেহমন থেকে এই মুহূর্তে মিশনারী মুছে গিয়েছে। ব্যগ্র হাতে শঙ্খিনীর মণিবন্ধ তুলে নিল ম্যাকলীন। আর, আর একটা ক্ষ্যাপা বাতাসের মত সাদা সারপ্লিসটার ওপর, বুকের মধ্যে হৃদয় নামক প্রদেশটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নাগমতী বেদের মেয়ে।

পৌষালী বাতাসের মত অস্পষ্ট গলা। শঙ্খিনী বললো, "উরে আর খুন করতে হবেক নাই। তু হামারে কুথাক লিয়া চলেক। হামরা ঘর বান্ধিক, ছানাপোনা হবেক। তু আর হামি। হামি আর তু থাকবিক। আর কেহ না। রাজী তো! হামার বড় সাধ, ঘরের—"

* * *

"ঘর!" আর্তনাদ করে উঠল তরুণ মিশনারী। ঘরের স্বপ্ন-কে নোঙর ফেলার সমস্ত কল্পনাকে চুরমার করে দিয়েই তো সে চলে

বিমল রায়ের "পরিবার" চিত্রের তারকা
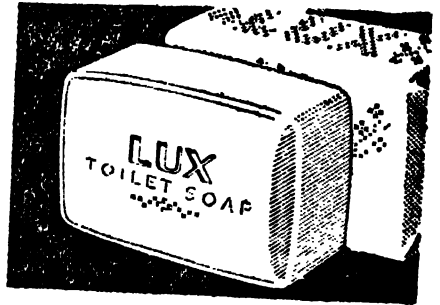
এসেছে চার্চের চ্যাপেলে! মাথার ওপর তুলে নিয়েছে প্রীচিংএর পতাকা। শিউরে উঠলো ম্যাকলীন। বুকের মধ্যে কোন অলক্ষ্য রিপুঘর থেকে অট্টহাসি উঠলো জুডাসের। আবার উচ্চারণ করলো ম্যাকলীন; "ধর!"

"তুর কী হলেক সাহেব!" খানিকটা চুপচাপ। তার পরেই শঙ্খিনী বললো, "বুঝছিক, তু ঘর চাস্ নাই। তুও বেদে। বেশ, ঘর না বাঁধবিক তো হামাদের দলে আয়। তুরে না পেলে হামার জান খ্যাম হই যাবেক সাহেব।" অপূর্ব আবেদন! মধুর আত্মসমর্পণ!

তবু শিলীভূত একটা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো ম্যাকলীন। এক মেরুতে শঙ্খিনী, আর এক মেরুতে চার্চ। দু'টি দ্বন্দ্বের মাঝখানে বিষুবরেখায় দাঁড়িয়ে মনটা ঘূরপাক খেতে লাগলো ম্যাকলীনের। এক দিকে দুর্বার আকর্ষণ, আর এক দিকে একটি নিষ্ঠুর তর্জনী তুলে রেখেছে মানবপুত্রের ক্রুদ্ধ নির্দেশ।

"ফাদার"—বাইবেলের কালসাপ পাশেই হিস্-হিস্ করে উঠলো যেন। চমকে তাকালো ম্যাকলীন। পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ডিক। আবো আবিষ্কার করলো ম্যাকলীন, তার বুকের ওপর নিবিড় আবেশে শঙ্খিনী এখনও তার মাথাটা রেখে দিয়েছে। সাদা সারপ্লিসের ওপর রাশি রাশি কালো চুল ছড়িয়ে রয়েছে। ত্রস্তে শঙ্খিনীকে বুকের ওপর থেকে সরিয়ে দিল ম্যাকলীন। তার পর থর-থর গলায় বললো, "তুমি যাও এখন।"

আকাশে কৃষ্ণা পঞ্চমীর ক্ষয়িত চাঁদ। নীচে বিবর্ণ জ্যোৎস্না। আশ্চর্য হিমাক্ত গলায় ডিক বললো, "রাত্রি সময়টা বড় খারাপ। আপনি সেদিন সেন্ট ম্যাথর গস্পেল ব্যাখ্যা করছিলেন ফাদার। অন্ধকারে রিপুরা সব মেয়েছেলের মূর্তি ধরে না কী আসে?"

এতক্ষণে অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে শঙ্খিনী, প্রথমে একটু হকচকিত হয়ে গিয়েছিল। এবারে সে তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "এই যে সাহেব, এই শয়তানটা হামার লগে বেসরম কাম করতে চাইছিলেক।"

কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছে না ম্যাকলীন। জলে-ডোবা মানুষ যেমন অতলে তলিয়ে যেতে যেতে অনুভব করে, তার কান, নাক ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। পৃথিবীর কোন শব্দ, কোন গন্ধ যেমন তার ইন্দ্রিয়ের কাছে কোন আবেদন আনে না, ঠিক তেমনি ম্যাকলীন একটি ভয়াল আতঙ্কের অতলান্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে লাগলো। অতীন্দ্রিয় কোন ভয় চার পাশ থেকে রাশি রাশি রোমশ বাহু দিয়ে হৃৎপিণ্ডটাকে যেন একটু একটু করে চাপ দিয়ে চলেছে। একেবারে বিচূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই রোমশ থাবার বন্ধন থেকে আর নিস্তার নেই। অস্ফুট গলায় ম্যাকলীন বললো, "তুমি যাও শঙ্খিনী।"

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো শঙ্খিনী। তার পর কালো একটা বিদ্যুতের চকিত রেখা টেনে ভাতারমারীর বিলের দিকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এক সময় দু'জনে পাশাপাশি চলতে সুরু করলো। ডিক আর ম্যাকলীন। টেনে টেনে, আশ্চর্য ব্যঙ্গের ভানায় কথাগুলোকে মুক্তি দিল ডিক, "ফাদার, যাই বলুন, ওদেশের এই কান্ট্রি গার্লগুলো বিশেষ করে জিপ্‌সি মেয়েরা ভারী ভালো। ভেরী চীপ্! এদের মধ্যে প্রীচিংএ লাভ অনেক দিক থেকেই আছে।"

ছোটবেলায় কিছুদিন একটা মিশনারী স্কুলে পড়েছিল ডিক। তাই ইংরেজী ভাষাটার সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছে কিছু কিছু। তা ছাড়া স্বয়ং যীশু যে ভাষায় অভয় দান করেছেন, সেই পবিত্র ভাষার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে ডিকের। সে অনুপ্রাণিত হয়ে বললো, "যাই বলুন ফাদার, মেয়েছেলেরা হলো প্রেরণা। তা চার্চেই হোক্ আর সংসারেই হোক্। ওরা থাকলে কাজ করার এনার্জি দু'গুণ, তিনগুণ বেশী পাওয়া যায়। আপনি যখন একটা এক্‌জাম্পেল্ সেট্ করলেন, তখন বুঝলেন কি না! আমরা তো আর কেউ যীশু নই, হেঁ—হেঁ। যেশাস্ ঐ একটাই জন্মায়! তাই বলছিলাম, প্রীচিং যেমন চলছে, তেমনি চলুক। আমরা আমাদের মত একটু ফুর্তি, এই একটু রিক্রিয়েশন্"—

কথাগুলো ম্যাকলীনের মুখের ওপর কেমন প্রতিক্রিয়া আঁকে, তাই লক্ষ্য করতে লাগলো ডিক। আর্তনাদ করে উঠলো ম্যাকলীন, "হোয়াট্ ডু ইউ মীন্, ইউ ডেভিল"—

এবার কোন জবাব দিল না ডিক। শুধু, খিক্-খিক্ করে গোরস্থানের শিয়ালের মত হেসে উঠলো। তার দাঁতগুলো আশ্চর্য সাদা মনে হলো ম্যাকলীনের। মনে হলো, প্রস্তর-যুগের কোন অর্দ্ধমানব শিকার ধরার জন্য গ্রাস মেলেছে। চমকে উঠলো ম্যাকলীন। শিউরে উঠলো।

দু'জন এগিয়ে যেতে লাগলো। একজনের পদক্ষেপে দিগ্বিজয়ের সংকেত। আর একজনের পদক্ষেপ থর-থর। অসংলগ্ন। অনিয়মিত।

শীতের পরমায়ু শেষ হলো। শেষ মাঘের কুয়াশা সরে গেল দিগন্ত থেকে। বসন্ত দিন এলো। এলো ঝির-ঝির বাতাসের সকাল, এলো মৌমাছি-গুন্-গুন্ বিকেল। রামধনুর সাত রঙ এনে ফুলে ফুলে ফাগ ছড়িয়ে দিল চৈতী হাওয়া।

অনেক দিন পর আজ দোতলা থেকে নীচের বাগানে নেমে এসেছে ম্যাকলীন। সেই বিভ্রান্তির রাত্রিটাকে মনে পড়লো তার। শঙ্খিনী, আকাশে ক্ষয়িত চাঁদ, বেনেবউ ফুলের সৌরভ— সব মিশিয়ে কী একটা বিপর্যয় যেন ঘটে গিয়েছিল সেদিন! তারপর বাইবেলের কালসাপের মত ডিকের আবির্ভাব। সেদিন চার্চে ফিরে দোতলার নিভৃতে নির্বাসন খুঁজে নিয়েছিল ম্যাকলীন। চারটে দেওয়ালের কারাগারে সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছে সেদিনের কলুষিত বিভ্রান্তির একটু একটু করে, তিলে তিলে। যেটুকু না হলে দেহ থেকে প্রাণ উধাও হবে, সেটুকু মাত্র আহার্য সে গ্রহণ করেছে। শরীরটা ভয়ানক দুর্বল। মাথার মধ্যে বোঁ-বোঁ ঘূরপাক। বাগানের কাঁকর-পথে এলোমেলো পায়ে হাঁটতে লাগলো ম্যাকলীন। রাশি রাশি ফুল ফুটেছে। রঙে রঙে আলো হয়ে গিয়েছে চার্চের প্রাঙ্গণ। বসন্ত এসেছে। সোনালী চুলের মধ্যে খেলা করে যাচ্ছে দক্ষিণা বাতাস। সারা দেহ ভরে বসন্তের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো ম্যাকলীন। বড় ভালো লাগছে এই চৈতী দিন। ভালো লাগছে এই আলো, এই বাতাস, এই ফুল, এই রঙ। মরশুমী ঝড়ের মত মনের আকাশ থেকে মুছে গিয়েছে শঙ্খিনী নামে একটি দুর্বিপাক। নারী নামে একটি দুর্ঘটনা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে চেতনাটা। এত দিন রুদ্ধদ্বার ঘরের বাইরে যে বিশাল পৃথিবীটা পড়ে রয়েছে, তার কোন খবরই নেয় নি ম্যাকলীন। এত দিন নিজেকে ক্ষয়িত করে করে, নিজেকে বিন্দু বিন্দু নিঃশেষ করে, মনের মধ্যে নারী কামনার শেষতম জীবাণুটিকেও সে

পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। তার এই আত্মশুচির মুহূর্তগুলিতে নিজেকে শাসন করার, চেতনাকে প্রহার করার প্রহরে আর কাউকে সে কাছে ভিড়তে দেয় নি। ম্যাকলীন ভাবতে লাগলো, কবে শীত এসেছিল, কবে চলে গিয়েছে। আবার কবে একদিন বসন্ত এসেছে। প্রসন্ন চোখে চারদিকে চনমন করে তাকাতে লাগলো ম্যাকলীন।

চার্চের ফটক পেরিয়ে শিস দিতে দিতে সামনের প্রাঙ্গণে ঢুকলো ডিক। আর ঢুকেই ম্যাকলীনের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। ভূত দর্শন হলো যেন তার। শিস নিবে গেল ঠোঁট থেকে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ডিক।

এত দিন চার্চের কোন খবরই রাখে নি ম্যাকলীন। ডিকের গতিবিধি, প্রীচিং কেমন চলছে—সেদিকে কণামাত্র মনোযোগ ছিল না তার। আজ এতদিনের প্রায়শ্চিত্তের অধিকারে সে ফিরে পেয়েছে হারানো সিংহাসন। এতদিন ডিকের জবাবদিহি নেবার সাহস তার হতো না। খুশীমতো চলাফেরা করতো ডিক। আজ প্রায়শ্চিত্তের কণা কণা শক্তি জমিয়ে নিজেকে দুর্জয় করে তুলেছে ম্যাকলীন। স্থির গলায় সে ডাকলো, "ডিক, এদিকে এসো।"

গুটি গুটি পায়ে সামনে এসে দাঁড়ালো ডিক; "ইয়াস্ ফাদার, এখন কেমন ফীল করছেন?"

এবার ম্যাকলীনের জিজ্ঞাসাটা সরাসরি, "প্রীচিং কেমন চলছে ডিক? আমি তো এ ক'মাসে কোন খবর নিই নি। আশা করি, কাজ ভালই চলছে। সব ভারই তো তোমার ওপর ছিল।" আশা উজ্জ্বল চোখে তাকালো ম্যাকলীন।

বিস্ময় ঢুললো ডিকের কণ্ঠে, "ইয়াস্ ফাদার! তবে, মানে, এই আর কি—"

"হোয়াট্‌স ম্যাটার? কী ব্যাপার? চার্চের কাজ কেমন চলছে, জিজ্ঞাসা করেছি। তা তুমি ইতস্ততঃ করছো কেন? তরুণ মিশনারীর গলা কঠোর হলো "আমি এ মাসের কাজকর্মের সব হিসাব চাই। আমাকে সব বুঝিয়ে দিতে হবে, এ ক'মাস যা করেছ, তার সমস্ত কিছু। বী রেডি।"

এই ক'টা মাস! ডিকের মেরুদণ্ড বেয়ে হিমধারা নামতে শুরু করলো যেন। এই ক'টা মাস সে যা করেছে, তা ভাবতেও কোন মিশনারী আত্মহত্যা করে বসবে নির্ঘাৎ। সে ভাবনা এই চার্চের পবিত্র প্রাঙ্গণে একান্ত বিজাতীয় সহজলভ্য নারী-মাংস আর পচাই, দুই নিষিদ্ধ রসে এই কটা মাসের জীবনকে স্নান করিয়ে দিয়েছে ডিক। প্রতিদিন রতিসঙ্গিনীর সন্ধানে গিয়েছে বেদেদের ডেরাতে তারপর, তারপরের ইতিহাস সে আর সেই শঙ্খিনীই জানে শুধু। আর জানে নিবিড় কোন নির্জন রাত্রি। দিনের পর দিন সুসমাচার নিয়ে বেরিয়েছে ডিক। আর অনিবার্য নিয়মে একেবারে এসে থেমেছে বেদেদের তাঁবুতে। ম্যাকলীন নির্বাসন নিয়েছে দোতলার নির্জনতায়। অতএব মসৃণতম সুযোগ এসে গিয়েছে থাবার মধ্যে। শঙ্খিনীকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ঐ ভাসমান জীবন থেকে তাকে নিয়ে কোথাও, কোন বংশীবটের ছায়াতলে ঘর বাঁধবে। নাগমতীর স্বপ্নকে, ঘরের কামনাকে চরিতার্থ করবে।

ডিক বলতো, "তোমাকে ঘর দেব, সব দেব। আমি তোমার দেশের মানুষ। আর ঐ সাহেব সাত সমুদ্দর পাড়ি দিয়ে বসেছে। তাও আবার চলে গিয়েছে। ওদের পীরিত করলে খালি ঠকতে হয় শঙ্খিনী।"

শঙ্খিনী চমকে উঠেছিল, যেন স্নায়ুগুলোর ওপর সাপের ছোবল পড়েছে তার; "চলে গেলক উই সাহেব। হামার কাছে আর একবারও আসলক নাই।"

"তবেই বোঝ, কী পীরিত করত তোমাকে! চল, চল, ঐ বিলের দিকে যাই আমরা। কেমন?"

প্রথম প্রথম ভূতগ্রস্তের মত ডিকের পেছনে ছায়া হ'য়ে অনুসরণ করত শঙ্খিনী। কয়েক বার চার্চে এসে ম্যাকলীনকেও সন্ধান করে গিয়েছে সে। কিন্তু দোতলার সেই নির্বাসন, সেই ছোট্ট ঘরের চারটে দেওয়াল বাইরের পৃথিবীকে বার বার প্রতিহত করে ফিরিয়ে দিয়েছে। শঙ্খিনীর কোন খবরই পৌঁছায় নি ম্যাকলীনের কানে। তার পর একটু একটু করে একটা পিচ্ছিল পথে ডিকের লালসায় নিজেকে সমর্পণ করেছে শঙ্খিনী। সুন্দর শ্রীঅঙ্গকে ঢেলে দিয়েছে রতির গ্রাসে। অন্ধকার রাত্রিতে তাদের সেই কুশ্রী কামের বাসর দেখতে দেখতে শিউরে উঠেছে অকোশের সপ্তর্ষি। চমকে উঠেছে ফাল্গুনী-শতভিষা-ভদ্রা—

এই ক'টা মাসের এই ইতিহাস। কালো শরীরটা বেয়ে বেয়ে কালঘাম ছুটলো ডিকের। ম্যাকলীনের চোখের সামনে দাঁড়াতে পারছে না সে। মনে হচ্ছে, একজোড়া বল্লম সরাসরি হৃৎপিণ্ডে এসে বিঁধে গিয়েছে। অনেক দিন আগের সেই রাত্রিতে

ম্যাকলীনের বুকের ওপর শঙ্খিনীকে আবিষ্কার করেছিল ডিক। সেদিন এই তরুণ ফাদারকে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিতে পারতো সে। কিন্তু এই ক'মাসের প্রায়শ্চিত্ত তাকে দুর্জয় করে তুলেছে। এ ম্যাকলীন আলাদা। এর দৃষ্টিতে মশাল, ক্ষীণ দেহে বজ্রের আভাস। আর দাঁড়াতে পারলো না ডিক। একটা আহত কুকুরের মত সেখান থেকে পালিয়ে গেল সে। পালিয়ে বাঁচলো। এই ক'মাসের ধিক্কার, এই ক'মাসের গ্লানি একটি রক্তমাংসের দেহে এত শক্তি সঞ্চার করে, তা কী কখনও আগে জেনেছিল ডিক!

আরো কয়েকটা মাস ম্যাকলীনের দৃষ্টির আড়ালে পালিয়ে পালিয়ে কাটিয়ে দিল ডিক। পোঁটলা ভরা মাথায় নিয়ে চার্চ থেকে বেরিয়ে যায়, আবার ফেরে নিঝুম রাত্তিরে। চার পাশের পৃথিবী তখন একটি নিটোল ঘুমের অতলান্তে তলিয়ে যায়।

আশ্চর্য নিস্পৃহ হয়ে গিয়েছে ম্যাকলীন। ব্যাপারটা বুঝেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যায়। একটা নির্বেদের দুর্গে নিজেকে আশ্রয় দিয়েছে সে। এই ক'মাসের নির্বাসন, তার মধ্যে একটা নিঝিবিলির কামনা রচনা করেছে। এ সব আর ভালো লাগে না তার। মাঝে মাঝে ছোট একটা টাট্টু নিয়ে বাজীতপুরের বন্দরে যায়, কখনও বা কমলাঘাটের গঞ্জে, কোন সময় বাসাইলের ওদিকে কোন গ্রামান্তরে। তার দৃষ্টিকে, তার মনকে বেদেদের তাঁবু থেকে একেবারেই সরিয়ে এনেছে ম্যাকলীন। একান্ত নিরাসক্ত হয়ে গিয়েছে সে। এত দিন পর তরুণ মিশনারীর রক্তে রক্তে চার্চের দিগ্বিজয় হয়েছে। একটি ঝরাপাতার মত উড়ে গিয়েছে আগনীস্। আগনীসের স্বেদলমাখা কে এক বেদের মেয়ে? তার নামও আজ আর মনে আসে না ম্যাকলীনের। বেদেদের গৃহস্থালীর দিকে আর যায় না সে। বন্দরে কী গঞ্জে প্রীচিং শেষ করে সরাসরি চার্চে ফেরে। তারপর সমস্ত চেতনাকে একাগ্র করে বাইবেলের পাতায় ডুবিয়ে দেয়। শামুকের মত একটি নিভৃত কোটরে নিজেকে গুটিয়ে এনেছে ম্যাকলীন। একটা রেভারেণ্ড ফাদার সাধারণ একটা ব্যাপটাইজড নিগার্ডের চোখে হতমান হলো, তার একটা ভয়ঙ্কর দুর্বলতা ধরা পড়লো; এই জ্বালা, এই দাহন তাকে পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে এত দিন।

বসন্তের পর গ্রীষ্মের আকাশে আগুনের বৃষ্টি হয়ে সময় উড়ে গেল। এখন সময় এসেছে বর্ষার মেঘে মেঘে নিরুদ্দেশের পারাবত হয়ে। আষাঢ় মাস। আকাশে কাজল মেঘ।

একদিন সিরাজদীঘার ক্যাথিড্রাল থেকে বড় পাদ্রী মঙ্গোপার্ক এলেন। মস্ত রেভারেণ্ড তিনি। এই অঞ্চলের সমস্ত চার্চগুলো তাঁরই নির্দেশে, তাঁরই পরামর্শে চালিত হয়। ফাদারটি ভারী গম্ভীর। একজোড়া চামরগোঁফ সেই গাম্ভীর্যকে আরো মর্যাদা দিয়েছে। ছ' ফুট লম্বা চেহারা। খাস আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে এখানে এসেছেন বিশ বছর আগে। এদেশের হৃৎস্পন্দনের প্রতিটি খবর তিনি রাখেন।

অলটারের সামনে এসে বেতের চেয়ারে বসলেন মঙ্গোপার্ক। পাশে ম্যাকলীন। মঙ্গোপার্ক বললেন "তারপর চ্যাপ, তোমার এখানে খবর কী? আলোকমন্ত্রে ক'জনকে দীক্ষা দিতে পারলে এ ক'মাসে? ছ'-সাত মাস এদিকের কোন খবর রাখতে পারি নি"।

"বেশী না ফাদার! দশ জন।" মাথাটা নীচের দিকে নেমে গেল ম্যাকলীনের।

"মাত্র দশ জন!" প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন রেভারেণ্ড মঙ্গোপার্ক। "সাত মাসে দশ জন! এই হারে ব্যাপটাইজড হ'লে আর একটা ডেল্যুজ এসে যাবে শুধু এই অঞ্চলটুকুতে প্রীচিং শেষ হ'তে। অসম্ভব, এখান থেকে চার্চ তুলে দিতে হবে দেখছি।"

চুপচাপ বসে রইলো ম্যাকলীন। একেবারেই নিরুত্তর।

এক সময় আবার মঙ্গোপার্ক বললেন, "সেই ডিক কোথায়?"

"কোথায়ও হয়তো বেরিয়েছে।" ম্যাকলীনের জবাবটা অত্যন্ত নিস্পৃহ।

"তা জানো না তুমি?" কয়েক সেকেণ্ড পিট্ পিট্ করে ম্যাকলীনকে লক্ষ্য করলেন মঙ্গোপার্ক। তারপরেই গুলবাঘের মত গর্জন করে উঠলেন, "ইট্ ইজ চার্চ মাই বয়। কড়া ডিসিপ্লিন আমি চাই। একটু এদিক-ওদিক হ'লে চলবে না। তোমার না পোষালে সোজা হোমে ফিরে যাও। চার্চের লোকের খবর তুমি রাখবে না তো, রাখবে কে? চার্চ ওয়ান্টস এফিসিয়েন্ট ফেলো।"

চমকে উঠলো ম্যাকলীন। উত্তেজনায় চামরগোঁফ থেকে কয়েক গাছা পট্ পট্ তুলে ফেললেন পাদ্রী মঙ্গোপার্ক।

পরের দিন সকাল থেকে বৃষ্টি সুরু হলো, অবিরাম। যতিহীন। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ম্যাকলীন। কাচের শার্সীর ওপারে ঝর ঝর বৃষ্টির চিক। তারও ওপারে বেদেদের সাদা তাঁবুগুলো কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সামনে দূর্বাদলের মাঠ। সবুজ ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে মাথা তুলে দিয়েছে রাশি রাশি চোরকাঁটা। তাদের ফাঁক দিয়ে সাদা জল খল খল খেলা করে চলেছে। বিশাল একটা কবন্ধের মত পড়ে রয়েছে ও পাশের পাকুড় গাছটা। দু'টো মরা কাকের ছানা ভেসে চলেছে নয়ানজুলির খরস্রোতে। আর একটা মহাপ্রলয়ের সূচনা যেন।

* * * *

নীচের অলটারে বসে বীডস্ জপছেন মঙ্গোপার্ক। কাল সারা রাত ডিককে নিয়ে পড়েছিলেন। তাকে শাসিয়ে, ধমকিয়ে, কখনও চামরগোঁফের কয়েক গাছাকে নির্মূল করে সারাটা রাত কাটিয়েছেন। সেই ধমক, সেই শাসন থেকে একটিমাত্র মৌন বক্তব্য আবিষ্কার করা গিয়েছে। প্রয়োজন হ'লে এই চার্চ তিনি বন্ধ করে দেবেন।

দুপুরের দিকে বর্ষণ থামলো। থমথমে আকাশটা বিশাল একখানা সীসার পাতের মত ছড়িয়ে রয়েছে। সামনের প্রাঙ্গণে বেরিয়ে এলো ম্যাকলীন। আচমকা গুরুগুরু মেঘ ডেকে উঠলো। চমকে আকাশের দিকে তাকালো সে। কিন্তু সেখানে একটুও মেঘের কারসাজি নেই। সহসা তার দৃষ্টিটা সামনের দিকে প্রসারিত হলো। বেদেদের তাঁবু যেদিকে, সেদিক থেকে ভৈরব গর্জনে কষাড়বন, নাটাঝোপ দলিত করতে করতে ছুটে আসছে অজস্র মানুষ। আকাশের দিকে দিকে উঠে যাচ্ছে প্রচণ্ড কোলাহল। এই চার্চের দিকেই ছুটে আসছে তারা, আসছে

নির্মম পদক্ষেপে। পৃথিবীটা যেন টলমল করে কাঁপছে। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে মানুষগুলো। নয়ানজুলি ডিঙিয়ে, বিল সাঁতরে হু-হু করে ছুটে আসছে। কালো কালো বিন্দুর মত দিগন্তে ফুটে উঠেছে মানুষগুলো। এরাই কী তবে আর একটা ডেল্যুজের মেসেঞ্জার! আর এক প্রলয়ের বার্তাবাহী! চমকে উঠলো ম্যাকলীন।

নীচের অলটার থেকে বেরিয়ে এসেছেন মঙ্গোপার্ক। অমন জবরদস্ত রেভারেণ্ড ফাদার পর্যন্ত একটু বিচলিত হয়ে পড়েছেন, "কী ব্যাপার ম্যাকলীন? এই নিগার্ডগুলো এমন ছুটে আসছে কেন? এই চার্চের দিকেই আসছে যেন।" চামরগোঁফকে সোহাগ করতে ভুলে গেলেন মঙ্গোপার্ক।

"ইয়াশ ফাদার"—নির্বিকার জবাব এলো ম্যাকলীনের।

পাশের একটি ঘর থেকে ছুটে এসেছে ডিক। মঙ্গোপার্কের সঙ্গে একটা নিরাপদ ব্যবধান রেখে দাঁড়িয়েছে।

একটু পরেই সেই ভৈরব জনতার বন্যা এসে আছড়ে পড়লো চার্চের প্রাঙ্গণে। চমকে উঠলো ম্যাকলীন। সকলের সামনে রাজা সাহেব আর শঙ্খিনী। তাদের পেছনে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে যাযাবরেরা। আর অজস্র জোড়া ক্রুদ্ধ চোখ ঝাঁপিয়ে পড়েছে ডিকের ওপর।

রীতিমত সোরগোল। চামরগোঁফে তা' দিয়ে গর্জন করে উঠলেন মঙ্গোপার্ক। অনেকটা আত্মস্থ হয়েছেন তিনি; "ষ্টপ নয়েজ। চুপ করো। ইউ ডার্টি ব্ল্যাকিজ—"মুহূর্তে স্তব্ধ হলো সেই ভৈরব মানুষগুলো।

সেই বিভ্রান্তির রাত্রিটার পর আবার চোখাচোখি। শঙ্খিনী আর ম্যাকলীন। আগনীসকে আবার মনে পড়লো ম্যাকলীনের। এ্যাটলাণ্টিকের ওপারের রজনীগন্ধা এ দেশের মাটিতে কৃষ্ণকলি হয়ে ফুটেছে। শঙ্খিনীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনের মধ্যে কোথায় যেন ক্ষ্যাপা মাতন লাগলো। অসহ্য আবেগকে সংযত করতে অন্য দিকে মুখ ফেরালো তরুণ মিশনারী।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল শঙ্খিনী। সোনালী চুল, নীল চোখ, দুধ দেহ—সব মিলিয়ে একটি স্নিগ্ধ স্বপ্নের মত দৃষ্টিটা ভরে যাচ্ছে তার। সহসা উচ্ছ্বসিত গলায় শঙ্খিনী বলে উঠলো, "তু বলে ইখান থেকে চইলে গেছিলিক সাহেব? উই কালা সাহেব হামারে বললক। হামি তিন দিন তুর খোজে আসছিক ইখানে।" ঘন অভিমানে কণ্ঠ আচ্ছন্ন হয়ে এলো শঙ্খিনীর। শিহরণ বইছে তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে।

"কই আমি তো কোথায়ও যাই নি!" বিস্মিত গলায় বললো ম্যাকলীন।

"তবে যে কালা সাহেব হামারে বুললক?"

"চুপ করেক শয়তানী!" গর্জে উঠলো রাজা সাহেব। তার পরেই সামনের দিকে তাকালো সে, হামরা উই সব কিছু শুনবক

নাই। ফাদার যীশুর নাম লিয়ে হামাদের ঘরের মাইয়্যার ইজ্জৎ লিবেক। উ সব চলবেক নাই। সিধা কথাটা বুললক হামি। তু দেখ সাহেব, শঙ্খিনীর ইজ্জৎ কুন সাহেব লিছেক! উয়ার প্যাটের ছোয়ার কী হবেক? ই শঙ্খিনী বলেক না তুই, কুন সাহেব তুর সরম মারলেক!"

গুটি গুটি পায়ে পেছন দিকে সরতে সুরু করেছে ডিক। অজস্র জোড়া চোখ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। সমস্ত শিরারেখার মধ্য দিয়ে বরফ-ধারা নামছে তার। স্নায়ুগুলো আড়ষ্ট হয়ে এসেছে। তার সামনে রাশি রাশি ঘৃণাভরা চোখ। মাথাটা বন্ বন্ করে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। মরা সাপের নির্ভাব দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে।

সহসা আকাশ থেকে সরাসরি একটা বজ্র ব্রহ্মতালুর ওপর যেন এসে পড়েছে মঙ্গোপার্কের। কয়েক মিনিট সময় লাগলো তাঁর আত্মস্থ হ'তে। তারপরেই সচেতন সত্তায় ফিরে গর্জে উঠলেন মঙ্গোপার্ক, "গেট আউট—ইল সন্স অব ডেভিল্স, ইউ হেল—বাইরে ভাগো। নইলে খুন করে ফেলবো। ইট ইজ চার্চ।" স্নায়ুতে স্নায়ুতে, রাগের বারুদে বারুদে যেন আগুন ধরে গেল মঙ্গোপার্কের।

এবার নির্মম ব্যঙ্গ ঝরলো রাজা সাহেবের কণ্ঠ থেকে। "ফাদার যীশু আর মাদার মেরীর নাম লিয়ে হামাদের জাত লিবেক, ইজ্জৎ লিবেক, আর বুলবেক ভাগো! উয়ার প্যাটের ছোয়াটার কী হবেক তু বলেক আগে। তারপর হামরা ভাগিক। উ সব শয়তানি উখানে চলবেক নাই। ধম্মের নামে বজ্জাতি। হামরা সব মানুষ-গুলাকে বুলে দিবক। শঙ্খি বুলেক না, কুন সাহেব উর ইজ্জৎ লিলেক? হামরা একবার দেখবক।"

চামরগোঁফের প্রান্ত দুটো টানতে টানতে অনেকটা প্রসারিত করে ফেলেছেন মঙ্গোপার্ক। চোখ দু'টো তাঁর টকটকে লাল, আর সেই লালের মধ্যে দুটি নীল মণি চক্রাকারে পাক খেয়ে চলেছে।

চার দিকে একবার চনমন করে তাকালো শঙ্খিনী। একবার তার চোখ দুটো এসে পড়লো ডিকের ওপর। চোখ নয়, দুটো জ্বলন্ত শলাকা এসে যেন বিঁধলো ডিকের চামড়ায়। অলক্ষ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল ডিক রোজারিও। তারপরেই দৃষ্টিটা কোমল হ'লো শঙ্খিনীর। বিনীত হলো। মধুর প্রার্থনায় এসে স্থির হলো ম্যাকলীনের মুখের ওপর। ফিস-ফিস গলায় শঙ্খিনী বললো, "ই সাহেব হামার মান-ইজ্জৎ, সরম-ভরম বেবাক লিছেক। হুঁ, ই সাহেব।"

চমকে উঠলো ম্যাকলীন। শিউরে উঠলো ডিক, একটা শঙ্খ-নাগের ছোবল যেন এসে পড়েছে চেতনায়। আকাশ থেকে একটার পর একটা জ্বলন্ত নীহারিকা খসে খসে সমস্ত মানুষগুলোকে যেন স্তব্ধ করে দিয়েছে! কথা বলতে ভুলে গিয়েছে রাজা সাহেব। চোখের মণিগুলো নিথর হয়ে গিয়েছে বেদেদের।

বলে কী শঙ্খিনী! এই মুহূর্তে একটা ডেলুজ যদি এসে পড়তো, পায়ের নীচে পৃথিবীটা যদি ভূমিকম্পে ওলট-পালট হয়ে যেত, তবুও এতখানি বিস্ময়ের কিছু ছিল না মঙ্গোপার্কের। আকস্মিক প্রহারে চামরগোঁফকে সোহাগ করতেও ভুলে গেলেন তিনি। অনেকটা সময় লাগল তাঁর ধাতস্থ হ'তে। এক সময় ভাঙা-ভাঙা গলায় আর্তনাদ ক'রে উঠলেন মঙ্গোপার্ক, "ইজ্ ইট্ শো? হোয়াট্ হেল্! ও যেশাস!"

কিছু একটা বলতে চাইলো ম্যাকলীন। কিন্তু রাশি রাশি রোমশ থাবা যেন তার কণ্ঠনলীকে চেপে ধরেছে। শরীরের সমস্ত পেশীর তলা থেকে আন্দোলিত হতে হতে একটা প্রতিবাদ বার বার গলার দরজায় আঘাত খেয়ে খেয়ে ফিরে গেল। একটি শব্দও মুক্তি পেলো না ম্যাকলীনের কণ্ঠে।

আবার গর্জন করে উঠলেন মঙ্গোপার্ক, "হোয়াট্ হরিবল্! ইউ ডেভিল, ক্রিশ্চ্যানিটি ডিজওনস্ ইউ। মিশনারী নামের তুমি কলঙ্ক। আজই, এ্যাট্ ওয়ান্স তুমি চার্চ থেকে জাহাজে গিয়ে উঠবে। সোজা ইংল্যাণ্ড। বেশী দিন এদেশে তোমাকে রাখলে ক্রিশ্চ্যানিটি বিপন্ন হবে। ফর সেফটি অব যেশাস ইউ মাষ্ট লিভ দিস কাণ্টি। শুনেছো তো বেদেরা কী বলেছে, ফাদার যীশু আর ভার্জিন মেরীর নামে মিশনারীরা নারীর সন্ধানে যায়। চার্চের অল্টারে দাঁড়িয়ে এই ডার্টি আলোচনা করতে হচ্ছে। বাট্ নো মোর!"

আরো একটা চমকের প্রহার অপেক্ষা করছিল মঙ্গোপার্কের জন্য। একবার শঙ্খিনীর মুখের দিকে তাকালো ম্যাকলীন। অনেক, অনেক দিন পরে আগনীসকে মনে পড়লো। সেদিনের রজনীগন্ধা আজ মাটির কৃষ্ণকলি হয়ে ফুটেছে। আগনীস থেকে শঙ্খিনী। আশ্চর্য একটা জন্মান্তর! আশ্চর্য পরিষ্কার গলায় ম্যাকলীন বললো, "আমি চার্চ ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। এই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করবো। এ অবস্থায় চলে গেলে ক্রিশ্চ্যানিটির ওপর অবিশ্বাস এদের বেড়ে যাবে। টু সেভ ক্রিশ্চ্যানিটি এদের সঙ্গে আমি চলে যাচ্ছি ফাদার।"

অনেকটা সময় পার হয়ে গিয়েছে। মঙ্গোপার্কের শুষ্কদৃষ্টির সামনে থেকে কখন যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যাযাবরেরা। ম্যাকলীনও চলে গিয়েছে তাদের সঙ্গে। এক পাশে দুটো হাঁটুর মধ্যে মুখখানা গুঁজে বসে আছে ডিক। ভেঙে চৌচির হয়ে গিয়েছে সে। ডিকের দিকে একবার তাকালেন মঙ্গোপার্ক। তার পর চক্রাকার দৃষ্টিটাকে ভাতারমারীর বিলের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। তার ওপর কী এক উত্তেজনায় চামরগোঁফ থেকে কয়েক গাছা পট্ পট্ উপড়ে আনলেন। আশ্চর্য, এতটুকু ব্যথা বোধ হলো না তাঁর!

রাজা সাহেবের সঙ্গে তাঁবুতে চলে গিয়েছে বেদেরা। একটা পিয়াল গাছের ছায়াতলে এসে দাঁড়ালো ম্যাকলীন আর শঙ্খিনী। শঙ্খিনী বললো, "মিছা কথা কইছিক বুলে কী গোসা হলিক সাহেব! কী আর করবক হামি, হামরা ইখান থিকে চইল্যা যাবক। মিছা কথাটা না বুললে তুরে কী পেতাম সাহেব? তু গোসা হবিক না, তবে হামি গলায় দড়ি দিবক।"

অপরূপ দৃষ্টিতে ম্যাকলীনের মুখের দিকে তাকালো শঙ্খিনী। দৃষ্টি মনকে বিবশ করে দেয়। চেতনায় সুখের শিহরণ ছড়ায়।

সবাই জানেন –
সীল করা প্যাকেটে
পাওয়া যায় ব'লে
ব্রুক বণ্ড চা
নির্ভেজাল ও একেবারে
খাঁটি থাকে
বাজারে
ব্রুক বণ্ড
চায়েরই কাট্‌তি
সব চেয়ে বেশী
প্রতি প্যাকেট
ব্রুক বণ্ড চায়ে
অনেক বেশী কাপ
ভালো চা
তৈরী করা যায়
এই জন্যেই অন্য
যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে
ব্রুক বণ্ড
চা
বেশী লোকে খান !

শিল্প-বাণিজ্যে বাঙালীর স্থান

যে-সব ভারতীয় ব্যবসাদার বাংলা বিহার প্রভৃতিতে কয়লা ও অন্যান্য খনিজ জিনিষের কারবার করেন, তাঁহাদের 'ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন' নামক একটি সমিতি আছে। বাঙালী ছাড়া অন্য কোন কোন প্রদেশের লোকও ইহার সভ্য। শ্রীযুক্ত এস সি ঘোষ অল্পদিন আগে পর্য্যন্ত ইহার সভাপতি ছিলেন। এখন তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের অন্যতম অনারারী সেক্রেটারী। তিনি খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য একজন সংবাদপত্র-প্রতিনিধিকে যাহা বলিয়াছেন, নীচে তাহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। বাংলা দেশে অবাঙালীদের আলাদা বণিক-সমিতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন :—

Some of the representatives of our non-Bengalee friends claim that Bengal is their province of adoption and they are in fact sailing in the same boat with the children of this province. Had this been the fact Bengal would have no cause to clamour. But the facts unfold a different tale. Let me cite the case of Indian commercial associations in Calcutta. Here we find that every community of India who trade in Bengal has its own separate Association, a position which would not have arisen if there were a real identity of interest.

একটি সমিতির একটি কীর্ত্তি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

In April this year, when the whole of Bengal strongly opposed the legislative measure of the Government of India which sought to impose a duty on imported salt, to support chiefly the salt industry at Aden a non-Bengalee commercial organization of Calcutta earned the singular distinction of lending the weight of their support to the measure. This measure is costing the poor consumers of Bengal to the extent of Rs. 40 lakhs annually.

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মিলের মালিকদের সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

It can never be disputed that Bengal is the best market for piece-goods manufactured in the textile mills of the Bombay Presidency and in fact these mills owe their prosperity to the patriotism of Bengal. But what is the attitude of these mills towards Bengal? They practically keep their doors closed against the Bengalee apprentices presumably out of a fear that such training may help in future to promote a large cotton textile industry in this Province. If my mill-owner friends would like to rebut my charges, let them agree to entertain at least 2 Bengalee apprentices in each of their mills and I shall most gladly withdraw my accusation.

Further I would enquire of the non-Bengalee mill-owners if it is not a fact that none of them have got any Bengalee agents in Calcutta? As far as my information goes there is none, and here again I would put the crucial question whether they are prepared to appoint as their agents men of this province. Economically Bengal is now bled white as much by non-Indians as by the non-Bengalees.

অবাঙালীদের সওদাগরী হৌস সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

While we freely make it a grievance against the Clive Street non-Indian firms that almost all the departmental heads are Europeans, we fail to see or rather we pretend to ignore that the non-Bengalee commercial communities are no less but rather worse offenders in this respect.

অবাঙালী ব্যবসাদারদের প্রতি তাঁহার অনুরোধ এই :—

I appeal to my non-Indian and non-Bengalee brethren not to be perturbed over the present public feeling against them—Personally I am not one of those who would bar out from Bengal talent and capital from outside, whether from other Indian provinces or from across the seas. I only wish them to transcend their present outlook. I desire them to give the best out of them to Bengal, if they will. But when working in this province, they must work in partnership and co-operation with the Bengalees. In short, they must give a complete Bengalee complexion to their activities and to their organizations from A to Z. I must say that the remedy lies in their hands. —রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কাচের ফুলদানি

কাচ ভঙ্গুর হ'লেও অন্যান্য ধাতুর তুলনায় কাচের বাসনপত্রের মূল্য আজও কমেনি, বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চ'লেছে। ফুল আমাদের জীবনে যেমন অপরিহার্য্য, ফুলদানি বিনা তেমনি আমাদের ঘর যেন মানায় না। টেবিল কিংবা ড্রেসিং-টেবিলের ধারে একটি ফুলদানিতে কিছু টাটকা ফুল—অনেকের ঘরেই আজকাল দেখতে পাওয়া যায়। আমরা বর্তমান সংখ্যায় কতকগুলি বিদেশী ফুলদানির আলোকচিত্র মুদ্রিত করেছি। আমাদের দেশী কাচের ফুলদানি অপেক্ষা এগুলি যে অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক তা আর লিখে জানাতে হবে না। এখানে উল্লেখ করলে অন্যায় হবে না যে, দেশী ফুলদানি তৈরীর শিল্প এখানে তত উন্নত হয় না। কারণ, হয়তো কাচ-শিল্পের প্রতিষ্ঠানে যথার্থ শিল্প-দৃষ্টির অভাব! ফুলদানির চিত্রসমূহ শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে পাওয়া গেছে।
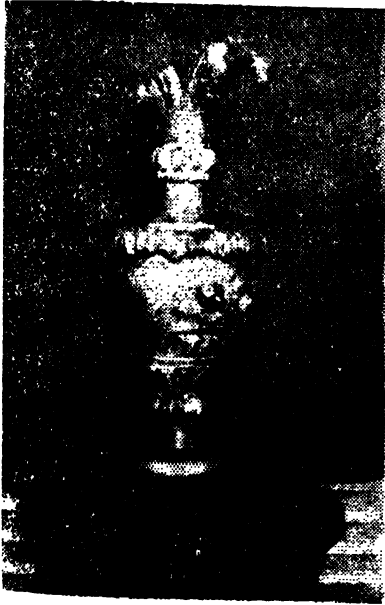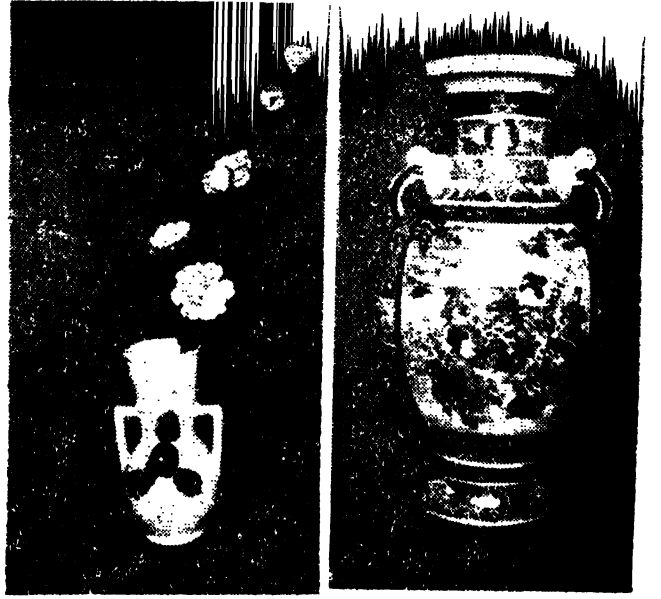
বিদেশী ফুলদানি
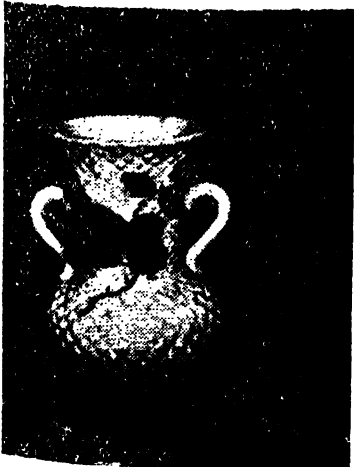
চা-শিল্পের ঐতিহ্য ও অগ্রগতি

আজকের দিনে যেমন বৃদ্ধ থেকে সামান্য শিশুর নিকটও চা-এর নাম অজানা নয়, অর্দ্ধ শতাব্দী আগেও অন্য দেশে যেমনই হোক, ভারতবর্ষে অন্ততঃ এমনি ছিল না। আমরা জানি, চা-এর আদি জন্মস্থান চীনদেশে, ভারতে যথার্থ শিল্প হিসাবে এর সূচনা—মাত্র এক শত বছর কাল। এক্ষণে সহর থেকে গ্রাম অবধি ধনী-দরিদ্র প্রায় সকলের ঘরেই এর অতিমাত্র সমাদর—পানীয় হিসাবে এইটি জলের ন্যায়ই একরূপ অপরিহার্য্য। ক্লান্তি অপনোদন, মনে স্ফূর্ত্তি ফিরিয়ে আনা এবং কাজে মেজাজ ও আনন্দ সৃষ্টির জন্যে অন্ততঃ এক কাপ চা যেন এ যুগে না হলেই নয়। কথায় আবার বলাও হয়ে থাকে—"ইহাতে নাহিক মাদকতা দোষ কিন্তু পানে করে চিত্ত পরিতোষ।"

মহাচীনে চা-পানের প্রচলন সত্যি কবে থেকে হয়, আজ তার সঠিক হিসাব খুঁজে হয়ত পাওয়া যাবে না। তবে ইতিহাস পর্য্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, চীন থেকে শীতপ্রধান ইংল্যাণ্ডে যেয়ে পানীয় হিসাবে এইটি চালু হয় সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়। গোড়াতেই এ কিন্তু সে দেশেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি, ইহা তখন ছিল ধনাঢ্য ব্যক্তি ও রাজা-বাদশাদের একটি বিলাসিতার ব্যাপার—উচ্চমহলে অভিনব দুষ্প্রাপ্য জিনিসরূপে পরিগণিত। ভারতভূমি চীনের কাছাকাছি হলেও চীন থেকে এইটি এখানে সরাসরি এল না, এসেছে ইউরোপ ঘুরে ইংরেজের হাত ধরে। তবে এ ব্যাপারে চীনের মর্য্যাদা যে-টুকু পাবার, সে না দিয়ে উপায় নেই।

ইংল্যাণ্ডে চীনা চা যে বাজার সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস পায়, তার মূলগত কৃতিত্ব ইংরেজ বণিকের নয়। ওলন্দাজ বণিকরাই দ্বিতীয় চার্লস-এর শাসন আমলে এইটি সে দেশে নিয়ে গেলো বলে আমরা জানতে পারি। প্রাচ্য থেকে বিশেষতঃ চীন থেকে অতীতে প্রতীচ্যে অনেক জিনিসই আমদানী হয়ে যায়—কাগজ, মুদ্রণযন্ত্র, গোলা-বারুদ এসব। কিন্তু পানীয় হিসাবে চা গিয়ে পৌঁছে সে দেশের অভ্যন্তরে বহু পরে এবং বেশ ধীরে ধীরে। এর ন্যায়সঙ্গত কারণ খুঁজবার চেষ্টা আজ বৃথা, তবে প্রাচ্যভূমির এই চা-সম্পদ এক্ষণে চাহিদা মিটিয়ে চলেছে শুধু ইংল্যাণ্ডের নয়, সারা দুনিয়ারই।

ডাচ বণিকরা যখন বিলেতের বাজারে চা নিয়ে হাজির করল, তখন এর মূল্য ছিল খুবই চড়া। রাণী আনি অবশ্য চা-পানটাকে একটা ফ্যাশন হিসাবে প্রচলন করেন এবং সেই থেকে ইংল্যাণ্ডে এইটি বেশ জনপ্রিয়ও হয়ে উঠতে থাকে সত্যি কিন্তু তাতেই এর দাম কমে গেল না অন্ততঃ উল্লেখ করবার মতো। দাম কমলো বেশী রকম ঠিক তখনই, যখন বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চা-এর বাজারে প্রবেশ করল এবং ভেঙ্গে দিল ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এত কালের একচেটিয়াগিরি। বৃটিশ বণিকরা শুধু এইটুকু কাজ শেষ করেই থামলো না—তারা ক্রমেই খুঁজতে লাগলো, কি করে এই চমৎকার পানীয়টি সস্তায় জনসাধারণ বিশেষ ভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সহজলভ্য করে তোলা যায়। বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ্ স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস্-এর সঙ্গে তারা পরামর্শও চালালো—বৃটিশ ভারতে যদি চা-উৎপাদন সম্ভব হয়। কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর অনুরোধে স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস্ চা-চাষ সম্পর্কে শেষ পর্য্যন্ত একটি মূল্যবান স্মারক-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ সকলেরই লক্ষ্য ছিল—চা-এর বাজারে যে একচেটিয়া আধিপত্য চলে আসছিল, উৎপাদক হিসাবে চীনাদের এবং বৈদেশিক চা-চালানকারী হিসাবে ওলন্দাজদের, তা নষ্ট করে দেওয়া।

বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভ করলো বটে, কিন্তু এ শিল্পের উপর একচেটিয়া অধিকার তাদেরও বজায় রইল না। আসামে তখনই প্রথম শ্রেণীর চা উৎপন্ন হচ্ছে কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আসামের চা-ব্যবসাগুলো চলে গেলো নবগঠিত আসাম কোম্পানীর হাতে। সেই সময় থেকে উক্ত শতাব্দীর শেষাশেষি পর্য্যন্ত একমাত্র আসাম কোম্পানীই চা উৎপাদন করে মোটামুটি ১০ কোটি পাউণ্ড। ভারতীয় চা সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বাজার ছেয়ে ফেলতে থাকে যে প্রায় সকল ইংরেজের নিকটই এইটি একটি মনোহারী অত্যাবশ্যক পানীয় হয়ে দাঁড়ায়।

চা-উৎপাদনের জন্যে উষ্ণ অথচ আর্দ্র-জলবায়ুর প্রয়োজন হয়, ফলে পৃথিবীর সব দেশে বা একই দেশের সকল অঞ্চলে চা-শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব নয়। চা-উৎপাদনকারী প্রধান দেশ হিসাবে চীনের পরই এখন ভারত, সিংহল, পাঞ্জাব, জাভা ও জাপানের নামই উল্লেখযোগ্য। ফরমোসা, টাঙ্গানিকা, ককেশাস পাহাড়, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানেও বেশ কিছু পরিমাণে চা অবশ্যি জন্মে থাকে। জল দাঁড়াতে না পারে, এমন ঢালু জমিই চা-চাষের পক্ষে ভাল বলে দেখা যায়। ভারতের মধ্যে ও আসামের পর্ব্বতগাত্রে, পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও ডুয়ার্স অঞ্চলে, মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর ও পাঞ্জাবের পার্ব্বত্যভূমিতে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। এর ভেতরও আবার লক্ষ্য করবার—গোটা ভারতের উৎপন্ন চা-এর প্রায় অর্দ্ধাংশই জন্মে থাকে একমাত্র আসাম রাজ্যে। তার পরই অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ ও মাদ্রাজের স্থান।

চা-উৎপাদনে চীনের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ করতে হলেও রপ্তানী-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারত ও সিংহলের পরে এর স্থান। জাপান, জাভা ও পাকিস্তান থেকেও কিছু পরিমাণ চা বিদেশে রপ্তানী হয়ে থাকে। ভারতের চা রপ্তানী হয় ইংল্যাণ্ড, রুশিয়া, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়ায়। বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর বিশ্বে চা-এর উৎপাদন অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সেই সঙ্গে চা-এর মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতের বহু চা-বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় চা-এর একটি বাজার সৃষ্টি হওয়ায় এবং সরকারী সাহায্যও এগিয়ে এলো বলে সে দুর্গতি খানিকটা সামলে নেওয়া গেছে। আমেরিকায় চা-এর চাহিদা বাড়িয়ে তোলবার জন্য ভারতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রচারকার্য্য চালাচ্ছে সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়াও।

ভারতে ৭ লক্ষ ৯১ হাজার ৩৭৩ একর জমির উপর ৬,৮০০টি চা-বাগান রয়েছে এবং এতে কাজ করছে দিনের পর দিন লক্ষ লক্ষ নিরলস কর্ম্মী। এ শিল্পে এখানে প্রায় ১১৩ কোটি টাকা মূলধন খাটছে—এবং এর বেশীর ভাগেরই মালিক এখন পর্য্যন্ত বিদেশী বণিকরাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ভারতীয় পুঁজি এই প্রচেষ্টায় খাটানো হচ্ছে অবশ্য পূর্ব্বের চেয়ে বেশী। সরকারী মহলে প্রয়োজন অনুযায়ী চা-শিল্প নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি নিয়ে আলাপ আলোচনার কথাও সম্প্রতি শোনা যায়।

ভারতে চা-শিল্পের আজ যে অগ্রগতি, কার্য্যতঃ এর সূত্রপাত বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগেই বলা চলে। প্রথমটায় এ শিল্প গড়ে উঠে ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে এবং তারপর অন্য দিকে এর প্রসার লক্ষ্য করা যায়। চা-এর বাজার সব সময় একরূপ থাকে না, উঠতি-পড়তি এর খুব বেশী। গত বর্ষেই (১৯৫৬ সাল) চা-এর বাজার উঠতি-পড়তি গেছে একটু অতিমাত্রায়। অবশ্য এর কতকগুলো অনিবার্য্য কারণও যে না ছিল, তা নয়। অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় এবং রপ্তানী বরাদ্দ ও রপ্তানী শুল্কের জন্যই এর অবস্থা অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে উঠে। সম্প্রতি কয়েক মাস ধরে সুয়েজখাল প্রসঙ্গে যে আন্তর্জ্জাতিক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, চা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া তা অনস্বীকার্য্য।

ভারতের একটি প্রধান শিল্প-সম্পদ হচ্ছে চা, এই সম্পর্কে কিছুমাত্র সংশয় নেই। এদেশের চা-বাগান সমূহের অবস্থা-ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্য্যালোচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছেন। এঁদের সুপারিশের উপর এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে বহুল পরিমাণে, ইহা নিশ্চিত। দেশ-বিভাগের পরিণতিতে শ্রীহট্ট জেলার বেশ কতকগুলো চা-বাগিচা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—যা পূর্ব্বে ছিল ভারতেরই সম্পদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতে চা-এর উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায়নি, বরঞ্চ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেড়েছে ও বাড়ছে—এইটাই আশার কথা। মিশর, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে, উত্তর-আমেরিকা ও রুশিয়ায় ভারতীয় চা-এর চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং ইহার ফলে চা-খাতে অর্জ্জিত হচ্ছে বিস্তর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। ভারতের অভ্যন্তরেও চা-এর চাহিদা আগের চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্ত্তমান অবস্থা-ব্যবস্থাধীনে এইটি কমবারও কিছুমাত্র কারণ নেই। যে কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে চায়ের দরকার, কাজে-কর্ম্মে চা-টি চাই আগে-ভাগে, এ যেন এখন অনেকটা আমাদের সুখ-দুঃখের সকল সময়েরই সাথী।

ভারতের কৃষি ও শিল্প-জীবনে চা-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। চা-শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সকল দেশেই সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকটি শিল্পের প্রসার হয়ে চলেছে, এইটিও লক্ষনীয়। শুধু মৃৎশিল্প কেন, কয়লা, সিমেন্ট, সার, চা-বাগানের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অনেক আনুষঙ্গিক শিল্পের উন্নতির মূলে রয়েছে এই চা। বলতে কি, একমাত্র প্লাইউড থেকেই আজ এই ভারতে তৈরী হয় প্রায় ৬০ লক্ষ চা-এর পেটি।

ভারতে চা-শিল্পের অগ্রগতির যে সর্ব্বশেষ সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরণ পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় যে, একমাত্র ১৯৫৫-৫৬ সালেই ভারত থেকে বহির্বিশ্বে চা রপ্তানী হয় প্রায় ৪০ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। ভারতের অভ্যন্তরেও উক্ত বৎসরে প্রায় ২১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড চা ব্যবহার হয়েছে। আলোচ্য সময়ে একমাত্র চা-খাতেই ভারত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করেছে প্রায় ১০৯ কোটি টাকা। ১৯৫৬ সালে ভারতের বাগান সমূহে চা উৎপন্ন হয় ৬৫ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ডের মতো এবং বিশ্বে উৎপন্ন চা-এর পরিমাণ ১৪০ কোটি পাউণ্ড।

চা-এর চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চা-শিল্পের অগ্রগতিও সংশ্লিষ্ট সব কয়টি দেশেই হয়ে চলেছে, ইহা নিশ্চিত। বিশ্বে চা-এর নতুন বাজার সৃষ্টি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে, এ স্বভাবতঃই আশা করা চলে। সুতরাং সরকারী দৃষ্টি ও তত্ত্বাবধানের অভাব না হলে এবং প্রকৃতি যদি বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়, তা হ'লে চা-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হবার কিছু নাই।

টুকিটাকি

১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতে চা ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ১৬'১৭ কোটি পাউণ্ড, কিন্তু বর্তমানে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২১'১৫ কোটি পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। * * বারাণসীতে সমবায় পদ্ধতিতে দিয়াশলাই কারখানা স্থাপনের জন্য ভারত সরকার ২,৮৫,৭০০৲ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। * * লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে বাণিজ্য-সচিব শ্রীমোরারজী দেশাই জানাইয়াছেন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে মোট ১৭,৩৬,৭১,২০৭৲ টাকা মূল্যের চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত চুক্তি অনুযায়ী ১,০৩ লক্ষ টাকার লেন-দেন হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় সংস্থা সিমেণ্ট, হাল্কা সোডা অ্যাশ, কষ্টিক সোডা, অ্যামোনিয়াম সালফেট, চিলির নাইট্রেট এবং জিপসাম আমদানীর জন্য চুক্তি করিয়াছে। আমদানী-চুক্তি অনুযায়ী পণ্য-দ্রব্যের মোট দাম ৮,৭৪,১৫,৭৬৫৲ টাকা। সংস্থা মোট ৮,৬১,৭৫,৪৪২৲ টাকা মূল্যের লৌহ-আকর, ম্যাঙ্গানীজ আকর, কফি, জুতা এবং হস্ত-শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানীর চুক্তি করিয়াছে। * * মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সটাইল রিসার্চ ইনষ্টিট্যুটে বর্তমানে যে পরীক্ষা

চলিতেছে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইলে ভবিষ্যতে পশমজাত পরিধেয় বস্ত্রাদি (সোয়েটার ইত্যাদি) কীটের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য সতর্কতা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না। মেষের গাত্রেই পশম-কীট নিরোধক ক্ষমতা অর্জন করিবে। মার্কিণ পরীক্ষাগারে মেষের গাত্রে কীটঘ্ন রাসায়নিক ডাই-এলড্রিন প্রয়োগ করা হইতেছে। ডাই-এলড্রিন ডিডিটি'র সমপর্যায়ভুক্ত রাসায়নিক। গবেষকগণ মনে করেন যে, এই পদ্ধতিতে মেষের গাত্রে ডাই-এলড্রিন প্রয়োগ করা হইলে, মেষের গাত্র হইতে ছাঁটাইয়ের পূর্বেই পশম-কীট নিরোধক ক্ষমতা অর্জন করিবে। * * পশ্চিমবঙ্গের রূপনারায়ণপুরে অবস্থিত হিন্দুস্থান কেবল ফ্যাক্টরীর মালিক হইলেন ভারত সরকার। ট্রাঙ্ক টেলিফোন লাইনের জন্য ব্যবহৃত বিশেষ ধরণের বৈদ্যুতিক তার (কো-অ্যাক্সিয়েল কেবল) প্রস্তুতির জন্য এই কারখানাটি সম্প্রতি সম্প্রসারিত হইয়াছে। ভারতে একমাত্র এই কারখানাতেই টেলিফোন 'কেবল' (অর্থাৎ টেলিফোন ব্যবস্থায় মাটির নীচে যে মোটা বৈদ্যুতিক তার ব্যবহৃত হয়) তৈয়ারী হইয়া থাকে। ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে এই কারখানার উৎপাদন সুরু হইয়াছে। ট্রাঙ্ক টেলিফোনের কো-অ্যাক্সিয়েল কেবল্ প্রস্তুতির যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। আশা করা যায় যে, ১৯৫৮ সালে এই বিশেষ কেবলের উৎপাদনই আরম্ভ করা যাইবে। পুরো উৎপাদন সুরু হইলে এখানে (প্রতি বৎসরে) ৩০০ মাইল কো-অ্যাক্সিয়েল ট্রাঙ্ক কেবল্ প্রস্তুত করা যাইবে। তখন ডাক ও তার বিভাগ মাটির নীচে 'কেবল্' স্থাপন করিয়া ভারতের বড় বড় সহরগুলির মধ্যে ট্রাঙ্ক টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। * * ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ। ১৯৫০ সালে শ্রমিকের সংখ্যা ৬ কোটি ৩৫ লক্ষ দাঁড়ায়। ইহার মধ্যে নারী-শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ১৭ শতাংশ। ১৯৫০ সালে উহা ২৯.৮ শতাংশে পৌঁছে। অবিবাহিতা নারী-শ্রমিকদের হিসাব ছিল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রতি পাঁচজনে দুইজন, ১৯৫০ সালে ছিল প্রতি দুইজনে একজন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের তুলনায় শ্রমিকগণ এক্ষণে বেশী বয়সে কাজ আরম্ভ করিতেছে। অবসর গ্রহণের পর তাহারা পূর্বাপেক্ষা বেশী দিন বাঁচিয়া থাকেন। পিতা-পিতামহের তুলনায় আজিকার শ্রমিকগণ সপ্তাহে ১৫ হইতে ২০ ঘণ্টা বেশী অবসর ভোগ করে। শ্রমিক-পরিবার-পিছু গড় আয় ১৯১৮ সালে ছিল ১,৫১৩ ডলার। উহা ১৯৫৩ সালে ৪,৭০০ ডলার হইয়াছে। * * ভারতের প্রায় তিন হাজার মাইলব্যাপী উপকূলরেখা ধরিয়া যে মাছ ধরার ব্যবসায় চালু আছে, তাহা হইতে ভারতের জাতীয় আয় প্রায় ২৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই ব্যবসায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় পঁচাত্তর হাজার নৌকা ইত্যাদি এবং প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ ধীবর নিযুক্ত আছে। * * ১৯৫৫-৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে মোট ২,৪৩,৭১,৯৬০৲ টাকা বরাদ্দ করেন। * * পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া সরকারের ব্যবসায়ে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন এবং অন্যায় প্রতিযোগিতা নিরোধ বিল পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। ১৯৫৭ সালের শেষ পর্যন্ত এই বিল বলবৎ থাকিবে। * * নয়াদিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে নূতন প্রজাতের টোম্যাটো সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে পুসা রুবি। ফলটি গাঢ় লাল বর্ণের মাঝারি সাইজের (এক পাউণ্ডে ৭টা হইতে ৯টা) এবং মৃদু অম্লাত্মক। শরৎ-শীতকালীন ফল হিসাবে চাষ করা হইলে, 'পুসা রুবি'র ফল, রোপণের ৬০ দিনের মধ্যে পাকিয়া থাকে। বসন্ত-গ্রীষ্মকালীন ফল পাকিতে প্রায় চার মাস সময় লাগে। * * নয়াদিল্লীর পরীক্ষাগারে এই জাতের টোম্যাটোর ফলন একর-প্রতি ৪৮৭/ মণ হইতে দেখা গিয়াছে। কোয়াম্বাটুর, ইন্দোর এবং জয়পুরে ইহার ফলন স্থানীয় টোম্যাটো অপেক্ষা যথাক্রমে ৫৭,৪৭ ও ২৫ শতাংশ বেশী হইতে দেখা গিয়াছে। 'পুসা রুবি' টোম্যাটো ভাইরাস ঘটিত রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে। অতিবৃষ্টির পর মাটি ভিজা থাকিলেও ইহার বেশী ক্ষতি হয় না। পার্বত্য-অঞ্চলের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় গ্রীষ্মকালে পুসা রুবির চাষ করা যাইতে পারে। নয়াদিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণাগার হইতে পুসা রুবির বীজ পাওয়া যাইবে। * * ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতে ইক্ষু ফলনের দ্বিতীয় পূর্বাভাসে বলা হইয়াছে যে, গত বৎসরের তুলনায় চলতি বৎসরে ইক্ষু-চাষ জমির পরিমাণ ১৪.৯ শতাংশ এবং ইক্ষু উৎপাদন ১৬.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে। হিসাবে দেখা যায়, গত বৎসরের (১৯৫৫-৫৬) পূর্বাভাসে যেখানে ইক্ষুচাষ জমির পরিমাণ ছিল ৩৯,৪৫,০০০ একর এবং উৎপাদন ছিল ৫,০৪,৫৫,০০০ টন, সেখানে চলতি বৎসরের পূর্বাভাসে দেখা যায়, ইক্ষুচাষ জমির পরিমাণ হইতেছে ৪৫,৩২,০০০ একর এবং উৎপাদনের পরিমাণ ৫,৮৯,১৪,০০০ টন ইক্ষু। * * প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নার্সারী স্কুল স্থাপনের জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারসমূহকে ও কয়েকটি সেবা প্রতিষ্ঠানকে মোট ৬,৫১,৮৯২, টাকা দান করিয়াছেন। * * চলতি বৎসরের নবেম্বর মাসে মোট ১,২৩,৯৭৬ জন বেকার হিসাবে নিজেদের নাম চাকুরি-বিনিময় কেন্দ্রে লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন। * * ভারতে যে সকল রাজ্যে নারিকেল উৎপন্ন হইয়া থাকে সেই সকল রাজ্যে সরকারের সহযোগিতায় ভারতের কেন্দ্রীয় নারিকেল-চারা উৎপাদনের জন্য ২০টি নার্শারী স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। নারিকেল-চাষীদের সরবরাহ করিবার জন্য এই সকল নার্শারীতে সর্বোচ্চ বার্ষিক ৩,৩২,৫০০ বাছাই নারিকেল-চারা উৎপাদনের পরিকল্পনা আছে।

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
সুস্থ লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে
—এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি,
তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের
প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোকমাত্রেই
লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত
রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।
L. 261-X52 BG
ভারতে প্রস্তুত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো পঁয়ষট্টি

আমাকে দেখ।

চিদমৃতসুখরাশিতে চিত্তফেন বিলীন হয়ে গিয়েছে। চঞ্চল চিত্তবৃত্তিতরঙ্গ আর নেই। নিশ্চলসুখসমুদ্র নিশ্চেষ্ট ও সুপূর্ণ। আমি সর্বদা একাবস্থ। আমাতে দুঃখ কি করে সম্ভব? আমি আনন্দরূপ, আমি অখণ্ডবোধ। আমি পরাৎপর, ঘনচিৎপ্রকাশ। মেঘ যেমন আকাশকে ছোঁয় না, আমিও তেমনি সংসার-দুঃখের বাইরে।

যে সূর্যালোকে অখিল জগৎ প্রতীত, তাকে কে সন্দেহ করে? তেমনি আমি যে স্বয়ংপ্রকাশ পরম-প্রকাশ কেবল-শিব তাতে কার সংশয়? দেখ আমাকে। আমি নিত্যস্ফূর্তি, নির্মলসদাকাশ, আমি নিত্যসুখশান্ত, আমার থেকেই সমস্ত মহামোহ দূরীকৃত, আমিই বেদ-প্রত্যয়বিহীন অখিলতত্ত্ব।

চীনে বাজারের বেঙ্গল ফটোগ্রাফার কোম্পানির লোক এল ফোটো তুলতে। আসতে আসতে বিকেল করে ফেলল। সকালের দিকে ঠাকুরের দিব্য দেহে, হরিপাদ-পঙ্কজ-পরাগ-পবিত্র দেহে, যে জ্যোতির্ময় দীপ্তি ছিল তা তখন ম্লান হয়ে গিয়েছে। পীতবস্ত্রে সাজানো হল সেই দেহ। নিচে নামানো হল খাটে করে। ভক্ত ও সন্তানেরা দাঁড়াল সন্নিহিত হয়ে, নরেনের কাঁধে হাত দিয়ে রাম দত্ত। ফোটো নেওয়া হল দু'খানা।

সেদিনের কথা মনে পড়ছে ডাক্তার সরকারের, যেদিন প্রথম এসেছিল শ্যামপুকুরের বাড়িতে। ঠাকুর বলেছিলেন, 'যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সেই ধন্য, সেই বীরপুরুষ। যেমন কারু মাথায় দু' মণ বোঝা আছে, আর ও দিকে বর যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। মাথায় বোঝা তবু বর দেখছে। খুব শক্তি না থাকলে কি এ সম্ভব?'

'দেখ, আমি বই-টই কিছু পড়িনি, কিন্তু মার নাম করি বলে আমায় সবাই মানে। যখন পঞ্চবটীতে মাটিতে পড়ে পড়ে মাকে ডাকতুম, বলতুম মা, আমি কিছু জানি না, তুই শুধু আমাকে দেখিয়ে দে। কর্মীরা কর্ম করে যা পেয়েছে, জ্ঞানীরা বিচার যা জেনেছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে। আমার কিছু নেই, আমার আছে শুধু ভক্তি। তোকে ভালোবাসি এই অখণ্ড অধিকার। এই অধিকারেই নেব তোর অভয়পদ—আমার পরমপদ।'

ডাক্তার বলেছিল আর আরদের, 'বই পড়লে এর এত জ্ঞান হত না।'

ঠাকুরেরও সেই কথা 'অনেকে মনে করে বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শোনা ভালো, শোনার চেয়ে দেখা। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শোনা আর কাশী দেখা অনেক তফাৎ।' আবার বললেন, 'যারা নিজে দাবা খেলে তারা চাল তত বোঝে না, কিন্তু যারা না খেলে উপর-চাল বলে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়। সংসারী লোক মনে করে আমরা বড় বুদ্ধিমান। তারা নিজে খেলছে তাই তারা নিজেদের চাল ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী সাধু নিজে খেলে না, তাই উপর-চাল ঠিক ঠিক বলে দিতে পারে।'

চার দিকে শোকের পাথার দুলে উঠেছে। সব চেয়ে কাঁদছে বেশি শশী।

ডাক্তারের মনে পড়ল একবার ঠাকুর বলেছিলেন, শোকের মতই এই ঈশ্বর। যদি কারু পুত্রশোক হয় সেদিন কি আর সে লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, না, নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে? সে কি লোকের সামনে জাঁক করে বেড়াতে পারে, না, সুখসম্ভোগ করতে পারে? তেমনি যদি ঈশ্বরে সত্যি-সত্যি ভক্তি হয়, যদি তাঁর নামগুণগান ভালো লাগে, তা হলে কি আর ইন্দ্রিয়ভোগে মন যায়?

মহেন্দ্র মুখুজ্জে বললে, 'সংসারে কি শুধু দারিদ্র্যই দুঃখ? এ দিকে ছয় রিপু, তারপরে রোগ শোক।'

'আবার মানসম্ভ্রম।' বললেন ঠাকুর, 'টাকা থাকলেই বা কি হবে! জয়গোপাল সেন কত টাকা করেছে, কিন্তু বিষম দুঃখ ছেলেরা মানে না। যা হোক, তুমি তো একটা ধরেছ—নিরাকার। যা বিশ্বাস তাই রাখবে, কিন্তু এটা জানবে যে তাঁর সবই সম্ভব।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই সম্ভব। সাকারও সম্ভব।'

'আর জেনো, তিনি চৈতন্যরূপে বিশ্ব ব্যাপ্ত করে আছেন।'

'তিনি চেতনেরও চেতয়িতা।'

'এখন ঐ ভাবেই থাকো, টেনে-টুনে ভাব বদলাবার দরকার নেই। ক্রমে জানতে পারবে ঐ চৈতন্য তাঁরই চৈতন্য। যাকে জড় বলছ তাও চৈতন্যেরই আবরণ।'

তাই ঠাকুর যখন সায়েন্স-এসোসিয়েশান বা বিজ্ঞানসভায় যাবার জন্যে ডাক্তারকে পীড়াপীড়ি করছিলেন তখন ডাক্তার বলেছিল, 'কি সর্বনাশ! তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে।'

'কেন কেন?'

'ঈশ্বরের নানা আশ্চর্য কাণ্ড দেখে।'

'তা বটে।' গম্ভীরমুখে বললেন ঠাকুর।

ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ডাক্তার। ভাবছে, আমার কি এখনো গ্রেপ্তার হবার সময় আসেনি?

রবীন্দ্র নামে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে আসত ঠাকুরের

কাছে। একবার একনাগাড়ে তিন রাত তাঁর কাছে বাসও করেছিল। তাকে ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোর কিন্তু দেরি হবে, এখনো তোর একটু ভোগ আছে কপালে। এখন কিছু হবে না। যখন ডাকাত পড়ে, তখন ঠিক সেই সময়ে পুলিশ কিছু করতে পারে না। একটু থেমে গেলে তবে পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে।'

ডাক্তার ভাবছে, তার ডাকাতি কি শেষ হয়নি এখনো? এখনো কি সই হয়নি পরোয়ানা?

ঠাকুরের তিরোধানের ক' মাস পরে, রবীন্দ্র একদিন পাগলের মত ছুটতে ছুটতে বরানগর মঠে এসে উপস্থিত। পরনে আধখানা মোটে কাপড়। আর আধখানা কোথায় গেল কে জানে?

'তোমার আর আধখানা কাপড় কোথায় গেল?'

'আসবার সময় কাপড় ধরে টানাটানি করলে, তাই আধখানা ছিঁড়ে গেল। নাও আধখানা। তবু তোমার খপ্পর থেকে যে করে পারি আসব বেরিয়ে—'

'কে সে?'

'আর কে? মদ আর তার সঙ্গিনী অবিদ্যা।'

'কি করে এলে?'

'স্রেফ পায়ে হেঁটে। ছুটতে-ছুটতে। যাই গঙ্গাস্নান করে আসি গে। আর সংসারে ফিরব না।'

রামলালও কাঁদছে অঝোরে। কি কথা ভাবছে কে জানে! কত কথাই ভাবছে!

ঠাকুর যখন চিকিৎসার জন্যে চলে যান কলকাতা, তখন রামলাল বলেছিল, আপনার জন্যে বড় মন কেমন করবে। ঠাকুর বললেন, মনে করবি যে ঝাউতলায় গেছি আবার আসব। যাব কোথায়? সদাই আছি আমি দক্ষিণেশ্বরে।

মনে পড়ছে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ বারান্দার দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা ঠাকুরের ছবিটি। একটি টবের উপর পদ্মফুলের গাছ, আর সেই ফুলের উপরে একটি পাখি। কাশীপুরের বাড়িতেও ছোট একটা কাঠির সাহায্যে দেয়ালে বালির উপর একটি গাছ এঁকেছেন আর গাছের ডালে-বসা একটি পাখি। পাখিটা এমন জীবন্ত যেন এখুনি উড়ে যাবে।

'ছেলেবেলায় কত ছবি আঁকতাম।' বলতেন সবাইকে: 'পোটোদেরও তাক লেগে যেত।'

শম্ভু মল্লিকের বাগানে কে একজন এসেছে, হিপ্‌নটিজম্ জানে। ঠাকুর শুনে শুধোলেন, সেটা কি জিনিস? সেটা হচ্ছে মন্ত্রের গুণে লোককে অজ্ঞান করে তাকে দিয়ে ইচ্ছে মতো কাজ করানো। ঠাকুর তাকে বললেন, হ্যাঁ গা, তুমি তো অনেককে করো, কই আমায় একবার ঐ রকম করো না? পারলে না, লোকটা ঠাকুরকে পারল না অজ্ঞান করতে। ঠাকুর বললেন, কে জানে বাপু, মার ইচ্ছে নয় যে আমি অজ্ঞান হই।

সেই সে-বার আলমবাজারে শিবু আচার্যির পাঁচালি শুনতে গিয়েছিল রামলাল। আসরে ভারি মজার ব্যাপার, একতাড়া কলার ঝাড় ও পঞ্চাশ টাকার নোট ঝোলানো। তার মানে, যে ভালো করতে পারবে, সে পঞ্চাশ টাকা পাবে আর যারটা সবচেয়ে খারাপ হবে, সে পাবে ঐ কলার ঝাড়। গান শুনে এসে ঠাকুরকে বললে রামলাল, কি সুন্দর গান! 'এমন অমূল্য শ্রীরামনাম কে শুনালে আমার কর্ণে?' ঠাকুর দুঃখ করে বললেন, আহা, আমি শুনতে পেলুম না!

ক'দিন পরেই শিবু আচার্যি হাজির দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বললেন, আহা, সেই গানটি গাও না। রামলাল শুনে কত প্রশংসা করলে। শিবু গান ধরল। দু'চক্ষের জলে ভেসে গেলেন ঠাকুর, রামলালকে বললেন, গানটা লিখে নে। শিবুকে বললেন, আহা, কত লোককে গান শোনাচ্ছ, চার-পাঁচ ঘণ্টা গাইছ একভাবে, তোমার গলা খারাপ হয় না এ কি কম কথা! যার দ্বারা দশ জন আনন্দ পায় আর যার আকর্ষণশক্তি বেশি, তার হৃদয়ে যেন শক্তি বিরাজ করছে।'

একদিন শিবু আচার্যি চারখানি নৌকো নিয়ে হাজির। ওপারে ভদ্রকালিতে তার শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাবে। সে কি ধুমধাম করে যাওয়া হল সে বার! এক নৌকোয় ঠাকুর, নরেন, রাখাল আর রামলাল আরেক নৌকোয় অক্ষয় মহিম আর মাষ্টারমশাই। নিশান টাঙানো হল নৌকোয়। শিঙে খোল করতাল বাজিয়ে হরিনাম করতে-করতে যাত্রা। পারে কত লোক এসে দাঁড়িয়েছে। কারু হাতে ফুলের মালা, কারু হাতে বা ধামিভরা বাতাসা। ঠাকুরের গলায় মালা দিলে, হরিবোল হরিবোল বলে বাতাসাগুলি ছড়িয়ে দিল চার দিকে। টলমল টলমল করতে করতে ঠাকুর নামলেন নৌকো থেকে।

কি হচ্ছে এখানে? এক দিকে কীর্তন অন্য দিকে পণ্ডিতদের আলোচনা। ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বসিয়ে দিল। সে কি তর্ক পণ্ডিতদের মধ্যে! সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী। তার জিভের আগে কেউ টিকতে পাচ্ছে না। যে যা বলছে সব সে কেটে দিচ্ছে। কিছু মানছে না কিছু রাখছে না। অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিলেন ঠাকুর, পরে রামলালকে বললেন, চল্‌তো রে একটু বাইরে যাব। বাইরে গিয়ে তিনি হঠাৎ মাকে বললেন, মা, শালা ভারি তর্ক করছে। কারু কথাই নিচ্ছে না ধরছে না। ভারি শুকনো পণ্ডিত। তুই ওকে একটু ঠাণ্ডা করে দে দিকিনি। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ঠাকুর সামাধ্যায়ীর ডান হাঁটুটা খপ করে ধরে ফেলে বললেন, হ্যাঁ গা, কি বলছিলে বলো না। সামাধ্যায়ী আমতা-আমতা করে বললে, কই, কিছু তো বলিনি। সে কি গো, এতক্ষণ যে কি দুর্দান্ত তর্ক করছিলে! সামাধ্যায়ী হেসে বললে, ও আমি ঠাট্টা-তামাসা করছিলাম!

যখন খেয়েদেয়ে দুপুরে শুতেন কত তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছি। কতক্ষণ পরেই বলতেন, যা, এইবার একটু গড়িয়ে নে গে যা। মাদুর-বালিশ নিয়ে একটু শুতুম, তারপর দপ্তরখানায় চিলে-ছাতে যেতুম রসিকের সঙ্গে গল্প করতে। কামারপুকুরের রসিকলাল সরকার মা-কালীর ঘরের সমস্ত কাজের জোগানদার, তখন থাকত সেই চিলে-কোঠায়। ঘুম থেকে উঠে ঠাকুর ডাকতেন, ওরে রামলেলো, শালা, শীগগির আয়, আমি বাইরে যাব। গল্পে এত মত্ত থাকতুম কখনো ঠিক-ঠিক শুনতে পেতুম না। যখন শুনতুম, পড়ি-মরি-ছুট মারতুম। বলতেন, শালার রসকের ওপর এমন ভালবাসা, গল্প করবে তো মাদুর-বালিশ তুলতেও সময় পায়নি।'

কত তামাক সেজে দিয়েছি। ঠাকুরের বায়ু বৃদ্ধি হয়েছে,

আগড়পাড়ার বিশ্বনাথ কবরেজ চিকিৎসা করছে। 'হ্যাঁ গা, তামুক খেলে কি হয়?' 'বায়ু কমে'। বললে বিশ্বনাথ। তবে যখন তামাক খাবেন তখন চিলিমের উপর কিছু ধনের চাল আর মৌরী দিয়ে খাবেন। ওরকম করে কত বার সেজে দিয়েছি।

কত ডাকা-আনা করেছি নরেনকে। ওরে রামলাল, একবারটি নরেনের খবর নিয়ে আয়। এই ছাখ এক মাড়োয়ারি ভক্ত এসে বাদাম-কিসমিস খেতে দিয়ে গেছে। যা এগুলো পৌঁছে দিয়ে আয় নরেনকে!

আবার কবে আসবি? নরেনকে জিগগেস করলেন ঠাকুর। বুধবার আসব। কটায়? তিনটায়। সেই বুধবার এসেছে, আর ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে কথা কইবেন কি, বারে বারে বাইরের দিকে তাকাচ্ছেন। হঠাৎ, বলা-কওয়া নেই, চটিজুতো পায়ে দিয়ে হন হন করে ফটকের দিকে এগিয়ে গেলেন ঠাকুর। এ কি, নরেন দাঁড়িয়ে। কি রে, কখন এলি, বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? নরেন বললে, এখন সবে দু'টো। অনেক আগে এসে পড়েছি। সত্যরক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে আছি, তিনটে বাজলে যাব। ঠাকুরও দাঁড়িয়ে রইলেন। ফটকের সামনে দু'জনের দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা। যখন ঠিক তিনটে বাজল তখন নিয়ে এলেন ঘরে।

কত দিনের কত কথা ভিড় করছে মনের মধ্যে।

মনে পড়ছে কাপ্তেনকে। কুকুর কাপ্তেন। কোন একটা কুকুর মন্দিরের সামনে চাতালে বসে থাকত। ঠাকুর তাকে কাপ্তেন-কাপ্তেন করে ডাকতেন। ডাকলেই সে এসে ঠাকুরের পায়ে গড়াগড়ি দেয়, ঠাকুরের হাতের লুচি-সন্দেশ পেলে দারুণ খুশি। ঠাকুর বললেন, ছাখ এত যে কুকুর রয়েছে, কই কেউ তো মায়ের সামনে বসে না? গঙ্গার ধাপে বসতে, গঙ্গাজল খেতে এর আর জুড়ি নেই। এ কাপ্তেনটা শাপভ্রষ্ট হয়ে জন্মেছে। ওর পূর্বজন্মের সংস্কার যা ছিল তাই এখানে এসে করছে। ধন্য হয়ে গেল।

সিস্টার নিবেদিতা শ্রীমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দেখল, বাড়িতে ঢোকার সিঁড়ির উপর একটা কুকুর শুয়ে আছে। নিবেদিতা হাত জোড় করে কুকুরটিকে বললে, 'ভক্তবর, দয়া করে পথ ছেড়ে দাও। আমি জগন্মাতার পাদপদ্ম প্রণাম করতে এসেছি, আমার পথ রোধ করে থেকো না। আমি জানি, তুমি ছদ্মবেশী মহাভক্ত, পূর্ব-পূর্ব জন্মে অনেক সুকৃতি ছিল, কিন্তু কি কারণে কে জানে এবার কুকুর-দেহ ধারণ করেছ। মায়ের পদধূলি পড়েছে এ সিঁড়িতে, পড়েছে কত সন্তান ভক্তের, তাই তুমি এ মহাতীর্থ ছাড়ছ না। আমিও তোমার সতীর্থ, আমাকে একটু পথ করে দাও।' কুকুর দোর ছাড়ল না, শুধু একটু পাশ দিল নিবেদিতাকে।

ঠাকুর যখন কল্পতরু হলেন, তখন সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে রামলাল ভাবতে লাগল, সকলের তো এক রকম হল, আমার কি গাড়ু-গামছা বওয়াই সার হবে? এই কথা যেমনি মনে হওয়া ঠাকুর অমনি পিছন ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'কি রে রামলাল, অত ভাবছিস কেন? আয় আয়।' এই বলে রামলালকে টেনে এনে তাঁর সামনে দাঁড় করালেন, তার গায়ের চাদর খুলে দিলেন। তার বুকে হাত বুলুতে বুলুতে বললেন, 'ছাখ দিকিনি এইবার।' রামলাল দেখল চারদিক অপার্থিব আলোতে ভরে গিয়েছে।

আর নরেন কি ভাবছে?

ভাবছে তার গুরু দায়িত্বের কথা! বলে গেলেন যাবার আগে, তুই সব চেয়ে বুদ্ধিমান, তোর হাতে আর সব ছেলেদের ভার দিয়ে গেলাম। দেখিস ওদের, ছাড়িস নে।

রাত্রে, আগারান্তে, ঠাকুর যখন খানিক স্বস্তি বোধ করলেন, বললেন, জানিস, আজ সারাদিন ভগবানের খেলা দেখে বিভোর ছিলাম, তাই তোদের সঙ্গে কথা কইতে পারিনি। তখন নরেন বলে উঠল, 'ভগবান তো সর্বভূতেই আছেন, ভুবনজোড়া তাঁর খেলার মাঠ—'

তখন ঠাকুর বললেন, 'ওরে, তোর বেদান্তের ঈশ্বর নয়। তিনি চিন্ময়ও বটেন আবার চিদ্‌ঘনও বটেন। লীলায় সেই চিন্ময়ের জমাট রূপ। দেখছি তিনি অপরূপ বালকৃষ্ণ হয়ে আপনমনে ধুলোখেলা করছেন। নবীন মেঘের মত রঙ, জ্যোতিতে সব দিক আলো, রূপ যেন ঠিকরে পড়ছে। পথ দিয়ে যত লোক যাচ্ছে তাদের গায়ে ধুলো দিয়ে আনন্দ। কেউ গাল দিয়ে গেল ভ্রূক্ষেপ নেই। কেউ আদর করে কোলে করতে এল, অমনি দে-দৌড়। আবার কেউ আনমনে চলে যাচ্ছে, ঝাঁপ দিয়ে তার কোলে উঠলেন। বালকের খেলা কিনা, কোনো হেতু নেই। যে আদর করলে তাকে উপেক্ষা, আর যে ভুলেও ডাকেনি তাকে কৃপা।'

বিকেল পাঁচটায় শুরু হল শোভাযাত্রা। গলায় ফুলের মালা, শ্রীপাদপদ্মে সচন্দন পুষ্প, চললেন ঠাকুর নারায়ণী দেহে আনন্দৈকমাত্র বৈকুণ্ঠলোকে। প্রেমাশ্রুব্যাকুল হয়ে সবাই ছুটোছুটি করতে লাগল, কেউ একটু খাট ছুঁতে পারে কিনা। কেউ একটু পারে কিনা কাঁধ দিতে। হে চরমশরণ, তোমাতে দৃঢ় দুরাশা রতি দাও, দাও পাদপঙ্কজ-পলাশবিলাসভক্তি। শতবর্ষ তুমি ভক্তহৃদয়ে বাস করবে, আমার হৃদয় তোমার বাসের যোগ্য করে তোলো।

খোল-করতালে সংকীর্তন চলল আগে-আগে। সঙ্গে নিশান, ওঁকার, ত্রিশূল। সমস্ত ধর্মের প্রতীক। বৈষ্ণবের খুন্তি, খৃষ্টানের ক্রুশ, মুসলমানের অর্ধচন্দ্র। চলেছেন সর্বধর্মসমন্বয়—সর্বধর্মএকীকরণ মন্ত্রের উদ্গাতা। যত মত তত পথ তো বটেই, যত মত এক পথ।

জ্ঞানে শঙ্কর, ভক্তিতে গৌরাঙ্গ, বৈরাগ্যে বুদ্ধ, আত্মবলিদানে যীশুখৃষ্ট, ঔদার্যে মহম্মদ। সর্বত্র অবিরোধ, সর্বত্র অবিদ্বেষ। তুমি সেই সর্বত্রগামী। সেই সর্বাত্মা। এক ঈশ্বর। এক পৃথিবী। এক মানুষের সত্তা। হে এক, তোমাকে অনন্ত চক্ষুতে দেখতে দাও।

রাম দত্ত লাটুকে বললেন, 'তুই বাগানে এখন কিছুক্ষণ থেকে যা। পরে যাস শ্মশানে।'

লাটু তাই থেকে গেল। শোভাযাত্রার সঙ্গে গেল না। ছন্নছাড়া শিশুর মত এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

'ঠাকুরের মিরাকল্ বা বিভূতি যদি কিছু দেখতে চাও তো লাটু মহারাজকে দেখ।' বলেছিল অতুল। 'ঠাকুর যে বলতেন ওরে লেটো, তোর মুখ দিয়ে বেদবেদান্ত ফুটে বেরুবে, ঠিক তাই ফলেছে।'

'দেখো, এইটুকু বুঝেছি যে এক ভাঁড় জল আলাদা করে রাখলে শুকিয়ে যায়', বলছে লাটু, 'বাকি সেই ভাঁড়কে যদি গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখতে পারি, তাহলে জল আর শুকোয় না। তেমনি এই জগতে হামাদের মনকে যদি ভগবানের পায়ে সঁপে দিতে পারি তাহলে বিষয়বাতাসে হামাদের মন আর শুকিয়ে উঠতে পাবে না, জগৎ আর নিরানন্দ লাগবে না।' আবার বলছে, 'দেখো গঙ্গায়

জলে ডুব দিলে মাথার উপর হাজার মণ জল থাকলেও ভারটা বোঝা যায় না, তেমনি ভগবানের সংসারে ভগবানকে ধরে ডুব দিলে সংসারের বোঝা আর বোঝা বলে মনে হয় না। সংসারকে মনে হয় আনন্দের নিকেতন। 'যে যাকে শরণ লিয়ে সে রাখে তাকো লাজ, উলটা জলে মছলি চলে বহি যায় গজরাজ।'

সব তাঁর ইচ্ছা এই ভাবে নিষ্পন্ন থাকো। ঠাকুরের সেই গল্প মনে পড়ল।

একজন লোক অনেক মেহনত করে পাহাড়ের উপর একখানি কুঁড়েঘর করেছিল। একদিন ভারি ঝড় উঠল। টলমল করতে লাগল ঘর। লোকটি তখন কাতরে প্রার্থনা করতে লাগল, হে পবনদেব, দেখো, ঘরটি যেন না পড়ে। পবনদেব শুনছেন না, ঘর মড়মড় করতে লাগল। তখন লোকটি একটা ফন্দি ঠাওরাল। হনুমান তো পবনদেবের ছেলে, তার নাম করে দোহাই দিলে। বাবা, এ হনুমানের ঘর, দেখো যেন ভেঙো না। কিন্তু তখনও ঘর পড়ো-পড়ো। তখন অনুপায় হয়ে লোকটি বললে, বাবা, এ লক্ষ্মণের ঘর। তবুও বারণ মানছে না ঝড়। বাবা, এ রামের ঘর, রামের ঘর। তবুও না। ঘর যখন সত্যি ভাঙতে শুরু করেছে, যখন আর উপায় নেই, তখন লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, যা শালার ঘর।

কিছুই করবার নেই। তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে তাঁর ইচ্ছায় যাচ্ছে।

আবার সবই তাঁর কৃপা।

দারোয়ান হনুমন্ত সিংএর সঙ্গে এক ভারী পাঞ্জাবী কুস্তি লড়তে এসেছে। পাঞ্জাবী লোকটা ভীষণ জোয়ান, দিন পনেরো ধরে খুব কসরৎ চালাল আর ঘি দুধ মাংস খুব খেতে লাগল। তার চেহারা দেখে সবাই সাব্যস্ত করলে তারই জিৎ হবে। হনুমন্ত সিংএর কোনো আয়োজন নেই, শুধু নীরবে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের আশীর্বাদ চাইলে। ঠাকুর বললেন, খাওয়া কমাতে হবে, কসরৎ কমাতে হবে, আর দিনভোর মহাবীরজীর শরণ নিতে হবে। মহাবীরজীর কৃপা হলে সব বিপক্ষ নিরস্ত হবে। লোকে ভাবলে এ কি সর্বনেশে বিধান, খাওয়া দাওয়া কমালে লড়বে কি করে? কিন্তু ঠাকুরের উপর হনুমন্তের অটুট বিশ্বাস, তাঁর কথা পুরোপুরি মেনে নিলে। জয় মহাবীরের জয়! কুস্তিতে হনুমন্তের জয় হল।

আর সে কৃপার কোনো কার্যকারণ নেই।

একদিন দুপুরবেলায় লাটুকে নিয়ে ঠাকুর চললেন তালতলায়, ডাক্তার দুর্গাচরণ বাঁড়ুয্যের বাড়ি। চল, একবার তাকে গলাটা দেখিয়ে আসি, এমন ডাকসাইটে ডাক্তার। অনেকক্ষণ ধরে দুর্গাচরণ ঠাকুরকে পরীক্ষা করলে, কিন্তু কি যে অসুখ, বলতে পারল না। ঠাকুর তাকে যত বার বলেন, হ্যাঁ গা, রোগ সারবে তো? দুর্গাচরণ তত বলে, ওষুধটা আগে খেয়ে দেখুন। বাড়ি ফিরে এসে ঠাকুর লাটুকে বলছেন, রোগ সারবে কিনা তার খোঁজ নেই, বলে ওষুধটা খেয়ে দেখুন। খাব না ওর ওষুধ। তবে সেখানে গেলেন কেন? ওরে তুই জানিস না, ও লুকিয়ে-লুকিয়ে যেত দক্ষিণেশ্বর। কত বার গিয়েছে, একবার আমার না গেলে কি ভালো দেখায়? ও তো নিজে থেকে ডাকল না ওর বাড়ি, না ডাকুক, আমি নিজেই উদ্যোগী হয়ে গেলাম। কত দিন রাত্তির
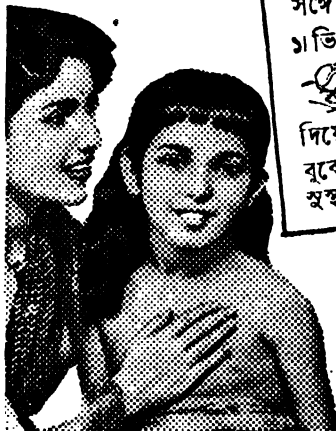
দশটা-এগারোটার সময় গিয়ে 'হৃদে, হৃদে' করে ডাকত। ওর গলা শুনে বুঝতে পারতুম, হৃদেকে বলতুম, ওরে দোর খুলে দে, কলকাতা থেকে দুর্গাচরণ এসেছে। হৃদয় দোর খুলে দিত। ডাক্তার একটি কথাও বলত না। চুপচাপ বসে থাকত অনেকক্ষণ। ঠাকুর বললেন, 'কি চোখে আমাকে দেখেছিল তা ও-ই জানে।'

রোজ সকালে ঘুম ভাঙতেই দু' চোখের উপর হাতচাপা দিয়ে ঠাকুরকে ডাকত লাটু। ঠাকুর এসে দাঁড়াতে তবে চোখ খুলত। দিনের প্রথম দর্শন দিনমণি নয়, দিনের প্রথম দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ।

এখন কোথায় দেখব তোমাকে?

লাটু জুটল কাশীপুর শ্মশানে। চন্দনকাঠের চিতা জ্বলছে। চিরঞ্জীব শর্মা গান গাইছে—শোকাশ্রুগম্ভীর কণ্ঠে: 'জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে, তোক তব ইচ্ছা পূর্ণ সুখ-দুঃখের ভিতরে।' 'মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ি অবাক হয়েছি। হাসিব না কাঁদিব তাই বসে ভাবিতেছি।'

কিন্তু প্রজ্বলিত চিতার পাশে পাখা হাতে কে বসে? আগুনকে হাওয়া করছে এ কে উন্মাদ?

উন্মাদ নয়, গুরুগতপ্রাণ শশিভূষণ। প্রভুর সেবাকালে অহরহ পাখা করেছে, এখনো দেহরক্ষা করার অন্তেও চলছে সেই সেবাকাজ। দেহে নেই বলে যারা ভাবছে ঠাকুর তিরোহিত, তারাই শশীকে উন্মাদ বলবে কিন্তু শশী সর্বকালে সর্বঘটে তার ইষ্টকে দেখছে, তার দৃষ্টিতে অগ্নিতে আর রামকৃষ্ণে কোনো ভেদ নেই, তাই সেই সত্যদ্রষ্টা সেই সত্যধ্যানী।

চিতা নিবে গেল, তবুও শশীর পাখার বিরাম নেই!

লাটু তুলল তার হাত ধরে। নরেন আর শরৎ নিজেদের কি প্রবোধ দেবে তা জানে না, শশীকে প্রবোধ দিতে লাগল।

ঠাকুরের সব ভস্মাস্থি একত্র করে একটি তামার কলসীতে রাখল শশী। মাথায় করে নিয়ে চলল। কাশীপুরের বাড়িতে ফিরে ঠাকুরের শয্যাস্থানে রাখল। আবার বসল পাখা করতে।

কে বলে তিনি নেই?

আমি আছি। আগুনে দগ্ধ হলেও আমি উড়ে যাই না, জলে মগ্ন হলেও আমি ধুয়ে যাই না। আমি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। আমি নিত্য সর্বব্যাপী স্থির অচল ও সনাতন। আমিই প্রাণীর গতি ও প্রতিপালক। আমিই প্রভু, সকল প্রাণীর নিবাস-স্থল ও কৃতাকৃতের সাথী। আমিই প্রত্যুপকার নিরপেক্ষ হিতকারী। স্রষ্টা ও সংহর্তা। আধার ও প্রলয়ভাণ্ড। আমিই অক্ষয়কারণ।

আমাকে দেখ।

'নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে।' আমার বিভূতির অন্ত নেই। যা কিছু শ্রেষ্ঠ যা কিছু পরম-প্রধান তাই আমি। প্রকাশকদের মধ্যে আমি মরীচিমালী সূর্য, পুরোহিতদের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনা-পতিদের মধ্যে কার্তিক আর জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র। পর্বতের মধ্যে মেরু, দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, নক্ষত্রের মধ্যে সুধাংশু। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন, অষ্টবসুর মধ্যে অনল, সর্বভূতে অভিব্যক্ত চেতনা। বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, স্থাবরের মধ্যে হিমালয়, শব্দের মধ্যে ওঁকার। দেবর্ষির মধ্যে নারদ, গন্ধর্বের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধের মধ্যে কপিল। অশ্বের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, মানুষের মধ্যে নরপতি। আয়ুধের মধ্যে বজ্র, ধেনুর মধ্যে কামধেনু, সর্পের মধ্যে বাসুকি। সৃজন-শক্তির মধ্যে কাম, নিয়ামকের মধ্যে যম, সংখ্যাকারিকের মধ্যে কাল। পশুর মধ্যে সিংহ, পাখির মধ্যে গরুড়, মৎস্যের মধ্যে মকর। নাগের মধ্যে অনন্ত, জলদেবের মধ্যে বরুণ, দৈত্যের মধ্যে প্রহ্লাদ। বেগবানের মধ্যে বায়ু, নদীর মধ্যে গঙ্গা, শস্ত্রপাণিদের মধ্যে রামচন্দ্র। অক্ষরের মধ্যে অ-কার, সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্বসমাস, বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা। সমস্ত সৃষ্টির আমিই আদি, আমিই মধ্য, আমিই শেষ, ক্ষণ-রূপে আমিই অক্ষীণ কাল, আমিই সর্বকর্মের ফলদাতা। অপহারীদের মধ্যে মৃত্যু, ভাবীকালের উৎকর্ষ, বিতণ্ডার মধ্যে বিচার। নারীর মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ, ঋতুর মধ্যে বসন্ত। ছলের মধ্যে অক্ষ, তেজস্বীর মধ্যে তেজ, বিজয়ীর মধ্যে বিজয়, উদ্যোগীর মধ্যে অধ্যবসায়। যাদবের মধ্যে কৃষ্ণ, পাণ্ডবের মধ্যে অর্জুন, মুনির মধ্যে ব্যাস, কবির মধ্যে শুক্রাচার্য। আমিই শাসকের দণ্ড, জিগীষুদের নীতি, গুহ্য বিষয়ের মৌন, জ্ঞানীর জ্ঞান। যা কিছু বীজস্বরূপ তাই আমি। সমস্তই আমার সত্তায় সত্তান্বিত। সবই মদাত্মক। আমার বিভূতির এত কথা জেনেই বা তোমাদের কি দরকার? এইমাত্র জেনে রাখো, আমিই এক পাদমাত্র দ্বারা সমস্ত জগৎ আবৃত করে আছি।

'জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে নমি নমি
জয় জয় পরমা নির্বৃতি হে নমি নমি।
অশ্রুশ্রাবণপ্লাবন হে নমি নমি
পাপক্ষালনপাবন হে নমি নমি।
সব ভয় ভ্রম ভাবনার
চরমা আবৃতি হে নমি নমি।

একশো ছেষট্টি

মা-ঠাকরুণ হাতের বালা খুলতে যাচ্ছেন, ঠাকুর সশরীরে দেখা দিলেন। বললেন, 'কেন গো, আমি কি কোথাও গেছি? এ যেন এ ঘর আর ও ঘর।'

কারু সাধ্য নেই মাকে থান কাপড় এগিয়ে দেয়। নিজ হাতেই মা কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে সরু করে নিয়েছেন।

লোকনিন্দা যায় না। স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণকন্যা সোনার বালা পরে, পেড়ে কাপড় পরে, এ কি কথা! তা হলে মানতে হয় দেশাচার। আবার খুলতে যাচ্ছেন বালা, আবার ঠাকুরের আবির্ভাব। এবার একেবারে মাঠাকরুণের হাত চেপে ধরলেন, বললেন, 'আমি কি মরেছি যে বিধবার বেশ ধরবে? গৌরীকে জিগগেস কোরো, ও সব শাস্ত্র জানে।'

গৌরীকে কোথায় পাব? সে তো এখন বৃন্দাবনে।

ঠাকুরের তিরোধানের খবর পেয়ে গৌরীমা তো কেঁদে আকুল! ভৃগুপাতে দেহত্যাগ করতে উদ্যত হল। অমনি চোখ চেয়ে দেখল, সামনে ঠাকুর দাঁড়িয়ে। তুই মরবি নাকি? ঠাকুর ধমক দিয়ে উঠলেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে গৌরীমা উঠে দাঁড়াল। ঠাকুর অদৃশ্য হয়ে গেছেন। গৌরীমা বুঝতে পারল তার দেহত্যাগ ঠাকুরের ইচ্ছে নয়। এখনো অনেক বুঝি তার কাজ বাকি।

'কি বলবে বলোই না।' কাশীপুরে একদিন মা দেখলেন

ঠাকুর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন অপলকে। দুই চোখ কি যেন বলি-বলি করছে।

'হাঁ গা, তুমি কি কিছু করবে না? সব এ-ই করবে?' নিজের দেহের দিকে ইঙ্গিত করলেন ঠাকুর।

'আমি মেয়েমানুষ, আমি কি করতে পারি?'

'না, না, তোমায় অনেক কিছু করতে হবে। লোকগুলো অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।' নিজের দেহের দিকে আবার ইঙ্গিত করলেন ঠাকুর, 'এ আর কি করেছে? তোমার অনেক অনেক কাজ বাকি। দায় কি শুধু আমারই? দায় তোমারও।'

এখন, ঠাকুর অপ্রকট হবার পর, মার ইচ্ছা হল আমিও চলে যাই। ঠাকুর দেখা দিলেন। বললেন, 'জগতে মাতৃভাব প্রকাশের জন্য তোমাকে রেখে গিয়েছি। তুমি থাকো।'

এদিকে মায়ের সন্তানদের মধ্যে ঝগড়া বেধেছে। ঝগড়া বেধেছে ঠাকুরের ভস্মাস্থি নিয়ে। কাশীপুরের বাড়ির ভাড়া টানবার আর সঙ্গতি নেই সন্তানদের, তবে ঠাকুরের পুতাস্থিপুর্ণ কলসীটি কোথায় রাখা হবে? যত দিন এ বাড়ির মেয়াদ আছে তত দিন না হয় এখানেই সে কলসীর পূজার্চনা হবে—তারপর?

রাম দত্ত আর তার দলের লোকদের ইচ্ছা কলসী কাঁকুড়গাছিতে তার যোগোদ্যানে নিয়ে গিয়ে সমাহিত করা হয়। কিছুতেই তা হতে দেব না। শশী আর নিরঞ্জন রুখে দাঁড়াল। গঙ্গাতীরে জমি কিনব নিজেরা, আর সেখানে সমাহিত করব পুতাস্থি। কিন্তু জমি কেনবার মত টাকা কই? নিজস্ব একটা বাড়ি পর্যন্ত নেই যেখানে এ সম্পদ আগলাতে পারি। সন্ন্যাসী ভক্তরা যুক্তি করতে বসল। তাম্রকলসী রাম বাবুকেই দেওয়া হোক কিন্তু তার আগে পুতাস্থিভস্মের অধিকাংশ সরিয়ে নেওয়া হোক। কিন্তু দেখো, রাম বাবু যেন জানতে না পারে।

তাই হল। বেশির ভাগ পুতাস্থিভস্ম সরিয়ে নেওয়া হল কলসী থেকে। রাখা হল একটি আলাদা কৌটোয়। সে কৌটোটি লুকিয়ে রাখা হল বলরাম বসুর বাড়িতে। সেখানেই হবে নিত্যপূজা।

মায়ের কানে গেল এই ঝগড়ার কথা। গোলাপ-মাকে বললেন দুঃখ করে, 'এমন সোনার মানুষই চলে গেলেন, দেখেছ গোলাপ, ছাই নিয়ে ঝগড়া করছে।'

এত কথার দরকার কি। বললে নরেন, 'আমাদের দেহই ঠাকুরের জীবন্ত সমাধি হোক।'

পুতাস্থির খানিকটা হামালদিস্তেতে চূর্ণ করা হল। সেই চূর্ণ ভাগ করে নিল সন্ন্যাসী-সন্তানেরা। জিহ্বায় স্পর্শ করল সকলে।

ঠাকুর মহাপ্রয়াণ করেছেন একত্রিশে শ্রাবণ, তার কিছু দিন পরে, জন্মাষ্টমীর দিনে, অস্থির কলসী নিয়ে যাওয়া হল যোগোদ্যানে কে আর নেবে, শশীই মাথা পাতল। যথোচিত পূজা হল কলসীর। তার পর তাকে যখন মাটির নিচে পোঁতা হল, উপরে মাটি ফেলে দুরমুশ করতে লাগল, তখন শশী তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল, 'ওগো ঠাকুরের গায়ে যে বড্ড লাগছে।'

নবীন শ্যামল ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে ঠাকুরের যেমন হত। ওগো, মাড়িয়ো না, মাড়িয়ো না, বুকে। ভীষণ বাজছে।

পটে পটে কাঠে শিলায় সর্বত্র চৈতন্য।

একটি ভক্ত মেয়ে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। উত্তর দিকের দরজার একটু ফাঁক করে দেখে, একলা ঘরে ঠাকুর তক্তপোষের উপর বসে পশ্চিম দিকের দেয়ালে টাঙানো দেবদেবীর ছবিদের সঙ্গে হাত নেড়ে-নেড়ে হাসছেন, কথা কইছেন। ভিতরে ঢুকে তাঁর আনন্দের ব্যাঘাত ঘটাতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু অন্তর্যামী ঠাকুর জানতে পেরেছেন, হাতছানি দিয়ে ডাকলেন মেয়েকে, বললেন, 'দেয়ালের এই সব ছবি চৈতন্যময়, তাই এদের সঙ্গে কথা কইছি। তোমার ঘরে যে গোবিন্দের পট আছে তাকে ছবি মনে কোরনি, তার সঙ্গে কথা কোয়ো—তাকে চিন্ময় ভাবতে ভাবতে একদিন ঠিক তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে। সেই দিনই সার্থক হবে তোমার পূজা, তোমার ভোগরাগ।'

গোবিন্দ মানে জানো তো? যিনি ইন্দ্রিয় সকলকে রক্ষা ও পরিচালনা করেন, যিনি ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ তিনিই গোবিন্দ। বৃন্দাবনে গরু চরিয়ে বেড়াতেন যে গোবিন্দ সেই তিনিই জীবের ইন্দ্রিয়ের রাখাল। সকল ইন্দ্রিয়ের কর্তা মন, সেই মন গোবিন্দ-পাচনবাড়িতে জব্দ থাকে। গোবিন্দই মনোরথের সারথি।

মনকে নিগৃহীত করো। মন নিগৃহীত না হলে অভয় লাভ অসম্ভব। মন নিগৃহীত হলেই দুঃখ ক্ষয়, প্রবোধ ও পরাশান্তি। ধীরে ধীরে মন নিগ্রহ করো। কুশাগ্রের মুখে বিন্দু-বিন্দু করে জল তুলে সমুদ্র সেঁচে ফেল। কামেই চিত্তের বিক্ষেপ। কামভোগে কেবল দুঃখ, এই বোধে বৈরাগ্যবলে উদ্দীপ্ত হও। আত্মানাত্মবিবেকই উপাসেব্য।

মনের সংযমই শম। কর্মেন্দ্রিয়ের সংযমই দম। সকলই ব্রহ্ম, এ জেনে ইন্দ্রিয়গ্রাম যদি সংযত হয়, তখন যে অবস্থা তাই যম। প্রতিকারের চেষ্টা না করে চিন্তা আর বিলাপ না করে দুঃখ সহ্য করাই তিতিক্ষা। নিগৃহীত মন আবার যদি বিষয়াভিমুখী হয় তাকে প্রত্যাহৃত করাই উপরতি। গুরু ও বেদান্তবাক্যে আস্তিক্য-বুদ্ধিই শ্রদ্ধা। পরমগুরু পরমেশ্বরে একান্ত অনুরক্তিই সমাধান।

বলরামকে ঠাকুর বললেন, 'আমার ইচ্ছে দু'খানি ছবি যদি পাই। একটি ছবি, যোগী ধুনি জেলে বসে আছে; আরেকটি ছবি, যোগী গাঁজার কলকে মুখে দিয়ে টানছে আর সেটা দপ করে জ্বলে উঠছে। এ সব ছবিতে বেশ উদ্দীপন হয়। যেমন শোলার আতা দেখলে সত্যিকার আতার উদ্দীপন হয়।'

একটা থেকে আরেকটা।

অরুন্ধতী পাতিব্রত্যের প্রতীকস্বরূপ। তাই নবোঢ়াকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখানো হয়। সে নক্ষত্র অত্যন্ত ছোট, সহসে চোখে পড়ে না। সুতরাং স্বামী নিকটের একটি স্থূল উজ্জ্বল তারার দিকে সঙ্কেত করে বলে, ঐ দেখ অরুন্ধতী। যখন বধূর দৃষ্টি তাতে সুস্থির হল, একাগ্র হল, তখন স্বামী বললে, না, না, ওটা নয়, ওর কাছে ঐ যে ছোট্ট তারাটি আছে ঐটিই অরুন্ধতী।

প্রতিমা দেখছ, তারপর দেখ সেই নিষ্প্রতীককে। মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারচিত্ত দেখছ, তারপর দেখ এই আপনাকে। আত্মসাক্ষাৎকার করো।

'কি চাই জানবার আগে কে চায় নির্ণয় করো। অন্বিষ্ট বস্তু ও অন্বেষক ব্যক্তি কি আলাদা?'

তাই নিজেকে ফোটাও, নিজে হও। নিজেকে জানো। নিজেকে জানাই সত্য, নিজেকে জানাই সাধুতা। নিজের তাগিদে নিজের

অনুপাতে হয়ে ওঠা। অন্তকে নকল করে নয়, নিজে অবিকল থেকে।

শিবের কোলে কালী বসে, এই ক্ষেমঙ্করী ছবিটি ঠাকুরকে দিয়েছিল সুরেশ মিত্তির। ঠাকুর বললেন, 'বা, বেশ হয়েছে। মা, এই ঘরে থাকো, আর মন্দিরে গিয়ে খেও। ওরে রামলাল, কালীপুজোর দিন মার ছবিটি মার ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখবি। মা সেদিন অনেক কিছু খাবে।'

ভবনাথ এনে দিয়েছিল নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ-কীর্তনের ছবি। যমুনাপুলিনের ছবিটি এনে দিয়েছিল রাখাল। 'বা, রাখালের কি পছন্দ! রাধিকা কোমরে হাত দিয়ে যেন বাঁশরী কাড়তে যাচ্ছে!' শ্বেতপাথরের বুদ্ধমূর্তিটি দিয়েছিল পাইকপাড়ার রাণী কাত্যায়নী। নেপালের বিশ্বনাথ উপাধ্যায় দিয়েছিল গণপতি মূর্তি। কেশবচন্দ্র দিয়েছিল যীশুখৃষ্টের ছবি, মহেন্দ্রলাল দিয়েছিল ষোড়শী আর যশোদাগোপাল। শিকদারপাড়ার পোটো দিয়েছিল পাষাণী অহল্যা, রামলক্ষ্মণ-বিশ্বামিত্র।

সব কিছু সজীব। সর্বত্র উদ্দীপন।

নন্দনবাগানে ব্রাহ্মসমাজে গিয়েছেন ঠাকুর। ব্রাহ্মমন্দিরের বেদীর সামনে ঠাকুর প্রণাম করলেন। বললেন, 'নরেন বলে, সমাজ-মন্দিরে প্রণাম করে কি হয়? উদ্দীপন হয়। মন্দির দেখলেই তাঁকে মনে পড়ে। যেখানে তাঁর কথা সেখানেই তাঁর আবির্ভাব। সেখানেই সকল তীর্থের উপস্থিতি। এক জন, জানো তো, বাবলা গাছ দেখেই ভাবাবিষ্ট হয়েছিল, কেন না ঐ কাঠে রাধাকান্তের বাগানের জন্যে কুড়ুলের কাঠ হয়। একজনের এমন গুরুভক্তি, গুরুর পাড়ার লোককে দেখেই ভাবে বিভোর। মেঘ দেখে, নীলবসন দেখে রাধিকার ব্যাকুলতা।'

নন্দনবাগানে সদরালা কাশীশ্বর মিত্রের বাড়িতেই এই ব্রাহ্মমন্দির। সেদিন সে উৎসবে উপস্থিত আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেদমন্ত্র পাঠের পর উপাসনা হচ্ছে। তারপরে প্রার্থনা। মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা।

অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও। অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে। মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে। হে চিরপ্রকাশ! একবার আমার হয়ে প্রকাশ পাও, আমাতেই তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ করো। হে রুদ্র, হে ভয়ঙ্কর, তোমার প্রসন্নসুন্দর মুখ আমাকে দেখাও, সে-মুখের অভয়লাবণ্যে আমাকে বাঁচাও, আমাকে উজ্জীবিত করো।

ঠাকুর খুব খুশি। বলছেন, 'অশ্বত্থই সত্য, ফল দু'দিনের জন্যে। গাছ কে দেখে, সব ফল কুড়োতেই ব্যস্ত। অন্তর শুদ্ধ না হলে বিশ্বাস হয় না। যার ঠিক বিশ্বাস, তারই ঠিক দর্শন। তবে কি না সংসারী লোকদের ঈশ্বরানুরাগ ক্ষণিক—যেন তপ্ত লোহায় জলের ছিটে, জল যতক্ষণ থাকে।'

এক শিখ-সেপাই এসেছিল ঠাকুরের কাছে। বললে, 'আমরা হরদম মারপিট করছি, সরকারি হুকুমে গুলী করে লোক মারছি, আমরা কি রকম থাকব?'

ঠাকুর ভাবে দেখলেন, একটা ঢেঁকি ধান ভানছে। বললেন, 'দেখ, ঢেঁকি যেমন অনেক মাথা নাড়ে, অনেক উঁচু-নিচু ওঠে, গড়ের ভিতর অনেক ধান ভানে, অনেক কাজ করে কিন্তু দু' পাশের দুটো কাঠি দু'টো খোঁটাতে আটকানো থাকে, কোনো নড়চড় নেই, তেমনি মন রেখে কাজ কোরো।'

কাশীপুর বাগানের পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে ছেলেরা। নরেন, নিরঞ্জন আর কালী। কালীই বেশি ওস্তাদ। নরেন, নিরঞ্জন একটি মাছ গাঁথতে যত সময় নেয়, তার মধ্যে কালী প্রায় চার-পাঁচটি ধরে ফেলে। ঠাকুরের কানে গেল এ সংবাদ। ছেলেদের তিনি ডেকে পাঠালেন।

কালীকে বললেন, 'তুই নাকি পুকুরে ছিপ ফেলে খুব মাছ ধরিস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ছিপ দিয়ে মাছ ধরা বড় পাপ।'

'কেন জীবহত্যা?' নরেন বললে।

'হ্যাঁ, জীবহত্যা।'

'সে কি? নায়ং হন্তি ন হন্যতে। আত্মা কাউকে মারতেও পারে না, নিজেও মরে না, তাহলে পাপ কোথায়?'

'পাপ বিশ্বাসঘাতকতায়।' বললেন ঠাকুর, 'আহারের লোভ দেখিয়ে বঁড়শি লুকিয়ে রাখা আর অতিথিবন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে তার খাদ্যে গোপনে বিষ দেওয়া একই পাপ। আত্মা মরে না, অন্যকেও মারে না—এ সত্য, কিন্তু এই জ্ঞান যার হয়েছে, সে তো আত্মাস্বরূপ হয়েছে। তার আর অপরকে হত্যা করার প্রবৃত্তি হবে কেন? যতক্ষণ ঐ হত্যাবৃত্তি আছে ততক্ষণ সে আত্মাস্বরূপ হয়নি, সুতরাং তার আত্মজ্ঞানও হয়নি। তাই জেনে রাখ, ঠিক ঠিক জ্ঞান হলে পা আর পড়ে না বেতালে।'

প্রয়াগে এসেছেন মা-ঠাকরুণ। ঠিক করলেন ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নানকালে কেশদাম বিসর্জন দেবেন। কাউকে সে কথা প্রকাশ করলেন না, লক্ষ্মীকেও না। স্নানের দিন খুব প্রত্যূষে মা শুনতে পেলেন, কে যেন লক্ষ্মীকে ডাকছে। 'লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী।' বেদনাবিদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠস্বর। মা চঞ্চল হয়ে ছুটে গেলেন দরজার দিকে! দেখলেন, ঠাকুর দুই হাত দিয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। পলক স্থির হতে না হতেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মায়ের প্রাণ অধীর হয়ে উঠল। কেন, কেন ঠাকুরের এই কাতরতা? সহসা মনে হল, তাঁর কেশদাম জলাঞ্জলি দেওয়া ঠাকুরের ইচ্ছে নয়।

কাশীধামে এসেছেন শ্রীমা। মৃত্তিকার কাশী নয়, স্বর্ণের কাশী।

কাশীতে এক গুরু তার শিষ্যকে এক ডেলা মাটি আনতে বললে। শিষ্য সারা কাশী ঘুরে ঘুরে গুরুর কাছে ফিরে এল দিনান্তে। বললে, গুরুদেব, আমি হতভাগ্য, আপনার আদেশ পালন করতে পারলুম না। কোথাও একটু মাটি নেই।

এ কি অসম্ভব কথা! গুরু ক্রুদ্ধ হল। সারা কাশী খুঁজে এক ডেলা মাটি পেলে না তুমি?

বিনয় বচনে শিষ্য বললে, না গুরুদেব! অন্নপূর্ণার সোনার কাশী, এখানে মাটির ছিটেফোঁটাও নেই—সমস্তই সোনা।

গুরু স্তম্ভিত হয়ে গেল। শিষ্য তাকে ছাড়িয়ে সাধন-ভূমির কত উঁচুতে উঠে গেছে।

বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢালছেন শ্রীমা, আর দেখছেন, অনাদি লিঙ্গ কোথায়, ঠাকুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। যত জল ঢালছেন সব ঠাকুরের পায়ে পড়ছে। হাত-পা কাঁপতে লাগল শ্রীমার, তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরলেন। এত তাড়াতাড়ি ফিরলে কেন মা?

কে একজন জিগগেস করল। মা বললেন, ঠাকুর আমাকে হাত ধরে মন্দির থেকে নিয়ে এলেন।

আরেক দিন মা নারায়ণ দেখলেন। বৃন্দাবনে শেঠদের মন্দিরে যেমন দেখেছেন তেমনি। শুধু নারায়ণ নয়, নারায়ণের পাশে ঠাকুর। ঠাকুর হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠাকুর হাত-জোড় করে দাঁড়িয়ে কেন? 'তাঁর কথা ছেড়ে দাও।' বললেন মা। 'সকলের কাছেই তাঁর দীনভাব—ঐ ওঁর বিশেষত্ব। এবার যে বালকবৎ অবস্থা অবলম্বন করে লীলা করলেন।'

একবার এক ভক্ত ঠাকুরকে একজোড়া মোজা দিল। নতুন মোজা পরে ঠাকুর ছোট ছেলের মত আহ্লাদে আটখানা। ছুটকো গোপাল এসেছে দর্শন করতে, আনন্দময় ঠাকুর বলে উঠলেন, 'ওরে, আমাকে আজ মোজা পরিয়ে কেমন বাবু সাজিয়েছে ছাখ।'

গোপাল হাসছে।

'তুই বড় হাসছিস যে?'

'মোজা পরে তো বেশ সেজেছেন।' বললে ছুটকো গোপাল, 'এদিকে পরনের কাপড়খানার যে ঠিক নেই।'

ঠাকুরের কাপড়খানা এলোমেলো হয়েছিল। তিনি নির্লিপ্তের মত বললেন, 'তাই তো রে, ঠিক বলেছিস তো!'

কাপড়খানা ঠিকঠাক পরিয়ে দিল গোপাল। একেবারে শিশু। সদানন্দ সর্বানন্দ শিশুর মতই হাসতে লাগলেন ঠাকুর।

কামারপুকুরে একদিন রঘুবীরের ভোগ হয়ে গেলে ঠাকুরকে ডাকতে গেলেন মা। দেখলেন, ঠাকুর ঘুমুচ্ছেন। মা একবার ভাবলেন ভাঙাবেন না ঘুম; আবার ভাবলেন ঘুম না ভাঙালে খেতে যে দেরি হয়ে যাবে। ভাবতে না ভাবতেই ঠাকুরের ঘুম ভেঙে গেল। বললেন, 'জানো গা, এক দূর দেশে গিয়েছিলাম। সেখানকার লোক শাদা-শাদা। তারা পরে আসবে। কিন্তু আমার দেখা তারা পাবে না।'

তাদের অগ্রদূতী নিবেদিতা। মাকে একটি জার্মাণ-সিলভারের কৌটো দিয়েছে, তাতে মা ঠাকুরের কেশ রেখেছেন। বলেন, 'নিত্য-পুজার সময় যখন এই কৌটোটির দিকে তাকাই, নিবেদিতাকে মনে পড়ে। নিবেদিতা আমায় বলেছিল, 'মা, আমরা আর জন্মে হিন্দু ছিলুম। ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার হবে বলেই ওদেশে জন্মেছি।'

কোয়ালপাড়াতে খুব জ্বরে ভুগছেন শ্রীমা। বেহুঁশ হয়ে বিছানাতেই অসামাল হয়ে পড়ছেন। হুঁশ হয়ে যখনই ঠাকুরকে স্মরণ করছেন তখনই দর্শন পাচ্ছেন।

সেই হৃষীকেশ থেকে এক সাধু লিখেছে মাকে, মা তুমি বলেছিলে, সময়ে ঠাকুরের দর্শন পাবে, কই তা হল? চিঠি পেয়ে মা বললেন, 'ওকে লিখে দাও তুমি হৃষীকেশে গিয়েছ বলে ঠাকুর তোমার জন্যে সেখানে এগিয়ে থাকেননি। সাধু হয়েছো ভগবানকে ডাকবে না তো কি করবে? তিনি যখন ইচ্ছা দেখা দেবেন।'

'আপনাকে দর্শন করেছে অথচ আপনার উপর বিশ্বাস-ভক্তি নেই, তাদের কি কিছুই হবে না?' একজন জিগগেস করল ঠাকুরকে।

ঠাকুর বললেন, 'ওরে নাই বা মানলেক, দর্শনের ফল যাবে কোথায়? পরের জন্মে তাদের সাধনভজনে মতিগতি হবে।' কেউ কেউ বা অশরীরী অবস্থাতেও উদ্ধার পায়।

গোপালের মার বাড়িতে ঠাকুর আর রাখাল গেছে মধ্যাহ্ন-ভোজের নিমন্ত্রণে। গঙ্গার ধারের বাগানবাড়ির নিচের ঘরটিতে থাকে গোপালের মা। কি রাশীকৃত আয়োজন করেছে কে জানে, তার রান্না তখনো শেষ হয়নি। উপরের ঘরটি খুলে দিয়ে অতিথিদের বিশ্রাম করতে বললে। ঠাকুরের পাশে তাকিয়া ঠেস দিয়ে রাখাল চোখ বুজে শুয়ে রইল। খানিক পরে শুনতে পেল, কে যেন ঠাকুরের সঙ্গে কথা কইছে। বলছে, 'আপনি এখানে আসাতে আমাদের ঘর ছেড়ে দিতে হয়েছে। বাইরে এই দুপুরের রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে বড় কষ্ট হচ্ছে আমাদের।'

ঠাকুর বললেন, 'তোমরা কারা?'

'আমরা প্রেতাত্মা। পাশের চটকলে কাজ করতুম, অপঘাতে প্রাণ গিয়েছে। সদ্গতি হয়নি এখনো। এই বাগানে ঘুরে বেড়াই আর এই খালি ঘরে থাকি'

'আহা, তোমাদের এত কষ্ট! এখুনি চলে যাচ্ছি আমি।' ঠাকুর উঠে পড়লেন।

রাখাল চোখ চেয়ে দেখল পাশে ঠাকুর নেই। ছুটে সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে ধরল। এ কি, নেমে যাচ্ছেন কেন? কার সঙ্গে কথা কইছিলেন এতক্ষণ?

'ওরে, এই ঘরটাতে ভূত থাকে। তারা বলছিল, তাদের কষ্ট হচ্ছে বাইরে থাকতে। তাই নেমে যাচ্ছি। খবরদার, এ কথা যেন বলিসনে বামনিকে।'

'আপনাকে দেখেও কি ওদের উদ্ধার হবে না?'

'হবে। এখানকার টান চলে গেলেই উঠে যাবে উপরে।'

এখানকার টান কি যে-সে টান। ঠাকুর ছড়া কাটলেন:

রাণী টানেন কোল পানে
রাখাল টানে বন পানে
রাই টানেন চোখের টানে
বল শ্যাম দাঁড়াই কোথা?

'সংসারে থাক কিন্তু আসক্তির গোড়া কেটে।' বললেন ঠাকুর, 'আসক্তি পুষে রাখলে এগুবি কি করে? নোঙর না তুলে দাঁড় টেনে গেলে নৌকো এক হাতও এগোয় না।'

'তবে কি সংসার থেকে দয়ামায়া স্নেহ-ভালোবাসা তুলে নেব?'

'তোমাকে নিষ্ঠুর হতে হবে, এ কে বলছে? সংসারের সবাইকে আপনার জন মনে না করে ভগবদ্জন বলে ভাবতে শেখ। তারই জন্য মনের জঞ্জাল আগে সাফ করো। মনের জঞ্জাল ঘুচলেই চোখের দৃষ্টি ফুটবে। তখন দেখতে পাবে এ সংসারও তাঁরই রচনা। যার যা পেটে সয় তার জন্যে তেমন খাবারের ব্যবস্থা।'

যেখানে থাকো না কেন, স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরেই। তুমি ছাড়া কেউ তা তোমার হয়ে আবিষ্কার করতে পারবে না।

ঈশ্বরে যুক্ত হয়ে থাকো। সব সময়ে তাঁর কথা ভাবো। তাঁর নাম করো। পুণ্যতীর্থ, নদীতীর, গুহা, পর্বতশৃঙ্গ, তীর্থস্থান,

নদীসঙ্গম, পবিত্র বন, নির্জন উদ্যান, বিল্বমূল, গিরিতট, দেবমন্দির, সমুদ্রতীর, নিজ গৃহ অথবা যে স্থানে মন প্রশস্ত হয়, প্রসন্ন হয়, সেখানেই নাম করো। অত বাচবিচারেই বা দরকার কি। যখনই মনে পড়বে তখনই নাম করবে। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে খেতে শুতে—যখন তখন। নাম করতে করতে মনের জঞ্জাল সাফ হবে। দেখা দেবে পবিত্রতা। পবিত্রতাই চিরতুষারমণ্ডিত কৈলাসধাম। নাম করতে করতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হবে। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ। চিত্তকে একতান বা একাগ্র করার নামই যোগ। বুদ্ধির সমস্ত মুখ বেঁধে দিয়ে একটি মাত্র মুখ খুলে রাখার নাম যোগ। আর সব মুখ বেঁধে দিয়ে ঈশ্বরের মুখটি খুলে রাখো। দেখ কি রকম বেগ কি রকম শক্তি!

চিত্তে বাসনা থাকতে যোগ হবার সম্ভাবনা নেই। তোমার চিত্ত তোমারই অধীন হবে, তুমি চিত্তের অধীন হবে না, এইটিই যোগের লক্ষণ। সর্বদিকে নিরুদ্ধ, শুধু একদিকে একাগ্র। ঈশ্বরে ঐকভাবনার নামই যোগ। সে অভিজ্ঞতার জন্যে প্রস্তুত হও। প্রস্তুত হওয়া মানেই অধিকারী হওয়া।

নিশ্চিন্তপুরুষ হয়ে যাও।

বর্ষার রাত, অবিশ্রাম বৃষ্টি হচ্ছে, ঝড়ও চলেছে দুর্নিবার, এক গোয়ালার ঘরের দেয়ালের ধারে ছেঁচতলায় আশ্রয় নিয়েছেন বুদ্ধদেব। জানলা দিয়ে গোয়ালা দেখলে, গেরুয়া কাপড়। হেসে বললে, 'সন্ন্যাসী, ওখানেই থাকো, ঐ তোমার ঠিক জায়গা।' তারপরে গান ধরল গোয়ালা, আমার গরু-বাছুর ঘরে আনা হয়েছে, সুন্দর আগুন জ্বলছে, আমার স্ত্রী নিরাপদে আছে, শিশুরা শান্তিতে ঘুমুচ্ছে, হে মেঘ, তুমি আজ যত খুশি বর্ষাও সারা রাত।' বাইরে থেকে বুদ্ধদেব বললেন, 'আমার চিত্ত সংযত হয়েছে, আমার ইন্দ্রিয় সকল গুটিয়ে এনেছি, হৃদয় আমার দৃঢ়, হে সংসারমেঘ, যত পারো বর্ষণ করো সারাজীবন।'

এই হচ্ছে নিশ্চিন্তপুরুষ।

একটি আসনে বসো ও ধ্যান করো।

যে অবস্থায় মুখে অজস্র ব্রহ্মচিন্তা হয়, তাই আসন। এ ছাড়া অন্য আসন সুখাসন নয়, সুখনাশন। শুধু স্তব্ধতাই মৌন নয়। বাক্য ও মন যাকে না পেয়ে নিবর্তিত হয় তাই মৌন। সমরস ব্রহ্মে লীন হওয়াই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমতা। নইলে শুধু শারীরিক ঋজুতাই সমতা নয়। নাসাগ্রনিবদ্ধ দৃষ্টিই যোগদৃষ্টি নয়। জ্ঞানময় দৃষ্টিতে সকলই ব্রহ্মময় দেখাই যোগদৃষ্টি। ব্রহ্মই আমি, এই জ্ঞানে যে নিরালম্বন স্থিতিলাভ হয় তাই ধ্যান। নির্বিকার ব্রহ্মরূপে অবস্থানে চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তিই সমাধি।

বিষয় আর কিছুই নয়, দুটি মাত্র অক্ষর: হ আর রি।

কি খুঁজছ? সুখ? হায় হায় সুখ কি খোঁজবার বস্তু?

এমন একটা জিনিস চাই যাকে ধরে বাঁচতে পারি। যে আমাকে অন্তহীন আশা দেবে অতলগভীর আশ্বাস দেবে, অবিচ্ছিন্ন উৎসাহ দেবে। নিজের মধ্যে এত আমি অনিশ্চিত, সে আমাকে অকম্পিত নিশ্চয়তা দেবে। কে সে?—ঐ দুটি মাত্র অক্ষর।

রাখাল ঠাকুরকে বললে, 'মাকে বলুন, যাতে শরীরটা আর কিছু দিন থাকে।'

নরেনেরও সেই কথা: 'আপনি ইচ্ছে করলেই মার ইচ্ছে হবে।'

'না রে না, এখন আর মাকে বলে কিছু হবে না'। বললেন ঠাকুর, 'এখন আর মার আর আমার ইচ্ছার মধ্যে ভেদ খুঁজে পাচ্ছি না'। পরে নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'এর মধ্যে দুটো! একটি মা পূর্ণ ও আর একটা ছেলে—অবতীর্ণ। ছেলেরই হাত ভেঙেছিল, ছেলেরই এখন অসুখ। পূর্ণই অবতীর্ণ হয়, মানুষ হয়ে ভক্ত সঙ্গে আসে, তার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও চলে যায়। বাউলের দল এল, নাচল, চলে গেল, কেউ চিনলে কেউ চিনলে না। জীবের জন্যেই এই শরীর ধারণ, আর শরীর থাকলেই কষ্ট।' ঠাকুর তাকালেন নরেনের দিকে। জিগগেস করলেন, 'আমাকে কি বলে বোধ হয়?'

নরেন বললে, 'আপনি সত্যদর্শী সিদ্ধ মহাপুরুষ, আপনিই স্বয়ং শ্রীমতী রাধারাণী।'

ঠাকুর নিজের বুকে হাত দিয়ে বললেন, 'দেখছি যা কিছু আছে, সব এখান থেকেই।'

তুমিই সব। তুমিই সমস্ত ঘর-ঘোরা পরিপক্ক ঘুঁটি। তুমি সব ঘরে সব ঘাটে সব পথে সব স্তরে। সব দৃষ্টিকোণে। তুমি আস্তিকের অস্তি, নাস্তিকের নাস্তি, শূন্যবাদীর শূন্য, অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈত। তুমি অভেদবাদীর এক, প্রভেদবাদীর বহু, দ্বৈতবাদীর দুই। তুমি কি নও? তুমি সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থী, সংসারী, ব্রহ্মচারী। তুমি কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত। তুমিই আমার একমাত্র। সার তুমি, বস্তু তুমি, প্রয়োজন তুমি। তুমিই আমার ঘর-বাড়ি, মাঠ-আকাশ, সাগর-পর্বত। আমার সমস্ত ভালোবাসা, স্তবস্তুতি কথন-কীর্তন সব তোমার। তুমি দুর্বলের বল, দুঃখীর দরদী, দরিদ্রের ধনরত্ন। তুমি নিরাকুল শান্তি, নিরাময় ক্ষমা, নিরঞ্জন সান্ত্বনা। তুমি মধুর, সর্বতোমধুর।

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং॥
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরং।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং॥
বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরো
পাণির্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং॥
গীতং মধুরং পীতং মধুরং
ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরং।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং॥

সমাপ্ত

সোবিয়েতের দেশে দেশে

মনোজ বসু

১৮

বাচ্চাদের এক ইস্কুল। ঠিক শহরে নয়—মস্কোর বাইরে শহরতলীতে। ১৯২৭ অব্দে প্রতিষ্ঠা। বাড়িটা আরও পুরানো—প্রাক-বিপ্লব আমলের। আগে শুধুই ছেলেরা পড়ত; এই সেপ্টেম্বর অর্থাৎ মাস দুই আগে থেকে মেয়েদেরও নিচ্ছে। হাই-ইস্কুল, দশম শ্রেণী অবধি। শিক্ষক পঞ্চান্ন জন; ছাত্রছাত্রী হাজারের বেশি। পুরুষ শিক্ষক এগারো জন, বাদ বাকি মেয়ে। সবাই ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। চল্লিশ বছর ধরে পড়াচ্ছেন এমন শিক্ষক আছেন, আবার এমনও আছেন যাঁদের অভিজ্ঞতা মাত্র দু-মাসের।

ডিরেক্টর মশায় ভারিক্কি মানুষ—পাকা চুল, পাকা গোঁফ, বুকের উপর মেডেল ঝুলছে। পথ দেখিয়ে তিনি নিয়ে চললেন। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে লম্বা করিডর পার হয়ে যাচ্ছি। দেয়ালের মাথা জুড়ে শিক্ষা-নেতাদের ছবি। সিঁড়ির মুখে যথারীতি আবক্ষ লেনিন ও ষ্ট্যালিন।

শিক্ষক কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা হল। যৌথ-চেষ্টায় বিশ্বাসী তাঁরা—ছেলেপুলে মিলেমিশে কাজ করবে, সেই শিক্ষা সকলের আগে। ভাল ল্যাবরেটারি আছে; সিনেমা-ছবি দেখানোর যন্ত্র এবং শিক্ষা ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আরও নানা রকমের যন্ত্রপাতি। ড্রইং শেখানোর এলাহি ব্যবস্থা। গানের ক্লাসও আছে। প্রত্যেক বিভাগের আলাদা লাইব্রেরি—ভূগোল-বিভাগে দু হাজার বই; ইতিহাসে তিন হাজারের বেশি। অথচ মনে রাখবেন, এমন কিছু নামজাদা প্রতিষ্ঠান নয়—শহরতলীর ছোটখাট ইস্কুল মাত্র।

পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে ঢেলে-সাজা হয়েছে। নতুন পদ্ধতিতে শ্রমের দিকটায় জোর দেওয়া হচ্ছে—প্রথম থেকে দশম শ্রেণী অবধি কারিগরি পাঠ দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা কাগজ, কাদা ও প্লাষ্টিসিন দিয়ে নানা জিনিষ বানায়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে কাঠের কাজ, তৃতীয় শ্রেণীতে ধাতুর কাজ। চতুর্থ শ্রেণীতে উঠে এই তিন শ্রেণীর যাবতীয় উপকরণ মিলিয়ে কাজ করবে। এমনি ধাপে ধাপে চলন। ট্রাক্টর রেল-ইঞ্জিন চালানো অবধি। দশম শ্রেণীতে ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে শেখায়। বিজ্ঞান ও কারিগরি সম্বন্ধে যা-কিছু ছেলেমেয়েরা বইয়ে পায়, সমস্ত হাতে-কলমে শেখানোর ব্যবস্থা আছে ইস্কুলে।

সেপ্টেম্বর থেকে মে অবধি শিক্ষার মরসুম। শীতের ছুটি ৩১ ডিসেম্বর থেকে ১৩ জানুয়ারি। বসন্তের ছুটি ২৫ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল। প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীতে পরীক্ষার বালাই নেই, বাচ্চারা এমনি প্রোমোশন পায়। পরীক্ষা জুনের শেষাশেষি—এক মাস আগে প্রোগ্রাম দেওয়া হয়। দুরকমের পরীক্ষা—লেখায় আর মুখে। পাঠ্য বই সর্বত্র এক রকম। বিভিন্ন ভাষায় পাঠ্য বইয়ের অনুবাদ হয়—যে গণতন্ত্রে যেটা মাতৃভাষা, সেখানে সেই ভাষায় বই পড়ানো হয়। প্রোগ্রাম সর্বত্র এক, পরীক্ষা ঠিক একই সময়ে হয়। প্রত্যেক গণতন্ত্রে শিক্ষা-দপ্তর আছে, শিক্ষা-কমিশন আছে; তাঁরা সেই গণতন্ত্রের শিক্ষা-নীতির নিয়ামক। প্রোমোশনের পর তিন মাস লম্বা ছুটি। ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কর্তারা ভারি সজাগ। প্রত্যেক ইস্কুলে আলাদা চিকিৎসা-কেন্দ্র, ডাক্তার, নার্স, শিশুদের জন্য বিশেষ হাসপাতাল। স্বাস্থ্যের কারণে যে ছেলের বাইরে যাবার দরকার, এই ছুটির মধ্যে তার ব্যবস্থা করা হয়। ইস্কুল থেকেও দল বেঁধে পাঠানো হয় শিক্ষার জন্য।

লেনিন বলেছিলেন, শিক্ষকরাই দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা পাবেন। বিস্তর আইন হয়েছে শিক্ষকদের সুখ-সুবিধার জন্য। একটা আইন ১৯৪৮ অব্দের—দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের পর যখন পুনর্বাসনের হিড়িক পড়ে গেছে। এই আইনে ইঞ্জিনিয়ারের সমান মাইনে পাবেন শিক্ষকরা। সর্বনিম্ন মাইনে আট-শ' রুবল। এই যে ডিরেক্টর মশায় আমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, ইনি পান ২৯০০ রুবল। ডিরেক্টর আবার অঙ্কের মাষ্টারও বটে, বারো ঘণ্টা কাজ সপ্তাহে। এমন আছেন—এ-ইস্কুলে দু-ঘণ্টা ও-ইস্কুলে দু-ঘণ্টা পড়ান। মাইনে ৩৫০০ রুবল। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী যাঁরা পড়ান, তাঁদের খাটনি চার ঘণ্টা দিনে; পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী যাঁরা পড়ান, তাঁদের তিন ঘণ্টা। পাঁচ বছর কাজ হলে মাইনের উপর দশ পারসেণ্ট বেশি পাবেন; দশ বছর হলে কুড়ি পারসেণ্ট। পঁচিশ বছরের বেশি কাজ হলে ত্রিশ পারসেণ্ট বেশি মাইনে, তা ছাড়া পেনসন চল্লিশ পারসেণ্ট পরিমাণ। পেনসনের টাকা কাজ করলে পাবেন, না করলেও পাবেন। পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য বাড়তি পাওনা। যাঁরা ক্লাস-টিচার, তাঁরা ঐ বাবদ মাইনের উপর সাড়ে বারো পারসেণ্ট অতিরিক্ত পান। কোন দিন যদি নিয়মিত তিন-চার ঘণ্টার বেশি পড়াতে হয়, তার জন্যও টাকা পাবেন। মফস্বল হলে বিনা খরচে বাসস্থান, কয়লা ইত্যাদি। কোন শিক্ষক নিজ সংসারের জন্য যদি জমি চাষ করতে চান, সরকার জমির ট্যাক্স মাপ করে দেবে। প্রাইভেট-টুইশানি করবার আইনত বাধা নেই, যদিও ছাত্রদের কদাচিৎ তার প্রয়োজন ঘটে। পাঁচ বছর অন্তর শিক্ষা-দপ্তরে কাজের রিপোর্ট যায়, দশ বছর ভাল কাজ হলে শিক্ষক সরকারি মেডেল পান। ত্রিশ বছরে অর্ডার অব লেনিন। আমাদের এই ডিরেক্টর মশায়ের তেতাল্লিশ বছর কাজ হয়েছে, অর্ডার অব লেনিন পেয়েছেন তিনি, সগর্বে সেই নিদর্শন জামায় সেঁটে রেখেছেন। এ ছাড়া গুণ বুঝে গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট প্রতি বছরের উৎসবে শিক্ষকদের উপাধি দান করেন।

রবিবারে ছুটি। মে দিবস (১ মে) ও বিপ্লব দিবসে (৭ নবেম্বর) ইস্কুল বন্ধ থাকে। বড়দিনের ছুটি নেই।

লেনিন স্তালিনের জন্ম ও মৃত্যুদিন আমরা স্মরণ করি, কিন্তু ইস্কুলের ছুটি নয়। পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পিরিয়ড—নিচু তিন ক্লাসে চার পিরিয়ড করে হয় রোজ। চতুর্থ শ্রেণীর সপ্তাহে আরও ভুটো পিরিয়ড বেশি। ছেলেমেয়ের একই রকম পাঠ্যসূচি। পরীক্ষা নেবার জন্য ডিরেক্টর মশায়ের তত্ত্বাবধানে কমিশন বসানো হয়, শিক্ষকেরা তার মধ্যে থাকেন। প্রথম শ্রেণীর ঘরে ঢুকলাম। সাত বছরের ফুটফুটে বাচ্চারা ধবধবে পোশাক পরে লেখাপড়া করছে। বেঞ্চিতে বসেছে দু-জন করে। বই নেড়েচেড়ে দেখি—ছবিই কেবল, লেখা যৎসামান্য। অধ্যাপক গুপ্ত দেশ থেকে কিছু ছবি এনেছেন—ছেলেমেয়েদের দিলেন। তারাও পালটা ছবি দিল ভারতের অদেখা বাচ্চা বন্ধুদের নাম করে।

ভূগোলের ঘর। ছবিতে ঠাসা—পাহাড়, অরণ্য, আমুদরিয়া নদী; বালুতে পাহাড় ক্ষয়ে গেছে—তার ছবি। এর মধ্যে স্তালিন, লেনিনের ছবিও আছে। বড় বড় ম্যাপ টাঙানো, নানা রকমের গাছ টবে। সামুদ্রিক গাছ-পালা। সমুদ্রের তলদেশ—ছেলেরা বানিয়ে রেখেছে। তিন রকমের ফিল্ম প্রোজেক্টার। বিশাল ব্লাকবোর্ডের পাশে পর্দা গোটানো থাকে, ফিল্ম দেখানোর সময় মেলে দেয়। আমাদেরও দেখাবে একটু। কালো পর্দায় চক্ষের পলকে জানলাগুলো ঢেকে দিল, সাদা পর্দায় ব্লাকবোর্ড। নানান দেশের ছবি দেখছি। ভারতেরও। দুর্গম গিরিসঙ্কট, নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য, জল সেচনের নানা রকম ব্যবস্থা।

জীবতত্ত্বের ঘর। কঙ্কাল, কতরকমের মডেল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মডেল। পোকামাকড়, কত বিচিত্র ধরনের পাতা। পাশেই জীবন্ত প্রাণীর ঘর। রকমারি পাখি, খরগোস, মুরগি, রঙিন মাছ। সামান্য একটা ইস্কুলের জন্য কী বিপুল বিচিত্র আয়োজন!

এই একটা জায়গায় নয়, সারা সোবিয়েত দেশ জুড়ে এমনি ব্যাপার। শিক্ষার ব্যাপকতা দেখে তাজ্জব হতে হয়। পিছিয়ে-পড়া দেশগুলো সদ্য ঘুরে আসছি—পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেও যেখানে শতকরা দেড় জন দু-জনের মাত্র অক্ষর-পরিচয় ছিল। তাও সুর করে কোরানের সুরা পড়ত মাত্র। আর এখন যে তল্লাটেই গিয়েছি, নিরক্ষরতা একেবারে নেই! যাবতীয় শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে—শিক্ষার প্রথম পর্বে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কিছু শিখতে হয় না। মাতৃভাষা যত দরিদ্রই হোক, রাষ্ট্রের কাছে তার সর্বোচ্চ সম্মান; মাতৃভাষাকে তুলে ধরবার জন্য প্রত্যেকটি গণতন্ত্র এবং সোবিয়েত রাষ্ট্র সকল চেষ্টা করছে। কয়েকটি ভাষার লিপি পর্যন্ত ছিল না, সেখানে লিপির ব্যবস্থা হয়েছে। ভাষা দুর্বল বলে বিলুপ্ত ঘটানোর চেষ্টা হয় নি।

শিক্ষা মানে কয়েকটা পাশ করা নয়—শিক্ষার উদ্দেশ্য, ওরা বোঝে, জীবনকে পরিপূর্ণ করে গড়ে তোলা। আঁটোসাটো ক্লাসের ঘরে খানকয়েক বইয়ের মধ্যে নিমগ্ন থাকা নয়। তিন স্তরের শিক্ষা। তিন বছর অবধি নার্সারি। তিন থেকে সাত কিণ্ডারগার্টেন। সাত থেকে সতের ইস্কুল। আজকে যার একটা দেখে এলাম।

লাখ লাখ ছেলে-মেয়ে নার্সারিতে পড়ে। দুনিয়ার ছয় ভাগের এক ভাগ সোবিয়েত দেশ—এই বিশাল দেশের সকল অঞ্চলে নার্সারি ছড়ানো। নার্সারির মধ্যে শিশু-কোরক ফুল হয়ে ওঠে। মা কাজকর্মে যাচ্ছে, নার্সারিতে বাচ্চা রেখে যায়। নার্সারি তা হলে হল দ্বিতীয়-মা। এই দ্বিতীয়-মা দিনের বেলা কাজের সময়ের; আসল মা রাত্রে ঘুমানোর। দ্বিতীয়-মা দেখে, যাতে শরীর গড়ে ওঠে শিশুর, সে হাসিস্ফূর্তিতে থাকে। যা স্বভাবক্রমে শেখা যায়, তাই শুধু শেখায় নার্সারিতে। এখানেই শেষ নয়—নার্সারির কর্মীরা বাড়ি গিয়ে দেখে, বাচ্চা কেমন অবস্থায় থাকে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ দেয়, যথাযথ ব্যবস্থা করে আসে। এখানকার মা শিউরে উঠবেন—কনকনে হিম, বরফগুঁড়ি পড়ছে, তারই মধ্যে খোলা জায়গায় বাচ্চাদের রেখে দিয়েছে। একটু বড়রা—গোলাপ ফুলের মতো লাল—দেখতে পাবেন, মাটির উপর ঝাপটে বসে খেলাধূলোয় মেতে আছে।

রঙের খেলা নার্সারিতে। ঘরের দেয়ালে নানা রং; খেলনায় বিচিত্র রঙের বাহার। রং দেখতে দেখতে জীবনও রঙিন হয়ে ওঠে নাকি। যাকে আমরা বলি পড়ানো—নার্সারি-কর্মীরা তা করে না কখনো। কথা বলে তারা শিশুদের সঙ্গে—গল্প করে, হাসায়। দু-একটা শিশু গম্ভীর মনমরা ছিল, দু-পাঁচ দিনে তারা হাসিস্ফূর্তি ছুটোছুটিতে মেতে ওঠে। গ্রীষ্মের সময়টা নার্সারিগুলো গাঁয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। জায়গা-বদলের ফলে বাচ্চারা স্বাস্থ্যে ভরে ওঠে।

তারপরে কিণ্ডারগার্টেন। সবাইকে এক ছাঁচে ফেলে শিক্ষাদান নয়। বয়স, মনের গঠন, স্বাভাবিক প্রবণতা সকল দিক লক্ষ্য রাখা

মস্কো-নদীর পাশে দলকে দেখিয়েছি

হয় প্রতিটি শিশুর। মানুষ তারা, এক প্যাটার্নের পুতুল নয়, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে তাদের—এই হল শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ার কথা। পড়া হয়, এই স্তরে, দিনের মধ্যে কুড়ি থেকে চল্লিশ মিনিট। চল্লিশের বেশি কখনো নয়। গ্রীষ্মের সময় শিশুদের গ্রামে নিয়ে যায়। সেখানে মাটি গাছপালা পাখি ও জীবজন্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যেক নার্সারি ও কিণ্ডারগার্টেন-প্রতিষ্ঠানে অভিভাবকের কমিটি আছে—তাঁরা এসে দেখাশুনা করেন, উপদেশাদি দেন।

এরই পরে ইস্কুল। যেমন একটায় আজ এসেছি। ইস্কুলের নাম নেই, শুধু নম্বর দিয়ে পরিচয়। অর্থাৎ সবই এক ধাঁচের। আমি বেশি মাইনে দেবো, আমার ছেলেপেলে ভাল শিক্ষা পাবে—এ রকম ব্যবস্থা হতে পারবে না। জায়গা হিসাব করে ইস্কুল—এই চৌহদ্দির ভিতরের সব ছেলেমেয়ে অমুক নম্বর ইস্কুলে পড়বে। অভিভাবকের পদ-প্রতিষ্ঠা যে রকমই হোক, শিশুদের মধ্যে বাছবিচার নেই। চাকরানির ছেলে আর অধ্যাপিকার ছেলে একই সঙ্গে একই শিক্ষা পাচ্ছে। মাষ্টার মশায়রা প্রতি বছর হিসাব নিয়ে দেখবেন, তাঁদের এলাকায় সাত বছরের উপর সব ছেলেমেয়ে ইস্কুলে আসছে কিনা। প্রতিটি শিশু ইস্কুলে আসবে—যদি না আসে, তার জন্য দায়ী হবেন শুধু অভিভাবক নয়, সেই এলাকার ইস্কুল-কর্তৃপক্ষও। সমস্ত সরকারি ইস্কুল, খরচপত্র সরকারের। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য অভিভাবকের এক পয়সা ব্যয় নেই। শিক্ষকেরা সকলেই ট্রেনিং-পাওয়া; তার জন্য বিরাট ব্যবস্থা, বিপুল অর্থব্যয়। ধরে নেওয়া হয়েছে—সাধারণ প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে মেধাসম্পন্ন। যাদের মেধা নেই, তাদের অসুস্থ বলে ধরা হয়। তাদের শিক্ষার জন্য পৃথক আয়োজন। কোন ছাত্র পিছিয়ে পড়লে তার দায়িত্ব ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের উপরও পড়বে। অভিভাবকও দায়ী হবেন, কেন তিনি শিশু-মনে শিক্ষার আগ্রহ সঞ্চার করতে পারেন নি।

বিভিন্ন গণতন্ত্রের জীবনরীতির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিস্তর ফারাক। এই সমস্ত বিচারবিবেচনা করে শিক্ষানীতি ঠিক করা হয়। বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিয়েও সমগ্র সোবিয়েতে শিক্ষার কাঠামো এক—একই পদ্ধতির খানিকটা রকমফের। আঞ্চলিক ভাষায় পড়াশুনোর আরম্ভ—চতুর্থ শ্রেণীতে উঠে রুশ-ভাষাটা শিখতে হবে। তার পরের বছর বিদেশি ভাষা শিখতে হবে একটা—ইংরেজি, ফরাসি বা জর্মন। পঞ্চম শ্রেণী থেকে শুরু করে ছাত্রদের বছরে তিরিশ ঘণ্টা দিতে হবে বরফ-পরিষ্কার, পুরানো পাঠ্যবই মেরামত, ইস্কুলের ইলেকট্রিক কাজকর্ম ইত্যাদি হাতের খাটনির ব্যাপারে। পয়সা বাঁচানোর জন্য নয়, ছাত্র যাতে কোন কাজ হীন মনে না করে। ইস্কুলের মধ্যেই ছাত্র মানসিক শ্রমের সঙ্গে দৈহিক শ্রম করবে, নিজের কাজ যথাসম্ভব নিজে করবে—এই অভিপ্রায়। রোমাঞ্চকর অপরাধমূলক বই ছেলেমেয়েদের পড়তে দেওয়া হয় না, সাধারণ সিনেমা-হাউসে ঢুকতে দেওয়া হয় না—ছোটদের জন্য বিস্তর সিনেমা-থিয়েটার আছে, দলে দলে তারা যায় সেখানে।

ইস্কুলের মধ্যেই বিভিন্ন বিশেষ শিক্ষণ-কেন্দ্র আছে, ছাত্রেরা তার কোন একটিতে যোগ দেয়। সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, কারিগরি শিক্ষা, নাটক, সঙ্গীত, ললিত-কলা, খেলাধুলা, দেহচর্চা ইত্যাদি। এমনি ব্যবস্থার ফলে সতের বছর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষা-সমাপ্তির সময় ছাত্র কোন এক বৃত্তি সম্পর্কে মন ঠিক করে ফেলেছে। এবং দশ বছরের চর্চার ফলে ঐ সম্পর্কে শিখেছেও অনেক কিছু।

১৯

রাত্রে সার্কাস দেখতে গিয়েছি। সোবিয়েতের ভুবনখ্যাত সার্কাস—যার কিছু নমুনা এই সেদিন এদেশে দেখিয়ে গেল। সার্কাসের ফাঁকে ফাঁকে ক্লাউনেরা এসে দেশপ্রেম ও শান্তির কথা বলে যাচ্ছে। আমেরিকার অস্ত্রসজ্জা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে খুব। নিজেদেরও ছাড়ছে না। ক'টি ক্লাউন এলো একবার। একজনে বিস্তর রুবল জমিয়েছে—তাড়া তাড়া নোট বের করে বন্ধুদের দেখাচ্ছে। মোটর কিনবে। বন্ধুরা পিঠ চাপড়ে সাবাস দিল। খানিক পরে পুনশ্চ এই ক্লাউন-দলের আবির্ভাব। মোটর কেনবার মানুষটার গলায় নম্বর ঝোলানো—লাখের উপরের এক সংখ্যা। বন্ধুরা অভিনন্দন করছে, কিনে ফেলেছ তবে—এই বুঝি তোমার মোটরের নম্বর? উঁহু, এটা হল কিউয়ের নম্বর। অর্থাৎ এর আগে আরও লক্ষাধিক লোক মোটরের জন্য নাম রেজেষ্ট্রি করে বসে আছে। তাদের হয়ে গেলে তবে এর পালা। চাহিদা অনুযায়ী জিনিষ সরবরাহ হচ্ছে না, তাই নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ।

পরদিন বিপ্লব-মিউজিয়ামে গেলাম। অপর নাম লেনিন-মিউজিয়াম—১৯৩২ অব্দে প্রতিষ্ঠা। লেনিনজীবনের আশ্চর্য নিদর্শনগুলো অধ্যায়ে অধ্যায়ে সাজিয়ে দিয়েছে। ভল্গাতীরের গাঁয়ে শিশুর জন্ম—সেই বাড়ির ছবি ও মডেল। বাবা মা ও পরিজনদের ছবি। বাড়িসুদ্ধ বিপ্লবী—বড় ভাইয়ের ফাঁসি হল জারের হত্যাচেষ্টার জন্য, তাঁর ছবি রয়েছে। ইস্কুলের পাঠ্যবইগুলা; সোনার মেডেল পেলেন ভাল পড়াশুনার জন্য। কাজান য়্যুনিভার্সিটিতে পড়বার সময় স্তালিনের সঙ্গে পরিচয়—সেখানে বিপ্লবচেষ্টা জেল। তারপরে নির্বাসন। ফেদাসিয়েভ প্রতিষ্ঠিত মার্কস-সোসাইটিতে যোগদান। পড়াশুনোয় বড় ভাল—টপাটপ পাশ করে যাচ্ছেন। পেট্রোগ্রাডে গুপ্ত মার্কস সমিতির প্রতিষ্ঠা। সমিতিতে সে সব বই পড়া হত, তার পরিপূর্ণ সংগ্রহ। নিজে সেই সময় অনেক মার্কসীয় বইয়ের তর্জমা করেছিলেন, তা-ও রয়েছে। পিটার্সবার্গে কম্যুনিষ্ট দল গড়লেন তিনি, কর্মিকদের ইউনিয়নগুলো সম্মিলিত করলেন। তখনকার সহকর্মীদের ছবি।

পিটার্সবার্গ জেলে ১৯৩ নম্বরের কামরায় চোদ্দ মাস আটক রইলেন। এই কামরায় বসে তাঁর অনেক রচনা। দুধ দিয়ে লিখতেন আইনের বইয়ের লাইনের ফাঁকে ফাঁকে। আগুনে ধরে সেই লেখা পড়া হত। তার পরে তিন বছর সাইবেরিয়ার এক কুঁড়েঘরে নির্বাসন। রেল-লাইন আড়াই শ' মাইল সেখান থেকে। সেখানেও বিস্তর লিখলেন। যে টেবিল-চেয়ারে বসে লেখাপড়া করতেন, সাদামাঠা ভারী সেই আসবাবগুলো এতদূরে নিয়ে এসেছে।

প্রথম মার্কসীয় কাগজ বের করলেন—স্পার্ক! যেথায় লেখায় আগুন বেরুবে—সেজন্য এই নামকরণ। কাগজকে কেন্দ্র করে পার্টির কাজকর্ম চলল। লেনিনের বইও ছাপা হয়ে বেরুতে লাগল, বিপ্লবী লেনিনের নাম দেশবিদেশে ছড়িয়ে গেল।

পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের যাবতীয় কাগজপত্র ও পাণ্ডুলিপি। দাবাখেলার টেবিল—তার তলায় চোরাগোপ্তা খোপ বানিয়ে সেখানে এই কাগজপত্র রাখা হত। পুলিশ অনেকবার এসে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। এঁরা তো দাবাখেলায় মগ্ন সেই টেবিলের গা এমন বস্তু, বুঝবে তারা কেমন করে?

১৯০৫ অব্দ। বুভুক্ষু নরনারীর রক্তে জারের অঙ্গন একদিন রাঙা হয়ে গেল। সেই ভয়াবহ ছবি দেখুন মিউজিয়ামের দেয়ালে। বিপ্লব সারা দেশে ছড়িয়ে গেল। জারতন্ত্র উৎসন্নে যাক, জমিদারি ধ্বংস হোক—সর্বত্র এই বুলি। পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস হল এই বছরের এপ্রিলে। একটা বাড়ির মডেল বানিয়ে রেখেছে—নেতারা নিরীহ ভালমানুষ হয়ে সেখানে বসবাস করেন; মাটির নিচে ছাপাখানা, দড়ি দিয়ে উঠানামা করতে হয়। আড়াই বছর একাদিক্রমে ছাপাখানার কাজকর্ম চলেছে, তারপরে পুলিশ ধরে ফেলে। ১৯০৩ অব্দে লেনিন যে বাক্স ব্যবহার করতেন, সেটা রয়েছে।

নানা জায়গায় সশস্ত্র অভ্যুত্থান। ব্যারিকেড দিয়ে পথ ঘিরেছে, তার ছবি কয়েকটা। দলাদলি; মেনশেভিকরা বিশ্বাসঘাতকতা করল। আয়োজন ব্যর্থ। অনেককে ধরল। দু-জন কর্মীর সঙ্গে লেনিন ফিনল্যাণ্ডে পালিয়ে গেলেন। একটুও দমেন নি তিনি; বললেন, বৃহতের প্রস্তুতি।

স্তালিনকেও ধরল এই সময়। সাত বার ধরেছে তাঁকে। ছ'বার নির্বাসন দেয়, তার মধ্যে পাঁচ বার স্তালিন পালিয়ে যান।

১৯১২ অব্দে লেনিন প্রাগে তৃতীয় কংগ্রেস ডাকলেন. বিদ্রোহ—লেনা নদীর তীরে কর্মিকদের উপর গুলী করা হচ্ছে, তার ছবি। প্রাভদা কাগজ বেরুল কর্মিকদের টাকায়। অনেক নির্যাতন হয়েছে কাগজের উপর, অনেক বার নাম পালটাতে হয়েছে। পোল্যাণ্ড থেকে লেনিন এই কাগজে লিখতেন। কর্মিকরা মহোৎসাহে প্রাভদা পড়ছে, তার ছবি।

প্রথম-মহাযুদ্ধ (১৯১৪) বাধল। লেনিন যুদ্ধের বিপক্ষে লিখতেন, বিপ্লবের স্বপক্ষে। লিখলেন, মরক্কো যদি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আর ভারত যদি ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ে, আমরা তাদের সমর্থন করব।

১৯১৭। কৃষক-কর্মিক এক হয়েছে। এপ্রিল মাসে লেনিন পেট্রোগ্রাড ফিরলেন। লেনিন রিপোর্ট দিলেন (এপ্রিল থিসিস)। স্বহস্তে লেখা তার কাপি। রেলষ্টেশনে লেনিন বক্তৃতা করছেন (মে, ১৯১৭), সেই বিরাট ছবি। লেনিনের ওভারকোট, দাড়ি, টিনের যে মগটা তিনি ব্যবহার করতেন। নানা রকম ছদ্মবেশ ধরতেন বহুরূপীর মতন, সেই সমস্ত ছবি। বিপ্লবে প্রধান নেতৃত্ব লেনিনের। বিজয়ের পর শান্তি-ঘোষণা—লাঙল যার, জমি তার—জমাজমির ষোল আনা মালিক চাষী। যে কলমে ঘোষণা লিখলেন, সেটা পরম যত্নে রেখেছে।

একতলা সেরে এবারে মিউজিয়ামের দোতলায় উঠছি। সমাজতান্ত্রিক নবরাষ্ট্রকে চারিদিক থেকে পিষে মারতে চায়। দেশরক্ষার মহানেতা লেনিন। লেনিনের হত্যার ষড়যন্ত্র। মস্কোর কর্মিকদের মধ্যে বক্তৃতা করছেন, একটা মেয়ে চার বার গুলী করল। দুটো তার মধ্যে বিঁধল। কোট ফুটো হয়ে ঢুকেছিল, সেই কোট রাখা আছে। সর্বপ্রান্ত থেকে উদ্বেগ জানিয়ে হাজার হাজার চিঠি আর টেলিগ্রাম আসছে। তিন সপ্তাহ পরে লেনিন বিছানা ছেড়ে উঠলেন। ডাক্তারের সার্টিফিকেট—ভাল হয়ে গেছেন তিনি।

ক্রেমলিনে লেনিনের পড়ার ঘরের ছবি। বই আর বই। দেয়াল-জোড়া ম্যাপ! দুটো টেলিফোন। বাতিদান ও বাতি—বিদ্যুতের সরবরাহ তখন অত্যন্ত কম। বাইরের লোক এসে বসবে গদি-আঁটা চেয়ারে; নিজের জন্য বেতের চেয়ার। ধূমপান নিষেধ—লেনিন ধূমপান করতেন না। লেনিনের গায়ের শীতের কোট, পায়ের বুটজুতা, নানা পোষাক। অজস্র পাণ্ডুলিপি।

রোগশয্যায় লেনিন বিশ্রাম নিচ্ছেন, সেই ছবি।

অবশেষে আমাদের হলঘরে নিয়ে বসাল। সিনেমা-ছবি দেখাবে। মাত্র কুড়ি মিনিটের ছবি। ১৯১৮ থেকে ১৯২২ চার বছরে একটু-আধটু তুলে রেখেছিল। নানা অনুষ্ঠানে লেনিন এখানে-ওখানে যাচ্ছেন। ১৯২২ অব্দে তাঁর সর্বশেষ বক্তৃতা। জীবন্ত লেনিনকে ছবিতে দেখলাম, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

সন্ধ্যায় আবার আজ বলসই-থিয়েটারে। নৃত্যনাট্য আজকে—ঘুমন্ত রূপসী (Sleeping Beauty)। রাজকন্যার জন্ম হল, রাজবাড়িতে আনন্দোৎসব। নানান ধরনের নাচগান। ডাইনি এলো, ডাইনির গাড়ি টেনে নিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর রকমের মুখোস-পরা কয়েকটা আজব জানোয়ার। আর সঙ্গী হয়ে আসছে কালো কালো লেজওয়ালা এক দঙ্গল জীব। রাজকন্যা মারা যাবে সূঁচ বিঁধে—ডাইনি খবরটা জানিয়ে উদ্দাম নৃত্য নাচতে নাচতে চলে গেল। রাজপুরী স্তম্ভিত। তারপরেই এলো দয়াবতী পরী। সে বলে, মৃত্যু নয়—সূঁচ বিঁধে রাজকন্যা একশ বছর পড়ে পড়ে ঘুমুবে। আসবে তারপরে রাজপুত্র—চুম্বন দেবে কন্যার কপোলে। ঘুম ভেঙে অমনি পুরীসুদ্ধ জাগ্রত হবে। রাজা হুকুম দিলেন, রাজবাড়িতে সূঁচ নিয়ে আসবে না কেউ কখনো···

নাটের এই হল প্রথম অঙ্ক। রূপকথা ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে। নৃত্যে আর আলোয় আলোয় গল্প বুনে যাচ্ছে। তিন চারশ' একত্র এসে নাচছে এক এক সময়। কী খেলা আলোর! ছিল মনোরম ফুল-বাগান, রংবেরঙের ফুল হাসছিল—ডাইনি আসার সঙ্গে সঙ্গে লাল মেঘে আকাশ ঢেকে গেল, চারিদিকে উৎকট বীভৎসতা, যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে এত বড় প্রেক্ষাগৃহের। [ক্রমশঃ।

নদী ও সময়

"সদায় ধায় নদীর ঢেউ
রাখিতে তায় পারে না কেউ;
সময় যায় তাহারি প্রায়;
কাহারো মুখে চাহে না, হায়!

চলিছে দিন, চলিছে রাত;
ধরিতে তায় কাহার হাত?
ধরিতে তায়, সে পারে ভাই,
আলস্য যার শরীরে নাই।" —মনোমোহন বসু।

* বিজ্ঞান বার্তা *

পক্ষধর মিশ্র

একটা সংবাদ চোখে পড়েছিল—'প্রমথনাথ রায় ট্রাষ্ট,' বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান চর্চার সম্প্রসারণের জন্য ২ লক্ষ টাকা দান করেছেন। সংবাদটি খুবই আশাপ্রদ—এই দানই ভিত্তি স্থাপন করলো এক মহা সম্ভাবনাপূর্ণ বিজ্ঞান-গবেষণা-মন্দিরের। বিজ্ঞান গবেষণার জন্য আবাসিক গবেষণা-মন্দিরের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি—কারণ নির্দিষ্ট নিয়মমাফিক সময় ব্যয় করে আর যে কাজই হোক না কেন, বিজ্ঞান গবেষণা হয় না। প্রয়োজনবোধে একাদিক্রমে ১০০—১৫০ ঘণ্টাও গবেষককে গবেষণাগারে কাটাতে হতে পারে। কিন্তু সহরে অসুবিধার কথা ভেবে দেখুন,—গবেষক থাকেন দমদমে আর গবেষণাগার যাদবপুরে; যাতায়াত করতেই তাঁর পাকা ৩ ঘণ্টা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বাড়ীর কাছেই গবেষণাগার থাকলে, যে কোন গবেষকই অক্লেশে সকাল ৭টায় কাজ সুরু করে, দুপুরে বাড়ীতে আহার করে,—রাত ৮-৯টা পর্য্যন্ত কাজ করতে পারেন।

পক্ষধর মিশ্র নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করেন, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আদর্শ বিজ্ঞান-গবেষণা-মন্দির স্থাপিত হতে পারে। কারণ এর দু'টি প্রধান সুবিধা আছে,—প্রথমটি এর ঐতিহ্য এবং নির্জ্জন শান্ত আশ্রমিক পরিবেশ এবং দ্বিতীয়টি হলো বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোস মহাশয়ের উপস্থিতি। এই রাজযোটক পাওয়া দুষ্কর।—যখন পাওয়া গেছে তখন তার পরিপূর্ণ সুযোগ ভারতবর্ষকে নিতেই হবে। বিজ্ঞানাচার্য্যের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠে বিশ্বভারতী বিজ্ঞান-গবেষণা-মন্দির একদিন যে সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করবে, ভারতের প্রত্যেক বিজ্ঞানকর্ম্মীই এ আশা মনে পোষণ করে। আমাদের দেশের জনসাধারণ যে এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছেন তা 'প্রমথনাথ রায় ট্রাষ্ট'র বিপুল দান থেকেই উপলব্ধি করা যায়। বছর দুই আগে বিশ্বভারতীর সমাবর্ত্তনে, নেহেরুজী তাঁর ভাষণে দেশের সর্ব্বত্র বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের উপর যথেষ্ট জোর দিয়েছিলেন। সুতরাং আশা করা যায়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে,—বিজ্ঞানাচার্য্যের পরিচালনায় এক নতুন বিজ্ঞান-গবেষণা-মন্দির প্রতিষ্ঠা কল্পে ভারত সরকারের সহযোগিতার কোন অভাব হবে না।

* * * *

কিছু দিন আগেই বৃহস্পতি গ্রহ থেকে প্রেরিত বেতার বার্তার কথা আপনাদের পরিবেশন করেছিলাম—এবার আবার গ্রহান্তর থেকে নতুন আর এক বেতার বার্তা পৃথিবীতে এসে পৌছেছে। ১১৫৬ সালের ৬ই জুন আমেরিকার নৌ-বিভাগের গবেষণা-মন্দিরের বিজ্ঞানিবৃন্দ শুক্র গ্রহ থেকে প্রচারিত এই বেতার বার্তা ধরতে সক্ষম হয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন। ৬ই জুনের কিছুদিন আগে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে শুক্র গ্রহ থেকে প্রেরিত অত্যন্ত দুর্ব্বল এই বেতার তরঙ্গ নৌ-বিভাগীয় গবেষণা-মন্দিরের তিন জন জ্যোতির্বিজ্ঞানী শ্রবণ এবং বিশ্লেষণ করেন। বিজ্ঞানীত্রয়ের নাম যথাক্রমে টিমোথি পি ম্যাককালফ; করনেল এইচ মেয়ার; এবং রাসেল এম্ শ্লোয়ানাকার। তাঁরা একটি ৫০ ফুট রেডিওটেলিস্কোপ এবং বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতীর সাহায্যে এই পর্য্যবেক্ষণ সম্পন্ন করেন। প্রায় দশ হাজার মেগাসাইকল ওয়েভ বাণ্ডে শুক্র গ্রহের এই বেতার তরঙ্গ ধরা পড়েছিল।

এই বেতার তরঙ্গের কারণাকারণ নির্ণয়কল্পে বিজ্ঞানীরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। গত ২২শে জুন শুক্রগ্রহ পৃথিবীর খুব কাছে এসেছিল—তাই বিজ্ঞানীরা তাকে নানা ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন। ফলাফল এখনও প্রকাশিত হয়নি—তবু আশা করা যায়, এই বেতার তরঙ্গের কিছুটা পরিচয় বিজ্ঞানীদের এই পর্য্যবেক্ষণের মাধ্যমে হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

অসুবিধাটা কি জানেন? শুক্রগ্রহকে একটি সাদা মেঘ কম্বলের মতো মুড়ে রেখেছে, তাই তার ভেতরে কি আছে না আছে তা টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখা যায় না। যাই হোক, দেখা তো গেল না—তাহলে ঐ গ্রহের ভেতর থেকে বেতার তরঙ্গের আমদানী হলো কি করে? বর্ত্তমানে ঐ গ্রহ বিষয়ে যা তথ্য মানুষ সংগ্রহ করেছে তার থেকে মোটামুটি বলা যায় শুক্রগ্রহে প্রাণীর বসবাস অসম্ভব। ঐ গ্রহের উপরিভাগের উত্তাপই প্রায় ২১২ ডিগ্রী ফারেনহাইট। এছাড়াও জানা গিয়েছে, শুক্রের উপরিভাগের মেঘে জলীয় বাষ্প অথবা অক্সিজেন নেই। তাহলে শুক্র থেকে কে বেতার বার্তা পাঠাল?—জানবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম।

* * *

একাধারে অণুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ এই দু'য়ের কাজই এক যন্ত্রের সাহায্যে চলবে। একই যন্ত্র অনায়াসে ক্ষুদ্রকে আপনার চোখের সামনে তুলে ধরবে এবং প্রয়োজন হলে দূরের বস্তুও আপনার দৃষ্টির নাগালের বাইরে থাকবে না।

নিউ জার্সির, এডমাণ্ড সায়াণ্টিফিক করপোরেশন একটি ছোট্ট পকেট মাইক্রোস্কোপযুক্ত টেলিস্কোপ বাজারে বিক্রয়ার্থে প্রেরণ করেছেন। আকারে এটি মাত্র একটি ফাউন্টেন পেনের মতো এবং এর দ্বারা ক্ষুদ্র যে কোন বস্তুকে ৫০ গুণ বড় করে দেখা চলে। দূরের জিনিষকেও ঐ ক্ষুদ্র যন্ত্রটি ১০ ভাগের ১ ভাগ কাছে এনে দেবে! এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটি,—বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের যন্ত্রবিজ্ঞানী; গবেষণা-মন্দিরের বিজ্ঞানী, ও কর্ম্মীদের নানা ভাবে করবে-সাহায্য। বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে প্লাষ্টিক, কাঠ, কাপড় ইত্যাদি পরীক্ষা করবার জন্য এবং উৎপাদন শিল্পের যন্ত্রপাতীর কোন দূরবর্ত্তী অঞ্চল দৃষ্টিগোচর করবার জন্য এই যন্ত্রটি বিজ্ঞানকর্ম্মীদের নিকট মনে হয় এক মূল্যবান সম্পদ বলে পরিগণিত হবে।

* * *

ভার্জ্জিনিয়ার ফোর্ট বেলভয়েরের যন্ত্রবিজ্ঞানের গবেষণা-মন্দিরের বিজ্ঞানিবৃন্দ আলোকমানচিত্র প্রস্তুত এবং জরিপ করবার জন্য এক নতুন ধরণের গাড়ী উদ্ভাবন করেছেন, সাধারণ ভাবে এই গাড়ীটি

চওড়া হলো ৭ফুট কিন্তু দু'জন লোক মিলে মাত্র ৫ মিনিটের মধ্যেই এই ভ্যানগাড়ীকে খুলে একে প্রায় ১৪ফুট চাওড়া করে নেওয়া যেতে পারে। একে গুটিয়ে ছোট করে নেবার প্রয়োজন হলেও ঐ একই ভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গুটিয়ে নেওয়া যাবে। সম্পূর্ণভাবে খোলা,—চওড়া এই গাড়ীতে জায়গা পাওয়া যাবে প্রায় ২৩০ স্কোয়ার ফুট। ওজনও খুব বেশী নয়—এই সমস্ত কাঠামোটি একটি আড়াই টন ট্রাকের উপর বসান থাকবে। ওজন কম করার জন্য কাঠামোটি বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত লোহার দণ্ডের উপর অ্যালুমিনিয়মের পাত দ্বারা নির্ম্মাণ করা হয়েছে। ছাতের এবং দেওয়ালের সংযোগের মাঝে দেওয়া হয়েছে খুব হাল্কা অথচ শক্ত ধরণের কাঠ। এই গাড়ী চলন্ত দোকান স্থাপনের খুবই উপযোগী। যে কোন মেলায় অথবা বিশেষ জনসমাবেশে আপনি এর সাহায্যে কাপড় ধোয়া, চুল কাটা এমন কি রোগ চিকিৎসার জন্য অক্লেশে ডাক্তারখানাও স্থাপন করতে পারবেন। এই গাড়ীর মধ্যে দাঁত তোলা, এক্স-রের ছবি তোলা, এমন কি অপারেসন পর্য্যন্ত করা চলতে পারে!

আরনেষ্ট রাদারফোর্ড

বিশ্ববিশ্রুত ইংরাজ বিজ্ঞানী আরনেষ্ট রাদারফোর্ড ১৮৭১ সালে নিউজিল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে অসাধারণ মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল এবং বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি সহকারে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি নিউজিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন ও ১৮৯৪ সালে ব্যাচিলর অফ সায়েন্স ডিগ্রী লাভ করেন। এই পরীক্ষার জন্য তাঁকে চুম্বকের গুণাগুণের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ পেশ করতে হয়েছিল। ১৮৯৫ সালে তিনি কেমব্রিজে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী অধ্যাপক জে, জে, টমসনের গবেষণাগারে কাজ আরম্ভ করেন এবং এখানে তিন বছর থাকার পর বিজ্ঞানী টমসনের সুপারিশ অনুযায়ী, মনট্রিলের ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ পান। এখানেই রাদারফোর্ড, বিজ্ঞানী সডির সঙ্গে একযোগে তেজস্ক্রিয় পরমাণু বিষয়ক গবেষণা সমূহ সম্পন্ন করেছিলেন।

১৯০৭ সালে অধ্যাপক রাদারফোর্ড ম্যাঞ্চেষ্টর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে জলের মধ্যে সাবমেরিণের অবস্থিতি নির্ণয়কল্পেও তিনি, তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই সমস্যা সমাধানে সহায়তা করেন। ১৯১৯ সালে রাদারফোর্ড আলফা কণার দ্বারা আঘাত করে নাইট্রোজেনকে কৃত্রিম উপায়ে ভেঙ্গে হাইড্রোজেন পান।

ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করবার মাত্র ১ বছর পরেই ১৯০৮ সালে রসায়ন-বিজ্ঞানে অতুলনীয় অবদানের জন্য অধ্যাপক আরনেষ্ট রাদারফোর্ডকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। মৌলিক পদার্থের পরমাণুর বিদারণ এবং তেজস্ক্রিয় বস্তু বিষয়ক গবেষণা করার জন্য বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডকে এই মহাসম্মান দেওয়া হয়। পূর্ব্বে পরমাণুই মৌলিক পদার্থের সর্ব্বশেষ কণারূপে বিবেচিত হতো, কিন্তু রাদারফোর্ডের গবেষণার সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, পরমাণু অবিভাজ্য অথবা পদার্থের সর্ব্বশেষ ক্ষুদ্রতম কণা নয়, এটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অন্য কণা সমূহের সমবায়ে গঠিত। তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমূহের বেলায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এই কণাগুলির সমবায় দুর্ব্বল এবং অস্থায়ী হওয়ার জন্য তাদের পরমাণু ভার পরিত্যাগ করে অন্য কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর স্থায়ী রূপ পরিগ্রহণ করতে চেষ্টা করে। তাঁর গবেষণার দ্বারাই পরমাণু কাঠামোর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হলো। ১৯১৯ সালে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যার ক্যাভেণ্ডিস্ অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ১৯২০ সালে তিনি লণ্ডনের রয়েল ইনষ্টিটিউশনের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে আমন্ত্রিত হন এবং একসঙ্গে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং রয়েল ইনষ্টিটিউশন এই উভয় প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকের পদই অলঙ্কৃত করেন।

বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডকে নোবেল পুরস্কার ছাড়া আরও নানা ভাবে দেশ-বিদেশ থেকে সম্মানিত করা হয়। ১৯০৩ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯২৫ থেকে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত তিনি রয়েল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৩১ সালে তিনি ব্যারণের পদমর্য্যাদা লাভ করেন। ১৯৩৭ সালের ১৯শে অক্টোবর ৬৬ বছর বয়সে কেমব্রিজে এই মহাবিজ্ঞানীর লোকান্তর ঘটে।

কোন্ মাসে কি খেতে হয়?

পাঠক-পাঠিকার স্মরণে আসতে পারে, কিছু কাল পূর্ব্বে আমরা পূর্ব্ব-বাঙলার একটি প্রচলিত ছড়া মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশ করি। সেই ছড়ায় কোন্ মাসে কি খেতে হয় তারই তালিকা আমরা পড়েছি। নিম্নে উদ্ধৃত ছড়াটি পশ্চিম-বাঙলার অতি পরিচিত, বিশেষতঃ মহিলা-মহলে। ছড়াটি এই—

চৈত্রে শ্রীফল মিঠা খেয়েছিলেন রাম;
বৈশাখেতে শসা মিঠা শোল মাছে আম।
জ্যৈষ্ঠেতে পাকা আম, আষাঢ়ে কাঁটাল;
শ্রাবণেতে খৈ-দৈ, ভাদ্রে পাকা তাল।
আশ্বিনেতে নারিকেল, কার্ত্তিকেতে ওল;
অগ্রহা'ণে নব-অন্ন চিঙ্গড়ি মাছের ঝোল।
পৌষ মাসে মূলা-মুড়ি খেতে লাগে মিঠা;
ঘন আউটা দুধের সাথে বাসি পোড়া পিঠা।
মাঘেতে মকর মিঠা তেলে ভাজা সীম;
ফাল্গুনে দ্বিগুণ মিঠা বার্ত্তাকুতে নিম।

নীলকণ্ঠ

দশ

পর্দার অন্তরালে কি ঘটছে পর্দা সম্পূর্ণ সরিয়ে দিয়ে তা' দেখাতে গিয়ে একটা ভয় কিছুতেই যাচ্ছে না। কেবলি মনে হচ্ছে, হয়ত এই সব কথা শাসনকর্তাদের কানে গেলে তাঁরা হঠাৎ বলে বসতে পারেন: হলিউডে যখন এত গোলমাল তখন ভারতবর্ষে ফিল্ম তোলাই বন্ধ করে দাও! বিচিত্র নয়; এদেশটা ভারতবর্ষ, এদেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম জহরলাল নেহেরু। শুধু জহরলাল তবু একরকম। জহরলালের সঙ্গে পান্নালালরা জুটেই সর্বনাশ করছে। জহরলাল-পান্নালালরা কাপড়ের দোকান করলে ঠিক আছে; জহরলাল-পান্নালালরা কাপড়ের দোকান না চালিয়ে দেশ চালাতে গেলেই ভয় হয়।

এদের গিয়ে যদি বলেন: সেন্সাসে পাওয়া গেছে দেশে গত দশ বছরে ক্রাইম বেড়ে গেছে সাঙ্ঘাতিক,—তাহলে জহরলাল-পান্নালালেরা তার জবাবে বলেন: সেন্সাস নেওয়া বন্ধ করে দাও এবার থেকে! যদি এদের বলেন: জহরলাল বলেছিলেন দেশের শাসনভার পেলে কালোবাজারীদের ধরে ধরে সবচেয়ে কাছের ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলিয়ে দেবেন, তার কী হল? দশ বছর পরে আজও কই একজন ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারকেও ল্যাম্পপোষ্টে ফাঁসী যেতে দেখলাম না ত'? সঙ্গে সঙ্গে জহরলাল পান্নালালদের জবাব পাবেন: তাহলে এক কাজ করা যাক; ভারতবর্ষের রাস্তায় পার্কে যেখানে যত ল্যাম্পপোষ্ট আছে সব তুলে নেওয়া যাক!

ডাক্তার ডেকে অসুখ সারানো নয়; রুগীকে পুড়িয়ে ঝামেলা এড়ানো। ছায়াচিত্রের বিরুদ্ধে কোনও জেহাদ ঘোষণা কোনও দিনই কারুর কর্তব্য নয়; অদ্য বা প্রত্যহ কখনই নয়। ছবি এখনও শিল্পের পর্যায়ে ওঠেনি; যেদিন শিল্পের শিলমোহর পাবে সে সেদিন সাহিত্য-সঙ্গীত-অঙ্কন সমস্ত শিল্পের সম্মিলিত প্রভাবের চেয়েও তার একার বক্তব্যে শুধু যাদু নয়, জোরও থাকবে অনেক বেশি। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় একশো বছরে যা না করতে পারে, একজন ভালো পরিচালক একটা ছবিতে ঘটাতে পারে সেই অঘটন। তেমন ছবি দেশে আনতে পারে সামাজিক বিপ্লব। গান শুনতে, বই পড়তে, আঁকা বুঝতেও তালিম দরকার হয়; ছবি দেখতে এসে শুধু চোখ আর কান খোলা রাখলেই হলো! না রাখলেও তেমন ছবি অন্ধ ও বধির সমাজের চোখ এবং কান দুই-ই খুলে দেবার ক্ষমতা রাখে। এখনও ছায়াবাজি করে যাচ্ছি বলেই এ-সব কথা ভাবতে পারছি না; ছায়াবাজির কোনও সম্ভাবনা নেই; ছায়াচিত্রের আছে। ছায়াচিত্রের মধ্যে গোপন আছে বিচিত্র সম্ভাবনা; বিপুল ভবিষ্যৎ; বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ।

ছবি দেখতে হলে চোখ-কান খোলা রাখলেই চলে; অশিক্ষিত লোকেরও ছবি দেখতে বাধা নেই। কিন্তু অশিক্ষিত লোকের ছবি দেখাতে নিশ্চয়ই আছে। এই 'উল্টা বুঝলি রাম' রাজ্যের দেশে সবই উল্টো। এখানে যারা ছবি দেখতে আসে তাদের কারুর চোখ-কান থাকলেও, যারা ছবি তৈরী করে তাদের চোখ-কান-বিবেক বুদ্ধি-বিদ্যা কিছুরই বালাই নেই। চোখের বদলে একজোড়া গগল্‌স্; কানের জায়গায় কাটার দাগ; বিবেক নেই—আছে শুধু পেট; বুদ্ধির পরিবর্তে একজোড়া সিং এবং বিদ্যা বলতে 'চুরি বিদ্যা মহা বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা!'

এদেশের রাজনীতিতে যা সব দুর্নীতিতেই তাই। যেমন একদিন জেলে গিয়েছিলো মাত্র এই গৌরব সম্বল করে আজ যারা দেশের গদীতে আসীন, তারা গদীতে বসে অন্যদের জেলে পাঠাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না; ঠিক তেমনি যাত্রার অধিকারী ছিলো যারা একদিন তারা আজ ফিল্ম-প্রোডিউসার হয়ে পৃথিবীর যতেক জ্ঞানী এবং গুণীকে মনে করছে অনধিকারী। পরশুরাম একুশ বার নিক্ষত্রিয় করেছিলেন মহা ভারতকে; বায়স্কোপের লোকেরা একুশ নয়, দেশের বিবেক-বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, রুচি সৌন্দর্য প্রগতির ওপর বাইশ কোপ দেবার কাজে আজ অগ্রণী। তাদের ঠেকায় কে?

এগারো

বাংলা দেশের একজন গোপাল ভাঁড় একবার বলেন যে তিনি নাকি চীনা ভাষায় কথা বলতে পারেন; সেই সময় কোলকাতায় চীনা সাংস্কৃতিক দল উপস্থিত থাকায় সেই দলেরই একজন চৈনিকের সামনে ভাঁড়কে তার চীনা সংলাপের সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে বলা হলো; সকলকে অবাক্ করে সেই বাঙালী গোপাল ভাঁড় সত্যি সত্যি যে কি সব আউড়ে গেলো যা হঠাৎ কানে যেন চীনা ভাষার মতই শোনায়! চৈনিক প্রতিনিধি কিন্তু মিটিমিটি হাসে; অথচ মুখে কিছু বলে না। সবাই মিলে তাকে চেপে ধরলো এই বলে যে, তাকে বলতেই হবে যে গোপাল ভাঁড় যা বললো তা' সত্যিই চৈনিক না বাঙালী ভাষাতত্ত্ববিদদের মতই কোনও গুল দেবার প্রচেষ্টা? অবশেষে বললো সেই চৈনিক প্রতিনিধি; খোলসা করেই বললো তার চৈনিক হাসির রহস্য কি! সে বললো, ভদ্রলোক যা বলেছেন তার প্রত্যেকটি শব্দ চৈনিক বটে কিন্তু সবটা মিলিয়ে তার কোনও

অর্থ হচ্ছে না; কোন সম্পূর্ণ সেন্টেন্স পাওয়া যাচ্ছে না যার মানে হয়! বাঙালী ভাঁড়কে চেপে ধরতে সে স্বীকার করলো যে বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট জুড়ে যত জুতোর দোকান আছে চীনাদের সেই সব দোকানের নামগুলোই সে পর পর বলে গেছে!

বাংলা ছবিও তাই। পর পর তোলা শটে চিত্র হয় বটে কিন্তু সব জড়িয়ে আজও চলচ্চিত্র হয় না কিছুতেই। চলচ্চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর মধ্যেই ভারতবর্ষের স্থান দ্বিতীয়। কিন্তু খারাপ ছবি তোলার ক্ষেত্রে কি সংখ্যা কি গুণের দিক থেকে ভারতবর্ষ আজও অদ্বিতীয়। আমাদের কোনও ছবি বিদেশে দেখাবার জন্যে নিয়ে গেলে আমরা উল্লসিত হই; কিন্তু এ আমাদের অকারণ পুলক; কারণ আমরা জানি না বলেই উল্লসিত হই; জানলে লজ্জিত হতাম। বিদেশের লোক আমাদের ছবি দেখায় ভালো ছবি বলে নয়; ভারতীয় ছবি তারা দেখায় এই জন্যে যে, প্রাগৈতিহাসিক কালেও যে পৃথিবীতে চলচ্চিত্র নামক বস্তুর অস্তিত্ব ছিলো তারই প্রমাণ দিতে। এ আমাদের গৌরব নয়; এ আমাদের গ্লানি!

ভারতবর্ষে যে আজও ছবির মত ছবি তৈরী হয় না, তার কারণ চলচ্চিত্র এখানে আজও ব্যবসা নয়; রেসের মতো বা ফাটকার মতো বাজী ধরার ব্যাপার। এ্যাডভেঞ্চার নয় মিস এ্যাডভেঞ্চার! courage নয় মিস ক্যারেজ! সবাক চিত্রর নামে 'অবাক জলপান'!

ভারতবর্ষের মাটিতে যে চলচ্চিত্রের চারা জন্মেই মরে যায় তার জন্যে দোষ মাটির নয়; জল-হাওয়ার নয়; দোষ মানুষের। চলচ্চিত্রের কারখানায় যারা কাজ করে তারা একে মনে করে মজা মারবার জায়গা। কর্মী যারা তারা এখানে কল্কে পায় না; অপকর্ম করবার জন্যে যারা এখানে আসে তারাই এখানে রাজত্ব করে। মদের সঙ্গে মেয়েদের নিয়ে আমোদের রঙ্গপল্লী হচ্ছে টলিউড। দশাবতার সত্য নয়; শেষ নয় কল্কি অবতারে। দশের পরে আছে একাদশ। কল্কির পরেও ভেল্কি অবতার। তারাই চলচ্চিত্র পরিচালক; প্রযোজক; পরিবেশক; প্রদর্শক এবং দর্শক।

বারো

ইথেল ম্যানিন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ছেলেমানুষী Confessions & Impressions-এ বলেছেন: Men like good food, good clothes & women who are not good. ফিল্ম-এর যারা ভাগ্যবিধাতা, তারাও ভালো ছবি করতে আসে না; তারা চায় ভালো খাবার; ভালো পরবার; এবং সেই সব মেয়ের সঙ্গ যারা ভালো নয়। তাই ভালো ছবি এখানে হয় না; ভালো মেয়েরাও এখানে ভালো থাকে না; মন্দ মেয়েদের জন্যেই ভালো রোলের ব্যবস্থা।

সেই সব মেয়েরা যারা প্রথম নামতে আসে ছবিতে, তারা পর্দার অন্তরালে কি ঘটছে, পুরো না জানলেও জানে যে এখানে মেয়েদের মান বজায় রেখে বড়ো হওয়া বড়ো শক্ত। তবুও তারা বলে: আমি যদি ভালো থাকি, আমায় মন্দ করবে কে? কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে সবাই ভালো; মানুষ অথবা মেয়েমানুষ
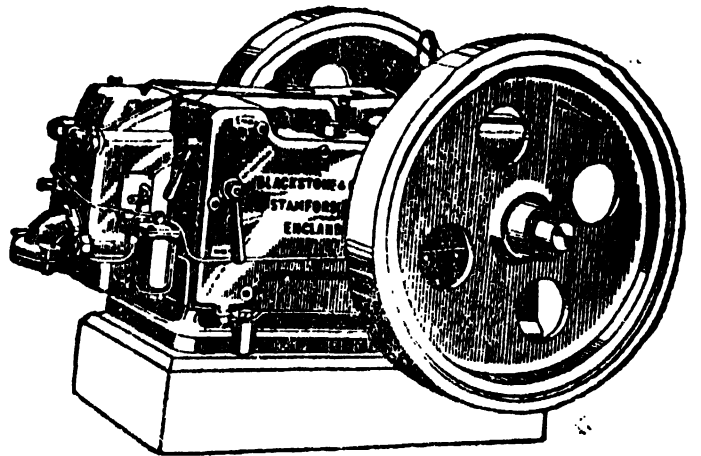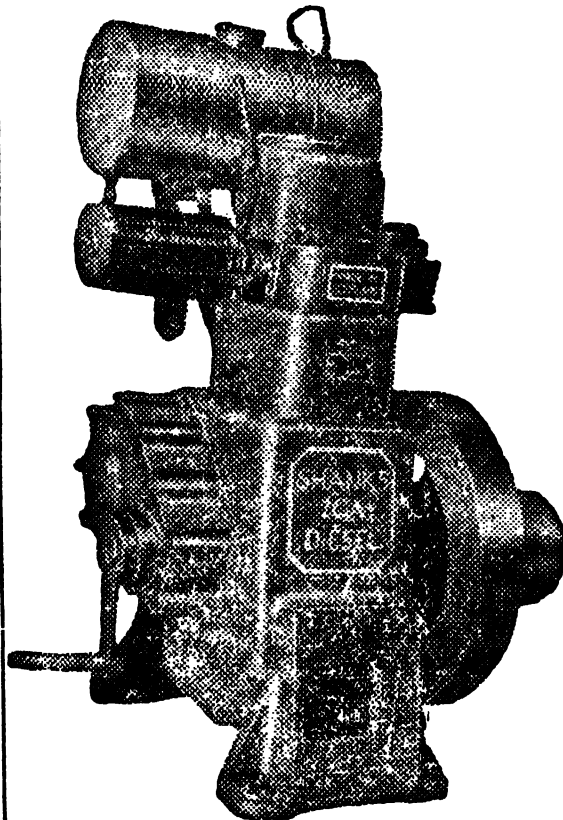
মন্দ হয় নিজের ইচ্ছেয় নয়, পেটের দায়ে ! পৃথিবীতে পাপ একটাই ; দারিদ্র্য। Poverty is Crime ! মধ্যবিত্ত জীবন তাই আগাগোড়া ডষ্টয়ভস্কির Crime & Punishment !

সব জায়গাতেই যেমন জাতভেদ আছে ; আগে যেমন ব্রাহ্মণ-শূদ্র ছিলো, আজকে বড় আর ছোট লোক, ধনী আর নির্ধন ; তেমনি বজ্জাতদের মধ্যেও আছে জাতভেদ। ফিল্ম লাইনে কারুর নজর কেবল মাত্র Extra-দের দিকে ; কারুর Extra-Ordinary-দের ওপরই শুধু ; কারুর Extra থেকে Extra-Ordinary কিছুতেই আপত্তি নেই। তাঁরাই এ-লাইনের অবতার।

যারা ভিক্টিম হয়ে আসে, তারাও জাতে আলাদা-আলাদা। Extra-র রোলের জন্যে যারা আসে, তারা জেনে-শুনেই আসে ; যারা আরেকটু বড়ো রোলের জন্যে আসে, তারাও জানে আজকাল অথবা পরশু ; 'বলি' তাদের হতেই হবে। আর যারা আসে, বড়ো ঘর থেকে তারা আসে গ্ল্যামারের জন্যে, থ্রিলের জন্যে, কিছুতেই তাদের কিছু এসে যায় না। শুধু চীৎপুরের মেয়েমানুষরা টলিউডে এসে ভেবে অবাক হয় ; অবাক হয়ে ভাবে : চীৎপুর থেকে নিউ আলিপুর আর এমন কী দূর ?

পেটের দায়ে এখানে যারা আসে, তাদের জন্যে দুঃখ হয় কিন্তু লজ্জা হয় না। দুঃখ হয়, কারণ পেটের দায়ে যারা আসে, তাদের কাছে যা পাবার তা আদায় করে নিয়ে তাদের দিয়ে বিশেষ কিছু আর হবে না জানিয়ে দেওয়াই এখানকার বৈশিষ্ট্য ; তাই তাদের জাত যায়, কিন্তু পেট ভরে না। কিন্তু যাদের স্বামী-সন্তান-সংসার সব আছে এবং যাকে বলে সত্যিকারের অভাব তা নেই, তারা কোন্ আকর্ষণে এখানে আসে, বোঝা শক্ত ; বোঝানো দুষ্কর। শুধু এখানেই শেষ নয় ; স্বামীরা এখন স্ত্রী ফিল্মষ্টার হলে খুশী হয় ; দুঃখিত হয় না। যে-সব মেয়েরা ফিল্ম করতে আসে, তারা সংসার না চাইলেও একটি স্বামী চায়। স্বামীর প্রয়োজন হয় অপরিহার্য ; প্রয়োজন অপরিহার্য হয় তার কারণ এখানে যে-নাচ মেয়েরা নাচতে আসে, তা ঘোমটার আড়ালেই জমে ভালো। স্বামীরাও চায় তাদের স্ত্রীরা ফিল্মষ্টার হ'ক ; চায় তার কারণ তাতে স্বামীদের কিছু না করে অথবা নামেমাত্র কিছু করেই Comfort-এ বাস করা চলে। স্বামীর একার রোজগারে আজকের কলকাতায় ভালো বাসা অসম্ভব ; তাই স্ত্রীকে পর্দায় অভিনয় করতে হয় ভালোবাসার ; ভালো বাসার জন্যে সেলামি যোগাতে গিয়ে একে-ওকে-তাকে ভালোবাসার আক্কেল সেলামি হয় অবশ্যম্ভাবী।

তেরো

সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক না হলেও প্রসঙ্গান্তরে যেতে হচ্ছে অতঃপর। এ্যামেচার থিয়েটার বলে আরেক উৎপাত কলকাতাকে পেয়ে বসেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। সৌখীন অভিনয়ের আসর আগেও ছিলো ; কিন্তু আজকের এ্যামেচার থিয়েটার সে বস্তু নয়। সখের নয় ; সুখের অভিনয় চলে এখানে ; অসুখের মহড়া। এ্যামেচার থিয়েটার শুনলে প্রথমতঃ হাস্য সম্বরণ করা সহজ নয় ; কারণ এখানে প্রোফেস্যানাল থিয়েটারেই ত' যে অভিনয় হয় তা অত্যন্ত এ্যামেচারিশ। তাই এদেশে এ্যামেচার থিয়েটারের আলাদা অস্তিত্ব বাহুল্য মাত্র।

[illegible] : কিন্তু সে কথা এখন থাক।

এই সৌখীন অভিনয়ের আসরে গ্রীণরুম নেই ; আছে ডার্করুম ; সেখানে আসে কতগুলি খেতে-না-পাওয়া হাফ-গেরস্থ মেয়ে। এই সব মেয়েরা না ঘরের না বাইরের। এরা সেই : 'ঘাটেও নহে, পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে, সন্ধ্যাবেলায় কে ডেকে নেয় তারে'। এরাও সন্ধ্যে হতে না হতেই ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ধর্মতলায়, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে, সেণ্ট্রাল এভিনিউ ধরে, শেয়ালদায়, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, কোথায় নয় ! অস্থিচর্মসার ক্ষীণ তনু এরা আস্তে আস্তে হাঁটে সন্দেহজনক পদক্ষেপে নয়, নিঃসন্দেহ অপেক্ষায় : 'সন্ধ্যাবেলায় কে ডেকে নেয় তারে !'

এদেরই মধ্যে যাদের জৌলুষ যৎকিঞ্চিৎ বেশি ; যাদের চক্ষুলজ্জার বদলে চোখে গগলস্ ওঠে রাত হলে তবেই, তারা পথে না দাঁড়িয়ে থেকে সৌখীন থিয়েটারে রিহার্স্যাল দিতে যায় ; এই ভাবে যে 'যাত্রা' আরম্ভ তা' শেষ হয় রিক্সয় অথবা গাড়ীতে হোটেলের কেবিনে ; ক' ঘণ্টার আমোদের জন্যে ভাড়া দেওয়া Empty room-এ, গোপন চিকিৎসালয়ে ; আন সাকসেসফুল এবর্সনে ; অপমৃত্যুতে। পাবলিক সেন্স অথবা গভর্ণমেণ্ট সেন্সর কোনটাই এখানে এখনও উদ্যত-দণ্ড নয়।

ম্যাসাজ হোম আইনের জোরে বন্ধ হয়েছে ; কিন্তু কোন আইনে আপাত নিরীহ এই সব অভিনয়ের আসর বন্ধ হবে ? এগুলি যে কৃষ্টি, সংস্কৃতি, শিল্পচর্চ্চার বাহন। তাই আইন যত কড়া আইনের ফাঁক ততই মিঠে। মিঠে-কড়া তামাকের মতই এর গন্ধে ভুরভুর করছে আজকের Evening in Calcutta, যে-কলকাতায় অতি স্বল্প সংখ্যক লোক স্বপ্ন দেখে বাটারফ্লাইয়ের ; আর অসংখ্য লোক দুঃস্বপ্ন দেখে ব্রেড এবং বাটারের। আসল কথা আইন যতই কড়া হ'ক ; হাতকড়া হ'ক যতই ভয়ের, পেটে খেতে এবং পরতে কাপড় না পেলে দুর্নীতি দূর হয় না ; জাগ্রত হয় না নীতিবোধ। যে-সব মেয়েরা এই ভাবে 'বলি' হতে বাধ্য হয়, তারা সখের জন্যেও নয়, সুখের জন্যেও নয়, বাধ্য হয় পয়সার জন্যে। সেই পয়সার বদলে নষ্ট পয়সা চালু হতে পারে ; তাতে নতুন সমাজের পত্তন হয় না। পুরানো অথবা নষ্ট পয়সা যতক্ষণ না সকলের হাতে আসছে, ততক্ষণ এ-পাপ বন্ধ হবার নয়।

ম্যাসাজ হোমের মেয়েরা যেমন জানে যে সেখানে কোনও গর্দভই ম্যাসাজ করাতে যায় না ; তেমনি এই সব সৌখীন রঙ্গমঞ্চে যারা রিহর্স্যাল দিতে আসে সেই সব মেয়েরা জানে তাদের কিসের জন্যে নিয়ে আসা। তাই তারা রিহর্স্যালের পরেই বাড়ী পৌঁছে দেবার লোক কে তা জানে। শুধু বাদ সাধে রিক্সাওলা। এক টাকার কমে সে যাবে না। অথচ সঙ্গের পুরুষটি বারো আনার বেশি উঠবে না। অবশেষে রিক্সাওলা রাজি হয় ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলে : হাঁ ! বারো আনাই হোগা ; লেকিন পর্দা নেহী লাগায় গা ! অতঃপর এক টাকাই দিতে হয়। পর্দা না দিলে পর্দার অন্তরালে নাটক জমবে কখন্ ?

চৌদ্দ

এই সৌখীন রঙ্গমঞ্চেরই বিকল্প হচ্ছে আজকের জলসা, যার আরেক নাম দেওয়া যেতে পারে মঞ্চরঙ্গ। পুলিশের হেড কোয়াটার্স লালবাজার, ম্যালেরিয়ার ডিপো হচ্ছে মফঃস্বল ; কচরীপানাপুকুর ; পাগলের—কাঁকে ; সাহিত্যের—কলেজ ষ্ট্রীট ;

আর বঙ্গজাতির পীঠস্থান হচ্ছে বারোয়োরী পুজামণ্ডপের এই সব জলসাঘর। রকে-বসা ছেলেদের ওপর নজর পড়েছে পুলিশের, দরকার ছিলো না। কারণ জায়গার অভাবে ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে রক আপনি বিদায় নিচ্ছে, রক এমনি উঠে যাচ্ছে, এমনি উঠে যাবেও। কিন্তু নরক বাড়ছে, নরক বাড়বে। এই সব নাচ গানের জলসায় সেই সব নরক গুলজার। ম্যাসাজ হোমে যেমন সায়েন্টিফিক ম্যাসাজের জন্তে কেউ যেত না, এ্যামেচার থিয়েটার যেমন থিয়েটরের জন্তে নয়, কলকাতার Bār গুলি যেমন বেশির ভাগই বারনারী সংগ্রহের ওয়েটিংরুম মাত্র, ঠিক তেমনি এই সব বারোয়ারী পুজো পুজার জন্তে নয়, জলসাগুলি নয় নাচ-গানের জন্তে। এই সব জলসার আয়োজন 'দাদা'-দের সঙ্গে 'দিদি'-দের দেখা হওয়ার প্রয়োজনেই।

তাই, দক্ষিণ-কলকাতায় যেখানে একটা বড়ো পুজার আয়োজন যথেষ্ট সেখানে এর অলিতে গলিতে সার্বজনীন পুজার লাল শালু, শুধু দুর্গাপুজার নয়, সরস্বতী, কালী, এমন কি বিশ্বকর্মা পুজাও ক্রমশঃ বিশ্ব-অকর্মাদের কৃপায় সার্বজনীন পুজায় রূপান্তরিত হলো বলে! সত্যনারায়ণ ও লক্ষ্মীর পাঁচালীরই এখনও শুধু বাকী!

তাই, এই সব পুজায় সাবেক কালের মূর্তি আজকে অচল! আজকের দুর্গা-মূর্তি দেখে অনেকক্ষণ ভাবতে হয়, ইনি মা দুর্গা? না,—দুর্গাবাঈ খোটে? দশচক্রে ভগবান ভূত নয় আর, দশের চক্রান্তে ভগবতী অদ্ভুত! এই সব পুজার ষষ্ঠীতে পুরোহিত ডেকে বোধন নয়, ফিল্মষ্টার, কালোবাজারী অথবা কংগ্রেসী কাউকে দিয়ে সাড়ম্বর উদ্বোধন। মন্ত্রের বদলে মাইকে গান, এই দুনিয়ায় বাবু সবি হয়! সব সত্যি! সেদিনের মতো আজও পুজা তিন দিন, কিন্তু ভাসান্ সাত দিন! এ দুর্গা প্রতিমার ভাসান্ নয় যে, এ হচ্ছে জেমিনীর ভাসান্—সবটাই Show! কিম্বা তাও নয়, এ বোধ হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর এক অদ্বিতীয় পার্ভার্সান!

যাদের উচিত চাঁদা করে মার দেওয়া, তাদেরই আমরা চাঁদা দিই ভয়ে। আজকের ভারতবর্ষে ভয়ের যে শেষ নেই! কালো-বাজারীর ভয় বাটপাড়কে, কংগ্রেসীর ভয় ইলেকশনকে, খবর কাগজের ভয় বিজ্ঞাপনকে, ভদ্রলোকের ভয় গুণ্ডাকে,—যে কুম্ভকর্ণর অকালে নিদ্রা ভঙ্গ করেছে ভদ্রলোকরাই,—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, আর সিনেমার টিকিট কাটতে গিয়ে।

পনেরো

মাসিক বসুমতীর পাতায় 'অন্ত ও প্রত্যহ' পড়তে-পড়তে কোনও কোনও পাঠক ইতোমধ্যেই বিচলিত হয়েছেন; প্রশ্ন করেছেন: আসল জায়গায় এতে কোনও কাজ হবে কি না কে জানে? তার জন্তে চিন্তা নেই। কারণ আসল জায়গা 'টলিউড' নয়। আসল জায়গার মালিক হচ্ছেন আপনারাই। আপনারা বিচলিত হলেই অজায়তনে ঘা পড়বে। আপনারা যদি প্রতিবাদ করেন তবেই লেখার কাজ কাজের লেখা হয়ে উঠবে। কারণ 'অন্ত ও প্রত্যহ' গল্প নয়: উপন্যাস নয়; নেহাৎই রম্য রচনা! এর উদ্দেশ্য নেই, কিন্তু সার্থকতা আছে। সে সার্থকতা, আপনারা যদি বিচলিত হন তবেই সার্থক। কারণ এ লেখার উদ্দেশ্য আমোদ বিতরণে অন্তর্নিহিত নয়; এলেখার সার্থকতা উন্মত্ততা বিতাড়নেই!

সমাজের যত অঙ্গ আজ লিক্ করছে তা' পবলিক প্রোটেষ্টের অভাবেই। 'কেন এমন হবে?'—এ জিজ্ঞাসা নেই বলেই এর জবাবও নেই। লেখার বাজারে চালু কাগজ যা ছাপে তাই লেখা: নামকরা প্রকাশক যা বার করেন তাই বই: লাইব্রেরীতে যে বই রাখা হয় তাই পাঠ্য। সাহিত্য নিয়ে আলোচনাও নেই, সমালোচনাও অসম্ভব। সমালোচনা অসম্ভব, কারণ সব কাগজেরই মুখবন্ধ বিজ্ঞাপনে। সিনেমার বেলাতেও তাই। ছবির সমালোচনা আরও যে কারণে অসম্ভব, সে শুধু বিজ্ঞাপন নয়, বাংলা ছবি এখনও কোনও শিক্ষিত বাঙালী বাধ্য না হলে দেখে না; আলোচনার অযোগ্য মনে করে; সমালোচনা করা দূরের কথা।

এরই বিরুদ্ধে যখন কেউ কিছু বলে তখন আপনারা, 'বাঃ, বেশ লিখেছে', এই বলেই আপনাদের কর্তব্য শেষ করেন। বাজে ছবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন না; কখনও বলেন না যে এমনটা হওয়া উচিত নয়; বরং উল্টোটাই করেন। যে-ছবি চলা উচিত নয় সেই ছবি সপ্তাহের পর সপ্তাহ সপরিবারে দেখে দেখে রজতজয়ন্তী হবার পর জানতে চান: এমন ছবি ভদ্রলোকে দেখে কেমন করে?

আপনারা ভাবেন কী হবে প্রতিবাদ করে? কে শুনবে আপনাদের কথা? তার ফলে প্রযোজক নিশ্চিন্ত হয়; আমরা যতই চীৎকার করি ততই তারা Box office-record দেখিয়ে নিরস্ত করে! টাকা বোঝে প্রযোজক; art বোঝে না। তাই যে ছবির রজতজয়ন্তী হয় সেই পরিচালকেরই বিজয়বৈজয়ন্তী। বই সাত দিনে সংস্করণ হলে তবেই ভালো বই-যখন তখন তার জন্তে দায়ী কে? লেখক? প্রকাশক? না পাঠক? ঠক কে? ঠক বাছতে গাঁ কাজে কাজেই উজাড়।

সনাতন ভারতবর্ষের বাণী ছিলো: সত্যম্! শিবম্! সুন্দরম্! কংগ্রেসী ভারতবর্ষের শ্লোগান হচ্ছে; অশিব! অসত্য! অসুন্দর। এর বিরুদ্ধে একজনেরও বক্তব্য শোনা গেলে এই মাটিতেই সোনা ফলত। একে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়েছেন বলেই মিথ্যে খবর বেচে খবর কাগজের, অযোগ্য লোকের প্রোগ্রামের আয়োজন করে আকাশবাণীর, বাজে লেখার ভেজাল সংস্করণ করে বাংলা পুস্তক প্রকাশকের, এবং দেখার অযোগ্য ছবিকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ দেখাতে পারার আনন্দে টলিউডের জয়যাত্রা অব্যাহত!

এরই ফলে বাংলায় সুপরিচালক নেই একজনও। shoe-পরিচালক আছে;—বাটা। সেই বাটার জুতো যাদের প্রাপ্য তাদের দিচ্ছেন জয়মালা! আপনারাই ত' ভালো ছবির পরম শত্রু; চরম প্রতিবন্ধক! [ক্রমশঃ।

১৯৫৬ সালের অলিম্পিকের ফলাফল

পনের দিন ধরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদরা তাঁদের নৈপুণ্য প্রকাশ করে স্ব স্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে মোটামুটি এবারের অলিম্পিকের ফলাফল দেওয়ার চেষ্টা করবো। এবারের অলিম্পিকে সোভিয়েট রাশিয়া চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছে।

এ্যাথলেটিক্‌স্‌

১০০ মিটার—স্বল্প পাল্লার দৌড়ে আমেরিকার প্রায় একচেটিয়া অধিকার। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ১০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী বব মরো এবারের অলিম্পিকে নতুন রেকর্ড করবেন, এটাই অনেকে আশা করেছিলেন। কিন্তু প্রবল বাতাসের প্রতিবন্ধকতায় তা সম্ভব হয়নি। মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়ে এবারেও অষ্ট্রেলিয়ার মেয়েরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অনেকেই আশা করেছিলেন মার্লিন ম্যাথুজ হবেন প্রথম। বেটি কাথবার্ট প্রথম স্থান অধিকার করেন।

পুরুষ—১ম—বব মরো (ইউ.এস.এ) ১০.৫ সেঃ। ২য়—থানে বেকার (ইউ. এস. এ) ১০.৪ সেঃ। ৩য়—হেক হোগান (অষ্ট্রেলিয়া) ১০.৬ সেঃ। ৪র্থ—ইরা মুর্চিসন ১০.৮ সেঃ।

মহিলা—১ম—বেটি কাথবার্ট (অষ্ট্রেলিয়া) ১১.৫ সেঃ। ২য়—ক্রিষ্টাষ্টাবনিক (জার্মাণী) ১১.৭ সেঃ। ৩য়—মার্লিন ম্যাথুজ (অষ্ট্রেলিয়া) ১১.৭ সেঃ। ৪র্থ—ইসাবেলি ডেনিয়ল (আমেরিকা)।

২০০ মিটার—বব মরো দু'শো মিটারে নতুন রেকর্ডে জেমি ওয়েন্সের রেকর্ড ম্লান হয়ে গেছে। দু'শো মিটারেই আমেরিকার জয়-জয়কার। মেয়েদের দু'শো মিটার দৌড়ে অষ্ট্রেলিয়ারই প্রাধান্য। বেটি কাথবার্ট দু'শো মিটারেও প্রথম স্থান লাভ করেছেন।

পুরুষ—বব মরো (ইউ. এস. এ) ২০.৬ সেঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)। ২য়—এণ্ডি ষ্টানফিল্ড (ইউ.এস.এ) ২০.৭ সেঃ। ৩য়—থানে বেকার (ইউ. এস. এ) ২০.১ সেঃ। ৪র্থ—মাইকেল অগষ্টনি (ত্রিনিদাদ) ২১.৩ সেঃ।

৪০০ মিটার—এবারের দৌড়ের ফলাফল খানিকটা অপ্রত্যাশিত। বিশ্ব-রেকর্ড স্থষ্টিকারী লোউ জোন্স প্রথম স্থান অধিকার করবেন এ ছিল সুনিশ্চিত। আমেরিকার এক অল্পখ্যাত তরুণ ছাত্র চার্লস প্রথম স্থান অধিকার করেছেন জেঙ্কিন্স।

১ম—চার্লস জেঙ্কিন্স (ইউ. এস. এ) ৪৬.৭ সেঃ। ২য়—কার্ল হাস (জার্মাণী) ৪৬.৮ সেঃ। ৩য়—আর্দনিয়ান ইগনটিয়েভ (রাশিয়া) ৪৭ সেঃ। ৪র্থ—ভি হেলষ্টেন (ফিনল্যাণ্ড) ৪৭ সেঃ। ৫ম—লোউ জোন্স (ইউ. এস. এ) ৪৮.১ সেঃ।

৮০০ মিটার—বেলজিয়ামের দৌড়বীর বজার মোয়েন্স বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী। এবারের অলিম্পিকে তিনি কোন স্থান লাভ করেন নি। নতুন অলিম্পিক রেকর্ড স্থষ্টি করে প্রথম স্থান লাভ করেছেন আমেরিকার এ্যাথলীট টম কোর্টনী। মোয়েন্সের পূর্ব্বে কোর্টনীই ছিলেন বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী।

১ম—টম কোর্টনী (ইউ. এস. এ) ১ মিঃ ৪৭.৭ সেঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—ডেরেক জনসন (বৃটেন) ১ মিঃ ৪৭.৮ সেঃ। ৩য়—এ বয়সেন (নরওয়ে) ১ মিঃ ৪৮.১ সেঃ। ৪র্থ—আর্নল্ড সোরেল (ইউ. এস. এ) ১ মি ৪৮.৩ সেঃ।

১৫০০—চারশো মিটার দৌড়ে চার জন দৌড়বীর অলিম্পিকের রেকর্ড ম্লান করে দিলেও পনের শ' মিটার দৌড়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে।

১ম—রোনাল্ড ডিলানী (আয়ারল্যাণ্ড) ৩ মিঃ ৪১.২ সেঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—ওয়াল্টার রিশেনহাইন (জার্মাণী) ৩ মিঃ ৪২ সেঃ। ৩য়—জন ল্যাণ্ডি (অষ্ট্রেলিয়া) ৩ মিঃ ৪২ সেঃ। ৪র্থ—লাসলো ট্যাবারী (হাঙ্গেরী) ৩ মিঃ ৪২.৪ সেঃ। ৫ম—ব্রায়ান হিউসন (বৃটেন) ৩ মিঃ ৪২.৬ সেঃ। ৬ষ্ঠ—এম. জাংওয়ার্থ (চেকোশ্লোভাকিয়া) ৩ মিঃ ৪২.৬ সেঃ।

৫০০০ মিটার—দূর পাল্লার দৌড়ে এবার রাশিয়ার দৌড়বীররা সাফল্য অর্জ্জন করেছেন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এবারে পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে তিন জন দৌড়বীর গত অলিম্পিকের রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছেন।

১ম—ভ্লাডিমির কুটস (রাশিয়া) ১৩ মিঃ ৩৯.৭ সেঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—গর্ডন পিরি (বৃটেন) ১৩ মিঃ ৫০.৬ সেঃ। ৩য়—ডেরেক ইবটসন (বৃটেন) ১৩ মিঃ ৫৪.৪ সেঃ।

১০০০০ মিটার—একই অলিম্পিকে দশ হাজার ও পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে প্রথম হওয়ার কৃতিত্ব খুব বেশী জনের ভাগ্যে হয়নি। ফিনল্যাণ্ডের কোলম্যান, চেকোশ্লাভাকিয়ার এমিল জেটাপেক ও এবার ভ্লাডিমির কুটস। শুধু কুটসই নয়, এবারের প্রতিযোগিতায় প্রথম পাঁচ জন জেটাপেকের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন।

১ম—ভাডিমির কুটস (রাশিয়া) ২৮ মিঃ ৪৫.৬ সেঃ। ২য়—জে কোভাক্স (হাঙ্গেরী) ২৮ মিঃ ৫২.৪ সেঃ। ৩য়—এলেন লরেন্স (অষ্ট্রেলিয়া) ২৮ মিঃ ৫২.৪ সেঃ। ৪র্থ—কে কাজিস্কোওয়াক (পোল্যাণ্ড) ২৯ মিঃ।

ম্যারাথন—ম্যারাথন দৌড়ের ইতিবৃত্ত গত বারে আলোচনা করেছি। এবারে যিনি অলিম্পিকে ম্যারাথনে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন, তিনি ফ্রান্সের এক প্রবীণ দৌড়বীর। নাম এলান সিঁমো।

১ম—এলান সিঁমো (ফ্রান্স) ২ ঘঃ ২৫ মিঃ। ২য় ফ্রাঙ্কো মিহালিক (যুগোশ্লাভিয়া) ২ ঘঃ ২৬ মিঃ ৩২ সেঃ। ৩য়—ভিকো কার্ভোনেন (ফিনল্যাণ্ড)। ২ ঘঃ ২৭ মিঃ ৪৭ সেঃ। ৪র্থ—চ্যাং মুন লী (কোরিয়া) ২ ঘঃ ২৮ মিঃ ৪৫ সেঃ। ৫ম—জোসিয়াকী কাওয়াসিমা (জাপান) ২ঘঃ ২৯ মিঃ ১১ সেঃ। ৬ষ্ঠ—এমিল জেটাপেক (চেকোশ্লোভাকিয়া) ২ঘঃ ২৯ মিঃ ৩৪ সেঃ।

৪×১০০ মিটার রিলে—পুরুষদের রিলে রেসে বিশ্ব-রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নতুন অলিম্পিক ও বিশ্ব-রেকর্ড করেছেন আমেরিকার চার জন শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর। বিশ বছর আগে জেসি ওয়েন্স যে টীম রেকর্ড করেছিলেন এঁরা তা ম্লান করে দিলেন। মহিলা বিভাগে অষ্ট্রেলিয়া দৌড়-পটীয়সীরা নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন।

পুরুষ—১ম—ইউ, এস, এ ৩৯'৫ সেঃ (নতুন অলিম্পিক ও বিশ্ব-রেকর্ড) ২য়—সোভিয়েট রাশিয়া ৩৯'৮ সেঃ। ৩য়—জার্মাণী ৪০'৩ সেঃ। ৪র্থ—ইটালী ৪০'৪ সেঃ।

মহিলা—১ম—অষ্ট্রেলিয়া ৪৪'৫ সেঃ। ২য়—বৃটেন ৪৪'৭ সেঃ ৩য়—আমেরিকা ৪৪'৯ সেঃ ৪র্থ—রাশিয়া ৪৫'৬ সেঃ।

৪×৪০০ মিটার রিলে—এতেও আমেরিকার দৌড়বীররা প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

১ম—আমেরিকা ৩ মিঃ ৪'৮ সেঃ। ২য়—অষ্ট্রেলিয়া ৩ মিঃ ৬'২ সেঃ। ৩য়—বৃটেন ৩ মিঃ ৭'২ সেঃ। ৪র্থ—জার্মাণী ৩ মিঃ ৮'২ সেঃ।

৮০ মিটার হার্ডলস—মেয়েদের হার্ডলসে অষ্ট্রেলিয়ার মিসেস শার্লি ডিলহ্যান্টির কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। সন্তানের জননী ডিলহ্যান্টি এবারের মেলবোর্ণ হার্ডলস এবং রিলে দৌড়ে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন।

১ম—শার্লি ষ্ট্রিকল্যাণ্ড ডিলহ্যান্টি (অষ্ট্রেলিয়া) ১০'৭ সেঃ (নতুন অলিম্পিক ও বিশ্ব-রেকর্ড) ২য়—সিসেলা কেলার (জার্মাণী) ১১ সেঃ। ৩য়—নর্মা থ্রোয়ার (অষ্ট্রেলিয়া) ১১ সেঃ ৪র্থ—গ্যাসিনা বয়ষ্ট্রোভা (রাশিয়া)।

৩০০০ মিটার ষ্টিপল চেজ—ক্রিশ ব্রাসার স্বর্ণপদক লাভ করায় দীর্ঘ ২৪ বৎসর পর বৃটেন এ্যাথলেটিকসে স্বর্ণপদক লাভ করল। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্লু' ব্রাসারকে অপর প্রতিযোগী নরওয়ের লারসেনকে বাধা দেওয়ার অভিযোগে প্রথমে প্রতিযোগিতা থেকে নাকচ করে দেওয়া হয়। ব্রাসার আপত্তি জানাতে জুরীদের বিচারে ব্রাসার প্রথম স্থান লাভ করেন।

১ম—ক্রিশ ব্রাসার (বৃটেন) ৮ মিঃ ৪১'২ সেঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—সান্তোর রোজনাই (হাঙ্গেরী) ৮ মিঃ ৪৩'৬ সেঃ। ৩য়—ই. লারসেন (নরওয়ে) ৮ মিঃ ৪৪ সেঃ। ৪র্থ—হাইঞ্জ লোফার (জার্মাণী) ৪৪'৪ সেঃ।

২০০০০ মিটার ভ্রমণ—বিশ হাজার মিটার ভ্রমণ প্রতিযোগিতা এবারের অলিম্পিকের নতুন প্রতিযোগিতা। এই বিষয়ে তিনটি স্থানেই অধিকারী রাশিয়ার যথাক্রমে—লিওনিও স্পিরিণ, আণ্টানাস মাইকেনাস, ব্রোউ আয়স্ক।

৫০০০০ মিটার ভ্রমণ প্রতিযোগিতার বিশ্বের খ্যাতিমান এ্যাথলীট দর্দনী, রোকা কেউই প্রথম স্থান অধিকার করতে পারেনি।

১ম—নর্ম্যান রিড (নিউজিল্যাণ্ড) ৪ঘঃ ৩০মিঃ ৪২'৮সেঃ। ২য়—ই, মাস্কিন স্কোভ (রাশিয়া) ৪ঘঃ ৩২মিঃ ৫৭সেঃ। ৩য়—জন ইলাং গ্রেন (সুইডেন) ৪ ঘঃ ৩৫মিঃ ২ সেঃ।

১১০ মিটার হার্ডলস-এ প্রথম তিনটি পুরস্কার লাভ হয়েছে আমেরিকার। চতুর্থ, পুরস্কার পেয়েছে জার্মানী।

১ম—লী ক্যালহাউন (ইউ, এস, এ) ১৩'৫ সেঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—জ্যাক ডেভিস (ইউ, এস, এ) ১৩'৫ সেঃ। ৩য়—জোয়েল শ্যাংকল (ইউ, এস, এ) ১৪'১ সেঃ। ৪র্থ—মার্টিন লোয়ার (জার্মাণী) ১৪'৭ সেঃ।

৪০০ মিটার হার্ডলস-এ প্রথম তিনটি স্থান আমেরিকার তিন জন এ্যাথলীট অধিকার করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বল্প পাল্লার দৌড়ের মত হার্ডলে আমেরিকার প্রাধান্যই বেশী।

১ম—গ্লেন ডেভিস (ইউ, এস, এ) ৫০'১ সেঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—এ ডি সাদার্ণ (ইউ, এস, এ) ৫০'৮ সেঃ ৩য়—জে ক্যালব্রেথ (ইউ, এস, এ) ৫১'৬ সেঃ। ৪র্থ—ইউরী লিটুয়েফ (রাশিয়া) ৫১'৭ সেঃ।

হাই জাম্প—উঁচু লাফের স্বর্ণপদক লাভ করেছেন আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলীট চার্লস ডুমাস। ডুমাস মেলবোর্ণে অতি অল্পের জন্য ৭ ফুট অতিক্রম করতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে গত জুন মাসে ৭ ফুট লাফিয়ে বিশ্ব-এ্যাথলীটে এক নতুন অধ্যায় সূচনা করেছিলেন।

মেয়েদের হাই জাম্পে বৃটেনবাসীর অনেকেই আশা করেছিলেন থেলমা হপকিন্স স্বর্ণপদক লাভ করবেন। কিন্তু আমেরিকার উইলড্রেড ম্যাকডেনিয়ল এবারে নতুন অলিম্পিক ও বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

পুরুষ—১ম চার্লস ডুমাস (ইউ, এস, এ) ৬ফু ১১½ ইঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—চার্লস পোটার (অষ্ট্রেলিয়া) ৬ ফু ১০½ ইঃ ৩য়—ইগোর ক্রাসক্রভ (রাশিয়া) ৬ ফু ৭¾ ইঃ ৪র্থ—কেনেথ মানি (কানাডা)

মহিলা ১ম—উইলড্রেড ম্যাকডেনিয়ল ৫ ফু ৯¼ ইঃ। ২য়—থেলমা হপকিন্স ৫ফু ৫¾ ইঃ। ৩য়—মেরিয়া পিসারেভা (রাশিয়া) ৫ ফু ৫¾ ইঃ।

লংজাম্পে মাত্র ১বার আমেরিকা স্বর্ণপদক হারিয়েছে গত বারটি অলিম্পিকের মধ্যে। সেটা ৩৬ বছর আগে এ্যান্টোয়ার্পের অলিম্পিকে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। আমেরিকার ঘরেই উঠেছে স্বর্ণপদক। মেয়েদের মধ্যে পোল্যাণ্ডের এলিজাবেথ ক্রিজেসিনিস্কা প্রথমস্থান অধিকার করেছেন।

পুরুষ—১ম—গ্রেগরী বেল (ইউ, এস, এ) ২৫ ফু ৮¼ ইঃ। ২য়—জন বেনেট (ইউ, এস, এ) ২৫ ফু ২¼ ইঃ। ৩য়—জে ভেলকামা (ফিনল্যাণ্ড) ২৪ ফু ৬¼ ইঃ। ৪র্থ—ডিমিট্রি বণ্ডারোস্কা —(রাশিয়া) ২৪ ফু ৪¾ ইঃ।

মহিলা—এলিজাবেথ ক্রিজিসিনিস্কা (পোল্যাণ্ড) ২০ ফু ৯¾ ইঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—উইলি হোয়াইট (ইউ, এস, এ) ১৯ফু ১১¾ ইঃ। ৩য়—নাদেরদা ভালচিভিলি (রাশিয়া) ১৯ ফুট ১১ ইঃ। ৪র্থ—এরিকা রিস্ক (রাশিয়া) ১৯ ফু ৩¾ ইঃ।

হপ ষ্টেপ ও জাম্প—ব্রেজিলের কীর্তিমান জাম্পার ১৯৫২ সালের বিজয়ী এডিমির ডি সিলভা এবারেও হপ ষ্টেপের স্বর্ণপদক লাভ করেছেন।

১ম—এ, ডি, সিলভা (ব্রেজিল) ৫৩ ফু ৭½ ইঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—ডি, আয়ার নারসন (আইসল্যাণ্ড) ৫৩ ফুঃ ৪ইঃ। ২য়—ভি, ক্রিয়ার (রাশিয়া) ৫২ ফু ৬½ ইঃ, ৪র্থ ডব্লু ই, সার্ফ (ইউ, এস, এ) ৫২ফু ১ইঃ।

পোলভল্ট—একমাত্র বিষয় যার স্বর্ণপদক আমেরিকা ছাড়া আর কোন দেশ পায়নি, বারটি অলিম্পিকে আমেরিকারই আধিপত্য। এবারেও পোলভল্টের স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক গিয়েছে আমেরিকার ঘরে।

১ম—বব রিচার্ডস (ইউ, এস, এ) ১৪ ফু ১১½ ইঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)। ২য়—বব গাটওয়াস্কি (ইউ, এস, এ) ১৪ ফু ১০½ ইঃ। ৩য়—জর্জেস রাউবানীস (গ্রীস) ১৪ ফু ৯ ইঃ। ৪র্থ—জর্জ ম্যাটেস (ইউ, এস, এ) ১৪ ফু ৩½ ইঃ।

ডিসকাস থো—ডিসকাস ছোঁড়ার ধুরন্ধর এ্যাথলীট গার্ডিয়েন লাভ করেছেন দ্বিতীয় স্থান। অনেকেই আশা করেছিলেন তাঁর উপর। কিন্তু আমেরিকার অন্য একজন এ্যাথলীট প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জ্জন করেন। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে রাশিয়ার মেয়েরাই ডিসকাসের পুরস্কারগুলো অধিকার করেছিল। নীনা পনোমারেভা এবার তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন, তার কারণ মানসিক প্রতিক্রিয়া তার সাফল্যকে প্রতিহত করেছে। কিছুদিন আগে লণ্ডনে টুপি চুরির অভিযোগে অভিযুক্তা ছিলেন তিনি।

পুরুষ—আলফ্রেড ওটার (ইউ, এস, এ) ১৮৪ ফু ১০½ ইঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)। ২য়—ফরচুন গার্ডিয়েন (ইউ, এস, এ) ১৭৯ ফু ৯½ ইঃ। ৩য়—ডেসমণ্ড কোভ (ইউ, এস, এ) ১৭৮ ফু ৫½ ইঃ। ৪র্থ—মার্ক ফারাগু (বৃটেন) দূরত্ব ১৭৮ ফু ৩½ ইঃ।

মহিলা—ওগলা ফিকোটোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া) ১৭৬ ফু ১½ ইঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)। ২য়—ইরিনা বেগলিয়াকোভা (রাশিয়া) ১৭২ ফু ৪½ ইঃ। ৩য়—নীনা পনোমারেভ (রাশিয়া) ১৭০ ফু ৮½ ইঃ। ৪র্থ—অর্লিন ব্রাউন (ইউ, এস, এ) ১৬৮ ফু ৫½ ইঃ।

বর্শা ছোঁড়া—এবারের বর্শা ছোঁড়ায় পুরুষদের বিভাগে বিশ্ব-রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর মেয়েদের মধ্যে রাশিয়ার এক তরুণী স্বর্ণপদক লাভ করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন।

পুরুষ—১ম—এজিল ডেনিয়েলসন (নরওয়ে) ২৮১ ফু ২½ ইঃ (নতুন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড)। ২য়—জে সিডলো (পোল্যাণ্ড) ২৬২ ফু ৪½ ইঃ। ৩য়—ভিক্টর জি বুলেঙ্কো (রাশিয়া) ২৬০ ফু ৯½ ইঃ। ৪র্থ—হার্বার্ট কোশেল (জার্মাণী) ২৪৫ ফুট।

মহিলা—১ম—ইনেশা আয়ানোজেম (রাশিয়া) ১৭৬ ফু ৮ ইঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)। ২য়—মার্লিন অবেন্স (চিলি) ১৬৫ ফু ৩ ইঃ। ৩য়—এস, কোলিয়েভা (রাশিয়া) ১৬৪ ফু ১১½ ইঃ। ৪র্থ—ডানা জেটাপেক (চেকোশ্লোভাকিয়া) ১৬৩ ফু ১০½ ইঃ।

লোহার বল ছোঁড়া—এতেও আমেরিকার প্রতিপত্তি। ১২টি অলিম্পিকের ১০টিতে স্বর্ণপদক লাভ করেছে। বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্যারী ও'ব্রায়েন এবারেও স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। মহিলাদের নতুন অলিম্পিক ও বিশ্ব-রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পুরুষ—১ম—প্যারী ও'ব্রায়েন (ইউ, এস, এ) ৬০ ফু ১১ ইঃ। ২য়—বিল নাইডার (ইউ, এস, এ) ৫৯ ফু ৭¾ ইঃ। ৩য়—জিরি স্কোবালা (চেকোশ্লোভাকিয়া) ৫৭ ফু ১০¾ ইঃ।

মহিলা—১ম—তামারা টাইকেভিচ (রাশিয়া) ৫৪ ফু ৫ ইঃ (নতুন অলিম্পিক ও বিশ্ব-রেকর্ড)। ২য়—গ্যালিনা জিবিনা (রাশিয়া) ৫৪ ফু ২¾ ইঃ। ৩য়—মেরিনা ওয়ার্ণার (জার্মাণী) ৫১ ফু ২½ ইঃ।

হ্যামার থো—এবারের হ্যামার থো-তে প্রথম ছয় জন আগের অলিম্পিক রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছে। গতবারের স্বর্ণপদক বিজয়ী এবারে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন।

১ম—হ্যারল্ড কনোলী (ইউ, এস, এ) ২০৭ ফু ৩½ ইঃ (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়—মিখাইল ক্রিভনোসভ (রাশিয়া) ২০৬ ফু ৯½ ইঃ। ৩য়—এনাটলী সামস্তভেটভ (রাশিয়া) ২০৫ ফু ৩ ইঃ। ৪র্থ—এলবার্ট হল (ইউ, এস, এ) ২০৩ ফু ৩ ইঃ। ৫ম—জোসেফ সারমত (হাঙ্গেরী) ১৯৯ ফু ১½ ইঃ।

ডেকাথলন—অলিম্পিকে ডেকাথলন বিজয়ী হওয়া একটি বিশেষ সম্মান। কারণ এই প্রতিযোগিতায় এ্যাথলীটদের সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী হতে হয়। এবারের স্বর্ণমুকুট লাভ করেছেন আমেরিকার ২২ বছরের নিগ্রো এ্যাথলীট মিল্টন ক্যাম্বেল।

১ম—মিল্টন ক্যাম্বেল (ইউ, এস, এ) ৭৯৩৭ পয়েন্ট। ২য়—রাফের জনসন (ইউ, এস, এ) ৭৫৮৭ পয়েন্ট ৩য়—ভ্যাসিলি কুজনেৎসভ (রাশিয়া) ৭৪১৫ পয়েন্ট।

পেন্টাথলন—আগে এই প্রতিযোগিতা ছিল এ্যাথলেটিকসের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যেও—বর্ত্তমান কালে অশ্ব চালনা, ফেন্সিং, রাইফেল চালনা, সাঁতার ও দৌড় এই পাঁচটি বিষয় নিয়েও সুইডেনের লার্স হল পর পর দু'বার পেন্টাথলনে স্বর্ণপদক লাভ করলেন।

১ম—লার্স হল (সুইডেন) ৫৯৯২ পয়েন্ট। ২য়—ওলাভি ম্যাকেলেন (ফিনল্যাণ্ড) ৫৯০৬·৫ পয়েন্ট। ৩য়—ভেলো কোর হেলেন (ফিনল্যাণ্ড) ৫৮৬৭ পয়েন্ট। ৪র্থ—ইগোর নভিকোভ (রাশিয়া)।

হকি—ভারতের হকি দল এবার নিয়ে পর পর ছ'বার অলিম্পিক হকির স্বর্ণপদক লাভ করলো। এবারের অলিম্পিকে অন্যান্য দেশের হকি খেলোয়াড়রা উন্নতি করেছেন প্রচুর। তাই ভারতকে এবারের হকিমুকুট লাভ করতে একটু বেগ পেতে হয়েছে। সেমি ফ্যাইনাল ও ফ্যাইনালে ভারত একটিমাত্র গোলের ব্যবধানে বিজয়ী হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শুধু বলা যায়, ভারতীয় খেলোয়াড়দের আরও বেশী অনুশীলন করতে হবে এ সম্মান বজায় রাখার জন্য।

ফুটবল—এবার ভারতের ফুটবল খেলোয়াড়রা অবশ্যই ভাল খেলেছেন। মূল প্রতিযোগিতায় 'বাঙ্গ' পেয়ে কোয়ার্টার ফাইন্যালে অষ্ট্রেলিয়াকে ৪—২ গোলে পরাজিত করে ভারতীয় দল সর্ব্বপ্রথম অলিম্পিক ফুটবলে জয়লাভের কৃতিত্ব অর্জন করলো, সেমি ফাইন্যালে ভারত যুগোশ্লাভিয়া দলের সংগে ৪—১ গোলে পরাজিত হয়েছে। এবারের ফুটবলের স্বর্ণপদক লাভ ঘটেছে রাশিয়ার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় বিশ্বের অন্যান্য শক্তিশালী দল হাঙ্গেরী, ব্রেজিল প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেনি।

স্থানাভাব বশতঃ এবারের মত এইখানেই খেলাধূলার আলোচনা শেষ হোল।
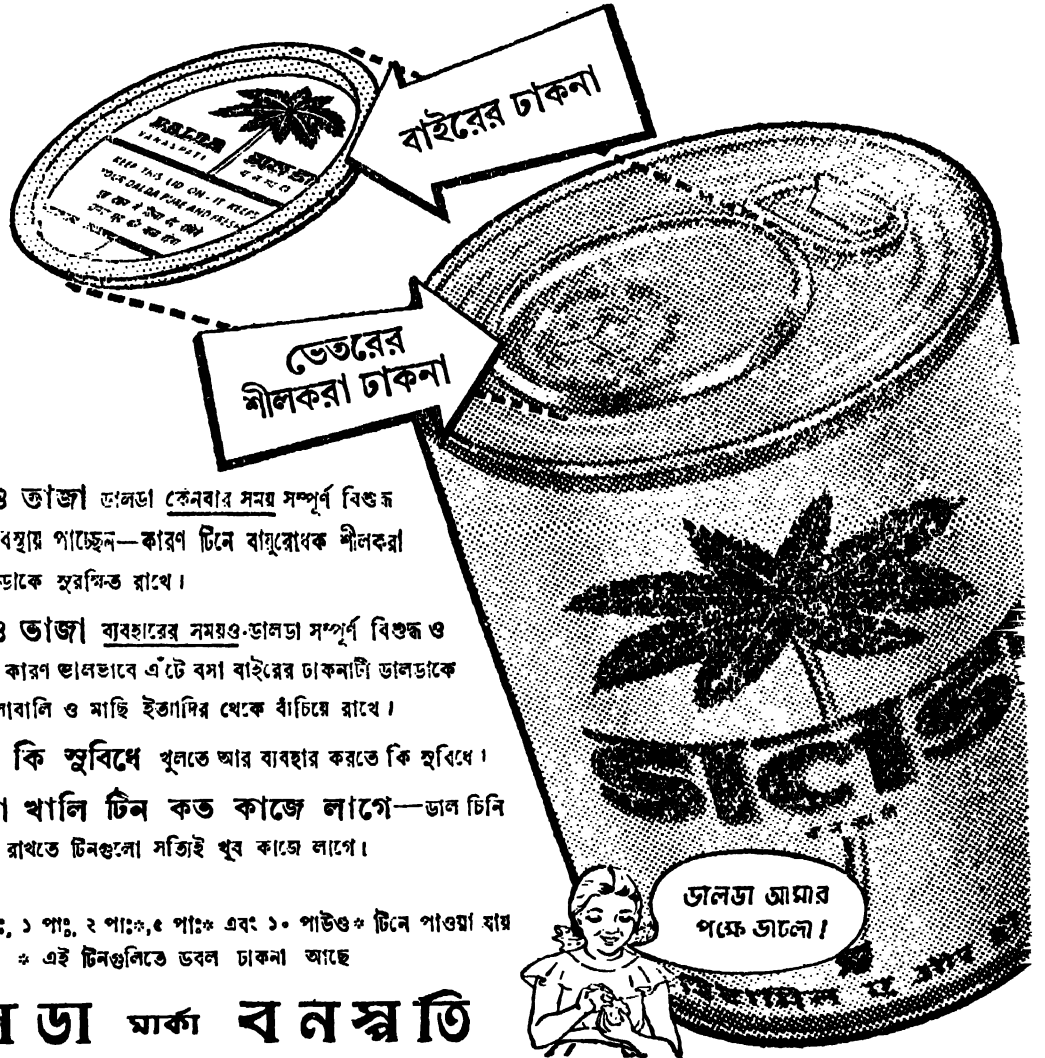
সঙ্গীত-রাজ্যের সম্রাট-চতুষ্টয়

[উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত চির-অবিস্মরণীয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া গেলেও সেগুলি অচল হয় না। সেগুলি চিরকালের। তাহা হইলেও অতীতের সেই অমর সঙ্গীত-রচয়িতাগণ সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিগণের নিকট পবিত্র নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছেন। লোকে কেবল শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের স্মরণ করিয়া থাকেন।

নিম্নে কয় জন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী সঙ্গীত-রচয়িতা ও নাট্যকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। তাঁহারা খৃষ্টীয় সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে জার্মাণী ও অষ্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইউরোপে সঙ্গীতানুরাগী ও সুধী সমাজে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ আসন এখনও দেওয়া হইয়া থাকে।]

ব্যাচ

জোহান সেবাষ্টিয়ান ব্যাচ ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর ইসেন্যাক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় এক শত বৎসর কাল কতকটা অনাদৃত ছিল, কিন্তু তাহার পর সেগুলি আবার রচয়িতাকে যথাযোগ্য স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

ব্যাচ সারা জীবন তাঁহার সময়ের সঙ্গীতগুলির উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার দেশবাসীরা তাঁহাকে অরগ্যান-বাদক ও অরগ্যান-বাদকমণ্ডলীর প্রতিভাশালী পরিচালক বলিয়া প্রশংসা করিত। কিন্তু তাঁহার নিজের রচিত নব ভাবের সঙ্গীতগুলি গীর্জার কর্তৃপক্ষ পছন্দ করিতেন না। সেজন্য ব্যাচ বর্ত্তমানে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত হইলেও সে সময় যথাযোগ্য পুরস্কারে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি যে একজন প্রতিভাশালী সঙ্গীত রচয়িতা, তাঁহার মৃত্যুর পর এ কথা বহুকাল লোকে ভুলিয়াই গিয়াছিল। ব্যাচ বিশেষ আত্মপ্রিয় ছিলেন; তবে নিজেকে সঙ্গীতচর্চ্চায় উৎসর্গ করিয়া তিনি সুখীই হইয়াছিলেন।

মাত্র ১০ বৎসর বয়সে ব্যাচ সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিতার পরিচয় দেন। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট অবস্থান করেন। ব্যাচের ভ্রাতা গীর্জার অরগ্যান-বাদক ছিলেন। গীর্জায় ব্যাচকে অনেক মূল্যবান ধর্মসঙ্গীতের পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত না। বালক ব্যাচ সেগুলি চুরি করিয়া চাঁদের আলোয় নকল করিয়া লয়। তাহার পর ঐ নিষিদ্ধ সঙ্গীতগুলি ব্যাচ গীর্জার অর্গানে বাজাইয়া আয়ত্ত করে।

তাঁহার দুই স্ত্রীর গর্ভে ২০টি সন্তানের জন্ম হয়। সে জন্য বড় পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। তিনি জার্মাণীর বহু রাজদরবারে কাজ করেন। শেষে তিনি লিপজিগের সেণ্ট টমাস গীর্জায় বাদক-দলপতির কার্য্য গ্রহণ করেন। ঐ কাজ তিনি ২৭ বৎসর চালাইয়া যান। সেই সময় তিনি বিবিধ সুন্দর সুন্দর ধর্ম-সঙ্গীত, নাটকাকারে লিখিত সঙ্গীত-গুচ্ছ, গীতি-কাব্য প্রভৃতি রচনা করেন। ঐ সকলে তিনি অশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। ইহা ছাড়া অর্থার্জনের জন্য তাঁহাকে বিবাহ-বাসরে ও অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশনও করিতে হইত।

জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি অন্ধ হইয়া যান। চক্ষুতে অস্ত্রোপচার ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। দুঃখ-দৈন্য-জর্জরিত শেষ অবস্থায় তিনি একখানি ধর্মমূলক গীতি-কাব্য রচনা করেন। চক্ষুর অভাবে তাহা অন্যকে দিয়া লিখাইতে হয়। মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া তিনি অন্ধ অবস্থায়ই দুর্ব্বল হস্তে সেই ধর্ম-সঙ্গীতের একটি নূতন শিরোনামা যোজনা করেন—"দয়াল প্রভু, তোমার সিংহাসন তলে এই উপহার; আমি যাইতেছি।" ব্যাচের ধর্মভাবই তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব।

ওয়াগনার

রিচার্ড ওয়াগনার ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে জার্মাণীর লিপজিগ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন স্কুলের বালক মাত্র, সে সময়ই সেক্সপিয়ারের বিয়োগান্ত নাটকের অনুকরণে একখানি নাটক লিখলেন। কিন্তু উৎসাহের আধিক্যে প্রথম অঙ্কেই তিনি তাঁহার অধিকাংশ নায়ক-নায়িকার জীবনান্ত ঘটান। ১৫ বৎসর বয়সে বীথোভেনের ঐক্যতান সঙ্গীত শুনেন। সেই সময় হইতে তিনি সঙ্গীতচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন।

সে সময় ইটালীয় প্রথায় অপেরাই প্রচলিত ছিল। ওয়াগনার সে রীতি অগ্রাহ্য করিয়া উগ্র ধরণের নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন।

তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনও মধুময় ছিল না। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী তাঁহার গোলমেলে মনোভাব ও কল্পনার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিতেন না। পরে ওয়াগনার অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিয়া শান্তি পান। ওয়াগনার অর্থলোভী ছিলেন এবং পৃষ্ঠপোষকদের যথেষ্ট শোষণ করিতেন। শেষে রাজনৈতিক বিষয়ে অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাঁহাকে সুইজারল্যাণ্ডে ১২ বৎসর কাল নির্ব্বাসন ভোগ করিতে হয়।

এই দুঃসময়ে বিখ্যাত লেখক ফ্রাঞ্জ লিষ্ট তাঁহার একনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে ওয়াগনার নিজ অনুসৃত পথেই চলিতে থাকেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ওয়াগনার লিষ্টের কন্যাকে বিবাহ করেন।

জীবনের শেষ দিকে ওয়াগনার পূর্ণ সাফল্যলাভ করেন। তাঁহার পুস্তকগুলি সুধীসমাজে প্রশংসা পাইতে থাকে। ইউরোপের সর্বত্র ওয়াগনারের মতবাদ আদৃত হইতে থাকে। ওয়াগনার যেন অনুপ্রেরণা পাইয়া বই লিখিতে থাকেন। পর পর পাঁচখানি বই তাঁহাকে সম্মানের শীর্ষস্থান প্রদান করে। ওয়াগনার সমাজকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত জয় করেন।

ওয়াগনার সে সময়ের সঙ্গীত-সম্রাট ছিলেন। তিনি নূতন সঙ্গীতধারা প্রবর্ত্তনের জন্য অদম্য উৎসাহ লইয়া বই লিখিয়া যান। তাঁহার জীবনে এক দিকে দারুণ হতাশা ও অপর দিকে বিরাট

সাফল্য। কখনও প্রবল দারিদ্র্য, আবার কখনও অতিরিক্ত বিলাসিতা। তিনি কখনও পান সমাজের উপহাস, আবার কখনও সার্ব্বজনীন প্রশংসা। ওয়াগনার তাঁহার উগ্রভাবের নাটক-নাটিকাগুলি সমাজের স্তুতিনিন্দার দিকে লক্ষ্য না করিয়া পরিবেশন করিয়া যান। শেষ পর্য্যন্ত অপেরা-ভবনে ইহাই শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করে।

মোজার্ট

উল্‌ফগ্যাং আমেডিয়াস মোজার্ট ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ৫ বৎসর বয়সেই তিনি অতি নিপুণ হস্তে সঙ্গত করিতে পারিতেন। এত অল্প বয়সে সঙ্গতে এরূপ অসামান্য শক্তির পরিচয় খুব কম দেখা যায়। ৬ বৎসর বয়সের মোজার্টকে লইয়া তাঁহার পিতা ইউরোপে তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় দিতে বাহির হন। শ্রোতৃ-মণ্ডলী অবাক হইয়া বালকের সঙ্গত ক্ষমতা দর্শন করিত। ভিয়েনার সম্রাট তাঁহাকে "ক্ষুদে যাদুকর" বলিয়া অভিহিত করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার প্রাসাদে সঙ্গত করিবার অনুমতি দেন।

১৪ বৎসর বয়সে মোজার্ট পোপকে গান গাহিয়া শুনান। পোপ বালকের ক্ষমতায় এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি তাঁহাকে উপাধি প্রদান করেন। ইহার কিছু পরে মোজার্ট স্যালসবুর্গের আর্ক বিশপের সঙ্গীতশিল্পীর চাকরী পান। কিন্তু এইখানেই তাঁহার সাফল্যের শেষ। ইহার পর ৩৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি আর সম্মানের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারেন নাই।

প্রথম ভালবাসায় ব্যর্থ হইয়া মোজার্ট সেই বংশেরই এক কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করেন। উভয়েই সমান নম্র ও সরল ছিলেন; ফলে তাঁহাদের দাম্পত্যজীবন সুখের হইয়াছিল। মোজার্ট এই সময় অনেক নাটিকা লিখেন; কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক "ডন জিও ভ্যানি"ও আর্থিক দিকে তেমন সাফল্য আনিতে পারে নাই; তবে সে সময়ের শ্রেষ্ঠ নাটিকা বলিয়া সুধী সমাজে সমাদৃত হয়।

মোজার্টের কবি-প্রকৃতি মৃত্যুতেও ম্লান হয় নাই। একদিন একজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া কোন মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনায় কবিতা লিখিবার অনুরোধ করে। এই কার্য্যে অগ্রসর হইবার সময় তিনি ক্রমশঃই ভাল ভাবে বুঝিতে পারেন যে, এই কবিতা তাঁহার মৃত্যুর সূচনা করিতেছে, এই কবিতা শেষ করিবার পূর্ব্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। দারিদ্র্যের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

হেডেন

ফ্রাঞ্জ জোসেফ হেডেন দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ৬ বৎসর বয়সে তিনি স্বগৃহ ছাড়িয়া কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৯ বৎসর কাল তিনি ভিয়েনায় এক কনসার্ট পার্টিতে গায়করূপে কাজ করেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার অর্থাভাব ঘুচে না। নিরুৎসাহ না হইয়া তিনি সঙ্গীতশিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। দুর্ভাগ্য তাঁহার সরস চিত্তকে কখনও নীরস করিতে পারে নাই। ঘটনাচক্রে তিনি প্রিন্স ইষ্টারহোজির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

৩০ বৎসর কাল এই ভাবে কাটাইয়া তিনি সঙ্গীতশিল্পে নূতন জ্ঞান অর্জন ও সেগুলিকে পূর্ণতা প্রদান করিতে সমর্থ হন। ঐক্যতান বাদ্যের বিভিন্ন ব্যবস্থায় ও ঐক্যতান সঙ্গীত রচনার খুঁটিনাটি ব্যাপারে তিনি পারদর্শিতা লাভ করেন। তাহাতে তিনি অশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। মোজার্ট ও বীথোভেন—তাঁহার দুই জন বিশিষ্ট ছাত্র তাঁহার ঐ সঙ্গীত কলাকৌশল গ্রহণ করেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার স্ত্রী কলহপ্রিয়া ছিলেন। কিন্তু হেডেন তাহাতে নিরুৎসাহ হন নাই। স্ত্রীর ব্যবহার ভাল না থাকিলেও তিনি তাঁহার গায়কদলের মধ্যে পসেলি নামে এক কোমলপ্রাণা সমঝদারকে সঙ্গিনীরূপে পাইয়াছিলেন।

হেডেনের প্রতিভা শেষে বৃদ্ধ বয়সে সর্ব্বজনস্বীকৃত হইয়াছিল। তাহা হইলেও তিনি কোন দিন সরলতা হইতে বিচ্যুত হন নাই। ভিয়েনায় তাঁহার "সৃষ্টি" নামক অনুপ্রেরণামূলক গীতিনাটিকার অভিনয়কালে "আলোকের আবির্ভাব হউক" কথাটির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক সূর্য্যালোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া উপরের দিকে হেডনের আসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। হেডন সজল নেত্রে আকাশের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলেন, ঐদিক হইতে আসিয়াছে।

হেডন সরল গ্রাম্যবালক মাত্র ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই গান গাহিতে ভালবাসিতেন। জীবিত কালেই তিনি খ্যাতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার বিরাটত্ব দীর্ঘ কয় শতাব্দী পরে লোকে প্রকৃত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। হেডন নিজে সরল প্রকৃতির থাকায় সেইরূপই চাহিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট কোন নূতন গ্রাম্য-সঙ্গীত শুনা ইউরোপের সম্রাটদের প্রশংসা অপেক্ষা কম আদরণীয় ছিল না। তাঁহার সঙ্গীতের মধ্যে গ্রাম্য লোক সম্বন্ধীয় ও পর্ব্বত উপত্যকার সঙ্গীত লোকের মনে আনন্দ-ধারা বর্ষণ করিত। তিনি সঙ্গীতশিল্পীদের পিতারূপে অমরত্ব লাভ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন, দীর্ঘ জীবনের শেষে তিনি সে অমরত্ব লাভ করেন।

সাঙ্গীতিক

কলকাতায় এবং শহরতলীর নাচ-গান-বাজনার জলসা এ বছরেও বেশ জ'মে উঠেছে। শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা তথা বাঙলা দেশে যেমন সঙ্গীতবাদ্যের সমাদর লক্ষ্য করা যায়, তেমনটি ভারতবর্ষের আর কোথাও দেখা যায় না। সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য জলসাগুলির মধ্যে এণ্টালী কালচারাল কনফারেন্স বা কলিকাতা সংস্কৃতি সম্মেলনের নাম ও আয়োজনের কথা সর্ব্বাগ্রে বলা প্রয়োজন। মার্গসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, নৃত্য (ভারত নাট্যম ও কথক) ও শিশুদের সাংস্কৃতিক আসর ও আলোচনা এই সম্মেলনে সুচারুরূপে পরিবেশিত হয়। শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় পরিকল্পিত অনিন্দ্য ও অপূর্ব্ব মঞ্চ ও প্রেক্ষাগারে শীতের মরশুমে আসর জমিয়েছেন বহু গুণী ও জ্ঞানী শিল্পিবৃন্দ। এই জলসার প্রধান সম্পাদক অমূল্য চট্টোপাধ্যায়ের নজর ছিল সর্ব্বদিকে, যেজন্য সম্মেলনের সার্থকতা প্রকাশ পেয়েছে সকল দিকে। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন সর্ব্বশ্রী অমর ভট্টাচার্য্য, আলাউদ্দীন খাঁ, হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আলি আকবর খাঁ, উমাশঙ্কর, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বড়ে গোলাম আলী, হীরাবাঈ, বিনায়ক পট্টবর্দ্ধন, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকণা চৌধুরী, আরতি সাহা রায়, নিখিল ঘোষ প্রভৃতি আরও অনেক স্থানীয় ও বাইরের শিল্পী। সম্মেলনের অন্যতম দুই প্রধান আকর্ষণ ছিল নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার অভিনীত মাইকেল মধুসূদন নাটকাভিনয় এবং 'সাংস্কৃতিকী' নামক একটি সুখ্যাত প্রতিষ্ঠানের 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যাভিনয়। সাংস্কৃতিকীর সুষ্ঠু সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনায় কয়েকটি প্রতিভাময়ী নর্ত্তকীর দেখা মিলেছে। এদের প্রত্যেকেই নৃত্যপটুত্বে দর্শকদের বিস্মিত ক'রেছে। সাংস্কৃতিকী যে নর্ত্তকীদের সাজপোষাকের দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দিয়েছেন সেজন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই। প্রদীপ গুহ-ঠাকুরতার দলের এই সাংস্কৃতিকী উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে যাক, আমাদের এই প্রার্থনা। * * কলকাতার শহরতলীতে যে সব সঙ্গীত-সম্মেলন হয় তন্মধ্যে বেলেঘাটা অঞ্চলের 'মিউজিক কালচারাল এসোসিয়েসনের' দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন সত্যিই এক অভিনব কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন সর্ব্বশ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (নাটুবাবু), হীরাবাঈ, দবীর খাঁ, গোপাল ব্রজবাসী, গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গল, বড়ে গোলাম আলী, অমরেশ চৌধুরী, সতীনাথ, উৎপলা, শ্যামল মিত্র, আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, পান্নালাল বসু, পূরবী দত্ত, সুধা রায়চৌধুরী, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ রায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মীরা চট্টোপাধ্যায়, বাণী লোধ, ডলি ভট্টাচার্য্য, চন্দ্রমালা লাহিড়ী, পুষ্প চক্রবর্ত্তী, শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। * * মিলনচক্রের ১২শ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে আগামী ১১ই, ১২ই ও ১৩ই জানুয়ারী দক্ষিণ-কলিকাতার ইন্দিরা সিনেমা হলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আয়োজন করা হইয়াছে। তাহাতে কণ্ঠসঙ্গীতে বড়ে গোলাম আলী খান, আমীর খান, সলামত আলী, নজাকৎ আলী ভ্রাতৃদ্বয়, হীরাবাঈ বরোদেকার, কালিদাস সান্যাল, শুচিস্মিতা মিত্র, মাধুরী মাটু, প্রভৃতি যন্ত্রসঙ্গীতে ও বিলায়েৎ হোসেন খান, ইমারৎ খান, আলী আকবর খান, ভি জি যোগ, রামরাও পরসৎওয়ার, ইকবাল খাঁন, আমীর হোসেন, শান্তাপ্রসাদ, কানাই দত্ত প্রভৃতি এবং কথক নৃত্যে শম্ভু মহারাজ, রোশন কুমারী যোগদান করিতেছেন। * * ১২ই জানুয়ারী, শনিবার সকাল ৮-৩০ মিঃ এ রবীন্দ্র ভারতী হলে নিখিল ভারত শিশু-সঙ্গীত-সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। ১২ই ও ১৩ই জানুয়ারী সকাল ও সন্ধ্যায় চারিটি বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের নিম্নলিখিত শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন—কুমারী রূপা জমানী, বোম্বাই ; কুমারী বিশাখা গান্ধী, সৌরাষ্ট্র ; শ্রীমান অনিল গান্ধী, সৌরাষ্ট্র ; শ্রীমান জগদীশ, গুজরাট ; শ্রীমান যতীন্দ্র, গুজরাট ; কুমারী জ্যোতিকা প্যাটেল, নাগপুর ; শ্রীমান প্রকাশ মিশ্র, বেনারস ; শ্রীমান গৌতম এইচ ভাটিয়া, করাচী ; সমবেত পল্লীনৃত্য—বিহার ও উড়িষ্যা ; কুমারী হৈমন্তী শুক্লা, কলিকাতা ; শ্রীমান সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা ; শ্রীমান সুপ্রকাশরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ; শ্রীমান বাণী লাহিড়ী, কলিকাতা ; কুমারী ব্রততী মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ; কুমারী কুমকুম বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ; কুমারী অনিন্দা রায়চৌধুরী, কলিকাতা ; কুমারী দীপালি রায়, কলিকাতা ; শ্রীমান গৌতম মিত্র (কলিকাতা) প্রভৃতি।

রেকর্ড পরিচয়

শীতের মরসুমে গানের আসর জমে উঠেছে। অলিতে-গলিতে জলসা, ইস্কুল-কলেজেও জলসা। গান যিনি চান তিনি তো পাচ্ছেনই, যিনি চান না তিনিও নিস্তার পাচ্ছেন না। এবার আবার আসন্ন নির্বাচনের ধুম পড়েছে, মহড়ায় পাড়া গরম এবং নির্বাচনী বক্তৃতার সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান-বাজনাও এসে পড়ছে। ভালোই, যে তরফেই হোক, জনসাধারণ দিনান্তেও হরিনামের মতো যদি কিছুক্ষণ নির্দোষ গান-বাজনায় আনন্দ পায়, সেটা সব দিক দিয়েই ভালো। কিন্তু যাঁরা ঘরের বাইরে যান না, তাঁরাও উপবাসী থাকবেন না। তাঁদের জন্যও মাসে মাসে নতুন গানের পসরা বের হচ্ছে। "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" ও "কলম্বিয়া" রেকর্ডের তালিকায় এমন এমন

সব গানও বেরোয়, যা সত্যি সংগ্রহ করে রাখবার মতো এবং নিত্য-নতুন প্রতিভার সাক্ষাৎ যতো না মেলে, প্রতিষ্ঠাবানদের নতুন নতুন সৃষ্টির কিছু কমতি নেই। এখানে আমরা নতুন প্রকাশিত রেকর্ডের বিবরণ দিচ্ছি।

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

স্বনামখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র দে'র সার্থক শিষ্য ও উত্তরসাধক তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মান্না দে বোম্বাই-এর চিত্রজগত গানে গানে মাৎ করেছেন। বাংলা গানে তাঁর সর্বাধুনিক দান—"তীর ভাঙ্গা ঢেউ" এবং "তুমি আর ডেকো না" সত্যই উপভোগ্য হয়েছে।—N 82724. সনৎ সিংহের নতুন আধুনিক গান—"তোমার সিঁথিতে সিঁদুর" এবং "নূপুর বাজায়ে পায়ে" সুর-লালিত্যে ও কণ্ঠমাধুর্যে চমৎকার। সুর দিয়েছেন দিলীপ সরকার।—N 82725. পল্লীগীতি বাংলার প্রাণের জিনিষ। নির্মলেন্দু চৌধুরী তাতে মিশিয়ে থাকেন অন্তরের দরদ, তাই তো বিদেশে যেয়েও তিনি অশেষ যশ অর্জন করে এসেছেন। তাঁর নতুন গান—"তোমার লাগিয়া রে" এবং "আমার সাধের নাও"।—N 82726.

কলম্বিয়া

লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে বাংলা গান, সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সম্ভব করেছেন এবং সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ও সেই দুশ্চর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, এবার ফলও হয়েছে আশাতীত সুন্দর। গান দুটি—"আকাশ-প্রদীপ জ্বলে" এবং "কত নিশি গেছে"—সবারই ভালো লাগবে।—GE 24813. রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নতুন রেকর্ড উপহার দিয়েছেন সমরেশ রায়। গান দুটি—"ওগো আমার চির-অচেনা" এবং "মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে"।—GE 24814. ইলা মজুমদার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেই শুধু যশস্বিনী নন, আধুনিক গানেও তাঁর বিশেষ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর নতুন আধুনিক গান—"দোলে মন দোলে রে" এবং "রূপালী জ্যোছনায়" অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত।—GE 24815. 'শিল্পী' কথাচিত্রের গানগুলি গেয়েছেন গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়—"নূপুরের গুঞ্জনে" এবং "তুমি যে আমার"—GE 30346. গায়ত্রী বসু—"রুমঝুম রুমঝুম" এবং ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য—"বন্ধু রে তুমি বিহনে"।—GE 30347. 'ঘুম' বাণীচিত্রের গান—"এ কি উতরোল" এবং "ঘুম ঘুম ঘুম" গেয়েছেন যথাক্রমে—গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়—GE 30345. 'নিউ দিল্লী' চিত্রের গান—"বড়ি বরবি" এবং "তুম সংপ্রীত" ক্লারিওনেট বাজিয়েছেন—অমর সিং বঙ্গাল।—GE 25833.

আমার কথা (২৪)

ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

গয়া-প্রবাসী কৃতী বাঙালী সন্তানদের মধ্যে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় পরলোকগত যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের নাম। সংস্কৃতির প্রতি অবর্ণনীয় অনুরাগ এঁর মধ্যে ছিল পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান। পিতার উচ্চ আদর্শের রেশ পুত্রদেরও মাতিয়ে তোলে। তারাও পিতার আদর্শকে বেছে নেবার চেষ্টা করে। সফলও হয় জীবনের পথ চলার ক্ষেত্রে। সুরশিল্পী শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র—যোগেন্দ্রচন্দ্রেরই এক পুত্র। বংশের গৌরববর্ধক। বংশমর্যাদার প্রতি পূর্ণমাত্রায় শ্রদ্ধাশীল। আপন সাধনায় আত্মহারা।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ধীরেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয় কলকাতা সহরের আহিরীটোলা অঞ্চলে। বাল্যশিক্ষা গয়ায়। প্রবেশিকা অবধি। তারপর কলকাতায় এসে মিত্র ইনষ্টিটিউশান (মেন) থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হন উত্তীর্ণ। সেণ্ট পলস্ থেকে আই-এস-সি। বিদ্যাসাগর থেকে বি-এ। এর পর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একসঙ্গে ইংরাজী ভাষায় এম-এ ও আইনশাস্ত্রের শিক্ষাগ্রহণ। শেষ অবধি এম-এ পরীক্ষা দেওয়া হয়ে উঠল না। তবে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ধীরেন্দ্রচন্দ্রের একলার নয়। বাড়ীর সকলেরই ছিল। গুরুজনদের সঙ্গীতপ্রীতি শৈশব থেকে প্রভাব বিস্তার করে ধীরেন্দ্রচন্দ্রের মনে। আপন মনে বালক গান শুনে যায়। আত্মমগ্ন হয়ে যায় সঙ্গীতের সুরঝঙ্কারে। প্রবল হয়ে ওঠে সঙ্গীতের আকর্ষণ। বাড়ীতে আপত্তির প্রাবল্য ছিল না—তা হলেও একেবারে জীবনের প্রারম্ভে সামনে পড়ে আছে বিদ্যালয়ের—মহাবিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ। দু' নৌকোয় পা দিয়ে যে সব একাকার হয়ে যাবে—এই মর্মে একটু আপত্তি বাড়ী থেকে উঠেছিল। কিন্তু এই সমস্ত আপত্তি নিষ্ফল হয়ে গেল একজনের প্রতিবাদে। দৃপ্ত প্রতিবাদ। তিনিই বললেন, নিষ্ঠা থাকলে দু'টো কাজই (অধ্যয়ন ও সঙ্গীতচর্চ্চা) একসঙ্গে চলতে পারে। তিনি আর কেউ নন স্বয়ং নৃপেন্দ্রচন্দ্র। ধীরেন্দ্রচন্দ্রকে নিয়ে গেলেন গয়ায় দেশবরেণ্য সুরসাধক হনুমান দাসের কাছে। ধীরেন্দ্রচন্দ্রের বয়স তখন আট। তখন থেকেই হনুমান দাসের কাছে লাভ করতে থাকলেন ঠুংরী-ধ্রুপদ-খেয়াল-টপ্পা প্রভৃতি উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে শিক্ষা। যত দিন ওস্তাদজী জীবিত ছিলেন তত দিন ধীরেন্দ্রচন্দ্রকে তিনি দান

ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

করে গেছেন তাঁর শিক্ষা। হনুমান দাস সম্বন্ধে কিছু বলা এখানে আবশ্যক। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে তরুণ হনুমান রাজপুতানার নিজগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন পিতার সঙ্গে। নানা দেশ ঘুরে তাঁরা গয়ায় আসেন। প্রথা অনুযায়ী গয়ায় সুফল দানের সময় পাণ্ডারা কিছু দানের পরিবর্তে গয়ায় স্থায়িভাবে বাস করতে তাঁদের অনুরোধ করে। তাঁরা রাজী হন। এবং সুফল দানের জায়গায় ঐ সত্যে তাঁরা বদ্ধ হন। সেই থেকে তাঁদের গয়ায় বাস। যন্ত্র-সঙ্গীতে হনুমান দাস জীবনে প্রচুর ছাত্র পেয়েছেন, কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতে সারা জীবনে জন পাঁচেকের বেশী পান নি। বলা বাহুল্য, ধীরেন্দ্রচন্দ্রই তাঁর শেষ ছাত্র। ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে জীবনের একটি শতাব্দী ও আরও একটি বৎসর অতিক্রম করে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন হনুমান দাস। মৃত্যুকালে ধীরেন্দ্রচন্দ্রকে বলে গেলেন—আমার ইচ্ছা—জীবনে তুমি আর দ্বিতীয় ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ না কর—আমি যা দিয়ে গেলুম এই নিয়েই চর্চা কর, সারা জীবনে তুমি শূন্যতা অনুভব কখনও করবে না। গুরুর অন্তিম আদেশের পূর্ণ মর্যাদা দিতে শিষ্য বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি।

ফিরে আসা যাক আবার ধীরেন্দ্রচন্দ্রে। ওকালতি শুরু করলেন। ভালো লাগল না—মনের খোরাক পেলেন না ধীরেন্দ্রচন্দ্র ঐ সত্য-মিথ্যার মায়াজালের মধ্যে। যুদ্ধ লেগে গেছে। ভারতবর্ষের দৈনন্দিন জীবনধারাকে ক্রমশঃ ছারখার করে দিচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। আকাশে-বাতাসে শুধু মৃত্যুর সঙ্কেত, ধ্বংসের হাতছানি, প্রলয়ের অট্টহাস্য। ছেড়ে দিলেন ওকালতি। ঠিক এমনই সময়ে ১১৪১ খৃঃ দেবকীকুমার বসু এঁকে আহ্বান করলেন 'স্বরগসে সুন্দর দেশ হামারা' চিত্রে কণ্ঠদানের জন্যে। এর পর দেবকীকুমারের 'মেঘদূত' চিত্রেও কণ্ঠদানের জন্যে আহ্বান এলো। সঙ্গীত পরিচালনা করছিলেন সম্প্রতি পরলোকগত অনুপম ঘটক। তখনকার দিনের আর একজন খ্যাতিময়ী গায়িকা স্বর্গীয়া শৈল দেবীকেও আহ্বান করা হয়েছিল কণ্ঠদানের জন্যে। কিন্তু এই ছবির চিত্রগ্রহণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তার পর আরও কিছু কাল বাদে দেবকী বোসেরই পরিচালনায় ঐ ছবির পুনর্চিত্রায়ণ শুরু হয়। এবারে কমল দাশগুপ্ত পেলেন সঙ্গীত পরিচালনার ভার। কণ্ঠ দিয়েছিলেন জগন্ময় মিত্র। অর্থাৎ আপনারা যে মেঘদূত দেখেছিলেন তাতে জগন্ময় মিত্রেরই গান শুনেছিলেন, ধীরেন্দ্রচন্দ্রের শোনেন নি। কয়েকটি ছায়াচিত্রের সঙ্গীত পরিচালনার ভারও গ্রহণ করেছিলেন ধীরেন্দ্রচন্দ্র। তার মধ্যে কানন দেবী অভিনীত পথ বেঁধে দিল (পরিচালনা প্রেমেন্দ্র মিত্র), হিন্দী রাজলক্ষ্মী হিন্দী বনফুল, (এই ছবিটির নির্মাণের মূলে ছিলেন যুগ্মভাবে এন-টির-পি-এন-রায় ও কানন দেবী), সরোজ মুখোপাধ্যায়ের অলকানন্দা (পরিচালক রতন চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত চিত্রে দেবকী বাবুর অনুরোধে ধীরেন্দ্রচন্দ্র সুরারোপ করেন। আনুমানিক ১১৩৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থান রেকর্ডের হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ধীরেন্দ্রচন্দ্রকে নিয়ে যান হিন্দুস্থান রেকর্ডে। সেই থেকে রেকর্ড-জগতে ধীরেন্দ্রচন্দ্রের পরিচিতি। আজ অবধি ধীরেন্দ্রচন্দ্রের গাওয়া প্রায় সত্তর-আশীখানি রেকর্ড বাজারে পাওয়া যায়। নানা সঙ্গীতানুষ্ঠানেও উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে পরিতৃপ্তি দান করেছেন ধীরেন্দ্রচন্দ্র তাঁর গান শুনিয়ে। অনুষ্ঠানাদিতে ধীরেন্দ্রচন্দ্রের যোগদানের মূলে ছিলেন বিখ্যাত য়্যাটর্ণি স্বর্গীয় নিমাই বোসের ভাইপো র‍্যালী ব্রাদার্সের মুৎসুদ্দি সঙ্গীতমহলে বিশেষ পরিচিত শরৎ বসু (ননী বাবু) মহাশয়। ইনি নিজে বাজাতেন এস্রাজ। ধীরেন্দ্রচন্দ্রের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ইনি ধীরেন্দ্রচন্দ্রকে তুলে ধরলেন জনসাধারণের সামনে। শিল্পীর শিরোদেশে ঝরে পড়ল বিধাতার আশীর্ব্বাদ।

আজকের সঙ্গীত-জগতে নানারকম গলদের হেতু প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, সেদিন যা ছিল সাধনার বস্তু, আজ তা ব্যবসার সামগ্রীতে পরিণত। তাই সেদিনকার শিল্পীদের যে ঔদার্য ছিল আজকের শিল্পীদের মধ্যে তা লেশমাত্র নেই। আজকের দিনে দেশের আর্থিক অবস্থার অবনতি মনের আন্তরিকতাকেও অবলুপ্ত করে দিয়েছে; নবীন শিল্পীদের এ জগতে প্রবেশ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর আসে তাদের বাধা প্রচুর। এখন গুণের মানদণ্ডে তাদের আগমন হয় না সুপারিশের প্রাবল্যই তাদের এ জগতের প্রতিষ্ঠালাভের প্রধান সহায়ক। তবে এর উল্টো দিকও আছে, এখন শেখার সুবিধে ঢের বেশী, তখন কেউ দয়া করে শেখাতে রাজী না হলে শেখার সুবিধে কোনমতেই সম্ভব হত না। বর্তমানে সঙ্গীতের নানা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং শিক্ষালাভের অসুবিধা বহুলাংশে এখন দূরীভূত হয়েছে। মেগাফোনের সঙ্গে যখন কাজী নজরুল সংশ্লিষ্ট সেই সময় তিনি ধীরেন্দ্রচন্দ্রকে আহ্বান করেন নানা অপ্রচলিত রাগে গানে সুর দেবার জন্যে। ধীরেন্দ্রচন্দ্র এগিয়ে এলেন। নজরুলের কথা ও ধীরেন্দ্রচন্দ্রের সুর। সে জিনিষের তুলনা হয় না। রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও পদাবলী কীর্ত্তনেও যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে ধীরেন্দ্রচন্দ্রের। বাড়ীতে নিয়মিত শিক্ষা দান করে থাকেন ধীরেন্দ্রচন্দ্র। ধীরেন্দ্রচন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শ্রীবিভাস দাশগুপ্ত, শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু (বর্তমানে দত্ত), শ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায় ও সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী সিপ্রা মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখনীয়। বর্তমানে ধীরেন্দ্রচন্দ্রের একটি গ্রন্থ প্রণয়নের ইচ্ছা আছে—এই গ্রন্থে আজকের দিনের সঙ্গীত-জগতে গলদ ও তা অতিক্রম করার পথ নির্দেশের একটি সুচিন্তিত চিত্র ফুটিয়ে তোলার আশা আছে শিল্পী ধীরেন্দ্রচন্দ্রের।

জিজ্ঞাসা করি, বর্তমান দিনের সঙ্গীতের উন্নতি ও প্রসারকল্পে কা'র কা'র অবদান আপনি বিশেষ ভাবে স্মরণ করেন—ধীরেন্দ্রচন্দ্র বলেন, রবীন্দ্রনাথের কথাই বলি—স্বরলিপির মাধ্যমে কথার মহিমায় সঙ্গীত-শাস্ত্রকে তিনি কোথা থেকে কোথায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভেবে দেখুন। এই প্রসঙ্গে আর এক জনের কথাও উল্লেখ করতে হয়। সঙ্গীতের জন্যেই যাঁকে বিধাতা পাঠিয়েছিলেন এই পার্থিব মরজগতে, সারা পৃথিবীর মাঝখানে দেশীয় সঙ্গীতকে যিনি বসিয়ে গেছেন শীর্ষস্থানে, আমাদের সঙ্গীতের গৌরব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে যাঁর কৃপায়—সঙ্গীতক্ষেত্রে আজও যিনি একক, অদ্বিতীয়, অনন্যসাধারণ—তাঁর নাম সঙ্গীতনায়ক রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সঙ্গীতশিল্পবিদ্যাসাগর মিউজ-ডক (অক্সন), এফ, আর, এস, এল (লণ্ডন)।

রঙ্গপট

নবজন্ম

পল্লীগ্রামে একটি সাধারণ পরিবারকে কেন্দ্র করে গল্প। মিথ্যে সন্দেহ ও যুক্তিহীন আশঙ্কা শুধু নিজেকেই নয়, সারাটি পরিবারকে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত করে, তারই একটি ইঙ্গিত পাওয়া যাবে 'নবজন্ম' ছবিতে। দেবকী বসু পরিচালিত 'নবজন্ম'-এর কাহিনী রচনা করেছেন স্বনামধন্যা লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী। শশধর এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, সংসারে তার স্ত্রী বাসন্তী, বোন সুধামুখী, ভগিনীপতি গৌরাঙ্গ, ভাগনা বাদল ও মা বর্তমান। গৌরাঙ্গ গাইয়ে লোক, প্রাণখোলা আমুদে, বাসন্তীর মনের সঙ্গে পাওয়া যায় তার মনের মিল। পরস্পরের মধ্যে ভাই-বোনের মত একটি নির্মল স্নেহ বিদ্যমান। শশধর সন্দিগ্ধচিত্ত, ইন্ধন জোগায় তার মা। সংসারে নিত্য নিত্য কলহের ভারে বিশৃঙ্খলায় অস্থির হয়ে ওঠে বাসন্তীর মন। নরনারায়ণের মেলায় গ্রামশুদ্ধ লোক যাচ্ছে, বাসন্তীকে যেতে দেবে না শশধর, পাছে তার স্ত্রীকে অন্যে কেউ দেখে ফেলে। হাঁপিয়ে ওঠে বাসন্তী, গৌরাঙ্গ রাজী হয় তাকে মেলা দেখাতে নিয়ে যেতে—তবে রাত্রে। যাত্রাকালে শশধর ধরে ফেলে। প্রহার করতে যায় বাসন্তীকে, বাধা দেয় গৌরাঙ্গ, শেষে শশধর পড়ে যায়, শশধর নিহত হয়েছে ভেবে গৌরাঙ্গ ভয়ে পালায়। তারপর অনেক ঘটনা, আবার ফিরে আসে গৌরাঙ্গ—শশধর ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে নিজের ভুল, বাসন্তী তখনও রোগশয্যায় শায়িতা, ভোরের আবির্ভাবের সঙ্গে বাসন্তী ওঠে সেরে। তারপর মধুরেণ সমাপয়েৎ। নগরজীবন এ গল্পে সম্পূর্ণ বর্জিত—তাতে ছবির গৌরব বা বক্তব্য বিন্দুমাত্র লাঘব হয় নি। খুব উঁচুদরের বা বিশেষ রকমের কিছু না হলেও 'নবজন্ম'কে অনায়াসে 'ভাল ছবি' আখ্যা দেওয়া যায়। তবে ছবির শেষে দেখতে পাচ্ছি, শশধর সত্যের স্বরূপ চিনতে পারলে, কিন্তু তার মায়ের কি হল, তিনি কি কর্পূর যে উবে গেলেন? ছবির শেষে তাঁর উপস্থিতির যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যে বিধবা জমিদার-বধুর বাড়ীতে গৌরাঙ্গ অতিথি হল সেখানে জমিদার-বধুর সামনে অতগুলি মেয়ের ঘুরঘুর করা, আড়ি পাতা ও ঐ জাতীয় রসিকতা অত্যন্ত অশোভন!

পরিচালক অভিনেত্রীদের রূপসজ্জার দিকেও যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টি দেন নি। পল্লীবধূরূপে তাদের বলে না দিলে তাদের চেনাই যায় না—এ যেন পল্লীগ্রামে পিকনিক করতে গিয়ে কোন অভিজাতবংশীয়া শহুরে মহিলা হাতে একটি কলসী নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন স্রেফ ছবি তোলাবার জন্যেই। অভিনয়াংশে প্রাণভরা অভিনন্দন পাবেন জহর গঙ্গোপাধ্যায় ও অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মর্মস্পর্শী অভিনয়ের জন্যে। নায়ক উত্তমকুমারও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মিতা চট্টোপাধ্যায়, নিভাননী দেবী, তুলসী লাহিড়ী, ভূপেন চক্রবর্তী প্রভৃতিকেও ভালো লাগবে।

কাবুলিওয়ালা

বহুদিন বাদে আশাতীত আনন্দের খোরাক নিয়ে দেখা দিল কাবুলিওয়ালা। এ কাহিনী যেন কালি দিয়ে বা কলম দিয়ে লেখা নয়। মাত্র একত্রিশ বছর বয়েসের মধ্যে যতটুকু পিতৃত্বের অধিকারী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার সবটুকুই যেন উজাড় করে তার রস নিংড়ে নিয়ে সেই পিতৃত্ব রস দিয়ে লেখা। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরদত্ত শক্তির পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতারই নামান্তর। তাঁর সেই অসামান্য শক্তির পরিচায়ক কয়েক পাতার মধ্যে লিপিবদ্ধ কাবুলিওয়ালাকে পর্দার মধ্যে সকলের সামনে নতুন করে তুলে ধরলেন তপন সিংহ, তাতে রসদ জোগালেন চারুচিত্র, অতিরিক্ত সংলাপ দিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র—আর তাকে জীবন্ত করে তুললেন কয়েক জন শক্তিশালী শিল্পী। সুরের ঝঙ্কারে তাকে ভরিয়ে তুললেন রবিশঙ্কর, সমস্ত কাহিনীটিকে আলোকচিত্রে ধ'রে রাখলেন অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কাহিনীর বিষয়বস্তুর নির্বাচনই তো অপূর্বত্ব মণ্ডিত—যে কাবুলিওয়ালা বলতে বাঙালী চিরদিনই বোঝে এক কর্কশ রুক্ষস্বভাব হিং-বিক্রেতা, টাকা ধার দিয়ে যারা বাঙালীর বুকে ছুরি চালাবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখে, 'রুবি দেও; রুবি দেও' শব্দে যারা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাদেরই মধ্যে কবিগুরু খুঁজে পেলেন 'রহমৎ'কে। মিনির সঙ্গে রহমতেরই পরিচয় হল—অন্য কোন প্রদেশের লোকের সঙ্গে হ'ল না—হ'ল কাবুলের রহমতেরই। এই রহমৎ মিনির মধ্যেই দেখতে পেল তার মেয়ে রাবেয়াকে। মিনিকে মেওয়া 'সে সওদা করতে দেয় না' মিনিকে 'খোঁখী তুমি শ্বশুরবাড়ী যাবে?' বলে মিনিকে সে আরও আপন করে নেয়—রহমৎকে দেখে কবিগুরুর মনে কাবুলিওয়ালা বলে মনে হয় না, মনে হয় 'মেয়ের বাপ'। যা তিনি নিজে। সেখানে আর কোন ভেদাভেদ নেই, সেখানে উভয়েই পিতা।

"কাবুলিওয়ালা" কাহিনী কারোরই অপরিচিত নয়। কাহিনী সম্বন্ধে আর বিস্তারিত বলার কিছু নেই। এ ছবি রসজ্ঞ সমাজে যে সবিশেষ সমাদর লাভ করবে এ বিষয়েও আমরা নিঃসন্দেহ। তবে ১২৯৯ সালের ঘটনার মধ্যে আঃ ১৩৪৫ সালে লেখা 'ঝর ঝর বয় বেগে' গানটি দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল, ঐ স্থানোপযোগী গান কবিগুরুরই লেখা তার আগেও হয় নি কি? সেই গানগুলি তো গাওয়ানো যেত। মঞ্চের উপর ঐ জাতীয় বিচিত্রানুষ্ঠানের রেওয়াজ পঁয়ষট্টি বছর আগে ছিল না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সংলাপ এত সুনিপুণ হয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর, অভিনয়াংশে অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেলেন ছবি বিশ্বাস। শিল্পনাথ গগনেন্দ্রনাথের প্রপৌত্রী টিঙ্কু ঠাকুর অসামান্য ক্ষমতার পরিচয়

দিয়েছে এই ছবিতে, তাকে প্রাণভরা অভিনন্দন জানাই। রাধামোহন ভট্টাচার্য, মঞ্জু দে, জীবেন বসু, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, করালী দেবী, ধীরাজ দাস, অতনুকুমার, দেবী নিয়োগী প্রভৃতির অভিনয়ও ভাল হয়েছে। কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মস্পর্শী অভিনয় দর্শকমনে যথেষ্ট পরিমাণে রেখাপাত করে

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

বাঙলা-সাহিত্যে বিশেষ করে কাব্য-জগতে নজরুল ইসলাম নিজেই একটি অধ্যায়। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে সাহিত্য-জগতে একটি পরিবর্তনশীল সময়ে আবির্ভূত হয়ে বাঙলার কাব্যে সৃষ্টি করলেন এক নতুন ধারা। বিধাতার ইচ্ছায় সেই চিরগঠনোন্মুখ লেখনী আজ পনেরো বছর প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। সশরীরে নজরুলকে দেখেও যেন মনে হয় তিনি নেই। থেমে গেছে আজ সেই লেখনীর অশান্ত গতিবেগ। আজ হিমালয়কে নতশির হতে কেউ আদেশ জানাচ্ছে না। শ্যামা মায়ের কোলে বসে শ্যামের নাম জপ করারও বাসনা কারোর মধ্যেই জাগছে না। বাঙলা ও বাঙালীর পক্ষে এ বড় করুণ মর্মান্তিক আঘাত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় দু' হাজার ফুটের মধ্যে কবির একটি প্রমাণ্য জীবনীচিত্র তুলতে মনস্থ করেছেন। এতে কবিকেও দেখা যাবে। কবির পরিজন-বর্গকেও দেখা যাবে। সরকারের এই প্রচেষ্টায় দেশবাসীমাত্রেই আনন্দিত হবেন। এই উদ্যম সর্বাঙ্গীন ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হোক কামনা করি। * * সাহিত্যের দরবারে সন্তোষকুমার ঘোষের নাম সুপরিচিত। তাঁর 'কিনু গোয়ালার গলি'র নামও অপরিচিত নয়। এই কাহিনীর চিত্রায়ণে একটি প্রতিষ্ঠান হাত লাগিয়েছেন। * * অভিনেতার খ্যাতি অর্জন করার অনেক আগেই লেখকের খ্যাতি-লাভে সমর্থ হয়েছিলেন বিকাশ রায়। তাঁরই রচিত ও পরিচালিত 'স্যানিটোরিয়াম'এ দেখতে পাওয়া যাবে পাহাড়ী সান্যাল, অসিত-বরণ, রবীন মজুমদার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবলা-খ্যাত নীরেন ভট্টাচার্য, সন্ধ্যারাণী দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ এবং স্বয়ং বিকাশ রায়কে। * * গেভাকালারে গৃহীত পূর্ণ দৈর্ঘ্য শিশুচিত্র 'স্বপনপুরী'র মুক্তি আসন্ন। কুমার সরকারের পরিচালনায় এতে অভিনয় করেছেন—শ্রীমান বিভু, শ্রীমান শ্যামল, শ্রীমান অলোক, অঞ্জলি দেবী, অনীতা ভট্টাচার্য, সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী গাঙ্গুলী, নিভাননী দেবীও একটি বিশেষ ভূমিকায় উৎপল বসু। সঙ্গীত পরিচালক ও চিত্রকররূপে দেখা যাবে যথাক্রমে নচিকেতা ঘোষ ও নিমাই রায়কে। * * প্রবীণ পরিচালক ফণী বর্মার আগামী নিবেদন 'হরিশ্চন্দ্র'। নচিকেতা ঘোষের সঙ্গীত পরিচালনায় দেখা যাবে ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান বিভু, দীপ্তি রায়, তপতী ঘোষ, রেণুকা রায়, অপর্ণা দেবী প্রমুখ শিল্পীদের। * * দেবকী বসুর ভাগনা কুমার ঘোষ পরিচালনা করছেন 'ভাঙন' ছায়াচিত্রটি। এতে রূপ দিচ্ছেন—ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, মঞ্জু দে, প্রণতি ঘোষ, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, ভারতী দেবী, নবাগতা শীলা

ঘোষ প্রভৃতি। সঙ্গীতের ভার পেয়েছেন অনিল বাগচী। * * বেণু দাস পরিচালিত 'শ্রীমতীর সংসার' অচিরেই বোধ হয় মুক্তিলাভ করছে। অভিনয়াংশে আছেন—ধীরাজ ভট্টাচার্য, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়, নবাগত পার্বতী চৌধুরী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, নবাগতা প্রীতি দাস ইত্যাদি। একটি বিশেষ ধরণের ভূমিকায় দেখা যাবে বাঙলার এক অসামান্যা শক্তিময়ী অভিনেত্রী চন্দ্রাবতী দেবীকে।

শুক্রবারের বেতার নাট্য

৬ই পৌষ—অম্বপালী। কাহিনী মুরারি সেন, প্রযোজনা ও পরিচালনা এইচ-এম-ভি। ১৩ই পৌষ—নাইন আপ। কাহিনী হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনা সরল গুহ। রূপদানে শৈলজানন্দ, শ্রীধর ভট্টাচার্য, জয়ন্ত চৌধুরী, সুধীর সরকার ও অনুভা গুপ্তা। ২০শে পৌষ—রূপকথা। কাহিনী ও পরিচালনা শৈলজানন্দ, নাট্যরূপ অনিল চট্টোপাধ্যায়। রূপায়ণে—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেশ ঘোষ, প্রমোদকুমার চক্রবর্তী, রথীন ঘোষ ও শোভা সেন। ২৭শে পৌষ—বশীকরণ, কাহিনী কালিকানন্দ অবধূত, নাট্যরূপ—ক্ষিতি মুখোপাধ্যায়, পরিচালনা শ্রীধর ভট্টাচার্য। রূপদানে মিহির ভট্টাচার্য, পবিত্র মিত্র, প্রেমাংশু বসু, পারিজাত বসু, রণেন ঘোষ, অজিত দে, নিত্যানন্দ বসু, পতিতপাবন মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র দে, মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষ, নমিতা দেবী ও তপতী ঘোষ। আগামী ২১শে পৌষ থেকে ৫ই মাঘ পর্যন্ত বেতার-সপ্তাহ পালিত হবে। এই সাতটি দিন সাতটি নাটকের অভিনয় হবে। আগামী সংখ্যায় এই বেতার-সপ্তাহের বিস্তৃত আলোচনা থাকবে।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

উদীয়মানা শিল্পী শ্রীমতী শুক্লা সেন

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

একঘেয়ে জীবন-যাত্রা থেকে মুক্তি চেয়েছিলুম এবং সে মুক্তির পথও পেলুম এক দিন ঘটনাচক্রেই। বললেন উদীয়মানা শিল্পী শ্রীমতী শুক্লা সেন। অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারের কন্যা ও বধূ ইনি। কথা শুনে আমি বিস্ময় প্রকাশ না করে পারলুম না।

শ্রীমতী শুক্লা হয়তো বুঝলেন আমি কি ভাবছি। তাই তাঁর আগেকার কথারই রেশ টেনে বলতে থাকেন—সত্যিই, মুক্তিই চেয়েছিলুম আমি। জীবনের একঘেয়েমি আমার মোটেই ভাল লাগছিল না, পরিবর্তনের দাবী সে জন্যেই উদগ্র হ'য়ে উঠছিল দিন দিন। পূর্বেই বললুম—মুক্তির পথ এসে জুটলো ঘটনাচক্রে এবং সে পথরেখা ধরেই সিনেমা-জগতে আমি এসে পড়লুম। বলতে কি, এ লাইনে আসবো পূর্বে এরূপ কোন কল্পনা বা পরিকল্পনাই আমার ছিল না—এ ছিল সত্যি আমার স্বপ্নেরও বাইরে।

সে ঘটনাচক্রটি কি জানতে চাইলুম আমি, অনুরূপ বিস্ময়-আগ্রহের সঙ্গেই। কোনরূপ দ্বিধা না ক'রেই শ্রীমতী সেন বললেন—আমি যখন জীবনের একটা পরিবর্তনের পথ খুঁজে চলেছি, এমনি একটি মুহূর্তে এক পার্টিতে মধু বাবুর (স্বনামধন্য পরিচালক মধু বসু)

শ্রীমতী শুক্লা সেন

সঙ্গে হ'লো আমার দেখা। তিনিই আমাকে সিনেমায় যোগদানের পরামর্শ দিলেন এবং প্রেরণাও জোগালেন নানা ভাবে। জীবনের একঘেয়েমি থেকে এমনি আমি অব্যাহতি খুঁজে পেলুম।

শ্রীমতী শুক্লা এ লাইনে এসেছেন খুব বেশী দিন নয়। কিন্তু সিনেমা-শিল্পের প্রতি তাঁর মমত্ব ও দরদ অত্যন্ত গভীর বলেই নাম ছড়িয়ে পড়েছে এরই ভেতর। পর্দায় তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন মধু বোসের 'শুভলগ্ন' ছবিতে। বিখ্যাত পরিচালক সুশীল মজুমদারের "দানের মর্য্যাদা" ছবিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় ইনি অবতীর্ণ হ'য়েছেন। সিনেমা সম্পর্কে শ্রীমতী শুক্লার ধ্যান ও ধারণা সম্বন্ধে জানবো বলেই সেদিন গেছলুম বালীগঞ্জে তাঁর বাস-ভবনে। আলোচনা চললো দু'জনায়—আমার যা জানবার জেনে নিলুম এরই ভেতর থেকে।

আমার একটি প্রশ্নের উপর শ্রীমতী সেন বললেন—সিনেমা লাইনেই আসবো ধারণা না থাকলেও নাচের প্রতি আমার ঝোঁক ছিল বরাবর। স্কুল ও কলেজ-জীবনে বহু শো'তেই আমি নেমেছি এবং প্রশংসাও জুটেছিল কম নয়। আই, এ পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার 'বে' হয় এবং আমি পুরোপুরি সংসারী হ'য়ে পড়ি।

—ছবিতে আত্মপ্রকাশের পর আপনার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কোন বিশেষ পরিবর্তন এসেছে কি?

নিঃসঙ্কোচে উত্তর করলেন শ্রীমতী শুক্লা—না, আসেনি। আসবার কারণ ছিল কোথায়? চলচ্চিত্র-জগতের সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রত্যক্ষভাবে ছিল না বটে, কিন্তু পরোক্ষ যোগাযোগ বলতে পারি বহুদিনকার। আমার দাদা শ্রীঅসিত সেন একজন ফিল্‌ম ডিরেক্টার এবং আমার স্বামী নিজেও একজন চিত্রপ্রযোজক। এ সকল কারণে সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে আমার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কোন প্রশ্ন উঠে না।

—আপনার বিশেষ কোন Hobby বা খেয়াল আছে কি ?

—বিশেষ Hobby বা খেয়াল বলতে আমার যেটি আছে সেটি একটু বিচিত্র ধরণের। নিজ হাতে রান্না করে লোক খাওয়ান—এটি আমার খুব ভাল লাগে এবং এটিকেই আমার বিশেষ হবি বলতে পারেন। খেলাধূলোর ভেতর ফুটবল খেলাটাই আমি বিশেষ পছন্দ করি। সাধারণ খেয়াল খুসীর ভেতর বই পড়াও আমার একটা অভ্যাস। বই'এর ভেতর ভ্রমণ কাহিনী, ডিটেকটিভ এ সবই আমার বিশেষ ভাল লাগে। ভাল বই হলেই আমি পড়ে থাকি। সাময়িক পত্রপত্রিকা পড়ার অভ্যাসও আমার রয়েছে। মাসিক বসুমতী আমি খুব ভালবাসি। অপর দিকে পোষাক পরিচ্ছদের বেলায় রুচি-সম্মত জমকাল পোষাকই আমার পছন্দ, এটুকু বলতে পারি।

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হ'লে কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন ? এ সম্পর্কে আপনার নিজস্ব মতামতই বা কি ?—জানতে চাইলুম আমি।

দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করলেন শ্রীমতী শুক্লা—প্রথমেই চাই সু চেহারা মানানসই গঠন কাঠামো। সে সঙ্গে অবিশ্যি চাই অভিনয় দক্ষতা, কণ্ঠস্বর, আত্মবিশ্বাস ও চেষ্টা। প্রতিষ্ঠাবান বা প্রতিষ্ঠাবতী শিল্পী হ'তে হলে এ ক'টি গুণের সমাবেশ না হলেই নয়। সর্বোপরি চাই একনিষ্ঠ সাধনা ও শিল্পের প্রতি অপরিসীম দরদ, এ বোধ হয় না বললেও চলে। শিল্পীদের স্বাস্থ্যের প্রতিও কড়া নজর রাখা অত্যাবশ্যক। স্বাস্থ্য মজবুত না থাকলে আর সকল গুণ থেকেও কিছু হয় না—অর্জ্জিত সাফল্য স্থায়িত্বের মর্য্যাদা থেকে আপনি বঞ্চিত হয়।

—চলচ্চিত্রে বাঙ্গালী, বিশেষ করে অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের যোগদান সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

এ প্রশ্নটির উত্তরদান কালেও শ্রীমতী সেনের কণ্ঠ দেখলুম বেশ জোরালো, তিনি স্পষ্ট বললেন—শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের এ লাইনে আরও বেশী করে যোগদান করা উচিত। বর্ত্তমানে এ লাইনের আবহাওয়া খুবই চমৎকার। অফিসে ও অন্যান্য জায়গায় কাজ করলে যদি আপত্তি না থাকলো, তা হ'লে এখানেই বা আপত্তি উঠবে কেন? এ আপত্তি উঠা নিশ্চয়ই উচিত হতে পারে না। আমার মনে হয়, যত বেশী শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়ে এ লাইনে আসবে ততই চলচ্চিত্রের উন্নতি।

আলোচনার শেষ পর্য্যায়ে আমি এইমাত্র জানতে চাইলুম—আপনার জীবনের চরম লক্ষ্য কি ?

সহজ গলায় উত্তর করলেন শ্রীমতী শুক্লা—শিল্পী আমি, শিল্প জগতে প্রতিষ্ঠা পাওয়াই আমার এখনকার মত লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌঁছলে তবেই চরম লক্ষ্যের কথা ভাববো।

দিল্লীতে এশীয় লেখক-সম্মেলন

বড়দিনের প্রাক্কালে এবার দিল্লীতে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাহিত্যিক-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এই অভিনব অনুষ্ঠানের উদ্যোগী ছিলেন ভারতেরই কয়েক জন সাহিত্যিক। সমগ্র এশিয়ার ১৪টি দেশের প্রায় দু'শো সাহিত্যিক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এশিয়ার বাইরের কয়েকটি দেশ থেকেও কিছু উৎসাহী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির। তিনি তাঁর ভাষণে সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন যে, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের লেখক ও জনসাধারণের মধ্যে মৈত্রী, প্রীতি ও সংহতি স্থাপনই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া তিনি বর্ত্তমান বিক্ষুব্ধ বিশ্বের সমৃদ্ধিসাধনের উদ্দেশ্যে লেখকগণকে শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী প্রচারের দ্বারা তাঁদের প্রভাব প্রয়োগ করার আহ্বান জানান এবং ভাষাগত পার্থক্যের গণ্ডী বিদূরিত করার উপায় সম্পর্কে, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাহিত্য অধিকতর পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করার যুক্তি প্রদর্শন করেন।

এই সম্মেলনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী প্রভৃতি চিন্তাশীল মনীষীরাও এই ধরণের সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা, লেখকদের আদর্শ এবং এশিয়ার নব-জাগরণে সাহিত্যিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মূল্য নানা ভাবে যুক্তির দ্বারা ব্যক্ত করেন।

বিশিষ্ট অভ্যাগতদের মধ্যে চীনের মাও তুং, ব্রহ্মের থিয়েন পে মিন্ট, কোরিয়ার হান সুল ইয়া, ইরাণের সৌদি নফিস, সিংহলের আনন্দ গুরুজী, ভিয়েৎনামের তু মো, সাইবেরিয়ার সোফরোশেভ আনাতোলি, পাকিস্তানের হিলেন বটসবি প্রভৃতিগণ তাঁদের নিজ নিজ দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে যেমন আলোচনা করেন, তেমনি সর্ব্ব এশিয়ার মানসিক ঐক্যের উপায় সম্বন্ধেও চিন্তা করেন। এই শেষোক্ত চিন্তাকে কার্য্যকরী করার জন্য একটি কর্ম্মী-পরিষদ গঠিত হয়। এই কর্ম্মী-পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন সিংহলের আনন্দ গুরুজী, সেক্রেটারী-জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন ভারতের মুলুকরাজ আনন্দ এবং সহ সভাপতিমণ্ডলী ও সদস্যগোষ্ঠীর মধ্যে বহু দেশের এক এক জন প্রতিনিধির নাম সংশ্লিষ্ট হয়।

এই সম্মেলনের প্রকাশ্য ও পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পূর্ব্বে চারটি কমিশনের চারটি বিষয়, যথা: 'একনায়ক শাসিত সমাজ বা অন্য ধরণের সমাজক্ষেত্রে লেখকগণের স্বাধীনতা', 'সংস্কৃতি বিনিময়', 'এশিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' এবং 'লেখক ও তার পেশা' সম্পর্কে রিপোর্ট আলোচিত ও গৃহীত হয়। এই আলোচনায় যোগ দেন বাংলা দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায় ও গোপাল হালদার। অন্যান্য ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন রঙ্গচারী, মুলুকরাজ আনন্দ, গঙ্গাধর গ্যাডগিল ও প্রকাশচন্দ্র গুহ প্রভৃতি।

সর্বশেষ সমাপ্তি অধিবেশনের দিন এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে, এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের কেন্দ্র প্রস্তুত করতে হলে, এক দেশের অধিবাসীকে অন্য দেশের বৈশিষ্ট্যমূলক জ্ঞান অর্জ্জন করতে হবে। কারণ, সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ভিত্তিই হ'ল এই। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, আমরা, অর্থাৎ এশিয়ার সাহিত্যিকরা, আশা করি এশিয়ার সকল দেশের লোকেরাও এই আদর্শ পূরণের জন্য যত্নশীল হবেন এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য একে অন্যের সঙ্গে সর্ব্বদা যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন। এ ছাড়া সমস্ত লেখকই যে এক গোষ্ঠীভুক্ত এই ধারণায় তাঁদের উদ্বুদ্ধ হতে হবে। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, সাহিত্যিকদের এই সম্মেলন জাগ্রত এশিয়ার নব-জাগরণের প্রতীক। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পার্থক্য সত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের জন্য এশিয়ার সাহিত্যিক-গোষ্ঠী মিলিত হয়েছেন।

এই শেষ অধিবেশনের দিন সভাপতি ছিলেন চীনা প্রতিনিধি দলের নেতা মাও তুং। ঐ দিন এই সম্মেলনের মধ্যে থেকেই শিশুলেখক সম্মেলনের উদ্ভব ঘটে, এবং ইতালীয় প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ কার্লো লেভি সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি এবং ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদ্বয় সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। উক্ত দিন কার্ডে বিশ্ব-ঘটনাবলীর সঙ্গে সাহিত্যের যোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। গোল্ডকোষ্টের প্রতিনিধি ডাঃ জনসন, হাঙ্গেরীর মিঃ টমাস এবং অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি মিঃ ক্লাড ক্রিষ্টেমসনও নিজের নিজের বক্তব্য বলেন।

সর্বপ্রথমেই এই সম্মেলনের কথা বলতে গিয়ে আমরা এটিকে 'অভিনব' আখ্যায় আখ্যাত করেছি এই কারণে যে, এশিয়ায় এ ধরণের সম্মেলন এই প্রথম এবং একত্রে এতগুলি দেশের গুণী জ্ঞানী ও সাহিত্যিকের একত্র সমাবেশ ভারতের পক্ষে অবশ্যই গৌরবের। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দলগত রাজনীতির প্রভাব সাহিত্যক্ষেত্রকে পর্য্যন্ত এমন ভাবে কলুষিত করেছে যে, এই সর্বএশীয় বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, এবং শুভবুদ্ধির অভাবে সভাপতি নির্ব্বাচন প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় নিয়ে কিছুসংখ্যক প্রতিনিধি অশোভন আচরণ করেন। এ সম্পর্কে এই সম্মেলনে দলগত স্বার্থের উর্দ্ধে থেকে তাঁদের সৃষ্টির কাজ করে যাবার জন্য চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী যে মূল্যবান কথাগুলি বলেছেন, সেইগুলিই এখানে উদ্ধৃত করে আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করব। তিনি বলেছেন, "সাহিত্যিকদের এই সংহতি যেন শেষ পর্য্যন্ত একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীতন্ত্রে পর্য্যবসিত না হয়। সাহিত্যিকরা সমাজের মানুষ, সে হিসাবে সমাজ-প্রচলিত রাজনীতি থেকে তফাৎ থাকা

তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, হয়ত সঙ্গতও নয়। কিন্তু সাহিত্যকে নিছক রাজনীতির হাতিয়ার করে তুললে তা'তে সাহিত্যেরও ক্ষতি হবে, মানুষেরও ক্ষতি হবে। সাহিত্য সর্ব্বমানবের আনন্দ, কল্যাণ ও উন্নতির জন্য—মতবাদের বেড়া তুলে তাকে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ করলে, সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।"

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

হিন্দু আইনে বিবাহ

বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহমালা বাঙলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট উপাদান। এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত 'হিন্দু আইনে বিবাহ' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানের বিবাহ এবং বিবাহের আইন সম্পর্কে নানা তর্ক-বিতর্ক চলেছে আমাদের দিল্লীর বিধানসভায়। বাংলা দেশে শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় বহু রকমের বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। দশ সংস্কার ছাড়া এখানে চালু আছে শৈববিবাহ, কণ্ঠিবদল, সাঙা-বিবাহ, পাণ-বেদল ইত্যাদি। লেখক তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় দেশীয় শাস্ত্রসমূহ থেকে নজীর তুলে বিবাহ এবং বিবাহ-আইন বিষয়ে অনেক কিছু বক্তব্য পেশ করেছেন। বৈধ আর অবৈধ বিবাহ, আর্য্য-অনার্য্য বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সপিণ্ড বিবাহ, সগোত্র-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ কিছুই এ দেশে অপ্রচলিত নেই। লেখকের হালকা ভাষায় লেখা শাস্ত্রীয় ও আইনগত দুরূহ বিষয়ের এই আলোচনা আমাদের প্রত্যেকের জানা কর্তব্য। বিশ্বভারতী। ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা সহজেই 'পরমপুরুষ' আখ্যা দিতে পারি। ধর্মের দোহাই না তুললেও বলা যায়, এমন মহাপুরুষ হয়তো মাত্র বাঙলা দেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় কেউ জন্মগ্রহণ করেননি। ভারতবর্ষকে মিস মেয়োর আঁকা ছবিতে দেখতে অভ্যস্ত ছিল ইউরোপ এবং আমেরিকা। স্বামী বিবেকানন্দ এই আরোপিত কলঙ্ক মোচনের কাজে নেমেছিলেন—ভারতবর্ষকে জগৎচোখে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন ক'রেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের আসন সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'হোমাপাখীর' সঙ্গে গুরু শিষ্যকে তুলনা করেন। গুরু বলেন, 'নরেন লোকশিক্ষা দেবে!' স্বামীজির রচনা ও চিঠি আমাদের দেশের অমূল্য সম্পদ। তাঁর রচিত বাঙলা গদ্যভাষা আজও অতুলনীয়; 'উদ্বোধন' স্বামীজির বাণী গ্রন্থাকারে প্রকাশ ক'রে দেশবাসীর ধন্যবাদ অর্জ্জন করবেন। 'গীতা'র মত এই মূল্যবান গ্রন্থ আমাদের ঘরে ঘরে ঠাঁই পাবে অতি অবশ্য। ছাপা ও বাঁধাই উল্লেখযোগ্য। উদ্বোধন কার্য্যালয়। ১, উদ্বোধন লেন। মূল্য দুই টাকা চার আনা।

রোগীলিপি প্রস্তুত ও ঔষধ নির্ব্বাচন প্রণালী

রোগ-লক্ষণ ও রোগী-লিপি সম্পর্কে তথ্যবহুল বই হয়তো এই প্রথম বাঙলায় প্রকাশিত হয়েছে। লেখক ডাঃ বিজয়কুমার বসু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। তিনি ইতিপূর্ব্বে হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন, "হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় মানুষের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ই সর্ব্বপ্রধান কথা। যে লক্ষণগুলি মানুষটির বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে যত বেশী সাহায্য করে, তাহারা তত বেশী মূল্যবান। মন সমগ্র মানুষটিকে প্রভাবিত করে। মানুষের 'মনুষ্যত্ব' তাহার মনেই থাকে। মানুষের মনই তাহার ভাল মন্দ বিচারের একমাত্র মাপকাঠি।" অর্থাৎ এক কথায় মানসিক চিকিৎসাই হোমিওপ্যাথির মাধ্যম—যার বিশ্লেষণে যথার্থ চিকিৎসার কাজ করা যায়। লক্ষণের মূল নির্ণয় এবং রেপার্টরী দেখার সঙ্কেত গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ছাপা ও বাঁধাই প্রশংসনীয়। ১এ, ইন্দ্র রায় রোড। কলিকাতা। মূল্য ছয় টাকা।

কড়ির ঝাঁপি

বিষয়-বৈচিত্র্য বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের প্রধানতম আকর্ষণ। চিরাচরিত ধারায় লেখা গল্প আর উপন্যাস আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের উপজীব্য নয়। বর্তমানের অধিকাংশ লেখক-লেখিকাই এই পথে এগিয়ে চলেছেন। রুদ্ধদ্বার-কক্ষে বসে লেখা আর জনগণের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে থেকে লেখায় পার্থক্য অনেক বেশী। 'কড়ির ঝাঁপি'র লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর লেখার বিষয়বস্তু আর ভাষার অভিনবত্বে গল্প আর উপন্যাস রচনায় নিজের আসন কায়েমী করেছেন সাহিত্য-দরবারে। লেখকের লেখার উৎকর্ষ অতুলনীয়, ভাষা-মাধুরী প্রায় অনন্যসাধারণ। বানিয়ে গল্প বলার সেই চিরকেলে রীতিকে পরিহার ক'রে তিনি যে বিভিন্ন রসসৃষ্টির নৈপুণ্য দেখিয়ে চলেছেন, তা সত্যই উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেকটি গল্পই লেখকের সুনাম অক্ষয় রেখেছে। প্রচ্ছদপট মনোরম। ক্যালকাটা বুক ক্লাব। ৮১, হ্যারিসন রোড। কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

রুদিন

মহাবিপ্লবের আগে রাশিয়ার চেহারা ছিল অন্য। চরম দুর্গতি তখন রুশবাসীদের। জারের দোর্দণ্ড প্রতাপে দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা হয়ে উঠেছিল অবর্ণনীয়। এক দিকে শিক্ষিত-অভিজাত শ্রেণী কেবল বিলাসিতায় মগ্ন, অন্য দিকে শিক্ষিত অথচ বিত্তহীন মানুষ তাদের জীবনযাত্রায় অস্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া আর কিছুই পায় না। প্রাক্-বিপ্লবের যুগের লেখক আই, এস, তুর্গেনিভ 'রুদিন' উপন্যাসে রাশিয়ার সেই কদর্য্য রূপকে রূপান্তরিত করেছিলেন। তুর্গেনিভের কাব্যধর্মী ভাষা, গল্পের পরিবেশ রচনার অপূর্ব্ব দক্ষতা রুদিনের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। ভবঘুরে রুদিনের জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। মন আর মস্তিষ্ক তার খুবই উর্ব্বর, কিন্তু তার চিন্তা-জগতের দ্বার প্রায় রুদ্ধ বললেই হয়। তুর্গেনিভের অন্যতম বিখ্যাত এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করায় অনুবাদক বিমল বসু যথেষ্ট

মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। আমাদের অনুবাদ-সাহিত্যে কদিন অন্যতম বিশিষ্ট সংযোজন। কে, গাঙ্গুলী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ। ৮বি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

জলধর সেনের আত্মজীবনী

স্বর্গত জলধর সেন ছিলেন বাঙলা সাহিত্যের সর্ব্বজনপ্রিয় 'দাদা'। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা ছাড়া সম্পাদকীয় জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, উপন্যাস, ছোটগল্প এক সময়ে দেশের পাঠক-পাঠিকারা সাগ্রহে পড়তেন। তাঁর অবিচলিত সাহিত্যানুরাগের ও সুমধুর ব্যবহারের ফলে লেখককুল ও সুধীবৃন্দ তাঁর প্রতি স্বতঃই আকৃষ্ট হ'তেন। পরিশিষ্টে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলছেন, "বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাজে জলধর বাবু একটি স্বতন্ত্র আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। সে আদর্শ গাম্ভীর্য্যের সারল্যের প্রেমের ও নিষ্ঠার আদর্শ। সে আদর্শের প্রয়োজন আজ আমরা সাহিত্যিকরা বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতেছি। আলোচ্য গ্রন্থ মাত্র দেড় শত পৃষ্ঠার মধ্যে জলধর সেন মহাশয় তাঁর অত্যাশ্চর্য্য আত্মজীবনী প্রকাশ করেছেন। লিপিকার নরেন্দ্রনাথ বসু। প্রবর্তক পাবলিশার্স। ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট। কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

অঙ্কুরপ্রিতা

আজকের দিনে বাঙলা সাহিত্য সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলছে যে ক'জন তরুণ সাহিত্যাসবীদের অবদানে, তাঁদের মধ্যে বারীন্দ্রনাথ দাসের নাম করা যায়। এই গ্রন্থে তিনি একটি ঘরোয়া কাহিনীর গল্পরূপ দিয়েছেন। এবং চরিত্র সৃষ্টিতে ও সংলাপ যোজনায় সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই ঘরোয়া গল্পের সবচেয়ে বিশেষত্ব এই যে, এতে কোন প্রকার সমস্যার আভাস বা বিশেষ কোনকিছুর প্রতি ঈর্ষান্বিত কটাক্ষপাতের আভাস মোটেই পাওয়া যায় না। বইটির যথাযোগ্য সমাদর লাভ কামনা করি। লেখক বারীন্দ্রনাথ দাস। ২৩৮বি রাসবিহারী এভিনিউ। কলকাতা। দাম চার টাকা।

কবিতায় শতশ্লোকী গীতা

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকা যথাসময়েই প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থ যে সমাদর লাভ করেছে, তা তার দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশই জানিয়ে দিচ্ছে। লেখিকাকে আমরা এ জন্যে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। তাঁর শ্রম সফল হয়েছে, এ আনন্দের কথা। লেখিকা শ্রীমতী পুষ্প দেবী কর্তৃক ১, ডাঃ শ্যামাদাস রো থেকে প্রকাশিত। দাম দুই টাকা।

শারদীয়া সংখ্যা

সন্তোষকুমার দে

বাংলা দেশের সব চেয়ে বড়ো পার্বণ শারদীয়া পূজা। আগে পূজাটাই মুখ্য ছিল—মহা-আড়ম্বরে দেবীর আরাধনা। ভক্ত, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব অতিথি-অভ্যাগতদের নিয়ে নিমন্ত্রণের ভোজ বসতো, আর ছিল গান, যাত্রা, ঢপ, কথকতা কত কি! পূজা-বাড়ির ধূম-ধাম গ্রামকে গ্রাম মাতিয়ে তুলত।

নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার সুরুতেও এ ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। তখনও পূজার ছুটিতে লোকে দেশে যেত, অন্তত ঐ কয়েকটি দিন সবাই একত্রিত হওয়ার উপলক্ষ ঘটত। কিন্তু ক্রমে সে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটে গেল। যারা পারেন ছুটি পেলেই ছুটে পালান পাহাড়ে, সাগরে বা বন-বাদাড়ে। আর যাঁরা বাইরে না যান তাঁরা নিজেরা নাচেন, অপরকেও নাচান—পাড়ায়-পাড়ায় রেশা-রেশি করে বারোয়ারী পূজার মণ্ডপে মাইকে হিন্দি-ফিল্মী সঙ্গীত বাজাবার প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। মা বড় লোকের পূজা-মণ্ডপ ছেড়ে বারোয়ারী পার্ক কি পথিপার্শ্বে কেমন আরামে আসর জমিয়েছেন সে কথা অবাস্তর কিন্তু সাধারণ মানুষের নিগ্রহের শেষ নেই: ঘরের বাইরে বেরুলেই ভিড়, পূজামণ্ডপের এক মাইল দূর থেকে মাইকের তারস্বরে কানপাতা দায়, আধ মাইলের কাছাকাছি এসে পড়লেই স্বেচ্ছাসেবকদের আদর আপ্যায়ন—দড়ি-ঘেরা পথ ভুল করলেই দাড়ি ধরে টান দেবে। অথচ আপিস-আদালত সব বন্ধ, যাবেনই বা কোথায়? প্রবাসে যেয়ে বা ঘরে বসে এই সময়টা কাটাবার দাওয়াইও হাতের কাছেই রয়েছে, ছোট-বড় মোটা-সরু সচিত্র অচিত্র যে যেমন চান মেদার শারদীয়া সংখ্যা! দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক দ্বৈ, ত্রৈ, ষাণ্মাষিক, বার্ষিক, সাময়িক, অসাময়িক সব বাংলা, ইংরাজি যায় হিন্দি কাগজেরও 'বিশেষাংক' বেরুচ্ছে—কোনটা ছেড়ে কোনটা পড়বেন, ছোটদের, মেয়েদের, যুবকদের, চিত্রামোদীদের সব রকম লোকের জন্যই শারদীয়া সংখ্যা আছে, দামও চার আনা থেকে চার টাকা, যার যেমন চাই।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে এবারের শারদীয়া সংখ্যাগুলির রচনা (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত) বিষয়ে চমৎকার টিপ্পনি বেরিয়েছে। সত্যই শারদীয়ার সাহিত্য প্রবাহ বাংলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। এ তরঙ্গ রোধিবে কে? রোধ করে লোকসান বই লাভই বা কি? লেখকেরা দু'পয়সা পাচ্ছেন, প্রকাশকেরাও না পাচ্ছেন এমন নয়—নইলে বছর বছর শারদীয়ার সংখ্যা বাড়ছে কেন? সুতরাং শারদীয়া সংখ্যার প্রচার চাই।

দেশ স্বাধীন হয়েছে, বাংলা সাহিত্য আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, শুধু পত্র-পত্রিকা নয়। শুনি—সপ্তাহে সংস্করণ শেষ হয়, এমন বইও হামেশাই বাজারে বেরুচ্ছে। বাংলা সাহিত্য চটপট উন্নতি করছে, এ সবই অতি আনন্দের কথা, কিন্তু তলিয়ে বুঝলে আতঙ্কের কারণও আছে। আমাদের আজকের আলোচনা শারদীয়া সংখ্যাতেই সীমিত থাকছে।

শারদীয়া সংখ্যার এই প্রবাহ বাংলা সাহিত্যে বিশ পঁচিশ বছরের বেশি পুরোনো নয়। আট আনা বারো আনা দামের শারদীয়া সংখ্যা আজ তিন টাকা সাড়ে তিন টাকায় বিক্রী হচ্ছে, তার প্রধান আকর্ষণ থাকে—অগুণতি গল্প এবং অন্তত একটা সম্পূর্ণ উপন্যাস। এবার একটি পূজাসংখ্যায় তিনখানি উপন্যাসও ছাপা হয়েছে। বিরাট কলেবর পূজাসংখ্যার উদর পূরতে অনেক অপরিণত রচনাও ছাপা হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরা জানেন, কোন ভাগ্যে

উপন্যাস তাড়াহুড়া করে লেখা সম্ভব নয়, এমন কি একবার লিখেও সব সময় পাণ্ডুলিপি তৈরী হয় না, দুই তিন বারও লিখতে হয়। শোনা যায়, হেমিংওয়ে তাঁর নোবেল প্রাইজ পাওয়া উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ২৮ বার লিখে তবে সেটা প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করেন। কিন্তু আমাদের শারদীয়া সংখ্যায় উপন্যাসের 'কপি' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখকের কাছ থেকে কিছু কিছু করে পাওয়া যায় এবং তা ছাপা চলতে থাকে। পূর্ব পরিচ্ছেদের নায়কের নাম রাম পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে পালটে শ্যাম হয়ে গেলেও শোধরাবার সময় ও সুযোগ পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে উপন্যাসের উৎকর্ষের দায় ভগবানের ঘাড়ে চাপানো ছাড়া গত্যন্তর কি? যা হোক করে শারদীয়া সংখ্যায় বেরুবার পর পুস্তকাকারে সংশোধন, সম্মার্জন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করা চলে, করা হয়েও থাকে, কিন্তু সেখানেও এখন এমনই তাড়া ও প্রতিযোগিতার মুখে রেষারেষি চলছে যে, কোন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকের উপন্যাস শারদীয়ায় বেরুচ্ছে—ঘোষণা প্রকাশ হওয়া মাত্রই প্রকাশক তার দ্বারে হাজির—পুস্তকাকারে প্রকাশের অনুমতি চাইতে। উৎসাহী প্রকাশক শারদীয়া সংখ্যা বাজারে বেরুবার সংগে-সংগেই তার কাজও সুরু করতে চান। লোহা গরম থাকতে-থাকতে ঘা দেওয়ার নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী আর কি! যেন খোলা জুড়ালে খই ফুটবে না, শারদীয়ায় উপন্যাসের নামটা গরম থাকতে-থাকতে খই বাজারে ছাড়লে কাটবে ভালো।

লেখক অনেক সময় অসহায় হ'য়ে পড়েন, পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় প্রুফ দেখতে পেলেন না, বই বেরুল—এমন ঘটনাও অসম্ভব নয়। কিন্তু এর দাওয়াই একমাত্র আছে পাঠকের হাতে। 'গরমা-গরম' হাঁক শুনেই ভিড় না জমিয়ে যদি পাঠক রস বিচার করতে চান এবং বিচার করে গ্রহণ করেন তবে অনেক আবর্জনা পরিষ্কার হয়, অনেক আগাছা জন্মাবার আগেই জমি কঠিন হয়ে ওঠে। পাঠকরা যদি সচেতন হন তবে লেখক বাধ্য হন সাবধান হয়ে লিখতে, লিখে পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করতে। স্রষ্টা লেখক যেমন রসসৃষ্টি করেন তেমনই বোদ্ধা গ্রহীতাও সে রসকে পরিশীলিত করিয়ে নিতে পারেন। মোদ্দা কথা হচ্ছে, এখন বিস্তর সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের তৈরী হতে হবে তা যেন নিছক সাময়িক উৎসাহ আড়ম্বরে পরিসমাপ্ত না হয়। যেন সাহিত্য-সাধনা ব্রত হিসাবে গ্রহণের নিষ্ঠা আমরা না হারাই। তার জন্য অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ, অপরিণত গল্প-উপন্যাস ও কাব্যকণ্ডুয়ন প্রকাশ সংযত হোক।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে প্রকাশনার দিক নিয়ে। বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে বাংলাদেশ পুনঃপুনঃ সর্বভারতীয় মুদ্রণ-বিচারে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং সরকারী স্বীকৃতির দ্বারা সম্মানিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের পত্র-পত্রিকার চেহারা দেখে সে গৌরব বোধ করা সব সময় সম্ভব হয় না। মুদ্রণ-পারিপাট্যের অভাব এবং প্রচার ব্যবস্থাপনার অভাবে আমাদের অধিকাংশ শারদীয়া পত্রিকাই অতি সাধারণ স্তরের মধ্যে গণ্য হবে। প্রচার-সংখ্যার বিচারে দক্ষিণ-ভারতীয় সাময়িক পত্রিকাগুলি সর্বভারতের পথপ্রদর্শক। সেখানে একটি শিশু-মাসিকের প্রচার-সংখ্যা দুই লক্ষেরও বেশি, বহু সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচার পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর হাজারের মধ্যে। আর ওদের বর্ণাঢ্য মুদ্রণও বিস্ময়কর! দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমি 'কলকি' এবং 'আনন্দ বিকাতন' সাপ্তাহিক পত্রিকা দু'টির এবারের দীপাবলী বিশেষ সংখ্যাগুলি দেখতে অনুরোধ করি। এদের বিশেষ সংখ্যাগুলিতে রঙ্গিন বিজ্ঞাপনের সংখ্যাও খুবই বেশি। এবছরের 'আনন্দবিকাতন'-এর দীপাবলী বিশেষ সংখ্যায় রঙ্গিন বিজ্ঞাপন ৮২টি, 'কলকি'-তে ১৫০টি। এই বিজ্ঞাপনগুলিতেই বই ঝকঝকে হয়ে ওঠে। তাছাড়া প্রত্যেক ফর্মাই দুই বা তিন রঙে ছাপা। এর সঙ্গে বাংলার বিখ্যাত শারদীয়া সংখ্যাগুলির মুদ্রণের কথা তুলনা করুন। আবার বোম্বাইএর 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' বার্ষিকীর মুদ্রণ-পারিপাট্যের কথাও ভাবুন। আমরা কোথায়?

প্রসঙ্গ ক্রমে বলা দরকার—হিন্দি সাংবাদিকতায় মুদ্রণ-পারিপাট্য বাংলাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ইংরাজি 'রিডার্স ডাইজেষ্ট' ভারতীয় সংস্করণ (লণ্ডনে ছাপা,—তবে প্রস্তাব হচ্ছে শীঘ্রই ভারতে এবং কলকাতাতেই এটি ছাপা হবে) যে অক্লান্ত চেষ্টায় অল্প-দিনে তাদের প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধি করেছে তা থেকে আমাদের সাময়িক পত্রিকার প্রকাশকেরা শিক্ষা নিতে পারেন। হিন্দি পত্রিকা ওই পথে যাত্রা সুরু করেছে। 'নবনীত'-তো অতি সক্ষম অনুসরণ, 'সুপ্রভাত' প্রভৃতি আরো কেউ কেউ এ পথে চলছেন।

প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধি ও মুদ্রণ-পারিপাট্যের দিকেও বাংলা সাময়িক পত্রিকা তথা শারদীয়া সংখ্যার প্রকাশকেরা যত্ন নিয়ে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের উপযুক্ত বাহন করে তুলুন, এই আবেদন জানাই।

রামায়ণে বাঙলা দেশ

বাঙলা দেশ কত দিনের কে জানে! অন্যান্য ভারতীয় শাস্ত্রের মত রামায়ণেও অযোধ্যাকাণ্ডের দশম সর্গ বা অধ্যায়ের ১৭ সংখ্যক শ্লোকে বিখ্যাত জাতিসমূহের সঙ্গে বাঙলা দেশের নাম উল্লেখ আছে। শ্লোকটি এই—

দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গ-মগধা-মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

১৯৫৬ সালের হিসাব-নিকাশ :—

জেনেভা মনোভাব বা Spirit of Genevaর আশাবাদের মধ্যে খৃষ্টীয় ১৯৫৬ সাল আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু শেষ হইয়াছে এই আশাবাদের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। যুদ্ধোত্তর বৎসরগুলির মধ্যে ১৯৫৫ সালই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কাটিয়াছিল, সৃষ্টি করিয়াছিল বিশ্বশান্তি সম্পর্কে সুদৃঢ় আশা। ১৯৫৬ সালের যে-সকল ঘটনার মধ্যে এই আশার সমাধি রচিত হইয়াছে এবং যে-সকল কারণে গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কার মধ্যে ১৯৫৭ সাল আরম্ভ হইয়াছে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে যুদ্ধোত্তর বৎসরগুলির পটভূমিকা সম্পর্কেও কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৪৭ সাল হইতেই ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে এবং কোরিয়া যুদ্ধের দুর্য্যোগের মধ্যে ১৯৫২ সাল সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটপূর্ণ বৎসররূপে কাটিয়াছে। ১৯৫৩ সালে কোরিয়ায় যুদ্ধ বিরতির মধ্যে এই সঙ্কট কিছু হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহার পর ১৯৫৪ সালে ইন্দোচীনে যুদ্ধ বিরতি শান্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি সম্পর্কে বিশ্ববাসীর মনে আশার সঞ্চার করে। এই আশাকে সুদৃঢ় করে ১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলন এবং জেনেভায় অনুষ্ঠিত বৃহৎ চারিরাষ্ট্র প্রধানের সম্মেলন। শান্তির দিকে আন্তর্জ্জাতিক গতিধারার যে অগ্রগতি ১৯৫৩ সালে সূচিত হয় ১৯৫৫ সালে তাহা এমন এক স্তরে পৌছে যে, আন্তর্জ্জাতিক বিরোধের মীমাংসা বহুল পরিমাণে হইবে, ১৯৫৬ সালের প্রারম্ভে এই আশাই বিশ্ববাসীর মনে জাগ্রত হইয়াছিল। ১৯৫৬ সালের প্রথমার্দ্ধের ঘটনাবলী এই আশাকে বহুল পরিমাণে সুদৃঢ় করিয়াছিল। কিন্তু সুয়েজখাল সমস্যা এবং উহাকে উপলক্ষ করিয়া বৃটেন ও ফ্রান্সের মিশর আক্রমণ প্রমাণ করিয়া দিল যে, বিশ্বশান্তির এই আশাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল চোরাবালির আশঙ্কাজনক ভিত্তির উপরে।

সুদানের স্বাধীনতা লাভের মধ্যে ১৯৫৬ সাল আরম্ভ হওয়া একটা শুভলক্ষণ বলিয়া গণ্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ১৯৫৭ সালের ৩১শে আগষ্ট মালয় বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবে, এই মর্ম্মে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদল এবং মালয়ের প্রতিনিধিদলের মধ্যে মীমাংসা হওয়াও যে ১৯৫৬ সাল সম্পর্কে একটা শুভলক্ষণ সূচনা করে ইহা মনে করিলেও ভুল হইবে না। একথাও অবশ্য সত্য যে, যেসকল সমস্যা আন্তর্জ্জাতিক মন কষাকষির কারণ সেগুলির একটিরও মীমাংসা হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা দেয় নাই। ১৯৫৫ সালে সম্পাদিত বাগদাদ চুক্তি নূতন আর একটি সামরিক জোট যেমন সৃষ্টি করে তেমনি অধিকাংশ আরব্য রাষ্ট্রই মিশরের নেতৃত্বে উহার বিরোধী হইয়া উঠে। ১৯৫৫ সালের শেষভাগে রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় অস্ত্রশস্ত্র ও মূলধন সরবরাহে পশ্চিমী শক্তিবর্গের একচেটিয়া অধিকার ক্ষুণ্ণ করায় আন্তর্জ্জাতিক মনকষাকষির নূতন আর একটি কারণের সৃষ্টি হয় সন্দেহ নাই। তথাপি ১৯৫৬ সালের প্রথম দিকে উহার উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। বরং ফেব্রুয়ারী (১৯৫৬) মাসের মাঝামাঝি রাশিয়ায় ষ্ট্যালিনবাদের অবসান ঘোষিত হওয়ায় সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠী এবং পশ্চিমী শিবিরের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই অনেকের মনে হইয়াছিল। ফ্রান্সও অবশেষে ২রা মার্চ্চ (১৯৫৬) ফরাসী-অধিকৃত মরক্কোকে স্বাধীনতা দিতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু জর্ডানকে বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করাইবার জন্য বৃটেন যে কৌশল অবলম্বন করে তাহার পরিণামে বাগদাদ চুক্তির বিরুদ্ধে জর্ডানে প্রবল বিক্ষোভ এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। উহারই পরিণামে জর্ডানের রাজা ২রা মার্চ্চ আরব লিজিয়নের সেনাপতি-মণ্ডলীর অধ্যক্ষের পদ হইতে বৃটিশ জেনারেল জন গ্লাব ওরফে গ্লাব পাশাকে অপসারণ করেন। মধ্যপ্রাচীতে সোভিয়েট অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনের এই কূটনৈতিক পরাজয় ১৯৫৬ সালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ভারতে ইরাণের শাহ ও রাণীর আগমন আন্তর্জ্জাতিক দিক হইতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ত নয়। কিন্তু বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ সেলুইন লয়েড, মার্কিণ রাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ডালেস এবং ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ পিনোর ভারতে আগমন এবং নেহরুজীর সহিত আলোচনার আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। বিশেষতঃ করাচীতে সিয়াটো সম্মেলনে যোগদান করিতে আসিয়াই তাঁহারা নেহরুজীর সহিত আলোচনা করেন, একথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক। এপ্রিল মাসের (১৯৫৬) মাঝামাঝি তেহরাণে বাগদাদচুক্তি পরিষদের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন শেষ হওয়ার দুই দিন পরেই (২১শে এপ্রিল) জেদ্দায় মিশর, সৌদী আরব এবং ইয়েমেনের মধ্যে এক সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। অতঃপর ৬ই মে মিশর ও জর্ডানের মধ্যে এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই সকল চুক্তি বাগদাদ চুক্তি বিরোধী এবং মধ্যপ্রাচ্যে বৃটেনের প্রভাব বিলোপের সূচক। কমিনফর্ম্মের বিলোপ এবং রুশ প্রধান মন্ত্রী বুলগানিন এবং রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের বিলাত ভ্রমণ (এপ্রিল, ১৯৫৬) আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে দুইটি আশাপ্রদ ঘটনা। ইঙ্গ-সোভিয়েট আলোচনা জেনেভার মনোভাবকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং স্যার এণ্টনী ইডেন রাশিয়া ভ্রমণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করায় আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে নূতন আশার সঞ্চার হয়। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে জেনেভায় চারি বৃহৎ রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মেলন বিশ্বশান্তি সম্পর্কে যে আশার সঞ্চার করে ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে রুশনেতৃদ্বয়ের বিলাত ভ্রমণ সেই আশাকে যেন সর্ব্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে। অতঃপর কয়েক মাস পরেই যে এই আশা ভগ্নস্তূপে পরিণত হইবে, এই আশঙ্কা ঐ সময় কাহারও মনে স্থান পায় নাই। সিঙ্গাপুরে

স্বাধীনতা আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়া এবং আলজেরিয়ার বিদ্রোহের আগুন ব্যাপকতর হওয়া এবং তথায় ফ্রান্সের দমন-নীতির তীব্রতা আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কিছু নৈরাশ্য সঞ্চার করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে মার্শাল টিটোর রাশিয়া ভ্রমণ এবং উহারই প্রাক্কালে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ মলটভের পদত্যাগ বিশ্বশান্তির অনুকূল অবস্থাই সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঃ মলে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ পিনো মস্কো গিয়াছিলেন। শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, এই ধারণা লইয়াই মঃ মলে মস্কো হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী উ নু বৎসরের মাঝামাঝি প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করেন। উহা এক সাময়িক এবং ঘরোয়া ব্যাপার মাত্র। উহা দ্বারা ব্রহ্মদেশের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। পাকিস্তানে আর এক দফা প্রধান মন্ত্রীর পরিবর্ত্তন হয়। চৌধুরী মহম্মদ আলীর স্থানে মিঃ সুহরাবর্দ্দী পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হন। কিন্তু মার্কিণ সামরিক সাহায্য গ্রহণ এবং সামরিক জোটে যোগদান সম্পর্কে পাকিস্তানের নীতি অপরিবর্ত্তিতই রহিয়াছে। সিংহলের সাধারণ নির্ব্বাচনে ইউনাইটেড নেশন্যাল পার্টির পরাজয় এবং মিঃ বন্দরনায়কের দলের জয়লাভ পশ্চিমী শক্তিবর্গকে দক্ষিণ এশিয়ায় একটি সমর্থক রাষ্ট্র হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। জুন মাসের মাঝামাঝি সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে শেষ বৃটিশ সৈন্য অপসারণ আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কর্ণেল নাসের তাঁহার নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি এবং বাগদাদ চুক্তির বিরোধিতা দ্বারা ইতিপূর্ব্বেই আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। সুয়েজখাল হইতে বৃটিশ সৈন্যের অপসারণ যেমন তাঁহার একটি শ্রেষ্ঠ বিজয় তেমনি শেষ বৃটিশ সৈন্য অপসারিত হওয়ার পরেই, ২৩শে জুন, মিশরে গণভোট গৃহীত হয়। এই গণভোটে কর্ণেল নাসের মিশরের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন এবং মিশরের শাসনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী-সম্মেলন এবং পোল্যাণ্ডের শিল্প-প্রধান সহর পোজনানে ব্যাপক ও গুরুতর শ্রমিক হাঙ্গামার কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু যখন কমনওয়েলথ সম্মেলন হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময় ব্রিওনিতে মার্শাল টিটো এবং কর্ণেল নাসেরের সহিত তাঁহার এক বৈঠক হয়। এই সময় পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ নীতি ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছিল। নিরপেক্ষ নীতির এই প্রসারের ফলে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেসের কাছে উহা যেন অসহ্য বোধ হইতেছিল। তিনি নিরপেক্ষ নীতিকে অদূরদর্শিতার পরিচায়ক বলিয়াই শুধু অভিহিত করেন নাই, উহাকে দুর্নীতি দোষে দুষ্ট বলিয়াও অভিহিত করেন!

নিরপেক্ষ নীতি যখন ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছিল এবং এশিয়া-আফ্রিকা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সংহতি যখন ক্রমশঃ শক্তিশালী হইতেছিল সেই সময় মিশর কর্ত্তৃক সুয়েজখাল কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করার ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গ আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর গতির মোড় আকস্মিক ভাবে ঘুরাইয়া দিলেন। ২৬শে
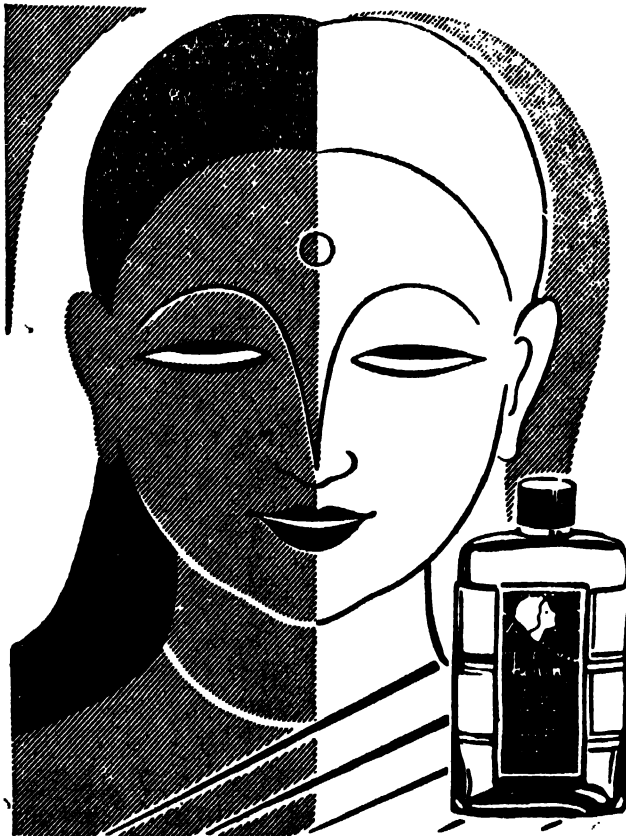
জুলাই (১৯৫৬) কর্ণেল নাসের সুয়েজখাল কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃটেন ও ফ্রান্স সামরিক তোড়জোড় আরম্ভ করিয়া দেয়। বলপ্রয়োগে সুয়েজ খাল দখল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পছন্দ করে নাই। মার্কিণ হস্তক্ষেপের ফলে প্রথম সুয়েজ সম্মেলন, মেঞ্জিস মিশনের ব্যর্থ কায়রো সফর, দ্বিতীয় সুয়েজ সম্মেলন এবং খাল ব্যবহারকারীদের সমিতি গঠনের সিদ্ধান্তের ভিতর দিয়া একদিকে যেমন সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী সমিতি গঠিত হয়, আর এক দিকে তেমনি বৃটেন ও ফ্রান্স নিরাপত্তা পরিষদে সুয়েজ সমস্যা উত্থাপন করে। তাহাদের উত্থাপিত প্রস্তাবের যে অংশে সুয়েজ খাল আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার পরিকল্পনা ছিল, রাশিয়া ঐ অংশটিতে ভেটো প্রদান করে। তথাপি আলাপ আলোচনার পথে সুয়েজ সমস্যার সমাধান হইবে এইরূপ একটা আশা সকলেই করিতেছিলেন। সেই সময় আকস্মিক ভাবে বৃটেন ও ফ্রান্স মিশর আক্রমণ করে।

ইতিপূর্ব্বে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডে বিপুল বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ঐ সময়েই (২২শে অক্টোবর) ফ্রান্স উড়ন্ত বিমান আটক করিয়া আলজেরিয়ার ৫ জন বিদ্রোহী নেতাকে গ্রেফতার করে। ইহার কয়েক দিন পরেই ২৯শে অক্টোবর (১৯৫৬) মিশরের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করে ইসরাইল। বৃটেন ও ফ্রান্সের প্ররোচনাতেই যে ইসরাইল মিশর আক্রমণ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ আর নাই। ইসরাইলের মিশর আক্রমণ উপলক্ষ করিয়া ৩১শে অক্টোবর (১৯৫৬) বৃটেন ও ফ্রান্স মিশরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান আরম্ভ করে। ওদিকে পোল্যাণ্ডের সঙ্কট পার হইতে না হইতেই হাঙ্গেরীতে আরম্ভ হয় ব্যাপক ও রক্তাক্ত অভ্যুত্থান। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্সের মিশর আক্রমণের মধ্যে হাঙ্গেরীর ঘটনাবলী অনেকটা চাপা পড়িয়া যায়। বস্তুতঃ এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগোষ্ঠী মিশর আক্রমণে যতটা বিচলিত হইয়াছিল হাঙ্গেরীর ঘটনায় ততটা বিচলিত হয় নাই। পশ্চিমী শক্তিবর্গও তেমনি হাঙ্গেরীর ঘটনাবলীতে যেরূপ বিচলিত হইয়াছে, মিশর আক্রান্ত হওয়ায় সেরূপ বিচলিত হয় নাই। ইহার কারণ লইয়া এখানে আলোচনা করিবার স্থানাভাব। পোল্যাণ্ডে বিক্ষোভ, হাঙ্গেরীতে প্রতিবিপ্লব, সিঙ্গাপুরের হাঙ্গামা, জর্ডানের সাধারণ নির্ব্বাচনে মিশরের সমর্থনকারীদের জয়লাভ সমস্তই বৃটিশ ও ফ্রান্সের মিশর আক্রমণের সম্মুখে ম্লান হইয়া গিয়াছিল। ১৯শে অক্টোবর সোভিয়েট রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটাইয়া উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৩শে অক্টোবর ৮২টি রাষ্ট্রের সম্মেলনে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য আন্তর্জ্জাতিক এজেন্সী গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। মিশর আক্রান্ত হওয়ায় এই দুই ঘটনাও কোন গুরুত্ব লাভ করিতে পারে নাই। সুয়েজ সমস্যা যখন আলাপ-আলোচনার স্তরে সেই সময় ২৪শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত নেহরুজীর সৌদী আরব সফরও ১৯৫৬ সালের আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মিশর আক্রমণ করিয়া বৃটেন ও ফ্রান্স জয়লাভ করিলেও আন্তর্জ্জাতিক চাপে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে পোর্ট সৈয়দ হইতে সৈন্য অপসারণের হীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাহাদিগকে রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইলেও মিশর আক্রমণ করিয়া তাহারা বিশ্ব-শান্তির আশাকেই ধ্বংস করিয়াছে। আমরা বিশ্বশান্তি বলিতে তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম এড়ানোকেই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু বিশ্বসংগ্রাম না বাধিয়াও যে বিশ্বশান্তি বিনষ্ট হইতে পারে বৃটেন ও ফ্রান্স মিশর আক্রমণ করিয়া তাহা প্রমাণিত করিয়াছে। সুয়েজ সঙ্কটের সময়েই ইথিওপিয়ার সম্রাট ভারতে আগমন করেন। দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামার ভারতে আগমন তিব্বত ও চীনের বাহিরে তাঁহাদের প্রথম পদার্পণ। চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাইয়ের ভারত ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ ভ্রমণ ১৯৫৬ সালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সর্ব্বোপরি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত সাক্ষাৎকার। জাপান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু কম্যুনিষ্ট চীন তাহার ন্যায্য আসন হইতে এখনও বঞ্চিত রহিয়াছে। মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের পদে মিঃ আইসেনহাওয়ারের দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচিত হওয়ার মধ্যে বিস্ময়কর কিছু নাই। উহা তাঁহার ব্যক্তিগত জয়লাভ। কারণ, সিনেটে ও প্রতিনিধি পরিষদে তাঁহার দলের লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারেন নাই।

১৯৫৬ সালে বৃটেন ও ফ্রান্সের মিশর আক্রমণের মধ্যে বিশ্ব-শান্তির আশা শুধু বিনষ্টই হয় নাই, বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কাও তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। নেহরু-আইক সাক্ষাৎকারের ফলে বিশ্বশান্তির আশা আবার জাগ্রত হইবে বলিয়া যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই আশা পূর্ণ হয় নাই। নেহরুজী দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না করিতেই মিঃ ডালেস মধ্যপ্রাচী সম্বন্ধে আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। নূতন বৎসর ১৯৫৭ সালের প্রথমেই ৫ই জানুয়ারী প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার মার্কিণ কংগ্রেসের উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে উক্ত পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। মার্কিণ বিমান বাহিনীর সেক্রেটারী মিঃ কোয়ার্লেস গত ৭ই জানুয়ারী ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধ বাধিলে আমেরিকা পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করিবে না, ইহা মনে করিলে বিপজ্জনক ভুল করা হইবে। সোভিয়েট ও পূর্ব্ব জার্ম্মাণী কম্যুনিষ্ট পার্টিদ্বয় একটি ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে, সাম্রাজ্যবাদী কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলন যৌথভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। ১৯৫৭ সালের সুরুতেই ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুধু তীব্রতর হইয়া উঠে নাই, উহা উত্তপ্ত হইয়া উঠিবার আশঙ্কাও দেখা দিয়াছে। বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধির মধ্যে আরম্ভ হইল ১৯৫৭ সাল। কি অবস্থার মধ্যে এই বৎসর শেষ হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন।

নেহরু-আইক সাক্ষাৎকার—

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। ফিরিবার পথে তিনি কানাডা, বৃটেন ও পশ্চিম জার্ম্মাণীতেও গিয়াছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এই দ্বিতীয় বার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন। ইতিপূর্ব্বে ১৯৪৯ সালে তিনি যখন প্রথম আমন্ত্রিত হইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যান তখন মিঃ ট্রুম্যান ছিলেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট। আইসেনহাওয়ার তখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা। তাঁহার হাত হইতেই শ্রীনেহরু

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারী উপাধিপত্র গ্রহণ করেন। সুতরাং আইসেনহাওয়ারের সহিত এই তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার একথা বলা চলে না। কিন্তু মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট রূপে আইসেন-হাওয়ারের সহিত তাঁহার এই সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব যে অনেক বেশী সেকথা বলাই বাহুল্য। ১৯৪৯ সালে শ্রীনেহরুর আমেরিকা গমনের সহিত তাঁহার দ্বিতীয় বার আমেরিকা গমনের পার্থক্য লইয়া এখানে আলোচনা করিবার স্থান আমরা পাইব না। গত জুলাই মাসে (১৯৫৬) প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়ায় ঐ সময় নেহরুজীর আমেরিকা যাওয়া হয় নাই। কিন্তু গত জুলাই মাসের পর আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে সকল গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হয় তাহার পরিপ্রেক্ষিতে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে নেহরু-আইক সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব যে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে যেমন সন্দেহ নাই, তেমনি এই সকল ঘটনার প্রতিক্রিয়া উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বৃটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধায়োজন হইতেই শুধু আমেরিকাকে দূরে সরাইয়া রাখেন নাই, বৃটেন ও ফ্রান্সের মিশর আক্রমণও তাঁহার সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। মিশর আক্রমণ সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এবং শ্রীনেহরুর দৃষ্টিভঙ্গী যে প্রায় একরূপ একথা বলিলে ভুল বলা হয় না। হাঙ্গেরীর ব্যাপারেও শ্রীনেহরুর দৃষ্টিভঙ্গী যে প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের দৃষ্টিভঙ্গীর কাছাকাছি হইয়া পড়িয়াছে, একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায়। তা সত্ত্বেও উভয়ের মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে গভীর পার্থক্যও রহিয়াছে। এই পার্থক্য নিরপেক্ষতা নীতি, সামরিক জোট প্রভৃতি সম্পর্কে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কমুনিষ্ট চীনকে আসন দান, পূর্ব্ব ইউরোপকে মুক্ত করা এবং সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কেও উভয়ের মতভেদ অত্যন্ত গভীর।

নেহরু-আইক সাক্ষাৎকারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও এই সাক্ষাৎকারের ফল বিস্ময়কর কিছুই হইবে, ইহা কেহই প্রত্যাশা করেন নাই। নেহরুজীর সহিত আলোচনার ফলে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্ত্তন সাধন করিবেন এইরূপ অসম্ভব প্রত্যাশা কেহই করেন নাই আইসেনহাওয়ারের প্রভাবে শ্রীনেহরু নিরপেক্ষ নীতি বর্জ্জন করিবেন, এতখানি দুরাশাও কাহারও মনে স্থান পায় নাই। একথা যদি স্মরণ রাখা যায়, তাহা হইলে আইক-নেহরু আলোচনার ফলাফল অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার হইলেও আমাদের নিরাশ হইবার বা উল্লসিত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। এই আলোচনার ফলে কোনও ভারত-মার্কিণ যুক্ত শান্তিফ্রণ্ট গড়িয়া উঠিয়াছে কি না, সে-সম্বন্ধে কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ কার্য্যকলাপের মধ্যেই শুধু উহা পরিলক্ষিত হইবে। নেহরু-আইক আলোচনার জন্য কোন কার্য্যসূচী সত্যই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল কি না, সে-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই অনুমান করা নয়। কিন্তু তাঁহারা সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতি সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন, একথা নিঃসন্দেহে আমরা বলিতে পারি। বিশ্ব পরিস্থিতিতে কমুনিষ্ট চীনের স্থান যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, একথা অনস্বীকার্য্য। নেহরুজীর মার্কিণ যাত্রার প্রাক্কালে চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন্-লাইয়ের ভারতে আগমন ও নেহরুজীর সহিত তাঁহার

আলোচনা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। নেহরুজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলে মিঃ চৌ এন লাই আবার ভারতে আসেন এবং নেহরুজীর সহিত আলোচনা করেন। অতঃপর তিনি মস্কো গিয়াছেন। এই সকল ঘটনার মধ্যে যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

১৬ই ডিসেম্বর (১৯৫৬) নেহরুজী ওয়াশিংটনে পৌছেন। ১৭ই ডিসেম্বর মার্কিণ গৃহযুদ্ধের স্মৃতি-বিজড়িত গেটিসবার্গে মার্কিণ প্রেসিডেন্টের পল্লীভবনে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর মধ্যে নিভৃতে আলোচনা আরম্ভ হয় এবং তাঁহাদের এই নিভৃত আলোচনা চলিয়াছিল বার ঘণ্টা কাল। দুই রাষ্ট্র-প্রধানের মধ্যে এইরূপ একান্তে আলোচনা এই প্রথম কি না এবং রুজভেল্ট ও চার্চ্চিলের মধ্যে আলোচনার সহিত উহার তুলনা চলিতে পারে কি না, সে-সম্পর্কে কোন আলোচনা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। গেটিসবার্গের আলোচনা এত নিভৃতে হইয়াছে এবং উহা এত গোপন রাখা হইয়াছে যে, উহার সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল সহজে নিবৃত্ত হইবার নহে। গেটিসবার্গের আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে কি না, এই প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়াও অসম্ভব। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার নেহরুজীর নিরপেক্ষ নীতির যুক্তি মানিয়া লইয়াছেন কি? রাশিয়ায় যে পরিবর্ত্তন চলিতেছে তাহার গতিবেগ বর্দ্ধিত করিবার জন্ম রাশিয়ার উপর চাপ কমাইবার জন্ম নেহরুজী প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কি? করিয়া থাকিলে তিনি কি ভাবে উহাতে সাড়া দিয়াছেন? ফরমোসা সমস্যা সমাধানের জন্ম নেহরুজী কি কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন? করিয়া থাকিলে তাহার ফল কি হইয়াছে? ভারত কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার সমর্থক নয়, একথা তিনি প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে বুঝাইতে পারিয়াছেন কি? এই সকল প্রশ্নের উত্তর শুধু ফল দেখিয়াই অনুমান করিতে হইবে। নেহরুজী ও প্রেঃ আইসেনহাওয়ার ১৮ই ডিসেম্বর গেটিসবার্গ হইতে ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্তন করেন। ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেহরুজী বলেন যে, ওয়াশিংটনে আসার পূর্ব্বে মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতি তাঁহার নিকট যেরূপ কঠোর মনে হইয়াছিল, আইকের সহিত আলোচনার পর এখন তিনি বুঝিয়াছেন যে, উহা সেরূপ কঠোর বা অপরিবর্ত্তনীয় নহে। টেলিভিশন বেতার বক্তৃতায় তিনি বলেন, প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের মানবতা বোধ এবং শান্তিনিষ্ঠা তাঁহাকে বিশ্বের রাজনীতিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছে। এই জাতীয় উক্তি হইতে গেটিসবার্গ আলোচনার ফলাফল কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়।

ওয়াশিংটনেও নেহরু-আইকের মধ্যে আলোচনা হয় এবং আলোচনার পর একটি যুক্ত বিবৃতিও প্রকাশ করা হয়। এই যুক্ত বিবৃতিতে যাহা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল এই যে, ওয়াশিংটন আলোচনায় বিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহাদের মতৈক্য (broad area of agreement) হইয়াছে। বিস্তৃত ক্ষেত্রে মতৈক্য হওয়া বা broad area of agreement-এর অর্থ যে বহু বিষয়ে মতৈক্য হওয়া নয়, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। ইহার একমাত্র অর্থ এই হইতে পারে যে, একই সাধারণ নীতি তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন এবং ব্যক্ত করিয়াছেন একই সাধারণ অভিপ্রায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা অর্থহীন বাক্য ছাড়া আর কিছুই নয়। গেটিসবার্গে এবং ওয়াশিংটনে দীর্ঘ আলোচনা সত্ত্বেও কোন বিষয়েই কোন সিদ্ধান্ত তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। বিস্তৃত ক্ষেত্রে মতৈক্য হওয়ায় উহাকে কার্য্যে পরিণত করার জন্ম কোন যৌথ কর্ম্মপন্থাও গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বিস্তৃত ক্ষেত্রে মতৈক্য হওয়া সত্ত্বেও নেহরুজী সামরিক জোটের যুক্তি যে মানিয়া লন নাই—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ২০শে ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতায় নেহরুজী বলেন, যুদ্ধ বাধিলেই উহা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা সত্ত্বেও সারা দুনিয়ায় সামরিক ঘাঁটি গড়িবার প্রয়োজন করে না। তিনি সামরিক চুক্তিরও নিন্দা করেন। নেহরু-আইক আলোচনা যে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে, একথা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যযোগ্য কি ফল পাওয়া তাহাই প্রশ্ন।

এই সাক্ষাৎকারের ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধির সুযোগ যে সৃষ্টি হইয়াছে, একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। নেহরুজী যে আধা-কম্যুনিষ্ট নহেন, একথাও আমেরিকার অধিবাসীরা বুঝিতে পারিয়াছেন। ভারতের পক্ষে মার্কিণ অর্থ নৈতিক সাহায্য পাওয়ার বিশেষ সুবিধা হয়ত হইয়াছে। কিন্তু উহার জন্ম কি মূল্য দিতে হইবে তাহা কে জানে? কাশ্মীর সম্পর্কে মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের নীতির কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি? কার্য্যক্ষেত্রে ছাড়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই। পাকিস্তান মার্কিণ অস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবে না, এই আশ্বাস যদি প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার দিয়াও থাকেন, তাহা হইলেও মিশর যুদ্ধের মত উহার ব্যতিক্রম ঘটিবার আশঙ্কা তাহাতে রোধ হয় নাই। ফরমোসা সমস্যা সমাধানের জন্ম কোন প্রস্তাব নেহরুজী আইকের নিকট উত্থাপন করিয়াছিলেন কি? অনেকে মনে করেন যে, চিয়াংকাইশেককে চীনের ভাইস্-প্রেসিডেন্ট এবং ফরমোসার গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া, কম্যুনিষ্ট চীন ফরমোসা সমস্যার সমাধান করিতে চায়। চৌএন লাই সত্যই এমন কোন প্রস্তাব প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের নিকট উপস্থিত করিবার জন্ম নেহরুজীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কি না তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। হাঙ্গেরীতে সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের পর্য্যবেক্ষকদিগকে যাইতে দিতে রাশিয়া ও হাঙ্গেরী গবর্ণমেণ্টকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্ম প্রেঃ আইসেনহাওয়ার নেহরুজীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কি? নেহরুজী তাহাতে রাজী হইয়াছেন কি? বৃটেন ও ফ্রান্সের এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরও গ্রহণযোগ্য রূপে সুয়েজ সমস্যার মীমাংসা মানিয়া লইতে কর্ণেল নাসেরকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্ম প্রেঃ আইসেনহাওয়ার নেহরুজীকে রাজী করাইতে পারিয়াছেন কি? এশিয়া ও আফ্রিকার নিরপেক্ষ দেশগুলি সম্পর্কে মার্কিণ নীতি পরিবর্ত্তন সাধন করিতে নেহরুজী প্রেঃ আইসেনহাওয়ার কে অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি? আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য যৌথ শান্তিফ্রন্ট গঠনের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে কি? এই সকল প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নেহরু-আইক আলোচনার সাফল্য বা অসাফল্য নিহিত রহিয়াছে। ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী দিবে তাহার সাক্ষ্য।

আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনা :—

গত ৫ই জানুয়ারী (১৯৫৭) মার্কিণ সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের এক অতিরিক্ত যুক্ত অধিবেশনে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার

মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলির আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে মার্কিণ সৈন্যবাহিনী নিয়োগের ক্ষমতা দাবী করিয়াছেন। মিশর যুদ্ধে বিশ্বশান্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নেহরু-আইক আলোচনা যখন নূতন আশার সঞ্চার করিবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই সময় নেহরুজী এই সাক্ষাৎকারের পর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না করিতেই প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের এই পরিকল্পনা যে বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিশর যখন বৃটেন ও ফ্রান্স কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল তখন মিশরকে রক্ষা করিবার জন্য মার্কিণ সৈন্য নিয়োগের কল্পনাও তিনি করেন নাই। আন্তর্জ্জাতিক চাপে মিশর হইতে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য অপসারিত হওয়ার পর মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির জন্য তাঁহার দরদ উথলিয়া উঠিবার কারণ কি, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। প্রেঃ আইসেনহাওয়ার তাঁহার উক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে নেহরুজীর নিকট ব্যক্তিগত পত্র দিয়াছেন। ঐ পত্রের বিষয়বস্তু গোপনীয়। তিনি প্রকাশ্যে যাহা বলিয়াছেন তাহারই ভিত্তিতে আলোচনা করা ছাড়া আর উপায় নাই। একথা অবশ্য সত্য যে তিনি শুধু মার্কিণ সৈন্যবাহিনী নিয়োগের ক্ষমতাই চাহেন নাই, দীর্ঘপত্রের শেষে 'পুনশ্চে'র মত অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়ার ক্ষমতাও চাহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনায় মূল কথা মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিণ সৈন্য নিয়োগের ক্ষমতা।

মার্কিণ কংগ্রেসের নিকট ক্ষমতা দাবী করিয়া প্রেঃ আইসেন- [illegible] আক্রমণের সম্ভাবনা রোধ করাই তাঁহার প্রস্তাবের প্রধান লক্ষ্য। সেই সঙ্গে তিনি রাশিয়াকেও আশ্বাস দিয়াছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে বা বিশ্বের অন্য কোথাও সোভিয়েট ইউনিয়নের শাসকগণ প্রথমে আক্রমণ না করিলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সোভিয়েট ইউনিয়নের আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মধ্যপ্রাচ্যে এ পর্য্যন্ত যে আক্রমণ ঘটিয়াছে তাহা রাশিয়ার দিক হইতে হয় নাই, কিম্বা কোন কম্যুনিষ্ট দেশের অনুপ্রেরণাতেও হয় নাই। আক্রমণ করিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরই মিত্রশক্তি। কাজেই মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের পরিকল্পনার মূলে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্য এতদিন ছিল বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রভাবাধীন অঞ্চল। সুয়েজ সঙ্কটের ফলে এই প্রভাবের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে চায়। ইহাতে বৃটেন ও ফ্রান্সের লুপ্ত প্রভাব কতক পরিমাণে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, বৃটেন ও ফ্রান্সের মনে এই আশাও জাগিয়াছে। এইজন্যই এই পরিকল্পনা বৃটেন ও ফ্রান্সে গভীর উল্লাস সৃষ্টি করিয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান সমস্যা তিনটি। আরব-ইসরাইল বিরোধ, আরব উদ্বাস্তু সমস্যা এবং সুয়েজ খাল সমস্যা। প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের পরিকল্পনা এই তিনটি সমস্যার একটিরও সমাধান করিবে না, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই পরিকল্পনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যের কোন রাষ্ট্রে সামরিক সাহায্য চাহিলেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সৈন্য প্রেরণ করিবে। ইহাতে বাগদাদ চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি সন্তুষ্ট হইলেও এই চুক্তির বিরোধী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে গভীর আশঙ্কা সৃষ্টি করিবে।

মধ্যপ্রাচ্যের কোন রাষ্ট্রে যদি আমেরিকার অপ্রীতিভাজন দল ক্ষমতা দখল করিতে চায় তাহা হইলেও প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট আমেরিকার সামরিক সাহায্য চাহিতে পারিবে। তাহা হইলে ঐ রাষ্ট্রে হাঙ্গেরীতে সোভিয়েট বাহিনী নিয়োগের মতই অবস্থা দাঁড়াইবে। কোনও স্বাধীন রাষ্ট্রে আমেরিকা যদি তাহার অনভিপ্রেত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠায় বাধা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তবে হাঙ্গেরীর ব্যাপারে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সহজ হইবে না।'

স্যার এণ্টনী ইডেনের পদত্যাগ—

স্যার এণ্টনী ইডেন গত ৯ই জানুয়ারী বৃটেনের প্রধান মন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়াছেন। তাঁহার এই পদত্যাগ অপ্রত্যাশিত ছিল, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। যদিও আপাতদৃষ্টিতে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যই তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি ইহা সকলেই জানেন যে, সুয়েজ সঙ্কটই তাঁহার পদত্যাগের অব্যবহিত কারণ। সুয়েজ সমস্যা সমাধানের জন্য যে-পন্থা তিনি গ্রহণ করেন, তাহা বৃটেনের পক্ষে কল্যাণকর তো হয়-ই নাই, বরং যে-ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দীর্ঘকালেও পূরণ হওয়া কঠিন হইবে। স্যার এণ্টনী ইডেন পদত্যাগ করাতেই যে এই ক্ষতিপূরণ হওয়া সহজ হইবে, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। তিনি পদত্যাগ না করিলেও পারিতেন কি না, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু তিনি যদি বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর পদ আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে সুয়েজের ব্যাপারে বৃটেনের প্রতি প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের অসন্তোষ দূর হইত কি না, তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

১৯৫৩ সালে কঠিন অস্ত্রোপচার এবং পরবর্তী জ্বরভোগ স্যার এণ্টনীর স্বাস্থ্যকে আঘাত করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। তথাপি ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে চার্চিল পদত্যাগ করিলে তিনিই প্রধান মন্ত্রী হন। ইহার পরই মে মাসে (১৯৫৫) বৃটেনে সাধারণ নির্ব্বাচন হয় এবং রক্ষণশীল দল জয়লাভ করায় স্যার এণ্টনীর প্রধান মন্ত্রিত্বেই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু উহার পর হইতেই পদত্যাগ করিবার জন্য রক্ষণশীল দলের একটি চক্র হইতে তাঁহার উপর চাপ দেওয়া হইতে থাকে। বস্তুতঃ গত বৎসর এই সময়েই তাঁহার পদত্যাগের আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। ঐ সময় ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীট হইতে ঘোষণা করা হয় যে, স্যার এণ্টনী ইডেনের পদত্যাগ করিবার কোন অভিপ্রায় নাই। হয়ত তিনি আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর পদেই থাকিতে পারিতেন। কিন্তু সুয়েজ সমস্যা সম্পর্কে তিনি যে নীতি গ্রহণ করেন তাহাই তাঁহার পদত্যাগকে ত্বরান্বিত করিয়াছে।

স্যার এণ্টনী ইডেন পদত্যাগ করায় ১০ই জানুয়ারী (১৯৫৬) মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলান বৃটেনের নূতন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইডেন মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন চ্যান্সেলার অব দি এক্সচেকার। সকলেই যখন আশা করিতেছিলেন, মিঃ আর এ বাটলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন সেই সময় মিঃ ম্যাকমিলানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় অনেককেই হয়ত বিস্মিত করিবে। কিন্তু বৃটিশ ধারা অনুযায়ীই যে এই নিয়োগ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইডেন মন্ত্রিসভায় মিঃ বাটলার সুয়েজ সমস্যা সমাধানের জন্য সশস্ত্র অভিযানের বিরোধী ছিলেন। মিঃ ম্যাকমিলান ছিলেন উহার গোঁড়া সমর্থক। সুয়েজের ব্যাপারে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করা যে ভুল হইয়াছে, মিঃ বাটলারকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া বৃটেন একথা স্বীকার করিতে চায় না। স্যার উইনষ্টন চার্চিল এবং মার্কুইস অব সেলিসবেরীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই ইংলণ্ডের রাণী মিঃ ম্যাকমিলানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। উভয়েই বৃটেনের সুয়েজ নীতির সমর্থক। এই নীতি যে অব্যাহত থাকিবে মিঃ ম্যাকমিলানের নিয়োগে তাহাই সূচিত হইতেছে। কিন্তু এই সুয়েজ নীতি বৃটেনের যেমন গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে তেমনি মাত্র ৫৯ বৎসর বয়সে স্যার এণ্টনী ইডেনের রাজনৈতিক জীবনেও যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। সুয়েজ সমস্যার সমাধান বৃটেনের অভিপ্রায় অনুযায়ীই যে হইবে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ১২ই জানুয়ারী, ১৯৫৭।

তুমি আমার চেনা

শমিতা গুপ্ত

হঠাৎ দেখে মনে হল তোমায় আমি চিনি,
কবে যেন কোন্ এক সাঁঝে,
অনেক লোকের ভিড়ের মাঝে,
দেখেছিলাম কোথায় যেন তোমার ও মুখখানি ;
তাই ত দেখে মনে হল তোমায় আমি চিনি।

মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেখছি আমি চেয়ে,
কত লোকের যাওয়া-আসা,
কত হাসি, ভালোবাসা,
কত দুঃখ, ঘৃণা আছে স্মৃতির কোঠা ছেয়ে ;
মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেখছি আমি চেয়ে।

স্মৃতির তারে লাগল আঘাত বাজল ঝিনিক ঝিন্,
আমার মনের গোপন কোণে,
যা ছিল ঢাকা সযতনে,
আজকে তাহা হল বাহির বাজল ব্যথার বীণ ;
স্মৃতির তারে লাগল আঘাত বাজল ঝিনিক ঝিন্।

সেদিন আমি গিয়েছিলাম তাঁকে দেখার আশে,
অনুরাগে লাজ-রাঙা মুখ,
আনন্দেতে কাঁপছিল বুক,
দেখি তাঁরে স্বপন-মগন দাঁড়িয়ে তোমার পাশে ;
যখন আমি গিয়েছিলাম তাকে দেখার আশে।

আজ বুঝেছি কেন তোমায় লাগছে এত চেনা,
যা ছিল মোর কল্পনাতে,
আনলে জীবন তুমিই তা'তে,
তোমায় দিয়েই মিটল তাহার আমার প্রেমের দেনা ;
তাই ভাবি, কেন তোমায় লাগছে এত চেনা !
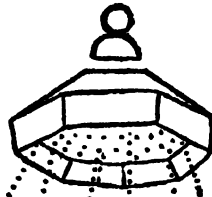
নিম তৈল থেকে
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে
প্রস্তুত সুগন্ধি
মার্গো সোপের প্রচুর
ফেনা যেমন
নির্মলকর তেমনি
জীবাণুনাশক।
মার্গো সোপ দেহের
কান্তি উজ্জ্বল করে।
কোমল ত্বকের
পক্ষেও ব্যবহার করা
সম্পূর্ণ নিরাপদ।
স্নানের সময়
ব্যবহার করতে ভুলবেন না
MARGO
SOAP
HYGIENIC TOILET SOAP
মার্গো
সোপ
ক্যালকাটা কেমিক্যাল
কোম্পানি লিমিটেড
কলিকাতা ২৯

উদয়ভানু

চতুষ্পাঠী যেন জনশূন্য, এমনই স্তব্ধতা সেখানে। ছাত্রশিষ্যদের পাঠ, ছড়া আর আবৃত্তি আজ আর শোনা যায় না। আর্য্য-ভাষার শাস্ত্রমন্ত্রের গুঞ্জন যেন থেমে গেছে চিরদিনের মত। মণ্ডপ-বেদীতে অধ্যক্ষের মৃগচর্ম্মের আসন শূন্য রয়েছে! দৈনন্দিন রীতির ব্যতিক্রম হয়। ব্রহ্মচারীরা ষড়রিপুকে জয় করেছে, তবুও তাদের মুখে মুখে আজ যেন ভয় আর দুশ্চিন্তা ফুটেছে। কারও মুখে কথা নেই। চতুষ্পাঠীর পুণ্যতীর্থরজঃ কি কারণে যেন অপবিত্র হয়েছে, মাহাত্ম্য হারিয়েছে। চতুষ্পাঠীর চতুঃসীমায় অদৃশ্য-পাপের ছায়ানৃত্য চলেছে যেন। পুঁথিপাঁজি যেমনকার তেমনি পড়ে আছে অস্পৃশ্যের মত। কি এক অনাচারের ফলে দিব্যজ্ঞান হারিয়ে ছাত্রদল যেন মূক হয়ে গেছে। অন্যায় অসহনীয়। অন্যায়কে কখনও সহ্য করবে না, প্রশ্রয় দেবে না, অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে প্রতি পদে পদে—এই মহৎ শিক্ষা দান করেছেন স্বয়ং চন্দ্রকান্ত। শিষ্যদের কানে কানে কি উদাত্ত কণ্ঠেই না এই বাণী শুনিয়েছেন কত দিন! হতাশার ধ্বনি অস্ফুটে উচ্চারণ করে ছাত্রদের কেউ কেউ। তাদের সকল আশা আর আকাঙ্খা যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। মন্ত্রগানের জপমালা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেন ছড়িয়ে পড়েছে। সরলমতি নাবালক ব্রহ্মচারীর দল সারা রাত জেগে ব'সে থাকতে পারে না। যে যেখানে ছিল সে সেখানে থেকেই নিদ্রায় অচেতন হয়। কেবল বয়ঃপ্রাপ্ত সাবালকের দল বিনিদ্রায় রাত্রি যাপন করেছে। জেগে ব'সে থেকেছে। কান পেতে শুনেছে যেন রাত্রির পদধ্বনি। গহন রাতে কত কত বার চমকে উঠেছে তারা। বৈশাখ-রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাসে গাছের পাতায় পাতায় স্পর্শশব্দ শুনে চমকে উঠেছে। নিবু-নিবু দীপের সলতে এগিয়ে দিয়ে দ্বার-মুখে গিয়ে দেখে এসেছে কত বার। কিন্তু প্রতি বারই ফিরে আসতে হয়েছে ব্যর্থমনে। যার জন্য এই আকুল প্রতীক্ষা, তিনি কোথায়? একটা কালপেঁচা তেঁতুলগাছের মগডালে ব'সে চেঁচিয়েছে রাতভোর, হয়তো শিকার মেলেনি তাই। একদল মৌনজনকে মনের খুশীতে যেন ব্যঙ্গ করেছে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে।

তারপর কখন কাক ডেকেছে, রাত্রি আর দিনের সন্ধিমুহূর্তে।

আকাশের পূর্ব্বভাগে রক্তচন্দনের ঢেউ নাচিয়ে সপ্তঅশ্ববাহী সূর্য্যের উদয় হয়েছে। তখন এক দমকা হাওয়ার মত অকস্মাৎ এসে পড়েছেন চন্দ্রকান্ত। ঘুম-জড়ানো চোখে দেখতে দেখতে যেন বিশ্বাস হয় না ছাত্রদের। গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে তারা—ঐ উন্নতবক্ষ, ভয়জয়ী ও সদাহাস্যময় চন্দ্রকান্ত যেন কেমন ভীত আর সন্ত্রস্ত হয়েছেন। বিমর্ষতার রেখা তাঁর মুখে। চন্দ্রকান্ত দ্রুতপদে আসেন কোথা থেকে? একদৃষ্টিতে সকলের মুখপানে তাকিয়ে আপন কক্ষে প্রবেশ করলেন। মৃত্যুভয়ে যেন আত্মগোপন করলেন। তাঁর বেশবাস যেন অবিন্যস্ত। উত্তরীয় নেই দেহে।

যারা অপেক্ষার রাত জেগে ব'সেছিল ঠায়, তারা উঠলো একে একে। দীর্ঘশ্বাস ফেললো কেউ কেউ। জাগরণের জ্বালায় তখন চোখ জ্বলছে। ক্লান্তদেহ টলছে ঘুমের ঘোরে। ভোরের হাওয়ায় আবার যেন ঘুম আসছে চোখে চোখে।

দিনের আলো দিকে দিকে। আঁধারে-ঢাকা পৃথিবীর সুন্দর আর কুশ্রী রূপ আবার দেখা দিয়েছে। খোল আর করতালের ধ্বনিছন্দ ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে। কীর্ত্তনীয়ার দল বেরিয়েছে পথে। হরির গুণগান গাইতে বেরিয়েছে এই পুণ্যক্ষণে।

'মা দিবা সাপ্সী!' আর ঘুম নয়, দিবানিদ্রা ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, নয়তো অযথা আয়ুক্ষয় হবে। কি এক বিতৃষ্ণায় কেউ কেউ কপালের মঙ্গলতিলক মুছে ফেললো। এই চতুষ্পাঠীর হাওয়া যেন বিষিয়ে উঠেছে। প্রার্থনায় বসতে চায় না কেউ। প্রার্থনা সঙ্গীতের কথা যেন আজ আর মনে পড়ে না কারও। সময় অতিবাহিত হয়ে যায় অথচ।

পুকুরতীরে চললো ছাত্ররা দলে দলে। নিমের দাঁতন হাতে। অন্য দিন গান গাইতে গাইতে স্নানযাত্রায় যায়, আজ চললো নীরবে। শোকের শোভাযাত্রায় চলেছে যেন।

—ইন্দ্রজিৎ!

মেঘগম্ভীর কণ্ঠে কে ডাকলো কোথা থেকে। অতি পরিচিত কণ্ঠ, তবুও যেন বিশ্বাস হয় না। যাকে আহ্বান, সে দেখে ইদিক সিদিক। স্বকর্ণে শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

—ইন্দ্রজিৎ, ব্যস্ততা না থাকে তো একবার আইস। কিছু কথা আছে গোপনীয়।

কৃষ্ণকক্ষের মধ্যে থেকে কথা শোনা যায়। শিষ্যদের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ। পড়ুয়াদের মধ্যে জ্ঞানগরিমায় শ্রেষ্ঠ। চন্দ্রকান্তর অবসর সময়ে ইন্দ্রজিৎ পাঠ দেয়, পাঠ নেয়। চতুষ্পাঠীর অন্যান্য ছাত্র তাকে মান্য করে যথেষ্ট। সে নাকি সর্দ্দার-পড়ুয়া।

—দ্বার মুক্তই আছে, নিকটে আইস। একটা কথা আছে।

আবার কথা বললেন চন্দ্রকান্ত। ব্রতধারী ব্রহ্মচারী ইন্দ্রজিৎ সসম্ভ্রমে দেখা দেয়। ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

—শুভমস্তু! চন্দ্রকান্ত স্মিত হেসে বললেন। শিষ্যের মস্তক স্পর্শ করেন। বলেন,—ইন্দ্রজিৎ, তুমি এই চতুষ্পাঠীর পরিচালনভার লও, আমি কার্য্যকারণে মান্দারণ ত্যাগ করবো কিছুকালের নিমিত্ত।

—আমার সামর্থ্য কি? চতুষ্পাঠী পরিচালনার মত দক্ষতা নাই আমার।

ভোরের সদ্যফোটা ফুলের মাধুরী-গন্ধভরা বাতাসে ইন্দ্রজিতের বিনম্র কথা ভেসে যায়। নতমস্তকে কথা বলে সে।

স্মিত হাসি ফুটলো চন্দ্রকান্তর অধরপ্রান্তে। এক-রাশ ধূপ জ্বলছে তাঁর এক পাশে। চন্দন দগ্ধ হচ্ছে, তারই পুঞ্জ-পুঞ্জ ধূম্ররেখা চন্দ্রকান্তর আশ-পাশে। পুঁথির রাশি ছড়িয়ে আছে ভূমিতে। চন্দ্রকান্ত কি সব বাঁধাছাঁদার কাজ করছেন। হাতের কাজে বিরত হয়ে বললেন,—আমি জানি তোমার সামর্থ্য কতটা। সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী তুমি, শিক্ষাদানের কাজেও তুমি সুদক্ষ। আমার আদেশ আশা করি অমান্য হবে না।

—যথাজ্ঞা। আপনার স্থানত্যাগের কি কারণ? গন্তব্যস্থলই বা কোথায়?

বিদ্যা বিনয় দান করে। ইন্দ্রজিৎ বিনয়াবনত স্বরে একেকটি প্রশ্ন ক'রলো। ভূমিতে চোখ রেখে কথা বলে।

চন্দ্রকান্ত কি এক আবেগে খানিক ঈষৎ চঞ্চল হন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন,—আমি তীর্থদর্শনে যাবো পদব্রজে। বঙ্গদেশ পরিক্রমা শেষ হওয়ার পর যাবো উত্তরকাশী। তত:পর কোথায় যাই, কিছুই ঠিক নাই।

কত কালের জন্য আপনার অনুপস্থিতি?

—তার কোন' স্থিরতা নাই। যদি আর না আসি, তাতেই বা বাধা কি?

অধুনা পদব্রজে যাওয়া যে খুবই বিপজ্জনক, তা আপনার অজ্ঞাত নয়, আশা করি।

মৃদু হাসলেন চন্দ্রকান্ত। সহাস্যে বললেন,—রথ শকট কোথায় পাই? নৌকার পাথেয় আমার নাই। পদব্রজে যাওয়া ছাড়া উপায় কি? আমি সহায়সম্বলহীন।

—বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে। ভয়ে ভয়ে যেন কথা বলে ইন্দ্রজিৎ। বলে,—বঙ্গদেশে মহাশয়ের নাম কারও অজানা নয়, তাই মনে করি কোন' অসুবিধা হবে না।

আবার অল্প হাসলেন চন্দ্রকান্ত। হাসির জের টেনে বললেন,—আমি পণ্ডিতম্মন্য নয়। যাই হোক, আমার যাত্রার সময় সন্নিকটে। তুমি এই চতুষ্পাঠীর সুনাম অক্ষয় রাখিও। ন্যায়পথে থাকিও, বাধাবিঘ্নকে উপেক্ষা করিও, কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি করিও না। শত বিপদেও মিথ্যার আশ্রয় লইও না।

চোখ ছলছল করে ইন্দ্রজিতের। নতমস্তক, তাই তার অশ্রুসজল চোখ আর নজরে পড়ে না। বাষ্পরুদ্ধ স্বরে কথা বলে—আজ আমাদের অনধ্যায় আর অরন্ধনের দিন।

—তথাস্তু ইন্দ্রজিৎ। তোমার মঙ্গল হোক। বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আমার পাঠাগারে আছে, তাদের সযত্নে রক্ষা করিও। কীটদষ্ট না হয় যেন।

—যথাজ্ঞা মহাশয়!

তৃপ্তির হাসি হাসলেন চন্দ্রকান্ত। স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। বললেন,—যাও, তোমার কাজে যাও। আমার যাত্রার সময় নিকটে। শুভসময় অতিক্রান্ত হ'লে যাত্রা বাধাপ্রাপ্ত হবে।

আবার প্রণাম করে ইন্দ্রজিৎ। অধ্যক্ষের পদদ্বয় স্পর্শ করে। চন্দ্রকান্ত তার কপালে হাত রাখেন। বলেন,—মঙ্গলমস্তু। তুমি শিক্ষিত, দীক্ষিত, তোমার কোন' ভয় আর চিন্তার কারণ নাই।

ছলছল চোখে পর্ণকুটীর ত্যাগ করলো ইন্দ্রজিৎ। আসন্ন বিয়োগ-বিরহের কাতর অনুভূতি তার মনে। বিবশ পায়ে পুকুরতীরে চললো সে। স্নান সেরে এখনই ফিরতে হবে। বিদায় দিতে হবে আচার্য্যকে। তত:পর শিক্ষাদানের কাজে বসতে হবে। কর্ত্তব্য অনেক, তাই পা চালালো ইন্দ্রজিৎ। নিজের মনকে শোনাতেই যেন ফিসফিসিয়ে বললে,—'যদিও আমার গুরু আনবাড়ী যায়, তবুও আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'

হাতে-গড়া চতুষ্পাঠী, ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে হবে মান্দারণের বাইরে। লজ্জা আর ভয়ে সঙ্কোচ আসে চন্দ্রকান্তর মনে। এখানে থাকলে বিপদ অনিবার্য্য। আনন্দকুমারীর আত্মীয়-স্বজন সহজে নিস্তার দেবে না। কোতোয়াল থেকে ডাক আসবে, পেয়াদা আসবে। তারপর সমাজে আর মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। ফুলের মত পবিত্র চরিত্রে কালির দাগ পড়বে। চতুষ্পাঠীর নামে দুর্নাম রটবে। আসল সত্য কেউ জানতে চাইবে না, মিথ্যা কলঙ্ক সত্যে পরিণত হবে লোকের মুখে মুখে।

জ্বরের জ্বালা ধ'রেছে যেন চন্দ্রকান্তর বুকে। অস্বস্তির কাঁটা বিঁধছে থেকে থেকে। চন্দ্রকান্ত ভাবলেন পথ দুর্গম। বিপদে আত্মরক্ষার উপায় কি? বৌদ্ধতান্ত্রিকদের শাণিত অস্ত্রাঘাত রুখতে হবে, নয়তো অপঘাতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অস্ত্রঘরে প্রবেশ করলেন চন্দ্রকান্ত। একটি ধারালো তরবারি সঙ্গে নিতে হবে।

লুব্ধ জন্তুর হিংস্র চোখের মত শত্রুর আয়ুধ লুকিয়ে থাকবে বনে-বাদাড়ে, অতর্কিতে আক্রমণ করবে। বিগত কয়েক দিন ধ'রে হত্যার উৎসবের রক্তে লাল হয়ে আছে পথ-প্রান্তর। গুপ্তঘাতীর দল ওৎ পেতে ব'সে আছে যেখানে-সেখানে। গভীর ঘনরজনীতে শোনা যায় অস্ত্রের ঝনঝনা। তরবারি-যুদ্ধ চলেছে জ্যোৎস্না রাতের সোনালী আলোয়। রাজ্যজয়ের নেশায় এই হানাহানি নয়, ধর্ম্মের বৈরিতায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে হিন্দু, মুসলমান আর বৌদ্ধ সম্প্রদায়। বাঙলা আর বিহারের মঠ, মন্দির আর মসজিদের দাহপর্ব্ব চলেছে যেন। স্থাপত্য আর শিল্পশোভা ভস্মে অঙ্গারে ঝ'রে পড়ছে। মাতৃমূর্তি ভূলুণ্ঠিত, বুদ্ধমূর্তি পদদলিত হয়েছে। ধর্ম্মান্তরের ফাঁস গলায় জড়াও, নয়তো বিধর্ম্মীর পাওনা গ্রহণ কর।

একটি তীক্ষ্ণধার তরবারি একখানি পুঁথির মধ্যে রেখে বেঁধে ফেললেন চন্দ্রকান্ত। স্বপ্নছবির মত গতরাতের দুর্ঘটনা চোখে ভাসছে যখন তখন। আনন্দকুমারীর বর্ণভূষা, দেহালঙ্কার, পোষাক-পরিচ্ছদ, কেশ-বিন্যাস সবই একে একে মনে পড়ে। কি দুঃসাহস চৌধুরীকন্যার! সমাজকে ভয় করে না, মানুষকে পরোয়া করে না, বনাঞ্চলের সর্পভীতি পর্য্যন্ত তার নেই!

—ঠাকুরমশাই!

এক শিশুকণ্ঠের কাতর-কথা এক টুকরো কান্নাগুঞ্জের মত বেজে উঠলো চতুষ্পাঠীর মণ্ডপে।

—কে? চমকে উঠে সাড়া দিলেন চন্দ্রকান্ত। দ্বারের কাছে এসে দেখলেন মণ্ডপে সারি সারি পদ্মকুঁড়ি ফুটেছে যেন। সারি

সারি বসেছে সহপাঠী শিশুর দল। সদ্যঃস্নাত। অনাবৃত দেহ, সুতির বস্ত্র পরনে। উপবাসী, প্রার্থনার গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনাহারে থাকতে হবে, অথচ সময় ব'য়ে গেছে কখন।

—গান হবে না ঠাকুরমশাই ?

পাখীর কাকলীর মত মিষ্টি কথা যেন। এক কৌতূহলী শিশু যেন সকলের পক্ষ থেকে কথা বলছে। যুক্তকরে ব'সে আছে অন্তান্তরা, সরল চাউনিতে যেন ভক্তির আভাস।

—ইন্দ্রজিৎ, তোমাদের ইন্দ্রভাই গান গাওয়াবে, পাঠ দেবে।

একসঙ্গে অনেক শিশু, কথা নয়, গান গাইলো যেন। বললে,—না না, ইন্দ্রভাই নয়, তুমি আমাদের গান গাওয়াবে, পাঠ দেবে।

—আমি যে গ্রাম ছেড়ে যাবো এখনই। বহু দিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না।

—আমরাও যাবো।

মিলিতকণ্ঠের কথা শুনে কাতর হাসি হাসলেন চন্দ্রকান্ত। কথাকারদের আকুল সুরের প্রতিধ্বনি ছুটলো বাতাসে। চন্দ্রকান্ত দেখলেন, প্রত্যেকের চোখে যেন লুব্ধ-চঞ্চল-ভ্রমর-দৃষ্টি। মিষ্ট হাসির রেখা ফুটেছে কচিমুখে। বাক্যহারার মত দাঁড়িয়ে থাকেন চন্দ্রকান্ত। কথা খুঁজে মেলে না যেন।

তেঁতুল গাছের হলুদ-রঙ পাতা ঝ'রে পড়ছে মণ্ডপে। বটের ঝুরি খ'সে পড়ছে। টিয়াপাখীর ঝাঁক বটফল খুঁজতে এসেছে আহারলোভে। শুষ্ক যুঁই উড়ছে বাতাসে। কনকচাঁপার পাপড়ি। চতুষ্পাঠীর আঙিনায় রোদের ঝিলিমিলি ছড়িয়েছে।

—পথে বিপদ অনেক। চন্দ্রকান্ত হেসে হেসে বললেন। প্রতিটি শিশুর মুখে দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন,—এই কষ্টকর যাত্রায় তোমাদের মত কোমল শরীর পাত হয়ে যাবে।

কি বলতে যায় শিশু-পাল, কিন্তু কথা থেমে যায়। কা'কে দেখে যেন ভীত হয় তারা। সুস্থির হয়ে বসে সকলে। ভয়ে যেন মূক হয়ে যায়।

স্নান-শেষে ফিরে এসেছে ইন্দ্রজিৎ। বেদীর এক পাশে দাঁড়িয়ে গান ধরে সুরেল ছন্দে। প্রার্থনা-সঙ্গীত গাইতে থাকে। শিশুদের পেছনে এসে বসে সকল ছাত্র। ইন্দ্রজিতের সুরে সুর মিলায়। ঐক্যতানে গান ধরে সকলে। গাছের পাখীও যেন সঙ্গে সঙ্গে গান গায়।

ভক্তিগদগদ গায়কদের চোখ এড়িয়ে চন্দ্রকান্ত ধীরে ধীরে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করেন। তাঁর হাতে এক নাতিবৃহৎ পুলিন্দা। পুঁথি পানপাত্র আর পরিধেয়। দ্রুতপদে চলতে থাকেন অধ্যক্ষ। ধরা পড়ার ভয়ে চোর যেমন পথ চলে তাড়াতাড়ি। অনেক দূরে গিয়েও গান শোনা যায় মিহিসুরে। প্রার্থনার গান নয়, যেন বিদায়-সঙ্গীত গাইছে শিষ্যদল। চন্দ্রকান্ত একবার পিছু ফিরে দেখলেন। চতুষ্পাঠীর মণ্ডপশীর্ষ চোখে প'ড়লো। মাটির প্রাচীরে দৃষ্টি ব্যাহত হয় তাঁর। আবার চলতে থাকেন। বিভীষিকার নিশ্বাস থমথম করছে যেন। জ্ঞানঘন চন্দ্রকান্ত ভয়ে যেন আড়ষ্ট হ'য়ে চলেছেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ে, পথিপার্শ্বে ঘাসের বনে কে এমন ধ্যানে ব'সেছে! পার্থিব সকল কিছু বিস্মৃত হ'য়ে যেন ধ্যান করছেন। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ধ্যানীর ধ্যান-গম্ভীর মূর্তি চিনতে পারেন চন্দ্রকান্ত। বুদ্ধের আবক্ষ মূর্তি। বাঙলার ভাস্কর্যের এক নমুনা, পথের ধারে আশ্রয় পেয়েছে অনাদরে। কোন্ এক বৌদ্ধমঠ ধ্বংস আর দগ্ধ হয়েছে কে জানে! মঠের আরাধ্য মূর্তিকে ভঙ্গ করতে পারেনি আক্রমণকারীরা। সঙ্ঘারাম পুড়িয়ে দিয়েছে শুধু।

আর কালবিলম্ব করেন না চন্দ্রকান্ত। তাঁর গতি দ্রুত হয় হাঁটাপথে। রৌদ্রতেজ অঙ্গে লাগে না! পথ বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছন্ন। আকাশস্পর্শী গাছের সারি পথের দুই পাশে। আমবৃক্ষ আর বাঁশের বন। সমুখে চোখ যায়, পথের সর্পিল বিস্তার ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। দুই এক পাকা গৃহের প্রাচীর আর পরিখা দেখা যায়। কুশলী স্থপতির কার্য্যকৌশলের চিহ্ন প্রাচীরে। চলতে চলতে আবার সভয়ে থামলেন চন্দ্রকান্ত। বাঁশঝাড় চঞ্চল হয় কেন এমন! চন্দ্রকান্ত দেখলেন, একটা খটাশ ব্যস্ত হয়ে পালিয়ে গেল বাঁশবন থেকে। তার কৃষ্ণচোখে হিংস্রতা। মানুষের পদশব্দে শিকার ফেলে পালিয়েছে। গাছের 'পরে পাখীর বাসায় হানা দিয়েছিল, ক'টা চিলের ছানাকে মেরেছে টুঁটি কামড়ে।

গ্রামের মায়া যেন ত্যাগ ক'রতে পারেন না চন্দ্রকান্ত। পথ চলতে চলতে কেবলই এধারে সেধারে দেখছেন। গুপ্তঘাতী শত্রুর ভয়ে নির্ভয়ে চলতে পারছেন না।

বহুজনের পদধ্বনি শোনা যায় পিছুপানে। এক দল মানুষ যেন তড়িৎগতিতে আসছে। আক্রমণকারী শত্রুদল হয়তো! বাঁশবনে লুকানো ছাড়া গতি নেই, অবধারিত মৃত্যুর কবল থেকে যদি রক্ষা পাওয়া যায়। একজন মাত্র একজনের সঙ্গে হাতাহাতি-যুদ্ধ চালাতে পারে, একজন বহুজনের আক্রমণ রোধ করতে পারে না।

—ঠাকুরমশাই!

পথের বাঁকে ডাকের প্রতিধ্বনি আছাড় খায়। বিপদ-ভীরু কণ্ঠস্বর যেন আহ্বানকারীর। মরণের ভয় পেয়ে মানুষ যে-সুরে চেঁচায়। দুর্ঘটনায় পড়েছে, তাই হয়তো পিছু ডাকছে।

পাশেই বনাঞ্চলের ফাঁকে এক সঙ্ঘারাম। সাড়া দিতে ভয় হয় চন্দ্রকান্তর। তিনি পথ চলা থামিয়ে অপেক্ষায় থাকেন।

সঙ্ঘারামে বুদ্ধের শীল আর মঙ্গল গাইছে ভক্তজন। এক সুর, এক তান, এক কথা। চন্দ্রকান্তর কানে যায় শুদ্ধমন্ত্রের একেক উক্তি। গানের কলির মত ভেসে আসে যেন। মুক্তিপথের পাথেয়, মোক্ষলাভের মহামন্ত্র, বুদ্ধপ্রাপ্তির স্তোত্রগান গাইছে ভক্তরা। তারা বলছে,—পাণং ন হানে।

মনে মনে ঐ উক্তি বঙ্গভাষায় রূপান্তর করেন চন্দ্রকান্ত। পালি আর প্রাকৃতে তাঁর জ্ঞানের অভাব নেই। মন্ত্র শুনে ঈষৎ হাসলেন তিনি। প্রাণীকে হত্যা করবে না,—মুখে শীল আওড়ায় কিন্তু কাজে কি করে বৌদ্ধতান্ত্রিকরা! শীলের অপমান করে। বিধর্মীর রক্তপাত করে।

তারা বলছে,—ন চ দিন্নমাদিয়ে।

যা তোমাকে দেওয়া হয়নি তা যেন তুমি গ্রহণ করবে না। চন্দ্রকান্ত মনে মনে ভাবলেন, হিন্দুর মন্দির ধ্বংসের পর মাতৃমূর্তির স্বর্ণালঙ্কার কারা আত্মসাৎ করে। মন্দিরের রূপার তৈজস কোথায় যায়। প্রণামীর অর্থ কোথায় উধাও হয়!

তারা বলছে,—মুসা ন ভাসে।

মিথ্যা কথা বলবে না। চোরের দলের কথায় কথায় মিথ্যা। বুদ্ধের বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা। সদাচার মানে না আর।
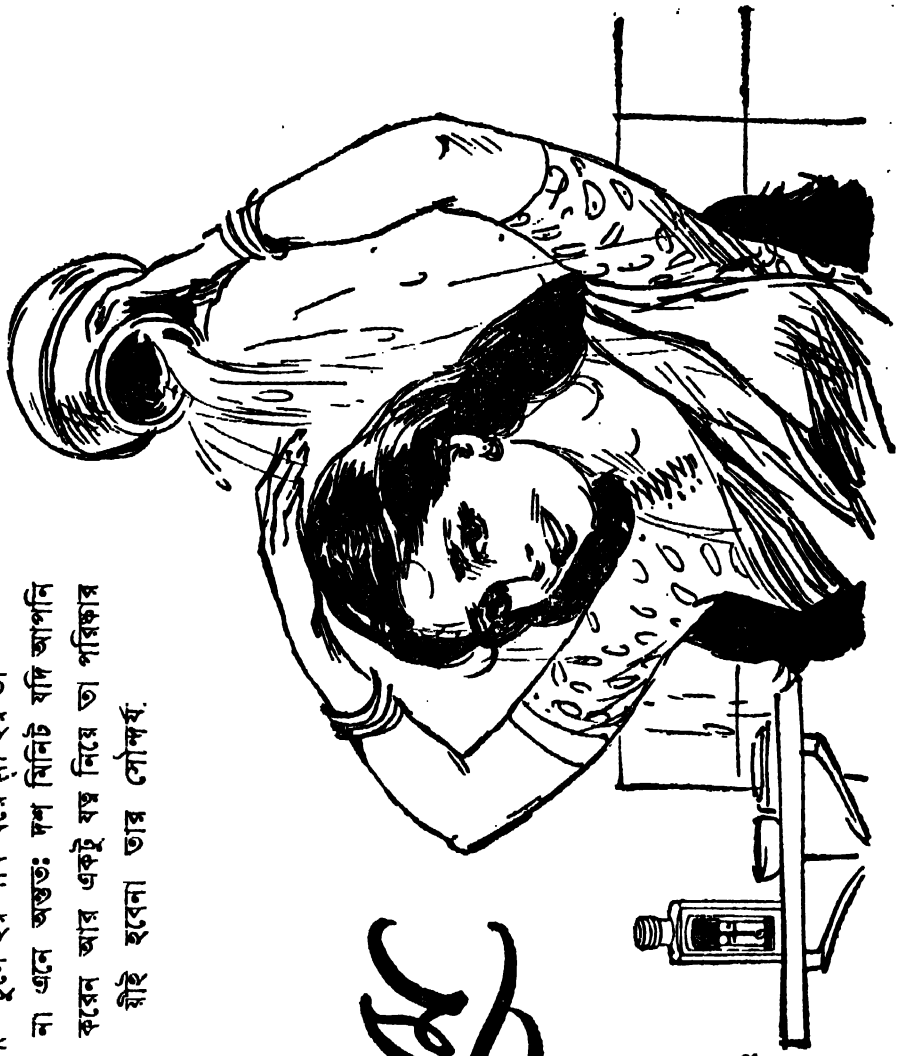
তারা বলছে,—ন চ মজ্জপো সিয়া।

মদ খাবে না। আবার মনে মনে হাসলেন চন্দ্রকান্ত। শোনা যায়, সঙ্ঘারামের ভিক্ষু আর শ্রমণদের জন্য মদ চোলাই হয়। ধ্বংসে মত্ত হওয়ার আগে তারা আকণ্ঠ মদ্যপান করে। মধ্যরাতে না কি নটীদের নৃত্য-উৎসবে যোগ দেয়।

সেই ছুটন্ত মনুষ্যদল এসে থেমে যায় অপেক্ষমান চন্দ্রকান্তর সমুখে। লক্ষ্য করা যায়, ওরা বহন ক'রে এনেছে এক শূন্য পালকী। বিচিত্র কারুকাজ পালকীতে, রূপার পাতের। দেবদেবীর চিত্র আঁকা পালকীর দুয়োরে।

—ঠাকুরমশাই!

পথের ধূলা কপালে মাখতেই যেন প্রণাম করলে একজন।

চন্দ্রকান্ত বিস্ময় বোধ করেন। সাগ্রহে দেখতে দেখতে বললেন,—মহাশয়দের বক্তব্য কি? আমাকে কি প্রয়োজনে?

—মা ঠাকরুণ ডাক পাঠিয়েছেন ঠাকুর মশাই! পালকী পাঠিয়েছেন।

—আমার তো চেনা নাই! কোথায় বসতি! পরিচয় কি?

—আনন্দকুমারীর মা।

বক্তার কথা শেষ হয় না। মাথা নত ক'রলেন চন্দ্রকান্ত। চিন্তার রেখা ফুটলো কপালে। বললেন,—কারণ কি শুনতে পাই?

—ঠাকুরমশাই, আমাদের রাজলক্ষ্মী আনন্দকুমারীর সন্ধান মিলছে না গত রাত্রি থেকে।

—তজ্জন্য আমার কি করণীয়? আমি কি করতে পারি?

কথা বলতে বলতে যেন আতঙ্কে শিউরে উঠলেন চন্দ্রকান্ত। যে আশঙ্কায় তিনি গ্রাম ত্যাগ ক'রে চলেছেন সেই শঙ্কা সত্যে পরিণত হয়।

—চৌধুরী-পরিবারের এই অসময়ে তাঁরা মহাশয়ের সাহায্যপ্রার্থী, এই ডাক উপেক্ষা করবেন না অন্যথা।

—আমি যে কার্য্যান্তরে চ'লেছি।

—তবুও অনুরোধ। গড় করছি মহাশয়কে। ব্রাহ্মণ প্রণামে তুষ্ট হয়। আপনি আর অমত করবেন না। আমাদের সহ চলেন এই পালকীতে। চৌধুরাণী আপনার ক্ষতিপূরণ দিবেন। আপনি তো গণনায় বলতে পারবেন।

—গণনার কাজ আমি করি না, জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা নাই।

কথা বলছেন ভাবনার চাঞ্চল্যে অস্থির চন্দ্রকান্ত। কণ্ঠস্বরে আর তেমন গাম্ভীর্য্য নেই। চোখের ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে যেন। দৃষ্টিতে শূন্যতা ফুটেছে।

লেঠেল বাগদীরা এতক্ষণ নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ ক'রেছিল। তাদের মধ্যে যেন এক চাপা গুঞ্জন শোনা যায়। বক্র-কটাক্ষে তাকায় কেউ কেউ। বাঁকা হাসি হাসে।

চন্দ্রকান্ত কি ভাবতে থাকেন কে জানে? কপালে তাঁর চিন্তারেখা দেখা দেয়। কথা বলেন না আর।

—পালকীতে ওঠেন, বৃথা চিন্তা ত্যাগ করেন।

—আমাকে রেহাই দেন। আমি যাওয়ায় কোন সুফল হবে না। আনন্দকুমারী বর্ত্তমানে কোথায়, সে জীবিতা না মৃতা, কিছুই আমার জানা নাই।

—কথায় কাজ হবে না। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।

লেঠেলদের মধ্যে থেকে কার ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কথায় চন্দ্রকান্ত ফিরে দেখলেন একবার। সহাস্যে বললেন,—শক্তি প্রয়োগেও কোন' লাভ হবে না, তোমাদের মেয়েকে মিলবে না। তবে চৌধুরাণী ঠাকরুণ যখন ডাক পাঠিয়েছেন তখন তাঁর আদেশ অমান্য করা অনুচিত মনে করি। চৌধুরীমশায় কি মান্দারণে নাই?

—না মহাশয়! বাণিজ্যযাত্রায় গেছেন আমাদের হুজুর। কবে যে ফিরবেন তার কোন স্থিরতা নাই।

একান্ত অনিচ্ছায় পালকীতে উঠে বসলেন চন্দ্রকান্ত। হাতের পুলিন্দা রাখলেন এক পাশে। পালকী ছুটতে থাকলো দ্রুতগতিতে। পালকীর মুক্তদ্বার থেকে জমিদার কৃষ্ণরামের ভগ্নগৃহের এক প্রান্ত অস্পষ্ট দেখা যায়। কৃষ্ণরামের সহধর্ম্মিণী বিন্ধ্যবাসিনীর রূপলাবণ্য মূর্ত্ত হয়ে মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে। শুধু রাজকুমারী নয়, আনন্দকুমারীও দেখা দেয় যেন। দুই নারী যেন দুই পৃথক ধাতুতে গঠিত। একজন শান্তশিষ্টা, অন্যজন যৌবনচঞ্চলা। একজনের রূপ স্নিগ্ধসুন্দর, অন্যজন যেন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। চাঁদের আলোর মত কমনীয় একজন, অন্য জন যেন সূর্য্যের তীব্র রশ্মি। প্রথমা আকর্ষণ করে, দ্বিতীয়া দগ্ধ করে।

রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনী কেঁদেই সারা হ'ল। কেমন শোকার্ত্তের মত অনুক্ষণ চোখের জল ফেলেন। নির্ব্বাসনের দণ্ড ভোগ করছেন তিনি, তাতে যেন দুঃখ নেই। আনন্দকুমারীর বিরহ-অনলে বুক জ্বলছে তাঁর। পুঁথি নকল করতে বসেছিলেন, কিন্তু লেখায় যেন মন বসে না কিছুতে। এক পঙক্তি লেখেন আর কালির দাগে নিশ্চিহ্ন করেন সেই লেখা।

পরিচারিকা বললে,—কাটাকুটি করবে, না লেখালেখি করবে?

জলভরা চোখ তুললেন রাজকুমারী। বললেন,—মন লাগে না লেখায়। আনন্দকুমারীর কথা মনে পড়ে কেবলই। সে এখন কোথায় কে জানে? ইচ্ছা হয়, ছুটে গিয়ে একবার তাকে চোখের দেখা দেখে আসি! আনন্দর মা না জানি কত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন!

যশোদা বললে,—ব্যস্ত হয়ে কি আর ফল হবে? সব স'য়ে যাবে দেখবে বৌ। টাটকা শোকে সবাই এমন উতলা হয়। তার পর একদিন সব ভুলে যায়। আবার হাসি ফোটে মুখে। বর্ষার মেঘ কেটে গেলেই আবার রোদের আলো ফোটে।

—তবুও, অমন সমর্থ মেয়েটা বেহাত হয়ে গেল? আমরা কেউ কিছুই করতে পারবো না?

হেসে ফেললো যশোদা। হেসে হেসে বললে,—তোমরাই যত কাঁদাকাটা ক'রছো, যার জন্যে এত কষ্টভোগ সে হয়তো হেসে মানিয়ে নেবে। ভুলেও মনে করবে না পেছনে যাদের ফেলে গেছে। খানিক থেমে আবার পরিচারিকা বললে,—আনন্দ আর কি কখনও সমাজে ঠাঁই পাবে! ঘরে নেবেন চৌধুরীমশাই?

লেখায় মন দেন বিন্ধ্যবাসিনী। কিন্তু লেখনী যেন চলে না আর। কালি শুকিয়ে যায়। নতমস্তকে ব'সে থাকেন চুপচাপ। আনন্দকুমারীর হাসির শব্দ যেন কানে ভাসতে থাকে। তার অনাবিল হাসিতে কোন খাদ নেই। এমন মিষ্টি হাসি কখনও শোনা

যায়নি। এমন স্পষ্ট কথা। নিলাজ ভাবভঙ্গী চৌধুরীকন্যার। বেপরোয়া গতিবিধি। ভয় কা'কে বলে জানে না।

—আহা আনন্দকুমারী সুখী হোক, প্রার্থনা করি। তার মাথার সিঁদুর অক্ষয় হোক।

—সিঁদুর-আলতার ধার ধারে না ম্লেচ্ছরা। শাড়ীর বদলে ঘাগরা পরায় মেয়েদের। পায়ে জুতো পরায়।

—যে দেশের যেমন রীতি তাই তো হবে।

—দেশের মুখে আগুন লাগুক। রীতির মাথায় ঝাঁটা মারি আমি।

—বড্ড নিষ্ঠুর তুমি যশোদা! যা মুখে আসে তাই বল'।

—কেন বল্‌বো না তাই শুনি? আমি কি কারও খাই না পরি?

—শুনতে পাই স্বয়ং নবাব নাকি ঐ ম্লেচ্ছদের কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়েছেন। কত গুণ তাদের!

—আমাদের নবাব তো মানুষ নয়, পশু। মনুষ্যত্ব বলতে কিছু নেই তাঁর। দেশে তাই এমন অনাচার চলেছে। লালমুখো বাঁদরদের রাজত্বি হবে দেশে! আমাদের শাসন করবে।

বিন্ধ্যবাসিনী আর বাক্যব্যয় করেন না। লেখায় মন দেন। কিন্তু লেখনী চলে না যেন। কালি শুকিয়ে যায়। পরিচারিকা দূরে থেকে লক্ষ্য করে জমিদার-পত্নীকে। অফুরাণ রূপ-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী বিন্ধ্যবাসিনী। শূন্য দেহ, অলঙ্কারের লেশ মাত্র নেই। তবুও তাঁর অবয়বের অলঙ্কার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। রাজকন্যার গড়ন আর গঠন দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যায় যশোদা। লেখনী থামিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন তিনি। তুলট কাগজের শুভ্রতার মাঝে কি লেখা আছে কে জানে, বিন্ধ্যবাসিনী একাগ্রচিত্তে যেন পড়ছেন সেই রহস্যকথা। পরিচারিকা স্থিরচোখে দেখছে তাঁর বর্ণভূষা। [ক্রমশঃ।

হৈমন্তিক

নীহার গুহ-মল্লিক

কচি কলাপাতার মত সবুজ রোদ!
চারি দিকে ক্ষেতে ক্ষেতে ধান।
ঘিয়ের রঙের মত ক্ষেতে তাম্রাভ রক্তিম পাকা ধান।
পাশেই নদী—তার বেলোয়ারী জল,
বালি সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে পারের অনেক নীচে নেমে গেছে।
একটু আগেই জাল ফেলেছিল জেলেরা,
শামুক ছড়ান তাই জলের কিনারে।
শামুকের ঘ্রাণ আসছে নাকে।

কোমল নীলাভ আকাশে দুধ-সাদা কাশ-ফুল রঙের,
বকের পাখার মত মেঘ নেই।
চিল মাছরাঙাদের শরীরে আমেজ আজ,
মাছ ধরিবার তরে নাই কোন তাড়া;
শিথিল নদীও যেন রূপালী সাপের মত রোদ পোহাতেছে।
ধানের রসে মশগুল কয়েকটি কৃষক,
ওখানে মাঠের পাশে করিতেছে রঙ্গ-আলাপন।

ইহাদের মত আমিও বসিয়া আছি
গাছের গুঁড়িতে পিঠ রেখে।
গাছের উপর থেকে অনেক হলুদপাতা,
খসে খসে পড়িতেছে গায়ে—ঘাসের উপরে।
শীতের রাতে নীড়ের পাখীর মতন এক অলসতা, অবসাদ দেহে।
চিন্তা ইচ্ছা উৎসাহ ক্রমেই বিবশ হয়ে আসিতেছে।
তখন তোমার মোটর এল—হেমন্তের মেঠো পথে
　　　　ধূলির ঝড় পিছে রেখে।

নেমে এসে বললে, "চল,"
তোমার দেহের ভাঁজে জীবনের ফেনার বর্ণালী।
তবু বিস্রস্ত আঁচল যেন ঘাস ছোঁয় মনে হয়।
শেষে পৃথিবীর মত তোমার মুখের দিকে
চোখ রেখে "কোথায়?" বলতেই আমি দেখি,
তোমার চিবুকে চোখে শ্রান্ত পাখিনীর বিষণ্ণ গান ছেয়ে গেল।

যক্ষ্মার প্রতিকার কি ?

"গত ১১ই জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে যক্ষ্মার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ইউনিয়নের প্রাচ্য আঞ্চলিক কমিটী গঠিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে প্রাচ্যের ২১টি দেশের যে সকল প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক সভায় মিলিত হইয়া এই কমিটী গঠন করিয়াছেন। এই কমিটীর হেড কোয়াটার্স ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। খুবই ভাল কথা। কিন্তু এই আঞ্চলিক কমিটী গঠিত হওয়ায় ভারতে এবং প্রাচ্য দেশগুলিতে যক্ষ্মার আক্রমণ নিরোধ করিবার কতখানি সুব্যবস্থা হইবে, ইহাই প্রধান প্রশ্ন। যক্ষ্মারোগের ভাল চিকিৎসা-পদ্ধতি যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে-সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। গত শনিবার কলিকাতায় বসু ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার বার্ষিক সভায় সভাপতির আসন হইতে ডাঃ এ, সি, উকীল বলিয়াছেন যে, বয়স ও পুরুষ-নারীভেদে যক্ষ্মার আক্রমণ কম-বেশী হওয়া সম্পর্কে ভালরূপে এখনও কিছু জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের এবং কাজের মানের উন্নতির দ্বারা যে যক্ষ্মার আক্রমণ হ্রাস করা যায়, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যক্ষ্মার আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি যে জীবনের বৈষয়িক অবস্থার উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে জনসাধারণের জীবিকা নির্ব্বাহের মানের উন্নতির জন্ত কোন চেষ্টা তো করাই হইতেছে না, বরং দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান নিম্নাভিমুখী হওয়ার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হইতেছে। যক্ষ্মা-রোগের প্রতিরোধের জন্ত যেখানে জীবনযাত্রার মান উন্নত করা প্রয়োজন, সেখানে বি, সি, জি, টিকা দিয়া কতটুকু আর ফল পাওয়া যাইতে পারে ?" —দৈনিক বসুমতী।

সরকার—হিসাব চাই

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহার প্রস্তাবিত আদর্শ পল্লী গঠনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই মর্ম্মের এক সংবাদে আমরা সমস্যায় পড়িয়াছিলাম। তারপর দেখিতেছি, সরকার তৎপরতার সহিত এই সংবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানাইয়াছেন যে, প্রকাশিত সংবাদের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই সংবাদ সর্বথা অমূলক। পক্ষান্তরে রাজ্য সরকার প্রস্তাবিত আদর্শ পল্লীগঠন পরিকল্পনাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বলিয়া মনে করেন। বন্যাবিধ্বস্ত পল্লীগুলিতে এই পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। আরব্ধ কার্য যথাসম্ভব শীঘ্র সম্পূর্ণ হইবে বলিয়াই সরকার পক্ষ আশা করেন। সরকার পক্ষের এই বিবৃতিতে অবস্থাটা পরিষ্কার হইয়াছে। আপাতত দ্বিধা-সন্দেহ দূর হইয়াছে। কিন্তু গত বর্ষার পরবর্তী প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে পুনর্গঠন কার্য কি ভাবে কতদূর অগ্রসর হইতেছে, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। সরকারের প্রস্তাবিত কাজের অগ্রগতির হিসাব পাইলে বুঝা যাইত, আদর্শ পল্লীগঠনের পরিকল্পনা কতখানি অগ্রসর হইয়াছে।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

বিদেশী নয়—দেশী চাই

"কলিকাতার বড় বড় হোটেলে খরিদ্দারদিগকে আকৃষ্ট করার জন্ত বিদেশ হইতে নর্তক, নর্তকী ও বিলাতী অর্কেষ্ট্রা আনাইয়া নাচ-গানের বর্তমান ব্যবস্থা বাতিল করার সিদ্ধান্তটি শুধু সময়োপযোগী নহে, ইহার ফলে প্রভূত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয়ও সাশ্রয় হইবে। এই বাবদ মাত্র কলিকাতা সহরের তিনটি বড় বড় হোটেলেই বছরে নাকি দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইত। বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ ও অন্যান্য সহরের বড় বড় হোটেলে এই বাবদ খরচটা ধরিলে সাকুল্যে ৭০।৮০ লক্ষ টাকার কম হইবে কি না সন্দেহ! বৈদেশিক মুদ্রার যেরূপ ঘাটতি চলিতেছে, তাহাতে ভারতের পক্ষে আপাতত এই খাতে এত টাকা ব্যয় করা দুঃসাধ্য। বিদেশী খরিদ্দারদিগকে আকৃষ্ট করার জন্ত এরূপ অনুষ্ঠান অপরিহার্য কি না—সে সম্পর্কেও গুরুতর সন্দেহ আছে। কেন না, ভারতে ভ্রমণকালে স্বদেশে, সব সময় দেখা অনুষ্ঠানগুলিই যে তাঁহারা আবার দেখিতে চাহিবেন—এমন কথা মনে হয় না। বরঞ্চ এ-দেশের নাচ-গান দেখাইবার ব্যবস্থা হয়তো তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর আকর্ষণীয় হইত। হোটেল পরিচালকগণ এ-সম্পর্কে চিন্তা করিলে ভালো হয়। বিলাতী ক্যাবারে নাচ তুলিয়া দেওয়ার পরে তাঁহারা যদি দেশী নাচ-গানের আসর বসান, তাহা হইলে সৌখীন খরিদ্দারদিগের আকর্ষণ কমিবে না ; অন্ত দিকে কিছু লোক কাজ পাইতে পারে।" —যুগান্তর।

ফলওয়ালার বিপদ

"কলিকাতায় ফলের বাজারে যে শোচনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ গত কল্য 'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। মালগাড়ীর অভাবে মাঝে মাঝে প্রায়ই ফল চালান আসা

বন্ধ হইতেছে এবং অন্য নানাপ্রকার রেল কর্ত্তৃপক্ষের অব্যবস্থা ও দুর্নীতি এবং সরকারী ঔদাসীনতার ফলে ফলের যে অপচয় হইতেছে তাহাতে আর কেহ না হউন, শহরের অসংখ্য রোগী ও শিশুর জীবন ও স্বাস্থ্য বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। তা ছাড়া গরীব ফল-বিক্রেতারাও বিশেষ ক্ষতির সম্মুখীন হইতেছেন। সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমরা এই বিষয়টির আশু নিরসন দাবি করিতেছি। কারণ ইহার সহিত বহুসংখ্যক লোকের স্বাস্থ্য ও জীবিকা জড়িত।" —স্বাধীনতা।

নির্ব্বাচনে নমিনেশন

"নমিনেশন যেরূপ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতায় আসিয়া বাংলা কংগ্রেসের ওকালতী করিয়া জহরলাল নেহরুকে বলিতে হইবে—নলিনাক্ষ সান্যাল অতি সৎ লোক, তুলসীর জলে ধোয়া অতিশয় সাচ্চা আদ্মী, উসকো ভোট দেও; পুরুলিয়ার বাংলা ভুক্তির বিরুদ্ধে যাহারা হিন্দীওয়ালাদের হইয়া লাঠিবাজি করিয়াছিল সেই দেবেন মাহাতো জাতীয় লোকদের জন্য বলিতে হইবে—ইহারা সাচ্চা বাংলাপ্রেমিক, ইনলোগোঁকো ভোট দেও। সেই বক্তৃতাতে নেহরু নিশ্চয়ই বলিবেন—কংগ্রেস সততা ছাড়া কিছু মানে না, দেশসেবা ছাড়া কিছু দেখে না। দেবেন মাহাতোকে বিহার বিধান সভায় টিকিট দিলে আমাদের বলিবার কিছু ছিল না। বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চল বাংলায় ফিরাইয়া আনিবার প্রতিশ্রুতি প্রাদেশিক কংগ্রেস দিয়াছিলেন, কংগ্রেস-পতি আন্দোলনের কথাও বলিয়াছিলেন, তার পরে অতিশয় নির্লজ্জ ভাবে বিবরাশ্রয় করিয়া দিল্লীর ডাণ্ডা হইতে চামড়া বাঁচাইয়াছিলেন। পুরুলিয়ার লোকসেবক-সঙ্ঘ যেটুকু এলাকা বাংলায় আনিতে পারিয়াছেন সেখানে তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেওয়ার কোনই প্রয়োজন ছিল না। উদ্বাস্তু সমস্যা বাংলার প্রধান সমস্যা। উদ্বাস্তু-মন্ত্রিণী রেণুকা রায়কে পাঠানো হইয়াছে মালদহে, যেখানে ভোটদাতারা মুসলমান এবং সাঁওতাল। মুখে বলা হইয়াছে তিনি যাহা করিয়াছেন ঠিক করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক কি না, যাচাই করিবার জন্য কোন উদ্বাস্তুকেন্দ্রে তাঁহাকে নমিনেশন দিতে সাহস হয় নাই। কংগ্রেস মুখে যে সমস্ত নীতিকথা বলিতেছে তাহাতে তাঁহাদের নিজেদের বিশ্বাস কতটা আছে, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় উহার নমিনেশন তালিকা। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতাবাদী বলিয়া জনসঙ্ঘের সহিত কথা বলিতে পারে না, কিন্তু নিজেদের নমিনেশন তালিকায় সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক কারণে প্রার্থীর নাম ছাঁটাইতে পারে। কংগ্রেস প্রাদেশিকতার ঘোর বিরোধী বলিয়া প্রচার করে, অথচ তাহাদের তালিকায় প্রাদেশিকতার পূর্ণ পরিচয় জ্বল-জ্বল করে। নেহরু বলিয়াছেন—আপনারা কি বড় জিনিষ চাহেন, না মাথা ভাঙ্গিতে চাহেন? কথাটা কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কি মনে করিয়া বলিয়াছেন তাহা ঠিক বোঝা যায় না। তবে এটা বোঝা যায় যে, কংগ্রেসী ধড়ের উপর মাথা নামক যে বস্তু রহিয়াছে উহা পাথরের, ওটা ভাঙ্গা সহজ নয় বটে, তবে ভাঙ্গিলে ক্ষতি নাই!"

—যুগবাণী (কলিকাতা)

শ্রমিক মঙ্গলের সরকারী প্রচেষ্টার নমুনা

"স্বাধীন দেশের কংগ্রেসী সরকার শ্রমিক মঙ্গলের জন্য বহু কিছু করিয়াছেন বা করিতেছেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্রমিক মঙ্গলের নামে শ্রমিকের উপর যে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করা হইতেছে—তাহারই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ কর্মচারী রাজ্যবীমা কর্পোরেশনের কীর্তিকলাপ। এই রাজ্যবীমা চালু হইবার পর শ্রমিকের সুবিধা হওয়া দূরে থাক—হয়রাণীর একশেষ হইতে হইতেছে। প্যানেল ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলে ঔষধের দোকানে ঔষধ পাওয়া যায় না। আবার চিকিৎসার তালিকাভুক্ত রোগ ছাড়া অন্য কোন রোগ হইলে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া চিকিৎসা চালাইতে হয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, প্যানেলের ঔষধ দিয়া রোগ সারাইতে না পারিয়া অন্য কোম্পানীর ভাল ও দামী ঔষধ দিয়া রোগ সারাইতে হইতেছে। কঠিন অসুখ হইলে বা এক্সরে ও রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন হইলে হাওড়ার বড় ডাক্তারবাবুর নিকটে ধর্ণা দিতে হইবে। সেই ধর্ণা দেওয়ার কাজে বহু শ্রমিককে ৩।৪ বার হাওড়ায় নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া যাইতে হইবে। সেই যাতায়াতের খরচ একত্র করিলে দেখা যাইবে যে প্যানেলের বাহিরের ডাক্তারখানা হইতে সেই পরিমাণ অর্থ খরচ করিলে এক্সরে অথবা রক্ত পরীক্ষা হইয়া যাইবে। এইতো গেল এই দিকের কথা। অন্য দিকে কঠিন অসুখ হইতে রোগ-মুক্তির পর দরিদ্র শ্রমিকেরা অর্থাভাবে উপযুক্ত পথ্য কিনিতে পারেন না। উপরন্তু কর্মচারী রাজ্যবীমা কর্পোরেশন এইবার হইতে টনিক জাতীয় দামী ঔষধও বন্ধ করিয়া দিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। ফলে হতভাগ্য শ্রমিকদের দুর্দশা বাড়িয়াই চলিবে—ইহাই মনে হইতেছে। রোগমুক্তির পর আবার 'সিক্ লিভের' টাকা তোলার ঝামেলাও কম নয়!"

—সন্দেশ (হাওড়া)

নির্ব্বাচনী আসরে

"শ্রীনারায়ণ চৌধুরী শুধু কংগ্রেসের প্রার্থীই নন। তিনি জেলা-স্কুল-বোর্ডের সভাপতি, এ কথাটাও বর্ত্তমানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। প্রকাশ, কংগ্রেসের পক্ষে প্রচারের 'পুরস্কার' স্বরূপ স্পেশ্যাল ক্যাডারের চাকুরী নাকি নির্ভর করিতেছে। বলা বাহুল্য, এই পদে ১২০০ যুবক, গত বৎসর বর্দ্ধমান জেলা স্কুল বোর্ড কর্ত্তৃক মনোনীত হয়। এক বৎসরের উপর নিয়োগপত্র পাইবার আশায় তাঁহারা অপেক্ষা করিয়া আছেন। কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী প্রচারে সরকার পরিচালিত উদ্বাস্তু পল্লীর বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগের চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া জানা গেল। জেলা শাসকের নাম করিয়া তাহাদের উপর কংগ্রেসী প্রচারে নামিবার জন্য চাপ দেওয়ার কথা শোনা যাইতেছে। রিলিফ অফিসে কংগ্রেস প্রার্থীর ভ্রাতাকে আমদানী ও উদ্বাস্তুপল্লীতে তাহাকে ঘোরানো নিশ্চয়ই অনর্থক নয়।"

—নূতন পত্রিকা (বর্দ্ধমান)।

যোগ্যতার লড়াই

"১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ আসিবামাত্র দেশে আবার সাধারণ নির্ব্বাচনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ১৯৪৭ অব্দে ভারত স্বাধীনতা পাইয়াছে। শাসনের ভার স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস-দলভুক্ত ব্যক্তিরা পাইয়াছিলেন। প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকে পরাস্ত করিয়া অন্য দলীয়েরা শাসনভার পাইবার জন্য খুব চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ

হন। তবে কংগ্রেস জয়লাভ করিলেও সব কংগ্রেসী সাফল্য লাভ করে নাই। কেউ কেউ নাছোড়বান্দা হইয়া পরাজয় উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তাভজার গুণে পরীক্ষায় ফেল ছেলের কম্পার্টমেণ্টাল দিয়া দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইয়া এম, এল, এ, খেতাবে বঞ্চিত হইয়া এম, এল, সি, হইয়া শাসন সাধ ও শাসন-স্বাদ দুইই উপভোগ করিয়া আবার ভোটযুদ্ধে নামিবার পাঁয়তাড়া করিতেছেন। এম, পি, হইতে না পারিয়া শেষ অবধি করুণা প্রাপ্ত হইয়া এম, এল, এ সাজিয়া উপনির্ব্বাচনে শোধিত এম,' এল, এ হইয়া পদগৌরবে সমৃদ্ধ হইয়া এবার আবার এম, পি, হইবার জন্য তৈরী হয়েছেন। কত এম, পি, কুমোরের কুয়ো খোঁড়া কাজে যে যত নীচে নামে তার তত উন্নতির মত এম, পি, ছেড়ে এম, এল, এ, হবার প্রয়াস পাইতেছেন। কত লোক নির্ব্বাচনে দাঁড়াবেন তবে ভাগ্য অনুসারে কারো নির্ব্বাচন, কারো নির্ব্বাসন হইলেও দুরাশাগ্নি নির্ব্বাপণ হইবে না।"

—জঙ্গীপুর সংবাদ

ধনী ও দরিদ্রের ট্যাক্স-পার্থক্য

"প্রতি বছর ধনীদের ট্যাক্স কমছে আর গরীবদের বাড়ছে। ১৯৪৮ সালে ধনীদের সুপার ট্যাক্স ও ইনকাম ট্যাক্স কমানো হোয়েছে ২ কোটি টাকা। অথচ তামাক ও আমদানী কর বসিয়ে ১৪ কোটি টাকা এবং ডাকমাশুল বৃদ্ধি কোরে ৪০ লক্ষ টাকা ট্যাক্স চাপানো হয়েছে গরীবদের ঘাড়ে। দেখা যাচ্ছে, যেখানে ধনীদের কমলো ২ কোটি টাকা সেখানে গরীবদের ঘাড়ে চাপলো ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ১৯৪৯ সালে ধনীদের অতিরিক্ত মুনাফা ট্যাক্স হ্রাস করা হয়েছে ৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। অপর দিকে সূতী বস্ত্রের উপর শুল্ক বাবদ ১১ কোটি টাকা ও আমদানী শুল্ক ৬ কোটি টাকা বাড়িয়ে মোট ১৭ কোটি টাকা যে ট্যাক্স বাড়ানো হোল তার বোঝা পড়লো সাধারণ মানুষের উপর। এর পর ১৯৫০-৫১ সালে আবার ব্যবসায়ীদের মুনাফা ট্যাক্স ও ইনকাম ট্যাক্স ১৫ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। এইবার তুলনা করুন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ পর্য্যন্ত সরকার ধনীদের ট্যাক্স কমিয়েছেন ২৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা আর ঐ সময়ের মধ্যে গরীবদের ট্যাক্স বাড়িয়েছেন ৩১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ধনীদের ট্যাক্স কেবলই কমিয়ে গরীবদের ট্যাক্স বাড়ালে কি রকম দেখায়! তাই সরকার এবার আরম্ভ করেছেন গরীবদের সঙ্গে ধনীদেরও সামান্য সামান্য ট্যাক্স বাড়াতে।"

—সাধারণতন্ত্রী (হাওড়া)।

শিক্ষার ফল

"লক্ষীবাঈনগরে ভারতের রাজনৈতিক বাজারের বিগতযৌবনা কংগ্রেসবাঈ-এর সাম্প্রতিক মজলিসের আসর বহুদিক দিয়া উপভোগ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। রূপ নাই—আকর্ষণ নাই—খ্যাতি অপগত-প্রায়, তবু চটকদার জরি-চুমকির-জেল্লায় চমক লাগাইবার চেষ্টা হাস্যকর হইলেও কিঞ্চিৎ বেদনাদায়ক বৈ কী। অধিবেশনের আয়োজন ও জাঁক-জমকের পিছনে যে কতখানি জনকল্যাণবিরোধী কার্য্যকলাপ বর্তমান, তাহা স্থানীয় এক বিশিষ্ট জনসঙ্ঘ প্রতিনিধি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাই রাজছত্রধারী কংগ্রেসের বর্ত্তমান স্বরূপ। ব্যর্থতার পশরা আজ চাপিয়া রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। নামের মোহে আজ আর লোক জমে না। দলীয় সরকার গদীতে অধিষ্ঠিত থাকায় কুক্ষিগত সুবিধার দৌলতে পাইক-বরকন্দাজ দিয়া আসর জমাইতে হয়। এবার লক্ষ্মীবাঈনগরে কংগ্রেসী মজলিসে পুলিশী ঘনঘটা অনেককেই বিস্মিত করিয়াছে। কংগ্রেসী নেতারা এ কয়দিনে যেন ক্ষুদে হিটলার হইয়া উঠিয়াছিলেন। একদিকে বিভিন্ন সভামণ্ডপে নিরাপত্তা এলাকা বলিয়া খানিকটা জায়গা গণ্ডী কাটিয়া রাখা হইয়াছিল। এই নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে ছিল প্রবেশ নিষেধ। এমন কি, সাংবাদিকদের সম্পর্কেও কড়া ব্যবস্থা। শুধু প্রেসকার্ডই যথেষ্ট নয়, প্রবেশাধিকারের জন্য পুলিশ প্রদত্ত "সিকিউরিটি পাশ" চাই। ঢালাও পুলিশী আয়োজন, পুলিশের আঁচলের তলায় অধিবেশন। এত বায়নাক্কা সামলাইয়া জনসাধারণের কাজ করেই বা কখন বেচারারা! বক্তব্য কিছুই নাই, এতাবৎকাল এত বকা হইয়াছে যে দেশের কাছে আজ আর বলিবার মতো তেমন কিছুই নাই। বহু ভাবিয়া একটি মুখরোচক কথা বাহির করা হইয়াছে—'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজগঠন'। বারান্তরে তাহারই চর্বিতচর্বণ চলিয়াছে। বিশ্লেষণ করিবার দায়িত্ব যেখানে নাই সেখানে শুধু উদগিরণ করিলেই যথেষ্ট। এই দিল্লীর লাড্ডুটি যে কিরূপ অর্থাৎ কংগ্রেসী মার্কাদাগা এই তথাকথিত 'সমাজতন্ত্র' বস্তুটি যে কি—তাহা কংগ্রেসী নেতারা কোথাও স্পষ্টভাবে বলেন নাই এবং বলিবার যে প্রয়োজন আছে তাহা উপলব্ধিও করেন নাই।"

—স্বস্তিকা (কলিকাতা)।

মেদিনীপুরের দুরবস্থা

"মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটীতে প্রায় এক বৎসরকাল এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার কার্য্যভার গ্রহণ করিলেও মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তা ঘাট, নর্দ্দমা, আলো ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কোনরূপ উন্নতিই এযাবৎ পরিলক্ষিত হইতেছে না। সমস্ত সহরে উচ্চতম হারে (২৬%) সকলে করভার বহন করিলেও আজও পথের জঞ্জাল, নর্দ্দমার পচানি এবং গলিপথের প্রায় ১২০০ কেরোসিন বাতির যেমন ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইল না তেমনি শাখাপথগুলির কিয়দংশ গভীর কৃষ্ণপক্ষেও প্রায়ই রাত্রি ৮।০টা পর্য্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া পথচারীর বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছে। ফলে সহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খুনখারাপী রাহাজানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদুপরি রোগেরও বিরাম নাই। কিছুদিন পূর্ব্বেই কয়েকটি অংশে কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। এখন আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে তাহা প্রশমিত হইলেও টাইফয়েড ও হাম ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়াছে। অথচ সতর্কতামূলক টিকা ইনজেকশনাদি প্রদানের তেমন তৎপরতা দেখা যাইতেছে না। জল সরবরাহ এখনও অপ্রতুল এবং গৃহে জলসংযোগ গ্রহণে এখনও জবরদস্তি সেলামী, ডিপজিট ও বিভিন্ন ফাণ্ডে সাহায্য বাবদ ক্ষমতাতিরিক্ত অর্থ আদায় অব্যাহত রহিয়াছে। ফলে অধিকাংশের পক্ষেই এই সংযোগ গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় পাতকুয়ার জলেই নির্ভরশীল হইতে বাধ্য হইতে হইতেছে। সহরের স্বাস্থ্যাবনতির ইহাও একটি অপরিহার্য্য কারণ। উপরন্তু গত দুই গ্রীষ্মে যে জলসঙ্কট গিয়াছে তাহা প্রতিরোধের কোন চেষ্টাই এযাবৎ হয় নাই। অথচ এই এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার পদটি রক্ষার জন্য পৌরসভার বেতনে ও বিভিন্ন খরচায় বাৎসরিক

প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা খরচা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ অবস্থায় সেই পরিমাণে যদি কাজের কোন উন্নতি পরিলক্ষিত না হয় তাহা হইলে ইহার সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে। আশা করি, মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষ ও সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।"

—প্রদীপ (তমলুক)

শিক্ষায় পক্ষপাত

"ইংরাজ যে শিক্ষাক্ষেত্রে নানাপ্রকার ভেদনীতি সন্নিবেশিত করিয়াছিল, তাহার মূল লক্ষ্যই ছিল শিক্ষকেরা যেন দানা বাঁধিতে না পারেন। প্রত্যেকেই যেন কিছু কিঞ্চিৎ নিজ নিজ সুবিধার প্রত্যাশায় চিরদিন সরকারের মনোরঞ্জনের জন্ম দেশ জাতি সব কিছু ঘুচাইতেও পশ্চাৎপদ না হয়। পাপ ইংরাজ গিয়াছে, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্র হইতে সেই পাপ ভেদবুদ্ধির তো অবসান হইল না! শিক্ষকদের একতা নষ্ট করিবার উদ্দেশ্য ছাড়া মাল্‌টিপারপাস ও একাদশ শ্রেণীযুক্ত কয়েকটি মাত্র স্কুলকে ভাগ্যবান্ করিয়া অবশিষ্টগুলির প্রতি বিমাতৃসুলভ বৈষম্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য কি? ছাত্র, ছাত্রই। এ স্কুল ও স্কুল বলিয়া কথা নয়। সরকারের পক্ষে সব ছাত্রকেই সমান দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। ইংরাজ আমলের মত কতকগুলিকে কোলগত করিয়া অবশিষ্টগুলিকে ফ্যা-ফ্যা করিতে বাধ্য করা এখন আর শোভা পায় না। এখন যাগ করিতে হইবে, যতটুকু পয়সায় কুলাইবে তাহা সবাইকে সমান ভাগে বণ্টন করিতে ব্যবস্থা না করিলে, সমানদৃষ্টি, সাম্যবাদ বা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্রগঠন ইত্যাদি কথাগুলা যে বিরাট ধাপ্পায় পরিণত হইবে। মৌলানা আজাদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াও একথা সুস্পষ্ট বলিতেই হইবে, তাঁহার শিক্ষা সংস্কার নীতি ব্যর্থ হইয়াছে। শিক্ষা বৃদ্ধির আনুকূল্য দূরে থাক্, নানা বৈষম্যের চক্রবৃদ্ধিতে শিক্ষারও সর্বনাশ হইতেছে, শিক্ষকদেরও মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে। মাল্‌টিপারপাসের মোহে চুণাপুঁটি পর্য্যন্ত তৈলমর্দ্দনের উৎসাহে হস্ত কণ্ডূয়ন সুরু করিয়াছেন।"

—পল্লীবাসী (কালনা)।

পরলোকে ভবতোষ ঘটক

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অন্যতম একজিকিউটার, প্রসিদ্ধ লৌহ-ব্যবসায়ী, টাটা স্কব ডিলার্স এসোসিয়েশন (কন্‌ট্রোল্ড ষ্টক) লিমিটেডের চেয়ারম্যান, কে সি ঘটক এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেডের কুসুমিকা ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস ও কনষ্ট্রাকসনের ডিরেক্টর বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রীভবতোষ ঘটক চন্দননগরের বিখ্যাত ঘটক-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় কার্তিকচন্দ্র ঘটক। ভবতোষ ঘটকের বাল্যকালের শিক্ষা সুরু হয় বিখ্যাত বিপ্লবী ও সাংবাদিক স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবী শ্রীহৃষীকেশ কাঞ্জিলালের শিক্ষকতায়। এই ভাবে বাল্যকাল হইতেই তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়েন। বৃটিশ শাসন আমলে চন্দননগর ছিল বিপ্লবীদের একটি আড্ডা। বালক ভবতোষ বিপ্লবীদের আড্ডায় চিঠিপত্রাদি লইয়া যাতায়াত করিতেন। বাল্যকাল হইতেই এই ভাবে তাঁহার বিপ্লবী-জীবন সুরু হয়। এককালে তিনি শ্রীঅরবিন্দ ও বিখ্যাত বিপ্লবী শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এই ভাবে তিনি বিপ্লববাদের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করিয়া ফেলেন। এজন্ম স্বর্গত ঘটকের শিক্ষাজীবন বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তিনি চন্দননগর স্কুলে প্রবেশিকা পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতায় তাঁহার পিতৃদেবের লৌহ-ব্যবসায়ে যোগদান করেন এবং তাঁহার স্বর্গত পিতা ও ভ্রাতাদিগের সহযোগিতায় বিখ্যাত লৌহ ব্যবসা, কে, সি ঘটক এণ্ড সন্স প্রতিষ্ঠানটির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করেন। নিজ অধ্যবসায় ও কর্মদক্ষতায় 'কুসুমিকা আয়রণ এণ্ড কনষ্ট্রাকসন, কুসুমিকা ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের বর্তমান উন্নতির মূলে একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি ঘটক-পরিবারের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং ব্যবসায়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের স্বত্বাধিকারী স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পূর্বে যে একজিকিউটিভ বোর্ড গঠন করিয়া যান, স্বর্গত ঘটক ছিলেন তাঁহার একজন সক্রিয় সদস্য। তিনি কলিকাতার বহু জনকল্যাণ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সদস্য কিম্বা সভাপতি ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর জাতীয় বণিক সমিতির কার্যকরী পরিষদের টেলিফোন এবং উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি কলিকাতা লৌহ-ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি, টাটা স্কব ডিলার্স এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান এবং রেলওয়ে উপদেষ্টা সমিতির অন্যতম সদস্য ও আরও বহু ব্যবসা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে স্বর্গত ঘটক অমায়িক, সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। অন্তের
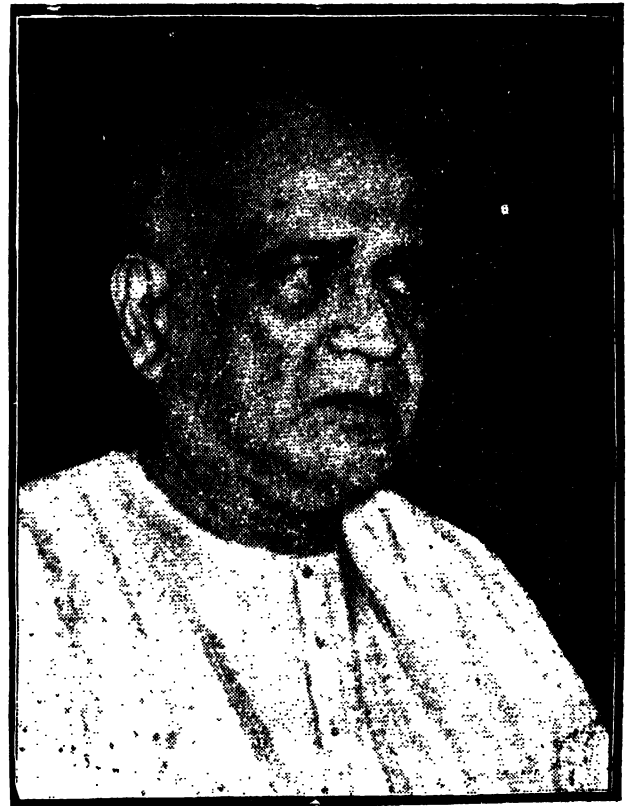
ভবতোষ ঘটক

আপদে-বিপদে তিনি ছিলেন সর্বদাই অগ্রণী। তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। স্বর্গত ঘটকের বৃদ্ধা মাতা এখনও জীবিতা। মৃত্যুকালে তিনি চার পুত্র সর্বশ্রী জীবানীতোষ, প্রাণতোষ, মনতোষ ও প্রিয়তোষ এবং ছয় কন্যা সর্বশ্রীমতী ইন্দিরা, বিজলী, স্বপ্রভা, সুলেখা, সুরূপা ও সুধীরা দেবী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র, জামাতা এবং বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। গত সোমবার ৩০শে পৌষ তিনি কার্যোপলক্ষে মুঙ্গেরে গমন করেন। তথায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গত মঙ্গলবার মধ্য-রাত্রিতে তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের অবসান ঘটে। আমরা পরলোকগত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

শোক-সংবাদ

শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মজঃফরপুরের সুপরিচিত ব্যবহারাজীব পণ্ডিতপ্রবর শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দীর্ঘকাল রোগভোগান্তে গত ৫ই পৌষ ৮২ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। শিখরনাথের ছাত্রজীবন ছিল গৌরবালোকে সমুজ্জ্বল। বি-এ পরীক্ষায় (১৮৯৪) ট্রিপল অনার্স নিয়ে পদার্থ ও রসায়নশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অঙ্কে প্রথম হয়ে এম-এ পরীক্ষায়ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথম জীবনে ডাফ কলেজে কিছু দিন অঙ্কশাস্ত্রে অধ্যাপনার পর মজঃফরপুরে ইনি ওকালতি শুরু করেন ও ১৯৩৪ খৃঃ ওকালতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এ ছাড়া সাহিত্যে ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁর রীতিমত দক্ষতা ছিল। শ্রদ্ধেয়া সাহিত্যিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী মহাশয়ার সঙ্গে ইনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সুলেখক পরলোকগত অনুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদেরই জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। আমরা অনুরূপা দেবীকে তাঁর এই গভীর শোকের দিনে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

সুহাসচন্দ্র রায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যেরই আর একজন প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক সুহাসচন্দ্র রায় ১১ই পৌষ ৬২ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। প্রথমে ইনি আশুতোষ কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

পান্নালাল বসু

বিখ্যাত আইনজীবী ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার বিচারক ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পান্নালাল বসু গত ১৪ই পৌষ রাত্রে ৭৬ বছর বয়সে স্বর্গারোহণ করেছেন। দর্শনশাস্ত্রে এম-এ ও ল' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কলকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে ও দিল্লীর সেন্ট ষ্টিফেন কলেজে অধ্যাপনা সুরু করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বিচার বিভাগে যোগদান করে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জেলা ও দায়রা জজরূপে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি পঞ্চকোট রাজ-এষ্টেটের জেনারেল ম্যানেজার ও কলকাতা পৌরসভার তদন্ত কমিশনের সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে রায়-মন্ত্রিসভায় শিক্ষা ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। শিক্ষামন্ত্রিরূপে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে সর্বার্থ-সাধক বিদ্যালয় স্থাপনে, মাধ্যমিক শিক্ষায় একাদশ শ্রেণী ও সেই সঙ্গে কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে পান্নালাল স্মরণীয় হয়ে রইলেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও এঁর অবদান স্বীকৃত। কবিগুরুর 'ক্ষুধিত পাষাণ'এর ইনি ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন। পান্নালালের মৃত্যু নিঃসন্দেহে দেশকে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করল—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মৃত্যুকালে ইনি একটি মেয়ে ও এগারোটি ছেলে রেখে গেছেন।

জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১০ই পৌষ ৮৫ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম ভারতীয় জন, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যাপনার খ্যাতি সারা ভারতের শিক্ষা-জগতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকার সঙ্গেও এঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বহু দিন ইনি এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন।

তুলসীচন্দ্র গোস্বামী

শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গোস্বামী-পরিবারের সন্তান পরলোকগত রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর পুত্র তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর গত ১৮ই পৌষ রাত্রে ৫৯ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ ও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরে এসে রাজনীতির সঙ্গে ইনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত হন। প্রথমে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্যদলে যোগ দেন ও ঐ দলেরই মনোনীত প্রার্থিরূপে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০ খৃঃ পর্যন্ত এই দলে থাকাকালীন কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের চীফ হুইপ, মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে বিরোধী দলের সহকারী নেতা—প্রভৃতি পদে সমাসীন ছিলেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ খৃঃ পর্যন্ত ইনি বঙ্গীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন ও ঐ সময়ে অবিভক্ত বঙ্গের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্রধান সম্পাদকরূপে দেশবন্ধুর 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সঙ্গেও ইনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাগ্মিতায় এঁর অসামান্য খ্যাতির পরিচয় দেশের ও বিদেশের বহু বিদগ্ধ সুধীজনকেও মুগ্ধ করেছে। তৎকালীন বাঙলার পঞ্চ-প্রধানের ইনি ছিলেন অন্যতম। বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ব্যতীত পঞ্চ-প্রধানের আর কোন প্রধানই জীবিত রইলেন না।

বিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত বাকুলিয়া হাউসের রায়বাহাদুর বিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায় ৭১ বছর বয়সে বায়ু পরিবর্তনোপলক্ষে কাশীধামে বাসকালীন মঙ্গলবার ২৪এ পৌষ দেহান্তরিত হয়েছেন। বাঙলার ব্যবসায় ও সমাজ-জগতে বিনোদগোপালের অবদান অনস্বীকার্য। 'যুগান্তর' ও অন্যান্য আরো কয়েকটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিনোদগোপালের যোগাযোগ ছিল।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ছেলেভুলানো ছড়া

গত মাঘ সংখ্যা মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার চিঠি পর্য্যায়ে অগ্রহায়ণ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত আমার সংগৃহীত ছেলে-ভুলানো ছড়াটির উপর শ্রীবৈদ্যনাথ মৈত্র মহাশয়ের চিঠি পড়লাম। এ ছড়াটি উত্তর-রাজসাহী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। বিগত কয়েক বৎসর ধরে আমার অজস্র ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে নানা অঞ্চলের ছড়া সংগৃহীত হয়েছে। একই ছড়ায় অঞ্চল ভেদে নানা পাঠভেদ পরিলক্ষিত হয়। এ ছড়াটি প্রথমতঃ 'ইটাকুমুরের পূজার' মন্ত্র (শোলোক) হিনাবেই সম্ভবত ব্যবহৃত হ'ত। কিন্তু কালের গতিতে সম্ভবত এর ছন্দ-মাধুর্য্যের জন্য, একদা একে দেখা গেল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে। এ ছড়াটিরও প্রায় ৪।৫টি নমুনা আমার নিকট সংগৃহীত আছে। নানা অঞ্চলে এ নানা ভাবে বর্ণিত হচ্ছে। শেষের দিকে কোন কোন স্থানে "ভালো কইরা কামাই কইরা যাইও শ্বশুর বাড়ী মধুর হাঁড়ি খাইও দিন চারি"···ইত্যাদি আছে। প্রাচীন সংগৃহীত ছড়ারও অধিকাংশ জুড়ে আছে "মাতৃহৃদয়ের যুগল দেবতা খোকা খুকুর স্তব" (লোকসাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসাহিত্য শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য) দ্রষ্টব্য ; যা ছড়িয়ে আছে তাইতো ছড়া ; "শিবঠাকুরের বিয়ে হ'লো তিন কন্যে দান" এ শিবঠাকুর কোন কোন অঞ্চলে একেবারে 'কুলীন-ব্রাহ্মণ' আবার কোন স্থলে ইনি 'শিবাঠাকুর' অর্থাৎ শিয়াল বা শৃগাল! সেদিক বিচারে একে অনায়াসে 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' পর্য্যায়ে ফেলে এর ক্রমধারা ইতিহাস নিরীক্ষণ করা যায়। শ্রীযুক্ত মৈত্র মহাশয় আগামী সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে তাঁর কৃত 'ইটাকুমুরের পূজা'র সম্পূর্ণ ছড়াটি পাঠক-পাঠিকার চিঠি-পত্র পর্য্যায়ে প্রকাশ করলে ছড়া সম্বন্ধে গবেষণাব্রতী অনেকেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হবেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত : অগ্রহায়ণ সংখ্যার ছড়াটির ৫ম পংক্তির শেষ শব্দ 'বুড়ি' ভুলে 'ড়ি' হয়েছে এবং দ্বাদশ পংক্তির প্রথম শব্দ 'বউ' ভুলে 'বেই' ছাপা হয়েছে। আমার সংগৃহীত ছড়াগুলি বসুমতীতে মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হ'বে। আশরাফ সিদ্দিকী। অধ্যাপক রাজশাহী কলেজ।

পত্রিকা সমালোচনা

আমি 'মাসিক বসুমতী'র নিয়মিত গ্রাহক না হইলেও পাঠক। গত আশ্বিন সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে "বৈদ্যগণ চিকিৎসা করুন"—এই শিরোনামায় আপনি লিখিয়াছেন, "চিকিৎসক হওয়া বা চিকিৎসা করা বৈদ্যজাতির প্রধানতম অবলম্বন। বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ যে অভিন্ন শাস্ত্রেও তার ভূরি ভূরি প্রমাণ মিলছে।" তার পর আপনি মনুসংহিতা, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, কুল্লুকভট্ট, অমরকোষ ইত্যাদি হইতে শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া আপনার মন্তব্য সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। "চিকিৎসক হওয়া বা চিকিৎসা করা বৈদ্যজাতির প্রধানতম অবলম্বন"—আপনার এ বাক্য সম্বন্ধে আপত্তির কিছুই নাই। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটি সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। স্বর্গীয় বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত—"ভারত হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র সংস্কার এবং জাতিতত্ত্ব প্রচার সমিতি" হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত একটি পুস্তিকায় দেখিলাম যে, শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর গুপ্ত-শর্ম্মা নামক কোনও কবিরাজ মহাশয় তদ্‌লিখিত—"বৈদ্য-পুরাবৃত্ত" (১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণ) নামক গ্রন্থে অকাট্য যুক্তি সহযোগে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ ত' নয়ই পরন্তু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। এই প্রসঙ্গে তিনি মনুসংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, মহাভারত, গীতা এমন কি বেদেরও বহু শ্লোক কৃত্রিম বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। মনুসংহিতা কৃত্রিমতা পূর্ণ হওয়ায় তাহার টীকাকার কুল্লুকভট্ট, মেধাতিথি প্রভৃতির গ্রন্থও ভ্রান্তিমূলক। অমর সিংহ প্রভৃতি কোষশাস্ত্রকারগণ তৎ-পরবর্ত্তী যুগের লোক, তাঁহারা উক্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ গ্রন্থে যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন—সুতরাং তাঁহাদের উক্তি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য নহে। উক্ত গুপ্তশর্ম্মা মহাশয় শুধু ইহা প্রমাণ করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গের দ্বারা উহা স্বীকার করাইয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা লিখিত ভাবে স্বীকৃতি জানাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, বঙ্গবাসী কলেজের গীতা ও উপনিষদের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং স্বর্গীয় বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৌখিক ভাবে সমর্থকদিগের মধ্যে সমসাময়িক নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কামাখ্যা-নাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ই প্রধান। প্রথমোক্ত পণ্ডিতবর্গ যে লিখিত বিবৃতি দ্বারা শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়কে সমর্থন জানাইয়াছিলেন—তাহাও ঐ পুস্তিকাটিতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শঙ্খ সংহিতা ও কাত্যায়ন সংহিতায় দায়ভাগ সম্বন্ধে বৈদ্য ও অবৈদ্য শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। ভুবনেশ্বর কবিরাজ ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, ভরদ্বাজাদি বৈদ্যগণের সন্তানগণ মধ্যে যাঁহারা বেদাদি পারগ নহেন—তাঁহারাই অবৈদ্য দ্বিজ ব্রাহ্মণ নামে কথিত ছিল। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও ইহা অসত্য প্রমাণের কোন উপায় দেখিলাম না এবং এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া বুঝিতে

পারিলাম যে, আমরা এতদিন প্রকৃত বৈদ্য-তত্ত্ব জানিতে পারি নাই বলিয়াই বৈদ্যকে অম্বষ্ঠাদি মনে করিয়াছি। কিন্তু এখন আমরা ভরদ্বাজাদিকে বৈদ্য স্বীকার করিয়া বৈদ্যের অবৈদ্য সন্তান বলিয়া পরিচয় দেওয়া গৌরবের বিষয় বলিয়াই মনে করি। বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় অনুরূপ মন্তব্যই করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদের মন্তব্য পৃথক ভাবে উল্লেখ করিয়া পত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না। আমার মনে হয় যে, আপনি যে সমস্ত শাস্ত্র-উক্তি দ্বারা বৈদ্যগণকে অম্বষ্ঠ প্রমাণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, উক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ সেগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যখন তাঁহারা উপরিলিখিতরূপ মন্তব্য করিয়াছেন তখন উক্ত কবিরাজ মহাশয় প্রদত্ত যুক্তি প্রমাণকে উপেক্ষা করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হইবে না। বিশেষতঃ কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে গেলে তাহার অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়বিধ যুক্তি প্রমাণই বিচার করা উচিত। প্রয়োজন বোধ করিলে এ পত্রটি আপনার চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশ করিতে পারেন। শ্রীআশীষকুমার সেন। ১ জয়নারায়ণ ব্যানার্জ্জী লেন। বরাহনগর, কলিকাতা—৩৬

মাসিক বসুমতীর ১৩৬২র আষাঢ় সংখ্যায়, ৪১৭ পৃষ্ঠায় একটি কবিতা পড়িলাম। কবিতাটির নাম 'আমি ভালবাসি না', কবি শ্রীশান্তিভূষণ রায়। কবিতাটি শ্রীশান্তিভূষণ রায়ের নিজের লেখা না অনুবাদ, এ বিষয়ে কোন মন্তব্য নেই। অথচ কবিতাটি Caroline E. S. Norton-এর একটি কবিতার সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ। কবিতাটি Pulgrave's Golden Treasury-র ৩৪১ পৃষ্ঠায় আছে। যদি কবি কবিতাটি নিজের নামে চালাতে চেয়ে থাকেন, তবে এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়! অচ্যুতকুমার ঘোষ। মহারাজগঞ্জ, বিহার।

১৩৬৩ অগ্রহায়ণ সংখ্যার "চার জন" শীর্ষক অধ্যায় সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। উক্ত অধ্যায়ে ডাঃ কুমারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের জীবন-আলেখ্যে একটি অতি মারাত্মক ভুল সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ডাঃ ঘোষ ভারতীয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কখনই "ব্রেণ টিউমার" অপারেশন করেন নাই। এমন কি বাঙালীগণের মধ্যেও উনি এক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম নহেন। কলিকাতা সহরে সর্ব্বপ্রথম "ব্রেণ টিউমার" অপারেশনের প্রচেষ্টা করেন ডাঃ উমাপদ মুখোপাধ্যায় এম্ এস, আর, জি, কর মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের পরবর্ত্তীকালে মেডিকেল কলেজের পূর্ব্বতন অধ্যাপক ডাঃ প্রভাত সান্যাল (অধুনা পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে সন্ন্যাসধর্মী) দুই তিনবার "ব্রেণ টিউমার" অস্ত্রোপচার করেন। ভারতীয়গণের মধ্যে সর্বপ্রথম "ব্রেণ টিউমার" অপারেশন করেন গোয়ালিয়র মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ বি, কে বালকৃষ্ণরাও। ইহার পরবর্তী যুগে ভেলোরের ডাঃ জ্যাকব চাণ্ডি, মাদ্রাজের ডাঃ রামমূর্তি, বোম্বাইএর ডাঃ গ্রিণ্ডে ও কলিকাতায় লেখক স্বয়ং এবং ডাঃ আর এন চ্যাটার্জি (বর্তমানে বিদেশে শিক্ষা-ব্যপদেশে নিবিষ্ট) ব্রেণ টিউমার অপারেশন করিয়া থাকেন। আশা করি, সত্যতার স্বার্থে আপনি আমার এই পত্র আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন অথবা ভ্রম সংশোধন-বার্তা প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন। শ্রীঅশোক বাগচী,৮, রোল্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—২০

মহাশয়, আপনাদের অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকায় 'চার জনে' আমার জীবনী-প্রসঙ্গে যাহা লেখা হইয়াছে, তন্মধ্যে "ভারতের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ব্রেণ টিউমার অপারেশন করেন ও তাঁর পূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় হাসপাতালে ব্রেণ টিউমার অপারেশন হয়নি।" এই লেখাটি ভ্রমবশত ছাপা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে ইহার পূর্ব্বেও ভারতে অনেকে এই অপারেশন করিয়াছেন। সেজন্য এ সম্বন্ধে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম।—ডাঃ কুমারকান্তি ঘোষ। কলিকাতা-২০।

দীর্ঘ দিন ধ'রে মাসিক বসুমতীর আমি গ্রাহিকা। অন্যান্য সমস্ত পত্র-পত্রিকার মধ্যে মাসিক বসুমতীর স্থান আমার কাছে সর্বোচ্চে। বর্তমানে নানাবিধ রচনা-সম্ভারে এবং নতুন নতুন বিভাগ সংযোজনে বসুমতী যেন আরও অপূর্ব হয়ে উঠেছে। উদয়ভানুর 'রাজায়-রাজায়' উপন্যাসের তুলনা হয় না। নীলকণ্ঠের 'অন্ত ও প্রত্যহ' বাঙলার ঘরে ঘরে নিশ্চয়ই সমাদর লাভ করবে। সমাজের একটি বিশেষ দিকের মুখোস খুলে দিচ্ছেন তিনি। তা ছাড়া বিজ্ঞানবার্তা, খেলাধূলা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, সাময়িক প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিভাগগুলি সত্যই প্রশংসনীয়। 'পত্রগুচ্ছ' বিভাগটি আপনার সম্পাদনার কৃতিত্বের স্বাক্ষর ঘোষণা করছে। শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠির দেশ' মাত্র এক পাতা কি দু' পাতা করে বেরোচ্ছে। এদিকে আপনি দয়া করে একটু দৃষ্টি দিন। সারা মাসে একটি ধারাবাহিক উপন্যাসের আয়তনের এরূপ হ্রস্বতা পাঠক-মনে বিরক্তির সৃষ্টি করে। শ্রীমতী নন্দিতা সেন, গোধূলিয়া, কাশী।

পুরাতন সংখ্যার কেনা-বেচা

কার্তিক ১৩২৯ থেকে ১৩৩২ সালের মাসিক বসুমতীর সংখ্যাগুলি বেচতে চাই। শ্রীনির্মলেন্দু মিত্র, ৮৩ বাবুরাম ঘোষ রোড, টালিগঞ্জ, কলকাতা-৪০।

১৩৫৭ থেকে ১৩৬২ সালের মাসিক বসুমতীর সমস্ত সংখ্যাগুলি বেচতে চাই। মূল্য ৯৲, ১২৲, ১৫৲-র স্থলে যথাক্রমে ৬৲ ও ৯৲। একসঙ্গে ছয় বছরের কিনলে বছরের এক টাকা হিসাবে কমদামে পাবেন। শ্রীননীলাল দত্ত, ৬০ কৈবর্তপাড়া লেন, সালখিয়া, হাওড়া।

কার্তিক ১৩৫৬, জ্যষ্ঠ ১৩৫৮, আশ্বিন, কার্তিক ও চৈত্র ১৩৫৯, শ্রাবণ ১৩৬১ ও ফাল্গুন ১৩৬২ সালের বসুমতীর সংখ্যাগুলি কিনতে চাই। শ্রীঅশোকলাল গোস্বামী, ১বি নেবুতলা রো, কলকাতা-১২।

বৈশাখ ও পৌষ ১৩৫৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র ১৩৫৯ ও ভাদ্র ১৩৬২ সালের মাসিক বসুমতীর সংখ্যাগুলি কিনতে চাই। এগুলি দিতে পারলে যদি প্রয়োজন হয় তো ১৩৫৬ সালের আশ্বিন সংখ্যাখানি বিনামূল্যে পেতে পারেন। শ্রীগোপেশ্বর সরকার, গ্রাম ছাউতরা, পোঃ সাঁইথিয়া, জেলা বীরভূম।

(জলরঙ)

বুদ্ধ, অজন্তা গুহা

—শ্রীঅজিত গুপ্ত অঙ্কিত

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

সপ্তপদী

(গল্পগ্রন্থ)

দাম : ১৸০

"......অনেক দিন পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নূতন গল্পের বই প্রকাশিত হল, এতে সবাই খুশী হবেন। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে গল্পকার হিসাবে দান ও স্থান সর্ব্বোচ্চ তলায়, তাঁর নূতন লেখার সন্ধান কে না করেন...?" —যুগান্তর

আশুতোষ ঘটক

আকাশ-পাতাল

(উপন্যাস)

দাম : ১ম—৫৲ : ২য়—৫৸০

"......এ কলকাতার চেহারাই আলাদা। অপচয়ের যুগ। দু হাতে ছড়িয়ে ছিটিয়েও শেষ হয় না। মুঠো মুঠো টাকাই শুধু নয়, মুঠো মুঠো যৌবন। ঘোড়ায় টানা ট্রাম, ঢিমে তেতালায় পাল্কি'র দোলন, বেলোয়ারী কাচের ঠুং ঠাং ছন্দের তালে তালে সুরা আর নারীর উৎসব।...লেখক যে এই উপন্যাসে ইতিহাসকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেও কালজয়ী হয়েছেন, time ও spaceকে অতিক্রম করে তুলতে পেরেছেন তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের ও গৌরবের...।"—দেশ।

দিলীপকুমার রায়ের

অঘটন আজো ঘটে

(উপন্যাস)

দাম : ৪৷৷০

বর্তমান বস্তুতন্ত্রবাদের দিনে অঘটন বা মিরাকেল-এর সম্ভাবনায় মানুষের মন সায় দেয় না ; কিন্তু অঘটন তবুও ঘটে। স্বনামধন্য সুরসাধক ও সাহিত্যসাধক দিলীপকুমার শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-প্রেরণায় আজ অধ্যাত্ম-সাধকে রূপান্তরিত। তাঁর সেই দিব্য-সাধনার অনুভূতি ও উপলব্ধি রঞ্জিত 'অঘটন আজো ঘটে' সাবলীল ভঙ্গীতে বর্ণিত রহস্যঘন উপন্যাস।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

সাগর থেকে ফেরা

(কবিতাগ্রন্থ)

দাম : ৩৲

"......কবিতাকে তক্ষণশিল্পে পরিণত করার চাইতে গভীর অনুভব ও মহৎ ভাবকে কাব্যরূপ দেবার দিকেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের লক্ষ্য। কৃত্রিম সঙ্কীর্ণ চতুর কোন সভ্য মানুষ নয়, এক সহজ বিশাল নিঃসঙ্গ জীবনের অন্বয় খুঁজে নেবার জন্য তাঁর এই সমুদ্র পরিক্রমা।......"
—শনিবারের চিঠি

দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্ম-জীবন-চরিত

(জীবনী)

দাম : ৩৲

নদীয়া রাজার দেওয়ান এবং কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জনক কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়। সততার প্রতিমূর্তি, তেজস্বিতার বিগ্রহ, প্রভুভক্তির দৃষ্টান্ত, সুগায়ক, সুকবি এবং একজন উঁচু দরের মনীষী ও সাহিত্যিক ছিলেন কার্ত্তিকেয়চন্দ্র। তাঁহার এই আত্মচরিতে শতবর্ষ পূর্ব্বেকার বাঙলার সমাজচিত্র এবং বাঙালীর জীবনচিত্র মূর্ত হইয়া আছে। ইহাতে আছে তখনকার কালে পাঠশালাতে ছাত্রদের অবস্থা, নব জামাতার সহিত নববধূর সখীদের মেলামেশার বিবরণ, ভদ্র সমাজের সহিত গণিকালয়ের সম্পর্ক, কৌলীন্যপ্রথার ফলাফল, প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক, সামাজিক আচার ব্যবহার, বাঙালীর বীরত্ব ও রণপ্রিয়তা, ম্যালেরিয়ার উদ্ভব ও বিস্তার প্রভৃতি নানাবিধ রাশি রাশি বিষয়ের নিখুঁত চিত্রণ। রচনা এতই উচ্চ শ্রেণীর যে লেখক যেমন বিদ্যাসাগর বঙ্কিম দীনবন্ধুর বন্ধু ছিলেন, তাঁহার রচনাও তেমনি তাঁহাদের রচনারই সমপর্য্যায়ের—একথা অকুণ্ঠ ভাবেই বলা যায়।

গোকুল নাগের

পথিক

(উপন্যাস)

দাম : ৬৷৷০

মাত্র একখানি উপন্যাস 'পথিক' রচনা করেই গোকুল নাগ পরলোক গমন করেন, কিন্তু সেই একখানি 'পথিক'ই সাহিত্যের সেই তরুণ পথিককে বাংলা সাহিত্যে অমর করে দিল। ত্রিশ বৎসর পরে সেই অবিস্মরণীয় 'পথিক' পুনঃ প্রকাশিত হল।

[illegible]ন গঙ্গোপাধ্যায়ের

তখন আমি জেলে

(রাজবন্দীর কাহিনী)

দাম : ৬৲

বিপ্লবী বাংলার অগ্নিগর্ভ দিনের কাহিনী। বিদেশী শাসকের চাপে তখন কেউ জানতে পারেনি বিপ্লবী কার্য্যকলাপ আর বিপ্লবীদের ভেতরকার কথা। ফাঁসীর মঞ্চ, আন্দামান আর কারান্তরালে অনেক ঘটনাই চাপা পড়ে গেছে। লেখক নিজে যুক্ত ছিলেন সেদিনকার বাংলার এক নাম-করা বিপ্লবী দলে। তাই তিনি বহু বিস্মৃত ঘটনাকে পরিবেশন করতে পেরেছেন তাঁর এই সুবৃহৎ গ্রন্থে। ঘটনা আর তথ্যকে অধিকৃত রেখেও এই বই লেখা হয়েছে মূলতঃ উপন্যাসের ভঙ্গীতে।

স্মরণীয় বই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

আমাদের বই

পেয়ে ও দিয়ে

সমান তৃপ্তি।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

যাহা চাওয়া যায়
তাহা পাওয়া যায়
ধন-ঐশ্বর্য্য
কন্তু
আপনি ইচ্ছামত একটী সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কেশতৈল অনায়াসে পাইতে পারেন। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত 'হিমকল্যাণ'ই আপনার কেশতৈল নির্ব্বাচন-সমস্যা সমাধানে সক্ষম। ইহার কল্যাণ পরশে যাবতীয় কেশরোগ নিরাময় ও মস্তিষ্ক শীতল হয়। দীর্ঘদিন নিয়মিত ব্যবহারেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।
ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যাণ
আয়ুর্ব্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ সুরভিত কেশতৈল।
HIMKALYAN
HAIR OIL
অন্যান্য প্রসাধনী
• পামিকোকো
সুরভিত নারিকেল তৈল
• হিমকল্যাণ
ক্যাষ্টর অয়েল
সুগন্ধিত কেশতৈল
• ভৃঙ্গামলা মহোপকারী কেশতৈল
• যোজনগন্ধা সুরভি নির্য্যাস
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ
কলিকাতা
UPCO

৩৫শ বর্ষ—মাঘ, ১৩৬৩] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [দ্বিতীয় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। "আরোপ করলে ভাব বদ্‌লে যায়। প্রকৃতি ভাব আরোপ করলে ক্রমে কামাদি রিপু নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মত ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায়। যাত্রাতে যারা মেয়ে সাজে, তাদের নাইবার সময় দেখেছি, মেয়েদের মত দাঁত মাজে, কথা কয়।"

"জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় কি রকম করে? আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ করতে হয়। আমি অনেক দিন সখীভাবে ছিলাম। মেয়েমানুষের কাপড়, গয়না পরতাম, ওড়না গায়ে দিতাম, ওড়না গায়ে দিয়ে আরতি করতাম।"

"সেজ বাবু আর সেজ গিন্নি যে-ঘরে শুত, সেই ঘরেই আমি শুতাম। তারা ঠিক ছেলেটির মতন আমায় যত্ন করতো। তখন আমার উন্মাদ অবস্থা। সেজ বাবু বলতো—বাবা, তুমি আমাদের কোন কথাবার্ত্তা শুনতে পাও? আমি বললাম, পাই।"

"আমার বালকের অবস্থা আজ বলে নয়। সেজো বাবুকে হাত দেখাতাম, বলতাম,—হ্যাগা, আমার কি অসুখ করেছে?"

"সেজ গিন্নি সেজ বাবুকে সন্দেহ করে বলেছিল,—যদি কোথাও যাও, ভট্টচায্যি মশায় তোমার সঙ্গে যাবেন। এক জায়গায় গেলো, আমায় নীচে বসালে। তার পর আধ ঘণ্টা পরে এসে বললে,—চল বাবা, চল বাবা গাড়ীতে উঠবে চলো। সেজ গিন্নি জিজ্ঞাসা করলে, আমি ঠিক ঐ সব কথা বললাম। আমি বললাম,—বসালে, উপরে আপনি গেল। আধ ঘণ্টা পরে এসে বললে,—চল বাবা, চল বাবা। সেজ গিন্নি যা হয় বুঝে নিল।"

"সেজ বাবুর ভাব হলো। সর্ব্বদাই মাতালের মতন থাকে। কোনও কাজ করতে পারে না। তখন সবাই বলে, এরকম হলে বিষয় দেখবে কে? ছোট ভট্টচায্যি নিশ্চয় কোন তুক্ করেছে।"

"কালীঘাটের চন্দ্র হালদার সেজ বাবুর কাছে প্রায় আস্‌তো। আমি ঈশ্বরের আবেশে মাটিতে অন্ধকারে পড়ে আছি। চন্দ্র হালদার ভাবতো, আমি ঢং করে ঐ রকম করে থাকি, বাবুর প্রিয়পাত্র হব বলে। সে অন্ধকারে এসে বুট জুতার গোঁজা দিতে লাগলো। গায়ে দাগ হয়েছিল। সবাই বললে, সেজ বাবুকে বলে দেওয়া যাক্। আমি বারণ করলাম।"

"ভক্তিপথেও অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ আপনি হয়। আর সহজে হয়। ঈশ্বরের উপর যত ভালবাসা আসবে, ততই ইন্দ্রিয়সুখ আলুণি লাগবে। যেদিন সন্তান মারা গেছে, সেই শোকের উপর স্ত্রী-পুরুষের দেহ সুখের দিকে কি মন থাকতে পারে?"

"শ্রীকৃষ্ণের শিরে ময়ূর-পাখা। ময়ূর-পাখাতে যোনি চিহ্ন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে মাথায় রেখেছেন। কৃষ্ণ রাসমণ্ডলে গেলেন, কিন্তু সেখানে তিনি নিজে প্রকৃতি হলেন, তাই দেখ, রাসমণ্ডলে তাঁর মেয়ের বেশ। নিজে প্রকৃতি ভাব না হলে প্রকৃতি সঙ্গের অধিকারী

ইচ্ছাশক্তির প্রভাব

নিত্যরঞ্জন গুহঠাকুরতা

পিতা যতই শক্তিমান্ অথবা যশস্বী হউন না কেন, পুত্রের পক্ষে তাঁহার ইঙ্গিত দানও অত্যন্ত সঙ্কোচের বিষয়।

এ কথা সম্পূর্ণরূপে অবহিত হইয়াও "ইচ্ছাশক্তির প্রভাব" তত্ত্বটি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ধারণা ব্যক্ত করিতে সসঙ্কোচে আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার জীবনের কয়েকটি ঘটনার পুনরুল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম।

আশা করি, পাঠক ইহাতে আমার অন্য কোন অভিসন্ধি আছে বলিয়া সন্দেহ করিবেন না।

১৮৯২ সনে পিতৃদেব যখন ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন, তখন তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু ঢাকা গেণ্ডারিয়ায় থাকিতেন।

সেই বৎসর ১০ই মাঘ ব্রাহ্মসমাজের নগর-সংকীর্ত্তনের জন্য নির্দ্ধারিত হয়। সকালে সামাজিক উপাসনার পরে সকলে নগর-সংকীর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, ১টার সময়ে কীর্ত্তন বাহির হইবে। বেলা প্রায় ১১টার সময়ে ৩।৪টি অপরিচিত যুবক পিতৃদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন যে, গেণ্ডারিয়া আশ্রম হইতে গোঁসাইজীর (শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর) নির্দ্দেশানুসারে তাঁহারা পিতৃদেবের নিকট আসিয়াছেন। ব্যাপারটি এই যে, একটি নব্য উকীল আজ কয়েক দিন একটা উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার শরীর সুস্থ এবং সবল ছিল, হঠাৎ একদিন দেখা গেল তিনি শয়ন করিয়া আছেন। কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেছেন না। এমন করিয়া দাঁতে দাঁত লাগাইয়া আছেন যে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত তল করাইবার উপায় নাই।

দু'-তিন দিন নিরম্বু উপবাসে থাকায় তাঁহার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়াছে যে, এখন প্রকৃত পক্ষে উত্থানশক্তি আছে কি না সন্দেহ! ডাক্তার-কবিরাজগণ কিছুই প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না।

অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে, এই অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, কোন দৈব প্রতিকার আছে কি না, জানিবার জন্য যুবকগণ শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর নিকট উপদেশ লাভ করিতে গিয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভু পিতৃদেবের নিকট সকল কথা বলিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিতে যুবকদিগকে উপদেশ দিয়াছেন।

উক্ত উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত উকীলের বিধবা মাতা ও বালিকা বধূর দুঃখের দোহাই দিয়া এই সকল কথা পিতৃদেবকে বলিলেন। তখন মাঘোৎসব তাঁহার মাথায় ষোল আনা অধিকার করিয়া আছে। এই নূতন ব্যাপারটি তাঁহার মস্তিষ্করাজ্যে সহসা একটা বিপ্লব উপস্থিত করিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহার প্রতি কেন এইরূপ আদেশ হইল এবং কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি ঐ উকীলটিকে আরোগ্য দান করিবেন। যাহা হউক, তিনি যুবকদিগের সঙ্গে রোগীর বাড়ীতে গেলেন। শাঁখারী বাজারে একটি বাড়ীতে দোতলার ঘরে রোগী মাটিতে পড়িয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিলে জীবিত কি মৃত ঠিক বুঝা যায় না। তিনি গৃহে প্রবেশ করিলে রোগীর মাতা সে ঘর পার্শ্বনাথ (পরেশ বাবু) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উকীল বাবুর বিশেষ বন্ধু। পিতৃদেবকে কি করিতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলেন যে, তিনি চক্ষু বুজিয়া প্রার্থনা করিবেন, সেই অবস্থায় মনে যাহা উদিত হইবে তাহাই গুরুদেবের ইচ্ছা বলিয়া মানিয়া লইবেন। তিনি পরেশ বাবুকে এবং তাঁহার সঙ্গী যুবকদের বাহিরে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা সকলেই বাহিরে গেলেন। তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া রোগীর নিকটে বসিলেন, মনে হইল যেন "শবসাধনা করিতে বসিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার শরীরে বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় একটা বিশেষ শক্তি অনুভব করিলেন। সে শক্তি তাঁহার শরীরে ও মনে এমনই বলের সঞ্চার করিল যে তাঁহার মনে হইতেছিল, তিনি ইচ্ছা করিলেই এই রোগীকে আরোগ্য প্রদান করিতে পারিবেন। তৎক্ষণাৎ তিনি রোগীর একখানা হাত শক্ত করিয়া ধরিলেন। রোগী চক্ষু মেলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইলেন। তিনি সজোরে বলিলেন "উঠিয়া বসুন।" অমনি তিনি উঠিয়া বসিলেন। তিনি রোগীর উভয় হস্ত তাঁহার উভয় হস্ত দ্বারা শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিলেন "শান্তিঃ শান্তিঃ, শান্তিঃ" অমনি রোগী বলিয়া উঠিল "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ"।

ক্রমশঃ তাঁহার মনের বল অধিক হইতে অধিকতর হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "আপনার কোন ব্যাধি নাই।" রোগী সহাস্য মুখে বলিলেন "না, আমার কোন ব্যাধি নাই।" তিনি বলিলেন "এখনই আপনাকে কিছু খাইতে হইবে।" রোগী বলিলেন "আপনি বলিলেই খাইব।" তিনি দরজা খুলিয়া সকলকে ডাকিলেন, অন্তরাল হইতে ইহারা তাঁহাদের পরস্পরের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। দরজা খোলা হইলে পরেশ বাবু এবং রোগীর মাতা সবেগে ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের তখনকার মনের ভাব, বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতা তাঁহাদের বাক্যে ও মুখশ্রীতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল। পিতৃদেবের আদেশ ক্রমে এক পোয়া হালুয়া আনান হইল এবং তাঁহার অনুরোধে রোগী এতই ব্যস্ততার সহিত উহা খাইতেছিলেন যে, হালুয়া গলায় ঠেকিয়া যাইতেছিল কিন্তু ভোক্তার সে দিকে দৃষ্টি রাখার শক্তি ছিল না! তিনি জলপান করিতে বসিলেন, জলপান করিয়া দুই মিনিটের মধ্যেই তিনি খাদ্য নিঃশেষ করিলেন। রোগীর ঘরে তাঁহার প্রবেশ হইতে তাঁহার আরোগ্যলাভ ও হালুয়া ভক্ষণ কার্য্য সম্পন্ন হইতে আধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগে নাই, হালুয়া আনিতেই অধিকাংশ সময় গিয়াছিল। রোগীর হাতে একখানি গীতা দিয়া তিনি বলিলেন, "উহা পাঠ করিতে থাকুন, নিয়মিতরূপে আহার করুন, কথা বলুন এবং মনে রাখুন যে, আপনি আরোগ্যলাভ করিলেন।"

রোগী বলিলেন, "তাহাই করিব।" তিনি নিজে বিস্ময়মগ্ন হইয়া প্রচার-আশ্রমের (বাসার) দিকে চলিলেন। যখন সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন তখন অনতিউচ্চ রমণী-কণ্ঠ হইতে নির্গত এই কথা তাঁহার কানে প্রবেশ করিল—"এ লোকটি মানুষ না দেবতা!" সেই হইতে পিতৃদেব এই অদ্ভুত শক্তি লাভ করিলেন।

[illegible] শ্রীগুরুদেব শিরো[illegible]

মধ্যে এই শক্তি প্রদান করিবেন বলিয়াই কৌশল করিয়া যুবকদের তাঁহার নিকট পাঠাইলেন এবং উপযুক্ত ও প্রিয় শিষ্যকে এই শক্তি প্রদান করিলেন।

রোগ আরোগ্য করিয়া কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করা গুরুদেবের নিষেধ ছিল।

ইহার পরে পিতৃদেব ঢাকা হইতে বরিশাল যাইবার পথে তাঁহার দিদির দেশে নরোত্তমপুর গ্রামে কয়েক দিন অপেক্ষা করিলেন। সেখানেও এক অদ্ভুত ঘটনা হইল। নরোত্তমপুরের নিকটবর্ত্তী বাগপুর গ্রামে ঈশানচন্দ্র সরকার নামক একটি যুবক তিন মাসের অধিক হইতে অতি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, পীড়ার প্রকৃতি সেই ঢাকার উকীলের পীড়ার মতন কিন্তু দীর্ঘকাল ভুগিয়া এই যুবকের শেষ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। গত তিন মাসের মধ্যে কোন কোন দিন বিশেষ চেষ্টায় অতি অল্প খাদ্যই তাহার উদরস্থ হইয়াছে, সুতরাং শরীর একেবারে কঙ্কালসার। তিন মাস তাহার নিদ্রা নাই, বাক্যব্যয় নাই। আজ তাহার মৃত্যুর সম্ভাবনা জানিয়া গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ দলে দলে তাহাকে দেখিতে যাইতেছেন। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র তাঁহার মধ্যে একটা তীব্র শক্তি প্রবিষ্ট হইল। উক্ত যুবকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃদেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল।

ঈশানকে তিনি ভাল করিয়া চিনিতেন না, তথাপি তাহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হইল। গ্রামের অনেক গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে তিনিও রওয়ানা হইলেন এবং গিয়া দেখিলেন, ঘরের দাওয়ায় একখানা তক্তপোষের উপর রোগী পড়িয়া আছে, তাহার মুখ দিয়া গেঁজলা উঠিতেছে। বৃদ্ধা মাতা এবং অন্যান্য সকলে সজল নয়নে বসিয়া আছেন। তাঁহারা মনে করিতেছেন, রোগীর অবস্থা এখন-তখন। পিতৃদেব রোগীর কাছে একখানি ছোট টুলে বসিলেন। রোগীর দিকে যতই তাকাইতেছেন, ততই একটা অসাধারণ শক্তির আবির্ভাবে তাঁহার শরীর ও মন পূর্ণ হইতেছে।

ক্রমে ক্রমে সেই শক্তি ধারণ করিতে তিনি অসমর্থ হইলেন। তখন রোগীর একখানা হাত শক্ত করিয়া ধরিলেন, মনে হইতে লাগিল। বাঁধ কাটিয়া দিলে নদীর জল যেমন প্রবল বেগে খালে প্রবেশ করে, সেইরূপ তাঁহার শরীর হইতে অনাহূত দৈবশক্তি রোগীর শরীরে ছুটিয়া যাইতেছে, এবং তাঁহার ইচ্ছাশক্তি রোগীর ইচ্ছাকে পরাভূত ও অবসন্ন করিয়া তাহারই অনুগত করিতেছে। এই সময়ে তিনি তাহার কঙ্কালসার ডান হাতখানা সজোরে নাড়িয়া দিলেন। রোগী চমকিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশান, আমাকে চিনিতে পারিতেছ?" রোগী বলিল "আজ্ঞে হাঁ।" তিন মাসের পরে হঠাৎ কথা বলিতে শুনিয়া সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইল। প্রতি পলে পলে তাঁহার ভিতরে শক্তির স্রোত আসিতেছিল। সে শক্তি ধরণ করিতে না পারিলে তিনি হয়ত অভিভূত হইয়া পড়িতেন কিন্তু সে দান গ্রহণ করিবার পাত্র নিকটেই ছিল। তিনি সজোরে রোগীকে আদেশ করিলেন "ঈশান, উঠে বসো।" তৎক্ষণাৎ সে উঠিয়া বসিল। পুনরায় তিনি বলিলেন, "আমার সঙ্গে এসো।" তখনই সে দাঁড়াইয়া ভাল করিয়া কাপড়টা পরিল এবং তাঁহার সঙ্গে চলিল। তাঁহার মনে হঠাৎ আশঙ্কার উদয় হইল যে এইরূপ কঙ্কালসার মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে একেবারে ছাড়িয়া দিলে চলিতে গেলে হয়ত পড়িয়া যাইতে পারে; সুতরাং তিনি তাহার হাত ধরিলেন। সে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া বাহির বাড়ীর প্রাঙ্গণে (প্রায় ২০০ হাত দূরে) গেল। সেখানে পুকুরের ঘাটে তাহাকে বসাইয়া তিনি কয়েক গণ্ডুষ জল তাহার চক্ষে সজোরে ছিটাইয়া দিলেন এবং বলিলেন "তুমি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইলে, তোমার কিছুমাত্র ব্যাধি নাই।" ঈশান বলিল যে, তাহার কিছু অসুখ নাই। সে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। তিনি রোগীকে বাহির বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া গেলেন। তখন সে স্বাধীন ও স্বাভাবিক ভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছিল। তাঁহার আদেশক্রমে অল্পক্ষণের মধ্যে ভাত ও মুসুরির ডাল রান্না হইল এবং তাঁহার আজ্ঞায় ঈশান আসনে বসিয়া সুস্থ মানুষের মত নিজের হাতে তৃপ্তির সহিত আহার করিল। তিনি যখন বলিতেছিলেন যে, খাদ্য খুব চমৎকার লাগিতেছে। ঈশান তখন মাথা নাড়িয়া তাঁহার বাক্যের সত্যতার সাক্ষ্য দিতে দিতে গোগ্রাসে ডাল-ভাত উদরস্থ করিতেছিল। সকলে দেখিয়া অবাক! স্ত্রীলোকেরা পিতৃদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন, "ইনি মানুষ না দেবতা!" কিন্তু তিনি দেখিতেছিলেন যে, এই সকল কার্য্যের উপর তাঁহার নিজের কিছুই কর্ত্তৃত্ব নাই। গুরুশক্তি তাঁহার ভিতর দিয়া এই সব কার্য্য করিতেছে। তিনি সাক্ষীগোপাল মাত্র।

পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিয়া ঈশান তক্তপোষে বসিল। তিনি তাহাকে শুইতে অনুরোধ করিলেন। সে শয়ন করিলে, তাহার মাথায় হাত দিয়া তিনি বলিলেন, "দুই মিনিটের মধ্যে তুমি ঘুমাইবে, তোমার গাঢ় নিদ্রা হইবে, আগামী কল্য ৭টার সময়ে তোমার ঘুম ভাঙ্গিবে, প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া বেলা ৮টার সময়ে তুমি নরোত্তমপুরের রায় মহাশয়দের চারি বাড়ী বেড়াইয়া আসিবে"।

তাঁহার কথা সমাপ্ত হইলে ঈশান গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল, তিন মাসের পর প্রথম নিদ্রা। পরের দিন পিতৃদেব ঈশানের জন্য তাঁহার দিদির বাড়ীতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঠিক ৮টার কিছু পরে ঈশান তাঁহাদের নিকট হাজির হইল। তাহার পশ্চাতে অনেক বালক যুবক ও বৃদ্ধ, সকলের মুখেই "কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!" ঈশান সরকার সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ২০ বৎসরের অধিক কাল বিষয়-কার্য্য করিয়াছে।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া উন্মাদ এবং অন্যান্য কতকগুলি রোগীকে অচিরে আরোগ্য দান করেন। পিতৃদেবের বন্ধু স্বর্গীয় শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী উহা হইতে কয়েকটি ঘটনা "মিরার" নামক দৈনিক ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া নানা স্থান হইতে রোগী আসিতে লাগিল। তিনি নিয়ম করিয়া দিলেন যে, সপ্তাহের মধ্যে একমাত্র বুধবার রোগী দেখিবেন। কোন কোন বুধবার শতাধিক রোগীও উপস্থিত হইত। ইহাদের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকও আসিতেন।

একদিন সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তাঁহার দুই চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি চক্ষু খুলিবার অনুমতি দিবার পূর্ব্বে, ন্যায়রত্ন মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই চক্ষু খুলিতে পারিলেন না। ইহা হইতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, পিতৃদেব ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে নিশ্চয়ই রোগমুক্ত করিতে পারিবেন।

নববিধান সমাজের অন্যতম নায়ক মহাবাগ্মী প্রচারক স্বর্গীয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত যখন পিতৃদেবের প্রথম আলাপ হইল, সেই দিন পিতৃবন্ধু স্বনামধন্য স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের মুখে পিতৃদেবের নাম শুনিয়াই মজুমদার মহাশয় পিতৃদেবকে বলিলেন যে, তিনি ইচ্ছাশক্তির অলৌকিক কার্য্য (miracle) বিশ্বাস করেন। তিনি বলিলেন যে, যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে যে সব অলৌকিক কার্য্যের উল্লেখ আছে, সে সকল অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

একদিন বরিশালে স্বনামধন্য স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত, অধ্যাপক স্বর্গীয় জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং স্বর্গীয় পণ্ডিত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে তিনি কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। এমন সময়ে ব্রজমোহন কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক স্বর্গীয় কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পিতৃদেবের ইচ্ছা হইল যে, তাঁহাকে বোবা করিয়া রাখিবেন। সত্য সত্যই তাঁহাকে বোবা হইতে হইল। পণ্ডিত মহাশয় কথা বলিতে না পারায় অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইলেন এবং একটা পেন্সিল দিয়া একটু কাগজে লিখিয়া অশ্বিনী বাবুকে জানাইলেন যে, তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তিনি কথা বলিতে পারিতেছেন না। কিরূপে শিক্ষকতা করিবেন? অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে লইয়া তাঁহারা আমোদ করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় যখন বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, তখন অশ্বিনী বাবু পিতৃদেবকে তাঁহার মুখ খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। পিতৃদেব বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়, কথা বলুন"। অমনি তিনি হাঁ করিয়া মুখ খুলিয়া কথা বলিতে লাগিলেন এবং নিজেকে বিপদমুক্ত মনে করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

গয়াধামে বাসকালে একদিন ডাক্তার চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি মহাশয়ের বাড়ী গিয়া তিনি দেখিলেন, একটি যুবক বসিয়া কথা বলিতেছে। সে যুবকটি পোষ্টাফিসে সামান্য বেতনে চাকুরী করে। যুবকের চিবুকখানা অত্যন্ত বাঁকা দেখিয়া তিনি ঐরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবকটি বলিলেন যে, একবার জ্বর হইয়া ঐ অঙ্গটি বিকৃত হইয়াছে। পিতৃদেবের মনের মধ্যে শক্তি আসিল, তিনি চিবুকখানা ধরিয়া তৎক্ষণাৎ সোজা করিয়া দিলেন। উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হইলেন।

ডাঃ চন্দ্রনাথ বাবুর একটি ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ অমরনাথ, তীব্র জ্বর ও নিমোনিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন, চন্দ্র বাবু নিজে সুচিকিৎসক, তিনিই যুবকের চিকিৎসা করিতেছিলেন কিন্তু যুবক বলিয়া বসিল যে, পিতৃদেব তাহাকে ঝাড়িয়া দিলেই সে আরোগ্য লাভ করিবে। চন্দ্র বাবুর বিশেষ অনুরোধে তিনি তাহাকে ঝাড়িয়া দিলেন। সত্যই যুবকটি আরোগ্য লাভ করিল।

সুবিখ্যাত দার্শনিক ও অধ্যাপক স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, স্বর্গীয় ডাঃ নীলরতন সরকার, প্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকে তাঁহার ইচ্ছাশক্তির কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

তাঁহার এমন একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, যদি কোন ডাকাত তাঁহাকে কাটিবার জন্য তরোয়াল উত্তোলন করে, তবে তিনি সজোরে যদি বলেন "থামো" তৎক্ষণাৎ ডাকাতের হস্ত অর্দ্ধপথে থামিয়া

ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও লেখক শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র গণেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ডাক নাম "গন্ধ") পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া বহু কাল চলচ্ছক্তিরহিত হইয়াছিলেন। তিনি যে সময়ের কথা বলিতেছেন তখন তাহাকে এক স্থান হইতে সরিতে হইলে কচ্ছপের মতন চারি হাত-পায়ের উপর ভর দিয়া নড়িতে হইত। তাহার বয়স তখন ২৫.২৬ বৎসর। স্বর্গীয় রেবতীমোহন সেন ও পিতৃদেব একদিন গোয়াবাগানে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তিন জনে ঘরে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে গজকচ্ছপের মতন থপ-থপ করিয়া তাঁহাদের ঘরে প্রবেশ করিল এবং হাতজোড় করিয়া পিতৃদেবকে বলিল "আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমি দাঁড়াইবার শক্তি হারাইয়াছি।" তৎক্ষণাৎ তরতর বেগে তাঁহার মধ্যে শক্তির আবির্ভাব হইল। তিনি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এবং গণুর মাকে (যিনি ছেলের সঙ্গে আসিয়াছিলেন) ঘর হইতে বাহিরে যাইতে বলিলেন। রেবতী বাবু (তাঁহার গুরুভ্রাতা) তাঁহার কাছেই রহিলেন। তিনি গণুর হাত ধরিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে বলিলেন। যুবক তখনই তাহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহার হাতে একখানি লাঠি দিয়া বলিলেন, "এই লাঠি ধরিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া যাও"। সে তখনই লাঠি ভর করিয়া চলিয়া গেল। তাঁহারা সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইলেন। প্রচারক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "এইরূপ অদ্ভুত মিরাকেল (miracle) আমি কখনও দেখি নাই"। সেই দিন হইতে গণু যত কাল বাঁচিয়া ছিল সর্ব্বদাই লাঠি ভর করিয়া ভ্রমণ করিত। এই ঘটনা ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই জানেন।

বিখ্যাত ডাক্তার শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের আঙ্গুলে ছুরির আঘাত লাগিয়া বিষাক্ত ঘা হইয়াছিল। অসুখের যন্ত্রণায় তিনি নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। মরফিয়া ইনজেকশন্ দিয়াও কোন ফল দর্শিত না। সেই অবস্থায় পিতৃদেব ডাক্তার বাবুর সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ী গিয়া ঝাড়িয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া আসিতেন।

হাজারিবাগের বিখ্যাত উকীল স্বর্গীয় গিরীন্দ্রকুমার গুপ্ত মহাশয়ের শ্যালীপতিভাই ব্রজেন্দ্র বাবু কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত ছিলেন। তাঁহার শরীরের নানা স্থানে কুষ্ঠক্ষত হইয়াছে। তিনি একরূপ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। গিরীন্দ্র বাবু প্রভৃতির যে কারণেই হউক, এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে পিতৃদেব ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এই রোগীকে আরোগ্য প্রদান করিতে পারিবেন। তাঁহাদের অনুরোধে তিনি রোগীকে দেখিতে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পিতৃদেবের মনে হইল তিনি এক মুমূর্ষুর নিকট আসিয়াছেন। মুখে, হাতে, নাকে আরও অনেক স্থানে কুষ্ঠক্ষত অতিশয় গভীর হইয়া পড়িয়াছে। রোগীর উঠিবার কিম্বা নড়িবার শক্তি নাই। পিতৃদেব কিছুক্ষণ তাঁহার গুরুদত্ত নাম জপ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মধ্যে শক্তির সঞ্চার হইল। তখন হাতে জল লইয়া কয়েক বার রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিলেন। তিনি বলেন যে হয়ত একটা মলমও দিয়াছিলেন। যাহা হউক, পরের দিন হইতে রোগী অনেকটা আরাম বোধ করিতে লাগিলেন এবং ২।৪ দিনের [illegible] হাঁটিয়া বেড়াইতে সক্ষম হইলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে কলিকাতায় একটা বাড়ীতে পিতৃদেব গিরীন্দ্র বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সেই বাড়ীতে সেই দিন কোন বিবাহের বরযাত্রী অনেক জুটিয়াছিলেন। সেই সকল লোকের মধ্য হইতে একজন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া নমস্কার করিয়া পরিচয় দিলেন যে, তিনি সেই কুষ্ঠরোগী ব্রজেন্দ্র বাবু, তিনি বরযাত্রী আসিয়াছেন।

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কিরূপে এইরূপ আরোগ্য লাভ করিলেন?" তিনি পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন—"আপনিই আমার জীবনদাতা।" পিতৃদেবও অবাক হইলেন।

পিতৃদেব-লিখিত "মনোরমার জীবনচিত্র" পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে নবম পৃষ্ঠায় ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে তিনি যেখানে লিখিয়াছেন, সেখান হইতে নিম্নে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিলাম—

"এইরূপ কত শত শত ঘটনা হইয়াছে, তাহার হিসাব নাই। এই সময়ে ইচ্ছা করিলে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতাম। সহস্র সহস্র লোককে শিষ্য করিতে পারিতাম। আমার এইরূপ ক্ষমতা দেখিয়া কত বড় বড় লোক আমার নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীগুরুদেব আমাকে কিরূপ কঠিন পরীক্ষায় ফেলিয়াছিলেন। যদি গোস্বামী মহাশয় আমার গুরু এবং মনোরমা আমার গৃহিণী না হইতেন, তাহা হইলে অর্থোপার্জ্জনের এইরূপ সুযোগ থাকিতে বিষম দরিদ্রতার মধ্যে এই বিষম পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম কি না, ঘোর সন্দেহের বিষয়।"

আমার এই বিবৃতিতে লিখিত সকল ঘটনাই পিতৃদেব লিখিত "মনোরমার জীবনচিত্র" পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। যখন পুস্তক প্রকাশিত হয় (১ম খণ্ড—১৩২১, ২য় খণ্ড ১৩২৫) তখন, যাঁহাদের বিষয় লেখা হইয়াছে তাঁহারা অনেকেই জীবিত ছিলেন।

ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক এই প্রবন্ধ পাঠে যদি আগ্রহান্বিত হন, তবেই আমি আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

ফাল্গুনী

শ্রীঅমলকৃষ্ণ সেনগুপ্ত

ভোমরা-পাখা সুর ছড়ালো
ফুল ঝরালো কুঞ্জবন,
অশোক-পলাশ শুনছে আহা
মৌমাছিদের গুঞ্জরণ!

তোমার-আমার ফুলবাসরে
সজল-হাওয়া আঁচল-ভরে
আনলো তুলে চাঁপার কলি
শান্ত হ'লো ক্লান্ত মন!

ঢেউ দিয়ো না ঝিলের জলে
খেলার ছলে আনমনে,
আকুল হিয়া চুপটি করে
আজকে পাখির গান শোনে।

তোমার হাতে কাঁকন বাজে
বাজুক আহা লাজুক সাজে
আমার চোখে দাও গো এঁকে
নীল স্বপনের আলিম্পন।

বিচিত্র ভ্রমণ

জ্ঞানাঞ্জন পাল

[এই ভ্রমণকাহিনীর লেখক স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের পুত্র। এই কাহিনীতে বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে প্রচুর অজ্ঞাত তথ্য আছে। —স]

"বাবুজী শুনুন", হিন্দিতে এক জন দোকানী আমায় ডাকল ভারতের প্রায় এক প্রান্তে—এখন ভারতের বাহিরেই এক ছোট সহরের এক বাজারে। প্রয়োজনটা এমন কিছু নয়—একটা মাত্র প্রশ্ন। সবটাই খুলে বলি।

১৯১৭ সাল। ইংরেজের বড্ড ভয় তখন, বুঝি বা শীঘ্র ভারত ছেড়ে যেতে হয়। ভিতরের অবস্থার খবর যা—বাহিরে আমাদের জানা ছিল না, এমন কিছু জানতে হয়ত পেরেছে। ভয়টা দিল্লী আর পাঞ্জাবেই বেশী হয়েছিল, সিপাহী ত সব প্রায় সেই অঞ্চলেরই। হুকুম বাহির হ'ল বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল ও মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক দিল্লী বা পাঞ্জাবের কোথাও যেতে পারবেন না।

এই সময় সিন্ধদের প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশন আহুত হ'ল শিকারপুর সহরে। শিকারপুর ছোট সহর; কিন্তু ধনী সিন্ধি ব্যবসায়ীদের যায়গা। কনফারেন্স একটু জমকালো রকমেই হবে, তার ব্যবস্থা হ'ল। তাঁরা আহ্বান জানালেন, বাংলা থেকে বিপিনচন্দ্র পালকে যোগ দিতে। শিকারপুর কলিকাতা থেকে যেতে হ'লে দিল্লী দিয়ে যাওয়াই সুবিধা। দিল্লীতে তখন বিপিনচন্দ্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ; সুতরাং বোম্বে হয়ে অনেক ঘুরে যেতে হবে। খরচ অনেক বেশী; সময়ও অনেক লাগে। সিন্ধি-বন্ধুদের আগ্রহে এত ঘুরে যেতে বিপিনচন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত রাজী হলেন; আমি তাঁর সঙ্গে।

একদিন বোম্বে মেলে পিতার সঙ্গে উঠলাম। জিনিষ নেই বটে, কিন্তু একেবারে যে নেই তা'ও নয়। মতিলাল নেহেরুর অনেক বাক্স সঙ্গে থাকত বাইরে গেলে; কোন বড় মোকদ্দমায় গিয়ে তিনি এলাহাবাদ ফিরছিলেন, একবার দেখেছিলাম। বিপিনচন্দ্র পালের সে বিভব ছিল না। তবে সঙ্গে নানা রকম ঔষধের বাক্স থাকত, আর থাকত ইকমিক কুকার। শরীর ভাল নয়, পথের খাদ্য খাওয়া চলবে না, এমন কি যাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করবেন তাঁদেরও স্বাদের দিক থেকে খুব লোভের নানা রকম রান্নাও খাওয়া চলবে না। গলা ভাত, মশলা ছাড়া একটা তরকারী বা ঝোল, একটু মাখন ও সম্ভব হ'লে একটু দই—এই ছিল তাঁর শেষের চোদ্দ-পনের বছরের বাঁধাধরা আহার। আর দূর পাল্লার রেলগাড়ীতে এটা কুকারের সাহায্যেই তৈরী করার ব্যবস্থা করতে হ'ত। ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিকের উদ্ভাবনে যত জন উপকৃত হয়েছেন, আমার বাবা তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান বলা যেতে পারে। এই কুকার ছাড়া শেষ জীবনের ১৪।১৫ বছর তাঁর সারা ভারত পরিভ্রমণ করা বোধ হয় সম্ভব হ'ত না। আমাদের সঙ্গে আর একটা জিনিষ নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকত, সেটা টাইপরাইটার যন্ত্র। রেলেও তিনি লিখতেন—অর্থাৎ বলে যেতেন, আমাকে টাইপ করে যেতে হ'ত সঙ্গে সঙ্গে। এই ভাবে গাড়ীতে ত' উঠলাম।

নাগপুর পর্য্যন্ত পথে একটা লেখা শেষ করে ষ্টেশনে নেমে চিঠির বাক্সে ফেলে দিলাম—কলিকাতায় যাবে, যতটা মনে আছে "অমৃতবাজার পত্রিকার" জন্য। নাগপুরে ক'জন মাড়োয়ারী বণিক উঠলেন। বিপিনচন্দ্র যেমন ভালবাসতেন লিখতে, তেমনি বলতে। এই বণিক সহযাত্রীরা রাজনীতিতে আগ্রহশীল, এমন মনে পড়ে না। রাজনীতিতে এখন বাণিজ্যপতিদের যে ঔৎসুক্য, তখন তা ছিল না। কিন্তু বিপিনচন্দ্র মানুষ ভালবাসেন, রাজনীতি করেন না এমন মানুষও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'তেন, দেখেছি। কিছুক্ষণ পরে এই বণিকেরাও দেখলাম তাঁর বেশ ভক্ত হয়ে উঠেছেন। এর প্রমাণটা বোম্বাই ষ্টেশনে পৌঁছেই পেলাম।

দুপুরের পরে গাড়ী থামল 'ভি. টি'তে। আমাদের বোম্বাইয়ের আতিথ্যের ভার নিয়েছিলেন তখনকার দিনের এক ধনী ব্যবসায়ী—যমুনাদাস দ্বারকাদাস। বিবি বেশান্তের তিনি ঐ অঞ্চলের এক প্রধান শিষ্য ছিলেন, ইংরেজী সাপ্তাহিক "Young India" পত্রিকার পরিচালক, বোধ হয় সম্পাদকও। এই পত্রিকায় বাবা বোধ হয় এই সময়ে একজন প্রায় নিয়মিত লেখক ছিলেন। ষ্টেশনে তাঁর লোক বা গাড়ী কিছুই কিন্তু আসেনি। একটু অস্বোয়াস্তি লাগছে। এমন সময় সঙ্গের বণিক সহযাত্রীরা বললেন, তাঁরা যমুনাদাসের আপিসে পৌঁছিয়ে দিতে পারেন। কথায় জানলাম তাঁরা বেশ বড় ধনী, এক কাপড়ের কলের মালিক বা অংশীদার। তাঁদের নিজেদের মোটর এসেছে ষ্টেশনে। আমরা তাঁদের গাড়ীতে উঠলাম; আর আমাদের সঙ্গে যে পরিচারকটি ছিল, তাকে জিনিষপত্র সমেত ভিক্টোরিয়ায় বা ভাড়া গাড়ীতে তুলে দেওয়া হ'ল। যমুনাদাসের আপিসে এলাম; তাঁর গাড়ী ষ্টেশনে গিয়েছিল, অল্পের দেরীতে আমাদের পায়নি। এরকম আপিস ঠিক আগে দেখিনি। বড় হল—ক'টা কামরায় ভাগ করা। প্রত্যেকের টেবিলে একটা করে ফোন ও পাশে একটা করে সিন্দুক। অন্য আসবাবপত্র বিশেষ নেই, কেরাণীও বেশী নেই। এমন কি ব্যবসা, ভাবলাম যার প্রায় অনেকটা ফোনেই হয়! আর সিন্দুক টাকায় ভরে ওঠে! পরে সেটা জানতে পারি। এঁরা জার্মাণীর রংয়ের ব্যবসা করেন; যুদ্ধের বাজারে এই রংয়ের দাম অসম্ভব রকম চড়ে যায়, ফলে অল্প আয়াসে বহু টাকা এঁদের উপার্জন হয়। আপিসের চেহারা এই রকমই ইঙ্গিত করে।

আমরা ত এলাম, আমাদের পরিচারকের কিন্তু দেখা নেই: জিনিসপত্র সবই তার সঙ্গে। ভাবনার কথা হ'ল—বিশেষ করে সেদিন রাত্রের ট্রেণেই আমাদের শিকারপুর রওয়ানা হবার কথা। পুলিশের সাহায্য নিলে যে তাড়াতাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে, এমন ভরসা কম। যমুনাদাস বিচক্ষণ লোক; বললেন, চলুন আমরা বেরুই; আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—এঁর বোধ হয় এই প্রথম বোম্বে আসা; সহরও দেখি ও তারও সন্ধান করি। তাঁর প্রকাণ্ড মোটরে নগর পরিক্রমায় বেরুলাম, চোখ আছে যদি পরিচারক সমেত ভিক্টোরিয়াটা দেখা যায়। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেলও বটে। আমাদের পরিচারককে গাড়ীতে যখন তুলে দেওয়া হ'ল, তখন সে ভাবল, গাড়ীর চালক কোথায় যেতে হবে নিশ্চয় বুঝেছে, চালক ভাবল সোয়ারী ত ঠিকানা জানবেই। কিছুক্ষণ পরে অবস্থাটা বুঝে চালক তাকে বাঙ্গালী থাকেন, এমন এক বাড়ীর সামনে নিয়ে গিয়ে বলল—নামো, এখানে নিশ্চয় তোমার বাবু আছেন! আমাদের পরিচারকটির কোন্ গ্রামে বাড়ী মনে নেই; কিন্তু

সাধারণ বুদ্ধিতে সে যে আমাদের কারো চেয়ে কম নয়, বুঝলাম। বাবুকে না দেখে সে নামতে রাজী হ'ল না। প্রায় ঘণ্টা আড়াই ধরে সে সহরের এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চল ঘুরেছে। আমাদের দেখে তার স্বোয়াস্তি হ'ল যেমন আমরাও তেমন আশ্বস্ত হলাম।

যমুনাদাস আমাদের তুললেন, গোকুলদাস মোরারজীর প্রাসাদের মত বাড়ীর সংলগ্ন অতিথি-আবাসে। এই ভদ্রলোক তখন বোম্বাইয়ের শিল্পপতিদের অন্যতম। ভাগ্যবিড়ম্বনায় এর অনেক বৎসর পরে শোচনীয় ভাবে এঁর মৃত্যু হয়। সন্ধ্যার অল্প পরেই আমাদের গাড়ী। ধনীগৃহের অতিথি-সংকারের আতিশয্যে উৎকণ্ঠা হল, সময়ে ষ্টেশনে পৌছিতে পারব কি না। বোম্বাই শহর ও শহরতলীতে অনেকগুলি ষ্টেশনে গৃহস্বামীর প্রতিনিধি আশ্বস্ত করলেন, 'সেণ্ট্রালে' না হয় 'দাদারে' গিয়ে গাড়ী ধরা যাবে। কলিকাতা অঞ্চলের লোক। হাওড়ায় বা শিয়ালদহে ট্রেণ ফেল করলে আবার সেই ট্রেণই যে ধরা যায় অন্য ষ্টেশনে গিয়ে এ অভিজ্ঞতা বিশেষ নেই। কথাটা সেজন্য বুঝতে দেরী হল। ভাবলাম, কিছু আগে বেরুতে পারলেই ত ভিক্টোরিয়ায় জিনিষপত্র পাঠিয়ে আমরা 'সেণ্ট্রাল' ষ্টেশনেই গুজরাটগামী ট্রেণ ধরতে পারতাম। কিন্তু এঁরা ত তা হতে দেবেন না। এঁরা আমাদের এই গৃহ থেকে বিদায় দেবেন না—ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ীতে তুলে দেবেন। অনেকগুলি লোক এসেছেন বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে, গুজরাটীই বেশী ; তাঁরাও অনেকে ষ্টেশনে যাবেন, বুঝলাম। কিন্তু সময় যত যায়, উৎকণ্ঠিত হয়ে ভাবি, ট্রেণ ধরা যাবে ত ?

কিছু পরে বড় থালায় সাজান অনেক খাবার এল। এঁরা মাছ, মাংস, ডিম খান না, কিন্তু তাতে পরিমাণ বা প্রকার কিছু কমে না। এত জিনিষের সদ্ব্যবহার করতে গেলে কোন কৌশলেই আর ট্রেন ধরা যাবে না। সুবিধা, বাবা প্রায় কিছু খান না ; আমি ও পরিচারক তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। একটু আগে ভাবছিলাম, এত লোক ও আমাদের নিয়ে যাবেন কিসে ? বাহিরে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, নিঃশব্দে পাঁচ-ছ'খানা বড় ও মাঝারি মোটর দাঁড়িয়ে গেছে। প্রায় অপ্রয়োজনে এত গাড়ীর এভাবে সমাবেশ কত টাকা কিরূপ সহজে উপার্জন করলে সম্ভব হয়, ভাবলাম। এক দিকের পাল্লায় ধন যেখানে এভাবে পড়ে, সেখানে অপর দিকে সাধারণের ভাগে কত যে কমে, তার হিসাব কি আমাদের মনে আসে ? গাড়ী তীরবেগে আমাদের পৌছে দিল সেণ্ট্রালে নয়, সেখানে আর গাড়ী পাওয়া যাবে না—দাদারে। গাড়ীতে যায়গার ব্যবস্থা আগেই করা ছিল। রাত্রে যে কামরায় উঠলাম, তাতে ছ'জনের শোবার ব্যবস্থা ছিল। সহযাত্রীদের মধ্যে একজন মারাঠী বয়স্ক লোক ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন। মারাঠী মহিলা এ অঞ্চলে দেখেছি, আলাদা কামরা ব্যবহারে উৎসুক ন'ন। মেয়েদের এমন সপ্রতিভ ব্যবহার—অপরিচিত পুরুষদের মাঝেও ভারতের অন্যত্র কোথাও দেখিনি ; বাংলা, বিহার বা উত্তর-ভারতে ত নয়-ই।

পরের দিন ভোরবেলা বরোদায় পৌছলাম। বরোদা নামের একটা মায়া আমাদের মধ্যে ছিল। সেখানে রাজার ব্যবস্থায় সাধারণে লেখাপড়া শেখবার বেশী সুযোগ পায় ; মেয়েরাও লেখাপড়ায় এগিয়ে চলেছে ; লাইব্রেরী আন্দোলনের এটা জন্মভূমি ; শ্রীঅরবিন্দের প্রথম কর্মভূমি। রাজার স্বদেশপ্রীতি সুবিদিত। শুধু অরবিন্দের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। শুনেছিলাম, মনে পড়ে, বিপিনচন্দ্রের "নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রিকা পরিচালনে পরোক্ষ ভাবে তিনি কিছু অর্থসাহায্যও করেছিলেন। বাংলার গৌরব রমেশচন্দ্র দত্তের বরোদাই শেষ কর্মক্ষেত্র ছিল। এসব কারণে বরোদায় ট্রেণ থামতেই মনটা একটা শ্রদ্ধার ভাবে ভ'রে গেল।

১০টা এ রকম সময়ে আমরা আমেদাবাদ পৌছলাম। এখানে গাড়ী বদলাতে হ'বে। ছোট লাইনের (narrow gauge) গাড়ীতে উঠে মাড়োয়ার জংশনে গিয়ে আবার গাড়ী বদলাবার প্রয়োজন হবে। দিনের ছোট গাড়ীতে বেশ ভিড ; উঠলাম ত এক কামরায়। সুপরিসর দেহের কয়েক জন ব্যবসায়ী মাড়োয়ারী দুটো বেঞ্চিই দখল করে আছেন ; আর কেউ যে ওঠে, সেটা একেবারেই পছন্দ নয়। আমরা দু'জনে একটু বসবার জায়গা চাওয়াতে অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে—সংস্কৃত নাটকে যেমন লেখা থাকে 'নাট্যেন', সে-ভাবে একটু সরে বা না সরে বসে রহিলেন। কষ্টে ত কোন রকমে বসলাম। সহযাত্রীরা দ্বিপ্রহরের খাওয়া আরম্ভ করেছেন—পুরী, ভাজি, মিষ্টি, ফলও আছে। বিপিনচন্দ্র ভাঙ্গা হিন্দিতে গল্প আরম্ভ করলেন ফলের—আমেরিকার, ফ্রান্সের, ইতালীর, ইংলণ্ডের। সহযাত্রীরা খাচ্ছেন আর শুনছেন ; মুখ চলছে, মাথাও নড়ছে। ক্রমে দেখি, আপনা-আপনি তাদের মাঝখানে আমাদের বসবার জায়গা বেশ একটু বেড়ে গিয়েছে, আরামে বসতে পেলাম। সহযাত্রীর প্রসন্নতায় বসবার জায়গার পরিসরও তা'হলে বাড়ে ! সহযাত্রীরা দু' দলের ছিলেন ; যাবেন তাঁরাও আমাদের মত অনেক দূরে। সন্ধ্যায় মাড়োয়ার জংশনে তাঁরাও গাড়ী বদল করে যোধপুর বিকানীর রাজ্যের গাড়ীতে উঠবেন। সে গাড়ীর কামরায় রাত্রে শোবার জায়গা নীচে দু'টা মাথায় দু'টা। এঁদের দু'জন করে এক দল, প্রতি দলই বিকালের দিক থেকে বলতে আরম্ভ করলেন—'পিতাজী' যে গাড়ীতে উঠবেন সে গাড়ীতেই তাঁরা দু'জন যাবেন—অন্য দু'জন যেন অন্য গাড়ীতে যান। বিভবের মোহ ত মানুষের আছেই। বাক্‌বিভূতিরই যে একটা আকর্ষণ আছে—আমরা যাকে কৃষ্টি বা সংস্কৃতি বলি তার সঙ্গে বিশেষ যোগ নেই যাদের, তাদের মধ্যেও এটা দেখে কৌতুক অনুভব করলাম।

বিখ্যাত আবু পাহাড় পার হয়ে মাড়োয়ার জংশনে সন্ধ্যার পর গাড়ী এসে থামল। কিন্তু গাড়ী নানা কারণে বড় দেরী হওয়ায় রাত্রের গাড়ীর সংযোগটা আর পাওয়া গেল না। ষ্টেশন বড় নয়, মাঝারি বা ছোট। বেশ গরম কাল এখন। রাত্রে শুতে হ'লে বাইরে শুতে হবে। মজা হ'ল, দিনে যাঁরা একটু বসতে দিতে প্রথমে রাজী ছিলেন না, তাঁরাই 'পিতাজী'র জন্য রাত্রে ভাল খাটিয়া সংগ্রহ করে শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন ; আমরা যেন তাঁদেরই অতিথি। তাঁদের এই অপ্রত্যাশিত যত্নের ফাঁকে ফাঁকে দু'দলেরই লোক কিন্তু আমায় বোঝাতে লাগলেন, তাঁরা দু'জন অন্য দু'জন থেকে সহযাত্রী হিসাবে কেন বেশী কাম্য। পরের সন্ধ্যায় আবার সেই রাত্রের গাড়ীতেই ত উঠতে হবে ; পিতাজীর সঙ্গে তাঁর কামরায় যাবার ইচ্ছাটা দু'দলের কেহই আর ভুলছেন না।

মাড়োয়ার জংশনে বাইরে শুয়ে রাতটা বেশ কাটল। পরের সমস্ত দিনও থাকতে হবে ষ্টেশনেই। লেখা যাঁদের সহজ, অর্থাৎ

আরামের নয় আনন্দের, তাঁদের দেখলাম অসুবিধা প্রায় কোন অবস্থাতে হয় না। হাত-মুখ ধুয়ে চা খেয়ে যেমন বাড়ীতে তেমনি এই ষ্টেশনের বিশ্রাম কক্ষে বসে বিপিনচন্দ্র বলে গেলেন—আমায় টাইপ করতে হ'ল মেসিনে ; চলে গেল লেখা "পত্রিকা"র জন্য কলিকাতায়। মাড়োয়ারী সহযাত্রীদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র সম্বন্ধে বেশ সম্ভ্রমের ভাব এসেছে, একটু দূরে দূরে থাকেন ; আর আমায় জিজ্ঞাসা করেন মাঝে মাঝে, কিছু অভাব-অসুবিধা নেই ত ?

সন্ধ্যায় যোধপুর-বিকানীর রেলে চড়লাম, পরদিন দুপুরের পর হায়দ্রাবাদ (সিন্ধে) পৌঁছে বিশ্রাম করে, আবার রাত্রের গাড়ীতে শিকারপুর যাব, এই ব্যবস্থা। মরুভূমির মধ্যে দিয়ে রাত্রে গাড়ী চলল। সকালে উঠে দেখি, চারি দিকে খালি ধূ-ধূ বালুভূমি। এখানে হরিতে হিরণের মেলা নেই, চলতে গেলে দুর্গা দলতে হয় না ; কোথায় বাংলার শ্যামল রূপ আর কোথায় এই মরুভূমির ধূসর চেহারা! মনে হ'ল কি বিচিত্র আমাদের এই মহাদেশ! এই রেলে একটা ব্যবস্থা বড় ভাল লেগেছিল। ব্রিটিশ-শাসিত আমাদের ভারতে রেলে খাদ্য ও পানীয়ের কামরা যেখানে সংযুক্ত থাকে, তা থাকে সাহেবদের জন্য, সাহেবী-এদেশীয়েরা ব্যবহার করতে পারেন সংকোচে যদি পয়সার প্রাচুর্য্য থাকে। এই ট্রেনের সংলগ্ন খাবার কামরায় ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ দেশী ধরণের। পিছনে রান্নাঘর, সামনে পিড়ায় বসে আর এক পিড়ায় থালা-গেলাস রেখে গরম পুরী তরকারী প্রভৃতি খাওয়ার ব্যবস্থা।

পরের দিন দুপুরে সিন্ধ হায়দ্রাবাদে পৌঁছলাম। সহর সামনে আসতেই এক নতুন দৃশ্য দেখলাম। সব বাড়ীর ছাতে কোণার দিক খোলা, ও তার মাথায় হেলান চিলের ছাতের মত ছাত। যেন অনেক সাদা পাল তোলা নৌকা একসঙ্গে জড় হয়েছে। এখানে বাতাসটা সারা বছর এক দিকেই বয় ; আমাদের মত গরমের সময় দক্ষিণ দিকে আর শীতের সময় উত্তর দিকে বয় না। বৃষ্টির বালাই নেই বললে হয়। মাথার ঐ পাল দিয়ে খোলা বাতাস ঘরের ভিতরে আনা হয়। বিপিনচন্দ্রের এই অঞ্চল পূর্ব-পরিচিত। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'city of sails'—'পাল তোলা সহর'। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক অধ্যাপক ভাস্বানির সঙ্গে বোধ হয় এখানেই পরিচয়। যতটা মনে পড়ে, কয়েকটি প্রতিভাবান ত্যাগী সিন্ধি যুবক ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁদের কারো কারো সঙ্গে যৌবনে বিপিনচন্দ্রের বন্ধুত্ব হয়েছিল। এঁদের মধ্যে একজন বোধ হয় সাধু সুন্দরলাল। গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছতেই ২৫।৩০ জন এসে বিপিনচন্দ্রকে নামিয়ে নিলেন। এখন থেকে বিপিনচন্দ্র এঁদেরই অতিথি। ষ্টেশনেই এঁরা বললেন—সরকারের নতুন হুকুম—বিপিনচন্দ্রকে নিয়ে কোন শোভাযাত্রাদি বাহির হ'তে পারবে না, কনফারেন্সেও তিনি সক্রিয় ভাবে যোগ দিতে পারবেন না, দর্শক হিসাবে ইচ্ছা করলে বসেও বা থাকতে পারেন। আর সরকারের এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে যাতে পালিত হয় তার জন্য পুলিশ সাহেব সদলে ও জেলার কর্তা শিকারপুরে গিয়ে অবস্থান করছেন। কি কর্তব্য? সিন্ধি বন্ধুরা চান না—বিপিনচন্দ্র অসুস্থ শরীরে ও এই বয়সে অকারণে ক্লেশ পান। অবস্থাটা ভাল করে বিবেচনা করা দরকার। বিপিনচন্দ্রের আতিথ্যের যেখানে ব্যবস্থা হয়েছে, সেখানে গিয়েই এ সম্বন্ধে কর্তব্য স্থির করা যাবে। একটা বড় গাড়ীতে তাঁরা ও আমরা উঠলাম ; শহরের মধ্যে গাড়ী ঢুকতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য—জনমানব নেই। বাড়ী-ঘর, দোকানপাট সব বন্ধ ; রাস্তা নিরালা দুপুরবেলায়। জানলাম হায়দ্রাবাদে প্লেগ আরম্ভ হয়েছে। ভয়েও বটে, প্রয়োজনেও বটে, লোক সব সহর ছেড়ে গেছে। একটা বড় দোতলা বাড়ীর সামনে দিয়ে গাড়ী যেতে দেখি, সে বাড়ীতে অনেক লোকজন, এটা প্লেগ-হাসপাতাল। প্লেগে নগর শূন্য হয়, শৈশবে শুনেছিলাম, এই দেখলাম। সহরের বাইরে নতুন ছাউনি পড়েছে, সেখানে লোক সব গিয়েছে। কিছু বাড়ীও আগে থেকে সেখানে উঠছিল। একটা বাড়ীতে আমাদের তোলা হ'ল। সিন্ধি হিন্দুরা টেবিলে খান, কাপড় পেতে মাছ-মাংসও খান। পঁচিশ-ত্রিশ জনের বড় রকমের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওঅঞ্চলের ক্যানেলে বা খালে বাংলার ইলিসের মত অতি সুস্বাদু এক রকম মাছ হয়। আমরা যাঁদের অতিথি তাঁরা গল্প করলেন এই মাছের জন্য এক নবাবের নাকি প্রাণ গিয়েছিল, গলায় কাঁটা বিঁধে নয়, খেতে আরম্ভ করে তিনি আর থামতে পারেননি। সহরের প্লেগের দৃশ্যে মন বিমর্ষতায় ভরে গিয়েছিল। যাঁদের বাড়ী উঠেছিলাম তাঁদের কয়েকটি অতি সুন্দর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নতুন অতিথি আমাদের পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছিল। প্লেগের অল্প দূরে মাত্র ত এরা আছে, অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কায় মনটা ভরে উঠল। ভোজ্যের এসব বর্ণনা বা স্বাদ কিছুই উপভোগ করতে পারলুম না।

কনফারেন্সে যাওয়ার কি হবে? রাজনীতি যে একটা কৌশলেরও খেলা, তার আর একটা পরিচয় সেদিন পেলাম। বিপিনচন্দ্র ঠিক করলেন তিনি শিকারপুর যাবেন ; সে রাত্রেই রওয়ানা হয়ে পরের দিন ভোরে পৌঁছিবেন ; কনফারেন্স সেদিনই আরম্ভ। যাবেন বিদেশী সরকারের পশুবলের সঙ্গে জোরের লড়াই করতে নয়, তাদের উদ্দেশ্যকে অন্য ভাবে বিফল করতে। দেশপ্রেম মনের একটা অতি উন্নত ভাব। লেখা বা বক্তৃতার দ্বারা যেমন একে উদ্দীপ্ত করা যায়, ব্যক্তিত্বের দ্বারাও তেমন জাগান যায় বা জাগিয়ে রাখা যায়। বক্তা বিপিনচন্দ্রকে সরকার মূক করলেন ; তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা তিনি সে কাজ করতে চাহিলেন যেটা তাঁর বক্তৃতার দ্বারা করতেন। ভোরে শিকারপুর ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছতেই দেখি, কয়েক হাজার লোকের ভিড়। শোভাযাত্রা হওয়া নিষেধ, সমবেত হওয়ার নিষেধ নেই। স্বদেশপ্রেমের জয়ধ্বনিতে তাঁকে গাড়ীতে তুলে দেওয়া হল ; জনতাকে বলা হল, শান্ত ভাবে সহরের দিকে ফিরে যেতে। দেশপ্রেমের উৎসাহের উচ্ছ্বাসেও যে সংযম লুকিয়ে থাকে, তা দেখলাম। এত বড় জনতা নীরবে নেতাদের আদেশ মেনে নিল। মনে ক্ষোভের আগুন নিবে গেল বলব না, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল শিখায় জ্বলে উঠল না।

যিনি কনফারেন্সের সম্পাদক, তাঁর বাড়ীতেই বিপিনচন্দ্র অতিথি। একটা মাঝারি ঘরে বিপিনচন্দ্র বসলেন। অগণিত জনতা গোলাপ ফুলের পাপড়ি হাতে নিয়ে এক দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে তাঁকে দেখে ফুল রেখে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। শিকারপুর গোলাপের বাগানের জন্য প্রসিদ্ধ। কিছুক্ষণ পরে দেখি, ঘরের মেঝেটা গোলাপের পাপড়িতে ছেয়ে গেছে ; যেন পাপড়ি দিয়ে কেউ অপূর্ব গালিচা তৈরী করেছে। এ সময়ের আর একটা দৃশ্য

ভুলতে পারিনি। এক বর্ষীয়সী সাধারণ মহিলা বোধ হয় মুসলমান —দূর গ্রাম থেকে এসেছেন বিপিনচন্দ্রকে দেখতে, হাতে তাঁর নিজের গাছের কি একটু ফল, কিছু ফুল আর দু'টি পয়সা। এই অভিনব অভ্যর্থনার মর্ম পরে বুঝতে চেষ্টা করেছি। আমাদের দেশে যাঁরা সাধু তাঁরাই ত্যাগী হ'ন। শক্তিমান পুরুষ সংসারে নিজের বা নিজের পরিবারের জন্মই পদ, প্রতিষ্ঠা, বিত্ত সংগ্রহ করে। যে করে না সে বিরাগী। বিপিনচন্দ্র শক্তি থাকতেও সরকারের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠা চাননি, অর্থোপার্জ্জনেও মন দেননি—এটা বোধ হয় প্রচার হয়েছিল আগেই। সুতরাং এই সাধারণ মহিলার ধারণায় তিনি ত্যাগী। আর ত্যাগী বা সাধুকে দেখতে এলে কিছু ফল, ফুল ও দু'-এক পয়সা নিয়ে আসতে হয়। এই মহিলাও তাই করেছিলেন। রাজনীতিক, বক্তা বা বিদ্বান বিপিনচন্দ্রকে ইনি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিতে আসেননি, এসেছিলেন তাঁর ধারণায় ত্যাগী বিপিনচন্দ্রকে প্রণাম করতে। দেশকর্মীও আমাদের দেশে ত্যাগী হলেই নমস্য, নচেৎ ন'ন। ত্যাগী দেশকর্মী গৃহী হ'লেও সাধারণের হৃদয়ে সাধু বা সন্তের আসনে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেন। বুঝলুম, যে দেশের তথাকথিত অশিক্ষিতদের মধ্যে এই বোধ এখনও জাগ্রত আছে, সে দেশ ছোট নয়।

রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্সে বিপিনচন্দ্র নীরব দর্শক হিসাবে কেবল উপস্থিত থাকবেন, এই প্রতিশ্রুতি জেলার কর্তা তাঁর কাছে চাইলেন। শুধু তাই নয়, কন্‌ফারেন্সের বাহিরেও জনতার সামনে রাজনৈতিক কোন বক্তৃতা দিতে পারবেন না। নচেৎ তাঁকে সেই দিনই বহিষ্কৃত করে দেওয়া হবে বা আবদ্ধ করা হবে। বিপিনচন্দ্র কন্‌ফারেন্সে গেলেন, কিছু বললেন না। কিন্তু দেশপ্রেম জাগরূক রাখার কাজ ত ব্যাহত হতে দিতে পারা যায় না! তার এক অভিনব পথ উদ্ভাবনের চেষ্টা হ'ল।

বিপিনচন্দ্রেরও দেশের সাধনা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনুরাগ কম ছিল না। রাজনীতি বাদ দিলেও তাঁর বলবার বা লিখবার বিষয়ের অভাব কখনও দেখিনি। তিনি দেশের সনাতন—কেবল পুরাতন নয়—সাধনা সম্বন্ধে কিছু বলবেন, ঠিক হল। কন্‌ফারেন্সের প্যাণ্ডাল ব্যবহার করা যাবে না। তাতে আট্‌কাবে না। এঁদের গোলাপের যে-সব বাগান আছে তারই একটায় ব্যবস্থা হতে পারবে; কোন কোন বাগানের মধ্যে ভাল চত্বর আছে। বৃষ্টির ভয় নেই, বৃষ্টি সে দেশে হয়ই খুব কম। কিন্তু কি ভাষায় বলবেন? ইংরেজী খুব কম লোক জানেন। বাংলা কেউ জানেন না, একজন বাঙ্গালীকেও সেখানে দেখিনি। হিন্দি—হতে পারে একরকম, যদি বক্তা সে ভাষা জানেন। বিপিনচন্দ্র সংস্কৃত কিছু জানেন কিন্তু তাও উচ্চ অঙ্গের ধর্ম, সাহিত্য ও দর্শনের মাধ্যমে। বিপিনচন্দ্র ইংরেজীতে বলবেন, অন্য কেউ তা স্থানীয় সাধারণের ভাষায় তর্জ্জমা করে দেবেন, এটা পছন্দ হ'ল না। আমাদের সামনে বিদেশী কোন পণ্ডিতের কিছু বলতে হলে এভাবেই তিনি বলেন। বিপিনচন্দ্র ত এঁদের কাছে বিদেশী নন। তিনি রাজী হ'লেন ভাঙ্গা (হয়ত কিছু ভুলও) হিন্দিতেই বলতে। আমার বিস্ময় লাগল।

বিপিনচন্দ্রের ছেলেবেলা থেকে প্রকৃতির এক সহজ বৈশিষ্ট্য ছিল—তিনি মুখস্থ করে কিছু শিখতে হ'লে তা শিখতে পারতেন না। তাঁর আত্মচরিতে আছে, তিনি বাল্যে ফার্সী শিখতে পারেন নি। মৌলবী আগে মুখস্থ পরে মানে, এই পথে পড়াতে চেয়েছিলেন বলে। ইংরেজী তিনি যা শিখেছিলেন, তা মুখস্থের পথে নয়। তাঁর ছেলেবেলার ইংরেজী শিক্ষক ভুল হলেও তাঁকে ইংরেজীতে লিখতে বাধা দেননি। এ-ভাবে ভাষার অন্তর্নিহিত প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর মনের একটা সহজ যোগ প্রতিষ্ঠিত হ'ত। সংস্কৃত সম্বন্ধেও অনেকটা তাই ছিল মনে হয়েছে। আর সংস্কৃতের অপভ্রংশে বাংলা প্রভৃতির মত হিন্দিও গঠিত বলে ভাঙ্গা (বা ভুল) হিন্দিতে তিনি দেশের সাধনা সম্বন্ধে সাধারণের কাছে বক্তৃতা দিতে রাজী হ'ন। ঠিক হ'ল সাত দিন ধরে বলবেন। আর লোকের আগ্রহ কত বেশী তা বোঝা গেল যখন টিকিট করে এই বক্তৃতার ব্যবস্থা হ'ল। এই ছোট সহরের কয়েক শত লোক ভক্তি-সাধনা সম্বন্ধে ভাঙ্গা হিন্দিতে তাঁর বক্তৃতা নিয়মিত শুনলেন। আমার ভয় ছিল বুঝি বা বক্তা তাঁর ভাষণ বাধ্য হয়ে সংক্ষিপ্ত করেন ভাষার অসুবিধায় বা শ্রোতাদের বোধগম্য হচ্ছে না বলে। কিন্তু ভয় নিছক কল্পনাই ছিল। এর একটা কারণও ছিল।

বিপিনচন্দ্র আগে থেকে তৈরী করা বক্তৃতায় কান দিতেন না। তিনি বাগ্মী ছিলেন, শুধু বক্তা নন। তাঁর মনের মধ্যে চিন্তা বা ভাবের স্রোতের খেলা চলত আপনা-আপনি; শ্রোতা পেলে তার উৎস খুলে যেত। এটা যাঁদের হয় ভাষা তাঁদের ভাবকে বাঁধতে পারে না, বাহন মাত্র হয়। ভাষার অসুবিধায় তাঁদের ভাবের স্রোত রুদ্ধ হ'তে পারে না। ভাব প্রকাশের তাগিদে আপনি ভাষা খুঁজে বাহির করে; সে ভাষায় ব্যাকরণের ভুল যতই থাক বা সাহিত্যের রীতি-বিচারে তা যতই দোষের হোক না কেন। বিপিনচন্দ্রের ভাঙ্গা হিন্দিতে শ্রোতাদের বুঝতে তত অসুবিধা হয়নি, আর এক কারণে। ভাগবত ধর্ম বা ভক্তিসাধনার মর্ম কথা আমাদের নিরক্ষর লোকেরাও জানেন। কঠিন দার্শনিক মতবাদে তা আচ্ছন্ন হয়নি সম্পূর্ণ; সাধু-সন্তদের জীবনে ও বাণীতে তা জীবন্ত হয়ে দেশের সর্ব্বত্র নিত্য ছড়িয়েছে। মুগ্ধ হয়ে সে জন্য দেখলাম সাধারণে তাঁর ব্যাখ্যান শুনল। মধ্যে মধ্যে যে তাদের আটকায় নি তা নয়। যে দোকানী আমায় 'বাবুজী শুনুন' বলে ডেকেছিলেন প্রথমেই বলেছি, তাঁরও এক জায়গায় এ রকম আটকিয়ে ছিল বুঝতে। তিনি বললেন—"আপনার পিতাজীর ব্যাখ্যান খুব সুন্দর হয়েছে। তিনি যে বলেছেন মানুষই ভগবান, এ-ও ঠিক কথা। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বললেন—পুরুষ ভগবান আর স্ত্রী ভগবতী। বাবুজী, স্ত্রী যদি ভগবতী হ'ন ত আমায় ত তাঁকে পূজা করতে হয়। আমি যদি তাঁকে পূজা করি ত হুকুম কি করে করব? কি করে বলব—কাপড় কেচে দাও, রান্না করে দাও, বাসন মেজে দাও? এটাতে আমি বড় মুস্কিলে পড়ে গেছি বুঝতে।" ফিরে এসে বাবার কাছে এ কাহিনী বললাম। বাবার সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষিত যাঁরা ছিলেন তাঁরা জিনিসটা লঘু-কৌতুকের ভাবেই নিলেন, খুব হেসে উঠলেন। আমি কিন্তু বুঝলাম—সাধু-সন্তদের জীবনে ও বাণীতে যে সত্য ফুটে উঠেছে, আমাদের দেশের সাধারণের অন্তর তা অসংকোচে গ্রহণ করেছে; কিন্তু তা সমাজের নিগড় ভাঙেনি। সমাজে এ বাণী প্রতিষ্ঠা পেলেই আমার শিকারপুরের দোকানী বন্ধু তাঁর প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

পরিমল গোস্বামী

প্রথম পর্ব

২

শিশুকাল থেকে বারো-তেরো বছর বয়স পর্যন্ত যে ঘটনা যেমন মনে আসছে তাই লিখে চলেছি। সাতবেড়ের ঝড়ের কথা বেশ মনে পড়ে, বিশেষ ক'রে যেবারে ঝড়ের সঙ্গে বড় বড় শিল পড়েছিল।

সাতবেড়ে অঞ্চলে এবং ফরিদপুর জেলার উত্তর অঞ্চলে—এই দু' জায়গারই মাত্র অভিজ্ঞতা তখন—বোশেখ মাসে প্রায় প্রতি দিন ঝড় বৃষ্টি হয়। বিকেলের দিকেই সাধারণতঃ। এই ঝড়ের খেলা জ্যৈষ্ঠ মাসের আধাআধি পর্যন্ত চলে। অতি অল্পক্ষণের আয়োজনে প্রলয় কাণ্ড। মেঘহীন ভালমানুষ আকাশ, দূরদিগন্তে পশ্চিম দিকে বা উত্তর-পশ্চিম কোণে সামান্য একটুখানি কালো আভাস; বার্কের ভাষায়—no bigger than a man's hand, কিন্তু ওতেই যথেষ্ট। অর্ধেক আকাশ ছেয়ে ফেলতে কয়েক মিনিটের কাজ। কি তৎপরতা! মনে হবে যেন কেউ প্রকাণ্ড এক অদৃশ্য তুলির টানে মেঘ এঁকে যাচ্ছে শূন্য আকাশ পটে।

স্তরে স্তরে সাজানো কাজল-কালো মেঘ। বর্ষাকালের পদ্মার স্রোতের মতো টগবগ ক'রে ফুটে-ওঠা আকাশ নদী যেন। উপরের স্তরের কিছু মেঘ নিচে আসছে, নিচের স্তরের কিছু মেঘ উপরে উঠছে। সাজানোর কাজটি কিছুতে যেন মনের মতো হচ্ছে না। আতঙ্কিত পাখীরা ছুটে চলেছে আশ্রয়ের খোঁজে। তাদের স্পর্শচেতন মনে বিপদের সঙ্কেত এসে গেছে। আকাশের গায়ে তাদের একটানা গতি। তারপর দেখতে না দেখতে সহসা শুকনো পাতা আর ধুলোবালি উড়িয়ে, বড় বড় গাছকে হেলিয়ে দুলিয়ে, ডালের মড়মড় ও শুকনো পাতার ঝনঝন শব্দের সঙ্গে একটানা শাঁ-শাঁ শব্দ মিশিয়ে, ঠাণ্ডা প্রবাহের সঙ্গে উঠে এলো ঝড়। কি তার প্রবলতা! সর্বাঙ্গে অনুভব করা যায়। তখন জানা শোনা আর সকল শক্তির উৎসকে খেলো মনে হয়।

ঝড়ের এ সর্বনাশা মূর্তির সঙ্গে পল্লীবাসী আমাদের শিশুকাল [illegible]

এ রকম নিয়মিত ঝড় কলকাতায় হয় না। এবং যে ঝড় হয়, তা যতই প্রবল হোক, তাতে তার নিজস্ব শব্দ ভিন্ন অন্য কোনো শব্দ বড় যোগ হয় না। কিন্তু পল্লীর ঝড়ে হাজার হাজার বনস্পতির আর্তনাদ যোগ হয়। প্রকৃতির সে এক অদ্ভুত আবির্ভাব রূপ, আর মানুষের মনে তার অদ্ভুত অনুভূতি।

আমি যে বিশেষ ঝড়টির কথা এখন স্মরণ করছি—সে ঝড়ের সঙ্গে প্রকাণ্ড এক একটা শিল পড়েছিল, এত বড় শিল আমি আর দেখিনি। অবশ্য সাতবেড়ে গ্রামাঞ্চলে ঝড়বৃষ্টির সময় নিয়মিত শিল পড়ে এবং প্রতি বছরই অন্তত দু'-এক দিন পথ-ঘাট ঢেকে যায় শিলে। পঞ্চাশ বছর আগের কথা বলছি। আজ সে আবহাওয়ার বদল হয়েছে কিনা কোনো ধারণা নেই। তখন এটি বছরের স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। শিল কুড়িয়ে মোটা কাপড়ে চাপা দিয়ে বল তৈরি ছিল আমাদের সাধারণ খেলা। কলকাতায় (১১ ও সম্ভবত) একবার মাত্র পথঘাট ছেয়ে যাওয়া শিল পড়তে দেখেছি। কিন্তু আমি যে বিশেষ শিলের কথা বলছি তা এত বড় যে কলকাতার সর্ববৃহৎ পঞ্চশিল বা ষট্‌শিল জুড়লেও তার সমান হবে ব'লে মনে হয় না। ছোট ছিলাম বলেই যে ছোট জিনিসকে বাড়িয়ে দেখেছি তা নয়। বড়রাও সবাই বলেছেন সে শিল অতিকায় শিল।

সেদিন এমনি বড় বড় শিল আকাশ ভেঙে নিচে পড়েছিল বহুক্ষণ ধ'রে। গ্রামে অধিকাংশই প্রায় টিন আর খড়ের ঘর। বহু খড়ের ঘর ভেদ করেছিল সে শিল, আর টিনের উপর ঘণ্টাখানেক ধ'রে সেই অতিকায় শিলের অবিরাম বর্ষণ। মনে হচ্ছিল যেন শিলভরা সম্পূর্ণ আকাশ-কড়াইটাকে সমস্ত পৃথিবীর উপর কাত ক'রে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। ভয়ে নির্বাক হয়ে জানালা দিয়ে চেয়ে দেখছিলাম সে দৃশ্য।

গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ি বড় বড় গাছের আড়ালে ঝড়ের হাত থেকে অনেকটা নিরাপদ, কিন্তু শিলের হাত থেকে বাঁচবার উপায় নেই। সেদিনও অনেক বাড়ির ক্ষতি হয়েছিল। এর সঙ্গে যে ঝড় ছিল তা অতি প্রবল হওয়া সত্ত্বেও তার কোনো পৃথক অস্তিত্ব আর [illegible]

দিয়েছিল। আমাদের স্কুলের জন্য বাইরে খোলা জায়গায় করুগেটেড শীটের বড় ঘর তৈরি হচ্ছিল। পরদিন শুনলাম ঝড়ে তার চাল উড়িয়ে নিয়ে ফেলেছে অনেক দূরে। গিয়ে দেখেছিলাম, কাগজের শীটের মতো জড়ানো টিনের শীট অন্তত সিকি মাইল দূরে বিধ্বস্ত অবস্থায় প'ড়ে আছে। স্কুলঘরের চার দিক তখনও খোলা ছিল, বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়নি, অতএব ঝড় অবাধে ভিতরে ঢুকে চাল ছিঁড়ে মাথায় তুলে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করেছে।

বালককালে গ্রাম্য জীবনের সকল দিকের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছিলাম। বয়স্কদের যা করতে দেখেছি তাই আদর্শ মনে ক'রে তার অনুকরণ ক'রে কৃতার্থ বোধ করেছি। মাছ ধরা তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

চারদিকে মাছ। স্নান করতে নেমে কাছাকাছি বাঁধা নৌকোর গায়ে গামছা অথবা কাপড় দিয়ে মাছ ধরা ছিল খুব সোজা। দু'জনে দু'দিকে ধ'রে গামছার একদিক ডুবিয়ে নৌকোর গায়ে গায়ে চেপে ধ'রে উপরে তুললেই অনেক মাছ। চিংড়ি মাছই বেশি। শীতের মুখে যখন খানা ডোবা সব শুকিয়ে আসত তখন অল্প জলে পলো দিয়ে মাছ ধরেছি। আরও কম কাদাজলে হাত দিয়ে শিঙি মাগুর প্রভৃতি অনেক ধরেছি, মাছের কাঁটার ঘাও খেয়েছি অনেকবার। বর্ষার মুখে পদ্মার জলে বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি খাঁচা পেতে মাছ ধরাও খুব চলতি ছিল। ওখানে তার নাম ছিল দোয়ার। জেলা ভেদে পৃথক উচ্চারণ শুনেছি। এই খাঁচা বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে তৈরি। দোয়ার পেতে দু'ধারে বাঁশের কাঠির ক্রস্ পুঁতে তার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিতে হয়—তারপর দোয়ারের মুখ থেকে ডাঙা পর্যন্ত পাতলা চেঁচাড়ির তৈরি চিকের মতো দেখতে তিনচার হাত লম্বা বেড়া পুঁতে দিতে হয়, যাতে মাছ তাতে বাধা পেয়ে দোয়ারের মধ্যে ঢুকে যেতে বাধ্য হয়। একবার ঢুকলে আর বেরোতে পারে না এমন কৌশলে তৈরি। সন্ধ্যাবেলা দোয়ার পেতে খুব ভোরে গিয়ে তুলতে হয়। বড় বড় চিংড়ি ও আড়মাছের বাচ্চা প্রভৃতি অনেক ধরা পড়ে। পিছনের ছোট্ট দরজা খুলে বের করতে হয়। আমিও একবার একজনের প্রায় পায়ে ধ'রে একটি তৈরি করিয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু বর্ষার পদ্মায় বালকের পক্ষে সেটি বিপজ্জনক বোধ হওয়ায় এক দিনের বেশি শখ করা চলল না।

পল্লীগ্রামে ঘুড়ি ওড়ানোর শখ ছোটদের মধ্যে যেমন বড়দের মধ্যেও তেমনি দেখেছি। কলকাতায় যেমন প্রতিযোগিতা ক'রে ঘুড়ি কেটে দেওয়ার রীতি বা খেলা, আমাদের সে রকম ছিল না। যার যার ঘুড়ি তার তার হাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উড়ছে। সে সব ঘুড়ির চেহারা বিচিত্র। যে চতুষ্কোণ ঘুড়ি কলকাতার আকাশে ওড়ে আমাদেরও অর্থাৎ ছোটদের ঘুড়িও তাই, কিন্তু রুচিভেদে কারো কারো ঘুড়ির সঙ্গে দীর্ঘ ল্যাজ জোড়া থাকত। দশ-পনেরো-বিশ হাত লেজ। এবং ঘুড়ি আমরা প্রত্যেকে নিজ হাতে তৈরি ক'রে নিতাম। এ কাজ অত্যন্ত সহজ ছিল। সাধারণ কাগজের ঘুড়ি, অবশ্য কোনো ভারী সুতোয় ওড়ানো হত। সুতোও কেনা নয়। বর্ষার আগে পদ্মার বিস্তীর্ণ বালুতীরে জাল মেরামত করত ধীবরেরা। তারই ফেলে দেওয়া সুতো কুড়িয়ে কুড়িয়ে জোড়া হত। প্রকাণ্ড ফুটবলের মতো গুলি। ঘুড়ি দূর আকাশে উঠে যেত। ল্যাজযুক্ত ঘুড়ির নাম চিলে, আর ল্যাজহীন ঘুড়ির নাম ছিল পতিং। বাবা বলতেন কথাটা বোধ হয় পতঙ্গ থেকে এসেছে। আমাদের ঘুড়ি তৈরিতে ছিওল গাছের আঠা ব্যবহার করতাম। কোনো দিকে ওজন সামান্য কিছু ভারী হলে বিপরীত দিকে ঘাস বেঁধে ওজন ঠিক ক'রে নিতাম।

বয়স্কদের ঘুড়ি অন্য জাতের, ঢাউস ও কৌড়ে বা কোয়াড়ে। এ সব নাম কোথেকে এলো জানি না। তবে চীনদেশের ঘুড়ির ছবি দেখেছি, তাতে ঐ ঢাউসের চেহারার মতো ঘুড়ি দেখেছি। ঢাউস উড়লে উড়ন্ত চিলের মতো অনেকটা দেখতে হয় অথবা বাদুড়ের মতো। কৌড়ের চতুষ্কোণ চেহারাটা বড়ই স্থূল। তার চার দিকে চারটি কালো নিশান। দু'খানা পা ও দু'খানা হাতের মতো, শুধু মুণ্ডটি নেই। কৌড়ের উপরের অংশটি ধনুকের মতো, ছিলেটা বেতচেরা ফিতের। উপরে উড়তে থাকলে একটানা বোঁ—বোঁ শব্দ বাঁশির শব্দের মতো বাজতে থাকে। হাতে ধ'রে বেশিক্ষণ রাখা যায় না, এমন তার শক্তি। গাছে বেঁধে রাখতে হয় তার মোটা দড়ির এক প্রান্ত। বাঁশের শলার ফ্রেমে কাগজ আঁটা লম্বা বাক্সের মতো ঘুড়িও দেখেছি কদাচিৎ, তার নাম ফানুস ঘুড়ি। কৌড়ে ঘুড়ি যারা ওড়ায় তারা এ ঘুড়িকে সমস্ত রাত গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে, সমস্ত রাত আকাশে বাজতে থাকে একঘেয়ে বাঁশি। কেউ কেউ শখ করে ঢাউস ঘুড়ির মুখেও ছোট একটি ধনুক লাগিয়ে দেয়—বেতের পাতলা ছিলেযুক্ত ধনুক। এ ধনুকও বাজতে থাকে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় আর একটি জিনিস গ্রামে বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। যেখানে সেখানে স্বাস্থ্যচর্চার আয়োজন। খেলার মাঠের কোণে, বাড়িসংলগ্ন জমিতে, এমন কি বাড়ির ভিতরেও প্যারালেল বার ও ডন বৈঠকের আয়োজন। বয়স তখন আমার আটের বেশি নয়, আমিও এর অনুকরণ করতাম কিন্তু এটি যে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে তা জানতাম না। অনেক পরে বুঝতে পেরেছি এ সব। আমরা কয়েক বন্ধু পদ্মার ধারে বালু জড়ো ক'রে নিতাম এবং সেই বালুস্তূপের উপর উপুড় হয়ে পড়তাম দুই কনুয়ে ভর ক'রে। দুই হাত দুই সমকোণে ভেঙে দেহ সম্পূর্ণ সরল রেখে এ রকম পড়া বেশ অভ্যাস সাপেক্ষ। এখন যদি এ রকম করতে যাই তা হলে দু' হাতের জোড় খুলে যাবে।

গ্রামে তৈরি ব্যাট ও বল দিয়ে আমরা ক্রিকেট খেলতাম পদ্মার ধারে। কখনো বা স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে কোনো মাঠে ফুটবল খেলা হত। স্কুলের নিজস্ব কোনো খেলার ব্যবস্থা ছিল না। তখনও সাঁতার কাটা সম্পূর্ণ শিখিনি, মাঝে মাঝে অভ্যাস করছি মাত্র।

একটি স্ত্রীলোককে কুমীরে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, গল্প শুনেছি।

চিলে, পতিং, কৌড়ে ও ঢাউস ঘুড়ি

বর্ষাকালেই কুমীরের ভয় বেশি। তাকে সবাই সাবধান ক'রে দিয়েছিল—বলেছিল কুমীর দেখা দিয়েছে, বেশি দূরে যেয়ো না, কিন্তু সে তা শোনেনি, বলেছিল, এতকাল চান করলাম—

কথা শেষ হবার আগেই তার পায়ে টান পড়েছিল এবং ওরে বাপরে—ব'লে ডুবে গিয়েছিল। এ ঘটনা আমার জন্মের পূর্বে ঘটেছিল। আমার কানে একদিন একটি উত্তেজক খবর এলো—বড় গোলার ঘাটে এই মাত্র একজন লোককে কুমীরে ধ'রে নিয়ে গেল।

কুমীরের মানুষধরা ও মানুষ খাওয়া সম্পর্কে গ্রামে নানা রকম কাহিনী প্রচলিত। তখন সে সব কাহিনী বিশ্বাস করতাম সরল মনে। যারা বলত তারাও বিশ্বাস করত। শুনেছি কুমীর মানুষ ধ'রে নিয়ে কোনো নির্জন স্থানে গিয়ে ওঠে, তার পর তার হাত পা মুণ্ড প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে ল্যাজের সাহায্যে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে শূন্য থেকেই লুফে নেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেলে। কুমীর সোজাসুজি দেহ থেকে কামড়িয়ে খেতে পারে না। কুমীরের একটি গোপন ভাণ্ডার থাকে, সেখানে স্ত্রীলোকদের দেহে যে সব অলঙ্কার পায়, সেগুলো জমা ক'রে রাখে। এ ভাবে এক একটি কুমীরের ধনভাণ্ডারে হাজার হাজার টাকার অলঙ্কার জমা হয়ে আছে। কেন আছে এবং এর উদ্দেশ্য কি, তা কেউ জানে না, ওটা কুমীরের স্বভাব, অতএব সমালোচনার বাইরে।

একবার বাঘে মানুষ ধ'রে নিয়ে গেছে গ্রামে ঢুকে, এমন কাহিনীও শুনেছি। কোন্ এক অনঙ্গের মাসীর ভাগ্য ছিল খারাপ। এ ঘটনাও আমার জন্মের পূর্বেকার। একবার বর্ষাকালে একটা টাইগার কি ক'রে গ্রামে ঢুকে বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল, এবং হৈ-হৈ গণ্ডগোলে একটি হেলানো তেঁতুলগাছের গুঁড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। গ্রামে শিকারী নেই কেউ। চারদিকে বহু লোকের পাহারা। কয়েক জন ছুটে গেল তাঁতিবন্দের চৌধুরী জমিদারদের বাড়িতে মাইল ছয়েক দূরে। তাঁরা বললেন সমস্ত রাত আটকে রাখো বাঘ, সকালে গিয়ে মারা হবে।

সমস্ত রাত নানা রকম কানফাটানো আওয়াজ ও হল্লা ক'রে বাঘকে ঘিরে রাখল, কিন্তু সকাল হলে সবাই একে একে চলে যেতে লাগল, কারণ এখন তো আর ভয় নেই, এখন দিনের আলো, বাঘের সাধ্য কি এক পা হাঁটে। দিনের আলোয় ওরা চোখে দেখে না। কিন্তু যখন বাঘ চোখেও দেখল এবং এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে আসতে লাগল, তখন অবশিষ্ট লোকগুলো কাঁপতে আরম্ভ করেছে। এ কি অবিশ্বাস্য কাণ্ড! এ বাঘের অসাধ্য তো তাহলে কিছুই নেই। এটি নিশ্চয় সামাজিক প্রথা অমান্যকারী বাঘ! কিন্তু তার বিরুদ্ধে যত অভিযোগই থাক, প্রত্যক্ষ সত্য কথাটি এই যে, বাঘ দিনের বেলা ভালই চোখে দেখে এবং সে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। তখন গতিশক্তিরহিত বেপমান লোকগুলো চাপা এবং কাঁপা গলায় বলতে লাগল, ওরে, তোরা সোর-গোল করিস নে, যেতে দে, যেতে দে, যেতে দে।

সবার সামনে দিয়ে বাঘ সকালে পালিয়ে গেল

বাঘ অবশ্য এ অনুমতির অপেক্ষা না করেই চলতে শুরু করেছিল। কাছেই ঘন জঙ্গল ছিল, সেখানে সে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। শিকারীরা এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন। আমাদের বাল্যকালে এ সব কাহিনী নিয়ে মুখে-মুখে ছড়া রচিত হয়ে খুব প্রচারিত হয়েছিল, এখন আর সে-সব ছড়া মনে আনতে পারি না।

প্রচুর সাপ থাকা সত্ত্বেও আমি মাত্র একটি লোককে সাপের কামড়ে মারা যেতে দেখেছি ছেলেবেলায়। ওঝারা কি ভাবে ঝাড়ার কাজ করে, মন্ত্র পড়ে, গায়ে জল ঢালে, গাছের ডাল দিয়ে চাবুক মারে, আর মন্ত্র আওড়ায়, সব দেখেছি। তিন দিন পরে মৃতদেহ পদ্মায় ভাসিয়ে দেওয়া হল। আমি একবার মাত্র শীতকালের এক রাত্রে বাঘের ডাক শুনেছি, ঘরের পাশে। শীতকাল হচ্ছে বাঘের মরশুম। চারদিকের টিনের আওয়াজে ঘুম ভেঙেই সে ডাক শুনতে পাই। কুকুরটা কোথায় যেন লুকিয়ে শুকনো গলায় দীর্ঘ একটানা কেঁউ-কেঁউ শব্দ করে চলেছে। বাঘটা বোধ করি মিনিট দশেক ডেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বাবার মুখে শুনেছি, ঠাকুরদার চরিত্র স্মরণীয় ছিল। তিনি সাধু ব্যক্তি ছিলেন। যা কিছু হাতে আসত, সব বিলিয়ে দিতেন সবাইকে। কেউ কিছু বিক্রি ক'রে গেলে (দুধ, মাছ ইত্যাদি) যদি পরে শুনতেন, বাজার দরের চেয়ে শস্তায় দিয়ে গেছে, তাহলে পরে তাদের জোর ক'রে আরও বেশি দিয়ে দিতেন। বাড়ির জমির ফল বা তরি-তরকারী পাড়ার সবাইকে দিয়ে তার পর খেতেন। এই প্রসঙ্গে বলি—আমাদের বংশ-তালিকায় দেখেছি, ঊর্ধ্বতন অধিকাংশ ব্যক্তিই কিছুকাল সংসার করার পর, সংসার ত্যাগ ক'রে গেছেন। সংসার বিষয়ে উদাসীনতা আমাদের পারিবারিক বৈশিষ্ট্য, শুনেছি।

গ্রামে ম্যালেরিয়া ছিল খুব। আমরা প্রায় জ্বরে ভুগতাম। আমার অনুজ সুবিমল, তার হল কালাজ্বর। তখন ও নাম ছিল ওর নাম ছিল দোকালীন জ্বর। ওর কোনো চিকিৎসা ছিল না তখন। বাবা মা তাকে নিয়ে কলকাতা এলেন। আমার তখন বয়স এগারো। আমি বাড়িতেই ছিলাম। বহু রকম চিকিৎসা হয়েছিল কলকাতায়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেছিলেন [illegible] রায়, কবিরাজি চিকিৎসা করেছিলেন বিজয়রত্ন সেন। এ সব মনে আছে—চিঠিতে লিখতেন বাবা। আড়াই মাস পরে রতনদিয়া (মাতুলালয়) থেকে একটি লোক এসে খবর দিল ওঁরা সব কলকাতা থেকে ফিরে এসেছেন রতনদিয়ায়। ভাইয়ের অবস্থা অনেকটা ভাল। আমাকে যেতে হবে রতনদিয়ায়। সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে

গেলাম। শীতকাল। খেয়া পার হয়ে নদীর ধার দিয়ে হেঁটে চলেছি। পায়ে বুট জুতো, হেঁটে খুব আরাম। মনে হচ্ছিল আরো হাঁটি, আরো হাঁটি। কি উৎসাহ রতনদিয়া যেতে। বেলা চারটেয় রওনা হয়ে প্রায় আটটায় এসে পৌঁছলাম রতনদিয়ায়। বাবার কাছে যেতেই আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললেন, সে আর নেই রে।

বাবা সেবারে আর সাতবেড়ে ফিরলেন না। ১৯১০ সালের গোড়ার দিকে, বাবা ওখান থেকেই আমাকে পোতাজিয়া নিয়ে চললেন হাই স্কুলে ভর্তি ক'রে দেবেন ব'লে। হঠাৎ এলাম নতুন পরিবেশে। এসে এক ক্লাস উপরে ভর্তি হলাম—অর্থাৎ নিয়মমতো হওয়া উচিত ক্লাস ফাইভ, কিন্তু ভর্তি হয়েছিলাম ক্লাস সিক্সে। গোয়ালন্দ থেকে ভোরবেলা ব্রহ্মপুত্র লাইনের ষ্টীমারে উঠে বেলা ১১টা আন্দাজ সময়ে পাবনা জেলার আরালিয়া (পরে সাধুগঞ্জ) ষ্টেশনে এসে নামতে হয়। তারপর সেখান থেকে নৌকো ভাড়া ক'রে বড়াল নদী পথে রাউতাড়া গ্রাম, তার পর সেখান থেকে মাইল খানেক হাঁটা পথে পোতাজিয়া। বর্ষাকালে বাড়ির দরজায় আসে নৌকো। স্থানীয় জমিদার অম্বিকানাথ রায় স্কুলের সেক্রেটারি—তাঁদের প্রকাণ্ড বাড়ির একটা ঘরে ছিল হেডমাষ্টারের বাস। সেইখানে হল আমারও বাস।

এ পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বড়ই কষ্ট হতে লাগল। রেড়ির তেলের প্রদীপে রাত্রে পড়া। তার সলতে অদ্ভুত। বর্ষাকালে জলে এক রকম লতা গাছ হয় তারই ভিতরের শাঁস, গোল লম্বা এবং শাদা। গ্রামটিও অদ্ভুত। এক একটা উঁচু জায়গার উপরে এক একটা পাড়া। এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় যেতে হলে পাহাড়ের মতো নিচে নেমে কখনো সঙ্কীর্ণ ঢালু পথ বেয়ে কখনো বা বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে গিয়ে আর এক পাড়ায় আরোহণ! বর্ষাকালে জলে সব ভ'রে ওঠে এবং দুই পাড়ার মধ্যবর্তী জল, পাড়ার জমির সমতলে এসে দাঁড়ায়। তখন নৌকোয় যাতায়াত। গ্রামটি প্রকাণ্ড, কিন্তু এ রকম গ্রাম্য ভেনিস আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি। এ গ্রামে সাইকেল বা মোটর সম্পূর্ণ অচল।

মনে হল এ আমার নির্বাসন। এ রকম জায়গায় বাবা কেন এবং কি ভাবে এসেছিলেন তা আমি জানি না। তবে এ সময়ের দু বছর আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি পোষ্টকার্ড আমি দেখেছিলাম; চিঠিখানি এই—

ওঁ

শিলাইদহ

সবিনয় নমস্কার পূর্বক নিবেদন,

বোলপুর বিদ্যালয়ে ইংরেজি অধ্যাপনার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছে। বেতন পঞ্চাশ—বিদ্যালয় গৃহেই বাস করিয়া অন্যান্য অধ্যাপকদের সহযোগে ছাত্রদের পর্যবেক্ষণ ভার লইতে হয়। যদি এ কার্যভার গ্রহণ করা আপনার অভিমত হয় তবে কতদিনের মধ্যে কাজে যোগ দিতে পারিবেন জানাইবেন। লোকের অভাবে ক্ষতি হইতেছে অতএব আপনার মত জানাইতে বিলম্ব করিবেন না। আমি ফাল্গুন মাস এখানেই যাপন করিব স্থির করিয়াছি যদি সুবিধামত আমার সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভবপর হয় তবে সকল কথা আলোচনা হইতে পারিবে। আশা করি ভাল আছেন। ইতি ৫ই ফাল্গুন ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কার্ডের বিপরীত দিকে ডাক ছাপ Shelidah B. O. 18 FE 08 Nadia. ঠিকানা—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামী সমীপেষু

Potazia (Pabna)

কার্ডখানা আজও আমার কাছে আছে। এক পয়সা দামের পোষ্টকার্ড ১৯০৮ সালে লেখা।

বাবা ১৯০৫ সালে ১লা এপ্রিল প্রথম এখানে হেডমাষ্টার হয়ে আসেন। এ চিঠি দেখার পর আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাবাকে, কিন্তু তিনি কি বলেছিলেন মনে নেই, কিংবা হয়তো বলেছিলেন এখানকার দায়িত্ব হঠাৎ ছাড়ি কি ক'রে। ১৯২২ সালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার অন্য একটি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বাবার কথা উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন "আমি একবার ডেকেছিলাম তাঁকে, হয়তো যেখানে ছিলেন সেখানকার সবাই তাঁকে ছাড়তে চাননি।" আমি বলেছিলাম "সম্ভবত তাই।"

পোতাজিয়া গ্রামটি যত বিচিত্রই হোক, আমার শিশুকালের পরিচিত সকল পরিবেশ থেকে এমন বিচ্ছিন্ন মনে হতে লাগল যে সহজে এ জায়গার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। মানিয়ে নিতে দেরি হল, যদিও একবার দেশে গেলে সহজে আর এখানে আসা হত না। এখানে সব চেয়ে খারাপ লাগত বাইরের সঙ্গে এর যোগাযোগহীনতা। সাতবেড়েতে ছিল পদ্মা; তার চলন্ত রূপ আমার মনকে সচল ক'রে রাখত। ওপারে ছিল রেলগাড়ি, সেও সর্বদা চলছে কত দূর দেশে। কিন্তু এখানে কিছু নেই। বহু দূরে ছোট নদী, আমার কল্পনাকে বহন করার পক্ষে তা বড়ই ছোট।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে একটা যোগাযোগ আবিষ্কার ক'রে নিলাম। সে আমার কত বড় মুক্তি। সে হচ্ছে এখানকার ডাকঘর। এই ডাকঘরই তো আমাকে এতদিন বাইরের জগতের স্বাদ গন্ধ

গ্রাম্য ভেনিস—পোতাজিয়া

বহন ক'রে এনেছে, এখানেও তারই আশ্রয় গ্রহণ করলাম। ছোটদের জন্তে যে সব মাসিকপত্র ছিল তার গ্রাহক হয়ে গেলাম, বড়দের কাগজও আমার অপঠিত থাকত না। এ ভিন্ন আমার পরিচিত যাবতীয় বন্ধুর কাছে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলাম নিয়মিত। তার ফলে প্রতি ডাকে আমার নামে চিঠি, না হয় পত্রিকা আসত এবং এরই জন্য সমস্ত দিন আমি উন্মুখ হয়ে থাকতাম। বিকেলে ডাকঘরে না যেতে পারলে দিনটি বৃথা মনে হত। বর্ষাকালে নৌকোয় যেতাম, এবং আমি নিজেই নৌকো চালিয়ে যাওয়া শিখে গেলাম অল্প দিনের মধ্যে।

সেক্রেটারি অম্বিকানাথ রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীকুমুদনাথ রায় (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সেশনস জজ)—তিনি তখন মুনসেফ। পরিবারে তাঁরই দুই পুত্র মাত্র। বড় ফণী, আমার সহপাঠী। ফণী 'মুকুল'-এর গ্রাহক ছিল, আমিও এখানে এসেই প্রথমে মুকুলের গ্রাহক হই এবং ধাঁধার উত্তর দিয়ে নিজের নাম ছাপা দেখে বড়ই পুলকিত হই। নাম ছাপার অক্ষরে ইতিপূর্বে ইংরেজীতেই দেখেছি। এপিফ্যানি নামক খৃষ্টান ধর্ম বিষয়ক সাপ্তাহিক কাগজখানা আমার নামে আসত বরাবর, ইংরেজী শেখার আগে থেকেই। তার পর জলছবির যুগে বিজ্ঞাপন দেখে রবার ষ্ট্যাম্প ও পকেট প্রেস—নানা জাতীয়, কত যে আনিয়েছিলাম তার সীমাসংখ্যা নেই। প্রথম বয়সে নাম ছাপার অক্ষরে দেখার একটা মোহ আছে। ও যেন নিজেকেই পরিচ্ছন্ন আকারে দেখা।

ডাকঘরে চিঠির পর চিঠি। এই চিঠি লেখা আমাকে নেশার মতো পেয়ে বসল। আমার রচনা শিক্ষা, বাংলা বা ইংরেজী, কলেজ জীবন পর্যন্ত এই চিঠির সাহায্যেই হয়েছে ব'লে আমি মনে করি।

মুকুলের পরে (কতদিন পরে মনে নেই) গ্রাহক হই 'প্রকৃতি'র এবং তারপর 'শিশু'র। প্রকৃতি আমার সব চেয়ে প্রিয় ছিল। ওতে পি ঘোষের আঁকা ছোট ছেলেমেয়ের ছবির মধ্যে এমন একটা অভিনবত্ব পেলাম যা তার আগে কোনো বাঙালী শিল্পীর ছবিতে পাইনি। এই প্রকৃতিতেও ধাঁধার উত্তর দেওয়া চলত নিয়মিত এবং শেষে ফণীর অনুকরণে ধাঁধাও পাঠিয়েছিলাম এবং তা ছাপা হয়েছিল। আমার আঁকা ছবি দু'বার ছাপা হয়েছিল প্রকৃতিতে। যতদূর মনে পড়ে এই প্রকৃতি কাগজেই ১৯১১ সালের মোহনবাগান দলের ছবি দেখে কি আনন্দ ও গর্ব যে অনুভব করেছিলাম! আজও সে কথা মনে এলে ভাল লাগে। এক পুজোর ছুটিতে রজনীকান্ত সেনের মৃত্যুর সচিত্র খবরও প্রকৃতি কাগজেই দেখেছিলাম, খুব সম্ভবত।

কিন্তু ডাকঘরের খোলা পথ সত্ত্বেও আমার মন ছুটে যেত দূর পদ্মা নদীর তীরে। সেখানকার আকাশ বাতাস, সেখানকার ক্ষেতের ছবি, সেই সরষে তেলের ঝাঁঝালো গন্ধের পরিবেশে ব'সে ঘানিতে পাক খাওয়া, বর্ষায় আম আঁঠির বাঁশি বাজানো, কুমোরের চাকের পাশে অপলক চেয়ে থাকা, সেই যতদূর ইচ্ছে পদ্মার পাড়ে ছোট ছোট ঝাউগাছের ভিতর দিয়ে লক্ষ্যহীন ঘুরে বেড়ানো, সব একসঙ্গে মনে জেগে উঠত। চোখে শিশুকাল থেকেই কিছু কম দেখতাম। দূর দৃষ্টি ঝাপসা ছিল, তার সঙ্গে চোখের জল মিশে সব যেন কোথায় হারিয়ে যেত। সে আমার নিজেরই হারিয়ে যাওয়া।

দেশের প্রত্যেকটি ইঞ্চি মাটির সঙ্গে আমার কি কঠিন বন্ধন তা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ছিল না, আজও নেই, কিন্তু তার স্মৃতি মনকে বিচলিত করে, তখনও এমনিই করত। তাই আমি পোতাজিয়াতে কোনো বছরই দু'তিন মাসের বেশি থাকিনি। স্কুলের পড়ায় মনোযোগ খুব বেশিক্ষণ রাখতে পারতাম না, সেজন্য ভাল ছাত্র হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কখনো হয়নি। পাঠ্যবস্তু মোটামুটি বুঝে যেতাম, এবং অতি দ্রুত। সব জ্ঞাতব্যেরই মূল সত্যটি অস্পষ্ট হলেও চকিতে চোখে ভেসে উঠত, সেজন্য খুটিনাটি তথ্যে কোনো আগ্রহ ছিল না। কোনো একটি বিষয় নতুন জানলে নতুন আবিষ্কারের আনন্দে মনে উত্তেজনা জাগত, আমি যা জেনেছি তা সবাইকে না জানানো পর্যন্ত ভাল লাগত না। এ আমার একটি নতুন উত্তেজনা ছিল।

এই সময় ১৯১০ সালের শেষের দিকে প্রথম কলকাতা যাবার সুযোগ ঘটল। সাতবেড়ে গ্রামের এক মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ছেলে কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কুলে পড়তেন, তাঁর নাম মুকুন্দলাল হালদার। গৌরকান্তি, স্বাস্থ্যবান। মধুর স্বভাব, মধুর ভাষী। তিনি স্কট লেনের সুবিখ্যাত মৎস্যব্যবসায়ী মতিলাল কুণ্ডু মহাশয়ের বাড়িতে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে কলকাতা এলাম এবং ঐখানেই উঠলাম। কলকাতায় প্রথম, তাই প্রায় সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে দিন কাটত। মনে আছে এই সময় ধর্মতলা ষ্ট্রীটে ফোটোগ্রাফ তুলিয়েছিলাম আট আনা দিয়ে। কাচের উপরেই পজিটিভ প্রিণ্ট, পিছনে কালো কাগজে ঢাকা ও আর একখানা কাচ চাপিয়ে ফ্রেমে এঁটে দেওয়া। এক আধখানা মোটর গাড়িও দেখেছিলাম মনে পড়ে। পরের বছরের শেষে পঞ্চম জর্জ আসা উপলক্ষে কলকাতা আসার প্রবল বাসনা হল এবং রতনদিয়ার কাছে কালুখালি ষ্টেশন উঠে আসাতে একা যাওয়া খুবই সুবিধাজনক মনে হল। কিন্তু সে কি ভিড়। রিটার্ণ টিকিট কিনে ডিসেম্বরের বোধ হয় ২০শে ২১শে থেকে ঢাকা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ওঠার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হলাম, এবং কয়েকদিন চুপ ক'রে থেকে ২৮শে কিংবা ২৯শে তারিখে নতুন টিকিট কিনে দিনের গাড়িতেই গেলাম, এক দিকের টিকিট নষ্ট হল। দিনের এইট-ডাউন প্যাসেঞ্জার শীতের দিনে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যায়, সেজন্য একা এ গাড়িতে এ ক'দিন চেষ্টা করিনি, যদি শিয়ালদ গিয়ে পথ না চিনতে পারি। কিন্তু সঙ্গে একজন যাত্রী পাওয়াতে আর কোনো অসুবিধে হল না। এলাম ১৯১১ সালের শেষে। রাজদর্শন হল ১৯১২ সালের প্রথমে।

সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য! কলকাতা আলোয় আলোময়। চোখে ধাঁধা লাগে। মুকুন্দলাল আমাকে খুব ভাল বাসতেন, তিনি রাজদর্শন করিয়ে দিলেন ময়দানে। প্যাজেণ্ট শো। তারপর বাজি পোড়ানো। সবই কল্পনাতীত ব্যাপার। বেশ কয়েক দিন কলকাতা থেকে, ফ্রেমে বাঁধা রাজা-রাণীর রঙীন ছবি কিনে নিয়ে গেলাম দেশে।

১৯১০ সালের একটি বড় ঘটনা স্মরণীয় হয়ে আছে। সে [illegible] হালির ধূমকেতু। জীবনের একটি পরম বিস্ময়। চার দিকে খুব উত্তেজনা। গ্রামের লোকেরা বলাবলি করত ভয়ানক একটা কিছু হবে। খবরের কাগজে কি লেখে জানবার জন্য ছুটোছুটি করত। প্রথমে শেষ রাত্রের দিকে উঠত, ক্রমে সময়ের বদল হতে হতে

সন্ধ্যা বেলা দৃশ্য হত। অর্থাৎ দিনের আলো কমে গেলেই আকাশ জোড়া ধূমকেতু কাঁচা সোনার রঙে ফুটে উঠত। শুনতাম ধূমকেতুর ল্যাজ পৃথিবী ছুঁয়ে যাবে, শুনে ভয় হত বেশ। তারপর শুনলাম পৃথিবী তার ল্যাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল, তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। ধূমকেতুর মাথাটি থাকত দক্ষিণে পদ্মানদীর ওপারে আর পুচ্ছটি ক্রমশঃ চওড়া হ'য়ে মধ্য আকাশও পার হয়ে যেত। প্রতিদিন দেখে দেখে পুরনো হয়ে গিয়েছিল। বেশ মনে আছে রতনদিয়া থেকে এক বন্ধু মজার ভাষায় আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, এখানে আমরা যে ধূমকেতু দেখছি তার দুটো দাঁত, তোমাদের ওখানকার ধূমকেতু ক' দাঁতের?

ধূমকেতুর কথায় সন্তপঠিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি চিঠির কথা মনে পড়ল। চিঠিখানি ১৩৬৩ সালের ভাদ্রসংখ্যা কথাসাহিত্যে বেরিয়েছে। চিঠির তারিখ ৩রা আশ্বিন ১৩৪৭ (১৯৪০) তিনি লিখছেন, "ধূমকেতু দেখার সুযোগ ঘটেনি। ছেলেবেলায় হ্যালির ধূমকেতু উঠেছিল শুনেছি, সে আজ ত্রিশ বছর আগের কথা, তখন খুব ছেলেমানুষ পাড়াগাঁয়ে থাকি কেউ দেখায়নি।"

এই চিঠিখানি আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। কারণ বিভূতি বাবু আমার চেয়ে অন্তত চার বছরের বড় ছিলেন। (দ্বারেশ শর্মাচার্যকে বিশ্বাস করলে আমাদের বয়সের পার্থক্য চার বছরই দাঁড়ায়)। ১৯১০ সালে ওঠা হ্যালির ধূমকেতু এমন বিরাট এবং এমন স্মরণীয় ঘটনা এবং এমন দীর্ঘদিনব্যাপী 'ইভেণ্ট' যে তা পনেরো ষোল বছরের বালকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কথা নয়। তবু তিনি এ রকম লিখলেন কেন, এটি আমার কাছে একটি রহস্য রয়ে গেল। তাঁর জীবিতকালে হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে কখনো তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছি মনে পড়ে না। সে সময় একথা জানলে এর একটা মীমাংসা তখনই হয়ে যেত, আজ তো আর কোনো উপায় নেই।

গাঁই স্কুলে যে ইংরেজী বই প্রথম পড়েছি তার নাম যতদূর মনে পড়ে নেলসন্‌স্ ইণ্ডিয়ান রীডার। তার দু' চার পাতা পরপর একখানা দু'খানা রঙীন ছবি ছিল। একটি রেলগাড়ির ছবি, একটি জ্যোৎস্না রাতের ছবি। পড়া ভুলে সেই ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে স্বপ্নজাল বুনতাম।

একটা কবিতার এইটুকু মাত্র এখন মনে আছে—

Follow me full of glee
Singing merrily merrily merrily.

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পড়তে এ দুটি লাইনের উল্লেখ দেখে চমকিত হয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ আরও শিশুকালে পড়েছিলেন, তাই তিনি এর অনেক কথাই ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর যেটুকু মনে ছিল বা ঐ কথাগুলো তাঁর মনে যে রূপ নিয়েছিল, তা এই—

"কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং।" তিনি লিখছেন—"অনেক চিন্তা করিয়া ইহার কিয়দংশের মূল উদ্ধার করিতে পারিয়াছি—কিন্তু 'কলোকী' কথাটা যে কিসের রূপান্তর, তাহা আজিও ভাবিয়া পাই নাই।"

বিষয়টি আমি এর পর ভুলে গিয়েছিলাম। নইলে তাঁর জীবিত-কালে [illegible]

একটি পরবর্তী মুদ্রণ খুলে দেখি, 'কলোকী' কলোকীই আছে, 'Follow me'-তে ফুটে ওঠেনি।

আর একখানি কল্পনা-উধাওকারী বই আমার হাতে আসে এই সময়। নাম ফিলিপস্ ইণ্ডিয়ান মডেল অ্যাটলাস। তার এক দিকে দেশজ্ঞাপক রঙীন ম্যাপ, তার বিপরীত পৃষ্ঠায় সেই দেশেরই রিলীফ ম্যাপের দু' রঙে ছাপা ফোটোগ্রাফ। সমুদ্র অংশ নীল, জমির অংশ সিপিয়া রঙের। এর এক-একখানা পাতার মধ্যে দিয়ে আমি দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করতাম। সবচেয়ে ভাল লাগত, ভারতের উত্তরের অংশটি। তুষার-ঢাকা পর্বতচূড়া ও সমস্ত হিমালয়ের উঁচু-নিচু জমির যেন সত্য একখানা ফোটোগ্রাফ। কি রহস্য-ভরা সে ছবি। পাহাড়-পর্বত তখন দেখি নি, শুধু সমতল জমি দেখার অভ্যস্ত চোখে হিমালয় খুব ভাল লেগেছিল। বাবার কুমারসম্ভবের কাব্যানুবাদ রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে কিছুকাল আগে ছাপা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। ছন্দ ও ধ্বনির সৌন্দর্য সম্পর্কে ধারণার জন্য তিনি সে-অনুবাদ মাঝে মাঝে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে পড়তেন। বিশেষ ক'রে হিমালয়ের বর্ণনা অংশ, যথা—

সিন্দুরে গৈরিকে কিন্নরী-ললনা
বিভ্রম ভূষা করি' বিহরিছে শিখরে—
ধাতু-আভা লেগে যবে মেঘে শোভে ছলনা
অকাল সাঁঝের মত পর্বত উপরে!
কটিতটে চলন্ত জলদের নিম্ন
ভুঞ্জি সানুর ছায়া সিদ্ধেরা সমুদয়
বৃষ্টির জলে পড়ে হলে পরে খিন্ন
রোদ্দুরে গিরিচূড়ে লভিতেছে আশ্রয়।

ইত্যাদি ছত্রগুলি বার বার শুনে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এর একটা অস্পষ্ট অর্থ মনে জেগে উঠত, এতে হিমালয় সম্বন্ধে আমার মনে একটা ভীতিসম্ভ্রমপূর্ণ আকর্ষণ জেগে উঠেছিল এবং তার বছর দুই পরে তার পরিণাম কি হয়েছিল, তা পরে বলা যাবে। এই অ্যাটলাসে ভূগোলকের ৩৬৫ দিনের সূর্য প্রদক্ষিণের একটি সুন্দর রঙীন ছবি ছিল। এ থেকে ঋতু পরিবর্ত্তনের ধারণা হয়েছিল সহজে। ভূগোলের অনেক জানবার জিনিস এই একখানি বই থেকেই খুব অল্প সময়ে জানা হয়ে গিয়েছিল। ছবিগুলো রঙীন ছিল ব'লেই তার প্রতি এক অদ্ভুত মায়া। রঙের সম্পর্কে আমি প্রায় উন্মাদ ছিলাম। রঙীন ছবির বই ছেলেবেলায় যতগুলো হাতে এসেছিল তা সযত্নে রক্ষা করতাম। বাইবেলের রঙীন ছবির সাহায্যে ইংরেজী অ্যালফাবেটের একখানা খুব বড় আকারের বই ছিল। তার কাগজ খুব মোটা, এবং দু'খানা কাগজ দু'ধারে, মাঝখানে মোটা গজ কাপড় দিয়ে এমন আঁটা যে তা সহজে ছেঁড়া যায় না। সে বইখানাও আমার খুব প্রিয় ছিল। জলছবির আকর্ষণের কথা আগে বলেছি। শেষ পর্যন্ত জলছবি বইএর মার্জিনে, চেয়ারে, ডেস্কে, দরজায়, দরজার চৌকাঠে, জানালায়, আয়নায়, এবং শেষে বন্ধুদের হাতে, পায়ে, কপালে, কাপড়ে, জামায়, লাগিয়ে লাগিয়ে জলছবি পর্বের একটা উপসংহার টেনে দিয়েছিলাম।

রঙের নেশা কিন্তু ওতে কাটেনি। তারই ফলে বহুদিন রঙীন ছবি আঁকা এবং কিছুকাল পরে তা ফেলে (১৯২০ সালে)

তীর্থে এসে উত্তীর্ণ হলেই হয়তো তা শোভন হত, কেননা সব কালো হয়ে মিলিয়ে যাবার ধাপ তো প্রায় দেখতে পাচ্ছি।

১৯১০-১১ সাল থেকে রতনদিয়ার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা বাড়তে লাগল। সম্ভবত রেল ষ্টেশন খুব কাছে ব'লেই। এখান থেকে যতদূর ইচ্ছা সহজে যাওয়া যায়, এখানে আর শুধু কল্পনায় ভ্রমণ নয়। এটি আমার কল্পিত আদর্শ জায়গার সঙ্গে অনেকটা মেলে। সাতবেড়েতে পদ্মার পাড়ে ব'সে এখানকার পথে চলা রেলগাড়ির ধোঁয়া দেখে দেখে মনে মনে স্বপ্ন রচনা করেছি, এখানকার মাঠে যেন আরও আত্মীয়তা। আমার মাতামহের প্রভাব এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট, অতএব এখানে আমার নতুন মর্যাদা। এখানে যারা আমার বন্ধু তাদেরই জমি এখানে দিগন্তস্পর্শী। কালুখালি ষ্টেশনে (তখন প্রায় তিন মাইল দূরে। ১৯১১-এর প্রথমে রতনদিয়ার সীমানায়।) প্রায় প্রতিদিনই যেতাম রতনদিয়াতে থাকতে। সেভেন-আপ গাড়িতে রাজবাড়ি গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে টু-ডাউনে ফিরে আসার অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ অনুভব করতে। ষ্টেশনে যেতে যেতে কিংবা ফিরে আসতে আসতে মেঠো পথের উপর একটা প্রচণ্ড মোহ জন্মে গেল। বলা বাহুল্য একমাত্র শীতকালেই এর আকর্ষণ বেশি ছিল, যদিও বর্ষাতেও দু'একবার গিয়েছি জল ঠেলে। শীতকালের সেই অজস্র কুলের ভারে নুয়ে পড়া ডাল থেকে যথা ইচ্ছা সুস্বাদু কুল পেড়ে খাওয়া, মটরের গাছ থেকে মটরশুঁটি ছিঁড়ে নেওয়া, এবং সব চেয়ে মধুর, আখের গুড়ের টাটকা জমা সর খাওয়া। মাঠের এক জায়গায় আখ মাড়াইয়ের এবং রস জ্বালানোর বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে গেলেই ওটা দক্ষিণা হিসেবে পাওয়া যেত প্রজাদের কাছ থেকে।

দু' মাইল দূরে হারোয়া গ্রামে প্রতি শীতকালে বসত মেলা। স্থানীয় জমিদার আলিমুজ্জমান চৌধুরী এম-এল-এর জমিতে। মস্ত কুত্তুর প্রকাণ্ড চালায় প্রকাণ্ড ভিয়েন, বড় বড় কড়ায় রসগোল্লা, পান্তুয়া আর জিলিপি তৈরি হচ্ছে দিনরাত। খদ্দেরের ভিড় সেখানে সবচেয়ে বেশি। টাটকা উপাদানে তৈরি টাটকা খাবার, পাবনা ফরিদপুর অঞ্চলে চির প্রসিদ্ধ। তার স্বাদ কলকাতায় মিলবে না। ছেলে বয়সের স্বর্গ এই মিষ্টান্নের দোকান। এখানে খাওয়া শেষ ক'রে পুরনো রেল লাইন ধ'রে ঘোরা পথে ফিরে আসার তৃপ্তিকর আস্বাদ আর ফিরে এলো না জীবনে।

রতনদিয়ার আরও একটি আকর্ষণ ছিল এখানকার পরিবেশ। সাতবেড়ে গ্রামটি প্রকাণ্ড, বড় এলোমেলো, অধিকাংশ স্থান বনজঙ্গলে ভরা। বর্ষায় বড় বড় পথ জলে আর কাদায় দুর্গম হয়ে ওঠে। গ্রামের মধ্যেই ছোট ছোট অনেক খোলা জমি, সেখানে ধান সরষে এবং পাট চাষ হয়। গ্রামের মধ্যে অনেক ডোবা সেখানে পাট পচানো হয়। রতনদিয়া গ্রাম সে তুলনায় স্বর্গ। এ গ্রামটি ছোট। দক্ষিণে চন্দনা নদী (শুধু বর্ষায় স্রোতস্বতী হয়)। উত্তরে গ্রামের সীমার উপর দিয়ে চলল রেললাইন ১৯১১ থেকে। গ্রামের দৈর্ঘ্য হাঁটাপথে মিনিট সাতেক, আর প্রস্থ মিনিট পাঁচেক। একটি দ্বীপ যেন। বাছাই করা লোকেরা এসে যেন একটি গ্রাম গড়ে তুলেছিল পূর্ব পরিকল্পনার সাহায্যে। বৃত্তি হিসেবে এক এক শ্রেণীর লোকের বাস এক একটি এলাকায়। সব সাজানো গোছানো। মোট প্রায় পঞ্চাশটি পৃথক বাড়ি। প্রধান দুটি পথের ধারে সম্পন্ন অথবা শিক্ষিত দোতলা। আজকের ১৯৫৭ সালের হিসেবে একশ থেকে সওয়া শ' বছর গত হল সে সব বাড়ি তৈরি হয়েছে ধরা যায়। ১৯১০ সালেই একটি বাড়ি ভাঙার মুখে। সেটি গোপাল সান্ন্যাল মহাশয়ের বাড়ি। মানময়ী গার্ল'স স্কুলের লেখক রবীন্দ্রনাথ মৈত্রদের পরিবার এঁরই সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

এক একটি বাড়ি সুন্দর সাজানো, ফুলের বাগান, ফলের বাগান, এবং চার দিক সুন্দর ভাবে ঘেরা।

১৯০৯-১০ এর কথা বলছি। রতনদিয়ার ঐশ্বর্যের তখন পূর্ণ অবস্থা। বেহিসেবী উপভোগ তখন শেষ উচ্চ মাত্রাচিহ্নে গিয়ে পৌঁছেছে। কি প্রাণধর্ম, কি উচ্ছলতা, কি বিলাস! একটি বালকের চোখে তা অবশ্যই অভিনব। ভোজন বিলাস ভিন্ন অন্য কোনো বিলাসের মূর্তি এমন প্রত্যক্ষ করিনি এর আগে। এখানে সমস্ত বিলাসই মাত্রার বাইরে। যখন গান বাজনা আরম্ভ হল তো পনেরো বিশ দিন ধ'রে চলল তা। যেখানে যত ওস্তাদের সন্ধান পাওয়া যেত কাছাকাছি, তাদের সবাইকে আনা হত সে আসরে।

উচ্চশিক্ষিতেরা বিদেশে থাকতেন, ছুটিছাটা উপলক্ষে কদাচিৎ আসতেন। অনেকেরই গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে আন্তরিক মিল ছিল না, আদর্শের সংঘাত অনিবার্য। একমাত্র ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য (রাজবাড়ি রাজা সূর্যকুমার ইনসটিটিউশানের হেডমাষ্টার) সহজ মানুষ, তিনি স্বতন্ত্র থেকেও সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারতেন। অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট—শুনেছিলাম তাঁকে ষড়যন্ত্র ক'রে গ্রাম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তিনি কাশীবাসী হয়েছিলেন। অখিলকুমার চট্টোপাধ্যায় (এস-ডি-ও) স্থায়ীভাবে গ্রাম ছেড়েছিলেন, ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (ত্রিপুরা ষ্টেটের ম্যানেজার) কদাচিৎ আসতেন।

যাঁরা গ্রামে থাকতেন তাঁরা সম্পূর্ণ আর এক জাত। এঁদের মধ্যে আমার মাতামহ যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও তাঁর কনিষ্ঠ ললিতচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন গ্রামের সর্ব বিষয়ে নেতা—অন্তত সে সময়ে তো বটেই। এ কথা বলছি কারণ তাঁদের এবং গ্রামের আর সবার অধঃপতন তার পর থেকেই শুরু। ১৯১০-১১ থেকেই সমৃদ্ধির শেষ সীমা পার হয়ে যাচ্ছিল, সেটি আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

যোগেশচন্দ্র-ললিতচন্দ্র—এঁরা বংশগত ভাবে গুরুগিরি করতেন। গ্রামের প্রধানেরা কয়েকজন এঁদের শিষ্য ছিলেন, দেশ বিদেশে অনেক বড় বড় শিষ্য ছিলেন এঁদের, রাজসাহীর সুবিখ্যাত দানবীর জমিদার কিশোরীমোহন চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। এঁদের ঐশ্বর্য কি ভাবে উপার্জিত জানি না, রুচি এবং সৌন্দর্যবোধ কোত্থেকে এলো তাও জানি না, কিন্তু যা দেখেছি তাতে বিস্ময় বোধ করেছি।

মামাদের বাড়িটি তিন-চার বিঘে জমির উপর। এমন সুন্দর সাজানো বাড়ি ওখানে আর ছিল না। বহিরঙ্গনের উঠোনটি একটি 'লন'। তার উত্তরে মণ্ডপ ঘর। সেখানে কালীপুজো হত এবং দোলের সময় গৃহদেবতা গোপালকে শোভাযাত্রা করিয়ে ঐখানে এনে বসানো হত।

লন্-এর পশ্চিম দিকের ঘর হচ্ছে বৈঠকখানা। তার উত্তর দিকের প্রকোষ্ঠে ছিল অস্ত্রাগার। সেখানে নানাজাতীয় খড়্গ, শড়কী, বল্লম, তলোয়ার, ছোরা প্রভৃতি থাকত। খড়্গ, লম্বা দা [illegible]

বন্দুকে ব্যবহার্য, আর কতকগুলো শৌখীন। বল্লম শড়কী প্রভৃতি শিকারের জন্য। এখানে যা বাঘ শিকার দেখেছি তা পৃথকভাবে উল্লেখযোগ্য। বড় মণ্ডপঘরের পাশে পুব দিকে পৃথক ঘর, তাতে বিরাট নিকষকালো শিবলিঙ্গ। পুবের দিকের পৃথক ঘর কাঠ কয়লা ইত্যাদি রাখবার। দক্ষিণদিকে বাগানের জমি পার হয়ে দেউড়ী, তার মাঝখান দিয়ে পথ। তার একধারে জোড়া তক্তাপোশে ফরাস পাতা, এবং পাশে প্রকাণ্ড বেঞ্চ। এখানে বৃদ্ধদের পাশা খেলা হত নিয়মিত, কখনো বা গান বাজনা। এর বিপরীত অংশে চাকরদের তামাক সাজা ও তৈরির জায়গা। দা দিয়ে তামাক পাতা কেটে কেটে তাতে চিটে গুড় মাখিয়ে ডলে ডলে তামাক তৈরি হত। প্রতিদিন চলত এ কাজ।

বৈঠকখানা ঘরে প্রকাণ্ড ফরাস। দেয়ালের ধারে ধারে বাদ্যযন্ত্র সাজানো। গোটা দুই বেহালার বাক্স, তবলা, ঢোলক, পাখোয়াজ, তানপুরা সেতার ইত্যাদি। দেয়ালে সেকেলে লিথোয় ছাপা রঙীন বা একরঙা বাঁধানো পট। একটি ছবির নিচে "বিনোদিনী" লেখা ছিল মনে আছে। প্রত্যেক দুটো ছবির মাঝখানে একটি ক'রে শিং ওয়ালা হরিণের মাথার খুলি। প্রবেশদ্বারে মোষের সিং কাঠের মাউন্টে লাগানো। মাঝখানে মাথার উপর ঝাড় লণ্ঠন। বাইরের প্রশস্ত দালানে চারটি ঘষা নক্সা আঁকা বড় বড় কাচের আবরণ ঘেরা দীপাধার ছাত থেকে শিকলে ঝুলছে। দালানে সারি দিয়ে সাজানো চেয়ার বেঞ্চি।

লনে প্রত্যেকটি ঘরের সঙ্গে লাগানো চারটি ক'রে ঝাঁকড়া পাতাবাহারের গাছ। কোনোটা লম্বা-পাতা লাল রঙ, কোনোটা বেঁটে পাতা হলদে ছিট দেওয়া। ললিতচন্দ্র নিজ হাতে এ সব পাতাবাহারের গাছ ছেঁটে দিতেন, ঘাস একটু বড় হলে সমান ক'রে দিতেন এবং সমস্ত লন্ এবং ফুলের বাগান নিজহাতে পরিষ্কার করতেন। সেখানে একটি কুটো পড়বার উপায় ছিল না। অস্ত্রাগারও তাঁর অধীন। প্রতি মাসে একবার অন্তত সেগুলো বের ক'রে নিজহাতে ঘষে মেজে পরিষ্কার ক'রে তাতে নারকেল তেল মাখিয়ে রাখতেন।

বাড়ির উত্তরের বাগানে তেজপাতার গাছ, দারুচিনির গাছ, সপেটার গাছ—গ্রামে দুর্লভদর্শন এ সবই।

কালীপুজো হত কোনো বিশেষ উপলক্ষে, নিয়মিত নয়। যাবতীয় শাক্ত আচার। প্রচুর পশুবলি, মাংস ও মদ্যের ছড়াছড়ি। ললিতচন্দ্র মাঝে মাঝে কাঁচা রক্ত পান করতেন, তিনি অন্য পানীয় স্পর্শ করতেন না। সেটি ছিল জ্যেষ্ঠের অধিকারে।

শিবপুজো করতেন যোগেশচন্দ্রের মা ও ভগিনী। অন্দরে গৃহদেবতা কালো পাথরের গোপাল, নাড়ু হাতে। রূপোর চোখ। আর কয়েকটি শালগ্রাম-শিলা। একসঙ্গে রোজ পুজো হত। যোগেশচন্দ্রই প্রতিদিন বসতেন পুজোয়। রত্নদিয়াতে থাকলে ভোরে উঠে ফুল তুলে দিতাম। সে পুজোর গন্ধ এখনও ভুলিনি।

এই ভট্টাচার্য বাড়ি ছিল সবার ঠাকুর বাড়ি। ওঁরা সবারই ঠাকুর মশাই। আমিও ঐ দলে পড়েছিলাম। জবরদস্ত ছিলেন তাঁরা। ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং ললিতচন্দ্র এ ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, দেখেছি। বাড়ির সীমানা দিয়ে অন্য কারো পাল্কীতে যাবার উপায় ছিল না। একবার দেখেছি পাল্কী-যাত্রীকে চ্যালেঞ্জ ক'রে নামিয়ে দেওয়া হল, তিনি হেঁটে গেলেন অবশেষে, এবং বাড়ির সীমানা পার হয়ে তবে পাল্কীতে উঠতে পারলেন। বাড়ির সীমানার সঙ্গে যুক্ত পথে অপরিচিত কেউ গেলে, "কে যায়" চ্যালেঞ্জ করা হত এবং তাঁকে নিজের পরিচয় দিয়ে যেতে হত। কেউ চ্যালেঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিলে ললিতচন্দ্র অস্ত্র নিয়ে ছুটে আসতেন। যোগেশচন্দ্র ছিলেন বিপরীত। উৎসবে উদার হয়ে পড়তেন। একবার দেখলাম ঢোল বাজনায় বিগলিত হয়ে বাদককে খুব দামী এক জোড়া শাল বখশিস দিলেন। নিজেদের সেটি বোধ হয় শেষ শাল-জোড়া।

পতনের ঠিক আগের অবস্থা। [ক্রমশঃ।

সনেট

দুর্গাদাস সরকার

আমাকে করেছো শিল্পী। অন্য নামে আমি মহীয়ান।
মৃত্তিকাও প্রাণ পায় আমার অপূর্ব অনুভবে,
পৃথিবী স্বাচ্ছন্দ্যে খেলে রূপৈশ্বর্যে আমার গৌরবে,
তবু নিজে ব্যর্থ আমি। ক্ষুব্ধ মনে রুদ্ধ অভিমান।
কঠিন মাটির বুকে যে পেল না আমার সীমানা—
হাতে তার রূপ গড়ি বেঁধে তাকে মনের নিগড়ে।
যদিও জেনেছি এই : সাধনারও সৌধ ভেঙে পড়ে,
তবু সে অন্তরে। কোন হৈম হর্ম্যে তার কি ঠিকানা!

কেউ আসে, কেউ যায়, কেউ দেয় দু'বেলা টহল
আশ্চর্য তৃপ্তির তীর্থে। আমি একা একান্ত নিশ্চপ।
নিখুঁত সুন্দর, শুনি, ধরণীর এই শিল্পস্তূপ ;
দেখে না মিলিয়ে কেউ কতো শূন্য শিল্পের মহল।
একদা তুমিও এলে। হলে যেন হঠাৎ অবাক
মূর্তি দেখে। আমি দেখি : নেই সেই [illegible]।

স্বামী বিবেকানন্দ ও দিব্য ভারত

শ্রীনৃত্যগোপাল রায়

রবীন্দ্রনাথ প্রতীচ্যের জনৈক মনীষীকে বলিয়াছিলেন, "If you want to know India, study Vivekananda. In him nothing is negative, but everything positive". রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে হইলে ভারতের মর্মবাণী কি, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে হইবে। আবার ভারতের মর্মবাণী ভারতবাসীদের নিকট শুধু একটি নিছক অনধিগম্য আদর্শমাত্র নয়—যুগে যুগে কঠোর সাধনার মধ্য দিয়া মূর্ত হইয়া এই আদর্শ ভারতবাসীর জীবনের সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুগে যুগে এই দেশে অবতার ও মহামানবের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা ভারতের মর্মবাণীর এক-একটি আলোকশিখা প্রজ্বালিত করিয়াছেন। ভারতের জনগণ দূর হইতে মুগ্ধ নেত্রে সেই আলোকশিখার প্রভা নিরীক্ষণ করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই—সেই আলোকে আপন আপন প্রাণের প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া আদর্শের সন্ধানে সাধনা করিয়াছে। ভারতীয় আদর্শের মূল কথা চৈতন্যের সন্ধান—অর্থাৎ চৈতন্য লাভের সাধনা। তাই ভারতের মর্মবাণী কি, তাহা বুঝিতে হইলে ভারতের সাধনার বিভিন্ন ধারাগুলি বুঝিতে হইবে।

ভারতীয় সাধনার অন্যতম প্রধান সুর ত্যাগের মন্ত্রে ধ্বনিত। অন্যতম বলার হেতু এই যে, ত্যাগের সাধনা বলিতেই ভারতের সাধনার সবখানি বুঝায় না। তাহার সাধনার মন্দাকিনী-স্রোতে এ-পাশ ও-পাশ হইতে কত জীবনের কত ধারা আসিয়া মিশিয়াছে। অবশ্য ত্যাগের সাধনা ভারতেরই বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর আর কোথাও ত্যাগের পথ প্রাধান্যলাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ভারতের পক্ষে ত্যাগ যেন তাহার মজ্জাগত ধর্ম। তাই ত্যাগ ভারতের মর্মবাণীর সপ্তসুরের প্রধান সুর। ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশে সিদ্ধার্থের ত্যাগের কাহিনী প্রচলিত। কিন্তু কে খবর রাখে, ভারতের পথে, ঘাটে, গিরিকন্দরে কত লক্ষ লক্ষ মহাপ্রাণ স্বেচ্ছায় সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় কঠোর সাধনায় লিপ্ত? ভারতের সমাজে ও সংসারাশ্রমেও সত্যকার ত্যাগীর অভাব নাই। পরমত্যাগী শ্মশানবাসী ভোলানাথ শিব এদেশে ত্যাগের আদর্শ।

পুরাকালে এই দেশে শৈশবেই ব্রহ্মচর্য আশ্রমে যখন শিক্ষা ও সাধনা সুরু হইত, তখনই ত্যাগের রঙে তরুণ শিক্ষার্থীর মনের গহন ও অঙ্গের বসন রঞ্জিত হইত। ব্রহ্মচর্য আশ্রম শেষ হইলে আরম্ভ হইত কর্মময় গার্হস্থ্য জীবন। তাহার পর আবার সে বাহির হইয়া আসিত ত্যাগের পথে বানপ্রস্থের যাত্রায়। পরিশেষে তাহার যাত্রা সমাপ্ত হইত—চরমত্যাগের মহাসমুদ্রে—সন্ন্যাসধর্মে। অর্থাৎ সুরুতেও ত্যাগ, আবার সমাপ্তিতেও ত্যাগ—কিন্তু মাঝখানে দেখি এক কর্মময় জীবন। এবং এই কর্মময় জীবনের লক্ষ্য যে ভোগবিলাস ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় শাস্ত্রে ও ইতিহাসে। ভবিষ্যৎ বানপ্রস্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সে যাগ-যজ্ঞ, পূজোপাসনা ও অন্যান্য বহুবিধ কর্মের মধ্যে যে জীবন যাপন করিত তাহাও ছিল তাহার সাধনার অঙ্গ। অর্থাৎ ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে ত্যাগও যেমন সত্য, কর্মও তেমন সত্য। যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বনে জঙ্গলে বা পর্বতগুহায় বসিয়া সমাহিতচিত্তে সাধনা করিতেন, তাঁহাদেরও যেমন লক্ষ্য ছিল চৈতন্য বা ব্রহ্মলাভ, তেমনি যাঁহারা সংসারে থাকিয়া কর্ম করিতেন তাঁহাদেরও লক্ষ্য ছিল কর্মের পথে জড়ের মধ্যে চৈতন্যের সন্ধান। ভারতীয় দৃষ্টিতে সমস্ত জড় প্রকৃতির মধ্যেও সেই চৈতন্যই বিরাজ করিতেছেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্", এই সত্যই সমগ্র বেদ-উপনিষদের মূল তত্ত্ব। এই সত্য আবিষ্কারের ফলেই ভারতীয় দৃষ্টির সর্বাবয়ব উদারতার (catholicity) উদ্ভব। বেদান্তের এই তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বধর্মসমন্বয়ের বীজ। এদেশে এই সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল বলিয়াই এখানে মূর্তিপূজার অর্থ পৌত্তলিকতা নয়—অরূপ যে ভাবঘন ব্যঞ্জনায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার পূজা। যাঁহারা এই তত্ত্বের মর্মে প্রবেশ করিতে পারেন নাই বা সেই উদ্দেশ্যে সাধনার পথে অগ্রসর হন নাই—শুধু পাণ্ডিত্যের দৃষ্টিতে অথবা পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্রয়ে বেদান্তের এবং ভারতীয় অন্যান্য শাস্ত্র ও অনুষ্ঠানের বিচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা পৌত্তলিকতা ভিন্ন মূর্তিপূজার আর কোনও তাৎপর্য খুঁজিয়া পান নাই।

উপনিষদ যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে—সেই তত্ত্বে পৌছিতে হইবে—অর্জন করিতে হইবে মুক্তি—শাশ্বত মুক্তি। তাই আরম্ভ হইল সাধনা। কিন্তু সকল মানুষই আর একই স্তরের জীব নয়। বিবর্তনের পথে মানুষের মধ্যে দেখা দিল স্তরভেদ। তাই এক দিকে দেখা দিল সেই পরমতত্ত্বের বহুধা ব্যঞ্জনা—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—আর দিকে সাধনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পথের উদ্ভব। আসিল জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ—আসিল ত্যাগের পথ, কর্মের পথ। বহুদিন পর্যন্ত ভারতে সাধনার ধারায়—ত্যাগ ও কর্ম সমভাবেই ওতঃপ্রোত জড়িত ছিল কিন্তু লোকসংখ্যার বৃদ্ধি ও সমাজের বিস্তারলাভের ফলে কালক্রমে স্বাভাবিক নিয়মেই কর্মের পথ প্রাধান্য লাভ করিল। মহাভারতের যুগে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণাবতারে দেখি, কর্মের পথের প্রাধান্যের পরাকাষ্ঠা। ত্যাগের পথ আপামর সকলের জন্য উপযোগী বা উন্মুক্ত নয়—সকলেই সেই পথে সাধনা করিবার অধিকারী নয়। তাই ত্যাগের নামে আসে কর্মবিমুখতা—আর কর্মবিমুখতা হইতে ক্লৈব্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই ভারতবাসীর কানে কর্মমন্ত্রের দীক্ষা দিলেন—তাহদিগকে ক্লৈব্য পরিত্যাগ করিতে আহ্বান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার ধারা বাহিয়া ভারতবর্ষের সাধনা ও সভ্যতার ইতিহাস বহু দিন পর্যন্ত প্রধানতঃ কর্মের পথেই প্রবাহিত ছিল।

বৌদ্ধযুগে আসিয়া এই প্রবাহের পথে একটা পরিবর্তন আসিল। ভারতীয় সাধনায় ভগবান বুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান সর্বস্ব ও সর্বাঙ্গীন ত্যাগের শিক্ষা। ত্যাগের সাধনা পূর্বেও ছিল। কিন্তু সেই ত্যাগ ছিল অনেকাংশে সংযমের নামান্তর—বুদ্ধদেব তাহার মহিমান্বিত রূপ দিলেন। বস্তুতঃ, ভগবান বুদ্ধই সর্বস্ব ত্যাগের মন্ত্র ভারতময় ছড়াইয়া দিলেন। তাই বুদ্ধের যুগকে বলা যায়—মূলতঃ ত্যাগের ও তপস্যার যুগ। কিন্তু বুদ্ধদেবের

ত্যাগের মন্ত্রের পিছনে রহিয়াছে একটা দুঃখবাদ। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার দরদী হৃদয়ের দৃষ্টিতে দেখিলেন, জগৎ শুধু দুঃখময়—মানুষ শুধু জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর নিগড়ে বদ্ধ। তাঁহার দরদী হৃদয় তাই কাঁদিয়া উঠিল। তিনি মুক্তির পথের সন্ধান দিলেন—দুঃখের বন্ধন হইতে মুক্তি। বেদান্তও মুক্তির সন্ধান দেয়—সেই মুক্তি সং-চিং-আনন্দের দ্বার খুলিয়া দেয়। বুদ্ধদেব যে মুক্তির সন্ধান দিলেন তাহার তাৎপর্য বিভিন্ন—জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি। এই মুক্তির পরিণতি নির্বাণের শূন্যতায়—তাই Negative. বেদান্তের মুক্তির পরিণতি সচ্চিদানন্দের পূর্ণতায়—তাই Positive. বুদ্ধের দুঃখবাদ হইতেই এই Negativism-এর উদ্ভব। বেদান্তের ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধের ধর্মের পার্থক্যও এইখানে। বেদান্ত যেখানে দেখিলেন আনন্দ—মানুষ অমৃতের পুত্র—বুদ্ধ সেখানে দেখিলেন দুঃখের পারাবার। তাঁহার ত্যাগের মন্ত্রের পিছনেও রহিয়াছে দুঃখবাদ। উপনিষদ যে ত্যাগের শিক্ষা দেয়, তাহার মূলে কোনরূপ দুঃখবাদ বা পলায়নী মনোবৃত্তি নাই। উপনিষদের বাণী—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—এই প্রপঞ্চময় জগৎকে ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিতে হইবে। ত্যাগের পথে জ্ঞানের সাধনায় মায়ার আবরণ খুলিয়া ফেল—জগৎ তখন পরম সত্যে অধিষ্ঠিত আনন্দময় বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

পরদুঃখকাতর পরমত্যাগী বুদ্ধদেব দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের জন্য আপামর সকলের জন্য ত্যাগের পথের নির্দেশ দিলেন। তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কালক্রমে সমগ্র দেশময় দেখা দিল একটা কর্ম-বিমুখতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্থান দখল করিলেন ভগবান বুদ্ধ। Positivism এর স্থানে আসিল Negativism. একথা সত্য যে, বৌদ্ধযুগেই এক দিকে ভারতের বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং অপর দিকে ভারতের প্রতিভা ও ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব ভারতের বাহিরে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইহাও সত্য যে, বৌদ্ধধর্মের Negativism এর মধ্যেই ভারতের ভবিষ্যৎ পতনের বীজ নিহিত ছিল। ভগবান বুদ্ধের ত্যাগ, তাঁহার কঠোর তপস্যা এবং সর্বোপরি তাঁহার বিশাল হৃদয় ও দরদের তুলনা নাই। কিন্তু একটা সমগ্র জাতি ও দেশের প্রাণ সঞ্জীবিত রাখিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভারও তুলনা নাই। স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক আমাদের হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করে, সন্দেহ নাই—কিন্তু নিদ্রার আবেশও আনে। আর দীপ্ত সূর্যালোক আনে পৃথিবীর বুকে জীবনের সাড়া—প্রাণের স্পন্দন।

বৌদ্ধযুগের পর আচার্য শঙ্করের আবির্ভাবে ভারতের প্রাণে এক নবজীবনের সাড়া আসে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে শঙ্কর বেদ-উপনিষদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া জ্ঞানের আলো প্রজ্বালিত করিলেন। ভারতবর্ষ তাহার লুপ্তপ্রায় দার্শনিক পথটি ফিরিয়া পাইল—তাহার জ্ঞানের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ হইল। শঙ্কর প্রমাণিত করিলেন, ভারতবর্ষের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি তাহার বেদান্তে, তাহার দর্শনে তথা চৈতন্যের আবিষ্কারে। ভারতের মূলগত ধর্ম চৈতন্যাশ্রয়ী। বৌদ্ধযুগের শেষে ভারতের আকাশে-বাতাসে একটা জড়বাদের প্রভাব দেখা দেয়। বৌদ্ধধর্মে আত্মা বা চৈতন্য সম্বন্ধে নীরবতায় যে নাস্তিকতার ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা অনেকাংশে এই জড়বাদের ইন্ধন যোগায়। বেদান্তের ভিত্তিতে চৈতন্যাশ্রয়ী দার্শনিক ভারতবর্ষকে রক্ষা করেন। পরমদরদী বুদ্ধের জয় হইয়াছিল হৃদয়ের, এবার মহাজ্ঞানী শঙ্করের জয় হইল মস্তিষ্কের। তখন পর্যন্তও এই দুই-এর মিলনসাম্য সম্ভবপর হইল না। বেদান্তের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে শঙ্কর বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে যে অভিযান প্রবর্তিত করিলেন তাহার ফলে দেশের বুকে সজীবতা আসিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে জ্ঞানের আলোক শঙ্কর প্রজ্বালিত করিলেন, সমষ্টিকে সাধনার পথে চালিত করিতে সেই আলোক অনেকখানি ব্যর্থ হইল। পাণ্ডিত্যের জয় হইল সত্য, কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্য জনসাধারণকে সাধনার দিকে পর্যাপ্ত প্রেরণা জোগাইতে পারে না। বুদ্ধের যুগ ত্যাগের যুগও যেমন, তেমন তপস্যার যুগ। শঙ্করের যুগ জ্ঞানের যুগ সন্দেহ নাই—কিন্তু তপস্যারও যুগ নহে। তাই শঙ্করের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানের চর্চা করিতে করিতে শঙ্কর পৌঁছিলেন মায়াবাদে। এই মায়াবাদে Negativism পরিপূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্যের মধুর শ্লোক "মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা" খুব সহজেই জনসাধারণের প্রাণ স্পর্শ করিল, কিন্তু "ব্রহ্মপদং ত্বং প্রবিশ বিদিত্বা" এই উপদেশ প্রায় ব্যর্থ হইয়া গেল। জনসাধারণ বুঝিল "প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে"। কাজেই তাহাদের যেন আর কিছুই করিবার রহিল না। এই ভাবে শঙ্করের মায়াবাদ আনিল একটা নেতিতত্ব—Negativism, শঙ্করের জ্ঞানের গভীরতার মতোই এই Negativismও সুগভীর। তবুও শঙ্করের প্রভাব আজিও সমগ্র ভারতে অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ, এবং যত দিন বেদ-উপনিষদ হিন্দুধর্মের ভিত্তিমূলে রহিবে তত দিন শঙ্করও অমর হইয়া থাকিবেন—কেন না, দার্শনিক ক্ষেত্রে তিনিই ভারতবর্ষকে পুনরাবিষ্কার করিয়াছিলেন।

শঙ্করের পরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ভারতের সাধনার পথে আবার একটি পরিবর্তন দেখা দিল। শঙ্করের জ্ঞানসূর্যের প্রখরতাকে স্নিগ্ধ করিতে দেখা দিল প্রেম-ভক্তির জলভরা মেঘ। ভারতের তৃষিত হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। চৈতন্যদেব লইয়া আসিলেন পিপাসার বারি। ভক্তিপ্লাবনে আন্দোলিত হইয়া অঝোর ধারায় ঝরিয়া পড়িল প্রেমের মেঘ। শুধু ক্ষণেকের পিপাসাই মিটাইল না—বন্যায় ভাসাইয়া দিল। "শান্তিপুর ডুবু-ডুবু নদে ভেসে যায়"—শুধু নদে কেন, সমগ্র বঙ্গদেশ ভাসিয়া গেল—আসাম, উড়িষ্যা, বৃন্দাবন ডুবু-ডুবু হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডুবু-ডুবু হইলেন পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ—"ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ" বাণীর উদ্গাতা শ্রীকৃষ্ণ—ভাসিয়া রহিলেন বৃন্দাবনানন্দকারী বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ; কর্ম ও জ্ঞানের মহিমা নিষ্প্রভ হইল—এবার জয় হইল প্রেমমন্ত্রের।

চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের এক দিকে প্রেম অপর দিকে বৈরাগ্য। পৃথিবীর সব আকর্ষণ; সব বন্ধন ছাড়িতে হইবে। চরম বৈরাগ্য না আসিলে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হওয়া যাইবে না। কিন্তু এইরূপ চরম বৈরাগ্যের তত্ত্ব এবং প্রেমের উচ্চাঙ্গ সুর আপামর জনসাধারণের পক্ষে উপযোগী নয়। জনসাধারণের হাতে ইহার বিকৃতি হওয়ার সম্ভাবনা—হইলও তাহাই। এই বিকৃতির ফলে "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা" ইত্যাদিরূপ শিক্ষার ফলে কালক্রমে জনসাধারণের উপর পড়িল এক ক্লৈব্যের ছায়া। বৈষ্ণব-ধর্মের চরম বৈরাগ্যের তত্ত্বের সঙ্গে রহিয়াছে পরিপূর্ণ Negativism

পরিশেষে রামকৃষ্ণাবতারে আসিয়া দেখি, ভারতের সাধনা এক সম্পূর্ণ নূতন পথ পরিগ্রহ করিয়াছে—জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্মের পরিপূর্ণ সমন্বয়ের পথ। পূর্ব-পূর্ব যুগে ভারতের মর্মবাণীর এক একটি সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছিল—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সপ্তসুর একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। পূর্ব-পূর্ব যুগে দেখা গিয়াছিল এক-একটি আলোকরশ্মি—এবার সপ্তরশ্মির আলোর রথে আবির্ভূত হইলেন পূর্ণ সূর্য। সমন্বয়ের পূর্ণতা আসিয়া পূর্বের সমগ্র অপূর্ণতা বিদূরিত করিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তিসাধনায়, তাঁহার ব্যাকুলকরা 'মা,' 'মা' ডাকে মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হইয়া ধরা দিলেন। ভাবি—শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তির অবতার। কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, তাঁহার মধ্যে ভক্তির আবরণে জ্ঞানের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি। সমগ্র বেদান্ত-উপনিষদ যেন তাঁহার মধ্যে জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—তাঁহার কথামৃতে ধ্বনিত হইতেছে উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের বাণী, কিন্তু এবার সংস্কৃতের পরিবর্তে বঙ্গভাষায়—তফাৎ শুধু এইটুকু। 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' এই জ্ঞানের উন্মেষে তাঁহার সমগ্র চেতন ও অচেতন সত্তা ত্যাগের দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছিল—ফলে তিনি কাঞ্চন কি মুদ্রা স্পর্শ পর্যন্ত করিতে পারিতেন না। বাসনাত্যাগী দেহ-মনে সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণের সংসারাশ্রমে অবস্থান সার্থক করিয়াছে উপনিষদের বাণী—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।" প্রেমের সাধনাকে শ্রীরামকৃষ্ণ রূপায়িত করিয়াছেন জীবসেবা মন্ত্রে। বলিলেন—"ছিঃ ছিঃ, জীবে দয়া কি রে! শিবজ্ঞানে জীবসেবা," বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন! স্বীয় অনুভূতিলব্ধ এই ছোট্ট দুটি কথায় তিনি নরেনের চোখের সম্মুখে একটি নূতন জগতের দ্বার খুলিয়া দিলেন। জীব ও শিবে অভেদ জ্ঞান তাঁহার জীবনে হইয়াছিল উপলব্ধিগত সত্য। তাই লোকের এঁটো পাতা মাথায় বহিয়া গঙ্গায় বিসর্জন দিতেন—কুকুরের ভুক্তাবশিষ্টও ভগবানের প্রসাদ জ্ঞানে খাইতে দ্বিধা করেন নাই। সর্বপ্রকার ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল—তাই পদদলিত ঘাসের ব্যথা, ফুল তুলিতে পুষ্পপাদপের বেদনা নিজ দেহে অনুভব করিয়া কাতর হইতেন।

কেহ কেহ মনে করেন, বিবেকানন্দের কর্মযোগে রামকৃষ্ণের প্রভাব কোথায়—কর্মযোগে রামকৃষ্ণের অবদান কি? কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ আসলে অভিন্ন—যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা। ঠাকুর নরেনের মধ্যে দেখিতে পাইলেন ভারতের আত্মার সহস্রদল পদ্মের স্ফুটনোন্মুখ কুঁড়ি। শুধু নিজের নির্বিকল্প সমাধি চাহে বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "তোকে দিয়ে যে জগতে আমার অনেক কাজ রয়েছে।" তাই কর্মযোগী রামকৃষ্ণ নিজের শক্তি নরেনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া বলিলেন—"তোকে আজ আমার যা কিছু সর্বস্ব দিয়ে ফতুর হয়ে গেলাম, কিন্তু চাবীকাঠি রইল আমার কাছে।" তিনি আশ্বাস দিলেন, সময় হইলে খুলিয়া দিবেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অমোঘ নির্দেশ দিলেন, এখন তাহাকে জগতের মঙ্গলের জন্য—প্রত্যেকটি জীবের ক্ষুধার অন্ন জোগাইবার জন্য ("খালি পেটে ধর্ম হয় না।")—তাহার ঐহিক ও পারমার্থিক মুক্তির জন্য সেবার পথে কর্ম করিতে হইবে। এই ভাবে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অভিন্ন। ভারতের আকাশে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসূর্য—আর স্বামী বিবেকানন্দ সেই মহাসূর্যের আলোকময় বার্তা।

তাই ভারতের সাধনার ক্ষেত্রে স্বামিজী আবির্ভূত হইলেন জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্মের সমন্বয় মূর্তিতে। তাঁহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে বৈদিক ঋষিদের সত্যদৃষ্টি, শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কাম কর্ম, বুদ্ধের হৃদয় ও ত্যাগ, শঙ্করের জ্ঞান, মহাবীর হনুমানের ভক্তি এবং শ্রীচৈতন্যের প্রেম। অর্থাৎ ভারতের সকল যুগের সকল সাধনার ধারা স্বামিজীর মধ্যে মিলিত হইয়াছে। এই মহামিলন বা মহাসমন্বয় পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। শ্রীকৃষ্ণের পরে Negativism এদেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। স্বামিজীর উদয়ে ভারতের আকাশ হইতে Negativism এর মেঘ কাটিয়াছে। মনে হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার "সম্ভবামি যুগে যুগে" এই আশ্বাস-বাণীর সত্যতা প্রমাণ করিতে—পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছেন বিবেকানন্দাবতারে। বুদ্ধ হইতে শ্রীচৈতন্য পর্যন্ত সকলেই অনেকাংশে শ্রীকৃষ্ণের বিপরীতধর্মী অর্থাৎ antithesis; স্বামিজী এই বিপরীত ভাব বা বিরোধ বিদূরিত করিয়া একটা সমন্বয় (synthesis) আনিলেন। তাঁহার মধ্যে শুধু যে শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে তাহা নয়—শ্রীকৃষ্ণের ভাবের সাথে শ্রীচৈতন্য, শঙ্কর বুদ্ধ এবং উপনিষদের ভাবের সমন্বয়।

বিবেকানন্দাবতারে আমরা পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণকে ফিরিয়া পাই। তাঁহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের পৌরুষ, বীর্য, নিষ্কাম কর্মের আদর্শ এবং বিশ্বরূপের জ্ঞানালোক। আদর্শ ভক্ত হনুমান রামনাম সম্বল করিয়া সমুদ্র পার হইয়াছিলেন। ভক্তবীর বিবেকানন্দও দেখি গুরুপদে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় সমুদ্রপারে পৃথিবীর অপর প্রান্তে যাইতেছেন। একটু অনুধাবন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, স্বামিজী ছিলেন জ্ঞানের আবরণে পরমভক্ত। তাই দেখি, ভবতারিণীর মন্দিরে যাইয়া মায়ের কাছে তিনি আর কিছু প্রার্থনা করিতে পারিলেন না—প্রার্থনা করিলেন শুদ্ধা ভক্তি। গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান তো দূরের কথা—কোথায় রহিল তাঁহার জ্ঞান-গরিমা—কোথায় রহিল তাঁহার অদ্বৈতবাদ—প্রার্থনা করিলেন শুদ্ধা ভক্তি। অন্তরের অন্তস্তলে যে পূর্ণভক্ত, তাহার ভক্তি ছাড়া মায়ের কাছে আর কি আকিঞ্চন থাকিতে পারে? এক বার নয়—দুই বার নয়—তিন তিন বারই ঐ একই প্রার্থনা করিলেন—"মা, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।" ঠাকুর রামকৃষ্ণও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন—নরেন বিষয় বাসনার পাশ কাটিয়াছে। কিন্তু কি সে সার্থক আয়ুধ যাহা দ্বারা সে এই পাশ কাটিল?—জ্ঞান নয়, বিচার নয়, বিবেক নয়,—তাঁহার অশ্রুজলাভিষিক্ত হৃদয়ের শুদ্ধা ভক্তি। আবার তাঁহার গুরুভক্তির কথাও আজ অনুপম দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘরে ঘরে প্রচলিত। এমন গুরুভক্ত শিষ্য পাইয়াছিলেন বলিয়া লোকে শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাগ্যবান মনে করে। ক্যান্সার রোগে ঠাকুরের দেহের যখন প্রায় অন্তিম অবস্থা, তখন একদিন পুঁযরক্তমিশ্রিত তাঁহার প্রসাদ স্বামিজী মহা আনন্দে ভক্তিসহকারে গ্রহণ করিলেন—উপস্থিত গুরুভাইরা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ইহা তাঁহার সীমাহীন গুরুভক্তির নিদর্শন।

স্বামিজীর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই ভগবান বুদ্ধের দরদী হৃদয়—যে হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল দেব ও ঋষির কোটি কোটি বংশধরগণের

বুদ্ধের ত্যাগ। এই ত্যাগ নিজের মুক্তির জন্ম নয়—অপরের দুঃখ মোচনের জন্ম। বলিতেছেন—'দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে এবং এই চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নাম-যশ, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তি এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ—?' আবার বলিতেছেন, 'তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না?' তাঁহার এই বিরাটের উপাসনার ব্রতে যেমন ধ্বনিত হইয়াছে জীবসেবা মন্ত্র, তেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে বৈদান্তিক দিব্যদৃষ্টি।

জ্ঞানমার্গে আচার্য বিবেকানন্দ আচার্য শঙ্করেরই উত্তরসাধক। শঙ্করের মতো বেদান্তই তাঁহার জ্ঞানযোগের উৎস এবং বেদান্ত প্রচার তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত। কিন্তু আচার্য শঙ্করের উত্তরসাধক জ্ঞানযোগী বিবেকানন্দের ব্রত আরও ব্যাপক এবং ব্যাপ্তি আরও বিস্তৃত। বিশ্বের জড়বাদের তমসা বিদূরিত করিয়া সর্বাবয়ব বেদান্তের ভিত্তিতে এক বিশ্বধর্মের (Religion of Universal Gospel) প্রবর্তন বিবেকানন্দাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বামিজী দেখিলেন, বেদান্তে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের গঙ্গা-যমুনা মিলন হইয়াছে এবং একমাত্র বেদান্তই হইতে পারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের সেতু।

স্বামিজীর মধ্যে শঙ্করের জ্ঞানের গভীরতা রহিয়াছে, কিন্তু শঙ্করের মায়াবাদের Negativism নাই। শঙ্করের মতে জগৎ নিছক মায়া—অতএব মিথ্যা। স্বামিজী এই মায়াবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করেন নাই। তিনি দেখিলেন, মায়াবাদের এই ব্যাখ্যা মানুষকে কর্মবিমুখ এবং ব্যাহত করে তাহার আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও তাহার দেবত্বের উন্মেষ। তিনি বলিলেন জগৎ পরম (absolute) সত্য না হইলেও আপেক্ষিক (relative) সত্য—অর্থাৎ মায়ারূপে জগৎ সত্য। তাই মায়াকে তিনি 'statement of fact' বলিয়া গ্রহণ করিলেন। বলিলেন "Realise that in illusion is the real"—মায়ার নিজস্ব বাস্তব রূপ রহিয়াছে—চিরন্তন সত্যকে আড়াল করিয়া মায়া বিরাজ করিতেছে। আবরণ হিসাবে ইহা সত্য। এই আবরণ উন্মোচন করিলে দেখা যাইবে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছেন সেই সৎ-চিৎ-আনন্দ। এইরূপে স্বামিজী মায়াবাদের Negativism পরিত্যাগ করিয়া তাহার একটি Positive রূপ দিলেন। মায়ার negative ব্যাখ্যায় একমাত্র ব্রহ্মই সত্য—সমগ্র সৃষ্টিই ভ্রম—'all this is but illusion'—তুমি, আমি, চন্দ্র-সূর্য সব মিথ্যা—জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এই পরম জ্ঞানলাভই একমাত্র লক্ষ্য। এই জ্ঞানের উন্মেষেই মায়ার ভ্রম কাটিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মলাভ হইবে। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে যুক্তিধার্মিক মনোবৃত্তি মনোবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়োপলব্ধ জগতের এই negative ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। স্বামিজী বেদান্তের ভিত্তিতেই মায়ার positive রূপ দিয়া প্রজ্ঞা ও যুক্তির, দর্শন ও বিজ্ঞানের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সংস্থাপিত করিলেন। মায়ার negative ব্যাখ্যায় মানুষের কর্মযোগ সাধনার অবকাশ নাই—তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশেরও প্রশ্ন আসে না। স্বামিজী মায়ার আপেক্ষিক নিজস্ব সত্যতা (fact) স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই মানবতার মহিমা প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন—বলিতে পারিয়াছিলেন, "The sun, the moon and the stars are

but waves on the boundless ocean which I am." বেদান্তের প্রতিধ্বনি তুলিয়া তিনি বিশ্ববাসীকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা উঠ, জাগ, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" এই মানবতার পরিমণ্ডলে আসিয়া বেদান্তের পূজারী বিবেকানন্দ আচার্য শঙ্করকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

শঙ্কর ভারতের মস্তকে জ্ঞানের কিরীট পরাইয়াছিলেন—যেন হিমাদ্রির শিখরে শিখরে অরুণকিরণদীপ্ত তুষার কিরীট। স্বামিজী সেই দীপ্তোজ্জ্বল তুষার বিগলিত করিয়া প্রেমের খাতে প্রবাহিত করিলেন। তাঁহার বিশ্বধর্মের প্রবাহে জ্ঞানের সাথে প্রেম মিশিয়াছে এবং প্রেমের সাথে জ্ঞান। চৈতন্যদেবের মতো তিনি প্রেমের বার্তা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার কর্মযোগ সাধনার, তাঁহার বিশ্বধর্মের সঙ্গীতের প্রধান সুরটি প্রেমের সুর—"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।" তাই "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" এই প্রেমের অন্বেষণে যেন তাঁহার মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে।

ভারতের কর্মযোগীকে তিনি এই প্রেমের দীক্ষামন্ত্র দিয়া গিয়াছেন। কর্মযোগীর ইহা শুধু আদর্শমাত্র নয়—তাহাকে বাস্তব জীবনে তিলে তিলে এই সাধনা করিতে হইবে। তাই স্বামিজীর প্রেমের দীক্ষায় নাই নেতি নেতি ভাব—negativism—নাই কোন পলায়নী মনোবৃত্তি। প্রেম ও সেবা তাহার কর্মযোগব্রত—একটি positive ধর্ম। বৈরাগ্যের নামে কর্মবিমুখতা নয়—নিষ্কাম কর্মের পথে বৈরাগ্যের সাধনা—ত্যাগের সাধনা। কর্মবিমুখতা বৈরাগ্য আনিবে না, আনিবে ক্লৈব্য—আনিবে তামসিকতা। তাই কর্মের উদ্দীপনায় তামসিকতা দূর করিতে হইবে। এইরূপে স্বামিজী যে পথের নির্দেশ দিলেন, সেখানে ত্যাগ ও কর্ম, প্রেম ও সেবা হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বামিজী জ্ঞানভিত্তিক, ত্যাগভিত্তিক ও প্রেমভিত্তিক কর্মমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ভারতের কর্মযোগীকে এক মহান ব্রতে ব্রতী করিয়া গিয়াছেন। এই মহাব্রতের একটি ধারা বহুরূপে প্রকটিত বিরাটের সেবার মধ্যে প্রেমের সন্ধান—অপর ধারা জ্ঞান ও প্রেমের বলে বিশ্ব বিজয় করিয়া জগতে চৈতন্যাশ্রয়ী বিশ্বধর্মের প্রবর্তন।

কবে কোন্ যুগে ভারতের গিরিকন্দরে, তপোবনে বেদান্তের শাশ্বত বাণী—সচ্চিদানন্দ মন্ত্র উত্থিত হইয়াছিল, কবে কোন্ যুগে পুরুষোত্তম নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে কর্মমন্ত্র উদ্গীত হইয়াছিল—তাহার পর ভারতের বুকের উপর দিয়া ত্যাগের যুগ, জ্ঞানের যুগ, প্রেমের যুগ বহিয়া গেল—ভারতের আকাশে তাহা আদর্শের এক একটি গগনচুম্বী জলদচিরেখা (high water mark). কিন্তু বেদান্তের সর্বাবয়ববর্জিত বলিয়া এবং কর্মযোগভিত্তিক নয় বলিয়া এই সব বিভিন্ন যুগের ভাবধারায় ক্রমে জমিয়াছিল এক Negativism এর কুহেলিকা। শ্রীকৃষ্ণের কাল হইতে আবার কত যুগ পরে আসিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। স্বামিজীর কণ্ঠে আবার ঝঙ্কৃত হইল বেদান্তের বাণী "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"; উদ্গীত নবযুগের কর্মযোগের গীতা। তাহার শঙ্খনিনাদে বিদূরিত হইল Negativism এর জড়িমা। সর্বপ্রথম সমন্বয় হইল জ্ঞান, ত্যাগ ও প্রেমের সাথে কর্মের—মিলিত হইল ভারতের সকল যুগের সকল

পত্রগুচ্ছ

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

১২, অনন্তপুর, পোঃ হিনু
রাঁচি।

অনেক ঝড়-বৃষ্টি মাথায় ক'রে অনেক অবিশ্বাস আর অসম্ভবকে অগ্রাহ্য করে শেষে সত্যিই রাঁচি এসে পৌঁছেছি। আসার পথে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখিনি, কেবল পূর্ণিমার অস্পষ্ট আলোয় স্তব্ধ গভীর বরাকর নদীকে প্রত্যক্ষ করেছি। তখন ছিলো গভীর রাত —(বোধ হয় রাত শেষ হয়েই আসছে) আর সেই রাত্রির গভীরতা প্রতিফলিত হচ্ছিল সেই মৌনমূক বরাকরের জলে, কেমন যেন ভাষা পেয়েছিল সব কিছুই। সেই জল আর অদূরবর্তী একটা বিরাট গম্ভীর পাহাড় আমার চোখে একটা ক্ষণিকস্বপ্ন রচনা করেছিল। বরাকর নদীর এক পাশে বাংলা অপর পাশে বিহার আর তারই মধ্যে স্বয়ং স্ফূর্ত "বরাকর"; কী অদ্ভুত : কী গম্ভীর! আর কোনো নদী (বোধ হয় গঙ্গাও না) আমার চোখে এতো মোহবিস্তার ক'রতে পারেনি।

আর ভালো লেগেছিল গোমো ষ্টেশন। সেখানে ট্রেন বদল করার জন্যে শেষ রাতটা কাটাতে হয়েছিল। পূর্ণিমার পরিপূর্ণতা সেখানে উপলব্ধি ক'রেছি। স্তব্ধ ষ্টেশনে সেই রাত আমার কাছে তার এক অস্ফুট সৌন্দর্য্য নিয়ে বেঁচে রইলো চিরকাল, তারপর সকাল হ'লো। অপরিচিত সকাল। ছোটো ছোটো পাহাড়, ছোটো ছোটো বিশুষ্ক-প্রায় নদী আর পাথরের কুচি ছিটানো লালপথ, আশে-পাশে নাম-না-জানা গাছপালা ইত্যাদি দেখতে-দেখতে ট্রেনের পথ ফুরিয়ে গেল। তারপর রাঁচি রোড ধরে বাস-এ করে এগোতে লাগলুম। "বাসের কী শিংভাঙা গোঁ" সে বিপুল বেগে ধাবমান হ'লো পাহাড়ী পথ ধরে, হাজার-হাজার ফুট উঁচু দিয়ে চ'লতে-চলতে আবেগে উচ্ছলে উঠেছি আর ভেবেছি এদৃশ্য কেবল আমিই দেখলুম? এই বেগ আর আবেগ কেবল আমাকেই প্রমত্ত করলো? হয়তো অনেকেই দেখেছে এই দৃশ্য, কিন্তু তা এমন করে অভিভূত ক'রেছে কা'কে?

রাঁচি এসে পৌঁছলাম। আমরা যেখানে থাকি সেটা রাঁচি নয়, রাঁচি থেকে একটু দূরে, এই জায়গার নাম ডুরাণ্ডা। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ব'য়ে চলেছে ক্ষীণস্রোতা সুবর্ণরেখা নদী, আর তারই কূলে দেখা যায় একটা গোরস্থান, যেটাকে দেখতে দেখতে আমি মাঝে মাঝে আত্মহারা হয়ে পড়ি। সেই গোরস্থানে একটা বটগাছ আছে, যেটা শুধু আমার নয় এখানকার সকলেরই প্রিয়। সেই বটগাছের ওপরে এবং তলায় আমার কয়েকটি বিশিষ্ট দুপুর কেটেছে। [illegible]

আমরা দলে ভারী ছিলাম। রবিবার দুপুরে আমরা রাঁচি থেকে ১৮ মাইল দূরে "জোন্হা প্রপাত" দেখতে বেরুলাম। ট্রেনে চাপার কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমুল বৃষ্টি নামলো এবং ট্রেনে বৃষ্টির আনন্দ আমার এই প্রথম। দু'ধারে পাহাড়-বন ঝাপসা ক'রে, অনেক জলধারার সৃষ্টি ক'রে বৃষ্টি, সে-ই আমাদের রোমাঞ্চিত ক'রলো। কিন্তু আরো আনন্দ বাকী ছিলো—প্রতীক্ষা ক'রেছিলো আমাদের জন্যে জোনহা পাহাড়ের অভ্যন্তরে। বৃষ্টি ভিজে অনেক পথ হাঁটার পর সেই পাহাড়ের শিখরদেশে এক বৌদ্ধমন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মন্দির-রক্ষক এসে আমাদের দরজা খুলে দিলো। মন্দিরের সৌম্য গাম্ভীর্য্যের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম নিঃশব্দে, ধীর পদবিক্ষেপে। মন্দির সংলগ্ন কয়েকটি লোহার দুয়ার এবং গবাক্ষবিশিষ্ট কক্ষ ছিলো, সেগুলি আমরা ঘুরে ফিরে দেখলাম, ফুল তুললাম, মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি করলাম। সেই ধ্বনি পাহাড়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো, বাইরের পৃথিবীতে পৌঁছল না। সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছিলো, সেই অরণ্যসঙ্কুল পাহাড়ে বাঘের ভয় অত্যন্ত বেশী, আমরা তাই সেই মন্দিরে আশ্রয় নিলাম। তারপর গেলাম অদূরবর্তী প্রপাত দেখতে। গিয়ে যা দেখলাম তা আমার স্নায়ুকে, চৈতন্যকে অভিভূত করলো। এতদিনকার অভ্যস্ত গতানুগতিক দৃষ্টির ওপর এ একটা সত্যিকারের প্রলয় হিসেবে দেখা দিলো। মুগ্ধ সুকান্ত তাই একটা কবিতা না লিখে পারলো না। সে কবিতা আমার কাছে আছে, ফিরে গিয়ে দেখাবো। জোন্হা যে দেখেছে তার ছোটনাগপুর আসা সার্থক, যদিও হুড খুব বিখ্যাত প্রপাত, কিন্তু হুড্রুতে "প্রপাত" দর্শনের এবং উপভোগের এত বেশি সুবিধা নেই, একথা জোর করেই বলবো এবং জোন্হা যে দেখেছে সে আমার কথায় অবিশ্বাস ক'রবে না। জোনহা সব সময়েই এতো সুন্দর, এতো উপভোগ্য তা নয়, এমন কী আমরা যদি তার আগের দিনও পৌঁছতাম তা হ'লেও এ দৃশ্য থেকে বঞ্চিত থাকতাম নিশ্চিত।

প্রপাত দেখার পর সন্ধ্যার সময় আমরা বুদ্ধদেবের বন্দনা করলাম। তারপর গল্পগুজব ক'রে, সব শেষে নৈশ-ভোজন শেষ ক'রে আমরা সেই স্তব্ধ নিবিড় গহন অরণ্যময় পাহাড়ে জোন্হার দূর-নিঃসৃত কলধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম। জোন্হা সারারাত বিপুল বেগে তার গৈরিক জলধারা নিষ্ঠুর ভাবে আছড়ে আছড়ে ফেলতে লাগলো কঠিন পাথরের ওপর, আঘাত-জর্জর জলধারার বুকে জেগে রইলো রক্তের লাল আর রুদ্ধ স্বর শোনা যেতে লাগলো আমাদের ক্লান্ত নিশ্বাস। প্রহরীর মত জেগে রইলো ধ্যানমগ্ন পাহাড় তার অকৃপণ বাৎসল্য নিয়ে আর

পায়ে। পরদিন আর একবার দেখলাম রহস্যময়ী জোনহাকে, তার সেই উচ্ছল রূপের প্রতি জানালাম আমার গভীরতম ভালোবাসা, তারপর ধীরে ধীরে চলে এলাম অনিচ্ছাসত্ত্বেও। আসবার সময় যে বেদনা জেগে ছিল বিদায়ের জন্যে তা আর ঘুচলো না। সেই দিনই দুপুরে আমাদের দলের অর্ধেককে বিদায় দিয়ে সেই বেদনা দীর্ঘস্থায়ী হ'লো। জোনহার ফিরতি পথে ফেরার সময় মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম আমাদের এই যাত্রা যেন অনন্ত হয়। কিন্তু পথও ফুরালো আর আমরাও জোনহাকে ফেলে, সেই আশ্রয়দাতা বুদ্ধমন্দিরকে ফেলে রাঁচি চলে এলাম। এ থেকে বুঝলাম, কোনো কিছুর আসাটাই স্বপ্ন আর যাওয়াটা কঠোর বাস্তব; খুব কম জিনিষই কাছে আসে কিন্তু যায় প্রায় সব কিছুই। জোনহাই তার বড়ো প্রমাণ। রাঁচি ফেরার পর আমাদের দলের অর্ধাঙ্গ হানি হওয়ায় আনন্দও প্রায় সেই সংগে বিদায় নিয়েছে। তবু এরই মধ্যে দু'দিন রাঁচি পাহাড়ে গেছি এবং উল্লসিত হয়েছি। এই পাহাড় থেকে রাঁচি সহরকে দেখায় ভারি সুন্দর। মনে হয়, লিলিপুটিয়ানরা গড়েছে তাদের সাম্রাজ্য। সহরের মধ্যে একটি লেক্ আছে, আবহাওয়ার সংগে সংগে তার দৃশ্যপটও ঘন ঘন বদলায় এবং সহরের সৌন্দর্য্যের জন্যে আমার মনে হয় লেকটিই অনেকখানি দায়ী। রাঁচি পাহাড়ের মাথায় আছে একটি ছোট্ট শিবের মন্দির, সেই মন্দিরে দাঁড়িয়েই দেখা যায় ছোটনাগপুরের দিগন্ত যেন পাহাড় দিয়ে ঘেরা; আর আছে একটি গুহা, সেটিও কম উপভোগ্য নয়। আর সব মিলিয়ে দেখা যায় রাঁচির অখণ্ড সত্তাকে, যা একমাত্র রাঁচি পাহাড় থেকেই দেখা সম্ভব।

'ডুরাণ্ডার বাঁধ' বলে একটি জিনিষ আছে, যেটিতে আমি একদিন স্নান করেছি এবং এক সন্ধ্যায় যাকে হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি দিয়ে অনুভব করেছি। এটিকে পুকুর বলাই ভালো, বড় জোর দীঘি, কিন্তু সবাই একে লেক বলে থাকে, যাই হোক্, জলাশয় হিসেবে এটিকে আমার খুব ভালো লেগেছে। আর তাছাড়া ডুরাণ্ডার পথ, মাঠ, বন সবই ভালো, এক কথায় ভালো এখানকার সবই। কেবল ভালো নয় এখানকার প্রতিবেশী; বাজারের দূরত্ব আর মিলিটারীদের আধিপত্য। এখানে এখন মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে যদিও বৃষ্টিটা এখানে ঠিক খাপ খাচ্ছে না, তবুও এই বৃষ্টি কাল অসাধ্য সাধন করেছে; ক্ষীণস্রোতা সুবর্ণরেখার বুকে এনেছে যৌবন। তার কল্লোলময় জলোচ্ছ্বাসে, তার স্রোতের বেগ আর ঢেউয়ের মাতামাতিতে আমরা শিহরিত হয়েছি, কারণ কাল সকালেও সুবর্ণরেখার মাঝখানে দাঁড়ালে পায়ের পাতা ভিজতো না। যাই হোক্, রাঁচির অনেক কিছুই এখনো দেখিনি কিন্তু যা দেখেছি তাতেই পরিতৃপ্ত হয়েছি—অর্থাৎ রাঁচি আমার ভালো লেগেছে। যদিও রাঁচির বৈচিত্র্য ক্রমশঃ আমার কাছে কমে আসছে, আর আজকাল সব দিনগুলোর চেহারাই প্রায় এক রকম ঠেকছে। অতএব বিদায়।

সুকান্ত ভট্টাচার্য।

পুনশ্চ—আমার ফিরতে বেশ দেরী হবে। তত দিন রাধারমণের ভাইকে তদারক করিস্, দয়া করে। কারণ এখানকার প্রাকৃতিক আকর্ষণের চেয়ে পারিবারিক আকর্ষণ বেশি। কবে যাবো তার ঠিক নেই। 'বন্যা'র কাজ কত দূর? চিঠির উত্তর দিস্।

সুঃ ভঃ।

শ্রীকৃষ্ণশরণম্

বেলেঘাটা
৩৪ হরমোহন ঘোষ লেন
ক'লকাতা।

পরম হাস্যাস্পদ,

অরুণ,—আমার ওপর তোমার রাগ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক, আর আমিও তোমার রাগকে সমর্থন করি। কারণ আমার প্রতিবাদ করবার কোনো উপায় নেই, বিশেষতঃ তোমার স্বপক্ষে আছে যখন বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ। কিন্তু চিঠি না লেখার মত বিশ্বাসঘাতকতা আমার দ্বারা সম্ভব হ'তো না, যদি না আমি বাস ক'রতাম এক বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে; তবুও আমি তোমাকে রাগ করতে অনুরোধ করছি। কারণ কলকাতার বাইরে একজন রাগ করবার লোক থাকলেও এখন আমার পক্ষে একটা সান্ত্বনা যদিও কলকাতার ওপর এই মুহূর্ত পর্যন্ত কোন কিছু ঘটেনি, তবুও কলকাতার নাড়ী ছেড়ে যাওয়ার সব কটা লক্ষণই বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত আমি প্রত্যক্ষ করছি।—ম্লানায়মান কলকাতার ক্রমশঃ স্পন্দনধ্বনি শুধু বারংবার আগমনী ঘোষণা করছে, আর মাঝে মাঝে আসন্ন শোকের ভয়ে ব্যথিত জননীর মত সাইরেণ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। নগরীর বুঝি অকল্যাণ হবে। আর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রস্তুত হ'চ্ছে কলকাতা, তবে নাটকটি হবে বিয়োগান্তক, এই হ'লো ক'লকাতার বর্তমান অবস্থা। জানি না তোমার হাতে এ চিঠি পৌছবে কি না; জানি না ডাক বিভাগ তত দিন সচল থাকবে কি না। কিন্তু আজ রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে পৃথিবী কলকাতার দিকে চেয়ে, কখন কলকাতার অদূরে জাপানী বিমান দেখে আর্তনাদ ক'রে উঠবে সাইরেণ সম্মুখে মৃত্যুকে দেখে, ধ্বংসকে দেখে।

প্রতিটি মুহূর্ত এগিয়ে চ'লেছে এক বিপুল সম্ভাবনার দিকে। এক একটি দিন যেন মহাকালের এক একটি পদক্ষেপ। আমার দিনগুলি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে বাসরঘরের নববধূর মতো এক নতুন পরিচয়ের সামীপ্যে। ১৯৪২ সাল কলকাতার নতুন সজ্জাগ্রহণের এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত। বাস্তবিক ভাবতে অবাক লাগে, আমার জন্ম-পরিচিত ক'লকাতা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাবে অপরিচয়ের গর্ভে, ধ্বংসের সমুদ্রে, তুমিও কি তা বিশ্বাস করো, অরুণ?

কলকাতাকে আমি ভালোবেসেছিলাম, এক রহস্যময়ী নারীর মতো, ভালোবেসেছিলাম প্রিয়ার মতো, মায়ের মতো। তার গর্ভে জন্মানোর পর আমার জীবনের এতগুলি বছর কেটে গেছে তারই উষ্ণনিবিড় বুকের সান্নিধ্যে; তার স্পর্শে আমি জেগেছি, তার স্পর্শে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। বাইরের পৃথিবীকে আমি জানি না, চিনি না, আমার পৃথিবী আমার কল্‌কাতার মধ্যেই সম্পূর্ণ। একদিন হয়তো এ পৃথিবীতে থাকবো না, কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি যে কলকাতায় ব'সে কলকাতাকে উপভোগ করছি। সত্যি, অরুণ, বড়ো ভালো লেগেছিলো পৃথিবীর স্নেহ, আমার ছোট্টো পৃথিবীর করুণা। বাঁচতে ইচ্ছা করে কিন্তু নিশ্চিত জানি কলকাতার মৃত্যুর সঙ্গেই আমিও নিশ্চিহ্ন হবো।

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে; প্রতিদিন সে ষড়যন্ত্র ক'রছে সভ্যতার সঙ্গে। তবু একটা বিরাট পরিবর্তনের মূল্য যে দিতেই হবে!

আবার পৃথিবীতে বসন্ত আসবে, গাছে ফুল ফুটবে, শুধু তখন থাকবো না আমি, থাকবে না আমার ক্ষীণতম পরিচয়। তবু তো জীবন দিয়ে এক নতুনকে সার্থক ক'রে গেলাম।—এই আমার আজকের সান্ত্বনা।

তুমি চ'লে যাবার দিন আমার দেখা পাওনি কেন জানো? শুধু আমার নির্লিপ্ত উদাসীনতার জন্যে। ভেবে দেখলাম, কোনো লাভ নেই সেই দেখা করায়, তবু কেন মিছিমিছি মন খারাপ করবো?—

—তুমি চ'লে যাবার পর আমি তারাশংকরের 'ধাত্রীদেবতা' বুদ্ধদেব-প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যর 'বনশ্রী' প্রবোধের 'কলরব' মণীন্দ্রলাল বসুর 'রক্তকমল' ইত্যাদি বইগুলি প'ড়লাম। প্রত্যেকখানিই লেগেছে খুব ভালো। আর অনাবশ্যক চিঠির কলেবর বৃদ্ধির কী দরকার? আশা করি তোমরা সকলে, তোমার মা-বাবা-বোন—ইত্যাদি সকলেই দেহে ও মনে সুস্থ। তুমি কি লিখলে-টিকলে? তোমার মা গল্প-সল্প কিছু লিখছেন তো? তা হ'লে আজকের মতো লেখনী কিন্তু চিঠির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। ২৪শে পৌষ '৪৮

সুকান্ত ভট্টাচার্য।

৩৪, হরমোহন ঘোষ লেন
বেলেঘাটা—কলকাতা
—ফাল্গুনের একটি দিন।

অরুণ—

তোর অতি নিরীহ চিঠিখানা পেয়ে তোকে ক্ষমা করতেই হ'লো কিন্তু তোর অতিরিক্ত বিনয় আমাকে আনন্দ দিলো এই জন্যে যে, ক্ষমাটা তোর কাছ থেকে আমারই প্রাপ্য। কারণ তোর আগের 'ডাক-বাহিত' ছিলো। যাই হোক, উল্টে আমাকে দেখছি ক্ষমা করতে হ'লো। তোর চিঠিটা কাল পেয়েছি, কিন্তু পড়লুম আজকে সকালে; কারণ পরে ব্যক্ত করছি। বাস্তবিক, তোর দুটো চিঠিই আমাকে প্রভূত আনন্দ দিলো। কারণ চিঠির মত চিঠি আমায় কেউ লেখে না এবং এটুকু বলতে দ্বিধা করবো না যে তোর প্রথম চিঠিটাই আমার জীবনের প্রথম একখানি ভালো চিঠি, যার মধ্যে আছে সাহিত্য-প্রধানতা। তোর প্রথম চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি, তোর মতই অলসতায়, এবং একটু নিশ্চিন্ত-নির্ভরতাও ছিলো তার মধ্যে। এবারে চিঠি লিখছি এই জন্যে যে, এতোদিন ভয় পেয়ে পেয়ে এবার মরিয়া হয়ে উঠেছি মনে মনে।

কাল বিকেলে তোর বাবা ঠিকানা খুঁজে খুঁজে অবশেষে তোর চিঠিখানা আমার হাতে দিলেন এবং আমাকে সংগে করে নিয়ে গেলেন তোর মা'র কাছে। কিন্তু তুই বোধ হয় এ খবর এখনো পাসনি যে তোদের আগের সেই লতাচ্ছাদিত, তৃণশ্যামল, সুন্দর বাড়িটি ত্যাগ করা হয়েছে। যেখানে তোরা ছিলি গত চার বছর নিরবচ্ছিন্ন নীরবতায়, যেখানে কেটেছে তোদের কত বর্ষণমুখর সন্ধ্যা। কত বিরস দুপুর, কত উজ্জ্বল প্রভাত, কত চৈতালী হাওয়ায় হাওয়ায় মোমাক্ত রাত্রি। তোর কত উষ্ণ কল্পনায়, নিবিড় পদক্ষেপে বিজড়িত সেই বাড়িটি, ছেড়ে দেওয়া হলো আপাত-নিষ্প্রয়োজনতায়। তোর মা এতে পেয়েছিল গভীরতম বেদনা, তাঁর ঠিক আপম জায়গাটিই যেন তিনি হারালেন। এক আকস্মিক বিপর্যয়ে যেন এক নিকটতম আত্মীয় সুদূর হয়ে উঠলো প্রকৃতির প্রয়োজনে। শত-শত জনকোলাহল মথিত ইস্কুলবাড়িটি আজ নিস্তব্ধ নিঝুম। সদ্যবিধবা নারীর মত তার অবস্থা। তোদের অজস্র স্মৃতিতে তার প্রতিটি প্রত্যঙ্গ যেন তোদেরই স্পর্শের জন্য উন্মুখ, সেখানে এখনো বাতাসে পাওয়া যায় তোদের স্মৃতির সৌরভ; কিন্তু সে আর কত দিন? তবু বাড়িটি যেন আজ তোদেরই ধ্যান করছে।

তোদের নতুন বাড়িটায় গেলুম। এ বাড়িটাও ভালো, তবে ও বাড়ির তুলনায় নয়। সেখানে রাত প্রায় পৌনে এগারোটা পর্যন্ত তোর বাবা এবং মা'র সংগে প্রচুর গল্প হ'লো। তাঁদের গত জীবনের কিছু কিছু শুনলাম; শুনলাম সুন্দরবনের কাহিনী। কালকের সন্ধ্যা কাটলো একটি পবিত্র সুন্দর কথালাপের মধ্যে দিয়ে; তার পর তোর বাবা-মা তোর ছোট ভাই আর আমি গিয়েছিলাম তোদের সেই পরিত্যক্ত বাড়িতে এবং এই জন্যেই ঐ সম্বন্ধে আমার এত কথা লেখা। দেখলাম স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে, সদ্যবিয়োগ-ব্যথাতুরা বিরহিণীর মত বাড়িটার এক অপূর্ব্ব মুহ্যমানতা! তার পর ফিরে এসে হ'লো আরো কথা; কালকের কথাবার্তায় আমার তোর বাবা এবং মা'র ওপর আরও নিবিড়তম শ্রদ্ধার উদ্রেক হ'লো। (কথাটা চাটুবাদ নয়)। তোদের (তোর এবং তোর মা'র) দু'জনের লেখা গানটা পড়লুম: বেশ ভালো। কালকে সংগে নিয়ে এসেছিলুম 'পাঁচটি ফাল্গুন সন্ধ্যা ও একটি কোকিল' গল্পটি। আজ দুপুরে সেটি পড়লুম। বাস্তবিক, এ রকম এবং এই ধরণের গল্প আমি খুব কম পড়েছি (ভালোর দিক থেকে), কারণ ভাব এবং ভাষায় মুগ্ধ হয়ে গেছি আমি 'পাঁচটি ফাল্গুন সন্ধ্যার সংগে একটি কোকিলে'র সম্পর্ক একটি নতুন ধরণের জিনিষ; গল্পটা বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য।

যাই হোক, এখন তোর খবর কি? তুই চ'লে আয় এখানে, কাল তোদের বাড়িতে তোর অভাব বড় বেশি বোধ হচ্ছিল, তাই চলে আয় আমাদের সান্নিধ্যে। অজিতের সংগে পথে মাঝে মাঝে দেখা হয়, তোর কথা সে জিজ্ঞাসা করে। ভূপেন আজ এসেছিলো—একটা চিঠি দিলো তোকে দেবার জন্যে—আর একটু আগে তাকে এগিয়ে দিয়ে এলাম বাড়ির পথে।

শ্যামবাজার প্রায়ই যাই। তুই আমাকে তোদের ওখানে যেতে লিখেছিস্, আচ্ছা চেষ্টা করবো, তুই আবার মারামারি করেছিস না কি? এ সব তো ভালো নয়!

চিঠিটা লিখেই তোর মা'র কাছে যাবো। বাস্তবিক, তোর মা তোর জীবনের স্বর্গীয় সম্পদ। তোর জীবনের যা কিছু তা যে তোর এই মাকে অবলম্বন করেই, এই গোপন কথাটা আমি জেনে ফেলেছি। তুই কিসের ঝগড়া পাঠালি বুঝতে পারলুম না। তুই চলে আয়, আমি ব্যাকুল স্বরে ডাকছি, তুই চলে আয়। প্রীতি-টিতি নেওয়ার ব্যাপারে যখন আমাদের সাধ্য নেই, এখন বিদায়।

সুকান্ত ভট্টাচার্য।

বেলেঘাটা
২২শে চৈত্র, ১৩৪৮

সবুরে মেওয়াফল-দাতাসু—

অরুণ, তোর কাছ থেকে চিঠির প্রত্যাশা করা আমার উচিত হয়নি, সেজন্যে ক্ষমা চাইছি। বিশেষতঃ, তোর যখন রয়েছে অজস্র অবসর—সেই সময়টা নিছক বাজে খরচ করতে বলা কী আমায়

উচিত? সুতরাং তোর কাছ থেকে চিঠি প্রাপ্তির দুরাশা আমায় বিচলিত করেনি।

কোন একটা চিঠিতে আমার ব্যক্তিগত অনেক কিছু বলার থাকলেও—।

একদিন তোর মা'র সান্নিধ্যলাভ করলুম গভীরভাবে এবং আর যা লাভ করলুম তা এই চিঠিতে প্রকাশ করা অসম্ভব। অনেক আলোচনায় অনেক কিছুই জানলাম যা জানার দরকার ছিল আমার। আর তোর বাবার সরল স্নেহে আমি মুগ্ধ—।

তোর খবর সমস্ত আমার জানা, সুতরাং কোন প্রশ্ন করবো না। আমার এই চিঠির উত্তর যত দিন পরে খুশি দিস—তবে না দিলেও ক্ষতি নেই। ইতি—

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য।

২০ নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড
২৮ ডিসেম্বর : ১৯৪২
বেলেঘাটা
সোমবার, বেলা ২টো

অরুণ,

দৈবক্রমে এখনো বেঁচে আছি। তাই এতদিনকার নৈঃশব্দ্য ঘুচিয়ে একটা চিঠি পাঠাচ্ছি অপ্রত্যাশিত বোমার মতই তোর অভিমানের 'সুরক্ষিত' দুর্গ চূর্ণ ক'রতে। বেঁচে থাকাটা সাধারণ দৃষ্টিতে অনৈসর্গিক নয়, তবুও তা দৈবক্রমে কেন, সে রহস্য ভেদ ক'রে কৃতিত্ব দেখাবো তার উপায় নেই, যেহেতু সংবাদপত্র বহুপূর্বেই সে কাজটি সেরে রেখেছে। যাক্, এ সম্বন্ধে নতুন ক'রে আর বিলাপ করবো না, যেহেতু গত বছরে এমনি সময়কার একখানা চিঠিতে আমার ভীরুতা যথেষ্টই ছিল, ইচ্ছা হ'লে পুরোনো চিঠির তাড়া খুঁজে দেখতে পারিস। এখন আর ভীরুতা নয়, দৃঢ়তা। তখন ভয়ের কুশলী বর্ণনা দিয়েছি, কারণ সে সময় বিপদের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু বিপদ ছিলো না, তাই বর্ণনার বিলাস আর ভাষার আড়ম্বর প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলো, আর এখন তো বর্ষমান বিপদ। কাল রাত্রিতেও আক্রমণ হয়ে গেলো, ব্যাপারটা ক্রমশঃ দৈনন্দিন জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে, আর এটা একরকম ভরসারই কথা। গুজবের আধিপত্যও আক্রমণের সংগে সংগে বাড়ছে। তোরা এখানকার সঠিক সংবাদ পেয়েছিস্ কি না জানি না, তাই আক্রমণের একটি ছোটখাটো আভাস দিচ্ছি। প্রথম দিন, খিদিরপুরে, দ্বিতীয় দিনও খিদিরপুরে, তৃতীয় দিন হাতীবাগান ইত্যাদি বহু অঞ্চলে—(এই দিনকার আক্রমণ সবচেয়ে ক্ষতি করে) চতুর্থ দিন ড্যালহৌসী অঞ্চলে—(এই দিন তিন ঘণ্টা আক্রমণ চলে, আর নাগরিকদের সবচেয়ে ভীতি উৎপাদন করে, পরদিন কলকাতা প্রায় শূন্য হয়ে যায়) আর পঞ্চম দিন অর্থাৎ গতকালও আক্রমণ হয়, কালকের আক্রান্ত স্থান আমার এখনো অজ্ঞাত। ১ম, ৩য় আর ৫ম দিন বাড়িতেই কেটেছে, কৌতূহলী আনন্দের মধ্য দিয়ে। ২য় দিন বালিগঞ্জে মামার বাড়িতে মামার সংগে আড্ডা দিয়ে কেটেছে, ৪র্থ দিন সদ্য স্থানান্তরিত দাদা-বৌদির সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাড়িতে কেটেছে সবচেয়ে ভয়ানক ভাবে। সেদিনকার ছোট্ট বর্ণনা দিই কেমন? সেদিন সকাল থেকেই মেজাজটা বেশ অতিমাত্রায় খুসী ছিলো, একটা সাধু সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কারণ, কয়েক দিন আগে দাদার নতুন বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে নিজের পৌরুষত্বের ওপর ধিক্কার এসে ছিল, তাই ঠিক করলাম, নাঃ, আজ বৌদির সংগে আলাপ ক'রে ফিরবোই, যে বৌদির সংগে আগে এত প্রীতি ছিলো, যার সংগে কত দিন লুকোচুরি খেলেছি, সাঁতার কেটেছি, রাতদিন এবং বহু রাতদিন বকবক্ করেছি, সেই বৌদির সংগে কী আর সামান্য দরজা খোলার ব্যাপার নিয়ে রাগ ক'রে থেকে লাভ আছে? অবিশ্যি এতখানি উদারতার মূলে ছিলো সেদিনকার কর্মহীনতা, যেহেতু Examination হয়ে গেছে, রাজনৈতিক কাজও সেদিন খুব অল্পই ছিলো, সুতরাং মহানুভব (!) সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর বৌদির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। প্রথমে দাদা না থাকায়, বৌদিই প্রথম কথা ক'য়ে লজ্জা ভেঙে দিয়ে অনেক সুবিধা করে দিলেন, তারপর ক্রমশঃ অল্পে অল্পে বহু কথা কয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে বৌদির স্বহস্তে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনে পরিতোষ লাভ করে, তারপর কিছু রাজনৈতিক কাজ ছিল, সেগুলো সেরে সন্ধ্যায় বৌদির ওখানে পুনর্গমন করলুম এবং সদ্য আলাপের খাতিরে বৌদির পরিবেশিত চা পান করে আবার বকবক করতে লাগলুম, ৮৷০টার সময় বাড়ি যাবো ভেবে উঠলাম এবং সেদিন সেখানে থাকবো না শুনে বৌদি আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ করলেন। কিন্তু দাদা এসে পড়ায় সেদিন আর বাড়ি ফেরা হলো না। কিছুক্ষণ গল্প করার পর ৯-১০ এমনি সময় সেদিনকার সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটলো, বৌদি সহসা বলে উঠলেন, বোধ হয় সাইরেণ বাজছে, রেডিও চলছিলো, বন্ধ করতেই সাইরেণের মর্মভেদী আর্তনাদ কানে গেলো; সংগে সংগে দাদা তাড়াতাড়ো করে সবাইকে নীচে নিয়ে গেলেন এবং উৎকণ্ঠায় ছুটোছুটি, হৈচৈ ক'রে বাড়ি মাৎ করে দিলেন। এমন সময় রঙ্গমঞ্চে জাপানী বিমানের প্রবেশ। সংগে সংগে সব কিছু স্তব্ধ। আর শুরু হয়ে গেলো, দাদার হায় হায়, বৌদির থেকে থেকে সভয় আর্তনাদ, আর আমার অবিরাম কাঁপুনী। ক্রমাগত মন্থর মুহূর্তগুলো বিহ্বল মুহ্যমানতায়, নৈরাশ্যে বিঁধে বিঁধে যেতে থাকলো আর অবিশ্রান্ত এরোপ্লেনের ভয়াবহ গুঞ্জন, মেসিন গানের গুলী, আর সামনে পেছনে বোমা ফাটার শব্দ। সমস্ত ক'লকাতা একযোগে কান পেতেছিলো সভয় প্রতীক্ষায়, সকলেই নিজের নিজের প্রাণ সম্বন্ধে ভীষণ রকম সন্দিগ্ধ। দ্রুতবেগে বোমারু এগিয়ে আসে, অত্যন্ত কাছে বোমা পড়ে, আর দেহে-মনে চমকে উঠি, এমনি ক'রে প্রাণপণে প্রাণকে সামলে তিন ঘণ্টা কাটাই। তখন মনে হচ্ছিল, এই বিপদময়তার যেন আর শেষ দেখা যাবে না, অথচ বিমান আক্রমণ তেমন কিছু হয়নি, যার জন্য এতটা ভয় পাওয়া উচিত। কালকের আক্রমণে অবশ্য অত্যন্ত সুস্থ ছিলাম।

বোমার ব্যাপার বর্ণনা করতে দু'পাতা লাগলো, কাগজের এত দাম সত্ত্বেও আরো দু'পাতা লিখছি।—

'সংকলন' গ্রন্থটি 'একত্রে' নাম নিয়ে বুদ্ধদেব, বিষ্ণু, প্রেমেন্দ্র, অজিত দত্ত, সমর সেন, অচিন্ত্য, অন্নদাশংকর, অমিয় চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বাংলার ৫৫ জন কবির কবিতা নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এবং তার মধ্যে আমার একটি কবিতাও সসংকোচে স্থান পেয়েছে। ভালো কথা, জ'বুর একখানা 'কবিতা' তোর কাছে ছিলো, কিন্তু তোর বাবার কাছ থেকে সেখানা এখনো পাইনি, তাই অপর ক'খানাও দেওয়া হয়নি;—অত্যন্ত লজ্জার কথা।

এবার 'আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীলা' মেয়েটির কথা বলছি। তোকে চিঠিতে জানানো ঘটনার পর একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, আমাকে দেখেই বিস্ময়ে, উচ্ছ্বাসে মর্মরিত হয়ে উঠলেন, আমিও আবেগের বন্যায় একটা নমস্কার ঠুকে দিলাম, তিনিও প্রতিনমস্কার ক'রে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে দরজা খুলে দিলেন, আমি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' সংগে এনেছিলাম তাঁকে দেবার জন্যে। সেখানা দিয়ে গল্প সুরু ক'রে দিলাম এবং অনেকক্ষণ গল্প করার পর বিদায় নিয়েছিলাম। সেদিন তাঁর প্রতি কথায় বুদ্ধিমত্তা, সৌহার্দ্য এবং সারল্যের গভীর স্পর্শ পেয়েছিলাম এবং বিদায় নেবার পর পথ চলতে চলতে বার বার মনে হয়েছিল, সেদিন যে কথোপকথন আমাদের মধ্যে হয়েছিল, তার মত মূল্যবান কথোপকথনের সুযোগ আমার জীবনে আর আসেনি। মেয়েটি স্নিগ্ধতার একটি অপরূপ বিকাশ, তার মধ্যে সহুরে চটুলতা, কুটিলতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্র আবিলতার কোন আভাস পেলাম না, অথচ তাঁর মধ্যে সুরুচি ও সংস্কৃতির অভাব নেই, সর্বোপরি পরিপূর্ণতার এক গভীর নীরবতা গ্রাম্য-আবেষ্টনীর মত সর্বদা বিরাজমান। তবুও সেদিন সুস্থ হ'য়ে কথা বলতে পারিনি, যেহেতু আমি পুরুষ—তিনি নারী।—

এখন তোর খবর কী? শরীর কেমন? গ্রাম্য জীবন কী ধাতস্থ হয়েছে? তোর বাবা যে কবে এখান থেকে গেলেন, আমি জানতেও পারিনি। তোর ভাই-বোন বাবা-মার কুশল সংবাদ সমেত একখানা চিঠি, যদি খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় তো পাঠাস, নতুবা দেরী করে পাঠাসনি, কারণ বোমারু বিমান সর্বদাই পৃথিবীর নশ্বরতা ঘোষণা ক'রছে। তোর উপন্যাসখানার বাকী কত? *

সুকান্ত ভট্টাচার্য।

অরুণাচল বসুর সৌজন্যে।

গ্রীক পাত্রের সম্পর্কে

(জন কীট্‌সের *'Ode to a Grecian Urn'*)

শোন অযি নৈঃশব্দ্যের কুমারী তনয়া!
হে তুমি পালিতা কন্যা স্তব্ধতা ও মন্থর কালের,
আরণ্য ঐতিহাসিকা, একমাত্র তুমিই সক্ষম
রচিতে প্রাণময় আখ্যান অসাধ্য যা মোদের কাব্যের:
পুষ্পপত্রময়ী কোন্ কীর্তি অই উৎকীর্ণ তোমাতে?
দেবতা না মানবের? না ও-কীর্তি যুগ্ম-অধিকারে?
কোন্ সে স্থানের—টেম্পী না আর্কেডি চারণ-ক্ষেত্রের?
কোন্ দেব, কি নর ওরা? কি নারী পালায় লজ্জাভরে?
কোন মত্ত উৎসব? এড়ানো কোন সে অমঙ্গলে?
কেন বাঁশি কেন ভেরী, কেন এত উল্লাস উথলে?

শ্রুতরাগ প্রাণ হরে, অশ্রুত আরও বহু গুণে
সুমধুর; তাই, সজোরে মধুর বাঁশি বাজো;
শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে নাহি পশিলেও, কিন্তু প্রিয়তর,
কল্পনার উদ্বোধনে মৌন তব খুরেই বিরাজো:
ওগো সুদর্শন যুবা বৃক্ষতলে, পার না থামাতে
তব গান, বিটপী ও নিষ্পত্র না হয়;
অধীর প্রেমিক, তব ব্যর্থ, ব্যর্থ চুম্বন প্রয়াস
সাফল্যের লগ্নে এসে—তবু, যেন খেদ নাহি রয়;
ম্লান সে ত হ'তে নারে, যদ্যপি না পেলে সিদ্ধিরূপ,
ভালবেসে যাওয়া তব চিরকাল, প্রিয়া অপরূপ!

আহা, ধন্য, ধন্য শাখা! নাহি তব পত্রবিমোচন
কদাপি না পার তুমি বসন্তের বিদায় রচিতে;
আর, ফুল্ল বাণ্ডরিয়া, ক্লান্তি তোমা করে না পরশ
নব নব সুর, সৃষ্টি করে যাও বাঁশরীখানিতে।
আরো সুখী। প্রেমাস্পদ! আরো সুখী, সুখী হে দয়িত,
সনাতন কবোষ্ণতা, অক্লান্ত বৈভব প্রেমের,
হৃদয় আরও চাহে, যৌবনের নিঃশেষ না হয়,
নির্বাসিত হোথা হ'তে ভোগের আসক্তি মানবের
যে-আসক্তি দুঃখময়, একমাত্র প্রাপ্তিই যে জানে,
বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে এবং রসনার দাহ আনে।

যজ্ঞের স্থলীতে বল উপনীত আজিকে কাহারা?
সবুজ বেদীতে কোন্ হে যাজ্ঞিক, নহ পরিচিত,
যে নিতেছ গো-বৎসটি হাম্বারবে-ডাকা নভপানে
ক্ষৌম গলদেশ তার মালিকায় করি বিভূষিত?
নদীতট, সিন্ধুতীরে কিংবা এক অচল উপরি
গঠিত শহর কোন দুর্গ-সংবলিত শান্তিময়,
অধিবাসী-পরিত্যক্ত আজিকে কি মঙ্গল-প্রত্যুষে?
আর, হে শহর, তব সরণিরা সকল সময়
মনুষ্যবিহীন রবে; বলিবার নাহি কোন জন
কেন গো বিজন তুমি, অসম্ভব পুনরাগমন।

অয়ি গ্রীক আধারিণি! সুলক্ষণে! রূপদক্ষ যার
মর্মর শরীরে এঁকে দিয়েছিল বিশোভন চাহি
নরনারী, বৃক্ষশাখা এবং দলিত তৃণদল,
নিস্তব্ধা শিখালে বৃথা অনুধ্যানে প্রয়োজন নাহি
যে শিক্ষাটি অনন্তেরও: শোন, মৌন গ্রামীন কবিতা,
কাল দেহে এই নরবংশ হবে বিলুপ্ত যদিও
অবিচল রবে তুমি, অনাগতদের দুঃখে নব
সুহৃদ-সম্মিত এই বাণী তুমি প্রচার করিও,
সত্যই সুন্দর, আর সুন্দরই সত্য—শেষ কথা
জ্ঞাতব্য ইহাই মাত্র, হে পৃথিবি, হও অবগতা।

অনুবাদ: জীবনকৃষ্ণ দাশ।

শ্রীশ্রীগৌরীমাতা

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

শত বর্ষ পূর্ব্বে এক মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পূজনীয়া গৌরীমার আবির্ভাব। বাংলা ও বাঙ্গালীর চিরস্মরণীয় পুণ্যময়ী তিথি এই মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী। আজ প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বীরভূমে একচাকা গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ এই পুণ্য তিথিতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দয়াল নিতাই স্ত্রী-শূদ্র বিচার না করিয়া নাম ও প্রেম বিলাইয়াছেন, যাহারা দীন দুঃখী দরিদ্র নিঃস্ব কাঙ্গাল, সমাজে হেয় অস্পৃশ্য, প্রেমদাতা নিতাই অযাচিত ভাবে তাহাদিগকেও প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। এই প্রেমদানের অর্থ কি? সমাজের স্বার্থপর গণ্ডী ভাঙ্গিয়া উপেক্ষিত উপেক্ষিতা নর-নারীকে মানবতার মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার অধিকার দান। যাঁহারা উন্নত পবিত্রচেতা সরল তাঁহারা শ্রীমন্নিত্যানন্দের অহেতুকী কৃপায় রসঘন রসিক-শেখর শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের লীলা আস্বাদন করিয়া ভাগবত ধ্যানে তন্ময় ও তদগতচিত্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের দ্বারাই আবার বাংলা-দেশে ধর্ম্মপ্রচার ও সমাজসংস্কারের প্রবল আন্দোলনে এক নবভাবের উদার দৃষ্টি সম্প্রসারিত হইয়াছিল, বাংলা দেশে আপামর সাধারণের মধ্যে এক নবযুগের সূচনা হইয়াছিল।

এই পুণ্যতিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়া গৌরীমা অনুরূপ ভাবে জাতি-বর্ণ ধনী-নির্ধন নির্ব্বিচারে তাঁহার বাৎসল্য প্রেমে সকলের হৃদয় সিক্ত করিয়াছেন। এই আবাল্য ব্রহ্মচারিণী কঠোর তপস্বিনী পূতস্বভাবা সন্ন্যাসিনী গৌরীমা রাজা-রাণী হইতে সামান্যা অসহায়া দীনহীনা নারীকে পর্য্যন্ত স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণে শান্তি ও আনন্দের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম হইতে গৌরীমার যে জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। কোথাও তীর্থ পর্য্যটনকালে কোন রাজা ও রাণীর সংসার-তাপক্লিষ্ট হৃদয়ে অভয় ও আশ্বাস দিয়াছেন, পুণ্যতীর্থ প্রয়াগধামে অনুতপ্তা পথভ্রষ্টা নারীকে শান্তি ও আনন্দের পথে চালিত করিয়াছেন —হৃষীকেশে নির্জ্জনে সাধন-ভজনের উপদেশে, কোথাও বিত্তশালী মদ্যপ তাঁহার স্নেহপূর্ণ কঠোর আদেশে সুরাপান ত্যাগ করিয়াছে। আবার বারাকপুর আশ্রমের প্রতিবেশী মুচিরাম, গগন প্রভৃতি ধীবর জাতীয় কত নর-নারী তাঁহার বাৎসল্য প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছে। তাহারা তাঁহাকে দেবী-জ্ঞানে সেবা করিত; সরল ভক্তিবিশ্বাসে তাহারা আধ্যাত্মিক পথেও অগ্রসর হইয়াছিল। মাতা ঘরে ঘরে গিয়া অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিণীদিগের সহিত মিশিয়া তাঁহাদের সুখদুঃখের ভাগিনী হইয়াছেন, সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে সকলকে সমবেদনা জানাইয়াছেন, ধর্ম্মই একমাত্র শান্তির পথ, যাহা অবলম্বন করিলে মানুষের সকল জ্বালাযন্ত্রণা দূর হয়—ইহা মায়ের তেজঃপূর্ণ অভয়বাণীতে তাহাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল।

গৌরীমার অপার্থিব মাতৃস্নেহ, তাঁহার ইষ্টনিষ্ঠা ও সদাচার, তাঁহার ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কঠোর তপস্যা, তাঁহার তেজ ও করুণার দৃষ্টি মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করিত, মুগ্ধ করিত, মানবদেহে তাঁহার দেবীত্ব উপলব্ধি করিত। এই [illegible] প্রতিষ্ঠান ও সন্ন্যাসিনীসংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, যে অপূর্ব্ব জীবন দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা শুধু বাংলায় নয়, ভারতে নয়, সমগ্র জগতে দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বাংলার ইতিহাসে, ভারতের মহিমময়ী মহিলাদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় গৌরীমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে গৌরীমাকে প্রথম দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় দার্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিলে রামকৃষ্ণ মিশনের অধিবেশনে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে তিনি গৌরীমার কথা উত্থাপন করেন। মুঙ্গেরে কষ্টহারিণী ঘাটে তাঁহাকে দর্শন করিয়া কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহার আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে আধ্যাত্মিক ভাবের উচ্চতর স্তরে সমাহিতা দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার 'দামু' (অর্থাৎ তাঁহার নিত্যপূজিত শ্রীশ্রীদামোদর শালগ্রাম) ও ঠাকুরের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অনুরাগ স্থানীয় লোকদের কিরূপে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহা আনুপূর্ব্বিক ভাবে তিনি আমার নিকট একে একে বর্ণনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, গৌরীমা এখন বারাকপুরে গঙ্গাতীরে একটি আশ্রম

প্রতিষ্ঠা করিয়া রহিয়াছেন, এবং তিনি মধ্যে মধ্যে সেখানে মায়ের নিকট যান।

গৌরীমাকে দর্শন করিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইলাম। কারণ, তাঁহার নাম এবং তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনকথা, তাঁহার ত্যাগতপস্যার কথা পূর্ব্বেই আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানগণের মুখে শুনিয়াছিলাম। মহাত্মা রামচন্দ্র দত্তের প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন-বৃত্তান্ত" পাঠ করিয়া গৌরীমার অলৌকিক ভাবের বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলাম। একদিন শনিবার বেলা দুইটার পর সুরেন্দ্রনাথ ও আমি ট্রেণে করিয়া বারাকপুর ষ্টেশনে গিয়া নামিলাম এবং তথা হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে প্রায় দুই মাইল গিয়া আশ্রমের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গার তীরে নির্জ্জনে বৃক্ষলতা-সমাচ্ছন্ন, তপোবনের ন্যায় স্থানটি। ভক্তিরসাপ্লুত অন্তরে পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলাম। পর্ণকুটীর, কিন্তু সম্পূর্ণ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত নয়। একটি ঘর, পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা, ইট-বাঁধানো ঘরের মেঝে ও বারান্দা। বারান্দাটি সাণ-বাঁধানো, উহারই সম্মুখে একটা কাঁচা গোলপাতার ছাউনীতে মাটির রান্নাঘর, বাঁশের চ্যাঁচা-বেড়া।

ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ শুনিয়া গৌরীমা দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া পাদস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাদিগকে ঠিক মায়ের মতই স্নেহ-বাৎসল্যে আদর করিলেন, আমি অপরিচিত হইয়াও তাঁহার কাছে যেন অনেক দিনের পরিচিতের মতই আদর পাইলাম। সুরেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার নাম উল্লেখ করিয়া আমাকে ঠাকুরের ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেন।

মায়ের আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই স্থানটিকে শান্ত, গম্ভীর ও পবিত্রতাপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শ্রীগৌরীমার দিকে চাহিয়া দেখিলাম—লালপাড়যুক্ত গৈরিক বস্ত্রপরিহিতা, উজ্জ্বলবর্ণ, হাতে শাঁখা, কপালে সিন্দুর,—এক অপূর্ব্ব মহিমময়ী বাৎসল্য-প্রেমপূর্ণা মাতৃমূর্ত্তি, আমরা তখন কিশোরকাল উত্তীর্ণ করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি, ছাত্রজীবন। সন্ন্যাসিনী মাকে দেখিয়া বোধ হইল, তিনি প্রৌঢ়ত্ব পার হইয়া বৃদ্ধত্বের সীমারেখায় পদার্পণ করিতেছেন। মায়ের চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল জ্যোতিঃপূর্ণ, কিন্তু স্নেহ-করুণা সমন্বিত। মুখমণ্ডলে দিব্য ভাবের দীপ্তি, সমস্ত দেহটি তেজ-জ্যোতিঃ-বিমণ্ডিত। আমাকে সম্বোধন করিয়া মা বলিলেন, "বাবা, তুমি ঠিক ঠিক মায়ের ছেলে হও। আমাদের দেশে মাতৃজাতির কী কষ্ট, কী ব্যথা, তা আর তোমায় আমি কি বলব। মাতৃজাতির দুর্গতি যত দিন থাকবে দেশের উন্নতি হবে না। জেনো, মায়েদের ঠেলে রাখলে ধর্ম্মকর্ম্মও হবে না। আমি আসমুদ্র-হিমাচল পর্য্যটন করে দেখেছি, সর্ব্বত্রই মায়ের জাত অপমানিতা, উপেক্ষিতা, লাঞ্ছিতা, এই অবস্থা যদ্দিন থাকবে তদ্দিন দেশের জাতের কোন মঙ্গল হবে না। মায়েদের সেবা করলে তাঁদের আশীর্ব্বাদে ধর্ম্মপথেও তোমাদের কল্যাণ হবে।"

আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, "ঠাকুর বলতেন, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করতে হবে। মেয়েদের সঙ্গে মিশবে না।" ঠাকুরের এই নির্দ্দেশের সঙ্গে পুরুষ মানুষ মাতৃজাতির সেবা কি করে করবে? এর মিল বা সামঞ্জস্য তো খুঁজে পাই না!

গৌরীমা তখনি সতেজে উত্তর করিলেন, "ঠাকুর যে মায়ের জাতকে শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্ত্তি বলতেন। তিনি তাঁদের সাক্ষাৎ জগজ্জননী জ্ঞান করতেন, প্রত্যক্ষ করতেন, তাঁদের সেবা করলেই জগদম্বার সেবা হবে। কিন্তু মাতৃজাতির প্রতি কামিনী-বুদ্ধি করলে হবে না, এই কামিনী-বুদ্ধি ত্যাগ করতে হবে, মানুষের ভেতরে যে পশুপ্রকৃতি আছে তাতেই আসক্তি ও ভোগ প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে। সেজন্য মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে থাকতে নেই, ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করতে নেই। ঠাকুর যেমন পুরুষভক্তদের বলেছেন—কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ কর, তেমনি মেয়েদেরও বলেছেন—পুরুষদের কখনও বিশ্বাস করবি না। তারা মেয়েদের সরল দেখে কামনার রাস্তায় প্রলোভনের জালে টেনে আনে। যুবতী মেয়েদের দেখে পুরুষরা কত ঢং ঢাং করে, ঠাকুর তা নকল করে আমাকে দেখিয়েছেন।

"ঠাকুরের আদেশেই আমি এই মায়ের জাত—জ্যান্ত জগদম্বার সেবার জন্যই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছি। এখানে মেয়েরা যখন থাকবে তখন কোন পুরুষ ভেতরে ঢুকতে পারবে না। তোমাদের সেবা কি জান? এই আশ্রমের জন্যে বাইরে যেখানে মেয়েরা যেতে পারবে না সেখানে গিয়ে আমার কথামত তোমরা কাজ করবে। ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চটকা।' আমি তাঁকে বলেছিলুম, 'এখানে তো সব কাঁকর, কাদা হবে কি করে?' ঠাকুর তখন আমার দিকে তাকিয়ে করুণস্বরে বললেন, 'মা, তুই আমার কথা বুঝলি না। মেয়েরা বড় দুঃখী, ঘরে ঘরে তাদের কী কষ্ট, কী জ্বালা, কী অত্যাচার, তা তোমাদের কি বলবো। ধর্ম্ম কর্ম্ম তারা করতে পারে না, ধর্ম্মতত্ত্বও তারা বোঝে না। পুরুষরা তাদের শুধু ভোগের সামগ্রী করে রেখেছে, তাদেরকে ধর্ম্মশিক্ষা কেউ দেয় না। মা, তুই তাদের শিক্ষার ভার নে, ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের অশিক্ষা, তাদের জ্বালা দূর কর।' ঠাকুর এমন ভাবে বললেন, যেন মেয়েদের দুর্দ্দশা মেয়েদের ব্যথা আমার ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'আমি অতি সামান্য মেয়েমানুষ, কখনো সংসারের জঞ্জালে পড়িনি, আমি একা কি করবো?' ঠাকুর আমাকে অভয় দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'ভয় কি, তুই কাদা চটকা, আমি জল ঢালবো, এর জন্যে তোকে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে হবে না, টাউনে বসেই করবি।'

"তখন ঠাকুরের কথা অন্তরে প্রবেশ করলেও কাজেত কিছু করতে পারি নি, নির্জ্জনে সাধন-ভজন করার জন্যে নানা তীর্থে পর্য্যটন করেছি, হিমালয়ে, পাহাড়ের গুহায়, বিজন প্রদেশে একা থেকে যখন তন্ময় হ'য়ে ধ্যান করেছি, তখন অন্তরের ভেতর থেকে ঠাকুরের সেই বাণী 'তুই কাদা চটকা, আমি জল ঢালছি' ধ্বনিত হয়ে আমাকে ব্যাকুল চঞ্চল করেছে। আমি জানি, আমি ও তোমরা উপলক্ষ মাত্র, ঠাকুর স্বয়ং আমার পেছনে রয়েছেন। ঠাকুরের সেই আদেশ পালন করবার জন্যই আমার এই ব্রত, তাই ভিক্ষে দ্বারা ক্ষুদ্রাকারে এই আশ্রম স্থাপন করেছি। তোমরা মায়ের ছেলে, ঠাকুরের পাদমূলে যখন এসে পড়েছ তখন তোমাদেরই কর্ত্তব্য ঠাকুরের এই কাজের সহায়তা করা। মায়েদের জন্যে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করতে প্রস্তুত। চাই তোদের মত দু-চারটে ছেলে যারা আমার কথামত বাইরে বাইরে কাজ করতে পারবে। আমি তো সব জায়গায় যেতে পারি নে। তোরা সব চার দিকে বলবি, মায়েদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা, তাদের দুঃখ দূর করবার কথা। এখানে কর্ত্তৃ

চলবে না। আমার মেয়েরাই আশ্রম চালাবে। কেবল অর্থসংগ্রহ ও খবরদারি করার জন্যে পুরুষ-ছেলেদের আবশ্যক।"

হঠাৎ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, সন্ন্যাসিনী যেন অপরূপ মাতৃতেজে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছেন! চক্ষে যেন অগ্নিকণা দীপ্তিমান, মুখে করুণামাখা, তীব্র আকুলতা রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বাণী নির্গত হইতেছে। সেই মহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিলে শ্রদ্ধায় আপনি মস্তক নত হইয়া পড়ে।

অতঃপর তাঁহার সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গ, শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গ, মেয়েদের শিক্ষাপ্রণালীর কথা—এই সকল আলোচনা হইল। হঠাৎ তিনি আমাদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আহা গো, কথায় কথায় তোমাদের পেসাদ দিতে ভুলে গেছি। রোদ্দুরে এসে বাছাদের মুখ শুকিয়ে গেছে।" এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দামুর প্রসাদ আনিয়া বলিলেন, "প্রসাদ গ্রহণ কর।" এগন যেন সরল সহজ মায়ের মতই মাতৃস্নেহধারায় আমাদিগকে আপ্লুত করিলেন।

প্রাচীন কালে যে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত ছিল তাহা বেদে, উপনিষদে, পুরাণে, বৌদ্ধযুগে, মধ্যযুগে, এমন কি অষ্টাবিংশ শতাব্দীতেও অনেক প্রতিভাশালিনী বিদুষী ও ব্রহ্মবাদিনী ঋষির উল্লেখ আছে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি শাশ্বতী, অপালা, ঘোষা, দেবীসূক্তের ঋষি অম্ভৃণকন্যা বাক্, ব্রহ্মবাদিনী সুলভা, বাচক্নবী, গার্গী ও মৈত্রেয়ীর নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ব্রহ্মচারিণী এবং সন্ন্যাসিনী নারীর কথা বেদে উল্লেখ আছে। আমরা দেখিতে পাই, শঙ্করাচার্য্যের সহিত যখন মণ্ডনমিশ্রের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বিচার হয় তখন উভয়ের সম্মতিক্রমে মণ্ডনমিশ্রের পত্নী উভয়ভারতী মধ্যস্থা হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যজ্ঞ এবং গায়ত্রীমন্ত্রেও নারীজাতির অধিকার ছিল। পরাধীনতা এবং সামাজিক স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে সঙ্কীর্ণতা ও অধঃপতন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মনুসংহিতা বলিয়াছেন, "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।" স্মৃতিকারেরা ইহাও বলিয়াছেন, "সহস্রন্তু পিতৃর্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে" অর্থাৎ সংসারে যেখানে নারীর সম্মান বা পূজা আছে সকল দেবতারাই সেখানে বিরাজ করেন, যেখানে তাহাদের সম্মান হয় না সেখানে সমস্ত কর্ম্মই বিফল হয়। এমন কি, সহস্র পিতৃগণের অপেক্ষা মাতার গৌরব অধিক। পূর্ব্বে আমাদের শাস্ত্রকারদের এইরূপ উল্লেখ থাকায় তখন মাতৃজাতির সম্মান দেখাইতে ভারতবাসী কুণ্ঠিত হইত না, বরং ইহা অবশ্য পালনীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। খনা, লীলাবতী, হটী বিদ্যালঙ্কারের নাম অনেকে জানেন। কিন্তু আমাদের দেশের অধঃপতনের সঙ্গে আমাদের প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা অনেকই লোপ পাইতে বসিয়াছিল। দুই একজন মহীয়সী নারী ব্যতীত জনসাধারণের মধ্যে সাধারণতঃ রন্ধনাদি গৃহকার্য্যেই মেয়েদের শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকিত। "মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখে কি করবে" এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা সমাজে প্রচলিত ছিল।

এদেশে মেয়েদের অজ্ঞতা দূর করিয়া শিক্ষা প্রচার করিতে বিলাত হইতে প্রথম মিস্ কুক কলিকাতায় আসেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তখন কলিকাতায় [illegible] সম্পাদক রেভারেণ্ড পিয়ারসনকে জানাইয়া দিলেন যে, হিন্দু সমাজে বালিকাদিগকে বাহিরে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে কেহ চাহে না। তৎকালে অন্তঃপুরে বিদেশী খৃষ্টান মহিলাদের প্রবেশ করিতে কেহ দিত না। অতঃপর চার্চ মিশনারী সমিতির সহযোগে স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারে মিস্ কুকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। ইহা ১৮২০ খৃষ্টাব্দের কথা। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত গৌরমোহন তাঁহার স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণে জানাইতেছেন, "প্রথম ইং ১৮২০ সালে জুন মাসে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা এই কলিকাতায় নন্দনবাগানে 'যুবনাইল পাঠশাল' নামে এক পাঠশালা করিলেন। তাহাতে আগে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না। এইক্ষণে এই কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রীপাঠশালা হইয়াছে। এই সব পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া ও সীবনকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইত। খৃষ্টধর্ম্ম ও ভজনগানও বালিকাদিগকে শেখান হইত।"

খৃষ্টানদের বিদ্যালয়ে পড়িতে গিয়া গৌরীমা বালিকা বয়সে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, এই স্থানে সেই ঘটনার উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কলিকাতার বিশপ রবার্ট মিলম্যান ও তাঁহার ভগিনী কুমারী ফ্রান্সিস্ মেরিয়া ভবানীপুরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উচ্চবর্ণের হিন্দু বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে গৌরীমা শিক্ষা লাভ করেন। পাঠে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ও মেধা, তাঁহার ব্যবহার ও চরিত্রগুণে কুমারী মিলম্যান এমনই মুগ্ধ হন যে, তাঁহাকে বিলাতে লইয়া গিয়া উচ্চশিক্ষা দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সেকালে কোন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু পরিবার তাহা অনুমোদন করিত না; এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। কিছুকাল পরে খৃষ্টান মিশনারীগণ তাঁহাদের বিদ্যালয়ে খৃষ্টধর্ম্মের কতকগুলি বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন এবং এতদুদ্দেশ্যে হিন্দুর প্রচলিত আচারনিষ্ঠা দেবদেবীর পূজা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে মন্তব্য করিতে লাগিলেন। প্রতিবাদে বালিকা বয়সেই গৌরীমা ঐ বিদ্যালয় ত্যাগ করেন, এবং সহপাঠী অনেক ছাত্রীও উক্ত বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, মিশনারীদের বিদ্যালয়গুলি সেকালে শিক্ষা ব্যপদেশে খৃষ্টধর্ম্মেরই প্রচারকেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইত।

মিশনারী-প্রভাব প্রতিরোধকল্পে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ব্রাহ্ম নেতৃবর্গ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং নানা স্থানে গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সব বালিকা বিদ্যালয়ে কেবল লেখাপড়া ও সীবনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ বা শিক্ষার দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না। মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী বালিকাদিগের মধ্যে হিন্দু শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য মহাকালী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। সেই শিক্ষা অবিবাহিত কুমারীদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্তোত্রপাঠ, শিবপূজা ও সরস্বতী পূজা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইত, কিন্তু কুমারীদিগের ভিতরে হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে বিশেষ কোন রেখাপাত করিত না, ফলে বেশীর ভাগ স্ত্রীজাতির পূর্ব্বের মতই গার্হস্থ্য কাজে কর্ত্তব্য পরিসমাপ্তি হইত। সমাজে নারীজাতি অধিকাংশই সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ছাড়া কেহ বিশেষ ভাবে ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের সংবাদ রাখিত না।

ও দুর্দ্দশা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তাহাদের বেদনা অনুভব করিতেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাই তাঁহার গুরুভ্রাতাকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে ঠাকুরের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "এবারে মাতৃভাব তিনি মেয়ে সেজে থাকতেন—তিনি যেন আমাদের মা—তেমনি সকল মেয়েকে মার ছায়া বলে দেখতে হবে, ভারতে দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলান, আর জাতি জাতি করে গরীব-গুলোকে পিসে ফেলা—He was the saviour of women, saviour of the masses, saviour of all high and low."

গৌরীমার জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই সময় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নারীজাতির দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারও হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল, শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ও আদেশ স্মরণ করিয়া তিনি এই সময় এক নিঃসম্বল অবস্থায় 'ঠাকুর জল ঢালবেন' এই আশ্বাসে ও ভরসায় বারাকপুরে গঙ্গাতীরে নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতিকল্পে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তিনি দেখিলেন, শুধু কয়েক জন নিরাশ্রয়াকে আশ্রমে রাখিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিলেই চলিবে না, ঠাকুর যে উদ্দেশ্যে তাঁহাকে কাজ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা ফলবতী হইবে না। শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে প্রকৃতপক্ষে চরিত্র গঠন, ধর্ম্মসাধন এবং স্ত্রীজাতির অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হইবে না, বর্ত্তমান যুগে শিক্ষার মূল আদর্শ কি হইবে? এক দিকে সমগ্র ভারতবর্ষে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আদর্শ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে প্রচার হইতেছে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি পাশ করিলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইল—এইরূপ ধারণা জনগনের মনে বদ্ধমূল হইতেছে, অপর দিকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিরোধীদল ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া প্রাচীন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শুধু রন্ধন সীবন ঘর-গৃহস্থালীর কাজ এবং কিছু স্তবস্তোত্র মুখস্থ করাই নারীশিক্ষার চরম বলিয়া মনে করিলেন।

গৌরীমা দেখিলেন, এই দুইটি ভাবের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে কিন্তু চরম আদর্শ থাকিবে—ধর্ম্ম, আত্মানুভূতি বা অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে গেলে চাই লোকবল, অর্থবল, এবং উপযুক্ত শিক্ষার্থিনী ও উচ্চভাবসম্পন্না শিক্ষয়িত্রী। শুদ্ধ পবিত্রস্বভাবা শিক্ষয়িত্রী গঠন করিবার জন্য তিনি মাতৃজাতির মধ্য হইতে কয়েক জনকে নির্ব্বাচন করিলেন। তাঁহাদের সাধন-ভজনের অনুরাগ যাহাতে বৃদ্ধি হয় সেজন্য তাঁহাদের নিকট শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব্ব আদর্শ ও ত্যাগ এবং বাণী দিনের পর দিন সম্মুখে ধরিতেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের নানা তীর্থে পর্য্যটন করিয়া যাহা দর্শন এবং যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগকে শুনাইতেন, মহাপুরুষদের জীবন কাহিনী ও পুরাণ ভক্তমালের মহীয়সী নারীদিগের কথা গল্পচ্ছলে তাঁহাদিগকে শুনাইতেন। ইহাতে শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষার্থিনী উভয়েই একটা মহান আদর্শে জীবন উৎসর্গ করিতে অনুপ্রাণিত হইত। এই প্রেরণার বলেই আশ্রম সন্ন্যাসিনীসংঘের মূল প্রতিষ্ঠার সূচনা হইল।

ধীরে ধীরে যখন এই কার্য্য বারাকপুর আশ্রমে চলিতেছিল কলিকাতা মহানগরীতে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে। তাঁহাদের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তিনি উত্তর-কলিকাতায় গোয়া-বাগানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিলেন। এই সময় এক দিকে বালিকা বিদ্যালয় ও আশ্রম পরিচালনার ব্যয়, ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপরায়ণা শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ তৎসঙ্গে মাতৃভাবের প্রচার এবং অন্তঃপুরচারিণীদের মধ্যে আশ্রম ও স্ত্রীশিক্ষার জন্য সাহায্যের আবেদন, এবং তাঁহাদের ভিতরেও মহান্ উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করাইবার ঐকান্তিক চেষ্টা,—এই প্রকার কত চিন্তা কত কাজ মাকে করিতে হইত, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ক্রমে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইলে তাঁহাকে নিরুৎসাহ অর্থকৃচ্ছ্রতা ও নানাবিধ দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্য দিয়াও অপরিসীম ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা সহকারে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। যে সকল সন্তান তাঁহার কার্য্যে সহযোগিতা করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন—এই সব বিঘ্ন-ঝঞ্ঝার মধ্যেও গৌরীমা ধীর স্থির। দেখিয়াছেন—শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর তাঁহার একান্ত নির্ভরতা, মনে-প্রাণে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ও পরার্থে আত্মবিলুপ্তি। তিনি সন্তানদের বলিতেন "ভয় কি? এই কাজ কি তোমার আমার ব্যক্তিগত চেষ্টায় হচ্ছে? তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র। শ্রীশ্রীঠাকুরই জল ঢালছেন ও জল ঢালবেন। আমরা শুধু মাটি চটকাব, অর্থাৎ তাঁর কাজ করে যাব"।

এমতাবস্থায় মায়ের নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ ও তাঁহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সকলের হৃদয়ে উৎসাহের একটা বিদ্যুৎ চমকের মত প্রেরণা খেলিয়া যাইত। তাঁহাদের দেহে-মনে শিরায়-উপশিরায় উৎসাহের প্রবাহ খেলিয়া যাইত, এবং সকলে দুঃখ-কষ্ট উপেক্ষা করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে কর্মপথে অগ্রসর হইতেন। দেশের মনীষিগণ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মায়ের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী কথায় এবং মাতৃজাতির দুর্দ্দশা ও শিক্ষাহীনতার কথায় ব্যথিত হইতেন এবং অনেকেই সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে এই কার্য্যে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক যাঁহারা হিন্দুয়ানীর নিষ্ঠা ও প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে আস্থাহীন ছিলেন, তাঁহারাও কেহ কেহ এই কার্য্যে সাহায্য করিলেন। সতীশ-রঞ্জন দাশ যিনি তৎকালে বাংলার এ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন এবং পরে ভারতের বড়লাটের আইনসচিব হইয়াছিলেন, তিনিও মায়ের আশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেন। একবার জনৈকা দানশীলা মহিলার বাড়ীতে জনৈক ব্যক্তি বিস্মিত হইয়া সতীশরঞ্জনকে বলিয়াছিলেন, "আপনিও গৌরীমার কাজে এভাবে নেমেছেন?" তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, "জগতে এমন অনেক কাজ আছে যা সাধারণ ভূমিতে দাঁড়িয়ে মানুষ জাতিধর্ম্ম-নির্বিশেষে করতে পারে। মানুষের মত ও পথের বিভিন্নতা তো থাকবেই, তাতে কি এসে-যায়? আমরা ইচ্ছা করলে সবাই মিলে-মিশে কত কাজ করতে পারি। সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী মাতাজী যে উদ্দেশ্যে কাজ করছেন তার জন্যে আমি ব্রাহ্ম হয়েও বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভিক্ষে করব, এতে আর আশ্চর্য্য কি? এখানে ব্রাহ্ম ও হিন্দুর কোন কথা নেই"।

আজ শ্রীশ্রীগৌরীমাতার শততম জন্মবার্ষিকী স্মরণ করিয়া তাঁহার অলৌকিক জীবনের ও আদর্শের অনুধ্যান করিতেছি।

ছিল না। ক্বচিৎ কোথাও দুই-একজন সর্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসিনী-সংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে ব্রহ্মচারিণী ও সন্ন্যাসিনীব্রতে দীক্ষিত করা পূর্ব্বে ছিল না। ব্রহ্মচারিণী ও সন্ন্যাসিনী-সংঘের প্রতিষ্ঠা বাংলা তথা ভারতবর্ষে গৌরীমাই প্রথম করেন। এবং এই সন্ন্যাসিনী-সংঘের আদর্শ শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী।

অনেকেই জানেন—শ্রীশ্রীমা ভক্তদের নিকট বলিয়াছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে মাতৃভাবের পরিপূর্ণ বিগ্রহরূপে রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা না হইলে ঠাকুরের মহাসমাধির পরেই তাঁহারও দেহত্যাগ হইত। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছেন, "সংসারের লোকগুলো কিলবিল কচ্ছে, তোমাকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।"

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দকে লিখিয়াছিলেন (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে) "মা-ঠাকরুণ কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী, জগতে জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এই জন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই।"

গৌরীমাও অনুরূপ ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীশ্রীমার নামে সর্বাগ্রে এই শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম—ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনীদের জন্য প্রথম নারীমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার ঘরে ঘরে শ্রীশ্রীমার কথা প্রচার করিয়া নারীসমাজকে তিনি অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। শুধু কি মাতৃজাতি, এই মহান কার্য্যে যোগদান করিয়া অনেক পুরুষ-সন্তানকেও শ্রীশ্রীমার প্রতি ভক্তিবিশ্বাসে ও মাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

এখন তাঁহার উপদেশের কথা কিছু বলিব। তিনি অতি সহজ এবং প্রাণস্পর্শী ভাষায় উপদেশ দিতেন। তাঁহার দুই-একটি সার কথা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। গৃহস্থ-বধূদিগকে তিনি বলিতেন, "মা, সকল সমাজের এখন যা অবস্থা তাতে আচারনিষ্ঠা, পবিত্রতা এবং শান্তি—এক কথায় সমাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদেরই বেশী, একথা তোমরা যেন কখনো ভুলো না। মনে রেখো, বাইরের চাকচিক্যে মেয়েদের সৌন্দর্য্য বাড়ে না। মেয়েদের আসল সৌন্দর্য্য—তাদের দেহ-মনের পবিত্রতায়"।

আর একটি কথা তিনি গৃহী ও ত্যাগী সকলকেই বলিতেন, "গৃহীই হও, আর সন্ন্যাসীই হও আসল কথা—মন। মন সাঁচ্চা তো সব সাঁচ্চা। মনটি খাঁটি হলে তবে ভগবানের কৃপা হয়। ঠাকুর বলতেন, 'পবিত্র দেহ-মনে খুব ব্যাকুল ভাবে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায়।' তাঁকে না ডাকলে, তাঁর কৃপা না হলে, মানুষের জীবন দুঃখের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সকল কাজের মধ্যেই তাঁকে স্মরণ করবে। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকবে, যেন তাঁর পাদপদ্মে শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়।"

গৌরীমার জীবন বাস্তবিকই অপূর্ব্ব, যাহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং তাঁহার গৃহী ও ত্যাগী অন্তরঙ্গগণ "কৃপাসিন্ধা গোপী" বলিতেন। এই গোপীভাবের কথা আমি ঠাকুরের পরম অন্তরঙ্গ ভক্ত ও নাট্য-সম্রাট "ঠাকুর গৌরীমাকে কৃপাসিন্ধা গোপী বলতেন। গৌরীমা তখন বয়সে যুবতী, ভাবে আবিষ্ট হয়ে ঠাকুরের সম্মুখে ভগবৎ-সঙ্গীত গাইতে গাইতে ভাবে নৃত্য করতেন। ঘৃণা, লজ্জা বা সঙ্কোচ তাঁর ছিল না। আমাদের দিকে বা আশে-পাশে দৃষ্টি থাকত না। একমাত্র ঠাকুরের দিকে ভাবে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হয়ে নৃত্য করতেন। দেখ না, তিনি নিজে জ্বলন্ত আগুন, তাই আগুন নিয়ে খেলা করছেন। যে কুমারী ব্রহ্মচারিণীর আশ্রম গৌরীমা করেছেন, ওর মতন জলন্ত পবিত্র চরিত্রই তা সামলাতে পারেন। এ কাজ বড় সামান্য নয়।"

এই গোপীভাব কি? শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণসখা শ্রীউদ্ধব গোপীদের ভাব দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। গো-বৎস হরণ করিয়া ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণকে সত্য সত্য পরমব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখন স্তব করিতে লাগিলেন। সেই স্তবে গোপীমায়েদের এত উচ্চ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন যে, ব্রহ্মা স্বয়ং গোপীপদ লাভ করিবার জন্য বর প্রার্থনা করিতেও সাহস পান নাই। গোপীভাবের মূল লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীরাধাকান্তিদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে। এই ভাবের অপূর্ব্ব প্রেমে গরগর মাতোয়ারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে নাম ও প্রেমে মহাভাবে আবিষ্ট থাকিতেন, তাহা এই অপূর্ব গোপীভাবেরই রসঘন বিগ্রহ। আমাদের গৌরীমা তাঁহার দামোদরশিলার মধ্যে সেই শ্যামসুন্দরকেই পরম পতিরূপে সেবা করিতেন। তাঁহার সেই দামোদরশিলার মধ্যেই নদীয়ার গৌর-হরিকেও দেখিতে পাইতেন। এই জন্য কথাপ্রসঙ্গে তিনি কখনও নবদ্বীপধামকে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী বলিতেন।

একবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কৌতুকচ্ছলে গৌরীমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীমা এবং ঠাকুরের মধ্যে কাহার প্রতি গৌরীমার অনুরাগ অধিক। তখন এই গোপীভাবে মাতোয়ারা গৌরীমা গান গাহিয়া ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন—

"রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী,
লোকের বিপদ হলে
ডাকে মধুসূদন বলে
তোমার বিপদ হলে পরে বাঁশীতে বল রাইকিশোরী।"

এখানেও আমরা দেখি, বৃন্দাবনের সেই গোপীমায়েদের ভাব ও লীলাকৌতুক। গোপীগণ সকলেই রাইয়ের পক্ষ হইয়া বৃন্দাবনচন্দ্রকে দুই কথা শুনাইয়া দিতেন, এখানেও গৌরীমা শ্রীশ্রীমার পক্ষ লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সেইরূপ ভাবই দেখাইয়াছিলেন। আর একদিন ঠাকুরের এক প্রশ্নের উত্তরে গৌরীমা বলিয়াছিলেন, "তুমি আবার কে? তুমি সেই—কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।" এই গোপীভাবই প্রেমমাধুর্য্যের অপূর্ব্ব বিকাশ, সাধনায় প্রেমের চরম পরিণতি। একমাত্র অতীন্দ্রিয় ভাবভূমিতেই এই অতীন্দ্রিয় ভাবের রস আস্বাদন ও পরমপুরুষার্থ লাভ। আমরা গৌরীমার জীবনে দেখিয়াছি, কখনও তাঁহার বিগ্রহের সম্মুখে, কখনও ভাবস্ফুরণে, তিনি হাসিতেন, কাঁদিতেন, গাহিতেন, নাচিতেন। আবার কখনও বা স্থির জড় পুত্তলিকার মত বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া যাইতেন। এই গোপীভাবই তাঁহার অন্তঃপ্রবাহ। বাহিরে সকল জীবের প্রতি সেই প্রেমের বিদ্যুচ্ছটা খেলিয়া যাইত। সেই প্রেম মনুষ্য ব্যতীত অন্য [illegible]

বলিয়াই মনে হইত। এই মাতৃভাবই তাঁহাকে গৌরীমা সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছিল।

যিনি বৃন্দাবনে শ্রীরাধা ছিলেন, তিনিই এবার শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী—জগজ্জননী—মাতৃভাবে আবির্ভূতা। তাঁহার সহচরীগণের গোপী সত্তা থাকিলেও এবারের লীলায় তাঁহারা মা-নামে আখ্যাত। গৌরীমা শ্রীশ্রীমায়ের নামেই সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান স্থাপন পূর্ব্বক মায়েরই মহিমা ও করুণা প্রচার করিয়াছেন, মায়ের ভাবেই ভাবিত থাকিয়া গৌরীমা বাংলার ঘরে ঘরে মায়েরই নাম প্রচার করিয়াছেন। প্রতি বৎসর তিনি মায়ের আবির্ভাব-তিথিতে মহাসমারোহে মহোৎসব করিতেন। এই সকল উৎসবে দলে দলে মানুষ আসিয়া মায়ের জীবনকথা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছে, ধন্য হইয়াছে।

গৌরীমা বর্ত্তমান যুগে আদর্শ নারীশিক্ষার প্রবর্ত্তক, সন্ন্যাসিনী-সংঘের ব্রহ্মবাদিনী আচার্য্যা। ব্যথিত হৃদয়ের তিনি করুণাময়ী মা, পরহিতকল্পে আর্ত্ত দরিদ্র নিপীড়িত ও নিগৃহীতের কল্যাণে তাঁহার কী প্রাণপাত প্রচেষ্টা! তাঁহার ত্যাগপূত নিষ্কাম কর্ম্ম, আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধি, প্রেমাস্পদ ইষ্টের পাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত জীবন এবং তাঁহার সহিত যোগযুক্তা,—তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবভক্তি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে তাঁহার চিন্তা ও ধ্যান করিয়া ধন্য হইব।

চুমু

ইতিহাসের ধারা পর্য্যন্ত পাল্টে দিতে পারে সামান্য চুম্বন কিংবা মুহূর্তের একটা 'কিসিং'-এরও অসামান্য মূল্য বা মর্য্যাদা থাকতে পারে, শুনে অমনি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু বিশ্বে এ সবের বিচিত্র নজীর খুঁজে পাওয়া যায় এখানে-সেখানে। ইংল্যাণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী সম্পর্কে একটি চমৎকার কাহিনী জানতে পারা যায়। প্রমোদ-উদ্যানে তিনি আনমনা ভাবে একদিন ঘুরাফেরা করছিলেন। একটি পথের বাঁকে আনে বলেইনের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি সাক্ষাৎ। ব্যস, আবেগ-উচ্ছ্বাসের ভরে অমনি একটি চুম্বন সমাধা হয়ে গেল, লোকচক্ষুর অন্তরালে। সেই থেকে আনের মর্য্যাদা বেড়ে গেল প্রচুর মাত্রায়। কিন্তু বিয়োগান্ত ঘটনায় পরিসমাপ্তি হ'ল তার এই প্রথম দিনকার অপ্রত্যাশিত অথচ মাধুর্য্যময় পরিচয়পর্ব্বের।

এক শত বছর আগেকার একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী বা ঘটনা। ভ্যালেণ্টাইন বেকার তখন একজন উদীয়মান বৃটিশ সামরিক অফিসার। চলতি পথে একদিন তাঁর নজরে পড়লো, একটি সুন্দরী তরুণী রেলের কামরায় ঘুমন্ত। ভ্যালেণ্টাইন একটু খানিক নুয়ে ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাকে 'কিস' করলে। জেগে গেল সঙ্গে সঙ্গে এই অবোধ বালিকা এবং ক্ষুব্ধ চিত্তে প্রতিবাদ জানালে, তাঁর অন্যায় ও অশিষ্ট আচরণের। সামরিক আদালতে ভ্যালেণ্টাইনের যথারীতি বিচার হলো এবং শেষ অবধি চাকরি থেকেই বিদায় নিতে হলো তাঁকে। বেকার-জীবন ভ্যালেণ্টাইনের কাছে দুঃসহ বোধ হ'ল। হতাশ মনে দেশ ছেড়ে তিনি যেয়ে যোগদান করলেন তুর্কী সেনা-বাহিনীতে। দেখতে দেখতে মিঃ বেকার হয়ে উঠলেন একজন নামকরা জেনারেল। পারশেষে এমনি হ'ল—তাঁরই সামরিক দক্ষতার সাহায্য পেয়ে মিশরীয় যুদ্ধে (১৮৮০ সাল) জয়যুক্ত হতে পারলে গ্রেট বৃটেন।

অষ্ট্রেলিয়ার একজন দোকান কর্ম্মচারী। এক দিন দেখা গেল—দোকানের কাউণ্টারের উপর সে ঝুঁকে পড়েছে—একটি রূপবতী মহিলা খরিদ্দারকে খাবার দিতে যেয়ে চুম্বনের তার ব্যাকুলতা। এই অপরাধে কর্ম্মচারীটির ৫০ পাউণ্ড জরিমানা হয়ে গেল—কেমন যেন লাগলো তার মনে। কিন্তু পরে জানা যায়, সেই মহিলা তার উইলে ২০ হাজার পাউণ্ড রেখে গেছেন দণ্ডিত এই দোকান কর্ম্মচারীর নামে। ব্যাপার কি, ব্যাপার কিছুই নয়। আচমকা যে সে 'কিস্' [illegible]

রোমান আইন-কানুনে 'কিসিং' বা চুম্বন বিবাহের একটা সনদ-স্বরূপ—এর মর্য্যাদা রাখতেই হ'বে যেমন করেই হোক্। চার্লেমেগনে একদিন মধ্যরাত্রিতে দেখতে পেলেন যে, তাঁর কন্যা রাজকীয় দপ্তরের একজন সেক্রেটারীকে 'কিস্' করছে। বাপ-মায়ের চোখ এড়াবার জন্য এই সম্রাট-কুমারী প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ পার হয়ে একটি নিভৃত স্থানে চলে গেছিল সেই সেক্রেটারী সহ। কিন্তু 'কিসিং'-এর মূল্য তাকে দিতেই হ'ল শেষ অবধি—তাই দেখা গেলো চার্লেমেগনে ঐ সেক্রেটারীর সঙ্গেই বিবাহ দিলেন আপন প্রিয়তমা কন্যার।

নববর্ষের প্রাক্কালে মিসেস ওলগা ফার্ডেন্স নিউইয়র্ক নগরীতে বসে আছেন তাঁর ঘরে। উন্মুক্ত জানালা দিয়ে বাইরে যেই তাঁর দৃষ্টি পড়লো—অমনি সামনে এক প্রহরারত সুঠাম-সুন্দর পুলিশ। হঠাৎ মনের কি ভাবান্তর হ'ল মিসেস ওলগার, ছুটে গেলেন তিনি রাস্তায় এবং তারপরই একটি চুম্বনের অস্ফুট শব্দ। অপরাধ হয়ে গেল একটা মস্ত এই নারীর। বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন—একে (পুলিশের লোক) 'কিস্' করব বলে এক বছর ধরেই আমি প্রতীক্ষা করে এসেছি। বিচারপতির রায়—দুই ডলার জরিমানা। মিসেস্ ফার্ডেন্সএর চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, মন্তব্য করলেন সহজ গলায়—একটি চুম্বনের মূল্য এ অবশ্যই হ'তে পারে!

মুসোলিনি কিন্তু প্রকাশ্য স্থলে পারস্পরিক 'কিসিং' বা চুম্বন একেবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। একটা সুন্দর ঘটনা। ১৯৩১ সালে একজন স্কুল-শিক্ষক ছুটিতে ইতালীয় নদীতীরে গেছলেন প্রমোদভবনে। চন্দ্রালোকস্নাত রাত্রিতে জনৈকা নারীকে 'কিস্' করতে যেয়ে পুলিশের হাতে তিনি ধরা পড়ে যান। অপরাধের শাস্তিস্বরূপ প্রথমে তাঁকে জরিমানা করা হলো দশ লিং (ইতালীয় মুদ্রা)। কিন্তু তিনি এই অর্থ পরিশোধ করতে চাইলেন না। ফলে বারবার তাঁর উপর শমন জারী হয় এবং প্রতিবারই জরিমানা বেড়ে যায় অতিমাত্রায়। ততদিনে তিনি সামরিক চাকুরীতে নিযুক্ত হয়ে নানা স্থানে ঘুরছিলেন। নাৎসী অন্তরীণ শিবির থেকেও শেষ মুহূর্তে জরিমানার টাকা না দেওয়ায় তাঁর কাছে শমন যায়—জরিমানা এখন আর দশ লিরা নয়, ৫,৫০০ লিরায় দাঁড়িয়েছে। সব অর্থ এবার পরিশোধ করে দিলেন তিনি আর ভাবলেন—'কিসিং' [illegible] বেড়ে যায়।

হাওয়া গেট, বম্বে —সুবোধ চট্টোপাধ্যায় (হালিশহর)
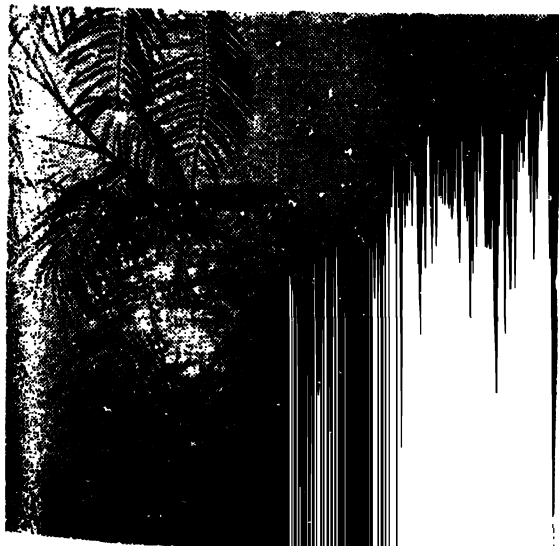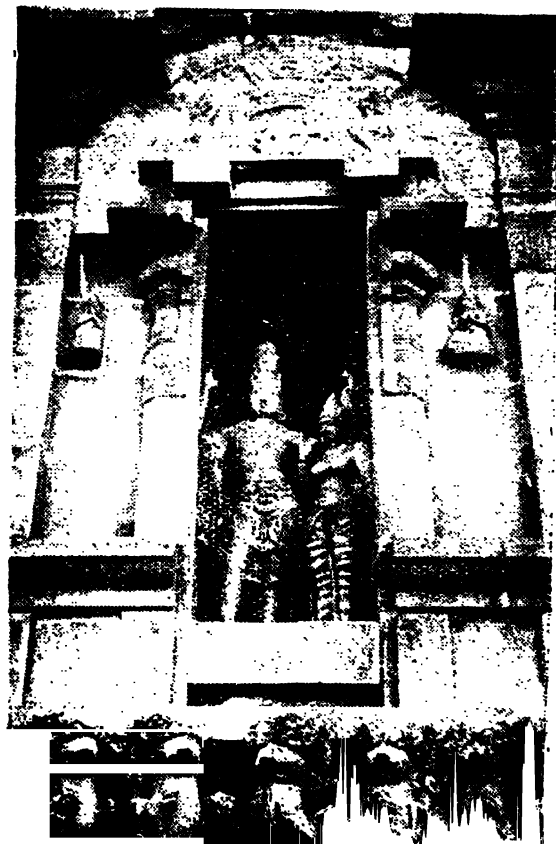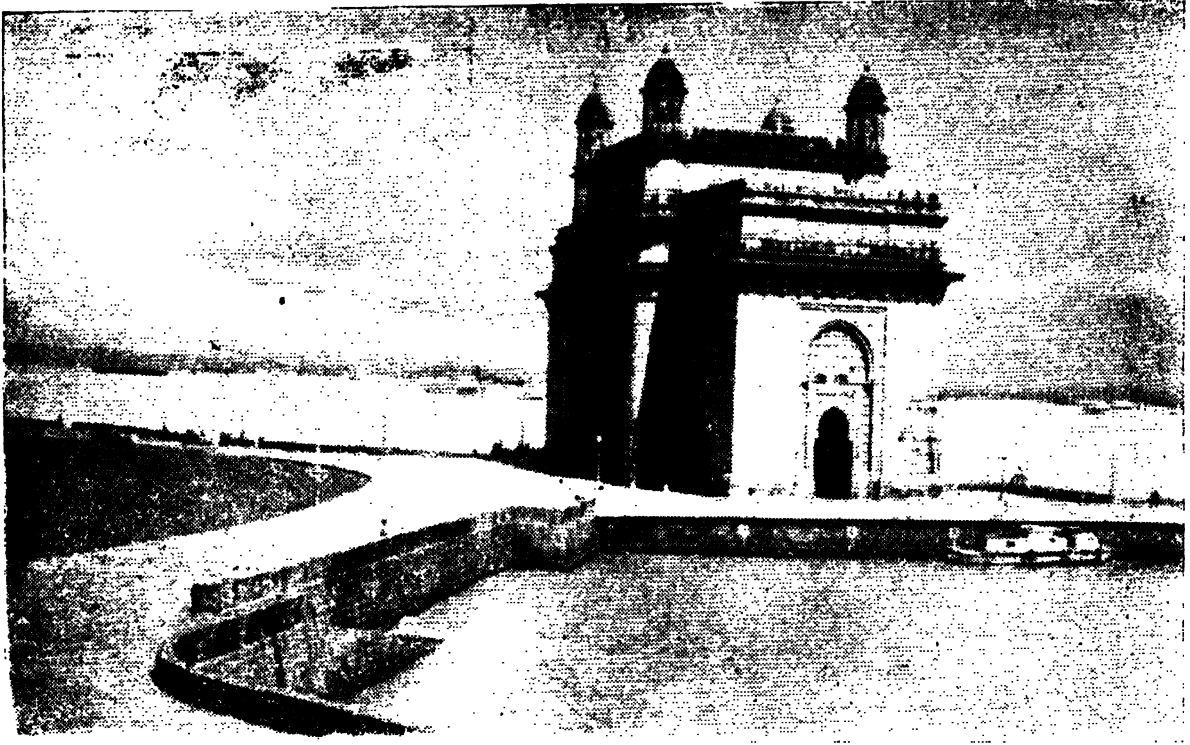
গাগরা ভরণে —সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভক্ত —জয়দেব দত্ত

শিবমন্দির (বোলাড়া, ওন্দা)

—রামকিঙ্কর সিংহ

প্রতিচ্ছবি — শাংকান্তি চন্দ
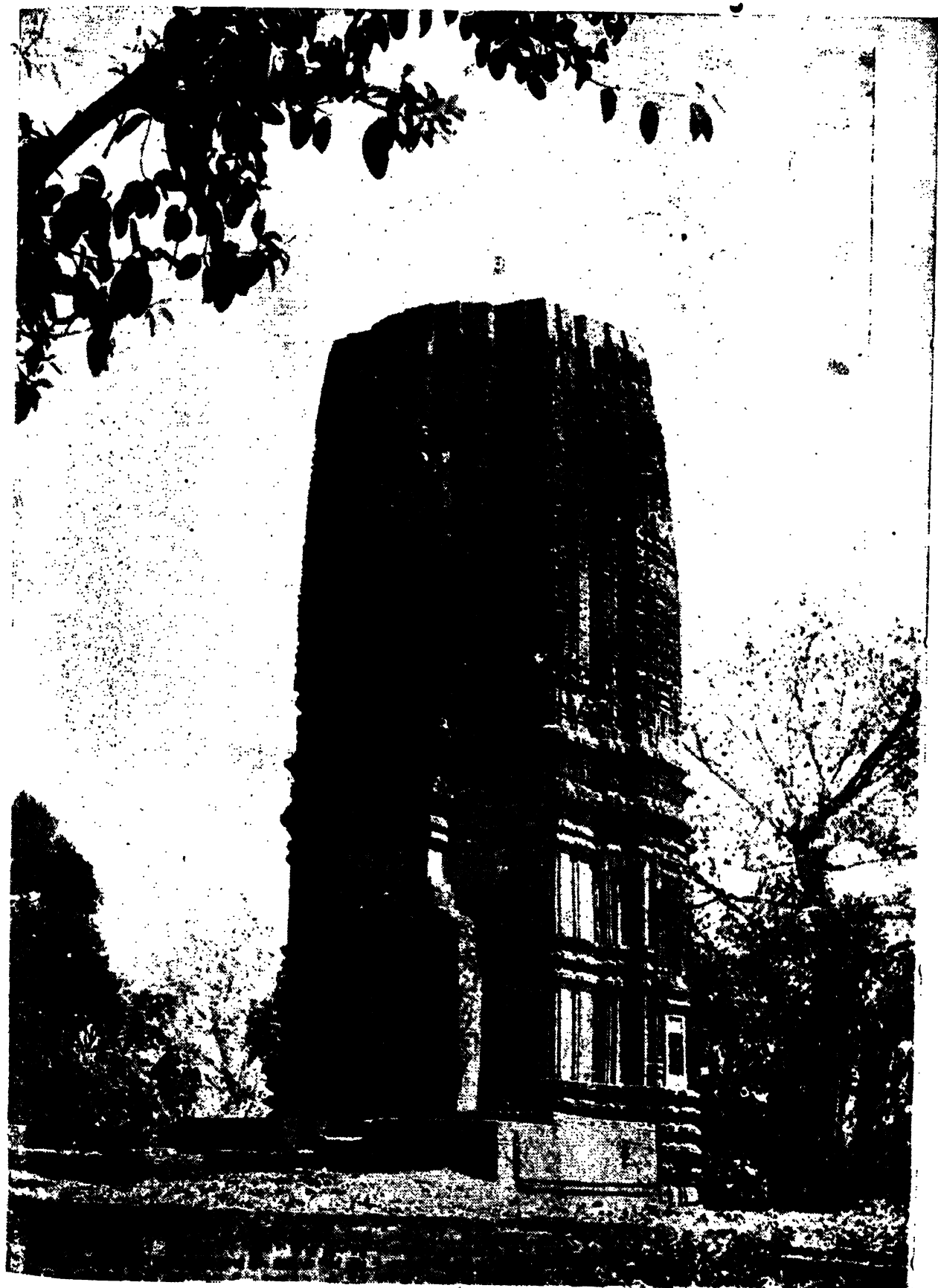
সুনয়নী দেবী

[দেশবরেণ্যা বর্ষীয়সী চিত্রশিল্পী]

মনোবিজ্ঞান বলে যদি কোন ব্যক্তি নিজের কোন সাধু প্রচেষ্টা অপূর্ণ রেখেই মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়—তাহ'লে তার সন্তানদের মধ্যে আপনা থেকেই অনুপ্রেরণা আসবে পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করার। তারই প্রত্যক্ষ নিদর্শন আমরা দেখতে পাচ্ছি গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে। 'বাবুবিলাস' গ্রন্থের প্রণেতা গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখনী ধারণ করলেও শিল্পের প্রতি তাঁর কম অনুরাগ ছিল না। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে ইনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ডিসেম্বর ১৮৫৪)। বাবার শিল্পিমনের ছায়া পড়ল ছেলেদের মনে। বড় ছেলে গণেন্দ্রনাথ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন হিন্দুমেলার অন্যতম মীনাররূপে, হিন্দু-মেলায় তাঁর অবদান সর্বজন-স্বীকৃত, মাত্র ২৭ বছর বয়সে (১৮৬৮) এই তরুণ দেশসেবীর হয় জীবনাবসান। ছোট ছেলে গুণেন্দ্রনাথ জ্যাঠতুতো ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে ভর্তি হলেন সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ে—পাঠ নিলেন অঙ্কনশাস্ত্র সম্বন্ধে। বাবার ও দাদার দেশ-প্রেমের ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের অধিকারী হলেন পূর্ণমাত্রায়। এ ছাড়া কৃষি ও উদ্ভিদবিদ্যাতেও গুণেন্দ্রনাথের দক্ষতা ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। ৩৪ বছরের যুবক গুণেন্দ্রনাথ যখন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন পূর্ণতার দিকে, শুভ্রোৎপল যখন ধীরে ধীরে মেলছিল তার পাপড়ি, জীবন-বীণায় বেজে উঠছিল আসোয়ারীর তান হঠাৎ এক দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় নিবে গেল গুণেন্দ্রনাথের জীবন-দীপ (১৮৮১)। শিল্পীর অন্তর্বাসনা সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত হল না বাস্তবে, রয়ে গেল স্বপ্নের মধ্যেই। কল্পনার মায়াজালেই সে রইল বন্দী, কোন সুনিপুণ হাতের সুমধুর রেখা তাকে করতে এল না মুক্ত। হয় তো সেই কারণেই, গুণেন্দ্রনাথের আশা অপূর্ণ রয়ে গেল বলেই তাঁর ছেলে-মেয়েদের প্রত্যেকের মধ্যেই জেগে উঠল শিল্পপ্রীতি। তারই ফল-স্বরূপ আমরা পেয়েছি কিউবিজমের পুরোধা শিল্পাচার্য গগনেন্দ্রনাথকে, মধ্যাহ্ন পাণ্ডিত্যের সমাহিত দীপ্তি সমরেন্দ্রনাথকে, বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল আধুনিক শিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা অবনীন্দ্রনাথকে, বিনয়িনী দেবীকে আর সুনয়নী দেবীকে। গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্র-সুনয়নীর শিল্পখ্যাতি সর্বজনবিদিত কিন্তু সমরেন্দ্র-বিনয়িনীও ছিলেন উঁচুদরের শিল্পী। এখানেই শেষ নয়, ঐ বংশে এর পরেও দেখা দিয়েছেন একাধিক শিল্পী গগনেন্দ্র-পুত্র নবেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্র-পুত্র ব্রতীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র-পুত্র অলোকেন্দ্রনাথ!

যশোর জেলার দক্ষিণডিহি গ্রামের স্বর্গীয় যদুনাথ রায়চৌধুরীর মেয়ে সৌদামিনী দেবীর গর্ভে ১২৮২ সালের এক শুভলগ্নে জন্ম নিলেন সুনয়নী দেবী। যদুনাথের আর এক মেয়ে সত্যকুমারী ছিলেন সঙ্গীতনায়ক রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দ্বিতীয় সহধর্মিণী। এঁদেরই পুত্র ছিলেন শিল্পপ্রাণ মহারাজা স্যার প্রদ্যোতকুমার ও দৌহিত্র ছিলেন রবীন্দ্র সঙ্গীতে খ্যাতিমান শিল্পী ও শিশির-সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

৬ বছরের মেয়ে সুনয়নী বাবাকে হারালেন। জীবনের পথে এগোতে লাগলেন মা ও দাদাদের স্নেহচ্ছায়ায় নিজেকে আবৃতা রেখে। যথারীতি শুরু হলো বিদ্যাশিক্ষা। যথাসময়ে বেজে উঠল মিলনের মঙ্গলশঙ্খ। ভারতের নব যাত্রাপথের প্রথম পথিক রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্রীপুত্র স্বর্গীয় ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী হলেন

অ্যাটর্ণি স্বর্গীয় রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিণীতা হলেন সুনয়নী। দেখতে দেখতে এল উনিশ শো পাঁচ সাল। পাঁচ সালের তাৎপর্য বা মহিমা দু'চার কথায় লিপিবদ্ধ করার নয়। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের স্বর্ণমঞ্জুষায় চির-উজ্জ্বল এই পাঁচ সালের ইতি-কথা সংরক্ষিত থাকবে চিরদিন। দেশের উন্নতিসাধনে বাঙলা দেশের ঠাকুর-পরিবারের অবদান বিশ্ববিশ্রুত। এ যে সেই পরিবার, যেদিন দেশের অধিকাংশ ধনিকসম্প্রদায় মত্ত ছিলেন সুরায়, এঁরা সেদিন মেতে উঠলেন সুরে, তাঁরা ছুটে চলেছিলেন আলেয়ার হাতছানিতে, এঁরা ছুটে চলেছিলেন আলোর সন্ধানে, তাঁরা সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন বারাঙ্গনাদের পাদপদ্মে, এঁরা হৃদয়ভরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন বীরাঙ্গনাদের শ্রীচরণে।

ঠাকুর-পরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারায় ভরিয়ে তুলতে লাগলেন দেশকে, দশকে, জাতিকে। সুনয়নীও ধরলেন অঙ্কনের পথ। কারো কাছে নিলেন না শিক্ষা। অন্তরের দুর্দমনীয় বেগে এঁকে গেছেন ছবি, কারো কাছ থেকে কোন কিছু আশা করে নয়। এলেন এক মেমসাহেব, শিক্ষা দিতে সুনয়নীকে। ছাত্রীর

অন্তর স্পর্শ করল না বিদেশিনীর শিক্ষাদানের ধারা। শিক্ষাগ্রহণ পর্ব সেইখানেই হল ইতি। সুনয়নী যখন তুলি ধরেছিলেন তখন বাড়ীতে তাঁর তিন দাদা ও দিদি অঙ্কন-সাধনায় মগ্ন। আশ্চর্য! এঁদের কারোরই প্রভাব পড়ল না তাঁর আঁকায়। বরং তাঁর ছবিতে যেটুকু অপরের প্রভাব পাওয়া যায় তা হচ্ছে শিল্প-রবি রাজা রবি বর্মার। পৌরাণিক চিত্রাঙ্কনে এবং চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে প্রাক-অবনীন্দ্র যুগে রবি বর্মার দোসর প্রায় কেউ ছিলেন না বললেই চলে। সুনয়নীর অঙ্কিত চিত্রাবলী বেশীর ভাগই পৌরাণিক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করা। এঁদের ছোট পিসীমা স্বর্গীয়া কাদম্বিনী দেবীর (ভূতপূর্ব পৌরপাল শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রপিতামহী) ঘরের দেওয়ালে টাঙানো থাকত অসংখ্য দেব-দেবীর ছবি। সেগুলিও অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছে সুনয়নীর প্রতি। এঁর অঙ্কিত ছবি বহু সাময়িকীতে হয়েছে প্রকাশিত ও দেশে-বিদেশে বহু স্থানে হয়েছে প্রদর্শিত। এঁর বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে অর্দ্ধনারীশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ, নীল-অঞ্জনা, বাঁশুরিয়া, মা ও ছেলে প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'অর্দ্ধনারীশ্বর' ছবিটি প্রথমে শিল্পী বাতিল করে দেন পরে তা সংগ্রহ করে রাখেন গগনেন্দ্রনাথ। এখন অবশ্য তা স্রষ্টার আশীর্বাদ লাভে সমর্থ হয়েছে। সুনয়নীর মত চোখ ও ভুরু আঁকার হাত আর দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে দেখতে পাননি গগনেন্দ্রনাথ। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সুনয়নীর আঁকা ছবিকে মাষ্টারপিস আখ্যায় ভূষিতা করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, পরম পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

ব্রাস দিয়ে কি করে ওয়াশ করতে হয় সুনয়নী তা আগে জানতেন না, এঁরই এক বোনপো শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীঅসিতকুমার হালদার মহাশয় যখন কাজ করতেন সেই সময় তা দেখে দেখে শিখে নিয়েছিলেন সুনয়নী। ঠিক এমনই দেখে বা শুনে আরও অনেক কিছু আয়ত্তে এনেছিলেন সুনয়নী। মাত্র অভিধানের সাহায্যে শিখেছিলেন ইংরিজী এবং পরে সে ভাষায় লাভ করেছিলেন রীতিমত ব্যুৎপত্তি। পিয়ানো বাজনা শিখেছিলেন আঙুলের চিহ্ন দেখে। এমনই প্রতিভাময়ী মেয়ে সুনয়নী দেবী! এঁর কয়েকখানি ছবি বহন করছে দেহ-লাবণ্যের সুষমার স্বাক্ষর, কোনটি দেখা দিচ্ছে রূপ-রস-রেখা-রঙের প্রতিভূরূপে। ছেলেবেলায় গান শিখেছেন মায়ের কাছে। শিখেছেন এস্রাজ বাজাতেও। অভিনয়প্রীতিও সুনয়নীর মধ্যে বিদ্যমান। রূপও দিয়েছেন বাড়ীতে অভিনীত কয়েকটি নাটকে। পরিচালনাও করেছিলেন একটি।

কালীক্ষেত্র কলকাতা। তার উত্তরার্ধে জোড়াসাঁকো অঞ্চল। সেইখানেই যুবরাজ দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাসপুরী। তারই সংলগ্ন বাড়ীটিতে বসত তাঁর প্রাত্যহিক বৈঠক। ঠাকুর-পরিবারের মধ্যে এ দু'টি বাড়ীর দু'টি ডাকনাম ছিল তা যথাক্রমে বড়বাড়ী ও বৈঠকখানা-বাড়ী। প্রতিটি সন্ধ্যা সেদিন ঝলমলিয়ে উঠত কত মধু আলাপনে, বেলোয়ারী ঝাড়-লণ্ঠনের সে কি অপূর্ব সমারোহ! বৈঠকখানা বাড়ীর প্রতিটি ইট-পাথরের মধ্যে জেগে উঠত প্রাণ। যুবরাজের দেহান্তের পর বড়বাড়ী পেলেন তাঁর বড় ছেলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—এ বাড়ীর মালিকানা গেল সেজ ছেলে গিরীন্দ্রনাথের হাতে। আজ বৈঠকখানা বাড়ীর চিহ্নমাত্র নেই। ধূলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে ঐতিহাসিক দক্ষিণের বারান্দাকে, চমৎকার ভাবে সুনিপুণ বাস্তুবিদদের সাহায্যে নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে শত শত সংস্কৃতির আলোয় উজ্জ্বল, গরিয়সী এই শিল্পপুরীকে। স্বাধীন ভারতে শিল্পাচার্য্যের প্রতি এই অপমান যেমনই কলঙ্কের, তেমনই দুঃখের ও তেমনই লজ্জার!

কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক রচনার একটি বিশেষ ভঙ্গী বিভূতিভূষণের হাতে সার্থক রূপ গ্রহণ করেছে। তাঁর হাস্য-রস কেবলমাত্র বিদ্রূপের রঙ্গরস নয়, সেই হাসির পেছনে কখন ব্যঙ্গ কখনও বা গোপন অশ্রু প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে আর সেই জন্যই তাঁর হাসির গল্প বাঙালী পাঠকের এত প্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছে।

বিহারের উত্তর-পূর্বাংশে মিথিলার পাণ্ডুলগ্রামে ১৩০৩ সালের আষাঢ় মাসে (১৮৯৬ খৃঃ) বিভূতিভূষণের জন্ম হয়।

হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমায় চাতরা গ্রামে তাঁদের আদি-নিবাস। বিভূতিভূষণের পিতামহ মাত্র ষোল-সতের বছর বয়সে নীলকুঠীতে চাকরীর জন্য মিথিলায় যান। পরবর্তীকালে বিভূতি-ভূষণের বাবা বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় পাণ্ডুলগ্রাম ছেড়ে দ্বারভাঙ্গায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। সেই থেকে তাঁরা দ্বারভাঙ্গারই অধিবাসী বলা যায়।

ছেলেবেলায় বিভূতিভূষণ দ্বারভাঙ্গার রাজস্কুলে পড়াশুনা করেন। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। সেকেণ্ড থার্ড ক্লাসে পড়বার সময় প্রথম সাহিত্য রচনায় হাত দেন।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সে সময় কুন্তলীন তেলের কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর ভাল গল্পের জন্য পুরস্কার দিতেন। সর্ত ছিল রসহানি না করে গল্পের মধ্যে তাঁদের তেলের নাম করতে হবে। গল্পগুলো বেশ ঝকঝকে তকতকে একখানা বইয়ের আকারে প্রকাশিত হত, বেশ প্রচারও ছিল। এই বইখানিতে একটু জায়গা পাবার লোভ বিভূতিভূষণের মনে প্রবল হয়ে উঠলো।

অতএব গল্প লেখায় হাত দিলেন। একটি নায়িকা খাড়া করে নিজেই নায়ক হয়ে দাঁড়ালেন, তারপর চলল ভাঙাগড়া। হাসি অশ্রু, মান অভিমানে গল্প একেবারে উপচে পড়ল। একবার যা লেখেন আবার তা কাটেন, আবার নতুন করে লেখেন। তারপর গল্প যখন শেষ হল তখন তা ডাকে পাঠাবার শেষ তারিখ একেবারে শিয়রে এসে গেছে। গল্প লেখাটা স্কুলের পড়া নয়, তাই সমস্ত ব্যাপারটাই করতে হচ্ছিল গোপনে। সময় অল্প অথচ গল্প শেষ হবার পর সেটা আর একবার মাজা-ঘষা করতে হবে, তারপর আছে কপি করা। সমস্তটাই অভিভাবকদের দৃষ্টি এড়িয়ে করতে হবে, তার ওপর ছোট ভাইদের অপদৃষ্টিও আছে। তারা যেন আঁচ পেয়েছে ভিতরে ভিতরে তিনি কি একটা করছেন। বেয়াড়া রকমে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে তাই সবাই! এ সবের ফলে এদিকে ক্লাসের পড়ারও ক্ষতি হতে লাগল। স্কুলে বেঞ্চের ওপর দাঁড়ানোটা, মাষ্টারের ধমক টিট্‌কিরি খাওয়াটা বলতে গেলে রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তবু মনে মনে ভাবতেন, আর ক'টা দিনই বা? একদিন তো সবাই দেখবে অমুক স্কুলের অমুক ক্লাসের অমুক নামের ছাত্র গল্প লিখে পুরস্কার পেয়েছে। শুধু বইয়ে একটি গল্প বেরুন নয়—একেবারে পুরস্কার! অবাক হয়ে সবাই হাঁ করে থাকবে।

কিন্তু দিন কতক পরে যখন নির্ব্বাচিত গল্পের বই বেরুল, অমুক স্কুলের অমুক নামের ছাত্রকেই তখন উল্টে হাঁ করে থাকতে হল। দেখা গেল, তার গল্পের নাম-গন্ধও নেই কোথাও।

বাংলা দেশের প্রায় সব বিখ্যাত সাহিত্যিকের মতই বিভূতিভূষণের গল্প লেখার ইতিহাসের একেবারে গোড়ার অধ্যায়টাও ছিল এমনি করুণ! কিন্তু তাই বলে লেখা তিনি ছাড়েন নি বা ছাড়তে পারেন নি। কারণ লেখার নেশা একবার যাকে পেয়েছে আর কি তার না লিখে উপায় আছে? অবশেষে উনিশ বছর বয়সে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম গল্প। ১৯১৫ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় গল্প প্রতিযোগিতায় তাঁর 'অবিচার', গল্পটি পুরস্কৃত হল।

বিভূতিভূষণের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'রাণুর প্রথম ভাগ।' চিন্তার স্বকীয়তায় ও রসরচনায় অল্পকালের মধ্যেই তিনি বাঙালী পাঠকের পরিচিত হয়ে উঠলেন। সাহিত্য-জীবনের প্রথম দিকে বিভূতিভূষণের রচনার সংখ্যা খুবই কম ছিল। চল্লিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত তাঁর 'রাণুর প্রথম ভাগ' ও 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ' এই দু'টি মাত্র গল্প-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই অল্প সংখ্যক রচনাতেই তিনি বাঙালী পাঠকের প্রিয় হয়ে ওঠেন। পরবর্ত্তী কালে গল্প, উপন্যাস, নাটক ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা করে বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর বহু প্রশংসিত উপন্যাস 'নীলাঙ্গুরীয়' বাংলা সাহিত্যে 'স্থায়ী স্থান লাভ করেছে। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস : বর্ষায়, বসন্ত, শারদীয়া, চৈতালী, হাতে খড়ি, সুরসপ্তক, বরযাত্রী, রূপান্তর, দুয়ার হতে ...

কাঞ্চন মূল্য ইত্যাদি। বিভূতিভূষণ ষোল বছর বয়সে দ্বারভাঙ্গা রাজ স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলকাতার তৎকালীন রিপণ কলেজ থেকে তিনি সম্মানের সংগে আই, এ, ও পাটনা কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করেন। ছাত্রজীবনে যেমন ছিল তাঁর নানা রকম বই পড়ার নেশা, তেমনি পারদর্শী ছিলেন তিনি হকি, ফুটবল, টেনিস প্রভৃতি খেলায়।

কর্ম্মজীবনে বিভূতিভূষণ সাহিত্যসেবার সংগে সংগে শিক্ষকতা, দ্বারভাঙ্গা রাজ-প্রেসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতির কাজ করেন। পাটনার 'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রিকা পরিচালনার কাজও তিনি করেন। গৌরকান্তি ও মৃদুস্বভাব বিভূতিভূষণ চিরকুমার। নিরহংকার, অমায়িক প্রকৃতির সদালাপী মানুষ তিনি। রচনার বৈশিষ্ট্যে তিনি নিজেই বাংলা সাহিত্যের একটা বিশেষ গোষ্ঠী। তাঁর একাধিক উপন্যাসের চিত্ররূপ গৃহীত হয়েছে।

শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

[বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক ও স্বদেশসেবী]

"বিপ্লবের মধ্য দিয়েই আমার জীবনের সূত্রপাত। কিন্তু অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সে পথ আমায় ত্যাগ করতে হলেও সততা ও অধ্যবসায়ের পথ আজও ছাড়তে পারিনি। বাল্যকালে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল এবং সে মহাপুরুষের বাণী ও উপদেশই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাথেয়।"

সেদিন কথা প্রসঙ্গে কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান এ, আর, মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী (প্রাইভেট) লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী শ্রী অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর জীবন-স্মৃতি থেকে আমাকে জানালেন।

সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ও আদর্শনিষ্ঠা থাকলে মানুষ সাধারণ অবস্থার মধ্য থেকেও কত বড় হ'তে পারে, শ্রী অমিয়রঞ্জন সত্যিই তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

শ্রী অমিয়রঞ্জনের জন্ম হয় ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার প্রসিদ্ধ বজ্রযোগিনী গ্রামে। শ্রী মুখোপাধ্যায়ের শৈশব আনন্দ ও স্বচ্ছলতার ভেতর দিয়েই কাটছিল—কোন অভাব অনটনই বলতে গেলে মুখুজ্জ্যেবাড়ীতে ছিল না। কিন্তু অমিয়রঞ্জনের বয়স যখন তের কি চৌদ্দ, সে সময় এক প্রচণ্ড বিপর্য্যয় নেমে আসে তাঁদের সংসারে। ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁদের ...

সব নষ্ট হ'য়ে যায় সুযোগ্য পরিচালনার অভাবে। শেষ অবধি অবস্থা এমন হ'য়ে দাঁড়ালো, দু'বেলা আহার পর্য্যন্ত বুঝি আর জোটে না!

অবস্থার বিপর্য্যয় সত্ত্বেও শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মনোবল অটুট রইলো। বড় তাঁকে হ'তেই হবে, জীবনে প্রতিষ্ঠা তাঁর না পেলেই নয়। এ সঙ্কল্প নিয়েই একদিন দেখা গেল তিনি কাউকে না জানিয়ে এক দুর্য্যোগপূর্ণ রাত্রিতে যাত্রা করলেন রেঙ্গুন, সংবাদ পেয়ে বালক অমিয়রঞ্জনকে চাটগাঁ থেকে আনলেন তাঁর বাবা। তারপর অভাবের ভেতরও তাঁর পড়াশুনোর পুনরায় একটা ব্যবস্থা হলো এবং ম্যাট্রিক অবধি গ্রামের স্কুলেই পড়া চলতে থাকে।

ক্রমে সাংসারিক অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠলো এবং শ্রী অমিয়রঞ্জন পড়াশুনো বন্ধ রেখে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। সেটা ছিল ১১২৮ সাল।

আত্মীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে থেকে জীবিকার সন্ধান করছিলেন। এর মাঝে চাকরী যে তাঁর একেবারেই জুটলো না এমন নয়, কিন্তু ব্যবসা করবার জন্য যাঁর মন ব্যাকুল, তিনি চাকরি করবেন কি করে? তাঁর এক আত্মীয় একটি পুস্তক প্রকাশন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এ সময়, সুযোগ বুঝে কর্ম্মী অমিয়রঞ্জন এ উদ্যমের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন একজন সহযোগী হিসেবে, সেখানে কাজ করতে করতেই তাঁর মনে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করবার ইচ্ছা ও আগ্রহ উদগ্র হয়ে উঠে। ধীরে ধীরে এ ইচ্ছাই দানা বাঁধতে থাকে, তার পরেই দেখতে পেলুম ১১৩৫ সালের গোড়ার দিকে তাঁর নিজস্ব ব্যবসায়ের সূচনা, পূর্ব্বতন পুস্তক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তখনও তাঁর যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি। কিন্তু ক্রমে নিজের ব্যবসায়ের পরিধি সম্প্রসারিত হয়ে পড়ায় শেষ পর্য্যন্ত (১১৪০ সাল) চলে আসেন তিনি সেখান থেকে এবং নিজের ব্যবসায়ে নিয়োজিত করলেন তাঁর পুরোপুরি সময়, উদ্যম ও শক্তি। এ মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানীর জয়যাত্রার আরম্ভ এখান হ'তেই।

শ্রীঅমিয়রঞ্জন যে ধরণের মৌলিক ও ব্যয় বহুল গ্রন্থ প্রকাশ করে এসেছেন তাতে তাঁর হৃদয়ের একটা বিরাট পরিচয়ই আমাদের চোখে পড়ে। গল্প উপন্যাস পাঠে অভ্যস্ত সাধারণ পাঠক সমাজের কাছে তাঁর বৃহদায়তন গ্রন্থসমূহ সঙ্গে সঙ্গে আদৃত হয় তো হবে না তিনি জানতেন, কিন্তু তবুও এক গভীর আদর্শবাদের প্রেরণায় আর্থিক ক্ষতির দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েই এ সকল সৎ-সাহিত্য প্রচারে তিনি ব্রতী হন। যে সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে আনন্দবর্দ্ধন অভিনব গুপ্তকৃত 'ধ্বন্যালোক ও লোচন' (ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্ত সম্পাদিত), ডাঃ সুশীল দের 'বাংলা প্রবাদ,' ডাঃ রাসবিহারী দাস প্রণীত 'ক্যাণ্টর দর্শন', ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের "শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ", যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত 'বঙ্গের মহিলা কবি,' ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সমালোচনা সাহিত্য," শ্রীবিবেকানন্দ মুখার্জী রচিত "রুশ-জার্মাণ সংগ্রাম" ইত্যাদির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১১৪১ থেকে ১১৫৬ সালের মধ্যে তিনি প্রায় ৪০০ পুস্তক প্রকাশ করেছেন। শ্রীমুখার্জীর বয়স মাত্র ৪৮ বছর। তিনি নিঃসন্তান। বাস করেন খড়দহের রহড়ায়।

শিল্পাচার্য্য শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা

ইনি সন ১২৮১ সালে, ১১ই মাঘ মঙ্গলবার, ইং ১৮৮৩—২৩শে জানুয়ারী, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বেলডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবেই ইঁহার গভীর ও স্বাভাবিক শিল্পানুরাগের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। গ্রাম্য উৎসব ও পূজা-পার্ব্বণে দুর্গা, কালী, সরস্বতী, কার্ত্তিক প্রভৃতির প্রতিমা ইঁহাকে যে অত্যন্ত আকৃষ্ট করিত তাহার প্রমাণ তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত ও রূপায়িত হইয়াছে। গ্রামের অনতিদূরে খোলা মাঠে সঙ্গিগণের সহিত বেড়াইতে গিয়া ক্রীড়ারত বন্ধুগণের আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াও অস্তগামী সূর্য্যের পার্শ্বচর রঙ্গীন মেঘগুলি দেখিতেন এবং সময় সময় এতই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন যে তাঁহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার কথা স্মরণ করাইতে বন্ধুগণকে সতর্ক থাকিতে হইত।

পাঠশালার প্রারম্ভিক ও পরবর্ত্তী স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া যথাকালে এবং কৃতিত্বের সহিত ১৭ বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সে সময় উক্ত পরীক্ষায়, Drawing, optional subject ছিল। ইনি উহাতে পাশ করিয়া Star পান। ইতিপূর্ব্বে ইনি কখনও কাহারও নিকট উহা শিক্ষা করেন নাই। ক্লাসে প্রত্যেক বিষয়েই ইনি প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। যদি কখনও কোনও subject-এ দু-এক নম্বরের জন্য সেকেণ্ড হইতেন তা হ'লে দুঃখে ও ক্ষোভে কয়েক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রায় অনশন চলিত। ইঁহাদের সাংসারিক অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল ছিল না। তাঁহার পিতার পক্ষে এই ব্যয়ভার বহন করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য ছিল। তদুপরি ইঁহার কিন্তু একান্ত

শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা

আন্তরিক ইচ্ছা ছিল শিল্পী হওয়া। যাহা হউক, সাময়িক ভাবে F. A. দেড় বৎসর পড়ার পর, যেমন ভাবেই হোক ইনি শিল্পশিক্ষার জন্ম দৃঢ়সংকল্প হন।

তখনকার দিনে এই প্রকার শিল্পশিক্ষার প্রতি লোকের নির্ভরতা কিছুই ছিল না। তজ্জন্ত ইঁহাকে প্রত্যেকের নিকট হইতে নিরুৎসাহের বাণী শুনিতে হইত। একান্ত অনুরাগ বশতঃ ঐ সকল বিরুদ্ধবাদীদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ধ্রুব বিশ্বাসের বশে ক্রমাগত চেষ্টার দ্বারা নিজের সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই শিল্প শিক্ষা গ্রহণের জন্ম Govt. School of Arts এ ভর্ত্তি হন এবং যথাক্রমে ৬ বৎসর কাল শিক্ষা করিয়া বিশেষ যশের সহিত সকল বিষয়ে পাশ করিয়া বাহির হন।

বৎসর খানেক Arts School-এ পড়ার পর, একান্ত আর্থিক অনটনের জন্ম লালগোলার মহারাজা বাহাদুর, কাশিমবাজারের রাজা আশুতোষনাথ রায় বাহাদুর এবং মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নিকট হইতে বিশেষ ভাবে আর্থিক সাহায্য পান। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রায় ৪ বৎসর ইঁহাকে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাগানবাটীতে (বর্ত্তমানে ৩০২নং আপার সার্কুলার রোড) আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দেন। ঐ সময়, ১৯০৬ সালের কিছু পূর্ব্বে, ইনি তাঁর দেশের বাড়ী হইতে গো-গাড়ীযোগে—তখন, ওদিকে রেললাইন হয় নাই—১৪ মাইল দূরস্থ পলাশীর রণক্ষেত্রের বর্তমান দৃশ্য দেখিয়া sketch করিয়া আনেন। পরে সেই পেণ্টিংখানি, সে সময় (১৯০৬ সালে) H. R. H. The Prince of Wales—(পরে H. R. H. King George V.)—কলিকাতায় আসিলে তাঁহাকে উপহার দেওয়া হয় ও তিনি প্রীত হন।

বড়লাট বাহাদুর লর্ড মিন্টো ঐ paintingখানি দেখিয়াই বলিয়াছিলেন—"Whose Copy is this?" উত্তরে তিনি যখন জানিলেন যে, "It is not a copy, but an original painting and is done by a native student of this place," তাহাতে তিনি খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হন।

তার পর এই শিল্পী পাইকপাড়ার রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং H. H. The Feudatory Chief and Maharaja of Jhind, Punjab প্রেরিত জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর শিল্পশিক্ষক হন। পরে স্বাধীন ভাবে এই কার্য্যের দ্বারা The Earl of Ponis, the descendant of Lord Clive, London, Messrs Taylor Bros. Leeds. England, Hon'ble Justice H. Holmwood of the High Court, Calcutta, Hon'ble Justice Sir Asutosh Mukherjee, Hon'ble Justice Sarada Charan Mitra, Maharaja Sir Jotindra Mohan Tagore, Maharaja Sir Manindra Ch. Nandy (Cossimbazar), Maharaja Sir Jogendra Narayan Roy (Lalgola), Maharaja Bahadur of Krishnagar, Raja Sreenath Roy (Bhagyakul, Dacca), Raja Manindra Ch. Sinha (Paikpara), Sir Jadu Nath Sircar, Vice Chancellor of Calcutta University, Mr. K. L. Barua, Education Minister, Assam. প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রশংসা অর্জ্জন ও ১৪টি পৃথক পৃথক শিল্পপ্রদর্শনী হইতে ১৪টি সুবর্ণ-পদক প্রাপ্ত হন। সংস্কৃত ভাষায়ও ইঁহার বেশ অধিকার আছে। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ধ্যানের সঙ্গে যথাসম্ভব মিলাইয়া, দেবদেবীর বহু চিত্রাঙ্কনের জন্ম নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধজননী সভা হইতে ইঁহাকে "শিল্পাচার্য্য" উপাধি ও ১টি সুবর্ণপদক দেওয়া হয়।

ইঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলী, মাসিক বসুমতী, মানসী ও মর্ম্মবাণী, আর্য্যাবর্ত্ত, ভারতী, পুষ্পপাত্র, উপাসনা, গৌরাঙ্গসেবক (Patna), নবচেতন (Kathiawar), সরস্বতী (Allahabad), Orient (Indian Press) প্রভৃতি বহু বিখ্যাত পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইঁহার বয়স ৭৪ বৎসর। এখনও তিনি পূর্ব্বের মতই সমান ভাবে চিত্রাঙ্কন করিতেছেন, তবে বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের জমিদারী উচ্ছেদ নীতির চাপে, তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ও মনীষীগণের মনে অর্থনৈতিক ভাঁটার ফলে কাজ যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ বলিয়াই ইনি সুরুচি ও সুনীতির উপাসনায় রত আছেন। সঙ্গীতেও ইঁহার যথেষ্ট অধিকার আছে।

[মাসিক বসুমতীর পক্ষ থেকে রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী, কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুখেন্দু দত্ত লিখিত।]

মাতৃজাতির সেবা

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন নহবতের সন্নিকটে বকুলমূলে পুষ্পচয়নরতা গৌরীমাকে বলেন, "ভাখ গৌরি, আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চট্‌কা।"

বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া শিষ্যা প্রশ্ন করিলেন, "এখানে কাদা কোথায় যে চটকাব? সবই যে কাঁকর।"

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "আমি কি বললুম, আর তুই কি বুঝলি? এদেশের মায়েদের বড় দুঃখ, তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।" বামহস্তে বকুলের একটি শাখা ধরিয়া তখনও তিনি দক্ষিণ হস্তস্থিত পাত্র হইতে আস্তে আস্তে জল ঢালিতেছিলেন।

—গৌরীমাতা হইতে

সোবিয়েতের দেশে দেশে

মনোজ বসু

ভারতীয় দূতাবাসটা পয়লা নম্বরের, কাজকর্ম বিস্তর। অনেকটা জায়গার উপরে গোটা তিনেক বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। ভাড়ার অঙ্কটা সঠিক বলতে পারছি না—শুনেছিলাম সেই সময়, রীতিমত জবরদার। দূতাবাসের কর্মচারী জন পনের। নিয়মমাফিক যা মাইনে দেওয়া হয়, রাশিয়ার ঐ বিষম মাগ্‌গি বাজারে তা ফুঁয়ে উড়ে যাবার কথা। ভারত সরকার সেজন্য কম দরে ওঁদের রুবল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। পাউণ্ডে ৩০ রুবল পান ওঁরা ; বাজার-দর যেখানে দশ-এগারো। তা ছাড়া ভুবন চুঁড়ে বাজার করেন—যেখানে যেটি ভাল ও সস্তা। হরে-দরে এমনি ভাবে পুষিয়ে যায়।

দূতাবাসে তিন জন বাঙালি। ইন্দুভূষণ দাশগুপ্তের কথা শুনেছেন, তিনি দেশে চলে গেলেন তো সেই জায়গায় ধর এসেছেন এখন। আছেন রবি ভাদুড়ি—তিন বছর হয়ে গেল, পথ তাকাচ্ছেন কবে চলে যাওয়ার হুকুম আসে। আর একটি তরুণ—শ্রীমান সুধীন্দ্রনাথ বসু, বর্ধমান রায়না অঞ্চলে বাড়ি। একলা মানুষ—ওঁরই মতো ক'জনে মিলে মেস করে আছেন। বিদেশে বঙ্গভাষায় আলাপনের মওকা পেয়েছি—তিন বাঙালির সঙ্গে বড্ড জমে গেছে। ভাদুড়ি-জায়াও ভারি খুশি। পুরুষরা তবু কাজে-কর্মে থাকেন—মেয়েদের অসুবিধা, কথাবার্তার মানুষ খুঁজে পান না। দেশের মানুষ—বাঙালি মানুষ পেয়ে বর্তে গেছেন একেবারে।

তা সুযোগ পেয়েছি, আমরাই বা ছেড়ে দেবো কেন? ভাদুড়ি-জায়াকে ধরে বসলাম, নেমন্তন্ন খাওয়াতে হবে আমাদের।

বেশ তো, বেশ তো—

ভাদুড়ি বিনয় করে বলেন, বড় বড় জায়গায় খাওয়াচ্ছে। আমাদের সামান্য ডাল-ভাত—

ধরে পড়লাম : ডাল-ভাতই কিন্তু খাওয়াতে হবে আমাদের। ভাত—এবং মুসুরির ডাল যদি যোগাড় করতে পারেন।

ভাত-ডালের নামে প্রাণ লালায়িত হয়ে উঠেছে। কত দিন ঐ বস্তু মুখে ওঠে নি!

ভাদুড়ি-জায়া হেসে বললেন, তাই হবে, মুসুরির ডালই খাওয়াবো। আর বেগুন-ভাজা সর্ষের তেলে।

এই গঙ্গাহীন দেশে মুসুরির ডাল এবং তদুপরি সর্ষের তেলের সংগ্রহ শুধু মাত্র অ্যাম্বাসির লোকের পক্ষেই সম্ভব : ঐ যে বললাম—ভুবন-জোড়া বাজার—হল্যাণ্ড থেকে মাখন, অস্ট্রেলিয়া থেকে মাংস, ইন্দোনেশিয়া থেকে চাল। নিখিল ভুবন কাস্টমসের জালে ঘেরা—সেই জালের আওতার বাইরে এঁরা।

আজ রাত্রে লেনিনগ্রাড রওনা হবো, তার আগে'সাবের নিমন্ত্রণটা সেরে যাই। রবি ভাদুড়ি খবর দিয়ে গেছেন, দুপুরবেলা ব্যবস্থা

শহরের মলোটোভ অঞ্চলে বাইশ নম্বরের শিশু-সদনটা দেখা হবে, দেখেই দূতাবাসে ফিরে যাবো।

লড়াইয়ে যেসব শিশুর বাপ-মা মরেছে, তাদেরই জন্য এমনি সব সদন গড়ে উঠল। পলের সঙ্গে সেই এক দিন কথা হচ্ছিল—দেশে পুরুষের সংখ্যা অত্যন্ত কম, সব মেয়ের বিয়ে হবার কোন উপায় নেই, অতএব কুমারী মেয়ের উপর ট্যাক্স কেন? পল বলেছিল, এই ট্যাক্সে আমরা আপত্তি করি না ; যুদ্ধের জন্য হাজার হাজার বাচ্চা অনাথ হয়ে গেল, ট্যাক্সের পুরো টাকাটা তাদের জন্য খরচ হয়। দেশ-সুদ্ধ মানুষের অপার মমতা ঐ শিশুদের সম্পর্কে। রেখেছেও তাদের রাজার হালে—মা-বাপ নেই, কোন সময় সে অভাব বুঝতে না পারে।

দোভাষিণী মীরা আগে আগে গিয়ে বোতাম টিপল। দরজা খুলে গেল। আগে খবর পায় নি, এতগুলো বিদেশিকে দেখে তারা হকচকিয়ে গেছে। কর্ত্রী তরতর করে নেমে এলেন উপর থেকে। বাচ্চারা ছুটোছুটি করছিল, বড় বড় চোখ মেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেল।

১৯৪৩ অব্দে এই সদনের প্রতিষ্ঠা। তিরানব্বইটা মেয়ে থাকে এখানে। সাত থেকে সতের বছর বয়স। শুধু মাত্র মেয়ে। ছেলে-মেয়ে এক প্রতিষ্ঠানে রাখতে যে মানা আছে, তা নয়। অনেক সদনেই আছে এমন। এখানে স্থানাভাবের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। পড়াশুনা বাইরের ইস্কুলে করতে যায়। সাতটার সময় উঠে ব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য। সাড়ে সাতটা থেকে আটটা প্রাতর্ভোজন দুই দলে ভাগ হয়ে। এক দল তার পরে ইস্কুলে চলে যায়, অন্য দল বেড়ায় ; ন'টা থেকে এগারোটা অবধি ঘরের কাজ করে এই দ্বিতীয় দল। বেলা দুইটায় এই দ্বিতীয় দল ইস্কুলে যায়। প্রথম দল ইতিমধ্যে ফিরে এসে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে ; পোশাক তৈয়ারি এবং নানান রকম হাতের কাজ করে। নাচ-গান ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান হয়। সপ্তাহে একবার করে সিনেমা দেখানো হয় এই বাড়িতে। বাইরের থিয়েটারে নিয়ে যায় মাসে একবার। মস্কো থেকে পঁচিশ মাইল দূরে অতি চমৎকার এদের পায়োনিয়র-ক্যাম্প। সেখানে যেতে হয় মাঝে মাঝে। আরও নানাস্থানে নিয়ে যায়—তলস্তয়ের গ্রামের বাড়ি, স্তালিনের জন্মভূমি গোরি, লেনিনগ্রাড, স্তালিনগ্রাড—ইতিহাসের স্মৃতিমণ্ডিত এমনি সব জায়গায়। এবারে ইউক্রেনে গিয়েছিল। ছ'জন আছেন খবরদারির জন্য। তা ছাড়া আছেন ডাক্তার নার্স ও পায়োনিয়র দলনেতা। মাসে প্রায় হাজার রুবল খরচ প্রত্যেকের জন্য।

মা-বাপ না থাকলেই যে সদনে নিয়ে আসবে, এমন কথা নেই। পোষ্যপুত্র করে নিতে পারে কেউ, অথবা আত্মীয়স্বজন এসে

তারাই স্থান পেত এমনি সব প্রতিষ্ঠানে। সেই সব ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে প্রায় সবাই বেরিয়ে গেছে। বাপ কিম্বা মা রোগাক্রান্ত—শিশুর লালনপালন করতে পারে না—সেই সব শিশুও নিয়ে আসে সদনে। আর আছে সেই সব, জারজ বলে যাদের দিকে আমরা নিচু চোখে তাকাই। বাপে-মায়ে বিয়ে হোক চাই না হোক, সন্তানমাত্রেই এদেশে ষোলআনা আইনসম্মত ও আদরণীয়।

বড় বড় সদন আছে—শ তিনেক থাকবার মতো। কিন্তু এই রকম মাঝারি সদনই বেশি—শয়ের কাছাকাছি যেখানে থাকে। অনেক ছেলেমেয়ে পড়াশুনোয় সুবিধা করতে পারে না, চোদ্দ বছর বয়স হতেই তাদের কারিগরি কাজকর্মে লাগিয়ে দেওয়া হয়। যেমন রেল-বিভাগের পরীক্ষায় পাশ করে সেই কাজে চলে গিয়েছে অনেকে। হাতের কাজেরও অনেক ব্যবস্থা; সেলাইয়ের কল বিস্তর দেখছি। অনেকে য়্যুনিভার্সিটির পড়াশুনো করে আঠারো বছরে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পর। যাবার সময় দরকার মতো অর্থ-সাহায্যও পায়।

শোবার ঘরে ঢুকে দেখছি। পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণীর মেয়েরা থাকে এ ঘরে। আঠারটি খাট, ধবধবে বিছানা। পাট-ভাঙা তোয়ালে প্রতিজনের। খাসা খাসা শিশুমূর্তি এদিকে সেদিকে, দেখে মন প্রসন্ন হয়। জ্ঞানীগুণী-বিদ্বানের ছবি বাড়িময়। একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব জমানো গেল—ভ্যালেন্টাইন নাম। আর একটির নাম লিউবা—পায়োনীয়র দলের কেষ্টবিষ্টু একজন। রান্নাঘরে গ্যাস-ষ্টোভ—হাসপাতালের মতন অ্যাপ্রন পরে ওদিকে চলাফেরা করতে হয়। খানাঘরে গোল-টেবিলের চারিধারে চারটে করে চেয়ার। পরিচ্ছন্ন কাপড় টেবিলের উপর। ষাট জন বসতে পারে একসঙ্গে। একটি মেয়ে নাতেসা—ইংরেজি শেখে; গুড-মর্নিং বলে আহ্বান করল আমাদের। লিউবা তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিল—ভারতীয় শিশুদের ভালবাসা জানিও। যেন তারা চিঠিপত্র লেখে আমাদের। একবার এসে দেখে যায়...

ক্লারাকে কোলে তুলে দাঁড়িয়েছি। ক্লিক করে ক্যামেরায় ছবি তুলে ফেলল।

সদন থেকে সোজা অ্যাম্বাসি। নিমন্ত্রণটা জুটিয়েছি আমি। গোড়ায় অনেকে দোষারোপ করলেন, বিদেশ-বিভুঁয়ে সুবিধা-অসুবিধা আছে—গায়ে পড়ে নিমন্ত্রণ চাওয়াটা ঠিক হয়নি। খাওয়াদাওয়ার পরে তাঁরা পরিতৃপ্তির উদ্গার তুলছেন এখন। বাঙালি গৃহস্থ-বাড়ির রান্না—অনেক দিন পরে সত্যিকার তৃপ্তি পাওয়া গেল। ডেলিগেটদের মধ্যে বাঙালি ক-জনের নিমন্ত্রণ—কিন্তু ধীরেন সেন মশায় বাইরের একজনকে টেনেটুনে সঙ্গে এনেছেন। প্রাদেশিকতার বদনাম খণ্ডে দেওয়া হল এমনি ভাবে। সে ভদ্রলোকের মুশকিল—অষুধ গেলার মতো করে খাচ্ছেন। গৃহকর্ত্রীও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হচ্ছেন গতিক দেখে।

আমাদেরই শুধু নয়, অ্যাম্বাসিতে যাঁরা বাঙালি আছেন—পুরুষ মেয়ে ও বাচ্চা, সকলের নিমন্ত্রণ। মস্কোর উপর বাঙালি যজ্ঞিবাড়ির হুল্লোড়। দেদার বাংলা ভাষা—রেখেঢেকে সেরে সামলে প্রায় বিবেচনা করে কথা বলবার দরকার হচ্ছে না। শ্রী ভাদুড়ির তিন বছর হয়ে গেল এখানে। গৃহস্থ পাড়াপড়শির সঙ্গে আলাপ-সালাপ হয়েছে কিছু কিছু। এক ভদ্রলোকের কাছে রুশভাষা শেখেন সপ্তাহে এক ঘণ্টা করে—মাসে মোট চারদিন। তার বাবদে এক শ' রুবল করে দিতে হয়। দূতাবাসের আরো অনেককে তিনি শেখান। সুধীন্দ্র বসুরা মেসে রান্নার জন্য এক মেয়েলোক রেখেছেন। সকাল আটটায় আসে, একবেলা খাইয়ে দিয়ে এবং অন্য বেলার রান্না ঢাকা দিয়ে রেখে আড়াইটে নাগাত চলে যায়। আপ খোরাকি—এক-আধবার চা খায় শুধু এখানে। পাঁচজন লোকের রান্না ও বাসন-মাজা—মাইনে হল আটশ' রুবল অর্থাৎ নশ' টাকার মতো। বুঝুন। একদিন এঁরা দোকান থেকে দুধ এনে দেবার জন্য বলেছিলেন, ইউনিয়নে অমনি চিঠি চলে গেল। ইউনিয়ন হুমকি দিয়ে ওঠে: ভেবেছ কি হে, কুল্যে আটশ' রুবল মাইনে—তাতে আবার দুধ ও এনে দেবে? রফা হল, আরও চারশ' রুবল দেবে—তন্মূল্যে বাজার-করা দুধ-আনা ও কাপড়-কাচা এই তিনটে কাজ অতিরিক্ত করবে।

কালো রঙের কদর খুব। রাস্তায় বেরুলে কালো আমাদের ঈর্ষ্যার চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে। ট্রামে চড়ে আমিও একদিন মুশকিলে পড়েছিলাম—সে গল্প পরে শুনবেন। শ্রীমতী ভাদুড়ি বিকালের দিকে হয়তো বা পার্কে গিয়ে বসলেন। রুশ-মেয়েরা আসে। শ্রীমতীর হাতখানা পরম আদরে টেনে নেয় তারা হাতের মধ্যে; বলাবলি করে, আহা কী সুন্দর কালো রে! তবু তো শ্রীমতী কালো নন, রীতিমতো গৌরাঙ্গী। তারই বাহার এমন—আর আসল কালো পেলে উল্লাসে ওরা যে কি করত, ভেবে পাইনে।

মস্কোর এক শিশুসদনে

বাচ্চা ছেলেপুলে বড্ড ভালবাসে ওখানকার মেয়েরা। আজব কিছু নয়, সব দেশেরই এক স্বভাব। ভাদুড়ির ছেলের নাম বুদ্ধদেব। অত হাঙ্গামার নাম জিভে জড়িয়ে যাবে, শ্রীমতী তাই সোজা করে বলে দিয়েছিলেন খোকা। পার্কে ছেলে নিয়ে গেলে চারিদিক থেকে 'কোকা' 'কোকা' করে অস্থির। নিজেদের বাচ্চার উপরেও অত্যধিক যত্ন। লেপের আচ্ছা রকম প্যাকিং করে শুধুমাত্র নাক এবং একটু চোখ বের করে ছেলেপুলে হিমের মধ্যে নিয়ে বসে। এমনি করে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পোক্ত করে তোলে বাচ্চাদের। শীতকালে ঘণ্টাখানেক অন্তত বেরুবেই পথে—এটা আবশ্যিক কর্ম, শখ নয়—মুক্ত বায়ুর জন্য।

খাওয়াটা অতিশয় গুরুতর হল। নড়াচড়া মুসকিল। খুব একচোট গল্প গুজবে সময়ক্ষেপ করে নিই। হোটেলে ফিরতে অপরাহ্ণ। শুধু একটু চা মুখে ঠেকিয়ে টহল দিতে বেরুব এবার। মেট্রনের কাছে ঘরের চাবি চাইতে গেছি। এই যে, এসেছ এতক্ষণে। দু-জনে তোমার কাছে এসেছে। সেই কখন থেকে এসে বসে আছে।

তাজ্জব লাগে। নেতা কিম্বা উপনেতার কোন রকম ঝামেলায় নেই, আমার কাছে আসতে যাবে কোন হতভাগা! কোথায় তারা? কি চায়?

একটা গোল-টেবিল ঘিরে আগন্তুকরা বসে। তার ভিতরে সেই দু-জন বুঝতে পেরেছে, আসামি হাজির। উঠে দাঁড়াল। তরুণ ছেলে আর তরুণী মেয়ে। সুশ্রী উজ্জ্বল চেহারা। গুরুঠাকুর দেখলে বুড়ি বিধবারা যেমন হয়ে ওঠে, মুখে-চোখে সেই প্রকার গদগদ ভাব।

ও দেশের নতুন মানুষ পেলে যেমন ধারা জিজ্ঞাসা করি, ইংরেজি বলবে তোমরা? অর্থাৎ কথা শুনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছে কি বেকুবের হাসি হেসেছ তো দোভাষি ডাকব।

মেয়েটি পরিষ্কার সাধু বাংলায় বলল, আমরা বঙ্গভাষায় বাক্যালাপ করিয়া প্রীতিলাভ করিতে চাহি।

বটে হে! তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতটুকুই বা প্রীতি হবে! সঙ্গীদের বলি, আপনারা বেরিয়ে পড়ুন মশায়রা। জাঁকিয়ে বসে প্রীতি-দানে লেগে যাচ্ছি আমি। ফরমাস করলাম: চা-কফি কেক-বিস্কুট কণ্টন্স ঘরে পাঠিয়ে দাও—দরাজ হাতে পাঠিও, তিন জনের মতো।

মেয়েটি আলেকসেয়েবা; ছেলেটি গ্লাতুক ডানিয়েলচুক। আমার খাতায় বাংলা হরপে নাম-সই আছে তাদের। মানুষের যত পেশা হতে পারে, তত ইউনিয়ন সোবিয়েত দেশে। ইউনিয়নগুলো অসীম শক্তিশালী—রাজ্য চালায় আসলে এরাই। আমাদের লেখকরাও ইউনিয়ন গড়ে বসে আছেন—সোবিয়েত রাইটার্স ইউনিয়ন (Soviet Writers' Union) যে কী বাড়ি মশায়, দু-দিন গিয়েছিলাম সেখানে। ঝকঝকে মোটর চড়ে লেখক মশায়রা আনাগোনা করছেন। লনের পাশে গাড়ি রাখবার সুবিস্তীর্ণ জায়গা—অত জায়গা ভরে যায় এক এক সময়, গাড়ি তখন রাস্তায় রাখতে হয়। ইউনিয়নের বিস্তর কর্মচারী নানান বিভাগ। বিদেশি দপ্তর আছে—সেই দপ্তরে বাংলা বিভাগের লোক এরা দুটি। কেমন করে জেনেছে, বাঙালি পিশাতিয়েল এসে জুটেছে একটি; খবরাখবর নিতে এসেছে।

ঘরের এক দিকে নিচু টেবিল ঘিরে আরাম করে বসেছি। আলেকসেয়েবা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে: এ তাবৎ বঙ্গভাষার বহু পুস্তক পাঠ করিয়াছি—অহো কি সৌভাগ্য, সেই ভাষার একজন লেখককে চর্মচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম।

বলতে বলতে—হাসি দেখেছে আমার—চুপ করে যায়। লজ্জায় মুখ নিচু করে।

হেসে তো চৌচির হবার কথা। কিন্তু ওদের দিকে চেয়ে প্রাণপণে সামলে নিই। শ্রদ্ধা জ্বলজ্বল করছে দু-জনের মুখে। বাংলা পড়াশুনো করে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর কী গভীর ভালবাসা! জানবার জন্য কত ব্যাকুলতা!

বঙ্কিমচন্দ্রের কোন বই পড়েছ?

হাঁ, কপালকুণ্ডলা পড়িয়াছি।

কেমন লাগল?

অতীব চিত্তাকর্ষক।

শরৎ বাবুর কিছু?

বিরাজ বৌ—

কেমন?

অতীব চিত্তাকর্ষক।

আমার দুটো বই দিলাম দু-জনকে। আলেকসেয়েবা আর আসেনি, অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। গ্লাতুক আসত; আমার ভাই হয়ে গিয়েছিল, আমি তার দাদা। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, পড়েছ আমার বইটা?

সম্পূর্ণ পড়িয়াছি। অতীব চিত্তাকর্ষক।

চালাক ছেলে। মনে মনে হাসছি, ধরতে পেরেছে। বলে, সাধুভাষার পুস্তক পাঠ করিয়া আমাদের যাহা-কিছু শিক্ষা। বড়ই দুঃখের বিষয়, চলিত ভাষায় আমরা কথা বলিতে পারি না।

বললাম, কলকাতায় চলো ভাই। আমার বাড়ি থাকবে, গেঞ্জি গায়ে বেড়াবে, গামছা পরে তেল মাখবে চানের আগে। ছ-মাসের মধ্যে চলিত-বাংলায় এমন রপ্ত করে দেবো যে আমরাই তখন বুঝে উঠতে পারব না।

চলিত-বাংলায় না হোক—এই এক তাজ্জব, ঘণ্টার পর ঘণ্টা উৎকৃষ্ট সাধুভাষায় চালিয়ে যাচ্ছে, ভারী ভারী বিষয়ের আলোচনা করছে, বাধে না। সে পরিচয় আপনারাও অনেকে পেয়েছেন। গ্লাতুক ভারতে এসেছিল (এখনো নাকি আছে, নানা রাজ্যে ঘোরাঘুরি করছে); আগ্রায় নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে বাংলায় বক্তৃতা করেছিল। আমি যাই নি, আপনাদের কেউ কেউ শুনেছেন হয়তো।

প্রথম রাত্রেই তাই দেখছি। সাহিত্যের কথা শুনতে এসেছিল, কিন্তু ধীরেন সেন মশায় নানা রাজনীতিক তর্ক জুড়ে দিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলল। ডিনারের সময় পার হয়ে যায়, একদল খেয়ে উদ্‌গার তুলতে তুলতে শব্দসাড়া করে ওঘরে ঢুকলেন। রাত্রি বারোটায় লেনিনগ্রাড রওনা হবো আজকেই। এই সব কারণে অনিচ্ছার সঙ্গে তারা উঠে পড়ল। দরজা অবধি গিয়ে ওভারকোট চড়াচ্ছে, তখনও সাহিত্য-প্রসঙ্গ। করিডরে অনেকদূর সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, তখনও।

মস্কোয় ফিরিয়া আসিলে যেন সংবাদ পাই। আমরাই সংবাদ লইব। আপনি বিরক্ত হইবেন না।

প্রণতি ঘোষ গুণী শিল্পি এবং সুন্দরী। কিন্তু তিনি জানেন যে, জনসাধারণের তাঁকে ভাল লাগার জন্যে তাঁর ত্বকের লাবণ্যও অনেকখানি দায়ী। সেইজন্যে তিনি সব-চেয়ে মোলায়েম ও নিরাপদভাবে প্রতিদিন শুভ্র বিশুদ্ধ লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে তাঁর ত্বকের যত্ন নিয়ে থাকেন।

আপনারও সেই একইভাবে ত্বকের যত্ন নেওয়া উচিৎ। লাক্স টয়লেট সাবানের সুগন্ধ সরের মত ফেণার রাশি আপনার সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলুক।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 615-50 BG

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

তরুণদের নিয়ে নিবর্গল সম্ভোগ-সুখের মধ্য দিয়ে যে বারবনিতা প্রচুর অর্থশালিনী হয়েছে, আশ্চর্য, তারও ধক্তি-ধক্তি করতে থাকেন এই সব স্ত্রীরত্নেরা,···নির্জনে সোচ্ছাসে এবং সদা। ১৬

চপলারা থাকেন হর্ম্যে; কিন্তু আপন মনে গান গেয়ে ওঠেন পথের দিকে চেয়ে চেয়ে, নিজেকে দেখিয়ে। অকারণে ছুটে চলেন, অথবা অকারণে হেসে ওঠেন,···স্ফটিক পাথরের মালার মত টুন-টুন। ১৭

অঙ্গনারা কিন্তু নিজের ঘরে পুরুষ মানুষের মতই সব কাজ ক'রে বেড়ান। বলেন—

"বলতে কয়তে কিছুই পারেন না, জানেন না, এমন পশু আমার স্বামী।" ১৮

অতএব ভোরবেলায় তিনি ওঠেন, ব্যবসা-বাণিজ্য আইন-আদালত নিজেই করেন; জীবন্মৃত স্বামীর গৃহিণীরূপে গৃহখানি জমকিয়ে রাখেন চেঁচিয়ে। ১৯

ঈর্ষাপরায়ণ বৃদ্ধের স্ত্রী, চাকুরের স্ত্রী, মনিবের স্ত্রী, কারিগরের স্ত্রী, নটের বৌ, কৃপণের বৌ, লম্পটের বৌ বা বণিকের বৌ,···এঁদের প্রকৃতিই হচ্ছে, সভা-সমিতিতে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো, স্বভাবতঃই এঁদের বাৎসল্য ঝরে পড়ে, তরুণদের উপরে। পরের গুণের বিচার বর্ণিমায় এঁরা সদা-পটু, নিজের স্বামীর দোষ-ব্যাখ্যানে এঁরা শতমুখী। ২০-২১

যে রমণীর বৈভব কম, অতি-সুখের মধ্যে যিনি লালিতা, যিনি রূপসী, অথবা যে ভার্যার রূপের বিকৃতি-লক্ষণ দেখা দিয়েছে, অথবা যিনি মুগ্ধবধূ, অথবা যিনি সকল কলা-মানবতী···তারা প্রত্যেকেই নীচ পুরুষের সঙ্গে মিলিত হবার জন্তে উদ্বিগ্না হয়ে ওঠেন। ২২

যে স্ত্রীলোক দ্যূত ও মধুপানে আসক্তা, একবার কথা বলতে সুরু করলে যিনি আর থামতে চান না, একবার গান গাইতে আরম্ভ করলে কণ্ঠ যাঁর গীতির বিরতি ভুলে যায়;

যাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফেরেন অনেক কুলটা বয়স্যা; অথবা যিনি স্বাস্থ্যবতী;—সাধারণতঃ সে ধরণের স্ত্রীলোকের পক্ষপাতিত্ব শূদ্রদের উপরেই ঢলে পড়ে। ২৩

ঘরের কাজ যিনি করেন না; বেশ-বিন্যাসের পারিপাট্য নিয়েই যিনি কাল কাটান; কাজকর্মে যাঁর আগল নেই; প্রত্যুত্তরবিধানে যিনি সপ্রতিভা, সত্যহীনা ও স্বভাবনির্লজ্জা;

ঘরে কে কেমন আছে, অথবা হাঁড়ির খবর নিতে যিনি তৎপরা, যাঁর আলাপে প্রকাশ পায় প্রীতির পেশলতা।

বিজনে যখন থাকেন তখন যাঁর মত্ততার অন্ত থাকে না খেলা-ধূলায় বা আড়ম্বরে, অথচ প্রকাশ্যে নিজেকে যিনি প্রচার করে বেড়ান সাবিত্রীসমা;

স্বাধীনতন্ত্রার মত, যিনি আজ যজ্ঞানুষ্ঠানে, কাল তীর্থে, পরশু মন্দিরে, গণৎকার, বৈদ্য, বন্ধুবান্ধবদের গৃহে গৃহে চর্কী ঘোরান ঘোরেন, পান-ভোজন করান, যাত্রা-উৎসবে চুটিয়ে ব্যয় করেন;

ভিক্ষুক-তাপসে যাঁর ভক্তি,

আপনজনে বিরক্তি,

কিন্তু মনোরমটিতে আসক্তি,

এবং যিনি···

দর্শন-দীক্ষারক্তা,

দয়িত-বিরক্তা,

ও সমাধি-সংযুক্তা;

এই রকমের গোষ্ঠী-মজানো মিত্রা দেখলেই বুঝবে, রমণীটি নষ্ট চরিত্রা। ২৪-২৮

মনে রেখো, এই স্ত্রীলোকেরা, এই পিশাচীরা, রাত্রি-রাগিণী সন্ধ্যার মত প্রেমিকদের রক্তিম ভালবাসাটিকে অন্ধকার ক'রে দেন; এঁরা চপলা, এঁরা ক্রূরা, রক্তচ্ছায়াহরা। গ্রহের আবির্ভাবের অন্ত থাকে না এঁদের প্রেমের কৃষ্ণ গগনে। সরল মূঢ়ের দল এঁদের অতি নগণ্য কাজটিকেও মন দিয়ে করেন, এঁদের বাহন হন। এঁদের কাছে যাঁরা অপরাজিত হয়ে থাকতে চান, তাঁদের শপথ করেই নিস্তেজ হয়ে থাকতে হয়। শৃঙ্গার এবং শৌর্যের শ্লাঘা, ও নানান অসমঞ্জস দানের বর্ণিমা,—ঐ হেন রমণীরত্নদের করপদ্মে, বশীকরণের অমন্ত্র-যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। ২৯-৩১

কলিকাল-তিমিররজনীর সহস্র মায়াময়ী এই নিশাচরীদের প্রসঙ্গে এত অধিক নৃশংস কাহিনী শুনতে পাওয়া যায় যে, বৎসগণ, কম্প দিয়ে শিউরে ওঠে গা। ৩২

এই পৃথিবীতে পুরাকালে অতি প্রসিদ্ধ জনৈক বণিক্‌রাজ ছিলেন, "ধনদত্ত" তাঁর নাম। সমুদ্রের মতই তিনি ছিলেন ধন-রত্নের আশ্রয়। কুবেরজয়ী তাঁর বৈভব। ৩৩

"বসুমতী"—নামে তাঁর একটি তনয়া ছিলেন। বৈভবের তিনি

বিভূতি, কামের তিনি প্রতিমূর্ত্তি। লাবণ্যে ঢল ঢল তাঁর অঙ্গ। দিগ্বিজয়িনী হয়েছিলেন, দু'নয়নের কেবল মাত্র নাচ দেখিয়েই। ৩৪

ধনদত্ত অপুত্রক। অতএব তাঁকে একদিন প্রাণপ্রিয়া কন্যাটিকে পুত্রপদে বিনিবিতা ক'রে, বণিক "সমুদ্রদত্তে"র হাতে তুলে দিতে হোলো। সমুদ্রদত্তেরও তুল্যবিভব, তুল্যকুল ইত্যাদি। ৩৫

মৃগ-নয়নার প্রেম বিভোর হ'য়ে শ্বশুর-মন্দিরে সমুদ্রদত্ত সুচিরস্থিতি লাভ করে আছেন, এমন সময়ে একদা সংবাদ এল, দ্বীপান্তর থেকে হঠাৎ বাণিজ্য পণ্য উপস্থিত হয়েছে; কি করেন? তদ্বিরাদির জন্য অতএব, সমুদ্রদত্তকে প্রস্থান করতেই হোলো। ৩৬

স্বামীও গেলেন, আর তরুণীটিও জনকগৃহে সখীদের সঙ্গে হর্ম্যশিখরে করলেন আরোহণ। কেলিবিলোলা হয়ে বিলাসোৎসবে ক্ষিপ্র মগ্ন হয়ে গেলেন বিলাসময়ী। ৩৭

সেদিন সৌধের উপরে তিনি উঠেছেন, হঠাৎ তাঁর নয়নে পড়ল একটি তরুণ-কুমার, পথ দিয়ে তিনি চলেছেন। ডাগর হয়ে উঠল তাঁর দু-নয়ন। সত্যিই, কামদেবের মত চেহারা। দেখেই, কোথায় যেন ভেঙে ভেসে গেল বসুমতীর ধৈর্যের বাঁধ। কুমতি কুপিতা হলে এমনিই হয়। ৩৮

চুল্‌বুল্‌ ক'রে উঠল তাঁর দু নয়নের কাজল তারা। কে যেন কোথা থেকে এসে হঠাৎ চুরি ক'রে নিয়ে চলে গেল তাঁর বিচার-বিবেচনার বুদ্ধিটুকুও। তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল সম্বরণ করা··· স্মর-বিকার। ৩৯

আকুল হয়ে উঠল তাঁর কটিতটের মেখলা।

মেখলা যেন মুখরা হয়েই তাঁকে সুচির মিনতি ক'রে জানালো—

"শীল পালন করো, চপলা হোয়ো না, নিম্নধারা নদীর মত কূল-ধ্বংসিনী হোয়ো না।" ৪০

কিন্তু স্থির থাকতে পারলেন না তরুণী।

একান্তে সখীকে ডেকে নিয়ে তাঁর মনের কথাটি ব'লে ফেললেন। এবং তাকেই দূতী ক'রে তরুণ-কুমারটিকে ডাকিয়ে আনালেন অন্দরে। কামিনীদের চিত্ত যখন চঞ্চল হ'য়ে কাঁপতে কাঁপতে ছোটে, তখন তার গতিরোধ করে কার সাধ্য? ৪১

তরুণ-কুমারটিকে নিয়ে প্রমত্তা হয়ে উঠলেন স্বৈরিণী।

কামের সে কী বিকাশ!

সুরতের সে কী বিলাস!

নর্ম পরিহাসের সে কী সুন্দরতা!

সহজাত দু জনের প্রেম রচনা ক'রে ফেলল মোহ-নীড়। পরিতৃপ্তা হয়ে উঠলেন স্বৈরিণী। ৪২

তার পরে একদিন মহাসমারোহে সমুদ্রদত্ত ফিরে এলেন শ্বশুর-মন্দিরে; ত্বরিতেই তিনি সমাধা ক'রে ফেলেছিলেন বাণিজ্য-কৃত্য; কারণ প্রবাসে তাঁকে অত্যন্ত আকুল করে ফেলেছিল দয়িতার দর্শনোৎকণ্ঠা। ৪৩

মহোৎসবের মাতামাতি, ব্যস্ত-সমস্ত পরিজন, ভোগৈশ্বর্যের ছড়াছড়ি,···তার মধ্যে দিবসভাগটি কোনক্রমে অতিবাহিত ক'রে শেষে প্রিয়তমাকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রদত্ত প্রবেশ করলেন রমণীয় শয়নীয়। বস্ত্র-বিতান, মনোরম স্থান। ধাই তুলছে সুগন্ধি-ধূপ, সুরগৃহ-স্বরূপ। সতেজে জ্বলছে মণি-প্রদীপ, যেন আনন্দ-নীপ। ৪৫

মধুমদিরায় তখন বিলুলিত হয়ে এসেছে প্রেয়সীর নয়ন-কমল। প্রিয়তমাকে সঘন আলিঙ্গন করতে করতে রতিলালসে সমুদ্রগুপ্ত শয্যায় এসে বসলেন, নব-পদ্মিনীকে নিয়ে যেন মত্তগজের লীলা। ৪৬

তরুণীটি কিন্তু শয়ন ক'রে রইলেন, নয়ন নিমীলিত ক'রে। তিনি আজ ধ্যানপরা যেন যোগিনী। এবং তাঁর ধ্যানের লক্ষ্য-স্থল, সেই পরপুরুষ, হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত সেই তরুণ-কুমার। ৪৭

স্বামী মহাশয় তাঁকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন, বারংবার মুখ চুম্বন করতে লাগলেন, নীবি-মোক্ষ করলেন, উচ্ছ্বাসের তাঁর অন্ত নেই, কিন্তু ভার্যার কেবল মনে পড়ে যেতে লাগল সেই তরুণ কুমারটির রূপ, যিনি তাঁর শীল-হর। সঙ্কুচিত হ'য়ে রইল তাঁর অঙ্গ। ৪৮

মূঢ় স্বামী সমুদ্রগুপ্ত।

তিনি ভাবলেন—প্রেয়সী নিশ্চয় প্রণয়-কুপিতা হয়ে রয়েছেন। অতএব তিনি অনেক তোষামোদ করলেন, প্রণিপাত করলেন, বললেন—"প্রসাদ-ভিক্ষা দাও।" ৪৯

সংসারে কিন্তু বৎসগণ, দেখা যায়, যে সব শ্রেষ্ঠা প্রেয়সীরা পর-পুরুষ রাগিণী,···অতএব বিমুখী,···অতএব অপমান করেন প্রেমের,···তাঁদের উপরেই সমধিক ঢলে পড়ে অতিমোহাচ্ছন্ন পুরুষ-পশুদের মন। ৫০

পরের ঘরে যখন চলে যায় ভালবাসা, স্বাধীনতা লাভ করে যখন কাম, তখন কী করতে পারে স্বামীর প্রেম? সন্ধ্যাকাশে কালো মেঘ রাঙা হয়ে উঠলেও, ভাস্করই তাকে রাঙায়। ৫১

বসুমতীর মাথায় তখন এক চিন্তা,···উপবনের গোপন কুঞ্জে তরুণ-বল্লভটি সঙ্কেত অনুসারে নিশ্চয় এখন বসে আছেন। এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি তখন মালাদান করলেন তাঁর পতিটিকে, পতি তো নয়, যেন বিষ! সংমূর্চ্ছিতার মত বহুক্ষণ তিনি পড়ে রইলেন। ৫২

তার পরে প্রণয়শ্রান্ত সমুদ্রদত্তের দু'নয়ন যখন মুদ্রিত হয়ে গেল গাঢ় ঘুমে, তরুণীটি তখন উঠলেন, রচনা করলেন বেশভূষা, কক্ষ থেকে বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হলেন নিঃশব্দে।

সেই মুহূর্ত্তে একটি চোর কিন্তু এসে প্রবেশ করল তাঁর ভবনে। গৃহবাসীরা সকলেই সে রাত্রে মধুপানে মাতাল হয়ে নিদ্রা দিচ্ছিলেন সুখে, সুযোগ বুঝে তাই চোরের এই শুভাবির্ভাব। ৫৩।

চোর দেখতে পেল গমনোৎসুকা সালঙ্কারা তরুণীটিকে। কিন্তু তরুণীটি টের পেলেন না যে চোর এসেছে। ৫৪

আকাশের ইন্দ্রকোণে তখন ধীরে ধীরে দেখা দিয়েছেন শশাঙ্ক। ইন্দ্রবল্লভা মীলিততারা দিগঙ্গনাকে সঘন আলিঙ্গন ক'রে যেন এইমাত্র তিনি চমকে উঠেছেন কেঁপে। ৫৫

কুমুদ, সেই যামিনীর কপট হাসির মতই ছড়িয়ে পড়তে লাগল চন্দ্রদেবের তুহিনভরা জ্যোৎস্না। ৫৬

রবি-দেবের খরতাপে শ্রান্তা হয়ে পড়েছিলেন দেবী আকাশ-সুন্দরী; চন্দ্রদেবের শুভাগমনে তাঁকেই আবার সানন্দা হয়ে উঠতে দেখে ভ্রমর-ঝঙ্কৃত আনন্দে কুমুদ-দন্ত বিকসিত ক'রে যেন হাস্য করে উঠল দীঘিগুলি। ৫৭

রজনী রমণীর অঙ্গ ঘিরে তিমির কঞ্চুকের নীলাবরণ। যেই সেটিকে হরণ করে নিলেন চন্দ্রদেব, অমনি যেন তিনি সরমে মরে গিয়ে সরাসরি অঙ্গে জড়িয়ে ফেললেন কুমুদ-গন্ধবিহ্বল ভ্রমরদের নীল উত্তরীয়। ৫৮

তারপরে, যখন সমস্ত পুরী শিথিল হয়ে গেল ঘুমে এবং বিপুল হয়ে উঠল চন্দ্রালোক, মধ্যরাত্রে···তখন তরুণীটি তমিস্রা দেবীর মতই নির্বিশঙ্কা হয়ে ধীরপদ-সঞ্চারে প্রস্থান করলেন উপবনের দিকে। ৫৯

স্বৈরিণীর নিজস্ব এই উপবন।

উপবনে তিনি প্রবেশ করলেন,···সম্পূর্ণ-বিবশা।

কে জানত মদনের পুষ্পবাণ আগুন হানে! তাঁর অলক্ষ্যে, তাঁরি পিছনে পিছনে, তাঁরি ভূষণের লোভে লোভে, উপবনে প্রবেশ করল চোরটিও।

বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল চোর। ৬০

পত্রমর্ম্মর সেই কাননে চোর দেখতে পেল তরুণীর প্রিয়তমটিকে।

তাঁর অঙ্গ বিভূষিত;

গায়ের চাদরখানি তেজপাতার মত চকচক করে কাঁপছে;

ছড়িয়ে পড়েছে কুসুম;

শঙ্কাজনক এক অবস্থা;

পাখী বসেছে গায়ে। ৬১

পরাণ প্রিয়ার বিরহে যেন তাঁর সর্বদেহ জ্বলে গেছে;

দিগ্বিলসিত জ্যোৎস্নার অনলে যেন পুড়ে গেছে। ৬২

প্রাণ হাতে ক'রে সঙ্কেত স্থানে বহুক্ষণ তিনি বসে ছিলেন; প্রেয়সীর সঙ্গে পুনর্মিলন তাহলে দুরাশা; শেষে আশাহীন হ'য়ে বৃক্ষবিলম্বিত লতারজ্জুতে কণ্ঠটি গলিয়ে প্রাণ হারিয়ে তিনি ঝুলেছেন। ৬৩

এই অবস্থায় না তাঁকে দেখে তন্বীটি প্রথমে যেন বিলীনা হয়ে গেলেন। তারপরে দুঃখে শোকে সন্ত্রাসে বিলাপ করতে করতে, অসি-দীর্ণা বল্লরীর মত, লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে, ধরিত্রীর আলিঙ্গনে। ৬৪

সংজ্ঞা হারালেন। এক মুহূর্তে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল তাঁর দুনয়নের প্রসিদ্ধ নাচ। অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপরে ধীরে ধীরে তিনি উঠে বসলেন। প্রাণ যেন ধীরে ধীরে ফিরে এল দেহে।

কিন্তু সে কোথায়, যে ছিল তাঁর দুনয়নের আনন্দ! প্রিয়তমের চন্দ্র-সুন্দর মুখখানি দেখবার জন্যে তরুণীর সে কী তরুণ করুণ আর্ত্তধ্বনি! মধুস্বরে তাঁকে অনেক ডাকলেন। কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে। মন্দ ভাগ্যকে দুষলেন। পুণ্য ব'লে কি জগতে আজ কিছুই নেই? কোথায় আমি আর কোথায় আমার সুন্দর? ৬৫-৬৬

তারপরে অবলাটি অতিযত্নে লতাপাশ থেকে তরুণের দেহটিকে মুক্ত ক'রে, কোলের উপর সেটিকে শুইয়ে, প্রাণ ঢেলে চুম্বন করতে লাগলেন তাঁর মুখ; যদি জীবন ফিরিয়ে আনে চুম্বন। ৬৭

একেই বলে মোহ।

নিজের মুখের মধ্যে প্রিয়তমের মুখকমলটিকে গ্রহণ ক'রে, তিনি তাম্বুল-গর্ভিত ক'রে দিলেন তাঁর মুখ; যেন মুখের মধ্যে প্রবেশিত হয়ে গেল সাকার একটুকরো রক্তিম ভালবাসা। ৬৮

তারপরে হঠাৎ ঘটে গেল এক অদ্ভুতপূর্ব কাণ্ড!

কুসুম-মৃগমদ-ধূপাদির সৌরভে আহূত হয়েই যেন শবের শরীরের মধ্যে জেগে উঠল জনৈক বেতাল। পলক ফেলতে না ফেলতেই সে নাসিকাটি কর্ত্তন করে ফেলল তন্বীর। ৬৯

চাপল্যের, দুর্নীতির উচিত ফলই ফলল।

ছিন্ন-নাসিকা তরুণী তখন পালালেন, স্বামীর ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন, হাহাকার শব্দে বাড়ী মাথায় ক'রে তুললেন। ৭০

নিদারুণ আর্ত্তনাদে জেগে উঠল পুরবাসীরা, জেগে বিছানায় উঠে বসলেন সমুদ্রদত্ত। কিন্তু পত্নী দেবী তখন তারস্বরে চীৎকার দিয়ে বলছেন—

"আমার সর্বনাশ করেছে, নাক কেটে ফেলে দিয়েছে···আমার স্বামী।" ৭১

ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন শ্বশুর, আত্মীয়-স্বজন সকলে। অজস্র ক্রুদ্ধ প্রশ্নের একটিও উত্তর দিতে পারলেন না সমুদ্রদত্ত। একটি অক্ষরও বেরোল না তাঁর মুখ থেকে। পরদেশে বিকিয়ে যাওয়া বোবার মত তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ৭২

তার পরদিন সুপ্রভাত হল। তাঁর বিরুদ্ধে রাজসভায় অভিযোগ জানালেন শ্বশুরকুল। রুষ্ট হয়ে উঠলেন নরপতি। ফলে, সমুদ্রদত্তের লাভ হল প্রচুর অর্থদণ্ড। ৭৩

চোর কিন্তু এদিকে সমস্ত ব্যাপারখানি স্বচক্ষে দেখেছিল। বেচারী বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। শেষে নিজেকে সম্বরণ করতে না পেরে, রাজসমক্ষে উপস্থিত হ'য়ে সে নিবেদন করে বসল আদ্যোপান্ত যথার্থ ঘটনা। রাজা শুনলেন, খুশী হলেন, এবং তাকে পুরস্কার দিলেন···বলয়। উদ্যানে মড়ার মুখের মধ্যে সন্ধান করতেই হস্তগত হল তরুণীর ছিন্ন নাসা।

একটি সামান্য চোর, অকারণ-সুহৃদের আদর্শ দেখিয়ে শুদ্ধি-বিধান ক'রে দিল সমুদ্রদত্তের। ৭৪-৭৫

বৎসগণ, চপলারা এই ধরণেরই হন। তাঁরা কুটিলার চেয়েও কুটিলা, তাঁদের আচার-বিচার নেই, তাঁরা ক্রূর, লজ্জাহীনা। যে বুদ্ধি-ধর এই হেন রমণীয়াদের জানেন, তাঁকে ঠকাতে পারে না স্ত্রীলোক। ৭৬

ইতি কামবর্ণনং নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

[ক্রমশঃ।

সবাই জানেন—
প্রতি প্যাকেট ব্রুক বণ্ড চায়ে অনেক বেশী কাপ ভালো চা তৈরী করা যায়
বাগান থেকে সদ্যসদ্য সরবরাহ করা হয় বলে ব্রুক বণ্ড চা একেবারে তাজা থাকে
লোকে রোজ সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশী কাপ ব্রুক বণ্ড চা খেয়ে থাকেন
VOTE FOR
Brooke Bond Tea
Green Label
Brooke Bond Tea
এই জন্যেই অন্য যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে
ব্রুক বণ্ড চা
বেশী লোকে খান!
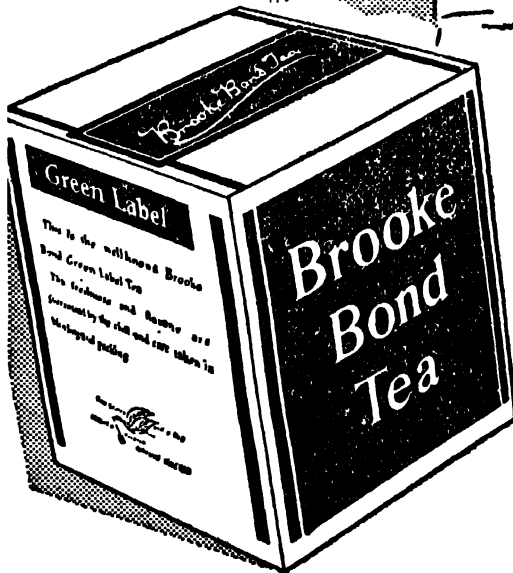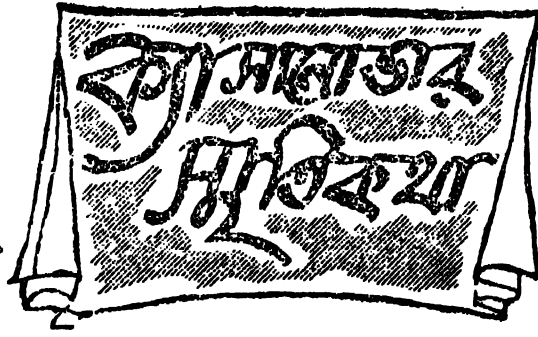
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দীর্ঘ একটি মাস কাটলো 'করফু'তে—নিশ্চিন্তে, নিরুপদ্রবে। তার পর জুলাই মাসের মাঝামাঝি একটি দিনে আমার ভাগ্যতরী এসে ভিড়লো—কনস্তান্তিনোপল-এ।

প্রথম দিনেই গেলাম 'ওসমান-পাশা অফ কারমনিয়া'র উদ্দেশে। চিঠিখানি সঙ্গে নিয়ে। কাউণ্ট দ্য বনিভ্যালই ঐ নামে অভিহিত হোয়েছিলেন সিংহাসন পাবার পর।

ফরাসী কায়দায় সাজানো মস্ত একটি হলে আমাকে স্বাগত জানালেন। তারপর প্রশ্ন করলেন—"রোমের কার্ডিন্যাল আপনাকে পাঠিয়েছেন—আপনাকে আমি কি ভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন?"

তাঁর হাস্যোজ্জ্বল স্মিত মুখের দিকে চেয়ে আমার অপরিচয়ের দ্বিধা মুহূর্ত্তে কেটে গেলো। অসঙ্কোচেই জানালাম, মনের এক তীব্র নৈরাশ্যের মুহূর্ত্তে আমি নিজেই কার্ডিন্যালের কাছে এখানে আসার জন্য পরিচয়-পত্র চেয়েছিলাম। তারপর সেই দায়িত্ব পালন করবার জন্যে নিজেকে বাধ্য করেছি এখানে আসতে।

—"তাহলে আমাকে আপনার সত্যকারের কোনো প্রয়োজন নেই?"

—"প্রয়োজন কিছু নেই, সে কথা সত্যি—কিন্তু একথাও সত্যি যে আমার আনন্দেরও সীমা নেই। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য থেকে তো বঞ্চিত হইনি—আজ সারা ইউরোপে আপনার কথা আলোচিত হচ্ছে—অতীতেও হোয়েছে আর ভবিষ্যতেও বহু দিন ধরেই হবে।"

কার্ডিন্যাল তাঁর চিঠিতে আমাকে উচ্চশিক্ষিত বলে অভিহিত করায় পাশা জিজ্ঞাসা করলেন, আমি ওঁর লাইব্রেরীটি দেখতে চাই কি না। আগ্রহের সঙ্গেই রাজী হলাম। আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন আর একটি মস্ত ঘরে। তার চার পাশে সারি সারি জাফরী-কাটা দরজা তার উপর পর্দা ঝলানো। পাশা এগিয়ে গিয়ে একটি দরজা খুললেন—কিন্তু বই? বই কোথায়? সারি সারি বাঁধানো বই-এর বদলে সারি সারি বোতল—সুরার—সবচেয়ে দামী, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সুরার অফুরান ভাণ্ডার।—"এই—এই হোলো আমার লাইব্রেরী—এই হোলো আমার অন্তঃপুর।—বৃদ্ধ হোয়েছি, যথেচ্ছাচার করে জীবনকে নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু সুরা? সুরা শুধু জীবনকে দীর্ঘই করে না—সেই দীর্ঘ পথ রঙীন করে তোলে তার নেশায় তার মায়ায়।"

প্রচুর ইংরাজ ও অন্যান্য পদস্থ সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের সমাবেশ দেখলাম। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন একটি বৃদ্ধ—বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি কিন্তু অত্যন্ত সুদর্শন। তাছাড়া তাঁর শান্ত, গম্ভীর মুখের দিকে তাকালে আপনিই সম্ভ্রম জাগে। পাশা তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন—নীতিবিদ, ধার্ম্মিক, দার্শনিক আর প্রচুর বিত্তবান বলে। তাঁর নাম জগুফ আলি।

সেদিনের পরিচয় মাত্র চার-পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে রীতিমত ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়ালো। আমরা প্রতিদিন ধর্ম্ম, নীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করতাম। একদিন হঠাৎ জগুফ আলি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি বিবাহিত কিনা। বিবাহিত নই আর আপাততঃ বিবাহ করার মত কোনো সদিচ্ছাও নেই শুনে আমাকে বললেন, এটা শুধু অপরাধ নয়, ঈশ্বরের আদেশও অমান্য করা হয় এতে। তারপর বললেন,—"শোনো, আমার দু'টি ছেলে একটি মেয়ে। ছেলেরা তাদের সম্পত্তির অংশ আগেই পেয়ে গেছে। বাকী যা কিছু আছে সব আমার মেয়ে জেলমার। জেলমার চোখ আর চুল তার মায়ের মতই নিবিড় কালো, তার রং হার মানায় শ্বেত পাথরে গড়া মূর্ত্তিকে। গ্রীক আর ইতালীয় ভাষা সে জানে—জানে বীণা বাজিয়ে গান গাইতে। আজ অবধি কোনো পুরুষের সৌভাগ্য হয়নি তাকে চোখে দেখবার। আমার এই অমূল্য রত্নটিকে আমি তোমাকে দিতে রাজী। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটি বছর থাকতে হবে আমার কোনো আত্মীয়ের কাছে—সেখানে তুমি শিখবে আমাদের ভাষা, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি—আমাদের রুচি, রীতি, নীতি। তারপর যেদিন তুমি নিজেকে সত্যিকার মুসলমান বলে এসে দাঁড়াবে, জেলমা সেদিনই তোমার হবে। প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হবে তুমি সেই সঙ্গে। না, না তোমার কাছ থেকে এখন কোনো কথাই আমি চাই না। চিন্তা কর এ বিষয়ে, যত দিন না সহজে উত্তর দিতে পারো।

এর পর দিন চারেক জগুফ আলির কাছে যেতে পারিনি কি এক সঙ্কোচে। কিন্তু তিনি নিজেই এ সঙ্কোচ ভেঙে দিয়ে আগের মতই সহজভাবে ব্যবহার করতে লাগলেন। এরই মধ্যে একদিন ওঁর বাড়ীর বাগানে বেড়াচ্ছিলাম—এমন সময় দারুণ বৃষ্টি এলো। ভিজতে ভিজতে ছুটে গিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সামনেই যে হলটায় ঢুকলাম সেখানে এর আগেই কয়েক বার এসেছি। ঢুকেই দেখি, জানলার ধারে একজন দাসী কি কাজ করছে আর একটি তরুণী তার পাশে দাঁড়িয়ে কি নির্দেশ দিচ্ছে। আমাকে দেখেই তরুণী ক্ষিপ্রহাতে ওড়নায় মুখ ঢেকে ফেললে। অপ্রস্তুত

আড়াল থেকে ভেসে এলো মধুক্ষরা কণ্ঠের সকাতর মিনতি। আলি সাহেবের নির্দ্দেশ আছে, তাঁর অনুপস্থিতিতে আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার। আমার মনে হোলো এ নিশ্চয়ই জেলমা। আলি সাহেব নিশ্চয়ই আমাদের পরিচয় করার জন্য এমন নিভৃত আলাপের সুযোগ দিয়েছেন। অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে আবার ভেসে এলো সেই মধুস্বর—

—"আমি কে আপনি জানেন ?"

—"না, জানি না তো বটেই, আন্দাজও করতে পারছি না—"

—"আমি আপনার বন্ধু আলি সাহেবের স্ত্রী। বছর পাঁচেক আগে আমাদের বিবাহ হয়। আমার এখন আঠারো বছর বয়স—"

অবাক হোলাম, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ করানোর মত এতটা উদার-চিত্ততা কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পক্ষে সম্ভব ? অবশ্য বিবাহিতা জানার পর আলাপ করাটা অনেক সহজ মনে হোলো। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার সেই চিরন্তন প্রকৃতিও জেগে উঠলো—দেখতেই হবে ঐ অবগুণ্ঠনের আড়ালে লুকোনো রহস্যময়ীকে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে যেন কোন ভাস্করের নিপুণ হাতে খোদাই-করা শুভ্র পাষাণ-প্রতিমা। কিন্তু ঐ অপরূপার আত্মার বিকাশ যে দুটি দীপাধারে সেই দৃষ্টিপ্রদীপ থেকে বঞ্চিত থাকি কেমন করে ? চোখের সামনে শুধু উন্মুক্ত একটি সুললিত, সুগঠিত বাহু। তার লীলায়িত ভঙ্গীতে মানস নয়নে জেগে উঠলো ওড়না-ঢাকা তন্বীর তনুদেহখানি। কোমল মসলিনের বহির্বাস তার দেহের ছন্দ ঢাকতে পারে নি—ঢাকতে পারে নি তার অপূর্ব্ব সুষমা। শুধু আবরণে বন্দী হোয়ে আছে তার উজ্জ্বল কোমল পেলবতা। দেহভঙ্গীতে বাঁধা পড়ে আছে এক অপরূপ ছন্দ, এক কোমল মূর্চ্ছনা—

মুগ্ধ, বিস্মিত, বিহ্বল অবস্থায় কখন এগিয়ে গেছি, দুই হাত বাড়িয়ে ঐ অবগুণ্ঠনের আড়াল ঘুচিয়ে দিতে—চকিতে, ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি—সম্বিৎ ফিরে এলো, আমার কানে এলো তীব্র ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে সেই কোমল, মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর—

—"এমনি করেই বুঝি বন্ধুর বিশ্বাসের মর্য্যাদা দিতে হয় ? তার স্ত্রীকে অপমান করে বুঝি আতিথ্যের ঋণ শোধ করতে হয় ?"

—"আমাকে ক্ষমা করুন। আমাদের দেশে হীনতম লোকও সম্রাজ্ঞীর মুখদর্শন থেকে বঞ্চিত থাকে না"—

—"হ্যাঁ, কিন্তু যখন ঢাকা থাকে তখন ওড়না ছিঁড়ে বোধ হয় তারা দেখে না—জগুফ আমাকে এর প্রতিফল দেবেই—"

এ কথায় আমি সত্যিই ভয় পেলাম। তখনি ওঁর পায়ের তলায় বসে ক্ষমা চাইলাম। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর তিনি শান্ত হোলেন। তখন অনুমতি পেলাম তাঁর হাতখানি স্পর্শ করার।

এমন সময় জগুফ আলি এলেন। আমাকে আলিঙ্গন করে স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে। তার পর স্ত্রীর হাত ধরে অন্তঃপুরের দিকে গেলেন।

আমি পরে পাশার কাছে এই সব কাহিনী বলাতে তিনি হেসে উঠলেন। বললেন,—"কোনো ভয় নেই, নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার আনাড়ীপনায় মহিলাটি শুধু মনে মনে হেসেছেন। খুব সনাতনপন্থী তুর্কী মহিলাদেরও সমস্ত লজ্জা ঐ মুখে। ওড়নায় মুখ ঢাকা থাকলে
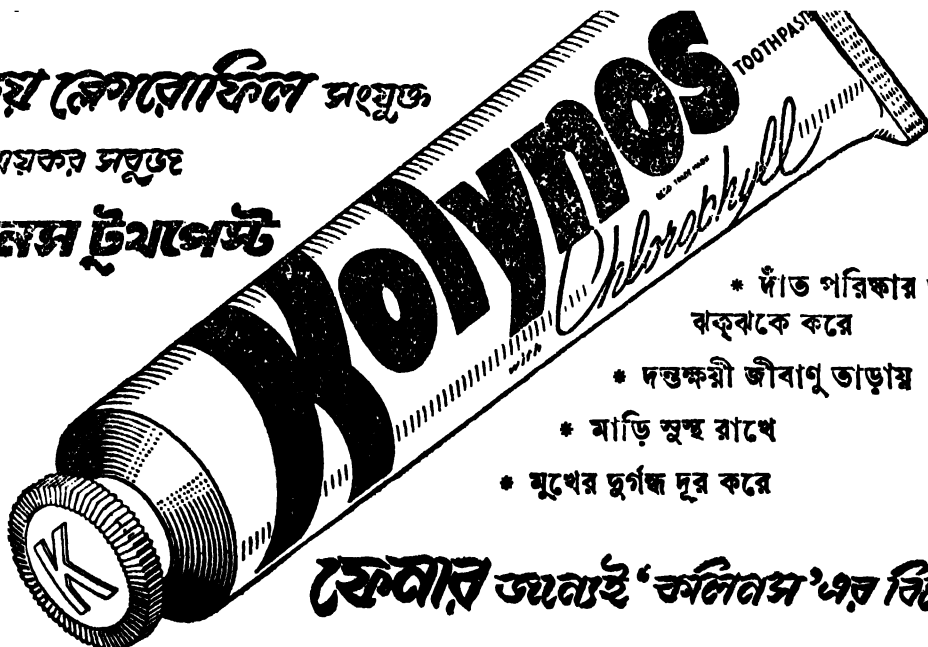
আর কিছুতেই তাঁরা লজ্জা পান না। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, স্বামীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপের সময়েতেও এঁর মুখ ওড়নায় ঢাকা থাকে—"

অবশ্য এর পর আলি সাহেবও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের আর কোনো সুযোগ আমাকে দেন নি। ঠিকই করেছিলেন অবশ্য। এর কিছু দিন পরেই আমার ফেরার সময় হোয়ে এলো। এক দিন বাজারে নানা রকম জিনিষপত্র দেখছিলাম এমন সময় আলি সাহেবও সেখানে এলেন। এসে প্রথমেই আমার রুচির আমার পছন্দকরা জিনিষগুলির খুব প্রশংসা করলেন। আমি কিন্তু কোনো জিনিষই কিনিনি—কারণ প্রত্যেকটি জিনিষেরই দেখলাম অসম্ভব বেশী দাম—কিন্তু আলি সাহেব বললেন, কোনোটারই দাম বেশী নয়, সবই ঠিক দাম। কিনলেনও প্রচুর জিনিষ। কিন্তু পরদিনই সব জিনিষগুলি আমার বাড়ীতে উপহার বলে পাঠিয়ে দিলেন। আমি বুঝেছিলাম এই দেওয়ার আড়ালে কতখানি আন্তরিক স্নেহ লুকানো আছে—এ-ও বুঝেছিলাম, এগুলি ফিরিয়ে দিতে গেলে কতখানি আঘাত লাগবে ওঁর মনে। কত অজস্র জিনিষ যে তার সংখ্যা নেই, প্রায় পাঁচ শ' ছ'শ' টাকার (তখনকার দিনে) মত হবে!

যাত্রার দিন সন্ধ্যায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাকে বিদায় দিতে এসে কেঁদে ভাসালেন। সেদিন জানালেন তাঁর জেলমাকে বিয়ে করার অনুরোধ না মেনে আমি তাঁর শ্রদ্ধাই অর্জ্জন করেছি। জাহাজের কেবিনে ঢুকে দেখি, মস্ত এক বাক্সভর্ত্তি আরও অজস্র উপহার উনি রেখে গেছেন। পাশাও উপহার দিয়েছিলেন বিদায় নেবার সময় কয়েক রকম উৎকৃষ্ট দুর্লভ সুরা।

প্রয়োজনে আর অভাবের দাবী মেটাতে এই সব উপহারের দুর্লভ সঞ্চয় আমার সব সমস্যার সমাধান করে দিতো। মনে রেখাপাত করতো না কিছুই।

* * * * * *

ভেনিস। দীর্ঘ দিন পর আবার পা দিলাম দেশের মাটিতে। কিন্তু করফু হোয়ে ভেনিসেও পৌছবার ভিতরই সব সঞ্চয় নিঃশেষ করে ফেলেছিলাম। তাই স্বদেশে ফিরে প্রধান চিন্তা হোলো অর্থ উপার্জ্জনের। জুয়া খেলা ধরলাম। ভাগ্য বিরূপ। কয়েক দিনেই নিঃসম্বল হোলাম। কি করি? কোথায় কাজ পাই? উপোস করে মরতে আমি পারবো না, কিন্তু কাজও তো আমাকে কেউই দিতে চায় না? এমনি অবস্থায় ডাঃ গাৎসির কাছে শেখা ভায়োলিন বাজানোই আমাকে পথ-নির্দেশ দিলে। আবে গ্রিমানী আমাকে একটা থিয়েটারে কাজ দিলেন—সেখানে প্রতিদিন এক ক্রাউন করে পেতাম। যাই হোক, তবু দাঁড়াবার মত মাটি পেলাম—তারপর ভাগ্য।

সেই ভাগ্যই নিয়ে এলো আমাকে এক বিবাহ উৎসবে বাদ্যকার হিসাবে। উৎসবের তৃতীয় দিনে প্রায় ভোর রাত্রে যখন বাড়ী ফিরছি তখন দেখলাম আমার আগে আগে একজন সেনেটের সদস্য চলেছেন। যেই তিনি তাঁর গণ্ডোলাতে উঠতে যাবেন অমনি একখানা চিঠি ওঁর পকেট থেকে পড়ে গেল। উনি টের পেলেন না দেখে আমি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ওঁকে দিলাম। উনি ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে ওঁর গণ্ডোলাতে উঠে আসতে বললেন বাড়ী পৌছে দেবেন বলে। আমরা দু'জনে গণ্ডোলাতে উঠে বসতে না বসতেই উনি বললেন, ওঁর বাঁ হাতটা একটু জোরে ঘষে দিতে কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্ করে অসাড় হয়ে আসছে। আমি খুব জোরে জোরে ঘষতে লাগলাম, কিন্তু উনি কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে বলে উঠলেন ওঁর সমস্ত শরীর নাকি অবশ হোয়ে আসছে। বোধ হয় মারা যাচ্ছেন—চমকে উঠে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখি, যন্ত্রণায় বিবর্ণ মুখ কেমন অদ্ভুত ভাবে বেঁকে যাচ্ছে। বুঝতে দেরী হোলো না যে এ নির্ঘাৎ সন্ন্যাস রোগ। তখনি গণ্ডোলা থামাতে বলে ডাক্তারের উদ্দেশে ছুটলাম। তাড়াতাড়ি তো ডাক্তার ড্রেসিং গাউন পরেই চলে এলেন। এসে ওঁর শরীরের এক অংশ চিরে খানিকটা রক্ত বার করে দিলেন। আমি আমার সার্ট ছিঁড়ে জায়গাটাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম। তার পর ক্ষিপ্রগতিতে গণ্ডোলা চালিয়ে ওঁর বাড়ীতে এসে পৌছলাম। চাকরদের ডাকাডাকি করে তুলে সবাই মিলে যখন ওঁকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিলাম তখন ওঁর দেহে প্রাণ আছে কি নেই, বোঝার উপর ছিল না। নিজেই ওঁর একজন চাকরকে ডাক্তার ডাকবার আদেশ দিয়ে বিছানার পাশে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে দু'জন বেশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ঘরের ভিতর এলেন। শুনলাম, ওঁর দু'জন বন্ধু। সমস্ত ঘটনাটা তাঁদের কাছে বললাম, আমার পরিচয় আমি জানাইনি, তাঁরাও নিজে থেকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলেন না। সারা দিন কাটলো একই ভাবে, রোগীর অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হোলো না।

প্রায় মাঝ রাতে রোগীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠলো। জ্বর অসম্ভব বেড়ে গেলো, সঙ্গে নিঃশ্বাসের কষ্ট। অত শ্বাসকষ্ট দেখে আমি উঠে ওঁর বন্ধুদের ডাকলাম। তাঁদের বললাম যে, ডাক্তার ওঁর সারা বুক জুড়ে যে পুলটিস দিয়ে গেছেন সেটা যদি এক্ষুণি না সরিয়ে ফেলি তাহলে ওঁকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। তারা কিছু বলবার আগেই আমি সেটা টেনে খুলে ফেললাম। তারপর অল্প গরম জলে বেশ ভালো করে স্পঞ্জ করে দিলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রোগীর নিঃশ্বাস সহজ হোয়ে এলো—অনেক সুস্থও মনে হোলো। ধীরে ধীরে শান্ত হোয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে যখন আবার ডাক্তার এলেন তখন রোগী অনেকটা সুস্থ। ডাক্তারকে বললেন, "এমন ডাক্তার পেয়েছি যে তোমার চেয়ে ভালো ডাক্তারী জানে—"

—"তাহলে আমার যখন প্রয়োজন নেই, তখন নতুন ডাক্তারের চার্জ্জেই থাকুন"—বলে ডাক্তার গম্ভীর হোয়ে বেরিয়ে গেলেন। মনে হোলো অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হোয়েছেন। হওয়াই স্বাভাবিক।

তিন জনেই আমার কাজে-কর্ম্মে কথাবার্ত্তায় বেশ একটু অভিভূত হোয়েছেন দেখে আমিও একটু সবজান্তার চালে চলতে লাগলাম। ভাবখানা যেন, সমস্ত আইনকানুন যেন আমার হাতের মুঠোয়। যাদের লেখা জীবনে পড়িনি তাদের সম্বন্ধে সব সময় বড় বড় কথা বলে, তাদের লেখা থেকে আউড়ে তিন জনকেই রীতিমত মুগ্ধ করেছিলাম।

এই ভাবে তাক্ লাগানোতে দোষের কিছু ছিল না। বিশ বছর বয়স তখন আমার। বাহাদুরী দেখানোর লোভ ছাড়তে পারি? তাছাড়া আমার স্বাস্থ্যও ছিলো চমৎকার! সেই বয়সে জীবনের পাওনার খাতায় কেউ কি শূন্যের অঙ্ক বসাতে চায়? অবশ্য আমার

আমোদ-প্রমোদ যে খুবই নির্দোষ হোতো সব সময় তা মোটেই নয়। কিন্তু সে-ও তো বয়সের দোষ!

ভেনিসে তো কেউ ভাবতেও পারতো না আমার মত লোকের সঙ্গে মেশবার কথা। তাদের চিন্তাধারা, তাদের আদর্শ সবই উচ্চ ভাবের, পবিত্র ভাবের—আমি ছিলাম পুরোপুরি রক্তমাংসের মানুষ, মাটির মায়ায় বাঁধা। তাদের কঠোর, সংযত, নীতির রাস্তা ধরে যাত্রার সঙ্গী আমি হোতে পারিনি—আমার পাথেয় আনন্দ আর উপভোগ।

যাক্ সে কথা। গরমের সুরুতেই উনি বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন—সেনেটে যাবার মত তো বটেই! ওঁর নাম ছিলো ম্যাসিয়ে ড ব্রাগাদিন্। যেদিন প্রথম সেনেটে গেলেন তার আগের দিন উনি আমাকে ডেকে পাঠালেন—আমি এলে আমাকে পাশে বসিয়ে বললেন,—

—"তুমি যা-ই হও না কেন, আমি তোমার কাছে চিরঋণী। তুমি আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছো। আগে যাঁরাই তোমার অভিভাবকত্ব করেছেন, তাঁরা তোমাকে ডাক্তার কিম্বা ধর্ম্মযাজক, কিম্বা, আইনজ্ঞ এই সব করতে চেয়েছেন—কিন্তু তাঁরা সবাই ভুল করেছেন। কেউই তোমাকে বোঝেননি। তোমার ভাগ্যদেবতাই তোমাকে আমার কাছে এনে দিয়েছে। আমি তোমাকে বুঝি—তোমাকে সমর্থনও করি। আমি মৃত্যু পর্য্যন্ত তোমাকে আমার নিজের ছেলের মত দেখবো। আমার বাড়ীতেই থাকবে তোমার নিজের ঘর। আমার সঙ্গে এক টেবিলেই তুমি খাবে। তোমার একজন নিজস্ব চাকর থাকবে, নিজস্ব একটি গণ্ডোলা থাকবে তার মাসে দশ সেকুইন (ইতালীয় মুদ্রা) তুমি হাতখরচা পাবে। তোমার বয়সে আমার জন্যে আমার বাবাও ঠিক এই ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন। ভবিষ্যতের জন্য কোনো ভাবনা তোমায় করতে হবে না। তুমি শুধু আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাও। যাই হোক না কেন, সব সময় মনে রেখো, আমি তোমার পাশে আছি—পিতার মত—বন্ধুর মত…"

আমার ভাগ্য এমনিই চিরদিন। দরিদ্র বেহালা-বাজিয়ে থেকে একেবারে অর্থ আর সামর্থের শিখরে!

* * * *

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বছর তিনেক পরের কথা। তখন আমি নেপলসে বেড়াতে যাবার পথে সেশেনাতে একটা হোটেলে উঠেছি। বেশ দিলদরিয়া মেজাজ তখন। সঙ্গে আছে বেশ কিছু সোনাদানা, মণিব্যাগটিও ভর্ত্তি, তা ছাড়া তেইশ বছরের অদম্য উৎসাহ।

একদিন ভোরবেলা দারুণ চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেলো। দরজা খুলে দেখি, চার দিকে পুলিশ আর সামনেই একটা ঘরের দরজা হাট করে খোলা। আমার দরজা থেকেই দেখতে পেলাম সেই ঘরে বিছানার উপর বসে এক ভদ্রলোক লাতিন ভাষায় অনর্গল চিৎকার করে যাচ্ছেন।
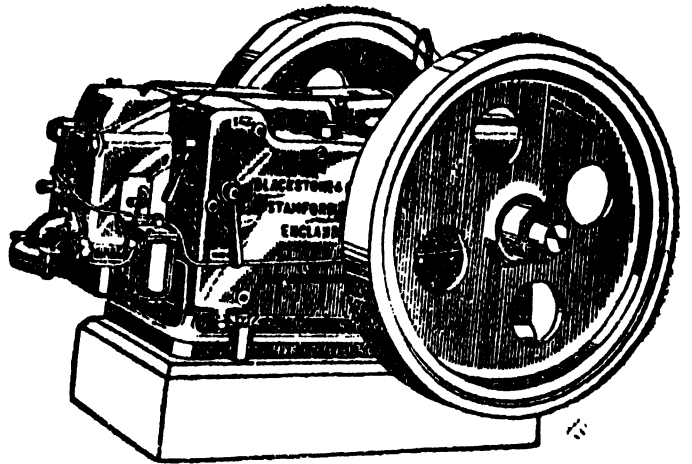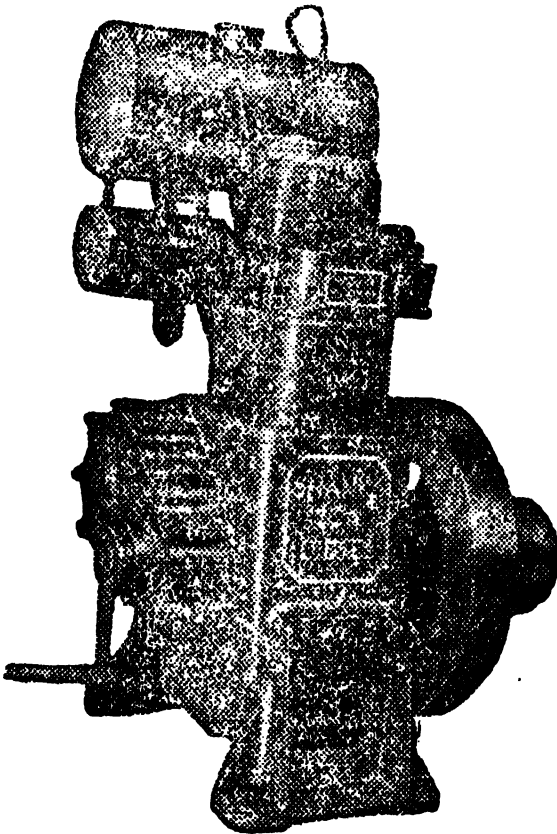
ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপারখানা কি ? তিনি বললেন,—"এই ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি মেয়ে রয়েছে, এখন বিশপের কাছ থেকে তাঁর অনুচরেরা জানতে এসেছে মেয়েটি ওঁর স্ত্রী কি না। যদি স্ত্রী হয়, তাহলে তো গোলমালের কিছুই নেই, শুধু ওঁদের বিয়ের সার্টিফিকেটটা দেখালেই সব ঝামেলা চুকে যায়। তা' না হলে অবশ্য দু'জনাকেই হাজত-বাস করতে হবে। কিন্তু মশাই, মাত্র তিনটি সেকুইন পেলেই আমি সব মিটিয়ে দিতে পারি! শুধু পুলিশের বড় কর্তাকে একবার বলা, তাহলেই তিনি পুলিশদের সরিয়ে নেবেন। আপনি যদি লাতিন ভাষা জানেন তো একবার দয়া করে যান ; গিয়ে ঐ ভদ্রলোককে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন"—

"জোর করে দরজাটা খুলেছিলো কা'রা ?"

—"কেউ নয় মশাই, আমিই খুলেছিলাম, ওটা আমারই কর্তব্য।"

ব্যাপারটাতে মাথা গলানোই ঠিক করে ফেললাম। সটান ঢুকে গেলাম তাঁর ঘরে। ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দিলাম কেন লোকগুলো এই ঝামেলা করছে। ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, ওঁর সঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি পুরুষ কি নারী বোঝবার উপায় নেই। কারণ, তিনিও ওঁরই মত অফিসারের পোষাক পরা। এই বলে তিনি একটা পাশপোর্ট বের করে দেখালেন। তাতে 'কার্ডিন্যাল আলবানি'র সই করা নাম—উনি হাঙ্গেরিয়ান রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন, জরুরী কাগজপত্র নিয়ে 'পারমা'তে চলেছেন। আমি লাতিন ভাষাতেই ওঁকে বললাম, —"ক্যাপ্টেন অনুমতি করুন আপনার হোয়ে আমি বিশপের কাছে যাই, গিয়ে জানাই, তাঁর অনুচরেরা আপনার সঙ্গে কি জঘন্য ব্যবহার করেছে। আর এই ঝামেলাও একেবারে চুকিয়ে আসি।"

অসভ্য পুলিশগুলো যে ভাবে একজন সম্ভ্রান্ত আগন্তুক ভদ্রলোককে অপদস্থ করলে তার জন্যে রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলছিল। আর সেই সঙ্গে সমস্ত মনও অস্থির হোয়ে উঠেছিলো ব্যাপারটার আড়ালে মধুর রহস্যটি জানার কৌতূহলে।

বিশপের কাছে সুবিধা করতে না পেরে সোজা গেলাম জেনারেল স্পাডার কাছে। তখন তাঁরই অধীনে ছিলো এই শহরটা। তিনি সব শুনে অত্যন্ত বিরক্ত আর ক্ষুব্ধ হোয়ে মন্তব্য করলেন, ধর্মযাজকদের কাজ হোলো ঈশ্বর আর পরলোক নিয়ে। ইহলোক নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন অধিকার তাদের নেই। কথা দিলেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি সব ব্যবস্থা করবেন। আর আমার সঙ্গেই লোক পাঠালেন হোটেল থেকে পুলিশদের সরিয়ে নেবার নির্দেশ দিয়ে।

হোটেলে ফিরে খোলা দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। ওই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করলাম, ওঁদের সঙ্গে একত্রে প্রাতরাশ করতে পারি কি না।

—"আমার সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করুন"—ক্যাপ্টেন বললেন।

—"ভদ্র, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ যদিও পাইনি, তবু আপনাদের টেবিলে তৃতীয়ের স্থান আমি নিতে পারি কি ?"—ফরাসী ভাষায় বেশ কায়দা করেই বললাম।

একগোছা সদ্যফোটা ফুলের মত তাজা, ভারী মিষ্টি একখানি মুখ বেরিয়ে এলো। মাথায় ছেলেদের টুপি। তার তলা থেকে এলোমেলো চুলের গুচ্ছ উঁকি দিচ্ছে। হাসিমুখে সম্মতি জানালে। আমি অর্ডার দিয়ে এলাম প্রাতরাশের। ঘণ্টাখানেক পর ওয়েটার [illegible]

রহস্যময়ী সঙ্গিনীটি হোলেন এক অপূর্ব সুন্দরী ফরাসী মহিলা। ঘন নীল অফিসারের পোষাকে ওঁকে আরও মিষ্টি আরও রূপসী দেখাচ্ছিল। সঙ্গের অভিভাবকটির বয়স ষাটের নীচে নয়—অথচ আমার তেইশ বছরের মন কিছুতেই তাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ মানতে পারছিল না। কি দারুণ বৈষম্য ! তার উপর মেয়েটি ফরাসী ছাড়া কোনো ভাষাই জানে না আর ভদ্রলোকটি ফরাসী একবর্ণও বোঝেন না। আর একটু সাহসে ভর করে বললাম ক্যাপ্টেনকে যে তিনি যখন 'পারমা'তেই যাচ্ছেন, তখন ট্রেণেতে আমার কামরার বাকী দুটো সিট যদি ওঁরা নেন তাহলে বাধিত হই। তিনি বললেন,—"আমি তো আনন্দের সঙ্গেই রাজী ; কিন্তু হেনরিয়েটাকে একবার জিজ্ঞাসা করুন।"

—"ভদ্রে, আপনার সঙ্গে 'পারমা' অবধি একসঙ্গে যাবার সৌভাগ্য কি আমার হবে ?" আবার সেই ফরাসী কায়দা !

—"খুব-খুব রাজী···অন্ততঃ কথা বলেও বাঁচবো, কয়েক দিন কি দুর্ভোগই না গেছে আমার"—'আমার ট্রেণের কামরাটা' এতক্ষণ অবধি আমার কল্পনাতেই বিরাজ করছিলো—এবার তাকে সত্যে রূপায়িত করতে চললাম। পরদিনই যাত্রা স্থির হলো।

ট্রেণ ছাড়বার কিছুক্ষণ পর থেকে আমার একটু অস্বোয়াস্তি হতে লাগলো। হাঙ্গেরিয়ান ভদ্রলোক বেচারী চুপ করে বসে আছেন এক ধারে, আমাদের একটি কথাও ওঁর বোধগম্য হচ্ছে না। তাই মেয়েটি যখনই কিছু হাসির অথবা মজার কথা বলছিলো তখনই সেটা আমি লাতিনে অনুবাদ করে ওঁকে শোনাতে লাগলাম। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, ওঁর মুখ ক্রমেই গম্ভীর হোয়ে উঠছে।

ফরাসী ভাষায় সেই প্রথম আমি ফরাসী মহিলার সঙ্গে কথা বললাম। মেয়েটির কথা বলার ভঙ্গী ভারী চমৎকার ! সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের মত। কিন্তু আমার ধারণা ছিলো ও নিশ্চয়ই খুব বেপরোয়া ধরণের মেয়ে। মনে মনে চাইছিলামও তাই যেন হয়। কারণ, ক্রমেই বুঝতে পারছিলাম যে আমার সমস্ত মন চাইছে ওই বৃদ্ধের কবল থেকে মেয়েটিকে অপহরণ করতে। অবশ্য বৃদ্ধের মনে যাতে খুব একটা আঘাত না লাগে তার দিকেও আমার দৃষ্টি ছিলো। কেন জানি না এই বৃদ্ধ মিলিটারী অফিসারটিকে দেখেই আমার শ্রদ্ধা জেগেছিলো ওঁর উপর। কিন্তু মেয়েটি কেমন ধরণের ? পুরুষের বেশ পরে থাকে, সঙ্গে না আছে কোনো মালপত্র, না আছে কোনো মেয়েলি প্রসাধন-সজ্জা কিংবা টুকিটাকি কিছু—একটা সেমিজ অবধি নেই আশ্চর্য্য, ক্যাপ্টেনের সার্ট নিয়ে পরে থাকে। সমস্ত ব্যাপারটা যেন দারুণ হেঁয়ালির মত—তাইতেই আমার উৎসাহও বাড়তে লাগলো।

রাত্রিবেলা বেশ একটি উপাদেয় ভোজের পর সবাই মিলে আগুনের ধারে বসে ছিলাম। তখন কৌতূহল আর চাপতে না পেরে সাহসে ভর দিয়ে মেয়েটিকে সোজা জিজ্ঞাসা করে ফেললাম, ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সঙ্গ কি করে নিলো ? ওঁকে তো ওর বাবার বয়সী মনে হয়, তবে ?

—"যদি জানতেই চান তো ওঁকেই বলুন সমস্ত কাহিনী আপনাকে শোনাতে। দেখবেন যেন কিছু বাদ না যায়"—মেয়েটি হাসতে হাসতে বললো।

তখন ক্যাপ্টেনকে বোঝানো গেল যে, কাহিনীটা বলায় মেয়েটি

একটুও আপত্তি নেই, তখন তিনি শুরু করলেন বলতে। "আমার ছ' মাসের ছুটী ছিলো। তাই ভাবলাম, রোমেতেই ছুটিটা কাটিয়ে আসবো। আমার ধারণা ছিলো, শিক্ষিত সমাজে সবাই বুঝি লাতিন ভাষা জানে। কিন্তু যখন দেখলাম আমার ধারণা একেবারেই মিথ্যে, তখন বুঝতেই পারছেন কি অসহ্য অবস্থা আমার হোলো। কোনো রকমে একটি মাস কাটার পর কার্ডিন্যাল আলবেনী যখন আমাকে কাজের জন্য পারমা পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন, তখন আমি যেন বাঁচলাম। ওই সময় ক'দিনের জন্য এক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে একদিন জেটির ধারে বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় দেখলাম এক বৃদ্ধ অফিসার আর এই মেয়েটি একটা নৌকা থেকে নামলো। তখনও ওর ঠিক এই রকম পুরুষের বেশ। তা' হোক, মেয়েটির চেহারাটা ভারী ভালো লাগলো। অবশ্য ভুলেই যেতাম, পরে যদি না হোটেলে ফিরে দেখতাম আমার সামনের ঘরটাই ওরা দখল করেছে। খোলা জানলা দিয়ে দেখলাম, ওরা মুখোমুখী খেতে বসেছে—লক্ষ্য করলাম, দুজনেই নিঃশব্দে খেয়ে গেল, একটিও কথা না বলে। খাবার পর মেয়েটি উঠে কোথায় বেরিয়ে গেল আর অফিসারটি চুপচাপ বসে কী পড়তে লাগলেন। পরদিন দেখলাম, মেয়েটি একলা, অফিসারটি কোথায় বেরিয়েছেন। সুযোগ বুঝে আমি আমার চাকরকে দিয়ে ওকে লিখে পাঠালাম, যদি ও আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাতে রাজী হয়, তাহলে আমি ওকে দশ সেকুইন দেবো। মেয়েটি বলে পাঠালে, আজ খাবার পরেই ওরা রোমে চলে যাচ্ছে। ইচ্ছা হোলে আমি সেখানে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি।

"রোমে ফিরে এলাম। ওই মেয়েটির চিন্তা নিয়ে আর একটুও মাথা ঘামাই নি। শেষে যখন আমার চলে যাবার আর দুদিন মাত্র বাকী, এমন সময় আমার চাকর এসে বললে, মেয়েটিকে দেখেছে, কোথায় উঠেছে তা'ও দেখেছে। আর এখনও সেই অফিসারটির সঙ্গে আছে। আমি বলে পাঠালাম মেয়েটিকে যেমন করে হোক জানাতে যে আমি কালই রোম থেকে চলে যাচ্ছি। মেয়েটি জানালে ঠিক ক'টার সময় কোন গাড়ীতে আমি যাবো জানলে ও আমার সঙ্গে শহরের বাইরে দেখা করতে পারে···আমার সঙ্গে গাড়ীতে উঠে পড়তেও পারে। স্থান, কাল সব জানলাম। যথাসময়ে মেয়েটি এসে গাড়ীতে উঠে পড়লো··· ব্যস, সেই থেকে আমার সঙ্গেই আছে। ওর কাছ থেকে এটুকু বুঝেছি যে ও আমার সঙ্গেই 'পারমা' যেতে চায়, সেখানে ওর কি কাজ আছে···আর রোমেতে ও আর ফিরতে চায় না। বুঝতেই পারছো পরস্পরের কথা না বোঝায় কি অসুবিধাতেই পড়তে হোয়েছে। এমন কি, এটুকুও আমি ওকে বোঝাতে পারিনি যে যদি কেউ আমাদের পিছু নিয়ে থাকে, ওকে যদি জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায় আমি কিছুই করতে পারবো না। আমি একেবারেই ওর কোনো পরিচয় জানি না। কে, কোথা থেকে এলো কিছুই না—শুধু জানি ওর নাম হেনরিয়েটা। ও ফরাসী কি না আসলে তা'ও ঠিক জানি না। তবে এটা দেখেছি অত্যন্ত শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির মেয়ে, তাছাড়া মনে হয় বেশ উচ্চশিক্ষিতা। মেয়েটির উপস্থিত বুদ্ধিও যেমন সাহসও তেমনি। আপনাকে যদি ও সেটি শোনান তাহলে আমি কত যে খুশী হই, বলতে পারি না। সত্যিই ওর ওপর আমার একটা টান পড়ে গেছে, ওর অকৃত্রিম বন্ধুই হোতে চাই আমি—'পারমা'তে ও চলে যাবে মনে হোলেও আমার ভীষণ কষ্ট হয়। ওকে বলুন আমি ত্রিশটি সেকুইন উপহার দিতে চাই—সাধ্য থাকলে আরও বেশী দিতাম।"
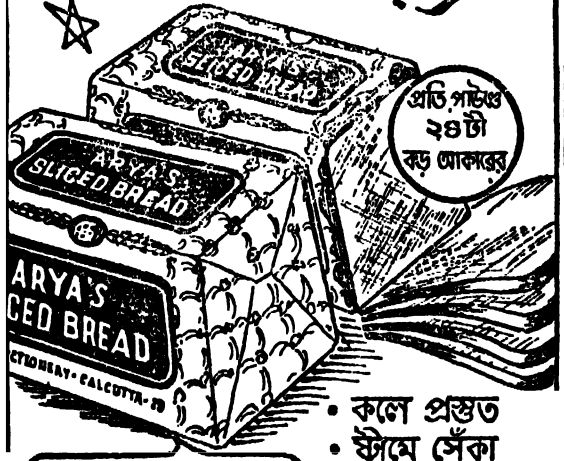
ক্যাপ্টেনের কাছে শোনা কাহিনীটা হেনরিয়াটাকে অনুবাদ করে শোনাতে গিয়ে দেখলাম ওর মুখ রাঙা হোয়ে উঠেছে। কিন্তু দ্বিধাহীন ভাবে সব কাহিনীটাকে স্বীকার করলে। তারপর আমাকে বললে "আপনি ওঁকে বলুন, যে জন্যে মিথ্যা কথা বলতে পারবো না ঠিক সেই জন্যেই সত্য কাহিনীটাও বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আর ঐ ত্রিশ সেকুইনের আধখানা সেকুইনও আমি নিতে পারবো না—উনি জোর করলে শুধু দুঃখই পাবো। 'পারমা' তে পৌঁছে আমি ওঁর কাছে বিদায় নিতে চাই, আর আমার ইচ্ছামত পথেই আমি যেতে চাই। উনি যেন জানতে না চান আর ভবিষ্যতে যদি কখনও আমার সঙ্গে দেখা হয়, তবে দয়া করে না চেনার ভাণ করলেই আমি সব চেয়ে অনুগৃহীত হবো।"

বেচারী ক্যাপ্টেনটি সব শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হোলেন মনে হোলো। জানতে চাইলেন মেয়েটির কোনো কিছুর প্রয়োজন বা অভাব আছে কি না। উত্তরে হেনরিয়েটা জানালে, তার জন্যে ওঁর ব্যস্ত হবার একটুও দরকার নেই।

এর পর কথাবার্ত্তা আর মোটেই জমলো না! আমিও উঠে পড়ে

ওদের 'শুভরাত্রি' জানালাম। লক্ষ্য করলাম, হেনরিয়েটার মুখ আরক্ত হোয়ে উঠেছে।

মেয়েটি কে? নিজের মনেই ভাবতে লাগলাম, কি আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ ওর মধ্যে? ওর ওই পবিত্র সরল স্বভাব; ভদ্র সংযত ব্যবহারের সঙ্গে এমন চরম উচ্ছৃঙ্খলতা কেমন করে সম্ভব হয়? কে ওর জন্যে 'পারমা'তে অপেক্ষা করে আছে? ওর প্রেমিক না ওর স্বামী? ওখানকার কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে কি ও? কে জানে, রোমে সেই অফিসারটির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে কি না? যাই হোক, ওদের সঙ্গে আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্যটা মেয়েটিকে জানাতেই হবে। নাহলে এ সবই তো পণ্ডশ্রম।

পরদিন এক সময় সুযোগ বুঝে জিজ্ঞাসা করলাম, "ক্যাপ্টেনকে যে সব আদেশ করলেন আমার উপরও ঐ একই আদেশ জারী করবেন নাকি?" উত্তরে বললে,—"আদেশ বলছেন কেন? আদেশ করবার কি অধিকার আমার? ও শুধু অনুরোধ। আমি ওঁকে অনুগ্রহ করে আমার সম্বন্ধে নির্লিপ্ত থাকতে অনুরোধ জানিয়েছি। আপনিও যদি আমার বন্ধু হন তবে আপনাকেও ওই একই অনুরোধ আমার"—

—"ভদ্রে, যা আপনি বললেন তা' মেনে চলা ফরাসীদের পক্ষে সম্ভব হোলেও একজন ইতালীয়ের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। একই শহরে থাকবো অথচ দেখা-সাক্ষাৎ করবো না? আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাহলে আপনার উপরই নির্ভর করছে আমার এখানেই বিদায় নেওয়া কিম্বা আপনাদের সঙ্গে যাওয়া; যদি বলেন আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি, তাহলে গোড়াতেই সাবধান করে রাখছি শুধু বন্ধুত্বেই আমি তৃপ্ত নই—বন্ধুত্বের চেয়েও গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই—কথা দিন আমাকে? ভয় নেই, ক্যাপ্টেনের মনে কিছুমাত্রও আঘাত দেবো না; তিনি বুঝেছেন আপনার প্রতি আমার মনোভাবটা কি। আশ্বস্তই হবেন, বিদায় বেলায় আমার মত নিরাপদ আশ্রয়ে আপনাকে রেখে গেলে। কিন্তু ও কি আপনি হাসছেন কেন?"

—"হাসবো না? আশ্চর্য্য লোক আপনি! এমনি করে কথা নিচ্ছেন একটা মেয়ের কাছে—একেবারে সোজা খাঁড়া উঁচিয়ে? একটু বিনয়, একটু কোমলতা, একটু রঙ, একটু রস—একেবারে কিছুই না?" উচ্চ মধুর কণ্ঠে হেসে উঠলো হেনরিয়েটা।

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি, আমি কোমল নই, আমি রসিক নই, আমি বীর নই—শুধু হৃদয়তাপের ভাপে-ভরা আমার সত্তা—শুধু জানি ভোগ করতে—বলুন, বলুন শীগগির, নষ্ট করবার মত সময় কই?"

—"চলুন আমাদের সঙ্গে পারমা অবধি," উত্তর এলো।

ওর হাতটিতে আমি চুম্বন করলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই ক্যাপ্টেন এসে পড়লেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই উনি এটা নিলেন। তার পর আমাকে এক ধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে জানালেন যে, ওঁর মনে হয় ওঁর একলাই পারমাতে চলে যাওয়া উচিত। আমরা না হয় দু'-একদিন পরে পৌছাবো। তাই ঠিক হোলো। বিদায় ব্যাপারটাও খুব সহজ আর স্বাভাবিক ভাবেই ঘটলো।

করলাম···অর্থহীন, বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় ও পারমাতে কি করতো? স্বীকার করলে হেনরিয়েটা যে নানারকম অসুবিধায় ওকে পড়তে হোতো। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও বললে যে, ও জানতো আমি ওকে দেখবোই—ও বুঝেছিলো যে আমি ওর বিপদে পাশে দাঁড়াবোই। একটু থেমে, একটু দ্বিধার সঙ্গে বললে আমি যেন ওকে খারাপ না ভাবি, যা কিছু হোয়ে গেছে সে সব ঘটনার জন্য দায়ী ওর শ্বশুর আর স্বামী। দুজনেই শুধু নিষ্ঠুর নয়, নরপিশাচ।

'পারমা'তে এসে আমি আমার মায়ের কুমারীবেলার পদবী 'ফারুসী' নামের সঙ্গে যোগ করলাম। আর হেনরিয়েটা নাম নিলে অ্যানি দ্য' আরসি। আমরা একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। একটি ফরাসী ছোকরা চাকরেরও ব্যবস্থা করে ফেললাম। তারপর বাজারে ঘুরতে ঘুরতে বড় একটা দোকানে ঢুকে চাইলাম চব্বিশ সেমিজ করবার মত খুব ভালো কাপড়, কয়েকটা পেটিকোট, কিছু দামী মসলিন রুমালের জন্য। তারপর দোকানীকে আমার ঠিকানা দিয়ে একজন দর্জ্জি পাঠাতে বলে এলাম। বেরিয়ে এসে আর একটা দোকানেও কিছু টুকিটাকী কিনে কতকগুলি ভালো সিল্কের আর সুতির মোজাও কিনে নিলাম।

কি অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তটি এলো! আগে থেকে এ-সব কেনার ব্যাপার আমি কিছুই বলিনি হেনরিয়েটাকে। কিন্তু জিনিষগুলি দেখে কি গভীর তৃপ্তি আর খুশীর হাসি ওর মুখে ফুটে উঠলো! এতটুকু উচ্ছ্বাসের আড়ম্বর ছিল না—ছিলো কৃতজ্ঞতা ওর প্রকাশভঙ্গীতে—পছন্দের আর রুচির প্রশংসায়। আনন্দের উচ্ছ্বাস ছিল না কিন্তু খুশীর মিষ্টি হাসি আরও মধুর হোয়ে ছুটে উঠেছিলো।

দর্জ্জিদের হাঙ্গামা চুকে গেলে দুজনে টেবিলে মুখোমুখি খেতে বসেছি, এমন সময় ক্যাপ্টেন এসে হাজির। হেনরিয়েটা ছোট্ট মেয়ের মত ছুটে গিয়ে "বাবা" বলে ডেকে ওর হাত ধরে নিয়ে এলো। সবাই মিলে খুব পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। ক্যাপ্টেন দেখলাম সত্যিই খুব খুশী হোয়েছেন, সেই বেপরোয়া মেয়েটিকে এমন নিশ্চিন্ত পরিবেশে দেখে। সত্যিই ওকে আন্তরিক ভালোবাসতেন উনি।

সন্ধ্যায় খাবার পর দুজনে বসে গল্প করছি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম হেনরিয়েটার মুখখানি অত্যন্ত ম্লান, বিষণ্ণ। কারণ জানতে চাইলে ও মৃদুস্বরে বললে,—"বন্ধু, তুমি তো আজ অনেক টাকা আমার জন্যে খরচ করলে—সে কি আমার কাছ থেকে আরও বেশী মনোযোগের আশায়? আমি বিশ্বাস করি না সেকথা। কিন্তু জেনো আজ তোমাকে যত ভালোবাসি গত কালও ঠিক এমনিই ভালোবাসতাম—কিছুমাত্র কম নয়। তোমাকে আমি ভালোবাসি, সমস্ত মন দিয়েই ভালোবাসি। নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ ছাড়া যা কিছু তুমি আমাকে দাও তার আর কোনো মূল্যই আমার কাছে নেই। শুধু আমাকে মনে করে এনেছো এই চিন্তাটুকুই তার দাম। কিন্তু যদি তুমি সত্যিই ধনী না হও তাবো তো কতখানি আত্মগ্লানি আমার বাড়বে···অকারণ, অনর্থক তোমার এই অপব্যয়?"

তাঁর রূপের কথা এঁর মুখে ধরে না

—যার কোমল মুখের কমনীয় প্রসাধন

বিনামূল্যে পুস্তিকা :
আমাদের প্রসাধন-পুস্তিকা 'লাভ্‌লিয়ার উইথ্ পণ্ড্‌স' চেয়ে পাঠান। মুখশ্রী ও সৌন্দর্য রক্ষা সম্বন্ধে অনেক কাজের কথা এতে পাবেন। ঠিকানা—পোঃ বক্স ১৬১২, বোম্বাই ১।

POND'S
cold
cream

P 4440

আমি ধনী। আমি জানি তুমি আমাকে কোনো দিনই নিঃস্ব করবে না। কিন্তু আজ আর কোনো চিন্তা নয় শুধু বলো তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না—কখনও না, কোনো দিনও না—কথা দাও—"

—"যতদূর সাধ্য চেষ্টা করবো। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে বলো? তুমি কি সম্পূর্ণ স্বাধীন? না তোমাকে কারো উপর নির্ভর করতে হয়?"

—"স্বাধীন—একেবারে পুরোপুরি স্বাধীন—"

—"ভালো, অভিনন্দন জানাই তোমাকে। কিন্তু তার বেশী যে কিছুই বলতে পারি না। প্রতি মুহূর্ত্তে ভয় করে, কেউ হয়তো দেখে ফেলবে, চিনে ফেলবে আর ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তোমার বাহুবন্ধন থেকে—"

—"অমন করে বোলো না—সত্যিই কি তোমার মনে হয় এমন বিপদও ঘটতে পারে?"

—"না, অবশ্য পরিচিত কেউ যদি আমাকে দেখে না ফেলে—"

—"যে অফিসারটি রোমে তোমার সঙ্গে ছিলেন তাঁর কাছে ধরা পড়ার ভয় করছো?"

—"একটুও না—তিনি তো আমার শ্বশুর—আমার খোঁজ নেবার জন্যে তাঁর একটুও মাথাব্যথা নেই, এ আমি জানি। বরং আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তিনি বেঁচেছেন। কেন ছেলেদের পোষাক পরে পাগলের মত ব্যবহার করেছি জানো—উনি আমাকে জোর করে একটা কনভেণ্টে ভর্ত্তি করাতে চেয়েছিলেন, আমার আন্তরিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও। কিন্তু বন্ধু, আর নয় আর তুমি জানতে চেয়ো না আমার কাহিনী। ও অমনিই রহস্যে ঢাকা থাক।"

—"তোমার এই গোপনতাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু মানসী, আমার মনের কোণ থেকে আজ ভয়ের কাঁটা সরিয়ে ফ্যালো, শুধু ভালোবাসার ফুল ফোটাও—শুধু ভালোবাসো।

একটানা আনন্দের স্রোতে কাটতে লাগলো দিনগুলি—কেটেই যেতো হয়ত চিরদিন. কিন্তু কুক্ষণে দেখা হোলো, পরিচয় হোলো, কুঁজো ম্যাসিয়ে হ্যাবোয়ার সঙ্গে। একটা লাইব্রেরীতে এই ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। ওঁর কথাবার্ত্তা, পরিহাসপ্রিয়তা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি আমাকে এত মুগ্ধ করলো যে, সে পরিচয় লাইব্রেরীতেই শুধু সীমাবদ্ধ রইলো না, আমাদের হোটেলের ছোট্টো বাসাটির দরজাও অবারিত রইলো ওঁর জন্য। কুক্ষণে ওর সঙ্গে হেনরিয়েটার পরিচয় করালাম।

গান-পাগল ছিলো হেনরিয়েটা। আমি অপেরাতে নিয়ে যেতে চাইতাম। কিন্তু ভয়েই সারা হোতো ও, পাছে কেউ দেখে ফ্যালে। তাই পিছনের বক্স রিজার্ভ করতাম, কিন্তু সুন্দরী মেয়েরা সহজেই যে চোখে পড়ে। ভয়ের চোটে রুজ অবধি মাখতো না বেচারা—বক্সে আলো তো জ্বালাতামই না। কিন্তু নাছোড় হ্যাবোয়া হেনরিয়েটাকে নিমন্ত্রণ করবেই। শেষে একদিন বললে ওর বাড়ীতে খেতে, আর কোনো অতিথি নয় শুধু আমরা। কিন্তু যখন পৌছুলাম, দেখি বাড়ী-ভর্ত্তি নিমন্ত্রিত। আড়চোখে দেখলাম হেনরিয়েটা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছে মনের উত্তেজনায়। কিন্তু সে সন্ধ্যাটা নির্ব্বিঘ্নেই

হেনরিয়েটার সব চেয়ে ভয় ছিলো অভিজাত সমাজে মিশতে! কিন্তু ক্রমেই অসতর্ক হওয়ার ফলে আর ওই নাছোড় হ্যাবোয়ার পাল্লায় পড়ে রাজসভার উৎসবে পর্য্যন্ত যোগ দিলাম। আর সেই হোলো আমাদের কাল। সেখানে একটি বেশ সুপুরুষ অশ্বারোহী সৈনিক রাজ-পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছিলো। তার দৃষ্টি বার বার দেখি আমার পার্শ্ববর্ত্তিনীটির উপর পড়ছে। একবার আমাদের মুখোমুখী হওয়াতে আমরা পরস্পরকে অভিবাদন জানালাম। লোকটি কিন্তু তখনি হ্যাবোয়াকে একান্তে ডেকে নিয়ে মৃদু স্বরে কি সব কথাবার্ত্তা বলতে লাগলো। তার পর আমরা বিদায় নেবার আগে আবার এসে হাজির হোলো। অতি বিনীত ভাবে হেনরিয়েটাকে লক্ষ্য করে বললে, ওকে যেন চেনে বলেই মনে হচ্ছে।—"কিন্তু আপনাকে তো কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না"—হেনরিয়েটা অত্যন্ত কঠিন স্বরে বললো। "ঠিক আছে, কিছু মনে করবেন না, আমাকে মাপ করবেন—"

হ্যাবোয়া এসে বললে লোকটির নাম দ্য আঁতোয়ান। ও বলছিলো হেনরিয়েটাকে চেনে, তাই ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করছিলো। হ্যাবোয়া অবশ্য বলেছিলো চেনেই যদি, তবে আবার পরিচয়ের কি দরকার? কিন্তু তা শোনেনি ও।

স্পষ্ট দেখলাম হেনরিয়েটার চোখে-মুখে একটি অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, দ্য আঁতোয়ানকে যে না চেনার ভাণ করলো সেটা কি সত্যি, না ইচ্ছে করেই চিনতে চাইলো না?

—"চিনি না ঠিকই" হেনরিয়েটা বললে, "তবে ওর নামটা চেনা—খুবই চেনা। প্রভেন্সে ওরা বেশ নামকরা পরিবার, কিন্তু ওই লোকটিকে এর আগে কখনও দেখিনি।"

ফিরে এলাম হোটেলে। কিন্তু হেনরিয়েটাকে দেখে আমার মনের সমস্ত আনন্দ নিমেষে অন্তর্হিত হোলো। কি ত্রস্ত, চঞ্চল ভাব! মিষ্টি হাসিভরা মুখখানি কোনো অজানা ভয়ে ম্লান হোয়ে গেছে। এক অশুভ কালো ছায়া আমার মনের সব আলো যেন ঢেকে দিলো।

সেই সন্ধ্যাতেই আমার চাকর এসে আমাকে একখানা চিঠি দিলে। বললে, পত্রবাহক অপেক্ষা করছে উত্তরের। চিঠিখানা হাতে নিয়ে হেনরিয়েটার কাছে গেলাম।

—"হেনরিয়েটা, কেন এই চিঠিটা এলো বলতো? আমার একটুও ভালো লাগছে না, খালি মনে হচ্ছে যেন কোনো অশুভ ইঙ্গিত এটা ব'য়ে এনেছে। আমার খুলতেও ইচ্ছে হচ্ছে না।"

আমার হাত থেকে চিঠিখানি নিয়ে হেনরিয়েটা খুলে ফেললো! আমাকেই সম্বোধন করে লেখা—

—"অন্তত কয়েক মিনিটের জন্যেও দয়া করে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আমার বাড়ীতে কিম্বা আপনার বাড়ীতে যেখানে আপনার ইচ্ছা। কয়েকটি বিশেষ কথা আছে—যা আপনার শোনা একান্ত প্রয়োজন।

ইতি

দ্য আঁতোয়ান।"

[ক্রমশঃ।

ভাস্কর

পার্ক ষ্ট্রীটের একটি তিনতলা বাড়ীর দোতলায় একটি ফ্ল্যাট। দুইখানি ঘর, একখানি বড় ও একখানি ছোট। ছোটঘরটি শয়নঘর, বড়টি ড্রইংরুম। সামনে একটি প্রকাণ্ড বারান্দা, পিছনে রান্নাঘর ও বাথরুম। ঘর দুইখানি আধুনিক রুচি অনুযায়ী সুন্দর করিয়া সাজানো। সোফা, সেটি, কার্পেট, টেবল-হারমনিয়ম, রেডিও, সবই আছে। একটি খোলা শেলফে অনেকগুলি বাংলা বই সুন্দর করিয়া সাজানো। একটি কাচের আলমারিতে ইংরাজি ও বাংলা বিভিন্ন বিষয়ের অনেকগুলি বই। দরজায় ও জানালায় শান্তিনিকেতনের পরদা। শোবার ঘরে একখানি সুদৃশ্য খাট। বালিশের পাশে একটি বেড-সুইচ। খাটের পাশে একটি ছোট টেবিলে কয়েকখানি বই আর সাময়িক পত্র, একটি টেবল-ল্যাম্প, এবং ঢাকাদেওয়া একটি জলের গ্লাস। রান্নাঘরে কিছুই নাই বলিলেই চলে। একটি ছোট ইলেক্‌ট্রিক হীটার, প্রয়োজন মত জল, দুধ প্রভৃতি গরম করা যায় বা ডিম সিদ্ধ করা বা ভাজা চলে। কিছু ফলও আছে একখানি প্লেটে। ছুরি, কাঁটা, একটি বিস্কুটের টিন ও মাখনের টিনও আছে। বেশ বোঝা যায়, রান্নার কোন আয়োজন নাই। একটি ঠিকা চাকর সকাল-বিকাল তিন ঘণ্টা করিয়া থাকে, বাহিরে কাজকর্ম করে, জুতা পালিশ করে। কাজ না থাকিলে ঘরের বাহিরে দরজার পাশে টুল পাতিয়া বসিয়া থাকে। একটি আয়া আছে, সে-ই প্রায় সর্বদা বাড়ীতে থাকে। রান্নাঘরের এক পাশে মেঝেয় বিছানা করিয়া শোয়।

ড্রইং-রুমের বাহিরে দরজার পাশে একখানি ি.ঃলের ফলক দেওয়ালে বসানো আছে। তাহাতে লেখা—মিস্ হেমলতা পাল, ডি, ডি, এস-সি, তাহার নীচে লেখা—দাম্পত্য এবং রন্ধন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। দরজার অপর পাশে ঐরূপ আর একটি ফলকে ঐ কথাগুলিই ইংরাজি করিয়া লেখা—Miss H. Paul. D. D. Sc. Specialist in Cooking and Conjugal Science. ডি, ডি, এস-সি, কথার অর্থ—ডক্টর অফ ডোমেষ্টিক সায়ান্স।

মিস পাল সম্প্রতি বিদেশ হইতে উক্ত ডিগ্রী লইয়া দেশে ফিরিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ডোমেষ্টিক সায়ান্সের চেয়ার প্রতিষ্ঠিত হইলেই তিনি সেই চেয়ারে উপবিষ্ট হইবেন, এইরূপ আশা আছে। আপাতত প্রাইভেট প্র্যাকটিস করিতেছেন। কনসালটেশন ফি ষোল টাকা। স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে আট টাকাও লইয়া থাকেন। মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রিকাদিতে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন এবং সুযোগ পাইলেই কোন কোন সভা-সমিতিতে বক্তৃতাও করিয়া থাকেন।

মিস পাল অবিবাহিতা। বিবাহ কোন দিন করিবেন, এ ইচ্ছা তাঁহার মনেও আসে না। প্র্যাকটিস্ ও কয়েক জন বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ, ইহাই তাঁহার সামাজিক জীবন। ফ্ল্যাটে একাকী থাকেন। রান্নার হাঙ্গামা নাই। নিকটবর্তী একটি হোটেলের সহিত ব্যবস্থা আছে, দিনে চার বার আহার্য সাজাইয়া দিয়া যায়। বিশেষ কোন প্রয়োজন হইলে আয়া আছে, ইলেক্‌ট্রিক হীটার আছে।

মিস পালের নির্ঝঞ্ঝাট স্বচ্ছন্দ জীবন সুমধুর ছন্দে চলিয়াছে।

২

একদিন প্রাতে মিস পাল চা খাইতে বসিয়াছেন। হোটেল হইতে একটি লোক একটি বড় ট্রে-তে সব সরঞ্জাম গুছাইয়া আনিয়া একটি ছোট টেবিলের উপর রাখিয়া গিয়াছে। চা, চিনি, দুধ প্রভৃতি ছাড়া কিছু খাদ্যও আছে। দু'খানি টোষ্ট, একটি ডিমের ওমলেট, চারখানা স্যাণ্ডউইচ, চারখানা বিস্কুট, একটি কলা ও একটি আপেল। পছন্দমত দুধ ও চিনি মিশাইয়া চা তৈয়ার করিয়া কেবল এক চুমুক খাইয়াছেন, এমন সময়ে ফোন বাজিয়া উঠিল। মিস পাল আয়াকে ডাকিয়া বলিলেন, ফোনটা ধর। যদি 'কল' হয়, তবে রিসিভার নামিয়ে রেখে আমাকে বলবে। আর যদি অন্য কেউ হয়, তবে বলবে এক ঘণ্টা পরে ফোন করতে।

আয়া ফোন ধরিল, হ্যালো?

ফোন: এটা কি ডাঃ পালের বাড়ী?

আয়া: হ্যাঁ। আপনার কি দরকার বলুন?

ফোন: এখনই একটা 'কল' দেব। ওঁকে একবার আসতে হবে।

আয়া: একটু ধরুন।

আয়া মিস পালকে বলিল, একটা 'কল' আছে।

মিস পাল ন্যাপকিনে হাত মুছিয়া উঠিয়া গিয়া ফোন ধরিলেন বলিলেন, হ্যালো, আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?

ভবানীপুর, বেলতলা থেকে।

কি কেস বলুন তো?

মাছ।

ও, আচ্ছা। আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই যাচ্ছি। ঠিকানাট বলুন।

ঠিকানা জানিয়া লইয়া মিস পাল আবার চায়ের টেবিলে বসিলে এবং একটু তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া সলমা-চুমকি-বসানো লা রং-এর গোল ব্যাগ হাতে করিয়া চাকরকে বলিলেন, গাড়ী ঠি আছে?

চাকর বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

মিস পালের গাড়ী সত্বরই বেলতলার একটি বাড়ীর সামে আসিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর কর্তা বাড়ীতে ছিলেন না। একটি ছেে আসিয়া মিস পালকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। গৃহি আসিয়া নমস্কার করিলেন এবং একখানি চেয়ার আনিয়া তাহাে মিস পালকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। মিস পাল বসিয়া জিজ্ঞা

করিলেন, আপনার স্বামী কি করেন? গৃহিণী বলিলেন, উনি মহেন্দ্র একাডেমির অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার।

মিস পাল বলিলেন, আপনাদের বাড়ীতে কত জন লোক?

এই ধরুন, নয়-দশ জন হবেন।

বেশ। এইবার বলুন, কি ব্যাপার।

গৃহিণী একটু দূরে বারান্দার দিকে তাকাইয়া মিস পালকে বলিলেন, ঐ দেখুন।

হ্যাঁ। একটা মস্ত কাতলা মাছ, ছয় সাত সের হবে।

গৃহিণী বলিলেন, তা হবে। উনি রোজ এমনি ওজনের মাছ এনে ফেলবেন। কোন দিন কাতলা, কোন দিন রুই, কোন দিন একটা আটসেরি চাঙ। কোন দিন দশ-বারো গণ্ডা গলদা চিংড়ী, কোন দিন সাত-আটটা ইলিশ!

বেশ, তার পর?

এখন আমি করি কি? এ-সব রাঁধবো কি করে?

একজ্যাক্টলি! সেই জন্যই তো আমরা আছি। ধরুন, আজকের এই কাতলা মাছ। আগে ছুরি দিয়ে বা চামচে দিয়ে বা ঐ রকম কিছু দিয়ে আঁশ ছাড়িয়ে ফেলুন। বিকল্পে, আগে কেটে নিয়ে পরে আঁশ ছাড়াতেও পারেন। ঘাড়ের কাছে কেটে মুড়োটা আলাদা করুন। যদি বঁটিতে না কাটতে পারেন, তাহলে বঁটির গোড়ায় রেখে দা দিয়ে কাটতে পারেন। মুড়োর প্রকাণ্ড কান ছ'টো কেটে ফেলুন, কানের ফুল ছুটোও কেটে বের করুন। তারপর দা দিয়ে বা বঁটি দিয়ে মুড়োটাকে ছ'ভাগ বা চার ভাগ করে কাটুন। এ-দিয়ে মুড়িঘণ্ট করতে পারেন সোনামুগের ডাল দিয়ে। মাছের পেটের দিকটায় হাত ঢুকিয়ে তেল বের করে ফেলুন। দেখবেন যেন পিত্তি গলে না যায়। এবার মাছটাকে চাকা চাকা করে ফেলুন! পরে কোল ও গাদা আলাদা করবেন। পরিমাণ মত লেজাটা আলাদা থাকবে। বাড়ীতে নূতন বৌ থাকলে, তাকে লেজাটা ভাল করে ভেজে খেতে দেবেন। গাদার মাছ বাড়ীর লোক বুঝে খানকতক ভাজা করতে পারেন। কালিয়া করতে পারেন। ইচ্ছে করলে খানকতক চপ করতে পারেন, মাছের পোলাও মন্দ হবে না। বড় পটল পেলে দোড়মা করতে পারেন। কারো যদি সখ হয়, টক করতে পারেন। বাঁকুড়া প্রকৃতি অঞ্চলে বড় মাছ পেলেই মাছের টক করে থাকে। ইলিশ মাছ হ'লে ঝাল, ঝোল, দইমাছ, ভাপে-সিদ্ধ মাছ, ভাজা, টক, এসব ছাড়াও মুড়ো দিয়ে কচু শাকের ঘণ্ট রাঁধতে পারেন, চমৎকার খেতে। লাউপাতায় মুড়ে পাতভাড়িও বেশ হয়। কেমন, মনে থাকবে?

হ্যাঁ, থাকবে। উঃ, বাঁচালেন আপনি। এত মাছ! অথচ শুধু রাঁধতে জানিনে বলেই আমাদের এত দুর্দশা!

একজ্যাক্টলি! সেই জন্যই আমি সবাইকে বলি, এখুনি একটা রন্ধন-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে। কত আর খরচ? কোটি দুই টাকা হ'লেই চলনসই বিশ্ববিদ্যালয় একটা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। সবাইকে একথা ভাল করে উপলব্ধি করতে হবে, আমরা রান্না করতে জানিনে বলেই আমাদের স্বাস্থ্য এমন করে ভেঙে পড়ছে।

মিস পাল আরও বক্তৃতা করতে যাচ্ছিলেন। গৃহিণী বাধা দিয়ে বললেন, এখন আমার কাজে লাগতে হবে। ওঁদের ইস্কুল [illegible] আছে।

হ্যাঁ। আজ মাছ পর্যন্তই থাক। পরে বরঞ্চ আর একটা 'কল' দেবেন, তখন, পাঁটার মাংস, হরিণের মাংস, কচ্ছপের মাংস, কাঁকড়া-মাছ, কুচে-মাছ প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটা স্পেশাল উপদেশ দিয়ে যাব।

গৃহিণী বলিলেন, আমরা জেনারল মানুষ, আমরা জেনারল খাবার খাই, বেশি স্পেশাল মাছ-মাংস সর্বদা খাই না।

তবু। দরকার হ'লে বলবেন।

নিশ্চয়ই।

মিস পাল তাহার নির্ধারিত ফি লইয়া প্রস্থান করিলেন। গৃহিণী কাতলা মাছে মনোনিবেশ করিলেন।

৩

মিস পাল সকাল আটটার সময়ে একটি ফোন পাইয়া যথারীতি সাজিয়া গুজিয়া মোটরে উঠিয়া যাত্রা করিলেন। শ্যামপুকুরে একটি ছোট দোতলা বাড়ী। বাস করেন গোবিন্দ বাবু, রেলওয়ের বুকিং-ক্লার্ক। গোবিন্দ বাবু ডিউটিতে গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী সরলা গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন।

মিস পাল বাড়ীর ভিতর গিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, আপনি ফোন করেছেন?

হ্যাঁ, পাশের বাড়ীতে ফোন আছে। সেখান থেকেই ফোন করেছি।

অমন বিষণ্ণ হ'য়ে বসে আছেন, কি ব্যাপার?

সামনেই একটি পিতলের কলসী, ছুধে ভরা। প্রায় দশ সের হইবে। কলসীটি দেখাইয়া সরলা বলিলেন, দেখুন, প্রায় রোজই এক ঘড়া করে ছুধ আসে অথচ কি করে রাঁধতে হয়, খেতে হয়, তা জানিনে বলে, অনেক দিনই ছুধ ড্রেনে ঢেলে ফেলে দিতে হয়।

একজ্যাক্টলি! এই জন্যই আমি বলি, ডোমেষ্টিক সায়ান্স, বিশেষতঃ কুকিং এবং কনজুগাল সায়ান্স আমাদের দেশের মেয়েদের সব চেয়ে আগে শেখা দরকার। এটাকে যাকে বলে টপ-প্রায়োরিটি দিতে হবে। ছ'-চার কোটি টাকা আর এমন বেশি কি? এতে এখনই একটা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা যায়। যাক, ভাল কথায় কেউ কোন দিন কান দেয় না।

সরলা বলিলেন, বেলা হয়ে যাচ্ছে। আপনার বক্তৃতাটা একটু অন্য সময়ে—

হ্যাঁ, যা বলেছেন। এখন আপনার সমস্যা ওই ছুধ নিয়ে। তবে শুনুন। যদি ছুধটা পাস্তুরাইজড্ ছুধ হয়, তাহলে কাঁচা ছুধই এক গেলাস করে সবাইকে খাইয়ে দিন। নইলে, কিংবা কাঁচা ছুধ পছন্দ না হ'লে, একটু জ্বাল দিয়ে এক এক বাটি সকলকে দিতে পারেন। বেশি করে জ্বাল দিয়ে ক্ষীর করতে পারেন। মিঠে আঁচে বসিয়ে রেখে মোটা সর পড়াতে পারেন। সর খেতে কে না ভালবাসে? আরো ঘন করে খোয়া ক্ষীর করতে পারেন। তাতে সমান পরিমাণ চিনি দিয়ে চটকালেই খাসা পেঁড়া হবে। ইচ্ছে করলে দই পাততে পারেন, একটু চিনি মিশিয়ে দিলেই খাসা মিঠে দই হবে। ভুরভুরে গন্ধওয়ালা কামিনী চাল দিয়ে পায়েস রাঁধতে পারেন। বাদাম, কিসমিস, একটু কর্পূর তাতে দিলে চমৎকার স্বাদ ও গন্ধ হবে। কমলালেবু ছাড়িয়ে, বীচি ফেলে, কোয়াগুলোর গা

সে কী কথা! এসো ভাই, নিশ্চয় আসবে আবার। কত জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল, কিন্তু তোমাদের এই দুটির মতো এমন সুজন আজও এখানে পাইনি।

২০

ঘুম ভাঙল ট্রেনের মধ্যে। রাত দুপুরে উঠেছিলাম। কী অপরূপ কামরা, রাজা-মহারাজার ঘরের মতো। কার্পেট বিছানো মেঝেয় ঝকমকে কারুমণ্ডিত আলো। সারা দেয়ালেও কারুকর্ম। দু'-কামরার গোসলখানা। সেটা এমনি কায়দার, এদিকটা খুললে ওদিক আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। শৌচাগার কামরার লাগোয়া নয়, একেবারে দূর প্রান্তে। এই এক অসুবিধা—চোদ্দ-পনের জনের এক শৌচাগার। শৌচ সম্পর্কে, দেখা যাচ্ছে, বিষম কঞ্জুষপনা এদের।

গাড়ি দুল্‌কি চালে চলেছে। এই নিয়ম এখানে, মানুষ-বওয়া গাড়ি অত্যন্ত সামাল হয়ে চালায়। সকলের বাড়া ধন-দৌলত নাকি মানুষের জীবন। আমাদের শুনে হাসি পায়—কি বলেন? রুশিয়ার গ্রাম দেখতে দেখতে চলেছি জানলায় বসে। পৌনে ন'টা বাজে—এখনও রোদ ওঠে নি, ঊষাকালের মতন আকাশ। ধোঁয়া ভেসে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে, ছেঁড়া ছেঁড়া কুয়াসা। রাতে কিছু বরফ পড়েছিল, এখানে-ওখানে চিহ্ন আছে। দাবানলের পর গাছের গুঁড়ির যেমন কালো কালো অবশেষ থাকে, বনের সেই চেহারা। বরফ পড়ে পড়ে এই দশা হয়েছে। বনরাজ্যের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি—দু-ধারে সীমাহীন বার্চ-পাইনের বন। ক্ষেত-খামার মাঝে মাঝে। ফসল ঝেড়ে নিয়ে আঁটি স্তূপাকার করে রেখেছে, আমাদের গাঁয়ের উঠানে যেমন পোয়ালগাদা দেখতে পাই। জলা জায়গা—আমাদেরই বিল-বাঁওড়ের মতন। কাঁচা রাস্তা—গাড়ির চাকার দাগ পড়ে গেছে। দু-দশটা সবুজ গাছও এবার দেখতে পাচ্ছি—বরফ আর শীত আমলে না এনে হাসছে পাতা ঝিলমিল করে। জঙ্গল কেটে ফেলেছে অনেক জায়গায়, গাছের গোড়াগুলো শুধু আছে। চাষবাস করবে। খরস্রোতা নদী—নদী পার হয়ে গ্রাম এলো এবার। কাঠের বাড়ি, ছাত-দেয়াল সমস্ত কাঠের। কিন্তু লোক-জন একটা দেখি না কোন দিকে। শীতে ঘুম ভাঙেনি এখনো গাঁয়ের। ঘর কানাচের সবজিক্ষেতে কয়েকটা সাদা মুরগি খুঁটে খুঁটে খেয়ে বেড়াচ্ছে শুধু। একটা মাঠের উপর বিস্তর গরু। পুষ্ট চেহারা, সাদায় কালোয় মেশানো রং। কিন্তু চরে বেড়াচ্ছে না, নড়াচড়া নেই, ঋষি-তপস্বীর মতো একটা জায়গায় ধ্যাননিমগ্ন যেন। জীব না অতিকায় পুতুল, সন্দেহ হয়।

এর পরে পুরোপুরি সবুজ অঞ্চল। অজস্র পাইন ও ফার। আপেল-বাগিচাও অনেক। গ্রামের পর গ্রাম পার হচ্ছি। রাস্তাঘাট ভাল নয়, বরফ-গলা জল জমে আছে এখানে-ওখানে। প্যাচপেচে কাদা। এক ঘোড়ায় টানা গাড়ি যাচ্ছে কাদা ছিটকাতে ছিটকাতে। দুটো একটা মানুষ দেখা যাচ্ছে এখন—মাথায় টুপি ও গায়ে ওভার-কোট এঁটে কাদা বাঁচিয়ে সামাল হয়ে যাচ্ছে। বর্ষাকালে আমাদের পাড়াগাঁয়ের পথে অবিকল এমনিধারা দেখি। কচি ছেলের হাত ধরে বাপ ঐ কেমন কাদা পার হচ্ছে, দেখুন দেখুন।

কামরায় কামরায় রেডিও বাজছে। আমাদেরও আছে। বন্ধ করে রেখেছি, নয়তো অসুবিধা হয় লেখার। কাচ-আঁটা কামরা—এ কাচ নামানো যায় না। ভিতরে গরম করে রেখেছে। কাচের খাঁচা থেকে বাইরের জগতে তাকিয়ে আছি, তার সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ নেই। মৃত্যুর পরে বায়ুভূত হয়ে ভুবন-ব্রহ্মাণ্ডের উপরে ভেসে চলেছি যেন।

এবারে এক মস্তবড় গ্রাম। কাঠের অগণ্য বাড়ি। হাঁস-মুরগি চরছে। নিষ্পত্র বার্চ গাছ এবং সবুজ পত্রময় ফার-পাইন। এই সব গাছপালা ও ঘরবাড়ি দেশের সঙ্গে একেবারে মেলে না। সারা পথে দেখে আসছি পতিত জমি বিস্তর। তাই এরা মানুষ চাচ্ছে, অগুন্তি মানুষ। মাঠের শেষে দূরে দূরে ফ্যাক্টরির চোঙা থেকে ধোঁয়া উঠছে। বড় কারখানা গ্রামপ্রান্তে—নীল কাচের বেড়ায় ঘেরা। লোক-চলাচল এবারে প্রচুর। আর দেরি নেই, পথ শেষ হয়ে এসেছে।

বড় ষ্টেশন। কিন্তু এমন নিচু জলা-জায়গা যে প্লাটফরম আগাগোড়া কাঠের পাটাতনের উপর করতে হয়েছে। কাঠেরও অপ্রতুল নেই। ক্ষেতের পর ক্ষেত—বড় বড় বাঁধাকপি ফলে আছে ঐ দেখুন। হাইড্রো-ইলেকট্রিক কারখানা অনতিদূরে। লেনিনগ্রাড।

জায়গাটা কি মশায় এখানে? ভুবনের প্রায় ঐ মাথায়; উত্তর-মেরুর কাছাকাছি এগিয়ে এসেছি। নেভা নদী ফিনল্যাণ্ড-উপসাগরে পড়ল—মোহানার উপর খাল-বিল জঙ্গলে ভরা ব-দ্বীপ, সেইখানটায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইন্দ্রপুরী বানিয়ে তুলল। পৃথিবীর এক সেরা শহর। নজরটা যদি ছড়িয়ে রাখেন আর কিঞ্চিৎ যদি কল্পনার দৌড় থাকে, শহরে ঢুকবার মুখে জায়গাটার আদি-অবস্থার আঁচ পেতে পারবেন।

নিয়ে তুলল একেবারে সকলের সেরা হোটেল আস্তোরিয়ায়। মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে কী যে চড়ে উঠল, কি আর বলি! এতই দহরম-মহব্বম আপনাদের সঙ্গে—কিন্তু দেখা করবার মনন নিয়ে যদি ঐ হোটেলের লাউঞ্জে গিয়ে বসতেন, সঙ্গে সঙ্গেই যে চিনে ফেলতাম এমন কথা হলফ করে বলতে পারিনে।

আস্তোরিয়া জানেন তো? ঘাড় নাড়লে শুনিনে, জানেন নিশ্চয়। লড়াইয়ের সময় জেনেছিলেন, শান্তির সময় এখন ভুলে বসে আছেন। লেনিনগ্রাড ঘিরে ফেলে হিটলার ধরে নিলেন, নির্ঘাৎ এইবারে কেল্লা ফতে। হিসাবপত্র করে ফেললেন, ক'দিন লাগবে শহর লেনিনগ্রাড পদতলে আছড়ে পড়তে। সেই হিসাব অনুযায়ী আস্তোরিয়ার ম্যানেজারকে চিঠি পাঠালেন, বড়দিনের ফুর্তি-ফার্তি এবার তোমার হোটেলে। অমুক দিন সদলবলে পৌছব। পাঁচশ লোকের মতো উত্তম খাদ্য ও মদ্যের জোগাড় রেখো। চিঠির নিচে সই খুদ হিটলার মশায়ের। কিন্তু হিসাবে গড়বড় হল। বড়দিন মাটি হয়ে গেল, তাঁরা এসে পৌছলেন না; ন'শ দিন সদলবলে শহর ঘিরে থেকে শেষটা পিছোতে লাগলেন। ঘরের ছেলে ঘরে—ঘরের একেবারে অন্দরদেশে। তিন-শ হাতবোমা মেরেছে একাই একটা মেয়ে, সেই মেয়ের সঙ্গে একদিন আলাপ হল ঐ হোটেলে। এখন বয়স চল্লিশ; তখন কি বয়স ছিল, হিসাব করে দেখুন। আর একটা ছেলে দেখলাম, পঞ্চাশ-ষাটটা বোমা মেরেছে। এমন কত! সমস্ত ইতিহাসের কথা—আমার পাঠকেরা মহাপণ্ডিত—মায়ের কাছে কোন মাসীর গল্প শোনাতে যাব? সেই তখন আস্তোরিয়ার নাম পেয়েছিলেন খবরের কাগজে। তত্র আমরা গিয়ে আছি। বুঝুন। হিটলার পেরে উঠলেন না, আর আমরা গাড়ি থেকে নেমে মচমচ করে জুতো বাজিয়ে উঠে পড়লাম। সেই কথা বললাম হোটেলের ম্যানেজারকে: দেখলেন তো মশায়,

হিটলারের চেয়ে অধিক শক্তি ধরি আমরা। বিপুল আয়োজন করেও শেষ অবধি তাঁর আসা ঘটে উঠল না, আর আমরা এই চলে এসেছি—কই ঢুকতে পারলেন না তো!

ম্যানেজার ঘাড় নেড়ে মেনে নিলেন। বটেই তো! আপনারা হলেন শান্তির দূত, প্রীতি আর সৌহার্দ্য বয়ে নিয়ে এসেছেন—আপনাদের শক্তি কত! হাতিয়ারের জোরে হিটলার ঢুকতে চাচ্ছিল, সেই লোকের তুলনা আপনাদের সঙ্গে!

বাইরে কনকনে শীত, হাড়-কাঁপানো মেরু-বাতাস—ঘরের ভিতরটা বিদ্যুতের তাপে নাতিশীতোষ্ণ। কাচ এঁটে বাইরের জানলা পাকাপোক্ত রকমে বন্ধ করা—উত্তাপ বেরিয়ে যেতে না পারে। পর্দা রয়েছে, আলো ঢাকা দিতে চান তো পর্দা টেনে কাচ ঢেকে দিয়ে বসুন। জানলা দিয়ে আরামে বাইরেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। ঠিক সামনেই পার্ক—ভোরোভিস্কি স্কোয়ার (Voroviski Square) সম্রাট প্রথম-নিকোলাসের মূর্তি পার্কের ভিতর। ঘোড়া পিছনের দু-পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারই উপরে সম্রাট—মূর্তির এই বিশেষত্ব। শহরের বড় এক কেন্দ্র জায়গাটা—তিন-চারটে বড় রাস্তা বেরিয়েছে পার্কের এদিক-ওদিক থেকে। ডাইনে বিখ্যাত আইজ্যাক ক্যাথিড্রাল—সেণ্ট আইজ্যাকের নামে উৎসর্গ করা। চূড়া সোনায় মোড়া—শোনা গেল, বহু পরিমাণ সোনা লেগেছিল সোনালি প্রলেপ দিতে। ভিতরটায় দামি পাথর বসানো, অজস্র আশ্চর্য শিল্পকর্ম। জার আর জাঁদরেল ব্যক্তিবর্গ ওখানে ঈশ্বর-ভজনায় আসতেন। এখন আর ভজন হয় না গির্জায়। মিউজিয়াম বানানো হয়েছিল, কৌতূহলী মানুষ ঘুরে ঘুরে সেকালের ধর্মীয় চিত্রাবলী দেখত। চূড়ায় উঠে শহর দেখত, দূরের ফিনল্যাণ্ড-উপসাগর অবধি নজর চলে এখান থেকে। এখন দেখতে পাচ্ছি, চারিদিকে ভারা বেঁধে গির্জার সংস্কার হচ্ছে। ১৮১৮ থেকে ১৮৫৮ চল্লিশ বছর ধরে বানানো। ইদানীং নজর পড়ল ইমারত মাটির তলে বসে যাচ্ছে ক্রমশ। আর বসলে ফেটে চৌচির হবে। সেটা বন্ধ করবার জন্ত ইঞ্জিনিয়াররা উঠে পড়ে লেগেছেন। আষ্টেপৃষ্ঠে তাই ভারা বেঁধেছে।

ক্যাথিড্রালের উল্টো দিকে আর একটা স্কোয়ার। ১৮২৫-এর ডিসেম্বরে বিদ্রোহ হয়েছিল প্রথম-নিকোলাসের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ দমন করা হয়। সেই স্মৃতিতে জায়গাটার নাম দেওয়া হল ডিসেম্ব্রিষ্ট স্কোয়ার। পিটার-দ্য-গ্রেটের বিশাল বলদৃপ্ত মূর্তি এই স্কোয়ারের প্রান্তে—শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু। বিপ্লবের আমলে ক্ষিপ্ত জনতা অনেক জারের মূর্তি গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছে, কিন্তু পিটার-দ্য-গ্রেটের দিকে রোষদৃষ্টিতে তাকায় নি কেউ কোন দিন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মূর্তিটা সন্তর্পণে ঢেকে দিয়েছিল, বোমা তাক করতে না পারে ওর উপর। পাথর কাটা হয়েছে সমুদ্রের মতন তরঙ্গিত করে, এটা রাশিয়ার প্রতীক। সেই পাথরের উপরে অশ্বারূঢ় পিটার। পায়ের নিচে দীর্ঘ-এক সাপ পেঁচিয়ে আছে; শত্রুকুল বিমর্দিত, সাপ দিয়ে সেইইঙ্গিত করেছে।

আর একটু এগিয়ে তরঙ্গিণী নেভা। বিশাল নদী—শহরকে জড়িয়ে পাকে ঘুরছে। পূর্ব-বাংলার খরস্রোতা নদীগুলোর সঙ্গে ভারি মিল। ফিনল্যাণ্ড-উপসাগরের মুখে দুর্গম জঙ্গল ও জলা জায়গা ছিল—সুইডেনের অধীন। প্রথম-পিটার জায়গাটা রাশিয়ার দখলে নিয়ে এসে শহরের পত্তন করলেন। সারা রাশিয়ার সর্ব অঞ্চল থেকে এবং বাইরে থেকেও অগণিত স্থপতি এনে জোটানো হল। পাথরে অজস্র অট্টালিকা উঠল দেখতে দেখতে। শুধু এই সেণ্টপিটার্সবা ছাড়া রাশিয়ার কোনখানে কেউ পাথরের ইমারত বানাতে পারে না, এই হুকুম দেওয়া হল। নেভা ফিন-উপসাগরে পড়ছে, সেই মোহানার উপর একশ'টা দ্বীপ নিয়ে শহর। কিন্তু দ্বীপ বলে আজকে চিনতে পারছেন না—তিনশ' ঘাটটা পুলে আষ্টেপৃষ্ঠে এমনি ভাবে বেঁধে দিয়েছে। নেভা ছাড়াও আটাশটা খাল শহরের নানা দিকে। খাল এবং নেভার দুই তীরে জলের কোল ছুঁয়ে নিটোল পিচের রাস্তা; কোথাও বা জলের মধ্যেই নেমে গিয়েছে রাস্তার কিনারা। উল্টো দিকে সারবন্দি অট্টালিকা। আপনার মনে হবে, শোভা বাড়ানোর জন্তেই বুঝি রাস্তার পাশে পাশে মানান করে খাল কেটে জল নিয়ে এসেছে। একটা পুলের নাম হল চুম্বনের সাঁকো (Bridge of Kisses)। একটেরে নিরিবিলি জায়গা, আমাদের বাপ-ঠাকুরদা'র আমলের প্রণয়ীরাও ঐ পুলের উপর এক আশপাশের গাছপালার নিচে ঘোরাঘুরি করে গেছেন। অতি বড় ভারিক্কি মানুষেরও এখানে এসে মন চনমনিয়ে ওঠে।

জারের শীত-প্রাসাদের উল্টো পারে নেভার কূলে আরোরা ক্রুজার নোঙর করা রয়েছে। জাহাজের কামানগুলো শীতের সন্ধ্যায় আগাগোড়া কাপড় মুড়ি দিয়ে একটু মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখছে আমাদের। নিশ্বাস নেবার মতো যৎসামান্ত ফিসফিস আওয়াজ অল্পসল্প পাতলা রকমের ধোঁয়াও উড়ছে একটা পাইপের মুখে অত বড় প্রাণীটা আলস্যে বসে বসে চুরুট টানছে, এমনি এক ছবি মনে আসে। ব্যাপার সত্যি তাই। এখন কাজকর্ম নেই ক্রুজারের—অনেক খাটনি ও বিস্তর যশোলাভের পরে বুড়া বয়সে নদীকূলে বসে বসে অবসর ভোগ করে। ইস্কুল একটা অদূরে নেভার উপরেই—সেখানকার ছেলেরা মাঝে মাঝে এসে কলকব্জা টিপে দেখে, জাহাজি ব্যাপারের আন্দাজ দেবার জন্ত অল্পসল্প যন্ত্র চালানো হয়। বাচ্চাদের সঙ্গে মহামান্ত প্রবীণের যৎকিঞ্চিৎ কৌতুক করার মতো। ১৯০৩ অব্দে তৈরি—১৯০৪ অব্দের রুশ-জাপান যুদ্ধে খুব খেটেছিল এই ক্রুজার। ইজ্জত কিন্তু সেজন্তে নয়! ১৯১৭ অব্দে অরোরা ক্রুজার বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলে নেভা নদীর উপর থেকে সর্বপ্রথম জারের উইণ্টারপ্যালেসের দিকে গোলা ছুঁড়েছিল। সেদিনের বিপ্লবীদের দেশজোড়া যে খাতির, এই ক্রুজারেরও তাই।

একটা পার্ক—নাম বলল 'পার্ক অব মার্স' (Park of Mars) অদূরে নানান রঙের গম্বুজওয়ালা বাড়ি। 'রক্তের উপর মন্দির' (Temple on Blood) বাড়িটার নাম। জার প্রথম নিকোলাসকে হত্যা করেছিল, সেই হত্যাভূমির উপর বানানো। নেভার তীরবর্তী বহুবিস্তীর্ণ বাগান, বার্চ ও আপেলগাছ অজস্র পাতা নেই অনেক গাছের, অনেকের পাতা লাল হয়ে গেছে। সেই বাগানের ভিতর ছবির মতন টালি-ছাওয়া ছোট এক বাড়ি। বাড়ির পিছন দিকে নেভা থেকে বেরিয়ে আসা খাল বয়ে যাচ্ছে। বাড়িটা হল পিটার-দ্য-গ্রেটের গ্রীষ্মপ্রাসাদ।

শহরের কয়েকটা পাড়ার উপর দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে এসে গাড়ি একটা গলির মাথায় মিনিট খানেক ধরে হাঁপাল। স্মোলনি গৃহাবলী—ঐতিহাসিক জায়গা, বিপ্লবের প্রধান অফিস ছিল এখানে।

ঐ বাড়ির একটা খোপে লেনিন তখন থাকতেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, পরে এক সময় ভাল করে দেখা যাবে। ওখান থেকে এসে নামলাম পায়োনীয়র কেন্দ্র-ভবনে।

ডিরেক্টর মানুষটি ভারি রসিক। কথায় কথায় হাসি-রহস্য। শিশু ও কিশোরদের মধ্যে থেকে থেকে নিজের বয়স ভুলে বসে আছেন। এই ৫৪ অব্দে আঠার বছর পুরল ওঁদের পায়োনীয়র-প্যালেসের। যুদ্ধের সময় ন'শ দিন আটক ছিল লেনিনগ্রাড।—অর্থাৎ তিন বছরের কাছাকাছি। চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছিল—একটি মাছি-মশার সেঁধোবার জো ছিল না। প্লেনে করে শহরের রসদ আসত। সেই অতি-বড় দুর্যোগের ভিতরেও একদিনের তরে এখানকার কাজকর্ম বন্ধ থাকেনি। এটা হল মূল-কেন্দ্র—শুধু এই শহরেই কুড়িটা শাখা। লেনিনগ্রাডে ছাত্র আছে চার লক্ষ—তারা মেম্বার হতে পারে। হয়েছেও প্রায় সবাই। দু-পাঁচটি মাত্র বাদ। এই কেন্দ্রভবনে এ বছর খরচ হবে সাড়ে সাত মিলিয়ন রুবল। শিক্ষা-মন্ত্রীর দপ্তর টাকা দিচ্ছেন। চলে আসুন, ঘুরে ফিরে দেখে যান একটু।

বাড়ি ঢুকবার মুখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি। উঠানে সারের গাদা। ছেলেমেয়েরা কোদালি দিয়ে সার কেটে কেটে নিয়ে যাচ্ছে। নতুন বাগান হবে কোনদিকে, গাছপালা আর্জাবে। ঘিরে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করল ঐ ছেলেমেয়েরা।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাইরের খেলাধুলা নেই। নিয়ে গেল দাবা খেলার ঘরে। ছকের পাশে ষ্টপ-ওয়াচ। এক একটা চালে কত সময় নেয়, রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। ঘরে ঘরে এমনি নানান খেলা—বুদ্ধির খেলা, ধৈর্যের খেলা, কৌতুকের খেলা। চিনামাটির রঙিন অতিকায় ব্যাং। আর একটা ঘরে রকমারি গাছপালা; ঘরের ছাতে মেঘ-ভরা আকাশে আঁকা। ছাতের দিকে তাকিয়ে হাঁটুন একটু—কি আশ্চর্য, আকাশে মেঘ ভেসে যাচ্ছে আপনি পরিষ্কার দেখবেন। কাচে তৈরি বড় একটা জারের মতো। এমনি কিছুই দেখছেন না—ঘোরাতে লাগুন ভিতরে দেখবেন পুতুল, শেওলা ইত্যাদি।

ফুটবল খেলা হচ্ছে পুতুলদের। সুপারির মতো ছোট্ট বল—নিচের দিক থেকে সরিয়ে ঘুরিয়ে মারতে হবে। ডিরেক্টর মশায়ের সঙ্গে আমরাও বসে গেলাম খেলতে। আর একটা খেলা—বিড়াল পুতুলের লেজে দূর থেকে আংটি পরানো। এমনি অনেক খেলা।

নানা দেশ থেকে উপহার গেছে, একটা ঘরে সেই সমস্ত সাজানো। ভারত থেকে গেছে ছবির এলবাম ও নানান রকমের পুতুল। বাচ্চাদের আঁকা ছবি এক ঘরে। আর এক ঘরে লাইব্রেরি—বইয়ের লেনদেন চলে।

রাজপ্রাসাদ ছিল এটা—জার-পরিবারের একজন থাকতেন। প্রতিটি ঘরের কারুকার্য দেখে অবাক হবেন। নৃত্যশালা। কবি পুশকিনের নামে তাবৎ রাশিয়া মেতে যায়—তিনি কবে নেচেছিলেন নাকি এই নাচের ঘরে। দেয়ালের ধার দিয়ে সেই আমলের চেয়ারগুলো সাজানো, সাদা কাপড়ের ওয়াড়-দেওয়া। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে, ঠিক কোন জায়গাটায় নেচেছিলেন পুশকিন, কোন চেয়ারে তিনি বসেছিলেন? চেয়ারটা সঠিক মালুম না হওয়ায় সবগুলো চেয়ারেই তারা একটু একটু বসে নেয়।

একটা ঘরে নানারকম পাথর ও ধাতু। ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেশের নানা অঞ্চলে অভিযানে বেরোয়—সেই সময়ে তারা এমনি সব বস্তু কুড়িয়ে নিয়ে আসে। ঘরময় বিপুল সংগ্রহ। কাচের আলমারিতে থরে থরে সাজিয়ে রেখেছে—মাটির নিচে পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাদের দেশের কী অপরিমিত সম্পদ!

রূপকথার ঘরগুলোয় চলুন এবার। বড় বড় ঘর—দেয়াল-ছাত আসবাবপত্রে চোখ-ধাঁধানো ছবি ওর মেলা। পুশকিনের লেখা একটা পরীকাহিনী আঁকানো। রাশিয়ার গালার কাজের খুব নাম—এক গোটাঅঞ্চল নিয়ে লাক্ষা-শিল্পীরা থাকে। সেখান থেকে তারা এসে লাক্ষা-চিত্রণে ঘর-ভরে দিয়ে গেছে। এই নিয়েই বা শিশুদের কত জিজ্ঞাসা! কত ডিম লেগেছিল আঁকতে? ডিরেক্টর মশায়েরও তেমনি জবাব; বাইশ হাজার। পুশকিনের ঘরের পাশে গোর্কির ঘর। গোর্কির লেখা একটা রূপকথার পরিচিত্রণ সেখানে।

ছেলেরা নিজ হাতে ছোট্ট ক্রেন বানিয়েছে, বিদ্যুতে চলে। নাগরদোলা—প্লাগ লাগিয়ে দিতে পুতুলেরা নাগরদোলায় খুব উঠানামা করতে লাগল। এ সমস্ত শিশুরাই মাথা থেকে বের করেছে। রেলপথ বানিয়েছে—দুর্গম পাহাড় দিয়ে পথ, টানেল, পুল—সুইচ টিপে দিতে গড়গড় করে ট্রেন চলল! একটা কুকুর—লাল জিভ একবার মেলছে, মুখের ভিতরে জিভ নিয়ে নিচ্ছে আবার।

গেলাম ওদের কারখানা-ঘরে—যে জায়গায় ওরা এমনি সব বস্তু বানায়। ছুতোরখানা। কাঠ কেটে রেঁদা ঘষে ঘষে ছোট্ট ছেলেমেয়েরা নানান জিনিষ গড়ছে। হাতে-কলমে জিনিষ গড়ে স্ফূর্তি কত তাদের! আরও ক্রেন তৈরি হচ্ছে, দেখলাম, লোহার জুড়ে জুড়ে। বয়স কত হে তোমার? ন' বছর। ইঞ্জিনিয়ার হবে তুমি? উঁহু, নাবিক হব। তবে এসব বানাচ্ছ কেন? বাঃ রে, ক্রেন না হলে জাহাজের মালপত্র ওঠানো-নামানো হবে কি করে? তাই বটে, আমারই ভুল! মালপত্রের জন্য আরও কয়েকটা ক্রেন ইতিমধ্যেই বানিয়ে তাকের উপর তুলে রেখে দিয়েছে।

গেলাম কনসার্টের ঘরে। ছেলে-মেয়ে মিলে দিব্যি বাজনার দল হয়েছে। পরিচালক একটা ছেলে—বছর ষোল বয়স। চট করে একখানা গৎ শুনিয়ে দিল।

কনসার্টের পর নাচের ঘরে। মেয়েরা নাচল, এক শিক্ষিকা পিয়ানো বাজালেন। পুতুলের ঘরে—প্রতিটি পুতুল এরা নিজ হাতে গড়ে। ফি বছর রূপকথার এক একটি পালা ভেবে তদনুযায়ী পুতুল বানায়। পুতুলের মানুষ শুধু নয়, কুকুর খরগোস সাজারু ব্যাং। পুতুল ঘরের মাতব্বর একটা ছেলে—দিব্যি সে বুড়োমানুষের ঢঙে বক্তৃতা করে তাদের কাজকর্ম কিছু কিছু বুঝিয়ে দিল। পুতুল নাচিয়ে দেখাবে এবার—যান, পুতুলের থিয়েটারে গিয়ে বসে পড়ুন। সময় নেই, কিন্তু হয়ত এড়ানো গেল না। তাড়াতাড়ি যা-হোক একটু দাও দেখিয়ে। মেয়ে পুরুষে পলকা নৃত্য। কুকুর-বিড়ালে প্রথমটা ঝগড়া, তারপরে যুগল-নৃত্য। য়ুক্রেনের একটি লোকনৃত্য। একটা হাসি-হুল্লোড়ের নাচ।

যে ছেলে-মেয়েরা পর্দার আড়ালে থেকে নাচাচ্ছিল, তারা বেরিয়ে এলো হাতে পুতুল নিয়ে। ভারতের ছেলেমেয়েদের ভালবাসা জানাল। শিক্ষকরাও প্রীতি জানালেন ভারতে যাঁরা শিশুদের মানুষ করার ভার নিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশে।

মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি আঁকা তিনটে মেডেল এবং অশোকচক্র-আঁকা একটা মেডেল কেন্দ্রভবনে দেওয়া হল—ভারতের প্রীতির উপহার।

[ক্রমশঃ।

উদয়ভানু

ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি সর্ব্বত্র। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই দৃষ্টি আবদ্ধ হয়। লক্ষ্মীর এমন অকৃপণ কৃপা দেখা যায় না সচরাচর। যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমন সাজসজ্জা চৌধুরীগৃহের। তামা, পিতল, কাঁসা আর রূপার আসবাব। ঘরে ঘরে জাজিম আর ফরাস—আবলুসের চৌকীতে। চাঁদোয়া-ঢাকা আড়কাঠ থেকে নানা রঙের রকম বেরকম ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলছে। দেওয়ালে দেবদেবীর পট, পশুদের মাথা আর শিং। ঢাল আর তরোয়াল। কস্তুরী আতরের সুগন্ধ ছড়িয়ে আছে গৃহময়। চন্দ্রকান্ত দেখে দেখে বিস্মিত হন। খুঁটিয়ে দেখেন সকল কিছু। টানাও লম্বা দালানে মূর্ত্তির সারি। পাথর আর ধাতুর শিল্পশোভা—ভাস্কর্য্যের যাদুঘর দেখছেন যেন চন্দ্রকান্ত! শিল্পীদের রূপকল্পনায় ভুলভ্রান্তি নেই কোথাও, শাস্ত্রসম্মত দেহগঠন চাক্ষুষ দেখতে পেয়ে সত্যিকার দেবদেবীর সাক্ষাৎ মিলেছে যেন। একটি মূর্ত্তির সম্মুখে থমকে থাকলেন চন্দ্রকান্ত, নির্নিমেষ চোখে। ওঁ মণিপদ্মে হুঁ! মন্ত্র বলতে বলতে চন্দ্রকান্ত চক্ষু নিমীলিত করেন ভক্তির উচ্ছ্বাসে। চন্দ্রকান্ত শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত, তথাপি এই ভগবানের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা, সৃষ্টির রক্ষাকর্ত্তা অবলোকিতেশ্বরকে দেখতে দেখতে মনে মনে প্রণাম জানালেন বার বার। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের স্থান বৌদ্ধ দেবসঙ্ঘে অতি উচ্চে। তিনি করুণার অবতার, অর্থাৎ মহাকারুণিক। কথিত আছে, তিনি মানুষের দুঃখকষ্টভোগ দেখে এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি নিজের মোক্ষ যোগাভাবে অর্জ্জন করা সত্ত্বেও সেই মুক্তি পরিত্যাগ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন। মানুষ দুঃখের করাল হাত থেকে পরিত্রাণ পাক, সম্যক সম্বোধিতে প্রতিষ্ঠিত হোক। যতদিন তা না হয় ততদিন বিশ্রাম নেই অবলোকিতেশ্বরের। যে জীব যে রূপে যাকে পূজা করে, অবলোকিতেশ্বর সেই সেই রূপধারণে দেখা দেন ভক্তকে। যারা তথাগতকে মানে তাদের তথাগতরূপে, যারা শৈব তাদের শিবরূপে, যারা বিষ্ণুকে পূজা করে তাদের মনের চোখে বিষ্ণুরূপধারী হয়ে ফুটে ওঠেন। ওঁ মণিপদ্মে হুঁ! আবার বৌদ্ধমন্ত্র উচ্চারণ করলেন চন্দ্রকান্ত। তাঁর সম্মুখে বোধিসত্ত্ব লোকেশ্বরের সুখাবতী মূর্ত্তি। শুভ্রপ্রস্তরের রূপালোপ দেখে দেখে ভাব-তন্ময়তা আসে চন্দ্রকান্তর। এই মূর্ত্তিতে লোকেশ্বর শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট; ত্রিমুখ ও ষড়ভুজ। ফটস্থ পদ্মের 'পরে ললিতাসনে উপবিষ্ট। সঙ্গে একাসনে শক্তি অধিষ্ঠিতা। লোকনাথ তিন দক্ষিণ হস্তে বাণ, অক্ষমালা এবং বরমুদ্রা প্রদর্শন করেন। দুই বাম হস্তে ধনু ও পদ্ম ধারণ করেন। তৃতীয়টি শক্তিরূপী তারাদেবীর উরুতে ন্যস্ত থাকে। মূল দেবতাকে বজ্রতারা, বিশ্বতারা, পদ্মতারা দেবীরা ঘিরে আছেন।

দালানের শেষ-প্রান্তে সূর্য্য-আলো পৌঁছায় না। তাই আঁধার-কালো।

সহসা চোখ পড়তেই চমক লাগে যেন। চন্দ্রকান্ত তাঁর দৃষ্টি বিস্ফারিত করেন। দশমহাবিদ্যার অন্যতমা ছিন্নমস্তার কৃষ্ণমূর্ত্তি। আপনার রুধির আপনি পান করছেন মহাকালী। ছিন্ন মুণ্ড ধ'রে আছেন এক হাতে।

—মাম্ অনুসর! আমাকে অনুসরণ করুন।

কার অনুরোধের সুর শুনলেন চন্দ্রকান্ত। কোন মূর্ত্তি কথা বলছে এমন মনুষ্য-কণ্ঠে! চতুর্দ্দিকে চোখ ফিরালেন চন্দ্রকান্ত। সহসা দেখলেন এক যাজক ব্রাহ্মণকে। চন্দ্রকান্ত তাকে বিলক্ষণ চেনেন, ব্রাহ্মণ এই চৌধুরীগৃহের মূল-পুরোহিত। কাশ্যপ গোত্রীয়, রাঢ়ী শ্রেণী।

—প্রাতঃপ্রণাম।

ব্রাহ্মণকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বললেন চন্দ্রকান্ত। অবিন্যস্ত উত্তরীয় সামলালেন। করজোড় কপালে ছোঁয়ালেন।

—জয় গুরু। ব্রাহ্মণ কথার শেষে আবার কথা বললেন কেমন যেন নত কণ্ঠে। বললেন,—চৌধুরী-গৃহিণী মহাশয়ের সাক্ষাৎপ্রার্থী। বজ্রাঘাত হয়েছে তাঁর। একমাত্র কন্যা, তার কোন' সন্ধান নাই গত রাত্রি থেকে। গৃহকর্ত্তাও বর্ত্তমানে অনুপস্থিত, কার্য্যব্যপদেশে স্থানান্তরে গেছেন। বাণিজ্য যাত্রায় গেছেন, শীঘ্র যে ফিরবেন তেমন কোন' আশা নাই।

চন্দ্রকান্তর চোখের তারা অচঞ্চল, স্থির। কথা শুনছেন, কিন্তু যেন শূন্য দৃষ্টি ফুটেছে চোখে। ব্রাহ্মণের পিছনে চললেন অবাধ পদক্ষেপে। অনিচ্ছা, তবুও চললেন।

ব্রাহ্মণ বললেন,—শুনা যায়, গত রাত্রে চৌধুরীকন্যা আনন্দকুমারী সপ্তগ্রামের জমিদার কৃষ্ণরামের ভগ্নালয়ে যায়। ততঃপর সেই স্থান থেকে নৌকা যাত্রা করে।

শব্দ এমন জ্বালাময়, তা যেন জানা ছিল না চন্দ্রকান্তর। ইচ্ছা হয়, ঐ ব্রাহ্মণের মুখে হাত চেপে কথা বলা থামিয়ে দেন এখনই। যে দুর্ঘটনা তাঁর চোখের সম্মুখে দেখেছেন, সেই কাহিনীর পুনরুক্তি অন্যের মুখে শোনায় কি লাভ আছে? চন্দ্রকান্ত বললেন,—চৌধুরী-গৃহিণীর নিকটে আমি যা জানি ব্যক্ত করবো। জল্পনা-কল্পনায় কোন' ফল নাই। যা সত্য তার যেন অপপ্রচার না হয়।

ব্রাহ্মণ বললেন,—আমাদের মনোগত ইচ্ছা তাই হোক।

চন্দ্রকান্তর মুখে দুঃখানুভূতির কাতরতা পরিস্ফুট হয়। ঈষৎ নত কণ্ঠে বললেন,—আনন্দকুমারীকে পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ।

ব্রাহ্মণ চলতে চলতে হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে পড়েন। তাঁর পদক্ষেপে বিরতি পড়ে। খানিক চিন্তামগ্ন থেকে বললেন,—এই চরম সিদ্ধান্তের কিছু কারণ আছে?

—হাঁ মহাশয়! চন্দ্রকান্ত বললেন কৃত্রিম হাসির সঙ্গে। বললেন,—আপনারা জ্ঞাত হোন, আনন্দকে আমরা সকলে চিরদিনের মত হারিয়েছি। সে আছে, তবুও নাই।

চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণের চোখের লালাভ প্রান্ত পদ্মরাগ মণির মত লাল আভা ছড়ায়। গলকম্বল থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে। কপালে চিন্তারেখা দেখা দেয়। কি বলতে চেয়ে নীরব হয়ে থাকেন। যে পথে চলেছিলেন সেই পথ ধ'রে এগিয়ে চললেন আবার। অস্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

দুয়োরে দুয়োরে মঙ্গলকলস। দ্বারশীর্ষে আম্রপল্লবের মালা ঝুলছে। কোথা থেকে ভেসে আসছে আতরের সুগন্ধ। তিব্বতের কস্তুরীর উগ্রগন্ধ। এক কক্ষ মধ্যে দৃষ্টি যায় চন্দ্রকান্তর। দেখলেন নিরেট সোনার বুদ্ধমূর্তি। মূলদেবতা আদিবুদ্ধের প্রতিমূর্তি। ধ্যানাসনে যেন সমাধি হয়েছে তাঁর। পদ্মপাপড়ির মত আয়ত আঁখি ধ্যানস্তিমিত ও অর্দ্ধনিমীলিত। মণিমাণিক্যের অলঙ্কার সর্ব্বদেহে। পরিধানের বস্ত্র বিচিত্র। দক্ষিণ হস্তে বজ্র, বাম হস্তে ঘণ্টা ধারণ করেছেন। দুই হস্তই বক্ষের 'পরে বজ্রহুঁকার মুদ্রায় সজ্জিত।

কক্ষমধ্যে বুদ্ধ-বন্দনা চলেছে। হোমকুণ্ড জ্বলছে, পঞ্চপ্রদীপ জ্বলছে। ধূপ আর ধুনা জ্বলছে। তাঁর অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষুদ্বয়ও যেন জ্বল্‌জ্বল্ করছে। পূজারী গম্ভীর কণ্ঠে বুদ্ধ-বন্দনা গাইছেন।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—মহাশয়, আরও কতটা পথ? পা যে আর চলে না।

ব্রাহ্মণ বলেন,—এটি দেবত্রভুক্ত। এই স্থান থেকে সদরে পৌঁছাতে হবে। সদরের শেষে অন্দরমুখে যাওয়া হবে। চৌধুরী-গৃহিণী সেই স্থলেই অপেক্ষমানা। আপনি অবশ্যই অবগত আছেন হিন্দু-বণিক-কুলরমণীগণ প্রায় অসূর্য্যম্পশ্যা। চৌধুরীপত্নী আপন মহল ত্যাগ করেন না।

চন্দ্রকান্ত হাসলেন মৃদুমন্দ। বললেন,—কেবল আনন্দই যত বাধাবিঘ্নকে অমান্য করে! নিষেধ মানে না।

—হাঁ, চৌধুরী-কন্যা স্বাধীনচেতা। এমন মেয়ে আমি তো আমার এই দীর্ঘ জীবনে কখনও দেখি নাই। ব্রাহ্মণ এক দালানের বাঁক ঘুরে কথা বললেন।

দেবত্র মন্দির, মণ্ডপ, দালান ও উঠানের সংলগ্ন ফুলবাগান। অন্য গাছের স্থান নেই, আছে মাত্র গন্ধপুষ্পের গাছ আর লতা। দেবদেবীর পূজায় বৃথা-ফুলের ঠাঁই নেই। গ্রীষ্মঋতুর ফুল ধ'রেছে গাছে গাছে। বৈশাখের দারুণ দাহনে কত গাছ পত্রহীনপ্রায় হয়ে আছে। শুভ্র শিমুল তুলার মত বেল আর যুঁইয়ের স্তবক ঘন সবুজ পাতার আড়াল থেকে দেখছে যেন উঁকি দিয়ে। মালাকরেরা গাছ আর লতার তদারকে লেগে আছে। বিচিত্রবর্ণের প্রজাপতি উড়ছে।

সদরের তোরণদ্বারের মস্তকে সঙ্কটনাশন গণেশমূর্তি। সাম্রাজ্য দেন তিনি,—আয়ু, কাম, অর্থ আর সিদ্ধি দান করেন। সম্রাটের দেবতা তিনি, অনাথের বন্ধু। গৌরীপুত্র গণেশকে প্রণাম জানালেন চন্দ্রকান্ত। আকাশে প্রথম আলোর চিকণ খেলতে দেখেই দিবারম্ভে প্রথম প্রণতি জানিয়েছিলেন সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে, পরব্রহ্মরূপ গণেশ গণেশকে—সর্ব্ববিদ্যা আর সর্ব্বসিদ্ধির দেবতাকে।

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করলেন নত কণ্ঠে। বললেন,—মহাশয়ের সঙ্গে কি চৌধুরী-কন্যার পূর্ব্ব-পরিচয় আছে?

ঈষৎ হাসলেন চন্দ্রকান্ত। ক্ষণেক যেন অন্যমনা থাকলেন। বললেন,—হাঁ, আনন্দ আমার খুবই পরিচিতা। সে আমার বাল্যসহচরী। শৈশবসঙ্গিনী।

সদরে পদার্পণ ক'রেই পুনরায় ব্রাহ্মণ শুধোলেন,—আমার যতদূর জানা আছে, মহাশয় তো এখনও পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাই!

—হাঁ, যথার্থই বলেছেন।

—এত কাল অবধি পাণিগ্রহণ না করার কি কারণ? সংসার বিতৃষ্ণা কেন?

—কারণ অভাব-অনটন। গ্রাসাচ্ছাদনের যোগ্য ব্যবস্থা নাই।

—মহাশয়ের কর্ম্ম কি?

—একটি চতুষ্পাঠী পরিচালনা করি। দান আর শিক্ষায় উদর চালাই। কোনক্রমে দিন গুজরাণ করি।

—আপনার সহ আনন্দকুমারীর শেষ সাক্ষাৎ হয় কবে?

—গত রজনীতে।

চন্দ্রকান্ত মিথ্যা বলেন না। মিথ্যার আশ্রয় ফল শুভ হয় না, তা তিনি জানেন।

ব্রাহ্মণ একবার চক্ষু ফিরিয়ে দেখলেন অনুসরণকারীকে। তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। বললেন,—মহাশয়, আর কিছু জানতে চাই না আমি। চৌধুরী-গৃহিণী এখন যা জানতে চান জানাবেন।

—তথাস্তু।

ব্রাহ্মণ আবার কথা বললেন। বললেন,—বিষয়টি খুবই রহস্যজনক মনে হয়। মঙ্গলময় ঈশ্বরের কি ইচ্ছা, এক তিনিই জানেন।

—রহস্য নয়, এ কেবলই কপালের দুর্ভোগ। কথা বলতে বলতে ক্ষণেক থেমে আবার চন্দ্রকান্ত বললেন,—আনন্দকুমারীর দুর্ভাগ্য!

—সাতগাঁর জমিদার কৃষ্ণরামের সহধর্ম্মিণীকে আপনি জানেন কি?

ব্রাহ্মণের কৌতূহল যেন অদম্য। নীরবতা অধিকক্ষণ পালন করতে পারেন না তিনি। তাই পুনরায় প্রশ্ন করলেন ব্যগ্র কণ্ঠে।

মুখে হাসি ফুটলো। সহাস্যে চন্দ্রকান্ত বললেন,—হাঁ, তিনি আমার পরিচিতা। তিনি সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। রূপে আর গুণে অতুলনীয়া। তাঁর মত এমন তীব্র কৃচ্ছ্রসাধন ইতিপূর্ব্বে আমি দেখি নাই। মনে হয়, কোন' দেবীর অংশে তাঁর জন্ম!

ব্রাহ্মণ কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তাঁর মনের কি এক বদ্ধমূল ধারণা যেন পরিবর্তিত হয় এত দিনে! ব্রাহ্মণ বললেন,—তবে লোকে তাঁকে মন্দ বলে কেন? যদিও আমি কখনও বিশ্বাস করি নাই।

স্মিতহাসির খেলা চলে চন্দ্রকান্তর মুখে। বললেন,—শুনা কথায় কর্ণপাত না করাই সমীচীন। সাতগাঁর জমিদারপত্নী নারীজাতির আদর্শস্বরূপ, নমস্যা। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা-নমস্কার জানাই।

এক দ্বারমুখে পৌঁছে ব্রাহ্মণ গতি রহিত করলেন। বললেন,—মহাশয়, এই স্থানেই আমি আপনাকে ত্যাগ করি। আমি যাই, আপনি থাকেন। চৌধুরী-গৃহিণীর মহলের এই প্রবেশদ্বার।

চৌধুরাণী আকুল নয়নে অপেক্ষায় ছিলেন। কান্নার আবেগে তিনি যেন বাক্যহীনা। দূর থেকে তিনি লক্ষ্য করেছেন, দুয়োরে একজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ এসে উপস্থিত হয়েছেন। চৌধুরাণী সজলচোখে দেখেন আগন্তুক অতি সুপুরুষ। তাঁর শরীর দৃঢ়; বক্ষ বিশাল; ললাট বিস্তৃত; বর্ণ কাঞ্চনসন্নিভ, মুখকান্তি জ্ঞানগাম্ভীর্য্যপূর্ণ।

—তুমি আমার সন্তানতুল্য। দীর্ঘজীবন হোক তোমার।

নারীকণ্ঠের কথা শুনে মাথা নত করলেন চন্দ্রকান্ত। দুয়োরের পাশ থেকে কাতর সুরের কথা ভেসে আসে।

—আমার পুত্র নাই, তুমিই আমার সেই। তুমি সুখী হও, আশীর্ব্বাদ করি। মা মনসা, তোমার মঙ্গল করুন।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—আপনার আশীষ আমি মাথা পেতে গ্রহণ করছি। এখন কি জন্ম আমাকে আহ্বান, তাই ব্যক্ত করুন।

কান্নার বেগ সামলে চৌধুরী-গৃহিণী বললেন,—আমার একমাত্র মেয়েটাকে হারিয়ে আমি সর্ব্বহারা হয়েছি। তাকে ফিরিয়ে দাও আমার কাছে। বল' সে এখন কোথায়? কেমন আছে? বেঁচে আছে না ম'রেছে?

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চন্দ্রকান্ত। কি বলবেন উত্তরে, ভাবতে থাকেন যেন। কপালে কর স্পর্শ করেন। ভেবে ভেবে বললেন,—আনন্দকুমারীকে এক বিধর্ম্মী হরণ ক'রেছে গত রাতে।

—কে সেই পাষণ্ড? কি নাম তার?

চৌধুরাণী কথা বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন যেন। ধৈর্য্য ধারণ করতে পারেন না আর।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—ইংরাজপক্ষের এক কর্ম্মচারী। তার নাম ম্যালেট। জরীপের কাজ করে সে। গত কয়েক মাস যাবৎ মান্দারণের আশে-পাশে ঘোরাঘুরি আর মাপামাপির কাজ করছে।

—তবে এখন উপায়? কোন্ পাপে আমার এই শাস্তিভোগ?

—ইংরাজের কুঠীতে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে, যদি কোন উপায় হয় এই আশায়।

—কে করবে এই কাজ? তেমন যোগ্যতা কার আছে, আমি তো জানি না। আমার আনন্দকে তুমিই ফিরিয়ে আনতে পারবে।

—চৌধুরী মহাশয় আগে আসেন, তিনিই এই কাজ করতে পারেন। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি অনস্বীকার্য্য। ইংরাজদের সঙ্গে তাঁর ব্যবসায়সূত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। আমি জানি, ইংরাজ, ওলন্দাজ আর ফরাসী কুঠীতে তিনি মাল সরবরাহ করেন। সমগ্র বাঙলা দেশে বাণিজ্য চালনার অধিকার তাঁর আছে। চৌধুরী মশাইয়ের খুব নামডাক বিদেশী মহলে।

চৌধুরাণী প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম ক'রেছেন, কিন্তু বার্দ্ধক্যের সীমায় যান নি এখনও। ভারী ওজনের ক'খানা সোনার গয়না তাঁর দেহে। পাটিহার গলায়; কোমরে মোহরগাঁথা। সাপ-তাগা ওপর হাতে। খাড়ু, চুড়ি আর বালা প্রায় কনুই পর্য্যন্ত। পায়ে রূপার আঙট। কপালে সিঁদুরের টিপ নয়, টল্লা।

জলচৌকি বসিয়ে দিয়ে যায় ঘোমটা-ঢাকা মুখের কৃষ্ণাঙ্গী এক দাসী। জলের ঘটির মুখে গামছা রেখে যায়। মুখ-হাত-পা ধোয়ার জল দিয়ে যায়।

বেলে পাথরের কঠিন মেঝেয় চলতে চলতে সত্যিই পদদ্বয় যেন ব্যথাতুর হয়েছে। চন্দ্রকান্ত জল ঢালেন পায়ে। কুলকুচা করেন। চোখে, কপালে আর কানে জল-হাত দেন।

নিথর হয়েছিলেন যেন চৌধুরী-গৃহিণী। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন,—আনন্দর বজরার একজন মাঝিও এসে ঠিক ঐ একই কথা বলেছে।

—কি বলেছে মাঝি?

কথায় আগ্রহ ফুটলো। চন্দ্রকান্ত বললেন জলচৌকিতে ব'সে।

—মাঝিও ব'লেছে ইংরাজ সাহেবের নৌকা থেকে প্রথম আক্রমণ হয়।

—আর কি ব'লেছে মাঝি?

চৌধুরাণীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধোলেন চন্দ্রকান্ত।

থেমে থাকেন অন্তঃপুরবাসিনী। কথা হারিয়েছেন তিনি যেন। কিংবা স্বেচ্ছায় যেন থেমে আছেন।

—মাঝি আর কি ব'লেছে?

আবার বললেন চন্দ্রকান্ত। কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা যেন। মহিলার নীরবতা যেন অসহ্য ঠেকছে।

—মাঝি তো বলে যে আপনিও না কি ছিলেন আনন্দর বজরায়।

চৌধুরাণী প্রায় যেন ফিসফিসিয়ে কথাগুলি বললেন।

—মিথ্যা কথা বলে নাই মাঝি। হাঁ আমিও ছিলাম।

আবার সেই ফিসফিস সুরের কথা। চৌধুরাণী বললেন,—আমরা জানি, আনন্দকুমারী কেন বিবাহে সম্মত হয় না। আমরা জানি তার কি মনের বাসনা। আমরা জানি সে আপনাকেই—

কথা আর শেষ হয় না। শেষাশেষি গিয়ে বাক সংযত করলেন চৌধুরী-গৃহিণী।

—গতরাত্রে আমাদের উভয়ের মধ্যে মাল্য-বিনিময় হয়েছে।

—কোথায়?

—আসমানদীঘির তীরে। জমিদারগৃহলগ্ন পুষ্পউদ্যানে।

—সাক্ষী কে ছিল?

—আকাশের চাঁদ আর তারকারাজি। উদ্যানের বৃক্ষসমূহ। আসমান দীঘি। রাত্রির অন্ধকার।

—মানুষ কোন কেউ?

—না কেহ নয়।

—তবে আপনি রক্ষা করলেন না কেন আনন্দকে? আমার বাছাকে?

—রক্ষার কোন' উপায় ছিল না। ইংরাজপক্ষের গুলী-বারুদের সঙ্গে লড়াই চালনার মত যোগ্য অস্ত্র ছিল না কাছে।

—আবার যদি আনন্দকে কখনও ফিরে পাই, আপনি তাকে গ্রহণ করবেন কি?

চৌধুরাণী আর ধীর কণ্ঠে কথা বলেন না। শেষ কথাগুলি বললেন যেন স্বর উঁচিয়ে।

চন্দ্রকান্ত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করেন। হাঁ-না কিছুই বললেন না। জমিতে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলেন। আকাশ

প'ড়েছে যেন মাথায়। যথা উত্তর না দেওয়ার অসামর্থ্যে অস্বস্তি বোধ করতে হয়। এবার চন্দ্রকান্তর মুখে কথা হারায়।

অসহ্য ঠেকে চৌধুরী-গৃহিণীর। তিনি আরও জোরালো স্বরে বললেন,—আপনি যদি তাকে গ্রহণ করেন তবেই আমি আনন্দকে ফিরাতে চাইবো। নয়তো আর চাই না তাকে। যাক সে যেখানে গেছে। যেমন আছে থাক।

—ঠিক এই মুহূর্তে আমি আমার বক্তব্য জানাতে পারি না। আমাকে চিন্তার অবকাশ দেওয়া হোক। কয়েক দিনের সময় দেওয়া হোক।

এমন বিষম এক সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে কল্পনায় ছিল না যেন চন্দ্রকান্তর। নৌকার মাঝিদের কেউ জ্যান্ত ফিরে আসতে পারে, আদপেই ভাবতে পারেন নি। মাঝি ফিরে এসেছে জানলে এই দিগড় মাড়াতেন না তিনি। যেমন চলেছিলেন উদ্দেশ্যহীন-ভাবে তেমনই তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়তেন। দেশে দেশে ঘুরতেন পদব্রজে। সারা বাঙলা দেশ দেখতেন ঘুরে ঘুরে। বঙ্গদেশ দেখার পর কাশী-কোশলের দিকে যেতেন—এই ছিল তাঁর যাত্রাপঞ্জী। এই ইচ্ছাকে মনের কোণে লুকিয়ে রেখে যাত্রা ক'রেছিলেন। তেমন সময়ে ডাক পড়লো পেছন থেকে। পিছু ডাক প'ড়লো।

কপালের দুই পাশে ঘামের বিন্দু ফুটছে একে একে। নতমাথা আর উঠছে না। আনত দৃষ্টি ফিরছে না আর কোথাও। মুখের সৌম্যতা মুছে যায় যেন। মাঝ-কপালে আকুঞ্চন।

—আগে আপনার কথা পাই, তারপর অন্য কাজ আমার। কথা যদি না পাই, মিথ্যা আর তাকে ফিরিয়ে মুখ পুড়াবো না।

কান্নার সুরে বললেন চৌধুরাণী। তাঁর কোরা শাড়ীর চওড়া লাল পাড় দুয়োরের পাশ থেকে একবার দেখা দেয় যেন। দেখা যায় দু'খানি পা। আলতায় লাল।

কৃষ্ণাঙ্গী দাসী আবার আসে। সিধার চুবড়ী বসিয়ে দিয়ে যায় চন্দ্রকান্তর কাছে। চাল, ডাল, তেল, সন্দেশ, ঘি, শব্জী, পরিধেয় বস্ত্র আর পাথেয়স্বরূপ কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রা আছে সিধার চুবড়ীতে।

—আমার প্রতি এই করুণা কেন মা ঠাকরুণ? বামুন বাদল বান, দক্ষিণা পেলেই যান। চন্দ্রকান্ত সহাস্যে কথা বলছেন। কথার জের টেনে বললেন,—তাই কি এই বিদায়ের দক্ষিণা?

চৌধুরী-গৃহিণী চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন,—ব্রাহ্মণজাতি আমাদের মাথার মণি। আমরা ব্রাহ্মণকে দেবতা জ্ঞান করি। এ তো আমাদের দান নয়, অর্ঘ্য। আপনি খুশী হোন। এ তো অতি সামান্য। মূল্যহীন বললেও হয়।

—আপনার অশেষ কৃপা। আমি হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করছি। চন্দ্রকান্ত কথা বলতে বলতে চৌকী ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—অনুমতি পাই তো বিদায় লই আমি।

—আজকের মত শেষ কথাটা শুধাই। সাতগাঁর জমিদার কৃষ্ণরামের স্ত্রীকে আপনি তো জানেন। আবার ফিসফিসিয়ে কথা বলেন চৌধুরাণী। বলেন,—তাঁর নাম শুনতে পাই বিন্ধ্যবাসিনী, তিনি তো রাজকন্যা?

—হাঁ, আপনি যথার্থই বলেছেন!

কেমন যেন সলজ্জায় বললেন চন্দ্রকান্ত। সিধার চুবড়ী কাঁধে তুললেন কথার শেষে।

চৌধুরাণী বলেন,—বিন্ধ্যবাসিনী মানুষটা কেমন? আমার আনন্দকে কি সেই এই বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে?

—আপনার অনুমানে বিন্দুমাত্র সত্য নাই। রাজকন্যার তুলনা খুঁজে মেলে না। আনন্দের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসা অপার। এই দুর্ঘটনায় তিনিও খুবই ব্যথা পেয়েছেন।

—জমিদার কৃষ্ণরাম তবে তাকে ত্যাগ করেছেন কি কারণে? কি দোষ তার?

—কৃষ্ণরামের বিষয়লালসার শেষ নাই। রাজকন্যার পিতার ভূসম্পত্তিতে অংশ দাবী ক'রেছেন তিনি। দাবী পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত রাজকন্যার মুক্তি নাই।

আকাশ থেকে পড়লেন যেন চৌধুরী-গৃহিণী। বিস্ময় প্রকাশ করলেন মুখে। বললেন,—আহা ব্যাচারী! অদৃষ্টের দুর্ভোগ আর কি! খানিক থেমে আবার বললেন,—রাজকন্যার প্রশংসায় আনন্দ যেন পঞ্চমুখ ছিল।

—বিদায় মা ঠাকরুণ!

—আপনার সিদ্ধান্ত না জানা পর্য্যন্ত আমার চোখে ঘুম নেই জানবেন।

—আপনি অধীর হবেন না। শীঘ্র আসছি আমি।

—প্রণাম জানাই আমি।

—আপনার জয় হোক।

—বিদায়!

—প্রণাম।

আকাশে অনেক তারা। গ্রহ আর উপগ্রহ। রাত্রির অন্ধকারে পৃথিবীর মাটি থেকে জ্যোতিষ্কের হ্রস্বদীর্ঘ ঠাওরানো যায় না। আয়তন বোঝা যায় না। গুণাগুণের মান নির্ণয় সম্ভব হয় না। শুধু দেখা যায়, নক্ষত্রমণ্ডলী ম্লান হয়ে থাকে চাঁদের আশ-পাশে। উজ্জ্বল চন্দ্রের কাছে দেখায় যেন নিবু-নিবু দীপালোক। দপ ক'রে কখন হয়তো নিবে যাবে!

বিন্ধ্যবাসিনী যেন চাঁদের সমতুল্যা। আর আর সকলের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না যেন। চন্দ্রকান্ত পথ চলতে চলতে গভীর চিন্তায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে যান। আকাশের চাঁদের মত তাঁর মন-আকাশে বিন্ধ্যবাসিনীর মুখচন্দ্র ভেসে ওঠে বার বার। পবিত্র এক অনুভূতির আবেগে রাজকন্যাকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছা হয়। বিন্ধ্যবাসিনীর মত সহনশীলতা সহসা যেন দেখা যায় না। কিন্তু চৌধুরী-গৃহিণীর কথা আর আবেদনের ভাষা যেন কাণে বিষ ছড়ায় এখনও। কি কথা বললেন তিনি! কি অসম্ভব কথা! বৈশাখের প্রখর সূর্য্যতাপে পথের মাটি উষ্ণ হয়ে উঠেছে। চন্দ্রকান্ত চলার গতি দ্রুত করেন। পথের পাশের ঘাস-মাটি ধ'রে এগিয়ে চললেন। কাঁধে সিধার পাত্র। অনেক দূর থেকে দৃষ্টিপথে পড়ে কৃষ্ণরামের ভগ্ন-আলয়। জরা আর ব্যাধিগ্রস্ত ইটের কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসের পথ চেয়ে। পাঁকের পদ্মের মত ঐ ভাঙাদেউলে যেন ফুটে আছেন লক্ষ্মীস্বরূপা বিন্ধ্যবাসিনী।

নিজেকে যেন ধিক্কার দিতে সাধ হয় চন্দ্রকান্তর। নিজের মনকে তিরস্কার জানাতে ইচ্ছা হয়। সংযমের বন্ধন ছিন্ন হয়ে পড়ে যেন।

আকাশের চাঁদের মত তাঁর মন-আকাশে বার বার উদয় হয় সেই চাঁদমুখের। মনে মনে লজ্জানুভব করতে হয়। একবার যদি তাঁর দেখা পাওয়া যায়! তাঁর মুখের মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনা যায়! পথে জন-মানুষ নেই, তবুও লজ্জায় যেন অধীর হ'য়ে ওঠেন চন্দ্রকান্ত। আরও দ্রুত চলতে থাকেন তিনি। ঘাস-মাটি পদদলিত হয়।

•

অনভ্যাসের ফল। হাত চলে না যেন। এক পঙ্‌ক্তি লিখতে কাটাকুটি করতে হয় কত। পুঁথি নকলের কাজ পেয়ে যেন সব দুঃখজ্বালা ভুলে গেছেন রাজকুমারী। তুলট কাগজের বুকে কালির আখর জমতে থাকে সারি সারি। লেখার আড়ষ্টতা আর না থাকলেও অত্যন্ত সন্তর্পণে লেখনী চালনা করেন।

ডেকে ডেকে সারা হয়ে যায় পরিচারিকা। ডাকাডাকিতে কোন ফল না পাওয়ায় সে-ও নীরব হয়ে ব'সে থাকে এক পাশে, গোমড়া মুখে। থেকে থেকে হাওয়া চলে না। গুমট গরমে হাত-পাখার বাতাস খায় মধ্যে মধ্যে। চুপচাপ থাকতে পারে না যশোদা। কেমন যেন আনচান করে। বিরক্তির সুরে কাটা-কাটা কথা বলে। বললে,—রান্না জুড়িয়ে যাচ্ছে যে ওদিকে। খাওয়া-দাওয়া সেরে যা খুশী কর' না, বলতে আসবো না তখন।

মৃদু মৃদু হাসির ঝিলিক খেললো বিন্ধ্যবাসিনীর লাল অধরপ্রান্তে। হেসে হেসে বললেন,—এই পাতাখান লেখা শেষ না হ'লে উঠবো না আমি, তুমি যাই বল' না কেন।

—এরই মধ্যে নেশা ধরে গেছে বুঝি?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। বেশ ভাল লাগছে লেখার কাজ করতে। সব ভুলে থাকছি লিখতে লিখতে।

—পণ্ডিত হতে চাও না কি বৌ?

—তেমন সৌভাগ্য কি হবে কখনও? কি-ই বা জানি আমি! কিছুই জানি না।

লেখা না থামিয়ে কথা বলেন রাজকন্যা। অসাবধানে তাঁর পিঠের কাপড় স'রে গেছে। দুগ্ধশুভ্র পৃষ্ঠদেশে এলো কেশের বোঝা নেমেছে। রুক্ষ কুন্তল উড়ছে মাঝে মাঝে। পরিচারিকার বিরক্তির চাউনি স্থির হয়ে থাকে। যশোদার চোখে যেন বিহ্বলতা দেখা দেয়, বিন্ধ্যবাসিনীর রুক্ষসুন্দর রূপ দেখতে দেখতে। এমন নিখুঁত দেহগঠন যেন চোখে পড়ে না কোথাও। পাশ থেকে দেখা যায় রাজকন্যার মুখমণ্ডল, কুমোরের তৈরী প্রতিমার মত দেখায় যেন।

লেখায় ক্ষণেক বিরত হয়ে মধ্যদিনের আকাশে চোখ তুললেন বিন্ধ্যবাসিনী। রূপার চাঁদোয়া যেন মহাশূন্যে। সূর্য্যের আলোয় ঝলমল করছে শুভ্রমেঘ। আকাশে চিল আর শকুনি উড়ছে। তৃষ্ণার্ত কাক ডাকছে কোথায়। অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে যেন কোন্ অদৃশ্যে, বাতাসে যেন আগুনের পরশ লাগে।

পরিচারিকা কথা বললে হঠাৎ। বিতৃষ্ণার সুর তার কথায়। বললে,—বৌ, তুমি দেখছি তোমার শ্বশুর আর পিতৃকুলের নাম ডোবাবে!

—কেন গো যশোদা? হেসে হেসে বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। মুক্তার সারির মত সমানসুন্দর দাঁতের সারি দেখা যায়। বললেন,—কি এমন গর্হিত কাজটা ক'রেছি, তাই শুনি?

—ঘরের বৌ রোজগার করতে নামবে, সে কেমন কথা! মুখ বেঁকিয়ে কথা বলে পরিচারিকা। অভিযোগের সুরে।

খিল-খিল হেসে উঠলেন রাজকুমারী। তাঁর কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি ভাসলো শূন্যপুরীতে। অলস মধ্যাহ্ন হেসে উঠলো যেন। হাসতে হাসতে বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—ভাত-কাপড়টা স্বোয়ামীর কাছ থেকে যদি না নিই, তাতে আর তোমার মাথাব্যথা কেন? কুলেই বা কালি পড়বে কেন?

—দেখে নিও বৌ, সমাজে ঢি ঢি প'ড়ে যাবে।

—তা যাক, ক্ষতি কি তায়?

—মুখ দেখাতে পারবে না আর।

—এ পোড়া মুখ আর নাই দেখালাম।

একান্ত দুঃখের কথা, কিন্তু হাসতে হাসতে বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। কথার শেষে আবার লেখায় মন দিলেন। মুখের হাসি মিলালো না।

—যাই বল' তুমি, আমি বৌ ভাল বুঝছি না তেমন। ব'সে-ব'সে কাজ কর'।

—ঢের হয়েছে। তোমার উপদেশ-অমৃত আমি মাথা পেতে নিয়েছি। এখন চল' এক মুঠো ভাত খেতে দেবে। আমার লেখা আপাতত শেষ হয়েছে। পাতা পূরণ হয়ে গেছে।

কথার শেষে লেখনী নামিয়ে রাখলেন রাজকন্যা। রুক্ষ চুলের রাশিতে ঢেউ নাচিয়ে উঠে পড়লেন আসন ছেড়ে।

পরিচারিকাও উঠে পড়লো। বললে,—এত যে লেখা-লেখি ক'রছো, ভাইদের দু'-চার ছত্র লিখতে পারছো না?

—কি লিখতে হবে তাই শুনি?

—লিখতে হবে যে, আমাদের জমিদার যা চাইছেন যেন দিয়ে দেওয়া হয়।

যশোদার কথা শুনে আবার খিল-খিল হাসি ধ'রলেন রাজকুমারী। আলগা শাড়ীর আঁচল ঠিকঠাক করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ফাঁকায় হাওয়ায়।

আমোদরের দেহরেখা দেখলেন ঘরমুখের দালান থেকে। কাঁচা রূপার প্রবাহ বইছে যেন। মধ্যাকাশের সূর্য্যের প্রতিচ্ছায়া আমোদরের বুকে। দিগ্বলয়ে বনরেখা স্তব্ধ হয়ে আছে। আকাশ-স্পর্শী গাছেরা যেন দাহনজ্বালায় ক্লান্ত। পত্রশাখা হয়তো তাই নিষ্কম্প।

—দাবী যদি ভিত্তিহীন হয় যশোদা?

দালান থেকে কথা বললেন রাজকুমারী। এক জলপাত্র থেকে এক আঁজলা জল তুলে চোখে-মুখে ছোঁয়ালেন।

—জানি না বাছা এত-শত।

কথা বলতে বলতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় পরিচারিকা। সিঁড়ির ধাপে ধাপে শব্দ তুলে নীচে নেমে যায়।

দুই ভাইয়ের মুখ দু'টি মনে পড়ে রাজকুমারীর। রাজাবাহাদুর আর রাজকুমারকে। রাজা কালীশঙ্কর আর কুমার কাশীশঙ্করকে। বেশ ভুলে ছিলেন এতক্ষণ, হঠাৎ যেন মনে পড়লো আর বুকটা হু-হু ক'রে উঠলো। চোখে জলের চিকণ খেললো। সিঁড়ির দিকে চললেন বিন্ধ্যবাসিনী।

[৭২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পঞ্চতপা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৫

ওপরের মেন্ কোয়ার্টারস্-এর মতই অনেকটা জায়গা জুড়ে নীচের আপিস কোয়ার্টারস্। হাল ফেশানের বড়-সড় আপিস-বাড়ি বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু নেই। ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দালান গোটাকতক। দু'তিনটে করে ঘর; পদমর্যাদা অনুযায়ী সেই সব ঘরের আসবাব-পত্র, সাজ-সরঞ্জাম। বিচ্ছিন্ন হলেও দালানগুলি মেন্ কোয়ার্টারস্-এর মত অতটা দূরে দূরে নয়। প্রয়োজনে সব সময়েই কর্মচারীদের এক দালান থেকে অন্য দালানে আনাগোণা করতে হয়।

সকালের আপিস শুরু হবার আগে সাধারণ কর্মচারীদের আড্ডা বসে একপ্রস্থ। সব একসঙ্গে নয়। এখানে সেখানে, বিচ্ছিন্ন ভাবে। দাওয়ার ওপর, এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে মাটিতে, ছোট ছোট ঝোপের ছায়ায়, অথবা শিলাসনে।

কিন্তু প্রায়ই ব্যতিক্রমও ঘটে আবার। মাঝপথে জটলা থামিয়ে যে যার কাজে বসে যায় চুপচাপ। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক। তখনই, যখন একেবারে ওই কোণের দালানটিতে একজনের উপস্থিতির আভাস পায়।

কারো কোনো অনুশাসন নেই এর পিছনে। কোনো ভ্রূকুটি নেই কারো। কিন্তু এমনি হয়ে আসছে। শুধু আপিস-পরিবেশে নয়। আউটডোরেও। মড়াইয়ের বুকেও। দলে দলে কোদাল-শাবল চালাচ্ছে মাটি-কাটা কুলিরা, একটু-আধটু মস্করা করছে মাটির ঝড়ি বা পাথর মাথায় কামিনরা, তদ্বির তদারকের ফাঁকে ফাঁকে তাদের খোলা বুকের ওপর একটু-আধটু চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে কুলিবাবুরা। এরই মধ্যে হয়ত দেখা গেল, প্রায় কোন দিকে না তাকিয়েই লোকটি চলে যাচ্ছে একপাশ দিয়ে। কুলিরা সচেতন হল একটু, ঝড়ি-মাথায় কামিনরা ফিরে ফিরে দেখে নিল, মুখের বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তৎপর হল কুলিবাবুরা। যন্ত্র সমাবেশের দিকেও তাই। লোকটি হয়ত দাঁড়াচ্ছে একটু কোথাও, কোথাও বা পাশ কাটিয়ে চলেই যাচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে কর্মচারীদের একটুখানি বাড়তি নিবিষ্টতা চোখে পড়বে।

···চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি!

কোণের দালানের স্বতন্ত্র ঘরটিতে কর্মমগ্ন। কাগজপত্র দেখছে। সই করছে। ফাইল ঘাঁটছে। টেবিলে ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জাম ছড়ানো। দেয়ালে দেয়ালে চার্ট, ম্যাপ। ঘরে ঢুকলে প্রথমেই সমস্ত পরিকল্পনার নক্সাটা চোখে পড়ে।

টেবিলের গায়ের বোতাম টিপতে প্যাঁ—ক্ করে শব্দ হল একটা। বেয়ারার আবির্ভাব!

—ওভারসিয়ার রায় বাবু।

বেয়ারা চলে গেল। খানিক বাদে অল্পবয়স্ক একটি লোক হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এলো। রায় বাবু তো এখনো জয়েন করেন নি স্যার!

ইঞ্জিনিয়ারের মুখে বিরক্তির রেখা।—স্পিলওয়ে সারভে ফাইল কে ডিল করছে নিয়ে আসতে বলুন।

আগন্তুক বেশ একটু বিব্রত মুখে বেরিয়ে গেল।

সামনের উঠোন ডিঙোলেই আর একটা দালান। তেমনি একটা বড় ঘরের মেঝেতে দেয়ালে টেবিলে সর্বত্র ড্রইংয়ের ছড়াছড়ি। আঁকার সরঞ্জামেরও। টেবিলে ছড়ানো ড্রইংয়ের ওপরেই দু'পা চালিয়ে দিয়ে চেয়ারে মাথা রেখে সিগারেট টানছে নরেন চৌধুরী। বাঁ হাতে হাতীর দাঁতের কান-কাঠি দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছে আর গলা দিয়ে সেই পেটেণ্ট শব্দ বার করছে।

ফাইল-হাতে সেই লোকটি ঘরে প্রবেশ করল। নরেন চৌধুরী সিগারেটের ধোঁয়ার জটিলতা সৃষ্টি করতে করতেই অলস নেত্রে তাকালো তার দিকে।

ফাইল-বাহক একটু ইতস্তত করে বলল, বড় সাহেব ডেকেছেন—

ধূম্র রচনা বন্ধ হ'ল। ঈষৎ কৌতূহলে তাকালো নরেন চৌধুরী। পরে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, যাচ্ছি।

—না, মানে—আপনাকে নয়—স্পিলওয়ে ফাইল নিয়ে আমায় যেতে বলেছেন।

ব্যাপার বুঝে নিতে আর সময় লাগল না একটুও। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে নরেন চৌধুরী যে কাগজটার ওপর ছাই ঝাড়ছিল তাতে ভুক্তাবশিষ্ট সিগারেটটা টিপে টিপে নেবাল। তার পর ছাইসুদ্ধ কাগজটা মুড়ে ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দেয়ালের গায়ে ওলটানো একটা কার্ডবোর্ড সোজা করে দিল। বড় বড় হরফে তাতে ঘরে ধূমপান নিষেধ বাণী লেখা। ফিরে বসল।

দুশ্চিন্তা ভুলে ছেলেটি হাসতে লাগল মিটি-মিটি। এই লোকটির সঙ্গে একটা সহজ অন্তরঙ্গতা আছে সকলেরই:

—তোমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছে যেতে হলে আমি কি মাঝপথের হলটিং ষ্টেশান?

—কি করব, অবনী বাবুর তো অসুখ—এ সব কখনো করেছি যে হুট্ করে ফাইল নিয়ে গিয়ে হাজির হব? ফাইল তো যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

—হুঁ? তবু তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে! খুব কড়া করে তাঁকে দু'কথা শুনিয়ে এসোগে যাও—যাও যাও যাও—দেরী কোরো না!

অপ্রস্তুত হয়ে হেসে ফেলল ছেলেটি। কিন্তু হাসলে চলবে না, ব্যবস্থা কিছু করতে হবে এক্ষুনি। ফাইল তার টেবিলের ওপর রেখে বলল, আপনি যা করবার করুন, আমি চললাম—।

দ্রুত প্রস্থান।

ফাইল তুলে নিয়ে নরেন চৌধুরী নেড়ে-চেড়ে দেখল একবার। হাতীর দাঁতের কানকাঠি পকেটে ফেলল। পরে ফাইল-হাতে হাল্কা-মৃদু শিস দিতে দিতে বাইরে এসে উঠোন ডিঙিয়ে গন্তব্যস্থানে চলল।

—গুড মর্নিং ইঞ্জিনিয়ার সাহেব! দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল।—এই নাও তোমার স্পিল্‌ওয়ে ফাইল।

—বোসো, তুমি যে ?

—আমি ছাড়া ওই শাদা ফাইল নিয়ে কে আর তোমার কাছে এগোবে? সারাক্ষণ মুখখানা যে করে থাকো, ওপরঅলার ভয়েই অস্থির সব

মৃদু হেসে বাদল গাঙ্গুলি তাকালো তার দিকে।—সেই রকমই দেখছি বটে।

হা-হা করে হেসে উঠল নরেন চৌধুরী।—দুঃখ থাকে তো বলো, হুজুর টুজুর জুড়েদি—। সবার সব-কিছু নিয়ে তোমার কাছে আসতে হয় বলে আমার একটা আলাদা এলাওয়েন্সের জন্য লেখা উচিত তোমার।

—লিখব'খন। কিন্তু এ ফাইলের কি হল ?

—কি আর হবে, অবনী বাবু সেরে উঠুন।

মনঃপূত হল না স্পষ্টই বোঝা গেল।—অবনী বাবু যদি এখন ছ'মাসে সেরে না ওঠেন ও ফাইল অমনি পড়ে থাকবে ?

বড় সাহেবের কথার পিঠে কথা বলতে একমাত্র নরেনই পারে। মাথা নেড়ে সায় দিল সে, ঠিক কথা, ছ'মাসে কেন, অবনী বাবু আর যদি সেরে না-ই ওঠেন—স্পিল্‌ওয়ে কি বন্ধ হয়ে যাবে ?

বাদল গাঙ্গুলি হার মানল প্রায়।—ওরা বুঝি এই করতেই ফাইল দিয়ে তোমাকে পাঠিয়েছে ?

—কি করবে, ওদের তো বাঁচতে হবে। যাক্, কিছু ভেবো না, ফাইল তোমার দু'দিনেই ঠিক করিয়ে দিচ্ছি। হঠাৎ কি একটা মতলব এলো যেন মাথায়। উঠতে গিয়েও চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পড়ল আবার।···মন্দ হয় না, সান্ত্বনা আকাশ থেকে পড়বে একেবারে। বলল, তুমি তো আচ্ছা বড় সাহেব, রোদে জলে সারা হয়ে ভদ্রলোক অসুখে পড়ে গেলেন, আর এখান থেকে এখানে তুমি একটি বার দেখতেও গেলে না তাঁকে ?

বিব্রত করাই উদ্দেশ্য। বিব্রত হলও।—উনি তো এখন ভালো আছেন শুনেছি—।

—তাহলেও একবার যাওয়া উচিত তোমার। তুমি হলে এই ড্যাম ফ্যামিলির মাথা —

হেসে উঠল দু'জনেই। বাদল গাঙ্গুলি বলল, গালাগালটি ভালই দিলে, আচ্ছা আমি যাব'খন—।

—যেও, আজই যেও। অবশ্য ভালই আছেন এখন তিনি, তবু আশাও তো করে লোকে।

তার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎই কিছু যেন মনে পড়ে গেল বাদল গাঙ্গুলিরও। মৃদু হেসে বলল, আশা যার করে সে তো রোজই যাচ্ছে বোধ হয়—। পরক্ষণে গম্ভীর মুখে হাতের কাজে মন দিল সে।

মুচকি হেসে নরেন চৌধুরী চেয়ে রইল তার দিকে। কিন্তু না। আর আশা নেই। দ্বিগুণ একাগ্রতায় কাগজপত্র দেখছে—প্রায় রূঢ় মনোযোগে।

—চলি। হাত বাড়িয়ে ফাইলটা নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল নরেন চৌধুরী। একটা কাজ মন্দ হল না। সান্ত্বনার চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার দর্শন ঘটবে আজ। ওর তখনকার মুখখানা দেখার লোভ হচ্ছে খুব। কিন্তু দেখতে গেলে সব পণ্ড। পরে বরং শোনা যাবে। কিছু একটা দৃশ্য কল্পনা করেই হয়ত হাসছে আপন মনে।

কিন্তু ভবিতব্য অন্য রকম। কি রকম জানলে নরেন চৌধুরীর মুখে হাসি আসত কি না সন্দেহ!

সান্ত্বনার মেজাজ সেদিন অন্যরকম। ছোকরা চাকরটার দেখা নেই তিন দিন। গোরুটার খাবার পর্য্যন্ত ফুরিয়ে এসেছে। মেজাজ আরো বিগড়েছে অন্য কারণে। পাহাড়ের পিছন দিকেও নতুন রাস্তা বার করা হচ্ছে একটা। যেখানে গোরু বাঁধা হয় তার থেকে অনেকটাই দূরে অবশ্য। বড় একটা পাথরের চাং ভূমিসাৎ করা হচ্ছে সেখানে। আর থেকে থেকে সেই বিস্ফোরণের গুরুগর্জনে ভয়ে ত্রাসে এদিকে সেদিকে ছুটে পালাতে চেষ্টা করছে গোরুটা।

ওদিকটা একবার পরিদর্শন করে আপন মনে আসছিল বাদল গাঙ্গুলি। অনতিদূরের নারীকণ্ঠে থমকে দাঁড়াল। খুঁটির সঙ্গে একটা গোরু বাঁধা। মেয়েটি তাকে বোঝাচ্ছে, গোরু বলে গোরু, আচ্ছা গোরু তুই, সেই থেকে শুনছিস ওই শব্দ, তবু তোর ভয় গেল না! ওখানে শব্দ হচ্ছে তো তোর তাতে কী? ঘুরে ঘুরে দিব্বি খাবি দাবি মোটা হবি, না ভয়েই মলো!

শান্তনেত্রে কথাগুলি শুনে গাভীকন্যা ভারী আশ্বস্ত হ'ল যেন।

—চল্ বাড়ি চল, আমি তো আছি, ভয় কি ?

এক হাতে বালতি এবং অন্য হাতে খুঁটি থেকে দড়ি তুলে নিল সান্ত্বনা। অদূরের মানুষটার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হল একবার। চেহারা-পত্র বেশভূষা এমন কিছু নয়, যাতে করে এই মেজাজ সত্ত্বেও কৌতূহল জাগতে পারে। ওরকম হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখাটাই বরং বিরক্তিকর আরো। লোকগুলোর স্বভাবই ওই।

ঠিক এমনি সময় আচমকা আবার সেই শব্দ একটা। ভয় পেয়ে গোরুটা দিল ছুট। হাত থেকে দড়ি ফসকে গেল সান্ত্বনার। বালতিটাও ছিটকে পড়ল। আর, টাল সামলাতে না পেরে নিজেও হুড়মুড় করে আছাড় খেল একটা।

বাদল গাঙ্গুলি দড়িটা ধরে ফেলে টেনে-হিঁচড়ে ভীতত্রস্ত গোরুটাকে থামালো কোন প্রকারে। তার পর ফিরে চেয়ে দেখে ওই অবস্থা। সান্ত্বনা মাটি ছেড়ে উঠতে পারেনি তখনো।

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল শেষে। বেশ লেগেছে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। কাপড় সামলাতে সামলাতে অগ্নিমূর্তিতে গোরুটার সামনে এসে হাত নেড়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল, চলো বাড়ি চলো আজ, তোমাকে দেখাচ্ছি মজা—পাজী হতচ্ছাড়া ভীতু গোরু—ঘাস খাস কি সাধে!

সামনের লোকটিকে দেখল। শক্ত হাতে গোরুর দড়ি ধরে নিষ্পলকনেত্রে তার দিকেই চেয়ে আছে। রাগে গর গর করতে করতে সান্ত্বনা ভূপতিত বালতিটার কাছে গেল। ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণুতায় স্রস্ত বেশবাস সম্বৃত করে নিল একটু। বালতিটা হাতে তুলে নিল তার পর। সামনে এসে বলল, ওটাকে ধরে একটু এগিয়ে দিতে পারবেনা? এই [illegible]—

নিজের অজ্ঞাতে সামনে-পিছনে একবার দেখে নিয়ে বাদল গাঙ্গুলি ঘাড় নাড়ল, পারবে।

হন হন করে ক'পা এগিয়ে গেল সান্ত্বনা। পিছনে দড়ি ধরে গোরু আগলে চলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি।

থমকে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা পিছন ফিরে দেখল। ভয় পেলেও গোরু হাতছাড়া হয়নি। রাগে গর গর করে বলে উঠল, ওঃ ঘটা কত! জল আনছে না তো একেবারে সমুদ্দুর নিয়ে আসছে সব! ভ্রূকুটি করে তাকালো, আপনি ওই ওখানে কাজ করেন?

প্রশ্ন অবান্তর নিজেই জানে। ড্যামের কাজ ছাড়া আর কোন কাজ নেই এখানে। কিন্তু রাগের মাথায় অত-শত খেয়াল নেই সান্ত্বনার।

বাদল গাঙ্গুলি ঘাড় নাড়ল, করে—।

—ওদের বলে দেবেন মাটির নীচে এন্তার জল আছে, মিথ্যে আর এত হাঁক-ডাক করা কেন, অমনি করে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলেই জলে জলময় হয়ে যাবে সব।

মেয়েটি কে, অনেকক্ষণই চিনেছে বাদল গাঙ্গুলি। বলল, জলের জন্য নয়, ওখানে একটা রাস্তা হচ্ছে।

কোমরের ব্যথায় হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, হাঁটুও বোধ হয় ছড়ে গেছে। প্রত্যুত্তর সহ্য হল না।—হ্যাঁ, দলে দলে লোক গিয়ে জলের মধ্যে সাঁতার কাটবে সেই জন্য রাস্তা হচ্ছে।

কেন যে বাদল গাঙ্গুলি একটু বোঝাবার লোভ সংবরণ করতে পারল না সে-ই জানে। মৃদু হেসে বলল, রাস্তা হলে তবে তার পাশ দিয়ে নালা কেটে এখানকার গাঁয়ের দিকে জল পাঠানো যাবে, নইলে—

—থাক্ থাক্ থাক্, আপনাকে আর বোঝাতে হবে না, আপনাদের থেকে ঢের বড় বড় চাকুরেদের মুখে অষ্টপ্রহর এই জল-কীর্তন শুনছি।

আবার সে হন-হন করে এগিয়ে গেল। অর্ধবিস্মিত কৌতুকে বাদল গাঙ্গুলি অনুসরণ করল তাকে। আনাড়ি হাত বুঝেই গোরুটা যেন এদিক-ওদিকে যেতে চাইছে। কোন রকমে সে সামলে চলছে ঠিকই, কিন্তু পায়ে পায়ে অনভ্যস্ততাও প্রকাশ পাচ্ছে।

সান্ত্বনা দাঁড়াল আবার। নিস্পৃহ অবহেলায় দেখল একবার। দৃষ্টি-বিনিময়। এই তো মুরোদ, ড্যাবড্যাব করে দেখতেই ওস্তাদ। বলল, একটা গোরু ঠিক মত চালিয়ে নিয়ে আসতে পারেন না, কোন কাজ হয় আপনাদের দিয়ে তাও বুঝিনে। অতটা দড়ি ছেড়ে দিয়ে ধরলে ও তো এদিক ওদিক যেতে চাইবেই, দড়িটা গুটিয়ে নিন আরো।

বেশ একটা বৈচিত্র্য অনুভব করছে বাদল গাঙ্গুলি। নির্দেশ মত দড়ি গুটিয়ে গোরুটাকে কাছাকাছি আনা হল।

বাড়ি। পাশের সেই প্রবেশপথ দিয়ে সান্ত্বনা আগে আগে চলল। পিছনে গোরু নিয়ে বাদল গাঙ্গুলি। গোয়াল-ঘর। সান্ত্বনার মেজাজ সপ্তমে চড়া তখনো। দুম করে বালতিটা রেখে বাদলের হাত থেকে দড়িগাছা নিয়ে খুঁটিতে গলিয়ে দিল।

কিন্তু এই বন্দিদশাও গোরুটার খুব পছন্দ নয়। পিছু হটতে চেষ্টা করে বাদলের গা ঘেঁষে এলো প্রায়। একটু ব্যবধান বজায় রাখতে গিয়ে তাকেও সরতে হল। ফলে এবার তারই পা লেগে বালতি ওলটালো। ভিতরের আহার্য পদার্থ কিছুটা ছড়িয়ে পড়ল।

আবার বকুনির ভয়েই হয়তো বাদল গাঙ্গুলি মাটি থেকে সেই জলে-খোলে মেশানো পদার্থ দু'হাতের আঁজলায় তুলে নিল খানিকটা।

সান্ত্বনা মুখ ফিরিয়ে দেখল একবার। কিছু না বলে গড়ানো বালতিটা তুলে নিয়ে গোরুর মুখের কাছে রেখে নতুন করে খাবার জোগান দিতে লাগল।

মাটি থেকে যা তুলেছিল তাই নিয়ে অঞ্জলিবদ্ধ দুই হাতে বাদল গাঙ্গুলি দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। বাড়ির ভিতর থেকে অবনী বাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, সান্ত্বনা এলি—!

এদিক থেকে অসহিষ্ণু জবাব গেল, যাই বাবা যাই! জল আনার যা ঘটা তোমাদের, ভগীরথও গঙ্গা আনতে অত তোড়জোড় করেনি, ভয়ে সুন্দরীটা একেবারে আধমরা হয়ে গেছে।

ওদিক থেকে আবার শোনা গেল, কি বলছিস কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

—কিচ্ছু শুনে কাজ নেই, ওখানে চুপ করে বসে থাকো, আমি আসছি।

সামনের লোকটার দিকে তাকালো এবার। অনেক নাজেহাল হয়েছে। হাঁ করে চেয়ে থাকার সাধ মিটেছে হয়ত। ঈষৎ সদয় কণ্ঠে বলল, আপনি আর দাঁড়িয়ে আছেন কেন, ওই ওদিকে জল আছে হাত ধুয়ে ফেলুনগে, তার পর ওই ওখানে বাবার কাছে বসুন গে যান, আমি আসছি—।

ধারণা, ড্যামে কাজ করে যখন তার বাবাকে চেনেই। হাতের কাজ সেরে না হয় দু'টো মিষ্টি কথা বলা যাবে।

হুকুম মত হাতের সেই বস্তু বালতিতে ফেলে বাদল গাঙ্গুলি বাইরে এসে জলের সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। গোয়ালঘরে কণ্ঠস্বর শুনল, গোরুর উদ্দেশে সান্ত্বনা বলছে, তুমি হাড়বজ্জাত হয়েছ, বুঝলে? আছাড় খাইয়ে আমার হাড়গোড় ভেঙ্গে দিয়েছ—নাও গেলো এখন—!

জলের সন্ধানে এসে বাদল গাঙ্গুলি যাঁর সামনে পড়ে গেল তিনি অবনী রায়। ঘর-সংলগ্ন বারান্দার ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান। মুখ খবরের কাগজের আড়ালে। কোন দিক থেকে কে এলো টের পাননি। কাছাকাছি হতে খবরের কাগজ সরালেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠলেন একেবারে।—স্যর আপনি! এদিকে আসুন স্যর এদিকে—ভারী সৌভাগ্য আমার!

ও'দিকে গোয়ালঘর ছেড়ে সবে বেরিয়েছে সান্ত্বনা। শোনামাত্র স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেল সে। একখানি নির্বাক্ পুতুল যেন। মাথায়ও ঢুকছে না কিছু।

বাদল গাঙ্গুলির হাত ধোয়া হল না আর। হাত দু'টো পিছনে নিয়ে সপ্রতিভ মুখে হাসল একটু।

—আসুন স্যর আসুন, ওরে সান্ত্বনা, একটা চেয়ার দিয়ে যা না শীগগির—আপনি এখানে বসুন স্যর—।

চেয়ার নিয়ে আসবে কি, মাটির সঙ্গে পা আটকে আছে সান্ত্বনার। কোনরকমে একটা বেতের চেয়ার নিয়ে পিছনে এসে দাঁড়ালো। দেখল, বাবা অনেকটা যেন আজ্ঞাভিভূত হয়েই আবার ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন।—চেয়ারটা এগিয়ে দে,—এই আমার মেয়ে সান্ত্বনা।

বাদল গাঙ্গুলি ফিরে দেখল তাকে। হকচকিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা বলল, ন-ন মস্কার—কণ্ঠস্বর নয়, যেন কান্না বেরিয়ে আসছে গলা বেয়ে।

দু'হাত তুলতে গিয়ে হাতের অবস্থা দেখেই আবার যথাপূর্ব দাঁড়িয়ে বাদল গাঙ্গুলি মাথা নাড়ল শুধু। সান্ত্বনা চেয়ার নিয়ে আর এগোতে পারছে না।

—থাক চেয়ার দরকার নেই। হাত দু'টো তেমনি পিছনে রেখেই অবনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কেমন আছেন এখন ?

—আমি তো সেরেই গেছি, আপনি মিছিমিছি কষ্ট করে এতটা পথ এলেন !

পিছন থেকে লোকটির দুই হাতের অবস্থা দেখে সান্ত্বনার দু' চক্ষু আরো স্থির। চেয়ার রেখে প্রস্থান করে বাঁচল।

বাদল গাঙ্গুলি বলল, না কষ্ট কি, আগেই আসা উচিত ছিল, আজ নরেন বলতে খেয়াল হল।

আড়াল থেকে সান্ত্বনা কাঠ হয়ে দেখছে আর শুনছে। অবনী বাবু বললেন, নরেনের কাণ্ড—আমি তো দু'-চার দিনের মধ্যেই কাজে যাব ভাবছি, আপনি বসুন না একটু, এক পেয়ালা চা অন্তত—

—না, এখন চা নয়, আমার তাড়া আছে। আপনি বেশ সেরে উঠুন আগে, এখনি কাজে বেরুবার দরকার নেই। ভালো বোধ করলে দুই একটা ফাইল বরং এখানে আনিয়ে নেবেন। আচ্ছা—

উঠে দাঁড়িয়ে অবনী বাবু নমস্কার জানালেন। বাদল গাঙ্গুলি চলে এলো। বাইরে সিঁড়ির কাছে জল-সাবান তোয়ালে নিয়ে সান্ত্বনা অপেক্ষা করছে। দাঁড়াতে হল। দেখল একটু। কে বলবে খানিক আগে এই মেয়ে অমন মেজাজে গোরু আর মানুষ দুই-ই একসঙ্গে তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ঢুকেছে! লজ্জা দেবার জন্যই জিজ্ঞাসা করল, আছাড়টা খেয়ে আপনার তখন লেগেছিল বোধ হয় খুব ?

জলের ঘটি তুলে নিয়ে সান্ত্বনা মাথা নাড়ল, লাগেনি।

সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে সান্ত্বনা জল ঢালতে লাগল। ওর বিব্রত মুখের দিকে চেয়ে আছে বাদল গাঙ্গুলি। বেশ কৌতুক অনুভব করছে।

প্রায় মরিয়া হয়েই সান্ত্বনা বলে ফেলল, আমি···আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

—কি বুঝতে পারেন নি ?

ঢোঁক গিলল সান্ত্বনা। কথা যোগাতে না পেরে তোয়ালে এগিয়ে দিল।

—এখন বুঝতে পেরেছেন ?

সান্ত্বনা তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়ল, পেরেছে।

—আচ্ছা। হাসি চেপে তোয়ালে তার হাতে ফেরৎ দিয়ে বাদল গাঙ্গুলি প্রস্থান করল।

সেদিকে চেয়ে সান্ত্বনা দাঁড়িয়েই রইল খানিকক্ষণ। বিভ্রান্ত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। গোয়ালঘর থেকে গোরুটার হাম্বা রব কানে এলো। হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল সান্ত্বনার। বেদম হাসি। অফুরন্ত। হাসতে হাসতে সেখানেই বসে পড়ে মুখে তোয়ালে চাপা দিল।

ভিতর থেকে অবনী বাবু ডাকলেন, সান্ত্বনা !

হাসি সামলে কোন প্রকারে সাড়া দিল, যাই বাবা !

কিন্তু বাবার কাছেও আসতে পারছে না চট করে। তাঁর সামনেও হেসেই ফেলবে হয়ত। তোয়ালে দিয়ে বেশ করে মুখ মুছে দমটম নিয়ে উঠল সে।

—দেখলি আমাদের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারকে ?

সান্ত্বনা নিরীহ মুখে মাথা নাড়ল। মুখে যাই বলুন, চিফ ইঞ্জিনিয়ার দেখতে আসায় অবনী বাবু মনে মনে খুশি খুব। প্রশংসায় মেতে উঠলেন। এতটুকু অহঙ্কার নেই, শুধু কাজটি হলেই খুশি, আর কাজ বোঝে কত! তুই যদি চট করে একটু চা করে এনে দিতিস।

যেমন স্বভাব, সান্ত্বনা ফস করে বলে বসল, বেশ করে ঘোল খাইয়ে দিয়েছি।

—ঘোল! ঘোল কি রে? কার কথা বলছিস ?

চট করে সামলে নিল সান্ত্বনা, ওই সুন্দরীর কথা, ভীতুর একশেষ, আজ আমায় নাজেহাল করেছে একেবারে! বড় রকমের জিভ কাটল, এই গো বাবা, তোমার ওষুধের সময় পেরিয়ে গেল, নিয়ে আসি আগে।

চপল পায়ে সরে পড়ল সেখান থেকে।

নিজের মধ্যে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না সান্ত্বনা। কাউকে না বলা পর্যন্ত ভেতরটা ফুলছে যেন। কা'কে বলবে, বাবাকে? ও-ব্বা-বা! একজনকেই শুধু বলা যেতে পারে। উন্মুখ আগ্রহে নরেনের প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। কিন্তু আসবেই এমন কোন কথা নেই। সকালে আপিসে নামার আগে বাবাকে দেখে গেছে, না আসাই সম্ভব।

বাড়ি বসে থাকতেও ভালো লাগছে না আর। কোন ছোট পরিসরে ওকে কুলোবে না এখন। বাইরের উন্মুক্ততা যেন টানছে। বাবাকে বলে বেরিয়ে পড়ল। কোন দিকে যাবে? যে দিকে লোক নেই। চলল। গোড়া থেকে ভাবতে চেষ্টা করল একবার ব্যাপারটা। কিন্তু ভাববে কি, মনে পড়ে আর নিজের মনেই হেসে খুন। লোকজন নেই এদিকটায় রক্ষা।

এই চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি! কি কাণ্ড! কিন্তু একেবারে হালকা লাগছে ভিতরটা। কিসের একটা আবিষ্টতা যেন কেটে গেছে। মোহগ্রস্ততাও বলা যেতে পারে! বাবা, বাবা—অদেখা মানুষ দেখা মানুষকে কতই না ছাড়িয়ে যায়। এরই সামনে পড়ে যাওয়ার ভয়ে কত দিন সে কি না! একেবারে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে! অবশ্য লজ্জায় মরে যাচ্ছিল আজও! কিন্তু সে ওই বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ডটা ঘটে গেল বলে। নইলে, হুঃ—!

পাকা রাস্তা ছেড়ে এবড়ো-খেবড়ো সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ ধরে চলেছে। কতটা এসেছে খেয়াল নেই। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের এম, এ পড়া মেয়ে ঝর্ণার কথা মনে পড়ল। আর সেদিনের সেই পার্টির কথাও। এখন আর বেমানান মনে হচ্ছে না একটুও। ওই ভোঁতা চেহারার লোকটির তুলনায় মেয়েটাই বরং বেশি ঝকঝকে। কি হল সেদিন আজ আরো বেশি জানতে ইচ্ছে করছে; নরেন বাবুর সবেতেই বেশি বেশি। গেলেই পারত—

অদূরে মেয়েগলায় খিল-খিল হাসির শব্দে সচকিত হয়ে থেমে

গেল সান্ত্বনা ; পাহাড়ের ওধারে বিদায়ী সূর্য গা-ঢাকা দিয়েছে। পাহাড়ের রঙ আর আকাশের রঙ এক হয়ে আসছে। এরই মধ্যে নারীকণ্ঠের উচ্ছল হাসিতে আসন্ন প্রদোষের স্তব্ধতা ফেটে চৌচির হয়ে গেল যেন !

পায়ে পায়ে এগলো সান্ত্বনা।—স্বেচ্ছায় নয়। দুর্বার কৌতূহলে। অদূরের একটা বড় পাথরের আড়াল পেরুতেই একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। পালাতে পারলে পালাতো সান্ত্বনা। কিন্তু আর সুযোগ নেই আড়াল হবারও !

পাগল সর্দারের মেয়ে চাঁদমণি। আর মাঝির ছেলে হোপুন !

—ই-ই-দিদিয়া—! খুশির মাত্রা যেন চতুর্গুণ বেড়ে গেল চাঁদমণির ! একটা ছোট পাথরে গা ঢেলে দিয়েছিল। সোজা হয়ে বসল।—ই দিদিয়া ! আঁই রে দিদিয়া—! মারাংবুরুর রাণীপানা দেখতে লাগছে তুকে—ইদিকে আয় না কেনে— !

কি করবে সান্ত্বনা ? সম্ভব হলে উল্টো দিকে ছুটতো। সম্ভব নয়। কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হাসি টেনে জিজ্ঞাসা করল, তুই কি করছিস এখানে ?

বড় করে নিশ্বাস ফেলল চাঁদমণি। কালো চোখের বিদ্যুৎকটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হল হোপুনের ওপর। চোখে-মুখে দাঁতের আভাসে তড়িত চপলতার ঝিলিক। ওরাঃ চালাঃ কানাইং—ঘরপানে যেতে লেগেছিলাম—মরদটোর 'দিল' দেখ কেনে—সনুঝে কালে লুবজির মতন পাছু নেছে—লাজডর নাই !

কি কুক্ষণে এই ফ্যাসাদের মধ্যে এসে পড়েছে সান্ত্বনা ! হতচ্ছাড়ী মেয়েটার জিভ যেন সাপের ছোবল। তবু হোপুনের দিকে এক বার না তাকিয়ে পারলে না সান্ত্বনা। যে ভাবে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা যেন একটা অপরাধ হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। বিব্রত, সঙ্কুচিত। মড়াইয়ের পাথরে-কোঁদা পাণ্ডা নয়। নিরস্ত্র বিহ্বল, দেউলে মূর্তি।

চাঁদমণির আলো ঠিকরনো কালো চোখের তারা দু'টো বারকতক যেন নেচে বেড়ালো সান্ত্বনার মুখের ওপর। উচ্ছলকণ্ঠে খিল্-খিল্ করে হেসে উঠল তারপর। তীক্ষ্ণ পাহাড়-চেরা হাসি। দেখে লে রে, দেখে লে, দিদিয়ার আঙ্গা মুখ দেখে লে—চান্দো মুখে আগুন লেগেছে দেখ্।

এবারে সোজা পৃষ্ঠপ্রদর্শন। পিছনে হাসির দমকে ভেঙ্গে পড়ছে চাঁদমণি। হাসি নয় তো যেন বরফ-গলানো জল। গায়ে কাঁটা দেয় আর অবশ করে ফেলে।

অনেকটা পথ এসে হাঁপ ফেলে বাঁচে সান্ত্বনা। হাঁপিয়েই গেছে। অজানা অনুভূতির স্পর্শ আছে মেয়েটার হাসির মধ্যে। দূরে আসা সত্ত্বেও সেটার অস্বস্তি যেন জড়িয়ে আছে গায়ের সঙ্গে। ধুপ করে বসে পড়ল এক জায়গায়। বড় বড় দম নিল দু'চারটে। হাতের কাছের একটা পাথর কুড়িয়ে নিল। নিজের অজ্ঞাতে হাতের মুঠোয় বারকতক নিষ্পেষণ করতে চাইল ওটা।

তারপর সুস্থ হল, সহজ হল।

কেন মরতে গিয়েছিল ওখানে। ভাবল, জেনে-শুনে তো আর যায়নি। কিন্তু নিজের ভিতর থেকেই যেন খোঁচা খেল একটা। জেনে-শুনে নয় ? ওই নিরিবিলি নির্জন কি একজনের জন্য নাকি ? না একা কেউ এখানে বসে অমন করে হাসে ? রাগ করে পাথরটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সান্ত্বনা।

মুখে হারবানা হাসির আভাস।

—কিন্তু কেনই বা বিয়ে দিচ্ছে না পাগল সর্দার ওদের ! লোকটা মেয়েকে যত না, হোপুনকে ভালবাসে তার থেকে বেশি। তবু বিয়ে দিচ্ছে না কেন ? জিজ্ঞাসা করলে আনমনা হয়ে কি যেন ভাবে পাগল সর্দার। সেই এক কথাই বলে তারপর। দেবে—। সময় হলে দেবে। সময়ের আর বাকি কত সে তো দেখছে। মড়াই বাঁধার আগে পর্যন্ত গাঁয়ের মাঁঝি হোপুনের বাবার প্রতিপত্তি কম ছিল না। দিনকাল বদলালেও এখনো ফেলনা লোক নয় সে, মুরুব্বিই বটে। মড়াইয়ের গোলযোগ মিটে যেতে আপোষ স্বরূপ সে নিজেই এসে ছেলের জন্য চাঁদমণিকে চেয়েছে। কিন্তু পাগল সর্দার সেই কথাই বলেছে তাকেও। বিয়ে দেবে। কিন্তু এখন নয়। পরে। বেশ অসন্তুষ্ট হয়েই ফিরে গেছে হোপুনের বাবা। হোপুনও খুশি হয়নি।

পাগল সর্দার নিজেই গল্প করেছে সান্ত্বনার কাছে।

হোপুনের বাবার মত সান্ত্বনার একবারও মনে হয়নি, মেয়ে নিয়ে মাঁঝির ছেলেকে খেলাচ্ছে পাগল সর্দার। বরং মনে হয়েছে, লোকটার বুকের কোথায় যেন মস্ত ক্ষত।—কিন্তু বিয়ে যখন দেবেই ঠিক করেছে, দিচ্ছে না কেন ? যে দজ্জাল মেয়ে ওর। হেসেই ফেলে সান্ত্বনা—পাজী হতচ্ছাড়ী মেয়ে !

বাড়ি ফিরে সান্ত্বনা দেখে নরেন বাবু বসে আছে বাবার কাছে। অপ্রত্যাশিত নয়। আসতে আসতে ভাবছিলও।

মড়াইয়ে নেমে অনেক দিন পরে আবার সেই পুরানো দিকেই পা বাড়ালো সান্ত্বনা। যন্ত্র-সমাবেশের দিকে নয়। ওর মনোযন্ত্রেও নতুন কিছুর আমদানী ঘটেছে। তাই চোখ যেদিকে টানছে সেদিকে না গিয়ে মন যেদিকে টানছে সেদিকে এগুলো।

দূরে এক জায়গায় হোপুন কাজ করছে। কিন্তু ওর দলের মধ্যে চাঁদমণি নেই। নিজের অজ্ঞাতে সান্ত্বনার দুই চোখ চার দিকে ঘুরল একপ্রস্থ। হয়ত তার বাবার সঙ্গে আছে, হয়ত বা আর কারো দলে গিয়ে ভিড়েছে। কেন জানি ভাল লাগল না সান্ত্বনার। ঠিক এমনটি প্রত্যাশা করে আসেনি। ওই হোপুন লোকটার দিকেই চোখ গেল আবার। দুই হাতের কোদাল উঠছে মাথার ওপর। লৌহখণ্ডের ধারালো দিকটা সূর্যচ্ছটায় ঝকমকিয়ে উঠছে। আর সঙ্গে সঙ্গে চকচক করছে ঘামে-ভেজা পেশল কালো দেহের কঠিন রেখাগুলি। তেমনি ঋজু, কঠিন। আর তেমনি নির্বিকার, নিরাসক্ত। কে বলবে, বিগত প্রদোষের অতনু-নির্জনে এই সেই ধরাপড়া বিড়ম্বিত মূর্তি। সান্ত্বনাকে সে-ও দেখল। কিংবা দেখেও দেখল না।

অনেক দূরে ঘড়-ঘড় ঝমর-ঝমর শব্দ হচ্ছে একটা। চার্নিং মেসিন চলেছে। সান্ত্বনা এগুলো। মাটি থেকে ক্রমশ ওই ওপরে উঠে গেছে চার পাঁচ তলা সমান উঁচু কনভেয়ার। আগাগোড়া এক হাত প্রমাণ চওড়া পুরু চামড়ার বেল্ট ফিট করা। অনবরত ঘুরছে। এ মাথা থেকে বেল্ট-এর ওপর পাথরকুচি ঢেলে দাও। সড় সড় করে ওপরে চলল। ওপরে ঘূর্ণ্যমান এক বিশাল ইস্পাতের চৌবাচ্চায় কংক্রীট মিকশ্চার তৈরীর ব্যবস্থা। চার্নিং হয়ে গেলে সেটা ক্রেণে করে ঢেলে নিয়ে এলো অতিকায় বালতির আকারের লোহার বাকেটে। এদিক থেকে দেখলে মনে হয়, বেল্টের ওপর দিয়ে

মাটি থেকে পাঁচতলা সমান উঁচু একসারি পাথর-কুচির অবিরাম শোভাযাত্রা চলেছে যেন। মইয়ের মত একটা খাড়া সিঁড়ি দিয়ে সেখানে ওরা যায়, কিন্তু একটু পা ফসকালেই সব শেষ। আর ওঠা যায় ক্রেণের সঙ্গে 'কেজ' ফিট করে। কর্মচারীরা সচরাচর কেজ-এ করেই ওঠে। সান্ত্বনার ভিতরটা উসখুস করে সেখানে উঠে সব দেখার আগ্রহে। ওই মইয়ের মত খাড়া সিঁড়ি বেয়েই অনায়াসে উঠতে পারে সে। লোকজন হাঁ-হাঁ করে উঠবে তাহলে। কিন্তু সুযোগ-সুবিধে পেলে ওখানে একদিন উঠবেই ও। ঠিক উঠবে।

—নমস্কার!

এত কাছে, সান্ত্বনা চমকে উঠল প্রায়। নীল চশমা, হীরের আঙটি, খাঁকী ট্রাউজার, সিল্কের বুশশার্ট।

ঘোষ-চাকলাদারের রণবীর ঘোষ।

প্রত্যভিবাদন। প্রথম সাক্ষাতের সেই আড়ষ্ট সঙ্কোচ ভোলেনি সান্ত্বনা। যেমন ওর বুদ্ধি। আজ তো মুখের দিকে এক নজর চেয়েই বুঝছে কম করে বছর চল্লিশ বয়েস হবে। হেসে বাক্যালাপ শুরু করে দিল সান্ত্বনা।—এদিকটায় বুঝি আপনার কাজকর্ম?

—হ্যাঁ, আজ একেবারে আমার রাজত্বে এসে পড়েছেন।

—আগেও এসেছি। উঁচু সেই ঘরের মত এলিভেটারের দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ওখানটায় ওঠা যায় না?

—কেন যাবে না, ওই তো উঠছে ওরা। আচ্ছা আপনাকে কেজ-এ করে একদিন তুলব খ'ন।—আপনি আমার গোডাউনও দেখেননি বোধ হয়?

—না তো, কোথায় সেটা?

—মাইল দুই হবে এখান থেকে। জিপে যেতে হবে, চলুন একদিন—মস্ত মস্ত সিমেণ্ট আর বালুর পাহাড় দেখতে পাবেন।

সান্ত্বনা সাগ্রহে রাজি। কবে নিয়ে যাবেন?

—যেদিন খুশি, আজই চলুন না?

দু'দশ পা এগিয়েছে। মনে মনে সান্ত্বনা কল্পনা করে নিচ্ছে আজ যাওয়া চলে কি না। কাছেই একটা এবড়ো-খেবড়ো নীচু জায়গার ওপর চোখ পড়ল। আরো এগুলো খানিকটা। ছোট একটা পাম্প বসিয়ে জল ছেঁচছে জনা দুই লোক। আর ঝুড়িতে পাথরের নুড়ি বোঝাই করে করে দূরে ফেলে দিয়ে আসছে পনের-বিশটি মেয়ে। এদের কারোরই বয়েস বেশি নয়; এখানে চাঁদমণিকেও দেখা গেল।

পাশ থেকে রণবীর ঘোষ জানালো, কাটাকুটিতে জল উঠছে, ওখান থেকে পাথর না সরালে হাত-পা ভাঙ্গার ভয় আছে বলে মেয়েগুলোকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কানে গেল না সান্ত্বনার। ঝুড়ি-হাতে চাঁদমণি নিষ্পলক চেয়ে আছে এদিকেই। তার কালো চোখে যেন শাদা আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

তদারকরত কুলিবাবু তাড়া দিল, দাড়িন পড়লি কেনে, গপাগপ তুলে লে।

চাঁদমণি ঝাঁঝিয়ে উঠল তাকেই, ধমকাইছিস কিসের লেগে, ফাকোপাকো (মুহূর্ত) বিরাম লিব নাই?

একপাও নড়ল না। জ্বলন্ত দুই চোখ এদিকেই নিক্ষিপ্ত হল আবার। চলতে চলতে পিছন ফিরে তাকালো সান্ত্বনা। চাঁদমণি দাঁড়িয়েই আছে। সান্ত্বনা অবাক! কাল কি দেখেছিল আজ কি দেখছে। কাল বরং রাগতে পারত। উল্টে হাসির বন্যায় নাকানি-চোবানি খাইয়েছে ওকে। কিন্তু আজ কি হল—!

—যাবেন নাকি আজ গোডাউন দেখতে?

—অ্যাঁ? আত্মস্থ হয়ে সান্ত্বনা তাকালো তার দিকে। অভ্যস্ত অন্ধকারে হঠাৎ একটা জোরালো আলো জ্বলে উঠলে যেমন হয়, চোখে চোখ পড়তে তেমনি একটা ধাক্কা খেল সান্ত্বনা।

নীল চশমাটা রণবীর ঘোষের হাতে। চেয়ে আছে। চেয়েই ছিল। সান্ত্বনা লক্ষ্য করেনি এতক্ষণ। চাউনি নয়, অজ্ঞাত একটা নগ্নতার স্পর্শ লাগল যেন ওর চোখে-মুখে সর্বাংগে। দৃষ্টি নয়, লেহন।

—না আজ না, আর একদিন যাব'খন। সবলে সেই পিচ্ছিল দৃষ্টিরজ্জু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল সান্ত্বনা। পাশাপাশির ব্যবধান বাড়ল।

—আজ কাজ আছে বুঝি?

—বাবার শরীর খারাপ—বাড়ি যেতে হবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছিলাম বটে তিনি অসুস্থ। অন্তরঙ্গ দুশ্চিন্তা রণবীর ঘোষের!—তিনি সেরে ওঠেননি এখনো?

—উঠেছেন—।

—আচ্ছা, আজ থাক তাহলে, তাড়া কি। চলুন, আমারও ওদিকেই কাজ আছে একটু।

দৃষ্টি-বিনিময় ঘটল আবারও। ঘটবে জেনেও না তাকিয়ে পারল না সান্ত্বনা। অসহায় বোধ করছে কেমন। দিন দুপুর। এত বড় মড়াইয়ে এত লোক কাজ করছে। তবু—। পুরুষের চোখে কামনার দাহ এ বয়েস পর্যন্ত একেবারে দেখেনি এমন নয়। কিন্তু এ সে রকম নয়। অস্বস্তিকর সিক্ত অনুভূতি একটা। না তাকিয়েও তার চাউনিটা যেন উপলব্ধি করছে সান্ত্বনা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ওকে। খুঁটিয়ে আস্বাদন করার মত। যেটুকু বস্ত্র গায়ে জড়িয়েছে এ দৃষ্টির সামনে সেটুকু যেন মোটেই যথেষ্ট নয়!

বাঁচা গেল।

ওই অদূরে পাগল সর্দার দাঁড়িয়ে। একলা নয়, দলের সঙ্গে। সান্ত্বনাকে দেখেছে, দেখে হাতের কাজ থামিয়ে এদিকে চেয়ে আছে। অবশ ভাবটা নিমেষে কেটে গেল সান্ত্বনার। আপনি যান, আমি একটু পরে যাব।

হন-হন করে একেবারে সর্দারের কাছে গিয়ে থামল সে। হাঁফ ধরে গেছে। ভিতরে ভিতরে ঘেমেও গেছে। কিন্তু সর্দারের দিকে চেয়ে বিব্রত বোধ করছে আবার। নিরক্ষর বৃদ্ধের একজোড়া সন্ধানী প্রাজ্ঞ চোখ বারকতক যেন শিথিল ভাবে বিচরণ করে ফিরল ওর মুখের ওপর। তার পর, অদূরে রণবীর ঘোষ যেখানে দাঁড়িয়েছিল এখনো, সেই দিকে! তার নীল চশমা চোখে উঠেছে।

সান্ত্বনা বিমূঢ় আবারো। দৃষ্টি নয়, অকস্মাৎ যেন ছোট দু'টো কয়লার টুকরো ধক্‌ধকিয়ে উঠছে পাগল সর্দারের অক্ষিকোটরে।

ধীরে-সুস্থে আবার চলতে শুরু করেছে রণবীর ঘোষ। পাগল সর্দার চেয়েই আছে।

ফিরে তাকালো খানিক বাদে। ঠাণ্ডা হয়েছে। স্নেহসিক্তও যেন। সামনের ফাঁকা জায়গাটা দেখিয়ে বলল, অন্‌তে টুকচি বসে লিই চল কেনে—।

দু'জনেই এসে বসল মাটির ওপর। সর্দার জিজ্ঞাসা করল, উবাসীর বাবুর শরীল আরাম হ'ছে—?

সান্ত্বনা ঘাড় নাড়ল, হয়েছে—।

—তু ইদিকে কোথা যেয়েছিলি?

—কোথাও না, এমনি ঘুরছিলাম।

একটু থেমে সর্দার জিজ্ঞাসা করল, উ কন্‌টাটর বাবুর সঙ্‌তে?

চকিতে একবার তার দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা জবাব দিল, না ওখানে দেখা হল।

—তু আমার থানে ছুটুটে আসলি কিসের লেগে, উ কি বুলল বটেটে?

আবার তাকালো সান্ত্বনা।—ছুটে আবার কোথায় এলাম। তোমাকে দেখেই তো এলাম। কি ভেবে পরের প্রশ্নটারও জবাব দিল।—উনি বলছিলেন আমাকে একদিন তাঁর গোডাউন দেখাতে নিয়ে যাবেন।

চুপচাপ কিছুক্ষণ।—তু যাস না দিদিয়া, আমি একটা দিন তুকে সেটো দেখিয়ে লিয়ে আসব···।

যাবে না তো বটেই। কিন্তু সান্ত্বনা উন্মুখ আরো কিছু শোনার জন্য।

রেখে ঢেকে কথা বলতে জানে না ওরা। নিজে থেকেই সর্দার জানালো অনেক কথা।—খুব 'ভদ্দ মুনিষ' নয় ওই বাবুটি, 'চি-লোকের' মান মর্যাদা রাখতে জানে না—ফাঁক পেলেই সোমত্ত মেয়েগুলোকে বিগড়ে দেয়—এই নিয়ে খুব গণ্ডগোলও পাকিয়ে উঠেছিল একবার, ইত্যাদি—।

সান্ত্বনার লজ্জা গেছে। উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, ওর নামে মুরুব্বিদের কাছে নালিশ করো না কেন তোমরা?

পাগল সর্দার সখেদে জানায়, তাও করা হয়েছিল কিন্তু মুরুব্বিদের কাছে ও অন্যায় অন্যায় নয়, বড় সাহেব শুধু কাজই বোঝে, মেয়েদের দাম বোঝে না।

বড় সাহেব অর্থাৎ চিফ ইঞ্জিনিয়ার। সর্দারের ক্ষোভ সান্ত্বনাকেও স্পর্শ করল যেন। গা-ঝাড়া দিয়ে সর্দার তার বক্তব্যটুকুই ফিরে বলল আবার।—উনি সঙ্‌তে তু যাস না দিদিয়া, বোঝলি?

মুখ ফুটে সান্ত্বনা বলতে পারল না কিছু। কিন্তু মাথা নেড়ে সায় দিল তৎক্ষণাৎ। বুঝেছে, যাবে না—।

মড়াইয়ের গহ্বর থেকে উপরে পা দিয়েই সান্ত্বনা আড়ষ্ট হয়ে গেল আবার। জায়গাটা এমন নয় যে কাউকে পরিহার করে চলতে চাইলেই চলা যায়। পাঁচটা পথ নেই আনাগোনা চলা-ফেরার।

অদূরে রণবীর ঘোষ দাঁড়িয়ে কথা বলছে কার সঙ্গে।

সান্ত্বনা ধরে নিল লোকটা ইচ্ছে করেই দাঁড়িয়ে আছে।—অপেক্ষা করছে। এতেই কাজ হল। আড়ষ্টতা গেল। দ্বিতীয় পথ নেই [illegible]

এবারও সহাস্যেই আপ্যায়ন করল রণবীর ঘোষ। এই ফিরছেন না কি?

হাঁ-না সান্ত্বনা কিছুই বলল না।

—আমিও আটকে গেলাম, চলুন। এক মিনিট, এঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়নি, আমার পার্টনার দ্বিজেন চাকলাদার।

সান্ত্বনা দেখল। চিনল। জিপের সেই দ্বিতীয় লোকটি যে তাকে সামনের আসন ছেড়ে দিয়ে পিছনে গিয়ে বসেছিল। কিন্তু এদের কারো সঙ্গেই আর আলাপ করার জন্য ব্যগ্র নয় সান্ত্বনা। প্রতি-নমস্কারে হাত তুলল কি তুলল না।

পড়ন্ত রোদে রণবীর ঘোষের নীল চশমা বুকপকেট আশ্রয় করেছে। কলমের ক্লিপের মত তার একটা ডাঁট পকেটের বাইরে ঝুলছে। ওভাবে তখন হঠাৎ ওই সর্দার লোকটার কাছে চলে যাওয়ায় বা এখনকার এই নির্বাক পরিবর্তনে কিছু উপলব্ধি করেছে কি না সেই জানে। চোখের সে নগ্ন দৃষ্টি গেছে। বেশ হাসি-খুশি মেজাজেই সঙ্গ নিয়ে বলল, বাবার শরীর খারাপ, তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবেন বলেছিলেন তখন—এই তাড়াতাড়ি?

সান্ত্বনা নিরুত্তর। সাদাসিদে কিছু বলতে পারলে বলত। একটু হাসতে পারলে হাসত অন্তত। কিন্তু কিছুই পারল না। ওদিকে দ্বিজেন চাকলাদারও নীরব। রণবীর ঘোষ বলল আবার, চলুন, ওই সামনেই জিপ রয়েছে।

সামনেই মানে বাঁকের মুখে ভুতু বাবুর দোকানের সামনে। মনে মনে আবারও যেন বাঁচল সান্ত্বনা। ভয় না হোক অস্বস্তি যাবে কোথায়। নারীচেতনার অস্বস্তি। এ ভাবে ও চেতনার মুখোমুখি আর বড় হয়নি কখনো। কিন্তু জবাব না দিলে নয় এবার। বেশ সহজ ভাবেই বলল, আমার যেতে ঢের দেরী এখনো, আপনারা যান।

রণবীর ঘোষ একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল ওকে। দু'-চার মুহূর্তের বিশ্লেষণী দৃষ্টি। এখানে আবার কোথায় যাবেন?

—কাজ আছে। মনে মনে নিজেই বিস্মিত হল সান্ত্বনা। হাসতেও পারল যতটুকু হাসা দরকার।

দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল ভুতু বাবু। তার স্থির চোখ দু'টো আরো বেশি গোল দেখাচ্ছে যেন। চেয়েছিল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে। এদের সঙ্গে দেখবে সান্ত্বনাকে ভাবেনি যেন। আরো কাছাকাছি হতে এদেরও চোখে চোখ পড়ল বোধ হয়। তাড়াতাড়ি আড়ালে চলে গেল ভুতু বাবু।

তারা জিপের দিকে এগুতে সান্ত্বনা ঘুরে দাঁড়াল। রণবীর ঘোষও থেমে গেল।—ও, এইখানে আপনার কাজ বুঝি?

ঘাড় নেড়ে সান্ত্বনা রাস্তা পার হয়ে ভুতু বাবুর দোকানের দিকে চলল। খুব নিশ্চিন্ত নয় এখনো।—ভুতু বাবুর দোকান সকলের জন্যই খোলা। আড়াল হলেও ভুতু বাবু লক্ষ্য করছিল ঠিকই। থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াল।—মা লক্ষ্মী! আসুন, আসুন!

ভিতরের দিকে কোণের একটা বেঞ্চে ধুপ করে বসে পড়ল সান্ত্বনা।—কই, চা দিতে বলুন।

—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! সাবান দিয়ে তাড়াতাড়ি ভুতু বাবু নিজেই একটা গ্লাস পরিষ্কার করতে বসে গেল।

আড়চোখে সান্ত্বনা দূরে শালগাছের নীচে জিপটাকে দেখছে। [illegible]।—[illegible] শোনা গেল। জিপ [illegible] চলল।

নিশ্চিন্ত। ফিরে দেখে চা তৈরী শেষ ভুতু বাবুর। হেসে বলল, পয়সা নেই কিন্তু সঙ্গে, কাল এনে দেব।

পানখাওয়া পুরু কালো জিভ বার করে মাথা ঝাঁকালো ভুতু বাবু। সান্ত্বনার কথাগুলি ঝেঁকেই কান থেকে বার করে দিল যেন। চায়ের গেলাস তার সামনে রেখে বলল, আপনাদের চা টি খেয়ে-পরেই বেঁচে আছি মা-লক্ষ্মী, তাবলে এ রকম বললে ভুতু ছেড়ে ভূতেও লজ্জা পাবে—।

নরেন বাবু শুনলে বলতো ;—'ঘুঘু'। কিন্তু এর মুখে মা-লক্ষ্মীটুকু শুনতে বেশ লাগে। আজ এই মুহূর্তে তো রীতিমত আপন জন মনে হচ্ছিল সান্ত্বনার। চায়ের প্রয়োজন ফুরালেও গেলাসটা সাগ্রহেই টেনে নিল।

দ্বিধা কাটিয়ে ভুতু বাবুই প্রশ্ন করল প্রথম।—এনাদের সঙ্গে বুঝি আলাপ পরিচয় আছে মা-লক্ষ্মীর ?

—কাদের সঙ্গে ? চায়ের রূপ নিরীক্ষণ করছে সান্ত্বনা।

—এই ঘোষ বাবু আর চাকলাদার বাবুর কথা বলছিলাম, এক সঙ্গে আসছিলেন মনে হল—।

—একটু-আধটু। দু'-চার চুমুকে গলা ভিজল।—আপনিও চেনেন বুঝি ওঁদের ?

—বিলক্ষণ! ভুতু আর কা'কে না চেনে এখানে ? আর ওঁদের তো।—থেমে গেল।—তা বেশ লোক, লাখো লাখো টাকা কামাচ্ছেন, খরচেও অক্ষেপণ—বিশেষ করে ওই ঘোষ বাবুটি, যাকে বলে দিল্‌দার মানুষ।

শুনলে নরেন বাবু যা বলত ভেবে এখন একটু খটকা লাগছে। দূর থেকে ওই দু'জনের সঙ্গে ওকে দেখে লোকটার সেই নিষ্পলক বিস্ময় ভোলেনি সান্ত্বনা। তার আড়াল হওয়াটুকুও নয়। চা নিঃশেষ হল। মনের হাওয়ায় মন চলে, যে প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলার কথা সেদিকেই ঝুঁকল সান্ত্বনা। উনুনের ছাই খুঁচিয়ে আঁচ তোলার মতই ফস্‌ করে ভুতু বাবুকেও একপ্রস্থ খুঁচিয়ে দিল যেন। কিন্তু আপনাদের পাগল সর্দারের মুখে তো শুনলাম, ওই ঘোষ বাবুটি মোটেই ভালো লোক নন !

নড়ে-চড়ে কিছুটা টান হয়ে বসল গোলগাল ভুতু বাবু। আলগা স্তুতির ছাই কিছু ঝরেও পড়ল নিজের অগোচরে। গলা নামিয়ে সাগ্রহে বলল, বলেছে বুঝি ? কবে ? আজ ? তার পরেও আপনি—ব্যাপারটা কি জানেন, অঢেল পয়সাওয়ালা লোকের একটু-আধটু যেমন ইয়ে—

কি বলবে আর কি বলবে না, ঠিক না পেয়ে হাঁসফাঁস করে থেমেই গেল। থেমে গিয়ে মনে হল, যেটুকু বলেছে, বলা উচিত হয়নি। মেয়েটাকে বেশ হাসিমুখে এদের সঙ্গে আসতে দেখেছিল—কোন্ কথা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, ঠিক কি ? গলা চড়িয়ে দিল।—তা ও-ব্যাটারা তো বলবেই, নিজের ঘর সামলাতে পারিস না, যত দোষ বাইরের লোকের ! নিন্দে করিস, দুধের মেয়ে রেখে সেই কোন্ যুগে তোর নিজের বউ পালায় নি ঘর ছেড়ে ? আর তোর মেয়েটাই বা কি, একসঙ্গে দশটা লোকের মুণ্ডু চট্‌কে বেড়াচ্ছে—সে বারে বাপের হাতে হাড়ভাঙ্গা পিটুনি খেয়ে ঢিট্ হয়েছে, নইলে ওই বাহাদুর জমাদারটার সঙ্গেই তো প্রায়, যাক্‌গে—

পাগল সর্দারের জীবনে গভীর অঘটন কিছু আঁচ করেছিল সান্ত্বনা। কিন্তু বাহাদুর-সংশ্লিষ্ট চাঁদমণির প্রসঙ্গটা প্রচণ্ড বিস্ময়। স্থান-কাল ভুলে সান্ত্বনা হাঁ করে চেয়ে রইল ভুতু বাবুর মুখের দিকে। লজ্জা বা সঙ্কোচের অবকাশও নেই। ভুতু বাবু বলে গেল, ওদের পূর্বপুরুষেরা হাঁসের লোভে, পায়রার লোভে, খেলনাপাতির লোভে ঘর-বাড়ি বিকিয়েছে জাত কে জাত—সেপাই-বেয়ারা পাহারাওলার সঙ্গে আজতক তিন-তিনটে মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে এই দেড় বছরের মধ্যেই। সেই মেয়েগুলো ঠিক ওদের জাতের নয় অবশ্য, কতই তো আছে এখানে—রঙচঙে শাড়ী আর ঠুনকো গয়না পেল দু'-চারখানা, অমনি চলল ঘর-বাড়ি ছেড়ে। আর পেত্যেক বারই পেথমে দোষ চাপাবে বাবুদের ঘাড়ে—যেন ওই কত্তেই আছে বাবুরা। গেল বার এই নিয়ে গোল পাকিয়ে উঠতে বড় সাহেব কশে ধমকে দিয়েছে সক্কলকে—সমঝে চলতে না পারলে মেয়েদের ঘরে আটকে রেখে দাওগে যাও, কাজ করতে হবে না—বড় সাহেবের কাছে ও-সব মেয়ে-টেয়ের কোন খাতির নেই, বুঝলেন।

তড়বড় করে এতগুলো কথা বলেও ভুতু বাবু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারল না বোধ হয়। সান্ত্বনার নির্বাক মুখের ওপর দুই গোল চক্ষু সংবদ্ধ হল আবার। এই ভুতু কারো নিন্দের মধ্যে নেই, বুঝলেন ? নিজেরা সামলে-সুমলে থাক না যেভাবে খুশি, কে তোদের বারণ করেছে—মিথ্যে নিন্দে কত্তে যাস কেন—যা বলব হক্ কথা বলব, নিন্দে কেন করব, কি বলেন ? এই এতগুলো কথা হল, একটা নিন্দের কথা কারো নামে বলেছি—আপনিই বলুন ?

এত কথার সার কথাটা এতক্ষণে স্পষ্ট হল যেন। সান্ত্বনা মাথা নেড়ে নীরবে আশ্বাস দিল তাকে, নিন্দে কারো করা হয়নি বটে। কিন্তু ভালও লাগছে না আর। উঠে পড়ল। নিশ্চিন্তে এবার বাড়ি ফেরা যাবে বোধ হয়।

চড়াইয়ের মাঝামাঝি এসে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে অতল মড়াইয়ের দিকে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। দূরে দূরে ওই মানুষেরা কাজ করছে। আর ওদের মেয়েরা।—এত উঁচু থেকে মেয়ে পুরুষের তফাৎ বোঝা যায় না খুব। পাগল সর্দারের ক্ষোভটুকু সান্ত্বনার মন থেকে মোছেনি তখনো। ভুতু বাবুর মুখে বড় সাহেবের অনুশাসনের কথা শুনে বরং বেড়েছে আরো। নিবিড় মমতায় সেই দূরের দিকে দৃষ্টি পড়ে রইল।—ওই মানুষদের রীতি আলাদা। নারী-পুরুষ একসঙ্গে কাজ করে। ঘরে-বাইরে, পাশাপাশি, কাছাকাছি। ওদের এই আনন্দ, এই বিনিময়টুকুই বিশেষ করে স্পর্শ করে তাকে। লোভের বিষ ছড়িয়ে এটুকু কলুষিত করা যেমন জঘন্য অপরাধ, নিস্পৃহ অনুশাসনের ভ্রূকুটিতে তাকে ব্যাহত করাও তার থেকে কম নিষ্ঠুরতা নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্তত সেই রকমই মনে হল সান্ত্বনার।

[ক্রমশঃ।

আমি মেরীয়ামকে ভালো ক'রে জানি। সাফল্যের প্রতি ওর তীব্র মোহ আর তুমি শিল্পী হিসেবে সেই সাফল্য লাভ করেছ। তবে তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, মেরীয়াম অদ্ভুত ধরণের মেয়ে। অনেক ব্যাপারে তাকে ঠিক বুঝতে পারি না। ও জাতে ইহুদী। ছোটবেলা থেকে মা-বাবা নেই ওর। খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, আর খুব ভালো করে বোঝে ও কি চায়। ওর জীবনের পরিকল্পনায় প্রেমের স্থান নেই। কপর্দকশূন্য যুবকের সঙ্গে প্রেমে পড়তে ও নারাজ। এ্যাভেন্যু দ্যু বুইসের একটা বাড়ির দিকে ওর চোখ আছে। আর আমার যদি খুব বেশী ভুল না হ'য়ে থাকে, তাহলে মনে হয় সেটা এক দিন ওরই করায়ত্ত হবে। এখন একজন যথার্থ মনের মানুষের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় আছে। এখন অপেক্ষা করবে, ওর বয়েস তো মোটে একুশ।

—এ সবের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?

—বললুম তো এক্ষুণি। আমার মনে হয় তোমরা দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারো। বন্ধুত্ব! একথা মনে রেখো। শুধু বন্ধুত্ব, আর কিছু নয়।

—আমার সংস্পর্শে ও বেশ নিরাপদেই থাকবে, হেনরী বলে উঠলো। প্রেমে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তাই না?

—হ্যাঁ—তা এক রকম সত্যি। সে-ও সঙ্গী চায়, প্রেম চায় না। তুমি বিশ্বাস না করতে পারো, তবে এ কথা সত্যি যে অনেক মেয়েই আছে যারা শুধু পুরুষের মিতালি চায়, তাদের শয্যাসঙ্গিনী হতে চায় না।

—তুমি বলতে চাইছ ও আমার বন্ধুত্ব কামনা করে। একসঙ্গে থিয়েটারে যাবে, ডিনার খাবে, এই সব।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তুমি এমন ব্যবহার করবে যাতে তোমার সঙ্গে ঘুরতে ওর ভালো লাগে। তবে মনে হয় ওর ইচ্ছে আছে। আর একটা কথা। এ সব চিরকাল চলবে ভেবো না। ইতিমধ্যে কোন লোক আসতে পারে। ও যা চায় দিতে পারে। আর সে যদি দেয় তাহলে—তবে এর মধ্যে তুমি,—ধরো ছ'মাস কি এক বছর ওর সুন্দর সাহচর্য উপভোগ করতে পারো। যা হোক, তোমায় সব কথাই খুলে বললুম। ইচ্ছে হয় নাও কিংবা ছেড়ে দাও। তবে তোমার বুদ্ধি ব'লে কিছু থাকলে ওকে গ্রহণই করবে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

দু' সপ্তাহ পরে হেনরী প্লেস ভেনদম আর রু দ্য লা পে-এ মেরীয়ামের জন্যে অপেক্ষা করতো। এখন এইখানে দু'জনে প্রায় সাক্ষাৎ হয়।

মেরীয়াম! আস্তে আস্তে তার নাম উচ্চারণ ক'রে হেনরী। মেরীয়াম···দু' সপ্তাহের মধ্যে মেরীয়ামের সংস্পর্শে সে যে অভাবিত আনন্দ লাভ করেছিল, সে সুখের অস্তিত্ব সে কোন দিন কল্পনা করেনি। সে যেন হেনরীর জীবনের ধারা পাল্টে দিয়েছিলো। এখন থেকে তার মদ্যপানের মাত্রা কমে গেল। সুখে থাকলে কে আর বেহুঁস হতে চায়? যখন তখন সে আর গান শুনতে যায় না, পথে পথে বৃথা ঘুরে বেড়ায় না। ঘুমোয় ঠিক সময়ে, আর ছবি আঁকার কাজে মন দিলো ফের।

একদিন তারা মলেয়ারের 'প্রেসাস রিডিকিউলস' দেখলো দু'জনে। অন্য দিন গান শুনতে গেল এক জলসায়। সেখানে মেরীয়াম তার চমৎকার ব্যবহারে, রূপলাবণ্যে আর গানের সমঝদারিতায় সকলকে মুগ্ধ করেছিল। তার পরের সন্ধ্যায় তারা লা

বেনাসাঁসএ গেল। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে হেনরী তাকে রঙ্গমঞ্চের পেছনের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলো। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো সার বার্ণহার্ড-এর সঙ্গে। রবিবার অপরাহ্নে তারা লুভারে বেড়াতে গিয়েছিলো। যদিও হেনরীর মতে ওটা 'পুরোন কবরখানা'। বিভিন্ন জায়গায় দু'জনে এই একসঙ্গে বেড়ানো তার কাছে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা।

এই ভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটতে লাগলো। প্রত্যেক সন্ধ্যায় হেনরী প্লেস ভেনদোমে মেরীয়ামের জন্যে অপেক্ষা করে। তারা থিয়েটার, ওপেরায় কনসার্ট আর সার্কাসে যায়। হেনরী তাকে নিয়ে ভেলদ্রোম দ্য হিভারে গিয়েছিলো। আর তাকে যখন হেনরী বিখ্যাত জিমারম্যানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল সে বেশ চমৎকৃত হয়েছিল। একদিন তারা গেলো সালোঁ ইণ্ডিয়ানে। সে একটা রোমহর্ষক, অভিজ্ঞতা। বড় বড় যন্ত্র এখান থেকে ওখানে গর্জন ক'রে যাচ্ছে, ঘরের মধ্যে ঘোড়া ছোটাছুটি করছে। অনেক লোক এই দৃশ্য দেখে চীৎকার করে উঠছে। কেউ বা উঠে পড়ছে চেয়ার ছেড়ে। মূর্ছিত হয়ে পড়ছে অনেকে।

কোন কোন দিন তারা জয়েন্টস-সের সঙ্গে একসঙ্গে ডিনার খাচ্ছে। গল্প গুজব করে বা তাস খেলে সন্ধ্যা যাপন করছে। রবিবার সকালে মেরীয়াম আকস্মিক ভাবে তার ষ্টুডিওতে এসে হাজির হতো। বই হাতে কোচের ওপর বসে পড়তো। হেনরীর ছবি আঁকা দেখতো মন দিয়ে। মেরীয়ামের সঙ্গে ম্যাডাম লুবেরতের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বেশ। হেনরীর পেছনে বসে বসে তারা বহুক্ষণ ধরে ফিস ফিস করে গল্প করতো।

ধীরে ধীরে মেরীয়ামের সঙ্গে হেনরীর বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে পরিণত হ'ল। হেনরী নিজের সম্বন্ধে অনেক কথাই তাকে বললো। বিগত কয়েক বছরের নিঃসঙ্গতার কথা বললো। সে তাকে ডেনিসের সম্বন্ধে গল্প করলো। আর এক অশ্রুমুখী সন্ধ্যায় মেরী শার্লেটের বৃত্তান্ত এক এক ক'রে খুলে বললো। মেরীয়ামও তাকে বিশ্বাস করতে লাগলো। সে'ও বললো তার শৈশবের সমস্ত কাহিনী।

তার পর মে মাস এলো। বসন্তের মায়ামন্ত্রের স্পর্শ প্যারিসের পথের বৃক্ষপর্ণে দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। গাছে গাছে দেখা গেলো রঙিন ফুলের সজ্জা। দরজার সামনে প্রণয়ীদের চুম্বনরত দেখা যেতে লাগলো।

জেন এভ্রিল তার প্রণয়ীর সঙ্গে লণ্ডন ছেড়ে চললো। সঙ্গে তার দাসী আর বিজনেস ম্যানেজার যাচ্ছিলো। আর ছিলো দুটো ছোট লোমশ কুকুর আর কুড়িটা তোরঙ্গ পেঁটরা। একটা লাগেজ কোথায় মিশে গেছে বলে মন খুঁতখুঁত করছিলো তার। শেষ মুহূর্তে টেলিগ্রাম আর উপহার হাতে গীতমঞ্চের তারকার মতো দেখাচ্ছিল তাকে।

ট্রেণ ছাড়বার পূর্বে সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে হেনরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো।—তোমাকে নতুন মানুষ মনে হচ্ছে, হাতের দস্তানা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে সে হেনরীকে বললো। মেরীয়ামের সঙ্গে কেমন দিন কাটছে বলো।

চমৎকার! তুমি যতখানি বলেছিলে ও তার চেয়ে সুন্দর! তুমি আমার জন্যে যা করেছ তার ঋণ কোন দিন শোধ দিতে পারবো না।

তার কণ্ঠস্বরের ব্যাকুলতা অনুভব করে জেন তার দিকে সন্দেহ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করেছিলো।

—হেনরী, মনে রেখো শুধু বন্ধুত্ব, আর কিছু নয়।

সেদিন সন্ধ্যায় হেনরী মেরীয়ামকে এক সঙ্গীতসভায় নিয়ে গিয়েছিলো। এই অনুষ্ঠান হচ্ছিল এক মৃত-গীতকারের সম্মানার্থে। তিনি সম্প্রতি ভিয়েনায় মারা গেছেন। সঙ্গীতের সময় মেরীয়াম নিমীলিত চোখে ধ্যান-মগ্নের মতো বসেছিল। হাত দুটো শিথিল হ'য়ে কোলের উপর পড়েছিল। সঙ্গীতের বিপুল মূর্ছনা-তরঙ্গে সে যেন ডুবে গিয়েছিলো। আড়চোখে তাকে দেখতে দেখতে হেনরী মনের পটে তার ছবি এঁকে নিচ্ছিল। কি সুন্দর দেখাচ্ছিল তার আনন্দ-পুলকিত মুখ, দ্বিধাভিন্ন ঠোঁটের রক্তিমা, আর শুভ্র কণ্ঠের ওপরে সূক্ষ্ম রেখাবলী!

সঙ্গীতের অন্তিম মূর্ছনায় সে তার হাতের আঙুল হেনরীর আঙুলের মধ্যে জড়িয়েছিল। ধন্যবাদ হেনরী, এই গান শোনানর জন্যে অজস্র ধন্যবাদ। এই গান আমি জীবনে যতো বার শুনবো তোমার কথা তক্ষুণি মনে পড়বে।

ঘরে ফিরে মেরীয়াম তার কোটটা কৌচের উপর ছুঁড়ে দিয়েছিল। আগুন জ্বালতে তার পর নীচু হয়ে বসলো।

আমি যদি জ্বেলে দিতে পারতুম—সোফা থেকে হেনরী বলে ওঠে। সে কোন উত্তর দেয়নি। তার পর লাফিয়ে উঠে হাত দিয়ে স্কার্টটা সোজা করে নিয়ে বলেছিলো, কফি তৈরী করছি, তুমি যদি খাও তো বলো।

রান্নাঘরে সে অদৃশ্য হলো। কিছুক্ষণ ধরে হেনরী কফি তৈরীর ঝনঝন শব্দ শুনতে পেলো। কত সামান্য জিনিষ পেয়েই না মানুষ সুখী হয়! একটু আগুনের উত্তাপ একটুখানি কফি আর একটি মেয়ে···মেরীয়ামের মতো মেয়ে। কি নরম আর উষ্ণ তার হাতের স্পর্শ—

—তোমাকে আজ রাত্তিরে সত্যি সুন্দর দেখাচ্ছে। সোফা থেকে হেনরী বললো।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে মেরীয়াম। ধন্যবাদ হেনরী! অনেক বার তুমি আমার প্রশংসা করলে।

আমার কাছ থেকে কিংবা অন্য কারুর কাছ থেকেই তোমার প্রশংসার দরকার নেই। তুমি সুন্দর—একথা তুমি ভালো করেই জানো। সত্যি বলতে কি একটু বেশী সুন্দর। তাছাড়া কোন মেয়েকে সে নিজে জানে না এমন কোন প্রশংসার কথাই বলা যায় না। নিজের সম্বন্ধে মেয়েরা খুব সচেতন।

তবে প্রশংসা শুনতে তারা ভালোই বাসে। কফি তৈরীর আওয়াজের চেয়ে জোরে হেসে মেরিয়াম বলেছিল।

আবার যখন মেরীয়াম ঘরে এলো তার হাতে দু' পেয়ালা কফি। গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও। হেনরীর দিকে কফির পেয়ালা বাড়িয়ে দিয়ে বললো সে।

ফায়ার প্লেসের কাছেই সে বসলো। কালো ভেলভেট স্কার্টের তলায় তার পা দু'টি দু' ভাঁজ করা। কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ।

ওরকম একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন?—আগুনের দিকে থেকে চোখ না সরিয়েই মেরীয়াম জিজ্ঞাসা করলো।

রয়েছ না আমি মনের কল্পনা দিয়ে তোমার মূর্ত্তি তৈরী করেছি। কল্পনায় আমার জোড়া নেই। আমি অনেক জিনিষ দেখি যার কোন বাস্তব নেই, তোমার সঙ্গে কোন দিন আমার সাক্ষাৎও হয়নি। তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে বলে আমি যে কি খুশী কি বলবো! শুধু খুশী নয়, কৃতজ্ঞও বলতে পারি।

মেরীয়াম একটুও নড়েনি। তার স্থির মূর্ত্তি ঘিরে যেন একটা অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা জেগে উঠলো। কোলের ওপর কফির পেয়ালা নামিয়ে রাখলো সে। চিন্তাচ্ছন্ন মুখখানা অনেক দূরে মনে হচ্ছিল যেন।

হেনরী, তুমি কি আমার প্রেমে পড়েছ?

সে অনুভব করলো তরল পানীয়টা সজোরে নেমে গেলো। হাতের মধ্যে ব্র্যাণ্ডির গ্লাসটা কেঁপে উঠলো। এবার মেরীয়াম তাকে ত্যাগ করবে—সারা সন্ধ্যা তাকে অদ্ভুত মনে হচ্ছে। খুব সুন্দর—সে হয়তো বলবে যে ধনী যুবকটির প্রতীক্ষায় সে আছে সে যুবকটি এসেছে—কিংবা বুঝতে পেরেছে সে তাকে ভালোবাসে—

তোমার প্রেমে পড়েছি? ও কি বলছো? নিশ্চয় না। মস্তিষ্কের প্রতিটি রন্ধ্রে সজাগ চেতনা। এবার তাকে সুন্দর করে মিথ্যা বলতে হবে। তাকে বিশ্বাস করাতে না পারলে হেনরীকে ত্যাগ করবে সে।

—না, মেরীয়াম, নম্রহাসি হেসে সে বললো। আমি শুধু তোমার বন্ধুই থাকতে চাই। মিতালির আনন্দ ছাড়া তোমার কাছে অন্য কিছু প্রত্যাশাও করি না, প্রয়োজনও নেই। আমি জানি তুমি এক দিন চলে যাবে। তবে যাওয়ার আগে পর্য্যন্ত আমাদের বন্ধুত্ব বজায় থাক, এই শুধু চাই।

সে হেনরীর মুখের ভাব ভালো করে লক্ষ্য করছিল। বললো, একথা শুনে খুশী হলুম হেনরী। আমিও তোমার বন্ধু হয়ে থাকতে চাই। আমিও তোমার কাছে কম কৃতজ্ঞ নয়। তুমি যা জানো, যতটুকু কল্পনা করো, তার চেয়ে হয়তো বেশী। আমি জীবনের কাছে কি চাই, জেন হয়তো তোমায় বলেছে। তুমি জানো আমি তোমায় ভালবাসি না, তুমি আমায় ভালবাসবে এ-ও আমি চাই না। কারণ, ভালোবাসলে তুমি দুঃখ পাবে। আর তুমি দুঃখ পাও এ আমার অভিপ্রায় নয়। আমি তোমাকে আনন্দই দিতে চাই দুঃখ নয়।

ধন্যবাদ, মেরীয়াম! মৃদু কণ্ঠে হেনরী বললো। আমাদের মধ্যে কোন কথাই অস্পষ্ট রইলো না। এখন আমি বাড়ী যাই তাহ'লে। কাল রবিবার, তুমি ভার্সেলাসে যাবে কি? সে তার শূন্য পানপাত্র টেবিলের কোণে রেখেছিল। ছড়িটা তুলে নিয়েছিল হাতে। কিন্তু সে ওঠবার আগেই মেরীয়াম তার পাশে এসে দাঁড়াল। ঠোঁটটা তার ঠোঁটের খুব কাছে এনে বললে, এক্ষুণি যেও না হেনরী।

গ্রীষ্মকালটা তারা দু'জনে আর্কেচনের সমুদ্রের ধারে কাটাল।

একসঙ্গে নৌকা চড়তো, মাছ ধরতো। চোখ বুজে, সূর্য্যের দিকে মুখ করে ডেকের ওপর শুয়ে থাকতো দু'জনে। সহজ কথাতেই হেসে উঠতো সে। আর উচ্ছল খুশীতে মানুষ যেমন বাজে কথা বলে, তেমনি ফেনিল উচ্ছ্বাসে কথাবার্ত্তা বলে যেতো। একসঙ্গে ভোজন করতো তারা। শীতের শহরে পাইনবীথির মধ্যে দিয়ে গাড়ী চালিয়ে বেড়াতে যেতো। জলটুঙ্গীর মতো কোন কাফেতে যা হোক করে সময় কাটিয়ে দিতো। ঝিনুক কুড়তো। তার পর রাত্রি তার নিবিড় অন্ধকারে তাদের আলিঙ্গনবদ্ধ আনন্দকে ঘিরে দিতো।

হেনরী কখনো তাকে ভুলবে না, সে-ও মনে রাখবে হেনরীকে চিরদিন। এই কুৎসিত বামনের কথা কোন দিন সে বিস্মৃত হবে না। ভুলবে না তার জ্বালাময় প্রেম।

সে হেনরীকে ভালোবাসেনি। এ কথা হেনরী জানতো। কোন দিন ভালোবাসবে না এ কথাও বুঝতো। সে তাকে দেহ দিয়েছে, হৃদয় দেবে না। হেনরী যদি আরো তরুণ হতো, আর একটু অনভিজ্ঞ হতো তাহলে হয়তো আশা করতো। কিন্তু এখন আর নয়। এখন সে তিরিশ উত্তীর্ণ, দাড়িতে পাক ধরছে তার।

নিজের কথা হলো—সে সত্যি মেরীয়ামকে ভালোবেসেছে। খুব গাঢ় গভীর ভাবেই। এজন্যে সে দুঃখিত। মনকে বশ করতে কম চেষ্টা করেনি সে, কিন্তু পারেনি। এই সমস্যার মীমাংসা করতেই হবে তাকে। সে মেরীয়ামকে মিথ্যা কথা বলেছে। বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্ত যখন উপস্থিত হবে সে যেন সসম্ভ্রমে বিদায় দিতে পারে। অশ্রুসিক্ত প্রেমাস্পদের হাস্যকর অভিনয় তাকে যেন না করতে হয়—

প্যারিসে ফেরবার পথে গাড়িতে পাশাপাশি বসে সূর্য্যাস্ত দেখছিল তারা। সমুদ্রে তখনো কয়েক জন স্নান করছিল—চোখ থেকে মুছে ফেলছিল নোণাজল। বাতাস মৃদু-মন্থর ভাবে বইছিল।

মেরীয়াম তার হাতটা হাতের মধ্যে তুলে নিল। এই গ্রীষ্মকালটা আমার জীবনে সবচেয়ে সুখে কাটলো। চার সপ্তাহ যেন স্বর্গে ছিলাম। এদিনগুলোর কথা কখনো ভুলবো না আমি।

আমিও প্রচুর আনন্দ পেয়েছি, হেনরী তার শুভ্র হাতের দিকে

লোতরেকের আঁকা পোষ্টার

চেয়ে অস্ফুট স্বরে বললো। এ ক'দিন এত্তো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল বলে দুঃখ হচ্ছে!

তুমি আমাকে ভালোবেসেছ, তাই না? এবার মেরীয়াম প্রশ্ন করেনি। কণ্ঠস্বরে তার স্থির প্রত্যয়। আমি অনেক দিন ধরে লক্ষ্য করছি, তবে সঠিক বুঝতে পারছি না।

হেনরী মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানাল। মিথ্যা ছলনা করে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে সে। অনেক আসামী যেমন মানসিক যন্ত্রণায় নিজের পাপ স্বীকার করে ফেলে, তেমনি ভাবে স্বীকার করলো হেনরী।

হ্যাঁ, মেরীয়াম, আমি তোমায় ভালোবেসেছি। প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি, সেই দিনই ভালোবেসেছি। যখন তোমায় বলেছি শুধু তোমার বন্ধুত্ব চাই তখন এমনি ভালোবাসতাম। সে রাত্রে আমি তোমায় মিথ্যে কথা বলেছিলুম। মিথ্যে বলেছি তোমাকে হারাবার আশঙ্কায়। তার পর থেকে মিথ্যেই বলে আসছি। আশা করেছিলাম তুমি বুঝতে পারবে না। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কোন দিন একথা বলবো না তোমাকে। কিন্তু যখন জানতেই পেরেছো তখন বলো, আমাকে কি তোমার ভার নিতে দেবে না?

মুখ দিয়ে কথাটা উচ্চারণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করলো মেরীয়ামের হাতটা তার মুঠোর মধ্যে থেকে সরে গেলো।

এ রকম হবে আমি জানতাম। এ জন্যে আমি দুঃখিত। মেরীয়ামের কণ্ঠস্বর খুব মৃদু ও ব্যথাপূর্ণ। তুমি বলতে, আমার ভালোবাসা তুমি আশা কর না। সে তোমার ভুল হেনরী। যে যাকে ভালোবাসে তার কাছ থেকে ভালোবাসার প্রতিদান সে চাইবেই। তুমি চাও। না বলো না। তুমি এখনো বিশ্বাস কর আমার প্রতি ভালো ব্যবহার করলে সদয় হলে, ধৈর্য ধরে থাকলে এক দিন আমি তোমায় ভালোবাসবো। এ ভুল তোমার কোন দিন ভাঙবে না। কোন দিন না। তোমার এ আশার কোন দিন শেষ হবে না। কোন না কোন মেয়ের কাছ থেকে ভালোবাসা পাওয়ার প্রত্যাশা তুমি করবেই। আর প্রত্যেক বারেই শুধু দুঃখ আর আঘাত পাবে। যেমন দুঃখ আমি তোমায় দিচ্ছি। ভেবে দেখো, তোমার আর আমার অবস্থা প্রায় একই। আমরা দু'জনেই যা চাই কেউই তা পাচ্ছি না। দু'জনেই ভালোবাসা চাই, কেউ কি পেয়েছি তা? আমি পাচ্ছি না আমি চাই না বলে, আর তুমি পাচ্ছ না খোঁড়া আর কুৎসিত বলে।

শেষ কথাটা হেনরীকে আঘাত করলো। তার মুখে যেন কথাগুলো আশাহীন সমাপ্তির আকার ধারণ করেছে মনে হলো। হঠাৎ আকাশ ধূসর, বাতাস ঠাণ্ডা, আর সমুদ্রতীর তামাটে মনে হতে লাগলো।

মেরীয়াম দেখলো, হেনরীর মুখ থেকে শেষ রক্তাভাটুকু মিলিয়ে গেছে। তবুও স্বেচ্ছায় ধীরে ধীরে সে বলতে লাগলো, হ্যাঁ, হেনরী, তুমি খোঁড়া আর কুৎসিত। সারাজীবন তুমি চেষ্টা করেছ এ কথা ভুলে থাকতে, লোককে ভুলিয়ে রাখতে, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। তুমি যে ধরণের ভালোবাসা চাও কোন মেয়েই সে ভাবে তোমাকে ভালবাসতে পারে না। যদি সম্ভব হতো আমিই তোমায় ভালবাসতাম। চেষ্টাও করেছি। কিন্তু পারিনি, কোন দিন পারবোও না।

মুখ তুলে হেনরী তার কথায় বাধা দিতে চেষ্টা করলো। না, আমি তোমায় ভালোবাসি না—কেন কোন দিন ভালোবাসব না। কারণ আঁদ্রেকে এখনো ভালোবাসি। যার কথা তোমাকে অনেক বার বলেছি। যে আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিলো। তুমি যদি আমাকে এ্যাভেনিউ ডু বইসেবে সব চেয়ে ভালো বাড়িটা দাও; সুন্দর পোষাক হীরে জহরৎ উজাড় করে এনে দাও, তবুও কোন দিন তোমায় আমি ভালবাসতে পারব না। বরং এই দানের জন্যে কম পছন্দ করবো। হয়তো ঘৃণাই করবো। তুমি তখন আর আমার বন্ধু থাকবে না। তখন তোমাকে এক জন ধনী যুবকের মতো মনে হবে যে টাকা দিয়ে সব কিছু কিনতে পারে। ঐ টাকার জন্যে তোমাকে ঘৃণা করবো। আমি এসব জিনিষ চাই, কিন্তু তোমার কাছ থেকে নয়। যাকে পছন্দ করি না তার কাছ থেকে শুধু এই সব হাত পেতে নিতে পারি। তুমি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু এ সত্য—তাহলে এখন আমাদের কি করা উচিত? মনে হয় আর দেখাশোনা না করাই ভালো। আমার প্রতিজ্ঞাই ছিলো তুমি আমায় ভালবাসলে আর সাক্ষাৎ করব না।

ম্লান হেসে মেরীয়াম হেনরীর দিকে তাকাল। ধূসর গোধূলির আলোতে তার চোখ দুটো ছল-ছল করছিল।

তবে দেখো, আমারও দুর্বলতা আছে। তোমাকে আমি এত্তো পছন্দ করি, তুমি আমার এত প্রিয় যে তোমার সঙ্গে দেখা না করার কথা ভাবতেই পারি না। গত শীতকালে আমরা কত সুখী ছিলাম। সেই লুভার আর ঘরের মধ্যে সেই সন্ধ্যাগুলোর কথা মনে করে দেখো! এখনো ঐ ভাবে আমরা দিন কাটাতে পারি। কিন্তু তুমি ভালোবাসার কথা আর কখনো মুখে আনবে না। এখন তোমার ওপরেই সব নির্ভর করছে হেনরী! চেষ্টা করে দেখো।

সমুদ্রতীরের বালুকাস্তূপের পেছনে সূর্য অস্ত গেছে। দু'টো নৌকা তীরে এসে নোঙর ফেললো। রাত্রির নিবিড় নিস্তব্ধতা সমস্ত আকাশে ছেয়ে গেছে।

প্যারিসে ফিরলো তারা। তাদের মাঝখানে বিচ্ছেদের ছায়া ঘনিয়ে আসছিল যেন। আর্কেচনের ঘনিষ্ঠ দিনগুলি অতিবাহিত করার পর শুধু মাত্র অল্প আলাপ-আলোচনায় তুষ্ট থাকা হেনরীর পক্ষে কঠিন মুশকিল। ডেকের ওপর সেই মেরীয়ামের অসম্বৃত মূর্তির সঙ্গে এই আপাদমস্তক বসনাবৃত রূপের কত তফাৎ! তবে হেনরী তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিল। প্রেমের কথা সে উচ্চারণ করেনি।

আবার প্রতিদিন সায়াহ্নে প্লেশ ভেমডমে যেতে লাগলো। চার দিকের কোলাহলের মধ্যে মেরীয়ামের প্রতীক্ষায় বসে থাকতো। তারা আবার নানা জায়গায় বেড়াতে লাগলো। হয়তো, মদ্যপানের বিষয়ে তর্কবিতর্ক করতো। ওপেরায় কনসার্টে যেতো। আর মেরীয়ামের রু দিস পেতিস চ্যাম্পস-এর ছোট ঘরে আগুনের ধারে বসে গল্পগুজব করতো।

গত শীতকালের মতো এবারও হেনরী আনন্দময় বন্ধুর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের সম্বন্ধের মধ্যে সূক্ষ্ম বেতালা সুর বাজছিল। দু'জনের মনেই অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। কথোপকথনের মাঝখানে আকস্মিক ভাবে দু'চার মিনিট স্তব্ধতা দেখা দিত। কষ্টকৃত হাসিতে আর জোর করে আলাপ-আলোচনা

ছ'মাস আগে যে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব ছিল এখন তার মধ্যে সূক্ষ্ম ছলনা দেখা দিয়েছে।

চার দিকের জনতা হেনরীর পক্ষে এখন অসহ্য মনে হতো। সাধারণের মধ্যে মেরীয়ামের সঙ্গে বেরুলে খুশী হতো না মোটেই। কোন সুশ্রী যুবক মেরীয়ামের দিকে চেয়ে আছে দেখলে কি এক অজানা আশঙ্কায় তার মন ভরে ওঠে। মেরীয়ামের এতো রূপ যদি না থাকতো! তার মনে মনে যেন দুঃখই হয়।

তাকে হারাবার ভয় যতো হেনরীকে পেয়ে বসলো, সে যেন ততোই তাকে মন-প্রাণ দিয়ে চাইতে লাগলো। সে আবিষ্কার করলো, ঈর্ষা ও বাসনার মতো যুক্তিতে কান দেয় না, হৃদয় ও দেহের মতো সমান স্বেচ্ছাচারী। মেরীয়ামের সঙ্গে বিচ্ছেদ সম্ভাবনা তার মনে এক বিন্দু শান্তি অবশিষ্ট রাখে নি।

নিজের প্রতি অহেতুক বিদ্বেষে সে আবার মদ খাওয়া ধরলো। খুব বেশী খেতো না। কারণ, পাছে তার মদ্যপানের ছল ধরে সে চলে যায়।

তাদের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে যেতে লাগলো। তাদের কথাবার্তায় অকথিত ভর্ৎসনার সুর বাজতে লাগলো। চোখে সাবধানী দৃষ্টি দেখা গেল। খাবার টেবিলে হেনরী মেরীয়ামের প্রতিটি চাউনি, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী ভালো করে লক্ষ্য করতো। থিয়েটারের ইণ্টারভেলে বাইরে বেরুতে রাজী হতো না মেরীয়াম। হেনরী আবার তাকে প্রশ্ন করতে সুরু করেছে।

এক দিন মিরীয়াম বললো, তাদের আর দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়াই মঙ্গল। হেনরী ক্ষমা চেয়েছিল, সে'ও ক্ষমা করেছিল।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মেরীয়াম আর সহ্য করতে পারে নি। এভাবে আমরা চলতে পারি না, কিছুতেই না। এক দিন সন্ধ্যায় বাঁ হাতে কপাল টিপে ধরে মেরীয়াম বলেছিল। তুমি আমার সঙ্গে যেভাবে চলেছো, অন্য কোন লোককে আমি সে-সুযোগ দিতাম না।

—কারণ, তুমি আমার জন্য দুঃখ বোধ কর, তাই না? আমি খোঁড়া বলে তুমি আমায় দয়া কর। বল, ঠিক কি না?

আঃ আমার মাথার দিব্যি থামো বলছি। তুমি কি বলছ তুমি নিজেই জানো না। আমাদের মধ্যেকার সম্বন্ধ তুমিই নষ্ট করেছ। তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলে এখন দুঃখ হয়। সত্যি দুঃখ হয়। আমি আর চাই না তোমার সঙ্গে দেখা হয়।

তার কথায় হেনরী সচেতন হয়ে উঠলো। তার সারা মুখ চাট-এর মতো সাদা হয়ে গেল।

মেরীয়াম, দয়া করে আমায় ছেড়ে যেও না। তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারব না। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। তোমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করবো না, কোন সন্দেহ করবো না। শুধ দয়া করে আমায় যেতে বলো না।

মেরীয়াম হেনরীর অশ্রুসজল চোখ, কম্পিত ঠোঁট আর করুণ পা দু'টোর দিকে চেয়ে দেখলো। আচ্ছা বেশ, দুঃখিত কণ্ঠে তার পর বললো; তাই হোক, আর একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

আবার বসন্তকাল এলো। মরিস লণ্ডনে হেনরীর ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে। লণ্ডনে যাওয়ার দিন যতো ঘনিয়ে আসতে লাগলো হেনরী ততো বদমেজাজী আর চঞ্চল হয়ে উঠলো। মেরীয়ামকে একা প্যারিস রেখে যেতে তার কি রকম আতঙ্ক জাগছিল। যাওয়ার ঠিক তিন দিন আগে সে মরিসকে জানিয়ে দিলো, সে যাবে না।

এ সংবাদে মরিস আশ্চর্য্য হলো। যাবে না? প্রথমে সংশয়, তার পর রাগের আভাস দেখা গেল তার মুখে। যাবে না? এবার সে গর্জন করে উঠলো। তোমার কি মতিচ্ছন্ন হয়েছে?

—আমার ছবি তো তারা দেখতে পাবে। তাই দেখতেই তারা চায়। তারা আমাকে দেখতে নিশ্চয়ই চায় না। তাহলে আমার গিয়ে লাভ কি?

গিয়ে লাভ কি? মরিসের নীল চোখ রাগে কাঁপতে লাগলো। বলছি কেন তোমার যাওয়া উচিত। আমি এক বছর ধরে এই প্রদর্শনীর জন্যে পরিশ্রম করছি। তুমি যে যাচ্ছ একথা ইতিমধ্যে ছাপান হয়ে গেছে। অনেকের সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাতের কথা স্থির হয়ে আছে। তোমার সম্মানে সেখানে ডিনার দেওয়া হচ্ছে। ছবি টাঙানর জন্যে মিষ্টার মারচেণ্ড তোমার মতামত চান। আর প্রিন্স অব ওয়েলস—

হাঁ,—তা বটে, তিনি আমার প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করছেন একথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি খুব সদয় তিনি।

মরিস, মিসিয়া, মেরীয়াম একসঙ্গে সবাই বোঝালো যে তার যাওয়া উচিত। আচ্ছা বেশ, সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হয়ে বললো; শুধু এক সপ্তাহের জন্যে, তার এক দিনও বেশী নয়।

মেরীয়াম তার সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়েছিলো। ট্রেণ ছাড়বার আগে একটা কামরায় হেনরীর কাছে বসেছিল।

এক সপ্তাহ শুধু, মেরীয়ামের মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলো, তুমি চিঠি দেবে তো? ঠিকানা মনে রেখো। ক্ল্যারিজস গ্রসভেনর স্কোয়ার। যদি আমাকে দরকার হয়—যে কোন কারণেই হোক, সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফ করবে। আমি তক্ষুণি চলে আসবো।

দু'জনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্ত যেন বুকের স্পন্দনের তালে এগিয়ে আসছে।

—আমি যখন ফিরবো, সব অন্য রকম হয়ে যাবে দেখো—

মুলাঁ রুজ হোটেলের দৃশ্য—লোতরেক অঙ্কিত

মেরীয়াম কোন জবাব দেয় নি। তার কথাও শুনতে পেয়েছে বলে মনে হ'লো না। গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো শুধু। যেন চোখ দিয়ে কিছু বলতে চায় সে।

ট্রেণের হুইসিল বেজে উঠলো। ঝনঝন করে একটা ঝাঁকুনি লাগলো এই দীর্ঘ সরীসৃপের গায়ে।

চলি হেনরী। মেরীয়াম হেনরীর ওষ্ঠাধরে চুম্বন করলো। ট্রেণ চলতে শুরু করলে হেনরী জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রুমাল নাড়তে লাগলো।

কাজের ঘূর্ণিপাকে পরের দিনগুলো কাটতে লাগলো। প্যারিসে যে সমস্ত ইংরেজ শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তাদের কাছে প্রচুর আপ্যায়ন পেলো হেনরী। লণ্ডন তার ভালোই লাগছিল।

কিন্তু মেরীয়ামের কোন সংবাদ না পেয়ে সব আনন্দ উবে গেল। লণ্ডনে পৌছে মেরীয়ামের কাছ থেকে কোন টেলিগ্রাম না পেয়ে সে ভীষণ মুষড়ে পড়েছিল। পরের দু' দিন কোন চিঠি না পেয়ে তার অধৈর্য্য আশঙ্কায় পরিণত হলো। কেন, কেন মেরীয়াম তাকে চিঠি লিখছে না? বিদায় নেবার পর হেনরী তাকে যে ফুলের স্তবক পাঠিয়েছিল, সে জন্য কেন ধন্যবাদ দিল না সে? সে কি এতোই ব্যস্ত যে একখানা চিঠি লেখবার সময় নেই তার? সে কি অসুস্থ? ভীষণ ভাবনা তার মন অস্থির করে তুলেছিল।

প্রদর্শনী তার মন ভেঙে গিয়েছিলো। আগের দিন রাতে হোটেলে একলা মদ খেয়ে কাটিয়েছে। সারা রাত নিজের ওপর অত্যাচার করেছে। নানা দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়েছে। মাথার চুলের ফাঁকে ফাঁকে আঙুল বুলিয়ে হাতের তালুতে মুখ রেখে সারা রাত জেগে কাটিয়েছে।

মেরীয়াম হয়তো কোন ধনী মহিলার গাউনের মডেল করছে। কিংবা সে হয়তো কোন সুন্দর আর স্বচ্ছল তরুণের সঙ্গে ডারসিনে ডিনার খাচ্ছে। কিংবা হয়তো অসুস্থ—শয্যাগত হয়ে পড়েছে—যে জন্যে তাকে কোন সংবাদ দিতে পাচ্ছে না। হয়তো আকস্মিক কোন দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে সে—ষ্ট্রেচারে করে কোন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে—সে হয়তো মুমূর্ষু—

সেদিন যখন সে গ্যালারিতে এলো তখন দুর্ভাবনায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ছড়ি নিয়ে কোন রকমে টলতে টলতে ভেলভেট-পাতা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। ঘর তখন নির্জন, গ্লাডিওলি ফুলের মিষ্টি গন্ধে আচ্ছন্ন। সে সোফায় শুয়ে পড়েছিল।

বেশ, কাল সে মেরীয়ামের কি হ'য়েছে জানতে পারবে। একটা ট্রেণ সন্ধ্যা ছ'টায় ডোভার যাবে। ট্রেণটা ধরতে হবে। তার মুখে স্বস্তির মৃদু হাসি দেখা দিল। বুকের ওপর হাত দুটো জড়ো করা তার। শুয়ে শুয়ে হৃদয়ের কামনার রঙিন স্বপ্ন দেখতে লাগলো সে।

মঁসিয়ে! স্যার! কি উচ্ছৃঙ্খল রে বাবা! আমাকে বলেছিলো লোকটা ভীষণ মদ খায়। সাবধান হওয়া উচিত ছিল আমার। ওর ওপর লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। ওঃ এই ফরাসীগুলো যেন কি রকম—

প্রথমে হেনরী যেন সারা দেহে মৃদু ঝাঁকানি অনুভব করলো। মৃদু গুঞ্জন আসতে লাগলো তার কানে। তারপর কাঁধের ওপর একটা হাতের চাপ অনুভব করলো। কে যেন উত্তেজনায় তার নাম ধরে ডাকছে। আধখোলা চোখের ফাঁক দিয়ে সে যেন তাকে ঘিরে জনস্রোত বয়ে যেতে দেখলো। তার পর দেখল প্রদর্শনীর প্রযোজক মার্সেগু তার দিকে বিকৃত মুখে চেয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকছে। সে চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছিল—চোখে-মুখে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব। তারপর সোফার ওপর উঠে বসলো।

আমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, না? সে আড়ষ্ট কণ্ঠে বলেছিল। তারপর চকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, প্রিন্স অফ ওয়েলস—

হ্যাঁ, তিনি এসে চলে গেছেন। মার্সেগু ক্ষুব্ধকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলো। এসে চলে গেছেন, শুনতে পাচ্ছেন?

হেনরী মার্সেগুর দিকে তাকিয়ে বললো, আমায় ডাকেন নি কেন?

ডাকিনি তার কারণ, তিনিই বারণ করেছিলেন।

দীর্ঘ হাসির রেখায় হেনরীর ঠোঁটটা বড় হয়ে গিয়েছিলো। খুব ভালো তো প্রিন্স—আমার প্রতি কি সদয়, সে ভেবেছিলো—

হাসতে হাসতে সে চার দিকের ভীড় দেখছিলো। তার পর হঠাৎ বললো, ট্রেণটা ধরতে হবে, ক'টা বাজলো এখন?

পাঁচটা বাজে—কে এক জন সময় বলে দিলো।

এখন তার নিদ্রাচ্ছন্ন ভাব কেটে গেছে। মাথার টুপি আর হাতের ছড়িটা তুলে নিলো সে।

দরজার সামনে গিয়ে জনতার উদ্দেশ্যে মাথা নীচু করলো। তারপর আমতা আমতা করে বলে গেলো, ট্রেণ ধরতে হবে···খুব দরকার—রয়্যাল হাইনেসের সঙ্গে দেখা হলো না বলে আমি অনুতপ্ত, আর এক বার মাথা নীচু করে সে অদৃশ্য হলো। ভেলভেটের পর্দা একটু দুলে স্থির হয়ে গেলো।

যখন ট্রেণ প্যারিসের শহরতলীর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ একটা চিন্তা তার মনে এলো। সে চিন্তার চমকে সে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। শূন্য দৃষ্টিতে হাঁ করে সে জানলার ওপর তার নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে রইলো। মূর্খ,—সে একটা আস্ত বোকা। একথা আগে ভাবেনি কেন? মেরীয়ামের কাছে এ প্রস্তাব করা উচিত ছিলো তার। তাকে হারাবার ভয় এমন পেয়ে বসেছিল যে সে একথা ভাবেনি বিবাহ একমাত্র না হারানোর স্থায়ী ব্যবস্থা। হয়তো সে-ও এই চেয়েছিলো—তাকে অর্থ নয়, তার খ্যাতি দিতে পারতো সে—

আজ রাত্তিরে সে এ ভুলের সংশোধন করবে। মেরীয়াম—সে বলবে, আমার খুব কাছে এসে একটু বসো। কিছুক্ষণ তারা পরস্পরের হাত হাতে নিয়ে আগুনের দিকে চেয়ে থাকবে। তার পর শান্ত গম্ভীর ভাবে সে বলবে, মেরীয়াম—। হেনরীর পুরোন পদবী তার নামের সঙ্গে কি সুন্দর মানাবে। মেরীয়াম, কমটেস দ্য তুলোস লোত্রেক—

ট্রেণ এসে ষ্টেশনে থামলো। প্লাটফর্মে নেমে ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা দিতে দিতে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললো। গাড়ীতে উঠে বললে, ২১ নম্বর ক্যাল কলিনফোর্ট। তাড়াতাড়ি গেলে পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক বকশিশ দোব।

দাঁড়াও দাঁড়াও, সে বলেছিলো যখন ল্যাণ্ডো বাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, একটু অপেক্ষা করবে আমি ফিরবো—

ঘরে গিয়ে সে স্নান সেরে, জামাকাপড় বদলে যখন বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে সেই সময় ম্যাডাম লুকাতের পায়ের শব্দ সিঁড়ির ওপর শুনতে পেলো। দরজা খুলে গেলো।

কি খবর ম্যাডাম লবে? সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো। তার

মনে হলো, কি যেন ঘটেছে। ম্যাডাম লুবাতের মুখ দেখেই সে অনুমান করতে পেরেছিল। ঘরের মেঝের ওপর শক্ত করে সে দাঁড়িয়েছিলো, তবু আপাদমস্তক যেন কাঁপছিল তার। যেমন মেরী শার্লেট এই ঘরে এইখানে দাঁড়িয়ে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল।

কি খবর? সে আবার প্রশ্ন করেছিলো। ম্যাডাম লুবাতের চোখ দু'টো খুব বড় বড়, শুকনো আর বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। একটু বসো মঁসিয়ে তুলোস। তিনি বলেছিলেন হেনরীকে।

হেনরী কোন কথা বলতে পারে নি। একদৃষ্টিতে ম্যাডাম লুবাতের দিকে তাকিয়েছিলো। তিনি এপ্রোণের মধ্যে থেকে একটা বড় খাম টেনে বার করলেন। হেনরীর সারা দেহ এমন ভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছিলো যে, তার দাঁতে দাঁত ঘষে যাচ্ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মানুষ বোধ হয় এই রকম অনুভব করে।

তুমি যেদিন লণ্ডন যাও মেরীয়াম, সেদিন এই চিঠিটা রেখে গেছে।

হেনরী খাম ছিঁড়ে ফেলে চিঠির ওপর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। 'আজ রাত্তিরে আমি মঁসিয়ে ডুপ্রের সঙ্গে চলে যাচ্ছি। বন্ধু, এইখানেই ছেদ টানা বোধ হয় শ্রেয়:'—

* * * *

[তুলোস লোত্রেকের জীবনে আনন্দের দৃশ্যে এইখানেই যবনিকা পতন। ১৯০১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তার মৃত্যুর পূর্ব্বে যে কয় দিন সে বেঁচেছিলো—ব্যথা-যন্ত্রণার আর অবধি ছিল না। অতিরিক্ত মদ্য-পানে স্বাস্থ্য ভেঙে গেছলো। একটা পাগলা-গারদে কিছু দিন থাকতে হয়েছিলো তাকে। কিন্তু শিল্পীর হাতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি বন্ধ হয়নি তখনো। তার সার্থক প্রতিভার সৃষ্টি একবারও ব্যর্থ বিফল হয়নি। তার পর সে তার মায়ের কাছে শান্তির মধ্যে শেষ আশ্রয় নিয়েছিলো।]

এখন তার কাছে শুধু মা রইলো। খুব কাছে—আরো কাছে—তার মায়ের মুখখানা তার ঠোঁট স্পর্শ করছে যেন। তাঁর স্নিগ্ধ আঙুলের স্পর্শ চুলের মধ্যে অনুভব করছে সে। যেমন করতো বহু দিন পূর্ব্বের সেই শৈশবের দিনগুলিতে।

ঘুমোও রিরি, একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর।

ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু তাঁর গাল বেয়ে ঝরে পড়ছিল, তবুও তাঁর মুখে হাসি লেগেছিলো যেন। না ঠিক হাসছেন না, তবে সুখী মনে হচ্ছে তাঁকে। সে নিশ্চয় বলতে পারে। গর্ব অনুভব করলো হেনরী। মায়ের আশা অপূর্ণ রাখে নি সে। সব দ্বন্দ্বের সমাপ্তি এখন। তার মা তাকে আর ধরে রাখবে না—

একটু ঘুমোও রিরি—

তার মায়ের সজল সুন্দর মুখ যেন কত দূরে সরে যাচ্ছে! অস্পষ্ট ছায়াময় হয়ে আসছে যেন। দিনের প্রথম আলোয় সারা ঘর ভরে উঠেছে, তবু কি অন্ধকার! এ মহা অন্ধকার তার মনের মধ্যে থেকে উঠে আসছে। মা—মা—বিদায় মা !!

অনুবাদক—কল্যাণ দাশগুপ্ত ও শ্যামাপ্রসাদ দে।

সমাপ্ত

হতাশ মুহূর্তগুলোকে চিনি

অশোক ভট্টাচার্য

আমার জীবনের ধুসর মুহূর্তগুলোকে আমি চিনি :
আমার স্বপ্নালু মনের নীল আকাশ জুড়ে
কালো শকুনির মতো তারা আসে
একে একে দলে দলে, তার পর তারা নামে
আমারই বুকের সোনালী প্রান্তর ঘিরে।

তাদের বিশাল খড়ি-আঁকা কালো পাখা
সূচাগ্র ঠোঁট আর সুতীক্ষ্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে
আতঙ্কে শিউরে উঠি আমি।
আর তারা ধীরে ধীরে, একে একে
আমার হৃদয়কে দীর্ণ ক'রে নিঃস্ব ক'রে
আয়ুকে হনন ক'রে ফিরে যায়।

তখনও আমি আমার মৃত বোবা চোখে তাকিয়ে থাকি :
দেখি, জীবনের কংকাল অবশেষ।

আমার কালো হতাশ মুহূর্তগুলোকে আমি চিনি।

(স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী)

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

পত্রত্যাগের এক মাস

২২শের দৈনিক লিখিয়াছ,—এখন প্রাতঃকাল ৫টা। ভোর ৩টার সময় যেন কে ডাকিয়া উঠাইল। আজ তুমি বিদেশে যাবে কি না, তাই একত্র উপাসনা করিবার জন্য মা ডাকিলেন। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। এখানে কেহই নাই, কে ডাকিল? নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ৩।টা পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিলাম ও তোমার সহিত মনে মনে কত কথা কহিতে লাগিলাম। ৩।টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত তোমার সহিত নাম করিলাম। তার পর উপাসনায় বসিলাম। ৫টার সময় উপাসনা হইতে উঠিয়া এই দৈনিক লিখিতেছি। আজ নিদ্রা ভঙ্গ হইতে না হইতে মা বলিলেন, 'দেখ, একগাছি সূত্রে তোমরা বাঁধা, যখন ইচ্ছা করিবে তখনই এই সূত্র ধরিয়া টানিও, অমনি দেখিবে তোমার প্রিয়জন তোমার নিকটে আসিবেন।' এই আশার কথা শুনিয়া প্রাণ আনন্দে নাচিতে লাগিল। কালকার অপেক্ষা আজ মন খুব ভাল। এই যে তুমি মফঃস্বলে যাইবার জন্য প্রস্তুত, আমিও তোমার ইচ্ছা পালনের জন্য স্কুলে যাইতে প্রস্তুত। দেখিতে অনেক দূর, কিন্তু এই যে তুমি আমার নিকটে। ত্যাগে যে যোগ বাড়ে, তাহার প্রমাণ হাতে হাতে পাইতেছি। যেন তুমি আমার রক্তের সঙ্গে মিশিয়া গেলে। আর চিন্তা করিয়া তোমাকে মনে করিতে হইতেছে না; আমার প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সহিত যেন মার কোলে তোমাকে আমার বুকের ভিতর দেখিতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তে যেন দেখা সহজ হইয়া আসিতেছে। আশ্চর্য্য! সেই জননীকে ধন্যবাদ দি। তুমিও যাইবার জন্য প্রস্তুত হও; একত্রই যাইব, ভয় কি? প্রকাশ, ভাবিও না, এই যে তোমার ঘোরী মার কোলে। তোমাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করি। কত দূরে যাইবে যাও, কিন্তু হৃদয় ছেড়ে যাইতে পারিবে না।

"৫টার সময় কুঠিতে গেলাম। নূতন কর্ত্রী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পত্র নাই কেন?' কালও পত্র চাহিয়াছিলেন, বলিয়াছিলাম 'দিব না'। আজ বলিলাম, 'তিনি বাহিরে গিয়াছেন।' তিনি বলিলেন, 'Mr. Roy খুব ভাল ব্রাহ্ম; না?' আমি বলিলাম 'আমি কি বলিব?' তিনি বলিলেন, 'কত কষ্ট হইতেছে, তবুও তোমাকে এতদূরে পাঠাইয়াছেন।' আমি বলিলাম, 'সংসারের কষ্ট না নিলে ভগবানের পথে চলা যায় না। তিনি তাহা স্বীকার করিলেন। ক্রমশঃ পরীক্ষা সহজ হইয়া আসিতেছে, আসক্তি প্রায় হারিল, তাহার আর জোর নাই। মন প্রায় শান্ত হইয়া আসিল। আহার, বিহার, উপাসনা, শয়ন যখন যাহা করিতেছি, মনে হইতেছে তুমিও যেন তাই করিতেছ। একটুও তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। মার কৃপায় আর একটু অগ্রসর হইতে পারিলেই তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। মনে হইতেছে আমার অপেক্ষা তোমার কষ্ট বেশী হইতেছে।

[illegible]

"আজ পড়া বেশ হইল, কিন্তু নির্জ্জন ভাল লাগিতেছে। পূর্ব্বে এইরূপ কোনও পরীক্ষার সময় আরাম আহার বিহার কিছুই কয়েক দিন ভাল লাগিত না। এবার আর তাহা নাই। সকল বিষয় ঠিক সমভাবে চলিতেছে। আজ শরীরটা ও মনটা বড়ই দুর্ব্বল বোধ হইতেছে। একটু আগে পেটে একরকম বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল। শয়ন করিতে পারিতেছিলাম না। দেখিতে দেখিতে বেদনা বড় কষ্টকর হইয়া উঠিল। অমনি বলিলাম, 'মা, প্রকাশ, আমি প্রস্তুত,—যদি এখনই যাইতে হয়।' চুপ করিয়া মাকে ও তোমাকে দেখিবার জন্য বসিয়া রহিলাম। মেয়ে তিনটির মুখ শুখাইয়া গেল। কোনও শব্দ করি নাই, কিছু বলিও নাই। শয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু পারিতেছিলাম না, ইহা দেখিয়াই তাহারা বুঝিতে পারিল। পরে বলিলাম, আমাকে একটু জল দাও। জল খাইবামাত্র বেদনা বেশী হইল, মার চরণ আরও ভাল করিয়া ধরিলাম, ও মার কোলে লুকাইয়া গেলাম। দেখিতে দেখিতে বেদনা কোথায় চলিয়া গেল। বোধ হয় ১৫ মিনিট কিংবা তাহারও কম সময় ছিল; এখন আর কিছুই নাই। এ বেদনা আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু মার কোল আমাকে প্রত্যেক বার বাঁচাইতেছে। প্রকাশ, এ তোমার সাধনের ফল।"

এই অবস্থায় তোমার আর এক সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তোমাদের বিদ্যালয়ের নূতন কর্ত্রীর সহিত তোমার ধর্ম্মালোচনা হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে আবার ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে তিনি বলিলেন যে, যদি তুমি খৃষ্টান হও, তাহা হইলে তিনি বড় সুখী হয়েন। তুমি বলিলে, "ঈশাকে আমরা ঈশ্বর-পুত্র বলি, কিন্তু ঈশ্বর বলি না। আপনারা কোন দরকার হইলে ঈশার নিকট যান, আমরা ঈশ্বরের নিকট যাই।" তিনি বলিলেন, "আমরা কখনও ঈশার নিকট কখনও ঈশ্বরের নিকট যাই।" এইরূপ অনেক কথা হইল। বেশী কথা ভাল নয় বলিয়া তুমি চুপ করিলে। তোমার মন ভীত হইল, মনে অনেক প্রকার আন্দোলন চলিল। বিশেষতঃ তুমি একাকিনী, আমার সঙ্গে পত্রও বন্ধ। তুমি প্রার্থনা করিলে, মায়ের হাতে সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলে এবং আপনাকে শান্ত করিলে।

২৩শে, ২৪শে, দুদিনে ক্রমে তোমার মন আরও শান্ত হইয়া আসিল; ২৪শে সেপ্টেম্বর ইংরাজি তৃতীয় পুস্তক শেষ করিলে। ২৫শে তোমার মন আরও ভাল ছিল। প্রাতে উঠিবামাত্র তোমার মনের যেটুকু শূন্যতা ছিল তাহাও যেন পূর্ণ হইল। আত্মার সঙ্গে সঙ্গে শরীরও যেন আজ আমার সান্নিধ্য অনুভব করিতে লাগিল, পুলকিত হইতে লাগিল। এইদিন বেলা ৪টার সময় মিস থোবর্ণ পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তুমি দেখা করিতে গেলে; তিনি বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "ভাল আছ? তোমার সন্তানেরা ভাল ত?" বিদুষী ঈশ্বর-কন্যার এই আদরে তোমার চক্ষে জল

[illegible] শুক্রবার

অনেকে বাটী যায়; যাদের বাড়ী দূরে তাহারা শনিবার আত্মীয় স্বজনকে পত্র লিখে। তোমার মনে হইল, সুবোধকে পত্র লিখিলে কিরূপ হয়? তাহা হইলে আমিও তোমার সংবাদ পাই। কিন্তু তাহা করিতে কিছুতেই তোমার মন সায় দিল না।

১১শে সেপ্টেম্বর পত্র বন্ধ করার প্রস্তাব করিয়া তোমাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাহার এক অংশে এই কথা ছিল—"পত্র লেখা ছাড়িলে কি উপায়ে ভালবাসিব ও বাসিবে?—মনে ও ভাবে। মনের এক শক্তি আছে তাহা দ্বারা সে দেশ কালকে অতিক্রম করিতে পারে; সাধুসঙ্গ করিয়া সুখী হইতে পারে। এই করিয়া আচার্য্য ঈশা-তীর্থ যাত্রা, মুসা-তীর্থ যাত্রা করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সেটাও আন্দাজী; তীর্থযাত্রার ফল হইল কি না, তাহার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু আমি যদি অঘোর-তীর্থে যাত্রা করি আর তুমি যদি প্রকাশ-তীর্থে যাত্রা করিতে পার, তাহা হইলে প্রমাণ হইবে, যে তীর্থযাত্রা সম্ভব। তুমি তোমার ভাবগুলি ডায়েরিতে লিখিবে, আমি আমার ভাবগুলি লিখিব; তারপর যদি সেই ভাবগুলি মিলিয়া যায়, তাহা হইলে একটি ভয়ানক সন্দেহ দূর করিয়া যাইতে পারিব।" এই কথা অনুসারে তুমি তোমার দৈনিক পুস্তকে নিজের প্রতিদিনের ঘটনা লিখিতে। আমিও প্রতিদিনের ঘটনা লিখিতাম; সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার পূর্ব্বজীবনের ইতিহাস তোমাকে সম্বোধন করিয়া লিখিতে লাগিলাম।

২৮শে সেপ্টেম্বর তুমি দিব্য চক্ষে দেখিয়া লিখিলে, আমি বাঁকীপুরে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি দৈনিক খুলিয়া দেখি, যথার্থই আমি বাঁকিপুরে ফিরিয়া আসিয়াছি। ইহা কিরূপে বুঝিলে? ঐ দিন তোমার শরীর বিশেষ অসুস্থ হইল, কিন্তু যন্ত্রণা বৃদ্ধির সঙ্গে মনে মনে আমাকে সাহস দিয়াছ, আর দৈনিকে লিখিয়াছ, "তুমি ভাবিও না, আমি চিরদিনই তোমার। দুঃখ করিও না, মার আর তোমার ইচ্ছা পালন করিতে করিতে গেলাম। এ আমার বড় সুখের যাওয়া; আমি বড় সুখী। আমার দুঃখ আসিল না। তোমার সঙ্গে একত্র হইয়া, তোমাকে বিবাহ* করিয়া ইহকাল ও পরকালে সুখী হইলাম। তবে আর কেন দুঃখ করিবে? এ সকল কথা আজ কেন মনে হইতেছে, তুমি জান, আর মা জানেন। যা মনে উঠিল, প্রতিদিনকার মনের কথা লিখিয়া রাখিলাম। তুমি পড়িও, আর জগৎকে বলিও, যে একজনকে চিরসুখী করিয়া মার নিকট পাঠাইয়া দিলে। সরোজিনীর শরীর খুব খারাপ বোধ হইতেছে, নিজেরও মাথায় একটা কি বেদনা, ইত্যাদি ভাবিয়া একবার মনে হইতেছিল, ফিরিয়া যাইবার জন্য তোমাকে বলি। কিন্তু অমনি চেতনা হইল। ভাবিলাম, মা আমার তো নিদ্রিত নন; তিনি সকলি জানিতেছেন। যা যখন প্রয়োজন, নিশ্চয় করিবেন। এই ভাবিয়া মনকে বুঝাইলাম।"

ঐদিন শেষ রাত্রে ঘড়ি দেখিতে গেলে, দেখিলে ঘড়ি খারাপ হইয়া গিয়াছে। নিকটে থাকিলে আমিই মেরামত করিয়া দিতাম। সে ভার আমার, কিন্তু তখন আমি থাকিলেও নাই। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে এবং উত্তর পাইলে যে, তখনও কাজ তোমাকেই করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে গিয়া কিছু ক্লান্ত হওয়াতে সেইখানেই প্রার্থনা করিলে, ও আমার পরিশ্রমের কথা মনে করিয়া পড়া প্রস্তুত করিলে। যখন রাত্রে একটি প্রাণীও জাগিয়া নাই, তোমার শরীর অসুস্থ, তখন আপনার অবস্থা আমাকে দেখাইবার ইচ্ছা হইল, ও আমাকে দেখিবার সাধ হইল। এই সময়ের আমার দৈনিক খুলিয়া দেখি, "সে সময়ে আমারও মনের অবস্থা ঐরূপই হইয়াছিল।" আমিও পরমাত্মার মধ্য দিয়া তোমাকে দেখিতেছিলাম। আর একদিন শয়ন করিতে যাইবার সময় লিখিয়াছিলে, "এ রজনীতে যদি দুঃখ কষ্ট বিপদ আসে, আমাকে তাহা দাও; সকলের হইয়া আমি বহন করিব।"

তখন তুমি লিখিয়াছিলে, "দুই জনের মধ্যে একজন যখন এ লোকে না থাকিব, তখন অপরের কাজ বন্ধ হইবে না; কেবল এক রকমের অভাববোধ যেন ভিতরে থাকিবে। এখন আমার অবস্থা এই যে, শোকে মুহ্যমান হই না বটে, কাজকর্ম্ম সবই করিতেছি, কিন্তু আমার প্রিয়জন কখনও কাছে থাকেন, কখনও দেখিতে পাই না। প্রথম দিন কয়েকের চেয়ে আজকার মন খুব ভাল।" দেখি, তখন তুমি যাহা অনুভব করিয়াছিলে, আজ দেখ আমার তাহাই হইয়াছে। কাজকর্ম্ম সবই চলিতেছে, কিন্তু একটা অভাব বোধ থাকিতেছে, সদাই মনে পড়ে, তুমি শরীরে থাকিলে আমার এ সকল কার্য্য কেমন ভাল করিয়া করিতে পারিতে।

আমি এই সময়ে তোমাকে সম্বোধন করিয়া আমার পূর্ব্বজীবনের যে ইতিহাস লিখিতেছিলাম, তাহার একখানি খাতা লেখা শেষ হইল। তখন পত্র বন্ধের কয়েক দিন হইয়াছে। তোমার কাছে সে খাতাখানি পাঠাইতে মনে প্রেরণা পাইলাম ও পাঠাইলাম। এই দিনে তোমার মন অত্যন্ত অস্থির হইতেছিল; মনে করিয়াছিলে কি যেন একটা নূতন ঘটিবে; সত্য সত্যই তাহা হইল। এমন করিয়া যে লিখিব, তাহা তুমি জানিতে না, আমিও জানিতাম না। পুস্তক পাইয়া তোমার মনে কি ভাব আসিল, তাহা তোমার দৈনিকে লিখিয়াছিলে। "কল্যই বুঝিয়াছিলাম যে, আজ কিছু নূতন লীলা মা করিবেন। আজ তাহাই হইল। ধন্য, ধন্য শত ধন্যবাদ দি সেই জননীকে। আমার মায়ের নাম যে জয়যুক্ত হইল, আসক্তি যে হারিয়ে গেল, তাহাতে যে অঘোর-প্রকাশ কি সুখী হইল, তাহা বলিতে পারি না। কত পরিমাণে যে যোগের পরিচয় দরকার তাহাও বুঝিলাম। এক জনের অভাব হইলে যে আর এক জনকে কিরূপে শেষ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে হইবে, তাহাও বুঝিলাম। বিশ্বাস যে কত পরিমাণে বাড়িল, তাহা বলিতে পারি না। মার সহিত যেন আরও নিকট হইয়াছি, তোমার সহিতও হইয়াছি তাহার আর ভুল নাই। প্রথমে ভয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু মার কৃপায় ও তোমার আশীর্ব্বাদে সে ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। অঘোর-প্রকাশের জীবন-পুস্তকে লেখা থাকিবে যে মহাত্যাগেই মহা সুখ। যত ত্যাগ ততই সুখ, ইহার আর ভুল নাই।" এই পুস্তক পাইয়া তোমার ইচ্ছা হইয়াছিল যে তুমিও পত্র লেখ; কিন্তু মার ইচ্ছা নয় জানিয়া আর লিখিলে না। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করিত যে আমার পুরাতন পত্রগুলি পাঠ কর। কিন্তু প্রাণ সায় দিল না। তাই সেগুলি স্পর্শও করিলে না।

এখন এমন অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছ যে পত্র দিলেও হয়, না দিলেও হয়, কোন পরোয়া নাই। পূর্ব্বে এক দিন সংবাদ না পাইলে

---

* আধ্যাত্মিক বিবাহ।

খাবার টাকা হইতে কাটিয়া, কম খাইয়া, টেলিগ্রাফ করিতে। আজ তার এ দশা কিরূপে হইল ? ব্রহ্মকৃপাবলেই হইল। ৬ই অক্টোবর ডায়েরিতে লিখিয়াছিলে, "আজ ১৫ দিন তোমার সংবাদ পাই নাই বটে, কিন্তু মন খুব ভাল। এ কথা এই জন্ম বলিলাম, যে আমার মত আসক্ত লোকেও মার কৃপায় এমন সুখ পায়। শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবুর বড় সাধ ছিল, যে তোমার নিকটে থাকিলে আমার মুখে যে হাসি থাকে, তোমা হইতে দূরে থাকিলেও যেন আমার মুখে সে হাসি দেখিতে পান। মা তাঁহার ভক্তের সে সাধ পূর্ণ করিয়াছেন।" এইরূপ বলিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বে যখন আমাকে ছাড়িয়া গয়ার উৎসবে ও গাজিপুরের উৎসবে গিয়াছিলে, তখন শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যে তোমার মন ভাল করিয়া খুলিতেছে না।

এই সময় তোমার সাহসও বৃদ্ধি পাইতেছিল। প্রতি রবিবার তিনটি মেয়েকে লইয়া সন্ধ্যার সময়ে অযোধ্যা ব্রাহ্মসমাজে যাইতে; ফিরিয়া আসিতে রাত্রি দশটা বাজিত। একা তিনটি বয়স্থা কন্যা লইয়া যাইতে হইত। তুমি একাকী, নূতন সহর; যদি কোন নূতন বিপদ উপস্থিত হয় কে তোমাদের রক্ষক ? মা জননী প্রহরী হইয়া যাইতেন, তাই তোমার কোনও ভয় করিত না।

একদিন সমাজের উপাসনার পর তুমি মেয়েদের লইয়া সৎপ্রসঙ্গ করিতেছিলে, এমন সময়ে ভাই বিহারীলাল ঘোষ ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "হেমের মা (তাঁহার পত্নী) আপনাকে দেখিতে চাহিতেছেন।" তখন রাত্রি ১টা। তুমি ইতস্ততঃ করিতেছিলে। ভাই বিহারীলাল তখন পীড়িতা পত্নীকে লইয়া একজন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বন্ধুর বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গৃহকর্ত্তা ব্রাহ্মদের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। তুমি ভাবিতে লাগিলে, এমন বাটীতে গৃহকর্ত্তার নিমন্ত্রণ বিনা কিরূপে প্রবেশ করিবে ? ভাই বিহারীলাল বলিলেন, 'হয়তো বাঁচিবেন না, একবার দেখিয়া যান।' আর কি তুমি থাকিতে পার ? গাড়ী করিয়া চলিলে। সে বাটীর দরজায় যখন গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, তখন একবার মাকে ডাকিলে; আর বুঝিলে আমার আত্মা তোমার সঙ্গে রহিয়াছে। বিহারী বাবু আসিয়া উপরে যাইতে বলিলেন, তুমি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে। উঠিবার সময় মুখে মা মা শব্দ করিতে করিতে উঠিলে। গিয়া ভালই করিলে। না গেলে ভগিনীর সে সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাইতে না; তোমার নির্ভরের পরিচয়ও দেওয়া হইত না। এই গৃহস্বামী লৌকিকভাবে তোমার অপরিচিত, তাহাতে আবার তিনি কোনও ব্রাহ্মকে বাটীতে আসিতে দিতেন না। কিন্তু যে মাকে চিনিয়াছে, তাহার কাছে সকল স্থান, সকল জীবই পরিচিত। তুমি গিয়া দেখিলে ভগিনীর দেহ অস্থিচর্ম্মসার। তুমি অতি সন্তর্পণে গলা ধরিয়া চুম্বন করিলে। তিনি বলিলেন, "মনে আছে তো ?" তুমি বলিলে, "আর কি ভুলিতে পারি ?" বুকের বেদনায় তিনি কথা কহিতে পারিতেছিলেন না; রোগের নানারূপ যন্ত্রণা এবং জ্বর; কিন্তু যতক্ষণ তুমি রহিলে, সেই মুখের হাসিতে শরীর আলো করিয়া রাখিয়াছিল। রোগের মধ্যে এমন হাসি দেখিয়া তুমি চমৎকৃত হইলে। ভগিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হয় ত আর বাঁচিব না।" তুমি প্রতিবাদ করিলে, এবং রাজগৃহে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলে। তাহাতে তিনি সুখী হইলেন। এই অবকাশে মায়ের কথাও কথা শুনিলেন, ও বলিলেন, "আপনি আসিবেন বলিয়া আপনার প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলাম। আবার রবিবার আসিবেন, মেয়েদের সঙ্গে লইয়া আসিবেন।" তাঁহার এই অভ্যর্থনা ও আদর পাইয়া প্রেমময়ী মাতাকে বার বার ধন্যবাদ দিলে। ইহার পর হইতে আর অপরিচিত লোকের বাটীতে যাইতে ভয় পাইতে না।

৫ই অক্টোবর তুমি একটি বক্তৃতাতে নিমন্ত্রিত হইলে। একজন পারসী স্ত্রীলোক হিন্দীতে বক্তৃতা দিবেন; তুমি যাইবে কি না এ বিষয়ে আমার অভিপ্রায় জানিতে চাহিলে। অমনি ভগবান বুঝাইয়া দিলেন। কি আশ্চর্য্য উপায়! কত সহজ। বক্তৃতা শুনিতে গেলে, ও গিয়া উপকৃত হইলে।

১৪ই অক্টোবর হইতে আবার দ্বিপ্রহরে স্কুল হইতে আরম্ভ হইল। এতদিন গ্রীষ্মকাল বলিয়া সকালে হইত। প্রথম যেদিন বেলায় স্কুল কিম্বা কাছারী করিতে হয় সেদিন কেমন একটু ঘুম পায়। দিনের বেলায় বিশ্রাম করা তোমার অভ্যাস হইয়াছিল। তাই পাঠ করিতে করিতে শরীর কেমন করিতে লাগিল ঘুমও পাইল। যে নামের গুণে সকলি করিতে পার, সেই নাম করিতে লাগিলে। আমার পরিশ্রমের কথা স্মরণ করিলে, অমনি নূতন বল পাইলে। তার পর খুব পড়িলে ও পড়া বেশ দিলে।

মাঝে মাঝে মনটা পত্রের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। আজ নূতন রুটীনের দিনে কি জানি কেন পত্র পাইবার আশা প্রবল হইল। ৫ টার সময় আহার হইল। তার পর কুঠিতে গেলে। আমার পত্র কিন্তু পাইলে না। মনটাতে আশা পোষণ করিয়াছিলে বলিয়া বুঝি একটু কষ্ট হইল, তাই ফিরিতে ফিরিতে মায়ের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলে। উচ্চারণ করিতে করিতে যেন শুনিলে, আমিও তোমার সঙ্গে নাম উচ্চারণ করিতেছি। তখন তোমার মুখ অত্যন্ত প্রসন্ন। একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এত প্রফুল্ল কেন ? পত্র পাইয়াছ না কি ?' তুমি বলিলে,—'না'। তবে প্রফুল্ল কেন ?' তোমার উত্তর—'জানি না'। তিনি বলিলেন, 'তুমি সব সময়ই প্রফুল্ল থাক।'

এক রবিবারে ৮ টার সময়ে গৃহে বসিয়া আছ, এমন সময়ে বোর্ডিঙের একটি মেয়ের মা তোমার ঘরে আসিলেন। তাঁহার কন্যার ফি'র টাকা আনিয়াছিলেন, মিস্ থোবর্ণ বাটীতে নাই, আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাই তোমার নিকট টাকা রাখিয়া গেলেন। তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলে। তিনি খৃষ্টান হইয়াও খৃষ্টান অপেক্ষা তোমাকে অধিক বিশ্বাস করিলেন!

আর একদিন জল গরম করিবার জন্য আগুন আনিতে যাইতেছিলে। পথে পড়িয়া গেলে। আগুন আনাও হইল না, জল গরমও হইল না, স্নানও হইল না। উপাসনায় বসিয়া মনে যথেষ্ট বল আসিল। তার পর আমার প্রেরিত আমার পূর্ব্বজীবনের ইতিহাসের খাতা আর একখণ্ড পাইলে। অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিতেছ, এমন সময় খাবার ঘণ্টা বাজিল। অমনি সে বই রাখিয়া দিতে হইল। আহারের পর আবার পড়িতে আরম্ভ করিলে, কিন্তু এবার স্কুলের ঘণ্টা বাজিল। আর তাহা পড়া হইল না; স্কুলে পুস্তক লইয়া পড়িতে গেলে। পড়া বেশ হইল। এই যে তুমি [illegible] থাকিতে ইহাতে তোমার মন বড় সুখী হইল।

বেলা ১টার সময় এই আত্মপ্রসাদ লাভ করিলে। আপনার কর্ত্তব্য করিলে এইরূপ হাতে হাতেই পুরস্কার পাওয়া যায়।

আর একদিন আমার ঐরূপ একখানি খাতা পাইয়া তোমার মনে হইয়াছিল, "আমি তো পত্র চাহিতেছি না, তবে শুধু লিখিতে দোষ কি?" কিন্তু যিনি আমাকে বারণ করেন, তিনি তোমাকেও বারণ করিলেন। পত্র লেখা হইল, কিন্তু ডাকে দেওয়া হইল না। পত্র লেখাতেও যে সুখ আছে। ছোটবেলায় গুরুজনের আজ্ঞায় দিনের বেলায় আমার সঙ্গে আলাপ করিতে না; এখন পরম গুরুর আজ্ঞায় আমাকে পত্র লেখা বন্ধ হইল।

এই যে ৮ মাস প্রতিদিন ১৪।১৫ ঘণ্টা করিয়া পাঠ অভ্যাস করিলে, ইহাতে তোমার চক্ষের জ্যোতিঃ না কমিয়া যেন আরও বাড়িতে লাগিল। যেন বাল্যচক্ষু পাইলে। বাস্তবিক এ সময়ে তোমার চেহারা ও স্বভাব এত শিশুর মত হইয়াছিল যে, তোমার মেয়ে দু'টিকে দেখিয়া লোকে মনে করিত না যে তাহারা তোমার কন্যা। কেহ কেহ তোমার স্বামীর পূর্ব্বপক্ষের কন্যা বলিয়া সন্দেহ করিত।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্ণৌ কলেজে শেষ এক মাস

ক্রমে পত্রসাধন শেষ করিবার দিন আসিল। ২০শে অক্টোবর আমি তোমাকে প্রথম পত্র লিখিলাম। এক মাস ধরিয়া ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইয়াছিল, পাছে ব্রত ভঙ্গ হয়, পাছে পত্র নিজ ইচ্ছায় লিখিয়া ফেল। ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িয়া থাকিলে লাভ ভিন্ন লোকসান হয় না। আচার্য্য দুঃখ করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্ম লইয়া সকলেই বলে লোকসান, কিন্তু এত ত্যাগ করিয়াও তুমি বলিলে লাভ।

২১শে অক্টোবর বিকালে কুঠিতে গিয়া দেখিলে, টেবিলের উপর আমার লিখিত পত্র রহিয়াছে। কিন্তু এখন যে আপনাকে জয় করিয়াছ, তাই আর ব্যস্ত হইলে না। পূর্ব্বজীবন এবং এখনকার জীবন কত ভিন্ন। প্রবোধ একদিন আমার লিখিত পত্র তোমাকে দিতে বিলম্ব করিয়াছিল, সে জন্য সে বেচারা কতই লজ্জিত হইয়াছিল, আর তুমিই বা কত মর্ম্মাহত হইয়াছিলে। প্রবোধচন্দ্র নিজে ডাকঘরে গিয়া তোমার পত্র তোমাকে আনিয়া দিলে তুমি তৃপ্ত হইতে। তারপর মতিহারীতে পাছে পত্রের বিলম্ব হয় তাই ভ্রাতৃজামাতা রামচন্দ্র নিজে তোমার পত্র লইয়া যাইতেন। পত্র পাইতে বিলম্ব হইত বলিয়া আমাকে পোষ্ট মাষ্টারের নামে অভিযোগ করিতে বলিয়াছিলে। এখন যেখানকার পত্র সেইখানেই রহিল, চাহিলে না। মনে মনে বলিলে, পত্র পাইবার হয় তো অবশ্যই পাইব। শুধু হাতে আপনার স্থানে চলিয়া গেলে। কিছু পরে একটি মেয়ে তোমার পত্র তোমাকে অর্পণ করিল। এইরূপে তুমি ধৈর্য্য শিক্ষা করিতে লাগিলে। এই যে জয়লাভ হইল, ইহাতে তোমার আনন্দ ধরিল না। তুমি লিখিলে, "পত্র ভালবাসিতাম বলিয়া কত লোকের গঞ্জনা খাইয়াও নিত্য পত্র লিখিতে, কখনও তুমিও ভোল নাই, আমিও ভুলি নাই। যখন বাটীতে থাকিতাম, তখন পূর্ণ অধীন ছিলাম। দিনে সময় পাইতাম না, কারণ দাসদাসীর, পাচকের, গৃহিণীর সমস্ত কাজই নিজে করিতে হইত, তারপর সন্তান পালন। সুতরাং রাত্রিতে নিদ্রার সময় হইতে কিছু কাটিয়া তোমাকে পত্র লিখিতে হইত। কত দিন তৈল পাইতাম না, যদি সকলের শয়নের পর কেহ দেখিতেন প্রদীপ জ্বলিতেছে, বড় বকিতেন,—এত তৈল কোথা হইতে আসিবে? অমনি প্রদীপ নির্ব্বাণ হইত। অন্ধকারে কালি, কলম আর খুঁজিয়া পাইতাম না। অন্ধকারে বল দেখি কিরূপে পত্র লিখিতাম? ঝাঁটার কাটি আমার কলম, পুঁই শাকের বীচির রস আমার কালি, চন্দ্র আমার আলো হইত, এই উপায়ে আমার পত্র প্রস্তুত হইত।"

এক দিকে মায়ের যেমন আদর, আবার অপরাধ হইলে একটুতে মুখ ভারি হয়। ২৩শে অক্টোবর একটু বিলম্বে উঠিয়াছিলে। কেন তাহা হইল? এ অপরাধ আর তাঁহার সহ্য হইল না। সমস্ত দিন মুখ ভারি করিয়া থাকিলেন। এত শাসনে তবে মানুষ উদ্ধার হয়।

২৪শে অক্টোবর আর একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল। একটি বাঙ্গালী মেয়ে বেশী দামের কাপড় চাহিয়াছিলেন। কর্ত্রী মিস্ থোবর্ণ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এইরূপ শীতের সময় তোমরা সাদা কি মেরুণা ব্যবহার কর? তুমি বলিলে সাদা। কর্ত্রী সেই ছাত্রীকে বলিলেন, "ইহার অপেক্ষা তুমি ধনী নও, বেশী মূল্যের কাপড় পাইবে না।" সে ছাত্রী অসন্তুষ্ট হইয়া অতিরঞ্জিত কথায় মাতাকে পত্র লিখিলেন। লেখা পত্র তোমার হস্তে অর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন। মেয়েদের বাঙ্গালা পত্রগুলি কর্ত্রী তোমাকে পড়িতে দিতেন, তুমি মত দিলে তবে ডাকে দেওয়া হইত। মন্দ বলিলে ফেরত যাইত। এ ব্যবহারে তোমার বিশেষ শিক্ষা হইয়াছিল। বিশ্বাস করিলে কিরূপ বিশ্বাসভাজন হইতে হয়, সে শিক্ষা বেশ লাভ করিয়াছিলে। তোমাকে এত বিশ্বাস করেন বলিয়া নিজের কিম্বা নিজ কন্যাদের কোন ভুল হইলে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া তাহা স্বীকার করিতে। ঐ দিন ঐ ছাত্রীর পত্র ও তোমার নিজের পত্র লইয়া কুঠিতে গেলে, কর্ত্রী নিজস্থানে ছিলেন না বলিয়া ঐ ছাত্রীর পত্র দেখান হইল না। একে একে তিন বার গেলে কিন্তু সাক্ষাৎ হইল না। টেবিলে পত্র রাখিয়া চলিয়া গেলে। পত্রবাহক কিছু জানিত না, সে অন্যান্য পত্রের সহিত সে পত্রও ডাকে দিয়া আসিল। যদি প্রথম শিক্ষয়িত্রীকে পত্রখানি দেখাইতে, ভাল হইত। একখানি আপত্তিজনক পত্র তোমার অসাবধানতার জন্য ডাকে চলিয়া গেল, ইহাতে তোমার মনে অত্যন্ত লজ্জা ও অনুতাপ উপস্থিত হইল। তুমি সন্ধ্যার সময় কুঠিতে গিয়া যেমন দেখিলে টেবিলে পত্র নাই, অমনি মন বলিয়া উঠিল, করিলে কি? যিনি তোমাকে এত বিশ্বাস করেন তাঁহার বিশ্বাস ভঙ্গ করিলে? বিবেক তোমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। বলিল, কর্ত্রীর নিকট গিয়া সব খুলিয়া বল ও ক্ষমা চাও। সেই যে মতিহারীতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলে, তাই এখন সহজ হইল। কর্ত্রীর দেখা পাইলে না, সুতরাং মনেও শান্তি পাইলে না। পাঠ করিতে বসিলে পাঠ অভ্যাস করিতে পারিলে না! চতুর্থবার ৭টার সময় কুঠিতে গিয়া কর্ত্রীর সাক্ষাৎ পাইলে। তিনি লিখিতেছিলেন; লেখা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে?

তুমি—আজ আমি একটি ভারি অপরাধ করিয়াছি; আপনি মাপ করিবেন ?

কর্ত্রী—(হাসিতে হাসিতে) শীঘ্র শুনিতে ইচ্ছা করিতেছে। এমন কি অপরাধ করিতে পার? (পরিহাসচ্ছলে) কিছু চুরি করিয়াছ নাকি ?

তুমি—চুরি তো ভাল, কারণ সে বাহিরের অপরাধ।

কর্ত্রী—(তোমাকে আরও নিকটে টানিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া) বল।

তুমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিলে। কর্ত্রী খুব হাসিলেন, ও বলিলেন, এই ? ইহার জন্য এত !

তুমি—আমি বিশ্বাস করি, এ অপরাধ আমার আর কখন দেখিতে পাইবেন না। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।

কর্ত্রী তোমার মুখে হাত দিয়া বলিলেন, তোমার ক্ষমা চাহিবার পূর্ব্বেই তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি। এ কিছুই নয়; বহুমূল্য বেশভূষা, বিলাস, যাহাতে বিদ্যালয় হইতে চলিয়া যায়, এ তাহারই চেষ্টা।

তুমি এই ঘটনায় বুঝিলে দোষ করিয়া যদি স্বীকার করিতে পারে, তবে সে দোষের ক্ষমা হয়, আর সে দোষ ভবিষ্যতে না করিবার জন্য মনে চেষ্টাও হয়। মা বিদেশে লইয়া গিয়া অনেক শিখাইলেন।

২৩শে অক্টোবর মিস্ খোবর্ণের নিকট পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করিলে। তিনি হাসিয়া স্বীকার করিলেন। তুমি বলিলে, "কিন্তু, ক্লাসে পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দিতে হইবে।" তিনি বলিলেন, "খুব ভাল কথা, অবশ্যই দিব।" তারপর তাঁহার সঙ্গে স্কুল সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। তিনি অনেক সময় তোমার পরামর্শ লইয়া চলিতেন।

২৪শে অক্টোবর তারিখে তোমার একজন মেম-বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি আদর করিয়া তোমাকে এক বাক্স আঙ্গুর খাইতে দিলেন। তুমি খাইতে চহিলে না; কারণ তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোনও ভাল জিনিস সম্ভোগ করিতে না। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে একটা আঙ্গুর উঠাইয়া লইলে, এবং আঙ্গুরটির দিকে লক্ষ্য করিয়া মায়ের করুণা বর্ণনা করিতে লাগিলে। মেম বলিলেন, "কেবল দেখিবে ?" তুমি একটু হাসিলে, কিন্তু খাইলে না। মেমের মনে কি হইল কি জানি; তিনি সন্ধ্যার সময় সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। তুমি স্বীকার করিলে। পাঠ ও আহারের পর ঘর অন্ধকার হইয়া আসিল। তুমি তোমার প্রিয় আত্মার সঙ্গে যোগসাধন করিতে চেষ্টা করিতেছিলে, এমন সময় সেই মেমটি হাজির। তিনি তোমার হাত নিজ হাতে চাপিয়া ধরিলেন, এবং বলিলেন, "বল আমাকে আর ভুলিবে না। যখন কলিকাতায় যাইবে আমার সঙ্গে দেখা করিবে, আমার জন্য প্রার্থনা করিবে।" তুমি বলিলে, চেষ্টা করিবে। তিনিও তোমার জন্য প্রার্থনা করিবেন বলিলেন। তিনি তাঁহার এক বন্ধুর নিকট তোমার কথা শুনিয়া তোমাকে ভালবাসিয়াছিলেন; তুমি যে ঈশ্বরকে পাইয়াছ, তাহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পরম পিতাকে তুমিও চাও, এই কারণে তোমার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ।

তুমি লক্ষ্ণৌ কলেজে থাকিতে তোমার দুই কন্যা ব্যতীত আর একটি কন্যার ভার লইয়াছিলে। তাঁহার পিতা লক্ষ্ণৌ সহরেই সঙ্গে কে যাইবে ? মিস্ খোবর্ণের সাধারণ আদেশ ছিল যে, মিসেস্ রায় যত দিন যেখানে ইচ্ছা করেন থাকিতে পারিবেন। এমন অনুমতি সত্ত্বেও সেই কন্যার বাটীতে গিয়া রাত্রিবাস করিতে পারিলে না। কারণ দিনকয়েক পূর্ব্বে কথায় কথায় মিস খোবর্ণকে বলিয়াছিলে যে, নভেম্বর মাসের পূর্ব্বে তুমি কোথাও গিয়া থাকিবে না। তিনি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি তো ভোল নাই। অনেক দিন পরে বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, একত্রে সদালাপ হইবে, বাহিরে থাকিবার জন্য তোমার মন ব্যস্ত। তাই মিস্ খোবর্ণকে পূর্ব্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সে সঙ্কল্প হইতে অব্যাহতি পাইতে চাহিলে। কিন্তু মিস্ খোবর্ণ কুঠিতে নাই। শীঘ্র ফিরিয়া আসিবারও সম্ভাবনা ছিল না; ৮টার সময় গোপাল বাবুর বাটীতে গেলে, কন্যাকে তাঁহার মায়ের হাতে অর্পণ করিলে, এবং জানাইলে যে, রাত্রিতেই তুমি ফিরিয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া আবাল-বৃদ্ধ সকলেই বলিয়া উঠিলেন, তাহা কখনই হইবে না। তুমি মেমের নিকটে তোমার সত্যের কথা বলিয়া বলিলে, যে তোমার সত্যরক্ষার ভার তোমার ভাই বোনের হাতে। ইহাতেই সকলে পরাস্ত হইয়া গেলেন, গাড়ী করিয়া তোমায় পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার পর একদিন তোমার ভবিষ্যৎ কার্য্যক্ষেত্র বিষয়ে ঐ কন্যার পিতা যদু বাবুর সঙ্গে এইরূপ আলাপ হয়।

যদু বাবু—আপনারা নাকি বাঁকিপুরে স্কুল করিতেছেন ?

তুমি—ইচ্ছা তো আছে, তবে জানি না।

যদু বাবু—টাকা কোথায় ?

তুমি—তাহা জানি না। তবে বিশ্বাস করি যদি সত্য মার কাজ কেহ করে, তাহার টাকার অভাব হইবে না। অনেকে দিতে পারেন। টাকার জন্য কিছু ভাবি না; আসিবে। কোনও দিন কোনও ভাল কাজ টাকার জন্য বন্ধ থাকে না।

যদু বাবু—এ ভার লইবার লোক কোথায় ?

তুমি—জানি না, অবশ্যই লোক আসিবে। আর স্বয়ং মা-ই লোক। শ্রদ্ধেয় অ—বাবু এ বিষয়ে খুব উৎসাহী, তিনি কিছু করিতে পারেন।

যদু বাবু খুসী হইয়া বলিলেন, তিনি বেশ লোক। কত টাকা খরচ হইবে মনে করেন ?

তুমি—জানি না, কিছুই ঠিক নাই। মনের ইচ্ছা যে একটা স্কুল হয়। তাই মনে হয় মাসিক এক শত টাকার কমে চলিবে না।

যদু বাবু—মেয়েদের নিকট কত ক'রে লওয়া যাইবে ?

তুমি—এ সকল কথা কিছু স্থির হয় নাই। তবে মনে হয় গরিবেরা কম দিবেন। ধনীরা সেই স্থান পূর্ণ করিয়া একটু বেশী দিতে ইচ্ছা করিলে দিবেন।

যদু বাবু—মেয়ে কোথায় পাইবেন ?

তুমি—কিছুই জানি না।

যদু বাবু—এ বিষয়ে আপনাদের সহানুভূতি করিবার কেহ আছেন ?

তুমি—ভগবান, আর এ পৃথিবীতে শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু।

যদু বাবু—এ বড় কাজ, হাতে লইলে লোকের গালি খাইতে

দেখুন! মাত্র অর্দ্ধেক সানলাইট সাবানেই

সানলাইটের ফেণার আধিক্যই এর কারণ !

ফেণার আধিক্যের দরুণই সানলাইট সাবান এত ক্রিয়াশীল। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে মাত্র **অর্দ্ধেকটী সানলাইটে** কতগুলি জামাকাপড় কাচা যায়!

সানলাইটের এই অতিরিক্ত ফেণার দরুণই প্রতিটী ময়লার কণা দূর হয়ে যায়—জামাকাপড় হয়ে ওঠে আশ্চর্য্যরকম সাদা এবং উজ্জ্বল !

সানলাইটের ফেণার আধিক্যের দরুণই জামাকাপড় বিনা আছাড়ে পরিষ্কার হয়। তার মানে আপনার জামাকাপড় টেঁকে আরও অনেক বেশী দিন।

ভারতে প্রস্তুত

সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

তুমি—তা জানি। কোন কাজ কোন দিন কে বিনা গাল খাইয়া করিতে পারিয়াছেন, যে সে আশা আমরা করিব ?

যদু বাবু—(খুশী হইয়া) তবে আমি কিছু বলি। (১) ঈশ্বর ছাড়া আর কাহারও উপর নির্ভর করিবেন না। (২) বিলাস একেবারে থাকিবে না। (৩) আপনারা দুইটিতে একেবারে সেই জন্ম প্রাণ দিবেন। পৃথিবীর গালি ও নিন্দাতে ভয় করিবেন না।

তুমি—ইচ্ছা তো তাই।

যদু বাবু—এইরূপ করিলে আপনাদিগকে কন্যা দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

আর এক দিন গোপাল বাবুর বাটীতে তোমার নিমন্ত্রণ হইল। সে দিন আবার যে কথাবার্ত্তা হইল তাহার সার অংশ এই।

তুমি—কিসে মেয়েরা সত্য খাঁটী উপাসনা শিখিতে পারেন, কিসে পরলোকের বিষয় জানিতে পারেন, পুরুষেরা এই সকল বিষয় মেয়েদের ভাল করিয়া শিখাইয়া দেন। মেয়েদের মন অতি দুর্ব্বল, জ্ঞান অতি কম। বিশেষ যত্ন না করিলে মেয়েরা এ ধন লাভ করিতে পারিবেন না। আর তাই যদি না পারেন কি শোচনীয় অবস্থা দেখুন দেখি ? অনেক সময় পুরুষেরা মেয়েদের সামান্য কিছু সাহায্য করিয়াই বলিয়া দেন, 'যাহা বলিলাম তাহাই এখন হজম কর।' দুর্ব্বলা নারী হয়তো এমনই হজম করিয়া ফেলিলেন যে, আর তাহার চিহ্নই পাওয়া গেল না। হতাশ হইয়া কেহ কেহ বলেন, 'মেয়েদের কিছুই হইবে না।' একবার কোনও বিষয় না বুঝিতে পারিলেই বলেন, 'আর কি করিব ?' মা জননী যদি পুরুষদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতেন, কি হইত ?

যদু বাবু—পুরুষেরাই এখনও কিছু পান নাই, নারীকে কি দিবেন ?

তুমি—যাহা পাইয়াছেন তাই দিন। এখনকার মত তাহাই অনেক হইবে। আবার দিতে দিতে যে বাড়ে।

যদু বাবু—যাঁহারা দিতে আসিয়াছেন (অর্থাৎ প্রচারকেরা) তাঁহারাই দিন।

তুমি—তাঁহারা দিন, কিন্তু আমার মনে হয় আপন স্বামী, ভাই, বাপ যদি দেন, তাহাতে বেশী ফল হইবে।

এই কথায় যদু বাবুর স্ত্রী বড় সুখী হইলেন। সকলেই অতি মিষ্ট ও শান্ত ভাবে কথা বলিতেছিলেন।

রাত্রি ৯॥টা পর্য্যন্ত এইরূপ কথা-বার্ত্তার পর সে বাড়ীর পুরুষেরা আহার করিলেন। পরে ১০॥টার সময় মেয়েরা আহার করিতে বসিলেন। অধিক রাত্রি হইয়াছে বলিয়া ছোট মেয়েরা খুব খুসী ; ভাবিল যে তোমাদের সে রাত্রিতে আর ফিরিয়া যাওয়া হইবে না। কিন্তু তাহারা তোমাকে চেনে নাই ; সকল মেয়েরা আহার করিতেই রহিলেন, তুমি ও তোমার দুই মেয়ে অভদ্রের মত পাতা গুটাইয়া উঠিয়া পড়িলে ও ক্ষমা চাহিলে। ভুবন বাবুর গাড়ীতে রাত্রি ১১টার সময় কলেজে চলিয়া গেলে।

৩১শে অক্টোবর তোমার ভাই জ্ঞান তোমার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। অনেক দিনের পর তাঁহাকে দেখিতে পাইবে বলিয়া মাকে ধন্যবাদ দিলে। বড় ভাল লাগিল। ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল। তারপর জ্ঞান বিশেষ অনুরোধ মাসীর সহিত সাক্ষাৎ কর। ছুটীর পরে যাইতে স্বীকার করিলে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মন উঠিল না। ইতস্তত করিতে দেখিয়া জ্ঞান বলিলেন 'বিবেচনা করিয়া বলিও'। তুমি রক্ষা পাইলে। একদিকে ভাইয়ের অনুরোধ, আর একদিকে কর্ত্তব্যের অনুরোধ। শেষটাই জয়লাভ করিল। কথাবার্ত্তার সময় জ্ঞানের মুখে শুনিলে,— বাবু বলিয়াছেন, 'তোমার দিদি একজন ভক্ত'। তুমি শুনিয়া লজ্জিত হইলে। ভাবিলে, দিন রাত্রি যে জীবনের সঙ্গে লড়াই করে, সে আবার ভক্ত, এ কি কথা !

পরের দিন ভাই জ্ঞান যখন একেবারে গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে আর ফিরাইতে পারিলে না। তোমাকে যাইতে হইল, মেয়েরাও সঙ্গে গেলেন। প্রথমে বৃদ্ধা মাসীমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে, তারপর জ্ঞানের শ্বশুরবাটী গেলে। এ বিষয়ে পরে লিখিয়াছ, "সেখানেও ১॥ ঘণ্টা ছিলাম। অনেক দিন হিন্দু-পরিবার দেখি নাই। সকলই নূতন বোধ হইল। যেমন ঈশ্বরের নিকটে আমরা অজ্ঞান, তেমনি এ সকল পরিবার অজ্ঞান বোধ হইতে লাগিল। মাসীর সহিত ও তাঁহার পুত্রবধূর সহিত ধর্ম্মবিষয়ক অনেক গল্প হইল। বধূ বাল্যকালে আমায় খুব ভালবাসিতেন। এখনও সেই স্নেহ ভোলেন নাই। পরে ৫টার সময় জ্ঞান আমাদের সমাজবাড়ী পৌঁছিয়া দিলেন। সেইখানে বসিয়া নানা কথা হইল। বিশেষ কথা দাদার ছেলেদের পড়ার বিষয়। একটু পরে সব লোক সমাজে আসিয়া পড়িলেন,—জ্ঞানও বাটী চলিয়া গেলেন, আমার একটু মনটা কেমন করিতে লাগিল। আমার ভাই সমাজে বসিলেন না ! মনে মনে তার জন্য মার নিকট বলিলাম।"

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন গোপালবাবুর স্ত্রী অনেক ভাল খাবার, ফল, চন্দন বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে তো ভাই নাই, সকলেই ভগিনী। তাই ভগিনী-দ্বিতীয়াই হইল। তুমি সকলকে ভাগ করিয়া দিলে, কর্ত্রী মেমকেও দিয়া আসিলে ; কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষটি (করুণার মাতা যেমন প্রস্তুত করিতেন সেইরূপ চন্দ্রপুলি) খাইলে না। ঐ খাবারটি আমি ভালবাসি বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া খাইতে ইচ্ছা হইল না। আমের সময় আম খাইলে না, ভগিনী-দ্বিতীয়ার চন্দ্রপুলিও ত্যাগ করিলে। তোমার বড়ই ভয় হইত, পাছে ব্রত ভঙ্গ হয়। "সর্ব্বদা সতর্ক থাকিলে পতন হইতে বাঁচা যায়" এই শিক্ষা লাভ করিলে।

আর একদিন প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে মেয়েদের হাসপাতাল দেখিতে গিয়াছিলে। তিনি গাড়ী ভাড়ার অংশ দিতে চাহিলেন ; তুমি লইলে না কেন ? অভ্যাস নাই বলিয়া। তিনিও বুঝিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় মিস্ ডাক্তার ছাতা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও লইলে না কেন ? এটাও অভ্যাসের জন্য। সে দিন রবিবার ছিল। পথে ভগিনী মহালক্ষ্মীকে (বিহারী বাবুর স্ত্রী) দেখিতে গেলে। তিনি তখনও রোগে জীর্ণ শীর্ণ। তাঁহার ইচ্ছা তুমি আর কিছুক্ষণ থাক, তুমি বলিলে, সমাজে যাইতে হইবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে দিন কি রবিবার ? হাঁ, এই উত্তর পাইয়া তিনি চুপ করিলেন। সমাজে গিয়া তোমার মনে আক্ষেপ হইতে লাগিল, সমাজে না গিয়া যদি ভগিনীর পার্শ্বে বসিয়া উপাসনা করিতে, খুব

১২ই নভেম্বর লিখিতেছ, "এই মাত্র স্কুল হইতে আসিলাম, সকাল হইতে বুকের ভিতর কেমন করিতেছে জানি না। মেমকে বলিলাম, তিনি একটি ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। পরে তোমার পত্রপাঠ করিয়া বুঝিলাম, কেন মন অমন করিতেছে। আজ হয়তো তোমার বেদনাটা বাড়িয়াছে কিম্বা ফোড়াটা কাটাইয়াছ ও আমার কথা মনে করিতেছ। পত্র পাইবার অনেক আগে হইতে বুক কেমন করিতেছিল। না বলিলে কি হইবে, মা-ই বলিয়া দেন।"

একদিন ডাকের পত্র দিয়া চলিয়া আসিতেছ, এমন সময় মিস্ থোবর্ণ বলিলেন—মিসেস্ রায়, একটু অপেক্ষা কর। (জনৈক ছাত্রীর প্রতি)—তুমি এখন যাও, মিসেস রায়ের সঙ্গে অনেক দিনের পর আলাপ করিব। মিসেস্ রায়, স্কুল সম্বন্ধে কি বল? বোর্ডিং কিরূপ চলিতেছে? তুমি যে আমার বন্ধু।

তুমি—(অনেক ভাল মন্দ যাহা জানিতে বলিলে; শেষে—) যদি আমি কোন কথা ভুল বলিয়া থাকি মাপ করিবেন।

মিস থোবর্ণ—(তোমার গলা জড়াইয়া নিজ বক্ষে চাপিয়া) আমাদের মধ্যে কখনও অমিলনের কথা হইবে না, মাপ চাহিবার পূর্ব্বেই সকল মাপ হইয়া আছে।

সন্ধ্যার সময় মিস থোবর্ণ তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, একটি মেয়ে পীড়িত; সুসার কি তাহার নিকটে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত থাকিতে পারিবেন? আর একটি মেয়েকে সঙ্গে দিব। তুমি বলিলে, সুসারকে জিজ্ঞাসা করি। এ কথা বলিয়াই মনে অতিশয় লজ্জা উপস্থিত হইল। ভাবিলে কোথায় আমি নিজে হইতে সেবার ভার লইবার প্রস্তাব করিব, তাহা না করিয়া এ কথা কেন বলিলাম? প্রকাশ করিয়া বলিলে—হয় সুসার থাকিবেন, নয় আমি থাকিব।

মিস থোবর্ণ—(আপনার বুকে চাপিয়া ধরিয়া) তুমি বড় রোগা হইয়া গিয়াছ। আমি তোমাকে এ কাজ দিব না। অন্য বন্দোবস্ত করিব। কিছুতেই শুনিলেন না, অন্য মেয়ের বন্দোবস্ত হইল।

তুমি কিন্তু নিজের ঘরে গেলে না, রোগীর গৃহে গিয়া সেবা করিতে লাগিলে।

মিস্ থোবর্ণ একটু পরে আসিয়া বলিলেন, শয়ন করিতে যাও। বড় রোগা হইয়া গিয়াছ, অসুখ করিবে। (যাইবার সময় তোমাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন।)

তুমি—না, আমি এখানেই থাকিব।

মিস্ থোবর্ণ—অন্য দিন থাকিবে, একটু ভাল হও।

তুমি—না, আজ আমিই থাকিব। (তোমার মনে তখনও অনুতাপের অনল জ্বলিতেছিল।)

মিস্ থোবর্ণ তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিলেন এবং বলিলেন, 'হুকুম মানো'।

তুমি—যে আজ্ঞা (ঘরে গেলে।)

যে তুমি অসাবধান হইয়া পূর্ব্বে কত অপরাধ করিতে, তাহার আজ এই দশা! এই সামান্য অপরাধে কত আত্মগ্লানি, কত অনুতাপ সহিতে হইল। পত্রে তোমার এই অপরাধের কথা ভাই বোনের কাছে প্রচার করিতে বলিয়াছ। আরও অনুরোধ করিয়াছ, "যদিও মার নামে একজন অজ্ঞান বঙ্গনারী, আজ একজন জ্ঞানধর্ম্মে ভূষিতা মহানারীর বন্ধু হইয়া প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। এই কি পৃথিবীর কৌশলে হইতে পারে? না। সেই জননীর কৌশলে। মাকে প্রাণের প্রাণ করিতে পারিলে আর কিছুই অভাব থাকে না। এ তো আমার গৌরব নয়, মার আর তোমার।"

এক দিন গোপাল বাবু তোমাকে, তোমার কন্যাদ্বয়কে ও বোর্ডিংএর আর দুটি কন্যাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার পত্রখানি মিস থোবর্ণের কাছে পাঠাইয়া দিলে। অল্পক্ষণ মধ্যেই মিস থোবর্ণ তোমার ঘরে আসিয়া তোমাকে একান্তে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্য মেয়ে দু'টিকে পাঠান বিষয়ে তোমার পরামর্শ কি?"

তুমি—আমার মেয়ে হইলে যাইতে দিতাম। কিন্তু এ দু'টি মেয়ে খৃষ্টান, ইহাদের সম্বন্ধে আমি কোন উত্তর দিতে পারি না।

মিস থোবর্ণ—তুমি যাইবে?

তুমি—না।

মিস থোবর্ণ—তুমি গেলে উহাদের যাইতে দিতাম, কিন্তু একা যাইতে দিব না। এ মাসের শেষ শনিবারে যখন তুমি যাইবে তখন তোমার সঙ্গে উহারাও যাইবে।

মেয়েরা বলিল, "মিস থোবর্ণ তোমার সকল কথাই শোনেন।" তুমি বলিলে, "আমি কি করিব?

আর একদিন তুমি দৈনিক লিখিতেছিলে, 'একটি এফ্ এ ক্লাসের মেয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি?" তুমি বলিলে "ডায়েরী।" বিদ্যাবতী মেয়ে ডায়েরী কি তা জানেন না, কেমন করিয়াই বা জানিবেন? অল্প লোকেই দৈনিক বৃত্তান্ত লিখিতে অভ্যাস করেন এবং উহাতে কি ফল হয় তাহা জানেন না। তোমার দেখাদেখি সেই মেয়েটিও তাঁহার মানের খাতায় ডায়েরী লিখিতে উদ্যত হইলেন। অবশেষে সে খাতাখানিকে এ অত্যাচার হইতে বাঁচাইবার জন্য ভিন্ন কাগজ আনান হইল ও সেই দিনই তাঁহার ডায়েরী লেখা আরম্ভ হইল।

তোমার লক্ষ্ণৌ ত্যাগের সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ভবিষ্যৎ কার্য্যের বিষয়ে ততই তোমার মনে চিন্তা আসিতে লাগিল। একদিন দৈনিকে লিখিলে—"এই তো কার্য্যের বুনিয়াদ পড়িল। কত কাজ যে করিতে হইবে বলিতে পারি না। কেমন করিয়া হইবে, তাহাও জানি না, কিন্তু করিতেই হইবে। একটি উপাসনা-গৃহ, একটি মেয়েদের স্কুল, একটি পীড়িতাশ্রম, একটি ছাত্রাশ্রম স্থাপন করিতে হইবে। স্কুলটি তো অতি শীঘ্র করিতে হইবে। খরচ আপাতত মাসে প্রায় ১০০ টাকা করিয়া লাগিবে। একটি বড় বাটীর প্রয়োজন। ৩০।৩৫ টাকা হইলে—বাবুর কন্যা, যিনি এণ্ট্রান্স পাস করিয়াছেন, আসিতে পারেন। এখন বুঝিতেছি, জ্ঞানের কত প্রয়োজন। কত মেয়ে এই জ্ঞানের অভাবে ব্রাহ্ম-সমাজে জড়ের মত আহার-নিদ্রায় দিন কাটাইতেছেন। টাকার জন্য আমরা কোন দিন ভাবি নাই, ভাবিও না। যদি সত্য মায়ের কাজ অঘোর-প্রকাশ করিতে পারে, নিশ্চয় কোন অভাব থাকিবে না।"

[ক্রমশঃ।

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৮

সীতারাম সত্যিই ছাড়া পেলে।

একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো সীতারামের বাড়ীর দরজায়। সেদিন তখন সবে সন্ধ্যা নেমেছে।

ট্যাক্সি থেকে প্রথমে নামলো বুড়োশিব। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সীতারামকে বললে, নামো।

সীতারাম নামতেই বুড়োশিব বললে, দোরটা খোলা থাকলে ভাল হতো।

—কেন?

—তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ ছিল, চুপি চুপি সেরে নিতাম।

সীতারাম বললে, এতটা রাস্তা এলাম, পরামর্শ করবার সময় পেলে না তুমি? তা বেশ তো, এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেরে নাও!

বুড়োশিব বললে, না। তোমাকে দেখবার জন্তে লোক জড়ো হয়ে যাবে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে কি করবে ভাবছে, এমন সময় বাইরের ঘরের বন্ধ দরজার পেছনে খুট্ করে আওয়াজ হ'লো। মনে হ'লো খিলটা কে যেন খুললে।

দোর খুলে চাকরটা বেরিয়ে এলো। সীতারাম এগিয়ে গিয়ে বললে, এসো। দু'জনে বাইরের ঘরে ঢুকলো। আলো নেই। অন্ধকার।

চাকর বোধ করি আলো আনতে যাচ্ছিল, বুড়োশিব ডাকলে, শোন্।

চাকরটা থমকে থামলো।

বুড়োশিব জিজ্ঞাসা করলে, আমরা এসেছি—মা কি দিদিমণি কেউ জানে?

চাকর ঘাড় নেড়ে বললে, না বাবু! আমি দেখতে পেলাম। আমার কাছে চাবি ছিল—খুলে দিলাম। লণ্ঠন আনি।

বুড়োশিব বারণ করলে। বললে, না। আলো আনতে হবে না। আমরা যে এসেছি সে কথা জানাসনি কাউকে। ওইখানে গিয়ে কোথাও চুপটি করে বোস্। দরকার হ'লে ডাকবো।

এই বলে চাকরটাকে বিদায় করে দিয়ে বুড়োশিব সীতারামের কাছে এসে বসলো। বললে, শোনো। যে কথা তোমাকে এখনও জানাইনি—

—কি এমন কথা হে?

বুড়োশিব বললে, রঞ্জন মরেনি।

সীতারাম বললে, এ কথা তো তুমি প্রথম দিন থেকেই বলছো। কে বিশ্বাস করবে তোমার কথা?

বুড়োশিব বললে, সবাই করবে। আমি প্রমাণ করে দেবো।

সীতারাম জিজ্ঞাসা করলে, তাহলে যে লাশটা পাওয়া গেল সেটা কার?

—তা জানি না।

সীতারাম বললে, সেইজন্যেই বুঝি আজ আমাকে ছেড়ে দিলে?

বুড়োশিব বললে, না। তোমার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পেলে না বলে ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'লো। দেবুর একটা হিন্দুস্থানী দরোয়ান আর ওর কলিয়ারীর জন দুই-তিন সি-পি কুলিকে বোধ হয় শিখিয়ে-পড়িয়ে ঠিক করেছিল তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়াবে বলে।

সীতারাম জিজ্ঞাসা করলে, কি বলতো তারা?

বুড়োশিব বললে, বলতো তোমাকে তারা কোদাল আর লণ্ঠন নিয়ে জনকতক লোকের সঙ্গে মুখুজ্যে-পুকুর থেকে আসতে দেখেছে একদিন শেষ-রাত্রে।

এত দুঃখেও সীতারামের মুখে হাসি ফুটলো। বললে, তার পর? কি হ'লো? তারা বললে না কেন?

বুড়োশিব বললে, ভরসা হলো না বোধ হয়। শুনলাম নাকি কথাগুলো কিছুতেই তারা মুখস্থ করতে পারলে না। একবার হয়ত' বেশ গড় গড় করে বলে গেল, কিন্তু আর একবার যেই জিজ্ঞাসা করা, আর বাস, সব গোলমাল করে ফেললে। কেউ বলে, কোদাল নামিয়ে লণ্ঠন দিয়ে মাটি কোপাতে দেখেছে। আবার কেউ বলে—

সীতারাম হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে, বুঝেছি। মিথ্যা কথা, জেরায় টেঁকে না কখনও। যাক্‌গে, এখন তোমার পরামর্শটা কি, তাই শুনি?

বুড়োশিব বললে, আমি যা করবো তার ওপর তুমি কিছু বলবে না বল ?

সীতারাম জিজ্ঞাসা করলে, কি করবে তুমি ?

—যা করবো তা তুমি দেখতেই পাবে।

—তবু বল না শুনি কি করবে।

বুড়োশিব বললে, মালার সঙ্গে রঞ্জনের বিয়ে দেবো ?

—রঞ্জনকে তুমি পাবে কোথায় ?

—পেতেই হবে। না পেলে তো বিয়ে হবে না।

সীতারাম খানিক চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলে, তার পর বললে, তোমরা দিতে চাও দাও, কিন্তু—

বুড়োশিব প্রবল বেগে মাথা নেড়ে তার আপত্তি জানালে। বললে, না না কিন্তু-ফিন্তু নয়। তোমার আবার কিন্তু কিসের ? তোমার কোনও কথা আমি শুনবো না।

সীতারাম বললে, তাহ'লে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কেন ?

বুড়োশিব বললে, তোমার মেয়ে, তাই তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা করলাম।

সীতারাম জিজ্ঞাসা করলে, বিয়ে কি দেবু চাটুজ্যের অমতেই দিয়ে দেবে ভেবেছো ?

বুড়োশিব বললে, হ্যাঁ। সে এখনও জানে না যে তার ছেলে বেঁচে আছে।

—যখন জানবে ?

বুড়োশিব বললে, তখন সে তোমার জামাই।

সীতারাম বললে, বেশ ভাল করে ভেবে ছাখো।

—ভাববার কিছু নেই।

ভালো। বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সীতারাম উঠে দাঁড়ালো। কত দিন সে তার স্ত্রী-কন্যাকে দেখেনি। মন তার চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তাদের দেখবার জন্যে। আই সে আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকলে, মালা!

দু'বার ডাকবার প্রয়োজন হলো না। তৎক্ষণাৎ দোতলা থেকে মালার কণ্ঠস্বর শোনা গেল : বাবা!

আলো হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো মালা। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে রইলো তার মা।

সিঁড়ির মাঝখানে দু'জনের মুখোমুখি দেখা। মালা তার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার ডাকলে, বাবা!

কান্নায় তার কণ্ঠস্বর তখন ভারি হয়ে এসেছে। চোখ দুটো জলে ভরা।

কাঁধে হাত রেখে সীতারাম বললে, চল। মা কেমন আছে ?

কাঞ্চন নিজেই জবাব দিলে। বললে, ভালই আছি। খারাপ কেন থাকবো ? —বাবা! যে ভয় আমার হয়েছিল!

সীতারাম বললে, সে ভয় গেল তো ?

কাঞ্চন বললে, গেছে। অনেক আগেই গেছে। রঞ্জন এসেছে। শুনেছো তো ?
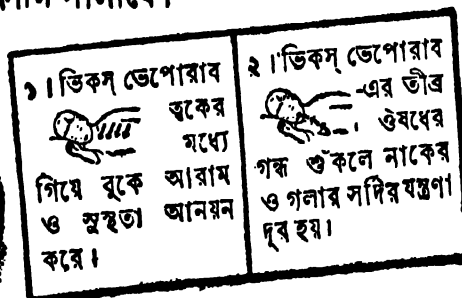
সীতারাম বললে, শুনলাম। বুড়োশিব বললে—এক্ষুণি।

বুড়োশিব ছিল সীতারামের পেছনে। বললে, যা ভেবেছিলাম তা কিন্তু হলো না। ভেবেছিলাম, সীতারামকে চম্‌কে দেবো।

কাঞ্চন বললে, হতভাগা মেয়ে দিয়েছিল সব নষ্ট করে। বলেই সে মালার দিকে একবার তাকালে। বললে, বলবো?

মালা তার মায়ের দিকে একবার তাকিয়েও দেখলে না, একটি কথাও বললে না, লণ্ঠন হাতে নিয়ে যেমন আসছিল, তেমনি আসতে লাগলো।

কাঞ্চন তার নিজের ঘরখানা দেখিয়ে বললে, এই ঘরে এসে বোসো। বলছি।

সীতারাম তার নিজের ঘরখানা দেখিয়ে বললে, কেন, এ-ঘরে কি হলো?

কাঞ্চন বললে, ও-ঘরে রঞ্জন রয়েছে যে!

সীতারাম এতক্ষণ পরে সত্যই বিস্মিত হলো। বললে, রঞ্জন! এখানে?

কথা বললে বুড়োশিব। বললে,—তবে আর বলছি কি! রঞ্জন তার বাপের কাছে না গিয়ে সোজা এখানে চলে এসেছে। দেবু চাটুজ্যে এখনও জানে না যে, তার ছেলে বেঁচে আছে।

এই কথা বলেই বুড়োশিব চলে যাচ্ছিল রঞ্জন যে-ঘরে রয়েছে সেই ঘরের দিকে। কাঞ্চন তাকে যেতে দিলে না। সামনা-সামনি তাকিয়ে কথা সে কোনো দিন বলেনি তার সঙ্গে, সেদিন কিন্তু কোনও বাধা-নিষেধ সে মানলে না। বললে, না না, আপনিও আসুন। মেয়েটা আমাকে কি রকম বিপদে ফেলেছিল শুনে যান।

—বিপদে ফেলেছিল?

বুড়োশিব তাকালে মালার দিকে। বললে, কি রে, কি করেছিলি?

মালা একটি কথাও বললে না। শুধু তার হাতের লণ্ঠনটা একটা টেবিলের ওপর নামিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বুড়োশিব বললে, বলুন এবার। মালা পালাচ্ছে।

কাঞ্চন ডাকলে, মালা!

মালা দোরের কাছ থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, বাবাকে একটু স্থির হ'তে দাও মা! আমি যাচ্ছি খাবার করতে।

কাঞ্চন বললে, তাই যা।

মালা চলে যাবার পর, কাঞ্চন এগিয়ে গেল সীতারামের কাছে। বুড়োশিবের দিকে ইঙ্গিত করে বললে, রঞ্জনকে উনি ধরে আনলেন আমাদের বাড়ীতে। আমি তো অবাক্!

সীতারাম বুড়োশিবের দিকে তাকালে। বললে, কোথায় পেলে ওকে?

বুড়োশিব বললে, আমি যাচ্ছিলাম কলকাতা,—তোমার মামলার জন্যে ভাল একজন ব্যারিষ্টার আনতে। রঞ্জনের সঙ্গে ষ্টেশনের পথে দেখা। ও-ও আসছিল ওর পিসির বাড়ী থেকে। রাজকন্যেকে বিয়ে করবার ভয়ে পালিয়েছিল সেখানে। রঞ্জন জানতো না যে এখানে এত-সব কাণ্ড হয়ে গেছে। আমি ওকে ওর বাবার কাছে যেতে দিলাম না। এক রকম জোর করে নিয়ে এলাম এইখানে। বললাম, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুমি থাকো এইখানে। ছেলেটি বড় ভাল ছেলে—রাজি হয়ে গেল। আমি গেলাম পুরুত ডাকতে। ভাবলাম, মালার সঙ্গে বিয়েটা দিয়ে দিই। তারপর ওর বাবার হাতে ছেলে-বৌ একসঙ্গে তুলে দেবো। হঠাৎ মনে পড়লো—আজ তোমার মামলার দিন। কিন্তু আজ যে তোমাকে ছেড়ে দেবে, তা ভাবিনি। ছেড়ে যদি না দিতো, মালার সঙ্গে ওর বিয়েটা দিয়ে রঞ্জনকে হাজির করে দিতাম আদালতে। তোমাকে ছেড়ে দিতে পথ পেতো না।

কাঞ্চন বললে, বিয়ে আপনি দিতেন কেমন করে? ছেলে রাজি হয়েছে, কিন্তু মেয়ে এদিকে বেঁকে বসেছে।

বুড়োশিব বললে, বেঁকে বসেছে কি রকম?

কাঞ্চন বললে, তবে আর বলছি কি! এদিকে শুনি দু'জনে এত ভাব, এত ভাব, তা রঞ্জন যে এলো বাড়ীতে তো একটি বার গেল না ওর কাছে। আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর জোর করে পাঠালাম। গিয়ে দেখি না—রঞ্জনকে বিদেয় করে দিয়েছে। ভাগ্যিস্ নীচের দোরে তালা বন্ধ করেছিলাম, নইলে এতক্ষণ রঞ্জনকে এখানে দেখতে পেতেন না।

বুড়োশিব জিজ্ঞাসা করলে, মালা কি বলেছিল ওকে?

কাঞ্চন বললে, কি বলেছিল তা মালাই জানে। আমি জিজ্ঞাসা করতে মালা বললে, তোমরা আমার বিয়ের জন্যে ধেই-ধেই করে নাচছো, কিন্তু আমার বাবার কথাটা একবার কেউ ভেবেও দেখছো না। আমার বাবাকে যিনি এত বড় অপমান করলেন, তাঁর বৌ হয়ে তাঁর বাড়ীতে আমি যাব কেমন করে? আমার বাবার মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

কথাটা শুনে বুড়োশিবের মুখখানা সহসা গম্ভীর হয়ে গেল। মনে হলো কি যেন সে ভাবছে। সীতারাম কিন্তু একটি কথাও বললে না। উঠে দাঁড়ালো। বললে, আসছি।

বুড়োশিব একা-একা বসেই বা থাকে কেমন করে? সে-ও উঠলো। বললে, চল, আমিও যাই।

সীতারাম বললে, তুমি বোসো রঞ্জনের কাছে। আমি আসছি।

[ক্রমশঃ।

কিন্তু, হায়, কেন বঙ্গসুতগণ!
এ উৎসব-উৎসে হয়েছ মগন?
প্রকৃত উৎসব যাহা হ'লে হয়,
তোমাদের তাহা হ'য়েছে বিলয়,
এ উৎসব শুধু ছেলেমি কথা।

বলিব না আমি বুঝে লও মনে,
বঞ্চিত তোমরা রয়েছ কি ধনে;
কালে যদি পার সে ধন লভিতে
উৎসব করিও হরষিত চিতে
নাচিয়া কুঁদিয়া কাঁপায়ে ধরা।
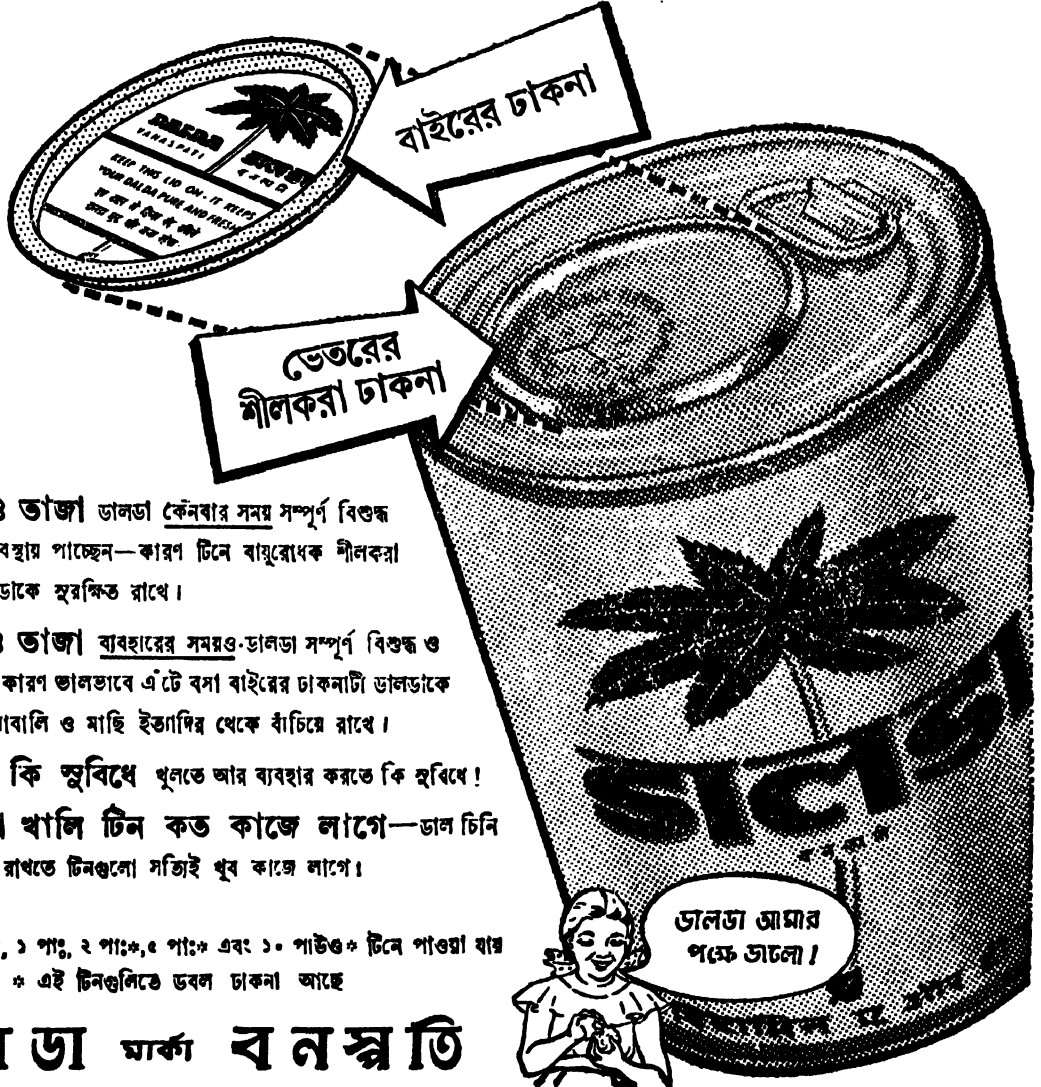
শ্রীমতী আর্ভেরএর দিনপঞ্জী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তরু দত্ত

২৩শে আগষ্ট। আজ সকালে আমি গ্রামের পুরনো বাসিন্দাদের দেখতে বেরিয়েছিলাম। একটি পরিবারকে আমার বড় ভাল লাগে। বুড়ো বাপ আঁদ্রে কোরেন, তাঁর স্ত্রী মিথ্যাল আর ষোল বছরের এক মেয়ে; মেয়েটি খুবই কর্মতৎপর, ধীর ও সুশ্রী। বেচারাদের দিন কাটে দারুণ দারিদ্র্যে। মেয়েটির আপ্রাণ চেষ্টা, রোজ দু'মুঠো অন্ন-সংস্থানের জন্য, কিন্তু একজনের রোজগারে তিনটে পেট চলে না। তা সত্ত্বেও এদের কোন অভিযোগ নেই, কারো কাছে নিজেদের দুঃখের কথা ভাঙে না। এত চাপা ওদের স্বভাব, তবু আমি জানি কী দারুণ ওদের অভাব! সহৃদয়া জমিদার-গিন্নীকে এদের কথা বলব ভাবছি, কারণ তাঁর নাকি একটি পরিচারিকার দরকার।

২৪শে আগষ্ট। আজ সকালে আমার জানালার সামনে বসেছিলাম। দিনটা বেশ উজ্জ্বল; নির্মেঘ পরিষ্কার আকাশ। বসে বসে ভাবছিলাম, আমাদের প্রতি—এই সব পাপী-তাপীদের প্রতি—ভগবানের করুণার কথা। বাগানে ঝরণার দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটা চড়ুই সেই জলে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে। প্রত্যেক বার জল পান করে সে আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইছে, যেন কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে তার সৃষ্টিকর্তাকে, সর্বমঙ্গলময়কে। হে ভগবান! আমার হৃদয়েও যেন অনুভব করতে পারি তোমার মহত্ত্ব, তোমার কৃপা। আজ আমি গ্রেস্তিনদের মাকে দেখে এলাম; গ্রামের মধ্যে তিনিই সব চেয়ে বৃদ্ধা। তারপর গেলাম কোরেনদের বাড়ীতে। জানেৎ দেখলাম মামুলী গোছের একটা সুপ জ্বাল দিচ্ছে; এক খণ্ড মাংস আর একটা ফুলকপি তার মধ্যে ছেড়ে দিলাম,—এগুলি আমার বাস্কেই ছিল। ছাইয়ের তলায় গোটা বারো আলুও ঝলসে দিলাম। গরীব বেচারাদের জন্য এই দিয়েই বেশ ভাল একটা খানা তৈরী হল। ওদের বাবা-মা হাঁ হাঁ করে ছুটে এসেছিলেন আমার কাণ্ড দেখে; কিন্তু আমি বললাম যে এ-বিষয়ে তাঁদের মাথা না ঘামালেও চলবে। আমার সঙ্গে সঙ্গে জানেৎ এল ছোট ওই বেড়াটা অবধি; আমায় ধন্যবাদ জানাতে চায়, কিন্তু একটি চুমুতেই তার মুখ বন্ধ করে দিলাম। তার চোখ দুটি জলে ভরে উঠল; আমারো সেই অবস্থা, বহু চেষ্টায়ও নিজেকে চাপতে পারলাম না।

ছোট্ট একটি গেঁয়ো সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়ী ঢুকছি, এমন সময় বাবার গলা শুনলাম।

"এতক্ষণে ফিরলি খুকি!" হলঘর থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন, "আমি ত ভেবে সারা, কোথাও কিছু ঘটল বুঝি!"

"তুমি কি আমায় খুঁজছিলে বাবা? তোমায় উদ্বিগ্ন করার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি বাবা!"

"আরে, আগে ভেতরে আয়, এই দেখ লুই এসে বসে আছে

তার পর এক তরুণ অফিসারের সাথে বাবা আমায় পরিচয় করিয়ে দিলেন; আগে কখনো দেখিনি একে।

"এই যে লুই, এই আমার মেয়ে, আমার একমাত্র সন্তান!"

অফিসারটি এমন সরল হাসি ও অমায়িক দৃষ্টিতে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন যে তক্ষুণি আমি বড় আশ্বস্ত বোধ করলাম।

"কি রে মার্গরিৎ, এর কথা বোধ হয় তোর মনে নেই, না?"

"উঁহু—" আমি মাথা নেড়ে জানালাম।

"তোমরা যে দু'জনেই খুব ছোট তখন।"

লুইয়ের বয়েস বড় জোর বছর কুড়ি। রোদে-পোড়া মুখে নতুন গোঁফের উন্মেষ; মনোহর গঠন, সুবিশাল বুক, ঘন কটা চুল; নির্ভীক স্বচ্ছ কপিল দুটি চোখ স্নেহ ও অকপটতায় ভরা। ঠোঁটে তার থেকে থেকে একটা ব্যথার ছাপ ফুটে ওঠে, বিশেষতঃ যখন তার মায়ের কথা ওঠে; কিন্তু হাসলে তার সারা মুখ দীপ্ত হয়ে ওঠে। আমার কাঁধের ওপর বাবা হাত রাখলেন।

"সাবধান!" গভীর অথচ সকৌতুক কণ্ঠে তিনি বললেন, "তোমার সামনে যাঁকে দেখছ, তিনি হচ্ছেন দ্বাবিংশ অশ্বারোহী বাহিনীর বিখ্যাত কাপ্তেন লুই লফেভ্র; সম্প্রতি ইনি আলজেরিয়া থেকে ফিরছেন। কয়েক দিন এখানেই কাটাবেন! গিয়ে এর জন্যে একটা ঘর সাজিয়ে ফেল্ ত খুকি। তার আগে তোর মাকে এ দৌড়ে গিয়ে বলে আয় যে লুই এসেছে। তাঁকে ত কোথাও দেখতেই পেলাম না; নইলে নিজে গিয়েই সুখবরটা তাঁকে দি আসতাম।"

গিয়ে দেখি ক্ষেতের মধ্যে মা তাঁর মটর আর শিমগাছগুলো পরিচর্যা করছেন।

"মা, লুই লফেভ্র এসেছেন।"

চট করে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

"কি বললি খুকি?" তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "এমন খবর এ দিলি, আয় রে, তোকে চুমা দিই।"

আমায় চুম্বনান্তে তিনি আমার হাত ধরে বাড়ীর দিকে বাড়ালেন।

"বলি ওগো, ও হেনরী!" বাবাকে তিনি শুধালেন, "আ আগে আমায় খবর দিতে পারনি?"

"তোমায় যে কোথাও খুঁজে পেলাম না গো," লুইকে এ নতুন বন্দুক দেখাতে দেখাতে তিনি চোখ তুলে জবাব দিলেন।

"লুই, বাপ আমার, তোকে দেখে কী যে সুখী হলাম।"

এগিয়ে গিয়ে তিনি কাপ্তেনের শির চুম্বন করলেন। বেচারা বড় বিচলিত হয়ে পড়েছে; ঠোঁট দুটি তার কাঁপতে লা

মিয়ে গেলেন। তাঁর চোখও সজল ; কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না। এখন অবশ্য সবই জানি। মাত্র সতের বছর বয়েসে লুই অনাথ হয় ; তার বাবা মারা যাবার দু'দিন বাদেই মারা যান তার মা। আমার বাবা ও তার বাবা ছিলেন একই সৈন্য বিভাগে। শোকে মুহ্যমান তরুণ উন্মাদপ্রায় অবস্থায় তখনি আফ্রিকা চলে যায়। বাবা-মা ছাড়া বেচারা কিছুই জানত না! সেই শেষ বারের মত আমার মা বাবার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। নাঃ, এবার আমার কাহিনী থামান দরকার।

"এত দিন কেমন ছিলি রে লুই? ভাল ত?" মা জানতে চাইলেন।

"নাঃ, বরাবর ভালই ছিলাম না ; এখান থেকে যাবার তিন দিন বাদেই জ্বরে পড়ি, যার জের এক মাসেরও বেশী চলে ; কিন্তু বর্তমানে, সে হাসল, "আমার চেয়ে ভাল স্বাস্থ্য কারো আছে কিনা জানি না।"

খাবার পর বাবা আমার হাতে লুইকে ন্যস্ত করে দেবার সময় বলে গেলেন, "মার্গরিৎ, লুইকে এবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তোর আশ্রিতগুলো দেখিয়ে আন ; আমায় কিছু চিঠি লিখতে হবে আর তোর মা ঘর গোছাতে বসবেন।"

অতিথিকে আমি বাগানে নিয়ে গিয়ে আমার খরগোস দেখালাম। আদর করবার জন্য লুই তাদের একটাকে সবে হাতে তুলেছে আর অমনি দুষ্টুটা কচ করে ওর আঙুলে কামড় বসিয়ে দিল। দেখলাম অতি ধীরে সে জন্তুটাকে ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখল, যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু লক্ষ্য করলাম খানিক বাদে, ওর আঙুল দিয়ে রক্তের ধারা বয়ে চলেছে।

আমি ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইলাম, "জন্তুটা কি তোমায় কামড়েছে?"

সে শুধু হাসল, "নাঃ, ও কিছু নয়।"

আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা দেখে শেষ পর্য্যন্ত ও দেখাল, একটা আঙুলে ছোট্ট চারটি দাঁতের দাগ। তাড়াতাড়ি আঙুলটা আমি বেঁধে দিয়ে, অপ্রতিভ হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, "তোমার কি খুব বেশী ব্যথা করছে?"

"মোটেই না।" তারপর নীচু গলায় লুই বলল, "জান, তোমায় দেখে আমার মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।" আমি চুপ করে রইলাম।

তেমনি ভাবেই লুই জিগ্যেস করল, "আচ্ছা তুমি কি তাঁকে দেখেছ?"

"বোধ হয় আমি দেখেছি, তবে তাঁর চেহারাটা ঠিক মনে পড়ে না।"

একটা বুড়ো ওকের তলায় আমরা গিয়ে বসলাম।

"বল ত, আফ্রিকায় গিয়ে তুমি কি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে?"

"আমার ত বাঁচবার আশাই ছিল না ; প্রিয়জন বলতে বিছানার পাশে কেউ ছিল না, যার থেকে একটু সান্ত্বনা পাই ; আমার মা-বাবা মারা যাবার ঠিক এক মাস পরের কথা ; এক সহকর্মী আমার শুশ্রূষা করত ; প্রলাপের ঘোরে কত বার যে মাকে দেখেছি! তাঁকে দেখতাম, মার্বেলের মত সাদা, সারা মুখ এক অপূর্ব মধুর হাসিতে উজ্জ্বল ; তিনি আমার হাত দুটো এসে ধরতেন ; আমার জলন্ত কপালের ওপর রাখতেন তাঁর ওষ্ঠ,—আমি তখনি শারীরিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে উঠে বসতাম, কিন্তু আবার ভেঙে পড়তাম নিরাশায়। কারণ, এই ভাবেই ত তাঁর সাথে পরলোকে মিলিত হবার স্বপ্নটি পেছিয়ে যেত।"

সে থেমে গেল আর স্বপ্নালু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল দূরের মাঠ পানে।

আমি কাঁদছিলাম। হঠাৎ সে মুখ ফেরাল।

"একি, তুমি কাঁদছ? আমার জন্যে?"

"কত কষ্টই না পেয়েছ তুমি!" আমি উত্তর দিলাম। খানিক বাদে সাধারণ ভাবে সে আমায় বলল, "চল ত, তোমার বাবার বুড়ো ঘোড়াটা আমায় দেখিয়ে দেবে।"

২৫শে আগষ্ট। আজ খুব ভোরে উঠে প্রাতরাশের আগেই আমি হাঁস-মুরগীগুলোকে খেতে দিচ্ছিলাম। লুই এসে দাঁড়াল আমার পাশে।

"তুমি দেখছি খুব সকাল সকাল উঠেছ আজ ; দেখ আমিও কেমন উঠে পড়েছি!" সে বলল।

"তা ত হল, কিন্তু তোমার আঙুলের খবর কি?"

"বোধ হয় ভালই আছে, যদিও আজ আর খুলে দেখিনি।"

"ব্যাণ্ডেজটা এ অবধি খোলই নি?" সবিস্ময়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

"উঁহু, যেহেতু তুমি বেঁধেছ, তোমাকেই এটা খুলে দিতে হবে।" তার অনুরোধ মত আমি খুলেই দিলাম। বুড়ি দাই তেরেস তখন সেখান দিয়ে আসছিল।

"কাপ্তেন সাহেবের হল কি খুকুমা?"

"বুঝলে তেরেস, একটা খরগোস এত দুষ্টু যে ওকে কামড়ে দিয়েছে।"

"ওঃ, এই কথা? বাছা রে! আমার ত মনে হয় ওর আসল ক্ষত আরো গভীর।"

এই বলে সে চলে গেল। লুই আমার দিকে একটু ঝুঁকে বসল। তার চাউনির ভঙ্গীতে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। "ও বুঝলে, ও হচ্ছে আমার মায়ের দাই," আমি কথা ফেরালাম, "আচ্ছা, একটা কথা। তুমি কি কখনো খুব আহত হয়েছিলে?"

"তিন বার," সে একটু থেমে বলল।

"গুরুতর ভাবে?"

"আমি শুধু গুরুতর আঘাতের কথাই মনে রাখি।"

প্রাতরাশের পর আমরা সবাই বসে গেলাম। আমাদের আগেই বাবা-মা বাড়ী চলে গেলেন। ছোট্ট নদীটির তীরে লুই আর আমি যখন বসে ছিলাম, পথের দিকে চেয়ে লুই বলল: "কেউ যেন আসছে।"

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে উত্তর দিলাম, "জমিদার আসছে।"

লুই ভ্রূকুটি করল, "কে জমিদার? নাম কি?"

প্লুয়ারভেনের জমিদার।"

"তুমি ওকে চেন?"

"হ্যাঁ ; ওর মা আর আমার মা একই কনভেণ্টে ছিলেন।"

আমাদের সামনে এসে জমিদার আমায় অভিবাদন জানাল ; তারপর লুইয়ের দিকে ফিরে তার পানে হাত বাড়িয়ে দিল।

"কাপ্তেন লফেব্রকে সম্ভাষণ জানিয়ে নিজেকে সম্মানিত মনে করছি ; আমার বাবা তোমাদের রেজিমেণ্টেই কাজ করতেন।"

লুই হাসল। "সত্যি" রহস্যভরে সে জিগ্যেস করল।

আমরা গল্প-গুজবে মেতে গেলাম।

"আমরা কিন্তু মা-ছেলে সবাই তোমার পথ চেয়ে বসে আছি।" জমিদার বলল, "কবে আমাদের সৌভাগ্য হবে তোমাকে আমাদের প্রাসাদে নিয়ে যাবার?"

"দিন পনের বাদেই সম্ভবতঃ।"

"আমার মামাও ওই সময় নাগাদ আসছেন; ভালই হল; অন্যথায় তুমি আমাদের ওখানে গিয়ে হয়ত বিরক্তি বোধ করতে।"

"উঁহু, মোটেই না।"

"তোমার কথা আমি অবশ্য বিশ্বাস করি। কারণ যার অন্তর সুন্দর, কোন কিছুতেই তার বিরক্তি আসে না।"

"তুমি যা বললে, তা অতীব সত্যি।" লুই অন্যমনস্ক ভাবে জলে নুড়ি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সায় দিল।

অনতিকাল পরেই আমরা বাড়ী যাবার জন্যে উঠে পড়লাম। যাবার আগে জমিদার লুইকে বলে গেল, "শীগ্গির তোমার সাথে দেখা হবে আশা করি। আমার মামাও মুগ্ধ হবেন তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে।"

"ধন্যবাদ", জানাল লুই প্রসন্ন মনে। তারপর জমিদার অদৃশ্য হয়ে গেল।

২১শে আগষ্ট। আজ সকালে লুই চলে গেল। আমরা সকলেই বড় মুষড়ে পড়েছি। মা অশ্রু-সম্বরণ করতে পারেন নি তাকে আলিঙ্গন-কালে; দশ বার তাকে দিয়ে দিব্যি করিয়েছেন, শীগগির সে আবার আসবে। বাবা আর আমি পথের খানিকটা ওকে এগিয়ে দিতে গিয়েছিলাম। নীরবেই আমরা চলছিলাম, কারণ প্রিয়জনকে বিদায় জানানো—যতই "আবার দেখা হবে" বলা যাক—বড় দুরূহ। একসঙ্গে গীর্জা অবধি গিয়ে লুই এগিয়ে গেল।

"আমায় ভুলবে না, বল?" লুই করমর্দন করবার সময় বলল।

"কক্ষনো না, নিশ্চিন্ত থেকো।"

"আর আমি," সে জানাল নীচু গলায়, "যদিও আর কোন দিন তোমার সাথে দেখা না হয়, জীবনে তোমায় ভুলতে পারব না।"

"কিন্তু দেখা হবেই, আমি জানি তুমি ফিরে আসবে!" ওর বিষণ্ণ ভাব দেখে আমি জবাব দিলাম।

"আবার দেখা হলে তুমি সুখী হবে?"

"বিলক্ষণ! তুমি আবার এলে আমরা সত্যিই প্রীত হব, তাই না বাবা?"

"নিশ্চয়ই।" লুইয়ের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি।

ঘোড়ায় চেপে সে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল। বনের মাঝে অদৃশ্য হবার আগে ফিরে তাকিয়ে সে টুপি নাড়ল। দুই হাতে আমায় জড়িয়ে ধরে বহুক্ষণ বাবা আমার দিকে চেয়ে রইলেন। স্নেহময় পিতা—কী গভীর না তাঁর ভালবাসা! তাঁর চোখ দেখলাম ভিজে ভিজে।

"মা আমার, নিষ্পাপ বনের ফুল!" শির চুম্বন করে তিনি [illegible]

"চল্ মা, মন খারাপ করে কি লাভ? আশা করি ও ওর কথামত শীগগির ফিরে আসবে।"

"আমিও তাই চাই বাবা, আর কয়েক দিন যদি ও থেকে যেত, বেশ হত, চলে যাওয়ায় বড় যেন ফাঁকা লাগছে।"

"ও চলে যাওয়ায় তোর মা বড় কাতর হয়ে পড়েছেন, ছেলেটাকে তিনি খুব ভালবাসেন, আর আমি—আমিও ওকে বড় স্নেহ করি।—তুই, মার্গরিৎ?"

"আমিও বাবা!"

লুই চলে যাওয়াতে সারা বাড়ীটা ফাঁকা লাগছে। যদিও অল্প কয়েক দিন ও ছিল আমাদের মধ্যে, তবুও ও চলে গেছে, মনে হচ্ছে বাড়ীরই কেউ গেছে। আজ সন্ধ্যাবেলা জমিদার-গিন্নী এসেছিলেন। বাবা-মাকে তিনি অনুরোধ করলেন,—আমায় নিয়ে অবশ্যই তাঁরা যেন একবারটি প্রাসাদে যান। তাঁরা জানালেন যে এখন বোধ হয় তা সম্ভব হবে না।—আমার বাপু মনে হয় নিমন্ত্রণটা রক্ষা করলেই ভাল হত। কথায় কথায় জমিদার-গিন্নী বললেন যে তাঁর একটি পরিচারিকার বড় দরকার। আমি তখন জানেৎ কোরেন-এর উল্লেখ করলাম। তিনি তাকে দেখতে চাইলেন, এবং আমি কথা দিলাম যে জানেৎকে প্রাসাদে গিয়ে ওঁর সাথে দেখা করতে নির্দেশ দেন। যখন আমি কোরেনদের দুঃখ ও মেয়েটির নিষ্ঠার কথা বললাম, তিনি আকুল হয়ে কেঁদেই ফেললেন। আমার ধারণা জানেৎকে তিনি কাজে বহাল করে নেবেন।

"এখনো এক মাস হয়নি তুই আমাদের কাছে এসেছিস, এরি মধ্যে তুই পেয়ে গিয়েছিস যত দীন-দুঃখীর হদিস?" তিনি বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দে গদগদ হয়ে বললেন, "তুই যে একেবারে সাক্ষাৎ দেবদূত,—ওদের রক্ষাকর্ত্রী!"

৪ঠা সেপ্টেম্বর। বাবা আজ সকালে লুইয়ের একটা চিঠি পেয়েছেন। সে এখন পারীতে আছে, তবে শীঘ্রই আলজেরিয়া যেতে হবে। ডিসেম্বরে সে ফিরে আসবে, সে লিখেছে, "আপনাদের সাথে পুনর্মিলিত হব আশা করি। আপনি ও মাদাম আর্ভের যে অকুণ্ঠ যত্ন করেছেন আমার স্বর্গত পিতা-মাতা ও আমাকে, তা জীবনে বিস্মৃত হব না। আমার শোকসন্তপ্ত মুহূর্তে আপনাদের নিকট যে বাৎসল্য পেয়েছি সে ঋণ কখনো শোধ করবার ক্ষমতা আমার হবে না। স্বর্গের দেবতারা সে ঋণ শোধ করুন আর রক্ষা করুন আপনাদের সবাইকে সকল বিপদ-আপদ থেকে,—এই আমার প্রার্থনা। আমি দূরদেশে থাকা কালীন আমায় ভুলে যাবেন না যেন; অবশ্য এ কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য। কারণ আপনিই আমার পিতার অভাব আর মাদাম আর্ভের আমার মাতার অভাব পূর্ণ করেছেন, আর, আমি জানি, আপনাদের হৃদয়ের একাংশ চিরদিন অধিকার করে থাকবে—লুই লফেভ্র।"

আজ আমি জমিদার-গিন্নীকে নিয়ে গিয়েছিলাম জানেৎ কোরেনদের বাড়ী। গাস্ত'ও সঙ্গে ছিল। মেয়েটিকে দেখে কঁতেস্ বড় সন্তুষ্ট হলেন। তখনি তাকে বহাল করে নিলেন। জানেৎকে পায় কে? আমার হাত ধরে সে কেঁদে ফেলল, ওর চোখে জল দেখে আমিও বেসামাল হয়ে পড়লাম; তবু ওকে শান্ত করতে সচেষ্ট হলাম। উঁচু গলায় তার মা-বাবা আমায় অজস্র আশীষ জানাতে লাগলেন। জানেৎ প্রাসাদে যাবে কাল থেকে। গাস্ত' ফেরার পথে আমায় অভিনন্দিত করল, "তুমি সত্যি বড় লক্ষ্মী মেয়ে!"

"নাঃ, আমি লক্ষ্মী হতে চাই, কিন্তু হলাম কই ?"

"যাঃ, আচ্ছা বলত তুমি না থাকলে এই গরীব বেচারাদের অবস্থাটা কি হত ?" সে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল।

"ভুলছ কেন—ভগবান তাদের কোন দিনই ছেড়ে যেতেন না। তাঁর সৃষ্ট জীবদের প্রতি অপার তাঁর ভালবাসা, তাদের আপন সন্তানরূপে দেখেন,—বাপ কি নিজের ছেলে-মেয়ে ছেড়ে থাকতে পারে ?"

চারি দিক স্তব্ধ।

"যাই হোক, মেয়েটি বড় সুন্দর," গাস্ত আবার সুরু করল। "বেশ, তুমি আর আমি একমত, জেনে বড় আশ্বস্ত হলাম; ওর আয়ত চোখ দুটি কি চমৎকার না ? শরতের আকাশের মত নীল।"

"আচ্ছা, এটা কি তোমার অন্তরের কথা ?"

"বটে, তুমি কি বলতে চাও ?" আমি পালটা প্রশ্ন করলাম, চোখ তুলে দেখি দুষ্টুমিতে তার চোখও ভরা। সে হেসে ফেলল।

"আমার যা সুখী বলি যদি, তোমার কী বা এসে গেল ?"

ইতিমধ্যেই আমাদের বাগানের সীমানায় পৌঁছে গেছি; ওরা বিদায় নিল।

৫ই সেপ্টেম্বর।—কাল আমি প্রাসাদে যাব। সারা সকালটা কেটেছে গোছ-গাছ করতে। আটটা বাজল ঘড়িতে। জানলাটা খুলেই রেখেছি; চকচকে তারাগুলো আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর রূপোলী চাঁদটা ভাগ করে দিয়েছে আমার ঘরখানা আলো আর ছায়ায়। চারি দিক নীরব; কোথাও টুঁ শব্দটি নেই, হাওয়া পর্যন্ত স্তব্ধ। আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। আমাদের কনভেন্টের ভগিনী ভেরোনিকের কথা মনে পড়ে গেল—চাঁদ দেখে। তিনিও রাতের ওই গ্রহের মতই ত নির্মল, সুন্দর, পাণ্ডুর; জগতের কোলাহলের বহু দূরে, কনভেন্টের পবিত্র পরিবেশে তিনি যাপন করছেন শান্ত নিবেদিত জীবন। কী তাঁর মহৎ চরিত্র! তিনি যে আমায় এত ভালবাসেন, তার জন্য আমি আন্তরিক সুখী; কারণ তাঁর মত স্নেহপ্রবণ ব্যক্তির ভালবাসা পাওয়ায় যে কী অপরিসীম তৃপ্তি! সর্বদা তাঁর দেওয়া ক্রুশটি আমি পরে বেড়াই।

৭ই সেপ্টেম্বর।—প্লুয়ারভেনের প্রাসাদ; আমি আজ এই প্রাচীন প্রাসাদে বাস করছি; বড় ভাল লাগছে; একা যখন থাকি তখন এই অতিকায় প্রাসাদের মাঝে অনুভব করি এক বিস্তার, কেমন যেন অবসাদ—যা আমায় আচ্ছন্ন করে দেয় বিষাদে, চিন্তায়। আমার স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত ব্যবস্থাই করা হয়েছে, সব কিছুই আমার মনোমত হয় যাতে, সেদিকে সবার নজর। গত কাল পাঁচটার সময় জমিদার ও তাঁর ভাই আমায় আনতে গিয়েছিলেন; পেছন পেছন এসেছিল তাঁদের পরিবারের রাজকীয় গাড়ীটা। হেঁটে গেলেই ভাল হয় বলাতে বাবা জোরে হেসে উঠলেন।

"গাড়ীটা দেখে বুঝি ভয় করছে রে খুকি ? পড়ে যাবার শঙ্কা ?" জমিদারও হাসল।
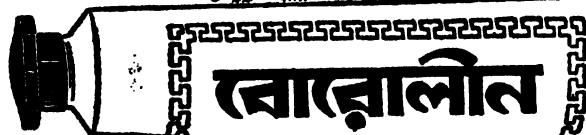
"আমার কিন্তু মনে হয় মাদ্‌মোয়াজেল," সে বলল, "তোমার প্রস্তাবটা বেশ লোভনীয়।"

মার কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে স্বতই অশ্রু নেমে এল দুই গাল বেয়ে; বহু চেষ্টায়ও তা বাধা মানল না।

"যা বাছা কাঁদতে নেই," তিনি বোঝালেন আমায়, "দেখা ত হবেই ঘন ঘন, আর, এ-সবই তোর ভালর জন্যে।"

বনের পথটাই সবচেয়ে ছায়াশীতল বলে আমরা সেদিক দিয়ে চললাম। আমার বাঁ দিকে জমিদার অন্য দিকে তার ভাই। লুইয়ের প্রসঙ্গ উঠলে জমিদার তার সম্বন্ধে বিশদ ভাবে জানতে চাইল। গাস্তঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম জানেৎকে পেয়ে তার মা খুসী কি না। সে জানাল যে ওর কাজে মন আর মাজিত রুচির মাঝে কোনও কিছু বলার ফাঁক নেই। চারি ধারের মনোরম দৃশ্যের দিকে জমিদার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অস্তসূর্যের সিঁদুরে আলোয় সেই লগ্নে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তমসাচ্ছন্ন ব্যথাতুর এই প্রাসাদ; বেরি ও গুল্মের ঝোপ এবং নানারকম ঘাসে ঢাকা একটি পাহাড় উঁকি মারছিল প্রাসাদের ঠিক পেছন থেকে। একটা বড় ক্ষেত পার হতে হল; অকৃপণ সূর্য্যের আলোয় পুষ্ট যব ওটের প্রাচুর্য চারি দিকে। গাছে গাছে পড়েনি এখনো হেমন্তের হলুদ ছোপ। আজ অবধি এখানে চলছে গ্রীষ্মের রাজত্ব। কয়েকটি পাখি ও পাহাড়ের পাদদেশে মুখর একটি নদী ছাড়া আর সবই নীরব। প্রাচীন একটি খিলানের নীচে দাঁড়িয়ে জমিদার-গিন্নী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সস্নেহ আলিঙ্গনে তিনি আমায় নিয়ে গেলেন বসবার ঘরে।

"সোনা আমার, তোকে এখানে পেয়ে যে কী আনন্দ হল!" বলে তিনি ছেলেকে ধমক দিলেন, "হ্যাঁ রে হ্যানোয়া, তুই ওকে গাড়ীতে আনলি না কেন রে?"

"মাদ্‌মোয়াজেল হাঁটতেই চাইছিল, আর কথাটা আমারো মনঃপুত হল বলে ওকে বাধা দিইনি।" বলে সে হাসল।

তিনি আমায় শুধালেন, "কিন্তু বাছা বলত, তুই ক্লান্ত হসনি?"

"মোটেই না। হেঁটে এলাম, বেশ ভাল লাগছে; বনের হাওয়াটা কী মিষ্টি!"—তারপর তিনি আমার বাপ-মার কুশল জানতে চাইলেন। তাঁর ভাই এসেছেন শুনলাম, কিন্তু কোথায় যেন বেরিয়েছেন, রাতে খাবার আগেই ফিরবেন।

"চল মা, তোর ঘরটা দেখিয়ে দিই। খাবার আগে একটু জিরিয়ে নে।"

তাঁর পেছন পেছন গিয়ে হাজির হলাম—তাঁর ভাষায়—'আমার ঘরে'! সামনের মাঠ থেকে হাজার সুবাস, আর জানলার ধারে মিষ্টি যুঁই ফুলের গন্ধে ঘরটা আমোদিত। ঠিক নীচেই এক অপূর্ব বাগান। দূরে, অনেক দূরে, একটা লম্বা নীল রেখা সূর্যের আলোয় ঝলমল করছিল: ওই ত সমুদ্র! অধীর হয়ে আমি ছুটে গেলাম কঁতেস-এর কাছে, জড়িয়ে ধরলাম তাঁকে।

"কি সুন্দর ঘরটা যে লাগল! আপনি সত্যি বড় ভাল!"

তিনি অন্তরে অন্তরে অতি তৃপ্ত হলেন।

"যদি ভগবান করেন তবে তোকে চিরদিনের মত ঘরটা ছেড়ে দেব," চিন্তাকুল অথচ প্রসন্ন তাঁর মুখ।

"তার পর তিনি বললেন, "যা মার্গরিৎ, এ যে তোর নিজেরই বাড়ী; তোর প্রসাধন যদি আমার আগেই শেষ হয়, অপেক্ষা না করে বিনা দ্বিধায় নিচে হলঘরে চলে যাস। ওখানে দেখিস তোকে পেয়ে সবাই কি কাণ্ডটা না করে।"

তিনি চলে গেলেন। আমি একা,—পাশের নিভৃত কক্ষে গিয়ে অভ্যাস মত আমি নতজানু হয়ে বসলাম, সেখানে রাখা ক্রুশের সামনে। ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানালাম তাঁর অসীম করুণার জন্য, আর প্রার্থনা করলাম, তাঁর চোখে যা ভাল শুধু সেটুকু করবার অধিকার তিনি যেন দেন আমাকে। হে ভগবান! ক্ষমা কর আমার সমস্ত পাপ, পাপ যে আমার অসংখ্য!—উঠে গেলাম, জানলার বাইরে তাকালাম; তার পর সাদা মসলিনের একটা কাপড় পরলাম, বাঁধলাম নীল সাটিনের একটা ফিতে। এই পোষাক আমার বাবার খুব পছন্দ; তৈরী হয়ে নীচে গেলাম। হলঘরে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় দরজা খুলে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বয়েস তাঁর পঞ্চাশের কাছাকাছি; মাথার চুল ও নিবিড় গোঁফে শুভ্রতার ছাপ পড়েছে, ছোট ছোট চোখ স্ফূর্তিতে ভরা। আমায় দেখে তিনি এগিয়ে এলেন ও করমর্দন করে সোৎসাহে বললেন:

"তোমায় আমি চিনি মাদ্‌মোয়াজেল, তোমার কথা ঢের শুনেছি; প্রায়ই আমার বোনের মুখে শুনি তোমার কথা; উল্লেখ যদি কখনো ওঠে, তিনি তোমার নামে অজ্ঞান,—আর এখন দেখছি তিনি ঠিকই বলেন। আমি হচ্ছি কর্ণেল দেক্লে।"

আমার মনে হল তিনি যেন আমার অন্তর অবধি দেখে নিচ্ছেন। কারণ একান্ত দৃষ্টিতে তিনি কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তার পর বললেন, "চল মা, বড় সন্তুষ্ট হলাম তোমায় দেখে; ভেতরে চল।" আমায় হাত ধরে তিনি 'হলে' নি'য় গেলেন। তাঁর পরিচয় পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম: কারণ তাঁকে একটু রুক্ষ মেজাজী ও কাঠখোট্টা গোছের কল্পনা করেছিলাম। কে জানত তিনি এত অমায়িক! হল-ঘরে দেখি জমিদার আর তার ভাই বসে আছে। খোলা জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম, ছাতভরতি নানা রকম প্রতিমূর্তি আর দুষ্প্রাপ্য সুন্দর সুন্দর গাছপালা। কর্ণেল সাহেব ইতিমধ্যেই বেশ স্নেহাসক্ত হয়ে পড়েছেন মনে হল। জানেৎকে দেখে, আর সে সুখী হয়েছে জেনে পুলকিত হলাম। আমায় সে মধুর হাসি আর আয়ত নীল চোখের নীরব ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানাল। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক: পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উটরোগ

(নাটক)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ বিশ্রামাগার

সূর্যপাল, চন্দ্রশীলা ও রাজগুরু উদয়াদিত্য

উদয়াদিত্য। আমার আশীর্বাদ ত তোমার জন্য সর্বদাই জাগ্রত আছে সূর্যপাল! তোমার আরোগ্য বিধানের জন্যে কোনো যাগ-যজ্ঞ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন বাদ পড়বে না। কিন্তু—

সূর্যপাল। (করজোড়ে) আর কিন্তু নয় গুরুদেব! গত নয় মাস 'কিন্তু' 'কিন্তু' করে কোনো ফল পাওয়া যায়নি, মৃত্যুর খাদে পৌঁছে গেছি। এখনো যদি কোন আশা থাকে ত আপনার আশীর্বাদ আর দৈব-অনুগ্রহের মধ্যেই তা আছে।

উদয়াদিত্য। দৈবানুষ্ঠানের সহিত লৌকিক প্রচেষ্টার যোগ থাকলে দৈবানুষ্ঠানও জোরালো হয় বাবা! চিকিৎসা একেবারে ছেড়ে দেওয়া উচিত হচ্ছে না তোমার।

সূর্যপাল। একেবারে ত' ছেড়ে দিচ্ছিনে গুরুদেব,—প্রকৃত শক্তিশালী কার্যক্ষম চিকিৎসকের হাতে চিকিৎসা-ভার অর্পণ করবার ব্যবস্থা করছি। আর যে চিকিৎসক আমাকে সারাতে পারবে, তাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছি।

উদয়াদিত্য—তোমার আরোগ্য-বিধানের জন্ত কোনো যাগ-যজ্ঞ

চন্দ্রশীলা। কিন্তু মহারাজ, তিন মাসের মধ্যে সারাতে না পারলে চিকিৎসকের প্রাণদণ্ড হবে, এ সর্তে বিচক্ষণ চিকিৎসকেরাও চিকিৎসার ভার নিতে সাহস করবে না।

সূর্যপাল। না করলেও খুব দুঃখিত হব না মহারাণি! এ রোগে মৃত্যু অনিবার্য তা ত' বুঝতেই আর অরিষ্ট-রসায়নের হাত থেকে মুক্তিলাভ ক'রে কয়েক দিন একটু শান্তিভোগ ক'রে মরতে চাই।

উদয়াদিত্য। এ মন্তব্যের দ্বারা তুমি কিন্তু আমাদের পীড়িত করছ সূর্যপাল!

সূর্যপাল। তা নিশ্চয়ই করছি, কিন্তু অনেক দুঃখে পীড়িত হ'য়ে তবে করছি।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। (নত হ'য়ে অভিবাদন ক'রে) প্রধান মন্ত্রীমশায় এসেছেন মহারাজ!

সূর্যপাল। নিয়ে আয়। (উদয়াদিত্যের প্রতি) যেদিন শঙ্কর মিশ্র আমার চিকিৎসার ভার দত্তভানুর হাতে দিয়েছিলেন, সেদিন মনে হয়েছিল রোগ কঠিন। তার পর তিন মাসের মধ্যে দত্তভানুকে নিয়ে তিন জন বৈদ্য হার মানায় বুঝেছি, এ রোগ সারবার রোগ নয়।

(বল্লভাচার্যের প্রবেশ)

বল্লভাচার্য। জয় হোক মহারাণী-মহারাজার!

সূর্যপাল। জয় হোক।

বল্লভাচার্য। (উদয়াদিত্যের নিকটে গিয়ে পদধূলি গ্রহণ)

উদয়াদিত্য। কল্যাণ হোক।

সূর্যপাল। আসন গ্রহণ করুণ প্রধানমন্ত্রী মশায়! তারপর? ঘোষণার সব ব্যবস্থা করেছেন ত?

বল্লভাচার্য। আজ্ঞে হাঁ, ব্যবস্থা প্রস্তুত।

সূর্যপাল। নিজ রাজ্য ছাড়া আর কোন্ কোন্ রাজ্যে ঘোষণা প্রচার করছেন?

বল্লভাচার্য। তা, অনেক রাজ্যেই করেছি। উত্তরে গান্ধার, কাশ্মীর, পশ্চিমে সিন্ধুদেশ, দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, মহাকোশল, চালুক্য-রাজ্য পূর্বে অঙ্গ, বঙ্গ, চম্পা।

সূর্যপাল। উত্তম।

বল্লভাচার্য। কিন্তু মহারাজ! আমার আশঙ্কা, এর দ্বারা কোনো ফল হবে না।

সূর্যপাল। আপনার আশঙ্কা, আমার বিশ্বাস। যে বিস্তৃত ভূখণ্ডে আপনি ঘোষণার ব্যবস্থা করেছেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকও লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার লোভের দ্বারাও মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করতে পারবে না।

বল্লভাচার্য। আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন মহারাজ! তাই যদি হয়, তা হলে চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করছেন তা ত' আত্মহত্যারই নামান্তর।

সূর্যপাল। আমি ব্যবস্থা করছি আত্মহত্যার নামান্তরের, আপন কেউ হ'লে এর বহু পূর্বে আত্মহত্যাই করত।

বল্লভাচার্য। মহারাজ! আমি আপনার সভাসদ্‌গণের মুখপাত্র হ'য়ে আপনাকে একটি প্রার্থনা জানাতে এসেছি।

সূর্যপাল। কি বলুন?

বল্লভাচার্য। চিকিৎসা বিষয়ে আপনার এ সিদ্ধান্তের আপনি দয়া ক'রে পুনর্বিবেচনা করুন।

চন্দ্রশীলা। (সাগ্রহে) মহারাজ! আমি অন্তরের সঙ্গে এ প্রার্থনার যোগ দিচ্ছি।

উদয়াদিত্য। আমি এ প্রার্থনা প্রবল ভাবে সমর্থন করছি

সূর্যপাল। (করজোড়ে) আপনি আশীর্বাদ করুন গুরুদেব, আমাকে যেন চিকিৎসা পরিত্যাগ করতে না হয়; শীঘ্রই যেন মৃত্যু-দণ্ড অতিক্রম করবার যোগ্যতা নিয়ে অপরাজেয় চিকিৎসক দেখা দেয়।

পঞ্চম দৃশ্য

চৈতসা

দেবরাজ উপাধ্যায়ের গৃহ

[গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হ'য়ে দেবরাজ উপবিষ্ট]

(দেবরাজের স্ত্রী নারায়ণীর প্রবেশ)

নারায়ণী। শুনছ?

দেবরাজ। (অন্যমনস্ক ভাবে) না।

নারায়ণী। (উচ্চতর কণ্ঠে) বলি, শুনছ?

দেবরাজ। হ্যাঁ।

নারায়ণী। কি শুনছ?

দেবরাজ। লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার নূপুর-নিক্কণ। ঝিনি-ঝিনি ঝিনি-ঝিনি করতে করতে তারা আসছে তোমার ভাণ্ডার আলো করতে।

নারায়ণী। তার আগে আর একটা জিনিসের আসা দরকার।

দেবরাজ। কিসের বল ত'?—আটার?

নারায়ণী। হ্যাঁ। দু'টো পেটের সিকি-পরিমাণ আগুন নেবাতে পারে, বাড়িতে এতটুকুও আটার সংস্থান নেই, ওদিকে তুমি লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রার স্বপ্ন দেখছ!

দেবরাজ। স্বপ্ন নয় নারাণী, স্বপ্ন নয়। একেবারে সত্যি। সিংহগড়ের রাজা সূর্যপালের পক্ষ থেকে যে ঘোষণা ক'রে গেছে তা শুনেছ ত'?

নারায়ণী। শুনেছি।

দেবরাজ। আমি সিংহগড়ে গিয়ে রাজাকে রোগমুক্ত ক'রে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার নিয়ে আসব।

নারায়ণী। এ কথা বলছ, অথচ বলছ স্বপ্ন দেখছ না? আমাদের মহারাজার প্রধান বৈদ্য গোবিন্দ শর্মা পশ্চিম-ভারতের সকলের বড় কবিরাজ। তিনিই যেতে সাহস করলেন না, কত বড় বড় বৈদ্য-কবিরাজ হার মেনে গেল, আর তুমি চিকিৎসা বিদ্যার বিন্দু-বিসর্গ জান না, তুমি যাবে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা উপার্জন করতে? সে যেও রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, দিনের বেলা যাও, যদি পার কিছু আটা জোগাড় ক'রে আনতে।

দেবরাজ। আটা আমি যে রকমে পারি এনে দিচ্ছি, কিন্তু সিংহগড়ে যাবই। চিকিৎসা বিদ্যের বিন্দু-বিসর্গ জানিনে সে কথা ঠিক, কিন্তু বড় বড় কবিরাজ-বৈদ্য যখন হার মেনেছে তখন বুঝতেই পারছ, এ রোগ বিদ্যের সারবার নয়। যদি সারে, বুদ্ধিতে সারবে।

নারায়ণী। বুদ্ধিতে কখনো রোগ সারে?

দেবরাজ। না যদি সারে তার দণ্ড ত' সূর্যপাল ঠিক করেই রেখেছেন। অর্থের এই নিদারুণ অভাব আর সহ্য হয় না নারাণী, ভাগ্যপরী জয় করতেই হবে। অর্থ পাই ত হাসতে হাসতে ঘরে ফিরব, নইলে এ ঘৃণিত জীবন শেষ হওয়াই ভাল।

দেবরাজ। সে জীবন যখন ফুটো নৌকোয় আশ্রয় নিয়েছে তখন তার অদৃষ্টে হয় ভাসা নয় ডোবা আছেই। কাল সকালে সূর্যোদয়ের তিন দণ্ড পূর্বে সিংহগড় যাত্রা করব।

নারায়ণী। ওগো, এ ত' তা হ'লে আত্মহত্যা করতে যাওয়াই হবে!

দেবরাজ। জীবন-সংগ্রামে লড়তে গিয়ে এ আত্মহত্যা না খেয়ে মরার চেয়ে গৌরবের হবে নারাণী! তা ছাড়া, এত হতাশ হবারই বা কি কারণ আছে? শাস্ত্রে বলে বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। বুদ্ধিবলে শশক সিংহের গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিল, আর আমি সূর্যপালের শূল থেকে পারব না?

নারায়ণী। চৈতসা থেকে সিংহগড় কতখানি পথ?

দেবরাজ। পঁচিশ ক্রোশ।

নারায়ণী। এই পঁচিশ ক্রোশ হেঁটে যাবে?

দেবরাজ। ক্ষেপেছ? দীপকমলের টাট্টু ঘোড়াটা চেয়ে নিয়ে সওয়ার হ'য়ে যাব।

নারায়ণী। সেই ঘিয়েভাজা হাড়ডিসার ঘোড়াটায় চ'ড়ে যাবে তুমি?

দেবরাজ। সওয়ারই বা কোন্ নাদুস-নুদুস নারাণী? ঘোড়া আর সওয়ার বেমানান হবে না।

নারায়ণী। না, বেমানান হবে না। পথের খানিকটা সওয়ার যাবে ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে, আর খানিকটা ঘোড়া যাবে সওয়ারের কাঁধে উঠে। পথে খাবে কি, খাওয়াবেই বা কি?

দেবরাজ। খাব ভিক্ষান্ন, আর খাওয়াব পথের ঘাস। যত দিন না ফিরি তুমিও বেচে-বুচে চেয়ে-চিন্তে যেমন ক'রে পার দেহে প্রাণটা বজায় রেখো। আর দেখ, তোমার কাছে লাল রঙের গুঁড়ো ছিল না?

নারায়ণী। আছে। লাল রঙে আবার কি হবে?

দেবরাজ। কাজে লাগবে নারাণী, কাজে লাগবে। সামান্য একটু নেকড়ায় বেঁধে দিয়ো। আর পাত্রও ত' একটা চাই—(একটু চিন্তা ক'রে) সে রাজপুরীতে সোনা-রূপোর অনেক পাত্র মিলবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদের প্রধান তোরণ

পাহারারত প্রহরী

[ধূলিধূসরিত দেবরাজ অদূরে ঘোড়া বেঁধে তোরণের সম্মুখে এসে প্রবেশোদ্যত]

প্রহরী। (হাত দিয়ে আটকে) কোথা যাও?

দেবরাজ। (ক্রুদ্ধনেত্রে) রাজপুরীতে।

প্রহরী। কার কাছে?

দেবরাজ। মহারাজের কাছে।

প্রহরী। (সরোষে তর্জন ক'রে) পালাঃ। কানাকড়ির ভিখিরী, মহারাজের কাছে যাবেন! পালা এখান থেকে, নইলে এখনি বন্দী

দেবরাজ। (তীক্ষ্ণকণ্ঠে) বন্দী করবে আমাকে? একবার ক'রে দেখ না মজাটা। এই কানাকড়ির বন্দীকে শেষ পর্যন্ত বন্দনা করতে না হয়। ছাড়ো পথ, আমার সময় নষ্ট কোরো না।

প্রহরী। (কতকটা নরম স্বরে) কে তুমি?

দেবরাজ। আমি মহাচণ্ড শ্মশানবাসী হ্রীং-ক্লৈং গোত্রের তান্ত্রিক দেবরাজ উপাধ্যায়।

প্রহরী। কি কাজ এখানে?

দেবরাজ। মহারাজার অসুখ শুনে নিস্পোটা আসন থেকে উঠে সোজা এসেছিলাম মহারাজকে রোগমুক্ত করতে। ঔষধ প্রয়োগের আজ প্রশস্ত দিন ছিল, কিন্তু তুমি প্রতিবন্ধক হয়েছ। (উচ্চতর কণ্ঠে) তুমি রাজদ্রোহী, রাজমৃত্যুকামী। তোমার বিরুদ্ধে রাজ-দরবারে অভিযোগ উপস্থিত ক'রে তোমার কর্মচ্যুতির পর তোমার জায়গায় উত্তম সিংকে বাহাল করাব। আপাততঃ ফিরে চললাম।

প্রহরী। (খপ ক'রে দেবরাজের হাত চেপে ধ'রে) শোন। উত্তম সিং কে?

দেবরাজ। মধ্যম সিংএর বড় ভাই।

প্রহরী। মধ্যম সিং আবার কে?

দেবরাজ। উত্তম সিংএর ছোট ভাই। হাত ছাড়, এখনি তোমার ব্যবস্থায় মহা-ভৃঙ্গরাট আসনে বসতে হবে।

প্রহরী। (এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে হাত ছেড়ে দিয়ে) উত্তম সিং মধ্যম সিংদের আমি জানিনে, আপনি কিন্তু আমাকে অধম সিং ব'লে জানবেন। (মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ উন্মোচিত ক'রে দেবরাজের সম্মুখে রেখে) আমি আপনাকে বুঝতে পারিনি প্রভু! আমার অপরাধ মার্জনা করুন।

দেবরাজ। তবে আমাকে মহারাজার কাছে পাঠিয়ে দাও।

প্রহরী। মহারাজার কাছে আপনাকে পাঠাবার অধিকার আমার নেই। ঐ প্রধানমন্ত্রী মশায় এদিকে আসছেন, আমি ওঁর কাছে আপনার কথা বলছি, উনি আপনাকে মহারাজার কাছে নিয়ে যাবেন। (করজোড়ে) কিন্তু প্রভু, আপনি যেন ওঁর কাছে—

দেবরাজ। ক্ষমা যখন করেছি, কোনো ভয় নেই তোমার।

(বল্লভাচার্যের প্রবেশ)

প্রহরী। (অভিবাদন ক'রে) প্রভু, ইনি মহাতান্ত্রিক, মহারাজকে সারাবার জন্যে এসেছেন।

বল্লভাচার্য। (দেবরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে) আপনি মহারাজার রোগ সারাবেন?

[illegible]

দেবরাজ। হ্যাঁ, সারাব বই কি।

বল্লভাচার্য। কিন্তু না সারাতে পারলে কি তার ফল, তা জানেন ত?

দেবরাজ। সব জানি মন্ত্রীমশায়। চৈতসা থেকে সিংহগড় এই দীর্ঘপথ এত কষ্ট ক'রে নিজের জীবন

জীবন দিতেই এসেছি। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না, এখানে আমি অর্থোপার্জনই করব। প্রাণত্যাগ করব না।

বল্লভাচার্য। ভগবানের অনুগ্রহে আপনি যেন এখান থেকে অর্থোপার্জন করেই যান।

দেবরাজ। কারুর অনুগ্রহের দরকার নেই মন্ত্রীমশায়, সে কাজ আমি নিজের বিদ্যেবুদ্ধির অনুগ্রহেই করব।

বল্লভাচার্য। তাতেও আমরা কম খুসি হব না। এখন চলুন, মহারাজের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর—বিশ্রাম কক্ষ

সূর্যপাল ও চন্দ্রশীলা

চন্দ্রশীলা। সেই জন্যেই ত বলেছিলাম মহারাজ, এ ব্যবস্থায় প্রকৃত পক্ষে চিকিৎসা বন্ধ ক'রে দেওয়াই হবে। এত ভয়ঙ্কর দণ্ডের বিধান আপনি করেছেন, মহা শক্তিশালী চিকিৎসকও আসতে সাহস করছে না। একটা যা-হোক চিকিৎসা চললে এই তিন মাসে খানিকটা উপকারও ত' হ'তে পারত।

সূর্যপাল। তা বলা যায় না মহারাণি, তাতে অপকারও হ'তে পারত। শনি যেখানে কুপিত হয়েছে সেখানে রাহুর আরাধনা করলে শনি আরও ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে।

চন্দ্রশীলা। আজ কেমন বোধ করছেন?

সূর্যপাল। এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তোমাকে খুসি করতে পারব না চন্দ্রা!

চন্দ্রশীলা। একটু নাচ দেখবেন?

সূর্যপাল। না।

চন্দ্রশীলা। গান শুনবেন?

সূর্যপাল। না। একেবারে হতাশ হয়ো না চন্দ্রা,—এখনো মহারাণীর মুখচন্দ্র তার চন্দ্রত্ব হারায় নি।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। (অভিবাদনান্তে) প্রধান মন্ত্রীমশায় দর্শনপ্রার্থী হয়েছেন।

সূর্যপাল। আসুন এখানে।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

সূর্যপাল। আবার কি দরকার পড়ল কে জানে? রাজকার্যও আর ভাল লাগে না মহারাণি!

(বল্লভাচার্যের প্রবেশ)

বল্লভাচার্য। জয় হোক্ মহারাজের।

সূর্যপাল। বসুন। কি সংবাদ?

বল্লভাচার্য। সুসংবাদ মহারাজ! আপনাকে চিকিৎসা করতে একজন চিকিৎসক এসেছে।

চন্দ্রশীলা। (হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে) এসেছে? সর্তের কথা জানে ত'?

বল্লভাচার্য। সম্পূর্ণ জানে মহারাণি! মহারাজকে সারাতে

[illegible]

চন্দ্রশীলা। জয় বাবা রুদ্রনাথ! মুখ তুলে চাও! তোমাকে আমি দু'হাজার ভরি সোনার সিংহাসন দোবো।

সূর্যপাল। কি জাত?

বল্লভাচার্য। ব্রাহ্মণ,—তান্ত্রিক।

সূর্যপাল। (উৎফুল্ল ভাবে) তান্ত্রিক? তান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ওষুধ দেবে না কি?

বল্লভাচার্য। সেই রকমই ত বলে।

সূর্যপাল। সে কথা ভাল। ভেষজশক্তির সঙ্গে মন্ত্রশক্তির যোগ হ'লে উপকার হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

বল্লভাচার্য। উপকার হলে ত আমরা বেঁচে যাই মহারাজ! কিন্তু তার চেহারা দেখলে একটুও শ্রদ্ধা হয় না।

সূর্যপাল। তা হোক্। তান্ত্রিকদের চেহারা ভাল হয় না।

বল্লভাচার্য। মহারাজ, তান্ত্রিক না হয় সে নিজে, তার ঘোড়া ত আর তান্ত্রিক নয়?

চন্দ্রশীলা। ঘোড়াও খুব খারাপ দেখতে না কি?

বল্লভাচার্য। মহারাণি, সওয়ার বলে আমায় দেখ, ঘোড়া বলে আমায় দেখ, ওরা দু'জনে চৈতসা থেকে সিংহগড় এই পঁচিশ ক্রোশ কি ক'রে যে দেহ বজায় রেখে এসেছে, সেটা পরমাশ্চর্যের কথা!

সূর্যপাল। ডাকিয়ে পাঠান তাকে।

বল্লভাচার্য। অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছে, আমি নিজেই নিয়ে আসি। [নিষ্ক্রান্ত।

চন্দ্রশীলা। আমি না হয় পাশের কক্ষে অপেক্ষা করি মহারাজ!

সূর্যপাল। তা করতে পার।

[চন্দ্রশীলার প্রস্থান, কিছু পরে দেবরাজ ও বল্লভাচার্যের প্রবেশ।

দেবরাজ। জয় হোক মহারাজার।

সূর্যপাল। (দেবরাজের মূর্তি দেখে একটু হতাশ হ'য়ে) তুমি আমাকে সারাতে পারবে?

দেবরাজ। নিশ্চয় পারব।

সূর্যপাল। তিন মাসের মধ্যে?

দেবরাজ। তিন মাসের মধ্যে বলছেন কি মহারাজ! (হাতের তিন আঙুল দেখিয়ে) তিন দিনে আপনাকে সারাবো।

সূর্যপাল। তুমি পাগল!

দেবরাজ। মহারাজ, এ পর্যন্ত যাঁরা আপনার চিকিৎসা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ পাগল ছিলেন?

সূর্যপাল। না, তাঁরা কেন পাগল হবেন?

দেবরাজ। (করজোড়ে) মহারাজ, মার্জনা করবেন, সুস্থ মস্তিষ্কের লোকেরা যখন সুবিধে করতে পারেনি, তখন একবার পাগলকে পরীক্ষা করেই দেখুন না? আর মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন যে ব্যক্তির মহাচণ্ড শ্মশানে কুম্ভক যোগের দ্বারা শিববিন্দুর চতুর্দিকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে কাটে, সে পাগল নয় ত' কি? আমি আপনার কাছে প্রাণ দিতে আসিনি মহারাজ! মহাচণ্ড শ্মশানে উৎকট ভৈরবের যে মন্দিরগুহা নির্মাণ করব, আমি এসেছি আপনার কাছ থেকে তার অর্থ সংগ্রহ করতে। আমি আপনাকে নিঃসন্দেহে ব'লে রাখছি, আজ থেকে চার দিনের দিন এই পাগলের হাতে গুণে গুণে এক লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা আপনাকে দিতে হবে।

সূর্যপাল। (উৎসাহ ভরে) তা যদি দিতে হয় ত' এক লক্ষ নয়, দু' লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা তোমাকে দোব; কিন্তু তা যদি না হয় তা হ'লে—

দেবরাজ। তা হ'লে পঞ্চম দিনের সকালে আমাকে শূলে চড়াবেন মহারাজ! আপাততঃ আপনার রাশি কি, আমাকে বলুন।

সূর্যপাল। সিংহ রাশি।

দেবরাজ। আর মহারাণীর?

সূর্যপাল। বৃষ রাশি।

দেবরাজ। (নিজের বাম চক্ষু বন্ধ ক'রে দক্ষিণ চক্ষু দিয়ে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে) মহারাজ, আপনি দক্ষিণ চক্ষু বন্ধ ক'রে বাম চক্ষু দিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে একটু তাকিয়ে থাকুন।

সূর্যপাল। (তথাকরণ)

দেবরাজ। (একটু স্থির ভাবে দেখে) আচ্ছা, এবার ঠিক উল্টো,—আপনি দক্ষিণ, আমি বাম।

সূর্যপাল। (তথাকরণ)

দেবরাজ। হয়েছে, এবার দুই চোখ খুলুন।

সূর্যপাল। (তথাকরণ)

দেবরাজ। কোনো ভয় নেই মহারাজ, তিন দিনেই আপনাকে সুস্থ ক'রে দোব। তবে রোগশান্তির পর 'দুষ্টস্ত দানং রবিনন্দনস্ত' করতে হবে।

সূর্যপাল। সে কি?

দেবরাজ। সে অতি সামান্য ব্যাপার, যথাকালে জানতে পারবেন। এখন আমি চললাম, সন্ধ্যার সময়ে ওষুধ নিয়ে আসব, আর সেই সময়ে ঔষধ সেবনের নিয়ম আপনাকে জানিয়ে দোবো।

সূর্যপাল। নিয়ম খুব কঠিন না কি?

দেবরাজ। আজ্ঞে না মহারাজ, অতি সহজ নিয়ম, জলের মতো সোজা, আপনা-আপনিই পালন হ'য়ে যাবে। কিন্তু কঠিনই হোক, আর সহজই হোক, নিয়ম পালন না করলে ওষুধে উপকার কেন হবে বলুন?

সূর্যপাল। সে ত' সত্যি কথা। তোমার কোনো চিন্তা নেই, নিয়ম আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

দেবরাজ। তা হ'লেই হ'ল। বিশেষতঃ এই চিকিৎসায় যখন আমারও জীবন-মরণের কথা জড়িত।

সূর্যপাল। বটেই ত! (বল্লভাচার্যের প্রতি) ব্রাহ্মণকে নিয়ে গিয়ে আহার এবং বাসস্থানের উত্তম ব্যবস্থা ক'রে দিন।

দেবরাজ। (করজোড়ে) একা নই মহারাজ, সঙ্গে একটি তুরঙ্গ আছে।

সূর্যপাল। (স্মিতহাস্যে) একেবারে তুরঙ্গ!—(প্রধান মন্ত্রীর প্রতি) আচ্ছা, তারও দানাপানির ব্যবস্থা ক'রে দিন।

বল্লভাচার্য। যে আজ্ঞে! গৃহপাল মহাশয়কে উপযুক্ত উপদেশ দিচ্ছি।

দেবরাজ। (বল্লভাচার্যের প্রতি) মন্ত্রীমশায়, আপনি রাজপ্রাসাদে আর বাইরে ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা ক'রে দিন, যে-উৎকট ব্যাধিতে মহারাজ প্রায় মৃত্যুর দ্বারে এসে হাজির হয়েছেন, আজ থেকে চতুর্থ দিনে তা থেকে তাঁর বেবাক বিমুক্তি। তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অত্যাশ্চর্য [illegible] জনসাধারণ [illegible]।

সূর্যপাল। আগে থেকে ঘোষণা করা ভাল হবে কি?

দেবরাজ। আপনাকে পরীক্ষা ক'রে আমার যখন একেবারে দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে, তখন ভাল না হবার কি কারণ থাকতে পারে বলুন? তা ছাড়া মহারাজ, একটা প্রত্যাশাময় পরিবেশে আপনার আরোগ্য দ্রুত হ'তে পারবে। আর আমার দায়িত্ববোধও উৎসাহ লাভ করবে।

সূর্যপাল। (বল্লভাচার্যের প্রতি) তা হ'লে দিন ঢেঁড়া পিটিয়ে।

দেবরাজ। আর দেখুন মন্ত্রীমশায়, ঢেঁড়ার ঘোষণায় এটুকু বাক্য জুড়ে দেবেন যে, জনসাধারণ যেন পঞ্চম দিবসে দু'টি অনুষ্ঠানের মধ্যে একটির জন্য প্রস্তুত থাকে, হয় সকালে দেবরাজের শূলারোহণ, নয় রাত্রে মহারাজের আরোগ্যলাভে মহামহোৎসব।

(রাজা ও মন্ত্রীর পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ ভাবে অবলোকন)

দেবরাজ। আর দেখুন, আমার পিছনে দু'জন সতর্ক প্রহরী মোতায়েন ক'রে দিন।

বল্লভাচার্য। (সবিস্ময়ে) কেন বলুন দেখি?

দেবরাজ। যাতে দিন চারেক পেট ভ'রে রাজভোগ খেয়ে নিয়ে প্রাণদণ্ডের ভয়ে গা-ঢাকা দিতে না পারি।

সূর্যপাল। হাঃ হাঃ হাঃ! সে জন্যে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না দেবরাজ! গা-ঢাকা দেবার একবার চেষ্টা করলে দেখতে পাবে, অনেক প্রহরীই তোমার গায়ের প্রতি মোতায়েন আছে।

দেবরাজ। যাক, তা হ'লে ত' চুকেই গেল। এবার আমি তা হ'লে চলি। কিন্তু যাবার আগে ধুলোপায়ের মঙ্গলাচারটা ক'রে যাই। আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে তিন বার বলুন—ক্রিং—কট্ ক্রিং—কট্ ক্রিং—কট্।

সূর্যপাল। (এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ ক'রে) ক্রিং—কট্ ক্রিং—কট্ ক্রিং—কট্।

দেবরাজ। (নিজে গম্ভীর মুখে) ক্রিং—কট ক্রিং—কট্ ক্রিং—কট্। (বল্লভাচার্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে) আপনিও তিন বার বলুন।

বল্লভাচার্য। (ঈষৎ বিমূঢ় ভাবে) আমি বলব? কিন্তু আমার ত' কোনো—

দেবরাজ। আরে মশায় ব'লেই ফেলুন না। তান্ত্রিক প্রার্থনায় যোগ দিতে আপত্তির কি আছে? ব'লে ফেলুন,—অধিকন্তু ন দোষায়।

বল্লভাচার্য। ক্রিং—ক্রট্ ক্রিং—কট্ ক্রিং—কট্।

দেবরাজ। উত্তম। এবার তা হ'লে আসি মহারাজ!

সূর্যপাল। এস।

দেবরাজ। মহারাজার জয় হোক। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

সিংহগড় রাজপথ

নেপথ্যে ঢেঁড়া পেটার শব্দ—ঢেঁট্ড়া-ঢেঁট্ড়া-ঢেঁট্ড়া-ঢেঁট্ড়া-ঢেট্ড়া

(সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁড়াবাদক ও ঘোষণাকারীর প্রবেশ)

ঘোষণাকারী। শোন শোন নগরবাসী আর নগরবাসিনী! শোন শুভ সংবাদ! মহাশক্তিশালী তান্ত্রিক চিকিৎসক শ্রীশ্রীদেবরাজ

ঢেঁড়াবাদক। ঢেঁট্ড়া-ঢেঁট্ড়া-ঢেঁট্ড়া-ঢেঁট্ড়া-ঢেঁট্ড়া—

ঘোষণাকারী। কান পেতে মন দিয়ে শোন সকলে—তান্ত্রিক মশায় সর্ত করেছেন তিন দিন ঔষধ পানের পর মহারাজ যদি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করেন তা হ'লে নিজে গিয়ে শূলারোহণ করবেন। তোমাদের প্রতি তাঁর অনুরোধ, আগামী সোমবার দু'টি অনুষ্ঠানের মধ্যে একটির জন্যে প্রস্তুত হও—হয় প্রাতঃকালে তান্ত্রিক মহাশয়ের শূলে স্বয়মারোহণ, নয় মহারাজের আরোগ্যলাভ হেতু রাত্রিকালে আনন্দোৎসব।

ঢেঁড়াবাদক। ঢেঁট্ড়া-ঢেঁট্ড়া-ঢেঁট্ড়া-ঢেঁট্ড়া-ঢেঁট্ড়া—

ঘোষণাকারী। কান পেতে মন দিয়ে শোন সকলে—মহারাজের আরোগ্য বিষয়ে তান্ত্রিক মশায় একেবারে নিঃসন্দেহ ব'লেই শূলারোহণের কথা বলতে পেরেছেন—সুতরাং তোমরা আনন্দোৎসবের দীপমালার জন্যে সল্‌তে পাকাতে আরম্ভ কর।

ঢেঁড়াবাদক। ঢেঁট্ড়া-ঢেঁট্ড়া-ঢেঁট্ড়া-ঢেঁট্ড়া।

[উভয়ে প্রস্থানোদ্যত।

(উভয়ের পিছনে পিছনে কয়েক জন নর-নারীর ধাবন)

১ম পুরুষ। বাবা! আমার ছেলে পা ভেঙেছে—তান্ত্রিক মশায়ের দয়া হয় না?

নারী। বাবা! আমার সোয়ামী হাঁপানীতে সারা রাত জাগে—তাকে যদি দয়া ক'রে—

২য় পুরুষ। বাবা! আমার ইস্তিরী চেলা কাঠ নিয়ে নিত্যি আমাকে তিন বার পিটোয়—তার মেজাজটা একটু যদি—

[সকলের প্রস্থান।

নেপথ্য হ'তে 'শোন, শোন, নগরবাসী, আর নগরবাসিনী'!

(শঙ্কর মিশ্র ও দত্তভানুর দু'দিক দিয়ে প্রবেশ)

দত্তভানু। প্রণাম হই মিশ্রজী! কি ব্যাপার বলুন ত'? এ যে একেবারে ভেল্কি লাগিয়ে দিলে!

শঙ্কর মিশ্র। আমি চিকিৎসক,—চিকিৎসকের নিদান করব?

দত্তভানু। করুন।

শঙ্কর মিশ্র। দেবরাজ আর যাই হোক, চিকিৎসক নয়, সম্ভবতঃ তান্ত্রিকও নয়। তবে প্রাণদণ্ড অবধারিত জেনেও কেন এমন কার্যে অগ্রসর হয়েছে, এইটুকু নিদানে মিলছে না।

দত্তভানু। যদি অনুমতি করেন, আমি ওটুকু মিলিয়ে দিই।

শঙ্কর মিশ্র। বেশ ত' দাও।

দত্তভানু। স্ত্রীর দ্বারা অহরহ দুঃসহ যন্ত্রণা লাভের ফলে দেবরাজ বৈধ উপায়ে আত্মহত্যা করতে এসেছে। পৃথিবী ত্যাগ করতে চায় কয়েক দিনের রাজভোগের পর।

শঙ্কর মিশ্র। হাঃ হাঃ হাঃ! নিতান্ত মন্দ মেলাও নি। কিন্তু সে যাই হোক, দত্তভানু, সর্বান্তঃকরণে কামনা করি মহারাজ আরোগ্য লাভ করুন, কিন্তু একান্তই যদি সেই শুভ ঘটনা ঘটে, আধুনিক ধন্বন্তরিকে স্বীকার ক'রে নিয়ে চরক-সুশ্রুতকে বিদায় দোব। কবরেজি ওষুধের দোকান তুলে দিয়ে শ্মশানক্ষেত্রে জ্বালানি কাঠের দোকান খুলব।

দত্তভানু। আর, আমি বনে গিয়ে আপনার জ্বালানি কাঠের চালানদার হব।

হাল ছেড়ে দিয়ে তোমাতে আমাতে শবের নিদানের হাল ধরা যাবে। হাঃ হাঃ হাঃ!···আচ্ছা, আসি।

দত্তভানু। (অভিবাদন ক'রে) আসুন।

(পট পরিবর্তন)

চতুর্থ দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর

বিশ্রাম কক্ষ

সন্ধ্যাকাল

সূর্যপাল ও চন্দ্রশীলা

চন্দ্রশীলা। প্রধান মন্ত্রী বলছিলেন, চেহারা দেখলে শ্রদ্ধা হয় না, কিন্তু যেতে-আসতে আমি যতটুকু দেখলাম, চেহারা ত' এমন কিছু মন্দ লাগল না মহারাজ! চেহারায় বেশ যেন একটু ইয়ে আছে।

সূর্যপাল। তাছাড়া, দেবরাজের কথা ত' এ পর্যন্ত শোননি। শুনলে বুঝতে কথাবার্তার মধ্যেও প্রচুর ইয়ে।

চন্দ্রশীলা। (সোৎসাহে) তাই নাকি? (তারপর সূর্যপালের মুখে কৌতুক হাস্যের আমেজ দেখে) ও! পরিহাস করছ মহারাজ?

সূর্যপাল। (হাসিমুখে) পরিহাস করলেও ইয়ে করছিনে চন্দ্রা!

চন্দ্রাশীলা। কি করছ না?

সূর্যপাল। অবিশ্বাস করছিনে। দেবরাজের ভাবভঙ্গী দেখে আর কথাবার্তা শুনেই সত্যিই মনে হয় সে সাধারণ মানুষ নয়,—সম্ভবতঃ কিছুটা অলৌকিক শক্তি ধারণ করে।

চন্দ্রশীলা। সম্ভবতঃ নয় মহারাজ, নিশ্চয়। তা নইলে এমন ক'রে কেউ নিজে উদযোগী হ'য়ে নিজের শূলদণ্ডের ঢেঁড়া পেটায়?

সূর্যপাল। তাছাড়া, মধ্যাহ্নে দেবরাজ যে পরিমাণ দই—আর মণ্ডা উদরসাৎ করেছে, শুনলাম, তার দ্বারা জীবনের প্রতি তার কিছুমাত্র অস্পৃহা অথবা শূলদণ্ডের জন্য কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা প্রমাণ হয় না।

চন্দ্রশীলা। তা হ'লেই বোঝা যাচ্ছে, তোমার আরোগ্যের বিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। (অভিবাদনান্তে) ঔষধ নিয়ে তান্ত্রিক মহাশয় উপস্থিত হয়েছেন মহারাজ!

সূর্যপাল। এখানে নিয়ে এস তাঁকে।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

চন্দ্রশীলা। জয় বাবা রুদ্রনাথ! দেবরাজের দেহ ধারণ করিয়ে ধন্বন্তরিকে পাঠাও।

(সুবর্ণপাত্রে লাল রঙের তরল পদার্থ সহ দেবরাজের প্রবেশ)

দেবরাজ। জয় হোক মহারাণী-মহারাজের!

চন্দ্রশীলা। (আসন ত্যাগ ক'রে উঠে) জয় হোক আপনার উপাধ্যায়জী!

দেবরাজ। (চন্দ্রশীলার হাতে ঔষধের পাত্র দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে হর্ষবিস্ফারিত নেত্রে ক্ষণকাল চন্দ্রশীলার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে) আহা, কী দেখলাম!

সূর্যপাল। কি দেখলে দেবরাজ?

দেবরাজ। দেখলাম, সুদূর ভবিষ্যতের এক অপরূপ চিত্র!

মহারাণীর মুক্তার মত দন্তগুলি সমস্ত প'ড়ে গেছে, মাথার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ কাশ-ফুলের মতো সাদা হয়েছে, আর তার মধ্যে জ্বল-জ্বল করছে লাল রঙের উজ্জ্বল সিঁদুর-রেখা! সাধ্য কি কোনো দুষ্টগ্রহ আপনার ক্ষতি করে!

চন্দ্রশীলা। জয় হোক্ আপনার দেবরাজজী! (আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে চন্দ্রশীলা দেবরাজের পদস্পর্শ করতে উদ্যত)

দেবরাজ। (তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে) হাত পরিষ্কার রাখবেন, রাণীমা, আপনার হাতেই ওষুধ দোবো।

চন্দ্রশীলা। (দু' হাত পেতে ভক্তি ভরে ঔষধ নিয়ে) কোথায় রাখব ওষুধ?

দেবরাজ। উপস্থিত ঐ পুষ্পাধারের পাশে রাখুন, পরে শয়ন-কক্ষে নিয়ে যাবেন।

সূর্যপাল। ঐ মঞ্চাসনে উপবেশন কর দেবরাজ!

দেবরাজ। (উপবেশন করে) মহারাজ, তিন দিন ঔষধ পান করলে আপনার দেহের রঙ যা উপস্থিত ব্যাধির আক্রোশে পাণ্ডুবর্ণে দাঁড়িয়েছে, এক পক্ষ কালের মধ্যে আমার ঔষধের মত লালচে বর্ণ ধারণ করবে।

সূর্যপাল। উত্তম কথা। এইবার ঔষধ পানের নিয়ম বল?

দেবরাজ। নিয়ম কঠিন নয়, কিন্তু খুঁটিনাটি কিছু আছে। মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

সূর্যপাল। বল।

দেবরাজ। রাণীমা, আপনিও ভাল করে শুনুন।

চন্দ্রশীলা। আজ্ঞে হ্যাঁ, শোনবার জন্য প্রস্তুত আছি।

দেবরাজ। আজ থেকে তিন রাত্রি আপনি মহারাণীকে আপনার দক্ষিণ পাশে নিয়ে এক পালঙ্কে পূর্বশিয়রে শয়ন করবেন। ঔষধের পাত্রটি সমস্ত রাত পালঙ্কের ঈশান কোণে রাখা থাকবে। প্রত্যূষে উঠে আমাকে ডাকিয়ে আনাবেন। আমি আপনাদের শয়ন-ঘরের বাইরে অলিন্দে অপেক্ষা করব। তার পর মহারাণী বাসি কাপড়ে আপনার হাতে ওষুধ দেবেন। আপনিও বাসি কাপড়ে পূর্বমুখে ব'সে সমস্ত ওষুধটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলবেন। তার পর আমাকে ডাকলে আমি ভেতরে গিয়ে আপনার বাঁ হাত ধ'রে ত্রৈরশন মন্ত্র পড়লে আপনার উদরস্থ ওষুধের সঙ্গে তান্ত্রিক মন্ত্রের একটা রাসায়নিক মিলন ঘটবে।

সূর্যপাল। তার পর?

দেবরাজ। তার পর আর কিছু না। আবার কাল সন্ধ্যায় আর এক পান ওষুধ দিয়ে যাব, যেটা ঠিক একই পদ্ধতিতে পরশু প্রত্যূষে খাবেন।

সূর্যপাল। ব্যস?

দেবরাজ। ব্যস। এমনি তিন দিন।

সূর্যপাল। আর কোনও নিয়ম নেই?

দেবরাজ। আর একটা মাত্র নিয়ম আছে। নিদিধ্যাসনে দেখা গেল আপনার এ ব্যাধির মূলে উষ্ট্রিকা দোষ আছে, ওষুধ খাবার সময়ে আপনি কদাচ উট মনে করবেন না। উট মনে করলে উপকার ত হবেই না, উলটে অপকার হবে। উট মনে পড়লে সেদিন আর ওষুধ খাবেন না।

সূর্যপাল। (সকৌতুকে) উট কি?

দেবরাজ। এই জন্তু উট। হাতী ঘোড়া উট বলে না! সেই উট। লম্বা গলা, পিঠে কুঁজ।

সূর্যপাল। আহা হা! অত ক'রে বলতে হবে না। আমার নিজের উটশালাতেই ত' হাজারো উট আছে। তার মধ্যে চুনডিনাথ নামে আমার খাস উট অনেক টাকা দিয়ে খাস আরব দেশ থেকে আনানো। না, না, উট মনে করব কেন? উট মনে করবার কি দরকার আছে?

দেবরাজ। কোনো দরকার নেই মহারাজ, কোনো দরকার নেই। বরং না মনে করবারই দরকার আছে।

চন্দ্রশীলা। তা ছাড়া মহারাজ, যে-কোনো কথা মনে রাখার চেয়ে ভুলে থাকা অনেক সহজ; সুতরাং এ নিয়ম সহজেই পালিত হ'তে পারবে।

সূর্যপাল। আর কোনও নিয়ম আছে দেবরাজ?

দেবরাজ। না মহারাজ, আর কোনও নিয়ম নেই। তবে একটা কথা আছে।

সূর্যপাল। কি কথা?

দেবরাজ। আপনার উষ্ট্রিকা দোষের কথা বা ঐ সম্পর্কে যে-কোনও কথা আমরা তিন জন ছাড়া চতুর্থ কোনও ব্যক্তির কানে যেন না প্রবেশ করে। তিন দিন পরে আপনি ভাল হওয়ার পর বলতে আর কোনও আপত্তি থাকবে না।

সূর্যপাল। এমনি হয়ত বলতামই না, নিষেধ ক'রে দিলে ভালই হ'ল।

দেবরাজ। রাণীমা, আপনিও যেন আপনার সহচরীদের কাছে—

চন্দ্রশীলা। না, না, সে কি কথা! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমাদের দু'জনের দ্বারা এ কথা কারো কাছে প্রকাশ হবে না।

দেবরাজ। কাল সকালে ওষুধ খাবার আগে আমাকে ডাকিয়ে আনাবেন। আচ্ছা, এখন তা হ'লে আসি?

সূর্যপাল। এস।

দেবরাজ। জয় হোক রাণীমার, জয় হোক মহারাজের!

[অভিবাদনান্তে প্রস্থান।

চন্দ্রশীলা। আমি নিঃসন্দেহ মহারাজ, আর দিন তিনেক পরে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হবে।

সূর্যপাল। আমারও আশা হচ্ছে। ঐ যে বললে ওষুধ খাওয়ার পর আমার বাঁ হাত ধ'রে কি-একটা মন্ত্র পড়বে, ঐটেই আসল কথা। ঐখানেই হবে ভেষজের সঙ্গে তন্ত্রের যোগসাধন।

[ক্রমশঃ

থকে ছাল ছাড়িয়ে শুধু ভিতরের নরম রসভরা অংশটা দিয়ে ক্ষীর-মসা করতে পারেন। ছানার জল দিয়ে বা ফিট্‌কিরি দিয়ে বা লেবুর রস দিয়ে ছানা কাটাতে পারেন। ছানা শুধু খেতে পারেন, চিনি দিয়ে খেতে পারেন। ছানা-চিনি চট্‌কে বা বেঁটে রস দিয়ে সন্দেশ করতে পারেন। ছানার ডালনাও বেশ হতে। তা ছাড়া ছানার পোলাও, ছানার মুড়কি, ছানার জিলিপী, এ-সব করতে পারেন। নরম ছানা দিয়ে লেডিকেনি বেশ হয়।

সরলা বলিলেন, আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত থাক। যা বললেন, সবটা ভাল করে শিখে নি। তার পরে দরকার হলে রং—

হ্যাঁ। দরকার হলে আবার একটা 'কল' দেবেন। আর একটা কথা বলি, যদি ওই সমস্ত রান্না রেঁধেও পাঁচ-সাত সের দুধ উদ্বৃত্ত য়, তাহলে কচি ছেলেমেয়েগুলোকে তাতে চান করিয়ে দেবেন। গায়ের চর্ম খুব নরম ও মসৃণ হবে।

হাঁ, তাই করব। ভাগ্যিস আপনি এসেছিলেন, নইলে কি যে করতুম এত দুধ দিয়ে!

মিস পাল তাঁহার ফি লইয়া প্রস্থান করিলেন। সরলা দুধের কলসী কাঁখে করিয়া রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

৪

এমনি 'কল' মিস পাল প্রায় প্রত্যহই পান। 'কল' আসে সাধারণ মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে। যাঁহারা ধনী, তাঁহাদের দক্ষ পাচক-পাচিকা আছে। তাঁহাদের কাছে মিস পালের প্রয়োজনীয়তা খুবই কম।

'কল' পাইয়া মিস পাল কখনো দেখেন, প্রকাণ্ড একটি ঝুড়ি সামনে করিয়া বাড়ীর গৃহিণী গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। ঝুড়িতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ ফল—আম, আনারস, কলা, আপেল, আঙুর, বেদানা, নারিকেল, আতা, পেয়ারা, তাল, আরো কত কি! কিন্তু ওগুলি দিয়া কি করিতে হয়, কেমন করিয়া খাইতে হয়, তাহা জানিতে না পারায় প্রত্যহ রাশি রাশি ফল নষ্ট হইয়া যায়। মিস পাল সুপরামর্শ দিয়া এগুলির আহারের ব্যবস্থা করেন। আবার কোন বাড়ীতে গিয়া দেখেন, ঘি, মাখন, ছানা, ক্ষীর, পর্য্যাপ্ত পরিমাণেরও অধিক আসিয়াছে, অথচ ওগুলি কিরূপে রন্ধনাদিতে ব্যবহার করিতে হয়, তাহা জানা না থাকায় গৃহিণী ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছেন। মিস পাল তাঁহাদিগকে সৎ পরামর্শ দেন। এমনি করিয়া মিস পালের কর্মতৎপরতায় শত শত সহস্র সহস্র গৃহস্থ পরম স্বস্তি ও শান্তি লাভ করিয়াছেন।

একদিন একটি 'কল' পাইয়া মিস পাল গিয়া দেখেন, একটি ঘরে নবনী নামে এক নববিবাহিত যুবক একখানি চেয়ারে পিছনের দিকে একটু হেলান দিয়া বসিয়া আছে। মুখখানি অমাবস্যার রাত্রির মত অন্ধকার। এই ছেলেটিকে দেখাইয়া দিয়া ইহার একটি নিকট-আত্মীয় ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন। মিস পাল ছেলেটির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে?

নবনী বলিল, আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। ওঁরা জোর করে ধরে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। বলিয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

মিস পাল বলিল, এতে কাঁদবার কি হ'ল?

আমি যে কিছুই জানি নে!

মিস পাল বলিলেন, এটা অতি পুরাতন কথা। আমাদের দেশে যে বিবাহ-সমস্যা এসে দেখা দিয়েছে, এই যে ছেলেরা মেয়েরা বিয়ে করতে চায় না, এ সবের এক মাত্র কারণ অজ্ঞতা। বিবাহ কি, প্রেম কি, স্ত্রীকে কি বলতে হয়, কি বলতে হয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে অজ্ঞতাই আমাদের সামাজিক জীবনের প্রধানতম সমস্যা। অথচ, এ সব শিক্ষার জন্য না আছে একটা কলেজ, না আছে একটা বিশ্ববিদ্যালয়। এই জন্যই তো আমার এ ক্ষুদ্র জীবনের এই বিরাট সাধনা। যাক, এখন বল, তোমার কি প্রশ্ন?

কি প্রশ্ন ক'রব, তাই তো জানিনে। প্রথম দেখা হ'লে কি বলব?

একজ্যাকৃটলি। প্রথমে কি বলতে হয়, তা না জানার জন্যই এদেশের এই বিরাট বিবাহ-সমস্যা। সবই তোমাকে বলছি। একটু কাছে এস।

মিস পাল নবনীকে পাশে বসাইয়া কানে কানে অনেক কথা বলিলেন। নবনী কখনো গম্ভীর হয়, কখনো ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলে, কখনো লজ্জায় গাল দুটো পাকা টমাটোর মত লাল হইয়া উঠে। বেশ খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর মিস পাল বলিলেন, এইজন্যই এদেশে এত সমস্যা, আর কোন সমস্যাই নাই বিবাহ-জগতে। যাক, এবার তোমার স্ত্রীকে একটু ডেকে আন।

নবনী গিয়া তাহার নবপরিণীতা স্ত্রীকে মিস পালের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। মিস পাল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা কর।

আমার কোন প্রশ্ন নেই।

ভারি ডেঁপো মেয়ে দেখছি!

আমাদের আসল সমস্যার কাছেও আপনারা যান না।

ওরে বাপ!

আঁৎকে উঠলেন যে? এই কথা বলিয়া বধূ উঠিয়া গেল।

নবনী ফিরিয়া আসিয়া মিস পালকে তাঁহার প্রাপ্য ফি দিয়া নমস্কার করিল।

মিস পাল বলিলেন, এই কনজুগাল সায়েন্স না শেখার জন্যই আমাদের দেশ অধঃপাতে যাচ্ছে। সিনেমা, ফুটপাথের বই এবং সাময়িক পত্রিকাদিতে বিশেষজ্ঞদিগের চিত্তোত্তাপবর্ষিণী রচনা, এগুলি অতি অপ্রচুর। এজন্য আমাদের মত বিশেষজ্ঞদের বিশেষ প্রয়োজন। আচ্ছা, আসি। আমি শীগগিরই কনজুগাল কলেজের একটা বিস্তারিত খসড়া করে জনসাধারণের কাছে টাকার জন্য আবেদন ক'রব। তখন তোমাদের সাহায্য চাই।

নবনী কি যেন বলিতে যাইতেছিল। সহসা ঘরের অপর দিকে নববধূর রোষকষায়িত চোখ দেখিয়া নির্বাক হইয়া রহিল।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধারণ মানুষ থেকে ওরা যেন অনেক দূরে। এই সাধারণ মানুষ যুগে যুগে দেশে যারা দশ জনের এক জন, তাদের পাঠিয়েছে। আর বড়ো মানুষেরা পাঠিয়েছে বড়ো চাকুরে। একথা বলেছিলো ওদের দিদিমণি মিস শীলা, যে দিদিমণি বলা পছন্দ করে। যীসাস্ এসেছিলেন সাধারণ মানুষদের মধ্যে! আরো একজন সিষ্টার বলেছিলো মানুষের কাজে লাগো। প্রতিবেশীকে দেখো।

মীরাদের প্রতিবেশীদের দেখবার উপায়ই নেই! তারা দরজা বন্ধ ক'রে বসে থাকে। বিপদেও নেই, সম্পদেও নেই। বিপদের দিনে ড্যাডির সাহেবী প্যাটার্ণের বন্ধুরা শুধু খোঁজ-খবর নেয়, ডাকতে হয় সেই বাগবাজারের বাড়ীর ছেলেদের।

ঐ বাড়ীর একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হল মীরার। শেখর ওর নাম। এ বাড়ীতে একদিন বেড়াতে এলো বাসে ক'রে। বললে, কলকাতার সঙ্গে যদি পরিচিত হ'তে চাও, তবে কলকাতার বাসে উঠতে হবে। প্রাইভেট বাস, ষ্টেট বাস। লেডিজ সীট নেই বলে কণ্ডাক্টর চেঁচাচ্ছে, তবু লেডিরা উঠবে। উঠবে শুধু নয়, রড ধরে দাঁড়িয়ে যাবে। হাসিমুখে। অসময়ে কালীঘাট চলেছে, অফিস টাইমে। অফিসের বাবুরা প্যান্ট-কোট পরে পান চিবুতে চিবুতে রাজনীতি আলোচনা করতে করতে চলেছে। তার মধ্যে স্কুল-কলেজের ছেলেরা উঠবে। দু'পা হাঁটবে না। বিপজ্জনক ভাবে ঝুলতে ঝুলতে যাবে। সবাই হাসিমুখে। এই কলকাতার বৈশিষ্ট্য। ভাবনা অনেক। কিন্তু ভাবে না ওরা।

ভাবনা এলে কি করে শেখরদা'? মীরার প্রশ্ন।

সিনেমায় লাইন দেয়। থিয়েটারে ঢোকে। থিয়েটারের সাত টাকার টিকিট যারা কিনে সীটগুলো ভরিয়ে দেয়, তারা সবাই বড়লোক নয়। মধ্যবিত্ত ঘরের অনেকে আছে। যায় সারা দুপুর বসে ক্রিকেট খেলা দেখতে। বুড়োরাও যায় সার্কাস, ফুটবল, গানের জলসায়। কালীঘাটে, দক্ষিণেশ্বরে বেলুড়ে ভিড় করে নানা ধরণের লোক। সংলোকও আসে। অসৎও আসে।

দেখেছিলো বটে মীরা ৩১শে ডিসেম্বর চিড়িয়াখানার ভিড়। মোটর থেকে নেমে লাইন দিতে হয় এক মাইল। মীরা বুঝতে পারলো না ঐ দিনে জু দেখতেই হবে, এমনই বা কি মানে আছে? যে কোনো দিন ত' নিরিবিলিতে দেখা যায়। মীরারা ফিরে এসেছিলো।

১লা জানুয়ারী গিয়েছিলো বটানিক্যাল গার্ডেনে। শিবপুরে। গঙ্গার ধারে। সেখানে ওরা লাঞ্চ নিয়ে গিয়েছিলো। ব'সে খাবার মতন কোনো দুর্বা ঘাসে ভরা জায়গা ছিলো না। সর্ব্বত্র লোকের ভিড়। সভ্য লোক, অসভ্য লোক।

শেষ পর্য্যন্ত গঙ্গার ধারে, যেদিকে নদীর শোভা দেখবার জন্যে বেশী কেউ নেই, সেইখানে ব'সে ওরা খাবার খেয়ে নেয়।

শেখর বললে, দক্ষিণেশ্বরে মেলা হয়। মন্দিরে যত না লোক তার বিশগুণ লোক দোকানে, মাঠে।

জুতো পরেই সব প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ছে। মানছে না যে জুতো পরে ফটক পার হওয়া নিষেধ। জুতো রাখবার জন্যে লোককে দু'-চার পয়সা দিতে হয়। সেই লোকেরা নম্বর-মারা টিকিট একটা তোমার জুতোর মধ্যে রাখবে, একটা তোমার হাতে দেবে।

তুমি যদি সেই খরচটুকুও না করতে চাও, তোমার মন্দিরে আসা উচিত নয়। তুমি যা খুসি তাই করতে পারো না পরমহংসদেবের লীলাভূমিতে।

ভিড় বলে হ্যাঁ, পারি।

পুলিশের উচিত ওদের ঢুকতে না দেওয়া।

কিন্তু পুলিশ কত দিক দেখবে? অসংখ্য চোর চারি ধারে ঘুরছে, কারুর হার ছিঁড়ে নিচ্ছে, কারুর কানের দুল ছিনিয়ে নিচ্ছে, কারুর আঁচল কেটে টাকা নিয়ে পালাচ্ছে।

বাসে বেশী কাণ্ড। শেখর বলে, প্রাইভেট বাসগুলোর বেশী আলো নেই, অন্ধকার, তার মধ্যে পকেট-কাটা উঠবেই। এক জন নয়, অনেক জন। কণ্ডাক্টর তাদের চেনে। কিছু বলে না। সাবধান ক'রে দেয় না। তারা কারুর না কারুর পকেট চিরে ব্যাগ নিয়ে বাজারের কাছে নেমে যাবেই। এ পথে মণিব্যাগ নিয়ে যেতে নেই। কোনো বাসেই যেতে নেই, যে বাস অন্ধকার। ভদ্রবেশী, ধুতি-পাঞ্জাবি সার্ট-কোট-প্যান্ট পরা সাপের মতন বিষাক্ত এই সব মানুষেরা মানুষের ক্ষতি করবার জন্যে সব জায়গায় ঘুরছে।

মীরা বলে, শহরের সব জায়গায় তা'হলে

তা ত' আছে, আবার আনন্দও আছে। অনেক ভালো লোক, অনেক ভালো কথা, অনেক ভালো গান, তাও ত' চলেছে এই শহর ভ'রে। যেদিকটা মলিন, নোংরা অন্ধকার, সেদিকের সম্পর্ক ছেড়ে তুমি যদি যাও যেদিকে আলো আনন্দ আর শিক্ষা, তবেই পাবে এই শহরের সত্যি পরিচয়।

ঝাপসা পরিচয় শহরের সঙ্গে তার হয়েছে, এখন মীরা চায় স্নেহ। মীরা চায় ভালোবাসা। এদের বাড়ীর যে ভালোবাসা তা যেন পালিশকরা, তার মধ্যে যেন প্রাণ নেই। এ যেন ভদ্রতা। এখানে মায়া নেই।

তাই এখানে অসুস্থ হ'লে মোটা ফী-এর বড়ো ডাক্তার আসে, দামী ওষুধ আসে, সুশ্রী নার্স আসে, টেম্পারেচার লেখা হয়, পথ্য ঠিক ঠিক পড়ে, কিন্তু সংমাও যা করত, পিসিমা যা করত, সেই মাথায় ঠাণ্ডা হাত দিয়ে জিগ্যেস করা নেই, আজ কেমন আছিস? না, জ্বর ছেড়ে গেছে। এবার ময়দার রুটি আর সিঙ্গি মাছের ঝোল।

শেখর বলে, নাই বা তা রইলো, কিন্তু আরামে তুমি আছ! মোজেক-এর সিঁড়ি, মার্বেল পাথরের মেঝে, তার ওপর গালচে কার্পেট, কত আর্শি, কত পাখা, একটা ঘরেই ক'টা আলো। আজ কি খাব, কাল কি বাজার হবে—দিন চলবে কি করে, এখানে ওখানে যাব কি প'রে, এ সব কিছুই ভাবতে হয় না, এক কথায় দুর্ভাবনা ব'লেই কোনো জিনিস এখানে নেই। এই বা কম কি?

দুর্ভাবনা নেই, কিন্তু ভাবনা আছে শেখরদা', দিন কাটবে কি ক'রে। সকাল থেকে রুটিন বাঁধা শোয়া-বসা চলা-ফেরা খাওয়া-বেড়ানো—রেডিয়ো শোনো, ইংরেজী ছবির বই দেখো, পরিচিত কাউকে ফোন করো—কিন্তু ঐ যে চঞ্চল শহরের কথা বললে, তার কত নতুনত্ব, কালকের সঙ্গে আজকে মেলে না, এখানে ভাই, তা পাবে না। এখানে সোমবারের সঙ্গে মঙ্গলবারের কোনো তফাৎ নেই।

মীরার কথা শুনে শেখর অবাক্! তাদের সংসারে সব দিন মাছ আসে না, দুধ সকলে খায় না—আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের মিল্ করবার জন্যে কর্তাদের সঙ্গে গিন্নীদের নিত্য পরামর্শ। দুঃসময়ের আগুনের যে আঁচ, তা খানিক খানিক ছোটদের গায়ে এসেও লাগে বৈ কি!

কলেজে স্কুলে একসঙ্গে তিন মাসের মাইনে দেওয়া, নতুন বই কেনা, মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে ত বটেই, পড়ানোর ব্যাপারেও কত রকম কথা ওঠে, তা ত ওরা শুনতে পায়।

সে জায়গায় এখানে একটা বাবুর্চির পঞ্চাশ টাকা মাইনে, চাকরের চল্লিশ টাকা, ঠাকুরের পঞ্চান্ন টাকা, আয়ার চল্লিশ টাকা, ড্রাইভারের একশ' পঞ্চাশ টাকা, এ সব শুনে শুনে ত' মনে হয় এরা খুব সুখী।

কে যেন বলছিলো, এন রায়-চৌধুরীর সংসার-খরচ মাসে তিন হাজার টাকা।

এতেও যদি সুখ না থাকে, তবে সুখ কোথায়?

বুদ্ধদেবও বলেছিলেন রাজত্বে সুখ নেই, তাই রাজ্য ছেড়ে চলেই গিয়েছিলেন, মীরা কি তাই বলতে চায় না কি? না কি গরীব ঘরের মেয়ে বড়লোকের বাড়ীতে এসে তার মূল্য বুঝতে পারছে না!

কাঁথির পিসিমা এসেছেন। এখন থাকেন কাশীতে। তবু নাম কাঁথির পিসিমা। কোন যুগে হয়ত কাঁথিতে ছিলেন, সেই থেকে নামটা র'য়ে গেছে।

তিনি এসেই বললেন, ম্লেচ্ছাচার আমার সইবে না। বৌ, আমায় গঙ্গাজল আনিয়ে দাও। পুজোর জায়গা ঠিক করে দাও। তোমার বাবুর্চি-টাবুর্চি যেন সেদিকে না আসে।

বৌ ত মানে খুব দেখা গেল। কাঁথির পিসিমার কাছে আর 'মেমসাব' নয়, ও সব চালাকী চলবে না। কাঁথির পিসিমার কাছে শুধু 'বৌ'।

কেন জানি না, সাহেবও খুব খাতির করলো। এই কাঁথির পিসিমা না-কি ভাইপো যখন ছোট ছিল, তখন কোলে-পিঠে নিয়ে অনেক যত্ন করেছেন। কত সুন্দর সুন্দর গল্প বলেছেন।

সেই সব দিনের কথা না কি কিছুতেই ভোলা যায় না। তাই না কি কাঁথির পিসিমার জন্যে পুজোর জায়গা ঠিক হল ওধারে, যে কাপড় ছাড়ার ঘরটা ছিল, সেইটা পরিষ্কার করে। একটা পাথরের জলচৌকি দেওয়া হল। তাইতে কাঁথির পিসিমা পাথরের শিবলিঙ্গ রাখলেন, ছোট্ট এতটুকু ফিকে নীল পাথরের। কাশী থেকে কেনা। রাখলেন তাঁর কষ্টিপাথরের গোপালকে।

কী সুন্দর ধূপ এনেছেন সেখান থেকে! চন্দন-ধূপ, কস্তুরী-ধূপ। লক্ষ্মীনারায়ণের একখানি বাঁধানো ছবি টাঙালেন সামনের দেয়ালে পেরেক মেরে।

দেখতে দেখতে ঘরের কোণটি যেন নতুন রূপ নিলো। সমস্ত ঘরখানাই যেন বদলে গেল। তার মার্বেল পাথরের মেঝে ধুয়ে-মুছে চকচকে ক'রে ফেললেন। ধূপ-ধুনোর গন্ধ, শাঁখ আর ঘণ্টার ধ্বনি, ফুলের শোভা আর মৃদু সুবাসে মনে হল যেন মন্দির।

গরদের কাপড়, ভিজে চুল পিঠে ছড়ানো। কাঁথির পিসিমার এত বয়স হয়েছে, তবু কী শক্ত, কী সুন্দর দেখতে!

মীরার ইচ্ছে করছে তাঁকে সাহায্য করতে। তিনি ডাকেন নি। তাই এগোতে সাহস করছিলো না।

তার পর হঠাৎ একবার ডাকলেন। কোনো পরিচয় জিগ্যেস করলেন না। যেন সব জানা। জানতে চাইলেন না, তার কাপড় কাচা কি না।

বললেন, পাশে এসে বোস্। তারপর প্রসাদের সন্দেশ নিয়ে বললেন, নে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কী সুন্দর তিনি প্রণাম করলেন!

বললেন, স্তোত্র শিখবি?

মীরা জোরে ঘাড় নাড়লো এক্ষুণি। যেন সে অপেক্ষা করতে পারছে না।

কাঁথির পিসিমা বললেন, আমি যেমন সুরে বলি, তেমনি বলবি। কেমন?

মীরা রাজী।

উনি ব'লে চললেন,

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে!
ত্রিভুবনতারিণি তরল-তরঙ্গে।

উনি থামলে মীরা ধরলো। ঠিক হচ্ছিলো না, 'তরলত' ব'লে মীরা থেমে যাচ্ছিলো।

উনি আবার সঙ্গে সঙ্গে গাইতে বললেন।

শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে!
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে।

মীরা শঙ্করমৌলিনি ব'লে থেমে যাচ্ছিলো। সংস্কৃত ত' জানে না, মানেও জানে না। গোলমাল হবেই ত!

কাঁথির পিসিমা খালি হাসেন। রাগ করেন না। বলেন, হবে তোর। একদিনে কি আর হয়। আবার ওবেলা বসবি আমার সঙ্গে। তোকে আমি 'প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং' শিখিয়ে ছাড়ব।

ওবেলা বসবে কি? মীরা যাবে কোথায়? তার ত খালি পিসিমার সঙ্গে ঘুরতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু না, মুস্কিল আছে। স্কুল না হয় আজ বন্ধ। কিন্তু মেম ঠিক্ পড়াতে আসবে। তাছাড়া ঠিক্ ঠিক্ সময়ে নাওয়া-খাওয়া এ বাড়ীতে করতেই হবে। এবাড়ীর বামুন-চাকর কারুর জন্যে বসে থাকে না।

পিসিমা না হয় স্বপাক রান্না করবেন। তাঁর কত বেলা হল, কারুর দেখবার দরকার নেই। তবু এক ফাঁকে ও কাঁথির পিসিমার কাছে এলো। এসে বললে, দিদু, কি রাঁধলেন দেখি?

কালো পাথরের থালায় পিসিমা ভাত বাড়ছিলেন, আলোচালের ভাতগুলো সমুদ্রের ফেনার মতন শাদা, আর ডাল-ভাতে, কাঁচকলা-ভাতে, বেগুন ভাতে, আলু-ভাতে আর কুমড়ো ছেঁচকি।

খাবি? খিদে পেয়েছে দুপুরবেলা? তোদের ত আবার লাঞ্চ খাবার সময় হল।

না দিদু, লাঞ্চ খাব না। আপনি দিন একটু একটু ক'রে।

একটু একটু ক'রেই তিনি দিলেন কালো পাথরের রেকাবিতে। এ সব পাথরের বাসন গয়া থেকে কেনা। উনি বললেন। গয়ার কুচকুচে কালো পাথরের পাহাড়গুলো যেন মীরার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ফল্গুনদীর সোনালী বালির ধারে ধারে কালো কুচকুচে পাহাড়ের মালা না কি?

ভাতের সঙ্গে উনি ঘি দিলেন। এটোয়া থেকে আনিয়েছেন। কী তার সুগন্ধ! কী তার স্বাদ!

সেদিন পড়ন্ত রোদের দুপুরবেলায় ঘুঘুডাকা নিস্তব্ধতায় কালো পাথরের রেকাবিতে কাঁথির পিসিমার রান্না আলোচালের ভাত ভাতে-ভাত দিয়ে খেতে খেতে মীরার মনে হল যেন অমৃত খাচ্ছে। তার পিসিমার রান্না এত সুন্দর নয়। ফোড়নগুলো যেন অন্য। রান্নার হাতটাই যেন আলাদা।

এ বাড়ীর কোনো রান্না এ রান্নার কাছে লাগে না। তার পরে উনি দিলেন একটু ক্ষীর, আর মর্ত্তমান কলা। তাই দিয়ে শেষপাতের ভাতগুলো কী চমৎকার লাগলো!

বাঙালী মেয়ের মুখে ক্রীম, পুডিং, কেক্, স্যাণ্ডউইচ, কী নিরমিষ্যি রান্নার মতন ভালো লাগতে পারে?

পূজোর ঘরের কোণেই কাঁথির পিসিমা তাঁর বিছানা পাড়লেন মাটিতে। ঠাকুরের দিকে যেন পা হয় না, দরজার দিকেও না। জানলার দিকে হবে।

সন্ধ্যেবেলার পড়া হ'য়ে গেলে নীল আলোজ্বালা সেই ঘরে ঠাণ্ডা বিছানার লোভে মীরা এলো। ফ্রক বিকেলের পরা। সেই ফ্রক পরে বিছানা ছোঁয়া যাবে কি না সে ভাবছিলো। কাঁথির পিসিমা ডাকলেন, নাত্নী আয়। দাঁড়িয়ে কেন? ভাবছিস বিছানা ছুঁবি কি না? আয়, কোন দোষ নেই।

দিদুর কাছে ও শুলো। বাগানের ঝাউগাছগুলো কাঁপিয়ে মিষ্টি হাওয়া আসছে বারান্দায় ধাক্কা খেয়ে। নীল আলো-জ্বালা ঘরে কাঁথির পিসিমার মুখে কাঁথির গল্প, কাশীর গল্প শুনতে শুনতে মীরার মনে হল, সমুদ্রের কিনারা থেকে কত দূর পর্য্যন্ত মাটি ছড়িয়ে আছে কত বিচিত্র দেশে। কতটুকুই বা তার দেখা হল? আর শুধু চোখে দেখে কতটুকুই বা জানা যায়?

সমুদ্র ত কত লোক দেখেছে। যে পুরীতে গেছে, সে-ই দেখছে। অন্য অন্য দেশেও হয়ত সমুদ্র আছে। কিন্তু মীরা যেমন ক'রে সমুদ্রের সমস্ত রূপ, সমুদ্রতীরের সমস্ত জীবনযাত্রা ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছে, তেমন ক'রে সমুদ্রকে জেনেছে কি তারা? যারা জগবন্ধু দর্শন ক'রে দু-এক দিন সমুদ্র-স্নান ক'রে দেশে ফিরে গেছে?

তেমনি কাঁথি, কাশী, দার্জ্জিলিং, শিলং, চেরাপুঞ্জি এ-সব দু-চার দিনে বা দু-চার মাসে কিছুই শেষ করা যায় না।

কলকাতা ত যায়ই না। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মেলা দেখতে গিয়েছিলো মীরা স্কুলের অন্য মেয়েদের সঙ্গে।

হঠাৎ লীলা একজন শিক্ষয়িত্রীকে ব'লে মীরাকে নিয়ে চললো তাদের বাড়ী দেখিয়ে আনবে ব'লে। বললে কাছে। হেঁটেই যাওয়া যাবে।

মল্লিক সার্কেল দিয়ে ওরা ঢুকলো, তার পর অক্রুর দত্ত ষ্ট্রীট, তার পর কি একটা রাস্তার নাম দেখতে পেলে না, এলো বাঞ্ছারাম অক্রুর ষ্ট্রীটে, তার পর মল্লিক ডিস্পেন্সারি লেন, পঞ্চাননতলা, হিদারাম ব্যানার্জ্জী লেন, বাঁকা রায় ষ্ট্রীট, রামকানাই অধিকারী লেন দিয়ে শশিভূষণ দে ষ্ট্রীটে পড়লো। বড়ো বাড়ীর একটা ফ্ল্যাট লীলাদের।

কিন্তু এই পথটুকু যেতে কত অসংখ্য বাড়ী, কত সেকালের, কত একালের, কত অন্ধকার ঘর, কত আলো-ভরা বারান্দা, কত মন্দির, কত পাঠশালা যে পেলো, বলবার নয়! এক একটা রাস্তায় যদি বড় মোটর ঢোকে, আর ওদিক থেকে একখানা রিক্স আসে, উপায় নেই পাশ কাটাবার। অথচ এই গলিগুলির প্রত্যেক বাড়ীতে বিয়ে-থা খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, কত গাড়ী দাঁড়িয়েছে, কত লোক এসেছে, কত বৃষ্টির জল জমেছে—কি ক'রে কি হয়েছে, ও ভেবে পেলো না। এই সামান্য পল্লীর অসংখ্য ঘরে কত লোকের মনে কত সুখ-দুঃখের খেলা—অত লোক হয়ত একটা বড়ো গ্রামেও নেই। যা আছে বৌবাজার-এর এই সামান্যতম অংশে—এই যদি কলকাতার হাজার ভাগের এক ভাগ হয়, তাহ'লে মহানগরীর সম্পূর্ণ ছবি কি কল্পনা করা যায়?

এ কথা দিদুকে বলতে তিনি হাসলেন। বললেন—কাশীও অনেকটা এম্নি, তার সরু সরু গলির দু'ধারে আকাশ-ছোঁয়া পাথরের বাড়ী। কলকাতায় ত' ইট, কাঠ, বালি, পাথর নেই।

এর মাঝে এক দিন ওর বাবা দে-মশাই, মা আর পিসিমাকে নিয়ে এলো। তারা ত মীরাকে দেখে অবাক্।

কলকাতায় থেকে মীরার রং খুব ফর্সা হয়েছে, তার ওপর নানা রকম সাজসজ্জা ক'রে দেখাচ্ছে যেন মেম। মেমের মতন সাজ পোষাক। গলাটাও যেন কেমন বদলে গেছে। যেন মাজা-মাজা। দাঁড়াবার ভঙ্গী, বসবার ভঙ্গী—সব নতুন নতুন। কায়দামাফিক। ড্রয়িংরুমে সোফায় সেটিতে ওদের বসিয়ে প্রত্যেককে চা আর অনেক জলখাবার দিলে। ওরা বেসিনে কল খুলে হাত ধুলো।

মীরা ও-পিসিমা ও-পিসিমা ব'লে ছুটে এলো না। যদিও কাঁথির পিসিমার কাছে দিদা দিদু ব'লে ছেলেমানুষের মতন ছুটে যায়।

আসলে ওর মনে হয়েছিলো, ওরা আমার পর ক'রে দিয়েছে। ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়েছে। এই রকম মনে হলে অভিমান আসা স্বাভাবিক। মিসেস্ চৌধুরী এসে সুর ক'রে বললে—নমস্কার! মুখে হাসি। যেন কত আন্তরিকতা। আবো বললে, বড়ো খুসি হয়েছি আপনারা আসাতে। মেয়েকে ত একখানা চিঠি লিখেও খোঁজ করেন নি। এতে ওর মনে দুঃখ হ'তে পারে ত'?

ওর বাবা বললে, তা ত' পারে। কিন্তু দেখুন চিঠি-লেখাটেখা আমাদের কারুরই আসে না। জানি, আপনাদের কাছে আছে, ভালোই আছে। দেখছি ত', বলতে নেই—মেয়ে আমার সুখেই আছে।

তা আছে। মুস্কিল হচ্ছে, ওর এমন একটা সঙ্গী নেই বাড়ীতে, যার সঙ্গে গল্প-টল্প করে। এসেছেন ক'দিন আমাদের এক পিসিমা, বয়স তাঁর অনেক, কিন্তু সম্পর্ক ঠাকুমা। দেখছি তাঁর সঙ্গে বেশ মিল হয়েছে। যখনি ফুরসৎ পাচ্ছে, গিয়ে জুটছে তাঁর কাছে। যে ক'দিন তিনি থাকেন, বুঝছি—ওর কাটবে ভালো। কিন্তু আপনারা কোথায় উঠেছেন?

এ প্রশ্নে ওর বাপ-মা বড়ো অসুবিধায় পড়লো। পিসিমা ত' হাঁ ক'রে বাগানের দিকে চেয়ে রইলো।

উপস্থিত ওরা উঠেছে কালীঘাটে এক ধরমশালায়। সেখানে মালপত্র রেখে ৺কালী দর্শন ক'রে কিছু তেলেভাজা খেয়ে এখানে এসেছে।

আশা ছিল, এরা বলবে এখানে থাকতে। তার পর বিছানাপত্র আনিয়ে নিলেই চলবে। এ বাড়ীতে ত অনেক ঘর দেখা যাচ্ছে।

তবু মীরার বাবা বললে, উঠেছি ধরমশালায়। আপনার এখানে দু'-চার দিন থাকা বুঝি চলবে না?

না—না, আমার এখানে হবে না। হলে ত' ভালোই হত।

ওরা উঠলো।

মিসেস্ চৌধুরী ব'লে দিলে, যে ক'দিন আছেন, রোজ একবার ক'রে মেয়েকে দেখে যাবেন। যখন খুসি।

সুখে থাকুক মেয়ে ঐশ্বর্যের মধ্যে। বাপ-মা-পিসিমার যে দুঃখ সেই দুঃখ।

ওরা চ'লে গেল।

বাগানের গাছে গাছে ঘরে-ফেরা পাখী ফিরলো সন্ধ্যেবেলায়। কাঁথির পিসিমা দক্ষিণের বারান্দায় জপে বসেছেন। বললেন, মীরা, তোর বলা উচিত ছিল তোর মামীকে—অন্ততঃ একদিনের জন্যে ওরা এখানে থেকে যাক্।

আমি কি ক'রে বলব দিদা, আমি কিছু বলতে পারি না।

ছোট ভাই দুটো এসেছিলো, তাদের হাতে তোর একটা খেলনাও দিলি না?

ও কথা মনে হয়নি।

মনে করতে হয়।

কাঁথির পিসিমা অন্য ধরণের চিন্তা করেন।

তাঁর আর এক ভাইপো এলো বিরাজ, সেদিন বিকেলে। বললে, পিসিমা, তোমার গোপালকে একটু বলো, আমার ভালো চাকরী করে দিন।

কি হল তোর? যে কাজ করছিলি?

সে কাজে উন্নতি নেই। ওপরওলা আমার ওপর চটা। আমাকে ডিঙিয়ে বাজ্যের লোককে ওপরে তুলে দিচ্ছে। আমার ওপর যত রাগ। আমিও এম-এ। আমি পাচ্ছি না, পাচ্ছে, আই-এ ফেল, বি-কম ফেলরা। এত অন্যায় সহ্য হয় না। শত্রু আমার চারি দিকে।

শত্রু তোর কেউ নয় বিরাজ। গ্রহ প্রতিকূল এখন ভগবান ত' নিজে শাস্তি দেন না, গ্রহকে দিয়ে দেওয়ান। রোগ, শোক, অপমান, পরাজয়, ব্যর্থতা কার জীবনে না আসে? সকলের জীবনেই আসে। ভগবানকে ডাকলে শুধু সহ্যশক্তি তিনি দেন, শাস্তি কমাতে পারেন না কমান না। মানুষ মানুষের ক্ষতি করতে পারে না, মানুষকে দিয়েই গ্রহ করায় যা করবার। তুই কারুর ওপর রাগ রাখিস নি। সময় যখন ভালো আসবে সব দিক থেকে তোর ভালো হবে। গোপাল এখন তোমাকে রাতারাতি কি ক'রে রাজা করে দেবেন? তাহ'লে তোমার কর্মফল কে ভুগবে? মানুষ কিছুই নয়। মানুষের ওপর রাগ রাখিসনি। তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে। মঙ্গলময় তিনি। [ক্রমশঃ।

কিস্‌মত কি খেল্

দেবদত্তা রায়

বাগদাদ শহরে বাস করত শাদ আর শা'দী, দুই বন্ধু। শিশু-বেলার খেলার সাথী, বড় হয়েও সেই বন্ধুত্বের কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। টাকার অভাব দু'জনের কারুরই ছিল না, কাজেই কেউ কারুর ধার ধারত না বলেই সম্ভবত বন্ধুত্বে ফাটল ধরেনি এ পর্যন্ত। এ-হেন হরিহরাত্মার মধ্যে মতের গরমিল এতদূর গড়াতে পারে যে এক জনকে দেখে আরেক জন মুখ ফিরিয়ে চলে যায়—এটা পড়শীরা কেউ আশা করতে পারেনি। কিন্তু এমন অসম্ভবও সম্ভব হতে দেখা গিয়েছিল একবার, আর সেই কাহিনীটাই আজ তোমাদের শোনাব।

আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, খোশমেজাজে গল্পগাছা করতে করতে হঠাৎ শাদ বলে বসল, "ভাগ্যের উপর কারো টেক্কা চলে না হে, এই যে একজন ভিক্ষে করে আর আরেক জন টাকার গদীতে শুয়ে পড়ে এ সবই হলো ভাগ্য—নসিব—তকদীরের খেল্।" শাদী প্রতিবাদ করে বললে, "দেখ, যারা হাত-পা ছেড়ে খালি বসে থাকতে জানে তারাই ঐ নসিবের দোহাই পাড়ে আর লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে দেখে ছেঁড়া চাটাইয়ে পাশ ফেরে। যার উদ্যম আছে, ভরসা আছে, সাহস রাখে, তেমন লোককে একটি টাকা দিলেও সে দশটি টাকা করে আনবে। এই যে বাবজান অমন ফলাও কারবারটা ফেলে রেখে খোদার আজানে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন, আমি যদি হাত গুটিয়ে হাঁ করে 'নসিব যা করে' বলে বসে থাকতুম তাহলে হতো কি কিছু? আসল কথা হলো টাকা, আর সেই টাকা খাটাতে জানা—ব্যস, আর তোমায় কিছু দেখতে হবে না।"

শাদ শান্ত হাসি হেসে বললে, "দোস্ত—নসিবে না থাকলে হাজার টাকা হাতে থাকলে আর হাজার খাটাবার ক্ষমতা থাকলেও কিছুই হয় না আর তকদীর প্রসন্ন থাকলে রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া তুচ্ছ এক টুকরো লোহাও ঐ জন্যেই সোনার দামে দামী হয়ে দাঁড়ায়।"

শা'দী নিজের মতের উপর কারো মত সইতে পারে না, অতএব তর্ক, এবং তর্কাতর্কি কচকচির ফলে সেই অঘটন, দুই প্রাণের দোস্তের কথাবার্তা বন্ধ, পাড়াপড়শীর চক্ষু চড়কগাছ।

যাই হোক, শাদ তার বন্ধুর মতন অতটা জেদীও ছিল না, তার স্বভাবটাও ছিল নির্ব্বিরোধী। নিজে থেকেই সে একদিন গিয়ে শাদীর সঙ্গে ভাব করে ফেললে, কিন্তু ঝগড়ার আসল কারণ সেই পুরানো তর্কটা দু'জনের মনেই একটা খোঁচা হয়ে জেগে রইল। শেষে এই অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলবার জন্ত শা'দীই জোর করে হেসে বলে উঠল, "কই দোস্ত, আমাদের সেই তর্কটার তো কোনো ফয়সালা হল না? আমি বলি কি, কথাটা উঠেই যখন পড়েছে তখন আমরা একবার কাউকে দিয়ে পরখ করে সত্যটা যদি যাচাই করে নিই তো দোষ কী?"

দোষের কিছু এতে আছে বলে শাদেরও মনে হ'ল না। দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়ল বাগদাদের পথে আপন আপন মতামতের সত্যতা যাচাই করে নিতে। পথ চলতে চলতে কত লোকই তো দেখে, কিন্তু কাউকে দেখেই মনে হয় না যে এর উপর দিয়ে পরখ করে যাচাই করা চলে। শেষ অবধি একটি পরিশ্রমী কারিগরকে তাদের দু'জনেরই পছন্দ হল, লোকটির নাম খাজা হাসান, দড়ি তৈরীর কাজ করে। শাদ আর শা'দী দু'জনেই লোকটির সঙ্গে আলাপ করে মতলবটা খুলে বললে।

তাদের এই বিদ্‌ঘুটে "এক্সপেরিমেন্টের" ব্যাপারটায় খাজা হাসান যে হকচকিয়ে গিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বড়লোকের হাজার রকম উদ্ভট খেয়ালের মতো এটাও একটা বলেই ধরে নিলে বেচারী। আর সত্যি কথা বলতে কী, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গরীব সংসারের রুটিগোস্ত জোগাড় করতে করতে হয়রাণ হয়ে গেলেও খাজা হাসানের ভিতর যে একটি কৌতুকপ্রিয় মন ছিল সেটি তখনও মরেনি। কাজেই শা'দী যখন তার নিজস্ব মতামত পরখ করে নিতে খাজা হাসানের হাতে দু'শোটি সোনার মোহর সমেত কারুকার্য্যকরা ছোট একটি চামড়ার থলিয়া দিয়ে বললে, "হাসান, আশা করি টাকাটার সদ্ব্যবহার করে তুমি নিজের অবস্থা ফেরাবে, আর উপযুক্ত কাজে টাকাটা খাটিয়ে 'টাকাই টাকা টানে' আমার এই মতের সত্যতা প্রমাণ করবে।" তখন তাকে বহুত বহুত আদাব করে টাকাটা নিতে হাসান দ্বিধা করলে না।

বন্ধুরা চলে যেতে হাসান দশটি মোহর বার করে বাকী একশো নব্বইটি মোহরসমেত থলিয়াটা নিজের মাথার পাগড়ীর ভাঁজের ভেতর পুরে গুণছুঁচটার দুটো কোঁড় দিয়ে সেটা পাগড়ীর সঙ্গে গেঁথে ফেললে, পাছে হারিয়ে যায়, তারপর চললো বাজারে পরিবারের, মানে তার পাঁচটি বাচ্চা আর তাদের মা'র জন্য নতুন কাপড়-চোপড় আর খাবারদাবার কিনে আনতে। এমন একটা ব্যাপারের পর তার আর দোকানে বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। ঐ টাকা দিয়ে সে আগে তার দড়ির ব্যবসাটা বড় করে ফাঁদবে। সেই ব্যবসার আয়ে তার সংসার স্বচ্ছল হবে, ভাল কাপড়চোপড়, খাবার—নানা স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে হাসান বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলে।

এমন সময় তার হাতের মাংস-মিষ্টির দিকে পড়লো হতভাগা এক চিলের চোখ—ছোঁ মেরে মাংসটা কেড়ে নিতে সেটা উড়তে উড়তে নেমে পড়লো হাসানের প্রায় মাথার উপর। হাসান তাড়াতাড়িতে মাংস সামলাতে যেতেই তার হাতের বোঁচকা-বুঁচকিগুলোর একটা খসে পড়ে গেল মাটিতে, আর সেটা কুড়িয়ে নিতে যেই বেচারা হেঁট হয়েছে অমনি সেই শয়তান চিল তাগ ফসকে মাংসের বদলে তার পাগড়ীটায় পড়েই, সেটা কি, তা না দেখেই ছোঁ মেরে তুলে আকাশে ডানা মেলে পগার পার। হতভাগ্য হাসান! মাথায় হাত দিয়ে সে সেখানেই বসে পড়ল। তার এত জল্পনা-কল্পনা ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন এক নিমিষে মরীচিকার মত মিলিয়ে গেল!

মাস দুই পরে শাদ আর শা'দী এক দিন হাসানের দোকানে এসে হাজির। তারা ত' দেখেই অবাক যে, শা'দীর টাকায় হাসানের অবস্থা তো ফেরেই নি বরং তার জামায় ক'টা নতুন তালি। আসলে নতুন পাগড়ী কিনতে হয়েছে বলে বেচারার পুরানো জামাটা আর বদলানো হয়ে ওঠেনি। নতুন পাগড়ী আবার পিরাণ—বাপ রে, অত নবাবী!

শাদ সব শুনে আরো কয়েকটা কাহিনী বলছিল, চিলের এ রকম ব্যাপার সে অনেক দেখেছে ও শুনেছে। শা'দী ত' প্রথমে বিশ্বাসই করবে না। ভাবলে, বাজে ব্যাপারে টাকাগুলো উড়িয়ে দিয়ে হাসান এখন এক গল্প কেঁদেছে মন্দ নয়, কিন্তু শাদের কাহিনীগুলো শুনে তারও বিশ্বাস হল যে হ্যাঁ, এ রকমটা হ'লেও হ'তে পারে। যাই হোক, শা'দী মেজাজী হলেও সদাশয় লোক সন্দেহ নেই, হাসানকে সে আবার দুই শো মোহর দিয়ে বলে গেল, "দেখো এবার যেন চিলে নিয়ে না পালায়!"

হাসান এবার টাকাটা নিতে রাজী হয়নি, কাজ কি বাবা ফ্যাসাদ ঘাড়ে নিয়ে? কিন্তু রাজী হ'তে হ'ল। এবার টাকাটা সে খুব সাবধানে একটা ছোট থলিতে পুরে তার মুখটা সেলাই করে বাড়ীতে গিয়ে লুকিয়ে রেখে এলো একটা ভুষির জালায়। আগে তার একটা ঘোড়া ছিল, এটায় তারই ভুষি থাকত। কিন্তু ঘোড়াটা মারা যাবার পর ও জালাটা ভাঁড়ারের এক অন্ধকার কোণে এমনিই পড়ে থাকে, কেউ হাতও দেয় না। কাজেই হাসান নিশ্চিন্ত হয়ে দোকানে গিয়ে বসল।

কিন্তু ভাগ্যের খেলা! মানুষকে নিয়ে চোখ বেঁধে লুকোচুরির খেলা খেলেই তার আনন্দ। হাসানের বিবি আয়েষার স্নান করবার সাজিমাটি ফুরিয়েছে, এক জন সাজিমাটিওয়ালাকে ডেকে খানিকটা সাজিমাটি কিনে তার বদলী ঐ অকেজো ভুষির জালাটা বিক্রী করে দিল সে। সে ত' আর জানে না কী সর্ব্বনাশটাই সে করে বসল। হাসান বাড়ী ফিরতেই সে হাসি-হাসি মুখে তার কাছে গিয়ে বললে, "আজ যা জিতেছি জানো, তোমাকে ক'দিন থেকে বলছি তুমি তো এনে দিলে না—এ দিকে গোছল করতে পারি না, কাপড় কাচতে পারি না, আজ দেখ সাজিমাটি কিনেছি, কাপড়-চোপড় ছেলেপিলেদের গা তক্ তক্ করছে। ভাবছ পয়সা ছিল না, কি করে কিনলাম? সেইটাই তো মজা, ঐ বাতিল ভুষির জালাটা বদলে"—

"অ্যাঁ"—ঘরের মধ্যে শত বজ্রপাত হলেও হাসান এতটা চমকাত না। পাগলের মত ছুটে গেল সে ভাঁড়ারে—নেই, নেই, নেই, তার সেই ভুষির জালা নেই, তার সঙ্গে নেই সেই দু'দুশো সোনার ঝকঝকে চকচকে মোহর! রাগে দুঃখে ক্ষিপ্ত হয়ে সে চীৎকার করে উঠল, "হতভাগি করলি কি, ঘরের লক্ষ্মীকে বিদেয় করে দিলি? এখন

শা'দীকে আমি কি বলে বোঝাবো ? ওঃ হোঃ হোঃ"—আত্মহারা হয়ে হাসান বৌ-এর গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিলে। তার বিলাপের মধ্য দিয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল, তাই শুনে দুঃখে রাগে আয়েষাও গেল পাগলের মতন হয়ে। "তবে আমাকে একবার বলতে কি হয়েছিল রে বিটলে বুড়ো আমি কি তোর ওই টাকা চুরি করে বড়লোক হতুম ? হবে না ? নিজের ইস্তিরি, তাকেও অবিশ্বেস, বেশ হয়েছে খোদা উচিত শাস্তি দিয়েছেন ! হায় হায়, একটি বার আমাকে বললে কি আমি নিজের হাতে"—শোকে পাগলের মতন হয়ে আয়েষাও হাসানের দাড়ি টেনে চুল ছিঁড়ে কিল ঘুঁষি কোনোটাই আর বাদ রাখলে না। হাসান তখন আপোষের আয়াসে বলে উঠল, "আচ্ছা যাক যাক, নসিবে নেই তা আর কী হবে, আমরা কালও যেমন ছিলাম আজও তেমনি থাকব। এখন চেঁচিয়ে হাট বাধিয়ে তো লাভ নেই, লোকে শুনলে যে দু'জনের গালেই চুণ-কালি দেবে।"

তিন মাস পরে আবার শাদ আর শা'দীর আবির্ভাব। কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে তারা এ বারেও দেখলে যে সেই ঘুপসি দোকান ঘরটায় বুকের সঙ্গে মাথা মিলিয়ে ঘাড় হেঁট করে হাসান এক মনে সেই একই কাজ করে চলেছে। উপরন্তু পাগড়ীটাতেও একটা তালি পড়েছে। তাদের দেখেই হাসান না দেখার ভাণ করে মাথাটা আরো ঝুঁকিয়ে দিতে ত্রুটি করলে না, কিন্তু শাদ এসে তার হাত ধরবার পরও তো আর না দেখার ভাণ করে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

শা'দীকে কিন্তু এবার আর আমি দোষ দিতে পারব না। এবার সে ধৈর্য্য হারালে। শাদ কিন্তু হাসানের মুখ দেখে সবটাই বিশ্বাস করে নিলে। এবার তার পরীক্ষার পালা। পথে আসতে এক টুকরো সীসা কুড়িয়ে পেয়েছিল, তাই সে হাসানের হাতে তুলে দিয়ে বললে, "হঠাৎ এটা আমার পায়ে বেধে গিয়েছিল বলে তুলে এনেছিলাম, দৈবাৎ এটা তোমার কাজেও লেগে যেতে পারে, এটা তুমি রেখে দাও।" তারপর শাদ বিনীত ভাবে বিদায় নিয়ে আর শা'দী সমস্তটাই অবিশ্বাস করে গালি দিতে দিতে ফিরে চলল, আর হাসান কাঁদো-কাঁদো হয়ে খালি বলতে লাগল, "আমি তো নিতে চাইনি, ফুটা নসিবে কি আর সোনার মোহর টেঁকে ?"

সেই রাত্তিরে কিন্তু একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হলো। হলো কি, এক জেলের জাল মেরামতের জন্ত এক টুকরো সীসে দরকার, কিন্তু কোথাও পাচ্ছে না। হাসান শুনে তাকে শাদের দেওয়া সীসে-টুকরোটা দিতেই সে বললে, "ভারি উপকার করলে। এই জাল সারিয়ে তবে মাছ ধরতে যাব। তা ভাই, প্রথম জালে যা মাছ পড়বে আমি তোমায় দিয়ে দোব, সত্যি ভারি উপকার করলে তুমি আমার।" কথা মতন সত্যিই বেশ বড়গোছের একটা মাছ সে হাসানের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলে। আরো আশ্চর্য্যের কথা এই যে, মাছটা কুটতে বসে আয়েষা তার পেট থেকে একটা জলজ্বলে পাথর পেলো। সন্ধ্যেবেলায় তাদের তেলের খরচটাও বেঁচে গেল। ঐ পাথরটা থেকে একটা কি রকম আলো বেরিয়ে তাদের আঁধার ঘরখানিকে উজ্জ্বল করে তুললে। তাই দেখে হাসানের মনে ভারি সন্দেহ হল। পাথরটা মাণিক নয় তো ?

সত্যিই সেটা লক্ষ টাকা দামের রত্ন। কোনো এক জাহাজ-ডুবির ফলে ওটা জলের তলায় হারিয়ে যায়, মাছটা খাবার মনে করে খেয়ে ফেলেছিল। নসিবের ফেরে ঐ মাছটাই আজ এসে হাসানের ঘরে উঠেছে।

হাসান হীরেটাকে নিয়ে পরদিন গেল বাগদাদের সেরা জহুরীর কাছে। তিনি যাচাই করে বলে দিলেন, এটা লক্ষ টাকা দামের বহুমূল্য রত্ন। এক জহরতওয়ালা ইহুদী হীরেটাকে কিনলে। অবিশ্যি সে অনেক দরকষাকষি করে দাম কমাতে কসুর করেনি, কিন্তু হাসান অটল হয়ে রইল। বললে, "লক্ষ রূপেয়ার একটি রূপেয়া কম হলেও ও মাণিক আমি বেচবো না। ঘরেই রেখে দেবো।"

ছ'মাস পরে শাদ আর শা'দীর সঙ্গে আবার হাসানের দেখা হলো। লক্ষপতির বিশাল প্রাসাদের সাজানো বৈঠকখানায় বসে হাসান আজ তাদের অভ্যর্থনা করলে। শাদ অকৃত্রিম আনন্দে আত্মহারা হয়ে হাসানকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল, শাদী কিন্তু প্রথমটায় বিশ্বাস করতে চায়নি। সে ভাবলে, তার টাকায় বড়লোক হয়ে হাসান আজ এই গল্প তৈরী করে বলছে। এই সময় সেই ইহুদী বণিকটি কিছু কাজ কারবার করতে হাসানের বাড়ীতে এসেছিলেন, তাঁর সাক্ষ্য পেয়ে তখন শা'দীর প্রকৃত ঘটনা বিশ্বাস হয়। শাদের সঙ্গে শা'দীকেও প্রচুর ধন্যবাদ দিয়ে হাসান শা'দীর সেই চার শো টাকা ফিরিয়ে দিলে।

ফিরে যেতে যেতে শা'দী বললে, "কি দোস্ত, জিত হলো কার ?" শা'দী উত্তর ক'রলে, "তাই দেখলুম দোস্ত, নসিবের খেলাই এই দুনিয়ার সেরা খেলা। তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু হেরে গিয়েছি বলে আমার আর দুঃখ নেই, আমার মন পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

সেই পুরোনো দিনের মত দুই বন্ধু আবার দু'জনের করমর্দ্দন করলেন।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

কল্যাণী দত্ত

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

মানুষের সেবা করাই হচ্ছে জগতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ, পাথরের দেবতার পূজা না করলেও ক্ষতি নেই যদি মানুষকে সেবা দিয়ে প্রীতি দিয়ে সুখী করা যায়। কারণ, পাথরের প্রতিমার মধ্যে সুখ-দুঃখ অনুভব করবার কোনো শক্তি নেই, কিন্তু মানুষের সেবা করলে পরোক্ষ ভাবে জাগ্রত ভগবানেরই সেবা করা হয়। সেবা নানা প্রকারের হতে পারে; তার মধ্যে রোগসেবা হচ্ছে অন্যতম মহৎ কাজ।

যে সব নারীগণ সেবাব্রতে দীক্ষা নিয়ে আজ শত শত বিপন্ন বিষাদগ্রস্ত জীবনকে সুস্থ করে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার ব্রত নিয়েছেন, তাঁদের এই সেবাব্রতের প্রথম পথপ্রদর্শিকা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে চাই।

১৮২০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ইতালীর ফ্লোরেন্স নগরে কুমারী নাইটিঙ্গেলের জন্ম হয়। ফ্লোরেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন বলে

তাঁর নাম রাখা হয় ফ্লোরেন্স। ফ্লোরেন্স জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইতালী-প্রবাসী এক ইংরাজ-পরিবারে। ফ্লোরেন্সের জন্মের কিছুকাল পরেই ঐ পরিবার ইংলণ্ডে ফিরে যান। ইংলণ্ডের অভিজাত ধনী পরিবারে ফ্লোরেন্স জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ধনীগৃহের অত্যধিক বিলাস-ব্যসন তাঁর মনকে সুখী করতে পারেনি। দিন-রাত কি যেন তিনি চিন্তা করতেন, কোথাও কোনো আর্ত্ত রোগীকে দেখলেই তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, কি করে তাঁর নিজের জীবনকে আর্ত্ত রোগিগণের সেবায় নিয়োজিত করা যায়। পিতাকে তিনি তাঁর বাসনা জানান। আশ্চর্য্য! এত বড় বংশের মেয়ে নার্স হবে কেমন করে? পিতামাতার নিকট হতে ফ্লোরেন্স বাধাপ্রাপ্ত হন। কিন্তু অন্তরের অদম্য বাসনাকে কোনো বাধাই দমন করতে পারে না। তাই বহু চেষ্টার পর ফ্লোরেন্স চিকিৎসা ও পরিচর্য্যাবিদ্যা অধ্যয়ন করতে থাকেন। ইংলণ্ডে কিছুদিন শিক্ষার পর তিনি শুনলেন যে, কাইসারবার্থ সহরে প্যাষ্টর ফ্লিডনার নামের জনৈক চিকিৎসক নার্সিং শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফ্লোরেন্স সেই প্রতিষ্ঠানে গিয়ে নিযুক্ত হলেন। তথাকার শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি জার্মাণী, ইতালী ও ফ্রান্সের হাসপাতালের বিধি-ব্যবস্থা নিরীক্ষণ করে ইংলণ্ডে ফিরে আসেন।

ফ্লোরেন্সের বয়স যখন চৌত্রিশ বছর, সেই সময় সমগ্র দেশের বুকে ঘনিয়ে এল ক্রিমিয়ার যুদ্ধের বিভীষিকা। শত শত আহত সৈন্যদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র হতে এল সাহায্যের আবেদন। সেবার অভাবে প্রতিদিন বহুসংখ্যক সৈন্য প্রাণ হারাতে লাগল কিন্তু এই বিভীষিকাময় পরিবেশের মাঝে কে যাবে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে আহতের সেবা করতে? ফ্লোরেন্স স্থির থাকতে পারলেন না। ভাবলেন, এইতো এসেছে তার চির-প্রতীক্ষিত মানুষকে সেবা করবার সুযোগ। সকল বাধা-বিপত্তিকে সরিয়ে ফেলে মাত্র তিরিশটি নার্স সঙ্গে নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন স্কুটারীর সৈন্যদের হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। সেখানে চার দিকে অব্যবস্থা ও আহত সৈন্যগণের করুণ কান্নায় ফ্লোরেন্সের দরদী মন করুণায় ভরে গেল; তিনি মূর্ত্তিমতী কল্যাণীরূপে নিজের সকল কষ্ট সহ্য করে দিন রাত ধরে আহতদের সেবা করতে লাগলেন। এবং সেখানে সকল প্রকার সুব্যবস্থা করলেন।

গভীর রাত্রি, ফ্লোরেন্সের চোখে ঘুম নাই; দীপ হাতে তিনি প্রত্যেক রোগীকে পর্য্যবেক্ষণ করে বেড়াতেন, যদি কারও রোগ যন্ত্রণায় দরকার হয় সেবার। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ক্রমশ তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু স্কুটারীর শেষ সৈনিকটিও যত দিন অবধি না সুস্থ হয়ে উঠেন, তত দিন পর্য্যন্ত তিনি কি করে অবসর নেবেন এই সেবার কাজ হতে? অবশেষে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসানে ফ্লোরেন্স অসুস্থ শরীরে তাঁর নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ফ্লোরেন্সের মহৎ কার্য্য দর্শনে মুগ্ধ ইংলণ্ডবাসী তাঁকে বিপুল ভাবে অভিনন্দন জানায়। তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্য বহু প্রকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল; কিন্তু তিনি সব-কিছুই প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন। পরিশেষে গভর্ণমেণ্ট থেকে তাঁকে সম্মানজনক উপাধি গ্রহণ করবার জন্য যখন যাগাযাগি চলতে থাকে, তখন তিনি জানান যে, শুধু একটি আমার প্রার্থনীয় বাসনা আছে—তা হচ্ছে লণ্ডনে একটি হাসপাতাল ও নার্সদের শিক্ষালয় স্থাপন। জাতির নিকট হতে সে ইচ্ছাটি পূর্ণ হলেই আমি সবচেয়ে সুখী হব। ফ্লোরেন্সের এই আবেদনের ফলে জনসাধারণের নিকট হতে বহু অর্থ সংগৃহীত হয় এবং দেশবাসীর পক্ষ হতে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড তাঁর হাতে প্রদান করা হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ হাসপাতাল ও নার্স-শিক্ষালয় "সেণ্ট টমাস হাসপাতাল এবং নাইটিঙ্গেল হোম" লণ্ডন সহরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নাইটিঙ্গেলের মৃত্যুর তিন বছর পূর্ব সবচেয়ে সম্মানিত উপাধি "অর্ডার অফ মেরিট" দ্বারা তাঁকে ভূষিত করা হয় এবং বহু দেশের রাজা প্রভৃতির নিকট হতেও শেষ জীবনে তিনি বহু সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে আর্ত্তের জননীস্বরূপা সেবাব্রতের প্রতিষ্ঠাত্রী সর্বজনপূজ্যা এই মহীয়সী নারী পরলোক গমন করেন।

মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিঃ ডাকে ....২৪৲

ষাণ্মাসিক " " ....১২৲

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিঃ ডাকে

(ভারতীয় মুদ্রায়) ....২৲

চাঁদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকাগণ মণিঅর্ডার কুপনে বা পত্রে অবশ্যই গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

ভারতবর্ষে

ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক ১৫৲

" ষাণ্মাসিক সডাক ৭৷৷০

প্রতি সংখ্যা ১।০

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে ১৸০

(পাকিস্তানে)

বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ..............২১৲

ষাণ্মাসিক " " " ১০৷৷০

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " " ১৸০

Rexona
BLENDED WITH CADYL

বিবেকানন্দ স্তোত্রে

সুমণি মিত্র

১৮

তবু তাঁকে পুরোপুরি বুঝে ওঠা ভার।
একটা গল্প শোনো শ্রীমা' সারদার।
যেমন মিষ্টি এই ছোটো কাব্যটা,
তেমনি তীক্ষ্ণ এর তাৎপর্যটা।

"রাতের অন্ধকার ঠেলে দিয়ে দূরে
চাঁদের শুভ্র ছায়া পোড়েছে পুকুরে।
তাকে পেয়ে ছোটো মাছ ভারি মজা পায়,
ঝাঁকে-ঝাঁকে আসে আর হাসে নাচে গায়।
ভাবে মনে—এ-মাছটা আমাদেরই কেউ;
খুশিতে অধীর হোয়ে জলে তোলে ঢেউ।
মাছেদের কেউ নয় আকাশের চাঁদ,
ওটা ওর ছায়া, তবু ঘোচেনা প্রমাদ।
লাফালাফি দাপাদাপি কোরে নিয়ে শেষে,
আকাশের চাঁদ যেই দিগন্তে মেশে,
তখন ভাব্‌তে থাকে—যে ছিলো সে কৈ?
আবার আঁধার নাবে, থামে হৈ-চৈ!
অবসাদ ঘিরে ধরে, ভাবে এলোমেলো!
মাছেরা ঝিমিয়ে পড়ে, বোঝেনা কে এলো!" ১

১৯

যে-কথা বোঝাতে চান শ্রীমা', অর্থাৎ
জীব আর অবতারে অসীম তফাৎ।

১। শ্রীশ্রীমায়ের কথা (দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ২৩৬)।

জীব হোলো পঙ্কিল পুকুরের মাছ।
অবতার পুকুরের ঐ ছায়া-চাঁদ।
নররূপী অবতার বিধাতারই ছায়া;
তবু যে মানুষ ভাবি—এটা তাঁরই মায়া।
পঙ্কিল পৃথিবীতে অবতার এলে,
আমরা মাছের দল তাঁকে কাছে পেলে
মানুষবোধেতে তাঁকে ভাবি সাধারণ,
ভগবান-বুদ্ধিতে কোরিনা গ্রহণ।
মনে ভাবি—ইনি বুঝি আমাদেরই জন,
আনন্দ-বেদনায় দোলায়িত মন।
ভালো আর মন্দের মায়া দিয়ে গড়া,
বিশ্বাস ও দ্বন্দ্বের ছায়া দিয়ে ভরা,
সত্য ও মিথ্যের মোহ দিয়ে ঘেরা,
আশা আর হতাশার ব্যথা দিয়ে চেরা,
আলো আর আঁধারের আব্‌ছায়া পথে,
জানা আর অজানার আব্‌ছা আলোতে,
পানা-ঢাকা পৃথিবীর পাঁকের তলায়,
অশুদ্ধ চিত্তের অস্বচ্ছতায়
যে-জীবন আমাদের কাটছে ক'দিন,
মনে ভাবি—উনি বুঝি তারই মায়াধীন!
আমাদের মতো বুঝি উনিও অশিব,
পঙ্কিল এ-পৃথিবীর ক্লেদাক্ত জীব!

২০

"Is not this Jesus,
The son of Joseph,
Whose father and mother we know?
How is it then
That he saith,
I came down from heaven?" ২

যতই বোলুন ঐ প্রতিবিম্ব-চাঁদ,
"Ye are from beneath;
I am from above;
Ye are of this world;
I am not of this world;" ৩
যতই বোলুন তিনি, যতই শোনান,
"I and my father are one", ৪

২। "যীশু তো ঐ জোসেফেরই ছেলে, যার বাপ-মা আমাদের পরিচিত? তবে সে কোন্ যুক্তিতে বলে, 'আমি স্বর্গ থেকে এসেছি'?" —St. John. (chap. VI. 42)

৩। "তোমরা এসেছো নীচে থেকে; আর আমি এসেছি ওপর থেকে; তোমরা হোলে পৃথিবীর জীব; আর আমি হচ্ছি অপার্থিব।" —ibid., (chap. VIII. 23)

৪। "আমি আর আমার পিতা এক।"—ibid., (chap. X. 30)

আমাদের কাছে তিনি "Son of Joseph",
পাড়াগাঁয়ে বাড়ি তাঁর, গ্রাম Nazareth.
তার বেশি হোতে গেলে সমূহ বিপদ!
"...Being a man, makest thyself
God?" ৫

সব চেয়ে অপরাধ ঐটেই ওঁর
Josephএর ছেলে কিনা বলে ঈশ্বর!

২১

মাছের চাইতে পেঁকো মানুষের 'আমি';
না-বুঝে নীরব থাক্, তা না বাঁদ্‌রোমি!
মাছ আর মানুষের তফাৎ অনেক।
মাছেরা চাঁদের গায়ে ঠোকে না পেরেক্।
'ভগবান-বুদ্ধিতে নেবোনা তোমায়'
—এ-কথা মানুষে যদি তাঁকেই শোনায়,
তা হোলে বিশেষ কিছু হয় না দোষের,
তবু এর মানে আছে, ক্ষমা আছে এর।
নররূপে পাই যাঁকে আমাদের ঘরে
ভগবানবোধে তাঁকে নিই বা কি কোরে?
ও-কিছু দোষের নয়, দোষটা তখন,
চাঁদের বিচার করে মাছেরা যখন।
যীশুর বিচার করে শিশুরা যেদিন,
পৃথিবীর ইতিহাসে নামে দুর্দিন!

চুনো-পুঁটি করে কিনা চাঁদের বিচার!
'জীবনের আলো'টাকে বলে "deceiver." ৬
এক ফোঁটা জীব কিনা মারে তাঁকে কিল্!
সদর্পে বলে কিনা—"he hath a devil." ৭
কাঁটার মুকুটখানা মাথায় পরায়,
তারপর তাঁকে কিনা 'ক্রশে'তে চড়ায়!
'ক্রশে' উঠে পিপাসায় জল চান, আর
জলের বদলে তায় তেতো 'ভিনিগার'!
কি করেন, তাই খান্, ওরা যে বালক!
মাথাটা নুইয়ে শেষে "gave up the ghost." ৮

* * *

সবচেয়ে বড়ো কথা, শুনে তায় যারা,
তাঁর কাছে অভিশাপ পায়নাকো তারা।

২২

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ১
সে-যুগের কাছে তিনি 'দেবকী-নন্দন'।
এখানেই প্রলাপের হয়নিকো ইতি।
ব্যাস-ভীষ্ম-উদ্ধব-বিদুর প্রভৃতি
অবতার বোলে তাঁকে মান্‌লেও ভাই,
জনসাধারণ তাঁকে ছুঁড়েছে কাদাই!
জরাসন্ধ, শিশুপাল কি বোলেছে তাঁকে?
ওদের কৃষ্ণ-দ্বেষ আজো মাথা কাটে!
'মহাভারতে'র ঐ 'সভাপর্বে'তে
দেখি কতো মহীপাল ছিলো এ-দলেতে।
জরাসন্ধ-ষড়যন্ত্র জানা নেই কার?
'রৈবতকে' গিয়ে তবে জান্ বাঁচে তাঁর।
সন্ধির কথা নিয়ে কৃষ্ণ স্বয়ং
'হস্তিনা'য় দূতরূপে এলেন যখন,
দুর্য্যোধন কি করেন 'উদ্‌যোগপর্বে'তে?
কিসের উদ্‌যোগ চলে বিনা-যুদ্ধেতে?
'মণি-চোর' অপবাদ দিয়েছিলো যারা,
কৃষ্ণের জ্ঞাতিবর্গ কি বোলেছে তারা?
যাদবশিশুকে মেরে উনি নাকি তাঁর
'স্যমন্তক মণি' চুরি করেন গলার!
'প্রভাসে'র ধ্বংস-লীলা চোলেছে যখন,
সশরীরে উপস্থিত 'ব্রহ্ম' স্বয়ং!

* * *

সত্ত্ব-প্রধান ঐ যুগ-অবতার,
তামসিক ইতরেরা কি বুঝবে তাঁর?
বিষ্ঠার পোকা যেটা থাকে বিষ্ঠায়,
ভাতের হাঁড়ির ঐ বিশুদ্ধতায়
তাকে যদি কোনো দিন পুরে রাখা হয়,
নিশ্চয়ই জেনো তার প্রাণ সংশয়।
বিষ্ঠাই আমাদের প্রাণের জিনিস্,
ভাতের হাঁড়ির ঐ গন্ধটা বিষ্।
ভাতের বিরুদ্ধতা কোরে থাকি তাই।
বাগে পেলে হয়তো বা 'ক্রশে'তে চড়াই!

২৩

"কলিযুগে কৃষ্ণ আমি, আমি নারায়ণ।
আমি সেই ভগবান দেবকী-নন্দন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটী মাঝে আমি নাথ।" ১০
তবু সে-যুগের মনে ঘোচে নি প্রমাদ।
'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' আমরা যা পাই।
মিশ্রের ছেলে তিনি, পাড়ার নিমাই।

৫। "মানুষ হোয়ে কি না নিজেকে ঈশ্বর বোলে বেড়াচ্ছো?"—ibid., (chap. X. 33)

৬। "প্রতারক"।—St. John. (chap. VII. 12)

৭। "ও হোচ্ছে একটি শয়তান।"—ibid., (chap. VII. 20)

৮। "প্রাণত্যাগ কোরলেন।"—ibid., (chap. XIX. 30)

১। "অন্যান্য অবতার ভগবানের অংশ বা কলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হোলেন স্বয়ং ভগবান্।"—ভাগবত।

১০। শ্রীচৈতন্যভাগবত (মধ্যখণ্ড। ৮ম অধ্যায়)

"কেহো বলে—'এত বা সম্ভ্রম কেনে করি।
আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি।
তিঁহো নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র পুত্র।
আমরাও নহি অল্প মানুষের সূত্র।
হের সভে পড়িলাঙ কালি তান সনে।
আজি তিঁহো গোসাঞি বা হইলা কেমনে।" ১১

* * *

"কেহো বলে—'আরে ভাই! মদিরা আনিয়া।
সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া।'
কেহো বলে—'ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত।
তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত।'
কেহো বলে—'হেন বুঝি পূর্ব্বের সংস্কার।'
কেহো বলে—'সঙ্গদোষ হইল তাহার।'...
'রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা' সভার সনে।
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ বসন।
খাইয়া তা' সভাসঙ্গে বিবিধ রমণ।
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেক দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ।" ১২

২৪

এইবার 'রামকৃষ্ণ-পুঁথি' খুলে ভাই।
'যে-রাম যে-কৃষ্ণ' তাঁর দশাটা শোনাই।

যিনি নিজে "বলিলেন করি উচ্চরব।
বারেক শ্রীকৃষ্ণ যেবা বারেক রাঘব।
সেইজন অবতীর্ণ এই ধরাধামে।
জীবের উদ্ধার হেতু রামকৃষ্ণ নামে।
পূর্ণ আবির্ভাব মোর এই অবতারে।
অদ্বৈত চৈতন্য নিত্যানন্দ একধারে।"

জনতার প্রতিনিধি দেখেছে কি চোখে,
একটা নমুনা শোনো নীচেকার শ্লোকে।—

"শ্রীঅঙ্গে না হেরি কোন সাধুর লক্ষণ।
জটা-ভস্ম-বাঘছাল গৈরিক বসন।
ব্রাহ্মণ সামান্যজ্ঞান করিয়া তাঁহায়।
একাসনে শ্রীপ্রভুর বসিল খট্টায়।
বিদ্যামদে দৃষ্টিহীন সকৌতুক মনে।
ইতি উতি মন্দিরের চায় চারিপানে।
যেখানে যা কিছু সব করি নিরীক্ষণ।
পশ্চাতে শ্রীপ্রভুদেবে কহেন তখন।
চাহিয়া শ্রীমুখপানে রহস্য ভাষায়।
তুমিই পরমহংস চেনা নাহি যায়।
বড়ই মজায় ভাই আছ এইখানে।
জমাট আসর হেন করিলে কেমনে।
আজন্ম ঘাঁটিয়া শাস্ত্র গ্রন্থ অগণন।
না পারি করিতে পোড়া উদর পোষণ।
লইয়া পরমহংস নামমাত্র এক।
কেমনে করিলে তুমি পসার এতেক।

* * *

জিজ্ঞাসিল প্রভুদেবে উপহাস ভাবে।
এতগুলি লোকে তুমি বশ কৈলে কিসে।
চেহারা সুবেশ বেশ হয় অনুমান।
সম্ভ্রান্ত বংশের সব ভদ্রের সন্তান।
নিজে হইয়াছ যাহা ক্ষতি নাহি তায়।
পরের ছাওয়াল নষ্ট শোভা নাহি পায়।"১৩

২৫

এ তো তবু পদে আছে, 'হালদার' ১৪ যেটা
ঠাকুরকে কোরেছিলো, বীভৎস সেটা।
'কালীঘাটে' বাস যার—সেই 'হালদার'।
যেমন মূর্খ আর তেমনি গোঁয়ার।

১১। শ্রীচৈতন্যভাগবত (মধ্যখণ্ড। ২৫শ অধ্যায়)
১২। ঐ (মধ্যখণ্ড। ৮ম অধ্যায়)

১৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। (পৃঃ ৪৫১ ও ৪৮৬)

১৪। "মথুরনাথের কালীঘাটের হালদার পুরোহিত ঠাকুরের প্রতি মথুরবাবুর অবিচলিত ভক্তি দেখিয়া হিংসায় জরজর'; ভাবে—'লোকটা বাবুকে কোনরূপ গুণ্‌টুন্ করিয়া ঐরূপ বশীভূত করিয়াছে'; ভাবে—'তাই তো, বাবুকে হাত করিবার আমার এতকালের চেষ্টাটা এই লোকটার জন্য সব পণ্ড? আবার সরল বালকের ভাণ দেখায়। যদি এতই সরল তো বলে দিক বশীকরণের ক্রিয়াটা। আমার যত বিদ্যা সব ঝেড়েঝুড়ে বাবুটাকে একটু বাগে আনছিলাম, এমন সময় এ আপদ কোথা হতে এল?'...

জানবাজারের বাড়ীতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুর একদিন অর্দ্ধ বাহ্যদশায় পড়িয়া আছেন, নিকটে কেহ নাই। ঠাকুরের সমাধি ভাঙ্গিতেছে; বাহ্যজগতের অল্পে অল্পে হুঁশ আসিতেছে। এমন সময় পূর্বোক্ত হালদার পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরকে একাকী তদবস্থ দেখিয়াই ভাবিল, ইহাই সময়। নিকটে যাইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ ঠেলিতে ঠেলিতে বার বার বলিতে লাগিল—'অ বামুন, বল্‌না—বাবুটাকে কি কোরে হাত করলি? কি করে বাগালি, বল্‌না? চঙ করে চুপ করে রইলি যে? বল্‌না?' বার বার ঐরূপ বলিলেও ঠাকুর যখন কিছুই বলিলেন না বা বলিতে পারিলেন না—কারণ ঠাকুরের তখন কথা কহিবার মত অবস্থাই ছিল না—তখন কুপিত হইয়া 'যা শালা বল্লিনি' বলিয়া সজোরে পদাঘাত করিয়া অন্যত্র গমন করিল। নিরভিমান ঠাকুর মথুর বাবু একথা জানিতে পারিলে ক্রোধে ব্রাহ্মণের উপর একটা বিশেষ অত্যাচার করিয়া বসিবে বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।" —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১১ ও ২০২)।

অনেকেই ঠাকুরকে বোঝেনি সেদিন।
কেউ খাল খেড়ে গ্যাছে, কেউ উদাসীন।
কটূক্তি কোরে গ্যাছে অনেকেই জানি,
কেউ বাপু করেনিকো এত বাঁদরামি!
বিটুলে বামুনটার এত বজ্জাতি,
ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে মারে কিনা লাথি!
তার ফলে বামুনের খাসা পরিণাম,
ইতিহাসে আজ তার উঠে গ্যাছে নাম।
এখন পুঁথিতে এর ঘটনাটা পোড়ে,
প্রথমেই এক চোট্ বাপান্ত কোরে,
মনে-মনে সকলেই বুট্ জুতো পায়
বামুনকে দমাদম্ লাথি মেরে যায়।
একটা লাথির ফলে কে জান্‌তো ছাই,
অনন্তকাল তাকে লাথাবে সবাই!

২৬

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতার আজ।
সে যুগের কাছে তিনি 'ছোটো-ভট্‌চায'।
স্বামিজীর মতে যাঁর শক্তি, সাধনা
রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধাদিতে ছিলো এক কণা,
বেদময় বাণী যাঁর 'mightier than
Those who have preceded,'১৫,
সেই শক্তিমান
সে-যুগের কাছে কিনা আর একটা লোক!
খুব যদি বেশি হন্ 'সিদ্ধ-সাধক'!
মায়ার প্রভাবে যারা আরোই বেহুঁস্,
তাদের উযর মনে উনি 'great goose'
রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, চৈতন্যের দল,
তাঁদের সমষ্টি যিনি, 'summation of all'
কেশব, বিজয় আর অন্তরঙ্গ ছাড়া,
কি বুঝেছে সেদিনের শিক্ষিত যারা?
তাদের কাছেতে ওঁর মান-সম্মান,
বেগুণ-ওলার কাছে হীরের যা দাম!

১৫। "Once more the wheel is turning up, once more vibrations have been set in motion from India which are destined at no distant day to reach the farthest limits of the earth. One voice has spoken, whose echoes are rolling on and gathering strength every day, a voice even mightier than those which have preceded it, for it is the summation of them all."—Reply to Khetri address.

"যাঁর পবিত্রতা আর প্রেম আর ঐশ্বর্য্য রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য প্রভৃতিতে এক কণা মাত্র প্রকাশ, তাঁর কাছে নিমকহারামি!!!" —পত্রাবলী (১ম, পৃঃ ৪৬৮

২৭

হীরে 'ভার্সেস্' ঐ বেগুণ-ওলার
মজাদার গল্পটা শোনো এইবার।—
"একজন বাবু তার চাকরের হাতে
একখানা হীরে দিয়ে বোল্লেন তাকে,—
'জেনে আয় বাজারেতে কতো দাম এর।
দামটা জেনেই তুই ফিরে আয় ফের।'
চাকর তো হীরে নিয়ে বাজারেতে যায়।
প্রথমে বেগুণ-ওলা, তাকে পাকড়ায়।
বোল্লে সে হীরেখানা হাতে দিয়ে তার,—
'কতো দাম দিতে পারো এই হীরেটার?'
হীরেটাকে বেশ কোরে নেড়ে-চেড়ে শেষে,
বেগুণ-বুদ্ধি নিয়ে সামান্য কেশে,
অনেক ভাবার পর বলে কি শুনুন,—
'বড়োজোর দিতে পারি ন'সের বেগুণ।'
চাকরটা বলে—'ভাই আর একটু ওঠো।
পুরোপুরি দশসের দাও অন্ততঃ।'
তাতে সে বেগুণ-ওলা বলে কিনা হেসে,
বাজারে যা দর তার বেশি বোলেছে সে।" ১৬

*

আমরা বেগুণ-ওলা, নেই কোনো গুণ।
অবতার খুব জোর 'ন'-সের বেগুণ'!
বাজারদরের চেয়ে তাও বেশি যায়!
আট্‌সের হোলে পরে তবেই পোষায়!

২৮

তা-ছাড়া কি আশা করো? দোষ দেওয়া মিছে
ঠাকুর যে অবতার 'কাগজে লিখেছে'?
তবে শোনো ঠাকুরের দানাদার শ্লেষ।
অবতার-না-মানার কারণটি বেশ!

* * *

"একজন বলে তার বন্ধুকে—'শোন্,
কাল্‌কে ও-পাড়া দিয়ে যাচ্ছি যখন,
নড়বোড়ে বাড়িখানা হুড়-মুড় কোরে
রাস্তায় পোড়ে গ্যালো চোখের ওপরে!'
বন্ধুটি শিক্ষিত, শুনে বলে—'সে কি!
দাঁড়া দাঁড়া, খবরের কাগজটা দেখি।'
তারপর কাগজের লম্বা 'কলম'
তন্ন-তন্ন কোরে খুঁজেও যখন
ঘটনার উল্লেখ পেলোনা কোথাও,
তখন বোল্লে হেসে—'গাঁজা রেখে দাও।'
বন্ধুটি বলে—'বাঃ রে, চোখে দেখেছি যে।'
—'কি জুলুম, কাগজেতে কিছু লেখেনি যে?

১৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

মনে কিছু কোরোনা হে, কাগজে যা নেই
—সে-খবর মেনে নেবো তুমি দেখলেই ?" ১৭

* * *

ভগবান আসেন যে মানুষের সাজে,
সে-কথা কি সাহেবের বইএ লেখা আছে ?
যে-কালে তা লেখা নেই, কি কোরে তা মানি ?
যতই বলোনা কেন, শুনছিনা আমি।

২৯

'মোক্ষমূলার' আর 'রলাঁ'র কৃপায়
ঠাকুর যে অবতার আজ শোনা যায়।
ঠাকুরের কথা ওঁরা কাগজে লেখায় ১৮
অনেকেই বাসে চোড়ে 'মঠে' ১৯ চোলে যায়।
'রোলিফ্লেক্স' ক্যামেরাটা বগলেতে ঝোলে।
সারাদিন নেচে-কুঁদে খালি ফটো তোলে।
'টিফিন-ক্যারিয়ারে'তে পুজো নিয়ে আসে।
নিজেদেরই ভোগ দিয়ে শুয়ে পড়ে ঘাসে।
রুটির টুক্‌রো আর কলার খোসায়
মাঠটা নোংরা কোরে বাড়ি ফিরে যায়।

৩০

এরা তবু যাই হোক ঠাকুরকে মানে।
যাই হোক আসে তবু ঠাকুরেরই টানে।
কোথাও এদের আছে শুভবোধ যেন,
নইলে 'লেকে' না গিয়ে 'মঠে' আসে কেন ?
আড্ডা মারুক আর ঘুরেই বেড়াক,
একদিন ঘুচে যাবে জড়তার ডাক।
ঠাকুরের আওতায় আসার মানেই,
এদের চেতনা হোতে বেশি দেরী নেই।

* * *

এইভাবে সুরু হয় শুভ-সংস্কার।
যেতে যেতে জেগে যায় বিবেক-বিচার।
ঐ যে সাধুরা যান গৈরিকবাসে,
আড্ডার ফাঁকে-ফাঁকে যেটা চোখে ভাসে,
এই জড়-জীবনেতে তারও আছে দাম।
গেরুয়ার অধিকার নাইবা পেলাম,
দেখতে তো পেতে পারি যেটা চোখে পড়ে।
গেরুয়া দেখাও ভালো, মনে ছোপ ধরে।
বিরাগের যে আগুন জ্বল্‌ছে 'মঠে'র।
চিন্তার তরঙ্গ সাধুসঙ্ঘের,
অজান্তে পাই যেটা বিনা পয়সায়,
তার দাম প্রকাশিত হয়না ভাষায়।
'প্লেগে'র চেয়েও ওর সংক্রামিকার
প্রচণ্ড শক্তিটা আরো জোরদার !
নিঃসাড়ে মনে ঢুকে উঁকি-ঝুঁকি মারে।
সুপ্ত যে শুভ-বোধ, তাকে তুলে ছাড়ে।

* * *

এইভাবে জাগ্রত শুভ-বোধ তাকে
নিয়ে যাবে স্বামিজীর পাকা বাড়িটাতে।
ঠাকুরের কৃপা আর আগ্রহ তার
হয়তো পৌঁছে দেবে ঐ দোতলার
প্রশস্ত ঘরটাতে—যে ঘরেতে আজ
'ঠাকুরের প্রতিনিধি' করেন বিরাজ। ২০
এই 'জাত-সাপ'২১ যদি মারেন ছোবোল,
তিন ডাকে ঘুচে যাবে জড়তার বোল।

* * *

তাই যারা 'মূলার' ও 'রমাঁ রলাঁ' পোড়ে
'ক্যামেরা'টা কাঁধে নিয়ে 'ট্রাউজার' পোরে
ঘন-ঘন মঠে আসে আড্ডাও দিতে,
তাদের অসার ভাবা চলেনা কিছুতে।
আজগুবি কথা নয়, সাদা চোখে ঢের
ডিগ্‌বাজী খেতে আমি দেখেছি এদের।
অতএব সবশেষে 'ফ্রেঞ্চ', 'জার্মাণ'
দুই মহা মনীষীকে জানাই প্রণাম।

[ক্রমশঃ।

১৭। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

১৮। অধ্যাপক মোক্ষমূলারই (Prof. Max Muller) সর্বপ্রথম ইংরিজী ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা 'Nineteenth Century'র ১৮৯৬ সালের আগষ্ট সংখ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন এবং উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তারপর 'The Life and Sayings of Ramkrishna' নাম দিয়ে দু'শো পাতার একখানা প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই জীবনী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলো।

ফরাসী মনীষী রমাঁ রলাঁও (Romain Rolland) ঠাকুর ও স্বামিজীর একজন বিশেষ ভক্ত। ১৯২৮ সালে ইনি 'Life of Ramkrishna' নামে তিনশো আটাশ পাতার এক বৃহৎ জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তারপরই "The life of Vivekananda and the Universal Gospel' নাম দিয়ে স্বামিজীরও একখানা জীবনী রচনা করেন। এটা চারশো-পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ঠাকুর ও স্বামিজীর এই দু'খানা জীবনীই বিশ্বসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার কোরেছে।

১৯। "বেলুড়-মঠ"। এখানেই স্বামিজী ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত কোরে গ্যাছেন।

২০। মঠাধ্যক্ষ। স্বামিজী বোলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণমঠের অধ্যক্ষই হোচ্ছেন ঠাকুরের প্রতিনিধি। স্বয়ং ঠাকুরই এঁর মাধ্যমে সঙ্ঘ পরিচালনা কোরবেন।

২১। গুরুতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বোলতেন,—যদি ঢোঁড়া সাপে ব্যাঙ ধরে, তাহোলে সে তাকে গিল্‌তেও পারেনা ছাড়তেও পারেনা। যদি জাতসাপে ধরে তাহোলে তিনডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হোয়ে যায়। অর্থাৎ গুরু কাঁচা হোলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। যদি সদ্‌গুরু হয়, জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে যায়।
—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

বিজ্ঞান বার্তা

পক্ষধর মিশ্র

গত ১৪ই জানুয়ারী ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশন কোলকাতায় সুরু হয় এবং ২০শে জানুয়ারীর আলোচনা-সভার পরে এর সমাপ্তি ঘটে। জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের ধারাই সাধারণ ভাবে অনুসরণ করা হয় কিন্তু এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসবের জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধা অনুযায়ী এই মহাসম্মেলনের উদ্বোধন ১৪ই জানুয়ারী স্থির করা হয়েছিল। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ইতিহাসে এই ১৪ই জানুয়ারী কিন্তু এক মহাস্মরণীয় দিন। তেতাল্লিশ বছর আগে, ১৯১৪ সালের ১৪ই জানুয়ারীই ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে এই কোলকাতা সহরেই। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের যে বিরাট রূপ এই বছর কোলকাতার বাসিন্দারা প্রত্যক্ষ করলেন, ১৯১৪ সালে এসিয়াটিক সোসাইটীর একটি ঐতিহাসিক কক্ষে মাত্র ১০৫ জন সভ্যের উপস্থিতিতে তার জন্ম হয়। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন চিরস্মরণীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। আধুনিক বিজ্ঞানের পাঁচটি বিভাগে মাত্র ৩৫টি প্রবন্ধ সেই অধিবেশনে পেশ করা হয়। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের জন্মস্থান কোন দিনই এই সম্মেলনকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে কার্পণ্য করেনি। এসিয়াটিক সোসাইটী আপন আবাসে এই প্রতিষ্ঠানকে কার্যালয় স্থাপন করবার সুযোগ দিয়েছে; কোলকাতার পৌরপ্রতিষ্ঠান দিয়েছে একখণ্ড জমি, কার্যালয়-ভবন গড়ে তুলবার জন্য। এই বৎসর সাধারণ সভাপতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় সেই জমিতে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের নিজস্ব কার্যালয় ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের এই ৪৪তম অধিবেশন হলো কোলকাতায় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশন।

শুধু কি সাহায্য, কোলকাতা বিজ্ঞান-কংগ্রেসের মর্যাদা রক্ষা করেছে। ১৯৪৩ সালের কথা, বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন হবে স্থির হয়েছে লখ্‌নৌতে। আগষ্ট আন্দোলনের বহ্নি তখন সারা ভারতবর্ষকে চঞ্চল করে রেখেছে। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সেই বৎসরের নির্বাচিত সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহেরু তখন কারাগারে। দেশের তখন চরম দুর্দ্দিন, অর্থাৎ বিজ্ঞান-জানাল, তারা ঐ বৎসর বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের গুরুদায়িত্ব নিতে অপারগ। এখন উপায়?—ভারতের বিজ্ঞান-মহাসম্মেলন তবে কি এই বৎসর স্থগিত থাকবে? জাপানী বোমার ভয়ে এবং আরো নানা শত সমস্যায় কোলকাতা মহানগরীও তখন বিব্রত, কিন্তু সেই শেষ সময়ে সে এগিয়ে এলো বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের গুরুদায়িত্ব বহন করতে। এর মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৩৮ সালে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের রজত জয়ন্তী উৎসবের দায়িত্বও কোলকাতা গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু এইবার কোলকাতা কি করলো? বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এইবার কোলকাতা যে চরম অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে, তার লজ্জা আজ এই সহরের জনসাধারণকেও কলঙ্কিত করেছে। সভ্যদের দেয় ব্যাজ, কার্ড সবই হয়ে গিয়েছিল ওলট-পালট। অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিরা এসে অনেকেই সবরকম প্রবেশপত্র না পাবার দরুণ সব অনুষ্ঠানে যোগদান করতে সক্ষম হননি। কেউ কেউ একটার বদলে তিনখানা কার্ড পেয়েছেন—চমৎকার ব্যবস্থা! আবার কোন কোন সাধারণ সভ্যকে ভুল করে প্যাণ্ডালে বসবার জন্য অধিবেশনের সভ্যদের কার্ড দেওয়া হয়েছে, তাঁদের বিনা কারণে বসতে হয়েছে অনেক পেছনে। প্যাণ্ডালের মধ্যে সামনের দিকে একটি অংশে বড় বড় করে লেখা ছিল 'সাধারণ সভ্যদের জন্য'। অনেক সাধারণ সভ্য সেই লেখা পড়েই নিজেদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বসেছিলেন কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকেরা কার্ড চেক্ করে তাঁদের পেছনে 'অধিবেশন সভ্যদের' স্থানে বসিয়ে দিয়ে এলেন। শত অনুরোধ করেও, নিজেদের বুকে সাধারণ সভ্যদের ব্যাজ থাকা সত্ত্বেও, তাঁরা স্বস্থানে ফিরে যেতে পারলেন না!

সাধারণ সভ্যদের কর্তৃপক্ষ ভুল করে 'অধিবেশন সভ্যদের' কার্ড দিয়েছেন, অথচ সাধারণ সভ্যদের নিদর্শন পত্র, ব্যাজ সব থাকা সত্ত্বেও সেই ভুলের মাশুল দিতে হল সভ্যকে! বিজ্ঞান মহাসম্মেলনে, বিজ্ঞানী ও কর্ম্মীদের চেয়ার থেকে উঠিয়ে দেওয়ার এই মিলিটারী ব্যবস্থা আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় এই প্রথম দেখলাম! অন্য প্রদেশীয় অনেক প্রতিনিধিকেও এই জুলুম সহ্য করতে হয়েছে,—এ আমাদের সকলের লজ্জা! কোলকাতার কোন কোন সভ্যকেই যে প্রকার অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল তা শুনলেই বুঝতে পারবেন, অন্য প্রদেশের কয়েক জন প্রতিনিধি কি প্রকার নাজেহাল হয়েছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতির রীডার ডাঃ জ্যোতি সেন, মূল অনুষ্ঠানেরই প্রবেশ-পত্র তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পান নি, ফলে অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য তাঁকে যে সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা একজন সভ্যের পক্ষে রীতিমত অপমানকর। এ ছাড়াও প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে ত্রুটি-বিচ্যুতির সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। অভ্যর্থনা সমিতি নিজেদের সহরের পরিচয়-সম্বলিত একটি স্মারক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, তাও অজস্র ভুলে ভর্ত্তি, এই সহজ ভুলগুলি একটু মনোযোগ দিলেই তাঁরা শোধরাতে পারতেন।

আর সমালোচনা নয়, বিজ্ঞান-কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষের এবারকার কর্ম্মতৎপরতা সমালোচনার অনেক উর্দ্ধে। পক্ষধর মিশ্র তো ছার, ভারতের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানীদের অনেকেও তীব্র সমালোচনা করে এঁদের নাগাল পাননি। অতএব যা হয়েছে তাই ভালো,—এবার

বিখ্যাত বিদেশী বিজ্ঞানীদের জনপ্রিয় বক্তৃতাবলী একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে। অবশ্য সাধারণের কাছে বক্তৃতার বিষয়ের চেয়ে বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত আকর্ষণই হয় বেশী। খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের দেখবার জন্ত এবং তাঁদের মুখে আলাপ-আলোচনা শুনবার জন্ত বিজ্ঞানকর্ম্মীরা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এবারকার বিজ্ঞান-কংগ্রেসে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড, অধ্যাপক হারজবার্গ, অধ্যাপক স্পেন্সার জোনস্ এবং অধ্যাপক নেসমিয়ানভ উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ্, প্রাচীন যুগের সভ্যতার বিষয়েই তাঁর আলোচনা করার কথা, তাই তাঁর সভাতেই সাধারণ লোক সব চেয়ে বেশী আকর্ষিত হয়েছিল। ছবির মাধ্যমে তাঁর বক্তৃতা চমৎকার হয়, কিন্তু কথার জড়তার জন্ত অনেকেই সম্পূর্ণ রস গ্রহণ করতে সমর্থ হননি। রুশীয় বিজ্ঞানী নেসমিয়ানভ কোন জনপ্রিয় বক্তৃতা দেন নি, রসায়ন-বিজ্ঞান শাখার আলোচনাচক্রের মধ্যে তিনি নিজস্ব গবেষণার বিষয়ে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। বিজ্ঞানী হারজবার্গ ও স্পেন্সার জোন্স সাহেবের বক্তৃতাও বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ও বাংলার বিজ্ঞানকর্মীরা যথেষ্ট উপভোগ করেছিলেন। ডাঃ এন দত্ত-মজুমদারের রূপকুণ্ড অভিযানের সচিত্র বক্তৃতাটিই এবারকার বিজ্ঞান-কংগ্রেসের জনপ্রিয় বক্তৃতাবলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। ভারতীয় বিজ্ঞানী দলের রূপকুণ্ড অভিযানের বিবরণী ডাঃ দত্ত-মজুমদার রঙীন ছায়াচিত্রের সহায়তায় বর্ণনা করেন। নগাধিরাজ হিমালয়ের তুষারাবৃত অঞ্চলে প্রাপ্ত একদল তীর্থযাত্রীর দেহাবশেষ এবং বস্তুসমূহের পরিচয় শ্রোতারা রুদ্ধনিঃশ্বাসে শ্রবণ করেন। সিনেট হলে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রদর্শনীতেই এই বস্তুগুলির স্বরূপ তাঁরা দেখেছেন, এবার তার পরিচয় কাহিনী সকলকেই তৃপ্ত করলো।

বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রদর্শনীটিতে কয়েকটি যন্ত্রপাতীর দোকান ছাড়া সাধারণতঃ আর বিশেষ কিছুই থাকে না। সারা ভারতবর্ষের এমন কি অন্তান্ত রাষ্ট্রের বহু প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্ম্মীরা এখানে এসে সমবেত হন; তাই গবেষণাগারের জন্ত প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের প্রদর্শনী করে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রদর্শনীতে,আশুতোষ বিল্ডিংএর শতবার্ষিকী প্রদর্শনী এবং আশুতোষ মিউজিয়াম বাদ দিলে দেখা যায়, এবারও দোকানঘর ছাড়া কেবলমাত্র রূপকুণ্ড এবং আণবিক শক্তি-কমিশনের প্রদর্শনীই ছিল। রূপকুণ্ডের বস্তুসমূহ অভিনবত্বের দাবী করতে পারে। আণবিক শক্তি কমিশনের প্রদর্শনী সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তির বিশেষ সহায়ক, তাই এরও মূল্য নেহাত কম নয়। পক্ষধর মিশ্র মনে করেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রদর্শনী বোধ হয় আরও অনেক চিত্তাকর্ষক করা সম্ভব।

জে, রবার্ট, ওপেনহাইমার

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসবে কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষ ও বিশ্বের কয়েক জন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিকে সম্মানসূচক

ডক্টরেট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। যাঁরা এই সম্মান লাভ করেন, প্রিন্সটনের বিশ্ববিখ্যাত গবেষণা-মন্দিরের ডিরেক্টার জে, রবার্ট ওপেনহাইমার তাঁদেরই এক জন। বিশেষ সমাবর্ত্তনে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে ডক্টর অফ সায়ান্স উপাধি অর্পণ করে সম্মানিত করেন।

বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিদ্ ডাঃ জে, রবার্ট ওপেনহাইমার ১৯০৪ সালের ২২শে এপ্রিল নিউইয়র্ক সহরে জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে তিনি জার্মাণদেশবাসী ইহুদি, তাঁর বাবা বয়নশিল্পের ব্যবসায়ে আমেরিকাতে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেছিলেন। বাল্যকালেই রবার্ট ওপেনহাইমার স্কুলের লেখাপড়াতে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন! অল্প সময়ের মধ্যে একসঙ্গে ফরাসী, গ্রীক ইত্যাদি ভাষা এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রাথমিক পুস্তক সকল শিক্ষা করে তিনি তাঁর শিক্ষকদের অবাক করে দেন। অবাক হবার মতোই কথা, মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি নিউইয়র্কের খনিজ বিষয়ক সমিতির সভ্যপদে নির্বাচিত হন, আর সব সভ্যরাই তখন প্রায় ৬০ এর কোঠা অতিক্রম করছেন! স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে, ওপেনহাইমার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হবার ৪ বছরের পাঠ্যতালিকা মাত্র ৩ বছরে সমাপ্ত করে ঐ পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। উচ্চশিক্ষার জন্য এবার তাঁর বাবা তাঁকে বিদেশে পাঠান। প্রথমে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, তারপর জার্ম্মাণীর গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাত্র তেইশ বছর বয়সে তিনি জার্ম্মাণীর গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অফ ফিলজফি উপাধি লাভ করেন।

আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করে ওপেনহাইমার একসঙ্গে দুটি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করবার জন্য আমন্ত্রিত হন। একটি বার্কেলেতে অবস্থিত ক্যালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, অপরটি ক্যালিফর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজি। উভয় আমন্ত্রণ গ্রহণ করে একযোগে তিনি এই দুটি প্রতিষ্ঠানেই কাজ করতে থাকেন। ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাসে আমেরিকার যুদ্ধ বিভাগ তাঁকে প্রথম পরমাণু-বোমা নির্ম্মাণ পরিকল্পনার নেতৃত্ব করতে আহ্বান করেন। পরমাণু-বোমা নির্ম্মিত এবং মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত হবার পর তার প্রচণ্ড ক্ষমতা ও নারকীয় ধ্বংসলীলায় তিনি বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। পরমাণু-বোমার সৃষ্টিনাশকারী ক্ষমতা দেখে যখন শান্তিকামী মানুষ একে সভ্যতার অভিশাপ বলে বর্ণনা করে এর সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞানীদের দোষ দিলেন, তখন ওপেনহাইমার বলেছিলেন ;—"The World cannot turn its back on knowledge."

বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার-এর পর আমেরিকার পরমাণু শক্তি-কমিশনের, হাইড্রোজেন বোমা নির্ম্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রধান পরামর্শদাতা নিযুক্ত হন। ওপেনহাইমারের মনোভাবের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হয়েছিল ; তাঁর নির্ভীক সমালোচনায় বিব্রত হয়ে সরকার আণবিক শক্তি-কমিশনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছেদ করে দিয়ে, আণবিক শক্তি সংক্রান্ত গবেষণা সমূহের গুপ্ততথ্যাবলী জানবার অধিকার থেকে এই বিজ্ঞানীকে বঞ্চিত করেন।

১৯৪৭ সালে বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমার প্রিন্সটনের বিখ্যাত ইনসটিটিউট ফর অ্যাডভান্স ষ্ট্যাডিজ-এর ডিরেক্টার নিযুক্ত হন। বহু কোটি ডলার ব্যয় করে নির্ম্মিত এই বিশ্ববিখ্যাত গবেষণা-মন্দিরে বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন, বিজ্ঞানী নীলস বোর প্রভৃতি চিন্তা-নায়কেরা গবেষণা করেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে রবার্ট ওপেনহাইমার অত্যন্ত মধুর প্রকৃতির লোক,—ছাত্রদের সঙ্গেই তাঁর প্রীতির সম্বন্ধ সবচেয়ে বেশী। ১৯৪০ সালে তিনি বিবাহ করেন,—তাঁর স্ত্রীর নাম ক্যাথেরিণ পুয়েননিং হ্যারিসন। বর্ত্তমানে ২টি সন্তান ও স্ত্রীর সঙ্গে প্রিন্সটনের একটি সতের কামরা-বিশিষ্ট বিরাট বাড়ীতে ওপেনহাইমার শান্তিতে বাস করছেন। কড়া মদ ও মসলাসংযুক্ত খাদ্যের প্রতি তাঁর বিশেষ আসক্তি আছে। খেলাধূলার মধ্যে ঘোড়ায় চড়তেই তিনি বিশেষ ভালোবাসেন। প্রতিবেশী ও লোকজনের সঙ্গে গল্প করাও তাঁর অবসর সময় যাপনের আর একটি প্রধান উপায়।

প্রথম পরমাণু-বোমা নির্ম্মাতা এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মনে-প্রাণে শান্তিকামী, তিনি বিশ্বাস করেন, খোলা মনে আলাপ-আলোচনার দ্বারাই বিশ্বে শান্তি রক্ষা করা সম্ভব। বিশ্বশান্তির সম্ভাবনার বিষয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ওপেনহাইমার বলেছিলেন, মাত্র দুটি লক্ষ্যে মানুষ যেদিন পৌঁছোতে পারবে, সেদিনই পৃথিবীর এই অশান্ত উত্তেজনার ঘটবে পরিসমাপ্তি। প্রথম লক্ষ্যটি হলো বলপ্রয়োগে রাজ্যশাসনের অবসান, দ্বিতীয়টি হলো রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে গোপনীয় রহস্যজালের উদ্ঘাটন। গোপনীয় আবহাওয়ার মধ্যেই মিশে থাকে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের ভাব ; তাই খোলা মনে বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি যদি একযোগে মানবকল্যাণে অগ্রসর হতে না পারে, তাহলে শান্তিময় জগতের প্রত্যাশা করাই বৃথা।

বিজ্ঞানী জে, রবার্ট ওপেনহাইমারের বর্ত্তমান বয়স মাত্র ৫৩ বছর,—এই অসাধারণ প্রতিভাশালী বিজ্ঞানীর কাছে সমগ্র মানব-সভ্যতা আরও অনেক কিছু আশা করে। তাই আমরা তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শরৎ-স্মৃতির টুকিটাকি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

কোন একটা কাজের জন্য প্রায় মাসখানেক আমাকে বরানগর থেকে আবার দক্ষিণ-কোলকাতায় এসে থাকতে হয়। সেই সময় একদিন সকালে—অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎচন্দ্রের বাড়ী এসেচি। আমার সঙ্গে ২২।২৪ বছরের একটি যুবক আছে। সে বেশ ভাল লেখে। তার কলমটির ভেতর থেকে শক্তিশালী ভাষায় সৌন্দর্যভরা লেখা বেরুতো। ছোট-বড় সব রকম জিনিসই সে দেখতে জানে এবং দেখার পর সে জিনিষ সে নিখুঁত ভাবে তার কলমের মুখে আঁকতে পারে। তার পর্যবেক্ষণ শক্তি (observation) অনেক নামকরা লেখকের চাইতেও তীক্ষ্ণ ছিল। কিন্তু তরুণ বয়স ও নতুন লেখক বোলে কোনও নামকরা পত্রিকার সম্পাদকই তার লেখা গল্প পত্রস্থ করতে রাজি হতেন না। এজন্য সে আমার শরণাপন্ন হয়। আমি আবার তাকে সঙ্গে এনে শরৎচন্দ্রের শরণাপন্ন হোয়েছি। অনেক চেষ্টা করেও সে তার কোনও গল্প প্রথম শ্রেণীর কোন কাগজে বার করতে পারে নি। তার দু'-চারটে গল্পের পাণ্ডুলিপি—সেদিন সে সঙ্গে করেই এনেছিল। শরৎচন্দ্রকে বললাম—"সম্পাদকদের কি অন্যায় দেখুন ত' দাদা! নতুন আর তরুণ হোলেই, তাঁদের কাগজে এদের প্রবেশাধিকার থাকবে না, এ কেমন কথা?" ছেলেটিকে বললাম—"গল্প দুটো রেখে যাও, উনি পড়ে দেখবেন, তারপর কোনও ভাল কাগজে—যাতে বার হয়, তার জন্য চেষ্টা করা যাবে, বুঝলে? আজকে তুমি যাও, হপ্তাখানেক পরে, দাদার সঙ্গেই হোক বা আমার সঙ্গেই হোক, দেখা কোরো।" ছেলেটি তার লেখা গল্প দুটো রেখে চলে গেলো। সে চলে গেলে আমি বললাম—"সম্পাদকদের কি রকম বিচার দেখুন দেখি! তরুণ আর নতুন লেখকের খুব ভাল লেখা হোলেও তাঁরা তা ছাপতে রাজী হন না, এটা বড় দুঃখের কথা! ভাল-মন্দ লেখার কি তাহোলে বৃদ্ধত্ব আর তারুণ্যই হোল মাপকাঠি? আমি ত বুঝি, লেখা ভাল হোলেই হোল। লেখক তরুণই হোক আর প্রবীণই হোক, তা নিয়ে ত' আর কথা নয়।"

শরৎচন্দ্র বললেন—"সাহিত্যক্ষেত্রের এইগুলো হোল—কাঁটা-বেড়া। অধিকাংশ লেখককেই এই 'কাঁটা-বেড়া' 'জল-বেড়া' ডিঙিয়ে তবে সাহিত্যিক হোতে হয়। যাকে এসব বাধা-বিপত্তি দুর্ভোগ ভুগতে না হয়, সে ত ভাগ্যবান সাহিত্যিক। আমি ত ঐ ভয়েই প্রথমে কোন বড় কাগজে ঘেঁষতে সাহস করি নি। তাই প্রথমে ভয়ে ভয়ে আমার পান্সী ভাসিয়েছিলুম—'যমুনা'য়!"

ছেলেটি চলে যাবার পর, এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হোল। এই শ্রেণীর তরুণ লেখকদের ওপর আমরা উভয়েই খুব বেশী মাত্রায় সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলাম। কিন্তু মুশকিল এই যে, কোন সম্পাদককে কোন-কিছুর জন্য অনুরোধ বা পেড়াপিড়ী করা শরৎচন্দ্রের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। স্বভাবের দিক দিয়ে এরূপ কোন বাধা আমার না থাকলেও, এক-আধ জন ছাড়া, কোনও সম্পাদকের সঙ্গে আমার তেমন পোট্-শোট্ ছিল না। সে এক-আধ জনের কাছে আমি চেষ্টা করতেও কসুর করি নি, কিন্তু কোন ফল হয় নি। আমিও আর একবার চেষ্টা করবো। তবে কোনও ফল হবে না, এ-ও আমরা জানি।

ওঠবার সময় শরৎচন্দ্র বললেন—"কিন্তু আমার ওপর আজ এই বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ভাল করলে না। দু'-দুটো হাতে-লেখা গল্প পড়া—ওঃ! ও ত আমার দ্বারা—। তুমি ত পড়েচ। তোমার যখন ভাল লেগেচে, তখন নিশ্চয়ই আমারও ভাল লাগবে; সুতরাং—"

"সুতরাং—একটা থাক, একটা আমি নিয়ে যাচ্চি। ছেলেটি বড় ভাল; একটু কষ্ট করে ওর একটা গল্প আপনি পড়বেন দাদা! যেন ভুলবেন না।"

"পড়বো'খন: ভুল আমার হয় না।"

যাব বলে পিছু ফিরেছিলাম; দাদার ঐ কথায় আবার ঘুরে দাঁড়ালাম, হাসতে হাসতে বললাম—"ও কথা আর বলবেন না দাদা। চিঁড়ের কথাটা না হয় পুরোনো হোয়ে গেছে, কিন্তু বোটানিকেল গার্ডেনের Pen Clubএর ব্যাপারটা এখনো টাটকা।" শরৎচন্দ্র আর কিছু বললেন না; আমি হাসতে-হাসতেই চলে এলাম।

চিঁড়ের ব্যাপারটা একটু বলি।

অপরাহ্ণ কাল। বেলা প্রায় পাঁচটা। এই সময় প্রায়ই আমরা 'লেক'এর দিকে বেড়াতে যেতাম। সেদিন গিয়ে দেখি, তিনি বেরুবার জন্য প্রস্তুত। আমাকে দেখে বললেন—"চল, আজ একটু বাজারের দিকে যাওয়া যাক।"

গাড়ী তৈরী ছিল, এলাম দু'জনে জগুবাবুর বাজারে। এটা-ওটা অনেক-কিছু কেনা-কাটা হোল। শেষে একটা জিনিস কেনা নিয়ে শরৎচন্দ্র মহা মুশকিলে পড়লেন। এই জিনিসটা কিনে নিয়ে যাবার জন্যে বাড়ীর মেয়েরা শরৎচন্দ্রকে বিশেষ করে বলে দিয়েচেন। এই জিনিসটা আনতে মেয়েরা শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ প্রকাশকে ক'দিন ধরে বলচেন, তিনি ভুলে যান; বাড়ীর চাকর-বাকরদের বলে দেন, তারাও ভুলে যায়। তাই আজ অনেক করে খোদ শরৎচন্দ্রকে তাঁরা ঐ জিনিসটা আনতে বলে দিয়েচেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র জিনিসটার নাম একেবারেই ভুলে গেছেন। শুধু মনে আছে তাঁর যে জিনিসটা খুবই উপকারী এবং দরকারী, সেটা নিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু তিনি কিছুতেই তার নামটা মনে করতে পারচেন না। জিনিসটা ভিজিয়ে খেতে হয়। সুতরাং ভিজিয়ে খাবার জিনিস—কি হোতে পারে?

আমি বললাম—"ভিজিয়ে খাবার জিনিস? এ না-মনে পড়বার ত' কিছু নেই, নিশ্চয়—মিছরী।"

"না, মিছরী নয়।"

"তা হোলে—বাতাসা।"

"আরে দূর! ও-সব নয়।"

"তবে কি—ছোলা?"

শরৎচন্দ্র একান্তমনে ভাবতে-ভাবতে মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ—

"তা হোলে, কাঁচা গোটা মুগ, কি বরবটী কড়াই বোধ হয়। কোন পুজোয় নৈবিদ্যির জন্তে ত ?"

একই ভাবে ভাবতে-ভাবতে শরৎচন্দ্র বললেন—"আহা-হা না না, ওসব নয়। আর কি বললে তুমি ? ছোলা ? তা হোতে পারে ; বোধ হয় ছোলা-ই—" পরক্ষণেই আবার বললেন—"নাঃ ছোলা নয়। কেন না, একটা ছোট ধামার প্রায় আধ ধামা ছোলা আজ সকালেই আমি ভাঁড়ারে দেখেছি, মেজের ওপর সামনেই রয়েচে।"

একটা জিনিসের নাম অল্পক্ষণের মধ্যে শরৎচন্দ্রের এই ভাবে ভুলে যাওয়া এবং ব্যর্থতার সঙ্গে সেটা আমাদের দু'জনের মনে আনবার চেষ্টা করাটা এতক্ষণ পর্যন্ত আমার মনে বিরক্তিই আনছিলো, কিন্তু এখন তার বদলে একটা উৎসাহের নাড়া যেন মনের ওপর এসে লাগলো। গভীর ভাবে ভাবতে লাগলুম। কি হোতে পারে ? ভিজিয়ে খেতে হয়, অথচ—মিছরী নয়, বাতাসা নয়, ছোলা নয়, মুগ নয়, বুট নয়—তা হোলে, আর কি হোতে পারে ? আমার মনে পড়লো, 'আলিবাবা'র সেই 'কাসেমে'র কথা। 'চিচিঙ ফাঁক', কথাটা ভুলে গিয়ে, শেষ কালে 'ঝিঙে ফাঁক,' 'বেগুণ ফাঁক,' 'আলু ফাঁক,' 'পটল ফাঁক,' 'ঢ্যাঁড়স ফাঁক,'—সব ফাঁক ! এ ক্ষেত্রেও আমাদের দেখছি, সেই দশা হোল, যা কিছু বলচি, সবই ফাঁকা হোয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আমি বলে উঠলুম—"দাদা, ইসবগুল্ কি ?" শরৎচন্দ্র আমার কথায় কান না দিয়ে, লাফিয়ে উঠে বললেন—"চিঁড়ে—চিঁড়ে !"

বাঁচা গেল ! চল্লিশ-দস্যুর গুহা থেকে বেরোবার পথ পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল। একটা মুদীর দোকান থেকে সের-আড়াই চিঁড়ে কিনে নিয়ে আমরা বাড়ীর পথে ফিরলুম। আমাকে আমার বাড়ীর কাছ-বরাবর নামিয়ে দিয়ে শরৎচন্দ্র চলে গেলেন।

পরের দিন সকালবেলা যেতেই শরৎচন্দ্র বললেন—"কাল তোমার জন্তে আমি বাড়ীতে কি বকুনিই খেলুম !"

চমকে উঠে বললুম—"কেন ; কাল আমি কি করেছিলুম, দাদা ?"

"তুমি চিঁড়ের কথা বললে, আমি চিঁড়ে নিয়ে এলুম। তারপর খুব একচোট বকুনি খেলুম !"

"তাহোলে—চিঁড়ে নয় ? কি আনতে বলেছিলেন ?"

"নালতে-পাতা। ছেলেমেয়ে দু'টোর কৃমি হোয়েচে, ওঁদেরও পিত্তি বেড়েচে, সব ভিজিয়ে দিনকতক খাবে। ওঃ ! ওর জন্তে কাল কি-কথাটাই শুনতে হোল !"

"শুনবেনই ত। আপনিই ত' বললেন—'চিঁড়ে'। আমার ঘাড়ে এখন দোষ চাপালে ত চলবে না। আমি বরং 'নালতে-পাতা'র কাছা-কাছি গিয়েছিলুম ; 'ইসবগুল' বলেছিলুম।"

যা'ক ; এই হোল চিঁড়ের কাহিনী। শরৎচন্দ্রের এইরকম ভুল হবার প্রধান কারণ, তাঁর মাথায় সর্বদা ভীড় জমিয়ে থাকতো—খালি লেখার ভাবনা। লেখার বিষয় ছাড়া, তাঁর মনের ওপর অন্য কোন কথাই গভীর ভাবে বসতো না। বিশেষতঃ ঐ সময়ে 'চরিত্রহীনে'র নতুন সংস্করণের জন্যে তাঁর মন খুব ব্যস্ত থাকতো। ঐ সময় একদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন—"দুটো আলাদা আলাদা বিষয়বস্তু নিয়ে, তাকে একসঙ্গে জুড়ে 'চরিত্রহীন' লিখতে হোয়েচে। এই দুটোর মিল রেখে একটা সমাপ্তি আনা বড্ড শক্ত।"

এর কিছু দিন পরে শরৎচন্দ্রকে প্রায়ই বিমর্ষচিত্ত দেখতুম। এই অবস্থায় প্রায়ই তিনি হতাশার সুরে একটা কথা বলতেন। সে কথাটা হোচ্চে—'কি হোল!' কথাটা বেদনাজড়িত হোয়ে তাঁর অন্তর থেকে বেরুতো। তাঁর এই 'কি হোল'র মানেটা এই যে, এত দিন ধরে, এত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, এত ছুটোছুটি, লাফা-লাফি, দাপা-দাপির পর, জীবন এ কোথায় এসে দাঁড়ালো! সে-সবের ফল কি হোল, পরিণাম কি হোল! মনের যে-অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে প্রায়ই এই 'কি হোল' কথাটা শুনতুম, মনের সেরূপ অবস্থা হওয়ার কারণটা বোধ হয় আমি বুঝতে পারতুম। মাত্রাধিক পরিশ্রমের পর, যেমন লোকের দেহে-মনে ক্লান্তি আসে ; এ সেই ক্লান্তিভাব। অল্পবয়স থেকে সুরু করে, দীর্ঘদিন ধরে মনের ওপর একটা অবসাদ আসে। শ্রান্ত মন তখন নির্জীবের মত হোয়ে যায়। হয়ত একটা ক্ষণিক উৎসাহ-উত্তেজনায় সে-মন একটু চাঙ্গা হোয়ে ওঠে, কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। এই অবসাদগ্রস্ত নির্জীব মনকে চাঙ্গা করে তুলতে, তিনি কিছুদিন উত্তেজক জিনিসও ব্যবহার করতেন, কিন্তু তাতে ফল আরো খারাপ হোত।

সম্প্রতি কোন এক পত্রিকায় আমাদের এক বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি শরৎচন্দ্র সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিখেচেন যে, এই সময়ে শরৎচন্দ্র না কি তাঁকে কথাচ্ছলে বলেছিলেন—"আমার লেখা আর তোমরা কিছু প্রত্যাশা কোরো না, আমাকে 'জরা'য় আক্রমণ করেচে।" শরৎচন্দ্র যদি তাঁকে এই কথা বলে থাকেন, তাহোলে তিনি তাঁর নিজের মনের এই অবস্থাটা নিজেই ঠিক ধরতে পারেন নি বলেই মনে হয়। মানুষের যে বয়সে 'জরা' এসে মনকে আক্রমণ করে, শরৎচন্দ্রের সে বয়স তখন হয়নি। প্রকৃত যা 'জরা', তা মানুষকে কমপক্ষে তার ৬৮।৭০ বছর বয়সেই আক্রমণ করে। আমি নিজেকে দিয়েই দেখি যে, এখন আমার বয়স ৭৫ বছর। এখন আমি বেশ বুঝতে পারচি যে এত দিনে আমি 'জরা'য় আক্রমিত হোয়েচি। দু'বছর আগে থেকেই হয়ত অল্পে অল্পে হোয়েচি। কিন্তু যখনকার কথা বলচি, তখন শরৎচন্দ্রের বয়স ছিল—৬০। ষাট বছর বয়সে বড় একটা কারোকে 'জরা'য় ধরে না। খুব তাড়াতাড়ি ধরলেও, ৬৫।৬৬ বছর বয়সের আগে যে কাকেও 'জরা' আক্রমণ করে, এ আমার মনে হয় না। তবে হয় ত আমার জ্ঞানের অল্পতার জন্যে এ বিষয়ে আমার ধারণা ভুল হোতেও পারে।

যাই হোক, শরৎচন্দ্রের মুখে ওই হতাশাব্যঞ্জক 'কি হোল'র উত্তরে, আমি তাঁকে একদিন বললাম—"দাদা, সবই ত হোয়েচে। নেই, দাদা! পৃথিবীতে জন্মাবার পর, দোলায় শুয়ে দুলেচেন, তার পর ছোটাছুটি করেচেন, লাফা-লাফি দাপা-দাপি দৌড়-ঝাঁপ করেচেন, কত খেলা খেলেচেন, যৌবন কালে কত প্রেম-প্রণয়ের কত বিরহ-মিলনের, কত স্বপ্ন মাধুর্যের, কত আশা-নিরাশা, তৃপ্তি-অতৃপ্তির ভেতর দিয়ে চলে এসেচেন। তার পর সাহিত্য-জগতের চিত্রকর হোয়ে, কত ভিন্ন ভিন্ন মানুষের, সমাজের, সংসারের নিখুঁত ছবি এঁকে কত যশ-মান, আনন্দ আদর-অভিনন্দন পেয়েচেন। আবার এখন এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েচেন, মন যেখানে আর পা বাড়িয়ে এগিয়ে যাবার উৎসাহ পাচ্চে না, খালি চলে-আসা পথের দিকে চেয়ে চেয়ে হতাশা আর ব্যথায় সে-মন আপনার ভেঙ্গে পড়চে। সুতরাং জীবনের যা কিছু হবার, সবই ত ঠিক ঠিক হোয়ে আসচে দাদা, একচুলও তার এদিক-ওদিক হয়নি ; সুতরাং কিছু না হওয়ার জন্যে দুঃখু করবার ত কিছুই নেই ; দাদা!"

মুখে এই কথা বললুম বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মানসিক অবসাদের অন্যতর কারণটারও কথা ভাবতে লাগলুম। হয়—এ ভাবটা তাঁর ক্লান্ত মনের অবসাদ, নয় ত—অন্য একটা কারণও হোতে পারে। গত জীবনে শরৎচন্দ্রের সুরাপানের অভ্যাস ছিল। শুনেছি তিনি অতিরিক্ত মাত্রাতেই ঐ জিনিসটা পান করতেন। এ অভ্যাসটা বর্মা প্রবাসকালে তাঁর বেশী ছিল। সেখান থেকে চলে এসে যখন শিবপুরে থাকেন, তখনও কিছু কিছু ছিল। তার পর হঠাৎ সেই অভ্যাস তিনি পরিত্যাগ করেন।

এক জিনিসকে ত্যাগ কোরে সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু অন্য জিনিসকে গ্রহণ করেন। সে জিনিস হোল আফিং। আফিং ধরেই ক্রমে ক্রমে ওর মাত্রা তিনি বাড়িয়ে দিলেন। তারপর তার মাত্রা আবার কমিয়ে আনেন। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে অধিক মাত্রায় সুরাপানের অনিবার্য ফল—স্নায়ুমণ্ডলীর দুর্বলতা আর মানসিক অবসাদ। মনে হয়, শরৎচন্দ্রের বর্তমান মানসিক অবসাদের মূল কারণ এইটাই, 'জরা' নয়।

তাঁর সুরাপানের কথায় একটা কথা না লিখে পারচি না। তিনি সুরাপান করতেন সত্য এবং হয়ত একটু বেশী মাত্রায় পান করতেন, তা'ও সত্য, কিন্তু বর্মা থাকাকালে তাঁর সুরাপানের মাত্রার কথা একখানা বইয়ে পড়ে আমাকে চমকে উঠতে হ'য়েচে। এই রকম অসম্ভব আজগুবি কথা ছাপার অক্ষরে কি করে প্রকাশিত হয় তা ভাবতেও পারি না। বইখানার নাম বোধ হয়—'শরৎচন্দ্র'। লেখক এক জায়গায় লিখচেন যে 'বর্মায় একদিন রাত্রে একজন য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে বাজী রেখে ও পাল্লা দিয়ে, শরৎচন্দ্র পর পর আঠারো বোতল সুরা পান করেছিলেন।' বইখানা আমার নেই ; থাকলে তার থেকে হুবহু বাক্যটা তুলে দিতে পারতাম। তাহ'লেও কথাটা এইরূপই। তারপরই লিখচেন—'কিন্তু তা'তেও তাঁর কিছুই হয় নি'। অদ্ভুত কথা! এক বোতল নয়, দু' বোতল নয়, একেবারে আঠারো বোতল! কোয়ার্ট বোতলের মাপ তিন পোয়া অর্থাৎ ২৪ আউন্স। ১৮ বোতলে হয় সাড়ে তের সের। বৃকোদরের পেটের খোলে সাড়ে তের সের জল তিনি ধরাতে পারতেন কি না সন্দেহ, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মত একজন সাধারণ মানুষ ১৩৷ সের—জল নয় সুরা অক্লেশে এবং সহজে উদরস্থ [illegible] কথা

আর নেই। কিন্তু এটা গভীর দুঃখদায়ক কথাও বটে! বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সর্বজনমান্য উপন্যাস-সম্রাটের বিষয়ে এইধরণের আজগুবি ও বে-পরোয়া লেখা কি কোরে মুদ্রিত পুস্তকে স্থান পায়—তা বুঝি না।

বহুদিন আগে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আর একটা কথা বহুলোকের মুখে প্রায়ই শোনা যেত। তিনি যখন সামতাবেড়ে রূপনারায়ণ নদের ধারে বাস করতেন, তখন অনেকেই কোলকাতা থেকে তাঁকে দেখতে সেখানে যেতেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই শ্রদ্ধা ভরে তাঁর জন্য মিষ্টান্নাদি নিয়ে যেতেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র এত দাম্ভিক ছিলেন যে, সেই সকল মিষ্টান্ন, উপহারদাতাদের সামনেই তিনি তাঁর প্রিয় কুকুর 'ভেলী'কে খাওয়াতেন, নিজে তার এক রতিও খেতেন না। এ-সব ব্যাপারের প্রতিবাদ করতে যাওয়াই মূর্খতা। সুতরাং এইখানেই এ-সবের পূর্ণচ্ছেদ ফেলা থাক।

* * * *

'বিচিত্রা' যখন তার বিচিত্র রূপ ও সাহিত্যসম্ভার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো এবং সাহিত্যরসিকগণের কাছে প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ পত্রিকারূপে সমাদর লাভ করলো, তখন থেকেই 'বিচিত্রা'র সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা। ধরতে গেলে আমার সাহিত্য-জীবনের সুরু 'বিচিত্রা'তেই। 'বিচিত্রা'র গোড়া থেকেই আমি 'বিচিত্রা'তে লিখতে থাকি। স্বর্গত: বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', অন্নদাশঙ্করের 'পথে প্রবাসে' ও আমার ছোটগল্প, একই সময়ে মাসের পর মাস 'বিচিত্রা'তে প্রকাশিত হোতে থাকে। এজন্য বিভূতিভূষণ ও আমি প্রায়ই 'বিচিত্রা' আফিসে যেতাম। 'বিচিত্রা'র আকর্ষণের চেয়ে তার সম্পাদকের আকর্ষণ আমাদের কাছে ছিল আরও বেশী। উপেন বাবুর মত অমায়িক লোক আমি খুব কমই দেখেছি। তিনি যেমন গুণী, তেমনি জ্ঞানী, তেমনি নিরহঙ্কারী। এমন লোক খুব কমই আছেন, যিনি তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও সৌজন্যে মুগ্ধ না হোয়েচেন। উপেন বাবুর কাছে গিয়ে ও তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কোয়ে আমি আনন্দ পেতাম; সেজন্য মাঝে মাঝেই তাঁর কাছে যেতাম। একবার উপেন বাবুর কাছে প্রস্তাব করলুম, "সাহিত্যিক ও কবিরা মিলে একখানা নাটক অভিনয় করলে কেমন হয়?" এ বিষয়ে অনেক দিন থেকেই আমার খুব একটা ঝোঁক ছিল। আমার প্রস্তাবের স্বপক্ষে তিনি খুব আনন্দের ও উৎসাহের সঙ্গে মত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন—"চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এসব বিষয়ে খুব উৎসাহী ও কর্মী। অমরেন্দ্রকে একথা জানালে, উৎসাহের সঙ্গে সাড়া পাওয়া যাবে; তারপর আপনি ত আছেনই।" উপেন বাবুর কথায় খুবই উৎসাহিত হলুম। তিনি বললেন—"শরৎকে একথাটা জানাবেন; তাকে এ ব্যাপারে চাই কিন্তু।" মনে মনে ভাবলাম শরৎচন্দ্রও সহজেই এ ব্যাপারে উৎসাহের সঙ্গেই রাজী হবেন।

সুতরাং কয়েক দিন পরে শরৎচন্দ্রকে কথাটা জানলাম। শরৎচন্দ্র শোনা মাত্রই বললেন—"দূর—দূর! ক্ষেপেচ! ও কিছুতেই হবে না!" তাঁর উত্তরের ভঙ্গীটা শুনে রাগ হোল; জিজ্ঞাসা করলুম—"হবে না কেন?"

"অর্থাৎ, হোতে পারে না বোলেই হবে না। যত সব পাগলামী তোমাদের!"

আমি কিছু বলতে গিয়ে আর বললুম না। শরৎচন্দ্রের কথায় বেশ একটু উৎসাহভঙ্গ হোয়েই গেলুম। কিন্তু একেবারে হতাশ হলুম না। হতাশ হলুম দিন কয়েক পরে উপেন বাবুর কাছে গিয়ে। উপেন বাবু সেদিন বললেন—"কতদূর কি হোল? শরৎকে সব বলেচেন ত?"

"হ্যাঁ, সবই বলেচি।"

"রাজী ত?"

বলতে যাচ্ছিলুম সত্য কথা, যে—রাজী ন'ন; কিন্তু তা না বোলে, বললাম—"হ্যাঁ, শরৎচন্দ্র খুব রাজী।"

"বেশ। তাহোলে খুব শীগগির যাতে হয়, উঠে পোড়ে লাগুন। কিন্তু একটা কথা। 'প্লেটা' কিন্তু সাধারণ ভাবে করা হবে না, একটু নতুন রকম—অর্থাৎ extempore play।"

উপেন বাবুর কথা শুনে চমকে উঠলুম। বুঝলুম—সক্ষণ সুবিধার নয়। উপেন বাবু বললেন—"রবীন্দ্রনাথকেও অভিনয়ের রাত্রে আমরা নামাতে পারবো। সে ভার আমার। তবে, একটা কথা, রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে কোলকাতায় আসবেন, আমাদের ঠিক ঐ সময় বেঁধে অভিনয় আয়োজনটা করে ফেলতে হবে। শরৎকে কথাটা বলবেন।"

মনে মনে বললুম, শরৎকে কথাটা বলবার আর দরকার হবে না। বেশ বুঝলুম যে, হবে না। উপেন বাবু বললেন—"আমি নিজে কিন্তু কোন ভূমিকা নিয়ে অভিনয় করতে পারবো না। সে দক্ষতা আমার মোটেই নেই। আমি একটা ভিখিরী বাবাজী বা ঐরকম কিছু একটা সেজে দু'-একখানা কীর্তন-গান গাইব।"

নিরুৎসাহ হলুম বটে, কিন্তু একেবারে হাল ছাড়লুম না। কথাটা শৈলজানন্দকে বললাম। শৈলজানন্দের কাছ থেকে খুবই উৎসাহ পেলাম। আরও দু'-চারজনকে বললাম। তাঁরাও উৎসাহ দিলেন। তখন ভাবলাম, এঁদের সকলের ইচ্ছা ও উৎসাহটা শরৎচন্দ্রকে আর একবার জানাই। কয়েক দিন পরে তাই জানালাম। কিন্তু শরৎচন্দ্র 'যথা পূর্বং তথা পরং' তাঁর সেই একই উত্তর—"তোমার মাথা খারাপ হোয়ে গেছে; এ কখনো হয়!"

"আচ্ছা দাদা, হবে নাই বা কেন?"

"আরে পাগল! হবেই বা কেন?"

একটুখানি ভেবে আমি বললুম—"হবে এই জন্যে যে, আমরা করবো।"

"আমরা কারা, একে একে নাম কর দিকি।"

আমি বারো-চোদ্দজনের নাম কোরে গেলাম। শরৎচন্দ্র বললেন—"এঁদের মধ্যে দু'-চার জন ছাড়া, ষ্টেজে নেমে প্লে করতে কেউ পারবেন না। এই সব সাহিত্যিক ও কবি—এঁদের প্রকৃতি খুব নরম, ঠাণ্ডা, এঁরা ঘরে একান্তে বোসে লিখতে পারেন, কিন্তু ষ্টেজে দাঁড়িয়ে এঁরা অভিনয় করতে পারবেন বলেও আমার মনে হয় না। ধর—'অমুক' বাবু; তিনি ষ্টেজে নেমে যখন দেখবেন, তাঁর সামনে এক হাজার মাথা আর তার নিচে দু'হাজার চোখ তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, তখন তাঁর যা বলবার কথা সবই তিনি ভুলে যাবেন, তাঁর পা থর-থর কোরে কাঁপবে, কিছুই তিনি বলতে পারবেন না—সে একটা বিতিকিচ্ছি ব্যাপার হবে। তোমরা

দু'একজন ডানপিটে যারা আছ, তারা হয়ত পারবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আর কেউ পারবেন না।"

আমি কথাগুলো ভাবতে লাগলুম। শরৎচন্দ্র গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন। দুটো টান দিয়ে আবার বললেন—"এর জন্যে আর মিছে চেষ্টা কোরো না, এ হবে না। তবে এর পরের যুগে, যখন হয়ত তুমিও থাকবে না, আমিও থাকবো না, তখন যাঁরা সাহিত্যিক আর কবি হবেন, তাঁরা পারবেন। এবং হবেও তাই। তখন অভিনয়-শিল্পটা সাহিত্য-শিল্পের সঙ্গে এক হোয়ে মিশে যাবে। যা বললুম, ভাল কোরে ভেবে দেখো।"

তাই দেখলুম। দু'চার দিন ধরে ভেবে দেখবার পর বুঝতে পারলুম, শরৎচন্দ্রের কথাগুলো ঠিকই। সুতরাং আর ও জিনিসটা নিয়ে মাথা ঘামানো বন্ধ করলুম। থিয়েটারের ব্যাপারে গোড়া থেকেই শরৎচন্দ্রের উৎসাহ বা সমর্থন ছিল না। তিনি বরাবরই বলে আসচেন—"কিছুতেই হবে না, যেহেতু হতে পারে না।" শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের কথাই ফলে গেল এবং বুঝতে পারা গেল যে, সত্যই হোতে পারে না। তখন না হোয়ে যদি এখন হোত, তাহোলে হতে পারতো। সময়টা তখন ঠিক উপযুক্ত ছিল না। বিশ বছর আগের তুলনায় এখন খুব পরিবর্তন হোয়েচে। এখন যে সব সাহিত্যিক ও কবি বাণী দেবতার পূজারী হোয়ে আত্মপ্রকাশ করেচেন, তখন এঁদের পাওয়া গেলে খুব ভাল ভাবেই অভিনয় করতে সমর্থ হতুম। কয়েক মাস আগে শুনেছিলাম যে এইরকম একটা আয়োজন হচ্চে। অল্পদিন পূর্বে কাগজে পড়লাম যে তখনকার দু'একজন ও এখনকার কয়েক জন মিলে বেতার-প্রতিষ্ঠানে সুন্দর অভিনয় করেচেন। সংবাদটা পড়ে আমার মন আন্‌চান্ কোরে উঠেছিল। কিন্তু এখন ৭৫ বছর বয়সে আমার পক্ষে আর কোন উপায় না থাকলেও, মনে খুব একটা আনন্দ পাচ্চি।

আজ শরৎচন্দ্র বেঁচে থাকলে তিনিও আনন্দ পেতেন। পরিতাপের কথা, তাঁর সৃষ্টিকর্তা অকালে তাঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন; নইলে মরবার বয়স তাঁর হয়নি। এ দুঃখ করে আর লাভ নেই, এ দুঃখের আর অন্ত নেই। শুধুই কি শরৎচন্দ্র? শরৎচন্দ্র গেলেন; তাঁর শেষ-জীবনের সর্বসময়ের সঙ্গী, তাঁর মাতুল আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু সুরেন্ গঙ্গোপাধ্যায় গেলেন; সতীশ ঘটক গেলেন, কান্তি ঘোষ গেলেন; বিভূতিভূষণ গেলেন। তারপর এই সেদিন, বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত রাধেশ রায়, সহসা আমাদের ছেড়ে ওই একই পথের 'পথিক হলেন। কবিশেখর কালিদাস রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীরাধেশকে শরৎচন্দ্র যৎপরোনাস্তি ভালবাসতেন। দুঃখের কথা যে, সকলেই গেলেন অসময়ে। ঠিক বুড়ো হোয়ে কেউই গেলেন না। শুধু 'বুড়ো' হোয়ে এই সব কঠিন আঘাত সহ্য করবার জন্য পড়ে থাকলাম আমি। জানি না, আরো কত আঘাত সহ্য করতে হবে! সৃষ্টিকর্তার এ কী নিদারুণ পরিহাস! জগতের এ কী নিষ্ঠুর বিধান, যে আজ একে একে এঁদের সবগুলিকেই এত অকস্মাৎ এই ভাবে হারাতে হোল! শরৎচন্দ্রের কথা বলতে বসেচি, শরৎচন্দ্রের কথাই বলি। শরৎচন্দ্রকে এক দিন ঘনিষ্ঠভাবে পেয়ে নিজেকে যেমন ভাগ্যবান্ ভেবেছিলাম, আজ তাঁকে হারিয়ে, নিজেকে তেমনি দুর্ভাগা বলেই মনে করচি। তাঁর জীবিতকালে তাঁর প্রত্যেক বই বহুবার কোরে পড়েচি আর সেই সঙ্গে ভেবেছি, এই 'শ্রীকান্তে'র লেখক, এই 'পণ্ডিতমশাই' 'নিষ্কৃতি' 'চন্দ্রনাথের' লেখক, এই 'দেবদাস' 'বিরাজবৌ' 'পল্লীসমাজ' 'বিন্দুর ছেলে' 'রামের সুমতি'র লেখককে কত সহজে, কত সুলভে আর কত কাছে আমি পেয়েছি! এর দাম যে কত বেশী, তার মাপ ঠিক করতে তখন 'থাই' পেতুম না।! কিন্তু সে পাওয়া আজ এক-একটা বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ফিরিয়ে দিতে হচ্চে! তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কোন বই-ই আর পড়িনি, ছুঁইও নি। সে সব যে কোথায় গড়াগড়ি খাচ্চে, কোথায় পোকায় কাটচে বা পোড়ে-পোড়ে পচচে, কেই বা নিয়ে যাচ্চে, সে সব খবরও আর রাখি না; কারণ, ব্যথার উপর ব্যথা পেতে আর চাই না; সে শক্তি এখন নেই। তাছাড়া, দুঃখ করবারও এখন অবসর নেই; কারণ, শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যা বলতে বসেচি, তার এখনো কিছুটা বাকী আছে। পরসংখ্যায় তা বলবার জন্যে আবার ত প্রস্তুত হোতে হবে।

[ক্রমশঃ।

শীতান্তিকা

পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়

শীত-সকালে নীল সায়রে চাঁদ যেন ঘুমপরী
আকাশ ভরে আলোর খুশি অজস্র অফুরন্ত
দূর দেশে কোন্ অজান্তেই পাল তোলে মন-তরী
শঙ্খচিল শঙ্কাহীন উদাস প্রাণবন্ত।

আল্‌তো শীত নিঝুম বন: ঠোকরায় কাঠ-ঠোকরা
বাবুই মেয়ে স্বপ্ন মেলে অসীম আদিগন্ত
মিষ্টি দিন—মিষ্টি হিম তোমার কালো কোঁকড়া

ধানের শীষ চমক-চুম গাঙশালিকের জন্য
কোন মাঠে কোন গাঁয়ের বধূ গানের সোনা বুনতো
কে ছোঁয়ালো প্রাণে তোমার ভালোবাসার ধন্য
পাহাড়তলী আগুন জেলে বরফ-ঝরা শুনতো।

ঘুমায় ধূপ বাতাস-কাঁপা কাকজ্যোৎস্নায় জ্বলতে
যূথী-কান্না হীরে-পান্না—জানতো এ-মন জানতো
অনেক দূরে তোমার দ্বীপ: দীপদানে নেই সলতে

স্বাস্থ্যবান লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে
চান করে –
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।

নীলকণ্ঠ

যোলো

টলিউড-পরিক্রমার' পথে টলিউড ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছি। তবুও, আরেকটু দূর নিয়ে যাবো আপনাদের। টলিউডের সত্যিকারের চেহারা টলিউডের বাইরে না এলে দেখা অসম্ভব; দেখানো শক্ত। বাড়ীর কথা লিখতে হলে বাড়ীর বাইরে কী ঘটছে তার রাখা চাই খবর। টলিউডের বাইরে এসে দেখছি টলিউডের বাইরে পা ফেলবার উপায় নেই। কলকাতার স্বর্গ মর্ত-পাতাল এই ত্রিপাদ ভূমিই আজ টলিউডের অন্তর্গত। রূপালী পর্দায় নয় শুধু পর্দানসীন গৃহের আবরুও উন্মোচন করতে সে এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে দ্রুত এবং নিশ্চিত। সুরা-উন্মত্ত দুজন; একজন পিপে পিপে খাবার পর বলছে আরেকজনকে: ওরে ভজা আর খাসনে! তোকে যে দেখা যাচ্ছে না আর,—তোর সব ঝাপসা হয়ে আসছে! ঠিক এমনি অবস্থাই আজকের কলকাতার। শুধু গঙ্গিকা নয়; টালিগঞ্জিকায় পেয়ে বসেছে তাকে। ঝাপসা হয়ে আসছে তার দৃষ্টি!

কোনও বাড়াবাড়িরই মাপ নেই। সংস্কৃতি-কৃষ্টি-বৈদগ্ধ্য কোনও বাড়াবাড়িরই ফল ভালো নয়। তার মারাত্মকতম দৃষ্টান্ত ফরাসী দেশ। সুরা, সাকি আর সুর ফরাসী দেশকে দিনে দিনে এমন দুর্বল করে তুলেছে যে, ছোট-বড় যে-কোনও অসুরের চোখ রাঙানীতেই তার হৃৎকম্প আর থামবার নয়। তারই অন্ধ অনুকরণ করে বাঙলা দেশ আজ যায় যায়! দুই-তৃতীয়াংশ গেছে; বাকী বাঙলা দেশটা এখন এসে ঠেকেছে শুধু কলকাতায়। বাঙালী মারা পড়েছে সঙ্গে চাই এগ্রিকালচারও। উনবিংশ শতাব্দী বাংলা দেশে রেনেসাঁ অথবা নব-জাগরণের যুগ। বিংশ শতাব্দীকে কি বলা হবে, সেকথা বলতে পারে আগামী কাল; আমার শুধু যেকথা মনে হয়েছে, তা' হলো কর্ণের উপাসক নেই আর কেউ এদেশে; আমাদের সকলেরই আরাধ্য আজকে কুম্ভকর্ণ। নাকে ভেজাল তেল দিলেও আমাদের ঘুমোন চাই। নির্ভেজাল ঘুম। কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদেই অক্ষম হীনবীর্য আমরা, যারা আজকে শাসকের গদীতে আসীন, তাদের শুধু ভোট দিয়েই আমাদের ঘুম নয়; তাদের ভেট দিয়ে তবেই আমাদের নিশ্চিন্তে পড়ে-পড়ে ঘুম দেওয়া!

এর আগে লিখেছি 'Poverty is the only Crime'—দারিদ্র্যই একমাত্র পাপ। আরও লিখেছি, আজকের অধঃপতিত কলকাতার উৎস অভাব। অভাব ঠিকই; কিন্তু শুধু অভাব নয়। স্বভাবও বটে! অভাবেই শুধু স্বভাব নষ্ট নয়; স্বভাবেও অভাব সৃষ্ট! অভাব যদি সত্যি সত্যি অনুভূত হতো, তাহলে কলকাতায় এতগুলি প্রেক্ষাগৃহে এতগুলি 'পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ'-র নিশান উড্ডীন হতো না। অভাব যদি সত্যিই তীব্র ভাবে বাজতো, তাহলে নাচ-গান-জলসায় উন্মত্ত হতো না কলকাতা, খেলার মাঠে ভেঙ্গে পড়তো না অর্ধভুক্ত, অভুক্ত বাঙালী। এ সবেরই প্রয়োজন আছে; কিন্তু শুধু এর প্রয়োজনেই জনে-জনে ধার-দেনা করার বাঁধা পড়ার বিক্রী হবার দরকার নেই। প্রমোদ চাই; প্রমত্ত হতে চাই না!

মধ্যবিত্ত বাঙালীর বিত্ত নেই; উদ্‌বৃত্ত ত' নেই-ই। তবুও তার মারাত্মক ভদ্রতা-রক্ষায় বেসামাল হওয়া চাই-ই। এই মধ্যবিত্ত বাঙালীর কথাই বলছি। এরা সবাই কিছু অভাবে মৃত নয়; স্বভাবেই অর্ধমৃত। এদের কোন ভবিষ্যচিন্তা নেই। আজকের দিনটা চলে গেলেই নিশ্চিন্ত; কালকের ভাবনা কালকে। তাই মধ্যবিত্তরা ঝি-চাকর ঠাকুর ছাড়তে না পেরে একদিন বসতবাড়ী ছাড়তে বাধ্য হয়; গিয়ে ওঠে বস্তীতে। নিম্ন-মধ্যবিত্তদের সঙ্গে এক হয়ে সাম্যের জয় গায়। কার্ল মার্ক্স যে সাম্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে সাম্যে নীচুর ওঠবার কথা ওপরে! মার্ক্সবাদীরা যে সাম্যের দুঃস্বপ্ন দেখাচ্ছে, সে সাম্যে উঁচু নেমে আসছে নীচুতে। গান্ধীবাদ মানে যে অবস্থায় গান্ধীকে বাদ দিলেই সুবিধে হয়! মার্ক্সবাদ মানেও তাই; কার্ল মার্ক্সকে পুরো বরবাদ!

একান্নবর্তী পরিবারের অসুবিধের দিকটাই আমরা দেখেছি। সুবিধার দিকটা নয়। দেখি নি, তার কারণ সকলের সুবিধায় নিজের বড় অসুবিধা। তাই একান্নবর্তী পরিবারের একান্নে প্রতিপালন নয় আর! তার বদলে ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে থাকা। আত্মীয়-স্বজন আজকে অনাহূত। বন্ধু-বান্ধব পাল-পার্বণ আজ দুষ্য। স্বার্থত্যাগের কথা ভুলে স্বার্থ আঁকড়ে থাকার ফলেই একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের মেরুদণ্ডই আমরা ভেঙ্গে দিয়েছি। এখন আমাদের অবস্থা হচ্ছে: ভাঙ্গবো তবু মচকাবো না!

এই সেদিনকার কথা! মফঃস্বলের বড় উকীলের বাড়ী দেখা করতে গেছে একজন মস্ত বড়ো মক্কেল। গিয়ে দেখে দাওয়ায় হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা, খালি গা, খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা বুড়ো হুঁকো টানছে। মক্কেল জিজ্ঞেস করেছে: বাবু কোথায়? বুড়োর জবাব নেই। বাবু কোথায়? বুড়ো চুপচাপ! আরে কথা কওনা

বাবু? মক্কেল বলে: উকীল বাবুর কথা বলছি; আবার বাবু কে এ বাড়ীতে। বুড়ো এবার নিজমূর্তি ধরে: আমিও সেই কথাই বলছি; তোমার উকীল আবার বাবু হলো কবে? বাবু? গুখোর ব্যাটা! শুনতে পাই মাসে দেড় হাজার টাকা রোজগার; তা'ও সংসার চালাতে হিমসিম! মেয়ের বিয়ে দিতে আমার কাছেই ত' হাত পাতে! আত্মীয়-স্বজন আসছে শুনলেই রক্ত জল! বাড়ী করেছে ধার করে;—তবুও ট্যাক্সো দিতে পারে না! বাবু? হুঁ—বাবু হচ্ছি আমি। ষাট বছর বয়স; এখনও দাঁত পড়েনি; মাথা ভরা চুল আছে! দশটা মেয়ের বিয়ে দিয়েছি; আত্মীয়-স্বজনের ছেলেপিলেদের খাইয়ে-পরিয়ে-পড়িয়ে মানুষ করেছি; কখনও ফেরাই নি কাউকে; দোল দুর্গোৎসব করি আজও; মরে গেলে যে টাকা রেখে যাবো তাতে দুশো বছর মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না এ-বংশে কারুর!

বুড়োর বাক্য শুনে মক্কেল বুড়বাক্! বুঝতে পারে এ বুড়ো শুধু বাবু নয়; শুধু বাড়ীরই নয়, পাঁচ দশটা গাঁয়ের মাথা কর্তাবাবু। মারা যাবে যেদিন সেদিন বহু বাড়ীতে খাওয়া হবে না; রাতে জ্বলবে না হারিকেন। কাঁদবে আশপাশের পাঁচ দশ গাঁ! কাঁদবে তারা সেদিন সত্যি সত্যি! সত্যি সত্যি অনাথ হবে সেদিন! পিতৃবিয়োগ হবে সব কটা গাঁয়ের।

সেই কর্তাবাবুর বদলে আজ Dad-এদের দিন এসেছে! বেঁচে থাকতেই তাই Dadদের নাকের ওপরেই পোলাপানদের ডা ড্যাং ডাং। ডা ড্যাং ডাং। ডা ডাং ডাং।

মনে করবেন না তখন দিনকাল সস্তা ছিলো বলেই কর্তাবাবুরা এত সব পারতেন। আজকের মধ্যবিত্ত বাঙালীর মনোবৃত্তি নিয়ে জন্মালে সেই সস্তার দিনেও তাদের তিন অবস্থা হতো। মনে করবেন না বিদ্যাসাগর সেকালে জন্মেছিলেন বলেই বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন। একালেও জন্মালে তিনি অবশ্যম্ভাবী বিদ্যাসাগরই হতেন। এবং ওই বড়বাজার থেকেই বেরুতো এযুগের বিদ্যাসাগরও। সেদিনকার বাংলা দেশে রঙ্গ ছিলো কিন্তু সিনেমা রেডিও মাইক ছিলো না। তাই দোল দুর্গোৎসবে পাড়ার লোকের ক্যাশ ভাঙতে হতো না।

এদেশের কথা বললে এদেশে কারুর কাণে যায় না তাই মার্কিণ দেশের কথাই বলি। আজকের বিলেত দেশটা সত্যিই মাটির সোনা রূপার নয়; কিন্তু মার্কিণ দেশটা মাটির নয়; ডলারের। সেইখানকার এক কারখানার শ্রমিক জিজ্ঞেস করছে তার বাবাকে: আচ্ছা বাবা, তোমাদের পেনসন পাবার পরেও এত টাকা হাতে থাকতো কী করে বলোত'? অশীতিপর বৃদ্ধ বললো জবাবে আমাদের সময়ে যে তোদের মতো মাইনে থেকে হেল্থ ইনসিওরেন্স, আন-এমপ্লয়মেন্ট ইনসিওরেন্স বাবদ এক পয়সাও কাটা যেতো না রে!

কথাটা খাঁটি! সেদিন যে একজনের অন্নে অনেকে প্রতিপালিত হতো আর আজ যে অনেকের অন্নে অতিরিক্ত একজনেরও প্রতিপালিত হওয়াটা দৃষ্টিকটু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার মোদ্দা কারণটা সস্তা দামের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে না; পাওয়া যাবে মনোবৃত্তির মধ্যে! মনোবৃত্তিটাই সেদিন দামী ছিলো! অন্ন নিজের নয় শুধু; অন্যেরও তাতে উদর পূর্ণ করতে পারলে খুসী হতেন কর্তাবাবুরা! অন্নপূর্ণা তাতেই তাঁর ঘরে অচলা হয়ে থাকতেন, শাক ভাত সকলের সঙ্গে ভাগ করে খেলে তখন আর তা শাকান্ন থাকে না; তখন তা-ই হয়ে ওঠে পরমান্ন! দেবভোগ্য! প্রসাদ!

আজকে সব চেয়ে জনপ্রিয় শ্লোগান হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির শ্লোগান। বললে বহু লোকের পেত্যয় হবে না এবং আরও বহু লোকের উষ্মা হবে কিন্তু আমরা নিরুপায়। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর বই লেখা হতে পারে, রাজনৈতিক বক্তৃতাও, কিন্তু গ্রীক রোমান সভ্যতা যতটুকু বেঁচে আছে তার চেয়ে অনেক বেশি মৃত এই তথাকথিত ভারতীয় সভ্যতা। ভারতীয় সভ্যতার বদলে জহরলালের ভারতবর্ষে যার পত্তন হচ্ছে তাকে বিশ্ব না ভারতীয় অসভ্যতা বলব জানি না, তবে এটুকু জানি আমরা যে বলি বহু সভ্যতার উত্থান পতনের পরেও ভারতীয় সভ্যতা আর সকলকে গ্রাস করেছে কিন্তু নিজের সত্তা বিসর্জন দেয় নি,—একথা কবির কল্পনা মাত্র, তার চেয়ে বেশি নয়। সূক্ষ্ম স্তরে আমাদের কোনও সর্বভারতীয় সংহতি নেই; স্থূল ক্ষেত্রে আমাদের সর্বভারতীয় কোনও ভাষা পোষাক খাদ্য কিছুই নেই। রাজকাপুর ঠিকই বলেছে, জুতা হ্যায় জাপানী। হিন্দী এখনও যে অবস্থায় রয়েছে তাতে তা বনমানুষের ভাষা হলেও তা কোনও মানুষের ভাষা হবার এখনও সম্পূর্ণ অযোগ্য।

সনাতন ভারতবর্ষের বাণী ছিলো নাকি অহিংসার বাণী। আজকের ভারতবর্ষের বাণীও অহিংসার। সনাতন ভারতবর্ষে সে বাণীর পেছনে অর্থ ছিলো; আজকের ভারতবর্ষে সে-বাণী নেহাতই অর্থহীন। শক্তিমানেরই অহিংস হওয়া মানায়, তাই অশোকের

অহিংসার অর্থ ছিলো কিছু। আজকের এটম বোমায় যুগে ভারতবর্ষের অহিংসার বুলি, ভিখারীর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের মতোই। আমরা আজকে হিংস্র হলেও যতটুকু এসে যায়, অহিংস থাকলেও ততটুকুই এসে যায় ম্যারিকা-রুশ্যার।

ভারতীয়ানা সম্বন্ধে ভাবি না কিন্তু যা সত্যিই ছিলো, যা এখনও আছে কিন্তু আর থাকছে না তা'হলো বাঙালীয়ানা। বড়লোকের নীচের তলার এবং মধ্যবিত্তের সকলেরই বাংলা দেশ যে বস্তু হারাতে বসেছে তা হচ্ছে এই বাঙালীয়ানা। এইটুকুই ছিলো, এইটুকুই আছে; এবং এইটুকু গেলেই বাঙালী যাবে। বাঙালীর যেদিন সত্যি সত্যি অর্থ ছিলো সেদিনও তার কাছে অর্থ পরমার্থ ছিলো না। লক্ষ্মীর সঙ্গে বিবাদ করতেও সে পেছপাও হয়নি ভারতীর সাধ্য-সাধনায়। বাঙালীর কবির জীবনেই : বাঁধা প'ল এক মাল্য বাঁধনে লক্ষ্মী-সরস্বতী?

বিশ্বপ্রেমে বেসামাল আজকে আমরা প্রথমে মানুষ; তারপর ভারতীয়; এবং সর্বশেষে বাঙালী। সাধারণ সময়ে এতে ভয়ের ছিলো না কিছু। আজ সঙ্কটের মুহূর্তে আমাদের আবার প্রথমে বাঙালী হওয়াই দরকার। সেদিন বাঙালীর এই বিশেষ বোধই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালাকে রত্নগর্ভা করেছিলো। কিন্তু শুধু রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, আশুতোষের কথা ভেবে বলছি না; সেদিনকার বাঙলা দেশে অশিক্ষিত গুণ্ডা শ্রেণীর বাঙালীর মধ্যেও বাঙালীয়ানা মরে নি। এখন তাহলে সেই গল্পই বলি।

শ্রীরামপুর থেকে সেকেণ্ড ক্লাসে রোজ ডেলি প্যাসেঞ্জারী করেন এক বাঙালী ভদ্রলোক। সহযাত্রীরা সবাই খাঁটি সাহেব। কালা-আদমীকে এক গাড়ীতে তাদের ভারি অপছন্দ। গালমন্দ ত করেই, গায়ে পা তুলে দেয়; ভয় দেখায়। শেষকালে না পেরে একদিন ধর্মতলার বিখ্যাত বেয়াকুব গুণ্ডার স্মরণ নেন। বেয়াকুবের রেট বাঁধা; একেবারে খুন করে ফেলতে হাজার টাকা; সাঙ্ঘাতিক জখমে পাঁচশো অল্প উত্তম-মধ্যমে একশো; শুধু একটু শিক্ষা দিয়ে দিতে পঞ্চাশ; ভদ্রলোক পঞ্চাশ টাকা আর সেকেণ্ড ক্লাস টিকিটের দাম দিয়ে বেয়াকুবের সঙ্গে ব্যবস্থা পাকা করেন।

পরের দিন; ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে, বেয়াকুবের দেখা নেই। ট্রেন দৌড়তে আরম্ভ করতেই বেয়াকুব ঢুকলো দরজা ঠেলে সেকেণ্ড ক্লাসে। একটু বাদেই সাহেবরা সেই আরম্ভ করলো গালাগাল; ছাই ফেলা; ভয় দেখানো; নিত্যকর্মপদ্ধতি। বেয়াকুব ইঙ্গিতে বাঙালী ভদ্রলোকটিকে বললেন পা তুলে দিতে সাহেবের গায়ের ওপর। কিন্তু হাজার হলেও বাঙালী বড়বাবু। সেদিনকার সূর্য্যি অস্ত না যাওয়া ইংরেজ রাজত্বে গোরার গায়ে কৃষ্ণপদ তুলে দেন কী করে। শেষকালে অনেক ইঙ্গিতের পর চোখ বুঁজে সেই ভদ্রলোক তুলে দিলেন পা সাহেবের বুকে।

তোলা মাত্র সাহেবদের গর্জন : **What? Stupid Bengalees?—How dare you?** সাহেবের কথা শেষ হবার আগেই বেয়াকুবের কাজ শেষ! জোলুই-এর বিখ্যাত upper cut-এ সাহেব কাত। সাহেব কাতরায় যত বেয়াকুব তত গরজায়: **What? Bengalees? Plural gender?**—অর্থাৎ তুমি একজন বাঙালীকে ষ্টুপিড বলতে পারো কিন্তু **Bengalees** বললে কেন?

বেয়াকুবের মুখে **plural gender** শুনে যারা হাসবে তাদের কানে কানে বলা দরকার একটা কথা; সেকথা আর কিছুই নয়; সামান্য কথা! সে হচ্ছে এই যে অশিক্ষিত বর্বর বেয়াকুবের ইংরেজি জ্ঞান ছিলো না একথা ঠিক কিন্তু **Gender Sense** ঠিকই ছিলো! আমাদের শিক্ষিত বাঙালীদের আজ হয়ত ইংরেজি ঠিক আছে কিন্তু আমাদের সমস্ত জাতটারই **Gender Sense** বেঠিক হয়ে গেছে কখন।

সতের

আজকের বাঙালী ছেলে মেয়েদের রামায়ণ এবং মহাভারত পাঠ করে যদি শোনাতেও না পারেন তবুও তাতে লাভ হবে না কিছু। লাভ হবে না কারণ রামায়ণ থেকে তারা যেটুকু বুঝেছে তা হলো পরস্ত্রী হরণেই পুরুষকারের প্রকৃষ্ট পরিচয়; মহাভারত থেকে তারা পেয়েছে সারমর্ম এই যে এক ছুঁচ জমিও বিনাযুদ্ধে বা মামলায় যত ন্যায্য পাওনাদারই হক তাকে দেওয়া মরদের কাজ নয়। এই বাঙালীই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শুধু এইটুকুই নিয়েছে যে ম্যাট্রিক পাশ করবার কোনও দরকার নেই। মধুসূদনের জীবন থেকে জানবার মধ্যে জেনেছে যে কবিতা লেখা মদ্যপান ছাড়া অসম্ভব। এই বাঙালী যুবক-যুবতীদেরই ধারণা উচ্ছৃঙ্খলতা শিল্পী-জীবনের জন্যে বুঝি একান্ত অপরিহার্য!

জলতরঙ্গে টলোমলো উটরাম বুফের বারান্দায় বসে এই সব কথাই সেদিন বিশেষ করে মনে পড়িয়ে দিলো একজন। সে এক জনকে আজকে হঠাৎ দেখলে হয়ত চিনতে পারবে না অনেকেই। আজকের তরুণ-তরুণী যারা সিনেমা বলতে পাগল তাদের মধ্যে প্রায় কেউই তাকে চোখে দেখেনি; নাম শুনেছে মাত্র। কিন্তু পনেরো বছর আগেও আরাধনা সেনের নামে টিকিট ঘরের সাম্নে ভেঙ্গে পড়তো মানুষ। শুধু তার নামটুকু পোষ্টারে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেজে কিম্বা সিনেমা হাউসে এ্যাডভান্স বিক্রি হয়ে যেতো সাতদিনের সব টিকিট। আজকের দিনের যে ফিল্মে নামে তারই Star হবার মতো নয়; সত্যিকারের Star ছিলো আরাধনা সেদিন। বক্স অফিসে যার একার নামে টাকা আসে সেই যে একমাত্র Star নামের যোগ্য একথাটাও হয়ত আজ অনেকেরই অজানা। আরাধনা সেন ছিলো সেদিন box-office!

সেই আরাধনাকে দীর্ঘ দিন বাদে উটরাম বুফেতে হঠাৎ দেখে চট করে আমিও চিনতে পারিনি। চেনবার কথাও নয়। চোখে গগলস; মুখে সস্তা মদের গন্ধ; ঠোঁটে সিগারেট; বেশবাস বর্ণনার অনুপযুক্ত। অনর্গল অসম্বদ্ধ প্রলাপ তুখোড় ইংরেজিতে। টেলিফোন করল বুফে থেকে; যাকে ডাকলো তাকে টেলিফোনে ডাকা দূরের কথা তার দেখা পাবার মত লোক ভারতবর্ষে বেশি নেই। ডেকে অনুরাগ-অনুযোগ মিশ্রিত সুরে যা বললো তা' হলো তাকে হোটেল থেকে বার করে দিয়েছে। একটু বাদেই আরাধনা যেমন এসেছিলো তেমন চলে গেলো। পা টলছে; শাড়ী খুলে খুলে পড়ছে। সিগারেট নিবছে। জ্বলছে।

মনে পড়ে গেলো কুড়ি বছর আগের কথা। আরাধনা তখনও বোস; সেন হলো সেই সময়েই প্রায়। নিমু সেনের সঙ্গে বিয়ে হলো যখন তার তখন তার দেহে লাবণ্য টলমল করতো; খুসী ছলছল করতো দুটি বড় বড় চোখে। যে

আসরে যত ভীড়ের মধ্যে গিয়েই বসতো মনে হতো এক মুঠো আলো পড়ে আছে তার শরীরের চার দিকে। ঝল ঝল করে উঠতো সবটুকু জায়গা। ঝলমল করে উঠত আশ-পাশ!

কোনও কোনও লোক যেমন গলায় সুর নিয়েই জন্মায়, কেউ কেউ কলমে নিয়ে কবি, তেমনি শরীরে সর্পিল গতি নিয়ে দু'পায়ে নিয়ে নৃত্যের তাল আরাধনা এসেছিলো পৃথিবীতে। ছোট্ট মেয়ে যখন এই এতটুকু তখন থেকেই মনে হত মেয়েটা হাঁটে না, নাচতে নাচতে চলে। যৌবনে মনে হত সেই মেয়েকে যেন দু'হাতে সে তার ভরা যৌবনের দুরন্ত সৌরভ দু পাশে ছড়াতে ছড়াতে চলেছে। তখনও সেই সৌরভ সৌরভই ছিলো; সে সৌরভ সঞ্জীবিত করত মানুষকে; মাতাল করত না।

দশ বছর বয়সে বাড়ীর ঘরোয়া এক আয়োজনে নটীর পূজায় নাচলো সেই পরমাশ্চর্য মেয়েটি। সকলের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে উদ্‌ঘাটিত হলো সেই চিরন্তন সত্য; সকলেই শিল্পী নয়; মাত্র কেউ কেউ শিল্পী। আরাধনা অবশ্য এ সব কিছুই বুঝলো না। সে নেচে গেলো তার দু'টি পায়ে সুরের ফুল ফুটিয়ে। কিন্তু সেই বুঝি কাল হলো তার। পুরুষ নষ্ট হয় অর্থে; নারী খ্যাতিতে। আরাধনা অবশ্য তখন এতো বাচ্চা যে হাততালি তার ভালো লাগলেও হাততালি শুনে নষ্ট হবার বয়স তার নয়। কিন্তু তার খ্যাতি-অচেতন কিশোর মনে সেইদিনই বাইরের পৃথিবীর ডাক এনেছিলো কিনা পলাতকা পদপতন ফেলে কে বলবে সেকথা আজ।

আরাধনা নাচের পৃথিবীতে পেলো নতুন জন্ম। নিজের মধ্যে যে নতুন মহাদেশ সে আবিষ্কার করলো সেইখানেই হারিয়ে গেলো সে। নাচতে পেলে সে আর কিছু চায় না। তবলায় বোল হ'ত যত শক্ত আরাধনার পায়ে পড়ে সে ফুটতো তেমনি অনায়াসে যেমন অনায়াসে গাছের ডালে ফুল ফোটে। মুদ্রা হোক যত আয়াস-সাধ্য আরাধনার আঙুলে ছিলো তার অবশ্যম্ভাবী মুক্তি ভগীরথের ডাকে শিবের জটা থেকে যেমন জাহ্নবীর। সেদিন আরাধনাকে দেখে সকলের একথাই মনে হতো যে এ-মেয়ের লৌকিক বিবাহ দিতে হলেও কার অলৌকিক আশীর্বাদে যেন এর জন্মমুহূর্তেই গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে নাচের তালের সঙ্গে! জীবন মহাদেবের নৃত্য এ মেয়ে তখনই শুনতে পেয়েছে কাণে।

কিন্তু সেদিন যাকে আশীর্বাদ বলে মনে হয়েছিলো আজ যে আবার তাকেই অভিশাপ বলে মনে হয় এ যাঁর রহস্য তাঁর সব কিছুরই মানে আমরা মনগড়া তৈরী করে নিই কিন্তু নিজের হাতে তিনি সেই 'গড়া'কে ভাঙেন; ভেঙে আবার গড়েন; এবং সে ভাঙা-গড়ার আদি-অন্ত কিছুই নয় আমাদের অধিগত। সে-রহস্য তাই রহস্যই থাকে; যেকথা এখন বলতে যাচ্ছিলাম তা হচ্ছে আরাধনার নাচে তার বাড়ীর লোকেরা যতই বাহবা দিক উর্বশীর ক্ষমিবার তারো দেখার

কথা সেদিন কারুর উদ্ভটতম কল্পনাতেও ছিলো না। শুধু আরাধনার মা'র ছাড়া। আরাধনার মা-ই শুধু মেয়েকে নিয়ে সেই রঙ্গে মাতবার স্বপ্নে রঙীন ছিলেন সে স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হবার অনেক আগেই ঘর ভাঙে স্ত্রীলোকের। সেও কিন্তু অনেক পরের কথা। আরাধনার বিয়ে হয়ে গেলো নিমু সেনের সঙ্গে যথারীতি। নিমু সেন বিলেত গেলো। ফিরে এলো পঙ্গু শরীর নিয়ে। দেশে ফিরে দেখা হলো নরেন ঘোষের সঙ্গে। নরেন ঘোষ দিলো নাচের দল খোলার পরামর্শ। নিমু সেন আঁকড়ে ধরলো সেই পরামর্শ ভেসে যাওয়া লোক যেমন করে খড়ের ডগা। আঁকড়ে ধরে তেমন করে নয়; আঁকড়ে ধরলো মানুষ যেমন করে আঁকড়ে ধরে ধর্ম বিশ্বাস।

দল তৈরী হলো; নাম হলো 'নব-বৃন্দাবন'। প্রাইমা ডোনা হলো এই নাচের দলের আরাধনা। শনির মত এসে জুটলো বাজিয়ে নিশীথস্মরণ। সেই যোঝালে সবাইকে বিশেষ করে আরাধনাকে যে শিল্পীর জন্যে নয় সামাজিক বিধি-নিষেধ। তার বিচার হবে না সাধারণ মানুষের মত মোটেই। তার বিচার সে কেমন শিল্পী তারই নিক্তিতে। অতএব? অতএব নব-বৃন্দাবনে ঢলে পড়তে লাগলো এ ওর গায়ে। শিল্প-শ্রীচৈতন্যের নয়; অচৈতন্যের লীলায় নরক গুলজার হলো। আরাধনার মুখে উঠলো মদের গেলাস। পা পড়তে লাগলো যতটা নয় নাচের তালে ততটা সোমরসের আধিক্যে। চোখ বুঁজে বসে রইল নিমু সেন,—দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখছিলো সে।

মপাসাঁর সাহিত্যগুরু ফ্লবেয়ার লিখেছিলেন মাদাম বোভারী। সেই বই বিশ্বসাহিত্যের ক্লাসিক পর্যায়ের; তবুও মাদাম বোভারী পড়তে-পড়তে কিছুতেই না মনে করে উপায় নেই যে এর বহু অংশই কল্পিত। মাদাম বোভারীর জীবনের অনেক পরিচ্ছেদই তার স্রষ্টার অদেখা। এবং একথাও ঠিক যে, এই জীবনের অল্প একটুখানি দেখা এবং অনেকটাই অদেখা বলেই রক্ষে! তাইতেই

ফ্লবেয়ার সামান্য সত্য এবং অসামান্য কল্পনা একত্র করে রচনা করতে পেরেছিলেন উপন্যাস-শৈলীর চরম পরাকাষ্ঠা মাদাম বোভারী। বাস্তব সত্যের সঙ্গে নিজের মনের মাধুরী মেশাতে পেরেছিলেন বলেই মাদাম বোভারী পড়া যায়। নাহলে মাদাম বোভারী উপন্যাস যদি মাদাম বোভারীর জীবনের যথার্থ প্রতিলিপি হতো তাহলে মাদাম বোভারী, পড়ে কারুর কারুর অশ্লীলই মনে হতো যে তা নয়; অনেক বেশি লোকের মনে হতো যে মাদাম বোভারী অবিশ্বাস্য। কারণ জীবন শুধু উপন্যাসের চেয়ে যে অলৌকিক মাত্র, তা নয়; কাঁচা জীবন পাকা উপন্যাসের চেয়ে অনেক অনেক, অনেক বেশি Shockingও বটে।

'নব-বৃন্দাবন' বলে সেই নাচের দলে প্রধান নর্তকী হয়ে নেমে আরাধনার জীবনে যে পতনের প্রারম্ভ তার ছবি এখানে তুলে ধরলে একটি অধঃপতনের ইতিহাসের পাতা নিজের হাতে ওল্টাতে ওল্টাতে অন্ত ও প্রত্যহর অনেক পাঠকই অন্ত ও প্রত্যহর লেখককে ক্ষমা করতে পারতেন না। শুধু তাই নয়; অন্ত ও প্রত্যহ কারুর কেচ্ছা গেয়ে অন্য বাঙালী লেখকদের মতো জনপ্রিয় হবার চেষ্টা না করে বরং যাতে কৃতার্থ হবো তা হচ্ছে আরাধনার জীবনের সেই অলিখিত পরিচ্ছেদ কল্পনায় পাঠ করেই যদি জীবনের ট্রাজেডী দেখে অন্তত দু'একজনকেও শিউরে উঠতে দেখি। কুৎসিত অসুখ কত কুৎসিত তার কালো প্রচারমূলক ছায়াচিত্ররূপেও আমার আপত্তি। সেই সব ছবি দেখে যত লোক বারবনিতাগৃহে যাওয়া বন্ধ করে তার চেয়েও অনেক বেশি লোক এই মনে করে আশ্বাস পায় যে এ অসুখও এমন কিছু দুরারোগ্য নয়; এ অসুখও সারানো যায়। তারা মনে করে অসুখ গোপন করাতেই যা কিছু ক্ষতি; এই সব স্ত্রীলোকের কাছে দৈহিক সুখের আশায় যাওয়া তেমন মারাত্মক নয় বুঝি!

অথচ এই আরাধনাই কী না পারতো? কি না পেতো জীবনে? শুধু দেশে নয়; পৃথিবীর যে কোন নৃত্যমঞ্চের সে হতে পারতো প্রাইমা ডোনা! সাহিত্য-চিত্র বিজ্ঞান-ধর্ম সমাজনেতৃত্বে যে সব বাঙালী বিশ্ববরণীয় হয়েছে তাদের কারুর চেয়ে নিজের ক্ষেত্রে আরাধনার কম সম্ভাবনা ছিলো না! কিন্তু সম্ভাবনা শুধু সম্ভাবনাই রইলো! কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটতে ফুটতে বুড়িয়ে গেলো। শুধু যে সম্ভাবনার কথা সেদিন মনেও আনেনি কেউ সেই চরম অধঃপতনের সম্ভাবনা আরাধনার জীবনে সত্য হয়ে রইলো। আরাধনা সেন,— ট্যালুলা ব্যাঙ্কহেড কি ইসাডোরা ডানকানের সঙ্গে সমান কি না জানিনা; কিন্তু আরাধনা নিজেই যদি আজও নিজের জীবনী লেখে ইসাডোরার আত্মজীবনীর চেয়ে তা কম উত্তেজক হবে না। শুধু উত্তেজক নয়; কম বিয়োগান্তও হবে কী? এবং পাঠকরা সে জীবনী পড়ে শুধু শিউরে উঠতো; কিন্তু আরাধনা নিজে পড়লে কোনদিন তার নিজের জীবনী পাগল হয়ে যেতো; আর না হয় করতো আত্মহত্যা! এখন যেমন করছে তেমন তিলে তিলে নয়; হঠাৎ যবনিকা পতন ঘটাতো। অনেকবার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় রঙ্গমঞ্চে যেমন করেছে সে: জীবনের রঙ্গমঞ্চেও তেমনই করতো তার করুণ পুনরাবৃত্তি! হয়তো; হয়তো নয়!

অথবা এই লেখাটুকুও যদি আরাধনার হাতে গিয়ে পড়ে তবে আরাধনা নিশ্চয়ই চমকে উঠবে; চীৎকার করে উঠবে। নিজের কাছ থেকে পালিয়ে মিথ্যেই বাঁচতে চাইবে সে। যেমন চেয়েছিলো নাকি, কল্পনা করতে পারি আজ, Picture of Dorian Grey পড়ে তার স্রষ্টা অস্কার ওয়াইল্ড্।

আরাধনার যে জীবনের কথা বলতে গিয়ে বললাম না, সেই না-বলা-জীবন এই কথাই বলতে চেয়েছে বার বার যে হাততালি, এনকোর, লাইম লাইট, ফ্যান-মেল সবই সত্য! কিন্তু শিল্পীর জীবনে সব চেয়ে বড় সত্য তৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণা মাত্র দু'একজনেরই মেটে; বাকী সকলেরই অপমৃত্যু হয় মরীচিকার পেছনে ছুটে। ফুল হয়ে ফুটে ওঠায় মুক্তির যত আনন্দ, নদী হয়ে মরীচিকায় মুখ বুঁজে ম'রে যাওয়ার সম্ভাবনা কী তার চেয়ে এতটুকু কম বেদনার?

আঠার

সব মাঠকেই দূর থেকে সবুজ দেখায়; বহুদূর থেকে মরীচিকাকে মনে হয় তৃষ্ণার মুক্তি; আর টলিউডকে একেবারে কাছ থেকেও মনে হয় স্বর্গ। কিন্তু স্বর্গের ভেতরে ঢুকলে তখন আর স্বর্গ মনে হয় না; মনে হয় বিসর্গ। একটি নয় দুটি শূন্যি; ইহলোকেও শূন্যি; পরলোকেও শূন্যি! টলিউডের বাইরে থেকে মনে হয় বুঝি টলিউডে যারা কাজ করে তাদের জীবন টালিগঞ্জের ষ্টুডিওতে তোলা ছবির মতই সুন্দর; সাজানো; সিকোয়েন্সের পর সিকোয়েন্সে স্বচ্ছন্দ। তারা বাইরে থেকে জানে বলেই এইভাবে জানে; ভেতরে ঢুকে চোখ খোলা রাখলে তারাও দেখতে পেতো এখানেও পৃথিবীর সকল প্রান্তের মত, জীবনের আর-আর ক্ষেত্রে যেমন এখানেও তেমনি অতি সামান্যসংখ্যক লোকেরই ষ্টুডিবেকার; আর বাকী অসংখ্য লোক প্রায়ই বেকার।

কাব্য পড়ে কবিকে যেমন মনে হয় কবি নাকি তেমন নয়! কোনও কোনও কবি তেমন নয়; কোনও কোনও কবি অবিকল তেমনই। সেকথা নয়; ফিল্মের কাগজে এই সব লোকেদের সঙ্গে কাগজওলার ইণ্টারভ্যু পড়ে ফিল্মরাজ্যের নরনারীদের যেমন মনে হয় তারা কিন্তু সত্যি তেমন নয়। একজনও নয়। টলিউডে প্রবেশ করলে চরিত্র খারাপ হবার কথা বলে যারা তারা চরিত্র কি তা-ও বোঝে না, চরিত্র খারাপ হওয়া বলতে গিয়ে কি বোঝায় তা-ও বোঝে না। স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের সামাজিক সমর্থনের বাইরে দৈহিক মিলনেই মাত্র চরিত্রের অধঃপতন নয়, চরিত্র এর চেয়েও অনেক বড় জিনিষ। একথা থেকে অবশ্য একথা কেউ যেন মনে না করেন যে অবাধ দেহ উপভোগে বুঝি চরিত্র বজায় থাকে! না থাকে না! কিন্তু এছাড়াও এর বাইরেও চরিত্র রক্ষার গুরুতর দায়িত্ব আছে মানুষের।

সে দায় মনুষ্যত্বের দায়। জীবনে কোনও রকম দেহবিলাস না করেও মানুষ চরিত্রহীন হতে পারে; অনায়াসে পারে। যে অর্থ-সর্বস্ব; যে খ্যাতি-সর্বস্ব; যে আলস্য-সর্বস্ব আর যে স্বার্থ-সর্বস্ব সে-ও চরিত্রহীন। যারা খ্যাতিমান, অর্থবান তাদের থেকে অনেক অখ্যাত-অবজ্ঞাত লোকের মধ্যেই চরিত্রের বিকাশ দেখেছি আমি। চরিত্র মানে হচ্ছে গোটা মানুষ। মানুষ একটা কোনও দিকে বড় হতে গিয়ে জীবনের আর সব দিকে এত ছোট হয়ে যায় যে আমাদের দেশের জীবনীতে তা লেখা যায় না বলেই বাংলা ভাষায় কোন "জীবন-চরিত" আজও লেখা হয় না; যা লেখা হয় তা সবই চরিতামৃত। সেই সব চরিতামৃত চরিত্রের অমৃত পরিবেশনের পরিবর্তে মৃতের চরিত্রচিত্রণ করেই কৃতার্থ!

ফিল্ম-পত্রিকায় ছাপা ইণ্টারভিউ পড়ে ফিল্ম-ষ্টার অথবা পরিচালক হতে চায় যারা তারা জানে না যে চরিত্র খারাপ হবার সুযোগই তারা পাবে না কোনও দিন! কাজেই সে ভয় নয়; ভয় হচ্ছে চরিত্র হারাবার নয়; চাকরী হারাবার। টলিউডে পার্মানেণ্ট হয় না কেউ! বর্ত্তমান কংগ্রেসী সরকারের চাকরীর মতো এখানে সবাই পারমানেণ্টলি টেম্পরারী। শুধু ফিল্মষ্টার কি কর্ম্মী নয়, যারা ছবির প্রযোজক তারা আজ বসে আছে টাকার ওপর; কাল 'হুণ্ডীর' ওপর; পরশু রাস্তার ওপর। এই হলো এ-লাইনের আজ-কাল-পরশুর গল্প! যে কোনও ব্যবসায় লোকসান হলেও ব্যবসা উঠে যেতে যেতেও সময় লাগে। এখানে একখানার পর আরেকখানা ছবি না লাগলেই সারা জীবন জলছবি; সমস্ত জীবনটাই কেঁদে কূল না পাওয়ার চোখের জলের ছবি!

ভদ্রঘর থেকে এসে পরিচালকের ফোর্থ এসিষ্টেণ্ট হবার দুর্ভাগ্যে যখন বিশেষ পল্লীর মেয়েদের ডাকতে হবে ম্যাডাম বলে তখন নিজেকে মনে হবে ড্যাম-ফুল্। আর মনে হবে নিজের মায়ের কথা। নিজের কথা মনে করেই তার মনে হবে যে তার মা যাকে গর্ভে ধরেছিলেন, সে মানুষ নয়; গর্ভস্রাব!

ফিল্ম-পত্রিকার এই সব ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যে না পড়ে এখন একটি সত্যিকারের ইণ্টারভ্যু পড়ুন। এই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পড়ে আপনাদের সকলের না হলেও দু'-একজনের চোখ খুলে গেলেও আমি খুসী। যার কথা বলতে যাচ্ছি সে হলো বিগত যুগের প্রথম দু'-তিনজনের মধ্যে নাম করা যায় এমন একজন অভিনেত্রী। সেই অভিনেত্রীটি তখন একটি ষ্টুডিওতে পুরো দমে স্যুটিং করছে রোজ। কিন্তু রোজই স্যুটিং করতে করতেই যেই শুনতে পাচ্ছে ষ্টুডিওর সেটে একটি মোটর গাড়ীর হর্ণ, সেই রাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনে আকুল হয়ে ছুটতেন, সঙ্গে সঙ্গে কাজকর্ম বন্ধ রেখে সেই গাড়ীতে করে উধাও হচ্ছে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। কিন্তু কালটা পুরাণের কাল নয়, রাধা চলে গেলেও সংসার চলতো কিন্তু অভিনেত্রী চলে গেলে স্যুটিং চলে না; ষ্টুডিওর ফ্লোর হচ্ছে ট্যাক্সীর মিটার; প্রতি মুহূর্ত্তে তার ভাড়া উঠছে। দু'তিন দিন হতে সবাই নড়ে চড়ে বসলো।

পরিচালকগোষ্ঠীর অন্যতম একটি সুদর্শন যুবক যে বাধা দিতে পারতো তাকেও কটাক্ষে ঘায়েল করেছিলো অভিনেত্রীটি। পুরো না পারলেও আধমরা করে ফেলেছিলো বলে অন্যদের ধারণা। সেই ধারণা থেকে আর নিষ্ক্রিয়তার দরুণ আড়ালে হাসি ঠাট্টা তামাসা পাগল করে তুললো সেই অন্যতম পরিচালককে। ফলে একদিন তাকে বাধা দিলে বাধবে লড়াই জেনেও রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হলো। অভিনেত্রীটিকে আইনের ভয় দেখালে সে হেসে উড়িয়ে দিলো; বলল: উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করেছি আমি; কোন আর্টিষ্টকেই কণ্ট্রাক্ট থাকলেও কেউ বাধ্য করাতে পারে না তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করাতে! পরিচালক বললো: জোর করে আটকে রাখবে সে। অভিনেত্রী বললো, গায়ের জোর দেখাতে গেলে জুতো খাবে পরিচালক; এবং আরোও যা বললো তা বিশেষ পল্লীর মেয়েরাও প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতে ভয় পায়! বলে চলে গেলো অভিনেত্রী-কুলরাণী!

কর্ণধারের কাণে উঠলো কথাটা; কাণ ধরে সবাইকে ডেকে আনলেন তিনি। অভিনেত্রীটি বিলকুল অস্বীকার করলো সব। পরিচালক যদিও নেপথ্যে প্রচুর তর্জ্জন-গর্জ্জন করেছিলেন, সামনে এসে কিন্তু স্পিকটি নট। অভিনেত্রীটির ঠোঁটের কোণে সবে মাত্র হাসির রেখা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে কি না করেছে, এমন সময় পরিচালকের সহকারী একজন বললেন: হেসে রেহাই নেই; হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিতে পারি আমি! রুখে ওঠে অভিনেত্রীটি: কী পারেন আপনি? পারেন ত' ভাঙ্গুন! বটে?—সহকারী পরিচালক সবাইকে নিয়ে প্রোজেকশান রুমে গিয়ে চালিয়ে দেয় সাউণ্ড ফিল্ম; প্রত্যেকটি কথা, মায় বিশেষ পল্লীর সেই ইতরোক্তি পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয় পর্দায়। সকলের অজ্ঞান্তে সেদিনকার সেই অভিনেত্রী-পরিচালকের সবটুকু সংলাপ রেকর্ড করে রেখেছিলেন সহকারী পরিচালক। মাথা নীচু হয়ে আসে অভিনেত্রীর! আর পরিচালক এতক্ষণে উঠে দাঁড়ায় সোজা হয়ে! প্রসঙ্গত আবার উল্লেখযোগ্য টলিউডে পরিচালক পায় বিশ হাজার টাকা ছবির জন্যে; আর সহকারীর মাইনে মাসে দেড়শো টাকা! মুচিরাম গুড়ের দেশে কপালই আসল; কাজ নয়!

এই ইণ্টারভ্যুতেও ভূতের ভয় না গেলে আরও কড়া ডোজ দিচ্ছি! এ ঘটনাটি সাম্প্রতিকতম। এক ভদ্রলোক আর তার ফিল্মষ্টার স্ত্রী আর তাদের একমাত্র মেয়েকে নিয়েই এই দুর্ঘটনা। ভদ্রলোক এবং স্ত্রীলোকদের অগম্য এক নাইট ক্লাবে মাকে অন্য লোকের কণ্ঠলগ্না অবস্থায় মাতাল হতে দেখে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে যায়; ভদ্রলোক স্ত্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে গাড়িতে উঠে ষ্টার্ট দিতে দেরী করেন। স্ত্রী দরজা খুলে আবার লাফিয়ে পড়েন সেই অন্য লোকটির বুকের ওপর। পরের দিন মেয়েটি লেকের জলে যায় আত্মহত্যা করতে। মরতে পারে না; ফিরে আসে বাপ-মায়ের যুগল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সারাজীবন ধরে।

দু'চার জন স্বামী অথবা স্ত্রী মরে বেঁচে গেছে। টলিউডে প্রচুর স্বামি-স্ত্রী বেঁচে মরে আছে। কিন্তু এসব কথা কাকে বলছি; মানুষই উপদেশের মণি-মুক্ত খোঁজে! নীতিপুস্তক বলেছে **Not to cast pearls before swines**!—বলেছে না?

[ক্রমশঃ।

স্থানাভাব বশত গত বারে অলিম্পিকের সাঁতারের ফলাফল দেওয়া সম্ভব হয়নি ; তাই এইবারে সংক্ষেপে দিয়ে আগামী চার বছরের মত অলিম্পিকের খতিয়ান থেকে যবনিকা টেনে দেব।

১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল সাঁতারে অষ্ট্রেলিয়ার ছেলে এবং মেয়েদের সাফল্যই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। পুরানো অলিম্পিক রেকর্ড ম্লান করে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে।

পুরুষ—১ম—জন হেনরিক (অষ্ট্রেলিয়া) ৫৫.৪ সে: (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ২য়-জে, ডেভিড (অষ্ট্রেলিয়া) ৫৫.৮ সে:। ৩য়—জি, চ্যাপম্যান (অষ্ট্রেলিয়া) ৫৬.৭ সে:। ৪র্থ—আর প্যাটারসন (আমেরিকা) ৬ষ্ঠ—ডব্লু উ উলসে (আমেরিকা)।

মহিলা—১ম—ডন ফ্রেজার (অষ্ট্রেলিয়া) ৬২ সে: (নতুন অলিম্পিক ও বিশ্বরেকর্ড) ২য়—লোরেন ক্র্যাপ (অষ্ট্রেলিয়া) ৬২.৩ সে:। ৩য়—ফোথ লিচ (অষ্ট্রেলিয়া) ৬৫.১ সে:। ৪র্থ—জে রোসাজো (আমেরিকা) ৫ম—ভি গ্রাণ্ট (কানাডা) ৬ষ্ঠ—এস ম্যান (আমেরিকা)।

৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল সাঁতারে পুরুষ বিভাগে ১৭ বছরের স্কুল ছাত্র মারো রোজ স্বর্ণপদক লাভ করলেন। মেয়েদের বিভাগে প্রত্যেকেই পুরাতন অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন।

পুরুষ—১ম—মারো রোজ (অষ্ট্রেলিয়া) ৪মি: ২৭.৩ সে (নতুন অলিম্পিক ও বিশ্বরেকর্ড) ২য়—টি, ইয়ামানাকা (জাপান) ৪মি: ৩০.৪ সে। ৩য়—জর্জ্জ বীন (আমেরিকা) ৪ মি: ৩২.৫ সে:। ৪র্থ—কে হ্যালোরান (অষ্ট্রেলিয়া) ৫ম—এইচ জিও রোগু (জার্মাণী) ৬ষ্ঠ—জি, উইনয়ম (অষ্ট্রেলিয়া)।

মহিলা—১ম—লোরেন ক্র্যাপ (অষ্ট্রেলিয়া) ৪মি: ৫৪.৬ সে: (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড) ডন ফ্রেজার (অষ্ট্রেলিয়া) ৫মি: ২.৫ সে: ৩য়—রুস্কা (আমেরিকা) সময় ৫মি: ৭.১ সে। ৪র্থ—এম, প্রিভার (আমেরিকা)। ৫ম—এস, জেকেলী (হাঙ্গেরী) ৬ষ্ঠ—এস মর্গ্যান।

১৫০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইলে পুরুষদের বিভাগের ৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইলের সংগে কোন তফাৎ নেই। শুধু ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন জে বয়টেক্স ফ্রেন্স।

৪×২০০ মিটার রিলে রেসে অষ্ট্রেলিয়ার সাঁতারুরা নতুন অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

১ম—অষ্ট্রেলিয়া ৮ মি: ২৩.৬ সে: (নতুন অলিম্পিক ও বিশ্বরেকর্ড)। ২য়—আমেরিকা ৮ মি: ৩১.৭ সে:। ৩য়—সোভিয়েট রাশিয়া ৮ মি: ৩৪.৭ সে:। ৪র্থ—জাপান। ৫ম—জার্মাণী। ৬ষ্ঠ—গ্রেট বৃটেন।

৪×১০০ মিটার মেয়েদের রিলে রেসে অষ্ট্রেলিয়ার মেয়েদের কৃতিত্ব নতুন বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে।

১ম—অষ্ট্রেলিয়া ৪ মি: ১৭.১ সে: (নতুন অলিম্পিক ও বিশ্বরেকর্ড)। ২য়—আমেরিকা ৪ মি: ১৯.২ সে:। ৩য়—দক্ষিণ আফ্রিকা ৪ মি: ২৫.৭ সে:। ৪র্থ—জার্মাণী। ৫ম—ক্যানাডা। ৬ষ্ঠ—সুইডেন।

১০০ মিটার ব্যাক ষ্ট্রোকে অষ্ট্রেলিয়ার সাঁতারুদের প্রাধান্য। মেয়েদের বিভাগে বৃটেনের সাঁতার-পটীয়সী গ্রীণহ্যাম স্বর্ণপদক লাভ করায় দীর্ঘ ৩২ বৎসর পরে ইংলণ্ড ঘরে তুললো একটি স্বর্ণপদক।

পুরুষ—ডি, থিলো (অষ্ট্রেলিয়া) ১ মি: ২.২ সে: (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)। ২য়—জে, মঙ্কটন (অষ্ট্রেলিয়া) ১ মি: ৩.২ সে:। ৩য়—এফ, ম্যাকিনে (আমেরিকা) ১ মি: ৪.৫ সে:। ৪র্থ—আর, ক্রিষ্টোফোন (ফ্রান্স)। ৫ম—জে, হেয়ারস্ (অষ্ট্রেলিয়া)। ৬ষ্ঠ—জি, সাইক্স (বৃটেন)।

মহিলা—১ম—জুডি গ্রীণহ্যাম (বৃটেন) ১ মি: ১২.৯ সে: (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)। ২য়—সি, কোন (আমেরিকা) ১ মি: ১২.৯ সে:। ৩য়—এম, এডওয়ার্ড (বৃটেন) ১ মি: ১৩.১ সে:। ৪র্থ—এইচ, স্কিমিও (জার্মাণী)। ৫ম—এম, মার্কি (আমেরিকা)। ৬ষ্ঠ—জে, হয়েল (বৃটেন)।

২০০ মিটার বাটারফ্লাই ষ্ট্রোক মেলবোর্ণ অলিম্পিকে নতুন করে প্রবর্তন করা হোল।

১ম—ডবলিউ, ওরজিক (আমেরিকা) ২ মি: ১৯.৩ সে:। ২য়—টি, ইশিমটো (জাপান) ২ মি: ২৩.৮ সে:। ৩য়—জি, টাম্পেক (হাঙ্গেরী) ২ মি: ২৩.৯ সে:। ৪র্থ—জে, নেলসন—(আমেরিকা)। ৫ম—জে, মার্শাল। ৬ষ্ঠ—ই, রিয়স (আমেরিকা)।

২০০ মিটার বেষ্ট ষ্ট্রোকে পুরুষ বিভাগে জাপানের সাঁতারু স্বর্ণপদক লাভ করেছেন, এবং মেয়েদের বিভাগে জার্মাণীর ইউ হামো।

পুরুষ—১ম—এম, ফুরকাওয়া (জাপান) সময় ২ মি: ৩৪.৭ সে:। ২য়—এম, জোসিমুরা (জাপান) সময় ২ মি: ৩৬.৭ সে:। ৩য়—কে, আয়ুনিটচেভ (রাশিয়া) ২ মি: ৩৬.৮ সে:। ৪র্থ—টি, গ্যাথারকোল (অষ্ট্রেলিয়া)। ৫ম—আই যশোদা (রাশিয়া)। ৬ষ্ঠ—কে, প্রেবি (ডেনমার্ক)।

মহিলা—১ম—ইউ, হামো (জার্মাণী) ২ মি: ৫৩.১ সে:। ২য়—ইভা জেকেলি (হাঙ্গেরী) ২ মি: ৫৪.৮ সে:। ৩য়—ই, মেরিয়া তেন এলসেন (জার্মাণী) ২ মি: ৫৫.১ সে:। ৪র্থ—জি, জেরিসিভিক (হাঙ্গেরী)। ৫ম—কে ডিলারম্যান (হাঙ্গেরী)। ৬ষ্ঠ—এইচ, জর্ডন (বৃটেন)।

১০০ মিটার ফ্লাই ষ্ট্রোক মেয়েদের বিভাগে অলিম্পিকে এবার নতুন করে পত্তন হোল।

১ম—শেলী ম্যান (আমেরিকা) ১ মি: ১১ সে:। ২য়—এন, র‍্যামে (আমেরিকা) ১ মি: ১১.৯ সে:। ৩য়—এম, সিয়ার্স (আমেরিকা) ১ মি: ১৪.৪ সে:। ৪র্থ—লিটে মারিজিকি (হাঙ্গেরী) ৫ম বি. বেনাব্রিজ (অষ্ট্রেলিয়া) ৬ষ্ঠ জে ল্যাংগেনো (জার্মাণী)।

হাই বোর্ড ডাইভিং মেক্সিকোর জে, ক্যাপিলা স্বর্ণপদক লাভ

করলেন। মেয়েদের বিভাগে আমেরিকার জয়-জয়কার। তিনটি স্থানই আমেরিকার ভাগ্যে।

পুরুষ—১ম—জে, ক্যাপিলা (মেক্সিকো) ১৫২'৪৫ পয়েন্ট। ২য়—জে, টেরিয়াক্ত (আমেরিকা) ১৫২'৪১ পয়েন্ট। ৩য়—আর, কেনার (আমেরিকা) ১৪১'৭১ পয়েন্ট। ৪র্থ—জে, গরল্যাচ (হাঙ্গেরী)। ৫ম—আর, ব্রেনার (রাশিয়া)। ৬ষ্ঠ—ডব্লু উ, কারেন (আমেরিকা)।

মহিলা—১ম—প্যাট ম্যাককর্মিক ৮৪'৮৫ পয়েন্ট। ২য়—জে, আরউইন ৮১'৬৪ পয়েন্ট। ৩য়—পি মেয়ার্স ৮১'৫৮ পয়েন্ট। এঁরা তিন জনই আমেরিকার প্রতিযোগী।

স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় আছে।

পুরুষ—১ম—আর ক্লটওয়ার্কি (আমেরিকা) ১৫৯'৫৬ পয়েন্ট। ২য়—ডি হার্পার (আমেরিকা) ১৫৬'২৩ পয়েন্ট। ৩য়—জে ক্যাপিলা (মেক্সিকো) ১৫০'৬১ পয়েন্ট। ৪র্থ—জে, হুস ইটেন (আমেরিকা) ৫ম—কি, আউধালোফ (রাশিয়া) ৬ষ্ঠ—আর ব্রেনার (রাশিয়া)।

মহিলা—প্যাট ম্যাককর্মিক (আমেরিকা) ১৪২'৩৬ পয়েন্ট। ২য়—জে, আরউইন (আমেরিকা) ১২৫'৮৯ পয়েন্ট। ৩য়—আই, ম্যাকডোনাল্ড (ক্যানাডা) ১২১'৪০ পয়েন্ট।

ডেভিস কাপ

গত বারের ডেভিস কাপ বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়া এবারেও আমেরিকাকে পাঁচটি খেলায় পরাজিত করে ডেভিস কাপ লাভ করেছে। চারটি সিঙ্গলস ও একটি ডাবলস খেলার মধ্যে আমেরিকা একটি খেলাতেও জয়লাভ করতে পারেনি।

সিঙ্গলস

লুই হোড (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-২, ৬-৩ ও ৬-৩ গেমে হার্বি ফ্লামকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

কেন রোজওয়াল (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-১, ৬-৪, ৪-৬ ও ৬-১ গেমে ভিক্ সেসাসকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

লুই হোড (অষ্ট্রেলিয়া) ভিক সেসাসকে (আমেরিকা) ৬-২, ৭-৫ ও ৬-২ গেমে পরাজিত করেন। কেন রোজওয়াল (অষ্ট্রেলিয়া) সাম গিয়ামালভাকে (আমেরিকা) ৪-৬, ৬-১, ৮-৬ ও ৭-৫ গেমে পরাজিত করেন।

ডাবলস

লুই হোড, কেন রোজওয়াল ৬-১, ১-৬, ৭-৫ ও ৬-৪ গেমে ভিক সেসাস ও সাম গিয়ামালভাকে পরাজিত করেন।

ফুটবল

কলকাতায় ফুটবল বড়দিনের সময় পদার্পণ করল অলিম্পিক রার্ণাস যুগোশ্লাভিয়া দলের প্রদর্শনী খেলার মধ্য দিয়ে।

উপর্যুপরি তিন বারের অলিম্পিক রার্ণাস যুগোশ্লাভিয়া দলের ফুটবল-মান অনেক উন্নত। ২১ তারিখে আই, এফ, এর বাছাই দলকে যুগোশ্লোভিয়া ৩—০ গোলে পরাজিত করে। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে দর্শনীয় খেলা দেখিয়েছেন লেফট আউট সেকুলার। তাঁর অপূর্ব নৈপুণ্য দর্শকগণকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে।

ডুরাণ্ড কাপ

ভারতের তিনটি প্রধান প্রতিযোগিতায় লাভ করেছে কলকাতার তিনটি জনপ্রিয় দল। আই, এফ, এ, শীল্ড মোহনবাগান, রোভার্স, মহামেডান স্পোর্টিং এবং ডুরাণ্ড কাপ লাভ করলো ইষ্টবেঙ্গল দল।

ক্রিকেট

অতীত ও বর্তমানের ধুরন্ধর ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নিয়ে কলকাতার ইডেন উদ্যানে রজত জয়ন্তীর প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। ঠিক এই সময় কলকাতায় রাশিয়ান সার্কাস তাঁদের নৈপুণ্য প্রকাশ করে দর্শকদের একটি অংশকে মাতিয়ে রেখেছিল। তাই আশানুরূপ দর্শক-সমাগম হয়নি। ডাঃ বি, সি, রায়ের দল সাগরপারের খ্যাতিমান সব খেলোয়াড় নিয়ে গড়া সফরকারী জয়ন্তী দলকে ১৪২ রাণে পরাজিত করেছে। অনেক দিন পরে অমরনাথ, হাজারে, মুস্তাক প্রভৃতি খ্যাতিমান খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্য ও এ্যালেক বেডাসার, ও, ট্রুমান প্রভৃতির বল দেখে প্রীত হয়েছি।

টুকরো খবর

নববর্ষ উপলক্ষে ইংলণ্ডের কীর্তিমান ফুটবল খেলোয়াড় ম্যাথুজ নববর্ষে বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে সি, বি, ই, উপাধি লাভ করেছেন। সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে এবারে অলিম্পিক হকি খেলার অধিনায়ক বলবীর সিংকে 'ভারতশ্রী' খেতাবে সম্মানিত করেছেন। এ সংবাদে ক্রীড়ামোদী মাত্রই আনন্দিত হয়েছেন।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

শ্রীশ্রীসারদা দেবী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীমালতী গুহ-রায়

দুই

সন্তানের জননী না হয়েও সারদা দেবী মা কেন, এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতেও বেশী দূর যেতে হয় না। আশৈশব তাঁর জীবন-ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করলে যে মহীয়সী রূপটি তাঁর মধ্যে ফুটে ওঠে, তাই হচ্ছে তাঁর মাতৃরূপ। তাই তিনি শত-সহস্র কণ্ঠে মা। অনাবিল ভালবাসা ও স্নেহময়ী দরদী মাতৃভাব যা তাঁর জীবনের প্রতি রন্ধ্রে ও ছন্দে ফুটে উঠতো, তার আর তুলনা নেই—তাই তিনি মা।

তাঁর মাতৃস্নেহের পরিধি কখনোই কোন দেশকাল পাত্রাপাত্র বিচারের অপেক্ষা রাখতো না। লক্ষ লক্ষ মাইল ব্যবধানে সম্পূর্ণ বিদেশী, অপর ভাষাভাষী, বিরুদ্ধ আচার নিয়ম পালনকারী সন্তানদের জন্যও তাঁর হৃদয় সদা প্রসারিত থাকতো। নিজ দেশাচারকে উপেক্ষা করেও তাদের বুকে টেনে নিতে তাঁর বাধতো না। তাই তিনি মা। আচারে, বিচারে, শুদ্ধিতে নিষ্ঠায়, তিনি আদর্শ নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী হওয়া সত্ত্বেও পাত্রাপাত্র নির্বিশেষে মাতৃস্নেহ প্রকাশ তাঁর কোন দিন বাধা হতে পারেনি। এ শুধু মাতৃহৃদয়েই সম্ভব। তাই তিনি মা।

তা যদি না-ই হত, তবে ভৌগোলিক পরিধি ছাড়িয়ে তাঁর অনাবিল মাতৃস্নেহের রসাস্বাদ সুদূর পাশ্চাত্যবাসীরা পেতে পারতো না। ভগিনী নিবেদিতা যখন প্রথম এদেশে আসেন, স্বামী বিবেকানন্দের মহা দুশ্চিন্তা হয়েছিল, কি করে এই ছোঁয়াছাপা বাঁচানো গোবর গঙ্গাজলের শুচিবাতিকগ্রস্ত যুগে তাঁকে আশ্রয় দেবেন। সেই সময় সারদা দেবীই নির্ভয়ে এগিয়ে এসে তাঁর দুশ্চিন্তা ঘুচিয়েছিলেন, নিবেদিতাকে নিজ স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় দিয়ে। সমাজ সংস্কার বা কঠোর সমালোচনায় যে কি পরিণতি হতে পারে একবারও তা ভাবেন নি। সন্তানহীনা রমণীর এ স্বর্গীয় প্রেম একমাত্র বিশ্বমাতৃত্বেই সম্ভব। কাজে কাজেই তাই তিনি সকলের মা।

সাধারণ মায়েদের মধ্যে আমরা যে ভালবাসা মমতা সহিষ্ণুতা ক্ষমা ও ত্যাগের প্রকাশ দেখি এবং অপার্থিব বলে বর্ণনা করি, তা অধিকাংশই তাঁদের আপনাপন গর্ভজাত সন্তানদের বেষ্টন করেই প্রকাশ পায়। কিন্তু সারদা দেবীর এই সব মাতৃগুণরাজি প্রকাশ পেতো তাঁর বিশ্বব্যাপী সন্তানদের জন্য। সত্যি কথা বলতে গেলে, যারা তাঁর কেউই নয়। তাই তিনি মা। তিনি ছিলেন পতিত-পাবনী, অসহায়ের সহায়, দুর্বলের বল, অন্তর্যামিনী মহামায়া। কী মহাশক্তির আধার হ'লে যে এ সম্ভব হয়, তার পরিমাপ করা আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের সম্ভব নয়। তাই তো কলম চলতে চলতে থেমে যায়। স্তব্ধ-বিস্ময়ে ভাবি যে, নারী তো আমরাও। আমরাও মা। কিন্তু একি অপরূপ এক মহিমময়ী মাতৃরূপের প্রকাশ আমাদের শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর?

আদর্শ স্থাপনের জন্যই বুঝি তাঁর নরদেহে এই অমরলীলা! আর কি আদর্শ নিয়েছি আমরা আধুনিক নারীরা? দুঃখে অন্তর ভরে ওঠে। ব্যর্থই কি যাবে ঐ মহিমময়ী নারীর পবিত্র জীবনাদর্শ? বৃথা কি হবে দেবীর মর্ত্ত্যে আগমন? আবার মনে হয়, না, না, এ তো ব্যর্থ হবার নয়! ধ্বংসের মধ্য দিয়েই তো নূতনের আবাহন। ক্ষয়ের মধ্য দিয়েই অক্ষয়ের আবর্ত্তন। শ্রীশ্রীমায়ের এই দেবোপম চরিত্রের শিক্ষা হারিয়ে যায়নি। বর্ত্তমান সভ্যতার খোলসের আবরণ যখন খসে পড়বে, ধ্বংস হবে, তখনই তা নূতন করে অঙ্কুরিত হয়ে উঠবার সূচনা হবে। আধুনিক যুগসভ্যতা ক্রমেই বিকৃতির মধ্য দিয়ে দ্রুত গতিতে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে, হয় তো বা শুভ শিক্ষার বীজটি অঙ্কুরিত করবে বলেই।

সারদা দেবীর দেবীমাহাত্ম্য এত দিন শুধু তাঁর নিকটতম কয়েকটি ভক্তের অন্তরের অন্তরতম মণিকোঠায়ই সযত্নে লুকানো ছিল। পরম শ্রদ্ধায় তাঁরা তাঁকে পূজা করতেন। কিন্তু যিনি বিশ্ববরেণ্যা, সর্ব্বপূজনীয়া, তিনি কি করে থাকতে পারেন সামান্য কয়েকটি ভক্তের হৃদয়াসনে? তাঁর আসন যে যুগে যুগে কোটি কোটি অন্তরে বিছানো রয়েছে এবং থাকবে। কাজেই এখন যতই দিন যাচ্ছে, ততই সারদা দেবীর দেবীমাহাত্ম্য স্বমহিমায় ফুটে বের হচ্ছে ও বিশ্বদুনিয়ায় বিস্ময়ের সৃষ্টি করছে।

আজ থেকে একশ বছর আগের ভারতকে বিচার করলে তার সমাজবিধি, শাসন, আচার-বিচার শুদ্ধি-নিষ্ঠা ধর্ম্মসংস্কার সব কিছু খুঁতিয়ে দেখলে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যেন শত-সহস্রচ্ছটাযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মতই মনে হয় সারদা দেবীকে। যেন চতুর্দ্দিকের ঘনায়মান অন্ধকারকে শত-সহস্র হস্তে একই সময়ে বিনাশ করতে চেয়েছেন তিনি। তিনি যেন অসুরনাশিনী দুর্গা।

অন্ধকারে থাকতে থাকতে মানুষ অন্ধকারেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আলোর কথা তাদের মনেও থাকে না। সেকালে মায়ের দিনের ভারতও কুসংস্কারের অন্ধকারেই বেশ তৃপ্ত ছিল। কুসংস্কারমুক্ত হবার জন্য বা আলোর জন্য কোন আগ্রহ ছিল না।

কিন্তু স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত বিধাতার আশীষ ও করুণাময়ীরূপে এলেও অন্ধকারে অভ্যস্ত সেদিনের মানুষ তাদের আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সারদা দেবীর মহিমা বুঝতে পারেনি। তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। অন্ধকারকেই আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না তো সত্যিই কিছু চোখঝলসানো সূর্য্যতাপ নয়, তাই বেশী দিন বিভ্রান্ত হবার উপায় ছিল না তাদের।

সারদা দেবীর যুগের মানুষ যেন দেশাচার কুসংস্কারের জন্যই বাঁচতো। মানুষের বাঁচার প্রয়োজনেই যে দেশাচারের সৃষ্টি, তা যেমন মানুষই গড়ে, আবার প্রয়োজনে মানুষই তাকে ভাঙতেও পারে; তারা তা বুঝতো না। কিন্তু সারদা দেবী তো বুঝতেন! তিনি জানতেন যে, যার সৃষ্টি প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে তার

অবসানই মঙ্গল। সেই জন্যেই তাঁর ভক্ত সন্তানদের মঙ্গলের জন্য, তাদের প্রয়োজনের জন্য তিনি নির্ভীকচিত্তে ও দৃঢ়তার সঙ্গে তা ভাঙ্গতে ইতস্তত করতেন না।

ব্যক্তিগত কারণে অবশ্য তিনি সমাজপ্রথা লঙ্ঘনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু যেখানেই তাঁর মাতৃধর্ম্মে আঘাত পড়তো, সেখানে তিনি নত হতে পারতেন না। ঐ ছুঃস্পর্শকাতর যুগে তাই তাঁকে দেখা যেত অত্যন্ত সহজ ভাবে সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় ভক্তদের সঙ্গে আপন গর্ভধারিণী জননীর মত অন্তরঙ্গ ব্যবহার করতে।

তিনি যখন খেতে বসতেন, চারি দিক থেকে ভক্তরা হাত পাততো একটু প্রসাদ পাবার জন্য। অবলীলাক্রমে তিনি খেতে খেতেই তাঁর পাতের মাখা ভাত তাদের হাতে চেপে-চুপে গুঁজিয়ে দিতেন, যাতে পড়ে না যায়। তারপর দিব্যি সেই হাতেই খেতে থাকতেন। হাত ধোবার প্রশ্নও তাঁর মনে আসতো না। কোন সময় হয়তো আঁচলে মুড়ী-মুড়কী খেতে বসে ভক্তদের হাতে মুঠো মুঠো তুলে দিতে দিতে নিজেও খেতে থাকতেন। তারা কোন বর্ণ কি জাত, এ প্রশ্ন তাঁর মনে আসতো না। তিনি মা আর তারা তাঁর সন্তান, এই তাদের একমাত্র পরিচয় ছিল।

মুসলমান ভক্তদের তিনি জেনে-শুনেই নিজের ঘরের দাওয়ায় বসিয়ে খেতে দিতেন। তাঁর সযত্ন পরিবেশনে মাতৃস্নেহের পরিচয় থাকতো। তারা বাসন নিয়ে উঠে গেলে তিনি নিজ হাতে তাদের উচ্ছিষ্ট স্থান মুক্ত করতেন। বাধা দিলেও শুনতেন না। মা কি সন্তানের নিষেধে তার সেবা কাজ বন্ধ করেন? কত সময় কত অস্পৃশ্য নিম্নশ্রেণীর ভক্তরা তাঁর কাছে কোন কাজে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি নিজে তাদের পরিচর্য্যা করতেন। গোলমাল বাধবার, বাধা পাবার আশঙ্কায় তিনি চুপি চুপি তাদের মলমূত্র পরিষ্কার করতেন। বিন্দুমাত্রও দ্বিধা জাগতো না তাঁর মনে। তিনি জানতেন মায়ের কাছে সন্তানের কোন পার্থক্য নেই। থাকতেও পারে না। এরা যে সবাই তাঁর সন্তান আর তিনি যে তাদের মা।

সমাজচোখে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ-বিধবাদের এরকম আচরণ অবশ্য তখনকার দিনে একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। তখনকার ঈর্ষা-পরায়ণ সমাজপতিরা এসব ব্যাপারে একেবারে নিঃশব্দে যে থাকতেন, তা-ও নয়। সামাজিক আইনের অজুহাতে নানা ছলে তারা সারদা দেবীর কাছ থেকে টাকা আদায় করতেন। চাওয়া মাত্র সারদা দেবী তাদের ঐ টাকা দিয়ে দিতেন। তিনি এই অর্থদণ্ডকে শাস্তি ভাবতেন না। তিনি বরং খুশীই হতেন, এভাবে কিছু কিছু
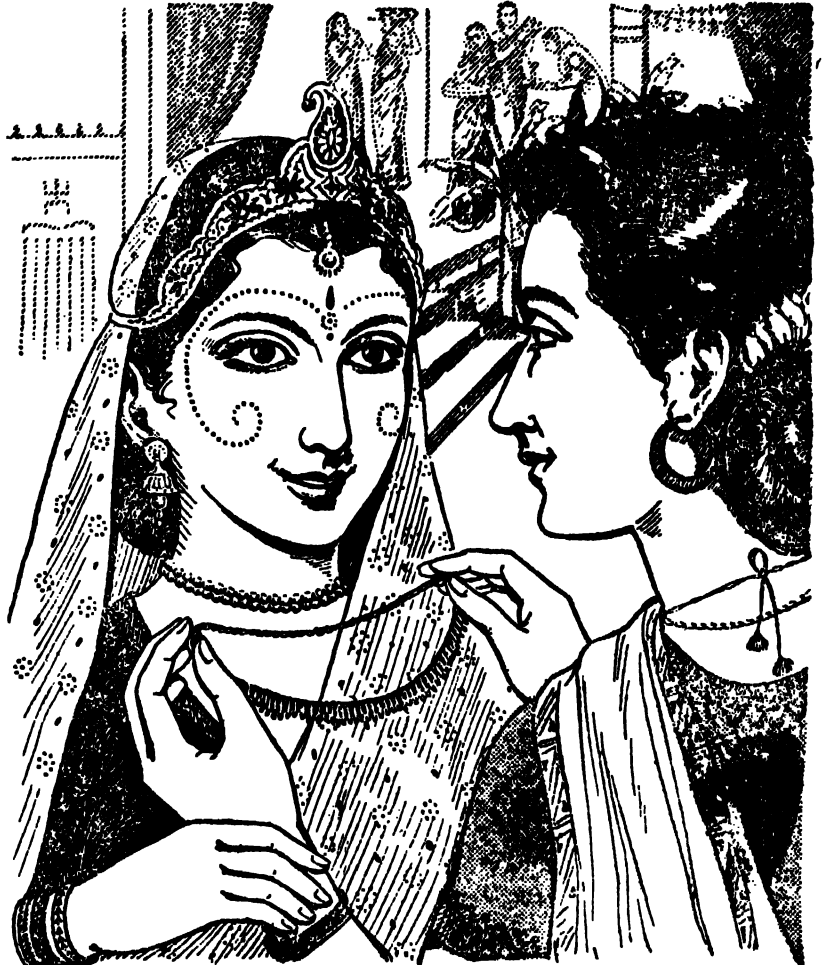
অর্থ দিয়েই অভীষ্ট কাজের ব্যাঘাত অপসারিত হয় ভেবে। সমাজ-শাসন মায়ের স্নেহ থেকে সন্তানদের বঞ্চিত রাখবে এ তাঁর অসহ্য ছিল। ঈশ্বরসেবা জ্ঞানে তিনি যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করতেন, তা যেন তাঁর সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবেই হত। সে সব কাজে কোন বাধা-নিষেধ বা শাসনের ভয় তাঁর মনের কোণেও জাগতো না।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'একমাত্র চরিত্রই বাধা-বিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করিতে সমর্থ। তার সেই বাণীটি যেন সারদা দেবীর মধ্যে রূপ গ্রহণ করেছিল। সারদা দেবী তো রূপবল, ধনবল, বিদ্যাবল ইত্যাদি চলতি কথায় যাদের আমরা বল ভাবি, তার কোন বল নিয়েই জন্মাননি। একমাত্র চরিত্রবলই তাঁকে সকল বলে বলীয়ান করেছিল। তাঁর নিজ চরিত্রমহিমায় তিনি অগণিত পাপী তাপী শোকসন্তপ্ত ও দুঃখী সংসারী নরনারীর জীবনাদর্শ গড়ে দিয়েছিলেন। আভিজাত্যহীন, অশিক্ষিতা দরিদ্র ও একান্ত লজ্জাশীলা পল্লীরমণীর চরিত্রবলের কাছেই তখনকার সন্দিগ্ধ, ঈর্ষাকাতর মানুষ নিজ থেকেই মাথা নীচু করেছিল। তাদের সামাজিক বজ্রদৃঢ় নানারকম বাধা-নিষেধের প্রাচীরও তাই ভেঙে পড়েছিল।

অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত অনাবিল স্নেহধারা সর্ব্বদাই তাঁর অন্তরে বইতো। যারাই তাঁর সংস্পর্শে আসতো, তারাই তা অনুভব না করে পারতো না। তাঁর স্নেহস্পর্শ থেকে কীট পতঙ্গ পশুপাখী পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যেতো না। গৃহপালিত কুকুর বিড়াল গরুগুলির প্রতিও তাঁর কি অসীম মমতাই না প্রকাশ পেতো!

আশ্রমের বিড়ালগুলি ভক্তদের বড়ই উৎপাত করতো। তারা যখন খেতে বসত, বিড়ালগুলি তাদের পাতের মাছ তুলে নিয়ে পালিয়ে যেতো। ছেলেরা খেতে বসে এমনি রোজ উত্যক্ত হয়, এ মায়ের সহ্য হতো না। তিনি খাবার সময় তাদের হাতের কাছে লাঠি রেখে বলতেন, 'যখন ভারী বিরক্ত করবে, এই লাঠি রইল তাড়িয়ে দিস্।' কিন্তু সব ভক্তরা অত নরম পন্থায় রাজী ছিলেন না। তাদের ২।১ জন মাঝে মাঝেই বিড়ালগুলিকে দুর্জ্জয় প্রহার দিত। মায়ের অন্তর তাদের ব্যথায় আবার কাঁদতো। "আহা অবলা মূক জীব, ওদের কি অমনি করে মারতে হয়?" অথচ সব সময় সবাইকে প্রতিবাদ করতেও তিনি পারতেন না। সঙ্কোচ বোধ করতেন।

জ্ঞান মহারাজ এই বিড়ালগুলিকে দেখতে পেলেই মারতেন। একবার মার কোথাও যাবার কথা হ'লে বড়ই ভাবনা হ'লো, 'আমি কাছে থাকতেই জ্ঞান বিড়ালগুলিকে এত মারে, আমি না থাকলে হয়তো একেবারেই মেরে ফেলবে।' রওয়ানা হবার সময় তাকে তিনি ডেকে বললেন 'বেড়ালগুলিকে মারিসনে বাবা, এদের মধ্যে কিন্তু আমিই রয়েছি।' সত্যি সত্যিই সেই থেকে জ্ঞান মহারাজের গভীর পরিবর্ত্তন হয়। তিনি বিড়ালগুলিকে মারা দূরে থাকুক, মাতৃজ্ঞানে সেবা করতেন। নিজে নিরামিষাশী হয়েও বাজার থেকে মাছ এনে ওদের খাওয়াতেন।

এই জ্ঞান মহারাজেরই একবার কি এক ধারণা হ'ল, গরুকে জল খেতে না দিলে দুধ ভাল দেয়। তাই তিনি আদেশ দিলেন খড় বিচালী ভাতের ফেন ছাড়া গরুকে যেন জল দেওয়া না হয়। আশ্রমে গরুদের জল পান নিষিদ্ধ হ'ল। এ সংবাদ কানে যেতে সারদা দেবীর অন্তর ব্যথায় টন টন করে উঠলো। একটু ভাল দুধ খাওয়ার জন্য গরুদের তৃষ্ণার্ত্ত ব্যথার ব্যবস্থায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। অথচ বয়স্ক সন্তান জ্ঞান মহারাজকে তিনি মান্য করতেন বলে সরাসরি তাঁকে কিছু বলতেও পারলেন না।

একদিন দুপুরবেলা গরুদের হাম্বারব কানে যেতে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। রামময় মহারাজকে ডেকে বললেন, 'দেখ তো বাছা, জ্ঞান ঘুমিয়েছে নাকি? জ্ঞান ঘুমোলে চট করে দুই বালতি জল ঐ তৃষ্ণার্ত্ত গরুগুলিকে একটু দিয়ে আয় তো।'

গরুগুলির সম্মুখে জলের বালতি রাখা মাত্র তারা চোঁ চোঁ করে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্তের মত সবটা জল খেয়ে নিল। তা দেখে সারদা দেবীর দু'চোখে জল এলো। তিনি বললেন 'আহা জ্ঞান ওদের এই কেষ্টটা কেন বোঝে না রে! তুই বাবা রামময়, জ্ঞান ঘুমিয়ে পড়লে নিত্য রোজ দু'বালতি জল এদের খাইয়ে যাস বুঝলি?' সারদা দেবীর মাতৃ-অন্তরখানি এমনি করে সারা বিশ্বের জন্যই কাঁদতো। একটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে মারলে পর্য্যন্ত তাঁর অন্তরে ব্যথা লাগতো, মাতৃপরিচয়ই তাঁর সব চেয়ে যেন বড় পরিচয় ছিল। তাই তিনি মা।

আশ্রম ছেড়ে কোথায় যাওয়া-আসা কালে তিনি যে গোছগাছ করতেন, সে মাধুর্য্যেরও তুলনা ছিল না। যেখান থেকে যেতেন সেখানে পাছে কারুর কোন অসুবিধা হয় তাই নিপুণভাবে সব গুছিয়ে হাতের কাছে রেখে সবাইকে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি রওনা হতেন। আবার যেখানে যাবেন সেখানে গিয়ে যাতে তাদের কোন অসুবিধায় না ফেলেন, তার জন্যও তাঁর ছিল অন্য রকম গোছগাছ। তাঁর প্রতি কথায় প্রতি ব্যবহারে প্রতি কাজেই যেন অন্তরের মাতৃস্নেহ ঝরে পড়তো। তিনি বলতেন, 'আমি যে তোদের কথার কথা মা নই রে! পাতানো মা-ও নই। আমি যে তোদের সত্যিকারের মা।' এই কথা কয়টি যে অক্ষরে অক্ষরে কতটা সত্য তা তাঁর স্নেহস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন, তাঁদের চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না।

মা যেন যাদু জানতেন। সন্তানরাও নিজেদের গর্ভধারিণী জননীকে ভুলে মা ছাড়া আর কিছু জানতো না। মায়ের পাতের একটু প্রসাদ, মায়ের একটু দর্শন, মায়ের একটু স্নেহপরশ পাবার জন্য তাদের মধ্যে একটা আকুলি-বিকুলি দেখা যেতো। সারদা দেবীর অনাবিল মাতৃস্নেহের পরশ পেয়ে কত মানুষের যে জীবনের মোড় ঘুরে গেছে তার অন্ত নেই। প্রকৃত দরদী মমতাময়ী মায়ের অন্তরের পরশ না পেলে এ কি সম্ভব হ'তো?

বৃষ্টিতে ভিজে ভক্তরা এলে আপন পরিধেয় বসন স্বচ্ছন্দে তাদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করতে বলতেন। শীতবস্ত্র কারুর সাথে না থাকলে নিজের কম্বলখানা তাদের হাতে গুঁজে দিতেন। তাদের সঙ্কোচ দেখলে এই ব'লে তাদের সহজ করে দিতেন 'হ্যাঁ বাবা, মায়ের জিনিষ ব্যবহারে কি ছেলেদের সঙ্কোচ হয়?'

বিদেশ থেকে ভক্তরা নোংরা জামাকাপড় নিয়ে এলে মা সেগুলি নিজের হাতে কেচে পরিষ্কার করে দিতেন। আবার দূর থেকে কেউ

দিতেন। খাবার পর নিজ হাতে তাদের হাত-মুখ ধোবার জন্ত জল ঢেলে দিতেন। ভক্তদের উচ্ছিষ্ট বাসন পর্য্যন্ত তিনি নিজ হাতে মাজতেন। বাধা দিলে বলতেন 'হ্যাঁ বাবা, আমি কি তোমাদের মা নই?'

ভক্তদের কারুর খা-পাঁচড়া হলে মা তাদের পরিষ্কার করে দিতেন। দিনের পর দিন নিজ হাতে খাইয়ে দিতেন। কত স্ত্রীভক্তরা সন্তানাদি নিয়ে আসতো। তাদের শিশুদের মলমূত্র মা নিজে পরিষ্কার করতেন। বাধা দিলে বলতেন, 'মেয়ের জন্ত মা তো কত কিছুই করেন, আমি আর কতটুকুই পারি?'

মা সকলকে খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন। নিজে না খেয়ে ভাল জিনিষ সব ভক্তসন্তানদের খাওয়াবেন বলে তুলে রেখে দিতেন। ঠাকুরের কাছে কালীঘরে ভক্তরা এলে তিনি নহবতঘরে বসে টের পেতেন আর যে যা ভালবাসে তাই রাঁধতে বসতেন। কেউ কোথাও কাজে গেলে না ফেরা পর্য্যন্ত স্নেহবৎসলা মায়ের মত নিজে না খেয়ে বসে থাকতেন। কে কি খেতে ভালবাসে, কার কি না হলে কষ্ট হয়, সব তাঁর জানা থাকতো। তার জন্ত অবশ্য তাঁর পরিশ্রমের অন্ত থাকতো না। কিন্তু হাসিমুখেই তিনি সব করতেন। তাঁর চা'দেবী ভক্তদের দুধের জন্ত বাটি হাতে কত দিন তাঁকে দেখা গেছে এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরে বেড়াতে।

দূর থেকে যাঁরা আসতেন, পথকষ্ট বুঝে তিনি তাঁদের ২-৪ দিন বিশ্রাম নিয়ে যেতে বাধ্য করতেন। অভাবের সংসারে অভাব বৃদ্ধির কথা তাঁর মনেও আসতো না। ভালোমন্দ খাবার ফল মিষ্টি যাই যখন ভক্তরা পাঠাতো তিনি শিকেয় তুলে রাখতেন 'কী জানি, রাত বিরাতে কখন কে আসবে বলা তো যায় না।'

ঠাকুরের দর্শন পেতে যে সব স্ত্রীভক্তরা আসতেন, রাত্রি হয়ে গেলে ফিরতে পারতেন না। ঠাকুর তাদের বলতেন কালীমন্দিরের বারান্দায় থাকতে। মা শুনে ছুটে আসতেন। 'মা থাকতে মেয়েরা বারান্দায় পড়ে থাকবে, তা কি হয়?' মুহূর্ত্তে নহবতখানার ক্ষুদ্রঘরটির ছড়ানো বিচিত্র আসবাব কোথায় উধাও হয়ে যেতো। ছোট্ট মেঝেটুকুতে তাদের নিয়ে এমনি জড়িয়ে শুতেন যে মনে হত তারা যেন তাঁর কত আপনার। সন্তানদের আনন্দেই তাঁর আনন্দ, তাঁদের তৃপ্তিতে তাঁর তৃপ্তি, সুখে সুখ, দুঃখে তাঁর যেন দুঃখ, এমন কি তাদের মুখেই যেন তিনি আহার করতেন। তাঁর কাছে এসে কেউ কখনো অভুক্ত বিদায় নিতে পারতো না।

রাত্রি-দিন মায়ের কাজের অন্ত ছিল না। অল্প দিনের জন্ত পিত্রালয়ে গেলেও সেখানকার সব বোঝা নিজের মাথায় নিতেন। ঘরে-বাইরে সকলের জন্তই তাঁর অন্তর সমান ভাবে কাঁদতো। ভক্ত সমাগমের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় না থাকায় তাঁর পরিশ্রমের অন্ত থাকতো না। পান সাজা তাঁর এক মস্ত কাজ ছিল। কেউ এলে-গেলে তার সুমুখে রেকাবে করে কিছু প্রসাদ, এক গ্লাস জল ও দু' খিলি পান নিয়ে এসে দাঁড়াতেন। ভক্তদের কাছে এই রেকাব-হাতে দাঁড়ানো মাকে দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যেতো। তাঁর সমস্ত অন্তরের মাতৃস্নেহটুকু নিয়ে যেন সন্তানের সম্মুখে এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন। আবার তারা যখন রওয়ানা হয়ে যেতো, তাদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে সমানে তিনি দুর্গানাম জপ করতেন। সজল চোখে অনেক দূর পর্য্যন্ত তাদের সাথে সাথে এগিয়ে দিতেন। আবার তারাও পথের বাঁকে অদৃশ্য না হওয়া পর্য্যন্ত সমানে পিছনে ফিরে ফিরে মাকে দেখতো। ভক্তদের কত স্মৃতিচিহ্নই যে মায়ের বাক্সে থাকতো, তার অন্ত নেই। শতছিন্ন হয়ে গেলেও মা প্রাণ ধরে তা ফেলতে পারতেন না। মার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিবেদিতার দেওয়া একটি রুমাল ছিন্ন অবস্থায় তাঁর বাক্সে রাখা ছিল। এ মায়ের কি আর তুলনা মিলে?

সারদা দেবীর লোভশূন্যতাও এক দৈবী সম্পদ ছিল। অগণিত ভক্ত-সন্তানের তিনি জননী ছিলেন। তাঁর ইঙ্গিত মাত্রই তারা হয়তো মাকে রাজরাণীর মত রাখতে পারতো। কিন্তু সেই মাটির ঘরের দাওয়ায় বসে পান সাজতে, কুটনো কাটতে, রুটি বেলতে ও নানারকম দৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে কায়িক পরিশ্রম করতেই ভালবাসতেন তিনি। সেই দারিদ্র্যের মধ্যেই হাসিমুখে ভক্তদের সেবা করতেন তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে। তাঁর ঈশ্বরনির্ভরতা এতই বেশী ছিল যে পরের দিনের সংস্থানটুকু বিলিয়েও ভক্তসেবা করতেন তিনি। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধকালেও কোন প্রলোভন তাঁকে টলাতে পারতো না।

একবার এক মাড়োয়ারী ভক্ত ঠাকুরের সেবার জন্ত দশ হাজার টাকা দিতে এসেছিলেন। ঠাকুর টাকা স্পর্শ করতেন না, তাই ঐ টাকা গ্রহণে অসম্মত হ'ন। ভক্তটি ঐ টাকাটা সারদা দেবীর কাছে দিবার বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন ঠাকুর ও ভক্তদের সেবার জন্ত। মা যাতে নিজে ঐ অর্থ রাখেন। ঐ সময়টা মাকে অভাবের সঙ্গে লড়াই করে ঠাকুর ও ভক্ত সন্তানদের সেবা করতে হত। কিন্তু তিনি ঐ অর্থ গ্রহণ করলে প্রকারান্তরে ঠাকুরেরই নেওয়া হয়, এই বিচার করে ভক্তটিকে ফিরিয়ে দিলেন। কিছুতেই নিলেন না সে অর্থ। ঐ সময়টায় সারদা দেবীর পিত্রালয়ের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ঐ ভক্তটিকে তিনি যদি আদেশ করতেন, ঐ অর্থ তাঁর পিত্রালয়ে দান করতে, তবে হয়তো ভক্তটি নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করতো। কিন্তু তাও করেননি তিনি। যে ভাবেই ঐ অর্থ ব্যবহারের তিনি নির্দ্দেশ দিবেন, প্রকারান্তরে তাঁরই তা গ্রহণ করা হবে, এই বিবেচনা তাঁর তীক্ষ্ণ ছিল।

মাদ্রাজ তীর্থ ভ্রমণের সময়ও সারদা দেবীর সম্মুখে এ রকমই এক প্রলোভন আসে। রামনাদের মহারাজা তাঁকে তাঁর রাজভাণ্ডার পরিদর্শন করিয়ে তাঁকে তাঁর ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার থেকে কিছু গ্রহণ করতে বারংবার সানুনয় অনুরোধ জানান। রাজভাণ্ডারে কত মহামূল্য চোখ ঝলসানো মণিমাণিক্যের সমাবেশ। সারদা দেবী হয়তো জীবনেও এসব চোখে দেখেননি। কিন্তু কোন মতেই তাঁকে কিছু গ্রহণ করাতে সম্মত করান যায়নি। বারংবার সানুনয় অনুরোধে ঐ একই জবাব দিয়েছিলেন যে, ধনঐশ্বর্য্য তাঁর কাম্য নয়। সন্তানের ঐশ্বর্য্য দেখেই তিনি তুষ্ট হয়েছেন।

[ক্রমশঃ।

"আশা" কবিতায় কবি নবীনচন্দ্র

সন্ধ্যা বসাক

"কাম্বেলের "আশা" পৃথ্বীলোক পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধ-গগনে বিচরণ করে; নবীন বাবুর আশা স্নেহগদগদ প্রিয়-কণ্ঠের ন্যায় হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চরণ করিয়া প্রাণ-মন কাড়িয়া লয়।

খরজ্যোতিঃ; আর একটি লঘুমেঘাবৃত চন্দ্রমার শীতল কান্তি। একটি সুদূরবর্তিনী, আর একটি মর্ম্মস্পর্শিনী।" (কালীপ্রসন্ন ঘোষ)

সত্যই "আশা" নবীনচন্দ্রের অমর সৃষ্টি। ইহা "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের অংশমাত্র। ইহা নবীন কবির মনের মুকুর। ইহাতে তাঁহার নবীন মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। মানবজীবনে আশার অমোঘ প্রভাবই কবিতার বিষয়বস্তু। এই "আশা" যদিও প্রধানতঃ শ্বেত সেনাপতি ক্লাইভের এবং তাহার সেনাদলের—তথাপি প্রসঙ্গচ্ছলে কবির অন্তরের আশাটিও প্রতিফলিত হইয়াছে।

কবিও আশার মোহিনী মায়ার পিছনে মরীচিকার ন্যায় ধাবিত হইয়াছেন। বাঙ্গালার বিস্তৃত একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কবি কাব্য লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সাহিত্য রচনার এই পথ অনভ্যসেবিত। তাই ইহার সার্থকতা সম্বন্ধে কবির মনে জাগে সন্দেহ। বঙ্গের মহাকবিগণ তাঁহাদের সুদূরপ্রসারী কল্পনার রঙিন সূতায় জাল বুনিয়া মাতৃভাষাকে বৈচিত্র্যময় করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নবীনচন্দ্রের সেই কল্পনাশক্তি কোথায়? কেমন করিয়া তিনি সফলতা লাভ করিবেন? তাইতো কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে শুনি,

"দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ আমি মূঢ়মতি!
নতুবা যে পথে কোন কবি বিচরণ করেনি,
সে পথে কেন হবে মম গতি?"

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কবির মনে আশার স্তিমিত আলো প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। তাঁহার মনে গোপন মন্ত্র ধ্বনিত হইতে থাকে—আশা বিশ্বভুবনে গতি দান করে, মুমূর্ষু অন্নহীন কাঙ্গালও বাঁচিবার আশায় আবার ভিক্ষায় বহির্গত হয়। আশার এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কবি বলিয়া উঠেন,

"......কিম্বা অসম্ভব
নহে কিছু হে দুরাশে, তোমার মায়ায়;
কত ক্ষুদ্র নর ধরি পদছায়া তব
লভিয়াছে অমরতা এ মর ধরায়!"

আলোচ্য অংশে কবির আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রাধান্য দেখা যায়। ইহার ফলে ভাবতরঙ্গের বন্যায় পাঠকের মন দোলায়িত হইয়া উঠে, হৃদয়ের মৃণালে টান পড়ে। দুরাশাকে আশ্রয় করিয়া এই মৃত্যুশীল সংসারে কবিকীর্ত্তি-জনিত অমরতা লাভের প্রয়াস সত্যই অভিনব। মিল্টনের "নিউজ" বিহারীলালের "করুণাসুন্দরী সারদা" রবীন্দ্রনাথের "জীবনদেবতা" এবং নবীনচন্দ্রের "দুরাশা" একই পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। নবীন কবিও তাঁহার কাব্য রচনার মূলে অনুভব করিয়াছেন কুহকিনী আশার প্রভাব।

এই কথাগুলিকে ভাবোচ্ছ্বাসের ফলে নবীনচন্দ্রের অসংযত, অসতর্ক প্রকাশ বলিয়া মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। সমুন্নত কবিকল্পনা ও প্রতিভা ছাড়া যে সার্থক কাব্য রচিত হইতে পারে না, ইহা নবীন কবির জানা ছিল। আর সেই সৃজনী প্রতিভা ও সমুন্নত কল্পনাশক্তি যে তাঁহার ছিল, এ কথাও তিনি জানিতেন। তিনি যে আশার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, ইহার একমাত্র কারণ আত্মপ্রত্যয়ের উপর তাঁহার অবিচল নিষ্ঠা। মহতী কীর্ত্তি রচনার ক্ষেত্রে প্রতিভাই যে একমাত্র বিবেচ্য বস্তু নহে, ইহার জন্য যে সুগভীর আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন, তাহা বিনয়ী নবীনচন্দ্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। এই দুরন্ত আত্মবিশ্বাসের বলেই তিনি কবিকীর্ত্তি লাভের আশা করিতে পারিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কবির আশা নিছক আবেগমাত্র নহে—এবং ইহা ব্যর্থ হয় নাই "পলাশীর যুদ্ধই" তাহার জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

মহিলা কবি ও ঔপন্যাসিক : তরু দত্ত

সলিলপ্রসাদ ঘোষ

কবি বলেছেন:—

যুগে যুগে যুগে ভারতের নারী
দিয়ে নানা প্রতিভার পরিচয়।
এ মর জগতে হয়েছে অমর
ভাতি' চির ম্লানহীন গরিমায়।

এ কথা বিশেষ করে স্মরণ হয়, বাঙালী তথা ভারতীয় মহিলাগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় যিনি সাহিত্য রচনা করে দেশ-দেশান্তরে খ্যাতি লাভ করেছিলেন,—সেই মহিলা কবি ও ঔপন্যাসিক তরু দত্তের প্রসঙ্গে।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ কলিকাতার রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত-পরিবারে তরু দত্তের জন্ম হয়। এই দত্ত-পরিবারের আদিনিবাস ছিল বর্দ্ধমান জিলার আজুপুর গ্রামে। এই বংশের নীলমণি দত্ত কলিকাতায় এসে রামবাগানে বিরাট অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে বসবাস সুরু করেন। তিনি ছিলেন মহারাজা নবকৃষ্ণের সমসাময়িক ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিখ্যাত উইলিয়াম কেরীকে তিনি তাঁর বাগমারীর বাগানে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিয়েছিলেন। অন্যান্য মহৎ গুণাবলীর সঙ্গে এই পরিবারের বিদ্যানুরাগের কথাও সর্বজনশ্রুত। গিরিশচন্দ্র, উমেশচন্দ্র, শশীচন্দ্র, হরচন্দ্র এবং তরুর পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্তের ইংরাজী রচনার খ্যাতি ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে এঁদের রচিত "The Dutt Family Album" নামে একখানি কবিতার বই প্রকাশিত হয়। রমেশচন্দ্র দত্তও এই পরিবারের সন্তান। বিশেষতঃ তরুর পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্ত অত্যন্ত সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সেকালের বিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রিকা "The Calcutta Review পত্রিকার সম্পাদক রেভারেণ্ড ডাঃ জর্জ্জ স্মিথ লিখিয়াছেন,—"I have always regarded him as the finest English scholar amongst the natives of Bengal and consequently of India."

খ্যাতনামা অধ্যাপক কাওয়েল কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যের ইংরেজী পদ্যানুবাদ করেছিলেন এই গোবিন্দচন্দ্র দত্তের সাহায্যে।

তরু ছিলেন পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। যদিও তাঁরা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত ছিলেন এবং সেকালের রীতি অনুসারে আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ সকল বিষয়েই বৈদেশিক রীতিনীতির অনুকরণ করতেন, তথাপি তরুর মা, কন্যার চরিত্র গঠনের জন্য তাঁকে দেশজ ছড়া ও পৌরাণিক কাহিনী শোনাতেন। সম্ভবতঃ এরই ফলে, সেই শৈশব কালেই তরু গীতি কবিতা ও সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

তরুর কৈশোর রামবাগানের গৃহ ও বাগমারীর বাগানেই অতিবাহিত হয়। এই উদ্যান তরুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং কবি তাঁর পরবর্ত্তী জীবনে এই বাগানকে কবিতায় অমর করে রেখে গেছেন। গোবিন্দচন্দ্র পুত্র-কন্যাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত গৃহেই করেছিলেন। শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক গৃহশিক্ষকের নিকট তরু ও তাঁর দিদি অরু ইংরেজী পাঠ গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে অরু ও তরুর দাদা অব্জুকুমারের মৃত্যু হয়। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর গোবিন্দচন্দ্রের সমস্ত স্নেহ ভালবাসা দুই কন্যার উপর বর্ষিত হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র সপরিবারে ইউরোপ যাত্রা করেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয় যে গোবিন্দচন্দ্রের পত্নী ও তাঁর দুই কন্যা অরু ও তরু দত্তই সর্বপ্রথম বাঙালী তথা ভারতীয় মহিলা হিসাবে ইউরোপ ভ্রমণের সৌভাগ্য অর্জ্জন করেন। তাঁরা প্রথমে মর্সেল বন্দর হয়ে দক্ষিণ-ফ্রান্সে গিয়ে অবস্থান করেন, এর কিছুদিন পর গোবিন্দচন্দ্র নীস সহরে উপস্থিত হন। এখানে ফরাসী ভাষা শেখবার জন্য অরু ও তরু এক ফরাসী স্কুলে ভর্ত্তি হন। ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ফরাসী জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কিশোরী অরু ও তরুর মনকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করে। এর পর প্যারিসে কিছুদিন থেকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁরা ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। ইংলণ্ডের ব্রমটন সহরে এক মনোরম সুসজ্জিত গৃহে তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা হয়।

ব্রমটনের সুন্দর পরিবেশই তরুর সুপ্ত কবিপ্রতিভাকে আত্মপ্রকাশের পথ দেখিয়ে দেয় এবং তরু এখানে বসেই প্রথম ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় কবিতা রচনা সুরু করেন। তরুর দিদি অরুও যথেষ্ট বিদুষী ছিলেন এবং তরুর মতই ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষায় কবিতা রচনা করতেন বটে, কিন্তু তবুও কি লেখাপড়া, কি সঙ্গীতশিক্ষা সকল বিষয়েই তরু তাঁর দিদিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতেন আর অরু সস্নেহে কনিষ্ঠ ভগিনীকে সকল বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করতেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁরা কেমব্রিজে গমন করেন। এখানেও দুই ভগিনী আরও ভালোভাবে ফরাসী ভাষা শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। এখানকার মহিলাদের জন্য আহূত সভা সমিতিতে নিয়মিত ভাবে উপস্থিত হয়ে অরু ও তরু সেখানকার বিভিন্ন আচার ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ গ্রহণ করতেন। অরু ও তরুর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মার্জিত ও মিষ্টি, তাই বহু বাধা সত্ত্বেও ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বহু নরনারীর সঙ্গে তাঁদের বিশেষ সৌহার্দের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। অবশেষে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপ ভ্রমণ সমাপ্ত করে তাঁরা 'পেশোয়ার' জাহাজ যোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কিন্তু হায়, কলিকাতায় এক গভীরতম দুঃখ এই পরিবারের জন্য অপেক্ষা করছিল,—মাত্র এক বছরের মধ্যেই ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই তরুর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় দিদি অরু দত্ত যক্ষ্মারোগে মারা গেলেন! দিদির এই অকাল মৃত্যু তরুর কোমল হৃদয়ে এক নিদারুণ আঘাত হানলো, কিন্তু পিতার কথা স্মরণ করে সকল দুঃখ বেদনাকে তিনি অন্তরের অন্তস্তলে গোপন রাখলেন। তরুর সকল কাজে সঙ্গিনী ছিলেন তাঁর দিদি অরু। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিক্ষা সকল বিষয়ে এক সঙ্গে কাজ করতেন দু'জনে, আপন ভাবে বিভোর হয়ে এগিয়ে যেতেন তরু, আর দিদি অরু সতর্ক ভাবে লক্ষ্য রাখতেন ছোট-বোনটির ওপরে, এর ফলে হয়তো তাঁর নিজের সাধনায় ব্যাঘাত ঘটতো, কিন্তু তাঁর সেদিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না।

এই সময় থেকেই তরুরও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। মানসিক ও দৈহিক যন্ত্রণা লাঘবের জন্য তিনি এই সময়ে আরও গভীর ভাবে পড়া ও লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। গৃহে বসে একদিকে চলে সংস্কৃত শিক্ষা আর একদিকে সৃষ্টি হয় ফরাসী কাব্যের অনুবাদ, মৌলিক উপন্যাস প্রভৃতি। তরু দত্তের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ রচনা এই সময়েই রচিত হয়। এর থেকে এই মনে হয়, তিনি যেন মৃত্যুর পদধ্বনি আগেই শুনতে পেয়েছিলেন, তাই তাঁর সমস্ত রচনা অতি দ্রুত এই স্বল্প সময়ের মধ্যে লিখে শেষ করেছিলেন। এই ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দেই তরু দত্তের রচনা প্রথম ছাপার হরফে মুদ্রিত হয়। একটি ফরাসী কবিতার ইংরেজী অনুবাদ রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সম্পাদিত "Bengal Magazine" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর পর থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (১৮৭৭ খৃঃ) ঐ পত্রিকায় তাঁর রচিত কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

এই সময়েই তিনি ফরাসী ভাষায় একখানি মৌলিক উপন্যাস রচনায় হাত দেন। এই উপন্যাসখানির নাম, 'Le Journal de Mind' Arves" অর্থাৎ 'কুমারী আরভার্স এর দিনপঞ্জী'। এই উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়, তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে।

তরু দত্তের সাহিত্যিক প্রতিভা যে কত বিরাট ছিল, তা এই উপন্যাসটির কথা আলোচনা করলে হৃদয়ঙ্গম হয়। ইংরাজী ভাষাকে বলা হয় Common Language বা বিশ্বভাষা অর্থাৎ বিশ্বের বহু ভাষাভাষী জাতিই ইংরাজী ভাষা বোঝেন বা ব্যবহার করেন। এমন কি বিশ্বের অনেক জাতি যাঁদের মাতৃভাষা ইংরেজী নয়, এমন বহু ব্যক্তি এই ইংরেজী ভাষায় কাব্য, সাহিত্য, উপন্যাস প্রভৃতি রচনা করবার চেষ্টা করেছেন এবং যশস্বীও হয়েছেন। কিন্তু ফরাসী জাতি ছাড়া বিশ্বের আর কোনও জাতি ফরাসী ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে সক্ষম হননি,—কিন্তু এর একমাত্র ব্যতিক্রম অষ্টাদশী বাঙালী তরুণী, তরু দত্ত। তাঁর রচিত উপন্যাসের সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে এক কথায় কিছু বলা অসম্ভব। তবে কৌতূহলী পাঠক এই উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ পড়ে কিছু আভাস পেতে পারেন। আর বর্তমানে 'মাসিক বসুমতী'তেও এর অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, ধৈর্য্য ধরে নিজেরা পড়ে এর বিচার করুন। তবে এই উপন্যাসের ভূমিকা-লেখিকা বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিকা, Clarisse এর একটি ছোট্ট মন্তব্যেই বহু আলোচনার সমাপ্তি ঘটিয়েছে, সে হচ্ছে যে—"একখানি উপন্যাস রচনা করেই তরু দত্ত ফরাসী সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছেন"। দুঃখের বিষয়, কোন অনুবাদকই এই ভূমিকাটি সম্পূর্ণ অনুবাদ করে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুরের 'সাপ্তাহিক সম্বাদ প্রেস' থেকে তরুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "A Sheaf Gleaned in French fields" নামে কাব্য-সংকলনটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বহু বিখ্যাত ফরাসী কবির রচনা সুললিত ইংরেজী ভাষায় ভাষান্তরিত করা হয়েছে। এই গ্রন্থ যখন প্রথম প্রকাশ হয়, তখন এদেশের অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, এ নিশ্চয়ই ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত কোন ইংরেজের রচনা। কিন্তু অত্যন্ত গর্ব ও আনন্দের বিষয় যে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বহু খ্যাতনামা পত্রিকা এই বাঙালী তরুণীর অপূর্ব সাহিত্যকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই প্রসঙ্গে ফরাসী সমালোচক Andre' Theurict এবং ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা সমালোচক Edmund Gosse এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটি বিদেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পর পর কয়েকটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। অবশ্য কবির প্রথম সংস্করণ ছাড়া আর কোন সংস্করণ দেখা সম্ভব হয়নি, কারণ এর পরই ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট, প্রতিভার বরপুত্রী, কবি তরু দত্ত পূর্বোক্ত যক্ষ্মারোগে দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ বৎসর।

তরুর মৃত্যুর পর, পিতা গোবিন্দচন্দ্র কন্যার কতকগুলি কবিতা একত্র করে "Ancient Ballads & Legends of Hindustan" নামে একটি কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। বিভিন্ন বিষয়-বস্তুর উপর ভিত্তি করে এই কবিতাগুলি রচিত হয়েছে, এর মধ্যে রামায়ণ মহাভারতের কয়েকটি বিভিন্ন চরিত্রের উল্লেখও দেখা যায়। এই গ্রন্থের কবি-পরিচিতি লেখেন, ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক Sir Edmund Gosse. তিনি কবির অনুবাদ ও মৌলিক রচনার প্রশংসা করে লিখেছিলেন—

"When the history of the literature of our Country comes to be written, there is sure to be a page in it dedicated to this fragile exotic blossom of song."

কিন্তু গভীর দুঃখের কথা যে, এডমণ্ড গস্'এর প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি! পরবর্তী ইংরেজ সাহিত্য-সমালোচকেরা এ সম্পর্কে অদ্ভুত নীরবতা অবলম্বন করেছেন, কিন্তু এডমণ্ড গস্ এবং পরবর্তী বিদেশী সমালোচকদের কথা বাদ দেওয়াই ভালো, কারণ তাঁরা অনেক দূরের লোক! কিন্তু আমরা মানে বাঙালী বা ভারতীয়রা? আমরাই কি তরু দত্তের কবিপ্রতিভা বা তাঁর কাব্যের যথাযোগ্য মূল্য বা মর্যাদা দিয়েছি? যেহেতু তিনি বাংলা বা ভারতীয় ভাষায় একটি লাইনও লেখেননি, শুধু মাত্র সেই অপরাধেই আমরা একটা বিরাট সাহিত্য-প্রতিভার সম্পর্কে কি নিদারুণ অবহেলা দেখিয়েছি, তা ভাবলে অবাক হতে হয়! সার্থক সাহিত্য যে দেশ, কাল ও ভাষার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়, বিভিন্ন চেহারা ও বৈশিষ্ট্য সত্বেও সার্থক সাহিত্য যে সার্বজনীন ও সর্বকালীন; এই মূল কথাটা আমরা (অর্থাৎ বাঙালীরা, যারা সাহিত্য নিয়ে কম হৈচৈ করি না,) বুঝতে পারি না!—এটাও কম আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু এরজন্য ক্ষতি কার? লজ্জা কোন পক্ষের? যিনি প্রতিভার অধিকারী তিনি, না যারা প্রতিভাকে চিনলো না অথবা চিনতে পেরেও অবহেলায় আজ যাঁকে বিস্মৃত হতে বসেছে? এর উত্তর ভবিষ্যৎ কালকে আমাদেরই দিতে হবে!

কোনও রকম তুলনা না করেও বলা চলে যে, তরু দত্তের প্রতিভার এক সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র যে সকল বাঙালী কবি ও লেখকদের মধ্যে দেখা গেছে, তাঁদের সম্পর্কে আমরা কতই না উৎসাহ বোধ করেছি। তাঁদের প্রতিভা, কবিমানস, জীবন-জিজ্ঞাসা প্রভৃতি নানা ভাবে আলোচনা করে বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে সুরু করে মোটা মোটা কত কেতাবই না রচিত হয়েছে; অথচ, আজ যে বাংলা দেশে সাহিত্য-সমালোচক বা সাহিত্য-বোদ্ধার অভাব ঘটেছে তাও নয়, কিন্তু তাতে কি? আজও তরু দত্তের কাব্য বা জীবনী নিয়ে কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হয়নি। এমন কি বাংলা ভাষায় কবির একখানিও বিস্তারিত জীবনীও নেই। আর গ্রন্থের কথা বাদ দিলেও তরু দত্তের সম্পর্কে কোন মূল্যবান প্রবন্ধ বা তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনাও আজ আর কোনও পত্র-পত্রিকায় দেখা যাবে না। এর একমাত্র কারণ, আত্মবিস্মৃত বাঙালী তাঁর নাম, তাঁর কীর্তি সব আজ ভুলতে বসেছে। আর যাদের কানে নামটা পৌঁছেচে, তাদেরও ধারণাটা খুব স্পষ্ট নয়, তারা জানে,—'তরু দত্ত! হ্যাঁ, ইংরাজীতে কবিতা-টবিতা লিখেছিল বটে!' ব্যস, এই পর্যন্ত, তার বেশী নয়।

সেই জন্য এই কয়েক মাস আগে, কবি তরু দত্তের জন্মশত বার্ষিকী দিবস, হুজুগপ্রিয় বাঙালীর হাত এড়িয়ে নিঃশব্দে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আপার সাকুলার রোডস্থ সি, এম, এস সমাধি ক্ষেত্রে, (প্রবাসী অফিসের বিপরীত দিকে) সেদিন তরুণী কবির সমাধিতে একটিও ফুল পৌঁছয়নি। হয়তো সেই কারণেই, কবি তরু ও অরু দত্তের সমাধি দেশবাসীর অবজ্ঞার ও অবহেলায় হতশ্রী হতমান হয়ে আগাছার মধ্যে আত্মবিলুপ্তির পথ খুঁজছে!

সমাহিতা

—নির্ম্মল দত্ত

দেবদত্তা রায়

। ছিলেন
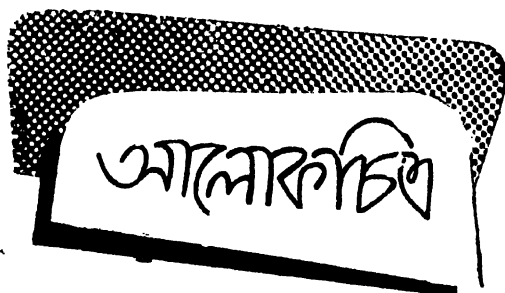
—দেবদত্তা রায়

যা হইয়াছেন

দাঁতের লড়াই

—রথীন রায়

মাটির ফসল —জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

নৌ ও নাবিক (মস্কো, রাশিয়া)

—শ্রীভুবনেশ্বর পাঁড়ে

ক্যান্থারাইডিন
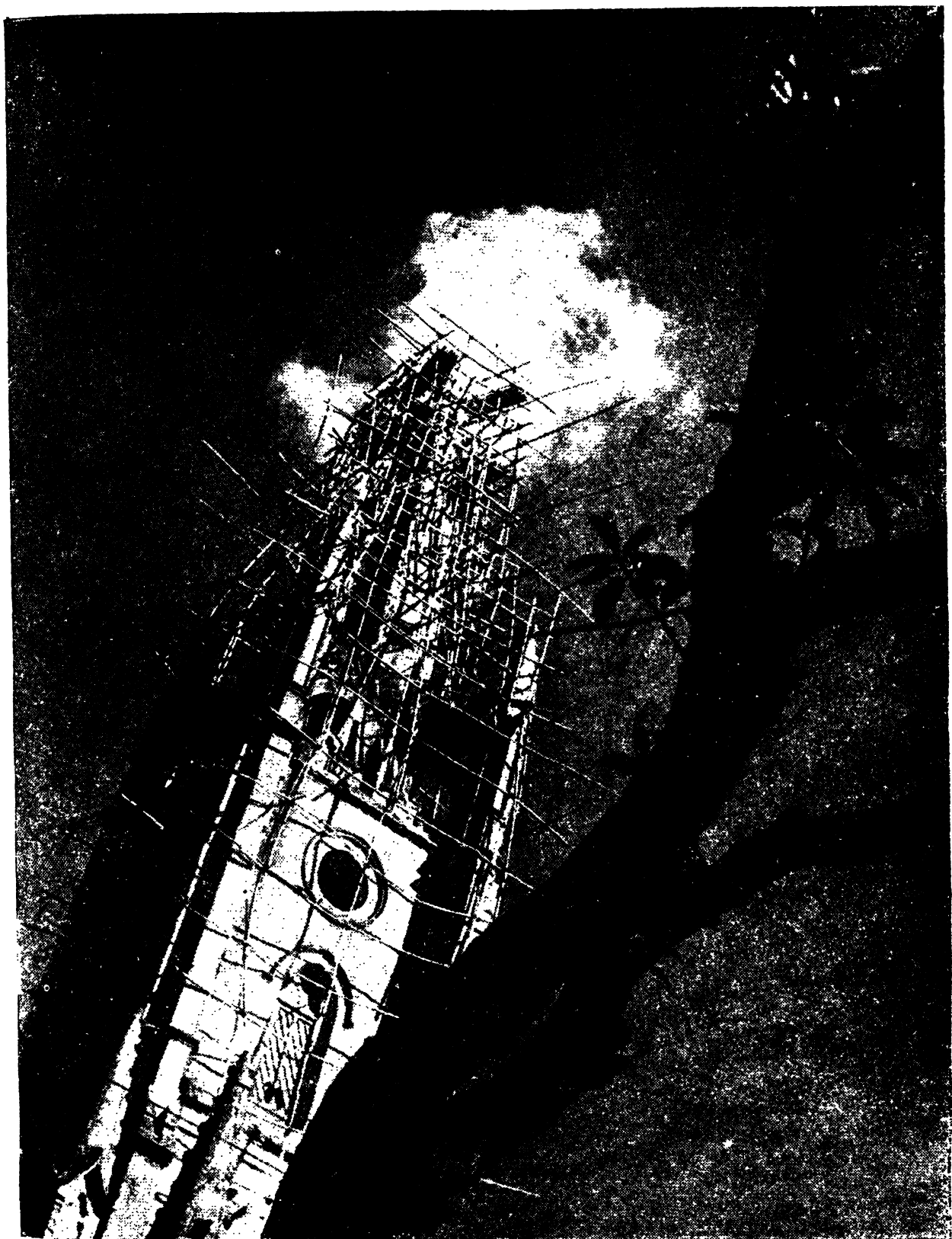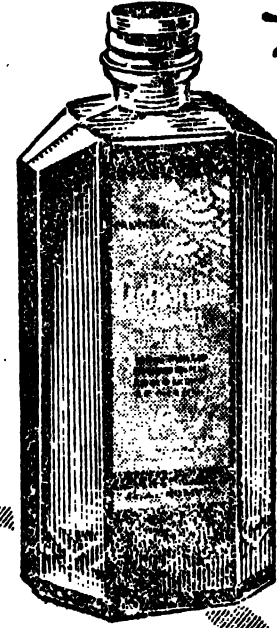
কেশ তৈল

বিশুদ্ধ অলিভ অয়েল ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তৈল সংমিশ্রণে এবং ক্যান্থারাইডিস্ সহযোগে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত। স্নিগ্ধ সুমধুর গন্ধে সুরভিত। কেশবর্দ্ধনে সহায়ক ও মরামাস নিবারক।

৫ আউন্স সুদৃশ্য আধারে পাওয়া যায়।

● নানারকম খোঁপার ছবি সহ "কেশবতী" পুস্তিকা চিঠি লিখলে পাঠান হয়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

খাদ্য হিসাবে দুগ্ধ

খাদ্য-খাবার হিসাবে দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্যের সর্ব্বাধিক গুরুত্ব স্বীকৃত হয়ে আসছে সব দেশেই। শিশুদের জন্যে দুধ না হলে একরূপ চলেই না—ওদের জীবনরক্ষা ও দেহপুষ্টির নিমিত্ত এইটি প্রায় চিরকালই অপরিহার্য্য।

খাদ্যতালিকায় দুধের স্থান নিঃসন্দেহে প্রথম পর্য্যায়ে। এইটির প্রধান কারণ, এতে খাদ্যপ্রাণ যেমন রয়েছে প্রচুর, তার চেয়েও বেশী—অন্য সব জিনিস থেকে এ সহজপাচ্য। বিলেতী চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞরাই পরীক্ষা করে দেখেছেন—যেখানে রুটি হজম করতে একটি সুস্থ মানুষের দু' ঘণ্টা থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে এক গ্লাস দুধ হজমে সময় দরকার মাত্র এক ঘণ্টা। চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞগণ আরও বলে থাকেন—দুধ নাকি চুষে ধীরে ধীরে খাওয়ার চেয়ে তাড়াতাড়ি পান করা ভাল। কারণ এতে পাকস্থলীর হজমশক্তির সহায়তা হয় অনেকখানি।

দুধের মধ্যে যে স্নেহজাতীয় পদার্থ আছে, তুলনায় এইটি হজম করাই সবচেয়ে সহজ। এর ভেতরও আবার গরুর দুধ অপেক্ষা ছাগ-দুগ্ধে স্নেহজাতীয় পদার্থের পরিমাণ বেশী। খাদ্যপ্রাণ বিচার করলে শীতকালীন আর গ্রীষ্মকালীন দুধ একরূপ থাকে না। শীতকালীন দুগ্ধে ভিটামিন 'ডি' যে-পরিমাণে থাকে, তার চতুর্গুণ ভিটামিন পাওয়া যায় গ্রীষ্মকালীন দুধে।

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এক গ্যালন (গড়পড়তা হিসাব) গো-দুগ্ধে জলীয় অংশ থাকে ১৪৪ আউন্স, ৬০ আউন্স প্রোটিন, ৭$\frac{1}{2}$ আউন্স চিনি ও ১$\frac{1}{2}$ আউন্স খনিজ পদার্থ। দুধে কি কি উপাদান আছে, গবেষণাগারে পরীক্ষায় ধরা পড়েছে সে সবই। কিন্তু তাই বলে কৃত্রিম দুগ্ধ তৈরী করা এখনও সম্ভব হয়নি বা করার সকল চেষ্টা ব্যর্থই হয়েছে।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দুধকে জমিয়ে বহুদিন পরেও খাওয়া যায়। এই রীতি প্রাচীন কাল থেকেই মনুষ্য সমাজে প্রচলিত রয়েছে। মার্কো পোলোর এক নির্ভরযোগ্য বিবরণেই জানা যায় যে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মঙ্গোলীয়রা খচ্চরের পিঠে দীর্ঘ-যাত্রায় বার হবার সময় সঙ্গে শুকনো দুধের তাল রাখতো। রোজ সকালে তারা সেটি খণ্ড খণ্ড করে একটি চামড়ার বোতলে জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিতো এবং বোতলটি ঝুলিয়ে দিতো চলতি অবস্থায় খচ্চরের পিঠে লম্বমান জীনের সঙ্গে। এই ভাবে অর্দ্ধ মাইল যাওয়ার পরই দেখা যেতো নাড়াচাড়ায় বোতলের জিনিষটি অবিকল দুধে পরিণত হয়েছে এবং পানেরও সম্পূর্ণ উপযোগী। তবে তখনকার দিনে গুঁড়া দুধ কি ভাবে করা হ'তো মার্কো পোলোর বিবরণে তা জানা যায় না।

গরু যদি দোহনের আগে কোন কারণে ঘাবড়ে যায় তবে অনেক ক্ষেত্রেই দুধ কম মিলে বা একেবারেই পাওয়া যায় না। পরিবেশ বা দুগ্ধ দোহনকারীর রদবদলের ফলে এই অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। এই ভাবে দেখা গেছে সকল দেশেই লক্ষ লক্ষ গ্যালন দুধ নষ্ট হয়ে গেলো। গাই-গরু থেকে দুধ যদি উপযুক্ত পরিমাণে পেতে হয়, তবে তার প্রতি অত্যধিক যত্ন প্রয়োজন। গোধনকে আপন ভাবে গ্রহণ করলে এবং সেভাবে খাদ্য জল দিলে, তার অন্তরের স্নেহ দুগ্ধাকারে বিগলিত হয়ে আসবেই পরিপূর্ণ মাত্রায়।

বলতে কি, দুধ হচ্ছে অমৃতের সমতুল্য। শিশু যুবক, বৃদ্ধ সকল বয়সের লোকের পক্ষেই ইহা উপকারী। পরীক্ষারই একটি ফল—প্রতি পাঁচজনে একজনের হয়ত দুধ হজম হ'ল না এবং ১৫ জনের ভিতর মাত্র একজনের শরীরে হয়তো এর ক্রিয়া হ'ল অন্যরূপ। কিন্তু সার্ব্বজনীন উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য বলতে দুধের মর্য্যাদা কোন ক্রমেই কমবে না, ইহা নিশ্চিত।

অব্যবহার্য টিন পুনরুদ্ধার

সাধারণ গৃহস্থের ঘরে অব্যবহার্য টিন প্রচুর পরিমাণে প'ড়ে থাকে। টিনের তৈরি কৌটাতে ক'রে গৃহস্থের ঘরে আসে নারিকেল তেল, মাখন, সংরক্ষিত মাছ, জ্যাম ও জেলি, ওষুধপত্র এবং নানাবিধ রঞ্জক ও রাসায়নিক দ্রব্য। এ ছাড়াও বড় বড় টিনে করে আসে কেরোসিন তেল, দালদা, পেট্রোল প্রভৃতি। ব্যবহার্য দ্রব্যগুলি বের করে নেওয়ার পর টিনের এই পাত্রগুলি সংসারে সাধারণত অব্যবহার্য আবর্জ্জনা রূপেই পড়ে থাকে। বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন শিল্পে টিনের চাহিদা যথেষ্ট বেড়েছে। টিনের তৈরি বিভিন্ন আকার ও আয়তনের পাত্র ছাড়াও টিন থেকে তৈরি হয়, ষ্ট্যানাস ও ষ্ট্যানিক্ ক্লোরাইড, টিন্ ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য। এ ছাড়াও লৌহ দ্রব্যের ওপর টিনের একটা পাতলা আস্তরণ দেওয়া হয়। আবার ব্রোঞ্জ, বেল-মেটাল প্রভৃতি কয়েকটি মিশ্র ধাতু তৈরির কাজেও টিন্ ব্যবহৃত হয়। শিল্পে টিনের এই রকম অনেক ব্যবহার আছে। টিনের এত ব্যবহার হয়েছে অথচ আমাদের দেশে এই ধাতুটি পাওয়া যায় খুবই অল্প পরিমাণে। এ অবস্থায় অব্যবহার্য টিনকে আবর্জ্জনা স্তূপে ফেলে রাখা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে দেখেছেন, এই অব্যবহার্য টিনের দ্রব্যগুলি থেকে বিশুদ্ধ টিন পুনরুদ্ধার ক'রে তাকে আবার বিভিন্ন শিল্পে নিয়োগ করা যায় কি না। বিজ্ঞানীরা এ কাজে সাফল্য লাভ ক'রেছেন। তাঁদের আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে পরিত্যক্ত টিনকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

ফেলে দেওয়া টিনের স্তূপের মধ্যে শুষ্ক ক্লোরিন গ্যাস প্রবাহিত করতে থাকলে টিন এই গ্যাস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'য়ে রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে "টিন-টেট্রাক্লোরাইড" নামে একটি তরল পদার্থে পরিণত হয়। বায়ুর সংস্পর্শে এলেই এই রাসায়নিক দ্রব্যটি থেকে ধোঁয়া বেরোতে

থাকে। এ জিনিষটি জলে সহজেই দ্রবীভূত হয় এবং এই দ্রবকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ফেলে রাখলে তা থেকে সৃষ্টি হয় হাইড্রেটেড অর্থাৎ জলযুক্ত দানাদার "ষ্ট্যানিক্‌-অকৃসাইড"। এই "ষ্ট্যানিক্‌-অকৃসাইড" রঞ্জন শিল্পে এবং কৃত্রিম রেশম শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ফেলে দেওয়া টিনকে এই ভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ষ্ট্যানিক্‌-অকৃসাইডে পরিণত ক'রে শিল্পে নিয়োগ করা যায়।

অপর প্রক্রিয়া: এই প্রক্রিয়ায় অব্যবহার্য টিনের দ্রব্যগুলিকে চূর্ণ করে প্রথমে খুব ভাল ক'রে আসিড এবং কষ্টিক সোডা দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া হয় এবং পরে ঐ ভিজা দ্রব্যগুলিকে ভাল করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এইবার এই পরিষ্কৃত এবং শুকনো টিনের চূর্ণ দ্রব্যগুলিকে লোহার তৈরি বড় বড় চোঙাকৃতি পাত্রের মধ্যে ভর্ত্তি করে ঐ পাত্রের মধ্যে ৫৪ পাউণ্ড চাপে শুষ্ক ক্লোরিন গ্যাস প্রবাহিত করা হয় এবং পাত্রের মধ্যেকার উত্তাপকে ৩৮° সেণ্টিগ্রেডের বেশী উঠতে দেওয়া হয় না। এইবার ধীরে ধীরে পাত্রমধ্যস্থিত গ্যাসের চাপ কমতে থাকে এবং চাপ কমার সাথে সাথেই রাসায়নিক ক্রিয়া চলতে থাকে।

যখন গ্যাসের চাপ আর কমে না, তখন চাপ-নির্দ্দেশক যন্ত্রের কাঁটা এক জায়গায় স্থির হ'য়ে থাকে এবং তখনই বোঝা যায় যে, পাত্রমধ্যস্থিত রাসায়নিক ক্রিয়ার পরিসমাপ্ত ঘটেছে। এই সময় অতিরিক্ত গ্যাস বের করে নিয়ে পাত্রমধ্যস্থিত টিনের টুক্‌রোগুলিতে জল ঢেলে দেওয়া হয়। তাতে ক'রে টিন অক্সাইড পৃথক হয়ে যায়।

এই প্রক্রিয়াটি হলো সবচেয়ে সহজ প্রক্রিয়া এবং এতে খরচও কম পড়ে।

বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যেও টিন পুনরুদ্ধার করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় পরিত্যক্ত টিনের দ্রব্যগুলিকে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ার পরিষ্কার ক'রে নিয়ে চূর্ণ ক'রে ফেলা হয় এবং ঐ চূর্ণকে তারের জাল দিয়ে তৈরি একটি সিলিণ্ডারে ভর্ত্তি করা হয়। এই চূর্ণীকৃত টিন-ভর্ত্তি সিলিণ্ডারটিকে কষ্টিক্‌ সোডা ও কষ্টিক্‌ পটাশের দ্রব পূর্ণ একটি বড় চৌবাচ্চার মধ্যে রেখে যন্ত্রের সাহায্যে ঘোরান হয়। চৌবাচ্চার মধ্যে এক পাশে রাখা হয় একটি বিশুদ্ধ টিনের প্লেট। এই টিনের প্লেটটিকে করা হয় নেগেটিভ ইলেক্‌ট্রোড এবং জালের তৈরি সিলিণ্ডারটিকে করা হয় পজিটিভ ইলেক্‌ট্রোড। ডায়নামোর সাথে এই দুটি ইলেক্‌ট্রোডকে যুক্ত ক'রে দিলে সিলিণ্ডারের মধ্যে দিয়ে চৌবাচ্চায় তড়িৎ-স্রোত ঢুকে বিশুদ্ধ টিনের প্লেটের মধ্যে দিয়ে ঐ তড়িৎ-স্রোত বেরিয়ে এসে ডায়নামোতে ফিরে যায়। এই তড়িৎ প্রবাহের ফলে জালের সিলিণ্ডারের মধ্যে থেকে টিনের অণু বের হ'য়ে চৌবাচ্চার মধ্যস্থিত দ্রবের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং শেষে অণুগুলি ক্রমান্বয়ে জমতে থাকে বিশুদ্ধ টিন প্লেটের ওপর। অনেকক্ষণ যাবৎ তড়িত প্রবাহিত ক'রলে বিশুদ্ধ টিন প্লেটের ওপর বেশ পুরু হয়েই বিশুদ্ধ টিন জমে যায় এবং তখন তার থেকে চেঁচে বিশুদ্ধ টিন উদ্ধার করা হয়।

উপরোক্ত তিনটি প্রক্রিয়ার সাহায্যেই সাধারণত টিন পুনরুদ্ধার

করা হ'য়ে থাকে। যদি এই কাজে প্রচুর পরিমাণে অব্যবহার্য টিনের দ্রব্য সরবরাহ পাওয়া যায়, তবে তার থেকে টিন পুনরুদ্ধারের কাজও বেশ ভাল ভাবে চালান যায়, কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী পরিমিত অব্যবহার্য টিনের জিনিস সরবরাহ না পেলে এ ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। দেশীয় শিল্পপতিরা টিন পুনরুদ্ধারের কাজে লিপ্ত হ'লে বেশ ভাল ফল পাবেন বলেই আশা করা যায়।

—অমরনাথ রায়

অল্প পুঁজিতে ব্যবসায়

বড়রকমের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যে মোটা পুঁজির দরকার কিন্তু সে পুঁজি সংগ্রহ ইচ্ছে থাকলেও ক'জনার পক্ষে সম্ভব হয়? অবশ্য জীবিকার জন্যে, জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্যে এখনও অনেক ব্যবসা করা যায়, যাতে তত বেশী পুঁজির দরকার করে না। এর ভেতর কতগুলো বিশেষ 'বার' বা খাবার-দোকানের কথাই বলা চলে—যাদের সুষ্ঠু পরিচালনায় সাফল্য নিশ্চিত।

বিলেতে ছোটখাট অথচ লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে পনের হাজার খাবারের 'বার' বা দোকান দেখতে পাওয়া যায়—সেখানে শুধু চা-কফি প্রভৃতি পানীয়ই নয়, বিচিত্র খাদ্য-খাবারও সরবরাহ হয়ে থাকে সঙ্গে সঙ্গে। এদের ব্যবস্থা সবই বিশেষ ধরণের এবং বিশেষ নামেই এরা পরিচিত। প্রত্যহ কত নর-নারী এসে এ সকল কেন্দ্রে ভীড় করে, শরীরকে চাঙ্গা করে বাড়া ফিরে যায়, ইয়ত্তা নেই।

বিলেতের এ খাদ্য সরবরাহ 'বার'গুলো পরিচালনার একটি বৈশিষ্ট্য—এ গুলিতে নারী কর্মচারীই বেশীরভাগ। এর একটা সুবিধা মালিকের পক্ষ থেকে—পুরুষ কর্মচারীর চেয়ে মেয়েদের মাস মাহিনা দিতে হয় অনেক কম। মূলধন বলতেও এই শ্রেণীর বিপণির জন্যে অস্বাভাবিক কিছু একটা দাবী নেই। এতে চাই চা-কফি তৈরীর জন্যে সরঞ্জাম, একটি রিফ্রিজারেটার, মাটির বিভিন্ন পাত্র ইত্যাদি।

আমাদের দেশেও বিভিন্ন ধরণের পানীয় ও খাবার বিক্রয়ের জন্য রেস্তোরাঁ, কেবিন, কাফেটেরিয়া এসব ক্রমেই অধিক সংখ্যায় গড়ে উঠছে। এখনও যে এই শ্রেণীর ব্যবসা বাণিজ্যের সম্ভাবনা এখানে প্রচুর, সে বলাই বাহুল্য। পুঁজি বা মূলধন এ সকলের জন্যে বিরাট কিছু নিশ্চয়ই চাই নে, বিশেষ ভাবে যেটি চাই সে হচ্ছে—উদ্যোগীপনা, অব্যাহত উদ্যম ও অধ্যবসায়। অল্পসময়ের ভেতর অল্প পয়সায় পরিবর্ত্তে অধিকসংখ্যক লোককে কিভাবে পরিতৃপ্ত করা যেতে পারে, ভাবতে হবে এই সমস্ত গভীর মনোযোগ সহকারে।

'মিল্কবার' বা দুগ্ধ বিক্রয় কেন্দ্রও গড়ে উঠেছে আমাদের সহরগুলিতে কিছু সংখ্যায়। এইটিও একটি অল্প মূলধনে ভাল পসারের ব্যবসা বলা চলে। দিবসান্তে এক কাপ 'চা' যেখানে চাই, সেখানে এক পো-আধ পো খাঁটি গরম দুধ পাওয়া গেলে কিনিয়ে লোকের অভাব নিশ্চয়ই হয় না। শুধু শারীরিক পুষ্টির প্রশ্নই নয়, রুচির জন্যেও আমাদের দেশের নর-নারীরা দুধের বড় ভক্ত। সুতরাং উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে দুধের দোকান খুলে বসলে লক্ষ্মী ঘরে আসবেই। এক্ষেত্রেও প্রয়োজন যেটি বড়-রকম, সে হচ্ছে ব্যবসায়ে শুচিতা ও পরিবেষণে স্বচ্ছতা সংরক্ষণ।

শীত-প্রধান রাজ্য বিলেতে 'মিল্ক বার' বা দুধের দোকান আরম্ভ হয়েছে খুব বেশী দিনের ব্যাপার নয়। এমন কি, ১৯৩৫ সাল অবধি 'মিল্ক বার' বলতে কিছু ছিল না লণ্ডনের রাজপথে। বৃটিশ মিল্ক মার্কেটিং বোর্ড এ ব্যাপারে যখন এগিয়ে এলেন, তখন থেকেই সে-দেশে স্থাপিত হয়ে চলে বহু দুগ্ধ বিপণি বা দুগ্ধ বিক্রয়-কেন্দ্র। আবার যুদ্ধ যখন আরম্ভ হলো, তখন দুধের সরবরাহ কমে যাওয়ায়, সেই সব দোকানগুলোতে অন্য সব খাবারের ব্যবস্থা হয়। চা, কফি প্রভৃতির বার বা দোকানের মতো আইসক্রীম', সোডা, সরবত—এ সকল বিক্রয়ের কাউণ্টারও দেখতে পাওয়া যায় লণ্ডনের রাস্তায় অসংখ্য।

আমাদের দেশেও এই জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনা উপেক্ষা করা চলে না। অল্প পুঁজিতে বা মূলধনে জীবনোপায়ের ব্যবস্থা এই সব নানা দোকান বা বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে চলতে পারে, এইটি পরিষ্কার। দেশের লোকদের ক্রয়-ক্ষমতা যত বাড়বে, ততই ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সরকারী সহযোগিতা ও সমর্থনের দাবী উঠে খুব স্বাভাবিক ভাবেই। অপর দিকে সরকার যদি সত্যি জাতীয় ভাবাপন্ন হ'ন এবং জাতির স্বার্থেই কাজ করে যান, তা হ'লে আশা করবারও থাকে অনেকটা।

মানসগঙ্গা

রথীন চট্টোপাধ্যায়

এ-পারে মায়ামাটির চর, ও-পারে ছায়া নাচে
তমাল-তালের পাতায় পাতায়। ডাহুক অবিশ্রাম
চলেছে তার দীর্ঘকরুণ কান্না গেয়ে। গ্রাম
ক্লান্তম্লান আঁচল মেলে স্তব্ধ হ'য়ে আছে।

এ-পারে সময়জীর্ণ বট, ফাটলধরা ঘাটে
নৌকো নেই, যাত্রী নেই। খেয়ার মাঝির মন
ছড়িয়ে আরো অন্য কাজে। জোয়ার অনেকক্ষণ
ফিরিয়ে নিলো ঢেউয়ের দল। পান্থপ্রহর হাঁটে।

ভাবনা ভাসাই নিরুদ্দেশের আকাশে মন মেলে,
যদিও দিন ধূসর হোলো, সন্ধ্যা ও-পার থেকে
ছায়া ছড়ায়। ব্যগ্রনীড় পাখিরা শেষ ডেকে
কখন গেছে চলেই, তবু সকল কাজ ফেলে!

একলা আছি বিবাগী এই নদীর পারে বসে

4

করা
দ্রব্য
বেশ ও
অব্যবহ
হওয়ার
কাজে

টুসুর গান

মানভূমে বাঙ্গালীর একটি বিশিষ্ট পর্ব 'টুসু'। এই উপলক্ষে গীত টুসুর গান একটি বিশেষ শ্রেণীর লোক সঙ্গীত। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি হইতে পৌষ বা মকর সংক্রান্তি পর্যন্ত এই পুরোমাস টুসু গান গাওয়া হয়।

বাঙলা দেশে 'তুষল তুষলী' বা 'তোষলা' ব্রতেরই রূপান্তর টুসু। তোষলা ব্রতের সঙ্গেও অন্যান্য ব্রতের ন্যায় এক প্রকার গান আছে; কিন্তু সে গানগুলি ব্রতকথায় আনুষঙ্গিক মন্ত্রগান মাত্র। যেমন,

তুষতুষলী কাঁধে ছাতি। বাপ-মা'র ধন বাচা বাটি।
স্বামীর ধন নিজপতি। বাপের ধন কান্নাকাটি।
(আর) পুত্রের ধন পরিপাটি।
তুষলী গো রাই। তুষলী গো মাই।
তোমার পূজায় আমি কি বর পাই?

আলিম্পন মণ্ডিত একটি মৃৎপাত্রে গোবরের গুলি সাজাইয়া তাহার উপর নবান্নের ধানের তুষ, সরিষা এবং শীতকালীন ফলমূল সাজাইয়া দেওয়া হয়। সারা মাস ধরিয়া কুমারী মেয়েরা দিনের বেলায় তাহার সম্মুখে পুষ্প অর্ঘ্য সাজাইয়া, সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ জ্বালাইয়া গান গাহিয়া তাহাকে সযত্নে ঘুম পাড়ায়। ইহাকে বলে 'টুসু চুলানো।' এই শ্রেণীর গান—

টুসু চুল চুল চুল গো, তাল তুলসীর মূল গো।
আগু যায় মা হাতী ঘোড়া, পিছু যায় মা ঝারি।
ঝারির চলনে মোরা চলিতে না পারি গো।

প্রকৃত পক্ষে, এই তুষু ব্রত নবান্নেরই উৎসব, ইহার মাধ্যমেই বালিকাদের মনে অকাল-বাৎসল্য ভাবের উন্মেষ হয়। সংসার ধর্মের প্রথম শিক্ষাও তাহারা এই ব্রতের মাধ্যমেই প্রথম গ্রহণ করে—

আলা গো তুষকুন্নি ঘরে বাইরে গাইগুলি
গেয়ের গোবরের সরষের ফুল;
আমরা পূজি গো মা-বাপের কুল॥

টুসু কুমিলক্ষ্মীরই পূজা। পৌষের নবান্ন সুরভিত গৃহ প্রাঙ্গণে কর্মচঞ্চলা গৃহলক্ষ্মীরা তুষু ছাড়া কাহার পূজা করিবে?

বাঙলা দেশের এই ব্রতই মানভূম ও ধলভূমে প্রসারিত হইয়াছে। মানভূমে গিয়া টুসু একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মানভূমের পূজায় সঙ্গে বঙ্গদেশের পূজার বিধিবিধানের কিছু পার্থক্য আছে। এ অঞ্চলে বয়স্থা বিবাহিতা মেয়েরা টুসুকে সন্তান কামনা করিয়া আরাধনা করে।

পৌষের প্রথমে একটি সরায় নবান্নের মাষকলাই, মুগ প্রভৃতি রাখিয়া চাপা দেওয়া হয়। লক্ষ্মী পূজার জলচৌকিতে তাহা স্থাপন করিয়া সারা মাস ধরিয়া, তাহার পূজা করা হয়। বিসর্জনের সমারোহ ঘটার আয়োজনের জন্য অনেক স্থলে আবার সংক্রান্তির আগের দিন একটি প্রতিমা স্থাপন করিয়াও টুসু পূজা হয়। স্বভাবতঃই এই প্রতিমা লক্ষ্মীপ্রতিমার অনুরূপ পরিকল্পিত হয়। প্রতিমা পা ফাঁক করিয়া কোমরে হাত দিয়া এক বিচিত্র ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া থাকে; প্রতিমার এই দাঁড়াইবার ভঙ্গী যেন দেবীত্ব অপেক্ষা সখীত্বেরই সূচনা করে।

পূর্ব বঙ্গের 'সহেলা গানে'র ন্যায় টুসু গানের মাধ্যমেও বালিকারা কুমিলক্ষ্মীর সঙ্গে সখীত্ব পাতায়, সখীকে কি দিয়া পরিতুষ্ট করিবে তাহার একটা বড় ফিরিস্তি দাখিল করে—

আজ আমাদের শানলা ফুল ভাজা
রসুন দিলে হয় মজা।
টুসু তোকে ভাব করেছি, বড় দায়ে ঠেকেছি।
ইলসা মাছের ফলসা দিয়ে মেথি দিয়ে ভেজেছি।

টুসু গানের সঙ্গে ভাদু গানের সাদৃশ্য লক্ষণীয়, একই ঢঙে একই সুরে উভয় শ্রেণীর ছড়া গাওয়া হয়। মানভূম ও তৎসংলগ্ন পশ্চিম-বঙ্গের বহু অংশে টুসু ও ভাদু পূজা একাত্মক হইয়া গিয়াছে। আবার টুসু পূজাও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ ধরিয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে মাটি দিয়া ছোট পুতুল গড়িয়া তাহার পূজা করা হয়, আবার অনেক অঞ্চলে যমপুকুর ব্রতের ন্যায় ছোট গর্ত খুঁড়িয়া তাহাতে জল ঢালিয়া পূজা করে, কোথাও আবার ভাদুর ন্যায় হলুদবর্ণের প্রতিমা সাজাইয়া ভোগ অর্পণ করিয়া তাহার পূজা হয়। এই সকল পূজারই মন্ত্র টুসুর গান, গানের বিষয়বস্তু অসংলগ্ন, বয়স্থাদের মুখে সংসারের যে সকল কথাবার্তা হয়, সেগুলিই যেন তালিকার ন্যায় সুর করিয়া বলা হয়, যেমন—

হলুদবনের তুষু তুমি হলুদ কেন মাখ না?
শাশুড়ী ননদের ঘরে হলুদ মাখা সাজে না।
ও তুষুর মা, ও তুষুর মা, তোদের কি কি তরকারী?
ঐ শালারি ক্ষেতের বেগুন, ঐ কানাচির গুগলি।

মানভূমী-বাংলার বিচিত্র টানে ছড়া আবৃত্তির মায়াময় সুরে মেয়েরা এ সকল গানে এক বিচিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করে। এ সকল গানের মধ্যে যেন একটা করুণা-বিগলিত সুদূর কামনার সুর জড়িত আছে, সামান্য তুচ্ছ কথাও কি ভাবে যেন অপূর্ব আবেগের সূচনা করে—

একলা ঘরের বউ ছিলি চঞ্চলা মন কে ক'রে দিলি?
পুরুলিয়ার সরু চাদর উড়ে গেলে ধরব না।
যার সাথে বিচ্ছেদের কথা, প্রাণ গেলে রা কাড়ব না।
এক পোয়া মুমুরি নিয়ে চাপব কলের গাড়ীতে।
মা জননী কাঁদবে যখন বুঝাবি ভাই সবাই মিলি।

দরিদ্র ঘরের সন্তান বালিকারা সখীর হইয়া বিশেষ কিছু তো চাহে না, তাহাদের বাসনা সামান্যই—

আমার টুসুর একটি ছেলে ফুল তোলে বই খেলে না।
কোন বিড়ালী দিল ধুলো পায়ের বরণ ফিরল না।

মাগো আমার ঝুপরা মাথা এক পোয়া তেল কই পাব ?

পাঁচ টাকার মাদল পাব কোন বাজারে নামাবো ৷

বাঙলা দেশের সাধারণ গ্রামবাসীদের মতই বৃহত্তর বাঙলার দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবনের দুঃখ-দৈন্যের অন্ত নাই। মেয়েরা তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার সকল আক্ষেপ টুসুর গানের মাধ্যমেই প্রকাশ করিয়াছে। বিশেষতঃ, টুসু অবলা নারীদেরই শরণ্যা, তাহাদের প্রাণের আবেদনও টুসুর গানের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

বালিকা বধূর মন বহুদিন পিত্রালয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল, বহুদিন পরে এই পর্ব উপলক্ষে তাহার আগমন হইয়াছে, কিন্তু অভিমানের বেদনা তাহার ঘচে নাই—

এত বড় পৌষ পরবে রাখলি মা শ্বশুর ঘরে,
পরের মা কি বেদন বুঝে, অন্তরে খেড়ে মারে,
এমন মন বলে
উড়ে যায়ে বইস বলো মায়ের কোলে ৷

বালিকারা আসন্ন শ্বশ্রূশাসিত পতিগৃহযাত্রার আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এই শঙ্কার সঙ্গে যে একেবারে আনন্দ নাহি তাহা নহে, তবে সে সঙ্গে আছে পিত্রালয়ের দুঃখ দুর্দশার স্মৃতি—

মনে করি পরকুল যাব, পরকুল যাওয়া হ'ল না।
এ বছর যেমন-তেমন আর বছর আর থাকব না ৷
ও রামের মা, ও রামের মা, দেখ না রামের দুর্দশা ;
বন্ন বিন্নু গাছের বাকড়, তেল বিনু মাথায় জটা ৷

অল্পবয়সী বালিকারা গানের মাধ্যমে বিবাদ বিসংবাদও করিয়া থাকে। টুসু পূজা তো প্রতি ঘরে ঘরেই হয়, এই সূত্রে প্রতিবেশিনীদের মধ্যে রসকলহ শুরু হয়—

আমার টুসু মুড়ি ভাজে, কাঁকন বাজে হাতে লো।
তোদের টুসু ন্যাকামাগী আঁচল পেতে জাগে লো ৷
আমার টুসু চিঁড়ে কোটে দালান কোঠার উপরে।
তোদের টুসু গরবাথাকী আঁচল পেতে লয় মেগে ৷

এই সকল তর্জার লড়াই-এর সঙ্গে অন্যান্য সখীরা সমবেত কণ্ঠে ধুয়া ধরে—বাঁধন বাঁধজোড়া তোকে কে দিল রে ঝালবড়া।

সঙ্গে 'দ্রা তিন দ্রা তিন' বাজে মাদল, সাধারণতঃ এ বাজনাও মেয়েরাই বাজায়।

টুসু গানের মাধ্যমে ছোট ছোট পালা গানেরও অভিনয় হয় ; এই সকল গানের নাটকীয়তা রীতিমত উপভোগ্য। একজন বালিকা কুটিলার অংশ গ্রহণ করিয়া আয়ান ঘোষকে বলে—

দাদা দেখবে চলো।
বউ পালালো, কি বুদ্ধি করি বলো ৷
বাঁশীর ঠারে রইতে নারে গো তাড়াতাড়ি ছুটিল।
না মানিল লো আমার মানা, গালিগালাজ করিল।
লাজ লজ্জা শরম ভরম হে সবই সে খোয়ালো ৷

অপর একটি বালিকা আয়ানের জবানীতে বলে—

পেছন ধর কুটিলে, ধর রে কুটিলে।
সোজাসুজি ছুটে চল কদমতলে ৷
দেখিব সে গোয়ালা ছোঁড়া পালাবে কেমন ছলে।
দিব তারে পাঁঠা বলি, দেখবি গো তুই নয়নে ৷

আয়ান ঘোষ ও কুটিলাকে আসিতে দেখিয়া কদমতলে বিব্রতা রাধা সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলে—

হের হের কালা।
কদমতলে আসিতেছে ঘোষ আর ঘোষের বালা ৷
কি করিব, কোথা যাব হে, বল বল এই বেলা।
অনেক দূরে আছে তারা, আসূলে পড়ে বিষম জ্বালা ৷

শ্রীকৃষ্ণও তখন ভয়ে আকুল হইয়া বলে—

ভয়ে অঙ্গ থরথর হে, করিব যে কিবা লীলা।
ছাড় ছাড় হস্ত ছাড়রে, ডুবে করি জলে খেলা ৷

কেবল রাধাকৃষ্ণের কাহিনীই নয়, রামায়ণী কথাও টুসু গানের অন্যতম বিষয়বস্তু। কথকতা, পাঁচালী ও যাত্রাগানের মাধ্যমে কৃষ্ণলীলা, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ এবং সীতাহরণ উপাখ্যান প্রত্যন্ত বঙ্গের নিভৃত পল্লীর গৃহস্থ বধূদেরও সুপরিচিত ছিল, তাহারাও নিজেদের রচিত ঘরোয়া গানেও কথায় কথায় ঐ সকল কাহিনীর পুনরাভিনয় করিত।

রাবণ দণ্ডকারণ্যে সীতাকে হরণ করিতে আসিয়া তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়া প্রশ্ন করিতেছে—

তুমি কার কুমারী ?
পরিচয় দাও গো তোমায় প্রশ্ন করি।

সীতা অতিথিকে বিনীত কণ্ঠে নিজের পরিচয় দিতেছেন—

আমি রাজনন্দিনী,
জনক নন্দনক সম হে বসুন্ধরা জননী।
লাঙ্গলে জনম আমার নাম সীতা ঠাকুরাণী ৷

মিথিলা পিতারি রাজ্য হে ধর্মধাতা ধরণী,
অযোধ্যায় ভূপতি শ্বশুর দশরথ নৃপমণি ;
স্বামী আমার রামচন্দ্র রঘুমণি।

টুসুর বিসর্জ্জন হয় মকর সংক্রান্তির দিন। এই দিনের গান যেন টুসুর বিজয়া গীতি। বালিকারা চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে টুসু ভাসাইয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসে—

আমার টুসু ধনে।
বিদায় দিয়ে ঘরে যাবো কেমনে।
মাসাবধি আজ টুসু ধনকে পুজেছি অতি যতনে।
তাহারে বিদায় দিলাম আজি এই মকর দিনে।
শাঁখা শাড়ী সিঁদুর দিলাম গো, আলতা দিলাম চরণে।
মনে দুঃখ হয় বড়, ফিরে যেতে ভবনে।

ভাদু গানের ন্যায় টুসু গানেরও আগমন, জাগরণ, পূজা, ভাসান প্রভৃতি পালা ভাগ আছে। টুসুর আগমনী গান তো রীতিমত আনন্দের আলোড়ন, এ সকল গান মানেই সুখাদ্যের ও বেশভূষার ফিরিস্তি—

টুসুপূজার বাজার।
বেনারসী-শাড়ীর তরে যাব গো হাওড়ার বাজার।
সায়া ব্লাউজ কিনব হাটে গো, কিনব চুড়ি দিলবাহার।
বাগবাজারের রসগোল্লা গো, শ্যামবাজারের দানাদার
ফলমূলাদি কিনব সকল, দেখে ভাল আড়তদার।

টুসু গানের অধিকাংশই টুসুর মেলাতেই শোনা যায়। কবির গানের আসরের মতো টুসু গানের মেলাতেও গায়কারা মুখে মুখে গান বাঁধিয়া গাহিয়া থাকে। তাহার ফলে গানগুলির ছন্দ, ভাব প্রভৃতি এলোমেলো হইলেও এগুলি স্বচ্ছ-সরল।

যে সকল টুসু গানের মধ্যে সাম্প্রতিক জাতীয় সমস্যাগুলির অনুপ্রবেশ হইয়াছে, তাহাতে বয়স্কা মেয়েরাও অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত দুঃখই নয়, রাষ্ট্রের অবিচার, সমাজের অব্যবস্থা, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, প্রবলের অত্যাচার প্রভৃতি বৃহত্তর ঘটনাও মাগনদের গম্ভীরা গানের ন্যায় টুসু গানেরও বিষয়বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। এই ভাবেই টুসু গানের স্বর মানভূমের গ্রামাঞ্চলের সীমা ছাড়াইয়া সারা বাঙলাদেশে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—

ওরে স্বাধীন প্রজা।
তোরা এবার স্বাধীন সুরে ঢাক বাজা।
নবীন স্বাধীন ভারতবাসী রে, নবীন যে তোদের ধ্বজা,
নবীন তোদের আইন কানুন লো, নবীন যে তোদের রাজা।

একালে সমাজ সংসার, জীবনযাত্রার যে সকল পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে, বহুদর্শী পল্লীর স্ত্রীলোকেরা তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। তাহারা লঘু পরিহাসের মধ্য দিয়া সে পরিবর্তনের উপর টীকাটিপ্পনী করিয়াছে—

স্ত্রী স্বাধীনতার উঠেছে গেজেটখানি।
স্বামী ছেড়ে করছে চাকরী গো, কত সব বিনোদিনী।
কাচ্চা বাচ্চার নেয় না সন্ধান, এমন অভিমানী।
সিনেমা আর থিয়েটারে গো, লাভমেরেজ হাতছানি।

সাম্প্রতিক সিংভূম ও মানভূমে বাঙ্গালীদের স্বার্থহানিকর রাজনীতিক আন্দোলনের রূপ প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে এই টুসু গানে। পূর্ব্বের ন্যায় চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে কুমারীরা আজও মকর সংক্রান্তির দিনে টুসু বিসর্জন দেয়, গৃহে গৃহে আজও সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ নিবিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু আজ যেন তাহাদের দুঃখ আরও বৃহত্তর আরও সার্বজনীন ; জননী বঙ্গভাষার সঙ্গে বিচ্ছেদ আশঙ্কায় তাহাদের মন ব্যথাতুর, ভারাক্রান্ত—

আমার বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা রে।
(ও ভাই) মারবি তোরা কে তারে।
এই ভাষাতেই কাজ চলেছে সাত পুরুষের আমলে।
এই ভাষাতেই মায়ের কোলে মুখ ফুটেছে মা বলে।
দেশের মানুষ ছাড়িস যদি ভাষার চির অধিকার।
দেশের শাসন অচল হবে, ঘটবে দেশে অনাচার।

জয়দেব রায়

রেকর্ড-পরিচয়

নতুন প্রকাশিত রেকর্ডে এবার অনেক ভালো ভালো গান বেরিয়েছে। এখানে আমরা সংক্ষেপে তার পরিচয় দিলাম :

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82727—শ্যামল মিত্রের নতুন গান—"তুমি আর আমি শুধু" এবং "এতো আলো আর এতো হাসি গান"। বিরহসঙ্গীত হলেও সত্যই চমৎকার। N 82729—সুবীর সেন যে সত্যই গাইছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল নতুন এই আধুনিক গান দু'খানিতে—"মনের আকাশ জুড়ে" এবং "যার আলো নিভে গেছে।" N 82730—কুমারী পূরবী সরকার আবার দু'খানি ভালো আধুনিক গান উপহার দিয়েছেন—"চৈতালী চম্পাবনে" এবং "সে তো জানো তুমি ডাকিলেই।" N 82731—শ্রীমতী গীতা দত্ত (রায়) নতুন আধুনিক গান—"ঝুম ঝুম ঝরণায়" এবং "তোমায় দেখেছি তন্দ্রাবিহীন রাতের তারায়।"

কলম্বিয়া

GE 24816—গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় নতুন চমৎকার দু'টি আধুনিক গান উপহার দিয়েছেন—"তুমি এলে তাই" এবং "আর জনমে হয় যেন গো।" GE 24817—কুমারী গায়ত্রী বসুর নতুন গান—"আয় পরী আয় পরী" এবং "এই ফাল্গুন হোক্ অবসান।" GE 24818—কুমারী ইলা চক্রবর্তীর কণ্ঠে দিলীপ সরকারের দেওয়া সুরে গান—"জল জল শুকতারা" এবং "উন্মন মন আমার।" GE 24819—সুরেন চক্রবর্তী নতুন পল্লীসঙ্গীত শোনালেন—"মনে লয় মোর" এবং "সুরধুনীর তীরে কে যায় গো।"

আমার কথা (২৫)

অনিল বাগচী

জ্ঞানে, গুণে, দানধর্মে, পরোপকারিতায়, কলানুরাগে, শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতির প্রতি পৃষ্ঠপোষণায় বাঙলা দেশের যে সকল জমিদার বংশের স্মৃতি আজও অমলিন—শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গোস্বামী পরিবার তাঁদেরই অন্যতম। অন্যান্য নানাবিধ গুণের সঙ্গে এঁদের সঙ্গীতানুরাগ ছিল অসাধারণ। এঁদের সভা আলোয় উজ্জ্বল করতেন বহু গুণী শিল্পী। এঁদের নাচঘর ঝঙ্কৃত হ'ত বহু কৃতী সুরসাধকের সুর-ঝঙ্কারে। শিল্পীদের মধ্যে লছমীনারায়ণ মিশ্র, মুন্নি মিশ্র প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখনীয়। নরানাং মাতুলঃ ক্রমঃ এই প্রবাদটি যেন সত্য হয়ে উঠল এঁদেরই এক ভাগনার মধ্যে। ছোট ছেলে, মামার বাড়ীতে স্নেহের মধ্যে যখন অতিবাহিত করে তখন সাধকদের সুরসাধনা মাতিয়ে তোলে তাকে। অজান্তে তার মনের মধ্যে গড়ে ওঠে সঙ্গীতের প্রতি একটা অভিনব আকর্ষণ। এমনি করেই সঙ্গীত পরিচালক অনিল বাগচীর সারা মন জুড়ে বসেছিল সঙ্গীতের অসামান্য প্রভাব।

পৈত্রিক নিবাস নবদ্বীপে। শ্রীগৌরাঙ্গের সময় থেকে। পিতৃদেব—পরলোকগত হরিপ্রসন্ন বাগচী। জন্ম—মেদিনীপুরে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে। কলকাতায় ভর্ত্তি হলেন হিন্দু স্কুলে। যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। উত্তীর্ণ হলেন আই-এস-সি পরীক্ষাতেও। সিটি কলেজ থেকে। চলে গেলেন কাশী। সেখানে অধ্যয়ন চলতে লাগল, চলতে লাগল সঙ্গীতশিক্ষাও। ভর্ত্তি হলেন ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসে। এদিকে ওস্তাদ মেহেদী হোসেন, গুণী মিশ্র, মহেশপ্রসাদ মিশ্রের নিলেন শিষ্যত্ব। বাঙলাদেশের ছেলে। উত্তর প্রদেশের সুরজ্ঞরা সহজে ধরা দিতে চান না। শিখে মেরে দেবে যে! আজ সারা ভারত জুড়ে প্রচেষ্টা চলছে বাঙালীর বিলুপ্তি। তার কারণ হিংসা তো আছেই, আর সে হিংসার মেরুদণ্ড হচ্ছে নিদারুণ ভয় ও ভাষাহীন ভীতি। সবাই জানে, বাঙালী কি অসম্ভব মেধাবী জাত, সেইজন্যেই তো আজ তাকে নাশ করার চেষ্টার সীমা নেই। অনিল বাগচী দমলেন না, নিতে তাঁকে হবেই। পদসেবা করে, তামাক সেজে দিয়ে জয় করলেন তিনি গুরুদের চিত্ত। এমনই সময়ে হঠাৎ তাঁকে চলে আসতে হল কলকাতায়। হল পিতৃবিয়োগ। মহাগুরু নিপাত। পাশ করলেন ব্যাঙ্কিং ও অ্যাকাউন্টেন্সী। কর্ম নিলেন লয়েডস্ ব্যাঙ্কে। সে জীবন অনিল বাগচীর সহ্য হবে কেন, জীবনব্যাপী সাধনা আজীবন স্বপ্নের মহিমা কখনও খর্ব হবার নয়। ছেড়ে দিলেন চাকরী। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ। সদ্যজাত শিশুর মত পৃথিবীর আলো সবে দেখছে ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ব্রডকাষ্টিং করপোরেশান আজ যার নাম অল ইণ্ডিয়া রেডিও। স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের আহ্বানে সেই প্রথমবারেই অনিল বাগচী ঢুকলেন রেডিওয়। তখন যাঁরা রেডিওর প্রাণস্বরূপ ছিলেন তাঁদের মধ্যে আজ সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র দে, রাইচাঁদ বড়াল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, রাজেন সেনগুপ্ত, বীরেন রায়, সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, ঊষারাণী, পুষ্প চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম সবিশেষ স্মরণীয়। যাবতীয় গানে সুর দিয়ে এঁরা সেদিন পরিবেশন করতেন সঙ্গীতের উপহার।

কিছুটা পিছিয়ে যাই। বোলপুরে যান অনিল বাগচী। তারপর সংস্পর্শে আসেন স্বর্গতঃ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিগুরুর ভাষায় যিনি ছিলেন 'সকল গানের ভাণ্ডারী মোর সকল সুরের কাণ্ডারী।' দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের তাঁরই একটি অনবদ্য গান অপূর্ব ভাবে গেয়ে। দিনেন্দ্রনাথ টেনে নিলেন তরুণ শিক্ষার্থীকে। সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীকে গুরু দিয়ে যেতে লাগলেন স্নেহ ভালবাসা আশীর্বাদ। শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীও সঙ্গীত সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন অনিল বাগচীকে।

কাজী নজরুলের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব স্থাপিত হল অনিল বাগচীর। দিনের পর দিন নিকটতম সান্নিধ্যে এসেছেন বাঙলার মানসলোকের রাজকুমার সুভাষচন্দ্র বসুর। সুভাষচন্দ্রের জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করে, নজরুলের ধূমকেতুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে বহুবার কারাবরণ ও নানাবিধ পুলিশী অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে অনিল বাগচীকে। 'সবুজ সঙ্ঘ' বলে ছিল একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। নেতাজী ছিলেন তার সভাপতি

অনিল বাগচী

প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত, স্বর্গীয় ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিভূতি সান্যাল, সাগর লাহিড়ী প্রভৃতি এরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অনিল বাবু ছিলেন এর প্রাণ। সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র রাসন্তী বিদ্যাবীথির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন অনিল বাবু যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সঙ্গীতাচার্য দিনেন্দ্রনাথ, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে অনিল বাবু রেকর্ড করলেন হিন্দুস্থানের মাধ্যমে একটি রবীন্দ্র-গীতি। 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে'। এবং আর একটি আধুনিক গান।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অনিল বাবু যোগ দিলেন সঙ্গীত পরিচালকের ক্ষমতায়। 'মাটির ঘর'এর নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য তাঁকে নিয়ে এলেন রঙমহলে। 'মাটির ঘর'এর পর 'রাজপথ', 'বিশ বছর আগে', 'মাইকেল মধুসূদন', নাটকেও সুর দিলেন অনিল বাগচী।

আহ্বান এলো নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত ও অপরাজিত অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরবার থেকে। যোগ দিলেন মিনার্ভায়। সুর দিলেন 'চিরন্তনী', 'দেবদাস', 'কাঁটাকমল', 'মাটির মায়া' প্রভৃতি নাটকে। অনেককাল পরে আবার 'মিনার্ভা'তে যোগ দিয়েছিলেন অনিল বাবু। নাট্যকার মন্মথ রায় ও নটপার্থ ছবি বিশ্বাসের আহ্বানে। তখন সুর দিলেন 'ঝিন্দের বন্দী' ও ও 'জীবনটাই নাটক' এ। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভাটপাড়া পণ্ডিত সমাজ 'সঙ্গীতবিদ্যানিধি' উপাধিতে ভূষিত করলেন অনিল বাগচীকে। নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলনী থেকে পদক পেলেন অনিল বাগচী। লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে সঙ্গীতানুষ্ঠানে গান গেয়ে শ্রোতৃবর্গকে পরিতৃপ্তি দান করেন অনিল বাবু। স্কটিশচার্চ কলেজের ফাইন আর্টস সোসাইটির সঙ্গীত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করার মূলে ছিলেন অনিল বাগচী। নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের বিচারকের পদও অনিল বাবুর দ্বারা অলঙ্কৃত। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে এলেন চিত্রজগতে। এবার ডাক দিলেন রাধা ফিল্মসের কর্ণধার ও এককালের গ্রন্থব্যবসায়ী শ্রীমাধব ঘোষাল। চল্লিশ বছর বয়েসে চিত্র প্রযোজকরূপে এ জগতে মাধব ঘোষালের আবির্ভাব। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত কত স্বনামপ্রসিদ্ধ কলাকুশলীকে এ জগতে ঢোকার প্রথম সুযোগ করে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। শৈলজানন্দের কাহিনী 'সন্ধি' মাধব ঘোষালের প্রথম ছবি। পরিচালনায় অপূর্ব মিত্র। সঙ্গীতের ভার পেলেন অনিল বাগচী। নায়ক-নায়িকা ছিলেন যথাক্রমে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুমিত্রা দেবী। 'সন্ধি' হিট ছবি হল। বি-এফ-জে-এর বিচারে অনিল বাগচী গৃহীত হলেন বছরের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালকরূপে। অনিল বাবুর দ্বিতীয় ছবি দেবকীকুমারের 'স্যার শঙ্করনাথ'। হিট। তারপর দেবকী বাবুরই আর একটি ছবি 'কবি'। সুপার হিট। কবির সঙ্গীত পরিচালনাও বছরের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালনারূপে গণ্য ছিল। রাণী রাসমণি! মহাকবি গিরিশচন্দ্র ছবির সঙ্গীত পরিচালনাও সৃষ্টি করেছে অভূতপূর্ব আলোড়ন। মায়াকানন, মহাদান, সুলতা, দুলহে, মানদণ্ড, শাস্তি, রাধারাণী, দুর্গেশনন্দিনী, ঝড়ের পর, ষোড়শী, সতী, সতী বেহুলা, অসমাপ্ত, কালো বৌ, ভাদুড়ী মশাই, বড় দিদি প্রভৃতি ছায়া চিত্রে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করেছেন অনিল বাবু। আগতপ্রায় ও নির্মীয়মান ছবিগুলির মধ্যে শ্রীশ্রীমা, খেলা ভাঙার খেলা, ভাঙন প্রভৃতিতে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব আছে অনিল বাবুর। আজ অবধি প্রায় পঞ্চাশ খানি রেকর্ড আছে অনিল বাবুর। গীতিকারদের মধ্যে ৺অজয় ভট্টাচার্য্য, সুবোধ পুরকায়স্থ, শৈলেন রায়, প্রণব রায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শ্যামল গুপ্ত, বটকৃষ্ণ বসু, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় আনন্দ পান অনিল বাগচী।

কথা ওঠে আজকের চিত্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে। হতাশার সঙ্গে উত্তর আসে নেগলেকটেড। চিত্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে যথাযোগ্য বিচার হয় নি। যে একবার বাঁশী বাজিয়েছে, যে শুধু এস্রাজ বাজাতে পারে তাকে সমগ্র ছবির সঙ্গীত পরিচালনার ভার দিলে সৎসৃষ্টি কি করে সেখানে সম্ভবপর? তিনি বলেন বাঙলাদেশে যাঁরা আগে সুযোগ পেতেন না, তাঁরা বম্বে চলে যান—সেখানে নাম করলেই অমনই ঝুরি ঝুরি টাকা দিয়ে তাঁদের ডেকে আনা হয়। এর অর্থ কি? জিজ্ঞাসা করি—বাঙলায় সুযোগ না পেয়ে বম্বে গিয়েই বা তাঁরা সুযোগ পান কি করে—শিল্পী উত্তর দেন—সেখানে প্রতিভার দরকার হয় না, আপনি চোখ বুজে থাকুন—ভাববেন হয় তো কোন বিলীতি ছবি দেখছেন, এমনই অনুকরণ সর্বস্ব বোম্বাইয়ের সঙ্গীত। তাছাড়া গভীরত্ব নেই তার মধ্যে এতটুকু। হাল্কা রস সাময়িক পরিতৃপ্তি দিতে পারে ঠিকই কিন্তু স্থায়ীত্ব তার কতটুকু? সব থেকে লজ্জার কথা কয়েকজন বিদেশী অভ্যাগত বোম্বাইয়ের সঙ্গীত দেখে তার অনুকরণ প্রবৃত্তি নিয়ে তো পরিষ্কার খোলাখুলি সমালোচনা করে গেছেন। ভারতের পক্ষে এ ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাকর। অনিল বাবুর লেখনীও গতিবান। নানা পত্র-পত্রিকায় দেখা যায় তাঁর রচনা। শেষে বললেন যে আজকে মিউজিক ডিরেক্টার বলে কেউ নেই—যাঁরা আছেন তাঁরা এখানে-ওখানে চুক্তির জন্যে ধন্না দেন, কাজ জোগাড় করেন, বাস্ তাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট। আমার প্রশ্ন, তবে এঁদের আপনি কি বলে অভিহিত করেন—মুচকি হেসে উত্তর দেন শিল্পী এরা—এরা হচ্ছে মিউজিক কন্ট্রাক্টার'।

এ মাসের প্রচ্ছদপট . . .

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের দেওয়াল গাত্রের ভাস্কর্যের একটি নমুনার আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। চিত্রটি পুলিনবিহারী চক্রবর্তী গৃহীত।

ষ্টার থিয়েটারে শ্রীকান্ত

ষ্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ প্রচুর অর্থব্যয়ে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহকে নতুন ভাবে গড়ে তুলেছেন। প্রথমেই হচ্ছে এঁদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার কথা। ভারতের মধ্যে ষ্টার থিয়েটারই সর্বপ্রথম এ-কাজে অগ্রণী হয়েছেন। শুধু এই নয় দর্শকদের বসবার আসন হয়েছে আরো অধিকতর আরামপ্রদ। মঞ্চ শৈলীর নতুনত্বের মধ্যে আছে ট্রলির সাহায্যে দৃশ্য পরিবর্তনের ব্যবস্থা। আর একটি বিষয় সবারই চোখে পড়বে। সেটি হচ্ছে ড্রপসিনে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের যে ব্যবস্থা ছিল তা তুলে দিয়ে বিরতির সময় সিনেমা হাউসের মত শ্লাইডের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বললে নয় সেটি হচ্ছে ষ্টার থিয়েটারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। একথা প্রায় সকলেই জানেন যে কলকাতার প্রাচীন নাট্যশালার মধ্যে ষ্টার থিয়েটার অন্যতম। ১৮৭৬ সালে এই রঙ্গালয়টি স্থাপিত হ'য়েছিল। সে আজ ৮০ বছর আগেকার কথা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রহ্লাদ দেখতে এসে এই রঙ্গালয়কে ধন্য করেছিলেন। তারই এক বছর আগে থিয়েটারটি হাতীবাগানে চলে আসে বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ী থেকে। ষ্টার থিয়েটারের বর্তমান স্বত্বাধিকারী সলিলকুমার মিত্র ম'শাই একে নবরূপে সাজিয়ে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রঙ্গালয়ে পরিণত করবার চেষ্টা ক'রছেন।

এবারে নাটকখানি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো। অপরাজেয় কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্ব অবলম্বনে খ্যাতনামা নাট্যকার, সাহিত্যিক ও সমালোচক দেবনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় নাটকখানি রচনা করে সমগ্র দর্শক সমাজ তথা বাঙ্গালীর প্রশংসা ভাজন হ'য়েছেন। নাট্যরূপ দানে তাঁর কৃতিত্ব বহুদিন পূর্ব্বেই স্বীকৃত হয়েছে। শ্রীকান্তের দুটি পর্ব্বকে একটি নাটকে রূপায়িত করবার বাসনাকে যদি মেনে নেওয়া যায় এবং তার যথার্থ রূপদানে দেবনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় যে কৃতকার্য্য হ'য়েছেন এ কথা অনস্বীকার্য্য। সমালোচকের দৃষ্টিতে অবিশ্যি বলা যেতে পারে যে শ্রীকান্ত কোথাও ঠিক compact ঠাস-বুনানির নাটক হয়ে উঠতে পারেনি। সংক্ষেপে একথা অনায়াসেই ব্যক্ত করা যেতে পারে যে এ উপন্যাসে এত প্রচুর ঘটনা এবং পাত্রপাত্রীদের সংখ্যা এত বেশী যে শ্রীকান্তের দু-দুটি পাঠকে সাড়ে তিন ঘণ্টার একটি নাটকের মধ্যে সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তবু এরই মধ্যে নাট্যকার দেবনারায়ণ বাবু যতখানি সার্থক করে তোলা সম্ভব তা অবশ্যই করেছেন একথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হবে।

তবে এ সম্পর্কে আরো দু একটি কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করি। নাটকখানিতে বহু বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ করে **entertainment**এর দিকে ঝোঁক রাখতে গিয়ে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর অন্তর্নিহিত প্রেমটা স্তরে স্তরে জমে উঠতে উঠতে পরিণতিতে ঠিক পৌঁছয়নি বলে মনে হয়। তবে একথা অবশ্যই বলতে হবে যে ছোট ছোট নানা চরিত্রের আসা যাওয়ায় এ নাটকের দৃশ্যগুলি পৃথক ভাবে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এ সকল দৃশ্যের আকর্ষণ সৃষ্টির কাজে ঘূর্ণায়মান এবং যান্ত্রিক কলাকৌশল, আলোকসম্পাত ও দৃশ্যসজ্জার নিপুণতা যেমন প্রচুর সহায়তা করেছে, তেমনি সহায়তা করেছে

অভিনেতা অভিনেত্রীদের টিমওয়ার্ক। ছোট বড় চরিত্র রূপায়ণে প্রায় সকলেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অভয়ার চরিত্রে সার্থক রূপদান করেছেন। চরিত্রানুগ সংবেদনশীল সংলাপ ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে অভয়ার চরিত্রটিকে ইনি করে তুলেছেন প্রাণবন্ত। শিপ্রা মিত্রকে রাজলক্ষ্মীর ভূমিকায় মানিয়েছে ভালই। পিয়ারী বাঈজী ও শ্রীকান্তর প্রিয়া— এই দুটি সত্তা তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত। কোন কোন স্থানে শিপ্রা দেবীর অভিনয়ে অনুভূতির অভাব ঘটলেও রাজলক্ষ্মীর চরিত্র সুষ্ঠুভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন দর্শকদের কাছে। শ্রীকান্তের (বড়) ভূমিকায় নির্ম্মলকুমারকে এঁদের কাছে নিষ্প্রভ বলে মনে হ'লো। তার কারণ খুব সম্ভবত রঙ্গমঞ্চে তাঁর অভিনয় এই প্রথম। ভবিষ্যৎএ তাঁর অভিনয় আরও উন্নত হ'বে বলে আমাদের বিশ্বাস আছে। অন্নদা দিদির ভূমিকায় অপর্ণা দেবী, শাহজীর ভূমিকায় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, নতুনদার ভূমিকায় অনুপকুমার, ইন্দ্রনাথ—শ্রীমান্ সুখেন অভিনয় ভালই করেছেন। অভয়ার স্বামীর ক্ষুদ্র ভূমিকায় একটি মাত্র দৃশ্যে জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় দর্শকদের আনন্দ দানে সক্ষম হয়েছে একথা অনায়াসেই বলা চলে। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নন্দ মিস্ত্রী) ও শ্যাম লাহার (সাধুজী) কৌতুকাভিনয় উপভোগ্য। টগরের চরিত্রে বেলারাণী যথাযথ রূপদান করেছেন। আর এ প্রসঙ্গে বাঈজীবেশী শ্রীমতী শিপ্রার গান দুখানি যে দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দান করেছে তা বলাই বাহুল্য। সর্ব্বশেষে আমরা আর একবার ধন্যবাদ জানাই ষ্টারের কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁদের এ সাধু প্রচেষ্টার জন্যে।

শেষ পরিচয়

অভিনবত্বে মণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে শেষ পরিচয়। খ্যাতিমান কবি বিমল ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় গৃহীত হয়েছে এই ছায়াছবি। এই চিত্রে বাঙালী দর্শকের মনের খোরাকের অনেক সন্ধান পাওয়া যাবে। দুটি মেয়েকে কেন্দ্র করে গল্প বলেছেন বিমল ঘোষ। গল্পের শেষ অংশ অবধি সাধারণ দর্শকের অনেকেই ধরতে পারে না যে মীনাক্ষী ও মীরা আসলে দুজন তারা এক নয়। কৃতিত্ব এই যে এই মীরা-মীনাক্ষী অংশটি এমন সুষ্ঠুভাবে

উপস্থাপিত করা হয়েছে যে সারা ছবি জুড়ে তারা থাকা সত্ত্বেও মূল বক্তব্য কোথাও ঘা খায়নি। ছবির গতি ঝুলে যায় নি এতটুকু। একবার মীনাক্ষী পরের বারই মীরা ফের মীনাক্ষী এই অধ্যায়গুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে পাওয়া যাবে প্রেমের উপাসনা, প্রতিহিংসার দহনজ্বালা, সন্তানহারার বুকফাটা বেদনা, দেখা যাবে অর্থলালসার বশীভূত হয়ে মানুষ কতখানি নীচে নামতে পারে—তারই প্রতিচ্ছবি। তবে একটি জায়গায় চোখে লাগে, বম্বে থেকে মীরা পালাচ্ছে উৎপলের জ্বালায়, সে ট্রেণে উঠল, উৎপলও উঠল—তারপর সে কি করে ট্রেণ থেকে পালাল—উৎপল যখন উঠে পড়েছে তখন আর কি তার পক্ষে কোন উপায় থাকে পালাবার? আর একটি প্রশ্ন জাগে যে উৎপল বর্ণিত হচ্ছে একজন অত্যন্ত কুৎসিত চরিত্রের অধিকারীরূপে, ছবির শেষাংশে সে রাতারাতি ও-রকম বদলে গেলে কি করে? স্ত্রীর একটি যমজ বোন শুনেই তার ভোল বদলে গেল। এ কি করে সম্ভব হয়? চিত্রগ্রহণের কাজ সুন্দর হয়েছে। দেওজীভাইএর মত চিত্রকরকে নতুন করে বলবার কিছুই নেই। অভিনয়াংশে যথেষ্ট পরিমাণে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় সম্পূর্ণ দুটি চরিত্র অভিনয় করেছেন অথচ কোনজায়গায়ই একের প্রভাব অন্যের উপর পড়ে নি। বিকাশ রায় ও বসন্ত চৌধুরীর অভিনয়ও প্রশংসনীয়। ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, জীবেন বসু, প্রেমাংশু বসু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অতিথি-শিল্পী বিপিন গুপ্ত, ছায়া দেবী, তপতী ঘোষ, নমিতা সিংহ, অপর্ণা দেবী, নিভাননী দেবী প্রভৃতিও সুঅভিনয় করেছেন। এঁরা ছাড়াও শান্তা দেবী, জহর রায়, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, স্বরূপ মুখোপাধ্যায়, এবং তারাকুমার ভাদুড়ীকেও দেখা যাবে এই ছবিতে। মিত্রা বিশ্বাসের এখনও সময় লাগবে জাতে উঠতে। সঙ্গীত পরিচালনার, ক্ষেত্রে আশানুরূপ কৃতিত্বই দেখিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বড়দিদি

শরৎচন্দ্রের এই গল্পের চিত্ররূপ এই প্রথম নয়। অনেকদিন আগে বাঙালীর গৌরব নিউ থিয়েটার্স উপহার দিয়েছিলেন বড়দিদি এবং তাঁদের সেই উপহার লাভ করেছিল অভূতপূর্ব অভিনন্দন। সেই গল্পই……অন্য নির্মাতা-গোষ্ঠীর দ্বারা নতুন রূপ পেয়ে আজ দেখা দিয়েছে। তবে অস্বীকার করবার উপায় নেই যে নিউ থিয়েটার্সের বড়দিদির নাগাল ধরতে পারেনি এম-কে-জির বড়দিদি। এ কাহিনীর বিষয়বস্তু সর্বজনবিদিত, সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। বড়দিদির প্রধান উপজীব্য প্রাণের ঘাত-প্রতিঘাত। আবেগোচ্ছল অনুভূতি, হৃদয়ের সূক্ষ্ম কোণগুলিরও সজীবতা ও নীরবে অন্তর্দ্বন্দ্বই এর প্রধান চরিত্র দুটির বৈশিষ্ট্য। অজয় কর পরিচালনার দ্বারা এ জিনিষগুলি আনতে পারেন নি ছায়াছবির মধ্যে। সুরেন্দ্রনাথ তার বাড়ীতেই মারা যায়। এখানে অজয় বাবু তাকে মেরেছেন নৌকোতেই। ছবির শুরুতেই সময় সম্বন্ধে অবহিত করা হয়েছে দর্শকসাধারণকে, করে নিজেরাই সে বিষয়ে রীতিমত অসতর্ক হয়ে পড়েছেন। তাই আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার এক কাহিনীর নায়কের হাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিডব্যাগ। চাকরী চানের ঘর বলছে না, বলছে বাথরুম। ভদ্রমহিলা যে ঘোড়ার গাড়ীতে আসছেন সে গাড়ীর জানলাগুলো খোলা। এ ছাড়া আরো ত্রুটি চোখে পড়ে। সুরেন্দ্রনাথ ব্রজরাজের বাড়ীতে এল শুধুমাত্র ব্যাগটি হাতে নিয়ে। কয়েকদিন যেতে না যেতেই দেখতে পেলুম তার ঘরখানি ছেয়ে গেছে অসংখ্য গ্রন্থে, শিবচন্দ্রকে সেখানে উপস্থিত করে আরও ভাল ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হল যে এ সব বই একান্তভাবে সুরেন্দ্রেরই। অত বই সে কোথা থেকে পেল? ক্যামেরায় যে পরিমাণ কৃতিত্ব কর মহাশয় দেখিয়েছেন সে তুলনায় পরিচালনার মান তিনি বজায় রাখতে পারেন নি। অভিনয়াংশে সন্ধ্যারাণীর অভিনয় নিখুঁত কিন্তু উত্তমকুমারের অভিনয় মনে বিন্দুমাত্র দাগ কাটে না। সুরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত এবং জ্ঞানীও, সে আত্মভোলা ও ভাবুক প্রকৃতির কিন্তু তাই বলে সে রামট্যাড়োস ঘোষ ছিল না, অন্ততঃ ছবিতে তো আমরা যে জিনিষ দেখছি, তার থেকেও চোখে লাগে যে ছবিতে নায়কের নিজস্বতা বিন্দুমাত্র দেখতে পাওয়া যায় না, সুরেন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্য তার কর্মকুশলতা তো এখানে অনুপস্থিত। একমাত্র শেষ অধ্যায়ে বড়দিদিকে ফিরিয়ে আনবার সময়ে যেন তার অস্তিত্বের কিছুটা স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এ ছাড়া সুরেন্দ্রনাথ তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত, মায়ের গোপাল, বড়দিদির স্নেহাস্পদ ও সপরিষদ নায়েব বেষ্টিত। তার নিজস্ব সত্তার ও ভাবধারার প্রকাশ কই? কেন তার প্রভাব পড়ছে না ছবিতে? ধীরাজ ভট্টাচার্যের অভিনয় অভিনন্দন যোগ্য। ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, তুলসী লাহিড়ী, অনুপকুমার, ছায়া দেবী, মঞ্জু দে, মেনকা দেবী, দীপ্তি রায় (এঁর তো কোন সুযোগই নেই বললে চলে) প্রভৃতির অভিনয় ভালো লাগবে। এ ছাড়া এতে অভিনয় করেছেন জীবেন বসু, প্রশান্তকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন পাঠক, শম্ভু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান শ্যামল, তপতী ঘোষ, অনুশীলা দেবী, মণিকা ঘোষ, সন্ধ্যা দেবী, অজন্তা কর, শান্তা দেবী প্রভৃতি। রূপা গাঙ্গুলীর ভবিষ্যতের ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধে আশা রাখা যায়।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

বিদগ্ধ সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'মেঘমল্লার' কাহিনীটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন আজ প্রোডাকসান্স। পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অভিনয় করছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, দীপক মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, মালা সিন্হা, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও আশীষকুমার প্রভৃতি। সঙ্গীতাংশ ভরিয়ে তোলা হচ্ছে বড়ে গোলাম আলী, এ, কানন, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরাবাঈ বরদেকার, সরস্বতী রানে, মীরা চট্টোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিগণের সমন্বয়ে। * * বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা 'খেলা ভাঙার খেলা' পরিচালনা করছেন রতন চট্টোপাধ্যায়, ক্যামেরার হাতল ঘোরাচ্ছেন সুধীর বসু, সুরের আবহাওয়া সৃষ্টি করছেন অনিল বাগচী, রূপ দিচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, বসন্ত চৌধুরী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহন ঘোষাল, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর

রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ বিন্তু, পদ্মা দেবী, সুমিত্রা দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, শুক্লা সেন, সুমালা চট্টোপাধ্যায়, নিভাননী দেবী প্রভৃতি! * * চিত্ত বসুর পরিচালনায় তোলা হচ্ছে বন্ধু। নচিকেতা ঘোষ সঙ্গীতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। অভিনয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন—ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, উত্তমকুমার, অসিতবরণ, মলিনা দেবী, মালা সিন্হা, প্রভৃতি, * * মেহের কালীবাড়ীর সর্বানন্দ ঠাকুরের জীবনী অবলম্বনে বীরেশ্বর বসুর পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে 'বাকসিদ্ধ' ছবিটি। এতে অংশ গ্রহণ করছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, অসিতবরণ, অরুণাংশু (নায়ক), মিহির ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, জয়নারায়ণ, তুলসী লাহিড়ী ও চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ধীরাজ দাস, বাবুয়া, পদ্মা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মেনকা দেবী, স্বাগতা চক্রবর্তী, রাজলক্ষ্মী দেবী এবং সৌন্দর্যময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী দেবযানী ও কয়েকটি বাঘ, ভাল্লুক ও কতিপয় জন্তু জানোয়ার। পূর্বাচল পরিচালিত 'গাঁয়ের বাড়ী'র কাহিনী রচনা করেছেন প্রীতি রায়। এতে রূপারোপের দায়িত্ব নিয়েছেন—ধীরাজ ভট্টাচার্য, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, প্রশান্তকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, মলিনা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, শ্যামলী চক্রবর্তী, সুপ্রিয়া সরকার প্রমুখ শিল্পীরা। * * 'অঙ্গীকার' ছবিখানি মুক্তির দিন গুণছে, প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এই আখ্যায়িকায় রূপ দিয়েছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য, সমর রায়, সন্তোষ সিংহ, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, বেচু সিংহ, ধীরাজ দাস, শ্রীমান্ সুখেন, শ্রীমান্ মুকুল, শোভা সেন, তপতী ঘোষ, রেণুকা রায়, প্রীতিধারা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন প্রভাত চক্রবর্তী।

শুক্রবারের বেতারনাট্য

১১ই মাঘ—কঙ্কাল। কাহিনী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, নাট্যরূপ ও পরিচালনা বাণীকুমার। রূপায়ণে—পরিমল সেন, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, গদাধর সেন, মুকুন্দ পোদ্দার, গোপাল দাস, উষা চট্টোপাধ্যায়, ভারতী দত্ত, অরুণপ্রভা চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণা সরকার। * * ১৮ই মাঘ—ত্রিযামা। কাহিনী—সুবোধ ঘোষ, নাট্যরূপ—মুরারিমোহন সেনগুপ্ত, পরিচালনা—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। রূপায়ণে—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, আদিত্য ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ চক্রবর্তী, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলি দেবী, নীলিমা দাস, রমা অধিকারী, রাজলক্ষ্মী। * * ২৫এ মাঘ—সন্ধি। কাহিনী—শৈলজানন্দ, নাট্যরূপ ও পরিচালনা—শ্রীধর ভট্টাচার্য। রূপায়ণে—বীরেশ্বর সেন, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, হরিধন মুখোপাধ্যায়, পশুপতি কুণ্ডু, মুরারি মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দে, নির্মল কর, সাধনা রায়চৌধুরী, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, নমিতা দেবী, নীরা মল্লিক।

গত ২১এ পৌষ থেকে ৫ই মাঘ অবধি বেতার সপ্তাহ পালিত হয়েছে। এই এক সপ্তাহ প্রতিদিন একটি করে নাটকের অভিনয় হয়! প্রথম দিন ২১এ পৌষ বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চ থেকে কর্তৃপক্ষ আরোগ্যনিকেতন নাটকটি বেতারায়িত করেন। * * ৩০এ পৌষ—মুচিরাম গুড়। কাহিনী—বঙ্কিমচন্দ্র, নাট্যরূপ ও পরিচালনা—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। রূপায়ণে—প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শীতলদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপকুমার, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, মনোজ চট্টোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, অমূল্য সান্যাল, কেষ্ট দাস, মণি ঘোষ, সত্যেন সেন, ম্যালকম, আরতি দাস, সত্যভামা দাস। * * ১লা মাঘ—মেঘনাদবধ। কাহিনী—মহাকবি মধুসূদন, নাট্যরূপ ও ও পরিচালনা—শ্রীধর ভট্টাচার্য। রূপায়ণে—কমল মিত্র, বীরেশ্বর সেন, জয়ন্ত চৌধুরী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, মোহনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মুরারি চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ চক্রবর্তী, অজিত কুমার রায়, অনুভা গুপ্তা, লিলি গুহ, মীনাক্ষী দত্ত, প্রতিমা দাশগুপ্তা, শান্তি সেন। * * ২রা মাঘ—আলিবাবা। রচনা—ক্ষীরোদপ্রসাদ, পরিচালনা—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, রূপায়ণে—শ্যামল ঘোষ, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, শুভেন মুখোপাধ্যায়, শিশির মিত্র, জহর রায়, শ্রীধর ভট্টাচার্য, ললিত চৌধুরী, জীবন মুখোপাধ্যায়, মিণ্টু চক্রবর্তী, রেণুকা রায়, নীলিমা দাস, ঝর্ণা দেবী, সঙ্গীতে—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, কল্যাণী মজুমদার, (সঙ্গীত পরিচালনায়—রাজেন সরকার)। * * ৩রা মাঘ—ষোড়শী। রচনা—শরৎচন্দ্র, পরিচালনা—শ্রীধর ভট্টাচার্য। রূপায়ণে—রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, শ্রীধর ভট্টাচার্য, অনিল চট্টোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর চৌধুরী, সত্যেন মুখোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, কমল মজুমদার, মণি চক্রবর্তী, শুভেন্দু সেনগুপ্ত, সুধীর সরকার, শিপ্রা মিত্র, বনানী পাল। * * ৪ঠা মাঘ—রুদ্রের অভিশাপ—পুরস্কারপ্রাপ্ত মারাঠী গল্প থেকে

মালা সিন্হা　　ছবি—মদন বসু

অনুবাদ—মন্মথ চৌধুরী (ইংরাজী থেকে), পরিচালনা—বাণীকুমার। রূপায়ণে—বীরেন চট্টোপাধ্যায়, ভানু চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, ধারা রায়। * * ৫ই মাঘ—শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে বহুরূপী সম্প্রদায় দ্বারা কবিগুরুর রক্তকরবীর বেতারাভিনয়।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

স্বনামধন্যা শিল্পী শ্রীমতী শোভা সেন

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'বাবলা' চিত্রখানি একদিন প্রশংসা অর্জন করেছিল। শুধু বিদেশেই নয় আমাদের এ-দেশেও। তাই এবারে সেই চিত্রের অন্যতমা নায়িকা শ্রীমতী শোভা সেনের মতামত জানবো বলেই বেরিয়ে পড়লুম। পূর্ব্বাহ্নেই শ্রীমতী সেনের বাড়ীর ঠিকানা জেনে নিয়েছিলুম সহকর্ম্মী সুনীল ঘোষের কাছ থেকে। শ্রীঘোষ শ্রী ও শ্রীমতী সেনের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত।

অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে ও বধূ ইনি। শ্রীমতী সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। শিশুকাল থেকেই শিল্পের দিকে একটু বিশেষ টান এঁর ছিল বরাবরই, তাই পরবর্ত্তী জীবনে এঁকে দেখতে পেলুম আমরা বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে।

যাক, শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে হাজির হ'লুম টালীগঞ্জের আজাদগড় কলোনীতে। শ্রীমতী সেনের গৃহে। আমার উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করতেই অনুযোগ এ'ল, চিরাচরিত ভাবে না লিখে আপনারা একটু নতুনত্ব করুন। কেন না অন্যান্য সিনেমা সংক্রান্ত কাগজ থেকে আপনাদের 'মাসিক বসুমতী' ভিন্ন ধরণের এবং এ পত্রিকাটির উপর আমাদের শ্রদ্ধা রয়েছে যথেষ্ট। আমি সবিনয়ে তাঁর প্রত্যুত্তর

শ্রীমতী শোভা সেন

দিলুম এবং শিল্পীদের মতামত লেখার ব্যাপারে আমাদের ধরণ যে সম্পূর্ণ পৃথক, তা জানাতেও দ্বিধা করলুম না।

এরপরেই সুরু হলো আমাদের আলোচনা। আমার প্রশ্ন এবং শ্রীমতী সেনের উত্তর। শ্রীমতী সেন ধীরে ধীরে বলে চললেন, ১১৪৭ সালে "ছিন্নমূল" ছবিতে 'বাতাসী'র চরিত্রে আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ। তারপর বহু ছবিতে এবং বিভিন্ন চরিত্রে রূপদানও করেছি প্রচুর। কোন ছবিতে এবং কোন ভূমিকায় অভিনয় করে সব চাইতে তৃপ্তি পেয়েছি তা আজ বলা সহজ নয়; তবে এটুকু অবশ্যই বলবো যে 'বাবলা' ছবিতে 'মায়ের' ভূমিকায় অভিনয় করে আনন্দ পেয়েছি প্রচুর আমি এবং একথাও স্বীকার করবো যে তৃপ্তিও পেয়েছি সেই পরিমাণে।

আমার অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী সেন বললেন, চলচ্চিত্র-জগতে যোগদানের আমার বিশেষ কোন কারণই ছিল না। আমি গণনাট্য-সঙ্ঘে অভিনয় করতুম এবং এখনও করি। এ সঙ্ঘেরই অন্যতম সহকর্ম্মী শ্রীনিমাই ঘোষ 'ছিন্নমূল' ছবি করেন। তিনিই আগ্রহ করে তাঁর ছবিতে আমাকে কাজ করতে বলেন এবং আমি সানন্দে তাঁর প্রস্তাবে রাজী হই। এই হ'লো চলচ্চিত্রে যোগদানে আমার গোড়ার কথা। ছবিতে যোগদানের পর কোন ক্ষেত্রেই আমার কোন পরিবর্ত্তন আসেনি—সে সামাজিক জীবনেই হোক আর পারিবারিক জীবনেই হোক, একথা অবশ্যই বলবো।

আমার দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী যদি জানতে চান তবে বলবো, শ্রীমতী সেন বললেন, অন্যান্য গৃহস্থ পরিবারের বধূর মত আমিও সংসারের কাজকর্ম্ম দেখি। তারপর যেদিন স্যুটিং থাকে না, নাটক একাডেমিতে ক্লাস করতে চলে যাই। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে ছেলের লেখাপড়া দেখি। যেদিন লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের শো থাকে সেদিন সেখান হয়ে বাড়ী ফিরি এবং যথারীতি সংসারের কাজকর্ম্ম দেখি। একটা কথা এখানে না বললে নয় যে, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ-এর আমি একজন সক্রিয় সদস্য।

এর পরেই শ্রীমতী সেন বললেন যে, 'কালী ফিলমস্'এ একখানা ছবির মহরৎ আছে। আমাকে অনেক অনুরোধ করে গেছে। একটিবার যেতে সেখানে হবেই। আপনাকে ঘণ্টাখানেক একটু বস্‌তে হ'বে, আমি এরই ভেতর চলে আসবো। বলেই তিনি ছুটলেন। শ্রী সেন আমাকে খবরের কাগজ এনে দিলেন পড়তে। আমি বললুম, একবার রিজেণ্ট গ্রোভ-এ হরিদাস ভট্টাচার্য্য (পরিচালক) ও শিল্পী বসন্ত চৌধুরীর বাড়ীর দিকে চলি। গেলুমও কিন্তু ভাগ্যদোষে তাঁদের কারুরই দেখা পেলুম না। কিছুক্ষণ পরে ফিরে দেখি শ্রীমতী সেনও ফিরে এসেছেন। অগ্রগামী পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম শ্রী—আসার দরুণ আলাপ আলোচনায় বাধা পড়লো কিছুক্ষণ। তারপরেই আবার সুরু হলো আলাপ আলোচনা।

শ্রীমতী সেন বলতে থাকেন, বিশেষ কোন 'হবি'র কথা যদি বলেন তবে বলবো বই পড়াই আমার একটা খেয়াল বা 'হবি'। কিছু শিখবো ও কিছু জানবো চিরদিনই এই হলো আমার লক্ষ্য। নাটক ও চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় পুঁথি পুস্তকই আমার ভাল লাগে। গল্প কিম্বা কবিতা লেখবার অভ্যাস আমার নাই। তবে সিনেমা সম্পর্কিত প্রবন্ধ আমি অনেক বার লিখেছি।

পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব মতামত কি, জানতে চাইলুম আমি শ্রীমতী শোভা সেনের কাছে। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে সাদাসিধে উত্তর দিলেন, ভদ্র রুচিসম্পন্ন পোষাক পরিচ্ছদই আমি পছন্দ করি।

অভিনেতা অভিনেত্রী হতে হলে কি কি গুণের একান্ত আবশ্যক, প্রশ্ন করলুম আমি।

শ্রীমতী সেন দ্বিধাহীন কণ্ঠে উত্তর দিলেন সুচেহারা, সুকণ্ঠ, অভিনয়-দক্ষতা এবং তার সাথে চাই নিয়মানুবর্ত্তিতা। আর এর সঙ্গে অভিনয়-শিক্ষার একাগ্রতা না হলে চলবে না।

ভাল ছবি তৈরী করতে হলে কি কি উপাদান বিশেষ ভাবে চাই যদি জানতে চান, তবে বলবো সর্ব্বপ্রথমে—চাই ভাল গল্প বা কাহিনী। ছবি তৈরী করতে হলে সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষার উপাদান, তাতে কিছু না কিছু অবশ্যই থাকবে। আমাদের দেশের সুনাম যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তার প্রতি দৃষ্টি না রাখলে চলবে না। ছবি ভাল করবার জন্য 'টিম ওয়ার্ক' যে চাই-ই, সে আশা করি না বললেও চলে। আর একটি জিনিষ অবিশ্যি বলা হ'লো না—ছবির মূল্য যদি বাড়াতে হয়, তবে একে বাস্তবধর্ম্মী ও Suggestive হতে হবে। নতুন চিন্তাধারা ও মৌলিক কাহিনী নিয়ে ছবি যদি গড়ে উঠলো, তবে সেটি ভাল না হ'য়ে পারে না। বাংলা ছবির ক্ষেত্রেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য, এ বলাই বাহুল্য।

শিল্পীদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা ও শরীরের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক কি?

—নিশ্চয়ই। আমাদের দেশের অর্থাৎ বাংলার মেয়েদের এটি অবশ্য প্রয়োজন—যেটার অভাব আছে। শিল্পীদের পক্ষে স্বাস্থ্যই হচ্ছে প্রকৃত সম্পদ, এটা ভুললে চলবে না।

অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়েদের চলচ্চিত্রে যোগদান সম্পর্কে মতামত জানাতে হলে আমি বলবো—শ্রীমতী সেন বলে চলেন, এ নিয়ে আজ আর প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়েরা এ লাইনে নিশ্চয়ই আসবেন এবং এঁরা যত বেশী সংখ্যায় আসবেন ততই এ শিল্পের পক্ষে ভাল। শুধু একটি জিনিষ লক্ষ্য রাখা দরকার—এ লাইনে আসতে যেয়ে সম্মান, আভিজাত্য, যেন কোন অবস্থাতেই ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ না হয়। প্রকৃত শিক্ষিতের মত আচরণই সকলের কাম্য হওয়া চাই। বিবাহিত শিল্পীদের স্বামী অথবা স্ত্রী আপত্তি করেন কি না, এ নিয়েও প্রশ্ন শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমার তো মনে হয়, গার্হস্থ্য জীবন ও শিল্পীজীবনের ভেতর একটা রফা করে নেওয়াই উচিত। আসল হচ্ছে, নিজেদের মধ্যে একটা Understanding থাকা। উপযুক্ত শিক্ষা, দীক্ষা ও সংযম থাকলে সবই ঠিক রইল।

—সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায়?

শ্রীমতী সেন জোর গলায় বলেন, সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের প্রভাব যে অনেকখানি, অস্বীকার করা যায় না। চলচ্চিত্র সমাজকে বহু দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এর মাধ্যমে শেখবার ও শেখাবার আছে অনেক কিছু। সমাজের দিকে তাকিয়ে আমাদের দেশে ছবি আজ কাল তৈরী হচ্ছে বটে তবে অগ্রগতি যতটা হওয়া উচিত ছিল সে ভাবে এখনও হয়নি। ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী ছবি অনেক বেশী হওয়া উচিত। সমাজ-জীবনের সমস্যাগুলো লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরতে হবে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রশ্নগুলো ছবিতে করে তুলতে হবে রূপায়িত।

আলোচনার শেষ পর্য্যায়ে শ্রীমতী সেন তাঁর ব্যক্তি-জীবনের আশা, আকাঙ্খা ও স্বপ্ন সম্পর্কে আমাকে কয়েকটি কথা জানালেন। বললেন তিনি—বেথুন কলেজে যখন পড়তুম তখন থেকেই আমার অভিনয়ের অভ্যাস। বি, এ, পাস করার পর আমি I. P. T. Aতে যোগ দিই। 'নবান্ন' বইতে বলতে গেলে আমার প্রথম অভিনয়। তার পর রেডিওতে যোগ দিই ১১৪৫ সালে, ১১৪১ সালে আমি চলচ্চিত্রে যোগদান করি সে অবিশ্যি প্রথমেই বলেছি। ভবিষ্যৎ জীবন কি ভাবে কাটাতে চাই বা কাটবে সে এখনি বলা কঠিন; তবে শিল্পী আমি, শিল্পী-জীবনই আমার কাম্য। ভবিষ্যতে অভিনয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে যদি আহ্বান আসে, সেটি গ্রহণ করবো—এইমাত্র বলতে পারি।

শীতে

প্রফেশকুমার রায়

কনকনে হিমরাত্রি
দুপুরেই হাত কি বাড়ায়?
শীতের স্বল্পায়ু দিনে
জবু-থবু বুড়ী
দু'কান ডানায় ঢেকে রৌদ্র পোহায়-
ঝিমুঝিমু রোদ সরে যায়।
সুমুখেই হিমরাত্রি—
ছন্নছাড়া যত যাত্রী
জীবনের পান্থশালায়
শঙ্কিত মুহূর্ত্ত গোণে
নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।
প্রেমের উত্তাপে আর
আত্মার উত্তাপে
এই সব হতভাগ্যে
কে বলো বাঁচায়?

আশু চট্টোপাধ্যায়

একটা সেণ্ট, ভারী মিষ্টি সেণ্ট। গন্ধটা যেন খুবই চেনা-চেনা। যুঁই কি? না বিলিতি হেলিওট্রোপ? না র‍্যাচেল? বিলাসিনী পারী সহরের সর্ব্বজনবন্দিত সেণ্ট। কি জানি কি সেণ্ট! কিন্তু খুব যেন পরিচিত। ওর ঘ্রাণ যেন দু'নাক দিয়ে নিয়েছি কত বার, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছি কত মজলিসি সন্ধ্যায়। আজ আবার সেই সেণ্ট কে মেখে এল? সামনের ওই চকচকে টাকের আশে-পাশে নিশ্চয়ই ওই রোমাঞ্চকর গন্ধের উৎস নেই, কিংবা ওই বিজ্ঞ দাড়ির এদিক-ওদিক। যাকগে, অত গবেষণার প্রয়োজন কি! তোফা আরামে কামড় দি এই মোলায়েম ক্রিম-রোলটাতে। তার পাশেই রয়েছে কত বিচিত্র পেস্ট্রি আর প্যাটি। আর ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে কত আধুনিক-আধুনিকা, চটুল হাস্য আর বাহুভঙ্গিমা, চোখ আর ঠোঁটের কত লাস্য! সবুজ লনের উপর হলদে বেতের চেয়ার আর টেবিলগুলি, ফুলকাটা ঈষৎ হরিদ্রাভ কত পেয়ালা-পিরিচ আর গ্লাস। এধার-ওধার কত ফিস্-ফাস্, কত চাপা-হাসি। কত কটাক্ষের শর-সন্ধান। পেলব বাহুগুলো যেন মাখন দিয়ে গড়া!

সব শেষ হতে এখনো সময় লাগবে। খাওয়াটা উপলক্ষ্য। সকলে এসেছে স্বাদ নিতে সঙ্গের, এসেছে রোমাঞ্চের সন্ধানে। নতুন ঠিকানা জোগাড় করতে সন্ধ্যা কাটাবার। ভুলে-যাওয়া সন্ধ্যেগুলোকে আবার স্মরণ করতে। যদি স্মরণ করতেই হয়, ওই গন্ধটাকেই বিস্মৃতির তল থেকে তুলে আনা ভাল। কত নিভৃত অন্ধকারই না ওর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, আর এক আকাশ-তারা। আর ঝাউ গাছের নিঃশ্বাস। কত অর্থহীন প্রলাপ, শুধু কথা-বলার ঝোঁকে। বোধ হয় সেই হেলিওট্রোপ! গন্ধটা যেন শুকনো অর্থাৎ ছাই লাগানো, ঠিক বাসি ফুলের মালার মত। ভোরবেলায় ফুরিয়ে-যাওয়া রাত্রির মত। মুঠো-মুঠো সময় নষ্ট করবার পাগলামি ত উত্তীর্ণ হয়ে আসা গেছে। কিন্তু তারপর যে-সময়টা কেটে গেছে, তা যেন কত শতাব্দী। সে-সময়টাকেই বা কি সার্থক কাজে লাগালাম? তার চেয়ে ওই অর্দ্ধচন্দ্রাকার চ্যাপ্টা কেকটা খাওয়া ভাল, সময়ের চমৎকার সদ্ব্যবহার, হিসেবী লোকের মত কাজ। আর এক পেয়ালা চা ঢেলে নেওয়া যাক, নতুন পট্-টা যখন দিয়ে গেছে। পাশের লোক দুটির সঙ্গে আলাপ জমালে কেমন হয়? কিন্তু ওরা দু'জন ত সখা-সামীপ্যের উত্তাপে মশগুল, কানেই যাবে না আমার ক্ষীণ স্বর।

এ ত আর রুমার আইভি-মণ্ডিত রাত্রির বারান্দা নয়, এ একটা রীতিমত চায়ের পার্টি, নাম-করা ঘরের সামাজিক অনুষ্ঠান। গৃহকর্তার বিবাহের উৎসব, তৃতীয় পক্ষের গৃহিণীর জনারণ্যে প্রথম প্রস্ফুটিত হবার শুভলগ্ন। কে গৃহকর্ত্তা কে জানে, আর কোন্ সৌভাগ্যবতীই বা তাঁর আয়ুর পশ্চিম গগনকে রাঙিয়ে দিতে এসেছে! সে-খবরে আমার প্রয়োজনই বা কি, আমার তৃতীয় পেয়ালা যখন এমন লোভনীয় ভাবে তৈরী হয়েছে। চুমুকে চুমুকে সন্ধ্যার অনির্ব্বচনীয় সময় অতিবাহিত হবে। পাশে কোথায় চাপা সুরে ইটালিয়ান ব্যাণ্ড বাজছে। গৃহকর্ত্তা ধনী। চোখেও তাঁকে দেখি নি। বন্ধুর অনুরোধে এখানে আসা। তারও পাত্তা নেই। শুধু মাঝে মাঝে নাকে আসছে সেই অতি-পরিচিত সেণ্ট, ভুলে-যাওয়া স্বপ্নের মত, ছেঁড়া স্মৃতির সঙ্গে যার বাস। ওই গন্ধের সঙ্গে একটি বারান্দার খুব আলাপ ছিল আর আইভিলতার এবং অনেকগুলো নিভৃত সন্ধ্যার।

চার পাশে সব উঠছে, বসছে, চলা-ফেরা করছে। কত হাসি, কত সম্ভাষণ। প্রীতি বিতরণের হরির-লুট চলছে। একটু মিশুক হলেই এখানে এক সন্ধ্যাতেই পরিচিতের পরিধি বেশ বাড়িয়ে নেওয়া যায়। সামাজিক জীবেরা তাই এই সব উৎসব অনুষ্ঠানের আশে-পাশে ঘুরঘুর করে। ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা-ধন্য কোন মাহেন্দ্র-লগ্নে কোনো লোভনীয়া নায়িকার সঙ্গে দৃষ্টির মাল্য-বিনিময় হয়ে যাবে, কে জানে! কিন্তু ওই হেলিওট্রোপের গন্ধে-ঘেরা আমার একক জীবন সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, সীমান্তের গণ্ডী ডিঙিয়ে কোনো বেণীর ফাঁসনার কিংবা মলয়াকুল অঞ্চল-প্রান্তের প্রবেশাধিকার নেই। আমি তাই চা-এর স্বাদে নিমগ্ন, আশে-পাশের সমস্ত মিলিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি রুমা'র সেই মিষ্টি গুনগুন্, সেই সব সন্ধ্যার সুপরিচিত বারান্দায় ছেঁড়া-ছেঁড়া টুকরো সুরের লুটোপুটি, সুগন্ধে-আবিষ্ট স্বপ্নেরা যেখানে আজও হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কান্যকুব্জের কবির বিরহাকুল মন্দাক্রান্তা ছন্দের মাধুর্য্য মণ্ডিত পুষ্প-সজ্জিত একটি প্রকাণ্ড কবরী আমার চারপাশের পৃথিবীকে আড়াল করে রেখেছে।

কিন্তু হেলিওট্রোপ সেণ্ট এখানে কে ব্যবহার করে! নবীনা গৃহিণীটিকে এখনো চোখে দেখিনি। খুব সম্ভব তিনি অতিথিদের তদারকী করে এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছেন, এবং তাঁরই বরতনু থেকে এই সুগন্ধের প্রসাদ ছড়াচ্ছেন। কুবের-ভাণ্ডারের অধিকারিণী হয়েছেন তিনি, যে-কোনো সেণ্ট ব্যবহারে নিশ্চয়ই তাঁর ক্ষমতা আর অধিকার আছে। সুতরাং একবার অন্তত তাঁর দর্শন লাভ করে নয়ন সার্থক করা প্রয়োজন। তাঁর গাত্রবর্ণ কি হেলিওট্রোপের মত দুগ্ধ-শুভ্র হবে? সাদা ভেলভেটের মত কমনীয়? তা না হোক, অন্তত আমাদের রজনীগন্ধার মত পেলব দেহ-মাধুর্য্যে আর

গন্ধ-সুষমার প্রতিটি রজনীকে সার্থক করবার মত তাঁর সামর্থ্য থাকা চাই; নইলে হেলিওট্রোপ ব্যবহার করবার অধিকার আসবে তাঁর কোথা থেকে! সেই আরেক জনের মত একটি টিকল নাক, টানা-টানা কাজলআঁকা চোখ, দীর্ঘায়ত কুসুম-কোমল দেহ কি তাঁর আছে? বক্ষ-রক্তের সমস্ত রাঙা কামনা দিয়ে তাঁর ঠোঁট দুটি কি গড়া? আঙুলগুলি কি অপর আঙুলের সঙ্গে জড়াবার ইচ্ছায় মূর্ত্তি নিয়েছে?

পাশের টেবলে চারটি তরুণ ইতিমধ্যেই বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। একটু উৎকর্ণ হতেই শোনা গেল একজন বলছে, "জানো, যাঁকে নিয়ে আজ এই উৎসব, তিনি নাকি বিয়ের আগে অনেকেরই লোভের জিনিষ ছিলেন।" আর একজন বলল, "তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে, অমন যাঁর রূপ! কিন্তু টাকাই যদি তাঁর পছন্দ, টাকা আছে এমন যুবক কি সহরে মিলত না?" আর একজন বোধ হয় কবি, সে কাব্যিক সমাধান করে দিল এই দুরূহ প্রশ্নের, "নিজের প্রস্ফুটিত যৌবনের মালা দিয়ে স্বামীর প্রকাণ্ড টাকটি ঢাকবেন, এইতেই তাঁর মহিমা।" চতুর্থ কোনো কথা বলল না, তার ব্যঙ্গ-বঙ্কিম ঠোঁটের পাশ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে দিল। মেঘদূতের মত উড়ে গিয়ে সেই হতাশ হৃদয়ের ধোঁয়া অনায়ত্ত নায়িকার দেহের চার পাশে ঘুরে বেড়াবে কি না জানি না, শুধু এইটুকু বোধগম্য হল যে সে-নায়িকা আলাপ-আলোচনার বস্তু হবার যোগ্যতা রাখেন। সুতরাং বাড়ি যাবার আগে তাঁকে একবার দেখতে হবে।

দেখতে হবে বই কি তাঁকে, যিনি সব-কিছু বাদ দিয়ে জীবনে কেবল টাকাকে বরণ করে নিলেন, অর্থাৎ এ-যুগের পক্ষে যিনি অসাধারণ বুদ্ধিশালিনী। তিনি নিশ্চয় বুঝেছেন যে টাকা দিয়ে এখন সব-কিছুই কেনা যায়, এমন কি যৌবনকে, এমন কি প্রণয়কেও। তাই সেই সব সস্তা জিনিষের উপর তাঁর লোভ থাকবে কেন? বুদ্ধিমতী, সন্দেহ নেই। যাবার আগে একবার তাঁকে নিশ্চয় দেখে যেতে হবে। হাতে কিছু থাকলে উপহার একটা দেওয়াও চলত, কিন্তু সঞ্জীবটা হঠাৎ ধরে এনেছে। তায় রবিবার, মার্কেট বন্ধ, ভাল জিনিষ কেনবার উপায় ছিল না। আর, এত বড়লোকের বউকে যা-তা সস্তা জিনিষ উপহার দেওয়া যায় না, বিশেষ করে সে নিজেই যখন সস্তা জিনিষ পছন্দ করে না। একমাত্র বাড়িতে আছে একটি 'সাদা হেলিওট্রোপে'র কুমারী শিশি, যা আজও খোলা হয়নি। কিন্তু সেটি কেনা হয়েছিল আর একজনের জন্ম, কিন্তু তাকে আর দেবার সুযোগ হয়নি। এখন সেটি ঘাড় থেকে নামানো যায় যদি যিনি ওই সেন্ট ব্যবহার করেন, অন্তত আজ করেছেন, তাঁকে যদি দেওয়া যায়। কিন্তু তাঁরই ত পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না! কেবল চার পাশে গন্ধের একটু চমক ছড়িয়ে যাচ্ছেন মাত্র।

একটু ঘাড় বেঁকিয়ে যে তাঁকে দেখব, সে উপায়ও নেই। অনেক অবাঞ্ছিত লোকের ভীড়, যারা আসর জমাতে এসেছে, সুযোগ সুবিধা নিতে এসেছে, খেতে এসেছে। কিন্তু আমার হেলিওট্রোপ যাঁর কাছে যাবে তাঁকে একটি বার দেখাও ত প্রয়োজন। তিনি কুমার মত রুক্ষ চুলের কাঁপানো অলস খোঁপা তৈরী করেন কি না, দীর্ঘ চোখের নিচের পাতায় সূক্ষ্ম কাজলের লজ্জিত রেখা টানেন কি না, স্মরগরলের পান-পাত্র দুটি স্ফুরিত ঠোঁটে একাধিক সহস্র রজনীর রোমাঞ্চ আছে কি না, এসব খবর আমার জানা চাই। কারণ এটি যাকে দেবার কথা ছিল তাকে শেষ পর্য্যন্ত আর দেওয়া হয়নি। কেন যে দেওয়া হয়নি তার ইতিহাস সুদীর্ঘ, সঙ্গিহীন রাত্রির মত। তবু সেই বারান্দার একটি মোহাচ্ছন্ন আবেশ ওই গন্ধটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই ভীড়ের মধ্যে এসে আবার যে সেই গন্ধটির সঙ্গে পরিচয় হবে, একথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

চার পাশের নর-নারীদের দেখে ভারী হাসি পেতে লাগল। এরা যেন সব লোকের লেজে ভর দিয়ে সার-সার ক্যাঙ্গারু বসে আছে। স্বার্থ-সন্তানগুলিকে সযত্নে লালন করছে। পাছে চার পাশে তাকালে নিজেকে সংযত করতে না পারি, হঠাৎ উচ্চহাস্য করে উঠি, এই ভয়ে টেবলের আশে-পাশে তাকাতে পারছিলাম না। নেহাৎ বেরসিকের মত ঘাড় গুঁজে চায়ের পেয়ালায় সাঁতার কাটছিলাম। কিন্তু একটি পেয়ালায় আর কত চা ধরতে পারে, তাতে কত বার আর চা নেওয়া যেতে পারে? অবশ্য এইবার সঙ্গীতের আসর বসবার একটা তোড়জোড় দেখা যেতে লাগল, তাতেই নিমগ্ন থাকবার একটা ভাণ দেখানো যেতে পারবে। কিন্তু নববধূকে একবার দেখবার পর না হয় ধৈর্য্যের এই রকম একটা পরীক্ষা দেওয়া চলতে পারে। আপাতত সঞ্জীবের সন্ধানে উঠে পড়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

লনটি বড়ই, কিন্তু ভাড়া করে আনা চেয়ারে-টেবলে আকীর্ণ। মাথার উপরে চন্দ্রাতপ, তাতে অজস্র আলোর সমারোহ। একটা রীতিমত বিয়ের রীতিমত উৎসব আয়োজন। হোক না আহার্য্যগুলি বিদেশীর তৈরী, আমার হেলিওট্রোপও ত তাই, কিন্তু সেই নির্জ্জন বারান্দাটি আর এই লনটি খাঁটি এ-দেশীয়। আশে-পাশে বেশ খুচরো রসালাপ চলছে এখানে-ওখানে, কারণ রসনা তখন রস-সিক্ত। অর্থাৎ পার্টি তখন রীতিমত জমে উঠেছে। এই জনারণ্যের মধ্যে কি করেই বা সঞ্জীবের এই গন্ধের উৎস-সন্ধান সম্ভব! নিভৃত ইচ্ছার মত সেই বারান্দাটি আইভি-মণ্ডিত অনেক সন্ধ্যার স্বপ্ন দেখুক। এই কোলাহলের মধ্যে তাকে টেনে এনে কি লাভ! যেদিন শেষ বারের মত সেখান থেকে বিদায় নিই, সেদিন নিশ্চয়ই অন্তরঙ্গতার অভাব অনুভব করেছিলাম, যদিও তার কারণ খুঁজে পাইনি, কেবলমাত্র আমার চিত্তহীনতা ছাড়া।

সুতরাং উঠে পড়লাম এবং সেই সামাজিক জীবগুলির আশ-পাশ দিয়েই সামনের মঞ্চের দিকে অগ্রসর হলাম। প্রথম বাধা পেলাম সঞ্জীবের কাছ থেকেই। এতক্ষণ কোথায় ছিল জানি না, কিন্তু আমার এই একান্ত প্রয়োজনের সময়েই পথরোধ করে দাঁড়াল। বলল, অর্থাৎ প্রশ্ন করল, "পালাতেই যদি চাও ত সামনে যাচ্ছ কেন? আর এত তাড়াতাড়ি পালাবেই বা কেন?"

অবিসংবাদিত সত্য কথা। হাসি চেপে উত্তর দিলাম, "উৎসবে যোগ দিলাম তোমার পাল্লায় পড়ে, আর বর-বৌ দেখব না।"

বাঁকা হাসিতে সঞ্জীবের ঠোঁটের কোণগুলো দুমড়ে গেল। বলল, "এখানে সবাই গান শুনতে আর খেতে আসে। আহা, হোষ্টেসের ত দেখা পাবেই, ধৈর্য্য ধর।"

সঞ্জীব আধুনিকতার একটি পরিমার্জ্জিত সংস্করণ, নির্লিপ্ত

বাক্যকুশলতায় দিগ্বিজয়ী। সে এখানে আসে এখানে আসাটাকে অব্যাহত রাখবার জন্যই। গৃহকর্ত্তার বিপত্নীক পার্টিগুলিতেও এসেছে। পরে যখন এগুলি গৃহকর্ত্রীর পার্টি হবে, তখনও ও আসবে সুস্বাদু কেক-পেস্ট্রিগুলিতে নির্লিপ্ত ভাবে কামড় দিয়ে বেড়াবার জন্য। হোস্টেস্ কে, কিংবা তিনি কি সেণ্ট ব্যবহার করেন এ-সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার তার অবসর নেই এবং অভিরুচিও নেই।

একটুও না হেসে, বেশ গম্ভীর ভাবে বললাম, "একটু পাশে চল, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

আমার এই গম্ভীর ভাব ভঙ্গীকে ও বরাবর তাচ্ছিল্য করে এসেছে, কারণ ওর কাছে জাগতিক সব কিছুই ছিল হাঁসের পিঠে জলের মত ক্ষণচপল। সেদিক দিয়ে ও ছিল পরমহংস। ঠিক আমেরিকানদের মত যারা বলে take it easy। তবু এই উৎসব পরিবেশে হঠাৎ আমার এই ভাবভঙ্গী দেখে সে বেশ চিন্তিত ভাবে চেয়ার-টেবলের এলাকা ছেড়ে একটি পাম-কুঞ্জের পাশে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, "কি, বল? তোমাদের নিয়েই বিপদ। তিলকে তাল কর। কি হয়েছে?"

বললাম, "আমি নব-বধূকে উপহার দিতে চাই।"

বুঝলাম সে মুস্কিলে পড়েছে। বলল, "তুমি পরিচিত নও, কি করে দেবে?"

ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে উত্তর দিলাম, "অপরিচিত হয়ে বিয়ের উৎসবে খেতে আসতে পারি, আর উপহার দিলেই যত দোষ? তোমার বন্ধু হিসেবে নিশ্চয় দিতে পারি।"

"উপহার কি এনেছ?"

"এখনি নিয়ে আসছি। তুমি কিন্তু চলে যেও না, তোমার হাত দিয়েই দেব কি না।"

"এর মধ্যে চলে যাব কি!" সঞ্জীব প্রশ্রয়ের হাসি হাসল, যেমন করে প্রবীণরা নাবালকের কথা শুনে হাসে, "পার্টি ভাঙবার পরেও দেখবে আমার নড়বারই মতলব নেই।"

নিশ্চিন্ত মনে বের হয়ে এলাম এবং একটি ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। উপহার আমাকে নিয়ে যেতেই হবে এবং সে-উপহার হবে ওই হেলিওট্রোপের শিশি। শুভ্র অকলঙ্ক হেলিওট্রোপ! কারণ যখন সঞ্জীবের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখনই পাশে চকিত দৃষ্টি ফেলে দেখে নিয়েছি নববধূকে। সে-যে নববধূই, তা আশ-পাশের সকলের ভাব-ভঙ্গী ও কথাবার্ত্তা থেকেই বুঝে নিয়েছিলাম। সুতরাং ওই হেলিওট্রোপই হবে উপযুক্ত উপহার। ওইটির সঙ্গেই দেওয়া হবে অনেকগুলি অনির্ব্বচনীয় সন্ধ্যার মালা, অনেক বিনিদ্র রজনীর রঙিন ফুল, অনেক দ্বিপ্রাহরিক দিবা-স্বপ্ন। গোলাকার টাকা আজ অনেক পূর্ণচন্দ্রকে পরাস্ত করল। পূর্ণিমার যে-চাঁদগুলি আইভিলতার পাশ দিয়ে তাকাত।

নিপুণ যত্নের সঙ্গে প্রসাধন করলাম। সামনে দাঁড়িয়ে হাতে দিতে হবে, চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। হাত একটু কাঁপলে চলবে না। সঞ্জীবের হাত দিয়ে দেওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করলাম, যদিও হেলিওট্রোপের শিশি তার হাত দিয়ে পৌঁছালেও যথেষ্ট কাজ হত। তবু আমাকেই এই শতাব্দীর অভিশাপের সম্মুখীন হ'তে হবে, যেখানে টাকা হৃদয়ের চেয়ে বড়, স্বপ্নের চেয়ে বড়। যেখানে সুখে-থাকার ইচ্ছা সুখকে নির্ব্বাসনে পাঠায়। যেখানে চেনা-গন্ধ লেগে থাকে ফেলে-আসা সময়ের গায়ে, অধুনা অনাদৃত কোনো বই-এর মধ্যে কয়েকটা শুকনো ফুলের পাপড়ির মত।

খুব মনোযোগ দিয়ে সাজতে লাগলাম। সামনে টেবলে বের করে রেখেছি "শুভ্র হেলিওট্রোপ"-এর শিশি। আজ সেটি উপহার দেবার শেষ সুযোগ উপস্থিত। তার পর পৃথিবীর নিরর্থক প্রতিদিন নভোপথ পরিক্রমার কোনো মানে যদি না-ই থাকে, একটি শেষ উৎসব-রজনী হস্তস্খলিত চূর্ণ-বিচূর্ণ শিশির গন্ধ-সুষমায় আর একবার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই। ঈষৎ হেসে চুলে ব্রাস দিতে লাগলাম।

নার্সিসাস

জয়ন্তী সেন

আত্মপ্রেমের বুভুক্ষা আজো হল না কি প্রশমিত?
সূর্য্যঘড়ির দেশনা দীপ্ত অমোঘ জীবন 'পরে
সূর্য্যমুখীর তৃষামাখা মন কালের হাওয়ায় ঝরে
বন্ধ্যা পৃথিবী ফসল-বিহীন ক্রন্দনে মুখরিত।
কীর্ণ তারায় সূচিত সহসা দিবসের অবসান
এখনো কি মোহে মুগ্ধ মনেতে বাজিল না আহ্বান?

ধূসর যুগের বিস্মৃত ক্ষণে কুসুমিত নির্জনে
বিম্বিত রূপে আত্মহারার আত্মকাহিনী লেখা
নিরুপায়ের বর্ণালী মায়া দুরাশা দহন একা
প্রতিধ্বনির অতনু কামনা জর্জ্জর মৃত মনে—
হেনেছ আঘাত প্রত্যাখ্যান—নির্বাক অপমান
নির্জ্জিত প্রেম, দুর্ধর দাহ তবু আজো অম্লান।

যুগ-যুগান্ত ঝরে গেল বৃথা পিঙ্গল ঝরাপাতা
পীত পৃথিবীর মৃত্তিকা-মনে রাত্রিরা চূর্ণিত
ধূসর চাঁদের পাণ্ডুলিপিতে এষণা অপরিমিত
কুয়াশা-সূর্য্য দিনমালিকে ভুলেছে আলোক গাঁথা।
মুখ তুলে চাও আকুল প্রেমিক শোনো পেতে আজ কান
অন্তরীক্ষে বিপ্রলব্ধ বেদনার অভিমান।

মেয়েদের লেখা

পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের লেখা পৃথিবীর সব দেশেই কম। বিশেষ ক'রে গল্প-উপন্যাসের লেখিকা হিসাবে খ্যাতিসম্পন্না কয়েকটি দেশে অত্যন্ত অল্প সংখ্যক আছেন মাত্র। কবিতার ক্ষেত্রে কিন্তু এ কথা বলা যায় না, কারণ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী ও আমেরিকার আধুনিক লেখিকাদের মধ্যে কবির সংখ্যাই সর্বাধিক। অবশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখিকার সংখ্যা নিতান্ত ন্যূন নয় বটে, এবং মেয়েদের পরিচালিত শুদ্ধ-সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য পত্র-পত্রিকাও প্রচুর প্রকাশিত হয় সত্য, কিন্তু উচ্চাঙ্গের গল্প-উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁদের ক্ষমতার প্রকাশ পর্যাপ্ত পরিলক্ষিত হয় না।

সম্প্রতি আমাদের দেশে ঘটনাটি কিন্তু দেখা দিয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে। অর্থাৎ অধুনা বাংলা সাহিত্যে কাব্য-কবিতা অপেক্ষা বরং গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেই বহু মহিলা লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছে, এবং তাঁদের রচনার মধ্যে সৃষ্টিশক্তির নিদর্শনও দেখা গিয়েছে। এ বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ হিসাবে একাসনে তাঁদের স্থান দেওয়া না গেলেও, অনেক অর্বাচীন লেখকের চেয়ে তাঁদের রচনাশৈলী দৃষ্টিভঙ্গী ও ঘটনা-বিন্যাসপটুতা যে কিছু কম নয়, তা বলতে দ্বিধা নেই। এই সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে অবশ্য পুরুষের সঙ্গে নারীর মানসিক প্রকৃতির জন্মগত কিছুটা তারতম্য থাকায় নর-নারীর মিলন প্রশ্নে পুরুষ যে ক্ষেত্রে বল্‌গাহীন সংস্কারমুক্ত, সে ক্ষেত্রে নারী অপেক্ষাকৃত লজ্জাশীলা, বেপমানা। শিল্পিমনের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করলে সাহিত্যের আসরে নারীর পক্ষে এ বেতসবৃত্তি যদিও মূল্যহীন, কিন্তু তবুও সংস্কারগত রুচিবোধকে অনেক স্থলে এখনও তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কাহিনীর মধ্যে রিপুতাড়িত বিবংসার বিষয়কে আমাদের মহিলা লেখিকারা বেপরোয়া ভাবে উদ্‌ঘাটন করবেন এ-ও যেমন আমরা সমর্থন করি না, তেমনি সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যে থেকে রসসৃষ্টিকে ব্যাহত করবেন, এ-ও শিল্পিমনের পরিচায়ক মনে করি না।

এই আলোচনার মূল বক্তব্য থেকে প্রসঙ্গত আমরা অনেকটা সরে এলেও এ কথা আজ স্বীকার করতেই হয় যে, অধুনা গল্প-উপন্যাস রচনায় মেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, এই গল্প-উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে মেয়েদের যে পরিমাণ আগ্রহ ও কৃতিত্ব দেখা দিয়েছে, সে পরিমাণ আগ্রহ কাব্য রচনার ক্ষেত্রে দেখা দেয়নি। সম্ভবতঃ বর্তমান কালে পুরুষদের অপেক্ষা মেয়েরা বেশি প্র্যাকটিক্যাল হয়ে ওঠার ফলেই কাব্যজগতে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেকালে কিন্তু আমাদের দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থা ছিল অন্যরূপ। অর্থাৎ গল্প-উপন্যাসের চেয়ে সেকালে মেয়েদের মধ্যে কবিতা লেখার রেওয়াজই ছিল বেশী, এবং তার মধ্যে দিয়েই মেয়েদের চিরন্তন স্নিগ্ধ রূপটি ফুটে উঠত।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রবেশক

রবীন্দ্র-রচনাবলীর তালিকায় বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক, প্রবীণ সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ। ইতিপূর্বে এই গ্রন্থের বৃহৎ তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এই শেষ খণ্ডের ভূমিকায় এক স্থানে গ্রন্থকার লিখেছেন, "আমাদের এই আলোচ্য খণ্ড রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ সাত বৎসরের ইতিহাস। এই পর্বটির ইতিহাস যেমন জটিল, উপাদানও তেমনি অতি প্রচুর।" কথাটি খাঁটি সত্য। বিচিত্র উপাদানে প্রস্তুত এই ইতিহাস প্রাঞ্জল সাহিত্যের মধ্যে মূল্যবান তথ্যাদির সহযোগিতায়, (৮ পেজী ডিমাই সাইজ) ৬৭৩ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে ধরে দিয়েছেন গ্রন্থকার। প্রায় ৪৬টি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে শেষ সাতটি বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি বর্ণিত হয়েছে। ১৯৩৫ সাঁল থেকে এর আরম্ভ এবং শেষ ১৯৪১-এর ৭ই আগষ্ট কবির মহাপ্রয়াণের দিন। অনন্তসাধারণ অধ্যবসায় ও যত্নের ফল এই বই। কত ঘটনা, কত লোক আর কত লেখার কাহিনীতে ভরা কবির শেষ জীবনের এই খণ্ডটিই যেন আজ সমধিক মূল্যবান বলে মনে হচ্ছে। 'শেষ কয়েক মাস' নামক পরিচ্ছেদটি ও 'পরিশিষ্ট'র মধ্যে—সংযোজন ও সংশোধন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাংলা বইয়ের তালিকা, ১৯৩৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নব-প্রকাশিত গ্রন্থাদি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ও নির্দেশিকা বিভাগগুলি অত্যন্ত গবেষণাপ্রসূত ও তথ্যপূর্ণ। কবিগুরুর সর্বাঙ্গীন দিক সম্পর্কে এরূপ মূল্যবান গ্রন্থ আর নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই একমাত্র গ্রন্থের জন্যই প্রভাতকুমার বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয় স্থান অধিকার করে থাকবেন সন্দেহ নেই। বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭ হইতে প্রকাশিত। এই খণ্ডের মূল্য : ১০৲ টাকা।

প্রেমের গল্প

বাজারে বিবাহাদিতে উপহার দেবার মত বই অনেক বেরিয়েছে বটে, কিন্তু 'প্রেমের গল্প' নামক বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এই সঙ্কলনটি সব দিক থেকেই যেন সার্থক একখানি উপহারের বই হয়ে

মূল্যও আছে যথেষ্ট। এক সঙ্গে তেইশ জন নামকরা সমসাময়িক গল্পকারদের তেইশটি গল্পের এমন সচিত্র সঙ্কলন এর আগে আর প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয় না। এই লেখকদের প্রত্যেকের চিত্র ও জীবনী আছে এর মধ্যে। সুরুচিবান সম্পাদকের সুসম্পাদনের পরিচয় আছে এর সর্ব্বত্র। প্রচ্ছদ-পটটি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত এবং ভারতীয় প্রেমের পরাকাষ্ঠা যেখানে সর্ব্বোত্তমরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে, সেই রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনের সার্থক রূপটি শিল্পী কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদারের তুলিতে ফুটে উঠেছে অপূর্ব্ব ভাবে। এর পর সম্পাদকের সুচিন্তিত ভূমিকাটির কথা উল্লেখ করতেই হয়। প্রেমের উপর এটি একটি উল্লেখযোগ্য 'থিসিস' বিশেষ। নানা দিক থেকে প্রেম-ভালবাসার স্বরূপটি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এই আনন্দদায়ক ভূমিকাটির মধ্যে। প্রিয়জনকে উপহার দেবার পূর্ব্বে এই উপাদেয় গ্রন্থখানির কথা অনেকেই যে চিন্তা করবেন তা আমরা নিশ্চিত বলতে পারি। প্রকাশক রীডার্স কর্ণার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। সাধারণ সংস্করণ—মূল্য ৭।০, শোভন সংস্করণ মূল্য ১০৲ টাকা।

শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী

পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর জীবনকথা যে কত পবিত্র কত স্নিগ্ধ, তা নতুন করে বলবার নয়। অধিকন্তু বলা বোধ হয় সম্ভবপরও নয়। মায়ের জীবনকাহিনী অবলম্বন করে এই গ্রন্থটি সুলিখিত হয়েছে। এতে মায়ের পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের একটি পরিপূর্ণ চিত্র অঙ্কন করতে সক্ষম হয়েছেন লেখক। মায়ের সঙ্গে ঠাকুরের সম্পর্কও বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে। মায়ের জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলি সুন্দর ভাবে একত্রে সংগ্রহ করে লেখক সম্পাদনা করেছেন সেইগুলি। মা'র দিব্যজীবনের প্রভাব জাতির যাত্রাপথের বিশেষ পাথেয়। আজকের দিনের হিংসা, লোভ-দ্বেষের সম্মিলনে যে ধ্বংসের মারণলীলা বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলছে জাতির বুকের উপর দিয়ে, মায়ের মা ভৈঃ আশীর্ব্বাণীই পারে এই ধ্বংসলীলার অবসান করতে। সমগ্র পুস্তকটি রচনা করতে লেখক যে শ্রম স্বীকার করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। অন্ধকার দুর্য্যোগময় বিশ্বে মায়ের পূতপবিত্র জীবনের কাহিনী যত প্রসার ও প্রচারলাভ করে ততই মঙ্গল। লেখক—শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত। ব্লক এ, ফ্ল্যাট ২, গভর্ণমেণ্ট হাউসিং ষ্টেট এণ্টালী থেকে প্রকাশ করছেন শ্রীমতী বিজয়া দাশগুপ্তা। দাম ছ' টাকা।

বাংলার জাগরণ

অতীতের জ্ঞানের সাধনা ও সাহিত্যকীর্ত্তির নব নব আবিষ্কার, জীবন সম্বন্ধে মানবমনে নতুন পুলক ও অনুভূতি, জীবনাদর্শ, জীবনদর্শন ও জীবনধর্ম সম্বন্ধে নতুন চেতনার সঞ্চার সাধারণতঃ এই তিন ভাগেই ভাগ করা যায় রেনেসাঁ অর্থাৎ নবজন্মকে। বাংলা দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি ও উনবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে জাতীয় জীবনে পাওয়া গিয়েছিল নবজন্মের ছাপ। এই নবজন্মকে প্রথম হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন রাজা রামমোহন। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র অধ্যায় গৌরবের আলোয় উজ্জ্বল, শুধু সৃষ্টি আর পথ চলার এক অভিনব উপাখ্যান। এই অপূর্ব রচনা করেছেন জাগরণ গ্রন্থটি। রামমোহনের যুগ থেকে সর্ব্বভারতীয় জাগরণ ও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব অবধি এই গ্রন্থের উপাদান। প্রত্যেকটি ঘটনার উপস্থাপন শ্রদ্ধেয় ওদুদ সাহেবের প্রাণপাত গবেষণার স্বাক্ষর বহন করছে। বাঙলা দেশের পণ্ডিত মহলে এ গ্রন্থ সমাদর লাভ তো করবেই, অধিকন্তু তরুণ গবেষকদের দরবারেও এর আবেদন কম নয়। লেখক—কাজী আবদুল ওদুদ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত। দাম তিন টাকা।

DISSENTIENT REPORT

দেশগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অসামান্য গৌরবদীপ্ত জীবনের পরিণতি রহস্যের মধ্যেই রয়ে গেল। কিছুকাল আগে ভারত সরকার তিন জন প্রতিনিধি পাঠালেন অকুস্থলে, সত্য ঘটনা উদ্‌ঘাটিত করার জন্য। বিশ্ববন্দিত নেতার সত্য সত্যই তাইহাকুর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কি না, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে প্রকৃত তথ্য পরিবেশিত করে দেশবাসীর এই দীর্ঘ দিনের ব্যাকুলতার অবসান করার জন্য ভারত থেকে যে তিন জন প্রতিনিধি প্রেরিত হয়েছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থের লেখকও তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অপর দু'জনের মতের সঙ্গে লেখকের মতভেদ হওয়ায় লেখক নিজের মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং তার সঙ্গে যথাযথ যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপিত করে রচনা করেছেন এই গ্রন্থ। নেতাজীর সত্যি সত্যি মৃত্যু হয়েছে কি না, এই রহস্যের সমাধানের জন্য যে সকল পথ অবলম্বন করা উচিত ছিল, সেই পথগুলি ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিহার করে অন্যান্য সদস্যরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার মধ্যে সত্যতার স্বাক্ষর খুঁজে পান না লেখক। কয়েকটি পত্র ও নক্সার দ্বারা নিজের যুক্তিগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন লেখক। লেখকের এই সমস্ত শ্রম সার্থক হোক ও নেতাজীর সম্বন্ধে সমস্ত মিথ্যা প্রচার ও রটনার সমাপ্তি হোক এবং যা সত্য তাই উপলব্ধি করতে দেশবাসী সক্ষম হ'ন, এই কামনাই করি। লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু। ৮৬ ডাঃ সুরেশ সরকার রোডস্থ সুবর্ণ প্রকাশনী থেকে শ্রীসাধন বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম দু' টাকা।

স্মৃতির রেখা

বাঙলা ভাষায় বহু বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে, যার ফলে আমরা দূরের অনেক কিছুই আনতে পেরেছি নিকটে। সুদূর সাগরপারের বহু গ্রন্থ আমরা বাঙলায় করেছি রূপায়িত। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের বহু সুগ্রন্থ ছড়িয়ে আছে অননূদিত অবস্থায়। হিন্দী সাহিত্যে মহিলা লেখিকার মধ্যে শ্রীমতী মহাদেবী বর্মার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয়। কবি হিসেবেই এঁর সমধিক প্রসিদ্ধি। যাঁদের কাব্যে ছায়াবাদ ও রহস্যবাদ অভিব্যক্ত হয়েছে ইনি তাঁদের শীর্ষস্থানীয়া। মাসিক বসুমতীর লেখিকা শ্রীমতী মলিনা রায় মহাদেবীর 'স্মৃতি কী রেখায়ে' গ্রন্থটি অনুবাদ করে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এই বইটির অনেকগুলি গল্প ইতিপূর্ব্বে মাসিক বসুমতীর মাধ্যমেই আপনারা পড়েছেন। এই গ্রন্থের মাধ্যমে বাঙালী পাঠকের কাছে অবাঙালীরা আরো নিকটে এগিয়ে আসে। আরো পরিচিত হয় তাদের জীবনধারা ও সমাজপ্রথা। লেখিকা শ্রীমতী মহাদেবী বর্মা, অনুবাদিকা শ্রীমতী মলিনা রায়, ৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট 'প্রদীপিকা' থেকে প্রকাশ করছেন শ্রীএন মুখার্জী। দাম আড়াই টাকা।

বাস্তব অভিজ্ঞতা সাহিত্য হিসাবে পরিবেশন করার কাজে লেখক দ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কুশলতা দেখিয়েছেন। জীবনদর্শনের বিচিত্র ছাপ নিয়ে তাঁর অভিনব উপন্যাস ভৃগুজাতক আত্মপ্রকাশ করেছে। এ ধরণের উপন্যাস ক্বচিৎ প্রকাশিত হয়েছে; প্রত্যক্ষ-দর্শনের আন্তরিক অনুভূতি ভৃগুজাতকের বিভিন্ন চরিত্রকে সরস ও সার্থক করে তুলেছে। মাসিক বসুমতীতে আংশিক প্রকাশিত ভৃগুজাতকের বর্তমান পূর্ণরূপ পাঠক-সমাজকে তার অভিনব বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ করবার শক্তি রাখে। ভৃগুর শিশুমনের ক্রম-পরিণতি ও ঘটনা-বৈচিত্র্যের সঙ্গে বাংলার প্রাচীন গ্রামীন-সংস্কৃতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এই গ্রন্থে। গ্রন্থখানির প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। মিত্র ও ঘোষ। ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

গৌরীমাতা

ভারতবর্ষ মাতৃজাতির কল্যাণে গরীয়সী। যুগে যুগে শত শত সাধকের তপঃপ্রভাবে ভারত পেয়েছে সত্যের নির্দেশ, এখানে সাধকদের সঙ্গে সাধিকাদের অবদানও কম নয়। সেই কল্যাণ-রূপিণী সাধিকাদের মধ্যে শ্রীশ্রীগৌরীমার নামোল্লেখ অনায়াসে করা চলে। পরমহংস রামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্যা গৌরীমা। ঠাকুরের নিবিড় সান্নিধ্যলাভে ভাগ্যবতী তিনি, ত্যাগের আলোয় উজ্জ্বল তাঁর জীবন। গৌরীমার আদর্শ ও বাণী দেশকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করুক। সেইখানেই গ্রন্থকর্ত্রীর সমস্ত শ্রমস্বীকারের সার্থকতা। শ্রদ্ধেয়া দুর্গাপুরী দেবী অতি সুনিপুণ ভাবে সংকলিত করেছেন এই জীবনী-পুস্তিকা। সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে গৌরীমার জীবনের অসামান্য ঘটনাবলী। লেখিকা শ্রীদুর্গাপুরী দেবী ২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীটস্থ শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম থেকে শ্রীমতী সুব্রতাপুরী দেবী কর্তৃক প্রকাশিত। দাম আট আনা।

রাজায়-রাজায়

[৬০৪ পৃষ্ঠার পর]

রাজাবাহাদুর তখন নেশায় আচ্ছন্ন। মজলিসঘরের ফরাসে এলিয়ে পড়েছেন। দু'জন খানসমা মুক্তোর ঝালর-দেওয়া বড় হাত-পাখা খেলিয়ে খেলিয়ে বাতাস বওয়াচ্ছে। দরবার ভেঙে গেছে আজ অসময়ে। দালাল আর জহুরীর দল এসে ফিরে গেছে রাজার সাক্ষাৎ না পেয়ে। কাগজে আর চুক্তিতে সই হ'ল না আজ আর। রাজা-বাহাদুরের হাত চললো না। ময়ূরপেখমের কলম খ'সে পড়লো হাত থেকে। কালীশঙ্কর কিছুতেই চোখ মেলে তাকালেন না। দেওয়ানের বারম্বার নিষেধ অনুরোধ সত্ত্বেও রাজা আসবের পাত্র হস্তান্তর করতে চাইলেন না। নেশায় যেন সমাধি-মগ্ন হয়ে থাকলেন।

তবুও দেওয়ান ডাক দিলেন রাজার কানে কানে। বললেন,—হুজুর, কুমারবাহাদুর দর্শন প্রার্থনা ক'রেছেন। আপনি প্রকৃতিস্থ হোন।

নেশার ঘোরে কালীশঙ্কর বললেন,—কে?

দেওয়ান আবার বললেন,—হুজুরের কনিষ্ঠ সহোদর, আমাদের কুমারবাহাদুর।

রাজা আবার বললেন,—কে?

—কুমারবাহাদুর কাশীশঙ্কর।

কর্ণকুহরে নামটি পৌঁছতেই পুরা চোখ খুললেন কালীশঙ্কর। জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন,—কোথায় তিনি?

—দরবারে অপেক্ষা করছেন।

—শুয়োর, গাধা! সে কি অপেক্ষার ধার ধারে?

দেওয়ান প্রায় ছুটলেন। মজলিসঘরের বাইরে অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুয়োরে দেখা দিলেন কুমার কাশীশঙ্কর। সদ্যস্নাত তিনি মজলিসে আসামাত্র সুগন্ধি কেশতৈলের গন্ধ ভাসলো। গরদের জোড় পরিধানে। কুঁচানো ধুতি আর চাদর। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

—রাজা, আমি তো কাল প্রাতেই যাত্রা করতে মনস্থ ক'রেছি।

চুপি চুপি কথা বলেন রাজাবাহাদুর। বললেন,—কোথায় ভাই?

—আমাদের রাজকুমারী সহোদরাকে হরণ করতে।

—তোমার জয় হোক। লোক-লস্কর সঙ্গে ল'বে তো?

—হাঁ!

—অস্ত্রশস্ত্র?

—হাঁ।

—রক্ষা-কবচ?

—হাঁ।

—আহার্য্য?

—হাঁ।

—যাত্রা নদীপথে না অশ্বারোহণে?

—নদীপথে যাওয়াই স্থির ক'রেছি।

—দেখিও, কিছু না প্রকাশ পায়। ঘুনাক্ষরেও যেন কেউ না জানে। আর কি চাও তাই বল'?

—আর কিছুই নয়, তোমার পদধূলি ভিক্ষা করি।

কথা বলতে বলতে কাশীশঙ্কর জ্যেষ্ঠের পাদস্পর্শ করলেন। সেই হাত নিজের কপালে ছোঁয়ালেন।

রাজাবাহাদুর অবশ হাত তুলে আশীষ জানালেন। বললেন,—তিষ্ঠ, যাইও না। এই অঙ্গুরীয় তোমাকে আমি দান করলাম। তোমার হাতে স্থান পা'ক। অত্যন্ত সুফলদায়ী এই অঙ্গুরীয়টি।

কুমার কাশীশঙ্কর আঙটি হাতে পেয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। নবরত্নের পদ্ম আঙটিতে। বললেন,—প্রাতে যাত্রার পূর্ব্বে আর সাক্ষাৎ হবে না।

—তথাস্তু।

গরদের চাদরের আঁচল উড়িয়ে কুমার কাশীশঙ্কর মজলিস ত্যাগ করলেন। ঘরে সুগন্ধি তেলের গন্ধ ভাসিয়ে রেখে গেলেন। চোখ আবার বন্ধ করলেন রাজাবাহাদুর। কত যেন চিন্তা তাঁর! ভাবনার খালা নেই আর। যেন নিদ্রায় অচেতন হ'লেন রাজা-বাহাদুর। তৃপ্তির শ্বাস ফেললেন। [ক্রমশঃ।

পরিবর্তন

বারি দেবী

শেষ রাতের থৈ-থৈ আঁধার-সায়রে আলোর কমলগুলি সবেমাত্র দল মেলতে সুরু করেছে। কলকাতা মহানগরী তখনও ঘুমে ঢুলু-ঢুলু। দু'-একটি ভিস্তিওলা অলস-গতিতে যাত্রা সুরু করেছে রাজপথগুলোর ওপর। গঙ্গার ধারে, আউটরাম ঘাটের কাছাকাছি একটা জায়গায় গাড়ী রেখে নেমে এলো উষা চ্যাটার্জ্জি। উদাস দৃষ্টি মেলে একবার চেয়ে দেখলো। অসীমের পটভূমিকায় দপ্-দপ্ করে জ্বলছে শুকতারাটা।

পরম ক্লান্তিভরে এসে বসে পড়লো, গঙ্গার ধারে ঝাঁকরা গাছতলার বেঞ্চিটাতে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ার যেন কোন দরদী হৃদয়ের মমতা ছড়ানো, উষার চোখে যেন লাগে মৃদু তন্দ্রার পরশ।

গঙ্গার ধারে আর একখানি গাড়ী থামলো। দরজা খুলে নেমে আসে অনিরুদ্ধ। চোখে-মুখে ওর বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তির ছাপ। চুলগুলো এলোমেলো, একটা সিগারেট ধরিয়ে পায় পায় এগিয়ে যায় ঐ গাছতলায় বেঞ্চিটার দিকে।

বেঞ্চির পাশে দাঁড়িয়ে চমকে ওঠে অনিরুদ্ধ। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। একি সম্ভব! আজ যে ওর বিয়ে!

বেঞ্চির হাতলে একখানি হাত ছড়িয়ে দিয়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে উষা। মুখখানি ম্লান, চোখের কোলে রাত্রিজাগরণের কালিমা, চূর্ণ কুন্তলগুলো নিয়ে খেলা করছে দুরন্ত বাতাস।

ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না অনিরুদ্ধ। ওকে জাগাতেও ইচ্ছা করে না। সন্তর্পণে বসে পড়ে ওর পাশে।

এই স্থানটি যে ওদের প্রাণনদী-সঙ্গমের মহাতীর্থ। মন দেওয়া-নেওয়ার টুকরো টুকরো হাসি আর কথার জলতরঙ্গ, এখানকার আকাশে, বাতাসে, জলকল্লোলে আজও বুঝি কান পাতলে শোনা যায়।

বেশী দিনের তো কথা নয়! মাত্র পাঁচ মাস আগেও তো কত সন্ধ্যার মুহূর্ত্তগুলো ওদের মধুময় হয়ে উঠেছিল এইখানে,···কোথায় গেল সেই দিনগুলো? কেন গেল? ওদের প্রেম কি তবে ঠুনকো রঙীন কাচের মত ছিলো? যে সামান্য ভুল বোঝাবুঝির আঘাতে ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল?

না, না! এ চিন্তাও যে ওর পক্ষে বেদনাদায়ক। যে প্রেমকুঞ্জের অধিবাসী ছিল ওরা, সেটা কোন বিলাসীর প্রমোদ-কানন নয়, সে যে ছিল প্রকৃতিসৃষ্ট মরুদ্যান! সে মরুদ্যানের ওয়েসিসের সন্ধান পেয়েছিলো ওরা। সে তো নয় ভ্রান্তি মরীচিকা; সে যে শাশ্বত প্রেমের অমৃতধারা।

স্মৃতিসাগরের গভীর অতলে তলিয়ে যায় ওর বিমুগ্ধ মন। বছর তিনেক আগেকার কথা। স্কটিসচার্চ্চ কলেজে এলো তরুণ অধ্যাপক অনিরুদ্ধ হালদার। তার বছর খানেক আগে ঐ কলেজেই ভর্ত্তি হয়েছিলো উষা চ্যাটার্জ্জি। এখন সে পড়ে সেকেণ্ড ইয়ারে।

ওদের দুজনের নাম নিয়ে কলেজের ছেলে-মেয়েরা অনেকেই হাসাহাসি করে। একদিন ঐ রকম "উষা-অনিরুদ্ধ" নাম ঘটিত রসালো কথার টুকরো ভেসে এলো ওদের দু'জনেরই কানে,—উষা আরক্ত মুখে হঠাৎ চেয়ে দেখলো অনিরুদ্ধর মুগ্ধ দৃষ্টিপাত তার মুখের ওপরই নিবদ্ধ।

উভয়ের মনেই লাগলো নামের দোলা! কলেজশুদ্ধ্ ছেলে-মেয়ে যদি অমন করে নামে নামে অনবরতই মেলাতে থাকে, তবে এস্থলে ওদেরও মনে মন মেশাতে দোষ কি? দ্রব্যের গুণ থাকলে, নামেরও গুণ আছে, আকর্ষণী শক্তি আছে। এ মাধ্যাকর্ষণকে অস্বীকার করবার শক্তি চন্দ্র-সূর্য্যের নেই; সাধারণ মানুষের থাকবে মনে করা ভুল অহমিকা মাত্র!

অনিরুদ্ধ উষাকে বলে—তোমার এমন নাম দিলো কে?

উষা হেসে জবাব দেয়—যিনি তোমার নাম দিয়েছিলেন অনিরুদ্ধ। কলেজশুদ্ধ্ ছেলে-মেয়ে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করে ওদের নব অনুরাগ পর্ব্বটি। তার পরের দিনগুলো কি রোমাঞ্চকর! সেদিনগুলো যেন বাস্তব জগতের নয়, স্বপ্ন দিয়ে গড়া দিনগুলো, সত্যিই এসেছিল ওদের জীবনে!

অনিরুদ্ধের বাড়ীতে কেউ ছিলো না, একজন পুরোনো চাকর ছাড়া। অবস্থা ভালো, তবে আপনজন কেউ নেই।

উষাও বড়লোকের মেয়ে, তবে চলাফেরায় একেবারে বেপরোয়া স্বাধীনতা পায়নি; বাপ-মায়ের নির্দ্দেশের ছকে-বাঁধা জীবন ছিলো তার!

অনিরুদ্ধর আগলভাঙা প্রেম উষার মানসগগনে দীপ্ত সূর্য্যের মত জ্বলে উঠলো। তার উজ্জ্বল কিরণে উষা হয়ে উঠলো দীপ্তিময়ী, মহিমময়ী, গরীয়সী।

উষা কিছু ভেবে দেখেনি; যেন একটা দুর্নিবার স্রোতে সে ভেসে চলেছিলো হাল্কা ফুলের মত। অনিরুদ্ধর মাঝে সে খুঁজে পেয়েছে নিজের পূর্ণতা।

সে এখন প্রায়ই মায়ের পাঠানো গাড়ী ফিরিয়ে দেয়। বলে পাঠায় বান্ধবীর বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে, অথবা তাদের সঙ্গে সিনেমা, না হয় আর কোনো কারণ।

মাকে বলে উষা—আমাদের ইংলিশের প্রফেসারকে বাড়ীতে একদিন নেমন্তন্ন করবো মা? ওঁর কাছে যদি আমি পড়ার সুযোগ পাই, দেখো এবারে ফার্ষ্ট ক্লাশ মার্ক নিশ্চয়ই পাবো আমি।

এ আর বেশী কথা কি? অনিরুদ্ধ প্রথমে উষাদের বাড়ীতে গেলো নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে; তারপর আসা-যাওয়া চললো, উষার পড়ার ঘরে, মাঝে মাঝে গাড়ীতে করে গঙ্গার ধার, লেক, বোটানিকাল গার্ডেন।

সে বছর শ্রাবণের ঝুলন-পূর্ণিমায় উষাদের বাড়ীতে ছিলো রাধাগোবিন্দের ঝুলন উৎসব। মধুর কীর্ত্তন আর ভজনের উদাত্ত সুরলহরী মনে পড়িয়ে দেয় বৃন্দাবনের তাল-তমাল-ঘেরা নিকুঞ্জ বনে পরমপুরুষ ও প্রকৃতির ঝুলনলীলা। মানবচিত্তেও বুঝি লাগে তার দোলা!

শ্বেতচন্দনের গুঁড়োর মত শুভ্র জ্যোৎস্নাধারা ঝরে পড়ছিলো ইন্দ্রনীল চন্দ্রাতপ থেকে। উতলা পূবের বাতাসে স্বর্ণচাঁপার গন্ধ। বাগানে ল্যাভেণ্ডারের ঝোপের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলো উষা আর অনিরুদ্ধ। দু'জনে দু'জনার মণিবন্ধে বেঁধে দিয়েছে জরির ফুল-দেওয়া রাখী। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিলো, রঙিন রাখীগুলো। উষার পরনে ছিলো সোনালী জরির পাড়-বসানো সাদা শিফন শাড়ী। খোঁপায় জড়ানো টাটকা যুঁইয়ের গোড়ের মালা। বেলজিয়াম গ্লাসের মত শুভ্র উজ্জ্বল রূপের বিভা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো ওর সর্ব্বাবয়ব থেকে। রাখীবন্ধনের সময় ওরা উচ্চারণ করেছিলো, অনন্তকালের হৃদয়-বন্ধনের প্রতিশ্রুতি।

তার পর একটা রঙিন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে কেটে গেলো ওদের তিনটি বছর। প্রতি বছর এই রাখী-বন্ধন উৎসবটি পালন করতো ওরা। এইটিই যেন মিলন-তিথির স্মরণীয় উৎসবরূপে ওদের জীবনে বার বার ফিরে আসতো।

চতুর্থ বর্ষ চলেছে উষার। পরীক্ষার সময় আসন্ন। ওদের মধ্যে সবচেয়ে যেটি মেধাবী ছাত্রী ছিলো, নাম তার মাধুরী সেন। অত্যন্ত গরীবের মেয়ে, বাপের আশা-ভরসা অনেক কিছু ওই মেয়েটির ওপর। যদি ভালো ভাবে পাশ করতে পারে, অফিসের বড় সাহেব ভালো মাইনেতে একটা চাকরী দেবেন, কথা দিয়েছেন।

মাধুরী চায় অনিরুদ্ধর সাহায্য। অনিরুদ্ধ ওকে আশ্বাস দেয়, তার দ্বারা যদি উপকার হয় ওর ভবিষ্যৎ-জীবনের, এতে সে আপত্তির কোনো কারণ খুঁজে পায় না।

কলেজের পর মাধুরী যেতো অনিরুদ্ধর বাড়ী। নোট লিখে নিয়ে আসতো। ওকে সাহায্য করবার পর, উষার কাছে যাওয়ার সময়টা খানিকটা পেছিয়ে যেতে লাগলো। উষা ক'দিন অভিমান করে বলেছিলো, কখন থেকে বসে আছি তোমার পথ চেয়ে, এত দেরী করলে কেন?

সরল ভাবে বলে অনিরুদ্ধ, মাধুরীর কথা। ওর প্রতি একটু সমবেদনাও জানিয়ে বলে, মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী, একটু সাহায্য সহায়তা পেলে ও নিশ্চিত স্কলারশিপ পাবে এবার।

এক মুহূর্ত্তে উষার মুখের আলোটুকু যেন দপ্ করে নিবে গেলো। স্ত্রী-চরিত্র-অনভিজ্ঞ পুরুষ এইটুকু বুঝতে পারে না যে, মেয়েরা তার পরম প্রিয়জনের অপর কোনো মেয়ের প্রতি সামান্য মনোযোগও সইতে পারে না। এর স্বপক্ষে যত যুক্তিই থাক্ না কেন। উষা সেদিন মুখে কোনো প্রতিবাদ না জানালেও, বেশ গম্ভীর হয়ে রইলো।

এ ব্যাপার নিয়ে কলেজেও মৃদু গুঞ্জন চলেছিলো, দু-একটা টুকরো ব্যঙ্গোক্তি ছিটকে এলো উষার কানে—

হায় সখি, কেমনে ধরিব হিয়া—
আমারি বঁধুয়া আন্ বাড়ী যায়,
আমারি আঙিনা দিয়া।

উঃ! কাটা ঘায়ে যেন নুণের ছিটে। তীব্র অভিমানে একদিন উষা বলে ফেললো, আমাকে পড়াতে আর হবে না অনিরুদ্ধ! কারণ পরীক্ষা আমি এবারে দেব না! মহা বিস্ময়ভরে বলে অনিরুদ্ধ। পাগলামি না কি? এ কি অদ্ভুত খেয়াল চাপলো তোমার মাথায় উষা? পরীক্ষা দেবে না কেন?

আরক্তমুখে, তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দেয় উষা—খেয়াল?

না খেয়ালী আমি নই। খেয়াল খুসিতে মেতে যারা অপরের জীবন নষ্ট করে তাদের মুখে একথাটা বড়ই বেমানান অনিরুদ্ধ!

স্তম্ভিত ভাবে অনিরুদ্ধ কিছুক্ষণ চেয়ে ছিলো ওর মুখের পানে! এ কি জঘন্য মনের পরিচয় আজ দিলো উষা! একজন অসহায়া দরিদ্র মেয়ের প্রতি এ ধরণের বিদ্বেষ, এমন হীন সন্দেহ, এ কি সত্যই সম্ভব এই রূপসী, বিদুষী, ধনীর দুলালীর পক্ষে?

উষা অনিরুদ্ধকে নির্ব্বাক হয়ে থাকতে দেখে অনিরুদ্ধ আক্রোশে জ্বলে ওঠে। উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে উঠে বলে,—তোমার অভিনয় চমৎকার! তবে মনে রেখো, তুচ্ছ খেয়াল মেটাতে মেয়েদের জীবন নিয়ে যে খেলা চলেছে তোমার, এর পেছনে আসছে তার নির্ম্মম প্রতিক্রিয়া! এ খেলায় যতটা সুখ পাচ্ছ—

আরো কি বলতে গিয়ে বলা আর হল না, উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগকে দমন করতে করতে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো উষা!

তারপর সে আর কলেজে আসেনি। অনিরুদ্ধও আর যায়নি ওদের বাড়ীতে। কিন্তু কি করতে কি হল? উষার উপর সাময়িক ভাবে রাগত হলেও, অনিরুদ্ধর জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে যে ওর মধুক্ষরা স্মৃতি! সে স্মৃতি যে আজ দাবানল জ্বালিয়ে দিয়েছে ওর অন্তরে।

মাঝে দু'-একদিন দ্রুত চলমান মোটরে দেখেছে অনিরুদ্ধ উষাকে আর তার পাশে উপবিষ্ট দামী স্যুটপরা এক সুশ্রী যুবককে। মনে চাপা বেদনা গুম্রে ওঠে। তবুও নিজেকে বোঝায়;—ওর সুখেই সুখী হওয়াই তো তোমার প্রেমিক-মনের ধর্ম্ম! মাঝে মাঝে ভেবেছে অনিরুদ্ধ যাবে উষার কাছে, ক্ষমা চেয়ে নেবে, তার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির। তার এখনও দৃঢ় বিশ্বাস উষা ওকে দেখলে নিজেকে আর দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না, সে হয় তো এখনও প্রতিদিন ওর প্রতীক্ষায় বসে থাকে। ওপরের দৃশ্যগুলো ওর ছলনা মাত্র। কিন্তু এসব স্তোকবাক্যে মন যে মানে না! পুরুষত্বের অহমিকা ওর অভিসারের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়।

প্রায় চার মাস কেটে গেলো—ফিরে এলো শ্রাবণ মাসে ঝুলন-পূর্ণিমা। সারা দিন শূন্য ভবনে অশান্ত মনের মর্ম্মদাহ জ্বালা বুকে নিয়ে কাটালো অনিরুদ্ধ। বাইরে যেন শোনা যাচ্ছে কার পদশব্দ! বুঝি আসছে তার অভিমানী প্রিয়া! হাতে জরি ঝলমলো রাখী, আর সুগন্ধি পুষ্পমাল্য নিয়ে। কৈ না! বৃথা প্রতীক্ষায় আকুলচিত্ত ব্যর্থ মুহূর্ত্তের পদধ্বনি আর শুনতে পারে না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই আকাশে দেখা দিলো ষোলকলায় পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ। না, ওর পানে চাইতে পারা যাবে না। দু'চোখ ঢেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় অনিরুদ্ধ। দূরসম্পর্কীয়া পিসিমা ক'দিন ছিলেন এখানে। অনিরুদ্ধ বলে, চলো পিসিমা দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যাই।

পিসিমাকে নিয়ে গাড়ী চালিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো অনিরুদ্ধ। ছুটে গিয়েছিলো সর্ব্বসন্তাপহারিণী ভবতারিণীর চরণপ্রান্তে। প্রাণভরে কেঁদেছিলো মায়ের দুয়ারে বসে—শিশুর মত ব্যাকুলকণ্ঠে চেয়েছিলো, মা গো, একটু শান্তি দাও মা! বুকটা বড় জ্বলে যাচ্ছে।

অনেক রাত্রে বাড়ীতে ফিরে হিন্দুস্থানী বুড়ো চাকরের কাছে শুনলো সে, বালিগঞ্জ থেকে দিদিমণি এসেছিলেন: তা, ও বলে দিয়েছিলো, বাবু তো বাড়ী নেই, কিছু বলতে হবে?—দিদিমণি একদম ছুটে নেমে গিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়ে গাড়ী চালিয়ে দিলেন, কিছু জবাব করলেন না।

ওঃ! আবার অনুশোচনার দংশন!—সে এসে ফিরে গেছে? কি করবে অনিরুদ্ধ? এখনি যাবে তার কাছে? কিন্তু রাত যে বারোটা বেজে গেছে, লোকে ভাববে কি?

তার পরদিনই গিয়েছিলো অনিরুদ্ধ! কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরে এলো। উষা তার দাদা আর দাদার এক বন্ধুর সঙ্গে আজ ভোরে মোটরে দীঘা রওনা হয়ে গেছে। ফিরতে চার-পাঁচ দিন দেরী হবে।

উষার ছোট ভাইটির কাছে আরো জানলো, ফিরে এলে, দাদার ঐ বন্ধুর সঙ্গে দিদির বিয়ে হবে। বাবা আর মা কবে থেকে বলছিলো দিদিকে ঐ সরোজদার কথা, দিদির মত আর হয় না! কিন্তু কাল রাতে দিদির যে কি হল, মাকে ডেকে নিজেই বললো, সরোজদাকে বিয়ে করবে। সরোজদাও তখন ছিলো, অমনি ওদের ঠিক হল, আজ যাবে দীঘায় বেড়াতে, আর ফিরে এলেই বিয়ে হবে। —দেখুন না স্যার, আমার এত ইচ্ছে করছিলো ওদের সঙ্গে যাবার; কিন্তু ওরা আমার কথা মোটে গেরাহ্যি-ই করলো না,—আচ্ছা আমিও ঠিক করেছি পূজোর ছুটিতে একলাই দার্জ্জিলিং যাবো! কারুকে আমার দরকার নেই। ছেলেটি চোখ ছলছলিয়ে বসে রইলো।

শূন্য মনে অনিরুদ্ধ ফিরে এলো!

দিন কতক পরে উষার দাদা এসে একখানি গোলাপী খাম দিয়ে জানিয়ে গেলো, উষার বিয়ে। আপনার অবশ্যই যাওয়া চাই! সে বড় ব্যস্ত আছে সেজন্য আসতে পারলো না, ইত্যাদি।

এ পাড়ায়ও বিয়ে লেগেছে একটা বাড়ীতে! কাল সারা দিন সারা রাত সানাইয়ের করুণ রাগিণী ওকে যেন পাগল করে তুলেছে। মিলন-রাগিণীর মাঝে ও অনবরত শুনেছে বিসর্জ্জনের সুর।

সারা রাত ইজিচেয়ারে বসে, একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়েছে। ভোর হয়ে আসছে; মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা! দু'রগের শিরার দপদপানি। বড় অসহ্য লাগছে! বুড়ো চাকরটাকে ডেকে বললো অনিরুদ্ধ, বাড়ীর ফটক বন্ধ করো, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি! গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে এলো সে জনশূন্য পথে,—কোথায় যাবে? হ্যাঁ, গঙ্গার ধারে সেই গাছতলার বেঞ্চি? বড় লোভনীয় জায়গাটা।

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে বসে থাকতে থাকতে কখন তন্দ্রার আঠায় জড়িয়ে গেছে উষার চোখ দুটো। পরিশ্রান্ত, দগ্ধ অনুভূতির কেন্দ্র-স্থলে, যেন কে বুলিয়ে দিলে পরম প্রশান্তির প্রলেপ। কি মধুর স্বপ্ন ঘোর নেমে এসেছে ওর চিত্তাকাশে। যেন কার, কোন পরম বাঞ্ছিতের অদৃশ্য স্পর্শমণি জ্বলে উঠেছে ওর অবচেতন মনের মণিকোঠায়! আর কি স্বর্গীয় আনন্দের শিহরণ খেলে যাচ্ছে প্রতি ধমনীর ভেতর। শ্বাসে-প্রশ্বাসে যেন ভেসে আসছে বড় পরিচিত বড় ভালোলাগা একটি গন্ধ। কিসের গন্ধ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও যে একটা সিগারেটের গন্ধ। অনিরুদ্ধর হাতে জ্বলতো ঐ সিগারেট। ও গন্ধ অভ্রান্ত তার কাছে। অন্তরের গভীর অতলে চাপা মনটা বাণ-বেঁধা পাখীর মত ছটফট করে ওঠে—নিষ্ঠুর! কোথা তুমি? তোমার অবহেলার বিষাক্ত শরাঘাতে আমার হৃৎপিণ্ডটা যে ছিন্ন-ভিন্ন রক্তাক্ত হয়ে গেলো। কি ত্রুটি পেয়েছিলে আমার? তোমার ওপর রাগ করেছিলাম? তোমাকে দুটো জ্বালাভরা কথা শুনিয়েছিলাম? আগে তো শুনেছো এই জ্বালাময়ীর কাছে অনেক মিষ্টি কথা! তার সঙ্গে দুটো অপ্রিয় বাক্য গ্রহণ করতে পারলে না কেন? কেন বুঝলে না ওগুলো সব মিথ্যে প্রলাপ মাত্র? কেন চেয়ে দেখলেন না আমার প্রিয়-বিচ্ছেদ-আশঙ্কা উদ্বেলিত মনের দিকে? কেন শুনলে না তার হৃদয়ভাঙা আকুল ক্রন্দন? তোমাকে ভুলে গেছি এই তোমার ধারণা?—সাগর কি ভোলে চাঁদের প্রেম? উষা কি ভুলে যেতে পারে অনিরুদ্ধকে? কৈ তুমি তো একবারও ফিরে এলে না, ওগো তোমার একবার দর্শন পেলে, একটি কথা শুনলে, সব যে ঠিক হয়ে যেতো,—আমি যে আকুল প্রতীক্ষা নিয়ে কত দিন-রাত অপেক্ষা করলাম তোমার জন্য—তুমি তো এলে না? আমি যে মনে মনে রোজ ছুটে গেছি তোমার সন্ধানে,—কিন্তু দুস্তর লজ্জার আর নিষ্ফল অভিমানের প্রাচীর বাইরে রেখেছিলো আমাকে আবদ্ধ করে।

আমাকে দেখেছো সরোজের সঙ্গে বেড়াতে? কি ভাবলে তুমি? ওকে ভালোবেসেছি? মিথ্যে কথা। জগতের সব চেয়ে বড় মিথ্যা এই যে, যে পুরুষের সোনার কাঠির পরশে জেগে ওঠে নারীর সুকুমার বৃত্তিগুলো; খুলে যায় তার মনের রুদ্ধকপাট, টুটে যায় নারীর যুগ যুগান্তের নিদ্রার জড়তা! তার মনোমন্দিরে যে দেবতার প্রথম পদচিহ্ন অঙ্কিত হোল, প্রথম আঁখি মেলে সে দেখলো যার মোহন রূপ, অমৃত-সিঞ্চনে যে পরমপুরুষ প্রেমমন্ত্রে করলো দীক্ষা দান, তাকে ভুলতে পারে না কোনো নারীর সচেতন মন। মনের স্বর্ণদেউলে, পায় না অপর কোনো পুরুষ, প্রবেশাধিকার। যা দেখেছো, যা বুঝেছো, ও-সব তোমার মনে বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বালবার একটা বাহ্যিক প্রচেষ্টা মাত্র।

প্রবল জ্বরে বিকারের ঘোরে রোগী অনেক সময় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়, কত কি অঘটন ঘটায়, কত প্রলাপ বকে। সে কি বুঝতে পারে, সে কি করছে? তার মানসিক বিকার আর ব্যাধির তীব্র যাতনা ওকে দিয়ে করিয়ে নেয় ঐ সব! তাই আমিও করেছিলাম,—তোমার নির্লিপ্ত মনকে আকর্ষণ করবার জন্যে, তোমার প্রতি প্রতিশোধ নেবার অদম্য বাসনার তাগিদে মিশেছিলাম ঐ মূল্যহীন শিমূল ফুলটার সঙ্গে!—তোমার বাড়ীর আশে-পাশে গাড়ী করে ঘোরাফেরা করেছি, তুমি ফিরে চাইবে বলে

কিন্তু হায়, তুমি যে কত বড় নির্ম্মম, পাষাণ তা বুঝিনি আগে বুঝতে পারলাম,—যেদিন সকল লাজলজ্জা অপমানের দুর্লঙ্ঘ্য সরিয়ে রাখী পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় ছুটে গেলাম তোমার কাছে, গিয়ে শুনলাম তোমার চাকরের কাছে, "বাবু মাইজীকো সাথ বাহার গিয়া! মাইজী! কে মাইজী? ওগো কে কেড়ে নিলে আমার শাশ্বত অধিকারকে?

কে সে? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, সে হচ্ছে মাধুরী সেন। মনটা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, দু'হাতে তার টুঁটি চেপে ধরে তাকে হত্যা করলাম।

বাড়ী ফিরে দেখি বসে আছে সরোজ, দাদার ঘরে। হ্যাঁ একটা কিছু করতে হবে, এ প্রহসনের সমাপ্তির রেখা টানতে হবে। যাকে জানালাম, আমার সম্মতি আছে বিয়েতে। তবে একটা সর্ত্তে, কাল ভোরবেলায় অনেক দূরে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে আমাকে। সরোজ তো প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলো আনন্দে। তখনি স্থির হয়ে গেলো। পরদিন ভোরে পালিয়ে গেলাম আমি, আমার নিজের কাছ থেকে!

কোথায় গেলাম, কি দেখলাম, কি কথা বলেছিলাম, আর তো কিছুই আমার জানা নেই? কারণ ঐ ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রেই আমার মনের মৃত্যু ঘটেছিলো। তারপর যে রইলো, সে আমার মনের প্রেতাত্মা। সে নিরবলম্ব, বায়ুভূত মহাশূন্য।

ভারি কৌতূহল নিয়ে চেয়ে দেখছি বাড়ীতে এত উৎসব কিসের? এত সুন্দর সুন্দর শাড়ী ব্লাউস, মণিমুক্তাখচিত আভরণ, এত লোকের কোলাহল, এত আলো, এত ফুল, এ সব কিসের জন্য? আমি তো মরেছি, এ সব কি আমার চিরবিদায়ের শোভাযাত্রার আয়োজন? কাল আবার সকাল থেকে বাড়ীতে সানাই বাজছে। উঃ! কি কান্নাভরা সুর ওর? হ্যাঁ আমি ঠিকই শুনেছি, অনিরুদ্ধ কাঁদছে, উষা কাঁদছে। কাঁদছে ঐ সুরের মধ্যে শত বিদেহী প্রেমিকার অতৃপ্ত আত্মা।

রাত হল। ভারি রাতের কোলে ঘুমে ঢলে পড়লো বাড়ীর প্রতিটি জাগ্রত প্রাণী। আমি জেগেছিলাম, আমার দু' চোখে জ্বলছিলো মশাল, আর বুকে জ্বলছিলো চিতার আগুন। নিজের মনে হেসে উঠছিলাম,—একটা কথা ভেবে। কাল এই সময় কত মিথ্যে হয়ে যাবে সব আয়োজন। মা কাঁদবে? বাবা কাঁদবেন? তা কাঁদুন ওরা! আমিও তো কত যাতনা ভোগ করলাম, কত কান্না কাঁদলাম। দাদা আছে, মিনু, চিনু আছে, ওরা আবার ভুলিয়ে দেবে মা-বাবার সব যন্ত্রণা। কিন্তু আমাকে কে ভোলাবে? কে নেবাবে আমার বুকের এই অনির্ব্বাণ চিতার আগুন? কেউ নেই। যে ছিলো, সে হারিয়ে গেছে জীবনে।

ভোর হয়ে আসছে। নিঃশব্দে উঠে এসে উঁকি মেরে দেখে নিলাম, মা বাবাকে ভাইদের, ছোট বাচ্চু বোনকে। আর কোনো ভয় নেই, কোনো নালিশ নেই কারুর বিরুদ্ধে! মনে পেয়েছি এক অভূতপূর্ব ঐশ্বরিক চেতনার আলো। সেই আলোয় দেখতে পেয়েছি আমার পথ।

গাড়ী বার করে নিলাম গ্যারেজ থেকে। দারোয়ানকে বলে এসেছি, বাবুকে বোলো দিদিমণি একটু বেড়াতে বেরিয়েছেন।

এসেছি গঙ্গার ধারে, ঐ যে পত্রবহুল নাম-না-জানা গাছটা। ও যে মিনতি জানিয়ে পাতার ঝালর দুলিয়ে ডাকছে আমায়, যাবেই তো গঙ্গার কোলে, একটু বসে যাও আমার কাছে। তোমরা যে আমার বড় চেনা।

না এ আকর্ষণ কাটানো গেলো না, আসতেই হল ওর তলায়।

কিন্তু সব যেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে? ও গন্ধটা কিসের? কোন্ মৃতসঞ্জীবনীর পরশ লাগছে যেন দেহে-মনে? জীবন-নদীতে আসছে বিপুল জোয়ার। চট্ করে উষার চোখ ছেড়ে ছুটে পালালো তন্দ্রা।

উষা মুখ ফিরিয়ে চাইলো অনিরুদ্ধর দিকে। তার পর মহাবিস্ময় আর সুতীব্র পুলকোচ্ছ্বাসের সংঘাতে থরথরিয়ে কেঁপে উঠে ছিন্ন লতিকার মত লুটিয়ে পড়লো ওর দেহখানা বেঞ্চির হাতলের ওপর।

পরম স্নেহভরে ওকে ধরে তুলে ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করে অনিরুদ্ধ। আজ তো তোমার বিয়ের দিন; এমন সময় এখানে এসেছিলে কেন উষা?

চোখ তুলে অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে ওর দিকে চায় উষা। সে চোখের তারায় রহস্য চিকমিকিয়ে ওঠে।

পরম ক্লান্তি ভরে জবাব দেয়, তুমি এখানে এমন সময় কেন এসেছো অনিরুদ্ধ? বিয়ে? কার বিয়ে? মড়ার আবার বিয়ে হয়? মড়ার ওপর ওরা বড় খাঁড়ার ঘা দিচ্ছে, তাই নিজেই বয়ে নিয়ে এলাম নিজের শবদেহটাকে ঐ গঙ্গার জলে বিসর্জন দেব বলে।

—উষা! এ তুমি কি বলছো? অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে অনিরুদ্ধ।

ঠিকই বলছি। এই দেখো। চঞ্চল ভাবে উঠে দাঁড়ায় উষা।

উন্মাদের মত ওকে নিজের বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে বেঁধে ফেলে অনিরুদ্ধ। কোথায় যাবে? আমি যেতে দেব না। তুমি যে একান্ত আমার! মৃত্যুর সাধ্য কি তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়?

তখন ভোরের থমথমে অন্ধকার সরে গেছে। পূর্ব্ব দিগন্তের সিঁড়ি বেয়ে নব-অনুরাগিণী, লাজনম্রা উষা, রক্তাম্বরে অবগুণ্ঠন টেনে ধীরে ধীরে চলেছে প্রিয় সন্নিধানে।

অনিরুদ্ধ আবেগভরে ডাকে—চলো উষা, আমরা যাই।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ক্ষীণ স্বরে উষা বললো, কোথায়?

—দূরে, অনেক দূরে,—তুমি তো জীবন বিসর্জ্জন দিতে এসেছিলে? তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি আমি। এতে আর কারুর অধিকার নেই উষা।

দু'চোখ পুলকাবেশে নিমীলিত হয়ে আসে উষার। ঠোঁটে ফুটে ওঠে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দসিক্ত মৃদু হাসি।—মোহনস্বরে জবাব দেয়—

অধিকার কোন দিন কারুর ছিলো না। তবে তোমাকে হারিয়ে মন আমার মরেই গিয়েছিলো, আজ শুধু এসেছিলাম দেহটাকে বিসর্জন দিতে। সেই শবদেহে নতুন জীবন প্রতিষ্ঠা করলে তুমি। জগতের কাছে আপাতদৃষ্টিতে আমি মৃতই রয়ে গেলাম।—তখন দু-চার জন স্বাস্থ্যান্বেষীর আনাগোনা সবে সুরু হয়েছে উন্মুক্ত ময়দানে, গঙ্গার ধারে। গাছে গাছে বিহগকুল প্রভাত-বন্দনার সুরের আলাপ ধরেছে। মসৃণ জলে-ভেজা পিচের রাস্তায় হু-হু শব্দে মোটরযানে ছুটে চলেছে অনিরুদ্ধ উষাকে নিয়ে।

পেছনে রইলো বেদনাময় অতীত। আর রইলো উষার শূন্য মলিন গাড়িখানা!

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

রাজা সৌদের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ—

মধ্য প্রাচ্য সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের পরিকল্পনা যে বিতর্ক সৃষ্টি করিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে সৌদীআরবের রাজার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফর যে খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ একথা অনস্বীকার্য্য। ইরাকের যুবরাজ আবদুল ইল্লাহের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গমন অপেক্ষাও তাঁহার সফরের গুরুত্ব অনেক বেশী। ইরাক বাগদাদ চুক্তির অন্যতম সদস্য। মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের পরিকল্পনাও ইরাকের সমর্থন লাভ করিয়াছে। এই দিক দিয়া ইরাক যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে 'গুড বয়,' একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ইরাক আর কি কি সাহায্য পাইতে পারে ইরাকের যুবরাজ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত তাহারই আলোচনা করিতে পারেন। কিন্তু আইসেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিন সম্পর্কে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের মত পরিবর্ত্তন করিবার মত প্রভাব বিস্তার করিবার ক্ষমতা ইরাকের নাই। মিশর, সিরিয়া, জর্ডান ও সৌদী আরব বাগদাদ চুক্তির বিরোধী। সৌদীআরবের রাজবংশ এবং ইরাকের রাজবংশের মধ্যে বিরোধও অনেক দিনের। মিশর, সিরিয়া ও জর্ডান সরকারী ভাবে আইসেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিনের বিরোধিতা করিয়াছে। সৌদীআরব অবশ্য প্রকাশ্যে এ সম্বন্ধে কিছু বলে নাই। কিন্তু জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে কায়রোতে মিশর, সিরিয়া, জর্ডান ও সৌদীআরব এই চারিটি আরব রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তরে যে সম্মেলন হয় তাহাতে আইসেনহাওয়ার-ডক্‌ট্রিনের বিরোধিতা করিয়াই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং সৌদীআরব এই প্রস্তাবের অন্যতম সমর্থক। তাঁহাদের অভিমত প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারকে জানাইবার জন্য উক্ত সম্মেলন সৌদীআরবের রাজাকে ক্ষমতা দান করে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে সৌদীআরবের রাজার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফরের সহিত আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনার যে বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সৌদীআরবের রাজা যখন যুবরাজ ছিলেন সেই সময় তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু সৌদীআরবের রাজা হিসাবে ইহাই তাঁহার প্রথম মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফর। এই সফরের গুরুত্ব সত্ত্বেও নিউইয়র্কের মেয়র নিউইয়র্ক নগরীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জানাইতে অস্বীকৃত হন। ইহার যে-সকল কারণ তিনি উল্লেখ করেন সেগুলি কূটনীতি বিরোধীই শুধু নয়, সৌদী-আরবের রাজার পক্ষেও শ্রুতিমধুর হয় নাই। নিউইয়র্ক সহরে ইহুদী এবং ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীদেরই প্রাধান্য। ইহা-ই অবশ্য উহার কারণ। নিউইয়র্ক নগরী তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা না করার ত্রুটি সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিয়াছেন স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার। রাজা সৌদ ওয়াশিংটন বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছিলে প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ার স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। সাধারণতঃ প্রেসিডেণ্ট হোয়াইট হাউসে উপস্থিত থাকিয়াই সম্মানিত অতিথিকে অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন, অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিমান ঘাঁটিতে কখনও যান না। সৌদী-আরবের রাজার অভ্যর্থনার ব্যাপারে সর্ব্বপ্রথম এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। প্রেঃ আইসেনহাওয়ার কেন স্বয়ং ওয়াশিংটন বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত হইয়া রাজা সৌদকে অভ্যর্থনা করিলেন, এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর বোধ হয় ইহাই যে, উহাও তাঁহার মধ্য প্রাচ্য পরিকল্পনারই একটি অংশ। মধ্য প্রাচ্য সম্পর্কে আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনা শুধু মধ্যপ্রাচ্যেই নয়, অন্যান্য নিরপেক্ষ দেশগুলিতেও আশঙ্কা এবং উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠী তীব্র ভাষায় উহার নিন্দা করিয়াছে। কিন্তু সৌদী-আরবের রাজার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গমন এবং প্রেঃ আইসেন-হাওয়ারের সহিত আলোচনা যে এই পরিকল্পনাকে রূপ দিবার একটা বিশিষ্ট ধারা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সৌদীআরবের রাজা কার্য্যতঃ যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তৈল-পুত্তলিকা (oil puppet) ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। কিন্তু বাগদাদ চুক্তি বিরোধীদের সহিত যোগদান করিয়া তিনি পশ্চিমীশক্তি বিরোধী যে-ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। আরব উপদ্বীপের উত্তর ও পূর্ব্ব উপকূলে বৃটিশের আশ্রিত যে সকল শেখ এবং সুলতান আছেন রাজা সৌদী অর্থ সাহায্য দিয়া তাঁহাদিগকে বৃটিশবিরোধী করিবার চেষ্টা করিতেছেন, বৃটেন এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। বৃটিশ-জর্ডান চুক্তি বাতিল করিতে হইলে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের নিকট হইতে জর্ডানের অর্থসাহায্য পাওয়া প্রয়োজন। জানুয়ারী মাসের (১৯৫৭) মাঝামাঝি কায়রোতে বাগদাদ চুক্তি বিরোধী যে চারিটি আরব রাষ্ট্রের সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে মিশর, সৌদী আরব এবং সিরিয়া এই তিনটি আরব রাষ্ট্র জর্ডনকে ১ কোটি ২৫ লক্ষ পাউণ্ড (ই) সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিশর ও সৌদী আরব প্রত্যেকে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং সিরিয়া ২৫ লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য দিবে। রাজা সৌদ মার্কিণ তৈল কোম্পানীর প্রদত্ত রয়েলটি বাবদ প্রচুর অর্থ পাইয়া থাকেন। উহার পরিমাণ বার্ষিক ৩০ কোটি ডলার। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার পক্ষে মধ্য প্রাচ্যে অর্থনৈতিক সাহায্য-দাতার ভূমিকা বেশী দিন গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। রাশিয়ার অর্থনৈতিক সাহায্য যদি আরব রাষ্ট্রগুলি গ্রহণ করে তবে উহার সম্মুখে সৌদীআরবের অর্থনৈতিক সাহায্যের কোন মূল্যই থাকিবে না। রাশিয়ার সাহায্য ঠেকাইতে হইলে মার্কিণ সাহায্য প্রয়োজন। তা ছাড়া সুয়েজ খাল বন্ধ হওয়ায় তৈল

হইতে রাজা সৌদের আরও কমিয়া গিয়াছে। কাজেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে তাঁহার অর্থনৈতিক সাহায্য পাওয়াও প্রয়োজন। যিনি তৈল বাবদ বৎসরে ৩০ কোটি ডলার রয়েলটি পাইয়া থাকেন তাঁহাকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে মার্কিণ কংগ্রেসকে সম্মত করান খুব সহজ হইবে কি না তাহা বলা কঠিন। সৌদী আরবের সামরিক সাহায্যও প্রয়োজন। রাজা সৌদ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ২০ কোটি ডলার হইতে ২৫ কোটি ডলার সামরিক সাহায্য চাহিয়াছেন। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

ঘরে-বাইরে সৌদী আরবের সমস্যা যেমন কম নয়, তেমনি সমস্যাগুলি কঠিনও বটে। বুরাইমি মরূদ্যান লইয়া বৃটেনের সহিত তাহার বিরোধটা অনেক দিনের। কিন্তু এই ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার হস্তক্ষেপ করিলে বৃটেনের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কটা আরও তিক্ত হইয়া উঠিবার আশঙ্কা আছে। মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার লইয়া মিশরের সহিত সৌদী আরবের প্রতিযোগিতা একেবারেই নাই, একথা বলা যায় না। মধ্যপ্রাচ্যে কর্ণেল নাসেরের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। রাজা সৌদ গোঁড়া রক্ষণশীলদের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকেন। কিন্তু কর্ণেল নাসেরের বিরোধিতা করার যে বিপদ আছে তাহাও তিনি ভাল করিয়া জানেন। আবার কর্ণেল নাসেরের সহিত মিত্রতা করার পরিণাম যে খাল কাটিয়া কুমীর আনার মতই তাহাও তিনি ভাল ভাবেই বুঝিতে পারিতেছেন। তৈল হইতে যে-বিপুল অর্থ রয়েলটিরূপে পাওয়া যায় তাহা তাঁহার ও রাজপরিবারের ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত আয়রূপে গণ্য হইয়া থাকে। রাজপরিবারের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র শিক্ষিত শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহারা ঐ অর্থকে সরকারী অর্থরূপে গণ্য করিবার এবং উহার উপযুক্ত হিসাব রাখিবার দাবী তুলিয়াছে। সংস্কারপন্থীরা রাজপরিবারের শাসনের পরিবর্তে দাবী করিতেছেন জাতীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার। ইহার উপর কায়রো রেডিও হইতে জনগণের জয় এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা আরব জগতে প্রচার করা হইতেছে। রাজা সৌদ উহার বিপদের কথা ভাল করিয়াই জানেন। মিশরীয় শিক্ষকরা সৌদী আরবের স্কুলগুলিতেও প্রবেশ করিয়াছেন। এই বিপদ ছাড়াও সামরিক ব্যাপারে তিনি উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

সৌদী আরবের প্রাক্তন রাজা ইবন সৌদ উপজাতীয় ওয়াহবীদের সাহায্যে আরবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তৈল হইতে অর্থাগম আরম্ভ হওয়ার পর তাঁহার শাসন ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সঙ্গে ওয়াহবীদের ক্ষমতাও হ্রাস প্রায়। কিন্তু এখন দেখা দিয়াছে এক নূতন সমস্যা। সৌদী আরব বাহিনীতে মার্কিণ উপদেষ্টা অবশ্যই আছে। কিন্তু মিশরের সহিত চুক্তির ফলে মিশরীয় সামরিক মিশনও আসিয়াছে। সৌদী আরব বাহিনীর তরুণ অফিসারদের উপর মিশরীয় সামরিক উপদেষ্টাদের প্রভাবের পরিণাম কি হইতে পারে তাহা তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না। বাহিরের লোক তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করে রাজা সৌদ তাহা পছন্দ করেন না। এই কারণেই কয়েক বৎসর পূর্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পারস্পরিক দেশরক্ষা চুক্তিতে সৌদী আরব রাজী হয় নাই। সৌদী আরবের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে, এই অজুহাতে মার্কিণ কারিগরী মিশনকে সৌদী আরব হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল। পশ্চিমী শক্তি-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রাজা সৌদ তাঁহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু সৌদী আরবের উপর কর্ণেল নাসেরের প্রভাবের কথাও তাঁহাকে চিন্তা করিতে হইতেছে। বৃটেন ও ফ্রান্সের আক্রমণের ফলে কর্ণেল নাসের যে খুবই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সুয়েজ খালের উপর আধিপত্য রক্ষার প্রশ্ন লইয়া তিনি খুবই বিব্রত। ইহার উপর মিশরীয় সৈন্যবাহিনীকে আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার সমস্যাও আছে। কর্ণেল নাসের যদি এই সকল সমস্যা কাটাইয়া উঠিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন। তাঁহার সম্মুখে রাজা সৌদ শুধু ম্লান হইয়াই যাইবেন না, নাসেরের সাফল্যের প্রতিক্রিয়া সৌদ আরবের অভ্যন্তরেও দেখা দিবে। উহার ফলে রাজা সৌদের সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্য বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহার বন্ধু ও সাহায্য প্রয়োজন। আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনার সাফল্যের জন্যও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরও মধ্যপ্রাচ্যে একজন বিশিষ্ট মিত্র প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই রাজা সৌদের আমেরিকা ভ্রমণ এবং প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের সহিত তাঁহার আলোচনার ফলাফল বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে তাঁহার পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার উপায় হিসাবেই রাজা সৌদকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রাজা সৌদও এই আমন্ত্রণকে নিজের জন্য কিছু সুবিধা আদায়ের সুযোগে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দুই দিক হইতেই যে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দশ দিনব্যাপী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর রাজা সৌদ ১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) স্পেনে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রেঃ আইসেনহাওয়ার এবং রাজা সৌদ তাঁহাদের মধ্যে আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে যে ছয় দফাবিশিষ্ট যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন উহা হইতে উভয়ের উদ্দেশ্যই যে বহুল পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিশ্বশান্তির জন্য সৌদী আরবকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উভয়েই একমত হইয়াছেন। সৌদী আরবকে শক্তিশালী করার সহিত ইস্তাহারের পঞ্চম দফার সম্বন্ধ খুব নিবিড়। সৌদী আরবের ধাহ্‌রানে যে মার্কিণ বিমানঘাঁটি আছে তাহার মেয়াদ আরও পাঁচ বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তাছাড়া সৌদী আরব বাহিনীকে শক্তিশালী করিবার জন্য প্রেঃ আইসেনহাওয়ার রাজা সৌদকে আশ্বাস দিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে দেশরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ এবং সৈন্যদিগকে শিক্ষাদান সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনা করা হইতেছে। সৌদী আরবের সৈন্য বাহিনী কায়রোস্থিত যৌথ আরব কম্যাণ্ডের অধীন। মার্কিণ সামরিক সাহায্যের ফলে যৌথ আরব কম্যাণ্ডের গতি কি হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন। মিশর, সৌদী আরব, সিরিয়া, জর্ডান ও ইয়েমেন এই পাঁচটি আরব রাষ্ট্র লইয়া যে আঁতাত গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে অনেকে 'নাসের ফেডারেশন' নামে অভিহিত

করিয়াছেন। মার্কিণ সামরিক সাহায্য পাইয়া সৌদী আরব অতি শীঘ্র এই আঁতাতের বাহিরে চলিয়া আসিবে এবং সৌদী আরব বাহিনীকে যৌথ আরব কমাণ্ডের আওতা হইতে মুক্ত করা হইবে, ইহাও স্বীকার করা কঠিন। ইহা করিতে গেলে যে-উদ্দেশ্যে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার রাজা সৌদকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইবে।

মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত উপায়ে মীমাংসা করার অভিপ্রায়ও যুক্ত ইস্তাহারে উল্লেখ করা হইয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা রাজ্যের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে যে কোন আক্রমণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অভিপ্রায় ও নীতি অনুযায়ী প্রতিরোধ করা হইবে। মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শান্তিতে বাস করা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বচ্ছলতা ভোগ করার দাবীও স্বীকার করা হইয়াছে। ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্যেরই একটি রাষ্ট্র। ইসরাইল রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইতেই আরব-ইসরাইল বিরোধ চলিতেছে। আরব রাষ্ট্রগুলি মধ্যপ্রাচ্য হইতে ইসরাইল রাষ্ট্রকে নিশ্চিহ্ন করিতে চায়। যুক্ত ইস্তাহারের উল্লিখিত ঘোষণা দ্বারা আরব-ইসরাইল বিরোধের মীমাংসা সহজ হইবে কি না, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। যুক্ত ইস্তাহারে রাজা সৌদি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত নিবিড় সহযোগিতা বজায় রাখার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কের উন্নতি সাধন করিতে অন্যান্য আরব নেতাদের অভিপ্রায়ও তিনি বহন করিয়া আনিয়াছেন। ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত ইস্তাহারে আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের কথা আদৌ উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু গত ৬ই ফেব্রুয়ারী রাজা সৌদ ওয়াশিংটনে প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের মধ্যপ্রাচ্য পরিকল্পনার ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি খুসী হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, পরিকল্পনাটি ভালই। আরব রাষ্ট্রগুলি এই পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া উহার গুণাগুণ দেখিতে পারেন। দেশে ফিরিয়া আরব দেশগুলির সহিত এবিষয়ে তিনি আলোচনা করিবেন, রাজা সৌদ ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা খুব সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করায় প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের মধ্যপ্রাচ্য পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার পথে একটি প্রধান অন্তরায় অতিক্রম করা সম্ভব হইয়াছে।

নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সমস্যা—

নিরাপত্তা পরিষদে আবার কাশ্মীর সমস্যা আলোচনার জন্য পাকিস্তান যে আবদার ধরে, তদনুসারে গত ১৬ই জানুয়ারী (১৯৫৭) নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ১৯৫২ সালের ২৩শে ডিসেম্বরের পর কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের ইহা-ই প্রথম অধিবেশন। কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিবার যে সিদ্ধান্ত কাশ্মীর গণপরিষদে গৃহীত হয় তাহা কার্য্যকরী করার তারিখ স্থির হয় ২৬শে জানুয়ারী। উহা রোধ করিবার উদ্দেশ্যেই পাকিস্তানের এই আবদার। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মালিক ফিরোজ খাঁ নুন পাকিস্তানের দাবী উত্থাপন করিয়া আলোচনার উদ্বোধন করেন। এই বক্তৃতায় তিনি কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জবাহিনী প্রেরণের এবং কাশ্মীরের ভারতভুক্তি নিরোধের জন্য নির্দ্দেশজারীর দাবী উত্থাপন করেন। ২৪শে জানুয়ারী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, কলম্বিয়া ও কিউবা এই পঞ্চশক্তি কাশ্মীর সম্পর্কে এক খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং ২৫শে জানুয়ারী এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এগার জন সদস্যের মধ্যে ১০ জনই এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। রাশিয়া ভোটদানে বিরত ছিল। এই প্রস্তাব সম্পর্কে প্রথমেই ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের প্রতিনিধি শ্রী ভি কে, কৃষ্ণমেননের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই এই প্রস্তাবটি রচিত হয় এবং নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হওয়ার কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই উহা প্রকাশ করা হয়। পাকিস্তানকে সমর্থন করিবার জন্য প্রস্তাবের রচয়িতারা এত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, শ্রীমেননের বক্তৃতা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্যও তাঁহাদের ছিল না। ভারতের বক্তব্য সম্পূর্ণ শুনিবার পূর্ব্বেই এই পঞ্চশক্তি তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাখায় তাঁহাদের ভারতবিরোধী মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের ভারতবিরোধী মনোভাবের কথা যে আমরা জানি না তাহা নয়। শ্রীমেননের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরে প্রস্তাবটি রচিত হইলেই যে উহা অন্যরূপ হইত তাহাও আমরা মনে করি না। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই প্রস্তাব রচনা করায় পাকিস্তানকে সমর্থন করিতে তাঁহাদের নির্লজ্জ আগ্রহই প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র।

উক্ত প্রস্তাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিচালনায় কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের নীতিতে নিরাপত্তা পরিষদ অবিচলিত থাকার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, কাশ্মীরের ভাগ্য নির্দ্ধারণের জন্য কাশ্মীর গণপরিষদ কিছু করিলে তাহা দ্বারা কাশ্মীরের গঠন প্রকৃত নির্দ্ধারিত হইবে না। নিরাপত্তা পরিষদ যে কাশ্মীর বিরোধ সম্পর্কে বিবেচনা চালাইয়া যাইতেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রস্তাবে তাহাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য যে দুইটি তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়। প্রথম উদ্দেশ্য কাশ্মীরের ভারতভুক্তিকে অসিদ্ধ করা। কাশ্মীর কোন্ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে, এই প্রশ্নটির কোন মীমাংসা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা উহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। এই প্রস্তাব যে কাশ্মীর সমস্যাকে নূতন রূপ দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পাকিস্তান যে আক্রমণকারী, এই বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করা হইয়াছে এবং কাশ্মীরকে পরিণত করা হইয়াছে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি বিরোধীয় অঞ্চলে। কাশ্মীর গণপরিষদ ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত করিয়া যে নূতন কিছু করে নাই, মহারাজা কর্ত্তৃক কাশ্মীরের ভারতভুক্তিকে নূতন করিয়া ঘোষণা করিয়াছে মাত্র, এই সত্যকে মোটেই আমল দেওয়া হয় নাই। পশ্চিমী শক্তিবর্গ এবং তাঁহাদের তাঁবেদারের নিকট হইতে অন্যরূপ প্রত্যাশা করা যে দুরাশা মাত্র, তাহাও আমরা জানি। কিন্তু রাশিয়া প্রস্তাবটিতে ভেটো দেয় নাই. কেবল ভোটদানে বিরত ছিল. ইহা বিস্ময়ের বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু হাঙ্গেরীর ব্যাপারে ভারত যে-মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিল, উহা যে তাহারই প্রতিক্রিয়া, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতের বিরোধী। রাশিয়ার সমর্থনও ভারত হারাইল। ভারতকে এই মূল্য দিয়া নিরপেক্ষ নীতি রক্ষা করিতে হইতেছে।

নিরাপত্তা পরিষদে এবার প্রথম দফার পাকিস্তানেরই জয়

হইয়াছে। অবশ্য পূর্ব্বেও কার্য্যতঃ পাকিস্তানেরই জয় হইয়াছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে নিরাপত্তা পরিষদ কি করিবে, ইহাই প্রশ্ন। ৩০শে জানুয়ারী পাক-পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ফিরোজ খাঁ নুন যে-বক্তৃতা দেন, তাহাতে কাশ্মীরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী প্রেরণ এবং কাশ্মীর হইতে উভয় পক্ষকে সৈন্য সরাইয়া লইবার নির্দ্দেশ দিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের নিকট আব্দার ধরিয়াছেন। ভারতের প্রতিনিধি শ্রীভি, কে, কৃষ্ণমেনন গত ১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) নিরাপত্তা পরিষদে তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় মিঃ নুনের সমস্ত উক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার ভাষা জ্বালাময়ী হয় নাই বটে, কিন্তু যুক্তি ও তথ্যে সুসমৃদ্ধ। কিন্তু পাকিস্তানকে সমর্থন করিতে যাঁহারা দৃঢ়সঙ্কল্প যুক্তি ও তথ্যে তাঁহাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন, হইবে এতখানি দুরাশা করিবার কিছুই দেখা যাইতেছে না।

আলজেরিয়া ও ফ্রান্স—

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে আলজেরিয়া সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইলে ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ পিনো ১১৪ পৃষ্ঠাব্যাপী এক নির্লজ্জ বিবৃতি পাঠ করিয়া জানাইয়াছেন যে, আলজেরিয়া ফ্রান্সের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং আলজেরিয়ার ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ ফ্রান্স কিছুতেই মানিয়া লইবে না। কথাটা বিশ্ববাসীর কাছে নূতন নয়। ফ্রান্স বহু বার বিশ্ববাসীকে এই মিথ্যা উক্তি শুনাইয়াছে। আলজেরিয়া সমস্যা আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করায় উহার প্রতিবাদে ১৯৫৫ সালে ফ্রান্স সাধারণ পরিষদ হইতে বাহির হইয়া যায়। তথাপি ফ্রান্স এই অধিবেশনে যোগদান করিল কেন, মঃ পিনো তাহার কারণও বিবৃত করিয়াছেন। আলজেরিয়ার ব্যাপারে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিয়মিত ভাবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে নিন্দাচর্চ্চা চলিতেছে, প্রকাশ্য ভাবে তাহার উত্তর দেওয়া তাঁহার একটি উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ আলজেরিয়ার ব্যাপারে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বহর কত বাড়িয়াছে তাহাও তিনি উল্লেখ করিতে চান। তাঁহার তৃতীয় উদ্দেশ্য সদস্যদিগকে সদুপদেশ দান। ফ্রান্স যে-ভাবে সনদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রকে সেই ভাবে সনদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছেন। মঃ পিনোর নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য এই বিবৃতির মধ্যে সীমাহীন হইয়া উঠিয়াছে।

আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের অঙ্গ বলিয়া ঘোষণা করিয়া একটা আইন পাশ করিলেই আলজেরিয়া ফ্রান্সের অঙ্গীভূত হইল, ফ্রান্সের সীমান্ত আলজেরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল, নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদী ছাড়া আর কাহারও পক্ষে একথা বলা সম্ভব নয়। ইহা সকলেই জানে, ১৮৩০ সালের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত আলজেরিয়া নামে তুর্কী-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৃটেন ও ফ্রান্স মিলিত ভাবে ১৮২৪ সালে আলজেরিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু আলজেরিয়াবাসীর শৌর্য্যবীর্য্যের নিকট পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসে। ইহার পর ১৮২৭ সালে আবার ফ্রান্স আলজেরিয়া আক্রমণ করে। এবারও ফ্রান্স পরাজিত হয়। অতঃপর ১৮৩০ সালে ফ্রান্স পুনরায় আক্রমণ করে এবং উহা দখল করিতে সমর্থ হয়। এই ঐতিহাসিক সত্য কাহারও পক্ষেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক কমিটিতে মঃ পিনো যখন আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া দাবী করিতেছিলেন সেই সময় আলজেরিয়ার অধিবাসীরা হরতাল করিয়া তাঁহার দাবীর অসারতা প্রমাণ করিয়াছে। আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের ৪ লক্ষ সৈন্য স্বাধীনতাকামীদিগকে দমন করিবার কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে। মঃ পিনোর পক্ষে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, এই ৪ লক্ষ সৈন্য বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতেছে। কাহারা এই বিদ্রোহী? আলজেরিয়ার ফরাসী কোলোন বা ফরাসী ঔপনিবেশিক ছাড়া আর সকলেই বিদ্রোহী পর্য্যায়ভুক্ত। সুতরাং আলজেরিয়া যে ফ্রান্সের অঙ্গ তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আলজেরিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য ফরাসী গবর্ণমেন্টের চারি দফাবিশিষ্ট একটি প্রস্তাবও মঃ পিনো তাঁহার বিবৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন। গত জানুয়ারী মাসে (১৯৫৭) ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ মলে আলজেরিয়া সম্পর্কে যে পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছিলেন মঃ পিনো তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। এই পরিকল্পনার মধ্যে যে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রহিয়াছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই অস্পষ্টতার মধ্যে যাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহা এই যে, উহাতে আলজেরিয়ার অধিবাসীদিগকে স্বাধীনতা দিবার কোন কথা নাই।

ভারতে সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট ও মাঃ জুকভ—

সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট সুকরি এল-কুওয়াটলীর ১০ দিন এবং রাশিয়ার দেশরক্ষামন্ত্রী মার্শাল জুকভের ১৮ দিনব্যাপী ভারত ভ্রমণের একেবারেই কোন আন্তর্জাতিক গুরুত্ব নাই একথা বলা যায় না। পশ্চিম এশিয়ার আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সিরিয়া শুধু বাগদাদ চুক্তি বিরোধীই নয়, শুধু তথাকথিত 'নাসের ফেডারেশনের'ই সদস্য নয়, পশ্চিমী শক্তিবর্গের দৃষ্টিতে সিরিয়া কম্যুনিষ্ট শিবিরে যোগদান করিয়া ফেলিয়াছে। বৃটেন ও ফ্রান্স যখন মিশর আক্রমণ করিয়াছিল সেই সময় ইরাক সিরিয়া এবং ইসরাইল জর্ডান আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল বলিয়া পরে প্রকাশ পাইয়াছে। দামাস্কাসে এই চক্রান্তের আসামীদের বিচারের সময় একজন আসামী বলিয়াছে যে, ইরাক সিরিয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল এবং বৃটেনের মিশর আক্রমণের সময়েই বৃটিশ ও মার্কিণ এজেণ্টদের সহযোগিতায় আক্রমণ আরম্ভ করা স্থির করা হইয়াছিল। ভারতের মত সিরিয়াও পশ্চিম এশিয়ায় বৃটিশ প্রভাব বিলুপ্ত হওয়ায় শক্তিশূন্যতা ঘটিয়াছে একথা স্বীকার করে না।

সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট প্রথমে পাকিস্তানে যান এবং পাকিস্তান ভ্রমণ শেষ করিয়া ১৭ জানুয়ারী (১৯৫৭) নয়াদিল্লীতে পৌছেন। করাচীতে সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট ও পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্টের মধ্যে চারিদিন ব্যাপী আলোচনার পর যে-যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করা হয় তাহা হইতে ইহা বুঝা যায় না যে, পশ্চিম এশিয়ায় মির্জ্জা সুহরাবর্দ্দীর সফরের ফলে সিরিয়া ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক নিকটতর হইয়াছে। নয়াদিল্লীতে নেহরুজীর সহিত তাঁহার আলোচনার পর যে-যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করা হয় (২১শে জানুয়ারী) তাহাতে পশ্চিম এশিয়ার সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সামরিক দিক হইতে প্রচেষ্টার নিন্দা করা হইয়াছে। আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা নাই বটে, কিন্তু এই সমালোচনা যে উহার

সম্পর্কেই প্রযোজ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। বাগদাদ চুক্তি যে আরব জগতে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে তাহাও যুক্তবিবৃতিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। হাঙ্গেরীর কথা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু ঔপনিবেশিকতা যে-রূপই গ্রহণ করুক তাহার অবসান ঘটাইবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হইয়াছে।

রাশিয়ার দেশরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল জুকভ মঃ বুলগানিন ও মঃ ক্রুশেভের সহিতই ভারতে আসিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সময় তিনি আসিতে পারেন নাই। কিন্তু পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর ঘটনাবলী এবং পশ্চিম এসিয়া সম্পর্কে প্রেঃ আইসেন-হাওয়ারের পরিকল্পনা ঘোষিত হওয়ার পর তাঁহার ভারতে আগমনের গুরুত্ব যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মার্শাল জুকভ ২৪শে জানুয়ারী (১৯৫৭) নয়াদিল্লীতে পৌঁছেন। ঠিক সেই দিনই কম্যুনিষ্ট চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই মস্কো, ওয়ারস, বুদাপেস্ত এবং কাবুল ভ্রমণ করিয়া নয়াদিল্লীতে আসেন। দুই মাসের মধ্যে ইহা তাঁহার তৃতীয় বার ভারতে আগমন। তিনি প্রথমে আসেন নেহরুজীর ওয়াশিংটন যাত্রার পূর্ব্বে। নেহরুজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি পাকিস্তান সফরের পর আবার ভারত আসেন। অতঃপর তিনি মস্কো, পূর্ব্ব ইউরোপ এবং কাবুল ভ্রমণ করিয়া নয়াদিল্লীতে আসেন এবং নেহরুজীর সহিত তিন ঘন্টা আলোচনা করেন। মস্কো, পোল্যাণ্ড এবং হাঙ্গেরী ভ্রমণের পূর্ব্বে গত ডিসেম্বর মাসে নেহরুজীর সহিত তাঁহার যে আলোচনা হয়, তখন তাঁহারা হাঙ্গেরীর ব্যাপার সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। এবারের আলোচনায় এই মত-পার্থক্য দূর হইয়াছে, একথাও স্বীকার করা যায় না।

মস্কো হইতে চীন ও রাশিয়ার প্রকাশিত যুক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, প্রতিবিপ্লব দমনের জন্য হাঙ্গেরীর জনগণকে সাহায্য করিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন হাঙ্গেরী ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের শ্রমিকদের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। ওয়ারসতে চৌ-এন লাই পোলিশ কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং গবর্ণমেন্টের সহিত যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন তাহাতে হাঙ্গেরীর কাদার গবর্ণমেন্টকে সমর্থন করা হইয়াছে। এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মার্শাল জুকভের ভারতে আগমনের তাৎপর্য্য বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মার্শাল জুকভের ভারতে অবস্থানের সময়েই নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সম্পর্কে পঞ্চ শক্তির প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সামরিক চুক্তির বিরোধিতার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। হাঙ্গেরী সম্পর্কে ভারত যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে সোভিয়েট রাশিয়া ভারতের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহাতে রুশ-ভারত-মৈত্রী ক্ষুন্ন হইয়াছে কি না তাহা বুঝিয়া উঠা হয়ত খুব সহজ নয়। ক্ষুন্ন হইয়া থাকিলে মার্শাল জুকভের ভারত ভ্রমণের ফলে রুশ-ভারত মৈত্রী আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি না তাহাও বলা কঠিন।

মধ্যপ্রাচ্য ও বৃটেন—

২১শে মার্চ্চ হইতে ২৪শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বারমুডায় প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌মিলানের মধ্যে আলোচনা বৈঠক চলিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। বারমুডায় এই ধরণের বৈঠক এই প্রথম নয়। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল এবং ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মঃ জোসেফ লেনিয়েলের মধ্যে এক বৈঠক হইয়াছিল। এবার ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ মলের সহিত প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের আলোচনা পৃথক ভাবে ওয়াশিংটনে হইবে। বারমুডায় যে-সম্মেলন হইবে সুয়েজ সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার পর উহা-ই বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর সহিত প্রেঃ আইসেন-হাওয়ারের প্রথম সম্মেলন। এই সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা যে উভয় পক্ষই উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বৃটেন ও ফ্রান্সের মিশর আক্রমণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন লাভ না করায় বৃটেন অসন্তুষ্ট হইয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যে ফ্রান্সের প্রভাব ১৯৪৫ সালেই বিলুপ্ত হয়; বৃটেন নানা উপায়ে তাহার প্রভাব রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সুয়েজ সমস্যা দেখা দেওয়ার অনেক পূর্ব্ব হইতেই মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ প্রভাবও হ্রাস পাইতেছিল। বৃটেন মিশর আক্রমণ করার পর এই প্রভাব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। এদিকে প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে চলিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের পরিকল্পনায় বৃটেন খুশী হইয়াছে, তাহার মনে আশা জাগিয়াছে যে, এই পরিকল্পনার খিড়কী দরজা দিয়া আবার সে মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু মধ্যপ্রাচীতে যুদ্ধে রত মার্কিণ সৈন্য বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য পাশে না থাকিলে অধিকতর নিরাপদ মনে করিবে, মিঃ ডালেসের এই উক্তিতে বৃটেন ক্ষুব্ধ না হইয়া পারে নাই। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলির মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যে মিঃ ডালেস এই কথা বলিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মধ্যপ্রাচ্যে কম্যুনিষ্ট আক্রমণ রোধ করিবার জন্য মার্কিণ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী যাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে আইসেন-হাওয়ার পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

মধ্য প্রাচ্যে বাগদাদ চুক্তি-ই এখন বৃটেনের একমাত্র ভরসা। কিন্তু আঙ্কারায় এই চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির মধ্যে তুরস্ক, পাকিস্তান, ইরাণ এবং ইরাক এই চারিরাষ্ট্র সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। উহাতে বৃটেন আমন্ত্রিত হয় নাই। এই সম্মেলন বাগদাদ চুক্তি পরিষদের অধিবেশন নয়, ইহা ভাবিয়া বৃটেন অবশ্যই সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে। দুই মাসের মধ্যে বাগদাদ চুক্তির অন্তর্গত সমস্ত রাষ্ট্রকে লইয়া এক সম্মেলনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইরাকের প্রধান মন্ত্রী জেঃ নুরী দাবী করিয়াছেন যে, ঐ সম্মেলন হইতে বৃটেনকে বাদ দিতে হইবে। ইহাই বাগদাদ চুক্তিতে বৃটেনের অবস্থা। এদিকে জর্ডান বৃটেনের সহিত তাহার ২০ বৎসরের চুক্তি বাতিল করিবার দাবী তুলিয়াছে। বৃটেনের নিকট হইতে জর্ডান বৎসরে ১ কোটি ২৫ লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য পাইয়া থাকে। মিশর সৌদী আরব এবং সিরিয়া ঐ পরিমাণ অর্থ সাহায্যদিতে স্বীকৃত হওয়ার পরই বৃটেনও ঐ চুক্তি বাতিল করা সম্পর্কে রাজী হইয়া জর্ডানের নিকট পত্র দিয়াছে, বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ সেলুইন লয়েড গত ২২শে জানুয়ারী বলিয়াছেন যে, ১৯৪৮ সালের ইঙ্গ-জর্ডান চুক্তির ষ্ট্রেটেজিক মূল্য কিছুই আর এখন নাই। ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭।

কংগ্রেসী মনোনয়ন

"কিছু সংখ্যক দুর্নীতিপরায়ণ লোককে কংগ্রেস মনোনয়ন দিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে নেহরুজী তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যদি কাহারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকিয়া থাকে তবে তিনি সত্যই কংগ্রেসের মনোনয়ন পাওয়ার যোগ্য নহেন। দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া মনোনয়ন পাওয়ার যোগ্য নহেন নেহরুজীর একথা স্বীকার করার কোন অর্থ হয় না। কারণ, তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, কিছু সংখ্যক দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে কংগ্রেস মনোনয়ন দিয়াছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। সর্দ্দার প্রতাপ সিং কাইরণের মত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগকে তিনি বিস্ময়কর বলিয়া মনে করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে যদি সত্যই ঐরূপ অভিযোগ উঠিয়া থাকে, তবে বিস্ময়কর বলিয়া তিনি উহাকে উড়াইয়া দিতে পারেন না। বরং তাঁহার সুনামের খাতিরেই অভিযোগ খণ্ডন করা তাঁহার উচিত ছিল। মনোনয়নের পক্ষে নেহরুজী যে সাফাই দিয়াছেন, তাহা লোকের কাছে সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। উহার মধ্যে নেহরুজীর ডিক্টেটরী মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া লোকের মনে আশঙ্কা জন্মিবে। অবশ্য প্রার্থীর যোগ্যতা কংগ্রেসের বড় কর্ত্তাদের দৃষ্টিতে কি, ভোটারদের সে সম্বন্ধেও সচেতন হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। ভোটারগণ যে সকল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিয়া নির্ব্বাচিত করিবেন, নির্ব্বাচনের পর আইন সভায় তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব করিবেন না। তাঁহারা পরিচালিত হইবেন কংগ্রেসের বড় কর্ত্তাদের নির্দ্দেশে। যাঁহারা বিনা ওজর-আপত্তিতে বড় কর্ত্তাদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী আইন সভায় ভোট দিবেন, স্বাধীন ভাবে ভোট দিবার বায়না ধরিবেন না, এইরূপ প্রার্থীই যে কংগ্রেসের বড় কর্ত্তাদের দৃষ্টিতে যোগ্য ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া আর কোন যোগ্যতা থাকিতে পারে না। কংগ্রেস যে এইরূপ যোগ্য ব্যক্তিকেই মনোনয়ন দিয়াছে তাহা মনে করিলে ভুল হইবে কি?"

—দৈনিক বসুমতী।

পল্লীর চিকিৎসা

"কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের পুনর্মিলন উৎসব-অনুষ্ঠানে বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তরুণ চিকিৎসকগণকে গ্রামে গিয়া পল্লীর অধিবাসীদের চিকিৎসা ও সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিবার আহ্বান জানান। এই অনুষ্ঠানেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ফ্যাকালটির ডীন ডাঃ সুবোধ মিত্র তাঁহার ভাষণে বলেন যে, যতদিন পল্লীতে ভাল রাস্তাঘাট, ভাল বাসস্থান ও অন্যান্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা না হইতেছে, ততদিন তিনি তরুণ চিকিৎসকদের গ্রামে যাইতে বলিতে পারেন না। তিনি সমুদয় চিকিৎসা ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করার দাবী করেন। দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিরুদ্ধ কথা বলিতেছেন, মনে হইতে পারে। বিচারপতি মুখোপাধ্যায় যে আদর্শ ও প্রয়োজনের দিক হইতে কথা বলিয়াছেন, ডাঃ মিত্র সেই দিক হইতে কথা বলেন নাই। গ্রামের অসুবিধার কথাটাই প্রাধান্য দিয়াছেন এবং তাঁহার বক্তব্য দাঁড়ায় এই যে, আগে অসুবিধা দূর হউক, তাহার পরে তরুণ ডাক্তারগণ গ্রামে যাইবে। পূর্বে যাইতে বলা অবাস্তব। পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে রাস্তাঘাটের অসুবিধা আছে; ভাল বাসস্থানের অসুবিধা আছে, ছেলেমেয়ের শিক্ষাদানের অসুবিধা আছে ইহা সত্য এবং এই অসুবিধা দূর হওয়াও একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ইহাই কি বাস্তব যে সহরে ভীড় করিলেই তরুণ চিকিৎসকগণ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবেন? ইহাও তো মনে রাখিবার যে আমাদের দেশের শতকরা ৮০।৮৫ জনই পল্লীতে থাকে। আর পল্লী মাত্রেই শিক্ষিত চিকিৎসকের বসবাসের অনুপযুক্ত স্থান ইহাও নয়। যথেষ্ট উপার্জন না হইলে সহরেই কি তরুণ চিকিৎসকগণ ভাল বাসস্থানের ও স্বাচ্ছন্দ্যের আশা করিতে পারেন? তাহা ছাড়া পল্লীতে শিক্ষিত চিকিৎসক ১০০ টাকাও উপার্জন করিতে পারিবেন না; পল্লীর লোককে এতোটাই নিঃস্ব মনে করাও চলে না। অবশ্য সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত চিকিৎসকগণের বেতন, বাসগৃহ প্রভৃতির উন্নতি বিধান একান্ত কর্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। পল্লীতে বিদ্যালয় মোটেই নাই ইহাও যথার্থ অবস্থা নহে। আর, বিচারক মুখোপাধ্যায় তরুণ চিকিৎসকগণের সম্মুখে যে জনসেবার আদর্শের কথা বলিয়াছেন তাহাই বা তুচ্ছ ব্যাপার কেন? পল্লীবাসীর সেবার প্রেরণা লইয়া গ্রামে কাজ আরম্ভ করিলে পল্লীর চিকিৎসকও এক শত কেন আরও অধিক উপার্জনে সক্ষম—ইহা কষ্টকল্পনা নয়। তবে সকলেই পল্লীতে যাইবে তাহাও সম্ভব নহে; আর সকলেই সহরে থাকিবে, যেভাবেই হউক, ইহাও বাস্তবতার কথা নহে। ইহাও মনে রাখা সঙ্গত যে পল্লীর অবস্থা চিরকাল এক থাকে নাই এবং থাকিবে না। পল্লীর প্রয়োজন এবং নিজের প্রয়োজন একই সঙ্গে মিটিতে পারে এই আশা ও প্রেরণা থাকা কিছু মন্দ কথা নহে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

নয়া পয়সার প্রস্তুতি

"সিকি, আধুলি ও টাকা লইয়া কোন গোলযোগের কারণ নাই, নয়া পয়সার সহিত উহার বিনিময় অবাধেই চলিতে পারিবে। দুই আনা হইতে এক পয়সার বিনিময় মূল্য নির্ধারণ লইয়া যাহা কিছু সমস্যা। এই মুদ্রাগুলি যথাসম্ভব শীঘ্র যাহাতে বাজার হইতে তুলিয়া ফেলা যায়, সেজন্য সরকার বিভিন্ন মিণ্ট-এ বা মুদ্রা তৈরীর কারখানায় প্রচুর পরিমাণে নূতন মুদ্রা তৈয়ার করিতেছেন। আগামী তিন বৎসর পর্যন্ত পুরাতন মুদ্রা প্রচলিত থাকিবে, তাহার পরে উহা অচল হইবে। সুতরাং জনসাধারণ ১লা এপ্রিলের পর হইতে যত শীঘ্র পুরাতন মুদ্রার বিনিময়ে নূতন মুদ্রা বদল করিয়া লইতে থাকিবেন, খুচরা মুদ্রা বিনিময়ের অসুবিধা তত শীঘ্রই দূর হইবে। সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, সহর ও মফঃস্বলের ট্রেজারী সমূহে, হায়দরাবাদ ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও মহীশূর ব্যাঙ্কের মারফতে নূতন মুদ্রা চালু করিবেন। প্রথম দিকে দশ, পাঁচ, দুই ও এক নয়া পয়সার বিনিময়ে পুরাতন মুদ্রা বদল করিয়া লওয়া চলিবে। প্রথমে একবারে চার আনা মূল্যের বর্তমান মুদ্রার বদল দেওয়া হইবে। অর্থাৎ চার আনার বদলে মোট পঁচিশটি নয়া পয়সা বা অনুরূপ মুদ্রা বদল করিয়া লইলে আর বিনিময়ের ব্যাপারে লোকসানের আশঙ্কা থাকিবে না। চার আনা মূল্যের কম পরিমাণ মুদ্রা বদলাইতে গেলেই আনার হিসাবে ও দশমিকের হিসাবে বিনিময়ের গোলযোগে লোকসানের বা লাভের প্রশ্ন আসিতে পারে বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু একসঙ্গে চার আনা পরিমাণ মূল্যের বর্তমান মুদ্রা বিনিময় করিয়া লইলে আর কোন অসুবিধার কারণ ঘটিবে না। ষোলখানি বর্তমান পয়সা আটখানি ডবল পয়সা, চারখানি আনি বা দুইখানি দুইআনি বা একখানি সিকি দিলেই উহার বিনিময়ে পঁচিশ নয়া পয়সা মূল্যের নূতন মুদ্রা পাওয়া যাইবে। চারখানি আনি দিয়াই হউক এবং দুইখানি আনি ও একখানি দুইআনি দিয়াই হউক, যে কোন হিসাবে মোট চার আনা করিয়া উহার বিনিময়ে মোট পঁচিশ নয়া পয়সা মূল্যের মুদ্রা আনিলেই বিনিময়জনিত অতি ক্ষুদ্র অংশের লাভ-লোকসানের সমস্যা অনায়াসে সমাধান হইয়া যাইবে। অতএব দুই আনা বা এক আনা অর্থাৎ সিকির ভগ্নাংশ বদল না করিয়া এক সঙ্গে বর্তমান মুদ্রার মোট চার আনা মূল্যের বিনিময় লইলে কোন অসুবিধাই ঘটিবে না।"—যুগান্তর

কাশ্মীর সমস্যা কি?

"মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট ও কমনওয়েলথের প্রধান পাণ্ডা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বন্ধু বলিয়া শ্রীনেহরু এখনও বক্ষে স্থান দিতেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা ৩১শে জানুয়ারীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ভারতবর্ষ যে কাশ্মীর প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ কোন দিন কোন মতেই সহ্য করিতে রাজী নয়, তাহা দুনিয়ার সকলেই জানে। এমতাবস্থায় কাশ্মীর প্রশ্নের উপর শ্রীনেহরু কোন দিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পরামর্শ লইয়া সুচিন্তিত অভিমত স্থির করিবার পরিবর্তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের কথা তিনি ও তাঁহার সরকার বলিয়া আসিয়াছেন। এবং তাঁহারাই সমগ্র অবস্থাটিকে জটিলতর করিতে সাহায্য করিয়াছেন। বর্তমান আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে আর এক বার কমিউনিষ্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য শ্রীভূপেশ গুপ্ত প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করিতে আবেদন জানাইয়াছেন। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপ-মুক্ত অবস্থায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আলাপ আলোচনাই কাশ্মীর প্রশ্নের সমাধানের শ্রেষ্ঠ পথ, ভারতের কর্তব্য অবিলম্বে কাশ্মীর প্রশ্নটি জাতিসংঘ হইতে প্রত্যাহার করা কিন্তু শ্রীনেহরু সে পরামর্শ গ্রহণ করিতে রাজী নন। কাশ্মীর প্রশ্নে সকল রাজনৈতিক দলেরই মতৈক্য থাকা সত্ত্বেও এরূপ একটি জাতীয় প্রশ্নকে কংগ্রেস দলীয় প্রশ্ন করিয়া নির্বাচনের সময়ে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করিতেছে। একটি দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নকে, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে জাতীয় উদ্যোগের প্রশ্নকে শ্রীনেহরু ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা এভাবে উপেক্ষা করিয়া নিছক সুবিধাবাদী কায়দায় নির্বাচনে জয়লাভের ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন। ইহার চাইতে লজ্জা ও ক্ষোভের আর কি আছে? শ্রীনেহরু বিভিন্ন পার্টি সম্পর্কে বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় যাহা বলিতেছেন তাহার অর্থ হইল—কংগ্রেস ছাড়া ভারতে আর কোন রাজনৈতিক দলই নাই"

—স্বাধীনতা।

নির্বাচনের আগে

"বাঙ্গালী উদার, নিজের জীবন বিসর্জন দিয়া বাঙ্গালীই সারা দেশের মুক্তি আনিয়া দেয়। আত্মরক্ষার সংগ্রামকেও অনেক বাঙ্গালী প্রাদেশিকতা বলিয়া মনে করে। এই বাঙ্গালী জাতিকে ধ্বংসের জন্য বিরাট ষড়যন্ত্র চলিতেছে। কংগ্রেসের মুরুব্বীরা এবং তাঁদের মাড়োয়ারী বন্ধুরা এই ষড়যন্ত্রের নায়ক। পৃথিবীর কোন দেশে, ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে এত ভেজাল চলে না, একা বাঙ্গলায় যতটা চলে। তার কারণ গবর্ণমেণ্ট ভেজালদাতার সহায়। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য যদি নষ্ট হয়, নিত্য মূল্যবৃদ্ধির চাপে যদি তাহাকে জীবন-সংগ্রামে জর্জরিত থাকিতে হয়, বাঙ্গালী জননীকে যদি শিশু পুত্র-কন্যা ফেলিয়া সংসারের প্রয়োজনে চাকুরীতে ঢুকিতে হয়, তো বাঙ্গালীর দেহ, মন, আত্মা বাঁচিতে পারে না। বাঙ্গালী যদি সুস্থ থাকে, বাঙ্গালীর যদি অবসর থাকে, বাঙ্গালীর বুদ্ধি যদি মুক্ত থাকে, তবে কংগ্রেসী চাঁয়েরা জানেন যে তাঁহাদের আবুহোসেনী টিঁকিতে পারিবে না। যে বাঙ্গালী স্বাধীনতা আনিয়াছে, সেই বাঙ্গালীই স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম। আজও বিপদে পড়িলে বাঙ্গালীকেই ডাকিতে হয় দিল্লী উদ্ধারে! বিশ্বের বৃহত্তম নির্বাচন সামলাইতে ডাকিতে হইয়াছে—সুকুমার সেনকে, কেন্দ্রের পাবলিক সার্ভিস কমিশন গড়িয়া দিতে ডাকিতে হইয়াছে—রবি ব্যানার্জিকে, প্রথম পাঁচশালা প্লানের ধ্বংসস্তূপ হইতে উদ্ধার করিয়া ভারতের পরিকল্পনাকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করিবার উপযুক্ত রূপ দিতে ডাকিতে হইয়াছে—প্রশান্ত মহলানবীশকে। বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে ভারতের সম্মান রাখিতে দুই দিন আগে স্বয়ং জহরলালকে টেলিফোন করিয়া পাঠাইতে হইয়াছে—মেঘনাদ সাহাকে। হায়দরাবাদ জয়ে পাঠাইতে হইয়াছে সেনাধ্যক্ষ জে, এন, চৌধুরীকে। দিল্লী চায় বিপদ সামলাইবার জন্য কয়েক জন বাঙ্গালী থাকুক, কিন্তু সব বাঙ্গালী যেন এই ভাবে গড়িয়া উঠার সুযোগ না পায়, দেশের কথা চিন্তার সময় তার না থাকে। অর্থ নৈতিক দাসত্বের ঘুঁটি

বাঙ্গালীকে জাতি হিসাবে পদানত রাখিতে চায়। লণ্ডনের মত দিল্লীও চায় বাঙ্গালীকে শুধু ভাড়া খাটাইতে। ইংরেজ বাঙ্গালীকে চিনিত, তাই যুদ্ধের সময় যাহাতে বাঙ্গালাদেশে বিপ্লবের আগুন জ্বলিতে না পারে তার জন্য তাহারা আগে সৃষ্টি করিয়াছে দুর্ভিক্ষ, তারপরে আনিয়াছে রেশন, রেশন দোকানের দরজায় বাঙ্গালীকে এমন ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে যেন বিপ্লবী বাঙ্গালা মাথা না তুলিতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের এই নীতি হুবহু নকল করিয়াছে কংগ্রেস। কম্যুনিষ্ট দল ভারতে ক্ষমতা অধিকার করিবার সম্ভাবনা থাকিলে তবে তাদের বেলায় এই প্রশ্ন উঠে। ইহা তাহারা নিজেরাও বিশ্বাস করে না, করিলে কংগ্রেসের বি-টিম পি-এস-পিকে সঙ্গে লইয়া তাহারা নির্ব্বাচনে নামিত না। কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, পি-এস-পি প্রভৃতিকে স্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন করিতে হইবে অবাঙ্গালী কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর আত্মরক্ষার সংগ্রামে তাঁহারা আমাদের সঙ্গে থাকিবেন কিনা, থাকিলে কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিবেন। ভাষাভিত্তিক বাঙ্গালা গঠনের প্রশ্নে দক্ষিণ-বাম সমস্ত দল বাঙ্গলার প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন তাহার প্রতিকারে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন কি না তাহাও জানা দরকার। বাঙ্গালার বিধানসভায় বাঙ্গালীর মনের কথা অকুতোভয়ে বলিবার জন্য বাঙ্গালী কাহাকেও পাঠাইবে কি না তাহাই আজ সব চেয়ে বড় প্রশ্ন। বিকল্প গবর্ণমেণ্ট যেখানে অসম্ভব, বিরোধীশক্তি বৃদ্ধিই সেখানে একমাত্র কাম্য। বাঙ্গালার আত্মরক্ষা আজ বাঙ্গালী জাতির জীবন-মরণের সমস্যা। অবাঙ্গালী শ্রমিক সংগঠন যাহাদের জীবিকা ও রাজনীতি, তাহারা কি ইহা পারিবে? বাঙ্গালীকে আজ প্রকৃত বন্ধু চিনিয়া লইতে হইবে।" —যুগবাণী (কলিকাতা)।

বুদ্ধির অগম্য

"নেহেরু মাদ্রাজে বলিয়াছেন যে, আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন, এই কথার প্রমাণ পাইলে হয় তিনি চুক্তি মানিবেন অথবা প্রধান মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিবেন। তাঁহার মনে দ্বন্দ্ব কেন? চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন, কে তাঁহাকে বুঝাইবে? বৃটেন, আমেরিকা? আর বুঝিতে পারিলে তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের ফৌজ কাশ্মীরে নামিতে দিবেন অথবা প্রধান মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিবেন! কি করিবেন—সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই স্থিরনিশ্চয় নন কেন? রাষ্ট্রসঙ্ঘের ফৌজ সম্বন্ধে বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্বন্ধে তাঁহার মোহ থাকিতে পারে, যেমন তাঁহার আছে কমনওয়েলথ সম্বন্ধে—আমাদের ন্যায় জনসাধারণের সে মোহ নাই। আমরা ইতিহাসের নিষ্করুণ পুনরাবৃত্তি আর চাই না; ছদ্মবেশে মিষ্টভাষা বলিয়া আজকাল সাম্রাজ্যবাদ প্রকট হইয়াছে। ইহা আমরা জানি। নেহেরু কি বুঝিতেছেন, তিনিই জানেন। কিন্তু গণতন্ত্রের নেতারূপে জনগণের মতামত অগ্রাহ্য করিলে, ইতিহাসের বিচার হইতে তিনিও বাদ যাইবেন না। আমরা আজও কমনওয়েলথ রহস্য বুঝিতে পারি নাই, পাকিস্তানী রহস্যও বুঝি না। উহার অন্তরালে কি খেলা চলিতেছে আগামী কয়েক মাসের ঘটনাই তাহা প্রকাশ করিবে।"—মেদিনীপুর হিতৈষী।

প্রতিকার আবশ্যক

"কাঁথি-কালীনগর রাস্তার পার্শ্বে সহরের আবর্জ্জনারাশি নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে মাঝে মাঝে এমন অসতর্ক ভাবে রাস্তার উপর আবর্জ্জনা ফেলা হয় যাহাতে সাধারণের ঐ অংশটুকু অতিক্রম করিতে খুবই অস্বস্তিকর বোধ হয়। এ ছাড়া সহরের মৃত কুকুর, বিড়াল আদিও নিক্ষেপে ঐ স্থানটিতে পূতিগন্ধময় এক ঘৃণারজনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে। সহরের সংযোগ-মুখে এইরূপ এক কদর্য্য ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের পক্ষে আদৌ গৌরবের বিষয় নহে। আশা করি ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ মৃত জন্তুগুলিকে আবর্জ্জনারাশির মধ্যে প্রোথিত করার ব্যবস্থা এবং রাস্তার নিম্নপার্শ্বে আবর্জ্জনা-স্তূপ নিক্ষেপের প্রতি তীব্রদৃষ্টি দিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম বজায় রাখিবেন।"

—নীহার (কাঁথি)

ভোটদাতা ও ভোটপ্রার্থী

"রাষ্ট্রের জনসাধারণের ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্ভর করিবে উপযুক্ত ব্যক্তি ও উপযুক্ত মতবাদের সমর্থনে ভোট দান করার উপর। জাতি সমাজ ও দেশের কল্যাণের জন্য জনগণকে এখন জীবন পণ করিতে হইবে না শুধু ভোটের দিনে এক খানি বা দুইখানি ভোটপত্র ভোট-বাক্সে ফেলিয়া দিয়া আপন আদর্শ অনুযায়ী পাঁচ বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্র পরিচালনার মাধ্যমে সমাজ সংস্কার, জাতি গঠন, দেশের দুঃখ দারিদ্র দৈন্যের অবসানের জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিয়োজিত করিবেন ভোটদাতাগণ। ছোট কথায় বুঝিতে হইলে বুঝা যাইবে, ইউনিয়ন বোর্ডের কথা ভাবিলে একটি ইউনিয়নের জনস্বাস্থ্য রক্ষা পথঘাট মেরামত ইত্যাদি কয়েকটি কাজের ভার

ইউনিয়ন বোর্ডের দ্বারা করাইবার আইন আছে। প্রতি তিন বৎসর প্রত্যেক ওয়ার্ডের ভোটদাতাগণ ভোট দিয়া নিজেদের প্রতিনিধি পাঠান সেই প্রতিনিধিগণ আবার ভোট দিয়া প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করেন। প্রেসিডেণ্ট মহাশয় অন্যান্য মেম্বরগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিন বৎসর ইউনিয়ন বোর্ড চালান, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট মহাশয় ইউনিয়নের রাজাও নয় মালিকও নয়! ঠিক সেইরূপ সাধারণ নির্ব্বাচনে ভোটদাতাগণ ভোটপত্র দিয়া যে ব্যক্তি বা যে দলকে নির্ব্বাচিত করিবেন সেই ব্যক্তি বা সেই দল অথবা বিভিন্ন মিলিত দলের এম, এল, এ, গণসংখ্যায় বেশী হইলে পাঁচ বৎসর রাষ্ট্রের কাজ চালাইবেন। আবার পাঁচ বৎসর পরে ভোট আসিবে নূতন প্রার্থী নির্ব্বাচনের সুযোগ ও সময় ভোটদাতাগণের মিলিবে। সেই সাধারণ নির্ব্বাচন আগত ভোটদাতাগণকে আত্মচেতনা—সমাজ-কল্যাণ ও রাষ্ট্রকল্যাণের জন্য ভোট দিতে হইবে!" —বীরভূম বাণী।

গান্ধী-ফাণ্ডের টাকা ও ময়ূরাক্ষীর "ফাঁকা আওয়াজ"

"গান্ধী-ফাণ্ডের টাকা সম্পর্কে যে অভিযোগ বহু দিন হইতে উঠিয়াছে সেই সম্পর্কে আবার একটি 'ফাঁকা আওয়াজ' করিয়া ময়ূরাক্ষীর বক্ষ প্রকম্পিত করা হইয়াছে! এই 'ফাঁকা আওয়াজের' কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। তবে এই অর্থের হিসাব দেওয়া সম্পর্কে 'ময়ূরাক্ষীর' অদৃশ্য পরিচালকের হস্ত কতখানি, জেলা কংগ্রেস সভাপতির জিজ্ঞাসার উত্তরে ডাঃ ঘোষের মন্তব্য যদি তাঁহার সেই চৈতন্য না হইয়া থাকে, তবে কি ভাবে সেই দায়িত্ববোধ জাগ্রত হইতে পারে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। সাধারণ মানুষের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবার যাহার উৎসাহ ছিল, সেই অর্থ কোথায় বা কি ভাবে ব্যয়িত হইয়াছে তাহা জানাইতে এত কুণ্ঠা কেন? তিনি যে সং এবং সরকারের 'বিশ্বাসভাজন' সেই সম্পর্কে একটি সরকারী সার্টিফিকেট 'ময়ূরাক্ষীতে' প্রকাশ করিলেই তো পারেন। বারে বারে একই কথা বলিয়া তিনি নিজের সততার যে বড়াই করিতেছেন তাহাতেই বীরভূমবাসীর অধিকতর সন্দেহের কারণ হইতেছে।" —বীরভূম বার্ত্তা।

খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি

"খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি উত্তরোত্তর দ্রুতগতিতে চলিতেছে। দেশের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি, সরকার এবং দরদী দেশপ্রেমিকগণের নিকট আমরা এই মূল্যবৃদ্ধির সর্ব্বনাশা এবং সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার প্রতি আশু দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছি। মধ্যবিত্ত মুমূর্ষু, শ্রমিক মুমূর্ষু জাতির নাভিশ্বাস উঠিয়েছে, তবুও সাড়া মিলিল না। ইহার অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি থাকিতে পারে জানি না!" —রাঢ়দীপিকা।

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট

"এবারকার নির্ব্বাচনে ভাবিয়াছিলাম যে গতবারের মতই একটি দক্ষিণ ও একটি বামপন্থীর মধ্যেই মূলতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে জন-সাধারণ স্থির করিয়া লইতে পারেন কাহাকে ভোট দিবেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বামপন্থী তিন জন ও দক্ষিণপন্থী দুই জন এবং স্বতন্ত্র মুসলমান প্রার্থী একজন মোট ছয় জন মনোনয়ন পত্র দাখিল করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে জনসাধারণের পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচন করা কষ্টসাধ্য তো বটেই, উপরন্তু নানা উপসর্গ এই ব্যাপারে আসিয়া পড়ে। ব্যক্তিগত যোগ্যতার কথা না বলিয়াও কেবল মাত্র দেশপ্রেমের জন্যই একটি মাত্র দক্ষিণ ও একটি মাত্র বামপন্থী প্রার্থী বাদে আমরা অন্য প্রার্থিগণকে আপনাপন নাম প্রত্যাহার করিয়া লইতে বলিতে পারি। নতুন অর্থ ও পরিশ্রম নষ্ট ছাড়া একজন বাদে আর কাহারও কোন সুবিধা দেখা যাইবে না। ভোট ভাগাভাগির ফলে ন্যূনতম জনসমর্থিত ব্যক্তিরও ভোট-সাগরে পার হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। আমরা আশা করিতেছি যে প্রার্থিগণ এই দিকটা চিন্তা অবশ্যই করিয়া দেখিবেন। বন্দে মাতরম্।" —আসানসোল হিতৈষী।

শোক-সংবাদ

মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত কয়লা-শিল্পপতি ও মাইনিং ফেডারেশানের ভূতপূর্ব সভাপতি মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গত ৬ই মাঘ ৭৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। কয়লা-শিল্প-নায়কদের প্রতিভূস্বরূপ ইনি ১৯২৭ খৃঃ থেকে দশ বছর বিহার ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা পৌরসভার প্রাক্তন চীফ-ইঞ্জিনীয়ার ও পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ ইঞ্জিনীয়ারিং উপদেষ্টা দ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গত ৭ই মাঘ লোকান্তরিত হয়েছেন। এঁর অগ্রজ ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও একটি পুত্র বর্তমান।

রাজমোহন সেন

শ্রদ্ধেয় মনীষী ও গণিতশাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ রাজমোহন সেন গত ১০ই মাঘ ৯৮ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। গণিতশাস্ত্রে এঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছাত্রাবস্থা থেকেই। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পরীক্ষায় (গণিতশাস্ত্রে) খ্যাতনামা গণিতজ্ঞদ্বয় কে, পি, বসু ও যাদব চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন, প্রথম স্থানের অধিকারী ছিলেন রাজমোহন। ইনি ঢাকা ও বহরমপুরে অধ্যাপনার পর রাজসাহী কলেজের গণিতের প্রধান অধ্যাপকের কার্যভার গ্রহণ করেন। ছত্রিশ বছর (১৯১৯ খৃঃ) ইনি সেই পদে সমাসীন ছিলেন। গণিতজ্ঞ রাজমোহনের সঙ্গীত শাস্ত্রেও ছিল প্রবল অনুরাগ। ওস্তাদ মৌজার কাছে ইনি সেতার বাজনা শিক্ষা করেন। মৃত্যুকালে ইনি স্ত্রী শ্রীযুক্তা নিশিতারা দেবী (৮৮) ও পুত্র প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্বনামধন্য শিক্ষাব্রতী শ্রীবি, এম, সেনকে রেখে গেছেন।

সিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

গত ২৪শে মাঘ প্রাতঃকালে বাংলার জনপ্রিয় অভিনয়-শিল্পী সিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় মাত্র ৪৬ বছর বয়সে কাল-কবলিত হয়েছেন। সিধু গাঙ্গুলী নামেই সিদ্ধেশ্বর সমধিক পরিচিত ছিলেন অভিনয়-জগতে। সিধু বাবুর অভিনয়-দক্ষতা ও নায়কোচিত সুগঠিত আকৃতি নাট্যামোদীদের কাছে একদিন গর্বের বস্তু ছিল। কিছুকাল পূর্বে তিনি নিয়মিত রঙ্গ-জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আলেকজাণ্ডার ও পুরু

আলেকজাণ্ডার পুরু কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, এই মর্মে মার্শাল জুকোভ সম্প্রতি যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা আমাদের বহুদিন প্রচলিত ও তথাকথিত ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত ধারণার মূলোচ্ছেদ করিয়া সাধারণের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, আলেকজাণ্ডারের সম্পর্কিত ইথিওপীয় একটি বিবরণ মার্শাল জুকোভের উক্তির যথার্থতা প্রতিপাদন করিতেছে। মৎপ্রণীত "The Achaemenids in India" নামক পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে আমি প্রাসঙ্গিক গ্রীক এবং ল্যাটিন তথ্যসমূহ আলোচনা করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, এইগুলি বিশদ ভাবে পর্যালোচনা করিলে আমরাও সম্ভবতঃ ঐ একই উপসংহারে উপনীত হইতে পারিব।—শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পি-আর এস, পি এইচ ডি, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন।

পত্রিকা সমালোচনা

গত পৌষ সংখ্যা "বসুমতী"র "পাঠক-পাঠিকার চিঠি" বিভাগে বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ যে অভিন্ন এই মতবাদের প্রতিবাদে শ্রীআশীষকুমার সেন মহাশয় যা' লিখেছেন—তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলার আছে। শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর গুপ্ত নামক কবিরাজ মহাশয় "বৈদ্যপুরাবৃত্ত" গ্রন্থে অকাট্য যুক্তি সহযোগে যে প্রমাণই করুন,—তা যে অভ্রান্ত এ কথা বলা চলে না। পরন্তু মনুসংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মহাভারত, গীতা, এমন কি বেদেরও বহু শ্লোক কৃত্রিম প্রমাণিত হওয়ায় স্বভাবতই সন্দেহ জাগে, তাঁর মতবাদ হিন্দুশাস্ত্র সমর্থিত কি না?

লেখক যখন অধিকাংশ শাস্ত্রের বচন বা শ্লোক কৃত্রিম বোধে মানতে চান না—তখন শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধৃতির প্রয়োজনীয়তা বাদ দিয়েও বলা চলে বৈদ্য কোনো জাতি নয়—বর্ণমাত্র। বিপ্র বা ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে অনুলোমক্রমিক অম্বষ্ঠ-বিপ্রকেই পরবর্তী কালে বৈদ্য বলা হয়। প্রাচীন বেদ-পুরাণ-সংহিতায় কোথাও "বৈদ্য" কথা নেই।

প্রাচীন যুগে অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহ চলতি ছিল। ঋষিরা অনুলোম বিবাহের সমর্থক ও প্রতিলোমের প্রতিরোধক ছিলেন। উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নিম্নবর্ণের কন্যার গর্ভে যে সন্তান জন্ম নিত—তারাই ছিল অনুলোমজ সন্তান। এরই উল্টা ব্যবস্থাকে বলা হয় প্রতিলোম। প্রতিলোমজ সন্তান হীন, অন্ত্যজ—এক কথায় বর্ণসঙ্কর যারা রাষ্ট্র ও সমাজ ধ্বংস হয়, এজন্য তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এদের স্থান অতি নিম্নে।

শাস্ত্র বলছে—"ষট্‌সুতঃ দ্বিজধর্মিণঃ"। অর্থাৎ অনুলোমজ ছয় প্রকার সন্তানই—দ্বিজ-ধর্মী। দ্বিজ অর্থে ব্রাহ্মণ নয়—বিপ্রবর্ণের গুণসম্পন্ন। ঋষিযুগে সর্ববর্ণই ব্রাহ্মণ হওয়ার অধিকারী ছিলেন। বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ হওয়ার বহু প্রমাণই আছে শাস্ত্রে। ব্রাহ্মণ বা বিপ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে মূর্দ্ধাভিষিক্ত-বিপ্র, বৈশ্যকন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ-বিপ্র, শূদ্রকন্যার গর্ভে পারশব-বিপ্র, বস্তুতই বিপ্র-ঔরসজাত হওয়ায় কতকটা বিপ্রপর্যায়ভুক্ত। সেই হিসাবে বৈদ্য অম্বষ্ঠ-বিপ্র। অম্ব শব্দের অর্থ পিতা। অম্বষ্ঠ মানে পিতায় থাকা। অর্থাৎ পিতার বর্ণপ্রাপ্ত হওয়া। এই হিসাবে বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে পারেন। আইনত শাস্ত্রসম্মত বৈদ্যগণ দ্বিজত্বের—অর্থাৎ উপনয়নের অধিকারী। সম্ভবতঃ এই কারণেই পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এই মতে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এতে বৈদ্যের অম্বষ্ঠত্ব বাতিল হয় না এবং বৈশ্যমাতা হওয়ায় বৈদ্যকে খাঁটি ব্রাহ্মণও বলা চলে না। বেদ পাঠ থেকেই বৈদ্য কথার উৎপত্তি মনে হয়। এ বিষয়ে লেখক সেন মহাশয় নূতন আলোকপাত করলে সুখী হব। ইতি —বিনয়াবনত: শ্রীহিরণ্ময় মুন্সী। জনাই।

পৌষ সংখ্যার মাসিক বসুমতী পড়লাম, এই সংখ্যার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের তথ্যপূর্ণ রচনা এবং আপনাকে লেখা তাঁর পত্রগুচ্ছ। মানিক বাবু সম্বন্ধে জানবার জন্য পাঠকের আর পাঁচটা পত্রিকার সন্ধান করতে হয় না। জীবনীর মধ্যে বিবেকানন্দ-স্তোত্র খুবই মৌলিক। সুমণি মিত্রের নিউটন্ আপেল প্রসঙ্গ ডারউইন্ বাঁদর প্রসঙ্গ 'মিছরির কটি' ও Bentham এর Utility প্রসঙ্গ ডারউইনের Evolution ও স্বামিজীর Involution প্রসঙ্গে কৃপা ও পুরুষকার বাদ যুক্তি ও বিশ্বাসবাদ, নরনারায়ণবাদ এবং সব শেষ অবতারবাদ কেউই সহজে ভুলতে পারবে না। পরিমল গোস্বামীর 'স্মৃতিচিত্রণ' পড়ছি। আরো কিছু সংখ্যা না পড়ে কোন মতামত প্রকাশ করা উচিত হবে না। নমস্কার ইতি। জ্যোৎস্না চৌধুরী, দমদম্ কলিঃ-২৮।

'আধুনিকা'য় ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে লেখকের উক্তি

'৫২।১ মলঙ্গা লেন, কলকাতা' থেকে মিনতি চন্দ্র 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'আধুনিকা' এবং পুস্তকাকারে

প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে অসামঞ্জস্য সম্বন্ধে সে-সব কথা লিখেছেন, তার লেখক-রূপে সমস্যাটির সমাধান কল্পে সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, 'মাসিক বসুমতী'তে 'আধুনিকা' প্রকাশিত হবার পরেই 'সাহিত্য-জগৎ' নামক বিশিষ্ট প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই সর্তে উপন্যাসখানি পুস্তকাকারে প্রকাশ সম্পর্কে চুক্তিবদ্ধ হই যে, মাসিক বসুমতীতে উহা সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবেন। সুতরাং মাসিকের সংখ্যাগুলি থেকে ফাইল সংগ্রহ করে 'সাহিত্য-জগৎ' প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বইখানির ছাপার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। সে ক্ষেত্রে কাহিনীর প্রসাধন বা পরিবর্তন লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক। এদিকে 'মাসিক বসুমতী'র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী কাহিনীটি সমাপ্ত করবার নির্দ্ধারিত কাল উপস্থিত হওয়ায় ঘটনাবহুল দীর্ঘ উপাখ্যানটির এমন স্থানে ছেদ বা দাঁড়ি টানতে হয়—পাঠক মহল আধুনিক উপন্যাসের রীতিতে সমাপ্তি বলে সাব্যস্ত করেন। সেই জন্যই মাসিকে প্রকাশিত কাহিনীর উপসংহারে—নায়িকা দেবীর নির্দেশমত তার তথাকথিতা আধুনিকা ভগিনী বাণীকে আশীর্বাদ দৃশ্যে আনিয়ে তার মুখ দিয়ে 'আধুনিকা'র প্রকৃত সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করে সেই চাঞ্চল্যকর অবস্থাটির সমাপ্তি করতে হয়েছে লেখককে। মাসিকের পাঠক-পাঠিকাদের এ সম্বন্ধে অসন্তুষ্টির যে কিছু নেই, মিনতি চন্দ্রের কথাতেই তা প্রকাশ পেয়েছে। মাসিকের লেখা ধারাবাহিক ভাবে পড়ে তিনি যে আনন্দ পেয়েছেন, বই পড়ে তা পাননি। তার কারণ, আসলে আত্মোপলব্ধির পর দেবী বাণীকে পত্র লিখে 'আধুনিকা' সম্পর্কে যে নির্দেশ দিয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হয়, সেখানে পুস্তকাকারে প্রকাশিত আধুনিকায় বড় একটা ছেদ পড়েছে মাত্র—শেষ নয়। কারণ, আধুনিকা সম্পর্কে বোঝাপড়ার ব্যাপারে নায়ক ললিত যেমন আড়ালে পড়ে আছে, তেমনি স্বল্পভাষিণী সরমসংকুচিতা দেবীর শাশ্বত আধুনিকারূপে স্নেহাতুরা দুটি সন্তানবতী নারীর পরম প্রতিশ্রুতিকে সার্থক করবার উদ্দেশ্যে সাংগ্রামিক অভিযান—ললিতকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহের প্রতীক্ষা করছে। আধুনিকা উপন্যাসে এ কথা স্পষ্টাক্ষরে জানানো হয়েছে। শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪২, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলকাতা—৩

পুরাতন সংখ্যার কেনা-বেচা

১৩৬২ সালের বৈশাখ সংখ্যা যথামূল্যে কিনতে চাই।—রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়। ষ্টেশানারী অফিস এমপ্লয়িজ য়্যাসোসিয়েশান (গ্রন্থাগার বিভাগ) ৩ চার্চ লেন, কলকাতা ১।

১৩৫৬ সালের বৈশাখ থেকে ১৩৬২ সালের চৈত্র সংখ্যাগুলি সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় প্রতি সংখ্যা এক টাকা হিসাবে ছাড়া ১৩৫৫ সালের আশ্বিন থেকে চৈত্র পর্যন্ত সংখ্যাগুলিও বেচতে চাই।—শ্রীউমাপ্রসাদ ঘোষাল, ১৪বি যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৬।

১৩৬০, ৬১, ৬২ সালের সংখ্যাগুলি ও ১৩৫৯ সালের আটদশখানি বেচতে চাই।• পুরো তিন বছরের নিলে প্রতি সংখ্যা দশ আনা হিসাবে ও খুচরা নিলে প্রতি সংখ্যা বারো আনা হিসাবে মূল্য নির্ধারিত হয়েছে।—শ্রীকরুণাময় পাণ্ডে, ১বি ফকির চক্রবর্তী লেন, কলকাতা ৬।

১৩৬২ সালের সংখ্যাগুলি প্রচ্ছদপট সমেত অবিকৃত অবস্থায় মোট দশ টাকায় বেচতে চাই।—শ্রীমতী লীনা সরকার, লীলা কটে, ক্রুকেড লেন, চুঁচুড়া (হুগলী)।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্র মাসের মাসিক বসুমতীর জন্য ৬০ পাঠাইলাম। গীতা মিত্র। লক্ষ্ণৌ, ইউ, পি।

মণিঅর্ডার যোগে পৌষ ১৩৬৩ হইতে এক বৎসরের জন্য অগ্রিম মূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী, অন্ধ্রপ্রদেশ।

আমার চাঁদা পুরা বছরের ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম, শ্রীমতী ইরা দেবী চাদিফগাওন।

আপনার স্মারকলিপি পাইলাম, ৭।০ আনা পাঠাইলাম নিয়মিত বসুমতী পাঠাইবেন। শ্রীঅণিমা চক্রবর্ত্তী, আসানসোল।

অদ্য ১৫৲ পাঠাইলাম। আমায় ১৩৬৩ সালের মাঘ মাস হইতে একখানি করিয়া মাসিক বসুমতী পত্রিকা পাঠাইবেন। সেই সঙ্গে আপনাদের মাসিক বসুমতীর একজন গ্রাহিকা করিয়া বাধিত করিবেন। আমি এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠাইলাম শ্রীনিভা দেবী। কাছাড়, আসাম।

Rs. 15/- being annual subscription for the 'Monthly Basumati', for further one year as from the month of Poush, Please acknowledge receipt —N. G. Chaudhuri, Assam.

I am sending Rs. 7/8/- only for the subscription for six months. Please acknowledge the amount and send the magazine regularly, yours sincerely. Kanika Dutta. Ganjam.

I am remitting herewith Rs. 7/8/- only on a/c. of my subscription for the period from "Poush to Jaistha." Kindly send me copy of Poush issue at the following address. Leela Ghose. C/o. Mr. A K. Ghose Dey. Supdt office of the Asst. collector, Central Excise Nagpur.

Sending a M. O. for Rs. 7/8/- only for a halfyearly subscription. Please enlist my name and send M. Basumati regularly from Magh 1363 B. S. Please acknowledge receipt of the M. O with compliments to you. Anisur Rahaman Hooghly.

Sending herewith Rs. 15/- for annual subscription. Kindly enlist me as a subscriber with effect from the Poush issue. Mrs. K. B Gupta. Hyderabad (Deccan).

প্রমথ চৌধুরীর
(বীরবল)-এর
ঘোষালের ত্রিকথা
(নূতন সংস্করণ)
দাম : এক টাকা বার আনা

স্বনামধন্য প্রমথ চৌধুরীর রচিত তিনটি প্রেমের গল্প। মধুর গল্পের সঙ্গে গভীর পাণ্ডিত্যের যোগ বাংলা সাহিত্যে একমাত্র প্রথম চৌধুরীর নিজস্বতা। বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী একদা একটি যুগের সৃষ্টি করেছিলেন—যার নাম সবুজপত্রের যুগ। তাঁর বীরবলী ষ্টাইল বাংলা ভাষায় আজ ক্লাসিকে পরিণত হয়েছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
পুতুল ও প্রতিমা
(নূতন সংস্করণ)
দাম : তিন টাকা

রবীন্দ্রোত্তর যুগের গল্পলেখকদিগের মধ্যে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের স্থান অবিসংবাদিতরূপে সু-উচ্চ। নৈষ্ঠিক বিধবা ব্রাহ্মণী থেকে পতিতা পর্য্যন্ত এবং এ্যারিষ্টক্রাট ব্যারিষ্টার থেকে কোকেন স্মাগলার পর্যন্ত নানা বিচিত্র টাইপের নরনারীর সমাবেশ রয়েছে এই গল্পগ্রন্থে; আর তাদের অন্তরের কত না রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

বিমল মিত্রের
সুয়োরাণী
(নূতন উপন্যাস)
দাম : আড়াই টাকা

শ্রীমদ্‌ভাগবতে শুকদেব বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠ গমনের পর থেকেই কলিযুগ আরম্ভ। এই যুগে টাকা আর শারীরিক বলের প্রাবল্য নিজের অভিরুচিমত স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ, প্রবঞ্চনা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য, রতিকৌশল দিয়ে স্ত্রী-পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব পৈতে দিয়ে ব্রাহ্মণের পরিচয়, চটুল বাক্য দিয়ে পাণ্ডিত্যের বিচার আর দম্ভ দিয়ে সাধুত্বের নিরূপণ হবে।

এই কলিযুগেই একজন ভদ্রলোক আসছিলেন উত্তর দিক থেকে আর একজন মহিলা আসছিলেন পশ্চিম দিক থেকে। রাস্তার মোড়ে দু'জনের দেখা। আর তার ফলেই জন্ম হলো সুয়োরাণীর। সুয়োরাণীই প্রমাণ করলো যে শাস্ত্র, পুঁথি, জ্ঞান, বিদ্যা, মনুষ্যত্ব দিয়ে মানুষের বিচার হয় না। মানুষের বিচারের মাপকাঠি অন্য কিছু। সেই অন্য কিছুর নামই ইতিহাস। ইতিহাস-বিধাতাই মানুষের একমাত্র বিচার-কর্তা।

আদ্যোপান্ত পরিবর্তনের পর 'সাহেব বৌদি' নব নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো।

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য
(প্রথম সংস্করণ)
দাম : তিন টাকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের আলোচনা। পর্তুগীজ ও ইংরাজ মিশনারীগণ বাংলা সাহিত্যের পুষ্টি ও বিকাশের জন্য যে বিস্ময়কর প্রচেষ্টা করেছিলেন তার বিশদ বিবরণ ও গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থখানিকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দেবকন্যা
দাম : চার টাকা

দেবদাসী প্রথা ভারতবর্ষের অত্যন্ত প্রাচীন প্রথা। আধুনিককালে আইন করে এ প্রথা রহিত করা হয়েছে বটে, কিন্তু দেবদাসী সমাজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। আজও দাক্ষিণাত্যের নিভৃত ভূমিখণ্ডে তাদের দেখা যায়। সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এসম্প্রদায়ের মানুষদের আনন্দ-বেদনায় হাসি-কান্নার কাহিনী লিখেছেন দেবকন্যাতে। অজিত গুপ্তের আঁকা অপূর্ব প্রচ্ছদসমৃদ্ধ সদ্য প্রকাশিত সুবৃহৎ উপন্যাস।

প্রাণতোষ ঘটকের
কলকাতার পথঘাট
দাম : তিন টাকা

কলকাতা ভারতবর্ষের ইংরাজ রাজত্বের সূচনা ও বিস্তারের পীঠস্থান এবং নব-ভারতের জন্ম-লাভের সূতিকাগৃহ। গহন-অরণ্যগর্ভ হতে জন্মলাভ করল এই বিস্ময়কর নগর। আড়াই শ বছরের সমাজ-সভ্যতা ও ইতিহাসের পুঞ্জ পুঞ্জ বিস্মৃত অবলুপ্ত ও অনুদ্‌ঘাটিত পদচিহ্ন মূর্তময়ী হয়ে ফুটে উঠেছে 'কলকাতার পথঘাট'এর প্রতি পৃষ্ঠায়।

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়ের
তখন আমি জেলে
দাম : ছয় টাকা

"* * * লেখক বিপ্লবী দলের বিশিষ্ট সভ্য হিসাবে যে সমস্ত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে যে কোন বৈপ্লবিক দলের ইহাই প্রকৃত ইতিহাস। প্রত্যেক বিপ্লববাদীকেই অল্প বিস্তর ঐ একই রাস্তা অনুসরণ করিয়া চলিতে হইয়াছে।

বৈপ্লবিকের গতিবিধি চিরদিনই অত্যন্ত নিরস নিষ্ঠুর অথচ রোমাঞ্চকর। সাধারণ পাঠক গ্রন্থকারের বহুবিধ রোমাঞ্চকর কাহিনীর গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে যে তাঁহারই রসপুষ্ট বিবৃতি পাড়য়া আনন্দানুভব করিবেন তাহা নিঃসন্দেহ। বাস্তব ঘটনাবলীর বর্ণনা কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া লেখক আলোচ্য গ্রন্থে যে রসসৃষ্টির প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাহা সর্বতোভাবে সার্থক হইয়াছে। গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত লেখকের রচনাশৈলীর প্রকৃষ্ট পরিচয় বহন করিতেছে।

মুদ্রণ পারিপাট্য প্রশংসনীয়। বাঁধাই প্রচ্ছদপট মনোরম।—দেশ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড

গ্রাম : কালচার ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭ ফোন : ৩৪-২৬৪১

যাহা চাওয়া যায়
তাহা পাওয়া যায়না
ধন-ঐশ্বর্য্য
কিন্তু
আপনি ইচ্ছামত একটী সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কেশতৈল অনায়াসে পাইতে পারেন। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত 'হিমকল্যাণ'ই আপনার কেশতৈল নির্ব্বাচন-সমস্যা সমাধানে সক্ষম। ইহার কল্যাণ পরশে যাবতীয় কেশরোগ নিরাময় ও মস্তিষ্ক শীতল হয়। দীর্ঘদিন নিয়মিত ব্যবহারেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।
ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যাণ
আয়ুর্ব্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ সুরভিত কেশতৈল
HIMKALYAN
অন্যান্য প্রসাধনী
• পামিকোকো সুরভিত নারিকেল তৈল
• হিমকল্যাণ ক্যাষ্টর অয়েল সুগন্ধিত কেশতৈল
• ভৃঙ্গামলা মহোপকারী কেশতৈল
• যোজনগন্ধা সুরভি নির্য্যাস
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ
কলিকাতা
UPCO

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৫শ বর্ষ—ফাল্গুন, ১৩৬৩] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [দ্বিতীয় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। "ঈশ্বরকে জানতে গেলে কথায় (শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে) বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাসেই তাঁকে বুঝতে পারা যায়। জীব ঈশ্বরচিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই। আবার ভুলে যায়, সংসারে আসক্ত হয়। বিষয়ীর ঈশ্বর কেমন জান? খুড়ী-জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা যেমন ঝগড়া করতে করতে বলে—আমার ঈশ্বর আছেন! অন্তর শুদ্ধ না হলে ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাসই হয় না।"

"বিশ্বাস হয়ে গেলেই হলো। বিশ্বাসে সব হতে পারে। যার ঠিক বিশ্বাস তার সব তাতেই বিশ্বাস হয়—সাকার, নিরাকার, রাম, কৃষ্ণ, ভগবতী। বিশ্বাস চাই—বালকের মত বিশ্বাস! বালকের মত বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মা বলেছেন,—ও তোর দাদা হয়, তো জেনে আছে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দাদা। মা বলেছেন, জুজু আছে, তো বালকের অমনি ষোল আনা বিশ্বাস যে ও-ঘরে জুজু আছে। এইরূপ বালকের মত বিশ্বাস দেখলে ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসার-বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।"

"বালকের মত বিশ্বাস! বালক মাকে দেখবার জন্য যেমন ব্যাকু হয়, সেই ব্যাকুলতা! এই ব্যাকুলতা হলো তো অরুণ উদয় হলো তার পর সূর্য্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বর দর্শন। জটি বালকের কথা আছে। সে পাঠশালে যেতো। একটু বনের প দিয়ে পাঠশালে যেতে হতো; তাই সে ভয় পেতো। মাকে বলাে মা বললেন—তোর ভয় কি? তুই মধুসূদনকে ডাকবি। ছেলে জিজ্ঞাসা করলে—মধুসূদন কে? মা বললেন,—মধুসূদন তোমা দাদা হয়। তখন একলা যেতে যেতে যাই ভয় পেয়েছে, অমা ডেকেছে—দাদা মধুসূদন! কেউ কোথাও নাই। তখন উচ্চৈঃস্ব কাঁদতে লাগলো,—কোথায় দাদা মধুসূদন! তুমি এসো, আমার ভয় পেয়েছে! ঠাকুর তখন থাকতে পারলেন না—এসে বলে এই যে আমি, তোর ভয় কি? এই বলে সঙ্গে করে পাঠশাল রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন, আর বললেন,—তুই যখন ডাক আমি আসবো—ভয় কি? এই বালকের বিশ্বাস! ব্যাকুলতা!"

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত এই তৃতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি গত ২৪শে ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রথম সভায় পশ্চিম-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যে সকল মহাপুরুষ সমগ্র শক্তি দিয়ে যাদবপুর কলেজটিকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহার পরিচালনা করেছেন, তাঁদের তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে চিরকালের জন্য ইহার পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের একটি বিশেষ স্থান রাখা হয়েছে। কারণ, জাতীয় শিক্ষা পরিষদই এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা এবং তাঁরাই এত দিন এর পরিচালনা করেছেন। তিনি এ আশ্বাসও দিয়েছেন যে, সরকার সর্ব্বদাই পরিষদকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবেন।

পরিশেষে তিনি বলেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বেশী আনন্দিত কিম্বা তিনি বেশী আনন্দিত, এ কথা তিনি বলতে পারেন না।

এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের একটা স্থায়ী ফল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ এদেশে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত শিক্ষা জাতীয় আদর্শের অনুকূল ছিল না। কেরাণী তৈরির প্রয়োজনে সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা নিজের হাতে নেন, তখন থেকে সস্তায় কেরাণী তৈরী হতে লাগল। কিন্তু ক্রমে শিক্ষার বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এ অভাব আর থাকল না। বরং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে গেল। একটা জাতির উন্নতির পক্ষে প্রয়োজন, দেশে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য গড়ে তোলা। কিন্তু সেটা ছিল ইংরাজের স্বার্থের প্রতিকূল। সুতরাং দেশের চিন্তাশীল মনীষীরা ইংরাজী শিক্ষার গোড়ায় গলদ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিন পাল, সিষ্টার নিবেদিতা, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশহিতব্রতীরা এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেন।

কিছু দিন পরে দেখা দিল স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের জন্য দেশে দেখা দেয় আত্মনির্ভরতার এক অভূতপূর্ব্ব প্রেরণা। এটা হল ১৯০৫ সালের শেষার্দ্ধের কথা। ছাত্রসমাজ দলে দলে গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় এবং গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত বিদ্যালয় বর্জ্জন করে। এই ছাত্রসমাজকে জাতীয় আদর্শ ও দেশের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে সুপথে পরিচালনা করার প্রয়োজনেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সূচনা। ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরীর (তখনও হাইকোর্টের জজ হন নি) আহ্বানে বাংলার নেতারা ১৯০৫ সালের ১৬ই নভেম্বর এক সভায় মিলিত হয়ে একটা অস্থায়ী কমিটি গঠন করলেন। এই কমিটিতে ছিলেন ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, চিত্তরঞ্জন দাশ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বিপিনচন্দ্র পাল, সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি চল্লিশ জন সদস্য। সম্পাদক হলেন আশুতোষ চৌধুরী ও ডাঃ নীলরতন সরকার।

এই কমিটির সিদ্ধান্ত পরদিন এক প্রকাণ্ড সভায় জানান হ'ল। নিয়ম-কানুন তৈরি হয়ে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ একটি প্রকাশ্য সম্মেলনে গৃহীত হ'ল। আর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হ'ল, 'ন্যাশানাল কাউন্সিল অব এডুকেশন' বা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। এই পরিষদ ১৮৬০ সালের ২১শ আইন অনুসারে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন রেজেষ্ট্রী হ'ল। ইতিমধ্যে বাংলার মফঃস্বলে কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইস-চ্যান্সেলর ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তিনি এই সভায় পরিষদের আদর্শ ও নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করেন। তিনি বললেন— প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা না করেও ভারতীয় জীবন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার চর্চ্চা করা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় এই জাতীয় শিক্ষার শুভ সূচনাকে অভিনন্দন জানালেন।

স্বনামধন্য বাঙ্গালী দানবীর 'রাজা' সুবোধচন্দ্র মল্লিক দিলেন এক লক্ষ টাকা। ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ও মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য-চৌধুরী আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি দানপত্র করে দিলেন। আরও অনেকে পরিষদকে অর্থ সাহায্য করতে লাগলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এলেন, বরোদার গাইকোয়ার কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। তিনি নামমাত্র বেতনে এই কলেজের অধ্যক্ষ হলেন। ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, মঃ মঃ চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, মঃ মঃ দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই ন্যাশনাল কলেজে যোগ দিলেন। জাতীয় কলেজ ও স্কুলের কাজ আরম্ভ হ'ল ১৬৬ নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে, বর্ত্তমান বসুমতী সাহিত্য মন্দির ভবনে। এখানকার শিক্ষার ভিত্তি হ'ল ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতি। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে পরিষদ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সান্ধ্য বক্তৃতারও আয়োজন করলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য, ডাঃ এ. কে. কুমারস্বামী প্রাচ্য শিল্পকলা, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্ক ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত উপনিষদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই পরিষদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করতেন এবং খাতা পরীক্ষা করতেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ জাতীয় হয়ে উঠল।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান আলোচনা আর ব্যবহারিক বিজ্ঞানে শিক্ষা দান কিন্তু তাঁরা এ বিষয়ে প্রথমেই হস্তক্ষেপ করেন নি। কিন্তু তারকনাথ পালিত প্রভৃতি পূর্ব্বেকার অস্থায়ী কমিটির কয়েক জন সভ্য এই বিষয়ে আগে প্রাধান্য দেবার

প্রস্তাব করলেন। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ হ'ল। তারকনাথ পালিতের নেতৃত্বে কয়েক জন এই কমিটি ত্যাগ করে তাঁরা আর একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। তার নাম দিলেন—"সোসাইটি ফর দি প্রোমোশন অব টেকনিক্যাল এডুকেশন।" এই সভাটিও ১৮৬০ সালের ২১শ আইন অনুযায়ী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন রেজেষ্ট্রী করা হ'ল। তারকনাথ পালিত ৯২ আপার সার্কুলার রোডে নিজের একটি বাড়ীতে ১৯০৬ সালের ২৫শে জুলাই "বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট" স্থাপন করলেন। এই সভারও সভাপতি হলেন ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ এবং সম্পাদক হলেন ডাঃ নীলরতন সরকার, সত্যানন্দ বসু ও রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

এখানে শেখান আরম্ভ হল—(১) মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং (২) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (৩) ভূতত্ত্ব ও (৪) ফলিত রসায়ন। কাচ ও মৃৎশিল্প, রঞ্জন, সাবান তৈরী ও চামড়ার কাজ শেষোক্ত বিষয়টির অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরও কতকগুলি কাজ যেমন এসিষ্টাণ্ট ফোরম্যান, ইঞ্জিন চালনা, মিটার ও মেকানিক্যাল ড্রাফ্টম্যানের কাজ শেখাবার ব্যবস্থা হ'ল।

১৯১০ সাল। তখন স্বদেশী আন্দোলনের দেশব্যাপী প্রবল তরঙ্গ থেমে এসেছে। ন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ এবং বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটেই ন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ উঠে এল ১৯১০ সালের মে মাসে। দুই প্রতিষ্ঠানই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অঙ্গীভূত হল। তবে প্রত্যেকটি পরিষদের অধীনে স্বতন্ত্র পরিচালক সভা রইল। ১৯১০ সালের জুন মাসে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ও ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র শিক্ষার জন্য আমেরিকার হার্ভাড, ইয়েল ও মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত জন ছাত্র পাঠাবার জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদের হাতে ত্রিশ হাজার টাকা দান করলেন। এই দানের একটা সর্ত্ত ছিল, যারা বিদেশ থেকে শিক্ষা লাভ করে আসবে তারা প্রত্যেকে সাত বৎসর পরিষদের অধীনে একটা নির্দ্দিষ্ট বেতনে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে। এই টাকার সাহায্যে যাঁরা বিদেশে গিয়ে শিক্ষা লাভ করে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েক জন দেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন।

১৯০৪ সালের নূতন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে এই সময় ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভাইসচ্যান্সেলার হয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়কে পুনর্গঠন করতে আরম্ভ করলেন। যদিও তিনি কখনও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে সংযুক্ত হননি। তবে তিনি এই জাতীয় আদর্শে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থায় বিশেষ উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী প্রতিষ্ঠান। তার সম্পদ ও শক্তি অপরিসীম। আবার ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়ে গেল। সুতরাং আগের মত ব্যাপক আন্দোলনের আর প্রয়োজন ছিল না। এখন আর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রয়োজনও অনেকে অনুভব করলেন না। তারকনাথ পালিত পরিষদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন। তাঁরই আদেশে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট ও ন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ আপার সার্কুলার রোডের বাড়ী থেকে উঠে গেল। তখন ১৯১২ সালে তারকনাথ এই সম্পত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করলেন। তখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠানগুলি মানিকতলায় মুরারিপুকুরে 'পঞ্চবটী ভিলা' নামে একটা বাগান-বাড়ীতে উঠে গেল।

এই সময় ন্যাশনাল কলেজের ছাত্র-সংখ্যা খুব কমে যায়। ১৯১৭ সালে কলেজ বিভাগ এবং ১৯২০ সলে স্কুল বিভাগ উঠে যাবার মত হয়। কিন্তু ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে আবার ছাত্রসংখ্যা বেড়ে তিনগুণ (৬৬৫ জন) হ'ল। মফঃস্বলের জাতীয় বিদ্যালয়গুলিও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরিষদ তাদেরও অর্থসাহায্য করতেন। চাঁদপুরে হরদয়াল নাগের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত জাতীয় বিদ্যালয়টি বহু বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে আত্মরক্ষা করে এসেও দেশ বিভাগের পর উঠে যায়। বরিশালের বানারিপাড়ায় জাতীয় বিদ্যালয়টি বহু দিন নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেও দেশ বিভাগের পর আর আত্মরক্ষা করতে পারল না।

১৯২১ সালে ছাত্রসংখ্যা অকস্মাৎ বেড়ে গেল। কর্ত্তৃপক্ষ অত্যন্ত বিপদে পড়লেন। ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার। তাছাড়া শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর দানের একটি সর্ত্ত ছিল যে, দানের সময় থেকে পনের বৎসর পরে পরিষদের মূলধন তাঁর দান বাদে সাত লক্ষ টাকার কম হলে তাঁর দান থেকে পরিষদ বঞ্চিত হবে। ১৯২১ সালটি সেই জন্য পরিষদের ইতিহাসে একটা ভীষণ সঙ্কটময় সময়। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ছিলেন ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ। তিনি সব সর্ত্তের কথা জানতেন। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাসবিহারী ঘোষের মৃত্যুর পর প্রকাশ পেল যে তাঁর উইলে তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে তের লক্ষ টাকা দান করেছেন। দানবীর রাসবিহারী ঘোষের দানে পরিষদের শিক্ষাতরীর পালে হাওয়া লেগে শিক্ষাতরী আবার তর-তর বেগে ছুটে চলল। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইতিহাসে ঝড়-ঝাপ্টা কেটে গিয়ে আবার মেঘমুক্ত নির্ম্মল নীল আকাশ দেখা গেল।

রাসবিহারী ঘোষের দেহত্যাগের পর স্যার আশুতোষ চৌধুরী জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি হলেন। আর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন অন্যতম সম্পাদক। এই দুই জনের স্নেহপুষ্ট হয়ে সৃষ্টি থেকেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ধন্য হয়েছে। অর্থের অভাব দূর হওয়াতে কর্ত্তৃপক্ষ কালবিলম্ব না করে কলিকাতা করপোরেশনের নিকট থেকে ৯২ বিঘা জমি নাম মাত্র খাজনায় লীজ নেন। যাদবপুরে এই জমির ওপর রাসবিহারী ঘোষের অর্থে গড়ে উঠল বিরাট অট্টালিকা সমূহ।

১৯২২ সালের মার্চ মাসে মূল বিদ্যালয়-ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হ'ল। ১৯২৮ সালে শেষ পর্য্যন্ত সওয়া আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলেজ-ভবন, পরীক্ষণ ও গবেষণাগার, বিদ্যুৎ উৎপাদন গৃহ, কারখানা, ছাত্রাবাস, অধ্যাপকগণের বাসগৃহ প্রভৃতি তৈরি হ'ল। কলেজ-ভবনটি তৈরী হতেই ইনষ্টিটিউট ১৯২৪ সালের জুন মাসে এখানে স্থানান্তরিত হয়। ১৯২৩ সালে পরিষদ এখানকার তিন জন অধ্যাপককে উচ্চতম ব্যবহারিক বিজ্ঞান শেখবার জন্য জার্ম্মাণীতে পাঠান। তাঁরা প্রত্যেকেই ইঞ্জিনিয়ারিং ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানে ডক্টর উপাধি পান।

কৃষিতত্ত্ব শিক্ষাদানের জন্য ১৯২১ সালে ভবানীপুর নিবাসী

গোপালচন্দ্র সিংহ বাৎসরিক সাড়ে চার হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি পরিষদকে দান করেন। কিন্তু পরিষদ কৃষিবিদ্যা শেখাবার কোন ব্যবস্থা করতে পারেননি। প্রথমে তাঁরা কিছুদিন চুচুড়া কৃষি-বিদ্যালয়কে এবং বিশ্বভারতীর অন্তর্গত শ্রীনিকেতনকে এই উপস্বত্ব থেকে সাহায্য করতেন। ১৯২৯ সালে পরিষদ করপোরেশনের নিকট থেকে ১২ বিঘা জমি পান। কিন্তু নানা কারণে কৃষি বিভাগ খোলা সম্ভব হয়নি। পরে আবার কৃষি বিভাগ খোলার কথা হয়। ১৯২৭ সাল থেকে করপোরেশন পরিষদকে বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করতে আরম্ভ করেন। ১৯৩৩ সালেও করপোরেশন পরিষদকে এককালীন দেড় লক্ষ টাকা দান করেন।

১৯২৯ সালে কর্তৃপক্ষ বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট নাম বদল করে "কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনলজি, বেঙ্গল" নামকরণ করেন। এখানে জুনিয়ার ও সিনিয়ার বিভাগে ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। জুনিয়ার বিভাগে তিন বৎসর এবং সিনিয়ার বিভাগে পাঁচ বৎসর পড়ার ব্যবস্থা আছে। সিনিয়ার বিভাগে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এই তিনটি উপবিভাগ আছে।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কলেজ ও স্কুল বিভাগ এখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে কিন্তু পূর্ব্বেকার সান্ধ্য বক্তৃতার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে হেমচন্দ্র বসুমল্লিক চেয়ার নামে ইতিহাসের অধ্যাপক ও প্রবোধচন্দ্র বসুমল্লিক চেয়ার নামে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হয়েছে। ১৯০৬ সাল থেকেই এই অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হয়। অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিধুভূষণ দত্ত, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ এই পদে নিযুক্ত থেকে বক্তৃতা দিতেন। দর্শন-বিভাগে অধ্যাপনা করতেন ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি।

রাত্রি যায়, দিন আসে। প্রকৃতি রঙের টানে গভীর অমানিশার অন্ধকারের পর পূব-আকাশকে আলোর আভায় রাঙিয়ে তোলে। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে এখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সুদৃঢ় আশ্রয় লাভ করেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। এখানকার ছাত্রেরা দেশের কৃতী সন্তান হয়ে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠুক, বিধানচন্দ্রের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা জানাই।

দোঁহে যবে লইনু বিদায়

(*Lord Byron*-এর 'When we two parted' কবিতা থেকে)

অশ্রু ঝরেছিল মোদের দু' নয়নে
মুখেতে ছিল না ত' বাণী,
ভগ্ন অন্তরে, দীর্ঘ দিন তরে
বিদায় দিলে যবে রাণি!

মদিরাহীন তব শীতল চুম্বনে
কি নিরাশা হ'ল যে প্রকাশ!
পাংশু কপোলেতে বুঝি বা ফুটেছিল
আজিকার দুঃখের আভাস।

প্রভাত-হিম-কণা, পরশি' ললাট মোর
কহিল কী বেদনার বাণী,
তারি মাঝে ছিল বুঝি, এ' মরম যাতনার
লুকানো সে ইঙ্গিতখানি।

মলিন হয়েছে আজি শুভ্র যশের মালা
শপথ যে ভাঙ্গিয়াছ হায়!
তোমার অপযশে আমার-ই বেদনা সে,
সে-ও যেন আমারি গো দায়।

সমুখে করে যবে সকলে কানাকানি
বিঁধে যে তাহা শেলসম,
শিহরি বেদনায় মনেতে ভাবি হায়
কেন এত প্রিয় ছিলে মম?

তোমার সাথে মোর নিবিড় পরিচয়
সে-কথা ওদের জানা নাই—
গভীর বেদনার ভাষা যে নাহি হায়,
নীরবে স'য়ে যাব তাই।

গোপনে মিলেছি দোঁহে, নীরবে কাঁদিব আমি
তুমি ত' ভুলেছ সব স্মৃতি,
তুমি যে ছলিতে পার, এ-কথা ভাবিনি কভু,
জানি নাই এ নিঠুর রীতি!

দীর্ঘ দিনের পরে যদি কভু দেখা হয়
কেমনে বরিব' তোমা রাণি?
অশ্রু রবে শুধু আমার দু' নয়নে,
মুখে না রবে কোনও বাণী!

অনুবাদ: মানসী চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ

আজ আপনারা আমাকে এই আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিবার যে সুযোগ দিয়াছেন, তাহার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আজকার এই আনন্দোৎসবে বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা আমার নাই। শুধু বর্তমান কালের 'বিজ্ঞানের অত্যাচার' সম্পর্কে সামান্য দুই-একটি কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব।

অগ্নি প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষের জন্য অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া তাহাদের প্রাণ ধারণের সহায়তা করে। আবার এই দাহিকা শক্তিই অপপ্রযুক্ত হইলে ধনসম্পত্তির ধ্বংস ঘটায়। ধর্ম আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের নিয়ন্তা, জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণের প্রেরণা-দায়ক, অথচ এই ধর্মের নামে পৃথিবীতে যত প্রকার অনাচার, অত্যাচার এবং নৃশংস ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, সেরূপ অন্য কোন কারণেই হয় নাই। সেইরূপ, বিজ্ঞান এক দিকে যেমন প্রকৃতির এবং ব্রহ্মাণ্ডের বিবিধ শক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, বিবিধ প্রকার আবিষ্কার উদ্ভাবন করিয়া আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিয়াছে, অগণিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যন্ত্র নির্মাণ করিয়া আমাদের জীবনযাত্রার পথ সুগম করিয়াছে, তেমনি অন্য দিকে মানবের অন্তর্নিহিত লোভ, স্বার্থপরতা, নীচতা, ক্রূরতা প্রভৃতির সুযোগ লইয়া বিবিধ অনর্থ ও অকল্যাণ ঘটাইতেছে। অ্যাটম-বম প্রভৃতি বিরাট বিরাট মারণাস্ত্রের কথা না হয় না-ই আলোচনা করিলাম। আমাদের দৈনন্দিন সাধারণ জীবন যাপনের মধ্যে আমাদিগকে বিজ্ঞানের বহু অপপ্রয়োগের সম্মুখীন হইতে হয়।

প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তেই আমরা বিজ্ঞানের মুখাপেক্ষী। টুথপেস্ট দিয়া দাঁত মাজা, অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করা, যানবাহন চলাচল করা, চোখে চশমা পরা, রোগে চিকিৎসা করা প্রভৃতি সকল বিষয়েই আমরা বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ পরাধীন। বিজ্ঞান ব্যতীত আমরা কোন কাজই করিতে পারি না। অথচ এই বিজ্ঞান-প্রয়োগের ফাঁকে ফাঁকে আমাদিগকে বিজ্ঞানের বহু অত্যাচারও সহিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক নামের মোহের সুযোগ লইয়া অনেক স্থলে স্বার্থসিদ্ধি করা হইয়া থাকে। বহু দ্রব্যের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মাইবার জন্য বৈজ্ঞানিক নামের সুযোগ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। বিজ্ঞাপিত ইলেক্‌ট্রিক রসায়নের নামের মূল কারণ হয়তো এই যে, যে ঘরে বসিয়া বোতলে রসায়ন ভরা হইয়াছে, সেই ঘর ইলেক্‌ট্রিক আলোয় আলোকিত। পঞ্জিকার পাতায় কেমিক্যাল স্বর্ণের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। এই কেমিক্যাল স্বর্ণের যোল গাছা ভাটিয়া চুড়ীর দাম সাত টাকা মাত্র এবং তৎসহ দুইটি উপহার, একখানি 'পতি পরম গুরু' খচিত চিরুণী এবং এক শিশি সুবাসিত তরল আলতা। এই সকল বিজ্ঞাপনে শিক্ষিত ব্যক্তিদের আস্থা না থাকিতে পারে, কিন্তু অশিক্ষিত ব্যক্তিরা ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত নহেন।

বিজ্ঞানের একটি অভিনব অবদানের কথা মনে পড়িতেছে। বর্তমানে যে কেমিক্যাল ঘৃত প্রচলিত হইয়াছে, ওই বস্তুটি কি, আপনারা বলিতে পারেন? ইহাকে ঘৃত কেন বলা হয়? বিশুদ্ধ ঘৃতের পার্শ্বে এই কেমিক্যাল ঘৃত ঠিক যেন পদ্মফুলের পার্শ্বে গোময়। এই ঘৃতে শরীরের কোন ক্ষতি হয় কি না তাহা আমরা জানি না। এই ঘৃতের কোন খাদ্যমূল্য আছে কি না, থাকিলেও তাহা কতটুকু, তাহা আমরা জানি না। শরীরের উপর কোন খাদ্যের কি প্রভাব তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়। দুই চারি দিনের বা দুই চারি বৎসরের পরীক্ষা দ্বারা ইহা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ভেতো বাঙ্গালীর শরীরের ভাতের কি প্রভাব, তাহা নির্ণয় করিতে বহু বৎসর আবশ্যক। এমন কি, বহু পুরুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ব্যতীত ইহা সঠিক নির্ণয় করা যাইবে না। তেমনি এই কেমিক্যাল ঘৃতে আমাদের শরীরের কোন প্রকার অনিষ্ট হয় কি না, তাহাও নির্ণয় করা অল্প সময়ে সম্ভব নয়। আমাদের এবং আমাদের বংশধরদের শরীরে এই কেমিক্যাল ঘৃতের ফল কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে হইতেছে। ফিজিওলজিতে বলে The fat which is build up by an animal is peculiar to the animal, but if it is starved and subsequently fed on fat unusual to its diet, it may put on fat of another composition. এই ব্যাপারটি একটু বিস্তৃত বা extend করিলে, আশঙ্কা হয়, ঘৃত আহার করিয়া আমাদের মস্তিষ্কে যে ঘিলু প্রস্তুত হইয়াছে, এই কেমিক্যাল ঘৃতের প্রভাবে তাহা ক্রমশ দালদালুতে পরিণত হইয়া না যায়! এই কেমিক্যাল ঘৃতের সাহায্যে বিশুদ্ধ ঘৃতকে ভেজাল ঘৃতে পরিণত করিবার যে সুবর্ণ সুযোগ হইয়াছে, তাহা সুবিদিত। এই ভেজাল নিবারণের জন্য কেমিক্যাল ঘৃতে কেন রঙ মিশানো যাইতেছে না, তাহাও একটি কেমিক্যাল রহস্য; লোজেঞ্জে নানাপ্রকার রঙ দেওয়া যায়, টফিতে, বিস্কুটে, কেকে বিবিধ রঙ লাগান যায়, সন্দেস, রসগোল্লা, পান্তুয়ায় রঙ দেওয়া যায়, রামধনুর বিবিধ বর্ণের সিরাপ প্রস্তুত করা যায়, অথচ কেমিক্যাল ঘৃতে কেন রঙ ধরান যায় না, তাহা বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে না। এই কেমিক্যাল ঘৃত উৎপাদনের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় না করিয়া এই অর্থে গোজাতির উন্নতি ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিয়া বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃত উৎপাদন করিলে রসায়ন শাস্ত্রের গৌরবের বৃদ্ধিই হইত, হানি হইত না।

আমার একটি ভুল ধারণা ছিল, প্রয়োজনানুসারে মৎস্য দুই চারি দিন বরফের মধ্যে বা কোল্ডষ্টোরেজে রাখা হইয়া থাকে। কিছুদিন পূর্বে জানিতে পারিলাম, মৎস্য তিন চার মাস পর্যন্ত ঠাণ্ডা ঘরে থাকিতে পারে এবং থাকে। এই সংবাদে স্তম্ভিত হইলাম! মৎস্যকে এইরূপে ঠাণ্ডা ঘরেই হউক বা অন্যঘরেই হউক রাখিয়া দিলে তাহা প্রাণনাশক বিষে হয়তো পরিণত হয় না, কিন্তু উহার মৎস্যত্ব যে থাকে না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আজকাল বাজারের যে মাছ আমরা খাই, তাহার অধিকাংশ টাটকা মাছের স্বাদই নাই। টাটকা মাছের স্বাদ আমরা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছি। পৃথিবীতে যত প্রকার আমিষ খাদ্য আছে তাহার মধ্যে আমাদের দেশের রুই মাছ, কাতলা মাছ এবং ইলিশ মাছের মত সুস্বাদু খাদ্য আর নাই। অবৈজ্ঞানিক যুগে বাজারে

গেলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রুই কাতলা দেখিলে মন আনন্দে নাচিয়া উঠিত। এখন ওইগুলিকে দেখিলে মনে হয়, এক একটা গলিত শব পড়িয়া আছে। মাছের কালিয়া খাইবার সময়ে মনে হয়, ঘুঁটের কালিয়া খাইতেছি! যে মাছগুলি স্বভাবতই কোমল, যেমন পাবদা, আড, ট্যাং, প্রভৃতি, সেগুলি খাইবার সময়ে মনে হয়, তুলা-সরা দিয়া বালি খাইতেছি। মাছগুলিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এরূপ অখাদ্য করিয়া খাইবার সার্থকতা কি? বহু দিন কোল্ড-ষ্টোরেজে থাকিবার পর মাছের খাদ্যমূল্য কতটা বজায় থাকে, তাহাও অনুসন্ধানের বিষয়! এ বিষয়ে আপনাদের কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে। একটা সদ্যধৃত দশ-পনের সের ওজনের রুই বা কাতলা মাছ আনিয়া আপনাদের কোল্ডষ্টোরেজে রাখিয়া দিন। তারপর প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া উহা হইতে কুড়ি সি. সি: পরিমাণ দুইটি টুকরা কাটিয়া লইয়া, তাহার একটি টুকরা ছাঁকা তেলে ভাজিয়া বেশ বাদামী রঙের করিয়া লইয়া খাইয়া ফেলিবেন এবং অপর টুকরাটি লইয়া রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা প্রতি সপ্তাহে উহার খাদ্যগুণ কিরূপে অবনত হয় এবং ক্রমশ কিরূপে অখাদ্য হইয়া যায়, তাহা নির্ণয় করিবেন। যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য বা ঐ ধরণের বিশেষ প্রয়োজনের জন্য শুঁটকি মাছ, টিনে-ভরা মাছ, প্রভৃতির প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য স্বেচ্ছায় টাটকা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিকৃত করিয়া ভোজনের তৃপ্তি এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি নষ্ট করিবার হেতু নাই। মাছ যখন বেশি পাওয়া যায় তখন না হয় একটু বেশি করিয়াই খাওয়া যাইবে। আবার যখন মাছ পাওয়া না যায়, তখন না হয় নাই খাইলাম। যে সময়ের যে খাদ্য, সে সময়ে তাহা খাওয়া, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। আমের সময়ে আম, জামের সময়ে জাম, ইহা স্বাস্থ্যসম্মত প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। পৌষমাসে লিচু কি না খাইলেই নয়?

চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যেমন অগণিত হিতকর অবদান আছে, তেমনি বহু অবদানও আছে। আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে, মানুষের শরীর শুধু একটা Physico-Chemical Compound নয় শুধু physics এবং Chemistry দ্বারা শরীরের সকল প্রকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। শরীরের মধ্যে এমন বহু উপাদান আছে এবং এমন সকল প্রক্রিয়া আছে, যাহা Physics এবং Chemistry-এর সাহায্যে বুঝা যায় না। এইরূপ অনেক বিষয়ে শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ একটা vital force বা vital action বা প্রাণশক্তির অবতারণা করিয়া সমস্যার উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন; অথচ এই প্রাণশক্তি কিরূপ বা ইহার সহিত শরীরের সম্বন্ধ কি, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। একটি জীবিত সেল এবং একটি মৃত সেলের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। পাকস্থলীর পাচক রসে পাকস্থলীটি নিজেই কেন পরিপাক হইয়া যায় না!

ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে, "The digestive enzymes do not enter the living cells." কিন্তু কেন? এ কথার কোন উত্তর নাই। Intestinal absorption সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "A number of phenomena concerned in absorption can, however, only be explained as being due to the vital activity of the cells themselves. Thus it is found that ·4 per cent sodium chloride is more rapidly absorbed than water, while isotonic solutions of sodium or magnesium sulphate are unabsorbed." আবার বলা হইয়াছে, "Glucose is more easily absorbed than lactose or xylose, although the latter has a smaller molecule. This is in direct conflict with physical laws and can only be explained as a result of vital action on the part of the cells." এই সকল ক্ষেত্রে যে vital action বা vital force-এর দোহাই দেওয়া হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে কোন গবেষণা এখনও হয় নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, শরীরের মধ্যে এমন সকল ব্যাপার আছে, যাহা physics এবং chemistry-এর আয়ত্তের বাহিরে। এই জন্যই শুধু physics এবং chemistry-এর উপর নির্ভর করিয়া যে-সকল ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে, সেগুলি যথাযথ ভাবে ফলপ্রসূ হইতেছে না। একটি ঔষধ আবিষ্কৃত হয়, ইহার উপকারিতা সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হয়, আবার কিছুদিন পরেই ঘোষিত হয় যে, উক্ত ঔষধ সেবনে বহু প্রকার অপকারের আশঙ্কা আছে। ইহার স্থলে আবার নূতন আর একটি ঔষধের উপকারিতা বিজ্ঞাপিত হয়। তত দিনে লক্ষ লক্ষ নরনারী পূর্বোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়া হয়তো নানাবিধ জটিল এবং দুরারোগ্য উপসর্গে ভুগিতে আরম্ভ করিয়াছেন! একটি রোগ সারিতে গিয়া অপর একটি নূতন রোগের সৃষ্টি হয়, ইহা সর্বদাই প্রত্যক্ষ হইতেছে। হাঁপানি সারিতে গিয়া পক্ষাঘাত, টাইফয়েড সারিতে গিয়া রক্তশূন্যতা, প্রভৃতি বহু ক্ষেত্রে ঘটিতেছে। শরীরের অন্তর্নিহিত vital force বা প্রাণশক্তির সহিত দেহের, রোগের এবং রোগনাশক ঔষধের মৌলিক সম্পর্ক কি, তাহা যথাযথরূপে আমরা অবগত হইতে পারি নাই বলিয়াই এরূপ ঘটিতেছে। বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞান সর্বশক্তিমান, এরূপ দম্ভ অসমীচীন। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক একত্রিত হইয়াও একটি পিপীলিকা বা একটি তৃণ বা এক বিন্দু দুগ্ধ বা একগাছি কেশ প্রস্তুত করিতে পারিবেন না।

বৈজ্ঞানিক অত্যাচারের মূল কারণ এই যে, বিজ্ঞান যত দ্রুত উন্নত হইয়াছে, যত সুদূর-প্রসারী হইয়াছে, মানুষের মন তাহা হয় নাই। মানুষের মনের আদিম দুর্বলতাগুলি প্রায় আদিম অবস্থাতেই রহিয়াছে। মানুষের ধর্মজ্ঞান এখন এই সকল দুর্বলতার মূল উৎপাটন করিতে পারে নাই। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বরং ধর্মবুদ্ধির অবনতিই ঘটিয়াছে। বিবিধ প্রকার বৈজ্ঞানিক কৌশল আয়ত্ত হওয়ায় মানুষের কুপ্রবৃত্তিগুলি বিজ্ঞানের সহায়তায় ক্রমশ যেন আরও অধোগতি লাভ করিতেছে। এই জন্যই সমগ্র জগতে বিজ্ঞান-প্রসূত বাহ্য ঔজ্জ্বল্যের পশ্চাতে রহিয়াছে বিবিধ পাপের গভীর কালিমা। এই কথা উপলব্ধি করিয়াই আইনষ্টাইন দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, Science has progressed much faster than morals.

আজিকার এই মনোরম বৈজ্ঞানিক সন্ধ্যায় আপনাদের সম্মুখে বিজ্ঞানের নিন্দা করিয়া আর আপনাদের কালহরণ বা ধৈর্য পরীক্ষা করিব না। আমি পুনরায় এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।*

---

*কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের পুনর্মিলন সভায় প্রধান অতিথিরূপে পঠিত—৫।১।৫৭,

প্রমথ চৌধুরীর সনেট

শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

'সনেট-পঞ্চাশৎ' পড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন —"বাংলায় এ জাতের কবিতা আমি ত দেখিনি। এর কোনো লাইনটি বার্থ নয়, কোথাও ফাঁকি নেই"...

প্রমথ চৌধুরীর সনেটের আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'লে তাঁর কাব্যের এই অনন্যসদৃশতাই প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অনন্যসদৃশতা ফুটে উঠেছে তাঁর কাব্যের ভাব-বস্তু এবং প্রকাশরীতিতে। তাঁর আগে বহু কবি বাংলা সনেট অথবা চতুর্দশপদী কবিতা লিখেছেন কিন্তু তাঁদের কবিতার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর কবিতার আদৌ মিল নেই—না দৃষ্টিভংগী, না প্রকাশরীতির। কবি নিজেই একটি চিঠিতে লিখেছেন—"কবিতা বস্তুকেই আমরা আর্টের কোঠায় ফেলি। সনেটে এই আর্ট নামক গুণই প্রধান লক্ষ্য করবার জিনিষ। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বড় কবিদের কবিতায় emotionই হয়ত আর্টকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে আছে। কিন্তু আর্ট অনেকটা বন্ধনের সামগ্রী। আমি যে সনেট লিখেছি, সে অনেকটা experiment হিসেবে।" এছাড়া 'পদ-চারণের' উৎসর্গ-পত্রে কবি আরো স্পষ্ট করে লিখেছেন যে, তাঁর কবিতায় আর কিছু না থাক, rhyme বা মিল আছে, আর আছে কিঞ্চিৎ reason বা যুক্তি। এর প্রথমটি পদ্যের এবং দ্বিতীয়টি গদ্যের বিশেষ গুণ। দু'শ্রেণীর রচনার দু'টি বিশেষ গুণ নিয়ে তাঁর কাব্য; তাই তার স্বাদও হয়েছে অপূর্ব!

প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় ছন্দ আছে, মিলও আছে কিন্তু প্রকাশভংগীতে ফুটেছে ব্যঞ্জনার বদলে বক্রোক্তি। কারণ সেখানে হৃদয়াবেগ ক্ষীণ, যুক্তিনিষ্ঠাই প্রবল। নিজের কবিধর্মের পরিচয় দেওয়ার সময় কবি তাই লিখেছেন;—

"কল্পনা রাখিনে আমি আকাশে তুলিয়ে,—

* * *

হৃদয়ে জন্মিলে মোর ভাবের অঙ্কুর,
ওঠে না তাহার ফুল শূন্যেতে দুলিয়ে।

* * *

কবিতার যত সব লাল-নীল ফুল,
মনের আকাশে আমি সযত্নে ফোটাই,
তাদের সবারি বদ্ধ পৃথিবীতে মূল,—
মনোঘুড়ি বুঁদ হ'লে ছাড়িনে লাটাই।"

বুদ্ধির সাহায্যে ভাবকে এই ভাবে নিয়ন্ত্রিত করার ফলে তাঁর বহু কবিতায় সত্যই "ভাষার সুসার আছে, নাই ভাবপ্রাণ। গোলাপের ছোপ আছে, নাই তার ঘ্রাণ।"

কবি অবশ্য এর উত্তরে লিখেছেন,—

"সনেটের গোণাগাঁথা ছত্র চতুর্দশ,
এ-পাত্রে যায় না ঢালা এক গঙ্গারস।
জানি মোর ভারতীর তনুর তনিমা,
না বধি রাবণ পক্ষে, কিংবা রাজা কংস।
সাধনার ধন মোর ভাবের অণিমা;
অর্থাৎ ভাষায় ধৃত মনের ভগ্নাংশ।"

বলা বাহুল্য যে, সনেটের চোদ্দটি অক্ষরের পাত্রে 'একগঙ্গা রস' কেউ প্রত্যাশা করে না। কবি-মনের ভগ্নাংশই তার মধ্যে রূপায়িত হয়ে ওঠে কিন্তু সেই ভগ্নাংশের হিসাব গাণিতিক নয়। এই প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ সমালোচকের একটি উক্তি স্মরণ করা যায়। "A poem does not reguire to be an epic to be great, any morc then a man need to be a giant to be noble." ভাবের অণিমা সকল কবিরই সাধনায় ধন। একটি বছর, একটি দিন বা ঘণ্টার মত একটি বিশেষ মুহূর্তেও এই ভাবের অণিমা অনুভূত হ'তে পারে, আর সেই মুহূর্তের স্মৃতিকে কাব্যে মহিমান্বিত করে তোলাই সনেট রচয়িতার উদ্দেশ্য। একজন খ্যাতনামা সনেটকার এই কথাগুলিই একটি সনেটের মধ্যে দিয়ে অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন।

"A sonnet is a moment's monument
Memorial from the soul'r eternity
To one deathless hour."

প্রমথ চৌধুরীর সনেটের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনার ভূমিকায় একথা বলা যায় যে, বাংলা চতুর্দশপদী কবিতায় তিনি ছন্দের নৈপুণ্য ও ভাব-সংযমের যে পরিচয় দিয়েছেন, বিশেষ করে সেজন্যেই তাঁর কবিতা অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে। এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখেই কবি সমালোচক প্রিয়নাথ সেন প্রমথ চৌধুরীর কবিতা আলোচনা করার সময় মধ্যমশ্রেণীর ইংরেজ কবি Mathew Pierre এর নাম উল্লেখ করেছেন। Pierre-এর মত প্রমথ চৌধুরীকেও তিনি এক বিশেষ মর্যাদা-সম্পন্ন কবি বলে অভিহিত করেছেন। বাস্তবিকই বীরবলী গদ্যের মত বীরবলী পদ্যও হাস্য-ব্যঙ্গ মিশ্রিত বক্র দৃষ্টিক্ষেপের ফলে অনন্য হয়ে উঠেছে। শুধু দৃষ্টিই তাঁর তির্যক নয়, প্রকাশভংগীতেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বক্রোক্তি অনুপ্রবিষ্ট হয়ে চিন্তাপ্রসূত বাগ্‌-বৈদগ্ধ্যের চমক সৃষ্টি করেছে। এই ভাবে এক আশ্চর্যশক্তি বলে ভাব ভাষা আর ছন্দ মিলিয়ে প্রমথ চৌধুরী এক শ্রেণীর সুতীক্ষ্ণ কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু ভাষা এবং ছন্দের বিচারে এগুলির মধ্যে শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও এর মধ্যে এমন একটা কাঠিন্য থেকে গেছে, যার ফলে কবিতাগুলি 'নির্মমভাবে নিখুঁত' হয়ে উঠেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাগুলি সম্বন্ধে একটি চিঠিতে লিখেছেন—"বীণাপানিকে প্রমথ খড়্‌গপানি মূর্তিতে সাজাবার আয়োজন করেছেন।" প্রমথ চৌধুরীর সনেট তাঁর গল্পেরই মত 'পালিশ করা, ঝক্‌ঝকে, তীক্ষ্ণ।'

এবার তাঁর সনেটের গঠনভংগীর আলোচনায় আসা যাক্‌। প্রমথ চৌধুরীর সনেটের গঠন সম্বন্ধে শোনা যায় যে, তিনি ইতালীয় বা ইংরেজ কবিদের অনুসরণ না করে ফরাসী কবির শরণাপন্ন হয়েছেন। এই উক্তি আংশিক ভাবে সত্য। তাঁর অধিকাংশ সনেটেই ষটক অংশকে দু'ভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগে একটি পয়ার শ্লোক দেওয়া হয়েছে। তিনি নিজেও একটি চিঠিতে লেখেন যে, এই ভাবে ষটক অংশকে দু'ভাগে ভাগ করার রীতি তিনি ফরাসী সনেটকারদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। কোন কোন ফরাসী কবির সনেটে ষটকের প্রথম দু'পংক্তিতে অন্ত্যমিল দেখা যায়, কিন্তু

সেখানেও ভাবের ছেদ পড়েনি। অপরপক্ষে প্রমথ চৌধুরীর বহু সনেটেই ভাববস্তু ঐ পয়ার শ্লোকেই পূর্ণতালাভ করেছে এবং ভাবতরঙ্গও সেই সঙ্গে প্রশমিত হয়েছে। সুতরাং তিনি যে ফরাসী সনেটকারদের রীতি হুবহু অনুসরণ করেছিলেন, তা বলা চলে না। ইংরেজ কবিদের মধ্যে মিল্টনের দু'-একটি সনেটে অবশ্য সপ্তম পংক্তিতে ছন্দের সঙ্গে ভাবের যতিপাত হয়েছে কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে আবার মিল্টনের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর সনেটের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া প্রমথ চৌধুরী নিজেই যদিও "সনেট পঞ্চাশৎ"-এর প্রথম চতুর্দশপদী কবিতায় লিখেছেন :

পেত্রার্কা চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ,

*   *   *

একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার,

*   *   *

ইতালীয় ছাঁচে ঢেলে বাঙ্গালীর ছন্দ
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।"

তবু লক্ষ্যণীয় এই যে, উল্লিখিত সনেটটিও পেত্রার্কীয় রীতিতে রচিত হয় নি। একমাত্র "পদ-চারণের" অন্তর্গত 'সনেট সুন্দরী', 'বনফুল', 'চেরিপুষ্প' ইত্যাদি কয়েকটি সনেটে পেত্রার্কীয় ছন্দোবন্ধ অনুসৃত হয়েছে।

কবি অবশ্য Terza Rima ছন্দে রচিত "কৈফিয়ৎ" নামক কবিতায় লিখেছেন—

আনিনু সংগ্রহ করি বিষৎ প্রমাণ
ইতালির পিতলের ক্ষুদ্র কর্ণেট,
তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধ প্রাণ।
এ হাতে মূরতি ধরে আজি যে সনেট,
কবিতা না হ'তে পারে, কিন্তু পাকা পদ্য,—
প্রকৃতি যাহার "জেঠ", আকৃতি "কনেঠ।"
অন্তরে যদিচ নাই যৌবনের মদ্য,
রূপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী,
বারো কিম্বা তেরো নয়, পুরোপুরি 'চোদ্দ'!"

বিখ্যাত ফরাসী সনেটকার Soulare কিন্তু সনেটের কঠিন বিধি-বাহুল্যের মধ্যে 'হৃদয়ের অভাব' অনুভব করেন নি। সনেটের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লেখা তাঁর একটি সনেটের প্রিয়নাথ সেন কর্তৃক অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল।

"ঢুকিবে না কায়া" বলে মুগ্ধা হাসি মুখ
ছিঁড়িবে যে ছোট জামা দেহ পরিসর
বাঁকাইয়া কটিতট ফুলাইয়া বুক,
বাড়াইল প্রতিকূল পথে রম্য কর।
ধীর আমি ভালবাসি এ মিষ্ট সংগ্রাম
হ্রস্ব বাসে সাজাইনু দেহযষ্টি তার
কোথাও বাঁধন দিয়া—কোথাও বিরাম
শির-স্কন্ধ-বক্ষ পরে করে দিনু পার।
উত্তিম দেখ বাসে—কলার কৌশলে
উচ্ছল দেহলতা—প্রতি অঙ্গরেখা
হাসিছে লক্ষ্মীটি বাহু সমান সম্বলে,
ঠিক বসিয়াছে বাস। শোভে তাহে লেখা।
হৃদয়ে অভাব নাই—বাহুল্য শরীরে
এমনি নারীরে চাই, এমনি বাণীরে।"

সনেটের ভাবস্বরূপ পরিস্ফুট করার জন্যে প্রমথ চৌধুরী প্রচুর মিত্রাক্ষরযুক্ত মিল ব্যবহার করেছেন। মিত্রাক্ষরের প্রাচুর্য সনেটকে গীতিকবিতার উচ্ছ্বাস ও আড়ম্বর থেকে মুক্ত রাখে। কিন্তু মিত্রাক্ষর মিলের আধিক্যের ফলে তাঁর সনেটে অনেক সময় পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে। অন্ত্যমিল হিসাবে একই শব্দের পর পর দু'পংক্তিতে ব্যবহারও শ্রুতিমধুর হয়নি। কিন্তু সাধু বা তৎসম শব্দের সঙ্গে তদ্ভব বা গ্রাম্য শব্দের সুন্দর প্রয়োগে তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। যেমন :—

"সেদিন পৃথিবী ছিল অন্ধকারময়
ঘন মেঘে ঢেকেছিল নক্ষত্রের বাতি
সে তিমিরে চিরেছিল বিদ্যুৎ-করাতি।"

স্থানে স্থানে এই ধরণের মিল এত সহজ ও সংক্ষিপ্ত যে শুধু শব্দধ্বনিই নয়, একটা মধুর ছন্দ-ধ্বনিও সৃষ্টি হয়েছে, যেমন ;

আগেকার জীবনের পালা হ'ল শেষ।
ঝরা ফুলে ভরা বিশ্ব, গন্ধ নাই লেশ।

কবি অতিমাত্রায় আত্মসচেতন এবং ফরাসী কবিদের মতই কলাপ্রিয় ও কলাদক্ষ। তাঁর বহু উক্তি প্রবাদ-বাক্যের মত শাণিত এবং ভাবগর্ভ। যেমন, 'সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত সার কাঞ্চন-কামিনী।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ফরাসী সনেটের আঙ্গিক হুবহু গ্রহণ না করলেও প্রমথ চৌধুরী ফরাসী সনেটের শিল্পকলা বাংলা কাব্যে প্রয়োগ করেছেন। প্রসিদ্ধ সমালোচক Lytton Strachey ফরাসী কবিতার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন—"The one high principle which though in many generations has guided like a star the writers of France is the principle of deliberation, of intention of a conscious search for ordered beauty. an unwavering—un indomitable persuit of the endless glories of art." প্রমথ চৌধুরীর মেজাজ ফরাসী কবিসুলভ। ফরাসী কবিতার মত তাঁর কবিতায়ও ভাবের জটিলতা বা ভাবার শিথিলতা নেই। ফরাসী কবিদের মত তিনিও 'ordered beauty'-র সাধক।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে প্রমথ চৌধুরীর সনেটগুলিকে মোটামুটি ভাবে লঘু রসাত্মক ও ব্যঙ্গপ্রধান এবং প্রেম ও ভাবমূলক এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এছাড়া কবিপ্রশস্তি, নায়িকার রূপবর্ণনা, রাগরাগিণীর পরিচয়ও কয়েকটি সনেটে পাওয়া যায়। কিন্তু কবির ভাবচিন্তা এবং ভাব-ধারার বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে ঐ দু'শ্রেণীর কবিতায় সুপরিস্ফুট। জয়দেবের কাব্য সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে কবি প্রতিবাদ করেছেন অম্ল মধুর ভাষায় ;—

"উন্মদ মদন রাগে জাগালে যৌবনে
রতিমন্ত্রে কবিগুরু দীক্ষা দিলে বঙ্গে।

*   *   *

আদি রসে দেশ ভাসে, অজয়ে জোয়ার
তাকো কম্কি, ম্লেচ্ছ আসে, করে করবাল।"

'চোর-কবি' সনেটটিও অনেকটা এই রকমের, তবে 'জয়দেবে'র মত লঘু ও সরস নয়। এই ধরণের সনেটের মধ্যে 'ভর্তৃহরি নামক সনেটে কবির স্বভাবসিদ্ধ হাল্কা ভাবের পরিবর্তে এক অপূর্ব মননসমৃদ্ধ ভাব ব্যক্ত হয়েছে। অধ্যাত্ম অনুভূতি এবং সৌন্দর্যপ্রীতির মধ্যে ভর্তৃহরির মনের দ্বিধা গতির উল্লেখ করে কবি মানব-মনের অনন্ত পিপাসার রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। কবির ভাষায়,—

"ভুক্তি মুক্তি তোমা কাছে সমান অসার।
সত্য শুধু মানবের অনন্ত পিপাসা,—
রত্ন দিয়ে তাই গাঁথা বৈরাগ্যের হার!"

প্রমথ চৌধুরীর পুষ্প-বিলাসও বিচিত্র ধরণের। অন্যান্য কবিদের মত তিনি ফুলের উজ্জ্বল বর্ণবিলাস এবং নয়ন-মুগ্ধকর শোভায় তৃপ্তি পান না, তাই রূপের আগুন জ্বালিয়ে যারা বন আলো করে থাকে বা বিলাসের সম্ভার হয়ে উঠে—সেই রক্তজবা, পলাশ বা গোলাপ কবির মনে সাড়া জাগায় না।

কবি লিখেছেন :—

"ভাল আমি নাহি বাসি নামজাদা ফুল,
নারীর আদর পেয়ে যারা হয় ধন্য,
ফুলের বাসরে যারা হইয়াছে পণ্য,
কবিরা যাদের নিয়ে করে হুলস্থূল।"

কবি বিহ্বল চিত্তে সেই ফুলের সন্ধান করেন 'যাহার অন্তরে আছে হলাহল।' রাত্রির ঘন অন্ধকারে বর্ণোজ্জ্বল ফুলেরা যখন রং হারায়, সেই অবসরে যে-রজনীগন্ধা তার গোপন সঞ্চিত গন্ধ ঢেলে দেয়, কবি তাকেই উদ্দেশ করে লিখেছেন ;—

"আবার আসিবে যবে জীবনের সন্ধ্যা,
দিবসের আলো যবে ক্রমে হবে ঘোর,
কানেতে পশিবে নাকো পৃথিবীর সোর,
মোর পাশে ফুটো তুমি হে রজনীগন্ধা!"

সংগীত-চর্চায়ও কবির রুচি অনন্যসুলভ। 'গজল' নামক সনেটে কবি এই রুচি-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন—

"যে সুর পশিয়া কানে চোখে আনে জল,
সে সুর বিবাদী জেনো মোর কবিতার;
মম গীতে নত তব চোখের পাতার
সীমন্তে রচিয়া দিব দু' ছত্র কাজল।"

প্রমথ চৌধুরী প্রেম, আদর্শ ইত্যাদি সম্বন্ধে কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক সনেটও রচনা করেছেন। এই সনেটগুলির কাব্য-মূল্য নগণ্য। আসলে কবির এই আপাত কঠোরতা এবং ব্যঙ্গের হাসির পেছনে ব্যথার অশ্রুই লুকানো রয়েছে। কবি নিজেই সেকথা বলেছেন 'হাসি' নামক সনেটে ;—

"নয়ন যখন দিই হাসিতে মুড়িয়ে
লুকিয়ে তাহার নীচে থাকে অশ্রুজল,
বৃথা কাজ! জীবনের প্রতি ব্যর্থ পল
স্মৃতিতে একত্র করা, অতীত কুড়িয়ে।"

ব্যঙ্গ ও হাল্কা হাসির ছদ্ম আবরণের তলায় যে কল্পনাপ্রবণ ও অনুভূতিশীল মনটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, কয়েকটি ভাব-প্রধান সনেটে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভাব ও রসের স্ফুরণ এবং প্রকাশভংগীর সরলতায় এই কবিতাগুলি অনবদ্য হয়ে উঠেছে। যে কবি ইতিপূর্বে লিখেছেন ;—

"নাহি জানি অশরীরী মনের স্পন্দন,
আমার হৃদয় যাচে বাহুর বন্ধন।"

তিনিই পরে 'ভুল' নামক কবিতায় লিখেছেন ;—

"ভাল তোমা বেসেছিনু, মিছে কথা নয়।
যেদিন একেলা তুমি ছিলে মোর সাথী,
বকুলের তলে বসি, মনে মন গাঁথি।
বকুলের গন্ধ বল কত দিন রয়?
*   *   *   *
নিবানো আগুন জানি জ্বলিবে না আর,
মনে কিন্তু থেকে যায় স্মৃতিরেখা তার—
হৃদিলগ্ন আমরণ পারিজাত-হার।
হৃদয়ের ভুল শুধু জীবনের সার।"

'পরিচয়' নামক সনেটটিতে প্রেমের এক অপূর্ব মায়াময় স্মৃতি-চিত্র এঁকেছেন কবি। কবিতাটির ভাব যেমন গভীর, ভাষাও তেমনি গাঢ় এবং মধুর। কবি তাঁর প্রেয়সীকে উদ্দেশ করে বলেছেন ;—

"দেখেছি তোমায় কোন্ মাধবী পার্বণে,
প্রকৃতির ঐশ্বর্যের সৌন্দর্যের সার!
এসেছিলে রূপ ধরি প্রতিমা উষার;
গন্ধর্বশালায় কিংবা আলেখ্য-ভবনে।
মেঘাচ্ছন্ন কোন্ দূর অতীত শ্রাবণে
এসেছিলে কাছে কিংবা করি অভিসার;
আঁধারের মাঝে করি রূপের প্রসার
গগন-সীমান্তে কোন্ বিস্মৃত ভুবনে!"

'রূপক', অন্বেষণ, 'মানব-সমাজ,' 'আত্মপ্রকাশ' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় যেন এক নিরাসক্ত কবি-চিত্তের গভীর ভাবনা ঝঙ্কৃত হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় ফরাসী-কাব্যের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে, ফরাসী-কাব্যের দু'টি প্রধান গুণ—স্পষ্টতা এবং কলা-নৈপুণ্য চৌধুরী মহাশয় তাঁর সনেটে গ্রহণ করেছেন। তার ফলে তাঁর কয়েকটি সনেট অপূর্ব উজ্জ্বলতা এবং স্বচ্ছতা লাভ করেছে। কিন্তু এই অতিরিক্ত স্পষ্টতা এবং কলা-প্রীতির জন্যই বোধ হয় ফরাসী-কাব্যে কল্পনা-ঐশ্বর্য অপেক্ষাকৃত ম্লান মনে হয়। প্রমথ চৌধুরী কিন্তু শুধু কলা-নিপুণ কবি নন। ইতিপূর্বে আমরা তাঁর এমন কয়েকটি সনেটের আলোচনা করেছি, যেগুলির ভাব-বস্তুর মধ্যে অতি কোমল কল্পনা-ঐশ্বর্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাই প্রমথ চৌধুরীকে কোন এক বিশেষ দেশের কাব্যকলার অনুকারী বলা চলে না। তিনি বাংলা সনেটের বিষয়বস্তু এবং প্রকাশরীতি সম্পর্কে যে পরীক্ষা করেছেন তা থেকে মনে হয় যে, কবি যেখানে ব্যঙ্গপরায়ণ সেখানে তিনি ফরাসী। তাঁর শব্দসম্পদ সুনির্বাচিত, পরিমিত শাণিত এবং প্রকাশভংগী তির্যক ও তীক্ষ্ণ। আবার যেখানে কবি তাঁর গোপন অনুভূতিকে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন সেখানে তিনি আর ফরাসী ন'ন, ইংরেজ। হৃদয়াবেগের গভীরতা এবং অনুভূতির গাঢ়তাকে রোমান্টিক কাব্য-রসে মণ্ডিত করেছেন। এই অনন্যসদৃশতাই কবি হিসাবে প্রমথ চৌধুরীকে এক পৃথক মর্যাদার অধিকারী করেছে।

স্মৃতিচিত্রণ

পরিমল গোস্বামী

প্রথম পর্ব

৩

রতনদিয়ার অখ্যাত পল্লীজীবনে ইংরেজী প্রভাবই স্পষ্ট, অথচ মজা এই যে, যাঁদের মধ্যে এ প্রভাব সব চেয়ে বেশি প্রকট, তাঁরা ইংরেজী জানতেন না আদৌ। তাঁদের বাড়িঘরের চেহারায়, চালচলনে, অনেকখানি আধুনিক ছাপ। এটি কি ক'রে সম্ভব হল তা আমি জানি না। যাঁরা যথার্থ ইংরেজী শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন শুদ্ধাচারী।

গানবাজনার পরিবেশটি ছিল অদ্ভুত। নদীয়া জেলার এক সানাই-বাদক, আকবর আলী সেখ, মাঝে মাঝে সানাই বাজাতে আসত, কিছুদিন পর থেকে সে গ্রামের আসরে রয়ে গেল, তাকে আর ছাড়া হল না, সে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর ওখানে বাস ক'রে গেল। কণ্ঠসঙ্গীতেও সে ওস্তাদ ছিল। সব আসরে তাকে দেখা যেত, সে না থাকলে আসর জমত না। আত্মসুখী লোক, খুব হাসিখুসি ভাব।

গ্রামে বংশানুক্রমিক ভাবে যারা ঢাক-ঢোল বাজাত, তবলা বাজাতেও তাদেরই ডাক পড়ত। ঢোল ও তবলা দুই-ই সমান চলত তাদের হাতে।

বেণী ভট্টাচার্য (বেণী ঠাকুর নামে পরিচিত) খুব তবলা-উৎসাহী ছিলেন। তিনি পাণিনি পড়ার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থকাম হয়ে তবলা ধরেছিলেন। আমি শিশুকাল থেকে প্রায় পঁচিশ বছর পর্যন্ত তাঁকে তবলা অভ্যাস করতে দেখেছি। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এ অভ্যাস চালিয়ে গেছেন। শেষ রাত্রে উঠতেন এবং তবলার বোল মুখে উচ্চারণ করতে করতে বাজাতেন। নিস্তব্ধ ঘুমন্ত গ্রামের প্রান্ত থেকেও তা শোনা যেত।

কোনো আসর বসলেই তিনি আগে এসে তবলা দখল ক'রে বসতেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গায়কের গান থেমে যেত, তিনি সবার গাল খেতেন, কিন্তু দমতেন না সহজে। অনেক সময় তাঁকে জোর ক'রে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাড়িতে তিনি অনেক টাকা খরচ ক'রে একখানা করুগেট টিনের ঘর তৈরি করিয়েছিলেন। ঘরখানা যাতে খুব মজবুত হয়, ঝড়ে উড়াতে না পারে, সেজন্য আস্ত শালকাঠের খুঁটি ব্যবহার করা হয়েছিল। বড় বড় গাছের আড়ালে ঘরখানা স্বাভাবিক ভাবেই নিরাপদে ছিল, তদুপরি শালকাঠের খুঁটি, ঝড়ের সাধ্য কি তাকে নড়ায়। বহু অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ ছিল এ ঘর তৈরির পিছনে।

এই ঘর ছিল গানের একটি বড় আসর। প্রবীণদের পরবর্তী ধাপের গুণীদের এটি পীঠস্থান ছিল। এই খানেই বেণী ঠাকুরের তবলা সাধনা চলত। গানের পুরো আসর চলছে এমন সময় হয়তো পশ্চিম আকাশে দেখা দিল কাল বোশেখীর মেঘ। ঝড়ের সঙ্কেতে বেণী ঠাকুরের তবলায় ভুল তাল বাজতে লাগল, তিনি তবলা ছেড়ে মুহুর্মুহু আকাশের দিকে চাইতে লাগলেন। তার পর আসন্ন ঝড়ের প্রথম শব্দে, সব ফেলে, ঝড়ের বেগে ছুটে চললেন কিছু দূরে অবস্থিত বরদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পাকা বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু সেখানেই কি সম্পূর্ণ ভরসা আছে? যদি সেই একতলা ইমারত ভেঙে পড়ে? তাই তিনি বরদানন্দকে বলেছিলেন, হলঘরে গোটাকয় শালকাঠের থাম লাগিয়ে দিন, তা হলে খুব ভাল হবে।

অরবিন্দ ঘোষ এলেন পাংশাতে। জায়গাটি রতনদিয়া থেকে পাঁচ-ছ মাইল দূরে, কালুখালি ষ্টেশন থেকে চার মাইল। কোন্ বছর ঠিক মনে পড়ছে না। আমি আর এক উৎসাহী বন্ধু, হরেন্দ্রকুমার রায়, সকালের এইট ডাউন প্যাসেঞ্জারে সেখানে গিয়ে হাজির। অরবিন্দ ঘোষ তখন খুব বিখ্যাত হয়ে পড়েছেন, বালকমনে সে নাম রোমাঞ্চকর বিস্ময়। শুধু তাঁকে দেখতে ছুটে যাওয়া।

পাংশা ষ্টেশনের আশ্রয়ে গিয়ে বসে আছি। এরই কয়েক মাইল দূরে দু'-তিন বছর আগে এক অতি ভয়াবহ কলিশন ঘটেছিল, পুজোর ছুটির যাত্রীবাহী ট্রেনের। দুই গাড়ির ইঞ্জিনে ইঞ্জিনে সামনা-সামনি ধাক্কা লেগেছিল। মনে পড়ে খবরের কাগজে তার কল্পিত ছবি ছাপা হয়েছিল, লাইন ব্লকে ছাপা ছবি। দুই ইঞ্জিন খাড়া হয়ে উঠেছে স্পষ্ট মনে আছে। কত গুজব যে রটেছিল! সত্য মিথ্যা জানি না, শুনেছিলাম, মরা আধমরা শত শত যাত্রীকে মালগাড়ি বোঝাই ক'রে গোয়ালন্দ ঘাটে নিয়ে গাড়িসুদ্ধ ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাংশার পরবর্তী মাছপাড়া ষ্টেশন। এই দুই ষ্টেশনের মাঝখানে ঘটেছিল এই দুর্ঘটনা।

ষ্টেশনে বসে আছি, কোথায় অরবিন্দ ঘোষ, কোথা

গেলে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে ভাবছি, এমন সময় বিরাট এক স্বদেশী সংকীর্তন দল সে পথে এলো গান গাইতে গাইতে। আমরা সেই দলে মিশে গেলাম। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রইল অরবিন্দ ঘোষকে খুঁজে বের করা। এই কীর্তন দলের কোন্ জন অরবিন্দ ঘোষ দু'জনে অনুমান করতে লাগলাম। শেষে দু'জনে একমত হয়ে এক ব্যক্তির উপর লক্ষ্য রাখলাম। পাছে আমাদের বোকা মনে করে, সে জন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি।

বিকেলে সভা। সভার বিজ্ঞপ্তি বিলি হয়েছিল, তাতে দেখলাম, পাংশা স্বদেশবান্ধব সমিতিতে অরবিন্দ ঘোষ বক্তৃতা দেবেন। বিকেলে সভাস্থলে গেলাম। অরবিন্দ ঘোষকে দেখলাম। গলায় পদ্মফুলের মালা। হাল্কা চেহারা। তবে কীর্তনের তিনি নন। আরও একটি নাম ও চেহারা মনে পড়ে—গীষ্পতি কাব্যতীর্থ। খুব জোর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু কারো বক্তব্যই মর্মে প্রবেশ করেনি, আমরা শুধু চোখকে খুশি করতে গিয়েছিলাম।

১৯১১-১২ থেকে রতনদিয়াতে আসা আরও একটু বেশি হতে লাগল। স্কুলে বছরে তিন মাসের বেশি কখনো থাকিনি। তার একটি কারণ ছিল ম্যালেরিয়া। এ সময় ম্যালেরিয়ায় পুনঃপুনঃ ভুগতে লাগলাম। সামান্য জ্বর হলেই ভাত বন্ধ হত। দুধ খাওয়া ভয়ানক অপরাধ ছিল, কারণ ওতে নিউমোনিয়া হয়। জ্বরের তাপ ১০৫ ডিগ্রী হলেও মাথায় জল দেওয়া নিষেধ ছিল। এ সব কারণে ম্যালেরিয়া হলে খাওয়ার দিকে লোভ খুব বেড়ে যেত। ভাত না খেয়ে, দুধ না খেয়ে, দুর্বল হয়ে পড়তে হত খুব। অতএব এ ব্যাধিটি বালকের পক্ষে সুখের ছিল না আদৌ। একবার ম্যালেরিয়ায় মাসখানেক ভুগলাম, আর শুয়ে শুয়ে ভাতখাওয়া সুখী লোকদের কথা কল্পনা করতে লাগলাম। নিজের উপর ভীষণ রাগ হত।

আমার জ্যেঠতুত ভাই নলিনী কলকাতায় প্রায় আসতেন। তিনি একবার কলকাতা থেকে রতনদিয়া ফিরে গিয়ে আমাকে একটি পরম উত্তেজনাপূর্ণ খবর দিলেন—কলকাতায় ম্যালেরিয়ার এক ওষুধ বেরিয়েছে, তাতে পথ্যের কোনো বিচার নেই, যা ইচ্ছে খাওয়া যায়। সে ওষুধের এইটিই প্রধান আকর্ষণ। শুনে আনন্দে রোগশয্যা থেকে লাফিয়ে উঠলাম, এবং ঠিকানা নিয়ে ১০০ ডিগ্রী জ্বর গায়ে, পরদিনই এক রিটার্ণ টিকিট কেটে কলকাতা রওনা হয়ে গেলাম। যতদূর মনে পড়ে ওষুধের নাম জার্মলীন।

ওষুধ কেনা বাবদ কিছু টাকা ও উদ্বৃত্ত গোটা পাঁচেক টাকা সঙ্গে রইল টিকিট কেনার পর। এসেই ওষুধ নিয়ে ফিরে যাব। কলকাতার পথ তখন আমার চেনা। (টাইম টেবলের সঙ্গে কলকাতার ম্যাপ থাকত, তা দেখে বড় বড় সমস্ত পথ চিনে ফেলেছিলাম।) ওষুধ খেলে সব খাওয়া যায়, বিধি-নিষেধ কিছুই নেই, যত ভাবছি তত উৎফুল্ল হচ্ছি, ট্রেনের মধ্যে সময় যেন আর কাটে না। শেষে শিয়ালদ পৌঁছে ওষুধের দোকানে না গিয়ে সোজা মির্জাপুর ষ্ট্রীটের খাবারের দোকানে উঠে আগে তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে নিলাম। স্কট লেনে উঠেছিলাম। পরদিন সকালে উঠে সন্দেশ দিয়ে শুরু ক'রে বিকেল পর্যন্ত ডিমভাজা, লুচি, রাবড়ি, রসগোল্লায় শেষ। ওষুধ খেলে তো এ সব খাওয়া যাবেই, তবে আর চিন্তা কি. সামান্য একটু আগে-পরের ব্যাপার মাত্র।

সেদিনও ওষুধ কেনা হল না, পরদিনও না, তার পরের দিনও না। ওষুধ অপেক্ষা করতে পারে, খাওয়া পারে না। এত দিনের রুদ্ধ বাসনা মিটিয়ে নিলাম মনের সাধে। তারপর ওষুধ কেনার পালা। কিন্তু তখন আর তার প্রয়োজন ছিল না। পয়সাও ছিল না। জ্বরের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ফিরে এলাম শূন্য হাতে, এবং ফিরে আসার পর জ্বর আপনা থেকেই সেরে গেল সে বারের মতো।

এর কিছু দিনের মধ্যেই রতনদিয়া গ্রামের শিকারীদের মারা একটা বাঘ দেখলাম। সেটি টাইগার, ডোরা-কাটা। চার পা বাঁধা, একটা লম্বা বাঁশের সঙ্গে ঘাড়ে ঝুলিয়ে আনা হল গ্রামে। বহু লোকের ভিড় জমল সে বাঘ দেখতে। এখানে বাঘ মারা হত এক অভিনব নিষ্ঠুর উপায়ে। গ্রামের বাইরে অন্যান্য যে সব গ্রাম আছে তার অধিকাংশই ঘন জঙ্গলে ভরা। বাঘের দৌরাত্ম্যের খবর শীতকালে প্রায় পাওয়া যেত।

এই রকম বাঘের খবর এলে রতনদিয়ার শিকারীদের পরিচালনায় নানা গ্রামের শিকারী সেখানে গিয়ে সন্দেহ জনক স্থানে অনুসন্ধান চালিয়ে বাঘের অবস্থান জায়গাটি আবিষ্কার করত এবং বহু লোকের সতর্ক পাহারায় দড়ির জাল দিয়ে তার চারদিক বেষ্টন ক'রে ফেলত। খণ্ড খণ্ড জাল বহু লোকে বহন করত। ঘেরা সম্পূর্ণ হলে ঘেরা জায়গার আয়তন ক্রমে ছোট ক'রে আনা হত চার দিকের জঙ্গল কেটে কেটে। জালের ভিতরে হাত চালিয়ে দিয়ে জঙ্গল কাটতে থাকলেই জালের ঘের ক্রমে কমে আসত। বাঘ শড়কির খোঁচার দূরত্বের মধ্যে আসা চাই, নইলে শিকার ব্যর্থ। জঙ্গল ঘেরার কাজটি খুব কঠিন। সমস্ত দিন লাগত। তারপর রাত্রে আগুন

"অতর্কিতে শত শত দর্শক একসঙ্গে বাঘ! ব'লে চিৎকার ক'রে ছুটতে লাগল।"

ফেলে হল্লা ক'রে পাহারা দেওয়া হত। পরদিন সকাল থেকে মারার আয়োজন।

কি ক'রে বাঘ মারা হয় তা দেখার সুযোগ পাওয়া গেল অল্প দিনের মধ্যেই। চন্দনা নদীর ওপারে মোহনপুর গ্রামে একটি চিতাবাঘ ঘেরা হয়েছে, এবং সকালে মারা হবে শুনে দলে দলে লোক যাচ্ছে দেখতে, আমিও সে দলে যোগ দিলাম। বাঁশের সাঁকোর পারে মাইল খানেক হাঁটলেই সেই গ্রাম।

গিয়ে দেখলাম, দড়ির জালে ঘেরা জঙ্গল। বেশ উঁচু, বাঘ তা ডিঙিয়ে যেতে পারে না হঠাৎ। আমি যখন গেলাম তখন দেখি, বাঘকে কেন্দ্র ক'রে জঙ্গলের যে বৃত্তটি ঘেরা হয়েছে তার ব্যাস যথেষ্ট দীর্ঘ, তাকে আরও খাটো না করলে হবে না, তাই জালের ভিতর হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে চার দিক থেকে জঙ্গল কাটা হচ্ছে। আমাদের দাঁড়াবার জায়গায় কিছু পূর্বেই অনেক গাছ ছিল, তার খোঁচা-খোঁচা গুঁড়ি অবশিষ্ট আছে, সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে।

ঘেরা বৃত্তটির ব্যাস ২৫-৩০ হাতের বেশি না হলেই ভাল। জালের ফাঁদে ফেলা বাঘকে বন্দুক দিয়ে মারা নিষেধ। নিয়ম হচ্ছে বাঘকে ঢিল মেরে বা খুঁচিয়ে উত্তেজিত ক'রে তুলতে হবে। তার পর বাঘ ছুটে আসবে আক্রমণ করতে, কিন্তু লাফিয়ে পড়বে দড়ির জালে, আর ঠিক সেই সময় শড়কি দিয়ে খোঁচা মারতে হবে। খোঁচা খেয়ে বাঘ বিপরীত দিকে ছুটে যাবে, কিন্তু সেখানেও শিকারীরা হাজির। সেখান থেকে খোঁচা খেয়ে গর্জন করতে করতে আর এক দিকে যাবে, আবার সেখানে খোঁচা খাবে। এই ভাবে বহু শিকারী একসঙ্গে হল্লা করতে করতে বাঘকে একটু একটু ক'রে কাবু করতে থাকবে। কারো শড়কির কোনো একটি আঘাতে বাঘকে ধরাশায়ী করা নিষেধ, তা হলে সেটি হবে শিকার-আইনের বিরুদ্ধাচরণ। সব শিকারী যাতে অন্তত একটি ক'রে খোঁচা মারতে পারে এই হচ্ছে আইন। হত্যার এই নিষ্ঠুর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি সবাইকে মানতে হয়। এটি কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগের সূত্র ধ'রে, অথবা কোন্ অতি সভ্যযুগের বিলাসিতার অঙ্গরূপে চলে আসছে, তা ভেবে পাওয়া যায় না।

যাই হোক, মোহনপুরের সেই জালঘেরা বাঘের বাইরে আমার উপস্থিতিটি সেদিন আমার নিজেরই কাছে বিস্ময়কর বোধ হচ্ছিল। তার কারণ, কোনো জিনিসের পরিণাম দর্শন যে বয়সে সম্ভব নয়, সেই বয়সে আমি সেদিন কিঞ্চিৎ পরিণাম চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিলাম। শিকারীদের উপর ভরসা করার মতো মনের অবস্থা তখন নয়, বাঘের আচার ব্যবহার সম্পর্কেও কোনো জ্ঞান নেই, এমন অবস্থায় দড়ির জালে ঘেরা এক অদৃশ্য হিংসার আক্রমণ-সীমার মধ্যে দাঁড়িয়ে খুব পুলক অনুভব করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যখন দেখি বেণী ঠাকুর সেখানে এসেছেন, তখন মনের জোর ফিরে এলো অনেকখানি। তখন এই কথাটাই মনে এলো যে তা হলে সম্ভবতঃ ভয়ের কিছু নেই।

অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে, দড়ির জালের বাইরে থেকে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে জঙ্গল কাটা দেখছিলাম। এক সাহসী ছেলে কিছু দূরে একটা গাছের উপরে উঠে বসেছে। সেটি বেষ্টনীর ভিতরে অবস্থিত। সে নিরাপদ উচ্চতায় নিশ্চিন্ত ছিল।

বেলা তখন সাড়ে আটটা বা ন'টা হবে। এমন সময় অতর্কিতে শত শত দর্শক একসঙ্গে "বাঘ!" বলে চিৎকার করে ছুটতে লাগল ডান ধার থেকে বাঁ ধারে। আমি পড়ে গেলাম সেই দিশাহারা ছুটন্ত লোকের গতিপথে। পড়েও গেলাম এক ধাক্কায়। অতগুলো ভয়ার্ত লোকের উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থার চাপটা খুব সহজ ছিল না। তাদের সমস্ত আতঙ্ক আমার মধ্যে সঞ্চারিত হওয়াতে আমিও মুহূর্তে বিদ্যুৎ-শক্তি লাভ করলাম এবং এক লাফে উঠে তাদের সঙ্গে ছুটতে লাগলাম। পড়ে গিয়ে কাঁটাগাছের কাঁটাপ্রায় উদ্ধত গুঁড়িতে পিঠ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, কিন্তু সেদিকে খেয়াল ছিল না। মুহূর্তে কি যে ঘটে গেল তা জানবার উপায় ছিল না।

যখন সম্বিত ফিরে এলো, তখন দেখি, আরও অনেকের সঙ্গে আমিও উঠে এসেছি নিকটস্থ এক গৃহস্থের একটি ঘরে। তখন নিশ্চিত বুঝতে পারলাম, ছুটন্ত লোকের ধাক্কায় চিৎ হয়ে পড়ে যাওয়াকেই আমি শেষ সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিই নি।

এখানে দাঁড়িয়ে দেহের কম্পন কিছু কম পড়ার পর শোনা গেল, চিতাবাঘটি গাছের ডালে-বসা ছেলেটিকে লক্ষ্য ক'রে উচ্চলাফের এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল যা দর্শকেরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী চিতা বাঘের কাছ থেকে আদৌ আশা করেনি, তাই এই কাণ্ড! অবশ্য এ খবরটাই সত্য কি না তাও বলা যায় না। মানুষ নিজের ভীরুতা ঢাকার জন্য প্রতিপক্ষের শক্তিতে অলৌকিকত্ব আরোপ ক'রে থাকে। সম্ভবতঃ ভয়েই এখানকার দর্শকেরা সামান্য একটি চিত্রক দর্শনে এ রকম বিচিত্র ব্যবহার করেছিল।

কিন্তু বাঘটা জাল ডিঙিয়ে বাইরে এসেছে কি না, তা কেউ বলতে পারল না। কারণ কোনো দর্শকই কোনো খবর ঠিক জানে না, জানবার আর উপায়ও নেই তখন। কারণ আমরা তখন মিনিট পাঁচেক দৌড়পথের দূরত্বে। এই অনিশ্চিত খবরে আমাদের মধ্যে ভয় আরও বেড়ে গেল।

দেখলাম, প্রায় পঞ্চাশ জন দর্শক সেই বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা ক'জন আছি একটি ঢেঁকিশালায়। খড়ের ঘর, বাঁশের খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘরের দরজা নেই।

এই প্রসঙ্গে আর এক বীরের কথা না বললে বর্ণনা বৃথা হবে। সে ললিতচন্দ্রের পুত্র, নাম প্রদ্যোতকুমার। এ রকম ক্ষীণজীবী যে, মনে হয় হাওয়ায় উড়ে যাবে। দেহ লম্বা এবং হাল্কা। এই বালকের সাহস ছিল দুর্দমনীয়—এবং গলার আওয়াজ আর সবাইকে ছাপিয়ে যেত। সমস্ত দুঃসাহসিক কাজে তার অগ্রাধিকার। সব কাজে সে এগিয়ে আসবে সবার আগে এবং কি করলে সে কাজ সবচেয়ে সহজ হবে, তার পরিকল্পনা তার মুখ থেকে খইয়ের মতো ফুটে বেরোত।

দুনিয়ায় আর কেউ কিছু জানে না, সে সব জানে, এ কথা সে নিজে বিশ্বাস করত। শিকারের খবর পেলেই সে গ্রাম থেকে নিরুদ্দেশ। তাকে সর্বদা দেখা যেত শিকারীদের সঙ্গে।

মোহনপুরের শিকারের স্থানে সে আগেই এসে পৌঁছেছিল এবং যখন বাঘ ব'লে ভয়ার্ত চিৎকারের সঙ্গে সবাই উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ছুটে পালিয়েছিল তার মধ্যে তাকে দেখা যায় নি।

সাহস ছিল তার খুবই বেশি, শুধু দেহটি উপযুক্ত হলে শিকারীদের উপর সর্দারি না ক'রে সে নিজেই শিকারী হতে পারত।

কিন্তু এই ক্ষোভ সে মিটিয়েছিল অন্য ভাবে। নানা স্থানে অন্যান্যদের সঙ্গে বাঘ শিকারে উপস্থিত থেকে সে এটি অন্তত বুঝেছিল যে, আর যাতেই হোক শুধু বক্তৃতা দিয়ে বাঘ শিকার করা যায় না। ভিতরে অসহ্য তেজ, বাইরে শক্তির অভাব। সম্ভবত এই কারণেই সে গোপনে গোপনে সন্ত্রাসবাদীদের দলে মিশেছিল।

এ খবর আমাদের কারো জানা ছিল না। জানলাম অনেক দিন পরে (১৯৩৩?)। কালুখালি ষ্টেশনের কাছে চব্বিশ বছর আগে লাট সাহেবের (অ্যাণ্ডারসন) গাড়ির নিচে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে, তার মূলে এই প্রশান্তকুমার। সে নিজ হাতে রেললাইন সিগন্যালের কাছে মারাত্মক বোমা পেতে এসেছিল। ধরা পড়ে গিয়েছিল অবশ্য। জেল খেটেছিল চার বছরের বেশি।

মোহনপুরের বাঘ শিকারের সময় তার বয়স দশ বছরের বেশি নয়, কিন্তু গর্জনে তখনই সে বাঘের সমান যায়। আমাদের পালিয়ে আসার পর সে এসে আমাদের সাহস দিতে লাগল।

এমন সময় আর একজন পলাতক দর্শক এসে যখন খবর দিল, বাঘ বেরিয়ে এসেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না, তখন কানের কাছে এক আশ্চর্য ধ্বনি শুনে চমকে উঠলাম। দেখি চাপা ও কাঁপা কান্নার সুরে কে আমাদের মাথার উপর থেকে আবৃত্তি করছে—হে ভগবান, হে ভগবান, হে ভগবান—

চেয়ে দেখি বেণী ঠাকুর।

তিনি সবার আগে ছুটে এসে এই ঘরের একটি বাঁশের আড়ের উপর বসে আছেন।

অনেক পরে জানা গেল, বাঘ বেরিয়ে যায়নি। যে ছেলেটি গাছের ডালে ব'সে ছিল বাঘ তার দিকে লাফিয়ে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু ছিল না, কিন্তু যাত্রা গানের দর্শক শিকারের দর্শক হতে গেলে অনর্থ ঘটা স্বাভাবিক। যাই হোক, আমরা নিশ্চিন্ত মনে ওখান থেকেই আর এক পথে বাড়ির দিকে রওনা হলাম, বাঘ মারা দেখার আর সাহস হল না। চিতা বাঘটিকে দুপুর বেলা মারা হয়েছিল।

রতনদিয়াতে প্রায় প্রতিদিন গানের আসর বসত। আসরের তিনটি জায়গা ছিল। একটি যোগেশচন্দ্রের বাড়িতে, একটি বেণী ঠাকুরের বাড়িতে, আর একটি গিরিজাকুমার রায়ের বাড়িতে। তখনকার আধুনিক রজনী সেনের গান 'বধির যবনিকা তুলিয়া মোরে প্রভু' গানটি বহু বার শুনেছি বীরেন্দ্র মজুমদারের মুখে। তিনি সাতবেড়ে থেকে এসে গানের আসরে দু'-চার সপ্তাহ কাটিয়ে যেতেন। গানের পরিবেশ ভালই লাগত, অকারণ এক কোণে বসে থাকতাম। অধিকাংশ গানই ধ্রুপদ বা খেয়াল। বেণী ঠাকুরের তবলা চর্চার উন্নতি হবে মনে ক'রে বেণী ঠাকুরের কয়েক জন শুভার্থী আমাকে হারমোনিয়াম বাজনা শেখাতে লাগলেন এবং হাত কিছু উন্নত হলে দু'-তিনটি গৎ শেখালেন। প্রথমত গানের সঙ্গে হাতে মাত্রা তাল প্রভৃতি ভাগ বোঝালেন, তার পর হারমোনিয়ামে। শেষে যখন দেখলেন দু'-তিনটি গৎ আমার বেশ শেখা হয়ে গেছে, তখন বেণী ঠাকুরকে আমার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল তাঁর ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য। আমার বাজনার সঙ্গে তিনি তবলা চর্চা করতেন। কিন্তু আমি ও বেণী ঠাকুর ভিন্ন আর সবাই জানতেন, বেণী ঠাকুরের শিক্ষা আরম্ভেই শেষ হয়ে গেছে, তার আর কোনো বিবর্তন নেই। মাঝখানে আমার যেটুকু দুর্ভোগ ছিল তা ভুগলাম। অবশ্য এ পথে আমারও কোনো বিবর্তন ছিল না।

আরও কয়েক বছর পরের ঘটনা হলেও এখানে সেটি উল্লেখ ক'রে গানের আসরের কথা শেষ করি। বরিশালের এক ওস্তাদ গায়ক কাছাকাছি কোথায়ও এসেছেন শুনে গ্রামের উৎসাহীরা তাঁকে ধরে নিয়ে এলেন। নামটি যতদূর মনে হয় মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে নিয়ে আসর বসবে, উত্তেজনা বহু দূরে ছড়িয়ে পড়েছে, বহু রসিক ব্যক্তি আসছেন নানা স্থান থেকে। আমিও গেলাম। তাঁর সঙ্গে তবলা বাজাবে কে, তা নিয়ে কথা উঠেছিল। বেণী ঠাকুরের খুব ইচ্ছা একবার চেষ্টা ক'রে দেখেন। অতিথি তাঁর বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু আর সবাই তাতে আপত্তি করাতে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তবলাবাদকের অভাব ছিল না, কিন্তু তবু একটা আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটল। ঠিক এই সময় কলকাতা অঞ্চলের কোনো এক সুবিখ্যাত যাত্রার দলের নামকরা তবলাবাদক, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রতনদিয়াতে এসেছিলেন এক আত্মীয়-বাড়িতে। তিনি কিছুদিন আগে অসুখ থেকে উঠে কয়েক দিনের জন্য বিশ্রাম নিতে এসেছিলেন। তাঁকেই ধ'রে আনা হল।

গানের আসর বসবে সকালে, আমিও দর্শকরূপে উপস্থিত আছি। দেখি, সেই নবাগত ওস্তাদ গাঁজা টানছেন। এক ছিলিম শেষ হয়ে গেল, আর এক ছিলিম ধরালেন। তারপর আরও এক ছিলিম। কত বড় গায়ক, সবাই তাঁর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে, কিন্তু তিনি নির্বিকার। পর-পর আট ছিলিম শেষ হল। এক ঘণ্টা লাগল মোটের উপর। এর পর শুরু হল গান। এ রকম গান গাওয়া আমি আগে বা পরে আর কখনো দেখিনি। প্রায় তিন ঘণ্টায় শেষ হল সে গান। অনেক গান নয়, একটি মাত্র গান। যত রকম সুর বিস্তার সম্ভব, যত রকম মাত্রা ভাগ সম্ভব, মিনিটে এক মাত্রা থেকে সেকেণ্ডে দশ পনেরো মাত্রা। খাদে সুর নামতে নামতে আর নেই সুর, তখন শুধু হাত নাড়া আর মুখ নাড়া। চলল মিনিট চার-পাঁচ এই নীরব গান। সুর শ্রবণের সীমানায় উঠে এলো খাদ থেকে, 'ফেড ইন' ক'রে। তার পর কিছুক্ষণের মধ্যে চড়ার দিকে তুলতে তুলতে আবার সুরের শেষ সীমা ছাড়িয়ে গেল, সুর গলাতেও সেই, যন্ত্রেও সেই। চলল নীরব
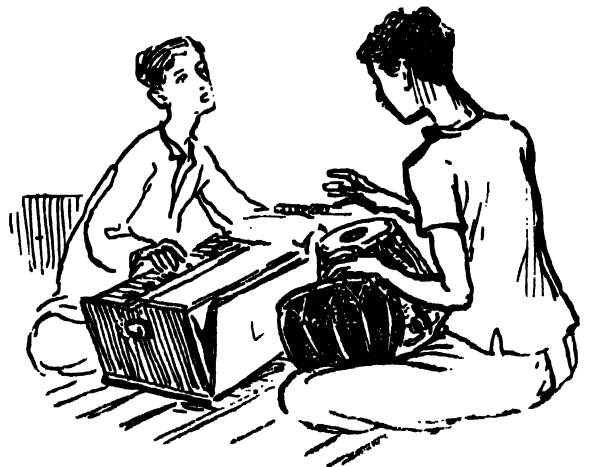
"আমার বাজনার সঙ্গে তিনি তবলা-চর্চা করতেন

গান তিন-চার মিনিট। তারপর চড়ার অশ্রুতির দেশ থেকে সুর নেমে এলো শ্রুতির সীমানায়। তবলা কিন্তু চলছে অবিরাম বিদ্যুৎ চালিত আঙুলে। তার কোথায়ও ছেদ নেই।

যে সাতটি রং আমরা চোখে দেখি, সেগুলো তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের হিসেবে পর পর সাজালে তার দীর্ঘ প্রান্তে থাকে লাল, হ্রস্ব প্রান্তে থাকে বেগুনী। রেড আর ভায়োলেট। দু'দিকেই রং আছে আরও, কিন্তু তা চোখে দেখা যায় না। লালের পারে যে রংটি আছে তাকে বলা হয় ইনফ্রা রেড, বেগুনী পারে যে রংটি আছে তাকে বলা হয় আলট্রা ভায়োলেট। এ দুটি কথা রঙের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু জীবনে এই প্রথম গানের সাতটি সুরের দুই প্রান্তে সুরের ইনফ্রা রেড ও আলট্রা ভায়োলেটের অস্তিত্ব সন্ধান পাওয়া গেল।

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজনা উচ্চ প্রশংসিত হল, কিন্তু তাঁর কাছেও গানের এ রীতি নতুন। একই গান প্রায় তিন ঘণ্টা গাওয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার!

বিকেলে আবার আসর বসল। এবারে আরো বেশি শ্রোতা। কিন্তু গানের আগে যেমন রাগের আলাপ, তেমনি ওস্তাদজির সব কিছুর আগে গাঁজার আলাপ। যথারীতি আট ছিলিম, বাঁধা বরাদ্দ। আশু বাবু বাজনা শেষ ক'রে বললেন, হাতে দারুণ ব্যথা হয়েছে।

পরদিন আসর বসল সকাল বেলা। রাজবাড়ি থেকে হেডমাষ্টার ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্যও এসেছেন। গাঁজা-পর্ব তখন কেবল শুরু। বহু শ্রোতার ভিড়। ধৈর্য রাখা কঠিন। ত্রৈলোক্য বাবু ধৈর্যের সঙ্গে তিন ছিলিম পর্যন্ত টানা দেখলেন। চতুর্থ বার সাজার সময় দুহাত দিয়ে ওস্তাদজির দুহাত চেপে ধ'রে বললেন, এখন আর খাবেন না দয়া ক'রে, এত লোক বসে আছে। ওস্তাদজি কলকে ছেড়ে দিয়ে তানপুরাটি তুলে নিলেন এবং তাতে গেলাপ পরিয়ে দেয়ালের সঙ্গে খাড়া ক'রে রেখে অভিমান-আহত কণ্ঠে বললেন—ওটা যদি থাকে তবে এটাও থাক।—ব'লে গুম্ হয়ে ব'সে রইলেন। ত্রৈলোক্য বাবু বললেন, না না, আমার অন্যায় হয়েছে, আপনি চালিয়ে যান।

আশু বাবুর হাতে ব্যথা হয়ে জ্বর হয়েছিল, তাঁকে এক রকম জোর ক'রেই তুলে আনা হয়েছিল, কিন্তু বাজাতে ব'সে তিনি সে সব ভুলে গেলেন, এবং বাজনা শেষে বেশি রকম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ রকম তবলার হাত স্থানীয় কারো পূর্বে দেখা ছিল না, সবাই একথা স্বীকার করলেন। কিন্তু ওস্তাদজির গানের উচ্চ প্রশংসা হলেও তাঁর তিন ঘণ্টা বিস্তারী গানের রীতিতে সবাই অবাক। এর অভিনবত্বই লোকের কৌতূহল উদ্রেক করেছিল বেশি।

আশু বাবুর অক্ষমতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বেণী ঠাকুরকে এ আসরে কোনো সুযোগই দেওয়া হল না, এবং উপস্থিত অন্য বাদকেরা একাজে সাহস পেলেন না, অতএব আসর তিন দিনের বেশি চলল না।

ক্রমেই রতনদিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। এখান থেকে যে-কোনো জায়গায় যাওয়া সবচেয়ে সোজা, অথচ সব সময় এখানে থাকাও সম্ভব নয়। সে জন্য শিশুকালের স্বপ্ন সফল ক'রে একখানা বাইসাইকেল কিনে ফেললাম। এতে গ্রাম্য পথের দূরত্ব আয়ত্তের মধ্যে এসে গেল। সকালে রতনদিয়া থেকে বেরিয়ে চন্দনা নদীপারের ফেরি-ঘাটের বড় রাস্তা ধ'রে পাংশা ষ্টেশন, এবং তার পর থেকে গ্রাম্যপথে পদ্মার বালুচরে যাওয়া এবং খেয়া নৌকোয় নদী পার হয়ে সাতবেড়ে। এই যাতায়াত শীতকালে খুবই সহজ। সাতবেড়ে থেকে পোতাজিয়া ২৮ মাইল দূরে। সাইকেল ততদূর পর্যন্তই ব্যবহার করলাম। দুটি শীতকালে সাইকেলে পোতাজিয়া গিয়েছি। সাইকেলের সঙ্গে অতি প্রয়োজনীয় জিনিস সহ ব্যাগ ও পিছনে টুল-ব্যাগ বাঁধা থাকত। পথে প্রয়োজন বোধে মেরামতের কাজও শিখে নিয়েছিলাম।

পথ চলা তখন কত নিরাপদ ছিল। একা বালকের পক্ষে পাবনা জেলার আধুনিকতা-স্পর্শবর্জিত অজ পাড়াগাঁয়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়া-আসা, সরল নির্ভরতা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি ক'রেই তো চলত। অপরিচিত গ্রাম্য জীবনের সমস্ত পরিবেশটি আমার চেতনার মধ্যে এক অদ্ভুত শ্রদ্ধা ভালবাসার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে আজও।

কলকাতার পথ ও পরিবেশও আমার পরিচিত হওয়াতে সেই বাল্যকালেই কত জনের ফরমায়েস খাটতে হত। একবার এক নিউমোনিয়া রোগিণীর জন্য অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে গেলাম টাকা জমা দিয়ে, এবং তা পৌঁছে দিয়ে জমা টাকা তুলে নিয়ে গেলাম। একবার এক রোগীকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছে দিতে এলাম। শিয়ালদ থেকে পাল্কী ভাড়া লাগল এক টাকা। তখন পাল্কী সব সময়েই পাওয়া যেত, রিক্শ ছিল না। এক হঠাৎ-অন্ধ-হওয়া বন্ধুকে মাসে দুতিন বার নিয়ে আসতে হত ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্রের কাছে, বীডন ষ্ট্রীটে। চোখ ভাল হয়ে গিয়েছিল বছর খানেকের চিকিৎসায়।

এই সময়ের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন অন্ধ বন্ধুকে নিয়ে আসছি এইট ডাউন প্যাসেঞ্জারে। ১৯১৩ সালের প্রথম দিক হবে, যতদূর মনে হয়। কুমারখালি থেকে এক ভদ্রলোক উঠলেন আমাদেরই কামরায়। তখন গাড়িতে ভিড় থাকত না আদৌ। কুমারখালি থেকে ওঠা ভদ্রলোকের হাতে প্রায় দশ ইঞ্চি ব্যাসের এক পানের ডিবে, তাঁর বড় সিগারেট কেস্-এ ২০টি সিগারেট। তিনি ক্রমাগত পান ও সিগারেট খাচ্ছেন, কিন্তু পোড়াদ ষ্টেশনে এসে যখন তিনি আরও গোটা-পঞ্চাশেক পান আর দু-প্যাকেট সিগারেট কিনলেন, তখন তাঁর দিকে অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। এত পান-সিগারেট খাওয়া কখনো দেখিনি, আমার কাছে এটি একটি নতুন আবিষ্কার ব'লে মনে হল, তাই কৌতূহল বশত তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম। তাঁর নাম হরিপদ সান্যাল। প্রশস্ত দেহ, স্থূল কিঞ্চিৎ, কৃষ্ণবর্ণ, এবং ঘন কোঁকড়ানো চুল। শুনলাম বি-এ চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন, এবং আরও আশ্চর্য ব্যাপার, তিনি ডাক্তার যতীন্দ্র মৈত্রের বাড়িতেই থাকেন। আমরাও সেখানেই যাচ্ছি।

এর পর আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি, শুধু মনে রেখেছি তাঁর বৈশিষ্ট্য।

আরও কয়েক বছর পার হয়ে এসে তাঁর কথাটি শেষ ক'রে রাখি। যে সময় তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় সে সময় আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। তারপর আমি বি-এ পড়তে এসে দেখি, তাঁর সঙ্গেই পড়ছি। খুবই আশ্চর্য লাগল। শুনলাম অনেক দিন ধ'রে তিনি ফেল করছেন। তারপর আমি বি-এ পাস ক'রে চলে যাই।

প্রাইভেট এম-এ পরীক্ষা (১৯২৩) দিতে এসে দেখি, তিনি তখনও বি-এ পড়ছেন। আরও বললেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে এই মর্মে এক আবেদন পাঠিয়েছেন যে, তিনি গত আট বছর ধ'রে বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছেন এবং এই আট বছরের হিসেবে তিনি সব বিষয়েই পাস করেছেন, এমন অবস্থায় তাঁকে বি-এ পাস ঘোষণা করা হোক। শুনলাম বিশ্ববিদ্যালয় এ চিঠির উত্তর দেননি।

তাঁর যুক্তিতে অসঙ্গতি ছিল না কিছু। এক বিষয়ে ফেল করলে পরের বছর আবার সব বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার রীতি যে অন্যায়, তা এত দিনে সংশোধিত হয়েছে।

আমি এম-এ পাস করার পর একবার কলকাতা আসি, হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা, আমাকে ধরলেন ইংরেজী নাটকটা একটু পড়িয়ে দিতে। কয়েক দিন দিয়েছিলাম। এর কয়েক বছর পর তাঁর সঙ্গে আবার দেখা, শুনলাম বি-এ পাস করেছেন এবং ল' পড়ছেন। আরও কিছুদিন পরে শুনি, তিনি আর বেঁচে নেই। অবিরাম পান সিগারেট খাওয়া যেমন পূর্বে দেখা ছিল না, তেমনি অবিরাম পরীক্ষা দেওয়ার দৃষ্টান্তও পূর্বে দেখা ছিল না। এ রকম ধৈর্য সম্ভবত আজ আর দেখা যাবে না।

আমার নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত হওয়ার বাধা ছিল। অবশ্য প্রধান বাধা মনের। স্কুলের পরিবেশ শেষ পর্যন্ত ভাল লাগলেও দৈহিক বাধা প্রবল হয়ে ওঠে। ম্যালেরিয়ার আরও একবার খুব বেশি রকম আক্রান্ত হই। তবু যে পড়ার ধারা বজায় রেখেছিলাম সে কেবল বন্ধুদের পড়িয়ে। অন্যকে পড়াতে আমার খুব ভাল লাগত। রতনদিয়া এবং পাশ্ববর্তী অনেক গ্রাম অন্তত দশ জন ছাত্র কালুখালি ষ্টেশন থেকে রেলের দৈনিক যাত্রী ছিল রাজবাড়ি স্কুলের। তারা সবাই আমার কাছে আসত ম্যাপ আঁকিয়ে নিতে। পড়াতাম অনেককে। ওতেই আমার নিজের পড়ার কাজ হয়ে যেত।

গিরিজাকুমার রায়ের বাড়িতে একটি ঘর নিয়ে কবিরাজ দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য কবিরাজি করতেন। তিনি সিরাজগঞ্জ থেকে এসেছিলেন, কিন্তু কোন্ সূত্রে তা আমার মনে নেই। কবিরাজের চেয়ে তিনি সমাজ সংস্কারক ছিলেন বেশি। তখন তাঁর জাতিভেদ নামক সুবিখ্যাত বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার রক্ষণশীল মহলে তা নিয়ে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এই বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন লেফটেনান্ট কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এ বই পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, কেন না আমিও মনে মনে ছিলাম নিয়ম ভাঙার দলে। আমার আর এক অনুচর হরেন্দ্রকুমার রায় (পূর্বে উল্লেখিত), সে-ও দিগিন্দ্রনারায়ণের বিশেষ অনুগত ছিল।

আমাদের বালকমন সহজে প্রভাবান্বিত হওয়া স্বাভাবিক, এ বিষয়ে হরেন্দ্রকুমার ছিল চরম। এ রকম মানসিক গঠন আর আমি দ্বিতীয় দেখিনি। আমার অনেক উৎসাহজনক কাজেরই সে ছিল সঙ্গী, কিন্তু যেখানে সে আমাকে ছাড়িয়ে যেত সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য ছিল আমার নাগালের বাইরে। সে স্কুলে খুব ভাল ছেলে ছিল। স্কুলের একটি বার্ষিক পরীক্ষায় একবার অঙ্কে পুরো মার্ক পেল। কিন্তু তার পরের বছর অঙ্কে পেল শূন্য। কি করে এটা হল, তা উল্লেখযোগ্য।

তার পিসতুত ভাই প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন সাহেবগঞ্জ স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন পড়ে। বাইরের জগতের যা কিছু আধুনিক তা তখন পর্যন্ত তারই মধ্যস্থতায় রতনদিয়ার ছাত্রমহলে আমদানি হত। ফুটবল খেলায় টীম গঠন, শিক্ষামূলক ভ্রমণ করা প্রভৃতিতে তার ভীষণ উৎসাহ। আমার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল তার, যদিও তিন চার ক্লাস উপরে পড়ত সে। একবার সে ডি, এল, রায়ের সাজাহানে উদ্বুদ্ধ হয়ে এলো গ্রামে এক খণ্ড সাজাহান হাতে নিয়ে। প্রায় এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (তখন স্কুলের ছাত্র) দ্বিজেন্দ্রলালের একখানা ফোটোগ্রাফ দেখালেন, তাতে লেখা ছিল 'আমার তরুণ বন্ধু রবীন্দ্রনাথ মৈত্রকে।' এই দুটি ঘটনার যোগাযোগে দ্বিজেন্দ্রলাল ওখানকার স্কুলের ছেলেদের মধ্যে 'হীরো' হয়ে পড়লেন। সে কি উন্মাদনা। প্রবোধ আপন উন্মাদনা সবার মধ্যে সঞ্চারিত করল, এবং সে তার কাজ শেষ ক'রে সাহেবগঞ্জে ফিরে গেল, কিন্তু সর্বনাশ হল হরেন্দ্রের। সাজাহান হল তার ধ্যান জ্ঞান। তার বাইরে জগতে আর কিছু নেই, সে আগাগোড়া সাজাহান মুখস্থ ক'রে এমন আনন্দ পেল যার কাছে স্কুল তুচ্ছ হয়ে গেল, এবং পরের বছর অঙ্কে শূন্য এবং অন্যান্য বিষয়ে কম মার্ক পেয়ে ফেল করল। শুধু তাই নয়, একদিন স্বপ্ন দেখল, সে নিজে ডি-এল রায় হয়ে গেছে।

দিগিন্দ্রনারায়ণের প্রভাবে হরেন সমাজ বিষয়ে চিন্তাশীল হয়ে উঠল এবং কয়েকখানা বইও লিখেছিল জাতির অধঃপতন বিষয়ে। অবশ্য এ সবই তার নিজের অধঃপতনের পরে। বহুকাল পরে (১৯২১ সম্ভবত) সে শান্তিনিকেতনে চাকরি নিয়ে যায়। তখন তাকে ঠাট্টা ক'রে বলা হত, দ্বিজেন্দ্রলাল তোমার সর্বনাশ করলেন, বাঁচালেন রবীন্দ্রনাথ। এই হরেন্দ্রকুমারের মনের একটা অংশ বরাবরই কোমল ছিল, সেজন্য শান্তিনিকেতনে ষ্টোরের কাজের ফাঁকে সে-মনের যতটুকু অবশিষ্ট থাকত তাইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গানে মেতে সে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। তার পরিচয় পাওয়া যেত দেশে ফিরলে। কলকাতায় শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি যখন যোগেশ
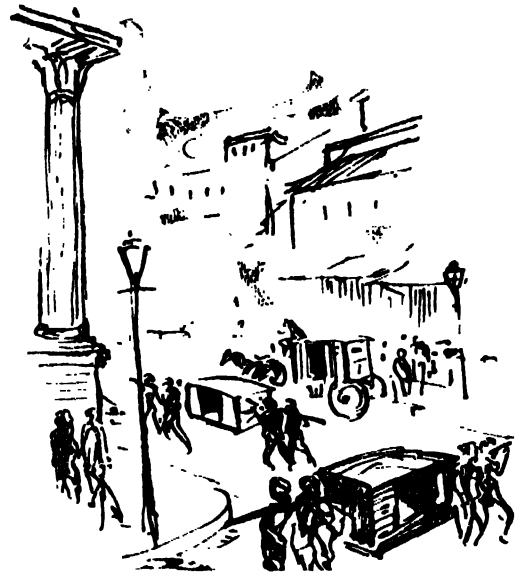
"শিয়ালদ থেকে মেডিক্যাল-কলেজ, পাল্কী-ভাড়া লাগল এক টাকা।"

চৌধুরীর সীতা মঞ্চস্থ করেন তখন আমার সঙ্গে সে সেই নাটক দেখে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে আমার ভয় হয়েছিল মাথা খারাপ হয়ে না যায়। অভিনয় দেখে ফিরে এসে সে সমস্ত রাত জেগে বসে ছিল, আমাকে ঘুমোতে দেয়নি। দশ পনেরো মিনিট পর পর আমাকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে শুধু বলছিল, 'কি দেখলাম!' এর পর তিন দিন আর সে কোনো কাজ করতে পারেনি। কয়েক বছর পরে সে বাস দুর্ঘটনায় মারা গেছে।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র গ্রামে থাকলে খুব হৈহৈ-এর মধ্যে দিন কাটত। সর্বদা আবৃত্তি চলছে নানা নাটক কাব্য থেকে। ডাকঘর ছিল চাটুজ্যেদের বাড়ীতে। অক্ষয় চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র যোগেন্দ্রকুমার লাহোর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, তিনি পাঠ শেষ না করেই চলে এসেছিলেন দেশে। দেশের সম্পত্তি তিনিই দেখাশোনা করতেন। তিনি ছিলেন রতনদিয়া ডাকঘরের পাঁচ টাকা বেতনের পোষ্টমাষ্টার। একদিন রবীন্দ্র মৈত্রের ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার খবর এলো ডাকঘরে। আমরা যাচ্ছিলাম ডাকঘরে, দেখি রবীন্দ্র মৈত্র উল্লাসে ফেটে পড়ছেন। যাকে দেখছেন তাকেই বলছেন, 'জান আমি ফেল করেছি!' হাতে পোষ্টকার্ড, তাতে প্রথম বিভাগে পাস করার খবর ছিল। 'ফেল করেছি' বলেই সেখানা সামনে মেলে ধরছিলেন।

আমার অনুজ সুবিমলের অকাল মৃত্যুতে বাবা শোকাহত হয়েছিলেন স্বভাবতই। তা ভুলে থাকবার জন্য গীতার মধ্যে ডুব মারলেন এবং ঐ সঙ্গে অনুবাদও করতে লাগলেন। শেষ রাত্রে উঠে সেতার নিয়ে বসতেন এবং আপন মনে বাজিয়ে চলতেন। কিছুদিনের মধ্যেই গীতার অনুবাদ সম্পূর্ণ হল। সেটি ১৯১২ সাল। বাবার দুজন নির্ভরযোগ্য ছাত্র, শ্রীনলিনীরঞ্জন রায় (বর্তমানে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ) ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তখন কলকাতায় থেকে কলেজে পড়তেন। তাঁদের উপর ভার পড়ল গীতার অনুবাদ ছাপাবার। এই সময় আমি খুব ছবি আঁকা অভ্যাস করছিলাম। 'হাউ টু ড্র গুড পিকচার্স' নামক একখানি খুব মোটা বই বাবা কিনে দিয়েছিলেন। তা থেকে বাবার সাহায্যে পার্সপেকটিভ বা পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা হতে দেরি হল না। বিলেত থেকে ডাকে অনেক রঙীন ছবি আনিয়ে নিয়েছিলাম। তা ভিন্ন মাষ্টারপীসেস অফ আর্ট নামক একখানা বড় বই কিনেছিলাম। গীতার জন্য কয়েকখানা ছবি এঁকে দিয়েছিলাম সেই বালক বয়সে। আমাকে উৎসাহ দেবার জন্য সেগুলো ছাপাও হয়েছিল, যদিও না হলেই ভাল হত।

অনুবাদ গীতাবিন্দু নামে ছাপা হয়। ছাপার সময় আমিও দু' একবার কলকাতায় এসেছি। ব্লক করেছিলেন কে, ভি, সেন, তাঁর সঙ্গে এই উপলক্ষে আলাপ হয়েছিল। পুরনো রিপণ কলেজের বাড়ির দোতলায় ছিল তাঁর ব্লক তৈরির কারখানা। নিচে বণিক প্রেস নামক এক ছাপাখানা ছিল, ফটকে ঢুকেই ডান ধারে।

অনুবাদের সময় ছন্দের আনন্দে বাবা খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। উৎসাহী শ্রোতাদের কাছে অক্লান্তভাবে পড়ে পড়ে শোনাতেন। মূল শ্রীমদ্ভগবতগীতায় যতগুলি ছত্র আছে, কাব্যানুবাদেও ঠিক ততগুলি ছত্র। প্রচলিত শ্লোকগুলি পৃথক ছন্দে অনুবাদ করা হয়েছিল, যাতে সহজে মুখস্থ করা যায়। পয়ার ছন্দ চলতে চলতে হঠাৎ এলো—

বসনখানি জীর্ণ মানি যেমন তারে ফেলে'
আরেক নব বসন পরে মানব অবহেলে,
তাহারি প্রায় দেহীর কায় জীর্ণ হলে পর
আবার সে যে গ্রহণ করে নূতন কলেবর। (২-২২)

কিংবা কবি পুরাতন, বিশ্ব শাসনকারী,
অণু হতে অণুসূক্ষ্ম সে তনু ধরে,
অনন্ত ভূপ, অচিন্ত্য রূপধারী
সূর্যের সম অজ্ঞান-তম হরে—(৮-৯)

এ সব বিচিত্র ছন্দের মাদকতায় পাঠপরিবেশ আচ্ছন্ন হয়ে যেত। ছন্দের ঝঙ্কারের অদ্ভুত এক নন্দনশক্তি। বিশ্বরূপ দর্শন (একাদশ অধ্যায়) বিশেষ ক'রে অনুবাদকারীর প্রিয় হয়ে উঠল। তিনি নিজের ছন্দের টানে ভেসে যেতে লাগলেন। সে ধ্বনি আজও কানে ঝঙ্কৃত হচ্ছে—

"অনল-শ্বসনা লেলিহা রসনা মেলিয়া সকল দিশে,
তোমার বদন বিশ্বের জন নিঃশেষে গরাসিছে!
নিখিল জগৎ তোমার মহৎ তেজে যে উঠিল ভরি'
উগ্র ঝলক সমগ্র লোক দগ্ধি ছুটিল, হরি!" (৩০)

কিংবা "বিশ্ব বিশাল গ্রাসি আমি কাল স্বয়ং ভয়ঙ্কর—
নিখিল-বিনাশ-সাধনে আয়াস করিনু অনন্তর!
তুমি নাহি মারো, তথাপি কাহারো নিস্তার নাহি আজি,
রয়েছে যদিও প্রতিপক্ষীয় যতেক যোদ্ধা সাজি! (৩২)

তুমি উঠি তবে খ্যাতি লুটি লবে, সমরে সমুত্তত;
অরাতিপুঞ্জ জিনিয়া ভুঞ্জ রাজ্য সমুন্নত!
আমিই সবাকে বধিয়াছি আগে, কেহই রহেনি বাঁচি'—
নিমিত্তার্থ কেবল মাত্র হও হে সব্যসাচী। (৩৩)

শ্রীমদ্ভগবতগীতার এর চেয়ে ভাল ছন্দানুবাদ হয়েছে কি না, আমার জানা নেই।

প্রকাশকের নাম ছিল শ্রীনলিনীরঞ্জন রায় ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫, রামতনু বসু লেন। রবীন্দ্রনাথ গীতাবিন্দু পাঠান্তে ছোট একখানি চিঠি দিয়েছিলেন, দুঃখের বিষয় সে চিঠিখানা হারিয়ে গেছে। বই বিক্রির ব্যবস্থাও প্রকাশকেরাই করেছিলেন। আমিও মাঝে মাঝে এসে বই দোকানে দিতাম। দুটি মাত্র জায়গায় রাখা হত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে ও বরেন্দ্র বুক ষ্টলে। এঁরা প্রতি মাসে বিক্রয় কমিশন কেটে টাকা শোধ ক'রে দিতেন। বরেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে এই সময় আমার পরিচয় হয়, আমার সঙ্গে অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহার করতেন। আজও তিনি টিকে আছেন বরেন্দ্র লাইব্রেরিতে—তখনও একা, এখনও একা।

পোতাজিয়াতে ইতিমধ্যে আমি আরও দু'খানা কাগজের গ্রাহক হয়েছি। একখানা লণ্ডন থেকে আসত 'বয়েজ ওন পেপার' আর একখানা 'ইংলিশম্যান', দ্বিসাপ্তাহিক। নিজের পছন্দসই সংবাদ বা রচনা বেছে নিয়ে পড়তাম এবং মোটামুটি এক রকম বুঝে নিতাম। মুকুল, প্রকৃতি, শিশু, নিয়মিত আসত। 'বালক' নামক একখানা মিশনারি কাগজ বার্ষিক মূল্য ছ আনা, আমার খুব প্রিয় ছিল। মনে আছে চার লাইন ছড়া লিখে অ্যাব্রাহাম লিন্কন-এর জীবনী উপহার পেয়েছিলাম।

লেখার ইচ্ছে হত। ফণীন্দ্রনাথ কবিতা লিখত, তার কবিতা সে সময় ছাপা হত কোনো কোনো কাগজে। বাবা বললেন, রচনা অভ্যাস করতে হলে খবরের কাগজে লেখা অভ্যাস করা ভাল। তাই ঠিক করলাম। পাবনা থেকে সুরাজ নামক একখানা সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ হত, তাইতে পনেরো দিন পর পর স্থানীয় সংবাদ লিখে পাঠাতাম। স্থানীয় আবহাওয়া ও অন্যান্য অনেক তুচ্ছ খবর লিখতাম এবং তা আমার নামে ছাপা হত। একখানা ক'রে কাগজ পেতাম তার বিনিময়ে। ১৯১৩ সাল সম্ভবত, মনে পড়ছে না ঠিক।

১৯১৩ সালের ১২ই কিংবা ১৩ই মে, পোতাজিয়া স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটির কিছু পূর্বের ঘটনা। দিনাজপুরের একটি ছেলে, নাম উপেন, পোতাজিয়াতে পড়ত। সে ছুটির আগেই বাড়ি যাচ্ছে, আমারও খুব ইচ্ছে হল ওর সঙ্গে গোয়ালন্দ হয়ে রতনদিয়াতে আসি। সকালে রওনা হয়ে রাত ৮টার সময় গোয়ালন্দ পৌছলাম ষ্টীমারে। উপেনের কাছে আগেই শুনেছিলাম সে হিমালয় দেখেছে এবং বরফঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখেছে, বহু দূর থেকেই দেখা যায়।

হিমালয় সম্পর্কে আমার একটা রহস্যময় আকর্ষণ জন্মেছিল, আগে বলেছি। হঠাৎ খেয়াল হল উপেনের সঙ্গেই যদি চলে যাই, তা হলে হিমালয় দর্শন সহজেই হতে পারে। নইলে ভবিষ্যতে কবে হবে বা আদৌ হবে কি না কে জানে? এ সুযোগ ছাড়া চলে না, সঙ্গে যথেষ্ট টাকা ছিল, আর ছিল আমার গ্লাডষ্টোন ব্যাগে ছবি আঁকার খাতা আর দু'-একটি টুকিটাকি জিনিস। দার্জিলিঙ সম্পর্কে সে সময় কোনো ধারণা ছিল না, শুনেছিলাম ঠাণ্ডা দেশ, তাই বোশেখের শেষের উত্তপ্ত হাওয়ায় সে ঠাণ্ডা কল্পনা ক'রে ভাল লাগল। তারপর গোয়ালন্দ থেকে পোড়াদ, সেখান থেকে দামুকদিয়া ঘাট পার হয়ে সারাঘাট থেকে আর এক গাড়িতে সমস্ত দিন ধ'রে গেলাম শিলিগুড়ি। পথে কয়েক ঘণ্টা ধ'রে অবিরাম বর্ষণ হয়েছিল। সারাঘাট থেকে সম্ভবত সান্তাহারে গিয়ে মিটার গেজ লাইনের গাড়িতে উঠেছিলাম, এখন মনে নেই। শিলিগুড়িতে পৌছতে রাত হয়েছিল। সেখানে গিয়ে জানা গেল, পরদিন সকালে দার্জিলিঙের গাড়ি। সমস্যা হল রাত কাটাব কোথায় এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে।

প্লাটফর্মের উপরে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল, বাজারের দিকে গেলে একটি খাবারের দোকান আছে। অতএব সেই দিকেই রওনা হচ্ছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন ব্যাগ টেনে নিচ্ছ কেন, অসুবিধে হবে। কোথায় রাখব ব্যাগ? বললেন, এই প্ল্যাটফর্মে রেখে যাও, কেউ নেবে না। অবিশ্বাস করতে শিখিনি তখনো, তাই কিছুমাত্র চিন্তা না ক'রে ব্যাগ শিলিগুড়ির সেই দীর্ঘ প্ল্যাটফর্মে রেখে রাত্রের অন্ধকারে খাবারের দোকানের সন্ধানে যাত্রা করলাম দুই বালক।

দোকান পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু সেখানকার খাদ্য মুখে স্পর্শ মাত্র ক'রেই ফেলে দিতে হল, অনেক দিনের পচা খাদ্য। হতাশ মনে ফিরে এলাম, ব্যাগটি সত্যিই কেউ ছোঁয়নি, যেমন রেখে গিয়েছিলাম তেমনি পড়ে ছিল। আমার 'পথে পথে' বইতে এই ভ্রমণের উল্লেখ আছে, সেখানে এই ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছি— "শিলিগুড়িকে এজন্য প্রশংসা করছি না, কেন না শিলিগুড়ি ১৯১৩ সালে যে কত অবনত ছিল তা এ থেকেই বোঝা যাবে। সে সময় শূন্য প্লাটফর্ম থেকে একটি গ্লাডষ্টোন ব্যাগ চুরি করার মতো লোক সেখানে ছিল না। চোর তো ছিলই না, এমন সুযোগ পেলে সাময়িক ভাবে চোর হয়ে উঠবে এমন সাধুও কেউ ছিল না।"

ষ্টেশনের লোকের পরামর্শ শুনে রাত্রিটা 'দার্জিলিং হিমালয়ান' গাড়ির মধ্যে শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। এ রকম অদ্ভুত খেলনা গাড়ি দেখে খুব হাসি পাচ্ছিল। আমরা কোথায় যে ঠিক যাব তা জানি না; দার্জিলিঙে, না তার আগের কোনো ষ্টেশনে, কিছুই স্থির করিনি। কোনো অভিজ্ঞতা নেই। শুনলাম, গাড়ির মধ্যেই টিকিট পাওয়া যায় ট্রামের মতো। তাই টাইম টেবল দেখে তিনধরিয়া তারপর কার্সিয়াং এবং সেখান থেকে দার্জিলিঙের টিকিট কিনলাম। নামতে ইচ্ছে হচ্ছিল না মাঝপথে। যত উপরে উঠছি তত অদ্ভুত লাগছে, এবং দেখছি সবার গায়েই শীতের পোষাক। আমরা বুঝতেই পারি নি কেন এ সময়ে সবার গায়ে শীতের পোষাক। দার্জিলিঙে পৌছে অবশ্য বুঝেছিলাম। শীত খুব বেশি ছিল না, দিনের বেলা, মে মাস। কিন্তু সবার মাঝখানে আমাদের পোষাক বেখাপ্পা লাগছিল। আমার গায়ে চেকের ছিটের গলাবন্ধ কোট, সঙ্গীর গায়ে শার্ট। দার্জিলিঙে নামতেই এক যুবক কাছে এসে খুব ভদ্রভাবে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তিনি পুলিসের লোক বলে পরিচয় দিলেন। তিনি আমাদের পোষাক দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, পালিয়ে এসেছ বাড়ি থেকে?

এ প্রশ্নের উত্তরে সোজা বললাম, না। কোথাও যাওয়া বিষয়ে এ রকম কৈফিয়ৎ দিতে হবে, তা জানতাম না। কাউকে ব'লে আসিনি ঠিক, কিন্তু আমার কাছে ব'লে আসা আর না বলে

"দার্জিলিঙে সবার মাঝখানে আমাদের পোষাক বেখাপ্পা লাগছিল।"

আসার মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। বাবা আমার কোনো কাজে কখনো বাধা দেন নি, এবং শুধু তাই নয়, আমি যা করেছি তাতে উৎসাহ দিয়েছেন। তাই না বলে এসেছি বললেও তা পালিয়ে আসার সমান জটিলতা সৃষ্টি করত। পুলিস-অফিসারের উদ্দেশ্য কিছু খারাপ ছিল না। তাঁর কাছেই শুনলাম কোনো হোটেল বা স্যানাটোরিয়ামে একটি সীট খালি নেই এবং সেজন্য তিনিই আমাদের থাকবার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। পাবনার লোক শুনে পাবনার এক ভদ্রলোক, নাম অন্নদাগোবিন্দ সান্যাল, তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন সরকারী অফিসের কেরানি, আমাদের জন্য অনেক পরিশ্রম করলেন। দু'টো ওভারকোট সংগ্রহ ক'রে দিলেন। খাওয়া তাঁদের মেসে চলত, শোবার ব্যবস্থা হল আরও সুন্দর। পরিচয় হতে হতে রত্নদিয়ার অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের এক শরীকের পুত্র নাম শৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (শান্তি নামে পরিচিত) এগিয়ে এলেন রত্নদিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ আছে শুনে। তিনি তখন একটা বড় বাড়িতে থাকতেন, বাড়িটি খালি ছিল। সেইখানে রাত্রিবাস ঘটতে লাগল।

পুলিস-অফিসার প্রতিদিন খোঁজ নিতে আসতেন এবং প্রতিদিন আমাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নিজে পোষ্ট করতেন। আমি আসবার সময় শিলিগুড়ি থেকে আগেই বাবাকে সব জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম।

দার্জিলিঙের সমস্ত সুন্দর লাগল। এ রকম উন্মাদকরা সৌন্দর্য আর আমি দেখিনি। দার্জিলিঙের দৃশ্য-বৈচিত্র্য, শত রকমের অভিনবত্ব আমাকে অভিভূত ক'রে ফেলল। যা ছিল এত দিনের কল্পনা, যার জন্য অন্তরে অন্তরে আমি এমন টান অনুভব করেছি, তা যে এমন আশ্চর্য সুন্দর, তা যে ভাষার অনেক উর্ধ্বে একটি অর্ধচেতন সত্তার শুধু স্পন্দনময় একটি আনন্দ-আবেগ, তা আগে কল্পনা করতে পারিনি। আমি ইতিপূর্বে ভাবপ্রবণ হরেন্দ্রকুমারের সীতা নাটক দেখার পরিণাম বর্ণনা করেছি। চিন্তা করতে গিয়ে দেখি, দার্জিলিং দেখে আমিও ঠিক ঐ রকমই অভিভূত হয়েছিলাম। দুটি পৃথক জিনিস, কিন্তু অনুভূতির গভীরতা সম্ভবত দু'দিকেই সমান।

একটি সংজ্ঞাহীন বলিষ্ঠ সৌন্দর্যের স্পর্শ যে একটি ভাবপ্রবণ বালকমনকে এমন ভাবে ভেঙে-চুরে দার্জিলিঙের কুয়াসার গুঁড়ো গুঁড়ো দানার মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে পারে, তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। নিজেকে শুধু জিজ্ঞাসা করছিলাম, এ কি দেখলাম!

[ক্রমশঃ।

ইলেক্‌শন

শ্রীতুষার নিয়োগী

প্রস্তুতি চলে আগত ইলেক্‌শনে,
তখৎ-এ-তাউস শুরু হবে ভাগাভাগি,
আবার নতুন বাধলো কুরুক্ষেত্র,
শোনা যায় ওই আকাশে-বাতাসে ভুখা গৃধ্রের ডাক।
আজকের রণে হয়ত' শান্তি, নয়ত' দুর্যোধন
বেঁচে থাকবেই, এ দু'য়ের এক পাঁচ বছরের জন্যে,
শোষণ, শাসনে হয়ত' জোয়ার আসবে নতুন কোরে,
নয়ত' মানুষ মনুষ্যত্ব ফিরে পাবে এইবার।
মসনদ নিয়ে কাড়াকাড়ি হবে পার্থ-জয়দ্রথে,
দুই যোদ্ধার বক্ষে আজকে সম্ভাবনার দোলা,
তর্পণ হবে একের রক্তে, অন্যে তিলক প'রে
সিংহাসনের ওপরে বসবে ন্যায়ের দণ্ড হাতে।
ডাক দেয় আজ ছোট্ট সেনায় পার্থ-সারথি স্নেহে
ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্রে ডাকছে দুর্যোধনের সেনা,
তাই ভাবি আজ কাহার হস্তে মানাবে ও ন্যায়দণ্ড,
তাই ভাবি আজ কার কাছে যাব দু' দিকে দু' ক্রূর ডাকে।
ক্রূর কৃষ্ণের ছলনার স্নেহে কু-মন্ত্রনার ধারা,
দুর্যোধনের শিরায়-শিরায় কুটিল জোয়ার চলে,
তাই আজ ভাবি কারে সাড়া দেব দু'জনে ছদ্মবেশী,
দু'জনার হাতে উদ্যত আজ মারণ-অস্ত্র দেখি।
যেই পাক আজ মসনদ ভাই, আমি যে ছোট্ট সেনা,
হয়ত' মিলবে লৌহবর্ম, ভুখা পেটে মিলবে না,
দু' মুঠো অন্ন সুখে খেতে ভাই, কৃষ্ণ, দুর্যোধন,
আমি রব দূরে, করুক না তারা আগামী নির্বাচন।

পত্রগুচ্ছ

[গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী রচিত 'জনৈকা হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' হইতে শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে]

পরমপূজ্য প্রণয়পবিত্র প্রাণবল্লভ

শ্রীযুক্ত··· স্বধর্ম্মপরিপালকেষু

প্রাণেশ্বর !

অদ্য তিন দিবস হইল আপনার বদন শশধর অদর্শনে এ অবলার হৃদয় গগন ঘোর চিন্তা-তিমিরাবৃত রহিয়াছে। মঙ্গল সমাচার দানে চিন্তাতিমির দূরীকৃত করিবেন।

প্রিয়তম ! তিন দিবস আপনার কোন সমাচার না পাইয়া কাননদগ্ধা কুরঙ্গিনীর ন্যায় আছি ; কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারি না এবং আপনার নিকট অধিক লোক থাকে এজন্য পরিচারিকারাও আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। তবে আমি আর কি প্রকারে সমাচার পাইতে পারি ? এ জন্য আমাকে নিষ্ঠুরা বিবেচনা করিবেন না।

গত ত্রিরজনী ওহে গুণমণি,
না পেয়ে তব সংবাদ।
হায় মোর মন, ভাবে সর্ব্বক্ষণ
ঘটিল এ কি প্রমাদ।
হয়ে কুলনারী সরমেতে মরি
জিজ্ঞাসিতে নারি কারে।
ওহে প্রাণপতি ! তবে কিসে সতী
সমাচার পেতে পারি।
যাহা হউক ভাই এই ভিক্ষা চাই
ঈশ্বর সদনে আমি।
থাক যেইখানে রেখ মোরে মনে,
কুশলে থাকহ তুমি।

কলিকাতা তদনুগতা
বহুবাজার শ্রীমতী···
১৫ই কার্ত্তিক ১২৭৭

[শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের রূপোপন্যাস ঠাকুরদাদার ঝুলি পড়িয়া লেখকের নিকট ৺রবীন্দ্রনাথের পত্র]

১নং পত্র

ওঁ

শিলাইদহ, নদীয়া

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পুষ্পমালা পড়িবার সময়ে তোমার বলামত হাতে একটা পেনসিল লইয়া বসিয়াছিলাম—কিন্তু তোমার লেখার গায়ে কোথাও একটা আঁচড় পড়িল না। এ জিনিস বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। বাংলাদেশের মুখে মুখে প্রচলিত লোকসাহিত্যে বিশেষ রসে তোমার এই কাহিনীগুলিতে মধুরভাবে রক্ষিত হওয়াতে এইগুলি বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব্ব সম্পদরূপে গণ্য হইবে। ইতি

১৪ই চৈত্র শুভানুধ্যায়ী
১৩১৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২নং পত্র

ওঁ

শিলাইদহ, নদীয়া

কল্যাণীয়েষু,

তোমার উপহার গ্রন্থ পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। বাংলার এই ঝুলি (ঠাকুরদার ঝুলি) এবার চিত্রে এবং রসে খুব করিয়া ভরিয়া তুলিয়াছ—তোমার এই রসের ঝুলি অক্ষয় হোক। আমার শরীর ভাল নাই। জ্বরে পড়িয়াছিলাম—এখনও সুস্থ হইয়া উঠিতে পারি নাই।—অতএব তোমাকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া আজ এইখানেই বিশ্রাম লাভ করিতে চাই।

কার্ত্তিকের শেষে অথবা অগ্রহায়ণের আরম্ভে কলিকাতায় যাইব তখন দেখা হইবে। ইতি

২রা কার্ত্তিক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩১৫

[গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'রাত্রির তপস্যা' উপন্যাস পড়িয়া লেখকের নিকট ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের পত্র]

স্নেহের গজেন বাবু,

পরশু আপনার 'রাত্রির তপস্যা' পেয়েছি। বইখানা পেয়েই পড়ে ফেলেছি। এরকম একখানি উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস কিছু দিনের মধ্যে পড়েছি বলে মনে হয় না। যে সব নামজাদা লেখকদের বই ছেপে আপনারা গর্ব্ব করেন ও তাঁদের জয়ন্তী করেন, তাঁদের অনেকের চেয়ে আপনার বইখানা ভাল হয়েছে। আধুনিক উপন্যাস প্রেমের ছেঁদো গল্প আর কমিউনিজমের নানা উত্তেজনার গল্প পড়ে' পড়ে' প্রায় হয়রাণ হয়ে গিয়েছি। আপনার ভাষা একেবারে নদীর স্রোতের মত হলেও স্বচ্ছ সাবলীল। কোথাও কোন জড়তা নেই, বা প্রকাশের দৈন্য নেই। কোনও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের বিশেষ জটিলতা নেই, অথচ নানা দিকের নানা ছবি বেশ সুন্দর হয়ে ফুটেছে। রুচির শুচিতা ও ভাবের পবিত্রতা বেশ সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এরকম একখানা বই বাংলা সাহিত্যে বিরল, অতি বিরল বললেও দোষ হবে না। আপনার বইটার সঙ্গে আমার 'অধ্যাপক' বইটার একটা জাতিগত ঐক্য আছে তা লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না। মূল সমস্যা এক জাতীয় ; তবে আপনি যে স্তরের ছবি দিতে চেষ্টা করেছেন, আমি তার উপরের স্তরে হাত দিয়েছিলুম। তাই আমার আলোচনা একটু ভারী হয়েছে। আপনার আলোচনার সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের পরিচয় অনেক বেশী, তাই সেগুলি জনসাধারণের পক্ষে বেশী হৃদ্য ও অনুভবযোগ্য হয়েছে। তবে আলোচনা আপনিও কিছু কম করেননি। শরৎ বাবুর গল্পের মধ্যে

নিছক গল্পের মধ্য দিয়ে ছবি ফোটানোর চেষ্টা আপনি করেননি। রবীন্দ্রনাথের মত চিত্তের ঘাত-প্রতিঘাত দেখাবার দিকও আপনার নয়। আপনি যে সব সমস্যার কথা তুলেছেন সেগুলি এমন সমস্যা যার উত্তর দেওয়া বিক্রমাদিত্যেরও সাধ্যাতীত হ'ত। আমি যে সমস্যার কথা তুলেছিলুম সেটা অতি উচ্চ স্তরের, অতি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে আবদ্ধ। তাই তার হয়ত একটা মীমাংসা হ'তে পারে। কিন্তু বিরাট জনসাধারণের যে শিক্ষার সমস্যা রয়েছে তার সমাধান যে আমাদের দেশেই কেবল দুঃসাধ্য তা নয়, এদেশেও শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রায় তেমনিই দুঃসাধ্য হয়ে রয়েছে। আমাদের দেশে বোলপুর, হরিদ্বার, সবরমতী প্রভৃতি নানা স্থানে যা ২। ১টা চেষ্টা হয়েছে সবই ব্যর্থ হয়েছে। 'সন্ধ্যা'র চেষ্টাও যে ব্যর্থ হবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। এ সম্বন্ধে আমার এত কথা বলবার আছে যে তা লিখতে গেলে একটা পুঁথি হয়ে যায়। 'সন্ধ্যা'র চরিত্রটি ভাল এঁকেছেন। স্ত্রী-চরিত্রের অতি মহত্ত্ব ও অতি দীনতা এ উভয়ই আমার জীবনে আমি দেখেছি। কেউ মেয়েদের চরিত্র শুচি ও বিশুদ্ধ করে আঁকলে আমার বড় ভাল লাগে। মেয়েদের জীবনটা সংসারের প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতের একটু আড়ালে। সেজন্য এখনও তাদের জীবনেই উন্নত আদর্শের উপাদান অনেক বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়, যদিও ক্লিন্নতায় ও জঘন্যতায় অনেক মেয়েই অনেক পুরুষকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। পুরুষের পৌরুষ বুদ্ধি অনেক সময়ে তাকে অভিমানে দৃপ্ত করে তোলে। যেটাকে পৌরুষ বা বীরত্ব বলে মনে করে, সেটা হয়ত অনেক সময় অভিমান ও মিথ্যা গর্ব্ব এবং এই গর্ব্বই আপনার ভূপেনের জীবনে ট্র্যাজেডি ঘটিয়ে তুলেছিল। আপনার গল্পের মধ্যে যে পরিস্থিতিগুলির সংগঠন করে তুলেছিলেন, সেগুলি বেশ ভালই হয়েছে। পরিস্থিতির দ্বারা যে ট্র্যাজেডি ঘটে তার মূলে থাকে চরিত্রের দ্বন্দ্ব, সে জন্যই তা স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য। আর বেশী কথা বলব না। আপনার গল্পটি পড়ে ভারী খুশী হয়েছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

[গজেন্দ্রকুমার মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প পড়িয়া লেখকের নিকট শ্রীরাজশেখর বসুর পত্র]

আপনার ১৪ জুনের পত্র যথাকালে পেয়েছি, 'শ্রেষ্ঠ গল্প'ও তার আগে পৌঁছেছে। * * *

আপনার গল্প আমার ভাল লাগে। লেখা সরল, মুদ্রাদোষহীন, যে সমাজকে জানি তারই কথা, এবং পাত্র-পাত্রীর বাক্যে ও আচরণে কৃত্রিম প্যাঁচ নেই। গল্প পড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্তবিনোদন বা নিত্যনৈমিত্তিক চিন্তা থেকে কিছুক্ষণ নিষ্কৃতি। যে গল্পের উদ্দেশ্য মত প্রচার বা কৃত্রিম সমস্যার উদ্ভাবন, তা text bookএর মতন দুষ্পাঠ্য। অবস্থা বিশেষে তা ভাল লাগতে পারে, কিন্তু সর্ব্বদা নয়। আপনার রচনা 'সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা' আরামে পড়া যায়। শ্রীযুত তারাশঙ্কর বাবু ভূমিকায় যা লিখেছেন, আমারও সেই মত।

'কথাসাহিত্য' মাঝে মাঝে পড়েছি। ছোট হলেও নূতন রকম। আশা করি বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। আমার লেখার প্রবৃত্তি এখন অত্যন্ত কম, শরীরও অসুস্থ। শুভেচ্ছা মনে মনে করছি, কিন্তু লিখতে আপত্তি আছে, মামুলী নমস্কার-আশীর্ব্বাদের মতন কৃত্রিম হয়ে পড়বে। কিছু মনে করবেন না। আপনার

রাজশেখর বসু

['মহাপ্রস্থানের পথে' পড়িয়া প্রবোধকুমার সান্যালকে লিখিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পত্র]

সবিনয় নিবেদন,

আপনার 'মহাপ্রস্থানের পথে' পড়িলাম।···আপনি যে তীর্থ-ভ্রমণের একটা বাস্তব চিত্র আঁকিয়াছেন, ইহার ফলেই বোধ হয় আপনার ভ্রমণ-কাহিনী রস-সাহিত্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। মানুষের মন একটা বিচিত্র জিনিস—কলিকাতার অন্ধগলিতে অথবা তুষার-ধবল বদরীনাথের উপর মানুষের অন্তর-প্রকৃতি সহজে বদলায় না এবং চিত্তশুদ্ধি না ঘটিলে তীর্থযাত্রার কায়িক ক্লেশের কোন আধ্যাত্মিক মূল্য নাই। এসব কথা আপনার বইয়ের মধ্যে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আপনার পুস্তক তীর্থযাত্রাকামীদের হাতে পড়িলে তাঁহাদের মঙ্গল হইবে।

"রাধারাণী"র জন্য আমার বাস্তবিক কষ্ট হইয়াছে এবং আপনার উপর রাগ হইয়াছে—আপনার হৃদয়হীনতার জন্য—যদিও আপনি বলিতে পারেন যে, হঠাৎ ঐ অবস্থায় পড়িলে আমিও ঐরূপ আচরণ করিতাম। হঠাৎ ঐ অবস্থায় পড়িলে আমি কি করিতাম, সে অনুমান এখন করিয়া লাভ নাই। তবে একথা আমি বলিতে পারি যে, আমার মতে আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় স্ত্রী-জাতির উপর ঘোর অন্যায় ও অবিচার করা হয় এবং তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোক আমরা, তাহা দেখিয়াও দেখি না।

"রাণী"র যে চিত্র আপনি আঁকিয়াছেন, তাহা যেমন সুন্দর, তেমনই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অন্যান্য পাঠকের মত, আমারও রাণীর সম্বন্ধে আরও জানিতে ইচ্ছা হয়—যখন পুস্তকটা শেষ করি। পাঠক যদি অতৃপ্তি এবং জিজ্ঞাসা-ভাবের মধ্যে পুস্তক শেষ করেন, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, লেখকের সৃষ্টি-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই।

স্বাঃ সুভাষচন্দ্র বসু

[বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-লিপি]

'পথের পাঁচালী'র আখ্যানটা অত্যন্ত দেশি, কিন্তু কাছের জিনিসেরও অনেক পরিচয় বাকী থাকে, যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। পথের পাঁচালী যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা, সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়, লেখার গুণ এই যে, নতুন জিনিস ঝাপসা হয়নি, মনে হয় খুব খাঁটি, উঁচু দরের কথায় মন ভোলাবার জন্যে সস্তা দরের রাঙতার সাজ পরাবার চেষ্টা নেই, বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে, এই বইখানিতে পেয়েছি যথার্থ গল্পের স্বাদ, এর থেকে শিক্ষা হয়নি কিছুই, দেখা হয়েছে অনেক, যা পূর্বে এমন করে দেখিনি, এই গল্পে গাছপালা পথঘাট মেয়েপুরুষ সুখদুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েছে। সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিসের মতো সে সুস্পষ্ট

১৩৪০। রবীন্দ্রনাথ।

সোবিয়েতের দেশে দেশে

মনোজ বসু

২১

আস্তোরিয়া হোটেলের এক একটা পুরো ঘর দখল করে প্রতি জনে বাদশাহি করছি। উঁহু, মাঝখানটা দেয়াল-ঘেরা না হলেও ঘর দুটো বলতে হবে। একটায় শোওয়া, অপরটা দামী আসবাবপত্রে সাজানো বৈঠকখানা। আট-দশটা বন্ধু নিয়ে আরামসে বৈঠকখানায় ওঠাবসা করতে পারেন। হায়রে কপাল, একলা আমাকেই এক মিনিট স্থির হয়ে বসতে দেয় না, তায় আবার বন্ধুবান্ধব সহ গুলতানি! খাটের উপর সওয়া হাত উঁচু গদি—সে এমন বস্তু, বপুখানি তদুপরি নিক্ষেপ মাত্রেই গদিতে বিলীন হয়ে যায়। দুপুরের ভোজন শেষে এই হাড়-কাঁপানো শীতে দু-দণ্ড যে সেখানে গড়াগড়ি করব, কিছুতে তা হতে দেবে না হতভাগারা। ঠাসা প্রোগ্রাম।

সেকেলে বদ্‌ অভ্যাস আমার—সকাল সকাল উঠি। পাঁচটায় উঠে পড়ে মুখ-হাত ধুয়ে জানলার পর্দা সরিয়েছি—আরে সর্বনাশ, লেনিনগ্রাডে রাত দুপুর যে এখন! শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। শেষটা আর পেরে উঠিনে, পৌনে-ছ'টায় উঠে মরীয়া হয়ে টেবিলে গিয়ে বসলাম। প্রাণের সাড়া নেই কোন দিকে কোথাও। ভিজে রাস্তা—বৃষ্টি হয়ে গেছে রাত্রে, অথবা কুয়াশা থেকে জল জমেছে। রাস্তায় সারবন্দি উজ্জ্বল আলো অবাক হয়ে তাকাচ্ছে, কোন নিশাচর হে, ছ'টার সময় উঠে টেবিলে কাজ করে!

সাতটা হল, আটটা হল। রাত পোহাবার লক্ষণ নেই। ভয় ধরে যাচ্ছে এবার, বিধাতার রবি-যন্ত্রটা বিগড়ে গেল না কি? ন'টা বাজলে তখন দেখি, ভোরের আলো ফুটি-ফুটি করছে। লোক চলাচল হচ্ছে দু-পাঁচটি; ট্রলি-বাস ও মোটরবাস চলছে। পার্কের মাঝখান দিয়ে মানুষ আড়াআড়ি পথ ভাঙছে। কিন্তু জমে ওঠেনি এখনো। নিতান্ত যাদের কাজের গরজ, তারাই বেরিয়েছে; গোটা শহর জাগতে দেরি আছে। তবু এ পুরো শীতকাল নয়, সবে অক্টোবরের তেসরা।

গ্রীষ্মের সময় আবার ঠিক উল্টো। দিনমান কিছুতে নড়তে চায় না। আলো-ভরা রাত দশটায় দলবল সহ টহল দিয়ে বেড়াবেন। 'সাদা রাত' ওরা নাম দিয়েছে।

—এই প্যাচপেচে বৃষ্টি-বাদলা বরফ-কুয়াশা, এমন দেশে থাক কি করে বলো তো? এক বেলাতেই আমরা যে হাঁপিয়ে উঠি!

—চড়চড়ে রোদ আগুন-ভরা হাওয়া অমন দেশে থাক কি করে তোমরা? আমরা তো একটা বেলাও টিকতে পারব না সেখানে।

হারমিটেজ—এলাহি ব্যাপার, রাশিয়ার সব চেয়ে বড় মিউজিয়াম। লণ্ডনের বৃটিশ-মিউজিয়াম ও প্যারির লুভরে—তাদেরই সমকক্ষ। নেভার কূলে বিশাল প্রাসাদাবলী—আগে বলত উইণ্টার-প্যালেস, শীতপ্রাসাদ। আঠারো শতকের মাঝামাঝি তৈরি (১৭৫৫-১৭৬২)। এখনকার নাম হয়েছে প্যালেস অব আর্ট, শিল্পপ্রাসাদ। এই প্রাসাদের লাগোয়া আরও সব প্রাসাদ গড়ে উঠেছে পরবর্তী কালে। হারমিটেজ এইখানে। এক হল থেকে আর এক হলে যাচ্ছি—নেভা চোখের সামনে আসছে বারম্বার। আর এক পাশে খাল—নেভা থেকে বেরিয়ে আঁকাবাঁকা পথে শহরের মধ্যে হারিয়ে গেছে। খাসা জায়গা।

একতলা দোতলা তিনতলা জুড়ে হলের পরে হল আর গ্যালারি। গুণতিতে তিন শ'। হলগুলো ভুঁয়ে নামিয়ে যদি পাশাপাশি বসানো যায়, হিসাব করে দেখা হয়েছে, লম্বায় আড়াই মাইল যাবে। সোনালি কাজকর্ম। থামগুলো পুরো এক এক পাথর কেটে তৈরি। নগ্ন নারী ও পুরুষ মূর্তি—সেকালের বনেদি ধাঁচের গৃহ-সজ্জা। ঘরে ঘরে শিল্পবস্তু ভরতি—মোটামুটি দুই মিলিয়ন গুণতিতে।

প্রথম পিটারের স্বর্ণখচিত গাড়ি। অতিকায় আলো। রাজকীয় সমারোহের নানা ছবি। সম্রাটের বিশাল ছবি। ফরাসী, ইতালীয়, ডাচ ও স্প্যানিস ছবি। আঠারো শতকের রুশীয় সংস্কৃতির নমুনা।

বিপুলায়ন এক একটা ঘর শেষ করে করিডরে এসে পড়বেন। অপরূপ সাজানো। নেভা ঝিকমিক করছে ঐ। বসে একটু বিশ্রাম নিন, ধকল তো কম নয়।

রকমারি ঘড়ি—নানা যুগের, নানা প্যাটার্নের। গাছের ডালে মণিমাণিক্যের ময়ূর—ময়ূর কেমন পেখম দোলায় ঐ দেখুন। মোজেয়িকে বানানো ছবি—ছোট-বড় বিস্তর।

দোতলায় বাগান। ছাতের উপর সাত ফুট মাটি ফেলে তার উপর রকমারি ফুল ও ফল লাগিয়েছে, ফোয়ারায় জল ঝরছে। নেভা নদী দেখুন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই স্বপ্নময় পরিবেশে।

সবুজ পাথরের বৃহৎ সেকেলে পাত্র। এই পাথর উরল পর্বত থেকে নিয়ে এসেছে। তের-চোদ্দ শতকের ইতালীয় শিল্পকর্ম, আসবাবপত্র, অগ্নি-আধার, বাক্স, দরজা। ফ্লোরেন্সের কাজ। চিনামাটির হরেক মূর্তি। বাইবেলের নানা ঘটনার ছবি। ইতালীয় শিল্পীর আঁকা যীশুর অনেক ছবি, যীশুর মৃত্যুর পর শোকদৃশ্য। লিওনার্ডো দা-ভিঞ্চির মূল ছবি দু-খানা। ভ্যাটিকানের যাবতীয় ছবির নকল—কাপড়ে আঁকা। রামায়ণের ছবির নকল। সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয়-ক্যাথারিন এই সমস্ত আঁকিয়েছিলেন। রাফায়েলের মূল ছবি—যোসেফ মেরী ও ছেলে, ডলফিন ও ঘুমন্ত ছেলে। মাইকেল এঞ্জেলোর মূর্তি। টিসিয়ানের ছবি—জীবন্ত, যেন কথা বলছে...

ভাগ্যে ছবিগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল লড়াইয়ের সময়। নয়তো কিছুই থাকত না। উপরটা কাচে ঢাকা, ছবির উপর যাতে ঠিক মতো আলো এসে পড়ে। বোমা পড়ে উপরের কাচ চুরমার হয়ে আগুন ধরে গিয়েছিল। আবার সব ঠিক হয়েছে, বুঝতেই পারবেন না এখন।

এথেন্সের শিল্পীদের গড়া মূর্তি ও ছবি। পাথর কুঁদে কী সব অপূর্ব মূর্তি বের করেছে! সতের শতকের ফ্লেমিশ শিল্প।

ভ্যান-ডাইকের আঁকা ছবি, ভ্যানডাইকের নিজের ছবি। রোঁদার ছবি। একটা ছবি—মুমূর্ষু বন্দী বাপকে মেয়ে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। কী সুন্দর !

রেমব্রান্টের পুরো একটা ঘর। তাঁর স্ত্রীর ছবি। যীশুর দেহ ক্রুশ থেকে ঝুলছে। ম্যাডোনা। শিশু যীশু অঘোর ঘুম ঘুমাচ্ছে। বাইবেলের সেই ছবি—বেহিসাবি ছেলে ফিরে আসছে। রেনোয়ার আঁকা ছবি। একটা ছবি সামনে দিয়ে দেখলে একেবারে ঝাপসা—কুয়াসায় আচ্ছন্ন। বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে তাকালে কুয়াশার আড়াল থেকে সেতু দেখা দেবে। সকল দেশের ছবি আছে, রুশীয় ছবি নেই—যে আছে পৃথক মিউজিয়ামে। ছবির অন্ত নেই—যত নাম-করা জিনিষ জড়ো করেছে। মূল-ছবি না মিলল তো চেষ্টাচরিত্র করে নকল নিয়ে এসেছে।

নাইটদের বর্ম। একটার ওজন পঞ্চাশ পাউণ্ড—এই বস্তু গায়ে চড়িয়ে লড়াই করত। চাষী ও নাগরিকরা বিভিন্ন যুগে যে সব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেছে, তার অনেকগুলো কচ্ছপের খোলার টেবিল। রূপার রকমারি মদ্যপাত্র। সিল্কের উপর সোনার তারে গাঁথা ছবি। ভলতেয়ারের মূর্তি—অবিকল বাঙালি টুলো পণ্ডিতের মতো।

ভারতের শিল্পকর্ম একটা ঘরে। নানা রকমের কাপড়। আঠার শতকের অস্ত্রশস্ত্রের বিস্তর সংগ্রহ। এক বৃটিশ-মিউজিয়াম ছাড়া এ-সব অস্ত্র কোথাও নেই।

রূপার কাজকর্ম-করা কফিন এক সেনাপতির স্মৃতিতে। তিন হাজার পাউণ্ড রূপা লেগেছে। অষ্টাদশ শতকের ছাপাখানা। দরবার-ঘর—প্রথম-পিটারের সিংহাসন। পুরানো পতাকা, সে আমলের সৈন্যদের পোশাক। অভ্যর্থনা-ঘর—এই ঘরে শুধুমাত্র জার বসবেন, আর কেউ বসতে পাবে না। ছাত আর মেজে অবিকল এক রঙের। পাথরের টুকরোয় এক ম্যাপ বানিয়েছে এই সেদিন—১৯৩৭ অব্দে। নানা রঙের পঁয়তাল্লিশ হাজার টুকরো পাথর লাগল।

মণি-মাণিক্যের ঘর। তিন হাজার বছর আগেকার গয়না ককেশাস অঞ্চলে কবর খুঁড়ে পাওয়া। সোনার বরা হরিণ ও ঘোড়া—একটা নদীর পাড় ভাঙছিল, সেইখানে পেয়েছে। সাইবেরিয়া অঞ্চলের প্রাচীন অনেক গয়না—ক্রিমিয়ায় পাওয়া গেছে। হীরা-বাঁধানো ছড়ি, আংটি।

রুশ জাতটা ধরেই থিয়েটার-পাগলা। মস্কো শহরে চুয়াল্লিশটা থিয়েটার। শহর যত ছোটই হোক, থিয়েটার দুটো চারটে থাকবেই। যে জায়গায় যাচ্ছি, নিতান্ত সময়ের অকুলান না পড়লে থিয়েটার-হল এক নজর দেখিয়েই দেবে।

এই দেশেরই লেবেদিয়েভ (গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদিয়েভ) বাংলা থিয়েটার করলেন কলকাতায় গিয়ে। সে কি আজকের কথা—দেড়শ' বছরের উপর হয়ে গেছে। ২৭ নবেম্বর, ১৭৯৫। তারিখটা সোনার অক্ষরে লিখে রেখে দিন। তার আগে বাংলা নাটকের অভিনয় হয় নি। অন্তত পক্ষে পুঁথিপত্রে কোন রকম নিশানা পাইনে।

লেবেদিয়েভ বিস্তর কষ্ট করে বাংলা শিখলেন। বাংলা ভাষার একটা ব্যাকরণই লিখে ফেললেন—বাংলা শিখতে তাঁর মতন এত কষ্ট আর কারো যেন করতে না হয়। লণ্ডন শহরে যে রুশ-রাষ্ট্রদূত ছিল, তার কাছে চিঠি লিখছেন : অনেক যত্নে আমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কিছু কিছু শিখেছি। আমার এই সাধনার ফল স্বদেশে প্রচার করতে চাই।" হিংসুটে ইংরেজ কিছুতে তা হতে দেবে না। যেমন করে পার, আমার দেশে ফিরবার বন্দোবস্ত করে দাও।

ইংরেজের রাজত্ব—রাশিয়ার সঙ্গে রাজনীতিক সামাজিক কোন রকম সম্পর্ক নেই। তবু ভালবেসে শিখে নিলেন হিন্দি বাংলা ভাষা। নাটকের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের কাব্যের আবৃত্তি করতেন সুর-লয় যোগে। রুশ ভাষায় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের তর্জমা করলেন। ইউরোপীয় ভাষায় বাংলা বইয়ের সেই সর্বপ্রথম তর্জমা। বাংলা অভিধান ও কথোপকথনের বই, বীজগণিত এবং বাংলা পঞ্জিকার কিছু কিছু তর্জমা হল। সংস্কৃত, বাংলা ও মিশ্র হিন্দি সুভাষিতাবলীও অনেক তিনি সংগ্রহ করলেন।

যে বাংলা নাটক অভিনয় হয় সেটা ডিসগাইজ (Disguise) নামক ইংরেজি কমেডির তর্জমা। লেবেদিয়েভ নিজে তর্জমা করেন। দুই রাত্রি অভিনয় হল—চারশ' লোকের মতন জায়গা, সেখানে তিলধারণের ঠাঁই নেই; বাঙালি অভিনেতা দিয়ে অভিনয় হল ; পালার মধ্যে একটি ইংরেজি কথা থাকতে দেওয়া হয়নি।

এই দেখুন, থিয়েটারের কথায় কথায় কতদূর এসে পড়লাম। আজ বিকালে নিয়ে চলেছে কিন্তু থিয়েটার-হলে নয়, যাঁরা সব একদা থিয়েটার করতেন তাঁদের বাড়িতে।

জায়গার ইংরেজি নাম—হাউস ফর ভেটারন্ থিয়েট্রিক্যাল আর্টিষ্টস্। কড়া বাংলায় ব্যাখ্যা করলে দাঁড়াচ্ছে—অবসরপ্রাপ্ত নাট্যশিল্পীদের আশ্রয়সদন। নেভার পুল পার হলাম। তারপর খালের পর খাল পার হয়ে শহরতলী মুখো যাচ্ছি। খাল ধারে বিস্তর কাঠের গোলা। কলকাতার নিমতলা অঞ্চলে যেমন দেখতে পান কাঠ সাজিয়ে পাহাড় বানিয়েছে। খালের জলে গাছের গুঁড়ি ভাসছে বিস্তর—জল থেকে এখনো ডাঙায় তোলা হয় নি। অনেক দূরের জঙ্গল থেকে গাছ কেটে নদী-খালে ভাসিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে আসে।

বিস্তর অলিগলি ঘুরে পুনশ্চ এক খাল পেয়ে গেলাম। খালের পাশে পাশে চলেছি। সূর্য আজ মুখ দেখান নি, টিপটিপে বৃষ্টি দিন ভর চলছে। হঠাৎ চেপে এলো বৃষ্টিটা—মুষলধারে ঢালছে। তার মধ্যে সেই খাল ধারে আমাদের গাড়িগুলো থেমে দাঁড়াল। জন কয়েক বুড়ো থুথুড়ে মানুষ—তার মধ্যে মহিলাও আছেন—অবিরল ধারার মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজছেন। গাড়ি থামতে অদূরের বাড়ি থেকে আরও বিস্তর বেরিয়ে এলেন। হাত ধরে ধরে পরম সমাদরে সকলকে নামাচ্ছেন—শ্বশুরবাড়ি নতুন জামাইরা এসেছেন যেন।

দোতলার হল-ঘরে নিয়ে বসাল। ওখানকার যত বাসিন্দা কারো আসতে আর বাকি নেই। সবাই বুড়োবুড়ি পলিত কেশ সকলের। ঘর বোঝাই সোফা-চেয়ার—তবু কম পড়ে যাচ্ছে আমরা ওঁরা দু-তরফের গুণতিতে অনেক। তা দেখলাম, বুড়ো হলে কি হবে—গায়ে দস্তুরমতো তাগত আছে, এঘর ওঘর ছুটোছুটি করে সবাই চেয়ার টেনে নিয়ে আসছেন। থুনথুনে এক বুড়ো আবলুস কাঠের যে গন্ধমাদন অবলীলা ক্রমে মাথায় বয়ে নিয়ে এলেন—হলপ করে বলছি, মুখে বলিরেখা, কোটরের ভিতরের চোখ, শনের মতন চুল—সমস্ত ছদ্মবেশ ওঁদের। থিয়েটারে যে কায়দায় পঁচিশ বছরের ছোঁড়া পঁচাশি বছরের বুড়ো সেজে আসেন।

জমিয়ে তো বসা গেল। শুনছি এখানকার ব্যাপার থিয়েটারের তিন গোত্র—অপেরা, ব্যালে ও ড্রামা। তাই কে

এক গোত্রের মানুষ হওয়া চাই, তবে এখানে ঠাঁই মিলবে। এবং হবেন বুড়োমানুষ—মেয়ে হলে নেহাৎ পক্ষে পঞ্চাশ, পুরুষ হলে পঞ্চান্ন। তার আগে ঢোকবার এক্তিয়ার নেই। আমাদের দেশে নাক সিঁটকান—ঐ লোকটা থিয়েটার করত এক সময়, আজকে তার অবস্থা দেখ। এ দেশে ঠিক উল্টো রেওয়াজ—তাদের এক রকম মাথায় তুলে নাচায়। আহা, আমাদের কত সন্ধ্যা আনন্দে ভরে দিয়েছ, কত রসের জোগানদার! আজকে বয়স হয়ে অশক্ত হয়ে পড়েছ বলেই কি ভুলে যাব তোমাদের? জাত ধরেই কৃতজ্ঞ, সরকার মোটা পেন্সন দেয়। এ কিন্তু আজকের সাম্যবাদী রাশিয়া বলে নয়—অনেক আগে জারের আমল থেকেই। যে হাউসে এসেছি, এর প্রতিষ্ঠা ১৮৯৮ অব্দে। এই থেকে বুঝতে পারছেন।

আত্মীয়জন তেমন যদি না থাকে, নাট্যশিল্পীরা এখানে এসে ওঠেন। ছেলেপুলের ঝামেলা না থাকলে অনেক স্বামী থাকেন স্ত্রীকে ফাউস্বরূপ সঙ্গে নিয়ে। স্ত্রীরাও তেমনি এসে ওঠেন নিজ নিজ স্বামী-পুঁটলি সহ। বেড়ে মজায় রয়েছেন—সেকালের সেই থিয়েটারি জীবনের মতোই। পায়ের উপর পা চাপিয়ে দিবারাত্রি বিশ্রাম সুখ নিচ্ছেন, এমত বিবেচনা করবেন না। কেউ কেউ আত্মজীবনী লিখছেন—এই মোটা হিজিবিজি খাতা দেখিয়ে দিলেন। ওর মধ্যে নানান খবর থিয়েটার-জগতের—বিস্তর গুহ্যকথা ও তত্ত্বকথা। চলতি থিয়েটারের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে কারো কারো—অভিনয় করেন না, নতুন আমলের অভিনেতাদের অভিনয় শেখান, বিবিধ উপদেশ ছাড়েন প্রাপ্তি কিছুই নয়—বিনি মাইনে আপ-খোরাকি।

হাউস চালানোর সমস্ত রকম দায় এঁদের। সরকার শুধুমাত্র টাকা দিয়ে খালাস। অশন আর বসন হলেই হবে না—এতে মানুষ বাঁচে না, বিশেষ করে এই সব শিল্পীমানুষ। বিরাট লাইব্রেরি আছে, চুপচাপ পড়াশুনো করো বসে বসে। আছে রকমারি বাদ্যযন্ত্র, সোরগোল করে যত খুশি বাজাও—অনেকখানি জায়গা নিয়ে কম্পাউণ্ড, পাড়ার লোকের তেড়ে এসে পড়বার আশঙ্কা নেই। দেয়াল ছবিতে ছবিতে ঠাসা। মেঝের উপর এঁরা সব জমিয়ে বসেন—আর দেয়ালে এঁদের মাথার কাছে আগের অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং সুরকারেরা, আজকে যাঁরা জীবন্ত নেই।

পুরানো প্রতিষ্ঠান—আগেই শুনিয়ে দিয়েছি। সৈবনা (Saibna) নামে এক অভিনেত্রী সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে এই আশ্রয় সদনের পত্তন করেন। বুড়ো হলে নটনটীর আর কদর থাকে না, কষ্টে পড়ে যায়। বুড়োথুত্থুড়েকে কে ষ্টেজের উপর দেখতে চায়? গলাও থাকে না তখন। তার জন্য এক সমিতি গড়া হল—নটনটীর অধিকার-রক্ষা সমিতি। শিল্পীরা বুড়ো বয়সে যাতে নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে পারে, সেই হল সমিতির কাজ। এই কাজে জনসাধারণ দু-হাতে টাকা দিলেন। বিপ্লবের পরে আর কোন ঝামেলা রইল না, কাউকে টাকা দিতে হয় না। ষ্টেট সমস্ত ভার বইছে। ষ্টেট বলতে পুলিশ-ঘেরা বিশেষ কয়েকটা অট্টালিকার জন কয়েক ঝানু ব্যক্তি নয়—ষ্টেট মানে জনসাধারণ। জনসাধারণ তাদের ষ্টেটের মারফতে এই সদন চালাচ্ছে। চালাচ্ছে রাজসূয় প্রণালীতে। প্রতি লোকের জন্য মাসিক তেরো শ' থেকে চোদ্দ শ' রুবল খরচ—আমাদের টাকায় পনের শ' ষোল শ'র মতন। বুঝুন এবারে। লেনিনগ্রাডের এই হাউস এখন এক শ' পচাত্তর জন আছেন, তন্মধ্যে এক শ'র উপর মেয়ে। প্রায় প্রমীলা-রাজ্য বানিয়ে ফেলেছে। তবে লোলচর্মা ন্যুব্জদেহা প্রমীলারা—এইটে বড় চোখে লাগে।

থিয়েটার-শিল্পীর আশ্রয় সদন এই একটি মাত্র নয়, মস্কোতেও আছে। আর থিয়েটারের মানুষ বলে নয়—বুড়োমানুষের আশ্রয় সদন সোবিয়েত দেশময় ছড়ানো। কতক আছে পেশা হিসাবে আলাদা করা—এই একটায় যেমন এসেছি। আবার সাধারণ সদনও বিস্তর আছে—যে কোন বুড়োবুড়ি গিয়ে উঠতে পারেন। এতে কুলায় না—নতুন নতুন বিস্তর সদন দিনকে দিন বাড়ানো হচ্ছে।

সেকালের নাম-করা ব্যালেরিনা নাম করা গায়ক কত জনের সঙ্গে আলাপ হল। লাখ লাখ মানুষ একদা পাগল হত তাঁদের নামে। আজকে নির্জন অন্তহীন অবসর—পাদ-প্রদীপের আলো জ্বলে না, নামই জানে না নতুন কালের মানুষ যারা থিয়েটারে যায়। টুংটাং পিয়ানো বাজিয়ে সেকালের এক-আধ কলি হঠাৎ গেয়ে ওঠেন কখনোসখনো—দেয়ালে ছাতে একটুকু রণিত হয়ে মিলিয়ে যায়।

এক ভদ্রলোক একেবারে নতুন এসেছেন। দস্তুরমতো সচ্ছল অবস্থা—এখানে আসবার মতন নয়, ছিলেনও এতদিন বাড়িতে। কিন্তু বিষম একঘেয়ে লাগছিল, টিকতে পারলেন না, সমস্ত ছেড়েছুড়ে দলের মাঝখানে চলে এসেছেন। বললেন, দিনরাত স্বপ্নের মধ্যে রয়েছি যেন মশায়। আমোদ-উৎসব রোজই কিছু না কিছু আছে। মরার কথা আর মনে আসে না। কিন্তু আমার মতো লোককে কায়েমি হয়ে থাকতে দেবে না, দু-দশ দিন পরে বিদায় করে দেবে। ঐ একটা ভাবনায় বড্ড মুসড়ে আছি, অন্য কিছু মনে আসে না।

কত দূর থেকে গিয়েছি আমরা, কত কি দেখাবার আছে! তাই নিয়ে দুঃখ করছেন। বৃষ্টি আর দিন পেলো না, আজই চেপে পড়েছে। আপনাদের এর মধ্যে কেমন করে বের করি বলুন তো?

তবু ছাড়লেন না শেষ পর্যন্ত। ওই আদি-বাড়ির পাশে অনেকটা জায়গা নিয়ে নতুন বাড়ি। জল ছপছপ করে সেখানে পাকড়াও করে নিয়ে চললেন।

নতুন বাড়ি ঢুকে চোখে আর পলক পড়ে না। রাজ-অট্টালিকা। পার্ক লেক ফুলবাগান—যত রকমে সাজানো যায়, খুঁত রাখে নি। চেয়ারে চেয়ারে সোনালি কাজকর্ম। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে কুলুঙ্গিতে ভাস্করের পাকা হাতের নানা মূর্তি। এ-ব্লক ও-ব্লক ঘিরে টানা-বারাণ্ডা চলে গেছে। বারাণ্ডার লাগোয়া ঘর। উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখতে পাচ্ছি—ঘরে ঘরে রেডিও, খাটপালঙ্ক, ছবিতে ছবিতে এলাহি কাণ্ড। যারা পঙ্গু ও ব্যাধিগ্রস্ত, তাদের জন্য আলাদা জায়গা এই নতুন বাড়িতে; সকলের সঙ্গে একত্র থাকতে দেয় না। নিচের তলায় ডাক্তারখানা, হাসপাতাল। চিকিৎসা বাবদে এক পা বাইরে যেতে হয় না। এক বাড়ির ভিতরে সমস্ত।

চা-টা খেয়ে যাবেন কিন্তু আপনারা। উঁহু, ঘাড় নাড়লে ছাড়ছিনে। আপনাদের ভারতের কত কথা শুনেছি! ছবিও দেখেছি। গাছ-পালায় সবুজ শান্তস্নিগ্ধ এক আশ্চর্য রোমান্টিক দেশ। আমাদের কত পালার মধ্যে ভারতের নাম এসেছে কতবার। এক মহিলা বললেন, যৌবন বয়স থেকে আমার বড় সাধ রহস্যময় বিচিত্র ভারতবর্ষ দেখে আসব। সে তো হবে না আর জীবনে—আপনাদের কাছে বসে গল্পগুজব করে সেই সাধ মেটাই আজ খানিকটা। পালাতে দেবো না।

কি বলবেন আর এর পরে ? এরই মধ্যে ঐ আদি-বাড়ির খানাঘরে টেবিল সাজানো হয়ে গেছে। সে কী রাক্ষুসে কাণ্ড—দেখে আঁৎকে উঠতে হয়। ধরে ধরে নিয়ে বসিয়ে দিল। কতই তো নিমন্ত্রণ খেয়েছি, কিন্তু মৃত্যুর দরজায়-দাঁড়ানো রূপশিল্পীদের এই সমাদর অন্য কোথায় পাবো ? ভারতীয় সিনেমা-দল—যাঁদের দেখা আগে পেয়েছেন—এই লেলিনগ্রাডেও তাঁরা ইতিমধ্যে ঘুরে গেছেন। সেই গল্প উঠল। ভারতের ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল, এঁদের অনেকে দেখে এসেছেন গিয়ে। সৌরকরোজ্জ্বল ভারতের রূপ দেখে এলেন ছবির ভিতরে। ভারতের সুখসৌভাগ্য কামনা করে ভারতের বন্ধুত্ব স্মরণ করে পাত্রের পর পাত্র চলল। ও রসে বঞ্চিত আমরা ক'টি গোবিন্দদাস ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি।

খাওয়া অন্তে হুল্লোড় লেগে গেল। এ বলে, এদিকে আসুন; ও বলে, ওদিকে চলুন। যে যার ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখাবে। চুরাশি বছরের এক বুড়া ক'জনকে নিয়ে বসিয়ে বাক্স খুলে অতিকায় এলবাম বের করলেন। কিশোর বয়স থেকে কত পালায় কত রকম অভিনয় করে এসেছেন, সেই সব ছবি। আর এক বুড়ি—বয়স সত্তরের নিচে হবে না, গাল ও চোখের নিচে চামড়া ঝুলে পড়েছে—হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে ঘরে নিয়ে দেয়ালে-টাঙানো মহিমান্বিত এক সাম্রাজ্ঞীর ছবি দেখালেন। দেখ, চিনতে পারছ ? আমি—আমিই সাজতাম চল্লিশ-পয়তাল্লিশ বছর আগে। স্তম্ভিত হয়ে যাই। ঢলঢল পরিপূর্ণ-যৌবনা কোন অপরূপার আশ্চর্য ছবি। ছবির মুখোমুখী বীভৎসদর্শন এই বৃদ্ধা। শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর সামনাসামনি তুলনা করে দেখানো। একবার ছবির দিকে আর একবার ঐ স্থবিরার মুখে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছি।

রাত্রিবেলা ডিনার সেরে নৃত্যনাট্য দেখতে গিয়েছি। পালা হল লাল পপি। ব্যালে ও প্যান্টোমাইন একসঙ্গে—অর্থাৎ নাচ আর মূক-অভিনয়। দৃশ্যপটের ভারি জাঁকজমক—নাচ দেখবেন কি, সিন দেখেই থ হয়ে যাবেন। ঘূর্ণ্যমান মঞ্চ নয়—কিন্তু আলো আর পর্দা খেলিয়ে আশ্চর্য গতিবেগ আনে, মায়ারহস্য ঘনিয়ে তোলে।

আমেরিকা থেকে মালের জাহাজ এসেছে চীনের বন্দরে। কুলিরা মাল নামাচ্ছে, বড় কষ্ট তাদের। নানান দায়-দরকারে বিস্তর লোক জাহাজঘাটায় আনাগোনা করছে। ঘাটের এক দিকে ফলের দোকান। রিক্সা চেপে মার্কিন মালিক দেখা দিল। রিক্সাওয়ালা বকশিস চাইল তো লাথি। অন্ধকার হল স্টেজ, জালের এক পর্দা পড়ল। আলো জ্বললে দেখি, খুব নাচ ও আমোদস্ফূর্তি। আর পিছনে জালের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, ক্লান্ত কুলিরা জাহাজের মাল নামাচ্ছে, ছুটোছুটি, বিষম ব্যস্ততা সেদিকে।

নায়িকা সব চেয়ে ভাল নাচে। মার্কিন মালিক নাচের ভিতরেই হাত ধরে টেনে নিয়ে তাকে পাশে বসাল। জাহাজঘাটে বিষম গণ্ডগোল হঠাৎ। নাচের মেয়ে ছুটল সেদিকে। অন্ধকার।

জালের পর্দা নেই—স্পষ্টাস্পষ্টি জাহাজ ঘাট! কুলি-সর্দার রুখে দাঁড়িয়েছে (সর্দার হল মাও-সে-তুঙের প্রতীক—চীনা দালাল মার্কিন মালিকের হয়ে ছুটোছুটি করছে, সে হল চিয়াং কাইশেক)। সৈন্যদল ছুটে এলো, কিন্তু জনতার রোষের সামনে উদ্যত বন্দুক সরিয়ে নেয়। নায়িকা এসে গেছে এই কুলিদের মধ্যে। নেচে নেচে তাদের মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফুল দিল মেয়েটাকে—লাল রঙের পপিফুল। জাহাজের লোকেরাও নাচে এসে যোগ দেয়।

ক্লাসিক্যালের সঙ্গে আধুনিক নাচ মিলিয়ে দিয়েছে। পালা শেষ হলেও লোকে ছাড়বে না—উঠে দাঁড়িয়ে কেবলই হাততালি। পাগল হয়ে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে—পর্দা সরিয়ে শিল্পীদের বারম্বার বেরিয়ে আসতে হয়।

২২

জালিয়ানওয়ালাবাগের মাঠে এক সন্ধ্যায় মগ্ন হয়ে বসেছিলাম। বুলেটের ক্ষত দেয়ালে দেয়ালে, গাছের গুঁড়িতে—সেগুলো যত্ন করে রেখেছে আর সেই কূয়া—যার মধ্যে আতঙ্কিত শত শত মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবু বাঁচে নি।

জারের প্রাসাদ-অঙ্গনে ঘুরতে ঘুরতে জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা মনে এসে যায়। ১৯০৫-এর রক্তাক্ত রবিবার। জারের কাছে দরখাস্ত নিয়ে এলো বিপুল জনতা। জারের দলেরই কেষ্টবিষ্টু একজন বুদ্ধি দিয়েছেন: সোজাসুজি চলে যাও, সুবিধা হবে। চলেছে তারা—হাতে আইকন, জারের ছবি। দয়ার প্রার্থী, অস্ত্রহীন, অসহায়—তাদের উপর রাইফেলের আগুন। জারতন্ত্রের সমাধি রচিত হল সেই রবিবার। একটা মেয়ে কারেলিনা চেঁচাচ্ছে—স্ত্রীরা-মায়েরা নিষেধ কোরো না তোমাদের স্বামী-ছেলেদের। জীবন দিক তারা মহৎ কাজে। কেঁদো না, গিয়েই থাকে যদি জীবন। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, আছি—আছি আমরা। এক হাজারের বেশি মানুষ ঐ উঠানে পড়ে গেল। কত বাচ্চা, কত মেয়েলোক তার ভিতরে!

ঘুরতে ঘুরতে অনেক বেলা হয়ে গেল। হোক—বেলা না হলে য়ুনিভার্সিটি খোলে না। গলির মোড়ে এক ভিখারি দেখলাম। এদিক-ওদিক তাকায় আর ভিক্ষা চায়। ভিক্ষাবৃত্তি কিন্তু আইনে মানা, পুলিশে দেখলে ধরে নিয়ে যাবে। সোবিয়েত রাজ্যে মোটমাট দেড় জন ভিখারি চোখে পড়েছে আমার। এই একটি, আর মস্কোর রাস্তায় ময়লা ছেঁড়া কাপড়ে হঠাৎ একজন সামনে এসে চক্ষের পলকে আবার উধাও হয়ে গেল। সেই লোকের সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ বললেন, ভিখারিই বটে, পুলিশের আঁচ পেয়ে ভেগে পড়ল। মতান্তরে, সেকেলে বুড়ো মানুষ—বিদেশিদের দেখে কৌতূহলভরে একটুকু দেখে নিল। অ্যাম্বাসিতে গল্পে গল্পে একদিন তুলেছিলাম কথাটা। তা হতে পারে ভিখারী। দেখা যায় এমন এক-আধটা। আইন থাকলে কি হবে, আইন ফাঁকি দেবার মানুষ-ও থাকে। বয়স হয়ে গিয়ে পেনসন পাচ্ছে, আয় কম হয়ে গেছে—আর মদ খাওয়াটা বড্ড চালু ওদেশে, হয়তো বা পেনসনের টাকা মদে ফুঁকে দিয়ে চোখে অন্ধকার দেখছে এখন। বিদেশি লোক দেখে সুড়ুৎ করে হাত পাতে, ফোকটে কিছু যদি জুটে যায়।

লেলিনগ্রাড য়ুনিভার্সিটি আমার বড্ড আপন মনে হল। বিশেষ করে প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের যে বিভাগ আছে। কোথায় আমার বাংলাদেশ আর কোথায় ওই ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের উপান্তে প্রাচীন বিদ্যামন্দির! টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে, নেভার জোলো হাওয়া গা কেটে

কেটে যেন হাড়ের ভিতর অবধি শীত বসিয়ে দিচ্ছে। কোন কিছুতে কাতর নই। বড় বড় হল আর করিডরের ভিতর ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছি।

এই ১৯৫৪ অব্দে প্রাচ্য-বিদ্যা বিভাগের নিরানব্বই বছর বয়স পুরল। আগামী বছর শতবার্ষিক উৎসব। ভারতের আধুনিক ভাষার মধ্যে বাংলা হিন্দি উর্দু মারাঠি ও পাঞ্জাবি এই পাঁচটা ভাষা পড়ানো হয়। প্রাচীন ভাষার মধ্যে পালি প্রাকৃত ও সংস্কৃত। ভারতের বাইরের চীন আরব তুর্ক ইরান কোরিয়া জাপান প্রভৃতি স্থানের ভাষা।

ভারতীয় ভাষার মধ্যে, যতদূর খবর পাই, সকলের আগে এবং সব চেয়ে দরদের সঙ্গে শিখতে শুরু করে বাংলা। বাংলার সে প্রভাব নেই এখন, মিইয়ে আসছে। হিন্দি-উর্দুর উপরে জোর। ওদের শিরে রাষ্ট্রভাষার পাগড়ি—হবেই তো! এই য়ুনিভার্সিটির ডক্টর বরনিকভ মহাভারত ও তুলসীদাসের রামায়ণের ও অনুবাদ করেছেন। আরও বিস্তর সাহিত্যকীর্তি আছে তাঁর। বৃদ্ধ অধ্যাপক গত হয়েছেন, ছেলে বরনিকভ ইদানীং উর্দু হিন্দির অধ্যাপক।

প্রাচ্য ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা ভেরা নভিকভা—মোটাসোটা গোলগাল চেহারা আর দশটা রুশ-মেয়ের মতো সাজ-সজ্জায় একেবারে উদাসীন। বাংলা শেখানোর ভার তাঁর উপরে। দশটি ছাত্র-ছাত্রী বাংলা ক্লাসে। আর নিতে পারছেন না, একা ক'জনকে সামলাবেন? বাংলা ছাড়া পাঞ্জাবির ভারও তাঁর উপর। এবং আরও কি কি—সঠিক এখন মনে পড়ছে না। পাঁচ বছরের কোর্স—তারপরে ডিগ্রি দেওয়া হয়। ডিগ্রি নিয়ে কাজকর্মে চলে যায়—শত শত মিউজিয়াম আছে, তাদের প্রাচ্য বিভাগে; প্রাচ্যের নানা দূতাবাসে; বিভিন্ন লাইব্রেরিতে; একাডেমি অব সায়েন্সের কাজে। সরকারের প্রাচ্য-পুস্তক প্রকাশন বিভাগ আছে, তার জন্যেও বহু লোকের দরকার। পাশ-টাশ করে প্রাচ্য ব্যাপারের গবেষণা করেন অনেকে; নানা সাময়িক পত্রে সেসব ছাপা হয়।

সাতটি ছেলেমেয়ে এবারের পঞ্চম শ্রেণীতে। তারা পাশ করে যাচ্ছে, আগামী বছর মাষ্টার হতে পারবে তাদের গুটিকয়েক। বাংলার ক্লাস তখন আর কিছু বড় করা চলবে।

নভিকভা নিজে দশ বছর ধরে বাংলা শিখেছেন। শিক্ষক দাউদ আলি দত্ত, অথবা প্রমথনাথ দত্ত—যাঁর কথা আগে কিছু পেয়েছেন। কলকাতার এক দুঃসাহসিক ছেলে ১৯০৫ অব্দে বেরিয়ে পড়েন—বিদেশি শক্তির সঙ্গে যোগসাজস করে যদি ইংরেজ তাড়ানো যায়। কত দেশে ঘুরলেন, তুর্কি রেজিমেন্টে ঢুকলেন মুসলমানি নাম দাউদ আলি নিয়ে। ফরাসি ও ইউরোপের নানা তল্লাট ঘুরে অবশেষে রাশিয়ায়। রাজনীতি ছেড়ে শেষটা মহত্তর কাজে নামলেন—বাংলা শিখানো, মস্কো য়ুনিভার্সিটিতে বাংলার অধ্যাপক হলেন। রুশ মেয়ে বিয়ে করলেন—তিনি হলেন বীণা দত্ত কিম্বা নুরজাহান দত্ত, স্বামীকে যেমন যেমন প্রমথ অথবা দাউদ আলি বলবেন। দাউদ আলি এই সেদিন (১৯৫৩) দেহ রেখেছেন; মহিলা আছেন মস্কোয়। চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে একটি, পড়াশুনো করছে। বীণা দেবীর ভারত বিশেষ করে বাংলা দেশের সম্বন্ধে ভারি আগ্রহ। কিন্তু মুশকিল হয়েছে ভারতীয় ভাষা একটিও জানেন না।

যাক গে, কি কথায় কদ্দুর এসে পড়লাম। এই প্রমথনাথের শিষ্যা নভিকভা। গুরুর নামে শ্রদ্ধায় মুখ জলজল করে উঠল। পুরানো কথা বলতে লাগলেন। আমায় পেয়ে-বায়ে। বাংলার শিক্ষিকা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ওঁর জীবন-সাধনা—আর আমি হলাম বাংলার পিশাতিয়েল, তদুপরি গুরুর জাতভাই বাঙালি। মুঠোর মধ্যে তাঁর দৈবাৎ এক কোহিনুর ছিটকে এসে পড়েছে, এমনি গতিক। কি ভাবে সমাদর দেখাবেন ভেবে পান না। আর যারা এসেছেন, তাঁরা সবাই ছড়িয়ে গেলেন অন্য লোকের তাঁবে; নভিকভা আমায় ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছেন, যত কথাবার্তা আমারই সঙ্গে। লেনিন এই য়ুনিভার্সিটির ছাত্র। এই খানটায় বসে কাজ করতেন—এমনি সব স্মরণীয় জায়গা দেখে বেড়াচ্ছি।

আমার ছ'খানা বই নিয়ে এসেছি, মওকা বুঝে হাতে দিলাম। প্রাচ্য গ্রন্থাগারে থাকবে অন্যান্য বাংলা বইয়ের সঙ্গে। কতবার কত রকমে যে নাড়াচাড়া করলেন! এত বই—তবু বইয়ের কাঙাল এঁরা।

ইতিহাসের ছাত্র হীরেন মুখুজ্জ মশায়। কথা তুললেন, ভারতের ইতিহাস কিভাবে পড়ানো হয় সোবিয়েতে—কি রকম ভাষ্য হয়েছে এ দেশে ভারত-ইতিহাসের? ইতিহাস নিয়ে খুব ঝোঁক পড়েছে—সম্প্রতি প্রাচ্য ইতিহাস ছাপা হয়েছে, তাতে সব পাওয়া যাবে।

অধ্যপক ডক্টর কালিনিয়ভ এসে পড়লেন, ইতিহাসের আলোচনা আর এগুতে পারল না। সংস্কৃতে সম্ভাষণ করলেন আমাদের সকলকে; ঝরঝর করে সংস্কৃত বলে যাচ্ছেন। ভারতের মানুষ—অতএব দেবভাষাটা বিশেষ ভাবে রপ্ত, এইটে ধরে নিয়েছেন অধ্যাপক। আমাদের ঘাম দেখা দিয়েছে, সংস্কৃতে জবাব দিতে হলে তো গেছি একেবারে। মাথায় অল্প টাক, সদাপ্রসন্ন রসিক সুপুরুষ—গোটা রামায়ণখানার তর্জমা করেছেন সংস্কৃত থেকে রুশ ভাষায়। এমন দিকপাল পণ্ডিত—চালচলনে বুঝবার জো নেই। সাহেব হলে কি হবে, সংস্কৃত পড়ে পড়ে টুলো পণ্ডিত বনে গেছেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে খুব ভাবসাব হয়েছে কেম্‌ব্রিজের এক ভাষাতাত্ত্বিক সমাবেশে। সুনীতিকুমারের কাছে কালিয়ানভ শ্লোক লিখে দিয়েছিলেন—ভারত-সোবিয়েত মৈত্রী এবং বিশ্বশান্তির নামে পান-প্রস্তাব:

মৈত্রায় ভারতবর্ষ-সোবিয়েৎ ভূম্যোরনন্তায়।
পাত্রমুপাপয়াম্যহং শান্ত্যর্থং সর্বভুবনে॥

সুনীতিকুমারই বা কম কিসে? তিনি পালটা শ্লোক ছাড়লেন: শ্রীকল্যাণ-বিবর্ধনং শ্রেয়সঃ সাধনং তথা।
যদেব কাময়ে হ্যহং রুষীয়াণাং শ্রবশ্চ বৈ॥

['কল্যাণ' কথাটার সাধারণ অর্থ তো আছেই; আবার কালিনিয়ভ কল্যাণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। 'শ্রবঃ' হল গৌরব; আবার শ্লাভজাতি—'শ্লাভার' অর্থ হল গৌরবময় জাত]

শ্লোক দুটো ছিল আমার কাছে। শোনালাম। কালিনিয়ভ বললেন, শ্লোকের উৎস শুকিয়ে যায়নি আমার। দাও খাতা, তোমায় একটা বানিয়ে দিচ্ছি। আমার খাতায় নিজের হাতে দেবনাগরি হরফে লিখে দিলেন নতুন শ্লোক:

মৈত্রং চেদমবিচ্ছেদ্যং প্রজানামাবয়োর্মহৎ।
জীবতু জনতাভূত্যৈ জগতু শাশ্বতীঃ সমাঃ॥

(কল্যানোভ, লেনিনগ্রাডে)

[ক্রমশঃ।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

[স্বনামধন্য শিশু-সাহিত্য যাদুকর]

শিহরণ ও রোমাঞ্চ কথা দুটোর অর্থ খুব সস্তার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ সস্তা দরের দু'চারটে বাক্চাতুর্যের বাণ মেরে একে ধরাশায়ী করা যায় না। বক্তব্যের অসারতা যেখানে, সেখান থেকে বহু দূরে এ করে বসতি স্থাপন। শিহরণ ও রোমাঞ্চ তাকেই বলব, যাতে দেখা যাবে এককে কিন্তু বোঝা যাবে অনেককে—বালকদের সঙ্গে আলাপ করার সঙ্গে সঙ্গেই বড়দের হাতে হাত মেলানোরও এর সমান অধিকার। অন্তরের গভীরতা যার ঢাকা থাকবে সারল্যের মুখোসে অথচ অনুভব করা যাবে তাকে সুস্পষ্ট। সাহিত্যের বেলাভূমিতে শিহরণ ও রোমাঞ্চ সর্বত্রই পরিবেশনীয়। এতে শুধু পুলকই থাকবে না থাকবে অনেক অজানা তথ্য, পাওয়া যাবে মনের খোরাক, চিত্ত হবে পরিতৃপ্ত হৃদয় কানায় কানায় ভরে উঠবে এর সারগর্ভ বক্তব্যে। জীবনের চলার পথের দিক নির্দেশনার দায়িত্বও এর উপর কম নয়—এখন এইগুলিকে প্রমূর্ত করে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজন শক্তিশালী লেখনীর, বলা বাহুল্য, এই শক্তিগর্ভা লেখনীর অধিকারীদের তালিকায় দেখা যাবে বিশেষ হরপে লেখা আছে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের নাম।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে আজ 'হেমেন্দ্রকুমার' তাঁর আসল নামে দাঁড়িয়েছে আর মূল নাম 'প্রসাদদাস' রূপায়িত হয়ে গেছে ছদ্মনামে। পিতৃদেবের নাম স্বর্গীয় রাধিকানাথ রায় মহাশয়। আদি বাড়ী পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে। পথ সম্প্রসারণের স্বার্থে পৌরসভার পুষ্ট বাস্তবিদদের বুদ্ধির কবলে তাকে দিতে হয়েছে আত্মাহুতি। তারপর থেকে বাস শুরু হয়েছে বাগবাজার অঞ্চলে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যাংশে প্রসাদদাসের পৃথিবীর আলো প্রথম দর্শন। প্রসাদদাসকে ছেলেবেলা থেকে আকৃষ্ট করে পিতৃদেবের গ্রন্থ সংগ্রহ। কখন যে অজান্তে সাহিত্যের হাতছানি আকর্ষণ করে বালক প্রসাদদাসের মন পৌনে সত্তর বছরের বৃদ্ধ হেমেন্দ্রকুমারর কাছে আজও অন্ধকারে ঢাকা আছে সেই রহস্য।

হেমেন্দ্রকুমারের অসামান্য ক্ষমতা শুধু সাহিত্যের শিশুবিভাগে বন্দী নয়। তার ধারা বহুমুখীন। কবিতায়, গান লেখায়, প্রবন্ধ রচনায় তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য্য। শুধু তাই নয়, এক প্রবন্ধ রচনাই তাঁর বহুবিধ বিষয়কে কেন্দ্র করা। বাঙলার অভিনয় জগৎ, বিদেশের অভিনয় জগৎ, বাঙলার সাহিত্য জগৎ, বিদেশের সাহিত্য জগৎ, নানান দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, অপরাধ কৌশল সম্বন্ধে অজস্র আলোচনা, সঙ্গীত-নৃত্য-শিল্পকলা-মন্দির প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য পরিবেশনায় কোনটিতেই তাঁর লেখনী অচল নয়, সমান বেগেই বেগবান।

সরকারী শিল্প মহাবিদ্যালয়ে অঙ্কন সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেছেন হেমেন্দ্রকুমার। সামরিক বাহিনীর হিসাব বিভাগের কর্মিরূপেও কিছুকাল দেখা গেছে হেমেন্দ্রকুমারকে। কিন্তু সহ্য হল না কবির, তাঁর জন্ম অন্য কাজের জন্যে, হিসাব-নিকাশের জালে নিজের জীবন জড়িয়ে ফেলার জন্যে নয়, তাই সেই সীমায়িত গণ্ডির ভিতর থেকে মুক্তিলাভ করে সাহিত্যের অসীম অনন্ত আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে হালকা নিঃশ্বাসে স্বস্তি বোধ করলেন। 'যমুনা'র সম্পাদকীয় বিভাগে করলেন যোগদান। আজীবন অতিবাহিত করে গেলেন সৃষ্টিধর্মী পরিবেশে, নিজেকে উৎসর্গিত করলেন সাহিত্যের বেদীমূলে—আবদ্ধ করে রাখলেন শিল্প-অভিনয়-সঙ্গীত-নৃত্য জগতের আঙিনায়।

লেখা আরম্ভ করেছেন ছেলেবেলা থেকে। কল্লোল-এর পূর্বযুগে বাঙলার সাহিত্য জগত সেদিন আলো করেছিল 'ভারতী'। কবি-বাল্মীকি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একদা যার ছিলেন সম্পাদক—'ভারতী'র সাহিত্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রতি রবীন্দ্রপ্রভাব ছিল অনতিক্রম্য। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের আদর্শ। রবীন্দ্র-নিন্দা ছিল তাঁদের অসহ্য। তাঁদের সামনে রবীন্দ্রনাথের নিন্দাকারী কোন ব্যক্তিই কখনো সহজে নিষ্কৃতি পেয়েছেন বলে জানা যায় না। রবীন্দ্র-আদর্শে অনুপ্রাণিত সেদিনকার এই সাহিত্যসেবীদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অমল হোম, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীরচন্দ্র সরকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ভারতীর বৈঠকও অনেকেই করতেন আলোকিত, যথা: রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, সরলা দেবী, দীনেশচন্দ্র সেন, শিশিরকুমার ভাদুড়ি ও আরো অনেকে। সবুজপত্রের প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার বলেন—তোমরা অনেকেই জানো না যে, সবুজপত্রের প্রতিষ্ঠার পিছনে সর্বাগ্রে ছিলো, মণিলালের উত্তম ও কল্পনা। মণিলালের প্রচেষ্টাতেই বীরবল-এর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন

তাঁর লেখা আবার নতুন করে আরম্ভ হয়। সেদিনকার রঙ্গজগতে সাহিত্যিকদের যোগ ছিল অবিচ্ছেদ্য। এই প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমারের কাছ থেকে জানা যায় যে—এর প্রধান কেন্দ্রস্থল শিশিরকুমার। বললেন—শিশির ভালবাসত সাহিত্যিকদের, সাহিত্যের প্রতি ছিল তার অচলা ভক্তি, নিজেকে সে তার সাহিত্যিকের মতই সাজিয়ে রাখত তার চুম্বকী আকর্ষণের প্রভাব অতিক্রম করা সেদিনকার সাহিত্যিকদের পক্ষে ছিল দুরূহ। সুতরাং তার জন্যেই সেদিন থিয়েটার জগতে ছিল আমাদের আনাগোনা। শুধু অভিনয়ের দিকটাই সে পূর্ণ করেনি, তার আনুসঙ্গিক দিকগুলোর পরিচালনার ভারও সে সঁপে দিয়েছিল যথাযোগ্য গুণী ব্যক্তির হাতে। হেমেন্দ্রকুমারের মতে শিশির সম্প্রদায় ছিল জ্ঞানী-গুণীর মিলন ক্ষেত্র। শিশিরকুমারের অসাধারণ দূরদর্শিতার ফলেই রঙ্গমঞ্চ লাভ করেছে বিশিষ্ট গুণীদের সান্নিধ্য। অর্থাৎ সঙ্গীতাচার্য দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, চারু রায়, প্রখ্যাত শিল্পী ও শিল্পনির্দেশক রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (দেবু), সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র দে, খ্যাতিমান রবীন্দ্র সঙ্গীতশিল্পী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এঁদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমারেরও একটি উল্লেখযোগ্য আসন ছিল।

হেমেন্দ্রকুমার সম্পাদনাও করেছেন কয়েকটি পত্রিকা। তাদের মধ্যে দীপালী, নাচঘর, ছন্দা, শিশির, রংমশাল-এর নাম উল্লেখনীয়। বহু ছায়া চিত্রের পরিচালনার মূলে ছিল হেমেন্দ্রকুমারের সুষ্ঠু হাত। বহু ছবির সুরারোপ ও নৃত্য পরিকল্পনাও হয়েছে হেমেন্দ্রকুমারের দ্বারা। সাহিত্যবিষয়ক পত্রে চলচ্চিত্র বা রঙ্গজগত সম্বন্ধে আলোচনা করা বা পত্রিকায় ঐ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের প্রবর্ত্তন, ধরতে গেলে হেমেন্দ্রকুমারই প্রথম করেন! সঙ্গীত বিদ্যায় এঁর গুরু ছিলেন রাধিকামোহন গোস্বামীর ছাত্র শ্রদ্ধেয় মহিম মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-সংখ্যা আজ তাঁর দাঁড়িয়েছে দেড়শ'রও উপরে। তাদের মধ্যে যখের ধন, আবার যখের ধন ময়নামতীর মায়াকানন, মেঘদূতের মর্তে আগমন, মানুষ পিশাচ, বিশাল গড়ের দুঃশাসন প্রভৃতি উদাহরণ যোগ্য কয়েকটি নামোল্লেখ মাত্র। 'অভিনয় কলা ও রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থটি তাঁর এখন প্রকাশের পথে। 'বঙ্গ রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার' গ্রন্থটি থেকে নাট্যামোদী ব্যক্তি অনেক রস পারবেন আহরণ করতে। এ ছাড়া 'যাঁদের দেখেছি' ও 'এখন যাঁদের দেখছি' গ্রন্থগুলিতে হেমেন্দ্রকুমার সে যুগের ও এ যুগের বিখ্যাত স্বনামধন্য পুরুষদের সঙ্গে তাঁর সান্নিধ্যের স্মৃতিচিত্রগুলি ধরে রেখেছেন—এই রেখাচিত্রগুলির মধ্যেই ছড়িয়ে আছে হেমেন্দ্রকুমারের জীবন কাহিনী—আছে তখনকার ও এখনকার সাহিত্য ও অভিনয়-জগতের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, স্বর্ণকুমারী দেবী, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, প্রমথ চৌধুরী, জলধর সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেশ সমাজপতি, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সরলা দেবী, অমৃতলাল বসু, মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাসুন্দরী প্রভৃতির সম্বন্ধে স্মৃতিকথা 'যাঁদের দেখেছি' গ্রন্থের সম্পদবিশেষ। 'নৃত্য-নাট্য-চিত্র' সম্বন্ধে আজ অবধি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় হেমেন্দ্রকুমার যত লিখেছেন তার থেকে বাছাই বাছাই অংশগুলি বেছে নিয়ে সম্পাদিত করলে পর পর চারখানি খণ্ড তা থেকে অনায়াসে হয়। ষাট বছর আগের কলকাতা নামক প্রকাশিতব্য গ্রন্থটিতে সকল দিক দিয়ে কলকাতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন হেমেন্দ্রকুমার।

এতগুলি দিকে দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর শ্রেষ্ঠ অনুরাগী বাঙলার ছেলে-মেয়েরা। তাদের হৃদয়ে তাঁর আসন অটল। জাহ্নবী পত্রিকা থেকে যে লেখনীর সূত্রপাত হয়েছিল সেই লেখনী নিত্য নবরসে উপাদানে ভরিয়ে দিয়েছে বাঙলার কিশোর-চিত্ত। তাঁর সাহিত্যে যেমনি আছে ভীতি, আছে আতঙ্ক, আছে ত্রাস, তেমনই আছে সাহিত্য-বিজ্ঞান-জ্যোতিষ-সৌরজগৎ-আইন-চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে কিশোরোপযোগী জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। আছে কাহিনীর প্রত্যেকটি পদ-ক্ষেপের পিছনে সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা—আছে নিঃসীম গভীরতা।

সরকারী চাকরীর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ ছেড়ে যিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সাহিত্যের অগাধ সাগরে—অতলে তলিয়ে গিয়ে জীবনব্যাপী অন্বেষণ যিনি আজও আহরণ করছেন মুঠো মুঠো রত্ন—বাঙলা দেশের এক নগণ্য সাময়িক-পত্রসেবীরূপে তাঁকে জানাই অন্তরের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।

ডাঃ তরুণচন্দ্র সিংহ

[ভারত-বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী, মনঃসমীক্ষক ও লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালের অধিকর্তা]

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে স্বল্প কয়েকজন বাঙালী পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছেন, ডাঃ তরুণচন্দ্র সিংহ তাঁদের অন্যতম। গারো জাতির মনঃসমীক্ষণ, গবেষণা জগতে তাঁর প্রধান কীর্ত্তি।

তিনি কলেজী শিক্ষার মাধ্যমে প্রথমে মনোবিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করেন নি,—মনোবিজ্ঞান ও মনঃসমীক্ষণ চর্চ্চা করতেন আপন ইচ্ছায়। জন্মগত ভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের এই শাখার উপর তাঁর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ, পরে স্বনামধন্য চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানী আচার্য

তরুণচন্দ্র সিংহ

গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের ব্যক্তিগত প্রভাবে তাঁর এই অনুরাগ আরও বর্দ্ধিত হয় এবং তিনি মনোবিজ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

ডাঃ তরুণচন্দ্র সিংহ ১৯০৬ সালের ২৫শে জানুয়ারী ময়মনসিংহ জেলার সুসঙ্গের বিখ্যাত রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সুসঙ্গের মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁর জ্যেষ্ঠতাত পুত্র। তাঁর পিতার নাম ৺কুমার নীরোদচন্দ্র সিংহ এবং মাতার নাম শ্রীবনলতা দেবী। বাল্যশিক্ষা সুসঙ্গেই এবং স্কুলের শিক্ষা কলিকাতার হিন্দু স্কুলে লাভ করেন। ঢাকার জগন্নাথ ইনটারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই-এস সি পাশ করার পর, পদার্থ বিদ্যায় অনার্স নিয়ে ঢাকার জগন্নাথ হলে ভর্ত্তি হন। এখানে তিনি আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ছাত্ররূপে সর্ব্বপ্রথম পরিচিত হন। ডাঃ সিংহ কিন্তু বি-এস-সি পরীক্ষা দিতে পারলেন না—পেটে আরম্ভ হলো প্রচণ্ড যন্ত্রণা, ডাক্তাররা বললেন 'গলষ্টোন' হয়েছে। এক বছর বিশ্রাম নেওয়ার পর শরীর যখন একটু ভালো হল তখন তিনি কলিকাতায় এসে মনোবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে আবার বি-এস-সি তে ভর্ত্তি হলেন। কিন্তু শরীর ভেঙ্গে পড়লো, রোগের প্রকোপ উঠলো বেড়ে। অতএব পড়াশুনা আবার ছাড়তে হলো—সোজা ফিরে গেলেন সুসঙ্গে।

বাড়ীতে সুরু করলেন ইংরাজি, বাংলা সাহিত্য বিষয়ে পড়াশুনা, দিনে ১২-১৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পড়াশুনা করতে আরম্ভ করলেন। শরীর আরো ভেঙ্গে পড়লো—যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। মরীয়া হয়ে তিনি জেদ ধরলেন অপারেশন করবার জন্য। অপারেশন করাতে পরিবারের অনেকেরই মত ছিল না, গলষ্টোন ছিল তখনকার দিনে (১৯৩২) খুবই কঠিন রোগ। কিন্তু ডাঃ সিংহ এই ভাবে বাঁচতে আর চাইলেন না, বাঁচতে যদি হয় মানুষের মতো বাঁচবেন,—অগত্যা সকলকে অপারেশনে মত দিতে হলো। অপারেশন হলো মেডিক্যাল কলেজে,—করলেন ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানুষের মনের কথা জানতে পারার একটা আকাঙ্খা ডাঃ সিংহের অতি শিশুকাল থেকেই ছিল। মাত্র ৩-৪ বছর বয়সেও তিনি লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন,—ভাবতেন যদি ওর মনের ইচ্ছেটা বোঝা যায়, তাহলে বড় মজা হয়। অবশ্য মনোবিজ্ঞানের পথে আসবার জন্য অনুপ্রেরণা তিনি পান আচার্য্য গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের কাছ থেকে। রোগাক্রান্ত শরীরে সুসঙ্গে যখন তাঁর সময় কাটতো না, তখনই তিনি মনোবিজ্ঞানের চর্চ্চা ও অধ্যয়ন সুরু করেন। গিরীন্দ্র বাবু ছিলেন তাঁদের পারিবারিক চিকিৎসক,—তিনিই ডাঃ সিংহকে ইণ্ডিয়ান সাইকোঅ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির সভ্য করে দেন,—ফলে ঐ সোসাইটির লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ ডাঃ সিংহ পেলেন। ডাকযোগে বই আনিয়ে এই বিষয়ে তিনি পড়াশুনা করলেন সুরু। রোগমুক্তির পরই তাঁর মন এই দিকে আরও ঝুঁকে পড়ে—গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়কে তিনি ধরলেন মনঃসমীক্ষণ শেখাবার জন্য। বসু মহাশয় তাঁকে এতদিন কেবল পড়তে উৎসাহ দিতেন, মনঃসমীক্ষণ শিখতে চাইলেই বলতেন, পড়ো, আরো পড়ো। ১৯৩৪ সালে তিনি ডাঃ সিংহকে তাঁর বেলগাছিয়ার ক্লিনিকে যাবার অধিকার দিলেন,—প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেলে বসু মহাশয় নিজে মানসিক চিকিৎসা করতেন—রোগী দেখতেন, আর ডাঃ সিংহ করতেন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। এবার আর বই পড়া বিদ্যে কেবল নয়—হাতে-কলমে শিক্ষা। মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগের সঙ্গে ডাঃ সিংহের যোগাযোগ স্থাপিত হলো, পৃথিবী-বিখ্যাত মনঃসমীক্ষক আচার্য্য গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় নিজে যত্ন করে তাঁকে বিভিন্ন রোগীর মানসিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতেন। ডাঃ সিংহ কিন্তু কেবল এই ক্লিনিকেই তৃপ্ত নন—এ কেবল out-door বিভাগ। মানসিক রোগের একটি সম্পূর্ণ হাসপাতাল নির্ম্মাণ করতে তাঁর ইচ্ছা হলো। আচার্য্য বসু হাসপাতালের একটি পরিকল্পনা করতে ডাঃ সিংহকে নির্দ্দেশ দিলেন। সুরু হলো কাজ, শিষ্য পরিকল্পনা করেন এবং গুরু-শিষ্যে আলোচনা হয়। হঠাৎ শিষ্যের প্যারা-টাইফয়েড হওয়াতে পরিকল্পনার কাজ কিছু দিন ব্যাহত হলো। অসুখ সারার পর আচার্য্য বসুর নির্দ্দেশেই ডাঃ সিংহকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সুসঙ্গে ফিরে যেতে হয়, সেখানে গিয়ে মাত্র পনের দিনের মধ্যে শরীর গেল ভালো হয়ে। কিন্তু গুরুর আদেশ, কয়েক মাসের মধ্যে কলিকাতায় ফিরতে পারবে না। কলিকাতায় বড় বেরিবেরি হচ্ছে—যা শরীর, আবার একটা নতুন রোগের উদ্ভব হতে পারে। কিন্তু সময় কাটে কি করে?—শিষ্য চিঠি লিখলেন। গারো অঞ্চলে ঘুরে বেড়াও,—তাদের মন বিশ্লেষণ কর, আর যা তথ্য পাও সব কেবল লিখে যাও;—এলো গুরুর আদেশ।

ডাঃ সিংহের জীবনে সুরু হলো এক নতুন অধ্যায়। তিনি ইংরাজ সরকারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে দিনের পর দিন পড়ে থাকতে লাগলেন বিভিন্ন গারো-পল্লীতে। লিপিবদ্ধ করতে লাগলেন তাদের স্বপ্ন,—স্বপ্নের কারণাকারণ সমূহ। এর জন্য কম বিপদে তাকে পড়তে হয়নি, কোন কোন গারো-পল্লীতে আটক পর্য্যন্ত পড়েছেন, সন্দেহ করে অনেক গ্রামে আবার প্রথমে ঢুকতেই দেয় নি। অনেক গ্রামে আবার রাজপরিবারের ছেলে বলে পেয়েছেন রাজসমাদর। এই গবেষণার শুরু চেঞ্জে এসেই কিন্তু এই গবেষণা চলে সুদীর্ঘ ১২ বছর ধরে। গারো জাতির মনঃসমীক্ষণই ডাঃ তরুণচন্দ্র সিংহের জীবনের এক অমূল্য কীর্ত্তি।

যাই হোক, চেঞ্জ থেকে ফিরে এসে ১৯৩৭ সালে ডাঃ সিংহ, আচার্য্য বসুকে ধরলেন তাঁর নিজের মনঃ সমীক্ষণ করবার জন্য। মনঃসমীক্ষণ না হলে পরীক্ষা দিয়েও মনঃসমীক্ষক হবার অনুমতিপত্র পাওয়া যায় না। তাঁর মনঃসমীক্ষণ চলতে লাগলো—ইতিমধ্যে ডাঃ সিংহের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো লুম্বিনী মানসিক হাসপাতাল। ঐ হাসপাতালের অধিকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হলেন শ্রীতরুণচন্দ্র সিংহ, তখনও তিনি গ্রাজুয়েট নন। যদিও ইতিমধ্যেই তাঁর গবেষণার মূল্য বহু বিদেশী বিজ্ঞানীদের কাছে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর লাভ করেছে। আচার্য্য গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় মানুষ চিনতেন, তাই কেবলমাত্র ডিগ্রীর উপর মূল্য না দিয়ে গুণাগুণ বিচার করে শ্রীতরুণচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে অধিকর্ত্তা নিযুক্ত করলেন, শ্রী সিংহের বয়স তখন মাত্র ৩৪ বছর। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ভারতীয় মনঃসমীক্ষণ সমিতির পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে মানসিক রোগের চিকিৎসা করবার অনুমতি পেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী না থাকলে পদে পদে অনেক বাধা আসতে পারে, তাই সিংহ মহাশয় ১৯৪২ সালে পুনরায় মনোবিজ্ঞানে অনার্স সহযোগে বি-এস-সি পড়তে

আরম্ভ করেন এবং ১৯৪৪ এবং ১৯৪৬ সালে মনোবিজ্ঞানে যথাক্রমে বি-এস-সি অনার্স এবং এম-এস-সি'তে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিছুদিন পরে 'গারো জাতির মন' নামক একটি থিসিস রচনা করে তিনি ডি-এস-সি ডিগ্রীও লাভ করলেন। তাঁর এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি বিজ্ঞানী-মহলে অত্যন্ত প্রশংসা লাভ করলো এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে এলেন এগিয়ে। ডাঃ তরুণ সিংহ গ্রাজুয়েট হবার আগেই মনঃ-সমীক্ষক হবার ডিপ্লোমা পান, নিয়ম আছে গ্রাজুয়েট না হলে কেউ এ ডিপ্লোমা পাবে না, তিনিই এর প্রথম এবং বোধ হয় একমাত্র ব্যতিক্রম। বর্ত্তমানে ইনি ভারতীয় মনঃসমীক্ষক সমিতির সম্পাদকের পদও অধিকার করে আছেন।

ইনি অকৃতদার সদাশিব মানুষ। পাকিস্থান হবার পর সুসঙ্গের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে,—তবু দেশের কথা উঠলে তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠে। মনে পড়ে তাঁর হাতীতে চড়ে শিকারের কথা, ঘোড়ায় চড়ে মাঠে প্রান্তরে বেড়ান আর গারোপল্লীতে সাধারণের সঙ্গে এক হয়ে তাদের মনের খবর সংগ্রহ করা। ছেলেবেলায় ইনি কবিতাও লিখতেন,—কবিগুরুকে একবার কবিতা পাঠিয়ে প্রশংসাও পেয়েছিলেন! গান-বাজনার চর্চ্চাও তাঁর এককালে ছিল। এই সব বিষয়ে তিনি সবচেয়ে উৎসাহ এবং সাহায্য পেয়েছিলেন দাদা (মহারাজা) ও বাবার কাছ থেকে।

মনোবিজ্ঞানী ডাঃ তরুণচন্দ্র সিংহ মহাশয় ভারতবর্ষের চিকিৎসক মহলে এক প্রধান স্থান অধিকার করে আছেন। মাতৃভূমির সেবার জন্ম আমরা এই অক্লান্তকর্ম্মী মনোবিজ্ঞানীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(স্বনামপ্রতিষ্ঠ সত্যাশ্রয়ী গ্রন্থসেবী)

অন্তরে এক অপরিসীম আনন্দের অনুভূতি জাগে তখনই যখন দেখা যায় এই আত্মপ্রকাশের যুগেও এমন কয়েক জন মানুষ আছেন, যাঁরা সকল সময়ে তা থেকে দূরে থাকারই পক্ষপাতী। আত্মপ্রচার অপেক্ষা জনসেবাকেই তাঁরা সম্মান দিয়ে থাকেন অধিক পরিমাণে। সেবাই তাঁদের আনন্দ, কর্ম্মই তাঁদের শক্তি, অধ্যবসায়ই তাঁদের অবলম্বন। এই ধরণের স্বল্পসংখ্যক কয়েক জনের মধ্যে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অন্যতম। গ্রন্থজগতের এক জন উল্লেখ-যোগ্য পুরুষ এই জিতেন্দ্রনাথ। প্রকাশক মহলে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানের অধিকারী তিনি। এক কথায় সৎসাহিত্যের যুগপৎ সৃষ্টি ও প্রসারকল্পে উৎসর্গিতপ্রাণ বিদ্যোৎসাহী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

জিতেন্দ্রনাথের পৈতৃক নিবাস হুগলীতে হলেও, ইংরেজী ১৯০৬ সালে তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্কুল-কলেজের শিক্ষাকালও অতিবাহিত হয় কলিকাতায়। ১৯২৮ সালে সিটি কলেজ থেকে তিনি বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর তিনি দিল্লী যাত্রা করেন এবং সেখানে গিয়ে আইন পাঠ আরম্ভ করেন। কিন্তু আইনজীবীর পেশায় সাফল্যলাভ করার পক্ষে ঊর্দ্ধু জ্ঞানের প্রয়োজন থাকায়, তিনি অর্দ্ধপথে এই অধ্যয়ন প্রচেষ্টা ত্যাগ করেন। জিতেন্দ্রনাথের পিতা ৺পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় ভারতীয় ডাক-বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। সেই সময় ডাক-বিভাগ থেকে চাকরির জন্ম তাঁর আহ্বান আসে, কিন্তু স্বাধীন মনোবৃত্তির জন্ম তিনি চাকরি গ্রহণে অসম্মত হন। বিধাতাপুরুষের শুভ-ইঙ্গিতই যেন কার্য্যগতিকে এর মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

যথানির্দ্দিষ্ট ডাক-বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করলে আজ আমরা তাঁকে উক্ত বিভাগেরই কোন একটি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকতে হয়ত দেখতুম, কিন্তু পুস্তক প্রকাশনের অন্তরাল থেকে যে দরদী মানুষটি বন্ধুর মত সেবা করে চলেছেন বাঙলা সাহিত্যের দল নির্বিশেষে, যিনি পুস্তকানুরাগী ও সাহিত্যসেবীদের সমান প্রিয়, সেই জিতেন্দ্রনাথকে আমরা এত কাছে পেতাম কি?

সরকার প্রবর্ত্তিত আইনে বর্ত্তমানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যে সাপ্তাহিক ছুটি ধার্য্য হয়েছে, সে সময় ঐরূপ ছুটির আইন বা রেওয়াজ ছিল না। জিতেন্দ্রনাথ এই ছুটির প্রয়োজনীয়তা তীব্র ভাবে অনুভব করেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় প্রতি মঙ্গলবার নয়াদিল্লীর ব্যবসায়ী মহলে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আজও নয়াদিল্লীর বাঙালী ব্যবসায়িগণ এই দিনটিকে ছুটির দিন হিসাবে ব্যবহার করে আসছেন। ১৯৪০ সালে জিতেন্দ্রনাথ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্বনামধন্য বীজগণিত-প্রণেতা স্বর্গত কে, পি, বসুর সুযোগ্য পুত্র শ্রীত্রিদিবেশ বসু এঁর সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই বন্ধু মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যেই ইনি আকৃষ্ট হন গ্রন্থ প্রকাশের দিকে। গ্রন্থ প্রকাশের সর্ব্বাঙ্গীন দিক সম্বন্ধে তাঁর উন্নত, উদার চিন্তা ও নিরবকাশ পরিশ্রম স্বল্পকালের মধ্যেই ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ (আই, এ, পি) নামক সাহিত্য প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি ফুলে-ফলে শ্রীমণ্ডিত করে তোলেন।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এই প্রতিষ্ঠানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সাহিত্য-গ্রন্থ প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট দিন। সেই দিনটি প্রতি মাসের ৭ই তারিখ; অর্থাৎ প্রথম সপ্তাহের সমাপ্তি ও দ্বিতীয় সপ্তাহের সূচনাকাল। এই স্মরণীয় ৭ই-এর স্রষ্টা জিতেন্দ্রনাথ। প্রকাশন বিষয়ে 'স্ব-নির্বাচিত গল্প' আই, এ, পি-র আরও একটি উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি। এই গ্রন্থমালার গল্পগুলি লেখকরা নিজেরাই নির্ব্বাচন করেন। তাছাড়া এই গ্রন্থমালায় লেখকদের প্রতিকৃতি ও পরিচিতি ব্যতীত তাঁদের স্বহস্তাক্ষরের প্রতিচ্ছবিসহ গ্রন্থের ভূমিকাও এর একটি অন্যতম আকর্ষণ। এতদ্বারা লেখকদের লেখার হাতের সঙ্গে সঙ্গে, হাতের লেখারও পরিচয় পাবেন পাঠকগণ।

প্রথম দিকে আই, এ, পি কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের রাজ্যের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। পরবর্ত্তীকালে জিতেন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই সাহিত্য-গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হন। উক্ত সময় প্রাণতোষ ঘটকের 'আকাশ-পাতাল' উপন্যাসখানি আই, এ, পি-র অন্যতম প্রথম গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়। ক্রমে ক্রমে প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি বাংলার খ্যাতনামা সমূহ সাহিত্যিকগণেরই সহানুভূতি লাভ করে এঁরা জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেন। জিতেন্দ্রনাথ বলেন, এই সময় তিনি বহু জনের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা লাভ করেন। তন্মধ্যে যাঁরা তাঁকে প্রথম দিকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায় ও শিল্পী অজিত গুপ্তর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই আই, এ, পি-র গ্রন্থ-সংখ্যা প্রায় এক শতের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে গল্প, উপন্যাস ও রম্য রচনা ব্যতীত আমরা কয়েকখানির মাত্র নামোল্লেখ করলাম। যেমন বীরবলের 'ঘোষালের ত্রিকথা' রাজশেখর বসুর 'বিচিন্তা,' সুবোধ ঘোষের 'ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস', অনাথনাথ বসুর 'মীরাবাঈ,' যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি,' প্রাণতোষ ঘটকের 'রত্নমালা,' ও 'কলকাতার পথঘাট', শ্যামপদ চক্রবর্ত্তীর 'অলঙ্কারচন্দ্রিকা,' মোহিতলাল মজুমদারের 'সাহিত্য বিচার', অপর্ণা দেবীর 'মানুষ চিত্তরঞ্জন', হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'এখন যাঁদের দেখছি' ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'আমরা ও তাঁহারা', দিলীপকুমার রায়ের 'দেশে দেশে চলি উড়ে' 'দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবন-চরিত', উমা দেবীর 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব', নরেন্দ্রনাথ বাগলের 'ভারতে জ্যোতিষচর্চ্চা ও কোষ্ঠীবিচারের সূত্রাবলী'। শান্তিদেব ঘোষের 'ভারতীয় গ্রামীন সংস্কৃতি' প্রভৃতি।

যে সময় সাধারণ পাঠকের কাছে গল্প-উপন্যাস ও লঘু বিষয়ক গ্রন্থই অপেক্ষাকৃত বেশী সমাদর লাভে সক্ষম হয়েছিল, সেই সময়ে অন্য ধরণের প্রবন্ধ-গ্রন্থ এবং প্রাচীন বিস্মৃতপ্রায় মূল্যবান গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণ ক'রে তীক্ষ্ণধী জিতেন্দ্রনাথ সৎসাহিত্যের প্রচারে প্রভূত সাহায্য করেন।

প্রকাশন বিষয়ে জিতেন্দ্রনাথ দলাদলির উর্দ্ধে, পক্ষপাতশূন্য। ব্যক্তি অপেক্ষা সাহিত্যের বিচারে, সাহিত্যকেই তিনি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন সর্ব্বক্ষেত্রে। সে কারণ, সর্ব্বদলীয় সমর্থনও তিনি লাভ করেছেন এবং সকল সম্প্রদায়ের সমান বন্ধুত্বও পেয়ে আসছেন।

জিতেন্দ্রনাথের মতে প্রকাশকের প্রধান দায়িত্ব সুন্দর, সুরুচিপূর্ণ ও সারগর্ভ পুস্তক পরিবেশন ক'রে যথাসম্ভব ন্যায্য মূল্যে পাঠকের সম্মুখে তা উপস্থিত করা। প্রকাশকের আর একটি দিক সম্বন্ধে জিতেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন যে, বিজ্ঞাপনের বাহুল্যে কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে অতিশয়োক্তির দ্বারা পাঠক সমাজকে বিভ্রান্ত করা প্রকাশকের কোন মতেই উচিত নয়। আর একটি দিকে প্রকাশকের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য; সেটি প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনের মান সম্বন্ধে পাঠকদের যাতে একটি সঠিক ধারণা জন্মায় সে দিকে দৃষ্টি সজাগ রাখা এবং এ জন্য তদুপযুক্ত পুস্তক নির্ব্বাচন ও প্রকাশ করা।

দৃঢ়চেতা জিতেন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সত্যপ্রিয়তা। এমন কি প্রয়োজনে অপ্রিয় সত্য ভাষণেও তিনি কুণ্ঠিত হন না। উপর্য্যুক্ত উক্তিগুলির মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যে সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন, সেটিই ব্যক্ত করেছেন তাঁর বক্তব্যের মধ্যে।

বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য

(অবসরপ্রাপ্ত প্রধান-শিক্ষক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ)

জীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত যে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ তাহা অসমর্থদেহী নবতি বৎসর বয়স্ক শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। নিয়মিত নূতন নূতন গ্রন্থ পাঠ ও নিজ পৌত্র-পৌত্রীদের পাঠন তাঁহার প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যকর্ম্ম। কারণ, তিনি মনে করেন যে, মানব জীবনে শিক্ষা সমাপনের কোন সীমারেখা অঙ্কিত করা যায় না।

১৮৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে বেণীমাধব কলিকাতার সন্নিকটস্থ হালিশহর গ্রামে এক উচ্চ বৈদিকবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যযুগের মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের দীক্ষাদাতা ঈশ্বরপুরী, সাধক রামপ্রসাদ ও

বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য

"চৈতন্য-ভাগবত" প্রণেতা বৃন্দাবন দাসের আধ্যাত্মিক কর্মক্ষেত্র এই গ্রামেই ছিল।

স্থানীয় পাঠশালা ও ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি হালিশহর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা রিপণ কলেজ হইতে বি. এ পাশ করেন। পর বৎসর তিনি বি. টি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিদ্যালয়ে তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র রায়, অধ্যক্ষ জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক), অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায় ও অধ্যাপক মন্মথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ডাঃ স্যার যদুনাথ সরকার কলেজে তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। কলিকাতায় অধ্যয়ন কালে বেণীমাধব তাঁহার পিতৃবন্ধু সবজজ মথুরানাথ গুপ্তের গৃহে অবস্থানকালে তদীয় পুত্র বিখ্যাত সাংবাদিক ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং স্বদেশসেবী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও ভ্রাতুষ্পুত্র সিভিলিয়ন্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। কলেজে অধ্যাপক (পরে রাষ্ট্রগুরু) সুরেন্দ্রনাথ, ৺কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এবং ৺মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (শ্রীম) তিনি অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

১৮৯১ সালে তিনি মজঃফরপুরে ৺জগদীশ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত "মুখার্জ্জি সেমিনারী"তে প্রথমে শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই স্থানে তিনি রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা আইনজীবী শরৎকুমার চক্রবর্ত্তীর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হন। একবার জামাতৃগৃহে আগমন করিলে বেণীমাধবের বিশেষ অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় বিদ্যালয়ে একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে উহাই "স্বদেশী সমাজ" নামে প্রকাশিত হইয়া সমস্ত বাঙ্গালী সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। কিছুদিন পরে কবিগুরুর আমন্ত্রণে তিনি শান্তিনিকেতনে গমন করেন এবং ভারত বিখ্যাত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও আনি বেশান্তের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্যলাভ করেন। প্রসঙ্গতঃ বেণীমাধব বলেন, আজ বিহারীরা বাঙ্গালীর যতই বিরুদ্ধাচরণ করুক না কেন, প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ পালিত প্রভৃতি বাঙ্গালীরাই তাঁহাদের আদি শিক্ষাগুরু। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ই বিহারে প্রথম হিন্দি সাহিত্য রচনা ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

১৯০৭ সনে তদানীন্তন ডি, পি, আই, আর্ল সাহেবের সুপারিশে বেণীমাধব বাবু দ্বারভাঙ্গা সরকারী বিদ্যালয়ে ও ১৯০৯ সালে মজঃফরপুর জিলা স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯১২ সালে বিহার পৃথক প্রদেশরূপে গঠিত হইলে তিনি টাকী সরকারী বিদ্যালয়ে বদলী হইয়া আসেন। উক্ত বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে তৎপর হইলে বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তাঁহাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। ১৯১৭ সালে তিনি বারাকপুর সরকারী বিদ্যালয়ে আগমন করেন এবং ১৯২৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তৎকালীন ডি-পি-আই ওটেন সাহেব বেণীমাধবের কার্য্যদক্ষতাকে পুনর্নিয়োগের জন্য তাঁহাকে বেসরকারী বর্দ্ধমান টাউন স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। ছয় বৎসর পরে তিনি বারাকপুর দেবীপ্রসাদ বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৬ সালে ৪৫ বৎসরের শিক্ষাব্রতীর জীবন হইতে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করেন।

এই সময় মহকুমার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধে সমাজসেবী অ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান "বারাকপুর মহকুমা-সমিতির" সভাপতির পদে তিনি বৃত হন। বেণীমাধবের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই বর্ত্তমানে কৃতী ও গণ্যমান্য হইয়াছেন।

বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আদর্শ পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করা, কথকতা, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, গীতা অবশ্য অধীত হওয়া, বয়সোপযোগী উপন্যাস, কাব্য, নাটক, গল্প-গ্রন্থের ব্যবস্থা করা, খেলাধূলা ও দলবদ্ধ ভ্রমণের মাধ্যমে শৃঙ্খলাবোধ আনয়ন করা বর্ত্তমান শিক্ষা-পরিচালকদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া বিধেয় বলিয়া তিনি মনে করেন।

[মাসিক বসুমতীর পক্ষ থেকে কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, পক্ষধর মিশ্র ও অমিয়কুমার ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত]।

গুপ্তচরবৃত্তিতে নারী

পারদর্শিনী গুপ্তচর হিসেবে হল্যাণ্ডের মাতাহরির নাম একদিন ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে। কিন্তু তাই থেকেই সরাসরি এ বলা চলে না—গুপ্তচরবৃত্তিতে পুরুষদের অপেক্ষা নারীরাই অধিকতর সক্ষম ও ক্ষিপ্র। তত্ত্বান্বেষীরাই বরঞ্চ বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছেন—গুপ্তচর হিসেবে নারীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষদের সমকক্ষ নয়। মোটামুটি ভাবে নারী গুপ্তচররা ব্যর্থই প্রমাণ করেছে এ যাবৎ নিজেদের।

তবে একটা কথা ঠিক এবং সেটি বলতে হবে—নারীরা দৌত্য বা বার্ত্তাবহের কাজে খুবই চমৎকার! গুপ্তচর বৃত্তির সঙ্গে দৌত্য-বৃত্তির সম্পর্ক ও যোগাযোগ একান্ত ঘনিষ্ঠ। পরন্তু এইটি স্বীকৃত হয়ে আসছে, গুপ্তচর বৃত্তির একটি প্রধান অঙ্গই হ'ল দৌত্য। অনেক সময় গোপন সংবাদ সংগ্রহ অপেক্ষাও দৌত্যবৃত্তিতে অধিকতর রোমাঞ্চ লক্ষ্য করা যায়।

কাহিনী রয়েছে—অনৈকা নারী-দূত সংবাদ বহন করে নিয়ে যায় একবার অপূর্ব্ব পদ্ধতিতে। যাত্রার পূর্ব্বে সে নাকি বহনযোগ্য বার্ত্তাটি নিজের শুভ্র পৃষ্ঠদেশে এক প্রকার অদৃশ্যমান কালিতে লিখে নিয়েছিল। আর একটি চটুলা নারী একটি পাত্রে জ্ঞাতব্য গোপন বার্ত্তা এমন ভাবে খোদাই করেছিল, যে-কৌশল আবিষ্কারে প্রয়োজন হয়েছিল কমপক্ষে দু'টি বছর সময়। পুরুষদের দৌত্য সম্পর্কেও অবশ্যি এ ধরণের নানা চমকপ্রদ কাহিনী জানতে পারা যায়।

মুক্তি-সংগ্রামে আজাদ হিন্দ ফৌজ

লেঃ এন, বি, দাস, আই এন এ

শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তার যুদ্ধ চালাবার ক্ষমতা ভেঙ্গে দিতে পারলেই চরম বিজয় সম্ভব, সেইরূপ বিদেশী শাসকদের শক্তি পর্যুদস্ত না করতে পারলে দাস জাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নহে। বিপ্লবীদের পক্ষে তাই একমাত্র কর্ত্তব্য হলো বিদেশী শাসকদের শক্তি উৎসাদন করা, নতুবা তাদের বিপ্লবীদের দলে আনয়ন করা। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তি নির্ভরশীল ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর উপর। কারণ, ভারতে বৃটিশ সৈন্য-সংখ্যা ছিল কম। ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর উপর কড়া নজর রেখে তাই তারা সাম্রাজ্যবাদী শাসন চালিয়ে গিয়েছিল। যত দিন পর্য্যন্ত ভারতীয় সেনা বাহিনী ও ভারতীয় পুলিশ বাহিনী অনুগত ছিল, তত দিন ভারতে বৃটিশ শাসন নিরাপদ ভাবেই কায়েম ছিল, একথা ভেবেই বৃটিশ শাসকেরা ভারতীয় সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর আনুগত্য রক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টিত থাকত। ভারতের জন-সাধারণ এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবল প্রবাহধারা থেকে তারা ছিল বিচ্ছিন্ন, তাদের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হতো, যাতে তাদের দ্বারা নিজ দেশবাসীদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করানো সম্ভব হতো, তাদের মধ্যে জাতি ও ধর্ম্মের বিভেদ জিইয়ে রাখা হতো। ফলে নিজেদের মধ্যে ব্যবধান বজায় থাকতো এবং বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে কখনই সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন করতে সমর্থ হতো না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এমন ভাবেই ভারতীয় সেনাবাহিনী তৈরী করতো, বৃটিশ কারিগরী বিশেষজ্ঞদের সহায়তা ব্যতীত যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। ১৮৫৭ সালের মহান বিপ্লবের পর প্রায় নব্বই বৎসর ধরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যে নিরঙ্কুশ ভাবে শাসন-কার্য্য চালিয়ে যেতে পেরেছে, তাতেই তাদের নীতির সার্থকতা প্রমাণ করে। ইহা সত্য যে, বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানরূপে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যুদয় এবং মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাতের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা খুবই অসুবিধায় পড়ে। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীর আনুগত্য ও ভারতীয় পুলিশ বাহিনীর উপর নির্ভর করে তারা আশা করেছিল, ভারতীয় জনসাধারণের সামান্য কিছু দাবী-দাওয়া মেনে নিলেই চলবে। মিঃ চার্চিলের মতো কয়েক জন লোক এই সামান্য দাবী মানতেও রাজী ছিলেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এমন কি ১৯৪২ সালের বিপ্লবের পরেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দম্ভ কিছু মাত্র হ্রাস পায়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে একমাত্র নেতাজীই দেশের এই পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, ভারতীয় জনগণ যদি অধিকতর শক্তিশালী না হয় তাহলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এ দেশ থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব নয়। নিরস্ত্র ভারতবাসীর পক্ষে এমন কোনো সশস্ত্র বিপ্লব করা সম্ভব ছিল না যা দ্বারা সাফল্য অর্জন করা যেত এবং জনগণের অভ্যুত্থান ব্যতীত ভারতীয় পুলিশ বাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিদ্রোহের আশাও ছিল ক্ষীণ, ভারতের একমাত্র আশা ছিল, বৃটিশ যদি কোন বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে যে সুযোগ বাইরের কোনো শক্তির সাহায্য লাভ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করা। যুদ্ধের পরিনাম কি হয়, তার উপর নির্ভর না করেও একথা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করা যায় যে যুদ্ধের পর ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনীর উপর তাদের প্রভাব হ্রাস পেয়ে যাবে। ১৯৩৯ সালে ইউরোপের যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর নেতাজীর বহুদিন-আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ উপস্থিত হলো, তিনি ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে জার্মাণী গেলেন এবং সেখানে জার্মাণীদের সাহায্যে ভারতীয় বে-সামরিক অধিবাসী এবং ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের সাহায্যে একটি ভারতীয় ফৌজ গঠন করলেন। এই ফৌজই ভারতের স্বাধীনতালাভের বৈপ্লবিক সংগ্রামে প্রথম কার্য্যকরী অগ্রদূত। জাপানের যুদ্ধে যোগদানের পর প্রবীণ ভারতীয় বিপ্লবী শ্রীরাসবিহারী বসু নেতাজীর অনুরূপ আদর্শ লইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় একটি ভারতীয় বাহিনী গঠন করেন। ১৯৪৩ সালে নেতাজী সিঙ্গাপুরে আসেন। তখন থেকেই ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসে। ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর নেতাজী সিঙ্গাপুরে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন। এই স্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতি দান করেন, জার্ম্মাণী, জাপান, ইতালী ব্রহ্ম, ফিলিপাইন থাইল্যাণ্ড, কোটিগ্য মাঞ্চুকু এবং ওয়াংটি ওয়েইর চীন, আইরিশ নেতা ডিভ্যালেরা এই সরকারের প্রতি শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন। আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠায় ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই সেনাবাহিনীর স্বাধীনতাকামী আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যেক পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে তোলে। বৃটিশ বাহিনীর যে সমস্ত ভারতীয় সৈনিক আজাদ হিন্দ ফৌজের সংস্পর্শে আসে তাদের মন থেকেও বৃটিশ শাসকদের সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূরীভূত হয়ে যায়, বৃটিশের প্রতি আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে ধুয়ে মুছে ফেলে দিয়ে তারা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করল, আজাদ হিন্দ ফৌজের এটাই সর্বপ্রথম প্রকৃত জয়লাভ।

দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের যে বিচার আরম্ভ হয়, তার বিবরণ থেকে দূর প্রাচ্যে এবং ইউরোপে নেতাজীর অদ্ভুত কর্মসংগঠন ও স্বাধীনতার জন্য পরম উৎসাহশীল সংগ্রামের কাহিনী জানা যায়। ইম্ফল, কোহিমা মাউনপোপ এবং ইউরোপ ও ব্রহ্মের যুদ্ধক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ বাহিনীর রক্তপাত ব্যর্থ হয়নি। ভারতের জনগণ সে কাহিনী পাঠ করে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের কাছে আজাদ হিন্দ ফৌজের সন্তমুক্ত সৈনিকেরা ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের আবেদন জানায়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যদি তাদের আবেদনে সে সময় কর্ণপাত করতেন তাহলে দেশ বিভাগ হত না এবং আমরা দেশ বিভাগের মাশুল হিসাবে রক্তাক্ত ইতিহাস প্রত্যক্ষ করতাম না। যদিও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সে সময়ে অস্বাভাবিক সংযম প্রদর্শন করেছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহসী সৈনিকেরা তাদের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য নিয়ে চুপ করে থাকতে পারলেন না। ভারতীয় নৌবাহিনী ভারতীয় বিমানবাহিনী এবং সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহের ফলেই ইংরেজ বলতে পারলো ভারতে তাদের শাসনকাল শেষ হয়ে আসছে অস্ত্রবলে ভারতকে দমন করে রাখবার প্রচেষ্টা আর কার্য্যকরী হল না, তাই তারা জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে একটি আপোষ নিষ্পত্তি করলো। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট যে স্বাধীনতা লাভ করেছি তা নেতাজীর আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা নয়। কিন্তু ইহা সত্য যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন এবং নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের ফলেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষ ছাড়তে বাধ্য হয়।

ওরা কাজ করে

—তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাবধান

—সাধন রায়

শিল্পী

—অসীমকুমার দত্ত

ভগ্ন দেউল —আনন্দ মুখোপাধ্যায়

মিনার —সতীশঙ্কর নন্দী
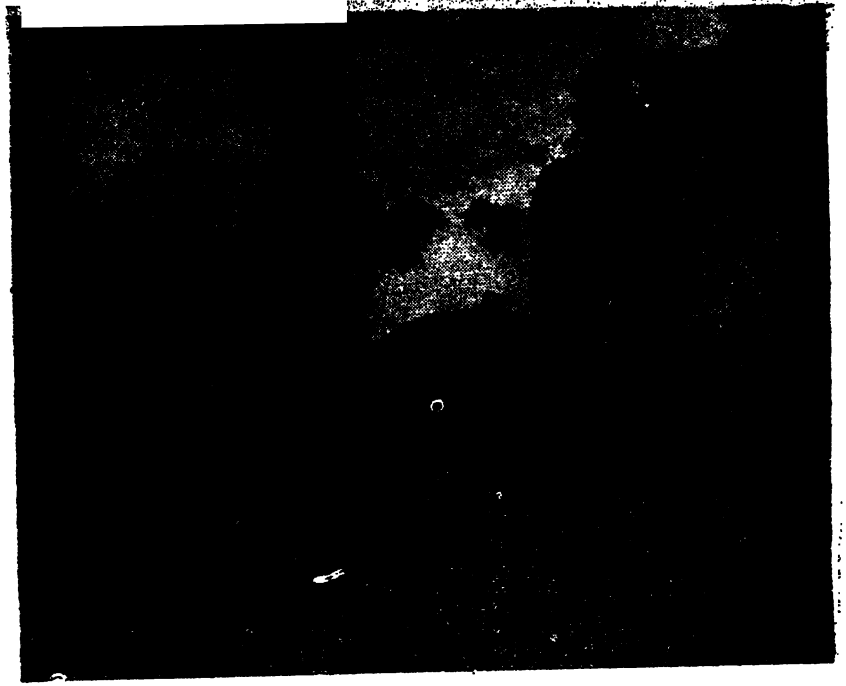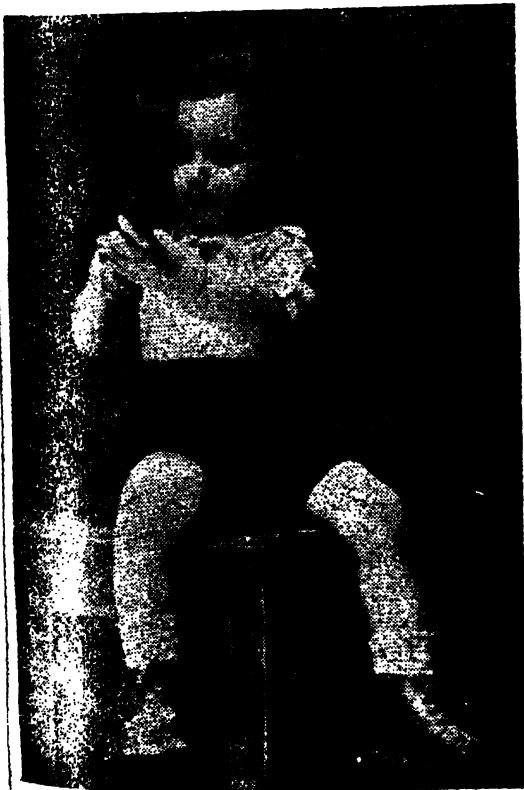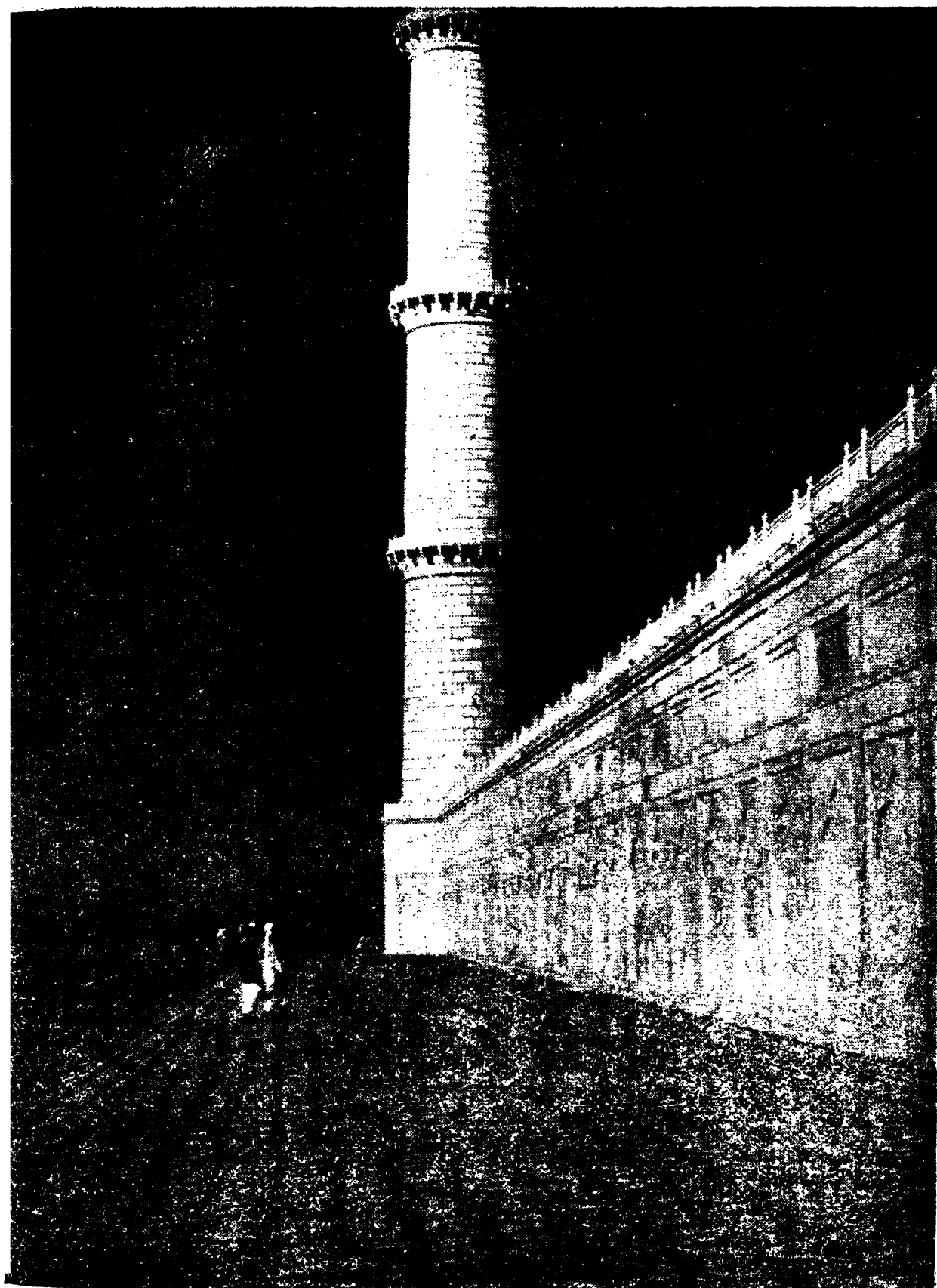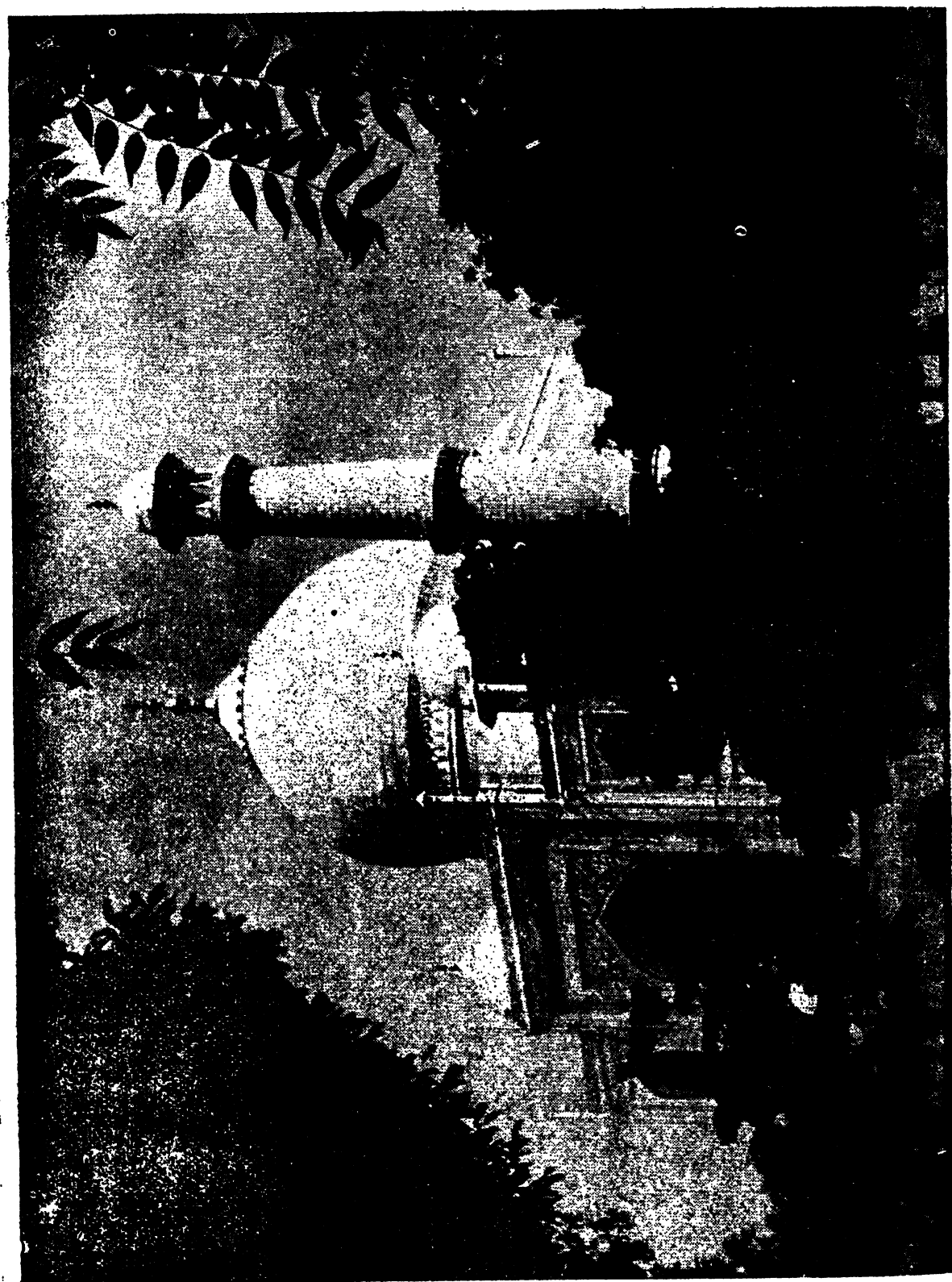
জরাসন্ধ

হঠাৎ যেন ধাক্কা খেয়ে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠবার আগেই আবার সেই বজ্রহুঙ্কার—হজৌর! আপাততঃ আশ্বস্ত হলেন মহেশ তালুকদার। বাজ নয়, বাঘও নয়, তাঁরই অনুগত অনুচর চীফ হেডওয়ার্ডার মহাবল সিং। পরক্ষণেই আবার কপালে ফুটে উঠল দুশ্চিন্তার রেখা। গুরুতর অঘটন কিছু না ঘটলে এই গভীর রাতে তার ডাক পড়েনি। জেলর সাহেবের ঘুম ভাঙ্গাবার আগে জানালার শিক ভেঙ্গে উধাও হয়েছে হয়তো কোনো ধুরন্ধর দায়মলি,* কিংবা বারো নম্বরের জুয়ার আড্ডায় বিড়ির বখরা নিয়ে ঝড়ু মণ্ডলের দাঁত ভেঙ্গেছে ছলিমদ্দির ঘুসি। তারই চনকপ্রদ রিপোর্ট পেশ করবার জন্যে তাঁর জানালায় হানা দিয়েছেন জমাদার সাহেব।

বাজখাঁই কণ্ঠের আর একটা উদ্গিরণ ঘটবার আগেই সাড়া দিলেন তালুকদার—কেয়া হুয়া?

নরম সুরে জবাব এল, সেলাম হুজুর, জেনানা ফাটকমে হল্লা হোতা হ্যয়।

—জেনানা ফাটকে হল্লা! কেন, ভাগল নাকি কেউ?

—নেহি হুজুর, এক আদমিকা শকত বেমার হুয়া।

—ডাক্তারকে খবর দিয়েছ?

—জী হাঁ। ডাকদর বাবু আফিসমে বৈঠল বা।

অতএব উঠতে হল। সুইচ টিপতেই নজর পড়ল, টেবিলের কোণে টাইমপিসটার উপর। রাত তিনটা বেজে পনর। শেষ-মাঘের দুর্দান্ত শীত। ওত পেতে বসে ছিল লেপের বাইরে। বেরিয়ে আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল অনাবৃত দেহের উপর। আল্না থেকে জামাটা আনতে গিয়ে চোখ পড়ল ড্রেসিং-টেবিলের আয়নায়। নিজের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন জেলর সাহেব। সদ্য-নিদ্রামুক্ত মুখের উপর গভীর হয়ে উঠল বিরক্তির কুঞ্চন। তারপর আপাদ-মস্তক বর্মাবৃত করে টেবিলের টানার ভিতর থেকে বের করলেন একটা থলে—জেনানা ফাটকের চাবির গোছা।

জেলখানার আসল প্রতীক এই তালাচাবি। কয়েদীকে মানুষ হবার সুযোগ দাও, তার সমাজ-বিরোধী মনকে ফিরিয়ে আনো সমাজ-কল্যাণের দিকে—এ সব হল কারাতন্ত্রের কেতাবি কথা। কাজের কথা হল, তাকে আটকে রাখো। তার অশন-বসন আরাম বিরাম কাজ-কর্মের দিকে নজর দাও, আপত্তি নেই, কিন্তু সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখো, সে যেন না পালায়। জেলের welfareটা তোমার ভাববার বিষয়, কিন্তু ভাবনার বিষয় হল তার **security.**

যে কোনো একটা কারাদুর্গের দিকে তাকিয়ে দেখুন। চার দিক ঘিরে আছে চৌদ্দ ফুট উঁচু দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল। এক পাশে একটি মাত্র লৌহতোরণ। তার সামনে অহোরাত্র টহল দিচ্ছে সশস্ত্র প্রহরী। শুধু এইটুকুর উপর নির্ভর করেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই জেলের কর্তৃমহল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জটিল এবং ব্যাপকতর তালাচাবির অবরোধ। সূর্যদেব পাটে বসবার আগেই সারা জেল জুড়ে সুরু হবে 'লক্-আপ' পর্বের আয়োজন। মেট আর কয়েদী-পাহারার দল তাদের আপন আপন বাহিনী কুড়িয়ে এনে জোড়ায় জোড়ায় বসিয়ে দেবে লম্বা লম্বা ব্যারাক এবং সেল ব্লকের দরজার সামনে। 'গুণতি' হবে—দো, চার, ছ, আট।...তারপর সার বেঁধে তারা ঢুকে পড়বে পূর্বনির্দিষ্ট 'নম্বরের' বিশাল গহ্বরে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাবে লৌহ-কপাটের ঝনৎকার আর তালাবন্ধের ক্লিক্ ক্লিক্। নিশান্তে যারা তালার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছিল, দিনান্তে আবার তাদের ফিরে যেতে হবে সেই দৃঢ়বদ্ধ তালার আশ্রয়ে। অতঃপর 'লক-আপ' পর্বের অবসান। নিরুদ্বেগ সবল কণ্ঠে ঘোষণা করবে চীফ-হেডওয়ার্ডার, সব ঠিক হ্যায়। সেন্ট্রাল টাওয়ারের শিখর থেকে বেজে উঠবে 'তিন ঘণ্টি'র প্রতিধ্বনি—সব ঠিক হ্যয়।

দরজার বুকের উপর তালার মালা ঝুলিয়ে দিয়েই কি দায়মুক্ত হলেন কর্তৃপক্ষ? না, না। এটা শুধু সূচনা। তারপর থেকে সুরু হবে তালার উপর বল প্রয়োগ। প্রহরে প্রহরে তার শক্তি পরীক্ষা করে যাবে শক্তিমান প্রহরীর দল, আর তার বিরাট চাবির বোঝা ঘাড়ে নিয়ে টহল দেবে আর একদল নিশাচর। জেলকোডে তাদের নাম হেড-ওয়ার্ডার, সিপাই-কোডে বলে জমাদার সাহেব। কয়েকটা করে ব্যারাক বা ওয়ার্ড নিয়ে তাদের আঞ্চলিক এলাকা এবং নিজ নিজ অধিকারের প্রতিটি চাবির জন্যে তাদের জবাবদিহির দায়িত্ব। কেবল একটি মাত্র ক্ষুদ্র রাজ্য তাদের এলাকার বাইরে। তার নাম ফিমেল ওয়ার্ড বা জেনানা ফাটক। সেখানকার চাবিগুচ্ছের নৈশ মালিক স্বয়ং জেলর সাহেব।

মহেশের মনে পড়ল দীর্ঘ দিন পিছনে ফেলে-আসা সেই সন্ধ্যাটির কথা, 'লক-আপ' অন্তে প্রথম যেদিন তাঁর হাতে এসেছিল এই জেনানা ফাটকের চাবির থলি। সে যেন তুচ্ছ একতাড়া চাবি নয়, তার সঙ্গে জড়ানো একটি নারীরাজ্যের গৌরবময় অধিকার। আজ

---

* যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী।

থেকে প্রতিটি রাত আমারই হাতে ন্যস্ত হল কয়েকটি অসহায়া বন্দিনীর মান, সম্ভ্রম, নিরাপত্তা, আমারই উপরে তারা একান্ত নির্ভর—এমনি একটা পুলকময় অনুভূতির মৃদু স্পর্শ হয়তো লেগেছিল তার সেদিনের তরুণ মনে,—তুলেছিল একটুখানি মিষ্ট সুরের গুঞ্জরণ। তারপর এক দিন কখন তার শেষ রেশটুকুও কোথায় মিলিয়ে গেছে! আজ এই গভীর রাত্রির অন্ধকারে ঐ লণ্ঠনধারী বড় জমাদারের অনুসরণ করতে গিয়ে চকিতে মনে হল সেইদিনকার কথা। এক ঝলক কৌতুক-হাসির মৃদু স্পর্শে গোঁফের কোণ দুটো নড়ে উঠল।

এত রাত্রে হল্লার রিপোর্ট পেয়ে জেলর সাহেবের মনে যে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছিল, জেনানা ফাটকের কাছাকাছি আসতেই সেটা মিলিয়ে গেল। ভুল করেছে জমাদার। এ হল্লা নয়, নারীকণ্ঠের কল-কাকলী। সুরসিক বলে বিধাতা পুরুষের খ্যাতি নেই। কিন্তু একটা ক্ষেত্রে তিনি রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। নারী জাতির বাগ্‌যন্ত্রে বেগ দিয়েছেন অপরিমেয়, কিন্তু ব্রেক নামক কোনো বল্গার সংযোগ করেন নি। তাই দেখা যায়, স্বজাতীয়ার দর্শন মাত্রেই তারা পুলকিত, তন্ময় হয়ে ওঠেন, এবং মুখোমুখী হলেই খুলে যায় মুখের অর্গল। তারপর সেই মুক্ত দ্বারপথে যে ঝটিকা-প্রবাহ ছুটে চলে, তাকে রোধ করতে পারে, সংসারে এমন শক্তি নেই। যে-কোনো নারীসমাবেশে গিয়ে দেখুন, কোথাও এর ব্যতিক্রম নেই। রেলের জেনানা কামরা থেকে, লেডি-হষ্টেলের কমন রুম, পল্লীপুকুরের স্নানের ঘাট থেকে মহিলা-সমিতির বাৎসরিক সম্মিলন—সর্বত্র এই একই দৃশ্য। সকলেই বক্তা, অভাব শুধু শ্রোতার। জেলের পাঁচিলের মধ্যে বসে নারী অনেক কিছু ভুলে থাকতে পারে, কিন্তু এই সনাতন জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাতে পারে না।

কম্পাউণ্ড-গেট খুলবার সঙ্গে সঙ্গেই কানে গেল ফিমেল-ওয়ার্ডার সুশীলা দত্তের দুর্জ্জয় ধমক। কোলাহলের সুর নেমে গেল কিন্তু গতি বন্ধ হল না। জেলর এবং জেলডাক্তার সদলবলে ওয়ার্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দরজার তালা খুলতেই ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে এল একটি মেয়ে। ডোরাকাটা জেলের সাড়ীখানা শক্ত করে কোমরে জড়ানো। সর্বাঙ্গে একটি অনাড়ষ্ট সহজ ভঙ্গী, তৃতীয় শ্রেণীর জেনানা-ফাটকে যেটা সুলভ নয়। ডাক্তার সিঁড়ির গোড়ায় এগিয়ে যেতেই সে বাধা দিল।

একটু পরে উঠবেন, ডাক্তার বাবু! দরজার সামনেটা নোংরা হয়ে আছে। এখখুনি পরিষ্কার করে দিচ্ছি। সুশীলার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, আমি যাচ্ছি, মাসীমা। বলেই, তর-তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল এবং জমাদারের দিকে চেয়ে বলল, আলোটা একটু ধরবেন, জমাদার সাহেব। বড্ড অন্ধকার।

জমাদার আলো নিয়ে গেল ওর সঙ্গে। ওয়ার্ডের পেছনে যতক্ষণ ওরা অদৃশ্য হয়ে না গেল, তালুকদার নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেরালেন সুশীলার দিকে। সুশীলা প্রশ্নটা বুঝল এবং সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, ওর নাম হেনা। ফরিদপুর জেল থেকে চালান এসেছে।

মহেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, কদ্দিন?

—তা, দিন পনের হবে।

—দেখেছি বলে তো মনে হয় না!

সুশীলা মৃদু হেসে বলল, দেখেছেন বৈ কি? রোজই তো থাকে নম্বর গোণার সময়। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেননি।

জেলর বিস্মিত হলেন। লক্ষ্য না করবার মত মেয়ে তো নয়! তবে এ হয়তো সেই জাতের, চিরদিন যারা ভিড়ের মধ্যেই থাকে, শুধু প্রয়োজনের দিনে বোঝা যায় ভিড় থেকে তারা আলাদা।

মিনিট চারেকের মধ্যেই সে ফিরে এল। এক হাতে ঝাঁটা, আর এক হাতে মস্ত বড় জলের বালতি। আর একবার সুশীলার ঝঙ্কার শোনা গেল, 'বলি, তোদের কি সব হাতে-পায়ে খিল ধরেছে! ঐ একটা মানুষ কত করবে, শুনি'? একটা চাপা গুঞ্জন উঠল মেয়েদের দলে। দু'-এক দল উঠেও দাঁড়াল, কিন্তু এগিয়ে আসবার বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। একজন মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক হেনার পাশে এসে বলল, 'ঝাঁটাটা আমার হাতে দাও, দিদিমণি। তুমি ওদিক থেকে জল ঢালো।' সঙ্গে সঙ্গে নাকে কাপড় দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, আপনারা সব সরে যাও বাবুরা—'তুমি পারবে না, কাদুর মা,' বাধা দিয়ে বলল হেনা। আমি চট করে ধুয়ে দিচ্ছি। তুমি বরং ফিনাইলের টিনটা নিয়ে এসো। ঐ কোণে আছে।

কয়েকটা লম্বা টান দিয়ে সিঁড়ির মুখে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে ঝাঁটা এবং বালতি নিচে নামিয়ে রাখল। তারপর ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলল, এবার আসুন। অনেকক্ষণ আপনাদের কষ্ট দিলাম ঠাণ্ডার মধ্যে।

ডাক্তারের পিছনে তালুকদারও সিঁড়িতে উঠবার উদ্যোগ করছিলেন। হেনা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আর না-ই বা এলেন স্যর, এই সব অসুখ-বিসুখের মধ্যে। তার চেয়ে বরং আমাদের ঐ খাটনি ঘরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান। বড্ড হিম পড়ছে। ঘরে ঢুকেই সুশীলাকে ফিস ফিস করে কি বলল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে-ও তাড়াতাড়ি নেমে এসে ওয়ার্ক-সেডের ভিতর থেকে একটা মোড়া বের করে আঁচল দিয়ে মুছে পেতে দিল বারান্দায়। তারপর জেলর সাহেবের কাছে গিয়ে সনির্বন্ধ বিনয়ের সুরে বসতে অনুরোধ করল। তালুকদার কৌতুক দৃষ্টিতে সুশীলা জমাদারণীর ঐ সিংহাসনটির দিকে তাকালেন, এবং কোনো উত্তর না দিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে সেটি গ্রহণ করলেন।

ডাক্তার বয়সে তরুণ। জেলের চাকরিও বেশি দিনের নয়। তখনো পুরোপুরি জেল-ডাক্তার হয়ে উঠতে পারেন নি। রোগীকে রোগী বলেই দেখেন, কয়েদী বলে নয়। মিনিট দশেক পরে রবারের নলটা গলায় ঝুলিয়ে যখন বেরিয়ে এলেন, হেনাকেও তার পাশে দেখা গেল। বলতে বলতে আসছে, বোধ হয় তাঁর কোনো প্রশ্নের উত্তরে, না; রক্তবমি এর আগে আর হয়নি। জ্বরটা চলছে বেশ কিছুদিন থেকে; তার সঙ্গে কাশি, রাত্তিরে রাত্তিরে ঘাম, তার পরেই ভীষণ দুর্বলতা, সবই আমি, আপনি আসার আগেই জিজ্ঞেস করে করে জেনে নিয়েছি।

—অথচ, এত দিন আমাকে কিছুই বলেনি, বিরক্তির সুরে বললেন ডাক্তার।

—আপনাকে বলেনি, তার কারণ আছে।

—কী কারণ? সাগ্রহ দৃষ্টি মেলে চাইলেন ওর মুখের দিকে। তেমনি ছদ্ম গাম্ভীর্যের সুরে বলল হেনা, যদি ভাত বন্ধ করে দেন! ও-ও, বলে হেসে উঠলেন ডাক্তার। পাশে যে দাঁড়িয়ে তার

চোখে-মুখেও ছড়িয়ে গেল সে হাসির ছোঁয়াচ। তারই উপর আরেক জনের দৃষ্টি স্পর্শ অনুভব করে চকিতে চোখ নামিয়ে নিল মেয়েটি।

কাছে এলে লণ্ঠনের আলোয় তাঁর এই নতুন কয়েদীটিকে আর একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখবার সুযোগ পেলেন জেলর সাহেব। বাইশ-তেইশ বছরের শ্যামবর্ণা মেয়ে। প্রথম দৃষ্টিতেই যেটা চোখে পড়ে সে হচ্ছে তার নিখুঁত দেহবিন্যাস। প্রতিটি অঙ্গ এবং তার প্রতিটি রেখা ও কোণ যেন কোনো নিপুণ ভাস্করের সযত্ন সাধনার ফল। বাহুল্য নেই, নেই কোনোখানে এতটুকু অপূর্ণতা। সব মিলিয়ে একটি অনুপম শিল্পসৃষ্টি। মেয়েটির মুখের দিকে তাকালেন তালুকদার। নাতিপ্রশস্ত কপালের নীচে মমতা-ভরা স্নিগ্ধ দুটি চোখ। সুগঠিত নিটোল দুটি গণ্ড; আলগোছে নেমে এসে মিলে গেছে চিবুকের রেখায়। পাতলা ঠোঁট দু'খানিতে মাধুর্যের সঙ্গে মিশেছে ব্যক্তিত্ব।

কী দেখলে? ডাক্তারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন তালুকদার।

—এক্সরে না করে ঠিক বলা যাচ্ছে না। তাহলেও ওখানে রাখা চলবে না। সরিয়ে দেওয়াই দরকার। রক্ত-টক্ত দেখে সবাই নার্ভাস্ হয়ে পড়েছে। বেশ তো; হাসপাতালে নিয়ে যাও।

সাধারণ ওয়ার্ড থেকে খানিকটা দূরে কম্পাউণ্ড-পাঁচিলের গা ঘেঁসে এক রাশ নেবুগাছের ঝোপের আড়ালে একখানা মাত্র ঘর। সেইটাই ফিমেল হাসপাতাল। ডাক্তার একবার সেদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, নিয়ে তো যাবো। কিন্তু একটা মুস্কিল আছে।

—কী মুস্কিল?

—একা-একা কিছুতেই যেতে চাইছে না।

—একা যাবে কেন? উত্তর দিল হেনা। আমি থাকবো ওর কাছে।

—আপনি! হেনার সর্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে কপাল কুঞ্চিত করলেন ডাক্তার। মাথা নেড়ে বললেন, উহুঁ।

দেহের চার দিকে আঁচলখানা আরো খানিকটা জড়িয়ে নিয়ে হেনা মৃদু হেসে বলল, কেন? পারবো না ভাবছেন? খুব পারবো।

—পারার কথা হচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন ডাক্তার। তারপর জেলর সাহেবের দিকে চেয়ে ইংরেজিতে বললেন, এ রোগের সব চেয়ে সহজ শিকার হচ্ছে যৌবন। ফস্ করে ধরে ফেলতে পারে।

—পোকাগুলো তো বেশ রসিক দেখছি, মন্তব্য করলেন তালুকদার। তোমরা এদের খালি খালি নিন্দে করে বেড়াও।

ডাক্তার হেসে উঠলেন। ঠিক তখনই ওয়ার্ডের ভিতর থেকে কাশির শব্দ শোনা গেল। হেনা ছুটে চলে গেল। ডাক্তারও তাকে অনুসরণ করলেন। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে বললেন, সন্দেহ করবার বিশেষ কিছু নেই। কাশিতেও রক্ত রয়েছে, স্কায়াগ্রামটা কাল সকালেই নিতে হবে।

জেলর বললেন, সরাবার ব্যবস্থাও কাল সকালেই ক'রো। এত রাত্রে টানা-হেঁচড়া সুবিধে হবে না। ঘরটাও একটু ঝেড়ে-পুঁছে গোছগাছ করে নিতে হবে। এ্যাদ্দিন খালি পড়ে আছে।

একটু থেমে, সুশীলার দিকে একবার চোখ তুলে বললেন, ঠিক খালি বোধ হয় নেই। কারো কারো দিবানিদ্রা ডিউটি বোধ হয় ওখানেই সেরে নেওয়া হয়। কি বল জমাদার?

মহাবল সিংএর জমকালো গোঁফের নিচে চকিতে একটা হাসির ঝিলিক খেলে গেল। নিজের মুখে নিজের নাম উল্লেখ মাত্র বুট ঠুকে অ্যাটেনশন্ হয়ে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে বলল, জী, হুজুর!

—বেশ, তাহলে এবার চলো, ডাক্তারের উদ্দেশে বললেন তালুকদার, যে রকম ঠাণ্ডার বহর, আর কিছুক্ষণ এই খোলা বারান্দায় বায়ু সেবন করলে আমাকেও তোমার হাসপাতালের আশ্রয় নিতে হবে। বলে, মাফলারের উপর ওভার-কোটের কলারটা আর একটু তুলে দিয়ে রুমাল বের করে নাক ঝাড়লেন।

সুশীলাকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবার পর যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় হেনা ছুটে এসে বলল, রোগীর সঙ্গে আমিই থাকবো তো?

ডাক্তারের মুখ গম্ভীর। সেদিকে একবার চেয়ে নিয়ে বললেন, তালুকদার, রোগটা তো ভাল নয়, দেখতে পাচ্ছ। ঘাঁটাঘাঁটি করলে বিপদ ঘটতে পারে।

হেনা কিছুমাত্র দমে না গিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, সে বিপদ তো সবার বেলাতেই আছে।

—তা আছে; কিন্তু তোমার এই বয়সে তার সম্ভাবনা একটু বেশী।

—তা হোক; আমিই ওর দেখা-শুনা করবো। আপনি বলে দিয়ে যান।

জেলর ফিরে দাঁড়ালেন। অস্পষ্ট আলোয় ওর মুখের চেহারা ঠিক দেখতে পেলেন না। বিস্মিত হলেন ওর কণ্ঠের দৃঢ়তায়। কিন্তু সে ভাব গোপন রেখে সহজ ভাবেই বললেন, বিপদ আছে জেনেও এত বড় ঝক্কি তুমি নিতে চাইছ কেন?

হেনা জবাব দিল না। নতমুখে দাঁড়িয়ে আঁচলের কোণে আঙুল জড়াতে লাগল। মহেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, তুমি ওয়ার্ডে যাও। হাসপাতালে কে থাকবে, কাল সকালে আমরাই স্থির করবো।

—আপনারা হয়তো জানেন না, মুখ তুলে মৃদু কিন্তু সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলল হেনা, কিন্তু আমি জানি, এখানে আর যারা রয়েছে তাদের সবারই ঘর-সংসার আছে, আপনার জন আছে; একদিন তাদের কাছে ফিরে যাবার আশা রাখে। তারা এ ঝক্কি নেবে কেন? আপনি হুকুম করলে অবিশ্যি না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?

একজন সাধারণ মেয়ে-কয়েদী জেলর সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখের উপর তর্ক করে যাবে, মহাবল সিং জমাদার কিংবা সুশীলা জমাদারণীর পক্ষে সেটা বরদাস্ত করা সহজ নয়। প্রথম দিন সুরু থেকেই ছটফট করছিল; দ্বিতীয় ব্যক্তি আর থাকতে না পেরে কী একটা বলে উঠতেই, হাত তুলে থামিয়ে দিলেন তালুকদার। তারপর তেমনি শান্ত কণ্ঠেই বললেন, কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ঠিক নয়, সে বিবেচনার ভার আমাদের। তবু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করবো। অন্য সবার বেলায় যে বাধার কথা বলছিলে সেটা কি তোমার বেলায় নেই? তোমাকেও তো একদিন ঘরে ফিরে সংসারের ভার নিতে হবে।

হেনা মুহূর্ত্ত কাল কী ভেবে নিয়ে বলল, না; সেদিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত।

নিতান্ত সহজ সুর। তবু কিছু একটা ছিল তার মধ্যে, বহুদর্শী জেলর মহেশ তালুকদারের কঠিন অন্তরেও তার ছোঁয়া লাগল। এই আশ্চর্য মেয়েটির পূর্বজীবনের কোন ইতিহাস তাঁর জানা নেই। চোখের উপর যেটুকু দেখলেন তার থেকেই মনে হল, এই বয়সে সমস্ত জেনে-শুনেও এই যে নিশ্চিত বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া, এর সবটুকুই বোধ হয় পরোপকারের প্রেরণা নয়।

জেলর সাহেবকে নিরুত্তর দেখে হেনা যেন উৎসাহিত হয়ে উঠল। ছুটে গিয়ে ওয়ার্ডের ভিতর থেকে নিয়ে এল তার কয়েদী টিকেট। ওঁর দিকে এগিয়ে ধরে বলল, তাহলে লিখে দিন। সুশীলা ধমকে উঠল, পাগল হলি না কি তুই? এটা কি ওঁর খাটনি পাশ করবার সময়? দে, আমাকে দে টিকিট।

—আপনি থামুন তো মাসীমা, খানিকটা আব্দারের সুরে বলল, হেনা। এখন না করিয়ে নিলে কাল ওঁর মনে থাকবে কি না! এদিকে আবার বাগড়া দেবার লোকের তো অভাব নেই, বলে চোখের কোণ দিয়ে তাকাল ডাক্তারের দিকে। তালুকদার হাত বাড়িয়ে টিকেটখানা নিলেন ওর হাত থেকে। নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন চমকে উঠলেন যখন নজর পড়ল অপরাধের ধারাটার উপর। এই মেয়ে খুন করেছিল! বিষ খাইয়ে। কাকে? কেন? পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলেন। এই সামান্য ব্যাপারে বিস্ময় তাঁর শোভা পায় না; তাঁর এই দীর্ঘজীবনে কত শত বার নিজের মনের কাছে এই প্রশ্ন করেছেন জেলর সাহেব। উত্তর পাননি। এ এক আদি-অন্তহীন আদিম রহস্য! এমনি আরো কত দেখেছেন তিনি। দিব্যি স্বাভাবিক মানুষ। কথায়-বার্তায়, চেহারায় হাব-ভাবে অন্য দশ জনের মত। কোথাও কোনো অসঙ্গতি নেই। হঠাৎ টিকেট উল্টে দেখা গেল, ঐ অতি সাধারণ হাত দু'খানা নররক্তে কলঙ্কিত। টিকেট যে দেখেনি, তার কাছে সে পরিচয় হয়তো কোনো দিনই প্রকাশ পাবে না। তবু দাগ থেকে যায়। অন্য সকলের অলক্ষ্যে হয়তো শুধু তার নিজের বুকের মধ্যে একটা মসীরেখা সে বয়ে বেড়ায় সারা জীবন। এই খুনী মেয়েটার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তালুকদার। খুঁজতে চেষ্টা করলেন সেই মৃত্যুহীন কালো ছায়া। কিন্তু ঐ প্রশান্ত চোখ দুটির মধ্যে তার কোনো আভাস চোখে পড়ল না। মনের মধ্যে জেগে রইল শুধু সেই সমাধানহীন চিরন্তন প্রশ্ন—এ কেমন করে সম্ভব? একদিন যে-হাত একজনের প্রাণ নিয়েছিল, আজ সে আর একজনের প্রাণ দেবার জন্যে ব্যাকুল। বিনামূল্যে নয়, নিজের প্রাণের বিনিময়ে। এটা তো তিনি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। এর মধ্যে তো কোনো ফাঁকি নেই?

বুকপকেট থেকে কলমটা তুলে নিয়ে বললেন তালুকদার, তোমার কথা আমি রাখলাম। কিন্তু আমার একটা কথাও তোমাকে রাখতে হবে।

—কী কথা বলুন? আপনি যা হুকুম করবেন, আমি আনন্দে মাথা পেতে নেবো।

—বেশ; কিন্তু আজ নয়, তার সময় একদিন আসবে। সেই দিন তোমাকে জানাবো।

এইটুকু বলেই সেই টিকেটের উপর বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলেন, **Sick Attendant, T. B. Ward.** যক্ষ্মারোগীর নার্সের পদে বহাল হল হেনা মিত্র।

জেলর সাহেবের হাত থেকে টিকেটখানা ফিরে পাবার পর সেই লেখাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল হেনা। তার পর সেটা বুকে চেপে ধরে বসে পড়ল তাঁর পায়ের কাছে। হাত দু'খানা পায়ে ঠেকিয়ে মাথায় রাখল। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে যখন মুখ তুলে তাকাল তাঁর দিকে, সবিস্ময়ে দেখলেন তালুকদার সেই চোখ দুটো জলে ভরে গেছে। অন্ধকার আকাশের দিকে চোখ ফেরালেন। মনে হল ঐ শিশির ঝরা তামসী রাত্রির সঙ্গে এই অশ্রুসজল শ্যামল মুখখানার কোথায় যেন একটা মিল আছে!

পরদিন ভোর থেকেই হেনার কাজ সুরু হয়ে গেল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে ধুয়ে-মুছে ঘসে-মেজে ঝকঝকে করে তুলল সেই নেবুতলার ছোট্ট হাসপাতাল। আরো দু' তিনটি মেয়েও খাটল তার সঙ্গে। মেইন হাসপাতাল থেকে ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দু'খানা লোহার খাট, দু' সেট আনকোরা নতুন গদি, বালিশ, চাদর, মশারি। সব সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে বিছানা পেতে রোগীকে শুইয়ে দিল জানালার ধারে। বেড-সাইড টেবিলটাও গুছিয়ে ফেলল। সেখানে রইল টেম্পারেচার চার্ট, থার্মোমিটার, খাবারের পাত্র এবং আর সব টুকিটাকি। একটা মাটির সরা আনিয়ে, তার মধ্যে কয়লা জ্বেলে, খানিকটা ধুনো ছিটিয়ে বসিয়ে দিল খাটের পাশে। সুগন্ধি ধোঁয়ায় ঘর ভরে উঠল।

গোছান-পর্ব শেষ হলে সকাল সকাল স্নান সেরে নিজের হাতে সাজিমাটি দিয়ে কাচা 'ফিমেল-কুর্ত্তা'র উপর ডোরাকাটা শাড়িখানা জড়িয়ে এক রাশ ভিজে চুল পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে, সবে এসে বসেছে বুড়ীর খাটের পাশে রাখা ছোট টুলটিতে, এমন সময় ডাক্তার এসে পড়লেন। চার দিকটা একবার চোখ বুলিয়ে, তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটি মাত্র অব্যয়—বাঃ! তার পর ওর দিকে যখন চোখ ফেরালেন, সে চোখে কিছুক্ষণ আর পলক পড়ল না। হেনার মুখের উপর ছড়িয়ে গেল এক ঝলক আরক্ত আভা। সেইটাই বোধ হয় লুকোবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে থার্মোমিটারটা ঝাড়তে সুরু করে দিল। ডাক্তারও ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। হেসে বললেন, আপনার হাতে দেখছি যাদু আছে। এই সব তুচ্ছ জিনিষগুলো অন্য হাসপাতালেও তো দেখেছি, কিন্তু—হঠাৎ বুড়ীর দিকে নজর পড়তেই সুর বদলে গেল, এই যে, আমার পেসেন্টও দেখছি বেশ তাজা হয়ে উঠেছে। কেমন আছ, কি নাম যেন তোমার?

হেনা হেসে ফেলল, এরই মধ্যে ভুলে গেছেন? ওর নাম মোনার মা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মোনার মা। কেমন লাগছে আজ?

বুড়ী ম্লান হেসে বলল, ভাল আছি, বাবা! আমার মা রয়েছে কাছে, আর আমার ভয় নেই।

বেশ, কই দিন থার্মোমিটার। হেনার দিকে হাত বাড়ালেন। বুড়ী বলল, হ্যাঁ বাবা, আমার মাকে এখানেই থাকতে দেবে তো?

—কেন, একলা থাকতে পারবে না?

—একলা! না, বাবা! তাহলে আমি মরেই যাবো, বলে

কম্পিত হাতখানা দিয়ে হেনাকে ধরে ফেলল, যেন এখনই কেউ তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। হেনা সেই হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ডাক্তারের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসল। মাথা নেড়ে বলল, দেখলেন তো?

ডাক্তারের মুখেও মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বুড়ীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তোমাকে একলা থাকতে হবে না। উনিও থাকবেন তোমার ঘরে।

রোগী দেখা হয়ে গেলে নার্সকে দু'চারটা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বারান্দার সিঁড়িতে যেমনি পা বাড়িয়েছেন ডাক্তার, হেনা এগিয়ে এসে গম্ভীর মুখে বলল, আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, জানতে পারি এ ঘরে পেসেণ্ট আপনার ক'জন?

উনি প্রশ্নটা হঠাৎ ধরতে পারলেন না। বললেন, কেন?

চোখের ইসারায় দ্বিতীয় দফা খাট-বিছানা দেখিয়ে দিয়ে তেমনি ভাবেই বলল হেনা, ওসব কার জন্যে?

ডাক্তার হাসলেন, সেটা এখনো বুঝতে পারেননি?

—পারলে আর জিজ্ঞেস করবো কেন?

—ঐ বিছানাটা যার জন্যে, তিনি আমার পেসেণ্ট নন। তবু পেসেণ্টের চেয়েও তার ওপর বেশি নজর দিতে হয়।

—কিন্তু সে যে তা মোটেই চায় না।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর নার্সের দিকে। তারপর ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললেন, দেখুন, সংসারে যার যা পাওনা, তা সে পাবেই। না চাইলেও পাবে। তা নিয়ে ঝগড়া করে লাভ নেই।

—কিন্তু, এগুলো তো সত্যিই আমার পাওনা নয়, সে কথা আপনিও জানেন, আমিও জানি। আমি সাধারণ কয়েদী। বিছানা বলতে আমার প্রাপ্য শুধু দুটো কম্বল।

—জানি। সে সব জেনেই এ ক'টা জিনিষ আপনাকে পাঠানো হয়েছে।

—কেন?

—কেন আবার কি? এই টি বি রোগীর ঘরে শুধু দুটো কম্বল বিছিয়ে মেঝের ওপর পড়ে থাকতে পারবেন?

—কেন পারবো না? অন্য সবাই যদি পারে আমিও পারবো।

—আপনি পারলেও, আমি তা দিতে পারি না। বলে আর কোনো প্রতিবাদের অপেক্ষা না করে ডাক্তার সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লেন। হেনা কয়েক মিনিট স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ফিরে দাঁড়ালেন, আবার কী হল?

—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—বলুন না?

—আপনি আমাকে 'আপনি আপনি,' করেন কেন? আমরা সাধারণ কয়েদী। অন্য সব বাবুরা, সিপাই, জমাদার সকলেই তো আমাদের 'তুমি' বলে থাকেন।

ডাক্তারের দৃষ্টি গভীর হয়ে এল। সমস্ত মুখে ঘনিয়ে এল গাম্ভীর্যের ছায়া। তারপর অনেকটা যেন আপন মনে বললেন, সকলের চোখ তো সমান নয়। কেউ যদি মনে করে, সাধারণ কয়েদী এই কথাটার মধ্যেই একজনের পরিচয় শেষ হয়ে যায়নি, তাতে আপত্তির কী আছে? মানুষ কি সব সময়ে নিজেকে দেখতে পায়, না বুঝতে পারে হেনা?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই ডাক্তার ধীরে ধীরে চলে গেলেন। কিন্তু আরেক জনের পা দু'টো যেন অচল হয়ে গেল। সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল অভিভূতের মত। ইতিমধ্যে সুশীলা কখন এসে তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, টের পায়নি। হঠাৎ চমক ভাঙল তার ডাক শুনে, এখানে কি করছিস? ও মা, চোখ দুটো যে ছল-ছল করছে। জ্বর-টর হয়নি তো? দেখি, বলে কাছে এসে কপালে হাত রাখল। আশ্বাসের স্বরে বলল, না, গা তো দেখছি ঠাণ্ডা।

মুখে একটু ম্লান হাসি টেনে এনে হেনা বলল, আমি কি কচি খুকী, মাসীমা, যে জ্বর হলেও বুঝতে পারবো না? কিছু হয়নি আমার।

—না হলেই ভালো, বাপু। ঝোঁকের মাথায় কাণ্ড তো একটা বাধিয়ে বসলে। এখন বিপদ-আপদ না ঘটলেই বাঁচি। কী দরকার ছিল ঐ ঘাটের মড়াটাকে আগলে রাখবার? ব্যারাম হয়েছে, বুঝুক সরকার, বুঝুক জেলখানার বাবুরা। তোর কি? কোন্ সাত পুরুষের কুটুম ঐ বুড়ী, যে ওকে বাঁচিয়ে না তুললে আর চলছে না? তোর যদি কিছু হয়, তখন দেখবে কে, শুনি?

হেনা ফিস-ফিস করে বলল, আস্তে মাসীমা! শুনতে পাবে যে?

—শুনুক গে। ভারী বয়ে গেল আমার? না বাপু, এ-সব আদিখ্যেতা আমার ভালো লাগে না। আর জেলার বাবুর আক্কেলটাই বা কী রকম! একজন চাইলো বলেই কি তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে হবে? কেন, যক্ষ্মারোগীর জন্যেও তো হাসপাতাল আছে। পাঠিয়ে দাও না সেখানে?

—তাই হয়তো দিতেন, ধীরে ধীরে করুণ কণ্ঠে বলল হেনা, তার পর আমার মুখের দিকে চেয়ে বোধ হয় একটু দয়া হল। তাই এ কাজে আমাকে লাগিয়ে দিয়ে গেলেন।

সুশীলা জ্বলে উঠল, দয়া! এর নাম হল ওঁর দয়া!

—হ্যাঁ, মাসীমা। কিন্তু সে-কথা এখন থাক। ঐ শুনুন, বুড়ী আবার কাশতে সুরু করেছে। আমি যাই···বলে হাসতে হাসতে হাসপাতালে গিয়ে ঢুকল। সুশীলা মুখখানা বিকৃত করে বিড়-বিড় করতে করতে ফিরে চলল খাটনি ঘরের দিকে।

এর পর ক'টা দিন কেটে গেল রীতিমত ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে। এক্সরে ফটো তোলার জন্যে মোনার মাকে পাঠানো হল বাইরের সদর হাসপাতালে। রিপোর্ট আসবার পর বিশেষজ্ঞ এলেন। জেলের বড় সাহেব একাধারে সুপার এবং মেডিক্যাল অফিসার। তিনিও একদিন এসে দেখে গেলেন। কাজের সূত্রে ডাক্তারকে একদিন অনেকখানি বেশি সময় কাটাতে হয়েছে রোগীর ঘরে। হেনাকেও থাকতে হয়েছে তাঁর হাতের কাছে। কখন কি চাই, কখন কি করতে হবে। কাজকর্মের মধ্যে কত বার দু'জনের চোখোচোখী হয়েছে, দাঁড়াতে হয়েছে একে অন্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। আঙুলের সঙ্গে ছোঁয়া লেগেছে আঙুলের, একজনের দেহে লেগেছে আরেক জনের নিঃশ্বাস। অকস্মাৎ হেনার বুকের মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে রক্তস্রোত, কখনো আবার অবশ হয়ে এসেছে হাত দু'টো। কিন্তু এই অসঙ্গত হৃদয়াবেগ তার কাছে এতটুকু প্রশ্রয় পায়নি। সঙ্গে সঙ্গে অবাধ্য চিত্তকে চোখ

রাঙিয়ে শাসন করেছে। নিজেকে নিবিষ্ট করে দিয়েছে নিরলস সেবার মধ্যে।

কয়েক দিন পরে সকাল সাড়ে আটটায় যথারীতি রোগী দেখতে এসেছেন ডাক্তার। বুড়ীর মুখে থার্মোমিটার দিয়ে অপেক্ষা করছেন। হেনা সেই ফাঁকে তাড়াতাড়ি ঘরটা গুছিয়ে ফেলছিল। তার পর রোগীর বাসি কাপড়গুলো কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই ডাক্তার বললেন, শোনো। হেনা ফিরে দাঁড়াল। চোখে পড়ল দু'টি একাগ্র মুগ্ধ চোখ। মনে হল শুধু এই মুহূর্তে নয়, এতক্ষণ ধরেই বোধ হয় তারা তাকে অনুসরণ করেছে। নিজের অজ্ঞাতে বুকের ভিতরটা দুলে উঠল। দেহটাও কেমন আড়ষ্ট হয়ে এল। বুকের কাপড়খানা টেনে দিয়ে বলল, কি বলছেন? ডাক্তারের মুখে সলজ্জ হাসি। অপ্রতিভ সুরে বললেন, না, থাক।

—কিছু চাই কি?

—না; দেখছিলাম, তুমি যখন ছুটোছুটি করে কাজ কর, ভারী আশ্চর্য লাগে। কেমন একটা সুন্দর ছন্দ আছে তোমার চলাফেরার মধ্যে।

—এই ব্যাপার? আমি ভেবেছিলাম, কী না জানি দরকারী কথা। আরো একটা কি বলতে যাচ্ছিলেন ডাক্তার। হেনা বাধা দিয়ে বলল, ও মা, ও করছেন কি? আর কতক্ষণ জিভ বার করে থাকবে বেচারা! ওটা তুলুন, তার পর না হয় ছন্দ দেখবেন বসে বসে। বলেই বেরিয়ে গেল তেমনি দ্রুত ছন্দে।

বাইরে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। এ কী করল সে! স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়ে এল, ওঁর ঐ স্তুতিটুকু সে মনে মনে উপভোগ করেছে, ভালো লেগেছে তার মিষ্টি স্বাদ। বাইরে যে ভাবই দেখাক, খুসী হয়েছে তার অন্তর। ছিঃ ছিঃ, এ কী কথা বেরিয়ে গেল তার মুখ থেকে! তার একমাত্র কর্তব্য ছিল একটা কড়া উত্তর। বলা উচিত ছিল, আপনি তো এখানে আমার দেহের ছন্দ দেখতে আসেন না, ডাক্তারবাবু! আপনার অন্য কাজ আছে, দায়িত্ব আছে। সেই দিকে মন দিন। একবার ভাবল, ফিরে গিয়ে শুনিয়ে দেয় কথাগুলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর হয়ে উঠলো না। কী ভাববেন ডাক্তারবাবু! কাপড়গুলো কেচে নিয়েও তার ফিরে যাওয়া হল না। কী এক মধুর লজ্জায় যেন জড়িয়ে গেল পা দু'খানা।

পরদিন আবার রাউণ্ডে এসেছেন ডাক্তার। হাসপাতালের দরজার বাইরে তার টিকেটখানা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে হেনা। মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত থমথম করছে। ডাক্তার দাঁড়িয়ে পড়লেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, এখানে দাঁড়িয়ে যে? খবর ভালো তো? বুড়ী কেমন আছে?

হেনা সে প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। টিকেটখানা এগিয়ে দিয়ে উষ্ণ কণ্ঠে বলল, এ সব কী লিখেছেন আমার টিকিটে? আমার তো কোনো অসুখ করেনি?

ডাক্তার লেখাটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হেসে ফেললেন, এই ব্যাপার? আমি তো রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। না; অসুখ তোমার করেনি। তবু, এই বাড়তি খাবারটুকু তোমার একান্ত দরকার।

—কিচ্ছু দরকার নেই, খানিকটা উদ্ধত সুরে বলে উঠল হেনা। সকলের যা বরাদ্দ, তাই আমার যথেষ্ট। এ সব আপনি কেটে দিন।

ডাক্তার অনুযোগের সুরে বলল, ত্যাখ, তুমি সব বোঝো, আর এই সোজা কথাটা বুঝতে চাও না, যক্ষ্মারোগের নার্স করতে গিয়ে যদি তাকে resist মানে ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা বাড়ানো না যায়, যে কোনো সময়ে সর্বনাশ ঘটতে পারে। যথেষ্ট পরিমাণে পোষ্টাই খাবার পেটে না পড়লে ঐ টি-বি germsগুলোর সঙ্গে লড়বে কি দিয়ে?

—আমার যা আছে, তা দিয়েই লড়বো। না পারি, মরবো। তাই বলে রোগের সেবার নাম করে ডিম-মাখন গিলতে পারবো না।

—আহা, ব্যাধিটাই তো হল রাজব্যাধি। তাকে রুখতে হলে রাজভোগ ছাড়া চলবে কেন? তোমার রোগীর খাবার লিষ্টিটা দেখেছ তো? সে তুলনায় তোমাকে তো কিছুই দিইনি।

—রোগীকে আপনার যা-খুসী দিতে পারেন। আমি তো আপনার রোগী নই। আমাকে দিচ্ছেন কিসের জন্যে? দিলেই বা আমি নেবো কেন?

ডাক্তারের সুরে ক্ষোভ ফুটে উঠল—নেওয়া না-নেওয়া তোমার ইচ্ছে। ডাক্তার হিসেবে আমার একটা দায়িত্ব আছে; তাই দিয়েছিলাম। না খেতে চাও, খেও না। আমার কী!

টিকেটখানা ফিরিয়ে দিয়ে ডাক্তার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বুড়ীর অবস্থা খানিকটা ভালো। তার সঙ্গে দু'-চারটা কথা হল। মিটসেফের মধ্যে সাজানো রয়েছে তার খাবার—মাখন, রুটি, ডিম, দুধ আর দু-চার রকমের ফল। সেই দিকে চেয়ে বললেন, খাবার-টাবারগুলো সব খাচ্ছ তো?

—আমি তো খাচ্ছি বাবু; ও কিন্তু কিছুই ছোঁয় না। খালি দু'বেলা দুটো ভাত, ফাইল থেকে যা আসে। আপনি একটু বুঝিয়ে বলে যান ডাক্তারবাবু!

—আমার কথা শোনে কৈ?

—শুনবে। আপনারে ও খুব মান্যি করে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ডাক্তারের কাজ শেষ হল। নেবু-ঝোপের পাশ দিয়ে পথ। মাঘ শেষ হয়ে ফাল্গুন মাস পড়েছে। ফুল এসেছে নেবুগাছে। সকালবেলার তাজা বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে তার মিষ্টি গন্ধ। কাছেই একটা ঘনপল্লব আমের গাছ। ডালপালাগুলো নুইয়ে পড়েছে মুকুলের ভারে। তার উপরে মধু-মাতাল মৌমাছির ভিড়। আকাশ গাঢ় নীল। তার নীচে এই শিশির-স্নিগ্ধ আলো-ঝলমল শীতের প্রভাত। কোথাও কোনো ব্যস্ততা নেই, কোলাহল নেই। শুধু খানিকটা দূরে ঐ খাটনি ঘর থেকে ভেসে আসছে একটানা ডালভাঙার শব্দ; তার সঙ্গে একটি সুকণ্ঠী মেয়ের মেঠো সুরের গান। সব মিলিয়ে ডাক্তারের তরুণ মনে ফুটে উঠল একটি পরিপূর্ণ সুর।

নেবুগাছের আড়াল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল হেনা। ডাক্তারের হঠাৎ মনে হল, বসন্ত-প্রভাতের এই অপরূপ ছবিটির সঙ্গে সে-ও যেন সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। ঐ শ্যামল চিক্কণ তনু-দেহখানি যদি না থাকত, সমস্ত দৃশ্যটাই বুঝি অপূর্ণ থেকে যেত।

তুমি এখানে? বিস্ময়ের সুরে বললেন ডাক্তার। তার মধ্যে ফুটে উঠল স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলতা।

—এমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম, গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর এল।

—দিনটা ভারী সুন্দর, না ?

—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, টি·বিদের যারা নার্স করে সব হাস-পাতালেই কি তাদের বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা আছে ?

—সব হাসপাতালের খবর জানি না, আচমকা আঘাতটা সামলে নিয়ে বললেন ডাক্তার, আমার হাসপাতালের কথা বলতে পারি ?

—আমি বলতে চাইছিলাম, ঐ খাবারগুলো কি সত্যি সত্যিই আমার দরকার, না ওটা শুধু আমার জন্যে, মানে আমাকে আপনারা দয়া করেন, তাই হয়তো আপনি—কথাটা শেষ করতে পারল না। কুণ্ঠাজড়িত আয়ত চোখ দুটি তুলে ধরল ডাক্তারের মুখের পানে। সেই দিকে চেয়ে, লজ্জায় সঙ্কোচে মাধুর্যে মণ্ডিত সেই কণ্ঠ শুনে ডাক্তারের বুকের ভিতরটা ব্যথায় ভরে উঠল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে গভীর সুরে বললেন, তোমাকে হাতে করে দেবার মত আমার তো কিছুই নেই, হেনা ! সে উপায়ও নেই। ডাক্তার হিসেবে যেটুকু দিলাম, সামান্য একটু খাবার, তা'ও যদি না নেও, আমি আর কি করতে পারি !

হেনা জবাব দিল না, তেমনি করুণ চোখে চেয়ে রইল। ডাক্তার আবার বললেন, কিসের জন্যে নিজের ইচ্ছায় এই বিপদের মধ্যে তুমি নেমে এসেছ, আমি জানি না। হয়তো এর পেছনে কোনো গভীর কারণ আছে। কিন্তু এটুকু জানি, যেমন করে হোক তোমাকে বাঁচাতে হবে। এখানে এই জেলের মধ্যে আমার চোখের সামনে তোমাকে আমি আত্মহত্যা করতে দেবো না। হেনার চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। আবেগ-কম্পিত সুরে বলল, কেন? আমার মত একটা তুচ্ছ মেয়েকে বাঁচিয়ে আপনার লাভ ?

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলেন না। তাঁর একান্ত কাছটিতে দাঁড়িয়ে আছে হেনা। ঠোঁট দু'খানা কেঁপে কেঁপে উঠছে, চঞ্চল নিঃশ্বাসে দুলে উঠছে তার উন্নত বুক। সেই চোখ দুটো তীব্র প্রতীক্ষায় তখনো তাঁর মুখের পানে চেয়ে। ডাক্তারের প্রশস্ত বুকের মধ্যে উদ্দাম হয়ে উঠল রক্তস্রোত। আজ হয়তো সে কোনো বাধা মানবে না। কিন্তু না, বাঁধ অটুট রইল। নিজেকে সংযত করে মৃদু কণ্ঠে বললেন ডাক্তার, কী লাভ ? তা জানি না। হয়তো কোনো লাভই নেই। কিন্তু লাভ-লোকসানের হিসাবটাই কি মানুষের জীবনের সব, হেনা ? তার বাইরে আর কিছু নেই ? আর কিছু দেখতে পাও না ?···বলে, কখনো যা করেননি, হঠাৎ নত হয়ে ওর ডান হাতখানা তুলে নিলেন নিজের দুটি উত্তপ্ত হাতের মধ্যে। পরক্ষণেই ছেড়ে দিয়ে দ্রুত বেগে এগিয়ে গেলেন।

মুহূর্ত কালের একটি নিবিড় স্পর্শ ! হেনার সমস্ত শরীর বারংবার শিউরে উঠল। কোনো রকমে ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল তার সেই নতুন খাটখানার উপর, সেখানে সাজানো প্রতিটি জিনিষের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একজনের গভীর প্রাণের স্পর্শ। বালিসে মুখ রেখে চোখের জলের ধারা আর ধরে রাখতে পারলো না।

বুড়ী শুয়ে ছিল দেয়ালের দিকে মুখ করে। শব্দ শুনে পাশ ফিরেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। বার বার বলতে লাগল, কী হল, মা ! অমন করছ কেন ?

পর পর কয়েক দিন ডাক্তার হাসপাতালে এসে তার নার্সের দেখা পেলেন না। তার জায়গায় দেখলেন আর একটি মেয়ে। তার নাম কমলা। এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, কখন কি দরকার হয়। তার পর রোগী দেখা যেমনি শেষ হল, সাবানটা এগিয়ে দিয়ে হাতে জল ঢেলে তোয়ালেটা বাড়িয়ে ধরে—এইটুকু তার কাজ। টেবিলের উপর চাপা-দেওয়া টেম্পারেচার-চার্ট হেনার হাতে তৈরি। তার পাশে তারই হাতের গোটা গোটা অক্ষরে লেখা সংক্ষিপ্ত নোট। তা ছাড়া যা কিছু দরকারী জিনিস, সব যথাস্থানে পরিপাটি করে সাজানো। যেদিকে তাকানো যায়, সর্বত্র তার নিপুণ হাতের চিহ্ন।

সেদিন কাজ সেরে ফিরে যাবার সময় সিঁড়ি থেকে নেমেই ডাক্তার হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন। মেয়েটির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের দিদিমণি কোথায় ?

কমলা বলল, এই তো ছিল এখানে। বোধ হয় চান করতে গেছে। ডেকে দেবো ?

ডাক্তার একটু ইতস্তত করলেন ; তার পর বললেন, না থাক।

পরদিন ডাক্তার আসবার সময় হতেই হেনা তার কাজ সেরে যথারীতি চলে যাচ্ছিল। ঘর থেকে বেরোতেই সুশীলার সঙ্গে দেখা।

—কোথায় যাচ্ছিস ?

—যাচ্ছি একটু ও দিকে।

—এই নে। ডাক্তারবাবু আসতে পারবেন না। একটা চিঠি দিয়েছেন তোকে।

—আমাকে ! কিসের চিঠি ? কপাল কুঞ্চিত করে জানতে চাইল হেনা।

—আমি কী জানি, কিসের চিঠি ? কি করতে টরতে হবে, তাই বোধ হয় লিখে জানিয়েছেন। নে, ধর।

ভায়োলেট রংএর মুখবন্ধ খাম। উপরে কোনো নাম নেই। হাতে করতেই হাতটা কেঁপে উঠল। একটু যেন দোলা লাগল বুকের মাঝখানে। কি জানি কি আছে এ চিঠির মধ্যে ! খুলতে গিয়ে হাতটা সরিয়ে নিল হেনা। মাথা নেড়ে বলল মনে মনে, না, এ চিঠি সে খুলবে না। যেমন আছে তেমনি ফিরিয়ে দেবে সুশীলার হাত দিয়ে। তাড়াতাড়ি এগিয়েও গেল খানিকটা তাকে ধরবার জন্যে। আবার কী ভেবে ধীরে ধীরে ফিরে এল। খামটার দিকে আরেক বার চেয়ে দেখল। মনের মধ্যে ছুঁয়ে গেল কিসের একটুখানি মৃদু সৌরভ, একটু কিসের মোহময় অনুভূতি। তার পরে আনমনে কখন ছিঁড়ে ফেলল একটি ধার। ছোট্ট একখানি কাগজে সুন্দর করে লেখা কয়েকটি কথা—

"হেনা, তোমার কোনো ভাবনা নেই। আমার দিক থেকে কোনো বিপদ তোমাকে স্পর্শ করবে না। তুমি স্থির হও। তোমার পথ থেকে নিজেকে আমি সরিয়ে নিলাম। দেবতোষ।"

দেবতোষ ! বেশ নামটি তো ! ডাক্তারবাবুর নাম এই প্রথম জানল হেনা। জানতে ইচ্ছা হয়েছে কত দিন। কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। দেবতোষ। মনে মনে আউড়ে নিল নামটা। তার পর আবার পড়ল চিঠিখানা। মনকে বোঝাতে চাইল, এ ভালোই হল। এই মুক্তিই তো চেয়েছিল। এরই জন্যে পালিয়ে বেড়িয়েছে দিনের পর দিন। সহজ ভাবে একটি বার কাছে এসে দাঁড়াতে পারেনি। দিন কেটেছে ছটফট করে, রাত কেটেছে, অস্থির অনিদ্রায়। স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। বুকের মধ্যে বয়ে নিয়ে ফিরেছে দুঃসহ গুরুভার। সে ভার নেমে গেল। আজ সে নিশ্চিন্ত, নিরাপদ। যাকে নিয়ে তার এত

দুর্ভাবনা, তিনি নিজের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এই আশ্বাসভরা অভয়বাণী—কোনো বিপদ তোমাকে স্পর্শ করবে না। তুমি স্থির হও।

চিঠিখানা হাতে করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল হেনা। মনে মনে বলল, আমি বাঁচলাম। তার পরে এক সময়ে মনে হল, কই মুক্তির হাওয়ায় তার বুকের বোঝা নামল কই? নিভৃত অন্তরের কোণে কে এক অবুঝ বসে রইল মুখভার করে, কে এক লোভী চেয়ে রইল তৃষিত দৃষ্টি মেলে। মনে পড়ল, কত দিন আগে কী একটা বইতে পড়েছিল, এক রকম অসভ্য জাত আছে, পাখীর পালক যাদের অমূল্য অলঙ্কার, বনের পথে চলতে চলতে গজমুক্তা কুড়িয়ে পেলে ছুঁড়ে দেয় গভীর জঙ্গলে। আজ সে-ও কি তেমনি মূঢ়ের মত ফেলে চলে যাচ্ছে না জীবনের সেই পরম রত্ন, সহস্র মুক্তার চেয়েও যা মূল্যবান?

সহসা জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে এল চিন্তার মোড়। না, না। এ কী করছে সে! এই সর্বনাশা মোহজালের মায়া তাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। এ-কথা ভুললে চলবে না, সংসারে কিছু পেতে হ'লে তার দাম দিতে হয়। কিন্তু তার তো কানাকড়িও সম্বল নেই। এই ক্ষুদ্রজীবনের যা কিছু সঞ্চয়, সব এক দিন জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। রেখে গেছে শুধু কালি। আজ চারি দিকে শুধু অন্ধকার, তার কোথাও নেই এক বিন্দু আলোর রশ্মি। অথচ এক দিন তার সবই ছিল। নারীজন্মের সেটা পরম সম্পদ, যা দিয়ে সে নিজে সার্থক হয়, অন্যকে সার্থক করে তোলে, অন্য দশ জন মেয়ের মত সেখানে সে-ও বঞ্চিত ছিল না। তার পর জীবনের বাইশটা বছর কাটতে না কাটতেই সংসারের সহজ সরল পথ থেকে কে তাঁকে নির্মম হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিল! তবু তো আশার মৃত্যু নেই, লোভের শেষ নেই। সব গেছে, তবু স্বপ্নের ঘোর কাটে না। বিধাতার এ কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

[ক্রমশঃ।

হায় সে কথা

এলা বসু

মরমের কথা হলো না বলা বলিতে গিয়া,
নিমেষ তরে সরমে বাধিল মুখর হিয়া।
সহসা কেন কেঁপে গেল মন
ধূলায় লুটাল বুকের ধন,
রহিল আঁখি আঁখিতে শুধু নীরবে চাহিয়া।
মরমের কথা হলো না বলা বলিতে গিয়া!

আজি নিশীথে বুকের মাঝে কে মরে কাঁদিয়া,
হারানো ক্ষণের ছিন্ন মালা গাঁথিব কি দিয়া?
বহু আয়াসে সযতনে গাঁথা,
বহু বরষের আঁখিজল মাখা,
নিমেষে সে যেন চলে গেল তারে পায়ে দলিয়া,
আজি নিশীথে বুকের মাঝে কে মরে কাঁদিয়া?

বুঝেছি স্বপ্ন ভেঙ্গেছে শুধু রয়েছে ঘোর,
শেষ বসন্তের ডালা সাজানো হয়েছে মোর।
নেই আর যে উতলা ফাগুনে
আবীর খেলা বিহ্বল মনে,
মুগ্ধ বয়ানে লজ্জা নয়নে জড়ানো ভোর!
বুঝেছি স্বপ্ন ভেঙ্গেছে, শুধু রয়েছে ঘোর!

রয়েছে শুধু হাসিতে ঢাকা কথার ছল,
অন্ধ দৃষ্টি খুঁজে না পায় বুকের তল।
নেই আর সে ব্যাকুল চাওয়া
মধুর দিঠিতে মধুর পাওয়া,
ভরা জোয়ারে ভেসে চলে যাওয়া হৃদয় দল
রয়েছে শুধু হাসিতে ঢাকা কথার ছল!

নাই হলো তবে ছিন্ন ক্ষণের মালা গাঁথা,
ধূলায় মিশাক অবহেলায় তুচ্ছ যা তা।
পাবার যা তা পেয়েই গেলেম,
শূন্য হৃদয় ভরে নিলেম।
রইল সেথায় চিরদিনের আসন পাতা।
নাই হলো তবে ছিন্ন ক্ষণের মালা গাঁথা!

হায় সে কথা বলিতে সেদিন হলো না বলা,
মরম-মাঝারে থাকুক সেই চির না-বলা।
বুঝি বা কভু ঘুমভাঙ্গা রাতে
অশ্রু-সজল নয়ন পাতে,
মানসতীরে শুনিব তাহার একেলা চলা,
হায় সে কথা বলিতে সেদিন হলো না বলা।

পঞ্চতপা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৬

ছুটির দিন নয়। তবু মস্ত একটা মাছ এনে হাজির নরেন চৌধুরী। এই বেখাপ্পা জায়গায় টাটকা মাছ কমই জোটে। রেফ্রিজারেটারের কল্যাণে একবারের চালান পাঁচ-সাত দিন চালায় এখানকার মাছের কারবারী। তাই সামনা সামনি লোভনীয় কিছু পেয়ে গেলে ছুটির দিন হোক আর যেদিন হোক নরেন চৌধুরীর পক্ষে লোভ সামলানো দায়।

নতুন নয়। এ রকম আরো হয়েছে। সান্ত্বনা খুব একপ্রস্থ বকাঝকা করে দাওয়ায় বসে সেই মাছ কোটা প্রায় শেষ করে এনেছে। অবনী বাবু সকালের আপিসে বেরুবার উদ্যোগ করছিলেন। তাঁর সঙ্গে আপিস সংক্রান্ত কিছু দরকারী কথাবার্তা সেরে ঘরে এসে নরেন বলল, যাক্, তোমার পিতৃদেবকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ইস্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া গেল, এখন বাবা নিশ্চিন্দি!

—আপনার ইস্কুল নেই?

হতাশ-নেত্রে তার দিকে চেয়ে থেকে নরেন বলল, এট্ টু ব্রুটাস! তোমার বাবাকে বলে দিলাম একটু বাদে যাব—এই মাছ রেখে এক্ষুনি যাই কি করে বলো!

—আ-হা, তা তো বটেই! চুপটি করে এবার ওই মোড়ায় বসে থাকুন, আমায় কাজ করতে দিন নয় তো আপনার মাছ আবার জলে গিয়ে সাঁতার কাটবে।

হৃষ্টচিত্তে মোড়ায় আসন পরিগ্রহ করল নরেন চৌধুরী।—বেশ। কিন্তু আমি তা হলে মুখ বুজে বসে এখন কি করব?

—কান কুড়কুড় করুন।

মস্ত এক সমস্যার সমাধান হল যেন। পকেটে হাত ঢুকিয়ে নরেন হাতীর দাঁতের কান-কাঠি বার করল। তারপর সন্তর্পণে সেটা কর্ণপটহে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে গোটাকতক সেই অদ্ভুত শব্দ বার করল গলা দিয়ে। হাসতে হাসতে সান্ত্বনা বঁটির ওপরেই পড়ে আর কি। কি বিচ্ছিরি স্বভাব, মা গো!

—এই। এই মেয়ে! কেটে এক্ষুনি রক্তগঙ্গা হবে যে! থাক্ বাবা, এই আমি রেখে দিচ্ছি কান-কাঠি। সাধে কি সবাই ছেলেমানুষ বলে!

ছদ্মকোপে সান্ত্বনা তাকালো তার দিকে, কে বলে?

—ওই ওরা—।

—কারা?

—ওই ড্যাম কলোনীতে যারা কাজ করে, যারা মাটি কাটে, যারা ইঁট চুন সুরকি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে তারা—তাদের সঙ্গেই বেশি ভাব কি না তোমার।

—মিথ্যেবাদী! আবার মাছ কাটায় মন দিল সান্ত্বনা।

নরেন দেখছে। সেদিনের মত দৈ-মাছ হবে তো?

—হুঁ।

—আর মাছের পোলাও?

—হবে।

—আর মাছের চপ?

—হবে, হবে, হবে—বাবারে বাবা, একেবারে পেটুক রাম গোস্বামী! নামকরণের ফুর্তিতে নিজেই হেসে উঠল খিলখিল করে।

হাসির ধার দিয়েও গেল না নরেন। গম্ভীর মুখে প্রস্তাব করল, একটা ছুতোনাতায় আজ তাহলে আপিসটা কামাই করে দিই, কি বলো?

—তা হলে কিচ্ছু হবে না। সেবারের মত ঠিক একটায় গাছতলায় বসে লাঞ্চ খাবেন।

কিন্তু নরেন চৌধুরীর এই অবসর বিনোদনের আনন্দে ছেদ পড়ল একটু পরেই।

কড়া নাড়ার শব্দ হল বাইরে।

সান্ত্বনা উঠে দেখতে গেল।

ভৃত্যশ্রেণীর একজন লোক দাঁড়িয়ে। সান্ত্বনা চেনে তাকে। অনেকদিন তার পিছনে পিছনে অথবা আগে আগে টিফিন ক্যারিয়ারে করে মনিবের খাবার নিয়ে নামতে দেখেছে। লোকটার ভাবভঙ্গী চালচলনে একটা গুরুগম্ভীর আত্মমর্যাদার ভাব দেখে ডেকে আলাপ করে নি কখনো। সকৌতুকে নিরীক্ষণ করেছে শুধু। বড়সাহেব অর্থাৎ চিফ ইঞ্জিনিয়ারের খাস চাকর নিধুরাম। নরেনের মুখে ওর গল্পও শুনেছে সান্ত্বনা। বহুকাল ধরে আছে, এবং প্রভুর হাবভাব চালচলন সযত্নে অনুশীলন করে আসছে।

—নরেন বাবু এখানে আছেন দিদিমণি?

সান্ত্বনা ঘাড় নাড়ল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নিধুরাম। সায়েবের চিরকুট নিয়ে আমি তামাম রাজ্যি উঁয়াকে খুঁজতেছি। একবার ডেকে দেন।

সান্ত্বনা হাত বাড়াল, আমায় দাও, আমি দিয়ে দিচ্ছি।

ফিরে এসে সেটা নরেনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই নিন, আপনার—।

—কে দিলে?

—ভগীরথ বাবুর চাকর নিধু।

কিছু না বুঝেই নরেন চিরকুটটা নিয়ে পড়ল। বড় করে একটা নিরুপায়-দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়ে থেমে গেল। বিস্মিত নেত্রে তাকালো, ভগীরথ বাবু মানে?

নিরীহ মুখে ফিরে তাকালো সান্ত্বনা। নরেন চৌধুরী হা হা করে হেসে উঠল।—তোমার সাহস তো কম নয়। বিলেত জার্মান ফেরত চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে সেদিন ওই কাণ্ড করলে, আজ আবার তাকে বলছ ভগীরথ বাবু!

—সেদিনও বলেছিলাম। সান্ত্বনা হেসে ফেলল, আমার কি দোষ, আমি কি গুণে জানব উনি বড় সাহেব—কোট প্যাণ্টের যা ছিরি, ওঁর থেকে আপনাকেই অনেক বড় সাহেব মনে হয়।

—ঠাট্টা হচ্ছে! কিন্তু সেদিনের কথাবার্তায় তো মনে হল বড় সাহেব ওরকম বলেই বেশি পছন্দ তোমার।

সান্ত্বনাও ছাড়বার পাত্রী নয়। স্বীকার করে নিল। পছন্দই তো। সুন্দরীর জন্য ওঁকেই রাখব ভাবছি, এ ছোঁড়াটা বেজায় ফাঁকি দেয়। হাত অবশ্য কাঁচা, তা হলেও গায়ে জোর টোর আছে, পারবে 'খন—।

যাকে নিয়ে এই হাসি-ঠাট্টা, তার চিরকুটের তাগিদটুকু তা বলে ভোলা চলে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নরেন চৌধুরীকে উঠতে হল।—যাই বাবা, এক্ষুনি হয়তো আবার দ্বিতীয় দফা পেয়াদা এসে হাজির হবে।

সান্ত্বনা হাল্কা নিঃশ্বাস ফেলল একটা। এই মানুষটির আচরণে এতটুকু ব্যতিক্রম দেখেনি কখনো। ভালো লাগতো। এখনো লাগে। কিন্তু কোথায় যেন তফাৎ একটু। এতক্ষণ তার এই বসে থাকাটা শুধু মাছের আকর্ষণে কি না আগে একবারও মনে হত না। কিন্তু এখন হয়। তফাৎ এখানেই। সবপ্রথম মাসি ওকে সমঝে দিয়ে গেছে। তারপরে চাঁদমণি আর হোপুনের নিভৃত-বিনোদনের ছাপটা চেষ্টা করেও তুলতে পারেনি মন থেকে। আর নিজের সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি ওকে সচেতন করেছে মড়াইয়ের বুকে কণ্ট্রাক্টর রণবীর ঘোষের সেই নগ্ন দৃষ্টিলেহন। সব মিলিয়ে সান্ত্বনার ভিতরে ভিতরে পরিবর্তন হয়েছে একটু। এই পরিবর্তনের উপলব্ধিটুকুই অস্বস্তির কারণ।

একটা বাজার কিছুক্ষণ আগে সান্ত্বনা দুই হাতে দুই টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কাঁধেও একটা থলে ঝুলছে। মেন কোয়ার্টারস্ ছাড়িয়ে একটু নেমে আসতেই হঠাৎ চোখে পড়ল অদূরে টিফিন ক্যারিয়ার হাতে আর একটি লোকও হেলে দুলে চলেছে। নিধুরাম—। ডাকল, ও নিধু, বাবুর খাবার নিয়ে যাচ্ছ?

ডাক শুনে নিধুরাম দাঁড়িয়ে পড়ল। সে কাছে আসতে একগাল হেসে জবাব দিল, হ্যাঁ গো দিদিমণি, তুমিও খাবার নিয়ে যাচ্ছ?

যেন একই কাজ দু'জনার। খুশি মুখে সান্ত্বনা বলল, হ্যাঁ, বাবার আর নরেন বাবুর। ভালোই হল, চলো তোমার সঙ্গে যাই।

—অত বড় বড় দুটো টিফিন-কার নিয়ে তোমার কষ্ট হচ্ছে না? একটা বরং আমায় দাও—

সান্ত্বনা জবাব দিল, কিছু কষ্ট হচ্ছে না, নামার সময় ভারী হলেও টের পাওয়া যায় না।

দু'পা এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল, বাবুর রান্না তুমিই কর বুঝি?

নিধু সগর্বে জবাব দিল, শুধু রান্না! সব কাজেই এই নিধুরাম—নিধু ছাড়া বাবু অচল।

কি ভাবল সান্ত্বনা। নিছক মেয়েলি কৌতূহল। আগেও হয়েছে। কিন্তু আগে সুযোগ মেলেনি। পথের ধারে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ে বলল, এখানে বসি দু'মিনিট, একবারে অত হাঁটতে পারিনে। আচ্ছা দেখি নিধু কি রাঁধলে তুমি—।

জবাবের প্রতীক্ষা না করে তার হাত থেকে টিফিন ক্যারিয়ার টেনে নিল। ক্যারিয়ারের হাণ্ডেলে একটা তোয়ালে জড়ানো। খুলে যা দেখল, সান্ত্বনার চক্ষুস্থির।

—ভাত যে ঠাণ্ডা কড়কড়ে হয়ে আছে নিধু!

—বাবুর ওই রকমই খাওয়া অব্যেস, আমি গরম ভাত ছাড়া খেতে পারিনে।

বাটি তুলে তুলে সান্ত্বনা দেখছে। এক বাটিতে একটু তরকারি, পরের বাটিতে একটু মাছ। দেখে মুখে কুঞ্চন রেখা পড়ল গোটা-কতক। নিধু বলল, তলার বাটিতে বিলিতি বেগুনের চাটনিও আছে।

—এই দিয়ে খাবেন তোমার বাবু?

আত্মপ্রত্যয়ে মাথা দুলিয়ে হাস্যবদন নিধুরাম বলল, হ্যাঁ, একেবারে তৃপ্ত হয়ে খাবেন। আমার বাবু বড় ভালো গো দিদিমণি—যা রেঁধে দিই মুখটি বুজে খেয়ে নেন।

—খাসা! সান্ত্বনা হঠাৎ রেগেই গেল যেন। কিন্তু নিধুর কাছে সেটা প্রকাশ পেল না। বাটিগুলো আবার গুছিয়ে টিফিন ক্যারিয়ার বন্ধ করল সান্ত্বনা। এক মুহূর্ত ভেবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, ওই শালতলা থেকে দু'টো পাতা কুড়িয়ে আনো তো, হাতে লেগে গেছে।

নিধু বলল, এই তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেল না।

—আঃ, যা বলচি শোন না, ওই তো কত পাতা পড়ে আছে।

থতমত খেয়ে নিধু তাড়াতাড়ি পাতা আনতে গেল। ফিরে এসে দেখে দু'হাতে দুই টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, থাকগে দরকার নেই, মুছে নিয়েছি।

পাতা ফেলে তোয়ালে জড়ানো টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে নিধুরামও অগ্রসর হল। কিন্তু সান্ত্বনা থামল পরক্ষণেই।—তুমি যাও নিধু, আমার একটা জিনিস আনতে ভুল হয়ে গেছে, চট করে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।

হন হন করে সে ফিরে চলল আবার।

হতভম্বের মত নিধুরাম দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। খেয়াল করলে তফাৎ কিছু খেয়াল হবারই কথা। এই মর্মগ্রাহী যোগাযোগ এবং নারী-চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তার কথা ভাবতে ভাবতে নিধু গন্তব্য পথে অবতরণ করতে লাগল।

কিন্তু সেটুকু যথাযথ উপলব্ধি করল যখন, দুই চক্ষু স্থির একেবারে।

আপিস ঘরে বসেই মধ্যাহ্নের আহার পর্ব সমাধা করে থাকে বাদল গাঙ্গুলি। টিফিন ক্যারিয়ার থেকে একে একে আহার্য সামগ্রী নাবাচ্ছে আর অবাক হচ্ছে। আর ততোধিক বিস্ফারিত হয়ে উঠছে অদূরে দণ্ডায়মান নিধুরাম।

—কি রে, করেছিস কি এসব—এ আবার তুই কবে রাঁধতে শিখলি?

টেবিলের ওপর তোয়ালের পাশে টিফিন ক্যারিয়ারের হাণ্ডেলের দিকে তাকালো নিধুরাম। অবাক বিস্ময়ে দেখল তোয়ালেটা তাদের বটে, কিন্তু টিফিন ক্যারিয়ারটা তাদের নয়। আহাররত মনিবের দিকে তাকালো। কি বলতে গিয়েও ভোজ্য পদার্থের দিকে চেয়ে রসনা সিক্ত হয়ে ওঠায় আর বলা হল না। চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল শুধু।

খেতে খেতে বাদল গাঙ্গুলি বলল, এমন যদি রাঁধতে পারিস হাঁদারাম, বারমাস ওই একঘেয়ে ছাইভস্ম খাওয়াস কেন শুনি?

ঢোঁক গিলে নিধুরাম হাসতে চেষ্টা করল শুধু। চোখের দৃষ্টি মাছ আর পোলাওয়ের ওপরেই আটকে আছে। বাবুর খাওয়ার নমুনা দেখে কিছু মাত্র আশা আছে বলে মনে হল না। বাটির শেষ মাছের টুকরোটাও প্লেটে নামিয়ে নিয়েছে···।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করুণ নেত্রে আহার পর্যবেক্ষণ করতে লাগল নিধুরাম।

ওদিকে বাড়ি ফিরে আবার টিফিন ক্যারিয়ার ভরে নিয়ে আসতে আসতে ভাবছে সান্ত্বনা। কাজটা ভালো হল না। ভদ্রলোক জানবেই। জানুক, কিন্তু ওই দিয়ে খায় কি করে। তবু ভালো হল না কাজটা। কি ভাববে কে জানে। হয়ত হাসবে মনে মনে আর মজা করে খাবে। মেয়েদের পরে লোকটার বিষম অবজ্ঞা শুনেছে। একে একে তিনজনের মুখে শুনেছে। অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের স্ত্রী মিসেস চ্যাটার্জির চায়ের আমন্ত্রণ প্রসঙ্গে নরেন বাবু বলেছিল প্রথম। কি বলেছিল অত মনে নেই, কিন্তু মেয়েদের প্রতি লোকটার মনোভাব প্রসঙ্গেই কি যেন ইঙ্গিত করেছিল। তারপর সেদিন মড়াইয়ে বসে পাগল সর্দার সখেদে বলেছিল। বলেছিল বড়সাহেব শুধু কাজই বোঝে মেয়েদের দাম বোঝে না। আর ভুতু বাবুও সেদিন বড়সাহেবের অনুশাসন প্রসঙ্গে প্রকারান্তরে সেই কথারই সমর্থন করেছে।

শুনে ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়েই ছিল সান্ত্বনা। আজ বিরক্তি বাড়ল আরো। যা খুশি খাক, যেমন খুশি খাক, ওর তাতে কি! কোন খোশামোদ তোষামোদের ধার ধারে না সে। কিন্তু লোকটা তাই ভাববে হয়ত···।

বাবার নির্দিষ্ট শিলাসনে খাবার রেখে সান্ত্বনা বলল, নাও বাবা, তুমি বসে যাও, আমার একটু দেরী হয়ে গেল আসতে, নরেন বাবুকে আমি খুঁজে বার করে নিচ্ছি।

ক্ষিদের মুখে অবনী বাবু আর দ্বিরুক্তি করলেন না। দ্বিতীয় টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে সান্ত্বনা নরেনের আপিস ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে কেউ নেই। বেরিয়ে এলো। দালানের পিছনের গাছতলায় ধ্যানী বুদ্ধের মত বসে আছে চুপচাপ। সান্ত্বনা হেসে ফেলল।

—কি ঘুমুচ্ছিলেন না কি?

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে নরেন জবাব দিল, খেতে দেবার লোভ দেখিয়ে এ ভাবে শাস্তি দিতে বোধ হয় মেয়েরাই পারে।

—সত্যি বড় দেরী হয়ে গেল। পরিপাটি করে আহার্য গুছিয়ে দিল তার সামনে। নিন্, এবারে শুরু করুন।

নরেন বলল, আগে দেরী হল কেন তাই শুনি?

—নিজে দিব্যি করে খেয়ে দেয়ে ঘুমুচ্ছিলাম বলে আরম্ভ করুন, নয় তো সব আবার টিফিন ক্যারিয়ারে তুলে নোব এক্ষুনি।

ত্রস্তে আহারে মন দিল নরেন চৌধুরী। গো-গ্রাসে। সান্ত্বনা হাসতে লাগল।

মড়াইয়ের অন্ত ধারটা দেখা যায় এখানে বসেও। লোকজন তেমন নজরে আসে না। যন্ত্রপাতি বা গঠন সমারোহ কিছু কিছু চোখে পড়ে। একটা ছুটো করে কন্‌ক্রিটের ব্লক উঠছে প্রায় পাতাল গর্ভ থেকে। এরকম বহু ব্লক একসঙ্গে জুড়ে দিলে তবে মড়াইকে বরাবরকার মত প্রাচীর অবরোধে দ্বিখণ্ডিত করা সম্পূর্ণ হবে। সান্ত্বনার মনে পড়ল কি যেন। সেদিন ব্যাপারটা ঠিক মত বুঝতে পারে নি। বলল, আচ্ছা, ওই ব্লকের নীচে যে লোহার ঘরের মত কি একটা তৈরী হচ্ছে, ওটা কী?

—দাঁড়াও বাপু, এখন তোমার কথার জবাব দিতে গেলে আমার খাওয়া পণ্ড।

—আঃ, বলুন না কি ওটা—লোহার ঘরের মধ্যে একরাশ লোহা-লক্কর দরজা ঢাকা হ্যাণ্ডেল-ম্যাণ্ডেল—কি হচ্ছে ওখানে?

—অটোমেটিক প্রেসার গেট হচ্ছে। বুঝলে?

সান্ত্বনা ঘাড় নাড়ল, না। কি হবে ওতে?

—বরাবর জলের নীচে থাকবে, জল বাড়লে তার প্রেসারে আপনি যন্ত্রপাতি চলবে, আর কমলে আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

সান্ত্বনা উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তার পর?

—তার পর পোলাওয়ের সঙ্গে কালিয়া মিশিয়ে তাতে চপ ভেঙে একেবারে উদরে চালান। আচ্ছা, আমাকে এখন বকাচ্ছ কেন, দেখছ না ব্যস্ত আছি?

কিন্তু সান্ত্বনার মন তখন অন্য রাজ্যে ধাওয়া করেছে। সাগ্রহে বলল, চলুন তাহলে ওর ভিতরে এক দিন গিয়ে ঘুরে আসি।

—কেন?

—আপনি তো বলছেন, বরাবর ওটা জলের নীচে থাকবে। কেউ জানতেও পারবে না ওখানে এ রকম একটা জিনিস আছে, আর সান্ত্বনা বলে একটা মেয়ে সেখানে ঘোরাঘুরি করত—বেশ মজা না?

বড় রকমের একটা গরাস মুখে তুলে নরেন বলল, হুঁঃ! তোমার তো সবেতেই মজা।

বাস্তবে ফিরে এল সান্ত্বনা। তেমনি জবাব দিল, না, তা কেন, যত মজা আপনার ওই পোলাও-কালিয়ার মধ্যে।

ওর এ ধরনের আগ্রহের কারণ কিছু কিছু জেনেছে নরেন চৌধুরী। কিছু একটা জিজ্ঞাসা করার জন্যই মুখ তুলল এবার। কিন্তু সান্ত্বনা কেমন যেন বিব্রত হয়ে উঠেছে হঠাৎ। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ফিরে তাকালো। পায়ে পায়ে এদিকে আসছে চিফ ইঞ্জিনীয়ার বাদল গাঙ্গুলি। কাছে আসতে নরেন হেসে ফেলল।—আবার তুমি এসে গেলে, নিরিবিলিতে খাচ্ছিলুম চাট্টি!

মৃদু হেসে বাদল গাঙ্গুলি দু'জনকেই নিরীক্ষণ করল একবার। পরে সান্ত্বনার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, অষ্টপ্রহর জলকীর্তন শোনেন বলেছিলেন সেদিন—এঁর কাছে শোনেন?

সান্ত্বনা জবাব দিল না। এক গাল মুখে নিয়েই নরেন চৌধুরী দু' চোখ কপালে তুলে বলল, আমি জলকীর্তন করি! ওর কাছে!···আর জন্মে ও-ই বরং চাতক পাখী ছিল, জল আসবে শুনেই মনে মনে অষ্টপ্রহর সাঁতার কাটছে তাতে।

সান্ত্বনা বড় রকমের একটা ভেংচি কাটল তাকে।—হ্যাঁ কাটছে সাঁতার, আপনাকে বলেছে।

বাদল গাঙ্গুলি সকৌতুকে চেয়ে রইল। সশব্দে হেসে উঠল নরেন চৌধুরী। পরে বলল, বোসো না, দাঁড়িয়ে কেন, দেখ কি খাচ্ছি, এ রাজ্যে এ রকম জোটে না সচরাচর, সান্ত্বনা আর একটা ডিশ—

শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল সান্ত্বনা! অনেক দেরী হয়ে গেল, বাবা অপেক্ষা করছেন, আমি—আমি চলি, খাওয়া হয়ে গেলে ওগুলো বেয়ারা দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

যাবার জন্য পা বাড়াল।

বাদল গাঙ্গুলি জিজ্ঞাসা করল, ওই···ও ভালো আছে?

সান্ত্বনা থামল।—কে?

—ওই কি যেন ওর নাম—আপনার সুন্দরী?

বিব্রত হোক আর যাই হোক, উষ্ণতার আঁচটুকু যায়নি। তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, হ্যাঁ ভালো আছে, আপনার খোঁজ করছিল।

দ্রুত প্রস্থান করল। ঝাঁজ মিটেছে একটু। বড়সাহেব হোক আর যেই হোক, খাবার পাঠাক আর যাই করুক, ও কেয়ার করে না কাউকে সেটা বুঝবে।

এরকম কথা চিফ ইঞ্জিনিয়ার শুনে অভ্যস্ত নয়। বিস্মিত নেত্রে চেয়ে রইল যতক্ষণ দেখা গেল।

মনে মনে বিব্রত একটু নরেনও হয়েছে। হেসে বলল, কিছু মনে কোরো না হে, ওর চালচলন কথাবার্তা সব ওই রকম!···তোমাকে দেখার আগে তো একেবারে ভগবান গোছের একজন ঠাওরেছিল।

তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাদল গাঙ্গুলি হাল্কা জবাব দিল, আর দেখার পরে গোপাল ভেবে গোরু টানিয়ে ছেড়েছিল।

নরেন সশব্দে হেসে উঠল। না হে, ভয়ানক লজ্জা পেয়েছে সেদিন, সে যদি দেখতে···

সেদিন না হোক, আজ লজ্জার বহর স্বচক্ষেই দেখল বটে। সে কথা বলেই টিপ্পনী কাটতে যাচ্ছিল আবারও। কিন্তু তার আগেই ছড়ানো আহার্য সামগ্রীর দিকে চোখ আটকে গেল যেন। সেই মাছের পোলাও আর কালিয়া, সেই মাছের ফ্রাই আর চপ।

অবাক বিস্ময়ে চেয়েই রইল সে।

—কি হল? নরেন বুঝে উঠছে না।

—কিছু না, খাও তুমি। আত্মস্থ হয়ে নিজের আপিস ঘরের দিকে পা বাড়ালো আবার।

বাবার কাছে যাবার কোন তাড়া নেই সান্ত্বনার। তাঁর টিফিন ক্যারিয়ারও বেয়ারাই নিয়ে যাবে। মেজাজ এখন প্রসন্ন একটু। ভুতু বাবুর দোকানের উদ্দেশে চলল। যাবে ঠিকই করেছিল। সেদিনের চায়ের পয়সা ক'টি দেওয়া হয়নি।

কিন্তু এসে দ্বিগুণ বিস্ময় আর দ্বিগুণ বিপন্ন অবস্থা তার।

এক কোণে, বাইরে থেকে দেখাও যায় না এমনি এক কোণের বেঞ্চিতে পাশাপাশি-ঘেঁষাঘেঁষি বসে চা খাচ্ছে আর হেসে গল্প করছে একটি মেয়ে আর একটি পুরুষ। মেয়েটিকে চেনে সান্ত্বনা। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের মেয়ে ঝরণা। আর লোকটিকেও যেন দেখেছে কোথায়···। টেবিলের ওপরেই ছোট একটা স্যুটকেস।

ভুতু বাবু তার ক্যাশবাক্সের সামনে বসে নিরাসক্ত মুখে একটা পুরানো কাগজ নাড়াচাড়া করছে। তার চোখ-কান অন্যত্র, অর্থাৎ সেই কোণের দিকে। হঠাৎ সান্ত্বনাকে দেখে উৎফুল্ল মুখে বলে উঠল, এই যে, আসুন মা-লক্ষ্মী, আসুন!

কোণের দু'জনের কলগুঞ্জনে ছেদ পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে তারা তাকালো এদিকে। ঝরণা মেয়েটি নিজের অজ্ঞাতেই যেন সঙ্গীর কাছ থেকে সুশোভন ব্যবধানে সরে বসল একটু। এদিকে মা-লক্ষ্মী রাঙিয়ে উঠেছে।

—বসুন মা-লক্ষ্মী, চা দিই? সানন্দে ভাবছে ভুতু বাবু, একটুখানি আব্রু দিয়ে আলাদা ক্যাবিন এবারে একটা না করলেই নয়।

সান্ত্বনা অস্ফুট আপত্তি জানিয়ে বলল, না, এখন চা নয়। পয়সা ক'টি বাড়িয়ে দিল, সেদিনের সেই···

আঁতকে উঠে হাত গুটিয়ে নিল ভুতু বাবু। কিন্তু কিছু বলার আগেই কাঠের বাক্সের ডালার ফুটো দিয়ে পয়সা ক'টা তাড়াতাড়ি ফেলে দিল সান্ত্বনা। তার পর যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই বাধা পড়ল আবার।

—চললেন যে? আমায় চিনতে পারলেন না? ঝরণা বলল।

বিব্রতমুখে ঘাড় নাড়ল সান্ত্বনা, চিনতে পেরেছে—।

—আসুন তাহলে পালাচ্ছেন যে বড়? আমরা বুঝি কেউ নই? উঠে এসে একেবারে হাত ধরে বেঞ্চির ওপর বসিয়ে দিল তাকে। সঙ্গীর উদ্দেশে বলল, আমাদের এখানে একাধারে গিরিকন্যা আর মড়াই-কন্যা আছেন একজন, তোমাকে বলেছিলাম না? এই ইনি —সাইনোশিওর অফ দি স্পট—লক্ষণীয় নক্ষত্রবিশেষ—আর ইনি এই···আমাদের একজন বন্ধু, কলকাতায় থাকেন, এখন ফিরে চলেছেন।—কই ভুতু বাবু, এঁকে চা দিলেন না?

আর এক পেয়ালা চা নিয়ে হাজির হল ভুতু বাবু।

পুরু লেন্সএর সোনালী চশমার ওধারে ঝিকিমিকি হাসি ও আর একজনের নীরব কৌতূহলের মধ্যে পড়ে সান্ত্বনা যেন হাবুডুবু খেতে লাগল। বিনিময়ে নমস্কারও করতে পারল না। কিন্তু তবু বন্ধুটিকে যেন চিনেছে সান্ত্বনা। ওদের অগোচরে যেন কোয়ার্টারসএ ঝরণার সঙ্গে দেখেছিল আর একদিন। ভেবেছিল, আত্মীয়-পরিজন কেউ হবে। প্রথম দিনের প্রথম দর্শনে ভালো লেগেছিল ঝরণাকে। কিন্তু আজ ভালো লাগল না তেমন। একটা অবিশ্বাসের কারণ দেখলে যেমন লাগে তেমনি লাগল।

ঝরণা জিজ্ঞাসা করল, ওপরে যাচ্ছেন তো? চলুন একসঙ্গে যাই। সঙ্গীর দিকে তাকালো, তোমার গাড়ির সময় হয়ে গেল বোধ হয়?

—হ্যাঁ, এইবার উঠব। হাতঘড়ি দেখা এবং জবাব।

তিনজনেই উঠল একটু বাদে। স্যুটকেস হাতে বন্ধু যথাবিধি বিদায় নিল। ওরা দু'জন চড়াইয়ের পথ ধরল।

রয়ে সয়ে উঠলে বড় জোর আধঘণ্টা লাগে সান্ত্বনার মেন কোয়ার্টারস পর্যন্ত উঠতে। প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল সেখানে। কিন্তু এই একঘণ্টা সান্ত্বনার এক জীবনের বিস্ময় যেন। মেয়েটার মাথায় গোলযোগ আছে কি না তাও সন্দেহ হচ্ছিল মাঝে মাঝে। ঝরণাই কথা বলে গেল। অনর্গল কথা। যে সব কথা একদিনের আলাপে কেউ বলে না, তেমন ধরনের কথাও। আর অজস্র হাসি। সান্ত্বনা বোবা সারাক্ষণ।

—সান্ত্বনাদের বাড়ি একদিন সে যাবে অনেকদিন ভেবেছে। সেই প্রথম দেখার পর থেকেই। হয়ে ওঠেনি।—কি করে হবে? ও বাবা! মায়ের যা ছুঁৎবাই বাছাই! তা এবার একদিন ঠিক যাবে। এখানে সে বাড়িতেই যায়, মেয়েরা, মানে মহিলারা সবাই বলে সান্ত্বনার কথা। বলে মানে টিপ্পনী কাটে। হিংসা, সোজা হিংসা—বুঝলেন না অ্যারিস্টক্র্যাট কি না ওরা। ও মা, আপনি আপনি করে বলছে কেন সে সান্ত্বনাকে! বয়েস কত? যতই হোক, সাতাশ তো নয়। ওর সাতাশ—মা অবশ্য···থাকগে, আর আপনি

বলবে না। ঝরণা কলকাতায় কবে যাবে? কেন? এম এ ক্লাশ! ···ও, মা বলেছিল বুঝি সেই প্রথম দিন—হ্যাঁ, এম, এ পড়ে বই কি, পাঁচ বছর ধরেই পড়ছে। কবে যে শেষ হবে পড়া কে জানে! না, হস্টেলে থাকে না। দাদার কাছে থাকে। দাদা বৌদি ঠিক মায়ের মনের মত হয়েছে। অ্যারিষ্টক্র্যাট হয়েছে। কি মজা জানো—ওই জন্তেই আবার বৌদির ওপর মা মনে মনে একটু—নিজের বোনেদের মধ্যে মায়েরই মন মত কিছু হল না কি না—বাবা তো এতদিনে ঘষে মেজে মোটে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার—বোনদের ওঁরা সব মস্ত মস্ত দিকপাল এক একজন। না, এখন সে চট করে যাচ্ছে না, মা, যেতে দিলে তো। নতুন নতুন কত হোমরা চোমরা লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হচ্ছে এখানে! নরেন চৌধুরী লোকটি বেশ—আলাপ হয়েছে, দিব্বি হাসি-খুশি আর তোমার প্রশংসায় তো পঞ্চমুখ! কিন্তু ওই গোমরা মুখো চিফ ইঞ্জিনিয়ারটিকে দেখলে গায়ে ঘর আসে, রসকস শূন্ত নিরেট একেবারে, প্রথম দিন পার্টিতে ওকে এন্টারটেন করতে গিয়ে মায়েরই হিমসিম অবস্থা, আমার মজা লাগছিল বেশ। আচ্ছা, এই যে লোকটা গেল, গাড়ি পাবে তো? আর একটু আগে উঠলেই পারত—মাষ্টারী বুদ্ধি আর কত হবে—মা বলে মাথায় শাদা দ্রব্য থাকলে কেউ আর প্রাইভেট কলেজে ছেলে পড়ায় না—কিন্তু লোকটা ভালো, বুঝলে—মা বলে বোকা কিন্তু আসলে ভালো বলেই একটু বোকা মত দেখায় আর কি।

সারাক্ষণ সান্ত্বনা স্থান কাল বিস্মৃত হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়েই ওপরে উঠে এলো। নিজে বোধহয় দশটা কথাও বলেনি, কিন্তু ঝরণা থামতে মনে হল ও নিজেই যেন হাঁপিয়ে গেছে বেশি। মেন কোয়ার্টারস্ এ পৌঁছেই হাসতে হাসতে বিদায় নিল ঝরণা। কিন্তু সোনালী চশমার ওধারে তার চকচকে দুই চোখে শুধু হাসিই চিকচিক করছিল কি না তাও যেন বুঝে উঠছিল না সান্ত্বনা।

বাড়ি ফিরে বাদল গাঙ্গুলি সামনে নিধুকে দেখেই জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁরে, আমার দুপুরের খাবার আজ কোথা থেকে এসেচে?

ফাঁপড়ে পড়লো নিধুরাম। বলত তখনই। কিন্তু সেই আহার্য সামগ্রী দেখে জিব নেড়ে কথা বলা শক্ত হয়ে পড়েছিল বলেই বলা হয়ে ওঠেনি তখন। কোন প্রকারে জবাব দিল, আজ্ঞে···বাড়ি থেকেই তো এসেছিল, পথের মধ্যে ওই···ওভারসিয়ার-দিদিমণি কি রেঁধেছি দেখতে চাইলে···তারপর কেমন করে কি হয়ে গেল!

প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস বাদল গাঙ্গুলির মুখে।—যা পালা, আর শোন, এখন কিছু খাব না।

দুপুরের খাওয়াটা বেশি হয়ে গেছে। জামা কাপড় বদলে হাতমুখ ধুয়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

ক্লান্ত লাগছে। রাজ্যের অবসাদ। কাজের মধ্যে ডুবে থাকে সারাক্ষণ কিন্তু আজ কিছু ভালো লাগছিল না। অন্যদিনের থেকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে। ঘরের আলো নিবিয়ে আরাম কেদারায় গা ছেড়ে দিয়েও আরাম কিছু পাচ্ছে না।

বিস্মৃতির কবরের তলায় সব কিছুর নির্বাসন অত সহজ নয় আজ সেটাই আবার নতুন করে উপলব্ধি করছিল বোধ হয়। কাজে ডুবে থাক আর যাই করুক। হাল ছেড়ে দিল বাদল গাঙ্গুলি।···আসুক ওরা। আসুক ব্যথার দূতেরা। আসুক খুশির দূতেরা। ভীড় করে আসুক নিভৃত অতল থেকে ব্যর্থতার যত বোঝা আর যত কিছু···।

এবারে যেন সহজ হল একটু। টানধরা স্নায়ুগুলি শিথিল হল অনেকটা। ওভারসিয়ারের ওই মেয়েটার আজকের এই খাবার বদলে পাঠানো থেকে সেই আর একদিনের আর এক মেয়ের টিফিন ক্যারিয়ার পাঠানো মনে পড়ছে। এক নয়। একরকমও নয়। বরং একেবারে উল্টো।···তবু মনে পড়ছে। আজ ছিল পূর্ণতার বিস্ময়। সেদিন ছিল শূন্যতার বিস্ময়।···সেদিন সেও ভালো লেগেছিল বাদল গাঙ্গুলির। কিন্তু সেদিনের সেই ভালোলাগাটুকুও বুকের ভিতরে টনটনিয়ে উঠছে যেন। ওর নতুন দিনের সেই ভরা প্রাচুর্য অমনি এক শূন্যতার দেউলে উজার করে দিয়ে বসে আছে আজও, সেই ব্যথাটাই যেন নতুন করে জাগিয়ে দিল একজন সামান্য ওভারসিয়ারের এক অতি সাধারণ মেয়ের ভরা টিফিন ক্যারিয়ার।

···ঠিক একটার সময় সেদিন মোটর হর্ন বেজে উঠেছিল নেশন-বিলডার্স লিমিটেডের দোর গোড়ায়।

উচু-নীচু, আপিসসুদ্ধ লোক চিনত এই মোটর হর্ন। তারা বলতে শ্যামের বাঁশী। সাত সুরে মেশানো মার্কামারা হর্ন। কিন্তু একটার সময় কেউ শুনতে অভ্যস্ত নয় এ হর্ন। ওটা বেজে উঠত ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায়। ঘড়ির দিকে না চেয়েও অন্য কর্মচারীরা বুঝতে পারত, পাঁচটা বাজল। জানত, এইবার পড়ি মরি করে ছুটবে একজন। যত কাজ থাক, আর যত ফাইলই জমে উঠুক। সত্যি তাই। বাদল গাঙ্গুলি তখন কলের মানুষ নয় আজকের মত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হয়তো শেষ ফাইলের কাজ শেষ করে নিত সেই মুহুর্মুহু হর্নের তাগিদে। নয়ত ঠেলে একপাশে সরিয়ে রাখত পরের দিনের জন্য। তারপর একে ঠেলে, ওকে ধাক্কা দিয়ে তরতর করে নেমে আসত সিঁড়ি বেয়ে।

এরই মধ্যে তাক বুঝে একমাত্র নরেন চৌধুরীই এসে পথ রোধ করে দাঁড়াত মাঝে মাঝে। শ্যামের বাঁশি কথাটা তারই মস্তিষ্কজাত। গলা ছেড়েই একদিন বলে উঠেছিল, শ্যামের বাঁশি শুনে গোপিনীকুলই আকুল হত, লোক হাসালে তুমি!

তাকে ঠেলে দিয়ে বাদল গাঙ্গুলি জবাব দিয়েছিল, কলিতে সব উল্টো বন্ধু, সব উল্টো—।

তবু একমাত্র সে পথ আগলালেই থামতে হত। নরেন কখনো বলত, এ ফাইলের কাজ শেষ করে দিয়ে যাও, নয় তো খেসারত দিতে হবে।

—কি খেসারত?

—আমিও যাব সঙ্গে।

বাদল গাঙ্গুলি কখনো হিড় হিড় করে তাকে সুদ্ধ টেনে নামাতো সিঁড়ি দিয়ে। কখনো আবার এক ধাক্কায় তাকে ফিরে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে একাই ছুটত। একগাল হেসে মোটরাসনায় সামনে এসে দাঁড়াত। কে বলবে বাদল গাঙ্গুলি একজন ক্লাস ওয়ান ইঞ্জিনিয়ার, আর কে বলবে ওই ঝকঝকে তকতকে মোটর গাড়ি এক দ্রুতগতির যান্ত্রিক সরঞ্জাম মাত্র। ওই মোটর গাড়িতে নীলাকে গা এলিয়ে বসে থাকতে দেখলে কাব্যের সুড়সুড়ি লাগত ক্লাস ওয়ান ইঞ্জিনিয়ারের মনোযন্ত্রের মধ্যিখানে। রোজ দেখত আর রোজই ভালো লাগত আর রোজই নতুন লাগত।

রাতের পর রোজই তো সকাল হয়, রোজই কি সেটা নতুন নয়? রোজই তো সূর্য ওঠে, নতুন নয় রোজই?

যতক্ষণ না নেমে আসে, থেকে থেকে ততক্ষণই হর্ন বাজে। দেরী হলে ছদ্ম কোপে নীলা ঝাঁজিয়ে উঠত, কানে তুলো গুঁজে বসে থাকো না কি, একধার থেকে হর্ন বাজাচ্ছি!

দরজা খুলে ধুপ করে তার পাশে বসে পড়ে বাদল জবাব দেয়, শুনেছি, সবকটাই শুনেছি—তোমার ওই মিষ্টি হর্ন শুধু আমার নয়, আপিসসুদ্ধু লোকেরই কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে গিয়ে বেঁধে —কিন্তু সখি, কাজ বড় বিষম গরল।

তবে নাবো, কাজই করো গে যাও!

কখনো আবার কোন জবাব না দিয়ে সেই ভরা দিনের খোলা রাস্তায়, মোটরের ভিতর হঠাৎ একেবারে তার সপ্রগলভ সান্নিধ্যে ঝুকে আসত বাদল গাঙ্গুলি।

—এই! ষ্টিয়ারিং ছেড়ে যথাসম্ভব দরজার দিকে ঝুঁকে বসত নীলা। রাস্তার মধ্যে ইয়ারকি করতে হবে না। রাগ দেখাত সত্যি, কিন্তু ঠোঁটের হাসিটুকু একেবারে গোপন করতে পারত না। গাড়িতে ষ্টার্ট দিত তারপর। কমলকলি হাতে ষ্টিয়ারিং ধরে গাড়ি চালাত আর বাদল গাঙ্গুলি দেখত চেয়ে চেয়ে। গাড়িটা যেন ওর দাসানুদাস।

কখনো পার্টিতে যেত, কখনো নাচগান বাজনার আসরে, কখনো ক্লাবে বা থিয়েটার বায়স্কোপে। আবার কখনো কোথাও না—শুধু পাশাপাশি যাওয়াটাই উপলক্ষ।

রোজ, প্রত্যহ।

কিন্তু দিনে দুপুরে বেলা একটার সেদিন ওই মোটরের হর্ন কেন?

দোতলার বিশাল হলেরই একধারে সারি সারি চেম্বার পদস্থ অফিসারদের। ওরই একটা থেকে স্প্রিং আঁটা দরজা ঠেলে এক্ষুনি একজন বেরিয়ে এসে হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ির দিকে ধাওয়া করবে এবার, সেটাই প্রত্যাশিত ছিল হলের কর্মমগ্ন কর্মচারীদের। কিন্তু কেউ এলো না। যার উদ্দেশে হর্ন, তার চেম্বার থেকে বেয়ারার উদ্দেশে প্যাঁক করে একটা শব্দ হল শুধু।

বাদল গাঙ্গুলি জানত এসময়ে এই হর্ন বাজবে; কিন্তু বাজলেও ব্যস্ত হওয়ার মত কিছু নয়। বেয়ারা ছুটে আসতে তাকে বলল, দেখো, ওই নীচের গাড়িতে আমার খাবার এসেছে, নিয়ে এসো।

বেয়ারা প্রস্থান করল।

দুপুরে সেদিন ওর লাঞ্চের নেমন্তন্ন ছিল নীলার ওখানে। প্রায়ই থাকে। কিন্তু সম্প্রতি কাজে ব্যস্ত খুব। একবার উঠলেতো আর অল্প সময়ে হবে না। বাদল বলেছে তার খাবার আপিসে পাঠিয়ে দিতে।

—কেন, তোমার আসতে কি?

—বেজায় চাপ কাজের, তোমার বাবাই বিষম তেঁতে আছেন, ছুটি মিলবে না।

নেশান বিল্ডার্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বিপুল বাড়রী। নাম ডাকের ছড়াছড়ি। সরকারী বেসরকারী এক্সপার্ট কমিটিতে বিশেষজ্ঞ হিসাবে ডাক পড়ে যখন তখন। নীলার বাবা। বাদল গাঙ্গুলির ভাবী শ্বশুর। হলে কি হবে, কাজের সময় কোন সম্পর্কের ধার ধারেন না। একটু এদিক ওদিক হলে ছাড়ন ছোড়ন নেই। সেই বলেই ধাপে ধাপে এত অল্প সময়ে অতটা উঠতে পেরেছিল বাদল গাঙ্গুলি। কারণ, এদিক-ওদিক বড় হত না তার কাজ। হলেও ভালর জন্যেই হয়েছে। অনেক বার সেটা বুকটান করেই প্রমাণ করে এসেছে সে।

ভুরু কুঁচকে নীলা চেয়েছিল তার দিকে। অর্থাৎ চালাকি পেয়েছ? হাত ধরেই টানতে টানতে নিয়ে গেছে পাশের ঘরে। —বাবা, কাল ও লাঞ্চে আসতে পারবে না বলছে, এত কাজ তুমি নাকি ছুটি দেবে না—খাবার আপিসে পাঠিয়ে দিতে হবে।

পাইপ মুখে বিপুল বাড়রী হাসেন। বাদল গাঙ্গুলির পদমর্যাদায় দু' ঘণ্টা ছুটি দেওয়া না-দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু কাজের চাপটা মিথ্যে নয়। আর শ্রীমান কাজ ছেড়ে একবার বেরুলে খেয়ে-দেয়ে সুবোধ ছেলেটির মত আবার আপিস করবে সে আশাও রাখেন না। বলেছেন, কাজটা আগে না তোর খাওয়া আগে? তুই তো তোর বন্ধুদের কম্প্যানী পাচ্ছিসই—ওর খাবারটা পাঠিয়েই দিস।

পছন্দ হল না। নীলারও না, নীলার মায়েরও না। মিসেস বাড়রী বললেন, আচ্ছা, কতক্ষণই বা লাগবে—তোমার কাজ একেবারে উল্টে যাবে ওটুকুতে!

বিপুল বাবু জবাব দেন, ওল্টাবে কি না সে তো ওই ভালো জানে। কাজ আছে যখন বলছে নিশ্চয়ই কাজ আছে—ওটাও তো আপিস একটা না কি!

—থাক বাবা থাক, আপিসেই পাঠাব'খন সব খাবার। ফিরে যেতে যেতে রাগ করে নীলা বলেছে, আমারও যেমন—তোমার কাছে এসেছি বলতে।

দরজা ঠেলে অতিকায় টিফিন-ক্যারিয়ার নিয়ে বেয়ারার আবির্ভাব। টেবিল থেকে ফাইল সরিয়ে গ্লাস-ডিস সাজালো। তার পর টিফিন ক্যারিয়ার খুলে একেবারে হাঁ। প্রথম বাটিতে কিছু নেই—শুধু এক লাইন লেখা কাগজ একটা। বেয়ারার সামনেই অপ্রস্তুতের একশেষ। নীলা বড় বড় করে লিখেছে, খাওয়ার ইচ্ছে থাকে তো পত্রপাঠ চলে এসো। ওদিকে দ্বিতীয় বাটিটাও খুলে ফেলেছে বেয়ারা। তাতেও স্লিপ একটা। বাদল গাঙ্গুলি ইশারায় বেয়ারাকে বলল চলে যেতে। সব ক'টা বাটিতেই ওই এক টুকরো করে কাগজ। লাঞ্চের মেনু কি, কারা কারা অপেক্ষা করছে, কতক্ষণের মধ্যে না এলে মেনুটা শুধু মুখেই শুনতে হবে, ইত্যাদি।

টিফিন-ক্যারিয়ার দেখেই ক্ষিধেটা বেশ চাড়িয়ে উঠেছিল বাদল গাঙ্গুলির।...হাসিও পেয়েছে, আবার রাগও হয়েছে। বেশি রাগ হয়েছে বেয়ারার সামনে অপ্রস্তুত হয়েছে বলে। বোতাম টিপে তাকে ডাকল আবার। নির্দেশ মত সে টিফিন-ক্যারিয়ার ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল।

কিন্তু জব্দ বাদল গাঙ্গুলিও করতে জানে। কাজ মাথায় উঠল। বসে আছে অপেক্ষা করে। টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিল।

ওধার থেকে। কি এলে না?

এধার থেকে। এক্ষুনি যাবো, একেবারে মুখ তুলতে পারছি না। তোমরা অপেক্ষা কোরো না।

—না, ওরা তোমার জন্যে বসে আছে।

—সেইজন্যেই তো আরো যাবো না। আমার জন্যে তুমি একা বসে থাকবে।

—চালাকী করতে হবে না, এসো শিগ্‌গির।

—যাচ্ছি, তোমরা সুরু করো। হাতের কাজটুকু সেরে না গেলে তোমার বাবাই চাকরী খতম করে দেবেন। অপেক্ষা কোরো না কিন্তু, হ্যাঁ—ঠিক যাবো।

ঠিকই গিয়েছিল। ঠিক পাঁচটায় আপিস থেকে বেরিয়েছে। তার পর যেতে যতক্ষণ লাগে।

নীলা চটেছিল। তার থেকে বেশি চটেছিলেন নীলার মা। কেন জানি স্বামী বা মেয়ের মত ওকে অতটা সুচক্ষে দেখতে পারেন নি মহিলা। যেভাবে জামাইকে হাতের মুঠোয় পেতে চেয়েছিলেন, সে ভাবে ঠিক পাওয়া যাবে কি না তেমন একটা সংশয় ছিল বলেই বোধ হয়। এত বড় বাড়ি, দু'টি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেদের তো ইস্কুলের বয়স পেরোয়নি। বিয়ের পর জামাই অনায়াসেই এখানেই থাকতে পারে। এখন থেকেই থাকতে পাবে। সে মনোভাব অনেকবারই ব্যক্ত করেছেন তিনি। কিন্তু গেঁয়ো মা-ই বেশি হল ওর। আর যে ছিরি ওর বাড়ির। মেয়ের সেখানে গিয়ে থাকার সম্ভাবনার কথা ভাবতেও শিউরে ওঠেন।

বিকেল পাঁচটা না বাজতে মেয়ে সেজেগুজে সাত তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে যায় কোথায় জানেন। বিরক্তও হন। মেয়ের বাবার উদ্দেশে অনেকদিন বলেছেন, যেমন তুমি তেমন তোমার মেয়ে, দু'জনেই তোমরা দিনকে দিন ওকে বাড়িয়ে তুলছ। ঘড়িতে চারটে বাজলেই মেয়ের আর তর সয় না, ছুটবে গাড়ি নিয়ে। কেন, গ্যাঁট হয়ে বাড়ি বসে থাক, ও আপনি আসবে'খন সুড় সুড় করে।

আড়াল থেকে নীলাও শোনে! বিপুল বাড়রীর মেজাজ ভালো না থাকলে জবাব দেন না। ভালো থাকলে বলেন, তা ওদের বিয়েটা দিয়ে দাও না, মিছি মিছি দেরী করে লাভ কী?

—থামো বাপু তুমি, হেসে খেলে দু'দিন বেড়াচ্ছে মেয়েটা বেড়াক, তার পর তো আছেই বিয়ে, বিয়ে পালাচ্ছে না কি?

ভদ্রলোক ঠাট্টা করেন, কিন্তু তোমার মেয়ে যে পালাচ্ছে!

এ সব খবর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নীলাই আবার বাদলকে জানিয়েছে। মায়ের এ অনুযোগ অভিযোগ ওদের দু'জনের কাছেই হাসির ব্যাপার।

বিপুল বাড়রী সেদিন বাড়ি ফেরা মাত্র মহিলা অগ্নিমূর্তি হয়ে ভাবী জামাইয়ের লাঞ্চে না আসার দাম্ভিকতাটাই বড় করে বিস্তার করতে বসলেন। মেয়েটা সেই থেকে প্রায় না খেয়ে মন খারাপ করে আছে। বলেছিলাম না, যে ভাবে চেয়েছিলাম ঠিক সে ভাবে পোষ মানেনি ও, আর মানবেও না কক্ষনো?

বিপুল বাবু বললেন, কিন্তু ওর তো খাবারটা আপিসে পাঠিয়ে দেবার কথা ছিল।

—কেন, ও আসবে না কেন? টেলিফোনে বলল আসবে, তার পরেও এলো না কেন?

বাদল আসার পর তার কাছেও মেয়ের ধকলটাই ফেনিয়ে তুললেন মিসেস বাড়রী। টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার না পাঠাবার ব্যাপারে তাঁরও পরোক্ষ সায় ছিল বলেই রাগ চাপতে পারছিলেন না। কিন্তু মেয়ের সঙ্গে আপসটা ওর সহজেই হয়ে গেল। কারণ, কাজটা আর যাই হোক ভালো হয়নি খুব, সেটা নীলা উপলব্ধি করছিল।

দুপুরের খাওয়াটা বেশ ভালো। ভাবে উশুল করে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল তার পর। গাড়ি চালাতে চালাতে মায়ের মেজাজ কতখানি বিগড়েছে নীলা তারই ফিরিস্তি দিচ্ছিল একটা।

সে থামতে বাদল জিজ্ঞাসা করল, আর কি বললেন তোমার মা?

—আর বললেন, ছেলেটা এখনো ঠিক পোষ মানেনি।

—তোমাদের টমি কুকুরের মত?

—তোমার যা বুনো স্বভাব, ওতে কুলোবে না, আরো শক্ত শেকল দরকার।

সন্ধ্যার একটা নিরিবিলি পথ ধরে নীলা গাড়ি চালাচ্ছিল। ষ্টিয়ারিং থেকে হাত তোলার উপায় নেই। আচমকা অধর স্পর্শে গাড়ির টাল সামলানো দায় হয়েছিল প্রায়। ছদ্ম কোপে ঝাঁজিয়ে উঠেছিল শুধু, অ্যাকসিডেণ্ট হলে তখন?

জবাবে আবার। এবং তেমনি আচমকা।

—ভালো হবে না বলছি, এক্ষুনি দোব কিন্তু ষ্টিয়ারিং ছেড়ে।

বাদল গাঙ্গুলি হেসেছে, বলেছে একে বুনো স্বভাব, তায় ছাড়া আছি আমার কি দোষ!

কিন্তু মধ্যাহ্নের এই আহার প্রসঙ্গ বাড়িতে ওর নিজের মায়ের কাছে প্রকাশ হয়ে যেতে একেবারে অন্যরকম দাঁড়াল ব্যাপারটা। রাত্রিতে খাবে না শুনে মা খবর করতে এসেছিলেন, সেই দুপুরে নেমন্তন্ন খেয়েছিস, এখনো খিদে পায়নি?

মায়ের কাছে হাসতে হাসতে সবিস্তারে জ্ঞাপন করেছিল দুপুরের মজার ব্যাপারটা। ওকে জব্দ করতে গিয়ে উল্টে নিজেরাই কেমন জব্দ হয়েছে সেই কথা।

কিন্তু মা এর মধ্যে মজা কিছু দেখলেন না, আর জব্দ হওয়া বা করার আনন্দও কিছুমাত্র উপভোগ করলেন বলে মনে হল না। শোনা মাত্র মুখ যেন শাদা হয়ে গিয়েছিল মায়ের। অস্ফুট আকুতিতে বলে ফেলেছিলেন, খালি টিফিন ক্যারিয়ার পাঠিয়ে তারা তোকে সমস্ত দিন না খাইয়ে রাখল!

সামলে নেবার জন্য ছেলে তারপরে অনেক কথাই হয়ত বলেছিল। কিন্তু মা তার একবর্ণও শুনেছেন বলে মনে হয়নি। আর একটি কথাও না বলে নিঃশব্দে প্রস্থান করেছিলেন তিনি।

মনে মনে মায়ের 'পরে সেদিন একটু বিরক্তও হয়েছিল। মায়ের চোখের সামনে ওর সমস্ত ভিতরশুদ্ধ খোলাখুলি ধরা পড়ে যেত বলেই বোধ হয়। ভাবত, মায়ের ধারণা মিথ্যে নয় খুব। কিন্তু যোগ্যতা তো তারও আছে। নেশান বিল্ডার্স'এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বিপুল বাড়রী হাজার গণ্ডা লোক চরান, ওর মত তো আর পাঁচজনকে বেছে নেন নি তিনি। যোগ্যতা না থাকলে, বরাবর স্কলারশিপ না পেলে, ওর মত গরীবের ছেলের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াটাই স্বপ্ন। অবশ্য এই পড়ার মধ্যে মা অনেকখানি। ছেলেবেলা থেকে মায়ের সবল ইচ্ছাশক্তিই যেন ঘিরে থাকত ওকে। চাকরীতে ঢুকে চট করেই নাম করেছিল। ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বিপুল বাড়রী কোম্পানী থেকেই ওকে ট্রেনিং'এর জন্য বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ রকম একটি ছেলেকে বড় হবার সুযোগ দেওয়াও সহজ, আর সুযোগ দিয়ে কিনে রাখাও সহজ। বিপুল বাড়রীর স্বার্থ সেদিনও অবিদিত ছিল না বাদল গাঙ্গুলির। নীলাকে কাছাকাছি পাওয়ার পর থেকে সে স্বার্থের পাকে পাকে

জড়িয়ে যেতে আপত্তিও ছিল না তার। গরীবের ছেলে এতবড় ভাগ্যের সম্ভাবনা কখনো ভাবেনি। কিন্তু ওর অস্থিমজ্জার আর একদিকে মিশে আছে মায়ের গড়া সত্তাবোধ। বিপুল বাড়রীর স্বার্থে নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছে, কিন্তু কেনা হয়ে থাকতে চায়নি তাঁদের। অনেক সময় সেটা নিজেই সে বরদাস্ত করতে পারত না। কিন্তু এ ব্যাপারে মায়ের দুশ্চিন্তা বা ইঙ্গিত কটাক্ষও খুব ভালো লাগত না তা বলে।

···কিন্তু সব শেষে একদিন সব কিছুর সেই কল্পান্তক অবসান।

আলো নেবানো ঘরের নিভৃতে বসে থাকতে থাকতে বাদল গাঙ্গুলির হঠাৎ মনে হল ঘরের বাতাস যেন কমে যাচ্ছে। একটা অব্যক্ত শূন্যতা চেপে বসছে ক্রমশ। ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সামনের টেবিলে নীলার ফোটো আছে একখানা। অনেকদিন ধরেই আছে। রাখার কোন অর্থ হয় না। তবু রেখেছে। চোখের সামনে ওকে রেখে, ওর সম্বন্ধে, একমাত্র মা ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত নারীর সম্বন্ধেই নির্মম নিস্পৃহতায় ভিতরটাকে অনুভূতিশূন্য করে তোলার তাগিদেই ওটা রেখেছিল বোধ হয়।

সামনে এসে দাঁড়াল। দু'হাতে তুলে নিল ফোটোখানা। আরো অনেক ছিল। সব নির্মূল করে ফেলেছে। এটাও করত—

—হ্যারে, এত বুঝিস আর এটুকু বুঝিসনে, ঘর হলে গায়ে জল ঢেলে গা ঠাণ্ডা করা যায়?

সচকিতে ঘুরে দাঁড়াল বাদল গাঙ্গুলি। ঘরের মধ্যে, শূন্য ঘরের মধ্যে, তার খুব কাছে, একেবারে কাছে, কোথায় বুঝি মা এসে দাঁড়িয়েছে। তার মা! তার মায়ের কথা! সেই সবশেষে সব শেষ করার জন্যই ও যখন ফোটো ছিঁড়ছিল একে একে—ওর মা বলেছিল সেই কথাগুলি যেন আজ আবার নিবিড় স্পর্শ হয়ে কানের ভিতরে বুকের ভিতরে পৌঁছুল হঠাৎ। অব্যক্ত যাতনায় শূন্য ঘরের মধ্যে একমাত্র সেই মাকেই যেন খুঁজে বেড়ালো মড়াইয়ের ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। মা, মা গো···!

—কে? হাতের ফোটো রেখে দিল। নিভৃত রোমন্থনে ছেদ পড়ে গেল।

—আমি নিধু, রাত্তিরের খাবার।

ঘরের আলো জেলে দিল বাদল গাঙ্গুলি। ঘড়ি দেখল। ছোট টেবিলে খাবার রেখে অপেক্ষা করতে লাগল নিধু। আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে পারম্পর্যহীন নিস্পৃহতার আবরণ নেবে এসেছে ভিতরে-বাইরে।

চেয়ার টেনে আহারে বসল কলের মানুষ চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। [ক্রমশঃ।

ফাল্গুনী

বাসুদেব গুপ্ত

হু হু করে হাওয়া :
গুচ্ছ বীথির
মৃদু-মৃদঙ্গ
নম্র অধীর
  পূর্ব-সকাল পুঞ্জে।

বেঁধে রাখি মন :
হয়ে যায় পাখী।
নবঘন ছায়
কোন সুরে ডাকি
  স্বপ্ন-শিথিল কুঞ্জে।

দেখেছি তখন
ছিলে উন্মনা ;
পাতা-ঝরা দিন :
বসে দিন গোণা
  চন্দন-চারু গন্ধে।

পলাশ-শাখায়
এবার বন্যা।
দু'হাতে ছড়াও
কাঁবে অনন্যা
  আমাকে দেখার ছন্দে।

বারীন্দ্রনাথ দাশ

কনফুশিয়াস একদা বলেছিলেন—Everything has its beauty, but not everyone sees it : সৌন্দর্যের প্রকাশ সব কিছুর মধ্যেই, কিন্তু তাকে দেখবার চোখ নেই অনেকেরই। সেদিন থেকে আড়াই হাজার বছর কেটে গেছে, ইতিহাসের পাতা থেকে রূপকথার পাতায় চালান হয়ে গেছে সম্রাট শি-হুয়াং-টি, স্মরণের দিগন্তে বিলীন হয়ে গেছে হান রাজবংশের স্বর্ণযুগ। সুই, তাং, সুং রাজাদের ঐশ্বর্য, চেঙ্গিস খানের স্বর্ণ-বাহিনীর অভিযান, কুব্লাই খানের শৌর্য, মিং আর মাঞ্চুদের বিলাস-ব্যসন আর বিপর্যয়ের কাহিনী, আজ শুধু অতীতের ইতিকথার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ। কিন্তু সেই দীর্ঘ শতাব্দীগুলোর ওপার থেকে কনফুশিয়াসের কথাগুলো আজো মনের মধ্যে টুং-টাং করে ওঠে, যখনই মনে পড়ে চায়না টাউনের পুরোনো দিনগুলোর কথা।

পশ্চিমে চিৎপুর, দক্ষিণে বৌবাজার। তারই এপাশে সাবেক কালের বনেদী চায়না টাউন। বড়ো রাস্তার চলতি ট্রাম-বাস থেকে চোখে পড়ে, এদিককার দু'-চারটি চীনে ডেন্টিস্টের দোকান। তাদেরই আশে-পাশে এখানে-সেখানে সরু-সরু গলি এসে পড়েছে বড়ো রাস্তার মোহানায়। তার ভেতর থেকে কখনো-সখনো বেরিয়ে আসে শার্ট-প্যান্ট-পরা চীনেম্যান, উদ্দাম সাইকেলে টিউনিক-পরা চীনে স্কুলের কিশোরী, মন্থর রিক্সায় বাদাম-নয়না গৃহিণী। এ রকম চীনে দু'-চার জন। আর যারা সব বেরিয়ে আসে কিংবা ঢুকে পড়ে গলির ভেতর তারা সব মুসলমান, নয় ইহুদী, নয় তো বা ফিরিঙ্গী। বড়ো রাস্তা থেকে দেখা যায়, এ গলি সে-গলির খানিকটা। সে-সব অলি-গলি দু'-চার পা এগিয়েই মোড় ফিরে এঁকে-বেঁকে কী যেন এক রহস্যঘন অজানায় মিশে গেছে! কতো গল্প এই চীনেপাড়াকে নিয়ে, রোমহর্ষক আলোচনা শ্যামবাজারের রকে, ভবানীপুরের ক্লাবঘরে আর চৌরঙ্গীর রেস্তরাঁয়, কতো রোমাঞ্চ-শিহর কল্পনা-বিলাস বটতলার গোয়েন্দা উপন্যাসের নিউজপ্রিন্ট পাতায়। সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত নাগরিক ও-পাড়ার ছায়া মাড়ায় না। কখনো হয়তো দু'-চার জন সখ করে সোয়াদ পাল্টাতে যায় চীনেপাড়ার বিখ্যাত রেস্তরাঁয়। সেখানে সোনালী গালার কাজ-করা পরিবেশে, সূক্ষ্ম খোদাই করা টেবিলের পাশে মার্বেলের মসৃণ চেয়ারে বসে চিলি-স'স্ দিয়ে চাও-মিয়েন, চিকেন সহযোগে বাঁশের কোঁড়, সোয়া-বীন স'স্ দিয়ে চিংড়ি ভাজা, কাঁকড়া সেদ্ধ প্রভৃতি চাখতে চাখতে চীনে জাফরির ওপার থেকে ভেসে-আসা অনুস্বরাক্ত কাকলী শুনে সরেস হয়ে টাটকা হয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে ফিরে আসে চেনা পৃথিবীর নিরাপদ আবহাওয়ায়। সেই বিখ্যাত রেস্তরাঁটির ওপাশে যে সরু অন্ধকার গলি ভেতরে ঢুকে গেছে, যার গুমোট পরিবেশ থেকে ভেসে আসে মিহি গলায় তীক্ষ্ণ হাসির তরঙ্গ,—সেদিকে তাকায় না। এ পাশের ছোটো দোকান, যার ভেতর কাঠের টেবিলের চার পাশে দু'-চারজন বিভিন্ন জাতের লোক জোরগলায় হাসে আর চাপা গলায় গল্প করে, সেদিকেও ফিরে তাকায় না। ডাস্টবিনের পাশের মাদী শুয়োরটা এড়িয়ে, দু'-চারটি নির্বিকার মুরগী আর পাতিহাঁস পেরিয়ে, শুকনো মাংসের টুকরো ঝোলানো, শুঁটকী মাছ আর শুয়োরের চর্বি সাজানো নোংরা দোকানটির সামনে পড়তেই নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ব্ল্যাকবার্ণ লেন, কিগ্রাস' লেন পেছনে ফেলে এগিয়ে চলে যায়।

গত ছয় সাত বছরে অনেক বদলে গেছে এ পাড়ার আবহাওয়া। অনেক চীনে চলে গেছে এ পাড়া থেকে, অন্য জাতের লোক অনুপ্রবেশ করছে আস্তে আস্তে। সেন্ট্রাল এভিনিউ থেকে দেখা যায় ইডেন হসপিটালের উল্টো দিক থেকে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের নতুন চওড়া রাস্তা বেরুচ্ছে, সরু সরু গলিগুলো নিশ্চিহ্ন করে, জীর্ণ বাড়িগুলো গুঁড়িয়ে সুরকি-পাথরের কুচি আবর্জনা পেরিয়ে চলে যাচ্ছে চিৎপুরের দিকে। মাঝখানে ফাঁকা পড়ে আছে অনেকখানি জায়গা। এক পাশে ইহুদীদের সিনাগগ আর একটি মসজিদ বড়ো কাছাকাছি, অন্য পাশে দু'-চারটি চীনে দোকান, আর এদিক ওদিক ফুটফুটে চীনে খোকা-খুকুদের হটগোল। দোকানগুলোর সামনে সাজানো রঙিন মোমবাতি, রঙিন ফানুস, বাজি-পটকা, কাগজের ফুল আর ফেস্টুন, ঝাপসা কাচের শো-কেসের ভেতর থেকে উঁকি মারা চীনে মাটির পুতুল, আর আশে-পাশের রান্নাঘর থেকে চর্বির গন্ধ—সুদূর প্রাচ্যের পরিবেশ যা একটুখানি টিমটিম করছে এরই মধ্যেই। এ-ও যে আর বেশী দিন থাকবে না, কর্পোরেশনের স্টীমরোলার আর রোড ক্লোজ্‌ড সাইন দেখে বেশ বোঝা যায়। এদিক ওদিক তাকালেই চোখে পড়ে নতুন নতুন চার-পাঁচটা পানের দোকান। কান খাড়া করলেই বোম্বের হিন্দি ফিল্মের গান শোনা যায়।

সেখানেই একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল জেনী ওয়াং'এর সঙ্গে।

নানকিংএ খেতে ডেকেছিলো এক পাঞ্জাবী বন্ধু যোগীন্দর সিং। খাওয়া-দাওয়ার পর সে চলে গেল অফিসপাড়ার দিকে। আমার গন্তব্য সেন্ট্রাল এভিনিউ, তাই শর্টকাট করছিলাম এদিক দিয়ে।

আকাশে তখন মেঘ করেছে, সেদিন আষাঢ় মাস।

হঠাৎ দেখি, ওধার থেকে আসছে খুব চেনা-চেনা মনে হওয়া কে একজন,—প্যারাসোলের নীচে বব্ চুল, ছোটো ছোটো দুটো চোখ, চাপা নাক, লাল টুকটুকে সরু ঠোঁট, ফর্সা গলার নীচে সাদা সিল্কের জামা আর কালো স্কার্ট, তার ভেতর থেকে বেরুনো দুটো নিটোল ফর্সা হাত। সব মিলিয়ে খুব মিষ্টি দেখতে।

জেনী? জেনী ওয়াং?

ভাবলাম ডেকে কথা বলবো কি না। যদি চিনতে না পারে? সাত বছর আগেকার কয়েকটি ঝড়ের মত দিন,—সেই দিনগুলোর কথা সে যদি মুছে ফেলে থাকে তার জীবন থেকে, তা'হলে তো আমাকে আর আরো অনেককে তার মনে রাখবার কথা নয়। আর মনে রাখলেও যদি চিনতে না চায়!

কাছে আসতেই দেখি, লাল টুকটুকে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে এক সারি মুক্তোর মতো দাঁত বেরিয়ে পড়েছে সহজ হাসিতে।

"হা—ল্—লো! তুমি?"

দাঁড়িয়ে পড়লাম।

জেনী বললে, "অনেক দূর থেকেই তোমায় দেখতে পেয়েছি। কতদিন পর দেখা হোলো, তাই না? তুমি তো এদিকে আজ-কাল আসোই না।"

"আসি মাঝে মাঝে—।"

"তবে আগের মতো নয়, কি বলো?" হাসলো জেনী। জিজ্ঞেস করলো, "তোমার সেই বন্ধুটি কোথায়?"

হঠাৎ বুক দুরু-দুরু করে উঠলো। "কোন্ বন্ধু?"

"সেই মিষ্টার সুলেমান?"

বুকের স্পন্দন স্বাভাবিক হোলো। যার কথা ভাবছিলাম, তার কথা সে জিজ্ঞেস করলো না।

"সুলেমান? সে এখন করাচিতে আছে।"

"তাই নাকি? আর সেই বন্ধুটি?"

বুক আমার দুলে উঠলো।

"কে?"

"হেনরি ডি' সুজা?"

বুক আবার স্থির হোলো।

"সে এখানেই আছে।"

"আর যোগীন্দর সিং?"

"সে-ও এখানেই আছে। নিজের অফিস করেছে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে। এতক্ষণ তো তারই সঙ্গে ছিলাম।"

"ও!" চুপ করে রইলো জেনী।

আমি ভাবলাম যার কথা এড়ানোর চেষ্টা করছি, তার কথা কি জিজ্ঞেস করবে সে?

জেনী বললো, "আজ-কাল আর কারো সঙ্গেই দেখা হয় না। এত ব্যস্ত থাকি।"

"কাজ করছো নাকি কোথাও?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, আমাদের একটি নতুন স্কুল হয়েছে, হুং-সুং-তাও মেমোরিয়াল হাই স্কুল। সেই স্কুলের অফিসে কাজ করি।"

তারপর যেন আর কিছু বলবার নেই।

আর কি বলা যায়, আমিও ভেবে পেলাম না।

অনেকের কথাই মনে এলো। জেনীর ভাই সুং-চাং আর চিয়েন-চাং, সুং-চাং এর বন্ধু ফেং-চে-শিয়াং, ফেং-চে-শিয়াংএর চো ধাঁধানো বোন টিং-লিং, ওদের বন্ধু ষ্টিভ রবিনসন, আর আ অনেকে, যাদের সঙ্গে অনেক মধুর দিন কাটিয়েছি এ পাড়ায়, জানে তারা আজ কোথায়! তাদের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে করতে পারলাম না।

শুধু বললাম, "তুমি কি এখনো সেই আগের বাড়িতেই থাকো?"

"আগের বাড়ি?" জেনী হেসে উঠলো। "ও বাড়ি আর নেই সে রাস্তাই নেই। তুমি দেখছি সব ভুলে গেছ। আমাদের রাস্তা কোথায় ছিলো তোমার মনে নেই? ভালো করে তাকিয়ে দেখ তো।"

তাকিয়ে দেখলাম চার দিক।

চার দিক ফাঁকা, পাথরের টুকরো আর সুরকি ছড়ানো কর্পোরেশানের নিশ্চল ষ্টীমরোলারটির চালে বসে দু'-চারটি কা জটলা করছে।

জেনী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো।

"ওই যে লোকটি যাচ্ছে, ওখান থেকে বেরিয়েছিলো বিবি আমেলিয়া লেন। ওই যে মেয়েটি বসে বালি দিয়ে প্যাগোডা বানাচ্ছে, সেখানেই ছিলো আমাদের—," হঠাৎ থেমে গেল জেনী। মুখ ফিরিয়ে নিলো কয়েক সেকেণ্ডের জন্তে।

তারপর ফিরে তাকিয়ে হেসে বললে, "তুমি এত আসতে! সেই গুড্ ওল্ড্ ডে'স! মনে পড়ে?"

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। এদিকে ব্ল্যাকবার্ণ লেন, ওদিকে ছাতাওয়ালা গলি। আর এপাশে ছিলো আঁকাবাঁকা অসংখ্য গলিঘুঁজি। জানা না থাকলে বিবি আমেলিয়া লেন খুঁজে পাওয়া বড়ো শক্ত। সব ভেঙে গুঁড়িয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে।

"কি ভাবছো?" জিজ্ঞেস করলো জেনী ওয়াং।

হেসে বললাম, "ভাবছি ওখানে একটি মার্বেল-ফলক লাগিয়ে দিলে কেমন হয়, যেখানে লেখা থাকবে: Here lived Jennie Wang and had fine time with her friends sometime in the summer of 1948......"

জেনী হাসলো। উত্তর দিলো, "তা' হলেও কি কারো মনে থাকবে?"

আকাশের মেঘ আরো ঘন হয়ে এলো।

"বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে," জেনী বললো, "এবার বাড়ি যাই।"

বলতে না বলতেই টিপ-টিপ করে বৃষ্টি সুরু হোলো।

প্যারাসোল গুটিয়ে নিলো জেনী। বৃষ্টিতে সেটি অচল। সকাল-বেলা ফুটফুটে রোদ্দুর ছিলো। এমন দিনে কেউ ছাতা নিয়ে বেরোয় না। কে জানতো যে আমার সঙ্গে দেখা হবে জেনীর! কে জানতো যে এমন ঝলমল রোদ্দুর মুছে গিয়ে মেঘ করে বৃষ্টি নামবে!

কাছেই সরু গলিটির মোড়ে একটি ছোটো দোকান। দিনের বেলা বেশ ফাঁকা, নিরিবিলি। গোটা তিন কাঠের টেবিল ঘিরে কয়েকটি চেয়ার।

আমরা ঢুকতেই নীল পায়জামা আর নীল জামা-পরা একটি মেয়ে-ছেলে বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। মনে হোলো জেনীকে সে চেনে। তাকে দেখে হাসতেই সোনার বাঁধানো দাঁত চিকমিক করে উঠলো। চীনে ভাষায় সে কি যেন জিজ্ঞেস করলো জেনীকে।

জেনীও উত্তর দিলো চীনে ভাষায়।

মেয়ে-ছেলেটি ফিরে এলো এক পট চা আর পেয়ালা-পিরিচ নিয়ে। জেনী পেয়ালায় চা ঢেলে দিলো।

যেখানে আমি আর জেনী ওয়াং মুখোমুখি বসে, সেখান থেকে ওধারের ফাঁকা জায়গাটি দেখা যায়। সেখানে তখন ঝাপসা হয়ে বৃষ্টি নেমেছে।

কখন দেখি সেখানে আর ফাঁকা নয়, ঝাপসা নয়। সেখানে তখন আঁকাবাঁকা গলি। অনেক লোকের আসা-যাওয়া। উনিশ শো ছাপ্পান্নোর আষাঢ় মাসের সজল দুপুর মুছে গিয়ে আমার মন ফিরে নামলো উনিশ শো আটচল্লিশের ফাল্গুনের এক ধূসর সন্ধ্যা।

উনিশ শো আটচল্লিশের ফাল্গুনের সেই ধূসর সন্ধ্যায় বাসের অপেক্ষায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম বৌবাজার সেন্ট্রাল এভিনিউর মোড়ে। হঠাৎ সামনে এসে থামলো একটি উড়ন্ত ট্যাক্সি। যে নামলো তার পরনে খাকি প্যান্ট আর সিল্কের স্পোর্টস শার্ট, মুখে চুরুট। কাছে এসে পিঠ চাপড়ে বললে, "তোকে দেখে নেমে পড়লাম। কি রকম আছিস? দাঁড়া, ভাড়াটা মিটিয়ে দিই। এখান থেকে হেঁটেই যাওয়া যাবে"।

"আমি যে সিনেমায় যাচ্ছি"।

"পাগল? এখন ছ'টা দশ। টিকিট পাবি না।"

"টিকিট করা হয়ে গেছে।"

"তাই নাকি? তা'হলে ওটা কাউকে দিয়ে দে।"

"কা'কে আবার দিতে যাবো?"

"দে' না রাস্তার যে কোনো লোককে বিলিয়ে। সে সারা জীবন তোকে মনে রাখবে।"

দিলীপ দা'র জীবনদর্শন আমাকে অনুপ্রাণিত করতে পারলো না। বললাম, "সে হয় না। তিনটি টিকিট কেনা হয়েছে, দুটো আরেক জনের কাছে। ওরা আগে গিয়ে বসে থাকবে।"

"তাই নাকি? বেচারা! তাদের তুই একদিনও একটু শান্তিতে সিনেমা দেখতে দিবি না? —আরে, এই যে, সলোমন, শোনো শোনো, তোমার কথাই বলছিলাম।"

পাশ দিয়ে হন-হন করে যাচ্ছিলো একজন। এক বিঘত লম্বা নাক, শ্যেন দৃষ্টি, ফর্সা গায়ের রং, আধময়লা জামা-কাপড়, মাথায় বাটির মতো দেখতে একটি কাপড়ের টুপি।

সে থেমে পড়লো। কাছে এসে বললো, "হালো মুখার্জী, তোমার বাড়ি চার দিন গিয়ে—"

দিলীপ দা' একগাল হেসে আমায় দেখিয়ে তাকে বললে, "এর সঙ্গে তোমার আলাপ নেই বুঝি? এ আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমানে অন্তরঙ্গ বন্ধু রঞ্জন"। তারপর আমার দিকে ফিরে— "এই যে পাষণ্ড অশ্বতরকে দেখছো এর নাম সলোমন, আমার হিতৈষী বন্ধু এবং পাওনাদার। গত বছর আমার দুর্দিনে দশটা টাকা ধার নিয়েছিলাম। কী বদমাইশ, এখনো তাগাদা দেয়! কিন্তু লোকটির অনেক গুণ। অভিশপ্ত ইহুদী জাতির মধ্যে এত বড় প্রতিভা জন্মায় নি। সমাজবিজ্ঞানে কার্ল মার্কস্, মনোবিজ্ঞানে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, পদার্থবিজ্ঞানে আইনষ্টাইন—আর ঘোড়দৌড়-বিজ্ঞানে এই সলোমন। এত ভালো রেসের টিপস্ দেয়, কতো লোক যে ফতুর হয়ে গেছে ওর টিপস্ নিয়ে। না, না, ঘোড়া জেতে না সে কথা বলছি না। ঘোড়া জেতে ঠিকই। কিন্তু একটা দুটো জিতে ভালোমানুষের নেশা ধরে যায়, ব্যস, সহধর্মিণীর ভ্রাতা এই লোকটি আর টিপস্ দেয় না, ভালোমানুষেরা ফতুর হয়ে যায়।— ওহে সলোমন, এই শনিবার সিলভার-ফিশের উপর ধরবে বলে দিচ্ছি। যাচ্ছে বটে আটের দরে, কিন্তু ঘোড়ার মুখের খবর, উইন না হোক প্লেস যদি না পায় তো আমার ৺বাবা আমার মতো সুসন্তানের নাম দিলীপ মুখার্জী রাখেনি। টাকাটা? হ্যাঁ, এসো, কালই এসো, কিম্বা সোমবার আমার অফিসে। ক্যানিং ষ্ট্রীটে নতুন অফিস করেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছি তো দেবো। তোমার তো দেখছি তাগাদা মুশকিল। ওহে, এখন কোথায় যাচ্ছো।"

"দেখি জনি ম্যাকডোনাল্ডের বাড়ি গিয়ে, ওকে যদি পাওয়া যায়," সলোমন উত্তর দিলো।

"কেন, টাকার তাগাদায় বুঝি? মানুষকে শান্তিতে থাকতে দেবে না? এমন সোনার গোধূলি, কোথায় ময়দানে গিয়ে গাছতলায় বসে চীনেবাদাম খেতে খেতে গুন্‌গুন্ করে সিনেমার লেটেষ্ট হিট্ গাইবে, তা'নয়, একটি লোক সারাদিন খেটেখুটে আগামী কালের অন্নব্যঞ্জনের সংস্থান করে বাড়ি ফিরে বৌয়ের হাতের তৈরী চা খেতে খেতে ছেলে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে আদর করছে, যাবে তার সন্ধ্যাটি মাটি করতে। এক কাজ করো, একটি সিনেমা দেখে এসো। হ্যাঁ মেট্রোতে, খুব ভালো বই। ওহে রঞ্জন, টিকিটখানি দেখি।"

ডোবালে দিলীপ দা'!

"ওটা বাড়িতে ফেলে এসেছি," মরিয়া হয়ে বললাম, "দিলীপ দা,' তোমার ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে। চলো আমায় বাড়িতে নামিয়ে দেবে।"

বলে উঠে পড়লাম ট্যাক্সিতে। দিলীপ দা'ও এলো পেছন পেছন।

"আমার টাকাটা পরশু দেবে তো?" সলোমন জিজ্ঞেস করলো।

"দেখছো ছেলেটার সামনে জীবনমরণ সমস্যা। ওর বাড়ির মেয়ে-ছেলেরা হলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর ও বাড়িতে টিকিট ফেলে এসেছে, আর তুমি আমায় টাকার জন্যে তাগাদা দিচ্ছো? আমার নাম করে পাঁচটা টাকা সিলভার-ফিসের উপর ধোরো, বুঝলে? সিলভার-ফিসের মাসী আমার মেশোমশায়ের ল্যাণ্ডো টানতেন, নিমকের মান রাখতে সিলভার-ফিস উইন হোক প্লেস হোক, একটা কিছু করে আমার দশ টাকা নিশ্চয়ই তোমায় ফিরিয়ে দেবে। আচ্ছা, বাই বাই। —চলিয়ে সর্দারজী। সিধা মেট্রো সিনেমা। এঁ্যা, মেট্রো নয়? কোথায় তা'হলে? ও, আচ্ছা, লাইট হাউস চলিয়ে।"

অন্য যে কেউ দিলীপদা'র কথাবার্তা শুনলে অবাক হোতো। কিন্তু আমি ওর সংলাপে অভ্যস্ত। সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি দীলিপ দা'কে। আমার জ্যাঠতুতো দাদার ক্লাসফ্রেণ্ড, কিন্তু আমার সঙ্গেও যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা। প্রতিভাধর ছেলে, কিন্তু নিজের কেরিয়ার নষ্ট করেছে মদ খেয়ে আর রেস্ খেলে। কে আজ বিশ্বাস করবে দিলীপ দা' ইতিহাসে ফার্ষ্টক্লাস এম-এ? দিলীপ দা'র মা ইংরেজ। তাই দিলীপ দা'র সোনালী চুল, ফর্সা রং, তবু বাঙালীর মেজাজ।

যখন স্কুলে পড়ে তখন ওর মা আর বাবার মধ্যে কি রকম যেন একটা গণ্ডগোল হয়। ওর বাবাকে ডিভোর্স করে মা বিয়ে করলো আসামের এক চা'বাগানের সায়েবকে। তখন থেকে ছেলের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। দিলীপ দা' পিসীর কাছে মানুষ, আর তখন থেকেই একটু কি রকম যেন। সংসারে কোনো কিছুর উপরই কোনো আসক্তি নেই। সিরিয়াস নয় কোনো ব্যাপারে, সব কিছুই খুব হাল্কা ভাবে নেওয়ার অভ্যেস। বাপের কিছু পয়সা ছিলো। এম-এ পাশ করবার পর দিলীপ দা'কে বিলেত পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেখানে কিছু করতে পারেনি। ও ফিরে আসবার পর বাপ চলে গেলেন পণ্ডিচেরি। তখন থেকে বাপের সঙ্গেও কোনো যোগাযোগ নেই।

বিলেত থেকে ফিরে এসে একটি প্রাইভেট কলেজে প্রফেসারি পেয়েছিলো দিলীপ দা'। কিন্তু নিয়মিত ক্লাসে যেতো না বলে, আর যখন যেতো তখন ছাত্রদের রেসের টিপস্ দিতো বলে ছাত্র মহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আদর্শ শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতি পেলো না।

দিলীপ দা'র ক্লাস নেওয়ার বর্ণনা অনেকের কাছেই শুনেছি।

…"নাইটি-টু ?"

"প্রেজেন্ট স্যর !"

"নাইটি-থ্রি—কী হে আগরওয়াল, শনিবার দেখিনি কেন ? কোন ঘোড়াটা খেললে ? কতোর দর ?—আচ্ছা, নাইটি ফোর ?"

"প্রেজেন্ট স্যর !"

"কে প্রক্সি দিচ্ছে হে ! নিতাই বোস ? কে এবারের ফেভারিট্, খবর রাখো ? জাহাঙ্গীরের নাম কিন্তু অনেকেই করছে। ওর উপর একবার ধরে দেখতে পারো। নাইটি ফাইভ ?"…

এই ছিলো দিলীপ দা'।

একদিন প্রিন্সিপ্যাল ডেকে পাঠালেন।

"দেখ দিলীপ, তোমায় কতো বার বলেছি, কলেজে একটু সংযত কথাবার্তা না বললে কলেজের বদনাম হয়। তুমি এরকম ব্রিলিয়্যান্ট ছাত্র বলে, আর বিশেষ করে মুখুজ্যে মশায়ের ছেলে বলে তোমায় কতো শিল্ড, করে চলি। কিন্তু তুমি তো ইমপসিবল্ হয়ে উঠছো। গভর্ণিং বডি তো কিছুতেই তোমায় আর রাখতে চাইছে না।"

সে তো আমি জানি। কিন্তু কাউকে আগামী শনিবার মর্ণিং গ্লোরির উপর পাঁচটা টাকা ধরবার পরামর্শ দিয়ে তাকে যদি দশ-পোনেরো টাকা রোজগার করবার ব্যবস্থা করে দিই, কী অন্যায়টা হয় বলুন ? ছেলেরা ভালো খেতে পায় না, কলেজের মাইনে দিতে পারে না, দুটো সিগারেট ফুঁকতে পারে না। একটু নিজে রোজগার করতে শিখুক, আপনারা নিজেরা তো ওদের কোনো রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারবেন না, আর আমি যদি দু'-একটা ফন্দি ফিকির বাতলে দিই তা'ও সহ্য করতে পারবেন না ! সত্যি, প্রতিভার আদর আমাদের দেশে হয় না। যাক, আমি কিন্তু এর জন্যে তৈরী হয়েই এসেছি। এই নিন আমার রেজিগনেশান।"

দিলীপ দা'র মুখে শোনা—প্রিন্সিপ্যাল দিলীপ দা'র রেজিগ্নেশান নিলেন। তার পর দিলীপ দা' যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, তখন ডাকলেন পেছন থেকে, "দিলীপ ! এক মিনিট। কোন্ ঘোড়াটার কথা বললে ? মর্ণিং গ্লোরি ? ঠিক তো ! আচ্ছা, থ্যাংক্যু।"

শিক্ষা-জগতের সঙ্গে দিলীপ দা'র সম্পর্ক শেষ সেদিন থেকে।

কিন্তু দিলীপ দা' পড়াতো ভালো। আমি যখন এম-এ দিচ্ছি, দিলীপ দা' আমায় পড়িয়েছিলো কিছু দিন। বেশ খেটে পড়িয়েছিলো, যার দরুণ আমার মতো ফাঁকিবাজ ছেলেও একটি মাঝারি গোছের রেজাল্ট করে এম-এ পাশ করতে পেরেছিলো।

দিলীপ দা' মাইনে নিয়ে পড়াতে রাজি হয়নি, কিন্তু যতো টাকা ধার নিয়েছিলো, মাইনে দিয়ে মাষ্টার রাখলে অনেক শস্তা পড়তো।

ইউনিভার্সিটি থেকে বেরুনোর পর, বড় একটা দেখা হোতো না ওর সঙ্গে। শুনেছিলাম, একটু অর্থাভাব যাচ্ছে। তাই আজ ট্যাক্সিতে দেখে অবাক হ'লাম।

দিলীপ দা' এখন কি করছে, সেটা জিজ্ঞেস করবো কি করবো না যখন ভাবছি, সে বললে, "সলোমনকে টিকিটটা দিলি না কেন ? বেচারা এ রকম একটা ভালো ছবি মিস্ করবে।"

"সে কথা ভেবে তো টিকিট কেনা হয়নি। আরেক জনের সঙ্গে একটি সন্ধ্যা কাটাবো বলেই কেনা হয়েছে।"

"তাতে কি। না হয় তোর হয়ে সলোমন তার সঙ্গে সন্ধ্যা কাটাতো। বলতো, সে তোর বন্ধু, তুই-ই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিস। ভদ্রলোক কি মাইণ্ড করতেন ?"

"কোন্ ভদ্রলোক ?"

"তোর বন্ধু।"

"ভদ্রলোক নয়, ভদ্রমহিলা।"

"তাই নাকি ? কে রে ?"

"তুমি চিনবে না। আমার এক বন্ধুর বৌয়ের মামাতো বোন। আমার বন্ধুটিও সঙ্গে থাকবে অবশ্যি। সেই সিনেমা দেখাচ্ছে আমাদের।"

"তাই নাকি ? নাম কি তার ?"

"আমার বন্ধুর ?"

"না রে, তার শালীর—"

"রেবা। রেবা চৌধুরী।"

"বাঃ, বেশ নাম। আচ্ছা, চল তোকে নামিয়ে দিয়ে আসি।"

আর কিছু বললো না দিলীপ দা'।

লাইট হাউসে পৌছে দিয়ে বললো, "দেখি তোমার টিকিট ?"

বার করে দিলাম।

কাউণ্টারে "হাউস ফুল" টাঙানো। দু'-চার জন তার সামনে বিষণ্ণ মুখে ঘোরাঘুরি করছে।

দিলীপ দা' জিজ্ঞেস করলো, "এদের মধ্যে সব চাইতে সুন্দর দেখতে কোন্ ছেলেটি বল তো ? ওই সিল্কের হাওয়াইয়ান শার্ট-পরা ছেলেটি, না ?" বলে টুক করে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, "আপনার টিকিট চাই ?"

আমি হাঁ-হাঁ করে উঠতে না উঠতেই লেন-দেন পরিষ্কার হয়ে গেল। ছেলেটা হলের মধ্যে ঢুকে পড়লো কোটর-মুখো কাঠবেড়ালীর মতো।

আমি স্তম্ভিত !

"এ কি হোলো দিলীপ দা' ?"

"যা হোলো তোমার ভালোর জন্যেই হোলো। তুমি পারতে ? এমন গাধা ! বন্ধুর প্যাঁচ বোঝো না ? দেখ তো, কী উপকার করলাম ! তোমার করলাম, এই ছেলেটির করলাম, তোমার বন্ধুর

শালীরও করলাম। তোমরা চিরকাল আমার কাছে বাধিত থাকবে।"

আসন্ন একটি বন্ধু-বিচ্ছেদের কথা ভাবতে ভাবতে শ্লথ-পদক্ষেপে সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম।

আবার ট্যাক্সি আরোহণ।

দিলীপ কী যেন বকে যাচ্ছিলো, খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখি বৌবাজার ষ্ট্রীট পেছনে রেখে ট্যাক্সি ঢুকছে একটি গলিতে।

"এ কোথায় নিয়ে এলে দিলীপ দা'?"

"এসো, এখানে নেমে পড়া যাক। ট্যাক্সি আর যাবে না। গলিটা বড্ড সরু এর পর থেকে।"

নামলাম।

ট্যাক্সি ব্যাক্ করে বেরিয়ে গেল।

তাকিয়ে দেখি, ডাইনে চীনে ডেণ্টিষ্টের দোকান, শো-কেসে তুলোর উপর কয়েক পাটি নকল দাঁত পথচারীদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। বাঁয়ে একটি চীনে লণ্ড্রী। ও-পাশে কাচের আলমারি সাজানো একটি মনোহারী দোকান, তার সাইন বোর্ডও চীনে ভাষায়। কী রকম একটা গন্ধ নাকে এসে লাগলো। তেল নয়, চর্বিতে রান্না হয় এদের খাবার, তারই গন্ধ।

"রঞ্জন, আগে কোনো দিন এ পাড়ায় এসেছো?" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"হাঁ, দু'-একবার নানকিং-এ খেতে এসেছি। কিন্তু সে দিনের বেলা। তবে এ তো নানকিং যাওয়ার রাস্তা নয়!"

"সেখানে তো যাচ্ছি না।"

"তা'হলে?"

"যাচ্ছি আরেকটি আড্ডায়," দিলীপ হাসলো, "একেবারে হার্ট অফ দি চায়না টাউন।"

দিনের বেলা চীনে রেস্তর্াঁয় খেতে যাওয়ার সময় দেখেছি, কি রকম যেন একটা ঘুম-ঘুম নিস্তব্ধ আবহাওয়া! কিন্তু রাতের চায়না টাউন অন্য রকম। অনেক বেশী ভিড়, অনেক বেশী হট্টগোল, অনেক বেশী অনুৎব্যস্ত কলরব, অসংখ্য কাঠের খড়মের ঠক-ঠক পদশব্দ। হয়তো বা আচমকা দু'-চারটে বাজি পটকার বিস্ফোরণ, একটানা ভুতুড়ে সুরে তীক্ষ্ণ ভিনদেশী বাঁশী, তালে তালে চীনে কাঁসরের গা' ছমছমানো ডিং ডং আওয়াজ,—সে কোনো উৎসবের আয়োজন হতে পারে, শবযাত্রার প্রস্তুতিও হতে পারে। ডাইনের বাড়ির একতলায় দরজা-খোলা বাইরের ঘর থেকে চপ-ষ্টিকের টুক-টুক শব্দ। এপাশের দোতলায় গোল গোল অথবা হাতপাখার অর্ধবৃত্ত আকৃতির জানলার ওপারে 'মাহ্ জং' এর আসর। হয়তো আচমকা ওপাশের এক-কাঁধ চওড়া কোনো এক অন্ধকার এঁদো গলি থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে এক পাংশু-মুখ মোটা ইহুদী। বেরিয়ে এসে মিশে যাবে লোকের ভিড়ে। পেছন পেছন গলির মুখে এসে দাঁড়াবে অন্য দু'জন লোক। তাদের মুখ দেখে আপনার পিলে চমকে যাবে। ওরা আপনাকে লক্ষ্যই করবে না। গলির চলতি ভিড়েও ফিরে তাকাবে না তাদের দিকে। সেই দু'জন খুব আস্তে ধীরে এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার ফিরে যাবে, মিশে যাবে গলির অন্ধকারে।

আর যা কিছু দেখবার, আর যা কিছু জানবার—সে সব দেখতে জানতে সময় নেবে। প্রথম দিন প্রথম পদসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়বে আপাতত এটুকুর বেশী নয়। অনেক বছর আগে দেখা সিনেমার ঝাপসা স্মরণের মতো,—পরিষ্কার খুঁটিনাটির চাইতে আভাসেই অনেক বেশী।

আজ শুধু মনে পড়ে এঁকে-বেঁকে এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে ঘুরে পথ যখন আরো সরু হয়ে মোড় ফিরে হঠাৎ ঝুম করে নির্জন নিঃসাড় হয়ে গেল, আর নিষ্প্রভ গ্যাসলাইটের ছায়া ছম-ছমে আধো-অন্ধকারের ওপার থেকে ভেসে এলো কোনো এক কিন্নরকণ্ঠে চীনে অপেরার গান, দিলীপের গা ঘেঁষে আস্তে আস্তে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম,—"এ রাস্তার নাম কি?"

দিলীপ হেসে আরো আস্তে আস্তে বললে, "এ রাস্তার নাম! খুব মিষ্টি নাম—বিবি আমেলিয়া লেন।"

পথ চলতে চলতে বিবি আমেলিয়ার গল্প বলে গেল দীলিপ দা'।

"সে যুগের কলকাতার একজন নামকরা সুন্দরী ছিলো আমেলিয়া বিবি। অনেক আমীর-ওমরাও রাজা-মহারাজার আসরে ডাক পড়তো তার, অনেক মহাজনের পায়ের ধুলো পড়তো তার বাড়িতেও। লোকে বলতো, সে জাতে ইহুদী, যদিও তার পদবী আজ আর কারো মনে নেই।

সে যখন এ রাস্তায় থাকতো, তখন এ অঞ্চলে অনেক ইউরেশিয়ানের বসবাস। সিপাই বিদ্রোহ যখন আরম্ভ হয়েছে তখন তার বোধ হয় উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস। সে সময় একজন খুব অর্থবান সায়েব মার্চেণ্ট ছিলো কলকাতায়, নাম ক্রিষ্টোফার গ্রীণ। তার খুব অনুগ্রহভাজন ছিলো আমেলিয়া। গ্রীণ সায়েব ছিলো তখনকার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর স্যর ফ্রেডারিক হ্যালিডের প্রিয় বন্ধু। সুতরাং তখনকার কলকাতার রাজনীতির নেপথ্যের অনেক ব্যাপারে আমেলিয়া বিবির বৈঠকখানার একটা গুরুত্ব ছিলো। লোকে বলে মিউটিনির সময় আমেলিয়া তার সায়েব বন্ধুদের বিশেষ একটা উপকার করেছিলো,—যদিও সে কথা ইতিহাসের পাতায় রেকর্ড করা হয়নি।

সে সময় সিন্ধুর গদীচ্যুত আমীরেরা থাকতো কলকাতার উত্তরে, দমদমে। কয়েক শো' সশস্ত্র রক্ষী ছিলো তাদের সঙ্গে। ওদের একজন নিকট-আত্মীয় সাহেবজাদা ইফতিকার ইসমাইল খান প্রায়ই আসতো আমেলিয়ার কাছে।

কলকাতার ইতিহাসে যাকে বলে "প্যানিক সানডে" (Panic Sunday), অর্থাৎ ১৮৫৭র ১৪ই জুন রবিবার—তার আগের দিন রাত্তিরে নাকি সাহেবজাদা ইফতিকার এসেছিলো আমেলিয়ার কাছে, মদের ঘোরে তাকে বলেছিলো, ব্যারাকপুরের সেপাইরা তাদের সঙ্গে আসুক বা না আসুক, তার পরিচালনায় তাদের কয়েক শো রক্ষী গার্ডেনরীচের নবাব ওয়াজেদ আলী শা'র হাজার খানেক সশস্ত্র অনুগামীদের সঙ্গে দু'দিক থেকে কলকাতার উপর চড়াও হবে রোববার দিন সন্ধ্যেবেলা, তারপর ইফতিকার গ্রীণ সায়েবকে ময়দানের গাছে লটকিয়ে আমেলিয়াকে তার বেগম করবে। কলকাতা তখন নানা রকম গুজবে গম-গম করছে। আমেলিয়া ইফতিকারকে মদের সঙ্গে আর কি যেন মিশিয়ে খাইয়ে বেহুঁশ করে রেখে গাড়ি হাঁকিয়ে সোজা চলে গেল গ্রীণ সায়েবের বাড়িতে।

কিন্তু গ্রীণকে পাওয়া গেল না। তার বোনের ছেলে ইচ্ছে, সে ডাক্তার নিয়ে গেছে সেখানে।

সেদিনের রাত কেটে গেল। তার পরদিন সকালে গীর্জার মর্ণিং-সার্ভিস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, ব্যারাকপুরের সেপাইরা বিদ্রোহ করে কলকাতার দিকে এগিয়ে আসছে, আশে-পাশের শহরতলীর লোকজনও বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে, খিদিরপুরে লুটপাট করতে সুরু করেছে নবাব ওয়াজিদ আলী শা'র লোকজন। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সায়েব আর ফিরিঙ্গী মহলে 'পালা পালা' রব পড়ে গেল। সায়েবরা দলে দলে ছুটলো নদীর দিকে, গঙ্গার বুকে নোঙর-করা জাহাজগুলিতে আশ্রয় নিতে। আর অনেকে আশ্রয় নিলো ফোর্টে। প্রাণের ভয়ে দিশাহারা সায়েবদের পাড়ায় সে কী দৃশ্য! তখনকার দিনের এক সায়েব, কর্ণেল ম্যালেসন, সেই ১৪ই জুনের কলকাতার আশ্চর্য বর্ণনা লিখে রেখে গেছেন তাঁর বিখ্যাত "রেড-প্যাম্ফলেটে"। জানো রঞ্জন, তিনি খোলাখুলি লিখেছেন,—It has been said by a great writer that there is scarcely a more undignified entity than a patrician in a panic. The veriest sceptic as to the truth of this aphorism could have doubted no longer, had he witnessed the living panorama of Calcutta on the 14th June. All was panic, disorder, and dismay.

এদিকে সকাল না হতেই আমেলিয়া বিবি আবার বেরিয়ে পড়লো গ্রীণ সায়েবের খোঁজে। গিয়ে শুনলো, গ্রীণ সায়েবের একটি ফুটফুটে ভাগ্নে হয়েছে—আর গ্রীণ সায়েব তল্পিতল্পা নিয়ে কেটে পড়েছে জাহাজঘাটার দিকে। আমেলিয়াও ছুটলো সেদিকে। তার সঙ্গে দেখা হ'তে আমেলিয়া বললে যে, সাহেবজাদা ইফতিকার ইসমাইল খান তখনো তার ঘরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। শুনে তো গ্রীণ সায়েব জুড়ী-গাড়ি হাঁকিয়ে তক্ষুণি ছুটলেন বেলভেডিয়ারে হ্যালিডে সায়েবের কাছে। কিন্তু হ্যালিডে সায়েব তখন বেলভেডিয়ার থেকে আস্তানা গুটিয়ে সরে এসে ডেরা পেতেছে গভর্ণর জেনারেলের কাছাকাছি। গ্রীণ সায়েব ফিরে এসে শুনলেন একদল সায়েব এসে জড়ো হয়েছে, কোথায় জানো? এখন যে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল, তখন তার নাম ছিলো উইল্‌সন্‌স্‌ হোটেল,—সেই হোটেলে। তাদের মধ্যে একদল হাতিয়ার জোগাড় করে গ্রীণ সায়েবের সঙ্গে চললো আমেলিয়া বিবির বাড়ি, সায়েবজাদা ইফতিকারকে ধরতে, আর প্রায় চল্লিশ জন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চেপে টহল মারতে গেল উত্তর-কলকাতার নিরীহ বাঙালীপাড়ায়।

সেদিন রাত্তিরে যখন অযোধ্যার নবাব আর তাঁর উজীরকে বন্দী করে ফোর্টে নিয়ে আসা হয়েছে, আর সে খবর তখনো না জেনে কলকাতার ভয়ার্ত ফিরিঙ্গীরা বন্দুকের এলোপাথাড়ি ফাঁকা আওয়াজ করে যাচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে—আর দিল্লিতে লালকেল্লায় বাহাদুর শা' তখনো হিন্দুস্থানের বাদশা—তখন নাকি আমেলিয়া বিবির বাড়িতে একটি কুঠুরির ভিতর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছিলো সাহেবজাদা ইফতিকার ইসমাইল খান, আর দোতলার একটি হলঘরে স্কচ হুইস্কির আসর জমে উঠেছিলো আমেলিয়া, গ্রীণ সায়েব আর অন্যান্য খাঁটি বৃটিশ বীরপুরুষদের নিয়ে। কোনো নেটিভ রাজা-মহারাজা জমিদার সেদিন রাত্তিরে এপাড়ার ছায়াও মাড়াতে সাহস করেনি।

সেদিনকার সেই ফিরিঙ্গীবহুল অঞ্চল আজ চায়না-টাউন—তার মধ্যে শুধু আঁকাবাঁকা পড়ে আছে বিবি আমেলিয়া লেন"।

একটু চুপ করে থেকে দিলীপ বললো, "তার প্রায় বছর তিরিশ পর আমেলিয়া বিবি যখন মারা যায়, তদ্দিনে এসব গল্প অনেকেই ভুলে গেছে। তখন চীনে অধিবাসীতে ভরে গেছে এ অঞ্চল, আর এ অঞ্চলের নামকরা দুর্ধর্ষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে আমেলিয়ার মেয়ে রেবেকা বিবি"।

"যা বললে এ-সব সত্যি দিলীপ দা?" আমি পথ চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলাম।

দিলীপ হাসলো। বললো, "চায়না টাউনের বুড়োদের মুখে নানারকম গল্প শোনা যায়।"

"তুমি কার কাছে শুনেছো এ-সব?"

"বুড়ো ওয়াং'এর কাছে। চল না দেখবি তাঁকে"।

বলতে বলতে দিলীপ যেখানে এসে থামলো সেখানে দেখি, একটি বাড়ির একতলায় সামনে একটি জীর্ণ সাইনবোর্ড, চীনে অক্ষরে লেখা। ঘরের ভিতর দু'টো তিনটে চৌকো টেবিল। আশে-পাশে দু-চারখানা করে চেয়ার। লোকজন নেই। খুব কম পাওয়ারের দুটি আলো ঝুলছে ঘরের দু'পাশে। মাঝখানে একটি অচল ফ্যান। দু'-চারটে বাদুড় উড়ছে। এক পাশে একটি কাউণ্টার। সেখানে চার-পাঁচটা বয়ামে বিস্কুট আর এটা-ওটা-সেটা সাজানো।

"এটা কি দিলীপ দা'?"

"রেস্তরাঁ।"

"এখানেও রেস্তরাঁ?"

"আয় না।"

ঘরে ঢুকে কিন্তু সেখানে বসলো না। ডাইনে একটি স্প্রিং-এর দরজা। সেটি ঠেলে এসে পড়লাম একটি প্যাসেজে। ম্লান সবুজ আলো জ্বলছে এক পাশের দেওয়ালে। সেই প্যাসেজ ধরে ভেতর দিকে খানিকটা এগিয়ে ডাইনে একটি সমকোণে ঘুরে আরো একটু যেতেই প্যাসেজের শেষে ফ্রস্টেড্‌ কাচের দরজা। খুব উজ্জ্বল আলো আসছে কাচের ভেতর দিয়ে।

উচ্ছ্বসিত হাসির আওয়াজ এলো।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি, একটি বেশ বড়ো ঘর। মাঝখানে একটি বড়ো গোল টেবিল ঘিরে অনেকগুলো চেয়ার। দেয়ালের গায়েও দু'-তিনটে চেয়ার সাজানো। দু'কোণে গোটা দুই নীচু টি'পয়। টি'পয়ে ফুলদানি, তাতে দু'টো তিনটে করে কার্নেশান, গ্লাডিওলা আর এ্যাসটার ফুল। দেওয়ালে গোটা দুই চাইনিজ স্ক্রোল্‌।

গোল টেবিল ঘিরে বসেছিলো কয়েক জন। আমাদের ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়ালো। "হিয়ার কাম্‌স আওয়ারফ্রেণ্ড মুখার্জী—।"

"এত দেরী হোলো কেন? তোমায় আশা করছিলাম অনেকক্ষণ আগে।"

"আসছো না দেখে ভাবলাম আজ হয়তো রেস-এ অনেক টাকা হেরেছো।"

"ও—নো। হারুক বা জিতুক মুখার্জী আসবেই। হারলে থ ভুলতে আসবে, জিতলে সেলিব্রেট করতে আসবে।"

"বাই দি ওয়ে, আজ আমাদের একজন নতুন বন্ধু এসেছে। নীর সঙ্গে আসছে আরো দু'জন। আর তুমিও তো দেখছি রঞ্জনকে এনেছো। লেট্'স ইনট্রডিউস আওয়ার সেলভ্স টু ওয়ান নাদার। সুলেমান, এদিকে এসো। মীট প্রফেসার দিলীপ গার্জী। সে এখন আর প্রফেসার নেই। হী ইজ ইন বিজনেস াইক মোষ্ট অফ আস। কিন্তু অল্ দি সেম আমরা ওকে প্রফেসার লে ডাকি। এ হোলো আমার বন্ধু হাসিম সুলেমান। করাচী কে এসেছে। হী ইজ ইন টী।"

"গ্লাড টু মীট ইউ। হা' ড্যু' ডু।"

"হা' ড্যু' ডু।"

"জেনী কোথায়?" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"জেনী ওর বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে তিনটের শো'তে। এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যেই।"

"মীট মাই ফ্রেণ্ড রঞ্জন।—এ আমার বন্ধু ওয়াং সুং-চাং, এই রেস্তর'াঁর প্রোপ্রাইটার।"

নিখুঁত ছাঁটের স্যুটপরা, মাঝারি গড়ন। শ্মশ্রুবিহীন মালায়েস ফর্শা মুখ। বয়েস বোঝা যায় না। তবে দিলীপ দা'র চাইতে বয়েসে বড়ো হবে না নিশ্চয়ই।

"রেস্তর'াঁর দু'টো অংশ দুরকম কেন?"

"বাইরেরটা বাইরের লোকের জন্যে," সুং-চাং বললো, "ভেতরেরটা প্রাইভেট। এ শুধু বন্ধুবান্ধবের জন্যে। আসলে এদিকটায় আমরা থাকি, এ ঘরটার সঙ্গে রেস্তর'াঁর কোনো সম্পর্ক নেই।"

রেস্তর'াঁর দীন চেহারার সঙ্গে রেস্তর'াঁর মালিকের মহার্ঘবাস চেহারার কোনো মিল নেই। তবু আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

ওয়াং সুং-চাংই আলাপ করিয়ে দিলো অন্য সবার সঙ্গে।

"এ আমার ছোটো ভাই ওয়াং চিয়েন-চাং।···আমার বোন মীনি ওয়াং।···আমার বন্ধু ফেং চেং-শিয়াং···"

অত্যন্ত দীর্ঘ সুপুরুষ চেহারা, পরনে দামী রেয়নের স্যুট, স্পষ্ট মার্কিণ ছাঁট। সবুজ জেড্ পাথরের দামী হোল্ডারে একটি ধূমায়মান সিগারেট, কড়া গন্ধে বোঝা যায় ভাজা আমেরিকান তামাক, নাক, যেটুকু আছে, মনে হোলো অত্যন্ত উঁচু।

"চেং শিয়াং' এর বোন মিস ফেং টিং-লিং!"···

টিং-লিং মীনি ওয়াং-এর চাইতে অনেক সুন্দর দেখতে। মীনি ওয়াং অতি সাধারণ চীনে মেয়ে। মিষ্টি মুখশ্রী, লিনেনের ফ্রকে প্রায় স্কুলের মেয়ে বলেই মনে হয়। কিন্তু টিং-লিং আশ্চর্য সুন্দর, দুধে-আলতা গোলা রং বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই, কিংবা সাদা বরফের উপর এক ফোঁটা গোলাপী সিরাপ ঢেলে দিলে যে রকম হয়,—মোমের মতো নরম, চীনে মাটির ডলের মতো কমনীয়, চীনে শিল্পীর তুলির দু'-চার টানে আঁকা ছবির মতো। পরনে হাতকাটা চীনে গাউন, হাঁটুর ঠিক নীচে অবধি তার ঝুল, কিন্তু উরুর দু' পাশ দিয়ে হাঁটু থেকে উরুর প্রায় মাঝা-মাঝি পর্যন্ত কাটা। জুতোর হীল অস্বাভাবিক উঁচু।

"আমাদের আরেক জন বন্ধু যোগীন্দর সিং।"

শেরওয়ানী আর চুড়িদার পায়জামায় দীর্ঘ সুপুরুষ চেহারা, মনে হয় যেন ময়দানের ও প্রান্তে মন্যুমেন্টের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। খুব যত্ন করে ছাঁটা গোঁফ, ঘন চাপ দাড়ি, মাথার গোলাপী পাগড়ির আবগুলো ইলেকট্রিক আলোয় চিক চিক করছে। ফর্সা রং আর চোখা নাক, দীর্ঘ চোখ দুটো বেশ হাসিখুশী।

"হেনরী লরেন্স। পোর্টে কাজ করে।"

কলকাতার সাধারণ এ্যাংলোইণ্ডিয়ান, ময়লা রং, বেশ স্মার্ট দেখতে।

"জয়প্রকাশ ত্রিবেদী। এ এসেছে দিল্লী থেকে, একটি বৃটিশ ফার্মের এঞ্জিনীয়ার।"

জয়প্রকাশ ত্রিবেদী হাত তুলে নমস্কার করলো।

সে আমার পাশেই বসেছিলো।

সবাই যখন আবার গল্প-গুজব করতে সুরু করলো, সে আমায় বললো, খুব পরিষ্কার বাংলায়, "আপনি দিলীপের খুব বন্ধু বুঝি? আপনাকে আগে কোনো দিন দেখিনি।"

"দিলীপ দা'র সঙ্গে আমার মাঝখানে বছর দু'-তিন দেখা হয়নি। কিন্তু আপনি তো পরিষ্কার বাংলা বলেন!"

জয়প্রকাশ হেসে বললো, "আমরা দিল্লীর লোক। কিন্তু আমার মা বাঙালী।"

"আমার জন্যে বীয়ার," —দিলীপ দা'র গলা শোনা গেল।

"আমিও তাই, যা গরম আর কিছু খাওয়া যায় না।"

"হোয়াট ক্যান আই অফার ইউ?"

"আমি? আমার এক কাপ চা হলেই চলবে।"

"হোয়াট? নো ড্রিঙ্কস্?"

"নট য়েট্,"—আরেক জন কে যেন হেসে বললো।

"অল রাইট, উই শ্যাল অল্ হ্যাড্ টী। জেনী আর ওর বন্ধুরা আসুক, তার পর উই মে হ্যাভ সাম থিং এলস্।"

"জেনী কখন আসবে? সাতটা যে বেজে গেছে।"

"জেনী সিনেমায় গেছে কার সঙ্গে," জিজ্ঞেস করলো দিলীপ।

"তুমি ওর বন্ধু ম্যাবেল রবিনসনকে নিশ্চয়ই চেনো?"

"হ্যাঁ, একদিন দেখেছি।"

"সে আছে, আর, হেনরির গার্ল ফ্রেণ্ড মা-খিন-চ্যি আর ওর ভাই মংং মংং জ্যি।"

"বার্মিজ্?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা! আমি জানতাম না হেনরীর একটি নতুন গার্ল-ফ্রেণ্ড হয়েছে। বোধ হয় এটি তোমার চার নম্বর?"

দিলীপের কথায় সবাই হাসলো।

"এ্যাণ্ড সো হোয়াট?" জিজ্ঞেস করলো হেনরী লরেন্স।

"কিছু না। ঠিক আছে। তুমি সেই ভদ্রমহিলার কতো নম্বর?" টেবিলে ঘুষি মেরে হেনরী উঠে দাঁড়ালো।

"ব্যস, ব্যস, বুঝেছি," দিলীপ বললো, "তুমি অনেক গভীর জলে তলিয়ে গেছ। তা' না হলে তুমি চটতে না। আমি তোমার সাফল্য কামনা করি, যাতে তুমি সারা জীবন একটি বিশ্বস্ত বধূর বাক্যবাণ-জর্জরিত হয়ে সুখী হও।—আ-হা, আমার কথায় রাগ করছো কেন? একজন বিখ্যাত আধুনিক দার্শনিক বলেছে, সাত বার প্রেম-করা ছেলে যদি অষ্টম বার একটি পাঁচ বার প্রেম-করা মেয়ের প্রেমে প'ড়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করে, তা' হলে মানব-সমাজে

ডিভোর্স' বলে কোনো কিছু থাকবে না, পারিবারিক জীবন সত্যি সত্যি শান্তিময় হবে।"

"তুমি ক'বার প্রেম করেছো প্রফেসার ?"

"আট বার হয়ে গেছে। A cat has nine lives জানো তো! পরেরটির পথ চেয়ে বসে আছি।"

"তার পর ?"

"তার পর আর কি। পঞ্চমার খোঁজ করতে করতে আরো সংখ্যা বেড়ে যাবে।"

"ওহে প্রফেসার, জানো, মা-খিন-চ্যি একজন আর্টিষ্ট। খুব ভালো ছবি আঁকে। ওদের দেশে ওর খুব নামডাক।"

"তাই নাকি ?" একটু চুপ করে গেল দিলীপ। তার পর বললো, "দেখ হেনরী, বন্ধুর একটি পরামর্শ গ্রহণ করবে ? যাকে খুশী বিয়ে করো, কিন্তু আর্টিষ্টকে নয়।"

"কেন ?"

"যে মেয়ে আর্টিষ্ট, সে তো কোনো দিন তোমায় সময় মতো ব্রেকফাষ্ট তৈরী করে খাওয়াতে পারবে না ? তোমায় বকাবকি করতে পারবে না, ছুটির দিনে বাড়িতে পাওনাদার এলে তুমি থাকলেও নেই বলে তাকে ভাগিয়ে দিতে পারবে না—নেহাৎ সে যদি আমার বন্ধু সলোমন দি' জু না হয়। আর্টিষ্ট শুধু বসে বসে ছবি আঁকবে, সে ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। ছবি দেখে তুমি যখন হাসবে, অন্য কোনো সমঝদারের সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে ঘর ছেড়ে। মেয়ে-আর্টিষ্ট খুব ভালো সুইট-হার্ট হয়, ভালো বৌ হতে পারে না।"

"কে বললে ? তুমি মা-খিন-চ্যি'কে জানো না—"

"দেখ ছোক্‌রা, তুমি ক'জন আর্টিষ্টের সঙ্গে প্রেম করেছো ?"

"তুমি ক'জনের সঙ্গে করেছো ?"

"আমি ? যখন বিলেতে ছিলাম, ব্রাইটনে একটি ফ্রেঞ্চ মেয়ে-আর্টিষ্টের সঙ্গে প্রেম করেছি দু' হপ্তা। যখন রিভিয়েরায় গিয়েছিলাম, ক্যালিফর্ণিয়ার এক মেয়ে-আর্টিষ্টের সঙ্গে প্রেম করেছি তিন দিন। যখন নেপল্‌স্‌-এ ছিলাম, তখন একজন হাঙ্গেরিয়ান মেয়ে-আর্টিষ্টের সঙ্গে—"

"প্রফেসার, তোমার কি আর্টিষ্টিক রুচি !"

"বেছে বেছে শুধু আর্টিষ্টরাই কেন তোমার প্রেমে পড়লো বন্ধু ?"

"ব্যস, ব্যস, অনেক হয়েছে। মানলাম তুমি যখনই যে সমুদ্রে গেছ, সেখানেই এক বিদেশী মেয়ে-আর্টিষ্টের সঙ্গে প্রেম করেছো। তাতে কি প্রমাণ হোলো ?"

"বৎস, আমার কথা শেষ করতে দাও। ফ্রেঞ্চ মেয়ে আমায় দিয়ে একটি ছবি আঁকলো, ছবির নাম দিলো : The dreamer from India। একজিবিশানে এক ইংরেজ ধনী সে-ছবি কিনতে চাইলো কয়েক হাজার পাউণ্ড দিয়ে। মেয়েটি তাকে ছবি না বেচে তাকে বিয়েই করে ফেললো। ক্যালিফর্ণিয়ার মেয়েটি মন্টিকার্লোর সমুদ্রের তীরে আমায় একটি বিছানার চাদর হাঁটুর উপর আঁট ধুতির মতো পরিয়ে, মাথায় একটি লাল চেক পর্দা লাল গামছার মতো জড়িয়ে ছবি আঁকলো : The fisherman from Puri। সেটি কভার পেজ-এ ছাপলো একটি বিখ্যাত মার্কিণ ম্যাগাজিন। মেয়েটি সেই ম্যাগাজিনে চাকরি নিয়ে নিউইয়র্ক চলে গেল। হাঙ্গেরিয়ান মেয়েটি আর আমি নেপল্‌স্‌-এ এক নাইটস্পটে বসে গল্প করছিলাম, এমন সময় হলিউডের ফিল্ম কোম্পানির এজেন্ট এসে তাকে আবিষ্কার করলো। ব্যস, এখন তার ছবি কলকাতায় এলে তোমরা হুড়মুড় করে এ্যাডভান্স বুকিং করতে ছোটো আর আমি বসে ধরমতলার বার-এ বসে দিশী হুইস্কি খাই। এদের বিয়ে করলে কেউ কোনো দিন সুখী হতে পারবে ?"

"মনে হচ্ছে ওদের বিয়ে করতে না পেরে তুমি খুব মর্মাহত হয়ে আছো।"

"যদি ওদের বিয়ে করতে তা'হলে কি তোমায় আমাদের মধ্যে পেতাম ?"

"তুমি কী লাকি, যেই তোমার সঙ্গে একবার প্রেম করে তারই ভবিষ্যৎ খুলে যায় !"

"আর্ট যারা ভালোবাসে তারা চিরকাল তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।"

"তা'ছাড়া ওরা পশ্চিমের মেয়ে—," বললো হেনরী লরেন্স।

"মেয়েদের আবার পুব-পশ্চিম কি ?"

"হাজার হোক আমাদের চীন বা বর্মা বা ভারতের মেয়েরা ইউরোপ-আমেরিকার মেয়েদের মতো নয়।"

"কি করে জানলে ? তুমি বিচার করে দেখবার সুযোগ পেয়েছো ?"

"তুমি পেয়েছো ?"

"হ্যাঁ।—আমি ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি, ফ্রেঞ্চের সঙ্গে করেছি, আমেরিকান, সুইডিশ, হাঙ্গেরিয়ান, জার্মাণ, নিগ্রো, টার্কিশ, পার্শিয়ান, স্পেনিশ, বাঙালী, মাদ্রাজী—"

"ব্যস, ব্যস, প্রফেসার, আর বলতে হবে না। মানলাম তুমি ইন্টারন্যাশনেল ফিগার। কিন্তু আর্টের বেশী হয়ে গেল যে !"

"তুমি চাইনিজ মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়েছো কোনো দিন ?"

চট করে কোনো উত্তর দিলো না দিলীপ।

"ওকে ও কথা জিজ্ঞেস কোরো না। চায়না টাউনের মাঝখানে বসে সত্যি কথা বলতে হয়তো ওর সৌজন্যে বাধবে—"

"দেখ, আমি যখন ইংল্যাণ্ডে ছিলাম তখন হংকং থেকে একটি চাইনিজ মেয়ে—"

সবাই হাসতে সুরু করলো। এমন হাসি, হাসির তোড় আর থামে না কিছুতেই।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। এমন সময় চা নিয়ে এলো মীনি ওয়াং।

একটি মস্তো বড়ো ল্যাকারের ট্রে, তা'তে সোনালী রেখায় ছবি আঁকা। ট্রে থেকে একটি চায়ের পট নামিয়ে রাখলো টেবিলে। নীল পোর্সিলেনের টি-পট, তা'তে লাল, সোনালী আর সাদা রেখায় একটি ড্রাগন আঁকা। তার সঙ্গে রং মেলানো কয়েকটি ছোটো ছোটো পোর্সিলেনের বাটি, উপরটা ঢাকা। চা ঢেলে এগিয়ে দেওয়া হোলো সবাইকে। ঢাকনির এক পাশে একটি ফাঁক। সবাই দেখি, সেখানে ঠোঁট লাগিয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছে।

বাটি ধরে আমিও চুমুক দিলাম। ওয়াং সুং চুং আমার মুখের দিকে তাকালো। "এনি থিং রং উইথ ইওর টী ?"

"না, না। চমৎকার ফ্লেভার, কিন্তু," আমি একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, আমারটিতে বোধ হয় দুধ-চিনি দিতে ভুলে গেছেন।"

সবাই এ-ওর মুখের দিকে তাকালো।

ফে: চে:-শিয়াং বললো, "এটা আমাদের গ্রীণ-টী। বোধ হয় তোমার অভ্যেস নেই।"

মীনি বললো, "আচ্ছা, আমি দুধ-চিনি দিয়ে এক কাপ চা করে আনছি।"

"দরকার নেই," বললো দিলীপ, "ও অভ্যেস করুক! দুধ-চিনি চায় তো এনে দাও। ওগুলো আলাদা খেয়ে নেবে। পেটে গিয়ে সব ইণ্ডিয়ান টী হয়ে যাবে। কিন্তু, জেনী ওয়াং এখনো আসছে না কেন?"

আমায় সাহনুভূতি করেই বোধ হয় আর কেউ দিলীপের কথায় হাসলো না। শুধু বোকার মতো আমিই হাসলাম।

দিলীপ আমায় বললো, "জানিস, আমাদের চায়ে আর ওদের চায়ে শুধু একটি মিল। চা'কে আমরা চা বলি, ওরাও বলে চা। ম্যাণ্ডারিন চাইনিজে 'চা', ক্যাণ্টনিজ ভাষায় উচ্চারণে একটু তফাৎ—ওরা বলে 'ছা'। তার থেকে আমাদের বাংলায় 'চা', হিন্দিতে 'চায়'। আর হোকিয়েন ভাষায় বলে 'টে', যার থেকে ফরাসী আর ইংরেজী প্রতিশব্দ এসেছে"।

"আমাদের ভাষার প্রভাব তা'হলে আন্তর্জাতিক বলতে হবে—"।

"নো ব্রাদার, এটা ওয়ান-ওয়ে ট্র্যাফিক নয়। আমাদের সংস্কৃত ভাষা থেকেও কিছু শব্দ গেছে তোমাদের ভাষায়। যেমন? এই ধরো, ম্যাণ্ডারিন। তোমাদের দেশে রাজপুরুষকে বলে ম্যাণ্ডারিন, তোমাদের জাতীয় ভাষাকেও বলে ম্যাণ্ডারিন। এ শব্দটা কোথেকে এসেছে জানো? সংস্কৃত 'মন্ত্রিন' থেকে।"

ফে: চে:-শিয়াং হাসলো। বললো, "আমাদের ভাষায় ম্যাণ্ডারিন বলে কোনো শব্দ নেই"।

"সে কি"?

"ওটা ইউরোপীয়েরা আমাদের সম্বন্ধে ব্যবহার করে। কথাটা এসেছে পর্তুগীজ 'ম্যাণ্ডারিম' থেকে। ওরা নিয়েছে মালয় ভাষার 'মান্ত্রি' থেকে। 'মান্ত্রি' মানে উপদেষ্টা, মালয় ভাষায় শব্দটা হয়তো সংস্কৃত 'মন্ত্রিন্' থেকে এসেছে। 'ম্যাণ্ডারিন' ইংরেজী শব্দ"।

"তোমরা কি বলো তা হলে?"

"আমরা বলি তং-শান' এর ভাষা। তং-শান মানে 'তং'এর দেশ। 'তং' হচ্ছে 'তাং' শব্দটির ক্যাণ্টনিজ উচ্চারণ। তাং রাজাদের আমলে দক্ষিণ চীন থেকে যারা বিদেশে যেতো, ওরা নিজেদের বলতো 'তং-য়েন', অর্থাৎ 'তং' বা 'তাং' এর সন্তান। চীনদেশকে বলতো তং-শান অর্থাৎ তং বা তাং'দের দেশ। তার থেকে 'তং-শান'এর ভাষা, যাকে ইউরোপীয়ানরা বলে ম্যাণ্ডারিন"।

"মনে হচ্ছে তুমি যেন ঠকে গেলে প্রফেসার—"

"না, ঠকে যাবো কেন? আমরা সবাই সবার কাছে অনেক কিছু শিখি।"

"বেশ তো, তোমার কি শেখাবার আছে বলো?" বললো সুলেমান।

"তুমি আজ নতুন এসেছো, না"?

"হ্যাঁ"।

"রঞ্জনও আজ নতুন—"।

আমি একটু হাসলাম। "বেশ শোনো। তোমাদের কাছে এ একেবারে নতুন গল্প। সুং-চাং আর চিয়েন-চাং বোধ হয় জানে, কিন্তু মিস ফে: আর চে:-শিয়াং না-ও জানতে পারে।"

সবাই নড়ে-চড়ে বসলো।

দিলীপ দা' প্রচুর মদ্যপান করুক বা রেস খেলুক বা প্রচুর গুল ওড়াক বা যাই করুক, যখন ইতিহাসের চাটনি দিয়ে গল্প বলতে বসে, তখন যে ওর জুড়ি নেই, সে কথা সবারই জানা।

"এ কথা তোমরা সবাই জানো," দিলীপ আরম্ভ করলো, "যে পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই যেখানে চায়না টাউন নেই। সানফ্রান্সিস্কো, ইলিনয়স্, লিমা, কেপটাউন, ড্রেসডেন, লণ্ডন, মার্সাই, নিউইয়র্ক, কলকাতা, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক, জার্কার্তা সব জায়গায় এরা একটি নিজেদের অঞ্চল গড়ে তোলে। এই রঞ্জনকে জিজ্ঞেস করো, সে কি কোনো দিন জানতো যে কলকাতায় এমন পাড়া আছে যেখানে এলে মনে হয় ম্যাকাও কি ক্যাণ্টনে বেড়াতে এসেছি? কিন্তু কোনো দিন কি কেউ ভেবে দেখেছো এই উপনিবেশগুলো গড়ে তোলার পেছনে আছে অনেকখানি রোমাঞ্চকর ইতিহাস? তোমাদের তো ধারণা, কলকাতায় যা কিছু দেখছো সবই আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু জব চার্ণক যখন ১৬৯০'র ২৪এ আগষ্ট সুতোনুটির ঘাটে এসে নামলো তখন কি ছিলো এই চায়না টাউন?"

দিলীপ যখন পুরোনো কলকাতার গল্প করতে বসে তখন সে আরেক দিলীপ, যার জীবনের একটি সময় কেটেছে শুধু বইয়ের মধ্যে ডুবে থেকে।—কিন্তু সেই ডুবে থাকাও তাকে ভোলাতে পারেনি যে তার ইংরেজ মা তার ছেলেবেলায় তাকে ছেড়ে, তার বাবাকে ছেড়ে, চলে গেছে আসামের এক টী-প্লাণ্টারের সঙ্গে। সেই ছেলেবেলা থেকে কী একটা যেন খুঁজে পাওয়ার দুর্বোধ্য অসহনীয় আকাঙ্খার বেদনা তার সব-কিছু পাওয়ার সামর্থ্য নিংড়ে নিঃশেষ করে অপচয় করে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে একটি পলাতক মনোবৃত্তির মধ্যে। সে সব ভুলে গিয়ে সবুজ চা খেতে খেতে সেদিন তার মুখে গল্প শুনলাম বাঙালী, চীন, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, উত্তর-ভারতীয়, পাঞ্জাবী ও পাকিস্তানীর ঘরোয়া জনতায়।

"তখন তো শুধু জলা মাঠ, এখানে-সেখানে দু'-চারটে গোলপাতায় ছাওয়া মাটির ঘর। বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট তখন একটি দীর্ঘ শীর্ণ পথের অংশ যা দক্ষিণে কালীঘাট থেকে বহুদূর উত্তরে ব্যারাকপুর ছাড়িয়ে চলে গেছে। সে অংশের তখনকার নাম কসাইটোলা। পুরোনো কলকাতার ম্যাপে দেখা যায়, সে পথের পূবে শুধু জঙ্গল, যেখানে আজ আমরা বসে গল্প করছি। তখন ইংরেজরা কলকাতায় নতুন, চীনেও প্রায় অপরিচিত—যদিও কলকাতায় আসবার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, মিং রাজবংশের রাজত্বের শেষভাগে, ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইংরেজ জাহাজ চীনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কলকাতা যখন বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠলো তখন একজন দু'জন করে চীনে দেখা যেতে লাগলো কলকাতায়। ওরা সাধারণত আসতো ম্যাকাও থেকে, যেটা পর্তুগীজদের দখলে চলে গিয়েছিলো পলাশী যুদ্ধের দু'শো বছর আগে, ১৫৫৭ সালে। বাংলা দেশে যখন পলাশীর যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে তখন অবশ্যি চীনাদের নাম-গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে পুরোনো কাগজ পত্রে। সায়েব-পাড়ার নীলাম থেকে বাঙালী জমিদার চীনে ছবি কিনে নিয়ে যাচ্ছে প্রচুর দাম দিয়ে, তারও খোঁজ পাচ্ছি। সে সময় ইংরেজরা অন্যান্য ইউরোপীয়দের মতো উঠে-পড়ে লেগেছে চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্যে। আমায়,

নিংপো, স্তিংহাই বন্দরে ইংরেজ জাহাজ আনাগোনা সুরু করেছে। তাদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে পিকিং'এর মাঞ্চুসম্রাট। পলাশীর যুদ্ধের বছর দু'য়েক পরে, কোয়াংতুং আর কোয়াংসির রাজপ্রতিনিধি লি শিহ-য়াও চীন সম্রাটের কাছে লিখতে বাধ্য হোলো:—The foreigners who come to China from afar do not know the Chinese language. They have to conduct their business transactions in Canton with the aid of Chinese merchants who know foreign languages...It is my most humble opinion that when uncultured barbarians who live far beyond the borders of China, come to our country to trade, they should establish no contact with the population, except for business..."

তখন থেকে বিদেশী বণিকদের বাণিজ্য শুধু ক্যান্টনেই সীমাবদ্ধ করা হোলো। যে সব চীনা ব্যবসায়ী ইউরোপীয়দের ভাষা জানতো বা তাদের চীনে ভাষা শেখাতে উৎসুক হোতো, তাদের সঙ্গে বেশী মাখামাখি করতো, তারা সবাই মাঞ্চু সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়লো। তাদেরই একজন একদিন দেশ ছেড়ে ক্যান্টন থেকে চলে এলো কলকাতায়। তার নাম তং আৎ-ছু।

পলাশীর যুদ্ধের পর ষোলো-সতেরো বছর কেটে গেছে। তখন কলকাতায় গভর্ণর জেনারেল অফ ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গল—মিষ্টার ওয়ারেণ হেষ্টিংস।

কলকাতার ইংরেজরা তখন চীনের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে খুব উৎসুক। আৎ-ছু'র সঙ্গে কলকাতার অনেক বড়ো বড়ো সায়েব-সুবোর সঙ্গে জানা-শোনা হয়ে গেল। শোনা যায়, ক্যান্টনের বিখ্যাত ইংরেজ সওদাগর জেম্স্ ফ্লিন্টের সঙ্গে আৎ-ছু'র জানা-শোনা ছিলো। সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, এ সব জনশ্রুতি আৎ-ছু'র পক্ষে কলকাতার অভিজাত ইংরেজ সমাজে পৃষ্ঠপোষক জোগাড় করে নেওয়ায় খুব সাহায্য করলো। কে যেন ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে বলেছিলো যে, ক্যান্টনের ইংরেজদের সঙ্গে আৎ-ছু'র সদ্ভাবই তার দেশ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হওয়ার অন্যতম কারণ।

সুতরাং, কিছুদিন পরে আৎ-ছু' যখন সাড়ে ছ'শো বিঘে জমির পাট্টা চাইলো, হেষ্টিংস দ্বিধাবোধ করলো না। বজবজ থেকে মাইল ছয়েক পশ্চিমে, গঙ্গার ধারে উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোডের পাশে সেই জমির উপর ভারতের প্রথম চিনির কল বসালো সেই অজ্ঞাত-কুলশীল চীনে সওদাগর আৎ-ছু'। সেই সাড়ে ছ'শো বিঘে জমির উপর গড়ে উঠলো ভারতের প্রথম চৈনিক উপনিবেশ। তার প্রতিষ্ঠাতা তং আৎ-ছু'র নামে সে জায়গার নাম হোলো আছিপুর।

তখনো কলকাতায় চীনেপাড়া নেই। তখনকার ম্যাপে কসাইটোলায় দেখানো হচ্ছে মোটে তিন-চারখানা বাড়ির নিশানা। সে পথের পুবের জঙ্গল তখনো সাফ হয়নি, বর্ষার দিনে এত কাদা যে যাওয়া যায় না।

আজ সন্ধ্যায় আমরা সবাই এখানে বসে চা খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছি।

সেদিন সন্ধ্যায়, তং আৎ-ছু' যখন দিনের কাজ সেরে গঙ্গার ধারে বসে তার পাইপে টান দিচ্ছে, তখন এখানে ঘনঘোর অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে।

আৎ-ছু'র চিনির কল, যাকে তখনকার দিনে বলা হোতো sugar manufactory, প্রথম দিকটা বেশ চলতে লাগলো। তখন ম্যাকাও থেকে যে সব পর্তুগীজ আর ওলন্দাজ জাহাজ আসতো কলকাতায় তাদের ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে চীনে শ্রমিক এদেশে আনানোর ব্যবস্থা করেছিলো আৎ-ছু'। চীনের জনসংখ্যা তখন অভূতপূর্ব ভাবে বাড়ছে। দক্ষিণ-চীনে ইউরোপীয় বণিকদের আফিং রপ্তানী সুরু হয়ে গেছে। চীনের আর্থিক অবনতি সুরু হয়েছে আস্তে আস্তে। সুতরাং সপরিবারে বিদেশে গিয়ে বসবাস করতে রাজী হওয়া চীনে শ্রমিকের অভাব হোলো না। দলে দলে অনেক লোক এলো কোয়াংতুং, ফুকিয়েন আর চেকিয়াং প্রদেশ থেকে। আর এলো ফেং সুং-তাও।

ফেং সুং-তাও ছিলো আময় শহরের একজন বিখ্যাত গুণ্ডার সর্দার। ইংরেজদের কাছ থেকে আফিং কিনে সেগুলো সে চালান দিতো কোয়েইচাও, হোনান, কিয়াংসি এসব অঞ্চলে। ফুকিয়েন প্রদেশের উপকূলে যে সব ডাকাতি হোতো তাতেও নাকি হাত ছিলো ফেং সুং-তাও'এর। কোয়াংতুং-এর প্রাদেশিক সরকার তাকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টায় ছিলো অনেক দিন থেকে, কিন্তু কোনো উপলক্ষ পায় নি। একদিন চি তু-শিউ নামে কোয়াংতুং-এর রাজপ্রতিনিধির অনুগ্রহভাজন এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী সুং-তাও'এর এলাকায় ছোরার ঘায়ে নিহত হওয়ার পর সুং-তাও'কে গ্রেপ্তার করতে গেল আময়ের পুলিশ। কিন্তু তার আগেই খবর পেয়ে আময় থেকে সিঙ্গাপুর রেঙ্গুন হয়ে কলকাতায় পালিয়ে এসেছিলো ফেং সুং-তাও।

তার মতন একজন লোকের প্রয়োজন ছিলো তং আৎ-ছু'র। সে তাকে আছিপুরে ডেকে নিয়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যে ফেং-সুং-তাও ডান হাত হয়ে উঠলো আৎ-ছু'র।

হয়তো একদিন আছিপুর বাংলা দেশের একটি বিখ্যাত শিল্পাঞ্চল হয়ে উঠতো। কিন্তু সে আর হোলো না। গোলমাল বাধলো আৎ-ছু' আর ফেং-সুং-তাও'এর মধ্যে।

এমন শত্রুতা বাধলো যে, আছিপুরের উন্নতির সমস্ত সম্ভাবনা ব্যাহত হোলো।

গোলমালের সূত্রপাত, চিরকাল যা' হয়, একটি মেয়েকে নিয়ে। মেয়েটির নাম জু-শী, তং আৎ-ছু'র পালিতা কন্যা।

জু-শী'কে ভীষণ ভালো বাসতো তং আৎ-ছু'। ফেং সুং-তাও এসে একদিন তং আৎ-ছু'কে কাও-টাও করে বললো, জু-শী'কে বিয়ে করতে চাই।

খুব দাম্ভিক লোক ছিলো আৎ-ছু'। ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলো খুব মোলায়েম গলায়, "জু-শী তোমায় বিয়ে করতে যাবে কেন?"

"কেন করবে না," সুং-তাও বললো।

"দেখ সুং-তাও," আৎ-ছু' বললো, "তুমি খুব কাজের লোক, আমি তোমায় পছন্দ করি, আমি চাই যে তুমি বিয়ে থা করো, তোমার বংশ বৃদ্ধি হোক, ফেং পরিবারের নবাগত সন্তানেরা তোমার পূর্বপুরুষদের গৌরব বৃদ্ধি করুক, বাপ-পিতামহের দেহ-নিষ্ক্রান্ত আত্মার সন্তুষ্টি বিধান করা যে কোনো তং-য়েন্' এর কর্তব্য। কিন্তু তাই

স্বং-তাও, তুমি আমার বন্ধু, তোমার বন্ধুর মতো পরামর্শ দিতে চাই, জু-শী' কে নয়।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো সুং-তাও।

"কারণ জু-শী' একটি শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে," উত্তর দিলো আং-ছু,' "জু-শী' নিজেও কবিতা লিখতে পারে। তার পিতামহ ছিলো একজন য়া-মেন্ রাজপুরুষ। আর তোমার বাবা ছিলো কসাই, তুমি আফিং বেচতে আময়ে। তোমার সঙ্গে জু-শী'র বিয়ে দিলে ওদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে আমার আত্মীয়-স্বজন যে 'মুখ' হারাবে।"

সুং-তাওএর ধমনীতে আময়ের গুণ্ডা সর্দারের রক্ত টগবগ করে উঠলো। সে বললে, "ও সব আমি বুঝি না। জু-শী কে ডেকে জিজ্ঞেস করো। সে আমায় বিয়ে করতে চায়।"

আং-ছু' হেসে বললো, "বেশ তো, এস আমরা খেতে বসি। বেশ বেলা হয়ে গেছে। জু-শীকে সেখানে ডেকে জিজ্ঞেস করছি।

ভাপে-সেদ্ধ কচ্ছপের স্যুপ ও বাঁশের কোঁড় আর খুব যত্নে রান্না করা সুনফং-সাই খেতে খেতে আং-ছু জু-শীকে জিজ্ঞেস করলো, "আমার বন্ধু সুং-তাও তোমার পাণিগ্রহণ করে সম্মানিত হতে চায়। তোমার কি মনে হয় না এরকম একটি অসম্ভব প্রস্তাব করে সুং-তাও তার সাময়িক মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার পরিচয় দিচ্ছে?"

জু-শী মাথা নীচু করে বসে রইলো। আং-ছু' তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলো। জু-শী মাথা নাড়লো আস্তে আস্তে। "কী?" লাফিয়ে উঠলো আং-ছু'।

সুং-তাও হেসে বললো, "আজ অনেক দিন ধরে নদীর পাড়ে সন্ধ্যের পর আমাদের দেখা হচ্ছে, তাই না?"

জু-শী মাথা নাড়লো।

সুং তাও জিজ্ঞেস করলো, "মাঝে মাঝে অনেক দিন আমরা নৌকো করে গঙ্গায় বেড়িয়েছি, তাই না?"

জু-শী মাথা নাড়লো।

"আমি তোমায় বলিনি যে আং-ছু' রাগ করবে?" সুং-তাও আবার জিজ্ঞেস করলো।

জু-শী মাথা নাড়লো।

সুং-তাও বলে চললো, "আর তুমি আমায় বলোনি যে আকাশে যতক্ষণ চাঁদ আছে আর আমার বুকে ভালোবাসা আছে ততক্ষণ তুমি আং-ছু'র রাগকে ভয় করো না?"

জু-শী মাথা নাড়লো।

সুং-তাও সামনে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলো, "আমি তোমায় জিজ্ঞেস করিনি, তুমি আং-ছু'র অমতে আমার বৌ হয়ে সুখী হবে কি না?"

জু-শী মাথা নাড়লো।

সুং-তাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো, "আর তখন তুমি আমায় বলেছো কি না যে তুমি খুব ভালো রাঁধতে পারো, আর আমি টাকা রোজগার করতে জানি, সুতরাং আমরা ঘর বেঁধে খুব সুখী হবো।"

জু-শী লাল হলো একটু, লাল হয়ে মাথা নাড়লো।

আং ছু' তখন বললে, "ওই যথেষ্ট, জু-শী এবার বাড়ির ভেতর যাও।"

জু-শী চলে যেতে আং-ছু' আস্তে আস্তে বললো, "সুং-তাও, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু। তোমায় কষ্ট দিতে আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এ বিয়ে হবে না।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো সুং-তাও।

"আমি কাউকে কৈফিয়ত দিই না সুং-তাও," আং-ছু' উত্তর দিলো।

সুং-তাও ঠোঁট কামড়ালো।

আং-ছু' বলে চললো, "আর আমার এখানে থেকে মনে কষ্ট পাওয়ার কোনো দরকার নেই সুং-তাও। তুমি আজই আছিপুর ছাড়ো। চলে যাও কলকাতায়। ইংরেজ এ দেশের রাজা হয়েছে। ভবিষ্যতে ওরা সারা ভারতেরই রাজা হবে। কলকাতা শহর আরো বড়ো হবে। ওই বর্বরদের মধ্যেই তোমার প্রতিভার যথাযোগ্য সমাদর হবে। আমরা সভ্যজাত। আছিপুরে তোমার আর যত্ন হবে না বন্ধু!"

"যদি না যাই," সুং-তাও আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

আং-ছু' আরো আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "তা'হলে হয়তো ইংরেজ সরকার খবর পাবে যে, যে-সব আফিং কোনো ব্যক্তিবিশেষকে দেওয়া হয় ক্যান্টনে চালান করে দেওয়ার জন্যে, সেগুলোর বেশীর ভাগ কেং সুং-তাও নামে একটি লোক চুরি করে মুর্শিদাবাদ, পাটনা, লক্ষ্ণৌএ চালান দেয়, আর কিছু গুম হয়ে যায় কলকাতা শহরের মধ্যেই। তারা হয়তো আরো জানবে যে ওয়া-তাও'এর কাছে মে-ক্লাওয়ার নামে যে ইংরেজ জাহাজটি লুঠ হয়েছিলো, তার মালপত্তর সওদা সব তোমারই হাত দিয়ে আময় থেকে ফু-চাও শহরে চালান হয়েছিলো। একথাও জানতে পারে যে আময়ের শাসনকর্তা তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পাগল হয়ে আছে। তোমায় হয়তো ক্যান্টনের এক ইংরেজ জাহাজে তুলে দিয়ে তারপর আময়ে নামিয়ে দেওয়া হতে পারে। আমাদের দেশে অপরাধীদের খুব কষ্ট দিয়ে মারে সুং-তাও। তোমার খুব কষ্ট হলে সে আমার সইবে না বন্ধু— !"

সুং-তাও আস্তে আস্তে উঠে গেল সেখান থেকে। সেদিন রাত্রে সে চলে গেল আছিপুর থেকে। তার পরদিন সকালে জু-শী'কেও দেখা গেল না।

এ ব্যাপারে আং-ছু'র মনে খুব লেগেছিলো। কিন্তু সে লোক ছিলো ভালো। সুং-তাওকে যা সব শাসিয়েছিলো, সে সব করলো না। হয়তো ভেবেছিলো, আমি চাইনি যে ওদের বিয়ে হোক, কিন্তু ওরা বিয়ে যখন করলোই, তখন সুখী হোক ওরা।

আং-ছু'র বয়স হয়ে যাচ্ছিলো। শরীরটা ভাঙতে সুরু করলো তখন থেকে। কিন্তু সুং-তাও'এর মনে শান্তি ছিলো না। তার সব সময় ভয়, কখন আং-ছু' গিয়ে ইংরেজদের সব কথা বলে দেয়, আর ইংরেজরা তাকে বা'র করে দেয় কলকাতা থেকে।

লোকের মুখে শুনতে পেলো আং-ছু' প্রায়ই কলকাতায় আসে, সায়েব-সুবোদের সঙ্গে দেখা করে দু'-একদিন কাটিয়ে আছিপুর ফিরে যায়।

তার মনে হোলো আং-ছু' তাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছে। ভাবতে ভাবতে আং-ছু'র সম্বন্ধে একটা তীব্র ভয় আর ঘৃণা জন্মালো সুং-তা'ও এর মনে। সেও শত্রুতা করতে সুরু করলো।

জু-শী'কে নিয়ে সে কিছুদিন ছিলো মুর্গীহাটায়। তারপর

দেখলো কসাইটোলার পেছন দিকের জায়গাটা খুব সুবিধের। ওদিকে খানিকটা জঙ্গল সাফ করে ঘর বাঁধতে পারলে বেশ নিরিবিলি থাকা যায়, অন্য জাতের লোকজনেরা কেউ ঘাঁটাবে না। তা'ছাড়া সে আফিং নিয়ে যে কারবার করছিলো, তার জন্যে একটু নিরিবিলি থাকতে পারলেই সুবিধে।

কলকাতায় তখন চার জন পাঁচ জন করে চীনে দেখা যাচ্ছে, মুর্গীহাটায় দোকান করেছে দু'-একজন।

কয়েকটি চীনে পরিবারকে নিয়ে কসাইটোলার পেছন দিকে জঙ্গল খানিকটা সাফ করে বসবাস করতে লাগলো সুং-তাও। তারপর লাগলো আৎ-ছু'র পেছনে।

সে সময় কলকাতায় প্রায়ই জাহাজ আসতো ম্যাকাও থেকে। সে সব জাহাজের খালাসী ছিলো বেশীর ভাগ চীনেম্যান। জাহাজের সায়েবরা খুব দুর্ব্যবহার করতো তা'দের সঙ্গে। জাহাজ এসে গঙ্গার বুকে নোঙ্গর করলে অনেকেই জাহাজ থেকে পালিয়ে কলকাতায় থেকে যেতো।

তাদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করতো সুং-তাও, তারপর তাদের কাজে লাগিয়ে দিতো। মুচির কাজ, ছুতোরের কাজ, দোকানদারী, সায়েবদের বাবুর্চি কিম্বা খানসামার কাজ, যা'র যাতে সুবিধে। কেউ বা ভিড়ে গেল সুং-তাও'এর দলে, কেউ তার আফিংএর চোরা ব্যবসায়, কেউ তার অধীনে চীনের মধ্যে শাস্তি-শৃঙ্খলার খবরদারী করবার কাজে—কারণ চীনেরা সরকারী আইন-শৃঙ্খলার ধার ধারতো না, নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে থাকতো, এবং অবস্থা গতিকে তাদের নেতৃত্ব এসে পড়লো ফের সুং তাও'এর উপর।

রাজ্য থাকলে রাজার প্রজা চাই। কলকাতায় যে কয় জন চীনে সে পর্যাপ্ত নয়। সুং-তাও নজর দিলো আছিপুরের দিকে।

আছিপুরের অবস্থা তখন ভালো নয়। চিনির কল ভালো চলছে না। মজুরদের আয় খুব কম। অথচ কলকাতায় প্রচুর পয়সা। কলকাতার বাতাসে পয়সা উড়ছে। ধরতে জানলে এবং ধরতে পারলেই হোলো।

সুং-চাও'এর লোকজন আছিপুরের চীনেদের গিয়ে বলতে লাগলো যে, তারা যদি কলকাতায় এসে থাকতে চায় তা'হলে সুং-তাও তাদের সব রকম সুবিধে করে দেবে। ম্যাকাও থেকে অনেকে এসে কলকাতায় বসবাস করছে। তাদের সঙ্গে মিলে-মিশে সুখেই থাকবে আছিপুরের চীনেরা।

তখন আস্তে আস্তে দু'জন চার জন করে চীনেরা এসে কলকাতায় জড়ো হতে সুরু করলো। আর কলকাতা থেকে কোনো চীনে গিয়ে আছিপুরে আৎ-ছু'র কলে কাজ করতে রাজি হোলো না।

আৎ-ছু ভাবনায় পড়লো। প্রথমে নিজে চেষ্টা করলো এসব ঠেকানো। যখন পারলো না তখন কলকাতার ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করলো যে ম্যাকাও-এর জাহাজ পালানো চীনেরা তার শ্রমিকদের ফুসলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আছিপুরের চিনির কল বন্ধ হয়ে গেলে কলকাতার সায়েবদের অসুবিধে। কারণ, তখনো জাভা সুমাত্রা থেকে ব্যাপকভাবে চিনির আমদানী আরম্ভ হয়নি। ইংরেজ সরকার আৎ-ছু'কে আশ্বাস দিলো যে, তারা তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে।

১৭৮১র ৫ই নভেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে একটি বিশেষ সরকা[রী] বিজ্ঞপ্তি বেরুলো। তাতে জানানো হোলো যে, গভর্ণমেন্ট সঙ্কল্প করে[ছে] "To grant every encouragement to the colony [of] Chinese under the direction of At Chew...an[d] to afford him every support and assistance i[n] detecting such persons..."

কিন্তু কথা দিয়েও ইংরেজ সরকার কিছু করলো না। কলকাতার কাউন্সিলে তখন ওয়ারেণ হেষ্টিংসএর সঙ্গে অন্য[ান্য] সদস্যদের গোলমাল চলছে। এসব নিয়ে সরকারী মহল মশগু[ল]। আৎ-ছু'র তুচ্ছ ব্যাপারটি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাদের নেই। ইংরেজ এলাকায় একজন চীনে ব্যবসায়ীর সাফল্যও অনেক ইং[রেজ] মার্চেণ্ট হাউসের কাম্য নয়। জাভা সুমাত্রা থেকে চিনি আমদানী ক[রে] মুনাফা করবার সম্ভাবনা তখন অনেক ইংরেজের মাথায় ঘুরছে।

১৭৮২ সনে সুং-তাও আর জু-শী'র একটি ফুটফুটে খো[কা] হোলো। সুং-তাও'এর বাড়িতে বিরাট নেমন্তন্ন দেওয়া হোলে[া]। নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলো আৎ-ছু'ও। জু-শী'র রান্নার প্রশং[সা] করে গেল সবাই।

সেদিন কেউ ভাবতে পারে নি যে, সুদূর ভবিষ্যতে সুং-তাও'[এর] এই ছেলেটিই হবে দক্ষিণ চীন-সমুদ্রের বিখ্যাত জলদস্যু ফেং পাও-[...] ১৮৪০-এর ওপিয়াম-ওয়ার'এর সময় যে হঠাৎ দেশপ্রেমিক হ[য়ে] উঠে একটি বৃটিশ জাহাজ আক্রমণ করবার সময় কামানের গোল[ায়] প্রাণ দেবে।

তার পরের বছর আৎ-ছু' খুব অসুস্থ হয়ে পড়লো। তখন ত[ার] চিনির কলের পড়ন্ত অবস্থা। তার শরীর আর মন দুই-ই ভে[ঙে] গেছে।

জু-শী গেল আৎ-ছু'র শুশ্রূষা করতে। কিন্তু আৎ-ছু ব[াঁ]চলো না। মারা গেল সে বছরই।

সুং-তাও খুব দুঃখিত হলেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সে কি ও [...] ইংরেজ সরকারকে জানানোর আর কেউ নেই।

এবার বাকী জীবনটা সে আর জু-শী নিশ্চিন্ত হয়ে কাটা[তে] পারবে। কিন্তু সেটা হয়ে উঠলো না। আৎ-ছু'র প্রতিহিংসা যে [...] ভীষণ কে জানতো?

আৎ-ছু'র মারা যাওয়ার কয়েক দিন পরে নেসফীল্ড নামে [...] ইংরেজ সলিসিটারের চিঠি এলো সুং-তাও'এর কাছে। তার ম[র্ম] এই:—আৎ-ছু' একটি বড়ো তামার বাক্স রেখে গেছে, যার ত[...] সীল করা। সেটির বর্তমান মালিক জু-শী। কিন্তু একটি [...] এই যে সুং-তাও যদ্দিন বেঁচে থাকবে তদ্দিন সে বাক্স জু-শী[কে] দেওয়া হবে না।...

সুং-তাও খুব উৎসুক হয়ে উঠলো সেই বাক্সে কি আছে জান[বার] জন্যে। জু-শী কিছু বলতে পারলো না। কিছুদিন পর [...] মহলে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে সেই বাক্সে আৎ-ছু' [...] হাজার গিনি রেখে গেছে জু-শী'র জন্যে। সে কথা সুং-তাও'[এর] কানেও এলো।

জু-শী বললো, তার দরকার নেই এ টাকা। সুং-তাও[এর] আগে মরতে পারলেই সে খুশী হবে। কিন্তু তখন সুং-তাও[এর] কানের কাছে শয়তান ফিস্‌ফিস্ করতে সুরু করেছে।

শী যদি খাবারের সঙ্গে বিষ মেশায়! জু-শী যদি রাত্তিরে ঘুমের মধ্যে গলায় ক্ষুর চালিয়ে দেয়! হাজার হোক জু-শী'র বয়স কম, তা'র বয়স প্রায় চল্লিশ!

তখন মনে পড়লো যে, হ্যাঁ, তাই তো! য়াং'দের বাড়ির ছেলের সঙ্গে তো জু-শীর খুব ভাব। আজ-কাল সে প্রায়ই আসে বাড়িতে।

রাত্তিরে আর ঘুম হয় না সুং-তাও'র। খাবার মুখে রোচে না। আস্তে আস্তে দেখা গেল সুং-তাও আর রাত্তিরে জু-শী'র সঙ্গে এক ঘরে শোয় না, জু-শীর রান্না খাবার মুখে তোলে না। অত্যন্ত রুক্ষ ব্যবহার জু-শী'র সঙ্গে।

তার পর জানুয়ারী মাসের এক কুয়াশা-ঘন সকালবেলা দেখা গেল একলা ঘরে জু-শী' মরে পড়ে রয়েছে। সুং-তাও সবাইকে বললে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে মারা গেছে। কিন্তু লোকে বললে অন্য কথা।

তার কিছুদিন পরে আৎ-ছু'র এক আত্মীয় একটি সীলকরা চিঠি দিলো সুং-তাও কে, বললো, আৎ-ছু'র চিঠি, সে মারা যাওয়ার আগে তাকে ডেকে চিঠিখানি রেখে দিতে বলেছিলো আর বলে গিয়েছিলো জু-শী যখন মারা যাবে তখন যেন এ চিঠি দেওয়া হয় সুং-তাও'কে।

সুং-তাও নিজে পড়তে পারতো না। আরেক জনকে দিয়ে পড়িয়ে নিলো। শুনলো আৎ-ছু' লিখে গেছে:

ভাই সুং-তাও, আমি জানি যে তুমি এমন একজন লোক যার প্রাণের ভয়। আর এ-ও তুমি চাও না যে তোমার বৌ জু-শী বিধবা হয়ে বেঁচে থাকুক। যখন তুমি এ' চিঠি পাবে তখন কবরের মধ্যে আমি হয় তো কঙ্কাল হয়ে গেছি, কিন্তু তোমার বৌ'র কবরের মাটি তখনো নরম ও কাঁচা, তখনো হয় তো ঘাস জন্মায়নি তার কবরের উপর। তোমায় শুধু এ খবরটা দিতে চাই যে, তোমার কাছে যে তামার বাক্সটি আছে, তার মধ্যে রাখা যে এক হাজার গিনির গুজব তোমার কানে যাবে বলে আমি আশা করছি, (সে গুজবটা রটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আমিই করে যাচ্ছি) সেটা সত্যি নয়। এক হাজার কেন, একটি গিনিও তাতে নেই। বাক্সটি ফাঁকা। আর এ-ও বলতে চাই যে জু-শী খুব ভালো মেয়ে। তোমায় খুব ভালো বাসতো। আশা করি দেবতারা তোমায় ক্ষমা করবেন এবং তোমার মনে শান্তি দেবেন।—আৎ-ছু'।

বছর তিন-চার পর ফেং সুং-তাও যখন মারা গেল তখন তার মন এবং শরীর একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ছেলে ফেং পাও-হুং কে নিয়ে গেল এক দূর-আত্মীয়।

তং-আৎ-ছু'র চিনির কলও অচল হয়ে গেল। ১৮০৫ এর ১৫ই নভেম্বর আৎ-ছু'র জায়গা-জমি চিনির কল সব নীলামে চড়ানো হোলো।

আছিপুরের চীনেরা সব আস্তে আস্তে কলকাতায় সরে এলো। বছর কুড়ি পর দেখা গেল আর একজনও নেই সেখানে। সব পাততাড়ি গুটিয়ে কলকাতার এই কসাইটোলা আর মুর্গীহাটায় গিয়ে আস্তানা গেড়েছে। কিছু চলে গেছে টেংরায়।

আজ আর আছিপুরে চীনে উপনিবেশের কোনো চিহ্নই নেই। শুধু গঙ্গার পাড়ে বিস্মৃত অযত্নে পড়ে আছে তং আৎ-ছু'র সমাধি। বিশেষ কেউ জানে না, খোঁজও নেয় না ওটা কার। লাল সিমেন্ট-বাঁধানো সমাধির অবতল দেওয়ালে একটি মার্বেল ফলকে চীনে অক্ষরে যা লেখা আছে সে কেউ বুঝতেও পারে না।

থামলো দিলীপ মুখার্জী। আমরা সবাই চুপ-চাপ শুনছিলাম। আমাদের সবার মন যেন উদাস হয়ে ভেসে গেল কলকাতার বাইরে এক নদীর পাড়ে। যেখানকার বিস্তীর্ণ শ্যামল পটভূমিকায় এক নির্জন সমাধি। খুব নীচু, ঘোড়ার খুরের মতো অর্ধবৃত্ত। লাল সিমেন্টে বাঁধানো। দেওয়ালের গায়ে একটি মার্বেলের ফলক, চীনে অক্ষরে লেখা আৎ-ছু'র নাম আর দূর থেকে চিলের তীক্ষ্ণ ডাক।

প্রায় দু'শো বছর আগে হয়তো সে জায়গা বাজি-পটকার আওয়াজে, ঝাঁঝর আর কাঁসরের তালে, বাঁশীর সুরে, ড্রাগন নাচে মুখর হয়ে উঠতো চীনে নববর্ষের দিন।

আজ সেই গঙ্গার তীর নিঃসাড়, নিস্তব্ধ! [ক্রমশঃ।

দেখুন! মাত্র অর্দ্ধেক সানলাইট সাবানেই

এত সব জামাকাপড় কাচা যায়!
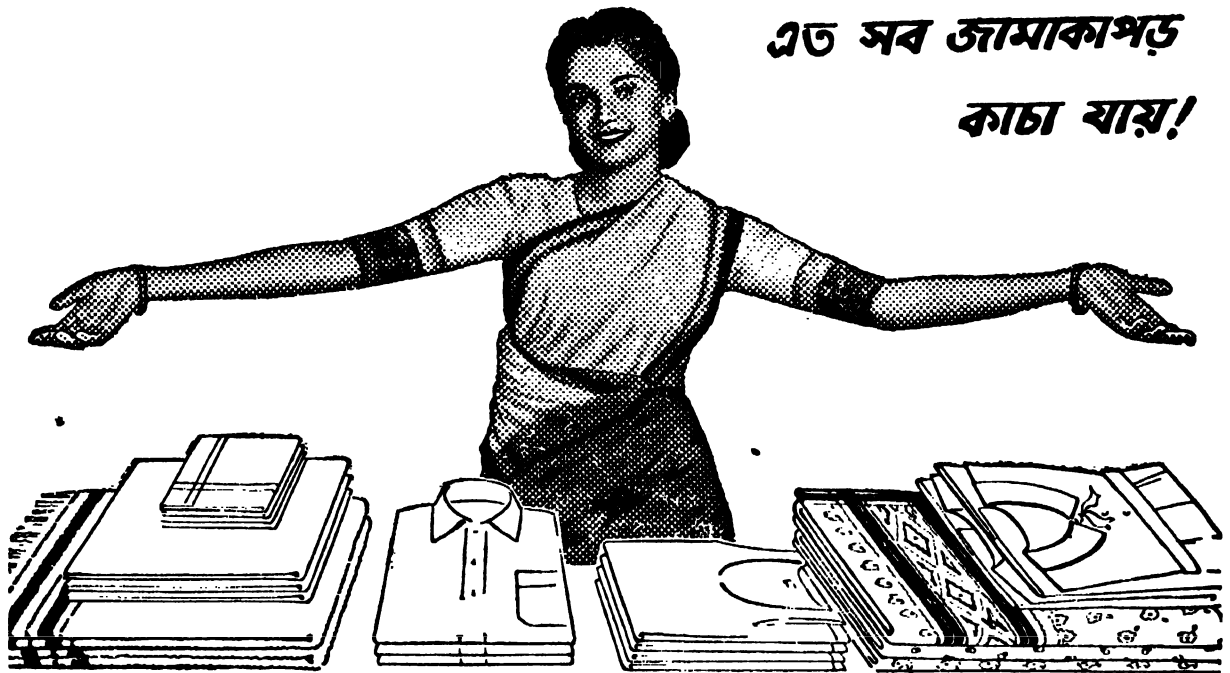
সানলাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারন !

ফেণার আধিক্যের দরুণই সানলাইট সাবান এত ক্রিয়াশীল। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে মাত্র **অর্দ্ধেকটী সানলাইটে** কতগুলি জামাকাপড় কাচা যায়!

সানলাইটের এই অতিরিক্ত ফেণার দরুণই প্রতিটী ময়লার কণা দূর হয়ে যায়—জামাকাপড় হয়ে ওঠে আশ্চর্য্যরকম সাদা এবং উজ্জ্বল!

সানলাইটের ফেণার আধিক্যের দরুণই জামাকাপড় বিনা আছাড়ে পরিস্কার হয়। তার মানে আপনার জামাকাপড় টেঁকে আরও অনেক বেশী দিন।

ভারতে প্রস্তুত

সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

S. 243-X52 BG

শ্রীমতী আর্ভেরএর দিনপঞ্জী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তরু দত্ত

ই সেপ্টেম্বর। আজ সকালে বাবা-মাকে দেখতে গিয়েছিলাম। করে তা সম্ভব হল বলছি। প্রাতরাশের সময় কর্ণেল সাহেব ও চাইলেন, আমি ঘোড়ায় চড়তে পারি কি না; পারি না শুনে জমিদারের দিকে ফিরে বললেন, "কি রে ত্যনোয়া, বিস্তাটা ওকে র দে না?"

৷ সানন্দে রাজী হয়ে গেল।

আজ থেকেই তবে লেগে যাও, অবশ্য মাদ্‌মোয়াজেলের যদি ধে না থাকে; এই সুবাদে তোমার মার সঙ্গেও দেখা করে ত পার···"

বাঃ, তাহলে কিন্তু খুব মজা হয়···কিন্তু···"

আর তবে দেরী নয়" বাধা দিলেন কর্ণেল।

কিন্তু", আমি আবার বললাম, "আমি চড়তে পারি, তেমন শান্ত কি আছে?"

—"আলবৎ আছে", ত্যনোয়া জবাব দিলেন। "বছরখানেক মা একটা সাদা রঙের মাদী ঘোড়া কিনেছিলেন, ভেড়ার চেয়ে ।"

ভাবী জমিদার-বধূর কথা ভেবেই ওটি কেনা হয়েছিল, না বোন?" র কর্ণেল ফোড়ন দিলেন।

কঁতেস্‌ হাসলেন, আর তাঁর বড় ছেলে চলে গেল সাজ-সরঞ্জাম ত। গাস্তঁর অন্য কাজ থাকায়, সে আমাদের সঙ্গে যাবে না ল। প্রাতরাশের পর ঘোড়াগুলো এনে হাজির করা হল র সামনে। জমিদারের ঘোড়াটার নাম সালার্ত্তাঁ, কালো চে তার রঙ; সাদা লোমের লেশমাত্র নেই; বিরাট চেহারা, ল বুক। মনিবের গলা পেয়ে সে উল্লসিত হয়ে ডেকে উঠল। র জন্যে আনা ঘোড়াটা বরফের মত সাদা; কেশর যেন গলান ; সত্যিই ভেড়ার মত নিরীহ তার হাবভাব। একটি যেন শক্তি হত্ব; অপরটি সৌন্দর্য আর কমনীয়তা। ফতেমাকে গিয়ে আদর তে সে মৃদু ডাক ছেড়ে আমার হাত চাটতে লাগল—যেন বুঝতে ছে যে, আমি ঘোড়া ভালবাসি। জমিদার রেকাবে পা দিয়ে লাক্রমে লাফিয়ে উঠল তার জিনের ওপর; কর্ণেল সাহেব তাঁর য় সবশেষে চাপলে কঁতেস্‌ আমাদের শুভেচ্ছা জানালেন। খিস ত্যনোয়া, মার্গরিতের গায়ে যেন কুটোটি না লাগে", তিনি ক করে দিলেন।

"কিছু ভয় নেই মা", হাল্কা গলায় সে উত্তর দিল।

আমি জিনের ওপর ঠিকমত বসেছি কি না, সে দেখে নিল।

"খুব ভালভাবেই বসেছি!" আমি বললাম।

রূপোর কাজ-করা একটা চাবুক সে আমার হাতে দিল; কর্ণেল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, "তুমি ত দেখছি খাসা চালাচ্ছ!"

আমি হাসলাম। কদম চালে আমরা শুরু করেছিলাম; খানিক বাদেই তা দ্রুতগতিতে গিয়ে পৌছল। সাবধানতা অবলম্বন করে জমিদার আমার পাশে-পাশেই চলছিল। সকালটা কি সজীব, কি নীল আকাশ! আমার চেয়ে সুখী আর কে আছে? আমাদের বাগানের সামনে এসে কারো সাহায্য বিনা আমি স্বচ্ছন্দে লাফিয়ে পড়লাম ঘোড়া থেকে, এক ছুটে গিয়ে আঁকড়ে ধরলাম আমার বাবাকে। তিনি তখন চৌকাঠের সামনে পায়চারি করছিলেন।

"আরে"! তিনি অবাক হয়ে গেলেন, "মা আমার ঘোড়ায় চড়ে এসেছে! বাঃ! দূর থেকে এক রণরঙ্গিনী ও দুই জন অশ্বারোহী যোদ্ধাকে এদিকে আসতে দেখে আমি ডাকলাম, বুঝি বা শ্রীমতী গোসরেন্স তাঁর অনুরাগীদের নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন।"

আমায় দেখে তিনি কেমন বিহ্বল হয়ে পড়লেন। মা ছুটে গেলেন জমিদার ও তার মামাকে অভ্যর্থনা করতে, আমি ঘোড়ায় চেপে এসেছি শুনে তিনিও আহ্লাদে আটখানা। ঘণ্টাখানেক বাদে আমরা প্রাসাদে ফিরলাম।

১ই সেপ্টেম্বর।—ছোট্ট নদীটির ধারে আজ গিয়েছিলাম আমরা। জমিদার নৌকা-বিহারের প্রস্তাব করাতে আমরা সোৎসাহে তা অনুমোদন করলাম। বুনো গোলাপ আর বঁইচি-ঝোপে ভরা দুই কূলের মাঝে সোনাসে ভেসে চললাম আমরা,—জমিদার, তার ভাই আর আমি। কি হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য! বহুদূরে, গাছের ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল প্রাসাদের আকাশচুম্বী চূড়া। ধারে-কাছে সবই নিস্পন্দ; নিজেদের কথা ছাড়া আর কিছুর শব্দই সেখানে ছিল না। থেকে থেকে লাল-নীল মাছেরা জলের ওপর দেখা দিয়েই তীরের মত ডুব দিচ্ছিল সবেগে। ঝোঁপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গোলাপের বাহারে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল। তুষার-শুভ্র একটা ফুল দেখে আমার পক্ষে লোভ সামলান দায় হল; জমিদার অমনি ডাঙায় লাফিয়ে পড়ল সেটা আনবার জন্য। কিন্তু পাড়টা এমন খাড়া যে তার পা পিছলে গেল; আমি আঁতকে উঠলাম। গাস্তঁ ভাবে বিভোর হয়ে ঢেউ দেখছিল; হঠাৎ সে চমকে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু ইতিমধ্যেই জমিদার টাল সামলে নিয়ে উঠে এল, হাতে তার সেই ফুল। "এ কি, তুমি এত বিবর্ণ হয়ে পড়েছ কেন? শরীর ভাল আছে ত?" শশব্যস্ত হয়ে সে আমায় ফুলটা দেবার সময় বলল।

"নাঃ, তুমি পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিলে দেখে বড় ভয় পেয়েছি, বিশেষ কিছু না"।—"ভয়ের কি আছে? আমি ত সাঁতার জানি," ত্যনোয়া আমার মুখের কথা কেড়ে নিল; আর বাপু ওই সাদা গোলাপের মত ফ্যাকাশে মুখ করে থেক না," হাসতে হাসতে সে অনুরোধ করল।

আমরা ফিরে এলাম প্রাসাদে; গাস্তঁর মুখে সব শুনে কঁতেস্‌ আমার সস্নেহে কোলে টেনে নিলেন।

১০ই সেপ্টেম্বর। আজ আমরা সন্ধ্যাবেলায় ছাতের ওপর খাওয়া সেরে নিলাম। বাড়ীর ভেতরটা বেশ গুমোট লাগছিল। কঁতেস্ আর তাঁর ভাই ফিরে এলেন যখন, সিঁদুর-বর্ণ সমুদ্রের বুকে সূর্য তখন পাড়ি জমিয়েছে। গোধূলির এই ম্লান দীর্ঘস্থায়ী আলো আমাদের যেন আহ্বান জানাচ্ছিল আরো কিছুক্ষণ বাইরে কাটিয়ে যেতে। গাস্তঁ ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল যাবার জন্যে। ভ্রূ কুঞ্চিত করে জমিদার তাকে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ততক্ষণে সে অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমাদের সামনেই ফোয়ারা, তার মধ্যে লাল মাছের খেলা দেখছিলাম; আমারি পাশে দাঁড়িয়ে জমিদার, আত্মবিস্মৃত ভাব। স্বচ্ছ জলে মাছের হুটোপুটি দেখে আমি বলে উঠলাম, "কি মজা! কি সুন্দর!"

সে হেসে বলল, "সত্যিই বড় সুন্দর; জলের মধ্যে সত্যিই তোমার মুখের ছায়া পড়ে।"

"যাঃ, আমি যেন সে-কথা বলছি", অপ্রস্তুত ভাবে আমি বাধা দিলাম, "আমি ত ওই সুদৃশ্য মাছগুলোর কথা বলছি।"

"আর আমি, আমি দেখছি সুদৃশ্য তোমার মোহন ছায়াটা!"

দারুণ লজ্জা করতে লাগল আমার; ওর প্রতিটি কথাই কানে যেন মাধুর্য ঢেলে দেয়! ভরাট গলায় ঈষৎ খুসীর আমেজ,—পাহাড়ের গায়ে ঢেউভাঙার মূর্চ্ছনা যেন ভেসে আসে! রাত হয়ে এল; আমরা ভেতরে গেলাম। জমিদার-গিন্নী আমায় ধরে বসলেন, ওই অঞ্চলের প্রচলিত কিছু গান গাইবার জন্য। আমি গাইলাম। কর্ণেল সাহেব প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন।

"মা-মণি, তোর গলা শুনে মনে হল, গোলাপ-বনে যেন বুলবুলি গাইছে", তিনি বললেন, "এইবার হ্যানোয়া, এইবার তোর পালা। একটা গান শোনা দেখি?"

অসাধারণ দক্ষতার সাথে সে বেহালার বুকে ছড় টানল, তার পর শুরু করল ভিক্তর য়্যুগোর একটা গান; তার গুরুগম্ভীর গলায় সারা ঘর ভরে উঠল,—

"আকাশ-রসে পরিপ্লুত
আছে কি সেই শ্যামল-ভূমি?"

গানটা শেষ হলে কর্ণেল বললেন, "বাবা হ্যানোয়া, গেল বছর তোর গান যা শুনে গিয়েছি, তার তুলনায় তোর অনেক উন্নতি হয়েছে!"

গাস্তঁ এর মধ্যে ফিরে এসেছে; কিছুতেই সে গাইতে রাজী হল না। আমাদের আসর ভাঙল রাত এগারোটা নাগাদ। আমার ঘরে আমি ক্রুশের সামনে নতজানু হয়ে বসলাম। ভগবান যেন ক্ষমা করেন আমার সমস্ত পাপ, কখনো তিনি যেন আমায় ভুল পথে না যেতে দেন। হে ভগবান, আমি তোমারি দাসী; দয়া কর আমায়।—জানলা খুলে তাকালাম বাইরে। ঝাউ আর বার্চ-গাছের ওপর দিয়ে চাঁদ উঠেছে। পৃথিবী আজ শান্তিমগ্ন! দূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের চাপা গর্জন। অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে রূপোলী ঢেউ! ঠিক ছিল, আসছে কাল আমি বাড়ী ফিরব; কিন্তু কঁতেস্ আপত্তি করায় আরো দু'দিন থেকে যাব।

১১ই সেপ্টেম্বর। জমিদার আর গাস্তঁর সঙ্গে আজ প্রাসাদের প্রতি অলি-গলি দেখে বেড়ালাম। কেল্লায় গিয়ে আমরা বুরুজটার ওপর বসে দেখলাম, দূরে নীল ঢেউয়ের মধ্যে কি ভাবে তলিয়ে গেল রাঙা টকটকে সূর্য!

"জান, এই দুর্গ সম্বন্ধে একটি কাহিনী চলিত আছে?" জমিদার বলল। আমি তাকে ধরে বসলাম, "কি কাহিনী, বল না, লক্ষ্মীটি!"

গাস্তঁ পায়চারী করছিল। জমিদার বলতে শুরু করল,—"দ্বাদশ শতাব্দীর কোনও এক সময়ে আমাদের জনৈক পূর্বপুরুষ থাকতেন এই প্রাসাদে; নাম তাঁর আঁরি দ্য প্লয়ারভেন। তখন তাঁর সন্তান বলতে ছিল রূপে স্বভাবে অতুলনীয় ষোড়শী এক মেয়ে। সে জমিদারের চোখের মণি। একটি ছেলেও ছিল; ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ধর্মযুদ্ধে সে যোগ দেবার পর বহু বছর তার কোনও খবর পাওয়া যায় নি। একদিন হয়েছে কি, একটি শীতের সন্ধ্যায় প্রাসাদে এসে হাজির হল অশ্বারোহী এক সৈন্য। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা! তাকে তাই তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে ডেকে আনা হল। বেচারার পোষাক বরফে একদম ঢেকে গিয়েছিল। সেকালের রীতি অনুযায়ী কাথেরিন—জমিদার-নন্দিনী—খুলে দিল সৈন্যটার কোমর-বন্ধনী। খাওয়ার সময় জমিদার আপ্যায়িত করে অতিথিকে বসালেন নিজের টেবিলে। লোকটার বয়স আন্দাজ পঁচিশ বছর। অঙ্গে কালো কুচকুচে বর্ম; টুপিতে কেবল একটা সাদা পালক, তুষারের মত ধবধবে সাদা। লম্বা চেহারা; আবলুশ-কালো কোঁকড়ান চুলগুলি জুলপি অবধি লম্বিত; কপালের ওপর, চুলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে একটা ক্ষতচিহ্ন; ঘন কালো গোঁফ আর এই দাগটা মিলিয়ে লোকটার মুখে এনে দিয়েছে সুন্দর পুরুষালি এক ভাব। কালো চিন্তাকুল চোখ দু'টি যে মাঝে মাঝে গৃহস্বামীর কন্যার দিকে পড়ছিল না, এমন নয়। মেয়েটিও প্রথম দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়; অশ্বারোহীর উন্নত চেহারার দিকেই নিবদ্ধ ছিল তার স্বচ্ছ নীল চোখ—সকলের অগোচরে। তার নম্র নিষ্পাপ মুখ লাল হয়ে উঠছিল আগন্তুকের মৃদুতম সম্ভাষণ শুনে। তাকে জমিদার অনুরোধ জানালেন, দু-এক দিন প্রাসাদে থেকে বিশ্রাম করে যেতে। সে যাবার সময় স্মৃতিচিহ্নরূপে দিয়ে গেল কাথেরিনকে সাদা একটি গোলাপ। "আবার দেখা হবে" না বলে সে বলে গেল, "বিদায়"! এই চূড়ার ওপর উঠে তাকে কাথেরিন অনুসরণ করেছিল আকুলতার দৃষ্টি দিয়ে, যতদূর সম্ভব। সেই মাথার পালক, সেই মনোহর গড়ন—সবই ক্রমশ ছোট হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেল এক সময়। এই বুরুজেই, তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল কাথেরিন। তার বাবা ভর সন্ধ্যাবেলা তাকে কোথাও না দেখে খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির হলেন এখানে। ম্লান শুভ্র জ্যোৎস্নার ছটা এসে পড়ছিল খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে। বিছানায়—জমিদার দেখলেন—শুয়ে আছে—তাঁর কাথেরিন, হাতের গোলাপটার চেয়েও বিবর্ণ। মাথার চুলগুলো চাঁদের আলোয় জ্যোতির্মণ্ডলের রূপ নিয়েছে। জমিদার তাকে ডাকতে গেলেন; দেখলেন, সব শেষ!

হ্যানোয়া বলে চলল, "লোকে বলে, ডিসেম্বরে শুক্লপক্ষের রাতে এখনো আজো সেই দৃশ্য দেখা যায়, যে-দৃশ্য দেখেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ, জমিদার আঁরি"!

দারুণ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে চারি ধারে; পাতার মধ্যে শুরু হয়েছে বাতাসের ক্রন্দন।

"ইস্, তোমার যে ঠাণ্ডা লাগছে," আমার গায়ে একটা চাদর জড়াতে জড়াতে জমিদার বলল, "হাত দুটো দেখছি একদম জমে গিয়েছে! চল, এবার আমরা ফিরি!"

আমরা নেমে এলাম।

১২ই সেপ্টেম্বর। কর্ণেল আজ সকালে পারী চলে গেলেন। ২০শে ডিসেম্বর—জমিদারের জন্মদিন—এর আগেই তিনি ফিরবেন, কথা দিয়ে গেলেন তাঁর বোনকে। চৌকাঠের সামনে আমার হাত ধরে কপাল চুম্বন করবার সময় তিনি বলে গেলেন।

"মা-মণি, আমার মত বুড়ো ছেলেকে বাধা দিতে নেই; শ্রীমান হ্যানোয়া হলে না হয় অন্য কথা, তাই না ?"

হাঃ-হাঃ করে তিনি হেসে উঠলেন। আমি দারুণ লজ্জায় পড়লাম। কালকেই আমার যাবার দিন। আঃ! আবার বাবা-মার কাছে ফিরব—ভাবতেও আনন্দ। কঁতেস্ আমায় বার বার অনুরোধ করেছেন, যেন জমিদারের জন্মদিনে আবার প্রাসাদে আসি। জমিদার নিজেও বহু বার বলেছে।

"তুমি আসবে ত, ঠিক বল। নইলে, জানই ত, তুমি ছাড়া সবই কত অনর্থক ঠেকবে, তাই না মা" ?

"তা কি বলতে ? আসিস কিন্তু মার্গরিৎ" !

আমি কথা দিলাম।

১৩ই সেপ্টেম্বর।—এই ত ফিরে এসেছি ছোট্ট আমার ঘরে, এই ত সেই চিরপরিচিত—ঘর যার জানালা খুললেই চোখে পড়ে আমাদের বাগানটা। সাদা পর্দায় ঘেরা এই ত আমার বিছানা, এই ত ছোট্ট টেবিলটা, যার ওপর আমি এই দিনপঞ্জী লিখি।

জমিদার আর তার ভাই আমায় পৌঁছে দিয়ে গেছে। বাবা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন; আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে তিনি বললেন. "মনে হচ্ছে যেন এক সপ্তাহ নয়, বছর খানেক হল তুই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলি অনেক দূরে।" মুখে হাসি থাকলেও চোখ দুটি তাঁর ভেজা।

মা নিজের ঘরে কাজ করছিলেন, ছুটে গিয়ে হাজির হলাম সেখানে; তিনি চমকে গেলেন, "সে কি রে ? আমি ভেবেছিলাম সন্ধ্যের আগে তুই ফিরবি না। কে পৌঁছে দিল ?"

"জমিদার আর গাস্ত"।"

তিনি তরতর করে নেমে গেলেন হলঘরে, আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। জমিদার ওর মায়ের দেওয়া একটা চিঠি তার হাতে দিল আর বার বার তাঁকে এবং বাবাকে নিমন্ত্রণ জানাল ওর জন্মদিনে প্রাসাদে যাবার জন্য। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে মা-বাবা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি, বাবার ভাষায়, "আমার সংসার" দেখতে গেলাম। খরগোসগুলো দেখে লুইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। রাতে খাবার সময় বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম লুইয়ের কোনও খবর এসেছে কি না।

মার দিকে চেয়ে তারপর তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, আজ সকালেই ওর চিঠি পেয়েছি।"

"ও ভাল আছে ত ?"

"হ্যাঁ।"

"এখন কোথায় আছে বাবা ?"

"কর্সিকায়।"

"তাই নাকি ? জায়গাটা কেমন লাগছে ? চিঠির খানিকটা পড়ে শোনাও না বাবা !"

কয়েক লাইন পড়েই তিনি থেমে গেলেন।

"আর লিখেছে এখানে কাটান দিনগুলির মধুর স্মৃতি সম্বন্ধে।"

চিঠিটা ভাঁজ করে তিনি পকেটে পুরে ফেললেন। শুতে শুতে বেশ রাত হয়ে গেল; কত কথাই যে জমেছিল এই কয় দিনে !

১৪ই সেপ্টেম্বর। কাল সন্ধ্যায় জমিদার এসেছিল; জানতে চাইল এতটা পথ চলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি কি না। মা ওকে পারী থেকে আনা নতুন কয়েকটা বিদেশী গাছ দেখালেন। সে তাঁকে লুইয়ের খবর জিজ্ঞাসা করল।

"আমি ওর সাথে দেখা করতে উদ্‌গ্রীব," জমিদার তাঁকে বলল, "এমন উদার চরিত্র বড় একটা দেখা যায় না। কি সরল দৃষ্টি, কি প্রাণখোলা হাসি,—দেখেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে।"

"অক্টোবর নাগাদ ও বোধ হয় আসছে।"

"সত্যি ? আমি সাগ্রহে অপেক্ষা করছি ওর জন্যে,—আমার মার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।"

লুইয়ের জীবন-কাহিনী সবিস্তারে মা ওকে বললেন। এক মনে শুনতে শুনতে জমিদারের সুন্দর মুখে নেমে এল চিন্তার ছায়া।

"বেচারা !" অধীর হয়ে ও বলে উঠল, "কত সংঘাতের মধ্যেই না ওকে দিন কাটাতে হয়েছে ! এই করুণ ইতিহাস শুনে ওর ওপর বড় মায়া লাগছে। এই অল্প বয়সে, এত বাধা তুচ্ছ করেও ও আজ কাপ্তেন।"

"বয়স ওর কুড়িও হয়েছে কি না সন্দেহ ! ওর রেজিমেণ্টে কাপ্তেনদের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে ছোট।" সগর্বে মা উত্তর দিলেন। খানিক কথাবার্তার পর জমিদার চলে গেল।

১৭ই সেপ্টেম্বর। আমার অস্ত্যারলিজের চেয়ে ভাল ঘোড়া আর ক'টাই বা আছে ? বাবা আমায় বড় ভালবাসেন। ঘোড়ায় চড়তে শিখেছি দেখে তিনি পারী থেকে আমায় আনিয়ে দিয়েছেন তেজী ঘিয়ে-রঙের এই ঘোড়াটা। কি কেশরের বহর ! আর স্বভাবটা ওর অতি নিরীহ। আমায় দেখা মাত্র চন্‌মন্ করে ওঠে। কাল ওকে কেনা হয়েছে; আজ আমরা সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ালাম। ও ছোটে হাওয়ারও আগে। বাবা আর আমি যখন যাচ্ছিলাম, জমিদারের সঙ্গে দেখা হল; তার মুখে ত অস্ত্যারলিজের প্রশংসা ধরে না। যাবার সময় ও রহস্য করে গেল, "মনে হচ্ছে শিকার থেকে ফিরছেন দেবী ডায়ানা স্বয়ং।"

১৮ই সেপ্টেম্বর। আজ ভগিনী ভেরোনিকের একটা চিঠি পেলাম। তাঁর অসুখ করেছে; খুব বাড়াবাড়ি; বাঁচার আর আশা নেই; অবিলম্বে আমায় দেখতে চান তিনি। ছোট্ট চিঠিটা দিব্য শান্তির মাঝে একান্ত একটি জীবনের সুবাসে ভরপুর। বেচারী ভগিনী ! এই ত সবে চাব্বিশে পা দিয়েছেন,—এরি মধ্যে উনি ছেড়ে যাবেন এই স্নেহের নীড়, যেখানে আমরা সবাই প্রতিপালিত হচ্ছি ভগবানের দয়ার মধ্যে ? বাবা অনুমতি দিয়েছেন ভগিনীকে দেখতে যাবার; মা ত চিঠিটা পড়ে কেঁদে আকুল। প্রাতরাশের পর দশটার সময় আমরা বেরিয়ে পড়ব।

২১শে সেপ্টেম্বর।—আঠারো তারিখ সন্ধ্যা নাগাদ আমরা 'মাতের দোলোরোজা' (Mater Dolorosa) কনভেণ্টে গিয়ে পৌঁছলাম। যোগিণীর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি শুয়ে আছেন; আমায় দেখে হাসলেন, ইশারায় কাছে ডাকলেন। নতজানু হয়ে তাঁর শিয়রের কাছে গিয়ে বসলাম। আমায় তিনি আদর করলেন;

অতি পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছে ওঁর চেহারা। হাতীর দাঁতে তৈরী একটা ক্রুশ ওঁর হাতে। আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি দেখে উনি সস্নেহে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ রে মার্গরিৎ, তুই তা হলে সত্যিই আমায় ভালবাসতিস? কাঁদিস না বোন, একমাত্র স্বর্গে গিয়েই আমি একান্ত সুখী হতে পারব; সেখানেই আবার তোর সঙ্গে দেখা হবে একদিন। এই জগতে বড় দুঃখ রে মার্গরিৎ, বড় ব্যথার এই জগৎ। কিন্তু পরম পিতার চরণতলে—সেখানে নেই শোক, নেই ক্রন্দন, নেই পরিশ্রম; সেখানে আমাদের সবার অশ্রুই ভগবান মুছিয়ে দেবেন।"

উনি থামলেন। আমাদের ত্রাণকর্তার করুণাপূত প্রতীকের ওপর ওঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। আবার উনি মুখ খুললেন।

"এই দেখছিস মার্গরিৎ, এই ক্রুশটা? কত বার যে এর আশ্রয় নিয়ে জীবনে সান্ত্বনা পেয়েছি! আমার ইচ্ছে, আমার সঙ্গে এটাও যেন কফিনে দেওয়া হয়।"

আমি অঝোরে কাঁদতে লাগলাম।

"মার্গরিৎ, বুঝলি, কি অপরিসীম শান্তি যে পাচ্ছি এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে যেতে; বড় বেদনার মাঝে দিন কেটেছে বোন! এবার ওদের সবাইকেই ফিরে পাব; বাবাকে, আমার মাকে, আর ব্যারনারকে।"

আমি সারা রাত ওঁর ঘরে কাটালাম; ভগিনী দর্কাস্‌ও ছিলেন। ভগিনী ভেরোনিক আজ এত আনন্দ পাচ্ছেন এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে! আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না! 'তিক্ত দিনের মাঝেও কি নেই মধুর দিনের স্মৃতি?'

এ-অবধি কোন দিন আমি দুঃখ পাইনি; অতি সুন্দর এই জগৎ!—সকালবেলা, সূর্যোদয়ের সময় উনি ডাকলেন। "মার্গরিৎ, আছিস?"

"হ্যাঁ?"

"আয় বোন, কাছে আয়।"

আমি ওঁর গা ঘেঁসে বসলাম; হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওঁর শীতল শুভ্র হাত দু'টি!

"ভগিনী ক্ল্যার", পার্শ্ববর্তিনীকে উনি বললেন, "জানলাটা খুলে দে বোন, দিনের সূর্য দেখে যাই।"

অবিলম্বে জানলা খুলে দেওয়া হল। ছোট ঘরটা ভোরের উজ্জ্বল আলোয় হেসে উঠল, দীপাধারের ক্ষীণ শিখাটি কেঁপে উঠছে, এবার বুঝি নিবে যায়! ভগিনী ভেরোনিক সূর্যের দিকে তাকিয়েছিলেন, রোদ পড়ে বিবর্ণ মুখ তাঁর উদ্ভাসিত!

"আরো তেজোদীপ্ত একটি দিনের দেখা পাব এবার, যেখানে ন্যায়ের সূর্য ওঠে স্বাস্থ্যের রশ্মি ছড়িয়ে!"

হাত দু'টি তাঁর প্রার্থনার ভঙ্গীতে যুক্ত; ভগিনী ক্ল্যারকে ডাকলেন, "বোনটি, ফাদার অগুস্ত্যাকে একবার দেখতে চাই।"

সে বেরিয়ে গেল। ভেরোনিক নিজের মুঠোয় তুলে নিলেন আমার হাত।

"মার্গরিৎ, তোকে যত যাতনা দিয়েছি, তার জন্তে আমায় ক্ষমা করবি ত?"

"আপনি? আপনি ত আমায় চিরদিন স্নেহ আর ভালবাসাই দিয়ে এসেছেন; আমিই বরং আপনার কাছে ক্ষমা চাই!" আমি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিলাম।

ফাদার এলেন; নতজানু হয়ে বসলেন পরলোক-যাত্রীর পাশে; শুরু করলেন প্রার্থনা। আধ ঘণ্টা কেটে গেল। নিশ্বাস প্রায় থেমে এসেছে, চোখ দু'টি বন্ধ। এক মিনিটের জন্য পাদরী থামলেন। ভেরোনিক চোখ খুললেন; বিড়-বিড় করে বললেন, "হে যীশু, ত্রাণকর্তা!" পরম শান্তির মাঝে আত্মা ত্যাগ করে গেল তার তনু-গৃহ। পাদরী উঠে দাঁড়ালেন; নীচু গলায় ঘোষণা করলেন।

"আমাদের ভগিনী চিরবিশ্রাম লাভ করেছেন; ভগবান গ্রহণ করুন তাঁর আত্মা।"

ভগিনীকে সৎকার করতে দেখলাম চোখের সামনে; দেখলাম তাঁকে কফিনে; বুকের ওপর ন্যস্ত হাতে ধরা আছে ক্রুশটি; অচেনা এক জ্যোতিতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল, ওষ্ঠে হাসির আমেজ; নিদ্রিত বলে ভুল হয়; পরনে সাদা পোষাক। নীরবে অশ্রু ঝরে পড়েছিল আমার গাল বেয়ে। মনে হল, দেবদূতরা নেমে এসেছেন এই ঘরে, ঘিরে আছেন পুণ্যাত্মাকে! উপস্থিত সকলে কফিনের ওপর এনে রাখলেন নিজের নিজের উপহার; আমি দিলাম একটি লিলি; সকালেই ওটি তুলে এনেছিলাম। বড় বড় সাদা মোমবাতি জলছিল। প্রার্থনা-গৃহের গম্বুজের তলায় ওঁকে নিয়ে যাওয়া হল; সবাই প্রার্থনা করল। অনুষ্ঠানের শেষে বাড়ী ফিরলাম। আগেই বলেছি, ভগিনী ভেরোনিক ছিলেন আমার বড় বোনের সামিল। যত দিন কন্‌ভেণ্টে ছিলাম, উনিই ছিলেন আমার একমাত্র সঙ্গী, শিক্ষয়িত্রী; এখনো কানে বাজছে ওঁর মধুর গলা, এখনো যেন আমায় বাইবেল পড়াচ্ছেন। মনে হত উনি যেন স্বর্গের অপ্সরী! তাঁর বাসের অযোগ্য এই পৃথিবী; কত কষ্টই না পেয়ে গেলেন এখানে! ওঁকে সর্বময় ভগবান নিজের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছেন, যাতে করে ধ্বনিত হতে পারে তাঁর স্তবগান অনন্তের কানে।

২৩শে সেপ্টেম্বর। আজ সকালে আমি বুড়ো কোয়েন ও তাঁর স্ত্রীকে দেখতে গিয়েছিলাম। দেখি, ওঁদের কুটির থেকে কে যেন বেরিয়ে যাচ্ছে। ও কি! গাস্ত! গরীব দুঃখীদের কথা ও ভাবছে দেখে বড় স্বস্তি পেলাম। ওকে কথাটা বললামও। শুনে ও বেশ লজ্জা পেল। বাবা-মা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করেই চলে গেল। কুটিরে জানেৎকে দেখে যেমন আশ্চর্য লাগল, তেমনি উৎফুল্লও হলাম। ওরা তখনো গাস্ত সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। আমার জন্য জানেৎ গিয়ে হন্তদন্ত হয়ে চেয়ার নিয়ে এল। প্রাসাদে কাজ পাবার পর ওদের অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে দেখলাম। ওর বাপ আমার প্রশংসায় আবার পঞ্চমুখ হয়ে উঠছেন দেখে তাঁকে হাসতে হাসতেই আমি ধমক দিলাম, "দেখুন, যদি অমন করেন, আমি এখুনি চলে যেতে বাধ্য হব।"

ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। ওদের সঙ্গে বহুক্ষণ গল্প করে আমি বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম।

২৪শে সেপ্টেম্বর। আজ প্রত্যূষে বাবা আর আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম। স্বচ্ছ শিশির-কণায় পায়ের তলার জমি ঝলমল করছিল। অন্ধকার বন থেকে বার হতেই আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল কাঁচা রোদ-মাখান ধূ-ধূ মাঠ দেখে; সামনেই একটা টিলা দেখে তার ওপর গিয়ে উঠলাম। নীচে দেখা যাচ্ছে গ্রাম, বেড়ার

রা আমাদের সাদা বাড়ী,—আর রক্তিম দিগন্ত দ্বিখণ্ড করে দাঁড়ানো গ্রুয়ারডেন প্রাসাদের অতিকায় চূড়া; আরো দূরে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র, যেখানে সূর্যের আলো পড়ে সৃষ্টি হয়েছে যেন সোনা আর রূপোয় গড়া হাজার তারার মেলা। প্রাতরাশের সময় আমরা বাড়ী ফিরলাম। মা দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন; বাবার হাতে একটা চিঠি দিয়ে বললেন, "লুইয়ের চিঠি!" বিনা বাক্যব্যয়ে বাবা সেটি পকেটে পুরলেন দেখে আমি একটু আশ্চর্য হলাম। কারণ ওর চিঠি হাতে পড়ামাত্রই বাবা পড়ে ফেলেন। যাক, ও নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই এখন, যা খিদে পেয়েছে!

২৫শে সেপ্টেম্বর।—আজ জমিদার এসেছিল। মাকে ও ধরে বসল, সামনেই ওর জন্মদিন, ওর মা একা হাতে সব-কিছু পেরে উঠছেন না, আমি যদি তাঁকে সাহায্য করতে প্রাসাদে যাই! ইতিমধ্যে মাদাম গোসরেল আর তাঁর মেয়েও এসে হাজির। জমিদার জানতে চাইল, আমি নিয়ম মত ঘোড়ায় চড়ছি কি না। —"নিশ্চয়ই!" আমি উত্তর দিলাম।

"চল মা, একটু বেড়িয়ে আসতে আপত্তি আছে?"

"বিন্দুমাত্র না!"

মাদাম গোসরেল ঠেস দিয়ে মন্তব্য করলেন। "সে কি জমিদার মশাই! ব্যাপারটা কি খুব ভাল হল? আমরাও এলাম, আর তুমিও উঠছ!"

ও চুপ করে রইল দেখে তাঁর উৎসাহ বেড়ে গেল।

"বলি, শতাব্দীখানেক ত হল আমাদের ছায়া মাড়াও না।"

ও তখন জবাব দিল। "দেখুন, লোকের বাড়ী ঘুরে বেড়ানর সময় আমার হাতে একদম নেই।"

ঘরে গিয়ে আমি ঘোড়ায় চড়ার পোষাক পরে এলাম। হ্যানোয়া উঠে পড়ল, "দেখবে আজ কি রকম দৌড়টা হয়!"

বাবা জুতো পরতে গেলেন। তিনিও আসছেন আমাদের সঙ্গে। শ্রীমতী গোসরেল এল আমাদের এগিয়ে দিতে; হ্যানোয়া আমায় জিনের ওপর বসিয়ে দিল; তারপর চেপে বসল নিজের ঘোড়ায়।

"তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে কোনও পৌরাণিক যুগে আমরা ফিরে গিয়েছি," শ্রীমতী গোসরেল টিপ্পনী কাটল। "অপূর্ব তোমার এই রণরঙ্গিনী মূর্তি, মার্গরিৎ! এবার থেকে কিন্তু আমার সঙ্গেও তোমায় বেড়াতে যেতে হবে ঘোড়ায় চড়ে।"

বাবা এসে গেছেন দেখে আমরা রওনা দিলাম। একেবারে পাশের গাঁয়ে গিয়ে ঘোড়া থামালাম। বাড়ী ফিরলাম পাক্কা তিন ঘণ্টা ছোটাছুটির পর। আমাদের বাড়ী অবধি জমিদার পৌঁছে দিয়ে গেল।

২৬শে সেপ্টেম্বর।—মা আর আমি আজ গাঁয়ের স্কুলমাষ্টার ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। নদীর ধারেই ওঁদের বাড়ী। সারা বছরে ভদ্রলোকের রোজগার আন্দাজ আশী টাকা। স্ত্রী বাড়ীর দেখাশোনা করেন; ঘরে তিনটি সন্তান, বড় ছেলের বয়স বছর আষ্টেক, সর্বদাই ছায়ার মত বাপের কাছে কাছে ঘোরে। তারপর হেলেন, ছয় বছরের মেয়ে; দাদা রুদের কথা বলতে অজ্ঞান। কোলের ছেলেটার বছর ছুই বয়স হল, গোলগাল হাসিখুসী চেহারা।

আমরা যেতেই মাদাম ভালপোয়ান্ সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বড় ছেলে রুদকে নিয়ে মাষ্টারমশাই স্কুলে গিয়েছেন। বাপ পড়াতে, ছেলে পড়তে। মাদাম ভালপোয়ান্ তাঁর ছোট্ট বাগান দেখাতে নিয়ে গেলেন মাকে। আমি রইলাম বাচ্চাটার কাছে। দোলনায় শুয়ে শুয়ে ওর আর হাসির বিরাম নেই। খানিক বাদেই হাততালি দিতে দিতে ঘরে এসে ঢুকল হেলেন, মেয়েটার খুসী যেন উপচে পড়ছে।

"তুমি আমাদের জন্যে চকোলেট আর লবেঞ্চুস এনেছ বুঝি?" বলতে না বলতেই আমার কোলে উঠে ও পকেট হাতড়াতে গেল। ওর অভিষ্ট মিলে গেলে পরম কৃতজ্ঞতায় আমায় চুমু খেল। —"লবেঞ্চুসগুলো আমি কিন্তু খেয়ে ফেলছি।" ও বলল।

"লক্ষ্মীটি, সবগুলো খেয়ো না যেন; একভাগ রাখ রুদের জন্যে। স্কুল থেকে ফিরে এসে ওগুলো পেয়ে দাদা কত খুসী হবে বল ত?" আমার কথামত ও তা-ই করল।

"জান? মা-মণি সেদিন আমায় বেশী লবেঞ্চুস খেতে মানা করছিল, না কি অসুখ করে। আচ্ছা, তুমি কি বল? সত্যিই কি ওতে ওসুখ হয়?" আমায় পেয়ে বসল ও।

"খু-উব সত্যি, তুই যদি বেশী লবেঞ্চুস খাস, নির্ঘাৎ শরীর খারাপ হবে। অসুখ হলে কি ভাল লাগে?"

"হ্যাঃ, বাবার সেদিন অসুখ করেছিল; সারাটা দিন সেদিন শুয়ে কাটাতে হল, থেকে থেকে কি কাৎরানি আর কাঁপুনি! মা বলছিল, খুব বেশী খাটুনির এই ফল; কই মা ত বলল না বাবা লবেঞ্চুস খেয়ে অসুখে পড়েছেন?"

এই ভাবেই আধ ঘণ্টাখানেক কাটল; ময়নার মত অনর্গল ওর বুলি; একটু পরে রুদ আর ওর বাবা এলেন। আমার কোল থেকে ঝাঁপিয়ে ছুটে গেল মেয়েটা দাদাকে লবেঞ্চুস দিতে। মঁসিয়ে ভালপোয়ান্ করমর্দন করলেন; ছেলেদের তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন; তাই তাদের সঙ্গে যদি কেউ ভাল ব্যবহার করে, অমনি তাকে আত্মার আত্মীয় বলে উনি মেনে নেন।

"শ্রীমতী আর্ভের! আপনিই কিন্তু হেলেনের মাথাটা খাবেন," হেসে উনি বললেন, "মেয়েটার মুখে অষ্টপ্রহর ত আপনার কথাই লেগে আছে! আপনি কত যে স্নেহপ্রবণ, সহজেই অনুমান করা যায় ছোটদের সঙ্গে আপনার ব্যবহার দেখে। আর ওদেরো ধন্যি বলি; আপনাকে দেখেই কেমন চিনে নেয়।"

দোলনা থেকে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলেন উনি, "একে কেমন দেখছেন বলুন ত?"

সত্যি বলতে কি বাচ্চাটা অপরূপ দেখতে; কোঁকড়া কোঁকড়া বাদামী চুল, বড় বড় কালো ছুটি চোখ। আরো আধ ঘণ্টা বাদে আমরা বাড়ি ফিরলাম। যেতে যেতে মা বললেন যে জমিদার, তার মা ও ভাই প্রায়ই এখানকার স্কুল দেখতে আসেন। বড় সহৃদয় জমিদার। সব দিকে ওর সমান নজর।—কাল আমরা গোসরেলদের সঙ্গে পিকনিকে যাব।

২৮শে সেপ্টেম্বর। বিখ্যাত 'গোলাপ বাগানে' আমরা কাল পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি বহু লোকের ভীড়; নিমন্ত্রিতদের মধ্যে জমিদার-বাড়ীর কাউকে দেখলাম না। শ্রীমতী গোসরেল আমায় স্বাগত জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল।

"এখানে আমাদের পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরাই রয়েছেন; এমন কেউ নেই যাকে তুমি চেন না।"

এদের এক আত্মীয়, মঁসিয় লঁাস, মহা পণ্ডিত; বাবা তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন; আমায় দেখে উনি প্রশ্ন করলেন।

"কি জেনেরাল, এটিই বুঝি আপনার মেয়ে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ভদ্রলোক আমায় বিনীত নমস্কার জানালেন। তার পর ঝোঁপঝাড় ডিঙিয়ে আমাদের নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন একটি ঢিবির ওপর; সেখানে প্রাচীন কেল্টিক্ পুরোহিত সম্প্রদায়ের কিছু ভগ্নস্তূপ রক্ষিত আছে। অত বড় পণ্ডিত তিনি; খুব মন দিয়ে ওঁর ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করছি; আমার এই মনোযোগ দেখে উনি প্রীত হলেন। শ্রীমতী গোসৃরেল খানিক বাদে আমাদের দলে এসে ভিড়লো।

হাসতে হাসতে ও বলল, "দাদা বাবু, কেন আর বেচারীকে উত্যক্ত করছ তোমার পাণ্ডিত্যের গুঁতোয়?"

"দূর," আমি প্রতিবাদ করলাম, "এ-সব আমার খুব ভাল লাগে।"

মঁসিয় লঁাস বিজয় দর্পে চেঁচিয়ে উঠলেন, "শুনলে দিদি, শুনলে"?

হাজার কথার মাঝে হঠাৎ জমিদার-গিন্নীর গলা শুনতে পেলাম, "বড় দেরী হয়ে গেল বাপু, হ্যানোয়ার হাতে কাজের আর যেন শেষ নেই"! —আর একটি গলা, শুনেই চিনতে পারলাম।

"কই, শ্রীমতী আর্ভের বুঝি আসেন নি? জেনেরাল কই?"

"হ্যাঁ, ওরা এসেছে, মার্গারিৎ ওর বাবার সঙ্গে কোথায় কোথায় ঘুরছে, জানিনে বাপু"! মার চিন্তিত গলা ভেসে এল।

জমিদার! জানতে চাইছে আমি এসেছি কি না? আনন্দে অধীর হয়ে উঠলাম আমি। শ্রীমতী গোসৃরেলের বুকনি বা মঃ লঁসের কচকচি এক বর্ণও আমার কানে ঢুকল না। একটি স্পর্শ আমার কাঁধে অনুভব করলাম। দেখি বাবা। গম্ভীর ভাবে তিনি গোসৃরেলের কথা শুনছিলেন। মিনিট খানেক বাদেই দেখি ঝোপের বাধা কাটিয়ে এগিয়ে আসছে—জমিদার।

"আরে, শ্রীমতী আর্ভের, তুমি এখানে? আমি ত তোমায় চারদিকে খুঁজে হায়রাণ!"

শ্রীমতী গোসরেলের দিকে ও তাকাল; চলল করমর্দন।

"যা. কঁতেস্-এর সাথে দেখা করে আয়," বাবা আদেশ দিলেন। আমি পা বাড়ালাম; পেছনে জমিদার।

"অস্ত্যারলিজের খবর কি?"

"বেশ ভালই আছে"।

জমিদার-গিন্নীর সাথে করমর্দন করলাম; তারপর আলিঙ্গনের পালা, "আর মা; কি সুন্দর যে লাগছে তোকে; তাই না রে, হ্যানোয়া?"

"একশো বার"!—ও হেসে ফেলল।

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন উনি এই উত্তর শুনে।

আমার হাত ধরে তিনি গিয়ে বসলেন নদীর ধারে, যেখানে আর সবাই জটলা করছিল। শ্রীমতী গোসৃরেল বসল আমার পাশেই।

"এবার থেকে তোমায় মার্গারিৎ-এর বদলে Rose' বলে ডাকলেই হবে। অমন রঙের বাহার দেখে গোলাপ বলেই ডাকতে সাধ হয়!" ও ধোঁটা দিল। ঘাসের ওপরে পাতা সাদা চাদরটার চার ধারে আমরা বসলাম। আমার বাঁ দিকে গাস্ত, ডান দিকে শ্রীমতী গোসৃরেল; তার ডান পাশে জমিদার; বাবা বসেছিলেন কঁতেস্-এর পাশে, আর পণ্ডিতমশাই মার পাশে। কথায় কথায় গাস্ত বললে যে বহুদিন ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমাদের ওখানে যেতে পারেনি,—তার জন্যে ক্ষমাও চাইল, "বুঝলে, একদিন এত কাজ ছিল!"

দিনটা বেশ মজায় কাটল সূর্যাস্তের পর কঁতেস্, তাঁর দুই ছেলে, আর আমরা—সবাই একসঙ্গে ফিরলাম। বাবাকে একটু গম্ভীর লাগল। বাড়ী ফিরে তিনি আর মা ওঁদের ঘরে বসে কি নিয়ে আলোচনা করছেন, শুনতে পেলাম। অবিলম্বে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নের ঘোরে যেন একটা শব্দ কাণে এল, দেখি আমার ওপর ঝুঁকে মা আমায় আদর করছেন। তাঁকে আমি জড়িয়ে ধরলাম। আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় আমি বিড়-বিড় করে বলে উঠলাম, "মা, মা-মণি!"—উনি চলে গেলেন।

আমি তখন সুখের স্বপ্নে বিভোর।

৩০শে সেপ্টেম্বর।—আজ মাসের শেষ দিন! কনভেন্টে গিয়ে দেখে এলাম ভগিনী ভেরোনিকের কবর। মাটির ওপর ঘাস গজিয়েছে, শ্বেত পাথরের ক্রুশটায় লেখা: "২৬ বৎসর বয়স্কা ভগিনী ভেরোনিকের স্মৃতিতে।"

"আজ যে তুমি অশ্রুরুদ্ধ, সেই তুমিই সুখী, কারণ আনন্দের মাঝেই তুমি আশ্রয় পাবে।"

হায় রে! কতই না কেঁদেছেন, কত কষ্টই না পেয়ে গিয়েছেন উনি! এ ধরণীতে যাদের তিনি ভালবেসেছিলেন, ওখানে গিয়ে তাদের ফিরে পেয়ে তিনি কতই না জানি সুখী আজ! কত দিন তাঁর পরিবারের গল্প করেছেন আমার কাছে। সব ব্যথার, সব দুঃখের কথাই তিনি আমায় একান্তে বলতেন। অত শোক পেয়েও অন্তরে তাঁর বিশ্বাস ছিল অটুট,—প্রিয়জনদের তিনি শীঘ্রই ফিরে পাবেন। হে দেবি, ভগবানের কাছে আমার হয়েও তুমি প্রার্থনা জানাও!

ফেরবার পথে ওক অ্যাভেনিউয়ে দেখা হয়ে গেল জমিদার ও তার ভাইয়ের সঙ্গে। তারা মাছ ধরতে গিয়েছিল। আমায় বাড়ী অবধি দিয়ে গেল।

১লা নভেম্বর।—আমার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাবে বলে আজ জমিদার আর ওর ভাই এসেছিল। মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দারুণ বৃষ্টি নামল; বাবা তাঁর শিরাভরণ খুলে আমায় দিচ্ছেন দেখে আমি হাসলাম, "আমি বাবা বৃষ্টিকে থোড়াই কেয়ার করি!" বলেই তীরবেগে ছুটিয়ে দিলাম অস্ত্যারলিজকে।

ওঁরাও দৌড়তে শুরু করলেন পেছন পেছন। হাওয়ার বেগ ক্রমেই বাড়ছে, বৃষ্টিও পড়ছে মুষলধারে। মনে হল, হাড় ক'খানা অবধি ভিজে গেল; হাওয়ায় খুলে যাওয়া আমার চুল দিয়ে বড় বড় মুক্তাবিন্দু ঝরে পড়তে লাগল। বাড়ী ফিরে দেখি, মা আমাদের জন্যে অধীর ভাবে পথ চেয়ে আছেন। বৃষ্টি থামল আধ ঘণ্টা বাদে সূর্য যেই দেখা দিল জমিদাররা উঠে পড়লো।

৪ঠা নভেম্বর। আজ সন্ধ্যাবেলা জমিদার-গিন্নী এসেছিলেন জমিদারের জন্মদিন উপলক্ষে তিনি আমার সাহায্য চান। সানন্দে সম্মতি দিলেন। ষোল তারিখ বেলা দশটার সময় প্রাসাদে যাব ঠিক হল। সূর্যাস্তের পর ফিরে আসব। আমাদের বুড়ী

তেরেস গল্প করছিল যে গ্রামের স্ত্রী, পুরুষ, শিশু সবাই প্রস্তুত হচ্ছে ড়ি তারিখের জন্য।

"জমিদার ছেলেটি বড় ভাল," তেরেস বলল; "আমার স্পষ্ট নে আছে ও যেদিন জন্মাল, ঠিক যেন গত কালের কথা! ওর াপ ছিলেন অতি সুপুরুষ: নিজে হাতে প্রতি গ্রামবাসীকে উনি ানা উপহার দিয়েছিলেন। আর ছেলের আটকড়াইয়ের দিনে ত ্রী ও নবজাত পুত্র নিয়ে প্রাসাদ-তোরণের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, একে একে প্রত্যেকটি লোককে দর্শন দিয়েছিলেন। সেদিন সবাই ্রস্ত আনন্দে মেতে উঠেছিল, মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং রাজপুত্রের ন্মোৎসব হচ্ছে। কি জয়ধ্বনির ঘটা! লোকে বলে কিনা এর ধ্যেই কেটে গেছে কুড়িটা বছর। মনে পড়ে, দু'-বছর বাদে যুদ্ধে িয়ে জমিদার মশাই প্রাণ দিলেন: সারা গ্রাম শোকে ভেঙে পড়ল; াছার-তেইশ বছরও হয়েছিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু তারি মধ্যে ্রামবাসীদের চোখে উনি পিতৃতুল্য শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। রুণী জমিদার-গিন্নী পড়লেন অসুখে; সবাই ভাবল চললেন বুঝি বতরণীর তীরে। কিন্তু না, দুধের বাছা দু'টোর মায়া উনি কাটাতে ারলেন না। বেঁচে উঠলেন তাদেরই মুখ চেয়ে। শ্রীমান য়ানোয়াকে ত অবিকল ওর বাপের মত দেখতে হয়েছে, সেই রূপ, সই অভিজাত আদল, সেই কালো চোখ, সেই চুল! আর ছোটটা পয়েছে তাঁর খোস মেজাজ। ভগবান এদের মঙ্গল করুন, এই আমার প্রার্থনা, সারা গ্রামবাসীর এই প্রার্থনা।"

তেরেসের বয়স সত্তরের বেশী; আমি তার চোখে একেবারে চি খুকিটি, কারণ আমার মা পর্য্যন্ত ওর হাতে মানুষ; ওর ্মৃতির কোঠায় সাজান দিনগুলি আমায় নিয়ে যায় এক ্বপ্নরাজ্যে। জমিদারের জন্মদিনে এত উৎসব হয়েছিল, তাতে ার আশ্চর্য কি?

৬ই নভেম্বর।—পারী থেকে আমার ঠাকুমা জরির কাজকরা একটি নীল ভেলভেটের পোষাক পাঠিয়েছেন। সেই সাথে একটা চিঠিও দিয়েছেন।

"স্নেহের নাতনী,

তোর বাবার চিঠিতে জানলাম তোর খবর। চিঠিটা খুলেই চাখে পড়ল—আমার জ্ঞানে যত মেয়ে দেখেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে ্দরী—একটি মেয়ের ছবি! প্রথম ঝলকেই তোকে চিনতে ারলাম, যদিও গেল চার বছর তোকে দেখিনি। বহুদিন থেকেই ্ছে আছে, তোকে দেখি; কিন্তু আজ আমি বুড়ো হয়ে গেছি, রলগাড়ীতে চাপার কথা ভাবতেও শিউরে উঠি। তুই যদি বাপির াথে পারীতে আসিস, বাপির এই বুড়ো পিসীর সঙ্গে দেখা করতে ুলিস না কিন্তু। ইতি।—

জেনেভিয়েভ হেনল্ট আর্ভের।"

গোসয়েলদের বাড়ী গিয়েছিলাম। শ্রীমতী য়োফোনী আমায় ার বুদোয়ারে নিয়ে গিয়ে দেখাল দামী কয়েকটা পাথর; সবে ারী থেকে আনিয়েছে। টেবিলের ওপর একটি যুবকের তৈলচিত্র ছল; অদ্ভুত ব্যথাতুর চেহারাটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

"কে এই ভদ্রলোক?" আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

"ও আমার খুড়তুত ভাই!" চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ওর বুক চিরে বরিয়ে এল। আমার কাঁধে হেলান দিয়ে ও বলল, "বেচারা আমায় ভালবাসত; থাইসিস হয়ে মারা যায় অষ্ট্রেলিয়াতে; আমি ওকে বিয়ে করতে রাজী হইনি; কারণ ওর কপর্দকহীনতা; তা ছাড়া আমার পাশে ওকে দেখে লোকে ছোট ভাই বলেই ভুল করত; ভগবানই আমাদের দু'জনকে আলাদা ভাবে সৃষ্টি করেছিলেন।"

আরো ছবি ও দেখাল, ওর মার ছবি, ওর স্বর্গত বাবার ছবি। বড় কষ্ট হল ওর কাহিনী শুনে। লেকের ধারে ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে গেলাম আমরা।

লুইয়ের একটা চিঠি এসেছিল; না দেখেই বাবা সেটি পকেটে পুরে ফেললেন।

"কি লিখেছে বাবা, পড় না?" আমি কৌতূহল দমন করতে পারলাম না, "কই তুমি ত আগের মত উৎসাহ নিয়ে ওর চিঠি পড় না আজ-কাল?"

"কারণ অনেক গোপন কথা ওতে থাকে যা তোর এখন জানার দরকার নেই," মৃদু হেসে আমার গালে উনি টোকা দিলেন।

"লুইয়ের আবার গোপন কি কথা, বাবা? ওর মত সরল ছেলে?"

উনি জবাব দিলেন, "সময় যখন আসবে, ও নিজেই তোকে সব কথা খুলে বলবে মা! যা, অনেক দেরী হল; খাবার আগে একটু জিরিয়ে নে।"

খেতে বসে বাবা কথাটা পাড়লেন: শীঘ্রই লুই আসছে; ১৮ তারিখে এসে পৌঁছবে।

"বাঃ, ঠিক উৎসবের আগেই," আমি হাততালি দিয়ে উঠলাম। —"উৎসব? কি উৎসব? ওহো, মনে পড়েছে, জমিদারের জন্মোৎসব!" বাবা খেই পেলেন।

লুই আবার আসছে, মা খুব খুসী; সত্যি বলতে কি আমিও কম খুসী নই।

৯ই নভেম্বর।—বেশ কিছু দিন হল জমিদার এদিকে আসেনি; ওর শরীর খারাপ হয়নি ত? নাঃ, তা হলে জানা যেত। বাবা আর আমি বেড়াচ্ছিলাম; তাঁকে প্রশ্ন করলাম, স্বর্গত জমিদারের চেহারা তাঁর মনে পড়ে কি না।

"তাঁকে কোন দিন দেখিই নি।"

ততক্ষণে আমরা পাহাড়টায় গিয়ে চড়েছি; "দেখ, মার্গারিৎ, কা'কে যেন প্রাসাদে দেখা যাচ্ছে?"

বহু চেষ্টা করেও কাউকে দেখতে পেলাম না।

"নাঃ, বাবা, চোখে বড় রোদ পড়ছে।"

ঘোড়ার মুখ আমরা ঘুরিয়ে নিলাম।

১০ই নভেম্বর।—আজ রবিবার; গীর্জায় গিয়েছিলাম। বিকেলের উপাসনাতেও আমরা উপস্থিত ছিলাম। যখন বেরিয়ে আসছি জমিদারের সঙ্গে দেখা; ওকে দেখে শঙ্কামুক্ত হলাম। শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের সাথে সাথে ও এল। চেহারাটা কেমন যেন খারাপ লাগছে; জিজ্ঞাসা করলাম, অসুখ করেছিল?"

"উঁহু, ঠিক অসুখ নয়," ও কথাটা লুফে নিল, "সারা সপ্তাহ দারুণ মাথাটা ধরেছিল। সে কথা থাক, তুমি ১৬ তারিখে আসছ, মনে থাকে যেন। তুমি এলে পুরনো প্রাসাদটা যেন প্রাণ ফিরে পায়!"

একসঙ্গেই আমরা বাড়ী অবধি গেলাম।

১৬ই নভেম্বর। আজ আমায় জমিদার নিতে এসেছিল, দশটার সময়; দেখে তাকে বেশ প্রফুল্ল লাগল। ও বলল, এখন ভালই আছে। গাস্ত‌ও এসেছিল। জানাল, ওদের মামা বাবু ফিরছেন পারী থেকে। বনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় আমি বড় একটা কথা বলছিলাম না; আমি যে একমনে শুনতে চাই ওর কথাই; আমার ভালো-লাগা প্রসঙ্গগুলোই ও বেছে বেছে আলোচনা করছিল। প্রাসাদে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন কঁতেস্। তাঁর ভাই, করমর্দন। ঘরে ঘরে ফুলের, মালার, পাতার—হাজার জিনিসের সমারোহ। এখুনি আমি ঘর-দোর সাজাতে লেগে যাচ্ছি দেখে জমিদার বাধা দিল।

"শ্রীমতী আর্ভের, আগে একটু বিশ্রাম করে নাও দেখি," ও অনুরোধ করল।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর আমরা কাজে হাত দিলাম। চারটি ছবি সাজানোর ভার পড়ল আমার ওপর—স্বর্গত জমিদারের জমিদার-গিন্নীর, বর্তমান জমিদারের ও তার ভাইয়ের। 'ইমর্তাল' আর প্যান্সির একটা করে মালা প্রথম দু'টিতে দিয়ে কমলা ফুলের মালা দিয়ে সে দুটি জুড়ে দিলাম। অন্য ছবি দুটিতে দিলাম লাল আর সাদা গোলাপের মালা, লরেল পাতা আর গুটিকয়েক লিলি। জমিদার গিন্নী আমার রুচির প্রশংসা করলেন। জমিদারের ছবির দিকে তাকিয়ে কর্ণেল বললেন, "ছেলেটা দেখতে একদম বাপকা বেটা।"

"হ্যাঁ," ওঁর বোন জবাব দিলেন, "তবে একটা তফাৎ আছে। চেয়ে দেখত ওদের চোখের দিকে,—আমার আশিল্-এর চোখ জ্যানোয়ার গভীর ব্যথাতুর চোখের চেয়ে কত কমনীয়। তা ছাড়া জ্যানোয়ার চিবুকে কেমন একটা রুক্ষতার ভাব।"—"আর কেমন পুরুষালি, সুঠাম, তাই না?" কর্ণেল জুড়ে দিলেন।

স্বর্গত জমিদারের ছবির তলায় লেখা, "প্লুগারভেনের আশিল্ জ্যানোয়া, বাইশ বছর বয়সে" অন্যটার তলায় লেখা: "প্লুগারভেনের জ্যানোয়া শার্ল, কুড়ি বছর বয়সে।"

ভাই-বোনে ছবির বিষয় নানা কথা হচ্ছে, এমন সময় জমিদার এসে ঢুকল।

"তোমার কথাই হচ্ছিল জ্যানোয়া," ওর মা হেসে বললেন।

"বেশ ত, এমন মিষ্টি সমালোচনায় ভয় পাবার কিছু ত দেখি না"। ওর মার কোল ঘেঁসে বসল জ্যানোয়া।

গাঁয়ের চাষারা ফুল আর পাতা দিয়ে একটা তোরণ মত করে এনেছে; তলায় গোলাপ দিয়ে লেখা, "তোমার জন্মদিনকে সাদর অভিনন্দন; ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!" জমিদারের প্রতি গ্রামবাসী'র স্নেহ ও শ্রদ্ধার প্রকাশ এটি। নিজে গিয়ে ওদের ধন্যবাদ দিল জমিদার। কি সমারোহ! হলঘর, খাবার ঘর, আর অন্য দুটি ঘর সাজান শেষ হল। এর মধ্যে জ্যানেৎকে একদণ্ডের বেশী দেখতে পাইনি। ওকে বেশ সুখী দেখলাম; বেচারা আমার সাথে কথা বলবার ফুর্সৎ মোটেই পাচ্ছে না,—"কারণ হাতে এখন যে কত কাজ রয়েছে," বলেই সে ছুটল রান্নাঘরের দিকে। সন্ধ্যাবেলা জমিদার ও তার মামা আমায় বাড়ী পৌঁছে দিল। তখন চাঁদ উঠেছিল। জমিদার আমায় হাজার হাজার বার ধন্যবাদ জানাল ওর
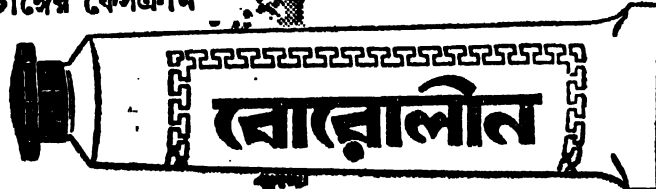
াকে সাহায্য করতে আসার জন্য। ঝোপগুলি দারুণ ঝলমল করছে, ানে হচ্ছে কেউ যেন ওদের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে রূপোর চাদর। যেতে যেতে দেখলাম আকাশে একটাও তারা চোখে পড়ছে না— এমনই চাঁদের আলো! ছোট্ট নদীটির স্বচ্ছ আয়নার মত জলের ওপর উইলোগাছগুলি ঝুঁকে পড়েছে, যেন নিজেদের ধ্যানেই মগ্ন। পাতায় পাতায় শিহরণ তুলেছে মৃদু বাতাস। সবই সুন্দর! আমরা মুগ্ধচিত্তে এগিয়ে চলেছি। বাড়ী অবধি গিয়ে জমিদার ও তার মামা করমর্দন করে জানালেন শুভরাত্রি।

১৮ই নভেম্বর। আজ সকালে লুই এসেছে। বেড়িয়ে যখন ফিরছিলাম, দেখি একজন অশ্বারোহী সৈনিক আমাদের দরজার সামনে থামল।

"ওই ত", বাবা বলে উঠলেন, "লুই এসেছে!"

ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম তীরবেগে।

লুইও এগিয়ে এল। "স্বাগত, লুই, সুস্বাগতম্"! বাবা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে ওকে বুকে টেনে নিলেন।

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে।

"আরে, তুমি ঘোড়ায় চড়তে পার? জানতাম না ত!"

"এই কয়েক সপ্তাহ হল শিখেছি," আমি জানালাম।

"হলে কি হয়," বাবা দুষ্টগলায় বললেন, "মেয়ে এখন পাকা ঘোড়সওয়ার বনে গিয়েছে!"

"সে আমি দেখেই বুঝেছি," অস্তেরলিজকে আদর করতে করতে লুই জবাব দিল, "চমৎকার ঘোড়াটি কিন্তু!" আমরা বাড়ীর ভেতর ঢুকতেই মার সঙ্গে দেখা; লুইকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরলেন।

"তুই এলি বাপ, কি যে শান্তি পেলাম।"

লুইকে ওর ঘরে নিয়ে গেলেন বাবা। আমি গেলাম আমার ঘরে। খেতে বসে জমিদার-গিন্নীর নেমন্তন্ন-চিঠি মা দিলেন লুইয়ের হাতে। সানন্দে ও রাজী হল। বিকেলের দিকে জমিদার যখন এসে ব্যক্তিগত ভাবে ওকে নেমন্তন্ন জানাল, তখনও লুই অতি আন্তরিক ভাবে তা গ্রহণ করল।

১৯শে নভেম্বর। বাবার সঙ্গে লুই আর আমি বেরিয়েছিলাম সকাল আটটায়, ফিরতে এগারোটা বেজে গেল। খাবার একটু আগে, হলঘরে আমি একা ছিলাম; একটি জোরাল পুরুষ-কণ্ঠে ভেসে এল মুসে'র বিখ্যাত কলি.—

"কে মোর প্রেমিক?—আমায় যদি শুধাও তবু
রাজ্য-লোভে বলব না সেই নামটি কভু!"

গান থামলে লুইকে দেখতে পেলাম বাগানে; ওকে গিয়ে বললাম। "কি মঁসিয়া লফেভ্র, আপনি এত ভাল গান জানেন, এত দিন চেপে ছিলেন কেন?"

ও সবিস্ময়ে জবাব দিল।

"এই কি আবার গানের ছিরি?"

"একশো বার!"

"সত্যি?"

—আমরা খেতে চলে গেলাম। কাল উৎসব।

২০শে নভেম্বর। কি ভাবেই যে আজ সারাটা দিন কাটবে! বাবাকে লুই জিজ্ঞাসা করল, প্রাসাদে সামরিক পোষাক পরে যেতে হবে কি না।

"নিশ্চয়ই, তুমি এখন সৈন্যবিভাগের কর্মচারী, আমার বয়সে, অবসর গ্রহণ করে, যা খুসী করতে পার, এখন নয়!"

প্রাতরাশের পরই আমরা রওনা হব, যাতে ওখানে গিয়ে চাষাদের অনুষ্ঠান দেখতে পারি। আজ ওদের মহা ভোজ দেওয়া হবে। এখানেই থামি।

২১শে নভেম্বর।—কাল যে কী আমোদেই দিন কেটেছে। গিয়ে দেখলাম চাষা-পাড়ার সব একে একে জড় হচ্ছে। লুই যাওয়াতে কঁতেস অতি প্রীত হয়েছেন। গোস্‌রেলরাও এসেছিল,— ধারে-কাছের কোনও পরিবারই বাদ যায়নি। ঘুরে ঘুরে আমরা সাজ-সজ্জা দেখতে লাগলাম। দুপুর বেলায় চাষাদের জন্য টেবিল পড়ল। ওপর তলায় বারান্দাতে আমরা গিয়ে বসলাম; নিমন্ত্রিতেরা দলে দলে ইতস্তত: ছড়িয়ে আছেন। আমায় সঙ্গে নিয়ে জমিদার প্রজাদের মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছিল, তখন বলিষ্ঠ এক বুড়ো মাথার টুপি খুলে অভিবাদন জানাল।

"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

জমিদারের দৃঢ় অভিজাত ওষ্ঠের মৃদু হাসি আর দৃষ্টির তীব্র মাধুর্যে একাত্ম হয়ে আমিও বলে উঠলাম, "হ্যাঁ, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।" মাথায় আজ ও টুপি পরেনি; ঢেউ খেলানো চুলের ওপর দিয়ে চপল হাওয়া খেলে বেড়াচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে সেগুলি উড়িয়ে এনে ফেলছিল ওর হাতীর দাঁতের মত শুভ্র কপালে। ওকে দেখলেই কেমন যেন ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

ওর সুমধুর দরাজ গলা শুনতে যে কি ভাল লাগছিল! এক এক করে প্রত্যেক চাষার সঙ্গেই ও কথা বলছিল। সব কিছু খুঁটিনাটিতেই ওর সমান আগ্রহ। আমরা ফিরে গেলাম কঁতেস্-এর কাছে।

"তুই যে কি বোকামি করেছিস দ্যনোয়া," তিনি মৃদু তিরস্কার করলেন, "এই রোদে কি টুপি ছাড়া বার হতে আছে? আবার যদি মাথা ধরে?"

আমি ততক্ষণে ওঁর পায়ের কাছে বসেছি; উনি সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। জমিদার কাছেই বসল। কঁতেস-এর হাঁটুর ওপর মাথা রাখলাম আমি।

"সবাই আজ খুব আমোদ করছে, তাই না রে দ্যনোয়া?"

"হ্যাঁ মা!"

"বাজল ক'টা?"

"প্রায় তিনটে।"

"উঃ, সময়ের সঙ্গে আর পেরে উঠছি না বাপু!" আধ ঘণ্টাখানেক বাদে কঁতেস আমায় বললেন, "কি মা, তুই যে অনেক কিছু ভাবছিস মনে হচ্ছে?"

আমার ভাব কেটে গেল; সংক্ষেপে জানালাম।

"কিছু না।"

"তা হলে প্রায় পনের মিনিট হল তোর মুখে কথা সরছে না কেন?" উনি হেসে ফেললেন।

শ্রীমতী গোস্‌রেল্ এল। কঁতেস্ উঠলেন। আমরা গিয়ে জড় হলাম মার কাছে। প্রায় পাঁচটা অবধি খুব ঘোরা-ঘুরি হল। তার পর খাবার আগে, সবাই একটু বিশ্রাম করে নিল। এর আগে এসে যে-ঘরে ছিলাম, কঁতেস আমায় সেখানেই নিয়ে গেলেন। সময় হলে সবাই গিয়ে জুটলাম বড় হলটায়। ছাদ থেকে শুরু করে চারি দিক

সাজানো ; সবারই চোখ জুড়িয়ে গেল। আমি সবার থেকে একটু গা বাঁচিয়েই চলছিলাম,—চেয়ে ছিলাম জানলায় ফাঁক দিয়ে। সুন্দর এক প্রশান্তি আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বয়ে চলেছে। বড় ভাল লাগছিল। হঠাৎ আমার ধ্যান ভঙ্গ করে শ্রীমতী গোসরেল প্রশ্ন করল।

"আচ্ছা, ওই মিলিটারি ভদ্রলোককে চেন না কি ?"

"ও তো কাপ্তেন লফেভ্র," জবাব দিলাম।

"তোমাদের আত্মীয় হয় বুঝি ?"

"না পুরনো বন্ধু।"

ইতিমধ্যে লুই এসে পড়ায় ওর সঙ্গে গোসরেলের আলাপ করিয়ে দিলাম। ও আমার কাছেই বসল। গোসরেল ওকে পেয়ে আর ছাড়তে চায় না ; হাজার কথা বলতে বলতে মুখর হয়ে উঠল। খাবার পর উৎসব-বহ্নি জ্বালান হল। প্রাসাদে নাচের চলন নেই। বাঁচা গেল। কঁতেস তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর আর কোন দিন বল-এর ব্যবস্থা করেন নি। গোসরেল বেশ ক্ষুণ্ণ হল।

"দূর ছাই ! একটু ভালস্ কিংবা কোয়াড্রি না হলে মজা কোথায় ?" আমায় বলল।

"সবটাই রুচির ওপর নির্ভর করে : প্রত্যেকেরই রুচি স্বতন্ত্র," আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা।

"তার মানে, তুমি নাচ ভালবাস না ?"

"বিশেষ না।"

"ওঃ, তা হলে তুমি এখনো এলে-বেলে !" বলে সে মার্কি ড মেরেং-এর সঙ্গে বেরিয়ে গেল। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কেরাণী-বধূ

সৈয়দ হোসেন হালিম

প্রভাতের আলো পূবের আকাশে যখন বুলায় তুলি,
কেরাণীর বধূ জাগে যে তখন নয়ন-পাপড়ি খুলি'।
ও-বাড়ীর ঘড়ি সময়ের কথা ক'য়েছে ঘণ্টা রবে,
কেরাণী-বধূকে এবার উঠতে হবে।

স্যাঁতসেঁতে ঘর, তাহার উপরে ছেঁড়া যে মাদুর পাতা,
কেরাণী-বধূর স্বামী করে কাজ সুদূর সে কোলকাতা।

হাতেতে প্রদীপ, মিটি-মিটি জ্বলে আলো,
কেরাণী-বধূটি নয়নে দেখে না ভালো !
তবু পাকশালে কোথায় কি আছে সবটুকু আছে জানা,
নিজ হাতে তার সাজানো-গোছানো এ যে তারি কারখানা।
ডান দিকে নুণ, তার পাশে তেল, তাহারো কিছুটা আগে
দুটো হাঁড়ি তোল, তার পরে যেটি তাহাতে মশলা জাগে।
বাম পাশে যাও, বঁট কাত-করা, সাম্‌নে সব্‌জি-ঝড়ি ;
কেরাণী-বধূকে বেড়াতে হয় না ঘুরি'।

তবু মাঝে-মাঝে ভুল করে বধূ, হয় তো মনের ভুলে
কিশোর বেলার ভাসে কথাগুলি অলখে স্মৃতির কূলে !

গোলাপের কুঁড়ি কাল ছিল যেটি ও-বাড়ীর খোলা ছাদে,
সেই কুঁড়ি কবে আলোকে-বাতাসে ফোটার জন্তে কাঁদে।
লাল হ'য়ে আসে দল,
এর জীবনেতে আলো-বায়ু নাই—আছে শুধু আঁখি-জল !
পৃথিবী যে এর চিংড়ির খোলা আর কয়লার ধোঁয়া,
থালা-ঘটি-বাটি রোগা ছেলে-পিলে দু'-হাতে দু'-গাছি নোয়া।

দিনে থাকে কাজ, রাতেতে আবার খুক্-খুক্ ধরে কাশি,
তবু-ও বধূর মন থাকে সেই শহরেতে পরবাসী।

হায় রে কেরাণী-বধূ,
কি কাজ জীবনে ? যদি-ই জীবনে না রহিল কিছু মধু !
কাঁচা কয়লারা একবার পুড়ে ফের দুয়ে হয় লাল,
কেরাণী-বধূর এক হনমে-ই মাস গিয়ে শুধু ছাল !
জীবন তো নয়,—যেন একখানা বন্ধ সে ঘুলঘুলি,
আলো পায় না কো, শুধু অকারণে থাকে যে নয়ন তুলি' !

নয়নেতে ঘুম—চোখেতে আঁধার—ঘন-ঘন ওঠে হাই,
তবু খুব ভোরে কেরাণীর বধূ ভাত যে রেঁধেছে ভাই !

এ-কাজের দাম নাই আমি জানি মানুষের দরবারে,
দাম আছে তার, যে জন চেঁচিয়ে গলাটি ফাটাতে পারে।
ছোট মানুষের ছোট-খাটো সুখ, ছোট-খাটো দুখ-গাথা
কেমনে জানবে বড় বাবু আর ধনী সেই কোলকাতা !
কেমনে জানবে পোড়া কয়লায় একজন হোল কালো,
কেমনে জানবে যৌবনে কার জোয়ার আসে না ভালো !

হায় রে কেরাণী-বধূ,
অভাবে আঁধারে শেষ হ'য়ে এলো জীবনের ফুল-মধু !
বাপের বাড়ীতে হয়নিকো সুখ, কপালে-ও হোল ছাই,
কেরাণীর বধূ আজিকে বাঁচার সময় এসেছে ভাই !

হাঁড়ি নয় আজ, বল সকলেরে দাবী কিছু আলো-বায়ু
আর দাবী আছে সকলের মতো মুক্ত সে পরমায়ু !
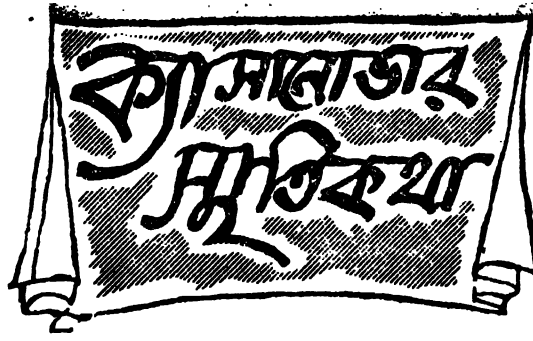
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পত্রের উত্তরে জানালাম সম্মতি—আর নির্দেশ দিলাম স্থান আর কালের। দেখা হোতেই দ্য আঁতোয়ান প্রথমেই বললেন,—"বাধ্য হোয়েই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ চাইলাম। কারণ, অন্য কারো হাতেই মাদাম দ্য আরসি'র এই চিঠিটা দেওয়া নিরাপদ নয়। এই চিঠিটা শীলমোহর করে আপনার হাতে দিতে হোলো বলে ক্ষমা করবেন। যদি আপনি ওর প্রকৃত বন্ধু হ'ন তবে চিঠির বিষয়বস্তু আপনাদের দু'জনকেই আকৃষ্ট করবে। চিঠিটা ঠিক ওঁর হাতে পৌঁছবে তো?"

—"আমি কথা দিচ্ছি, আপনি নিশ্চিন্ত হোন—"

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হেনরিয়েটার কাছে গেলাম। সব বলার পর চিঠিখানি দিলাম। তাড়াতাড়ি চিঠিখানি খুলে ও পড়তে লাগলো—লক্ষ্য করলাম, পড়তে পড়তে ওর মুখের প্রতিটি রেখায় ফুটে উঠছে গভীর উত্তেজনার আর আবেগের ছাপ।

—"বন্ধু আমার, লক্ষ্মীটি রাগ কোরো না, এ চিঠি তোমাকে দেখাতে পারলাম না বলে—দু'টি পরিবারের মানসম্ভ্রম আজ বিপন্ন। এই 'দ্য আঁতোয়ান' ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে, ইনি বলছেন ইনি আমাদের না কি আত্মীয় হ'ন।"

—"ওঃ! তাহলে আগমনী শেষ না হোতেই বিসর্জ্জনের বাজনা সুরু হোলো? জানি না কি কুক্ষণে ওই হতভাগা ছ্যাবোয়াটাকে বাড়ী ঢুকতে দিয়েছিলাম—" আমি আর্ত্তস্বরে বলে উঠলাম।

—"বিশ্বাস কর, এই দ্য আঁতোয়ান আমার সমস্ত ব্যাপারটাই জানেন, উনি সত্যিই সৎপ্রকৃতির লোক, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করবেন না। কিন্তু প্রিয়তম, যদি ঘটনাচক্রে বিচ্ছেদের প্রয়োজন হয় তাহলে তুমি ভেঙে পোড়ো না, আমাকে জোর দিও, যেন সঙ্কল্পচ্যুত না হই। বন্ধু আমার, বিশ্বাস কর, তোমার কাছে যে শান্তি আমি পেয়েছি তা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা আমি শেষ অবধি করবো—"

মেনে নিলাম—কিন্তু মনে নিলাম কি? হতাশার কালো মেঘে মনের আকাশ ভরা। দু'জনার প্রেমেই তখন বিষাদের সুর বাজছে—বিদায়ের পূর্ব্বাভাষ কি? কত সময়ে দু'জনে বসে থাকি মুখোমুখী, কোনো কথাই বলা হয় না শুধু শোনা যায় সুগভীর দীর্ঘশ্বাস···

পরদিন যখন দ্য আঁতোয়ান হেনরিয়েটার সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন আমি অন্য ঘরে উঠে এলাম জরুরী চিঠি লেখার ছল করে—কিন্তু ঘরের দরজা খোলাই রেখেছিলাম···সামনের আয়নায় ছায়া পড়ছিলো ওদের। দীর্ঘ ছ'টি ঘণ্টা চললো ওদের আলাপ-আলোচনা—কথা আর লেখা। কিন্তু শ্রবণে বঞ্চিত হোয়ে সে যে কী যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্ত্তগুলি কেটেছিলো!

সেই রাহুরূপী দ্য আঁতোয়ান বিদায় হোতেই হেনরিয়েটা আমার কাছে এলো—"বন্ধু, কালই আমরা এখান থেকে চলে যেতে পারি কি না বলো তো?"

—"হাঁ ভগবান, তুমি যা বলবে আমি তাই করবো, কিন্তু কোথায় তোমাকে নিয়ে যেতে বলছো?"

—"যেখানে তোমার খুশী! কিন্তু পনরো দিন পরে আমাদের এখানে ফিরতেই হবে।"

আমি কথা দিয়েছি সে সময় আমার লেখা চিঠির উত্তর আমি এখান থেকেই নেবো। না, না, ভেবো না আমি ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছি—আসলে এ জায়গাটা আর এক মুহূর্ত্তও সহ্য করতে পারছি না।

সবই বুঝলাম···সবই ভবিতব্য। গেলাম মিলানে—চোদ্দটি দিনের ভিতর এক দরজী ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো লোকের সঙ্গে আমরা দেখা করিনি। আমি দরজীকে দিয়ে হেনরিয়েটার জন্যে বহুমূল্য একটি পোষাক করিয়ে দিলাম···ওর বিদায়োপহার। আর ওই চোদ্দ দিনে জলের মত অকাতরে ব্যয় করতে লাগলাম আমার সঞ্চয়। একটি প্রশ্নও করেনি হেনরিয়েটা আমার এই অর্থব্যয়ের প্রাচুর্য্যে। পারমাতে ফিরলাম যখন তখন পকেটে শ'তিন-চার সেকুইন অবশিষ্ট আছে।

যেদিন এলাম তার পরদিন আবার দ্য আঁতোয়ানের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা—আমাদের বিচ্ছেদ হোলো সুনিশ্চিত। হেনরিয়েটা এলো কাছে, জানালে উপায় নেই আর···এখনি জেনিভাতে যেতে হবে আমাদের, সেখান থেকে ও চলে যাবে।

বিদায়ের মুহূর্ত্ত এলো। দুঃসহ বেদনায় আচ্ছন্ন দু'জনার মন। সেই সীমাহীন ব্যথার প্রকাশ শুধু অবিরল অশ্রুধারায়।

—"ভাগ্য যখন বিচ্ছেদই এনে দিলে তখন আর ফিরে দেও না আমাকে···যাকে হারাতে হোলো তাকে হারিয়েই ফেলো, খবরের জন্য ব্যাকুল হোয়ো না···যদি কখনো দেখতে পাও তবে অপরিচিতের দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলো তোমার চোখে···"

যাবার বেলায় ক্ষণ-সঙ্গিনীর শেষ কথা। পরদিন ছোটো একটি চিরকুট পেলাম—তিনটি অক্ষর লেখা—'বিদায়'। আমার ঘরের জানলায় হঠাৎ চোখ পড়লো, দেখি কাচের উপর হীরার অগ্রভাগ দিয়ে কেটে কেটে লেখা—

"ভুলে যাবে, হেনরিয়েটাকেও একদিন ভুলে যাবে" আর একখানি চিঠি। কয়েক দিন পর পেলাম—সেই প্রথম আর শেষ চিঠি—

—"বন্ধু, অদৃষ্টই জোর করে আমাকে ছিনিয়ে এনেছে তোমার কাছ থেকে···আমাকে ভুলে যেও···স্মৃতির ভারে দুঃখকে আরও

নিবিড় করে তুলো না। মনে কর তিনটি মাসের এ এক নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বপ্ন। এত আনন্দ, এমন রঙীন মায়া, এমন সুধারসে ভরা ক্ষণগুলি সঞ্চিত থাক মনের মণিকোঠায়···থাক না ভেসে ক্ষণ-সঙ্গিনী ···স্বপ্নচারিণী হোয়েই রইল সে। আমি ভালো আছি, তোমাকে ছেড়ে যতখানি ভালো থাকা সম্ভব। আমি আজও জানি না তুমি কে? কিন্তু তোমার মনের এত কাছে দুনিয়ায় আর কেউ এসেছে কি? তোমার প্রতিটি চিন্তার সঙ্গে শুধু আমারি তো ঘটেছে পূর্ণ পরিচয়।

আমার অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে—সে অর্ঘ্য আমার ভালোবাসা—যে ভালোবাসা রূপায়িত হোয়েছে শুধু তোমাতেই···

কিন্তু তুমি থেকো না অপরিবর্তনীয়···ভালোবাসার আগমনী বাজুক···আবার তোমাকে সার্থক করে তুলুক আর এক হেনরিয়েটা—বিদায়···বিদায়!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম প্যারিসে এসে সব বিদেশীদের মতই আমি প্রথম উৎসুক হোলাম প্যালেস রয়্যাল দেখার জন্যে। নতুন অভিজ্ঞতা, পথ-ঘাট মানুষ-জন সবই উপভোগ করছিলাম—মন্দ লাগছিল না পথের দু'ধারে খোলা ফুটপাথের উপরই ছোটো ছোটো টেবিলে সবাইকে পানাহার আর গালগল্পে মত্ত দেখতে। আমিও একটা টেবিলে বসে এক গ্লাস চকোলেটের অর্ডার দিলাম। উৎকৃষ্ট রৌপ্যআধারে নিকৃষ্ট পানীয় আস্বাদন করতে করতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু খবর-টবর আছে কি না। সরাইওলা জানালে যে একটি ছেলে হোয়েছে। শুনেই পাশের টেবিল থেকে একজন বলে উঠলেন—"বাজে কথা, ছেলে নয় মেয়ে হোয়েছে।" তৎক্ষণাৎ অন্য একটি ভদ্রলোক ওধার থেকে জবাব দিলেন—"আরে মশাই, আমি এখনি ভার্সাই থেকে ফিরছি—ও ছেলেও নয়, মেয়েও নয়"—

তারপর আমার দিকে চেয়ে মন্তব্য করলেন আমি নিশ্চয়ই বিদেশী। সবিনয়ে জানালাম আমি ইতালীয়। তখনি ভদ্রলোক প্যারিসের নাড়ি নক্ষত্র বর্ণনায় মুখর হোয়ে উঠলেন। ওঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম। প্রথম ভদ্রলোকটি আমার সঙ্গ ছাড়লেন না। দু'জনে বেড়াতে বেড়াতে এগোতে লাগলাম। একটা দোকানের সামনে দেখি অসম্ভব ভিড়।

—"কী ব্যাপার এখানে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

—"নস্যির কৌটা ভরবার জন্যে সব দাঁড়িয়ে আছে"—

—"সে কি! শহরে আর তামাকের দোকান নেই নাকি?"

—"আরে না মশাই, বহুৎ আছে। আসলে গত সপ্তাহে ডাচেস দ্য চার্টার এই দোকানেই দু'-তিন দিন গাড়ী থামিয়ে নেমে এসে নস্যি কিনেছেন, ব্যস তাইতেই ওটা মস্ত ফ্যাসনে দাঁড়িয়ে গেল। প্যারিসের লোকেরা যাদের প্রতি মুগ্ধ হয় যাদের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয় সেই সব 'দেবতা'রা যা কিছু করেন তাই নতুন আর তাই-ই ফ্যাসান। তারাও সুযোগটা পুরোপুরিই নেন। ঐ তামাকের দোকানওয়ালী মেয়েটি ডাচেসের সুনজরেই ছিলো, তাই তার ভাগ্য ফিরিয়ে দিলেন তিনি এইটুকু কৌশলেই"—

প্যারিসের হালচাল দেখতে দেখতে আমরা বিখ্যাত অভিনেত্রী সিলভিয়ার বাড়ীর সামনে গিয়ে পৌছলাম। সে রাত্রে সেখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিলো। ভদ্রলোকটি সেখানেই বিদায় নিলেন। সিলভিয়া আমাকে ভিতরে নিয়ে অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। 'ক্রেবিল' নামটি শুনতেই আমি চমকে উঠলাম।

—"বলেন কি! কি সৌভাগ্য আমার! গত আট বছর ধরে আপনার লেখা পড়ে আমি মুগ্ধ। আমি কল্পনাও করিনি কোনো দিন আপনার সাক্ষাৎ পাবো—মনে মনে অথচ কি আকাঙ্খাই না ছিলো আমার আপনাকে দেখতে, আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে—আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে একটু সময় দিন"—

এই বলে আমি ওঁকে ওর এক বিখ্যাত রচনার আমার স্বরচিত ইতালীয় অনুবাদ থেকে আবৃত্তি করে শোনালাম। কি গভীর মনোযোগের আর আনন্দের সঙ্গেই না উনি শুনতে লাগলেন! ইতালীয় ভাষায় ওঁর মাতৃভাষার মতই দখল। আমি থামাতেই উনি ঐ অংশটাই ফরাসীতে আবৃত্তি করলেন। আশী বছর বয়সের বৃদ্ধের পক্ষে নিজের রচনা অন্যের ভাষায় আবৃত্তি করতে শুনে খুশীতে উচ্ছ্বসিত তখন তিনি। আমরা দু'জনে বহুক্ষণ কথাবার্তা বললাম। প্যারিস আর ফরাসীদের সম্বন্ধে আমার যা কিছু ভালো-মন্দ ধারণা হোয়েছে সবই আমি অকপটে জানালাম। উনি বললেন, প্রথম দিনের পক্ষে বিশেষ করে একজন বিদেশী হোয়ে আমার এই সমালোচনায় উনি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন যে, আমার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আমার বর্ণনার ক্ষমতারও যথেষ্ট প্রশংসা করলেন।

—"এ দেশে পা দিয়ে অবধি আমি ভাবছি কি করে ফরাসী ভাষাটাকে আরও ভালো করে আয়ত্ত করবো। আরও মার্জিত ভাবে বলতে পারবো। আমার পক্ষে একজন উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়াও কঠিন, কারণ ছাত্র হিসাবে আমি অত্যন্ত তার্কিক, সহজে কিছু মেনে নিতে পারি না; তাছাড়া অত্যধিক প্রশ্ন করি, আবার এই সব গুণাবলী সহ্য করবেন, এমন ধীর স্থির শিক্ষক পেলেও তাঁর পারিশ্রমিক দেবার ক্ষমতা আমার নেই"।

—"আজ পঞ্চাশ বছর ধরে আমি আপনার মতই ছাত্র খুঁজছি"—বললেন ক্রেবিল—"আপনি যদি আমার বাড়ীতে আসেন তবে আমিই আপনাকে পড়াবো, তাছাড়া পারিশ্রমিকও দেবো—আমার কাছে শ্রেষ্ঠ ইতালীয় কবিদের রচনা আছে, আমি সেগুলিকে ফরাসীতে অনুবাদ করতে চাই।"

কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পেলাম না। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে যে রাজী হোলাম সে বলাই বাহুল্য। অদ্ভুত প্রকৃতির লোক! চেহারায় সত্যি সুপুরুষ—প্রায় ছ'ফুট লম্বা, আমার চেয়েও তিন ইঞ্চি মাথায় বড়। চমৎকার কথা বলতে পারেন, সূক্ষ্ম পরিহাসেও তিনি বিখ্যাত। কিন্তু সাধারণতঃ লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পছন্দ করেন না—সারাক্ষণ বাড়ীতে বসে থাকেন পাইপ মুখে আর প্রায় গোটা কুড়ি বেড়াল চার পাশে নিয়ে। আশ্চর্য্য ওঁর এই বেড়াল-প্রীতি! একটি বৃদ্ধা ওঁর গৃহস্থালী দেখাশোনা করতেন, তাছাড়া একটি চাকর আর একটি রাঁধুনী এই নিয়ে ওঁর সংসার। বৃদ্ধাটি সব কিছুরই ভার নিয়ে ছিলেন, টাকা কড়ির হিসাব রাখা, খরচ করা, ওঁর প্রয়োজনীয় যা কিছু সব করা—শুধু কখনো হিসাব দিতেন না কাউকেই। অবশ্য ক্রেবিল'ও কখনও চাইতেন না কোনো হিসাব। ক্রেবিল জাতীয় সংবাদপত্র আর

পুস্তকাদি মুদ্রণের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ; অনেক ধরণের লেখাই তাঁর কাছে আসতো, বৃদ্ধাটি সেই সব তাঁকে পড়ে শোনাতেন—যে সব জায়গাতে সন্দেহ হোতো সেখানে থেমে যেতো, মাঝে মাঝে দু' জনের মধ্যে এই নিয়ে শোনবার মত তর্ক-বিতর্কও চলতো। আমিও একদিন এই বৃদ্ধাটিকে একজন নামকরা লেখককেই বলতে শুনেছিলাম—"আগামী সপ্তাহে আসবেন, এ সপ্তাহে আপনার পাণ্ডুলিপি আমাদের পড়বার সময় হয়নি"—

একটি বছর আমি প্রেবিলঁর কাছে যাতায়াত করেছি সপ্তাহে দু'-তিন বার করে। আমার ফরাসী ভাষায় যতটুকু অধিকার সবই ওঁর কাছ থেকে পাওয়া। ওঁর শিক্ষা পদ্ধতিও বিচিত্র! একবার আমি আট লাইনে একটি কবিতা রচনা করে ওঁকে সংশোধন করতে দিলাম। উনি সবটা পড়লেন তার পর বললেন—"এই আট লাইনে কোনো ভুল নেই—ভাবধারাও কাবিত্বপূর্ণ, ভাষাও চমৎকার, কিন্তু তবুও কবিতাটি একদম বাজে হোয়েছে"—

—"সে কি! কেমন করে তা হয় বুঝলাম না তো!"

—"তা বলতে পারি না, কি যেন একটার অভাব আছে কবিতাটার মধ্যে; যেটা ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না অথচ অনুভব করছি। ধর একটি লোককে তোমার মনে হয় সুদর্শন, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, অমায়িক, এক কথায় তোমার মতে সম্পূর্ণ নিখুঁত। একটি মহিলা এলো, সেই ভদ্রলোকটিকে দেখলে আর যাবার সময় বলে গেল যে তার ভালো লাগেনি' লোকটিকে। তুমি জিজ্ঞাসা করলে, কেন? কি ত্রুটি, কি অভাব আপনি ওঁর মধ্যে দেখলেন?—"কিছু না, মোট কথা আমার ভালো লাগেনি, কেন তা' জানি না।"—তুমি ফিরে এসে আবার লোকটিকে দেখলে—এবার অবাক হোয়ে তুমি আবিষ্কার করলে যে ঐ মোহিনী কণ্ঠস্বর তোমার ভালো লাগার ভাবটিকে নিয়ে উধাও হোয়েছে। তোমার সমস্ত মন যেন জোর করেই মহিলাটির ঐ স্বতঃস্ফূর্ত মতামতেই সায় দিচ্ছে—"

এমনই ছিল ওঁর উপমা দেওয়ার ধরণ। চতুর্দ্দশ লুই-এর রাজসভায় তিনি পনেরো বছর ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কাহিনীই উনি শোনাতেন আমাকে। প্রেবিল' বিয়োগান্ত রচনা 'ক্রমওয়েল' উনি শেষ করতে পারেন নি চতুর্দ্দশ লুই-এর জন্যেই। কারণ রাজা তাকে বলতেন ঐ হতভাগার উপর লেখে সময় নষ্ট না করাই উচিত। ভলটেয়ারের উচ্চ প্রশংসা করতেন কিন্তু এ সঙ্গে এ-ও বলেছিলেন যে সিনেটের সমস্ত দৃশ্যটাই ভলটেয়ার ওঁর রচনা থেকে চুরি করেছেন। উনি বলতেন ভলটেয়ার জন্ম-ঐতিহাসিক, কিন্তু ঘটনার সঙ্গে বাস্তব-অবাস্তব কাহিনী জুড়ে তাকে মনোজ্ঞ করে তোলাই তাঁর প্রধান দুর্বলতা ছিলো—সেজন্যে ঐতিহাসিক সত্য অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হোতো। ওঁর মতে 'ম্যান ইন দি আয়রণ মাস্ক' নাকি সেই রূপকথা—চতুর্দ্দশ লুই-এরও সেই একই ধারণা ছিলো।

বিদেশীদের পক্ষে প্যারিস মাঝে মাঝে একঘেয়ে লাগে, অবশ্য পরিচিতি-পত্র না থাকলে তো কোথাও যাওয়া সম্ভব হয় না। সেদিক থেকে আমি যথেষ্ট সৌভাগ্যবান বলতে হবে। সেইজন্যে পনেরো দিনের মধ্যেই অভিজাত সমাজে আমার অবাধ গতিবিধি হোয়েছিলো।

একবার আমার সঙ্গে 'রয়েল একাডেমী অফ মিউজিকের' সদস্যা এবং জনপ্রিয় অভিনেত্রী মাদামোয়াজেল লা ফেল-এর পরিচয় হোয়েছিলো। একদিন তাঁর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি, তিনি তিনটি ফুলের মত সুন্দর শিশুর সঙ্গে খেলা করছেন।

"আমি ওদের ভারী ভালবাসি"—তিনি বললেন—

—"আপনার ভালবাসার ওরা সম্পূর্ণ যোগ্য। অপূর্ব্ব সুন্দর ওদের দেখতে কিন্তু তিন জনেই তিন রকম দেখতে—"

—"আশ্চর্য্য নয়—শান্ত স্বরে উনি বললেন—বড়টি এক জন ডিউকের ছেলে, মেজোটি কঁতে দ্য এগ মণ্ড এর ছেলে আর ছোটোটি মঁসিয়ে দ্য মেসোঁকজের ছেলে, সম্প্রতি মাদামোয়াজেল দ্য রোমাঁভিলের সঙ্গে ওর বিয়ে হোয়েছে—"

—"মাফ করবেন, আমি ভেবেছিলাম আপনারই ছেলে ওরা—"

—"ঠিকই ভেবেছেন।"

হতভম্ব হোয়ে গেলাম শুনে আর ধিক্কার দিলাম নিজেকে ঐ বোকার মত প্রশ্ন করায়। প্যারিসে নতুন এসেছি, এখানের হালচালও ভালো জানি না তখন। পরে দেখলাম এ ধরণের ব্যাপার হামেশাই ঘটছে এখানে। দুই বিখ্যাত লর্ড—বুফার্স আর লুক্সেমবুর্গ খুব স্বাভাবিক ভাবেই নিজেদের স্ত্রী বদল করলেন—বাচ্ছারাও বদল করলো তাদের পদবী। বুফার্সরা হোলো লুক্সেমবুর্গ আর লুক্সেমবুর্গরা হোলো বুফার্স।

ফন্টেনব্লুতে পৌছবার পরদিন আমি পঞ্চদশ লুই-এর রাজসভাতে গিয়েছিলাম। পঞ্চদশ লুই-এর চেহারার মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার ওর মুখের প্রকাশভঙ্গিই কি অপূর্ব! আমার মনে হোয়েছিলো সত্যিকারের রাজকীয় সৌন্দর্য্যই আমি দেখলাম। একটুও সন্দেহ রইলো না মাদাম দ্য পম্পাডুরের কাহিনীতে যে প্রথম দর্শনেই উনি রাজার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন আর তারপর আসতে চেয়েছিলেন রাজার কাছে। সত্যি না-ও হোতে পারে, কিন্তু পঞ্চদশ লুইকে দেখার পর এ সব ঘটনা মন সহজেই সত্যি বলে মেনে নেয়।

রাজভবনের ভিতরের মহলে দেখতে দেখতে যেতে এক জায়গায় দেখলাম বারো জন কুরূপা মহিলা এগিয়ে আসছেন—তাঁরা হাঁটছেন বললে ভুল বলা হয়, এমন বিশ্রী ভঙ্গিতে দৌড়োচ্ছেন যে মনে হোলো এই বুঝি মুখ থুবড়ে পড়েন। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম ওঁরা কারা, আর অমন করে দৌড়োচ্ছেনই বা কেন? শুনলাম ওঁরা রাণীর খাস পরিচারিকার দল। ওঁদের জুতার হিল পুরো ছ' ইঞ্চি লম্বা তাই ওঁরা পড়ে যাবার ভয়ে অমন করে চলছেন।

—"নীচু হিলের জুতো পরলেই পারেন—"

—"তাই কি হয়। উঁচু হিলই যে ফ্যাশন"

কি বেয়াড়া ফ্যাশন রে বাবা! এগিয়ে যেতে যেতে বিরাট সুসজ্জিত একটি হলে পৌছলাম। দেখলাম জন বারো সভাসদ ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর হলের মাঝখানে বিরাট টেবিলে বিপুল আহারের আয়োজন। কিন্তু কার জন্য এত আয়োজন? উত্তর পেলাম রাণীর জন্য, এখনি তিনি আসছেন। ফ্রান্সের রাণী এসে ঢুকলেন হলটায়। খুবই সাদাসিধে পোষাক, মাথায় মস্ত টুপী, গালে অবধি এতটুকু রঙ লাগানো নেই। টেবিলে গিয়ে বসতেই বারো জন সভাসদ টেবিল থেকে দশ পা' পেছিয়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়ালো! আমিও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে পড়লাম। রাণী কোনো দিকে না

সিরোলিন
কেবল যে 'কাশি থামিয়ে দেয়' তা নয়
—একেবারে জড় থেকে দূর করে
সিরোলিন কাশির বীজাণু-গুলোকে ধ্বংস করে
কাশি হ'লেই বিপদ। কাশতে শুরু করলে বুঝবেন, আপনার গলা ও ফুসফুসের কোমল ঝিল্লীতে প্রদাহ হয়েছে, ফুলে উঠেছে। কাজেই, আপনার এমন ওষুধ চাই যা শুধু 'কাশি থামিয়েই দেয়' না, একেবারে জড় থেকে দূর করে।
সিরোলিন দু'টি উপায়ে কাশির গোড়ায় ঘা দেয়। প্রথমতঃ,বীজাণু-গুলোকে ধ্বংস করে, রোগ আর বাড়তে দেয় না। দ্বিতীয়তঃ,বুকের জমাট শ্লেষ্মা সহজে বা'র করে দিয়ে খুব শীগ্‌গির সত্যিকার আরাম দেয়। সিরোলিন-এ এফিড্রিন নেই।
নিরাপদ পারিবারিক ওষুধ
বাড়ীর সবাই নির্ভয়ে সিরোলিন খেতে পারে — ছোটদেরও খাওয়ানো যায়, কেননা সিরোলিন-এ ক্ষতিকারক কোন ওষুধ বা মাদকদ্রব্য নেই। এর মিষ্টি গন্ধ ছোটদের খুব প্রিয়। সব সময়ে বাড়ীতে এক শিশি রাখবেন।
SIROLIN
'ROCHE'
for COUGHS COLDS and all irritable and inflamed conditions of the Chest and Respiratory Tract
ROCHE
সিরোলিন
VT 1274

চয়ে খেতে লাগলেন। যেটা ভালো লাগলো সেটা আবার চেয়ে নিলেন। তারপর চোখ তুলে সামনে সভাসদদের দিকে চাইলেন—ভাবখানা যেন কার সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যের ছোটোখাটো বিষয়ে আলোচনা করবেন দেখে নিচ্ছেন। দেখার শেষে ডাকলেন।

—"ম্যসিয়ে দ্য লাওগেল?"—অপূর্ব্ব-দর্শন এক রাজপুরুষ এগিয়ে এসে অভিবাদন জানালেন।

—"মাদাম?"

—"আমার মনে হয় এটা খুব উপাদেয় মুরগীর 'ফ্রিকাসে'।"

—"আমারও সেই একই মত মাদাম"—এই বলে অটল গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মার্শাল লাউগেল পিছিয়ে এসে নিজের জায়গায় দাঁড়ালেন।

'বার্গ—অপ-জুম'এর বিখ্যাত বিজয়ীকে স্বচক্ষে দেখে যেমন পুলকিত হোলাম ততখানি ক্ষুব্ধ হোলাম এই দেখে যে, অত-বড় বীরপুরুষকেও সামান্য মুরগীর রান্নার উপর অভিমত দিতে বাধ্য হোতে হোয়েছে—তাও এমন ভাবে যেন রাজ্য পরিচালনার কোনো গুরুতর বিষয়ে মতামত জানানো হচ্ছে। মনে মনে ভাবলুম, আমার সৌভাগ্য যে রাণীর আতিথ্য নিতে হয়নি।

* * * *

একদিন আমার এক বন্ধুকে নিয়ে সেই লরেন্টের মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে বন্ধুটি ঝোঁক ধরলে একটি ফ্লেমিশ অভিনেত্রীর সঙ্গে খেতে হবে। অভিনেত্রীর, নাম 'মরফি'। মেয়েটি আমাকে কিছুমাত্র আকর্ষণ করেনি। কিন্তু বন্ধুকে এড়ানো শক্ত। গেলাম সঙ্গে। খাওয়ার পর্ব্ব সারা হোলে বন্ধুটি রাতটিকেও একটু লোভনীয় করে তোলার তালে রইলো। আমাকেও এদিকে ছাড়বে না, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঘুমোবার মত একটা সোফা টোফা অন্তত জুটবে তো?

'মরফি'র একটি ছোট্টো বোন ছিলো—বছর তেরো বয়সের কিশোরী মেয়ে। সে বললে যে কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে ওর বিছানাটি আমায় ছেড়ে দিতে পারে। রাজী হলাম। ও-মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোট্টো ঘরে ঢুকে দেখি, টুকরো কাঠের উপর একটা মাদুর পাতা।

—"এটাকে তুমি বলছো বিছানা?"

—"ম'সিয়ে, এছাড়া আর আমার বিছানা বলতে কিছু নেই—"

—"না; এ আমার চাই না—আর টাকাও তুমি পাবে না।"

—"আপনি কি কাপড়-জামা ছেড়ে শোবেন?"

—"নিশ্চয়ই—"

—"সে কি করে হবে! আমাদের তো বিছানার কোনো চাদর নেই?"

—"তাহলে তোমরা জামা-কাপড় পরেই শোও?"

—"মোটেই না।"

—"বেশ কথা, যেমন করে তুমি রোজ শুতে যাও তেমনি করে শুয়ে পড়। টাকাটাও তাহলে পাবে।"

—"কেন বল তো?"

—"কেমন তোমায় দেখায়, আমি দেখতে চাই।"

—"কিন্তু তুমি আমার কিছু ক্ষতি করবে না তো?"

—"বিন্দুমাত্রও না।"

মেয়েটি ওই নোংরা মাদুরে শুয়ে পড়লো, গায়ে একটা ছেঁড়া পর্দা ঢাকা দিয়ে। সেই অবস্থায় ওর আবরণের তুচ্ছতা মনেও পড়লো না, শুধু দেখলাম অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশি। ওর নিরাবরণ প্রকৃত রূপটি দেখার জন্যে ব্যগ্র হোয়ে উঠলো সারা মন। সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার চেষ্টায় বাধা দিলে মেয়েটি—কিন্তু আরও কয়েকটি মুদ্রায় বাধা গেল সরে। দেখলাম ওর সৌন্দর্য্যে খুঁত নেই কোথাও, শুধু পরিচ্ছন্নতার নিদারুণ অভাব। নিজের হাতে ধুইয়ে দিলাম ওর সমস্ত মালিন্য।

পরদিন সেই ছোট্টো হেলেন ওর দিদির হাতে সমস্ত মুদ্রাগুলি তুলে দিলে একটিও না গোপন রেখে—কেমন করে উপায় করেছে তার বিবরণও দিলে। আমরা খাবার আগে মরফি জানালে, ওদের বড় টাকার অভাব। আর আমার যদি মেয়েটার উপর নজর পড়েই থাকে ও না হয় টাকাটা কমিয়েই নেবে। আমি হেসে ফেলে বললাম, পরদিন আবার আমি ওকে দেখতে আসবো।

আমি বন্ধুটিকে ওর রূপের কথা জানাতে বন্ধুটি বাড়াবাড়ি বলে উড়িয়ে দিলে। কিন্তু সত্যিকারের জহুরী বলে নিজের গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যেই আমি জোর করলাম বন্ধুটিকে হেলেনকে দেখার জন্যে—যেমন করে আমি দেখেছি। দেখবার পর বন্ধুটি স্বীকার করলে যে শ্রেষ্ঠ চিত্রকরও তুলির টানে ঐ সুষমা ফোটাতে পারে না। ও যেন শিল্পীর সাধনা···প্রকৃতির পরম বিস্ময়। ওর বৃষ্টিধোয়া ফুলের মত মুখখানি শুধু দৃষ্টিকেই মুগ্ধ করে না, আত্মাকেও ভরে তোলে অনাবিল আনন্দে, প্রশান্ত মাধুর্য্যে। ও শুধু সুন্দর নয়···অপরূপ। ওর নীল-আকাশের মত দু'টি আঁখি-তারায় কালো হরিণচোখের সব বিদ্যুতই স্থির হোয়ে আছে!

পরদিন আবার গেলাম ওকে দেখতে। ওর দিদিকে বললাম, আমি ওর বাড়ীতে যত বার হেলেনকে দেখতে যাবো বারো ফ্রাঙ্ক করে দেবো। ছ'শ ফ্রাঙ্ক আমার কাছে অত্যধিক মনে হোয়েছিলো, এই নিয়ে দর কষাকষি করে ঠিক হোলো আসা-যাওয়াই করবো যত দিন না মনে করি ছ'শ ফ্রাঙ্ক দিয়ে ওর উপর পূর্ণ আধিপত্য নেবার যোগ্যতা ওর আছে। এরূপ হীন দর কষাকষি ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ, মরফি এমন শ্রেণীর মেয়ে যাদের নীতির কোনো বালাই নেই। অত টাকা দিতে আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কারণ ওর পণ্যারিণী রূপের প্রতি আমার একটুও আকর্ষণ ছিল না—আমি ওর কাছে লালসা তৃপ্তির ক্রেতা হোয়ে যাইনি···ওর সৌন্দর্য্যের পূজারী আমি, তাইতেই আমার সব পাওয়া হোয়েছিল।

ওর দিদি ভাবতো আমাকে খুব সহজেই প্রতারিত করেছে। দু'মাসে শুধু দৃষ্টির আনন্দেই তিন শত ফ্রাঙ্ক আমার খরচ হয়! ঐ অপরূপ দেহবল্লরী তুলির টানে রূপায়িত করার জন্যে আমার প্রবল আগ্রহ হোলো। একজন জার্ম্মাণ চিত্রকরকে ছয় লুই দিয়ে আমি ওর ছবি আঁকিয়ে নিলাম। কি লীলায়িত ভঙ্গী! রক্তের মধ্যে যেন নেশা লাগিয়ে দেয়···উপাধানে ভর রেখেছে পেলব দুটি বক্ষের, এলিয়ে রয়েছে কমনীয় দু'টি বাহু, বিশ্বের মাধুর্য্য বুঝি একত্রিত হোয়েছে ওর দেহের নমনীয় কোমল কান্তিতে···আর কি অপরূপ গ্রীবাভঙ্গি! রাজহংসীর দর্পও চূর্ণ হোয়ে যায়। প্রতিভা আছে, রুচি আছে সেই চিত্রকরের, প্রতিটি তুচ্ছ রেখাও যেন

তুলির টানে জীবন্ত হোয়ে উঠেছে···সৌন্দর্য্যের এমন পূর্ণ প্রকাশ বুঝি কল্পনাও করা যায় না। মুগ্ধ-বিস্ময়ে ছবিখানির তলায় আমি লিখে দিলাম—'ও-মরফি' যার অর্থ 'সুন্দর'।

কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে কি লুকানো থাকে কেউ কি জানতে পারে ?

আমার সেই পুরাতন বন্ধুটি ছবির একখানি প্রতিলিপি চেয়ে পাঠালেন। বন্ধুর এই সামান্য অনুরোধ রাখতে আমি চিত্রকরটিকে আর একটি এঁকে দেবার জন্য জানালাম।

কিন্তু এই চিত্রকরটি ভার্সাইতে ডাক আসাতে সেখানে গিয়ে অন্য ছবির সঙ্গে ওই ছবিটিও প্রদর্শনীতে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে মঁসিয়ে দ্য সেণ্ট কুইণ্টিন ছবিটি দেখেন, এবং স্বয়ং রাজাকে দেখান। সবাই জানে, পঞ্চদশ লুই একজন প্রকৃত অনুরাগী সৌন্দর্য্যের। ছবিটি দেখে তিনি এত মুগ্ধ হোলেন যে, আসলটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাইলেন। সেণ্ট কুইণ্টিনের উপরই তার ব্যবস্থাপনার ভার পড়লো।

বড় বোনের কাছে প্রস্তাবটি পাঠানো হোলো। মরফি তো সেই মুহূর্ত্তেই উঠে-পড়ে লেগে গেলো বোনকে সাজাতে-গোছাতে। দু'-তিন দিনের মধ্যেই ওরা ভার্সাই যাত্রা করলো। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠেছিলো মরফি। চিত্রকরটি তাদের সঙ্গে নিয়ে এলো। পৌঁছবার পর রাজার নির্দেশ মত দুই বোনকে প্রাসাদের অন্তর্গত একটি বাড়ীতে রাখা হোলো আর চিত্রকরকে রাজার অতিথিশালায়। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর রাজা এলেন। একলাই এলেন। এসে পকেট থেকে ছবিটি বার করে 'ও-মরফি'র দিকে চাইলেন—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বার বার ওর আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন আর ছবিটি দেখলেন। তারপর সহর্ষে বলে উঠলেন—"এমন আশ্চর্য্য মিল আমি কখনো দেখিনি।"

তারপর আসনে উপবেশন করে ও-মরফিকে ওঁর জানুর উপর বসালেন, আদর করলেন, চুম্বন করলেন।

আর ও-মরফি সারাক্ষণ ওঁর দিকে চেয়ে রইলো আর মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগলো।

—"হাসছো কেন তুমি ?"

—"হাসছি, কারণ আপনি ঠিক সেই বারো ফ্রাঙ্কের মতন দেখতে—"

ওর সেই সরল স্পর্দ্ধায় রাজা উচ্ছ্বসিত ভাবে হেসে উঠলেন। তার পর জানতে চাইলেন যে, ও ভার্সাইতে থাকতে চায় কি না।

ও-মরফির নিঃসঙ্কোচ উত্তর।—"দিদি যা বলবে তাই হবে—"

দিদি তো তখনি রাজী। সবিনয়ে জানালে এর চেয়ে সুখের বিষয় সে আর ভাবতেই পারে না। রাজা যাবার সময় ওদের বন্ধ করে রেখে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই সেণ্ট কুইণ্টিন এসে ছোটো বোনকে একটা মহালে নিয়ে গেল। আর মরফিকে জার্মাণ চিত্রকরটির কাছে।···চিত্রকরটিকে যাবার সময় ছবিখানির পঞ্চাশ লুই দিয়ে গেল। আর মরফিকে কিছু না দিয়ে ওদের ঠিকানা নিয়ে গেল। পরদিন মরফি হাজার লুই পেলে। চিত্রকরটি আমাকে পঁচিশটি লুই দিলে ছবিখানির দরুণ আর প্রতিজ্ঞা করলে, আমার বন্ধুর কাছের ছবিখানি দেখে সমস্ত মন দিয়ে অনুরূপ ছবি এঁকে দেবে। তাছাড়া বললে যত মেয়ের ছবিই আমি আঁকাতে চাই সব সে বিনা অর্থে এঁকে দেবে। সাধু প্রকৃতির সন্দেহ নেই।

অবশ্য হাজার লুই হাতে পেয়ে খুশীতে উপছে পড়া মরফিকে দেখেও কম আনন্দ পাই নি। অর্থের প্রাচুর্য্যে, আর আমাকেই তার একমাত্র উপলক্ষ ভেবে, আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পেল না মরফি।

'কিশোরী সুন্দরী ও-মরফি'—রাজা এই বলেই ডাকতেন ওকে—রাজাকে ও মুগ্ধ করেছিলো ওর সরলতায়, স্পষ্টবাদিতায় ওর আশ্চর্য্য রূপের চেয়ে ওর মিষ্টি চালচলন আরও বেশী মনোহরণ করেছিলো রাজার।

'ডিয়ার-পার্কে'র একটি মহলে ওকে রেখেছিলেন—এটা ছিলো পঞ্চদশ লুইএর হারেম। রাজা ছাড়া কারো প্রবেশাধিকার ছিল না সেখানে। অবশ্য যে-সব মহিলারা রাজসভাতে উপস্থিত হোতেন তাঁদের যাবার অনুমতি ছিলো। একটি বছর পরে 'ও-মরফি'র একটি ছেলে হোলো। কিন্তু আর সবার মত তার দশাও যে কি হোলো—কেউ তা' জানে না। কারণ যত দিন রাণী মেরী বেঁচে ছিলেন তত দিন রাজা পঞ্চদশ লুইএর এই সব সন্তানদের ভাগ্য রহস্যের অন্ধকার গর্ভেই নিমজ্জিত ছিলো।

তিন বছর পরে 'ও-মরফি'র ভাগ্যতরী অতলে ডুবলো—তার মূলে ছিলো মাদাম দ্য ভ্যালেণ্টাইন—প্যারিসে এই মহিলাটি বেশ পরিচিতই ছিলেন। তাঁর হিংসাই ওর সর্ব্বনাশের মূল। একদিন ওর সরলতার সুযোগ নিয়ে মাদাম দ্য ভ্যালেণ্টাইন ওকে বলেন রাজাকে খুশী করতে হলে, হাসাতে হলে জিজ্ঞাসা করতে হয় বৃদ্ধা রাণীটির সঙ্গে রাজা কেমন ব্যবহার করেন। নির্ব্বোধ বালিকা এই প্রতারণার জালে পা দিলে—রাজাকে এই অপমানজনক প্রশ্ন করে বসলো। পঞ্চদশ লুই ক্রোধে জ্ঞানহারা হোয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"বদমাইশ মেয়ে, কে তোমাকে এ প্রশ্ন করতে শিখিয়েছে, তার নাম বল ?"

বেচারী 'ও-মরফি' ভয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় রাজার পায়ের তলায় আছড়ে পড়ে সব ঘটনাই খুলে বললো। রাজা চলে গেলেন ওর মহল ছেড়ে। তারপর কখনো আর ওর মুখদর্শন করেন নি। মাদাম দ্য ভ্যালেণ্টাইনকেও রাজসভা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। এবং দুই বছরের মত প্রবেশ নিষেধ করে দেওয়া হয়। রাজা পঞ্চদশ লুই ভালো ভাবেই জানতেন রাণীর প্রতি কতখানি অন্যায় তিনি করেছেন। কিন্তু রাণীর প্রাপ্য সম্মান দিতে এতটুকু ত্রুটি করেন নি। অন্য রাণীর প্রতি একটুও অসম্মান দেখালে তিনি কখনো তা সহ্য করেন নি।

'ও-মরফি'কে সাড়ে চারশ' হাজার ফ্রাঙ্ক দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে একজন ব্রেটন অফিসারের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়।

বহু কাল পরে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে, একবার ফণ্টেনব্লুতে একটি সুশ্রী সুন্দর তরুণ যুবকদের সঙ্গে পরিচয় হোলো। পরিচয়ে বুঝলাম 'ও-মরফি'র বিবাহিত জীবনের পূর্ণতার প্রতীক ওই যুবক। মায়ের সঙ্গে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য—যদিও মায়ের পূর্ব্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমিও তাকে এ বিষয়ে কিছুই জানাতে চাইলাম না। শুধু ওর অটোগ্রাফ-বইতে আমার নামটি লিখে বললাম, ওর মাকে আমার শুভেচ্ছা জানাতে।

পঞ্চদশ লুই-এর সঙ্গে 'ও-মরফি'র যখন বিচ্ছেদ ঘটলো সে সময়ে আমি প্যারিসের জীবনে আরও বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করছিলাম। এ সময় আমার গূঢ় বিদ্যার বলে সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারি বলে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করছিলাম। ক্যামিলি নামে একটি মহিলা আমার এই বিদ্যায় মুগ্ধ হোয়ে আমার সঙ্গে 'ডাচেস দ্য শাড়ব' এর পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়ে তিনি আমাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, তাঁর আরও অনেক কিছু জানবার আছে আর এই গূঢ় বিদ্যার শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছাও আছে। আমি তাঁকে বললাম, যদি উনি লিখে জানান ওঁর প্রশ্নগুলি তাহলে তিন ঘণ্টার ভিতরই উত্তর দিতে পারি। উনি রাজী হলেন আর বার বার আমাকে শপথ করিয়ে নিলেন কোনো দ্বিতীয় প্রাণী যেন এ সম্বন্ধে কিছু না জানতে পারে—আর উত্তর লিখে এনে যেন ওঁর হাতেই দিয়ে যাই।

ডাচেসের বয়স ছাব্বিশ বছর। প্রাণোচ্ছ্বাস আর চঞ্চলতায় ভরা। অত্যন্ত আমোদপ্রিয় আর রসিকা বলেও ওঁর খ্যাতি ছিলো। এক কথায় মনোহারিণী···কিন্তু একটি ত্রুটি ওঁর থেকে গিয়েছিলো, সমস্ত মুখময় ব্রণের দাগে ভর্ত্তি। যতগুলি প্রশ্ন উনি লিখেছিলেন সবই ওঁর প্রণয় সংক্রান্ত, আর বর্ণের উজ্জ্বলতা আর মসৃণতা সংক্রান্ত। দাগগুলি সারাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন তিনি।

পরদিন আবার 'প্যালেস রয়্যাল' এলাম ওঁর সঙ্গে দেখা করতে, প্রশ্নের উত্তর জানাতে। প্রথম প্রণয় ঘটিত প্রশ্নটির উত্তরে স্রেফ অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লাম। দ্বিতীয়টিতে হজমের গোলমালে নিজেই ভুগে ব্রণ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাই ছিলো আমার। আর আমার ডাক্তারী বিদ্যার ফলেও জানতাম, কোনো জোরালো প্রলেপ কিম্বা ওষুধে ও সারে না।

আমি নিঃসঙ্কোচেই বললাম, যদি সাত দিন আমার কথা মত চলেন তবে ঐ দাগ মিলিয়ে যাবে—আর যদি এক বছর চলেন তবে স্থায়ি ভাবেই সেরে যাবে।

উনি নিয়মিত, আর আমার নির্দ্দেশ মত পানাহার সুরু করলেন, সমস্ত রকম প্রসাধন ত্যাগ করলেন আর সকালে, সন্ধ্যায় কলাপাতার নির্য্যাসে মুখ ধুতে লাগলেন। আট দিন পর ওঁকে দেখলাম বাগানে বেড়াচ্ছেন, উজ্জ্বল মসৃণ হোয়ে উঠেছে চামড়া আর একটিও ব্রণ নেই। আমাকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু পরদিনই আবার ব্রণ দেখা দিল। তক্ষুণি আমার জরুরী তলব এলো। আমি গিয়ে বললাম, আমার গুপ্ত গণনার ফলে জেনেছি যে আপনি আমার দেওয়া নির্দ্দেশ ঠিক মত মানেন নি। তখন তিনি স্বীকার করলেন যে একটু সুরা আর শূকরমাংস খেয়েছিলেন সেদিন।

এই ভাবে ডাচেস প্রায়ই আমাকে ডেকে পাঠাতেন, অবশ্য ব্রণর চিকিৎসা করবার জন্যে নয়। কারণ আমার বিধি-নির্দ্দেশ মেনে চলার মত ধৈর্য্য তাঁর আর ছিল না। মাঝে মাঝে পাঁচ, ছয় ঘণ্টাও একসঙ্গে দু' জনে বসে গল্প করেছি। রাতের খাওয়া, দুপুরের খাওয়াও বহুদিন ওখানেই সারতে হোয়েছে। আমি সত্যি বলতে কি ডাচেসের প্রেমেই পড়েছিলাম—কিন্তু সে কথা প্রকাশ করতে আমার আত্মসম্মানে বাধতো। একদিন ডাচেস এসে বললেন, আমার ঐ গূঢ় বিদ্যা দিয়ে আমি মাদাম দ্য পপিলিনেয়ারের বুকের দুরারোগ্য ক্যানসার সারাতে পারবো কি না।

তখনি আমি উত্তর দিলাম যে, ঐ ক্যানসারটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক; মহিলাটি সম্পূর্ণ বহাল তবিয়তে আছেন।

—"কিন্তু সারা প্যারিসে জানে, উনি একের পর এক ডাক্তার দেখাচ্ছেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আপনার কথাও আমি বিশ্বাস করছি"।

উনি গিয়ে ডিউক দ্য রিশেল্যুকে জানালেন যে ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস মাদাম দ্য পপিলিনেয়ার সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। ডিউক সজোরে প্রতিবাদ জানালেন। তখন ডাচেস এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক বাজী রাখলেন, কিন্তু ডিউক তার বেলায় রাজী হোলেন না।

কয়েক দিন পর, ডাচেস বিজয় গর্ব্বে আমার কাছে জানালেন যে ডিউক স্বীকার করেছেন যে ক্যানসারটা সত্যিই ভাণ। মঁসিয়ে দ্য পপিলিনেয়ারের করুণার উদ্রেক করার জন্যে যাতে তিনি স্ত্রীকে ক্ষমা করে ঘরে ফিরিয়ে আনেন। ডিউক তা ছাড়াও বলেছেন, তিনি আনন্দের সঙ্গেই এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক দিতে রাজী যদি মাদাম দ্য শাড়ব কোন গুপ্ত বিদ্যার বলে জেনেছেন সেটা প্রকাশ করেন।

—"যদি আপনি কিছু টাকা উপায় করতে চান তো বলুন আমি ওঁকে জানাই"—ডাচেস বললেন।

আমি ধরা পড়বার ভয়ে রাজী হলাম না। আমি জানি ডিউক অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অতএব টাকার মায়া না করাই ভালো। তা ছাড়া লা পপিলিনেয়ারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা সবাই জানে।

এই সময় আমার ভাই ফ্রাঁসোয়া কয়েকটা চমৎকার ছবি এঁকে এনেছিল। ল্যুভার প্রদর্শনীতে দেবার জন্যে অনেক তদ্বিরের পর আমরা একসঙ্গে একখানা যুদ্ধের ছবি নিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট ঘরে রাখলাম। নিজেরাও কাছেই বসেছিলাম। ক্রমেই দর্শক সমাগম হোলো। প্রথমেই একটি লোক ছবিটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে মন্তব্য করলে বাজে আঁকা হোয়েছে। তারপরই দু' তিনজন এসে ছবিটা দেখে হেসে বললে বোধ হয় কোনো স্কুলের ছেলের আঁকা। ক্রমে ক্রমে প্রচুর দর্শক সমাগম হোলো আর প্রত্যেকেই ছবিটা নিয়ে এত হাসি ঠাট্টা সুরু করলেন যে ফ্রাঁসোয়া আর না সহ্য করতে পেরে ছুটে বেরিয়ে গেল। আমরাও ওর সঙ্গে বাড়ী ফিরলাম—আমাদের চাকরটাকে বলে এলাম ছবিটা বাড়ীতে নিয়ে আসতে। ছবিটা আসতেই ফ্রাঁসোয়া সেটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের তরবারি দিয়ে সেটাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। তখনি ঠিক করেও ফেললে যে প্যারিস ছেড়ে চলে যাবে। অন্য কোথাও গিয়ে ভালো করে শিখবে চর্চ্চা করবে ওর পছন্দ মত শিল্পের। আমরা ঠিক করলাম ড্রেসডেন যাব। অগাষ্টের মাঝামাঝি প্যারিস ছেড়ে মাসের শেষাশেষি ড্রেসডেন পৌঁছলাম। সেখানে মা ছিলেন, বহুকাল পরে আমাদের দুই ভাইকে দেখে উচ্ছ্বসিত আনন্দে আমাদের বুকে টেনে নিলেন।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

চতুর্থ সর্গ

এই সব বরাঙ্গনাদের চেয়ে, বারাঙ্গনারা আরও কুটিল। কূট সোহাগের লাবণ্য ছড়িয়ে তাঁরা আকর্ষণ করেন মনুষ্যের হৃদয়। তাঁদের কপট আচার-বিচার-ব্যবহারের কথা আর কী বলব! কুবেরও ভিখারী হন। ১

তরঙ্গের বহু ভঙ্গিমা ও অধোগামিত্ব নিয়ে নদীর দল যেমন সমুদ্রে গিয়ে মিশে যায়, চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যাও তেমনি আপন আপন মন-ভোলানো মাধুর্য ও অতি চাঞ্চল্য নিয়ে মিশিয়ে আছে বেশ্যাদের হৃদয়ে। ২

এক এক ক'রে এই চৌষট্টিটি কলার কথা বলি শোনো। প্রত্যেক বারাঙ্গনাকেই এগুলি জানতে হয়, শিখতে হয়।

(১) বেশ-কলা। অর্থাৎ বারাঙ্গনা-ভবনের সৌষ্ঠব-বিধান নৈপুণ্য।

(২) নৃত্য।

(৩) গীত।

(৪) চোখ বাঁকিয়ে দেখার কৌশল।

(৫) কাম-বিষয়ক তুকতাক।

(৬) ধনাদায়ের চাতুর্য্য, বা হৃদয়ের বন্দী-করণের চাতুর্য।

(৭) সই-পাতানো।

(৮) সই-ঠকানো।

(৯) সুরাপান করা বা করানোর বিদ্যা।

(১০) নর্ম পরিহাস বিদ্যা।

(১১) সুরত-কলা।

(১২) সপ্ত প্রকার আলিঙ্গন, যথা :—

আমোদালিঙ্গন, মুদিতালিঙ্গন, প্রেমালিঙ্গন, আনন্দালিঙ্গন, রুচ্যালিঙ্গন, মদনালিঙ্গন ও বিনোদালিঙ্গন ;—এগুলির বিষয়ে নৈপুণ্য।

(১৩) চুম্বনকলা।

(১৪) শত্রুতা-করণ-বিদ্যা।

(১৫) কেমন ক'রে নির্লজ্জা সাজতে হয়,

(১৬) আবেগ দেখাতে হয়,

(১৭) সম্ভ্রম নিবেদন করতে হয়,—তার বিদ্যা।

(১৮) ঈর্ষ্যাযুদ্ধের অভিনয়-কলা।

(১৯) সুযোগ বুঝে ক্রন্দন-বিদ্যা।

(২০) মানভঞ্জন-কলা।

(২১) প্রয়োজন-মত হঠাৎ ঘেমে-ওঠা,

(২২) হঠাৎ ভুলে যাওয়া,

(২৩) হঠাৎ কেঁপে-ওঠা,

(২৪) একান্তে নিয়ে-যাওয়া···তার বিদ্যা।

(২৫) প্রসাধন-বিদ্যা।

(২৬) রতিতৃপ্তিজনিত নেত্র-নিমীলনের ভাণ,

(২৭) বা অসহ্য সুখের ভাণ,

(২৮) বা নিঃস্পন্দতার ভাণ,—তার বিদ্যা।

(২৯) মৃতোপম-কলা ;—অর্থাৎ মড়া মেজে পড়ে থাকার বিদ্যা।

(৩০) বিরহ-কলা।

(৩১) অসহ্য অনুরাগ-প্রদর্শন-কলা।

(৩২) কোপ-বিদ্যা।

(৩৩) নিবারণ করার চাতুর্য।

(৩৪) নির্ণয়-করণ।

(৩৫) নিজের জননীর সঙ্গে কলহ-কলা।

(৩৬) ভদ্রগৃহে গমনের পারিপাট্য।

(৩৭) উৎসব-দর্শন-কলা।

(৩৮) নায়কের ধনাদি-হরণ-বিদ্যা।

(৩৯) ছন্দঃ রচনা।

(৪০) ফল-ফুল নিয়ে খেলা।

(৪১) সরস্বতী-বীণা বাজানোর চাতুর্য।

(৪২) চৌর-পার্থিব খেলা।

(৪৩) গরিমা-প্রকাশন।

(৪৪) শৈথিল্য-প্রকটন।

(৪৫) নিষ্কারণ দোষ-ভাষণ-কলা :

(৪৬) শূল-কলা।

(৪৭) তৈল-মর্দ্দন।

(৪৮) নিদ্রাক্ষি-কলা।

(৪৯) রজস্বলাম্বর-কলা।

(৫০) কৃষ্ণ-কলা।

(৫১) তীক্ষ্ণ-কলা।

(৫২) ঘাড় ধরে নায়ক-বিতাড়ন বিদ্যা।

(৫৩) ঘরে খিল-দেওন বিদ্যা।

(৫৪) পরিত্যক্ত কামুককে নিকটে ডেকে নিয়ে আসা, তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, তার স্তুতি করার কলা-বিদ্যা।

(৫৫) তীর্থ উপবন দেবালয় প্রভৃতি স্থানে বেড়াতে বেড়াতে হেলাভরে শৃঙ্গার-ভাব দেখানোর বিদ্যা।

(৫৬) নায়কের গৃহটিকে নিজের ঘরের সামিল ক'রে তোলার বিদ্যা।

(৫৭) বশীকরণ।

(৫৮) ঔষধ-করণ।

(৫৯) মন্তর পড়ানো।

(৬০) বৃক্ষ-কলা।

(৬১) কেশ-রঞ্জন-কলা।

(৬২) ভিক্ষুক-তাপস বহুবিধ পুণ্য-কলা।

(৬৩) দ্বীপ-দর্শন-কলা।

এই তেষট্টি প্রকার কলাবিদ্যা অভ্যাস করতে করতে বারাঙ্গনা যখন খিন্না হয়ে পড়েন, তখন তদন্তে তিনি অভ্যাস করেন—

(৬৪) কুট্টনী-কলা। ৩-১১।

কিন্তু বৎসগণ, চিনে রেখো মানুষকে, তার মলিন মূঢ়তাকে। কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে, একজন অজ্ঞাত-নাম-বর্ণ পুরুষের হাতে যে বারাঙ্গনা সমর্পণ করে দেন নিজের আত্মাটিকেও, কী আশ্চর্য, সেই দুঃশীলার মধ্যেও সদ্ভাব খুঁজে বেড়ায় মানুষ···ব্যর্থকাম হ'য়েও।

সে ভাবে, তার হৃদয়ে শুভ প্রেমের উদয় হয়েছে, দুর্বিনীত মদন তাকে কেবল দগ্ধাচ্ছেন; মানুষ-ঠকিয়ে-রোজগার-করা রাশি রাশি মলিন ধন সে সুখে ঢালতে থাকে বারাঙ্গনার শ্রীচরণে। আর সেই ধন কে খায় জানো? আর একজন পুরুষ;···হয় তিনি গুণভগ্ন, নয় তিনি নগ্ন, নয় তিনি হীন। ১২-১৩।

যে বারাঙ্গনা বিশ্বজনকে প্রতারণা করে বেঁচে থাকেন, তাঁর আবার বল্লভ হয় কে জানো? হয়ত কোনো নীচ ঘোড়-সওয়ার, নয় কোনো মাহুত, নয় কোনো অতি খল শিল্পী। ১৪।

পুরাকালে এক মানী রাজা ছিলেন। তাঁর নাম "বিক্রমসিংহ।" প্রবল কতকগুলি অধীনস্থ ভুঁইয়ার হস্তে তাঁকে পরাস্ত হতে হয়। তিনি চলে আসেন বিদর্ভে। গুণ-যশস্বী মন্ত্রীটিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে আসেন, এবং সেখানে এক বেশ্যাভবনে প্রবেশ করে আশ্রয় লাভ করেন। অল্প বিভব হলেও কিন্তু তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটে বহু ধন-শালিনী গণিকা "বিলাসবতী"র। ১৫-১৬।

বিক্রমসিংহের রাজকীয় ব্যবহারের মধ্যে গণিকা স্পষ্টই দেখতে পায় রাজ-লক্ষণ। অতএব, রাজার মহাপ্রাণতা গণিকাকে যে মুগ্ধ করবে তাতে আর আশ্চর্য্যের কি? তাই যেন মুগ্ধা হয়েই গণিকা শেষে রাজা বিক্রমসিংহের ব্যয়াধীন ক'রে দিলেন নিজের স্বর্ণ-কোষ, মণি-কোষ ইত্যাদি সর্বস্ব। ১৭।

রাজাও প্রত্যক্ষ করলেন, গণিকার সহজ অনুরাগ, তাঁর অদ্ভুত ঔচিত্য-বোধ। বিস্ময়ে বিবশ হয়ে গেলেন; এবং একদিন মহামাত্যকে বিজনে ডেকে প্রেম-গদগদ কণ্ঠে বললেন— ১৮।

"বড় আশ্চর্য ঠেকছে মন্ত্রী, আমার জন্যে কি না একটা বেশ্যাও শেষে তৃণ-বৎ নষ্ট করতে বসেছে তার বিপুল ধন-দৌলত। কে না জানে, গণিকার ভালবাসার মূলে থাকে দৌলত। প্রীতির পথ মাড়ায় না তাদের নূপুর-পরা পা। সকলেই জানে, একটি দানা চাঁদির লোভেই বন্ধকীরা দর্শায় মিথ্যে অনুরাগ। সেই হেন ধন যে গণিকা স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিচ্ছেন, তাঁর প্রেমে কেমন করে থাকতে পারে সন্দেহের অবকাশ?" ১৯।

রাজার ভাষণ শুনে মন্ত্রিবর একটু হাসলেন। তারপরে বাণীতে কিঞ্চিৎ অসূয়া মিশ্রণ ক'রে বললেন—

"রাজন্, বেশ্যাদের আবার আচার-বিচার-ব্যবহার! কেউ বিশ্বাস করেন না তাঁদের।

মিথ্যা-বই সত্য বলতে তাঁরা জানেন না। যেখানে একটি দানা সোনা পড়ে থাকে সেখানেই দেখবেন, মাছির মত তাঁরা লীনা হয়ে আছেন। সুখের মুহূর্ত্তটিরই তাঁরা কেবল অধীন। মিষ্টির মত মধুর তাঁদের মুখ। যাঁরা বিচার-বিবেকশূন্য কেবল তাঁদের হৃদয়েই বেশ্যাদের অবাধ প্রবেশ।

প্রথম মিলনে এঁরা দান করেন সুখ, মধ্যে ঘটান বিপদ, তারপরে পর-বাস। পরিণামে আসে দুঃখ-ফল,···পুরুষদের আশালতায়,··· বেশ্যাদেরও।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ইত্যাদি অমর দেবতারাও অদ্যাপি এঁদের চেনেন না···তত্ত্বতঃ। ভ্রম বিভ্রম মোহ···যেমন সংসারমায়ার, তেমনি এই বারাঙ্গনাদেরও বিশিষ্ট ঐশ্বর্য।" ২০-২৪।

মন্ত্রীর উপদেশ কর্ণে প্রবেশ করলো রাজার। বিক্রমসিংহ তখন পরামর্শ করতে বসলেন মন্ত্রীর সঙ্গে। শেষে স্থির হোলো···বেশ্যা-পরীক্ষার্থ রাজা নিজেকেই দান করবেন মিথ্যা-মৃত্যু। ২৫।

পরামর্শ মত রাজার মিথ্যামৃত্যু ঘটল। সজ্জিত হল চিতা। চিতার উপরে মন্ত্রিবর যথারীতি বিন্যস্ত করে রাখালের শব-শরীর। আগুন দিয়েছেন, উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠছেন অগ্নিদেব, এমন সময়, সহসা সেখানে আবির্ভূতা হলেন সালঙ্কারা গণিকা বিলাসবতী। এবং যেই সেই বহ্নিভূমির উপরে নিজেকে গণিকা নিক্ষেপ করতে যাবেন আবেগে অধীরা হ'য়ে, অমনি অধীর আনন্দে দু'বাহু বাড়িয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে ফেললেন রাজা, বলে উঠলেন···"প্রিয়ে, আমি বেঁচে আছি।" ২৬-২৭।

গণিকার ভালবাসা যে দৃঢ় হতে পারে, সত্য হতে পারে,···এই ধারণাটুকু রায়-বদ্ধ হয়ে গেল রাজার হৃদয়ের বিচারে। অতএব পূর্ণ-পুষ্ট হয়ে উঠল তাঁর স্নেহ। বেশ্যাদের গুণপণার সমাদর-বাণী লগ্ন হয়ে রইল তাঁর মনের মুখে। একবার নয়, বার বার নিন্দা করতে লাগলেন মন্ত্রীর বিচারকে।

এর পরে,—গণিকার বিপুল ধনসম্পত্তি মহীপতির আত্মাধীন হয়ে গেল। বিক্রমসিংহ সমুত্থান করলেন গজতুরঙ্গ-ভট-বিকট এক সৈন্য-বাহিনী। সেই বিপুল বল-প্রবাহের সম্মুখে সংগ্রামে মুহূর্ত্ত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না ভুঁইয়ারা। তাঁরা পরাস্ত হলেন।

এবং ভূপাল বিক্রমসিংহ···আনন্দফুৎ পূর্ণচন্দ্রের মত লাভ করলেন খ-মণ্ডল। ২৮-৩০।

গণিকা বিলাসবতীকে রাজা তখন নিজের রাজ-অন্তঃপুর-কান্তাদের মাথার উপর বসিয়ে দিলেন। চামরের বাতাসে দুলতে লাগল তন্বীর চূর্ণ কুন্তল। গণিকা উপমা হয়ে দাঁড়ালেন শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবীর।

দেখতে দেখতে কিছু দিন কেটে গেল। তারপরে একদিন, করপদ্মে অঞ্জলি রচনা ক'রে নিভৃতে রাজার কাছে এসে দাঁড়ালেন বিলাসবতী। প্রণাম-নতা হয়ে বললেন—

"রাজন, বরাভয় দিন : কিছু প্রার্থনা আছে। আপনি কল্পতরু, আর আমি আপনার দাসী। বহুদিন আপনার চরণসেবা করেছি। প্রভু, যদি কোনদিন আমি আপনার রাজ্যলক্ষ্মী উদ্ধারের কারণ হয়ে থাকি তাহলে আপনারও কি উচিত নয়, প্রসন্ন মনে আমারও একটি আকাঙ্ক্ষা আশা সফল করে তোলা? তীর্থের মতই আপনি মহান্, স্বভাব নির্মল, পুণ্য-ফল-লভ্য। পরের মলিনতা নিজগুণে আপনি ক্ষালন ক'রে দেন। মহতের সঙ্গে মিলন কখনও বিফল হয় না।

আমি একটি যুবককে ভালবাসতুম। সে-ও আমাকে ভালবাসত। এতো ভালবাসা বোধ হয় কেউ কাউকে বাসে না। ধন মান প্রাণের চেয়েও সে আমার কাছে ছিল বেশী। কিন্তু দৈবের এমনি খেলা, চোর ব'লে তাকে রাজা ধরে নিয়ে গেছেন, তাকে বন্দী করে রেখেছেন, এখন সে রয়েছে বিদর্ভপুরে। মহারাজ, তাকেই মুক্ত করবার আশায় এত কঠিন সেবা আমি আপনাকে করেছি। এখন, আপনার হৃদয়, কুল এবং শৌর্যের বিধানমতে যা সমীচীন বোধ হয় তাই করুন।" ৩১-৩৬।

কী নিদারুণ প্রতারণা! বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন মহারাজ। কানের মধ্যে দুন্দুভির মত বাজতে লাগল মহিষী-গণিকার বাণী। চোখ দুটি নীচু ক'রে মাটির দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তিনি বসে রইলেন। কেবল মনের মধ্যে বিদ্যুতের মত চিকিয়ে উঠতে লাগল তাঁর অমাত্যের অমৃতবাক্য। ৩৭।

তার পরে গণিকার মুখের দিকে মুখ তুলে তিনি চাইলেন। তাঁকে আশ্বাস দিলেন।

বিদর্ভরাজের সঙ্গে লড়াই হল। পরাস্ত হলেন বিদর্ভরাজ। প্রেমিক-চোরের বন্ধন মোচন করে দিলেন বিক্রমসিংহ। গণিকার সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটালেন চোরের। ৩৮।

বৎসগণ, এই রকমেরই হন বারবিলাসিনীগণ।

বেশ্যার জিহ্বা একটি নয়,···বহু;

হৃদয় একটি নয়,···বহু;

দুটিই কেবল বাহু নয়,···বহু;

অনন্ত তাঁর মায়া।

এই সত্ত্ববিহীনাদের জানি না কে জানেন তত্ত্বতঃ! ৩৯।

এঁদের চরণে কেউ হয়ে থাকেন স্তাবক-প্রেমিক; কেউ ধন-প্রেমিক; কেউ দাস্য-প্রেমিক; কেউ রক্ষা-প্রেমিক; আবার কেউ বা হয়ে ওঠেন তাঁর নর্ম-প্রেমিক। ৪০।

ইতি বেশ্যাবৃত্তং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

[ক্রমশঃ।

(স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী)

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্ণৌ কলেজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষা

বড় বড় বোর্ডিঙের নিম্নতন কর্ম্মচারী ও ভৃত্যেরা প্রায়ই কোমল ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে না। সেখানেও অনেক সময় তাহাই হইত। তোমাকেও কখনও কখনও তাহার ফল ভোগ করিতে হইয়াছে। একদিন তোমার তেল ছিল না। কাঙ্গালিনীর মত তুমি সেখানকার মেট্রনের নিকট তেল ভিক্ষা করিলে, তিনি বলিলেন, আজ পাইবে না। মেথরানীর নিকট ভিক্ষা করিলে, সেও অস্বীকার করিল। তারপর চাপরাসী অনুগ্রহ করিয়া একটু তেল দান করিয়া গেল। আর একদিন এক পয়সার ধুনা ক্রয় করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। আবার সেই মেট্রনের নিকট গেলে। নিজের ভাণ্ডার হইতে দিতে হইত না, কেবল চাপরাসীকে হুকুম করিলেই সে আনিয়া দিত। মেট্রন অতিশয় কর্কশ স্বরে তোমাকে ধমক দিয়া বিদায় করিলেন। তখন মা জননী নিকটে না থাকিলে সহ্য করিতে পারিতে না। তুমি মেট্রনের কর্কশ বাণী যেমন শুনিলে, অমনি বলিয়া উঠিলে, "মার ইচ্ছা পূর্ণ হো'ক"।

আর একদিন, যে দাসীর উপর সকলকে তেল দিবার ভার ছিল, সে তোমাকে তেল না দিয়াই চলিয়া যাইতেছিল। অত্যন্ত বিনয়ের সহিত তুমি তাহার কাছে তেল ভিক্ষা করিলে; সে দিল না। তুমি বলিলে, "আলো ধরিতেছি একটু তেল দাও"। দাসী হাত-মুখ বিকৃত করিয়া ধমক দিয়া রাগের সহিত তেল দিতে গেল। তুমি বলিলে, "আচ্ছা দিও না, কিন্তু বকিও না"। তখন সুসার আসিয়া তেল লইলেন; তুমি বারণ করিলে না। কিয়ৎকাল পরে তোমার জ্ঞানের উদয় হইল। যখন অপমানের প্রথম আঘাত আসিয়াছিল, মুহূর্ত্ত কালের জন্য জ্ঞান হারাইয়াছিলে।

আর এক দিন আগুন আনিতে গেলে; দাই বলিল, আগুন নাই, পাইবে না। চোরের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলে। দ্বিতীয় কিঙ্করীর একটু দয়া হইল। আজ্ঞা দিল অন্য উনুন হইতে আগুন লও। অতি সশঙ্কচিত্তে আগুন লইতে গেলে পাছে একটু আগুন পড়ে, এবং কিঙ্করীদিগের কাহারও পা পোড়ে। তাহা হইলে আর কখনও তাহারা আগুন দিবে না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এক টুকরা জ্বলন্ত অঙ্গার তোমারই হাতে পড়িল। হাত বিলক্ষণ পুড়িয়া গেল। কিছু না বলিয়া সেই অগ্নি বহন করিয়া নিজ প্রকোষ্ঠে আসিলে।

আর এক দিন শুধু ডাল ভাত খাইতে হইবে বলিয়া একটু মাখন গলাইতে উনুনের নিকট গিয়াছিলে। মেট্রন অতি কর্কশ ভাবে ধমক দিলেন এবং একটু ধাক্কা দিলেন। তোমার উত্তর দিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু অমনি মনে হইল, তুমি যে ছাত্রী, এখন অধীন। এই মনে হইতে না হইতে বুঝিলে, উত্তর দেওয়া উচিত নয়। চুপ করিয়া চলিয়া আসিলে। শুধু ডাল, ভাত খাইতে বসিলে। আহার যখন প্রায় শেষ হইয়াছে তখন একটি মেয়ে কিছু মাংস আনিয়া দিলেন। মেট্রনের বোধ হয় দয়া হইল, তাই তিনিও একটু মাংস আনিয়া দিলেন। এইরূপই হয়। মানুষের প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলে এইরূপেই দয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এ বিদ্যালয়ে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল না। তোমার কন্যাদের অত্যন্ত কষ্ট হইত; তোমার ত কথাই নাই। কোনও দিন আহারের সময় তোমার কোনও কন্যা কাঁদিয়া ফেলিতেন। নিজের দুগ্ধে দধি পাতিয়া প্রায় তাহারই সাহায্যে আহার করিতে। একদিন তোমার দৈনিকে লেখা আছে—"আজ আহারের সময় লবণ, ভাত, দধি, দুগ্ধ সবই অল্প ছিল, কিন্তু আনন্দ মনে আহার করিলাম"! আর একদিন—"আজ বড় ক্ষুধা লাগিয়াছে, কিন্তু খাবার নাই। মায়ের নামই আমার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল"। আর এক দিন—"টাকা ভাঙ্গাইতে পারিলাম না। খাবার কিছু নাই, কিন্তু প্রাণ শান্ত, মার কৃপায়"। আর এক দিন তোমার অত্যন্ত ক্ষুধা লাগিয়াছিল; মেয়েরা দুধসুজি আহার করিলেন; অসাবধানতা বশতঃ সুসার তোমার অংশ ফেলিয়া দিলেন; তোমার বিরক্তি না হইয়া হাসিই পাইল। আর এক দিনের ডায়েরিতে দেখিতেছি যে, সে দিন শুধু গুড়-ভাত খাইয়া থাকিতে হইয়াছিল! আর এক দিন পেটের বেদনায় বড় কষ্ট পাইয়াছিলে অনেকক্ষণ কষ্টভোগের পর উঠিয়া দেখিলে, তোমার খাবার বানরে লইয়া গিয়াছে; রাত্রিতে একটু দুগ্ধ মাত্র সম্বল; কিন্তু বিরক্তি আসিল না। আর এই দিন লিখিয়াছিলে, "আহারের স্থানে গেলে হাসি পায়। কারণ দুই কিম্বা তিন মিনিটে আহার শেষ হয়; কিন্তু বাসন মাজিতে অনেক সময় লাগে। বাসন নিজেই মাজিতেই হয়।" অনেক দিনই দধি-ভাত মাত্র আহার হইত। ১৮ই অক্টোবর লিখিয়াছ "আজ খাবার কম ছিল। শয়ন করিয়া পেট কেমন করিতে লাগিল। আর কোন উপায়ও ছিল না। গানে শুনিয়াছিলাম, হরিনামের এমনি গুণ যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে যায়। আজ আমি সেই নাম করিতে করিতে কাপড় খুব কসিয়া পরিয়া মার নিরাপদ কোলে নিদ্রা গেলাম। একেবারে ৪টার সময় মা ডাকিলেন, তখন উঠিলাম।"

লক্ষ্ণৌ যাইবার পূর্ব্ব হইতেই তোমার শরীর অপটু হইয়া যাইতেছিল। ওখানে গিয়া পেটের অসুখ ও মাথার অসুখ প্রায়ই করিত। তোমার কন্যাদেরও শরীর দুর্ব্বল হইয়া নাসিকার রক্তস্রাব হইত। কিন্তু আহারের ক্লেশ তোমাকে একটুও অশান্ত করিতে পারে নাই। অন্যান্য মেয়েরা তোমাকে উত্তেজিত করিতেন যে, তুমি কর্ত্রীর নিকটে এ সকল জ্ঞাপন কর। কিন্তু তুমি তাহাতে কখনও সায় দিতে না। কারণ সেখানকার বিদ্যালয়ের সাধারণ নিয়ম ছিল যে কোনও মেয়ে অভিযোগ করিবে না। যদিও তোমার সম্বন্ধে এই নিয়ম ছিল না, তথাপি তুমি আপনাকেও এই নিয়মে আবদ্ধ করিয়াছিলে।

যখন হইতে বেলায় স্কুল হইতে লাগিল, তোমার বিশ্রামের সময়

অল্প হইয়া গেল, তখন তোমার শরীর আরও রোগা হইতে লাগিল। তোমাকে রোগা হইতে দেখিয়া মিস থোবর্ণ ক্লেশ পাইতেছিলেন। কিসে নিবারণ হয় তাহার জন্য চেষ্টাও করা হইতেছিল।

এক দিন গভীর রাত্রিতে তোমাদের পাশের ঘরে কি গোলমাল হইল। সুসার ভাবিলেন, রাত্রি শেষ হইয়াছে, তোমাকে ডাকিলেন। একটু পরে শুনিলে ২টা বাজিল, আবার তোমরা শয়ন করিলে। প্রাতঃকালে শুনিতে পাইলে, একটি মেয়ের কলেরা হইয়াছে, কিন্তু পাছে তোমাদের অসুবিধা হয়, তাই তাহাকে দূরের একটি ঘরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বেলা ২টার সময় মেয়েটি মারা গেল। বোর্ডিঙের এক শতটি মেয়ে একেবারে চুপ। যাহাদের মা বাপ নিকটে ছিলেন, কন্যা লইয়া গেলেন। তুমি যদু বাবুর কন্যাকে গোপাল বাবুর বাটীতে পাঠাইয়া দিলে। আর তুমি দুই মেয়ে লইয়া কোথায় রহিলে? মায়ের নিরাপদ কোলে, কেন না সেই তোমার চিরদিনের বাড়ী ও ঘর। সেখানে বিনা হুকুমে অসুখের সংবাদ দিবার নিয়ম ছিল না, তাই সংবাদ দিতে পারিলে না। ইচ্ছা হইল, দিন কয়েক স্থানান্তরে যাও, কিন্তু হুকুম পাইলে না, বলা হইল না। দেখিতে দেখিতে আর একটি বড় মেয়ের ভেদ-বমি হইল। তোমার মনে হইল, যদি তোমার অন্যত্র যাওয়া প্রয়োজন হয়, অবশ্যই মিস্ থোবর্ণ বলিবেন। এইরূপে এক্ষেত্রেও বিশ্বাসের পরিচয় দিলে। মাকে বিশ্বাস করিয়া কোন দিন ঠক নাই, বরং লাভই হইয়াছে। ১২ই নভেম্বর কলেরার সংবাদ দিতে ইচ্ছা হইল; ভিন্ন কাগজে লিখিয়া মিস্ থোবর্ণের কাছে লইয়া গেলে। তিনি সংবাদ দিতে বলিলেন, আর বলিলেন যে "লেখ, এখানে আর কলেরা নাই, স্কুলের মেয়েরা ভাল।" তাই করিলে এবং বিশ্বাসের পরিচয় দিলে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

কন্যা সুসারের পরীক্ষা

সেই সময়ে জামাতা বৃন্দাবনচন্দ্র পুনরায় হিন্দুমতে বিবাহ করিলেন। তোমার জন্য এ পরীক্ষাটা বড় কি ছোট? তোমাকে যে ভাল করিয়া দেখিয়াছে সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, এ পরীক্ষাটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। বাল্যকালে কিম্বা যৌবনে যদি এ পরীক্ষা আসিত তাহা হইলে স্বভাবতঃই তুমি অত্যন্ত অধীর হইতে। লোকেও বুঝিতে পারিত যে তুমি সহ্য করিতে পারিতেছ না। যখন তোমার সম্মুখে তোমার প্রিয় পিতাঠাকুর দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন মোমের পুতুলের মত তুমি গলিয়া গিয়াছিলে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার ছোট ভ্রাতার দেহত্যাগ হইয়াছিল, সেই সংবাদ শুনিয়া তুমি এমন অসুস্থ হইয়াছিলে যে, ডাক্তার ডাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু আজ তুমি ও তোমার কন্যা বিশ্বাসী ব্রহ্মসন্তানের মত এ আঘাত সহ্য করিলে।

তুমি পূর্ব্বেই জানিয়াছিলে, সুসারের কপালে সংসারে যাহাকে সুখ বলে, তাহা ঘটিবে না। স্বামীর ধর্ম্মবিশ্বাস ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, শাশুড়ী, ননদ দেবরেরা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী; এমন গৃহে তোমার কন্যার স্থান কখনই হইবে না, ইহা তুমি জানিতে। সুসারও বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বীর নারীর মত সকলই সহ্য করিতে হইবে। স্বামিসঙ্গ লাভ কখনই ঘটিবে না। তাই যে কয় দিন ধরাধামে থাকিতে হইবে, পরসেবা কিরূপে ভাল করিয়া করা যায়, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য সুসারকে লইয়া লক্ষ্ণৌ নির্ব্বাসিত হইলে।

১২ই শ্রাবণ ১২১৮ বৃন্দাবন পুনরায় বিবাহ করিলেন। তুমি সংবাদ পাইয়া লিখিলে, 'বৃন্দাবন যে বিবাহ করিবে তাহা জানিতাম ও প্রস্তুত ছিলাম তাই কিছুমাত্র লাগিল না। সুসার শুনিলে অবশ্যই তাহার লাগিবে, সেই জন্য তাহাকে বলিলাম না। মা যা করেন তাই ভাল, কি আঁধার, কিবা আলো। প্রকাশ-অঘোর, আশীর্ব্বাদ কর, শেষ নিশ্বাস যেন এই বলিতে বলিতে ফেলিতে পারি, মা তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে সুখী করুন' এই পূর্ব্ব-জ্ঞান, এবং পূর্ব্ব-প্রস্তুতি তোমাকে রক্ষা করিল। তুমি এই পরিণত বয়সে বুঝিয়াছিলে যে, জীবনে অনেক এমন ঘটনা ঘটে যাহার হাত হইতে কিছুতেই রক্ষা পাওয়া যায় না। নীরবে তাহা বহন করিতে হয়। তুমি জানিতে, আইন অনুসারে বৃন্দাবনের নামে নালিশ করা যায়। কিন্তু তাহাতে আমাদের ধর্ম্মের উচ্চতার পরিচয় দেওয়া হইত না। সুসারেরও কোন লাভ হইত না, ভয়ে কত দিন মানুষকে শাসন করা যায়? ভয়ে তো আর প্রেম হয় না। ভালবাসা না হইলে সকলই বৃথা। তাই লিখিলে, মা যা করেন তাই ভাল; তাই এই ভয়ানক অপরাধ করিয়াছে শুনিয়াও তুমি বলিলে, মা তাহার অপরাধ ক্ষমা কর। শুধু তাই নয়, তাঁহার সুখের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলে। হায়, বৃন্দাবন কি কখনও ইহা বুঝিবেন?

মাতার ধৈর্য্য ও বিশ্বাসের কথা বলিলাম। যার জন্য এত, তার অবস্থা কি? সুসারের ডায়েরী পড়িলে কতকটা বুঝা যায়। সুসার শরীরে থাকিতে এ দৈনিক কেহ পড়িতে পাইত না। তুমিও বোধ হয় পাও নাই। এখন সুসার দেহে নাই। তাঁহার পবিত্র শোকের চিহ্নে পরিপূর্ণ এই ডায়েরীগুলি এখন আমি পাইয়াছি। প্রথম প্রথম স্বামী দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া মাসে মাসে এক একবার করিয়া লিখিতেন, "আজ এক মাস হইল," "আজ দুই মাস চলিয়া গেল।" ডায়েরীর প্রতি মাসের শেষের এই কথাগুলি আমার চক্ষে এখন কন্যা সুসারের হৃদয়ে বিদ্ধ এক একটি নূতন নূতন শেলের মতন লাগিতেছে। ৭ই অক্টোবর ১৮১১ লিখিতেছেন, "আজ কি দিব! আজ যে আমার এক আশ্চর্য্য দিন! মার কৃপায় আজ ৪ বৎসর মায়ের দুঃখী সন্তান হতে পৃথক রয়েছি। কেবল মায়ের কৃপায় উভয়ে বেঁচে আছি। ধন্য! মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এই যদি তাঁর ইচ্ছা হয়, এইরূপই হউক। মা গো, তুমি যে তোমার সন্তানকে তোমার ঐ স্নেহকোলে এত দিন এত সহ্য করে রেখেছ, কি করে মা তুমি এত সহ্য কর, এত ভালবাস, জানি না মা, তুমি কেমন মা! তোমার ভালবাসায় তুমি তোমার ছেলেকে মোহিত কর; দেখে সকলে সুখী হউক, জগৎ সুখী হউক। মা, ধন্য তোমার ব্যবহার, তোমার আশ্চর্য্য ব্যবহার! এমন করে এই এত দিন কাটিয়ে দিলে; জানি না মা কোথা হতে গেল দিন! মা তোমারই কৃপায় বেঁচে আছি।" বৃন্দাবনের জন্মদিনে একবার (১১শে নভেম্বর ১৮১১) লিখিতেছেন —"আজ কি দিব! আজ এক জীবনের জন্মদিন। আজ আমার পালনীয়, স্মরণীয়। আজ আমার স্বামীর জন্মদিন! মার চরণে শত শতবার কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিলাম যে তিনি আজ ২৬ বৎসরে পড়িলেন। মা ধন্য! তাঁহার স্নেহ ধন্য! তিনি আমায় এত ভালবাসেন। আমি তাঁর প্রেমের কথাতো আর বলিতে পারি না; দেখে দেখে অবাক্! মার কাছে প্রাতে উঠিয়া প্রার্থনা করিলাম, মা, তোমার সন্তান বলে তিনি যখন একবার জীবন

য়েছিলেন, তখন মার দয়া কখনও তাঁকে ছাড়িতে পারে না ; কারণ মার মত স্নেহ জগতে আর নাই। সকলে ছাড়িতে পারে, কিন্তু আমার এই জগন্মাতা, অসহায়ের মাতা, দুর্ব্বলের মাতা, কখনও সেই দুর্ব্বল এবং অসহায় সন্তানকে ছাড়িবেন না। তাঁর এই নবজীবনের দিনে তাঁকে মা আপনার দিকে টানিয়া লউন।"

তুমি লক্ষ্ণৌ থাকিতে বৃন্দাবনের পুনর্বিবাহের সংবাদ পাইয়াছিলে। তখন সুসারকে বল নাই। লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আসার পর যখন সুসার এ সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন, "আজ আমার জীবনের কি দিন! আজ বৈকালে জানিলাম, প্রাণনাথ পুনরায় বিবাহ করেছেন। কি আঘাত! ভেবে দেখিলাম আজ যদি আমার পরম জননীর সান্ত্বনাক্রোড় না পাইতাম, কাঁদিয়া ভূমে গড়াগড়ি দিতাম। কেবল জগজ্জননীর আশ্রয় ভেবে আমি আজ খাড়া হয়ে রয়েছি।" ধন্য মাতা, ধন্য কন্যা! সত্যই তোমরা এই গুরু পরীক্ষাকে ব্রহ্মকৃপাগুণে হাল্কা করিয়া আপনাদের সমুদয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিয়াছিলে।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্ণৌ ত্যাগ ও লক্ষ্ণৌর ফল

এদিকে লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইল। লক্ষ্ণৌর উৎসবে থাকিয়া তোমাকে লইয়া আসিব ও পথে কয়েকটি স্থানে ভ্রমণ করিয়া আসিব বলিয়া আমি কিছুদিনের জন্য ছুটি লইয়াছিলাম। তুমি ইহার মধ্যে একবার ভগিনী মহালক্ষ্মীকে দেখিতে গিয়াছিলে। তাঁহার মহাপ্রয়াণের সময় নিকট হইয়া আসিতেছিল। চিকিৎসা হয় তো পথ্য হয় না, খরচ-পত্রের অভাব। ডাক্তার যাহা বলিতেছেন তাহা পালন হইতেছে না দেখিয়া, আমার মত না লইয়াই, পথ্যের জন্য যে খরচ হইবে তাহা দিতে স্বীকার করিলে। লক্ষ্ণৌ উৎসবের জন্য প্রচারক মহাশয়েরা আসিবেন, তাই চাঁদাতোলা হইতেছিল। হাতে পয়সা নাই বলিয়া তুমি চাঁদার খাতায় স্বাক্ষর করিলে না, অথচ ভগিনীর পথ্যের মত খরচ হয়, তাহা দিতে স্বীকার করিলে।

আমার প্রস্তাব ছিল যে তুমি ২৬শে লক্ষ্ণৌ হইতে ফয়জাবাদ আসিয়া থাকিবে। সেখান হইতে উভয়ে প্রাচীন অযোধ্যানগরী দর্শন করিয়া উৎসবের জন্য পুনরায় লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিব।

এই প্রস্তাব অনুসারে তুমি ২৬শে মহানারী মিস্ থোবর্ণের নিকট বিদায় লইয়া গোপাল বাবুর বাটীতে আসিলে। ফয়জাবাদ পর্য্যন্ত তোমাকে কে পৌঁছিয়া দিবে, গোপাল বাবু তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। প্রাতঃকালে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তুমি বলিলে, যদি কোন লোক না যায়, আমি একাকীই যাইতে প্রস্তুত। তাই গোপালচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে সামান্য বঙ্গনারীর পক্ষে ইহা স্বপ্নের কল্পনা। যখন দৃঢ়তা দেখিলেন, ষ্টেশনে যাইবার জন্য ঘোড়ার গাড়ী করিয়া দিলেন। ছেলেরা একজন ষ্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিল। আর ফয়জাবাদ প্রবাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকারকে তারে খবর দেওয়া হইল। দুই কন্যা ও তুমি কোনও পুরুষ মানুষ সঙ্গে না লইয়া অজানিত স্থানে যাত্রা করিলে। ফয়জাবাদ ষ্টেশনে মহেন্দ্র বাবু রেলের গাড়ী তল্লাস করিয়া তোমাদের স্বীয় বাঙ্গালায় লইয়া গেলেন। সেখানে হাত-মুখ ধুইয়া আবার ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলে। যেমন আমাদের ট্রেণ ফয়জাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছিল, অমনি গাড়ির অতি সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে, আমরা সকলেই মহেন্দ্র বাবুর, বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলাম।

মহেন্দ্র বাবুর বাঙ্গালায় সন্ধ্যাকালে উপাসনা হইল। আহারান্তে তুমি আমার কাছে আসিলে। নয় মাস পরে তোমাকে দেখিলাম। তপস্যায় তোমার দেহ চর্ম্মাবশেষ, মস্তক কেশহীন, হস্ত অলঙ্কারশূন্য, পরিধান সামান্য পরিচ্ছন্ন বস্ত্র, কিন্তু আমার সম্মুখে তুমি যেন দিব্য জ্যোতিতে উজ্জ্বল। এ তোমার কি রূপ! এ কি দেবী না মানবী? এত দেবসৌন্দর্য্য কোথায় পাইলে, এ তো পৃথিবীর রূপ নয়? তখন তোমাকে প্রণাম করিলাম কি না মনে নাই কিন্তু প্রণাম করিবার সময় ছিল বটে।

দেখিলাম, এই নয় মাসে তোমার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মন প্রশস্ত হইয়াছে ; বিদুষী নারীদের সঙ্গে মিশিয়া সাহস বাড়িয়াছে ; কার্য্যক্ষেত্র সম্বন্ধে মনের চিন্তা বাড়িয়াছে ; হৃদয়ের কোমলতা বাড়িয়াছে, উপাসনার মধুরতা বাড়িয়াছে। লক্ষ্ণৌ গিয়া নারীর মর্য্যাদা বুঝিতে শিখিলে। জীবনে কি কি করিতে হইবে তাহার পূর্ব্বাভাস এখানেই লাভ করিলে ; অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও এখানে শিখিলে। তোমার পরিবার কিরূপে গঠিত হইবে, বিদ্যালয়ে কিরূপে কার্য্য করিতে হইবে, ছোট ছোট মেয়েগুলির হৃদয় কিরূপে আকর্ষণ করিবে, তাহাদের খেলার সাথী হইয়া কিরূপে তাহাদেরই একজনা হইবে, কিরূপে ছেলে মানুষের মত খেলিবে, দৌড়িবে, কিরূপে মধুমাখা হাসির দ্বারা তাহাদের শাসন করিবে, এ সকল সেখানে থাকিয়া দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিখিয়া আসিলে।

মহানারী মিস্ থোবর্ণের সঙ্গলাভ করিয়াই তোমার এমন অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। এই উৎসাহময়ীর সঙ্গলাভ করিয়া তোমার উৎসাহ দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নয় মাসে চারিখানি ইংরাজী পুস্তক পড়িয়াছিলে। দুটি চারটি সরল ইংরাজীতে কথা কহিতে পারিতে। ইংরাজী সুরে "Oh my" এমন মিষ্ট করিয়া বলিতে যে, তাহা আমার অনেক বার শুনিতে ইচ্ছা করিত। পূর্ব্ব হইতে পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছিল। কিন্তু মিস্ থোবর্ণের সঙ্গলাভ করিয়া তুমি একেবারে স্থির করিয়া ফেলিলে যে যদি বাহিরে যাইতে হয়, তাহা হইলে ভদ্রোচিত বস্ত্র পরিধান করা প্রয়োজন। সাড়ীর অঞ্চল মস্তক হইতে পড়িয়া যায়। যাহারা বাহিরের কাজ করিবে, তাহাদের পক্ষে সর্ব্বদা মাথার কাপড় উঠাইয়া লওয়া সম্ভব নয় ; যাহারা পরহিত কামনায় বাহিরে যাইবে তাহাদের মস্তক ও মুখ ঘোমটায় আবৃত থাকিলে চলিবে কেন? মস্তক ঢাকিবার জন্য নন্‌দিগের মতন এক প্রকার মস্তকাবরণ প্রস্তুত করিয়াছিলে। একদিন খেলিবার সময় মিস থোবর্ণ তোমার দেখাদেখি রুমালে মস্তক আবৃত করিয়া খেলা করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বঙ্গনারীর উদ্ভাবিত শিরোবসনে ভূষিত হইয়া কি সুন্দর না জানি দেখিতে হইয়াছিলেন। মিস্ থোবর্ণের দেখাদেখি তুমিও, না কামিজ, না অলষ্টার, গলা হইতে পদতল পর্য্যন্ত বিলম্বিত এক প্রকার গাত্রাবরণ প্রস্তুত করাইয়াছিলে। কখনও এই গাত্রাবরণ সাড়ীর উপরে, কখনও বা সাড়ীর ভিতরে পরিতে। এই সময় হইতে জুতা মোজা ব্যবহার করিতেও অভ্যস্ত হইলে। মোজা কাটিয়া গেলে অল্প পরিশ্রমে

এবং অল্প ব্যয়ে কিরূপে মেরামত করিতে হয়, তাহা ঐ বিদ্যালয়েই শিখিয়া আসিয়াছিলে। বঙ্গনারীর যে জড়সড় ভাব তাহা এই সময় হইতে তোমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। হঠাৎ বিপদ আসিলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা আর তোমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিত না। তুমি বঙ্গনারীর উন্নত পদবী বুঝিলে। তাহার উন্নতি করা, তাহাকে রক্ষা করা, যেন তোমার জীবনের এক মহামন্ত্র হইল। তোমার মধ্যে উৎসাহাগ্নি প্রথম হইতেই যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, কিন্তু তাহার পরিণাম কি হইত জানি না, যদি তুমি খৃষ্টান মহিলাদের সঙ্গে এত দীর্ঘকাল না থাকিতে পাইতে। ভস্মে-ঢাকা অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আর সে অগ্নি কেহই নিবাইতে পারিল না। সেই অগ্নিই যেন তোমাকে গ্রাস করিল। ফিরিয়া আসিবার পর কেবল তোমাকে অগ্নিময় দেখিতাম, আর ভাবিতাম সে অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার হেতু খৃষ্টীয় মহিলাদিগের সঙ্গে বাস। এই নয় মাসে আবার উপাসনা ও প্রার্থনা দ্বারাও মিস্ থোবর্ণের শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলে। খৃষ্টানদের বাইবেল ক্লাসে যাইতে হইত, গির্জ্জাতেও যাইতে হইত, কিন্তু তাহাতে তোমাদের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হয় নাই। খৃষ্টের জীবনের ইতিহাস শিখিলে; তাঁহার ছোট ছোট উক্তিগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলে। খৃষ্টানদিগের মত কার্য্যময় দয়ার ব্যাপারে কিরূপে নিযুক্ত থাকিতে হয়, বিপদের সময় বিশ্বাসীর মত ভগবানের উপর কিরূপে নির্ভর করিতে হয়, তাহাও ঐ সময় শিখিলে। শুদ্ধতা কি বস্তু তাহাও বুঝিতে পারিলে। গৃহে থাকিতে পাপবোধ তত প্রখর ছিল না। ধার্ম্মিকা মহানারীর সঙ্গলাভ করিয়া তোমার পাপবোধও কেমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বোপরি কেমন করিয়া পরসেবার জন্য আপনার সর্ব্বস্ব দিতে হয়, এ শিক্ষাও খৃষ্টীয় মহিলাদিগের সংস্পর্শে থাকিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিবার পথে

লক্ষ্ণৌ ছাড়িয়া তোমার কানপুরে গিয়া— বাবুর বাড়ীতে উঠিবার কথা হইল। তাঁহার বাটীতে যাইবার প্রস্তাবে সকলে আপত্তি করিতেছিলেন, কারণ তিনি দুই বৎসর কাল উপাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন; বাড়ীর উপাসনার ঘর বন্ধ। ক্রমে ক্রমে তিনি সরিয়া যাইতেছিলেন। তুমি কিন্তু তাঁহার বাটীতে যাওয়াই মীমাংসা করিলে। তোমার গমনে তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল। ১লা ডিসেম্বর ১৮৯১ বেলা ৯।০ টার সময় তাঁহার বাটী প্রবেশ। ১০টার সময় তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উপাসনায় যোগ দিলেন। নিজে উপাসনার ঘর পরিষ্কার ও প্রস্তুত করিলেন। বেশ উপাসনা হইল। অনেক দিন জমি পড়িয়া থাকিলে যেমন ভাল শস্য উৎপন্ন হয়, তেমনি

ভাইয়ের পরম উপকার হইল। এমন সরল অনুতাপের ক্রন্দন অনেক দিন শুনি নাই। আবার সন্ধ্যার সময় মেয়েদের উপাসনা হইল। দুই বৎসর যাহার উপাসনার ঘর বন্ধ, আজ তাহার এ কি দশা? বাহিরে তিনি নিজে ধর্ম্মালোচনা করিলেন, ভিতরে তুমি মেয়েদের লইয়া উপাসনা করিলে। সকালে ভাইয়ের অনুতাপাশ্রু প্রমাণ করিল যে বিশ্বাস একেবারে পলায়ন করে না। স্বামি-স্ত্রী উভয়ের মিলিত অনুরোধে পরদিন ৬টায় আবার উপাসনা হইল। ভাই-ভগিনী উভয়েই উপাসনায় যোগ দিলেন, খুব ভাল উপাসনা হইল, দুই ঘণ্টা তাহার স্থিতি। ভাই অনুতাপসূচক প্রার্থনা করিলেন ও অনেক কাঁদিলেন। দুই বৎসরের পর এবার কাঁদিলেন ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। যখন তাঁহার বাটীতে যাইবার কথা হয়, তখন যাঁহারা আপত্তি করিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ যদি ভাইয়ের অবস্থা দেখিতেন, তাঁহারাও কাঁদিতেন ও তোমাকে শত আশীর্ব্বাদ করিতেন।

কানপুর হইতে আগ্রা গমন করিলাম এবং তথায় একটি সরাইয়ের দ্বিতল গৃহে অবস্থিতি করিলাম। দুখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আমরা সকল স্থান দেখিয়া বেড়াইলাম। আকবর বাদসাহের তিনটি স্ত্রী ছিলেন একজন হিন্দু, একজন খৃষ্টান, একজন মুসলমান। জীবনে তিন জনার সমান সম্মান দেওয়া তাঁহারই পক্ষে সম্ভব ছিল। বিধানের প্রথম সূত্র সেইখানে। আচরণে দেখাইলেন, সকল আত্মাই ভগবানের, সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে। তাজমহল দেখিয়া ভালবাসার মহত্ত্ব বুঝিলে।

৪ঠা ডিসেম্বর মথুরায় শ্রীযুক্ত বাবু—মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। তোমরা ভিতরে গেলে, আমি বাহিরে রহিলাম। ইহাতে তোমার মনে ক্লেশ হইতে লাগিল। অনেক দিন অন্তঃপুর অতিক্রম করিয়াছ, এখন আর কেন ভাল লাগিবে? কোনও উপায়ে একত্রে উপাসনা হইল। একত্রে উপাসনা হইবে না, ইহা কি তোমার প্রাণে সয়? তার পরদিন ৫ই প্রাতঃকালে Dr. Miss Sheldon এর স্কুলে উপাসনা করিলাম। আমরা উপাসনার স্থান পাইতেছি না শুনিয়া Miss Sheldon স্কুল-ঘর খুলিয়া দিয়া সেখানে স্থান করিয়া দিলেন। সকলে মিলিয়া উপাসনা করিয়া সুখী হইলাম। ঠিক যেন ধর্ম্মের লোকের জন্য আয়োজন করিয়া দিলেন। Miss Sheldon এক জন M. D. কিন্তু কোন অভিমান নাই। নিজ হাতে দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া উপাসনা করিতে অনুরোধ করিলেন। এমন করিয়া অপর ধর্ম্মাবলম্বীর উপাসনার সহায়তা কে করে? এখানে এ বিষয়ে তোমার বিশেষ শিক্ষা লাভ হইল। ৬ই ডিসেম্বর বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের মন্দির, গোঠের মন্দির দেখা হইয়া গেল। তোমার মনে হইল, এখানকার সকলই মিষ্ট। ভিখারীগুলি অনেক দূর পশ্চাতে আইসে, একটি সিকি-পয়সা দিলেও দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া যায়। অন্য স্থানের ভিখারীরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। ৭ই সনাতনের সমাধি দেখিতে গেলাম। তিনি যে পরম বৈরাগী ছিলেন, সেই স্থানটি তাহার পরিচয় দিতে লাগিল। কোনরূপ বিলাসের চিহ্ন নাই, শিশুগুলিও একটি পয়সা চাহিল না। স্থানটি সন্তোষ-পূর্ণ।

৮ই তারিখে প্রেমানন্দ স্বামী নামক বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। কিরূপে সহজে দোষ স্বীকার করিতে হয়, উচ্চ নীচ বিচারশূন্য হইয়া সকলের নিকট হাত যোড় করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে হয়, এ সকল বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেক শিক্ষা লাভ করিলে। তথা হইতে মথুরা, কানপুর ও এলাহাবাদ হইয়া ১৫ই ডিসেম্বর মোগলসরাই আসিলে। অসি নদীর তীরে একজন মহারাষ্ট্রীয় সন্ন্যাসীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। মোকামার দিদি (শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী) সঙ্গে ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, নারীর বেদে অধিকার আছে কি না? সন্ন্যাসিনী বলিলেন, স্ত্রীর অধিকার নাই। কিন্তু স্ত্রীর আটটি লক্ষণ আছে। যথা, (১) অদয়া, (২) ভয়, (৩) অবিবেক, (৪) সাহসহীনতা, (৫) চঞ্চলতা, (৬) মায়া, (৭) অশৌচ, (৮) অনর্থ। এই লক্ষণগুলি থাকিলে স্ত্রী বলা যায়। যাহাতে এ লক্ষণ নাই, তিনি স্ত্রী নহেন, তাঁহার বেদে অধিকার আছে।

তথা হইতে কাশী হইয়া ১৬ই ডিসেম্বর খগোলে ভাই যষ্ঠীদাসের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিলে, এবং সকলকে লইয়া বাঁকিপুর আগমন করিলে। বাঁকিপুরে তোমার জন্য এমন অভ্যর্থনা অপেক্ষা করিতেছিল, যেন তুমি মহাযুদ্ধ জয় করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগত হইয়াছ! রাজপথ হইতে গৃহ পর্য্যন্ত দীপমালা শঙ্খধ্বনি, আলো বাদ্য প্রস্তুত। মানুষের জন্য মানুষ এত করে তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। বাটীতে আসিবামাত্র তুমি উপরের ঘরে দৌড়িয়া গেলে, প্রবোধের বিধবা পত্নীকে আলিঙ্গন করিলে, তারপর উপাসনার ঘরে উপাসনা করিতে গেলে। উপাসনার ঘর খুব ভাল করিয়া সাজান হইয়াছিল।

[ক্রমশঃ।

১০৫—১২

উটরোগ

(নাটক)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদের প্রধান তোরণ, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, প্রহরারত প্রহরী,

[প্রহরী তোরণের সামনে টহল মারছে, এমন সময়ে এক ব্যক্তি এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াল।]

প্রহরী। কি চাও?

আগন্তুক। (করজোড়ে) আজ্ঞে হুজুর, ভেতরে সেঁদোতে চাই, দয়া ক'রে ফাটকটা একটু টেনে ধরুন।

প্রহরী। কে তুমি?

আগন্তুক। দাস ছক্কন সিং, ওয়লদ্ ধক্কন সিং, সাকিন দুর্বড়টাড়, পরগণা বনডিহা।

প্রহরী। কি দরকার?

আগন্তুক। হুজুর, গৃহপাল মহাশয়ের খাস খাওয়াস ভৈরব দাসের সঙ্গে বহুৎ দরকারী কথা আছে। আমি ভৈরব দাসের শালা।

প্রহরী। (মাথা নেড়ে) হবে না। আমি শালা লোকদের অন্দরে যেতে দিইনে।

আগন্তুক। (হতাশ ভাবে) হবে না?—তা হ'লে?···কিন্তু ঐ যাঃ হুজুর, ঘাবড়ে গিয়ে উলটো ব'লে ফেলেছি। আমি ভগিনীপতি, ভৈরব শালা।

প্রহরী। আমিও উল্‌টো ব'লে ফেলেছি, শালালোকদের সঙ্গে আমি দেখা করতে দিইনে।

আগন্তুক। তা-ও দেন না? তা হ'লে ভৈরব দাস আমার বাবা বললেও বোধ হয় দিতেন না?

প্রহরী! বাবা বললে কি? মা বললেও দিতাম না। ভাগ—

আগন্তুক। মা বললেও দিতেন না?···উঃ। আপনি কড়া হাকিম হুজুর!

[প্রস্থান।

(ইত্যবসরে ফাটকের অপর দিকে একটি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়িয়েছিল, তার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে)

প্রহরী। কি, দুর্গাবাঈ? এত রাত্রে কোথা থেকে আসছ?

দুর্গাবাঈ। তোমার শ্রাদ্ধ থেকে আসছি।

প্রহরী। আমার শ্রাদ্ধ থেকে আসছ! [illegible]

বল? আঃ! বাঁচা গেল! কি হয়েছিল তোমার স্বামীর?

দুর্গাবাঈ। নাও, নাও, ফাটক টানো, বেশি রঙ্গ করতে হবে না। আমার স্বামীর মরণে তোমার শ্রাদ্ধ থেকে আসব, এত ভাগ্যি এ জন্মে ক'রে আসনি। নাও, টানো।

প্রহরী। দু'হাত ধরে?

দুর্গাবাঈ। দু'হাত দিয়ে।

(অদূরে জন-কোলাহল)

প্রহরী। (ফাটক টেনে ধ'রে) নাও, ঢুকে পড়, বোধ হয় মাতালরা হল্লা করতে করতে আসছে।

দুর্গাবাঈ। (প্রবেশ করে) মাতাল নয়। চৈতমলরা রুদ্রনাথের পুজো দিয়ে ফিরছে। আমি দেখে এলাম উদয় সিংহের দাওয়ায় ব'সে জিরুচ্ছে ওরা।

(নিকটে জয় বাবা রুদ্দরনাথ! জয় বাবা রুদ্দরনাথ ধ্বনি)

দুর্গাবাঈ। ঐ এসে পড়েছে।

(একে একে চৈতমল প্রভৃতি সাত জনের প্রবেশ ও জয় বাবা রুদ্দরনাথ ধ্বনি)

প্রহরী। বেশি চেঁচিও না, মহারাজা নিদ্রা যাচ্ছেন।···তার পর চৈতমল, পুজো দিয়ে ফিরলে তোমরা?

চৈতমল। আজ্ঞে হ্যাঁ দ্বারপালজী, ফিরলাম।

প্রহরী। আস্তে আস্তে ভিতরে এস।

(সকলের ফাটক পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ)

প্রহরী। তোমার মাথায় ও কি?

চৈতমল। আজ্ঞে, এই-ই ত বাবা রুদ্দরনাথের প্রসাদ। সিংহগড়ে ঢুকে পর্যন্ত মাথায় মাথায় রেখেছি, ভুঁয়ে নামাইনি। রাণীমার হাতে দিয়ে তবে নিশ্চিন্তি।

প্রহরী। রাণীমা ত' এখন নিদ্রা যাচ্ছেন!

ঝনঝর রাও। মহারাজ নিদ্রা যাচ্ছেন আবার রাণীমাও নিদ্রা যাচ্ছেন, তা হ'লে উপায়?

প্রহরী। বাকি রাতটুকু তোরাও নিদ্রা দিগে যা ঐ পলাশ গাছের চাতালে শুয়ে। সকালে রাণীমার ঘুম ভাঙলে তাঁর হাতে প্রসাদ দিস।

ঝনঝর রাও। (চৈতমলের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে) কিন্তু প্রসাদের কি হবে চৈতখুড়ো? প্রসাদ ত' ভুঁয়ে রাখা চলবে না?

চৈতমল। তা কখনো চলে? বাকি রাতটুকু দু'জনকে ভাগাভাগি করে মাথায় রাখতে হবে। তুমি আর পুরণ দাস এ কাজের ভার নাও।

ঝনঝর রাও। রাজি।

পুরণ দাস। আমিও রাজি। আমি না হয় প্রথম রাত ঘুমোই, আর ঝনঝর শেষ রাত জাগুক।

ঝনঝর রাও। (নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা ক'রে দেখে) কিন্তু অসুবিধে ঠেকছে যে পুরণ, সারা রাতে প্রসাদ যে আমার মাথা থেকে একবারও নামে না!

পুরণ দাস। তা হলে প্রথম রাত তুমি না হয় জাগো, শেষ রাত আমি না হয় ঘুমোই।

ঝনঝর রাও। (প্রসন্ন মুখে) হ্যাঁ, এই ঠিক ব্যবস্থা হ'ল,—এতে আর কোনো অসুবিধে রইল না।

(জয় বাবা রুদ্দরনাথ! বলতে বলতে সকলের পলাশ-গাছের দিকে গমন)

প্রহরী। এত বড় আহাম্মোকরা কি করে পূজো দিয়ে ফিরে এল,—আশ্চর্য !

ষষ্ঠ দৃশ্য

সূর্যপালের শয়ন কক্ষ

প্রত্যূষ

চন্দ্রশীলা। মহারাজ! মহারাজ!

সূর্যপাল। (নিদ্রাভঙ্গ) কি বলছ চন্দ্রা?—ও! সকাল হয়েছে বুঝি?

চন্দ্রশীলা। হ্যাঁ, সকাল হয়েছে। এবার ওষুধ খেতে হবে।

সূর্যপাল। (শয্যা ত্যাগ ক'রে) দেবরাজ? দেবরাজকে ডাকাতে হবে ত?

চন্দ্রশীলা। ডাকিয়েছি। উপাধ্যায়জী অলিন্দে অপেক্ষা করছেন।

(বাইরে অলিন্দে গলা খেঁকারি)

সূর্যপাল। খুব কান ত'! সাড়া দিচ্ছে।

চন্দ্রশীলা। আসন পেতে দিয়েছি, পূর্বমুখ হয়ে বোসো।

(সূর্যপালের তথাকরণ)

চন্দ্রশীলা। (সূর্যপালের হাতে ঔষধের বাটি দিয়ে) এবার খেয়ে ফেল, সবটা একেবারে।

সূর্যপাল। (ওষ্ঠের কাছে ঔষধের পাত্র নিয়ে গিয়ে না খেয়ে ভূমিতে স্থাপন করলেন)

চন্দ্রশীলা। (উৎকণ্ঠিত স্বরে) কি হল মহারাজ? খেলে না কেন?

সূর্যপাল। (অপ্রতিভ মুখে) উট মনে পড়ে গেল।

চন্দ্রশীলা। ইশ! আগে থেকেই মনে পড়ছিল, না খেতে গিয়ে মনে পড়ল?

সূর্যপাল। খেতে গিয়ে মনে পড়ল।

চন্দ্রশীলা। (দুঃখিত স্বরে) কি আর করবে বল? এক দিন পেছিয়ে গেল। কাল আর মনে কোরো না।

সূর্যপাল। (কি ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক ভাবে) না। তা আর করব না।

(অলিন্দে গলা খেঁকারি)

সূর্যপাল। দেবরাজ ব্যস্ত হচ্ছে। কি ওকে বলি বল দেখি?

চন্দ্রশীলা। কি আবার বলবে? যা বলবার আমি ব'লে ডেকে নিয়ে আসছি।

(চন্দ্রশীলার প্রস্থান, এবং দেবরাজসহ পুনঃপ্রবেশ।)

দেবরাজ। (বিরক্তিব্যঞ্জক মুখে) মহারাজ, এত ক'রে যে কথাটা নিষেধ ক'রে দিলাম, শেষ পর্যন্ত তাই ক'রে বসলেন?

সূর্যপাল। (অপ্রতিভ ভাবে) কি করি বল? ইচ্ছে ক'রে করেছি কি? হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

দেবরাজ। তার আগেই টপ ক'রে খেয়ে ফেললে ত হ'ত!

সূর্যপাল। কিন্তু তার চেয়েও আগে টপ ক'রে মনে পড়ে গেল যে!

চন্দ্রশীলা। যা বলছেন কাল থেকে না-হয় তাই কোরো।

সূর্যপাল। (অন্যমনস্ক ভাবে) আচ্ছা, তাই করব। (দেবরাজকে সম্বোধন ক'রে) দেখ দেবরাজ, এ নিয়মটা তুমি যদি আমাকে না জানাতে তা হ'লে আপনা-আপনিই পালন হ'য়ে যেত। জানিয়েই অসুবিধেয় ফেলেছ।

দেবরাজ। (চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে) বলেন কি মহারাজ! এর ওপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে, না জানিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারি কি? হঠাৎ যদি আপনি উটের কথা মনে ক'রে ফেলেন, তখন?

সূর্যপাল। না, না, হঠাৎ উটের কথাই বা মনে করতে যাব কেন?

দেবরাজ। এই যে কাল আপনি বললেন, আপনার উট্‌শালায় হাজারো উট আছে?

সূর্যপাল। কি গেরো! শুধু কি আমার উটশালাই আছে? হাতীশালা নেই? ঘোড়াশালা নেই?

দেবরাজ। কিন্তু মহারাজ, উটশালাও ত' আছে?

সূর্যপাল। আহা-হা, আছে ত নিশ্চয়ই,—কিন্তু কথাটা তুমি ঠিক ধরতে পারছ না দেবরাজ! যাক্, তর্ক ক'রে কোনো লাভ নেই। সন্ধ্যাবেলা ওষুধ নিয়ে আসছ ত?

দেবরাজ। অতি অবশ্য আসছি। কয়েক দিনের মধ্যে আপনাকে ষোল-আনা সারিয়ে না দিয়ে আমি নড়ছি নে এখান থেকে। আমার যা কিছু করবার সবই করছি আর করবও, শুধু আপনি তা'তে একটু যোগ দিলেই বেঁচে যাই।

সূর্যপাল। আর কি ক'রে যোগ দোব বল?

দেবরাজ। আর কোনো রকমেই দরকার নেই মহারাজ, শুধু একটু শক্ত হ'য়ে দিন তিনেক উট শব্দটি ভুলে গিয়ে যোগ দিলেই হবে। শুধু উট শব্দই বা কেন, দু'চার দিন বর্ণমালা থেকে উ অক্ষরটি সেরেফ বাদ দিয়েই চলুন। (চন্দ্রশীলার প্রতি) আপনি যদি মহারাণি, অনুগ্রহ ক'রে আমাদের দু'জনকে একটু সাহায্য করেন তা হ'লে অতিশয় উপকৃত হই।

চন্দ্রশীলা। অত ক'রে ব'লে আমার প্রতি অবিচার করবেন না উপাধ্যায়জী, যা করতে হবে আদেশ করুন, আমি প্রাণপণে করব।

দেবরাজ। আপনি কয়েক দিন মহারাজের সঙ্গে অবিরত হাতীর গল্প ক'রে, ঘোড়ার গল্প ক'রে উটের কথা ভুলিয়ে রাখুন। কদাচ উটের নাম মুখে আনবেন না। দাঁড়ান, দাঁড়ান। (একটা কিছু ভেবে দেখবার চিন্তার ভাণ ক'রে) না, হাতীর শুঁড় বিপজ্জনক বস্তু।

সূর্যপাল। (সকৌতূহলে) কেন, বিপজ্জনক কেন?

দেবরাজ। মহারাজ, হাতী শুঁড় উঁচু করলে উটের গলার মতো দেখায়। হাতী থেকে হাতীর শুঁড়, আর হাতীর শুঁড় থেকে উটের গলা মনে প'ড়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। গলা মনে পড়লে দেহ মনে পড়তে আর কতক্ষণ।...আচ্ছা, আসি তবে এখন।

সূর্যপাল। এস।

দেবরাজ। জয় হোক মহারাজার। জয় হোক মহারাণীর।

[প্রস্থান।

পট পরিবর্তন

সপ্তম দৃশ্য

প্রধান মন্ত্রী বল্লভাচার্যের গৃহের সম্মুখ

প্রত্যূষ

শঙ্কর মিশ্র। ও বল্লভাচার্য! বল্লভাচায বাড়ি আছ হে? ও প্রধান মন্ত্রী মশায়!

(ভিতর হ'তে শোনা গেল, আসছি, দাঁড়াও)।

বল্লভাচার্য। (নিষ্ক্রান্ত হয়ে) পথে দাঁড়িয়ে কেন? বৈঠকখানায় বসবে চল।

শঙ্কর মিশ্র। না ভাই, বসব না, তাড়া আছে। দুটো কথা শুনে যাই। রাজবাড়ির খবর কি বল ত?

বল্লভাচার্য। খবর ভাল। রাজবাড়ির ওপর যথারীতি সূর্যচন্দ্রের কিরণ বর্ষণ চলেছে।

শঙ্কর মিশ্র। মহারাজের খবর কি?

বল্লভাচার্য। মহারাজ এখনও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন, স্বর্গারোহণ করেন নি।

শঙ্কর মিশ্র। তাঁর রোগের খবর কি? ঢেঁড়া ত পিটিয়েছিলে চার দিন পরে হয় শূলারোহণ, নয় আনন্দোৎসব। এক মাস হ'য়ে গেল অথচ দুইয়ের মধ্যে একটিও হ'ল না—এও একটি দুর্ভেদ্য রহস্য মনে হচ্ছে।

বল্লভাচার্য। একেবারে দুর্ভেদ্য নয়। মহারাজের কাছে শুনেছি, এখনো এক মাত্রাও ঔষধ তাঁর পেটে যায়নি।

শঙ্কর মিশ্র। যায়নি? কেন, বল ত?

বল্লভাচার্য। সেই রহস্যটি শুধু দুর্ভেদ্য নয়, অভেদ্য।

শঙ্কর মিশ্র। এ দিকে তোমার দেবরাজ ত রাজভোগ সেঁটে সেঁটে ভুঁড়ি বাগিয়ে ফেললে। আর তার হাড্ডি-চামড়া-সার ঘোড়াটাও রাজবাড়ির দানা খেয়ে খেয়ে সাজ্ঘাতিক মুটিয়েছে। আগে দু'পা চলতে পায়ে-পায়ে ঠোকাঠুকি লাগত, এখন কাছে গেলে হারামজাদা জোড়া পায়ে লাথ ছোঁড়ে।

বল্লভাচার্য। সওয়ার আর বাহক দু'জনেরই উপস্থিত তুঙ্গী চলেছে শঙ্কর! তাই মনের সাধে একজন খাচ্ছে ছানা, আর একজন খাচ্ছে চানা। তোমার দৈবরাজের মতো ধূর্ত লোক সমস্ত ভারতবর্ষে দুটি আছে কি-না সন্দেহ! ওর পেটে এক বিন্দু বিদ্যে নেই, কিন্তু ওর মাথায় এক পাহাড় বুদ্ধি আছে। বুদ্ধির জোরে ও ত উপস্থিত তোমার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, আর কিছুদিন থাকলে বোধ হয় আমার স্থলাভিষিক্তও হবে।

দেবরাজ—(করজোড়ে) আজই না মহারাজ, কাল

শঙ্কর মিশ্র। (হেসে) তাহ'লে সাবধান হও। মহারাজের মেজাজ কি রকম?

বল্লভাচার্য। গুম্‌ হয়ে আছেন। মনে হয় শীঘ্রই বোধ হয় বোমা-ফাটা হবেন। কথাবার্তা কম কইছেন।

শঙ্কর মিশ্র। আচ্ছা ভাই, চলি।

পটপরিবর্তন

অষ্টম দৃশ্য

প্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষ

(সূর্যপাল, চন্দ্রশীলা ও বল্লভাচার্য আসীন। দেবরাজের প্রবেশ)

দেবরাজ। (নত হ'য়ে) জয় হোক মহারাজ!

সূর্যপাল। জয় আর আমার হ'ল না দেবরাজ! জয় ত দেখছি তোমারই। তার পর, কত দিন হ'ল বল ত?

দেবরাজ। কিসের মহারাজ?

সূর্যপাল। সিংহগড়ের রাজপ্রাসাদে তোমার শুভ অধিষ্ঠানের?

দেবরাজ। (একটু ভেবে দেখে) তা মাস দেড়েক হবে।

সূর্যপাল। আরও কত দিন ইচ্ছে আছে, শুনতে পাই?

দেবরাজ। আমার অপরাধ কোথায় বলুন? মনে করেছিলাম দিন চারেকে কাজ শেষ ক'রে বাড়ি ফিরব, বাড়িতে কত প্রয়োজনীয় কাজ পণ্ড হচ্ছে, কিন্তু আপনি এমনই ছেলেমানুষী আরম্ভ করেছেন যে এ পর্যন্ত আমার এক কৌটা ওষুধ আপনার পেটে ঢুকল না!

সূর্যপাল। ঢুকবে কেমন ক'রে? এমন চাকা চালিয়েছ যে, ওষুধের পাত্রে হাত ঠেকিয়েছি কি, অমনি খুরশুদ্ধ মনের মধ্যে খট্ খট্ ক'রে বেড়াতে আরম্ভ করে। শুধু আমার মনের মধ্যেই নয়, মহারাণীরও।

বল্লভাচার্য। (উৎকট বিস্ময়ে) কি বেড়াতে আরম্ভ করে মহারাজ?

সূর্যপাল। বলছি। শোন দেবরাজ, তুমি একটি বিষম ধাপ্পাবাজ, ভণ্ড, জোচ্চোর!

দেবরাজ। (কাঁচুমাচু মুখে) কেন প্রভু?

সূর্যপাল। (কঠোর স্বরে) আবার চালাকি হচ্ছে, কেন, তা জান না?

দেবরাজ। (করজোড়ে কাতরমুখে অবস্থান)

সূর্যপাল। আমার আগেকার রোগ সেরে গেছে, তার বিন্দু বিসর্গও আর নেই। কিন্তু তার জায়গায় নতুন যে রোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্যে পাগল হ'য়ে যাবার মতো হয়েছি। আগেকার রোগ এর চেয়েও ভাল ছিল। তার শেষ ছিল মৃত্যুতে, কিন্তু এ রোগে বেঁচে থেকে দিবারাত্র মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করছি।

দেবরাজ। (কষ্টে হাসি চেপে) কি রোগ প্রভু?

সূর্যপাল। হারামজাদা! আবার ন্যাকামি করছ? উটরোগ, তা তুমি জান না?

বল্লভাচার্য। (চকিতস্বরে) বললেন কি মহারাজ! উটরোগ?

সূর্যপাল। হ্যাঁ, উটরোগ। ওই নচ্ছারটা একটা আস্ত উট আমার মনের মধ্যে ঢুকিয়েছে। ঘুমিয়ে পর্যন্ত নিস্তার নেই, স্বপ্ন দেখি উটের। উট ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি, ঘুম ভাঙলে মনে হয় উট। জেগে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ মনের মধ্যে উট খট্-খট্ ক'রে বেড়িয়ে বেড়ায়। (দেবরাজের প্রতি আরক্তনেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে)

বার কর্ এ উট আমার মনের ভেতর থেকে, নইলে তোকে শূলে চড়িয়ে আগুনে পোড়াব।

দেবরাজ। (অপরিসীম উল্লাস কষ্টে দমন ক'রে) মহারাজ, প্রথম দিনেই ত বলেছিলাম, নিদিধ্যাসনে দেখা গিয়েছিল আপনার রোগে উষ্ট্রিকা দোষ।

সূর্যপাল। (চিৎকার ক'রে) চোপ রও পাষণ্ড! ফের যদি উষ্ট্রিকা দোষ শব্দ উচ্চারণ করেছ, এক্ষণি দু'খণ্ড করব তোমাকে।

দেবরাজ। (করজোড়ে) দোহাই মহারাজ! দয়া ক'রে ও কার্যটি করবেন না। প্রাণটা দেহে বজায় থাকলে উটের যা হয় একটা ব্যবস্থা করতে পারব, কিন্তু না থাকলে উটকে কোনো মতেই বার করতে পারব না। এর অতি সহজ প্রতিকার আছে, অভয় দেন ত' নিবেদন করি।

সূর্যপাল। (হুঙ্কার দিয়ে) কি?

দেবরাজ। আপনার পায়ের শির ত আর টন্‌টন্ করে না?

সূর্যপাল। (সজোরে) না।

দেবরাজ। বুক ধড়ফড় করে না?

সূর্যপাল। না।

দেবরাজ। চোখ লাল হয় না?

সূর্যপাল। না, না,—হয় না।

দেবরাজ। মহারাজ, তা হ'লে ত আপনার আসল রোগ একেবারে সেরে গেছে। আপনার প্রতিশ্রুত দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে আমাকে বিদায় করুন, তা হ'লে আপনার মন থেকে বেরিয়ে এসে উটও আমার পেছনে পেছনে খট্‌খট্ করতে করতে চ'লে যাবে।

সূর্যপাল। (এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে) আমারও তাই মনে হয়। মন্ত্রী মশায়, এই সয়তানটাকে দু'লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে লাথি মেরে বিদায় করুন।

বল্লভাচার্য। মহারাজ, এর এক কৌটা ওষুধ আপনার পেটে গেল না, আর দু'লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিতে বলছেন?

সূর্যপাল। এই সর্বনেশে লোককে আর একদিনও আমাদের রাজ্যে রাখবেন না। ওর হাত থেকে পরিত্রাণ না পেলে শেষ পর্যন্ত ও আপনার মনে হাতী ঢুকিয়ে ছাড়বে। তখন চার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ওকে বিদায় করতে হবে।

বল্লভাচার্য। (সন্ত্রস্ত হয়ে) না, তা হ'লে দু' লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়েই বিদায় করা যাক্।

সূর্যপাল। আজই।

দেবরাজ। (করজোড়ে) আজই না মহারাজ, কাল। দেড় মাস যখন আপনার অন্ন সেবন করলাম, আর একদিন করলে আপনার অক্ষয় ভাণ্ডারের কোনও ক্ষতি হবে না। অনুমতি করেন ত' একটা প্রার্থনা নিবেদন করি।

সূর্যপাল। কি বলো?

দেবরাজ। মহারাজ, যে উপায়েই হোক, আমিই যখন আপনার রোগ সারিয়েছি ও অর্থটা আমি চোরের মত নিয়ে যেতে চাইনে। আপনিই বা লুকিয়ে জরিমানার মত দেবেন কেন? কথা ছিল অনারোগ্যে আমার শূলদণ্ড, আর আরোগ্যে মহা-উৎসব হবে। আমার শূলদণ্ড যখন হ'ল না, আগামী কাল মহোৎসবই তখন হোক্। আর সেই উৎসব-সভায় আপনি অর্থটা পুরস্কারস্বরূপ দিন। তাতে আমার সক্ষমতা আর আপনার প্রতিশ্রুতি পালন দুই-ই কীর্তিত হতে পারবে।

সূর্যপাল। (বল্লভাচার্যের প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত)

বল্লভাচার্য। মহারাজ, উপাধ্যায়জীর প্রস্তাব সমীচীন মনে হচ্ছে। রোগ যখন আপনার আরোগ্য হয়েছে, উৎসব তা হ'লে কেনই বা না হবে?

সূর্যপাল। কিন্তু এই উটরোগ?

বল্লভাচার্য। উটরোগও আপনার আরোগ্য হ'য়ে যাবে মহারাজ! ওষুধ যখন আর খেতে হবে না তখন উট থাকলেও উটের উদ্বেগ থাকবে না। আজ সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখে আপনি এ-কথার প্রমাণ পাবেন।

চন্দ্রশীলা। (সভয়ে) কিসের স্বপ্ন দেখে উপাধ্যায়জী? উটের নয় ত'?

দেবরাজ। সন্তানের ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন মহারাণি! উটের নয়, আপনার স্বপ্ন দেখে।

চন্দ্রশীলা। (আরক্ত মুখে মৌনাবলম্বন)

সূর্যপাল। (সহাস্যে) দেবরাজ শুধু শুষ্ক নয় মহারাণি, খানিকটা সরসও বটে। দেবরাজের প্রস্তাব সম্বন্ধে তোমার যা সিদ্ধান্ত তাই হবে।

চন্দ্রশীলা। উপাধ্যায়জীর প্রস্তাব আগামী কালই কার্যে পরিণত করবার ব্যবস্থা করুন প্রধান মন্ত্রী মশায়!

বল্লভাচার্য। যথাদেশ মহারাণি!

য ব নি কা

গদ্য-কবিতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র

"এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে কবিতা পদ্যেই লিখিত হইবে, তাহা সঙ্গত কি না আমার সন্দেহ আছে। কেবল পদ্যই কবিতা নহে। অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কবিতার উপযোগী।"

—১৮৭১ খৃঃ।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

বিশেষ করে কাশীর এই অঞ্চলটা, শিবালয় থেকে তুলসীঘাট পর্য্যন্ত বিপিনের বড় ভাল লাগে। শুধু জনবিরল বলে নয়, তার ধারণা তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য বা প্রকৃত অধ্যাত্ম রূপ যদি এখনো কোথাও অনুভব করা যায় ত ওইখানে। ওর নির্জ্জন ঘাটে, পুরনো ভাঙ্গা মন্দিরে, অগণিত সোপানশ্রেণীর মাথায় অবস্থিত ঝুরি-নামা বটগাছের নিঃসঙ্গতায়, বুক পর্য্যন্ত গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে জপরত নর-নারীর হর-হর বোম-বোম ধ্বনিতে। এছাড়াও ওই যে একটা-দু'টা নৌকো, খেয়াবন্ধ হয়ে যাবার পর মাঝিরা যাদের পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে ঘরে, একাকী ঘাট থেকে দূরে এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চুপ, তাদের দেখে ওর মনে হয় যেন ওরাও সারা দিনের কর্ম্মবিরতির পর নির্জ্জন সাধনায় বসেছে। এই পূতগঙ্গার ধারার সঙ্গে সারা ভারতের নাড়ীতে নাড়ীতে যে অচ্ছেদ্য বন্ধন রয়েছে তাকে বুঝি ওরাও উপলব্ধি করতে চায় মর্ম্মে-মর্ম্মে। আবার খুব ভোরে উঠে মাথার ওপরে জলজলে শুকতারা দেখে গঙ্গায় ডুব দিয়ে যে সব পুণ্যার্থীরা চুপি চুপি চলে যায় কিংবা আসন্ন সন্ধ্যায় মন্দিরে মন্দিরে যখন কাঁসরঘণ্টা বেজে ওঠে, আর তার ধ্বনি সামনের বিস্তৃত গঙ্গা অতিক্রম করে, রামনগরের বালুচর পেরিয়ে রাজপ্রাসাদের চূড়া ও পিছনের ঘন অরণ্যের কালরেখা ছাড়িয়ে আরো ঊর্দ্ধে অন্ধকারে সদ্যজাগা তারাদের বুকে কাঁপতে থাকে তখন যে দু'চারটি ভাবসমাহিত মূর্ত্তি নিঃশব্দে ঘাটের চাতালের কোথাও না কোথাও বসে থাকে, তাদের দিকে তাকিয়ে নিমেষে বিপিনের মন যেন এই সংসার থেকে বহুদূরে কোন এক তপোবনের মধ্যে প্রবেশ করে। ক্ষণিক হলেও এর অনুভূতিটুকু তার অন্তরের গভীরে পূজার প্রদীপের মত জ্বলতে থাকে।

কিন্তু এত ভাললাগা সত্ত্বেও কখনো এদিকটায় বিপিনের বাস করা হয়ে ওঠে না। যখনই আসে হোটেলে, ধর্ম্মশালা কিংবা বড়লোক বন্ধু-বান্ধবদের ওখানে থেকে চলে যায়। কিন্তু প্রত্যেক বারই যাবার সময় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, এবার এসে আর ওই হাটবাজারের কোলাহল ও টাঙ্গা, এক্কা, সাইকেল-রিক্সার ভীড়ের মধ্যে থাকবে না কিছুতেই। আর বন্ধু-বান্ধবদের এই অঞ্চলে ঘর দেখে দিতে বললে, তারা বাধা দেয়। বলে, রামো, ওখানে কি তোমার মত লোক বাস করতে পারে? না বাথরুম, না ভালো আলোর ব্যবস্থা আছে, তাছাড়া বাড়ীগুলো সব পুরনো মান্ধাতার আমলের, এখন এক-একটি রোগের ডিপোতে পরিণত হয়েছে।

বিপিনের মুখে-চোখে বিস্ময়ের সীমা থাকে না, সে প্রশ্ন করে, কিন্তু এত লোক জেনে-শুনে তবে সেখানে বাস করে কি ভাবে?

উত্তর আসে, যত সব বুড়োবুড়ির দল—ওরা মণিকর্ণিকা পাবার আশায় ওখানকার ওয়েটিংলিষ্টে নাম লিখিয়ে, দিন গুণছে।

বিপিনের মন কিন্তু এ-সব যুক্তি মেনে নিতে পারে না। সে বার ওখানে বাস করার তীব্র বাসনা তাকে এমন ভাবে পেয়ে বসলো যে, কাউকে কিছু না বলে একেবারে ষ্টেশন থেকে সোজা সাইকেল-রিক্সা চেপে সে হাজির হলো শিবালয়ে। তারপর খুঁজতে খুঁজতে একটা বাড়ীতে দু'খানা ঘরের সন্ধান পেলে। একখানা দু'তলায়, একখানা তিন তলায়—পৃথক ভাবেই ভাড়া দেবে।

বাড়ীটা যেমন পুরনো তেমনি অন্ধকার। নীচের তলাটায় দিনের বেলাও ভাল করে দেখা যায় না—ভেতরে ঢুকতেই ঝাপসা স্যাঁতসেঁতে একটা দুর্গন্ধ নাকে এলো বিপিনের। চৌকো উঠানটা পেরিয়ে খাড়াই পাথরের সিঁড়ির উঁচু-উঁচু ধাপ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সে ওপরে উঠলো, তার পর দু'খানা ঘর ও একটা ছোট্ট বারান্দা পেরিয়ে ভেতরের দিকে আরো কিছুটা অগ্রসর হতে যে ঘরখানায় এসে পড়লো, সত্যি সেটি চমৎকার! একেবারে গঙ্গার ওপরে তার বারান্দাটা ঝুলছে। আর একটা চামেলী ফুলের গাছ, অজস্র ডালপালা নিয়ে ঘরটাকে তিন দিক থেকে যেন ঘিরে রেখেছে। ফুটন্ত ফুলে গাছটার সর্ব্বাঙ্গ ভরে রয়েছে, বারান্দাটায় ঝরে পড়েছে আরো অসংখ্য ফুল।

এ ঘরটা মাঠাকরুণ কাউকে ভাড়া দেন না। বলে বিপিনকে নিয়ে তার পাশে আর একটা ঘরে গেল ঝি।

সে ঘরটা এর চেয়ে বড় এবং আরো বেশী ফাঁকা, আলো-বাতাসও ঢোকে বেশী কিন্তু চামেলী ফুল এর ত্রিসীমানায় নেই, তাই বিপিনের এটা পছন্দ হলো না। সে ঝিকে বললে, আমি ওই চামেলীফুলওলা ঘরটা চাই।

ওটা ত ভাড়া দেওয়া হয় না, আগেই বলেছি। বলে ঝি মুখটা ফিরিয়ে নিলে বিপিনের দিক থেকে।

বিপিন বললে, কিন্তু আমার এই ঘরটাই পছন্দ। তোমার মাঠাকরুণকে জিজ্ঞেস করে এসো, ভাড়া দেবেন কি না। আমি কেবল দশ দিন থাকবো এখানে।

ঝি চলে যাচ্ছিল, বিপিন বললে, হাঁ যদি দেন, তাহ'লে ভাড়াই বা কত দিতে হবে সেটাও জিজ্ঞেস করে আসতে ভুলো না।

একটু পরে ঝি ফিরে এসে বললে, ও ঘরটা হবে না। তবে ওপাশের ঘরটার মাসিক ভাড়া পনেরো টাকা। দশ দিন থাকলে ওর অর্দ্ধেক ভাড়া দিতে হবে আপনাকে। বিপিন বললে, আচ্ছা আমি যদি পনেরো টাকা পুরো দিই, তাহ'লেও কি তোমার মাঠাকরুণ ওই ঘরটায় আমায় দশটা দিন থাকতে দেবেন না? জিজ্ঞেস করে এসো আর একবার তাঁকে।

ভেতর থেকে ঘুরে এসে এবার ঝি বললে, আচ্ছা, তাহ'লে আপনার জিনিষপত্রগুলো গাড়ী থেকে নিয়ে আসুন। মাঠাকরুণ বললেন, যখন এতই পছন্দ হয়েছে আপনার এই ঘরটা, তখন থাকুন। তিনি পূজোয় বসেছেন, নইলে নিজেই আসতেন। টাকাটা কিন্তু সব আগাম এখনি দিতে হবে, তিনি বলে দিলেন।

ঝির মুখের কথা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গেই টাকাটা পকেট থেকে বার ক'রে তার হাতে দিয়ে বিপিন চলে গেল জিনিষগুলো গাড়ী থেকে আনতে।

ঝি ঘরটা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিলে, জিনিষপত্র গোছ-গাছ করে রেখে বিপিন গিয়ে দাঁড়ালো বারান্দায়। সামনে অবারিত গঙ্গা, তাকে ছাড়িয়ে ওপারে ধূ-ধূ করছে রামনগরের চড়া। একটি পাল-তোলা নৌকো তুলসীঘাটের দিক থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। ডান পাশে যে ঘাটটা তার নড়বড়ে পুরনো সিঁড়ি ভেঙ্গে ভিজে কাপড়ে কমণ্ডলু হাতে উঠে এলো এক বৃদ্ধা। বুড়ো বটগাছটার তলায় এবং কালো কালো কয়েকটা নুড়ি পাথরের ওপর বিড়-বিড় ক'রে মন্ত্র পড়তে পড়তে গঙ্গাজল ঢেলে দিয়ে চলে গেল। ভোরের ফোটা চামেলীর গন্ধ তখনো ফুরিয়ে যায় নি, বরং সূর্য্যের তাপ লেগে তার মাদকতা বেড়েছে আরো। সে সৌরভ নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে করতে বুঝি বিহ্বল হয়ে যায় বিপিন। তাই আরো অনেকক্ষণ ঠিক সেই জায়গায় উদাস দৃষ্টি মেলে সে দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি ভাবে। মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা বুঝি তার চোখের সামনে নানা রঙের ছবি এঁকে চলে।

এক সময় যেন তার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। মুখে শুধু 'বাঃ' এই শব্দটা উচ্চারণ করে ধীরে ধীরে ঘরে গিয়ে ঢোকে।

সে দিন ঐ অঞ্চলের ঘাটগুলো বিপিন বেড়িয়ে বেড়ালো অনেক রাত পর্যন্ত। তার পর আবার যখন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো তখন রামনগরের চড়ার ওপর ত্রয়োদশীর যে চাঁদ উঠেছিল তার জ্যোৎস্না যেন গঙ্গার জল সাঁতরে পার হয়ে এসে সেই বারান্দার ওপরের চামেলীকুঞ্জের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঝরা ফুলে আর জ্যোৎস্নায় সারা বারান্দায় যেন আলপনা আঁকা, সতরঞ্চিটা ঘর থেকে এনে এক কোণে পেতে চুপ করে বসে রইলো বিপিন। হাওয়ায় তার চোখের সামনে চামেলীর লতানে ডালগুলো যেন ফুলে ফুলে উঠছিল রেশমী ঝালরের মত।

সহসা ঝিয়ের কণ্ঠস্বর শুনে বিপিনের যেন ধ্যান ভঙ্গ হোলো! ঝি বললে, বাবু, মা-ঠাকরুণ এসেছেন আপনাকে রসিদটা দিতে।

ওঃ, বলে উঠে বসতেই তার সামনে এসে দাঁড়ালেন শুভ্র থান-পরিহিতা এক বিধবা ভদ্রমহিলা। তাঁর দেহের কোথাও কোন ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন ত ছিলই না বরং যাকে বলে একেবারে নিরাভরণা। অনেকটা তপস্বিনীর মত শীর্ণা অথচ জ্যোতির্ম্ময়ী সে মূর্ত্তি। চাঁদের আলো তাঁর চোখে-মুখে, সারা গায়ে এসে পড়েছিল। তারই আভায় বিপিনের মনে হলো এক কালে ইনি বেশ সুন্দরী ছিলেন।

কেবল রসিদটা তিনি দিলেন না। সেই সঙ্গে আরো সাড়ে সাতটা টাকা বিপিনকে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, মা গঙ্গার বুকে বাস করে আমি অন্যায় করতে পারবো না। ঘরটা পছন্দ হয়েছে বলেই যে ধমক দিয়ে আপনার কাছ থেকে বেশী আদায় করে নেবো, তা ভাববেন না।

বিপিন জিভ কেটে বললে, না না, আমি মোটেই তা ভাবিনি। শুনলুম এ ঘরটি আপনি কাউকে ভাড়া দেন না, শুধু আমায় যে দিয়েছেন তাতেই আমি কৃতার্থ হয়েছি, সত্যি এ ঘরের তুলনা হয় না। সামান্য টাকায় কি এ সৌন্দর্য্যের মূল্য দেওয়া যায়! আহা কি সুন্দর চামেলী ফুল!

আপনি বুঝি চামেলী ফুল খুব ভালবাসেন? মহিলাটি একটু থেমে হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন বিপিনকে। বিপিন বললে, কে না ভালবাসে বলুন—এমন সুন্দর ফুল! তবে সত্যি কথা বলতে কি, এই চামেলী ফুলের সঙ্গে আমার মনে এমন এক বিন্দু স্মৃতি জড়ানো আছে যে এই ফুল দেখলেই সেদিনের কথাটা মনে পড়ে যায়।

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরিষ্কার সুমিষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তাই বুঝি এই ঘরটায় থাকবার জন্যে এত ঝোঁক আপনার?

বিপিন একটু ইতস্ততঃ করে বললে, হাঁ, অনেকটা সেই জন্যেই বলতে পারেন। তবে সেই যে চামেলী দেখেছিলুম তার সঙ্গে একমাত্র তুলনা দেওয়া যায় আপনার এই গাছের। ঠিক এমনি ভাবে লতিয়ে উঠেছিল এত বড় গাছটা এবং এই ভাবে বারান্দাটাকে চতুর্দ্দিক থেকে ঘিরে যেন ফুলের কুঞ্জে পরিণত হয়েছিল। আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! সেই কথাটাই এখানে আসার পর থেকে বারে বারে কেবলি মনে পড়ছে। একেবারে, হুবহু এক!

সে কোথায় দেখেছিলেন, এই কাশীতেই নাকি?

না। সে দেখেছিলুম নিউ দিল্লীর এক ছোট্ট সরকারী কোয়ার্টারে! বললে বিশ্বাস করবেন না, এমন রুচি এমন শিল্পবোধ আমার জীবনে আর কোন দিন কোন মেয়ের আমি দেখিনি। সহসা বিপিনের মুখ-চোখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কিসের আবেগে! বিপিন যেন তার মনশ্চক্ষুর সামনে তাকে দেখছে, তাই তার কণ্ঠ দিয়ে ভাবোচ্ছ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এলো, কি রোমান্টিক, কি সেন্টিমেন্টাল মেয়ে!

মেয়ে? আপনার তিনি কে হন? প্রশ্ন করলেন মহিলাটি আস্তে আস্তে মাথার ওপরে ঘোমটার কাপড়টা টেনে দিতে দিতে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিপিন বললে, কেউ হন না। হলে ত সারা জীবন তাকে মাথার মণি করে রাখতুম। ওরকম মেয়ে এ জগতে দুর্লভ! লাখে একটাও মেলে না। অথচ কি একটা বর্ব্বরের হাতে পড়েছিল। সংসারের এমনি উল্টো নিয়ম। পাকা ফল চিরকাল দাঁড়কাকেই ভোগ করে। বলে উদাস দৃষ্টিতে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইলো।

তার মানে? তার স্বামী কি তাকে মার-ধোর করতো?

তাহ'লেও ত বাঁচতুম। কিন্তু সে একেবারে পাথরের দেবতা! তার প্রাণ বলতে বা অনুভূতি বলতে কিছু নেই। তাই বার বার শুধু তার পায়ে ব্যর্থ হয়ে মাথা খুঁড়েছে সে কিন্তু কোন সাড়া আসেনি।

মহিলাটি এবার কণ্ঠে জোর এনে বললো, মাপ করবেন। যদিও আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার কোন কথা বলা অশোভন, তবু বড় কৌতূহল হচ্ছে, আপনার কথা শুনে। যদি কিছু মনে না করেন ত একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

হাঁ হাঁ স্বচ্ছন্দে—মনে কোন দ্বিধা রাখবেন না। এ অনেক দিন আগের কথা, এখন প্রায় গল্পে পরিণত হয়েছে। আমি তখন সবে কলেজ ছেড়েছি! বয়েস একুশ কি বাইশ হবে।

মহিলাটি ঠোঁটের কোণে ছোট্ট একটা হাসি চেপে নিয়ে বললেন, আমার মনে হচ্ছে আপনি বোধ হয় তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন কিন্তু মেয়েটির বাপ-মা দেননি কিংবা আপনি তার প্রেমে পড়েছিলেন, ব্যর্থ হয়েছেন।

সশব্দে একটা নিঃশ্বাস ফেললে বিপিন। তার পর বললে, আপনার অনুমান কোনটাই সত্যি নয়। তবে ওরকম মেয়ের প্রেমে পড়তে সবাই চায়। কবির ভাষায় যাকে বলে, 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল।'

ও-সব ত কাব্যের হেঁয়ালি। আপনি পড়েছিলেন কি না, তাই জিজ্ঞেস করতে চাই।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিপিন বললে, আমার পক্ষে ত পড়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু ও-পক্ষ পড়েছিল কি না সেটা আজ পর্য্যন্ত আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় হয়ে রইল। যার জন্তে কিছুতেই ভুলতে পারি না সে কথা।

কি রকম? এ যে রীতিমত একটা নভেল-নাটক বলে মনে হচ্ছে। বলে আঁচলের প্রান্ত দিয়ে মুখের হাসি চেপে নিলেন।

বিপিন এবার গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললে, নভেল-নাটকের চেয়ে অনেক বেশী গভীর। তবে বলি শুনুন। আপনাকে হয়ত বলতুম না। কিন্তু আপনার কণ্ঠস্বরে মনে হচ্ছে আপনি এমন গুরুতর ব্যাপারটাকে বিদ্রূপের চোখে দেখছেন। তাই আপনাকে না-বলা পর্য্যন্ত আমার মন সুস্থির হবে না কিছুতেই।

তখন সবে যুদ্ধটা লেগেছে। ভারতবর্ষে বিশেষ করে দিল্লী শহরে মিলিটারীর কড়া পাহারা। গাড়ী লেট্ করার ফলে রাত্তির দশটার সময় নিউ দিল্লীর পথে পথে আমার আত্মীয়ের বাড়ী খুঁজে বেড়াতে লাগলুম। যে ঠিকানাটা জানা ছিল সেখানে গিয়ে দেখি, এক ইয়া দাড়ী-গোঁফওলা পাঞ্জাবী বাস করে। উনচল্লিশ নম্বরের বাড়ী খুঁজে না পেয়ে তখন উনপঞ্চাশ, উনতিরিশ, উনষাট, উনসোত্তর প্রভৃতি নম্বরের বাড়ীগুলোতে গিয়ে একে একে কড়া নাড়তে লাগলুম। আমার তখন মাথাটা যেন কেমন গুলিয়ে গেছে। হয়ত নম্বরটা আমিই ভুলে গিয়েছিলুম, কিন্তু নম্বরটার শেষে যে নয় ছিল এ সম্বন্ধে আমি একেবারে সুনিশ্চিত। ট্যাঙ্গাওয়ালাটাকে সঙ্গে নিয়ে এই ভাবে ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়ে যখন একটাও বাঙ্গালীর বাড়ী খুঁজে বার করতে পারলুম না, তখন ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। দিল্লীতে সেই প্রথম পদার্পণ করেছি। এর আগে বার কতক শুধু আসানসোল ষ্টেশনে নেমে পিসিমার বাড়ী গিয়েছিলুম। তাছাড়া ট্যাঙ্গাওলাটা আরো ভয় দেখিয়ে দিলে। বললে, ধর্ম্মশালার ফটক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোন হোটেলেও স্থান হবে না। কারণ, সব জায়গায় মিলিটারী ভর্ত্তি। তারা মদ খায়, হুল্লোড় করে সারা রাত।

তখন সব উন নম্বরগুলো যাচাই করে দেখবার জন্তে একে একে সব বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়তে লাগলুম। এদিকে রাস্তা-ঘাট সব এত নির্জ্জন যে গাড়ীঘোড়া দূরে থাক, একটা পথচারীও কোথাও নজরে পড়লো না। আর রাত ত তখনো সাড়ে দশটার বেশী হয়নি। যা হোক, এমনি ভাবে মরীয়া হয়ে কয়েকটা বাড়ীর কড়া নেড়ে ব্যর্থ হয়ে শেষে একবারে সর্বশেষ বাড়ীটার কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এলেন এক বাঙ্গালী। অত্যন্ত কাঠখোট্টা চেহারা, যেমন কালো রঙ, তেমনি শুকনো হাড়-বার-করা মূর্ত্তি। কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে উঠতে হয়েছে ব'লে বিরক্তিতে মাখা তাঁর মুখ। কা'কে চান? জিজ্ঞেস করলেন এমন রুক্ষস্বরে যে ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। তবু সাহসে ভর করে কথা পাড়লুম, আজ্ঞে আপনি ত বাঙ্গালী?

দেখে কি মনে হয়? তিনি খেঁকে উঠলেন।

আমি তখন আমার বিপদের কথাটা সবই আনুপূর্ব্বিক তাঁকে বর্ণনা করলুম। আমার আত্মীয়ের নামটা বলে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি যখন বাঙ্গালী এবং এখানে অনেক দিন আছেন, তখন নিশ্চয় তাঁর বাড়ীটা চেনেন?

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, মাপ করবেন। আমি এখানকার কোন বাঙ্গালীকে চিনি না। বরং সাহেব-সুবোদের কথা বলুন ত ঠিকানা বলতে পারি।

আমি এবার একটু থেমে বললুম, আচ্ছা উপস্থিত আজকের রাতটা কাটাতে পারি এমন-কোন স্থানের সন্ধান বলে দিতে পারেন, তাহ'লে বড়ই উপকৃত হই।

তিনি বললেন, কোন হোটেল-টোটেলে গিয়ে দেখুন। এত বড় রাজধানী জায়গা, এখানে টাকা যোগালে শুধু হোটেল কেন, আরও অনেক কিছু মেলে। বলে আমার মুখের সামনে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

আমি তখন প্রায় ট্যাঙ্গার কাছ বরাবর এসে দাঁড়িয়েছি, পিছন থেকে আমায় তিনি ডাকলেন, ও মশায়, শুনে যান।

কাছে যেতেই দেখি, তাঁর কণ্ঠস্বর একেবারে বদলে গেছে। রুক্ষতার বদলে মাধুর্য্য যেন ঝরে পড়ছে। বললেন, আমার স্ত্রী বলছিলেন যে আমাদের ঘরে খেতে দেবার মত কোন কিছু নেই, যদি শুধু রাত্তিরটা শুয়ে থাকতে চান, তাহ'লে আমার এই বৈঠকখানাটায় থাকতে পারেন। এখানের 'রেশন' বড় কড়াকড়ি কি না।

যদিও পেটের মধ্যে আগুন জ্বলছিল, তবু মুখে বললুম বিলক্ষণ,

আমি দিল্লীর ষ্টেশন থেকে খেয়ে আসছি। শুধু রাতটুকু কোন রকমে একটা আশ্রয় পেলে বেঁচে যাই। কাল সকালে ঠিক তাঁকে খুঁজে বার করবো।

যা হোক, এই ভাবে একটু আশ্রয় পেলুম বটে, কিন্তু ঘরের মধ্যে পা দিয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। অনেক ধনী ও রাজা-মহারাজার সাজানো বৈঠকখানা দেখেছি কিন্তু ওরকম পরিচ্ছন্ন অথচ সুরুচিসম্মত সাজানো ঘর কখনো দেখিনি!

বাড়ীর মধ্যে কলতলায় মুখ ধুতে গিয়ে বিস্ময় আরো বাড়লো। যেমন কলঘর, তেমনি উঠান, তেমনি বারান্দা, সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। সিঁদুর পড়লে যেন খুঁটে তোলা যায়। এই সময় ভেতরের বারান্দাটায় চোখ পড়তে চমকে উঠলুম চামেলী ফুলের শোভা দেখে। সারা গাছটা যেন সেই বারান্দাটাকে ঘিরে রেখেছে তিন দিক থেকে, ঠিক এরই মতন আর অসংখ্য ফুল সাদা হয়ে ফুটে আছে তার সর্ব্বাঙ্গে। সেদিনটা ছিল এমনি শুক্লপক্ষের রাত। শরতের মেঘহীন নীল আকাশ থেকে জ্যোৎস্না এসে বাড়ীর ভিতরের উঠানে ও সেই পুষ্পকুঞ্জটায় মাতামাতি শুরু করেছিল।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। রাত তখন বোধ হয় সাড়ে বারোটা হবে, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। পা টিপে টিপে পাশের কাচের জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে শিউরে উঠল সর্ব্বাঙ্গ! দেখি অপূর্ব্ব রূপবতী একটি তরুণী নাচছে সেই চামেলীর কুঞ্জে, তার সর্ব্বাঙ্গে চামেলী ফুলের অলঙ্কার ঝলমল করছে। নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে সে যখন তার স্বামীর পায়ের ওপর তার দেহের সমস্ত রূপ-যৌবন উজাড় করে দিতে গেল তখন তার স্বামী ঘুমে অচেতন। তরুণীটি তখন তার পায়ের কাছে বসে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

পাছে আমি জেগে আছি জানতে পারে, তাই চুপি চুপি এসে আমার বিছানায় শুয়ে পড়লুম। সারা দিনের ক্লান্তি, বোধ হয় একটু পরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। এবার গভীর রাত্রে সেই তরুণীটির কান্নার শব্দে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার স্বামীর কণ্ঠস্বর বেশ স্পষ্টই আমার কানে এলো—কেন তুমি বৈঠকখানা-ঘরে ঢুকেছিলে, সত্যি করে বলো, ও তোমার কে হয়?

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে যত বলে, আমি যাইনি, ওকে চিনি না, ও বিদেশী। ওর স্বামী বলে, মিথ্যে কথা। নইলে আমি ওকে আশ্রয় দিতে চাইনি, তুমি নিজে ওকে ডাকতে পাঠিয়েছিলে কেন?

আতঙ্কে আমার বুকটা কাঁপতে লাগল। সর্ব্বনাশ! বলে কি। আমার ঘরে এসেছিল তরুণীটি! এর চেয়ে আর বড় মিথ্যা কি হতে পারে! ভাবতে ভাবতে যেই নিঃশব্দে পাশ ফিরতে যাবো অমনি একটা চামেলী ফুলের মালা আমার হাতে ঠেকলো। আমার মাথার বালিশের পাশেই পড়ে ছিল। এই বৈঠকখানা-ঘরের মধ্যে নানা পাত্রে চামেলী ফুল সাজানো ছিল। আর তারি সুগন্ধে সারা ঘর ছিল মদির হয়ে। কাজেই মাথার কাছের ওই ফুলের মালার যে এত গন্ধ, তা নতুন করে উপলব্ধি করতে পারিনি। কোথা থেকে এলো এটা এখানে? চিন্তা করতে যাচ্ছি, এমন সময় তার স্বামীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আমার কানে এলো, আচ্ছা সকাল হোক, তখন এর ফয়শালা হবে, ওই ছোকরাকে ডেকে। দেখি তুমি কত বড় চতুর। তার পর চাবুক মেরে তোমাদের দু'জনের পিঠের ছাল-চামড়া এক করে দেবো।

এই পর্যন্ত বলে বিপিন হঠাৎ থেমে গেল।

মহিলাটিও যেন কিসের চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন। তাই উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সহসা তিনি বলে উঠলেন, তার পর কি হ'লো?

বিপিন বললে, তার পর আর কি হবে? ভোর হবার আগেই দরজা খুলে একেবারে চম্পট! হাঁ, বলতে ভুলে গেছি, সেই ফুলের মালাটা পকেটে করে।

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, পাছে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' হয় সেই ভয়ে নিশ্চয়? না হয় মারই খেতেন অমন মেয়ের জন্যে?

বিপিন বললে, শুধু মার কেন, মরে যেতেও রাজী ছিলুম তার জন্যে। কিন্তু আমার সামনে তার গায়ে কেউ হাত দেবে, আর তা দাঁড়িয়ে চোখে দেখতে হবে। তা ছিল কল্পনারও অতীত। বলে সহসা থেমে গেল বিপিন।

ওদিকে ভদ্রমহিলারও মুখের কথা কে যেন হরণ করে নিলে। তিনিও তেমনি ভাবে মৌন থেকে কখন যে নিজের ঘরে চলে গেলেন নিঃশব্দে, বিপিন তা জানতেও পারলে না।

পরদিন থেকে ভদ্রমহিলা যেমন আর বিপিনের সামনে আসেন নি, তেমনি তারও প্রয়োজন হয়নি তাঁকে। বিপিন নিজের মনেই থাকে। বারান্দায় বসে বসে কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকে গঙ্গার দিকে, কখনো বা ঘাটের সিঁড়িতে অনেক রাত পর্য্যন্ত কাটিয়ে ঘরে ফেরে।

শেষ দিন। বিছানাপত্তর বেঁধে গাড়ী ডাকতে যাবার আগে বিপিন ঝিকে ডেকে না পেয়ে নিজেই ঘরের চাবীটা ফিরিয়ে দিতে গেল ভেতরে। কিন্তু দরজা পেরিয়ে ঠাকুরঘরের সামনে যেতেই সে শিউরে উঠলো। যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে সাহস হচ্ছে না। এ কেমন করে সম্ভব? ভদ্রমহিলা তখন ঠাকুরঘরে জপে বসেছিলেন। একেবারে হুবহু সেই চেহারা। সেই নিউ দিল্লীর কোয়ার্টারে দেখা মূর্ত্তি চামেলীর ফুলে সুসজ্জিতা অত্যাশ্চর্য্য মহিলা! একবার বিপিনের মনে হলো, না এ কিছুতেই হতে পারে না। এ তার মনের বিকার। সে স্বপ্ন দেখছে না ত? চোখটা দু'হাতে রগড়ে নিয়ে আবার চাইতেই, তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ঠাকুরঘরের সামনের দেওয়ালটার ওপর। সেখানে যে বড় বাঁধানো ফটোটা ঝুলছিল, সেটা দেখে নিমেষে তার সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেল। হাঁ, এ তবে সেই! চামেলীর অলঙ্কারে শোভিতা হয়ে তার স্বামীর চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পাশের সেই লোকটিকেও চিনতে তার কিছুমাত্র বিলম্ব হলো না। তার স্বামীর সেই চেহারা হুবহু!

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত বিপিন কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর প্রথমেই ভাবলে, না পালাই, এ মুখ কি করে দেখাবো তাঁকে? আবার পরক্ষণেই মনে হলো, না তার চেয়ে ওঁকে ডেকে ভাল করে বিদায়টা নেবে আজ! আর সেদিনের কথাটা মুখ ফুটে একবার জিজ্ঞেস করবে। সত্যি মালাটা কি ক'রে ওর ঘরে এলো? তবে কি সত্যিই সেই? আর উচ্চারণ করতে পারলে না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলে কিন্তু তবু কিছুতেই ভরসা পেলে না। কি জানি যদি বলে, না। তখন চোরের মত চুপি চুপি চাবীটা সেখানে রেখে পালিয়ে এলো।

সন্ধ্যা বসাক

প্রো গ্রামটা দেখতে দেখতে চমকে ওঠে পল্লব। আরে কার নাম দেখছে সে! এ-ও কি সম্ভব? আরেক বার কাগজটা খুলে দেখতে থাকে। না ঠিকই আছে, শ্রীমতী সুতপা ব্যানার্জ্জী। আজ-কালকার বিখ্যাত গায়িকা। হ্যাঁ, সুতপাই একদিন তার জীবনে এসেছিল। একেই পাবার নেশায় পল্লব উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। নিজের সব-কিছুকে বিসর্জ্জন দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সুতপাও কি তাই চেয়েছিল? মনে পড়ে যায় বিগত দশ বছর আগেকার কথা। স্মৃতির ছেঁড়া পাতার কয়েকটা টুকরো-টুকরো ঘটনা। যাকে আজও মুছে যেতে দেয়নি পল্লব। কল্পনা দিয়ে যাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ঠিক দশ বছর আগের এমনি একটা দিন।

সেদিন আকাশটা ছিল মেঘলা। মাঝে মাঝে ঝির-ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। হঠাৎ কি মনে হয়েছিল পল্লবের, গিয়েছিল ওস্তাদজীর বাড়ীতে। সুতপা তখন ওস্তাদের কাছে গান শিখছিল। কি একখানা যেন রাগপ্রধান গাইছিল। গলার কাজগুলো সেদিন পল্লবের কাছে অপূর্ব্ব লেগেছিল। গান শেষ হলে ওস্তাদজী ও'দের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

পল্লব বলেছিল—"সত্যি, আপনি অদ্ভুত ভাল গান গাইতে পারেন!"

সুতপা বলেছিল—"দেখুন, এ আপনার কিন্তু ভারী অন্যায়। এরকম ভাবে লজ্জা দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?"

কি একটা উত্তর দিতে গিয়েছিল পল্লব। এমন সময় ওস্তাদজী তাকে গান ধরতে বলেছিলেন। আর সুতপার কাছ থেকেও এ বিষয়ে এসেছিল একটা ছোট্ট অনুরোধ। পল্লব সেদিন গান গেয়েছিল বটে, কিন্তু কেমন যেন একটা আড়ষ্ট ভাব এসে গিয়েছিল মনে। গান শেষ হলে সুতপা তাকে তাদের বাড়ীতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

সেদিন বাড়ী ফিরে পল্লব যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কিছুতেই পড়ায় মন দিতে পারেনি। বার বার সুতপার কথা মনে পড়েছিল। এর পর কয়েকটা দিন কেটে গিয়েছিল। পল্লব কিন্তু সুতপাদের বাড়ী যেতে পারেনি। ওস্তাদজীর কাছে শুনেছিল যে, সুতপার বাবা বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। আর সুতপা তাঁর একমাত্র কন্যা। নিজের দারিদ্র্যতার সঙ্কোচ বোধ করেছিল পল্লব, আর সেইটাই হয়েছিল সুতপাদের বাড়ী যাবার পথে বাধা।

সেদিন কলেজ থেকে বেরিয়ে পল্লব যখন "কলেজ স্কোয়ারের" সামনে ট্রাম ধরবার জন্যে অপেক্ষা করছিল, হঠাৎ যেন কে তার নাম ধরে ডেকেছিল। পিছন ফিরে দেখে, সুতপা। জিজ্ঞেস করেছিল পল্লব—"আরে আপনি এখানে?"

সুতপা হেসে উত্তর দিয়েছিল—"একথাটা কিন্তু আমারই জিজ্ঞাসা করার কথা।"

"ওঃ আমি, এই কলেজ থেকে বাড়ী ফিরব বলে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু আপনি এখানে কেন, কই বললেন না ত?"

"না, আমি আমার এক বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আপনাকে দেখতে পেয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়েছি। তা, ট্রামে ত এখন ভীষণ ভীড়। আপনি যাবেন কি করে? চলে আসুন না আমার গাড়ীতে।" একসঙ্গে এই এতগুলো কথা বলেছিল সুতপা। প্রথমে পল্লব আপত্তিই করেছিল। কিন্তু সুতপার আবেদনকে সে উপেক্ষা করতে পারেনি সে দিন। গাড়ীতে উঠে সুতপা জিজ্ঞেস করেছিল—"আচ্ছা, আপনাকে এত বার বলতেও, আপনি আমাদের বাড়ী যাননি কেন বলুন তো?"

এ-কথার আর কি উত্তর দেবে পল্লব? বলেছিল—"না, ক'দিন একটা থিসিস লেখায় খুব ব্যস্ত ছিলাম কি না, তাই সময় হয়ে ওঠেনি।"

সুতপা বলেছিল—"ওঃ, তাই বলুন। আমি ভেবেছিলাম যে আপনি বুঝি আমাকে ভুলেই গেছেন!"

হঠাৎ যেন মনের সমস্ত ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল পল্লবের। মন্ত্রমুগ্ধের মত বলেছিল—"তোমাকে ভুললেও, তোমার গানকে কি ভুলতে পারি সুতপা?" কথাটা বলে ফেলেই লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছিল পল্লব। আর ভালো করে সারাক্ষণ গাড়ীতে কথা বলতে পারে নি। সব সময় কেবল মনে হয়েছিল যে তার এই ব্যবহারে সুতপা হয়ত কি মনে করল। কিন্তু তার সমস্ত অনুমান মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল, সুতপা যখন তাকে টানতে টানতে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল।

পল্লব শুধু একবার প্রতিবাদ করে বলেছিল—"কারণ কি?" সুতপার কাছ থেকে উত্তর এসেছিল—"দেখুনই না।"

সেদিন সুতপার বাবা-মার সঙ্গে পল্লবের পরিচয়ও হয়েছিল।

দিন যেতে লাগল। পল্লব আর সুতপার পরিচয়ও ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। পল্লব সুতপাকে নিত্য-নতুন ছন্দে আবিষ্কার করেছিল। সুতপাও হয়ত নিজের অলক্ষ্যে পল্লবের কাছে ধরা দিয়েছিল, অন্তত পল্লবের দৃষ্টিতে। কিন্তু পল্লব কি বুঝতে পেরেছিল যে, এই মেয়েটিরই মনের অতল কোণে বিষের ছুরি লুকিয়ে আছে? পল্লব তখন সৃষ্টির নেশাতেই ছিল বিভোর। কোন দিন সুতপার কাছ থেকে কি পেল না পেল, সে নিয়ে ভাবে নি। পল্লবের এই সৃষ্টির জাল একদিন হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়েছিল আর তা থেকে সুতপার স্বরূপটাও বুঝতে ভুল করেনি পল্লব।

সেদিনটার কথা আজও ক্ষণে ক্ষণে চকিত বিদ্যুতের মত মনে পড়ে যায় পল্লবের। সেদিনটাও ছিল আজকের মত এক শীতের দিন। বিকেলের দিকে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি হওয়ায় শীতটা একটু বেশী মনে হচ্ছিল। ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস সোঁ-সোঁ করে বইছিল। সকাল থেকেই পল্লবের মনটা ভাল ছিল না। তার ওপর—

বিকেলের টিপটিপানি বুঝি মনটাকে আরও বিগড়ে দিয়েছিল। মনের জড়তাকে কাটিয়ে সুতপাদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছিল পল্লব। বাড়ীতে তখন সুতপা ছিল না। সে জন্ত সুতপার বাবার সঙ্গেই আলোচনায় ব্যস্ত ছিল পল্লব। হঠাৎ আলোচনার মাঝে ছেদ পড়েছিল সুতপার বাবার কথায়, "আরে, এসো, এসো। দীপক যে!"

এর পরে সুতপার বাবা দীপকের সঙ্গে পল্লবের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে সুতপার মা কখন ঘরের মধ্যে এসে গিয়েছিলেন। পরিচয়ের সূত্রে তিনি পল্লবকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, দীপক হবে এ-বাড়ীর জামাই। আর ভাবী জামাই-এর বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশেষতঃ ঐশ্বর্য্যেরও পরিচয় দিতে বাকি রাখেন নি। কিন্তু অত কথা তখন পল্লবের কানে যায়নি। একটা কাজ আছে বলে সুতপার বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল সেদিন। ওদের বাড়ীর গেটের কাছে সুতপার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল পল্লবের। মনের মধ্যে একটা প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল সুতপার মনের কথা জানতে। তাই বলেছিল সুতপাকে,—"তোমার মা'র কাছ থেকে দীপক বাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ের যে খবর পেলাম তা কি সত্যি?"

প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে সুতপা বলেছিল—"হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন?"

পল্লব বলেছিল—"আজ আমি জানতে চাই সুতপা, ওটা কি তোমারও মনের কথা?"

কৌতুকের ছলে সুতপা বলেছিল—"যদি বলি হ্যাঁ।"

পল্লবের কিন্তু তখন মনের অবস্থা পরিহাস শোনবার মত ছিল না। একটু দৃঢ় কণ্ঠেই বলেছিল—"তবে তুমি আমার সঙ্গে কেন এত দিন অভিনয় করে এসেছ সুতপা?"

এবার সুতপাও দৃঢ় স্বরে উত্তর করেছিল—"হ্যাঁ, অভিনয় বলতে পার বই কি। তোমাদের মত বোকাদের সঙ্গে একটু অভিনয়ই করতে হয়। যারা গরীবের ছেলে হয়ে বড়লোকের মেয়েকে পাবার আকাশ-কুসুম রচনা করে, তাদের সঙ্গে অভিনয় না করে উপায় কি? যাই হোক, আমার বিয়েতে আসছ ত'? একটা নিমন্ত্রণ-পত্র পাবে নিশ্চয়ই। যাই আমি এখন," বলেই হনহন্ করে এগিয়ে গিয়েছিল সুতপা।

চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে এসেছিল পল্লবের। মনে হয়েছিল পৃথিবীতে টাকাটাই যেন সব। রূপ, গুণ, সমস্তই টাকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তুচ্ছ হয়ে যায়। সেদিনই সে প্রথম দারিদ্র্যতার আঘাত পেয়েছিল।

হঠাৎ সোরগোলে পল্লবের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। চেয়ে দেখে ষ্টেজের ওপর সুতপা ব্যানার্জ্জী। ভাবে, এই কি সেই সুতপা! যাকে সে প্রথম দিনটিতে এমনি ভাবেই গান গাইতে দেখেছিল! মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে। তাই সবার অলক্ষ্যে হল থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে পল্লব। সুতপা তখন গান ধরেছে। বাইরে শীতের হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। লক্ষ-কোটি যোজন দূরের তারকাশ্রেণী তারই দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছে, যেন তার ব্যথিত হৃদয়ের বেদনায় তারাও মুহ্যমান!

ধনঞ্জয় বৈরাগী

ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ হল এক রেস্তরাঁয়। শনিবারের দুপুর। অফিস থেকে বাড়ী ফিরছিলাম, রাস্তায় বিনয়ের সঙ্গে দেখা। কিছুতেই ছাড়ল না, খাবার জন্যে এখানে ধরে নিয়ে এল। এ রেস্তরাঁ আমার অপরিচিত নয়, বিনয়ের সঙ্গে আগেও কয়েক বার এসেছি। ও বলে, এটা আমার ফেবারিট জায়গা, সময় পেলেই এখানে আসি। ওর মুখে এত বার এই কথা শুনেছি যে এখন আর কারণ জিজ্ঞেস করি না। কয়েক বছর আগে বলতে গেলে এই রেস্তরাঁই ছিল বিনয়ের ঘর-বাড়ী। আর তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল চিতুদা', বিনয়ের ভাষায়, 'চিতুদা' দি গ্রেট।' বিনয় বলত, চিতুদা' সকালে উঠে 'বীয়ার' দিয়ে দাঁত মাজে, হুইস্কিতে চান করে, সারা বাড়ী গঙ্গাজলের মত ককটেল ছড়ায়।

ভদ্রলোকটির কথা এত শুনেছি যে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল। আজ এখানেই দেখা হয়ে গেল। ছিমছাম শরীর, সুন্দর সাজ-পোষাক, রঙ ফরসা না হলেও চোখে-মুখে সেয়ানা হাসির ঝিলিক। বিনয় আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেই বললেন, খবর্দার! বিনয়ের সঙ্গে বেশী মিশবেন না, একেবারে বকিয়ে ছেড়ে দেবে।

উত্তর দেবার কিছুই ছিল না, আমি হাসলাম।

চিতুদা' বলে যান, বিনয় একটি চীজ, আরে মশাই, আমার মত এক সৎ ব্রাহ্মণকে গোল্লায় দিলে। সঙ্গদোষ যে কি জিনিষ জানেন না, কি বল বিনয়, তুমি আমার সঙ্গে একমত নও?

বিনয়ের গোল মুখ হেসে ওঠে, একশ' বার। একটা চোখ ছোট করে ব'লে, সঙ্গদোষ যে কি জিনিষ, আমি আর জানি না?

কথাটা শুনেই চিতুদা'র মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কি যেন ভেবে নিয়ে বলেন, তোমাদের সঙ্গে দেখা হলে কত কথাই মনে পড়ে যায়। কে একজন ভদ্রলোক যেন বলেছিলেন 'ট্রুথ ইজ্ ষ্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকসান।' খুব খাঁটি কথা। হাতের ঘড়ি উল্টে দেখে ব্যস্ত হয়ে বলেন, আমি চলি বিনয়, একটু কাজ আছে।

চিতুদা' চলে গেলে বিনয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নিজের সর্বনাশ নিজে করেছে, মদ আর মদ।

বললাম, ওর কথা একটু খুলে বল না?

—খুলে বলার তো কিছু নেই। বড়ঘরের ছেলে, ভাল ভাবে এম, এ পাশ করে বেরুল। পয়সার লোভে চাকরী নিলে নামকরা হোটেল 'বার'এ। ক্রমে হল 'বার' ম্যানেজার, মাইনে ছ'শ' টাকার ওপর। ডিউটি বিকেল ছ'টা থেকে রাত দুটো, দিনের বেলা ছুটি।

জিজ্ঞেস করলাম, বাড়ীতে আপত্তি ওঠে নি?

—কে আপত্তি করবে? বাপ-মা ছিল না। বাড়ী ছেড়ে অফিসেই পড়ে থাকত। অফিস-ঘরেরই অর্দ্ধেকটা পার্টিশান দিয়ে শোবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল।

—তোমার সঙ্গে কদ্দিনের আলাপ?

বিনয় সিগারেট ধরিয়ে বলতে সুরু করে, তা বেশ কয়েক বছর। এক বন্ধুর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে চিতুর লাইফ ইন্সিওর করতে গিয়েছিলাম। বেশ মনে আছে ওর টেবিলের সামনে গিয়ে বসলাম তখন সন্ধ্যে সাতটা। চিঠি পড়েই জিজ্ঞেস করলে, কত টাকার ইন্সিওর করতে হবে? ঠিক এ ধরণের প্রশ্ন শুনব আশা করিনি। বললাম, আপনার যত খুশী। চিতু বললে, তাহলে তের হাজার করুন।

—তের হাজার কেন? ঐ নম্বরটার ওপর আমার দুর্ব্বলতা আছে। আমি রোজ তের বোতল বীয়ার খাই, তের পেগ হুইস্কি, তের ঘণ্টা কাজ করি।

কথা শুনে আশ্চর্য্য হলাম। পরদিনই মেডিকাল একজামিনেশন করিয়ে চেক লিখে দিলে প্রিমিয়ামের। বললেন, মাঝে মাঝে আসবেন, আপনার কিছু কেস্ করিয়ে দেব।

সেই থেকে প্রায়ই যেতাম। খুব অল্প সময়ের মধ্যে লোক ধরে ধরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওর করিয়ে দিল। আমি বলেছিলাম কমিশান বাবদ কিছু নিতে, তাও এক পয়সা নেয়নি। আমার বীয়ার খাওয়ার হাতেখড়ি ওর কাছে, পয়সা লাগত না, বসে বসে দিব্যি গল্প করতাম। জোর করে বীয়ারের গ্লাস হাতে ধরিয়ে দিত। কত দিন রাত্রে চিতুদা'র সঙ্গে নাইট ক্লাবে গেছি, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, সর্ট ষ্ট্রীট সব জায়গায়। কলকাতার কত নামজাদা মক্কেলকে মাতাল হয়ে ছেলেমানুষি করতে দেখেছি, কত সম্ভ্রান্ত ভারতীয়কে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের কোমর ধরে নাচতে দেখেছি। চিতুদা' নেশার ঝোঁকে বলত, এরাই সব তোমরা-চোমরা, দূর দূর যত সব নর্দমার পোকা। এই সময় লক্ষ্য করে দেখেছি, চিতুদা'র পরিচয় রাতের কলকাতার সঙ্গে, দিনের বেলায় কলকাতাকে সে চিনত না। নামজাদা লোকের মত অবস্থাটাই সে দেখেছে, তাদেরও যে একটা কাজের জীবন আছে তা চিতুর কাছে বোধ হয় অজানাই রয়ে গেল! ও ভাবত তা সবাই মাতাল, সবাই চরিত্রহীন। মদ খাওয়া আর মেয়েদের পেছনে ছোটা এইটাই জীবন ধারণের উদ্দেশ্য।

এক দিন ওর সঙ্গে বসে আছি, কার টেলিফোন এল। চিতুদা' চাপা গলায় রসিয়ে রসিয়ে কথা বলে, মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে। বুঝলাম, নারী ঘটিত ব্যাপার। কান খাড়া ক'রে রইলাম, ফোন শেষ করে বললে, চল হে, অভিসারে যাওয়া যাক।

বিনয় চায়ের পেয়ালায় ঘন ঘন কয়েক বার চুমুক দিয়ে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে আবার বলতে সুরু করে, বেশ রাত্রি করে আমরা ট্যাক্সীতে বেরুলাম। ফিরিঙ্গি পাড়ায় গাড়ী থামিয়ে ড্রাইভারকে দিয়ে এক তোড়া রজনীগন্ধা ওপরে পাঠিয়ে দিলাম। অল্প পরে একটি মেয়ে নেমে আসে, সাদা ব্লাউজ, সিল্কের সাদা শাড়ী পরা, বব্ চুল। একটা আহা-মরি চেহারা কিছু নয়। চিতুদা' আলাপ করিয়ে দিল, তার নাম মিস্ বোস্। সেদিন আমরা একসঙ্গে হোটেলে খেয়ে যে যার বাড়ী ফিরেছি।

বিনয় আর একটা সিগারেট ধরিয়ে মৌজ করে টান দেয়, এর পর থেকে মিস্ বোস্কে চিতুদা'র সঙ্গে প্রায়ই দেখেছি। ভদ্রমহিলা সব সময় হুইস্কি খেতেন। একদিন আমাকে জোর করে ধরলেন, হুইস্কি খেতেই হবে। হাত জোড় করে বললাম, মাপ করবেন, আমি খাই না। মিস্ বোস ছাড়েন না, তাও কখনও হয়, চিতুর বন্ধু আপনি, হুইস্কি খাবেন না?

সেদিন চিতুদা' আর মিস্ বোস জোর করে আমায় হুইস্কি খাইয়ে দিল।

বিনয় কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, বোধ হয় আগের দিনের কথা ভাবছিল। নাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মিস্ বোস মেয়েটি কি রকম?

বিনয় ঠোঁট ওল্টায়, কি জানি, গোড়ার দিন থেকেই মেয়েটাকে আমার বিশ্রী লাগে। মনে হয়, বাজারের বন্দি জিনিষ। চিতুদা' যে কি করে ওর সঙ্গে ভিড়ল তা আমি এখনও বুঝতে পারি না। দু'জনেই মাতলামী করত, মদ ছাড়া এক মিনিট চলত না। এক দিন নেশার ঝোঁকে চিতুদা' মিস বোসকে বলছিল আমি শুনে ফেলি, তোমার ডাক্তারটিকে ছাড়ো। মিস্ বোস উত্তর দেয়, আমি তো ছাড়তে চাই, সে-ই তো চায় না।

পরে জানতে পারি মেয়েটি নার্স, কোন এক ডাক্তারের কাছে কাজ করে। চিতুদা' ওকে ছিনিয়ে আনতে চায়। রাতের পর রাত তারা এখানে-সেখানে কাটাত। চিতুদা' প্রায়ই মিস্ বোসকে বলতে শুনেছি, তুমি চলে এস, আমার সঙ্গে থাকো। তোমার জন্যে আমি আলাদা ফ্ল্যাট নিয়েছি। তুমি না এলে আমি বাঁচব না।

তারপর সত্যি সত্যিই মিস্ বোস একদিন এসে উঠল চিতুদা'র ফ্ল্যাটে, আর গেল না। এর পরের ইতিহাস বড় ট্রাজিক্, চিতুদা'র জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। কত দিন দুঃখ করে বলেছে, বিনয়, আমি নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছি, একটা বেশ্যাকে নিয়ে জীবন কাটাতে হবে। ও মিস্ বোস না হাতী, দু'ছেলের মা, ছেলেগুলো পর্য্যন্ত আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। সাত কুলের গুষ্টিবর্গ নিয়ে হাজির, আমার সর্বনাশ না করে যাবে না।

জিজ্ঞেস করলাম, এখন কি অবস্থা?

বিনয় গলা পরিষ্কার করে বলে, ওর হাতে এখন এমন পয়সা নেই যে ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম দেয়, পুরান পলিসিটাও নষ্ট হয়ে গেল। বেচারী চিতুদা', মিস্ বোস্ ওকে শুষে নিয়েছে।

বিল চুকিয়ে দিয়ে বিনয় উঠে দাঁড়ায়, চল এবার যাওয়া যাক্, দেখি যদি কোথাও সিনেমার টিকিট পাওয়া যায়।

বললাম, চিতুদা'র কথা শুনতে কিন্তু বেশ লাগছিল।

বিনয় হো-হো করে হাসে, এ ধরণের লোকের সঙ্গে বেশী মেশনি বলে তাই বলছ, ওরা সব সমান।

বিনয়ের কাছে চিতুদা'র বিষয় শুনে অবধি ওর কথা আরও জানতে ইচ্ছে করত। কিন্তু সুবিধে হয় না। অনেককে জিজ্ঞেস করে দেখেছি, কেউই বিশেষ কিছু বলতে পারে না। মাস দুয়েক বাদে চিতুদা'র বিষয় আরও কিছু শোনার সুযোগ ঘটে গেল মনোরঞ্জনের ষ্টুডিওতে, মনোরঞ্জনের সঙ্গে স্কুলে পড়েছি, তারপর অনেক দিনের ছাড়াছাড়ি। সম্প্রতি ক'লকাতায় ফিরেছে কোন স্কুলে ছবি আঁকা শেখানোর কাজ নিয়ে। বালীগঞ্জে একখানা বড় ঘরে ওর ষ্টুডিও আর থাকার জায়গা দুই-ই। সন্ধ্যের দিকে সময় পেলে ওর কাছে যাই। মনোরঞ্জনকে ভাল লাগে এই জন্যে যে ও সত্যিকারের শিল্পী, ছবি আঁকা বিলাসিতা নয়। কত দিন দেখেছি মনোরঞ্জন তন্ময় হয়ে ক্যানভাসের ওপর রঙ্ চড়িয়ে যাচ্ছে, আমি যে ঘরে বসে, সে খেয়ালও নেই।

আজ কিন্তু মনোরঞ্জনের কাজে সে রকম মন ছিল না, একটা পুরোন পোর্ট্রেট নেড়ে নেড়ে দেখছিল। কি মনে করে জিজ্ঞেস করলে, একে কোথাও দেখেছ?

ছবিটা দেখে আশ্চর্য্য হলাম, এ তো চিতুদা'!

মনোরঞ্জন তেতো গলায় বলে, এক নম্বর মাতাল, ধাপ্পাবাজ, মিথ্যেবাদী।

মনোরঞ্জনের কাছ থেকে কথা শোনার জন্যে ইচ্ছে করে বললাম, দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। যখন লোকটার ছবি আঁকি বুঝতেই পারিনি ও এমন একটা লোফার। ঐ সোফায় বসিয়ে ওর পোর্ট্রেট করেছিলাম।

—তোমার সঙ্গে ক'দিনের আলাপ?

—অনেক দিনের।

মনোরঞ্জন উঠে এসে আমার পাশে বসে, চিতুকে যখন চেনো, মিস বোসের কথা শুনেছ নিশ্চয়? ওর পিসতুতো বোন লীনা আমার কাছে ছবি আঁকা শিখত। তখন থেকে ওদের সঙ্গে আলাপ।

—এদের দেশ কোথায়?

—ঠিক বলতে পারব না। মিস বোসকে আমি চিনতাম মিসেস ঘোষ হিসেবে। ওঁর স্বামী মফঃস্বলে বড় কাজ করতেন। সেখানে মিসেস ঘোষের মন টিঁকলো না। বিবাহিত জীবন পাঁচ বছর কাটিয়ে স্বামীকে দু'টি পুত্র উপহার দিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। তার পর থেকে কুমারী পদবী বদলে মিস বোস ব্যবহার করতেন।

মনোরঞ্জন চশমা মুছতে মুছতে বলে, ভদ্রমহিলা নার্সিং জানতেন। এক ডাক্তারের সঙ্গে প্রাইভেট নার্সিং-হোম খোলেন নিজের বাড়ীতে। ঐ খানেই চিতুর সঙ্গে আলাপ। ও গিয়েছিল ঐ নার্সিং-হোমে চিকিৎসার জন্যে। এর পর মিস বোস চিতুকে নিয়ে আমার ষ্টুডিওতে মাঝে মাঝে আসতেন। লোকটাকে দেখেই আমার বিরক্তি জন্মায়, পয়সার দেমাক, প্রচণ্ড মাতাল। কথায় কথায় বড় বড় চাল মারে। কি জানি, আমার মনে হ'ত ও একটা বাফুন।

মনোরঞ্জনকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মিস বোসকে কি রকম মনে হত?

—ভদ্রমহিলা সাধারণের বাইরে। খুব স্মার্ট, বাড়ীর বউ হবার জন্যে তার জন্ম নয়। তার স্বামী একটা অপদার্থ, তাকে ত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এখানে ফিরে এসে নার্সিং করতেন মহৎ কাজ বলেই।

—শুনেছি উনি পান করতেন খুব বেশী?

—হ্যাঁ, প্রথমে পান করতে সুরু করেন চিতুকে 'কম্প্যানী' দেবার জন্যে। মদ না খেয়ে চিতু এক মিনিট থাকতে পারত না, তাই মিস বোস দেখলেন যে চিতুকে এ ব্যাপারে 'কম্প্যানী' দিতে না পারলে মাতাল বন্ধুদের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবেন না। তা ছাড়া খানিকটা ভোলবার জন্যেও বটে, হাজার হোক, হিঁদুর মেয়ে স্বামী ত্যাগ করাটা তো খুব সুখের নয়! সারা দিন কাজ নিয়ে ভুলে থাকতেন, সন্ধ্যের পর মদ খেয়ে। একটু চুপ করে থেকে মনোরঞ্জন আবার বলে, চিতুকে অধঃপতনের হাত থেকে যদি কেউ বাঁচিয়ে থাকে তো সে মিস বোস। কতকগুলো সুবিধেবাদী বন্ধু,

বিনয়, প্রভাত, কেউ বাদ যায় না। সবাই গেছে চিতুকে শুষে নেবার জন্যে। তাদের হাত থেকে মিস বোস ওকে বাঁচিয়েছে।

—কি বলছ ?

—ঠিক কথাই। মিস বোস চিতুকে ভালবাসে। আমার মনে আছে একদিন ষ্টুডিওতে চেঁচামিচি। মিস বোস বলছে, চিতু, যদি নিজের ভাল চাও, বদ সঙ্গ ত্যাগ কর। চিতু বললে, তারা আমার বন্ধু।

—শুধু আড্ডা মারলেই বন্ধু হয় না। তোমার কাছে ওরা মজা লুঠতে আসে, কেন ওদের প্রশ্রয় দাও ?

কথায় কথায় চিতু হঠাৎ ক্ষেপে গেল, বললে, খবর্দার, আমার বন্ধুদের নামে যা-তা বলবে না।

মিস বোস জোর দিয়ে বললেন, এক শ' বার বলব, সত্যি কথা বলতে আমি ভয় পাই না।

চিতুর কি বিশ্রী রাগ, উঠে গিয়ে দমাদম মারতে সুরু করলে মিস বোসকে। আমি তো অবাক! লোকটাকে জানোয়ার মনে হল। কাছে গিয়ে ছাড়িয়ে দিলাম, আমার ধাক্কায় চিতু মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল। শুনলে আশ্চর্য্য হবে, অত মার খেয়েও মিস বোস হুটে গিয়ে চিতুকে উঠতে সাহায্য করে। আমার ওপর রাগ করে কোন কথা না বলে, চিতুকে নিয়ে ষ্টুডিও থেকে বেরিয়ে গেল।

মনোরঞ্জন সামনের চেয়ারে পা' দুটো ছড়িয়ে আরাম করে বসে, মিস্ বোসের ভালবাসা যে কতখানি খাঁটি তার প্রমাণ পেলাম সে যখন নার্সিং, ডাক্তারী, সব কিছু ছেড়ে দিয়ে চিতুর সঙ্গে থাকতে লাগল। আগের পক্ষের ছেলে দু'টিও এখন মিস্ বোসের কাছেই থাকে।

ইতস্তত করে বললাম, কিন্তু ওদের মিলিত জীবনও তো শুনেছি সুখের হয় নি, মনোরঞ্জন ফোঁস করে ওঠে, সে তো চিতুর জন্যে। একটা জানোয়ার, এখনও দেখেছি কত সময় মিস্ বোসের ওপর অত্যাচার করে। মিস্ বোস মুখ বুজে সব সহ্য করে। এক দিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, এত অপমান সহ্য করে পড়ে আছেন কেন ?

মিস্ বোস উত্তর দিল, আমি ছাড়া চিতুর আর কে আছে ?

বললাম, ও তো একটা অমানুষ।

যত দিন না ওর মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আনছি আমার ছুটি নেই।

সেই দিনই বুঝতে পেরেছিলাম মিস্ বোস কত গভীর ভাবে চিতুকে ভালবেসেছে।

মনোরঞ্জনের ষ্টুডিও থেকে বেরিয়ে চিতুদা'র কথাই ভাবছিলাম। কি আশ্চর্য্য, দু'জনে দু'রকম ছবি আঁকল, যদিও বক্তব্য একই—চিতুরা সুখী হয়নি। কিন্তু তার জন্যে দায়ী কে ? সেইটা বোঝাই শক্ত। আমার মন কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এর পর প্রায়ই যেতাম সেই রেস্তর্াঁয়, চিতুদা'র সঙ্গে দেখা হওয়ার আশায়।

এক দিন দেখা হয়ে গেল। চিতুদা' একলা বসে এক কোণার টেবিলে চা খাচ্ছিলেন। আমি সোজা টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলাম। পরিচয় দিয়ে বললাম, চিনতে পারছেন না বোধ হয় ? বিনয় এক দিন এখানেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

চিতুদা' হাসেন, মনে আছে বই কি, বসুন।

বসলাম। দু'-চারটে মামুলী কথাবার্তা। চিতুদা' জিজ্ঞেস করলেন, বিনয়কে অনেক দিন দেখিনি। ওর খবর কি ?

ওদের বাড়ী পার্টিশান হচ্ছে, সেই নিয়ে একটু ঝামেলায় আছে। ওদের সম্পত্তি তো কম নয়।

চিতুদা' হাসেন, সে আমি জানি। বরাবর ওর কাছে শুনছি ভাইদের সঙ্গে লাঠালাঠি লেগেই আছে। সম্পত্তি না থাকাই ভাল রে ভাই, যত নষ্টের মূল ঐখানে।

বললাম, আমি ও-সব বুঝি না। না আছে দু'পয়সার সম্পত্তি যে তাই নিয়ে মাথা ঘামাব।

সেদিন চিতুদা' আমাকে কিছুতেই পয়সা দিতে দিলেন না। বিল মেটালেন নিজে। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি বিনয়ের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করেছিলাম। ইউনিভার্সিটির নামকরা ষ্টুডেণ্ট, তার ওপর ঐ রকম স্মার্ট, ইচ্ছে করলেই ভাল কিছু করতে পারত।

—কেন, ও ত ভাল রোজগার করে ?

—রোজগারটাই কি সব ?

আশ্চর্য্য হ'লাম, চিতুদা'র মুখ থেকে ঠিক এ-ধরণের কথা শুনব আশা করিনি। উনি আরও বললেন, বিনয় এম, এ পরীক্ষাই দিল না এই ভয়ে, পাছে ও সেকেণ্ড হয়ে যায়। বড় বড় কোম্পানীতে চাকরী পেল, এক জায়গাতেও টিকে থাকল না। এখন ইন্সিওরেন্সে কাজ করে, সে-ও একরকম সখের জন্যে।

জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু কেন ?

—সেটা তো আপনাকেই জিজ্ঞেস করছি। বলেই হাসতে হাসতে হাত তুলে নমস্কার করে চিতুদা' চলে গেলেন।

বিনয় সম্বন্ধে ঠিক এ ভাবে কোন দিন আমি ভাবিনি। মনে হল চিতুদা' ঠিকই বলেছেন, ইচ্ছে করলে বিনয় সত্যিই অনেক বড় হতে পারত। কিন্তু কেন পারল না, সে প্রশ্নের উত্তরও খুঁজে পাই না।

কিন্তু দিন দশেক বাদে বিনয় যেদিন আমার কাছে এসে বললে, তার নামে ভাইপোরা কেস্ করেছে, সম্পত্তির বখরা নিয়ে, একটা স্পষ্ট বুঝলাম আর যাই থাক বিনয়ের জীবনে শান্তি নেই। সেদিন কথাচ্ছলে বলেও ছিলাম, ভাইপোরা যা চাইছে দিয়ে দে না, ঝামেলা মিটে যাবে।

বিনয় ফোঁস করে উঠল, হতভাগাদের খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করিনি, সে পয়সা দেবে কে ?

—আহা নিজেরই ভাইপো তো ?

—ও-সব বাজে কথা রাখ, ছোঁড়াগুলোর মামা একের নম্বর শয়তান। মামলাবাজ। আমার পেছনে লাগার মতলব। এই তালে নিজে কিছু গুছিয়ে নেবে। আমিও দেখে নেব, এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়ব না—

কথা হ'ল আরও অনেক বিষয় নিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, বৌদিদের সব খবর ভাল তো ?

বিনয় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, ওর তো বারমেসে অসুখ। আজকালকার মেয়েদের অসুখ করাটাও ফ্যাসান। কত রকম ওষুধ, ডাক্তার, বদ্যি, লেগেই আছে। আসিস্ না এক দিন—

প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললাম, যাব।

বিনয়কে কথা দিলেও অনেক দিন যেতে পারিনি, নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। এক শনিবার ঠিক করলাম, অফিসের

র তাড়াতাড়ি করে সোজা বিনয়ের বাড়ীতেই যাব, এমন সময় মনোরঞ্জন এসে হাজির। উস্কো-খুস্কো চুল, চোখের তলায় কালী পড়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে, শরীর খারাপ না কি ?

—না, কিছু টাকার দরকার।

—হঠাৎ ?

—ঠিক করেছি এখান থেকে চলে যাব, বাঙ্গালোরে একটা কাজ পেয়েছি।

উৎসাহ দিয়ে বলি, সে তো ভাল কথা।

মনোরঞ্জন নীরস গলায় বলে, ভাল কিছু নয়। ক'লকাতায় বসে বসে বিরক্তি ধরে গেছে। আমায় শ' দুই টাকা দিতে হবে।

—কবে ?

—আজ, কাল। যত শীঘ্র সম্ভব। আমি কতগুলো ছবি তোর বাসায় দিয়ে যাব। একটু চেষ্টা করলেই বিক্রী করে টাকাটা তুলে নিতে পারবি।

ওর কথা মত টাকা দিয়ে দিলাম, ষ্টুডিওর ঘরটা ছেড়ে দিচ্ছিস ?

—ক'লকাতায় আর কোন পাট রাখব না।

পিঠ চাপড়ে বললাম, এবার বিয়ে-থা কর।

মনোরঞ্জন হালকা হাসে, সত্যিকারের আর্টিষ্ট কখনও বিয়ে করে না। অনেক ধন্যবাদ, ভাবছি কালই চলে যাব।

মনোরঞ্জনকে বিদায় দিয়ে বিনয়ের বাড়ী যখন এসে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বিনয় বাড়ী ছিল না, বৌদির সঙ্গেই দেখা হ'ল। চুপ করে ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন, আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছেন। আমায় দেখে খুসী হয়ে উঠলেন, কি, পথ ভুলে না কি ?

কৈফিয়ৎ দিয়ে বললাম, নানা কাজে আসতে পারিনি। বিনয়ের কাছে অবশ্য সব খবর পাই, ও কোথায় গেল ?

বৌদি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, কোথায় আর, উকীলের বাড়ী।

চুপ করে রইলাম। বৌদিই বলে যান, সকাল নেই সন্ধ্যে নেই উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। একটার পর একটা মকর্দ্দমা—

—আপনি কিছু বলেন না কেন ?

—আমার কথা কে শুনবে ভাই! গরীবের ঘরের মেয়ে, বিষয়-আশয় কিছুই বুঝি না—

বৌদির কথার সুরটা মনে লাগল। জিজ্ঞেস করলাম, শরীরটা ভেঙ্গে ফেললেন কি করে ?

ক্লান্ত হেসে বলেন, শরীর নিয়ে আর কি করব ? মনটাই যে ভেঙ্গে পড়েছে। চিরকাল পাঁচজনে মিলে-মিশে থেকেছি, এই ঝগড়া-ঝাঁটি মারামারি আর ভাল লাগে না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে থেকেও বিনয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল না। উঠে পড়লাম, আজ তাহলে আসি বৌদি !

বৌদি ম্লান হাসেন, এসো ভাই মাঝে মাঝে। বড় একলা, কথা বলারও লোক পাই না।

বৌদির জন্যে দুঃখ হল। ভারী মন নিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে সদর দরজায় বিনয়ের সঙ্গে দেখা, প্রকৃতিস্থ নয় মোটেই। জিজ্ঞেস করলাম, এত দেরী যে ?

জড়ানো গলায় উত্তর দিলে, কি করবো, কত কাজ!

—বৌদির এরকম শরীর খারাপ, একলাটি বাড়ীতে রয়েছেন।

বিনয় রুখে ওঠে, আমি কি করব ? রুগ্ন বৌ নিয়ে আর কাঁহাতক দিন কাটানো যায় ? আমিও তো একটা মানুষ।

বিনয় টলতে টলতে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে যায়।

পরদিন সিনেমা থেকে বেরিয়ে চিতুদা'র সঙ্গে সামনা-সামনি দেখা। উনি দোকান থেকে কিছু কিনে ফিরছিলেন। বললেন, অনেক দিন পরে দেখা, খবর সব ভাল তো ?

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

—কোথায় যাচ্ছেন ?

বললাম, বাড়ী যাব।

—যদি না তাড়া থাকে চলুন না আমার ফ্ল্যাটে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করলাম, কত দূর ?

—এই তো, পাশের রাস্তায়।

ফিরিঙ্গী-পাড়ার দোতলার ফ্ল্যাটে চিতুদা' আমাকে এক রকম জোর করেই নিয়ে এলেন। বাইরের ঘরে বসিয়ে হাতের জিনিষগুলো নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। তাকিয়ে তাকিয়ে চার দিক দেখি। সোফাসেটগুলো সরানো দরকার, দেয়ালে ডিসটেম্পার ময়লা হয়েছে, কার্পেটটাও বদলালে ভাল হয়। মিস্ বোসের কথা ভাবতেই মনে মনে কেমন যেন একটা সঙ্কোচ বোধ করি। আর যাই হোক, বিনয় আর মনোরঞ্জনের কাছে তাঁর বিষয় যা শুনেছি তা মোটেই প্রীতিজনক নয়।

খানিক বাদেই চিতুদা' এক ভদ্রমহিলাকে এনে স্ত্রী বলে আলাপ করিয়ে দিলেন। বুঝলাম, ইনিই মিস্ বোস। হাত তুলে নমস্কার করে সপ্রতিভ কণ্ঠে বললেন, আপনাকে তো আগে দেখিনি। বললাম, না, চিতুদা'র সঙ্গে আমার আলাপ বেশী দিনের নয়।

চিতুদা' আমার পরিচয় দিয়ে বলেন, বিনয়ের বিশেষ বন্ধু।

মিস্ বোস উৎসাহিত হ'ন, তাই না কি? কই বিনয় বাবু তো আজ-কাল মোটেই আসেন না!

বললাম, মামলা-মোকর্দ্দমা নিয়ে বেচারা বড় ঝামেলায় আছে।

কথায় কথায় আলাপ বেশ জমে উঠল। এক সময় উঠে গিয়ে মিস বোস ছেলেদের ডেকে আনেন, এটি আমার বড় ছেলে, জুনিয়ার কেমব্রিজ দিয়েছে। আর এইটি ছোট, দু'জনেই এক স্কুলে পড়ে।

চিতুদা' আমার দিকে সিগারেট এগিয়ে দিয়ে, ছোট ছেলেকে দেখিয়ে বলেন, সানি খুব ভাল 'মাউথ অরগ্যান' বাজায়। দেখি তোমার আঙ্কলকে শুনিয়ে দাও তো—

ছেলেটির ব্যবহারে এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। প্যান্টের পকেট থেকে 'মাউথ অরগ্যান' বার করে কি একটা ফিল্মের সুর বাজিয়ে দিলে। সকলের সঙ্গে আমিও বাহবা দিয়ে হাততালি দিলাম। বাঃ, বেশ বাজায় তো!

বড় ছেলেটি ভাইয়ের বাহাদুরীতে নিজেই এগিয়ে আসে, ড্যাডি, আমি সেই রেসিটেশানটা শোনাব?

চিতুদা' সায় দিয়ে বলে, নিশ্চয়। 'হি রিসাইট্‌স ভেরী ওয়েল'।

ছেলেটি ইংরিজি কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়।

মিস বোস বললেন, লীনা আসছে না কেন, ডেকে এলাম। সানি, যাও তো মাসীকে ধরে নিয়ে এস। সানির যাবার দরকার হ'ল না। লীনা এসে ঘরে ঢোকে, সুশ্রী তরুণী। আমায় দেখে হাত তুলে নমস্কার করে। মিস বোস আলাপ করিয়ে দেন, আমার পিসতুতো বোন, খুব ভাল ছবি আঁকে। ঘরের কোণে টাঙানো অয়েল পেন্টিং দেখিয়া বলেন, এটা ওর আঁকা।

দূর থেকে দেখেই প্রশংসা করলাম, কার কাছে আঁকা শেখেন?

চিতুদা' উত্তর দেন, তুমি চিনবে বোধ হয়, মনোরঞ্জন, বিনয়ের বন্ধু—

—বললাম, চিনি বই কি, স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম যে—

—তাই না কি? মিস বোস উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, তাহলে তো সুখবরটা এখনই দেওয়া উচিত।

লীনা সলজ্জ হাস্যে বাধা দেয়, আঃ দিদি, তুমি আর সারপ্রাইজটা রাখতে দেবে না দেখছি।

—আহা, উনি তো মনোরঞ্জনের বন্ধু, বলতে আপত্তি কি?

চিতুদা' কথাটা পরিষ্কার করে দেন, আমার শ্যালিকার সঙ্গে মনোরঞ্জনের বিয়ে।

আমি আশ্চর্য্য না হয়ে পারি না, আমায় বলে নি তো। লীনাকে উদ্দেশ্য করে বলি, 'কন্‌গ্র্যাচুলেশন'। এই ক'ঘণ্টার আলাপে ভুলে গিয়েছিলাম, এদের সঙ্গে আজই পরিচয় হয়েছে। চিতুদা', মিস বোস, লীনা আর ছেলে দু'টি সবাইএর মধ্যে আমিও মিশে গিয়েছিলাম। মনোরঞ্জনের কথা উঠতেই কেমন যেন খট্‌কা লাগে। আর বসতে পারলাম না, বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

সারা রাস্তা ভাবি, মনোরঞ্জন কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করল? কিন্তু আজ সকালেও বাড়ীতে ছবিগুলো দিয়ে যাবার সময় বলে গেল, রাত্রের ট্রেণেই সে চলে যাবে। মনোরঞ্জনের ষ্টুডিওর সামনে গিয়ে দেখি, দরজায় তালাবন্ধ। দূরে একটা ট্যাক্সী দাঁড়িয়ে রয়েছে, কাছে এগিয়ে গেলাম। হ্যাঁ, মনোরঞ্জনই, মালপত্র তুলে গাড়ীতে উঠে বসেছে। পাশে একটি মেয়ে। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি নেমে এল, হঠাৎ এ সময়? আমি তো ষ্টেশনে যাচ্ছি।

সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, শুনছি লীনার সঙ্গে তোর বিয়ে? কই আমাকে বলিস নি তো?

মনোরঞ্জন চমকে ওঠে, কে বললে একথা?

—সে যেই বলুক, সত্যি কি না?

মনোরঞ্জন উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, আমি তো বলেছি শিল্পীরা কখনও বিয়ে করে না।

তেতো গলায় জিজ্ঞেস করলাম, ট্যাক্সীতে ও মেয়েটি কে?

—আমার সঙ্গে বাঙ্গালোর যাচ্ছে।

—তার মানে?

মনোরঞ্জন ট্যাক্সীতে উঠতে উঠতে চাপা গলায় বলে, এখন ঐ আমার ইন্সপিরেশান।

আমার কথা বলার আগেই ট্যাক্সী ছেড়ে দেয়: লীনার হাস্যোজ্জ্বল মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বাড়ী ফিরে ঘুমুতে পারলাম না। একে একে মনে পড়ছে মিস্ বোস সম্বন্ধে বিনয়ের বিদ্রূপভরা গল্প। চিতুদা'র প্রতি মনোরঞ্জনের কুৎসিত ইঙ্গিত। সেই সঙ্গে মনে পড়ছে বৌদির ব্যর্থ জীবনের অনুশোচনা, বিনয়ের অশান্তি ভরা দম্ভ। মনোরঞ্জন পালিয়ে গেল বটে, কিন্তু নিজের বিবেকের কাছ থেকে পালাবে কি করে?

বেচারী লীনা! মনোরঞ্জনকে সে নিশ্চয় ভালবেসেছে। কষ্ট পাবে। তবে এই সান্ত্বনা—তাকে বিয়ে করে সারাজীবন দুর্ভোগ সহ্য করতে হবে না।

পরদিন চিতুদা'র সঙ্গে দেখা করলাম 'বারে' গিয়ে। একদিকে দাঁড়িয়েছিলেন, আমাকে দেখে খুশী হয়ে বললেন, আসুন ঐ কোণে গিয়ে বসা যাক্।

দু'জনে বসলাম। নিজে থেকেই কথা পাড়লাম, জানি না শুনেছেন কি না, মনোরঞ্জন কাউকে না জানিয়ে কলকাতা থেকে চলে গেছে।

—তাই না কি, হয়তো কোন কাজে বেরিয়েছে!

সব কথা খুলে বললাম, শুধু ট্যাক্সীর মেয়েটির কথা বাদ দিয়ে। চিতুদা' হেসে বললেন, ও আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করেছে। নিশ্চয় বাঙ্গালোরে ভাল কাজ পেয়েছে, লীনাকে বোধ হয় ওখানেই নিয়ে যাবে। কথা শুনে আশ্চর্য্য না হয়ে পারি না, মানুষকে এত বিশ্বাস করতে পারেন!

—মানুষকেই যদি বিশ্বাস না করবো তবে আর করবো কা'কে? একটু থেমে বললে, জানি না, আমার কথা কিছু বলেছেন কি না তবে এই জানবেন, শুধু এক জনকে বিশ্বাস করে নিজের সব ভার তার হাতে দিয়েছিলাম বলেই আমার ছন্নছাড়া জীবনটা আজ শান্তিতে ভরে গেছে।

বুঝলাম চিতুদা' মিস্ বোসের কথা বলছেন, থামতে দিলাম না।

—তাঁর নিজের জীবনেও অনেক ফাঁক ছিল, কিন্তু এখন সব ভরে গেছে। ছেলেপুলে সংসার, কোন অভাব নেই। নাই বা রইল সমাজ আর লোকদেখানো বন্ধুর দল, সুখটা থাকলেই তো হ'ল।

বয় এসে চিতুদা'কে ডেকে নিয়ে গেল। সেই দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবলাম, আশ্চর্য্য, জীবনের সব চেয়ে বড় সত্যটা চিতুদা' কত সহজে উপলব্ধি করেছে, যা বিনয় কি মনোরঞ্জন পারলো না!

সুস্থ ছেলেমেয়েরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে
— এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও
বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই
রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয়
সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত
রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY
SOAP
L. 257-X52 BG
ভারতে প্রস্তুত
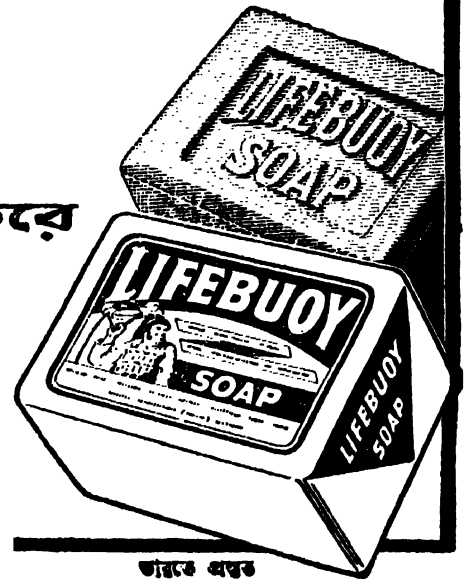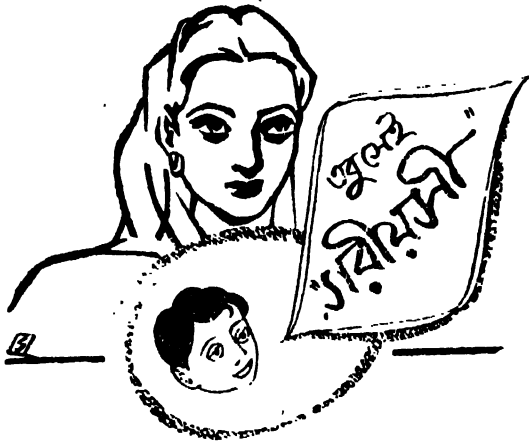
কুন্তলা দত্ত

একটা অস্পষ্ট জুতোর শব্দ—শশধর বাবু ইচ্ছে করেই মুখ তুললেন না। তিনি জানেন এ জুতোর শব্দ কার। আজ দু'মাস ঐ জুতোর শব্দ তাঁকে যে অসহ্য যন্ত্রণা দিচ্ছে, জীমূতের মৃত্যুও বোধ হয় ততখানি দিতে পারে নি! ঐ জুতোর সঙ্গে মিশে আছে একটা বিরাট আতঙ্ক, উদ্বেগ। কালো ভেলভেটের ষ্ট্র্যাপ ও রবারের শুকতলা-ওলা জুতোটা ঠিক শব্দ করতে পারে না, মৃদু খসখসানি মাত্র শোনা যায় কিন্তু সেই শব্দই শশধর বাবুর বুকে যেন হাতুড়ির ঘা মারতে থাকে। মুখ তুলে তাকাতে ভয় পান তিনি, না জানি কি বেশে দেখবেন আজ অভীপ্সাকে! কোথায় যাচ্ছে; তাও জিজ্ঞেস করেন না। যদিও সবই জানেন, তবু সেই রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হবার সাহস তাঁর নেই, তাই তিনি মুখ লুকিয়ে থাকেন খবরের কাগজে।

জুতোর শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়, অভীপ্সা চলে গেছে। শশধর বাবু মুখ তুলে তাকান, রাধারাণী এসে দাঁড়িয়েছেন, ভাঙাগলায় রাধারাণী বলেন—"তুমি কি কিছুই দেখবে না?"

শশধর বাবু বিষণ্ণ হেসে কাগজটা ভাঁজ করে সামনের ছোট টিপয়ে রাখেন।

"কি দেখব বল? শিক্ষিতা, বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়ে, সে যদি চির-বৈধব্যকে অন্তরের সঙ্গে মেনে নিতে না পারে, আমি শুধু শাস্ত্রবচন আর উপদেশের বোঝা চাপিয়ে ওকে কি মানাতে পারব?"

"সে ত পরের কথা, এখন একটা কেলেঙ্কারী হলে পর তখন"—রাধারাণীর গলা বুজে এলো। শশধর বাবু গম্ভীর হয়ে বললেন——"না, বৌমা সে রকম কিছু করবে না, তেমন মেয়ে ও নয়।"

"নয় কিসে? বিধবা মেয়ে, কোলে ছেলে, তিনি চললেন অভিসারে"—মুখ বিকৃত করেন রাধারাণী—"তার পর কখন কি"—

"আঃ, আস্তে"—শশধর বাবুর ভ্রূ কুঁচকে এলো—"চাকর-বাকরে শুনবে যে"—

"ওদের কি কিছু বুঝতে বাকী আছে? রোজ যে বৌমা বেরিয়ে যায় ভবেশের সঙ্গে, সে কি জানে না ওরা?"

ঝঙ্কার দিয়ে বলেন রাধারাণী—"আর পারি না। এই শাস্তি পাবার জন্তই কি জীমূতকে—কেঁদে ফেললেন তিনি। এমন সময় পাশের ঘর থেকে শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি ভেসে এলো, সেই সঙ্গে শোনা গেল, হিন্দীতে আয়া শিশুকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। রাধারাণী চোখের জল মুছতে মুছতে দ্রুত চলে গেলেন পাশের ঘরে।

শশধর বাবু চুপ করে বসে রইলেন।

একমাত্র ছেলে জীমূত তিন বোনের পর হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সৌখীন অধ্যাপনা করতে করতে ২৭ বৎসরের হল। নিজে পছন্দ করে ভালবেসে বিয়ে করলে সে অভীপ্সাকে। শশধর বাবু ও রাধারাণী যে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হননি, এ কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। তবু ছেলের মুখের দিকে চেয়ে, সে সুখী হবে বলে তাঁরা আপত্তি করে নি। তা ছাড়া অভীপ্সা সুন্দরী, শিক্ষিতা, গুণবতী, আর পরিবারও এঁদের মত অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত পরিবার। বধূর ব্যবহারেও তাঁরা সন্তুষ্ট হলেন। কাজেই একমাত্র ছেলের জন্ত তাঁরা নিজে পছন্দ করে বউ আনতে পারলেন না, তাঁদের উপেক্ষা করে নিজে বৌ পছন্দ করল, এ ক্ষোভ তাঁদের রইল না। দু' বছর পর জীমূতের ছেলে হল, তিন মাস পরে হঠাৎ ধনুষ্টঙ্কারে আক্রান্ত হয়ে জীমূত তাঁদের ছেড়ে গেল। সে দিনটা আজো শশধর বাবুর চোখে ভাসে।

রাধারাণী নাতি জিতুকে নিয়ে দোতালার বারান্দায় বসে আছেন। বিকেল বেলা; শীতের বিকেল, ধোঁয়া আর কুয়াশায় ঢাকা ইজিচেয়ারে শশধর বাবু বসে আছেন। জামা, টুপি-মোজার আবরণে মোড়া জিতু পিট-পিট করে চাইছে, আর রাধারাণীর কথার উত্তরে খিলখিলিয়ে হাসছে। খনিক আগে স্যাকরা এসে রূপার কোমর-পাটা ও নূপুরের ফরমাস নিয়ে গেছে, আর অভীপ্সার জন্ত মুক্তোর কঙ্কণ।

হঠাৎ নিচে সোর-গোল উঠল। শশধর বাবু ও রাধারাণী ঝুঁকে দেখলেন ক'টি ছাত্র জীমূতকে ধরে নিয়ে আসছে, প্রবল জ্বরে সে আচ্ছন্ন।

তক্ষুণি ডাক্তারকে ফোন করা হল। ডাক্তার যখন এলেন তখন জীমূতের অঙ্গবিক্ষেপ সুরু হয়ে গেছে। যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কিছু হল না। রাধারাণী মাথা খুঁড়তে লাগলেন। শশধর বাবু নীরবে মৃত পুত্রের শিয়রে বসে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। প্রথম শোকের ধাক্কাটা কাটার পর অভীপ্সা খুব ধৈর্য্য ধরলে। রাধারাণীকে সেই সান্ত্বনা দিত—"মা, আপনি কাঁদবেন না। আমি ত আছি।"

রাধারাণী কেঁদে উঠে বলতেন—"ওরে, সেই ত আমার বড় দুঃখ। চোখের উপর তোকে দেখে দেখে এ রাবণের চিতা যে জ্বলতেই থাকবে।"

তারপর দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতেন। রাধারাণী অভীপ্সাকে বিধবাবেশ ধারণ করতে দেন নি, শাদা জমির লালপাড় ছাড়া অন্ত সব রকম পাড়ই অভীপ্সাকে পরতে হত। আর জীমূত মারা যাবার পর এই দেড় বছর জিতু ছাড়া এ বাড়ীর কেউ মাছ মাংস মুখে তোলে নি। ডাক্তারের কথা মত চিলেকোঠায় উনুন জেলে রাধারাণী জিতুর জন্ত মাছ, ডিম রেঁধে দেন।

প্রথম প্রথম অভীপ্সা কোথাও বের হ'ত না। শশধর বাবু ও রাধারাণী জোর করে বড় মেয়ে সুচিত্রার সঙ্গে ওকে বেড়াতে পাঠাতেন। শাদা রংএর রূপোলী জরিপাড় জর্জেট ও সিল্ক পরিয়ে সুচিত্রা ওকে বেড়াতে নিয়ে যেত। হাতে গলায় গয়নাও কিছু কিছু থাকত বৈ কি।

তার পর রাধারাণী হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, শাদা জর্জেট কখন ফিকে সবুজে পরিণত হয়েছে, প্রসাধনে আবার আগ্রহ এসেছে, কেশ-বিন্যাসে দেখা দিয়েছে যত্নের ছাপ, সর্ব্বোপরি জেগেছে সুচিত্রার বাড়ীতে যাওয়ার আগ্রহ। রাধারাণী সুচিত্রাকে বলবেন বলবেন

মনে করছেন, এমন সময় একদিন সুচিত্রা নিজেই বললে। অভীপ্সা ওর মার কাছে গিয়েছিল। সুচিত্রা আস্তে আস্তে রাধারাণীর কাছে এসে বসল—"মা, একটা কথা"। রাধারাণীর বুকটা ধ্বক্ করে উঠল। কোলের ওপর জিতুকে আঁকড়ে ধরে তিনি বলে উঠলেন—"কি, কি, কি হয়েছে রে?"

সুচিত্রা ভেঙে বললে সব। সুচিত্রার পিসতুতো দেওর ভবেশ সুচিত্রার ওখানে প্রায়ই আসে। সুন্দর চেহারা, কথাবার্ত্তাও চমৎকার, অগাধ বিদ্যা। প্রথম প্রথম সান্ত্বনা দিয়ে অভীপ্সাকে গীতা, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকে অনেক ভাল ভাল কথা বল্‌ত ও পড়ে শোনাত। সুচিত্রা সেটা ভাল মনে করে প্রশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু মাস খানেক যাবৎ সুচিত্রার একটু কেমন কেমন ঠেকছে। ভবেশ প্রায়ই অভীপ্সাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। তা ছাড়া ওদের ভাবভঙ্গীও যেন কেমনতর। সুচিত্রা কথা শেষ করে অপরাধীর মত নখ খুঁটতে খুঁটতে বললে—"এমন হবে, তা আমি বুঝতে পারিনি মা!"

রাধারাণী শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এক বছরের মধ্যেই জীমূতকে ও ভুলে গেল? ওরা ত ভালবেসে বিয়ে করেছিল, এই ওদের ভালবাসা? আজ-কালের মেয়েদের প্রেমের এই নমুনা? একটু পরে তিনি বললেন—"আমারও সন্দেহ হচ্ছিল। আগে কোথাও যেতে চাইত না, এখন রোজই তোর ওখানে যেতে চায়। তা ছাড়া সাজগোজও বেশ সুরু করেছে।"

জিতুর মুখের দিকে তাকান রাধারাণী—"কি কপাল নিয়েই এসেছিল।" অন্য কেউ হলে এ অবস্থায় জিতুকে বলত—"অলক্ষুণে, রাক্ষস, বাপখেকো।" কিন্তু রাধারাণী কখনো তা বলেন না। তিনি শুধু বলেন "কপাল মন্দ।" জিতুর আয়া থাকা সত্ত্বেও রাধারাণীই বেশীর ভাগ সময় জিতুকে কোলে, কাছে রাখেন, আর অপলক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে জীমূতের এই বয়সের চেহারার ছাপ খোঁজেন।

মা-মেয়েতে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, সুচিত্রা একদিন অভীপ্সাকে বুঝিয়ে বলুক, অভীপ্সা হয় ত ঠিক বুঝতে পারছে না। বুঝিয়ে বললে সে সচেতন ও সতর্ক হবে।

সুচিত্রা একদিন অভীপ্সাকে দুপুরে নিমন্ত্রণ করলে যখন ভবেশের আসার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং সুচিত্রার স্বামী পরেশও অফিসে থাকবে। অভীপ্সা বোধ হয় সুচিত্রার উদ্দেশ্য আঁচ করতে পেরেছিল। সে প্রথমে রাজী হল না। কিন্তু রাধারাণী ও সুচিত্রা বেশী জোর করাতে না গিয়ে পারল না।

সুচিত্রা ভয়ে ভয়ে কথাটা তুললে। এমন রূপসী অভীপ্সা, কপাল যখন পুড়েছেই তখন আচরণ, ব্যবহার সম্বন্ধে যাতে কেউ কিছু না বলতে পারে সেটা ত দেখা উচিত। মা-বাবা কত ভালবাসেন অভীপ্সাকে, তার এতটুকু নিন্দা শুনলে কত ব্যথা পান—ইত্যাদি।

অভীপ্সা নতমুখে শুনছিল। মুখ তুলে সুচিত্রার মুখের দিকে
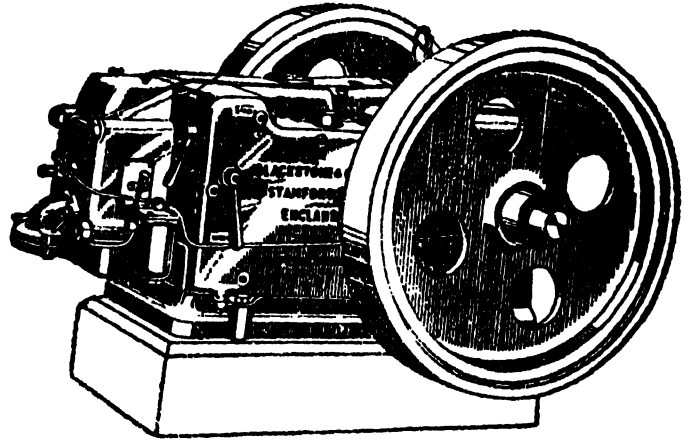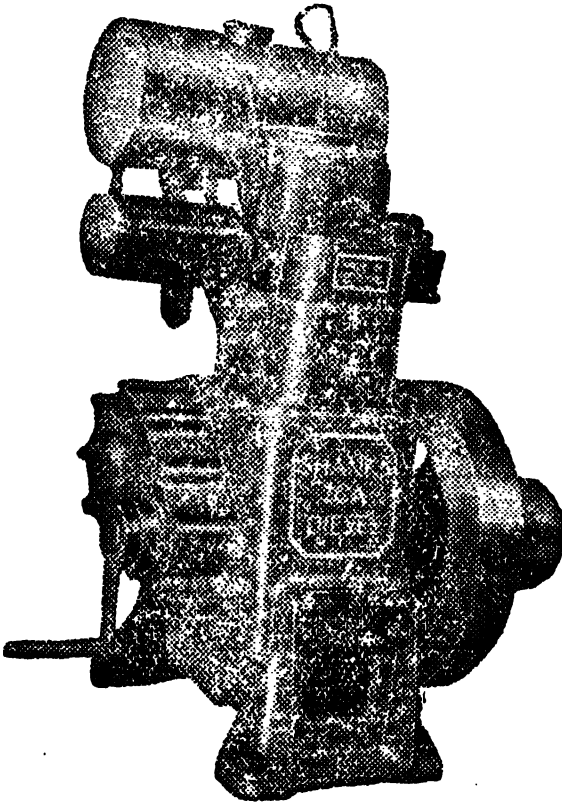
তাকিয়ে বললে—"বুঝেছি। তুমি ভবেশ বাবুর কথা বলছ ত?" ওর নিঃসঙ্কোচ ভাব দেখে সুচিত্রা থতমত খেয়ে গেল। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললে—"ভবেশ বাবু অবশ্য লোক খারাপ ন'ন, তবু বলা ত যায় না, পুরুষ-মানুষ, কখন কি মতি হয়। শুধু শুধু যে তোমার ওপর ঝোঁক তা ত মনে হয় না।—শেষে যদি কিছু……"

সুচিত্রা কথা শেষ করলে না। কথার ভঙ্গীতেই ওর বক্তব্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। অভীপ্সা গম্ভীর কণ্ঠে বললে—"সে রকম কিছুর ভয় করো না। আমরা কেউ এত তরলমতি নই।"

সুচিত্রা এ সম্বন্ধে আর কিছু বলতে পারলে না।

সুচিত্রার মুখে সব শুনে রাধারাণী মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। অভীপ্সা অনুতপ্তও হয়নি, লজ্জিতও হয়নি, এ কেমন কথা?

ভবেশের সঙ্গে অভীপ্সার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে চলল। অভীপ্সা প্রায়ই গাড়ী চালিয়ে বেরিয়ে যায়। সুচিত্রার ওখানে যাওয়া বন্ধ করেছে। ভবেশের সঙ্গে সে যে অন্যত্র দেখা-সাক্ষাৎ করছে, তা বুঝতে সুচিত্রা ও রাধারাণীর বাকী থাকে না। অভীপ্সা কাউকে কিছু না বলেই বের হয়। কারো সঙ্গে বিশেষ কথাবার্ত্তা বলে না। রাধারাণী মনে মনে উদ্বিগ্ন হলেও ওকে কি বলবেন ঠিক করতে পারেন না। একদিন তিনি আকারে-ইঙ্গিতে অভীপ্সাকে সচেতন করে তুলতে চাইলেন কিন্তু অভীপ্সা তা গ্রাহ্য করলে না। অগত্যা রাধারাণী আবার সুচিত্রার শরণাপন্ন হলেন।

সুচিত্রার কথা শুনে অভীপ্সা একটু চুপ করে রইল। তার পর বললে—"তোমরা চাও যে আমি ভবেশের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে ঘরে বসে থাকি—এই ত? কিন্তু আমি কি নিয়ে থাকব, সেটা কেউ ভাবছ না। তোমরা শুধু লোকনিন্দার কথাই ভাবছ।" বলে সে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিলে। তারপর বললে— "আমার আশা তোমরা ছেড়ে দাও। আচার, সংস্কার ও পূজা-আর্চ্চায় মনকে ভুলিয়ে দিবে মারা আমার দ্বারা হবে না। আমিও সত্যি কোনো অন্যায়, অধর্ম্ম বা অশাস্ত্রীয় কিছু করছি না।"

প্রথমে রাধারাণীর মনে যখন খট্‌কা লেগেছিল তখন তিনি শশধর বাবুকে সে কথা বলেছিলেন কিন্তু তখন শশধর বাবু তা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এর পর শশধর বাবুকে রাধারাণী আর কিছু বলেন নি। কিন্তু সুচিত্রার কাছে অভীপ্সার ঐ কথাগুলোতে তিনি শশধর বাবুর শরণাপন্ন হতে বাধ্য হলেন। সুচিত্রাও মা'র কথা সমর্থন করল। শশধর বাবু চিন্তিত হলেন। অভীপ্সার প্রেমের একনিষ্ঠতায় তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল—তাই মাসখানেক আগে রাধারাণীর কথা তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন, বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন—কিন্তু অভীপ্সার পরিবর্ত্তন তিনি লক্ষ্য না করে পারেন নি। তাই সুচিত্রা ও রাধারাণীর কথায় তিনি আর অবিশ্বাস করতে পারলেন না। কয়েক দিন অভীপ্সাকে লক্ষ্য করে তিনি বুঝলেন এখন আর কিছু করার নেই। রাধারাণীর ক্রমাগত অনুনয়ে শশধর বাবু বললেন—"এখন আর কিছু করার নেই, আগে থেকে সাবধান হলে হয় ত কাজ হ'ত। এখন আমি যা দেখছি তাতে জোর করে বাধা দিয়ে ফল হবে না।"

রাধারাণী ক্ষোভের সঙ্গে বললেন—"আগেই ত বলেছিলাম, তখন ত কানে তুললে না। এখন কেমন, হল ত?"

শশধর বাবু বিষণ্ণ হেসে বলেছিলেন—"আগে বুঝলেও যে কিছু করতে পারতাম, তা হয় ত নয়।" রাধারাণী কেঁদেছিলেন।

সুচিত্রা একদিন ভবেশকে বলেছিল যে এটা উচিত হচ্ছে না, কিন্তু ভবেশ স্পষ্টই বলেছে, আচারের বেড়ি পরিয়ে জপ-তপের ছলনায় যে জীবন্ত সহমরণের ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত, তার প্রতি তার কোনো সহানুভূতি নেই। সুচিত্রার স্বামী পরেশ সব শুনে বলেছে— "এখন যা অবস্থা তাতে বাধা দিতে গেলে হয় ত গোলমাল কেলেঙ্কারী হবে, তার চেয়ে এখন যাতে ওরা ভদ্রমতে বিয়ে করে ফেলে, সে চেষ্টা করাই ভাল।"

হয় ত তাই। কিন্তু তবু বুকের ভেতরটা যে মোচড় দিয়ে ওঠে। অভীপ্সার চলাফেরা সবই লক্ষ্য করেন শশধর বাবু, আর স্পষ্টই বুঝতে পারেন অভীপ্সা তাঁদের কাছে পর হয়ে গেছে। জলের আলপনার মত জীমূতের স্মৃতি ওর মন হতে উবে গেছে।

রাতের ময়ূর আকাশে পেখম মেলেছে। সেই দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকেন শশধর বাবু। সান্ধ্যধূম্ররাশি রাস্তার বাতিগুলোকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে।

রাধারাণী অনেক ইতস্ততঃ করে শেষে একদিন মরীয়া হয়ে অভীপ্সার মা'র কাছেই গিয়ে কথাটা বললেন। অভীপ্সার মা'র কোনো ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। তিনি বললেন—"বেয়ান, আমার কানেও কথাটা এসেছে। আমি ওঁকে বলেছিলাম। উনি বললেন—তা যদি হয়, ভালই ত। ঐ কচি মেয়ে কি বৈধব্য-যন্ত্রণা সইতে পারে? এ ত কিছু অশাস্ত্রীয় নয়। লোকনিন্দার ভয়ে বৈধব্য পালন করা, আর সুখী দম্পতিকে দেখে আড়ালে হা-হুতাশ করা কোনো কাজের কথা নয়।"

"আমিও ভেবে দেখলাম বেয়ান, সত্যি মা-বাপ হয়ে ঐটুকু মেয়ের বৈধব্যদশা আমরা চোখে দেখতে পারছি না। যা গেছে সে ত গেছেই, ও যদি আবার সংসারী হয় তবে তা মেনে নেওয়াই উচিত। মেয়ে মরে গেলে যদি জামাই আবার বিয়ে করত, আমরা কি বাধা দিতুম? মোটেই না, সেই বৌকেই আমরা মেয়ে মনে করতুম। এই ত হালদার-গিন্নীর জামাই দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে। সে বৌ ত প্রায়ই হালদার-বাড়ীতে এসে থাকে, কর্ত্তা-গিন্নী কত ভালবাসেন ওকে।"

পিক্‌দানীতে পিক্ ফেলে অভীপ্সার মা আবার বললেন,—"অল্প বয়সের বিধবার আবার বিয়ে দেওয়াই উচিত। মহাত্মা গান্ধীও এ জন্যে কত চেষ্টা করেছেন। বিশেষতঃ আপনার যখন ছেলে নেই, ভবেশকেই মনে করুন আপনার ছেলে। ভবেশ ত ছেলে খারাপ নয়, অতি চমৎকার!"

রাধারাণী গম্ভীর মুখে আর কথাটি না বলে উঠে এলেন। ওঃ! ভেতরে ভেতরে এই ব্যাপার! বেয়ানের আস্কারা পেয়েই বৌমার অত বড় বুকের পাটা। তাই ত বলি। আবার বোঝাতে আসে, "হালদার-গিন্নীর জামাই দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে"—ছেলে আর মেয়ে এক হল? তা ও তাঁদের একমাত্র বংশধর। নিজের যদি অমন একমাত্র ছেলে যেত……না, না, না—

চমকে উঠে রাধারাণী দুরন্ত, অবাধ্য চিন্তার রাশ টেনে ধরেন— তাঁর মত কপাল যেন শত্রুরও না হয়, হে ভগবান!

সব দিকে হতাশ হয়ে রাধারাণী শশধর বাবুকেই পীড়াপীড়ি করতে

সুরু করেছেন। এখনও বৌমা ওঁকে একটু মানে, উনি বললে ওঁর কথা ঠেলতে পারবে না। কিন্তু শশধর বাবু নিজের সীমা লঙ্ঘন করে অপমানিত হতে প্রস্তুত ন'ন। তিনি নির্লিপ্ত ভাব দেখান, কিন্তু নিজেকে ত আর ফাঁকি দেওয়া চলে না? বুক ভেঙে পড়তে চায় যাতনায়; পড়াশোনায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন শশধর বাবু। রাধারাণী জিতুকে কোলে নিয়ে এসে বসেন। শশধর বাবু ফিরে তাকান না। রাধারাণী বলেন—"দেখছ দাদু, বুড়োর গুমোর কত? তোমার দিকে মোটে তাকাচ্ছে না। যাও, কাগজটা কেড়ে নাও।"

জিতু সোৎসাহে উঠে এসে কাগজটা কেড়ে নিতে চায়। শশধর বাবু হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, ততক্ষণে জিতু কাগজ থেকে একটা টুকরো ছিঁড়ে নিয়েছে। শশধর বাবু সেটা ওর হাত থেকে নেবার জন্ত হাত বাড়াতেই জিতু টলমল পায়ে ও-পাশে ছুটে যায়, তার পর ছেঁড়া কাগজের টুকরোটা মেলে ধরে চেঁচাতে থাকে, রাধারাণী বলেন—"দেখেছ? তুমি যে মধ্যে মধ্যে আমাকে কাগজ পড়ে শোনাও, তাই নকল করছে। কি দুষ্টু!"

জিতু শুনতে পেয়ে বলে ওঠে—"দুত্তু, পাজি।" এমন সময় কে ডাকে "দিদিমা!" রাধারাণী চেয়ে দেখেন অভীপ্সার ভাই-পো সুকুমার। ছেলেমানুষ, বছর বারো বয়স, কুণ্ঠিত পদে এসে শশধর বাবু ও রাধারাণীকে প্রণাম করে একটা চিঠি দিয়ে বললে, "ঠাকুমা দিলে।"

অভীপ্সাকে কয়েক দিন নিজের কাছে রাখতে চান ওর মা। সম্ভব হলে কালই নিয়ে যেতে চান। জীমূত মারা যাওয়া অবধি অভীপ্সা বাপের বাড়ীতে রাত্রিবাস করেনি। শশধর বাবু ও রাধারাণী কি করে জিতুকে না দেখে থাকবেন, তাই ভেবে অভীপ্সা নিজেই রাজী হয়নি। চিঠি পড়ে রাধারাণীর মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু শশধর বাবু বলে দিলেন—"আচ্ছা, কাল সকালে যাবে।"

সুকুমার চলে গেলে রাধারাণী বললেন—"অমনি রাজী হয়ে গেলে? ওদের নিশ্চয় কোনো মতলব আছে। মেয়ের নিকের জোগাড় করবেন—"নিষ্ফল ক্ষোভে তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে যায়। শশধর বাবু বলেন—"যেতে না দিলেই কি আর কিছু করতে পারতাম? যা অনিবার্য্য তাকে মেনে নেওয়াই ভাল। আমাদের পাষাণে বুক বেঁধে প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের সুখ-স্বার্থের জন্ত আমরা বৌমাকে জোর করে চির-বৈধব্য পালন করাতে পারি না।"

রাধারাণী সজল চোখে বললেন—"সবাই ত আর তোমার মত মহেশ্বর হতে পারে না?"

হঠাৎ জিতুর দিকে চোখ পড়তে হাঁ-হাঁ করে ওঠেন তিনি। সুকুমারের ভুক্তাবশেষ খাবারের টুকরো মুখে দিয়েছে জিতু। ছুটে এসে ওর মুখ থেকে খাবারের টুকরো বের করে ফেলে দিয়ে চাকর-বাকরকে ধমকাধমকি করতে থাকেন রাধারাণী। কেন এতক্ষণেও উচ্ছিষ্ট সরিয়ে নেওয়া হয় নি। শশধর বাবু বিষণ্ণ হাসেন। আর কত দিন? এখনও মায়া কাটাতে পারছেন না রাধারাণী, হয়ত বিশ্বাস করতে পারছেন না যে তাঁদের একমাত্র অবলম্বনও দূরে চলে যাবে। অভীপ্সার মার কথামত ভবেশকে ছেলের মতন দেখতে পারলে হয়ত জিতুকে কাছে

পাওয়া যাবে কিন্তু আত্ম-প্রতারণা করা শশধর বাবু বা রাধারাণী কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এক গাছের বাকল অন্য গাছে লাগানো যায় না—লম্বা-চওড়া হিতোপদেশে ওটা সম্ভব হয় না। শশধর বাবু তাই জিতুকে এড়িয়ে চলতে চান, তার মায়া কাটাতে চান। বিশ্বজোড়া যে মায়ার ফাঁদ পাতা, তা থেকে ফাঁকি দেওয়া কি অত সহজ? অর্দ্ধেক চিঠি লিখে শশধর বাবু উঠে গেছেন কোনো কাজে, ফিরে এসে দেখেন 'জিতুর শ্রীহস্তের লাঞ্ছন সর্ব্বাঙ্গে নিয়ে চিঠি মাটিতে পড়ে আছে, আর জিতু টেবিলের ওপর উঠে বসে পিনকুশনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। দাদুকে দেখেই সে ভুবন-ভোলানো হাসি হেসে হাত বাড়ালে কোলে আসার জন্য। যাক্ ভালই হয়েছে এবার, কাল থেকে চোখের আড়াল হবে।

রাধারাণী কিন্তু অত সহজে মেনে নিতে পারলেন না। আড়াল থেকে অভীপ্সাকে লক্ষ্য করে শব্দভেদী বাণ ছুঁড়তে লাগলেন—"ডাইনী, জীমূতকে খাবার জন্য ঢং দেখিয়ে বিয়ে করেছিল সম্পত্তির লোভে—"

শশধর বাবুর অনুপস্থিতি ছাড়া ত এ সব বলা চলে না, তাই আশ মিটিয়ে বলতে পারলেন না।

পরদিন অভীপ্সার বড় ভাই এসে ওকে নিয়ে গেল। শশধর বাবু সামনে থাকায় রাধারাণী ভাই-বোনকে একহাত নেবার ইচ্ছাটা পূর্ণ করতে পারলেন না। জিতুকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে শশধর বাবু বললেন—"দাদু, কবে আসবে?"

জিতু গম্ভীর মুখে জবাব দিল "কাল আসব।" সব অনাগত দিনই ওর "কাল।"

জিতুরা যাবার পরদিনই রাধারাণী বিকেলে বললেন, "ওগো, একবার যাও না, জিতুকে একবার দেখে এস।"

শশধর বাবু এড়াতে চাইলেন। মিছিমিছি মায়া আর বাড়ানো কেন? জিতু তাঁদের একমাত্র বংশধর, পরলোকে গেলে তাঁরা তার কাছে থেকে জলগণ্ডুষ আশা করতে পারেন, কিন্তু ইহলোকে জিতুকে আর তাঁরা কাছে পাবেন না। কিন্তু রাধারাণী তা বুঝতে চান না—চব্বিশ ঘণ্টা শুধু ওর কথা। ভাত খেতে বসে বলবেন—"কে দাদুকে ভাত খাওয়াবে? এখানে আমি খাওয়াতাম, ওর দিদিমা কিছু করবে না। বোতল বোতল দুধ গিলিয়ে নিশ্চিন্ত হবে। ছেলে মানুষ করতে জানলে ত?"

কখনও বলবেন—"যা গাড়ী চলে ওদের বাড়ীর ধারের রাস্তায়, ওকে আর কে দেখে রাখবে বল? কখন যে কি হবে!"

রাধারাণী কান্নাকাটি সুরু করাতে অগত্যা শশধর বাবু বাধ্য হলেন জিতুর মামাবাড়ী যেতে। অভীপ্সার বাবা একটা বড় রকম আক্রমণের আশঙ্কা করেছিলেন, কিন্তু শশধর বাবু দু'-এক কথার পরই বললেন, "দাদুকে একবার দেখব।"

জিতু দাদুকে দেখে মহা খুসী। তার সব মামাতো মাসতুতো বোনদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সে শশধর বাবুর কোলে উঠে বসল। আর বলতে লাগল—"আমার দাদু, আমার"—

অভীপ্সার বাবা বললেন—"নাতি কম নয় বেয়াই-মশাই, ওর সম্পত্তিতে কাউকে ভাগ বসাতে দেবে না, হাঃ-হাঃ-হাঃ। থাক, দাদু, থাক, তোমার দাদুর কোল তোমারই একচেটিয়া থাক, ওতে কেউ ভাগ বসাচ্ছে না।"

দু'দিন পর রাধারাণী আবার বললেন—"দাদুকে দেখে এসো। কেন, পরশু দেখে এসেছ বলে আজ যেতে নেই?"

শশধর বাবু কিছুতেই রাজী হলেন না দেখে রাধারাণী কাঁদতে সুরু করলেন—"তোমার মুখে তবু খবরটা পেতে পারতাম, তাও হবে না, কি পাষাণ তুমি, সবে ধন নীলমণি আমাদের, ওর কোনো খোঁজ-খবর নিচ্ছ না।"

হাউ-হাউ করে কাঁদেন রাধারাণী। শশধর বাবু বিব্রত হয়ে বলেন—"না হয় ফোন করে খবর এনে দিচ্ছি।"

"হ্যাঁ, তবে ত সবই হল। ফোনে হয়ত মিছে কথা বলবে, অসুখ করলেও বলবে, ভাল আছে, ডাক্তার দেখাবে না! ওদের কি আর বাছার ওপর মায়া আছে একটুও, সব শত্তুর।"

কাঁদতে কাঁদতে রাধারাণী মূর্চ্ছা গেলেন। শশধর বাবুর হল বিপদ। সুচিত্রা এখানে নেই, চলে গেছে দিল্লীতে ওর ভাসুরের কাছে। শাশুড়ীর অসুখ, না গেলেও চলে না। ও থাকলে রাধারাণী একটু শান্ত হতেন হয়ত। ছোট মেয়ের স্বামী বিলেতে চাকরী করে, ও সেখানেই আছে। মেজ মেয়ে মাদ্রাজে; ছেলে-মেয়েদের স্কুল রয়েছে, নাহলে নাতি-নাতনীদের কাছে পেলে রাধারাণী একটু প্রবোধ মানতেন।

শশধর বাবু অগত্যা অভীপ্সার বাবার কাছে গিয়ে প্রস্তাব করলেন, তিনি রোজ সকালে গাড়ী পাঠাবেন, জিতুকে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সন্ধ্যের সময় আবার তাকে দিয়ে যাবেন শশধর বাবু। অভীপ্সা আর শশধর বাবুর ওখানে যাবেন না, এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। ভবেশ বদলি হয়েছে পাটনায়, ওখানেই বিয়ে হবে, রেজেষ্ট্রি করে; ভবেশের বাপ-মা ত আর নেই, অনুষ্ঠানের হাঙ্গামা করে কি হবে? অভীপ্সার বাবা যদিও শশধর বাবুকে কিছু বলেন নি, কিন্তু শশধর বাবু কিছু টুকরো খবর থেকে কিছু বা আন্দাজে সবই বুঝতে পারছিলেন। অভীপ্সার বাবা শুনে বললেন—"দেখি বাড়ীতে জিজ্ঞেস করে।" শশধর বাবু ইতস্ততঃ করে বললেন—"ওর ঠাকুমা বড় কাতর হয়ে পড়েছেন।"

অভীপ্সা ইতস্ততঃ করছিল, কিন্তু ওর মা বললেন—"উনি যা বলছেন তাই হোক। মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি বলে যে ওঁদের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে হবে তেমন কোনো কথা নেই।"

জিতু রোজ আসে আয়ার সঙ্গে, সেই সঙ্গে টুকরো খবর এঁদের কানে আসে—অভীপ্সার বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। শীগগির সবাই পাটনা চলে যাবে। রাধারাণী রেগে আগুন হয়ে আবার কেঁদে ভাসান, শশধর বাবু হাসিমুখে তাঁকে শান্ত করেন।

দিন কয়েক পরে অভীপ্সার বাবা এলেন। উদ্দেশ্য শশধর বাবু আঁচ করতে পেরেছিলেন। ভদ্রলোক ধীরে ধীরে অতি দূর থেকে আসল প্রসঙ্গে আসবার চেষ্টা করলেন—ইংরাজী শিক্ষার ফলে মনের প্রসার, কুসংস্কার, বিদ্যাসাগর, মহাত্মা গান্ধী বিধবাদের সম্বন্ধে কি বলেছেন—

শশধর বাবুই বললেন—"বৌমার বিয়ে দিচ্ছেন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই; সেজন্য চিন্তিত হবেন না।"

অভীপ্সার বাবা একটু থতমত খেয়ে গেলেন, তার পর শশধর বাবুর উদার হৃদয়ের প্রশংসা কীর্ত্তন করতে লাগলেন। শশধর বাবুর

অসহ্য মনে হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"তারিখ ঠিক হয়ে গেছে?"

অভীপ্সার বাবা বললেন—"এ মাসের সাতাশে দিন ঠিক হয়েছে, আর পনেরো দিন মাত্র আছে। বেয়াই, আপনাকে যেতেই হবে, মনে করুন আপনার মেয়ের বিয়ে, ও ত আপনার মেয়েই, ওর সব দোষ ক্ষমা করে আপনাকে যেতে হবে।"

শশধর বাবু অটল ধৈর্য্যের সঙ্গে বললেন—"এ শরীরে পাটনা যাওয়া আর পোষাবে না বেয়াই মশাই! এখান থেকেই ওকে আশীর্ব্বাদ করছি।"

উঠবার সময় অভীপ্সার বাবা বললেন—"পরশু বিকেলের গাড়ীতে ওদের নিয়ে আমি পাটনা রওয়ানা হব। জিতুকে কাল আর পাঠানো সম্ভব হবে না বোধ হয়, তবু দেখব চেষ্টা করে। ওরা পাটনায়ই থাকবে এখন। বুঝতেই পারেন, পাড়াপড়শী আর আত্মীয়-স্বজনরাও কেউ কেউ অভীপ্সার ওপর খুশী নয়। আমিই কি বেয়াই খুব খুসী হচ্ছি? জীমূতের মুখখানা সব সময়েই মনে ভাসে। কিন্তু কি করব, মেয়েটার দিকেও ত চাইতে হবে।"

শশধর বাবু আস্তে আস্তে বললেন—"যাবার আগে একবার নাতিকে দেখিয়ে নিয়ে যাবেন বেয়াই মশাই, এই আমার অনুরোধ।"

এর পর শশধর বাবু ও রাধারাণী কি ভাবে সময় কাটাতে লাগলেন, তা না বলাই ভাল।

* *

অভীপ্সার বাবা জিতুকে নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে বললেন—"তুইও আসবি না কি?"

অভীপ্সা ঘাড় নাড়লে। শাশুড়ীর অভ্যর্থনা গ্রহণ করবার তার সাহস নেই।

পাঁচ মিনিট দশ মিনিট পনেরো মিনিট করে আধ ঘণ্টা কেটে গেল, কৈ বাবার ত আসার নামটি নেই। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অভীপ্সা বিরক্ত হয়ে উঠল, কি করছেন এতক্ষণ? নিশ্চয় শাশুড়ী কান্নাকাটি শুরু করেছেন, যত সব ন্যাকামী।

নাঃ শেষ পর্য্যন্ত যেতেই হল। দরজা খুলে অভীপ্সা নেমে পড়ল। ঘরের ভেতরে রাধারাণী তখন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলছেন—"একটু অপেক্ষা করুন বেয়াই মশাই, রাধামাধবের নির্ম্মাল্য ওর মাথায় ছোঁয়ানো হয় নি; সে ত কালীঘাটের নির্ম্মাল্য, এটা দিই নি।"

অভীপ্সার বাবা বিপন্নমুখে বললেন—"কিন্তু এই করে করে যে দেরী করিয়ে দিচ্ছেন বেয়ান—"

"একটুখানি দেরীতে কিছু হবে না। ওকে প্রসাদ দিইনি—"

অভীপ্সা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিল। শাশুড়ী কি ভেবেছেন যে এ রকম করে তিনি অভীপ্সাকে আটকাতে পারবেন? শাশুড়ীর জন্য ত আর সে আত্মপ্রতারণা করে চিরজীবনের জন্য দুঃখবরণ করতে ও দুঃখ দিতে পারে না। দৃঢ়পদক্ষেপে অভীপ্সা ঘরে ঢুকল।

"বাবা, শীগগির চল। অনেক দেরী হয়ে গেছে।"

রাধারাণী চমকে উঠলেন। সন্ত্রস্ত, ব্যাকুল স্বরে বললেন,—"এই, এখুনি দিচ্ছি; আর একটু—"

অভীপ্সার দিকে চাইলেন তিনি। আসন্ন, অনিবার্য্য সব হারানোর যাতনায় আকুল, অসহায় সে দৃষ্টি যেন অভীপ্সাকে চাবুক মারলে। তার হাত-পা শিথিল হয়ে এল। শশধর বাবুও আজ ভেঙে পড়েছেন। তাঁরও দুই চোখে জল। জিতু অবাক হয়ে সবার দিকে তাকাচ্ছে।

অভীপ্সা হঠাৎ তার বাবার হাত ধরে বললে—"চল বাবা, আমরা যাই। জিতু না হয় থাকুক।"

"সে কি রে? তুই যে—"

"আঃ, চলই না।"

হতভম্ব দম্পতীকে প্রণাম করে অভীপ্সা চলে গেল।

ভবেশ ওদের বাড়ীতে অপেক্ষা করছিল। অভীপ্সাকে দেখে বললে—"কই, জিতুকে নিয়ে এলে না যে?"

"পারলুম না,—বলে অভীপ্সা পাশের ঘরে চলে গেল। ভাবী শ্বশুরের কাছে সব শুনে ভবেশ পাশের ঘরে গেল—"

"ওকে ছেড়ে থাকতে পারবে?"

"পারতে হবে—"একটু থেমে অভীপ্সা বললে।

"আমার ত তুমিই আছ কিন্তু ওঁদের যে জিতু ছাড়া কেউ নেই তাই"—ভবেশের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল অভীপ্সা, মৃদু নরম গলায় বললে—"আমিও যে মা!"

পুরাকালে অনেক দূরে এক পাহাড়ে এক দরিদ্র দম্পতি বাস করতো। খুবই কষ্টের জীবন ছিল তাদের। পাহাড়ের এক ধারে একটা অনুর্বর জমিতে তারা আলুর চাষ ক'রতো। ফসল হত খুব সামান্যই এবং তাতে তারা কোন রকমে কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করতো।

ক্রমশঃ বয়স বেশী হ'তে থাকায় তাদের শক্তি কমে যেতে লাগলো। এখন তাদের ভয়ানক ভাবনা হ'ল, বুড়ো হলে কি ক'রে তাদের দিন চলবে, কে তাদের খাওয়াবে। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো: "আমাদের যদি একটি ছেলে হ'ত, তাহলে বুড়ো বয়সে সে আমাদের জমি চাষ করতো, চুংপো (জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর) নির্দিষ্ট কাজ ক'রে দিত আর শীতের সময় "থোরা"র (তিব্বতীদের প্রত্যেকের বাড়ীতে ঘরের মাঝখানে একটা গোলাকার গর্ত থাকে আগুন জ্বালাবার জন্য তাতে আগুন পোয়ানোও হয় আবার রান্নার কাজও চলে) জন্য কাঠ কেটে আনতো। তাহলে বুড়ো বয়সে আমরা একটু বিশ্রাম করতে পারতাম।"

তারা পাহাড় এবং নদীর দেবতার কাছে একটি ছেলের জন্য প্রার্থনা জানাল। "হে ঠাকুর, আমাদের একটি সন্তান দাও।" দেবতা তাদের প্রার্থনা শুনলেন কি না কে জানে, কিন্তু স্ত্রীটির

তিব্বতী গল্প

সন্তান-সম্ভাবনা হল। সাত মাস পরে সে যা প্রসব করল তা মানবশিশু নয়, সেটা একটা মস্ত বড় কোলা ব্যাং, তার ড্যাবা-ড্যাবা দুটো চোখ।

বুড়ো লোকটা বললে: "কি আশ্চর্য্য! এ যে দেখছি একটি কোলা ব্যাং, ওটাকে বাইরে ফেলে দাও।"

স্ত্রী কিন্তু তাতে সম্মত হ'ল না। সে উত্তর দিলে: "ভগবান আমাদের প্রতি সদয় নন। মানুষের বদলে তিনি আমাদের ব্যাং দিয়েছেন। কিন্তু পেটে যখন ধরেছি তখন ফেলে দিতে পারবো না। ব্যাং-এরা পুকুরের ধারে জল-কাদার মধ্যে বাস করে। আমাদের বাড়ীর পেছনে যে জলাশয়টা আছে তাতেই ওকে রেখে দেওয়া যাক্।"

বুড়োটা ব্যাংটাকে নিয়ে যাবার জন্য যেই তুলে ধরেছে, অমনি ব্যাংটা বলে উঠলো: "বাবা, মা, আমাকে পুকুরে নিয়ে এসো না। মানুষের পেটে জন্মেছি, আমাকে মানুষের মতই মানুষ কর। বড় হয়ে আমি আমাদের দেশের অবস্থা ফিরিয়ে ফেলব, কেউ আর গরীব থাকবে না।"

বৃদ্ধ অবাক-বিস্ময়ে বললে: "ওগো, কি আশ্চর্য্য দেখ, ব্যাংটা ঠিক মানুষের মত কথা বলছে!"

স্ত্রী উত্তর দিলে: "কিন্তু ও যা বলছে তাতে ভালই হবে। আমাদের মত গরীব লোকদের অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার, এভাবে আর চলে না। ও কক্ষণো সাধারণ ব্যাং নয়, নইলে মানুষের মত কথা কয়? ও আমাদের কাছেই থাকুক"।

সেই থেকে ব্যাং-শিশু তাদের কাছেই মানুষ হতে লাগল। বুড়ো-বুড়ী তাকে ঠিক মানুষের ছেলের মতই আদর-যত্ন করে। এই ভাবে দিন যায়।

তিন বছর পরে ব্যাংটা একদিন তার মা-বাবার কষ্ট দেখে থাকতে না পেরে বললে: "মা, আমার জন্য একখানা মোটা আটার রুটি তৈরী করে রাখ। কাল সকালে সেটা একটা প্যাকেটে পুরে আমাকে দিও। উপত্যকার ওদিকে এক দুর্গে চুংপো থাকে। আমি তার কাছে যাব। তার তিনটি সুন্দরী মেয়ে আছে। তার মধ্যে একজনের শরীরে খুব মায়া-দয়া এবং বেশ শক্ত-সমর্থ। আমি তাকে বিয়ে করে নিয়ে আসবো। সে এসে তোমাদের কাজ করে দেবে, তাহলে আর তোমাদের কষ্ট হবে না।"

"শোনো, পাগলা ছেলের কথা শোনো একবার," বুড়ী বলল। "তোর সঙ্গে কে মেয়ের বিয়ে দেবে বল? ব্যাং বলে সবাই তোকে তাড়িয়ে দেবে, মাড়িয়ে দেবে, হয়ত বা দৈত্য মনে করে গায়ে ছাই দিয়ে দেবে। ওরা তাই করে কি না"।

ব্যাং কিন্তু কিছুতেই শুনবে না। সে বললে, "তুমি দেখো না, চুংপো ঠিক রাজী হবে। তুমি রুটি তৈরী করে রেখো।"

মা কি আর করে! শেষে রাজী হতেই হয়। "আচ্ছা বেশ, তাই হবে। তোর যখন একান্ত ইচ্ছে, তখন রুটি করে রাখবো এখন। কিন্তু যদি তারা তোকে হতশ্রদ্ধা করে, যদি গায়ে ছাই ঢেলে দেয়?"

ব্যাং বললে: "তুমি দেখো মা, তারা কক্ষণো তা করতে সাহস করবে না।"

পরদিন সকালে মা একখানা বড় রুটি তৈরী করে একটা ব্যাগে পুরে ব্যাংকে দিলে। ব্যাং ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে থপ্‌থপ করে লাফাতে লাফাতে উপত্যকা অভিমুখে রওনা হল।

দুর্গের ফটকের সামনে হাজির হয়ে ব্যাং হাঁক দিল: "দরজা খোল, দরজা খোল"।

চুংপো শুনতে পেল, কে যেন ডাকছে। সে তার চাকরকে পাঠিয়ে দিলে কে ডাকছে দেখবার জন্যে।

চাকরটা অবাক হয়ে ফিরে এসে বললে: "কি আশ্চর্য্য হুজুর! ছোট্ট একটা ব্যাং ফটক খুলে দিতে বলছে!"

চুংপোর সর্দার খানসামা বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বললে: "আমি ঠিক ধরেছি হুজুর! ওটা নিশ্চয়ই কোন দৈত্য, ওর গায়ে ছাই ছুঁড়ে দেওয়া যাক।"

চুংপো কিন্তু এতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন: "একটু অপেক্ষা কর। দৈত্য না-ও হতে পারে। ব্যাং-এরা সাধারণতঃ জলে বাস করে। ব্যাংটা হয়ত ড্রাগন-রাজের প্রাসাদ থেকে কোন বার্ত্তা নিয়ে এসেছে। দেবতার মত ওকে দুধ দিয়ে স্নান করাও। তার পর আমি নিজে ওর সঙ্গে দেখা করবো।"

ভৃত্যেরা তখন ব্যাংকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল এবং দুধ দিয়ে স্নান করাল। তার পর চুংপো ফটকের নিকট এসে বললেন: "তুমি কি ড্রাগন-রাজের প্রাসাদ থেকে আসছ? তুমি কি চাও?"

ব্যাং উত্তর দিল: "আমি ড্রাগন-রাজের কাছ থেকে আসিনি। আমি নিজের ইচ্ছাতেই এসেছি। আপনার তিনটি মেয়েরই বিয়ের বয়স হয়েছে। আমি একটিকে বিয়ে করতে চাই। আমি আপনার কন্যার পানিপ্রার্থী হয়ে এসেছি। অনুগ্রহ করে আপনার একটি মেয়েকে বিয়ে করবার অনুমতি দিন।"

ব্যাং-এর কথা শুনে তো সকলের আক্কেল গুড়ুম! চুংপো তাকে বললে: "তুমি একটা কদাকার ব্যাং, তোমার সঙ্গে কি করে মেয়ের বিয়ে দেব! কত বড় বড় লোক আমার মেয়েদের বিয়ে করবার জন্য সাধাসাধি করছে, তাই রাজি হচ্ছি না, আর তুমি তো সামান্য ব্যাং।"

"ও, তাহলে আপনি রাজি নন?" ব্যাং বললে। "বেশ আপনি যদি বিয়েতে মত না দেন তাহলে আমি হাসব।"

চুংপো ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বললেন: "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। হাসতে হয় হাসগে যাও।"

তখন ব্যাংটা হাসতে আরম্ভ করল। সে কি ভীষণ হাসি! হাসির এত জোর যেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ব্যাং একসঙ্গে ডাকছে। হাসির চোটে পৃথিবী কাঁপতে লাগল। চুংপোর দুর্গের চূড়া কাঁপতে লাগল। মনে হল এখনি দুর্গ ভেঙে পড়বে। দেয়ালে ফাট ধরল। ধুলো-বালিতে সূর্য ঢাকা পড়ে অন্ধকার হয়ে গেল। চুংপোর বাড়ীর লোকজনেরা ভয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলে। হুড়োহুড়ি, ছুটোছুটি, ধাক্কাধাক্কি, সে এক প্রলয় কাণ্ড!

একান্ত নিরুপায় হয়ে চুংপো জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ব্যাংকে বললেন: "ওগো ব্যাং, দোহাই তোমার, আর হেসো না, নইলে আমরা সবাই মারা পড়বো। আমি কথা দিচ্ছি, আমার বড় মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।"

ব্যাং তখন তার হাসি বন্ধ করল। মাটী-কাঁপা থেমে গেল, ঘর-বাড়ী সব যেমন ছিল তেমনি রইল, যেন কিছুই হয়নি।

চুংপো বাধ্য হয়ে তাঁর বড় মেয়েকে ব্যাং-এর হাতে সমর্পণ করলেন। চাকরদের বললেন দুটো ঘোড়া আনতে। একটা ঘোড়ায় বড় মেয়েকে চাপান হল এবং অপর ঘোড়ায় বোঝাই করা হল যৌতুক। আর আগে আগে ব্যাং থপ্-থপ করতে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

বড় মেয়ের কিন্তু ব্যাংকে বিয়ে করতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কি আর করবে! বাপের হুকুম। সে একটা মতলব আঁটলে। ঘোড়ায় উঠবার আগে দু'খানা যাঁতার পাথর সংগ্রহ করে নিলে। ভাবলে পথে পাথর চাপা দিয়ে ব্যাংটাকে মেরে ফেলবে। প্রথমে সে ঘোড়াটাকে খুব দ্রুত চালাতে লাগল, যাতে তার খুরের আঘাতে ব্যাংটা মারা পড়ে। কিন্তু ব্যাংটা থপ্-থপ্ করে একবার ডান দিকে একবার বাঁ দিকে এমন ভাবে লাফাতে লাফাতে যাচ্ছিল যে কিছুতেই তাকে চাপা দেওয়া গেল না। তখন বড় মেয়েটা রাগে যাঁতার পাথর ছুঁড়ে ব্যাংটার ঘাড়ে ফেলে দিলে এবং ব্যাংটা মরে গেছে ভেবে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে বাপের বাড়ী ফিরে চলল। কিন্তু কি আশ্চর্য! যেই না ঘোড়ার মুখ ফেরালো অমনি পেছন থেকে ব্যাংটা তাকে ডাকল।

বড় মেয়ে চমকে উঠলো। ব্যাংটা তাহলে মরে নি, যাঁতার মধ্যের ফোকর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

ব্যাং তাকে বললে: "দেখ, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে বিধাতার অভিপ্রেত নয়। তা ছাড়া তুমিও যখন আমায় বিয়ে করতে চাও না, তখন তোমায় তোমার বাড়ীতে রেখে আসি চল।" ব'লে ব্যাংটা ঘোড়ার লাগাম ধরে চুংপোর দুর্গে ফিরে গেল।

দুর্গে ফিরে ব্যাং চুংপোকে বললে: "আমাদের যোটক ঠিক নয়, আমি আপনার বড় মেয়েকে ফিরিয়ে এনেছি। আপনার অন্য মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিন।"

চুংপো এবার খুব রেগে গেলেন। তিনি বললেন: "তুই তো আচ্ছা বদমাইস! আমার মেয়েকে ফিরিয়ে এনেছিস! নিজের পছন্দ মত মেয়ে বেছে নিয়ে বিয়ে করবেন! তোর স্পর্দ্ধা তো কম নয়!" রাগে কাঁপতে লাগলেন চুংপো।

ব্যাং বললে: "ও, আপনি তাহলে রাজী নন? বেশ, আপনি যদি রাজী না হন তাহলে আমি কাঁদবো।"

চুংপো ভাবলেন, কাঁদলে আর কি হবে, না হাসলেই হল। তিনি বিদ্রূপ ক'রে বললেন: "কাঁদ্‌বি, কাঁদ্. তাতে কারো কোন ক্ষতি নেই।"

ব্যাংটা তখন কাঁদতে সুরু করল। সে কি ভীষণ কান্না! বর্ষাকালের রাত্রিতে ঝমঝম করে বৃষ্টি হলে যে রকম শব্দ হয় ঠিক সেই রকম। চার দিক মেঘে অন্ধকার হয়ে গেল, আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল, মুহুর্মুহু বজ্রপাত হতে লাগল। প্রবল বৃষ্টির ফলে দারুণ বন্যা হল এবং পথ-ঘাট ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা এবং এমন কি পাহাড় পর্য্যন্ত জলে ডুবে সব একাকার হয়ে গেল। জল ক্রমশঃ আরও উঁচুতে উঠতে লাগল। চুংপোর বাড়ীর লোকেরা দুর্গের ছাদে আশ্রয় নিলে। কিন্তু ক্রমে সেখানেও জল উঠলো। চুংপো কোন রকমে গলা বাড়িয়ে চীৎকার করে ব্যাংকে বললেন: "ওগো ব্যাং, তোমার কান্না থামাও, আমার মেজ মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।"

ব্যাং তখন কান্না থামালো। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি থেমে গেল এবং জলও ক্রমে সব নেমে গেল।

চুংপো তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর মেজ মেয়েকে ব্যাং-এর সঙ্গে যেতে বললেন। মেজ মেয়ের কিন্তু ব্যাংকে বিয়ে করতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বাপের আদেশ, কি আর করবে, অগত্যা

যেতে হল। সে তার দিদির মত যাঁতার আধখানা পাথর লুকিয়ে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চাপলো। দ্বিতীয় ঘোড়ায় দেওয়া হল যৌতুক। ব্যাং ঘোড়ার লাগাম ধরে থপ-থপ করে যেতে লাগল তার নিজের বাড়ীর পথে।

মেজ মেয়ে তার দিদির মত ব্যাংকে মেরে ফেলার জন্য জোরে ঘোড়া চালাতে লাগল কিন্তু ব্যাং আগের মত একবার বাঁ দিকে একবার ডান দিকে—এই রকম করে অগ্রসর হতে থাকায় তাকে চাপা দেওয়া গেল না। তখন মেজ মেয়ে রাগে যাঁতা ছুড়ে মারল এবং ব্যাংটা মরে গেছে ভেবে বাড়ী ফেরার জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু ঘোড়ার মুখ ফেরাবা মাত্র পেছনে ব্যাংএর গলা শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল।

ব্যাং বললে: "দেখ, আমাদের বিয়ে হওয়া বিধাতার অভিপ্রেত নয়, চল তোমায় বাড়ী রেখে আসি"। ব'লে সে মেজ মেয়েকে নিয়ে তার বাপের দুর্গে ফিরে গেল। চুংপোকে বললে: "দেখুন, আপনার মেজ মেয়ের সঙ্গে আমার মিলবে না, আপনার ছোট মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিন"।

চুংপো এবার আর থাকতে পারলেন না। রেগে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন: "তুই মনে ভেবেছিল কি! বড় মেয়েকে দিলাম, পছন্দ হল না। মেজ মেয়েকে দিলাম, তাকেও মনে ধরল না। এখন চাই ছোট মেয়েকে। কোন মেয়েই ব্যাংকে বিয়ে করতে রাজী হবে না, আমার মেয়ে তো নয়ই। তোর যা খুশী করগে যা"।

কথাটা বলে চুংপোর মনে মনে কিন্তু খুব ভয় হতে লাগল। না জানি ব্যাং এবার কি করে। কিন্তু সে রাগ সামলাতে পারল না।

ব্যাং তখন বললে: "তাহলে আপনি দেখছি রাজী নন? যদি রাজী না হ'ন তাহলে আমি লাফাব"।" বলে সে লাফাতে আরম্ভ করল।

আর যায় কোথা! অমনি সুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড ভূকম্পন। ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্ব্বত সব তোলপাড় হতে লাগল। মাটী ফেটে চৌচির হয়ে গেল। ধুলো-বালি উড়ে চারদিক অন্ধকার হল। চুংপোর দুর্গ এমন দুলতে লাগল, যে কোন মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। চুংপো তখন নাচার হয়ে চেঁচিয়ে বললে: "ওগো ব্যাং, তোমার নাচ বন্ধ কর, আমার ছোট মেয়ের সঙ্গেই তোমার বিয়ে দেব।"

ব্যাং তখন লাফান বন্ধ করল। পৃথিবী ঠাণ্ডা হল। চুংপো ছোট মেয়েকে ব্যাং-এর সঙ্গে যাবার আদেশ দিলেন।

এই ছোট মেয়েটির ছিল খুব দয়ার শরীর এবং তার প্রকৃতি ছিল খুব ধীর ও শান্ত। সে ভাবলে, এই ব্যাং খুব বুদ্ধিমান। ছোট মেয়ে যেতে কোন আপত্তি করলে না, স্বেচ্ছায় গিয়ে ঘোড়ায় উঠল।

এবার আর কোন গোলমাল হল না। ব্যাং তাকে নিয়ে তার নিজের বাড়ীতে হাজির হল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

অনুবাদক—হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

বিরাজ বলে, ও পিসিমা, বরাত বিশ্বাস ক'রে কি চুপচাপ থাকা যায়? মানুষ চেষ্টা করবে না? হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থাকবে?

চেষ্টা করতে নিশ্চয় বাকী রাখোনি?

তা রাখিনি। বিলেতে বড়ো সাহেবকে পর্য্যন্ত চিঠি লিখে জানিয়েছি। এখানকার অফিসের অন্যায় অবিচার।

তাতে ফল কিছু হ'য়েছে?

কিছুই না।

তাই ত বলছিলাম, এখন তোর এই রকমই চলবে বিরাজ! কষ্ট পাওয়া যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আজ যারা বিপক্ষতা করছে, তারাই তখন একেবারে জব্দ হয়ে যাবে। যুগে যুগে অনন্তকাল ধ'রে এই খেলা চলছে।

মানুষ তবু সৎপথে থাকে না। তবু ভুল করে।

তোমার জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে তুমি থাকো পিসিমা, আমাদের ওতে ভরসা নেই। আমরা কাজ ক'রে যাব। কাজ বুঝি। তবে তোমার গোপাল যদি কাঁকতালে কিছু ক'রে দিত, আপত্তি ছিল না।

আমার গোপাল কেন হবে? তোদেরও গোপাল। গোপাল ত দুনিয়ার সকলের।

তবে যে সে বার আমার বোন সুশীলার অসুখের সময়ে ডাক্তার যখন জবাব দিয়ে গেল, তুমি ঠাকুরঘরে খিল দিয়ে গোপালের পায়ে মাথা খুঁড়তে লাগলে, চাকা ঘুরে গেল। সুশীলা সেরে উঠলো। সে কি ক'রে হল? সেই কাশীতে। মনে পড়ে?

পড়ে বৈ কি। কি জানি সে কি ক'রে হল! হয়ত সুশীলারও গ্রহ কেটে এসেছিলা সেই সময়ে। ঠাকুর নিয়মে বাঁধা। সব পারেন, প্রাণ দিতে পারেন না। আমার আকুল প্রার্থনা যখন তাঁর পায়ে পৌঁছলো তখন সুশীলার সময় এসেছে সারবার।

বিরাজ বলে, মীরা এ সব কি শুনছ? তোমার ত এ বয়সে এ সব শোনবার কথা নয়?

কাঁথির পিসিমা বলেন, এই বয়সেই শোন্‌বার। কচি বয়স থেকেই জেনে নিতে হবে জীবন কি, ধর্ম্ম কি! কী নোংরা এই পৃথিবী, কতো কষ্ট এ সংসারে, ও কিছুই জানে না। ধর্ম্মের নৌকোয় ওকে এখন থেকেই উঠতে হবে, জীবন-সমুদ্রের বিপদের ঝড়বাদল কাটিয়ে যাবার জন্তে।

মীরার মনে পড়ে, সমুদ্র সে দেখেছে, নীল সমুদ্র আকাশ-ছোঁয়া। এপার দেখা যায়, ওপার নয়। মাঝ সমুদ্রে ঝড়ের কথাও সে শুনেছে, যার দাপট কূলে এসেও পৌঁছেছে। ঝড়ের সমুদ্রে রামবাইয়া শিঙ্গাবাইয়ারা হারিয়ে গেছে, এ-ও তার দেখা।

পিসিমা বলছেন—তেমনি জীবনের সমুদ্র, এ পার দেখা যায়, ওপার নয়। সেই সমুদ্রে ঝড় আসে—কষ্টের' ঝড়, দুঃখের ঝড়। সেখানে কাঠের কাটমারান চলবে না। চাই তার জন্তে ধর্ম্মের নৌকো। যাতে কোনো বিপদ নেই।

গরদের থান-পরা কাঁথির পিসিমা, হাতে জপের মালা। বিকেল বেলার সোনা-রোদ এসে পড়েছে তাঁর প্রতিমার মতন মুখে, দেখাচ্ছে কী সুন্দর, চাঁপার মতন রং তাঁর। সাবান মাখেন না, স্নো ঘষেন না, অথচ কী চক্চকে তাঁর গা! দাঁতগুলি এখনো পরিষ্কার ঝক্ঝকে, সাজানো। উনি না কি যোগ করেন দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে। সে সময়ে কেউ যেতে পায় না কাছে।

কাঁথির পিসিমা পুরুষের বুদ্ধি, সাহস আর মেয়েদের মমতা নিয়ে এসেছেন নাকি?

অথচ এই রকম বিধবারা কত সংসারে অশান্তি করছে, ইতিমধ্যেই মীরার চোখে পড়েছে। মন যতদূর ছোট হ'তে হয়, ঝগড়ার গলা যতদূর বাড়াতে পারা যায়, যতদূর নিষ্ঠুর হওয়া যেতে পারে এমনি ক'টি বিধবার সঙ্গে তার দেখা হ'য়ে গেছে, যারা মনে করে একটু ব'সে কথকতা শুনলে আর গঙ্গায় একটা ডুব দিলে সব পাপ খণ্ডন হ'য়ে যায়, সুতরাং যত ইচ্ছে পাপ করো।

সেদিন একজন কোট-প্যাণ্টপরা ভদ্রলোক এলো ওদের ড্রয়িংরুমে। মিঃ বাসু তার নাম।

মীরা ভেবেই পেলো না বাসু কি পদবী। সে ত অনেক পদবীর কথা শুনেছে, বাঘ, হাতী, পধ্যস্ত, কিন্তু বাসু শোনে নি। মাম্মিকে জিগেস করলে, বাসু কি মামমি?

বাসু মানে বসু, বোস,—উনি বিলেত ঘুরে এসে বাসু হয়েছেন। সিনেমার ডিরেক্টর।

সে আবার কি জিনিস?

তোমার জানবার দরকার নেই।

কিন্তু ওর জানবার দরকার হল।

কি ক'রে?

মিঃ বাসুর ভয়ানক পছন্দ হ'য়ে গেল মীরার মুখ, মীরার গড়ন-পেটন। বললে, চমৎকার মানাবে আমার রাজকুমারীর পার্ট। প্রতিমার মতন মুখ, শ্লিম্ চেহারা। যেন আমার স্বপ্নে-দেখা রাজকন্তা। আপনারা দেবেন আমায় এই মেয়েটিকে?

ড্যাডি বললে, ওর পড়ার ক্ষতি হবে।

বাসু বললে, কিচ্ছু ক্ষতি হবে না। সামার ভ্যাকেশনের মধ্যে আমার ছবি তোলা শেষ হ'য়ে যাবে, অন্ততঃ ওর পার্টটা। গরমের ছুটি ত' এসেই গেল।

মীরা ভাবছে—শ্লিম মানে কি?

বাসু নিজের মনেই বলছে, কেমন শ্লিম, তোমরা যাকে তন্বী বলো, রোগা-রোগা ভাব অথচ রোগাও নয়, বেশ হাড়ে-মাসে, লম্বা ধরণের মেয়েটি, সব চেয়ে এর মুখখানা ভারী ভালো লাগছে আমার। ভেরি সুইট—ভারী মিষ্টি। রংও খুব। রংটাও দরকার। কারণ আমার ছবি হবে রঙীন। দাও ত বলো। কণ্ট্র্যাক্ট করে ফেলি।

ড্যাডি পাইপ নামিয়ে বললে, কত দেবে?

শ' পাঁচেক।

আমাদের ত' দরকার নেই, ওর নামেই থাকবে। হাজার ক'রে দাও না। হাজারে যখন একটা এমন মেয়ে মেলে।

তাই হল।

চুক্তিপত্রে মীরা সই করলো। মীরার ড্যাডিও সই করলো।

মীরা পেলে পাঁচশো টাকার নোট দু'খানা।

একখানা নোট ভাঙালেই পাঁচশোটা করকরে টাকা পাওয়া যাবে? কী আশ্চর্য্য বলো ত!

একটা ছুটির দিন ও গেল টালিগঞ্জ। ট্রাম লাইন শেষ হ'য়ে গেল, তার পরেও কলকাতা ছিল? সেখানেও বড়ো বড়ো বাড়ী, বড়ো বড়ো লন্।

ওদিকেও না কি লক্ষ লক্ষ লোক থাকে।

মীরা পড়েছে—রামচন্দ্রের অযোধ্যাও নাকি চল্লিশ মাইল লম্বা, বারো মাইল চওড়া ছিল। বাংলার রাজধানী গৌড়, মুর্শিদাবাদও নাকি এত বড়োই ছিল। কলকাতা একদিন ভারতের রাজধানী হয়েছিলো, তাই এত বড়ো হ'য়ে গেছে। আজ শুধু ছোট্ট পশ্চিম-বাংলার রাজধানী, তবু এশিয়ার সেরা শহর।

ও দেখেছে হাইকোর্টের পাশে গঙ্গার ধারে তেরোতলা বাড়ী।

"তেরোতলা বাড়ী, তেরোতলা বাড়ী
ডাকিছে পান্থজনে
এই কলকাতা—এই কলকাতা
নীরব নিমন্ত্রণে।"

ষ্টুডিয়োয় ঢুকে মীরা দেখলো, সেখানে প্রাসাদ আছে, সাজানো যার ঘরগুলি, পাড়াগাঁয়ের কুঁড়ে ঘর আছে, রাঙা দাওয়া হলুদে উলুখড় ছাওয়া—হাঁস-চরা পুকুরের ধারে, আছে বনপথ, আছে খানিকটা নিবিড় অরণ্য।

ষ্টুডিয়োর মধ্যে হাজার রঙের বাহার ফুলে ফলে লতায় পাতায় আচ্ছন্ন কুঞ্জবনে হাজার হাজার 'বাড়ির আলোর সামনে রঙ মেখে ঝলমলে সাজ-সজ্জা প'রে ওকে দাঁড়াতে হল, ওরই বয়সী সখীদের সঙ্গে।

ক্যামেরা দ্রুত ঘুরতে লাগলো। মাথার ওপরে সাউণ্ড-বক্স ঝুলতে লাগলো। ওরা লাল নীল হলদে ফুল গাছ থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে সোনার সাজিতে ভরতে লাগলো, আর মুখ নড়তে লাগলো শেখানো মতন—ওদিকে ক্যামেরার আড়ালে গান হতে লাগলো, ওকেই নাকি বলে প্লে-ব্যাক—কত রকমের যন্ত্র, কত রকমের আওয়াজ, কত মিঠে মিঠে সুর—

ফুল-বাগানের ফুলের মেলায়
ফুল তুলি আজ ফুল তুলি।
শাড়ীর আঁচল বাঁচিয়ে চলি
এলিয়ে দিয়ে চুলগুলি।
ফুল তুলি আজ ফুল তুলি।
ডাকছে শ্যামা, ডাকছে কোয়েল,
বৌ কথা কও, মুনিয়া, দোয়েল।

পিউ কাঁহা ঐ পাপিয়া ডাকে
শিস দিয়ে যায় বুলবুলি।
ফুল তুলি আজ ফুল তুলি।

ছবিটা কেমন উঠলো, মীরা দেখতে পেলে না। কিন্তু আগাগোড়া রূপোলী কাজকরা সবুজ বেনারসীতে লক্ষ বাতির আলোর গরমে ও একবারে ঘেমে উঠলো।

ওর ঠাণ্ডা হতে অনেকক্ষণ লাগলো। অনেক পাখার হাওয়া অনেক সরবৎ ডাব আর কমলালেবু খেতে হল। বুঝলো—ফিল্ম ছবি তোলা খুব আরামে হয় না, রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়। বুক কেমন করে। শরীর কেমন করে।

ওদিকে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেল—স্বপ্নপুরীর উদ্বোধন হ'য়ে গেছে। নতুন মুখ নতুন প্রতিভা নিয়ে নতুন রাজকন্যা আসছে। মীরা রায়চৌধুরী।

সিনেমার কথায় জান তোমরাও ব্যস্ত হয়ে উঠেছ, এটা সিনেমার যুগ কিনা—মীরার কি হল? মীরার কি হল?

তাই তাড়াতাড়ি সামার ভ্যাকেশনে এসে পড়ি। ছুটি না হলে ত আর ফিল্ম তোলা হবে না?

কিন্তু দিন নেই, রাত নেই, কখন গাড়ী আসে, কখন মীরাকে নিয়ে যায়, কখন কাজ হয়, ফের মীরাকে দিয়ে যায়, কিছুই ঠিক ঠিকানা নেই। অনিয়মের চূড়ান্ত!

কিন্তু যেদিন তাকে রাক্ষসীর সামনে হাজির করা হল সেদিন তার ভয় পাবার কথা, কিন্তু জানে ত ও সুরমাদি'—সুন্দর তার চেহারা, আস্তে আস্তে তার চোখের সামনেই শনের নুড়ি ঝাঁটার কাটির মতন চুল করেছে, মুখে কালীর দাগ দিয়ে মুখটাকে বীভৎস ক'রে তুলেছে, সেই রাক্ষসী তাকে ঝুলির মধ্যে পুরে নিয়ে এসে প্রকাণ্ড প্রাসাদে রাখলো, যে প্রাসাদের অসংখ্য থাম, অসংখ্য ঘর। সব ত পিজবোর্ডের তৈরী।

তারপর সোনার খাটে মাথা, রূপোর খাটে পা দিয়ে—সত্যি কি আর সোনা রূপো?—সোনালী পাত রূপালী পাত মোড়া কাঠেরই খাট। মখমলের বালিসে মাথা দিয়ে মীরা যখন ঘুমিয়ে পড়লো, আর দূর থেকে বাঁশী বাজতে লাগলো, আলোটা সবুজ থেকে নীল হয়ে এলো, তখন লাগছিলো স্বপ্ন-স্বপ্ন।—তখন ত রাতই নয়, বাইরে জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর—মাথার শিয়রে প'ড়ে রইলো সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি রাংতামোড়া—আসছে রাজকুমার অনিলদা' পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে আকাশপথে—সত্যি কি আর আকাশ-পথে, ফটো তোলার কায়দায় পিচবোর্ডের মেঘ ভেসে যাচ্ছে, পাখাওলা কাগজের সাদা পক্ষীরাজ কেমন উড়ে উড়ে আসছে। মীরা কি দেখেনি? দুধসাগর, ক্ষীরসাগর, শ্বেতহস্তী, সবই ত ফাঁকি।

যাক্, রাজকুমার আস্‌ছে আস্‌ছে, সেদিন তোলা হয়েছিলো—আজ এসে যাবে রাজপুরীতে, সোনার কাঠি ছুঁইয়ে নীল আলোজ্বালা, রূপোর ধূপদানীতে ধূপজ্বালা ঘরে ধূপের ধোঁয়ার নিঝুম রাজকন্যার ঘুম ভাঙাবে, কুঁচবরণ কন্যা যার মেঘবরণ চুল। সেই রাজকন্যা মীরার—এই ত গল্প—আজ এই পর্য্যন্ত। সামনের শনিবার বাকীটা তোলা হবে।

এলো সামনের শনিবার। নীলসায়রের মাঝখানে স্ফটিকস্তম্ভ প্ল্যাষ্টিকের, তরোয়াল দিয়ে সেটা ভেঙে লাল প্ল্যাষ্টিকের সিঁদুর-কৌটো হাতে নিয়ে খুলে, কাগজের কালো ভোমরাকে ধরতেই ভীষণ চীৎকার ক'রে রাক্ষসী ছুটে আসছে আথালি-পাথালি ক'রে, কাগজের লম্বা লম্বা হাত দিয়ে রাজপুত্রকে ছোঁয়-ছোঁয়—ছিঁড়ে ফেলে বুঝি টুকরো ক'রে—রাজপুত্রের হাতের তরোয়াল কালো ভোমরাকে দু'ভাগ ক'রে দিলে, রাক্ষসী পড়লো আছাড় খেয়ে। আর ও দিকে ক্যাঁ ক্যাঁ ক্যাঁ ক্যাঁ করে কি জোর একটা বাজনা বাজলো, তারপর ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ।

বাবাঃ, ভয় করে এ-সব দেখলে!

এই রূপকথার আগাগোড়া মীরা দেখতে পায়নি, পুরো গল্পটা কি ঠিক জানে না, দেখেছে টুকরো টুকরো ছবি নেওয়া, একদিন যখন সব একসঙ্গে জুড়ে ছবি-ঘরে দেখানো হবে তখন ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে, ছেলেবেলায় শোনা পিসিমার সেই গল্পটার সঙ্গে মেলে কি না। কিন্তু সে-সুযোগ আসবে কবে?

এক বছরেও এলো না। বই তৈরী হ'য়ে গেল, হাউস পাওয়া যায় না দেখানোর। হিন্দি বই হচ্ছে, বড়োদের বই হচ্ছে, বাচ্চাদের এ বইটা আর কিছুতে সুযোগ পাচ্ছে না।

মীরা নতুন ক্লাসে উঠে গেল। মাথায় খানিকটা বড়ো হ'য়ে গেল। দেখতে আরো সুন্দর হ'য়ে গেল। তবু স্বপ্নপুরীর প্রাচীর-পত্র, স্বপ্নপুরীর বিজ্ঞাপন পড়লো না।

অনিলদা'র সঙ্গে ভাব হয়েছিলো। সে স্কুল ফাইনাল পাশ ক'রে কলেজে ঢুকে গেল, তবু বইটা দেখানো সুরু হল না। ক্লাসের সব মেয়ে মীরার আশ্চর্য্য রাজকন্যা দেখবার জন্যে তৈরী হয়ে ছিলো, ক্রীশ্চানরা পর্য্যন্ত, তারা ত জানে ফেয়ারী টেল্‌স্ এই রকমই হয়, সেই সব মেয়ে কোথায় কোথায় চলে গেল, সকলে এ ক্লাসে এলোও না, স্বপ্নপুরীর দেখা নেই।

শেষটা মীরা হাল ছেড়ে দিলে। মনে করলে, আর বুঝি হবে না সে বই। মিথ্যে অত টাকা খরচ ক'রে তোলা হল। মিথ্যে মীরারা অত পরিশ্রম করলো!

একদিন ওরা বাড়ীর মোটরেই ত্রিবেণী বেড়াতে গেছলো। গঙ্গার ধারে সেখানে কাগজের কল। সেখানে ড্যাডির ছোট ভাই বড়ো সাহেবদের এক জন। তারই বাংলোয় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া।

গঙ্গা সেখানে সরু। কিন্তু কোথায় যমুনা? কোথায় বা সরস্বতী? তিন নদীর মিলন কই? এইখানে কাছাকাছি সে বাংলা দেশের গ্রাম দেখলো, কবি যাকে বলেছেন 'ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়।' এইখানে পল্লীবধূ দেখলো, ঘড়ায় করে জল নিয়ে বাঁশঝাড়ের ধার দিয়ে চলেছে। কিছুই তার মনে রেখা রাখলো না। এ মাটির সঙ্গে ত তার টান নেই!

জন্ম থেকে সে দেখেছে সমুদ্র, চির-অশান্ত চির-চঞ্চল। হুশ্ হুশ্ হাওয়া হুড়মুড় ক'রে ঢেউয়ে আছড়ে পরা বালুতটের ওপর দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, আকাশ যেখানে সাদা ইস্পাতের মতন উজ্জ্বল, জল যেখানে চোখ জুড়োনো নীল, ঝগড়া নেই, নীচতা নেই, কেউ চেঁচালেও যেখানে শুনতে পাওয়া যায় না, দুধ-সাদা সী-গাল্ পাখা মেলে উড়ে বেড়ায় নীল জলের কাছাকাছি, অনেক দূরে মাদ্রাজগামী জাহাজের মাস্তুল দেখা যায় দিগন্তের কোল ঘেঁসে।

হঠাৎ মনে প'ড়ে যায় দুটো ভাইয়ের ম্লান বিষণ্ণ মুখ। হ্যাংলা আর প্যাংলা। যেদিন এসেছিলো, চেয়ে চেয়ে দেখছিলো দিদির

সাজ-সজ্জার দিকে, ছেঁড়া হাফপ্যান্ট কোট আর ময়লা জুতো পরে। সে দিদি হাদের কাছেও ডাকলো না, পাছে তার গায়ে রেলের ধুলো, ধরমশালার ধুলো লাগে। না কি? দিলো না একটাও খেলনা ওদের নরম হাতে তুলে তার খেলনার পাহাড় থেকে। মীরার এমন ভাব দেখানো হ'য়ে গেল, যেন—'আমি ত ওদের কেউ নই!' কিন্তু বাচ্চাদের কী দোষ?

মীরা ভাবে, ঐ ছেলেরা যদি কলকাতায় থাকত, তাহ'লে দারিদ্র্যের জন্যে নিজেকে ছোট ভাবতে ভুলে যেত। বড়লোককে ডোন্টকেয়ার করতে শিখত। সেদিন ত' রাস্তায় মীরা দেখলে শেয়ালদার মোড়ে দু'খানা মোটর আটকেছে দুটি কিশোর। একখানাতে ব'সে আছে জজ্, আর একখানাতে এমন একজন বড়ো-লোক—বাজার আর ব্যবসায়ে যার দৈনিক তিরিশ হাজার টাকা আয়, দু'জনেরই গাড়ী ভুল পথে চলছিলো, যাকে বলে রং সাইড—দু'টি বাচ্চাকে চাপা দিতে দিতে র'য়ে গেছে—নিতান্ত ভিখিরীর ছেলে—কিন্তু এ দু'টি ছেলের কী রোখ, কেন তারা রং সাইডে আসবে? পাবলিকও তেড়ে এলো, কেন আসবে রং সাইডে? ভয় করলো না কি তারা কাউকে? মাপ চাইয়ে ছাড়লো না? তুমি বড়োলোক আছ, বড়োলোক আছ, রাস্তায় আমিও যে তুমিও সে। মোটর চ'ড়ছ ব'লে কি সাপের পাঁচ পা দেখেছ? পল্লীগ্রামে পারত না কি এরকম কেউ বলতে? এ হল কলকাতার শহর। ভয় কা'কে বলে এখানকার ছেলেরা জানে না। মীরা গাড়ীতে ব'সে ব'সে দেখছিলো, তাদের গাড়ী, আরও কত গাড়ী আটকে গেছে।

ওরকম টুপি-পরা ড্রাইভার ওরা ঢের দেখেছে। বেশী চালাকি করলে গাড়ী পুড়িয়ে দিতে পারে। ওদের হয়ে কেউ বলতে এলে পানের দোকানের সোডার বোতল সব খালি হ'য়ে যেত। নাও, আর ছোঁড়ো। যখন নীচু হ'য়েছ, মাপ চেয়েছ, ড্রাইভারকে বকেছ, তখন যেতে পারো।

কাল সকালে পাশের বাড়ীতে কী হল, বারান্দায় ব'সে ব'সেই মীরা দেখেছে। একটি ছেলে, কতই বা বয়স? উনিশ কুড়ি হবে। সাইকেল নিয়ে মাড়োয়ারী মিল-মালিকের বাড়ীতে ঢুকলো। হিন্দুস্থানী দারোয়ানের হাতে কি একখানা কাগজ দিয়ে কি বললে, এতদূর থেকে বোঝা গেল না। দারোয়ানটা চেঁচিয়ে বললে, ভাগ হিঁয়াসে, মুলাকাৎ নেহি হোগা।

ছেলেটিও চেঁচালো—আলবাৎ হোগা। তুম্ যাকে খবর দে দো।

নেহি দেগা।

দেনে হোগা।

তারপর বঙ্গালী ব'লে কি একটা গালাগাল দিলে দারোয়ানটা—ছেলেটি অমনি সাইকেলটা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে রেখে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, আর কি বক্সিং চালালো! আর একটা দারোয়ান এসে ছেলেটির বড়ো বড়ো ব্যাকব্রাশ চুল ধ'রে টেনে মাথাটা দেয়ালে ঠুকে দিলে, সে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে মারলে এক লাথি—কীল চড় ঘুসির শব্দ, আর অভিমন্যুর মতন সেই ছেলেটি শত্রুব্যূহের মধ্যে বার বার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, তারপর সাইকেল তুলে নিয়ে উঁচু ক'রে ধ'রে ঠুকে দিলে দু'-চার জনের মাথায়। লড়াই বটে একটা! মীরা ভয়ে অবাক হয়ে চেঁচাতে ভুলে গেল, লোক ডাকতে ভুলে গেল, তারপর অনেকগুলো সাইকেল এসে পড়লো, অনেকগুলি ছেলে লাফিয়ে প'ড়ে সব দারোয়ানগুলোকে আচ্ছা ক'রে মার দিলে। এমন মার যে, তারা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

তারপর, যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাব দেখিয়ে তারা বাড়ীর মালিকের নাম ধ'রে ডাকতে লাগলো। মালিককে নেমে আসতে হ'ল, তাদের সঙ্গে কথা বলতে হ'ল, দারোয়ানদের মাপ চাওয়াতে হল।

এরাই হল এখনকার কলকাতার ছেলে। তুমি বড়োলোক ব'লে মান্য পাবে না, তুমি মানুষের মতন মানুষ হ'লে আমি তোমায় নিশ্চয় মানব, যেমন মানি নেতাজীকে, যেমন মানি স্বামীজীকে, যেমন মানি বিশ্বকবিকে, বিদ্যাসাগরকে। ভুলে যাইনি বন্দে মাতরম, ভুলিনি জয় হিন্দ। এই কথা এরা বলে।

হাংলা প্যাংলা এখানে থাকলে এমনি হত। দিদি বড়োলোক আছে ত আমাদের কি? আমাদের কিছু নেই, তাতেই বা কি? কপাল ত' কেউ কেড়ে নিতে পারবে না?

শেষ অবধি স্বপ্নপুরীর জন্যে হাউস পাওয়া গেল। শুধু একটা হাউসে নয়, হাওড়া, বালি, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, বেহালা, ভবানীপুর, বরানগর। আর, বাংলা বই হবে নিউ এম্পায়ারে।

মীরা রায়-চৌধুরীর ফটো সিনেমার কাগজে কাগজে। হাউসের সামনে ছবি, কাগজের মালা দিয়ে আলো দিয়ে ঘিরে। কোথাও বা তারার মধ্যে ওর মুখ। ও কি ষ্টার হয়ে গেল না কি?

নিউ এম্পায়ারেই ওরা পাশ পেয়েছিলো, যে বাড়ীর একতলাটা ফাঁকা, দোতলায় হল, তিনতলা পর্য্যন্ত আসন।

গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত রূপকথার গল্প শুনে গেল সমস্ত দর্শক মুখটি বুজে। ছোটরা হাততালি দিয়ে দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলো।

মীরারও মনে হল, সত্যি যেন ওকে রাক্ষুসী ধ'রে নিয়ে গেছে, ছবি দেখে ওর ভয় হল, অভিনয় করতে যা হয়নি। রাক্ষুসীর প্রাসাদ কত বড়ো রে বাবা! কত রং, কত সোনা, কত জহরৎ। চকচক করছে সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি মখমলের বিছানায়। সব যেন স্বপ্ন—স্বপ্নপুরী ছবিতে।

নিউ সিনেমার দোতলায় চায়ের সঙ্গে কেক খেতে খেতে ও শুনতে পেলো, সকলেই বলছে—বাচ্চা মেয়েটা ভারী ভালো করেছে।

কে একজন বলে গেল, এই মেয়েটির মুখ ঠিক রাজকন্যার মতন, দেখো দেখো মাসীমা! ওরা কি জানে 'মতন' নয়, ঐ সে?

বড়োঘরে মানুষ হ'য়ে একটা সংযম তার হয়েছে এই যে আমি, আমি এটা করেছি এমন কথা বলে না।

চুপ ক'রে থাকে। জানে, প্রশংসা আর নিন্দা দু'ই গ্রাহ্য না করাই হল শিক্ষা।

হাঁ, পিসিমার পুরোন গল্পটার মতনই অবিকল এ গল্পটা। তবে, তার চেয়ে অনেক বেশী আশ্চর্য্য লাগে, চোখে দেখার জন্যেই হয়ত বা। কিন্তু দুঃখ হয়, সেই পিসিমাই দেখতে পেলো না তার ভাইঝির অভিনয়। দেখতে পেলো না মা বাবা আর ভায়েরা হাংলা, প্যাংলা।

আর এই সময়েই কি না কাঁথির পিসিমাও কলকাতায় নেই। নবদ্বীপে ভাইয়ের কাছে হঠাৎ ডাক পড়েছে।

পুরীতে কি এসব ছবি যাবে? উড়িষ্যার লোকেরা কি বাংলা দেশের একটা রূপকথা শোনবার জন্যে ব্যস্ত হবে?

মামমি বললে, রজা অছি, রাণী অছি, তাঁইকিড়ি একটি

কণ্ঠা অছি, ধাঁইকিড়ি বুঝ পারচু এই ত তোমার দেশের ভাষা মীরা ?

মীরা হেসেই আকুল। বললে, মোটেই না, উড়িয়া ভাষার মাধুর্য্য বুঝতে হ'লে ভালো ক'রে শিখতে হবে। ধাঁইকিড়ি কাঁইকিড়ি করলে চলবে না।

আসলে উড়িষ্যার মন্দির, উড়িষ্যার শিল্প, উড়িষ্যার সমুদ্র, উড়িষ্যার ভাষা তার প্রাণের জিনিস, সেই তার জন্মভূমি, হ'লোই বা সে বাঙালী। বাঙালী সারা ভারতবর্ষকে নিজের দেশ মনে করে। সে মনে করে, তার কাশী, তার দ্বারকা, তার রামেশ্বর, তার চন্দ্রনাথ।

তার একটা কবিতা মনে পড়ে—

"তোমার তখন জন্ম হয়নি, বারোশো সাতাশী সাল,
উৎকল দেশে অন্নকষ্ট আনিল পঙ্গপাল।"—

কী করুণ সে কবিতাটা ! [ক্রমশঃ।

লোমহর্ষক ম্যাজিক

যাদুকর এ, সি, সরকার

এখন যে খেলার কৌশল তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি, তা দেখলে দর্শকদের গায়ে কাঁটা দেবে—মুখে কথা সরবে না। দুর্ব্বলচিত্ত দর্শকদের ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। কেনই বা তারা অজ্ঞান হবে না বলো ? যদি চোখের সামনে দেখা যায় যে, একজন লোকের গলায় কোপ বসানো হয়েছে রামদা দিয়ে···রামদাটা কেটে বসে গেছে গলায়···গড়িয়ে পড়ছে টাটকা তাজা লাল রক্ত···এ দৃশ্য দেখলে যাদের নার্ভ খুব শক্ত, তারাও চোখে সরষে ফুল দেখবে !

যাদুকর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন হাতে একটা ধারালো ঝকঝকে রামদা নিয়ে। এই রামদাটা পরীক্ষা করে দেখার জন্ম দর্শকদের হাতে দিয়ে তিনি আরম্ভ করেন বক্তৃতা। "এইবার আমি আমার অলৌকিক যাদু-কৌশল প্রদর্শন করাবো। মন্ত্রবলে যে মরা মানুষকে বাঁচানো যেতে পারে, তা বিশ্বাস করতে চান না আপনারা। কিন্তু সত্যি সত্যিই যে মন্ত্রবলে মরা মানুষকে বাঁচানোর মতন অতি অদ্ভুত কাজও করা সম্ভব, তাই দেখাবো এখন আপনাদের। এই যে ধারালো রামদাটা আপনারা দেখছেন, এর একটা কোপেই একজন লোককে যমের দোরে পাঠানোর পক্ষে যথেষ্ট সে কথা তো স্বীকার করবেন আপনারা সবাই। আপনাদের মধ্যে যার এ কথা বিশ্বাস করায় আপত্তি আছে, তিনি দয়া করে ষ্টেজে উঠে এসে নিজের হাতে এই রামদা নিজের গলায় বসিয়ে আমার এবং আর দশ জনের মন্ত্রের সত্যাসত্য পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।" (বলা বাহুল্য, কেউই ষ্টেজে আসবেন না এর পরে, পরীক্ষা করতে)

এর পরে যাদুকরের নির্দ্দেশ ক্রমে তার সহকারী ষ্টেজে এসে ঢোকেন করুণ মুখে। সহকারীকে চেয়ারে বসিয়ে যাদুকর একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দেয় তার আপাদমস্তক। এই অবস্থায় রামদাটা চাদরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে সহকারীর গলায় বসায় কোপ। সহকারীর করুণ আর্ত চিৎকারে কেঁপে ওঠে চারদিক, রক্তে ভিজে যায় চাদর। ষ্টেজের উপরেও বইতে থাকে রক্তের ধারা। ধীরে ধীরে চাদরটা উঠিয়ে নেন যাদুকর। হতভাগা সহকারীর অসাড় দেহ পড়ে আছে নিস্পন্দ। রামদাটা বসে গেছে গলায় ; গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে ক্ষতস্থান থেকে। যাদুকর আবার আরম্ভ করেন তার বাক্যবিন্যাস, "রামদার এক কোপেই আমার সহকারীর জীবন-দীপ নিবে গেছে। এইবার এই প্রাণহীনের দেহে আমি ফিরিয়ে আনবো জীবনস্পন্দন আমার যাদু প্রভাবে। আপনারা ভাল করে লক্ষ্য করুন।"

এর পরে যাদুকর চাদর দিয়ে আবার ঢেকে দিলেন সহকারীকে। চাদরের নীচে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলেন রক্তমাখা রামদা আর ম্যাজিকের মন্ত্র পড়তে থাকলেন—

"আয় ফিরে আয় প্রাণের সাড়া
পঞ্জরে দে আবার নাড়া
চক্ষু মেলে চা
মরণ চলে যা।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই চাদর-ঢাকা সহকারীর দেহটা নড়ে উঠলো··· চাদরের ঢাকা নিজের হাতে সরিয়ে সহকারী অভিবাদন জানালো সবাইকে। গলায় ক্ষতের চিহ্নমাত্র নাই !!

এবার শোন খেলাটার কৌশল : এ খেলার জন্ম দরকার হয় একই রকমের দু'টো রামদা। এদের মধ্যে একটা রামদা থাকে সাধারণ রামদারই মতন। অন্যটির ঠিক মাঝখানের কিছুটা অংশ

দু'টি রামদা এক রকম। একটা সহকারীর গলার মাপে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে কাটা।
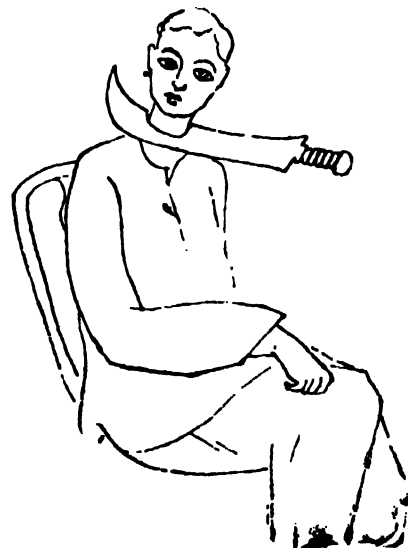
ধারালো ধার থেকে কেটে বাদ দিতে হয় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সহকারীর গলার মাপে [ছবি দেখ] এই কৌশল করা রামদাটি সহকারী তার পোষাকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে আসে শিশিতে করে। যাদুকর চাদরের আড়ালে রামদাটাকে বদল করে নিয়ে কৌশল করা রামদা সহকারীর গলায় বসিয়ে দেন আর শিশির রঙীন জল ঢেলে দেন। এই সময়ে সহকারী চিৎকার করে ওঠে আর্ত্তস্বরে। খেলা শেষে কৌশলকরা রামদা পুনশ্চ লুকিয়ে ফেলেন যাদুকর তার সহকারীর পোষাকের মধ্যে। আর আসল রামদা বের করে আনেন দর্শকদের চোখের সামনে। বুঝলে তো খেলাটা এখন? ভাল করে অভ্যাস করে এ খেলাটা দেখাতে পারলে সবাইকে অবাক করে দিতে পারবে সন্দেহ নাই।

উড়ো-পাখী

শ্রীউমা দেবী

উড়ে এল পিছনের মেঘেদের ফেলে
প্রকাণ্ড শাদা পাখী বড় ডানা মেলে।
পাখী নয় প্লেন ও যে
পাখীরাও চোখ বোঁজে
আকাশের ঘর-ঘর শব্দটি এলে—
উড়ে যায় শাদা পাখী শাদা ডানা মেলে।

মার কাছে কেঁদে খোকা করেছে বাহানা,
কাকুতির সুরে বাজে পিলু ও সাহানা—
বল না গল্প এক—
মা বলে—ঐ দেখ দেখ
পক্ষীরাজের নাতি উড়ে চ'লে যায়
জল-চোখে হাসি মুখে খোকা ফিরে চায়।

ঘর-ঘর ঘর-ঘর আকাশের বুক,
পথের ছেলেরা যত পথে খেলে সুখ
বাপ বলে—কি বালাই,
দিদা কাঁদে—আই আই,
গাল খেয়ে কচিদের কালি হ'ল মুখ
হঠাৎ আকাশে চেয়ে ত্যাখে উৎসুক—

বন্-বন্ পাখা ঘোরে শন্-শন্ ওড়ে,
কে যায় কে যায় ঐ শাদা পাখী চ'ড়ে?
ও কি রাজপুত্তুর
ও কি ভুবমণ—দূর—
হাসি মুখে থামে ছেলে গলিটির মোড়ে,
কি মজা ওঃ—কাজ নেই, ইস্কুলে প'ড়ে!

সহরতলীর সরু লম্বা চিম্‌নি—
কি উঁচু—উঃ, দেখলেই লাগবে ভিরমি—
যেন কালো জানোয়ার
গলাটি উঁচিয়ে তার
হাঁ ক'রে ফেলছে শুধু কালো নিঃশ্বাস
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালি অমন আকাশ—

সেই কালি ধোঁয়া মাখা আকাশ পেরিয়ে
চলে যায় শাদা পাখী শাদা ডানা নিয়ে।
নিচে করে থল্‌বল্
গঙ্গার ঘোলা জল,
বাঁধনের বেদনায় ফেনায় আকুল
ওড়ার মজাটি পেতে করে চুলবুল্।

বাঁশবন কচুবন খাল-বিল-ডোবা,
পাটাতনে ধুতি-শাড়ী আছড়ায় ধোবা।
অনেক—অনেক দূর—
গুন্-গুন্-গুন্ সুর
ক্রমে হয় ঘর-ঘর আওয়াজ বেজায়,
ছেলেরা চেঁচিয়ে ওঠে—ঐ চ'লে যায়।

রেলের লাইন পাতা ক্ষেতের উপরে,
সকালের রোদ্দুরে ঝক্‌ঝক্ করে।
দু'ধারের চষা মাঠ
সোনার রাজ্যপাট—
কি আসে—কাস্তে হাতে চাষারা দাঁড়ায়,
অবাক্ অবাক্ চোখে আকাশে তাকায়।

উড়ে যায় শাদা পাখী দেশের সীমায়,
সারা রাত জেগে ভোরে সান্ত্রী ঝিমায়!
হঠাৎ ও কি ও আসে
তাকায় উপরে পাশে,
আকাশে নিরিখ ক'রে টুপিটি তোলে,
আমাদেরই প্লেন—বুক গর্বে ফোলে।

উড়ে যায় শাদা পাখী শাদা ডানা মেলে,
পিছনে কত কি দেশ, কত যুগ ফেলে
কত ভুল-ভ্রান্তির
পাহাড় উঁচায় শির
আটকাতে পথ তার কত কি প্রয়াস
আঁধার জমাট হয়ে নামে চার পাশ।

পায় না নাগাল তবু পায় না নাগাল,
আবার আলোয় পাখা উথাল-পাথাল।
দেশে দেশে মিলনের
রাখে সে প্রীতির জের
পাখার ছন্দে ওরি শান্তিটি এলে
উড়ে যায় শাদা পাখী শাদা ডানা মেলে।

ব্যাংককে কয়েক দিন

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

২৩শে অক্টোবর ১৯৫৫। চীনি ভাইদের নিমন্ত্রণে আজ আমাদের অল ইণ্ডিয়া ল ইয়ার্স ডেলিগেশনের সভ্যদের মধ্যে তিন জনের চীন যাত্রা। বাকী সভ্যগণ দিন কতক পরে যাত্রা করবেন। আমরা তিন জন ব্যাংকক দেখে দিন কতক পরে তাঁদের সঙ্গে পিকিং যাত্রা করব ক্যানটন থেকে।

নানান কাজের মধ্যে সেদিন সকাল থেকে এক মিনিটও অবসর পাইনি। এমন কি, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে বসে যে একটু গল্প করব বা কথা কইব, তারও ফুরসৎ পাইনি।

গোছগাছ কিছু হয়নি। টুকি-টাকি জিনিষ-পত্তর জামা-কাপড়, গরম জামা কি কি এবং কতটা নিতে হবে তা নিয়ে এক ভাবনা। শুনেছি, এ সময় উত্তর-চায়না ও মাঞ্চুরিয়ায় শীত খুব বেশী। অতএব গরম জামা-কাপড় বেশ ভাল করেই নেওয়া উচিত। এদিকে আবার মাল-পত্তরের ওজন চুয়াল্লিশ পাউণ্ডের বেশী হলে এক কাঁড়ি বাড়তি মাশুল পড়ে যাবে, তা-ও এক সমস্যা!

আমাদের ট্রাভলিং এজেণ্ট জীনা কোম্পানীর বাদল বাবু এর মধ্যে বার তিনেক টেলিফোন করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, আমার আর দুই সহযাত্রী বন্ধু শ্রীমান রাজেন মজুমদার ও প্রতাপ চন্দ্র আমাকে বাড়ী থেকে তুলে নিতে আসবেন, আমি যেন দেরী না করি। থাইল্যাণ্ড ও চাইনিজ ভিসার জন্যে আমাদের অবিলম্বে তাদের আপিসে যাওয়া দরকার। আর তা ছাড়া প্লেনের টিকিট করা ট্রাভলার্স চেক ইত্যাদি করানো, তাতেও বেশ খানিকটা সময় যাবে। আমি যেন তৈরী থাকি।

দশ মিনিটের মধ্যেই বন্ধুরা সব এসে হাজির। সকলে মিলে তখন টালিগঞ্জের দিকে থাইল্যাণ্ডের কন্সাল আপিসে যাওয়া গেল। সেখানে ভিসা করাতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগলো।

থাই কনসালের আপিসটি বেশ। জায়গাটি নিরিবিলি। ছোট একটু বাগান, তাতে নানা রকম ফুল ফুটে রয়েছে। বাড়ীটিও খাসা ছিমছাম পরিষ্কার। এক বাঙ্গালী অফিসার আছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমাদের উদ্দেশ্য জানাতে তিনিই সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

নানান কথাবার্ত্তার মধ্যে জানা গেল যে, থাইল্যাণ্ডের ভিসা জোগাড় করা বড় সহজ কথা নয়। তা ছাড়া আমরা তিন জন হচ্ছি চীনযাত্রী, যে চীন রাশিয়ার বন্ধু। ওদিকে থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার কি রকম দহরম মহরম চলছে, তা সকলেই জানেন।

যাই হোক, আলাপ-সালাপ করে ভিসা নিয়ে ব্যাংকক ও থাইল্যাণ্ডের বিষয়ে গুটি কতক ছোট ছোট পুস্তিকা সংগ্রহ করে আমরা হাজির হলাম লোয়ার সারকুলার রোডে চাইনিজ কনসালের বাড়ী।

কনসাল জেনারাল মিষ্টার লিউ ও মাদাম লিউ কাল রাত্রে আমাদের ডেলিগেশনের সভ্যদের একটি সান্ধ্য ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন ও খুব আদর-যত্ন করে খাইয়েছিলেন।

বড় চমৎকার লোক তাঁরা! খেতে খেতে নানারূপ গল্প-সল্প হয়েছিল। কথায় কথায় আমার বন্ধু শ্রীমান স্নেহাংশু আচার্য্য চৌধুরী তাঁদের জানিয়েছিলেন যে, আমার স্বর্গত পিতৃদেব ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক প্রায় ৫৫।৫৬ বৎসর পূর্ব্বে চায়নায় গিয়েছিলেন এবং তাঁর লেখা 'চীন ভ্রমণ' নামে একটি অতি সুন্দর ও সুখপাঠ্য বই আছে। সে কথা শুনে তাঁরা খুব আনন্দিত হয়ে আমাকে বলেছিলেন, "আশা করি চায়না থেকে ঘরে এসে তুমিও নব্য চায়নার বিষয়ে বই লিখবে আর সেই বই পড়ে এদেশের লোকেরা তাদের চীনি ভাই-বোনদের বিষয় জানতে পারবে। ভারত ও চীনের মৈত্রী দৃঢ়তর হয়ে উঠবে দিনের পর দিন।"

অল্প সময়ের মধ্যেই চাইনিজ ভিসা পাওয়া গেল। সুবাসিত সবজে চা পান করে তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা সোজা চলে এলাম জীনা কোম্পানীর আফিসে। সেখানে এসে কলিকাতা হংকং রিটার্ণ টিকিট করলাম। প্রতি টিকিট প্রায় ১৪০০৲ টাকা করে লাগল। টিকিট করা হয়ে গেলে সেখান থেকে গেলাম আমেরিক্যান এক্সপ্রেসে ট্রাভলার্স চেক কেনবার জন্যে। বাদল বাবু আমাদের তিন বন্ধুকে তিনখানি এয়ার ব্যাগ দিয়েছেন। ব্যাগগুলি বড় চমৎকার, আমাদের খুব ভাল লাগল। আমেরিকান এক্সপ্রেসে কাজ সেরে যখন বাড়ী ফিরলাম তখন সন্ধ্যা প্রায় হয়ে গেছে।

বাড়ী এসে দেখি, আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্ত্রী ছুঁচ-সুতো বোতাম ইত্যাদি নিয়ে লেগে গেছেন। ঘরের আলমারী ও ট্রাঙ্কগুলি খোলা। ঠাণ্ডা-গরম সুট সার্ট পাঞ্জাবী শাল ধুতি ইত্যাদি খাটের ওপর ছড়ানো।

দুটি সুটকেশ, একটি বেশ বড় আর একটি মাঝারী। এর মধ্যে কোনটির আয়তন অনুযায়ী মাল পত্তর নিলে মোট ওজন ৪৪ পাউণ্ডের কাছাকাছি হবে, সে বিষয়ে আমার কোন ধারণাই নেই। এত অল্প সময়ের মধ্যে ওজন করিয়ে দেখে নেবার মত অবসর ও সুবিধেও হাতে নেই। অতএব কি আর করা যায়! মাঝারি সাইজের সুটকেশটি নেওয়াই ঠিক করলাম। গোছগাছের সমস্ত ভার মিসেসের ওপর চাপিয়ে দিয়ে স্নান করতে চলে গেলাম।

স্নান সেরে ঘরে এসে দেখি, বাড়ীর যত ছোট ছেলে-মেয়ে দাদা-বৌদিরা সকলেই প্রায় আমার ঘরে এসে উপস্থিত। আমার ছেলে-মেয়েরা ত' গোছগাছ সুরু হবার পর থেকে আর তাদের মায়ের কাছ-ছাড়া হয়নি। ঘরভরা বেশ চমৎকার একটি মন-কেমনের আবহাওয়া। বাড়ীতে ৺দুর্গাপুজো। পুজোর ঠিক আগেই সকলকে ছেড়ে একলা সুদূর চীন ও মাঞ্চুরিয়া ভ্রমণে যাচ্ছি, 'ঘরের ছেলে ঘর-ছাড়া হয়ে থাকব এক মাসেরও বেশী, এতে আর মন কেমন না করার উপায় আছে?

গরম জামা কি রকম কি নিয়েছি, বড়দা' ও বলাদা' জিগেস করলে। বলাদা' বললে "যাক রাজেন আর প্রতাপ সঙ্গে আছে, ওরা খুব গোছালো, কোন অসুবিধেই হবে না।"

মঙ্গলাদা'দের ওখানে আজ রাত্রে খাওয়ার নেমন্তন্ন। বেশ তৃপ্তি করে পেট ভরে খাওয়া দাওয়া সেরে দুর্গাপুজোর দালানে যাত্রা করতে গেলাম।

সেখানে ছোট খুড়িমা দইএর কৌটা কপালে ঠেকিয়ে আশীর্ব্বাদী ফুল ইত্যাদি মাথায় ঠেকিয়ে, ভগবানের উদ্দেশে আমার শুভযাত্রা কামনা করে আশীর্ব্বাদী ফুল আমার হাতে দিয়ে পকেটে রাখতে বললেন।

এত বড় বাড়ীর মধ্যে এই পুজোর দালানটুকু আমাদের কাছে একটি অপূর্ব্ব পীঠস্থান! মনে হয় এমন জায়গা যেন আর কোথাও

নেই। এ বাড়ীর যা কিছু কাজ-কর্ম্ম পুজো-আর্চ্চা আচার-অনুষ্ঠান সবই ওই পুজোর দালানটুকু ঘিরে। দুর্গাপুজো লক্ষ্মীপুজো কালীপুজো, কার্ত্তিক গণেশ সরস্বতীপুজো, চণ্ডীপাঠ কীর্ত্তন যাত্রা থিয়েটার সবই এখানে। ভাত, পৈতে, বিয়ে, শ্রাদ্ধ-শান্তি স্বস্ত্যয়ণ সবই এখানে। এ পরিবারের সকল মাঙ্গলিক কাজের মিলন কেন্দ্র আমাদের এই ছোট্ট পুজোর দালানটুকু।

পুজোর দালানে ঠাকুর প্রণাম করে ছোটকাকা ছোট খুড়িমা ও আর আর গুরুজনদের প্রণাম করে ঘরে এলাম। ঘরে এসে দেখি, সুটকেশ এয়ার-ব্যাগ গোছান হয়ে গেছে। নমিতা তার হাতে বাঁধান একটি খাতা দিয়ে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখবার জন্যে বলে দিলে। মাইয়া ও বাবু মশাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তাদের না জাগিয়ে আদর করে আর আর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে, গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। খোকা মুনে আর বাবলু আমাকে কে, এল, এম-এর সিটি-আপিস অবধি পৌছে দেবার জন্যে সঙ্গে চললো। সেখানে গিয়ে দেখি যে আমার সহযাত্রী বন্ধু দুইজন তখনো এসে পৌছাননি। খানিক পরেই তাঁরা এলেন আর স্নেহাংশু অরুণ ইত্যাদি অন্যান্য বন্ধুরাও এসে হাজির হ'ল। কে, এল, এম, বাস রাত প্রায় ১২টার সময় ছাড়লো দমদম এয়ার পোর্ট এর উদ্দেশে। যারা আমাদের তুলে দিতে এসেছিল তারা ফুলের মালা দিয়ে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে চলে গেল। সুদূর পথের যাত্রী আমরা তিন বন্ধু তখন আমাদের আসন্ন ব্যাংকক ও চীন ভ্রমণের বিষয় নানারূপ আলোচনা করতে করতে চললাম।

আলোচনার মধ্যে তিন জনকেই মাঝে মাঝে কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক ও বিমর্ষ দেখাচ্ছিল—বাড়ীর জন্যে বৌ, ছেলে-মেয়ের জন্যে মন কেমনের লক্ষণ, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

এয়ার পোর্টে পৌছতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগলো। সেখানে পাশপোর্ট টিকিট ও অন্যান্য কাগজ পত্র দেখান শেষ হলে রিফ্রেসমেণ্টরুমে গিয়ে ঠাণ্ডা পানীয় পান করে একটু বিশ্রাম করে নিলাম। তারপর প্রায় দুটোর সময় প্লেনে গিয়ে উঠলাম।

প্লেনটি বেশ বড় আর বসবার সিটগুলিও খুব নরম ও আরামপ্রদ। ইউরোপীয় যাত্রীই বেশী। ভারতীয়দের মধ্যে আমরা তিন বন্ধু আর দু-একজন অন্য লোক। এয়ার হোষ্টেস একটি ডাচ তরুণী। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, রং ফরসা, চেহারা মোটের উপর ভালই। চুলগুলি পুরুষদের মত ছোট করে ছাঁটা। শুধু স্মার্ট বললে সবটুকু বলা হয় না, একেবারে যাকে বলে অক্লান্ত পরিশ্রমী। সব সময়েই কিছু না কিছু কাজ করছেন। ফুরসৎ নেই এক মিনিটও। একবার তিনি সকলকে লবেনচুষ দিয়ে গেলেন, তারপর নিয়ে এলেন ফলের রস। ফলের রসটা বোধ হয় একটু টকই ছিল, তাই পরিবেশনের সময় মুখখানিতে হাওয়াই হাসি এনে তাকে যথাসম্ভব সুমিষ্ট করে নেবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন।

প্লেন ছাড়বার ঠিক আগেই "বেল্ট বাঁধো" আলো জ্বলে উঠলো। দুঃখের বিষয় প্লেনটি মাটি ছেড়ে আকাশে অনেক উঁচুতে ওঠবার পরেও আমার পেট ও বেল্টের মধ্যে বোঝাপড়া সাঙ্গ হয়নি। আমার ঠিক পাশের সিটেই বসেছিলেন এক প্রবীণ নধরকান্তি সাহেব। তাঁর অবস্থাও আমারই মতন। "বেল্ট খোলো" আলো যখন জ্বলে উঠলো তখনো রবার্ট ব্রুশের মত তিনি চেষ্টাই করে চলেছেন। লক্ষ্য করে দেখলাম যে দুটি কম্বল ও একটি বালিশ তাঁর পেট ও বেল্টের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে তিনি বেল্টের দু' মুখকে কিছুতেই এক করতে পারছেন না।

সহানুভূতিতে মন আমার ভরে উঠলো। আড়চোখে একবার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে তাঁকে বললাম, বেল্ট বাঁধার আর দরকার নেই, বেল্ট খোলার সিগনেল পড়ে গেছে। তিনি বার দুই থ্যাঙ্ক ইউ বলে অতি করুণ ভাবে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। আমিও ততোধিক করুণ হাসি হেসে তার জবাব দিলাম। তিনি আমতা আমতা করে আমায় বললেন যে এরোপ্লেন ওড়ার সময় বেল্ট যে বাঁধতেই হবে এমন কোন কথা নেই, প্রতাপ কাছে থাকলে কি বলত জানি না, তবে আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে মাথা নাড়লাম।

প্লেনটি উঁচু থেকে উঁচুতে উঠতে লাগলো, ক্রমে খুব উঁচুতে উঠে পড়লো। যখনই কোন সহর কি নগরের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলো তখন অন্ধকারের মধ্যে নীচে দূরের আলোগুলি ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিলো। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই সীটে বসে খানিক বাদেই নাক ডাকতে সুরু করেছেন। কেউ কেউ বা সারা রাত ধরে সিটের উপর প্লেনের বালিশ ও কম্বলগুলিকে একবার এদিক থেকে ওদিক একবার ওদিক থেকে এদিক একবার উঁচু একবার নীচু করে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন, আরামসই ভাবে কিছুতেই তাদের সাজিয়ে উঠতে পারেননি। ঘুমের কসরৎ করেছেন খুব কিন্তু ঘুম হয়নি এক মিনিটও।

এ যেন সেই কাঁচা সাইক্লিষ্টএর হপ করতে করতে বাড়ী পৌছে যাওয়ার মত। আমি সময় কাটিয়েছি কখনো বা ছবির বই দেখে কখনো বা একটু-আধটু পড়ে আর বেশীর ভাগ সময় বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। বেশ লাগে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে। মনটা যেন কি রকম হাল্কা হয়ে যায়। কত রকমের ভাবই না মনে আলতো ভাবে আসা-যাওয়া করে কিন্তু কোন ভাবনাই মনের মধ্যে দানা বাঁধতে পারে না, এ যেন অনেকটা স্বপ্ন ও বাস্তবের মাঝামাঝি অবস্থা।

ক্রমে ক্রমে রাতের অন্ধকার যখন ফিকে হয়ে এলো, ভোরের আলো যখন ফুটি-ফুটি করেও ফুটতে পারছে না, তখনকার সে দৃশ্য একেবারে অপূর্ব্ব। প্লেনের উপর থেকে সে দৃশ্য চোখে না দেখলে ঠিক ধারণা করা যায় না। আলো-আঁধারের ক্ষণিক মিলনের সে দৃশ্যটুকু বড়ই করুণ, বড়ই মনোরম। তার পর একটু আলো যখন ফুটে উঠলো তখন মনে হ'ল যেন অন্ধকারে মায়াজাল ছিন্ন করে হঠাৎ ভূমিষ্ঠ হ'ল আমাদের এই সুন্দর ভুবন! তপন দেবের সোনার কাটির পরশে। প্লেন চলেছে কখনো বা আকাশের খুব উঁচু দিয়ে কখনো বা একটু-আধটু নীচে নামছে। কোথাও কোথাও মেঘরাজ্যের মধ্যে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলছে, কোথাও বা মেঘরাজ্যকে নীচে ফেলে আকাশের অবিচ্ছিন্ন নীলিমার মধ্যে দিয়ে উড়ে চলেছে। মেঘের কত রকম রূপই না চোখে পড়ে! টুকরো মেঘ, হালকা মেঘ, গাঢ় ঘন মেঘ, প্যাঁজা তুলোর মত। কোনটি ধবধবে শাদা, কোনটি একটু লালচে, কোন কোনটিতে আবার রামধনুকের রং খেলে যায়।

পরদিন সকাল প্রায় সাতটায় ব্যাংকক এরোড্রোমে এসে পৌছলাম। এরোড্রোমটি মস্ত বড় আর দেখতেও খুব ভাল। পৃথিবীর অনেক জায়গা থেকে বহু প্লেন প্রতিদিন এখানে যাওয়া-আসা করে।

লগেজ টিকিট ইত্যাদি দেখাতে এখানে খানিকটা সময় লাগলো। ও দেশের অনেক মেয়েই এয়ার-আপিসে কাজ করে। বেশ চালাক চতুর ও চটপটে। কথাবার্ত্তা হাবভাব দেখে মনে হয়, কিঞ্চিৎ আমেরিকান ভাবাপন্ন। পোষাক-পরিচ্ছদেও ইউরোপীয় ছাপ।

খানিক বাদেই এয়ার-অফিসার তাঁদের বাসে করে আমাদের কে, এল, এম হোটেলে নিয়ে চললেন। হোটেলটি সেখান থেকে প্রায় ১২।১৪ মাইল দূরে সহরের উপকণ্ঠে। পীচ-ঢালা রাস্তাগুলি খুব ভাল, রাস্তার দুই ধারে সারি সারি গাছ বসানো রয়েছে।

বাসে যেতে যেতে মনে হল, ঠিক যেন আমাদের বাঙ্গালাদেশ। বাঙ্গালা দেশের মতই সবুজ মাঠ, আল-দেওয়া ধানের ক্ষেত, গাছ-পালা ঝোপ-ঝাড়। সেই হালকা ঝির-ঝিরে হাওয়ায় ভিজে মাটির গন্ধ, সেই নীল আকাশের বুকে সাদা মেঘের ভেলা, সবই যেন খুব চেনা ও আপনার বলে মনে হতে লাগলো।

এখানে কাক চড়াই গোলাপায়রা সবই আছে। কোকিলের ডাকও শুনেছি এবং শুনে আনন্দও পেয়েছি। পথে যেতে যেতে যে গুটিকতক পাখী ও প্রজাপতির সঙ্গে দর্শন মিললো, মনে হল তারাও যেন বাঙ্গালী ;'আমাদেরই'মত বাঙ্গালা দেশ থেকে এখানে দিন কতক হাওয়া খেতে এসেছে।

কে, এল, এম, হোটেলটি অতি চমৎকার! এমন সুন্দর হোটেল সচরাচর চোখে পড়ে না। গেটে ঢুকতেই খাসা সাজানো কেয়ারীকরা বাগান ও লাল কাঁকরের পথ। মাঝখানে খানিকটা গোল জায়গা মাটি ও ইট দিয়ে উঁচু করে তার উপরে চুণ ও রং দিয়ে K. L. M. অক্ষরগুলি ইংরাজীতে বড় বড় করে লেখা রয়েছে। প্লেন যখন ঘুরতে ঘুরতে নামে তখন দূর থেকে সহজেই সেই অক্ষরগুলির দিকে নজর পড়ে। ডান দিকে খানিকটা জলা জায়গার উপর লম্বা একসারি সুদৃশ্য কাঠের ঘর খুঁটির উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নীচে জল। সেই জলে যখন আলোর প্রতিবিম্ব পড়ে তখন বড়ই চমৎকার দেখায়। পাশেই সবুজ গালচের মত টেনিশ খেলার মাঠ, তার পরেই হোটেলের মস্ত বড় দোতলা বাড়ীখানা। সেই বাড়ীর একতলার বিরাট হলঘরটি রিসেপশন রুম হিসাবে ব্যবহার হয় আর দু'তলার ঘরগুলিতে অফিসারদের থাকবার ব্যবস্থা। তার পরে আবার একটি প্রকাণ্ড লন, হোটেলের ভোজঘর অবধি বিস্তৃত আর সেই লনের দু'পাশে সারি সারি মনোরম কাঠের দু'তলা ঘরগুলি। প্রতি ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুম। পাশাপাশি দু'খানি ঘরে আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত হল। আমাদের ঘরের পিছনে আর একটি ছোট পুকুর, তার চার পাশে ছোট-বড় গোটাকতক গাছ ও এক কোণে একটা কাঠের ঘর। তারও পিছনে প্রকাণ্ড বড় মাঠ ও ধানের ক্ষেত। দূরে একটি সাদা মন্দিরের খানিকটা দেখা যায়। মাথার উপরে নীল আকাশ। বড়ই মনোরম দৃশ্য!

দাড়ি কামিয়ে বেশ ভাল করে স্নান করে পোষাক বদলে নিলাম। শরীর খুব হাল্কা মনে হল আর খিদেও পেল খুব। তখন তিন বন্ধু মিলে খাবার ঘরে যাওয়া গেল। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাজানো-গোছানো গোলাকৃতি ঘরটি। চারদিকে কাচের জানালা ফিট করা, ওপর দিকের দেওয়ালে রঙচঙা রামায়ণের ছবি আঁকা। একটি ছবিতে দেখি যে, বীর হনুমানজী এক হাতে গদা আর এক হাতে একটি পরমাসুন্দরী যোড়শীকে টেনে নিয়ে চলেছেন সমুদ্রের তলার দিকে।

কফি টোষ্ট জ্যাম চীজ ডিম হাঁস-মুরগীর ঠাণ্ডা মাংস, ফলের রস কলা ইত্যাদি দিয়ে খুব তৃপ্তি করে প্রাতরাশ সারা হল। তার পর রাজেনের দেওয়া একটি চুরুট ধরিয়ে হোটেলের আপিসে এলাম আমাদের দেশী টাকা ভাঙ্গিয়ে সেখানকার টাকা মানে "টিকল" করে নেবার জন্যে। টাকা ভাঙ্গানো হয়ে গেলে হলের বারান্দায় এসে বাড়ীতে চিঠি লিখতে বসলাম তিন জনে। আকাশে তখন একটু মেঘ করেছে, টিপি-টিপি বৃষ্টিও সুরু হয়েছে। সে বৃষ্টি পড়া দেখে বাঙ্গালা দেশের বৃষ্টি পড়ার ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

চিঠি লেখা সাঙ্গ হলে, সেগুলি ডাকে দেবার জন্যে আপিসে যে মেয়েটি সারাক্ষণ কাজকর্ম্ম দেখা-শুনো করে, তার হাতে দিলাম ও বললাম যে আমরা ব্যাংকক সহরটি একটু ঘুরে দেখে আসতে চাই। থাই-ভারত কালচারাল লজটি কোন দিকে, তাও তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললে যে, হোটেলের একটি বাস এখনি পোষ্ট-আপিসের দিকে যাবে, আমরা স্বচ্ছন্দে তাতে করে যেতে পারি। সেখান থেকে ব্যাংকক বাজার ও থাই-ভারত কালচারাল লজ ইত্যাদি খুব কাছে, সেখানে যাবার কোন অসুবিধেই হবে না। ভালই হল। বাসে উঠে পোষ্ট-আপিসের দিকে চললাম।

এ দেশের ড্রাইভাররা বোধ হয় আস্তে গাড়ী চালানো যাকে বলে, তা জানেই না। এত জোরে গাড়ী চালাতে আর কোথাও দেখিনি। এত ভাল নতুন ধরণের গাড়ীও আর কোথাও নজরে পড়েনি। এমন কি কলকাতায়ও না। এক-একখানা গাড়ী একেবারে পেল্লায় বড়, ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করছে। চেহারা রং ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রকম-ফেরই বা কত! লাল কাল সবুজ হলদে পাঁচমিশেলি গাঢ় ফিকে কত রকম রং। লম্বা ঢেঙা মাঝারি বেঁটে কোনটা গোলগাল মোটা-সোটা, কোনটার বা বেশ ছিপছিপে গড়ন, সিনেমায় নামবার মত।

কোনটার মাডগার্ড ও বডি দেখে মনে হয় আহা বেচারার বোধ হয় "ঈডিমা" হয়েছে। কোন কোনটির নিতম্বের বাহার দেখে তাদের আর মোটর গাড়ী না বলে নিতম্বিনী রাই বলতে ইচ্ছা যায় বৈষ্ণব কবিদের মত। সবই আমেরিকার তৈরী।

চারিদিকে কত যে নতুন নতুন বাড়ী হচ্ছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী। ইস্কুল কলেজ হাসপাতাল আপিস কারখানা দোকান পত্র ইত্যাদি বিস্তর তৈরি হচ্ছে চারি দিকে। ব্যাংকক আর সে পুরানো ব্যাংকক নেই। আমেরিকার সঙ্গে সে এখন গাঁটছড়া বেঁধেছে। আমেরিক্যান জিনিষপত্র কলকব্জা কাপড় চোপড় এসেন্স পাউডার ইত্যাদি যাবতীয় পণ্যদ্রব্যে ব্যাংকক তথা থাইল্যাণ্ড এখন ভর্ত্তি বললেও চলে।

যে ব্যাংককের ব্যবসাকেন্দ্রের চেহারা আমরা দেখে এসেছি, তা প্রায় সম্পূর্ণ মার্কিণ টাকা ও তদারকে তৈরী বলেই মনে হয়। ওখানের লোকেদের কাছে বিদেশী মার্কিণদের আসন যে বেশ খানিকটা উঁচুতে, তা বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

[ক্রমশঃ

বিবেকানন্দ স্তোত্রে

স্নমাণ মিত্র

৩১

আর একটা দল ছিলো, ইতিহাসে পাই—
সে-যুগের সাহেবের পোঁ-ধরা সানাই।
স্বদেশী আহম্মক, দিশী ইংরেজ,
নিজেদের 'হি'ন' বোলে করে যারা খেদ।
পাদ্‌রী-সাহেবদের জুতোর তলায়
নিজেদের মন-প্রাণ যারা সোঁপে দ্যায়,
'অহিন্দু' ভেবে যাঁরা আনন্দ পান,
'ভারতে পশুর বাস' যাঁরা কপ্‌চান,
—এহেন দলের সব বিশিষ্ট নেতা
'মূলার'কে যা লেখেন অপূর্ব সেটা !
অপূর্ব পরশ্রীকাতরতা আর
ঈর্ষায় অপূর্ব চিঠির বাহার !

সবচেয়ে দুঃখের কথা শুনবেন ?
প্রথম জীবনে যিনি ভক্ত ছিলেন,
প্রতাপ মজুমদার ১ তিনি কিনা শেষে
হঠাৎ বিগড়ে গিয়ে মূলারোদ্দেশে
ঠাকুরের বিরুদ্ধে চিঠি লিখলেন !

ধারণা—'মূলার' তার কথাটা নেবেন।
অবিশ্যি ফল তাতে উল্টোই হয়।
'মোক্ষমূলার'টি তো কচি-খোকা নয়।
প্রতাপ যতই তাঁকে যুক্তি দ্যাখান,
মহাঋষি 'সায়ন' ২ কি তাতে ঘাবড়ান্ ?
পরের শ্রী দেখে যারা খালি কাতরাও,
'মূলারে'র জবাবটা শুনে রেখে দাও।

৩২

'ঠাকুরের ভাষা নাকি ভারি অশ্লীল'—
আপনার এ-মত আমি করেছি বাতিল।
ভাষার শ্লীলতা কেউ রাখেনি কো বেঁধে ;
সেটাও বদল হয় দেশ-কাল ভেদে।
সাধুরা ল্যাংটো হোয়ে বেড়ায় যে-দেশে,
ভাষা কি জরির জামা পোরবে সে-দেশে ? ৩

১। স্বনামধন্য ব্রাহ্ম-ধর্ম-প্রচারক শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৮৯৭ সালের Theistic Quarterly Review'এর অক্টোবর সংখ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন—সেই বৃত্তান্ত পোড়েই Max Muller (মোক্ষমূলার) রামকৃষ্ণজীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন্ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে প্রথমে 'Nineteenth Century' নামে ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায়, এবং পরে পুস্তকাকারে তাঁর জীবন এবং উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

২। 'ম্যাক্সমূলার' প্রসঙ্গে স্বামিজী তাঁর গৃহীশিষ্য শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে বোলেছিলেন,—"সায়নই নিজের ভাষ্য নিজে উদ্ধার করতে Maxmuller (মোক্ষমূলার) রূপে পুনরায় জন্মেছেন। আমার অনেক দিন হতেই ঐ ধারণা। Maxmullerকে দেখে সে-ধারণা আরও যেন বদ্ধমূল হোয়ে গেছে"।

শিষ্য প্রশ্ন কোরেছিলেন,—"সায়নই যদি Maxmuller হন তো পুণ্যভূমি ভারতে না জন্মে ম্লেচ্ছ হয়ে জন্মালেন কেন" ? উত্তরে স্বামিজী বোলেছিলেন,—"জীবের উপকারের জন্যে তিনি যথা ইচ্ছা জন্মাতে পারেন। বিশেষতঃ যে দেশে বিদ্যা ও অর্থ উভয়ই আছে, সেখানে না জন্মালে এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ ছাপবার খরচই বা কোথায় পেতেন ? শুনিস্‌নি ? East India Company এই ঋগ্বেদ ছাপাতে নয় লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছিল। তাতেও কুলোয়নি। তিনি ২৫ বৎসর কাল কেবল manuscript লিখেছেন ; তারপর ছাপতে ২০ বৎসর লেগেছে"। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ (পূর্বকাণ্ড. পৃ: ৮৪)

৩। "As to his filthy language, we must be prepared for much plainspeaking among Oriental races. In a country where certain classes of men are allowed to walk about in public place stark naked, language too is not likely to veil what with us requires to be veiled. There is, however, a great difference between what is filthy and what is meant to be filthy. I doubt whether the charge of intentional filthiness or obscenity, which has been brought against writers like Zola, could be brought, or has ever been brought, against Ramakrishna...It should not be forgotten that in Homer, in Shakespeare, nay even in the Bible, there are passages against which our modern taste revolts, yet we object

দ্বিতীয় যে অভিযোগ, সেটা হোলো—'তাঁর
বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি মহা অবিচার।'
আপনার এ-ক্ষোভে আমি খুব দাম দি'না।
জানা চাই স্ত্রীর মনে ক্ষোভ আছে কি না।
স্ত্রী যদি সহায় হন ধর্ম-জীবনে,
স্বামীর পবিত্রতা চান্ মনে মনে,
তাহোলে এ-অভিযোগ দাঁড়ায় কোথায় ?
সবাই কি এ-জীবনে সম্ভোগ চায় ? ৪

তাছাড়া শুনেছি আমি স্বামিজীর কাছে।
শ্রীমা'র বিদেশী ভক্ত—তাঁরও সায় আছে।
Mrs. S. C. Bull শ্রীমা'র শ্রীমুখে
যে-কথা শোনেন সেটা শোনো নিন্দুকে।—
'When she gladly gave her husband...
Her assent
That he should lead a Samnyasin's life,
She gained his intimate friendship,
And became his disciple,
Receiving daily instruction.
During the year's of her life with him
She was his adviser,
Praying earnestly
For such purity of motive
That she might never fail him.
She had also taken the vow
Of poverty and chastity,
And renouncing the natural joys of a mother,
She became with him
The spiritual parent of many children.' ৫

* * *

"অতএব 'আজীবন স্ত্রী-সঙ্গ নেই'
—এ ব্যাপারে আমাকে যা লিখেছেন, সেই
আপনার অভিযোগ সঙ্গত নয়।
স্ত্রীকে রেখে কামত্যাগ অবিচার নয়।
অবিশ্যি আমাদের ইউরোপী ধাতে
আপনার অভিযোগ ষোল আনা খাটে।
তাই বোলে ভারতের পুণ্যভূমিতে
আজীবন অমলিন শুদ্ধ প্রীতিতে

---

to Bowdlerised editions, because the indecencies are never of an intentional character, and would seem to have been so, if they were now removed by us."—Ramakrishna, His Life And Sayings. By Prof. F. Max Muller. (Page 62)

এ-ব্যাপারে স্বামিজীর মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য।—

"ব্রাহ্ম-সমাজের গুরু স্বর্গীয় আচার্য শ্রীকেশবচন্দ্রের শ্রীমুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি যে—শ্রীরামকৃষ্ণের সরল মধুর গ্রাম্য ভাষা অতি অলৌকিক পবিত্রতা-বিশিষ্ট, আমরা যাহাকে অশ্লীল বলি, এমন কথার সমাবেশ তাহাতে থাকিলেও তাঁহার অপূর্ব বালবৎ কামগন্ধ-হীনতার জন্য ঐ সকল শব্দ প্রয়োগ দোষের না হইয়া ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছে। অথচ ইহাই একটি প্রবল আক্ষেপ !!"

—ভাববার কথা। (পৃঃ ৬৪)

৪। "Another charge which Mozoomdar seems to consider as proved against Ramakrishna is what he calls his almost barbarous treatment of his wife...Vivekananda told us that when at the age of seventeen his wife (Sri Sarada Devi) went to find him (Sri Ramakrishna), he received her with real kindness, and that she was quite satisfied to live with him on his own terms, if he would only enlighten her mind and make her to see and to serve God. Such a relationship is by no means without a precedent, and can not be called barbarous...It is strange that a man of Mozoomdar's knowledge and experience should have considered the resolve of Ramakrishna's wife to live with him as a Samnyasini as barbarous treatment. She herself evidently did not think so, nor have I heard of any other cruelties on the part of her husband. If she was satisfied with her life, who has any right to complain ; and is love between husband and wife really impossible without the procreation of children ? We must learn to believe in Hindu honesty, however incredulous we might justly be on such matters in our country. Anyhow, I know of no one else who has taken offence at Ramakrishna's spiritual marriage."

—Ramakrishna, His Life And Sayings.
By Prof. Max Muller. (Page 64 and 65)

৫। যখন তিনি (শ্রীশ্রীসারদা দেবী) সানন্দে তাঁর স্বামীকে (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে) সন্ন্যাসজীবন যাপনের মত দিলেন, তখন তাঁর স্বামী তাঁকে আরও নিবিড়ভাবে গ্রহণ কোরেছিলেন, আর সেই থেকে সারদা দেবী তাঁর শিষ্যা হোয়ে প্রাত্যহিক উপদেশ গ্রহণ কোরতে লাগলেন। স্বামীর সঙ্গে তাঁর সেই ক'বছরে, তিনিই স্বামীকে পরামর্শ দিতেন, এবং তাঁর প্রতি একাগ্রনিষ্ঠার জন্যে চিত্তের যে পবিত্রতার প্রয়োজন, তার জন্যে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা কোরতেন। তিনি নিজেও (তাঁর স্বামীর মত) দারিদ্র্য ও পবিত্রতার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, এবং মা হওয়ার স্বাভাবিক আনন্দ ত্যাগ কোরে তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে আধ্যাত্মিকসূত্রে অসংখ্য সন্তানের মা হোয়েছিলেন।

—Ramkrishna, His Life and Sayings.
By Prof. Max Muller (Page 65)

যদি তুমি কোনো যোগী শুভ-নিষ্ঠায়
স্ত্রীকে নিয়ে নিষ্পাপ জীবন কাটায়,
নিঃসন্দেহে আমি মেনে নি' সে কথা ;
সন্দেহ যে জাগায় নি' না তার কথা।
ইউরোপ যা পারে না ভারত তা পারে ;
ইউরোপীয়ান সেটা বিশ্বাস করে।"

৩৩

"আর একটা প্রস্তাব এনেছেন যিনি,
কেশব সেনের কোনো আত্মীয় তিনি।
তাঁর মতে—'ঠাকুরকে শ্রীকেশব সেন
অজানার গুহা থেকে বাইরে আনেন।'
অতএব তাঁর মনে এই কথা জাগে,
কেশব সেনের স্থান ঠাকুরের আগে।
প্রথম যে প্রস্তাব কোরেছেন তিনি,
সে-কথার প্রতিবাদ আমিও কোরিনি।
আমি জানি শিষ্যকে যত্ন কোরেই
প্রকাশিত হন গুরু এমনি কোরেই।
তাই বোলে কেশবের আসন আগেই,
—একথাতে যুক্তির ছিটে-ফোঁটা নেই! ৬

আর একটা অদ্ভুত অভিযোগ কিনা,
'বেশ্যাকে তিনি নাকি করেননি ঘৃণা।'
এতে শুধু এইটুকু বোলে রাখি ভাই,
শুধু রামকৃষ্ণ নন, অনেকেই তাই।
যুগ-ধর্ম-প্রবর্তক বুদ্ধ খৃষ্টাদি,
এ-ব্যাপারে সকলেই সম-অপরাধী।" ৭

সমাজের ঘৃণা যাকে ঘেরে চারদিকে,
তথাগত কি করেন 'অম্বাপালী'কে ?
'সামরীয় মহিলা'কে যীশু কি করেন ?
ঘৃণা না অনুগ্রহ—সেটা দেখেছেন ?

অতএব রামকৃষ্ণদেব শুধু নন্,
অবতার সবই দেখি পতিতপাবন।

৩৪

খৃষ্টান মিশনারী, যারা এতদিন
হিন্দু-হিদেনকুল ধর্মবিহীন—
এই কথা বোলে স্রেফ বগল বাজান,
'মূলারে'র পুঁথি পোড়ে তাঁরা খাবি খান।

আর এদিকে হিংসুটে ব্রাহ্মের মনে,
আদা-জল খেয়ে যারা নেমেছিলো রণে,
জ্বলে ওঠে ঈর্ষার তীব্র আগুন।
'মূলারে'র পুঁথি যেন কাটা ঘায়ে নুণ।

৩৫

সমাজে একটা দল এখনো আছেন।
অবিশ্যি সংখ্যায় ঢের কমেছেন।
সর্ববিষয়ে এরা গলাবেই নাক,
যাকে বলে একেবারে বেঁড়ে-ওস্তাদ্।
যে কোনো বিরাট ভাব মাথা তোলে যেই,
এই সব বিজ্ঞেরা পিছু লাগবেই।
এদের কর্ম শুধু বাড়ি বোসে থাকা,
চুড়ির আওয়াজটাতে কান খাড়া রাখা।
দারুণ মরদ্ এরা, ঠোকে যাকে-তাকে।
এদের দীনতা শুধু মেয়েদের কাছে।
বাইরের ঘরে এরা তর্ক বাধায়।
বাড়ির ভেতরে গেলে কেঁচো বনে যায়।
তাবোলে 'সমাজ-সেবা' করে নাকি তারা ?
মেয়েদের ফরমাস্ খাটে তবে কারা ?
পাশের বাড়ির ঐ মাসিক বাজার,
সাবান, মাথার কাঁটা, ফেস্-পাউডার—
এরাই তো কিনে আনে, তার দাম কম ?
পরের বাড়িতে এরা ছেলের মতন।

৩৬

এ-হেন শুভার্থীরা আমায় ডাকেন,
'মঠে' যাই বোলে তাঁরা ফোড়ন কাটেন,—
"'সিদ্ধ-পুরুষে' বুঝি সানায় না আর ?
ইদানীং রামকৃষ্ণ শুনি 'অবতার' ?

৬। "A relative of Keshub Chander Sen, however, who evidently completely misapprehended what was implied by the influence which I said that Ramakrishna had exercised on Keshub Chandra Sen, Mozoomdar, and others as his disciples, is very anxious to establish the priority of Keshub Chander Sen, as if there could be priority in philosophical or religious truth. 'It was Keshub Chander' he tells us, 'who brought Ramakrishna out of obscurity.' That may be so, but how often have disciples been instrumental in bringing out their master ?"

—Ramakrishna, His Life And Sayings.
By Prof. Max Muller. (Page 66)

৭। "He then continues to bring charges against Ramakrishna, which may be true or not, but have nothing to do with the true relation between Keshub and Ramakrishna. If, as we are told, he did not show sufficient moral abhorrence of prostitutes, he does not stand quite alone in this among founders of religion"

—Ramakrishna, His Life And Sayings.
By Prof. Max Muller. (Page 67)

একেবারে অবতার ? খাসা মতবাদ !
নইলে যে চ্যালাদের জুটবে না ভাত !
বাবুদের ভোগ-রাগ মান-সম্মান,
নইলে যে দু-দিনেই পাবে নির্বাণ !
চ্যালা, নাতি-চ্যালাদের প্রয়োজনে উনি
'অবতার বরিষ্ঠ'(৮) বুঝলে সুর্মণি ?
বিবেকানন্দ যদি না থাকতো, তবে
অবতার হওয়া তাঁর ঘুচে যেতো কবে"

• • •

এই সব কথা শুনে আগে রাগ হোতো।
ভাবতাম—দুটো চড় মারি অন্ততঃ।
ইদানীং আর একটা ভাব ওঠে মনে,—
ধরাতে আসেন যাঁরা যুগ-প্রয়োজনে,
সেই অবতার ছাড়া, পৃথিবীর বুকে
প্রচণ্ড মহেরাও আসে যুগে-যুগে :
ঘেউ-ঘেউ করে তারা, ঠিক অবিকল
হাতীর পেছনে ঐ কুকুরের দল।
সামনে এ সাহসীরা আসেনাকো কেউ।
বেশ কিছু পশ্চাতে করে ঘেউ-ঘেউ।
অবিশ্যি ফল তাতে উল্টোই ফলে।
হাতীর মহিমা তাতে আরো বেশি খোলে।

দিগন্তব্যাপী ঐ খোলা মাঠটাতে
যদি দুটো বেঁটে আর ঝাড়া গাছ থাকে,
মাঠের শূন্যতাটা আরো বেশি পাই।
মাঠের মহত্ত্বটা বাড়ায় এরাই।
সে-হিসেবে বেঁটেদের মূল্য বিরাট।
কুকুরই প্রমাণ করে হাতীটা বিরাট।

কুকুরের ডাক শুনে অতিকায় হাতী,
ঘাড় ফিরে তাকায় না, মারে নাকো লাথি ;
হাতী সোজা চোলে যায়, কুকুরেরা তার
তাদের হীনতা দিয়ে বাড়ায় বাহার।

একটা মহৎ কাজ আরো যেটা পাও,
সেটা হোলো আহ্বান—'হাতী দেখে যাও।'
কুকুরের ঘেউ-ঘেউ যেই কানে যায়,
সকলেই ছুটে আসে হাতীর আশায়।
হাতী খ্যাখা হোয়ে যায় কুকুরের ডাকে।
সে-হিসেবে কুকুরেরও প্রয়োজন থাকে।

ঠাকুরের প্রচারক স্বামিজীই নন্।
ঘেউ-ঘেউ করে যারা তারা কিছু কম্ ?

৩৭

মুক্তো কি কোরে হয় জানা যদি থাকে,
বোঝা যাবে বিরোধিতা কতো কাজে লাগে।
জলের তলায় ঐ ঝিনুকের বুকে
তুলতুলে জানোয়ার থাকে যেটা ঢুকে,
তার গায়ে যেই কোনো বালি এসে পড়ে,
বিষাক্ত লালা দিয়ে তাকে ঘিরে ধরে।
সে ভাবে এ বিষে তাকে তাড়াবেই ঠিক ;
কিন্তু কপালক্রমে হয় বিপরীত !
বালির শত্রু এই বিষ-লালাটাই
এই ভাবে ক্রমে-ক্রমে জমে জমে ভাই
অজান্তে একদিন সর্বপ্রকারে
বালিকে মুক্তো কোরে তবে তাকে ছাড়ে।
বালিকে হটাতে গিয়ে—এই অভিযান,
এই যে বিরুদ্ধতা, ভ্যাখো কতো দাম।

৩৮

যে-কোনো মহানভাব মাথা তোলে যেই,
একদল মূর্খেরা পিছু লাগবেই।
মায়ার প্রভাবে পোড়ে এরা না-জেনেই
ভাবটা সুদৃঢ় করে সমাজ-মনেই।
ঝর্ণা যে একদিন প্রচণ্ড বেগে
মাটি কেটে ফেঁপে-ফুলে সমতলে নেবে
ঊষর সমাজটাতে ঢুকে যায় দাদা,
তার মূলে আছে ঐ পাহাড়ের বাধা।
শত্রু ও নিন্দুক মূর্খ পাগাড়
বাধা দিয়ে গাঙবেগ এনে দ্যায় তার।
এইভাবে একদিন এদেশি এ-ভুলে
ভাবের স্রোতস্বিনী তরঙ্গ তুলে
ঢুকে যায় সমাজের মজ্জাতে ভাই।
সুতরাং নিন্দুকও হেয় নয় তাই।
পৃথিবীতে চাও যদি কায়েমী আসন,
'জটিলা-কুটিলা'দের বড়ো প্রয়োজন।
যেখানেই অবতার সেখানে ওরাই।
নইলে কি কোরে হবে লীলা পোক্তাই ?
আদা-জল খেয়ে এরা যত ফেউ ডাকে,
ততোই প্রচার করে ঐ বাঘটাকে।

• • •

অতএব করে যারা কুকুরের পার্ট,
তেড়ে-ফুঁড়ে আসে যারা বেঁড়ে-ওস্তাদ,
গর্বোদ্ধত ঐ সব-জান্তারা,
ঘ্যান্-ঘেনে প্যান্ পেনে মাথা-মোটা যারা,
ছটাকে-বুদ্ধিওলা জ্যাঠা নাস্তিক,
আহম্মকির ঐ জ্যান্ত প্রতীক্,
তমঃপ্রধান ঐ কূপমণ্ডূক,
মিট্‌মিটে বিট্‌লে ও পচা নিন্দুক,
মূর্খ, গোঁয়ার আর পাজী শয়তান,
—তারা কেউ হেয় নয়, তাদেরও প্রণাম। [ক্রমশঃ।

৮। স্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শুধু অবতার বোলেই ক্ষান্ত হন্‌নি, অবতারদের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ কোরে গ্যাছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণাম-মন্ত্রে বোলে গ্যাছেন,—

"স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্ব্ব-ধর্ম্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।"

ব্যাডমিণ্টন

এবারে পূর্ব-ভারত চ্যাম্পিয়ানসিপের আয়োজন করেছিলেন শোভাবাজার ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েসন। দেশ-বিদেশের গুণী খেলোয়াড়দের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছিলেন মালয়ের ওং পো লিম্, ইন্দোনেশিয়ার উদীয়মান খেলোয়াড় তান জো হক, ভারতের তিন ও চার নম্বরের খেলোয়াড় পি, এস, চাওলা ও অমৃত দেওয়ান।

সিঙ্গলস, ডাবলস ও জুনিয়র সিঙ্গলস, এই তিনটি বিভাগ ছিল পূর্ব-ভারত চ্যাম্পিয়ানসিপের সীমাবদ্ধ। ফ্যাইন্যাল ও সেমিফ্যাইনাল খেলা ছাড়া ইনডোর ষ্টেডিয়ামে তেমন দর্শক সমাগম হয়নি। ফলে পরিচালক প্রতিষ্ঠানকে বহু টাকা ঘাটতি পূরণের ঝুঁকি নিতে হয়েছে।

সিঙ্গলস—এবারে সিঙ্গলসের চ্যাম্পিয়ান লাভ করেছেন ইন্দোনেশিয়ার তরুণ খেলোয়াড় তান জো হক। দ্বিতীয় রাউণ্ড থেকে ফাইন্যাল পর্য্যন্ত প্রতিটি ষ্ট্রেট গেমে জয়লাভ করেছেন। ফাইন্যালের ফলাফল:—তান জো হক (ইন্দোনেশিয়া) ১৫-২ ও ১৫-৭ পয়েণ্টে অমৃত দেওয়ানকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ডাবলস—ডাবলসের খেলায় ভারতের পি, এস চাওলা ও অমৃত দেওয়ান বিশ্ববিখ্যাত মালয়ের ডাবলস জুটি ওং পো লিম ও ইসমাইল বিন মর্জিনের পরাজয় উল্লেখযোগ্য। তবে এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ওং পো, লিম শারীরিক অসুস্থ ছিলেন। তাঁর হাঁটুতে জল জমা অবস্থায় খুড়িয়ে খুড়িয়ে খেলেন। এবার পূর্ব-ভারত খেলায় খেলতে এসে আরও একটি নতুন উপসর্গ দেখা দেয়—তৃতীয় রাউণ্ডে মনোজ গুহর সঙ্গে খেলতে খেলতে হঠাৎ তিনি কোমরে ব্যথা অনুভব করায় আর খেলতে পারেননি। ফাইন্যালে ডাবলসের ফলাফল:—অমৃত দেওয়ান ও পি, এস, চাওলা ১০—১৫, ১৫—১০ ও ১৫—১০ পয়েণ্ট ওং পো লিম ও ইসমাইল বিন মার্জিনকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র সিঙ্গলস—পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়ান সিপে জুনিয়ার বিভাগে অপূর্ব মনোবল ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন চন্দননগরের রমেন ঘোষ। রমেন ভারতের জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন দীপু ঘোষ ও রানার্স গোরা ঘোষের কনিষ্ঠ সহোদর। জুনিয়র বিভাগে আর একজন খেলোয়াড়ের নাম করা যায়, সে হচ্ছে সুকুমার দেব। সুকুমার রমেনের কাছে সেমি ফ্যাইনালে পরাজিত হয়েছে। ফাইন্যালে রমেন বৌবাজারের কে শর্মাকে পরাজিত করে।

রমেন ঘোষ ১৭—১৪ ও ১৫—১ পয়েণ্টে কে শর্মাকে পরাজিত করে।

বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসিপের খেলা শেষ হয়ে গেছে, বিভিন্ন খেলার ফলাফল নিয়ে দেওয়া হল।

সিঙ্গলস—মনোজ গুহ ১৫—৫ ও ২৫—১০ পয়েণ্টে দীপু ঘোষকে পরাজিত করেন। ডাবলস—মনোজ গুহ ও দীপু ঘোষ ১৫—৮, ১৫—১২, পয়েণ্টে প্রণব বসু ও হরিপদ গুহকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র সিঙ্গলস—গোরা ঘোষ ১৫—১১ ও ১৫—১০ পয়েণ্টে সুমার দেবকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র ডাবলস—গোরা ঘোষ ও রমেন ঘোষ ২৫—৮ ও ১৫—৬ পয়েণ্টে সুকুমার দেব ও কে শর্মাকে পরাজিত করেন।

ক্রিকেট

সি, এ, বি, ক্রিকেট লীগের খেলা শেষ হয়ে গেছে। এবার তিনটি গ্রুপে সি, এ, বি ক্রিকেটের খেলা পরিচালিত হয়। প্রতি গ্রুপে ৮টি করে দল থাকায় প্রত্যেক দলকে ৭টি করে খেলা খেলতে হয়েছে। 'এ' গ্রুপে মোহনবাগান 'বি' গ্রুপে কালীঘাট ও 'সি' গ্রুপে রাজস্থান চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করে। লীগ চ্যাম্পিয়ান-সিপের জন্য এই তিনটি দলকে লীগ প্রথায় খেলে, কালীঘাট দল মোহনবাগান ও রাজস্থান পরাজিত করায় চ্যাম্পিয়ানসিপ অর্জন করে।

এশিয়ান টেনিস

এবারের এশিয়ান টেনিসের চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছেন মিশরের কীর্তিমান খেলোয়াড় জারোস্লাভ ড্রবনি। জারোস্লাভ ড্রবনি অষ্ট্রেলিয়ার তরুণ খেলোয়াড় আর্থার হুবারকে জুটি নিয়ে পুরুষদের ডাবলস ও মিস এ্যালথিয়া গিবসনকে জুটি নিয়ে মিক্সড ডাবলসেও বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করে 'ত্রিমুকুট' লাভ করলেন। এদিকে মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছেন এ্যালথিয়া গিবসন। এবার ছিল এশিয়ান টেনিসের ষষ্ঠ বার্ষিক অনুষ্ঠান। এই খেলার পরিচালনা করেন সিংহল লন টেনিস এসোসিয়েসন।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল

জারোস্লাভ ড্রবনী (মিশর) ৬-১, ৬-২ ও ৬-৪ গেমে ওয়ারেণ উডককে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল

জারোস্লাভ ড্রবনি (মিশর) ও এ বুবার (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৩, ৮-১০, ৪-৬ ও ৬ ৪ গেমে এফ, এমান ও আর ডেইরোকে (ফিলিপাইন) পরাজিত করেন

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল

মিস এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ৬-০, ও ১৩-১১ গেমে মিস প্যাটওয়ার্ডকে (গ্রেট বৃটেন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইন্যাল

মিসেস কে সিং (ভারত) ও মিস প্যাটওয়ার্ডকে (গ্রেট বৃটেন) ৬-৪ ও ৭-৫ গেমে মিস এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ও মিস সি ফোনসেকাকে (সিংহল) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্যাল

জারোস্লাভ ড্রবনী (মিশর) মিস এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ৭-৫ ও ৬-২ গেমে মাইকেল ডেভিস ও মিস প্যাটওয়ার্ডকে (গ্রেট-বৃটেন) পরাজিত করেন।

জাতীয় এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ানসিপের ৮টি বিষয়ে নতুন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তন্মধ্যে পুরুষ বিভাগে ৪টি ও মহিলা বিভাগে ৪টি। একজন মহিলা দুইটি বিষয়ে নতুন রেকর্ড করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। বিশ্বের এ্যাথলীটদের সংগে ভারতীয় এ্যাথলীটদের তুলনা করলে দেখা যায় যে ভারতীয় এ্যাথলীটদের মান অত্যন্ত নিম্নমুখী।

এ্যাথলেটিকসের যেটুকু চর্চ্চা সেটা একপ্রকার সামরিক বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলা যায়। সার্ভিসেস দল ইতিপূর্বে পর পর ৬ বার জাতীয় এ্যাথলীট চ্যাম্পিয়ান হয়েছে, এবার নিয়ে সাতবার হল। পুরুষ বিভাগে ২৪টির মধ্যে ১১টিতে সার্ভিসের এ্যাথলীটরা প্রথম স্থান লাভ করেছেন।

মহিলাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিহারের এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট। লোহার বল ও বর্শা ছোঁড়ায় তিনি নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হাইজাম্পে ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের বসন্তকুমারী ও ডিসকাম থ্রোতে মহীশূরের সিলিন ও'কনেল দুইটি নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেন।

এশিয়ান টেবিল টেনিস

ম্যানিলায় চতুর্থ এশিয়ান টেবিল টেনিসের চ্যাম্পিয়ানসিপের খেলায় ভারত অতি অল্পের জন্য টীম-চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করতে পারেনি। চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ভিয়েৎনাম। মোট ৬টি দেশের সংগে দলগত যে প্রতিযোগিতা হয়, তাতে ভারত ও ভিয়েৎনাম উভয়েই পাঁচটি দেশকে পরাজিত করে ও একটিতে পরাজিত হয়। চ্যাম্পিয়ানসিপের জন্য ভারত ও ভিয়েৎনাম মধ্যে খেলার ব্যবস্থা হলে ভিয়েৎনাম অজুহাত দেখায় তারা ২৮টি খেলায় জয়ী হয়েছে এবং ভারত ২৬টি। অতএব ভিয়েৎনামই বিজয়ী সাব্যস্ত হয়।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসিপের খেলায় চীনা খেলোয়াড়দের জয়জয়কার। নিম্নে ফলাফল দেওয়া হ'ল।

পুরুষদের টীম চ্যাম্পিয়ান

বিজয়ী—ভিয়েৎনাম, রাণার্স—ভারত।

মহিলাদের টীম চ্যাম্পিয়ান

বিজয়ী—তাইওয়ান ; রাণার্স—কোরিয়া।

সিঙ্গলস-ফ্যাইনাল

লাউ সেক ফোক (হংকং) ১৩-২৩, ২১-১৮, ২১-১৬, ও ২১-১১ পয়েন্টে সু লুঙ সাঙকে (তাইওয়ান) পরাজিত করেন।

ডাবলস—ফ্যাইনাল

মাই ভ্যান হোয়া ও ট্রান ক্যান ডুয়োক (ভিয়েৎনাম) ২২-২০, ১৪-২১, ২১-১১ ও ২১-১৩ পয়েন্টে নুয়েন কিম্ হাং ও ট্রান ভ্যান লিউক (ভিয়েৎনাম) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফ্যাইনাল

চো কিয়াং জো (কোরিয়া) ২১-১০, ২১-১৮ ২১-১৫ পয়েন্টে উই স্যাঙ্গ সুককে (কোরিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফ্যাইনাল

চিং পাও পো ও লী চ্যাং চাই (তাইওয়ান) ২১-১৫, ২১-১৪ ও ২১-১৮ পয়েন্টে ইয়াও লিলিয়ান ও ইয়াও চুকে (তাইওয়ান) পরাজিত করেন।

হকি

ক'লকাতায় হকি মরশুম সুরু হয়ে গেল। অতি অল্পদিনের হকি মরশুম শেষ হলেই কলকাতা থেকে হকিকে বিদায় নিতে হবে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে কুশলী খেলোয়াড়রা এক হকি মরশুমে কলকাতা মাঠে ভীড় করার আর তেমন বিশেষ উপায় নেই তবুও আইনের বেড়াজাল টপকে কিছু কিছু খেলোয়াড়কে কলকাতা মাঠে খেলতে দেখা যায়। গৌরচন্দ্রিকা স্বরূপ খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তন নতুন খেলোয়াড়ের যোগদানের খতিয়ানে মোহনবাগানের কোন ক্ষতি হয়নি। গত বারে গুরুং অসুস্থ ছিলেন বলে নিজ দলকে তেমন সাহায্য করতে পারেন নি। শোনা যাচ্ছে, কেশব দত্ত নিয়মিত খেলবেন, তাছাড়া উত্তর-প্রদেশ থেকে কয়েক জন খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের যোগদানের সম্ভাবনা রয়েছে। গতবারের রাণার্স ভবানীপুরে নতুন খেলোয়াড় দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। রবিদাস, হরদেও সিং ও বালু দল পরিত্যাগ করেছেন, সেই সংগে ফিরে এসেছেন হাফহাউস, ডাফং ও বিষ্ণু। ইষ্টবেঙ্গল দলে অনেক নতুন খেলোয়াড় এসেছেন। তন্মধ্যে পাঞ্জাবের ডোগরা, পুণার গুরুবক্স মহীশূরের ডি মেলো উন্নিকৃষ্ণ, পাঞ্জাব স্পোর্টস থেকে শেঠি ও জগদীশপ্রসাদ। রবিদাস ও বালুকে ইষ্টবেঙ্গলে খেলতে দেখা যাবে। কাষ্টমস দলের খেলোয়াড় তেমন রদ-বদল হয়নি। আগামী বারে হকি লীগের পর্য্যালোচনা করার ইচ্ছা রইল।

গ্রহান্তরে বসতির সন্ধানে

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

মানুষ যখন জানতে পারলো যে, সূর্যের চার দিকে যে সব গ্রহ ঘুরছে তারাও পৃথিবীর মত বস্তুপিণ্ড, তাদের স্বভাবতঃই জানবার আগ্রহ হ'ল যে, এ সব গ্রহে কোন প্রাণী আছে কি না এবং এ সব জায়গায় মানুষের বাসের যোগ্য স্থান হবে কি না। বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে কিছু কিছু তথ্য জানতে পেরেছে।

মানুষের বাঁচবার জন্যে তিনটি প্রধান উপকরণ দরকার, যথা—জল, অক্সিজেন এবং পরিমিত উত্তাপ। এ সব উপাদান উপযুক্ত পরিমাণ না থাকলে মানুষের এ পৃথিবীতে বাস করা সম্ভব হ'ত না।

সব প্রাণীরই জীবন ধারণের জন্যে জল একান্ত আবশ্যক। জল না হ'লে খাদ্য পরিপাক হয় না। কিন্তু এই জল তরল হ'তে হবে, না হ'লে চলবে না। সব জলই সম্পূর্ণরূপে বরফ হ'লে কিংবা সম্পূর্ণরূপে বাষ্প হ'লে কোন প্রাণীই বাঁচবে না। কাজেই যেখানে বসবাস করতে হবে সে জায়গার উত্তাপ এ দুইয়ের মাঝামাঝি হ'তে হবে; আবহাওয়ার উত্তাপ এত কম হলে চলবে না যে, সব জল জমে বরফ হয়ে যায়। আবার এত বেশী হলেও চলবে না যে, সব জল গরমে বাষ্প হয়ে যায়।

শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের জন্যে বায়ুতে যথেষ্ট অক্সিজেন থাকা দরকার। এ কথা সবাই জানে যে, পৃথিবীর যত উপরে উঠা যায়, বায়ু তত পাতলা হতে থাকে এবং অক্সিজেনের পরিমাণও কমতে থাকে। এ জন্যে এরোপ্লেনে ক'রে অনেক উপরে উঠতে হলে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের জন্যে অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিতে হয়। এভারেষ্ট বিজয়ের সময় অক্সিজেন সিলিণ্ডার সঙ্গে নিতে হয়েছিল। কারণ, পাহাড়ের উঁচুতে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব কম। এরূপ বায়ুতে শ্বাস-প্রশ্বাসের খুব কষ্ট হয় এবং একটু পরিশ্রম করলেই যথেষ্ট ক্লান্ত হতে হয়।

মানুষের খাবার জন্যে ফলমূল শাকসব্জী দরকার। কাজেই যেখানে বাস করতে হবে সেখানে গাছপালা থাকতে হবে। গাছপালা বাতাস থেকে কারবন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং মাটি থেকে জল ও অন্যান্য দ্রব্য নিয়ে সূর্যরশ্মির তেজের মাধ্যমে পরিপাক করে। কাজেই গাছপালার বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্যে বায়ুতে কারবন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস থাকা দরকার। সূর্যের আলোও আবশ্যক।

কাজেই কোন গ্রহে বাস করা যায় কি না জানতে হলে আগে খোঁজ নিতে হবে যে, সেখানে তরল জল, আলো, বায়ুতে অক্সিজেন ও কারবন-ডাই-অক্সাইড এবং আবহাওয়ায় পরিমিত তাপ আছে কিনা। কোন গ্রহ থেকে পৃথিবীতে যে আলো আসে তা স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, সেখানে অক্সিজেন, কারবন-ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প আছে কি না এবং কি পরিমাণ আছে।

দূরবীণের সঙ্গে সংলগ্ন সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে বহুদূরে অবস্থিত বস্তুর তাপ জানা যায়। ৪০০ মাইল দূরে যে মোমবাতি জ্বলছে তার তাপ হিসাব ক'রে বলা যায়। এমনি করেই বহুদূরে অবস্থিত গ্রহ ও তারার উত্তাপ নির্ণয় করা হয়।

বুধগ্রহ সূর্যের সবচেয়ে নিকটে। মধ্যাহ্নে তার উত্তাপ হয় ৬০০ ডিগ্রি ফারেনহিট। এত উত্তপ্ত আবহাওয়ায় বাস করবার কথা কল্পনাও করা যায় না। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস, নেপচুন ও প্লুটোর উত্তাপ খুব কম। হিমাঙ্কের চেয়েও ১৮০ থেকে ৩০০ ডিগ্রি নীচে। আমাদের পৃথিবীর কোন প্রাণী এত ঠাণ্ডায় এ সব গ্রহে থাকতে পারে না। চন্দ্রে বাতাস ও জল দেখা যায় না, কাজেই এখানেও কোন প্রাণী বাঁচবে না।

আর বাকি রইল শুক্র ও মঙ্গল। শুক্রের চারদিকের বায়ুমণ্ডল কুজ্‌ঝটিকাময়। ভিতরের কোন বস্তু ভাল ক'রে দৃষ্টিগোচর হয় না। বাতাসে কারবন-ডাই-অক্সাইড খুব বেশী, অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্প খুব কম। বাইরের উত্তাপ ফুটন্ত জলের তাপের মত। এরকম আবহাওয়ায় কোন প্রাণী না থাকাই সম্ভব। সবদিক বিবেচনা করলে মনে হয় যে, পৃথিবীতে কোন প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার আগে যে অবস্থা ছিল শুক্রের বর্তমানে সেই অবস্থা।

মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল খুব পাতলা। বহির্ভাগ পরিষ্কার দেখা যায়। পৃথিবীর মত এই গ্রহেও ঋতু পরিবর্তন হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তাপ দিনে ৫০ ডিগ্রি হয় রাত্রে হিমাঙ্কের নীচে যায়। শীতকালে মেরুপ্রদেশে সাদা টুপির মত দেখা যায়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে প্রায় থাকে না। ইহা বরফের অস্তিত্বই প্রমাণ করে। কাজেই মঙ্গলগ্রহে জল আছে বলেই মনে হয়। কিন্তু পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের ভাগ খুব কম। বায়ুতে অক্সিজেন সামান্য আছে, পৃথিবীর এক হাজার ভাগেরও কম। এই গ্রহের উপরিভাগের প্রায় সর্বত্রই লাল হলদে রং দেখা যায়, লোহার মরিচার মত। বোধ হয় অক্সিজেন লোহার সঙ্গে মিশে এরূপ হওয়াতে বায়ুর অক্সিজেনের ভাগ এত কমে গেছে। অন্য কোন গ্রহে এরূপ দেখা যায় না। চন্দ্রে এরূপ রং মোটেই দেখা যায় না, কারণ সেখানে বাতাস নেই।

মঙ্গলগ্রহে যে সব কালো অংশ দেখা যায়, যদিও অনুপাতে খুব কম, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারা রং বদলায়। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালেই এই সব অংশ অধিকতর বিস্তৃত ও সবুজ হয়। বোধ হয় এই গ্রহে এখনও অবশিষ্ট যা সামান্য উদ্ভিদ আছে তারই নিদর্শন। কিন্তু এই গ্রহে কোন কালে কোন প্রাণী ছিল কিনা কিংবা এখনও আছে কিনা সঠিক জানা যায় না। সবদিক বিবেচনা করলে মনে হয় যে, বহু যুগ পরে পৃথিবী যে অবস্থায় পরিবর্তিত হবে, মঙ্গলগ্রহ এখন সেই অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

কাজেই সৌরজগতের গ্রহ সম্বন্ধে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবী ব্যতীত শুক্র ও মঙ্গলে প্রাণী থাকা অসম্ভব নয়। বিশ্বজগতের আর কোথাও গ্রহ আছে কি না এবং সেখানে বসতি আছে কি না, একথাও স্বতঃই মনে হয়।

সৌরজগতের বাইরে কোন গ্রহ আছে কি না, এত দিন জানা যায় নি। সম্প্রতি কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সূর্যের খুব কাছে যে-সব তারা রয়েছে, বোধ হয় তাদের কারো কারো অদৃশ্য সঙ্গী রয়েছে। কারণ, এই তারাগুলো একটু বেতালে ঘোরে, বোধ হয় কোন অদৃশ্য সঙ্গীর আকর্ষণে। তাহলে এসব অদৃশ্য সঙ্গীরাই তাদের গ্রহ হবে। সূর্য থেকে বহু দূরে যে-সব তারা আছে, তাদের সম্বন্ধে এখনও কোন তথ্যই জানা যায় নি। হয়তো তাদের অনেক গ্রহ আছে, যেখানে কোনরূপ প্রাণী থাকা অসম্ভব নয়।

সব জগতেই যে প্রাণী একরূপ হবে এবং তাদের জীবনধারণের প্রণালীও যে একই হবে, এরূপ মনে করা সঙ্গত হবে না। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত বিবর্তনের ঘূর্ণাবর্তে কত আকার ও কত প্রকারের কত প্রাণীর আবির্ভাব হ'ল, তার সংখ্যা নেই!

স্নানের

সময়

মার্গো সোপ

ব্যবহার করতে ভুলবেন না

সুরভি-সুন্দর মার্গো সোপের প্রচুর স্নিগ্ধ ফেণা লোমকূপের গভীরে প্রবেশ ক'রে শরীরের মলিনতা দূর করে এবং শীতকালের শুষ্ক শীতল বাতাসেও তনুচ্ছদ মসৃণ ও কোমল রাখে। পরিবারের সকলের পক্ষেই মার্গো সোপ একটি আদর্শ সাবান। কোমল দেহের পক্ষেও সম্পূর্ণ নিরাপদ।

প্রস্তুতকারক

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

কলিকাতা • ২৯

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ
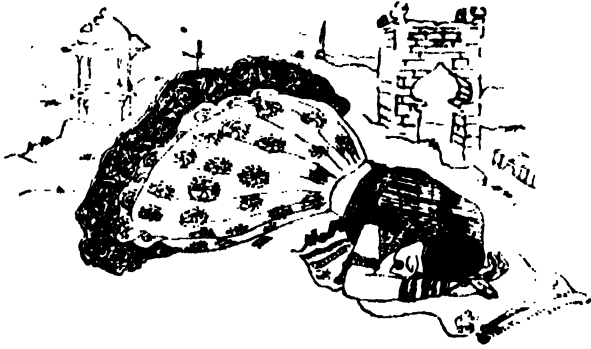
শ্রীশ্রীসারদা দেবী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীমালতী গুহ-রায়

স্বার্থগন্ধলেশশূন্য আত্মোৎসর্গীকৃত ভালবাসায় যে কী দীপ্তি, কি স্বর্গীয় আভা, মায়ের জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্র ঘটনায় তা জাজ্বল্যমান। বন্যা ও দুর্ভিক্ষ যখন মহামারীরূপে ধ্বংসকারী হয়ে দেখা দিত, মায়ের কি ভয়ার্ত ব্যথিত অন্তর! চোখেই বা কত জল! সর্বহারাদের দুঃখ স্মরণে তাঁর অন্তর যেন পিষ্ট হতে থাকতো। প্রপীড়িত অঞ্চলের খুঁটিনাটি সংবাদ জানবার জন্য প্রতিদিন তাঁর কি গভীর আগ্রহ! কি আকুলতা! নিজের হাতে কোন প্রতিকারের উপায় নেই দেখে যেন অন্তরে এক অসহ্য যন্ত্রণা। আশ্রমবাসী ভক্ত সন্তানদের উৎসাহ দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে তিনি ঘটনাস্থলে পাঠাতেন সেবার জন্য। তারা ফিরে এলে তাদের মুখে উদ্ধারকার্য্য সেবা-কার্য্যের বিবরণ শুনে কতই না আনন্দ প্রকাশ করতেন, কতই আশীর্ব্বাদ করতেন তাদের।

কোনখানেই কোন দুঃখ দুর্দ্দশার সংবাদ পেলে তিনি যেন পাগল হয়ে যেতেন। মনে হত, সারাটা দুনিয়ার দুঃখকে যেন তিনি গুটিয়ে এনে আপন অন্তরে বাসা দিয়ে সবাইকে হাল্কা করতে চাইতেন। সারদা দেবীর মাতৃপরিচয় কারুকে দিতে হয় না। তিনি যে মা কেন, এ প্রশ্নের উত্তর প্রস্রবণের ধারার মতই অফুরন্ত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবিত কালে সারদা দেবী তাঁর কাছে যে দেবী-জনোচিত সম্মান পেয়েছিলেন, সাধারণ মানুষ হলে তিনি তা কি ভাবে গ্রহণ করতেন, আত্মস্ফীতিতে কতটা উজ্জ্বল হতেন, আত্মপ্রচারেই বা কত ব্যস্ত হতেন, তা সহজেই আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক ঘটনার সঙ্গে মিশিয়ে অনুমান করতে পারি। কিন্তু সারদা দেবী শুধু ছায়ার মত স্বামীর অনুগামিনী অনুসারিণী হয়েই চলতেন। নিজের অস্তিত্বকে ঠাকুরের মধ্যেই সম্পূর্ণ বিলোপ করে দিয়েছিলেন।

ঐ অপরিসর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নহবৎখানার ঘরটির বাইরে দাঁড়িয়ে মনে হয়, কি করে ভিতরে ঢুকবো? কিন্তু সারদা দেবী অবলীলাক্রমে দিনের পর দিন ঐ ঘরটিতেই শ্বশ্রুর সঙ্গে বাস করতেন। শুধু বাসস্থান নয়, সেটাই ছিল তাঁর ভাঁড়ার, রান্না ও শোবার ঘর এবং ঠাকুরের ও অতিথি সেবারও সর্ব্ব আয়োজনের একমাত্র ঘর। প্রয়োজনে কত অতিথিই না ঐ ঘরটুকুতে আশ্রয় পেতো। মাথার উপর ঝুলতো সব খাবার রাখা শিকা, এক কোণে থাকতো ঠাকুরের জন্য জিয়ানো কৈ-মাগুর মাছ। সে জন্য তাঁর কোন অস্বাচ্ছন্দ্য ভাব বা দুঃখবোধটুকুও ছিল না। অন্তরে সর্ব্বদাই সন্তোষজনিত আনন্দে তিনি পূর্ণ থাকতেন। 'সন্তোষং সুখমুত্তমম্'-এর পূর্ণ অধিকারিণী ছিলেন তিনি।

তিনি যেমন ছিলেন সন্তানমাত্রেরই আদর্শ মা, তেমনি ছিলেন আদর্শ পতিব্রতা স্ত্রী'। দেবজ্ঞানে তিনি ঠাকুরের সেবা করতেন। সর্ব্ববিষয়ে তিনি নিজের জীবনকে স্বামীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত করে গেছেন। দুইটি মাত্র ব্যাপারে তাঁকে দেখা যায় এর ব্যতিক্রম করতে। অবশ্য তাতেও তাঁর মাতৃস্নেহেরই গভীরতা বোঝা যায়।

ঠাকুরের নির্দেশ ছিল, ছেলেরা আহারে সংযম করবে। না হলে তাদের সাধন-ভজন জমবেনা। কিন্তু সারদা দেবী তাঁর ছেলেদের আহারের কৃচ্ছতা সইতে পারতেন না। তিনি লুকিয়ে ছেলেদের পেট ভরে খেতে দিতেন। ঠাকুর জানতে পেরে রাগ করতেন। কিন্তু তাতে তিনি ভয় না পেয়ে বলতেন, 'তুমি খাওয়া নিয়ে আমাদের বাছাদের খুঁড়ো না তো! এই তো খাবার বয়স। ওরা পেট পুরে দুটো খাবেনি'? ঠাকুর হাসতেন।

নৈতিক অধঃপতিত সন্তানদের সারদা দেবী ত্যাগ করতে পারতেন না। বরং লোকেদের দ্বারা ঘৃণিত, অবহেলিত বলেই তাঁর মমতা তাদের প্রতি দ্বিগুণ হত। তিনি বলতেন, 'সন্তান মায়ের কাছে সব সমান। ধুলো-কাদা মেখে এলেই কি মা তাকে কোলে নেবে না?' যদিও ঠাকুর অপবিত্র মানুষের সংস্পর্শে আসতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, তবু সারদা দেবীর উত্তর শুনে কিছু বলতেন না। তিনি বলতেন, "ঠাকুরঘরের দেবী রাগ করলে উপায় আছে, কিন্তু নহবতের দেবী রাগ করলে উপায় নাই।" অথচ এই দুইটি কারণ ছাড়া সারদা দেবীকে স্বামীর মনোবৃত্তি-অনুসারিণী, আজ্ঞাপালনকারিণী, আনন্দদায়িনী ভিন্ন অন্য কোন রূপেই দেখা যায়নি।

নিজ গণ্ডীকে কি করে পরার্থে সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বভূতে বিস্তার করা যায়, কোন দেশকাল পাত্রাপাত্র বিচারের অপেক্ষা না করে, তারই জীবন্ত আদর্শ ছিলেন শ্রীশ্রীসারদা দেবী। মরদেহে কি করে অমরত্ব অর্জ্জন করা যায়, সাধারণ থেকে কি করে অসাধারণত্বে পৌঁছান যায়, নিজ জীবনের কর্ম্ম দিয়ে তিনি জগতকে সেই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছিলেন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। কর্ম্মকেও তিনি বর্জ্জন করেছিলেন। তাঁর আদর্শ সন্ন্যাসীরই আদর্শ। কিন্তু সারদা দেবীর জীবন গৃহী ও সন্ন্যাসীর এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ!

পিতৃসম্পর্কীয় কুটুম্বাদি নিয়ে তাঁর গার্হস্থ্য ও সংসার-কর্ম্মের নিপুণতার পরিচয় আমরা পাই। আবার স্বামিসাহচর্য্যে, সেবানৈপুণ্যে আত্মনিবেদনের এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসিনী-জীবনও দেখি। আর এক দিকে দেখি, ভক্তসন্তানদের মধ্যে তাঁর মহিমময়ী মাতৃরূপ। তিনি ছিলেন আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ জননী এবং আদর্শ পতিব্রতা স্ত্রী। পার্থিব সকল সম্পর্কেই তাঁর জীবনকে আদর্শ বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

সাংসারিক সর্ব্বকর্ম্মই যে ধর্ম্মের অঙ্গ, এ তিনি একদিনের জন্যও ভোলেন নি। তাই তিনি তাঁর অধ্যাত্ম জগতের পথেও ধাপে ধাপে উঠতে পেরেছিলেন। সংসারের কাজ, ভক্তের সেবা, উন্মাদ

ভ্রাতৃবধূর যন্ত্রণা, রাধুর অত্যাচার, এ সব কিছুকেই তিনি তাঁর ধর্ম্মের অঙ্গ বলে সহজ ভাবে নিতে পেরেছিলেন বলেই, তাঁর ঊর্দ্ধারোহণে কান বাধা হয়নি। এও তাঁর এক অসাধারণত্বেরই প্রকাশ। সাধারণ মানুষ সংসারের কর্ত্তব্যকে ধর্ম্মপথে বিঘ্ন মনে করে বলেই আটকে যায়। অগ্রসর হতে পারে না। সারদা দেবীর শিক্ষাই ছিল কর্ম্মের মধ্যে ভগবান লাভ করা সম্ভব।

তাই তো আমরা দেখি, আমাদের রাজরাজেশ্বরী মাকে মাটীর ঘর গোবর-ন্যাতা দিয়ে নিকাতে, বাসন মাজতে, কাপড় কাচতে, ধান সিদ্ধ করতে ও চাউল ঝাড়তে। এক কথায় সংসারের ক্ষুদ্রাদপি সকল কাজই নিজ হাতে করতে। আবার স্বেচ্ছায় পিতৃপরিবারের দৈন্য-দুর্দ্দশা ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা বরণ করে নিতে। অন্তরভরা তাঁর দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রীতি, সেবা-নিষ্ঠতা ও অসীম ধৈর্য্য। যাঁর অঙ্গুলি হেলনে সমস্ত কাজ মুহূর্ত্তে সম্পাদিত হতে পারতো, যাঁর সম্মতিমাত্র মাটীর ঘরটি রাজ-অট্টালিকায় পরিণত হতে পারতো, তাঁর এই নীরব কৃচ্ছ্রবরণ, সেবা ও বিনয়ের মূর্ত্তি থেকে আমরা কি বুঝবো? কি জানবো? এইটুকুই কি জানবো না যে, তিনি সাধারণ মানবী নন? সত্যিই দেবী? তিনি সামান্যা নন, অসামান্যা?

সারদা দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধুকে বাদ দিলে তাঁর জীবনকথা অনেকটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রাধুর প্রতি তাঁর মমতা ও ভালবাসা অনেকটা সংসারী সাধারণ লোকের মতই দেখাতো। প্রকৃতপক্ষে রাধুই ছিল মায়ের জীবনে মায়ার এক আবরণ। ঠাকুরের প্রারব্ধ কাজ সম্পন্ন করার জন্তই তাঁর নরদেহে অবস্থান। কাজেই মনে হয়, ঠাকুরের ইচ্ছায়ই সারদা দেবীর জীবনে রাধুর আবির্ভাব। ঠাকুরের দেহাবসানের পর কোন একটা মায়ার আবরণ না হলে মার দেহ রক্ষা করাই কঠিন হ'তো। ঐ সময়টা মা প্রায়ই ভাবসমাধিস্থ থাকতেন এবং তা বেশ দীর্ঘস্থায়ী হ'ত। অতি অপরূপ রূপলাবণ্য যেন তাঁর দেহে ধরতো না। স্বর্গীয় এক আভা তাঁর দেহকে ঘিরে থাকতো। কিন্তু রাধুর আবির্ভাবের সাথে সাথে তা আর রইল না। মহামায়ার আবরণে যেন ঢেকে গেল!

রাধুকে মা দৈববাণীর ইঙ্গিতে পেয়েছিলেন বলে ঈশ্বরের দান বলেই গ্রহণ করেছিলেন। হীনস্বাস্থ্য, অপরিণত বুদ্ধি রাধুর প্রতি তাঁর স্নেহ ও ক্ষমার যেন অন্ত ছিল না! মায়ার আবরণের মধ্যেও সংসারে থেকে কি করে ঈশ্বরলাভ সম্ভব, এইখানেই সারদা দেবীর জীবনে সে উদাহরণ দেখা যায়।

রাখাল মহারাজ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শিষ্যদের প্রতি ঠাকুরের স্নেহাধিক্য লক্ষ্য করে স্বামী বিবেকানন্দ একবার ঠাকুরকে
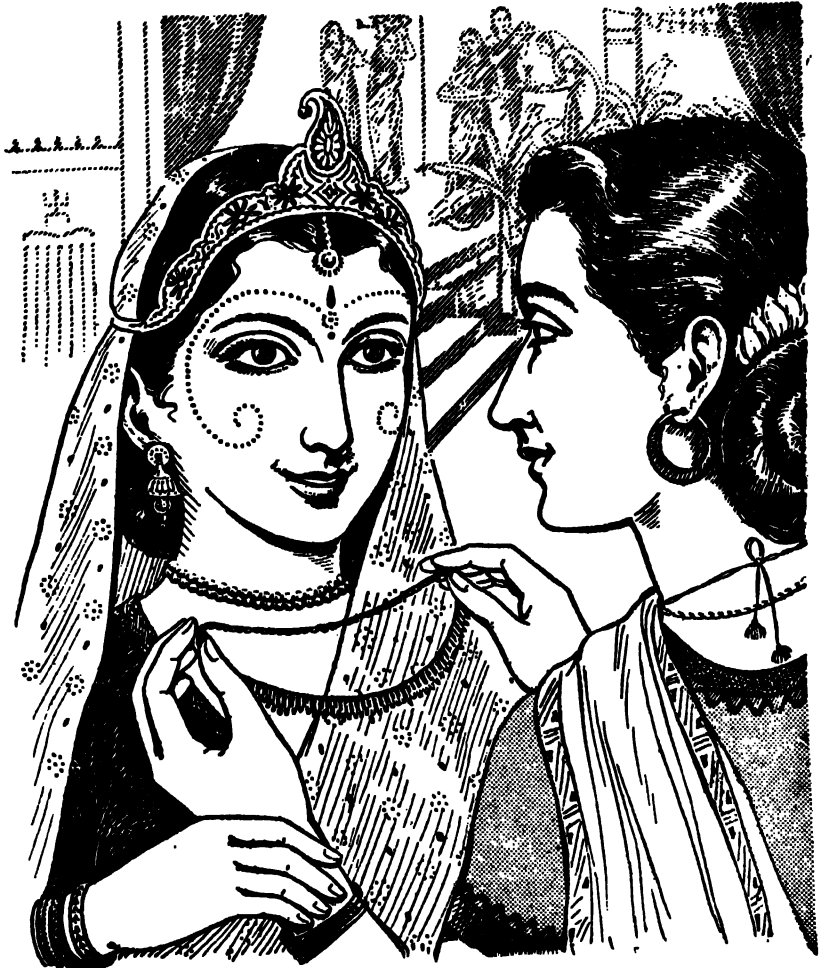
প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি যে আমাদের এত ভালবাসেন, শেষ পর্য্যন্ত আপনার কি জড়ভরতের মত অবস্থা হবে নাকি?"

ঠাকুর বলেছিলেন, "জড়কে ভাবতে ভাবতে লোকে জড় হ'য়ে যায়। আর আমি যে চৈতন্যকে ভাবি রে! যেদিন শুধু তোদিকেতে মন যাবে, সেদিন সব দূর করে তাড়িয়ে দেবো।"

রাধুর প্রতি সারদা দেবীর স্নেহাধিক্য সম্বন্ধেও ঠাকুরের এই উক্তি খাটে। ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধু তাঁর জীবনে মায়ার বন্ধন ছিল বটে, কিন্তু রাধুর প্রতি সন্তানবাৎসল্য প্রকাশে তাঁকে অন্য কারুকে বঞ্চিত করতে হয়নি! সংসারী মানুষের মত রাধুর জন্য তিনি পৃথক কোন পুঁজিও গড়ে তোলেন নি। তাঁর অনাবিল স্নেহধারার সহজ প্লাবনে সকলে যেমন ভরে উঠতো, রাধুও তেমনি। তবে স্বাস্থ্যহীনতা ও বুদ্ধিহীনতার জন্যে রাধু তাঁকে খুব বেশী রকমই জ্বালাতন করতো। ঠাকুর বলতেন, "গার্ড সাহেবের হাতের লণ্ঠনে গার্ড সাহেব সবাইকে দেখতে পান, কিন্তু তাঁর মুখ অন্ধকারই থাকে।" তেমনি সারদা দেবীর আত্মীয়-স্বজনেরা সর্বদা কাছে থেকেও তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারতো না। তাঁর সঙ্গে শুধু পার্থিব স্বার্থ সম্পর্ক নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। রাধুকেও তাই আমরা সব সময় স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে দেখি।

আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সারদা দেবীকে দেখা যায় ক্ষমায়, ভালবাসায়, মমতায় মধুর হয়ে নিষ্কাম সেবা ও উপকারের উদ্দেশ্যে অনলস ভাবে কাজ করে যেতে। তাতে তাঁর কোন পাত্রাপাত্র বিচার ছিল না, সম্পর্কের নৈকট্য-দূরত্ববোধ ছিল না। আপন-পরের গণ্ডীকে তিনি অনায়াসে ডিঙিয়ে গিয়ে এক মহামানবতার গণ্ডীকে অবলম্বন করেছিলেন।

সারদা দেবীর এই আদর্শ, সংসারে শান্তি ও ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার নিদর্শন। প্রতিদানের আশা না রেখে নিষ্কাম ভালবাসা, সেবা ও দয়া দিয়ে কাজ করলে সংসারেই কি ভাবে ভগবান লাভ সম্ভব, সারদা দেবীর গার্হস্থ্য জীবন তারই সাক্ষ্য দেয়।

রাধু সম্বন্ধে তার স্নেহাধিক্য সম্বন্ধে তাঁকেও ভক্তরা প্রশ্ন করেছিল, উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "বিদ্যুৎ আর্শিতেই চমকায়, কাঠে নয়।" অর্থাৎ যাঁরা একান্ত ভাবে সাধন করেন, তাঁরা যাতেই মনোনিবেশ করেন তাই একান্ত হয়। কিন্তু যখনই ইচ্ছা করেন, ইচ্ছামাত্রই মন উঠিয়েও নিতে পারেন, যা সংসারী লোকেরা সাধারণতঃ পারে না।

সারদা দেবী যদিও বৃহত্তর সংসারই করতেন, কিন্তু তিনি সংসারাসক্ত বদ্ধ জীব ছিলেন না। কেন না, তারা যদি কাহারো প্রতি আসক্ত হয়, তবে ডোবার বদ্ধ জলের মতই ঘোলাটে ও পঙ্কিল হয়ে ওঠে। সেই একের প্রতি তাদের মন এতটা আসক্ত হয় যে, অন্য সকলের প্রতি সমান ব্যবহার দেওয়া তাদের সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সারদা দেবীর অন্তরে ভালবাসা মুক্ত সমুদ্রের মত দিগন্তপ্রসারী ছিল। তাই রাধুর প্রতি আকর্ষণ তাঁর নিজের মধ্যে কোন পঙ্কিলতা বা ক্ষুদ্রতা আনতে পারতো না। তাঁর বিরাট বিশাল মাতৃহৃদয় লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রতি সমভাবে মাতৃস্নেহ বিতরণ করে তাদের অন্তর ভরিয়ে দিয়েছে। তাঁর সংস্পর্শে যেই আসতো, সেই ভাবতো, মা বুঝি তাকেই বেশী ভালবাসে—তাদের প্রত্যেকের মনে এই বিশ্বাস তাদের অন্তরে গভীর তৃপ্তির কারণ ছিল।

সংসারী মানুষ সাধারণতঃ মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রিয়জনের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়ে থাকে। শেষ সময়ে তাদের দেখার জন্য, কাছে পাওয়ার জন্য অধীর চঞ্চল হয়। এতেই তারা সংসারের সঙ্গে একটা বন্ধন রেখে যায়। তাদের ঊর্দ্ধগমন রুদ্ধ হয়। কিন্তু সারদা দেবী মৃত্যুর পূর্ব্বে রাধুকে দেশে পাঠাতে ব্যস্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ওর উপর থেকে আমি মন তুলে নিয়েছি। এর পর ওরা যেখানে থাকবে, ওকে সেখানেই পাঠিয়ে দাও।" জীবিতাবস্থায় রাধুর প্রতি এতদিনকার আত্মভোলা ভালবাসা মুহূর্ত্তে সংবরণ করে নিলেন তিনি।

মনে পড়ে, রাধুর প্রতি তাঁর স্নেহ প্রকাশকে বাড়াবাড়ি বলে মনে সংশয় আসায় ঠাকুরের শিষ্যা যোগীন মাকে ঠাকুর নিজেই দর্শন দিয়ে তাঁর সংশয় মিটিয়েছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, "গঙ্গার জলে কত অপবিত্র দ্রব্য ভেসে যায় কিন্তু গঙ্গা কি অপবিত্র হয়? ওঁর প্রতিও তোমরা তেমনি সন্দিগ্ধ হয়ো না। গঙ্গার মতই ওঁকে পবিত্র মনে করো।"

রাধুর প্রতি মার স্নেহ কতকটা অপার্থিব ছিল, এ স্নেহের কোন পারাপার ছিল না। এ স্নেহ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর যে অসীম ধৈর্য্য সহ্য ও ক্ষমা প্রকাশ পেতো তার তুলনা নেই। তিনি রাধুকে যতই স্নেহ করতেন, রাধুর অত্যাচার ততই বেড়ে যেতো।

অসুখের জন্য রাধু আফিং খাওয়া অভ্যাস করে। অসুখ সারলেও যে তা ছাড়তো না। মা যথেষ্ট চেষ্টা করেও তার এই অভ্যাস ছাড়াতে পারেননি। একবার তো আফিংএর পয়সা দিতে অস্বীকার করায় রাধু ক্ষিপ্ত হয়ে তরকারীর ঝুড়ি থেকে একটি প্রকাণ্ড বেগুন তার মুখে এমন জোরে ছুড়ে মারে যে, আঘাতে মা বিবর্ণ হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে আহত স্থান ফুলে ওঠে। অথচ রাধুকে একটি কথাও বলেননি তিনি। বরং ঠাকুরের ছবির কাছে গিয়ে করযোড়ে প্রার্থনা করলেন, অজ্ঞানে রাধু যে অপরাধ করেছে, তিনি যেন তাকে মার্জ্জনা করেন। রাধুকে তিনি নিজ পায়ের ধূলো মাথায় দিয়ে মঙ্গল কামনা করলেন। একটি কটুবাক্যও বের হ'লো না তাঁর মুখ থেকে। তিনি শুধু রাধুকে বললেন, "তোমাদের ঘরে জন্মেছি, তোমাদের নিয়ে থাকি বলে, তোমরা আমার মূল্য বোঝ না, আমায় এমনি কষ্ট দাও। ঠাকুর কিন্তু একদিনের জন্যও আমাকে একটা কটু কথা পর্য্যন্ত বলেননি।" উত্তরে রাধুর অনুতাপের অশ্রু ঝরে পড়েছিল। স্নেহময়ী ক্ষমাময়ী পিসী তার ক্ষমা চাইবার আগেই তাকে ক্ষমা করে বসে আছেন। প্রণাম করার আগেই পদধূলি দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছেন। চোখের জল ফেলা ছাড়া তার আর কি করণীয় আছে?

কলিকাতার আশ্রম বা মঠে অবস্থান কালে সারদা দেবী, আধ্যাত্মিক আকর্ষণের খনি থাকতেন। কিন্তু নিজ পিত্রালয়ে অবস্থান কালে তাঁর রূপ যেতো সম্পূর্ণ বদলে। এ সারদা দেবী, এ মা যেন সেই মা, সেই সারদা দেবীই ন'ন! এখানে তিনি মায়ের মেয়ে, ভাইয়ের বোন, আত্মীয়ের আত্মীয়া। এ যেন তাঁর পৃথক এক রূপ। জননীর পরিশ্রম বাঁচাবার জন্য, ভাইয়ের সংসারে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কি অনলস পরিশ্রমই না দিবারাত্র করতেন। শুধু যে মায়ের প্রিয় কন্যা ভাইয়ের প্রিয় বোন ও আত্মীয়দের প্রিয় আত্মীয়া হতেন তাই নয়, গ্রামবাসীদেরও সেই হাস্যমুখী মমতাময়ী সারদার একটুও রূপান্তর হ'ত না। সর্ব্ব অবস্থায় সকলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এমন এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর।

মাছধরা

—বীরেশ অধিকারী

হিলার মূর্ত —শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়
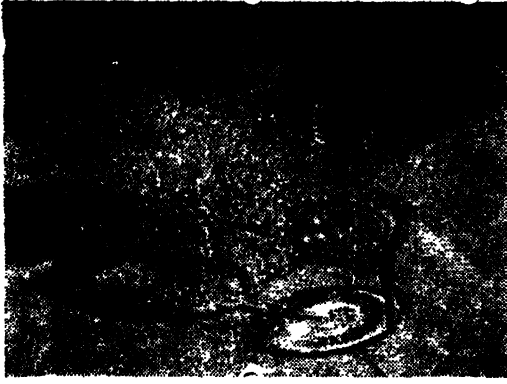
পানপাত্র
—সুপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টেপ্ এসাইড —শিবনাথ সান্যাল

রক-ফোর্ট
(ত্রিচিনাপল্লী) —সুনীল ঘোষ
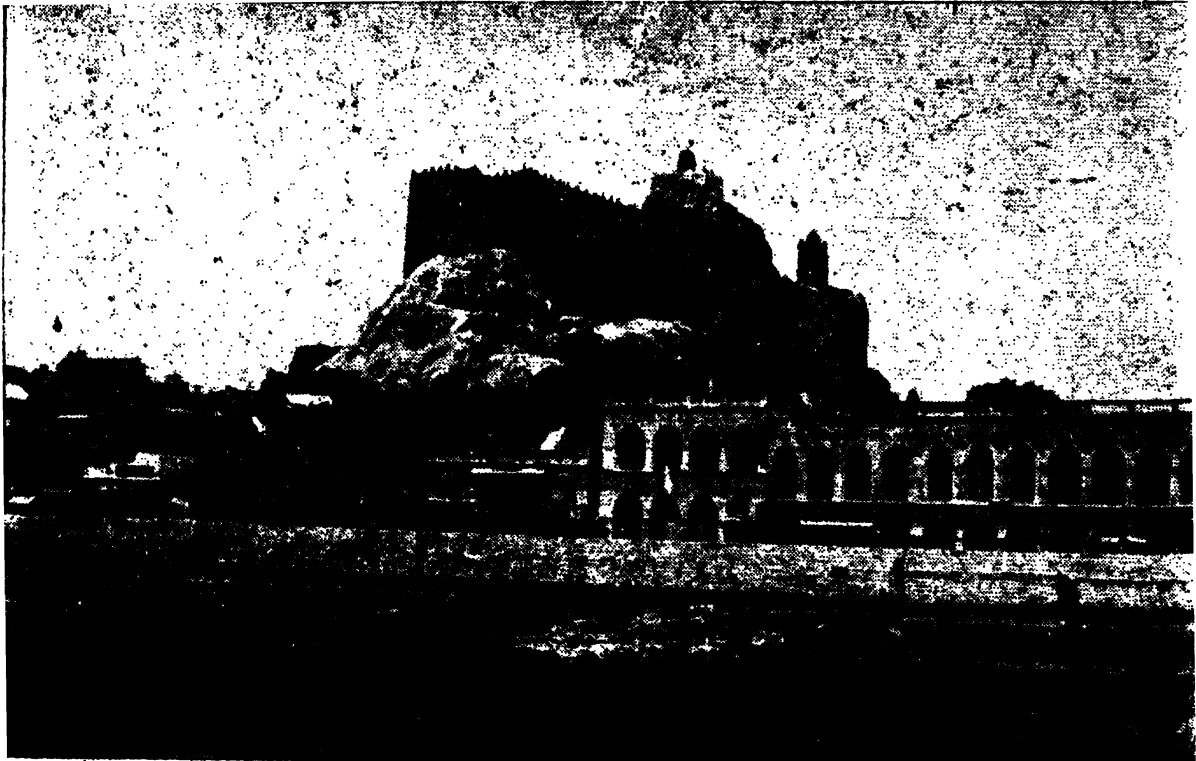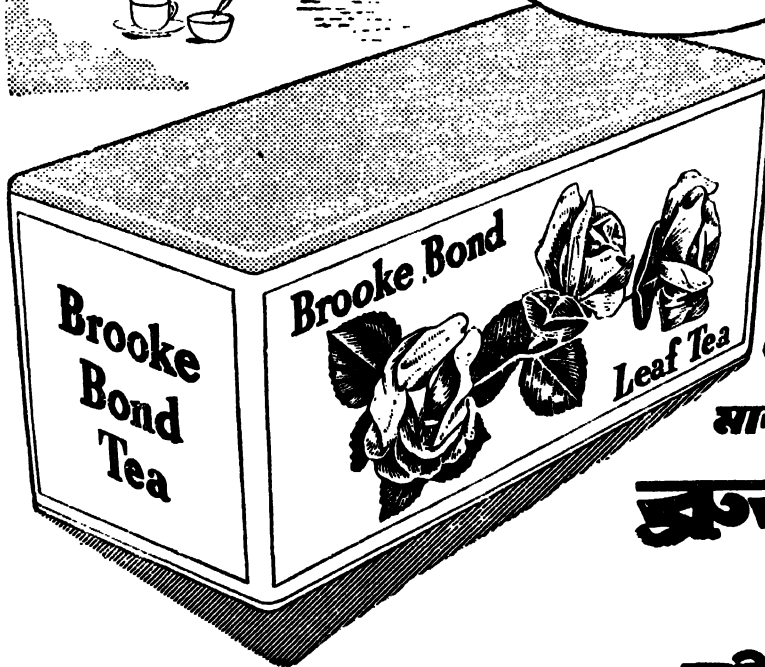
সবাই জানেন —
বাজারে ব্রুক বণ্ড চায়েরই কাট্‌তি সব চেয়ে বেশী
লোকে রোজ সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশী কাপ ব্রুক বণ্ড চা খেয়ে থাকেন
চট্‌পট সরবরাহ করা হয় বলে ব্রুক বণ্ড চা একেবারে তাজা থাকে
Brooke Bond Tea
Brooke Bond Leaf Tea
এই জন্যেই অন্য যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে ব্রুক বেশী লোকে খান !
BB 139 TR

কলিকাতায় থাকা কালে ভোর সাড়ে তিনটায় তিনি ঘুম থেকে উঠতেন। পুরো দুটি ঘণ্টা বিছানায় বসেই জপ-ধ্যান করতেন। তারপর সুরু হ'ত তাঁর অনলস কাজ। ফুল-বেলপাতা বাছা, ফল-তরকারী কাটা, ভোগ রান্না করা, সকলকে প্রসাদ পরিবেশন, পান সাজা, চাল-ডাল ঝাড়া, ঘর পরিষ্কার করা, এমন কি বাসন পর্য্যন্ত মাজা। এত সব নিত্যকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে মাকে ব্যস্ত থাকতে দেখে অনেকে প্রশ্নও করতেন, 'মা গো, তোমার কাজকর্ম দেখলে তো আমাদের মা-ঠাকুমার মত সাধারণ সংসারী বলেই মনে হয় তোমাকে? তাদেরই মত সামান্য সাধারণ কাজ নিয়ে তুমি জড়িয়ে থাক'। তিনি হাসিমুখে জবাব দিতেন, 'বেশ তো, আমাকে তাই ভেবো।' নিজেকে অতি সাধারণ রমণীর সঙ্গে মিলিয়ে তুলনা দেওয়ায় তাঁর মনে কোন বিকার আসেনি। নিজের পরিচয় দিতে বা তাদের মা-ঠাকুমার সাথে তাঁর নিজের তফাৎ বুঝাতেও বিন্দুমাত্র সচেষ্ট হ'নান তিনি।

সাংসারিক কাজকে তিনি কোন দিনই কাজ মনে করতেন না। দেবসেবা ভাবতেন। ক্ষুদ্র তুচ্ছ কাজেও তাঁর শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা ও নিপুণতা ফুটে উঠতো। পরম যত্নে, পরম শ্রদ্ধায় তিনি তা সম্পন্ন করতেন। সংসারের প্রতিটি জিনিষ কার্য্যান্তে যথাস্থানে না রাখলে দুঃখবোধ করতেন। তাঁর নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলা সকলের পক্ষেই শিক্ষণীয় ছিল।

একদিন একটি ভক্তকে ঘর ঝাড়ু দিয়ে ঝাঁটাগাছা ছুঁড়ে ফেলতে দেখে দুঃখ পেয়ে বলেছিলেন, 'অমনি অশ্রদ্ধায় কি কাজ করতে হয়? সামান্য কাজটুকুতেও শ্রদ্ধা চাই। সংসার ঠাকুরের। আর সংসার-সেবাকেও ঠাকুরসেবাই ভাবতে হয়। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে নাই'।

সাংসারিক অপচয় তাঁর চোখে অত্যন্ত অন্যায় ও পাপ মনে হ'ত। ফল-ফুলের ঝুড়িগুলি পর্য্যন্ত খালি হ'লে তিনি ফেলতেন না। তুলে রেখে দিতেন। বলতেন, 'সময়ে কাজে দেবে'। এবং সত্যি কাজে দিতও।

রামময় মহারাজ একদিন পাতে অনেকটা খিচুড়ী ফেলে উঠে গেলে তাঁকে তিনি বলেছিলেন, 'বাবা, এভাবে অপচয় করতে নাই'। সেই ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য তিনি একটি সদগোপের মেয়েকে ডেকে তখুনি দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। মেয়েটি যখন খুশী হয়ে নিয়ে গেল, দেখে তিনি বললেন, 'দেখলে তো! যার যেটি প্রাপ্য তাকে তা দিতে হয়। যা মানুষে খায়, তা গরুকে নয়। যা গরুতে খায়, তা কুকুরকে নয়। যা আবার কুকুরে খাবে, তা বেড়ালকে নয়। আর কুকুর-বিড়ালে যা না খাবে, তা পুকুরে ফেলে দিলে মাছে খেয়ে নেয়। ফলতরকারী কেটে খোসাগুলি পর্য্যন্ত ফেলতে নেই, গরুকে দিয়ে দিতে হয়।'

সারদা দেবীর মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব ছিল, যাতে তাঁর কাছে যাঁরাই আসতেন, সকলেই সহজে প্রভাবান্বিত হ'তেন। তিনি যেখানেই যখন থাকতেন, সেখানেই যেন একটা আশ্রম গড়ে উঠতো। তাঁর আশ্রমের শৃঙ্খলা সবাইকে মানতে হত। কাজকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে সকলে ঠিক মত ধ্যান-জপ পূজা-আর্চ্চা যাতে ঠিক মত করে সেই দিকে তাঁর যথেষ্ট সজাগ দৃষ্টি থাকতো। তিনি ভক্তদের জিজ্ঞাসা করতেন, 'দিনে ভগবানের নাম কত বার ক'রে কর? সব সময় তাঁকে ডাকবে, তাঁর নাম জপ করবে। তাঁর নাম জপ করতে করতেই মন স্থির হবে। দিনে অন্ততঃ পনেরো কি বিশ হাজার করলে শান্তি পাবে। আমি নিজে দেখেছি।'

ক্ষুব্ধ চিত্তকে শান্ত করার এক অদ্ভুত নিপুণতা ছিল সারদা দেবীর মধ্যে। যেখানেই তিনি, সেখানেই এক অপূর্ব্ব শান্তির হাওয়া। অশান্ত মন তাঁর সংস্পর্শে এলেই যেন আপনি শান্ত হয়ে উঠতো। ভক্তরা কোন সংশয় নিয়ে এলে তাঁর কাছে আসামাত্র তা আপনি মিটে যেতো। প্রথম প্রথম নিবেদিতার মধ্যে নানা সংশয় দেখে তাই তারা বলতো, 'মাকে সাক্ষাৎ দেখেও তোমার মনে এত সংশয় কেন?'

সারদা দেবী যেখানেই যখন যেতেন, আপন শৃঙ্খলা ও নিয়ম-নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হতে দিতেন না। বাইরের শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠাকে সহজে হারিয়ে ফেললে, অন্তরের নিষ্ঠাতেও শৈথিল্য আসার সম্ভাবনা থাকে, এই ছিল তাঁর মত। নিয়মিত ব্যায়ামের মতই যত্ন করে তিনি নিজ নিষ্ঠাকে বাঁচিয়ে রাখতেন। যদিও তা নিয়ে তাঁর কোন গোঁড়ামী ছিল না। সংসার ছেড়ে ছেলে-মেয়েরা আসে। তারা যেন এখানে এসেও আর এক রকমের সংসারী না হয়ে ওঠে; এই তার ভাবনা ছিল। আবার সেজন্য সর্ব্বদাই যে গুরুগাম্ভীর্য্যে ভক্তদের তিনি বেঁধে রাখতেন, তা নয়। আশ্রমের মধ্যে সম্ভব মত একটা হাল্কা হাওয়ারও ব্যবস্থা রাখতেন, ধর্ম্মগ্রন্থের অভিনয়, ভজন, গান সংকীর্ত্তন বাজনা ইত্যাদি দিয়ে। খোশ গল্পও যে না হত তা নয়। কিন্তু পরেই আবার ধূপ-ধুনা জ্বালিয়ে, আরতি দিয়ে, সম্মিলিত কণ্ঠের স্তোত্রপাঠ করিয়ে, হাওয়া বদলে দিতেন তিনি। প্রার্থনা সবাইকে নিত্য করতে হ'ত। তারপর হত ধ্যান-ধারণা। কেউ বা বসতো ঘরে, কেউ বা বারান্দায়, কেউ বা উন্মুক্ত আকাশের নীচে ছাদে। নিজেও বসতেন তাদের সাথে। একটা শান্তির স্পন্দন যেন ছড়িয়ে পড়তো চারি দিকে। আর তারা শীঘ্রই একাগ্র হয়ে ধ্যানে ডুবে যেতো। এ প্রসঙ্গে নিবেদিতা বলতেন, 'মা যখন ধ্যান করেন তখন যেন তাঁর মধ্য থেকে একটা জ্যোতিঃ বের হয়, আর আশে-পাশের সবাইকে তা আচ্ছন্ন করে দেয়।'

সারদা দেবী অত্যন্ত কোমল-স্বভাবা লজ্জাশীলা রমণী ছিলেন। তিনি পুরুষ-ভক্তদের সাথে কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করতেন। অতি পরিচিত ভক্ত-শিষ্যদের সঙ্গে অত্যন্ত মৃদু স্বরে কথা বলতেন, আর অপরিচিত বা বয়স্ক ভক্তদের সাথে তিনি ঘোমটার আড়ালে মৃদুস্বরে কথা বলতেন কিংবা মাথা নেড়ে উত্তর দিতেন। অনেক সময় স্ত্রীভক্তদের মধ্যস্থতায়ও কথা বলতেন।

সারদা দেবীকে সর্ব্বদাই স্ত্রী-ভক্তরা ঘিরে থাকতো, সেজন্য পুরুষ-ভক্তরা তাঁর দর্শন, উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ পেতো না বলে ক্ষুণ্ণ বোধ করতো। তাই সপ্তাহে দুই দিন তিনি তাঁদের দর্শন দিতেন। সে সময় তিনি তাদের কথা শুনতেন, আপদে-বিপদে পরামর্শ দিতেন, সাধন-ভজনের আলোচনা করতেন। কে কত দূর সাধন-ভজনে অগ্রসর হচ্ছে, খোঁজ-খবর নিতেন। কখনো বা তাদের অনুরোধে তাদের সঙ্গে বসে সারা গায়ে কাপড় মুড়ি-সুড়ি দিয়ে বসে ধ্যানও করতেন। শক্তিময়ীর সংস্পর্শে তারা একটা শক্তি অনুভব করতো। সেই অনুভূতিটুকু তাদের দীর্ঘস্থায়ী হ'ত।

অথচ নিজে নিজের আত্মশক্তি সম্বন্ধে অবহিত হয়েও কখনো

কোন ভাবেই নিজেকে সাধারণের চেয়ে উঁচুতে স্থান দেন নি। রাজা মহারাজদের দ্বারাও পূজিত হয়ে রাজসম্মান পেয়ে তিনি দীনাতিদীনের মত দিনতিপাত করতেন। অথচ এর লেশটুকু মাত্র ছিল না তাঁর মধ্যে।

ঠাকুর বলতেন, ছুঁচে সুতা পরাতে হলে সামান্য একটু রোঁয়া থাকলেও সুতা পরান চলে না। তেমনি অহং এর লেশমাত্র থাকলেও ভগবান লাভ করা সম্ভব নয়; শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে আমরা ঠিক তেমনি রোঁয়াশূন্য সুতোর মতই অহংশূন্য জীবন যাপন দেখি।

বাঙ্গালোরে তীর্থ পর্যটনকালে সেখানকার ভক্তদের দ্বারা তিনি যে অভাবনীয় সম্মান ও সমাদর পান, তা সাধারণ যে কোন মানুষকেই বিচলিত করার পক্ষে যথেষ্ট। ফুলে ফুলে তাঁর চলার পথটুকু তারা ঢেকে দেয়! ষ্টেশনটি যেন ফুলের পাগাড় হয়ে ওঠে। তাঁর গাড়ীর ঘোড়া খুলে ভক্তরা সেই গাড়ী নিজেরা টেনে নিয়ে চলে। সারদা দেবী এ সব দেখে অভিভূত হয়ে বলেন 'আহা, প্রভুর বাণী এখানে এতদূরেও কেমন পৌঁছেচে দেখ!'

পণ্ডিতসমাজ দ্বারা যখন তিনি দেবীজ্ঞানে পূজিত হতেন তখন তাঁকে বলতে শোনা যেতো, 'প্রভুর দাসী হয়েছিলাম তাই।' তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পূজা, শ্রেষ্ঠ গৌরবকেও তিনি এভাবে ঠাকুরের প্রাপ্য হিসাবে গ্রহণ করতেন। এক দিনের তরেও নিজের কৃতিত্ব বলে গ্রহণ করেননি।

অথচ ঠাকুর জীবিত কালে সর্বদাই বলতেন 'এ সারদ যদি এমন না হ'ত আমার সাধন-পথের বিঘ্ন হতে পারতো। সারদা জ্ঞানদাত্রী সরস্বতী। এবার রূপ ঢেকে জ্ঞান দিতে এসেছে।' [ক্রমশঃ।

বাণীবন্দনা

গৌরী বিশ্বাস

দরজার কড়া আবার নড়ে উঠল, এই তৃতীয় বারের মতো। এবং দরজা খুলতেই সুরেশ বাবু যথারীতি চাঁদার খাতা হাতে দণ্ডায়মান একদল ছেলের সম্মুখীন হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কোথাকার পূজো?" চাঁই গোছের একটি ছেলে এগিয়ে এলো। "আজ্ঞে, এ' পাড়ার 'সবুজ আলোর' পক্ষ থেকে এসেছি আমরা।" এ ধরণের একটা উত্তরই প্রত্যাশা করছিলেন সুরেশ বাবু। কারণ, পাড়া একটা হলেও পাড়ার পূজো বলতে অনেকগুলো। পঁচিশ-ত্রিশ গজের ব্যবধানেই এক একটি প্যাণ্ডেল তৈরীর তোড়জোড় চলেছে। ছেলেটি আবার বলল, "সত্যিকারের পাড়ার বলতে এই 'সবুজ আলোকেই' বোঝায় জ্যাঠামশাই!" চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন সুরেশ বাবু কয়েক মুহূর্ত। চাঁদার খাতার পাতা উলটে বলেন, "তা কত দিতে হবে?" এগিয়ে এলো লম্বা চুল ফিনফিনে চেহারার আরেকটি ছেলে। "সে আপনি বিবেচনা করে দেবেন স্যার, জবরদস্তির ব্যাপার তো কিছু নেই। তবে খরচ তো নেহাৎ কম নয়। তাছাড়া এ বারে আমরা আপনাদের আনন্দ দেবার জন্যে একটু বিশেষ ব্যবস্থা করবার কথাও ভাবছি। আলবেলা চ্যাটার্জ্জি, সুমিত্রা সেন ও ঝুনু চক্রবর্ত্তীকে আনার খুব চেষ্টা করছি এবারে।"

উল্লেখিত নামগুলোর সাথে পরিচিত নন সুরেশ বাবু। তাছাড়া মাস ছয়েক হয় এসেছেন উনি কলকাতায়, এখনো ঠিক ধাতস্থ হয়ে ওঠেন নি এখানকার আবহাওয়ায়। ছেলেরা অবিশ্যি নিজেদের জ্ঞান-ভাণ্ডারের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলো না তাঁকে। আহা! ওরা জানে আধুনিক তরুণ-তরুণীর হৃদয় হরণকারী নায়ক কমলকুমারের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও উনি সমান অনভিজ্ঞ। তাই সস্মিত মুখে আলোকদান করলো দলের সমীরণ। "প্লে ব্যাক শিল্পী স্যার! আর ঝুনু চক্রবর্ত্তী হচ্ছেন আজকের দিনের বিখ্যাত কমেডিয়ান।" পরিচয় দিতে গিয়ে দীপ্ত হয়ে উঠল সমীরণের মুখ-চোখ।

অপরেশ বাবুর বাড়ী। কয়েক ঘর ভাড়াটের বাস এখানে। 'রক্তিম শিখা'র আলাদা ক্লাব-ঘর নেই। অপরেশ বাবুর সামনের ছোট ঘরটিতে তাই থিয়েটারের রিহার্সাল বসেছে রোজকার মতো। প্রায় বিশ-পঁচিশটি কিশোর আর তরুণে পূর্ণ হয়ে উঠেছে ছোট ঘরখানা। সন্ধ্যে থেকে শুরু হয় রিহার্সালের পালা, চলে রাত 'দশটা এগারোটা অবধি। সারা বছরের ক্লাসের টাস্ক, কোয়াটার্লি আর হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার পর একেবারে এ্যানুয়াল পরীক্ষার প্রমোশন শেষে একদল পিঞ্জরবদ্ধ জীবন সহসা পেয়েছে যেন মুক্তির খোলা হাওয়া। এখন কয়েকটা দিন অন্ততঃ একঘেয়ে পড়া মুখস্থ আর মাষ্টার মশাইদের তাড়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি। সহজেই তাই অনেকগুলো উৎসাহদীপ্ত প্রাণ সানন্দে মেতে উঠেছে বাণী-বন্দনার প্রস্তুতিতে। কিন্তু আসন্ন স্কুল-ফাইন্যাল ইণ্টারমিডিয়েট আর বি-এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও নেহাৎ নগণ্য নয় পাড়ার ঘরে ঘরে। অপরেশ বাবুর বাড়ীর ভাড়াটে

কামাখ্যা বাবুর ছেলে সঞ্জীব এবং অন্যতম ভাড়াটে নিত্যানন্দ বাবুর ছেলে অমলকেও তাই দেখা যায় উসখুস করতে। আসন্ন স্কুল-ফাইন্যাল ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার কঠিন বাস্তব চেহারাটা ওদের সামনে। মহা অস্বস্তিতে বই ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সঞ্জীব। টিউশনির টাকায় পড়া চালাতে হয় সঞ্জীবকে বেশ কষ্ট করেই। কিন্তু উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সে স্বপ্ন দেখে, একটু ভাল রেজাল্টের প্রত্যাশা করে। অমল বাড়ীর বড় ছেলে এবং মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। সে জানে তার স্কুলের মাইনে এবং পরীক্ষার ফি জোগাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে নিত্যানন্দ বাবুকে। কিন্তু হাসিমুখেই তিনি পড়ার সমস্ত খরচ জোগাচ্ছেন সংসারের অনেক টানাটানির মধ্যেও। কিন্তু পরীক্ষার দিনগুলো যত দ্রুত পায়েই এগিয়ে আসুক না কেন, পাশের ঘরের এই রিহার্সালের ধাক্কা চলবে অন্ততঃ আরো দিন কয়েক। রিহার্সালের নাটকীয় কণ্ঠ উচ্চকিত হয়ে ওঠার সঙ্গেই সঙ্গেই এদিকে পরীক্ষার্থিদ্বয়ের থিয়োরেম্ আর প্রবলেমের জটিল ব্যাখ্যা, ফিজিক্স আর কেমিষ্ট্রির দুরূহ সূত্র যায় কখন গুলিয়ে। চেয়ার থেকে ঝুঁকে তাকাল অমল পাশের ঘরে। ওর বন্ধুমহলের অনেকেই আছে ওর মধ্যে। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে ওদের নাটকীয় অঙ্গভঙ্গি সহযোগে রিহার্সালের মুণ্ডে সবার মুণ্ডপাত করার ইচ্ছেটাই প্রবল হয়ে উঠছে মনে। দরজা জানলা সেঁটে ভাল করে বসবে তারই কি জো আছে? পড়ার জন্যে একখানা ঘর আলাদা করে ছেড়ে দেবার মতো অবস্থা ক'জনেরই বা আছে আজকের দিনে? তরুণদলের মধ্যমণি সুব্রতদা' হাসিমুখে এসে ঢুকলেন রিহার্সালের মাঝখানে। একটা খুশীর হুল্লোড় উঠল ঘরে। সুব্রতদা'র উপস্থিতিতে ও নির্দ্দেশনায় গোড়া থেকে আবার শুরু হলো রিহার্সাল। "সত্যি সেলুকাস! কি বিচিত্র এই দেশ!" এ ঘরে স্বগতোক্তি শোনা যায় সঞ্জীবের কণ্ঠেও। "কি বিচিত্র এই দেশ......!"

পুজো-প্যাণ্ডেল, 'রুচি প্রাণের' মহিমময়ী দেবী-মূর্ত্তি আয়ত দুই চোখে অপার স্নেহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন। ওদিকে পাশেই ভীষণ ভাবে এম্পলিফায়ার যোগে বেজে চলেছে 'ইচক দানা ইচক দানা' ইত্যাদি। তরুণ মনের ওপর রাষ্ট্র ভাষার যে এতখানি আধিপত্য, তা কে জানতো! পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরেই আরেকটি প্যাণ্ডেল। এখানে চলেছে আরতি-প্রতিযোগিতার পালা—অর্থাৎ জ্বলন্ত ধুনুচি হস্তে ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে উদ্দাম নৃত্য, তৃতীয় ছেলেটি বেরিয়ে আসতে এগিয়ে এলো চতুর্থ প্রতিযোগী। ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন আরতি-প্রতিযোগিতায় অনেক কাপ মেডেল নাকি পেয়েছে। প্যাণ্ডেলের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে খ্যাতনামা 'দীপক মজুমদার' আঁটসাট করে মালকোচা মেরে অতঃপর সার্টের আস্তিন গুটোতে গুটোতে কুস্তিগীরের ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে গিয়ে দু'টি জ্বলন্ত ধুনুচি হস্তে আরতি আরম্ভ করতেই চার দিকে এতটা উল্লাস-রোল জেগে উঠল। দর্শকবৃন্দের উৎসাহ বোধ হয় প্রতিযোগীকে অধিকতর প্রেরণা জুগিয়ে থাকবে। ক্রমে তার হাই জাম্প, লং জাম্পের সাথে তাল রাখতে গিয়ে ঢাকী দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু অভিনবতর আরেক কেরদানী দেখাতে গিয়ে এবারে সে কিঞ্চিৎ বেসামাল হয়ে পড়তেই জ্বলন্ত ধুনুচির আগুন ছড়িয়ে পড়ে প্যাণ্ডেলের একটি কোণ ধরে উঠল সাঁ-সাঁ করে। আর শুরু হলো সম্মিলিত কণ্ঠের হৈ-চৈ, আর্ত্ত চিৎকার আর দমকলের জন্যে ছুটোছুটি।

'ঝিলিমিলি সঙ্ঘের' প্রতিমাটি দেখে অনেকেরই বিস্মৃতপ্রায় বিখ্যাত একটি রাজপুত চিত্র আবার নূতন করে মনে পড়ছে। ভিড়ের মধ্যে থেকে এক বৃদ্ধা নাতির হাত ধরে কম্পিত পদে এগিয়ে গেলেন প্রতিমার সামনে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো কয়েকটি ভলাণ্টিয়ার। "ওদিকে নয়, ওদিকে নয়, এই ডান দিক দিয়ে আসুন ঠাকুমা!"

থমকে দাঁড়িয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকান বৃদ্ধাটি এদিক ওদিক। তার পর বলেন, "কেন বাবা, বাঁ পাশ থেকে ঠাকুর দেখতে কি দোষ?"

"সে জন্যে নয়, এটি পুরুষদের প্রবেশ-পথ, আর এটি হচ্ছে আপনাদের মহিলাদের জন্য।" অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ভলাণ্টিয়ারটি লিখিত নির্দ্দেশনামাটি দেখায়।

"বাছা, তাহলে আমার এই ছোট নাতিটি?" মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক বললেন পাশ থেকে, "আহা যেতে দাও না, দেখছো তো ছোট নাতিটির সঙ্গে এসেছেন উনি, তোমাদের আইন মাফিক ওদের যদি এখন নির্দ্দিষ্ট এলাকায় ভাগ হয়ে যেতে হয়, পরে যে আবার তোমাদেরই ষ্টেজে গিয়ে হারান প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে।"

ছেলেরা তবু একটু গুজ-গুজ করতে লাগল, "তা বলে স্যার, ডিসিপ্লিন তো একটা বজায় রাখতে হবে। এমনিতেই তো কারো শৃঙ্খলাবোধ নেই মোটেও।" হাসিমুখে বললেন ভদ্রলোক, "সেটা সত্যি, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে সব বিষয়েরই ব্যতিক্রম হয় ভাই!"

'ঝিলিমিলি চক্রের' আসরে ভলাণ্টিয়াররা বুকে ব্যাজ এঁটে গুরুগম্ভীর চালে হাঁটছে। মুক্তিফৌজের সেনানীর মতো মুখ-চোখের ভাব। পাঁচমেশালী গল্পে আর বাঁধভাঙ্গা হাসিতে আসর সরগরম। আশ-পাশ থেকে মাঝে মাঝে জেগে উঠছে ভলাণ্টিয়ারদের কণ্ঠ। "আপনারা সব চুপ করে বসে পড়ুন। দয়া করে গোলমাল করবেন না।" আসরের গোলমাল থামাবার উদ্দেশ্যে ভলাণ্টিয়ারদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত প্রচেষ্টা আর প্রক্রিয়া চলেছে তাতে হৈ-হৈ এর মাত্রা বাড়ছে না কমছে, বলা মুস্কিল। এরই মধ্যে আচম্বিতে স্ক্রীনঢাকা ষ্টেজের অন্তরাল থেকে মাইকে কার নেপথ্য কণ্ঠের অনুরোধ গর্জ্জে উঠল, "বন্ধুগণ, আপনারা দয়া করে চুপ করুন, আমাদের অনুষ্ঠান এখনি আরম্ভ হচ্ছে।" পনেরো বিশ মিনিট বাদে স্ক্রীন উঠল। সস্মিত মুখে বসে আছেন শিল্পিবৃন্দ। কিন্তু কোন শিল্পীর নাম ঘোষণার পরিবর্ত্তে শোনা গেল।' "টুলু সেন বলে একটি ছ' বছরের বালিকা তার দিদিকে খুঁজে পাচ্ছে না, দিদির জন্যে কাঁদছে। যদি এই ভিড়ের মধ্যে তিনি উপস্থিত থেকে থাকেন তবে তাকে ষ্টেজে চলে আসতে অনুরোধ করছি।" শুধু টুলু সেনই নয়, এর পর যথাক্রমে বনানী রায়, পিণ্টু দাস এবং আরো দু'-একটি নাম ঘোষিত হতে লাগল। ভীড়ের মধ্যে থেকে একটি অধৈর্য্য কণ্ঠ শোনা গেল। "কি জ্বালা রে বাবা! এ যে দেখি হারান-প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি শুরু হলো।" অবশেষে আরম্ভ হলো নির্দ্ধারিত অনুষ্ঠান-সূচি। হারমোনিয়াম সহ সুবেশা শিল্পী বসলেন মাইকের সামনে। টেরিকাটা তবলচি ঘাড় ঝাড়া দিয়ে প্রস্তুত। ওদিকে ভীড়ের এক পাশ থেকে একদল ছেলের সম্মিলিত কণ্ঠের অনুরোধ ভেসে এলো। "স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা হোক।" অতঃপর শিল্পীর 'সাত সাগর আর তেরো নদীর' পরিক্রমা শেষ হতেই ছেলেরা এবার তাঁকে সরাসরি 'অগ্নিপরীক্ষার' সম্মুখীন করে দিলে।

'নব্যসঙ্ঘে' দেখা গেল চিরাচরিত নিয়মের পরিবর্তে বসেছে রামায়ণী গানের আসর। ফিল্মের হিন্দি গানের মাহাত্ম্য এদের বোধ হয় ঠিক বোধগম্য হয়ে ওঠেনি। শুনছে অনেক উৎসুক শ্রোতা। দু'-তিনটি ছেলে উসখুস করছে এক পাশে। ফটিক এবারে একটা খোঁচা দিলে সামনের ছেলেটিকে। "কি রে, তুই যে দেখছি এখানেই গ্যাট্ হয়ে বসলি রে মানুকে!" পিছু না ফিরেই বলল মাণিক, তা "বেশ লাগছে রে।" "তাহলে হরিসভায় বসে থাক্গে না, আরো ভাল লাগবে।" উঠেই পড়ল ছেলেটি গুজ্‌গুজ করে।

রাত্রি বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে বাইরের দর্শনার্থীদের ভীড় পাতলা হয়ে এসেছে—কিন্তু সে ফাঁকটুকু ছেলেরা ভরিয়ে রাখার প্রয়াস পাচ্ছে অবিশ্রান্ত রেকর্ড বাজিয়ে আর নিজেদের বিচিত্র হৈ-হুল্লোড়ে। রেকর্ড বাদনে মিনিট খানেক ছেদ পড়তেই পাশের বাড়ীর জানালাটি খুলে যায় সশব্দে, উদ্যত কাশির বেগ সামলে বৃদ্ধ তারিণী বাবু গলা বাড়িয়ে বললেন, "আচ্ছা মেনো, তোদের মতলবটা কি বল তো? এক দিনেই সব শেষ করে দিতে চাস্ নাকি?" মেনো ওফে মনোরঞ্জন মাথা চুলকে বিনীত হাস্যে বলল, "কি যে বলেন দাদু! অনুষ্ঠান তো সব চুকেই গেছে সাত তাড়াতাড়ি। কিন্তু রাত দশটা বাজতেই যদি আসরটা ঠাণ্ডা মেরে যায় তাহলে—"তার বাকী কথাগুলো চাপা দিয়ে এরই মধ্যে বেজে ওঠে, "তেরে দিল্‌কে বাংলেমে তো আনা মাংতা"। ছেলেরা বৃত্তাকারে বসে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আয়োজিত পূজো তথা আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে তুলনামূলক সমালোচনা জুড়েছে মাঠের এক পাশে। ঝুপ করে এসে মাঝখানে বসে পড়ল বীরু। সোৎসাহে পার্শ্ববর্তী সীতেশের পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, "আমাদের 'বিচিত্র-চক্র' সবার ওপরে টেক্কা মেরে দিয়েছে এবারে, কি বলিস্ এঁ্যা?" গম্ভীর ভাবে মাথা দুলিয়ে হাসল সীতেশ, "তা আর বলতে! কিন্তু দেখিস্ কালকের বিসর্জ্জনের প্রশেশানটাতেও 'বিচিত্র চক্রের' ষ্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখা চাই-ই কিন্তু।"

রোমে দু'দিন

বাণী দাশগুপ্তা

জাহাজে বসে রোম যাচ্ছি, ভাবতে ভাবতে ইতিহাসের পাতাগুলো যেন চোখের সামনে খুলে যেতে লাগলো। রোমের সভ্যতা, রোমের কৃষ্টি, রোমের ভাস্কর্য্যের আলো যখন ইউরোপের প্রতি কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়েছিল তখন ছিল ব্রিটনরা অসভ্য বর্বর ও নিরক্ষর। রোমের রাজারা যখন জয়ের বৈজয়ন্তী উড়িয়ে চলেছিল তখন কোথায় ছিল আমেরিকা—কোথায় ছিল ইংরেজ!

সুশিক্ষিত রোমান সিপাহীর আগমন বার্ত্তায় উঠতো ত্রাস বৃটনদের মধ্যে। এমনি সভ্যতায় উচ্চশিখরে উঠেছিল যে রোম, আজ সে রোম ছোট একটি শক্তি; পৃথিবীর মহা-মহা শক্তিধরদের মধ্যে। সমরসজ্জায়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, শিল্পোন্নতি ক্ষেত্রে কোথায় যেন ইতালী সে শীর্ষস্থানের নাগাল পাচ্ছে না। কোথায় যেন তার ছন্দ ভেঙ্গে গেছে।

এমনি যখন তন্ময় হ'য়ে ভাবছি, জাহাজের হুইসিল শুনে বুঝতে পারলাম নেপলস বন্দরে জাহাজ ভিড়ছে।

১৯৫৩ সালের ২৪শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় নেপলস্ থেকে রওনা হ'য়ে ২৫শে রাত দশটার রোমে এসে পৌঁছাই আমি, আমার স্বামী ও একটি পথের ভাই শ্রীসৎসঙ্গী। শ্রীসৎসঙ্গী আমাদের সঙ্গে থাকতে দলও ভারী হ'ল আর হৈ-হৈর মাত্রাও বেড়ে গেল। বিদেশে দু'-একজন ভারতীয়ের মুখ দেখলে সে এত আপনার মনে হয় তা আগে কখনও উপলব্ধি করিনি। রোম ষ্টেশন যেন মনে হচ্ছিল স্বপ্নপুরী—চতুর্দ্দিক নিয়ন লাইটে ঝলমল করছে—সমস্ত ষ্টেশন জুড়ে বড় বড় দোকান, তাতে কাচের 'শোকেসে' পোষাক, সুন্দর জুতো, লেডিস ব্যাগ ইত্যাদি অতি সুন্দরভাবে সাজান রয়েছে—মনেই হচ্ছিল না আমরা কোন ষ্টেশনে এসেছি। আমার স্বামী ও সৎসঙ্গী ভাই পরের দিন টুরিষ্ট 'বুরো' তো টিকিট কেনা ও অন্যান্য বিষয় খবর নিতে যাওয়ায় আমি বেশ ঘুরে ঘুরে দোকানগুলো দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ষ্টেশনের কাছে Amalfi নামে এক পেনসিওনিতে উঠি আমরা। এই পেনসিওনি হচ্ছে ছোটমত হোটেল। পরের দিন ভোরে আমরা টুরিষ্ট বাসে রোম সহর দেখতে রওনা হই। সহরের মধ্য দিয়ে বাস চ'লছে আর আমাদের প্রধান গাইড ইংরেজিতে সমানে পথের দ্রষ্টব্য অট্টালিকা মুসোলিয়ামের Running Commentary দিয়ে চলেছেন। রোমের রাস্তার কিছু দূরে দূরে নানা শ্বেতপাথরের মূর্ত্তি দেখতে

পাওয়া যায়। ইতালীর শ্বেতমর্মর পৃথিবী-বিখ্যাত, তাই বোধ হয় এরা এত পথের ধারে ধারে মূর্ত্তি স্থাপনা ক'রেছেন। আমাদের বাস এসে প্রথমে থামলো 'বড়গেজ' ভিলায়। এটি প্রথমে বিখ্যাত বড়গেজ পরিবারের প্রাসাদ ছিল। এখন একটি মিউজিয়মে পরিণত হ'য়েছে। এখানে ৪০০০ পেন্টিং ও বহু শ্বেতপাথরের মূর্ত্তি আছে, এ সবই পৃথিবী-বিখ্যাত শিল্পীর শিল্প। রাফেলের, মাইকেল এঞ্জেলোর নানা পেণ্টিং ও মূর্ত্তি দেখলাম এখানে। একটি মূর্ত্তি দেখলাম লেডি বড়গেজের, তিনি ছিলেন নেপলিয়ান পরিবারের মেয়ে, বিয়ে হয়েছিল বড়গেজ পরিবারে। অপরূপ সুন্দরী এই মহিলা, তিনি অর্দ্ধশায়িত একটি ডিভানে। পাথরের মূর্ত্তি যে এত জীবন্ত, তা না দেখলে ভাষায় বোঝান যায় না। মর্ম্মরপাথরের গদির লেসের ওয়াড় জায়গায় জায়গায় ভাঁজ হ'য়ে গেছে সুন্দরী বসবার ভঙ্গীতে—কিন্তু কি আশ্চর্য্য, গদি ও তার ঢাকনা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—অথচ সবই একটা আস্ত পাথর।

বড়গেজ ভিলা থেকে বেড়িয়ে বাসে গিয়ে উঠলাম, সময় কম, আরোও অনেক দেখবার আছে। পথে যেতে যেতে দেখলাম, যে জায়গায় সম্রাট নীরো খৃশ্চিয়ানদের হিংস্র সিংহ দিয়ে খাওয়াত। এই জায়গার কিছু দূরেই গাইড দেখালেন নীরোর ফিডল্ বাজাবার জায়গা। বাস এসে থামলো বিরাট Colosseum এর কাছে। আমরা সুড়সুড় ক'রে সব টুরিষ্টরা বেরিয়ে এলাম বাস থেকে। এই ভয়াবহ বিল্ডিংএ ঢুকবার আগে আমার স্বামী চকোলেট দিয়ে বললেন, 'তোমাদের তো ভেতরে গেলে গলা শুকিয়ে আসবে তাই চকোলেট মুখে রাখ'—এ কথা শুনে সকলেই হেসে উঠলাম। Colosseum হচ্ছে চারতলার সমান একটি গোল বিল্ডিং; এর মধ্যে খৃশ্চিয়ানদের ও বন্দীদের হিংস্র পশু দিয়ে খাওয়ান হ'তো। সম্রাট বসতেন তার পারিষদ নিয়ে তেতলায় আর রোমবাসিগণ নিজ নিজ উচ্চতা অনুযায়ী এক এক তলায় বসতেন এ নিষ্ঠুর খেলা দেখতে। মহিলাগণ ছয় তলায় বসতেন—বিল্ডিংএর মাঝখানে জায়গাটা খালি, সেখানেই হ'তো এই নির্ম্মম খেলা। চারিদিকে গোল হয়ে এসেছে বসবার জায়গা। কোন বন্দী ক্ষমা ভিক্ষা ক'রলে সম্রাটের দয়া হ'লে তাকে সরিয়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত আছে। মধ্যখানে ছোট উঁচু-নীচু দেওয়াল দেওয়া আছে, যাতে মানুষটি একটু লুকাতে পারে আর সিংহ খুঁজে খুঁজে এসে ধরে, তাতে খেলাটা হয়তো জমতো ভাল। সন্ধ্যা হওয়ার আর দেরী নেই মাত্র' দু ঘণ্টা আছে, তাই বাস জোরে চালিয়ে ফোরামের কাছে এসে থামলো। যে বিখ্যাত স্কোয়ারের কথা ইতিহাসে প'ড়েছি—তা দেখলাম সবই প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'য়েছে। শুধু যেখানে 'জুলিয়াস সিজার'কে হত্যা করা হ'য়েছিলো, সে জায়গার পিলারগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে আর সেখান থেকে Mark Antony দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন, সেই স্থানটিও এখন একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়নি। ইতিহাসের এক একটি পাতা যেন চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। সেদিনকার মত আমাদের রোম দেখা শেষ হ'ল—পেনসিওনিতে ফিরে এলাম। ইতালীর বিখ্যাত খাবার প্লেট Spagatti এনে দিল আমাদের। যদিও আমার তত প্রিয় নয় এ খাবারটি, কিন্তু ক্লান্ত থাকার দরুণ সেদিন তা অমৃত লাগছিল। পরের দিন ভোরে উঠেই তৈরী হ'য়ে নলাম। টুরিষ্ট বাস আসবে, অন্যান্য দ্রষ্টব্য জায়গায় সেদিন যাবে।

বাস এস ম'টায়, প্রথমে নিয়ে গেল Cata-comb এ। সেখানে ৪০০০ Crucified Monks-দের হাড় দিয়ে নানা ভাবে সিলিং থেকে সুরু করে সারা দেওয়ালের গায়ে নক্সা করে সাজিয়ে রেখেছে। কিছু কঙ্কালস্তূপ করে রেখেছে। এই চার্চ্চের basement-এ এই হাড়গুলো রেখেছে অর্থাৎ একতলার নীচে অন্ধকার আ'র একতলা। সেখানে টর্চ্চের সাহায্যে আমরা চলতে থাকি, একটা বিশ্রী গন্ধ আসছিল, চলছি একের পর এক বারান্দা পেরিয়ে—এ পথ যেন শেষ হবে না। কিংবদন্তী আছে, এই নিচের পথ যে কোথায় গিয়ে শেষ হ'য়েছে, কেউ জানে না—তাই অনেক Monk নীরোর অত্যাচারে এখানে লুকিয়েছিল আর ভেতরেই ঘুরেছে বাইরে যাওয়ার পথ খুঁজে না পেয়ে, ওখানেই মারা গেছে। আমার ভেতরকার বদ্ধ হাওয়ায় যেন মাথা ধরে গিয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি বে'রিয়ে এসে আবার সূর্য্যের আলো দেখে যেন বাঁচলাম। তার পর বাস রোমের সপ্ত পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে চ'ললো, ভেটিকান ষ্টেটে এই ষ্টেটের নিজস্ব ফৌজ, নিজস্ব ডাক বিভাগ সব আছে। এ ষ্টেটটি রোমের অধীনে নয়। এখানে পৃথিবী-বিখ্যাত সেণ্ট পিটার চার্চ আছে। এই চার্চের ভিতরকার ভাস্কর্য্য দেখবার মত। নানা রকম কারুকার্য্যে ও শ্বেত-পাথরের মূর্ত্তিতে ভেতরকার আর্চ গুলো সাজান হ'য়েছে। এক জায়গায় দেখলাম সেণ্ট পিটার এর একটা ব্রোঞ্জমূর্ত্তি আছে, তার পায়ের দিকে খানিকটা ক্ষয় পেয়ে গেছে ভক্তদের চুম্বনে। এইখানেই সেণ্ট পিটারকে কবর দেওয়া হয়। খৃষ্টধর্ম্মের সব চেয়ে বড় ধর্ম্মযাজক পোপ এই চার্চে আসেন এবং বিশেষ বিশেষ দিনে তিনি উপরকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে জনতাকে আশীষ বর্ষণ করেন। পোপের বাসস্থান চার্চ্চের সংলগ্ন একটি ম্যানসন। গির্জ্জার ভেতরে এক জায়গায় প্রবেশ-মূল্য দিয়ে দেখলাম, পোপের অলঙ্কার ও মূল্যবান সামগ্রী। ভক্তরা পোপকে কেহ হীরা-বসান সোনার থালা, কেহ সোনার কাজকরা ভেলভেটের পোষাক, কেহ প্লেটিনামের মুকুট, ইত্যাদি নানা মূল্যবান সামগ্রী উপহার দিয়েছেন। এই বিচিত্র সামগ্রী তিনটি বড় ঘরে সাজান আছে।

রোমের সেভেন হিলস্ থেকে নেবে সেণ্ট পলএর চার্চ এ গেলাম, এই গির্জ্জার আড়ম্বর সেই অথচ এক শান্তি বিরাজমান। মাইকেল এঞ্জেলোর তৈরী এক শ্বেতপাথরের সেণ্ট পল-এর মূর্ত্তি দেখলাম,যেন মূর্ত্ত জীবন্ত সেণ্ট পল বসে আছেন, ভাষায় এর প্রকৃত রূপ দেওয়া যায় না। চার্চ্চ থেকে বেরিয়ে দেখি, সূর্য্যদেব বেশ চনচনে হ'য়ে উঠেছেন—সৎসঙ্গী বললে "বৌদি, রোমের হাওয়া খেয়েই কি আজ কাটাতে হবে?"

আমরা তাড়াতাড়ি পথে এক রেষ্টুরেন্টের সামনে নেবে প'ড়লাম। তখন সকলেই দক্ষিণ হস্তের কাজে লেগে গেলাম, যদিও ঐ দেশে দু'হাতই চালাতে হ'য়েছিল। একটা জিনিষ আমি ইতালী ভ্রমণের সময় দেখেছি, প্রতি জায়গায় আমার মনে হ'য়েছে এরা আমার থেকে বেশী পয়সা নিচ্ছে! কুলি ষ্টেশন থেকে কাছেই হাঁটা-পথে এক পেনসিওনিতে নিয়ে এল—চাইল ১০০০ লিরা অথচ টুরিষ্ট অফিস থেকে আমাদের ৫০০ লিরা দিয়ে দিতে ব'লেছিল।

সেদিন বিকেলে আমার স্বামী ব'ললেন "আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আছে Paris ট্রেণ ছাড়বে, এস, অল্প কিছু কেনাকাটা করা যাক" আমরা তাই বেরিয়ে পড়লাম পেনসিওনি থেকে।

কি খাবেন ?

মানুষের আসল সৌন্দর্য্য নিঃসন্দেহে তার স্বাস্থ্য। কিন্তু এ স্বাস্থ্য গড়ে তুলতে হলে—শেষ অবধি এইটি অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে প্রধানতঃ চাই খাদ্য। খাওয়াটা কিন্তু সব সময়ই যা হোক্ একটা হলেই হবে না। বলকারী, রুচিপ্রদ খাদ্য-খাবার বেছে নিয়ে তবেই খেতে হবে। বলতে কি, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও দীর্ঘজীবন লাভের উপরই হচ্ছে নিয়মিত 'ভিটামিন' সমন্বিত সুষম ও সুস্বাদু খাদ্যগ্রহণ।

পরিমিত আহারের আগ্রহ ও অভ্যাস থাকা চাই জীবনারম্ভের গোড়া থেকেই। খুব কম খাওয়া যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ, বেশী রকম খাওয়াটাও তেমনি অহিতকর। এই গুরুত্বপূর্ণ জিনিষটির দিকে প্রায়ই লক্ষ্য রাখা হয় না। অথচ দেখা গেছে—মাত্রাতিরিক্ত খেয়ে মানুষ কিরূপ অসুখী হয় এবং কষ্ট পায়। কম খাওয়ায় স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়বে বা ভাল থাকবে না, এ তো সহজেই অনুমেয়।

খাওয়ার ব্যাপারে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশী। কেন না, স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে খাদ্যের ভাল-মন্দের প্রশ্ন। অনেক সময় খেতে যেয়ে খাদ্যের ভেতরকার মূল্যবান খনিজ পদার্থটাই বাদ দেওয়া হয়। রান্নার ব্যবস্থার ক্রটিতে খাদ্যের ভিটামিনগুলোই হয়ত কোথায় উধাও হয়ে গেল। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞ এবং বিচারবুদ্ধির অভাব ছাড়া এ আর কিছু হ'তে পারে না। খাদ্যের আসল জিনিসটাই যদি বাদ পড়ে গেল, যদি আগেভাগেই বিনষ্ট হ'ল সবটুকু খাদ্যপ্রাণ—তা হ'লে খাওয়ার সার্থকতা কোথায় আর স্বাস্থ্যেরই দাবী বজায় থাকবে কিসে ? খনিজ পদার্থ, 'প্রোটিন' বা উপযুক্ত খাদ্যপ্রাণের অভাবে শরীরে ক্রমশঃ ক্লান্তি, কুশ্রীতা ও নানারূপ আধি-ব্যাধি দেখা দিতে বাধ্য।

পরিপূর্ণ দেহ-শ্রী ও স্বাস্থ্যের জন্যে মামুলি আহারই যথেষ্ট হতে পারে না। এক কাপ কড়া চা আর মাখনবিহীন একটু বিস্কুট—প্রাতঃকালীন আহার যদি এই দিয়েই সমাধা হয়, তবে ফল কতটা আশা করা যায় ? বিলেতের শরীরবিজ্ঞানীদের অভিমত—'ব্রেকফাষ্টটা' রোজই বেশ ভালরকম হতে হবে। তাঁদেরই তৈরী একটি 'মেনু' বা খাদ্যতালিকা—

সকাল বেলাকার আহারে আর কিছু হোক্ বা না হোক্—ডিম, রুটি ও কিছু ফল চাই-ই। নৈশ-আহারের ন্যায় দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পর্বটাকেও উপেক্ষা করলে চলবে না। মাংস ইত্যাদি খাওয়া রীতিমত অভ্যেস রাখতে হবে এই সময়ে। এ ছাড়াও ফাঁকে ফাঁকে যখনই খিদের ভাব হবে, খেয়ে নিতে হবে কোন কিছু—কখনও হয়ত একটা আপেল, কখনও বা এক গ্লাস কমলালেবুর সুস্বাদু রস।

বিশেষজ্ঞদের আর একটি মত—খাওয়ার বেলায় জিহ্বার রুচি আর মনের তৃপ্তিটাই সবচেয়ে বড় কথা এবং নজর রাখতে হবে সেদিকটাতেই বেশী রকম। অরুচি ও অতৃপ্তি নিয়ে আহার করলে, সে আহার্য্য যতই উঁচুদরের হোক, সহজপাচ্য হয় না এবং ফলতঃ স্বাস্থ্যের উপরও এর প্রতিক্রিয়া হয় খারাপ। আবার রুচি ও তৃপ্তির সঙ্গে পর্য্যাপ্ত ডাল, ভাত, তরী-তরকারী খেয়েও স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে দেখা গেছে অনেক মানুষকেই। মোটের উপর উন্নত শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য চাই উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য, খাদ্যপ্রাণযুক্ত উপাদেয় খাদ্য। শরীরের উপযোগী খাদ্য চিনে নিয়মিত খেয়ে গেলে ক্ষয়-ক্ষতি ও দুশ্চিন্তার অবকাশ সাধারণতঃ থাকে না।

আমরা কে কি করতে পারি ?

সম্ভবপর মত লেখা-পড়া শিখবার পরই যুবকদের সামনে একটি মস্ত সমস্যা এসে দেখা দেয়—এখন কোন লাইনে যাই, কী কাজ নিই। সবাই যে দল বেঁধে কেরাণীর চাকরী নেবে, এমন তো হ'তে পারে না। যোগ্যতার দাবী রেখে মনের সঙ্গে মিলিয়ে কাজের ঠিক লাইন যে বাছাই করে নিতে পারলে, সাফল্য ও উন্নতি তারই। অতএব দেখা যাচ্ছে, কাজ গ্রহণের পূর্ব্বে মন সত্যি কোনটা চায় এবং এর জন্যে আবশ্যক যোগ্যতা আছে কি না, এইটি নিরূপণই বড় কথা।

মনের সঠিক খবর কি ভাবে জানতে পারা যাবে ? যুব-মনের উৎসাহ ও আগ্রহ একই জিনিসকে কেন্দ্র করে সাধারণতঃ দাঁড়িয়ে থাকে না। অথচ এর ভিতর থেকেই আসল মনটিকে চিনে নেওয়া চাই। এ জন্যে বাপ-মায়েদের দায়িত্ব খুব বেশী রকম থেকে যাচ্ছে। এ নিশ্চিত তাঁরাই বুঝবেন—তাঁদের ছেলের দৈনন্দিন চলাফেরায় কোন জিনিসটা নিয়ে থাকতে ভালবাসে, কোন দিকে মনের ঝোঁক রয়েছে ছেলেদের অতিমাত্র। এ সম্পর্ক কয়েক বার নমুনা বা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়। যেমন, (১) ছেলে যদি খোলা হাওয়ায় বেড়ায়, আনন্দ পায় এবং গাছ-গাছড়া ও জীব-জন্তু বিষয়ে কৌতূহলী হয়, তবে বুঝতে হবে তার মনের গঠন হচ্ছে—মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার, সয়েল টেকনিশিয়ান, ফার্মার বা ফরেষ্টার হওয়ার মতো। (২) কাউকে যদি দেখা গেলো, যন্ত্রপাতি নিয়ে আপন মনে কাজ করে চলছে—তবে ধরে নেওয়া যায়, সেই ছেলের ঝোঁক ইঞ্জিনীয়ার, ম্যাপ-মেকার, কম্পোজিটার বা মেকানিক হবার দিকে। (৩) যদি দেখা যায়, কোন যুবক দিন-রাত অঙ্ক, গণনা, হিসাবপত্র—এসব নিয়েই কাটাতে চাইছে, তবে সেক্ষেত্রে বুঝতে হ'বে এইটিই—যুবকের অবচেতন মনে ব্যাঙ্কার, একাউন্টেণ্ট, এষ্ট্রোনোমার, পদার্থবিজ্ঞানী বা ব্যবসায়ী হবার লক্ষণ বিদ্যমান। (৪) কোন ক্ষেত্রে হয়তো বাপ-মা দেখলেন—পুত্র কেবলি জটিল সমস্যাটি বিশ্লেষণে ব্যস্ত, নয়া জিনিস আবিষ্কারের দিকে তার ঝোঁক বেশী, বুঝতে হবে—ডাক্তার, ডিজাইনার, রসায়নবিদ্, পদার্থবিজ্ঞানী—এ সবের কোন একটা হতেই

সেই যুব-মনের চাহিদা। (৫) লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বা মেলামেশায় ছেলে যেখানে সবচেয়ে বেশী আনন্দ পাচ্ছে কিংবা ছেলেকে যদি পণ্য বেচা-কেনার ব্যাপারে অতিরিক্ত আগ্রহশীল দেখা যায়, তাহ'লে এর মানসিক গঠন অভিনেতা, পুরোহিত, আইনজ্ঞ, সেল্‌সম্যান ও রাজনীতিজ্ঞ—সাধারণতঃ এর কোন একটি হবার মতো। (৬) হাতে-কলমে কোন জিনিস গড়ে তোলার দিকে কোন তরুণের অব্যাহত উৎসাহ যদি দেখা যায়, সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে—এর মন বেশী রকম চাইছে চিত্রকর, কারুশিল্পী, ডেকোরেটার বা ড্রাফট্‌স্‌ম্যান হ'তে। (৭) লেখালেখি বা পড়াশুনো নিয়ে দিন-রাত কাটাতে দেখলে, বাপ-মাকে ধরে নিতে হবে, তাঁদের ছেলে মনের দিক থেকে লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক বা গ্রন্থাগারিক হ'তে চায়। (৮) কারও ছেলেকে হয়তো দেখা গেলো সব সময়েই মেতে আছে গান-বাজনায়, আন্দাজ করতে হবে সেই থেকেই, আলোচ্য ক্ষেত্রে যুব-মনের দাবী—সে নামকরা গায়ক বা বাদক এক জন উঁচুদরের সুরশিল্পী। (৯) যেখানে বাপ-মা দেখলেন যে, ছেলে মানুষের সেবা ও কল্যাণব্রতে আত্মনিয়োগ ক'রে অনেক বেশী আনন্দ পায়, বুঝতে হ'বে সেই ছেলের মানসিক গঠন শিক্ষক, পুরোহিত, সমাজসেবী—এ সকলের কোন একটি হবার মতো। (১০) ছেলেকে যদি অফিস সাজাবার দিকে যথেষ্ট আগ্রহশীল বুঝা যায়, তা হলে ধরে নিতে হবে অভিভাবকদের—কর্ম্মক্ষেত্রে এ হতে চাইছে সেক্রেটারী, একাউন্টেন্ট, সিভিল সার্ভেন্ট, ষ্ট্যাটিষ্টিশিয়ান বা অফিস ম্যানেজার।

যুব-মনের ধারা জান্‌বার এইরূপ আরও অনেক সূত্রই রয়েছে। বাপ-মারা একটু সতর্ক ও সচেতন থেকে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন—ছেলের মানসিক গতি-প্রকৃতি বা প্রবণতা ঠিক কোন্ দিকে। ছেলে ইঞ্জিনীয়ার হবে কি বৈজ্ঞানিক হবে, ডাক্তার হবে কি ব্যবসায়ী হবে, অফিসার, ম্যানেজার হবে কি অধ্যাপক হবে—এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা আগেভাগেই হওয়া চাই। এ ক্ষেত্রে আরও একটি বড়রকম বিচার্য্য বিষয়—শুধু মন চাইলেই হবে না—যে লাইন বা কাজের জন্য একান্ত আগ্রহ, সে'টি পেতে হলে থাক্‌তে হবে সম্যক্ যোগ্যতা। যে কাজে যে সক্ষম নয়, মন চাইলে বলেই তাতে আত্মনিয়োগ করলে ব্যর্থতাকেই বরণ করতে হবে। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, কাজ আদপেই আরম্ভ না করে, যোগ্যতার যাচাই কি করে সম্ভব? তা' ছাড়া নিষ্ঠা, উদ্যম ও অধ্যবসায় এ কয়টি মূলধন নিয়ে মানুষ অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে বলার মতো আর কোন গুণ বা যোগ্যতা না-ই যদি থাক্‌লো। উত্তরে বলতে হবে এইটি বিশেষ অবস্থাধীনের কথা, সাধারণক্ষেত্রে কাজ বা দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব্বেই মনের আগ্রহের সঙ্গে যোগ্যতার কতখানি সামীপ্য আছে, দেখে নেওয়া ভাল।

আগে থেকেই যোগ্যতার মোটামুটি যাচাই-এর জন্যে কয়েকটি সূত্রও প্রয়োগ করা চল্‌তে পারে। যেমন, (১) কোন যুবককে যদি দেখা গেল সে বেশ লিখতে পারে, বলতেও পারে অনর্গল এবং কোন জটিল বিষয়ও বুঝতে বা বুঝাতে তার আটকায় না, তবে ধরে নেওয়া যায় সেই যুবকের লেখক, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, আইনজ্ঞ, গ্রন্থাগারিক বা সেলস্‌ম্যান হবার যোগ্যতা রয়েছে। (২) যেখানে বাপ-মা দেখলেন, ছেলে যে কোন কাজের পরিকল্পনায় সুদক্ষ, যখন তখন একটা কঠিন প্রশ্নেরও মীমাংসায় আসতে সক্ষম এবং নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে সব সময়ই আগ্রহশীল, সেক্ষেত্রে সাধারণতঃ বুঝতে হবে এই ছেলের পক্ষে ডাক্তার, অফিসকর্ম্মকর্ত্তা, সুপারভাইজার, শিক্ষক, আইনজ্ঞ ও বিজ্ঞানী এই ধরণের কোন পেশাই হবে বিশেষ উপযোগী। (৩) হয়ত দেখা গেলো কোন তরুণ রঙ, তুলি ও মাপকাঠি নিয়ে দিন-রাত আঁক-জোক করছে কিংবা বেশ নৈপুণ্যের সঙ্গে বাজিয়ে চলছে পিয়ানো বেহালা স্বরোদ বা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র—তার মনে বিচিত্র কল্পনা রয়েছে, সৃষ্টির রয়েছে দুরন্ত তাগিদ—ধরে নিতে আপত্তি নেই, সেই তরুণ চিত্রশিল্পী, ভাস্কর্য্য শিল্পী, ডিজাইনার, নৃত্যশিল্পী, অভিনেতা বা সুরশিল্পী হিসাবে যোগ্যতার বাহাদুরি দেখাতে পারবে। (৪) আবার এমনটি দেখা যায়, কোন যুবক, জটিল প্রশ্ন পেলেই সেটি সমাধানে হয়ে উঠলো তৎপর, জ্যামিতিক সম্পাদ্য ও উপপাদ্য প্রসঙ্গ তার অতি প্রিয় এবং নতুন পরিকল্পনায় তার হাত খুব পাকা—সম্ভাবতঃই ধারণা করা চলে, কর্ম্মজীবনে সে যুবককে হতে হবে ইঞ্জিনীয়ার, কারুশিল্পী, মেকানিক, বৈজ্ঞানিক, ড্রাফটসম্যান—এইরূপ কোন কিছু। (৫) বাপ-মা যেখানে দেখবেন ছেলের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি—ইতিহাসের নাম, তারিখ বা টেলিফোন নম্বর কখনই সে ভুল করে না—সেই সব ছেলে যে কোন লাইনেই যেতে পারে। তবে স্মৃতি-শক্তিটা সেক্রেটারী একাউন্টেন্ট, লাইব্রেরীয়ান, সেলসম্যান, রাজনীতিজ্ঞ এ সকলের ক্ষেত্রেই বিশেষ কার্য্যকরী হয় (৬) হাতের কাছে কোন যুবককে যদি বেশ দক্ষ দেখা গেলো, কিংবা সে যদি যন্ত্রপাতি চালিয়ে তৎপরতার সঙ্গে এবং ঠিকভাবে কাজ করতে পার্‌লো সর্বক্ষণ—তা হলে এইটুকু অনায়াসেই অনুমেয় যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে যুবকের ভিতর একজন সার্থক শিল্পী, সার্জ্জন, দন্ত-চিকিৎসক বা মেকানিক-এর পথে যা যা প্রয়োজন, সে গুণগুলো রয়েছে অনেকখানি। (৭) কোথাও দেখা যেতে পারে—একটি তরুণ হয়ত অঙ্ক পেলেই আনন্দে লাফিয়ে উঠছে—গাণিতিক খুব জটিলতাও তার নিকট আদৌ জটিল ঠেকছে না, যে কোন বিষয়ের উপলব্ধিতে সে যৎপরোনাস্তি ক্ষিপ্র—তা হ'লে বুঝতে হ'বে, সেই তরুণের ইঞ্জিনীয়ারিং বা বুককিপিং এর কাজে সাফল্য দর্শনের যোগ্যতা রয়েছে কিংবা সেলস ক্লার্ক বা ক্যাশিয়ার পদের দায়িত্ব গ্রহণেও সে নিতান্ত সক্ষম।

মোটের উপর কর্ম্মজীবনে কোন একটি বিশেষ লাইনকে বরণ করার পূর্ব্বে সেটি পছন্দসই কি না এবং দ্বিতীয়তঃ সেখানে কুশলী হিসাবে প্রমাণ দিবার সত্যি যোগ্যতা আছে কতখানি—অবশ্যই ভাবতে হবে এবং সে ভাবনা সম্পন্ন হওয়া চাই গোড়াতেই। আর এইটুকুও ঠিক—কর্ম্মক্ষেত্রে মনের সঙ্গে যোগ্যতার যেখানে সহজ সুন্দর যোগাযোগ ঘটলো—সেখানেই নিশ্চিত সাফল্য, সেখানেই অগ্রগতি।

তৈলসম্পদ ও বর্ত্তমান বিশ্ব

খনিজ তৈল বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। উপযোগিতার দিক থেকে কয়লার ন্যায় এরও স্থান প্রথম পর্য্যায়ে। বিজ্ঞানী মানুষ তৈল-সম্পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে বহুদিন থেকেই। একে কেন্দ্র করে পৃথিবীর শক্তিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও রেষারেষি চলে আসছে চিরকাল।

তৈল-উৎপাদক দেশ হিসাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নাম করতে হয় সকলের আগে। তৈলের জন্ম বৃটেন, ফ্রান্স এ সব দেশকেও বাহিরের আমদানীর উপর নির্ভর করতে হয়, কিন্তু আমেরিকা এ ব্যাপারে বহুল পরিমাণে স্বাবলম্বী। সোভিয়েট রাশিয়াও এদিক থেকে পরনির্ভরশীল নয়—এইটুকু বলা চলে।

আজকের পৃথিবীতে তৈলের চাহিদা কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরই সবচেয়ে বেশী। বৃটেনের চাহিদা আমেরিকার অনেকটা নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। যে দেশ যতখানি শিল্প-সমৃদ্ধ হ'তে চাইছে, সামরিক সজ্জা যার যত বেশী, তৈলের প্রয়োজনীয়তাও তার তত বেশী পরিমাণে। তৈল না হ'লে অগ্রগতি ও উৎপাদন প্রচেষ্টা পরিকল্পনা অনুযায়ী কখনই হ'তে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে তৈল ছাড়া বর্ত্তমান যান্ত্রিক যুগ একেবারেই অচল।

নানা কারণেই তৈলের সন্ধান চলেছে আজ সারা বিশ্বময়। মধ্যপ্রাচ্যের ভূমিতে এই তৈল বিশেষ ভাবে ছড়িয়ে। সেই জন্যেই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর উপর বড় বড় শক্তিগুলোর লুব্ধ দৃষ্টি। এত কাল বৃটেন তৈল সরবরাহ করে আসছে মধ্যপ্রাচ্য থেকেই। নিজ দেশে এনে সে এই তৈল শোধন করে কাজে লাগায়। গত বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে যে পরিমাণ তৈল বৃটেন ব্যবহার করে, ১৯৫৩ সালেই ব্যবহৃত হয় ইহার দ্বিগুণ পরিমিত। মহাযুদ্ধের সময়ে জার্ম্মাণ ও বৃটেনে প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম তৈল উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়। এই শ্রেণীর তৈল উৎপাদিত হয় নিম্নশ্রেণীর কয়লা থেকে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়।

গত মহাযুদ্ধের পর থেকে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর প্রায় সব কয়টিতেই তৈল উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যাপক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ভারত, ব্রহ্ম ও পাকিস্তানের খনি সমূহ থেকেও যতটা সম্ভব তৈল নিষ্কাশন করার উদ্যম চলেছে। শিল্পোন্নত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে তৈলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনের পর দিন। অপর দিকে সোভিয়েট দেশে তৈল উৎপন্ন হচ্ছে পৃথিবীর উৎপাদনের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ।

আত্মপ্রতিষ্ঠার কয়েকটি মূলমন্ত্র

কর্ম্মজীবনে যাঁরা আত্মপ্রতিষ্ঠা বা উন্নতিলাভ করেন, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সেই সব মহৎ লোকেরই কাজ ও চিন্তায় রয়েছে একটি বিশেষ ধারা। কয়েকটি মূলমন্ত্র বা মূল সূত্র অনুসরণ করেই জীবনপথে ধাপে ধাপে তাঁরা এগিয়ে চলেন। সেই সূত্র ও মন্ত্রগুলো জানবার কৌতূহল হওয়া বিচিত্র নয়। মন্ত্রগুলোর মধ্যে প্রধান যে কয়টি, মোটামুটি এইরূপ বলা চলে :—

১। জীবনে যিনি উন্নতিকামী হবেন, সুনাম ও সাফল্য যাঁর চাই-ই, প্রথমেই থাকতে হবে তাঁর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও কাজের অদম্য আগ্রহ। লক্ষ্য ও স্বপ্ন স্থির যদি থাকল, আর সেই সঙ্গে যদি থাকল একান্ত নিষ্ঠা ও আগ্রহ তা হ'লে এগিয়ে যাবার পথ প্রশস্ত হবেই।

২। কাজ করতে যেয়ে ভুল হলেও থমকে গেলে চলবে না। পরন্তু ধাক্কার ভেতর দিয়েই নতুন নতুন শিক্ষা গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। আর দেখতে হবে সযত্নে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন কখনই না হয়। মোটের উপর ভুলের জন্য ঘাবড়াবার কিছু নেই। —সবচেয়ে বিজ্ঞ, সবচেয়ে বিদ্বান হয়ত যিনি, তাঁরও কার্য্যক্ষেত্রে ভুল হতে পারে। তবে অজ্ঞ ও অবিবেচকের মতো একই ভুল তিনি দ্বিতীয় বার করবেন না, সেইটাই লক্ষ্য করবার।

৩। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যেমন বাড়াতে হবে দিনের পর দিন —তেমনি ক্ষমতা অর্জ্জন করা চাই ভাল রকম, কি করে ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মনের ভাব ঠিক ঠিক প্রকাশ করতে পারা যায়। চাকুরীজীবীদের পক্ষে এইটি একটি অবশ্য শিক্ষণীয় ব্যাপার। পত্রে যে বিষয়টি জানাবে, সেইটির গাঁথুনি হ'তে হবে খুব অল্প কথায় অথচ পরিষ্কার বুঝবার মতো। কোন কথা না জানাবার ইচ্ছে থাকলে, সহজ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে চেপে যেতে হবে সেইটি।

৪। যাঁর অধীনে থেকে কাজ করতে হবে, তাঁর কোন সঙ্গত প্রশ্নে বা জিজ্ঞাসায় বিরক্তি বোধ করলে চলবে না—আপত্তি বা প্রতিবাদ করা তো দূরের বিষয়। পক্ষান্তরে, অধীন কর্ম্মচারীর মনে উপযুক্ত ও সন্তোষজনক জবাব হাজির করার জন্যে থাকতে হবে জরুরী তাগিদ। যেখানে উত্তর জানান না থাকবে, খোলাখুলি বলে ফেলাই হবে তখন উত্তম কার্য্য ব্যবস্থা।

৫। কাজের সময় মনে অনেক রকম দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ নিয়ে চললে হবে না। দুশ্চিন্তা থাকলে কোন প্রশ্নের সঠিক সিদ্ধান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়। ফলতঃ এই ভাবে কাজ আদৌ এগুতে পারে না, ভুলের পর ভুল হয়ে কাজ পণ্ড হবারই কারণ ঘটে। এবং পরিণতিতে কর্ম্মোন্নতির পরিবর্ত্তে কর্ম্মচ্যুতি এসে দেখা দেওয়াও অসাধ্য অবস্থায় বিচিত্র নয়।

৬। পদস্থ আসনে বসবার সুযোগ পাওয়া মাত্র অহঙ্কারের মাদকতা যেন পেয়ে না বসে। সাক্ষাৎপ্রার্থীকে অযথা দাঁড় করিয়ে রেখে নিজকে জাহির করবার চেষ্টা—সুনাম ও উন্নতি উভয়েরই পরিপন্থী। সহজ কথায় মনে রাখতে হবে—যখন যে কাজটি ঠিক ভাবে করা চাই, প্রতিটি মুহূর্ত্তের মূল্য সম্পর্কে সচেতন না থাকলে নয়। অফিস-বয় কিংবা ম্যানেজিং ডিরেক্টার—যে কেহই হোক, সাক্ষাৎকার নির্দ্ধারিত থাকলে, সঠিক সময়ে তা সম্পন্ন করতেই হ'বে।

৭। অধীন কর্ম্মচারীদের প্রতি অটুট আস্থা বা বিশ্বাস রাখতে হবে বরাবর। স্মরণ রাখতে হ'বে—এই ভাবেই কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য এবং প্রত্যাশিত কাজ আদায় সম্ভব। পদস্থ ব্যক্তি বলে অধীন লোকদের থেকে খুব একটা দূরত্ব টেনে চললে হবে না। কর্ম্মক্ষেত্রে সবই সক্ষম, সবই কর্ম্মী এই ধারণা পোষণই প্রতিষ্ঠাকামীদের পক্ষে শ্রেয়ঃ।

. . . এ মাসের প্রচ্ছদপট . . .

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে ভারতবর্ষে আদিবাসীদের একখানি আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। চিত্রটি শ্রীসুনীল জানা কর্ত্তৃক গৃহীত।

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৯

পরের দিন সকাল থেকে ক্রমাগত লোক আসতে লাগলো সীতারামের বাড়ীতে। সে যে ছাড়া পেয়ে ফিরে এসেছে—সারা সুলতানপুরে কথাটা বোধ করি কারও আর জানতে বাকি নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর বুড়োশিব কাল রাত্তেই বলেছিল, আমি বাড়ী যাই।

সীতারাম যেতে দেয়নি। হেসে তার মুখের পানে একটি বার তাকিয়েছিল শুধু। বুড়োশিব তক্ষুণি বুঝতে পেরেছিল কি সে বলতে চায়।

বুড়োশিব বলেছিল, না না হাসি নয়। আমার কাজ আছে।

সীতারাম বলেছিল, তার চেয়ে বল না কেন, তোমার বাড়ীর লোক ভাববে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা—নাতি-নাতনী—

ঠিক এই সময় কাঞ্চন ঢুকলো ঘরে। বুড়োশিব বললে, শুনুন মুখুজ্যেগিন্নি, বিয়ে-থা করিনি বলে সীতারাম আমাকে কি রকম বলছে শুনুন!

কাঞ্চন একটু হাসলে। হেসেই কি একটা জিনিস নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বুড়োশিব বললে, বিয়ে না করে খুব ভাল আছি সীতারাম। বিয়ের অনেক জ্বালা।

সীতারাম বললে, তা যদি জানো তো অন্যের বিয়ে দেবার জন্যে এত ছটফট করছো কেন?

ইঙ্গিতটা যে কোথায়—বুড়োশিব বুঝতে পারলে। বললে, তুমি থামো। আমি যা ভাল বুঝবো করবো। কারও কথা আমি শুনবো না।

সীতারাম বললে, তাই কর। আমি আর কিছু বলবো না।

সকালে সীতারাম কাঞ্চনকে ডেকে বললে, আমি নীচে গিয়েই বসি। লোকজনের যে রকম আসা-যাওয়া সুরু হয়েছে, ওপর-নীচে করতে করতে পায়ে ব্যথা ধরে যাবে।

মালা এলো বাবার চা নিয়ে।

সীতারাম বললে, বুড়োশিবকে ডাক্। ওর চা এইখানেই দিয়ে যা।

মালা বললে, জ্যেঠা তো চলে গেছে!

সীতারাম একটু বিস্মিত হলো।—না বলেই চলে গেল? কখন গেল?

মালা বললে, আমরা তখনও কেউ উঠিনি ঘুম থেকে।

সীতারাম ম্লান একটু হাসলে। তার পর চা খেয়ে নীচে নেমে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, রঞ্জন কি করছে?

রঞ্জনের নাম শুনেই মালা পালিয়ে গেল।

কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করলে, কি করবে?

সীতারাম বললে, বুড়োশিব ছাড়বে না কিছুতেই। বিয়ে সে দেবেই।

কাঞ্চন চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলো।

সীতারাম বললে, কি ভাবছো?

কাঞ্চন বললে, বিয়ে ওদের হোক্, তা আমিও চাই। কিন্তু তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনও কাজই আমি হতে দেবো না।

সীতারাম বললে, বড় ভাবনায় ফেললে। আচ্ছা, আজকের দিনটা ভাল করে ভেবে দেখি। বুড়োশিব আসুক্।

চাকরটা এসে দাঁড়ালো। আবার কে যেন এসেছে দেখা করবার জন্যে।

সীতারাম নেমে গেল।

চাকর যাচ্ছিল তার পিছু-পিছু। কাঞ্চন ডাকলে, লখিয়া শোন্।

লখিয়া ফিরে এলো। কাঞ্চন বললে, শিব বাবুর বাড়ী চিনিস?

লখিয়া বললে, চিনি।

—যা তো বাবা, চট্ করে ডেকে আন ওঁকে। বলবি, মা ডাকছে। এক্ষুণি আসুন।

লখিয়া চলে যাচ্ছিল। কাঞ্চন আবার বললে, খুব তাড়াতাড়ি যাবি আর আসবি। তুই যেন সেখানে গিয়ে বসে থাকিস না বাবা!

মালা ঘরে ঢুকলো। জিজ্ঞাসা করলে, লখিয়াকে তুমি কোথায় পাঠালে মা ?

কাঞ্চন বললে, তোর জ্যেঠাকে ডাকতে।

মালা বললে, তোমার বেশ আক্কেল তো! বাবা বাড়ীতে রয়েছে। লোকজন আসছে। কোনো কিছু দরকার হলে কি আমি ছুটে যাবো বাইরের ঘরে ?

কাঞ্চন বললে, ঠিক বলেছিস। ডাক মা, ওকে ফিরিয়ে আন। আমার মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে। ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

মালা সিঁড়ির কাছে ছুটে গিয়ে ডাকল, লখিয়া! লখিয়া!

লখিয়ার জবাব পাওয়া গেল না।

মালা বললে, হ'লো তো! চলে গেছে।

রঞ্জন যে-ঘরে বসেছিল, তারই পাশ দিয়ে ছাদে ওঠবার সিঁড়ি। মালা ছুটে সেই সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে গেল। ছাদ থেকে বাড়ীর সুমুখের রাস্তাটা দেখা যায়। লখিয়া বেশি দূর যায় নি। ছাদ থেকে ডাকলেই ফিরে আসবে।

কিন্তু না, ছাদ থেকেও তো দেখা যায় না। তাহ'লে কি উড়ে গেল নাকি? নিশ্চয়ই সে এখনও বাড়ী থেকে বেরোয় নি।

দূরে মুখুজ্যেপুকুর দেখা যাচ্ছে। মুখুজ্যেপুকুরের সুমুখের রাস্তা। মুখুজ্যেপুকুরের সেই বাঁধানো ঘাট। মালার মনে পড়লো রঞ্জনের কথা। যাক্ লখিয়া। বুড়োশিবকে ডেকে আনে তো আনুক্।

একদৃষ্টে মালা সেই বাঁধানো ঘাটের দিকে তাকিয়ে ছিল। দেখলে, একটি মেয়ে যেন তাদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে।

চেনা-চেনা মনে হলো মেয়েটিকে। মনে হলো—কোথায় যেন তাকে দেখেছে।

ক্রমশ এগিয়ে আসছে সে। মুখখানি চমৎকার! গায়ের রং দুধে-আলতায় গোলা!—মালার মনে পড়লো হঠাৎ! এ সেই ইরাণী নাচওয়ালী—চুমকি!

কিন্তু চুমকির পরনে সে ঘাঘরা নেই, সঙ্গে সাথী নেই। বাঙ্গালী মেয়ের মত শাড়ী পরেছে চুমকি।

মালা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যাবার জন্যে যেই পেছন ফিরেছে, মনে হলো মা যেন তাকে ডাকছে।

মালা বললে, যাই মা!

কাঞ্চন বললে, লখিয়া যায়নি, ফিরে এসেছে।

ছাদের কার্নিশের ওপর ঝুঁকে পড়ে মালা দেখলে, লখিয়া দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্চনের কাছে।

মালা বললে, আমাকে ডাকছো মা?

কাঞ্চন ওপরের দিকে তাকিয়ে বললে, বলছিলাম লখিয়াকে আর ডাকতে হবে না; সে ফিরে এসেছে। তোর বাবা চার পেয়ালা চা পাঠিয়ে দিতে বলেছে নীচে।

মালা বললে, এই জন্যেই বলেছিলাম তখন। বলেই সে নীচে নেমে যাচ্ছিল সিঁড়ি দিয়ে। হঠাৎ সিঁড়ির ওপর মুখোমুখি দেখা রঞ্জনের সঙ্গে।

রঞ্জন দেখেছিল তাকে ছাতে উঠতে। তাই বোধ হয় তার সঙ্গে নিভৃতে একটি বার দেখা করবার জন্যে চুপি-চুপি উঠে এসেছে।

রঞ্জন বললে, একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মালা! শুনতে চাও তো বলি।

মালা বললে, বল।

রঞ্জন বললে, আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। তুমি আমাকে একটু সাহায্য কর। আমি চুপি-চুপি চলে যাই তোমাদের বাড়ী থেকে।

মালা বললে, এখন আর তা হয় না। মা ডাকছে। আমি চললাম। আর কিছু না বলেই মালা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল।

কাঞ্চন চা করবার জন্যে ষ্টোভ জ্বালাবার ব্যবস্থা করছিল। মালা কাছে এসে বললে, মা, সেই মেয়েটা আসছে। সেই যে সেই ইরাণী মেয়ে—চুমকি?

কাঞ্চন বললে, তাড়িয়ে দে!

মালা বললে, না মা, তাড়াব না। কি বলে শুনি।

কাঞ্চন বললে, নীচে নেমে যা। দোতলায় আনিস নি। রঞ্জনকে দেখতে পাবে!

মালা নীচে নেমে গেল। লখিয়া তাকে দেখেই ডাকলে, দিদিমণি!

মালা থমকে থামলো।—কি রে, কি বলছিস?

সেই নাচনেওলী মেয়েটা এসেছে দিদিমণি!

—জানি। ডেকে দে।

লখিয়া চলে যাচ্ছিল। মালা আবার ডাকলে, শোন্!

—বাইরের ঘরে বাবা বসে আছে। ওকে এই দিকের এই দরজা দিয়ে নিয়ে আয়।

লখিয়ার গোমড়া মুখখানা হঠাৎ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চুমকিকে সে খিড়কি দরজা দিয়ে চুপি চুপি ডেকে আনবে দিদিমণির কাছে—এইটেকেই সে তার দুর্ল্লভ সৌভাগ্য বলে ভাবছে।

চুমকিকে ডেকে আনতে তার মোটেই দেরি হ'লো না। লখিয়ার পিছু-পিছু এলো চুমকি।

লখিয়া জিজ্ঞাসা করলে, দিদিমণি, নাচ-গান হবে না?

মালা বললে, না। তুই বাইরের ঘরে যা। বাবা ডাকতে পারে।

লখিয়ার মুখখানি শুকিয়ে গেল। চুমকিকে ছেড়ে বুড়ো বাবুর কাছে গিয়ে বসে থাকতে ভাল লাগে না; তবু তাকে যেতে হলো।

যেতে যেতেও আবার ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, আপনাদের কিছু দরকার হবে না দিদিমণি?

দিদিমণি এবার চটে গেল। বললে, না না। তুই যা এখান থেকে। লখিয়া চলে যেতেই মালা চুমকির কাছে এসে তার পরনের শাড়ীটার দিকে তাকিয়ে বললে, বাঃ, বেশ মানিয়েছে তোমাকে কোথায় ছিলে এত দিন? তোমাদের দল কোথায়?

চুমকির সে হাসি-খুসী ভাব নেই, মুখের ওপর কেমন যেন একটা বিষণ্ণতার ছাপ!

চুমকি মালার মুখের পানে তার সেই টানা-টানা চোখ দুটি তুলে ম্লান একটু হাসলে। হেসে বললে, ও-সব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না। জবাব পাবে না। তুমি কেমন আছ, তাই বল।

মালা বললে, ভাল নেই।

চুমকি বললে, ভাল থাকবে না তা জানি। দেখি দিদি, তোমার হাত?

মালা তার হাতখানা বাড়িয়ে দিলে।

চুমকি নিবিষ্ট মনে তার সেই সুন্দর হাতখানি বার কতক নেড়ে-চেড়ে বললে, তোমার জন্যে তোমার বাবাকে খুব কষ্ট পেতে হ'লো।

মালা বললে, সে কথা সবাই জানে। আর কিছু জান তো বল।

চুমকি বললে, তা'হলে তো সবই বলবে তুমি জানো। আচ্ছা, তবে এমন একটা কথা বলি যা কেউ জানে না। বলি?

মালা বললে, বল।

চুমকি বললে, তোমার সঙ্গে যার বিয়ে হবার কথা, লোকে জানে সে মারা গেছে। হয়ত' তুমিও জানো। কিন্তু সে মরেনি। সে আবার একদিন ফিরে আসবে।

মালা জিজ্ঞাসা করলে, তাহ'লে যে মরেছে, সে কে?

চুমকি বললে, সে যেই হোক, তোমার তাতে কি?

—তাহ'লেও ইচ্ছে করে না জানতে?

চুমকি বললে, আমিই যদি জানিয়ে দেবো তো পুলিশ কি করবে? পুলিশ তাকে খুঁজে বের করুক।

মালা এগিয়ে এলো চুমকির কাছে। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কি না বল।

চুমকি বললে, বলছি। তার আগে তুমি বল—আমার একটা কথা রাখবে?

মালা বললে, রাখবার মত কথা যদি হয় তো রাখবো।

চুমকি বললে, আমাদের দল ছেড়ে আমি পালিয়ে এসেছি। ওদের সঙ্গে আর থাকবো না। থাকতে আমার ভাল লাগে না। আমাকে চারটি খেতে-পরতে যদি দাও দিদিমণি, আমি তোমার চাকরাণীর কাজ করবো। রাখবে আমাকে?

মালা চুপ করে কি যেন ভাবলে। ভেবে বললে, তুমি সুন্দরী যুবতী, নাচ জানো, গান জানো—শহরে কোথাও চেষ্টা কর, চাকরি তোমার হয়ে যাবে।

চুমকি বললে, না, আমি তোমার কাছে কাজ করতে চাই। যে কাজ তুমি দেবে সেই কাজ করবো। আমি মাইনে চাই না, শুধু খাওয়া-পরা।

মালা ঘাড় নাড়লে। বললে, আমি যদি নির্ব্বোধ হতাম তাহ'লে হয়ত' এ লোভ আমি সামলাতে পারতাম না। কিন্তু আমি জানি, তুমি আমার চেয়ে সুন্দরী। তোমাকে আমার সঙ্গে রেখে নিজের সর্ব্বনাশ আমি ডেকে আনতে চাই না চুমকি! তুমি যেন কিছু মনে কোরো না ভাই! আমি সত্যি কথাই বললাম।

চুমকি মাথা হেঁট করে কি যেন ভাবতে লাগলো।

মালা জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছো?

চুমকি মুখ তুলে চাইলে। মনে হলো যেন চোখ দুটো তার ছলছল করছে। কি যেন বলতে গিয়েও বলছে না।

চট করে উঠে দাঁড়িয়ে চুমকি বললে, আসি ভাই। যদি বেঁচে থাকি তো দেখা হবে। বলেই সে আর মুহূর্ত্তমাত্র দেরি না করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মালা অবাক্ হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইলো।

[ক্রমশঃ।

উনিশ

কিন্তু টলিউডের মহাকাব্যে যিনি অতিনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ এখন পর্যন্ত সেই বিপন্নপালক দেবের কথা বলাই হয় নি। বিপন্নপালক কে? এ প্রশ্ন করে টলিউডকে লজ্জা দেবেন না। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠ সমাপ্ত হবার পর 'সীতা রামের কে?' এ প্রশ্নের চেয়েও ছেলেমানুষী জিজ্ঞাসা হবে যদি সত্যিই বিপন্নপালক কে জানতে চান। পরিচালক বিপন্ন পালক সম্প্রতি টলিউডের একমাত্র পুরুষ; বাকী সবাই প্রকৃতি। তাকে চিনলেই টলিউডকে জানা হল; শুধু তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেই টলিউডের তীর্থ-পরিক্রমা সমাপ্ত হল। এই সদানন্দময় পুরুষটিই এ-লাইনের ছোট-বড় নায়িকা-একস্ট্রা সকলেরই গুরু। এমন নায়িকা নেই এঁকে গুরুদক্ষিণা না দিতে হয়েছে যাকে। নেই এমন নায়ক যিনি এঁকে না বলেছেন 'স্যর'। তিরিশ বচ্ছর আছেন টলিউডে; তার নির্বাক যুগ থেকে। তিরিশ বচ্ছরে ষাট বচ্ছরের কোর্স কম্‌প্লিট করেছেন। বিপন্নপালক টলিউডের সিদ্ধপুরুষ। তুরীয় লোকে থাকেন যখন তখন তাঁর উত্তরীয় পর্যন্ত ঠিক থাকে না। কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলকেই সমজ্ঞানে সমান কাহিল করেন। বিপন্নপালক নমস্য ব্যক্তি। তাঁর কীর্তির চেয়েও তিনি নিজে অনেক মহৎ।

মাইকেল বাংলা সাহিত্যের একমাত্র মহাকাব্য 'মেঘনাদ বধ'-এর স্রষ্টা হিসেবে প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ। টলিউডের অলিখিত মহাকাব্য প্রোডিউসার বধ-এর প্রধান রচয়িতা হিসেবে বিপন্নপালক আজও সমস্ত পরিচালকের জীবনে প্রাতে স্মরণীয়; রাতেও অবিস্মরণীয়। তিনি মহাজন; যা সবাই তাঁর পথই পথ বলে মেনে নিয়ে এগিয়েছে। পথের শেষে পৌঁছবার কৃতিত্ব অবশ্য একা তাঁরই। তাঁর ডাক নাম বাঁশ; পদবী 'দেব'। তিনি এখেলায় বলেই নেমেছেন: পদবী 'দেব'। তিনি এখেলায় বলেই নেমেছেন: বাঁশ দেব কী? উত্তরের অপেক্ষা না করে বাঁশ দিয়েছেন। অনেকটা যেন আরেক প্রাতঃস্মরণীয় সেই ব্যক্তির উক্তির মত; সেই যে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন যে তাঁর জীবনের একটি মাত্র বাসনা হচ্ছে একটি ব্যাঙ্ক করা; আর তার নাম দেওয়া: নেওয়াখালি ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের যাবতীয় গচ্ছিত সরিয়ে ফেলবার পর যখন লোকে টাকা ফেরত চাইতে আসবে তখন তিনি ব্যাঙ্কের সাইন বোর্ডটির দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে শুধু বলবেন; নেওয়াখালি ব্যাঙ্কে শুধু নেওয়া আছে; দেওয়া নেই!

টলিউডে অনুষ্ঠিত যত পাপ; যতেক অন্যায়; যত কিছু অপরাধ আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে তার ভরা পূর্ণ হলে ভগবান পাঠিয়েছেন বিপন্নপালককে; শুধু দণ্ড হিসেবে নয়; বংশদণ্ড দিতে। বিপন্নপালক যাবার আগেই টলিউডের বংশে বাতি দিতে আর কেউ থাকবে না। There will be no one to put candle into its bamboo! আর কি। পৃথিবীতে যতবার পাপের ভরা পূর্ণ হবে ততবার নাকি অবতীর্ণ হবেন নারায়ণ! শঙ্খের মুখে তারই ঘোষণা: সম্ভবামি যুগে যুগে! কিন্তু এ হল শ্রীভগবানের কথা; কিন্তু শ্রীমান শয়তানেরও কিছু কথা আছে বৈ কি? সেই কথাই বিপন্নপালকের স্মৃতিস্তম্ভে পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ থাকবে একদিন:

শয়তান তুমি যুগে যুগে ভূত পাঠায়েছ বারে বারে
টলিউড সংসারে।

নীলকণ্ঠ

তারা বলে গেল চুষে নাও সবে;
মেরে নাও যত পার!
পশ্চাৎ হতে বিষের ছোবল মার!
স্মরণীয় তবু বরণীয় তবু
আজি এই দিনে পূজিব কি প্রভু
স্মৃতির পুরস্কারে?
আমি যে দেখিনু ভীষণ বিষের
গোপন দাঁতের ধারে,
হেনেছে প্রোডিউসারে!
আমি যে দেখিনু তরুণী নায়িকা বেশবাস খুলে ছোটে
কি মন্ত্রণায় দেখিছে যে কাজ হাসিলের
হাসি ঠোঁটে।

লক্ষ্য আমার ভ্রষ্ট আজিকে
দণ্ড মুষ্টিহারা
চারশ বিষের পারা
ঠাণ্ডা করেছে সারা টলিউড শিরায় গিয়েছে ঢুকে!
তাইত তোমায় শুধাই সকৌতুকে
যাহারা তোমার তুলিয়াছে ধ্বজা গাহিয়াছে তব জয়
তুমি কি তাদের বাঁচায়ে রেখেছ? দিয়াছ কি বরাভয়?

রাস্তায় কোনও অচেনা ভিখারীকে দেখলে আজও আমার যে প্রথমেই মনে স্বতঃই উদয় হয় তা হলে এই ভিখারী কোনও সময়ে বিপন্নপালক পরিচালিত কোনও ছবির প্রযোজক ছি কি না? হাসির কথা নয়; বিপন্নপালক সিপাই বিদ্রোহের

থেকে চলচ্চিত্রের পিণ্ডি চটকাচ্ছেন। কত লোক এল কত লোক গেল। বিপন্নপালক still going strong। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিপন্নপালক একাই কত প্রযোজককে পথে বসিয়েছেন তারই জন্যে প্রয়োজন হবে অনেকগুলি পরিচ্ছেদের এই সেদিনও নগদনারায়ণ সুপ্রতিষ্ঠিত এক পরিবেশককে জিজ্ঞেস করেছেন ইংরেজিতে: If I guarantee a definite flop how much minimum guarantee can you offer? ইংরেজি না বুঝে প্রযোজক সই দিয়েছেন এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকার মিনিমাম গ্যারাণ্টি পত্রে। তার পর? তার পর এক এ্যালোপাথিক অথবা হোমিওপ্যাথিক কি সিষ্টেমে এক ডোজ এমন দিলেন যাতে লাভ দূরের কথা সেই ছবি দেখিয়ে পরিবেশককে মিনিমাম গ্যারাণ্টির সিকি টাকা তোলবার অনেক আগেই যা তুলতে হবে সেটি একটি ফল; তার নাম পটল।

মহাত্মা গান্ধী যেমন জাতির জনক; দুরাত্মা বিপন্নপালক তেমনি টলিউডে অনুষ্ঠিত যাবতীয় বজ্জাতির জনক। হাবাধনের যেমন দশটি ছেলে; বিপন্নপালকের তেমনি দশটি ass! অর্থাৎ দশটি এসিষ্টেণ্ট। দশজনের মধ্যে কেউ শ্যালক; কেউ ভাগ্নে, ভাইপো; কেউ ভায়রা-ভাই। বিপন্নপালক আগে; পেছনে দশটি ass। প্রযোজক অথবা পরিবেশক তারও পেছনে। কেউ বিপন্নপালক হাসলে হাসছে; বসতে অসুবিধে হলে পায়ের তলায় ছোট মোড়া ঠিক করে দিচ্ছে। বিপন্নপালক কিছু জিজ্ঞেস করলে অবধারিত ভুল উত্তর দিচ্ছে। একজন পাশে খাতা খুলে দাঁড়িয়ে; একজন নথির কৌট খুলে। একজন শ্লেট আর পেন্সিল নিয়ে রেডি। বিপন্নপালকের আজ মৌন দিবস। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে, শ্লেটে তার উত্তর লিখে দিচ্ছেন। স্বেচ্ছায় মৌন নয়; ডাক্তার কথা বলতে বারণ করেছেন। আজ কদিন থেকে বিপন্নপালকের ভয়েস চোক্‌ড্।

বিপন্নপালকের ভয়েস চোক্‌ড্ হওয়ার ইতিহাস কিন্তু অতীব ভয়ঙ্কর। সময় বুঝে তাঁর ভয়েস্ বেরোয়; সময় বুঝে চোক্‌ড হয়। সেকথা তাহলে খুলেই বলি। বিপন্নপালকের আগাগোড়া পরিচয় এমনই পঙ্কিল; তার ইতিবৃত্ত দুর্গন্ধযুক্ত; তার অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যত সমান ঘোরাল। জীবনে যখনই কোনও প্রযোজকের দ্বারস্থ হয়েছেন তখনই ঢুকেছেন কেঁচোর মত। ছবি আরম্ভ হবার সময় প্রত্যেকবার কেঁচো; ছবি আরম্ভ হয়ে গেলে কিন্তু আর কেঁচো নয়; তখন কেউটে। ছবি আরম্ভ হবার সময় বলেন: এক লক্ষ টাকার মধ্যেই ছবি করে দেব। ছবি করে দেন। ছবি আরম্ভ হয়ে গেলে কত লক্ষে যে ছবি শেষ হবে কি ছবির মুক্তির আগেই প্রযোজক শেষ হবে তা এক ওই বিপন্নপালকই জানেন, কিম্বা তখন আর জানেন না।

এই ভাবে লক্ষ টাকার খেলায় মজে বাড়ী ঘর দোর গয়নাগাঁটি বেচে, হুণ্ডিতে টাকা ধার করে এনে, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা হয়ে যাবার পরও যখন ছবির অর্ধেক বাকী তখন প্রযোজক আসে কাটাকাটির উদ্দেশ্যে; শেষ বোঝাপড়া সেরে যেতে; এসপার-ওসপার করবার মনোবৃত্তি নিয়ে। এসে দেখে বিপন্নপালক বিছানায় কাৎ; হাতে শ্লেট পেন্সিল ধরা; তাতে লেখা: Voice chocked! Doctor advises, 'no talk'! এমন মৌনীবাবার সঙ্গে আপনি কতক্ষণ ঝগড়া করতে পারেন? বোবার শত্রু নেই! এক হাতে কতক্ষণ তালি বাজে? তাই প্রোডিউসার অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে বিপন্নপালকের গরুর মত করুণ চোখের দিকে। রাগ জল হয়; তারপর অনুরাগের বাষ্পে উবে যায় সব। বিছানায় কাত হয় বিপন্নপালক; কিন্তু কাতরায় প্রযোজক। সেই আসলে কুপোকাৎ। উঠে যায় প্রযোজক; উঠে বসেন বিপন্নপালক। উঠে বসে বলেন: ওরে এক কাপ চা। ঘড়ির দিকে তাকান; চা খাবার সময় কি এখন? তারপর মনে পড়ে: Any time is tea-time!

লক্ষ লক্ষ টাকার রাস্তা ধরে এগুতে এগুতে বিপন্নপালক বাড়ী করেছেন, গাড়ী করেছেন। এক লক্ষ্যে এগিয়েছেন নিজের ধ্বজা নিজে ধরে। কিন্তু তার জন্যে তাঁর এসিষ্টেণ্টদের কোনও সুরাহা হয়েছে, এমন নয়। বরং তাদের ক্ষতিই হয়েছে। বিপন্নপালকের সহকারী শুনলে তার পক্ষে কারুর কাজ পাওয়া শক্ত। কারণ সিপাহিকা ঘোড়া; কুছ নেহি ত থোড়া থোড়া! বিপন্নপালকের সহকারী আর কিছু না পারুক ছবির খরচা অন্তত বিপন্নপালকের মত করতে পারবে, এ বিষয়ে প্রযোজকরা নিশ্চিন্ত। তাই বিপন্নপালককে তারা যত না ডরায় বিপন্নপালকের সহকারীকে এড়ায় তার চেয়ে বেশি! বিপন্নপালক যে আত্মীয়-স্বজনদের সহকারী করেছেন সে বিপন্নপালনের জন্যে নয়; খুব কম খরচায় গোপালনের জন্যে। চাট দেবে কম; দুধ দেবে বেশি—দুঃস্থ আত্মীয় ছাড়া এমন বৎসহারা গাভী আর কোথায় পাওয়া যাবে? এক ঢিলে লোকে মারে দুপাখী; বিপন্ন মারেন তিন। প্রথমেই প্রযোজকের সঙ্গে নিজের পারিশ্রমিক ঠিক করবার সময়েই সহকারী সমেত ঠিক করে নেন; তারপর সহকারীকে দেবার সময় তার থেকেও কিছু সরিয়ে রাখেন। তারপর প্রচার হয় বিপন্ন-পালকের দুঃস্থ আত্মীয়দের বিপদের দিনে কাজ দিয়ে বাঁচাবার মহত্ত্ব।

এত বাধা বিপত্তির মধ্যেও দৈবাৎ যদি বিপন্নপালকের কোনও সহকারী যদি একা স্বাধীন ভাবে ছবি করবার সুযোগ পায় তাতেও সিংহের ভাগ বসাতে ভোলেন না বিপন্ন। সুপারভিসন করবেন বলে যে টাকা নেন পরিচালনা করে তার সিকিও পায় না তাঁর সহকারী। ছবি যদি লেগে যায় তাহলে লোকে মনে করে সহকারী শিখণ্ডী মাত্র; আসলে অন্তরাল থেকে সব্যসাচীর কাজ করেছেন স্বয়ং বিপন্নপালক। ছবি যদি না লাগে তাহলে স্ত্রীলোকেও বোঝে যে বিপন্নপালক যা পারেন তা যদি তাঁর সহকারী পারত তাহলে লোকে আর অত পয়সা দিয়ে বিপন্নপালকের কাছে যেত না। এছাড়া আরও ব্যাপার আছে। সে রহস্য ডিটেক্‌টিভ গল্পের চেয়েও চুল খাড়া করার; চোখ কপালে তোলার; নিশ্বাস রুদ্ধ হবার মত।

সে রহস্যের বন্ধ দরজায় এবার তাহলে চিচিংফাঁক চাবি লাগাই। বিপন্নপালক যখন অন্য প্রযোজকের কাছে কাজ করেন পরিচালক অথবা চিত্রনাট্যকার হিসেবে তখন প্রযোজকের দুঃখ বোঝেন না। কিন্তু যখন প্রযোজকের অভাবে নিজেই প্রযোজনা এবং পরিচালনা দুইই করেন তখন প্রযোজকের দুঃখ ষোল আনা বোঝেন। আর্টিষ্টদের বাংলা ছবির জন্যে দরদী হতে বলেন;

বোঝান যে বাংলা ছবির বাজার কত ছোট ; আর্টিষ্টদের বেশি টাকা দিলে ছবির Cost বেশি হয়ে গেলে টাকা উঠবে না ; ফলে বাংলা ছবি তোলাই বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। এসিষ্টেণ্টরা বোঝায় বাকীটুকু ; বলে : বিপন্নপালকের কাছে কাজ করতে পাওয়াই যে কোন শিল্পীর পক্ষে কত বড় ভরসার কথা। একখানা ছবিতেই ত' ভারতজোড়া নাম হবে তার। তখন এ ছবির ক্ষতিপূরণ হয়ে লাভ হবে কত। ব্যস ! আর বোঝাতে হয় না। বিপন্নপালকের ছবিতে নেমে ছায়াছবির নায়ক-নায়িকারা ধন্য হয় ; বিপন্নপালকের ছবিতে ক্যমেরার কাজ করে আলোকচিত্রকর হয় কৃতকৃতার্থ।

সব শেষে পালা এসিষ্টেণ্টদের। এসিষ্টেণ্টদের বোঝান বিপন্নপালক নিজেই। একজন সহকারীকে কাছে ডেকে বলেন : শোন, নাড়ুগোপাল শোন ; ব্যাপারখানা বোঝ। তোমাদের আর কি ? তোমাদের জন্যে আছি আমি। তোমাদের একটা হিল্লে হয়ে যাবেই একদিন না একদিন। কিন্তু আমার জন্যে আছে কে ? তাই বলছি রাগ করবার আগে একবার ভাবো নাড়ুগোপাল ; ভাবো। নাড়ুগোপাল আর ভাবে না। বিনা বাক্যব্যয়ে কাজে এসে ঢোকে। এক নাড়ুগোপালের সঙ্গে বাকী সব নাড়ুগোপালরাও।

বিপন্নপালক প্রযোজনা করেন বটে, কিন্তু তার জন্যে গাঁট থেকে বার করেন না এক পয়সাও। তখন যান পরিবেশকের কাছে। তখনই ওঠে মিনিমাম গ্যারাণ্টির কথা। অন্য সব প্রযোজকরা পরিবেশকের কাছ থেকে যে টাকা পান দফায় দফায় তা হল অগ্রিম ; সে টাকা যদি ছবি দেখিয়ে না ওঠে তাহলে সে টাকা ফেরত দেবার দায় থাকে প্রযোজকের। কিন্তু মিনিমাম গ্যারাণ্টি মানে তা নয় ; মিনিমাম গ্যারাণ্টি হল ছবির হাল যাই হক মিনিমাম গ্যারাণ্টির টাকাটা দিতেই হবে ; শুধু দিতেই হবে না, কোন দিন আর ফেরত চাওয়া চলবে না। তাই মিনিমাম গ্যারাণ্টির উপরই বিপন্নপালকের ঝোঁক। অন্য প্রযোজকদের মত দফায় দফায় কাজ সারা নয় তাঁর : এক কোপেই দফারফা করার জন্যেই তিনি। অন্য প্রযোজকদের হল স্যাকরার ঠুকঠাক ; বিপন্নপালকের হল কামারের এক ঘা।

কামারের সেই এক ঘা-র আর মার নেই।

এত কথা না বলে একটি ঘটনার উল্লেখ করি। তাতেই বিপন্নপালকের ভেতরের মানুষটি পুরো বাইরে বেরিয়ে আসবে। ঘটনাটি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ছায়ারাজ্যেও অবিস্মরণীয় এক অভিজ্ঞতা। যে ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছি সে ঘটনার নায়ক প্রযোজক রাধামাধব ঘোষ ; অতিনায়ক যথারীতি পরিচালক বিপন্নপালক। প্রযোজক রাধামাধবকে আজ আপনারা অনেকেই দেখে থেকে থাকেন হয়ত ধর্মতলায় ; নয়ত বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে। পরিবেশকের দরজায় দরজায় হানা দিয়ে ফিরছেন। বাঁ হাতের কবজিতে ধুতির কোঁচা ফেলে রাখা ; মুখে পান ; নয় একটা দেশলায়ের কাঠি দাঁতে খোঁচান চলছে। পায়ে চটি ; গায়ে সার্ট। ট্যাঙস ট্যাঙস করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলেছে। রাধামাধব আজকে এই ; কিন্তু যেদিনকার কথা বলছি সেদিনকার রাধামাধব এই নয়। সেদিন রাধামাধব কাগজ, কার্ডবোর্ড রাবিশের সোল এজেন্সী পেয়ে বিরাট লোক হয়ে গেছে। আজ তার বাড়ীর রকে যেমন

পাগলাগার বসে থাকে সেদিন ঠিক এমনই লোক বসে থাকত ছাঁট কাগজের আশায়। এত পয়সা হয়েছে সেদিন যে ভারতবর্ষের যেখানে যত মার্সেডিজ বেনজ ছিল সমস্ত গাড়ী একের পর এক কিনছে। যেখানে যত বড় টেণ্ডার সব ডাকছে একা। তারপর ছবির কারবারে দুখানার পর তৃতীয় ছবিটি লাগিয়েছে সাঙ্ঘাতিক। ষাঁড়ের চোখে গিয়ে লেগেছে অন্ধকারে ছুঁড়ে দেওয়া তীর; ইংরেজীতে যাকে বলে hit the bull's eye! দুখানা ডার্বির প্রাইজে যা না পায় লোকে একখানা ছবিতেই তার চেয়ে বেশি পেয়ে গেছে। কিন্তু তারপরেই পড়েছে রাঘব বোয়াল বিপন্নপালক দেবের পাল্লায়। বিয়োগান্ত নাটকের সেই ত' আরম্ভ। রাধামাধব সেদিন থেকেই টলিউডে নতুন নামে পরিচিত হতে আরম্ভ করল; রাধামাধব নয় আর সেদিন থেকে; সেদিন থেকে তার নতুন নাম হল: গাধামাধব ঘোষ।

ছবি শেষ হবার অনেক আগেই গাধামাধব ডাক ছেড়ে কাঁদছে। চুয়ান্ন হাজার টাকা গেছে এসিষ্টেন্টদের পেছনে; আঠার হাজার টাকা পেয়েছে একা একজন অভিনেতা যার বাকী জীবনের সমস্ত রোজগার মেলালেও এত টাকা হবে না। তখন যুদ্ধের বাজার; প্ররেটার পালা। প্ররেটা হচ্ছে অনেকটা রাতের পাতে ভাতটাত খাবার পরে পরোটা খাওয়ার মত গুড় দিয়ে। অর্থাৎ পঁচিশ-তিরিশ দিনের জন্যে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সঙ্গে থোক টাকায় কণ্ট্রাক্ট হবার পর যখন পঁচিশ দিনেও কাজ শেষ হয় না তখন দৈনিক মোটা টাকার চলে প্ররেটার পালা। বিপন্নপালকের ত এমনিতেই কোন ছবিই সময়ে শেষ হয় না; তায় আবার গাধামাধবের ছবি মানে ত' দুহাতে লোটবার মরশুম। একশ দিনের বেশি হয়ে গেছে শুটিং; কণ্ট্রাক্ট পিরিয়ডে আর্টিষ্টের যা প্রাপ্য তার চেয়ে অনেক বেশি পাচ্ছে সে প্ররেটায়। ফিল্ম খরচারও শেষ নেই; ষ্টুডিও ভাড়ারও না।

ছবির সেটে যা বলেছেন বিপন্নপালক তাই জোগাড় করে এনে দিয়েছে গাধামাধব! একটা সিঁড়ি তৈরী করতে লেগেছে কয়েক হাজার টাকা; সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সগর্বে গাধামাধব বলছে সিঁড়ির নীচে দাঁড়ান বিপন্নপালককে! কেমন হয়েছে সেটটা? অনেকক্ষণ নাকে রুমাল চাপা দিয়ে চুপ করে চেয়ে দেখবার পর বলেছেন পরিচালক প্রযোজককে: হয়েছে ত ভালোই; কিন্তু এ সিঁড়ি ত কাজে লাগবে নেই! শুনেই পিলে চমকেছে প্রযোজকের লাগবে নেই কেন? বিপন্নপালক আবার নাকে রুমাল চাপা দিয়ে চুপ করে থেকেছেন অনেকক্ষণ; তারপর ফের বলেছেন: লাগবে নেই; আমি যে চিত্রনাট্য পালটেছি। সিঁড়ির মাথা থেকে গাধামাধব সেই যে গড়াতে আরম্ভ করেছে, এসে পড়ছে একেবারে বিপন্নপালকের পায়ের কাছে।

নাচের জন্যে বহুটাকা খরচ করে আনা হয়েছে ভারতবিখ্যাত নৃত্যপটীয়সীকে। চব্বিশ হাজার টাকা খরচা করে তৈরী হয়েছে সেট; তারপর সব আপসেট করেছে বিপন্নপালকের সেই মোক্ষম দুটি কথার একটি ডায়ালগ: লাগবে নেই! সে কি মশাই? লাগবে নেই কেন? লাগবে নেইই ত; আমি যে চিত্রনাট্য বদল করেছি। ছবি রিলিজ হয়ে একদিন চলেই কর্মিদের ষ্ট্রাইকে হাউস বন্ধ থাকে এক মাস। বিপন্নপালক বোঝান প্রযোজককে: এমন সুযোগ ত আর পাওয়া যাবে না; পাবলিক রিএকসন জানা গেছে অথচ এদিকে হাউসও বন্ধ। আসুন ছবিটাকে মেরামত করি। ফলে আবার স্যুটিং; আবার সেই লাগবে নেই; এবং মেরামতে মেরামতে ছবির যাই হক, ছবির প্রযোজক ততদিনে beyond repair!

কিন্তু এসব কিছুই নয়; তাহলে আসল ঘটনাটা এবারে বলি। গাধামাধবের ছোট ছেলের সেদিন জন্মদিন। মাছের মুড়ো এসেছে তার জন্যে একটা; তাই নিয়ে তার বড় এবং ছোট ছেলেতে ভয়ানক গোলমাল। গাধামাধব তার স্ত্রীকে বলেছে: দুটো মুড়ো আনলেই হত; স্ত্রী বলেছেন: না; এখন টানাটানির দিন। গাধামাধব চলে গেছে ষ্টুডিওতে। সেখানে গিয়ে দেখে একটা মস্ত মাছের মুড়ো; কি ব্যাপার? শুটিংএ লাগবে। তারপর দেখা গেল একটি দৃশ্যে নায়ককে মাছের মুড়ো সুদ্ধ খেতে দেওয়া হয়েছে; এমন সময় ট্রেণের সময় হয়ে গেছে বলে নায়ক মাছের মুড়ো ফেলে রেখেই উঠে চলে গেল। অর্থাৎ সত্যিকারের মাছের মুড়ো আনার দরকারই ছিল না। কিংবা দরকারই ছিল; কারণ গাধামাধব মনে মনে সেই ভেবেছে যে যাক মাছের মুড়োটা সে বাড়ী নিয়ে যেতে পারবে, অন্তত সকালবেলায় মাছের মুড়োর জন্যে ছেলের কান্নাটিকে রাত্রিবেলায় মুছিয়ে দিতে পারবে মাছের মুড়োর হাসিতে, এই ভেবে সে একা পুলকিত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার এই অকারণ পুলক উধাও হয়ে গেছে; শুটিংএর পর মাছের মুড়ো গিয়ে উঠেছে বিপন্নপালকের গাড়ীতে। কেন? কেন আবার! মেনী খাবে বলে! মেনী কে? মেনী হচ্ছে বিপন্নভার্যার প্রিয় বেড়াল!

গাধামাধব একটি কথাও বলে নি। বললেও লাভ হত না। টলিউডে কুকুর বেড়াল শিম্পাঞ্জির যা দাম অনেক সময়ে মানুষেরও ত দাম নয়। তাই ছেলের কান্না-ভেজা মুখ যতই গাধামাধবের বুকের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠুক সারা দিন, তবুও তাকে বুকে করেই ফিরে হবে; বুক চিরে বার করবার রাস্তা নেই টলিউডের কোনও ছবি প্রযোজকের।

যৌবনের প্রারম্ভ থেকে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্ত পর্যন্ত টলিউডে যত উৎপাত আজতক বিপন্নপালক একা করে এসেছেন তারই, অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করেছে এইমাত্র। উৎপাতের কী চীৎপাতে যাবার পুণ্যলগ্ন সমাগত। বিবেক এতদিনে তাঁর গলা টিপে ধরেছে। একদিন খাওয়া পরার ভাবনা ছিল; কিন্তু ঘুমের নয়। আজ খাওয়া পরার ভাবনা নেই; কিন্তু সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে ঘুমের দুর্ভাবনা। খাওয়া পরা হয়; ভালোই হয়। কিন্তু ঘুম আর হয় না। তার জন্যেই যেতে হয় মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে। চিকিৎসককে গিয়ে বলেন বিপন্নপালক: আমাকে বলতে পারে কিসে একটু হেসে বাঁচব? মনোরোগ চিকিৎসক অনেক ভে[illegible] বলেন: এক কাজ করুন; বিপন্নপালক দেব বলে এক বিখ্যাত বাঙালী পরিচালক আছেন তাঁর তোলা যে কোন ছবির কোন সিরিয়স করুণ দৃশ্য ছবির পর্দায় দেখে আসুন; হেসে খুন হবে আপনি! ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে আসে বিপন্নপালক। ভরসা করে বল[illegible] পারেন না যে তিনিই বিপন্নপালক স্বয়ং।

বিপন্নপালক আজ সত্যিই বিপন্ন। কপালের ও[illegible] ফুসফুড়িটাও দেখিয়ে কেউ যদি বলে কি হয়েছে আপনার

ব্যস! হয়ে গেল বিপন্নপালকের। হাত বুলোন আরম্ভ হল সেই যে তার আর শেষ নেই। ডেটল, আইডিন, সিবাজল অয়েন্টমেন্ট লাগাতে বাকী রইল না কিছু! আধা হাসপাতাল খুলে বসলেন তক্ষুণি। কেউ যদি জিজ্ঞেস করেছে ভুলে: ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে নাকি? ব্যস! হয়ে গেল বিপন্নপালকের। শুটিং থাকলে শুটিং বন্ধ। শুটিং না থাকলেও শয্যাগত; এবং যে দেখা করতে চায় তাকেই বলে দেওয়া: দেখা হবে না! এমন সময় যদি ছেলে এসে বলে: ডাক্তারবাবু এসেছেন; কি বলব? বিপন্নপালক না ভেবেই জবাব দেন: ডাক্তারকে বল আমি অসুস্থ; দেখা হবে না আজ! পৃথিবীতে এই প্রথম ডাক্তারের সঙ্গে রুগীর দেখা হয় না; রুগী অসুস্থ,—এই কারণে!

বিপন্নপালক দেবের কথা লিখলাম বিপন্নপালক দেবকে লজ্জা দেব বলে, এমন দুরাশা আর সেই করুক, আমি করি না। বিপন্নপালককে লজ্জা দেওয়া অসম্ভব। লজ্জা না পাবার ব্যাপারে তিনি বর্তমান কংগ্রেস-নেতাদের লজ্জা দিতে পারেন। সে কথা নয়; বিপন্নপালকের কথা এত করে বলবার কারণ এই মাত্র যে, বিপন্নপালকের মত লোকেরা টলিউড থেকে বিদায় না নিলে টলিউড সত্য সত্যই বিপন্ন হবে। বিপন্নপালকরা যত টাকা এই শিল্পকে দিয়েছেন তার চেয়ে ঢের বেশি টাকা বার করে দিয়েছেন; সবচেয়ে জনপ্রিয় এই মাধ্যম মারফৎ যতটুকু আনন্দ দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি রুচি বিকৃতি দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন জান্তে এবং অজান্তে।

আজকের ছেলে-মেয়েরা যে মা বলবার পরই সিনেমা বলতে সুরু করে তার জন্যে দায়ী বিপন্নপালকদের তথা টলিউডের রঙ্গীন অসুস্থ অপপ্রচার। সিনেমার কাগজ, সিনেমার বিজ্ঞাপন সিনেমার গান সমস্ত দেশ থেকে গভীর এবং গম্ভীর চিন্তাকে বিদায় দিয়ে তরল আলতার মত হাল্কা ভাবনার স্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছে যুগের ভবিষ্যৎ। সিনেমার প্রভাব আজ এত দূর প্রমত্ত করেছে বিংশ শতাব্দীকে যে আদর্শের প্রচার-মঞ্চের পরিবর্তে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আজ আর নেতা নেই; যারা আছে তারা সবাই অভিনেতা। জহরলাল আর জহর গাঙ্গুলীতে আজ আর তফাৎ সামান্যই।

কিন্তু সে কথাও ছেড়ে দিলাম না হয়। খোদ টলিউডের যে ক্ষতি করছে বিপন্নপালকরা তার ক্ষতিপূরণ হবে কিসে? জোড়া বলদ অথবা কাস্তে ধানের শীষে,—কোনও বাক্সে ভোট দিলেই তা হবার নয়। বিপন্নপালকের অনুকারকেরা প্রযোজককে আজও যেভাবে বধ দিয়ে চলেছে তাতে এক-আধজন নয়, যক্ষের কুবেরও উবে যেতে আটকাবে না। শুধু ফিল্ম ষ্টারেরাই যে প্রযোজকদের ঘায়েল করেছে তা নয়; এই সব কনফিডেন্স ট্রিকষ্টাররাও কম ডোবায়নি তাদের। বিপন্নপালক তবু এ ইণ্ডাস্ট্রিকে সাকসেসফুল ছবি মারফৎ টাকা এনে দিয়েছেন বহুবার; কিন্তু এই অনুকারকের দল, এরা এই ইণ্ডাস্ট্রির টাকা জলেই দিয়েছে; এই ইণ্ডাস্ট্রির মর্যাদা দিয়েছে ধুলায় মিলিয়ে; এই ইণ্ডাস্ট্রি থেকে ইণ্ডাস্ট্রি কথাটা বাদ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে কপালই সব।

এরা নিজেরা এক পয়সা বার করবে না; এক পয়সা বার করবার অবস্থাও এদের অনেকেরই নয়। এরা আসলে দালাল। শিকার ধরে; শিকার খুঁজে বেড়ায়। যারা নোট ডবল করে দেব বলে লোক ঠকায় তাদের কারুর চেয়ে এরা কম যায় না। নোট ডবল করে দেওয়ার দল স্বভাব-অপরাধী; অর্থাৎ জন্ম-অপরাধী নয় এদের অনেকেই। কিন্তু যারা টলিলডের দালাল তারা স্বভাব-অপরাধী। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে এই যে এরা লোকের পর লোক পায়ও। লোক নয় গরু। এবং দালালদের মধ্যে যারা হিন্দু তাদের টলিউডে এই রকম 'গো'-বধে আপত্তি কম; উৎসাহ বেশি।

টলিউডে অনাদিকাল থেকে এই রকম কামধেনু যে পাওয়া যাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে লোহা, কয়লা, চা, পাট, কাপড় যারই ব্যবসা করতে যায় তার সম্বন্ধে কিছু জেনে অথবা জানবার চেষ্টা করে তবে লোকে নামে। কিন্তু ফিল্মের ব্যবসায় বোধ হয় কিছুই জানবার দরকার হয় না। অনেকটা সাহিত্যের ওপর যেমন যে কেউ মত দিতে পারে; ওকালতি-ডাক্তারী বিজ্ঞান,—এ সম্বন্ধে যে কেউ যা কিছু বলতে ভয় পায়; গল্প-উপন্যাস-কবিতা, এ ব্যাপারে কারুরই কিছু বলতে বাধা নেই। 'আমার মনে হয়'—বলে ক্ল্যাসিক্যাল গান শুনে না বুঝে তাল দেওয়া মত মাথা নেড়ে যায়। ফিল্ম-ব্যবসা যে ব্যবসা নয়; রাতারাতি বড়লোক হবার রাস্তা মাত্র আজও।

আর এই অজ্ঞতারই সুযোগ নেয় টলিউডের দালালরা; তা বোঝায় ছবি আরম্ভ করে দিলেই পরিবেশক দৌড়ে আসবে, অগ্রি টাকা; মফঃস্বলের প্রদর্শক আসবে তার সঙ্গে সঙ্গেই। ছবি রিলি হবার পর 'হিট' করলেই টাকা ঘরে আসতে আর কতক্ষণ। এর মধ্যে সব হিসেবই মেলে। মেলে না,- শুধু 'হিট' করা টুকু; ঠিকে ভু থেকে যায়। ফলে টাকা আর ঘরে আসে না; মাথা ঘুরতে থা সেই যথা সর্বস্ব, বাড়ী, গাড়ী, গয়না খোয়ানো হুণ্ডী ধরা প্রযোজকের। বছরে এই রকম কত ছবি হিট করা দূরে থাক, রিলিজই হয় না, রিলিজ দূরে থাক অসম্পূর্ণ থেকে যায়, আধা সিকি তোলা কত ছবি যে দিনের আলোর মুখ দেখতে পায় না, সিকেয় তোলা থাকে, তার খবর রাখে কে? যেই রাখুন, ফি খবর কাগজ সে খবর রাখলেও দেয় না, বিশুদ্ধ জাতীয়তার সংবাদপত্র যেমন আজকে কংগ্রেসের খবর খারাপ হলে চেপে যায়; করে না।

তবুও যে fool এর অভাব হয় না টলিউডে, তার ক টলিউডের ফুল শুধু ফুল নয়; এরা হচ্ছে বিউটি-fool! রূপের রূপো গেলে এরা নিজেদের দোষ দেখে না; বলে কপালের দোষ।

[ক্রমশঃ

ভাওয়াইয়া গান

উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের মধ্যে ভাওয়াইয়া ও চটকা গান সুপ্রসিদ্ধ। ভাওয়াইয়া কথাটির উৎপত্তি ভাব হইতে ; ভাবের গান বলিয়াই এই শ্রেণীর গানের নাম 'ভাওয়াইয়া'। এই গানের সঙ্গে দোতারার বাদ্যসঙ্গত যেন কতকটা অপরিহার্য, তাই কোন কোন অঞ্চলে এই গানের আর এক নাম 'দোতারা-গান'।

নদীবহুল পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে ভাওয়ালিয়া বা 'ভাউলে' নামে এক শ্রেণীর ছোট নৌকা আছে, প্রেমিক নিশিযোগে 'ভাউলে' বাহিয়া প্রেমিকার অভিসারে যায় বলিয়া একটি লোকপ্রসিদ্ধি আছে। প্রেমের এই শ্রেণীর গানের নাম 'ভাওয়ালিয়া' বা 'ভাওয়াইয়া'-ও হইতে পারে।

হিন্দী উচ্চাঙ্গের নৃত্য-সঙ্গীতেও 'ভাও-বাতলান' নামক ভাব প্রদর্শনের একটি প্রথা আছে। এই গানে অনুরূপ ভাববৈচিত্র্য দেখানো হয় বলিয়া ভাওয়াইয়া হওয়াও অসম্ভব নয়।

এই গানে এমন একটা বিরহের ঔদাস্যের ও অতৃপ্তির কারুণ্য-মিশ্রিত সুর আছে যে, সহজেই এগুলি মনকে উন্মনা করিয়া দেয়। দেহ অন্ধকার করিয়া জীবনের বাতি নিবাইয়া একদিন চলিয়া যাইতে হইবে, ক্রন্দনের করুণতর সুরে তাহারই ধ্বনি বাজিয়া উঠে—

ও কি রে মনসুয়া,
একদিন ছাড়িয়া যাবু দেহ আন্ধার করিয়া (রে)।
জোড়া নৌকা, জোড়া বৈঠা মন
জোড়া বাতি রে এ' জ্বলে ;
(ও) তোর দেহের বাতি নিবিয়া গেলে মন,
কে জ্বালাবে বাতি রে মনসুয়া।

ভাটিয়ালী ও ভাওয়াইয়ার নামের সৌসাদৃশ্যের ন্যায় গীতি-রীতিরও কতকটা সাদৃশ্য আছে। তবে ভাটিয়ালী গাওয়া হয় টানা সুরে, কিন্তু এই গানগুলির সুর বেশ কাটা-কাটা। গায়কের কণ্ঠের চাতুর্য না থাকিলেও এগুলি গাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া, ভাওয়াইয়ার নিজস্ব সঙ্গতযন্ত্র দোতারার বাজনা বাউলের একতারার ন্যায় এগুলির মধ্যে বিশিষ্ট ছন্দোবৈচিত্র্যের সঞ্চার করে।

পূর্ববঙ্গে সারি ও ভাটিয়ালী গানের সঙ্গেও অনেক সময়ে যে দোতারা বাজানো হয়, ভাওয়াইয়া গানের দোতারা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। উত্তরবঙ্গের দোতারার কাঠামো ও ইহার বাজরীতি ভিন্ন প্রকার। মেচ উপজাতির বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের কতকটা সংস্কারিত রূপ এই দোতারা। ভাওয়াইয়া গানের সুরের সঙ্গে মেচ ও পোলিয়া আদিবাসীদের প্রেমগীতির সুরেরও বেশ মিল আছে।

উত্তরবঙ্গের উচ্চভূমির সানুদেশকে বলে 'বাহে অঞ্চল'—এই অঞ্চলের কথ্যভাষাতেই সাধারণত ভাওয়াইয়া গান রচিত। এ যেন গানেরই ভাষা—শব্দগুলি যেমন মধুর, তেমনই ভাবব্যঞ্জক।

ভাওয়াইয়া গান এই অঞ্চলের অধিবাসী বাউদিয়া সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট গান—

(আরে ও) ও ভাবের দোতারা,
নবীন বয়সে মোক করলি রে বাউদিয়া
(আরে ও) মরি হায় রে হায়!
যখন দোতারা নিলাম হাতে,
নিষত ক'রে মোকে পাড়ার লোকে
নিষত, ক'রে মোকে দয়াল বাপ-ভাই।
তোর জন্য মোর গেরামবাদী, আনাত দেয় ইজহারী।
(আজ) তুই দোতারা রাখিস মান,
রূপা দিয়া মই বান্ধবো-রে কান
নয়া গাছের মাণিক রে কথা।

দোতারা বাদ্যযন্ত্রই প্রেমের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে, মিলন সম্ভাবনায় বাজনার কান বাঁধিবার আগ্রহ রসেরই ইঙ্গিত!

এই বাউদিয়া সম্প্রদায় এক শ্রেণীর বৈরাগী সম্প্রদায়। উত্তর-বঙ্গের কোচবিহার, দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলেই তাহারা বাস করে। বাউলদের ন্যায় ইহারাও ঘর-সংসারের বাঁধন বা সমাজ সংস্কার মানে না, ঘর বাঁধিয়া স্থায়িভাবে কোথাও বাস করে না, ভবঘুরেদের ন্যায় নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। বেদিয়া হইতে তাই তাহাদের নামও হইয়াছে বাউদিয়া।

হিন্দু, মুসলমান দুই ধর্মের লোকই এই সম্প্রদায়ে আছে। বাউলদের ন্যায় দুই বিভিন্নমুখী সংস্কৃতির মিলিত ধারায় তাহারা আপ্লাত। তবে বাউলগানের ন্যায় ভাওয়াইয়া গান ভগবদভিমুখী নয়, ভাটিয়ালী গানের ন্যায় তাহাদের গানও লৌকিক বিরহ-বিচ্ছেদ লইয়াই রচিত—

প্রেমের আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি
(মুই সেন জান)
বন্ধুর ঘরে প্রেম করা ভালো,
কেইন্দে কেইন্দে চক্ষের জল
মোর হ'ল সায়া রে।
আরে ওই রকম, ওই নারীর প্রাণ সদাই ঝরে রে।
চন্দ্রসূর্য যাচ্ছে জ্বলিয়া রে,
আরে ওই রকম, ওই নারীর প্রাণ সদাই ঝরে রে।

রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমকাহিনী তাহাদের কণ্ঠে মধুরতর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যেমন, রঙপুর হইতে সংগৃহীত তাহাদের গানে আছে—"তোমার ও আমার মাঝখানে বিচ্ছেদের নদী বয়ে যাচ্ছে এ নদী পার হওয়ার শক্তি আমার নেই, এমন কি কোন সখাও নেই যে আমাকে পার ক'রে দেবে!"

মোক যদি কবিতো রে পার
দান করিতাম গলার হার,
পার হইয়া (বন্ধু রে) যৈবন করতাম দান রে।
উ-পারৎ বন্ধুর বাড়ী, ই-পারৎ মুই নারী
মধ্যে বয় চিরল নদীর ধারা ॥
অকূল দরিয়া আমি ক্যামনে হই পার রে।
আমি বালুৎ আছিনু, আমি বালুৎ বাড়িনু :
জলৎ ভাসাই দিলাম হাঁড়ি রে ॥

রঙপুরের অনেক ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে বেশ কবিত্বমণ্ডিত সুভাষিতাবলীও আছে; প্রেমিক নাগর অবিশ্রাম বর্ষণে আঙ্গিনায় ভিজিতেছে, কক্ষের মধ্যে নায়িকাও তাহার সঙ্গে সমানে অশ্রুবর্ষণ করিয়া চলিতেছে—

বারি পড়ে রিমিঝিমি বাইরে ভিজে তুম।
ছন্‌ছাত (ঘরের ছাঁইচে) ভিজে পরার (পরের)
বেটা এটা বড় দুখ।
ছনছাত কেনে ভিজ বে বন্ধু, ছনছাত কেনে ভিজ।
কান্‌ছিত (খিড়কি) আছে মানের ডেরা (পাতা)
কাটিয়া মাথায় ধর ॥

পূর্ববঙ্গের অন্যান্য পল্লীসঙ্গীতের ন্যায় ভাওয়াইয়া গানেরও আঞ্চলিক বিশিষ্ট উচ্চারণ এগুলিকে একটি বিশিষ্ট মাধুর্য দান করে। ভাওয়াইয়া গানের এই বিশিষ্ট ভাষার সম্পর্কে শ্রীযতীন্দ্র সেন বলিয়াছেন—"বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই প্রাচীন লোকসাহিত্যের প্রাসাদ গাঁথিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্ত লোকসাহিত্যের ভাষা বাঙলার বট, বকুল ও বেতসকুঞ্জের শ্যামল পত্রান্তরালবর্তী বিহগের কাকলীর মতই সহজাত, স্বাভাবিক ও সুন্দর।"

গানগুলি পুরুষদের কণ্ঠে গীত হইলেও ভাওয়াইয়া গানের অধিকাংশের মধ্যেই নারীজীবনের নৈরাশ্য ও প্রেমার্তি নারীদের জবানীতেই ধ্বনিত হইয়াছে—

বক্ষ বইয়া পড়ে নারীর ঘাম রে।
যে জন বঁধুয়া হবে, ঘাম মুছিয়া কোলে লবে;
বক্ষ বইয়া পড়ে নারীর ঘাম রে ॥

বাঙলার পুরুষদের বেদনার তুলনায় নারীদের বেদনাই সাহিত্যের উপজীব্য হিসাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে পল্লীসঙ্গীতের আলোচক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন—"ভাওয়াইয়া গানের মধ্যেই নারীমনের নিরাশার (frustration) সুর ধ্বনিত হইয়াছে, আকাঙ্ক্ষিত বস্তু না পাওয়ার মধ্য দিয়াই নর-নারীর মনের সূক্ষ্মতম ভাবগুলি বিকাশ লাভ করে; পাওয়ার মধ্যে যে পূর্ণতা আছে, তাহা দ্বারা হৃদয়ের সূক্ষ্মতম ভাবগুলি আচ্ছন্ন হইয়া যায়—সেইজন্য প্রাণে যেখানে রিক্ততার বেদনা জাগে, সেখানেই মধুরতম সঙ্গীত জন্মলাভ করে। ভাওয়াইয়া গানও এই রিক্ততার বেদনায় মধুর হইয়া উঠে।"

ভাওয়াইয়া গানের মূল উপজীব্য এই কারুণ্যরস। এই সুরের মধ্যে উন্মাদনার সঙ্গে আকুলতাও মিশ্রিত আছে, যেমন—

ওরে জীবন, ছাড়িয়ে না যাস মোরে।
ওরে জীবন, ছাড়িয়া গেলে আদর করবে কে মনরারে।
ভাই বল, ভাতিজা বল রে সম্পত্তির ভাগী,
আগে করবে রে ধনের আশা পিছে করবে গতি ॥

ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে বৈরাগ্যের সুরটি প্রকট। সংসারের শত বন্ধন হইতে মুক্তির প্রয়াসী গায়কের কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠে—

আমার হাড় কালা হইল রে অন্তর কালার লাগি;
অন্তরকালা হইল রে মোর অন্তর পরবাসে।
(ও মন রে) হাড় হইল জড়সড় মোর অন্তর হইল গুঁড়া রে
পিরিতি ভাঙাইয়া যাইলে আর না লাগে জোড়া রে ॥

ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে দেহাত্মকতা ছাড়া তান্ত্রিক ভাবেরও কিছু প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে; রামপ্রসাদের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়, যখন শোনা যায়—

আপন কর্মদোষে সব হারালি দোষ দিলি তুই কারে।
মন রে ইঙ্গলা পিঙ্গলার ঘর,
ঘুমে করেছে জড়জড়
খন্দে পড়ল তোর বত্রিশ বান্ধনের জোড়া ॥
মন রে পুবান পচ্ছিমে বাও
রাধাকৃষ্ণের ভাঙা নাও
ঠমকে ঠমকে ওঠে পানি ॥

এই শ্রেণীর গানের গীতিরীতির মধ্যে ভাটিয়ালী ও পাহাড়ী উপজাতীয়দের রীতি সম্মিলিত হইয়া একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

ভাওয়াইয়া গানের গীতি-রীতি সম্পর্কে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—"সুরের দিক থেকে লোকসঙ্গীত রাগরাগিণীর বাঁধন

সঙ্গীতের বিশেষত্ব। ভাওয়াইয়ার সুর টানা সুর, তবে গাওয়ার পদ্ধতিতে মাঝে মাঝে গলাটাকে ভেঙে নিয়ে একটানা সুরের মাঝে যেন একটু একটু থমকা দেওয়া হয়।"

—শ্রীজয়দেব রায়।

রেকর্ড-পরিচয়

হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82728—কুমারী আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া "ও গুণের নাইয়ারে" ও "আমার শ্যাম শুকপাখী"—দু'খানি অনবদ্য পল্লীগীতি।

N 82732—সতীনাথ মুখোপাধ্যায় "কোথা তুমি ঘনশ্যাম" (রাগ-নন্দকোষ) ও "ওগো শ্যাম মিনতি তোমায়" (কাফি-ঠুংরী)—রাগপ্রধান এ গান দু'খানি বিশুদ্ধতায় নিখুঁত।
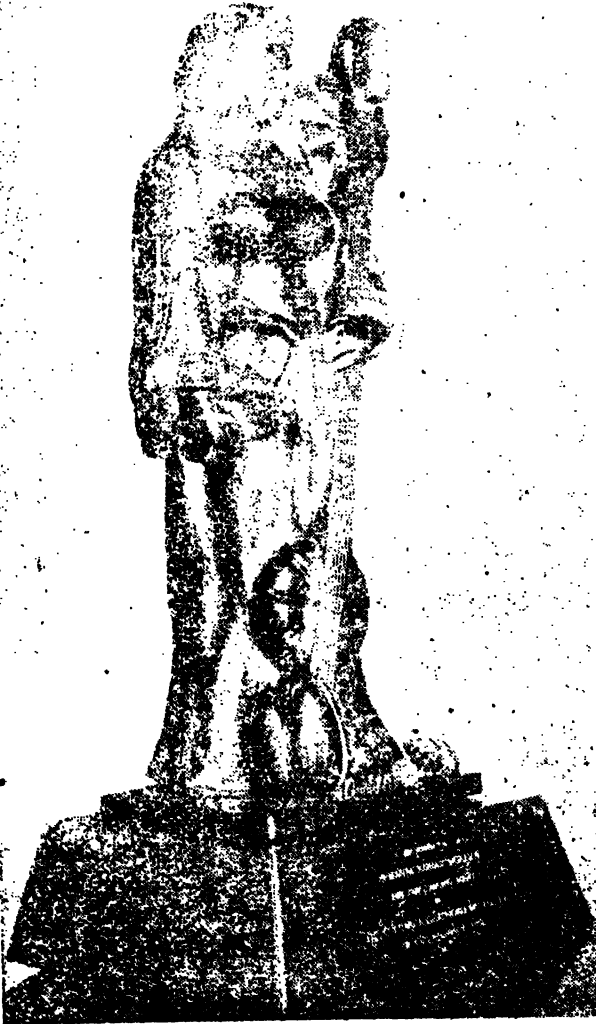
কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী কর্তৃক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে উপহৃত ব্রোঞ্জের সরস্বতী মূর্তি। কুমার রবীন রায় এই মূর্তি

N 82733—শ্রীমতী উৎপলা সেন "সপ্তরঙের খেলা আকাশ-পারে" ও "রাঙামাটির পাহাড়ে চাঁদ উঠেছে" আবেগমধুর আধুনিক গান।

N 82734—শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের দু'খানি আধুনিক গান "একা মোর গানের তরী" ও "কে তুমি বসি"—শিল্পীর সার্থক সৃষ্টি।

কলম্বিয়া

GE 24829—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় "মেঘ কালো আঁধার কালো" ও "খিন্ কেটে খিন্" আধুনিক ও পল্লীগীতি—সম্পূর্ণ নতুন ধরণের গান।

GE 24830—কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় "নন্দন বন হতে" এবং "বাজে ঝন্ ঝন্"—শিল্পীর দরদী কণ্ঠের ধর্মমূলক ও ভজন গান।

GE 24831—দীপক মৈত্র "এতো নয় শুধু গান" ও "কত কথা হলো বলা" পরলোকগত শিল্পী দীপক মৈত্রের এইটাই প্রথম ও শেষ রেকর্ড—সংগ্রহে রাখবার উপযুক্ত গান।

"শেষ পরিচয়" বাণীচিত্রের চারখানি গান রেকর্ড করেছেন—ভারতের প্রিয় শিল্পী লতা মঙ্গেশকর GE 30349 এবং GE 30350 রেকর্ডে।

GE 30351 রেকর্ডে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় "শেষ পরিচয়" বাণীচিত্রের "আমার আকাশ মেঘলা" ও "পথ হারানো তেপান্তরে"—গান দু'খানি পরিবেশন করেছেন।

GE 24820-22, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার শিল্পিবৃন্দ অভিনীত ও গীত রেকর্ড নাটিকা "অন্নপূর্ণার আসন"—অধিনায়ক পঙ্কজ মল্লিক। এ ছাড়াও লোকরঞ্জন শাখার 'যুগবন্দনা' ধারায় GE 24823, GE 24824, GE 24828 এবং পল্লীগীতিতে GE 24825, GE 24826, GE 24827 রেকর্ডে যে নতুন ধারা প্রচারিত হয়েছে, তা সুন্দর! সব গুলিতেই সুর দিয়েছেন বাংলার প্রিয় শিল্পী ও সুরকার—পঙ্কজকুমার।

GE 24819—দীর্ঘ দিন পরে কুমার প্রদ্যোৎনারায়ণের ক[ণ্ঠে] দু'খানি সুন্দর পল্লীগীতি—"মনে লয় মোর" এবং "সুরধুনীর তীরে"।

"নবজন্ম" বাণীচিত্রের দু'খানি জনপ্রিয় গান "আমি আড়[ু] কাটিয়া" ও "ওরে মন মাঝি"—গেয়েছেন যথাক্রমে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় GE 30348 রেকর্ডে।

আমার কথা (২৬)

শান্তিদেব ঘোষ

পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার এক গ্রামে ১৩১০ সালে জন্মগ্রহণ ক[রে] শান্তিদেব মাস ছয়েক পরেই শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। পি[তা] কালীমোহন ঘোষ তখন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকে[তনে] বিদ্যালয় গঠনের কাজে নিযুক্ত। অতি শৈশবেই শান্তিদে[বের] স্বাভাবিক সংগীত-ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের মনোযো[গ] আকর্ষণ করে। ছোটবেলা থেকেই বালকদলের সংগীত-নৃত্যোৎ[সবে] শান্তিদেব কেন্দ্রস্থলে আসীন। রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের শিক্ষক[তায়] শান্তিদেবের সংগীত-পারদর্শিতা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। মাত্র কুড়ি ব[ছর] বয়সেই তিনি শান্তিনিকেতনের সংগীত-শিক্ষক নিযুক্ত [হন এবং] রবীন্দ্র সঙ্গীতের কাণ্ডারী পদ লাভ করেন। শৈশব থেকেই শান্তিদে[ব]

নৃত্য ও অভিনয়েও স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। শান্তিনিকেতনের নৃত্য-আন্দোলনের প্রথম যুগে বীরভূমের বিভিন্ন গ্রামে ও মেলায় ঘুরে ঘুরে শান্তিদেব বাউল, রায়বেঁশে প্রভৃতি লোকনৃত্য আয়ত্ত করেন।

সে যুগের বসন্তোৎসবের দিন দিনেন্দ্রনাথ আশ্রমের সবাইকে নিয়ে আম্রকুঞ্জে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গান গেয়ে চলতেন, তার সঙ্গে শান্তিদেবের গান ও অবিশ্রাম নৃত্য-উৎসব মাতিয়ে তুলত। কখনও কখনও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও সে আনন্দ-আসরে টেনে আনত। সেই সময়েই শান্তিদেবের নৃত্যক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথ তখন নৃত্যের মাধ্যমে নিজের শিল্প-প্রতিভার আরেক মহৎ বিকাশের সম্ভাবনা দেখেছেন—তাঁর নাটকে, আশ্রমের উৎসবে, নৃত্যের প্রাধান্য ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। তাঁর নৃত্য-নাট্যের বিকাশ ও প্রয়োজনায় একই সঙ্গে সংগীত ও নৃত্যাভিনয়ে সমান পারদর্শী একজন সহকারীর প্রয়োজন তিনি অনুভব করছিলেন। শান্তিদেবের মধ্যে সেই সম্ভাবনা রয়েছে দেখে তাঁকে তিনি দাক্ষিণাত্যে, মণিপুরে পাঠান কথাকলি, মণিপুরী প্রভৃতি নাচ শিখে আসতে। শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারায় কথাকলির প্রচলন শান্তিদেবের হাতেই।

১৯৩১ সালে কেরলা কলামণ্ডলম্ থেকে তিনি কথাকলি শিখে আসেন। "রবীন্দ্র-জীবনী"তে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৩১-র গীতোৎসব অভিনয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "এবারকার এই নৃত্যাভিনয়ে কথাকলি নাচের প্রবর্তন করেন শান্তিদেব।" (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৩) তারপর ক্রমশঃ নবীন, শাপমোচন, তাসের দেশ, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা প্রভৃতি রচিত হয়ে চলল, তাতে শান্তিদেব কবির পরিচালনায় তাঁর শিক্ষা ও সংগীতকে স্বয়ং অভিনয় করে, অন্যদের শিখিয়ে রূপ দিয়ে চললেন। রবীন্দ্রনাথ যখনই কোনো নৃত্য-নাট্য রচনার বা পুনরভিনয়ের প্রেরণা পেয়েছেন তখনই তার রূপ-বৈচিত্র্য ঘটাবার জন্য শান্তিদেবকে ভারত বা ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশে পাঠিয়েছেন নতুন নৃত্যপদ্ধতি সংগ্রহ করে আনতে। ১৯৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথ "শাপমোচন" নিয়ে সিংহলে যান। শান্তিদেব ছিলেন তার প্রধান শিল্পী। সিংহলের ক্যাণ্ডিনৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তার চর্চায় শান্তিদেবকে ১৯৩৬ সালে আবার সিংহলে পাঠান। ভারতীয় নৃত্যের আসরে আজ এই ঐশ্বর্যপূর্ণ নৃত্যধারা স্থায়ী আসন করে নিতে চলেছে। এই মিলনের পথিকৃৎ শান্তিদেব আর তা রবীন্দ্রনাথের উৎসাহেই সম্ভব হয়েছে। ১৯৩৬ সালে চিত্রাঙ্গদা ও পরিশোধ (শ্যামা) রচিত ও কলিকাতায় অভিনীত হয়। শান্তিদেবের ভার ছিল রচয়িতার নির্দেশানুযায়ী সঙ্গীত ও নৃত্য পরিচালনার।

১৯৩৭ সালে শান্তিদেব বর্মা দেশে যান রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও ভারতীয় নৃত্য শেখাতে এবং সে-দেশের বিখ্যাত রামাপোয়ে নৃত্যের পরিচয় বহন করে আনতে। ১৯৩৮ সালে শান্তিদেব বিশ্বভারতীর সঙ্গীত-ভবনের পরিচালক নিযুক্ত হন। সেই বছরেই কেরলা গিয়ে কথাকলির চর্চা করেন, পরে সিংহলে যান ক্যাণ্ডিনৃত্য চর্চায় ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং ভারতীয় নৃত্যের প্রচারে। সিংহল থেকে ফিরে এলে সুরু হয়, রবীন্দ্রনাথের নবরচিত নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার মহড়া। এর পর ১৯৩৯ সালে শান্তিদেব আবার বর্মা হয়ে জাভা ও বলিদ্বীপে যান পূর্ব-এশিয়ার নৃত্যনাট্য ও সঙ্গীতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও ভারতীয় নৃত্যকলার প্রচারে। জাভা ও বলিদ্বীপের নৃত্যের অলঙ্করণ-গুণ রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য বাড়াতে সক্ষম, একথা শান্তিদেব উপলব্ধি করেছিলেন। তাই স্বচেষ্টায় পূর্ব দ্বীপবর্তী নৃত্যের সুন্দর ভঙ্গী সংগ্রহ করে এনে রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের রূপ, বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যের আরও সমৃদ্ধি ঘটালেন। ভারতীয় নৃত্যকলার পূর্বসাগরের এই অর্ঘ্যদান শান্তিদেবের আগ্রহেই সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যকলার বিকাশে শান্তিদেব ছিলেন কবির দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ। ১৯৩৫ সালে দিনেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ত্যাগের পর থেকেই যুগপৎ সংগীত ও অভিনয় ও নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে শান্তিদেবের সাধনা রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে বড় সহায় হয়। শান্তিদেবের প্রতি কবির স্নেহসূচক "সুরসেন," "নটরাজ" প্রভৃতি সম্বোধনে তার স্বীকৃতি রয়ে গেছে।

শান্তিদেব শুধু সংগীত, নৃত্য ও নাট্যের বড় শিল্পী ও শিক্ষকই নন, এ বিষয়ে তাঁর গবেষণাও সুধীসমাজে শ্রদ্ধার্জন করেছে। সংগীত ও নৃত্যাভিনয়ে শিক্ষকতা, প্রযোজনা এবং চর্চার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৩৩ সাল থেকে শান্তিদেব রবীন্দ্র তথা ভারতীয় সংগীত, নৃত্য ও নাট্য বিষয়ে গবেষণা করে চলেছেন। তাঁর "রবীন্দ্রসঙ্গীত" বইটি রবীন্দ্রনাথের সংগীত-প্রতিভার একমাত্র প্রামাণিক সুলিখিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা পড়ে কবি বলেছিলেন,

"তোর এই লেখাটি পড়ে মনে পড়ে গেল আমার অনেক দিনের কথা···আমার গান তখন অবজ্ঞার এমন কি বিদ্রূপের বিষয় ছিল কিন্তু আমার জীবন ছিল রসে পূর্ণ, সেই কথা মনে করিয়ে দিল তোর এই লেখা—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পড়া শেষ করলুম।"

—রবীন্দ্রনাথ। ২১।১।৪১

শান্তিদেব ঘোষ

তাঁর দ্বিতীয় বই "জাভা ও বলির নৃত্যগীত" আমাদের দেশে ভারতের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সংস্কৃতি বিষয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। সম্প্রতি "রূপকার নন্দলাল" এবং "ভারতীয় গ্রামীন সংস্কৃতি" নামে তাঁর আরও দুটি বই প্রকাশিত হয়ে কর্মী ও চিন্তাশীলদের অভিনন্দন অর্জন করেছে। বর্তমানে তিনি নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনায় রত। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর আরো একটি বই অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়।

সুরকার হিসেবে কাজ করবার সময় তিনি বেশী পান নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদিকেও তাঁর ক্ষমতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের "হে মোর দুর্ভাগা দেশ" কবিতাটিতে সুর যোজনা করে। গানটি বাংলার খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী শ্রীপঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে গীত হয়েছে H. M. V. রেকর্ডে। শান্তিদেব শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটকের গানে সুর যোজনা করেন এবং সেই গান সমেত শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা নাটকটির অভিনয়ও করেছেন। এক সময়ে কবি নিশিকান্তের অনুরোধে তাঁর অনেকগুলি হাসির গানের সুরও তিনি দিয়েছিলেন। সুরকার হিসেবে শান্তিদেবের সব চেয়ে বড় কাজ হলো শ্রীক্ষিতীশ রায় লিখিত শিশুনাট্য "কুড়ুনীকাব্য" নাটিকাটিকে সম্পূর্ণভাবে সুর যোজনার দ্বারা গীতিনাট্যে রূপান্তরিত করে অভিনয় করানো। এই গীতনাটিকাটি গত মহাযুদ্ধের সময় কলিকাতার খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পীদের দ্বারা বর্তমান Elite নামে খ্যাত রঙ্গমঞ্চে নৃত্যনাট্য-রূপে বহু দিন অভিনীত হয়। মাস কয়েক হলো কলিকাতার বেতার কেন্দ্র থেকে তা পুনঃপ্রচারিত হয়েছে শিশুশিল্পীদের দ্বারা।

তাঁর শিল্প ও গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বভারতীর বাইরেও শান্তিদেবের নানা কাজে ডাক পড়েছে। ১৯৪৭ সালে বোম্বাইয়ে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনে সঙ্গীত শাখার সভাপতিরূপে তিনি আমন্ত্রিত হন। পরের বছর জয়পুরের জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের ভারতীয় লোকনৃত্য, গীত ও অভিনয়ের ব্যবস্থাপক-মণ্ডলীর তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫১ সালে কলম্বো সহরে যে কলম্বো প্ল্যান প্রদর্শনী হয় শান্তিদেব তার প্রাচ্যসঙ্গীত ও শিল্পশাখার সদস্য পদে আহূত হন। প্রজাতন্ত্র দিবসোপলক্ষে প্রতি বার নয়াদিল্লীতে যে জাতীয় লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা হয় ১৯৫৪-৫৫ এবং ৫৭ সালে শান্তিদেব তার বিচারক হন। এ ছাড়াও অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো কলিকাতা শাখার পরিকল্পনা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত পাঠসমিতি, দিল্লীর সঙ্গীতনাটক আকাডামির পুস্তক প্রকাশ সমিতির সদস্য পদে তাঁর সাহায্য কামনা করা হয়।

১৯৫৬ সালে ভারতীয় সঙ্গীত-নাটক আকাডামি কর্তৃক অনুষ্ঠিত সংগীতালোচনা সভাতেও তিনি যোগ দেন ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই বছরেই ভারত-সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রণালয় তাঁকে ভারতের সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের জন্যে নৃত্যবিষয়ক উপসমিতির আহ্বায়ক নিযুক্ত করেন। গত ১৫ বৎসর যাবৎ বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী দল নিয়ে কলিকাতা ও বাংলার বাইরে রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান করিয়েছেন।

১৯৫৬ সালে যে সাংস্কৃতিক দল পূর্ব-পাকিস্থানে যায় শান্তিদেব তার নেতৃত্ব করেন এবং তাঁর পরিচালনায় বিশ্বভারতীর ঢাকায় শ্যামার অভিনয় করেন।

বর্তমানে শান্তিদেব বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও নৃত্যবিভাগের প্রধানরূপে নিযুক্ত এবং রবীন্দ্রনাথের সংগীত, নৃত্য রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়ের সাধনা ও গবেষণায় ব্যাপৃত এবং একই সঙ্গে এ সবের শিক্ষকরূপেও কাজ করে যাচ্ছেন অবিশ্রান্ত ভাবে। এই কাজে তাঁর প্রেরণার উৎস হল মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের এই কামনা-জ্ঞাপন—

"কেবল দুটি উপদেশ আমার আছে। এই আশ্রমেই তুই মানুষ। সিনেমা প্রভৃতির সংস্পর্শে কোন গুরুতর লোভেও নিজেকে যদি অশুচি করিস, তাহলে আমার প্রতি ও আশ্রমের প্রতি অসম্মানের কলঙ্ক দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়, আমার গানের সঞ্চয় তোর কাছে আছে—বিশুদ্ধ ভাবে সে গানের প্রচার করা তোর কর্তব্য হবে। আমি তোর পিতার পিতৃতুল্য, আশা করি আমার উপদেশ মনে রাখবি।" ইতি ২১।১।৪১

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ

ফাল্গুনী

সন্তোষ চক্রবর্ত্তী

এবারেও ফাল্গুন এলো।
তোমার কুন্তলে কতো রজনী-গন্ধা;
সুবাসের ঢেউ এলোমেলো;
বাসনা রোপণ করে সেই তারা—সেই বাসনার।

এবারেও ফাল্গুন যাবে।
তোমার সন্ধ্যায় কতো নিশি-অপেক্ষার
স্মৃতিগুলি বেদনা জাগাবে।
জীবনকাঠির মতো দু'টি কথা—সেই দু'জনার।

বাংলা বইয়ের বাজার

পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর মতই পুস্তকও কারও কাছে প্রয়োজন, কারও কাছে আরাম ও কারও কাছে বিলাস। আবার কারও কাছে বা সব কয়েকটাই। প্রয়োজন বলা চলে তার, যে বই থেকে জ্ঞানার্জ্জন করতে চায়। আরাম, যার পক্ষে বই পড়া শুধু সময় কাটাবার জন্ত। আর বিলাস, যিনি বাড়ীতে আসবাব রাখবার মত বইও রাখেন কখনো শুধু নিজের অহমিকাকে তুষ্ট করতে, কখনো গৃহসজ্জারূপে। এই তিন দল ছাড়া আর একটি দল আছেন যাঁরা পুস্তক-রসিক, কলা-রসিকের মত এঁরা বইয়ের সমঝদার।

বর্ত্তমান যুগের এই সহজ মুদ্রণের দিনে বই মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। এত জড়িত যে, খোঁজ করলে এমন নিতান্ত অশিক্ষিতেরও ঘর পাওয়া যাবে না যেখানে একখানা কোন না কোন বই নেই।

বাঙ্গালীর প্রধানতম কৃষ্টি ও কৃতিত্ব তার সাহিত্য। ভারতের অন্যান্য স্থানের ঐতিহ্যে তার শিল্প আছে, সঙ্গীত আছে। নৃত্য আছে কিন্তু সাহিত্য বলতে প্রাচীন কিছু থাকলেও বর্ত্তমান বলতে এখন বিশেষ কিছু নেই। তবুও বিদেশী সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্য আজও নিতান্তই শিশু, তবু তার যে দ্রুত উন্নতি হচ্ছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। সাহিত্যেরও দুটি দিক আছে, একটি তার সৃষ্টি আর একটি ব্যবহার অর্থাৎ একটি কারখানা আর একটি বাজার।

বিয়ের বাজারের বরের মত বইয়ের বাজারেও একটি মূল্যায়ন আছে। সেই জন্ত বইয়ের ছাপা বাঁধাই ও অন্যান্য গুণাগুণও দেখতে হয়, শুধু সাহিত্যিক প্রতিভার উপরেই বই চলে না, যদিও সেটাই তার প্রধান গুণ। বাংলা বইয়ের সেদিক থেকে বর্ত্তমানে অত্যন্ত উন্নতি হয়েছে। বাংলা বইয়ের রূপসজ্জা, চিত্রায়ন, মুদ্রণ দেখবার মত। কিন্তু মনে হয় একটি বৃহৎ ত্রুটি বাংলা বইতে বহুদিন থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং এখনও মাথা চাড়িয়ে রয়েছে, তা বাংলা বইয়ের বোর্ডবাঁধাই। এই বোর্ডবাঁধাই করা মলাট বই পড়া আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ছিঁড়তে আরম্ভ করে এবং ছ'মাস এক বছরের মধ্যেই মলাটখানি সম্পূর্ণ খুলে যায়। প্রথম দু'-চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই তার পেছনের মেরুদণ্ডটি খুলে আসে। অমন সুন্দর একখানি প্রচ্ছদপট যখন অমনি ভাবে নষ্ট হয়ে যায় বলে তা' যে কোন পুস্তকপ্রিয়ের পক্ষেই অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক!

পুস্তক জিনিষটা শুধু পড়ে ফেলে দেবার জন্ত নয়। ওটি ঘরে রাখবার জন্তও—কারণ বই ঘরে না জমলে জাতির কৃষ্টি বাড়েও না, স্থায়ীও হয় না। সেদিক থেকে বর্ত্তমান বাংলা বইয়ের যে অনেকগুলিই স্থায়ী হয় না সেকথা নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায়। কারণ, সব মানুষই ত' আর বই ছিঁড়ে যাবার পর আবার বাঁধিয়ে এনে ঘরে রেখে দেবার মত তৎপর নয়? প্রায় বার আনা বাংলা বই-ই বর্ত্তমানে সম্ভবতঃ এই ভাবে নষ্ট হয়ে যায়। স্বীকার করি, যাঁরা বই বিক্রয় করেন তাঁরা ব্যবসা করতেই বসেছেন, পরোপকার করতে বসেন নি। তা' হলেও বলব যে তাঁরা যে দাম নেন (বাংলা বই বর্ত্তমানে অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য) তাতে ওর চাইতে ভাল বাঁধাই দেওয়া চলতে পারে। তাঁরা যদি মনে করেন তাতে তাঁদের লাভ থাকে না, তা হলে মূল্য তাঁরা বৃদ্ধিও করতে পারেন। যদি দু'রকম বাঁধাই-ই দেওয়া যায় দেশের মানুষ ভাল এবং স্থায়ী বাঁধাইটিরই মূল্যাধিক্য সত্ত্বেও, পৃষ্ঠপোষকতা করবেন বলেই মনে হয়। এ কথাও পুস্তক ব্যবসায়ীদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, তাঁরা প্রথমে বাঙ্গালী পরে ব্যবসাদার। বাংলার কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখা ও এগিয়ে দেওয়া সমস্ত বাঙ্গালীর মত তাঁদেরও কর্ত্তব্য।

আর বই দ্বিতীয় বার বাঁধানো যদি বা হয়ই তা' হলেও কয়েকটি জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে। প্রথম, দ্বিতীয় বার অর্থব্যয়, দ্বিতীয়, সময়ক্ষেপণ ও ঝঞ্ঝাট, তৃতীয়, বই বাঁধাতে গেলেই বাঁধাইওয়ালা বইটিকে কেটে একটু ছোট করে দেয়। যে কোন পুস্তকপ্রিয় ব্যক্তিই স্বীকার করবেন, তাতে পুস্তকের যথেষ্ট পরিমাণে রূপহানি হয়। বস্তুর চেহারা সম্বন্ধে যাঁরা একটু খুঁতখুঁতে তাঁদের পক্ষে তা অত্যন্ত মন খুঁতখুঁতের কারণ হয়ে ওঠে। অন্যান্য সমস্ত ব্যবসার মতই বইও যখন একটা ব্যবসা, তখন তার বাজারও একটু খতিয়ে দেখা যাক। বই কেনে কে? যার অক্ষর পরিচয় হয়েছে, আর যে ভাষার বই সেই দেশের লোক। বাংলা দেশ বর্ত্তমানে বড়ই ছোট হয়ে গেছে, যাতে করে তার বইয়ের বাজার অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পশ্চিমবাংলাকে বাদ দিয়ে বাংলা বই পড়ে কিছু পূর্ব্বপাকিস্থান, কিছু আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার লোক। আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা, বাংলার গায়ে-লাগা হওয়াতে ওখানকার অনেকেই বাংলা বলতে লিখতে পড়তে জানেন এবং বাঙ্গালীও ওখানে অনেক আছেন, যাদের ইচ্ছেয় অনিচ্ছেয় বই পড়তেই হয়।

আরও একটি প্রকাণ্ড বাজার আছে তা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়া বাঙ্গালী, এবং বাংলা-জানা অবাঙ্গালী। বাংলা-জানা অবাঙ্গালী যে সারা ভারতবর্ষে কত আছে তা হঠাৎ কল্পনা করা যায় না। বাংলা বলতে পারেন এরকম লোক ত' অজস্র আছেনই, বাংলা পড়তে ও লিখতে জানেন এরকম অবাঙ্গালীর সংখ্যাও কম নয়। এই বিরাট জনসমুদ্রকে বোধ করি বাংলার কোন পুস্তক ব্যবসায়ীই কোন দিন বাজিয়ে দেখবার চেষ্টা করেন নি। তারা বই কিনতে চায় কিন্তু জানে

না কোথায় পাওয়া যায়। আর তা জানলেও মানুষকে কোন জিনিষ কেনাতে হলে মাঝে মাঝে সেটা তাকে মনে করিয়ে দিতে হয়। যদিও বাংলা দেশে সমস্ত কাগজেই আজ-কাল বইয়ের বিজ্ঞাপন বিশেষ ভাবেই থাকে, বাংলার বাইরেও বিজ্ঞাপন মাঝে মাঝে যাবার দরকার। এবং সে বিজ্ঞাপন হতে হবে বাংলায়। একটি ইংরেজী বা হিন্দী বা মারাঠি বা তামিল বা তেলেগু কাগজে একখানা বাংলা বিজ্ঞাপন থাকলে যিনি বাংলা জানেন তিনি তা পড়বেনই। একটা জিনিষ বিচার করবার আছে যে তাদের ছাপাখানায় বাংলা হরফ নেই, তাই সে বিজ্ঞাপন অমনি না পাঠিয়ে পাঠাতে হবে আগাগোড়া ব্লক করে। সেই বিজ্ঞাপনের বিষয়ীভূত বস্তুও আগে থেকেই প্রকাশকের সঙ্গে বলে-কয়ে বন্দোবস্ত করতে হবে। কারণ যে ভাষা বিদেশের সম্পাদক বোঝে না তার বিষয়বস্তু তাকে না বুঝিয়ে দিলে সে তা ছাপাবে না। বিদেশবাসী বাঙ্গালীও স্থানীয় ইংরাজী পত্রপত্রিকা পড়ে থাকেন। এ ব্যবস্থা করলে তাঁরাও বর্ত্তমান অবস্থা থেকে বাংলা বইয়ের বেশী পৃষ্ঠপোষকতা করবেন। তাঁরা অনেক সময় জানেনই না বাংলা সাহিত্যের প্রগতি কোন পথে চলেছে বা বাংলায় নূতন কি বই বেরোলো।

আরও একটি অস্ত্র পুস্তক ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করতে পারেন, তা' প্রতিনিধির ব্যবহার। বাজারে যদি অঙ্গরাগ প্রতিষ্ঠান, ডাক্তারী প্রতিষ্ঠান, মোটর গাড়ী প্রতিষ্ঠান, বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির দল ঘুরতে পারেন, তা হলে পুস্তকের কারবারীর প্রতিনিধিই বা ঘুরতে পারবেন না কেন? মোটের উপর বাংলা বইয়ের বাজার আরও ব্যাপক হওয়া চাই, বাংলা ভাষার আরও প্রসার হওয়া চাই, তা হলেই বাংলার বৃদ্ধি, বাংলা সাহিত্য ও তথা বাঙ্গালী জাতির মঙ্গল এবং সে চেষ্টা করতে হবে বাঙ্গালীকেই। বইয়ের ব্যবসার মত এমন 'রথ দেখা ও কলা বেচা' অর্থাৎ অর্থাগম ও সমাজসেবা একই সঙ্গে করতে পারবার মত কারবার খুব কমই আছে।

—শ্রীবিনায়কশঙ্কর সেন।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

কর্মবীর রাসবিহারী

ভারতের শৃঙ্খল মোচনকল্পে জীবনের উষালগ্নে যে সকল মুক্তিকামী সন্তানেরা নিজেদের সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিলেন দেশমাতৃকার সেবায়, পরলোকগত রাসবিহারী বসু সেই তীর্থযাত্রীদেরই অন্যতম। রাসবিহারী নিজেই ছিলেন জীবন্ত বিপ্লব। তাঁর জীবনের নানান অগ্নিময় ঘটনা, সাবগর্ভা কাহিনী ভবিষ্যৎ ভারতের প্রত্যেক নর-নারীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। বিপ্লবীর ভ্রাতা শ্রীবিজনবিহারী বসু তাঁর অগ্রজের একটি জীবনকাহিনী রচনা করেছেন। রাসবিহারীর জীবনী যত প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। তাঁর সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা, তাঁর স্বপ্ন ধ্যান সাধনা সম্বন্ধে গভীর বিশ্লেষণ এই গ্রন্থটির সৌষ্ঠব বর্ধন করেছে। রাসবিহারীর জীবনের অনেক তথ্যই প্রায় অজানা ছিল অনেকের কাছেই; তাঁরা এই গ্রন্থ পাঠ করে উপকৃত হবেন। গোমো-মানভূম থেকে শ্রীমতী ইলা বসু কর্তৃক প্রকাশিত। দাম পাঁচ টাকা।

জলে ডাঙায়

'মাসিক বসুমতী'র পাতায় দীর্ঘদিন ধরে এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছে—আশা করি পাঠক সাধারণের তা অজানা নেই। ডাঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্যিক প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত, সে সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছুই নেই। তবে এবার তিনি এক নবতর শক্তির পরিচয় দিলেন। শিশুসাহিত্যেও তাঁর দক্ষতা যে অনন্যসাধারণ তারই পরিচয় তিনি দিলেন এই ভ্রমণবৃত্তান্তটি পরিবেশন করে। বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে সে সব দেশের মানুষ, সমাজ, জীবনযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী সম্বন্ধে তাঁর যে বিরাট অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে, শিশুদের উপযোগী করে সেই অভিজ্ঞতার কিছু অংশ তিনি এখানে তুলে ধরেছেন। নানা দেশের মানুষের ঘনিষ্ঠ পরিচয় শিশু-সমাজকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করবে। ডঃ আলীর গল্প বলার ভঙ্গিমা এদের চিত্ত জয় করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হবে। বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশ করছেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দাম সাড়ে তিন টাকা।

ধূলি-ধূসর

বাঙলা সাহিত্যের একটি উজ্জ্বলতম রত্ন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর কবিতা বাঙলা কবিতার গৌরব যে কি পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে, তা রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝতে পারবেন। ছোট গল্পেও তাঁর দক্ষতা কম নয়। তাঁকে ছোট গল্পের যাদুকর বললেও অত্যুক্তি হয় না। ধূলি-ধূসর কতকগুলি ছোট গল্পের সংকলন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মন অত্যন্ত সন্ধানী। পৃথিবীর বুকে অসংখ্য রহস্য ছড়িয়ে আছে, তার মনে আছে কত না-বলা কথা। সেই রহস্যের উন্মোচন করা সেই না-বলা বাণীকে সর্বজন সমক্ষ রূপ দেওয়াতেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের আনন্দ। ধূলিধূসর, নিশাচর, শৃঙ্খল, ভস্মশেষ, সপ্তরাত্রিনী, অমীমাংসিত প্রভৃতি গল্পগুলি সমস্বরে ঘোষণা করছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কৃতিত্ব। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলি একের মধ্যে অনেককেই তুলে ধরে, সেইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থে তাঁর সেই বৈশিষ্ট্য বিন্দুমাত্র লাঘব হয়নি। ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট থেকে মিত্র ও ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। দাম তিন টাকা।

মধুচাঁদের মাস

'মধুচাঁদের মাস' নামক গ্রন্থটিতে খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যালের কয়েকটি সুলিখিত গল্প সংকলিত হয়েছে।

গল্প-সাহিত্যে প্রবোধকুমার একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী। জীবনের খুঁটি-নাটি অন্তর্দ্বন্দ্ব, মানব-মনের কল্পনা ও তার বিকাশ প্রবোধকুমারের লেখনীর বৈশিষ্ট্য। প্রভূত জীবনের চাপা কান্নার শব্দ আকৃষ্ট করে প্রবোধকুমারকে। এই গ্রন্থের স্ফুলিঙ্গ, আলো, জুয়া, একটি সন্ধ্যার টুকরো, ভারবাহী প্রভৃতি গল্পগুলি নিঃসংশয়ে পরিতৃপ্ত রেখে পাঠকচিত্তকে। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট থেকে প্রকাশ করছেন মিত্র ও ঘোষ। দাম দু' টাকা বারো আনা।

মধুমাধবী

সুশীল রায়ের নাম পাঠক সাধারণের কাছে আজ আর অপরিচিত নেই। তাঁর উপন্যাস মধুমাধবী তাঁর কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সামাজিক গল্প। কোন দলীয় প্রচার এর গৌরবহানি করেনি। মাধবী ও মধুমালা দুই বোনের নাম এক করে গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে মধুমাধবী। এদের পিতা পিনাকিভূষণ এই গ্রন্থের সম্পদবিশেষ, চরিত্রগুলির সুচিত্রণে, সুচিন্তিত সংলাপ প্রয়োগে সুশীল রায় এই গ্রন্থটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেছেন। যে পটভূমিকায় তিনি আশ্রয় নিয়েছেন সেটিও আকর্ষণযোগ্য। হেরম্ব, ক্ষিতীশ, আলোক তিনটি যুবক স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ও ভাবভঙ্গিমার অধিকারী। কারো প্রভাব কারো উপরই পড়ে না। এখানেও সুশীল বাবুর শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ১১৭ কর্ণওয়ালিশ-স্ট্রীটের সত্যব্রত লাইব্রেরী প্রকাশ করছেন দাম তিন টাকা।

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার

সে যুগের পণ্ডিতরা গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন, কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে কিছুই ছিল না। আমাদের দেশের রাজা-বাদশাহদের অনেকের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল—যেখানে সাধারণের কোন প্রবেশাধিকার পর্যন্ত ছিল না। আধুনিক যুগে কলকাতায় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হওয়ার পর এ দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে 'লটারী'তে সংগৃহীত অর্থে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রস্তাব হয়, যদিও কার্যকরী হয় না। ইং ১৮৩৫ সালে স্থাপিত "কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী"কেই প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার বলা যায়। বর্তমানে কলকাতা তথা বাঙলা দেশের প্রায় পল্লীতে পল্লীতে সাধারণ পাঠাগার দেখতে পাওয়া যায়—"লাইব্রেরী এ্যাক্ট" প্রচলিত হওয়ার ফলে। এই সমস্ত পাঠাগার প্রতিষ্ঠার ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ইতিহাস আলোচ্য গ্রন্থ। লেখক বৃন্দময় ভট্টাচার্য্য বিপুল পরিশ্রমে এই পাঠাগার সমূহের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বইয়ে কলকাতা এবং হাওড়ার প্রায় প্রত্যেকটি বিখ্যাত পাঠাগারের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। রচনাগুলি একদা দৈনিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। বাঙলা দেশের প্রত্যেক পাঠাগারে এবং সাহিত্যরসিক ব্যক্তিদের নিকট এই বইয়ের যথাযোগ্য সমাদর হবে নিশ্চয়ই বলা যায়। দেবদত্ত এণ্ড কোং। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা—১২। মূল্য আট টাকা।

আলোকে-নিরালোকে

সুরজিৎকুমার দাশগুপ্ত

আলোকে-নিরালোকে আশায়-সন্ত্রাসে
সে থাকে শিয়রের কাছেই চিরদিন।
ব্যথিত প্রণয়ের ব্যাকুল মধুমাসে
নীলিমা যেই দেশে নিয়ত উদাসীন!

সখী সে নিরালোকে শুক্লা নিশীথিনী
শান্ত চোখ তার খচিত জ্যোৎস্নায়।
বাতাস অনুরাগে বাজালে শিঞ্জিনী
সে থাকে অবিচল অলোক মূর্চ্ছায়।

কি বলে ডাকি তারে; কি নাম কে তা জানে;
স্বপ্নে দেখি তাকে, জানি সে চেতনায়
লুটিয়ে পড়ে থাকে, হৃদয়ে কোনোখানে
শান্তি এতটুকু মেলে না বুঝি তাই।

আলোকে-নিরালোকে সারা জীবনভর
কে নারী মায়াবিনী কেবলি নিরুপম!
দু'চোখ মেলে থাকে! হায় কি নাম তার।
—কবিতা-অনুরাধা! প্রেরণা! মেঠো ঘর!

উদয়ভানু

অপরাহ্ণের আকাশ যেন করালমূর্তি ধারণ করে।

একদিকে অস্তগামী সূর্য্যের শুভ্রলাল আলোর বিস্তার, অন্য দিকে শ্যামগম্ভীর মেঘের জটলা। কে যে কাকে গ্রাস করবে বোঝা যায় না। আমোদরের জলে বহুরূপী আকাশের প্রতিচ্ছায়া কাঁপছে। দূরের ঘন বনতল আঁধারে অদৃশ্য হয়েছে, কালো প্রাচীরের আকৃতি ধ'রেছে। বৈশাখের অগ্নিবাহী বাতাস আর চলে না। উন্মাদ হাওয়ায় যেন হিমের স্পর্শ। ঘনকালো মেঘপুঞ্জকে উপহাস করে আকাশ। মেঘের ফাঁক থেকে ভ্রূকুটি দেখা দেয় ঘন ঘন। বিদ্যুৎ চমকে চমকে ওঠে। আলোর লহরী খেলে দুরন্ত গতিতে। বজ্রপাতের আশঙ্কায় দ্রুত পথ চলে পথিক জন। কাল-বৈশাখীর ঝড় আসছে কি মহা উল্লাসে নাচতে নাচতে। মাটির বুক থেকে ধূলো উড়ছে সর্পিল গতিতে। হাওয়ার আগে শুকনো পাতা উড়ছে। বিজলীর হঠাৎ-আলোয় আকাশের শারীরস্থান স্পষ্ট চোখে পড়ে। আলোর আঁকা-বাঁকা রেখা না আকাশের শিরা-উপশিরা কে জানে, সহসা দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায় আবার। বিদ্যুতের রঙ ধরা যায় না ঠিক। কখনও সবুজ, কখনও হলুদ, কখনও নীলাভ হয়ে ফুটে উঠছে। বহু দূরে কোথায় যেন মৃদঙ্গ বেজে চলে মধ্যে মধ্যে। কে বলবে যে মেঘের গুরু গুরু গর্জ্জন এমন সুরেলা।

ঠাণ্ডা এক ঝলক বাতাস এসে বিন্ধ্যবাসিনীর কপাল স্পর্শ করে। কেমন এক পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুই চোখ বন্ধ করলেন রাজকুমারী। নিমেষহীন নিশ্চল চোখে মেঘের বৈচিত্র দেখছিলেন না গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন—তা তাঁর মনই জানে! উন্মুক্ত ছাদের এক প্রান্তে মৌন স্তব্ধতায় ডুবে থাকেন। পৃষ্ঠের কেশভার যেন এক খণ্ড কালো মেঘ। কপালের 'পরে কুঞ্চিত কুন্তল উড়ছে। রাজকুমারীর দেহ যেন আতপ্ত হয়ে আছে। অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ—কে-ই বা দেখে! অনাদৃত কুসুম, হয়তো কোনদিন ঝ'রে যাবে প্রতিকূল হাওয়ায়। আবার আকাশে চোখ তুললেন বিন্ধ্যবাসিনী। বন্দিনীর চোখে আকাশের আহ্বান যেন মুক্তির আস্বাদ। খাঁচার পাখী যেমন বিমুগ্ধনয়নে শূন্যের দিকে তাকায়, ঠিক সেই দৃষ্টি ফুটেছে রাজকন্যার চোখে। দিনের পর দিন অন্যের অধীনে থাকতে হবে, মানতে হবে কড়া পাহারার শাসন, ভুলতে হবে সঙ্গসুখের লোভ—কিন্তু বুকের মাঝে স্বাধীন মন যেন কিছুই মানতে চায় না। বাইরের দেহটা যত রকমের শাসন সহ্য করতে পারে, ভেতরের মনটার যেন নাগাল পায় না কেউ। ধরা-ছোঁয়ার বাইরের সেই মন আজ কেমন উদাস হয়ে আছে। বিবশ হয়ে আছে দেহ। চোখের চাউনিতে শূন্য দৃষ্টি ফুটেছে। অবাধ্য মন যেন আর একা থাকতে চায় না। অন্য কোন' মনে সমর্পণ করতে চায় নিজেকে। মনে মনে মিলতে চায়।

দেখতে দেখতে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে। দূরের বনরেখা মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। বিদ্যুতের আলো যেন অশ্রান্ত। ঘন ঘন চমকে উঠছে। অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার দেখা দেয় বক্রগতিতে। গাছের পাখীরা সন্ত্রাসে শিউরে ওঠে।

রাজকুমারী দেখলেন, ছাদের আলশের এক নীড়হারা পাখী। কোথা থেকে উড়ে এসে ব'সলো ভয়ে ভয়ে। হাঁফ ধ'রেছে হয়তো, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। ঠোঁট দু'টি জোড়া নেই আর, হাঁ হয়ে আছে সভয়ে। চোখে ভয়ার্ত চঞ্চলতা।

কি পাখী? মনে মনে শুধোলেন রাজকন্যা। হতাশ-হাসির মৃদু আভাস উঁকি দেয় মুখে। এত দুঃখেও তবু একবার হাসলেন বিন্ধ্যবাসিনী। লক্ষ্মীছাড়া বাকহারা পাখীর দুঃখে হাসলেন, তা হোক। মাছরাঙা পাখী হয়তো, রাজকন্যা ঠাওরালেন। এমন বরণ নীলবর্ণ, এমন বৃহৎচঞ্চু। শান্ত প্রসন্ন চোখে দেখতে থাকেন বিন্ধ্যবাসিনী।

দেখতে দেখতে কখন আঁধার ঘন হয়েছে, নজরে পড়ে না যেন। রাজকুমারী চোখ ফিরিয়ে দেখলেন দূরান্তে। কিছু আর দেখা যায় না। আমোদরের জলও নয়।

শুধু নদীর অপর তীরে আলো জ্বলছে কোথায়। আকাশের হৃৎপিণ্ড জ্বলছে যেন। লাল আর হলুদ রঙের আগুন। হৃদয়-আঘাতের শিহরণ খেলছে ধিকি-ধিকি কম্পনে।

সঙ্ঘারামে হোমকুণ্ড জ্বলছে। বেল-কাঠ দগ্ধ হচ্ছে রাশি রাশি। কলসী কলসী গব্য ঘি পুড়ছে।

জাঙ্গুলী দেবীর পূজা চলছে আজ সঙ্ঘারামে।

বিপদের আর আপদের সময় চলেছে কত কাল। শান্তি আসছে না কিছুতেই। সঙ্ঘারামের চতুর্দ্দিকে সর্পভীতি দেখা দিয়েছে। ক'জন ভিক্ষু আর একজন নটী সর্পাঘাতে মারা প'ড়েছে মাত্র কয়েক মাসে। সাপের ভয় যেমন তেমনি ধর্ম্মান্ধ ব্রাহ্মণের ভয়। শ্বেতবস্ত্র আর উপবীতধারী শাক্তদের ভয়। কালীকরালীর ভক্তরা রক্তপানের লালসায় মেতে উঠেছে যেন। বলিদানের বাজনা বাজে মধ্য রাত্রে—সারা মান্দারণ কান পেতে শোনে।

রাত্রি শেষ হওয়ার আগে ঢাকের বাদ্যি থেমে যায়। কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে। তখন শোনা যায়, অতিরিক্ত কারণ পানের পর উন্মত্ত তন্ত্রধারীদের অট্টহাসির বিকট সুর। শিবের করোটি পানপাত্র—শূন্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ ক'রে দেয় এলোকেশী তামাজিনী ভৈরবীর দল। কালীমন্দিরের আশ-পাশে সাধনা চালিয়েছে

ব্রাহ্মণ তান্ত্রিকের দল। গলিত শবের 'পরে আসন। কেউ কেউ রাতের অন্ধকারে শিশুর সন্ধানে বেরিয়েছে। ঘুমন্ত শিশুকে সাবধানে তুলে আনতে হবে গভীর নিদ্রায় অচেতন মায়ের বুক থেকে।

সঙ্ঘারামের ভিক্ষুরা আর নটীরা খেয়ে ঘুমিয়ে সুখ পায় না। সাপ আর ব্রাহ্মণ—দুই যেন এক মহাব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। মূলোচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তি নেই।

তাই জাঙ্গুলী দেবীর পূজা চলেছে সঙ্ঘারামে। হোমকুণ্ড জ্বলছে।

রাজকুমারী অনুমানে কিছুই বোঝেন না। সাগ্রহে দেখেন সেই অগ্নিপিণ্ড। কখনও জোরালো হয়, কখনও বা ঈষৎ নিস্তেজ হয়। দাবানল জ্ব'লেছে হয়তো বনাঞ্চলে। তাই যদি হয়, তবে আগুনের বিস্তার নেই কেন! দাবানলের আগুন তো ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে। দূর থেকে দেখাবে, যেন আলোর মালা।

বিন্ধ্যবাসিনীর কানে পৌঁছয় না দেবীর পূজার মন্ত্র।

ভিক্ষু আর নটীরা, ঐকতানে মন্ত্র বলছে। দেবীর বেদীতে ধূপ জ্বলছে। ধূনার ধোঁয়ায় দেবীর মূর্ত্তি দেখা যায় না। দেবীর চোখ দু'টি দেখা যায়। দুই চোখে দু'খণ্ড নীলা জ্বলছে। দেবীর বর্ণ শুভ্র। শুক্লবর্ণা জাঙ্গুলী একমুখী, চতুর্ভুজা, শ্বেতসর্পের অলঙ্কারে বিভূষিতা। উপরের দুই হাতে বীণা ধ'রেছেন, নীচের হাতের ডাইনে অভয়মুদ্রা, বামে শুক্লসর্প।

ওঁ ইলিমিত্তে তিলিমিত্তে ইলিতিলিমিত্তে দুম্বে দুম্বালীয়ে তর্কে তর্করণে মর্মে মর্মরণে কশ্মীরে কশ্মীরমুক্তে অঘে অঘনে অঘানাননে ইলি ইলীয়ে মিলীয়ে ইলিমিলিয়ে অক্যাইএ অপ্যাইএ শ্বেতে শ্বেততুণ্ডে অনন্বরক্তে স্বাহা!

মন্ত্রপদ এত দূরে থেকে শোনা যায় না। এই মন্ত্র না কি একবার গাইলে, সপ্ত বৎসর যাবৎ সর্প-দংশনের ভয় থাকে না। নিয়মিত পাঠ ক'রলে যাবজ্জীবন সর্পাঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। মহামন্ত্রটি কবচরূপেও শরীরে ধারণ করা যায়।

—পাল্কী এসেছে বৌ। তোমাকে নিতে এসেছে।

আচমকা হঠাৎ কথা বললে পরিচারিকা, ছাদের দুয়োরে দাঁড়িয়ে। থামলো না এক কথার শেষে। বললে,—যা দুর্যোগ, কোথায় বা যাবে এখন!

পাল্কী এসেছে, শিউরে উঠলেন যেন বিন্ধ্যবাসিনী। ভয়ে যেন শ্বাস বন্ধ হয়। মুখে যেন কথা আসে না। কার পাল্কী, কোথা থেকে এসেছে, জানতে চাইলেও মুখে যেন বলতে পারলেন না।

—সাড়াশব্দ নেই কেন গো? জপে বসলে না কি বৌ?

প্রথম অন্ধকারের ধাঁধা পরিচারিকার চোখে। স্পষ্ট যেন দেখতে পায় না কিছু। কাল-বৈশাখীর বাতাস বইছে শন শন। ধূলো আর কুটো উড়ছে। যশোদার চোখের দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে গেছে, খোলা ছাদের দ্বারে এসে।

জপের কথা শুনে আবার ঈষৎ হাসলেন রাজকুমারী। অস্ফুটে বললেন,—কোথা থেকে পাল্কী এলো? সাতগাঁ থেকে?

—সাতগাঁ থেকে পাল্কী আসবে! কথা বলতে বলতে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো পরিচারিকা। বললে,—না গো না, চৌধুরী-বাড়ী থেকে পাল্কী এসেছে। চৌধুরীগিন্নী পাঠিয়েছে। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুয়োর ত্যাগ করলো যশোদা। চোখের বাইরে গিয়ে বললে,—যাই আমি, সাঁঝের বাতি জ্বেলে আসি।

বুকে কাঁপন লাগলো। বিন্ধ্যবাসিনী কেমন যেন নিরুৎসাহিত হয়ে প'ড়লেন। ভেঙ্গে পড়লেন। খানিক নিশ্চুপ ব'সে থেকে উঠে পড়লেন ধীরে ধীরে। ছাদ ত্যাগ ক'রে ঘরে চললেন। বুকের কম্পন যেন থামতে চায় না।

অন্ধকার কক্ষ। ক'দিনের চেনা-জানা, তাই অভ্যাসে এগিয়ে চললেন রাজকুমারী। ভেবেছিলেন ছাদ থেকে ঘরে গেলে ভাবনার ভয় থেকে হয়তো রেহাই পাওয়া যাবে। শূন্যকক্ষে যেন আরও বেশী ভয় হয়। অন্ধকার ঘরের এ-কোণে সে-কোণে যেন কার মূর্ত্তি ঘোরাফেরা করছে, মুখে হাসি মাখিয়ে। কায়া না ছায়া কে জানে, বিন্ধ্যবাসিনী ভয়ে ভয়ে দেখেন ঘরের ইদিক-সিদিক। যেন দেখা যায় সেই হাস্যময়ী মেয়েটাকে। আনন্দকুমারীকে। অন্ধকারে তার সোনার অলঙ্কার যেন চিকচিকিয়ে ওঠে। ঢাকাই শাড়ীর জরি চিকচিক করে। আতঙ্কে বিন্ধ্যবাসিনী কেমন যেন জবুথবু হয়ে পড়েন। এখনও স্পষ্ট কানে ভাসছে, আনন্দকুমারীর হাসি। অঙ্গে অঙ্গে হিল্লোল তুলে সে যেমন খিলখিল হাসি হাসতো, ঠিক সেই হাসির ধ্বনি ভাসছে কানে। ঘরে থাকতে শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হয়। মুখের মধ্যে আঁচল চেপে চাপা-কান্নার বেগ সামলে ঘর থেকে বেরিয়ে দালানে যান রাজকন্যা।

এক ঝলক আলো। ঘরের মেঝেয় আর দেওয়ালে ছড়ালো।

পলকহীন চোখে কি দেখছেন রাজকুমারী। তাল আর নারকেল গাছের সারি ঝড়ের হাওয়ায় হেলছে দুলছে। সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস বইছে সজোরে। কা'রা যেন কোথায় ফিসফিস কথা বলছে। আসমান-দীঘির তীরে শুকপত্র নাচানাচি করছে হয়তো। একদল মাতাল মানুষ যেন কি এক স্ফূর্তিতে হাসাহাসি করছে। বাতাসের বেগ ভীষণ। বাঁশবনে শিষ বেজে চলেছে এক নাগাড়ে। যেন বাঁশী বেজে চলেছে একটানা।

রাজকুমারী দালান থেকে আকাশে চোখ তুললেন। ঘনকালো মেঘের জটলা হাওয়ার দাপটে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে। মাথার আকাশ থেকে ভেসে গেছে অনেক দূরে, সেই যেখানে মান্দারণ শেষ হয়েছে সেই দিকে।

চাঁদ উঠেছে কখন। মেঘমলিনতার আড়াল থেকে হেসে হেসে দেখা দেয় একেকবার। ভেসে-যাওয়া মেঘের আঁচলে ঢাকা ছিল এতক্ষণ। ঝড়ের রাতের চাঁদ, সোনা-রঙে তাই যেন আজ আর তেমন জৌলুশ নেই।

—পাল্কী ফিরিয়ে দিই বৌ?

ঘরের কোণের কুলুঙ্গীতে জ্বলন্ত পিদিম রাখতে রাখতে কথা বললে পরিচারিকা। তৈল-দীপের আলোর কাছাকাছি পতঙ্গ নাচতে থাকলো।

—না। বিন্ধ্যবাসিনী ভাঙা গলায় বললেন,—আমি যাবো যশো, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। আনন্দর মা বিপদের সময় ডাক পাঠিয়েছেন, না যাওয়া অন্যায় নয়, পাপ। আমি পাপের ভাগী হ'তে চাই না। ঘরের কোণের দালান থেকে রাজকন্যা কথা বলছেন। তাঁর কথার সুর যেন বিষণ্ণ। চোখ ফিরিয়ে আছেন অন্য দিকে। আমোদরের জল-কল্লোলের আছাড়ি পিছাড়ি শব্দ শুনছেন।

পূর্ণিমা আসন্ন। চাঁদ প্রায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। যুবতীকন্যার মত তাই যেন আমোদরও হয়তো আর শান্ত নেই আজ। আকাশের চাঁদের দিকে তরঙ্গের হাতছানি। আমোদর যেন আজ ঊর্দ্ধগতি হয়েছে। কেমন যেন উচ্ছ্বসিত।

—এই ঝড়ের রাতে ঘরের বার হবে কোন্ সাহসে! মরতে চাও নাকি?

—তুমি আমার সহায় হও তো সাহসের অভাব হবে না। কথার শেষে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজকন্যা। বললেন,—ঈশ্বর ততটা দয়ালু নয় যে আমার দিকে চোখ ফেরাবেন।

—গাছ পড়ছে। ঘরের চালা উড়ে যাচ্ছে। অজানা অচেনা পথ, যাবে এই রাতবেরাতে?

—তুমি প্রহরীকে ডাকো। তাকে আগে তুষ্ট করি।

—আবার ডাকবে বিপদকে? কি হ'তে কি হয় কেউ বলতে পারে? মেয়ে চুরির দায়ে ধরা পড়বে যে! হাতে হাতকড়া পড়বে! কোতোয়ালে ধরে নিয়ে যাবে!

কথা শুনে শুনে চমকে চমকে উঠলেন বিন্ধ্যবাসিনী। ভয়ে চোখ বন্ধ করলেন। সেই অবস্থায় পা চালিয়ে দালান থেকে ঘরে ঢুকে বললেন,—তবে কি ক'রবো যশোদা?

—পাল্কী ফিরিয়ে দিই আমি। ঝড়ে যে উড়িয়ে দিচ্ছে ভিটে মাটি!

পালঙে বসলেন রাজকন্যা। কপালে হাত দিয়ে ভাবতে থাকলেন। বাইরে ঝড়ের গর্জ্জন। কোথায় ভাঙা দুয়োর পড়ছে সশব্দে! আসমানের বুকে নারকেলের শুকশাখা পড়ছে।

ঘরে ঘরে দ্বার বাতায়ন বন্ধ হয়ে গেছে। এমন ধুলো উড়ছে যে চোখ মেলা যায় না। প্রথম রাত্রির অন্ধকারে ধূলার আঁধার এক হয়েছে।

—মন মানছে না যশোদা। তুমি প্রহরীকে ডাকো। তুমি আমার সহায় হও।

এই ঘনঘটা আর ঝড়বাতাসে এক ঝলক হাসলো পরিচারিকা। আকাশের বিদ্যুতের মত হঠাৎ দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায় হাসি। বললে,—দেখো বৌ, তোমার জেদ বড় বেশী।

—দোহাই যশোদা। অমত করিস্ না আর।

—প্রহরীকে ডাকি তবে?

—হাঁ, এখনই। আর দেরী নয়।

—ভেবে চিন্তে দেখো এখনও।

—আঃ, তুমি যাও না যশো।

শুধু বিরক্তি নয়, কিছু বা ক্রোধের সঙ্গে ধমকানির সুরে বললেন রাজকন্যা।

পিদিমের সতেজ শিখা নম্রমুখী হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে সজোর হাওয়ায়। ফুলঙ্গীতে আছে, তাই আর নিবছে না পুরোপুরি।

আলোয় সহসা নিজের দিকে চোখ পড়লো রাজকুমারীর। দেখলেন বেশ তাঁর ম্লান, কেশ বন্ধনহীন। জট প'ড়েছে হয়তো এলোচুলের বোঝায়। নিজের হাত দু'খানি দেখলেন। অলঙ্কারের লেশ নেই, মাত্র লোহা আর শাঁখা। লাল রঙের কড়, গালার বালা। পালঙের বিছানায় হাত-আরনা ছিল একখানা। অভ্রের আয়না তুলে মুখ দেখলেন অজিজ্ঞায়। স্বর্ণবর্ণ যেন আর নেই আগের মত। কোথায় সেই রূপসায়র! ভোরের আকাশে চাঁদের মত যেন, স্বর্ণাভার চিহ্ন নেই।

কি মনে পড়লো কে জানে, আয়নাখানা আবার নামিয়ে রাখতে হ'ল। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন বিন্ধ্যবাসিনী। দড়ির আলনা থেকে বদলের শাড়ী নামালেন। লালপাড় পাটের শাড়ী। তসরের গা-ঢাকা চাদর। গায়ে যে অলঙ্কার নেই, আর কারও চোখে পড়বে না।

রাতের বেলায় আয়নায় মুখ দেখতে নেই, তাই হয়তো দর্পণের এই মানের হানি। নিজেকে আর দেখলেন না রাজকন্যা। সরিয়ে রাখলেন তাকে। রাতে আয়নায় মুখ দেখলে না কি কলঙ্ক রটনা হয় তার নামে, যে দেখে। মিথ্যা অপবাদ রটে। দুর্নাম দেয় শত্রুলোকে। অযথা।

শাড়ী বদলের পর চাদরে ঊর্দ্ধাঙ্গ ঢাকলেন। এক দেখায় দেখেছেন মুখের মালিন্য, তাই জলপাত্র তুলে মুখে জল দিলেন। ত্যক্তশাড়ীতে মুখখানি চেপে চেপে মুছলেন।

কোথায় কে জানে, আলগা দুয়োর পড়ছে বিশ্রী শব্দে। যেন বন্দুক দাগছে কে কোথায়। জমিদারের ভগ্ন দেউলের ভিৎ কেঁপে উঠছে যেন।

মনে বল সঞ্চয় করেন রাজকুমারী। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে ঘরে পায়চারী করতে থাকেন ইদিক-সিদিক। দেওয়ালে দেওয়ালে বিন্ধ্যবাসিনীর সচল ছায়া যাওয়া-আসা করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে।

জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, এক দেখায় দেখে নিয়েছেন রাজকন্যা। রূপের রূপা বিলুপ্ত হয়ে যায় দিন কে দিন। অযত্নে, অদেখায়! তা যেতে ব'সেছে, আত্মপীড়নের সুখে যেন একবার হাসলেন।

বিন্ধ্যবাসিনীর চলনের ভঙ্গীটি বেশ। চলনের সঙ্গে-সঙ্গে দেহরেখা বিকশিত হয়ে ওঠে; কেমন এক রাজসিক সদর্প পদক্ষেপে চলেন তিনি। বাঘ আর কুকুরের চলায় না কি অনেক পার্থক্য। রাজার মেয়ে বিন্ধ্যবাসিনী, বাঘের বাচ্চা! জেলের ঘরের মেয়ে নয়, কুলীনকন্যা।

—তোমার প্রহরী আজ তাড়ি টেনে বেহুঁস হয়ে আছে বৌ! আর ডাকাডাকি করতে ভরসা পাইনি তাই।

—নেশায় অচৈতন্য!

—হাঁ গো হাঁ। হুঁস নেই তার। পাশে তাড়ির কলসী উপুড় হয়ে প'ড়ে আছে! মাংসের কাবাবে বেড়ালে মুখ দিচ্ছে। একদল মানুষ এসেছে, চৌধুরীদের পাল্কী এসেছে, জানেও না।

—ঘরে শেকল তুলে দাও যশো? দীপের আলো জ্বলুক! চল আমরা বেরিয়ে পড়ি।

—আমার কেমন মন সায় দিচ্ছে না বৌ! তবে তুমি যখন ব'লছো আমাকে যেতেই হবে। চৌধুরীগিন্নি যখন ডেকেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, তাদেরও অপরাধ নেই। তাদের মেয়ে তো তোমার কাছেই এসেছিল কাল রাত্রে।

কালরাত্রিই বটে। পরিচারিকার অগোচরে দুঃখের হাসি হাসলেন রাজকুমারী। বললেন,—চল' আর দেরী নয়। বেশী বিলম্ব হ'লে ফিরতে ফিরতে রাত ঘন হবে।

—এই কথাটি মনে রেখো। যাবে আর চ'লে আসবে, আসর জমিয়ে বসবে না। এ পোড়া দেশের মানুষ আবার রাতের বেলায়

ঘরের বাইরে বেরোয় না। নেহাৎ যারা শ্মশানযাত্রী তারা ছাড়া কেউ পথে বেরোয় না। কথা বলতে বলতে যেন হাঁফিয়ে উঠেছে পরিচারিকা।

—চল' যশো. সিঁড়ির পথ ধরো।

—তুমি এগোও. আমি ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করি।

ঘরের শেকল তুলতে তুলতে কথা বলে যশোদা। হাতের কাজ সারতে সারতে। সাবধানী দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে।

বাইরে হাওয়া চলেছে এলোমেলো। রাজকুমারী দালানে এসে দাঁড়াতেই তাঁর কেশ-বাস চঞ্চল হয়ে ওঠে। দিনের শেষে এতক্ষণে বাতাসে যেন স্নিগ্ধস্নিগ্ধতা ভেসেছে। কাছাকাছি কিম্বা দূরে কোথায় হয়তো আকাশ থেকে ধারাবর্ষণ হয়েছে। অন্ততঃ হাওয়া তাই বলে, ঠাণ্ডা পরশে। ফাটলধরা উত্তপ্ত মাটির তৃষায় দয়া হয়েছে আকাশের।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে বুক দুরু-দুরু করে বিন্ধ্যবাসিনীর। বধ্যভূমিতে যাওয়ার আগে যেমন ভয় হয় সেই ধরণের ভীতিকাতরতা যেন। পায়ের তলায় ভূমি যেন সরে যাচ্ছে। চোখে যেন শুধু আঁধার দেখতে পাওয়া যায়। চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

—আমাদের জমিদারমশাই জানতে পারেন তো আর রক্ষা থাকবে না।

চুপিচুপিয়ে সিঁড়ি নামতে নামতে কথা বলে যশোদা। বলে,—কৈ গো বৌ, কোন দিকে গেলে?

কথা বলার আগে নিজের দুই চোখ আঁচলে মুছে ফেলেন বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন—তোমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাবো মনে করলে?

—না না তা নয়। তোমাকে দেখতে না পেয়ে শুধিয়েছি কথাটা। কথা বলতে বলতে দম নেয় পরিচারিকা। বলে,—তুমি যে তেমন নয় তা আমি জানি। চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মত মেয়ে তুমি নয়।

জমিদার কৃষ্ণরামের গৃহপ্রাঙ্গণে মশাল জ্বলছে। পাল্কীর বাহকরা খানিক ফুরসৎ পেয়ে গাঁজার কলকেয় আগুন ধরিয়েছে। মশালের জোরালো আলোয় বাহকদের তৈলাক্ত কালো আকৃতি চিকণ তুলছে। মশালের ঊর্দ্ধগামী শিখা সতেজ বাতাসের সঙ্গে যেন যুদ্ধ চালিয়েছে।

রাত্রি স্থির গম্ভীর। দিনের চাঞ্চল্য রাতে থাকে না। তবুও আজকের রাত্রি যেন এক ব্যতিক্রম হয়ে দেখা দিয়েছে। সঙ্গে এনেছে অশান্ত হাওয়া। ঝড়ের দোলায় তাই মান্দারণ আজ মুখর হয়ে আছে। দুরন্তগতি বাতাসের সোঁ-সোঁ গর্জ্জন, গাছে গাছে সংঘর্ষের শব্দ, শুষ্কপত্রের মর্ম্মরধ্বনি, বাঁশবনে বাঁশীর সুরের মত শিসের একটানা আওয়াজ—পাল্কীতে উঠতে উঠতে রাজকুমারীর শ্বাস রোধ হতে থাকে যেন। হাত আর পা দু'খানি যেন অবশ হয়ে আছে। তৃষায় কণ্ঠ শুকিয়ে যায়।

বিন্ধ্যবাসিনী এক লহমায় দেখলেন, চৌধুরীগৃহের মূল্যবান পাল্কী। রূপায় পাতে মোড়া। পাল্কীগাত্র চিত্রবিচিত্র। লাল শালুর পর্দা ঝুলছে পাল্কীর দুয়োরে। দ্বাদশ জন বাহক আর পাইক পেয়াদা—যাত্রীদের দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো তারা। মশালচি মশাল ধ'রলো হাতে।

লাল শালুর পর্দা সরিয়ে পরিচারিকা পাল্কীর ভেতর থেকে ফিসফিসিয়ে বললে,—পা চালিয়ে যেতে হবে। ঢিমে তালে গেলে চলবে না।

—জোর বাতাস চলেছে ঠাকরুণ, বাতাস ভেঙ্গে যেতে হবে আমাদের। যেতে একটু বিলম্ব হবে, আসতে তেমন হবে না। হাওয়ার গতি এই মুখে।

বাহকদের মধ্যে থেকে কে একজন কথা বললে। পাল্কী চ'লতে থাকলো নেচে নেচে। মশালচি আগে আগে চললো পথে আলো ছড়িয়ে। বাহকরা ছড়া ধ'রলো এক সঙ্গে। বাতাসের শব্দে ছড়ার সুর ভেসে ভেসে যাচ্ছে ইদিক-সিদিক।

—দ্যাখ যশো, আমাদের যাওয়া-আসাই সার হবে। আনন্দকে আর কি কখনও পাওয়া যাবে? মনে তো হয় না।

—শকুনির খপ্পর থেকে মড়া কি টেনে আনতে পারে কেউ? আনতে হয়তো পারা যায়, তবে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় না।

কথা বলতে বলতে শালুর পর্দা ঈষৎ সরিয়ে ইতি-উতি দেখে পরিচারিকা। মশালের আলোয় যতদূর দেখা যায় কোথাও মানুষের পদচিহ্ন নজরে পড়ে না। বসতির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। চোর আর ডাকাতের ভয়ে গ্রামবাসীরা উন্মুক্ত স্থানে বাসভূমি তৈরী করতে ভুলে গেছে। মানুষ আছে মান্দারণে, তাদের ঘর আর চালা আছে। কিন্তু গোপনে লুকিয়ে আছে বনজঙ্গলের মধ্যে। দুর্ভেদ্য বনাঞ্চল যেন দুর্গের প্রাচীর।

পরিচারিকার কথাগুলি বোধগম্য হ'তে যেন কিঞ্চিৎ দেরী হয়। রাজকুমারী যেন অনেকক্ষণ ধ'রে মনে মনে উপলব্ধি করেন যশোদার কথা। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হতাশায় নিশ্চপ হয়ে ব'সে থাকলেন স্থাণুর মত।

কি এক আর্ত্ত চিৎকার ভেসে আসে কোথা থেকে। অনেক মানুষের কণ্ঠ, একসঙ্গে শোনা যায়। কান পেতে শুনতে শুনতে বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—মানুষ চেঁচায় কেন ?

শালুর পর্দা সরিয়ে শুনলো পরিচারিকা। বললে,—তাইতো শুনছি। আগুন লাগলো না কি কোথাও !

আর্তরব এগিয়ে আসছে যেন। কান্নার ঐকতান ছোটাছুটি করছে তীব্র হাওয়ায়। কাছাকাছি শ্মশান আছে না কি কোথাও !

অস্থির হয়ে ওঠে যশোদা। পর্দা সরিয়ে মুখখানা বের ক'রলো। পাল্কীর দুই পাশে পাইক আর পেয়াদারা চ'লেছে। তাদের শুনিয়ে বললে,—কারা এমন অসময়ে কান্নাকাটি করে ?

পাইক আর পেয়াদারা ব্যঙ্গের হাসি হাসলো, মশালের আলোয় স্পষ্ট দেখলো পরিচারিকা। একজন পেয়াদা হেসে হেসে বললে,—অসময় নয় ঠাকরুণ, বড্ড দুঃসময় এসেছে। গ্রামে মড়ক লেগেছে। মহামারীতে গ্রাম উজাড় হয়ে গেল।

—কিসের মহামারী ?

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে যশোদা। হাওয়া ঝিমিয়ে আছে, সেই আশঙ্কায় যেন শ্বাস নেয় না আর।

হেসে ফেললে পাইক-পেয়াদার দল। আনন্দ না দুঃখের হাসি কে জানে! একজন বললে,—রোগ তো ঠাকরুণ এক-আধটা নয়, অনেকগুলো। জ্বরজ্বালা, শেতলা মায়ের অনুগ্রহ পানবসন্ত, ওলাউঠো। এ সব রোগের কোন চিকিৎসে নেই ঠাকরুণ। একবার ধ'রলে আর সারে না।

পাল্কী থামে না। দুলতে দুলতে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলে মেঠো পথ ধ'রে। গন্তব্যে না পৌঁছে যেন থামবে না। বাহকরা ছড়া কাটতে কাটতে ব'য়ে চলেছে। সমুখ ছাড়া কোন দিকে দৃকপাত নেই তাদের।

কান্নার কোরাস দূরে স'রে যায় ক্রমশঃ। অরাজকতার শ্রীহীন রাজত্ব পাশে ফেলে, পেছনে ছাড়িয়ে এগিয়ে চললো পাল্কী। এগিয়ে চলে মশালের আলোকপরিধি।

অধিকক্ষণ স্থৈর্য্য থাকে না রাজকন্যার। কি কারণে কে জানে, কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকতে থাকতে কেমন যেন আনচান করতে থাকেন বিন্ধ্যবাসিনী। বুকের মধ্যে না মাথার মধ্যে কি এক অসহ্য জ্বালা ধ'রে যেন। কান দু'টো তেতে ওঠে তখন। কপালের দুই পাশ ঝিকমিক করতে থাকে। বুকে যেন বেদনা লাগে। ঠিক গত রাত্রি থেকে যেন এই রকম এক অসহনীয় অনুভূতির জ্বালায় ভেতরে ভেতরে জ্বলছেন তিনি। সময় নেই অসময় নেই, যখন তখন চৌধুরাণীর সহাস কথা যেন তাঁর কানে ভাসছে। আনন্দকুমারীর মিষ্টি মুখের মিষ্টি কথা। তার হাস্য-পরিহাস !

দুর্দান্ত এক ঝলক বাতাসে পাল্কীর লাল শালুর পর্দা স'রে যায়। পাইক আর পেয়াদারা পাল্কীর ভেতরে চোখ দেয়। দেখে নেয় এক দৃষ্টিতে। মশালের আলো আর ছায়ায় দেখে নেয়। দেখতে পায়, পাল্কীর ভেতরে এক অনন্যসাধারণ রূপের পশরা। শুধু ঢলোঢলো মুখখানি দেখা যায়। দেখা যায় রাজকন্যার স্বর্ণবর্ণ।

•

গঙ্গানদীর খরস্রোতে দ্রুতগতিতে ভেসে চলেছে ম্যালেটের বজরা। মাঝ-গঙ্গা ধ'রে।

প্রথম রাত্রির আঁধার-প্রলেপে তীরভূমি অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাস চলেছে উত্তরমুখে। মাঝিদের সর্দার লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে কখন। রেড়ীর তেলের আলো।

পুরা একটি রাত ঘুম নেই চোখে, তাই হয়তো আনন্দকুমারী ঘুমে অচেতন হয়ে আছে। যেন এক যুগ ঘুম হয়নি, এমনই ঘুমের ঘোর।

ম্যালেট ব'সে আছে চৌধুরাণীর পাশে। বজরার কাঠের দেওয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে। আনন্দকুমারীর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তারা-ভরা আকাশে চোখ তুলে অন্ধকারে কি দেখছে ম্যালেট ! আকাশের পটে নক্ষত্র-অক্ষরে কি যেন লেখা আছে—এক পাশে পানপাত্র। ডিকেন্টার আর পেগ-গ্লাশ। খাঁটি স্কচ হুইস্কি খায় ম্যালেট। এ যেন তার প্রাত্যহিক অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে।

—বজরা লাগাই সায়েব ? মাঝিদের সর্দার বজরার গলুই থেকে কথা বললে।

এপাশে ওপাশে মাথা দোলায় ম্যালেট। বলে,—নো, নো, নো। কথার শেষে আবার চোখ তুললো আকাশে। নক্ষত্র-অক্ষরে লেখা পড়তে থাকলো। নেশার ঘোরে কি না কে জানে, ম্যালেট বিড়বিড়িয়ে বকতে থাকে। থেমে থেমে বলে আপন মনে। আকাশে যত তারা, তাদের সঙ্গে যেন কত দিনের পরিচয়। ম্যালেট থেমে থেমে বলে,—ক্যাপ্রিকর্ণ ! জেমিনি ! নেপচুন ! সেমি-সেক্সটাইল ! লিবরা ! ইউরেনাস্ !

সন্ধ্যালোক ছড়িয়েছে গঙ্গার বুকে। এই মাত্র যেন দেখা দিয়েছে চাঁদ। মেঘের আড়াল থেকে মুখ দেখিয়েছে। নববধূ যেন, সলজ্জায় গুণ্ঠন সরিয়েছে। আকাশের কোথাও নীহারিকা, কোথাও ছায়াপথ। কোথাও যুগ্মতারা। কোথাও সপ্তর্ষিমণ্ডল।

ম্যালেটের পাশে সোনামুখী চাঁদ যেন। আকাশ থেকে কখন নেমে এসেছে। চোখে পড়তেই ঝুঁকে দেখলো ম্যালেট। চাঁদের কপালে একটি চুমা দিলো অত্যন্ত সন্তর্পণে।

চোখ চাইলো চৌধুরাণী। খানিক বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে দেখ'লো ম্যালেটকে। তার পর ক্ষীণ হাসি হেসে আবার চোখ বন্ধ ক'রলো। তার কপালে হাত বুলিয়ে দেয় ম্যালেট। কোঁকড়া চুলের রাশিতে আঙুল চালায়। আনন্দকুমারী ধীরে ধীরে ম্যালেটের হাতখানি কপাল থেকে সরিয়ে নিজের বুকের 'পরে রাখলো। ধ'রে রাখলো নিজের হাতে। চেপে রাখলো।

ম্যালেট দেখছিলো যেন সাগ্রহে, ঘুমালে তাকে কত সুন্দর দেখায় ! চৌধুরাণীর আপাদমস্তক দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ফুলের মত কোমল যেন আনন্দকুমারীর দেহ। নধর নরম গঠন। শিল্পীর দৃষ্টি ম্যালেটের চোখে। শ্বেত প্রস্তরের মূর্তির মত দেখে যেন চৌধুরাণীকে। বর্টিসেলী, ম্যানটেগ্না কিংবা লিওনার্দো'র আঁকা নারী মূর্তির সমতুলনীয়।

কাছে কাছে থেকে থেকে দ্বিধা-সংশয় যেন ঘুচে গেছে চৌধুরাণীর। মনের দ্বন্দ্ব কেটে গেছে। রাগের বদলে যেন অনুরাগে মন ভিজেছে। মৌনস্তব্ধতা মুছে গেছে মুখ থেকে। হাসি ফুটেছে লাল অধরে।

আবার বকতে শুরু ক'রলো ম্যালেট। গান গাইতে থাকলো যেন সুবেল ছন্দে। আর গন্ত নয়, পদ্য আওড়াতে থাকলো চৌধুরাণীকে দেখতে দেখতে। ম্যালেট বলতে থাকে গুইনেসেলীর কবিতা :

"For Lo ! the star which measures our time
Is like that lady who hath lit my love.
Placed in Love's heaven she is,
And as that other (star) by countenance

From day to day illumineth the world
So doth she (illumine) the hearts
Of gracious folk and all the valorous,
With but the light which rests in her face;
And each man honors her,
Seeing in her the light all perfected
Which bears full virtue to the minds
Of all who (thereby) grow enamored,
And such is she who colors
The heaven with light, being guide of the
true-hearted
With a splendour which lures by its fairness."

কবিতা শোনাতে শোনাতে আরও যেন কাছে টেনে নেয় ম্যালেট। নিবিড় বন্ধনে বেঁধে সরিয়ে নেয় নিজের কাছটিতে। চৌধুরাণী আরেক বার তাকায় তন্দ্রালু চোখে। আরেক বার ক্ষীণ হাসি ফুটলো তার মুখে। চোখের ইশারায় কি যেন দেখালো বাহির পানে।

মুহূর্তের জন্য সাবধান হয় যেন ম্যালেট। তৎক্ষণাৎ আবার যেমনকার তেমনি। চোখে নেশা না ভালবাসা ফুটিয়ে আনন্দর মুখের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে যায়।

চৌধুরাণী ইশারায় জানায়, ঘরের বাইরে আরও মানুষ আছে। মাঝিরা আছে। ম্যালেট তাদের মানে না। শুধু যে গোপনেই প্রেম হয়, বিশ্বাস করে না ম্যালেট। ভালবাসাকে চেপে রাখতে পারে না। ম্যালেট মনে করে, হাঁচি-সর্দির মত প্রেমও গোপন থাকে না কখনও।

আধ-ঘুম আধ-জাগার মধ্যে থেকে ম্যালেটের আবেদন-নিবেদনে আরও যেন অনেক বেশী সুখী হয় চৌধুরাণী। স্বর্গসুখের মত পৃথিবীতে এমন আর কি আছে!

পেছনে যাদের ফেলে এসেছে, যাদের পিছিয়ে রেখে এগিয়ে চলেছে, তাদের কথা মনে আসে যখন-তখন। সেতারের তার ছিঁড়ে যায় যেন তখন। সুরের খেলা থেমে যায় হঠাৎ। ঝঙ্কারে ছেদ পড়ে সহসা।

মান্দারণের মায়া যেন কাটে না মন থেকে। চারিদিকে বন আর উপবন, মধ্যিখানে আমোদর নদী—এই তো গড় মান্দারণের ছবি। বৌদ্ধ, হিন্দু আর মুসলমানের মঠ, মন্দির আর মসজিদ এখানে-সেখানে। চৌধুরী মশাইয়ের চার মহলা গৃহ মান্দারণের আলো। দালান, উঠান, দেব-দেউলের গণনা হয় না যেন।

আজন্মের স্মৃতিমাখা মান্দারণের মায়া কাটে না মন থেকে। লক্ষ্মী-স্বরূপিণী মা আছেন আনন্দকুমারীর। তাঁর স্নেহের বাঁধন কখনও ভোলা যায় না। একটি মাত্র মেয়ে, তাঁর বুকের মণি। মেয়ে চোখের আড়ালে গেলেই তিনি চোখে অন্ধকার দেখেন।

জলের গতির সঙ্গে সঙ্গে বজরা ভেসে চ'লেছে। হাল বাইতে হয় না তাই। মাঝিরা জিরেন পেয়েছে।

পেছনে যাদের ফেলে এসেছে তাদের মুখগুলি মনে ভাসলেই চৌধুরাণীর মনে আর কোন' সুখের অনুভূতি থাকে না। এই সুজলা সুফলা পৃথিবীকে মনে হয় নরকের মত—যেখানে শুধু পাপাচারের রাজত্ব।

মান্দারণে তখন বৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডব চ'লেছে। গাছের ডাল খ'সে খ'সে পড়ছে বাতাসের দাপটে। বিদ্যুৎ চমকে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। হাওয়ার ঘূর্ণীতে শুষ্কপত্র উড়ছে। রাত্রির অন্ধকার ধূলিধূসর। ভাঙা-ঘরের চালা উড়ে গেল কত! বাঁশবনে বাঁশীর সুরে শিষ বেজে চলে অবিরাম।

ঝড়ের গতিতে পাল্কী এগিয়ে গেছে মেঠো-পথ ধ'রে। চৌধুরীগৃহের অন্দরে পৌঁছে দিয়ে তবে থেমেছে বাহকরা। ঝড়ের রাতকে যেন পরোয়া করেনি মনিবের বিপদের রাতে।

পাল্কী দুয়োরে লাগতেই কোথা থেকে ছুটে আসলেন চৌধুরী-গৃহিণী। বিন্ধ্যবাসিনীর পায়ে মাথা রাখলেন। তাঁর হাত ধ'রে পাল্কী থেকে নামালেন।

রাজকুমারী বললেন,—আপনি আমার মাতৃজন। আমি তো আপনাকে প্রণাম ক'রবো।

—এসো মা রাজলক্ষ্মী। বললেন চৌধুরাণী। কান্নার সুরে বললেন,—তুমি যে ব্রাহ্মণ মা। আমরা তোমাদের চরণের দাসী।

চৌধুরাণী কথা বলতে বলতে অন্দরে চললেন। রাজকুমারীর হাত ধ'রে তাঁকেও নিয়ে চললেন সঙ্গে।

রাজকন্যা দেখলেন, অন্দরের দালানে বেলোয়ারী বেল-লণ্ঠন জ্বলছে নানা রঙের। কোথাও লাল, কোথাও নীল, কোথাও হলুদ রঙের আলোর আভা। বিন্ধ্যবাসিনীর দুধবর্ণে রঙের খেলা চলে। তিনি ইতিউতি দেখেন, অন্দরের সাজ আর শোভা দেখেন। দালানে সারি সারি রূপার ঘড়া। মুখ-বাঁধা লাল শালুতে। হয়তো গঙ্গাজল আছে। চৌধুরাণীর পূজা আর পানের জল আছে।

—তুমি তো মা আমার মেয়ে। তুমিই তো আমার আনন্দকুমারী। তুমি তো সাক্ষাৎ দুর্গাপ্রতিমা। তোমাকে আমি প্রণাম ক'রবো না!

রাজকুমারীর মুখে বাক্য সরে না। চৌধুরাণীর স্নেহ-আহ্বানে চোখে জল ঝরে। দুঃখের জীবন তাঁর, সম্বল একমাত্র অশ্রুপাত, তাই রাজকন্যার চোখ ছলছল করে।

—শুনেছি তুমি রাজার মেয়ে। এক কুলাঙ্গারের ঘরে প'ড়ে তোমার না কি কপাল পুড়েছে!

ছলছল চোখ, তবুও ক্ষীণ হাসলেন বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন,—বাদ দিন আমার কথা, আমার ভাগ্য মন্দ।

রূপার পালঙ্কে রাজকন্যাকে বসিয়ে দিলেন চৌধুরীগৃহিণী। নিজেও বসলেন ঘরের মেঝেয়, রাজকন্যার পায়ের কাছে। বললেন,—কি খাবে মা বল'? পান-জল দিক।

—কিছু নয়। আপনার দর্শন পেয়েছি, আবার কি চাই!

—তোমার বাপের বাড়ী কোথায় মা?

—সুতানুটিতে। এখান থেকে অনেক দূরে।

উঠে পড়লেন চৌধুরাণী। বললেন,—ঘরের দুয়োর ক'টা ভেজিয়ে দিই মা। তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার। খুব গোপন কথা, কেউ যেন না শোনে।

কথা বলতে বলতে চৌধুরীগৃহিণী ঘরের একেকটি দ্বার বন্ধ করেন। ঘরের এক দিকে লম্বা পিতলের পিলসুজ। মানুষ-প্রমাণ উঁচু। পিতলের দীপ জ্বলছে। দ্বার রুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছড়ানো আলো যেন কেন্দ্রীভূত হয় ঘরে। রাজকুমারীর মুখ আরও যেন স্পষ্টতর দেখায়।

গঙ্গার অন্য এক প্রান্ত ধ'রে তখন অন্য একখানি বজরা সুতানুটির দিক থেকে আসছে এই দিকে। কুমার কালীশঙ্করের ভারী বজরা আসছে দলবল সমেত। কুমারবাহাদুর বগলামুখীর পূজায় বসেছেন নৌকামধ্যে। শত্রুদলনীর পূজা করছেন। ওঁ হ্লীং বগলামুখী—

[ক্রমশঃ।

স্বাগতম্

এমন একটি সময় ছবির রাজ্যে দেখা দিয়েছিল, যে সময় নতুন শিল্পীর আগমন একরকম বন্ধ ছিল বললেই হয়। থোড় বড়ি খাড়া, আর খাড়া বড়ি থোড়, এই ভাবে চলছিল ভূমিকালিপি বণ্টন। চল্লিশ বছরের মহিলাকে নির্বিবাদে দেওয়া হয়েছে 'ষোড়শী নায়িকার ভূমিকা। চলচ্চিত্র-শিল্প রীতিমত হয়ে উঠেছিল অন্তঃসারশূন্য। আশার কথা এই যে, আগতপ্রায় বা নির্মীয়মান বা মুক্তিপ্রতীক্ষিত কয়েকটি চিত্রে বাঙলার চিত্রামোদীরা অনেক নতুন মুখের সন্ধান পাবেন। সেই অনাগত নবাগত ও নবাগতাদের মধ্যে এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। মানসী চট্টোপাধ্যায় (সিঁদুর) কাজল চট্টোপাধ্যায় (বসুন্ধরা) সুমালা চট্টোপাধ্যায় (প্রিয়া, খেলা ভাঙার খেলা), কাজরী গুহ (হারানো সুর), কমলা মুখোপাধ্যায় (লুকোচুরি), সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (নৌকাডুবির থাল ও নবজাতক), শেফালী নায়েক (তাসের ঘর), অনীতা ভট্টাচার্য (স্বপনপুরী) প্রীতি দাস (শ্রীমতীর সংসার), অরুণোদয় মোদক (হাতছানি), অরুণাংশু (সাবন্ধির), অসীমকুমার (নীলাচলে মহাপ্রভু), বিশ্বনাথ মৈত্র (শ্রীশ্রী গৌর-কিশোর), পার্ব্বতী চৌধুরী (শ্রীমতীর সংসার) এই অনাগতদের আমরা স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছি। কামনা করি এঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, প্রার্থনা করি বাঙলার চিত্রজগৎ নবরূপ লাভ করুক এঁদের স্ব স্ব প্রতিভার গৌরবময় অবদানে।

ঘুম

পিতৃ-মাতৃহীনা, পরগৃহে পালিতা একটি যুবতীর করুণ কাহিনী 'ঘুম' নাম নিয়ে হয়েছে চিত্রায়িত। সারা দিন গৃহকর্মের গুরুদায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি তো নেই-ই, উপরন্তু রাত্রেও যদি বা সে একটুখানি আশ্রয় নিতে যায় তন্দ্রার কোলে, তার পরিবর্তে একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দিতে হয় প্রাণ ও তাকে যেতে হয় প্রায় ফাঁসিকাঠের সিঁড়ির কাছে। 'ঘুম' কাহিনীর এই হচ্ছে মুখ্য উপাদান। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় পরিচালকের অপটু হাতের সুস্পষ্ট ছাপ। ছবির এক একটি অধ্যায় গতানুগতিকতা ও পৌনঃপুনিকতার ভারে পুষ্ট। একটি জিনিষকে বার বার একই ভাবে দেখিয়ে দর্শকচিত্তে সৃষ্টি করা হয়েছে বিরক্তির। ছবিতে যে ধরণের বৃষ্টিপাত দেখানো হয়েছে, তা দেখে ধারাপাত পড়ে যে ছেলে, সেও হেসে ফেলবে। ফ্ল্যাশব্যাক করে দেখানোর কোন প্রয়োজনই তো ছিল না, সোজাসুজি আরম্ভ করলে ক্ষতি হ'ত কি কিছু? শেখরকে অন্ধ করাও অর্থহীন। বিমলের সঙ্গে বেলাকে একসঙ্গে দেখে ফেলে শেখর ভুল বুঝলেও মেলামেশা বন্ধ করলে। পরে অনুতপ্ত বিমল শেখরকে তার ভুল ভেঙে দিলে—এই দেখালে বোধ হয় ছবি জমত। ভাই-ফোঁটার দৃশ্যে বাড়ীর অন্যান্যকে দেখা গেল না কেন? একটিমাত্র নির্বাক দৃশ্যে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাসিয়ে লোক হাসাবার প্রয়োজন কি ছিল? সঙ্গীতাংশ ও চিত্রগ্রহণ নিন্দনীয় নয়। অভিনয়াংশে ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, সন্ধ্যারাণী, মঞ্জু দে, শোভা সেন, রাজলক্ষ্মী ও বাবুয়ার কৃতিত্ব চোখে পড়ে। অসিতবরণ কাজ চালিয়ে গেছেন মাত্র। আর প্রবীর-সবিতা এক কথায় লাইফলেস্।

বড়মা

সুসাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনায় চিত্রায়িত হয়েছে বড়মা। স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়ায় আবার বিবাহ করে সুবিমল। যথাকালে পুত্রলাভ হলে শান্তি পায় সে। সেই শান্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করে অশান্তি। ছেলে মানুষ হয় শোভনার (প্রথমা) কাছে, নীলিমার (দ্বিতীয়া) পিসী তাকে বোঝায় ছেলে বেহাত হয়ে গেল, ছেলের উপর শুরু হ'ল নির্যাতন, শোভনা সহ্য করতে পারে না, করে গৃহত্যাগ। অনুতপ্ত সুবিমল গমন করে লোকান্তরে। পিসীকে তাড়ায় নীলিমা। বহু দেশে ঘুরে তীর্থ পর্যটন করে পুত্র গোপালের মায়ায় ফিরে আসে শোভনা সেই দিন, যেদিন শোভনার নামে স্মৃতিমন্দির তৈরী সম্পূর্ণ করে নিজের আশৈশব কল্পনার রূপ দিচ্ছে গোপাল। সেইখানেই কিশোর গোপাল ও দৃষ্টিহীনা নীলিমার সঙ্গে শোভনার মিলন। সমস্ত গল্পটির মধ্যে নতুনত্ব কোথায়? আজকের দিনে বাঙলার সাহিত্য ও চলচ্চিত্র উভয়েই এগিয়ে চলছে প্রসারের পথে নব নব উপাদানকে কেন্দ্র করে। সেখানে এ জাতীয় অসার সাবেকী বস্তুব্যহীন গল্প পরিবেশন করার অর্থ কি? শরৎচন্দ্রের প্রভাব খুব বেশী না পড়লেও বেশ ভালো রকমের প্রভাব পাওয়া যায় বটতলা-সাহিত্যের সুবিখ্যাত ভট্টাচার্য যুগলের সুরেন্দ্রমোহনের 'দুই সতীন' কাহিনীটি কারোর মনে পড়ছে কি? তারই উপর ঈষৎ পরিবর্ত্তনের একটি আলতো তুলি বুলিয়ে রচিত হয়েছে 'বড়মা'র কাহিনী। কয়েকটি খুঁটিনাটি দোষ তো ধরা পড়েই। সুবিমলের মৃত্যুটি বড় অদ্ভুত লাগল, ঐ দৃশ্য লোককে অভিভূত তো করেই না উপরন্তু জনসাধারণের উপহাস লাভ করে। শোভনা যখন গৃহত্যাগ করে তখন গোপালের বয়েস অন্ততঃ দশ থেকে বারো এবং সে নিবিড় ভাবে পেয়েছিল শোভনার সান্নিধ্য, সেই ছেলে শোভনাকে চিনতে পারল না, এ অস্বাভাবিক! শোভনার আকৃতিও খুব পরিবর্ত্তিত দেখা যায় নি। জানি না, নীতীশ মুখোপাধ্যায়ের মত শক্তিমান শিল্পীকে দু'বারমাত্র দাঁড় টানিয়ে কি লাভ করলেন নীরেন লাহিড়ী! তবে ছবির আরম্ভটি চমৎকার হয়েছে। প্রশংসার যোগ্য নিশ্চয়ই। 'এই দুনিয়ায় ঘরে ঘরে' গানটি গীত হওয়ার সময় রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্গভঙ্গী অত্যন্ত অশোভন মনে হয়। মনে হয় গানের কথাগুলির অর্থই বোধ হয় বুঝতে পারেন নি রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ রকম একটি গভীর

বাইরে থেকে যে নারীকে দিয়েছে বিসর্জ্জন
অন্তরে সেই নারীকে পরম দিয়েছে সিংহাসন...

করেন রায়ের মর্ত্তের মৃত্তিকা অবলম্বনে

ভূমিকায় : সন্ধ্যারাণী, বিকাশ, মঞ্জু, রবীন, কমল, পাহাড়ী, অমর মল্লিক, জীবেন, তুলসী, রাজলক্ষ্মী এবং নবাগতা মানসী চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন : ২-৩০, ৫-৪৫ ও রাত্রি ৯টায়

মিনার ০ বিজলী ০ ছবিঘর

॥ এবং সহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে ॥

মুহূর্তে মনে হচ্ছে তিনি যেন কোন প্রমোদপ্রিয় জমিদারের বিলাস-কক্ষে নৃত্য-গীত পরিবেশন করছেন; অন্ততঃ তাঁর ঐ ধরণের অঙ্গভঙ্গী তো সেই কথাই বলতে চায়। অভিনয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ তিলক চক্রবর্তী। বাঙলার আজকের দিনের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী সরযূবালা দেবী প্রশংসা পাবেন। সন্ধ্যারাণীর অভিনয়ও ভাল লাগবে। দীপ্তি রায়ও পরিতৃপ্তি দিয়েছেন দর্শক সাধারণকে। ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়ও স্ব স্ব চরিত্র যথাযোগ্য গাম্ভীর্যের সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। বড় গোপালকেও ভাল লাগল, আর একটু স্বাভাবিক হওয়া দরকার। এ ছাড়া অভিনয়াংশে আছেন কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, গোকুল মুখোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, ধীরাজ দাস, জ্ঞানদা কাকোতি, লীলাবতী, অজন্তা কর, শান্তা প্রভৃতি। নায়কের চরিত্রে আশাহত করেছেন বিকাশ রায়। তাঁর মত শিল্পীর কাছ থেকে এ জিনিস আমাদের অভিপ্রেত নয়। খ্যাতনাম্নী সঙ্গীতজ্ঞা শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদেকারের একটি গান যথেষ্ট পরিমাণে উপভোগ্য ও আদরণীয়।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণের 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' বাঙলা সাহিত্যের একটি সম্পদবিশেষ। ঘাত-প্রতিঘাতে, আবেদন নিবেদনে সমুজ্জ্বল এর আখ্যানবস্তু। রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনীত আদর্শ হিন্দু হোটেলের চিত্ররূপ দিচ্ছেন অর্ধেন্দু সেন। চিত্রনাট্য ও অতিরিক্ত সংলাপ রচনার ভার গ্রহণ করেছেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় রায়। প্রধানাংশে দেখা যাবে ধীরাজ ভট্টাচার্য ও সন্ধ্যারাণীকে। অন্যান্যাংশে রূপ দিচ্ছেন—ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, তুলসী লাহিড়ী, অনুপকুমার, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, অজিত চট্টোপাধ্যায়, ৺আশু বসু, রঞ্জিত রায়, বেচু সিংহ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, দীপ্তি রায়, শিখা বাগ প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ। * * * শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর 'গরীবের মেয়ে' গ্রন্থটিও বহুজন পঠিত। এই কাহিনীর চিত্রায়ণ গড়ে উঠছে অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। মালা সিন্হার সঙ্গে জহর গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য, আশীষকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতিকে দেখা যাবে এই ছবিতে। * * * বাঙলার সাহিত্যাকাশে আজকের দিনের অন্যতম উজ্জ্বল তারকা সমরেশ বসু। সমরেশের 'পশারিণী' গল্পটি অবলম্বন করে 'পুতুলের মা' পরিচালনা করছেন ফণী লাহিড়ী। সঙ্গীতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন প্রবীর মজুমদার। অভিনয়াংশে দেখা যাবে জহর গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীদের। * * * 'শ্রীচাণক্য' ছদ্মনামের আড়ালে খ্যাতিমান চিত্র-সম্পাদক অজিত দাস পরিচালনা করছেন 'মরণের আগে' ছবিটি। এতে দেখতে পাবেন রবীন মজুমদার, শ্রীপতি চৌধুরী, মলিনা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, প্রণতি ঘোষ, শোভা সেন, বনানী চৌধুরী ও অন্যান্যদের। * * * তরুণ চিত্রকর সন্তোষ গুহ-রায় পরিচালিত প্রথম ছবি 'রাত্রিশেষে'। এতে সুরারোপ করছেন ভারতবরেণ্য শিল্পী ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ। চিত্রনাট্য রচনার ভার নিয়েছেন জ্যোতির্ময় রায়। চরিত্র রূপায়ণের ভার গ্রহণ করেছেন—পাহাড়ী সান্যাল, রবীন মজুমদার, অসিতবরণ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, রেণুকা রায়, পদ্মা দেবী, বাণী গঙ্গো, শ্যামলী চক্রবর্তী, রত্না গোস্বামী ইত্যাদি। * * * কালীপদ দাস পরিচালনা করছেন 'রাত একটা' অভিনয় করেছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য, পাহাড়ী সান্যাল, রবীন মজুমদার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, কালী সরকার, শিশির মিত্র, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা মিত্র, তপতী ঘোষ, শ্যামলী চক্রবর্তী প্রমুখ অভিনয়-শিল্পীরা। * * * হরপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'গৃহদেবতা' পরিচালনা করেছেন দিলীপ দাস। রূপারোপে আছেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺আশু বসু, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, গীতশ্রী কবিতা সরকার প্রভৃতি। * * * প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'সীমন্তিকা'তে রূপ দিয়েছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য, বসন্ত চৌধুরী, তুলসী লাহিড়ী, অনুভা গুপ্তা, যমুনা সিংহ, প্রমীলা ত্রিবেদী ইত্যাদি।

খ্যাতনামা অভিনেতা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেছেন। বিশ্বরূপায় তাঁর অভিনীত চরিত্রটি রূপ দিচ্ছেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।...'তাসের ঘর' এ সুচিত্রা সেনের পরিবর্তে দেখা যাবে সবিতা চট্টোপাধ্যায়কে।

শুক্রবারের বেতার-নাট্য

১৫ই ফেব্রুয়ারী—বিয়ের খাতা, নরেশ সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ, —রামকৃষ্ণ রায়-চৌধুরী, সাধন সরকার, সুবলচন্দ্র দত্ত, সুনীত মুখো, কমল মজুমদার, মণি ঘোষ, নমিতা চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার বন্দ্যো, লাবণ্য পালিত, গীতা সিং, প্রীতিধারা মুখো, মিহির ভট্টা, রেণু বিশ্বাস। * * ২২শে ফেব্রুয়ারী—ধাত্রীপান্না, শচীন সেনগুপ্ত, বীরেন ভদ্র, —দীপা পাল চৌধুরী, উষাবতী, সন্তু বসু, কালীপদ চক্রবর্তী, ভূপেন চক্রবর্তী, সন্তোষ সিংহ, ছবি বিশ্বাস, মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়কুমার, শিপ্রা মিত্র। * * ১লা মার্চ—ঘরে বাইরে, রবীন্দ্রনাথ, নাট্যরূপ, ক্ষিতি মুখো,—শ্রীধর ভট্টাচার্য, অজিত বন্দ্যো, সঞ্জীব দে, সুশীল দেব, পূর্ণেন্দু দত্ত, অমূল্য কাবেঞ্জী, দক্ষিণারঞ্জন ঘোষাল, নীলিমা দাস, সাধনা রায়-চৌধুরী, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। * * * বিদুষী—মসেয়ার। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র,—শোভা সেন, তৃপ্তি মিত্র, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, রমা অধিকারী, নমিতা হালদার, শান্তা ঘোষ, পাহাড়ী সান্যাল, সুকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যেন মুখোপাধ্যায়, অসিত মিত্র। * * * পথ ভুলে—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

কুশলী অভিনেত্রী শ্রীমতী দেবযানী (উষা খাঁ)

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের অংশ পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের দামামা বেজে উঠেছে। সর্বত্রই

জেগে উঠেছে উৎসাহ ও উদ্দীপনা। এরই মধ্যে একদিন রওনা হলুম চলচ্চিত্র-শিল্পে শিল্পীদের মতামত জানবো বলে শ্রীমতী দেবযানীর (উষা খাঁ) বাসভবনে লাউডন স্ট্রীটে। সাধারণতঃ এখানে যাঁরা বাস করেন তাঁরা সকলেই সম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। এখানে সহর ও গ্রাম একত্র হয়ে এক অভিনব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বাড়ীখানির নিস্তব্ধতা একটা বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়। শিল্পিমনের যথেষ্ট খোরাক এখানে যে পাওয়া যায়, তার পরিচয় পেলুম শ্রীমতী দেবযানীর বাসভবনের সম্মুখে এসে। সত্যিই যেন শিল্পীর আঁকা একখানি ছবি! পূর্ব্বেই টেলিফোনে এ সাক্ষাৎকারের সময় নির্দ্ধারিত ছিল। তাই যাওয়া মাত্র আমাকে নিয়ে বসান হলো একটি সুসজ্জিত কক্ষে। শিল্পীর রুচি এ স্থানটির সব কিছুতে পরিস্ফুট দেখতে পেলুম।

কয়েক মিনিট পরেই শ্রীমতী দেবযানী এসে উপস্থিত হলেন নিতান্ত সাদাসিধে পোষাকে। আধুনিক যুগে যাঁরা উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে চিত্রজগতে আসে—এর ভাল মন্দ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে এঁদের কি ধারণা, এ জানবো ও জানাবো বলেই শ্রীমতী দেবযানীর সঙ্গে আমার এবারকার সাক্ষাৎকার। বাঙ্গালার শিক্ষিত অভিজাত পরিবারের মেয়ে ও বধূ ইনি। এঁর স্বামী শ্রী এ ডি খাঁ আই, সি, এস পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পদস্থ কর্ম্মচারী। ক'লকাতার বেথুন স্কুল ও কলেজেই এঁর বেশীর ভাগ পড়াশুনো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি পড়াশুনো করেছেন। উত্তর-কলকাতার রমেশ দত্ত স্ট্রীটে এক অভিজাত শিক্ষিত পরিবারে এঁর জন্ম। এ সকল দিক থেকে তাঁর চিত্রজগতে অবতরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্বীকার করতেই হ'বে।

প্রাথমিক নমস্কার আদান-প্রদানের পরই সুরু হলো আমাদের চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোচনা। শ্রীমতী দেবযানী বলতে থাকেন ১৯৫০ সালে 'বড় বউ' ছবিতে একটি ক্ষুদ্র অংশে আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ। তারপর অনেক ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছি। কোন ছবিতে এবং কোন ভূমিকায় অভিনয় করে সব চাইতে তৃপ্তি পেয়েছি তা আজ বলা সহজ নয়। তবে এটুকু অবশ্যি বলবো যে 'স্পর্শমণি' ছবিতে কল্যাণীর চরিত্রে রূপদান করে আনন্দ পেয়েছি প্রচুর এবং তৃপ্তিও পেয়েছি সেই পরিমাণে। চলচ্চিত্রে যোগদানের বিশেষ কোন কারণই ঘটেনি আমার জীবনে। তবে ছেলেবেলা থেকে স্কুল ও কলেজে আমি অভিনয় করতুম এবং এ জন্য প্রশংসাও পেয়েছি প্রচুর। তাই এমনি 'বড় বউ' ছবির পরিচালক মশা'ই একদিন যখন অনুরোধ করলেন, আমিও রাজী হয়ে গেলুম। তবে এটুকু বলবো, এ লাইনে আসতে আমার ব্যক্তিগত আপত্তি কোন দিনই ছিল না এবং আমার স্বামীও কোন দিন আপত্তি করেন নি। চলচ্চিত্র শিল্পে যোগদানের পর আমার সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে কোন পরিবর্ত্তনই আসে নি, এ-ও বলব। আমি আগেও যেমন ছিলুম, এখনও ঠিক তেমনই আছি।

এর পর আমি শ্রীমতী দেবযানীর দৈনন্দিন কর্ম্মসূচীর বিষয় জানতে চাইলুম। তিনি বলে চল্লেন—সাধারণতঃ আমি একটু দেরী করে ঘুম থেকে উঠি। তার পর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে বেরিয়ে যাই। কোন দিন হয়তো গেলুম বাজারে, কোন দিন হয়তো বা বন্ধু-বান্ধবীদের বাড়ীতে। দুপুরবেলা বাড়ীতে ফিরে এসে পড়াশুনো করি। সন্ধ্যায় স্বামীর সঙ্গে প্রত্যহই প্রায় বেড়াতে যাই। কখনও বা সিনেমায় গেলুম। 'হবি'র কথা যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বলবো, বিশেষ কোন 'হবি'ই আমার নেই; তবে পড়াশুনো ও ছবি আঁকতে আমি ভালবাসি। এ দুটোকে যদি 'হবি' বলে ধরেন তাতে আপত্তি করবো না। খেলা-ধূলো সম্পর্কে যদি জানতে চান তবে বলতে পারি যে, টেনিস খেলা দেখতে আমি খুব ভালবাসি। পড়াশুনোর দিক থেকে বলতে পারি, যে পুস্তক পাঠ করলে নোতুন ধরণের জ্ঞান ও শিক্ষা পাওয়া যায়, যার ভেতর যুক্তি ও তর্কের অবতারণা থাকে, সেই সব পুঁথি-পুস্তক পাঠ করতেই আমার ভাল লাগে।

এর পর আমি শ্রীমতী খাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলুম। তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন, সাদাসিধে ধরণের পোষাকই আমার পছন্দ। কেন না, পোষাক-পরিচ্ছদ এমন হওয়া উচিত নয় যে লোকে আসল মানুষটিকে বাদ দিয়ে তার পোষাকের উপরেই নজর দেয়। আসল কথা হচ্ছে, আসল লোকটাকেই যাতে চোখে পড়ে, এমনই সাদাসিধে পোষাক-পরিচ্ছদ পরতে হবে। জমকাল পোষাক আমি পছন্দ করি না এবং আমার ভালও লাগে না।

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি বিশেষ গুণ থাকার দরকার, আমি জিজ্ঞেস করলুম। প্রথমেই শ্রীমতী দেবযানী বললেন, অভিনয়-দক্ষতা কণ্ঠস্বর এবং সু-চেহারা। ভাল ছবি যদি তৈরী করতে হয় তবে সর্ব্বপ্রথম ভাল 'সিনেরিও' তৈরী করতে হবে। তার পরেই অভিনেতা-অভিনেত্রী সঠিক নির্ব্বাচন। যাকে যে চরিত্রে মানায় তাকে ঠিক সেই চরিত্রটির উপযোগী অংশে নির্ব্বাচন করতে হ'বে। এ করলে অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়ও সহজ হয়ে আসে। তার

শ্রীমতী দেবযানী

পরেই প্রয়োজন সুদক্ষ পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানের। এ ক'টির সমাবেশ হলেই ছবি ভাল না হ'য়ে পারে না। তবে এটুকু অনিবার্য্য বলবো যে, বাংলা ছবির উৎকর্ষ সাধন করতে হলে সরকারকে এ বিষয়ে অগ্রণী হতে হবে। সরকার যত দিন এ শিল্পের management না নিচ্ছেন তত দিন এ ছবির উৎকর্ষ সাধন হবে না এই আমার বিশ্বাস। বাংলা ছবি সম্পর্কে আমার মত এই যে not quantity but quality is essential, অবিশ্যি বাংলা ছবিও উচ্চ পর্য্যায়ের হয়েছে। যেমন 'পথের পাঁচালী' "কাবুলিওয়ালা" ইত্যাদি। এ রকম ছবি হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শিল্পীদের স্বাস্থ্যরক্ষা করা ও শরীরের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক কি? প্রশ্ন করলুম আমি। শ্রীমতী দেবযানী দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন নিশ্চয়ই, শিল্পীদের স্বাস্থ্যরক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। কারণ স্যুটিং খুব পরিশ্রমের কাজ। এজন্যও স্বাস্থ্য-রক্ষা করা প্রয়োজন। চেহারাই যখন এ শিল্পের সব, সুতরাং সেটা বজায় রাখার জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের এদিকে 'knack' আছে, ইচ্ছে আছে—তাদের আরও অধিক সংখ্যায় এ লাইনে আসা উচিত। কেন না, অন্যান্য লাইনেও যোগ দিতে যেমন বাধা নেই, এ শিল্পের বেলাতেও ঠিক তাই।

এর পর আমি আর একটি প্রশ্ন কর'লুম—আপনার গড়ে মাসিক আয় কত এবং কত দিন যাবং এ বৃত্তি আপনি গ্রহণ করেছেন? শ্রীমতী দেবযানী উত্তর করলেন স্পষ্ট ভাষায়—চলচ্চিত্র শিল্পটিকে আমি বৃত্তি বলে গ্রহণ করিনি। কখনও অভিনয় করি কখনও করি না। আজকাল খুব কম ছবিতেই আমি অভিনয় করে থাকি। সুতরাং গড়ে মাসিক আয়ের কোন প্রশ্নই উঠে না। আমার অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী খাঁ বললেন, সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান অতি উচ্চে। এ'র মাধ্যমে অনেক কিছু শিক্ষাদান করা যায়। সমাজ-জীবনে এর প্রভাব অত্যন্ত বেশী। তবে ছবিগুলো আদর্শমূলক ছবি হওয়া চাই। যার ভেতর শিক্ষণীয় কিছু থাকবে। আমার মতে লোকশিক্ষার জন্যে চলচ্চিত্রই হচ্ছে একমাত্র মাধ্যম। তবে এক ধরণের লোক আছেন যাঁরা, এটাকে খারাপের চোখে দেখে থাকেন। আমি কখনই তাদের দলে নয়।

এর পর আমি কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলুম। শ্রীমতী দেবযানী উত্তর দিয়ে চলেন। আমি ইংরেজী ছবি দেখতেই ভালবাসি। বিবাহিত স্বামী অথবা স্ত্রী অভিনয়ে আপত্তি অনেক যায়গায়ই করেন না বলে আমার মনে হয়। তবে এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, পারিবারিক প্রশ্ন।

এভাবে চলচ্চিত্র-শিল্পের বহু দিক আলোচনা হ'লো। শ্রীমতী খাঁয়ের এ শিল্প সম্পর্কে খুব গভীর জ্ঞান একথা স্বীকার করতেই হ'বে। তিনি এ শিল্পের উৎকর্ষ সম্পর্কে চিন্তা করে থাকেন। এবং যা'তে এ শিল্পের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়, এটাই তাঁর কামনা। পরিশেষে তিনি বললেন, চলচ্চিত্রের উন্নতি সাধন যথাযথ ভাবে দেশের সরকারই করতে পারেন। বললেন আরও—আমি আশা রাখবো, ভবিষ্যতে সরকার যাহাতে এ শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে অগ্রণী হন, তবেই দেশে ভাল ভাল ছবি নির্ম্মিত হ'বে।

ওজন যদি কমাতে হয়

এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাঁদের দেহ-কাঠামোগুলো অতিমাত্র চর্ব্বি বা মেদবহুল। এঁদের দুর্ভাবনা কিন্তু কম নয়; চলাফেরায়, আহারে, নিদ্রায় সব সময়ই এঁদের কী অস্বস্তি! এঁরা ঠিক সুস্থ বা নীরোগ, এ সত্যি বলা চলে না—অতিরিক্ত মেদ বা চর্ব্বিটাই হ'ল এঁদের ব্যাধি। বাধ্য হয়ে অর্থাৎ বাঁচবার তাগিদে এঁরা ছুটে যান ডাক্তার বা চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞের কাছে—ব্যবস্থাপত্রে যাতে শরীরের অস্বাভাবিক বাড়তিটা কমে যায়। হার্টটাকে মজবুত ও সক্রিয় রাখতে হলে এইটি তাঁদের না হলেই যে নয়।

রকমারী ব্যবস্থাপত্রই এর জন্যে চলে আসছে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বলা হয়—খাওয়া কমাও। অবশ্য এটা ঠিক, অতিরিক্ত দেহ বা উদরস্ফীতি কমাতে হলে বয়স ও উচ্চতার অনুপাতে আমাদের খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে। মূল সূত্র বা কথাই—শরীরকে কষ্ট দাও, জিভ সংযত কর, তবেই ক্ষীণকায় হতে পারবে। যারা এমনি কৃশাঙ্গ, যাঁদের ওজন স্বাভাবিক পর্য্যায়েরও নিম্নে, তাঁদের জন্য ব্যবস্থাপত্র অবশ্যি আলাদা, প্রথমোক্ত শ্রেণীর ব্যবস্থাপত্রের বরং উল্টো।

বিলেতী দেহ-বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকেরা মেদবহুল মানুষের প্রশ্ন নিয়ে কম গবেষণা করেন নি। নানা ধরণের পরামর্শ তাঁরা তাঁদের রোগীদের দিয়ে আসছেন—এর ভিতর যতটা সম্ভ খাদ্য বর্জ্জন, শরীরচর্চা প্রভৃতি বিচিত্র বিধি-ব্যবস্থাও পরিকল্পি হয়েছে। এ সব ব্যবস্থা অনুসরণে সাফল্যও যে কিছু পরিমা দেখা যায়নি, এমন নহে। খাদ্য সংক্রান্ত একটি ব্যবস্থাপ চমৎকার—কোন বাঁধাবাঁধি খাদ্য-তালিকার প্রয়োজন নেই বাড়তি ওজন বা মেদ কমাবার জন্যে। খেতে বসে সব রকম খাদ্য চেয়ে নেওয়া চাই কিন্তু সবই পুরোপুরি না খেলেই হ'ল। কোনট হয়ত ভেতর থেকে একটু, কোনটার বা উপর উপর খেয়ে নেওয় অভ্যেস করতে হবে এবং এ ধারা অনুসরণ করে চললেই শেষ অব নিশ্চিন্তি।

কোন কোন মহলে আর একটি ব্যবস্থা বা ব্যবস্থাপত্রের কথা ব হয়—সেটি হ'ল মনকে সব সময় চিন্তার মধ্যে রেখে দেওয়া। চিন্ত বাড়তি মেদ যতটা সহজে কমতে পারে, হ্রাস পেয়ে যাবে দৈ ওজন, অন্য ব্যবস্থায় তেমনটি প্রায়ই সম্ভব নয়। রাত্রিতে না ঘু কাটাবার চেষ্টা, কাজে অকাজে ঘুরে বেড়ান, মাথা গুলিয়ে যায়, এ কিছুকে হতে দেওয়া শরীরের অস্বাভাবিক স্ফীতি কমাবার জন্যে সব ব্যবস্থার কথাও শুনতে পাওয়া যায়। এগুলো অনুসরণ ক খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ির দিকে ততখানি মনোযোগী না হ' চলতে পারে, এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদেরই এইটি দাবী।

বিজ্ঞান বার্ত্তা

পক্ষধর মিশ্র

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগের নিরাময়ের জন্য মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু হলো ইনসুলিন। ইনসুলিন, এবং তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় খাদ্য ব্যবহার করে ডায়াবেটিস রোগের কারণকে অতি সহজেই সাফল্যের সঙ্গে আয়ত্তাধীন রাখা যায়। কিন্তু ইনসুলিনের একটি বিশেষ অসুবিধা যে, একে মুখ দিয়ে গ্রহণ করা যায় না, সর্ব্বদাই ইনজেকসন করে দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়। ঔষধ হিসাবে ইনসুলিনের কার্য্যকারীতা অত্যন্ত সন্তোষজনক হওয়া সত্বেও, কেবলমাত্র এই একটি অসুবিধার জন্যই বিজ্ঞানীরা এর পরিবর্ত্তে বহুমূত্র রোগের জন্য অন্য নতুন কোন ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন। কয়েকটি পদার্থ আবিষ্কৃতও হয়েছে যা মুখ দিয়ে গ্রহণ করলেই রক্তে অবস্থিত শর্করার ভাগ কমিয়ে দেয়, কিন্তু উত্তেজক ও ক্ষতিকারক ক্রিয়ার জন্য তাদের মানবদেহে ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি। গত মহাযুদ্ধের আগেই জার্ম্মাণীতে সিনথেলিন নামক একটি পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছিল; এর বহুমূত্র রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা চিকিৎসকদের সন্তোষবিধান করলেও, লিভারের উপর ক্ষতিকারক প্রক্রিয়ার জন্য চিকিৎসামহলে ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি। দু'জন জার্মান চিকিৎসাবিজ্ঞানী নতুন একটি অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় বস্তু আবিষ্কার করেছেন যা বহুমূত্র রোগে মুখগহ্বর দ্বারা গ্রহণ করলেও সুফল দেয়। ঔষধটির রাসায়নিক নাম সালফানিলিল এন্ বুটাইলইউরিয়া; সাধারণ ভাবে এটি বি-জেড্ ৫৫ নামেই পরিচিত। বি-জেড্ ৫৫ পৃথিবীর বহু বিখ্যাত হাসপাতালেই রোগীদের উপর পরীক্ষা করা হয়েছে,—সব জায়গায়ই পাওয়া গেছে একই সুফল। তাঁরা জানিয়েছেন প্রৌঢ় বয়সে যে সব বহুমূত্র রোগী কেবলমাত্র খাদ্য সংযমের দ্বারা রোগকে দমন করে রাখতে পারেন না, তাঁদের পক্ষে বি-জেড্ ৫৫ অত্যন্ত সুফলদায়ক হবে। কিন্তু কিটোনিউরিয়া নামক জটিল বহুমূত্র রোগে এই ঔষধ ফলপ্রদ হবে না।

• • • •

কয়েকজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী কিন্তু বি-জেড্ ৫৫-এর সাফল্যের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। এটি একটি সালফোনামাইড জাতীয় ঔষধ;—রোগমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার ক্ষতিকারক প্রক্রিয়ার জন্য এই জাতীয় ঔষধের যথেষ্ট কুখ্যাতি আছে। সন্দেহকারী চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে বি-জেড্ ৫৫, রক্তের শ্বেতকণিকার সংখ্যা কমিয়ে দেয় এবং এছাড়াও নানা প্রকার উপসর্গের উদ্ভব ঘটে। যদিও আবিষ্কারক বিজ্ঞানীরা, এর ক্ষতিকারক কোন প্রক্রিয়াই নেই বলে দাবী জানিয়েছেন, —তবু এই ঔষধ প্রয়োগের জন্য অ্যালার্জ্জী এবং অন্যান্য উপসর্গের দ্বারা দু'টি রোগীর মৃত্যুও হয়েছে। কয়েকটি হাসপাতালে তাই বি জেড্ ৫৫কে সামান্য পরিবর্ত্তিত করে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হচ্ছে।* পরিবর্ত্তিত যৌগিক পদার্থটির নাম প্যারাটলিল সলফোনিল এন্ বুটাইল ইউরিয়া বা সংক্ষেপে ডি ৮৬০। এটি সালফোনামাইড জাতীয় ঔষধ নয় তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আশা করছেন এর উপসর্গও অনেক কম হবে। ঔষধটি পৃথিবীর বিভিন্ন হাসপাতালে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

• • • •

বিজ্ঞান শিক্ষার এক প্রধান সমস্যা হলো বাংলাদেশে কলেজগুলিতে উপযুক্ত ল্যাবরেটরীর অভাব। ল্যাবরেটরী নিশ্চয় আছে,—কিন্তু সেখানে স্থানের একান্ত অভাব আর পরিবেশ এতোই অস্বাস্থ্যকর যে, স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে অবিলম্বে আমূল সংস্কার প্রয়োজন। উপযুক্ত ল্যাবরেটরী আছে এরূপ কলেজের সংখ্যা আমার মনে হয় খুবই কম। বেসরকারী কলেজের কথা ছেড়ে দিন,—এমন অনেক সরকারী কলেজ আছে যেখানে রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণাগারকে অন্ধকূপের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বাতাস চলাচলের পথ একেবারে বন্ধ, কাজের সময় ল্যাবরেটরীর মধ্যে যে গ্যাসের সৃষ্টি হয়, তা ছাত্রদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসায়ন বিজ্ঞানী অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় তাঁর এরূপ এক সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কথা আক্ষেপ করে বর্ণনা করছিলেন। তিনি গিয়েছিলেন কোন একটি সরকারী মফঃস্বল কলেজে তাদের বিজ্ঞান পরিষদের বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করতে;—অনুষ্ঠানের পর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ল্যাবরেটরী তিনি পরিদর্শন করেন। ল্যাবরেটরীর দুরবস্থা বর্ণনা করা যায় না, বাইরের বাতাসের সঙ্গে ভেতরকার পরিবেশের কোনই সংযোগ নেই। সরকারী কলেজে এরূপ অস্বাস্থ্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করে সরকারের কর্ত্তব্যে অবহেলা করলেও,—বিশ্ববিদ্যালয় করছেন কি? বাংলার ভবিষ্যত বিজ্ঞান কর্ম্মীদের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে. নিয়মকানুনের অস্ত্র প্রয়োগ করে তাঁরা কি এর প্রতিবিধান করতে পারেন না? কলেজ দরিদ্র হতে পারে জিনিষপত্র কম থাকতে পারে, কিন্তু যেখানে হাতে-কলমে কাজ হবে সেখানকার পরিবেশ নির্ম্মল থাকতেই হবে। নীচু ক্লাসে ছাত্রদের পড়ানো হয়, —'স্বাস্থ্যই সম্পদ।' কর্ত্তৃপক্ষেরও এই শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

• • • •

আপনারা বোধহয় জানেন পরমাণু শক্তি পরিচালিত ২টি ডুবো জাহাজ আমেরিকার নৌবিভাগ ইতিমধ্যেই নির্ম্মাণ করেছেন। ডুবো জাহাজ দুটির নাম দেওয়া হয়েছে 'নটিলাস' এবং 'সীউল্ফ।' সম্প্রতি নৌবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ পরমাণু-শক্তি চালিত একটি বাণিজ্য জাহাজ নির্ম্মাণ করতে মনস্থ করেছেন। জাহাজটিতে যাত্রীও নেওয়া হবে এবং মালও বহন করা হবে। ১২ হাজার টনের এই জাহাজটিতে যাত্রী ধরবে ১০০ জন. জাহাজটির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হবে ১৯৫৯ সালে। এই জাহাজটি নির্ম্মাণ করতে নৌবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষকে আমেরিকার 'অ্যাটমিক এনার্জ্জি কমিশন' সাহায্য করেছেন। জাহাজের শক্তি

সরবরাহকারী অংশ নির্মাণ করবেন 'এ্যাটমিক এনার্জি কমিশন' এবং অন্যান্য অংশ নির্মাণ ও তৎসঙ্গে নাবিকদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন নৌবিভাগের কর্তৃপক্ষ। উভয় বিভাগের কর্তৃপক্ষই বহুদিন ধরে একযোগে, পরমাণু-শক্তি চালিত জাহাজ নির্মাণের জন্য গবেষণা করছিলেন। তাঁদের গবেষণার ফলাফল আশাপ্রদ হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁদের এই জাহাজটি নির্মাণ করবার জন্য ৪ কোটি ২৫ লক্ষ ডলার মঞ্জুর করেছেন। পরমাণু-শক্তি চালিত জাহাজের, সাধারণ জাহাজের চেয়ে কয়েকটি বেশী সুবিধা আছে। সর্বপ্রথম সুবিধা স্থান সঙ্কুলান। পরমাণু শক্তি সরবরাহের যান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য তেল বা কয়লার বয়লারের চেয়ে স্থান অনেক কম লাগবে,—তাছাড়া বিরাট জ্বালানী ভাণ্ডারেরও প্রয়োজন হবে না। বছরে মাত্র একবার জ্বালানী বদল করলেই জাহাজে শক্তি সরবরাহের কাজ অক্ষুণ্ণ থাকবে। কতো সুবিধা হবে একবার চিন্তা করে দেখুন,—তেল আর কয়লা গ্রহণ করার জন্য জাহাজকে মূল্যবান সময় ব্যয় করতে হবে না। জ্বালানী ভাণ্ডার না থাকার জন্য; যান্ত্রিক আয়োজন হাল্কা হওয়ায় বাণিজ্য জাহাজ সমূহ অনেক বেশী মাল বহন করতে পারবে। বন্দরে বন্দরে জ্বালানী সংগ্রহের প্রয়োজন না থাকায় জাহাজ কোম্পানী-গুলি অনেক সংক্ষিপ্ত সময়ে মাল খালাস করে লাভবান হবেন।

* * * *

গোর্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশ পর্য্যবেক্ষণ মন্দিরের পরিচালক অধ্যাপক এন, পি, বারাবাসভ ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা মঙ্গলগ্রহের উপর ১৯৫৬ সালের শেষে একটি উজ্জ্বল অঞ্চল দেখতে পেয়েছেন। তিনি বা তাঁর সহকর্মীরা পূর্ব্বে এরূপ উজ্জ্বল অঞ্চল এসময় আর কখনও দেখেন নি। পর্যবেক্ষণের সময় মঙ্গলগ্রহ তার দক্ষিণ মেরু অঞ্চল পৃথিবীর দিকে ঘুরিয়েছিল, অধ্যাপক বারাবাসভ এর মতে তারই কোন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তুষারপাতের জন্য, এই অতি উজ্জ্বল সাদা অংশ তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কিন্তু কারণ কি? এখন তো মঙ্গলের এই মেরু অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল, জুন মাসে হাজার হাজার মাইল অঞ্চলে যে তুষার জমে থাকে তা তো সূর্য্যের কিরণে বহুপূর্ব্বেই গলে গিয়েছে। গত আগষ্ট মাসেই ঐ বরফের চিহ্নমাত্র ছিল না, সমস্ত স্থান পৃথিবী থেকে দেখাচ্ছিল কালো। পৃথিবীর আরও বহু পর্য্যবেক্ষণ মন্দিরই তাঁর বিবৃতিকে সমর্থন জানিয়েছেন কিন্তু হঠাৎ কি কারণে মঙ্গলের বুকের উপর অকালে এই প্রচণ্ড তুষারপাত হলো তার কারণাকারণ নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় নি।

জোসেফ জন থমসন

বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী জোসেফ জন থমসন শতবর্ষ আগে ১৮৫৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ম্যাঞ্চেষ্টারের সহরতলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন পুস্তক বিক্রেতা এবং প্রকাশক ফলে তার বাল্যকাল বইয়ের পরিবেশেই কেটেছিল। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ম্যাঞ্চেষ্টারের ওয়েনস্ কলেজেতে তিনি ভর্ত্তি হন এবং এখানেই কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান শিক্ষকের সংস্পর্শে আসবার তাঁর সুযোগ হয়। এখানে রস্কু তাঁদের রসায়ন বিজ্ঞান, টমাস বারকার গণিত বিজ্ঞান এবং ষ্টিউয়ার্ট পদার্থ বিজ্ঞান পড়াতেন। ষ্টিউয়ার্টের প্রভাবেই থমসনকে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করে।

কলেজে ভর্ত্তি হবার ২ বছর পরে থমসনের বাবা মারা যান। মা এবং ছোট একটি ভাইকে নিয়ে মাত্র ১৬ বছরের ছাত্র থমসনকে আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়তে হয়েছিল কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে নানা প্রকার বৃত্তি লাভ করে তিনি কোনরকমে আর্থিক অসুবিধা কাটিয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ২০ বছর বয়সে ১৮৭৬ সালে থমসন ট্রিনিটি কলেজে একজন গবেষক হিসাবে প্রবেশাধিকার পান। ইতিমধ্যেই তিনি রয়েল সোসাইটীর মুখপত্রে 'বিদ্যুৎ শক্তি'র উপর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। ১৮৮০ সালে জোসেফ থমসন ট্রাইপস পরীক্ষা সেকেণ্ড র‍্যাঙ্গলার হিসাবে উত্তীর্ণ হয়ে গবেষণা করবার জন্য ক্যাভেণ্ডিস ল্যাবোরেটরীতে যোগদান করলেন। লর্ড র‍্যালে অবসর গ্রহণের পরে মাত্র ২৮ বছর বয়সে তরুণ বিজ্ঞানী থমসন ক্যাভেণ্ডিস অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। থমসনের পরিচালনায় ক্যাভেণ্ডিস গবেষণা-গারের নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো। ১৮৯০ সালে থমসন, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের আর একজন অধ্যাপক সার জর্জ প্যাগেটের কন্যা মিস্ রোজ প্যাগেটকে বিবাহ করেন। মিস রোজ প্যাগেটও পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্রী এবং তিনি থমসনের প্রথম ছাত্রী গবেষকদলের অন্যতমা ছিলেন। ১৮৯৩ সালে 'বিদ্যুৎ এবং চুম্বক বিজ্ঞানের উপর সাম্প্রতিক গবেষণা', নামক একটি পুস্তক থমসনের খ্যাতি আরও বহুগুণে বৰ্দ্ধিত করলো। ইতিমধ্যেই ১৮৯৪ সালে এই খ্যাতনামা তরুণ বিজ্ঞানী ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটির সদস্য পদ লাভ করেছেন। থমসন ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত গ্রেট বৃটেনের রয়েল ইনসটিটিউসনের প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ক্যাভেণ্ডিস অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর ট্রিনিটি কলেজের মাষ্টারসিপও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে দেশের সরকার থমসনের কাছে সহায়তা চাইলেন এবং তিনি সরকারের বিভিন্ন বিভাগে উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করে যুদ্ধ জয়ে সম্পূর্ণ সহায়তা করেন। ১৯১৬ সালে তিনি রয়েল সোসাইটীর সভাপতি হন এবং পাঁচ বছর এই পদ তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি সার উপাধি পান এবং সমগ্র জীবনে দেশে-বিদেশে এতো বিভিন্ন প্রকার সম্মান লাভ করেছিলেন তা এখানে বর্ণনা করা অসম্ভব। ১৯০৬ সালে বিজ্ঞানী থমসন পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

থমসনের করপাসকলস আবিষ্কারই বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরকাল অমর করে রাখবে। নেগেটিভ বিদ্যুৎকণার ভরের অবস্থিতি তাঁর গবেষণার মাধ্যমেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরীক্ষামূলক ভাবে 'ইলেকট্রনের' অবস্থিতি প্রমাণিত করে এই বিজ্ঞানী বর্ত্তমান কালের পরীক্ষামূলক পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। একটি বায়ুশূন্য বদ্ধ টিউবের মধ্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ চালিয়ে তিনি ক্যাথোড রশ্মির গুণাগুণ নির্ণয় করেন। এই ক্যাথোড রশ্মি সারিবদ্ধ ইলেকট্রন কণিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর ভর আছে, এই রশ্মি বৈদ্যুতিক এবং চুম্বক পরিবেশে বক্র পথ ধারণ করে। পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ছাড়াও, বিশুদ্ধ গণিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানী থমসন কিছুদিন গবেষণা করেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে সার থমসন ছিলেন সদালাপী, সরল মানুষ। গৃহে কি গবেষণাগারে তাঁর মন বেশীর ভাগ সময়েই গবেষণার চিন্তায় মগ্ন থাকতো, গবেষণাগারে নিপুণ কর্ম্মী তিনি ছিলেন না, কিন্তু বিষয় বস্তুর অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ছিল প্রখর। তাই তাঁর চিন্তাধারায় পুষ্ট বহু কাজ অন্য বিজ্ঞানীরা সম্পাদিত করেছেন। বিজ্ঞানী থমসন ১৯৪০ সালের ৩০শে আগষ্ট, ৮৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

আরব-ইসরাইল বিরোধ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—

অবশেষে ইসরাইল গাজা অঞ্চল ও তিরান প্রণালী হইতে সৈন্যবাহিনী অপসারণ করায় চারি মাসব্যাপী এক অচল অবস্থার অবসান হইয়াছে। সুয়েজ খাল পরিষ্কার করিবার কাজও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সুয়েজ খাল সংক্রান্ত মূল সমস্যাটি এতদিন ধামা চাপা পড়িয়াছিল। এবার উহা আবার উত্থাপিত হইবে। তাহাড়া ইসরাইল মিশর আক্রমণ করায় আরব-ইসরাইল, বিশেষতঃ মিশর-ইসরাইল সমস্যাটা নূতন ভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। মিশর হইতে ইসরাইলী বাহিনী অপসারণের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ছয় বার নির্দ্দেশ দেওয়ার পরেও ইসরাইল দীর্ঘকাল এই নির্দ্দেশ যে কারণে অমান্য করিয়াছে, তাহারই মধ্যে এই সমস্যা পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একটি দাবী গাজা অঞ্চলের ফাদিয়ান হইতে গেরিলা আক্রমণ বন্ধ করিতে হইবে। দ্বিতীয় দাবী শারম-এল-শেখ-এর উপকূল বাহিনীর গোলাবর্ষণ হইতে আকাবা উপসাগরে ইসরাইলের জাহাজ নিরাপদ করিতে হইবে। গত ১লা মার্চ্চ (১৯৫৭) ইসরাইলের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিসেস গোল্ডা মেইর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ইসরাইলী বাহিনী অপসারণ সম্পর্কে যে-পরিকল্পনা উত্থাপন করেন, তাহাতে উল্লিখিত সর্ত্ত দুইটির উল্লেখ করেন। তিনি এই পরিকল্পনা উত্থাপনের পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি মিঃ লজ বলেন যে, ওয়াশিংটনে ফরাসী অফিসারদের সহযোগিতায় মার্কিণ গবর্ণমেন্ট ও ইসরাইলের মধ্যে যে চুক্তি হয় তাহা হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে, অবিলম্বে সৈন্য অপসারণ করা হইবে এবং উহা সর্ত্তাধীন হইবে বলিয়া মার্কিণ গবর্ণমেন্ট মনে করেন না। তাঁহার এই উক্তির ফলে ইসরাইলী সৈন্য অপসারণ ব্যাপারে নূতন এক বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল। মিশর গাজা অঞ্চলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট হইতে এই আশ্বাস না পাইলে ইসরাইল সৈন্য অপসারণ করিবে না, এইরূপ আশঙ্কা দেখা দেয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট হইতে ইসরাইল কোনই আশ্বাস পায় নাই। অধিকন্তু আরব রাষ্ট্রগুলি ইসরাইলের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের দাবী উপস্থিত করে। সুয়েজ খাল পরিষ্কারের কাজে মিশর বাধা সৃষ্টিও করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় ছিল না।

ইসরাইল বিনা সর্ত্তেই সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইয়াছে বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়। ইসরাইলের দাবী সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তো কোন আশ্বাস দেয়-ই নাই, মিশরও কোন আশ্বাস দেয় নাই। তবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ইসরাইল যে আশ্বাস পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কি আশ্বাস পাইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। ইসরাইলী সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে মিসেস গোল্ডা মেইর সাধারণ পরিষদে পরিকল্পনা উত্থাপনের পূর্ব্বে ইসরাইল যে মার্কিণ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে আশ্বাস পাইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। মিঃ লজের উক্তির পর এই আশ্বাস সম্পর্কে নূতন করিয়া ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা ইসরাইল মন্ত্রিসভা বিশেষ ভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন। ২রা মার্চ্চ (১৯৫৭) প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের নিকট হইতে ব্যাখ্যা পাওয়ার পর সৈন্য অপসারণের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। ২রা মার্চ্চের পত্রে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মিঃ বেন গুরিয়নের নিকট কি লিখিয়াছেন তাহা অবশ্য জানিবার উপায় নাই। এ সম্পর্কে গত ৫ই মার্চ্চ মিঃ ডালেস যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, যে-সকল সর্ত্তাধীনে ইসরাইল সৈন্য সরাইয়া লইতে সম্মত হওয়ার কথা ইসরাইলের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উল্লেখ করেন মিঃ বেন গুরিয়নের নিকট ২রা মার্চ্চের পত্রে প্রেঃ আইসেনহওয়ার তাহার সবই মানিয়া লইয়াছেন, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। আরব-ইসরাইল সমস্যা এবং মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিণ গবর্ণমেন্টের আশ্বাসের কথা বিবেচনা করা আবশ্যক।

গাজা অঞ্চল এবং আকাবা উপসাগর সম্পর্কে ইসরাইলের দাবী যে খুবই সঙ্গত একথা অস্বীকার করা যায় না। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল অমুসলমান রাষ্ট্র বলিয়াই তাহার ন্যায়সঙ্গত দাবী অন্যায় হইয়া গিয়াছে, একথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইসরাইল মিশর আক্রমণ করায় আক্রান্ত মিশর সমগ্র বিশ্বের সহানুভূতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার ফলে মিশরের বিরুদ্ধে ইসরাইলের কেস্‌টা খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, একথাও অনস্বীকার্য্য। মিশর ইহার সুযোগ ষোল আনা গ্রহণ করিয়া এইরূপ ধারণা সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে যে, প্রকৃত পক্ষে ইসরাইলের কোন ন্যায়সঙ্গত দাবী নাই বা থাকিতে পারে না। এইরূপ ধারণা সৃষ্টির ব্যাপারে মিশর কতকটা সাফল্যলাভ করিলেও উহা সত্য নয়। ইস্রাইল যে মিশর আক্রমণ করিয়া আন্তর্জ্জাতিক আইন ভঙ্গ করিয়াছে, একথা কেহ-ই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু মিশর একেবারেই নির্দ্দোষ, একথাও স্বীকার করা অসম্ভব। ইহা অবশ্য সত্য যে, মিশর ১৯৪৮ সাল হইতে সুয়েজ খাল দিয়া ইসরাইলী জাহাজ যাইতে দিতেছে না। কিন্তু ইহাও সত্য যে, সুয়েজ খাল দিয়া ইসরাইলী জাহাজ যাইতে না দিয়া মিশর ১৯৪৮ সাল হইতেই ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া আসিতেছে। গাজা অঞ্চল হইতে মিশর ইসরাইলের বিরুদ্ধে চালাইতেছে গেরিলা যুদ্ধ। সুতরাং ইসরাইল অপেক্ষা মিশর কম আইন-ভঙ্গকারী নয়। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্য ইসরাইল রাষ্ট্রকে সহ্য করা হইবে না, এ কথা প্রত্যেক আরব-রাষ্ট্র প্রকাশ্যেই ঘোষণা করিয়া আসিতেছে। এ

বিষয়ে বাগদাদ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত আরব-রাষ্ট্র এবং বাগদাদ চুক্তি বিরোধী রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কম্যুনিষ্ট আক্রমণ নিরোধের জন্য প্রাপ্ত সামরিক সাহায্য ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে তাহারা তাহাদের অভিপ্রায়ও প্রকাশ্যেই ব্যক্ত করিয়াছে। আরব-ইসরাইল সম্পর্কের এই পটভূমিকাতেই ইসরাইলের দাবীর কথা বিবেচনা করা আবশ্যক। গাজা অঞ্চল হইতে ইসরাইলী সৈন্য অপসরণের পর উহা যখন পুনরায় মিশরের অধিকারে যাইবে তখন মিশর আবার যে গেরিলা-যুদ্ধ চালাইবে না সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। তথাপি ইসরাইল তাহার সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইয়াছে। কর্ণেল নাসের কিম্বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যেখানে কোন আশ্বাস দেয় নাই, সেখানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কি ভাবে আরব তথা মিশরের আক্রমণ হইতে ইসরাইলকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিবে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের নীতি যে ইসরাইল রাষ্ট্রের অনুকূল তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে মনে করেন যে, বাগদাদ চুক্তিতে ইসরাইল রাষ্ট্রের স্থান হয় নাই বলিয়াই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঐ চুক্তিতে যোগদান করে নাই। বৃটেন, ফ্রান্স ও ইসরাইলের মিশর আক্রমণ প্রেঃ আইসেনহাওয়ার সমর্থন করেন নাই বলিয়াই, মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের নীতি ইহুদী বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার অনুপ্রবেশ রোধের জন্য হিসাবে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে তাঁহার পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছেন। শ্যাম ও কুল দুই-ই বজায় রাখা বড় কঠিন সমস্যা। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে মিশর, সিরিয়া, সৌদীআরব এবং জর্ডান এই চারিটি আরব রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানগণ কায়রোতে এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বলিয়াছেন, "The United States would have to choose between supporting Israel and being fair to the Arabs before the Arabs could discuss co-operation with the U. S." অর্থাৎ আরবরা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারার পূর্ব্বে ইসরাইলকে সমর্থন এবং আরবদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ এই দুই-এর একটি তাহাকে বাছিয়া লইতে হইবে। আরব রাষ্ট্রগুলির যেখানে এইরূপ মনোভাব সেখানে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট ইসরাইলকে যে আশ্বাস দিয়াছেন তাহা কার্য্যকারী করা বড় সহজ হইবে না। কর্ণেল নাসের প্রকাশ্যে কোন প্রতিশ্রুতি দিবেন, ইহা কল্পনা করা অসম্ভব। তিনি যদি প্রাইভেট কোন প্রতিশ্রুতি দেনও তাহা হইলে তাহার কোনও মূল্য হইবে কি? ইসরাইল তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে কি? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার মিত্রশক্তিবর্গের চেষ্টার ফলে কর্ণেল নাসের অপ্রকাশ্যে কোন প্রতিশ্রুতি দিলেও উহা কার্য্যকারী করিবার জন্য গাজাকে বাফার অঞ্চলে পরিণত করিতে হইবে। ইহার অর্থ গাজায় স্থায়ী ভাবে জাতিপুঞ্জ বাহিনীকে রাখিতে হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এই ধরণের প্রস্তাব পাশ করা বড় সহজ হইবে না। আকাবা উপসাগর দিয়া ইসরাইলী জাহাজ যাইতে না দেওয়ার অধিকার মিশরের আছে কি না, ইহাকে একটি আইনগত প্রশ্নে পরিণত করা যাইতে পারে। উহা হইবে আন্তর্জ্জাতিক আদালতের বিচার্য্য বিষয়। আকাবা উপসাগর যদি পুনরায় অবরোধ করা হয় তাহা হইলে তৎসম্পর্কে পরীক্ষা করিবার জন্য একটি মার্কিণ জাহাজ প্রেরণ করা হইতে পারে, এইরূপ ইঙ্গিতও দেওয়া হইয়াছে। মার্কিণ জাহাজ যাইতে বাধা দেওয়ার পরিণাম গুরুতর হওয়ার আশঙ্কা আছে।

মিশর হইতে ইসরাইলী বাহিনী সরাইয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইসরাইলকে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট যে আশ্বাস দিয়াছেন তাহাতে আরব-ইসরাইল সমস্যা গ্রহণ করিয়াছে নূতন রূপ। এই আশ্বাসের প্রতিক্রিয়া আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের উপর কি ভাবে হইবে তাহা এখনই অনুমান করা সম্ভব নয়। ইসরাইলী সৈন্য অপসারিত হওয়ায় সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যে-সমস্যা লইয়া এত কাণ্ড ঘটিয়া গেল সেই সুয়েজ সমস্যার সমাধান এখন কতদূরবর্ত্তী তাহা অনুমান করা কঠিন। অন্তর্ব্বর্ত্তী কোন সমাধানও এখন পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। অন্তর্ব্বর্ত্তী কালের জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। উহাতে সুয়েজ খালের শুল্ক অর্দ্ধেক মিশরকে এবং অর্দ্ধেক বিশ্বব্যাঙ্কে জমা দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ৯ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, মিশর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। মিশরের আল আহ্রাম পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে; বৃটিশ ও ফরাসী জাহাজ যে-পর্য্যন্ত মিশরকে শুল্ক দিবে এবং খাল চলার সময় মিশরেও আইন মানিয়া চলিবে সে পর্য্যন্ত উহাদের জাহাজ সুয়েজ খাল দিয়া যাইতে দেওয়া হইবে। ইসরাইলী জাহাজ যাইতে দেওয়া হইবে কি না সে সম্পর্কে কর্ণেল নাসের এখনও কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই।

স্বাধীন ঘনা রাষ্ট্র—

আফ্রিকায় অন্যতম বৃটিশ উপনিবেশ গোল্ড কোষ্ট পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী গত ৬ই মার্চ্চ (১৯৫৭) স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং এই স্বাধীন রাষ্ট্রের নূতন নামকরণ করা হইয়াছে 'ঘনা।' প্রাচীন কালে ঘনা ছিল আফ্রিকায় একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য। আফ্রিকার সমস্ত সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়াছিল এই ঘনা সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য হইতেই গোল্ড কোষ্টের অধিবাসীরা উদ্ভূত হইয়াছে, বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে প্রথমেই ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আফ্রিকার যে অঞ্চলকে সাধারণ ভাবে গোল্ড কোষ্ট বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহা একটি জাতি দ্বারা অধ্যুষিত রাজ্য নহে এবং সমগ্র অঞ্চল এক সময়ে বৃটিশের অধীনেও আসে নাই। এখানে আমাদের স্থান এত অল্প যে, গোল্ড কোষ্টের অতীত ইতিহাস সংক্ষেপেও উল্লেখ করা সম্ভব হইবে না। সাধারণ ভাবে যাহাকে গোল্ড কোষ্ট বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহা (১) গোল্ড কোষ্ট উপনিবেশ, (২) অশান্তি, (৩) আশ্রিত উত্তর রাজ্য এবং (৪) বৃটিশ ট্রাষ্টিশিপের অন্তর্গত টোগোল্যাণ্ড এই চারিটি পৃথক অঞ্চল বা রাজ্য লইয়া গঠিত। বৃটেন গোল্ড কোষ্টের অংশ হিসাবেই টোগোল্যাণ্ড শাসন করিত। যখন গোল্ড কোষ্টকে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রস্তাব হয় তখন টোগোল্যাণ্ড সম্পর্কে এই প্রস্তাব করা হয় যে, টোগোল্যাণ্ড হয় স্বাধীন গোল্ড কোষ্টের অন্তর্ভুক্ত হইবে, না হয় বৃটিশ ট্রাষ্টিশিপের অধীনেই থাকিবে। তদনুসারে গত মে মাসে (১৯৫৬) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে টোগোল্যাণ্ডে গণভোট গৃহীত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ

জনমত স্বাধীন গোল্ড কোষ্টের অন্তর্ভূক্ত হওয়াই সমর্থন করে। অতঃপর জুলাই মাসে (১৯৫৬) ট্রাষ্টিশিপ কাউন্সিলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে অছিগিরির অবসান ঘোষণা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর ভারতের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সাধারণ পরিষদও উহা অনুমোদন করে।

দুই শত বৎসরেরও অধিককাল বৃটিশের অধীনে থাকিয়া গোল্ড কোষ্ট স্বাধীনতালাভ করিল। উহার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসও খুব পুরাতন নহে। এই প্রসঙ্গে কেনিয়া ও সিঙ্গাপুরের কথা স্বতঃই মনে পড়ে। বৃটিশ গায়েনায় জনগণের আস্থাভাজন মন্ত্রিসভাকে উৎখাত করিতেও আমরা দেখিয়াছি। কাজেই মাত্র ১০ বৎসরের আন্দোলনের ফলে গোল্ডকোষ্টের স্বাধীনতালাভ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অভিনব বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উহাকে বিশেষ ভাবে প্রচার করা হইতেছে, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৯৫০ সালের শাসন সংস্কারে গোল্ডকোষ্ট আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনেকখানি স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। ১৯৫৬ সালের ১১ই মে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সচিব কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, সাধারণ নির্ব্বাচনে গঠিত আইন সভায় বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া স্বাধীনতা দাবী করিলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহা মানিয়া লইবেন এবং স্বাধীনতার সুনির্দ্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা হইবে। জুলাই মাসে (১৯৫৬) অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্ব্বাচনে কনভেনশন পিপলস্ পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নূতন আইন সভার প্রথম অধিবেশনেই বৃটিশ কমনওয়েলথের অধীনে স্বাধীনতা দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, ১৯৫৭ সালের ৬ই মার্চ্চ গোল্ডকোষ্ট বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবে। তদনুসারেই গোল্ডকোষ্ট স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র ঘনা বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং ইংলণ্ডের রাণী হইবেন উহার অধীশ্বরী।

চারিটি সম্পূর্ণ পৃথক অঞ্চল লইয়া ঘনা রাষ্ট্র গঠিত হইলেও উহার শাসন ব্যবস্থা ফেডারেল না করিয়া ইউনিটারী করা হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ফেডারেশনের বিরোধী কেন তাহা অবশ্যই ভাবিবার বিষয়। বিরোধীদল উত্তর আয়র্লণ্ডের পার্লামেণ্টের মত ক্ষমতাসম্পন্ন আঞ্চলিক পরিষদ দাবী করিয়াছিলেন। আঞ্চলিক পরিষদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার ক্ষমতা বিশেষ কিছুই নাই। ঘনা রাষ্ট্র চারিটি সম্পূর্ণ পৃথক অঞ্চল লইয়া গঠিত বলিয়া আঞ্চলিক আশঙ্কা, সন্দেহ ও বিভেদ বর্তমান রহিয়াছে। এই সকল আশঙ্কা ও সন্দেহ নিরশনের জন্য শাসনতন্ত্রে সংশোধন এবং আঞ্চলিক সীমারেখা পরিবর্ত্তন সম্পর্কে খুব জটিল বিধান করা হইয়াছে। ঘনা বৃটিশ কমনওয়েলথেও অধীনে স্বাধীনতা লাভ করিলেও উহার অভ্যন্তরে যে বিরোধ রহিয়াছে তাহার সমাধান হওয়া বড় সহজ হইবে না। বিশেষতঃ শাসন ব্যবস্থা ইউনিটারী হওয়ায় বিভেদ ও বিরোধ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা আদৌ উপেক্ষার বিষয় নয়। ঘনার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ নক্রুমা যদি উদার দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত শাসন ব্যবস্থা পরিচালন করিতে পারেন তাহা হইলেই শুধু আশঙ্কা, সন্দেহ ও অন্তর্বিরোধ দূর করিয়া উহাকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারিবেন। কিন্তু বৃটিশের প্রভাব যত দিন থাকিবে তত দিন উহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা—

ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ সমস্যা যে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্যার যথার্থ স্বরূপটি বুঝিয়া উঠা সত্যই খুব কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) প্রেসিডেণ্ট সুয়েকর্ণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের বৈঠকে এবং দেশব্যাপী বেতার বক্তৃতায় ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য এক নূতন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন, ইন্দোনেশিয়ায় সর্ব্বপ্রকারে এক নূতন ধরণের গবর্ণমেণ্ট গঠনের সময় আসিয়াছে। তিনি মনে করেন, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ইন্দোনেশিয়ার জনগণের উপযোগী নয়। ইন্দোনেশিয়ার জনগণের আদর্শ অনুযায়ী পাশ্চাত্য গণতন্ত্র 'সত্যিকার গণতন্ত্র' নয় বলিয়াই তাঁহার ধারণা। তিনি বর্ত্তমান রাজনৈতিক পদ্ধতি বাতিল করিয়া সমস্ত দলের প্রতিনিধি লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন এবং একটি জাতীয় পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করেন। যাহাদিগকে লইয়া এই জাতীয় পরিষদ গঠিত হইবে তাহাও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁহার এই নূতন পরিকল্পনার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা বলা কঠিন। মাসজুমী দলের পার্লামেণ্টারী নেতা ডাঃ বুরহানুদ্দীন এক পাল্টা প্রস্তাব উপাপন করিয়াছেন। উহাতে ডাঃ হাত্তার প্রধান মন্ত্রিত্বে পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা এবং একটি প্রেসিডেণ্টের মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব আছে। নাহ্দাতুল উলেমা পার্টি ডাঃ সুয়েকর্ণের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় আজ যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহার মূল কোথায় ইহাই প্রধান প্রশ্ন।

সুমাত্রায় বিদ্রোহ হইতেই যে এই সঙ্কটের সূত্রপাত একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৫৬) সামরিক অফিসারগণ উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ সুমাত্রা দখল করিয়া বসেন। তাঁহাদের অভিযোগ এই যে, সুমাত্রার এই তিনটি অঞ্চলকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয় নাই। সুমাত্রার এই বিদ্রোহের ফলে মাসজুমী পার্টির সদস্যরা নেশনেলিষ্ট মাসজুমী কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা হইতে সরিয়া আসেন। ইহাতে মন্ত্রিসভা যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ডাঃ শাস্ত্রামিদ্জোর মন্ত্রিসভা এখনও টিকিয়া আছে। গত ২১শে জানুয়ারী (১৯৫৭) প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শাস্ত্রমিদজো পার্লামেণ্টে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, সকল প্রদেশকেই যথাসম্ভব ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই। গত ২রা মার্চ্চ একটি সামরিক গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব ইন্দোনেশিয়ার শাসনকর্ত্তৃত্ব দখল করিয়াছেন। পূর্ব্ব ইন্দোনেশিয়া বলিতে সেলিবিস, মোলাক্কাস এবং লেসারসুণ্ডা দ্বীপগুলিকে বুঝায়। গত ডিসেম্বর মাসে সুমাত্রা কেন্দ্রীয় শাসনের বাইরে চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর পূর্ব্ব ইন্দোনেশিয়াও আওতার বাহিরে চলিয়া গেল। তাহাদের দাবীও পর্য্যাপ্ত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার। বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে রহিয়াছে শুধু জাভা এবং ইন্দোনেশিয়ান বোর্ণিও।

সুমাত্রা ও পূর্ব্ব ইন্দোনেশিয়া যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিতেছে তাহা নয়। কিন্তু এই সকল দাবীর মূলে বিদেশী উস্কানী রহিয়াছে কি না, থাকিলেও কতটুকু রহিয়াছে তাহা বলা কঠিন। ইন্দোনেশিয়া ভারতের নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করিয়াছে। মুসলমান-প্রধান হইলেও ইন্দোনেশিয়ায় এখনো ইসলামী রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করে নাই। ভারতের সহিত ইন্দোনেশিয়ার মৈত্রী সম্পর্ক যথেষ্ট নিবিড়। এই সকল কারণে কতগুলি বিদেশী রাষ্ট্র যে ইন্দোনেশিয়ায় গোলমাল সৃষ্টির চেষ্টা করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করার পর হইতে ইন্দোনেশিয়া সঙ্কট সৃষ্টির চেষ্টা বড় কম করা হয় নাই। ওয়েষ্টারলিংয়ের বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইবার চেষ্টার কথা আমরা সকলেই জানি। দারুল ইসলামও একবার বিদ্রোহ করিয়াছিল। সেলিবিস ও মোলাক্কাসে আরও একবার অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছিল। ইন্দোনেশিয়া এই সকল সঙ্কট পাড়ি দিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার নিজস্ব সমস্যাও বড় কম নয়।

বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী ছোট-বড় তিন হাজার দ্বীপ লইয়া ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্র। কাজেই ইন্দোনেশিয়ার সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলিকে অনেক দূরে দূরে স্থাপন করিতে হয়। তাছাড়া সৈন্যবাহিনীকে সংস্কার করিয়া উহাকে সুসংহত বাহিনীতে পরিণত করিবার চেষ্টা লইয়া রাজনীতিকদের সহিত সেনাবিভাগের সংস্কারপন্থীদের মতভেদ ১৯৫২ সাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ডাঃ সোয়েকর্ণ সেনাবাহিনীর চীফ অফ ষ্টাফ পদের জন্য যাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন সেনাবাহিনী তাঁহাকে গ্রহণ করিতে রাজী হয় নাই। সমর বিভাগের চাপে প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রমিদ্জোকেও পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পরে যিনি প্রধান মন্ত্রী হন তিনিও বেশী দিন টিকিতে পারেন নাই। মিঃ শাস্ত্রমিদজো আবার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। কিন্তু মতবিরোধটা চলিতেছেই। পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ রুসলাম আবদুল গণিকে তাঁহার সুয়েজ সম্মেলনে যোগদানের জন্য লণ্ডন যাত্রার প্রাক্কালে এরিয়া আর্মি কমাণ্ডারের নির্দ্দেশে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে চীফ অব ষ্টাফের হস্তক্ষেপের ফলে তিনি মুক্তি লাভ করেন। অতঃপর ভাইস প্রেসিডেণ্টের পদ হইতে ডাঃ হাত্তার পদত্যাগ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি সুমাত্রার অধিবাসী। কিন্তু সুমাত্রার ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁহার কোন সংযোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা উল্লেখযোগ্য ডাঃ হাত্তার চেষ্টাতেই ১৯৪৮ সালে কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া মন্ত্রিসভা গঠনের প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার আশা খুব কম। সাধারণ নির্ব্বাচন এবং নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার পর ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ স্থিতিশীল অবস্থা হইবে বলিয়া যে আশা করা গিয়াছিল তাহা পূর্ণ হয় নাই। গণপরিষদের পাঁচশত সদস্য যেখানে ৩০টি রাজনৈতিক দলে বিভক্ত সেখানে সমস্যা বড় সহজ নয়। ইন্দোনেশিয়া মুসলিম রাষ্ট্র হইবে, না, লৌকিক রাষ্ট্র হইবে এই প্রশ্নের মীমাংসা এখনো হয় নাই। তারপর আছে ইন্দোনেশিয়া ফেডারেল রাষ্ট্র হইবে, না, ইউনিটারী রাষ্ট্র হইবে। এই প্রশ্নটির সহিত সুমাত্রা ও পূর্ব্ব ইন্দোনেশিয়ার ঘটনাবলীর সম্পর্ক খুব নিবিড় বলিয়াই মনে হয়।

১১ই মার্চ্চ, ১৯৫৭

ছাত্রদের দাবী

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে—কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীকে ও পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন বিভাগকে অনুরোধ করা হইয়াছিল, তাঁহারা যেন ছাত্রদিগের জন্য কিছু অল্পমূল্যে মাসিক টিকিটের ব্যবস্থা করেন। উভয় স্থান হইতেই জানান হইয়াছে—তাহা হইবে না। আমাদিগের মনে আছে, এককালে কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী ছাত্রদিগের জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে টিকিটের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এখন—পশ্চিম বঙ্গ সরকারই যখন এ বিষয়ে বণিক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তখন সে জন্য বিদেশী ট্রাম কোম্পানীর নিন্দা করার সার্থকতা থাকিতে পারে না। অর্থই যে স্থানে পরমার্থ সে স্থানে—শিক্ষার বিস্তার জন্য প্রচেষ্টার স্থান কোথায়। কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীতে যাত্রীর ভীড় যে অত্যন্ত আপত্তিকর তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সেই অভিযোগ হইতে সরকারের পরিবাহন বিভাগও অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে "যে যায় লঙ্কায়—সে-ই হয় রাবণ।" মনে হয়, এ বিষয়ে পুলিসের অর্থাৎ সরকারের কোন কর্ত্তব্য নাই। অন্যান্য সভ্য দেশে সাধারণের ব্যবহার্য্য যানে ভীড় নিয়ম নহে—নিয়মের ব্যতিক্রম। কলিকাতার তাহাই নিয়ম।"

—দৈনিক বসুমতী।

পাকিস্তানের মাছ ও ডিম

"ভারত-পাক বাণিজ্য চুক্তির ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে কলিকাতায় মাছ ও ডিম প্রভৃতির আমদানী বৃদ্ধি বই হ্রাস পাইবার কথা নয়। কিন্তু কার্যকারণে পূর্ববঙ্গ হইতে মাছ ও ডিমের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে এবং ফলে কলিকাতার বাজারে মাছ ও ডিমের মূল্য কিছু দিনের মধ্যে বাড়িয়া গিয়াছে। নূতন বাণিজ্য চুক্তির পরে পূর্ববঙ্গ সরকার মাছ-ডিম চালান দেওয়ার লাইসেন্সের বিধি ব্যবস্থার বেশ কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। দুইটি নির্দিষ্ট পথ (গোয়ালন্দ ও সিরাজগঞ্জ) ছাড়া মাছ-ডিম আসিতে পারে না। টাকার আদান-প্রদান ব্যাঙ্কের মাধ্যমে করিতে হইবে। ইহার ফলে মাছ-ডিম নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইতে খরচা বেশী হয়, বিলম্ব হয়। ইহা ছাড়া ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা দিবার ব্যবস্থা হওয়ায় ছোটখাটো ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় চালানো সম্ভব হইতেছে না। কলিকাতায় চাহিদার একটা বড় অংশ পূর্ববঙ্গের মাছ ও ডিম মিটাইয়া থাকে। বাণিজ্য চুক্তিতে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল যে, উভয় রাষ্ট্র পারস্পরিক আমদানী-রপ্তানি ব্যাপারে সুহৃদ রাজ্যের অনুকূল বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিবে। পূর্ববঙ্গের মাছ ও ডিম কলিকাতায় আমদানী ব্যাপারে যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূর করার জন্য ভারতের দিক হইতে কোনও কিছু করা সম্ভব নয় কি?"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সেদিন পরীক্ষাসমূহের ফী হইতে সংগৃহীত টাকার একটা অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলির মধ্যে বিতরণের যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা খুব সঙ্গত হইয়াছে। ফী বাবদ পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থের কত অংশ ঠিক কি কি উদ্দেশ্যে অনুমোদিত কলেজগুলিকে দেওয়া হইবে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার দেওয়া হইয়াছে সিণ্ডিকেটের উপর। প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছিলেন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ফী বাবদ সংগৃহীত অর্থের দশমাংশ কলেজগুলির গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, মিউজিয়াম প্রভৃতির উন্নয়ন কাজে যেন ব্যয়িত হয়। সিণ্ডিকেট ঠিক এই এই দফায় অর্থব্যয় অনুমোদন করিবেন কি না, বলা যায় না। কিন্তু যে যে বিষয়ে ব্যয়ের কথা প্রস্তাবক তুলিয়াছেন, সেই সেই বিষয়ে ব্যয় হইলে কাহারও আপত্তি করার বোধ হয় কোন কারণ থাকিবে না। যাহা হউক, অনুমোদিত কলেজগুলিকে আর্থিক সাহায্যদানের এই নূতন প্রস্তাব কার্যে রূপায়িত করার ক্ষমতা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের হাতে, তখন এই ব্যাপারে কোন বাধা উপস্থিত না হইবারই কথা। সেনেটের সদস্যগণের বক্তৃতায় প্রকাশ যে, বিশ্ববিদ্যালয় আই-এ, আই এস-সি, বি-এ, বি এস-সি, বি-কম প্রভৃতি পরীক্ষার ফী বাবদ প্রতি বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ টাকা পাইয়া থাকেন। ইহার একটা অংশ কলেজগুলিকে দিলে ন্যায়সঙ্গত কাজই হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার সময় অনুমোদিত কলেজগুলি নিজেদের যথেষ্ট অসুবিধা সত্ত্বেও পূর্ণ সহযোগিতা দান করিয়া আসিতেছে। সুতরাং তাহারা পরীক্ষার ফীর একটা অংশ দাবী করিতে পারে, ইহা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাহা ছাড়া বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থাও ভাল বলিয়া মনে হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেটে যদি পৌনে ৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তবে ফী বাবদ সংগৃহীত অর্থের সমস্তটা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের ব্যয়ের জন্য লাগিবে না বলিয়াই ধরিয়া লওয়া

যাইতে পারে। সুতরাং এ সম্বন্ধে সেনেটের প্রস্তাব সর্বপ্রকারে সমর্থনযোগ্য।"

—যুগান্তর।

নেতাজী এখন রুশিয়ায় আছেন

"বিড়লাগোষ্ঠীর দিল্লী হইতে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা, হিন্দুস্থানে (হিন্দী) গত ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬ সালে একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদের শিরোনামা— "নেতাজী রুশ মেঁ হ্যায়।" সংবাদটি আসিয়াছে পূর্ব্ব পাঞ্জাবের কপূর্থলা হইয়া, জলন্ধর হইতে। সংবাদটি দিয়াছেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন পাঞ্জাবী সৈনিক। ইনি দীর্ঘ এগার বছর পরে মস্কো হইতে সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহার সংবাদে প্রকাশ, নেতাজী এখন রুশিয়ায় আছেন। চীন এবং রুশিয়া—উভয় দেশেই তিনি যাতায়াত করিতেছেন। এই বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের গোড়ার দিকে তিনি ভারতে ফিরিবেন যদি যুদ্ধ লাগে অন্যথা আগামী অক্টোবরে আত্মপ্রকাশ করিবেন. কারণ, ঐ সময়ে দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইবে এবং যুদ্ধাপরাধীরূপে তাঁহার বিচারের কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না। আজও তিনি আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধাপরাধীরূপে গণ্য।"

—মেদিনীপুর হিতৈষী।

বর্ত্তমান প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি

"প্রাচ্য জাতি সুলভ দয়া মায়া, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদি হৃদয়ের মূল বৃত্তিগুলিকে দমিত বা অবজ্ঞা করিয়া দুর্বল চিত্ত ও জীবনের ওজনে হাল্কা হইয়া যাইতেছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে আমরা জীবনের পূর্ণতাকে পঙ্গু করিয়া স্বার্থসর্বস্ব ইহকালবাদী হইয়া পড়িয়াছি। ইহার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ দেশে সততার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে সর্বস্তরে, সর্বকর্ম্মের মধ্যে। সম্প্রতি সরকার গতানুগতিক পন্থা বাদে বুনিয়াদি বিদ্যালয় নামক এক অভিনব প্রণালীর শিক্ষাধারা প্রবর্ত্তন জন্য চেষ্টিত হইতেছেন ইহা অবশ্য মন্দের মধ্যে আশার কথা। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার মানসে সরকার অবহিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে যে ২১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৬০টি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় আছে তাহাই যথেষ্ট কি আরও করা প্রয়োজন তাহার অনুসন্ধান করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আশার সঙ্গে সঙ্গে নিরাশার বার্ত্তা ও ঘোষিত হইতেছে শিক্ষার ব্যয় বাহুল্যের কথা শুনিয়া। বিরাট বিরাট অঙ্কের অর্থসংখ্যা যাহা সাধারণ অবস্থার সঙ্গে আদৌ অসঙ্গত মনে হইতেছে। মনে হয় যেন শিক্ষা প্রসারের নামে শিক্ষাকে সংকোচ করারই ব্যবস্থা করা হইতেছে। প্রতি বৎসরই শিক্ষা ব্যয় ক্রমোর্দ্ধগামী, অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষা, বিশেষ উচ্চশিক্ষা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব হইবে অর্থ ব্যয়ের দিক হইতে। এ অবস্থায় সাধারণ অক্ষর জ্ঞান যেমন রাষ্ট্র কর্ত্তৃক অবৈতনিক করা হইয়াছে মাধ্যমিক শিক্ষাকেও ঐ ভাবে অবৈতনিক করিলে তবেই কতকটা শিক্ষাবিস্তারের আশা করা যাইতে পারে। উচ্চশিক্ষা যাহার আর্থিক সামর্থ্যে কুলাইবে সে উচ্চশিক্ষা লাভে সমর্থ হইবে। তাহা হইলেও রাষ্ট্র কর্ত্তৃক দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিশেষ বৃত্তি বা অবৈতনিক উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। গভীর চিন্তার বিষয়, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ পুস্তক ব্যবসাকে কতকাংশে স্বহস্তে লইয়াও দেশের জনসাধারণের আর্থিক সামর্থ্যের কথা একবারেই চিন্তা না করিয়া পুস্তক নির্বাচন, পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন করিয়া দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ শিক্ষা সংস্থাকে কি লোকসমক্ষে ক্রমে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন না? আমরা এবিষয়ে বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষকে চিন্তা করিয়া দেখিতে বিশেষ অনুরোধ করি।"

—নারায়ণ (কাঁথি)।

সাবেক খতম

"আধুনিক ও প্রগতির যুগে সাবেক পন্থা প্রায় সব অচল; তাই ১৯৫৫ সালে হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং ইহার সুফল বা কুফল স্বরূপ পঃ বঙ্গের অন্যান্য জেলার কথা বাদ দিয়া শুধুমাত্র কলিকাতার শিল্পাঞ্চলসহ ২৪ পরগণা জেলার আলিপুর কোর্টে ২২৫টি বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদনপত্র দাখিল হইয়াছে। এই সব মামলা ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ১৩টা খারিজ, ২৫টা বিচ্ছেদ মঞ্জুর এবং ৩টি ক্ষেত্রে আপোষ মঞ্জুর হইয়াছে। অবশিষ্টগুলি এখনও অমীমাংসীত অবস্থায় আছে। এই সব আবেদনের অধিকাংশ মোকর্দ্দমাই হয় ধনী নয় মধ্যবিত্ত সংসার হইতে দায়ের করা হইয়াছে এবং আবেদনকারিগণের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই অধিক। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে আবার মান্ধাতা আমলের পয়সা, আনা তুলিয়া দিয়া নয়া পয়সা প্রবর্ত্তিত হইবে। তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর প্রায় ৭৫ ভাগ রাষ্ট্রে এই দশমিক মুদ্রার প্রচলন আছে। নয়া পয়সা প্রচলিত হইলে হিসাব নিকাশের যেমন সুবিধা হইবে তেমনি ছাত্রেরা ইহা সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময়ে হিসাব নিকাশ করার সুবিধা হইবে। অবশ্য এই নয়া পয়সা চালু হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসার ক্ষেত্রে পুরাতন পয়সাগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে না এবং এইগুলি তিন হইতে চারি বৎসর পর্য্যন্ত বাজারে চালু থাকিবে। অবশ্য প্রথমে এই নয়া পয়সা প্রচলনের ব্যাপারে হাটে বাজারে অসুবিধা দেখা দিবেই। কিন্তু জনসাধারণ ১লা এপ্রিলের পর হইতে যত শীঘ্র পুরাতন মুদ্রার বিনিময়ে নূতন মুদ্রা বদল করিয়া লইতে পারিবেন খুচরা মুদ্রা বিমিময়ের অসুবিধা তত শীঘ্রই দূর হইবে। চারি আনা মূল্যের কম পরিমাণ মুদ্রা ভাঙ্গাইতে গেলেই আনার হিসাবে ও দশমিকের হিসাবে বিনিময়ের গোলযোগে লোকসানের বা লাভের প্রশ্ন আসিতে পারে কিন্তু একসঙ্গে চারি আনা মূল্যের বর্ত্তমান মুদ্রা বিনিময় করিয়া ২৫টি নয়া পয়সা লইলে আর কোন অসুবিধা ঘটিবে না। আবার আগামী ২২শে মার্চ্চ হইতে ভারত সরকার নূতন পঞ্জিকা প্রবর্তন করিতেছেন। তাহাতে ১৯৫৭ সালের ২২শে মার্চ্চ, বাংলা ১৩৬৩ সালের ৮ই চৈত্রকে ১লা ধরিয়া নূতন ১৮৭৯ শকাব্দ আরম্ভ হইবে। ইহাতে ইংরাজী তারিখের কোনরূপ অদলবদল হইবে না এবং পর্ব্বাদির ছুটি যেরূপ চলতি আছে সেইরূপ চলিতে থাকিবে। তবে ইংরাজী বৎসরের ন্যায় শকাব্দ ৩৬৫ দিন এবং লিপ-ইয়ার ৩৬৬ দিনে বৎসর হইবে এবং লিপ-ইয়ারে চৈত্র মাস ৩০ দিনের বদলে ৩১ দিনে হইবে। তাই বলিতেছিলাম সাবেক খতম"।

—প্রলাপ (মেদিনীপুর)।

শুভ-বিবাহ

শ্রীঅশোককুমার ঘোষ-চৌধুরী ও শ্রীমতী সুপ্রীতি (হৈমবতী) দেবী

"কলিকাতার পুলিশ কমিশনার সর্বজনপ্রিয় শ্রীহরিসাধন ঘোষ-চৌধুরীর একমাত্র পুত্র শ্রীমান অশোককুমার ঘোষ চৌধুরীর সঙ্গে হাওড়া রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীহরিসাধন বসুর চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী সুপ্রীতির (হৈমবতীর) শুভ-বিবাহ গত ২৭শে জানুয়ারী রবিবার শ্রীবসুর রামকৃষ্ণপুরস্থ ভবনে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে কমিশনার শ্রীঘোষ-চৌধুরীর কীড ষ্ট্রীটস্থ ভবনে বৌ-ভাত ও প্রীতিভোজ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কমিশনার শ্রীঘোষ-চৌধুরীর গৃহে সমবেত হইয়া প্রীতি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্ত্তী, সার এস এম বসু, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সার ধীরেন মিত্র, সার বীরেন মুখার্জী, লেডী রাণু মুখার্জী, বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখার্জী, বর্দ্ধমানের মহারাজা ও মহারাণী, সন্তোষের রাজা ও রাণী, সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাণী সুরীতি ঠাকুর, বিচারপতি ডি এন সিংহ, বিচারপতি এস এন গুহরায়, লর্ড সিংহ, শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না, শ্রীমতী খান্না, শ্রীকালীপদ মুখার্জী (মন্ত্রী,) ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি পি বি মুখার্জী, মাসিক বসুমতী সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী শ্রীএস এন রায়, স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীএম এম বসু, ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডি আই জি, শ্রীপ্রণবকুমার সেন, ডেপুটি কমিশনার শ্রীরঞ্জিত গুপ্ত, শ্রীডি এন জালান, শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (রেজিষ্ট্রার হাইকোর্ট), আমেরিকার কনসাল জেনারেল, জার্ম্মাণ কনসাল জেনারেল, ফ্রেঞ্চ কনসাল জেনারেল, নেপালের কনসাল জেনারেল, কলিকাতা পুলিসের পদস্থ কর্ম্মচারী ও ডেপুটি কমিশনারগণ এবং আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

অন্ধকার

"সামান্য কয়েক বৎসরের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রে সততা, সাধুতা ও সত্যবাদিতা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশ আজ আর এগুলির জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করে না। দেশের মানুষকে ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে যে, যে-কোন উপায়ে অর্জ্জিত অর্থ হউক না কেন, অর্থ না থাকিলে দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রে কোন অধিকার জন্মিতে পারে না। সততা, সাধুতা, সত্যবাদিতা লইয়া যদি থাকিতে হয় তবে তাহাকে টাকার পাহাড়ের তলে চাপা পড়িয়া মরিতে হইবে। সুতরাং মানুষও দেশের হাওয়া বুঝিয়া টাকা অর্জ্জনের দিকে মন দিয়াছে এবং তাহাদের টাকা অর্জ্জনের প্রতিযোগিতায় সর্ব্বস্তরের মানুষ আজ দ্রুত দুঃখ, দুর্দশা ও দারিদ্রের অতল তলে তলাইয়া যাইতেছে। অথচ নেতারা মুহুর্মুহু নূতন ধাঁচের সমাজতন্ত্রবাদের বাণী শুনাইতেছেন এবং সেই বাণী বিচিত্র করিয়া আজ্ঞাবহ কতকগুলি দৈনিক সংবাদপত্র প্রচার করিতেছে। যাহার সামান্য দৃষ্টিশক্তি আছে তিনিই আজ উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন যে নির্ব্বাচনে টাকার বিরাট খেলা চলিয়াছে। অর্থ আমদানীর বিরাম নাই। যাঁহারা অর্থের বিরুদ্ধে নিজ নিজ দলের শক্তি ও সামর্থ্যের উপর ভরসা করিয়া প্রতিযোগিতায় নামিয়াছেন তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন যে অর্থ-শক্তি আজ তাহাদের নিকট প্রধান প্রতিবন্ধক। অর্থ আজ সমস্ত অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে এবং অর্থব্যয় না করিতে পারিলে কোন কিছুই সহজে সম্ভবপর হয় না। দরিদ্র ও অজ্ঞ দেশে অর্থ-শক্তি আজ মহাশক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই শক্তির এক তরফা বিরাট খেলাই চলিয়াছে। মিথ্যার অপূর্ব্ব ভাষ্য এবং নির্লজ্জ মিথ্যার জয়গান অধিকাংশ দৈনিকের পাতা পূরণ করিয়া তাহা এ দেশে বর্ত্তমানে মানুষের সংবাদপত্র পাঠের স্পৃহা দূর করে। সততা ও সাধুতার আশ্রয় লইতে মানুষ ভীত ও ত্রস্ত হইয়া উঠে। দুর্নীতিপরায়ণ ও অসৎব্যক্তির দাপটে মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং দেশের বর্ত্তমান সময় একটা অন্ধকারময় যুগ। জনসাধারণকে এই অন্ধকার যুগে খাদ্যের নামে অখাদ্য খাইতে হইতেছে, ঔষধের নামে রঙিন জল সেবন করিতে হইতেছে, দুধের নামে মিল্ক পাউডার খাইতে হইতেছে, কল্যাণকর আইন অকল্যাণ ডাকিয়া আনিতেছে, সরকারী ও বেসরকারী শোষণের পরিমাণ ও পরিধি দ্রুত বিস্তারলাভ করিতেছে, শিক্ষার নামে অশিক্ষা কুশিক্ষা গ্রহণ করিতে হইতেছে, সংস্কারের নামে স্বজন পোষণের পথ প্রশস্ত হইতেছে, চোরা কারবারী, ফাঁকিবাজ, ঘুষ আদায়কারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করিতেছে। তথাপি বলা হয় যে নূতন ধাঁচের সমাজতন্ত্রবাদ দেশে আসিয়া গেল। মানুষ কিন্তু ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে!

—ত্রিস্রোতা জলপাইগুড়ি।

শোক-সংবাদ

এলাহাবাদ নিবাসী কৃতী বাঙালী সাংবাদিক ক্ষিতীন্দ্রমোহন মিত্র ২৮এ মাঘ মাত্র ৪১ বছরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মায়া, মনোহর কহানী ও মনোরমা নামক পত্রিকাত্রয়ের ইনি প্রধান সম্পাদক ছিলেন।

বাঙলা দেশের শিশুসাহিত্য জগতের একজন প্রধান স্তম্ভ সুকবি সুনির্মল বসু ১৩ই ফাল্গুন মাত্র ৫৬ বছর বয়সে আকস্মিক ভাবে পরলোকগমন করেছেন। ইনি দেশবরেণ্য মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার দৌহিত্র ছিলেন ও এঁর প্রকৃত নাম ছিল নির্মলচন্দ্র। জীবনের অর্ধাংশ সুনির্মল অতিবাহিত করে গেছেন সাহিত্যের সেবায়। গত পঁচিশ-তিরিশ বছর যাবৎ বাঙলা সাহিত্যকে ইনি ভরিয়ে দিয়ে গেছেন অজস্র অবদানে। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া, প্রভৃতি সকল বিভাগেই ছিল এঁর অসামান্য দক্ষতা। কিছুকাল আগে ছোটদের চয়নিকা ও ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন নামে দু'টি সংকলন গ্রন্থও সম্পাদন করে গেছেন। এঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় দুই শত। সম্প্রতি কবিকে 'ভুবনেশ্বরী পদক' উপহার দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সুনির্মলের আকস্মিক প্রয়াণে বাঙলার শিশুসাহিত্যের আকাশ থেকে একটি রশ্মিমান তারকা নিবে গেল।

নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এল-সি গত ১৪ই ফাল্গুন ফুলিয়ার কাছে জীপ দুর্ঘটনায় পরলোক যাত্রা করেন। ইনি ছাত্রাবস্থা থেকেই দেশের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ও জীবনের একটি দীর্ঘ অংশ কারাগারে অতিবাহিত করেন। ইনি অকৃতদার ছিলেন ও মৃত্যুকালে এঁর তেষট্টি বছর বয়েস হয়েছিল।

বিখ্যাত সমাজসেবিকা হানা সেন নয়াদিল্লীস্থ ভবনে ২০এ ফাল্গুন ৮৩ বছর বয়সে লোকান্তরগমন করেছেন। তিনি ভারতের সমাজ জীবনে একটি বিশেষ আসনের অধিকারিণী ছিলেন। এঁর ছাত্রজীবনও ছিল সমপরিমাণে উজ্জ্বল। অনার্স সহ বি-এ পাশ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীভুক্তা হয়ে ইনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৫ খৃঃ ইনি লণ্ডনের সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশান থেকে 'টিচার্স ডিপ্লোমা' প্রাপ্ত হন এবং অধ্যাপক স্পারমানের অধীনে গবেষণা কার্যে ব্যাপৃতা থাকেন।

বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক অমিয় চক্রবর্তী গত ২২শে ফাল্গুন বাক্যালাপ করতে করতে হঠাৎ বেদনা অনুভব করার অল্পক্ষণেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েছেন। মাত্র ৪৭ বছর বয়েসের এই অকাল মৃত্যু চিত্র-জগতকে বিশেষ পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত করল। গ্রাজুয়েট হবার পর ১৯৩৪ খৃঃ ইনি চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ রচয়িতা হিসাবে বোম্বাইয়ের ছায়ারাজ্যে যোগদান করেন। এঁর পরিচালন কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে পুনর্মিলন, অঞ্জন, 'বসন্ত' হামারি বাত, জোয়ার ভাঁটা, দাগ, পতিতা, বাদল, সীমা প্রভৃতি। এঁর শেষ ছবি দেখ কবীরারো-এরই সংক্রান্ত কথাপ্রসঙ্গে তিনি চিরবিদায় নেন।

মাসিক বসুমতীর মালিকানা ও অন্যান্য তথ্য সম্পর্কিত বিবৃতি

১। প্রকাশের স্থান—বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

২। প্রকাশের সময়—মাসিক বসুমতী।

৩। প্রকাশক ও মুদ্রাকরের নাম ও ঠিকানা—শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় নাগরিক। গ্রাম, মেড়িয়া। পোঃ, আক্না। জেলা, হুগলী।

৪। সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা - শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক (চট্টোপাধ্যায়)। ৫।১এ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪।

৫। স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চরমপত্র অনুযায়ী সংবাদপত্রের মালিকগণ এবং পার্টনারগণ কিম্বা মোট মূলধনের শতকরা এক ভাগের অধিকের অধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা—শ্রীমতী দীপ্তি দেবী। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। শ্রীমতী ভক্তি দেবী। ১৪১, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭। শ্রীমতী আরতি দেবী ৫।১এ, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪। কুমারী প্রণতি দেবী। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। কুমারী উৎপলা দেবী বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বৌবাজার ... কলিকাতা—১২।

স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এষ্টেটের পক্ষে একজিকিউটরগণ—ভবতোষ ঘটক (মৃত); শ্রীবীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়; শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আমি শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসসম্মত।

স্বাক্ষর
শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক
তারিখ—১৫-৩-১৯৫৭।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৩৫শ বর্ষ—চৈত্র, ১৩৬৩] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [দ্বিতীয় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। "সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর করবে। তাদের সঞ্চয় করতে নাই। ত্যাগীর বড় কঠিন নিয়ম। কামিনী-কাঞ্চনের সংস্রব লেশমাত্রও থাকবে না। টাকা নিজের হাতে ত লবে না, আবার কাছেও রাখতে দেবে না। লক্ষ্মীনারাণ মাড়োয়ারী বেদান্তবাদী, এখানে প্রায় আসতো। বিছানা ময়লা দেখে বললে, আমি দশ হাজার টাকা লিখে দোবো, তার সুদে তোমার সেবা চলবে। যাই ও-কথা বললে, অমনি যেন লাঠি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। চৈতন্য হবার পর তাকে বললাম—তুমি অমন কথা যদি আর মুখে বলো, তাহলে এখানে আর এসো না। আমার টাকা ছোঁবার যো নাই। সে ভারি সূক্ষ্ম বুদ্ধি। বললে—তাহলে এখনও আপনার ত্যাজ্য গ্রাহ্য আছে। তবে আপনার জ্ঞান হয় নাই। আমি বললাম—আমার বাপু এত দূর হয় নাই। লক্ষ্মীনারাণ তখন হৃদের কাছে দিতে চাইলে। আমি বললাম,—তাহলে আমায় বলতে হবে—একে দে, ওকে দে, না দিলে রাগ হবে। টাকা কাছে থাকাই খারাপ। সে সব হবে না। আরশির কাছে জিনিষ থাকলে প্রতিবিম্ব হবে না?"

"মথুর জমি লিখে দিতে চাইলে,—তা লতে পারলাম না। একখানা তালুক আমার নামে লিখে দেবে বলেছিল। আমি কালী-ঘর থেকে শুনলাম। সেজ বাবু আর হৃদে একসঙ্গে পরামর্শ করছিল। আমি এসে সেজ বাবুকে বললাম,—ত্থাখো অমন বুদ্ধি করো না, ওতে আমার ভারি হানি হবে।"

"আমি তিন ত্যাগ করেছিলাম—জমিন, জরু, টাকা। রঘুবীরের নামের জমিও দেশে রেজেষ্ট্রি করতে গিছলাম। আমায় সই করতে বললে। আমি সই করলুম না। আমার জমি বলে তো বোধ নাই। আম এনে দিলে,—তা বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই। সন্ন্যাসীর সঞ্চয় করতে নাই।"

"সঞ্চয় করবার যো নাই। শম্ভু মল্লিকের বাগানে একদিন গিছলাম,—তখন পেটের অসুখ। শম্ভু বললে, একটু একটু আফিং খেও, তাহলে কম পড়বে। আমার কাপড়ের খোঁটে একটু আফিং বেঁধে দিলে। যখন ফিরে আসছি ফটকের কাছে কে জানে ঘুরতে লাগলাম, যেন পথ খুঁজে পাচ্চি না। তার পর যখন আফিমটা খুলে ফেলে দিলে, তখন আবার সহজ অবস্থা হয়ে বাগানে ফিরে এলাম।"

"দেশেও আম পেড়ে নিয়ে আসছি, আর চলতে পারলাম না,—দাঁড়িয়ে পড়লাম। তার পর সেগুলো একটা ডোবের মত জায়গায় রাখতে হলো, তবে আসতে পারলাম।"

"বেটুয়া করে পান আনবার যো নাই, কোন জিনিষ সঙ্গে করে আনবার যো নাই, তাহলে সঞ্চয় হলো কি না! হাতে মাটি দেবার জন্ম মাটি নিয়ে যেতে পারি না।"

বৌদ্ধ সহজিয়াগণের সাধনতত্ত্ব

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণের সাধনার একটা আভাস পাইতে হইলে আমাদিগকে মুখ্যভাবে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ রচিত চর্যাপদগুলি এবং দোঁহাগুলিকে আশ্রয় করিতে হয়; কারণ সহজিয়া সাধকগণের মতবাদটি এখানে যেরূপ বিশুদ্ধ ভাবে পাওয়া যায় অন্যত্র সেরূপ ভাবে তাহা কোথাও পাওয়া যায় না। বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতেও সহজিয়াগণের সাধনার কথা ছড়ান আছে বটে, কিন্তু সেখানে সহজিয়াদের বৈশিষ্ট্য কিছুই ফুটিয়া ওঠে নাই, সেখানে নানা প্রকার পূজা-অর্চা, ক্রিয়া-কাণ্ড তন্ত্র-মন্ত্র, যোগসাধনার সহিত সহজিয়াদের সাধনার কথা ছড়াইয়া রহিয়াছে।

সহজিয়াগণের সাধনার কথা বুঝিতে হইলে সহজযানের ইতিহাস সম্বন্ধেও একটা সাধারণ ধারণা থাকা উচিত। মহাযান বৌদ্ধধর্ম হইতেই এই সকল ধারার উদ্ভব। মহাযান তাহার 'মহা যান' লইয়া যখন উপস্থিত হইল তখন সমাজের সর্বস্তরের পারগামী লোকের জন্যই সেখানে স্থান করিতে হইল। বিভিন্ন ধরণের ধর্মবিশ্বাস এবং প্রচলিত সাধনপদ্ধতি লইয়া নানা ধরণের লোক প্রবেশ লাভ করিল মহাযানের 'মহা যানে'; ফলে আস্তে আস্তে মহাযানও পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিল। মহাযানের মধ্যে ক্রমে দেখা দিল দুইটি মত; 'পারমিতা-নয়' এবং 'মন্ত্র-নয়'। যাঁহারা পারমিতার অনুশীলনের দ্বারা বৌদ্ধ দশভূমি অতিক্রম করিয়া উর্ধ্বাবস্থা লাভ করিবার চেষ্টা করিতেন তাঁহাদের মত হইল 'পারমিতা-নয়'; কিন্তু অপর দল এত পারমিতার অনুশীলনের উপরে জোর দিলেন না,—তাঁহারা জোর দিলেন বিবিধ প্রকারের মন্ত্রের উপরে। এই মন্ত্রের সহিত আসিয়া দেখা দিল 'মুদ্রা' ও 'মণ্ডল'; এই 'মন্ত্র,' 'মুদ্রা' ও 'মণ্ডল' লইয়া পত্তন হইল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের। এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মই কিছুদিনের মধ্যে সাধারণ নাম গ্রহণ করিল 'বজ্রযান'। এই বজ্রযানের মধ্যে মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল ব্যতীত নানা প্রকার দেবদেবীর পূজা-অর্চা, ধ্যান-ধারণা, অন্যান্য তান্ত্রিক ক্রিয়াবিধি এবং কতগুলি গুহ্য যোগ-সাধনা প্রবর্তিত হইল। 'বজ্র' শব্দের অর্থ শূন্যতা; সুতরাং বজ্রযানের মূল অর্থ হইল শূন্যতা-যান। বজ্রযানের সবই 'বজ্র'; দেব-দেবী, পূজা-বিধি, উপকরণ সামগ্রী, সাধনাঙ্গ—সবই 'বজ্র'-চিহ্নিত। নেপাল-তিব্বতে বজ্রযানের আর একটি রূপ দেখা গেল 'কালচক্র-যানে'; এই মতে শ্বাস-প্রশ্বাস-প্রবাহকেই ধরা হইয়াছে কাল-প্রবাহের বাহন বলিয়া; সেই শ্বাস-প্রবাহকে নানাভাবে নিরুদ্ধ করিয়া কালচক্রকে (কালের চক্রকে) অতিক্রম করিতে হইবে। সাধনার এই দিকটার উপরে জোর দেওয়াই হইল কালচক্রযানের বৈশিষ্ট্য।

বৌদ্ধ তন্ত্রাদিতে 'সহজযান' এই নামে বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের উল্লেখ আমরা পাই না। বজ্রযান-পন্থী একদল সাধকের কতগুলি মতবৈশিষ্ট্য এবং সাধনবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াই এই নামটি পরবর্তী কালে গড়িয়া তোলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সম্প্রদায়ের সাধকগণকে সহজিয়া বলিবার দুই দিক্ হইতে সার্থকতা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ ইহাদের 'সাধ্য'ও ছিল 'সহজ'—আবার 'সাধন'ও ছিল সহজ। প্রত্যেক জীবের—প্রত্যেক বস্তুরই একটি 'সহজ' স্বরূপ আছে—ইহাই তাহার সকল পরিবর্তনশীলতার ভিতরে অপরিবর্তিত স্বরূপ। এই সহজ-স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া মহাসুখে মগ্ন হইতে হইবে—ইহাই হইল এই পন্থী সাধকগণের মূল আদর্শ—এই জন্যই ইহারা হইলেন সহজিয়া। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা সাধনার জন্য কোনও বক্রপথ অবলম্বন করিতেন না—গ্রহণ করিতেন সরল সোজা পথ, এই জন্যও তাঁহারা সহজিয়া। এই জন্য সিদ্ধাচার্যরা বলিয়াছেন—

উজুরে উজু ছাড়ি মা জাহুরে বঙ্ক।
নিয়ড়ি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক।

'ঋজু হইল এই পথ—ঋজুকে ছাড়িয়া কেহ যাইও না বাঁকা পথে; নিকটে আছে বোধি—যাইও না (দূর) লঙ্কায়।'

সিদ্ধাচার্যগণ সর্বত্রই তাঁহাদের দর্শিত পথকে 'উজুবাট' (ঋজুবর্ত্ম) বা সোজা পথ বলিয়াছেন। বাঁকা পথ কাহাকে বলে? শাস্ত্র-তর্ক-পাণ্ডিত্যের পথ, ধ্যান-ধারণা-সমাধির পথ—বিবিধ-তন্ত্র মন্ত্র—আচার-পদ্ধতির পথই হইল বাঁকা পথ। সমস্ত লোকেরই হইল এই গর্ব যে 'আমিই হইলাম পরমার্থে প্রবীণ'; কিন্তু কাহ্নুপাদ তাঁহার দোঁহায় বলিতেছেন যে 'পরমার্থে প্রবীণ' হইলে কি হইবে,—যাঁহারা পরমার্থ-প্রবীণ তাঁহাদের ভিতরে কোটির মধ্যে একজনও যে 'নিরঞ্জনে লীন' নহেন।

লোঅহ গব্ব সমুব্বহই হউঁ পরমত্থ পবীণ।
কোড়িহ মাহ এক্কু ণহি হোই নিরঞ্জণ লীণ।

পণ্ডিতেরা মান বহন করেন কি লইয়া?—তাঁহাদের মান হইল আগম-বেদ-পুরাণের পাণ্ডিত্য লইয়া; কিন্তু এই যে সত্যের চারিপাশে পাণ্ডিত্যের গুঞ্জন ইহা হইল ঠিক একটি পাকা বেলের চারিপাশে অলির গুঞ্জন। অলি যেমন পাকা বেলের গন্ধ পায়, আর সেই গন্ধে মুগ্ধ হইয়া বেলের চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া করিতে থাকে গুঞ্জন—কিন্তু বেলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আসল বস্তুর যথার্থ আস্বাদন করিতে পারে না—পণ্ডিত ব্যক্তি যাঁহারা, তাঁহারাও তেমনই পরমাস্বাদ 'মহাসুখ' বা 'সহজানন্দে'র চারিপাশে পাণ্ডিত্যে মত্ততা লইয়াই ঘুরিয়া মরেন—কিন্তু সত্যের ভিতরে প্রবেশ লা করিয়া তাহাকে আস্বাদন করিতে পারেন না।

আগম-বেঅ-পুরাণে পংডিআ মাণ বহন্তি।
পক্ক সিরিফলে অলিঅ জিম বাহেরিঅ ভমন্তি।

তিল্লোপাদ বলিয়াছেন, যাহা পরমার্থতত্ত্ব তাহা হইল সম্পূ স্ব-সংবেদ্য; নিজের ভিতরেই করিতে হয় তাহার অনুভব; যাঁহার মন-ইন্দ্রিয়কে প্রধান ভাবে অবলম্বন করেন—বুদ্ধি দ্বারাই লা করিতে চান সত্যকে—তাঁহাদের ভিতরে যাহা প্রবেশ করে, তাহ কখনই পরমার্থ নয়।

সঅসংবেঅণ তত্তফল তীলপাঅ ভণন্তি।
জো মণগোঅর পইট্ঠই সো পরমত্থ ণ হোন্তি।

আরও সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন সরহপাদ—

অক্খরবাঢ়া সঅল জগু ণাহি নিরক্খর কোই।
তাব সে অক্খর ঘোলিআ জাব নিরক্খর হোই।

অক্ষরে বদ্ধ হইয়া আছে সকল জগৎ—নিরক্ষর নাই কেহই ; কিন্তু এই সকল অক্ষর যাইবে ঘোলাইয়া, যখন কেহ হইতে পারিবে 'নিরক্ষর'।

এই শাস্ত্র-তর্ক-পাণ্ডিত্যের পথকে যেমন সহজিয়ারা বাঁকা পথ বলিয়াছেন, তেমনই বাঁকা পথ বলিয়াছেন সকল ক্রিয়া-কাণ্ডের বাহ্যাড়ম্বরকে—সকল প্রকার যোগের 'ভড়ং' এবং সিদ্ধাইকে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, 'সহজ'ই ছিল বৌদ্ধ সহজিয়াগণের সাধ্য—অর্থাৎ আমাদের রূপের মধ্যে যে একটি 'অরূপ' সত্তা রহিয়াছে, শরীরের মধ্যে যে এক অশরীরী রহিয়াছে—তাহাকে উপলব্ধি করাই হইল চরম লক্ষ্য। চর্যাকার এবং দোহাকারগণ বার বার বলিয়াছেন —এই 'সহজ' হইল বাক্য-মনের অগোচর—সুতরাং তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিবার কোনও উপায় নাই—শুধু কোনও রূপে তাহার অনুভূতির একটা আভাস-ইঙ্গিত দেওয়া যাইতে পারে মাত্র। সরহপাদ ভারী চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন, নিজের স্বভাব নিজেই জানা যায়—অন্যে তাহার কথা কি করিয়া বলিবে? শুধু গুরুর উপদেশই পারে তাহা দেখাইয়া দিতে—অন্য কিছুতে নয়।

ণিঅ-সহাব ণউ কহিঅউ অন্নেঁ।
দীসই গুরু উবএসেঁ ণ অন্নেঁ॥

যাঁহারা নিপুণ যোগী তাঁহাদের মন নিঃশেষে যায় বিলীন হইয়া সহজের মধ্যে—যেমন জল যায় নিঃশেষে বিলীন হইয়া জলের মধ্যে।

ণিঅ মণ মুণহু রে ণিউণে জোই।
জিম জল জলহি মিলন্তে সোই॥

বৌদ্ধতন্ত্রে দেখিতে পাই স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে সহজই হইল স্বরূপ—সমস্ত জগতেরই মূলস্বরূপ—সুতরাং স্বরূপই হইল নির্বাণ—অতএব সহজই হইল নির্বাণ।

তস্মাৎ সহজং জগৎ সর্বং সহজং স্বরূপমুচ্যতে।
স্বরূপমেব নির্বাণং বিশুদ্ধাকার-চেতসঃ॥ (হেবজ্র-তন্ত্র)

অন্যত্র বলা হইয়াছে 'স্বভাবং সহজমিত্যুক্তং' (ঐ),—স্ব-ভাবই হইল সহজ। সেই সহজ একদিকে দেহস্থ—কারণ দেহের মধ্যে তাহার বাস, কিন্তু দেহস্থ হইলেও সে দেহস্থ নয়,—'দেহস্থোঽপি ন দেহজঃ' (ঐ)। দোহাকারগণ বলিয়াছেন,—সহজ হইল আদি-রহিত এবং অন্তরহিত—এই যে আদি-অন্ত-রহিত শাশ্বত স্বরূপ ইহাকেই বজ্রগুরুগণ অভিহিত করেন অদ্বয় বলিয়া।

আই রহিঅ এহু অন্ত রহিঅ।
বরগুরু-পাঅ অদ্দয় কহিঅ॥

এই সহজ—(গুণ দোস রহিঅ এহু পরমত্থ।
সঅসংবেঅণ কেবি ণত্থ॥

*   *   *   *

রূব্ব বি বজ্জই আকিই বিহুণ্ণ।
সব্বাআরে সো সম্পুন্ন॥

ইহা হইল সর্বপ্রকারের গুণ দোষ রহিত—ইহাই হইল পরমার্থ ; ইহা হইল স্ব-সংবেদ্য তত্ত্ব—ইহা সর্বপ্রকারের বর্ণবর্জিত এবং আকৃতিবিহীন, সর্বাকারে এই সহজ আছে সম্পূর্ণ হইয়া।

সরহপাদ তাঁহার দোঁহাতে বলিয়াছেন,—

সঙ্কপাস তোড়হু গুরুবঅণেঁ।
ণ সুণই সোণউ দীসই নঅণেঁ॥
পবণ বহন্তে ণউ সো হল্লই।
জলণ জলন্তে ণউ সো উজ্ঝাই॥
ঘণ বরিসন্তে ণউ সে ত্মই।
ণউ বজ্জই ণউ খঅহি পইসসই॥
ণউ বট্টই ণ তণুন্তে ণ বজ্জই।
সমরস সহজাণন্দ জাণিজ্জই॥

শঙ্কাপাশ সব ছিঁড়িয়া ফেল গুরুর বচনে ; এই শঙ্কা দূরীভূত হইয়া গেলে আভাস পাওয়া যাইবে সহজের, যাহাকে শ্রবণ কখনও শোনে না, চোখের দ্বারা যাহাকে যায় না দেখা। পবন বহিলে তাহা শব্দায়মান হয় না, জ্বলন (অগ্নি) জ্বলিলে তাহা পোড়ে না ; ঘন বর্ষায় তাহা ভেজে না, তাহা বাড়েও না—তাহা ক্ষয় প্রাপ্তও হয় না। তাহা (একস্থানে) থাকে না, বিস্তৃতও হয় না—কোথায়ই যায়ও না,—সমরসই হইল সহজানন্দ।

'সহজে'র এই বর্ণনা পাঠ করিলে আমরা লক্ষ্য করিতে পারিব ইহা গীতা প্রভৃতি জনপ্রিয় শাস্ত্রে দেহের ভিতরকার যে অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য স্থাণু, অচল এবং সনাতন দেহীর কথা বলা হইয়াছে সেই বর্ণনার সহিতই সমসূত্রে গ্রথিত। আমাদের এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা প্রয়োজন কি করিয়া অনাত্মবাদী বৌদ্ধধর্ম হইতে উদ্ভূত তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বা সহজিয়াগণ এমন করিয়া স্পষ্ট আত্মবাদে না হোক, একটা স্বরূপবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। দীর্ঘকালের চিন্তার আবর্তনের ভিতর দিয়া এই পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে।

বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনার দিক হইতে আর একটি তথ্য এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে,—তাহা হইল এই যে চরম 'সাধ্য'রূপে তাঁহারা যে সহজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেই সহজকে তাঁহারা 'সহজ' রূপেও উল্লেখ করিয়াছেন, আবার 'সহজানন্দ'রূপেও উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে 'সহজ'ই 'সহজানন্দ'। সে কথার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য হইল এই যে-সহজ-স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই নির্বিকল্প পরম আনন্দ লাভ হয়—সেই নির্বিকল্প পরম আনন্দই হইল সহজানন্দ। সেই সহজানন্দকেই সহজিয়া বৌদ্ধগণ বলিয়াছেন 'মহাসুখ'। বৌদ্ধ তন্ত্রে এই 'মহাসুখে'র দীর্ঘ ইতিহাস রহিয়াছে।

প্রাচীন বৌদ্ধগণ যে চরম লক্ষ্য নির্বাণের কথা বলিয়াছেন সেই নির্বাণের স্বরূপ কি, ইহা লইয়া অদ্যাবধি পণ্ডিত মহলে বিতর্কের অন্ত নাই। নির্বাণ কথাটি সাধারণত নির + V বা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হয়,—অর্থ হইল নিভিয়া যাওয়া—নিঃশেষ হইয়া যাওয়া,—যেমন দীপধারা স্নেহক্ষয়ে নিভিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। এই নিভিয়া যাওয়া বা জুড়াইয়া যাওয়ার অর্থটি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে পালি 'মহাভিনিক্খমণ' সুত্রে (নিদানকথা)। সেখানে দেখি, যুবরাজ সিদ্ধার্থের অনিন্দ্যরূপে মুগ্ধ হইয়া 'কিসা-গোতমী' নামক একটি ক্ষত্রিয়কন্যা অলিন্দ্য হইতে একটি গান করিয়াছিল,—

নিব্বুতা নূন সা মাতা নিব্বুতো নূন সো পিতা।
নিব্বুতা নূন সা নারী যস্সায়ং ইদসো পতি॥

অর্থাৎ 'জুড়াইয়া গিয়াছে সেই মা (মায়ের হৃদয়) যাঁহার এমন ছেলে, জুড়াইয়া গিয়াছে সেই পিতা (পিতার হৃদয়) যাঁহার এমন ছেলে—জুড়াইয়া গিয়াছে সেই স্ত্রী (স্ত্রীর হৃদয়) যাঁহার এমন স্বামী।'

এই গাথাটির ভিতরকার 'নিব্বুত' (নির্বৃত) কথাটি যুবরাজ সিদ্ধার্থকে ভাবাইয়া তুলিল ; তিনি বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—এই কন্যাটি তাহার গানে বলিল, মায়ের হৃদয় জুড়াইয়া যায়, পিতার হৃদয় জুড়াইয়া যায়—স্ত্রীর হৃদয় জুড়াইয়া যায়,—কিন্তু সত্য সত্যই কি জুড়াইয়া গেলে মায়ের হৃদয়, পিতার হৃদয়, স্ত্রীর হৃদয়—সকলের হৃদয়ই জুড়াইয়া যায় ? তাহাই দেখা দিল কুমারের মনে একটা মহাজিজ্ঞাসার রূপে, কস্মিংনু খো নিব্বুতে হদয়ং নিব্বুতং নাম হোতি ?

এই মহাজিজ্ঞাসার উত্তর কুমার সিদ্ধার্থ নিজের বিষয়-বিরক্ত ধ্যানপরায়ণ মনের মধ্যেই লাভ করিলেন ; তিনি বুঝিলেন,—'রাগগ্গিম্হি নিব্বুতে নিব্বুতং নাম হোতি, দোসগ্গিম্হি মোহগ্গিম্হি নিব্বুতে নিব্বুতং নাম হোতি'—হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছে যে রাগের আগুন, যে দ্বেষের আগুন, যে মোহের আগুন—সেই আগুন নির্বাপিত হইলেই আসে হৃদয়ের যথার্থ নির্বাণ। কুমার ভাবিলেন, এই কন্যাটি ত আমাকে বড়ই সুন্দর সঙ্গীত শুনাইয়াছে,—আমি এই 'নির্বাণে'র সন্ধান করিয়াই বেড়াইব, 'অহং হি নিব্বাণং গবেসন্তো চরামি।'(১)

এখানে দেখিতেছি হৃদয়ের আগুন নিভাইয়া ফেলাই হইল নির্বাণ। এই নির্বাণকে পালি শাস্ত্রে আরও অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত দেখিতে পাই। সেখানে সমগ্র জীবন প্রবাহকেই একটি প্রদীপকে অবলম্বন করিয়া প্রজ্বলিত আলোশিখার প্রবাহের সহিত তুলনা করা হইয়াছে ; বাসনাই হইল এই জীবনদীপে 'স্নেহ' স্বরূপ ; স্নেহক্ষয়ে যেমন দীপের আলোশিখা-প্রবাহ একেবারে নিভিয়া যায় সেইরূপ সর্ববাসনা ক্ষয় হইলে—ক্লেশাবরণ এবং জ্ঞেয়াবরণ নষ্ট হইলে—সুখদুঃখময় জীবনপ্রবাহ নিঃশেষে থামিয়া যায়—ইহাই নির্বাণ।

কিন্তু ইহা ত নির্বাণের একটা নঙর্থক (negative) বর্ণনা মাত্র হইল ; সব নিভিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবার অর্থ কি ? কিছুই কি থাকে না ? দার্শনিকগণ এ-বিষয়ে স্পষ্ট কোনও জবাব দেন নাই। যে জবাব দিয়াছেন তাহা হইতে কেহ ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছি কিছুই থাকে না—কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছি কিছু থাকে। সেই দার্শনিক তর্কে এখানে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গে এইটুকু লক্ষ্য করিতে পারি যে, দার্শনিকগণ নির্বাণকে যতই নেতিমার্গে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করুন না কেন পালি শাস্ত্রে ও সাহিত্যে—এবং পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে নির্বাণ শুধু একটা পরম 'নাস্তিত্ব' মাত্র নয়,—নির্বাণই সুখ, নির্বাণই শান্তি। অশ্বঘোষ তাঁহার 'সৌন্দরানন্দ কাব্যে' যেখানে নির্বাণের সঙ্গে দীপ-নির্বাণের তুলনা দিয়াছেন সেখানে তিনিও বলিয়াছেন যে দীপ যেরূপ 'স্নেহক্ষয়াৎ শান্তিমভ্যুপৈতি'—স্নেহক্ষয়বশতঃ নির্বাপিত হইয়া অত্যন্ত শান্তি লাভ করে। জীবন প্রদীপও 'ক্লেশক্ষয়াৎ শান্তিমভ্যুপৈতি'—ক্লেশক্ষয়ে অত্যন্ত শান্তি লাভ করে। এই যে অত্যন্ত শান্তি লাভ করার সত্যটি তাহা পালি 'মিলিন্দ-পঞ্হো'র মধ্যে নির্বাণ সম্বন্ধে বহু আলোচনার প্রসঙ্গে অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারি। পালি শাস্ত্রে এই নির্বাণকে বলা হইয়াছে 'পরং', 'সন্ত' (শান্ত), 'বিসুদ্ধ' (বিশুদ্ধ), 'সন্তি' (শান্তি), 'অক্খর' (অক্ষর), 'ধ্রুব', 'সচ্চ' (সত্য), 'অনন্ত', 'অচ্যুত', 'সস্সত' (শাশ্বত), 'অমত' (অমৃত), 'অজাত', 'কেবল', 'সিব' (শিব)। 'সুত্তনিপাতে' দেখিতে পাই নির্বাণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'সন্তী'তি নিব্বাণং ঞত্বা' অর্থাৎ নির্বাণকে শান্তি বলিয়া জানিয়া। ধম্মপদে একাধিকস্থানে বলা হইয়াছে, 'নিব্বাণং পরমং সুখং'। 'অঙ্গুত্তর-নিকায়ে' বলা হইয়াছে—

ওধুনিত্বা মলং সব্বং পত্বা নিব্বাণ-সম্পদং।
মুচ্চেতি সব্বদুঃখেহি সা হোতি সব্ব-সম্পদা ॥(২)

'বিমানবত্থু'তে নির্বাণকে বলা হইয়াছে অচল স্থান—যেখানে গিয়া আর শোক করিতে হয় না—'পত্তা তে অচল-ট্ঠানং যথা গন্তা ন সোচরে'। 'থেরী-গাথা'র সমজাতীয় উক্তি দেখিতে পাই,—'নিব্বাণ-ট্ঠানে বিমুত্তা তে পত্তা তে অচলং সুখং'।

নির্বাণকে এই যে পরম সুখ বা পরম শান্তি বলিয়া বর্ণনা পরবর্তী কালের তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ এইখান হইতে তাঁহাদের সাধ্যবস্তুর ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টভাবেই বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করিলেন যে পরম সুখই হইল নির্বাণের স্বরূপ—তাঁহারা ইহার নাম দিলেন 'মহাসুখ'। কিন্তু তাঁহারা এইখানেই থামিলেন না ; তাঁহারা বলিলেন, নির্বাণ যে মহাসুখ তাহা নহে—মহাসুখই হইল নির্বাণ। একটি বিশেষ প্রকারের সাধনা দ্বারা চিত্তকে যদি এই মহাসুখের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দেওয়া যায় তবে যাহা বাকি থাকে তাহাই স্বরূপ—তাহাই হইল সহজ ; মহাসুখের মধ্যে সমস্ত সঙ্কল্প-বিকল্পের বিলয় ঘটিলেই এই সহজ-স্বরূপে অবস্থান ঘটে ; মহাসুখই হইল সহজানন্দ। এই সহজানন্দ বা স্বরূপানুভূতির ক্ষেত্রে কোনও জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞেয়ত্ব বা গ্রাহকত্ব-গ্রাহ্যত্ব থাকে না। গ্রাহ্যত্ব-গ্রাহকত্ব-রহিত যে স্বরূপ তাহাই হইল অদ্বয়-স্বরূপ, অদ্বয়ই হইল সহজ—সহজই হইল মহাসুখ। সুতরাং এই মহাসুখে স্থিতিলাভের দ্বারা যে অদ্বয়ে বা সহজে স্থিতি ইহাই হইল বৌদ্ধ সহজিয়াগণের সাধনার মূল লক্ষ্য। আবার দেখিতে পাইব, এই অদ্বয়-মহাসুখে বা সহজে প্রতিষ্ঠা এবং বোধিচিত্ত লাভ সহজিয়াগণের নিকটে একই কথা—কারণ অদ্বয়ই হইল বোধিচিত্ত।

বৌদ্ধ সহজিয়াগণের সাধনার কথা বুঝিতে হইলে এই বোধিচিত্তের ধারণাটাও ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে বোধিচিত্ত শব্দের অর্থ হইল বোধিলাভের জন্য এবং সেই বোধিলাভের দ্বারা সর্বভূতের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত একটি 'চিত্ত'—অর্থাৎ দৃঢ় চেতনা বা সঙ্কল্প উৎপাদন করা। এই বোধিচিত্ত উৎপন্ন হইলেই চিত্তের ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ হয়—দশটি ভূমি অতিক্রম করিয়া চিত্ত 'ধর্মমেঘ' রূপ দশম ভূমিতে স্থিতি লাভ করে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে এই বোধিচিত্ত একটি বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিল। শূন্যতা এবং করুণার অভিন্নাবস্থাকেই বলা হয় বোধিচিত্ত—'শূন্যতা-করুণাভিন্নং বোধিচিত্তং তদুচ্যতে।' এই শূন্যতা এবং করুণার অভিন্নত্বের তাৎপর্য কি ? এই তাৎপর্য নানা দিক হইতে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। ধর্মমতের দিক হইতে বলা যাইতে পারে, বৃহত্তর সমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া শুধু মাত্র শূন্যতা-সাধনের দ্বারা নির্বাণ লাভের চেষ্টা না করিয়া করুণা অবলম্বনে

(১) এই প্রসঙ্গে রীস্ ডেভিড্‌স্ কৃত 'পালি ভাষার অভিধান' গ্রন্থে 'নিব্বাণ' শব্দটি দ্রষ্টব্য।

(২) উপরিউক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত।

বিশ্বজীবের মঙ্গলের জন্ত কুশলকর্মের পথ গ্রহণ করাই হইল এই বোধিচিত্ত-সাধনার তাৎপর্য। এই শূন্ততাকে বলা হয় 'প্রজ্ঞা'—কারণ শূন্ততা-জ্ঞানই ত হইল প্রজ্ঞা; আর করুণাকে বলা হয় 'উপায়'—কারণ করুণাই বিশ্বজীবের মঙ্গলের উপায়। এই 'প্রজ্ঞোপায়ে'র মিলন হইতেই লাভ হয় বোধিচিত্ত। দর্শনের দিক হইতে শূন্ততাই হইল গ্রাহক—principle of subjectivity; আর করুণা হ ল গ্রাহ্য—principle of objectivity; এই গ্রাহ্য-গ্রাহকত্বের দুইটি প্রবহমাণ ধারা নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায় যে অদ্বয়-তত্ত্বে সেই অদ্বয়তত্ত্বই হইল বোধিচিত্ত—তাহাই সহজস্বরূপ। যোগ-সাধনার দিক হইতে দেখিতে পাইব, আমাদের দেহের মধ্যে তিনটি প্রধান নাড়ী আছে—একটি বামগা—শ্বাসবাহী নাড়ী বা প্রাণবাহী নাড়ী,—অপরটি হইল দক্ষিণগা—প্রশ্বাসবাহী নাড়ী বা অপানবাহী নাড়ী; এই দুই হইল দেহ মধ্যে সর্বপ্রকার দ্বৈততত্ত্বের প্রতীক বা প্রতিনিধি; আর একটি নাড়ী আছে মধ্যগা নাড়ী—তাহাকে বৌদ্ধতন্ত্রে বলা হয় অবধূতী বা অবধূতিকা; উভয় নাড়ীর ক্রিয়া এবং ধারাকে অবলম্বন করিয়া চলে সংসারের গতি—ইহারাই একটি 'ভব' (অস্তিত্ব) অপরটি 'নির্বাণ' (অনস্তিত্ব)—একটি সৃষ্টি—অপরটি সংহার—একটি 'ইতি', অপরটি 'নেতি'; এই উভয় ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক নিম্নগা ধারাকে অবধূতিকা পথে উর্ধ্বগা করিতে পারিলে অদ্বয় বোধিচিত্ত বা সহজানন্দ বা মহাসুখ লাভ হয়।

হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়বিধ তন্ত্রশাস্ত্রে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, একটি অদ্বয়তত্ত্বই হইল পরমতত্ত্ব। এই পরম অদ্বয়-তত্ত্বের দুইটি ধারা—হিন্দুমতে একটি হইল শিব—অপরটি শক্তি। গুণাতীত নিষ্কল শিব হইলেন বিন্দু—তাহাই হইল নিবৃত্তিতত্ত্ব; আর ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি হইলেন নাদ—ইহাই হইল প্রবৃত্তিতত্ত্ব; এই বিন্দু-নাদ—নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি—ইহাদের মিলনের নিম্নগা ধারায় হইল সংসারপ্রবাহ,—আর তাহাদেরই মিলনের উর্ধ্বগা ধারায় হইল অদ্বয়ে প্রতিষ্ঠা—সহজানন্দ বা মহাসুখ-প্রাপ্তি। অদ্বয় বোধিচিত্তেরও তাই একটি সাংবৃতিক রূপ রহিয়াছে—আর একটি পারমার্থিক রূপ রহিয়াছে। শূন্ততা এবং করুণাই হইল বৌদ্ধমতে অদ্বয় বোধিচিত্তের দুইটি ধারা—একটি প্রজ্ঞা—অপরটি উপায়,—একটি বিন্দু—অপরটি নাদ; একটি নিবৃত্তি—অপরটি প্রবৃত্তি। এই প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলনের নিম্নধারায় হইল বহিঃসৃষ্টি—জরা-মরণ-দুঃখ-দৌর্মনস্যের জীবন-যাত্রা; তাহাদের মিলনের একটি উর্ধ্বধারা আছে—এই উর্ধ্বধারার পথই হইল অবধূতিকা মার্গ; সেই মার্গ অবলম্বন করিয়া 'স্রোতে উজাইয়া' চলিতে পারিলেই হয় অদ্বয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ—সেই প্রতিষ্ঠাতেই হয় যে মহাসুখ লাভ তাহাই হইল সহজানন্দ—তাহাই হইল 'সামরস্য'। নিবৃত্তি-রূপিণী শূন্ততাকে অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয় একটি রস—প্রবৃত্তি-রূপী করুণাকে অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয় সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্মের আর একটি রস;—এই উভয় রসের ধারাই স্বাভাবিক ভাবে নিম্নগা। এই উভয় রস যদি মধ্যমার্গে আসিয়া মিলিয়া একেবারে এক হইয়া যায়—তবেই তাহা হয় 'সমরস'; এই 'সমরসে'র বিশুদ্ধি হইল উর্ধ্বস্রোতে; অবধূতিকা-মার্গকে অবলম্বন করিয়া এই সমরসের ধারা যখন সর্বোর্ধ্ব-অবস্থিতি লাভ করে, তখনই তাহা পরিশুদ্ধ 'সামরস্য' রূপ লাভ করিল। এই পরিশুদ্ধ সামরস্যের পূর্ণতম রূপই হইল সহজানন্দ—তাহাই অদ্বয় বোধিচিত্ত। এই মহাসুখ বা সহজানন্দ বা অদ্বয় বোধিচিত্ত লাভই হইল বৌদ্ধ সহজিয়াগণের চরম লক্ষ্য।

এইত গেল মোটামুটি ভাবে বৌদ্ধ সহজিয়াদের চরম লক্ষ্যের কথা; এই বারে আসা যাক তাঁহাদের সাধনার কথায়। সাধনার দিক হইতে আমরা দেখিতে পাই, ইহাদের সাধনা মূলতঃ তান্ত্রিক সাধনা। এই তান্ত্রিক সাধনা বলিতে আমরা কি বুঝি? এ বিষয়েও অনেক সংশয় এবং তর্ক রহিয়াছে,—আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহি না। তন্ত্রসাধনার বহু বহিরঙ্গ দিক রহিয়াছে; সহজিয়া সাধকগণ সর্বদাই বহিরঙ্গ বিরোধী ছিলেন; তাই তাঁহারা তন্ত্রের বহিরঙ্গ সাধনা ছাড়িয়া মূল সাধনার উপরই জোর দিয়াছেন। তন্ত্র-সাধনার মূল কথা হইল দেহ-সাধনা—অর্থাৎ দেহকেই যন্ত্র করিয়া তাহার ভিতর দিয়াই পরম সত্যকে উপলব্ধি করার সাধনা। তন্ত্রমতে দেহভাণ্ডটিই হইল ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্ররূপ—সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে যাহা কিছু সত্য নিহিত আছে, তাহার সবই নিহিত আছে এই দেহভাণ্ডের মধ্যে। সহজিয়া বলেন, আমাদের দেহের ভিতরে অবস্থান করিতেছে যে সহজস্বরূপ তাহাই হইল বুদ্ধ-স্বরূপ। বুদ্ধ ত তাহা হইলে অশরীরী রূপে এই শরীরের মধ্যেই অবস্থান করিতেছে—

> অসরির কোই সরীরহি লুক্কো।
> জো তাহি জাণই সো তহি মুক্কো॥

'অশরীরী' কেহ আছে শরীরে লুকাইয়া, যে তাহাকে জানে সে-ই হয় মুক্ত।

> ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।
> পই দেক্খই পড়িবেসী পুচ্ছই॥

'ঘরে (দেহ ঘরে) আছে, বাহিরে জিজ্ঞাসা করিতেছ; (ঘরে) পতি দেখিতেছ, কিন্তু প্রতিবেশীকে (তাহার খোঁজ) জিজ্ঞাসা করিতেছ।'

আবার বলা হইয়াছে,—

> পণ্ডিঅ সঅল সত্ত বক্খাণই।
> দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই॥

'পণ্ডিত সকল করেন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান, জানে না সেই বুদ্ধকে যিনি বাস করেন দেহের মধ্যেই।'

সরহপাদ আরও চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন—

> এত্থু সে সুরসরি জমুণা
> এত্থু সে গঙ্গাসাঅরু।
> এত্থু পআগ বণারসি
> এত্থু সে চন্দ দিবাঅরু॥
> ক্ষেত্তু পীঠ উপপীঠ এত্থ
> মই ভমই পরিট্ঠিও।
> দেহা সরিসঅ তিত্থ মই
> সুহ অণ্ণ ণ দীট্ঠিও।

'এখানেই (এই দেহেই) সেই সুরসরিৎ (গঙ্গা) ও যমুনা, এখানেই সেই গঙ্গাসাগর; এখানেই প্রয়াগ-বারাণসী, এখানেই হইল চন্দ্র দিবাকর; ক্ষেত্র, পীঠ, উপপীঠ—সবই হইল এখানে, বহু ঘুরিয়া এই বুঝিয়াছি—দেহ সদৃশ তীর্থ এবং সুখ আর কোথাও দেখা গেল না।'

চর্যাপদগুলির মধ্যে আমরা বহু ভাবে দেখিতে পাই এই দেহকে

অবলম্বন করিয়া সাধনার কথা। কোথাও দেখিতে পাই 'দেহ নজরী'তে বিহারের কথা,—কোথাও দেখিতে পাই 'কায়-নৌকা'কে ভব-সমুদ্রের ভিতরে বহিয়া যাইবার কথা। চর্যাকারগণও বারবার বলিয়াছেন, অতি নিকটেই—এই দেহেই আছে বোধি—বোধিলাভের জন্য প্রয়োজন নাই লঙ্কায় যাইবার, 'নিয়ড়ি বোহি মা জাহিরে লঙ্ক।' কোথাও বলা হইয়াছে কায়রূপ মায়াজাল বাহিবার কথা—'বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল'; কোথাও দেহকে বলা হইয়াছে রথ (জো রথে চড়িলা বাহবা ন জাই ইত্যাদি), কোথাও দেহকে বীণা করিয়া বাজাইবার কথা বলা হইয়াছে (বাজই আলো সহি হেরুঅ বীণা); দেহকে নৌকা করিয়া নৌকা বাহিবার রূপকই গ্রহণ করা হইয়াছে সব চেয়ে বেশি।

সহজানন্দ-রূপ পরম সত্য দেহকে যন্ত্ররূপে অবলম্বন করিয়া দেহের মধ্যেই অনুভব করিতে হয়, এই মতকেই সাধনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ—তথা বৌদ্ধ সহজিয়াগণ দেহের মধ্যে কতগুলি চক্র বা পদ্মের কল্পনা করিয়াছেন, এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের ত্রিকায়ের সহিত একটি সহজ-কায়, বা স্বাভাবিক-কায় বা বজ্রকায়ের যোগ করিয়া এই চারি কায়কে এই চারি চক্রে বা চারি পদ্মে স্থাপন করিয়াছেন। হিন্দুতান্ত্রিক মতে আমরা ষট্‌চক্র বা ষট্‌পদ্মের পরিকল্পনা দেখিতে পাই, বৌদ্ধতন্ত্রে সেখানে এই চারি চক্র বা পদ্ম। প্রথম চক্র হইল নাভিতে, দ্বিতীয় চক্র হৃদয়ে, তৃতীয় কণ্ঠে, চতুর্থ মস্তকের সর্বোচ্চ দেশে (তুলনীয় হিন্দুমতের সহস্রার)। নাভিতে হইল নির্মাণকায়-তত্ত্বের অবস্থিতি, সুতরাং নাভিতে হইল নির্মাণ-চক্র; এইরূপ হৃদয়ে ধর্মচক্র, কণ্ঠে সম্ভোগ-চক্র (মহাযান মতানুসারে অবশ্য হৃদয়ে সম্ভোগ-চক্র এবং কণ্ঠে ধর্মচক্র হওয়া উচিত ছিল, কারণ নির্মাণকায়ের পরে সম্ভোগকায়—তাহার পরে ধর্মকায়) এবং মস্তকস্থিত 'উষ্ণীষ-চক্রে' হইল 'সহজ-চক্র' বা 'মহাসুখ-চক্র'; বোধিচিত্তের স্থিতি এই উষ্ণীষ-কমলে।

আমরা দেখিয়াছি, বোধিচিত্তের দুইটি ধারা প্রজ্ঞারূপিণী শূন্যতা—এবং উপায়রূপ করুণা। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, ইহারাই বিন্দু-ও নাদ-তত্ত্ব, গ্রাহক ও গ্রাহ্য-তত্ত্ব, নিবৃত্তি-ও প্রবৃত্তি-তত্ত্ব। বামনাসারন্ধ্র হইতে প্রবাহিত হইয়া যে বামগা-নাড়ী (হিন্দুতন্ত্রমতে ইড়া) তাহাই হইল প্রজ্ঞা-রূপিণী, দক্ষিণ নাসারন্ধ্র হইতে প্রবাহিত হইয়া যে দক্ষিণগা নাড়ী তাহাই হইল উপায়-রূপিণী (হিন্দুতন্ত্রমতে পিঙ্গলা); আর এই দুই নাড়ীর ঠিক মধ্যভাগ হইতে প্রবাহিত যে নাড়ী (হিন্দুতন্ত্র মতে সুষুম্না)—তাহাই হইল আমাদের পূর্বব্যাখ্যাত অবধূতী বা অবধূতিকা—ইহাই হইল অদ্বয় বোধিচিত্ত বা সহজানন্দ লাভের জন্য মধ্যমার্গ। আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, নানা ভাবে এই মধ্যপথের কথা বলা হইয়াছে। সহজিয়াদের মধ্যপথের সাধনা হইল এই অবধূতিকা-মার্গকে অবলম্বন করিয়া। এই যে বামগা এবং দক্ষিণগা নাড়ী—ইহারাই হইল শূন্যতা-করুণা, প্রজ্ঞা-উপায়, বিন্দু-নাদ, নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি, গ্রাহক-গ্রাহ্য প্রভৃতি সর্বপ্রকারের দ্বৈতত্ত্বের প্রতীক। এই দ্বৈতত্ত্বের প্রতীক নাড়ীদ্বয়কে আরও অনেক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সাধারণ ভাবে দেহের বামদিকে শূন্যতা-রূপিণী প্রজ্ঞাতত্ত্ব এবং দক্ষিণদিককে করুণারূপ উপায়তত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। শূন্যতা বজ্র বলিয়া বামগা নাড়ী বজ্র, দক্ষিণ গা নাড়ী সৃষ্ট্যাত্মক উপায়ের প্রতীক বলিয়া পদ্ম বলিয়াও অভিহিত হয়; ইহারা কুলিশ-কমল নামেও খ্যাত। শূন্যতা স্বতন্ত্রা বলিয়া বামগা নাড়ী স্বর (বা 'আলি' অর্থাৎ অকারাদি-ক্রমে বর্ণমালা) আর করুণা বা উপায় পরতন্ত্র বলিয়া দক্ষিণগা নাড়ী ব্যঞ্জন (বা 'কালি'—অর্থাৎ ক-কারাদি-ক্রমে বর্ণমালা)। বামা হইল গঙ্গা নদী, দক্ষিণা যমুনা; বামা চন্দ্র (বা শশী); দক্ষিণা সূর্য (বা রবি); বামা রাত্রি, দক্ষিণা দিবা; এইরূপে আমরা আরও নাম দেখিতে পাই, যেমন—প্রাণ-অপান, ললনা-রসনা, চমন-ধমন, এ-বং, ভব-নির্বাণ ইত্যাদি। সাধনার ক্ষেত্রে এই নামগুলি নাড়ী-দ্বয় বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইয়াছে, আবার সাধারণভাবে সর্বপ্রকারের দ্বৈত তত্ত্ব বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইয়াছে। যেখানেই বাম-দক্ষিণ ছাড়িয়া মধ্যপথের কথা বলা হইয়াছে সেইখানেই অবধূতিকা মার্গে ঊর্ধ্বস্রোতে অদ্বয়-বোধিচিত্তের পথ বা মহাসুখ সহজানন্দের পথ বুঝিতে হইবে।

সহজিয়াগণের আসল সাধনা হইল সর্বপ্রকারের দ্বৈতবিবর্জিত হইয়া অদ্বয় মহাসুখে বা সহজস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকা। তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরমার্থ অনুভূতির জন্য তাঁহারা যে সাধনা করিতেন দেহই তাহার অবলম্বন বলিয়া নাড়ী-চক্রাদি অবলম্বিত সাধনার উপরে তাঁহারা জোর দিয়াছেন। প্রথমে বাম ও দক্ষিণা নাড়ীদ্বয়কে নিঃস্বভাবীকৃত করিতে হইবে। তাহাদের ক্রিয়াধারা স্বাভাবিক ভাবে নিম্নগা; এই নিম্নগা ধারাকে যোগের সাহায্যে প্রথমে বিশুদ্ধ করিয়া রুদ্ধ করিতে হইবে—তাহার পরে সমস্ত ধারাকে একীকরণের সাধনা; যখন সব ধারা একীকৃত হইল মধ্যমার্গে—তখন সেই মধ্যমার্গে তাহাকে করিতে হইবে ঊর্ধ্বগা। সেই ঊর্ধ্বগা ধারাই আনন্দের ধারা; সেই আনন্দের মধ্যে অনুভূতির তারতম্য আছে; প্রথমে যে ঊর্ধ্বস্পন্দনাত্মক আনন্দানুভূতি তাহার নাম আনন্দ, দ্বিতীয়ানুভূতি হইল পরমানন্দ—তৃতীয়ানুভূতি বিরমানন্দ—চতুর্থানুভূতি হইল সহজানন্দ। এই চতুর্থানুভূতি সহজানন্দই হইল চতুর্থশূন্য প্রকৃতি-প্রভাস্বর সর্বশূন্য। বোধিচিত্ত উষ্ণীষ কমলস্থিত চন্দ্র,—সহজানন্দেই ঘটে সেই চন্দ্র হইতে অমৃতক্ষরণ।

এই সহজানন্দের সাধনা—এই মহাসুখের সাধনা—বা এই অদ্বয় বোধিচিত্তের সাধনার কথা ছড়াইয়া আছে বহু চর্যাপদের মধ্যে। প্রথম পদেই বলা হইয়াছে চঞ্চলচিত্তকে নিঃস্বভাবীকৃত করিতে হইবে মহাসুখের মধ্যে তাহাকে বিলীন করিয়া। সেই সাধনায় অগ্রসর হইয়া—

> ভণই লুই আমহে ঝাণে (সাণে) দিঠা।
> ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা॥

'লুই বলিতেছে, আমি ধ্যানে (বা সানে, অর্থাৎ আভাসে-ইঙ্গিতে) দেখিলাম,—ধমন-চমন দুইয়ের আসনে বসিয়া আছি।' দুইয়ের উপরে বসিয়া আছি অর্থ দুইকে এক করিয়া অদ্বয় মহাসুখে অবস্থিত বা মগ্ন আছি।

পঞ্চম পদে চাটিলপাদ বলিয়াছেন, দুই অন্তেই কাঁদা—মাঝে নাই থই। এই দুইকে তাহা হইলে মিলিত করিতে হইবে। চাটিলপাদ নদীর দুই ধারে মিলাইয়া দিবার জন্য সাঁকো গড়িলেন—সাঁকো গড়া শব্দের অর্থই দুইকে মিলাইয়া দেওয়া; এই দুইকে জুড়িয়া সাঁকো গড়িবার জন্য মোহতরুকে ফাড়িয়া পাট জোড়া হইয়াছে—অদ্বয়-দৃষ্টিকে করা হইয়াছে টাঙ্গি। এই সাঁকোতে চড়িলেও 'দাহিণ বাম মা হোহী'—গ্রহণ করিতে হইবে অদ্বয় মহাসুখের মধ্যপথ।

কাহ্নুপাদ যেখানে বলিয়াছেন 'অলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা'—তখন এই আলি-কালি রূপ দ্বৈতত্বের দ্বারা পরমার্থের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এই ব্যঞ্জনাই গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য যোগের দিক হইতে ইহার অন্য ব্যাখ্যাও করা চলে,—সেখানে অর্থ হইল, আলি এবং কালিকে বিশুদ্ধ করিয়া এবং উভয়কে একীকৃত করিয়া অবধূতী-পথ রুদ্ধ করিলাম বা দৃঢ় করিলাম,—অর্থাৎ সকল নিম্নগা ধারা রুদ্ধ করিয়া করিয়া দিলাম। অষ্টম পদে কম্বলাম্বরপাদ বলিয়াছেন—

বামদাহিন চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা ॥

'বাম-দক্ষিণ চাপিয়া মিলিয়া মিলিয়া পথে—(অবধূতিকা) পথেই মিলিল মহাসুখের সঙ্গ।'

কাহ্নুপাদ কোথাও চিত্তকে গজেন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন—যে মত্ত গজেন্দ্র 'এবংকার দৃঢ় বাখোর মোড্ডিউ'—এ-কার এবং বং-কার রূপ দুইটি দৃঢ় থাম মর্দিত করিয়া দিয়াছে। আবার কোথাও—

আলি-কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবিশশীকুণ্ডল কিউ আভরণে ॥

আলি-কালির ঘণ্টা-নূপুর তাহার চরণে—রবিশশীর কুণ্ডলের আভরণ তাঁহার কর্ণে। সব কথারই ব্যঞ্জনা দুইকে নাশ করিয়া অদ্বয় সহজ বা মহাসুখের সামরস্যে স্থিতি। বীণাপাদ আবার সূর্যকে লাউ করিয়া—চন্দ্রকে তাহার সঙ্গে তার লাগাইয়া—অবধূতীকে মাঝখানের দণ্ড করিয়া দেহকে চমৎকার একটি বীণা যন্ত্রে পরিবর্তিত করিয়া এই বীণা বাজাইয়াই সহজের সাধনা করিতেছেন (১৭ নং)। সরহপাদ বলিয়াছেন—

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল।
চিঅরাঅ সহাবে মুকল ॥

'নাদ নাই বিন্দু নাই—না আছে রবি-শশীর মণ্ডল—আছে শুধু স্বভাবে মুক্ত চিত্তরাজ,'—এই নাদ-বিন্দু, রবি-শশীর অতীত যে স্বভাবমুক্ত চিত্তরাজ—তাহাই হইল সহজ-স্বরূপ। এই পদের শেষেও তিনি বলিয়াছেন,—

বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।
সরহ ভণই বপা উজুবাট ভাইলা ॥ (৩২ নং)

'বাম-দক্ষিণে খাল-বিখাল, সরহ বলে, বাপু সোজা পথ হইল।'

সরহপাদ তাঁহার আর একটি পদে বলিয়াছেন—

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেড়ুআল।
সদ্গুরু বঅণে ধর পতবাল ॥
চীঅ থির করি ধরহু রে নাই।
আন উপায়ে পার ণ জাই ॥
নৌবাহী নৌকা টাণঅ গুণে।
মেলি মেলি সহজে জাউ ণ আণেঁ ॥
বাটত ভয় খাণ্ট বি বলআ।
ভব উলোলেঁ সব বি বোলিআ ॥
কুল লই খরে সোন্তেঁ উজাঅ।
সরহ ভণই গঅণেঁ সমাঅ ॥

'কায় হইল নৌকা, খাঁটি মন হইল দাঁড়; সদ্গুরুর বচনে ধর হাল। চিত্ত স্থির করিয়া নাও ধর—অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যায় না। নৌবাহী নৌকা গুণে টানে, সহজের সঙ্গে মিলিয়া মিলিয়া আর অন্যত্র যায় না। পথে ভয় বলবান্ শঠের (চন্দ্র-সূর্যের); (সেই দুই শঠের প্রভাবে) ভব (অস্তিত্ব) উল্লোলে সবই হইল পিচ্ছিল। কূল লইয়া খরস্রোতে উজাইয়া চলে—সরহ বলে গগনে গিয়া প্রবেশ করে।'

এখানে দেখিতে পাইতেছি, কায়-রূপ নৌকা লইয়া বাহিয়া আগাইয়া চলিবার প্রতিবন্ধক হইল পথের বলবান্ শঠেরা—ঐ সেই 'দুই' শঠ। তাহাদের বশীভূত করিয়া আগাইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু সেই আগাইবার পদ্ধতিটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়—আগাইতে হইবে খরস্রোতে উজাইয়া—আর গিয়া পৌঁছাইতে হইবে কোথায়? পৃথিবী হইতে রওনা হইয়া পৌঁছাইতে হইবে গগনে। নৌকার গতি সাধারণতঃ অনুকূল স্রোতের সঙ্গে নিম্নদিকে: দেহ-নৌকার গতিও ভব-প্রবাহের অনুকূলে নিম্নমুখে; সেই গতি ফিরাইয়া হইতে হইবে; কায়কে লইয়া চলিতে হইবে ঊর্ধ্বগতির সাধনায়—পৌঁছিতে হইবে পৃথিবী হইতে গগনে—বিষয় হইতে শূন্যে—রূপ হইতে স্বরূপে! ইহাই হইল ভারতীয় যোগিগণের 'উল্টা-সাধন' বা 'উজান-সাধন'। কম্বলাম্বর পাদও পৃথিবীর ঠাঁই রূপের রূপা রাখিয়া দিয়া শূন্যের সোনা লইয়া করুণার নায়ে রওনা হইয়াছেন—কোথায় যাইবেন?—'বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ' (৮নং); পৃথিবীর ঠাঁই রূপের রূপা রাখিয়া করুণার নায়ে শূন্যতার সোনা লইয়া তাহাকে যাইতে হইবে গগনের উদ্দেশে—ঊর্ধ্বগতিতে এই যাত্রা।

রূপকচ্ছলে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সহজানন্দের কথা বুঝাইতে গিয়া চর্যাকারগণ সহজানন্দকে বহু স্থলে বিবিধ রূপে নারী বলিয়া কল্পনা এবং বর্ণনা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাহাকে দেখিতে পাই 'যোগিনী' বলিয়া, যেমন—

জোইনি তঁই বিনু খনহি ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বি কমলরস পীবমি ॥ (৪নং)

কোথাও এই সহজানন্দরূপিণী নৈরাত্মা-যোগিনীকে বলা হইয়াছে 'ডোম্বী' কোথাও চণ্ডালী, কোথাও মাতঙ্গী, কোথাও শবরী বলিয়া,—বেশি স্থানেই দেখিতে পাই তাহাকে স্পর্শের অযোগ্য নীচকুলোদ্ভবা বলিয়া। ইহার কারণ হইল এই সহজানন্দরূপিণ বা মহাসুখরূপিণী যোগিনীটি একেবারেই ইন্দ্রিয়াতীতা; ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা স্পর্শনীয়া নয় বলিয়াই এই যোগিণীকে অস্পর্শা নীচজাতীয়া রমণী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে 'অস্পর্শা ভবতি যস্মাৎ তস্মাৎ ডোম্বী প্রকীর্তিতা'। দশম পদে এই ডোম্বীর একটি বিশদ বর্ণনা পাইতেছি। এই পদে দেখিতেছি, এই ইন্দ্রিয়াতীতা সহজানন্দরূপিণী ডোম্বীর বাস হইল নগরের বাহিরে—অর্থাৎ দেহ-নগরের বাহিরে, ইন্দ্রিয়াদির নাগালের বাহিরে; এই জন্য পাণ্ডিত্যাভিমানী যত ব্রাহ্মণ নেড়ার দল তাহারা ইহাকে যেন ছুঁইয়া ছুঁইয়া যায়—ঠিক ভাবে ছুঁইতে পারে না। বাহ্য কাপালিক যাহারা তাহারা এই-জাতীয় নীচ-জাতীয়া ডোম্বীর সঙ্গ করে একেবারে নির্ঘৃণ হইয়া; আর কাহ্নুপাদ হইলেন আন্তর কাপালিক 'কং মহাসুখং পালয়তীতি কাপলিক:' মহাসুখকে পালন করেন বলিয়াই তিনি কাপালিক—তিনি ঘৃণার সংস্কার ত্যাগ করিয়া সঙ্গ করিতে চান এই সহজানন্দ ডোম্বীর। নাভিচক্রে (মণিপুরে—অর্থাৎ নির্মাণ-চক্রে) এই সহজানন্দের স্পন্দন প্রথম অনুভূত হয়; এই মণিপুরের পদ্ম হইল চৌষট্টি দলযুক্ত; সেই জন্যই বলা হইয়াছে যে

একটি পদ্ম, চৌষট্টিটি পাপড়ি—তাহাতে চড়িয়া নাচে আদরিণী ডোম্বী। বাহিরের ডোম্বী নৌকায় চড়িয়া আসা-যাওয়া করে, ভিতরের ডোম্বী কাহার নায়ে যে আসা-যাওয়া করে তাহার রহস্য কেহ জানে না। বাহিরের ডোম্বী তাঁত বিক্রয় করে আর করে চাঙ্গাড়ি বিক্রি; ভিতরের ডোম্বী বিক্রয় করে অবিদ্যার তাঁত—বিষয়াসক্তির চাঙ্গাড়ি। বাহিরের ডোম্বী পুকুর ভাঙ্গিয়া খায় মৃণালখণ্ড—তাহার ফলে মার খায় লোকের কাছে। অপরিশুদ্ধ সাংবৃতিক রূপে এই আনন্দানুভূতির ডোম্বী দেহ-সরোবরের সারাংশ আহার করে; যোগী তাই তাহাকে মারিতে চান—প্রাণ লইতে চান, অর্থাৎ যোগ সাধনার দ্বারা অপরিশুদ্ধা আনন্দরূপিণী ডোম্বিকে পরিবর্তিত করিতে চান পরিশুদ্ধা সহজানন্দরূপিণী ডোম্বিতে।

অপর একটি পদে (১৪ সং) দেখিতে পাই, এই সহজানন্দরূপিণী নৈরাত্মা দেবীকে একটি মতঙ্গ-কন্যা রূপে খেয়ার পাটনী রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। গঙ্গা যমুনার দুই ধারার মাঝখানে এই সামরস্য-রূপিণী দেবী নৌকা লইয়া পারাপার করেন; এই গ্রাহ্য-গ্রাহকত্বের দুই ধারার ঢেউ প্রবল—মনে হয় এই দুইয়ের মাঝখানে যে পাটনী মেয়ে পারাপারারের সংযোগ ব্যবস্থা করিতেছে সে বুঝি ডুবিয়াই গেল—দ্বৈতাশ্রয়ী বিষয়ানন্দই বুঝি অদ্বৈত সহজানন্দকে ঢাকিয়া ফেলিল; কিন্তু সাধনায় যাহার অচল প্রতিষ্ঠা সে যোগীকে এই মতঙ্গ-কন্যা ঠিক পার করিয়া দেয়। পাঁচ দাঁড় হইল পঞ্চতথাগত-স্মরণ এবং পঞ্চসাধন ক্রমের অবলম্বন। আর আছে পিঠে 'কাছি' (দড়াদড়ি) বাঁধিয়া নৌকা টানিবার কথা; ভিতরের অর্থে দেহের মধ্যে প্রত্যেকটি চক্রে একটি প্রসিদ্ধ 'পীঠ'-এর কল্পনা করা হইয়াছে,—সেই চক্রে বা পীঠে যৌগিক 'বন্ধ' (দেহ-মন স্থির করিবার জন্য ও ঊর্ধ্বধারা লাভ করিবার জন্য এক প্রকারের যৌগিক প্রক্রিয়া) প্রয়োগ করিতে হইবে। নৌকার জল—অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি-মল—সেঁচিতে হইবে গগন-সেঁউতিতে—অর্থাৎ প্রজ্ঞা দ্বারা। সৃষ্টি-সংহারের তত্ত্ব চন্দ্র-সূর্য হইল নৌকার দুই চাকা—মধ্যে আছে মাস্তুল—অদ্বয়ের প্রতীক। এই পাটনী মেয়ে কড়ি-বুড়ি কিছুই লয় না—অর্থাৎ সহজ পথে দিতে হয় না কোনও কৃচ্ছ্রতার বা পাণ্ডিত্যের বহুমূল্য—স্বচ্ছন্দে যাওয়া যায় পার হইয়া।

অন্য একটি পদে বলা হইয়াছে, কাহ্নুপাদ তিন ভুবন অবলীলায় বাহিয়া আসিয়াছেন; কায়বাক্‌-চিত্তের তিন ভুবন অতিক্রান্ত হইলে আসে অদ্বয়-প্রতিষ্ঠা—তখনই আসে মহাসুখ-লীলায় মগ্নতা। এই মহাসুখে মগ্ন হইলেই লাভ হয় ইন্দ্রিয়াগোচরা সহজরূপিণী ডোম্বীর সঙ্গ। সেই ডোম্বীর সঙ্গ লাভ করিয়া সিদ্ধাচার্য বলিতেছেন,—

> কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।
> অন্তে কুলিণজণ মাঝেঁ কাবালী।
> তঁইলো ডোম্বী সঅল বিটালিউ।
> কাজ ণ কারণ সসহর টালিউ।
> কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।
> বিদুজণ লোঅ তোরে কণ্ঠ ন মেলই।
> কাহ্নে গাই তু কামচণ্ডালী।
> ডোম্বিত আগলি নাহি ছিণালী।

চঞ্চলা ডোম্বীর চালাকি কিছুই যায় না বোঝা, কুলীনজনের সে বাইরে—ভিতরে থাকে কাপালিকের। কুলীন কথাটি দুই অর্থে এখানে ব্যবহৃত। যাহারা পাণ্ডিত্যাভিমানী তাহারাও কুলীন, আর যাহারা 'কু'—অর্থাৎ দেহে লীন—অর্থাৎ দেহ-অবলম্বনে সাধনা করিতে গিয়া দেহকে যাহারা আর অতিক্রম করিতে পারে না—দেহেই প্রকারান্তরে বদ্ধ হইয়া পড়ে তাহারাই হইল 'কুলীন'। এই দুই প্রকারের কোনও 'কুলীন'ই পায় না সহজরূপিণীর সন্ধান; সন্ধান পায় 'কাপালি'ক—অর্থাৎ যে মহাসুখ-রূপ 'ক'-কে (কং মহাসুখং টীকা) পালন করিতে (ভিতরে ধারণ করিতে) জানে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই মহাসুখরূপিণী ডোম্বীর দুইটি রূপ আছে, সাংবৃতিক এবং পারমার্থিক—অপরিশুদ্ধা এবং পরিশুদ্ধা; অপরিশুদ্ধা রূপে যে দেখা দেয় সর্ববিধ ক্লেশবন্ধনের কারণ বিষয়ানন্দ-রূপে—তাহাই আবার পরিশুদ্ধা রূপে দেখা দেয় মহাসুখ-রূপিণী নৈরাত্মারূপে। তাই বলা হইয়াছে, যে এই অপরিশুদ্ধা সাংবৃতিকা ডোম্বীই সকল বিটালিত (নষ্ট) করে—সেই টালিত বা নষ্ট করে উষ্ণীষকমলে চন্দ্ররূপে অবস্থিত অমৃতময় বোধিচিত্তকে। এই মহাসুখের সাধনায় অনেকে করেন সংশয় প্রকাশ—এই-জাতীয় মহাসুখে মগ্ন হওয়াই পরমার্থ কি না; কিন্তু কাহ্নুপাদ বলিতেছেন,—এই-জাতীয় সংশয় হইল 'অবিদুজনে'র—যাহারা ভিতরের খবর সব জানে না তাহাদের; কিন্তু 'বিদুজন' কখনও এই ডোম্বীকে কণ্ঠ হইতে ত্যাগ করে না। যোগের দিক হইতে কণ্ঠ হইল সম্ভোগ-চক্র—সেইখানে সহজরূপিণীর সহিত সম্ভোগ। সিদ্ধাচার্য তাই বলিতেছেন,—রহস্যময়ী এই 'কামচণ্ডালী'র গতি—মনে হয় তাহা অপেক্ষা আর নাই কেহ অধিক চপলমতি।

পরের পদটিতে (১১নং) কাহ্নুপাদ রূপকচ্ছলে এই ডোম্বীকে বিবাহ করিতে চলিয়াছেন; সেই বিবাহের যাত্রার এবং অন্যান্য আয়োজনের এবং বিবাহান্তিক নব-মিলনের অবিচ্ছিন্নতা ও গাঢ়তার রহিয়াছে ঘনসংবদ্ধ বর্ণনা। অপর একটি পদে শবরপাদ এই 'সহজ-সুন্দরী'কে ময়ূরপুচ্ছ এবং গুঞ্জামালায় শোভিত উচ্চ পর্বতবাসিনী শবরী বালিকারূপে অপূর্ব কবিত্বে বর্ণনা করিয়াছেন। উচ্চ পর্বত এখানে দেহস্থ সর্বোচ্চ চক্র উষ্ণীষ-চক্র; ময়ূরপুচ্ছ এবং গুঞ্জামালায় তাহাকে বিচিত্র করিয়া তুলিবার কারণ—তাহার সাংবৃতিক-পারমার্থিক উভয়বিধ রূপের মধ্য দিয়া যে বিচিত্র রহস্যময়ীত্ব তাহারই একটা আভাস দেওয়া। এই রহস্যময়ী বালিকার পাগলা স্বামী (সাধক-চিত্ত) কি সব সময় তাহাকে চিনিতে পারে? নিজের দেহ-ঘরের 'ঘরিণী'কেই মানুষ চিনিতে পারে না—ইহাই হইল সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা!

স্মৃতিচিত্রণ

পরিমল গোস্বামী

প্রথম পর্ব

৪

দার্জিলিঙ দেখা দিল একটি রহস্য প্রশ্ন রূপে। হঠাৎ সব নতুন, সমতল মাটি নেই, দিগন্ত রেখা নেই, গ্রীষ্মের দাহ নেই, দৃশ্যের একঘেয়েমি নেই, সব অনিয়মিত, সব অস্থির। ঊর্ধ্বে মেঘ, পায়ের কাছে মেঘ, পায়ের নিচে মেঘ। আকাশে গাছ, পাশে গাছ, পায়ের নিচে গাছ। আকাশে মানুষ, পাশে মানুষ, পাতালে মানুষ। মনের যে কি অবস্থা তা বোঝানোর ভাষা নেই : শুধু একটি ভাবসমাহিত অবস্থা।

আজ আমি ভেবে অবাক হই এই অদ্ভুত উদ্দাম নিসর্গ শোভা কি ক'রে আমাকে এমন ভোলাল! কোন্ অদৃশ্য আকর্ষণে চলে এলাম এখানে? তখনকার দিনে অন্য কোনো দিকে পথ খোলা ছিল না, সে জন্যই হয় তো। আজকের দিনে বালক বয়সে এ রকম সুযোগ পেলে নির্ঘাৎ বন্দে।

দার্জিলিঙ মনের সমস্ত ধারণা ওলটপালট ক'রে দিল। অভ্যস্ত জিনিসের বা জানা জিনিসের বাইরেও যে সত্য আছে, সুন্দর আছে, তা মন সহজে বিশ্বাস করতে চায় না ব'লেই মন নতুনের কাছে অনেক সময় এমন পরাভূত হয়। মনের গোঁড়ামি ছাড়লেই মনের মুক্তি। তা স্বাস্থ্যকর কি ক্ষতিকর সে প্রশ্ন আলাদা।

কিন্তু আমি যে দার্জিলিঙে ব'সে স্বপ্ন দেখছি, এর কোনো দাম আছে কি না আমি জানি না। চোখ খুলে দিবাস্বপ্ন দেখছি। মেঘ এসে সব ঢেকে দিচ্ছে, আবার ঢাকনা খুলে গিয়ে সব রোদে ঝলমল ক'রে উঠছে। পরক্ষণেই হয় তো ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি হয়ে গেল সেকেণ্ড খানেক। মেঘ আমাদের আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে, কাছের মানুষ চেনা যায় না। মনে হচ্ছে পৃথিবী এখানে এসে ফুরিয়ে গেছে, পায়ের নিচে থেকে সব শূন্য। কিছু পরেই রবারে ঘষা পেন্সিলের ছবির মতো একটু একটু দেখা যাচ্ছে সব।

দার্জিলিঙের প্রথম প্রভাত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সোনা গলানো তরঙ্গায়িত রেখায় ফুটে ওঠা কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ দৃশ্যে। বিছানা থেকে মাথা তুলে সে দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একটা অদ্ভুত পবিত্র সে দৃশ্য! এই নতুন জায়গার কোথায় আরম্ভ কোথায় শেষ সব গোলমাল হয়ে গেল। কোন্ রূপকথার রাজ্যে এসেছি এবং এমন অপ্রস্তুত ভাবে! আমাকে কোনো অভিনবত্বের সন্ধানেই ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে না। যে-কোনো দিকে চোখ মেললেই অভিনবত্বের অক্লান্ত শোভাযাত্রা। কোথায়ও পুনরাবৃত্তি নেই, শুধু চোখ মেলে বসে থাকা।

সাত দিন ছিলাম দার্জিলিঙে। মনে পড়ে বার্লিংটন স্মিথের দোকান থেকে যত পারি কেবল ছবি কিনেছিলাম। ফোটো পোস্টকার্ড ও ফোটোর বই। একখানা বইতে বইয়ের আকারের চেয়ে বড় একখানা রঙীন ছবি ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘার। লম্বা প্যানোরামা, অদ্ভুত সুন্দর ছাপা, ভাঁজ খুলে দেখতে হত। ফোটো পোস্টকার্ডগুলো একরঙা ও রঙীন দু রকমই ছিল। পোষাকের অভাব কিছু মিটিয়ে নিয়েছিলাম হোয়াইটঅ্যাওয়ে লেডল'র দোকানে ঢুকে। সেখানকার কেনা একজোড়া দস্তানা আজও প'ড়ে আছে অব্যবহৃত অবস্থায়।

দার্জিলিঙে জলাপাহাড় রোডে একটু ঘুরেছিলাম। আর

একটা অদ্ভুত পবিত্র সে দৃশ্য

দেখেছিলাম বটানিক্যাল উদ্যান। ষ্টেশন থেকে ঠিক কত দূরে কোন্ এলাকায় ছিলাম এখন তা আর মনে পড়ে না। ঘুরে ঘুরে নানা লোকপ্রসিদ্ধ স্থান দেখার প্রবৃত্তি তখন ছিল না, ঘর থেকে খেয়ে বেরিয়ে কোনো একটা নির্জন পথের ধারে গিয়ে বসে থাকতাম। একটি বেলা কাটিয়ে দিতাম ব'সে ব'সে।

একই জায়গায় ব'সে অন্তহীন সৌন্দর্য রহস্যের স্বাদ আমি পেয়েছি সেই বালক বয়সেই। জীবনে কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল ব'লে মনে পড়ে না, কিন্তু যে প্রেরণা আমি সমস্ত অন্তরে অন্তরে বালককাল থেকে অনুভব করেছি সে হচ্ছে এই সৌন্দর্যভোগের প্রেরণা। ছেলেবেলা থেকেই আমি অনেকখানি কল্পজগতে বাস করতে অভ্যস্ত হয়েছি, সে আমার নিজের গড়া জগৎ, তা আজও সম্পূর্ণ ভেঙে যায়নি। সেই জগতের পরিব্রাজক আমি চিরদিন। আমার মনের গঠনটাই এই, চেষ্টা ক'রে হয় তো কিছু বদলানো যায়, কিন্তু মূলতঃ কোনো বদল হয় না।

দার্জিলিঙকে কেন এত ভাল লাগল তা যত ভাবেই ব্যাখ্যা করি, তাকে ঠিক ব্যাখ্যা বলা যায় না। আমি নিজে যা জানি না তার ব্যাখ্যা করব কি ক'রে? দার্জিলিঙের ছোট গাড়ি, তার অদ্ভুত পথ, তার আদিম অরণ্যখচিত দেহ, তার ফাটলে ফাটলে অন্তঃসলিলা স্নেহধারার প্রকাশ, তার নতুন মানুষ, নতুন ভাষা, নতুন ঘরবাড়ি, তার চিরতুষারমৌলি দীর্ঘপর্বতশ্রেণী, তার মেঘস্পর্শী উচ্চতা, তার অকালশৈত্য, তার অস্থির শোভা, তার বিরামহীন রূপান্তর —সব মিলে একটা সুখস্বপ্নানুভূতি মাত্র। গাড়িতে উপরে ওঠার সময় থেকে আরম্ভ ক'রে পলকহীন চোখে শুধু একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি মনে মনে—কি দেখছি, এ কি স্বপ্ন না সত্য? মাঝে মাঝে গাড়ি থেকে নেমে পাথর, মাটি, পাহাড়-বেয়ে-চুঁইয়ে-পড়া জল, স্পর্শ ক'রে ক'রে প্রশ্ন করেছি নিজের মনকে—এ কি স্বপ্ন না সত্য? পথের ধারে ব'সে সমস্ত দেহ দিয়ে স্পর্শ করতে চেয়েছি হিমালয়ের জমি। মাটিতে অর্ধশায়িত অবস্থায় দু হাতে ঘাস মাটি পাথর চেপে ধ'রে শুধু অনুভব করতে চেষ্টা করেছি, এ কি জিনিস। খাওয়া ভুলে গিয়েছি। সঙ্গীকে ছেড়ে দিয়ে আমি একা ব'সে থেকেছি পাহাড়ের ধারে। কখনো ফেরিওয়ালার কাছ থেকে দু'চার আনার কেক কিনে খেয়ে বিকেল পর্যন্ত একই জায়গায় বসে কাটিয়েছি, তবু তৃপ্তি হয়নি, তবু সেই চলমান রূপের কাছে আমি অবসন্ন এবং পরাজিত।

দার্জিলিঙের ক'টি দিনের একটি ভাষাহীন উপলব্ধি নিয়ে নিচে নেমে এলাম। পুলিসের আর এক জন অফিসার আমাদের সঙ্গে এলেন শিলিগুড়ি অবধি। সেখানে এসে তিনি আমাদের টিকিট কিনে দিয়ে চলে গেলেন। শেষে মনে হয়েছে এ শুধু আমাদের প্রতি মমত্ব বশতই নয়, এর পিছনে ব্রিটিশ রাজের নিরাপত্তার প্রশ্নও ছিল।

একই সঙ্গে সাবলাইম আর রিডিকিউলাস, পর্বত এবং মূষিক; সর্বত্র এই বৈষম্য, এড়াবার উপায় নেই।

ষ্টেশনে এসে একখানা ইংলিশম্যান কিনলাম ষ্টল থেকে। সেই কাগজে সেই ষ্টেশনে ব'সে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যু সংবাদ প'ড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই ঘটনাটা আমার বিশেষ ক'রে মনে আছে, তার কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে একটি রোম্যান্টিক ভাব ছিলই, তদুপরি নতুন ক'রে জেগেছিল ভারতবর্ষ কাগজ সম্পর্কে। তখনও কাগজ প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু কি আকুল আগ্রহে তার অপেক্ষা করছিলাম। এ সময় সম্পাদকের মৃত্যু সংবাদটা ভীষণ ভাবে অপ্রত্যাশিত ছিল।

দার্জিলিঙ থেকে ফিরে এসে কিছুদিনের মধ্যে আবার ম্যালেরিয়া জ্বরে কাতর হয়ে পড়ি। জ্বর আর কিছুতে ছাড়ে না। পিলে হাতে লাগে এমন অবস্থা। জ্বর ১০০ ডিগ্রী (ফারেনহাইট) প্রায় বাঁধা। কিন্তু এই অসুখটি ক্রমে এমনই ধাতসওয়া হয়ে উঠছে যে জ্বর নিয়েই বেশ চলা ফেরা করছি, অভিভাবকীয় শাসনও শিথিল। শেষ কালে নিজেরই উপর বিরক্ত হয়ে চলে এলাম কলকাতায় এবং জ্যেঠতুত ভাই নলিনীরঞ্জনের পরামর্শ অনুযায়ী লেফটেনান্ট কর্ণেল রসিকলাল দত্তের কাছে গেলাম এক অপরাহ্নে। চৌরঙ্গী থেকে বেরিয়েছে এমন একটা পথ, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কি সদর ষ্ট্রীট, মনে নেই আজ, কিন্তু আর সবই মনে আছে। তিনি তখন আর, এল, দত্ত নামে প্রসিদ্ধ। ক্ষীণদেহ, সাহেবী পোষাক পরা ডাক্তার। আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করলেন। কাঠের খাটো ষ্টেথস্কোপ ব্যবহার করেছিলেন বুক পরীক্ষায়। ফী দিয়েছিলাম আট টাকা। তাঁর ব্যবস্থা সবই মনে আছে। প্রেসক্রিপশনও মুখস্থ আছে অনেক দিনের ব্যবহারে। সেটি এইভাবে লেখা ছিল—

Re.

(i) Arsenoferratose
one teaspoonful to be
taken twice after meals.

(ii) Ferri et quini. citras
one tablet thrice daily.

(iii) Casagra
two teaspoonfuls at
bedtime.

তিনটাই পেটেন্ট ওষুধ, কিনতে গেলাম স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীটের দোকানে ধর্মতলা ষ্ট্রীটে। এক ঘণ্টা আন্দাজ ব'সে রইলাম, তারপর পেলাম ওষুধ। দেরির কারণ, প্রত্যেকটি শিশির মূল লেবেল তুলে তাতে দোকানের লেবেল লাগিয়ে তার উপর ডাক্তারের নির্দেশ পরিষ্কার হাতে লিখে দেওয়া হয়েছে। স্ক্রিপ্ট টাইপে "দি প্রেসক্রিপশন" স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট ইত্যাদি ছাপা একখানি মোটা খামে প্রেসক্রিপশনখানি ফেরৎ পেলাম। ওষুধের নাম যে আজও মনে আছে তার কারণ ওষুধ বিষয়ে খুব ছেলেবেলা থেকে আমার একটি দুর্দমনীয় আকর্ষণ ছিল। বাল্যকালে ওষুধ নিয়ে যেসব এক্সপেরিমেন্ট করেছি তা শুনলে ভেষজজগৎ স্তম্ভিত হবে, অতএব তা আর বলব না, তবে এই আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত আমাকে অনেক দূর টেনে নিয়ে গিয়েছিল এবং এককালে ডাক্তারী পরীক্ষার্থীরা আমার কাছে ডোজ জিজ্ঞাসা ক'রে স্মৃতি ঝালাই ক'রে নিত। সে সব কথা ভবিষ্যতের জন্য রইল।

আর, এল, দত্তের শুধু ওষুধ ব্যবস্থা নয়, হাওয়া-বদল ও পথ্য বিষয়েও ব্যবস্থা ছিল। বলেছিলেন স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকতে হবে; সকালে পথ্য দুধ বার্লি, দুপুরে ভাত, বিকেলে দুধ বার্লি, রাত্রে রুটি বা লুচি। সকালে এবং বিকেলে বেড়াতে হবে নিয়মিত।

বন্ধু প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় (পূর্বে উল্লেখিত) থাকত সাহেবগঞ্জে, সেখানে যাওয়াই ঠিক করলাম। ই-আই-আর গাড়িতে এই প্রথম চড়া। এবং এই প্রথম অনুভব করলাম এ গাড়ি আমাদের ই-বি-এস আর-এর গাড়ি থেকে অনেক আরামপ্রদ, এতে ঝাঁকুনি অনেক কম, যেন দুধারে একটু হেলে দুলে চলে। নতুন জায়গায় যাওয়ার উত্তেজনায় রাত্রে ঘুমনো সম্ভব ছিল না। প্রায় ফাঁকা গাড়ির সুপ্ত নির্জনতার মধ্যে আমি একা জেগে বসে আছি কাচের জানালায় নাক লাগিয়ে। শীতকালের মধ্যরাত্রি। বাংলার সীমা ছাড়াতে দেরি আছে তখনও, বীরভূমের আকাশে অস্পষ্ট তালবনের সিলুয়েট দেখতে দেখতে চলেছি। মাঝে মাঝে ট্রেনের শব্দ প্রখর এবং গাঢ় হয়ে উঠছে, তাকিয়ে দেখি গাড়ি দুই উঁচু জমির প্রাচীর ভেদ ক'রে চলেছে। ক্রমে শক্ত মাটির, পাথরে মাটির, উপরে চলতে চাকার সঙ্গে রেলের একটা মধুর ঠং ঠং আওয়াজ হচ্ছে। এদিকে রেল পাতা হয়েছে সমতল জমির উপরে, সেও আমার কাছে নতুন। পূর্ববঙ্গের সব জায়গায় সমস্ত রেল উঁচু পথের উপরে পাতা।

একটি রাত্রির অবসানে আবার চোখে সব নতুন। নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষ, নতুন ভাষা। এই ছবিটিও আমার সহজ-মুদ্রণগ্রাহী বালক মনে চিরচিহ্নিত হয়ে আছে। একটা অহেতুক আনন্দের স্মৃতি সকল সত্তাকে জড়িয়ে ধরে, কোনো দিন আর তাকে ছাড়ানো যায় না।

আমার চোখে তখন পাহাড় পর্বত মাত্রেই অতি সম্ভ্রমের বস্তু। সম্ভবত এই জন্যই সাহেবগঞ্জ আমার চোখে খুব ভাল লাগল, কারণ এখানেও যতদূর চাই, পাহাড়শ্রেণী পূব-পশ্চিমে সীমাহীন বিস্তৃত। এবং সে পাহাড়ও কুয়াসায় কিছু ঢাকা, কিছু খোলা। তাতে ঘননীল ঘন সবুজ, আর ঘন বেগুনীর মিশ্রণ। পাহাড়ের কোলে সমতল বহু-প্রশস্ত মাঠ সবুজ ঘাসে ঢাকা, তার বুকে আঁকা-বাঁকা চলার পথ। সে সব পথ দূর পাহাড়ে মিলিয়ে গেছে। শুনলাম সাঁওতালরা আসে ঐ সব পাহাড় পার হয়ে, সেখানে তাদের বাড়ি আছে পাহাড়ের তলে তলে। সাঁওতালও এই প্রথম দেখলাম, দার্জিলিঙের ভুটিয়া লেপচার কালো সংস্করণ। সুতরাং এ-ও অভিনব। দার্জিলিঙের পরেই হঠাৎ সমতল বাংলার জমিতে এসে শেষ অবধি দার্জিলিঙকে একটি স্বপ্ন বলেই মনে হয়েছিল। একটি স্পর্শযোগ্য বস্তু যেন ছুঁতে না ছুঁতে হাতছাড়া হয়ে গেল। সাহেবগঞ্জের পাহাড় দেখে সে দুঃখ কিছু ভুলতে পেরেছিলাম। যেন এ একটা কত বড় আশ্রয়। আজন্ম সমতলে বাস ক'রে হিমালয়ের মতো এমন মহিমময় বিরাটত্বের উপলব্ধি চট ক'রে হয় না। মনে তার ছাপ মাত্র পড়েছিল একটা সুখস্বপ্নের মতো। দেখার আগে ছিল স্বপ্ন, দেখার পরেও তা স্বপ্ন হয়েই রইল। চেতনায় তা সত্য হয়ে উঠতে অনেক দেরি হল। মনের মধ্যে তাকে একটু একটু ক'রে গড়তে লাগলাম। সাহেবগঞ্জের পাহাড় একটা ধাপের কাজ করল মধ্যপথে এসে। তাই সাহেবগঞ্জ ভাল লাগল।

বাসস্থান ঠিক হল স্কুলের বোর্ডিং-হাউস। এই বোর্ডিং-হাউস সম্পর্কে আমার কোনো আনন্দের স্মৃতি নেই। খাওয়া-দাওয়া এবং পরিবেশ ভাল লাগেনি। কিন্তু আমার মধ্যেকার সেই অসুখী বালকটি নীরবে সব মেনে নিল সাহেবগঞ্জে পাহাড় ছিল ব'লে।

দুধ বার্লি ও প্রাতর্ভ্রমণ ছিল ব্যবস্থা, কিন্তু বার্লি বাদ দিয়ে চলতে হল। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব একটি যুক্তি ছিল, এবং জ্বরে খাওয়া বিষয়ে কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও জন্মেছিল, আগে বলেছি। সে হচ্ছে জ্বর সত্ত্বেও খাওয়ায় রুচি থাকলে খাওয়ায় ক্ষতি হয় না, কিংবা কি ক্ষতি হয় তা আমার অজ্ঞাত। অতএব প্রবোধের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একটা ব্যবস্থা করা গেল এই যে সকালে উঠে তার সঙ্গে আমি আধ মাইল দূরে গোয়ালাপাড়ায় যাব এবং সেখানে গিয়ে শুধু দুধ খেয়ে ফিরে আসব। একসঙ্গে পথ্য এবং প্রাতর্ভ্রমণ।

কিন্তু এ ব্যবস্থা চার পাঁচ দিন পরে আর ভাল লাগল না। নিয়মিত বিধিপালন আমার দ্বারা সম্ভব ছিল না। কাছাকাছি খাবারের দোকান ছিল, সেখানে বেলা প্রায় ৮টায় গরম দুধ পাওয়া যেত। কিন্তু সকালে উঠে না খেয়ে বেলা ৮টা বাজতে দেওয়া আমার পছন্দ হল না। আমি সাড়ে সাতটার মধ্যে দোকানে চলে আসতাম। দুধ তখন মিলত না, গত দিনের রাবড়ি (মালাই) মিলত। দুধ বার্লি থেকে আগেই বার্লি বাদ গিয়েছিল, এবারে দুধও বাদ গেল, রইল শুধু সর। দুধের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেই হল। কিন্তু কয়েক দিন পরে এটিও একঘেয়ে লাগাতে রসগোল্লা, সন্দেশ, পান্তুয়া অথবা পেঁড়া। ভেবে দেখলাম দুধ বাদ দিয়ে এর একটিও গড়া যায় না, অতএব আমার বিবেক বেশ সুখে দিন কাটাতে লাগল। সাহেবগঞ্জে প্রবোধের বন্ধু হিসেবে কয়েকজন বাঙালী ছাত্রের সঙ্গে তখন পরিচয় ঘটেছিল, তার মধ্যে সুধাংশুশেখর মজুমদারকে সবচেয়ে বেশি মনে আছে। তিনি বটুদা নামে খ্যাত, তখন সম্ভবত কলেজে প্রথম ঢুকেছেন। এখন তিনি সমাজসেবী সন্ন্যাসী মানুষ। তিনি প্রবোধেরও বটুদা, তাই সবার শ্রদ্ধেয় ছিলেন, কারণ প্রবোধ নিজেও অনেক শিষ্য-পরিবৃত ছিল, সে-ও ছিল তাদের প্রবোধ দা। সাহেবগঞ্জে পরে অনেকবার গিয়েছি এবং পরে অনেকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি।

শীতকাল, মনে আছে। ১৯১৪ সালের জানুয়ারি মাস। বোর্ডিং-হাউস থেকে আমার চলে আসবার সময় মনিহারীঘাট থেকে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় মাইনর পাস ক'রে সাহেবগঞ্জে এসে ভর্তি হল, এবং ঐ বোর্ডিং-হাউসে এসে উঠল। হয় তো এক দিনের পরিচয় ঘটেছিল সে সময়। বলাইচাঁদের কবিতার খাতার নাম ছিল 'বনফুল'। সে সেই খাতার নাম নিজে গ্রহণ ক'রে খাতা ছেড়ে তখনই প্রকাশ্যে বেরিয়েছে কি না, মনে নেই। তখন আমরা কেউ জানি না পরবর্তী জীবনে আমরা পরস্পর এত কাছে এসে পড়ব।

ষ্টীমার যে-কোনো মুহূর্তে তলিয়ে যাবে

সাহেবগঞ্জে এক মাস ছিলাম, কিন্তু কোনো পরিবর্তন হল না স্বাস্থ্যের। জ্বর লেগেই রইল। তখন (সম্ভবত জীবনে এই দ্বিতীয় বার) নিজের পরিণাম চিন্তা করতে লাগলাম। বন্ধুদের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান হত নিয়মিত। বেশ মনে আছে ফণী (সম্ভবত তখন কুষ্টিয়াতে) লিখেছিল, তার ভাবার্থ, দার্জিলিঙের মতো স্বাস্থ্যকর স্থানে থেকে এসেও এত ভুগছ ? চিঠি লেখা তখন ইংরেজীতেই চলত।

সাহেবগঞ্জে আর থাকা সম্ভব নয়, ক্লাস-নাইনে ষাণ্মাসিক পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে সোজা দার্জিলিঙ গিয়েছি, এবং তারপর ১৯১৪ সালের জানুয়ারি এসে গেছে, এখনও বাইরে বাইরে কাটাচ্ছি। তাই এবারে মন খারাপ হয়ে গেল। এবারে সীরিয়াস। ফেরবার পথে কলকাতা থেকে নতুন ক'রে ওষুধ কিনলাম এবং ঐ সঙ্গে একটি 'প্রাইমাস-১০০', স্পিরিট, ও একটিন বিস্কিট বার্লি কিনে নিয়ে রতনদিয়াতে এলাম। ঠিক করলাম এইখানে কিছুদিন থেকে শুধু সকালের দুধবার্লিটি নিজ হাতে তৈরি ক'রে নেব, এবং অন্যান্য নিয়ম সবই পালন করব। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, অল্প দিনের মধ্যেই জ্বর ছেড়ে গেল এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠলাম। হয় তো বা এর পিছনে এতদিনের হাওয়া-বদল কিছু কাজ করেছে। এ সবের ঠিক ব্যাখ্যা কি, তা হয়তো কারোই জানা নেই, দেহ বড়ই খামখেয়ালি।

যাত্রা করলাম সাতবেড়ের উদ্দেশে। সঙ্গে ছিল হরেন্দ্রকুমার।

গোয়ালন্দ ঘাট থেকে ষ্টীমারে যাত্রা, হরেন্দ্রের আত্মীয়-বাড়ি ছিল সাতবেড়েতে। আমরা বেলা সাড়ে দশটা-এগারোটা আন্দাজ সময়ে ওয়ান আপ প্যাসেঞ্জারে গোয়ালন্দে এসে পৌছলাম। ষ্টীমার যে কখন ছাড়বে তার স্থিরতা নেই, শুনলাম শেষ রাত্রে ছাড়বে। সমস্ত দিন কি করা যায় ভাবছিলাম, এমন সময় হরেন্দ্র বলল, রান্না ক'রে সময় কাটানো যাক। বাজার থেকে মাটির হাঁড়ি, চাল, ডাল, মশলা প্রভৃতি কিনে ষ্টোভে রান্না হ'ল পদ্মার ধারে। হাওয়াতে কিছু অসুবিধে হয়েছিল, কিন্তু দমিনি। সন্ধ্যায় গিয়ে উঠলাম ষ্টীমারে এবং একটি গরম জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে রইলাম, যখন ইচ্ছে ছাড়ুক আর ভয় নেই। সকালে ব'সে ব'সে অ্যাব্রাহাম লিংকন বইখানা ষ্টীমারে পড়েছিলাম যতটা সম্ভব।

এই বছরেই গ্রীষ্মের ছুটিতে রতনদিয়াতে যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রফুল্লর সঙ্গে পরিচয় হয়। সে কাশীতে ম্যাট্রিকুলেশন পড়ত, অর্থাৎ আমার সমান সমান। সে আকর্ষক চরিত্র ছিল। তখনকার দিনের তরুণ সন্ত্রাসবাদীদের চালচলনে যেসব রহস্য এবং চরিত্রে যেসব গুণ থাকা দরকার, তা তার ছিল। ভাল স্বাস্থ্য, খেলাধূলোয় অত্যন্ত ক্ষিপ্র এবং পটু, সাঁতারের সকল কৌশল জানে, গাছের ডালে ডালে বেড়াতে পারে, দৌড়ে ওস্তাদ, পড়াশোনায় খুব গভীর এবং দুষ্টুমি বুদ্ধিতে মনোহর। আবরণ ভেদ করলে আদর্শবাদীকে দেখা যায়। পুলিসের সাসপেক্ট হয়েছে তখন থেকেই। তার দৈনন্দিন ডায়ারি লেখা হচ্ছে পাংশা থানায়। (এর পরে তার সঙ্গে সর্বদা পুলিস থাকত) রতনদিয়া পাংশা থানার অধীন।

প্রফুল্ল বর্তমানে ঝাঁসি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠানের বা অন্যান্য বিভাগের নেতৃত্ব কাজের ভিতর দিয়ে সে সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। একবার সে স্পোর্টে কলকাতায় আগত ঝাঁসি ইলেভেনের নেতৃত্ব করেছিল।

প্রফুল্ল গ্রামে একটি নতুন হাওয়া বইয়ে দিল। সে এলে প্রবোধ প্রতিষ্ঠিত স্পোর্টিং ক্লাব খুব উৎসাহিত হয়ে উঠত এবং রতনদিয়ার তরুণদের মধ্যে আধুনিক যুগের যা কিছু রোম্যান্টিক উদ্দীপনা এবং একটা নবজাগরণের রোমাঞ্চ তা স্পষ্ট জেগে উঠত। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, স্পোর্ট, হাতে-লেখা কাগজ বের করা এবং আধুনিক জগতের নানা বিষয়ের আলোচনায় সবার মধ্যে বেশ একটা সাড়া প'ড়ে যেত ; বাইরে থেকে সবাই নিজ নিজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঔজ্জ্বল্য বহন ক'রে এসে মিলত দীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটির মধ্যে। পুরো দেড় মাস ধ'রে সে কি উন্মাদনা। প্রফুল্লর কাছে ন্যাচুরাল ফিলসফি নামক মোটা এক সুচিত্রিত একখানা পদার্থবিদ্যার বই দেখি, এবং তা থেকে ইলেকট্রিসিটি ম্যাগনেটিজম প্রভৃতি বিষয়ে আরও একটু কৌতূহল চরিতার্থতার সুযোগ পাই।

সাঁতারের কিছু কৌশল শিখলাম প্রফুল্লর কাছ থেকেই। জলে দেহ সম্পূর্ণ শিথিল ক'রে, দুখানা হাত টান ক'রে সোজা উত্তর মেরু দিকে ফিরিয়ে চিৎ হয়ে যতক্ষণ ইচ্ছে জলে ভেসে থাকাও শিখলাম। চন্দনা নদীর বদ্ধ জলে নতুন জল পদ্মা থেকে আসে আষাঢ়ের মাঝামাঝি। তার আগে নদী প্রায় শুকনো, স্রোতহীন, অনেক সময় শ্যাওলায় ভরা। গ্রীষ্মের সূর্যে জল গরম হয়ে উঠত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে আমাদের সাঁতার খেলা চলত দু'তিন ঘণ্টা। বর্ষায় চন্দনার আর এক রূপ। তখন সে খরস্রোতা, তার জল বর্ষার পদ্মারই মতো গেরুয়া রঙের। নিতান্তই ঘরোয়া পোষা নদীটি, বছরে একবার জীবন্ত হয়ে ওঠে, তখন সে সবার আদরে আদরে অস্থির। বর্ষায় একবার স্রোতের মুখে একমাইল অবধি গিয়েছিলাম। মাথায় অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়েছিল, তারপর থেকে দীর্ঘ সাঁতারের আর চেষ্টা করিনি। রতনদিয়া থেকে পদ্মানদী তখন দেড় মাইল দূরে। আমরা অনেক সময় বেড়াতে যেতাম সে দিকে। আবার সেই পাড়ে পাড়ে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ। এমনি ভাবেই এক একটা দেশের সঙ্গে পরিচয়। তার প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক গড়ে ওঠে এমনি ক'রে। তখন বোঝা যায় না, কিন্তু ছেড়ে এলে বোঝা যায় সে শুধু ছেড়ে আসা নয়, ছিঁড়ে আসা।

নানা বিষয়ে জানবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল স্কুল-জীবনে। ক্লাস-নাইনে পড়তে ডাকে সাহেবী দোকান থেকে বই আনিয়ে পড়তাম। সম্ভবত ম্যাকমিলান কম্পানি থেকে অ্যাচীভমেণ্টস ইনি কেমিক্যাল সায়েন্স ও দি ওয়াণ্ডার্স অফ ফিজিক্যাল সায়েন্স এ দুখানি বই আনিয়েছিলাম ভি, পি'তে। ষ্টুডেণ্ট নামক একখানি ইংরেজী মাসিকপত্র বেরোয়। ১৯১৩ কি ১৪ মনে পড়ছে না। প্রথমে এক সংখ্যা নমুনা চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। আমার যতদূর স্মরণ হয় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই কাগজের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, এবং তিনিই চিঠি লিখেছিলেন। 'পীপস অ্যাট মেনি ল্যাণ্ডস' পর্য্যায়ের কয়েকখানা বই পড়েছিলাম এ সময়ে। এই সময়েই একবার রাজবাড়ি ষ্টেশনে হকারের কাছ থেকে একখানা বই (দাম দু পয়সা বা চার পয়সা) কিনি, বইখানার নাম "দি ওয়াণ্ডারফুল হাউস উই লিভ ইন"। দেহের পরিচয়, পাতায় পাতায় ছবির সাহায্যে কঙ্কাল স্নায়ু রক্ত চলাচল প্রভৃতি দেহের সর্বাঙ্গীন পরিচয় গল্পের ভঙ্গিতে লেখা। মিশনারি বই। এই বইখানা আমাকে মুগ্ধ করল।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল ১৯১৪ সালের অগষ্ট মাসের গোড়ায়—সারাইয়েভো-হত্যাকাণ্ডের কিছু পরেই। সেখানে আর্চডিউক ফার্ডিনাণ্ড নিহত হলেন সস্ত্রীক। অষ্ট্রীয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করল, জার্মানি করল রাশিয়ার বিরুদ্ধে এবং তার পরেই বৃটেন করল জার্মানির বিরুদ্ধে। তারপর আরও অনেকে এলো।

এ যুদ্ধে ভারতবর্ষের জনসাধারণের কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। তারা ব'সে ব'সে কেবল গুজব রটাত। যারা কাজের লোক তারা অবশ্য নীরব তৎপরতায় এই উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছিল। তারপর ১৯১৬ সালে যখন বাঙালী তরুণদের ডাক পড়ল যুদ্ধক্ষেত্রে, তখন বাঙালী জাতির যেন আরও একটা জাগরণের যুগ এলো। প্রথম বাঙালী দল ফরাসী চন্দননগর থেকে গেল যুদ্ধে, তারপর বৃটিশ বাংলার ডাবল কম্পানি, ফার্টিনাইনথ রেজিমেণ্ট। গ্রামে গ্রামে রিক্রুটমেণ্টের উৎসাহ, যুদ্ধের চাঁদার উত্তেজনা।

রতনদিয়ার কুমুদপ্রসন্ন রায়, পুলিসে চাকরি করত, কিন্তু এক মারামারি কেস-এ প'ড়ে অল্পমেয়াদি জেল হয়েছিল। জেল থেকে মুক্তি পাবার পরই সে চারুপ্রসন্ন রায় হয়ে যোগ দিল বেঙ্গলী রেজিমেণ্টে। ল্যান্সনায়েক বেশে তাকে দেখেছি অনেক বার। রাজবাড়ির সাব ডিভিশন্যাল অফিসার অ্যালফ্রেড বোস যুদ্ধোদ্যমে ভীষণ উৎসাহী ছিলেন, তিনি মাঝে মাঝে রতনদিয়াতে আসতেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন।

টেষ্ট পরীক্ষা দিয়ে পড়ায় মনোযোগী হলাম। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে পরীক্ষায় বসলাম পাবনা শহরে। আমাদের সময়ে ইংরেজী বা বাংলা কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্য ছিল না। নির্দিষ্ট বই ছিল সংস্কৃত। ক্ল্যাস-নাইন ও টেন-এ ইংরেজী পড়েছি লালবিহারী দের ফোকটেলস অফ বেঙ্গল, লেজেণ্ডস অব গ্রীস অ্যাণ্ড রোম, লাহিড়ি'স সিলেক্ট পোয়েমস। অতিরিক্ত নিয়েছিলাম সংস্কৃত ও ভূগোল। অঙ্ক জলের মতো সোজা।

জুলাই মাসে এলাম রাজসাহী কলেজে ভর্তি হতে, যোগেশ-চন্দ্রের সঙ্গে। নাটোর থেকে মোটরে যেতে হল। রাজসাহীর কিশোরীমোহন চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। সেটি তাঁর শিষ্যালয়। অতএব ওখানে থাকার ব্যবস্থা হল। ইচ্ছে ছিল বিজ্ঞান পড়ব, কিন্তু অঙ্কে পিছিয়ে আছি, তাই আই-এতে একটি অন্তত বিজ্ঞানের বিষয় নেওয়া যায় কি না চেষ্টা করলাম। কর্তৃপক্ষ বললেন, আই, এসসি ভর্তি শেষ হওয়ার পর যদি জায়গা থাকে তা হলে কেমিষ্ট্রিতে আমার নাম দিয়ে দেবেন, কিন্তু তার আগে ইতিহাস নিয়ে আই-এতে ভর্তি হতে হবে· তাই হয়েছিলাম। কিন্তু এক মাস পড়ার পর জানা গেল জায়গা খালি নেই।

আমার রাজসাহীতে থাকা হল না। এখানে সাগরপাড়ার একটি বাড়িতে আরও কয়েক জন ছাত্রের সঙ্গে থাকতাম। সকালে গোয়ালাদের ছেলেরা মাখন ফেরি ক'রে বিক্রি করত। ঘরে তৈরি, বলের মতো গড়া, চার পয়সায় একটি বল, ওজন অন্তত এক ছটাক হবে। ভোরে সবাই মিলে ঐ মাখন খেতাম চিনি দিয়ে। খাবার সর্বত্র খুব শস্তা। এ রকম পরিবেশে প্রবাসের দুঃখ কোথায়? আমরা কয়েক জন স্নান করতাম এসে পদ্মা নদীতে। একটু দূর হওয়া সত্ত্বেও ভাল লাগত। বর্ষাকাল তখন, ভীষণ স্রোত। সাঁতার কাটতে গিয়ে একদিন প্রবল স্রোতে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে লড়াই করা অসম্ভব ছিল। তখন বুদ্ধি ক'রে স্রোতের সঙ্গেই ভেসে তীরের দিকে একটু একটু ক'রে এগিয়ে সিকি মাইল দূরে গিয়ে উঠেছিলাম। উঠে ভীষণ কেঁপেছিলাম, মনে আছে।

রাজসাহী থাকা হল না, কিন্তু ফেরবার সময় একটি বড় জিনিষের স্মৃতি বহন ক'রে আনলাম সঙ্গে। সে হচ্ছে কিশোরীমোহন চৌধুরীর স্মৃতি। তাঁর সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। শুনেছিলাম তিনি ছাত্রদের অনেক সাহায্য করেন এবং তাদের জন্য অনেক দেনাগ্রস্তও হয়েছেন। দানের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো হিসেব নেই। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্র তাঁর বাড়িতে আশ্রিত। একটা লম্বা ঘরে দু' সারিতে বসে ছাত্ররা খাচ্ছেন, তিনিও খেতেন প্রায় ঐ সময়। দু'সারের মাথায় একটু দূরে বসতেন। আমি বসতাম তাঁর বাঁ পাশে। ঠাকুর পরিবেশন করছে—খাওয়া কিছু এগিয়েছে—ঠাকুর পুনরায় কিছু মাছ বা মাছের ডিম দিতে এলো কিশোরীমোহনের পাতে, তিনি হাত তুলে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন—না না, আমাকে আর নয়, ওদের দাও, ওদের দাও। ছাত্রদের দিকে দেখিয়ে দিলেন। ঠাকুর এটি জানত। তবু বেশি থাকলে জিজ্ঞাসা করতে বাধা কি, এই রকম ভাব। একদিন আমের টুকরো দিতে এলেও ঠিক ঐ ভাবেই, নিজে এক টুকরো অতিরিক্ত খেতে অস্বীকার করলেন। চোখে না দেখলে এমন একটি দুর্লভ জিনিষ আমার অজানা থেকে যেত। ধনীর দান বা চ্যারিটি-সম্পর্কে আমার যে ধারণা তার সঙ্গে এর আদৌ মিল ছিল না। এ ঘটনা আমাকে খুব বিচলিত করেছিল, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম। শুভ্রকেশ কিশোরীমোহনের ছবিটি শুভ্রতুষার-মণ্ডিত হিমালয়ের ছবিটিকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল সেদিন।

এইখানে থাকতে আর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। সে অভিজ্ঞতা সেই প্রথম এবং সেই শেষ। একটি স্বপ্ন-অভিজ্ঞতা। তখন ইউরোপে পুরোদমে যুদ্ধ চলছে, তার গোলা বারুদের আক্রমণ সম্পর্কিত

"আজ্ঞে, শালী ভিন্ন আমার কোনো বন্ধু নেই।"

ছবি এদেশে খুব প্রচার হচ্ছিল, অতএব গোলার বিস্ফোরণ এবং তার ফলে চার দিকের অবস্থা মনে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। স্বপ্নে সমস্ত আকাশব্যাপী সেই যুদ্ধ দেখতে লাগলাম। হাজার হাজার সূর্যের মতো এক একটা বিস্ফোরণ, ধোঁয়ায় অন্ধকার, তারই ফাঁকে ফাঁকে বহু কালীমূর্তি, যেমন মূর্তি দেখতে আমরা অভ্যস্ত। আকাশব্যাপী বিরাট এক আলোড়ন, বিভীষিকপূর্ণ, ভয়াবহ। চাইলে চোখ ঝলসে যায়।

কিন্তু এ রকম স্বপ্ন দেখা বা গোলা ফাটার সঙ্গে বহু কালীমূর্তির ছবি দেখাকে আমি গুরুতর কিছুই মনে করিনি, স্বপ্নে অসম্ভব সব জিনিস একসঙ্গে এসে মেলে, আমি চাই বা না চাই। এ স্বপ্নের বৈশিষ্ট্য অন্য। আমি প্রথম স্বপ্ন দেখে অত্যন্ত ভয় পেয়ে জেগে উঠি এবং অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারিনি। তার পর কখন ঘুমিয়ে প'ড়ে আবার ঐ একই স্বপ্নের ধারাবাহিক রূপ দেখতে থাকি এবং আবার জেগে উঠি। তার পর ঘুমিয়েও ঐ একই স্বপ্ন দেখি বাকী রাতটুকু। স্বপ্নের এই ক্লাসিকপত্র-সুলভ ক্রমশ-প্রকাশ্য রূপ এক রাত্রে আদৌ সম্ভব কি না জানা ছিল না, আর কেউ হয় তো এরকম অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে থাকবেন, আমার আর হয়নি। ফ্রয়েডশিষ্যরা নিশ্চয় বলতে পারবেন কিস্তিবন্দী স্বপ্ন সম্ভব কি না।

অগষ্টের মাঝামাঝি পাবনা এলাম ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে। এখানে অভীষ্ট সিদ্ধ হল, কেমিষ্ট্রি পেলাম লজিক-সংস্কৃতের সঙ্গে। কয়েক মাসের জন্য স্থানীয় উকিল কালীচরণ সেনের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হল, ইনি বাবার বন্ধু। হষ্টেলে গিয়েছিলাম পুজোর ছুটির পর।

পাবনা শহরটিকে খুব ভাল লাগল। পরিচ্ছন্ন ছোট্ট শহর। এইখানে এসে আমার চিঠির সংখ্যা বেশ বেড়ে গেল। প্রতি ডাকে পাঁচ-ছ'খানা চিঠি আসা চাই-ই, নইলে তৃপ্তি হ'ত না। বন্ধুদের চিঠি পেতে খুব ভাল লাগত। আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ছিল চিঠি। পাওয়া ও লেখার মধ্যে একটা রোমাঞ্চকর মোহ ছিল। শুধু এই চিঠি ও নানা জাতীয় প্যাকেট প্রতি ডাকে আসত ব'লে পাবনা ডাকঘরে আমি পরিচিত হয়ে গেলাম। শেষে আমার নামের সঙ্গে শুধু পাবনা জুড়ে দিলেই চলত। একটি জেলাশহরে নবাগত আমার এ বিষয়ে বেশ একটা গর্ব ছিল।

আমার দৃষ্টিশক্তি ছেলেবেলা থেকে ক্ষীণ ছিল, কম দেখতাম অনেক, কিন্তু তা নিয়ে ভাবনা করিনি কখনো। ছোটবেলায় ষ্টীমারের নাম পড়া নিয়ে আমি হেরে যেতাম। বন্ধুরা অনেক আগে পড়তে পারত, অনেক কাছে এলে তবে আমার পক্ষে পড়া সম্ভব হত। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে এসে এক বন্ধুর চশমা হঠাৎ চোখে দিয়ে দেখি দুনিয়া সুন্দরতর। তখন থেকে ইচ্ছা ছিল চশমা নিতে হবে। বাবা কখনো চশমা ব্যবহার করেন নি। দূরের জন্যও না, কাছের জন্যও না। আমরণ বিনা চশমায় পড়াশোনা করেছেন। তাই চশমার মর্য্যাদা বুঝিনি। এবারে পাবনায় এক অ্যাংলোইণ্ডিয়ান চশমাওয়ালা এসে বাসা বাঁধল কিছুদিনের জন্য। তাঁর কাছে গিয়ে চোখ পরীক্ষা করিয়ে চশমা নিলাম। মাইনাস্ ১·৫ পাওয়ারের চশমা। নতুন আলো এলো জীবনে।

পাবনা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন রাধিকানাথ বসু, আর, বোস নামে খ্যাত। ইংরেজী গদ্য পড়াতেন। ইংরেজী কাব্য পড়াতেন সুরেন্দ্রনাথ রায়। কেমিষ্ট্রি পড়াতেন জগদীশচন্দ্র দাস। লজিক, ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। সংস্কৃত, হেমচন্দ্র রায়। আর, বোসের ইংরেজী বলবার ভঙ্গি বেশ মনোহর ছিল। হেমচন্দ্র রায় সংস্কৃতকে খুব চিত্তাকর্ষক করতে পারতেন। শিশুর মতো সরল এবং আপন বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য অধিকার ছিল। আমাদের ইংরেজী পাঠ্য ছিল কাভার্লি-পেপার্স, (ষ্টীল অ্যাডিসন) দি রুইষ্টার অ্যাণ্ড দি হার্থ (চার্লস রীড), ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কতকগুলি কবিতা ও মিলটনের সনেট। সংস্কৃত, ভট্টিকাব্যম্, রঘুবংশম্, দশকুমারচরিতম্, সবই আংশিক। কেমিষ্ট্রি পি, সি, রায়; লজিক, এ, সি, মিত্র।

কলেজ বসত ছোট্ট একটি একতলা পুরনো বাড়ি ও তার সংলগ্ন একটি টিনের আটচালা-ঘরে। তবু তো এডোয়ার্ডের স্মৃতি বুকে জড়িয়ে আছে। অল্পদিনের মধ্যেই এর পরিবেশের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে উঠল। মাইনর স্কুলে ছেড়ে-আসা বন্ধুদেরও দু-এক জনের সঙ্গে দেখা হল।

পাবনা থেকে কুষ্টিয়াতে একখানা ষ্টীমার যাতায়াত করত। পথের দৈর্ঘ্য বারো মাইল কিংবা ঐ রকম। পদ্মা থেকে বেরিয়ে একটি নদী কুষ্টিয়ার পাশ দিয়ে যশোর জেলায় গিয়ে প্রবেশ করেছে, সে নদীর নাম গড়াই বা মধুমতী। কুষ্টিয়া থেকে ষ্টীমারে চ'ড়ে সেই নদীপথে প্রথমে পদ্মায়, তারপর সেখান থেকে ডান দিকে ঘুরে পাবনার দিকে যাওয়া। গড়াই নদী কুষ্টিয়া ষ্টেশন থেকে দু'-মিনিটের পথ।

কলেজে আমার প্রথম পুজোর ছুটি, পাবনা থেকে রাত্রিবেলা সেই পথে কুষ্টিয়াতে এসে ঢাকা প্যাসেঞ্জার ধরব। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্র আর অধ্যাপকে ষ্টীমার প্রায় বোঝাই। আশ্বিন মাস। বর্ষার ভরা নদী, দুকূল হারা। ষ্টীমার ছাড়বার কিছু পরেই মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে এলো। অনেকক্ষণ ধ'রে একটা গুমোট ভাব। রাত তখন হয় তো দশটা হবে। কালো আকাশ, কালো জল। নদীর কোথায় আছি জানি না। মাঝারি দোতলা ষ্টীমার। চার দিক নীরন্ধ্র অন্ধকার। সেই অন্ধকারের বুক চিরে আঁকা-বাঁকা বিদ্যুৎ জ্বলতে লাগল মুহুর্মুহু। প্রবল গর্জন আকাশ কাঁপিয়ে তুলছে। খোলা নদীর মেঘে-ঢাকা বুকে তার প্রতিধ্বনি অন্ধকারকে আরও ভয়াবহ ক'রে তুলছে। বিদ্যুতের আলোতেও এপার ওপার ঠাহর হয় না।

ঝড় উঠে এলো অতি প্রবল বেগে। সঙ্গে তুষার-তীরের মতো ঠাণ্ডা বৃষ্টির তীর। ষ্টীমার দুলে উঠল প্রথম ধাক্কাতেই। ষ্টীমারের উপরের ছাউনি মড়মড় ক'রে উঠল। একটার পর একটা উন্মত্ত ঢেউ এসে ভেঙে পড়তে লাগল একতলার ডেকে। বৃষ্টির ছাট বন্ধ করার জন্য ঝড়ের দিকের চটের পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল দোতলায়, কিন্তু ঝড়ের যা বেগ তাতে পর্দা ঝোলানো থাকলে ষ্টীমার যে-কোনো মুহূর্তে কাত হয়ে তলিয়ে যাবে। আমি স্তম্ভিতবৎ দাঁড়িয়ে আছি মাঝামাঝি জায়গায়, চিমনির জন্য ঘেরা জায়গা থেকে একটু দূরে। দেখছি, খালাশিরা ছুরি হাতে ছুটে এসে পর্দার দড়ি কেটে দিল। দেখছি, তার সঙ্গে সঙ্গে সেই হিম-শীতল বৃষ্টির আঘাতে সমস্ত দেহ জর্জরিত করছে। দেখছি, কিন্তু কিছুই করছি না। কয়েক পা স'রে গেলে চিমনি-ঘেরের আড়ালে গিয়ে বাঁচতে পারি, কিন্তু এক পা সরবার প্রবৃত্তি নেই। পাথরের মতো

অচল ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছি। কানে আসছে—অধ্যাপক ছাত্রদের ভয়ার্ত কণ্ঠে বলছেন এই তো শেষ—বিদায় বন্ধুরা। সব কথা কানে আসছে, কিন্তু মর্মে প্রবেশ করছে না। লাইফবয় লাগানো আছে, স্টীমার ডুবলে তা ধ'রে ভাসা যায়, কিন্তু কোনো ইচ্ছেই নেই। চিন্তার এমন একটি পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা সচেতন অবস্থায় যে সম্ভব তা জানতাম না। মন তার আধার থেকে যেন গড়িয়ে নিচে প'ড়ে গেছে। আমি তখন সকল সুখ-দুঃখ সকল ভাল-মন্দের উর্ধ্বে, ভয়-ভাবনার উর্ধ্বে। প্রায় এক ঘণ্টা ঝড় চলেছিল, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে এক পা নড়িনি, ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজেছি। শীতের কাঁপুনি আরম্ভ হয়েছিল ঝড় থেমে যাবার পর। পরে বুঝতে পেরেছি অনেকেই আমারই মতো চিন্তাশূন্য ছিল। উপায় নেই, এমনিই হয়। যেখানে ব্যক্তিগত কোনো ইচ্ছার কোনো দাম নেই, সেখানে ইচ্ছা অসাড় হয়েই নিজের মান বাঁচায় এই ভাবে।

অনেকক্ষণ পরে মনে হয়েছিল সারেঙের কথা। এত বড় বিপদে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে তিনি স্টীমারকে তাঁর সমস্ত চালনা-নৈপুণ্য দিয়ে ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। বিস্ময়ে মন ভরেছিল, কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয়েছিল।

মৃত্যু সম্পর্কে এই উদাসীনতা সম্ভবত ভয়ের শেষ অবস্থা। একদিন এ বিষয়ে অবহিত হলাম। ভয়ে এ রকম জীবন্মৃত হয়ে যাওয়াতে নিজের প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব এলো। একদিন সচেতন হলাম মনের কোমলতা দূর করতে হবে। দেবদেবতা অপদেবতা প্রভৃতি আমার মনে কোনো দিনও স্থান পায়নি, ছেলেবেলা থেকেই এ বিষয়ে উদাসীন এবং সবাই মানে ব'লে আমি স্বতন্ত্র ছিলাম। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব অনেক যুক্তি ছিল। এবারে এই ঝড়ের পর থেকে আবার আমার মনোযোগ এদিকে গেল।—ভয় ছাড়তে হবে। কিন্তু কি ভাবে? সব বিষয়ে, অন্তত নিজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত নয় এমন সব বিষয়ে, নিস্পৃহ না হতে পারলে অকারণ ভয় বা নার্ভাসনেস ছাড়া যাবে না। অতএব যে-কোনো ভয় পাবার মতো বিষয়ে আগে এগিয়ে যেতে হবে। বাড়ির কাছে নতুন রেলপথে এঞ্জিনে চাপা পড়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মানুষকে দেখলাম পর পর তিন-চারটি। খুব কাছে গিয়ে মাথার ভাঙা খুলির মধ্যেকার মগজ কেমন দেখায়, তা আমার পড়া সেই শারীরতত্ত্ব বিষয়ের ইংরেজী বইখানার সঙ্গে কতটা মেলে, দেখলাম। ছিন্ন হাত-পায়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখলাম মনকে প্রস্তুত ক'রে। আগে এ রকম কল্পনায় মন বিদ্রোহ করত, কিন্তু মন স্থির করলাম যুক্তি দিয়ে। সে যুক্তি বৈজ্ঞানিকের চেয়ে দার্শনিকই বেশি ছিল, এবং আজও সে দৃষ্টি আমি সম্পূর্ণ হারাইনি, যদিও মনের সে অবস্থা এখন আর নেই।

মৃতদেহের খণ্ডিত অংশের সঙ্গে এমন চাক্ষুষ পরিচয়ে মনে বেশ একটা জোর অনুভব করতে লাগলাম। এর কিছু দিন পর এক দুর্দান্ত পাগল হঠাৎ ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে গ্রামের প্রান্তে এক বুড়িকে বঁটি দিয়ে কেটে ফেলল। হৈ হৈ চিৎকার শুনে ছুটে গেলাম। খুব কাছে গিয়ে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলাম, কি পরিমাণ কাটা। মনের এ রকম আশ্চর্য পরিবর্তনে আমার ভাল লাগল। কালুখালি স্টেশন থেকে উঁচু রেলপথ ধ'রে একদিন শেষ রাত্রে একা ফিরলাম বাড়িতে (১৫ মিনিট হাঁটা পথ)। যে রেলের উপর রক্তাক্ত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মানুষকে দেখেছি দিনের বেলায়, সেই পথের উপর দিয়ে রাত্র ছুটোর সময় একা চলেছি হেঁটে। মনে ভয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না। এর পর থেকে মৃতপ্রায় রোগীর বিছানায় গিয়ে বসতে আরম্ভ করলাম। থার্মোমিটারে তাপ দেখে তার সঙ্গে নাড়ীর গতির সম্পর্ক পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলাম। এ সবই নিজের মন থেকে। এ সবই কৌতূহল থেকে, অভিজ্ঞতা লাভের নিজস্ব উপায়। মুমূর্ষু রোগীর পাল্‌স্‌ ধ'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি ঘড়ি সামনে নিয়ে। ক্ষীণ পাল্‌স্‌ মিনিটে ১৩০ চলছে, কিন্তু থার্মোমিটারের পারা এক ধাপও ওঠে না। হাত-পা ঠাণ্ডা, নাড়ীর গতি এলোমেলো, পাওয়া যায় কি যায় না, তার পর সব থেমে গেল। গলায় ঘড়ঘড় আওয়াজও ঐ সঙ্গে নীরব। তিনটি বৃদ্ধের ক্ষেত্রে এই একই ব্যাপার দেখলাম। শ্মশানে গিয়েছি ইচ্ছে ক'রে। পোড়ানো খুব কাছে থেকে ব'সে ব'সে দেখেছি। মনে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। জগতের সমস্ত স্বাভাবিক ঘটনার সঙ্গে এ-সব মিলিয়ে দেখেছি। এ-সব অবশ্য তখন থেকে পরবর্তী তিন বছরব্যাপী প্রয়াসের কথা।

ভূতের ভয় নামক কোনো ভয়ের যে কোনো অস্তিত্ব নেই আমার মনে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি। পাবনা থাকতে কালীচরণ সেনের বড় বাড়িতে আমাকে দু'-তিন রাত্রি সম্পূর্ণ একা থাকতে হয়েছিল এক সময়। কিছুমাত্র ভয় হয়নি। মজা ক'রে অন্যকে ভূতের ভয় দেখিয়েছি। সামান্য সাজের কৌশলে যে-কোনো লোককে ভীষণ ভয় দেখানো যায় রাত্রে।

পুজোর ছুটির শেষে পাবনা রওনা হয়ে গেলাম, কুষ্টিয়ায় পৌঁছলাম সন্ধ্যা প্রায় ছটায়। কিন্তু আকাশে দেখি মেঘ ঘনাচ্ছে। স্টেশন থেকেই অনেক রাত্রে ঢাকা প্যাসেঞ্জারে ফিরে এলাম, পাবনা যাওয়া তখন আর হ'ল না। এক মাস আগের ঝড়ের কথা মনে এলো। যে ভয়ের কাছে কোনো চ্যালেঞ্জ খাটে না, সে ভয় জয় করা কঠিন!

কিছুদিন পরে ফিরলাম পাবনা এবং এসে হস্টেলে জায়গা পেলাম। এই আমার প্রথম হস্টেল-জীবন। ভাল লাগল খুব। গণেশচন্দ্র চক্রবর্তী পাবনার বিশিষ্ট উকিল ছিলেন, তিনি পাবনা ছেড়ে চলে

এক মিনিটের মধ্যেই অতুলানন্দের সংযম ভেঙে গেল।

গিয়েছিলেন, তাঁর বাড়িতে ছিল আমাদের হষ্টেল। একতলা বাড়ি, বাড়ির সামনের উঠোনের ছ'পাশে ছ'খানা বড় টিনের ঘর। ডান দিকের একখানা ঘরে সাত আট জন ছাত্রের সঙ্গে একটা সীট পেলাম।

বাড়ির পিছনে ইছামতী নদী, এই নদীতেই স্নান করতে ভাল লাগত। বাড়ির ভূতপূর্ব মালিকের দুই পুত্র প্রবোধানন্দ ও অতুলানন্দ চক্রবর্ত্তী ঐ হষ্টেলেই থাকত। আমাদের সবার বেশ একটা সজ্ঘজীবন গড়ে উঠেছিল এখানে। নানা চরিত্রের বিচিত্রতা বড়ই লোভনীয় ছিল। তারাপদ সান্যাল ছিল ভীষণ আমুদে লোক। চমৎকার গান গাইত, বাঁশী বাজাত। হৈ হৈ করা ছিল তার অভ্যাস। সে সমস্ত দিন অন্যদের পড়া নষ্ট ক'রে নিজে সমস্ত রাত জেগে পড়ত। দুষ্টুমি বুদ্ধিতে ভরা।

একবার হষ্টেল সার্চ হল—রাজদ্রোহ এখানে কি পরিমাণ বাসা বেঁধেছে দেখার জন্য। সবার বাক্স খুলে চিঠিপত্রের সন্ধান। সার্চের ধরন দেখে মনে হয়েছিল কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট ছাত্রের প্রতি লক্ষ্য ছিল, কেন না তাদের দিকেই প্রথম এবং প্রধান মনোযোগ ছিল। আমাদের ঘরে আদৌ আসেনি। তারাপদদের ঘরে দু'চার জনের বাক্স খোলা হয়েছিল। তারাপদ ছিল বিবাহিত, সে হুঁকোয় তামাক খেত। পুলিসের সঙ্গে একজন অধ্যাপককেও থাকতে হয়েছিল, তারাপদ বিপদ অনুমান ক'রে তামাকের সরঞ্জাম বাইরে সরিয়ে রাখল। কিন্তু বাক্স খুলতে হল। তারপর পুলিস ও তারাপদ সান্যালের মধ্যে নিম্নলিখিত ঘটনা অনুষ্ঠিত হল।

"চিঠি আছে বাক্সে?"

"আছে," ব'লে তারাপদ একটা চিঠির বাণ্ডিল বের ক'রে পুলিসের হাতে দিল। পুলিস তা খুলে একের পর এক তিন চার খানা চিঠিতে দেখেন 'প্রিয়তমেষু' সম্বোধন এবং স্ত্রীলোকের হাতের লেখা। বয়স্ক অফিসার, একটু খোঁত খোঁত করে বললেন, "এ চিঠি নয়, কোন বন্ধুর চিঠি আছে?"

তারাপদ আরও একটা বাণ্ডিল বের করে পুলিসের হাতে দিতে দিতে বলল, "এগুলো বন্ধুর চিঠি।"

পুলিস-অফিসার এবারেও বিপন্ন হলেন, "বললেন, এ-ও তো দেখছি মেয়ে-ছেলের লেখা, কোনো পুরুষ-বন্ধুর চিঠি আছে?"

তারাপদ খুব গম্ভীর ভাবে বলল, "আজ্ঞে পৃথিবীতে আমার এক শালী ভিন্ন আর কোনো বন্ধু নেই, ওগুলো তারই লেখা।"

পুলিস অফিসার বিরক্ত হয়ে বললেন, "না না, এ সব নয়,"—ব'লে উঠে এলেন সেখান থেকে। অধ্যাপক আগেই ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম তারাপদর কীর্ত্তি।

পাবনায় তখন আহার্য বস্তুর দাম বেশ শস্তা। আমাদের সীটরেন্ট সমেত দশ-বারো টাকার মধ্যে চলে যেত যতদূর মনে পড়ে। হষ্টেলে দিন কত অতিরিক্ত ইলিশ মাছ খেয়ে বিরক্ত হয়ে মাস তিনেক নিরামিষ খেয়েছিলাম। সকালে এক হিন্দুস্থানী প্রকাণ্ড কাঠের পরাতে সন্দেশ ও ক্ষীরের লুচি সাজিয়ে নিয়ে আসত হষ্টেলে। খুব হাসিখুশি লোকটা, বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করত। আমাকে বলত প্রামল বাবু। তার খাবারের স্বাদ পাওয়ার পর থেকে আমাদের হষ্টেল-জীবনে এক বিপর্যয় দেখা ছিল। আমরা কয়েকজন, মিষ্টান্নলোভী খাবারওয়ালার গলা শুনতে পেলেই ছুটে বেরিয়ে এসে কাড়াকাড়ি ক'রে সব খেয়ে ফেলতাম। সন্দেশ অনেক আনত, কিছু ক্ষীরের লুচি আনত কুড়ি পঁচিশখানা, তার একখানিও অবশিষ্ট থাকত না। অনেক সময় কে কত খেল, কে তার হিসেব করে, বিক্রেতা খুব দিলদরিয়া ছিল, সে সূক্ষ্ম হিসেব গ্রাহ্যই করত না। যার যা খুশি দিলেই চলত। আমাদের দলে মিষ্টান্নপ্রিয়তার দিক দিয়ে অতুলানন্দ ছিল প্রথম শ্রেণীর প্রথম। আর তাকে নিয়ে কি মজাটাই না করা হত। তার পড়াশোনায় মনোযোগ ছিল বেশি, ভাল ছাত্র হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল উগ্র, কিন্তু পাবনার মতো শহরে থেকে মিষ্টান্নপ্রিয়তার মূলোচ্ছেদ না করতে পারলে সে বাসনা পূরণ হওয়া শক্ত ছিল। বয়সটা ছিল ক্ষীরের লুচির অনুকূল, এবং এর আকর্ষণ যে পাঠ-আকর্ষণের চেয়ে বেশি ছিল, তার প্রমাণ প্রতিদিনই পাওয়া যেত।

এতে পড়ার ক্ষতিই শুধু নয়, পকেটের ক্ষতি এবং পাকস্থলীর ক্ষতিও কম হত না। এত খাওয়ার পর আর পড়ায় মন বসত না। এ জন্য অতুলানন্দ একদিন প্রতিজ্ঞা ক'রে বসল সে আর খাবে না। কিন্তু আমরা যারা প্রতিজ্ঞা রাখতে পারব না জেনে প্রতিজ্ঞাই করতাম না, সেই আমরা তাকে ছাড়ব কেন? অতএব খাবারওয়ালা এলে ঘটনাস্থানটি গার্ডেন অফ ইডেন কল্পনা ক'রে অতুলানন্দকে প্রলুব্ধ করতে লাগলাম ঈভের ভূমিকা নিয়ে। শয়তান তো আমাদের আগেই ভুলিয়েছে।

আমরা কয়েক জনে মিলে অতুলানন্দের মুখের কাছে গিয়ে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সন্দেশ খেতে আরম্ভ করলাম। এক মিনিটের মধ্যেই অতুলানন্দের সংযম ভেঙে গেল, ছুটে বেরিয়ে এসে রুদ্ধ আবেগ মুক্ত ক'রে একটার পর একটা সন্দেশ খেতে আরম্ভ করল এবং তা স্বাভাবিক মাত্রা স্বভাবতই ছাড়িয়ে গেল। এ রকম অনেক বার হয়েছে। তার কঠিনতম প্রতিজ্ঞা বার বার ভেঙে গেছে। এই বয়সেই মিষ্টি সম্পর্কে তার এমন তিক্ত অভিজ্ঞতার মূলে আমরা।

হষ্টেল-জীবনের বিচিত্র দিক। এমন অনাবিল আনন্দ আর কোথায়ও পাইনি। পাইনি তার আর একটি বড় কারণ মনে হয় এই যে, এই বাল্য-জীবন ছেড়ে যত এগিয়ে এসেছি, আন্তরিকতাও তত যেন এক এক মাত্রা ছেড়ে ছেড়ে গেছে। বন্ধুদের বিষয়ে এমন ব্যাপক এবং পূর্ণাঙ্গ আত্মীয়তা পরবর্তী কলেজ-জীবনে আর হয়নি। পাইনি এ রকম, দিইনি এ রকম। সবারই ঐ একই ইতিহাস, সবারই জীবনে বাল্যকালের স্মৃতিটিই সব চেয়ে মধুর। এ মাধুর্য অন্য হাজার রকম মাধুর্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এই হষ্টেলের স্মৃতিটি তাই মনের মধ্যে এমন ভাবে গুঞ্জন করছে। কেউ সমস্ত রাত জেগে লজিক মুখস্থ করছে, কেউ চিৎকার ক'রে কেমিষ্ট্রি পড়ছে, কেউ গান করছে, কেউ গল্পের আড্ডা জমিয়েছে, কেউ নীরবে অঙ্ক কষছে। এক দিন ঠাকুর এলো না, গোপাল চক্রবর্তী এবং আরও কজন 'ওস্তাদ মিলে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। পরিবেশনের সময় বলে, "গামছা এনে এই ডালের গামলাতেই স্নানটা সেরে নিই।" তার মানে ডাল ও জলে মেলেনি, শুধু জল দেখা যাচ্ছে উপরে। কিন্তু তাতে তৃপ্তি কিছুমাত্র কম হয়নি। সব আহার্যের মধ্যেই যে পরম আত্মীয়তার স্বাদ।

[ক্রমশঃ।

সৈয়দ মুজতবা আলী

'চুঙ্গীঘর' কথাটা বাঙলা ভাষাতে কখনো খুব বেশী চালু ছিল না বলে আজকের দিনে অধিকাংশ বাঙালী যদি সেটা ভুলে গিয়ে থাকে, তবে তাই নিয়ে মর্মাহত হবার কোনো কারণ নেই। ইংরিজিতে একে বলে 'কাস্টম হাউস', ফরাসীতে 'দুয়ান্,' জর্মনে 'ৎসল-আম্ট্,' ফার্সীতে 'গুমরুক' ইত্যাদি ইত্যাদি। এতগুলো ভাষাতে যে এই লক্ষ্মীছাড়া প্রতিষ্ঠানটার প্রতিশব্দ দিলুম তার কারণ আজকের দিনে আমার ইয়ার, পাড়ার পাঁচু, ভুতো সবাই সরকারি নিম-সরকারি, মিন-সরকারি পয়সায় নিত্যি নিত্যি কাইরো-কান্দাগার, প্যারিস-ভেনিস সর্বত্র নানাবিধ কনফারেনস করতে যায় বলে, আর পাকিস্তান হিন্দুস্থান গমনাগমন তো আছেই। ঐ শব্দটি জানা থাকলে তড়িঘড়ি তার সন্ধান নিয়ে আর পাঁচজনের আগে সেখানে পৌছতে পারলে তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ওটাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা কস্মিনকালেও করবেন না। বরঞ্চ রহমৎ কাবুলীকে তার হক্কের কড়ি থেকে বঞ্চিত করলে করতেও পারেন কিন্তু তার দেশের 'গুমরুক'টিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবেন না। 'কাবুলী-ওয়ালা' ফিল্ম আমি দেখিনি। রহমৎও বোধ করি সেটাতে তার গুমরুককে এড়াবার চেষ্টা করেনি।

কেন? ক্রমশ প্রকাশ্য।

ডাক্তার, উকীল, কসাই, ডাকাত, সম্পাদক (এবং সম্পাদকরা বলবেন লেখক) এদের মধ্যে সক্কলের প্রথম কার জন্মগ্রহণ হয় সে কথা বলা শক্ত। যারই হ'ক তিনি যে চুঙ্গীঘরের চেয়ে প্রাচীন নন সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষে মানুষে লেনদেন নিশ্চয়ই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল এবং সেই মুহূর্তেই তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠেছে, 'আমার ট্যাক্সোটা ভুলো না কিন্তু'—তা সে তৃতীয় ব্যক্তি গাঁয়ের মোড়লই হ'ক, পঞ্চাশখানা গাঁয়ের দলপতিই হন, কিম্বা রাজা অথবা তাঁর কর্মচারীই হন। তা তিনি নিন, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই, কারণ এ যাবৎ আমি পুরনো খবরের কাগজ ছাড়া অন্য কোনো বস্তু বিক্রি করিনি। কিন্তু যেখানে দু' পয়সা লাভের কোনো প্রশ্নই ওঠে না সেখানে যখন চুঙ্গীঘর তার নাহক্কের কড়ি নাহক চাইতে যায়, তখনই আমাদের মনে সুবুদ্ধি জাগে ওদের ফাঁকি দেওয়া যায় কি প্রকারে?

এই মনে করুন আপনি যাচ্ছিলেন ঢাকা। প্যাক করতে গিয়ে দেখেন, মাত্র দুটি শার্ট ধোপার মারপিট থেকে গা বাঁচিয়ে কোনো গতিকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। ইষ্টিশানে যাবার সময় কিনলেন একটি নয়া শার্ট। ব্যস, আপনার হয়ে গেল। দর্শনা পৌছতেই পাকিস্তানী চুঙ্গীঘর হুলুধ্বনি দিয়ে দর্শনী চেয়ে উঠবে। তারপর আপনার শার্টটির গায়ে হাত বুলবে, মস্তক আঘ্রাণ করবে এবং শেষটায় ধৃতরাষ্ট্র যে রকম ভীমসেনকে আলিঙ্গন করেছিলেন ঠিক সেই রকম বুকে জড়িয়ে ধরবে।

আপনার পাঁজর ক'খানা পটপট করতে আরম্ভ করেছে, তবু শুকনো মুখে চিঁ চিঁ করে বলবেন, 'ওটা তো আমি নিজের ব্যবহারের জন্য সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ওতে তো ট্যাক্স লাগবার কথা নয়!'

আইন তাই বলে।

হায় রে আইন! চুঙ্গীওলা বলবে 'নিশ্চয় নিশ্চয়। কিন্তু ওটা যদি আপনি ঢাকাতে বিক্রী করেন?'

তর্কস্থলে ধরে নিলুম, আপনার পিতামহ তর্কবাগীশ ছিলেন। তাই আপনি মূর্খের ন্যায় তর্ক তুললেন, 'পুরানো শার্টও তো ঢাকাতে বিক্রী করা যায়।'

এই করলেন ভুল। তর্কে জিতলেই যদি সংসারে জিত হ'ত তবে সক্রাতেসকে বিষ খেতে হত না, যীশুকে ক্রুশের উপর শিব হতে হত না।

চুঙ্গীওলা জানে, জীবনের প্রধান আইন, চুপ করে থাক, তর্ক করার বদভ্যাসটি ভালো না। একেবারেই হয় না ওতে বুদ্ধিশক্তির চালনা।

কি যেন এক অজানার ধেয়ানে, দীর্ঘ এ্যারস্ট্রিপের পশ্চাতে সুদূর দিকচক্রবালের দিকে তাকিয়ে বলবে, 'তা পারেন।'

তার পর কাগজ পেন্সিল নিয়ে কি সব টরে-টক্কা করবে। তার পর বলবে, 'পনরো টাকা।'

আপনার মনের অবস্থা আপনিই তখন জানেন—আমি আর তার কি বয়ান দেব। ব্যাপারটা যখন আপনার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হল তখন আপনি ক্ষীণতম কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু ঐ শার্টটার দামই তো মাত্র চার টাকা।'

চুঙ্গীওলা একখানা হলদে কাগজে চোখ বুলিয়ে নেবে। আপনি এটাতে দস্তখত করেছিলেন এবং নূতন শার্টটার উল্লেখ করেন নি। চুঙ্গীওলার কাছে তার সরল অর্থ, আপনি এটা স্মাগল করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পাচার করতে চেয়েছিলেন, হাতে নাতে বেআইনী কর্ম

করতে গিয়ে ধরা পড়লে তাঁর জরিমানা দশ টাকা, জেলও হতে পারতো—আফিং কিম্বা ককেইন হলে—এ যাত্রা বেঁচে গেছেন।

সেই হলদে কাগজখানা অধ্যয়ন করে কোনো লাভ নেই। কারণ তার প্রথম প্রশ্ন ছিল।

১। আপনার জন্মের সময় যে কাঁচি দিয়ে নাড়ি কাটা হয়েছিল, তার সাইজ কত?

এবং শেষ প্রশ্ন,

২। আপনার মৃত্যুর সন ও তারিখ কি?

আপনি তখন শার্টটির মায়া ত্যাগ করে ঈষৎ অভিমান ভরে বললেন, 'তা হলে ওটা আপনারা রেখে দিন।'

কিন্তু ঐটি হবার যো নেই। আপনি ঘড়ি চুরি করে পেয়েছিলেন তিন মাসের জেল। ঘড়ি ফেরৎ দিলেই তো আর হাকিম আপনাকে ছেড়ে দেবে না। শার্ট ফেরৎ দিতে চাইলেও রেহাই নেই।

তখন শার্টটা চড়বে নিলামে। এক টাকা পেলে আপনি মহা ভাগ্যবান। জরিমানাটার অবশ্য নড়নচড়ন হল না।

ঢাকা থেকে ফিরে আসার সময় ভারতীয় চুঙ্গীওলা দেখে ফেললে আপনার নূতন পেলিকান ফাউন্টেন পেনটি। কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। আপনি ভাবলেন, ভারত এবং পাকিস্তান উভয়ই এ কর্মে নূতন, তাই প্যাসেঞ্জারকে খামখা হয়রাণ করে। বিলেত-ফিলেতে বোধ হয় চুঙ্গীঘর টুরিষ্টদের নিছক মনোরঞ্জনার্থে। তবে শুনুন।

আমার এক বন্ধু প্রায়ই ইউরোপ-আমেরিকা যান। এতই বেশী যাওয়া-আসা করেন যে, তাঁর সঙ্গে কোথাও দেখা হলে বলবার উপায় নেই, তিনি বিদেশ যাচ্ছেন না ফিরে আসছেন। ঐ যে রকম ঢাকার কুট্টি গাড়োয়ান এক ভদ্রলোককে ভি শেপের গেঞ্জি উল্টো পরে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কর্তা আইতেছেন, না যাইতেছেন?'

তিনি নেমেছেন ইটালির ভেনিস বন্দরে জাহাজ থেকে। ঝাণ্ডু ব্যবসায়ী লোক। তাই চুঙ্গীঘরের সেই হলদে কাগজখানার যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে শেষটায় লিখেছেন, 'এক টিন ভ্যাকুয়াম প্যাক্ট ভারতীয় মিষ্টান্ন। মূল্য দশ টাকা।' অস্কার ওয়াইল্ড যখন মার্কিণ মুলুকে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন চুঙ্গীঘর পাঁচ জনের মত তাঁকেও শুধিয়েছিল, 'এনি থিং টু ডিক্লেয়ার?' তিনি আঙ্গুল দিয়ে তার মগজের বাক্সটি বার কয়েক ট্যাপ করে উত্তর দিয়েছিলেন, 'মাই জিনিয়াস।' আমার পরিচিতদের ভিতর ঐ ঝাণ্ডুদা'ই একমাত্র লোক, যিনি মাথা তো ট্যাপ করতে পারতেনই, সঙ্গে সঙ্গে হাটটা ট্যাপ করলেও কেউ কোনো আপত্তি করতে পারতো না।

জাহাজখানা ছিল বিরাট সাইজের—ঝাণ্ডুদার বপুটি স্বচক্ষে দেখেছেন যাঁরা, তাঁরাই আমার কথায় সায় দেবেন যে, তাঁকে ভাসিয়ে রাখা যে-সে জাহাজের কর্ম নয়—তাই সেদিন চুঙ্গীঘরে লেগে গিয়েছিল মোহনবাগান ভর্স'স ফিল্ম-ষ্টার-টীম ম্যাচের ভিড়। ঝাণ্ডুদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ মনে পড়ল ইতালির 'কিয়ান্তি' জিনিসটি বড়ই সরেস এবং সরস। চুঙ্গীঘরের কাঠের খোঁয়াড়ের মুখে দাঁড়িয়েছিল এক পাহারওলা। তাকে হাজার লিরের একখানা নোট দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কয়েক বোতল কিয়ান্তি রাস্তার ওধারের দোকান থেকে নিয়ে আসতে। পাহারওলা খাঁটি খানদানী লোকের সংস্পর্শে এসেছে ঠাহর করতে পেরে ঝাঁটা নিয়ে এল তিন মিনিটেই। পূর্বেই বলেছি ঝাণ্ডুদা জন্মেছিলেন ভাগড়াই হার্ট নিয়ে—জাহাজের পরিচিত অপরিচিত তথা চুঙ্গীঘরের পাহারওলা, সেপাই, চাপরাসী, কুলী সবাইকে কিয়ান্তি বিলোতে লাগলেন দরাজ দিলে। 'স্বাস্থ্যপান' আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই ঝাণ্ডুদার ডাক পড়ে গেল চুঙ্গীর কাউণ্টারে। মাল খালাসীতে তাঁরে পালা এসে গেছে। নিমন্ত্রিত রবাহুত সব্বাইকে দরাজ হাত দু'খানা পাখির মত মেলে দিয়ে বললেন, 'আপনারা ততক্ষণে ইচ্ছে করুন; আমি এই এলুম বলে।' কিয়ান্তি বীবীকে নিয়ে রাখা চুমাপাপ।

ঝাণ্ডুদার বাক্স-পেটরায় এত সব জাত-বেজাত হোটেলের লেবেল লাগানো থাকতো যে, অগা চুঙ্গীওলাও বুঝতে পারতো এগুলোর মালিক বাস্তু ভিটার তোয়াক্কা করে না—তার জীবন কাটে হোটেলে হোটেলে। 'আজকের চুঙ্গীওলা কিন্তু সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করলে, প্রথম ভাগের ছেলে যে রকম বানান করে করে বই পড়ে। লোকটার চেহারা বদখদ। টিঙটিঙে রোগা, গাল দুটো ভাঙা, হাড় দুটো জোয়ালের মত বেরিয়ে পড়েছে, চোখ দুটো গভীর গর্তের ভিতর থেকে নাকটাকে প্যাসনের মত চেপে ধরেছে, নাকের তলায় টুথব্রাসের মত হিটলারী গোঁপ। পূর্বেই নিবেদন করেছি, ঝাণ্ডুদা ঝাণ্ডু লোক, তাই তিনি মানুষকে তার চেহারা থেকে যাচাই করেন না। এবারে কিন্তু তাঁকেও সেই নিয়মের ব্যভিচার করতে হল। লোকটাকে আড় চোখে দেখলেন, সন্দেহের নয়নে। আমাকে কানে কানে বললেন, 'শেক্স্‌পিয়ার নাকি বলেছে, রোগা লোককে সমঝে চলবে।' আমার বিশ্বাস আজ যে শেক্স্‌পিয়ারের এত নাম-ডাক সেটা ঐ দিন থেকেই শুরু হয়—কারণ ঝাণ্ডুদা আত্মনির্ভরশীল মহাজন, কারো কাছ থেকে কখনো কানা কড়ি ধার নেন নি। তিনি ঋণ স্বীকার করাতে ঐ দিন থেকে শেক্স্‌পিয়ারের যশপত্তন হয়।

চুঙ্গীওলা শুধালে, 'ঐ টিনটার ভিতর আছে কি?'

'ইণ্ডিয়ান সুইটস।'

'ওটা খুলুন।'

'সে কি করে হয়? ওটা আমি নিয়ে যাব লণ্ডনে। খুললে বরবাদ হয়ে যাবে যে।'

চুঙ্গীওলা যে ভাবে ঝাণ্ডুদার দিকে তাকালে তাতে যা টিন খোলার হুকুম হল, পাঁচশ ঢ্যাঁঢরা পিটিয়ে কোনো বাদশাও ওরকম হুকুম-জারী করতে পারতেন না।

ঝাণ্ডুদা মরিয়া হয়ে কাতর নয়নে বললেন, 'ব্রাদার, এ-টিনটা আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর মেয়ের জন্য লণ্ডনে—নেহাৎই চিংড়ি মেয়ে। এটা এখানে খুললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

এবারে চুঙ্গীওলা যে ভাবে তাকালে তাতে আমি হাজার ঢ্যাঁঢরার শব্দ শুনতে পেলুম।

বিরাট-লাশ ঝাণ্ডুদা পিঁপড়ের মত নয়ন করে সকাতরে বললেন, 'তাহলে ওটা ডাকে করে লণ্ডন পাঠিয়ে দাও, আমি ওটাকে সেখানেই খালাস করবো।'

আমরা একবাক্যে বললুম, 'কিন্তু তাতে তো বড্ড খরচা পড়বে।' পাউণ্ড পাঁচেক—নিদেন।'

দুমখাস ফেলেই বললেন, 'তা আর কি করা যায়।'

কিন্তু আশ্চর্য, চুঙ্গীওলা তাতেও রাজী হয় না। আমরাও অবাক। কারণ এ আইন তো সক্কলেরই জানা।

ঝাণ্ডুদা একটুখানি দাঁত কিড়িমিড়ি খেয়ে লোকটাকে আইনটার মর্ম প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝালেন। তার অর্থ টিনের ভিতর বাঘ-ভাল্লুক, ককেইন-হেরয়িন যাই থাক, ও-মাল যখন সোজা লণ্ডন চলে যাচ্ছে তখন তার পুণ্যভূমি ইতালি তো আর কলঙ্কিত হবে না।

আমরা সবাই কসাইটাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, ঝাণ্ডদার প্রস্তাবটি অতিশয় সমীচীন এবং আইনসঙ্গতও বটে। আমাদের দল তখন বেশ বিরাট আকার ধারণ আছে। 'কিম্‌ভূত'-রাণীর সেবকের অভাব ইতালিতে কখনো হয় নি—ভূচর্য থাকলে পৃথিবীতেও হ'ত না। এক ফরাসী উকিল কাইরো থেকে পোর্ট সঈদে জাহাজ ধরে—সে পর্যন্ত বিন্ ফীজে লেকচর ঝাড়লে। চুঙ্গীওলার ভাবখানা সে পৃথিবীর কোনো ভাষাই বোঝে না।

ঝাণ্ডুদা তখন চটেছেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'শালা, তবে খুলছি। কিন্তু ব্যাটা তোমাকে না খাইয়ে ছাড়ছি নে।' তারপর ইংরাজিতে বললেন, 'কিন্তু তোমাকে ওটা নিজে খেয়ে পরখ করে দেখতে হবে ওটা সত্যি ইণ্ডিয়ান সুঈট্স্ কি না।'

শয়তানটা চট করে কাউণ্টারের নিচের থেকে টিন্-কাটার বের করে দিলে। ফরাসী বিদ্রোহের সময় গিলোটিনের অভাব হয় নি।

ঝাণ্ডুদা টিন-কাটার হাতে নিয়ে ফের চুঙ্গীওলাকে বললেন, 'তোমাকে কিন্তু ঐ মিষ্টি পরখ করতে হবে নিজে, আবার বলছি।'

চুঙ্গীওলা একটু শুকনো হাসি হাসলে। শীতে বেজায় ঠোঁট ফাটলে আমরা যে রকম হেসে থাকি।

ঝাণ্ডুদা টিন কাটলেন।

কি আর বেরবে? বেরল রসগোল্লা। বিয়ে-শাদীতে ঝাণ্ডুদা ভূরি ভূরি রসগোল্লা স্বহস্তে বিতরণ করেছেন—ব্রাহ্মণ সন্তানও বটে। কাঁটা চামচের তোয়াক্কা না করে রসগোল্লা হাত দিয়ে তুলে প্রথমে বিতরণ করলেন বাঙালীদের, তারপর যাবতীয় ভারতীয়দের, তার পর আর সবাইকে, অর্থাৎ ফরাসী জর্মণ ইতালীয় স্প্যানিয়ার্ডদের।

মাতৃভাষা বাঙলাটাই বহুৎ তকলীফ বরদাস্ত করেও কাবুতে আনতে পারি নি, কাজেই গণ্ডা তিনেক ভাষায় তখন বাঙালীর বহু যুগের সাধনার ধন রসগোল্লার যে বৈতালিক গীতি উঠেছিল তার ফোটোগ্রাফ দি কি প্রকারে?

ফরাসীরা বলেছিল, 'এপাতাঁ!'

জর্মনরা 'ক্লর্কে!'

ইতালিয়ানরা 'ব্রাভো!'

স্প্যানিশরা 'দেলিচজো, দেলিচজো।'

আরবরা 'ইয়া সালাম, ইয়া সালাম।'

তামাম চুঙ্গীঘর তখন রসগোল্লা গিলছে। আকাশে বাতাসে রসগোল্লা। কিউবিজ্‌ম্ বা দাদাইজমের টেক্‌নীক দিয়েই শুধু এর ছবি আঁকা যায়। চুঙ্গীঘরের পুলিস-বরকন্দাজ, চাপরাসী-স্পাই সক্কলেরই হাতে রসগোল্লা। প্রথমে ছিল ওদের হাতে কিরাস্তি, আমাদের হাতে রসগোল্লা। এক লহমায় বদলাবদলি হয়ে গেল।

আফ্রিকার এক ক্রিশ্চান নিগ্রো আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ক্রিশ্চান মিশনরিরা যখন আমাদের দেশে এসেছিল তখন তাদের হাতে ছিল বাইবেল, আমাদের ছিল জমিজমা। কিছুদিন বাদেই দেখি, ওদের হাতে জমিজমা, আমাদের হাতে বাইবেল।'

আমাদের হাতে কিরাস্তি।

ওদিকে দেখি, ঝাণ্ডুদা আপনার ভুঁড়িটি কাউণ্টারের উপর চেপে ধরে চুঙ্গীওলার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলছেন—বাঙলাতে—'একটা খেয়ে দেখো। হাতে তাঁর একটি সরেস রসগোল্লা।

চুঙ্গীওলা ঘাড়টা একটু পিছনের দিকে হটিয়ে গম্ভীররূপ ধারণ করেছে।

ঝাণ্ডুদা নাছোড়বন্দা। সামনের দিকে আরেকটু এগিয়ে বললেন, দেখছো তো, সবাই খাচ্ছে। ককেইন নয়, আফিঙ নয়। তবু নিজেই চেখে দেখো, এ বস্তু কি।'

চুঙ্গীওলা ঘাড়টা আরো পেছিয়ে নিলে। লোকটা অতি পাষণ্ড। একবারের তরে 'সরি, টরি'ও বললে না।

হঠাৎ বলা-নেই-কওয়া-নেই, ঝাণ্ডুদা তামাম ভুঁড়িখানা কাউণ্টারের উপর চেপে ধরে ক্যাঁক করে পাকড়ালেন চুঙ্গীওলার কলার বাঁ হাতে, আর ডান হাতে থেবড়ে দিলেন একটা রসগোল্লা ওর নাকের উপর। ঝাণ্ডুদার তাগ সব সময়েই অতিশয় খারাপ।

আর সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলায়, 'শালা, তুমি খাবে না! তোমার গুষ্টি খাবে। ব্যাটা তুমি মস্করা পেয়েছ। পই পই করে বললুম, রসগোল্লাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, চিংড়িটা বড্ড নিরাশ হবে, তা তুমি শুনবে না'—আরো কত কি!

ততক্ষণে কিন্তু তাবৎ চুঙ্গীঘরে লেগে গিয়েছে ধুন্ধুমার! চুঙ্গীওলার গলা থেকে যেটুকু মিহি আওয়াজ বেরচ্ছে তার থেকে বোঝা যাচ্ছে সে পরিত্রাণের জন্য চাপরাসী থেকে আরম্ভ করে ইলদুচে মুসোলীনি—মাঝখানে যত সব কনসাল, লিগেশন মিনিস্টার, এম্বেসেডর প্লেনিপটিনশিয়ারি—কারুরই দোহাই কাড়তে কসুর করছে না। মেরি মাতা, হোলি ঘোসস, পোপঠাকুর তো বটেনই।

আর চিৎকার-চেঁচামেচি হবেই না কেন? এ যে রীতিমত বেআইনী কর্ম। সরকারী চাকুরেকে তার কর্তব্য-কর্ম সমাধানে বিঘ্ন উৎপাদন করে তাকে সাড়ে তিন মণী লাশ দিয়ে চেপে ধরে রসগোল্লা খাবার চেষ্টা করুন আর সেঁকো খাওয়াবারই চেষ্টা করুন, কর্মটির জন্য আকছারই জেলে যেতে হয়। ইতালিতে এর চেয়ে বহুৎ অল্পেই ফাঁসী হয়।

ঝাণ্ডুদার কোমর জাবড়ে ধরে আমরা জনাপাঁচেক তাঁকে কাউণ্টার থেকে টেনে নামাবার চেষ্টা করছি। তিনি পর্দার পর পর্দা চড়াচ্ছেন, 'খাবিনি, ও পরাণ আমার, খাবিনি, ব্যাটা—'চুঙ্গীওলা ক্ষীণ কণ্ঠে পুলিশকে ডাকছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে আমার মাতৃভূমি সোনার দেশ ভারতবর্ষের ট্রাঙ্ক কলে যেন কথা শুনছি। কিন্তু কোথায় পুলিশ? চুঙ্গীঘরের পাইক বরকন্দাজ ডাণ্ডা-বরদার, আস-সরদার বেকার চাকর-নফর বিলকুল বেমালুম গায়েব! এ কি ভানুমতী, এ কি ইন্দ্রজাল'!

দেখি, ফরাসী উকিল আকাশের দিকে দু'হাত তুলে, অর্ধনিমীলিত চক্ষে, গদ্‌গদ কণ্ঠে বলছে, 'ধন্য পুণ্যভূমি ইতালি, ধন্য পুণ্য নগর ভেনিস্! এ ভূমির এমনই পুণ্য যে হিদেন রসগোল্লা পর্যন্ত এখানে মিরাক্‌ল্ দেখাতে পারে! কোথায় লাগে 'মিরাক্‌ল্ অব মিলান'

এর কাছে—এযে সাক্ষাৎ জাগ্রত দেবতা, পুলিশ-মুলিস সবাইকে ঝেঁটিয়ে বের করে দিলেন এখান থেকে! ওহোহো, এর নাম হবে 'মিরাকুল অ রসগোল্লা।'

উকিল মানুষ, সোজা কথা প্যাঁচ না মেরে বলতে পারে না। তার উচ্ছ্বাসের মূল বক্তব্য, রসগোল্লার নেমকহারামী করতে চায় না ইতালীয় পুলিশ—বরকন্দাজরা! তাই তারা গা ঢাকা দিয়েছে!

আমরা সবাই একবাক্যে সায় দিলুম। কিন্তু কে এক কাষ্ঠ-রসিক বলে উঠলো, 'রসগোল্লা নয়, কিয়াস্তি'। আরো দু'চার পাষণ্ড তাতে সায় দিলে।

ইতিমধ্যে ঝাণ্ডুদাকে বহু কষ্টে কাউন্টারের এদিকে নাবানো হয়েছে। চুঙ্গীওলা রুমাল দিয়ে রসগোল্লাব থ্যাব্ড়া মুছতে যাচ্ছে দেখে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'ওটা পুছিস নি; আদালতে সাক্ষী দেবে—ইগজিবিট্ নাম্বা ওয়ান!'

ওদিকে তখন বেটিং লেগে গিয়েছে, ইতালিয়ানরা কিয়াস্তি পান করে, না রসগোল্লা খেয়ে গা ঢাকা দিয়েছে? কিন্তু ফৈসালা করবে কে? তাই এ-বেটিডে রিস্‌ক্ নেই। সবাই লেগে গিয়েছে।

কে এক জন ঝাণ্ডুদা'কে সদুপদেশ দিলে; 'পুলিশ-টুলিস ফের এসে যাবে। ততক্ষণে আপনি কেটে পড়ুন।'

তিনি বললেন, 'না, ঐ যে লোকটা ফোন করছে। আসুক না ওদের বড় কর্তা।'

তিন মিনিটের ভিতর বড় কর্তা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। ফরাসী উকিলদের বোধ হয় সব চেয়ে বড় যুক্তি ঘুষ। এক বোতল কিয়াস্তি নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঝাণ্ডুদা বাধা দিয়ে বললেন, 'নো।'

তার পর বড় সায়েবের সামনে গিয়ে বললেন, 'সিন্নোর, বিফো ইউ প্রসীড, অর্থাৎ কি না ময়না-তদন্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আপনি একটি ইণ্ডিয়ান সুইট্‌স চেখে দেখুন।' বলে নিজে মুখে তুললেন একটি। আমাদের সবাইকে 'আরেক প্রস্ত বিতরণ করলেন।

বড় কর্তা হয়তো অনেক রকমের ঘুষ খেয়ে ওকীবহাল এবং তালেবর। কিম্বা হয়তো কখনো ঘুষ খান নি। 'না বিইয়ে কানাইয়ের মা' যখন হওয়া যায় এবং স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র যখন এ-প্রবাদটি ব্যবহার করে গেছেন, তখন 'ঘুষ না খেয়েও দারোগা' তো হওয়া যেতে পারে।

বড় কর্তা একটি মুখে তুলেই চোখ বন্ধ করে রইলেন আড়াই মিনিট। চোখ বন্ধ অবস্থায়ই আবার হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফের। আবার।

এবারে ঝাণ্ডুদা বললেন, 'এক কৌটা কিয়াস্তি?'

কাদম্বিনীর মাক্ গম্ভীর নিনাদে উত্তর এলো, 'না। রসগোল্লা।'

টিন তখন ভোঁ ভাঁ।

চুঙ্গীওলা তার ফরিয়াদ জানালে।

কর্তা বললেন, 'টিন খুলেছ তো বেশ করেছ, না হলে খাওয়া যেত কি করে?' আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কি করতে? আরো রসগোল্লা নিয়ে আসুন।' আমরা সুড় সুড় করে বেরিয়ে যাবার সময় শুনতে পেলুম, বড় কর্তা চুঙ্গীওলাকে বলছেন, 'তুমিও তো একটা আস্ত গাড়ল। টিন খুললে আর ঐ সরেস মাল চেখে দেখলে না?'

কিয়াস্তি না রসগোল্লা সে বেটের সমাধান হল।

ইতালির প্রখ্যাতা মহিলা-কবি ফিলিকাজা গেয়েছেন,

"ইতালি, ইতালি, এত রূপ তুমি কেন ধরেছিলে, হায়।
অনন্ত ক্লেশ লেখা ও-ললাটে নিরাশার কালিমায়।"

আমিও তাঁর স্মরণে গাইলুম,

রসের গোলক, এত রস তুমি কেন ধরেছিলে, হায়!
ইতালির দেশ ধর্ম ভুলিয়া লুটাইল তব পায়!!

কি কি করতে নেই

সমাজে চলাফেরায় এবং দৈনন্দিন আচরণে কয়েকটি সাধারণ সূত্র মেনে চলতেই হয়। ভব্যতা বা শিষ্টাচারেরই এগুলো অপরিহার্য্য অঙ্গ। পরস্পর ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ যাতে না ঘটে, পরন্তু মানুষে মানুষে নৈকট্য যাতে বৃদ্ধি পায়—সে দিকে তাকিয়েই এ সকলের ব্যবস্থা। সামাজিক ক্ষেত্রে আলোচনা বা কথাবার্ত্তা কালে যে কয়টি মানা না মানলেই নয়, সেগুলো মোটামুটি এভাবে বলা যায়: (১) নিজের যুক্তি যতই বড় হোক, যতই খাঁটি হোক, অপরের যুক্তি বা বক্তব্য শোনবার ধৈর্য্য হারালে চলবে না; (২) একজন যখন কথা বলছেন, তখন বাধা সৃষ্টি করা মোটেই ঠিক নয়—পরন্তু নিজের বলবার পালা যতক্ষণ না আসছে, ততক্ষণ অপেক্ষা করাই সমীচীন; (৩) ষোল আনা নিশ্চিত না হয়ে কোন বিষয়েই অকারণ 'চ্যালেঞ্জ' বা প্রতিবাদ ঠিক নয়; (৪) যে বিষয় বলা হয়নি বা বলতে চাওয়া হয়নি, সে বিষয় ধরে নিয়ে তর্ক করা অনুচিত; (৫) নেহাৎ আপনার জন না হলে উপরে পড়ে কাউকে বিচক্ষণের মত উপদেশ বা পরামর্শ দিতে নেই; (৬) যাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলবে, তাঁর মনের সঙ্গে পরিচিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঠাট্টা বা উপহাস চলতে পারে না; (৭) যে কোন বৈঠক বা দরবারে নিজের 'অহংভাব'টাকে বড় করে তোলা যুক্তিযুক্ত নয়; (৮) আলোচনা বা বিতর্ককালে যে কথা কয়টি নিতান্ত প্রাসঙ্গিক, এর বেশী অযথা বলতে গেলেই ভুল করা হবে; (৯) পাঁচ জনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ কথা যেখানে চলছে, সেখানে জেরার মনোভাব পরিহারই উত্তম যুক্তি; (১০) সাক্ষাৎকারের মুহূর্ত্তে যেমন, কথাবার্ত্তা শেষে বিদায় নেবার সময়ও পারস্পরিক সম্ভাষণে ভুল করা অনুচিত।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার

[বাঙলা চলচ্চিত্রের প্রধান পুরুষ]

হাজার হাজার বছরের নয়, শত শত শতাব্দীর নয়, যুগ-যুগান্তেরও নয়, মাত্র কিছু বেশী পঁচিশটি বছরের ব্যবধান। প্রভেদ আকাশ-পাতাল। সেদিন যে ছিল সমাজের একটি বিশেষ কোণে, নির্জনে, অস্বীকৃত অবস্থায়, আজ তার স্থান সমাজের হৃদয়াসনে, বিশ্বের দরবারে, আজ তার ব্যাপক স্বীকৃতি শুধু তাই নয়, ঘূর্ণায়মান বিশ্বে আজ তার অসীম প্রভাব।

সিনেমার কথা বলছি। গিরিশ-হীন যুগের অভাব, অনটন ও নৈরাশ্য ঘুচিয়ে দিয়ে প্রাণভরা প্রতিশ্রুতি নিয়ে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' (তখন নাম ছিল ভীমসিংহ) নাটকের মাধ্যমে অধ্যাপক শিশিরকুমার যেদিন সূচনা করলেন রঙ্গজগতের নব-জন্ম, সেদিনও এই শিল্প প্রায় অন্ধকারেই ছিল।

অন্ধকার থেকে আজ সে এসেছে আলোয়, অখ্যাতির বেড়াজাল ভেদ করতে হয়েছে সে সমর্থ। আপন বিশেষত্বকে মণ্ডিত করেছে মহিমায়। কিন্তু ক্ষুদ্রতা থেকে বিশালতার অভিমুখে এই অভিযানের সম্ভাব্যতা আকাশ থেকে পড়ে নি, মাটি ফুঁড়ে ওঠে নি, দু'রাত্রির খেয়ালী স্বপ্নের বিলাস বিচরণের মধ্যেও ধরা পড়ে নি। এ জিনিষ সম্ভব হয়েছে কয়েক জনের অবদানে কয়েক জনের প্রাণপাত পরিশ্রমে, কয়েক জনের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ছেড়ে অনিশ্চিতের কাছে আত্মোৎসর্গে।

বাঙালী সেদিন সিনেমা বলতে নিউ থিয়েটার্স'ই বুঝত, নিউ থিয়েটার্স ছিল রঙ্গপ্রিয়দের একান্ত আপনার, বাঙালী জানত যে বাঙলা দেশ থেকে ধনপতি লক্ষ্মীন্দরের রক্তের উষ্ণতা এখনও হ্রাস পায় নি। আরও একটি কথা সেদিন বাঙালী জানত, আজও জানে, চিরদিনই জানবে—নিউ থিয়েটার্স হাজার হাজার কর্মীর কর্মক্ষেত্র হলে কি হবে—নিউ থিয়েটার্স মানে—একের মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠছে বহুর রূপ। তিনি—এই চিত্রজগতের একটি বিশেষ স্তম্ভ—স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার।

পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্রের বর্ণপরিচয়ই করিয়ে থাকে জাতির বর্ণ-পরিচয়। ইংরাজী শিক্ষা আমাদের সুরু হয় ফার্ষ্ট বুক থেকে। সেই দিন থেকেই মনে গাঁথা থাকে প্যারীচরণ সরকারের নাম। প্যারীচরণের পৌত্র নৃপেন্দ্রনাথ। ভারতের আইন-জগতের একজন বিরাট পুরুষ স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার। নৃপেন্দ্রনাথের মেজ ছেলে চলচ্চিত্রজগতে দধীচি বীরেন্দ্রনাথ।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই ভাগলপুরে জন্ম। কলকাতায় হিন্দু স্কুল ও হেয়ার স্কুলে শিক্ষালাভ। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পাশ করলেন আই-এস-সি। তারপর পশ্চিমে দিলেন পাড়ি। লণ্ডন থেকে ইঞ্জিনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে এলেন ফিরে। এখানে মার্টিন-বার্ণের সঙ্গে কিছুদিন শিক্ষানবীশ হিসেবে যুক্ত থেকে "বি, এন, সরকার" নামক নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের করলেন প্রতিষ্ঠা।

এই অবধি ঠিকই আছে, যেমন ঘরে যেমনটি হয়ে থাকে, স্যার এন-এন'এর ছেলের যেমন ভাবে জীবন কাটানো উচিত—যথাছন্দে ওজন করা। তারপরই হলো ছন্দপতন। এখানে পতন অর্থে স্খলন নয়—নতুন ছন্দের সংযোজন। সাগরের দিকেই নদী যাবে কিন্তু যথানির্দ্ধারিত পথে নয়—একটু ঘুরে, অন্য দিকে, জীবনের পূর্ণতার দিকেই পথ চলতে লাগলেন বীরেন্দ্রনাথ, গতিপথটাই গেল বদলে। গন্তব্যস্থল ঠিকই রইল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নিউ থিয়েটার্স'র হল প্রতিষ্ঠা। সুনিশ্চিত সোনালী ভবিষ্যৎ ছেড়ে অনিশ্চিত অন্ধকারে পা বাড়ালেন বীরেন্দ্রনাথ সরকার। তাঁর কল্যাণে চলচ্চিত্রজগত পেল পূর্ণতা, পেল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ। আর কি পেল? পেল অসংখ্য পরিচালক, সুরকার অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং অন্যান্য কলা-কুশলীদের নাম আমরা কারুরই এক্ষেত্রে করব না, আজকের দিনে যাঁরা এ জগতের স্তম্ভরূপে স্বীকৃত তাঁদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন নিউ থিয়েটার্স'র সৃষ্টি। তাই নামোল্লেখ থেকে বিরত রইলুম—কার নাম করতে কার নাম বাদ পড়ে থাকে এই জন্যে। নিউ থিয়েটার্স নিজের ইতিহাস আর সেই অলোক-সামান্য ঐতিহাসিক স্বয়ং বীরেন্দ্রনাথ।

ছেলেবেলা থেকেই অভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল। নিজেই বললেন "তখন কোন প্রেষ্টিজ এখানে ছিল না—সুখের বিষয় এখন হয়েছে।" আমার প্রশ্ন আজকের ছবিগুলির ব্যর্থতার কারণ কি? সরকার সাহেব বলেন, প্রধান কারণ পরিচালক ইচ্ছাসত্ত্বেও পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্যে অনেক ইচ্ছে কাজে লাগতে পারেন না। শত শত যুগান্তকারী ছবির প্রযোজক, বীরেন্দ্রনাথকে আমার শেষ প্রশ্ন "প্রযোজক" কথাটির সংজ্ঞা কি হওয়া উচিত—উত্তরে বলেন, প্রযোজক অর্থে শুধু টাকা দিয়ে খালাস হলেই চলবে না, প্রত্যেকটি বিভাগের তাঁকে খুঁটিনাটি জানতে হবে এবং বুঝতেও হবে।

পৃথিবীর বহু জায়গায় পরিভ্রমণ করে বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার আস্বাদ গ্রহণ করেছেন বীরেন্দ্রনাথ। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল চীন দেশ সূচনা চিত্রে একটি বিশেষ স্থান ও খ্যাতির অধিকারী, ছোটদের চিত্র-নাটিকা পরিবেশনেও তাঁরা সিদ্ধহস্ত। সারা বিশ্ব-ভারতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল এবং সে শ্রদ্ধা অন্তরের।

আজ সাময়িক কর্মবিরতি এসেছে নিউ থিয়েটার্স'র কিন্তু বিরতি তার আগামী দিনের জাগরণেরই পূর্ব্বাভাস। যে নতুনত্বের মঞ্জুষা তুলে ধরেছিলেন তাঁরই কৃপায় চলচ্চিত্র আবার নতুন করে পাবে সঞ্জীবনী শক্তি। প্রার্থনা করি, বীরেন্দ্রনাথ শতায়ু হোন ও কতকগুলি অকৃতজ্ঞের কর্কশ চীৎকার থামিয়ে দিন তাঁর নব নব কীর্তির অসামান্যতায়। প্রমাণ করে দিন যে প্রাণহীন ঐরাবতের নির্দ্ধারিত মূল্য এখনও এক লক্ষ টাকা।

জীবতাং জ্যোতিরেতু ছায়াং।

শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ

সন ১৩০৫ সালের শ্রাবণ মাসে তাঁহার জন্ম হয়। ১৯০৮ সালে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন সুরু করিলে সেই সংগ্রামের আহ্বানে সাড়া দিয়া মানভূম হইতে যাঁহারা ঐ আন্দোলনে সপরিবারে যোগদান করিলেন তাঁহাদের মধ্যে ৺ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত সর্ব্বাগ্রগণ্য, সেই সময় শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ দুই পরিবারের শিশু-পুত্র-কন্যাদের লইয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনিশ্চিত ও বন্ধুর পথে যাত্রা সুরু করেন।

এই সংগ্রামের আহ্বানে যে সকল কর্ম্মী আসিয়া যোগদান করিলেন তাঁহাদের সংগ্রামী জীবনের আশ্রয়স্থানরূপে "শিল্পাশ্রম" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে এবং মানভূমের দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা লাভের গণ-আন্দোলনমূলক বহু সংগ্রামের শিবিররূপে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশিষ্টতম স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই আশ্রমের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ সকলের 'মা'রূপে অভিহিতা। ১৯২১ সালে কংগ্রেসে যোগদান করিয়া ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির নেতৃস্থানীয়া পদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন।

১৯৩২ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ইনি কারাবরণ করেন। এই সময় ইংরাজ সরকার শিল্পাশ্রম বাজেয়াপ্ত করেন। ১৯৪০ সালে যুদ্ধবিরোধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হইলে তিনি এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া দণ্ডিতা হন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময় সিকিউরিটি বন্দীরূপে তিনি প্রায় দুই বৎসরকাল কারাবাস করেন। এই সময়ও শিল্পাশ্রম সরকার কর্ত্তৃক পুনরায় বাজেয়াপ্ত হয়।

ভাষা সমস্যা ছাড়াও স্বাধীনতা লাভের পর মানভূম জেলায় দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যসমস্যা, নাগরিক অধিকার হরণ ও সংখ্যালঘুদের উপর দমনমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্যা লইয়া ১৯৪৯-৫৬ সালের মধ্যে জেলাব্যাপী যে সকল গণ-অন্দোলন ও সত্যাগ্রহ পরিচালিত হয় তাহাতে ইনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।

লাবণ্যপ্রভা ঘোষ

মানভূমের ভাষা ও সংস্কৃতি দমনের বিরুদ্ধে যে, ঐতিহাসিক "টুসু" সত্যাগ্রহ পরিচালিত হয়—সেই সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্য পাঁচ দফা অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে ১৩ মাস কারাদণ্ড এবং ৬০০৲ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৪ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। একীকরণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লোকসেবক সঙ্ঘের পরিচালনাধীনে যে এক সহস্রাধিক পুরুষ ও মহিলা সত্যাগ্রহী পদব্রজে কলিকাতা অভিযান করেন, তাহাতে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ নেতৃত্ব করেন।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস

ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালী ভূপেন্দ্রনাথ দাস সেখানকার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং য়্যাডভোকেটরূপে এক কালে ব্রহ্মদেশে সুনাম ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। নানাবিধ লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রেঙ্গুনের উপর জাপানীদের আক্রমণ সুরু হ'লে তিনি তাঁর দীর্ঘ কালের প্রিয় কর্মস্থল ছেড়ে এসে কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে বাস করতে থাকেন।

ঢাকা জেলার শুভড্যা একটি বৰ্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তথায় এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত কায়স্থ-বংশে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ৺পার্বতীনাথ দাস সে অঞ্চলে সুপরিচিত ছিলেন। পরোপকার ও অন্যান্য গুণের জন্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল যথেষ্ট। ছয় পুত্রের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন দ্বিতীয়। ছাত্র-জীবনেই তাঁকে অভাব-অনটনের সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। মেধাবী ছাত্র ভূপেন্দ্রনাথ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জুবিলি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে পনের টাকা মাসিক বৃত্তি (বিভাগীয়) পান। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ হতে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কুড়ি টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তারপর ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পাশ করেন বি, এ, পরীক্ষা। পাঠ্যাবস্থায় গৃহ-শিক্ষকের কাজ করে এবং বৃত্তির টাকা দিয়ে নিজের পড়ার খরচ চালিয়ে কনিষ্ঠ সহোদরদের পড়ার খরচাদির জন্যেও টাকা দিতেন। তাঁর বিলাসিতা ছিল না এবং তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে পারতেন।

বি, এ, পাশ করার পরে ভূপেন বাবু কিছু কাল ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ হাই স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের কাজ করেন। আদর্শ শিক্ষাব্রতীরূপে তাঁর সুখ্যাতি ছিল যথেষ্ট। ইতিমধ্যে তিনি পাশ করলেন বি, এল, পরীক্ষা। ভাগ্যান্বেষণে চলে গেলেন বাংলা দেশ ছেড়ে সুদূর ব্রহ্মদেশে। রেঙ্গুনে য়্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে কেরাণীর কাজে নিযুক্ত হলেন। দু' ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত কাজ সেরে ফেলে তিনি ছুটি হওয়ার সময় পর্যন্ত অমৃতবাজার পত্রিকা পড়তেন। অফিসের মাদ্রাসী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তা দেখতে পেয়ে অপরের অসমাপ্ত কাজগুলো তাঁর ওপর চাপালেন। তিনি প্রতিবাদ করলেন; তা নিষ্ফল হওয়ায় ছেড়ে দিলেন কেরাণীর কাজ। এর পর ভূপেন বাবু বেসিন সহরে মিউনিসিপাল হাই স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত

হন। ওকালতি পাশ করেও তিনি তখন পর্যন্ত উকিল হন নি; কেন না শিক্ষাব্রতীর কার্যেই ছিল তাঁর আকর্ষণ ও অনুরাগ। এখানে প্রায় সাত বছর (১৯০৫ খৃঃ থেকে ১৯১২ খৃঃ পর্যন্ত) শিক্ষকতা করে তিনি যশ এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর বর্মী ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই উত্তর কালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। স্বাধীন ব্রহ্মদেশের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট ডক্টর বা, উ, এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ উ, এ, মং ভূপেন বাবুর ছাত্র। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বেসিন মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলটি গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলে পরিণত হল। ভূপেন বাবুরই ন্যায্য দাবী ছিল হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হওয়ার। কিন্তু সে দাবী অগ্রাহ্য করে কর্তৃপক্ষ বিলেত থেকে মিঃ ই সি ডাউন নামে একজন লণ্ডন ম্যাট্রিক পাশ করা সাহেবকে এনে বসালেন সেই পদে। স্বাধীনচেতা তেজস্বী ভূপেন্দ্রনাথ সে অন্যায় নীরবে নত শিরে মেনে নেবেন কেন? বিদেশী সরকারের অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করে একখানা কড়া চিঠি লিখে ইস্তফা দিলেন কাজে।

স্বাধীন ওকালতি ব্যবসায় তাঁকে বেছে নিতে হল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বেসিনে ওকালতি সুরু করলেন। অল্পকাল মধ্যে তাঁর পসার হল ওকালতিতে। ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হলেন। অ্যাডভোকেটের শ্রেণীভুক্ত হয়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। দেওয়ানী এবং ফৌজদারী উভয় বিভাগেই তাঁর পসার হল। আশাতীত আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ সৎ কার্য্যে এবং আত্মীয় ও অনাত্মীয়কে সাহায্য দানে ভূপেন বাবুর ব্যয়ও বৃদ্ধি পেল যথেষ্ট। একাধিক কর্মক্ষেত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠা লাভ হল। বেসিন বার এসোসিয়েশিয়েশনের সহ-সভাপতি এবং মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। একটা শ্মশানের ব্যবস্থা করে তিনি স্থানীয় হিন্দু সমাজের বহু দিনের অসুবিধা দূর করেন। বেসিন শহরের কালীবাড়ী, জগন্নাথবাড়ী, গৌরাঙ্গ-আশ্রম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানেও ভূপেন বাবুর দান উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। ব্রহ্মের ব্যবস্থাপক সভায় ভূপেন বাবু প্রথমে নির্ব্বাচিত হন বিনা প্রতিযোগিতায় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে। পরবর্তী দুইটি নির্বাচনে তিনি প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে আরও দুই বার আসন পেলেন আইন-সভায়। দক্ষ ও স্পষ্টবাদী পার্লামেণ্টারিয়ান বলে তাঁর সুনাম শুধু ব্রহ্মদেশে নয়, ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি ছিলেন একটা ভারতীয় দলের লীডার বা নায়ক। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মে অন্তরীন ও কারাবদ্ধ ভারতীয় রাজবন্দীদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করে এবং তাদের মুক্তির জন্যে ভূপেন বাবুর কার্য্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় ষোল বছর তিনি ছিলেন ব্রহ্মের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য।

কর্মব্যস্ত জীবনেও তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবা করে এসেছেন। তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রস-রচনাদি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভূপেন বাবুর রচিত উপন্যাস "সাগরবক্ষে" এবং "বহ্নিপ্রেম" (গল্প সংগ্রহ) প্রকাশিত হয়েছে। শেষোক্ত গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি একজন সুগায়ক এবং ভাল অভিনেতা। ঢাকা জগন্নাথ হলের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন।

গত ছয় বৎসর কাল ভূপেন বাবু ব্লাডপ্রেসার রোগে শয্যাশায়ী। তিনি ডাঃ অমল রায়চৌধুরীর চিকিৎসায় আছেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় "বহ্নি-প্রেম" পুস্তকের ভূমিকায় যা লিখেছেন, তা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের নাম বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাজে অপরিচিত নহে। ব্রহ্মদেশে বেসিন নগরে বহু কাল ধরিয়া ইনি ওকালতী করেন এবং প্রায় চৌদ্দ বৎসর কাল ব্রহ্মদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইনি ব্রহ্ম-প্রবাসী বঙ্গ-সন্তানদের মধ্যে বঙ্গভাষার সেবাতেও আত্মনিয়োগ করেন।

"প্রথম নিখিল ব্রহ্ম-প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যখন আমি ব্রহ্মদেশে যাই, তখন ইঁহার সহিত আমার পরিচয় হয় এবং ঐ সময়ে ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—ব্রহ্মদেশীয় শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। কিঞ্চিদধিক আড়াই বৎসর কাল এই পদ অলঙ্কৃত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সেবা করেন। এই সময়ে ইঁহার রচিত ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী জীবন সম্বন্ধে "সাগরবক্ষে" নামক একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস প্রকাশিত হয়। সাহিত্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে বহু প্রবন্ধ এবং ব্রহ্মদেশের জীবন ও সাধারণ বাঙ্গালী জীবন অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি ছোট গল্পও ব্রহ্মদেশে ও বঙ্গভূমিতে প্রকাশিত নানা পত্র-পত্রিকায় ইনি প্রকাশিত করেন।...ব্রহ্মদেশের জীবন ও উপাখ্যান লইয়া রচিত কতকগুলি গল্পের বেশ একটু বিশিষ্টতা আছে। অন্য গল্পগুলি আমাদের সমাজের কথা লইয়া। সাধারণের কাছে এগুলি ভালই লাগিবে বলিয়া আমার মনে হয়। কতকগুলি গল্প আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের সাহিত্য সাধনা জয়যুক্ত হউক, আমি ইহাই কামনা করি।"

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এম্-এ, এল-এল, বি, এম, বি-ই

[রেজিষ্টারার, কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগ]

বাড়ীটির নাম "ময়দান্ এণ্ড" অর্থাৎ প্রান্তর প্রান্তে। সার্থক-নামা বাড়ী। গেট্ পেরিয়েই চোখে পড়ে শ্যামল প্রান্তরের প্রান্তভাগ ধ'রে বিচিত্রপুষ্পের বর্ণবৈচিত্র্য, সানবাঁধান পথ দু' পাশের স্বাভাবিক প্রকৃতি-সম্পদের বুক চিরে চলে গেছে। তারই প্রান্ত ভাগে ছোট 'ভাগাঙ্গ বাড়ী'। বাড়ীটার বয়স বছর দশেকের কাছাকাছি হ'লেও সর্বাঙ্গে নবীনত্বের আভা ঝরে পড়ছে।

শুধু বাড়ী নয়, বাড়ীর মালিকটিও চিরনবীন। পঞ্চাশের সীমানা পেরিয়েছেন বেশ কিছুদিন হ'ল, তবুও বানপ্রস্থ গ্রহণের নির্জীবতা নেই। বনে গিয়ে সাধনা করতে চান না।

তবে সাধনা করেন—সেটা কর্মের সাধনা। 'ধর্ম' মানে যদি এই হয়, যা মানুষকে ধারণ ক'রে রাখে বা মানুষ যাকে ধারণ ক'রে বেঁচে থাকে, তবে শচীন্দ্রনাথ পরম ধার্মিক। কর্মকেই যিনি ধর্মজ্ঞান করেন, এমন মানুষ বাঙলা দেশে সুলভ নয়। সেই সুদুর্লভ গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হ'য়েছিলাম; মুগ্ধ হ'য়েছিলাম কাজকে মানুষ এতো ভালবাসতেও পারে!

'রেজিষ্টারের' উচ্চনাদ (!) এবং পদমর্যাদায় ভীত না হ'য়ে মানুষটির কাছে যদি এগোন যায়, সত্যি অভিভূত হ'তে হয়। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে হাইকোর্ট এবং আইনের জটিলতার মধ্যে আত্মনিমজ্জন, বাকীটুকু আনন্দবিলাসী-শচীন্দ্রনাথ।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাক্ষাৎ-প্রত্যাশী হ'য়ে গিয়েছিলাম একদিন। ঢুকেই একটু ভীত হ'য়ে পড়লাম—সাহেব-বাড়ী নয় তো? মাঝে মাঝে ইংরেজী কথাবার্তা ভেসে আসছে। গৃহকর্তা কন্যার সঙ্গে কথা বলছেন।

বাইরের ঘর, বিলিতি কায়দায় সাজান। প্রতি মুহূর্তেই প্রতীক্ষা করছি, সাহেবী-পোশাকে গৃহকর্তা দেখা দেবেন। দেখা দিলেন, তবে গরদের ধুতি পরে গায়ে কোঁচার খুঁটটা জড়িয়ে। একটু হকচকিয়ে গেলাম। এই বেশে এই বাড়ীর গৃহকর্তা দেখা দেবেন ভাবি নি। সরলতায় মুগ্ধ হলাম। "কি হে! কি খবর? ভালো তো সব, একটু দেরী হ'য়ে গেলো—পুজোয় বসেছিলাম।"

"পুজো?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

"অবাক হচ্ছো যে! বাড়ীর ছোট মেয়েটি পর্যন্ত দু' বেলা পুজো করে। ব্রাহ্মণের বাড়ী—পুজো করবো না কি গো?" অবাক লাগলো। কথাবার্তায় জানলাম বাড়ীতে প্রতি বছর কালীপুজো হয়। এই উপলক্ষে এবং দুর্গাপুজা উপলক্ষে তিনি মনোমুগ্ধকর কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করে থাকেন। চণ্ডীপাঠে তাঁর খ্যাতি সর্বজনস্বীকৃত। শোবার ঘরে খাটের মাথায় মা কালীর ছবি খাটের সঙ্গে লাগানো। কালীভক্ত শচীন্দ্রনাথ! প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শের কী নিখুঁত অনুশীলন! এক দিকে 'ডিনার'—ককটেল্ পার্টি, অন্য দিকে আহ্নিক করার প্রতি আত্যন্তিক বিশ্বাস। এক দিকে বিলিতি সুরের সঙ্গে 'ডান্স' (মনে মনে!), অন্য দিকে ঢাকীর বাজনা শুনে মাতোয়ারা হ'য়ে পড়া—দুই বিপরীত আদর্শের এমন সমন্বয় দুর্লভ বই কি!

পরিবার-জীবন নিয়ে শচীন্দ্রনাথ গর্বিত। স্ত্রী-র প্রসঙ্গে শ্রদ্ধানত চিত্তে স্বীকার করলেন শুধু নামে নয়, গৃহের যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় সত্যকা'র 'রাজলক্ষ্মী' তিনি। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের প্রসঙ্গে শচীন্দ্রনাথ একেবারে পঞ্চমুখ নয়, শতমুখ হয়ে উঠলেন। চার পুত্র ও তিন কন্যার গর্বিত পিতা শচীন্দ্রনাথ।

চা খেতে খেতে তাঁর জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করি। হাওড়া শিবপুরে তাঁর পূর্বপুরুষের বাস ছিল। পিতা রায়বাহাদুর গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ সন্তান তিনি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের মধ্যে ডাঃ জ্যোতিরিন্দ্র (বর্তমানে মৃত), B. C. S-এর ভূতপূর্ব কর্মচারী শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ এবং D. I. G (Bengal) ও I. G. (Rajasthan) বর্তমানে ব্যারিষ্টার শ্রীরাঘবেন্দ্র। পিতা গোপালচন্দ্র ছিলেন জেলা জজ। ১৯০১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী বেলা ৩-৪৫ মিঃ বরিশালে শচীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। মিত্র মেন স্কুলে শিক্ষালাভ শেষ ক'রে তিনি স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকেই আই, এ, এবং বি, এ, পাশ ক'রে ১৯২২ সালে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে এম, এ, পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯২৩ সালে আইন পাশ করে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯২৯ সালে এসিষ্টেন্ট রেজিষ্টার নিযুক্ত হন। বিবাহ হয় ১৯২২ খৃঃ এপ্রিল মাসে মেদিনীপুর নিবাসী জাড়াগ্রামের শ্রীসুধীরপতি রায়ের কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে।

কর্মজীবনে শচীন্দ্রনাথ নতুন কীর্তি স্থাপন করলেন। হাইকোর্টের ইতিহাসে এই প্রথম আদিম বিভাগে একজন উকিল এসিষ্টেন্ট রেজিষ্টারের পদে উন্নীত হলেন। তারপর_ কর্মোন্নতির জয়যাত্রা।

ধাপে ধাপে কর্মভক্ত শচীন্দ্রনাথ Asst. Master Referee. Deputy Registrar প্রভৃতি আরও কয়েক ধাপ পেরিয়ে সর্বশেষে Registrar পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। প্রত্যেক পদেই তাঁর দ্বারা নতুন ইতিহাস রচিত হ'ল।

এই পরিচিতি শচীন্দ্রনাথের কর্মজীবনের সামগ্রিক পরিচয়ের বোধ হয় শতাংশের একাংশ। স্কাউট আন্দোলনের পুরোধায় শচীন্দ্রনাথ। আজও অদম্য উৎসাহে স্কাউট আন্দোলনের নেতৃত্ব করে থাকেন। 'Setur Star'এর সম্মান লাভ স্বাধীন ভারতে দুর্লভ। সেই সম্মানের প্রথম অধিকারী তিনি। তা ছাড়া M. B. E. উপাধি লাভ করেছিলেন সিভিক গার্ডের কর্মকুশলতার জন্ম। যুব আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্ম তিনি লাভ করেন 'কাইজার-ই-হিন্দ' ইত্যাদি বহু সম্মান। যুদ্ধের সময় 'সিভিক গার্ড'এর পরিচালক হয়েছিলেন। তা ছাড়া A. A. B. B. O, A. University Institute, পশ্চিমবঙ্গ মল্লযুদ্ধ সমিতি ইত্যাদি বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রিয় সভাপতি। এই সব পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা অত্যন্ত দুর্লভ। এই সুদুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী শচীন্দ্রনাথ। খেলাধুলা—তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই থাকুক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের অধীনেই হোক্, শচীন্দ্রনাথ সমান উৎসাহে তাতে যোগ দেন। এ ছাড়া ডিনার-পার্টি, ডান্স—সর্বত্রই তাঁর উপস্থিতি ও আগ্রহ সমান ভাবে সক্রিয়। বিলিতি মহলের কেতাদুরস্ত আদব-কায়দা সম্পর্কে তিনি যেমন নিখুঁত ভাবে সচেতন, ঠিক তেমনি সচেতন নিতান্ত দেশীয় ঘরোয়া অনুষ্ঠান সম্পর্কে অর্থাৎ যেখানে যেটুকু প্রয়োজন, যেভাবে প্রয়োজন, শচীন্দ্রনাথ তা জানেন এবং মেনে চলেন। 'অনুষ্ঠান' পেলে তিনি ক্লান্তিকে যান ভুলে। সারা রাত জেগে গান শুনতেও যেমন দ্বিধা নেই, আবার 'মোটর রেস' পরিচালনায় জন্ম সারা রাত জেগে পরের দিন যথারীতি 'কোর্টে' যেতেও ভয় নেই বা বিরক্তি নেই। তাঁর জীবন-অভিধানে 'ক্লান্তি' শব্দটি অনুপস্থিত। বলেছিলাম, "কাজ একটু কমিয়ে দিন। এতো চাপ—!"

লাফিয়ে উঠলেন, "বলো কি? মরে যাবো যে তা' হ'লে। Function আর কাজ নিয়েই তো বেঁচে আছি।"·····

নেশার মধ্যে সিগারেট উপস্থিত স্থগিত—ছাড়বার চেষ্টা চলেছে। চা খান, তবে অপরিমিত নয়। 'মজলিশ' জমাতে পারেন সহজেই, তার কারণ সহৃদয়তা। ভালো গান গাইতে পারেন এখনও। এতো চিৎকার ক'রেও কণ্ঠের দরাজভঙ্গী নষ্ট হয়নি একটুও। আবৃত্তি, থিয়েটার (বাঙলা, ইংরেজি, সংস্কৃত) করতে পারেন। ছাত্রাবস্থায় এ সবের 'পাণ্ডা' ছিলেন। পরেও তাঁকে 'পালের গোদা' বলা হ'তো। সেজন্ম বহু প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার ও সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পেয়েছেন। সিনেমা দেখতে ভালবাসেন—একা নয়, সপরিবারে। বই পড়তে চান না, বলেন সময় পাই না। বাঙলায় এম, এ, হ'লেও ইংরেজির ভক্ত। বলেন তিনি: "আগেকার দিনে বাঙলায় এম, এ, অর্থাৎ এক লাইনও বাঙলা লিখতে হোতো না। প্রশ্ন ইংরেজীতে, উত্তরও ইংরেজীতে।" অভিনেতা-অভিনেত্রী, খেলোয়াড়, ব্যারিষ্টার, জজ, প্রফেসার, কেরাণী, ঘটক, ফটোগ্রাফার প্রেস-রিপোর্টার সকলের সঙ্গেই বন্ধুভাবাপন্ন। প্রত্যেকেরই পরিচয় করিয়ে দেন সবিস্তারে ফলাও ক'রে, অন্যের সঙ্গে। কসশ্রুতিও হয় এই যে, তাতে মনে মনে সকলেই খুশী হয়। পঞ্চাশের দ্বারে এসেও কর্মের শৈথিল্য কোনও দিকে এতটুকু নেই। বাঙলা দেশে এমন কর্মভক্ত মানুষ যদি আরও পেতাম আমরা। আক্ষেপ করতে হয়। সর্বকর্মক্ষেত্রের যোগ্য নেতা সহৃদয় মানুষ শচীন্দ্রনাথ·····

[মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত]

অতিরিক্ত কর-ধার্য্যের জের

কর-ধার্য্যের প্রশ্ন যখন উঠে, তখন একতরফা রাষ্ট্রের আর্থিক প্রয়োজনের দিক লক্ষ্য করলেই চলে না। এর পরিণতি কিরূপ দাঁড়াবে, বা প্রতিক্রিয়া কোন্ কোন্ দিকে হ'তে পারে, গভীর গবেষণা মারফত সেগুলো দেখে নেওয়া দরকার আগের ভাগেই। মোটের উপর, সব ক্ষেত্রেই মাত্রাতিরিক্ত কর ধার্য্য হলে, বিশেষ করে আয়কর যদি বাইরের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় করে নির্দ্ধারিত না হয়, তবে ফল বিপরীত হয়েও দাঁড়াতে পারে।

বিলেতে একটি চিন্তা আরম্ভ হয়েছে—অতিরিক্ত আয়কর ধার্য্য থাকায় সে দেশ থেকে প্রতিভাবান ও বিদেশী অনেক মানুষ এরই ভিতর চলে গেছেন অন্যত্র। বেশীর ভাগই যেয়ে কাজ গ্রহণ করছেন মার্কিণ ভূমিতে—কারণ সেখানে আয়কর দিয়েও যা রোজগার হয় কিংবা অর্থ জমা থাকে, ইংল্যাণ্ড থেকে বেশী। উদ্যোগী ও কর্ম্মক্ষম বৃটিশ যুবকদের ভেতরই এই দেশান্তর গমনের তৎপরতা অধিক লক্ষ্য করা যায়। অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও হিসাব করে দেখেছেন—বৃটেনে আয়কর ও অন্যান্য করের মাত্রা যেরূপ, তাতে কোম্পানী গড়ার সময় বেশ ভেবে-চিন্তে করা দরকার।

প্রতি মাসেই বলতে গেলে বিভিন্ন সংস্থা থেকে এরূপ সংবাদ পাওয়া যায়—তরুণ বৃটিশ বিজ্ঞানবিদগণ জন্মভূমি ছেড়ে কাজ নিচ্ছেন যেয়ে উত্তর আমেরিকায়। ব্যাপার কি? অনুসন্ধানে জানা গেছে—আয়করের মাত্রাধিক্যই এর জন্যে প্রধানতঃ দায়ী। অথচ এইটি ঠিক—এভাবে কর্ম্মকুশলী ও বিশেষজ্ঞদের হারিয়ে বিভিন্ন শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে পারে না। তাছাড়া, এ পরিস্থিতি চলতে থাকলে গবেষণা ও শিক্ষা বিভাগের কাজও ব্যাহত হতে বাধ্য।

অবশ্য বর্দ্ধিত হারের কর এড়াবার জন্যেই যে উদ্যোগী মানুষ বহির্দেশে যেয়ে থাকেন, এইটি সব সময় সত্যি নয়। দেশ থেকে দেশান্তরে রুজি রোজগার ও সুনাম অর্জ্জনের সুযোগ যদি অধিক থাকলো, তবে ঝোঁক সে দিকে না যেয়ে পারে না। কর-ভারের প্রশ্নটি এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রধান, এইটি তা হ'লেও অনস্বীকার্য্য।

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

পঞ্চম সর্গ

"মোহ"ই সর্বস্ব-চোর। প্রথমেই তিনি হরণ ক'রে নেন···
মানুষের বুদ্ধি।

তিনি অত্যন্ত সঙ্গোপনে বাস করেন—
"কায়স্থ"দের মুখে এবং তাঁদের কলমের ডগায়। ১

চাঁদের কলার মত দিনে দিনে পূর্ণ হ'য়ে যেই পৃথিবীর বুকের উপর ফলে উঠল সোনার ফসল, অমনি এক মুহূর্তে সেই সোনার সম্পত্তিটিকে গ্রাস করবেই করবে "দিবির" রাহুর কলাভ্যাস। দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে যাবে সব।

"কায়স্থে"র আর একটি নাম 'দিবির'। 'দিবির'দের কিন্তু আবার বৈশিষ্ট্য আছে। এঁরা মদ্যপান করেন না, মাংস খান না, পরের ধন গায়েব না ক'রে চলেন না, পরের অপকার ছাড়া উপকার করতে জানেন না, স্বর্গে গিয়ে চীৎকার ক'রে কাঁদেন। ২

যাঁদের সম্মোহ খসে পড়েছে, এমন সব যোগীদের,—থাকতে পারে সংসার-কলা সম্বন্ধে জ্ঞান, কিন্তু বহু ও বিপুল যত্ন উঠিয়েও তাঁদের কারো পক্ষেই দিবির-কলাটিকে পূর্ণ জেনে ফেলা অসাধ্য।

কাল গ্রাস করেন না, পৃথিবীর সমস্ত জনতাকে গ্রাস ক'রে বসে থাকেন দিবিরের দল। এঁরা—শত শত কূট নীতির শিবির, জনগণের ধন লুণ্ঠন করে এঁরা ধনের খনি হয়ে ওঠেন, এঁরা যম-যামিনীর তিমির। ৩-৪

বৎসগণ, জেনে রেখো,—

এঁরা-ই কালপুরুষ। এঁদেরি ভীমদণ্ডের আঘাতে মানুষ মরে। মুদ্রা-গণনার গণনায় এঁরা পিশাচ। ভূর্জপত্রের ধ্বজা উড়িয়ে এঁরা ঘুরে বেড়ান ধরাধামে। কুটিল এঁরা, যমরাজের বিষাণ-কোটির মত কুটিল। যাঁরা এঁদের বিশ্বাসের পাত্র তাঁদের গলায় যমের দড়ি ফাঁসবেই। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ৫-৬

এঁদের কলমের ডগা থেকে যে মসীবিন্দু ঝরে সেগুলি রাজ্যলক্ষ্মীর যেন অঞ্জন-মাখা অশ্রুবিন্দু। কায়স্থেরাই তাঁকে লুঠ ক'রে একেবারে খিন্না করে ছাড়েন। তিনি কাঁদেন। ৭

অঙ্কন্যাস বিষয়ে কায়স্থেরা মহা বিচক্ষণ। সে এক বিষম আচরণ! আঁক কষতে কষতে আঁচড় টানা তো নয়, যেন আঁকা হয়ে যায় মায়া-সুন্দরীর কুটিল চূর্ণ-কুন্তল···খাতার পাতায়। এমন জীব জগতে বিরল, যাকে না বোকা বানিয়েছেন এই কায়স্থের দল। ৮

কায়স্থ আর ইন্দ্রিয়···দুই-ই সমান। মায়ার খেলায় ভুলিয়ে, বিশ্ব ঠকিয়ে এই দুটিতেই সঞ্চয় করেন কামনার ধন। বিষয়গ্রাম ···সমস্তই গ্রাস করেন; এক নাগাড়ে ধ্বংস করেন মানুষকে। ৯

কুটিল এঁদের লিপি-বিন্যাস। যেন কালসাপ। দেখলেই মনে হবে, কায়স্থদের ভূর্জপত্রের শিখরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে সাপ। ১০

বৎসগণ,

এই দিবিরেরাই চিত্রগুপ্তের সজ্ঞ। গুপ্তিবিষয়ে এঁরা পোক্ত। একটিমাত্র রেখার বিনাশ ঘটিয়ে এঁরা স-হিতকে র-হিত ক'রে দিতে পারেন। বিচিত্র এঁদের প্রতিভা! ১১

দিবির-দের যে সমস্ত প্রসিদ্ধ কলা সাধারণতঃ পৃথিবীতে সচল, সেগুলির সংখ্যা স্বল্প। এঁদের গূঢ়কলাগুলির কাছে কিন্তু সেই প্রসিদ্ধেরা নিষ্প্রভ। গূঢ়গুলিকে জানেন···হয় কলি নয় কৃতান্ত। ১২

ষোলোটি বিভিন্ন রকমের এঁদের কলা। যথা:—

(১) কথার ঘোরপ্যাচ ক'রে দলিলাদি সম্পাদন করা।
(২) সমস্ত হিসাবপত্র গায়েব করার বিদ্যা।
(৩) মনুষ্যের অন্তর্বিগাহন।
(৪) লোক-সংগ্রহ।
(৫) ব্যয়-বিবর্ধন।
(৬) মাত্র গ্রহণযোগ্যটুকুর নির্ণয় করা।
(৭) দেয় ধন আদায় করা।
(৮) অবশিষ্টটুকুর জন্যে বিবেক দেখানো।
(৯) ঠিক দিতে দিতে সর্বভক্ষণ।
(১০) যা কিছু উৎপন্ন হয়, সেটিকে আত্মসাৎ করা।
(১১) নষ্ট হয়ে গেছে, বিশীর্ণ হয়ে গেছে, ইতি প্রদর্শন।
(১২) খরিদ করতে গিয়ে ফাউ আদায়।
(১৩) ভোজনচর্য্যাদি-দ্বারা ক্ষয় করা।
(১৪) নিঃশেষে দলিলাদি দহন।
(১৫) শেষ পর্যন্ত প্রমাণ নাশ। এবং
(১৬) ভূর্জগ্রহণ বিষয়ে ধনহারীকে নিরালোক করা।

চাঁদের কুটিল ষোলোটি কলার মত দিবিরদের এই কলা-রাশি। কলঙ্কের অন্ত নেই। সর্বদাই যেন যক্ষ্মায় এঁরা ধুঁকছেন। ভোল বদলান রহি রহি। সুদে-আসলে কেঁপে ওঠেন। ১৩-১৭

এঁর সমাজের সর্বোচ্চ স্থানে বিরাজ করেন অর্থাৎ কূটস্থ। এঁদের

একটি মাত্র সিদ্ধমন্ত্র রয়েছে, সেটি হচ্ছে,—'না'। গুরুদের মত এঁরা মায়া-বিশারদ অর্থাৎ হাঁ-কে না করেন, না-কে হাঁ। এক মুহূর্তে বৃত্তিচ্ছেদ করতে ওঁদের বাধে না। ১৮

এই অখিল মহীতলে পুরাকালে বিচরণ করতেন জনৈক জুয়োড়ী। অত্যন্ত গরীব হয়ে পড়েছিলেন। এক দিন ছিল যখন তাঁর ধন-দৌলত, পশু-গবাদি, পোষাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই ছিল; এখন সব গেছে। পাছে আবার তিনি চৌর্যের পথ ধরেন, এই ভয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন বন্ধুরাও। পুণ্যের জোরে একদা তিনি পৌঁছে যান উজ্জয়িনীতে। স্নানাদি সমাপন ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় তাঁর চোখে পড়ে···বিজন এক শিবের দেউল। ১১-২০

শূণ্যায়তনে প্রবেশ করলেন জুয়োড়ী। কাজকর্মে ইতি দিয়ে, অবিশ্রান্ত চন্দন ফুল আর ফল চড়িয়ে তিনি সেবা করতে লেগে গেলেন বরদ দেব মহাকালকে। কপালে যদি থাকে, মিলতেও তো পারে বর। ২১

রাত্রির পর রাত্রি কাটে নিদ্রাহীন। সারা দিন স্তোত্রপাঠ, জপ, গান, দীপদান, আর বিপুল ধ্যান। জুয়োড়ীর বিরাম নেই আরাধনার। দুঃসহ দৌর্গত্য নাশের আশায় সে কী তাঁর আপ্রাণ সেবা!

শত শত শুভকর্মের মধ্য দিয়ে এই ভাবে তাঁর দিন কাটছে, দিনের পর দিন; একদিন হঠাৎ ভক্তি-প্রসাদিত হয়ে ভবভয়হারী ভগবান ভূতপতি যেই "পুত্র, এই নাও,···" মাত্র এইটুকু বাণী উচ্চারণ করেছেন, সেই কপালমালীর জটাশিখরে নড়ে উঠলো একটি নরকপাল, মুহুর্মুহুঃ নড়ে চড়েই যেন সচেতন ক'রে দিলেন মহাদেবকে।

বরদানের অর্দ্ধপথেই থেমে গেলেন রুদ্র। মড়ার খুলি আবার বলে কি? স্থগিত হয়ে গেল দেবতার আশীর্ব্বাণী। জুয়োড়ীর পুণ্যের ঘর তখনও বোধ হয় অধিকার ক'রে বসেছিল দারিদ্র্য··· তাই। ২২-২৫।

স্নান করতে চলে গেলেন জুয়োড়ী।

বিজন দেউল।

ধূর্জ্জটির দশন থেকে সহসা ঝরে পড়ল জ্যোৎস্না। যেন প্রথমেই তিনি করিয়ে দিলেন গঙ্গা-দর্শন!

তারপর মুণ্ডটিকে তিনি বললেন—"এই শঠ জুয়োড়ীটি···সাধু ভক্ত, মানৎ ক'রে পড়ে রয়েছে। আমি বর দিতে গেলেম, তুমি কেন বাধা দিলে? কেন এমন ক'রে পেষণ করলে আমার শিখর, আমায় সংজ্ঞা-দান করলে?

ধক্-ধক্ করে জ্বলতে লাগল রুদ্রের তৃতীয় নয়ন। খরতাপে গলে গিয়ে অমৃত ঝরাতে লাগলেন মাথার চাঁদ। সেই সুধারসেই যেন প্রাণে বাঁচতে বাঁচতে, মন্দ শিথিল হাস্তে মুণ্ডটি বললেন—"ভগবন্, আপনার আত্মা স্বভাবতঃই সরল। শুনুন, কেন আমি আপনাকে উক্ত ভাবে সংজ্ঞা দান করেছি। ঈশ্বরের সবই সুলভ। অকারণে কি কেউ তাঁকে জ্ঞান দিতে যায়?"

এই শঠ ব্যক্তিটি অতি দুঃখী। দরিদ্র ব'লেই সে আজ তার নিজের ব্যবসা চালাতে পারছে না। সব কাজ ফেলে এই প্রাসাদে বসে রয়েছে, অর্ঘ্য রচনা করছে ফুল চন্দনের ধূপের। যে জন দুঃখী তিনি তপস্বী হন; যে জন নির্ধন তিনি মানী হন; যাঁর ক্ষমতা গেছে, বিভব গেছে, তিনি সকলের প্রণাম কোড়ান, প্রিয়ভাষী হন। যিনি নির্ধন তিনি দেব ব্রাহ্মণের অর্চনা করেন, গুরুদের পায়ে মাথা নোয়ান, মিত্রকে চিনতে পারেন। কিন্তু হে দেব, এক তাল লোহা কঠিন হলেও, তপ্ত হলেই কর্মণ্য হয়ে ওঠে। যাঁদের হৃদয় সত্যই দারিদ্র্যে পরিতপ্ত, স্বভাবতঃই তাঁরা সদাচারী হয়ে থাকেন; কিন্তু ঐশ্বর্যের নেশায় একবার মোহিত হয়ে পড়লে তাঁদের কি আর কর্ম-স্মৃতি থাকতে পারে?

ভগবন্, এই জুয়োড়ীটি ঐশ্বর্য চায়। আশার দড়ি গলায় জড়িয়ে এ ঝুলছে, পরিচর্যার পরাকাষ্ঠা করছে। অভীষ্ট সিদ্ধ হলেই ওর কিন্তু আর দর্শন মিলবে না। মানুষ স্বার্থের সন্ধানে যতক্ষণ ফেরে, ততক্ষণই সে সেবক। যেই অর্থলাভ হয়ে গেল সেবকের, সেই থেকে সে ব্যর্থ। জগতে এমন একটিও মনুষ্য নেই, কৃতকার্য হ'য়ে যে সেবক হয়।

হে দেব, এই প্রাসাদটি বিজন। ঐ শঠ ব্যক্তিটি পূর্ণতা লাভ করলেই সরে পড়বে। ফল-জল-কুসুমাদি নিয়ে অন্য কোনো মানুষই এখানে আর সেবা চড়াতে আসবে না। সেই হেতুই বলছি, শঠটিকে এখানে এই পুণ্যায়তনে নিত্যসেবক করে রেখে দিন। একে বরদান করার অর্থ হচ্ছে আত্মপূজার নির্বাসন।" ২৬—৩৭

বক্রবঙ্কিম বাণী শুনে বিপুল-বিস্ময়ে কিঞ্চিৎ হেসে ফেললেন পিনাকী। জিজ্ঞাসা করলেন—

"তুমি কে, যথাসত্য আমাকে জানাও।" সম্ভাব [illegible]

মড়ার খুলি তখন সত্বর উত্তর দিলেন,—

"মগধে আমার বাস্তব্য ছিল। কায়স্থকুলে একদা জন্মে-ছিলাম। বিমুখ ছিলাম স্বকর্মে; নিরত থাকতাম স্নান, জপ, ব্রতে। তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতাম। করায়ত্ত করেছিলাম নিখিল শাস্ত্রার্থ। এই দীন শরীরটিকে ভাগীরথীসলিলে বিসর্জন দিয়ে অধুনা লাভ করেছি···ত্বৎপদম্।"

শুনেই ভগবান বলে উঠলেন—

"সত্যই তুমি কায়স্থ। বিচিত্র! খুলিসার হয়েও কৌটিল্য-কলা ছাড়োনি। ৩৮-৪১

ভগবানের মৃদুহাসির জ্যোৎস্নায় কুসুমশুভ্র হয়ে উঠল আশালতার দল। স্নান সেরে ফিরে এলেন জুয়োড়ী এবং তিনি আসতেই, তাকে বরদান করলেন বরদ মহেশ।

এবং শঠের হিতসাধন অন্তেই শশাঙ্কমৌলি নিজের উত্তমোত্তম মালিকাপঙ্‌ক্তি থেকে নিষ্কাশিত ক'রে বিদায় দিয়ে দিলেন মুণ্ডটিকে। অবাক্ চোখে চেয়ে রইলেন জুয়োড়ী। ৪২-৪৩

বৎসগণ, যমের দংষ্ট্রার মত এই কৌটিল্যকলা। কায়স্থদের ওটি সহজাত। বড় মলিন, এর কাজ জনক্ষয়। অস্থি-শেষ হলেও ওই কলাটিকে বর্জন করেন না কোনো কায়স্থ, একটি অশুচিতায় যেন সর্ব্বদাই কলুষিত হয়ে থাকে এঁদের কলা। ওঁরা দুষ্ট বিষ্ঠার মত। এঁদের সৌষ্ঠবে পৃথিবীর কোন মানুষ বলো স্বস্তিতে থাকতে পারে? আসুরীশক্তির কৃপায় যে মহাত্মার বিশেষ জ্ঞানলাভ ঘটে দিবিরদের এই বঞ্চনা-শাস্ত্রে, একমাত্র তিনিই সংরক্ষিত করতে পারেন রত্নবতী বসুধাকে।

ইতি কায়স্থচরিতং নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ। [ক্রমশঃ।

রজায় রাজায়

উদয়ভানু

রাজপুরীতে খুশীর হাওয়া বইতে থাকে আজ।

দুঃখের আঁধার-রাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভোরের মিষ্টি আলো ফুটেছে রাজ-অন্তঃপুরে। রাজপুরীর প্রতিটি মানুষের মুখে হাসি দেখা দিয়েছে, আজ কত কাল পরে। নাটমন্দিরে সানাইয়ের সুর যেন আজ আর মানতে চায় না। একের পর এক সুর বেজে চলেছে ধীর মন্থর গতিতে। মন্দিরে পূজা আর হোমের পালা চলেছে। রাজমাতা বিলাসবাসিনীর আদেশে নানা দেবদেবীর পূজার ব্যবস্থা হয়েছে। বিপত্তারিণীর জন্ত জোড়া-বলিদানের আয়োজন হয়েছে। পূজারী ব্রাহ্মণদের শ্বাস পতনের অবকাশ নেই যেন। নৈবেদ্যর থালিতে প্রায় পূর্ণ হয়ে গেছে দালান। অন্নভোগের সুগন্ধ খেলছে বাতাসে। রাজমাতা আদেশ দিয়েছেন, আজকের আয়োজনে যেন ত্রুটি না থাকে; উপচারের বাহুল্য যেন বজায় থাকে। পূজা যেন বিঘ্নপ্রাপ্ত না হয়। গীতা আর চণ্ডীপাঠ চলেছে অবিরাম।

অনাঘ্রাদিত নৈবেদ্য রাক্ষসের ভোগ্য হয়, এই নিমিত্তে ভোগের পাত্রে পুষ্প আর বিল্বপত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সুবর্ণ, রজত, তাম্র আর কাংস্যপাত্রে ভোগ দান করা হয়েছে। প্রস্তর আর বজ্র-কাষ্ঠময় পাত্রে ফল আর চিনি-সন্দেশ। অন্য ফুল অচল আজ, কেবল মাত্র রক্ত-জবা ও রক্ত-পদ্মই উপচার। দেবীর শ্রীঅঙ্গে নতুন বস্ত্র পরিয়েছেন রাজমাতা। ঘোর রক্তবর্ণের চেলী। ... আর কলকা বস্ত্রাঞ্চলে। দেবী যেন আজ যুবতী রমণীর বেশ ধারণ ক'রেছেন। বিলাসবাসিনী আভরণ দান ক'রেছেন আজ। অন্য দিন পুষ্পাভরণে সজ্জিতা হন দেবী। রাজমাতা ভূষণ আর উপভূষণ দিয়েছেন আজ।

যুবতী রমণী নয়, মা যেন আজ অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার রূপ ধারণ ক'রেছেন। বিলাসবাসিনী তাঁকে সাজিয়েছেন মনের সুখে। চরণাভরণ, নিতম্বাভরণ, হস্তাভরণ, কণ্ঠ-নাসা-কর্ণ-সীমন্তাভরণ দিয়েছেন নিজের সিন্দুক থেকে। সমুদায় অলঙ্কারই হিরণ্ময় ও মণিময়! ছত্র, চামর ও চন্দ্রাতপ উপভূষণ।

কারণে-অকারণে রাজমাতা আজ হাসছেন। সহচরী পরিচারিকাদের সঙ্গে নিয়ে দেখে গেছেন পূজার আয়োজন। ভূমিষ্ঠ হয়ে অর্থাৎ ভূমিতে কপাল ছুঁইয়ে প্রণামের বদলে কত বার মাথা খুঁড়েছে কে জানে? উপবাসে আছেন আজ। পূজা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জলগ্রহণ করবেন না। দেবীর চরণামৃত পানের পর উপোস ভঙ্গ করবেন।

রাজপুরীতে হৈ-হৈ। দানসত্র খুলেছেন না কি রাজমাতা বিলাসবাসিনী। ভাণ্ডার খুলে ব'সেছেন। আসরফী মোহর আর রৌপ্যমুদ্রার গাদা... নিয়ে বসেছেন। যে যেমন তাকে তেমন দান করছেন। সোনা রূপা আর বস্ত্র দান করছেন।

প্রথমে ডাক প'ড়েছে রাজরাণীদের। উমারাণী, সর্ব্বমঙ্গলা আর সর্ব্বজয়া তিনজনেই এসেছেন। বড়রাণীর আঁচল ধ'রে এসেছে কিশোর রাজকুমার শিবশঙ্কর। কনিষ্ঠপুত্র কাশীশঙ্করের ধর্ম্মপত্নী মহাশ্বেতার সঙ্গে এসেছে তাঁর একমাত্র কন্যা বনবালা।

—তোমাদের কে কি চাও বল'। যে যা চাও, তাই দেবো।

বধূমাতাদের উদ্দেশে বললেন বিলাসবাসিনী। কথায় স্নেহের সুর ফুটিয়ে বলছেন। জলচৌকিতে বসেছেন। আশপাশে মোহর আর মুদ্রার ছড়াছড়ি। শালকাঠের সিন্দুকের ডালা খুলেছেন।

বড়রাণী উমারাণী স্বভাবসুলভ হাসি হেসে বললেন,—রাজমাতা, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন আমাদের। আপনার আশীর্ব্বাদই আমাদের শ্রেষ্ঠ পাওনা।

কৃত্রিম ক্রোধে মুখ বাঁকালেন বিলাসবাসিনী। বললেন,—সোনা-দানা কিছু চাই না?

উমারাণী আবার অধরে হাসি মাখালেন। বললেন,—আপনি যা দেবেন মাথা পেতে নেবো। দিতে কিছু কি বাকী রেখেছেন?

সর্ব্বমঙ্গলা, সর্ব্বজয়া আর মহাশ্বেতা নীরব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে আছেন এক পাশে। তাঁদের যেন কোন বক্তব্য নেই। তাঁদের মুখপাত্রী যেন উমারাণী—তাঁদের পক্ষ থেকে যেন বড়রাণী আম-মোক্তার পেয়েছেন।

—আজ আমার সুদিন এসেছে বড়রাণী। অনেক ডাকাডাকি আর মাথা খোঁড়াখুঁড়ির পর মা আমার মুখ তুলে চেয়েছেন।

কথা বলতে বলতে কথার সুর যেন কেমন সিক্ত হয়ে যায় আনন্দের উচ্ছ্বাসে। চোখের প্রান্ত ভিজে যায়। এটা-সেটা নাড়াচাড়া ক'রতে ক'রতে সোনার দোয়াত-কলম হাতে তুলে বললেন,—এই নাও রাজকুমার! সবার আগে তোমাকে দিই। তুমি আমার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

কুমারকে এগিয়ে দিলেন উমারাণী। বললেন,—কুমার, আগে প্রণাম কর' রাজমাতাকে।

শিবশঙ্করের কোমল হাত বিলাসবাসিনীর পা দু'খানি স্পর্শ করলো। সোনার দোয়াত আর কলম তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন,—শত বর্ষ পরমায়ু হোক তোমার। লক্ষ্মী আর সরস্বতীর বরপুত্র হও। কথার শেষে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপচাপ থেকে খানিক দেখলেন বনবালাকে। দেখতে দেখতে হাসলেন মৃদু মৃদু। বললেন,—আয়, আমার বনবালা আয়। তোকে ভাই কি দিই?

পায়ের মল বাজিয়ে রাজমাতার কাছে যায় বনবালা। দুই

হাত পাতে ভিক্ষাপ্রার্থীর মত। রাঙা হাতে রাজমাতা তুলে দিলেন একখানি টিকলী। চুণী আর পান্নার অর্দ্ধচন্দ্র টিকলীতে। সোনার সুতুলী।

বনবালাকে কিছু বলতে হয় না। সে নিজেই প্রণাম করে রাজমাতাকে। বিলাসবাসিনী তার কপালে হাত রেখে বললেন,—ফুল ফুটুক, প্রজাপতি উড়ে এসে গায়ে তোমার বসুক। এক রাজার মাণিকের সঙ্গে বিয়া হোক।

সলজ্জায় মাথা নত করে বনমালা। মুখ লুকিয়ে হাসে মিটিমিটি। তারপর সহসা দৌড় দিয়ে পালায় পায়ের মল বাজিয়ে।

—এসো মা তোমরা। বধূদের ডাকলেন বিলাসবাসিনী।—এই নাও একে একে।

বিলাসবাসিনীর হাতে একনরী একরাশি। লালাভ মুক্তার একনরী। এক মুঠোয় যা উঠেছে তুলেছেন।

বধূমাতারা এগিয়ে একে একে প্রণাম করলেন রাজমাতাকে, কণ্ঠে আঁচল জড়িয়ে। প্রত্যেকের গলায় বিলাসবাসিনী মুক্তার একনরী পরিয়ে দিলেন। তারপর সহাস্যে বললেন,—আজ আমার সুখের দিন এসেছে। মা জননীরা আনন্দ কর' তোমরা। মুখে হাসি ফোটাও। সীঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক তোমাদের।

কথার শেষে মহাশ্বেতার চিবুক ধ'রে তুললেন। প্রণামনতা মহাশ্বেতার মুখে যেন হাসি নেই, কেমন যেন মনমরা তিনি। চোখের দৃষ্টিতে যেন চিন্তামগ্নতা।

—মুখে হাসি নেই কেন মা?

রাজমাতা শুধোলেন। চাপা কণ্ঠের গাম্ভীর্য্য ফুটলো তাঁর কথার স্বরে। বললেন,—কাশীশঙ্করকে ছেড়ে দিয়ে মনে সুখ নেই তোমার, তা আমি বুঝেছি। কথা বলতে বলতে কি জানি কেন থেমে থাকেন। আবার বলেন,—তবে তুমি মা নিশ্চিন্তায় থাকো। আমি বলছি, ছেলে আমার অক্ষত শরীরে ফিরে আসবে। আমার কাশীশঙ্কর ভাগ্যবান পুরুষ, কোন' কাজে সে বিফল হয় না।

কাশীশঙ্কর যাত্রা ক'রেছেন সদলবলে। গঙ্গা নদীর বুক ধ'রে গড়মান্দারণের উদ্দেশে গেছেন। মহাশ্বেতার মনের সকল সুখ কেড়ে নিয়ে গেছেন যেন। দিনের আহার আর রাতের ঘুমও কেড়ে নিয়ে গেছেন। মহাশ্বেতা পাষাণের মত স্থির আর নীরব হয়ে আছেন। এত ঐশ্বর্য্য দেখছেন, তবুও চোখে যেন অন্ধকার দেখছেন। রাজমাতার সান্ত্বনা শুনেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'লেন না। মুখে যেন কুলুপ এঁটেছেন মহাশ্বেতা।

উমারাণীও বললেন,—ছোটকুমার পয়মন্ত মানুষ, তিনি যে কাজে হাত দেন সে কাজ ঠিক সমাধা হয়। তুমি দুঃখ পাও কেন ভাই?

মহাশ্বেতা অবশেষে বললেন,—বলা কি যায় দিদি? কি হ'তে কি হয় কে জানে! শুনেছি মান্দারণে বিনা লড়াইয়ে কোন' কাজ হবে না। ঠাকুরজামাই শুনতে পাই বন্দুকধারীদের পাহারা রেখেছেন। রাজকুমারী একা থাকলে ভাবনা ছিল না।

শিউরে শিউরে উঠলেন রাজমাতা। কুমারের সৌভাগ্যকে মানলেও তিনিও যেন ক্ষণেকের মধ্যে ভীতা হয়ে পড়লেন। কি এক চাঞ্চল্যে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটি।

বড়রাণী আবার বললেন,—মন্দ ভাবলে মন্দ হয়। তুমি তোমার আরাধ্যকে ডাকো, তাঁকে জানাও। আমরাও জানাই! কুমার-বাহাদুর ঠিক কাজ উদ্ধার করবেন; তা আমি বেশ ভালই জানি।

দাসদাসীদের ভীড় জ'মেছে ঘরের বাইরের দালানে। যত তাঁবেদার একত্র হয়েছে সেখানে। পাইক আর বরকন্দাজরা এসেছে। মালী আর মালিনীরাও বাদ যায়নি। রাজমাতার মহল যেন গম-গম করছে। সকলেই হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে।

—তোমরা যে যার মহলে ফিরলে তবে আর কেউ আসবে এখানে। বাইরে সব অপেক্ষা করছে।

চোখের প্রান্ত আঁচলে মুছে কথা বললেন রাজমাতা।

মহাশ্বেতার হাত ধ'রে ফিরে চললেন বড়রাণী। মেজ আর ছোটরাণী তাঁদের পিছনে চললেন। রাজকুমার শিবশঙ্কর সোনার কলম-দোয়াত লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে দেখাতে গেছে কখন।

—রাজমাতা, আমাকে যে ডাক দাওনি?

কে যেন ব্যস্তকণ্ঠে কথা বলতে বলতে ঘরে এসে উপস্থিত হয়। বলে,—আমি কোন্ দুঃখে বাদ যাই!

—আয় শিবানী আয়! তোকে কখনও বাদ দিতে পারি মা?

বিলাসবাসিনী কি যেন খুঁজতে খুঁজতে কথা বলেন। বলেন,—যা দেবো তাই নিয়ে খুসী হোস যদি তবে তাই দিই।

—হাঁ গো হাঁ, যা দেবে তাই মাথা পেতে নেবো।

শিবানীর কেশবেশ যেন বৈরাগিনীর মত। এলো চুল আর আলগা আঁচল উড়ছে বাতাসে! চোখে হয় তো টাটকা কাজল দিয়েছে। কপালে শ্বেতচন্দনের টিপ।

—রূপ যেন তোর দিন দিন খুলছে শিবানী। কথার শেষে খানিক থেমে আবার বললেন বিলাসবাসিনী,—হয়তো বিয়ের নামেই তোর এত রূপ হয়েছে।

—এ পোড়া রূপের দাম কি! হাসতে হাসতে বললে শিবানী। রাজমাতার সামনে বসে পড়লো। বললে,—রূপ নিয়ে কি খাবো?

ক্ষীণ হাসি ফুটলো বিলাসবাসিনীর মুখে। বললেন,—কেন, শশিনাথ আর কি ফিরে দেখে না তোকে? লজ্জায় অধোবদন হয় শিবানী। বলে,—রাজমাতা, তোমার অনুমান সত্যি নয়। সেই মানুষটা আমার জন্য সব করতে পারে।

হা হা শব্দে হেসে উঠলেন বিলাসবাসিনী। হাসতে হাসতেই বললেন,—তোকে বিয়া করতে পারে?

আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সলো শিবানী। বললে,—হাঁ তাও পারে। আমার জন্য মরতেও পারে।

—তোর ভাগ্যিটা ভাল বলতে হবে। হাসির জের টেনে বলেন রাজমাতা। বলেন,—এখন কি চাই তাই বল্।

—তুমি যা দেবে তাই নেবো! আমি মুখে কিছু চাইবো না।

—তবে তুই এই কণ্ঠহারখানা নে। তোকে বেশ মানাবে।

—বেশ কথা, ঐ কণ্ঠহারই দাও। কথা বলতে বলতে হাত পাতলো শিবানী। তার হাতে আলগোছে ফেলে দিলেন রাজমাতা, এক ছড়া স্বর্ণহার।

হঠাৎ কথার সুর নামিয়ে তামাসার ছলে রাজমাতা বললেন,—হাঁারে শিবানী, একটা সত্যি কথা বলবি ?

—হাঁা। মিথ্যা আমি বলি না। মিথ্যা বলায় পাপ হয়, তা আমি জানি।

—হাঁারে শিবানী, আমাদের শশিনাথের সঙ্গে তোর দেখা-সাক্ষাৎ হয় না ?

—দু'বেলা দেখা হয়।

—কথাবার্তা হয় ?

—হাঁা তাও হয়।

—পাকা কথা ক'য়েছে সে ?

হাঁা গো হাঁা।

—তবে তো কেল্লা মেরে দিয়েছিস্।

—খান দুই চার মোহর দেবে না রাজমাতা ?

—মোহর পেয়ে কি হবে তোর ? কি করবি। যা দিয়েছি তাতে মন উঠলো না ?

—তোমার পায়ে পড়ি রাজমাতা! সারা জীবন তোমার নাম ক'রবো।

—তোর বিয়াতে কত আবার দিতে হবে।

—দিতে হবে বৈ কি। দু'চারখানা মোহর দিলে তুমি কি ফকির হয়ে যাবে না কি ?

মুখে কৃত্রিম বিরক্তি ফুটিয়ে বিলাসবাসিনী বললেন,—এত যখন তোর খাঁই, তবে নিয়ে যা দু'খানা মোহর। কা'কেও যেন মুখ ফসকে বলে দিস না।

স্বর্ণমুদ্রা আর কণ্ঠহার আঁচলে বেঁধে ঢিপ ক'রে একটি প্রণাম করলো শিবানী। নিমেষের মধ্যে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল মুখে হাসি মাখিয়ে।

রাজমাতার মহল গম গম করছে। দালানে দালানে কাতারে কাতারে মেহনতী মানুষের জটলা।

—রাজমাতা বিলাসবাসিনীর জয় !

জয়ধ্বনি দেয় সমবেত জনতা। মাটির মানুষের ঐকতান মর্ণীকোঠে পৌঁছয় যেন। রাজমাতার বিরাট মহল কেঁপে কেঁপে ওঠে। রাজমাতার বক্ষে যেন গর্বের সঞ্চার হয়। মনে মনে ভাবেন, কুমারবাহাদুর কাশীশঙ্কর বাধাবিপত্তি কাটিয়ে বিদ্যাকে ফিরিয়ে আনলে আরও কত কি করবেন। আজকে যা দান-খয়রাতি করছেন, তার দ্বিগুণ আবার দিতে প্রস্তুত আছেন তিনি !

—রাজমাতা বিলাসবাসিনীর জয় !

একমনে কত কি ভাবতে থাকেন রাজমাতা। জয়ধ্বনির আকাশ-ফাটা শব্দ শুনে বারেক চমকে উঠলেন। আঁচলে চোখ মুছলেন, পাছে কারও চোখে পড়ে। তাঁর চোখে এখন আনন্দাশ্রু। পরিচারিকাদের বললেন,—তোমরা সকলে এখানেই থাকো, কেউ যেন কোথাও না যাও। এত লোককে আমি একা সামলাতে পারবো না। হাত তুলে তুলে দিতেও পারবো না। আমি ব'লে দেবো, তোমরা তাদের হাতে তুলে দেবে। যে যেমন তাকে তেমন দেবো!

হঠাৎ যেন থমকে গেল কলধ্বনি। আর কোন সাড়াশব্দ নেই। মধ্যে মধ্যে এক-আধটা ফিসফাস কথা বলে কেউ কেউ।

এক খানসমা দেখা দেয় কক্ষের দুয়োরে। তার পেতলের তকমা ঝলমলিয়ে ওঠে। তার হাতে খাপযুক্ত বাঁকা তরোয়াল উঁচিয়ে আছে।

ভ্রূ বাঁকিয়ে খানিক দেখলেন বিলাসবাসিনী। বললেন,—কি চাই তোমার ?

—রাজাবাহাদুর আসছেন হুজুরণী !

—কে ? কাশীশঙ্কর আসছে ?

—হাঁ হুজুরণী, খোদ রাজাবাহাদুর আসছেন।

কথা বলতে বলতে খানসমা দ্বারমুখ থেকে স'রে যায় সৈনিকী কায়দায়। তরোয়াল [illegible] ভ'রে সেলাম জানায় অর্ধনত হয়ে। আগন্তুক রাজার উদ্দেশে কুর্নিস করে।

পাদুকার শব্দ এগিয়ে আসে। পেশোয়ারী কাবুলীর মচ মচ শব্দ।

ব্যাকুল চোখে দ্বারের দিকে তাকিয়ে থাকেন বিলাসবাসিনী। দু'জন পরিচারিকা দুই পাশ থেকে হাত-পাখার হাওয়া খেলায়, তবুও তিনি দরদরিয়ে ঘামছেন। গোলাপ পাশ থেকে গোলাপজল দেওয়া হয় রাজমাতার মাথায়। গোলাপের মিষ্টি গন্ধ ভাসে ঘরে।

—তোমরা এক দিকে যাও ওর দিকে। রাজা আসছে আমার কাছে। আমার ছেলে আসছে !

বিলাসবাসিনী কথা বললেন সানন্দে। ঠিকঠাক হয়ে বসলেন। তাকিয়ে থাকলেন দুয়োরের দিকে চোখ রেখে।

—মা !

অদৃশ্য থেকে ডাকলেন রাজাবাহাদুর। দালানে সেই ডাকের প্রতিধ্বনি ভাসলো।

—রাজমাতা কৈ ?

—এই যে আমি। এসো, আমার বাছা এসো। মঙ্গল হোক তোমার।

—এসো, একটু পায়ের ধূলা দাও।

দ্বারের কাছে পৌঁছে স্থির হ'লেন রাজাবাহাদুর। আজ তাঁর পোষাকের ভিন্নতা লক্ষণীয়।

ঘি-রঙের রেশমের পাশোয়াজ পরেছেন। আঁটস াঁট পায়জামা। মাথার উষ্ণীষে হীরের তাজ ঝলমল করছে। মসলিনের রোমাল হাতে। কালো মুক্তার মালা ঝলমল করছে, কণ্ঠ থেকে বুকে নেমেছে। মালায় একটা ধুকধুকি—একখানি আটরতির পদ্মরাগ-মণি। সুগন্ধি মেখেছেন রাজাবাহাদুর। রোমাল থেকে মনপছন্দ আতরের গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। হাতের আঙুলে ক'টা আঙটি কে জানে ? নৌকাকৃতির হীরার আঙটি।

রাজমাতার রঙমহল ছিল এই কক্ষ। যখন তিনি রাণীর পদে অভিষিক্ত ছিলেন তখন এই কক্ষ ব্যবহার করতেন—সে অনেককাল আগের কথা। অতি মনোহর এই বিলাসকক্ষ। শ্বেতকৃষ্ণ প্রস্তরের হর্ম্যতল। শ্বেতমর্মরের কক্ষপ্রাচীর। পাথরে রত্নের লতা, রত্নের পাতা, রত্নের ফুল, ফল পাখী ভ্রমর। প্রাচীরের কিছু ঊর্ধ্বে সোনার কামদার বীটের মধ্যে মধ্যে বিচিত্র আকারের দর্পণ। ওপরে রূপার তারের চন্দ্রাতপ, মতির ঝালর ঝুলছে। মেঝেয় কোমল তৃণ অপেক্ষাও কোমলতর সবুজ গালিচা পাতা।

বহুদিন এই কক্ষ চোখে পড়ে না রাজাবাহাদুরের। বড় একটা উন্মুক্ত হয় না এই বিলাসকক্ষ। কালীশঙ্কর কক্ষমধ্যে লক্ষ্য করেন সাগ্রহে। দেওয়ালের মতির কারুকাজ দেখেন—দেখে দেখে বিস্মিত হন যেন। কি অপূর্ব শিল্পশোভা!

বিলাসবাসিনী উঠে আসেন রাজার সম্মুখে। বলেন,—পেশোয়াজ আর পায়জামা কেন? কোথাও চললে না কি?

—নাঃ, তেমন কোথাও যাওয়ার নাই। মাতৃপদে হাত ছুঁইয়ে সেই হাত কপালে ঠেকালেন রাজাবাহাদুর,—একই পোষাক প্রত্যহ ভাল লাগে না। তাই এই বাস পরিবর্তন। শুধু তাই নয়, আজ নবাবের ক'জন মনসবদার দরবারে আসছে [illegible]তে। কিছু কাজের কথা আছে আমার জমিজমা সম্পর্কে।

—কোন জমি বিক্রী নয়। বিলি বন্দোবস্তের কথা কইবো। কথার শেষে ইদিক সিদিক দেখে কালীশঙ্কর বললেন,—তুমি তো দেখি কুবেরের ভাণ্ডার খুলেছো। যাকে যা ইচ্ছা দান ক'রছো।

—কালীশঙ্কর যাত্রা করেছে সেই আনন্দে। বিন্ধ্য এলে আরও কিছু দান করবো, মনস্থ করেছি। আমার যা আছে বিলিয়ে দেবো বিলকুল। আমার [illegible] অক্ষয় করবো।

হেসে ফেললেন রাজাবাহাদুর। রোমালে মুখ মুছতে মুছতে বললেন,—তবে আমরা কোথায় যাবো? তোমার ছেলে দু'টাকে ত্যাগ করবে না কি?

—বালাই ষাট। এমন কথা বল' কেন? তোমরা ছাড়া আমার আর কে আছে! বিন্ধ্যর গায়েও তোমাদেরই রক্ত বইছে।

—প্রার্থনা জানাও কুমারবাহাদুর যেন ভালয় ভালয় ফিরে আসে।

—সে আর বলতে! আমি তো কত কি মানত ক'রেছি। পুজোপাঠের ব্যবস্থা করেছি। জোড়া সত্যনারায়ণ করবো ভেবেছি। হরির লুট দেবো।

রাজমাতার কথা শেষ হওয়ার আগেই কালীশঙ্কর দ্বার ত্যাগ করলেন। যেতে যেতে বললেন,—এখনও একবিন্দু জলপান পর্য্যন্ত হয়নি। আমি যাই, ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে যেন।

—মঙ্গল হোক তোমার। পরমায়ু অক্ষয় হোক। মন-পছন্দ আতরের সুগন্ধ ভাসিয়ে রেখে গেলেন রাজাবাহাদুর।

সকলে আজ হাসছে, শুধু মহাশ্বেতা নয়।

তাঁর মুখে যেন আষাঢ়ের মেঘ জমেছে। চোখে শুষ্ক দৃষ্টি ফুটে আছে। কেমন যেন জবুথবু হয়ে আছেন। মুখ খুলছেন না, কথা বলছেন না। রূপের এত বাহার, তাও যেন ম্লান হয়ে আছে।

উমারাণী তাঁর হাত ধ'রে নিয়ে চললেন নিজের মহলে। বললেন,—আয় মেজরাণী, আয় ছোটরাণী, মহাশ্বেতার কাছে তোরা বসবি। ওর সঙ্গে দু' দণ্ড গল্প করবি। ওকে ভুলিয়ে রাখবি।

—দিদি, আমরা তো থাকবো, আপনি যাবেন কোথায়?

মেজরাণী মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর রাঙা অধর তাম্বুল-রাগরক্ত। পরিধানে নীলাম্বরী। সোনার অলঙ্কার পানকয়েক। নিয়ম রক্ষার জন্ত পরেছেন যেন। নাকে হীরার নাকছাবি নানা রঙের আভা ঠিক্‌রোয়। চোখে মিহি সুর্মার রেখা। পায়ে ঘোর লাল আলতা।

বড়রাণী বললেন,—আমি তোদের জলখাবারের ব্যবস্থা করি। সত্যিই আজ আমাদের শুভদিন এসেছে। ছোট কুমারবাহাদুর যখন গেছেন, তখন কাজ উদ্ধার হবেই। আমাদের ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আসবে। কেউ রোধ করতে পারবে না মহাশ্বেতার স্বামী-দেবতাটিকে, তিনি এমনই কৌশলী আর বুদ্ধিমান। কি বলিস মহাশ্বেতা?

অল্প একটু হাসলেন মহাশ্বেতা। গর্ব্বের ভাবটুকু লুকিয়ে ম্লান হাসি হাসলেন যেন।

—আয় বনবালা, আমার সঙ্গে আয়। কি লক্ষ্মী মেয়ে এই ফুলের মত মেয়েটা! উমারাণী স্নেহপূর্ণ সুরে কথাগুলি বললেন। বললেন,—আমি বনবালা বলবো না, ওর নাম হোক আজ থেকে বনরাণী।

সলাজ হাসি ফুটলো বনবালার কচি কোমল মুখে। মাকে ছেড়ে সে বড়রাণীর আঁচল ধ'রলো। পায়ের অলঙ্কারের ঝমাঝম শব্দ তুলে চললো উমারাণীর সঙ্গে।

—আমি কিছু খেতে পারবো না। মেজরাণীকে শুনিয়ে বললেন মহাশ্বেতা। ভয়নম্র সুরে বললেন,—কিছু যেন মুখে তুলতে ইচ্ছা হয় না আর। কাল সারা রাত চোখে-পাতায় এক হয়নি। ভাবনা আর চিন্তায় কেমন যেন হয়ে আছি আমি। খাওয়ায় রুচি নেই মোটে।

—মনটাকে শক্ত কর' মহাশ্বেতা। লক্ষ্মীটি বোন আমার।

মেজরাণী চাপা কণ্ঠে উপদেশ দেওয়ার সুরে বললেন পান চিবানো থামিয়ে। মেজরাণীর মুখ থেকে কস্তুরী তাম্বুলের সুগন্ধ ছড়ায়।

—ভেবে ভেবে যেন কূলকিনারা খুঁজে পাই না আমি। মহাশ্বেতা ভয়ার্ত কণ্ঠে কথা বলেন। বললেন,—হাতাহাতি সামনা-সামনি যুদ্ধ হ'লে চিন্তার কিছু থাকতো না। বন্দুক ছোঁড়াছুঁড়িতে বড় বেশী ডরাই আমি। কি হ'তে কি হয় বলতে পারে! উনি বন্দুক ব্যবহারে তেমন পাকাপোক্ত নয়। সবে এই টিপ দাগ শিখেছেন।

পরিচারিকারা আহারের পাত্র নিয়ে আসে। রূপার ফুলকাটা রেকাবীতে নানাবিধ সুখাদ্য। মিষ্টি আর নোনতা খাবার। রাজভোগ, মতিচুর, জলভরা, পেস্তার বরফী আর অমৃতী একেক রেকাবীতে। আরেক পাত্রে কচুরী, নিমকী, পাঁপর, আর ভাজা বাদাম। জলের পাত্রে তরমুজের সরবৎ।

দুই হাতে দু'টি রেকাবী ধ'রে মহাশ্বেতার সামনে বসিয়ে দিলেন উমারাণী। যাওয়া আসায় ঘেমে উঠেছেন তিনি। কপাল আর চিবুকের ঘাম আঁচলে মুছতে মুছতে ব'সে পড়লেন। বললেন, তুমি যদি খাও তো আমরা সকলে মিলে খাই।

—আমার যে রুচি নেই বড়রাণী! মহাশ্বেতা কথা বলতে মুখ বিকৃত করলেন।

বড়রাণী বললেন,—তবে আমরা সকলেই উপোস করি আজ। মান্দারণ থেকে কুমারবাহাদুর না ফেরা পর্য্যন্ত অনশন করি।

অপ্রস্তুত হ'লেন যেন মহাশ্বেতা। দীর্ঘ চোখ আরও বড় ক'রে

বললেন,—সে কি কথা! আমার জন্যে আপনারা কেন কষ্টভোগ করবেন?

মৃদু হাসির সঙ্গে মেজরাণী বললেন,—সেই বা কেমন কথা, আমরা মিষ্টিমেঠাই খাবো আর তুমি থাকবে অনাহারে! তা হয় না।

—অগত্যা কি করি! মহাশ্বেতা যেন বাধ্য হয়ে রেকাবী টানলেন হাতের কাছে। বললেন,—আপনি দিদি মানুষটা তেমন সুবিধার নয়। আমাকে আমার পণ রাখতে দিলেন না। অঙ্গীকার ভাঙতে হচ্ছে আমার।

মহাশ্বেতার মুখে জোর ক'রে সন্দেশ পুরে দিয়ে সহাস্যে উমারাণী বললেন,—কি অঙ্গীকার, কার কাছেই বা?

—আমার নিজের কাছে। মহাশ্বেতা ফিসফিসিয়ে বললেন,—পণ করেছিলাম, তিনি না ফেরা পর্য্যন্ত মুখজল ছাড়া আর কিছু মুখে তুলবো না। রাখতে দিলেন কৈ?

—আমার কথা রেখে খাও, দেখো সেই মানুষটার জয় হয় কি না।

কথার শেষে উমারাণী নিজেও মুখে তুললেন কি যেন। বললেন,—তবে আর মিথ্যে মিথ্যে উপোসে থাকবি কেন? রাজমাতা জানলে আর রক্ষে থাকবে না যে! কথা বলতে বলতে একেক জোড়া রেকাবী একেক জনের দিকে ঠেলে দিতে থাকেন বড়রাণী।

মহাশ্বেতার মন যেন কোথায় উড়ে গেছে। তিনি তখন কুমারবাহাদুরের ভাবনায় মগ্ন হয়ে থাকেন। বিপদের আশঙ্কা অপেক্ষা বিরহের অনলে যেন দগ্ধ হয়ে আছেন সদাক্ষণ। সীঁথিতে সিঁদুর ওঠার পর থেকে একটি রাতের তরেও তাঁকে কখনও ছেড়ে থাকেননি মহাশ্বেতা। অদর্শন কাকে বলে জানা ছিল না তাঁর। অনভিজ্ঞতার কষ্ট যেন একটু বেশী জোরালো হয়। এও ঠিক তাই। কুমারবাহাদুর কালীশঙ্করের টিকালো সুন্দর মুখখানি যেন কিছুতেই ভুলে থাকা যায় না। তাঁকে ছেড়েও যেন এক মুহূর্ত বাঁচা যায় না।

বধূরাণীরা সকলেই যে যার পাত্র টানলেন কাছে। ছোটরাণী তন্ময় হয়ে যান দেখতে দেখতে। মহাশ্বেতার কত রূপ তাই দেখেন। মুখে আহার তুলে খেতে ভুলে যান। মহাশ্বেতার দীর্ঘ চোখ দু'টিতে যেন শুভ্র আকাশের বিস্তার।

গঙ্গানদীর বুকে তখন একখানি বজরা এগিয়ে চলেছে বরাহনগর, বালি আর উত্তরপাড়াকে পাশে ফেলে। কুমারবাহাদুর চোখে দূরবীণ লাগিয়ে দেখছেন ইদিক সিদিক। একজন খানসামা তাঁর মাথায় ছাতা ধ'রে আছে। রূপার ছাতার চতুষ্পার্শ্বে মণিমাণিক্যের ঝালর। কালীশঙ্কর গঙ্গার দুই তীরে লক্ষ্য করছেন সাগ্রহে। নদীর দুই তীরে ঘন সবুজ রঙের পাহাড় যেন। দূরবীণের চোখে ধরা পড়ে এই ভুল—স্পষ্টতর হয়ে দেখা দেয় গাছ আর গাছ। সবুজের আড়াল থেকে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় মন্দির আর মসজিদ। কোথাও বা একটি চার্চ। চূড়ায় যীশুখৃষ্টের ক্রুশ। কোথাও দু'চারখানা চালাঘর। এর সিন্দেশ্বর পাকাবাড়ী।

জলের বুকে দূরবীণ ফেললেন কুমারবাহাদুর। এধার সেধার দেখতে থাকলেন। দেশী নৌকা আর বিদেশীদের বাণিজ্যপোত। পতাকা উড়ছে দেশ বিদেশের। মাস্তুলে মাস্তুলে।

আর্ম্মাণী, পর্তুগীজ, ফরাসী আর ইংরাজদের বাণিজ্যপোতের শীর্ষে নিশান উড়ছে দুরন্ত হাওয়ায়। গঙ্গার বুকে ঢেউ উঠছে সারি সারি। কালীশঙ্করের বজরাখানা পর্য্যন্ত সেই ঢেউয়ের বেগে টলমলিয়ে উঠছে। [ক্রমশঃ।

ইতিহাস যা পড়ান হয়

বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণতঃ যে ইতিহাস পড়ান হয়, সে প্রাচীনযুগের বিভিন্ন রাজারাজড়াদের কাহিনী মাত্র। ঠিক আধুনিক বা সমসাময়িক যুগের ইতিহাসের সঙ্গে ছাত্রসমাজের যথোচিত পরিচয় প্রায়ই হয় না। এরূপ ব্যবস্থা আদৌ ঠিক কি বেঠিক, নিশ্চয়ই একটি সঙ্গত প্রশ্ন। এই প্রশ্ন নিছক এ দেশের সম্পর্কেই নয়, বহির্বিশ্বের দেশগুলোকে লক্ষ্য করেও উত্থাপিত হয়েছে। বস্তুতঃ, বর্ত্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য ইতিহাসে ভিক্টোরিয়া, কাইজার—এঁদের বিবরণেরই যদি ছড়াছড়ি দেখা যায়, হিটলার, মুসোলিনী, ষ্ট্যালিন, গান্ধী প্রভৃতি সম্পর্কে জানবার তেমন কোন সুযোগ না থাকে, তাহ'লে ইতিহাস পাঠের মূল্য হ্রাস না পেয়ে পারে না।

অবশ্য এইরূপ ত্রুটিপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্যে বিদ্যালয়সমূহ বা শিক্ষকমণ্ডলী প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী নয়। এর দায়িত্ব আসলে স্কুলবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর। অতি আধুনিক বা সমসাময়িক যুগের ইতিহাস থেকে ছাত্রসমাজকে অনেক ক্ষেত্রে যে অজ্ঞ রাখা হয়, এর পক্ষেও যুক্তি দেখান হচ্ছে নানারূপ। প্রথমতঃ, এরূপ পাঠ্য নির্দ্ধারিত হ'লে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর রাজনৈতিক প্রভাব এসে পড়তে পারে আপনা থেকেই। তা ছাড়া বলা হয়, দীর্ঘদিন না গেলে পর ঐতিহাসিক ঘটনার গতি-প্রকৃতি বা ঐতিহাসিক চরিত্রের গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি হওয়া সাধারণতঃ সম্ভব নয়। এমন কি, এও বলা হয়ে থাকে যে, অল্প দিনের ব্যাপারগুলো ইতিহাসের পাঠ্য-পুস্তকে সংযোজিত না হলেও আরও কত সূত্রেই জানতে পারা যায়। বিলেতে ছাত্রদের ইতিহাস পড়ান সংক্রান্ত ব্যাপারটি নিয়ে সরকারী শিক্ষাদপ্তর ও শিক্ষাবিদ্‌রা অনেক মাথা ঘামাচ্ছেন। এ ব্যাপারে আধুনিক রুশিয়ার নাম করতে হয় বিশেষ ভাবে। রুশরা ইতিহাসের যে কী প্রচণ্ড শক্তি, সে সম্পর্কে সর্ব্বদা সজাগ। দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য তাঁরা বহু সময় ব্যয় করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে রচনা করেছেন তাঁদের লড়াই-এর ইতিহাস। রুশ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আধুনিক রুশিয়া ও আধুনিক বিশ্ব এতটুকু অপরিচিত থাকবার উপায় নেই।
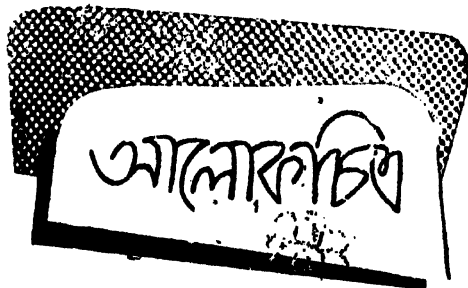
গঙ্গাবক্ষ

—ফুলরাণী দাশগুপ্ত

আলিপুর চিড়িয়াখানায়

—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

—সলিল গুহ

জৈন-মন্দির (বেলগাছিয়া)

শ্রীকৃষ্ণ (মহীশূর) —নিমাইচাঁদ শীল

দৃষ্টিদান

—শান্তিনাথ মুখোপাধ্যায়

পরিচয়

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

বেলেঘাটা—চৈত্র-সংক্রান্তি '৪৮
কলকাতা।

প্রভূত-আনন্দ-দায়কেষু—

অরুণ! তোর আশাতীত, আকস্মিক চিঠিতে আমি প্রথমটায় বেশ বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম—আর আরো পুলকিত হ'য়েছিলাম আর এক টুকরো কাগজে কয়েক টুকরো কথা পেয়ে। তারপর কৃতসংকল্প হ'লাম পত্রপাঠ চিঠির জবাব দিতে। আজ খুব বেশী বাজে কথা লিখবো না,—আর আমার চিঠি সাধারণত একটু উচ্ছ্বাসবর্জিতই, সুতরাং আজকে প্রধান কথাটি বলতে, সাধারণ জবাবগুলো একটু সংক্ষেপে সারবো। এতে আপত্তি চলবে না।

তুই যে খুব সুখে আছিস তা বুঝতেই পারছি, আর তোর অপূর্ব দিনগুলোর গন্ধ পেলাম তোর চিঠির মধ্য দিয়ে। তুই আমাকে তোদের কাছে যেতে লিখেছিস কিন্তু আমার ভয় হয় পাছে কলকাতার ভয়ঙ্কর দিনগুলো হারিয়ে ফেলি। তবে আশা রইলো বৈশাখ মাসেই হয়তো লাভ ক'রবো তোর সামীপ্য। তবে তা দ্বিতীয় সপ্তাহে কি না ব'লতে পারি না। আর তোদের ওখানে যাবার একটা নীট্ খরচ যদি জানিয়ে দিতে পারিস তবে আমার কিছু সুবিধা হয়। তোর একাকীত্ব ভালো লাগে না এবং ভালো লাগে না আমারো, এই প্রাণ-স্পর্শ-হীন আত্মমগ্নতা। তবে একাকীত্ব অনুকূল নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করার পক্ষে। একাকী মানুষ যা চিন্তা করে সেইটাই তার নিজের চিন্তা, নিঃসঙ্গ মানুষ নিজের প্রকৃতিকে কাছে পায়। সেই জন্যেই, একাকীত্বের একটা উপকারিতা আছে ব'লে আমার মনে হয়, তা দীর্ঘ হ'লেও ক্ষতি নেই।

তোর কথা মতো অজিতকে শুধু জানিয়েছি তোকে লেখার কথা। আর কাজগুলো সবই ধীরে সুস্থে সম্পন্ন করবো—সন্দেহ নেই। তোর চিঠি প'ড়তে প'ড়তে একটা জায়গায় থমকে গিয়েছিলাম, আমার চিঠির প্রশংসা দেখে, কারণ তোর কাছে আমার চিঠির কিছুটা মূল্য হয়তো থাকতে পারে কিন্তু অন্যের কাছে প্রশংসনীয় জেনে নিজের সম্বন্ধে আমার বিস্ময় বেড়ে গেলো, বিশেষত: আমার মত জলীয়, লঘুপাক চিঠিগুলো যদি প্রশংসা পেতে থাকে, তবে চিঠির ভালোত্ব বিচার করা কঠিন হ'য়ে পড়বে মনে হ'চ্ছে। আমার সমগ্র জীবনের লেখা তোদের ওখানে নিয়ে যাওয়া অসাধ্য-সাধন-সাপেক্ষ। কারণ লেখা আমি সঞ্চয় করি না কখনো, যেহেতু লেখবার জন্যে আমিই যখন যথেষ্ট, তখন আমার সঙ্গে একটা অহেতুক বোঝা থাকা রীতিমত অন্যায়। তবে প্রকৃতির প্রয়োজন বাঁচিয়ে যেগুলো এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্ত, সেগুলো সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারি।

তুই আমাকে গ্রহ-বিচ্ছিন্ন উল্কার সঙ্গে তুলনা করেছিস—কিন্তু গ্রহটা কু-গ্রহ, যেহেতু তার আগ্রহ আমায় নিক্ষেপ করা কোনো এক প্রশংসা-মুখর ক্ষেত্রে। যাই হোক, তোর এই চিঠিটা যেন নতুন জন্মের আভাস দিয়ে গেলো।

* * * *

...এখন অন্যান্য খবর দিচ্ছি, শৈলেন ও মিন্টু দু'জনেই কলকাতা ছেড়েছে বহু দিন। আর বাচ্চীনদার B. A. Examination ১লা মার্চ। সুতরাং তিনি ব্যস্ত আছেন পড়াশুনায়। ইতি—

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

* * * *

S. B
C/o Haridas Bhattacharya
279, Agastya Kunda.
Benaras City.

অরুণ!

যে ম্যালেরিয়া তোকে প্রায় নির্জীব ক'রে তুলেছে, আমি এখানে আসার পঞ্চম দিনে তারই কবলে প'ড়ে সম্প্রতি আরোগ্য লাভ করার পথে—তাই এতো দিন চিঠি দিইনি। আজ অন্নগ্রহণ করলুম। তুই এখন কোথায়? কোডারমায় না কলকাতায়? দু'দিন মাত্র সুযোগ পেয়েছিলাম কাশী দেখবার, তাতেই অনেকখানি দেখে নিয়েছি। কাশী ভালো লাগছে না: অনেক দিন পর ফিরে পাওয়া তামার পয়সার মতো ম্লান লাগছে। আমার শরীর এখন খুবই দুর্বল, কারণ এক'দিন সাংঘাতিক কষ্ট গেছে। তোকে রীতিমত কষ্ট ক'রেই লিখতে হ'চ্ছে। আর লিখতে পারছি না। সকলের কুশল সংবাদ সহ এই চিঠির আশু বিস্তৃত জবাব চাই।

সুকান্ত ভট্টাচার্য
২৮।১০।৪৪

S. B
C/o Haridas Bhattacharya
279, Agastya Kunda.
Benaras City.
২০.১১.৪৪.

অরুণ!

তোর চিঠি অনেক দিন হ'লো পেয়েছি; পেয়ে তোকে হতাশই করলুম। অর্থাৎ উত্তর দিতে দেরীও ক'রলুম অথচ কাশীর বর্ণনামূলক ব্যক্তিগত ভাবে চিঠিটা লিখলুম না। লিখলুম না এই জন্যে যে কাশীর একটানা নিন্দে ক'রতে আর ইচ্ছে ক'রছে না: ওটা মুখোমুখিই করবো, তাই আপাতত স্থগিত রাখলুম। শুনে বোধ হয় দুঃখিত হবি যে আমি আবার অসুখে পড়েছি; তবে এবারে

বোধ হয় জলের ওপর দিয়ে যাবে। তাছাড়া যদি ভালো হ'য়ে উঠতে পারি, তাহ'লে আশা করা যায় আগামী ২১ তারিখে তোর সঙ্গে ক'লকাতায় আমার সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু বেলেঘাটায় ফিরে যেতে আশঙ্কা হ'চ্ছে, কেন না বেলেঘাটাই এখন ম্যালেরিয়া-সাম্রাজ্যের রাজধানী। আর আমি ম্যালেরিয়ার রোগী হ'য়ে কি সেখানে প্রবেশ করতে পারি? বিশেষত: আমি যখন ম্যালেরিয়া-সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার ক'রতে আর রাজী নই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তুই চিরকেলে ম্যালেরিয়া রোগী, তুই কি ক'রে এখনো টিঁকে আছিস? (অবশ্য এখনো কি না ঠিক ব'লতে পারছি না)। কেবল ম্যালেরিয়ার কথাই ব'লে চ'লেছি, এখন কাশীর কথা কিছু বলি।

কাশীর আমি প্রায় সব দ্রষ্টব্যই দেখেছি। ভালো লেগেছে কেবল ইতিহাসখ্যাত চৈত সিংহের যুদ্ধ-ঘটনা জড়িত প্রাসাদের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা, আর রাজা মানসিংহ স্থাপিত observatory মানমন্দির। অবশ্য বিখ্যাত বেণীমাধবের ধ্বজা থেকে কাশী শহর খুব সুন্দর দেখায়, কিন্তু সেটা বেণীমাধব বা কাশীর গুণ নয়, দূরত্বের গুণ। কাশীর গঙ্গা এবং উপাসনার মতো স্তব্ধ তার শ্যামল পরপার, এ দুটোই খুব উপভোগ্য। কাশী শহর হিসেবে খুব বড়ো সন্দেহ নেই; বিশেষত আজকের দিনে 'আলো ঝলমল' শহর হিসেবে। অর্থাৎ এখানে 'ব্ল্যাক আউট' নেই। আর পথে পথে এখনো দেখা যায় লোকের ভিড়, কলকাতার মতোই। ধর্মান্ধ বিধবা এবং অশিক্ষিত লোকেরাই এখানকার যাত্রী। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেখলাম, যা পৃথিবীর সব চেয়ে 'বড়ো ছাত্র-নিবাস-মূলক' বিশ্ববিদ্যালয়, আর দেখলাম গান্ধিজী পরিকল্পিত ভারত-মাতার মন্দির। দু'টোতেই ভালো-লাগার অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও, ধর্মের লেবেল আঁটা ব'লে বিশেষ ভালো লাগলো না। আর সব চেয়ে ভালো লাগলো সারনাথ। তার ঐতিহাসিকতায়, তার নির্জনতায়, তার স্থাপত্যে, আর ভাস্কর্যে, তার ইঁট-পাথরে খোদিত কর্মগাথায় সে মহিমাময়। *

সুকান্ত ভট্টাচার্য

অরুণ!

প্রথমে বিজয়ার সম্ভাষণ জানিয়ে রাখছি। এর পর একে একে প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। প্রথমে কথা হচ্ছে···'কবিতা' শেষ পর্যন্ত দিলো না—চেয়েছিলাম তা সত্ত্বেও। তবে আগের ক'খানা রেখে দিয়েছি, সামনের সপ্তাহ থেকে সেগুলি ক্রমান্বয়ে পাঠাবার সংকল্প রইলো। আর···ওখানে গেলুম না নিজের নিতান্ত অনিচ্ছায়, বইখানা ওর অজ্ঞাতসারে ওকে দান করলুম, তুই বরঞ্চ ওকে আর একখানা চিঠি ডাক মারফৎ পাঠাস।···কাছে যাই যাই ক'রে যাওয়া হয় নি, তবে যাবার ইচ্ছা আছে। এখানে সপ্তমীর দিন সারা দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর, রাত্রে ভয়াবহ ঝড় সমস্ত ক'লকাতায় অল্প-বিস্তর ক্ষতচিহ্ন রেখে গিয়েছিল। কাল শ্যামবাজারে গিয়ে প্রভূত আনন্দ পেলুম ওদের উচ্ছল সাহচর্যে···সঙ্গে কোলাকুলি কালকের দিনের স্মরণীয় ঘটনা। আজ দুপুরে আমাদের উপন্যাসখানা শ্যামবাজারে নিয়ে গিয়েছিলুম—তোর অংশটুকুর ওরা খুব প্রশংসা ক'রলো, আমি এখনো হাত দিই নি, এর পরের পরিচ্ছেদ লিখছে যেলু। তোর ঘরটায় আজ কাল আমাদের অফিস বসছে। আচ্ছা তোর সেই মেয়েটিকে মনে আছে আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীলা? সহসা শ্যামবাজারে তাঁর সঙ্গে দেখা, আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের একটা বই ছিলো, সেটি দিয়ে লাভ করলুম মোমবাতির আলোর মত তাঁর স্নিগ্ধ ব্যবহার। তোর শরীর ভালো আছে জেনে নিশ্চিন্ত হলুম, ফিরছিস কবে? ভাই-বোনেরা ভালো আছে? বাবা-মাকে আমার বিজয়ার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাস্—তাঁরা বোধ করি ভালো আছেন? আমার বই বেরোবে তবে নতেদা'রা দার্জিলিং থেকে ফিরে না এলে নয়।—সুকান্ত। রাত—১০।১। (১৯৪২) ২০শে অক্টোবর।

অরুণ!

বিয়ের দিন সকালবেলা তোর চিঠি পেলাম। তোর কথামতো শুধু বিশ্বনাথকে 'জনযুদ্ধ' দেওয়ার সুযোগ পেলাম না বিয়ের কাজের চাপে, অন্য অনুরোধগুলো রাখবার চেষ্টা করবো। এই চিঠির প্রধান আলোচ্য বিষয় বিয়ে, এবং বিয়েও হয়ে গেলো দু'দিন হ'লো। আজ ফুলশয্যা। বিয়েটা আমার ভালো লাগেনি, বরং খুব নিরানন্দেই কেটেছে। বিশেষ ক'রে, আদর এবং সম্মান পাওয়ায় অভ্যস্ত আমি, মোটেই সম্মান পাইনি কোথাও, ভাঁড়ের মতো আমার অবস্থা। ···আমার ডান পাশে খাটের ওপর ঘুমিয়ে নববধূ (মন্দ নয়)। মেঝেতে মেজ বৌদি এবং ভূপেন। বেলা প্রায় পাঁচটা। এই আবহাওয়ায় লেখা খুব অস্বস্তিকর হ'য়ে উঠেছে। কয়েক দিন বিয়ের জন্য পার্টির কাজের কামাই হ'য়ে গেলো, হয়তো তোদের ওখানে যেতে পারবো না, ছুটি না পেয়ে। না গেলে ক্ষমা করতে পারবি না?

১৬।৪৪ সুকান্ত ভট্টাচার্য

আমি যাই আর না-যাই ১৫ তারিখের মধ্যে তুই কলকাতায় ফিরিস। ১৫ই A. I. S. F. Conference.

অরুণ! ৩।৭।৪৬

তুই কবে আসছিস? আমার চতুর্দিকে দুর্ভাগ্যের ঝড়। এসময় তোর উপস্থিতি আমার পক্ষে নির্ভরযোগ্য হবে। তোর খবর ভালো তো?

আমাদের ঝি চলে গেছে। আসার সময় তুই যে ঝি দিবি বলেছিলি, তাকে আনা চাই-ই। আমার ১৩৫২র বৈশাখের 'পরিচয়'খানাও আনিস। আর সবার খবর ভালো।

সুকান্ত

[শ্রীঅরুণাচল বসুর সৌজন্যে]

* এখন আবার জ্বর আসছে!

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জরাসন্ধ

কমলা অসুখে পড়ল। পড়বার কথা অনেক আগেই। বহু চেষ্টায় নিজেকে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে, শেষ পর্যন্ত আর ধরে রাখতে পারলো না। ব্যথাটা প্রথমে ছিল তলপেট আর কোমর জুড়ে। ক্রমে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে গেল। পায়ের গাঁটগুলো যেন পাকা ফোড়া। একটু জোরে হাঁটতে গেলে হাঁফ ধরে, ধড়ফড় করে বুক। দেহে রক্ত নেই, চোখের কোলে কালি, গাল দুটো ফ্যাকাসে। চুল উঠে যাচ্ছে গোছা-গোছা, গায়ের ফর্সা রং তামাটে হয়ে যাচ্ছে। বয়সে হেনার চেয়ে দু'-এক বছরের ছোটই বরং হবে। কিন্তু কোথাও কোনো লাবণ্য নেই, শ্রীহীন শীর্ণ দেহের সীমান্ত থেকে দ্রুত মুছে যাচ্ছে যৌবনের রেখা।

হেনার চোখে পড়েছে অনেক আগেই। অন্যান্য মেয়েদেরও নজর এড়ায়নি। কেউ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে, কেউ বা সস্নেহ উৎকণ্ঠায় জানতে চেয়েছে নানা কথা। কমলা একটুখানি হাসি দিয়ে এড়িয়ে গেছে, কিংবা যা হোক একটা সংক্ষিপ্ত জবাব। সেদিন একলা পেয়ে চেপে ধরল হেনা, ব্যাপার কী বলতো?

—কিসের ভাই? জানতে চাইল কমলা।

—শুকিয়ে যাচ্ছিস কেন দিন দিন?

—তাই না কি? কই, আমি তো বুঝতে পারছি না। ওটা তোমার চোখের ভুল, হেনাদি'। মোটা আমি কোনো কালেই ছিলাম না।

হেনা রাগ করে চলে গেল।

দু'-তিন দিন পর বিকাল বেলা খাটনি ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সুশীলার চিৎকার শুনে ঢুকে পড়ল।

—কি হল মাসীমা?

—হল আমার মাথা আর মুণ্ডু। এই ছাখ খাটনির ছিরি। মোটে তো আধ মণ ছোলা। তার এই অবস্থা! এ ছাই ঝাড়েই বা কে, আর বাছেই বা কে? গুদামী বাবুকে এখন কি বুঝ দিই বল। সে তো আমাকেই ধরবে।

—কার খাটনি এটা? আধভাঙা ছোলাগুলোর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল হেনা।

—কার আবার? তোমাদের কমলমণির।

রেগে গেলে সুশীলা প্রত্যেকের নামে ঐ রকমের একটা সাদৃশ অলংকার জুড়ে দিত। কমলা হত কমলমণি, জ্ঞানদা হত জ্ঞানুরাণী। হেনা হাসি চেপে বলল, কোথায় গেল সে? কয়েক জন মেয়ে যাঁতায় ডাল ভাঙছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, যাবে আর কোথায়! নম্বরে গিয়ে লম্বা হয়েছে!

হেনা বলল, আহা, বেচারা! শরীরটা ওর ভাল নেই। তাই নিয়েই কাজ করছিল। আজ বোধ হয় আর পেরে ওঠে নি!

সুশীলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, শরীর ভাল না থাকে, 'সিকমান' গেলেই তো হয়। আমি এ পিণ্ডি নিয়ে এখন কী করি!

—আপনি সরুন, আমি ভেঙে দিচ্ছি। এ আর কতক্ষণ লাগবে?

—থাক, তোমাকে আর এ-সব করতে হবে না।

এত দিন তো করে এলাম। ক'দিন নার্সগিরিতে প্রমোশন পেয়েছি বলে কি এই ক'টা ছোলা পিষতেও পারবো না?

কয়েক জন মেয়ের চোখে চোখে একটা চাপা হাসির ঝিলিক খেলে গেল। ওপাশ থেকে একজন বলে উঠল, ওকে মানা করুন, মাসীমা! ডাক্তার বাবু জানতে পারলে আপনার আর রক্ষা নেই।

হাসির রোল উঠল ঘরের একটা কোণ জুড়ে। সুশীলার অগ্নিদৃষ্টি পড়ল সেই দিকে। কিন্তু হুঙ্কার ছাড়বার আগেই চাপা গলায় বাধা দিল হেনা, থাক মাসীমা।

আজকার মত এমনি প্রকাশ্য রূপ না নিলেও ইঙ্গিতটা যে কিছু দিন থেকেই ভিতরে ভিতরে দানা বাঁধছে, হেনার সে-কথা অজানা ছিল না। ওয়ার্ড থেকে হাসপাতালে যেতে আসতে, স্নানের লাইনে, খাবার লোভে এখানে ওখানে হঠাৎ নজরে পড়েছে দু'-চারটি মেয়ের ছোটখাটো জটলা। তাকে দেখতে পেয়েই ফিক করে হেসে দিয়েছে কেউ, কিংবা চিমটি কেটেছে একজন আর একজনের গায়ে। কথা চলেছে চোখের ইশারায়। তাদের এই নীরব আলোচনার লক্ষ্য কে এবং বিষয়টা কী, হেনার বুঝতে কষ্ট হয়নি। না-বোঝার ভাণ করে নিজের কাজে চলে গেছে। কিন্তু একে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে পারেনি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, এর একটা জবাব দরকার। মুখ বুজে সহ্য করলে দুর্নামের মুখ বন্ধ হয় না। তারপর অনেক ভেবে আর অগ্রসর হয়নি। প্রবৃত্তিও হয়নি। মনকে বুঝিয়েছি, নোংরা জিনিষ ঘাঁটলেই তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে যায়। আজও তাই কোনো কথা না বলে সহজ ভাবেই সে কমলার যাঁতার পাশে গিয়ে বসল। কিন্তু এই সামান্য ঘটনাটাকে মন থেকে সরাতে পারল না। একে আশ্রয় করেই তার জীবনের এই নতুন ক'টা দিন তাদের আনন্দ বেদনা লজ্জা

ও গৌরবের পসরা নিয়ে ঐ ধাঁধাটার মতই যেন তার অন্তরের নিভৃত লোকে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল।

'টপ-ওয়ার্ক' অর্থাৎ দিনের মত কাজ শেষ করবার ঘণ্টা পড়ে গেছে। একটু পরেই খাবার আসবে, এবং নিশি না আসতেই নৈশ ভোজনের ফাইল বসবে। মেয়েরা সব বাইরে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা মাঠে কেউ বেড়াচ্ছে, কেউ বিশ্রাম করছে। অল্পবয়সী যারা, জমাদারণীর দৃষ্টি এড়িয়ে ওরই মধ্যে একটু ছুটোছুটি করবার চেষ্টা করছে। নির্জন ব্যারাকে চুপ করে শুয়ে আছে কমলা। হেনা গিয়ে বসল তার পাশটিতে। পাতলা রুক্ষ চুলগুলোর মধ্যে ধীরে ধীরে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, ক'দিন থেকে বলছি, কী হয়েছে খুলে বল। ডাক্তার দেখা। কমলা চমকে উঠল, ডাক্তার! না দিদি, ও-কথা বলো না। সে আমি পারবো না।

—কেন? ডাক্তার খেয়ে ফেলবে তোকে?

হেনার একটা হাত নিজের শীর্ণ হাত দু'টির মধ্যে নিয়ে সলজ্জ মৃদু কণ্ঠে বলল কমলা, তুমি জান না হেনাদি', এ রোগ কাউকে মুখ ফুটে বলা যায় না।

হেনার চোখের উপর থেকে যেন একটা পরদা উঠে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আর কাউকে না বলিস, ডাক্তারকে লজ্জা করলে চলবে কেন?

—না ভাই, অন্য ডাক্তার হলে যদি বা হত, কিন্তু ওঁর কাছে! ছিঃ—বলে জিভ কেটে জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল।

—কেন, ওঁকে তোর ভয় কিসের?

—ভয় নয় ভাই, সে যে কী, আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না। ওঁর চোখ দু'টো দেখেছ তো? যখন তাকান, মাথাটা আপনিই নুয়ে পড়ে। বাপ রে! ওঁর কাছে কখনো বলা যায় এই সব নোংরা কথা!

হেনা উত্তর দিল না। তার চোখের উপর ভেসে উঠল দেবতোষের সেই দেবোপম মুখখানা। উদার আয়ত দু'টি আত্মভোলা চোখ। ঠিকই বলেছে কমলা। মাথাটা আপনিই নুয়ে পড়ে। ইচ্ছা করে, ঐ পা দু'টির উপর নিজেকে বিলিয়ে দিই। নিজের বলে যেন আর কিছু বাকী না থাকে। বুকের ভিতরটা কোন্ অজানা বেদনায় টনটন করে উঠল। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল জানালার বাইরে, দিনশেষের রক্তরঞ্জিত আকাশের দিকে।

—হেনা দি,' মৃদু কোমল স্বরে ডাকল কমলা।

—কি?

—একটা কথা বলবো? কিছু মনে করবে না?

চোখ ফেরাল হেনা। ওর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে তরল কণ্ঠে বলল, কী বল না? মনে করবো কেন?

—তুমি ভুল করছ, হেনাদি'।

কমলার হাতের মধ্যে তার হাতখানা কেঁপে উঠল। ত্রস্ত কণ্ঠে বলল, তার মানে? কিসের ভুল?

—আমি সব জানি দিদি। ভুলে যাও কেন, আমিও তোমারই মত মেয়েমানুষ!

—তুই কী জানিস? কতটুকু জানিস?

—সবটুকুই জানি। ক'টা দিন তুমি সামনে যাও নি; তখন যদি ওঁকে দেখতে একবার! আমি চেয়ে চেয়ে দেখেছি, ওঁর হাত দু'টো কাজ করছে, আর চোখ দু'টো খুঁজছে তোমাকে। এমন করে দুঃখ দিয়ে আর দুঃখ পেয়ে লাভ কি?

—সে তুই বুঝবি না, কমলা।

—খুব বুঝবো! আমি ছেলেমানুষ নই। তা ছাড়া—হঠাৎ থেমে গেল কমলা। একটু ইতস্ততঃ করল। তার পর বলল, তা ছাড়া, এ জিনিষ তো আমার অচেনা নয়, ভাই, বলে একটু হাসবার চেষ্টা করল। হেনার বিস্মিত দৃষ্টি পড়ল তার মুখের উপর. সেটা লক্ষ্য করে বলল কমলা, তোমার কাছে লুকোবো না, দিদি, আমার সব কথাই তুমি শুনতে পাবে। কিন্তু সে আরেক দিন। আজ তোমার কথা শুনবো। বল, কেন সাড়া দিচ্ছ না তুমি, কোথায়, কিসে তোমার বাধা।

হেনা জবাব দিল না। ক্ষণকাল অপেক্ষা করে তার হাতে একটু চাপ দিয়ে হাসি মুখে আবার প্রশ্ন করল কমলা, আর কারো কাছে বাঁধা পড়েছ কি?

হেনা স্মিতমুখে জবাব দিল, না, রে না। বাঁধা পড়বো আবার কোথায়?

তারপর ধীরে ধীরে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। অস্ফুট-স্বরে বলল যেন তার আপন মনের প্রশ্নের উত্তরে, আমি যে আমার নিজের কাছেই বাঁধা। শুধু এই জেলখানার কালো পাঁচিলের মধ্যে নয়। আমি বাঁধা পড়ে আছি আমার নিজেরই জীবনের কালো গণ্ডীর মধ্যে, যে জীবন পেছনে ফেলে এলাম। আমার কি আর সাড়া দেবার উপায় আছে রে?

—কি জানি ভাই, তেমনি মৃদু কণ্ঠে বলল কমলা, তোমার এ সব কথা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমি শুধু বুঝি, যেদিন ফেলে চলে এলাম, তার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল তাকিয়ে থেকে কী লাভ? যে গেল সে গেল। তার ওপর আবার কিসের টান? নতুন ডাক যদি এল, তাকে ফিরিয়ে দিতে যাবো কেন? কোন্ দুঃখে কিসের অভিমানে? তোমার পথ চেয়ে তো কেউ বসে নেই?

হেনা হাতের উপর চিবুক রেখে নিঃশব্দে বসে ছিল। কমলার প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। শুধু তার শেষ কথাটা শুনে ওষ্ঠ-প্রান্তে ফুটে উঠল একটুখানি বাঁকা হাসি। কমলা আবার বলল, আজ হোক, কাল হোক, এই জেলের বাঁধন তোমার শেষ হবে। তারপর? জীবনভোর শুধু ভেসে বেড়াবে? তোমার এই বয়স, এই রূপ, এই প্রাণ, এই ভালবাসা, সব বৃথা হয়ে যাবে। তাতে করে কী উপকারটা হবে শুনি?

—কিন্তু তোর ঐ চোখ দিয়ে আমাকে যা দেখছিস, সেইটুকুই তো আমার সব নয়, পাগলী! পেছনে যা পড়ে রইল তাকে ঢেকে রাখি কি করে? কি করে ভুলি, কোথায় এলাম, কোত্থেকে, কোন পথ ধরে এলাম? আমি যদি বা ভুলি, গোটা সংসার তা ভুলবে না; ভুলতে দেব না।

—চুলোয় যাক তোমার গোটা সংসার। যার ভুলবার সে যদি ভুলে থাকে, বাকী সব নিয়ে তোমার কিসের ভাবনা?

—সেই জন্যেই তো আরো বেশী ভাবনা। শুধু ভাবনা নয়, ভয়। বলতে বলতে হেনার চোখে-মুখে ফুটে উঠল যেন কোন আতঙ্কে

ছাড়া। স্বর নামিয়ে বলল, তাই তো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। কাছে যেতে পারি না।

কমলার মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়। শুষ্ক কণ্ঠে বলল, কিসের ভয় হেনাদি'?

—না, না, আমার নিজের জন্যে নয়, ভয় ওঁর জন্যে। ওঁর সম্মান, ওঁর মর্যাদার জন্যে আমার আশঙ্কা। ওঁকে বঞ্চনা করছি, এই ভেবে আমার ভাবনা। কমলার মুখে একথার কোনো উত্তর এল না। নির্বাক-বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল সেই চোখের দিকে। স্নেহ এবং উৎকণ্ঠায় ভরা অপরূপ দু'টি চোখ। হেনা লজ্জিত হল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করে সহজ সুরে বলল, আচ্ছা, আমার কথা না হয় ছেড়ে দে। তুই পারতিস? এত যে বড় বড় বক্তৃতা করছিস, তুই কী করতিস বল তো?

—আমি? হেসে ফেলল কমলা। আমার কী আছে? কে আছে? আমি যে ফুরিয়ে গেছি, দিদি! আমার আর কিছু নেই। তা যদি না হত, আমি যদি তুমি হোতাম, আর আমার জীবনে আসত এমন কেউ, তুমি কি মনে কর, তখনো তোমার মত পেছনের দিকে চেয়ে শুধু বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতাম? কখখনো না। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি। আমার যে অনেক চাই, ঘর চাই, আশ্রয় চাই। এক জন চাই, যাকে ধরে দাঁড়াতে পারি, যার হাত ধরে চলতে পারি। সে এল, আর আমি মুখ ফিরিয়ে রইলাম, এত বড় দুর্মতি আমার কোনো দিন হত না।

দুর্বল শরীরে একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে কমলা হাঁপাতে লাগল। হেনা আর কথা বাড়াল না। শুধু নিঃশব্দে তার শীর্ণ হাতখানার উপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। সেই স্পর্শটুকু দিয়েই বোধ হয় অনুভব করল এই রোগজীর্ণা বঞ্চিতা নারীর একান্ত অন্তরের অত্যুগ্র গোপন-কামনা, যা হয়তো চিরদিন অপূর্ণ থেকে যাবে। অনেকক্ষণ কেটে গেল। তার পর কমলা যখন অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছে, স্নেহার্দ্র মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল: ঘর বাঁধবার তোর বড্ড সাধ, না রে কমলা?

—বাঃ, সাধ হবে না? সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কমলা। ঘর বাঁধবো বলেই তো ঘর ছেড়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জুটল এই শ্রী-ঘর—বলে হেসে ফেলল।

হেনা সে হাসিতে যোগ দিল না। গভীর দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল জানালার বাইরে।

বুড়ী অনেকখানি সেরে উঠেছে। জ্বর বন্ধ হয়ে গেছে। কাশি আছে, কিন্তু তার মধ্যে নেই সেই মারাত্মক রক্ত-কণা। ওজন বেড়েছে। খানিকটা বলও এসেছে দেহে। একটু-আধটু উঠে-হেঁটে বেড়ায়। কিন্তু মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে যে সব আণবিক মহারথীর দল তার ফুসফুসে হানা দিয়েছিল, তারা খানিকটা হটে গেলেও এখনো পুরোপুরি দখল ছেড়ে দেয়নি। ডাক্তার যথারীতি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এখন আর রোজ নয়, মাঝে মাঝে এসে তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে সিরিঞ্জ চালনা করেন। হেনার সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না। তিনি আসবার আগেই সে হাসপাতালের যেটুকু কাজ চটপট শেষ করে চলে যায় খাটানি ঘরে। কারো হাত থেকে যাঁতা টেনে নিয়ে মটর বা অড়হর ভাঙতে বসে। কখনো কোনো নতুন মেয়েকে ধরে শিখিয়ে দেয় ডাল মাড়ার কৌশল। সুশীলা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তুই এখানে কি করছিস? পালা। নিজের কাজে যা।

—হুঁ; ভা-রী তো আমার কাজ; কখন সেরে ফেলেছি।

কোনো কোনো দিন আবার যাঁতা না ঘুরিয়ে কাঁথা সেলাই করে সুশীলার নাতনীর জন্যে, কিংবা বুনতে বসে তার নাতীর গায়ের সোয়েটার।

সেদিনও সকাল আটটার মধ্যেই তাড়াতাড়ি হাসপাতালের কাজটুকু সেরে নিচ্ছিল। মোনার মার বুকে তেল মালিস করছে, এমন সময় সুশীলা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। এসেই বলল, তোর টিকিটখানা দে তো, হেনা!

—টিকিট কী হবে?

—দে না? বোর্ডে যাবে।

—সে আবার কী?

—'বোড্' 'বোড্' শুনিসনি! কি করেই বা শুনবি? ছোট জেলে ছিলি। সেখানে তো এসব কাণ্ড নেই। বোড্ বসে খালি আমাদের মত 'সেন্টার' জেলে।

উৎসাহের ঝোঁকে যা কোনো দিন করেনি সুশীলা, তাই করে বসল। চৌকাঠ পার হয়ে ঢুকে পড়ল বুড়ীর ঘরের মধ্যে; স্কার্টটা উঁচু করে, যথাসম্ভব ছোঁয়া বাঁচিয়ে। হেনা বলল, বসুন না ঐ চেয়ারটায়।

সে কথার জবাব না দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হাত নেড়ে শুরু করল জমাদারণী, বোড্ কি জানিস? কোলকাতা থেকে জেনারেল সায়েব আসে। এখান থেকে আসে কালেকটার সায়েব, জজ সায়েব, আরো সব কারা কারা। আমাদের সায়েবও থাকে। সবাই মিলে টিকিট আর কী সব কাগজ-পত্তর দেখে ঠিক করে কোন্ কোন্ কয়েদীকে খালাস দেওয়া হবে।

—মেয়াদ শেষ হবার আগেই? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল হেনা।

—আগে মানে? অনেক আগে। অর্দ্ধেক মেয়াদ খাটতে হয়নি, বেরিয়ে গেছে কত লোক।

বুড়ীও উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল জমাদারণীর এই বোর্ডতত্ত্বের ব্যাখ্যা। সাগ্রহে বলে উঠল, হ্যাঁ মা, সবাইকেই ছাড়ে তো? আমিও ছাড়া পাবো?

—হ্যাঁ; তা আর পাবে না? শ্লেষতিক্ত কণ্ঠে মুখ বিকৃত করে উত্তর দিল সুশীলা। দিব্যি শুয়ে শুয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি ডিম মাংস দুধ-মাখনের শ্রাদ্ধ করছ! সরকারের কত বড় উপকারটি করছ তুমি! তোমাকে না ছাড়লে আর ছাড়বে কা'কে?

ভারী লজ্জিত হল মোনার মা। শুকনো মুখখানা কালো হয়ে উঠল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে চুপ করে পড়ে রইল। হেনা বিরক্ত হল, দুঃখিতও হল বুড়ো মানুষের উপর এই রূঢ় ব্যবহারে। কিন্তু কয়েদীর সামনে জমাদারণীর আচরণ নিয়ে তো কিছু বলা যায় না। সুশীলা ও সব কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে আগের সূত্র ধরেই বলল, সোজা ব্যাপার না কি! যে-সব ভারী মেয়াদী লোক বরাবর পুরো খাটনি দেয়, ভালো ভাবে থাকে, টিকিটে একটাও রিপোর্ট নেই তারাই কেবল এ সুবিধা পেতে পারে। তার মধ্যেও আবার যা আছে। ডাকাতি, জাল-জোচ্চুরি, মেয়েমানুষের উপর অত্যাচার—

এ সব কেস-এ যাদের সাজা হয়, তারা কেউ বোর্ড-এ যেতে পারে না।

হেনা অনেকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। শেষ কথাটা কানে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে বসল, তবে আমি যাবো কেমন করে?

—শোনো কথা! তুই কি ডাকাত না জালিয়াত, যে—কথাটা শেষ না করেই ফিস-ফিস করে বলল সুশীলা, ডিপটি বাবু তোকে বাদ দিয়েই রেখেছিল। আমার ওয়ার্ড থেকে এক ফুলবানু ছাড়া আর কারো নাম দেয়নি। তার পর জেলর বাবু হুকুম দিলেন, হেনার টিকিটও নিতে হবে।

এত বড় একটা চাঞ্চল্যকর শুভ সংবাদ গোপনে শুনিয়ে হেনার কাছ থেকে কিছুটা কৃতজ্ঞতা অন্ততঃ আশা করেছিল সুশীলা। মুখে কিছু না বলুক, আসন্ন মুক্তির সম্ভাবনায় মুখখানা যে তার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। সেইটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কই? উৎসাহের কিছুমাত্র চিহ্নও সেখানে দেখা গেল না। হেনাকে সে সত্যিই স্নেহ করে। তাই শুধু বিস্মিত নয়, ব্যথিতও হল সুশীলা। হেনা উঠে গিয়ে টিকেটখানা এনে তার হাতে দিতেই সে নিঃশব্দে প্রস্থান করল। ভাবতে ভাবতে গেল, সংসারে দুর্বোধ্য যদি কিছু থাকে, সেটা হচ্ছে এই সব লেখা-পড়া জানা অল্পবয়সী মেয়েগুলোর মন-মেজাজ।

সুশীলার স্কার্ট জ্যাকেট জড়ানো বিশাল বপুখানা ধীরে ধীরে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। হেনা সেই দরজার মুখটাতেই দাঁড়িয়ে রইল নিস্পন্দের মত। সমস্ত মন ছেয়ে রইল জমাদারণীর ঐ 'বোর্ড' অর্থাৎ তার সম্ভাব্য খালাসের আতঙ্ক। এ তো মুক্তি নয়, অন্তহীন শূন্যতা। সে দিকে চাইলে চোখে পড়ে শুধু একটা অতল-স্পর্শী গহ্বর, যার মধ্যে না আছে আশ্রয়, না আছে কোনো অবলম্বন। জেল-গেটের ওপারে যে জগৎ। তার সমস্ত দুয়ার তার কাছে বন্ধ হয়ে গেছে। খোলা আছে শুধু পথ আর তার খর রৌদ্রের জ্বালা। তার ডাইনে বাঁয়ে হাত বাড়িয়ে নেই কোনো স্নেহনীড়, আঁচল বিছিয়ে নেই কোনো গৃহস্থরা। তার চেয়ে কি অনেক বেশী, আপনার নয় এই প্রাচীরঘেরা জেনানা ফাটক! এইখানে এই নেবুগাছের ছায়ায় এমনি স্বচ্ছন্দ নির্বিবাদে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায় না? যদি যেত, তার চেয়ে বড় তার আর কোনো কাম্য নেই। কিন্তু একথা তো কাউকে বলা যায় না। কে বিশ্বাস করবে? সঙ্গিনীরা বুঝবে না, কেউ হেসে উড়িয়ে দেবে, কেউ আড়ালে মুখ বেঁকিয়ে বলবে, ন্যাকামি! সুশীলা তাকে ভালবাসে। তাকে বলতে গেলে লাভ হবে শুধু তিরস্কার। আর জেলর সাহেব? তিনি নিশ্চয়ই দুঃখ পাবেন। হয়তো ভাববেন, এ শুধু তার জিদ, শুধু একগুঁয়েমী, মিথ্যা মর্যাদার ধূয়া তুলে স্নেহের দানকে প্রত্যাখ্যান। প্রকারান্তরে বলা, জেল খাটতে এসেছি, খাটতে দাও। তোমাদের দয়া চাই না, চাই না তোমাদের অনুগ্রহ···না, না। সেখানে সে যেতে পারবে না। কিন্তু আর এক জনকে বলা যায় না? তিনি হয়তো বুঝবেন তার একান্ত মনের কথা। কিন্তু বলবে কেমন করে? ছিঃ, কী ভাববেন তিনি?

গাছের আড়াল থেকে যেন ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল ফুলবানু। হাসিভরা মুখ। হেনা তাড়াতাড়ি নিজেকে গুটিয়ে নিল নিজের মধ্যে, এগিয়ে গিয়ে ফুলবানুর হাতটা ধরে তরল সুরে বলল, খুব খুসী দেখছি যে আজ?

—খুসী হবো না? নিজেকে দিয়েই বুঝতে পার। এক সাথেই তো যাচ্ছি।

—বেশ; তোমার বাড়িতে গিয়েই উঠবো।

—সে তো আমায় ভাগ্যি, দিদিমণি! কিন্তু আমাদের মত গরীবের ঘরে—

—আমার মত এই এত বড় একজন বড়লোক, বলেই খিল-খিল করে হেসে ফেলল হেনা।

ফুলবানুও হাসল। তার পর হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, আচ্ছা, কবে ছাড়বে আমাদের? ছেলে দু'টোকে কত কাল দেখিনি। বড্ড ছটফট করছে মনটা।

—শুধু ছেলে দু'টো? তাদের বাপের জন্যে নয় বুঝি?

ফুলবানুর মুখের উপর ফুটে উঠল একটুখানি ম্লান হাসি। সঙ্গে সঙ্গেই সেটা মিলিয়ে গেল। শুষ্ক কণ্ঠে বলল, কি জানি কী দেখবো গিয়ে? এ্যাদ্দিনে হয়তো একটা নিকে করে বসে আছে। দেশে তো পোড়া মেয়েমানুষের আকাল নেই। আমার কপালে আবার সেই লাথি ঝ্যাঁটা।

হেনা সান্ত্বনার সুরে বলল, না, না। এ তোমার মিথ্যে ভয়, ফুলবানু! নিকে অমনি করলেই হল?

—করলেই বা ঠেকায় কে? এদের কাছে আমরা তো হাঁড়িকুঁড়ির সামিল। পুরোনো হলেই ফেলে দিয়ে নতুন নিয়ে আসবে।

—তাই যদি হয় তুমিই বা লাথি-ঝ্যাঁটা খাবে কোন দুঃখে? ছেলের হাত ধরে চলে যাবে; ঘর বাঁধবে নতুন লোকের সঙ্গে। তোমাদের সমাজে সেটা দোষের নয়। আইনত কোনো বাধা নেই। ফুলবানু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বাধা নেই বলেই কি সব কিছু পারা যায়, দিদি? ওরা পুরুষমানুষ; ওরা পারে। আমরা পারি না।

ফুলবানু ওয়ার্ডে ফিরে যাবার পরেও হেনার মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল তার সেই শেষ কথাটা—ওরা পারে, আমরা পারি না। কেন পারি না? নিজের মনের কাছে প্রশ্ন করল হেনা। দুর্বল বলে? অসহায় বলে? দৃশ্যতঃ হয়তো তাই। কিন্তু তার মূল কারণ জড়িয়ে আছে, নারী বলে বিধাতার যে আজব সৃষ্টি, তার প্রকৃতি, তার অস্থিমজ্জার মধ্যে। একদিন হয়তো আসবে, যখন তার এই বাইরের অক্ষমতা আর থাকবে না। অর্থে, সামর্থ্যে, জ্ঞানে, গরিমায়, সামাজিক প্রতিষ্ঠায়, নারী হবে পুরুষের সমকক্ষ। তখনো হয়তো তাকে ফুলবানুর মত নিঃশ্বাস ফেলে বলতে হ'বে—ওরা পারে, আমরা পারি না। যত ভালোই বাসুক, স্বামীর কাছে স্ত্রী তার নর্ম-সহচরী। কিন্তু স্ত্রীর কাছে স্বামী তার মর্ম-সহচর। একে অন্যকে যখন ছেড়ে যায়, পুরুষের চোখ ফেটে যদি জল ঝরে, নারীর বুক ফেটে ঝরে রক্ত। পুরুষের প্রেম তার আত্মদান, আর নারীর প্রেম তার আত্ম-বিলোপ। নিজেকে হারিয়ে ফেলে ফুলবানুর জাত চিরদিন কেঁদে এসেছে, চিরদিন কাঁদবে।

রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে, জেলের মধ্যে তার মোহনাটা অতি স্পষ্ট। সন্ধ্যা যেখানে ধীরে ধীরে রাত্রির মধ্যে

মিলিয়ে যায় না। রাত্রি হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে প্রণাম করে। একের বিদায় যেমন আচমকা, অন্যের আগমন তেমনি আকস্মিক!

দিনের রুটিন শেষ হয়ে গেছে। জেলের ভিতরকার রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য। চারি দিকে হাঁকডাক ছুটাছুটি। মুহূর্ত-কয়েকের ব্যবধান। হঠাৎ দেখা গেল, সব ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেছে। পথ শূন্য, মাঠ নিস্তব্ধ, ঘাট জনহীন। বিশাল ওয়ার্কশপগুলো দাঁড়িয়ে আছে প্রেতপুরীর মত। খাঁ-খাঁ করছে রান্নাঘর, খাবার হল, স্নানের লাইন। সন্ধ্যার কোলাহল সহসা থেমে গেছে, নেমে এসেছে রাত্রির স্তব্ধতা।

দীর্ঘ ব্যারাকগুলোর ভিতর থেকে শুধু শোনা যাচ্ছে একটা এক-টানা গুঞ্জন। নির্জন রাস্তায় এখানে-ওখানে লণ্ঠন দুলিয়ে পাহারা দিচ্ছে রাতের সিপাই। মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিচ্ছে—আ—স্তে। কেউ হাঁকছে, মুখ বন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে নেমে যাবে গুঞ্জনের সুর। আবার ধীরে ধীরে চড়তে থাকবে তার পরদা। মাত্রা ছাড়িয়ে উঠবার আগেই গর্জে উঠবে সিপাই বাবুর দ্বিতীয় হুঙ্কার।

আফিস মহলের চেহারা অন্য রকম। জেলর ও সুপারের ঘরে তালা ঝুলছে। কিন্তু গেট দিয়ে ঢুকে বাঁদিকটার ডেপুটি এবং কেরাণী বাবুরা যেখানে বসেন, সে ঘরগুলো রীতিমত সরগরম, উজ্জ্বল বিজলি বাতির নিচে টেবিলে টেবিলে নানা আকারের খোলা রেজিষ্টার। তার পাশে যাঁরা জমিয়ে বসেছেন, তাঁদের হাতে কলম, মুখে সিগারেট, আর তার ফাঁকে ফাঁকে খোস খবরের বুকনি। বাইরেকার লৌহ-তোরণ পার হয়ে ভিতরের দিকে যে বিরাট কাঠের গেট তার বুকে রাত্রির মত তালা পড়ে গেছে। দরকার মত খোলা যাবে পাশের দিকে বসানো একটা ছোট্ট দরজা, যার নাম উইকেট গেট। আকারে ছোট হলেও তার প্রতাপ ছোট নয়। খোলা এবং বন্ধ করার শব্দে গোটা আফিস সজাগ হয়ে ওঠে।

আসর বেশ জমে উঠেছে। সেই উইকেট গেট খোলার সাড়া পাওয়া গেল। অনেকেই উৎকর্ণ হলেন। প্রত্যাশিত ব্যক্তিই বটে, গলায় ষ্টেথিস্কোপ-পরা ডাক্তার দেবতোষ ঘোষ, পিছনে তার কম্পাউণ্ডার। বাবুদের কারো কারো মুখের উপর খেলে গেল নীরব হাসির চমক। বাক্যের স্রোতে দেখা গেল সাময়িক ভাটার টান। সামনেকার গেট খোলা এবং বন্ধ করার ঝনৎকার শোনা যেতেই আবার সবাই নড়ে চড়ে বসলেন। আমদানি দপ্তরের সাদেক হোশেন বলল, বড্ড মুসড়ে পড়েছে যেন মনে হল।

কোণের দিক থেকে কে একজন যোগ করল, তেমন সুবিধে হচ্ছে না বোধ হয়।

—আরে, না, না। সুবিধা ঠিকই আছে। মান-অভিমানের পালা চলছে; এর পরেই ভাব-সম্মিলন। বৈষ্ণব কবিতা পড়নি? উত্তর দিলেন গজেন বাবু। ছ'নম্বর ডেপুটি বরেন রায় বললেন, লোকটার একটা বিয়ে-থার ব্যবস্থা করুন, দাদা! শেষটায় একটা বড় রকমের কেলেঙ্কারি না করে বসে। সিনিয়র ডেপুটি রিলিজ ডায়রি লিখছিলেন। খাতা থেকে মুখ না তুলেই বললেন, জানা-শোনা মেয়ে আছে না কি তোমার হাতে?—রক্ষে করুন। থাকলেও ওর হাতে দেবার আগে জলে ডুবিয়ে দেবার পরামর্শ দিতাম। কী **taste** দেখুন লোকটার। একটা **confirmed criminal,** বলতে গেলে রাস্তার মেয়ে। তাকে নিয়ে ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তুই হলি একটা ডাক্তার, লেখাপড়া শিখেছিস, সরকারী চাকরি করছিস, বংশের একটা মান আছে।

গজেন বাবু বললেন, আরে মশাই, এর নাম হল লভ—, কবিরা বলেছেন, প্রেম-তৃষা, যার ঠেলায় লোকে নর্দ্দমার পাঁক তুলে মুখে দেয়, আর এ তো—

—নর্দ্দমা ঝর্ণা হতে কতক্ষণ? বাধা দিয়ে বললেন সিনিয়র, সেই চেষ্টাই হচ্ছে, জানো না বুঝি?

ব্যাপারটা বুঝতে না পেয়ে সকলেই জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। সিনিয়র বুঝিয়ে দিলেন, অ্যাডভাইসরি বোর্ডে নাম গেছে। খালাস হয়ে গেলে আর পায় কে? কয়েদী তো গায়ে লেখা থাকে না?

—বোর্ড ছাড়বে মনে করেন? প্রশ্ন করলেন বরেন বাবু।

—আমার তো মনে হয় না। আর ছাড়লেও গভর্মেন্ট শুনবে কি না সন্দেহ! ঐ রকমের **heinous offence!** তারপর জেল-রেকর্ডও ভালো না। প্রেসিডেন্সি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ডিষ্ট্রিক্ট জেলে। সেখানেও পানিসমেণ্ট আছে গোটা কয়েক।

কে একজন বলল, কিন্তু এখানে তো বেশ ভালো ভাবেই আছে। কোনো রিপোর্ট হয়নি।

—তার মানে সুশীলাটা যে ভেড়া। সব মেয়েগুলো কাঁধে চড়ে নাচে, কিচ্ছু বলে না। ওখানকার ফিমেল ওয়ার্ডার কড়া লোক। ওর সঙ্গে বনত না একেবারেই। তাই এখানে এসে জুটেছে।

—কোন জেল? জানতে চাইলেন গজেন বাবু।

—ফরিদপুর।

—ফরিদপুর! ও-ও! সেখানকার জমাদারণীও এক দারুণ চীজ।

—কী রকম? কৌতূহলী হলেন শ্রোতার দল।

গজেন বাবু বললেন, ডিউটিতে এসেই তিনি দিব্যি বিছানা-টিছানা করে শুয়ে পড়বেন। তারপর চলবে অঙ্গ-সেবা। একসঙ্গে দুটো মেয়ে। একজন পায়ের দিকে, আর একজন মাথার দিকে। তাও যাকে-তাকে দিয়ে চলবে না। বয়স কম হবে ও দেখতে-শুনতেও ভালো হওয়া চাই। তাছাড়া পছন্দমত কমবয়সী মেয়ে পেলে অন্য ব্যাপারও চলে।

—কী ব্যাপার? সাগ্রহে প্রশ্ন করল ছোকরা মত একজন, কেরাণী।

—সে সব কি এখানে বলা যায়? দাদা বসে আছেন।

—দাদার খাতিরে বাকীই বা কি রাখলে শুনি? মন্তব্য করলেন সিনিয়র। শুধু ফরিদপুর কেন, ও সব প্রেমলীলা সব জেলেই আছে। পুরুষে পুরুষে যেমন চলে, মেয়েতে মেয়েতেও তেমনি। জমাদার, জমাদারণীরাও মাঝে মাঝে অংশ নিয়ে থাকেন। সাদেক বলল, তাহলে একে নিয়েও বোধ হয় সেই রকম একটা কিছু হয়ে থাকবে। জমাদারণী সুবিধে করতে পারেনি। এ-ও তো চীজ কম নয়!

—চীজ কম নয়, তুমি জানলে কী করে? পরখ-টরখ করে দেখেছ নাকি? অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করলেন গজেন বাবু।

—না, দাদা। সে সুযোগ আর হল কই? সুযোগ হলেও, সত্যি বলতে কি, সাহস হয়নি। তা ছাড়া রুই-কাতলা যেখানে ঘায়েল হয়ে গেল, সেখানে আমার মত চুনো-পুঁটি—

আমি এবার চলি, দাদা, কথার মাঝখানে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন বরেন বাবু। একটু বেরোতে হবে। গুডনাইট।

সিনিয়র তার খাতায় মুখ রেখেই বললেন, গুডনাইট।

সাদেক হোসেনকে ঘিরে ধরল সবাই। গজেন বাবু বললেন, তুমি তো সাঙ্ঘাতিক লোক হে! একটা থলে হাতে করে বসে আছ! ঝাড়ো ঝাড়ো। ও সব হেঁয়ালি-টেয়ালি ছেড়ে সোজা বাংলায় বলো। কাতলাটি কে?

—সাদেক একেবারে আঁৎকে উঠল, সর্বনাশ! সেটা একেবারে strictly confidential ভাঙলেই চাকরি যাবে।

—আচ্ছা নাম-ধাম থাক। ব্যাপারটা বলে যাও।

—ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়। ঐ মেয়েটা আসবার বোধ হয় দু'-তিন দিন পর। টিকিটখানা কী কাজে এসেছিল আমার টেবিলে। কাতলার নজর পড়ে গেল। নামটা পড়া আর শেষ হয় না। তারপর বোধ হয় বয়সটা আরো গোল বাধাল। বুঝলাম কাতলা বাবুর চোখে ঘোর লেগেছে। ভিতরে ভিতরে খবর রাখতে সুরু করলাম। যা ভেবেছিলাম তাই। একটা কী ছুতো-টুতো নিয়ে একদিন বিকেল বেলা ফিমেল ওয়ার্ডে গিয়ে হাজির। রীতিমত সাজগোজ করে। সুশীলা যখন থাকে, তখন নয়। ছোট জমাদারণী রাণীবালার ডিউটি। তার সঙ্গে বোধ হয় কোনো বন্দোবস্ত হয়ে থাকবে। হেনাকে ডেকে পাঠানো হল। গেট খুলতেই যে দেয়ালের স্ক্রীনটা আছে, তার পাশে।

—জায়গাটি চমৎকার—দলের মধ্য থেকে মন্তব্য শোনা গেল।

—হেনা আসতেই রাণীবালা চলে যাচ্ছিল। সে বাধা দিল, আপনি যাবেন না। টোনটা অনুরোধের নয়, একেবারে হুকুমের মত। রাণীবালাকে থাকতে হল। কাতলাও সাহস করলেন না তাকে সরিয়ে দিতে। অত্যন্ত ফরওয়ার্ড মেয়ে। সোজা তাকিয়ে বলল, আমাকে ডেকেছেন, আপনি? কাতলা নার্ভাস। আমতা আমতা করে বললেন, তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তোমার কেসটা মিথ্যা। উকিলের সঙ্গে পরামর্শও করেছি। মোটামুটি কতকগুলো facts জানতে পারলে তোমার খালাসের জন্যে চেষ্টা করতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, ধন্যবাদ! কেসটা মিথ্যা নয়। খালাসের চেষ্টারও দরকার নেই।

কাতলা দ্বিগুণ নার্ভাস। তবু কোনো রকমে বলে ফেললেন, তাছাড়া, তোমার খাটনি, মানে এই ডাসভাঙাটা বদলে যাতে অন্য কোনো সোজা কাজ দেওয়া হয়, সে বিষয়ে আমি সাহেবকে বলবো। ভাবছি······

—দরকার হলে আমিই বলতে পারবো। তবে, দরকার নেই।

অতঃপর কাতলার প্রস্থান। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়, আবার একদিন লাক্ ট্রাই করতে ছুটলেন কাতলা বাবু। রবিবার দুপুর বেলা। সেই দেয়ালের আড়ালেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। খবর পেয়ে হেনা বেরিয়ে এল। নমস্কার করে বলল, ওখানে কেন, এদিকে আসুন না? যেন কত খুসী ওঁকে দেখে। ওয়ার্ক সেডের বারান্দায় একটা মোড়া ছিল। সেখানে নিয়ে বসাল। খাটনি বন্ধ। মেয়েরা সব ওয়ার্ডে ঘুমুচ্ছে। ধারে-কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কাতলার আনন্দ আর ধরে না। হেনাই কথা পাড়ল, বলুন। সেন্ট-মাখা সিল্কের রুমাল দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বললেন কাতলা বাবু, তোমাকে দেখলে বুঝতে পারি, মেয়ে-কয়েদীদের এই পোষাকগুলো বদলানো দরকার। যেমন মোটা কাপড়, তেমনি বিশ্রী কাটছাঁট। এ বিষয়ে আমরা লিখবো। অন্ততঃ তোমার মত ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়েদের জন্যে—

কথার মাঝখানেই হেনা বলে উঠল, ভদ্রঘরের মেয়ে বলে মনে করেন নাকি আমাকে?

কাতলার তীব্র প্রতিবাদ, কী যে বল! তোমাকে মানে—

হেনা তেমনি শান্ত ভাবেই বলল, কিন্তু আর কোনো অপরিচিত ভদ্রঘরের মেয়েকে 'আপনি' না বলে যদি 'তুমি' বলে আলাপ সুরু করতেন, আপনাকে কী নিয়ে ফিরতে হত জানেন?

কাতলার চোখ ছানাবড়া। উত্তরটা হেনাই দিল—অপমান! বলে নমস্কার করে চলে গেল ওয়ার্ডে।

সাদেকের কথা শেষ হতে না হতেই অফিস ফাটিয়ে উল্লাসময় অট্টহাসি এবং তার পিঠের উপর সমবেত চপেটাঘাত। হুল্লোড় থামলে সিনিয়র শান্ত কণ্ঠে বললেন, এই সরস কাহিনীটি কি সাদেক সাহেবের latest রচনা?

—আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি, দাদা, এর প্রত্যেকটি কথা সত্যি।

sourceটা কী জানতে পারি?

—মীনা বলে যে বি-ক্লাশ মেয়েটা খালাস পেল সেদিন, ঐ যে প্রায়ই আসে, তারই কাছে শোনা। রাণীবালাও স্বীকার করেছে।

—তাই বল; মাথা নেড়ে বললেন সিনিয়র, এবার বোঝা গেল ডাক্তারের ওপর বরেন বাবুর এত রাগ কিসের—

—এবং আঙুরফলটাই বা এত টক লাগল কেন? যোগ করলেন গজেন বাবু।

আর একবার হাসির রোল।

এ কাহিনী যে সময়ের, তখনকার দিনেও জেলে জেলে কয়েদীদের জন্যে একটা করে লাইব্রেরী ছিল। বই যা থাকত, দু'-চারখানা ধর্মগ্রন্থ বাদ দিলে, বেশির ভাগই নিচু স্তরের, অন্ততঃ সাবালকদের পড়বার মত নয়। ও জেলে থাকতে ক্যাটালগটা আনিয়ে একবার পাতা উলটিয়ে দেখেছিল হেনা। ভূত-প্রেত জিন-পীরের কাহিনী, তিন আনা সিরিজের জীবনী কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর অ্যাডভেনচার আর যা, তার প্রায় সবগুলোই ছেলেবেলায় পড়া হয়ে গেছে আর বাকীগুলো দুর্বোধ্য। সবে নতুন। জেলখানার হালচাল তখনো রপ্ত হয়নি। তাই বিষয়টা একদিন খোদ সুপার সাহেবের সাপ্তাহিক ফাইল-এ পেশ করে বসল। তিনি জেলর সাহেবের মুখের দিকে তাকালেন, এবং জেলর সাহেব তাকালেন ডেপুটি সাহেব পানাউল্লার দিকে। সে বছর বই কিনবার ভার পড়েছিল তারই উপর, এবং তিনি কয়েকখানা আমপাড়া বিষাদসিন্ধু আর বাকী সব ফতিমাবিবির কেচ্ছা ইত্যাদি মূল্যবান সংগ্রহ দিয়ে আলমারি ভর্ত্তি করেছিলেন। হেনার অভিযোগের উত্তরে একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন, জেলের বেশির ভাগ লোক নিরক্ষর, বাকী প্রায়ই চাষাভূষা, নামমাত্র লেখাপড়া জানে। তাদের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই

আমাদের বই কিনতে হয়। দু'-চার জন শিক্ষিত বা শিক্ষিতার স্বার্থ দেখলে চলে না।

হেনা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, যারা নিরক্ষর কিংবা সবে পড়তে শিখেছে, তারা লাইব্রেরী দিয়ে কি করবে? লাইব্রেরী জিনিষটাই শিক্ষিত লোকের জন্যে। বইএর অভাব শেষ করে তারাই। তাদের যা কাজে লাগে, সেই সব বই-ই রাখা দরকার। তা না হলে লাইব্রেরী করে কী লাভ?

বলা বাহুল্য, একটা সামান্য কয়েদীর কাছ থেকে এরকম স্পষ্ট উক্তি কর্তারা পছন্দ করেননি। নেহাৎ মেয়েমানুষ বলে শুধু একটা রুদ্ধ ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করেই প্রস্থান করেছিলেন; insolence impertinence এর অপরাধে আর কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করেননি। এর পরের বার বই কিনবার সময় শোনা গেল, বড় সাহেব লিষ্টি তলব করে বসেছেন। তার কিছুদিন পরেই হেনার বদলি হয়ে গেল।

এখানকার ক্যাটালগ দেখে সে কিন্তু অবাক না হয়ে পারেনি। প্রথম দিকের বইগুলো যাই হোক, হাল আমলের সংগ্রহটা চমৎকার। সুশীলার কাছে শুনেছিল, বই নির্বাচনের ভার নাকি তালুকদার নিজের হাতেই রেখেছেন। মাঝে মাঝে দু'-একখানা বই সে লাইব্রেরী থেকে আনিয়ে পড়ত। একদিন একটা নতুন উপন্যাস পড়তে পড়তে হঠাৎ চোখে পড়ল পেনসিলে লেখা কতকগুলো কুৎসিত কথা। শুধু এক জায়গায় নয়, মাঝে মাঝেই অমন ধারা অশ্লীল মন্তব্য। গা'টা এমন পাক দিয়ে উঠল যে বইখানা তাকে শেষ না করেই ফেরৎ দিতে হয়েছিল। তারপর অনেক দিন আর বই আনবার মত উৎসাহ বোধ করেনি। কিন্তু সুশীলার পীড়াপীড়িতে আবার একদিন কয়েকখানা বইয়ের নাম লিখে স্লিপ পাঠিয়ে দিল লাইব্রেরীয়ানের কাছে। সুশীলাকে এ ব্যাপারে নিঃস্বার্থ বলা যায় না। দুপুর বেলা হেনার ঐ মিষ্টি সুরের গল্প পড়া না শুনলে তার ভাত হজম হত না। কোনো কোনো দিন এটা ছিল তার নিদ্রাকর্ষণের ওষুধ। সুশীলা ছাড়া কমলা এবং আরো কয়েকটি মেয়েও ছিল পাঠের আসরের নিয়মিত সভ্যা।

লাইব্রেরীর চার্জটা একজন কেরাণী বাবুর হাতে থাকলেও কাজ-কর্ম সব চালাত "রাইটার" অর্থাৎ খানিকটা লেখাপড়া জানা একজন মাতব্বর কয়েদী। হেনার স্লিপ পেয়ে খানকয়েক বই পাঠিয়ে দিল ফিমেল ওয়ার্ডে। পড়তে গিয়ে তাদের একখানার মধ্যেও পাওয়া গেল তেমনি পেনসিলে লেখা অশ্রাব্য উক্তি। কিন্তু এবার আর ওসব গ্রাহ্য না করে এগিয়ে চলল। তারপর একটা পাতা ওল্টাতেই বেরিয়ে পড়ল এক টুকরা কাগজ। সজলেখা প্রেমের কবিতা। তার মধ্যে ভাব ভাষা ছন্দ সবটারই অভাব, অভাব ছিল না শুধু কুরুচির। নাম ধাম উল্লেখ না থাকলেও এটা যে তারই উদ্দেশে রচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ ছিল না। মাথার ভিতরটা হঠাৎ ঝাঁ করে উঠল। কবিতার শেষে লেখক তার নামটাও প্রকাশ করেছেন। ইচ্ছা হল জেলর সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেয় কাগজখানা। তারপর ভাবল, কী লাভ হবে তাতে? আরো খানিকটা ঘুলিয়ে উঠবে পাঁক। একবার মনে হল আর কারো নজরে পড়বার আগে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলা দরকার। কিন্তু ঐ নোংরা জিনিষটা স্পর্শ করতেও প্রবৃত্তি হল না। তিউটি জমাদারকে খবর পাঠিয়ে সেই দিনই সে সব বইগুলো ফেরৎ দিয়ে দিল। আর কোনো দিন লাইব্রেরীর বই চেয়ে পাঠায়নি।

বুড়ী অনেকখানি সেরে উঠবার পর হেনার হাতে বেশ কিছু সময় জমতে সুরু করল। মনটাও যেন কিছুদিন থেকে ভাল নেই। নতুন করে আবার তীব্র হয়ে উঠল বইএর অভাব। লাইব্রেরীর ব্যাপারটা সম্বন্ধে সুশীলাকে খানিকটা ইঙ্গিত দিতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথমে 'দেখে নেবো' গোছের খানিকটা আন্দোলন করলেও শেষ পর্যন্ত সে-ও হেনার মতেই সায় দিয়েছিল। বলেছিল, তোর কথাই ঠিক। দেখেছি তো, এ সব ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত দোষের ভাগী হয় মেয়েরাই, আর কলঙ্কের দাগও তাদের গায়েই লাগে।

অনেক ভেবে-চিন্তে হেনা একদিন সুশীলাকেই ধরে বসল, আপনার জানা-শোনা কেউ নেই, মাসীমা, যেখান থেকে দু'-একখানা বই ধার পাওয়া যায়? পাবলিক লাইব্রেরী থেকে আনা যেত, কিন্তু সেখানে আবার টাকা লাগবে যে। সুশীলা একটুখানি কী ভাবল। তার পর বলল, আচ্ছা, দাঁড়া, দেখি তোর বই জোগাড় করতে পারি কি না।

ঠিক দু'দিন পরে সুশীলা একটা ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেট হাতে করে হাসতে হাসতে দাঁড়াল গিয়ে হাসপাতালের দরজায়। সেদিকে নজর পড়তেই হেনার চোখ-মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ছুটে গিয়ে প্যাকেটটা একরকম কেড়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কলকণ্ঠে, বই! কোত্থেকে আনলেন?

—খুলেই তাখ।

তাড়াতাড়ি মোড়কটা খুলে ফেলতেই বেরিয়ে এল তিন খণ্ড গল্পগুচ্ছ। নতুন বইএর মিষ্টি গন্ধে ভরে গেল বুকখানা। বইগুলো দু'হাতে বুকে জড়িয়ে অনুযোগের সুরে বলল, আপনি আবার কিনতে গেলেন কেন এতগুলো বই? এর যে অনেক দাম!

সুশীলা মুখ টিপে হেসে বলল, দাম তো আর আমি দিইনি। যে দিতে পারে, সেই দিয়েছে।

—কে সে? হেনার চোখে-মুখে ফুটে উঠল বিস্ময় আর বিরক্তির কুঞ্চন।

সুশীলা ধমকের সুরে বলল, তা দিয়ে তোর কাজ কি? পড়তে চেয়েছিলি, পড়।

—এই রইল আপনার বই। কোত্থেকে পেলেন না বললে কখখনো নেবো না।

—শুনলে আবার লাফাতে সুরু করবি না তো?

কেন, লাফাবো কেন?

ডাক্তার বাবু।

অকস্মাৎ যেন তাড়িতাঘাতে হেনার আপাদমস্তক শক্ত হয়ে গেল। দৃপ্ত কণ্ঠে বলল, তাঁর কাছে বই চাইতে গেলেন কেন আপনি? সুশীলা খানিকটা এগিয়ে এসে স্বাভাবিক রুক্ষ স্বর যথাসাধ্য নরম করে বলল, তাখ, কথায় কথায় ওরকম মাথা গরম করতে নেই। কার কাছে চাইব শুনি? এতবড় জেলখানার এতগুলো বাবু। তার মধ্যে বই পড়ে ঐ একটা লোক। মস্ত বড় আলমারী-ঠাসা খালি বই। সে যদি দেখতিস? যতক্ষণ বাড়ি থাকে, ঐ নিয়েই পড়ে আছে। চাকরটার কাছে শুনেছি, মাঝে মাঝে রাত্তিরে খাওয়াই হয় না। পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ে।

হেনার সেই দৃঢ় ভঙ্গী আস্তে আস্তে কোমল হয়ে এল। অনেকটা যেন সলজ্জ সুরে বলল, আমার নাম করে চাইলেন ?

—না ; তোর নাম করবো কেন ? আমার নাম করে চাইলাম। বললাম, ওগো, তোমাদের সুশীলা জমাদারণী এত বড় পণ্ডিত হয়ে গেল। দু'খানা বই পড়তে দেবে না ? বলে পরিহাস-তরল কণ্ঠে হেসে ফেলল সুশীলা। হেনা বোধ হয় শুনতেই পায়নি। আগের সূত্র ধরেই বলল, ছি, ছি, কী মনে করলেন উনি ?

—কী আবার মনে করবে ! দেখে তো মনে হল খুসী ই হয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে আলমারী খুলে বেছে-বেছে খান-চারেক বই আমার হাতে দিয়ে বলল, এগুলো পড়া হলে আবার এসে নিয়ে যেও। তারপর ও মা ! বারান্দা পেরিয়ে কেবল উঠোনে পা দিয়েছি, পেছন থেকে এই ডাকাডাকি। 'কী হল ?' 'না, না, ওগুলো নিতে হবে না। কাল এসো, অন্য বই দেবো।' বই কটা যেন কেড়ে নিলে আমার হাত থেকে। আজ আবার যেতে ঐ বাণ্ডিলটা দিলে। লোকে ঠিকই বলে, ডাক্তার বাবুর মাথায় বেশ একটু ছিট আছে।

হয়তো তাই। কিন্তু এই 'ছিট'এর পেছনে আরো কিছু আছে, যা সুশীলা না জানলেও, হেনার কাছে আজ আর অস্পষ্ট নেই। তার মনে পড়ল, দেবতোষের সেই চিঠি—'আমার কাছ থেকে তোমার কোনো ভয় নেই। নিজেকে আমি তোমার পথ থেকে সরিয়ে নিলাম।' পাছে তাঁর নিজের ঐ ক'টি প্রিয়বস্তুর রূপ ধরে সেই 'ভয়' এসে দেখা দেয় হেনার মনের কোণে, পাছে তার সন্দেহ জাগে, এ তো নিজেকে সরিয়ে নেওয়া নয়, কৌশলে নিজেকে নতুন করে বিস্তার করা, তাই বই এল, কিন্তু সে তাঁর নিজের কাছ থেকে নয়, তাঁর হাতের কোনো স্পর্শ লেগে নেই এর কোনোখানে। বই ক'খানা আবার উল্টে-পাল্টে দেখল হেনা। একটা কালির আঁচড় পড়েনি এর কোনো পাতায়। কী দোষ হত যদি প্রথম পাতাটির মাঝখানে ছোট্ট করে থাকত তাঁর নাম, আর তার নিচে যত্ন করে লেখা তাঁর একটি সুন্দর স্বাক্ষর—দেবতোষ। সংসারে কার কী ক্ষতি হত ?···সহসা ঘুরে গেল চিন্তাস্রোত। ক্ষণিকের মধুর ঘোর কেটে গেল। নিজের স্পর্দ্ধা দেখে আশ্চর্য হল হেনা। আপনাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এল দৃঢ় শাসনের বন্ধনে।

বুড়ী ঘরে নেই। জানালার ধারে টুলটা টেনে নিয়ে প্রথম খণ্ডখানা খুলে বসল হেনা। নিজেকে ডুবিয়ে দিল কবিগুরুর এই অনবদ্য সৃষ্টির মধ্যে, যার জন্য মন-প্রাণ তৃষিত হয়েছিল কত দিন। তারপর কখন এক সময়ে অনুভব করল, বইএর অক্ষর তার চোখে ঝাপসা হ'য়ে গেছে। মন বলছে তার কানে কানে নাই বা রইল লেখনীর টান, নাই বা রইল মসী-চিহ্ন। এই সাদা পাতার বুকের উপর যে অদৃশ্য লিপি তিনি পাঠিয়ে দিলেন, তার প্রতিটি রেখাই তো তার কাছে প্রত্যক্ষ। দেখা না গেলেও সে দৃশ্যমান, শোনা না গেলেও সে সুরময়।

বই ক'খানা তুলে নিয়ে পরম শ্রদ্ধাভরে কপালে ঠেকাল, তার পর গভীর আবেগে চেপে ধরল বুকের উপর। [ক্রমশঃ।

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীপদ্মা গঙ্গোপাধ্যায়

বর্ষে বর্ষে দ্বারে আসি দিয়ে যাও ডাক
পঁচিশে বৈশাখ,
তুমি একদিন
বাজালে যে জাগরণী বীণ
"জাগো জাগো ওগো নর-নারী
তব দ্বারে এসেছে অতিথি, লহ তারে বরি'।"
তব সে আহ্বান
দিকে দিকে সঞ্চারিল প্রাণ।
উদিল পূরব নভে জ্যোতির্ময় রবি,
আলোকে আনন্দে গান গেয়ে ওঠে কবি।
সেই সে প্রাণের তারে ঝঙ্কৃত যে সুর
তাহারই নবীন তান বাজিল মধুর।
শিহরি উঠিল ধরা, তৃণ, তরুলতা,
মাধবীর কাণে অলি বলে সে বারতা
বনভূমি ফুলদলে রচি আলিম্পন
জানাইলো প্রিয় সম্ভাষণ।
মর্ম্মরিত নদীর কল্লোলে,
বসন্তের পবন হিল্লোলে,
দিবসের শান্ত নীলিমায়,
রাতের আঁধারে গাঁথা তারার মালায়,
ওঠে কানাকানি,
"এসেছে যে আজি তারে জানি ওগো জানি।
নয় সে অচেনা,
বারে বারে এই পথে তারি আনাগোনা,
শুনেছি সে গান
যাহার পরশ পেয়ে জেগে ওঠে প্রাণ।"
তাই তো ধরণী
রূপে, বর্ণে, গন্ধে ভরা অন্তরখানি
মেলি দিল সবার সমুখে,
তাহার সুধার পাত্র সব তৃষা হরিল পলকে।
হে পঁচিশে বৈশাখ
আর বার দিবে না কি ডাক
তব কবিটিরে।
উৎসবের সাজ খুলে ফেলিয়াছে দূরে,
বিরহ-বিধুরা-ধরা,
লুপ্ত আজি তার প্রাণে আনন্দের ধারা,
এসো এসো আনো তব এ আশ্বাস-বাণী
নহে নহে নিঃশেষিত সে মাধুর্য্য-খনি।
এনেছি বহিয়া
সে প্রাণ-গঙ্গার ধারা, লহ গো চিনিয়া।
ফিরিয়া আসিবে কবে সেই বাণী নিয়া,
আগ্রহে আকুল ধরা আছে প্রতীক্ষিয়া।

পঞ্চতপা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

(৭)

সান্ত্বনা দু'চারবার অনুরোধ করতে নরেন রাজি হয়ে গেল। ইতস্তত করেছিল প্রথম। কিন্তু আনন্দ জিনিসটাও ছোঁয়াচে কম নয়। চাকরীর বাইরেও শুকনো পদমর্যাদার শিকলে আটকা পড়ে থাকবে সে মন নয় নরেন চৌধুরীর।

বাদনা উৎসবে নেমন্তন্ন করে গেছে পাগল সর্দার।

সান্ত্বনা শুনেছে সে এক মস্ত পর্ব। বার মাসে তের ছেড়ে তেত্রিশ পার্বণের অজস্রতাই ছিল একদিন ওদের। সে দিন গেছে। পৌষে ধান কাটার উপলক্ষও আর নেই বড়। মেয়ে-পুরুষের প্রধান জীবিকা এখন চাকরী। ক্ষুধার দায়ে পেশা বিকিয়েছে। সে পেশার লাগাম অন্যের হাতে। তবু দুই একটা উৎসবে লাগাম ছেঁড়ে ওদের। বাদনা উৎসবে বেশ ভালো করেই ছেঁড়ে। উপর্যুপরি পাঁচটা দিন একটা সাঁওতাল নারীপুরুষকেও আর মড়াইয়ের ধারে কাছে দেখা যাবে না।

ওদের এই ক'টা দিনের অনুপস্থিতি মড়াইয়ের কর্মকর্তাদেরও মেনে নিতে হয়। বিভিন্ন জাতের সহস্র সহস্র কুলিকামিনের মধ্যে মাত্র ক'টা দিনের জন্য এই একদলের অনুপস্থিতি লক্ষ্যনীয় নয় এমন কিছু। উৎসবের ব্যাপারটা নরেন চৌধুরী কিছু কিছু জানে। গতবারে আভাস পেয়েছে। সান্ত্বনা দেখেনি কখনো। শুনেছে। শোনার পরেও আর চুপচাপ ঘরে বসে থাকে কি করে।

যেতে হবে ওদের বাড়ির পেছন দিক দিয়ে পাহাড়ী রাস্তা ধরে নিচে নেমে, গোটা দুই গ্রাম ছাড়িয়ে শালমহুয়ার বন পেরিয়ে তার পর।

অদ্ভুত ভালো লাগছে সান্ত্বনার। এ পথে আর আসেনি কখনো। মহুয়া বনে বসে টইটম্বুর মহুয়া ফলের মিষ্টি মাতাল আতপ-আতপ গন্ধে কি একটা সাড়া জাগছে যেন চেতনার তলায় তলায়। আসন্ন বসন্ত বাতাসে শালপিয়ালের ঝরঝরানি যেন গানের মতই কানে বাজছে নরেন এটা সেটা টিপ্পনী কাটছে মাঝে মাঝে। এ পরিবেশে নীরবতাও প্রায় স্পর্শ-বাহিনী। তাই কথা বলতে হচ্ছে ওকে। নইলে চুপচাপ ওই নানা প্রাচুর্যের দিকে চেয়ে থাকা অনেক বেশি লোভনীয়।

কিছুটা পথ বাকি তখনো। দূর থেকে ঢোল মাদলের শব্দ কানে আসছে। সামনের বাঁকে একজন লোক দাঁড়িয়ে। অবাঙালী। সেপাই বা দরোয়ানের কাজটাজ করে বোধহয়। নরেন চৌধুরী মন্তব্য করল, ব্যাটা এখানেও এসে জুটেছে আবার!

কে ও?—সান্ত্বনা ফিরে তাকালো।

জবাব দেওয়া হল না। কাছাকাছি এসে পড়েছে। লোকটা আগে দেখেনি ওদের। দেখে বেশ বিব্রত হয়েছে বোঝা গেল। তাড়াতাড়ি আনত অভিবাদন জ্ঞাপন করল নরেন চৌধুরীর উদ্দেশে।

কেয়া বাহাদুর, দেখনে আয়া? নরেনের হিন্দি।

জবাবে লোকটা লজ্জায় ঠোঁট দুটো একবার নাড়ল শুধু। তারা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। নামটা শোনা শোনা লাগছে সান্ত্বনার। নরেনকে মুখ টিপে হাসতে দেখে আবার জিজ্ঞাসা করল, কে লোকটা বলুন না?

—যাকে দেখবে তাকেই চিনে রাখতে হবে তোমার?

সান্ত্বনা লজ্জা পেয়ে বলল, তবে হাসছেন কেন—?

অল্প থেমে নরেন জবাব দিল, একটুখানি কাব্য কথা মনে পড়ে গেল, ওই ফুলের লোভে লোভে কারা সব আসে···সেই কথা। ওর নাম বাহাদুর, জমাদার—একেবারে বাহাদুর জমাদার। হেসে উঠল।

···জমাদার···বাহাদুর···

কার মুখে শুনেছিল? কোথায় শুনেছিল? মনে পড়তে একেবারে ঘুরে দাঁড়াল সান্ত্বনা। কিন্তু দেখা গেল না। লোকটা আড়াল নিয়েছে। ভুতুবাবুর মুখে শুনেছিল এ নাম। পাগল সর্দারের মেয়ে চানমণির সঙ্গে জড়িয়ে ভুতুবাবু বলেছিল কিছু। বলেনি, বলতে যাচ্ছিল···।

—কি হল?

অপ্রতিভ মুখে সান্ত্বনা এগলো আবার।—কিছু না, এই লোকটা ভয়ানক পাজী শুনেছি।

আর একটু বিব্রত করার উদ্দেশ্যেই নরেন লোকটাকে সমর্থন করে বলল, ওর দোষ কি? ফুলের লোভে লোভে ওই কারা সব না এলে ফুলের জীবনই ব্যর্থ শুনেছি।

—থাক্, আপনাকে আর কাব্য করতে হবে না। বলল বটে, কিন্তু হেসেই ফেলল সেও। দিন কতক আগেও পাগল সর্দারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার। কথায় কথায় সান্ত্বনা মেয়ের বিয়ের কথা তুলেছিল। সর্দারের কথা শুনে বেজায় হেসেছিল সেদিন। মনে পড়তে জোরেই হেসে উঠল এবার।

—সর্দারের ওই মেয়েটার সঙ্গে হোপুনের বাপলা হবে শিগগীরই জানেন? বাপলা বুঝলেন না? বিয়ে—।

বুঝলাম, তা তোমার এত হাসি কেন? তোমাকেও নেমন্তন্ন করবে?

—করবেই তো। হাসছি ওই সর্দারের কথা শুনে। ঠিক করেছে এই চৈত্র মাসে বিয়ে দেবে ওদের—কিন্তু ওদের কিছু বলেনি এখনো—ঠিক করেছে শুধু। চৈত্র মাসে শিবরাত্রি পার হলে দিয়েই দেবে বিয়েটা। শিব হল বাবা। আগে বাবার বিয়ে না হলে ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে কি করে! সে রকম নিয়ম নেই ওদের। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল সান্ত্বনা।

নরেনের সমস্যা মন্দ নয়। হাসবে, না হাসি দেখবে··· ।

সুরে বাঁধা জমাট আসর নয় কিছু। সুরে আর বেসুরে, গানে আর গর্জনে, তালে আর তাণ্ডবে একটা একাকার

ব্যাপার। আবালবৃদ্ধবনিতার উৎসব। মাঁঝি পারানিক, জগমাঝি, জগপারানিক নায়েক প্রভৃতি গণ্যমান্যদের সমাবেশ। ছেলেমেয়েদের হৈ-হুল্লোড়ে তারা সরাসরি যোগ দিচ্ছে না বটে, কিন্তু চোখে মুখে তাদেরও প্রশ্রয়ের আভাস। যোয়ানেরা অনেকে কালিঝুলি মেখে সং সেজেছে। অনেকে আবার ময়ূরের পেখম পরেছে বা মাথায় চূড়া বেঁধেছে। বাসন্তী রং-এ শাড়ি ছুপিয়েছে মেয়েরা, কপালে টিপ পরেছে, কালো চুলে গুঁজেছে মহুয়া ফুল।

মন্ত্র পড়ে নায়েক অর্থাৎ পুরোহিত। বলে, ওগো পীঠস্থানের ঠাকুর, ওগো 'জাহের এরা', তোমাকে প্রণাম। তোমার নামে আজ আমরা ছোট বড় সকলে এসে মিলেছি। 'জাহের এরা' আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দিও। তোমায় প্রণাম বাবাঠাকুর, আমাদের ব্যারাম পীড়া দুঃখজ্বালা সব দূর কোরো, প্রাচীনকালের মত ধনে-ধান্যে সমৃদ্ধ কোরো আমাদের 'জাহের এরা', আমাদের আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুস্বজন ছোট বড় সকলের মঙ্গল হোক, আমাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ নাশ-বিনাশ যেন সৃষ্টি না হয় ঠাকুর, নেচে গেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে যেন আমরা থাকতে পারি। ওগো বাবাঠাকুর, ওগো 'জাহের এরা', প্রণাম তোমাকে।

মাঁঝি সকলকে আশীর্বাদ করে বলে, ঝগড়াঝাটি কোরো না, লোভ-লালচ কোরো না, পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি ভাই-বোনেরা মিলে ফুর্তি করো।

এই ফুর্তির আমেজ লাগে ছেলেবুড়ো সকলের মনে। মুরগী উৎসব হয়। সাদা রঙের আর বাদামী রঙের। মুরগীর পোলাও রান্না হয়। আর নাচ আর গান, গান আর নাচ। ঢাক বাজে, মাদল বাজে, নাগড়া বাজে, মোষের শিঙের বাঁশি ফোঁকা হয়। একটা শব্দ-তরঙ্গের উত্তাল আনন্দের আরতি হতে থাকে দেহের প্রতি রন্ধ্রে।

সান্ত্বনা এবং নরেন চৌধুরীর পদার্পণে সব থেকে খুশি পাগল সর্দার। এমনিতে অতিথিবৎসল ওরা। তার ওপর দিদিয়া এসেছে, সাহেব এসেছে। আনন্দ ধরে না। কিন্তু আর সকলের ওদের দিকে তাকাবার অবকাশ নেই খুব। নিজেদের নিয়ে নিজেরা বিহ্বল ওরা।

বিহ্বল সান্ত্বনাও। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে প্রচুর হেসেছে। কিন্তু এই মত্ত আনন্দের ছোঁয়ায় উজাড় করে দেবার একটা ইশারাও আছে যেন। অস্বস্তি লাগে। দেহের রক্তে সব-বিলানো নাচনের ছোঁয়া। থেকে থেকে মুখ রাঙিয়ে উঠছে, চোখে ঘোর লাগছে কিসের। বাতাসে মহুয়ার গন্ধ ভেসে আসছে এক একবার।

এখানে চাঁদমণিও আছে, হোপুনও আছে। এত লোকের মধ্যে দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার জায়গা নয় বলেই সান্ত্বনা বিশেষ করে দেখার সুযোগ পাচ্ছে ওদের। মত্ত মাতাল খুশির নেশায় যেন ঢলে ঢলে পড়ছিল মেয়েটা। কিন্তু খানিক বাদেই কি হল যেন। ফিরে ফিরে তাকায় সান্ত্বনার দিকে। সান্ত্বনার হাসির সঙ্গে ওর হাসি আর যেন মেলে না তেমন। এই মেয়েটার প্রতি বরাবর একটা প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ সান্ত্বনার। ভেবেছিল চাঁদমণি কাছে আসবে, কথা বলবে, আর হাসবে। যেমন করে কথা বলে ও, আর যেমন করে হাসে। কিন্তু সান্ত্বনার হাসি দেখে ওর হাসি কমে এলো আস্তে আস্তে। আড়ে আড়ে দেখে, চলনে চাউনিতে একটা সর্পিল কাঠিন্য দেখা দেয় কেমন। হোপুনের কাছে এসে কানে কানে বলে কি। হোপুন ওদের দিকে ফিরে তাকায় একবার। ওর চাউনিটাও দুর্বোধ্য মনে হয় সান্ত্বনার।

নরেন তাড়া দিল, এইবার পালাই চলো, একটু বাদেই মদ গিলতে বসবে সব।

সভয়ে উঠে দাঁড়াল সান্ত্বনা। এতক্ষণে মনে হল, ওদের এত ফুর্তির উৎসটা খুব যেন স্বাভাবিক নয়। মদ খেয়েই বোধ হয় আসরে নেমেছে সব। আসর শেষ হলে আবারও খাবে। পাগল সর্দার এলো। জিজ্ঞাসা করল, আখুনি যাবি তুরা?

সান্ত্বনা ঘাড় নাড়ল।

সর্দার বলল, কাল আসিস দিদিয়া, কাল ডাংরা জিয়ে জোর নাচ হবে।

সান্ত্বনা জবাব দিল না। দূর থেকে চাঁদমণি চেয়ে চেয়ে দেখছে ওকে। হোপুনও। ওদের মুখভাব খুব যেন সদয় নয়। মনে মনে অবাক হল সান্ত্বনা।···কিন্তু দু' চার মুহূর্তের জন্যে শুধু। তার পরেই ভুলে গেল ওদের কথা। বিস্মৃতিরই আসর এটা। অনেকটা আচ্ছন্নের মতই নরেনের পাশে পাশে চলতে লাগল সে।

···ভাবছে। ভাবতে চেষ্টা করছে। এ ভদ্রলোকই বা এমন চুপচাপ কেন! হালকা হাসি ঠাট্টা কিছু করতে পারলে এ ভাবটা কাটে হয়তো। কিন্তু মুখ তুলে চাইতেও পারছে না। কি যেন হচ্ছে ভিতরে ভিতরে।

হঠাৎ সচকিত হল সান্ত্বনা। সম্ভবতঃ নরেন চৌধুরীও। অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ ঘটল আর একজনের সঙ্গে। একজন নয়, দুজনের সঙ্গে। শাল মহুয়া পেরিয়ে দু'জনেই থমকে গেল অদূরের জীপ গাড়িটি দেখে। ঘোষ-চাকলাদারের জিপ। শুকনো মড়াইএর ধারে পাশাপাশি বিচরণ করছে রণবীর ঘোষ আর অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের মেয়ে ঝরণা চ্যাটার্জি।

ওদের দেখে হর্ষোৎফুল্ল মুখে এগিয়ে এলো দু'জনেই। রণবীর ঘোষ বলল, উৎসব দেখতে গিয়েছিলেন নাকি? ওয়াণ্ডারফুল, না?

নরেন কিছু জবাব দেবার আগেই ঝরণা বলে উঠল, এ মা, দেখব বলে এতদূর এলাম, আর দেখা হল না। অনুযোগ করল রণবীর ঘোষকেই, আপনার জন্যেই তো, কেন নিয়ে গেলেন না?

নরেন বলল, জিপ রয়েছে সঙ্গে, এখনো যেতে পারেন।

ঝরণা সাগ্রহে তাকালো তার সঙ্গীর দিকে, চলুন যাই তাহলে। এগোতে গিয়েও সান্ত্বনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল, কি গো মেয়ে, আমাকে যেন চিনতেই পারছ না—তোমার মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না উৎসব দেখে এলে।

চশমার ওধারে চোখ দুটো তার হেসে উঠল। ও ধরা পড়েনি, সান্ত্বনাই ধরা পড়ে গেছে যেন।

নরেন বলল, ওদের ওই আসুরিক আনন্দ দেখে সান্ত্বনার মাথা ধরে গেছে। আপনারা যাবেন তো যান তাড়াতাড়ি—সন্ধ্যে হয়ে গেলে আর কি দেখবেন, এসো সান্ত্বনা—আচ্ছা, নমস্কার।

এগিয়ে চলল আবার।···পাহাড়ী রাস্তা। উঠতে লাগল। এই মেয়েটার সঙ্গে ওই লোকটার এই অন্তরঙ্গতা সান্ত্বনা কিছুতেই যে বরদাস্ত করতে পারছে না। যদিও মেয়েটা কেমন খুব বুঝেছে

সেদিন ওর সঙ্গে সেই পাহাড়ে উঠতে উঠতেই বুঝেছিল। আজ আরো বেশি বুঝল।

—ওদের এখন ওখানে যেতে বললেন যে ?

নরেন ফিরে তাকালো তার দিকে। হাসল একটু। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, বললেও ওরা যাবে না, গেলে আগেই যেত।

এতটা হাঁটার পর চড়াইয়ে ওঠাটা কষ্টকর বেশ। তবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সান্ত্বনা বাড়ি যেতে পারলে বাঁচে এখন। মন বললে, আসা উচিত হয়নি। এমন জানলে আসত না। কিন্তু ভিতর থেকে আর একটা অনুভূতি যেন দ্বিগুণ বিব্রত করে তুলেছে তাকে। এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটা অনাকাঙ্খিত নয় খুব।···বেদনাদায়ক, কিন্তু অবাঞ্ছিত নয় যেন···।

এইখানে বসা যাক একটু। নরেন একটি পাথরের ওপর বসে পড়ল।

চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সান্ত্বনা। বসতে চায় না, তবু বসতে হল। আপত্তি করতে গেলেই এই লোকটার চোখে আরো যেন ধরা পড়ে যাবে ও। কিন্তু কাউকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না, নিজেকেও না।

—কি হল বলো দেখি তোমার, অমন চুপ মেরে গেলে কেন ? নরেন চৌধুরী প্রায় ঘুরে বসল তার দিকে।

বড় পাথরটাও খুব বড় মনে হচ্ছে না সান্ত্বনার। বলল, ওদের ওই অত ঢাকঢোল শুনে মাথাটা সত্যি ঝিম-ঝিম করছে কেমন।

—বাড়ি যাবে ?

সান্ত্বনা উঠে দাঁড়াল তৎক্ষণাৎ, হাঁা চলুন, বাবা হয়ত ভাবচে।

বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অবনীবাবু উল্টো কথা বললেন। এরই মধ্যে ফিরে এলে যে তোমরা, ভালো লাগল না বুঝি ?

মায়ের কোলে বসে শিশু যেমন জাহির করে নিজেকে, বাড়ি ফিরে সান্ত্বনাও সেই চেষ্টাই করল প্রায়। হেসে বলে উঠল, ভালো আবার লাগবে না, খুব ভালো লাগল, লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি, নরেনবাবুকে ধরে রাখাই দায়।

হাসতে হাসতে ভিতরে চলে এলো। স্বতোৎসারিত নয়, ভিতরে আসার সঙ্গে সঙ্গে হাসি মিলিয়ে গেল।

রাত্রি।

ঘুম নেই সান্ত্বনার চোখে। এপাশ ওপাশ করছে খালি। আর যাবে না কক্ষনো। জীবনে আর ও মুখো হবে না। অবশ লাগছে, ক্লান্ত লাগছে। অস্বস্তি একটা। কোথায় যেন। কিসের যেন। চোখের সামনে, কাণের পরদায়, আর মনের অতলে কি সব আনাগোনা করছে। এলোমেলো দেখা, টুকরো টুকরো কথা, আর আবোল তাবোল অনুভূতি। মাসতুত' বোনের চপল ইঙ্গিত আর মাসিমার কথা। পাহাড়ের নির্জনে চাঁদমণি আর হোপুন আর চাঁদমণির হাসি। মড়াইয়ে রনবীর ঘোষ আর রনবীর ঘোষের সেই ক্লেদাক্ত চাউনি। সর্দারের কথা আর ভুতু বাবুর কথা আর বাহাদুর জমাদার। সর্দারদের উৎসব আর ওই মেয়ে পুরুষদের নাচন-মাতন আর মহুয়ার গন্ধ। ঝরণা আর ঝরণার সেই বন্ধু আর ঝরণা আর রনবীর ঘোষ। আর ও নিজে আর নরেন বাবু আর সেই পাথরে বসা আর সেই ভয় আর সেই···

আর সেই কি ?

অন্ধকারে অধর দংশন করে নিজেকেই যেন চোখ রাঙালো সান্ত্বনা।

আর সেই যন্ত্রণা···আর সেই ভয় মেশানো প্রত্যাশা।

না, আর সে যাবে না, যাবে না কক্ষনো, যাবে না।

কোন দিন না।

পরদিন ঘুম ভাঙলো খুব সকালে। হালকা লাগছে, ভালো লাগছে। আর একটু নতুনও লাগছে যেন। রাতের সেই অবসাদের বোঝা ভোলেনি। কিন্তু আজ আর সেটা তেমন সঙ্কোচের কারণ বলে মনে হচ্ছে না। তা বলে আজ আর যাবে না কোথাও। আজ কেন, কোন দিনই যাবে না। না যাক, কিন্তু ভালো লাগছে।

বেলা গড়িয়ে গেল। বেয়ারার হাতে বাবার খাবারটা পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সেলাই নিয়ে বসল একটা।···কিন্তু এখন আবার তেমন ভালো লাগছে না। পাগল সর্দার বলেছিল ডাংরা, অর্থাৎ গোরু নিয়ে নাচ হবে আজ। গোরু নিয়ে নাচ ! সে আবার কি ? কতই জানে ওরা। যাই হোক, কিছুতেই আজ আর ও পথ মাড়াচ্ছে না সে।

কিন্তু ক্রমশ কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগল। থেকে থেকে মন টানছে কোথায়।

কোথায় ?

সেই শাল-মহুয়ার বন পেরিয়ে, সেই ছুটো গ্রাম ছাড়িয়ে সেই নাচ আর সেই আনন্দ আর সেই বিস্মৃতি-ঘন মহুয়ার গন্ধ। নেশাগ্রস্তের নেশা ছাড়ার পণ না ভাঙা পর্যন্তই যত বিড়ম্বনা। সান্ত্বনারও সেই অবস্থা প্রায়। কেন, যাবে নাই বা কেন ? কোথায় বাধা ? কিসের বাধা ? অন্যায় তো কিছু করছে না, তবে— ?

এই ভবের সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণের একটা জমাটবাঁধা প্রতিরোধ সঙ্কল্পবিচ্যুতির এক পলকা হাওয়ায় উড়ে গেল। দিনের আলোয় যাবে আর দিনের আলোয় ফিরে আসবে।

শান্তি আর মুক্তি।

বৃদ্ধ মাতব্বরেরা তখনো আসেনি। পুরুষ ও মেয়েরা পৃথক পৃথক রঙ্গরসে মেতে আছে। পুরুষেরা নিজেদের মধ্যে একজনকে মরা সাজিয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। মেয়েরা গান গাইছে :

বনেরো গুড়ুরি, কি খাঁয়ে আছে বেচারি।
শিকারী তো আছে বেনা বুদা আহড়্।
শিকারী তো বেনা বুদা আহড়ে,
গুড়ুরি তো চরি চরি বেড়ায়।

বনের গুড়গুড়ে পাখি বেচারি কি খেয়েই বা আছে ! গুড়গুড়ে পাখি তো খুব চরে চরে বেড়ায়, এদিকে শিকারী তো বেনাঝোপের আড়ালে।

কিন্তু ওদের মধ্যে আসল গুড়গুড়ে পাখিটি দেখতে পেল না সান্ত্বনা। পুরুষের মধ্যে হোপুন আছে। বসে বসে ঝিমুচ্ছে যেন। হুঁকো হাতে জগমাঝি এসে মাঝে মাঝে ঘুরে যাচ্ছে। এ ক'টা দিন বিষম দায়িত্ব তার। কোনও ছেলেমেয়েদের মধ্যে গর্হিত কিছু ঘটলে সে দায় তার।

আসর আজও জমল খুব। কিন্তু কালকের মত লাগল না সান্ত্বনার। আজকের ব্যাপারটা যেমন আসুরিক তেমনি স্থূল।

খুঁটি পুঁতে গোরু বাঁধা হয়েছে ক'টা। তাদের তেল সিঁদুর দেওয়া হয়েছে। ঘটি ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়েছে বেশ করে। তারপর হৈ-হুল্লোড়। হঠাৎ এক একবার মাদল নাগড়া ভেঁপু বেজে ওঠে, ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠে গোরুগুলি। তার দ্বিগুণ লাফায়, ওরা। মাতব্বরেরা দেখে আর হাসে। গোরু যত ভয় পায়, যত লাফায় ওদের ততো ফূর্তি। গতকাল' থেকে মদ খেয়ে সব অন্যরকম হয়ে আছে, কাজেই যা করছে তাতেই আনন্দ।

চাঁদমণি কখন এসেছে খেয়াল করেনি। চোখে চোখ পড়তে আর আরও বেশি অবাক হল' সান্ত্বনা। এই আনন্দ মাতামাতির সঙ্গে তার তেমন যোগ নেই যেন। কালকের থেকে আজ আরো বেশি রুষ্ট মনে হচ্ছে তাকে। সান্ত্বনা ভাবল' উঠে গিয়ে কথাবার্তা বলবে ওর সঙ্গে। কিন্তু রকম সকম দেখে ভরসা পেল না। শুধু হোপুন নয়, আরো দু'পাঁচ জনের কানে কানে বলছে কি। আর তারা ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে ওকে। সে দৃষ্টিতে আর যাই থাক সুস্থতা আছে বলে মনে হল না সান্ত্বনার।

সুবিধে পেলে সর্দারকে হয় তো জিজ্ঞাসা করত কি ব্যাপার। কিন্তু বুড়ো একধার থেকে হুঁকো টানছে আর ঝিমুচ্ছে। এবার আর একটা আনন্দপর্ব দেখে সান্ত্বনা হেসে উঠল খুব। গান আর নাচের ভেতর দিয়ে পুরুষ আর মেয়েরা পরস্পরের নিন্দাবাদে মেতে উঠেছে খুব। সান্ত্বনা ঘাবড়ে গিয়েছিল প্রথম, ঝগড়াঝাটি শুরু করে দেবে না কি রে বাবা! কিন্তু না। পুরুষেরা হাত ধরে নাচতে রাজি নয় মেয়েদের সঙ্গে, বলে তোদের হাত ভাঙা আর মেয়েরাও পা মিলিয়ে নাচতে রাজি নয় পুরুষদের সঙ্গে, বলে, তোদের পা গোদা। তারপর হাসির হাট এবং নাচ। ওদের এই আপসের রঙ্গ দেখে সান্ত্বনাও হেসে সারা।

কিন্তু হাসি থেমে গেল আবার চাঁদমণির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই। তার চোখে খুশির লেশমাত্র নেই কোথাও। দর্শকদেরও অনেকেই নাচ ছেড়ে বার বার নিরীক্ষণ করছে তাকে।

কিন্তু এ নিয়ে আর ভাববারও সময় পেল না। বেলা পড়ে এসেছে। বাড়ি পৌঁছুতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। আজ আর সঙ্গে কেউ নেই। চিন্তিত মুখে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল সে। হুঁকো হাতে পাগল সর্দার কাছে আসতে বলল, যাই সর্দার, ভয়ানক দেরি হয়ে গেল, একা একা যাব।

ঘুমঘুম চোখেও সর্দার ওর দুশ্চিন্তাটুকু উপলব্ধি করল যেন। কি ভেবে ঘুরে দাঁড়িয়ে হোপুনকে ইশারায় ডাকল কাছে। দিদিমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে বলল সে।

—না না না, কিছু দরকার নেই। ব্যস্ত হয়ে উঠল সান্ত্বনা, এই তো কতক্ষণ আর লাগবে যেতে।—তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল।

কিছুদূর এসে পিছন ফিরে তাকাতেই দেখে অলস মন্থর গতিতে হোপুন আসছে পিছনে পিছনে। সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে পড়ল। বিরক্তও হল মনে মনে। হোপুন কাছে আসতে বলল, আমার সঙ্গে আসতে হবে না, তুমি ফিরে যাও, আমি একলা খুব যেতে পারব।

ঠাণ্ডা নিষ্প্রাণ চোখে হোপুন চেয়ে রইল শুধু।

সান্ত্বনা জোরে জোরে হাঁটতে সুরু করল আবার। অনেকটা দূরে এসে পিছনে ফিরে তাকালো আর একবার। আর মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

হোপুন ফিরে যায়নি। তেমনি নির্বিকার পদক্ষেপেই অনুসরণ করছে তাকে।

না থেমে সান্ত্বনা দ্রুত চলতে লাগল আবার। কি মতলব লোকটার? চিন্তিত হল এবারে। পরপর দু'দিনই কেমন কেমন লেগেছে। চাঁদমণির কানে কানে কথা বলা আর এদের চাউনি। দু'দিন ধরে সমানে মদ টেনে চলেছে মনে পড়তে বেশ ভয়ও ধরল। রেগে গেল পাগল সর্দারের ওপর। কি দরকার ছিল সর্দারী করে ওকে সঙ্গে যেতে বলার!

বেশ জোরেই পা চালিয়েছে সান্ত্বনা। শাল-মহুয়ার বন পেরোলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। ও ধারে দু'পাঁচজন লোকজনের যাতায়াত আছে।

কিন্তু এই নিশ্চিন্ত জায়গায় এসেই পা যেন একেবারে স্থাণুর মত আটকে গেল মাটির সঙ্গে। পাহাড়ী চড়াইয়ের ধারে রণবীর ঘোষের সেই জিপ। সঙ্গে সঙ্গিনী নেই আজ। জিপে ঠেস দিয়ে একলাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছে। সামনের দিকে চেয়ে আছে, এখনো দেখেনি ওকে।

ত্রিশঙ্কু অবস্থা।

ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরে তাকালো সান্ত্বনা। যথাপূর্ব হোপুন আসছে ঠিকই। নিজের অজ্ঞাতে দু'চার পা পিছিয়েই গেল। হোপুন কাছে এসে দাঁড়াল। সান্ত্বনা প্রায় অসহায় দৃষ্টিতেই তাকালো ওর দিকে। হোপুন দেখল ওকে, দেখল দূরের জিপটাকেও। কিন্তু কিছু উপলব্ধি করেছে কি করেনি মুখের দিকে চেয়ে বোঝা গেল না কিছুই। পাশাপাশি এগিয়ে চলল তারা।

নীল চশমা নেই। খুশিতে একবার ঝকঝকিয়ে উঠেছিল বুঝি রণবীর ঘোষের মুখ। কিন্তু সান্ত্বনার মনে হল পরক্ষণে যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল হঠাৎ।

—কি, আজও এসেছিলেন না কি?

সান্ত্বনা ঘাড় নাড়ল শুধু। জিপে করে বাড়ি পৌঁছে দেবার আহ্বান প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রস্তুত হয়েছে সে। ঘোষ বলল, আপনার আগ্রহ তো খুব! আমি এখানটায় প্রায়ই আসি বেড়াতে। নিরিবিলিতে বেশ লাগে।

ওই পর্যন্তই। জিপে পৌঁছে দেবার আমন্ত্রণ এলো না। সান্ত্বনা মনে মনে অবাকই হল একটু।

চড়াই। আর এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল না সান্ত্বনা। হোপুনের পাশে পাশে চলতে লাগল। আড়চোখে ওকে দেখলও বারকতক। ইচ্ছে হল, যা হোক কিছু কথা বলে ওর সঙ্গে। ইচ্ছে হল, চাঁদমণির সঙ্গে এই চৈত্রমাসেই ওর যে বিয়ে দেবার কথা ভাবছে পাগল সর্দার সেই সুসমাচারটা জানিয়ে দেয়। কিন্তু একটা কথাও বলা সম্ভব হল না।···সঙ্গে আসছে বটে, কিন্তু ঠিক যেন জ্যান্ত মানুষ নয়।

ভয় গেছে। পাহাড়ের মাথায় উঠে এসেছে তারা। আর মিনিট পনেরও লাগবে না বাড়ি পৌঁছুতে। সান্ত্বনা দাঁড়াল। খুব মিষ্টি করে বলল, এবারে তুমি ফিরে যাও হোপুন, এখন আমি ঠিক যেতে পারব।

ঠাণ্ডা; দুই চোখ তুলে হোপুন তাকালো ওর দিকে। মাথা নেড়ে বলল, সর্দার তুকে ঘরতক্ এথে আসতে বলেছে।

ওর সুবিধে অসুবিধের কথা ভেবে সঙ্গে আসছে না সে, আসছে সর্দার বলেছে বলে। চুপচাপ পথ চলা আবার। সান্ত্বনার আনন্দ হচ্ছে একটু। চাঁদমণি যে জন্যেই ওর ওপর চটুক, আর দলের লোকের কানে কানে যাই গুজগুজ করুক, ওর জোরটা যে কোথায় সেটা এরা বেশ ভালো করেই জানে।

একেবারে বাড়ির দোর গোড়া পর্যন্ত ওকে পৌঁছে দিয়ে তেমনি মন্থর পদক্ষেপে আবার ফিরে চলল হোপুন।

পরদিন আর নয়। আর যাওয়ার সম্ভাবনাটা সান্ত্বনা চিন্তার থেকে বাতিল করে দিল। কিন্তু তার পর দিন আবার··· ভোরের আলোয় ঘুমন্ত পাখির ডানা যেমন উসখুস করে ওঠে, তেমনি এক বাঁধনছেঁড়া মুক্তির ছোঁয়ায় তার এই একদিনের অবকাশ-আচ্ছন্ন মনের তলায় তলায় একটা টান পড়তে লাগল। মনের জোরও বেড়েছে। বিগত একদিনের আচরণে রণবীর ঘোষও তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে।

গত দিনের থেকে আজ আবার অন্যরকম লাগছে সান্ত্বনার। প্রায় প্রথম দিনের মতই। নরেন বাবু পাশে থাকার অস্বস্তিও নেই। হাতের ফাঁকে হাত গুঁজে নাচছে একদল মেয়ে পুরুষ। নাচছে না, নিজেদের একেবারে সমর্পণ করে দিচ্ছে যেন। অন্য একদিকে গোল হয়ে বসে একদল মেয়ে গান ধরেছে। ভাত মাংস পরিবেশন করা নিয়ে যেন সমস্যায় পড়েছে তারা :

> খোরা খোরা মুরগী শূকর
> বন্ধু বন্ধু কুটুম
> ভাত কিম্বা ঝোল
> আমি বাবা না পারি বাটতে।

কিন্তু সান্ত্বনা আসার মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে লাগল কেমন। আসর ঝিমিয়ে পড়তে লাগল। সান্ত্বনা প্রথম ভাবলে, চারদিন ধরে ক্রমাগত মদ খেয়ে খেয়ে ওদের এই অবস্থা বোধ হয়।

কিন্তু না।

আজ আর শুধু চাঁদমণি নয়। শুধু হোপুন বা আর পাঁচ সাত জন নয়। ওই নারীপুরুষেরা আজ এক প্রতিকূল স্তব্ধতায় বার বার নিরীক্ষণ করছে তাকে। আগে খেয়াল করেনি সান্ত্বনা। শুধু চাঁদমণিকেই দেখেছিল। তার রাগ বিরাগের ধার ধারে না, সেটা বোঝাবার জন্যেই আর ফিরেও তাকায়নি। রোজ কাঁহাতক ভালো লাগে। একটা দিন না আসার দরুন চোখ কাণ মন দিয়ে ওই নাচ গানে বুঝি মেতে উঠেছিল সান্ত্বনা। একটু বেশিই হাসছিল বোধ হয় আজ। কিন্তু হঠাৎ একসময় মনে হল যারা নাচছে আর যারা গাইছে তাদের সঙ্গে খুব যেন একটা যোগ নেই বাকি নারী পুরুষদের। থেকে থেকে যেন একটা শিথিল ছেদ পড়ছে। হ্যাঁ, ওকেই দেখছে ওরা। মাতব্বরেরাও অনেকে। নিজেদের মধ্যে কি ফিস ফিস করছে মাঝে মাঝে। ওদের চার দিনের মদ খাওয়া ঘোলাটে চোখে প্রীতির আমেজ নেই।

সান্ত্বনা অবাক! প্রথমে সঙ্কোচ, তারপর অস্বস্তি, তারপর ভয় ভয় একটু। নাচ গান করছে যারা, সায় না পেয়ে তারাও ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে এদিকে। ক্রমেই অন্যরকম লাগছে। ওদের মুখের ভাব কঠিন হচ্ছে ক্রমশ। একটা অজানা আশঙ্কায় সান্ত্বনা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল সকলের দিকে।

এরা এমন করছে কেন?

এ ভাবে দেখছে কি?

চাঁদমণি কোণের এক দিকে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন শাণ দেওয়া অস্ত্র একখানা!

হোপুনের চোখদুটোও তার মুখের ওপর সংবদ্ধ—আরো মরা, আরো নিষ্প্রাণ। এমন কি মাঁঝি জগমাঁঝির চাউনিও অনুকূল নয়। অন্তত সেরকমই মনে হল সান্ত্বনার।

ভয়ে বিস্ময়ে হকচকিয়ে গেল একেবারে। তারপরেই ওর ব্যাকুল দুই চোখ বিশেষ করে খুঁজে বেড়ালো কাকে। সর্দার কই···পাগল সর্দার···!

পাগল সর্দারও তাকেই দেখছিল। দৃষ্টি-বিনিময় হতে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে তার পাশে বসল। সশঙ্ক ভীরু চোখে সান্ত্বনা তাকালো তার দিকে।

সামনের নারী-পুরুষদের দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পাগল সর্দার হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠল যেন।—বেজায় বুল আকানাম? চেৎ হোয় এনা? এনে: ই মে! সেরিং সেরিং মে—! বেজায় নেশা হয়েছে বুঝি? হল কি সব? নাচ্ না! গান কর না!

যেটুকুও নাচ গান হচ্ছিল, থেমে গেল।

সর্দার সান্ত্বনাকে বলল, চল্ দিদিয়া তুকে ঘর পানে ছেড়ে আসি।

যন্ত্রচালিতের মত উঠে দাঁড়ালো সান্ত্বনা। অজ্ঞাতসারে চাঁদমণির সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হল আবারও। হিংস্র ধারালো মূর্তি, পারলে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক্ষুনি।

অনেকটা পথ এসে পাগল সর্দারই কথা বলল প্রথম। তু উদের মাফ্জনা করে লে দিদিয়া। আতভর হাঁড়িয়া খেয়ে উদের মাথার ঠিক নাই।

কাতর আবেদন কথাগুলির মধ্যে। সান্ত্বনা আস্তে আস্তে মুখ তুলে তাকালো। মদ পাগল সর্দারও কিছু কম খায়নি। শুধু এ জন্যেই নয়। কারণ আছে কিছু। কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট কেঁপে গেল সান্ত্বনার। বলল, কিন্তু ওরা সবাই আমার ওপর রেগে গেল কেন? আমি কি করেছি?

বার কতক ঘাড় নাড়ল সর্দার। পরে বলল, তু কিছু করিস নাই, তু ওজ এসে খুব হাসিস, উ-সব ভাবল উদের লিয়ে তু 'সিরোগ' (ঠাট্টা) করতে লেগেছিস। ভদ্দনোক সিরোগ করলে পেচণ্ড রপমান হয়।

সান্ত্বনা হতভম্ব।—কিন্তু আমি তো একটুও ঠাট্টা করে হাসিনি সর্দার!

সর্দার বারকতক মাথা নাড়ল আবারও। অর্থাৎ, সেটা সে খুব ভালো করেই জানে। বলল দিদিয়া যেন কিছু মনে না করে, দিদিয়া যেন 'আগ' না করে, নেশা টুটে যাক, ও ওদের সবকটাকে দেখে নেবে, সবকটাকে টেনে এনে দিদিয়ার পায়ের কাছে গড় করাবে।

চুপচাপ চলতে লাগল তারপর। কিন্তু ভিতরটা চুপ করে নেই সান্ত্বনার। কেন? কেন ওরা এমন করল আজ?

চাঁদমণি সকলকে উসকে দিয়েছে, উত্তেজিত করেছে তাই।

কিন্তু কেন?

কেন মড়াইয়ে চাঁদমণি সেদিন কাজ থামিয়ে অমন জ্বলন্ত চোখে ভস্ম করতে চেয়েছিল তাকে? কেন এখানেও এমন হীন মিথ্যে কৌশলে এই নেশাগ্রস্ত নারীপুরুষদের তার বিরুদ্ধে বিষিয়ে দিল চাঁদমণি? প্রত্যেক দিনই সান্ত্বনা স্বচক্ষে দেখেছে সেটা, উপলব্ধি করেছে। কিন্তু কেন? কেন? কেন?

বলবে না কি পাগল সর্দারকে, সকলকে টেনে আনতে হবে না, নিজের মেয়েকে শুধু জিজ্ঞাসা করে দেখো, তার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ নাও!

কিন্তু বললে এর জের অনেক দূর গড়াবে। কিছুই বলল না। বলতে পারল না। নিঃশব্দে বাড়ি পৌঁছলো। নিঃশব্দে বিদায় দিল পাগল সর্দারকে। সচরাচর যা হয় না, তাই হয়ে গেল, তারপর রাগে দুঃখে অপমানে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো।

আর কোনদিন ওদের সংস্রবে যাবে না, আর কোনদিন কাছে টানতে চাইবে না ওদের।

কিন্তু পরের ক'টা দিনের মধ্যে এই ছোট পরিসরে আচমকা যেন ভূমিকম্প হয়ে গেল একটা। এ রকম বিপর্যয় এখানকার বাসিন্দারা হয়ত আর দেখেনি কখনো। মানুষ ছেড়ে মড়াই ঘেরা শুকনো পাহাড়টা পর্যন্ত যেন নাড়া খেল একপ্রস্থ।

সান্ত্বনা জানত না কিছুই। গত দশ পনের দিন বাড়ি থেকেও বেরোয়নি বড়। সেদিনের সে অপমান তখনো ভোলেনি। খবরটা দিল ওর গোরুর জন্য বহাল আছে যে ছোকরা সে। জানালো, পাহাড়ের নীচে দোকানের রাস্তায় শ'য়ে শ'য়ে লোক জমেছে আর ডাল ফেরাচ্ছে।

সান্ত্বনা অবাক।—ডাল ফেরাচ্ছে কি রে!

—হিঁ গো দিদিয়া, পাগল সর্দারের 'বিটলা' হবে। উঁকে মেরে কেটে মাটির নীচে পুঁতে ফেলাবে এক্কেবারে।

শুনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত দাঁড়িয়ে রইল সান্ত্বনা। বুঝল না কিছু, কিন্তু বিষম কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে পাগল সর্দারের, এটাই বুঝল শুধু। ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন? কেন রে?

ছোকরাটা ততক্ষণে আরো কিছু জানার উত্তেজনায় এটুকু খবর দিয়েই আবার ছুটেছে। বিমূঢ় ভাবটা কাটতেই অস্থিরচিত্তে ঘরবার করতে লাগল সান্ত্বনা। বাবাও নেই, সকালে নীচে নেমে গেছে, একটা খবর করারও উপায় নেই।

স্থির থাকতে না পেরে ঘরের শিকল তুলে দিয়ে পায়ে পায়ে মেন কোয়ার্টারসের পথে চলে এলো। কিন্তু সেখান থেকেও বোঝা যাচ্ছে না কিছু। প্রায় নীচে নেমে আসার পর থমকে দাঁড়ালো। ভুতুবাবুর দোকান ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে অনেক লোক জনের একটা জটলা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তার থেকে বেশি দেখা যাচ্ছে তাদের হাতে হাতে পাতা-সমেত ছোট ছোট শালের ডালগুলো। ভেতরটা যেন কাঠ হয়ে আসছে সান্ত্বনার।

দুই এক জনকে জিজ্ঞাসা করল কি ব্যাপার। তারাও ব্যাপার

দেখতেই চলেছে। বলল শুধু, বিটলা হবে পাগল সর্দারের। কেন হবে? বা রে—ওর মেয়েটা যে ঘর ছেড়ে বেজাতের সঙ্গে পালিয়েছে। তাই ডাল ফেরাচ্ছে ওরা, গাঁয়ে গাঁয়ে খবর পাঠাচ্ছে।

সান্ত্বনা স্তম্ভিত!

আস্তে আস্তে ভুতুবাবুর দোকানের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ব্যতিব্যস্ত এখন ভুতুবাবুও। দোকানের সামনে বিভিন্ন জাতীয় দর্শক নারী-পুরুষদের ভীড়। রাস্তার ওপরেই চা ইত্যাদি সরবরাহ করতে হচ্ছে তাদের। তফাতে দাঁড়িয়ে ইশারায় সান্ত্বনা একজনকে বলল ভুতুবাবুকে ডেকে দিতে।

ব্যস্তসমস্ত ভাবে ভুতুবাবু এসেই বলল, দেখুন কাণ্ড মা লক্ষ্মী, ওই সর্দারটাকে একেবারে শেষ করে ছাড়বে সব—ওদের বিটলা বড় সাংঘাতিক ব্যাপার।

ভুতুবাবুর কথা থেকে ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝল সান্ত্বনা। বুঝে শরীরের রক্ত আরো জল হয়ে গেল যেন। বিটলা অর্থাৎ সমাজচ্যুতি। তেমন বড় রকম কিছু না ঘটলে বিটলা সচরাচর হয় না আজকাল। কিন্তু বড় রকমেরই ব্যাপার এটা। খোদ মাঝির ছেলের বউ হবে বলে বাগদত্তা হয়ে আছে, সে পালিয়েছে বেজাতের সঙ্গে—সোজা কথা না কি? ওই সর্দারের জন্মেই এ রকমটা হয়েছে, নইলে হোপুন তো আজ দু'বছর ধরে হাঁ করে বসে আছে চাঁদমণিকে বিয়ে করার জন্যে। সর্দারই ইচ্ছে করে দেয়নি বিয়ে। মাঝি মাতব্বরদের বরাবরই বেজায় রাগ সর্দারের ওপর—ছেলেটার জন্মেই করতে পারছিল না কিছু—এবারে ছেলেই বিগড়েছে সব থেকে বেশি—কাজেই এখন পোয়া বারো, আগের রাগও সুদে আসলে ঝালিয়ে নেবে সব। শয়ে শয়ে লোক দল বেঁধে যাবে, বাড়ি ঘর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেবে, উঠোন কুপিয়ে ঝাঁটা বাঁশ পুঁতবে।···আর সর্দার?

সর্দারকে আর পাবে কোথায়? বিটলা যার হয়, সে কি বাড়িতে বসে থাকে? তাকে পালাতেই হয় কোথাও না কোথাও। নইলে একেবারে ছাল চামড়া ছাড়িয়ে তাকে সুদ্ধ পুঁতে ফেলে দেবে না! কেউ আটকাতে পারবে না, কেউ আসতেই সাহস করবে না এ সব ব্যাপারে। পাগল সর্দার নিশ্চয় এতক্ষণে সরে গেছে কোথাও। মিটিং করে বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাকে কেউ আটকাচ্ছে না। পরে ফিরে আসতে পারে আবার। তখন প্রাণে আর কেউ মারবে না বটে, কিন্তু সমাজ তার কাছে একেবারে বন্ধ।

নিস্পন্দের মতই সান্ত্বনা ফিরে এলো। কিন্তু বাড়ি এসে ছটফটানি চতুর্গুণ বাড়ল। কি করবে এখন? কি করা যায়? কি করার আছে? ছোকরা চাকরটা এসেছে দেখে তৎক্ষণাৎ তাকে পাঠাল বাবাকে সংবাদ দিতে। তিনি ওপরেই যেন খেতে আসেন আজ, আর খুব তাড়াতাড়ি আসেন যেন। কি ভেবে ডাকল তাকে আবার। আর শোন্, নরেনবাবুকেও খবর দিবি একটা, বলবি ট্রাকে করে এক্ষুনি যেন একবার আসেন, বিশেষ দরকার।

পাগল সর্দার বিপন্ন। এতবড় বিপদ বোধ করি কারো হয় না কখনো। কিন্তু থেকে থেকে এই অপরিসীম দুশ্চিন্তার মধ্যেও মনের তলায় আর এক প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ভুতুবাবুর সঙ্গে পারেনি। পাগল সর্দার বিপন্ন কারণ তার ওই দজ্জাল পাজি মেয়েটা ঘর ছেড়ে চলে গেছে কারো সঙ্গে···।

···কার সঙ্গে?

ওই মেয়ের দ্বারা সবই সম্ভব। তবু এতটা কল্পনাতীত। চাল-চলন যেমনই হোক, ওই হোপুন লোকটার প্রতি অন্তত···যাকৃগে, গেল কার সঙ্গে?

অবনীবাবুই রাড়ি ফিরলেন আগে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তিনিও। ট্রাক এবং লোকজন দিয়ে নরেনকে পাগল সর্দারের খোঁজ করতে পাঠিয়েছে। বাড়িতে পাওয়া যায়নি তাকে। পেলে অন্তত বিশ তিরিশ মাইল দূরে কোথাও রেখে আসতে হবে তাকে।

অধীর প্রতীক্ষা আবার। অবনীবাবু ফিরে অফিসে বেরুবার আগেই নরেন এলো।

সর্দারের দেখা মেলেনি। ব্যাকুল হয়ে সান্ত্বনা জিজ্ঞাসা করল, কি হবে তাহলে?

—কি আবার হবে, মার খেয়ে মরার জন্তে ও এখানে বসে আছে না কি, নিশ্চয় গেছে কোথাও।

যথাসময়ে আবার আপিস করতে বেরিয়ে গেল তারা। সান্ত্বনার মন মানছে না। যদিই সর্দারকে ওরা ধরে ফেলে! যদিই খুঁজে বার করে! হিংস্র প্রতিশোধ নিতে এবারে সবার আগে এগিয়ে আসবে মাঁঝির ছেলে হোপুন, যতবার মনে হয় সে কথা, ততবারই কণ্টকিত হয়ে ওঠে। একটা অব্যর্থতার বর্ম আঁটা হোপুনের চোখে মুখে, চালচলনে। লোকটা সহায় হলে ভয় নেই, শত্রু হলেও রক্ষা নেই যেন।

ডু ডু-ডুম! ডু-ডু-ডুম! ডু-ডু-ডুম! ডু-ডু-ডুম!

আঁতকে উঠল সান্ত্বনা। দুপুর গড়ায়নি তখনো। নাগড়া বাজানোর শব্দ আর কোলাহল একটা। বাইরের দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াল সে। এই পথেও পাহাড় ডিঙিয়ে দলে দলে লোক চলেছে পাগল সর্দারের ঘর বাড়ি উচ্ছেদ করতে। সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করে উঠল সান্ত্বনার। বসে পড়ল সেখানেই।

সন্ধ্যের আগেই নরেন চৌধুরী এলো আবার। কিন্তু সান্ত্বনা তখন কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহসও হারিয়ে ফেলেছে প্রায়।

নরেন বলল, পাগল সর্দার যায়নি কোথাও, সে বাড়িতেই ছিল।

—অ্যাঁ—! অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল সান্ত্বনা।

ভেবো না কিছু, সে ভালো আছে।

এটুকুই নয় শুধু। বিস্ময়ে অভিভূত হবার মতই শোনার ছিল আরো কিছু।

লাঠি সোঁটা কোদাল শাবল নিয়ে প্রায় হাজার লোক নাকি গিয়েছিল পাগল সর্দারের ভিটে-মাটি নির্মূল করতে। সকলের আগে ছিল গাঁয়ের মাঁঝি হোপুনের বাবা আর অন্য মাতব্বরেরা। তাদের ইঙ্গিত মাত্রে নিষ্ঠুর উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত সকলে।

কিন্তু মাঁঝি মাতব্বরদের পিছনে পটে-আঁকা ছবির মতই দাঁড়িয়ে পড়তে হল সকলকে।

পাগল সর্দারের ভিটে আগলে পাষাণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে

হোপুন!

আদিম হিংসায় আজ সকালেও যে হোপুন তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে পাগল সর্দারকে। মড়াইয়ের সমস্ত ইঁট পাথর উপড়ে ফেলে যে খুঁজে বার করতে চেয়েছে ওই বাপ-মেয়েকে! যে ছেলের এতবড় প্রতিহিংসা ঠিক তত বড় করে চরিতার্থ করার জন্তই বিটলার আয়োজন মাঁঝির।

দূরের জনস্রোত দেখেই পাষাণ-মূর্তি হোপুনের হাতের ধনুক বেঁকে গেছে গোল হয়ে, ছিলায় পড়েছে নির্মম টান। ওই একটা তীর এক উন্নত বাজের মত সহসা এক সহস্রের গতি রোধ করে দিল যেন।

বিমূঢ়, বিভ্রান্ত সকলে।

বাপের উদ্দেশে একবার মাত্র হুঙ্কার শোনা গেছে ছেলের।—ওদের ফিরে যেতে বলো, হোপুন বেঁচে থাকতে একটা লোকও যেন তার তীরের আওতায় না আসে। সর্দার এখানেই আছে, যায়নি কোথাও, কিন্তু তাকে মারতে হলে দু'জনকেই মারতে হবে, আর অনেককে মরতে হবে! তাদের যেতে বলো! ওদের বলে দাও, বিটলা হবে না!

মাঁঝি কি করবে? কি হল, কেন হল, ভাবার সময়ও নেই। ছেলের হিংসা মেটাতে এসে ছেলেকেই মারবে সকলের আগে? পাগল সর্দারও পালায়নি, মরবার জন্ত বসে আছে প্রস্তুত হয়ে, এও এক অভিনব খবর! শুধু মাঝি নয়, বিভ্রান্ত সকলেই।

মাঁঝি ঘুরে দাঁড়াল।

মাতব্বরেরাও।

বোবা পুতুলের মত সেই সংস্কারাচ্ছন্ন সহস্রের উদ্দেশে মাঁঝি বলল, চলো ভাই, বিটলা হোক মারাংবুরুর ইচ্ছে নয়। পরে শুনব, পরে ভাবব।

অনুক্ষণ ছবিটা যেন চোখের সামনে ভেসেছে সান্ত্বনার। পর পর তিন দিন অধীর আগ্রহ নিয়ে মড়াইয়ে এসেছে তারপর, কিন্তু সর্দারের দেখা পায়নি। হোপুনকে দেখেছে। তেমনি উঠছে হাতের কোদাল, তেমনি নামছে।···কিন্তু ঠিক তেমনি নয়। আঘাতে আঘাতে ঝরে পড়ছে যেন অন্তস্তলের পুঞ্জীভূত যত ক্ষোভ। সাহস করে কাছে যেতে পারে নি সান্ত্বনা।

কার সঙ্গে ঘর ছেড়েছে আর এই মানুষটাকে ছেড়েছে চাঁদমণি, সেও আর অজানা নয় কারো। মড়াই থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে আরো একজন। বাহাদুর জমাদার। এ খবর শুনে কেন জানি সান্ত্বনার উত্তেজনা কমেছে অনেকখানি।

আরো দিন দুই পরে পাগল সর্দারের বাড়ি গিয়েছিল সান্ত্বনা।

···মানুষটা পাথর হয়ে গেছে।

বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে যেন একাকার হয়ে গেছে সান্ত্বনার। বলতে পারলে বলত, সর্দার, চেয়ে দেখো—এখনো তোমার একজন মেয়ে আছে সর্দার!

···একদিন। দু'দিন···।

মুখ ফুটে সর্দার কথা বলেছে তারপর। বলেছে, হোপুন মরদ হে দিদিয়া, জমছিম বোঙ্গার (সূর্যদেবের) ব্যাটা আছে উঃ···

—আরো কয়েকদিন গেছে তারপর।

সর্দার মেয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপনও করেনি একবার। শুধু বলেছে, আগের দিন হলে, ইতিহাসের দিন হলে, রক্তে ভেসে যেত মড়াই। ইতিহাসের যুগে, সিধু কান্থর যুগেও প্রথম রক্তের বান ডেকেছিল গোড়া সাহেবরা ওদের তিনটে মেয়ে চুরি করার পরেই।

সান্ত্বনা বলতে গিয়েছিল, তার মেয়েকে তো চুরি করেনি কেউ, আর, কোন ভদ্রলোকেরও কাজ নয়। কিন্তু শাদা আগুন সর্দারের শুকনো চোখে। ভয়ে ভয়ে চুপ করে গেছে সান্ত্বনা।

কিন্তু সর্দারের চোখের ও আগুন নিবতেও দেখেছে আবার।

হোপুনই বাঁচিয়েছে তাকে। আগেও বাঁচিয়েছিল। কিন্তু আগে সর্দারও বাঁচতে চেয়েছিল। এবারে কোন দরকার ছিল না। তবু বাঁচিয়েছে। মারতে এসেও বাঁচিয়েছে।

পালাতে গিয়েও ফিরে এসেছিল সর্দার। বিটলার আয়োজন হচ্ছে জেনেও নিঃশব্দে ফিরে এসেছে। এই সংস্কারাচ্ছন্ন উন্মত্ত জনতাই সব নয়, তারও শুভার্থী সংখ্যা আছে কিছু। কিন্তু কাউকে ডাকেনি সে। হোপুন নেবে প্রতিশোধ, ডাকবে কেন কাউকে!

চুপি চুপি একজনকে দিয়ে শুধু হোপুনকেই খবর পাঠিয়েছিল সর্দার।

হোপুন এসেছিল।

নিরস্ত্র আসেনি। অস্ত্র নিয়ে এসেছিল। জিঘাংসা নিয়ে এসেছিল!

সর্দার বলেছে, এসো হোপুন, আমাকে মারতে চাও তো? সেইজন্তেই ফিরে এসেছি আমি। সেইজন্তেই তোমাকে ডেকেছি।

হোপুন দেখেছে তাকে। সেই খুন-চোখে হাড় পাঁজর সরিয়ে সরিয়ে দেখেছে একেবারে। তারপর কথা বলেছে।—চাঁদমণির সঙ্গে এত দিন আমার বিয়ে দাওনি কেন?

—দিইনি তুমি 'ছাড়ই' হতে বলে। ছাড়ই হয়ে আমার মত চিরকাল জ্বলতে বলে।

আরো বলেছে সর্দার। বলেছে বিয়ে দেয়নি নিজের মেয়েকে সে চিনত বলে আর ওই মেয়ের মাকে চিনত বলে আর ওই মেয়ে কারো ঘরে থাকবে না জানত বলে।

—কিন্তু এসব বলোনি কেন কখনো? নিষ্পলক চোখে চেয়ে হোপুন জিজ্ঞাসা করেছিল।

বলেনি চাঁদমণি যেমন মেয়েই হোক নিজের মেয়ে বলে, আর, একদিন শুধরে যেতেও পারে, মনে মনে এই আশা না করে পারত না বলে।

—কিন্তু বিয়ে হলে শুধরে যেতেও পারত? চোখ থেকে খুন সরে যাচ্ছে হোপুনের।

পাগল সর্দার জবাব দিয়েছে হোপুনের বয়সে সেও কম জোয়ান কম মরদ, কম প্রিয় ছিল না মেয়েদের। কিন্তু তবু চাঁদমণির মা ফুলমণি তাকে ছেড়ে গিয়েছিল। হোপুন তার বুকের পাঁজর। সে পাঁজর সে ভেঙে দিতে চায়নি বলেই অপেক্ষা করছিল আর আশা করছিল।

হোপুন দেখছিল চেয়ে চেয়ে। নির্নিমেষে দেখছিল আর চোখ থেকে খুন সরে যাচ্ছিল।

তার পরে···অনেকক্ষণ পরে, পায়ে পায়ে হোপুন বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

···আবার ফিরেছে।

···ধনুক নিয়ে। আর তীর নিয়ে। [ক্রমশঃ।

বিড়ম্বিত ভাগ্যবেত্তা

দেবাচার্য

আবার চলেছি পথে। পুণায়। পকেটে তিন আনা মাত্র পয়সা। দেশে টাকা পাঠাতে হবে অন্ততঃপক্ষে একশো টাকা। চিঠি পেলাম পোষ্টঅফিসে গিয়েই।

ঠিক করি, আজ সাহেবপাড়া দিয়ে হাঁটবো। ষষ্ঠে রাহু, তুলা লগ্ন, শনি গোচরে শুভ চন্দ্র একাদশে। নির্ঘাত আজ ম্লেচ্ছ সংস্পর্শে ধনলাভ হবে, হবেই হবে। না হলে, একশো টাকা পাঠাবই বা কি করে?

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম, ম্লেচ্ছরা কি চিজ্। বই-এর পাতায়, আর অনভিজ্ঞ লোকের মনের ধারণায়—সাহেবদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করা মোটেই কঠিন নয়। আরও ভুল ধারণা আছে লোকের মনে, সাহেবরা পয়সা খরচ ক'রে জ্যোতিষীদের সাহায্য নেয়।

একেবারেই ভুল।

প্রথমে একটা বাড়ীর সামনে দেখলাম, লনে বসে আছেন বুড়ো-বুড়ী সাহেব-মেম। বুড়ী হাসলেন, বুড়ো চেঁচিয়ে বললেন—হেভেন সেভ্ আস্ ফ্রম ডকটর্স এ্যাণ্ড ফরচুন-টেলার্স। অর্থাৎ সাদা বাংলায় বললেন, ভগবান তাঁদের ডাক্তার আর জ্যোতিষীদের হাত থেকে রক্ষা করুন।

···দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি। আবার পথে হেঁটে চলি।

দরজায় দরজায় বৃথা প্রয়াস। বেশীর ভাগ বাংলোয় লেখা—বি ওয়্যার অব দি ডগ্—হরি হে মধুসূদন···। পথ যেন আর ফুরোতে চায় না।

হঠাৎ নজরে পড়ে সুদৃশ্য একটি সাহেবী ধরণের হোটেল। দরজায় সাইনবোর্ড ঝুলছে। ইনি বাউন্ডস না আউট অব বাউনডস—ঠিক ঠিক কি লেখা ছিল, তা আমার মনে নেই।

ল্যাণ্ডলেডী মেমসাহেব, আমার দিকে এগিয়ে আসেন বারান্দা বেয়ে। আমার নিবেদন শুনে একটু হাসেন; ইংরেজিতে বলেন—যাও, ওই ঘরে যাও, ওখানে কর্ণেল···আছেন।—এর আগে ঠিক সামনাসামনি মিলিটারী লাইনের বড় কোন অফিসারের সঙ্গে তেমন মেলামেশা হয় নি। যদি কর্ণেলের মেজাজটাও মিলিটারী হয়। তখনও ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় নি।

কর্ণেলের মুখখানা হাসি-হাসি। সোনালী গোঁফ। বয়সে তরুণ, ব্যবহার ভদ্র—কিন্তু তাঁর পরিহাস বড়ই মর্মান্তিক। ইংরেজিতে বললেন—আমি সত্যিই বড় দুঃখিত, পণ্ডিত। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানবার ঔৎসুক্য আমার আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে তোমাকে প্রশ্ন করবার সময়টাও পর্য্যন্ত আমার নেই। কবে যে সেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার সুযোগ পাব, তাও বলতে পারি না। তুমি বরং সেই দিনক্ষণ গুণে এসো।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাই। ল্যাণ্ডলেডী হঠাৎ পেছু ডাকেন, বলেন—তুমি ঐ ঘরটায় যাও। ওখানে দু'জন ভদ্রলোক বসে আছেন। ওঁরা হয়তো বা—।

ল্যাণ্ডলেডীকে ধন্যবাদ জানাই। দরজায় পর্দা টাঙানো ছিল না। এক কোণে কাউন্টার—কাউন্টার জনশূন্য। কমনরুম ধরণের কামরা, বেশ প্রশস্ত, আর এক কোণে দু'জন সাহেব কুশনে বসে পাইপ টানছিল, আর নীচু গলায় কি যেন গোপন-কথা আলোচনা ক'রছিল। একজন বয়সে প্রৌঢ়, কানের কাছে চুলে পাক ধরেছে, আর এক জনের চুল ঘন ও কালো, চেহারায় তারুণ্যের ছাপ। প্রৌঢ়ের নাম ধরুন ফ্রেডারিক। সঙ্গীর নাম ভ্যালেনটিনো বা ঐ গোছের। নাম-ধাম পালটিয়ে লেখাই যুক্তিসঙ্গত—কেন তা পরে বুঝবেন।

দু'জনে আমার দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকালেন। আমি অভ্যাস-মত বক্তব্য ব'ললাম।

এইমাত্র বলেছি মিঃ ফ্রেডারিক বয়সে প্রৌঢ়। দেখলে মনে হবে পঁয়তাল্লিশের উপর বয়স তাঁর। বেশ শক্ত শরীর, একটু বেঁটে ধরণের দেখতে। একেবারে লালমুখো নয়। রংটা একটু হলদে ধরণের। নাকটা সামান্য একটু বোঁচা, কিন্তু চেহারায় কোথায় যেন একটু আভিজাত্যও আছে। বহু লোকের মধ্যেও তাঁকে একবার দেখলে আর ভোলা যাবে না, এই রকমই তাঁর চেহারা। ভ্যালেণ্টিনোর বয়স ত্রিশের কাছাকাছি মনে হয়। বেশ সুপুরুষ চেহারা।

আমার পরিচয় পেয়ে ফ্রেডারিক চুপ করে থাকেন এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন—হাঃ, হাঃ, হাঃ, তুমি—তুমি একজন ভাগ্যগণক! —বটে, বটে! তুমি সব গুণে বলে দিতে পার! ভূত—ভবিষ্যৎ—বর্ত্তমান; বা বা বা—তোমার এত গুণ, তবু তোমাকে দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে হয়! হাঃ হাঃ হাঃ—।

ভ্যালেণ্টিনো আমার দিকে তাকিয়ে নিরুৎসাহের সঙ্গে চোখ ঘুরিয়ে নেয়। তার ভাবটা হ'ল—আর কেন, এইবার কেটে পড়, আমাদের কথার মাঝখানে তোমার আর থাকবার দরকার নেই।

আমি ন যযৌ, ন তস্থৌ। প্রৌঢ় সাহেবের কথার আসল উদ্দেশ্য কি, ঠিক ধরতে পারছিলাম না। একবার মনে হ'ল, কি জানি, ইনি তো একেবারেই না না না ক'রে বিদেয় ক'রছেন না। তা'হলে কি শেষ পর্যন্ত একটা কাজ পাওয়া যাবে আজ? একটা টাকাও যদি জোটে, তাহলেও দুবেলা পেট ভরে ডালরুটি খাওয়া যাবে, তারপর সামনের দিনের কথা সামনের দিনে ভাববো। বর্তমানের জ্বলন্ত সমস্যার তো সমাধান হোক। বেশী রেট হাঁকলে যদি ফসকে যায় কাজ, তাই মনে মনে ঠিক করি, বেশী চাইব না, মাত্র এক টাকায় হাত দেখতে রাজী হয়ে যাব।

ফ্রেডারিকের ঠোঁটের কোণায় বিদ্রূপের হাসি তখনও লেগে আছে। তাঁর চোখের ভাষায় মানুষ ও জীবন সম্বন্ধে কি যেন এক অনির্বচনীয় ঘৃণার ভাব। এক মুহূর্তেই আমার অভ্যস্ত চোখের কাছে ধরা পড়ে

যান প্রৌঢ় ফ্রেডারিক। যেন মানসচক্ষে আমি দেখতে পাই হঠাৎ তাঁর সমগ্র অতীতকে।...

মরিয়া হয়ে বলে ফেলি—দেখ সাহেব, অত ঠাট্টা ক'রো না। দেয়ার আর মোর থিংস ইন্ হেভেন এ্যাণ্ড আর্থ দ্যান্ আর ড্রেম্ট্ অব ইন্ ইয়োর ফিলসফি।

ফ্রেডারিক এবার হাসেন, বলেন—হা হা, হি কোট্স সেক্সপীয়ার। কাম্ অন্, বী সীটেড।

এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। এইবার বসতে পেলাম।

ফ্রেডারিক আমাকে বাজিয়ে নিতে চান। প্রথমে নিজের হাত দেখালেন না।—হ্যাঁ হে ভাগ্যগণক, তোমার নাম কি?—চেবাচাবি—আচ্ছা, এই ভদ্রলোকের হাত দেখ, দেখি তোমার ক্ষমতা।

ইংরেজিতে সব কথাবার্তা হচ্ছিল। যতদূর স্মরণ আছে, বাংলা করে লিখছি। মাঝে মাঝে ইংরেজিই রেখে দিলাম, দোষ নেবেন না।

ভ্যালেণ্টিনোর হাত হাতে নিয়ে বলে যাই অভ্যস্ত প্রণালীতে। জানতাম বেশীর ভাগ সাহেব, বিশেষ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হলেই রেসের দিকে ওদের ঝোঁক থাকে—আর আশ্চর্য এই, 'রেসেল' যারা তারা কিন্তু বড় একটা জ্যোতিষীকে হাত দেখাতে চায় না। হাত দেখায় যারা তারা একটু সতর্ক বেশী। একবার ভাবে, দু'বার পেছ-পা হয়। ঝুনো বদমাইস, পাঁড় মাতাল, খুনে ডাকাত, পাকা জুয়াড়ী আর সন্ন্যাসী ত্রিগুণাতীত—সাধারণতঃ এই কয় শ্রেণীর লোকেরা জ্যোতিষীর ধার ধারে না।

যাই হোক, আমি একে একে রেখার অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে যাই। প্রৌঢ় সাহেব বলে—হাঃ হাঃ, ভেরী ক্লেভার—ভেরী ক্লেভার, ইউ নো হাউ টু গেস্। অলরাইট, কাম অন্, টেল্ মি হোয়াট্ ইউ সি ইন্ মাই পাম।...

ফ্রেডারিকের কথা বলার ধরণে এমন একটা খোঁচা ছিল, মরা লোকেরও রাগ না হয়ে যায় না। সবটাই আমার আন্দাজ বলে সে উড়িয়ে দিতে চায়। এতক্ষণ বকালো, পয়সা-কড়ির কথা তো মুখেই আনে না। শেষ পর্যন্ত কানাকড়ি মিলবে কি না সন্দেহ! যে রকম ভাবসাব। ভাবছি, আর পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠছে—পিপাসায় কণ্ঠগত প্রাণ।

ফ্রেডারিকের হাত নিয়ে কি বলব চিন্তা করি। যা বলি তা যদি না খাটে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বিদেয় করে দেবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মনে মনে দীনবন্ধু আদিনাথ আর দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করে সাহেবের হাত টিপতে থাকি। বলি—আই সি মেনি থিংস। ইউ আর এ্যানাদার অলিভার টুইষ্ট।

ফ্রেডারিকের মুখ গম্ভীর। ভাবলাম অলিভার টুইষ্টের কথা সাহেব জানে না হয়তো। সব বাঙ্গালী যেমন বঙ্কিমচন্দ্র পড়েনি, সব ইংরেজ যে ডিকেন্স পড়েছে তাই বা কেমন করে হয়? যাই হোক, হেঁয়ালী করে বললে কিছুটা হদিস্ পাওয়া যায় জাতক সম্বন্ধে। ভুল ক'রলেও শুধরে নেওয়া যায়।

ফ্রেডারিক বলেন—ডিকেন্সের 'অলিভার টুইষ্ট' ছেলেবেলায় পড়েছিলাম বটে। তা ঘটনার মধ্যে খানিকটা মিল আছে। কিন্তু আমি চাইছি তুমি আমার অতীত সম্বন্ধে এমন কিছু বল যাতে করে আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি, তুমি প্রকৃতপক্ষে হাতের ভাষা জানো। বল দেখি আমার জীবনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি?

অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। আমি চোখ বুজি। ইষ্টদেবীর মূর্তি স্মরণ করি, বলি, মা, বলে দাও কি বলব। চোখ খুলতেই দেখি, ফ্রেডারিকের হাতে শুক্রস্থানের উপর একটা রেখা নেমে এসেছে রাহুস্থান থেকে—ঠিক যেন, একটি বাঁকা তলোয়ার। বললাম—টু মান্থস এগো অর সো ইউ টুক্ ডাইভোর্স ফ্রম্ ইয়োর ওয়াইফ। দু' মাস আগে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ ঘটেছে।

ফ্রেডারিক তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান, ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন আমার মুখের দিকে—তার পর ভগ্নস্বরে বলেন—ইউ আর এ ঘোষ্ট।...অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব, ভ্যালেণ্টিনো—এ কি ক'রে সম্ভব হল? তুমি ছাড়া ভারতবর্ষে আর একটি প্রাণীও তো জানে না এই খবর! তুমি কি এই গণৎকারকে এর আগে দেখেছো কোথাও? কোন দিন কি আমার সম্বন্ধে এর সঙ্গে কোনো আলোচনা করেছ?

ভ্যালেণ্টিনো এইবার নড়ে চড়ে বসে, ঘাড় নেড়ে জানায়—না, সে এর আগে কোন দিনই কোথাও আমাকে দেখেনি। কথা বলা তো দূরের কথা।

ফ্রেডারিক আমাকে এক রকম হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন হোটেলের দোতলায়। কোণের একটি নাতিপ্রশস্ত ঘরে বসলাম আমি। দরজা বন্ধ করে এসে বসলেন ফ্রেডারিক। আমার সামনে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে। আমার হাতে একটি সিগার দিয়ে আপ্যায়িত ক'রলেন। কল টিপে আগুন ধরিয়ে দিলেন আমার সিগারে।

যথারীতি ফ্রেডারিকের হাতের প্রিণ্ট তুলি। ঘরের সঙ্গেই ঝকঝকে বাথ-রুম। নতুন সাবান ও নতুন তোয়ালে দিলেন ফ্রেডারিক। হাতের কালি ধুয়ে-মুছে যখন চেয়ারে এসে আরাম করে বসি, ফ্রেডারিক দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন গট্ গট্ করে। কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার ফিরে এলেন; তার পর গভীর দৃষ্টিতে আমার চোখের উপর চোখ রেখে বললেন—কি দেখছো আমার ভবিষ্যতে?

তাঁর নীল চোখের প্রখরতা সহ্য করতে না পেরে চোখ নামাই, ইতস্ততঃ করি—যদি সবই বলে ফেলি, তা'হলে কি আর পয়সা-কড়ি কিছু দেবে সাহেব?

বয় এসে দু'কাপ কফি দিয়ে যায়। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ফ্রেডারিক যেন একটু লজ্জিত হন। উঠে দাঁড়ান তার পর, টেবিলের দিকে এগিয়ে পকেট থেকে একটি সরু চাবীর রিং বের করে ড্রয়ার খোলেন। একতাড়া নোট, একশো টাকার অনেকগুলো নোট, তা প্রায় হাজার বিশেক টাকা হবে।

ভাবি লোকটা কি—অতগুলো টাকা রেখে দিয়েছে টেবিলের ড্রয়ারে! যদি কোনো বয় টের পেয়ে ডুপ্লিকেট কোন চাবী দিয়ে সরিয়ে ফেলে টাকাগুলো? কিন্তু মুখে কিছু বলি না।

মহামায়ার খেলা। ফ্রেডারিক আমার হাতে দু'খানা নোট গুণে দেন, বলেন—একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম তোমার প্রয়োজনের কথা।

দু'শো টাকা! জয় গুরু—জয় শিবশম্ভুকী জয়! জয়...ইষ্টদেবীর মূর্তি পুনরায় স্মরণ করি। বার বার প্রণাম জানাই। কাজ না করবার আগেই এ্যাডভান্স টাকা! তা-ও, অপ্রত্যাশিত ভাবে একেবারে দু'শো! আমার একান্ত প্রয়োজন যেখানে একশো—বড়জোর একশো পাঁচ।

পেটের ক্ষিধে তখন মরে গিয়েছে। কামরার উত্তর-পশ্চিম জানালা দিয়ে দেখি অনেকগুলো অর্কিড। অনেক নাম-না-জানা বিলিতী ফুলের কেয়ারী। হোটেলের টেনিস-লনের ওপারে মেদীগাছের লাইনের ধারে ধারে অনেকগুলো ইউক্যালিপটাস গাছ। বাতাসে দুলছে পাতা—রদ্দুরের তেজও অনেক কম বলে মনে হল হঠাৎ!

—অতীত সম্বন্ধে জানবার কোন কৌতূহলই নেই আমার। অতীত সবই তো আমার জানা। আমি শুধু জানতে চাই আমার ভবিষ্যতে কি আছে। তুমি মনোযোগ দিয়ে গণনা ক'রো। লিখিত ভাবে আমাকে দিয়ো কিন্তু, বেশী দেরী ক'রো না, সামনের সপ্তাহেই আমি বাঙ্গালোরে রওনা হব।

অতীতের কথা লিখতে হবে না। ফ্রেডারিকের কথায় আমি হাফ ছেড়ে বাঁচি। ভবিষ্যৎ মেলে মিলুক, না মেলে না মিলুক, কেউ তো আর এখনই বুঝতে পারছে না।......

* * *

পাঁচ দিন পরে ফ্রেডারিকের হোটেলে ফিরে গিয়ে তাঁর হাতে একটি বাঁধানো সুদৃশ্য খাতা দিলাম—ফ্রেডারিক বইটা রেখে দিলেন, বল্লেন—অবসর মত ভাল করে পড়ে, বুঝে, তোমার সঙ্গে আলোচনা করব। তুমি বরং কাল সন্ধ্যের পর একবার এসো।

ড্রয়ার থেকে আরও দু'শো টাকা বের করে আমার হাতে দিলেন, বললেন, চিয়ার ইউ......

পরদিন, যখন নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়ালাম, তখন দরজাটা বন্ধ ছিল। ভিতর থেকে যেন কণ্ঠস্বর শুনলাম, কে যেন কা'কে কি বলছেন।

ভাবলাম কি করি, কলিং-বেলও নেই ছাই যে, সাহেবকে আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করতে পারি। দরজায় 'নক' করা কি উচিত হবে? ভিতর থেকে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর দরজার ফাঁক দিয়ে, অথবা ভেন্টিলেটের সাহায্যে ভেসে আসছে কানে। মিষ্টি গলায় কে যেন বার বার কি একটি বিষয়ে অনুরোধ জানাচ্ছে, আর গম্ভীর পুরুষকণ্ঠে গমগম করছে—নো, নো, নো।...

এমন সময় কি দরজায় নক করা অভদ্রতা হবে না?

হঠাৎ মনে হ'ল শব্দ থেমে গিয়েছে। কারা যেন উঠে আসছেন। জুতোর শব্দ শুনতে পাই। দরজা খুলে দাঁড়ালেন মিঃ ফ্রেডারিক। পাশ দিয়ে একটি রূপসী মেমসাহেব বেরিয়ে গেল। আমি ভাল করে মেমসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়েও দেখতে পেলাম না, মুখ নীচু করে, আমার দিকে না তাকিয়েই চলে গেলেন মেমসাহেব, করিডর বেয়ে। চেয়ে দেখলাম, সিঁড়ি বেয়ে তরতর ক'রে নেমে যাচ্ছেন তিনি। মিঃ ফ্রেডারিকের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙলো।...মেমসাহেব—মেমসাহেব, কেনই বা মেমসাহেব এসেছিল ফ্রেডারিকের কাছে? কে এই মেমসাহেব?...কি চান উনি?...নো, নো, নো—কেনই বা বললেন মিঃ ফ্রেডারিক? কিছুই বুঝতে পারি না, ফ্রেডারিককে অনুসরণ করি, ভিতরে গিয়ে বসি।

...অনেক কথার পর ফ্রেডারিক বললেন, দেখ দেবাচারী, তুমি আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই লেখ নি। সোজা কথায় বলা যায়, আমাকে সহজ লোক পেয়ে ফাঁকি দিয়েছ। পুরো দু' পাতা শুধু কবিতার লাইন তুলে দিয়েছ।...

তার পর আমার দিকে চেয়ে হাসেন—না, না—ভয় পেয়ো না, টাকা ফেরৎ চাইব না। কবিতার অংশগুলি সত্যিই ভাল—এর মধ্যেই দু'বার আমি পড়ে ফেলেছি। এবং বলতে পারো, আমি আমার ভবিষ্যৎ বিষয়ে প্রায় সব কথাই জেনে ফেলেছি।

আবার থামেন। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ ভাবে কেটে যায়। তার পর পুনরায় বলতে থাকেন ফ্রেডারিক—এ কবিতার লাইনগুলো কার লেখা? কখনও এর আগে পড়েছি বলে তো মনে হয় না? আমি যে কবিতা পড়তে ভালবাসি, তা তুমি ঠিক ধরেছ, আমার বাবা ছিলেন লণ্ডনের একজন ধনী পাব্লিশার। লাডগেট হিলে ছিল আমাদের বইএর দোকান। জার্মাণীর বোমায় দোকানটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বাঙ্গালোরে আমার এক বোন থাকে, তার চিঠিতে জেনেছি।...

অনেক কথাবার্তা আরও হ'ল। মিঃ ফ্রেডারিকের অতীত সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারলাম। তিনিই নিজে বলে যেতে লাগলেন।

তার পর বললেন—এই নাও আর একশো টাকা। তোমাকে পাঁচশো টাকা দেব ঠিক করেছিলাম। কলম্বোয় যদি যাও, তাহলে আমার ওখানে নিশ্চয়ই উঠবে। আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। কোনো হোটেলে উঠবার দরকার নেই। আমার বাগানঘেরা প্রকাণ্ড বাড়ী। একেবারে সমুদ্রের ধারে। শহর থেকে মাত্র আধ ঘণ্টা ড্রাইভ। অতি সুন্দর দৃশ্য চারি দিকের। তুমি কবিতা ভালবাস, তোমার খুব ভাল লাগবে। আর তোমার জ্যোতিষীতে ইন্টারেস্টেড এমন লোকের অভাব হবে না। শহরে অনেক পামিষ্ট আছে, মাঝে মাঝে বাইরে থেকে টুরিং পামিষ্টও আসে অনেক। পয়সাও পেটে এরা এক এক সীজনে প্রচুর। কেউ কিছু জানে না।

আবার মৌনী হয়ে আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ফ্রেডারিক। তাঁর নীল চোখের মণি দুটো আমার চোখের মণির সঙ্গে ক্ষণেকের জন্যে মিলিত হয়।—সেই দৃষ্টির মধ্যে কি যেন বেদনা, আক্রোশ, স্নেহ, আশা, প্রেম, ঘৃণা—সব মিশে গেছে। এক মুহূর্তে মনে হয়, এ যেন সম্পূর্ণ আর এক ব্যক্তি সামনে দাঁড়িয়ে, চেহারা এক, কিন্তু প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের।

আমি বিদায় নেব নেব, এমন সময় মিঃ ফ্রেডারিক হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন—আমার পাঁচশো টাকা ফিরিয়ে দাও—ইউ আর জাষ্ট এ ফ্রড—তোমার ঐ কবি—কি বললে এডউইন আরনল্ড—লাইট অব এসিয়া—হাঃ হাঃ, লাইট, লাইট—দেয়ারস নো লাইট—ফ্রম্ ডার্কনেস উই কেম্—ইনটু ডার্কনেস উই গো।

আমি বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যাই। ফ্রেডারিকের চোখের দৃষ্টি কি স্বাভাবিক মানুষের মতন? কই না, উন্মাদ বলে তো মনে হচ্ছে না?

—লুক হিয়ার, ইয়োর পোয়েট সেস্, দি হার্ট অব বিয়িং ইজ সিলেস্‌চিয়াল রেষ্ট। ডিড ইউ এক্সপীরিয়ানস ইট্ হোয়েন্ আই ওয়ানটেড মাই মানী ব্যাক্? সি ডিউপড মি ফর ফুল সেন্ডেল

ইয়ারস এ্যাবাউট হার পাষ্ট। ইউ ওয়ান্ট টু ডিউপ মি এগেন ফর অল মাই ইয়ারস ইন্ দি ফিউচার!

তোমার কবির কথা, সত্তার অন্তরে আছে স্বর্গীয় শান্তি, কেমন কি না। যখন আমি টাকাগুলো ফিরিয়ে নিতে চাইলাম তখন কি তা অনুভব করতে পেরেছিলে তুমি? একজন ঠকালো পুরো সাত বছর ধরে তার অতীত সম্বন্ধে, আর তুমি এসেছ ঠকাতে গোটা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, আমাকে—হাঃ হাঃ হাঃ!

অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন ফ্রেডারিক।···

আবার শান্তকণ্ঠে বলেন—তুমি দেখছি ভয়ানক ভয় পেয়েছ। কাম্ অন্ উই'ল ড্রাইভ।···

আ, ইউ হ্যাভ নট্ ইয়েট রিকভার্ড ফ্রম দি শক! মাই ডিয়ার পামিষ্ট, টেক ইট ফ্রম মি—দেয়ার আর মোর থিংস ইন্ হেভেন এ্যাণ্ড আর্থ দ্যান আর ড্রেমট অব এন্ অল্ দি বুক্স্ অব ফিক্সন। এঃ, কাম্ অন্ দেবাচারী—ইটস এ জোক্।

প্রচুর মাল টেনেছে সাহেব। আমার ভয় হয় সাহেবের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠতে। কিন্তু তখন আমার নিজের ইচ্ছেশক্তি বলে আর যেন কিছুই ছিল না।

ট্যাক্সিওয়ালা মারাঠী, জিগ্যেস করে, কোথায় যাব সাহেব? সাহেব চেঁচিয়ে ওঠেন—টু হেল, টু হেল!

সঙ্গে সঙ্গে প্রায়, শান্তস্বরে বলেন—রাস্তা বেয়ে চল, দেখো এক্সিডেণ্ট ক'রো না। যে পথে ইচ্ছে চালিয়ে যাও, আমার আপত্তি নেই।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুরলাম সাহেবের পাশে বসে। সাহেব কোন কথাই বললেন না। হোটেলে ফিরে এসে ট্যাক্সিওয়ালাকে হিসেব করে টাকা মিটিয়ে দিলেন, আর আমার হাতে দু'টাকা দিয়ে বললেন—তোমার হোটেলে ফিরে যাবার ট্যাক্সি ভাড়া। আমি আর বাঙ্গালোরে যাব না, এ সীজনটা এখানেই থাকব—তোমার টাকার প্রয়োজন হলে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো।

বিচিত্র ফ্রেডারিক! এমন সাহেব আর জীবনে দেখি নি। সুস্থ-মস্তিষ্ক না পাগল, বুঝে উঠতে পারি না, এমন কি তাঁর হাতের রেখার আলোকেও কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না—সেখানে চিত্রিত আছে শুধু গভীর বেদনার ক্ষত।···

সাহেবের হোটেল থেকে আমার হোটেল অবশ্য অনেকটা দূর। আশ্চর্য, ঠিক দু'টাকাই মিটারে উঠল।

তিন দিন পরের ঘটনা। রাত্রি তখন এগারোটা হবে। আমি যে হোটেলে থাকতাম তার তিনটে ভাগ আছে। মাঝখানে দোতলা বিল্ডিং, উপরতলা কাঠ আর সিমেণ্টে তৈরী। সামনের দিকে অফিস, গেটে ঢুকতে ডান দিকে কতকগুলো টালি শেডের কটেজ, সেখানে সুর্মাচোখে অনেক সুন্দরী ইরাণী-তরুণীর চকিত চাহনি হোটেল প্রবেশকারীর হৃদয়ে আগুন জ্বালাতো। মেন বিল্ডিংএ আসতো নামকরা বোম্বের এক্টর এক্ট্রেস্··। গেট বরাবর সোজা পূব দিকে খানিকটা হাঁটলে দেখা যায় ছোট্ট ফুলের বাগান—বাগানের প্রান্তদেশে আবার কতকগুলো টালি ও খোলার শেড্। আইভি বা ঐ গোছের নানা লতাপাতায় ঘেরা একটি প্রাচীরের আড়ালে একটি কটেজের মাঝের ঘরে থাকতাম আমি। আমার কটেজের আর একটি ঘর প্রায়ই খালি থাকতো। আসত যেত প্যাসেঞ্জার, কেউ একদিন, কেউ দু'দিন, কেউ বা মাত্র এক রাত্রি কাটিয়ে কখন যে বিদায় নিত টেরও পেতাম না।···

সে রাত্রিতে কোণের ঘরটায় ছিলেন এক মেমসাহেব। সকাল বেলায় এসে উঠেছেন, কয়েক ঘণ্টা শহরের এদিক ওদিক ঘুরে, কুলির মাথায় অনেক কিছু জিনিসপত্র চাপিয়ে যখন বিকেলের দিকে ফিরলেন, তখন তাকে নজর দিয়ে দেখেছিলাম। নজর দিয়ে দেখেছিলাম মানে সত্যি সত্যি নজর দিয়ে দেখতে বাধ্য হয়েছিলাম।

মেমসাহেবদের দেহের গঠন দেখে বয়স ধরা বড়ই কঠিন। কখনও মনে হয় ষাট বছরের বুড়ীকে চল্লিশ বছরের। আবার চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়াকে পঁচিশ বছরের যুবতী বলে ভুল করে নি এমন স্বচ্ছদৃষ্টি ভারতীয় খুব কম দেখা যায়। যাই হোক, মেমসাহেবটিকে ইণ্ডোইয়োরোপীয়ান বলে মনে হ'ল। রঙে যেন খাদ আছে। তবে সব মিলিয়ে যে ইম্প্রেশন তাতে কবির ভাষায় প্রায় বলা যায়—নহ মাতা, নহ কন্যা হে অনন্তযৌবনা উর্বশী! আর রূপের বর্ণনা কি দিতে হবে?

মেমসাহেব যখন সন্ধ্যের দিকে বারান্দায় এসে তার রুমের সামনে চেয়ারটা টেনে বসলেন, তখন তার দেহের বিভিন্ন অংশের বক্ররেখাগুলির দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলাম, মেমসাহেবের কর্তা-ব্যক্তি কেউ আছেন কি না, থাকলে তিনি কি করেন? মেমসাহেব কেনই বা এমন একা-একা হোটেলে এসে উঠলেন? তাও আবার পুণায়? এমন একটি ফিগারের উপর যার একাধিপত্য, তিনি না জানি কোন্ মেকারের?

আগেই বলেছি, রাত্রি তখন বোধ হয় এগারোটা। আমি বিছানার উপর নতুন-কেনা বেডশিটটি বিছিয়ে দরজা বন্ধ করি। টাকার নোটগুলো আবার একবার গুণে খামে পুরে বিছানার মধ্যে গুঁজে রাখি। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ি, চিন্তা করি—আর চিন্তা কি, টেলিগ্রাম-মনিঅর্ডার করে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি, ঠিক সময়েই পৌঁছে যাবে টাকা—হাতে এখনও চারশো টাকা মতো জমে গিয়েছে—আঃ কি আরাম! বিছানাটা এত নরম হ'ল কি করে?···

চোখে ঘুম এসে-এসে আসে না, কানে যায় মচ-মচ জুতোর শব্দ—কে যেন বাগান পেরিয়ে বারান্দায় উঠল···কোণের ঘরের দিকেই চলেছে জুতোর শব্দ।···

দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ শোন যায়, কিন্তু কই মেমসাহেব তো দরজা খুলছে না! ভাবলাম, ঘুমিয়ে পড়েছে মেমসাহেব···এত গাঢ় ঘুম?···কড়ানাড়ার শব্দেও ঘুম ভাঙে না!···মেমসাহেবের কর্তা-ব্যক্তিটিই বুঝি এলেন? পুণায় আবার মিলিটারী অফিসার অনেকে রাত কাটিয়ে যান ঐ কোণের ঘরটায়। মাঝে মাঝে আসেন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রূপসীরা—কত কথাই তো লোকমুখে শুনতে পাই—আমার অত কথায় কাজ কি।···ঘুমুনো যাক।

আবার কড়ানাড়ার শব্দ! এবার এত জোরে এবং এত ঘন ঘন যে সারা কটেজের দরজা-জানালাগুলো যেন কাঁপতে লাগলো। এই রে, সাহেবটা বুঝি মদ খেয়ে এসেছে!

পরক্ষণেই শুনতে পেলাম দরজা খোলার শব্দ—যাক, বাঁচা গেল!—এইবার মেমসাহেব সামলাক মাতাল স্বামীকে বা স্বপ্নাভিবিক্ত রজনীনাথকে।

ভাবতে ভাবতে অবশেষে তন্দ্রাচ্ছন্ন হই। তন্দ্রাঘোরে যেন শুনতে পাই চাপা নারীকণ্ঠের করুণ আর্তনাদ। বাতাসে কি শব্দ ভেসে আসছে না? কাঠবেড়ালীর বাচ্চাটা কি করে এ-ঘর ও-ঘর করে? না, ইঁদুর—ইঁদুরই কেটে ফুটো বানিয়েছে—ক্ষীণশব্দ পথ কি করে সৃষ্ট হ'ল কে জানে!···

সুইচ টিপে আলো জ্বালি। দেখি, সত্যিই আমার ঘরের সিলিংএ এসবেষ্টস্ শিটের জোড়ায় ফাঁক রয়েছে।···

আলো জ্বালাই থাকে। কান পেতে শুনি। পাশের ঘরে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলেছে বলে মনে হয়। স্প্রিংএর খাট কটকট করে। টেবিলে কে যেন ঠকাস করে কি ফেলে দেয়। আর চাপা গলায় যেন মনে হয় কে যেন কা'কে কি বলছে।···

সাহেব কি মেমের উপর সত্যিই অভদ্র আচরণ করছে? ভাবি কি করি!

এ অবস্থায় আমার কি-ই বা কর্তব্য থাকতে পারে? যদি স্বামী তার স্ত্রীর উপর দাম্পত্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণ বীরত্ব প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়, আপনারই পাশের ঘরে—তাহলে আপনি কি চীৎকার করে লোক জড়ো করবেন?

সাত-পাঁচ অনেক কিছু ভাবছি, আর সাহেবটার উপর বিরক্ত হয়ে উঠছি। অবশেষে আর চুপ করে শুয়ে থাকা গেল না—উঠে বসলাম। তারপর দরজা খুললাম। সঙ্গে সঙ্গে কোণের ঘরের দরজাও খুলে গেল। দরজা দিয়ে বারান্দায় লাফিয়ে পড়ল সাহেব, আর এক লাফে বাগানে, তারপর দৌড়।···

বারান্দার আলো সারা রাত জ্বলে। তাই বেশ পরিষ্কার দেখতে পেলাম রক্তাক্তবদনা শ্বেতাঙ্গিনী দিগম্বরা। মা কালী-মূর্তিতে দরজায় দাঁড়িয়ে। হাতে রিভলবার।···একটা আণ্ডার-ওয়ের ছাড়া তখন তার দেহের কোন আবরণই ছিল না।···

ঘবনাসুরের নখক্ষতে শুভ্র স্তনযুগ কলঙ্কিত। বব্‌ড্‌হেয়ার বিস্রস্ত হয়ে কপালে ঝুলে পড়েছে। কপালে ও গালের উপর। চোখের দৃষ্টিতে ত্রিনয়নীর বজ্র-বিদ্যুৎ।

সাহেবের কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছে—ঠোঁট বেয়ে রক্ত পড়ছে—নেকটাই ছিঁড়ে কোটের বোতামে লেগে আছে। বিদ্যুৎ ঝলকের মতন বিবসনা অদৃশ্য হ'ল দরজার আড়ালে। দড়াম করে দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ হয়ে গেল।

এত সব ঘটনা ঘটলো, আশ্চর্য, হোটেলের অন্য কেউ-ই জানতে পারলো না। পরে বুঝেছি, এ রকম ঘটনা এ-সব কটেজে প্রায়ই নাকি ঘটে থাকে। নিজ নিজ কক্ষের মত্ততায় কেউ আর বাইরের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না।

আমি এ রকম দৃশ্য দেখি নি। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম এল না। শেষ রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ পেয়ে। হোটেলের বয় এসেছে মর্ণিং কফির পেয়ালা নিয়ে। ছেলেটি মারাঠী, একটু ল্যাজা ধরণের, ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি বলতে পারে। বাঙ্গালী জ্যোতিষী মিষ্টারের উপর তার অসীম শ্রদ্ধা—তাই কফির সঙ্গে যে পাউরুটি, জেলি, আর মাখন বরাদ্দ, তা পেতে আমার একটুও দেরী হোত না।

বয়ের কাছে শুনলাম, এর আগে দু'বার এসে ফিরে গেছে সে। এমন তো কোন দিনই হয় না। পাশের ঘরের মেমসাহেবের কাছে ইতিমধ্যে আমার অনেক গুণগান করে এসেছে সে। মেমসাহেব না কি আমার ফি-এর কথা জানতে চেয়েছেন। বয় বুদ্ধি করে বলেছে বাঙ্গালী মিষ্টার মহারাণীজ এষ্ট্রলজার—ফি ওয়ান হানড্রেড রূপীজ—মেমসাহাব হি ইজ ভেরী গুড বেংগালী··হি টেক্‌স, টেক্‌স মাচ ফ্রম ব্যাড মেন, বাট নট নট ফ্রম গুড লেডীজ··মিষ্টার ইজ এ অনেষ্ট···এ্যাণ্ড এ্যাণ্ড—

আর ইংরেজিতে কুলোয় নি।

বলতে চেয়েছিল, কি জানি, মিষ্টার ইজ মডারেট এ্যাণ্ড অনেষ্ট টু অল গুড লেডীজ।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন স্নান সেরে ডিনার-হলে উপস্থিত হলাম, দেখলাম, এক কোণে দাঁড়িয়ে কক্ষান্তরবাসিনী শ্বেতাঙ্গিনী। আমার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়তেই যেন লজ্জিত হলেন। বয়কে কি বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

আমি খাওয়া দাওয়া সেরে যখন রুমে এলাম, বিছানায় গা এলিয়ে ভাবছি বেরুব না ঘুমুব, এমন সময় দরজায় কার যেন ছায়া পড়ল। বিছানা ছেড়ে উঠতেই কানে গেল মিষ্টি গলায় মেমসাহেব বলছেন, মে আই কাম ইন?···

তারপর—?

তারপর, অনেক কিছু ঘটেছিল। সব কথা লিখতে গেলে পাতা বেড়ে যাবে।······

কবে, কখন যে মেমসাহেবের বিশ্বাসভাজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেলাম!···সে স্মৃতির রোমন্থনেও সুখ আছে।···যখন রূপসী শ্বেতাঙ্গিনী আমাকে তার অতীতের সকল কাহিনী বর্ণনা করে চলেছিল তারই ঘরে আমাকে নিমন্ত্রিত করে, মাত্র তিন ফুট দূরে বসে—কৃষ্ণা রাত্রির আকাশে অসংখ্য তারা দূরে মিটমিট করে যেন তাকিয়ে আছে আমাদের দিকেই, খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায় মস্ত উঁচু দেবদারু গাছ প্রহরীর ন্যায় নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে, আর শিশির ঝরে পড়ছে গাছের পাতা থেকে শহরের ধুলায় ধূসর ও হেমন্তে ঈষৎ বিবর্ণ ঘাসের ওপর—চার দিকের আওয়াজ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর, মিলিয়ে যাচ্ছে টাঙ্গাওয়ালার গৃহাভিমুখী শেষ কশাঘাত, পুণা ষ্টেশনে শেষ ট্রেনও এসে গিয়েছে অনেকক্ষণ, যাত্রীরা যারা আমাদের হোটেলে এসে উঠেছে তারাও বোধ হয় এতক্ষণে যে যার ঘরে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে·····হঠাৎ, হঠাৎ আবিষ্কার ক'রলাম আমি আর বারবারার মাঝখানে নর ও নারীর প্রাচীর খসে পড়েছে।—একমাত্র সখীর কাছে শুধু স্ত্রীলোক যে কথা বলতে পারে, স্বামীর কাছেও বলতে লজ্জা বোধ করে, সে সব কথাও বলতে আর তার কুণ্ঠা নেই। এরকম অভিজ্ঞতা জীবনে আমার নতুন নয়। অবশ্য এর একটু কারণও ছিল।

ফ্রেডারিকের হোটেলে যে রূপসীকে ভাল করে দেখতে পাইনি সেদিন, সেই রূপসীই যে বারবারা, এ সন্দেহ শুরুতেই আমার মনে জাগে। দুটি মূর্তির চলার ভঙ্গী এক। সেই রাত্রে যে সাহেব এসেছিল বারবারার ঘরে, সে যে ফ্রেডারিক নয়, তা অনুমান করা মোটেই কঠিন ছিল না আমার পক্ষে। কিন্তু পাশব সাহেবটি যে ভ্যালো্টিনো, রক্তাক্ত মুখ দেখে আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি।···

আমার দুর্ভাগ্য হোক, আর সৌভাগ্যই হোক, বরাবর দেখে

জানছি, মেয়েরা আমাকে···মোটেই ভয় করে না। আপনারা যারা নিন্দুক, তাঁরা বলবেন—গ্রাহ্য করে না। আপনাদের নিন্দাই আমার কণ্ঠভূষণ হয়ে থাকুক। আমি দাসানুদাস, নীলকণ্ঠ দাসেরও পূজারী।

বারবারা বলে—তাহলে তুমিই সেদিন ফ্রেডারিকের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিলে?

আমি ঘাড় নেড়ে বলি, হ্যাঁ।

কি দেখলে ফ্রেডারিকের ভবিষ্যতে?

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই আবার বলে—মে ইউ টেল মি হোয়াট ইজ্ ইন্ ষ্টোর ফর্ মি? (আমার ভবিষ্যতে কি আছে, বলবে কি?)···

আমি বলি—ইট ইজ ইন আস্ ছাট উই আর দাছ অর দাছ। (আমাদের মধ্যেই আমাদের ভাগ্য নিহিত)···

বারবারা ম্লান হাসি হাসে—অনেক দিন আগে পড়েছি, ভুলে গিয়েছি সব, সাহিত্য চর্চায় আর শান্তি পাই না। মনে পড়ে, শেক্সপীয়ার আর এক জায়গায় লিখেছেন—দেয়ারস এ প্রভিডেন্স দ্যাট্ শেপস আওয়ার এন্ড্স, রাফহিউ দেম হাউ ইউ উইল্।

—তোমার স্মৃতি-শক্তি তো বেশ প্রখর!

বারবারার মুখে বিষাদের ছায়া পড়ে—আমিই তো কোনবার ··মিশনারী স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলাম। আমিই ইংরেজি পড়াতাম।

হঠাৎ নিজেকে থামিয়ে দেয় বারবারা। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে—তুমি জ্যোতিষী হয়েও কর্মের উপর আস্থা রেখেছ, আশ্চর্য্য নয় কি?

আমি—আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রে ভাগ্যকে কর্মফল বলেই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অদৃষ্ট মানে ন দৃষ্ট—পূর্বজন্মের কর্মের ফলভোগ করতেই হবে এ জন্মে। গ্রহগণ ভাগ্যের কারক নয়, সাক্ষী।

বারবারা—পূর্বজন্মে ক্রীশ্চানেরা বিশ্বাস করে না।

আমি—পূর্বজন্মে বিশ্বাস কর আর নাই কর, তাতে আসে-যায় না। ভাল কাজ করলেই ভাল ফল পাবে, মন্দ কাজ করলে মন্দ।

বারবারা—তোমার কথাগুলোই যদি সত্যি হোত!

বারবারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

বারবারা—দেবাচারী, তুমি যখন কিছুটা জানো, তখন সবটাই শোনো। বলে দাও কি এমন খারাপ কাজ করেছি, যার জন্যে আমার কপালে এই বিড়ম্বনা।

বিড়ম্বনা—বিড়ম্বনাই শুধু পেয়েছে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের হাত থেকে চিরদিন। ইতিহাস ঘেঁটে একটাও উদাহরণ কি দিতে পারো তুমি, বলো, কবে, কোথায় স্ত্রীলোক পুরুষের উপর অত্যাচার করেছে? পুরুষের চরিত্র আর স্ত্রীলোকের ভাগ্য কি এক জিনিস নয়?

···শুনেছি, আমার দেহে নানা জাতির রক্তের সংমিশ্রণ আছে। সম্রাট সাজেহান যখন হিন্দোস্তানের বাদশা—ক্যালকাটার কাছাকাছি কোনো হ্যামলেটের ব্রাহমিন লর্ড মারা যান। হি হ্যাড থারটি থ্রি ওয়াইভস। দি ইয়াংগেষ্ট—সি উড নট্ ডাই এ সাটী, সি র‍্যান্ এওয়ে। সি ফেল ইন দি হ্যাণ্ডস অব দি পর্তুগীজ। দে টুক হার টু গোয়া। দে সোল্ড হার এ্যাজ এ স্লেভ।

·ফাদার আলভ্যারেজের দয়ায় তিনি ক্রীশ্চান হয়ে মুক্তি পান। ইটালিয়ান ক্যাথলিক ভিত্তিরিয়োর সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বার বিয়ে হয়। ভিত্তিরিয়ো ছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর। শুনেছি, তাজমহলের কবর-ঘরের দেওয়ালচিত্রে তাঁর হাত আছে। তাঁরই বংশে জন্মেছিলেন আমার মাতামহীর মাতামহী।

কবে যে আমরা গুজরাটে এসে বসবাস শুরু করি, তা বলতে পারব না। আমার মা কাজ করতেন ভিক্টোরিয়া-টারমিনাসে বুকিং-অফিসে। বাবা মারা যাবার পর আমার জন্ম, এই নিয়ে গ্রামে মিথ্যা কুৎসা রটনা হওয়াতে মা গ্রামের বাসা তুলে দিয়ে দাদারের স্থায়ী বাসিন্দা হন। ইচ্ছে করলে তিনি আর একবার বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু বাবাকে তিনি সত্যিই ভালবাসতেন। বিধবা হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু কোন স্থানেই তিনি শান্তি পেলেন না। আমার রূপই হোল কাল।

তাঁর শত চেষ্টা সত্বেও তিনি আমাকে পুরুষের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। তালিকা প্রকাশ করতে লজ্জা করে। খুব কম পুরুষই দেখেছি সত্যিকারের পুরুষ, অসহায় বালিকা আর স্ত্রীলোকের উপর সুযোগ সত্বেও সুযোগ নেয়নি।

কথাটা বললে খুব রূঢ় হবে, তোমরা পুরুষ মানুষ এখনও মানবত্বই অর্জন করনি, দেবত্ব তো দূরের কথা। দুই একজন তোমাদের মধ্যে এক্সেপসন আছেন বটে, কিন্তু মাসলক্লে, বলা যায়, স্ত্রীলোক এভলিউশনের পথে পুরুষের তুলনায় অনেক কয় ধাপ এগিয়ে আছে। যে পৃথিবীর পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতে একটুও ইতস্ততঃ করে না, সে পৃথিবীর দুঃখ্ কোনো দিনই ঘুচবে না। এমন কি হান্ড্রেড পারসেণ্ট লিটারেসী প্রেড করলেও ঘুচবে না। দি রুট কজ অব ওয়ারলড-ডিজাষ্টার ইজ ল্যাক অব সেল্ফ-কন্ট্রোল।···

বারবারা থামে। আমার দিকে তাকিয়ে মুখ নীচু করে। ···মাত্র ন'বছর যখন আমার বয়েস, একটা বিস্কুট কারখানার মালিক ···হ্যাঁ, লোকটি ছিল বৃদ্ধ, দাড়ীওয়ালা—তেষট্টি বছরের উপর তখন বয়েস তার···অনেক সব খারাপ রোগে ভুগছিল সে···কে একজন ফকির নাকি তাকে পরামর্শ দিয়েছে···ছ' মাসের জেল হল কারখানার মালিকের। তারপর সে ছাড়া পেয়ে গেল।···কিন্তু চিরদিনের মতো কলঙ্কিত হল একটি কুমারীর জীবন।···

ভ্যালেণ্টিনোর মা ছিলেন আমার মায়ের পরিচিত। একই বাড়ীর ভিন্ন ফ্ল্যাটে বাস করতেন তিনি তাঁর স্বামী আর ছেলে নিয়ে···

ভ্যালেণ্টিনো বয়সে আমার থেকে বছর খানেকের ছোট।

আমার জীবনের এই কলঙ্কের কথা ভ্যালেণ্টিনো জানতো। অনেক লোকেই জেনেছিল ঘটনার কথা। খবরের কাগজে তো এসব ঘটনা সবিস্তারে প্রকাশিত হয়। অনেক লোকেই পড়ে। কিন্তু কয় জন পাঠক নাম-ধাম স্মরণে রাখে?···

সব খুঁটিনাটি বলতে গেলে অনেক রাত হয়ে যাবে।

বারবারা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। টেবিলের দিকে পিঠ বেঁকিয়ে হাতঘড়িটা দেখে।

—সর্বনাশ, রাত যে বারটা! যাও, তুমি ঘুমোও গে। আমার ভয়ানক অন্যায় হয়ে গিয়েছে। তোমাকে এতক্ষণ ডিটেন করা আমার পক্ষে মোটেই উচিত হয় নি।

আমি বলি—তুমি কাহিনী শেষ কর। আমি জানতে চাই, ফ্রেডারিকের মত সজ্জন লোকও কেন তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার ক'রল ?

—ওই একমাত্র পুরুষ, আমার জীবনের অভিজ্ঞতায় যাকে দেখলাম, অভদ্র ব্যবহার করে নি কোনো দিনই। ওর কোন দোষ নেই। দোষ আমার ললাটের। ফেট্, ফেট্—ডার্ক ফেট্ ওয়াজ্ এগেন্‌ষ্ট মি। অর্ টু এডপ্‌ট ইয়োর ল্যান্‌গোয়েজ, আই হ্যাভ্ টু সাফার বিকজ্ অব্ দি ডীড্‌স অব মাই প্রিভিয়াস বার্থ। আই মাষ্ট সে, ইয়োর হিন্দু থিয়োরী অব প্রিভিয়াস্ বার্থ এ্যাণ্ড ট্রানস্‌মাইগ্রেশন্ অব্ সোলস হ্যাব গট্ ওয়ান এ্যাডভান্‌টেজ্—ইউ বিকাম রিসাইন্‌ড টু দি ক্রুয়েলেষ্ট শাফ্‌টস অব মিস্‌ফরচুন্।

আমি কোনো কথা বলি না।

বারবারা পুনরায় কাহিনী শুরু করে—কোলাবায় যখন প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাজে ভর্তি হয়েছি, সেই সময় থেকেই ফ্রেডারিকের সঙ্গে আমার আলাপ। একদিন সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে আণ্ডারকারেণ্টের টানে পড়ে প্রাণ যায়-যায়, সেই সময় ফ্রেডারিকই আমাকে উদ্ধার করে।···সেই ঘটনার শেষ পরিণতি, আমরা উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হই।···

ফ্রেডারিক একদিন প্রোপোজ ক'রলো।

বারবারা আমার দিকে চায়।

আমি গম্ভীর ভাবে টিপ্পনি করি—ফ্রেডারিক বুদ্ধিমান।

বারবারা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে—না না না, সে মোটেই বুদ্ধিমান নয়। বুদ্ধিমান যদি হোত, তাহলে সে কি বুঝতে পারতো না, কে তাকে সব চেয়ে ভালবাসে, সব চেয়ে শ্রদ্ধা করে!

আসলে কি জানো, পৃথিবীর চরিত্রবান পুরুষ মাত্রেই ওথেলোর মতো বোকা আর অভিমানী। ভাল লোকগুলো যেদিন বুদ্ধিমান হবে, সেই দিন স্যাটান উইল ডাই, এ্যাণ্ড দি কিংডম অব হেভেন উইল বি সেফ্ ফর এভার।···আমি—আমি অবশ্য ডেস্‌ডেমোনা নই। আমার শরীর কলুষিত হয়েছে একাধিক বার। কিন্তু প্রত্যেক-বারেই আমি ছিলাম ভাগ্যবিড়ম্বিত, অসহায়, নিরস্ত্র নারী। আমার মন কলুষিত হয় নি কোনো দিনই।···

···দ্বিতীয় বার, মাদ্রাজ থেকে বোম্বে আসবার পথে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ একলা একটি কামরায়। চেন টানবারও সুযোগ পেলাম না। আমি একা, ওরা তিন জন মাতাল সোলজার—জ্ঞান ছিল না আমার।···

তৃতীয় বার,—তৃতীয় বার, সে···বারবারা চুপ করে যায়। আমি জিজ্ঞাসু ভাবে বারবারার মুখের দিকে তাকাই। ওর চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক!···

ওকে;···ওকে খুন করাই উচিত ছিল। ও তো আর অজ্ঞ কুসংস্কারাপন্ন বিস্কুটের কারখানার মালিক নয়—অথবা স্বাভাবিক সমাজ-জীবন বর্জিত কাণ্ডজ্ঞানহীন মাতাল সৈনিক নয়। ও, ও একজন ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট—কথায় কথায় বার্ণার্ড শ,' আর বারট্রাণ্ড রাসেল আওড়ায়—সভ্যতার সকল চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসেছে যে তাকে কি ক্ষমা করা উচিত? যীশু—যীশুও বোধ হয় ওকে ক্ষমা ক'রতেন না। নিজ হাতে গুলী করে ওকে মারতেন।

বারবারা উত্তেজিত ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করে।

আমি বলি, বোসো, উত্তেজিত হয়ো না—কে লোকটা কে? বারবারা চেয়ারে ফিরে এসে বসে, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই বলে যায়—অথচ দেখ, এমন একদিন ছিল··· একদিন···একদিন—ও আমাকেই পেতে পারতো ধর্মের বন্ধনের মধ্যে। আমিও ওকে স্বামিরূপে স্বীকার করতে মোটেই অনিচ্ছুক ছিলাম না! ফ্রেডারিকের সঙ্গে তখনও আমার দেখা হয় নি।

আমার হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে ও। ওর বিবেকে একটুও বাধে নি কোনো দিন। ক্রমাগত ও আমাকে মিথ্যা—মিথ্যা দ্বারা প্রতারিত করে এসেছে। ও ভয়ঙ্কর, খলিতবুদ্ধি শয়তানেরই আধুনিক পার্শ্বচর···মানুষ কখনও ও রকম কোল্ড-ব্লাডেড ভিলেন হতে পারে না। ও এক হাতে তোমার বুকে ছুরি দেবে, আর এক হাতে খবরের কাগজ পড়ে যাবে, নির্বিকার চিত্তে। স্ত্রীলোকের ধর্মনাশে ওর বিন্দুমাত্র অনুতাপ জাগে না মনে। অর্থের জন্যে লোভ আছে, দরদ নেই। সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্যে চক্রান্ত আছে, পরিশ্রম নেই। অথচ—অথচ—ও একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। ইয়াগো—ইয়াগোও ওর তুলনায় ভাল লোক। ইয়াগো কোন স্ত্রীলোকের সতীত্বের ক্ষতি করে নি। সে নিজে লম্পট ছিল না। ডেস্‌ডেমোনার ভাগ্যের সঙ্গে ভগবান যদি আমার ভাগ্য বদলাবার সুযোগ দিতেন, আমি একশো বারই সে প্রস্তাব গ্রহণ ক'রতাম। সি সাফারড মেণ্টালী, নট ময়্যালী—

আমি···আমি—

বারবারা টেবিলের উপর রাখা রিভলবারটাকে হাতে তুলে নেয়—জব্বলপুরের ঘটনার পর পুলিশের কাছ থেকে আমার লাইসেন্‌স নিতে বেগ পেতে হয় নি, সিলোনে গিয়েও নতুন করে লাইসেন্‌স নিয়েছিলাম। ফ্রেডারিক অবাক হয়েছিল, কিন্তু প্রশ্ন করে নি।···

বারবারা আবার থামে, রিভলবারটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। আমার চোখে চোখ রেখে বলে—সেদিন তুমি আমার সম্মান বাঁচিয়েছ; কিন্তু শয়তান তোমার জন্যেই বেঁচে গেল।

আমি বিস্মিত হয়ে বলি—সে কি! আমি কি করে তোমার সম্মান বাঁচালাম? আর শয়তানই বা কে? কি করেই বা আমার জন্যে শয়তান বেঁচে গেল। তুমি কার কথা বলছো—ভ্যালেণ্টিনো?

—তুমি যদি আলো না জ্বালতে, তাহলে ও আমাকে ছাড়তো না, ক্লোরোফর্মের রুমালটা নাকের উপর আলগা হ'ত না। আর তুমি যদি ঠিক সেই সময় দরজা না খুলে বেরিয়ে আসতে, আমি ঠিক গুলী ক'রতাম ওকে। এ্যাণ্ড নীড আই টেল ইউ, আই এ্যাম এ গুড শট?···দুর্ভাগ্য আমার, রিভলবারটা ছিল প্রথম থেকেই আমার হাতের বাইরে।

—আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না, তুমি আর ফ্রেডারিক কি করে বিচ্ছিন্ন হলে!

বারবারা আমার প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলেছিল—দেবাচারী, আমাকে আজ ক্ষমা কর। আমি বলব, তোমার কাছে কোন কিছুই লুকোবো না, কিন্তু আজ থাক, আমার মাথায় আগুন ছুটছে। ডোণ্ট মাইণ্ড, গুড নাইট।
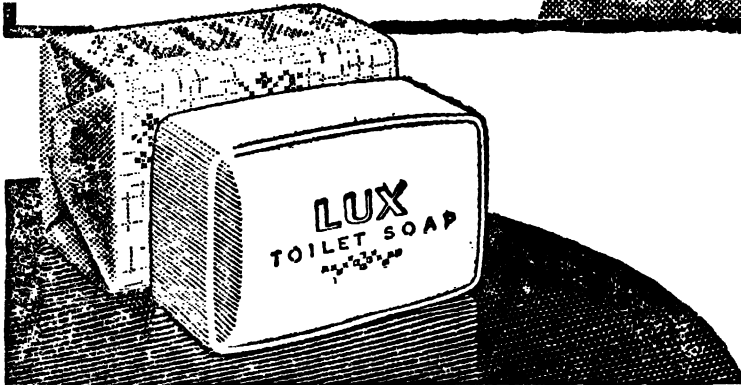
বারবারা বলেছিল, আমাকে গোটা কাহিনীটাই শুনিয়েছিল। কোন কথাই লুকোয় নি। কিন্তু সে কাহিনী বলতে গেলে পাঁচশো পাতার উপন্যাসেও শেষ হবে না। আমি মাঝে মাঝে তার কথার বিচ্ছিন্ন অংশ তুলে দিচ্ছি, দেখুন যদি কিছু বুঝতে পারেন।

আমি কি জানতাম ও এমন কাজ করবে? আমাকে মদ খাইয়েছিল প্রচুর, আর সে মদের সঙ্গে মিশিয়েছিল ঘুমের ওষুধ।

পিশাচ—পিশাচ—পৈশাচিক কাণ্ডকারখানাতেই ওর আনন্দ···

আত্মহত্যাই করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু শয়তান বাধা দিয়েছিল। বলেছিলাম···বলেছিলাম···আমাকে সামাজিক সম্মান দাও।

নির্লজ্জের মত হেসেছিল, দাঁত বের করে হেসেছিল, বলেছিল ভয় নেই···

আমি এখন বিবাহিতা—আর ওর জন্ম নয় কি ক্রীশ্চান-পরিবারে?

এসেছিল একদিনের গেষ্ট হিসেবে—রেস কোর্সে মাঠেই ওর সঙ্গে ফ্রেডারিকের আলাপ—থেকে গেল কলম্বোয় স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে···স্বামী বাড়ী নেই, আমি একলা···কী স্পর্দ্ধা।—

আমারই বাড়ীতে স্বামীর অতিথি হয়ে আমাকে অপমান।

—এমন অশ্লীল প্রস্তাবও কি কোন শিক্ষিত লোক করতে পারে? কেন আমার সন্তান হয় নি···স্বামী যদি ইমপোটেন্ট হয়, তাহলে সাবষ্টিটিউট লরেন্সের লেখা লেডী চ্যাটারলীস্ লাভার পড়নি?

—না, পড়িনি—পড়বার প্রয়োজন নেই।

ও হাসে, এগিয়ে আসে। ফ্রেডারিক বাড়ী নেই। মেরেছিলাম, মেরেছিলাম ওকে হান্টার দিয়ে। সে দাগ এখনও আছে ওর ডান ভ্রূর উপর।

কিন্তু, কিন্তু শয়তান আমাকে এমনি কায়দায় ফেলেছিল ভয় হয়, যদি ওর কথা স্বামীকে জানাই, ও-ও শাসিয়েছে সব কথা ফাঁস করে দেবে।

—ফাঁস করে দিক, ফ্রেডারিক না হয় কতকগুলি দুঃখের ঘটনাই জানতে পারে।

না, না, থাক, ফ্রেডারিক যদি অন্য কিছু ভাবে! আমাকে সন্দেহ করবে, ও যা পিউরিটান।

—শয়তান থেকে যায় কিছুদিন। আশ্চর্য, অতিশয় ভদ্র আচরণ তার, দেখতে পাই—আমিই বোধ হয় ওর দোষটাকে বাড়িয়ে দেখেছি। থাক, আমিও চুপ করে যাই।

ও কি আর আমাদের বাড়ী ছেড়ে যাবে না?

—না, কিছুতেই যাবে না। ফ্রেডারিক বলে, আমাদের তো ছেলে-পিলে কেউ নেই, থাক না কেন ও। তোমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, কত সুখ্যাতি করে তোমার। কম্প্যানীরও তো প্রয়োজন আছে। কম্প্যানী না, না, কম্প্যানী চাই না আমি।

—ফ্রেডারিককে কি করে বোঝাই? বোঝাতে গেলেই তো অনেক জিনিসই প্রকাশ করে বলতে হয়। বলি না কেন সত্যি যা। স্বামীর কাছে কি কোনো কিছু লুকোনো উচিত?

না না না—কী লজ্জা। তাই কি সব বলা যায়। ফ্রেডারিক হয়তো ভাববে আমারও গোপন সহযোগিতা ছিল। ছিঃ ছিঃ··· এ সব কথা মুখ ফুটে বলবার নয়।

শয়তান প্রতিশোধ নিল, অত্যন্ত জঘন্য উপায়ে।···

আমাদের বিবাহিত জীবনে তো বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেই, কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের কথা সরলপ্রকৃতি অনভিজ্ঞ তরুণ ডাক্তার তার প্রাণ হারালো।···ভ্যালেন্টিনোর পরামর্শে ফ্রেডারিক গায়নাকোলজিষ্ট ডাক্তার নিকলসনকে কল দিল···গায়নাকোলজিষ্টের কাছে, জানতো, অত্যন্ত সচ্চরিত্র লোকের মনেও উত্তেজনা আসতে পারে: ডাক্তার হলেও—এমন কি গায়নাকোলজিষ্ট হয়েও···আর নিকলসন ছিল সাদাসিদে ধরণের···লোকচরিত্র সম্বন্ধে তার খুব বেশী অভিজ্ঞতা হবার বয়েসও হয় নি।

শয়তানের কারসাজিতে ডাক্তার নিকলসন ভুল করে ভাবলো আমি বুঝি সত্যি তার প্রতি অনুরাগিণী।

তখনও যদি বুঝতাম নিকলসনের এই ভাবান্তরের পিছনে কার উস্কানি ও জালিয়াতি আছে, তাহলে হয়তো শোচনীয় পরিণাম থেকে সরলপ্রাণ ডাক্তারকে বাঁচাতে পারতাম। সে আমার কথা শুনতো।

কারণ—কারণ আমি জানি সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই ভালবেসেছিল, আমার দেহকে নয়।

* * * *

আমার বয়েস চৌত্রিশ—কিন্তু ফ্রেডারিক বলে আমাকে নাকি সিক্সটিনের বেশী দেখায় না—সত্যিই কি তাই?

সমুদ্রের ধারে অনেকগুলো নারকোল গাছের ফাঁকে ফাঁকে ফণি-মনসার আড়ালে ঘেরা নির্জন জায়গা···আমার সব চেয়ে প্রিয় স্থান। প্রায়ই আমি এসে ওখানে বসতাম, ফ্রেডারিক প্রায়ই বাড়ীতে থাকতো না সে সময়ে।

গরমের জন্যে গা খুলে···প্রায় অর্দ্ধনগ্ন ভাবে একটি পাথরের টুকরোর উপর আমি অন্যমনস্ক ভাবে বসেছিলাম। দেখছিলাম সমুদ্রের ঢেউ। আর ভাবছিলাম আমার যদি বিয়ে হোত হিন্দু বা মুসলমান ঘরের মেয়েদের মতো অল্প বয়েসে—আমার ছেলের বয়েস হোত কত?···সে কি নিকল্সনের মতো কৃতী ছাত্র, বিলেত ফেরত ডাক্তার হয়ে ফিরতো না, এতদিনে···না, গায়নাকোলজিষ্টের কাজটা ভাল নয়···আমার ছেলেকে আমি ব্যারিষ্টারী পড়াবো, সে কি হবে মস্ত নামকরা বৈজ্ঞানিক, না না—সে হবে খৃষ্ট বা বুদ্ধের মতো হিরো। অসংলগ্ন অনেক চিন্তা ওঠে আর মিলিয়ে যায় সামনের বিস্তৃত ফেনিল সাগরের ঢেউ-এর ন্যায়। সম্ভব, অসম্ভব কল্পনার তরঙ্গে ভেসে যাই অনেক দূর।

একটা জাহাজ ভেসে চলেছে—আমার এক দিদির ছেলে নেভাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে বড় চাকরী পেয়েছে ব্রিটিশ নেভীতে—আশ্চর্য, তারও মুখটা নিকলসনের মতনই সুকুমার, প্রায় এক রকমই দেখতে—আমার—আমার ছেলে ওদের চেয়েও সুন্দর হবে না কি? ফ্রেডারিকের মতন যেন সে শরীরের শক্তি আর চরিত্রের বল পায়—আর, আর—আমার মতন যেন তার রূপ হয়!···সে কি নতুন খৃষ্ট অথবা বুদ্ধের মতন হতভাগ্য, মূর্খ, নিষ্ঠুর, এখনও বর্বর মানব জাতিকে পরিত্রাণের পথ দেখাতে পারবে?

মানুষের লালসায় বিবেই কি আমি আজও বন্ধ্যা নই? বিস্কুট-কারখানার মালিকের বিষ কি এখনও আছে? আমি—আমি—সন্তানের স্বপ্নে আমার স্পর্দ্ধারও কি সীমা নেই? কিন্তু, খ্রাইষ্ট বা বুদ্ধের মতন ছেলের মা'ই বা হতে আমার বাধা কোথায়? তাঁরাও কি আমারই মতো মানুষ ছিলেন না?

* * * *

হঠাৎ ডাক্তার কোথা থেকে চুপি চুপি এসে পেছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আবেগের সঙ্গে আমার গলায়, ঠোঁটে, কাঁধে, বুকে, চুলে চুমু খেলো।

টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে বসে পড়ি। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আমার কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। আমি যত বলি, কর কি, কর কি—তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছ?—ও বলে' হ্যাঁ, ডার্লিং, তুমিই তো আমাকে পাগল করে তুলেছ।

তোমার কোন ভয় নেই। তোমার রক্তে সিফিলিস বা গণোরিয়ার বীজাণু আমি সত্যই পাই নি। ভ্যালেণ্টিনোর কাছে আমি সব শুনেছি। চিঠি না লিখলেও আমি আসতাম। তুমি যখন আমাকে চাও, নিশ্চয়, নিশ্চয়—আমি রাজী আছি।

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কার ছায়া দেখে চমকে উঠলো। আমাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

আমি লজ্জায় মাটিতে মিশে গেলাম।

এমনি আচমকা ভাবে ডাক্তার আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল এমনই সম্ভব ও আকস্মিক তার কথাগুলো আমার কাছে মনে হয়েছিল তখন, আমি তাকে নিরস্ত করবার আগেই সমস্ত ঘটনাটা ঘটে গেল। আমি সেই অবস্থায় আমার কি করা উচিত ছিল তাও ঠিক করতে পারিনি সহজে।

তোমাকে তো আগেই বলেছি—ওকে, ওকে দিদি—যে চোখে ছোট ভাইকে দেখে বা মা ছেলেকে, আমিও সেই চোখে দেখতাম। এখনও দেখি। নিকলসন আজ বেঁচে নেই। তবু তাকে ভুলতে পারিনি। তার সব অপরাধই আমি ক্ষমা করেছি। সেও প্রাণের বিনিময়ে পাপ স্খালন করেছে। জেনো, নিশ্চিত, সত্যিকারের ভিলেন যে, সে কখনও আত্মহত্যা করে না। সে বেঁচে থাকতে চায় ঠিক শয়তানেরই মতো।

যে দুটো ছায়ামূর্তি মুহূর্তের মধ্যে সরে গেল, সে মূর্তি একটি ফ্রেডারিকের, আর একটি ভ্যালেণ্টিনোর।

পরদিনই খবরের কাগজে বেরিয়েছিল: সমুদ্রের স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে উদীয়মান ডাক্তার ডি, নিকলসন, এম, ডি, এচ, আর, এ, এ, এম সি, ডি, জি, সি (ইত্যাদি, ইত্যাদি, অনেকগুলো ডিগ্রী ছিল তার) অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা করেছেন বলে পুলিশের সন্দেহ। তাঁর একটা চোখ সম্পূর্ণ মাছে ঠুকরে নষ্ট করে ফেলেছে। তবু মৃতদেহকে সনাক্ত করা কঠিন হয় নি। বুকপকেটে নোট বই-এর মধ্যে একটি ভিসিটিং কার্ড পাওয়া গিয়েছে। একটি মেয়েলি ছাঁদের হাতের লেখা দীর্ঘ চার পাতা চিঠিও পাওয়া গিয়েছে। ডাক্তার নিকলসন অবিবাহিত ছিলেন।

* * *

আমি গম্ভীর কণ্ঠে বারবারাকে জিজ্ঞেস করি—চিঠিটা কে লিখেছিল, তোমার অনুমান?

বারবারা আমার গলার স্বরে বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকায়। পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমার চোখের ভাষা ও প্রশ্নের কারণ বুঝতে চায়। অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে বলে—দেবাচারী, তুমিও কি আমাকে বিশ্বাস কর না?

...চিঠিটা কি জাল চিঠি হতে পারে না?

ধরো, আমারই লেখার অনুকরণ করে যদি কেউ দক্ষ জালিয়াত চিঠি লিখে তরুণ যুবকের কাছে নিয়মিত পাঠিয়ে যায়, আর তরুণটি যদি একদিন ভুল করে প্রেম নিবেদন করে, তারপর বুঝতে পারে, সে এক কুচক্রীর চক্রান্তে, জালিয়াতের কৌশলে সম্পূর্ণ মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে তারই পিতৃতুল্য পিতৃবন্ধুর স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অশোভন আচরণ করেছে, তাহলে সে কি অনুতাপে জ্বলে-পুড়ে আত্মহত্যা করবে না?

তারপর—?

তারপর, অনেক দিন, অনেক মাস, অনেক বছর কেটে গিয়েছে। আমি একটা সরু গলির ভাড়া দোতালার কোণের ঘরে বসে ছেঁড়া খাতায় লিখে যাচ্ছি সেই পুরোনো কাহিনী। এ কি কাহিনী? এ তো স্বচক্ষে দেখা, নিজ কানে শোনা ঘটনা।

পারলাম না—পারলাম না—'লাইট অব এশিয়া' উপহার দিয়েও পারলাম না ওদের দু'জনকে স্বামি-স্ত্রীকে, ফ্রেডারিক আর বারবারাকে মিলিয়ে দিতে। বিশ্বাস যেখানে নেই সেখানে দাম্পত্য সুখ কি আর সম্ভব? ফ্রেডারিক কিছুতেই আমার যুক্তি গ্রহণ করতে চায় না। তাঁর এক কথা, নিজের চোখকে কি করে অবিশ্বাস করা যায়? আমিও হাল ছেড়ে দিলাম। ভাঙা কাচকে জোড়া দিতে যাওয়া বৃথা প্রয়াস।

অবশ্য, বারবারার মৃত্যুর কিছুদিন পরে, অবশেষে ফ্রেডারিক মেনে নিয়েছিলেন, স্বীকার করেছিলেন যে তিনিই ভুল করেছেন। বারবারার প্রতি অবিচার করেছেন। মদের ঝোঁকে ভ্যালেণ্টিনো নাকি অনেক কিছু স্বীকার করে নিয়েছে যা ফ্রেডারিক ভাবতেও পারেন নি।

কিন্তু, বারবারার আত্মা তখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছেড়ে কোন অদৃশ্য গ্রহতারকার বিবর্তন-পথে মিলিয়ে গিয়েছিল কে জানে!

বারবারা—বিড়ম্বিতা বারবারা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল শেষ রাত্রে। অনেক বেলা হলেও ঘুম আর ভাঙেনি।

দরজা ভেঙে যখন আমরা ঢুকলাম তার ঘরে—সে ঘুমিয়েছিল ঠিক যেন ষোড়শী কুমারী। পদ্মের পাপড়ির মতন তার চোখের পাতা। ধনুকের মতন ভ্রূ। তিলফুল থেকেও টিকালো নাক। প্রবালের মতন লাল ঠোঁট।

সত্যি, এমন মুখ, এমন ফিগার আর দেখিনি!

সোবিয়েতের দেশে দেশে

মনোজ বসু

ভারতীয় ভাষায় লায়েক হওয়া চাটি কথা নয়। পাঁচ বছরের কোর্স। হিন্দি উর্দু ও বাংলা ভাষার ইতিহাস তো জানবেনই, ভারত সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানও চাই মোটামুটি। ভারতের ইতিহাস শিখতে হবে—প্রাচীন কাল থেকে এই হাল আমল। ব্যাকরণ শিখতে হবে। কোনটা যে শিখবেন না, তা জানিনে। আচার্য বারনিকভ এই লম্বা-চওড়া সিলেবাস বানিয়ে গেছেন।

নভিকভা বলে যাচ্ছেন। ফার্স্ট ইয়ারে হল বক্তৃতা শোনা ও দরকার মতো নোট নেওয়া। ভারতবর্ষ দেশটা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে যা-কিছু জানবার আছে। ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব নিয়েও বক্তৃতা হচ্ছে। সেকেণ্ড ইয়ার থেকে বই। বই দু-রকমের। এক হল, ওরা নিজেরাই নানা লেখার সঙ্কলন বের করেছে; আর হল, সেই সেই ভাষার মূল-বই। হিন্দিতে প্রেমচন্দ সুদর্শন এঁদের মূল-বই পড়ানো হয়; বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। উর্দু ছাত্রেরা কিষান চন্দরের বইও পড়ে। এসব বলছি উনিশ শ' চুয়ান্নর খবর। এর পরে কি রদল-বদল হয়েছে জানিনে।

বললাম, বাংলা ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মোলাকাত করব। চলুন।

নভিকভা চুকচুক করেন: তাই তো, খবরবাদ না দিয়ে এসে পড়লে। ক্লাস তিনটেয়। একটুকু খবর পেলে তারা সব ছুটে আসত। তিনটে অবধি থাকা চলে না তো তোমাদের!

তা কেমন করে? বাইরে দুর্যোগ—মেঘভরা আকাশ, টিপিটিপি বৃষ্টি, ঝোড়ো বাতাসে ঢেউ দিয়েছে নেভার জলে। দুপুরের খানাপিনা হয় নি। তা হলেও আমি থেকে যেতে রাজি। কিন্তু অন্য সবাই? বাংলা নিয়ে কী তাঁদের মাথাব্যথা বলুন।

য়ুনিভার্সিটি জায়গা—দুড়ুম-দাড়াম অবিরত বক্তৃতার বোমা ফাটে। কিছু খেল না দেখিয়ে আমাদেরও ছাড়ান নেই। বেলা হয়ে গেছে যে! তা হোক তা হোক, সংক্ষেপে দু-চার কথায় সারবেন। বক্তৃতা শুনে শুনে এরা যেন ক্ষেপে রয়েছে। যে আসে তাকে ধরবে, লাগাও বক্তৃতা। এবং কান উঁচিয়ে টপাটপ বসে পড়বে।

অগত্যা আমরাও ঠাঁই নিলাম সামনাসামনি। প্রথম হীরেন মুখুজ্জে মশায়। এ মানুষ দাঁড়ালে বুকের ছাতি ফুলে ওঠে। বক্তৃতা কি বলেন, ঝিকমিকিয়ে কথার তারা কাটছে। শুনতে পাচ্ছ ভারতবাসী আমরা বলি কি রকম?

—হাল আমলের ভারতীয় লেখক বলতে আপনারা তো মুলুকরাজ আনন্দ, ভবানী ভট্টাচার্য, আহ্মাস—এমনি ক'জনাকে জেনে বসে আছেন। যে হেতু লেখেন এঁরা ইংরেজিতে। কিন্তু আসল সৃষ্টি মূল-ভাষায়। সেই যথার্থ আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ নেই। ভারত-সোবিয়েত সংস্কৃতির মধুবন্ধনে বাঁধা পড়বে প্রধানত সাহিত্যের মারফতে। অতএব আপনারা একটুখানি তলিয়ে ভারতের সাহিত্য-মন্দিরের সন্ধান নিন।

একটু ভিন্ন কথা বলে নিতে হয় যে! হীরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার গূঢ়তত্ত্ব বুঝবেন তা হলে। খেটেখুটে ওরা এক সঙ্কলন বই বের করেছে—ভারত ও পাকিস্তানের গল্প। তাতে ওঁরাই সব জমিয়ে আছেন—ঐ মুলুকরাজ ইত্যাদি। কারো কারো গল্প চারটে পাঁচটা। বাংলা ছোট গল্প আজকে ভুবনের যে-কোন সাহিত্যের সামনে বুক ঠুকে দাঁড়াতে পারে। সেই বাংলা গল্পের সাকুল্যে একটি মাত্র স্থান পেয়েছে—ভবানী ভট্টাচার্যের গল্প। সেই কথা আমি তুলেছিলাম মস্কোর সোবিয়েত রাইটার্স-য়্যুনিয়নে। ওঁরাও সায় দেন: কি করা যায় বলুন। আমরা তো চাই ভাল ভাল লেখা—সঙ্কলনটা যাতে যথাযথ হয়। কিন্তু খবর জানিনে, অনুবাদের মাধ্যমে হালের কোন বাংলা লেখাই তেমন সামনে আসে না। বরঞ্চ মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলার অত বড় সাহিত্য কি মরে গেল?

ব্যাপার তাই। বাংলায় লেখকরা আত্মতুষ্ট—বাইরে চেষ্টা করবার তাগত নেই। রুচিতেও বাধে হয়তো। নানান দেশ ঘুরে মোটের উপর বুঝে এলাম, রবীন্দ্রনাথের খুব প্রভাব—নিজে তিনি জগৎময় ঘুরেছেন, বিদেশির অনুরাগ তার ফলে আরও বেড়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরে কি হচ্ছে, কেউ বড় জানে না (শরৎচন্দ্রকে নিয়ে এমন-কিছু মাতামাতি নেই বাইরে)। বাংলা সাহিত্য নিজের ঘরে খিল এঁটে রইল, আজকের এই ছোট্ট দুনিয়ায় নেচে চরে বেড়ায় না।

হীরেন মুখুজ্জের পর আমাদের ভিতরকার উর্দুওয়ালা একজন উঠলেন। দোভাষি উঠে উর্দু থেকে রুশীয় তর্জমা করে দিল। তারপর হিন্দিতে বললেন একজন। তাঁরও তর্জমা হল। এবারে পালা আমার। আমি লোকটা কম কিসে, স্বভাষা বাংলাতেই বলব। কিন্তু বাংলা দোভাষি নেই। তাই বুঝুন, কি রকম বেইজ্জতি আপনাদের বাংলার। অথচ ভারতীয় ভাষার মধ্যে ওদেশের মানুষ বাংলা শিখেছিল সকলের আগে, বাংলারই দিল সকলের বড় খাতির। আজকের গতিক, অসুধ করতে একটি বাংলা দোভাষি মেলে না! নভিকভা বললেন, আস্তে আস্তে এবং খুব সহজ বাংলায় বলুন—দেখি আমি চেষ্টা করে।

সেই মনের ক্ষোভই আমি ব্যক্ত করছি: রবীন্দ্রনাথ অবধি মোটামুটি জানেন আপনারা। ১৯৩০ অব্দে তিনি এদেশে আসেন। না এলে এ জন্মের তীর্থ-দর্শন অপূর্ণ থেকে যেত—এমনি কথা লিখলেন তিনি। আমরা, যারা সাহিত্য করি, তাঁরই মানস-সন্তান—এ যুগে তাঁর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের সেই ঘুরে যাবার পর থেকে কৌতূহল আরও উদগ্র হয়েছে আপনাদের সম্পর্কে; সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোলবার লোভ বেড়েছে। বৃটিশ-আমলে হয়ে ওঠে নি, স্বাধীন গণতন্ত্রী ভারত এবারে সুযোগ-সুবিধা করে দিচ্ছে। দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের শান্তি ও সৌভ্রাত্রের সম্পর্ক।

এই জেনে রাখুন, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য থেমে নেই। উজ্জ্বল ঐতিহ্যের অবমাননা হতে দিই নি আমরা। বলতে পারেন, কিংবা কূর্মবৃত্তি আমাদের—নিজের সাহিত্যবুদ্ধি ও সাহিত্যধর্মের মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতে ভালবাসি। শফরী কয়েকটি সামান্য সগর্বে ভুবনময় ফরফরিয়ে বেড়ায়, তাতেই চোখ ঝলসে আছে আপনাদের, খাঁটি-সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করব। খান কয়েক বই দিয়ে যাচ্ছি, আরও পাঠাব। আমার স্বদেশের সাহিত্যিক বন্ধুরাও এগিয়ে আসবেন। ভোকস আমাদের দাওয়াত দিয়ে এনেছেন—ভরসা করি, সাংস্কৃতিক সেতু-বন্ধনের ভার তাঁরাই নেবেন বিশেষ করে।

চটাপট হাততালি। ভিনদেশে এই এক সুবিধা—আগডম-বাগডম যা-ই বলি, হাততালিটা পাওয়া যায়। নভিকভা বই কখানা তুলে ধরছেন। হাতে হাতে ঘুরছে। বাংলা জানেন না প্রায় কেউ, তবু উলটেপালটে দেখেন। আমার লজ্জা লাগে সামান্য জিনিষে এমন হ্যাংলাপনা দেখে। নানান প্রশ্ন বইগুলো নিয়ে—বিষয়বস্তু কি? কভারের ছবির কোন অর্থ? নভিকভা বললেন, লিখে দিন—লেনিনগ্রাড প্রাচ্য-গ্রন্থালয়কে উপহার দিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের হাতে লিখে-দেওয়া বই আছে। অনেক কাল পরে আবার এক বাংলা-লেখকের লিখে-দেওয়া বই গ্রন্থাগারে এলো।

লিখতে কিছু সময় লাগে, দলের অন্য সবাই ইত্যবসরে উঠে পড়েছেন। প্রাচ্য বিভাগে যাচ্ছি এবার। সে এক আলাদা বাড়ি। বিশাল করিডর পার হয়ে যাচ্ছি। নভিকভা গা ঘেঁসে মৃদুকণ্ঠে বাংলায় ইংরেজিতে আলাপ করতে করতে যাচ্ছেন! সত্যি, কতকালের পাশাপাশি আমরা যেন! এই প্রাচীন বিদ্যামন্দিরে কত কত মহামনীষী বৈজ্ঞানিক দেশনায়ক ছাত্র হয়ে পড়াশুনো করে গেছেন। দেয়ালের উপরে তাঁদের ছবি, দেয়ালে খোপ কেটে কেটে তাঁদের মূর্তি। আর, দেখুন, উচ্ছল আনন্দে কলহাস্যে একালের ছাত্রছাত্রী এধারে-ওধারে যাচ্ছে এই করিডরের ভিতর দিয়ে। একাল-সেকাল এক জায়গায় মিলেছি আমরা—মাথার উপরের নিঃশব্দ ওঁরা, নিচেকার জীবনচঞ্চল এই এরা। নতুন কালের ছেলেমেয়েদের উপর ওঁদের কৌতুক প্রসন্ন আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে উপর থেকে। ঠিক সামনে মস্ত বড় ছবি—পথ আটকে যায় আমাদের সেখানে। বুদ্ধি প্রদীপ্ত এক কিশোর, মুখটা চেনা-চেনা লাগে। লেনিন। কিশোর বয়সে লেনিন এই য়ুনিভার্সিটিতে পড়ে এখান থেকে ডিপ্লোমা নিয়েছেন। তাই নিয়ে জাঁক করে এরা। জাঁক করবার মতোই বটে! এমন ছাত্র কোথায় মেলে—দেশের নতুন চেহারা এনে দিলেন যিনি, গোটা ছুনিয়া নতুন আশায় মাতিয়ে তুললেন? পাশের এক ঘরে নিয়ে গেলেন—এইখান থেকে লেনিন ডিপ্লোমা নিয়েছিলেন। এক শ' পঁয়ত্রিশ বছরের লাইব্রেরি, সাড়ে-তিন মিলিয়ন বই—এরই মধ্যে কিশোর লেনিন অনেক সময় ডুবে থাকতেন।

রাস্তায় পড়েছি এবার। ফুরফুর করে বরফের গুঁড়ি ঝরছে। জোর-পায়ে আর এক বাড়ি উঠে পড়লাম। য়ুনিভার্সিটিরই এক বিভাগ—প্রাচ্য বিদ্যাগার ও গ্রন্থালয়। একটি মেয়ে গ্রন্থাগার থেকে বাংলা স্বর্ণলতা নিয়ে বেরুচ্ছে। আমাদের দেখে থমকে দাঁড়াল। নভিকভা বললেন, এই যে—ফিফথ ইয়ারের ছুটো মেয়ে এরা। বাংলা-ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করতে চাচ্ছিলে—এখন ক্লাস নেই, কপাল গুণে এসে পড়েছে এরা। বয়স কী-ই বা, বিশ-বাইশ। উজ্জ্বল ঝলমলে চেহারা—একটির তো বিশেষ করে।

বাংলায় নাম লেখো তো আমার এই খাতায়—

লিখল, ইরা সেভেতোভিদভা—। লিখতে লিখতে ফিক করে হেসে বলে, নামের শেষটা অত্যন্ত কঠিন—কি বলেন? শেষটুকু ইংরেজিতে লিখে দিল আগের লেখার নিচে—Svetovidova। আবার ঐ কটোমটে কথাটার বাংলা (বা সংস্কৃত) করে পুরো নাম বলল, ইরা শ্বেত-দর্শনা। অপর মেয়েটা ইরার চেয়ে ঢ্যাঙা—এমন ছটফটে নয়, স্থির-শান্ত, লাজুক ধরনের হাসি হাসে একটুখানি মুখ নিচু করে। নাম লিখল—এলেনা স্মির্নোভা। কড়া যুক্তাক্ষরের বানান—এই কলম তুলে আমারও ভাবতে হল—এলেনা ঝড়াক করে লিখে দিল বাংলায়।

তারিপ করছি, বাঃ, খাসা হাতের লেখা তোমাদের। লেখক মানুষ আমি, দিনরাত কলম পিষতে হয়, আমি তো এমন পারিনে।

লেখক! কি নাম?

নভিকভা নাম বলে দিলেন। ভ্রূ কুঁচকে মেয়ে দুটি ভাবছে। ভেবে মানিক হদিস পাবে না, তোমাদের জ্ঞানের চৌহদ্দির ভিতরে আমি নেই।

বললাম, খানকয়েক বাংলা বই দিয়ে যাচ্ছি তোমাদের। আরও সব ভারতে গিয়ে পাঠিয়ে দেবো।

এলেনা বলে, আমাদের পত্র দিবেন, বঙ্গভাষায় লিখিবেন।

ঠিক দেবো। তোমরা জবাব দেবে তো?

নিশ্চয় দিব। বঙ্গভাষায় উত্তর দিব, দেখিতে পাইবেন।

কিন্তু সে দেখা হয়ে ওঠেনি। যেহেতু আমিই লিখিনি চিঠি। বিলকুল ভুলে মেরেছি। খাতায় নোট করে এনেছিলাম—খাতা উল্টাতে উল্টাতে আজ মনে পড়ে গেল। এত দিন পরে এখন আর দেওয়া যায় না, কি বলেন?

প্রাচ্য গ্রন্থাগার। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি, মুখোমুখি প্রায় সমান মাপের প্রেমচন্দ। আর আছেন আচার্য বরনিকভ, ভারতের ভাষা-সাহিত্য নিয়ে যিনি জীবনপাত করলেন। ভারতের হরেক ভাষার বই আলমারির থাকে থাকে সাজানো। ভারতীয় নানা বইয়ের রুশীয় তর্জমা। অতিকায় রামায়ণ-মহাভারতের তর্জমা। কালিদাসের অনেক বই, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ও আরও একত্রিশখানা তর্জমা করে নিয়েছে। আরও অনেক, অনেক। গান্ধিজীর 'সত্যাগ্রহ সপ্তাহ' নামক চটি বই এবং 'রাজবিদ্রোহকা অভিযোগ'। বাংলা বই বড় কম। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজ-হাতে উপহারের বড়াই করে—বইটা নেড়ে-চেড়ে দেখছি—বিষবৃক্ষ, পঞ্চম সংস্করণ, ১২৯১ অব্দে ছাপা। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিতে লিখে উপহার দিয়েছেন, কিন্তু কাকে দেওয়া হল উল্লেখ নেই। মাইকেলের অনেক বই; তার মধ্যে দীননাথ সান্যাল সম্পাদিত সচিত্র মেঘনাদ-বধ কাব্য। রবীন্দ্রনাথের গল্প-গুচ্ছ ও নৌকাডুবি।

সকলে ঘিরে এসে আলাপ করছে, ভাল ভাল কথা শোনাচ্ছে। ইরা-এলেনাও আছে, কিন্তু তারা ভিড়ের মধ্যে নেই। ঐ গোটা চারেক বাক্যেই চুকে গেল নাকি, লেখা সম্পর্কে উৎসাহ উবে গেল? বিষম দমে গেছি। দুই সখী মাথায় মাথায় এক হয়ে শলাপরামর্শ

করছে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে, এক টুকরো কাগজ নিয়ে ইরা শশব্যস্তে কি-সব টুকে যাচ্ছে।

অবশেষে এগিয়ে এলো। ইরা বলে, সৌভাগ্যক্রমে আপনি এখানে শুভাগমন করিয়াছেন। এই শব্দগুলির অর্থগ্রহণ করিতে পারি না, আপনার সাহায্য পাইলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব।

কী কাণ্ড! কতকগুলো কথার ফর্দ করেছে এতক্ষণ ধরে। এসে পড়েছি তো মাষ্টারি করিয়ে নেবে। প্রথম কথাটা হল—'ভোটাভুটি'। বুঝিয়ে দিলাম—ভোট দেওয়া-দেয়ির ব্যাপার, ইংরেজিতে যাকে বলে ইলেকসন।

বিস্ময়ে ইরার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে: চমৎকার! ইংরেজি ভোট থেকে বাংলা কথা বানিয়ে নিয়েছেন?

হেঁ হেঁ মা-লক্ষ্মী, ক্ষমতা জানো না তো আমাদের ভাষার! দুনিয়ার তাবৎ ভাষার উপর ছোঁ মেরে মেরে এমন বিস্তর কথা আমরা হজম করেছি।

তার পরের কথা—'পিটুনি'। কত রকমে চেষ্টা করছি, কিছুতে বুঝবে না। তবে তো ঘাড়টা নুইয়ে ধরে পিঠের উপর বুঝিয়ে দিতে হয়। শেষটা তাই করলাম—সত্যি সত্যি নয়, আকারে-ইঙ্গিতে থিয়েটারের অভিনয়ের মতন করে। জন্মে পিটুনি খেলে না, বুঝবে কি করে আনন্দময়ীরা? স্ফূর্তি করে দেশবিদেশের ভাষা শিখছ, যে দিকে তাকাও ঝলমল করছে দুশ্চিন্তাহীন উল্লসিত জীবন।

পরের কথাটা হল 'সাগরেদ'। আরও সব অনেক আছে। কী কষ্ট করে যে বাংলা শেখে! বাংলা শিখবেন তো ইংরেজিটা রপ্ত করে নেবেন আগেভাগে। বাংলা থেকে ইংরেজি দুটো অভিধান আছে—সুবল মিত্রের ও বেণীমাধব গাঙ্গুলির। বাংলা-শিক্ষার দুই হাতিয়ার। পড়তে পড়তে কোন কথা ঠেকে গেল তো অভিধান খুলে ইংরেজি প্রতিশব্দ দেখে নিন। তখনও না বোঝেন তো ইংরেজি-রুশ অভিধান খুলুন। হালফিল আমরা তো সব চলতি ভাষায় লিখছি—সে এমন যে নিজের লেখা নিজেই কত সময় বুঝিনে। দু-খানি ভোঁতা হাতিয়ারের সম্বলে ঐ ব্যাসকূট ওরা ভেদ করবে কেমন করে? সামনে পেয়ে আমার তাই শরণ নিয়েছে।

কথার মানে হয়ে গেল তো উচ্চারণ। 'শ্যামা' 'ব্যথা' 'কৃষ্ণ'—বাংলার ঠিক-ঠিক উচ্চারণ কি? সংস্কৃত কিম্বা হিন্দি নয়, বাংলা। এক একটা করে বলছি আমি, আর জিভের উপর ফেলে বার পাঁচ-সাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখস্থ করে নেয়। তার পরে ধরে বসল, রবীন্দ্রনাথের কথা বলে যান কিছু, তাঁর জীবনসায়াহ্নের কথা। 'শেষের কবিতা'র পর কি কি বই লিখেছেন?

জোঁকের মতন ধরেছে, ছেড়ে দেবে না। না-না করে উঠি: দুপুর গড়িয়ে গেল, দলের সবাই বেরিয়ে পড়ছেন, চলে যাবো এবার।

হাসেন কেন? যথা ধর্ম বলছি, বিপদে ধরা পড়ার আশঙ্কা নয়। দলের লোকেরা সত্যি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এই সব বিদেশ জায়গায় ভরটা কিসের? রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভাষার শিক্ষাত্রিয়েন আমি যখন সরলমতি তরুণী দুটোকে যা বলব, সেই তো বেদবাক্য। 'শেষের কবিতার' পর রবীন্দ্রনাথ 'বউঠাকুরাণীর হাটে' হাত দিলেন—যদিস্যাৎ এখন কথাই বলি, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে আপত্তি করবে? হাত এড়ানো গেল না, বলতেই হল কিছু। আহা, কী তন্গত হয়ে শুনছে! শ্রদ্ধা-বিনত দৃষ্টি। আমার সেই অপরূপ ভাষণ কেউ যে আপনারা শুনলেন না! খুন করলেও আর বলছিনে, সে নিষ্ঠা কোথায় আপনাদের যে বলব?

শহর ছেড়ে ছুটেছি। পিচ-দেওয়া পথ—এমন মসৃণ পায়ে হাঁটতে হলে পিছলে পড়ে যেতাম বোধ হয়। শহরতলী পার হয়েছি। গ্রাম, কত গ্রাম! মাঠের পর মাঠ। কাঁকুরে পোড়োজমি। বড় জঙ্গল। পথ তবু ফুরোয় না। কত দূর রে বাপু? ঘণ্টা দেড়েক হু হু করে ছুটে—এবারে বোধ হয় পৌঁছে গেলাম।

গ্রামের নাম কোলতুসি। পাভলভ-নগরও বলে—বৈজ্ঞানিক পাভলভের সাধনপীঠ পাভলভইনষ্টিট্যুট এখানে। সেই তীর্থে এসে পৌঁছলাম। বাড়ির সামনে পাভলভের বিশাল মূর্তি।

তাবৎ দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা পাভলভকে জানেন। আনাড়ি মানুষ আমি কি বোঝাতে যাব? টুকেও আনি নি তেমন কিছু। বিজ্ঞানে পাকাপোক্ত জন কয়েক আমাদের দলে—তাঁরা বলছেন, কিছু টুকতে হবে না মশায়, বাড়ি গিয়ে জলের মতন বুঝিয়ে দেবো। অনেক খোশামোদ করেছি সেই মহাশয়দের, আজ দেবো কাল দেবো করে কাটিয়ে দিলেন। তার মানে, ওঁদের কাজ হয়ে গেছে—বিদেশের দশটা জিনিষ দেখেশুনে আসা এবং চর্বচোষ্যে উদর ভর্তি করা। আবার যদি বাইরে যাওয়ার কথা ওঠে, লিষ্টির সকলের উপরে দেখবেন ওঁরাই।

বিপ্লবের উপর বিষম খাপ্পা ছিলেন পাভলভ। জারতন্ত্র খতম হলে তিনি ইংল্যাণ্ডে চলে গেলেন। গবেষণা সেখানে চলছে। এদিকের খানিকটা গুছিয়ে নিয়ে লেনিন তাঁকে আনবার জন্য লোক পাঠালেন। দেশের গৌরব অমন এক বৈজ্ঞানিক ভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকবেন, বৃটিশ জাত তাঁর গবেষণার ফলভোগী হবে—তা কিছুতে হতে পারে না। পাঠালেন খুদ গোর্কিকে। পাভলভ যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করে ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে। লেনিন দমলেন না। আবার লোক গেল—রাজনীতির সঙ্গে কি সম্পর্ক? শহর থেকে দূরে নিরিবিলি গবেষণার সমস্ত রকম সুবিধা পাবেন। পছন্দ না হলে চলে আসবেন আবার।

এলেন পাভলভ। ব্যবস্থা দেখে খুশি হলেন। জীবন কাটিয়ে দিয়ে এখানেই তিনি দেহ রেখেছেন। ভারি মনোরম জায়গা। ল্যাবরেটারি বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে উচ্ছল ঝরণা ঝরছে, উঁচু-নিচু জমি, ঘনশ্যাম গাছপালা—পাথরে মানুষের মনেও কবিতা গুনগুনিয়ে ওঠে। এরই মধ্যে থেকে তপস্বী পাভলভ আজীবন বিজ্ঞান সাধনা করে গেলেন।

দোতলায় উঠতে লেনিনের ছবি। ঘরে ঢুকে খুব বড় ছবি পাভলভের। অশীতিপর এক বৃদ্ধ—পাভলভের সাক্ষাৎ শিষ্য—এখানকার প্রধান। মোটামুটি একটু বোঝাচ্ছেন আমাদের—শরীর ও অভ্যাসতত্ত্ব সম্বন্ধে বলছেন। মীরা দোভাষিণী—তর্জমা ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ করে হেসে ফেলছে। থই পাচ্ছে না সে-ও, একরকম বোঝাতে গিয়ে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। বড্ড গোলমেলে ব্যাপার—বলছেও সেই কথা। বুড়া বৈজ্ঞানিক কিন্তু অবিচল—বলেই যাচ্ছেন তিনি। তাঁর কাছে জলের মতো তরল—অপরে কেন গুলিয়ে ফেলবে, তাঁর বোধ হয় ধারণায় আসে না।

মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। ভিজতে ভিজতে ল্যাবরেটারি-বাড়ি গেলাম। দুর্গন্ধে তিষ্ঠানো যায় না নিচের তলায়। বোকা-ছাগল ভেড়া ইঁদুর ইত্যাদি জানোয়ার। এদের নিয়ে নানা রকমের গবেষণা চলে। ধুপধাপ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে বাঁচি। দু-একটা পরীক্ষা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন। একটা কাঠের ফ্রেমে গোলক-ধাঁধার মতো নানা পথ। তার মধ্যে ইঁদুর ছেড়ে দেওয়া হল। ইঁদুরের গতিবিধির ছায়া পড়ছে একটা কাচের উপরে—সমস্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি। বেলের ক্ষীণ আওয়াজ—সঙ্গে সঙ্গে দেখি মরীয়া হয়ে ইঁদুর ছুটল। কি কারণ? ইতিপূর্বে ইঁদুর দেখেছে, বেল বাজবার এক সেকেণ্ড পরে ঐ জায়গায় বিদ্যুতের শক লাগে। ঠেকে শিখেছে, অতএব শব্দ হতে না হতে সে পালাল। সোজা পথে ছুটছিল—এক জায়গায় হঠাৎ সোজা পথ ছেড়ে এক পাশের বাঁকা পথে মোড় নিল। কেন? আর কয়েক ইঞ্চি সোজা পথে এগিয়ে দেখেছে, বিদ্যুতের শক লাগে। অতএব সে বাঁক ঘুরল, এক তিল দ্বিধা না করে।

কিন্তু লাভটা কি হল এত খরচপত্রের ল্যাবরেটারিতে এমনিতরো পরীক্ষায়? সাধারণ লোক আমরা—ঐ মোট হিসাবটা বুঝি। লাভ বিস্তর—মুরগি ডবল আণ্ডা পাড়ছে, গুঁটি পোকা অনেক বেশি রেশম বানাচ্ছে। মুরগির ব্যাপারটা শুনুন।

মুরগি একবার মাত্র ডিম পাড়ে রাত্রিবেলা। মোটামুটি বারো ঘণ্টায় দিন, বারো ঘণ্টায় রাত। ঘরের মধ্যে মুরগি রেখেছেন। ছ-ঘণ্টা দিনের মতো আলো দিয়ে কৃত্রিম দিনমান করুন। তার পরের ছ-ঘণ্টা অন্ধকার করে হোক কৃত্রিম রাত্রি। তার পরে আবার দিনমান, আবার রাত্রি। এক অহোরাত্রির মধ্যে দুটো রাত্রি বানানো হল—মুরগি বোকা বনে গিয়ে দু-বার ডিম পাড়ল। চলল এমনি। অভ্যাস শেষটা এমন পাকা হয়ে দাঁড়াল—আপনা হতেই দু বার ডিম পড়ে, আলোর ধাঁধা দেবার দরকার হয় না। ঐ মুরগির বংশের মধ্যেও দু-বার ডিম দেবার অভ্যাস বর্তে যাবে।

অভিরুচি। রোজ পাঁচ হাজার লোক আসে। ছুটির দিন হলে আট-ন'হাজার।

সাইত্রিশ বছর আগে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল এখানে—এই লেনিনগ্রাডে। সে আগুন—নজরে আসুক আর না আসুক—বিশ্বের কোনখানে ছড়াতে আর বাকি নেই। কর্মিক মানুষ খাটবে ও রোজগার করবে, শুধুমাত্র এই নয়—আনন্দ করবে তারা, সাংস্কৃতিক জীবনের ষোল-আনা অধিকার তাদেরও। এমনি সব প্রতিষ্ঠান সেই জন্যে। লেনিনগ্রাডে কর্মিকদের সংস্কৃতি-ভবন ও ক্লাব আশিটা। সেই সব প্রতিষ্ঠানের মানুষও আসেন—এটা হল কর্মিক মাত্রেরই মেলামেশার জায়গা। ছাত্রেরাও আসে। সাংস্কৃতিক কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন (**Trade Union of Workers of Culture**) নামে এক বিভাগ, ছাত্রেরা সেখানকার সভ্য। কুড়ি কোপেক, অথবা ছাত্রের যে সরকারি বৃত্তি পায় তার এক শতক হল মাসিক চাঁদা। আর ঐ যে শিশু-বিভাগের কথা হল—শিশুদের কিছুই লাগে না, এমনি এসে জমে। বছরের খরচ বারো মিলিয়ান রুবল—সরকারই দেয় সমস্ত। তার মধ্যে এক মিলিয়ন রুবল বিশেষ ভাবে শিশুদের বাবদে। সবই খরচ করে ফেলতে হবে কিন্তু, রুবল বাঁচানো চলবে না।

কিরভ নামে এক কর্মিক-নেতা নিহত হয়েছিলেন উনিশ বছর আগে। তাঁর নামে প্রতিষ্ঠান। লেনিনগ্রাড-অবরোধের সময় হাসপাতাল হয়েছিল এখানে। হাসপাতালে বোমা মেরেছিল—আগুনে-বোমা—রোগিদের সরিয়ে ফেলতে হয়। লড়াইয়ের পর আগাগোড়া মেরামত হয়েছে।

কর্মিক-মানুষ যখন, নাচবে তো গেঁয়ো-নাচ, গাইবে তো গাঁয়ের গান—এমনি এক অবজ্ঞা পুষে রাখেন আপনারা। লোক-কলা অবহেলিত নয় এ জায়গায়, কিন্তু ক্লাসিকাল অভিজাত কলারও পুরোপুরি চর্চা। নাটক করে নিজেরা—থিয়েটার-হলে তের'শ বসবার জায়গা। ভারি কদর থিয়েটারের। গোটা সোবিয়েত দেশ জুড়েই থিয়েটার-প্রীতি। টিকিট বিক্রি এজেন্টের মারফতে, সংস্কৃতি-ভবনে

সন্ধ্যার পর শহরে ফিরে এলাম। সোজা হোটেলে নয়, আর এক জায়গা ঘুরে আসি। কিরোভ সংস্কৃতি-ভবন (**Kirov Palace of Culture**)। মস্কোয় ফিরবার তাড়া—নবেম্বর-বিপ্লবের উৎসবের তিনটে দিন মাত্র বাকি। কাল রাত্রেই লেনিনগ্রাড ছাড়ছি, তার মধ্যে যতদূর দেখে নেওয়া যায়। ছোটদের সংস্কৃতি-ভবন আগে দেখে এসেছেন, এটা হল বড়দের। বাচ্চাদের ব্যবস্থাও আছে এখানে, তাদের জন্য আলাদা শিশু-বিভাগ। যে কোন পেশা হোক আপনার, যে ট্রেড-ইউনিয়নের লোক হন আপনি (সব রকম পেশারই ট্রেড-ইউনিয়ন আছে) এখানে অবারিতদ্বার। আসুন, আমোদ-আহ্লাদ করুন, পড়াশুনো গান-বাজনা কলাচর্চা খেলাধুলা—যেমন

কারো আসতে হয় না। কর্মিকদের ধারে দেওয়া হয় টিকিট। তিন মাস পরে শোধ করে। অপেরার দল আছে—দু'শ' চল্লিশ এসে শিখে যায় তার মধ্যে আঠারো থেকে ষাট সর্বশ্রেণীর লোক। জুলাই আগষ্টে দলে নতুন লোক নেওয়া হয়। যারা সক্ষম সমর্থ এবং গলায় যাদের সুর আছে, তারা দরখাস্ত করে। গত বছরের অপেরার পালা—কোয়ায়েট ফ্লোস দ্য ডন (Quiet Flows the Don)। এমন অনেকে আছে গানের গ জানত না, পেশাদারের মতো এখন গান শিখে নিয়েছে। শেখানো হয় একেবারে মুফতে। লোকে টিকিট কেটে অপেরায় আসে, তাই থেকে খরচাটা উঠে আসে। লাভ করা হয় না এক পয়সাও।

ব্যালের দল আছে, দেড়-শ জন দলে। এর জন্যে টিকিট নেই। নাটুকে দল—একটা বড়দের, একটা বাচ্চাদের। পুরানো ক্লাসিক নাটক এবং হালের সোবিয়েত নাটক—সব রকম অভিনয় করে। সোবিয়েতের নানা অঞ্চলের লোকনৃত্যের চর্চা হয়। লোকযন্ত্রের অর্কেষ্ট্রা এবং হাল আমলের অর্কেষ্ট্রা। তরুণ ছেলেমেয়েরা সোবিয়েতের ও দেশবিদেশের সঙ্গীত শেখে, সেজন্য দরাজ ব্যবস্থা। ভারতীয় সিনেমা-ছবি আসছে কিছু কিছু, তার বড্ড আদর। টিকিট সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায়। এক ছবি বিস্তর দিন ধরে চলে।

লেকচার-হল। রাজনীতি অর্থনীতি শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত আন্তর্জাতিকতা—নানান বিষয়ে বক্তৃতা হয়। নামজাদা গুণী-জ্ঞানীরা এসে বলেন, লোকে ভিড় করে শোনে। খেলার বিভাগ—বাইরে হুড়োহুড়ির খেলা, ভিতরে সময় কাটানোর খেলা। দাবার প্রতিযোগিতা হয়—সেটার খুব নাম। কলাচর্চার রকমারি ব্যবস্থা—দেড় হাজার লোক এসে এসে নিখরচায় নিয়মিত শেখে। তরুণ-তরুণীদের জন্য নানারকম পার্টি ও অভিযানের ব্যবস্থা।

লাইব্রেরিতে নিয়ে গেল। দশ হাজার মেম্বার, চাঁদা লাগে না। সব রকমের বই আছে। একটু বক্তৃতা হল: তিনটি ভারতীয় ডেলিগেশন এরই মধ্যে সম্বর্ধনা করেছি আমরা এই জায়গায়। ভারতকে আমরা ভালবাসি—ভারত শান্তি চায়, সম্পর্কটা সেই জন্য বেশি ঘনিষ্ঠ। আমাদের এই সামান্য প্রচেষ্টা দেখে গেলে, বোলো এর কথা দেশে ফিরে গিয়ে। আমাদের বক্তৃতার বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল—'ভারতের শান্তি-প্রচেষ্টা'।

মস্ত বড় নৃত্যশালা, সাড়ে তিন-শ ফুট লম্বা। দু'শ মানুষ এক সঙ্গে নাচে। বল-নাচ নাচছে ঐ দেখুন। ছেলেরা মেয়েরা তো বটেই, কিন্তু মেয়েয় মেয়েয় বেশি। এরা জুড়ি পায়নি, মেয়ের সংখ্যা অনেক বেশি—লড়াইয়ে বিস্তর ছেলে খতম হয়েছে। ছেলেয় ছেলেয় নাচছে ওদিকে ক-জোড়া। আমরা ঢুকতেই বাজনা থামল। যে যেমন ছিল, নাচ থামিয়ে দাঁড়াল। অভ্যর্থনা হবে একটুকু, তার পরে আবার নাচ। নাচবেন? আসুন না—দু-পা নেচে যান। ওরে বাবা, মুহূর্তে আমরা কেটে পড়ি।

শখের ছবি আঁকা হচ্ছে একটা ঘরে। পটের মতো নিশ্চল একটি মেয়ে—তাকে দেখে দেখে ছোকরারা চতুর্দিকে ছবি আঁকছে। লোক-সঙ্গীতের ঘরে গেলাম। গান হচ্ছিল—বিপ্লবের আমলের এক লোক-গাথা। ছেলেমেয়েরা চেয়ার ছেড়ে দিল আমাদের জন্য। ইটালীয় লোক-সঙ্গীত চলল এর পরে। পুশকিনের গান গাইল এক ইঞ্জিনিয়ার-মেয়ে। এক বুড়ো কারিগর গান গাইলেন—মানে বুঝিনে, কিন্তু অবিকল আমাদের কালোয়াতি গান। [ক্রমশঃ।

চৈত্রের দিন চলে যায়

অসীম সেনগুপ্ত

তবুও তাকে বিদায় নিতে হলো।
খুলতে হল আগুন-রঙা বেশ;
চোখের তলে ঈষৎ ছলোছলো—
মুছতে হলো জলের লেখা, রেশ।
বুকের মাঝে উঠলো বেজে আজ,
কি এক ব্যথা: কি এক ব্যথা ভরে।
যাবার আগে স্মৃতির ভীরু লাজ,
কাঁপলো নাকি দেহের রঙে তার।
অনেক ধ্বনি চরণ ছিল ছুঁয়ে—
অনেক গানে হৃদয় ছিল ভরা;
আয়ুর দীপও নিবিয়ে দিয়ে ফুঁয়ে,
চলতে তাকে হলোই আজি ত্বরা।
চলতে হবে বলেই সে তো চলে,
কণ্ঠে নিয়ে একটি মালাগাছ:
পথের শেষে পরিয়ে দেবে বলে—
নতুন কোন দয়িত এলে আজ।

সবাই জানেন —
চটপট
বিলি করা হয় বলে
ব্রুক বণ্ড চা
এত তাজা থাকে
প্রতি প্যাকেট
ব্রুক বণ্ড চায়ে
অনেক বেশী কাপ
ভালো চা তৈরী
করা যায়
রোজ
২৪,৯০,৪৯৬ প্যাকেট
ব্রুক বণ্ড চা
বিক্রি হয়
এই জন্যেই
অন্য যে কোন
মার্কা চায়ের চেয়ে
ব্রুক বণ্ড
চা
বেশী লোকে খান!
FINEST TEA
Brooke Bond Tea
KORA BRAND
Tea Dust

সোমেন্দ্রনাথ রায়

রবিবার সকালবেলা ছোট মেয়ে ঘুম ভাঙিয়ে বলল, "বাবা, তোমাকে রমজান ডাকতে এসেছে।"

ভাল করে ঘুম ছাড়েনি চোখ থেকে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কে রমজান?"

খিল-খিল্ করে হেসে উঠল আমার ছ' বছরের মেয়ে। "বাবা কিছু জানে না! রমজান আমাদের ধোপা।"

"দুর্গা, দুর্গা, সকাল বেলায় ও সব কি নাম!" রাগ করে উঠলেন স্ত্রী ঘর ঝাঁট দিতে দিতে।

"বাবাকে ডাকতে এসেছে যে," অনুযোগ করল মেয়ে।

পাশ ফিরে শুয়ে বললাম, "আচ্ছা, তাকে বসতে বল, আমি যাচ্ছি।"

"না বাবা, ওঠ তুমি। নইলে ঠিক আবার ঘুমিয়ে পড়বে। রমজানের সঙ্গে সেই মজার লোকটা এসেছে।" ঠেলতে লাগল সে ছোট দু'খানি হাত দিয়ে।

"মজার লোক আবার কে?" তার মা প্রশ্ন করলেন।

"সে তুমি জান না। একটা লোক তো," হাত-মুখ নেড়ে সুরু করল ঝুনু, "এই রকম একটা ময়লা ঝোলা কোট পরে, মজার একটা টুপি মাথায় দিয়ে কাজিবাগানের তেঁতুলতলায় ঘুরে বেড়ায়। হাতে এই রকম একটা লম্বা লাঠি। সানু দা' কি বলে জান মা? বলে, ও ছেলে-ধরা।"

"তাই নাকি?" রসিকতা করার লোভ সামলাতে না পেরে বলে উঠলাম, "কা'কে ধরতে এসেছে, তোমার বাবাকে, না মাকে?"

"আহা, কি কথার ছিরি!" মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠলেন স্ত্রী। উঠবে তো ওঠো। বেলা আটটা বাজতে চলল।"

বসবার ঘরে ঢুকতেই রমজান বলল, "সেলাম বড়দা'! রোববার সকালবেলায় এসে ঘুম ভাঙালাম, কিছু মনে করবেন না। আমার এই চাচা আজ পঁচিশ বছর দেশ-ছাড়া। জাহাজে কাজ নিয়ে বিদেশে গিছিল।"

বিস্মিত হয়ে দেখলাম রমজানের চাচাকে। পরনে খালাসীদের মত ঢোলা পাতলুন, গায়ে ময়লা জোব্বা, মাথায় পুরানো ফেজ। মুখে আধ হাত কাঁচা-পাকা ময়লা দাড়ি। আমার দিকে ঘোলাটে চোখে চেয়ে বলল, "আদাব বাবু-সায়েব। আপনিই এখন এ অঞ্চলের মাতব্বর ব্যক্তি। ভরসা করে কয়েকটা কথা বলতে এসেছি। অভয় দেন তো বলি।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। রমজান ফিস-ফিসিয়ে বলল, "পুরোনো মানুষ তো কাজিপাড়ায় নেই বিশেষ। কিছু যাদের ছিল, তারা সব পাকিস্তানে পাড়ি দেছে। ওঁকে এ অঞ্চলে কেউই চেনে না প্রায়। ওঁর আসল নাম হল মকবুল আলি। ওঁর বড় বেটা ইয়াসিন আলি আপনাদের সাথে পড়ত ইস্কুলে। পদ্মপুকুর ইষ্টিশানের কাছে রেল-লাইনে গলা দিয়ে মরে যায়। মনে পড়ছে না বড়দা'?"

বহুদিনের বিস্মৃতির কুয়াশা হঠাৎ বিদীর্ণ হয়ে গেল ইয়াসিনের কথায়। ইয়াসিন বলে একটা রোগা হ্যাংলা ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়ত, সে আজ বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ আগেকার কথা। যাকে পরিচিতির মূল্যটুকুও দিইনি আমরা কোন দিন, হঠাৎ সেই ইয়াসিন আমাদের সবার কাছে দুর্মূল্য হয়ে উঠল একটি ঘটনায়। হাওড়ার এই সহরতলী অঞ্চলে জীবনযাত্রা সে সময়ে ছিল সম্পূর্ণ নিস্তরঙ্গ। তাই যেদিন স্কুলে গিয়ে শুনলাম, ইয়াসিনের বাবা মকবুল আলি বউকে খুন করে ফেরারী হয়ে গেছে, সেদিন শান্ত পল্লীর জীবনযাত্রায় যে আলোড়ন উঠতে দেখেছিলাম, আজও তা ভুলিনি। পুলিশে ইয়াসিনকে ধরে রেখেছিল সব খবরাখবর জানবার জন্য। পরের দিন ভোর রাত্রে থানা থেকে পালিয়ে ছেলেটা সটান পদ্মপুকুর ইষ্টিশানের কাছে রেললাইনে গলা দিয়ে লজ্জাকর জবাবদিহির হাত থেকে আত্মরক্ষা করে। আমাদের তখন অল্প বয়েস, বড়দের কথায় কান দেবার সাহস বা অধিকার কিছুই ছিল না। তবু ভাসা-ভাসা যেটুকু শুনেছিলাম, তাতে ধারণা হয়েছিল, বউকে সন্দেহ করে খুন করেছিল মকবুল। সেই পঁচিশ বছর আগে ফেরারী আসামী মকবুল আলিকে কল্পনা করে নির্জন সন্ধ্যায় গলা শুকোনো ভয়ে কাজিবাগানের পথ পার হয়েছি। আজ তাকে সামনে দেখে কোন অনুভূতিই যেন জাগল না মনে। যুদ্ধ, দুভিক্ষ, মহামারী, দাঙ্গা ইত্যাদি এত অস্বাভাবিক অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, নিরীহ এই আধপাগল বুড়োটাকে একটু ঘেন্না করতে পারলাম না পর্যন্ত। বললাম, "অনেক দিনের কথা তো!"

মাথা নেড়ে মকবুল বলল, "অনেক দিন বই কি! তবু মনে হয় এই বুঝি গতকালের কথা। এখান থেকে পালিয়ে বোম্বায়ে গিছি। সেখান থেকে জাহাজে কাজ নিয়ে এ মুল্লুক সে মুল্লুক করে কাটালুম আজ পঁচিশ বছর। ফিরে এসেও দেখুন না নাম ভাঁড়িয়ে তাড়া-খাওয়া শ্যালের মত ঘুরতিছি হেথা-হোথা। মরণের আগে আর শান্তি নেই বাবু!"

ওর পিঁচুটিভরা ঘোলাটে চোখ জলে ভরে এল। বললাম, "বুঝলাম। তা আমি কি করতে পারি বল দেখি?"

জামার হাতায় চোখ মুছে মকবুল বলল, "বললাম বটে মরণের আগে শান্তি নেই। কিন্তু বাবু, মলেই কি শান্তি মিলবে? নিজের মনের পাপ সন্দেহে খুন করেছি আমার বেটার মাকে। মনের দুঃখে বেটাও আমার রেলের চাকার তলায় গলা দেছে। এ পাপের প্রাচিত্তির না করে মরে শান্তি পাব কি করে বলুন?"

তার সরল স্বীকারোক্তিতে সহানুভূতি জাগার কথা। কিন্তু জবাব দিতে গিয়ে কোন উৎসাহই যেন পেলাম না! বললাম, "কি করতে চাও এখন?"

"পুলিশে যে জায়গাটায় আমার পরিবারের লাশ কবর দিছিল, সেই জায়গাটা অনেক কষ্টে পাত্তা করেছি। শুনলুম, ওটা নাকি মুনসিপালিটির জায়গা। আপনার সঙ্গে কমিশনার সায়েবদের খব

রকম মহরম আছে শুনিছি। ওই জায়গাটা মুনসিপালিটির কাছ থেকে আমাকে কিনিয়ে দিতে হবে বাবু!"

অকৃত্রিম বিস্ময়ে বলে উঠলাম, "সে জায়গা কিনে কি করবে?"

রমজান উত্তর দিল, "বুড়োর ভীমরতি হয়েছে বড়দা'! বলে, চাচির কবরের ওপরে ও এমন একটা ইয়াদ্‌গার তৈরী করাবে, যেটা আগ্রার তাজমহলের সামিল হয়। সারা জীবন লোকে যেমন ওকে ঘেন্না করেছে, মরার পর সেই ইয়াদ্‌গার দেখে যেন তারা তেমনি সেলাম বাজায়।"

হেসে বললাম, "সারা জীবনে তাহলে অনেক টাকাই রোজকার করেছে মকবুল। তা ও ইয়াদ্‌গার-ফার তৈরী করিয়ে কেন অনর্থক টাকা নষ্ট করবে? ওর চেয়ে চ্যারিটেবল হাসপাতালটায় দান কর বাপু, কাজের কাজ হয়।"

হাসবার চেষ্টা করল বুড়ো। বলল, "ওর কথা শোনেন কেন বাবু! তাজমহল বানাতে বাদশার ঐশ্বর্য লাগে। আমার যে টাকা আছে, তাতে কোন রকম ছোটখাট একটা ইয়াদগার বানানো যায়। আপনি যখন বলছেন হাসপাতালে টাকা দিতে, তখন যা পারি দেব বই কি।"

বললাম, "মিউনিসিপ্যালিটির জমি কিনতে হলে অনেক ফৈজ্‌ৎ বাপু। তাই হাসপাতালে কিছু টাকা দান করলে, ওদিক দিয়েও সুবিধে হবে তোমার।"

"সে তো ভাল কথাই বাবু, আমার তো তাতে আপত্তি নেই। দিনকাল ঘনিয়ে এসেছে আমার। আপনার লোক কে-ই বা আছে কাছে-পিঠে। মরবার আগে শুধু তাই তার কবর চোখের জলে ভাসিয়ে আর্জি জানাই, সারা জীবন ধরে দোজখের আগুনের দগ্ধানি বুকে করেও কি প্রাচিত্তির শেষ হয়নি? কি করলে আমার গুণাগার শেষ হবে, কে হদিশ যেন বাতলে দেয়। খোদাতালার মেহেরবাণি আশা করি না বাবু। যারে একদিন অন্যায় করে গলা টিপে মেরে রেখেছিলুম রাগের মাথায়, তার কাছে মাফ চেয়েই যেন শান্তি মেলে মরার আগে"।

আবেগে ভারী হয়ে এসেছিল মকবুলের গলা। ঘড়-ঘড় শব্দ হচ্ছিল শ্লেষ্মার। বললাম, "আচ্ছা, আমি এ বিষয়ে কথা বলে রাখব। পরে এস তুমি।"

রমজান বলল, "হাঁ চাচা, তুমি যাও এখন। ভয় নেই। একবার যখন ভরসা করে খুলে বলতে পেরেছ বড়দা'র কাছে, তখন ফয়শালা একটা হবেই।"

মাথা ঝুঁকিয়ে চলে গেল মকবুল রমজানের সঙ্গে। সামনের টেবিলে খবরের কাগজখানা দেখে মুখ ধোবার আগে চোখ বুলিয়ে নেব একবার ভাবছি, ফিরে এল রমজান। বলল, "মাসখানেক হল এসেছে বুড়ো এখানে। খায় আমার বাড়িতে, শোয় মস্তাজ মিঞার ভাঙা বৈঠকখানায়। বুড়োর অনেক পয়সা বড়দা', কিন্তুক বেজায় কিপ্পণ। আমাকে গত মাসে পঞ্চাশটা টাকা দিছিল। এ মাসে চাইলুম। বলে কি না, খাওয়াস তো ডাল আর রুটি। অত টাকা খরচ হয় কিসে শুনি? কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ইয়াদ্‌গার বানাবে বলে রেখে দিয়েছে, আর আমার ছেলে-মেয়েরা মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়।"

কোন কথা না বলে মিটি-মিটি হাসতে লাগলাম আমি। রমজান [illegible]

আমার মেয়েকে। ও মরে যাবার পর ওদের কবর-জিয়াত করবার জন্য। কিন্তু কবে মরবে, সেই আশায় আজ পেটে কিল মেরে বসে থাকি কি করে বলুন দেখি?"

বললাম, "ওর টাকার ভরসায় তো আর ছিলে না তুমি? না দিলে কি করতে পার বল?"

হাত-মুখ নেড়ে রমজান বলল, "করতে পারি না-ই বা কি বড়দা'? ব্যাটা খুনে এসেছেন এত দিন পরে সাধু সেজে বিবির কবরের ওপরে ইয়াদগার বানাতে। যদি আজ পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিই, কে এসে বাঁচাবে শুনি? ওর আসল পরিচয় জেনে কে ওকে নিজের বাড়িতে রেখে খেতে দিত? কিসের লেগে এত হেঁপা সইব আমি?"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "তা আমি কি করব?"

"আপনিই পারেন বড়দা'! ওকে বলেছি, আপনিই এ অঞ্চলের মাতব্বর। পুলিশের ভয়ে অন্য লোকের কাছে বুড়ো যাবে না। জমি কেনার সময়ে আমাকে কিছু টাকা আদায় করে দিতেই হবে বড়দা'। ওকে ঠকিয়ে টাকা আদায় করতে কোন পাপ নেই। বউকে খুন করে ফেরার হল, ছেলেটা রেল-লাইনে গলা দিয়ে ম'ল। এখন উনি এসেছেন ওদের কবরের ওপরে ইয়াদগার বানাতে। আপনাকে বললাম না, চাঁদির জুতো মেরে ও মানুষের সেলাম আদায় করতে চায়।"

বললাম, "হতে পারে এক কালে সে খুন করেছিল বউকে। এতদিন ধরে তার জন্যে ও কম যন্ত্রণা পেয়েছে মনে মনে! তাই ত মরবার আগে ছুটে এসেছে বউয়ের কবরের ওপরে ইয়াদগার বানাতে।"

"শোনেন কেন বড়দা'!" উড়িয়ে দিল রমজান। "হলফ করে বলতে পারি, চাচির মুখখানা মনে করতেও পারে না বুড়ো। যে মানুষ জাহাজে বন্দরে আজ পঁচিশ বছর কাটিয়েছে, তার অন্ততঃ পাঁচশটে বিবি আছে পাঁচশ জায়গায়।"

"দূর, তাই কখনো হয়? তাহলে একটি একটি করে পয়সা জমাতে পারত কখনো?"

"দু'হাতে চোরাই কারবারের পয়সা লুঠেছে বুড়ো, নিজের ফূর্তির জন্যে ছাড়া আর কিছুতে খরচ করতে হয়নি। কাজেই জমবে না কেন? আমাদের মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাগ-ছেলেকে খাওয়াতে হত, তাহলে দেখতাম ওর ইয়াদগারের সখ আসে কোথা থেকে। যাই হোক, ও নিয়ে আর দুঃখু করে কি করব? আপনি বড়দা' মেহেরবাণি করে বুড়োর ওই জমিটা কেনার ব্যবস্থা করে দেবেন। বলেছে তো কবর-জিয়াত করার জন্যে দিয়ে যাবে কিছু। তবে ও বুড়ো ঘুঘু যদি ঠকায় আমাকে, ওকে ঠিক ঝুলিয়ে দেব, আপনাকে বলে রাখছি বড়দা'!"

সেদিন আরও কিছুক্ষণ বকবক করে চলে গিয়েছিল রমজান। তারপর ক'দিন ওদের সঙ্গে দেখাও হয়নি, আমিও এ বিষয়ে ভেবে দেখবার অবকাশ পাইনি। পরের রবিবার সকালে হাসপাতালের ডাক্তার বাড়িতে এসেছিল সবাইকে কলেরা ইনঅক্যুলেশন দেওয়ার জন্য। ওকে দেখেই মনে পড়ে গেল মকবুল আলির কথা। সম্পূর্ণ ইতিহাস গোপন রেখে প্রয়োজনীয় অংশটুকু জানালাম ডাক্তারকে। বললাম, "মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের বলে বলেও তো তোমার হাসপাতালের উন্নতি করাতে পারলাম না। যেমন ওষুধের টক, তেমনি তোমার চিকিৎসা!"

"চিকিৎসার আর দোষ কি দাদা?" বিরক্ত হল ডাক্তার। "ডাক্তার দেখলেই তো আর অসুখ ভাল হয়ে যাবে না! বেশ তো, ব্যবস্থা করে দিন না মুসলমান ভদ্রলোকের কাছ থেকে হাজার আষ্টেক টাকা। তিন বেডের একটা ইনডোর ওয়ার্ড খুলে দিই। তারপর দেখবেন, আপনাদের মত লোকেরাও তার সুযোগ-সুবিধে নিচ্ছেন।"

ডাক্তারের রাগ অযৌক্তিক নয়। আমাদের এ অঞ্চলে মানুষ কম। তাই চিরকালই মিউনিসিপ্যাল অথরিটিদের কাছে এ অঞ্চল অবহেলিত। হাসপাতাল একটা আছে, কিন্তু সে নামেই। খানকয়েক ভাঙা বেঞ্চি-চেয়ার। একটা ওষুধের আলমারি আর এই ডাক্তার আর একজন কম্পাউণ্ডার ছাড়া একটা ইনডোর বেডের প্রভিসান নেই পর্যন্ত। বললাম, "অত টাকা দিতে পারবে কি জানি না, তবে কিছু টাকা দেবে বলে কথা দিয়েছে।"

অধৈর্য্য হয়ে উঠল ডাক্তার। "যাই দিক, ব্যবস্থাটা করে ফেলুন না দাদা শীগগির। মানুষের মন পাল্টাতে বেশী দেরী হয় না। কে লোকটা বলুন দেখি? আমি চিনি না?"

"না চিনলেও দেখেছ তাকে। পাগলা মত একটা বুড়ো, মুখে আধ হাত দাড়ি। কাজিপাড়ার বাগানে গোরস্থানের কাছে ঘোরাঘুরি করে।"

ঝুনুর ইনজেকশন নেওয়া শেষ হয়েছিল। সে বলে উঠল, "কে বাবা, সেই ছেলেধরা বুড়োটা? কাল সে আমাদের বাড়ি এসেছিল। আমি তখন সানু দা'কে ডাকতে যাচ্ছিলাম। মা বলল, জিজ্ঞাসা করে আয় সানুরা সিনেমা দেখতে যাবে কি না। এই যাঃ!" বলেই জিভ কাটল ঝুনু। তারপর কাঁদ-কাঁদ মুখে বলল, "তুমি যেন মাকে বলে দিও না বাবা, আমি সিনেমা যাবার কথা বলে ফেলেছি তোমাকে।"

ডাক্তার আর আমি হাসলুম একটু। ওর পিঠে হাত বুলিয়ে ডাক্তার বলল, "কখন এসেছিল সেই বুড়ো?"

"কাল বাবা আপিস যাবার পরে।"

"কি বলল এসে?"

"কি জানি আমি শুনিনি। যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। ওই বুড়োটা, জান বাবা, গোরস্থানের কবরের ধারে বসে থাকে দিন-রাত। কেউ যখন থাকে না, তখন ও মাটি খুঁড়ে মড়া বার করে খায়। সানু দা' নিজে দেখেছে।"

আমি ওকে ধমক দিয়ে ভেতরে পাঠালাম। বললাম, "সানু মিছে কথা বলেছে।"

ডাক্তার বলল, "কবরের ধারে বসে বসে করে কি বুড়ো? কেউ মারা গেছে নাকি?"

বেগে ডেকে বললাম, "ওর বউকে কবর দেওয়া হয়েছিল ওই জায়গাটায়, বুড়োর ইচ্ছে, বউয়ের কবরের ওপরে ছোট একটা সুন্দর ইয়াদ্‌গার বানায়।"

"ও বাবা, বুড়োর প্রাণে তাহলে সখ আছে যথেষ্ট?"

"সখ কি প্রেরণা, কি করে বলব? বউয়ের মৃত্যুর পর থেকে একটি একটি করে পয়সা জমিয়ে যে ইয়াদ্‌গার বানাবার স্বপ্ন দেখে, তার সেই সারা জীবনের আত্মনিগ্রহ আর প্রবল ইচ্ছেটাকে সখ বলতে পারি না। তবে ইচ্ছেটা একটু অদ্ভুত ধরণের বই কি।"

"তা সে তার জমানো পয়সা দিয়ে যা খুসী করুক, আপত্তি করব না। মোট কথা, হাসপাতালে তার টাকা দেওয়া চাই। আগে মানুষের প্রাণ, না মরা মানুষের স্মৃতি? বেশ তো, তার বউয়ের স্মৃতি রাখতে চায়, টাকা দিক। হাসপাতালের ওয়ার্ড তার বউয়ের নামেই রাখা হবে।"

"আচ্ছা, তাকে কাল ডেকে পাঠাই, তুমিও এসো। তার পর কথাবার্তা হবে, কেমন?"

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা রমজানের সঙ্গে বুড়ো মকবুল আলি এল আমার বাড়িতে। ডাক্তার তখনো আসেনি। আমি বললাম, "ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। উনি বলছেন, অন্তত পক্ষে হাজার দশেক টাকা দিতে হবে তোমাকে হাসপাতালের উন্নতির জন্যে। অবশ্য তেমনি হাসপাতালের নাম হবে তোমার বউয়ের নামে। চাও তো তোমার নিজের নামটাও ওই সঙ্গে জুড়ে দিতে পার।"

"সব তো বুঝলাম বাবু! কিন্তু অত টাকা পাব কোথায়?"

"পাবে আবার কোথায়?" রমজান ঝাঁঝিয়ে উঠল। "থলি ঝেড়ে বার করবে। তোমার ইয়াদ্‌গার কার উপকারে আসবে শুনি? এতে তবু পাঁচটা লোক চিকিৎসা করাতে পারবে, নাম করবে তোমার।"

"আমার তো অত টাকা নেই বাবু! সারা জীবন খালাসীর কাজ করে ক'পয়সা জমানো যায় বলুন?" করুণ গলায় আবেদন জানাল মকবুল আমার কাছে।

"আর তোমার চোরাই ব্যবসার টাকা? আমরা মুরুক্ষু মানুষ বলে ঘাসে মুখ দিয়ে চলি নাকি?"

"কেন বিশ্বাস করছিস্ না রমজান? আমার কে আছে, যে জমিয়ে রেখে যাব টাকা? যে খুদ-কুঁড়ো থাকবে, তোর মেয়ে আমিনাই পাবে।"

"রেখে দাও তোমার ফাঁকা কথা। সবস্বই তুমি ফুঁকে দেবে ইয়াদগার বানাতে, তা আর জানি না?"

এই সময়ে ঘরে ঢুকল ডাক্তার। ফাঁক পেয়ে বললাম, "এই যে ডাক্তার। দেখ ভাই, বলছি মকবুলকে, হাজার দশেক টাকা হাসপাতালের জন্যে দান কর, নাম হবে তোমার। তা বলছে, পাবে কোথায় অত টাকা।"

বিস্মিত হয়ে ডাক্তার বলল, "সে কি মিঞা? শুনলাম জাহাজের কাপ্তেন ছিলে তুমি, দু'হাতে উপায় করেছ। পাঁচ জনের উপকারে লাগে এমন সংকাজে ব্যয় করলে পুণ্য হবে তোমার।"

"বাবু, সত্যি কথা বলতে কি, দায়ে পড়ে জাহাজের এঞ্জিনে কয়লা ঠেলা এট্টোকারের চাকরি নিয়ে দেশান্তরী হয়েছিলুম এক কালে। শেষতক মেট হয়ে কাজ ছেড়েছি। সামান্য মাইনে থেকে ক'টা পয়সা রাখা যায়? তবু দু'-চার পয়সা যে জমিয়েছি, সে নিতান্ত প্রাণের দায়ে। আর সব খালাসী লস্করেরা বন্দরে বন্দরে ফুর্তি করে ওড়াত পয়সা। মন যে টানেনি ফুর্তিবাজীতে, তা তো নয়। কিন্তু যখনই মনে পড়েছে ফুর্তি করার অধিকার নেই আমার, তখনই গুটিয়ে গেছে ইচ্ছে, পয়সা খরচ করতে আর মন ওঠেনি।"

"সে তো বেশ ভাল কথাই। নষ্ট না করে যে পয়সা জমিয়েছ, পাঁচ জনের উপকারে যদি লাগে সে পয়সা, সেই তো দেখা উচিত। শুনেছি ছেলে-বউ কেউই নেই তোমার। কার জন্যে আর রাখতে যাবে টাকাকড়ি?"

দু'চোখ জলে ভরে এল বুড়োর। বলল, "যারা নেই, তাদের মুখ মনে করেই জমিয়েছি টাকা। ইচ্ছে আছে, আমার বৌ-বেটার নামে এটা ছোট ইয়াদ্‌গার গেঁথে রেখে যাই।"

"তাতে আর কত খরচ হবে তোমার?"

"হিসেব করে তো দেখিনি বাবু, তবে হাজার দুই টাকা তো লাগবেই। এখন জমির দাম পড়বে কত, সেটা আগে জানতে পারলে নিশ্চিন্ত হতাম।"

"সে আমরা ব্যবস্থা করে দেব, লাগবে না বিশেষ কিছু। হাসপাতালের জন্যে টাকাটা দিলেও সেই একই কথা হবে। তোমার স্ত্রীর নামেই হাসপাতালের নাম হবে। যত লোক চিকিৎসা করাতে আসবে, সবাই একবার করে নাম করবে তোমাদের।"

"তাতে তো আমার আপত্তি নেই বাবু! কিন্তু আপনারা যে টাকার কথা বলছেন, অত টাকা তো নেই আমার! গুণে গেঁথে দেখিনি, তবে মনে হয়, সব সমেত হাজার চার পাঁচেক টাকার বেশী হবে না।"

"খুব হবে। পঁচিশ বছর ধরে জমিয়ে ওই ক'টি টাকা হয়েছে, এ কি বিশ্বাস করা যায়? ভাল করে গুণে দেখ একদিন। সামান্য কিছু টাকা তোমার কাছ থেকে নিয়ে হাসপাতালের কোন স্থায়ী কাজ তো হবে না। তা হতে গেলে কম করেও হাজার আষ্টেক টাকা লাগবে। সে টাকা তোমায় দিতেই হবে মিঞা!"

"আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলছি বাবু, অত টাকা সত্যি নেই আমার। ইয়াদগারের জন্যে হাজার দুই টাকা রেখে বাকি সব টাকাই দিয়ে দেব আপনাদের, কিন্তু ওই হাজার দুই টাকা আমায় রাখতেই হবে।"

"আহা-হা, পা ছাড়, পা ছাড়", বিব্রত হল ডাক্তার। "আচ্ছা, ভাল করে গুণে দেখ আগে, তারপর যেমন ভাবে খরচ করলে ভাল হয়, তাই করা যাবে। কিন্তু বুড়ো বয়সে আর মিথ্যে বল না বাপু!"

"না বাবু, মিথ্যে বলব কেন? কম টাকার কথা বলছেন, অন্যায় উপায়ে আমিও যথেষ্ট রোজগার করতে পারতাম। পারিনি শুধু এই ভেবে, মিথ্যের পয়সায় ইয়াদগার বানালে পাপ আমার বেড়েই যাবে। নিজেকে যদি একটুও ভোগে রাখতে পারতাম, তাহলে আর এই বয়েসে শরীরের এই দশা হয়?"

"কত বয়েস হল তোমার?" হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলাম আমি।

"তিন কুড়ি পুরতে এখনো বছর চারেক বাকি আছে হুঁজুর!"

"সে কি হে, দেখলে তো মনে হয় সত্তর হয়ে গেছে তোমার বয়স।"

"আজ্ঞে, বছর তিনেক কাশির ব্যামো আর গলায় একটা ঘা হয়ে এত কাহিল হয়ে পড়েছি।"

"গলায় ঘা আছে নাকি তোমার?" প্রশ্ন করল ডাক্তার।

"আছে বই কি বাবু! জাহাজের ডাক্তার বাবু বলেছেন, খুব খারাপ ঘা নাকি। বলেছেন, এ ঘায়ের চিকিচ্ছা নেই কিছু। দঙ্কে দঙ্কে মরতে হবে তিন-চার বছর ভুগে। তাই তো তাড়াতাড়ি কাজ ছেড়ে চলে এলুম। মনে মনে যে সঙ্কল্প করে বেঁচে রইলুম এদ্দিন, উদয়াস্ত খেটে একটি একটি করে জমালুম পয়সা, সে তো বেফয়দা হয়ে যাবে হঠাৎ মরে গেলে। এক একবার যখন কাশির দমক আসে, মরে যাবার মত হই, তখন আল্লাকে ডাকি শুধু। আমার গুণাগার শেষ না হতেই তোমার দরবারে টেনে নিও না আল্লা! দঙ্কে দঙ্কে মরাই আমার পাপের প্রাচিত্তির। তার জন্যে ঘাবড়াই না। কিন্তু কাজ আমাকে শেষ করে যেতেই হবে মরার আগে।"

ডাক্তার বলল, "আচ্ছা, কাল সকালে একবার আমার হাসপাতালে এস দিকি, দেখব ঘা'টা।"

দিন কয়েক ওদের আর কোন খবর পাইনি। কাপড় দিতে এসে রমজান বলে গেল, "দেখলেন তো বড়দা, বুড়ো কি রকম মিথ্যুক?"

আমি বললাম, "কি ব্যাপার হল?"

"কেন, আপনি কিছু শোনেন নি ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে? সেদিন বলল না, হাজার চার-পাঁচ টাকা আছে মোটে ওর। ডাক্তার বাবু চেপে-চুপে ধরতেই বেরিয়ে পড়ল সব। সাতটি হাজার টাকা জমিয়েছে বুড়ো।"

"ডাক্তার কত টাকা বাগালো মকবুলের কাছ থেকে?"

"আপাতক পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে বুড়ো। তবে ডাক্তার বাবু ছাড়বে না। দেঁড়ে-মুষে বার করে নেবে ঠিক।"

আরও কিছু দিন পরে সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে দেখি, বুড়ো মকবুল বসে আছে আমাদের দরজার সামনে। আরও খারাপ হয়ে গেছে চেহারা। প্রাণপণে কেশেও সামলাতে পারছে না। একপাল কৌতূহলী শিশু-জনতা নিরাপদ দূরত্ব থেকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছিল বেচারাকে। কেউ কেউ দু'-চারটে ছোট ইটের টুকরোও ছুঁড়ে থাকবে। আমি যেতেই পালাল সব। বললাম, "কি খবর মকবুল? ছেলেগুলো উৎপাত করছিল বুঝি?"

একটু সামলে নিয়ে সে বলল, "না বাবু! সোনার টুকরো সব। আমার পোষাক-আশাক দেখে মণিরা ভয় পায়। মনে করে ছেলেধরা।"

"তার পর, তোমার খবর কি? ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কত দূর এগুলে?"

"বলছি বাবু! আপনি এখুনি আপিস থেকে এলেন, ভেতরে যান। আমি অপেক্ষা করছি খানিক।"

"আচ্ছা, ভেতরে এসে বস তুমি। আমার বেশী দেরী হবে না।" ভেতরে গিয়ে মকবুলকে এক কাপ চা আর কিছু খাবার পাঠিয়ে দিতে বললাম স্ত্রীকে।

ফিরে এসে শুনলাম মকবুলের কাছ থেকে, ওর অনুযোগ। ডাক্তার পাঁচ হাজার টাকা নিয়েও সন্তুষ্ট হয়নি। বলেছে আরও হাজার দুই টাকা না পেলে মিউনিসিপ্যালিটির বাবুদের কিছু বলতে পারবে না। এদিকে কুল্যে আর এক হাজার সাতশ' টাকা বাকি আছে। ইয়াদ্‌গার বানাতে হাজার দুই টাকা লাগবার কথা। আবার ওদিকে রমজান আর তার বউ শাসাচ্ছে দিন-রাত। কবর-জিয়েত করার জন্যে যে টাকা দিয়ে যাবে বলেছে সে, আগে তা দিক। না হলে কেমন করে পাড়ায় বাস করে মকবুল, আর কে ওকে খেতে দেয়, তা তারা দেখে নেবে। বললাম, "আজ-কাল খাচ্ছ কোথায় তুমি?"

"অসুখটার জন্যে বাবু, খাবার তেমন ইচ্ছে হয় না। যেদিন

যা মুখে ভাল লাগে, দু'-চার পয়সার তেলেভাজা, কোন দিন বা দু'মুঠো মুড়ি, এই খেয়েই বেশ কেটে যায় দিন।"

"ডাক্তার বাবু তোমার গলার ঘা-টা দেখেছিল?"

"হ্যাঁ দেখেছেন ডাক্তার বাবু! ওষুধও একটা দেছেল। সেটা ফুরিয়েছে। কিন্তু আনতে যাই আবার কি করে বলেন তো? দেখা হলেই টাকার তাগাদা করবেন। এই তো কুল্যে দেড় হাজার টাকা আছে! এর থেকে আরও কিছু দিলে থাকবে কি?"

"অসুখটা কি হয়েছে বলল ডাক্তার?"

"সেই জাগাঙ্গের ডাক্তার যা বলেছেল। ক্যানছারই হয়েছে।"

"তা হলে তো তোমার ভালরকম চিকিৎসা করা দরকার!"

"আর চিকিৎসা করাতে মন চায় না বাবু! মিথ্যে কতকগুলো টাকা যাবে তো আরও।"

"কেন যাবে টাকা?" একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলাম আমি। "হাসপাতালের জন্তে তোমার পঁচিশ বছর ধরে জমানো রক্তজল-করা টাকা দিয়েছে এক কথায়। আর তোমার চিকিৎসা করবে না ডাক্তার?"

"রাগ করবেন না বাবু! ডাক্তার বাবু চিকিৎসা করতে চায় না, তা তো নয়। খুব যত্ন করে দেখে। ওষুধটাও খুব কাজে দিছিল ক'দিন। কিন্তু কি হবে আর বেঁচে থেকে বলুন? যে ক'দিন কাজটা শেষ না হয়, কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে খাড়া রাখা। তা সে একরকম হয়ে যাবে। আচ্ছা বাবু, জমিটা পেতে কত দিন লাগবে বলে মনে হয়?"

"আমার তো মনে হয় শীগগিরই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ডাক্তার বাবুর কাছে কাল একবার যেও তুমি সকালে। টাকার কথা তুললে বলে দিও, আমি একবার ডেকেছি। যা বলবার আমিই বলব খ'ন্। আর শরীরের যত্ন একটু নিও। যা তা খেও না।"

উঠে দাঁড়াল মকবুল। মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম করে বলল, "আপনার মেহেরবাণি চিরকাল মনে থাকবে বাবু! সামান্ত অত্যেচারে কিছু হবে না আমার। আজ চলি, কাল সকালে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা করব।"

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা ডাক্তার এল আমার কাছে। বলল, "ডেকে পাঠিয়েছেন শুনলাম মকবুলের কাছে।"

বললাম, "বস। তোমার সঙ্গে কথা আছে। মকবুল বলছিল, ওর বাকি আর হাজার দেড়েক টাকা আছে মাত্র। এর থেকে তোমাকে যদি আরও দিতে হয়, তবে ওর কাজই বা হবে কি দিয়ে, আর রমজানকে কবর-জিরেত করবার জন্তে দিয়েই বা যাবে কি?"

"বুড়ো বুঝি ওই কথা বুঝিয়েছে আপনাকে? আস্ত ঘুঘু লোকটি। ওর কথায় বিশ্বাস করতে আছে? অন্ততঃ আরও এক হাজার টাকা বার করতেই হবে ওর কাছ থেকে।"

"কিন্তু টাকা যদি ওর থাকবেই, তবে শরীরের দিকে একটু যত্ন নেবে না ও?"

"সে ওর স্বভাব সমীর বাবু! এতদিনের কৃচ্ছ্রসাধনের অভ্যাস পালটাবে কি করে বলুন?"

"আমার তা মনে হয় না ভাই! পাঁচ হাজার টাকায় হাসপাতালের কাজ হবে না?"

"কি করে হবে বলুন? এষ্টিমেট নিয়ে কণ্ট্রাকটারের সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেছে। সাড়ে ছ' হাজার টাকা লাগবার কথা। হাসপাতাল বলে ছ' হাজার টাকায় রাজি করিয়েছি ভদ্রলোককে। এখন আরও হাজারখানেক টাকার জন্তে হাত পাততে যাব কার কাছে বলুন তো? এমনিতেই চটে আছে মিউনিসিপ্যাল অথরিটি। তাদের না জানিয়ে একেবারে সব ব্যবস্থা করে বসে আছি বলে কম ক্ষেপে আছে সব? ওদের হাত দিয়ে লেন-দেন হলে ওদের পেটেও যেত কিছু। সে তো আর হবার নয় এখন। নেহাত বাধা দিতে গেলে ভাল দেখায় না, তাই নিমরাজি হয়েছে। বাকি হাজার টাকার ব্যবস্থা করে দিন একটা। মকবুলকে তাহলে চাপ দিতে হয় না আর।"

বললাম, "পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে এষ্টিমেট করালে না কেন?"

"কি যে বলেন সমীর বাবু! এই যা হবে, একেবারে সামান্ত ক্ষেলে।"

ডাক্তারের অসুবিধেটা বুঝতে পারছিলুম। এতদূর এগিয়ে এখন হাজার টাকার জন্তে পিছিয়ে আসতে হলে কেলেঙ্কারীর আর বাকি থাকবে না কিছু। একে তো চটে আছে পৌরসভার কর্তারা। বললাম, "তাহলে কি করা যায় বল দেখি?"

"কি আবার করা যাবে? টাকা দেবে বুড়ো।"

"কিন্তু তাহলে টাকার শোকে নির্ঘাৎ মারা যাবে বুড়ো।"

"মরবে সে এমনিতেই। গলায় ওর ক্যানসার হয়েছে, এখন তা টার্শারি ষ্টেজে। যে কোন দিন পট করে মারা যেতে পারে বুড়ো।"

"তাই নাকি?" আশঙ্কিত হয়ে উঠলাম আমি রীতিমত।

"তবে আর বলছি কি। ওর ইয়াদ্‌গার বানানো হয়ে উঠবে বলে মনে হয় না। আজ আবার তো দেখলাম ভাল করে। এখন টাকাটা যদি পাওয়া যায়, কাজে লাগবে। মরে গেলে আর একটি কাণা কড়িও পাওয়া যাবে ভেবেছেন? শকুনির পালের মত ছিঁড়ে খুঁড়ে নিয়ে যাবে সবাই।"

"তোমার কথা অবশ্য একেবারে উড়িয়ে দিতে পারিনে। যাই হোক, মকবুলকে এখানে ডাকিয়ে একবার সামনাসামনি কথাবার্তা করে নিলে ভাল হয়। তুমি কি বল?"

পরের দিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ভাবলাম আলসেমী করে আর শুয়ে না থেকে একটু ঘুরে এলে মন্দ হয় না। কাজিপাড়ার রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল হল, মকবুলকে একটা খবর দিতে হবে সন্ধ্যেবেলা আমার কাছে আসবার জন্তে। রমজানের বাড়ির কাছে গিয়ে ডাকতে ওর ছোট মেয়ে আমিনা বলল, "রমজান তো ঘরে নেই!"

"বলতে পারিস মকবুল কোথায় থকে?"

হেসে উঠল আমিনা, বলল, "ফজর বেলায় সে বুড়ো কি ঘরে থাকবে? দেখ গিয়ে নানির কবরের ধারে বসে আছে।"

বললাম "চ দেখি, রাস্তা দেখিয়ে দিবি আমাকে।"

ছুটে চলে এল আমিনা। বকবক করে পথ চলতে থাকল আমার আগে আগে। ওর কথায় বুঝলাম, ইদানীং বুড়োর মেজাজ বড় খিটখিটে হয়েছে। প্রথম যখন এসেছিল, বেশ ভাল মানুষ ছিল। কত ভালবাসত, আদর করত তাদের। এটা-ওটা কিনে দিত, রাত্তিরে কত দেশের গল্প বলত। আজ-কাল যে কি হয়েছে

বুড়োর। এ বাড়িতে তো আসেই না প্রায়। মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হলে ভাল করে কথা বলে না আমিনার সঙ্গে। নিজের মনেই বকবক করে সর্বদা।

গোরস্থানের ঠিক পাশে উঁচু মত একটুখানি জায়গায় বসে কাশছিল মকবুল। দূর থেকে নজরে এল। কাছে গিয়ে বললাম, "এই ভোরে উঠে এসেছ মকবুল? ঠাণ্ডা লেগে অসুখ যে বাড়বে।"

অনেক কষ্টে কাশি সামলিয়ে বলল, "আর বাড়াবাড়ি বাবু! এখন পরাণটা গেলেই বাঁচি।"

"কিন্তু রোগ আরও বাড়লে ইয়াদগার তৈরী করাবে কি করে? নিজে দেখা-শুনো না করলে মনের মত হবে কি?"

"সেই জন্তেই তো বলছি বাবু, একটু শীগ্‌গির করে জমিটার ব্যবস্থা করে দিন।"

"আজ সন্ধ্যেবেলা আমার ওখানে এস, বুঝলে? ডাক্তার বাবু আসবে, মোকাবিলা করে একটা ফয়সালা করে দেওয়া যাবে।"

আবার একবার কাশির দমক এল মকবুলের। সেটা সামলে নিয়ে বলল, "আচ্ছা বাবু!"

কিন্তু উভয় পক্ষকে একটা রফায় আনা সে সন্ধ্যায় আমার সাধ্যে কুলতো না। হঠাৎ ডাক্তার প্রস্তাব করল, "আচ্ছা মকবুল, তোমার ইয়াদ্‌গার বানাতে সব টাকা তো একেবারে লাগছে না। তোমার পুঁজির থেকে এক হাজার টাকা আপাতত সমীর বাবুর কাছে রেখে দাও, আমাকে দিতে হবে না। যদি তোমার সম্পূর্ণ টাকাটা না লাগে, তখন হাসপাতালের জন্তে নেব। তোমার এতে আপত্তি আছে?"

একটু আশার আলো দেখতে পেল মকবুল। বলল, "না, তাতে আমার আপত্তি নেই। এখন আর নিজের কাছে টাকা রাখতে ভরসাও পাইনে বিশেষ। কিন্তু একটা কথা দিতে হবে ডাক্তার বাবু! ইয়াদ্‌গার বানাবো বলে মরে মরে এত কাল ধরে টাকা জমিয়েছি। যেমনটি ভেবেছিলুম, তেমন কিছু করার সামর্থ আমার আর নেই। তবু যেটুকু পারি, ভাল করেই তৈরী করাব'। সে সময়ে যেন বাগড়া দেবেন না, হাতটান করতে পারব না আমি।"

হেসে উঠল ডাক্তার, বলল, "তাই কি পারি? এমনিতেই তোমার টাকায় হাত দিতে হচ্ছে বলে কম দুঃখ হচ্ছে না। এর পরে তোমার এত দিনের আশায় যদি বাগড়া দিই, তবে পাপে ডুবব যে।"

আমি বললাম, "কিন্তু আমাকে টাকার জিম্মা দিচ্ছ কেন বল দেখি? পরের টাকা নিয়ে শেষে ফ্যাসাদে পড়ব না তো?"

"ভাল কাজে হাত দিতে গেলে একটু-আধটু ঝুঁকি নিতেই হয়।" ডাক্তার মন্তব্য করল।

কথামত পরের দিন হাজার টাকা গুণে দিয়ে গেল মকবুল। বলে, "তা হলে জমিটার দখল পাচ্ছি কবে বাবু?"

"ডাক্তার তো বলে গেল আসছে রবিবার হাসপাতালের নতুন ব্লকের ভিত দেওয়া হবে। মিউনিসিপ্যালিটির বাবুদের সঙ্গে দেখা হবে ঐদিনে। কথাবার্তা বলে রাখব। আমার মনে হয়, নিশ্চিন্ত মনে তুমি শরীরের যত্ন নিতে পার এবার।"

"আচ্ছা বাবু, তাহলে উঠি এবার। পরের সপ্তাহে তাহলে জমির দখল পেয়ে যাব?"

কিছু বিলম্ব হতে পারে। তার জন্তে ঘাবড়িও না। ও সব ঠিক হয়ে যাবে।"

রবিবার দিন হাসপাতালের নতুন ব্লক ফতিমা-ওয়ার্ডের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের নিমন্ত্রণ পেয়ে গেলাম দেখতে। বেশ সুন্দর ব্যবস্থা করেছে ডাক্তার। বিনা পয়সায় ম্যারাপ বাঁধিয়েছে ডেকরেটারকে দিয়ে। চাঁদা তুলে চায়ের বন্দোবস্ত করেছে। কলকাতা কর্পোরেশনের অলডারম্যান এসেছিলেন প্রধান অতিথি হয়ে। ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করলেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। মকবুলের প্রকৃত ইতিহাস চেপে রেখেছিলাম ডাক্তারের কাছ থেকে। যেটুকু জানত, তাই মনোজ্ঞ করে তুলে ধরল ডাক্তার উপস্থিত জনতার সামনে। তার সারা জীবনের সঞ্চয় নিঃস্বার্থ ভাবে পরোপকারের জন্তে দেওয়ায় মকবুলের অন্তরের যে ঔদার্য্য আর ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, আজকের দিনে তা একান্ত দুর্লভ! উপস্থিত সকলে সেই অসামান্ত মানুষটিকে দেখবার জন্তে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু কোথায় মকবুল? বুঝলাম, এই সভায় উপস্থিত হওয়ার চেয়ে অনেক বড় কাজ তার অপেক্ষা করে আছে কাজিপাড়ার গোরস্থানের কাছে।

সভা তখনও শেষ হয়নি। হঠাৎ পাড়ার একটি ছেলে সাইকেলে করে এসে খবর দিল আমায়। রমজানের সঙ্গে কি কারণে ঝগড়া সুরু হয়েছে মকবুলের। শুধু পরিবারের সকলে মিলে বুড়োকে গালাগালি করেই ক্ষান্ত হয়নি। বুড়োকে মেরে আধমরা করে ফেলেছে রমজান। শুনে আর স্থির থাকতে পারলাম না। ডাক্তারকে চুপি চুপি ব্যাপারটা জানিয়ে চলে গেলাম সাইকেলে করে। ডাক্তার বলল, সভার শেষে সে-ও যাবে দেখতে।

গিয়ে দেখি, নোংরা রাস্তার এক পাশে উবু হয়ে বসে ধুঁকছে মকবুল। পরনের জোব্বা ছেঁড়া, মাথার টুপিটা হাতে। শণের মত অগোছালো চুল মাথা-মুখ ঢেকে দিয়েছে। ঘোলাটে চোখ থেকে জলের ধারা নেমে গালের দাড়ি ভিজে গেছে। বিড়বিড় কি বলছিল মকবুল, শোনা যাচ্ছিল না একটি কথাও। ওকে ঘিরে জমেছিল কিছু লোক। আমি সাইকেল থেকে নেমে কাছে যেতে সরে দাঁড়াল সবাই। তাদের কাছ থেকে শুনলাম, দুপুর থেকে বচসা সুরু হয় রমজানের বউয়ের সঙ্গে মকবুলের, ওর কিছু টাকা আমিনা সরিয়েছে, এই সন্দেহে বুড়ো রমজানের বাড়ি এসে গালাগালি সুরু করে। রমজানের বউ রাগ করে সমানে তার উত্তরে গালাগালি করতে থাকে। রমজান বাড়িতে ছিল না। লোকমুখে খবর পেয়ে খানিক আগে ছুটে আসে সে। তারপর প্রচণ্ড ঝগড়ার শেষে বুড়োকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় রমজান। আর শাসিয়েছে, শীগ্‌গিরই তার পাওনা টাকা যদি না দেয় মকবুল, তাহলে খুনের দায়ে ধরিয়ে দেবে সে বুড়োকে।

কাছে গিয়ে বললাম, "কি হয়েছে মকবুল?"

আমাকে দেখে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল বুড়ো। "আমাকে মেরে ফেলেছে বাবু! পাড়ার এই সব ছোকরারা না থাকলে এতক্ষণে আমাকে শেষ করে ফেলত হতভাগা। আর ওকে কি না আমি মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিয়ে এসেছি।"

ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল রমজান, "শালার বুড়ো, বাবুর কাছে লাগাতে এসেছ? আজ তোমাকে শেষ করেই ফেলব। জানেন

বলে কি না, ওর টাকা চুরি করেছে আমিনা। তোর টাকা ছোঁবার আগে হাতে কুষ্ঠব্যাধি হবে না রে বুড়ো? তোমার ইয়াদগায় বানানো বার করছি। দেশছাড়া যদি তোমায় না করেছি তো বাপ-মায়ে আমার নাম রমজান দেয়নি।"

অল্প অল্প কাশছিল মকবুল। বলল, "নীল চেক লুঙির খুঁটে যে টাকা বাঁধা ছিল, তার হদিস কে জানত, তোর মেয়ে আমিনা ছাড়া?"

"কে জানত তার আমি কি জানি? তোমার নীল লুঙি না সবুজ দোপাটা কার খুঁটে টাকা রেখেছিলে, তার আমরা কি জানি?"

বাধা দিয়ে বললাম, "কি হচ্ছে রমজান? কেন বাজে চেঁচামেচি করছ?"

"ইচ্ছে করে চেঁচামেচি করছি না কি বড়দা'? বেলা তিন পহর অব্দি দানা-পানি জোটেনি, এক-ভাঁটি কাপড় আছড়ে উঠে শুনি, বেটা খুনে আমার আমিনাকে যা নয় তাই বলে গাল দিচ্ছে। বলে, ওর টাকা চুরি করেছে আমিনা। আমার মেয়েরে পাড়ায় চেনে না কে? বলুক তো দেখি কেউ তার স্বভাব খারাপ?"

"মকবুলের টাকা কিছু হারিয়েছে নিশ্চয়ই, না হলে মিথ্যে কেন বলতে আসবে বল?"

"হারিয়েছে বলে আমার মেয়ে দুষি হতে যাবে কোন বিবেচনায়?"

"ও কোথায় টাকা রাখে, তোমার মেয়ে জানত। তাই জিজ্ঞাসা করেছে।"

"না বড়দা', ও বুড়োর হয়ে বলতে আসবেন না! খাতির রাখতে পারব না।"

"বটে?" রাগ করে বললাম, "তাই তুমি ওকে ধরে ঠ্যাঙাবে?"

"আলবৎ ঠ্যাঙাব। বলেছি ত, এ পাড়ায় ও কেমন করে বাস করে দেখে নেব, তবে আমার নাম রমজান।"

"বেশ, দেখে নিও কেমন পার। যদি এর পর শুনেছি কোন গোলমাল করেছ তুমি, তাহলে তোমাকে বিপদে পড়তে হবে, এ বলে রাখলাম।"

"তাতে পেছ-পা নই বড়দা'। খুনে আসামী, বউ-বেটাকে মেরে রেখে ফেরার হয়েছিল এদ্দিন। ওর টাকার লোভে আপনাদের মত ভদ্দরলোকের দরদ উথলে উঠতে পারে। আমরা ছেড়ে কথা কইব না। আমিও থানায় গিয়ে বলে আসছি সব। দেখি কি হয়।"

"খুব সুবিধে হবে না তাতে। ওর পরিচয় আমরা কেউ জানতাম না। তুমিই ওর টাকার লোভে নিজের বাড়িতে রেখেছ এত কাল। আজ আর আশা নেই দেখে উৎপাত সুরু করেছ। সাজাটা তাহলে তোমাকেও কম পেতে হবে না।"

"গুস্তাকি যা করেছি তার তো আর চারা নেই। তবু সাজা পাই পাব, ও বুড়োকে ফাঁসিতে ঝোলাবই, এ দেখে নেবেন।"

ডাক্তার এর মধ্যে কখন এসেছিল দেখিনি। হঠাৎ কে পেছন থেকে বলে উঠল, "থাম তুমি। লজ্জা করে না, জোয়ান মর্দ হয়ে একটা আধমরা বুড়োর গায়ে হাত তুলতে? বেশী ট্যাঁ ফুঁ কোরো না রমজান, নিজেই বিপদে পড়বে।"

মকবুল বলে উঠল, "ক্ষমা জান কর্তারা। বেশী লাগেনি আমার। রাগের মাথায় গায়ে হাত তুলেছে, তাই নিয়ে আর কথা বাড়াবেন না।"

রে। নিজের চরকায় তেল দাওগা চাচা! আমার হয়ে কথা বলতে হবে না।"

ডাক্তার মকবুলকে ওপর ওপর পরীক্ষা করে বলল, "তুমি একবার কা'কেও সঙ্গে নিয়ে ডিস্পেন্সারীতে এস, বুঝলে? একটু ড্রেস করে দেওয়া দরকার।"

বিব্রত হল মকবুল। "কি আর হয়েছে বাবু, ও নিজে থেকেই সেরে যাবে। আমার সেই জমিটার কি হল বলুন দেখি মেহেরবাণি করে? পরাণটা ঠাণ্ডা হোক।"

ডাক্তার আর আমি হেসে ফেললাম পরস্পরের দিকে চেয়ে।

দিন কতক পরে ডাক্তার এল আমার কাছে সন্ধ্যেবেলা। বলল, "মকবুল বুড়ো সত্যি সত্যি বউকে খুন করে ফেরারী হয়েছিল নাকি সমীর বাবু?"

উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন বল ত?"

"সেদিন চেয়ারম্যানকে জমিটার কথা বলতে এক কথায় রাজি হয়ে গেল, সে তো আপনি জানেন। আজ দুপুরে আমাকে ডেকে বলল, ওদের কানে এসেছে, মকবুল নাকি ফেরারী খুনী আসামী। এখন জেনে-শুনে এমন একটা লোককে তো জমির দখল দিতে পারে না মিউনিসিপ্যালিটি!"

বললাম, "ব্যাপারটা সত্যি। এখন কি উপায় করা যায় বল দেখি?"

চিন্তিত হয়ে ডাক্তার জবাব দিল, "সেই তো ভাবছি। চেয়ারম্যানকে তো আপনি জানেন। কোন ঝামেলার মধ্যে যেতে রাজি নয় ও। আপনি একবার কমিশনার রাম বাবুকে দিয়ে যদি ইনফ্লুয়েন্স করাতে পারেন, তাহলে হয়ত কাজ হতে পারে।"

হেসে বললাম, "ভাল খবর নিয়ে এলে যা হোক! এদিকে বুড়ো তো জমি জমি করে খেয়ে ফেললে আমাকে। রোজ দু'-বার করে তাগাদা দিতে সুরু করেছে।"

বিস্মিত হয়ে ডাক্তার বলল, "বলেন কি? ওকে উঠতে পর্যন্ত মানা করে দিয়ে এসেছি পরশু। শুনেছিলেন, সে দিনে ও বাবার দাখিল হয়েছিল?"

"না, তা শুনিনি। তবে চেহারা দেখে বুঝতে পারি, খুব কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারা।"

"কাহিল! ও উঠে বেড়াচ্ছে শুনেই ত চমকে গেছি আমি। যদি বা আর কিছু কাল পরমায়ু ছিল বুড়োর, এরকম করলে তো একটা সপ্তাহও টিঁকবে না।"

বললাম, "কালই তবে রাম বাবুর সঙ্গে গিয়ে চেয়ারম্যানকে ধরি, কি বল?"

চেয়ারম্যান সুবোধ দত্ত লোক মন্দ নন, তবে বড় সাবধানী। সহজে কি ওঁকে রাজি করাতে পারি? রাম বাবু বললেন, "লোকটা যে হাসপাতালের জন্যে এত টাকা দিল, তার জন্যেও অন্ততঃ কিছু করা দরকার আমাদের।"

"করা দরকার বলে বে-আইনী কিছু করতে বলেন না নিশ্চয়ই?"

"সবই কি আইন-মাফিক হচ্ছে বলতে চান? সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে, এমন একটা ব্যবস্থা করলেই হয়।"

"বেশ তো, সে রকম একটা ব্যবস্থা বাতলে দিন না?"

যা শুনেছি, তাতে লোকটা বেশী দিন বাঁচবে বলে মনে হয় না। তিন কুলে ওর কেউ নেই যে, পরে ওয়ারিশনের মামলা কাঁদতে আসবে। সামান্য আধ-কাঠাটাক জমি যদি ও দখল করে, এখন না হয় আমরা চোখ বুজেই রইলাম। পরে এ নিয়ে হাঙ্গামা হুজ্জুৎ হলে বলতে পারব, আমাদের অজ্ঞাতসারে জমির দখল নিয়েছে বুড়ো। ইজেংশান স্যুট একটা ফাইল করে দিলেই চলবে তখন।"

"উহু", ঘাড় নেড়ে গম্ভীর ভাবে সুবোধ বাবু বললেন, "জেনে-শুনে এ অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারি না।"

রাগ করে রাম বাবু বললেন, "কত অন্যায় চোখের ওপর ঘটছে দিন-রাত, দেখে যাচ্ছেন মুখ বুঁজে। আর গোরস্থানের পাশে দু'ছটাক পোড়ো জমির দখল কে নিল, তার জন্তে একেবারে আইন্-ই-আকবরী খুলে বসতে হবে। বেশ তো, গোলমাল হয়, আমরা আছি। আপনি নিজে থেকে ঘাঁটাতে যাবেন না, কথা দিন।"

"তা কি করে বলি। আমি তো মিউনিসিপ্যালিটির ইণ্টারেষ্ট আগে দেখব। তা ছাড়া লোকটা ভাল হত, সে একটা কথা ছিল।"

"আপনার অন্যায় কথা সুবোধ বাবু! পঁচিশ বছর আগে একটা লোক খুন করে থাকেও যদি, আজ মরবার সময়েও ক্ষমা পাবে না সে? ধরুন সে পঁচিশ বছর জেল খেটেই এসেছে। আর যা শুনেছি এঁদের কাছে, তাতে তার বড় কম শাস্তি হয়নি এত দিন ধরে। যাই হোক, ও দু-চার ছটাক জমি নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না।"

"না, সে আমি এখন কথা দিতে পারি না। আচ্ছা, আরও সব কমিশনারদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি, তাঁরা কি বলেন।"

রাগ করে চলে এলাম আমরা। রাম বাবু বললেন, "দখল নিক বুড়ো ও জমির, তারপর লড়া যাবে। এ্যাসেসারকে বলে রাখব, ও জমির পরচা গোলমাল করে রাখবে। দেখি কেমন করে আটকায় চেয়ারম্যান।"

ঘুরে এলাম তিন জনে জমিটা দেখে। মস্ত একটা সিমুল গাছের শেকড়ে মাথা রেখে ধুঁকছিল বুড়ো। ডাক্তার গায়ে হাত দিয়ে বলল, "এ তো দেখি বেশ জ্বর হয়েছে। তুমি আজই মরতে চাও নাকি মকবুল?"

"আমার জমিটার কি হল কর্তা?"

"জমির ব্যবস্থা হয়েছে", রাম বাবু বললেন, "তুমি কি এখানে তৈরী করাবে বলছিলেন সমীর বাবু, তার ব্যবস্থা করতে পার।"

আগ্রহে উঠে বসল বুড়ো। বলল, "জমিটা তাহলে পাওয়া যাবে আজ্ঞে?"

ডাক্তার ধমক দিয়ে বলল, "শুনলে তো কমিশনার বাবু নিজে মুখে বললেন। এত দূরে এসে তোমার সঙ্গে রসিকতা করছি বলে মনে হয় না কি?"

"আজ্ঞে অপরাধ নেবেন না। ভাবনায় চিন্তায় মাথার আর ঠিক নেই।"

"তবে শরীরের ওপর অত্যাচার করছ কেন? হাসপাতালে যেতে পারবে, না আমি ওষুধ পাঠিয়ে দেব?"

"দেখি, নিজেই যেতে পারব বোধ হয়।"

দিন আষ্টেক আর কোন খবর নিতে পারিনি মকবুলের। বাইরে যেতে হয়েছিল বিশেষ প্রয়োজনে। ফিরে এসে শুনলাম ছোট ভায়ের কাছ থেকে, মকবুল বার বার করে একবার যেতে বলে গিয়েছে গোরস্থানের কাছে, তার ইয়াদগারের ভিত খোঁড়া হচ্ছে।

মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলাম কিছুটা। আমার আর কোন কাজ নেই যে পাঁচশ মাইল পথ ট্রেণ-জার্নি করে এসে ছুটতে হবে গোরস্থানে? মনের সে বিরক্তিতে ইন্ধন জোগালেন স্ত্রী, কাজেই সেদিন আর যাওয়া হয়নি। পরের দিন সকালে বাজারে যাওয়ার পথে দেখা হল ডাক্তারের সঙ্গে। বলল, "আপনি ছিলেন না সমীর বাবু! যা একচোট তুলকালাম হয়ে গেল মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে। কমিশনারদের মিটিঙে মকবুলের কেসটা নিয়ে একেবারে কেলেঙ্কারীর একশেষ। জমিটা দেওয়ার ব্যাপারে সুবোধ বাবুর খুব বেশি অনিচ্ছে নেই। কিন্তু সুবোধ বাবুর নিজের অনেষ্ট ওপিনিয়ান দেবার ক্ষমতা নেই। শালকের ওঁরাই আসলে চালাচ্ছেন ওঁকে। কিন্তু রাম বাবু তো ছেড়ে কথা বলার লোক নন। মিটিঙের মাঝখানে একবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে ঝেড়ে বলে নিয়েছেন একচোট। শালকের ওঁরা চেয়েছিলেন ব্যাপারটাকে ওখানেই শেষ করে দিতে। কিন্তু বেগতিক দেখে সুবোধ বাবু ভেঙে দিলেন মিটিঙ। বলেছেন আগামী পরশু তিনি তাঁর ডিসিসান জানাবেন সিলেক্ট কমিটির কাছে। তার পর প্রস্তাবটা ভোটে দেবার প্রয়োজন হয়, সে তখন নেক্সট মিটিঙে তোলা যাবে।"

বললাম, "তা হলে এখনও কোন নিষ্পত্তি হল না জমিটার?"

"নাঃ, হল আর কই। তবে চিন্তার কারণ নেই কিছু।"

হাসলাম আমি। "চিন্তার কারণ আর তো কিছু নয়, তাগাদায় তাগাদায় অস্থির হয়ে গেলাম। আট দিন পরে বেনারস থেকে ফিরে শুনি, মকবুল বার বার করে যেতে বলে গিয়েছে গোরস্থানে। ওর ইয়াদগারের ভিত খোঁড়া হচ্ছে নাকি।"

"বলেন কি? আর ক'টা দিন সবুর করতে পারল না বুড়ো? দেখ দেখি। শালকের ওঁরা যে রকম চটে আছেন, হঠাৎ ওঁদের কানে গেলে এখুনি আবার ট্রেস পাসের চার্জে একেবারে পুলিশ কেস না করে বসেন! তাই তো বলি, আজ সাত আট দিন ওষুধ নিতে এল না বুড়ো! কখন যাবেন ওর কাছে?"

"এই, বাজারটা সেরেই বেরুব ভাবছি। তুমি আসবে নাকি?"

"ভাবছি দেখে আসি একবার। আচ্ছা, আপনি বাজার সেরে নিন, আমি একটু ঘুরে আসি। কাছেই কল আছে একটা।"

খানিক পরে ডাক্তারের সঙ্গে গোরস্থানের কাছে গিয়ে দেখি, কাঠাখানেক জায়গায় গোল করে খোঁড়া হয়েছে ভিত। হাজার দুই ইট সাজান রয়েছে থাক থাক করে। এক পাশে মাথার ওপরে ছাউনি বেঁধে খোয়া ভাঙছে বেহারী মজুর ক'জন! মকবুলের চিহ্ন নেই কোথাও। ইতস্তত খুঁজে কোন হদিশ না পেয়ে ভাবছি কি করা যায়, হঠাৎ নজরে পড়ল দুই সারি সাজানো ইটের মাঝখানে চট বিছিয়ে শুয়ে আছে মকবুল।

কাছে গিয়ে ডাকতে রাঙা ঘোলাটে চোখ মেলে তাকাল সে। হাত নেড়ে সেলাম করার ভঙ্গী করে অস্ফুটে কি যে বলল বোঝা গেল না। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছ মকবুল?"

যন্ত্রণা-বিকৃত মুখে হাঁ করে আঙুল দিয়ে গলা দেখাল সে। বুঝলাম গলার ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। কথা বলার ক্ষমতা নেই।

"গলার ব্যথা বেড়েছে, আর তুমি ওষুধ-বিষুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়ে এই রোদ্দুরের মধ্যে শুয়ে আছ?"

কপালে হাত ঠেকিয়ে একটা হতাশার ভঙ্গী করল মকবুল। আস্তে আস্তে ওকে ধরে বসিয়ে দিল ডাক্তার। বলল, "নিজেকে তো একেবারে শেষ করে এনেছ দেখছি। আজ বাদে কাল তোমাকেই তো ওই ভিতের মধ্যে শুইয়ে মাটি চাপা দেবে সবাই। কবর খোঁড়ার কষ্টটুকুও করতে হবে না কাউকে।"

দর-দর ধারে জল নেমে এল বুড়োর চোখ থেকে। ডাক্তার বলল, "বসে থাক এখন চুপচাপ, আমি রিক্সা ডেকে আনছি। হাসপাতালে দু'-চার দিন থাক এখন আমার নজরে। বুঝলে?"

ডাক্তারের দু' পায়ে হাত দিয়ে হাতজোড় করল মকবুল। তার পর হাত নেড়ে দেখাল খোঁড়া ভিত আর ভাঙা পোয়া। অনেক কষ্টে খনখনে গলায় বলল, "কে দেখবে?"

"সে কথা আর ভাবলে কোথায় তুমি? তা হলে কি এমন করে মরতে পারতে? তোমার যে অবস্থা হয়েছে, দু'টো দিনও আর বাঁচবে কি না সন্দেহ! মরে গেলে দেখবে কে তখন?"

মকবুলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল ডাক্তার। নিজের বাসা থেকে ক্যাম্পখাট আনিয়ে কম্পাউণ্ডারের ঘরে ইন্‌ডোর বেড তৈরী করাল। ওষুধ, ইঞ্জেক্‌শন, গলায় স্প্রে ইত্যাদি দিয়ে দু'দিনের মধ্যেই অনেকখানি তাজা করে তুলল বুড়োকে। চতুর্থ দিনে আমি গেছি হাসপাতালে বুড়োকে দেখতে, ডাক্তার বলল, "আবার এক ফ্যাসাদ জুটল সমীর বাবু!"

প্রশ্ন করলাম, "কি হল আবার?"

"থানায় কে খবর দিয়েছে, মকবুল ফেরারী খুনী আসামী। দারোগা তাই আমার কাছে এসেছিলেন গত কাল। বলছেন, এর পেছনে ইনফ্লুয়েনসিয়াল লোক জড়িত আছে। কাজেই ব্যাপারটাকে চাপা দেওয়া সহজ হবে না। আই-জি অফিসে তিনি রিপোর্ট দিয়ে পাঠিয়েছেন। সেখান থেকে ইন্‌স্ট্রাক্‌শান না আসা পর্যন্ত আসামীকে নজরবন্দী রাখতে চান। আমার এখানে মরণাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসার জন্ম রয়েছে জেনে আর পুলিশ পিকেট রাখেন নি। এক দিক যদি বা সামলানো গেল, আবার এক দিকে বেধে গেল ঝঞ্ঝাট। এমন অপয়া লোক আমি বাপু জন্মে দেখিনি।"

আমি বললাম, "এক দিক সামলালে মানে?"

"আপনি শোনেন নি? মিউনিসিপ্যাল অথরিটি রাজি হয়ে গেছে জমিটা দিতে। অবশ্য এই নতুন ডেভালাপমেণ্টটা আগে জানা গেলে কি হত বলা যায় না।"

"দেখ, তাহলে হয়ত পরে আবার ডিসিসান চেঞ্জ করতেও পারে।"

"তাই তো ভাবছি। এত কাণ্ড করেও বুঝি শেষ রক্ষা হয় না।"

"সে যাক, যা হবে দেখা যাবে। তোমার রুগী কেমন আছে বল?"

"আছে তো ভালই। কিন্তু ধরে-বেঁধে তো আর চিকিৎসা করা যায় না। কে যে ওকে খবর দিয়েছে ইট, চুণ, সুরকি, সব নাকি চুরি হয়ে যাচ্ছে ওর। প্রাণটা পড়ে আছে খোঁড়া ভিতের কাছে। গত কাল থেকে চুপচাপ কাঁদছে শুধু। ধমক দিয়েছি খুব। অমন করলে জমির ব্যবস্থা হবে না মোটেই।"

ডাক্তার চলে গেল আউটডোরে রুগী দেখতে। ভেতরে গিয়ে বসলাম মকবুলের পাশে টুলে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন আছ মকবুল?"

ঝিমুচ্ছিল বেচারা। আমার প্রশ্নে চমকে ফিরে তাকাল, বলল, "সেলাম হুজুর! ডাক্তার বাবুর ওষুধে সব ব্যথা কমে গেছে। এখন আমাকে ছেড়ে দিতে হুকুম দিন বাবু! ওদিকে আমার ইট চুণ সুরকি সব বেবাক চুরি হয়ে গেল।"

আমি বললাম, "এ সব গল্প কে করেছে তোমার কাছে? আমি নিজে আজ দেখে এসেছি, সব ঠিক আছে তোমার।"

আগ্রহে উঠে বসল মকবুল। "আপনি আজ গিছিলেন ওখানে বাবু?"

মিথ্যে কথাটাকে জোর দিয়েই বললাম, "তবে আর বলছি কি?"

"কাজ-কর্ম করছে সব? দেয়াল গাঁথা সুরু করেছে? তবে তো আমি আর থাকতে পারিনে এখানে। ওদের কাছে থেকে না দেখিয়ে দিলে কি বানাতে কি বানিয়ে বসবে, তার কিছু ঠিক আছে? আপনি ডাক্তার বাবুকে মেহেরবাণি করে ছুটি করে দিতে বলুন আমায়। চিরকাল আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব হুজুর!"

বিব্রত হয়ে বললাম, "আরে, তোমার কাজ, তুমি না সেরে উঠলে কি হতে পারে? কাজ এখন বন্ধ আছে। তবে জিনিষ-পত্র সব ঠিকঠাক করে রেখে দেবার ব্যবস্থা করেছি। তুমি আগে এখানে কিছুদিন চুপচাপ থেকে সেরে ওঠ ভাল করে, তারপর নিজে দেখাশুনো করে পছন্দমত তোমার ইমাদগার তৈরী করিও। বুঝলে না? এখন রোদে হিমে কষ্ট পেলে আবার পাকিয়ে তুলবে অসুখ। ডাক্তার বাবু তোমার জন্মে কতটা করছেন সে তো দেখতে পাচ্ছ? ওঁর কথা না শোনা কি উচিত হবে তোমার?"

"আমি তো বেশ ভালো হয়ে গেছি বাবু", অনুনয়ে কাঁদ-কাঁদ হয়ে গেল মকবুলের কণ্ঠস্বর। "কত রোদে জলে পোড় খাওয়া শরীল, কত ধকল সয়ে তবে না টাকা জমিয়েছি পঁচিশ বছর ধরে। আর কিছু হবে না বাবু! আপনি ডাক্তার বাবুকে বলে দিন।"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "সে আমি বলতে পারব না বাপু! দু'দিন অপেক্ষা করে শরীর সারিয়ে নিতে যদি আপত্তি থাকে তোমার, যা খুসী কর। আমি কিছু বলতে পারব না ডাক্তারকে।"

"রাগ করবেন না বাবু, আমার মাথার ঠিক নেই। তবু আন্দাজ কত দিন আর থাকতে হবে আমাকে?"

"সে আমি কি করে বলব? ভাল ভাবে চিকিৎসা করাও যদি, তাড়াতাড়িই ভাল হয়ে উঠবে।"

চলে এলাম ওর কাছ থেকে। কিন্তু অপরাধী হয়ে রইলাম মনে মনে। সত্যি ওর জিনিষপত্র সব চুরি হয়ে যাচ্ছে কি না কে জানে! হওয়া ত কিছু বিচিত্র নয়। একবার দেখা উচিত ছিল। কিন্তু ফিরে এসে এমনই কাজে আটকা পড়ে গেলাম যে মনে রইল না সে কথা।

পরের দিন সকালে চা খেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছি বারান্দায়, পাড়ার

এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। দেখি, হন-হন করে আসছে ডাক্তার, আর তার পেছনে থানার দারোগা। আমাকে দেখে ডাক্তার বলল, "একবার কবরখানার দিকে যাচ্ছি সমীর বাবু! আসবেন নাকি?"

বললাম, "কি ব্যাপার?"

"আসুন, যেতে যেতে বলছি।"

শুনলাম, সকাল বেলা আমারই মত সবে চা খেয়ে বাইরে বেরুতে যাবে ডাক্তার, হঠাৎ তার কোয়ার্টারে দারোগা এসে উপস্থিত। বলল, গতকাল রাত্তিরে আই-জি অফিস থেকে অর্ডার এসেছে, সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগষ্ট যে অর্ডিনান্সে বহু বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, মকবুলকেও সেই কারণেই ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে যখন তার সম্পর্কে লোক্যাল ডাক্তার, থানার ইনসপেক্টর এবং রেসপেক্টেবল্ পাবলিকের সহানুভূতি আছে। দারোগা সব কিছু খুলে লিখেছিল রিপোর্টে। এ-ও লিখেছিল, বেশী দিন আর বাঁচবে না আসামী। দুরারোগ্য ক্যানসার হয়েছে গলায়। যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে বেচারা। সকালে খবরটা পেয়ে মহানন্দে ডাক্তার মকবুলকে দেখতে যাচ্ছিল। এমন সময় কম্পাউণ্ডার এসে বলল, রুগী আগের রাত থেকে নাকি উধাও।

রেগে গেল ডাক্তার। আগের রাত থেকে উধাও, অথচ এখন সে কথা জানাতে এসেছে কম্পাউণ্ডার? উত্তরে লোকটা বলল, দোষ তার নেই। রাত ন'টায় খাবার দাবার দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দরজায় তালা দিয়ে তবে গেছে সে। রুগী যদি জানলা টপকে পালায়, সে কি করতে পারে?

"কাল রাত্তিরে যে পালিয়েছে সে, জানলে কি করে?"

"মোড়ের পানওলা বলল। মকবুলকে দেখে সে প্রশ্ন করেছিল, কি বুড়ো, অসুখ ভাল হয়ে গেল? উত্তরে মকবুল একবার হ্যাঁ, বলেই দৌড় মারে অন্ধকারে।"

আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল। ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, তারও সেই একই অবস্থা। দারোগা বললেন, "অত জোরে ছুটচেন কেন মশাই? দু' মিনিট আগে গিয়ে আর কি লাভ হবে?"

কথার উত্তর না দিয়ে চললাম আমরা আগের মত বেগেই।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল, জটলা করছে কয়েকটি বয়স্ক লোক আর ছেলেপুলে। সঙ্গে দারোগাকে দেখে সরে দাঁড়াল সবাই। আগের সেই ইটের স্তূপ সত্যিই অনেকখানি নিঃশেষিত। টুকরো খোয়াও যেন অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। সেই যে গোল ভিত কাটা হয়েছিল দেখেছিলাম, তাই আছে এখনও। বাড়তির মধ্যে শুধু এক কোণায় থাক থাক করে সাজান শ' খানেক ইটের গায়ে হেলান দিয়ে বিকৃত মুখে কাঠ হয়ে মরে পড়ে আছে বুড়ো মকবুল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার অসম্পূর্ণ ইয়াদগারের দিকে!

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ড্রেসডেন থেকে সোজা ভিয়েনা। কিন্তু ভিয়েনার নিরঙ্কুশ, বৈচিত্র্যহীন মন্থর দিনগুলি অসহ্য হোয়ে উঠলো এই জন্ম-যাযাবরের কাছে।

মনে পড়ে গেল নিজের দেশের কথা—পুরানো দিনগুলি পুরানো বন্ধু-স্বজনদের স্মৃতি নিয়ে জেগে উঠলো। পাড়ি দিলাম ভেনিসের পথে—

দীর্ঘ তিনটি বছর পর আবার দেখা হোলো পিতৃসম অভিভাবক, বান্ধব মঁ্যাসিয়ে দ্য ব্রাগাদিনের সঙ্গে। দেহে মনের মাধুর্য্যে কোথাও এতটুকুও ফাটল ধরেনি—ঠিক আগের মতই অকৃত্রিম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন আমাকে পেয়ে। আর তার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু দুটি বারবারো আর ডাণ্ডালোও কিছু কম খুশী হোলেন না—এই সুদীর্ঘ ভ্রমণের শেষে আমাকে অর্থে-সামর্থে স্বচ্ছন্দ আনন্দের সঙ্গে ফিরতে দেখে।

আমার এইবারের গৃহে প্রত্যাগমন মোটের উপর শুভই হোয়েছিলো। রীতি-নীতি আর লোকচরিত্রে ইতিমধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছিলাম। নম্র ভদ্র ব্যবহার, আভিজাত্যপূর্ণ সম্মানবোধ সবই আমার আয়ত্তে। আর তার সঙ্গে সাধারণের চেয়ে নিজেকে একটু উঁচুদরের বলে মনে করাটা তো আমার স্বভাবেই ছিলো—সেই পুরানো সবজান্তা ভাবটাও যে মনের মধ্যে সুড়সুড়ি দিত না তা নয় কিন্তু মনে মনে এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোয়েছিলাম, খুব সংযত আর গম্ভীর হোয়ে থাকবো।

মঁ্যাসিয়ে দ্য ব্রাগাদিনের বাড়ীতে আমার নিজের ঘরখানিতে এই তিনটি বছর পরে ঢুকে কি যে ভালো লাগলো! যেখানে যেটি যেমন ভাবে রেখেছিলাম তেমনি ভাবেই রয়েছে। এতটুকুরও নড়চড় হয়নি কোথাও। আমার কাগজপত্রের উপর এক ইঞ্চি পুরু ধুলো দেখে বুঝলাম, কেউই সে-সবে হাত দেয়নি, সরায়নি, আমি বাড়ী ফেরবার কয়েক দিনের মধ্যেই আড্রিয়াটিক সাগরের সঙ্গে বাৎসরিক মিলনোৎসব সুরু হোলো। মঁ্যাসিয়ে দ্য ব্রাগাদিন অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির আর নির্জ্জনতাপ্রিয় ছিলেন। তাই এই উৎসবমত্ত দিনগুলি এড়াবার জন্যে কয়েক দিনের মত পাদুয়াতে থাকবেন ঠিক করলেন। আমিও তাঁর সঙ্গী হোলাম। পাদুয়াতে ওঁকে পৌঁছে দিয়ে দু' একদিন পরেই শনিবারের একটা ডাকগাড়ীতে করে আমি ভেনিসের পথে ফিরলাম। কিন্তু এখানেও সেই কৌতুকময়ী ভাগ্যদেবীর অদৃশ্য অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঘটলো আর এক বিপর্য্যয়! যদি এক মিনিট আগে কি পরে বেরোতাম তাহলে হয়তো নির্ব্বিঘ্নে যাত্রাই হোতো। কিন্তু জীবনের প্রতিটি বাঁকেই বৈচিত্র্য যার জন্যে অপেক্ষা করে তার জন্যে মসৃণ পথ কোথায়?

ওরিয়োগার কাছাকাছি আসতেই দেখলাম, একটা সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ী অত্যন্ত দ্রুতবেগে আসছে। আমার গাড়ীর পাশ কাটিয়ে যেতেই দেখলাম, গাড়ীর মধ্যে অপূর্ব্ব সুন্দরী একটি মহিলা আর জার্ম্মাণ অফিসারের পোষাকে এক ভদ্রলোক রয়েছেন। কিন্তু পলকমাত্র—পরমুহূর্ত্তেই আমার চোখের সামনে গাড়ীটা গতির বেগ সামলাতে না পেরে উল্টে গেলো আর মহিলাটি সজোরে ছিটকে গিয়ে নদীর পাড়ে পড়ে গেলেন—সেখান থেকে একেবারে নদীর বুকে গড়িয়ে যাচ্ছেন দেখে আমিও লাফ দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে ছুটে গেলাম মহিলাটিকে বাঁচাতে। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে মহিলাটি কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মত বসে রইলেন, তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে চকিত হোয়ে উঠলেন নিজের অসম্বৃত বেশবাস লক্ষ্য করে। অত্যন্ত লজ্জিত হোয়ে দ্রুততার সঙ্গে বেশবাস সংযত করে বার বার আমাকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন ওঁর ত্রাণকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা বলে। ইতিমধ্যে ওঁর সঙ্গী ভদ্রলোকটিও উঠে এলেন, তিনি বিশেষ আহত হননি। পরস্পর ধন্যবাদের পালা শেষ করে আবার আমরা গাড়ীতে গিয়ে বসলাম—ওঁরা গেলেন পাদুয়ার দিকে আমি ভেনিসের দিকে।

পরদিন ভোরবেলা ছদ্মবেশে উৎসবে যাবার জন্য মুখোশে মুখ ঢেকে ব্যুশাঁতোর-এর শোভাযাত্রায় যোগ দিতে গেলাম। আড্রিয়াটিকের বিবাহোৎসবের সমস্ত কৌতুকটাই নির্ভর করে আবহাওয়ার উপর। এই অদ্ভুত কৌতুক-উৎসব সারা ইউরোপের কাছে এক অভিনব ব্যাপার। স্বয়ং নৌ-সেনাপতি নিজের জীবন বাজী রাখেন আবহাওয়ার সঠিক খবর দেবার জন্যে। কারণ, আবহাওয়ার একটু ইতর-বিশেষেই জলযানটি উল্টে যাবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আর সেই সঙ্গে সমস্ত রাজকর্ম্মচারী, বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত, উচ্চবংশীয় বিশেষ সম্ভ্রান্ত অভিজাত সম্প্রদায় সর্ব্বসমেত 'দোজ' অর্থাৎ প্রধান শাসনকর্ত্তার সলিল সমাধি অনিবার্য্য। আর সেই একান্ত শোকাবহ ঘটনা দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি ঘটে, তা' সত্ত্বেও সমস্ত ইউরোপই বিদ্রূপের হাসি হাসবে—বলবে, শেষ অবধি 'দোজ' অ্যাড্রিয়াটিকের সঙ্গে বিবাহটা পুরোপুরি সার্থক করতেই গেলেন!

টেবিলের উপর মুখোশটা রেখে এক জায়গায় বসে একটু কফি খেয়ে নিচ্ছিলাম—এমন সময় একটি মুখোশাবৃতা মহিলা এসে তাঁর হাতের পাখাখানা দিয়ে আমার কাঁধের উপর মৃদু আঘাত করে চলে গেলেন। মহিলাটিকে অচেনা দেখে আমি আর ও বিষয়ে বিশেষ নজর না দিয়ে কফি শেষ করে মুখোশটা এঁটে বেরিয়ে

পড়লাম। জেঠির ধারে বেড়াতে বেড়াতে দেখি, ম্যঁসিয়ে স্ত্রাগাদিনের গণ্ডোলা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আরও একটু গিয়ে 'লা পাই'এর সেতুর কাছে দেখি, সেই মুখোশটানা মহিলাটি খুব মন দিয়ে ভানুমতীর খেল দেখছেন। দশটি করে 'সু' দিলেই খেল দেখাচ্ছে। আমি এগিয়ে গেলাম মহিলাটির কাছে। পাশে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে তখন অমন করে পক্ষ সঞ্চালনে তাড়না করার অধিকারটা তাঁর কোথা থেকে হোলো। "

—"ওটা হোলো একবার আমার প্রাণরক্ষা করে তারপর আমাকে না চেনার শাস্তি।"

মনে পড়লো সেদিন গাড়ী থেকে ছিটকে যাওয়া যে মহিলাটিকে বাঁচিয়েছিলাম তিনিই। উপযুক্ত অভিবাদনের পর জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যুশঁতোর এর উৎসবে যেতে রাজী আছেন কি না।

—"খুব রাজী—অবশ্য যদি একটা নিরাপদ গণ্ডোলা পাই।"

—"আমার গণ্ডোলাতেই চলুন না, যদি আপত্তি না থাকে। এটা সব চেয়ে বড়ো গণ্ডোলা—"

সঙ্গের ভদ্রলোকটির সঙ্গে পরামর্শ করে মহিলাটি সম্মতি জানালেন। যেমনি ওঁর গণ্ডোলাতে পা দিলেন, অমনি আমি অনুরোধ করলাম ওঁদের মুখোশগুলি খুলে ফেলতে। ওঁরা বললেন, বিশেষ কারণে ওঁরা লোকের কাছে অপরিচিতই থাকতে চান। তবে তাঁরা যে ভেনিসেরই লোক এটুকু নিশ্চিত ভাবেই জানালেন। আমি মহিলাটির পাশেই বসেছিলাম এবং পাশে বসার সুবিধাটুকু পুরোপুরি উপভোগ করার জন্য কিছু অগ্রসরও হোতে গিয়েছিলাম। কিন্তু প্রতিবারই মহিলাটি সরে বসে আমার উৎসাহকে নিবৃত্ত করছিলেন। উৎসব যাত্রার শেষে আমরা আবার ভেনিসে ফিরে এলাম। অফিসার ভদ্রলোকটি আমাকে রাত্রের আহারের জন্য সবিনয়ে আমন্ত্রণ জানালেন। রাজী হোলাম—কারণ মহিলাটির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে অত্যন্ত উৎসুক হোয়ে উঠেছিলাম। অবশ্য প্রথম দিনের সেই চকিতে দেখা রূপলাবণ্যই আমার মুগ্ধতার কারণ। অফিসারটি আমাদের দু'জনকে রেখে আহারের ব্যবস্থা করতে গেলেন।

এই নিভৃত ক্ষণটুকুর প্রথম সুযোগেই আমি মহিলাটিকে জানলাম যে আমি ওঁর প্রেমে পড়েছি—মুখোশে মুখ ঢাকা থাকাতে এতটুকু দ্বিধা হোলো না বলতে—সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলাম যে অপেরাতে আমার নিজস্ব একটা বক্স সংরক্ষিত আছে। আর-আর বেশী খোশামোদ না করিয়ে যদি মহিলাটির কাছে আশা পাই তবে কার্নিভালের শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ওঁর কাজে বহাল থাকতে রাজী।

—"আমার প্রতি নিষ্ঠুরতাই যদি আপনার মনোগত ইচ্ছা, তবে সেটা খুলে বলুন"

—"আপনিও খুলে বলুন, কার সঙ্গে কথা বলছেন বলে আপনার মনে হয়।"

—"একটি অতি মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে—তা' সে রাজকুমারীই হোক আর গরীব ঘরের মেয়েই হোক। আশা করি অন্ততঃ আজ থেকেও আপনার মাধুর্য্যের প্রমাণ পাবো, না হয়তো বলুন আহারের পরই নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিই।"

পর থেকে আপনিও আপনার কথার ভঙ্গীটুকু পরিবর্ত্তন করবেন—অমন কথার ভঙ্গীতে কি আকর্ষণ করা যায়? আমার মনে হয় এমন একটা বোঝাপড়া হবার আগে আমাদের পরিচয় হওয়া দরকার, বুঝতে পেরেছেন?"

—"হ্যাঁ বুঝেছি, কিন্তু প্রতারিত হবার ভয়ও যে মনে রয়েছে।"

—"আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য! যে ভয়ের সুরুতে এই ব্যাপারে যবনিকা পতন হোতো সেই ভয়ই তোমাকে আমার চোখে নূতন করে তুললো।"

—"আজ একটু আশার বাণী পেলে আমিও নতুন মানুষ হবো। কোমল নম্র মাধুর্য্যে আমিও ভরে উঠবো। এই অসম্বদ্ধ প্রলাপও আর আপনাকে শুনতে হবে না"—

—"এই চুপ"—

দরজার প্রান্তে দেখা গেল অফিসার ভদ্রলোকটিকে। তাঁর সঙ্গে আমরা হোটেলের নির্দ্দিষ্ট খাবার ঘরটিতে গেলাম। ঘরে ঢুকতেই মহিলাটি মুখোশ খুলে ফেললেন। সেদিনের চেয়ে ওঁকে আরও সুন্দরী লাগলো। এবার মনে হলো যে প্রথমেই জানা দরকার অফিসারটির সঙ্গে মহিলাটির কি সম্বন্ধ। কারণ, সেই বুঝেই আমাকেও এগোতে হবে। খাবার পর ওঁদের নিয়ে অপেরায় গেলাম, সেখান থেকে আবার আমারই গণ্ডোলাতে ওঁদের বাড়ী পৌঁছে দিলাম। বিদায় নেবার সময় অফিসারটি আমাকে বললেন, "কাল আপনার সঙ্গে দেখা করবো।"

—"কোথায়? কখন?"

—"সে তো দেখাতেই পাবেন।"

পরদিন ভোরবেলাই তিনি এসে হাজির। প্রাথমিক সম্বর্দ্ধনা জানানোর পর আমি তাঁর আসল পরিচয় জানতে চাইলাম অবশ্য খুবই সবিনয়ে। তিনি স্বচ্ছন্দেই সমস্ত পরিচয়ই দিলেন কিন্তু একটি বারও চোখ না তুলে। তিনি বললেন যে, আমার নাম পি. সি। আমার বাবা একজন বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ধনী; কিন্তু তাঁর সঙ্গে বিবাদ করেই আমি চলে আসি। যদিও বাবার অজ্ঞাতসারে তাঁরই বাড়ীতে একটি মহলে আমি থাকি। যে মহিলাটিকে আপনি দেখেছেন তিনি হলেন এজেন্ট 'সি'র স্ত্রী। মাদাম 'সি'রও তাঁর সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটে, অবশ্য তার মূল আমিই—আমিও মাদাম 'সি'র জন্যেই বাবার সঙ্গে বিবাদ করেছি। আমি এই অফিসারের পোষাক পরি, কারণ অষ্ট্রিয়ার সৈন্যদলের ক্যাপ্টেন হিসাবে সে অধিকার আমার আছে—কিন্তু আমি কোনো দিনই কোনো কাজ করিনি। ভেনিসেতে গৃহপালিত পশু সরবরাহ করার ভার আমি পেয়েছি—সাধারণতঃ হাঙ্গেরী থেকেই ওগুলি পাঠানো হয়। এই ব্যবসাতে বছরে প্রায় দশ হাজার ফ্লোরিন (ইতালীয় টাকা) লাভ থাকে। কিন্তু হঠাৎ অনেকগুলি কারণে অত্যন্ত অর্থসঙ্কট দেখা দিয়েছে—চার বছর আগেই আমি আপনার নাম শুনেছি—আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছাও আমার অনেক দিনের। মনে হয় পরশুর ঘটনায় নিশ্চয়ই ঈশ্বরের হাত ছিলো—তাই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলো। আমার একটি বিশেষ প্রয়োজনের জন্য আপনাকে অনুরোধ করতে দ্বিধা করবো না। এর ফলে আমাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে উঠবে। আমাকে সাহায্য করলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। আপনি যদি আমাকে এখন অর্থ সাহায্য করেন তাহলে আপনার চিন্তার কিছু নেই; কারণ এক

দেবো, তাইতে আমি টাকা শোধ না করতে পারলেও ঐ ব্যবসার আয় থেকেই আপনার প্রচুর লাভ হবে।"

এই দীর্ঘ বক্তৃতাসহ আবেদনের ফল যে এমন করে মাঠে মারা যাবে, সে কথা বোধ হয় ভদ্রলোকটি ভাবতে পারেননি। অত্যন্ত বিরক্ত ভাবেই আমি সোজাসুজি তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলাম। ফলে তাঁর বক্তৃতাস্রোত দ্বিগুণ উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠলো. কিন্তু আবার তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম যে, তাঁর এত জানাশোনা আত্মীয় থাকা সত্ত্বেও মাত্র হু'দিনের পরিচিত আমার প্রতি এই অনুগ্রহ-র্বণ কেন? কিছুমাত্র বিচলিত না হোয়েই তিনি বললেন, —"দেখুন, আপনার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আর বুদ্ধিমত্তার কথা সুপরিচিত। সেই জন্তেই আপনার কাছে এসেছি, কারণ আপনিই ঠিক বুঝতে পারছেন যে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলে কতখানি সুবিধা আর লাভ হবে।"

—"সবই বুঝেছি। সেই সঙ্গে এটাও বুঝেছি যে, আপনার প্রস্তাবে রাজী হলে আপনি নিজেই আমাকে একটি গর্দভ ছাড়া আর কিছু ভাববেন না।"

ভদ্রলোকটি চলে গেলেন। অবশ্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। যাবার আগে জানিয়ে গেলেন, সেণ্টমার্ক স্কোয়ারে মাদাম'সি'র সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় তিনি আসবেন. আমার উপস্থিতিও সেখানে আশা করেন। তাছাড়া যে জায়গায় তিনি আছেন সেখানের ঠিকানাও আমাকে দিয়ে গেলেন—বোধ হয় আশা করেছিলো তাঁর আসার পর সৌজন্ত রক্ষার্থে আমিও যাবো। কিন্তু মনে মনে ভাবলাম, একটু বুদ্ধি থাকলেও সেখানে যাচ্ছি না। লোকটির ছলনাতে অত্যন্ত বিরক্ত হোয়ে মহিলাটির প্রতিও আমার সব আকর্ষণ চলে গিয়েছিলো। সত্যিই আর বোকা বনবার ইচ্ছা ছিল না। তাই ইচ্ছা করেই সন্ধ্যায় সেই সেণ্টমার্ক স্কোয়ারে গেলাম না। কিন্তু পরদিন সকালবেলা আমার সেই কৌতুকময়ী ভাগ্যদেবীর ইঙ্গিতেই বোধ হয় খালি মনে হোলো, ভদ্রতার খাতিরেও একবার দেখা করা উচিত বৈ কি! শেষ অবধি চলেই গেলাম।

একজন চাকর আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো। অফিসার ভদ্রলোকটি আমাকে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। সন্ধ্যায় যাইনি ব'লে মৃদু অনুযোগও করলেন। তারপরই আবার সুরু করলেন ব্যবসার কথা—রাশীকৃত কাগজপত্র বেরোলো—আবার আমার মনটা তিক্ত হোয়ে উঠলো। অজস্র লোভ দেখানো যখন অসহ্য হোয়ে উঠলো তখন বাধ্য হোয়ে বললাম, এ-সব সম্বন্ধে আর একটি কথাও আমি শুনতে চাই না। এই বলে আমি যেই বিদায় নেবার জন্তে উঠলাম তখনি ভদ্রলোকটি জানালেন যে, তাঁর মা আর বোনের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করাতে চান। এই বলে বেরিয়ে গেলেন, মিনিট হুইয়ের ভিতরই তাঁদের নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মায়ের দিকে দেখলাম আভিজাত্যে, স্নেহে, সরলতায় প্রকৃত মাতৃমূর্ত্তি। আর মেয়ে? শুধু সুন্দরী নয়—সৌন্দর্য্যের আদর্শ ছবি। সে রূপের দিকে চেয়ে শুধু মুগ্ধ নয়—স্তম্ভিত হোয়ে গেলাম।

একটু পরেই মা আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে গেলেন—মেয়েটি রইলো। মাত্র আধ ঘণ্টা—এটুকু সময়ের মধ্যেই ওর রূপ আর গুণের নিখুঁত পরিচয় পেয়ে মনে মনে স্বীকার করলাম আনন্দের উচ্ছলতা অনাঘ্রাত ফুলটির মত নিষ্পাপ পবিত্র চিন্তাধারা···অনাবশ্যক সঙ্কোচহীন সহজ মাধুর্য্য আমার কাছে এক সম্পূর্ণ নূতন সৌন্দর্য্যের দ্বার খুলে দিলে। সবার উপরে ওর আশ্চর্য্য রূপ! সে যেন এক পরম বিস্ময়!

মাদমোয়াজেল 'সি সি' মায়ের সঙ্গে ছাড়া কখনও বেরোয় না। অত্যন্ত বাধ্য মেয়ে। বাবার বেছে দেওয়া বই ছাড়া অন্ত বইও পড়ে না—যদিও উপন্তাসের প্রতি প্রচণ্ড লোভ। ভেনিসকে ভালো করে দেখার জানার প্রবল ইচ্ছা। বাড়ীতে কেউ বেড়াতেও আসে না—তাই আজ অবধি লোকমুখে নিজের আশ্চর্য্য রূপের প্রশংসা শুনে সচেতন হোতে শেখেনি।

মেয়েটির সঙ্গে অনেক কথা কইলাম। কথা বলার চেয়ে তার অনর্গল অজস্র প্রশ্নের উত্তরই দিয়েছি বললে ভালো হয়। তাও তার অজস্র জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করতে পারিনি। ওর মনটি যেন মুদিত শতদল—আলোর কিরণে সন্ত পাপড়ী মেলেছে—চোখে লেগে আছে মুগ্ধতার আবেগ—মনটিকে ঘিরে আছে বিচিত্র বিস্ময়। আমি ওকে বলতে পারলাম না—সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী, আমার সমস্ত মন তোমার বন্দনাগানে মুখর হয়ে উঠেছে—যে স্তুতিগানে বহু বার বহু নারীর কানে কানে গুঞ্জন করেছি—যে আবেদন-নিবেদনে তাদের মুগ্ধ করেছি—সে সবই যেন অর্থহীন হোয়ে উঠলো—মিথ্যায়, ছলনায় ওই সরল নিষ্পাপ মাধুর্য্যকে মলিন করতে মন সায় দিলে না—ও যে একক, ও যে অনন্তা।

ওদের বাড়ী থেকে সেদিন ফিরলাম ভারাক্রান্ত, অতৃপ্ত মনে। মাধুর্য্য আর সৌন্দর্য্যের এই অপরূপ বিকাশ আমার সমস্ত মনকে দুর্ব্বার চঞ্চল করে তুলছিলো। বাড়ী এসে প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করলাম, আর ওখানে যাবো না। ওকে দেখলে আমার মন কখনই ধৈর্য্য ধরতে পারবে না—কিন্তু ওকে বিয়ে করে এই স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবনকে শৃঙ্খলিত করতে আমি চাই না—আমি যে জন্ম-যাযাবর। তবুও মনে মনে বার বার স্বীকার করলাম, আমার জীবনে সুখের আনন্দের অমৃতধারা-সিঞ্চন শুধু ও-ই করতে পারবে।

হু'দিন কেটে গেলো। তৃতীয় দিনে আমার সঙ্গে রাস্তায় অফিসার ভদ্রলোকটির দেখা হোলো। দেখা হোতেই 'পি. সি.' বললেন যে, তাঁর বোন না কি সারাক্ষণ আমার কথা বলে।. সেদিন আমার সঙ্গে যা কিছু হোয়েছিলো সব ও মনে রেখেছে···প্রায়ই সে সব বলে। তাঁর মা-ও না কি আমাকে দেখে আমার সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত আনন্দিত হোয়েছেন। আরও বললেন, আমার বোনের সঙ্গে আপনার বিয়ে হলে কিছু খারাপ হবে না। ওর বিয়ের জন্ত দশ হাজার মুদ্রা যৌতুক আছে। আমাকে আবার পরদিন চায়ের নিমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, তাঁর মা আর বোনের সঙ্গেও দেখা হবে আবার।

নাঃ, আমি কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম কিছুতেই আর না যাবার। কিন্তু হায় রে প্রতিজ্ঞা! এ সব ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাও তো পদ্মপত্রে জলবিন্দু!

তিনটি ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল আমার মানস-লক্ষ্মীর সাহচর্য্যে। কি মধুর তৃপ্তিতেই না মন ভরে উঠেছিলো সেদিন ফেরার পথে! আসার সময় 'সি সি'কে বলেছিলাম সেই ভাগ্যবান পুরুষকে আমার হিংসা হয়, যে তোমাকে পাবে তার জীবনসঙ্গিনীরূপে।

পরিচয়—প্রথম শুনলো মুগ্ধ প্রশংসার বাণী। চকিতে লজ্জায় দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললে—সারা মুখের সে আবীর-ছড়ানো গাঢ় রক্তিমাভা আমার দুই চোখ আচ্ছন্ন করে দিলো।

ফেরার পথে সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে নিজের মনকে যাচাই করতে লাগলাম। আর নিজের মনের প্রকৃত স্বরূপ যতই ধরা দিতে লাগলো ততই মন ভরে উঠতে লাগলো আশঙ্কায়। ওকে জীবনসঙ্গিনী করার দুর্বার প্রলোভনকে যেমন সংযত রাখতে পারছি না—তেমনি ওকে দু' দিনের বিলাসসঙ্গিনী করার ইঙ্গিতও যদি কেউ করে তবে তাকে সেই মুহূর্তে খুন করার মত প্রচণ্ড ক্রোধকেও সম্বরণ করার মত জোর পাচ্ছি না। আমার সমস্ত মন এই দুই ধারার মাঝে পড়ে দিশাহারা হোলো। অন্যমনস্ক হবার চেষ্টায় জুয়াখেলা ধরলাম। হৃদয়-রোগের অব্যর্থ ওষুধ বলেই জানতাম জুয়াখেলাটাকে।

পরদিন আবার 'সি, সি' এসে হাজির। খুব উৎফুল্ল ভাবে জানালে যে, ওর মা ওর বোনকে নিয়ে অপেরা দেখতে যেতে অনুমতি দিয়েছেন। আর, 'সি, সি'ও ভারী খুশী, জীবনেও এ-সব দেখেনি বলে।

আরও বললে যে, যদি ইচ্ছা করি তবে আমিও ওদের সঙ্গে যে-কোনো জায়গাতেই দেখা করতে পারি।

—"আপনার বোন কি জানে যে, আমিও আপনাদের সঙ্গী হবো?"

—"নিশ্চয়ই···আর তাই তো অত খুশী হোয়ে উঠেছে।"

—"আর আপনার মা?—তিনি জানেন তো?"

—"না, কিন্তু একথা শুনলে একটুও রাগ করবেন না বরং খুশীই হবেন। ইতিমধ্যেই আপনার উপর মায়ের বিশ্বাস আর আস্থা যথেষ্ট হোয়েছে।"

—"আচ্ছা, আমি একটা 'বক্স' নেবার চেষ্টা করবো।"

—"খুব ভালো—আর একটা জায়গা ঠিক করে বলবেন, সেখানেই আমরা আসবো।"

শয়তানটা সেদিন ওর ব্যবসার কথা মোটেই তুললে না। আর যেই দেখেছে আমি ওর প্রেমিকাটির প্রতি নজর না দিয়ে ওর বোনকে দেখে রীতিমত মুগ্ধ হোয়েছি, তখনি মনে মনে আঁচ করেছে, আমার ভালোবাসার সুযোগ নিয়ে আমার কাছে বোনটিকে বিক্রী করার। তাই এত প্রলোভন। সমস্ত মনটা ব্যথায় ভরে উঠলো—এই শয়তানটাকে দুটি নিষ্পাপ সরলা নারী সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে, স্নেহ করে। কিন্তু হায় রে মুগ্ধ প্রেম! তা সত্বেও পারলাম না শয়তানটার আমন্ত্রণ এড়াতে···তবু তো আবার তার সঙ্গ পাবো··· সেই রূপ-মাধুর্য্যের কামনায় সমস্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই ভেসে গেল। মনকে বোঝালাম, আমি ওকে ভালোবাসি, ওর সমস্ত বিপদ থেকে ওকে রক্ষা করাই তো আমার কর্ত্তব্য। ভালোবাসি বলেই তো সরে দাঁড়াতে পারি না···যদি আর কোনো শয়তান, দুশ্চরিত্র লোকের কবলে পড়ে ওর সর্ব্বনাশ হয়!···সে চিন্তাটাই যে আমার কাছে অসহ্য। মনে হোলো, আমার সঙ্গে থাকলে ওর বুঝি কোনো ভয়-আশঙ্কাই নেই। আমার কাছে ওর কোনো অনিষ্ট সাধনই হোতে পারে না।

সেন্ট স্যামুয়েল অপেরাতে একটি 'বক্স' কিনলাম। তার পর বহু আগেই এসে নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওরা যখন এলো, তখন আমার কিশোরী মানসীটিকে দেখেই আমার সমস্ত ভাইয়ের পরনে সেই অফিসারের পোষাক। আমার গণ্ডোলাতেই ওদের আসতে বললাম। পথে ওর ভাই সেই মহিলাটির বাড়ীতে নেমে গেল। জানালে মাদাম-সি—অত্যন্ত অসুস্থ তাই ত দেখা করতে যাচ্ছে, পরে এসে আমাদের সঙ্গে মিলবে। আমি অবাক হোলাম যে, 'সি সি' এতটুকু বিস্ময় কিম্বা অনিচ্ছা প্রকাশ করল না, আমার সঙ্গে একলা গণ্ডোলাতে যেতে। ভাইটি চোখের আড়াল হোতেই আমি বুঝলাম যে, শয়তানটা বোধ হয় এই মতলব ইচ্ছা করেই করেছে—লাভের আশায়।

আমি 'সি সি'কে বললাম, অপেরা সুরু হবার সময় অবধি আমরা গণ্ডোলাতেই বেড়াই। আরও বললাম, এত গরমে মুখোশে কষ্ট হবে, ওটা খুলে ফেলাই ভালো। একটুও আপত্তি না করে 'সি সি' তখনি মুখোশটা খুলে ফেললো।

ওকে সম্মান জানানোর, ওর প্রতি কর্ত্তব্যের যে প্রতিজ্ঞা আমার মনে ছিলো—ওর দেহের সেই শান্ত, মধুর, পবিত্র সৌন্দর্য্য···ওর আশ্চর্য্য সরল বিশ্বাসে ভরা মন···ওর নির্দ্দোষ খুশী-ভরা ব্যগ্র-চঞ্চল ব্যবহার···সব মিলিয়ে যেন আমার বুকের মধ্যে ঝড় বইয়ে দিচ্ছিলো।

কি কথা ওকে বলবো, ভেবে পাচ্ছিলাম না···মনের মধ্যে যে অজস্র কথা মাথা কুটে মরছিলো, সেকথা কি ওকে শোনানো যায়? সে তীব্র অনুভূতি, সে আবেগ-চঞ্চল ভালোবাসার প্রকাশ কি ও সইতে পারবে!···স্তব্ধ হোয়ে শুধু ওর অপরূপ লাবণ্যে ঢলঢল মুখখানির দিকে চেয়ে রইলাম···ওর ওই সুঠাম দেহের সুষমায় ভরা বর্ণচ্ছটার দিক হোতে দৃষ্টি ফিরিয়ে। পাছে আমার কামনা-দৃষ্টিতে ম্লান হোয়ে পড়ে ওই আনন্দ-শতদল।

—"কিছু কথা বলুন···শুধু আমার দিকে চেয়েই রয়েছেন তখন থেকে, একটি কথাও না বলে। আজ আপনার সময়টা মিথ্যে নষ্ট হোলো আমার জন্যে···তাই না? দাদার সঙ্গে আপনি তো যেতে পারতেন তা নাহলে দাদার বান্ধবীর কাছে···শুনেছি অপ্সরার মত সুন্দরী সে।"

—"আমি দেখেছি তাঁকে।"

—"উনি খুব বুদ্ধিমতী না?"

—"হোতে পারে···সেটা জানার সুযোগ হয়নি আমার। আমি তাঁর বাড়ী কখনও যাইনি···যাবার বাসনাও নেই। কিন্তু ওগো সুন্দরী 'সিসি', তার জন্যে তোমার একটুও চিন্তা করার দরকার নেই··· আমার সময় এতটুকুও বৃথা যায়নি"—

—"আমার কিন্তু তাই মনে হোয়েছিলো। সারাক্ষণ আপনি একটিও কথা বলছেন না দেখে আমি ভেবেছিলাম আপনি মনে মনে দুঃখিত হোয়েছেন।"

—"কেন কথা বলিনি বুঝবে কি? বলতে পারিনি···তোমার মধুর, অমলিন সান্নিধ্য আমার সমস্ত সত্তাকে নিবিড় সুখে মূর্চ্ছাতুর করে তুলেছে—সে গভীর অনুভূতির অনুরণন ভাষায় ফোটে না"···

—"আমারও ভারী ভালো লেগেছে আপনাকে···শুধু ভালো লাগা নয়, আপনার উপর নিশ্চিন্ত নির্ভর আর বিশ্বাস আমার মনে জেগেছে। সত্যি দাদার সঙ্গে থাকার চেয়ে আপনার সঙ্গে আমি যেন অনেক নিরাপদ অনেক নিশ্চিন্ততা অনুভব করছি। মা বলেন,

লোক। তাছাড়া আপনি বিবাহিতও নন। এই কথাটাই আমি মাকে সবার আগে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মনে আছে আপনার··· একদিন বলেছিলেন, আমাকে যে বিয়ে করবে তার ভাগ্যকে আপনি হিংসা করেন? সেই সময় আমিও বলেছিলাম আপনাকে যে স্বামিরূপে পাবে, সারা ভেনিসে সেই সবচেয়ে সুখী নারী।"

কী অদ্ভুত সরলতা, আর অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসে ভরা কথাগুলি। ওর গলার মিষ্টি রিনরিনে স্বরটি অবধি যেন মনের সব ক'টি তার ছুঁয়ে যায়। ওর কোমল কিশলয়ের মত পেলব রক্তিম দুটি ওষ্ঠে আমার অনুরাগের চিহ্ন এঁকে দেবার দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা প্রাণপণে দমন করলাম ···না পাওয়ার বেদনাকে ছাপিয়ে উঠলো আর এক পাওয়ার তীব্র মধুর অনুভূতি···আমি পেয়েছি আমার মানসলক্ষ্মীর স্বীকৃতি··· জেনেছি তার ভালোবাসা আমাকে ঘিরেই ভালোবাসার রূপ পেয়েছে।

—"মানসী আমার! দু'জনার মনই যখন একই সুরে বাঁধা তখন অভেদ বন্ধনের মধ্যেই আমরা সুখের উৎস খুঁজে পাবো— মিলনেই ভরে উঠবে আমাদের সব শূন্যতা। কিন্তু হায় রে, সবচেয়ে বড় বাধা যে আমার বার্দ্ধক্য। আমি তোমার বাবার বয়সী হবো প্রায়—"

—"বাবার বয়সী! কি ভেবেছেন! জানেন আমার বয়স চোদ্দ পূর্ণ হোয়ে গেছে?"

—"আর আমি যে চোদ্দ দু'গুণে আটাশ!"

—"আচ্ছা বেশ! দেখান তো একজনকেও, অন্ততঃ যার আটাশ বছরে আমার বয়সী মেয়ে আছে? আপনি বাবার বয়সী ভাবলেও যে হাসি আসছে আমার।"

থিয়েটারের সামনে এসে আমরা গণ্ডোলা থেকে নেমে পড়লাম। অপেরাতে ঢুকে বক্সে গিয়ে বসলাম···মুখোশ চশমাতে 'সিসি'র মুখ প্রায় ঢেকে গিয়েছিলো। ওর দাদার দেখা নেই—শেষ হবার একটু আগে এসে পৌঁছালো। বুঝলাম এটাও ওর মতলবেরই অংশ।

এবার আমিই ওদের আহারের নিমন্ত্রণ জানালাম। কিন্তু আহারের সমস্ত সময়টা সত্তজাগ্রত তীব্র প্রেমের অনুভূতি আমাকে এমন করে গ্রাস করেছিলো যে একটি কথাও আমি বলতে পারলাম না। দাঁতের ব্যথার ভাণ করলাম। ওরাও আমার নীরবতার এই ছলনায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলে। আহারের শেষে 'পি, সি' ওর বোনকে জানালে যে আমি ওকে ভালোবাসি, আর তাই ওকে আলিঙ্গন করলে আমার ব্যথার উপশম হোতে পারে। 'সি সি' তখনই এগিয়ে এলো আমার কাছে···এসে ওর হাস্যোজ্জ্বল রক্তিম মধুর ঠোঁট দু'খানি আমার মুখের দিকে তুলে ধরলে···সে আমন্ত্রণে আমার রক্তে যেন আগুন জ্বলে উঠলো···কিন্তু ওর ওই নিষ্পাপ পবিত্র সরল মূর্ত্তি আমার সমস্ত কামনার উপর যে শ্রদ্ধার আসন পেতেছিলো তারই জয় হোলো শেষ পর্য্যন্ত। তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হোয়েও শান্ত ধীর ভাবে ওর ললাটে এঁকে দিলাম একটি স্নেহ-চুম্বন।

—"এ কী! এ কেমন চুম্বন? যান ওকে প্রকৃত প্রেমিকের মত চুম্বন করুন।"

ওর কথা শুনেও শুনলাম না। 'পি, সি'র এই ওপর-পড়া ভণ্ডামিতে আমার যথেষ্ট বিরক্তি ধরছিলো। কিন্তু ওর বোন মুখখানি ফিরিয়ে অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে বলে উঠলো,—"ওঁকে জোর কোরো না দাদা! আমি হয়তো ওঁকে সত্যিকারের আনন্দ দিতে পারিনি।"

আমার ভালোবাসা যেন মুহূর্ত্তে সচেতন হোয়ে উঠলো প্রবল প্রতিবাদে। আর আত্মসম্বরণ অসম্ভব—"কী? কি বলছো— তুমি 'সি'···জান না তুমি আমার সমস্ত মন ভরে রয়েছো—আমার সমস্ত কল্পনাকে রূপ দিয়েছো···আমার এই কঠিন আত্মসংযমকে তুমি ভুল বুঝলে? তুমি বিশ্বাস করতে পারলে যে আমি তোমাতে তৃপ্ত নই? বেশ, যদি চুম্বনই আমার ভালোবাসার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারে তবে নাও, আমার সমস্ত ভালোবাসার গভীরতা নিবিড় হোয়ে ফুটে উঠুক আমার চুম্বনে।"

প্রসারিত দুটি বাহুর মধ্যে বন্দিনী হোলো আমার মানস প্রতিমা। ওর সুঠাম তনুলতা আমার তৃষিত ব্যাকুল বক্ষের উপর টেনে নিলাম···এঁকে দিলাম অনুরাগের গাঢ় চুম্বন, কামনার রক্ত-রাঙা রেখা দু'টি কোমল বিহ্বল ওষ্ঠে···। কিন্তু অনুভব করলাম সেই বলিষ্ঠ, লুব্ধ আলিঙ্গনের আড়ালে ভীরু কপোতীর থরথর কম্পিত হৃৎস্পন্দন।···ধীরে ধীরে নিজেকে আমার আলিঙ্গনমুক্ত কোরে নিলেও···দুটি চোখে নির্ব্বাক বিস্ময়···সে কি আমার প্রেমের এই দুরন্ত উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেয়ে?

ধীরে ধীরে নিজের মুখোশটা পরে নিলে 'সিসি', মনের ভাবকে গোপন করার জন্যেই হয়ত আমি তবু জিজ্ঞাসা করলাম, এখনও সন্দেহ আছে কিনা আমাকে সুখী করতে পারেনি এই চিন্তায়?

—"না, সব সন্দেহ আপনি ঘুচিয়ে দিয়েছেন।"

এইবার পরস্পরের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলাম। যাবার সময় মুখোশটা পরে নিলাম। পথে ওদের নামিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরলাম। ভালোবাসার তীব্র মধুর অনুভূতিতে তখন আমার সমস্ত মন ভরে আছে—তবু মনের কোণে কোথায় যেন একটু বিষাদের ছোঁয়া লেগেছিলো।

পরদিন 'পি, সি' আমার ঘরে এসে হাজির রীতিমত বিজয়ীর ভঙ্গিতে। বললে, ওর বোন নাকি মায়ের কাছে জানিয়েছে যে আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি আর যদি বিয়ে করতেই হয়, তবে শুধু আমাকে পেলেই ওর জীবনে সুখী হওয়া সম্ভব হবে।

—"ওর সাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু আপনার কি মনে হয়, আপনার বাবা আমার হাতে ওকে সমর্পণ করতে রাজী হবেন?"

—"আমি জানি না—তবে তাঁর বয়সও বেশ হোয়েছে। যাই হোক, আপনার ভালবাসায় আশঙ্কার কিছু নেই। আজ সন্ধ্যাতেও মা 'সি, সি'কে আমাদের সঙ্গে অপেরা দেখতে যাবার অনুমতি দিয়েছেন।"

"—বেশ তো, তাহলে আমরা যাবো।"

—"কিন্তু একটা কথা, অনুগ্রহ করে আমার একটা কাজ করবেন?"

—"আদেশ করুন।"

—"খুব ভালো সাইপ্রিয়ান মদ বিক্রী আছে ব সস্তায়। আমি হ্যাণ্ডনোটে এক পিপে পেতে পারি, মাসিক কিস্তীতে ছ'মাসে শোধ করলেই হবে। আর ঐ মদ এক্ষুণি রীতিমত চড়া দামে বিক্রী হোয়ে যাবে, এ আমি জোর গলায় বলতে পারি। কিন্তু ব্যবসাদারটি একটু কড়া একটা জামিন চায়। আপনি যদি রাজী হন সই করতে, তাহলেই ও দেবে।"

—"আনন্দের সঙ্গেই রাজী।"

আমি হ্যাণ্ডনোটে সই করে দিলাম একটুও দ্বিধা না করে। কারণ প্রেমিকের মনে যে সদাই ভয়—যদি আপত্তি করলে ও আমার প্রেমের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে তার শোধ তোলে? সন্ধ্যায় ওদের সঙ্গে কোথায় দেখা হবে সেটা ঠিক করে নিয়ে বিদায় নিলাম। বাইরে বেরোবার জন্তে তৈরী হোয়ে কি মনে করে সোজা দোকানে গেলাম। সেখান থেকে এক ডজন দস্তানা, রাশীকৃত রেশমী মোজা কিনলাম আর একটি সুন্দর এমব্রয়ডারী করা সোনার ক্লিপ দেওয়া গার্টার কিনলাম, আমার নতুন পাওয়া মনভরানো বান্ধবীর হাতে প্রথম উপহার তুলে দেবার আনন্দে উৎফুল্ল হোয়ে উঠলাম।

আমি ঠিক সময়েই আমাদের নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে পৌছলাম—কিন্তু দেখি ওরা আগেই এসে আমার জন্তে অপেক্ষা করছে। আমি যেতেই 'পি, সি' জানালে যে ওর কাজ আছে, তাই বোনকে আমার কাছে রেখে ওকে এখনি চলে যেতে হবে, একেবারে অপেরাতে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। ও চলে যেতে আমি 'সি সি'কে বললাম, "যতক্ষণ না অপেরা শুরু হয় ততক্ষণ গণ্ডোলাতে করে একটু বেড়ানো যাক।"

—"না, তার চেয়ে জুক্কার বাগানে একটু বেড়িয়ে আসি চলুন।"

—"খুব রাজী আমি।"

আমি একটা সাধারণ গণ্ডোলা ভাড়া করলাম। তারপর সেণ্ট ব্লেজের একটি বাগানের দিকে চললাম—আমি জানতাম ঐ বাগান এক সেকুইনে (ইতালীয় মুদ্রা) সারাদিনের জন্তে ভাড়া পাওয়া যায়, আর কেউ ঢুকতে পাবে না। সেখানে গিয়ে দেখলাম আমাদের দু'জনার কারোই খাওয়া হয়নি। অতএব একটি বেশ উপাদেয় ভোজের অর্ডার দিয়ে সোজা বাগানবাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়লাম। সেখানে মুখোস ইত্যাদি খুলে দু'জনেই বাগানে নেমে এলাম। 'সিসি' একটি তাফতার ব্লাউস আর ওরই একটি হ্রস্ব স্কার্ট পরেছিলো। কিন্তু এই স্বল্প আবরণে ওর দেহের লাবণ্য যেন উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠেছিলো। আমার গভীর অনুরাগের দৃষ্টি ওর আবরণ ভেদ করে ওর পূর্ণ প্রকাশকে নন্দিত করলে—সমস্ত অন্তর মথিত করে বেরিয়ে এলো দুর্ব্বার কামনা আর প্রচণ্ড সংযমের মিলিত দীর্ঘশ্বাস।

সবুজ ঘাসে পা দিয়েই আমার কিশোরী লীলাসঙ্গিনী বন-কুরঙ্গীর মত চঞ্চল হোয়ে উঠলো, দিনের পর দিন অন্তঃপুরের আড়াল থেকে এমন অবাধ মুক্তির হাওয়ায় ও যেন নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। প্রজাপতির মত উচ্ছল আনন্দে এদিক সেদিক সমানে ছুটোছুটি করতে লাগলো। শেষ কালে হাঁফিয়ে উঠে ছুটে এসে আমার সামনে ধপ করে বসে পড়লো। তারপরই আমার চোখে সস্মিত স্নেহের মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে উচ্চ মধুর কণ্ঠে হেসে উঠলো। পরমুহূর্ত্তেই আবদার ধরলো আমার সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করবে। রাজি হলাম তখনি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর সঙ্গে একটা বাজী ফেলতে চাইলাম।

—"যে হারবে তাকে কিন্তু যে জিতবে তার সব দাবী মানতে হবে"—

—"আমি রাজী।"

দু'জনেই শুরু করলাম দৌড়তে। বেশ বুঝলাম জয় আমার অনিবার্য্য। কিন্তু তখনি কৌতূহল হোলো, আমি হারলে আমার কাছ থেকে ও কী দাবী করে সেটা জানবার। ইচ্ছে করে পিছিয়ে পড়লাম—তখনও 'সিসি' প্রাণপণে ছুটে চলেছে—চট্ করে ও পৌঁছে গেল আমার আগেই। দম নিতে নিতে ওর মাথায় কি দুষ্টবুদ্ধি এলো, চট্ করে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে ওর আংটিটা আমাকে খুঁজে বের করতে বললে। আমি টের পেয়েছিলাম আংটিটা ও নিজের কাছেই রেখেছে—এতে ওকে স্পর্শ করবার অধিকার ও আপনিই আমাকে দিলে। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম অন্যায় সুবিধা ওর কাছ থেকে কিছুতেই নেবো না—ওর সরল বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করবো না।

ঘাসের উপর দু'জনেই বসে পড়লাম। আমি ওর পকেট হাতড়ালাম, ওর জামার ভাঁজগুলির ভিতর দেখলাম, জুতো খুলে দেখলাম শেষ অবধি ওর গার্টার অবধি খুঁজে দেখলাম। হাঁটুর উপরই গার্টার আটকানো ছিলো—কিন্তু সেখানেও পেলাম না। আমি ঠিক জানতাম ওরই কাছে লুকানো আছে তাই ওটা খুঁজে বের করবই, ঠিক করে আরও খুঁজতে লাগলাম। এবার আমি নিঃসন্দেহেই বুঝেছিলাম তন্বী তনুদেহখানির কোন গোপনে সেটি লুকানো আছে। সে কথা ভাবতেই মধুর আবেশে সারা দেহ-মন যেন রোমাঞ্চিত হোয়ে উঠলো। ওর উষ্ণ, কোমল সুগঠিত বক্ষের মাঝ থেকেই আংটিটা উদ্ধার হোলো—কিন্তু সেই পেলব স্পর্শে আমার হাতখানি থরথর করে কেঁপে উঠছিলো শিরায় শিরায় ব'য়ে যাচ্ছিল অজানা পুলকের আগুন-জ্বালা স্রোত···

—"অত কাঁপছেন কেন?"

—"আনন্দে···তোমার আংটিটা অমন করে লুকানো সত্ত্বেও খুঁজে পাবার আনন্দে। কিন্তু আবার তোমাকে দ্বিবৃতি প্রতি-যোগিতায় নামতে হবে এবার কিছুতেই তুমি জিততে পারবে না—"

আবার ছুটতে শুরু করলাম। 'সিসি' বেশী জোরে ছুটতে পারছে না দেখে আমিও গতি মন্থর করে দিলাম নিশ্চিন্ত ভাবে। কিন্তু ঠকতে হোলো এইবার গোড়ার দিকে এই ভাবে দম রেখে, হঠাৎ ও তীরের মত ছুটে এগিয়ে গেল। পরাজয় নিশ্চিত জেনে মাথায় জাগলো দারুণ একটা মতলব—যন্ত্রণায় চীৎকার করে সজোরে পড়ে গেলাম মাটিতে। বেচারী সরলা কিশোরী, আমাকে পড়ে যেতে দেখেই থেমে গেল। তারপর আমাকে তোলবার জন্তে ছুটে আমার দিকে এগিয়ে এলো। যেই আমার হাত ধরে তুলেছে সেই মুহূর্ত্তেই আমি সোজা দাঁড়িয়ে উঠে হাসতে হাসতে ছুট দিলাম প্রাণপণে···অনেক অনেক পিছনে ওকে ফেলে রেখে।

অভিমানিনী কিশোরী অপরূপ ভ্রূভঙ্গী করে ক্ষুব্ধ স্বরে বললে,—"তাহলে সত্যিই আপনার লাগেনি?"

—"একটুও না—আমি তো ইচ্ছা করেই পড়েছিলাম"

—"ইচ্ছা করে···আমাকে ঠকাবার জন্তে···আমি ভাবতেই পারি না আপনি ঠকাতে পারেন···না, না জুয়াচুরি করে জেতাটা মোটেই জেতা নয় আমি মোটেই হারিনি—"

—"নিশ্চয়ই, একশো বার হেরেছো, আমি তো তোমার আগে পৌঁছে গেছি। আর চালাকীর বদলে চালাকী করা খুব চলে··· বল সত্যি করে, প্রথমটা আস্তে ছুটে হঠাৎ তীরের মত গতি বাড়িয়ে আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করনি?"

—"ওটা খুবই চলে···কিন্তু আপনারটা একেবারেই অন্তরকম ···ওটা মোটেই খেলাতে চলে না।"

—"কিন্তু ওইতেই তো জিততে পারলাম আমি।"

—"জয় জয়ই···প্রতারণা আর সাধুতা—ন্যায় আর অন্যায় যে পথেই তা হোক না কেন?"

—"হ্যাঁ আমার দাদার মুখে প্রায়ই এই ধরণের কথা শুনি। কিন্তু বাবার কাছে কখনও শুনিনি। আচ্ছা বেশ, মেনে নিলাম আমি হেরেছি ··এখন বলুন কি দাবী আপনার···আমি তাই মানবো।"

—"দাঁড়াও। আপাততঃ এখানে বসা যাক, কারণ ভাবতে হবে তো···হোয়েছে, আমার দাবী হোলো তোমার সঙ্গে আমার গার্টার বদল করবো।"

—"গার্টার? আমারটা দেখেছেন? বিশ্রী, পুরানো, কিছু কাজে লাগবে না।"

—"তাতে কি হোয়েছে? দিনে অন্ততঃ দু'বার তো গার্টার খুলতে হবে···দু'বারই মনে পড়বে যাকে ভালোবাসি তার মুখখানি··· আর তুমিও একই সময় আমার কথা ভাবতে বাধ্য হবে।"

—"বাঃ বেশ মজা হবে! আমি খুব রাজী। নাঃ, আপনি ঠকিয়ে জিতেছেন বলে আর আমার কোনো দুঃখ নেই···এই যে আমার বিশ্রী গার্টার দু'টো।"

—"আর এই যে আমারটা।"

—"উঃ কি দুষ্ট আপনি! কী চমৎকার; কী সুন্দর দেখতে ওগুলি? সত্যি চমৎকার উপহার! মা-ও কী খুসী হবেন দেখলে। নিশ্চয়ই ওটা আপনার উপহারের জিনিষ, একেবারে আনকোরা নতুন দেখছি যে···"

—"নাঃ আমাকে কেউ উপহার দেয়নি। আমিই তোমাকে দেবো বলে কিনেছিলাম···তোমাকে দেবার সুযোগ খুঁজছিলাম এমন ভাবে যাতে তুমি না ফিরিয়ে দিতে পারো। এবার বুঝছো তো, তোমাকে দৌড়তে জিততে দেখে আমি কি রকম হতাশ হোয়ে পড়েছিলাম···তাই তো বাধ্য হোয়ে ছলনার আশ্রয় নিতে হোলো।"

—"কিন্তু আমি নিশ্চয় বলতে পারি, তাইতে আমি যে কী কষ্ট পেয়েছি, জানলে আপনি অমন ছলনা কখনই করতে পারতেন না—"

—"আমার সম্বন্ধে তুমি এমন গভীর ভাবে অনুভব করো?"

—"একথা আপনাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে আমি কী না করতে পারি? যাক্, আমার কিন্তু ভারী ভালো লেগেছে, খুব পছন্দ হোয়েছে এই সুন্দর গার্টার দু'টো। সাবধানে রাখতে হবে, যাতে দাদার নজরে না পড়ে। তাহলেই চুরি করবে।"

—"সত্যি সত্যি চুরি করতে পারবে?"

—"খুব পারবে, বিশেষ করে ক্লিপ দু'টো যদি সোনার হয়—"

—"ওদু'টো সোনারই। কিন্তু তুমি ওকে বোলো ও দুটো পিতলের উপর সোনার জল করা।"

—"কিন্তু কেমন করে ক্লিপ দু'টো আটকায় আমাকে শিখিয়ে দেবেন?"

—"নিশ্চয়ই দেবো।"

তখনি দেখিয়ে দেবার জন্য ও ব্যগ্র হোয়ে উঠলো। ওর মনে কোনো দ্বিধা কোনো সঙ্কোচের লেশ নেই। কোনো ছলা-কলা কোনো চাতুরীই আজও ওর নিষ্পাপ সরল মনটিকে স্পর্শ করতে পারেনি। চতুর্দশ বসন্তের অনাহত মাধুরী আজও পায়নি সোহাগের আলিঙ্গন, কামনার তপ্ত স্পর্শ। সমাজ আর সঙ্গিনী দুই-এরই অভাব ওকে সচেতন হোতে দেয়নি ওর বিকচোন্মুখ যৌবনের আগমনীতে। যৌবনের দুর্ব্বার আকাঙ্খা কামনার লেলিহান শিখা কেমন করে ইন্ধন পেয়ে ফুলে ওঠে সে রহস্য আজও ওর অজানা। যখন কুমারী-মনের অনুভূতিতে প্রথম অনুরাগের রঙ জাগলো তখনি প্রথম প্রেমের অসহ পুলকে সমস্ত মনটি নিবেদন করে বসলো—একান্ত-বিশ্বাসে সরল নির্ভরতায়। কিছু গোপন কিছু অদেয় থাকবে না···তাইতেই বুঝি ভালোবাসার পরম প্রতিদান দিতে পারবে।

মোজা দু'টো এত ছোটো যে হাঁটুর উপর গার্টারের ক্লিপ আঁটা গেল না। তাই দেখে 'সি সি' বললে এবার থেকে লম্বা মোজা পরবে। তক্ষুণি পকেট থেকে রেশমী মোজাগুলি বার করে ওর সামনে ধরলাম—সস্নেহ অনুরোধ জানালাম ওগুলি গ্রহণ করতে। আনন্দে কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হোয়ে ছোটো মেয়েটির মত ছুটে এসে আমার কোলের উপর বসে পড়লো, তারপর মনের উচ্ছল খুশীতে আমাকে অজস্র চুম্বনে ভরে দিলে···ঠিক যেমন ভাবে ওর বাবার কাছ থেকে কোনো উপহার পেলে বাবাকে আদর করতো, ঠিক তেমনি সারল্যে তেমনি খুশীভরা চাঞ্চল্যে। প্রতিদানে আমিও চুম্বন করলাম কামনার তপ্তবাষ্প বুকের মধ্যে চেপে রেখে। ওর কানে কানে অস্ফুটে শুধু বললাম, ওর একটি চুম্বনের জন্য সমস্ত সাম্রাজ্যও বিলিয়ে দেওয়া যায়।

আমার কিশোরী প্রিয়া নিতান্ত অবহেলায় খুলে ফেললো ওর পুরানো মোজা দু'টি। আমার দেওয়া নতুন রেশমী মোজা নিয়ে স্বচ্ছন্দে পরে নিলে···বেশ লম্বা ছিলো এগুলি, প্রায় ওর উরুর মাঝামাঝি এলো—আমি অবাক হোয়ে দেখলাম ওর নিঃসঙ্কোচ আশ্চর্য্য সরলতা, ও যেন আমার সামনে ফাঁদে-পড়া বন্য-হরিণী সম্পূর্ণ আয়ত্তে পাওয়া, ধরা দেওয়া এই মুগ্ধ শিকারকে আক্রমণ করতে আমার সমস্ত পৌরুষ যেন তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলো।

আমরা দু'জনে বাগানে বেড়াতে লাগলাম। প্রায় সন্ধ্যার সময় আমরা অপেরাতে গিয়ে হাজির হলাম—মুখোশ টুখোশ পরে···কারণ থিয়েটারের হলটি বেশ ছোটো—যদি কেউ চিনে ফেলে! 'সিসি' বলেছিলো ওর বাবা যদি টের পান যে ও এই ভাবে অপেরা ইত্যাদি দেখে, তাহলে বাইরে বেরোনোই বন্ধ করে দেবেন। অপেরাতে এসে ওর দাদাকে কোথাও না দেখে দু'জনেই একটু আশ্চর্য্য হোলাম। আমাদের ডান পাশে বসেছিলেন স্পেনের রাজদূত আর মাদমোয়াজেল বোলা আর বাঁ দিকে মুখোশ ঢাকা এক ভদ্রলোক আর একজন মহিলা। এঁদের দু'জোড়া চোখ সর্ব্বদাই আমাদের অনুসরণ করছিলো। আমি বেশ টের পাচ্ছিলাম কিন্তু 'সিসি' পিছন ফিরে থাকাতে দেখতে পায়নি। এ অভিনয় দেখতে দেখতে এক সময় 'সিসি' প্রোগ্রামটি নিয়ে বাঁ পাশের বক্সের পার্টিশনের উপর রাখলে। মুখোশ-পরা ভদ্রলোকটি তখনি হাত বাড়িয়ে সেটি তুলে নিলেন। এই দেখে আমার সন্দেহ হোলো এঁরা নিশ্চয়ই পরিচিত কেউ হবেন। 'সিসি'কে ডেকে বলতেই ও পিছন ফিরে দেখলে, দেখেই ওর দাদাকে চিনতে পারলে—পাশের মহিলাটি আর কেউ নন—মাদাম সি।

দ্বিতীয় অঙ্কে ওর দাদা মহিলাটিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ঘরে এলেন। অভিনয়ের পর ক্যাসিনোতে আমাদের একত্রে আহারের অনুরোধ জানালেন।

'সিসি' আর মহিলাটি মুখোশ খুলে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলো। খাবার টেবিলে লক্ষ্য করলাম 'সিসি' মহিলাটির সঙ্গে রীতিমত শ্রদ্ধা আর সম্মানের কথা বলছে—বেচারী মেয়ে···দুনিয়ার রীতিনীতি ওর সবই অজানা! মাদাম সি—কিন্তু তাঁর সমস্ত ছলাকলা সত্ত্বেও আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেন নি—আমি স্পষ্ট দেখলাম গোপন ঈর্ষার ছায়া ওঁর মুখে-চোখে···'সিসি'র অনিন্দিত সৌন্দর্য্য তাঁর রূপের প্রাখর্য্যকেও ছাড়িয়ে গেছে, মুগ্ধ করেছে আমায়···সেখানেই যে পরাজয়ের গ্লানি।

আহার-পর্ব্বের শেষের দিকে সুরার মাত্রাধিক্যে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত অবস্থায় 'পি.সি' মহিলাটিকে আলিঙ্গন করলে তারপর আমাকেও উৎসাহ দিতে লাগলো 'সিসি'কে আলিঙ্গন করতে। আমি উত্তর দিলাম মাদমোয়াজেল 'সিসি'র অনবদ্য সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ বটে কিন্তু যতক্ষণ না ওর হৃদয়ের সত্য অধিকার পাই তত দিন কোনো সুযোগই ওর উপর আমি নেবো না। 'পি. সি' এই নিয়ে ঠাট্টা করতে গেলে মাদাম সি—, তৎক্ষণাৎ ওকে থামিয়ে দিলেন। ওঁর এই সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় পেয়ে মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। পকেট থেকে সেই এক ডজন দস্তানা বের করে ছ'টি নিয়ে তখুনি ওঁকে উপহার দিলাম, বাকী ছ'টি আমার মানসীকে নিবেদন করলাম।

সেই রাত্রে 'পিসি'র সুরার মাত্রাধিক্য ঘটায় কাণ্ডজ্ঞানের যথেষ্ট অভাব ঘটেছিলো। ওর নির্লজ্জ প্রণয়-লীলার দৃশ্য থেকে 'সিসি'র দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলাম···ওর ক্ষুব্ধ, লজ্জিত বিরক্ত দৃষ্টির সামনে আমিও অত্যন্ত অস্বস্তি ভোগ করছিলাম। কোনো মতে সময়টা কাটলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ক্রোধে, ঘৃণায়, তিক্ততায় আমার সমস্ত মনটা ভরে গিয়েছিলো—বেশ বুঝেছিলাম নির্লজ্জ 'পিসি' ওর এই বীভৎস অশ্লীলতার মধ্য দিয়েই ওর বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠার প্রমাণ দেবার চেষ্টা করছে। পরদিন সকালেই আবার যখন এসে হাজির হোলো তখন আমি আর থাকতে না পেরে ওই ব্যবহারের জন্য ভর্ৎসনা করলাম।

আমি বেশ অনুভব করছিলাম দিনে দিনে তিলে তিলে 'সিসি'র প্রতি আমার অনুরাগ কি গভীর হোয়ে উঠছে। এ অনুরাগ প্রেমে করুণায় কল্যাণ কামনায় যেন শতবাহু বিস্তার করে ওকে ঘিরে রাখতে চাইছে সমস্ত বিপদ সমস্ত নিষ্ঠুরতা থেকে। যাতে ওর দাদা নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য কোনো চরিত্রহীন সুবিধাবাদী কারো কবলে ওকে না ফেলতে পারে, সেজন্যে আমি জীবন পণ করেছিলাম।

আমি শুনেছিলাম 'পি.সি' লোকটি মোটেই সুবিধার নয়। ওর আকণ্ঠ ঋণে ভরা। ভিয়েনাতে ও দেউলে হোয়ে বসেছিলো—এমন কি সেখানে ওর স্ত্রী-পুত্রও রয়েছে। ভেনিসে ওর কাণ্ডকারখানায় ওর বাবা ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে অবধি বাধ্য হোন্নে···তা সত্ত্বেও বাড়ীতে রয়েছে জেনে মনের ঘেন্নায় সে কথা না জানারই ভাণ করেন। পরস্ত্রীকে তার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বিপক্ষে টেনে আনতেও ওর বাধে না। তার পর সে মহিলাটির ধন-সম্পত্তি সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে তাকে নিজের কুৎসিত কামনার উপাদান করে রাখতেও ওর দ্বিধা নেই। ওর মা—অন্ধ মাতৃস্নেহে ছেলেকে 'আদর্শ' বলেই মনে করেন। উপযুক্ত ছেলেও মায়ের সমস্ত টাকাকড়ি এমন কি দামী পোষাকগুলি অবধি হরণ করে তার প্রতিদান দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনি।

এবার আমি তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ওর কথাতে কিছুতেই প্রশ্রয় দেব না। নির্দ্দোষ সরলা কিশোরী বোনকে আমার সামনে প্রলোভনের মত তুলে ধরে ওর দুষ্কর্ম্মের সঙ্গী করবে আমাকে, আর আমার ধ্বংসের কারণ হোয়ে দাঁড়াবে সেই নিষ্পাপ ফুলের মত মেয়েটি—এ চিন্তাও যেন আমি সইতে পারছিলাম না। আমি ওকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলাম যে, যদি আমাকে বাধ্য হোয়ে ওর বোনের সঙ্গে দেখা করতেই হয় তাহলে ওর সাহায্য ছাড়াই তা আমি করবো আর 'সিসি' কেও বারণ করবো, যাতে ও দাদার সঙ্গে কোথাও না যায়—ওর চোরাবালির ফাঁদে যেন কিছুতেই না পা দেয়।

এ-সব শুনে 'পি.সি' খুবই কাতর ভঙ্গীতে ক্ষমা চাইলে। ওর মাতলামির জন্যে অত্যন্ত অনুতপ্ত হওয়ার ভাবও দেখালো···ক্ষমা চেয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে আমাকে আলিঙ্গনও করলো। আমার মনটা হয়ত ক্ষণিকের জন্য দুর্ব্বল হচ্ছিল, কিন্তু এমন সময় মেয়ের হাত ধরে মা ঘরে ঢুকলেন। আমার উপহারগুলির জন্যে মা আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন। আমিও সোজাসুজি মাকে জানালাম যে তাঁর মেয়েকে আমি ভালোবাসি আমার ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গিনী করার আশায়, আমার ভালোবাসা তাকে স্ত্রীর মর্য্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আমি আরও বললাম যে, যখন আমি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবো, আমার ভাবী স্ত্রীকে স্বাচ্ছন্দ্য দেবার ক্ষমতা অর্জ্জন করবো, তখন আমি নিজেই তাঁর স্বামীর কাছে প্রার্থনা জানাবো তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণের।

এই বলে আমি মায়ের হাতখানি চুম্বন করলাম। মনের উত্তেজনায় আর আবেগে আমার চোখ দিয়ে তখন ঝর-ঝর করে জল পড়ছিলো। সেই আবেগের ছোঁয়া মায়ের মনেও লাগলো। অশ্রুসিক্ত হোয়ে উঠলো তাঁর ছুটি আঁখিপল্লব। গভীর স্নেহে আমাকে আশীর্বাদ জানিয়ে মনের আবেগ লুকোতেই বুঝি উঠে গেলেন ঘর থেকে—'সিসি'কে রেখে। ছুনিয়াতে এমন মা বিরল নয়। স্নেহে, মমতায় করুণায়, কোমলতায় এঁদের অণু-পরমাণু গড়া। সরলতাই এঁদের স্বভাব—ছুনিয়া-জোড়া কুটিলতা, হিংস্রতা, লোভ আর ছলনা এদের সন্দেহহীন পবিত্র মনে ঠাঁই পায় না—তাই যাকে স্নেহ করেন, ভালবাসেন, অগাধ বিশ্বাস আর অসীম নির্ভরতায় তাকেই আশ্রয় করেন।

আমার প্রস্তাবের আকস্মিকতায় 'সিসি'ও বিস্ময়ে আনন্দে হতচকিত হোয়ে পড়েছিলো—এ পাওয়া ওর অপ্রত্যাশিত। ওর দাদার মনেও বুঝি অনুশোচনার ব্যথা জেগেছিলো! পরদিন কি একটা পর্ব্বদিন ছিলো। 'পি, সি' জানালে বোনকে নিয়ে আমার কাছে আসবে—আমরা হু'জনে উৎসবে যোগ দিতে যাবো—ও ফিরে যাবে মাদাম 'সি-র' কাছে। উৎসব শেষে আমিই 'সিসি'কে বাড়ীতে পৌঁছে দেবো—তাই ওর চাবিটাও আমাকে দিয়ে দিলে।

পরদিন নির্দ্দিষ্ট জায়গায় 'সিসি'কে পেলাম। আগেই অপেরাতে একটা বক্স ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু হু'জনে মিলে ঠিক করলাম এখনও অপেরার সাত-আট ঘণ্টা দেরী—অতএব ততক্ষণ আবার জুক্কার সেই বাগানে বেড়াতে যাওয়াই ভালো। 'সিসি' তো খুশীতে উপছে উঠলো। সেদিন প্রচুর উৎসব-মত্ত নর-নারীর সমাবেশ বাগানেতে। আমরা আমাদের পুরানো কামরাটিই ভাড়া করে নিলাম।

বাগানে নামার আগে ঘরে এসে ঢুকতেই 'সিসি' উচ্ছল আনন্দে মুখোশটা এক ধারে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে এসে আমার হাঁটুর উপর বসে পড়লো। ওর ঝিকিমিকি ছুই চোখে হাসির কুহক—স্ফুরিত অধর মদিরায় ভরা। ওর স্পর্শে আমার রক্তে জাগলো আগুনের জ্বালা···ওর সব কথাকে স্তব্ধ করে দিলাম চুম্বনে চুম্বনে—

—"জানো আমার সমস্ত মন ভরে উঠেছে আজ তোমার কথায়"···

—"আমার কথা?"

—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, মায়ের কাছে তুমি যে প্রস্তাবটি করলে সেই কথায় তুমি কত বড়, তুমি কত মহৎ···তুমি আমাকে এমন করে ভালোবাসো? ঠিকই বলছো তুমি, যত দিন না আমাদের প্রকৃত মিলন হয় তত দিন কোনো উচ্ছৃঙ্খলতাকেই প্রশ্রয় দেব না আমরা··· আমার বড় ভয় করে দাদার ঐ উন্মত্ত স্বেচ্ছাচারিতা। তোমার ভালোবাসায় আমার যেন সব অভাব মিটে গেছে সব চাওয়া শেষ হোয়েছে আবেগে ওর কণ্ঠ বুজে আসে। দেখি সোনার কাঠির পরশ পেয়ে রাজকন্যার ঘুম ভেঙেছে—

—"কী ভাবছো বলো তো?"

—"আমি? আমি কি ভাবছি জানো? তোমাকে সম্পূর্ণ করে পাবার আগেই যদি আমার মৃত্যু হয় কী অতৃপ্ত আকাঙ্খা নিয়েই না আমাকে যেতে হবে!"

অনুষ্ঠান? সে তো যে কোনো দিনই সারা যায়। আর আমরা তো এখন স্বাধীন। বাবাকে নিশ্চয়ই মত দিতে হবে—"

—"ঠিক বলেছো। সম্মান বাঁচাবার জন্যে অন্ততঃ মত দিতে হবে! অবশ্য তাঁরও সম্মান রক্ষার জন্যে আমিই তাঁর কাছে তোমার পাণিপ্রার্থনা করবো। তাহলে আশা করছি আমাদের আর অপেক্ষা করতে হবে না, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বিয়ের অনুষ্ঠান···"

—"সে কি! এত শীগগির? দেখো তুমি, বাবা নিশ্চয়ই বলবেন যে আমি এখনও অনেক ছেলেমানুষ আছি"—

—"কথাটা কি খুব মিথ্যে বলবেন?"

—"মোটেই না। এমন কিছু ছেলেমানুষ নই আমি। তোমার পাশে আমাকে খুব মানাবে। তোমার বউ হিসেবে একটুও বেমানান হবো না—"

ও জ্বালছে কথার ফুলঝুরি আর তার আগুনের ফুলকি, এ আমার শিরায় শিরায় আগুন জ্বালাচ্ছে। ছুরন্ত বাসনা আমার চেতনাকে মাতাল করে তুললো।

—"মানসী আমার···আমার প্রেম তোমাকে জাগিয়েছে···কিন্তু সত্যি বলো আমার ভালোবাসায় তোমার বিশ্বাস আছে? আমার কাছে আত্মসমর্পণের আড়ালে থাকবে তোমার একান্ত নির্ভরতা?—কোনো দিনও জাগবে না অনুশোচনা আমার জীবন-সঙ্গিনী হয়েছো বলে? বলো, উত্তর দাও"—

—"আমার স্থির বিশ্বাস, তুমি কখনো আমাকে ছুঃখ দিতে পারো না। তাইতো আমার চরম নৈবেদ্যের আড়ালে আছে পরম পরিতৃপ্তি"—

—"এসো আমার কল্যলক্ষ্মী, আজ এই মুহূর্ত্তেই আমার জীবন-সঙ্গিনীরূপে তোমায় বরণ করে নিই। আমাদের এ বিবাহের সাক্ষী থাকুন বিধাতা—আমাদের শপথমন্ত্র উচ্চারিত হোক শুধু হু'জনার কানে কানে···আজ থেকে আমাদের হু'জনার ভাগ্যতরী একই ঘাটে এসে ভিড়ুক। আমাদের এই পবিত্র মিলনের বন্ধন দৃঢ় করবো তোমার বাবার অনুমতি নিয়ে সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে···কিন্তু আজকের রাত সাক্ষী থাক আমাদের প্রথম মিলন-লগ্নটির। আজ প্রেমের অনুষ্ঠানে বরণ করি প্রেয়সীকে। আজ তুমি আমার···শুধু আমার···"

—"ঈশ্বর সাক্ষী থাকুন, আজ আমি তোমায় নিবেদন করলুম নিজেকে তোমার সহধর্ম্মিণীরূপে—তোমার চিরজীবনের সঙ্গিনী হবার শপথ নিলাম···"

আবেগে হু'টি বাহুর আলিঙ্গনে বন্দী করলাম আমার মোহিনী মানসীকে। কানে কানে অস্ফুট আশ্বাস দিলাম···জেনো তুমি, কোনো ফাঁক কোনো ফাঁকি নেই আমাদের বিবাহে। আমাদের শপথেই হোয়েছে তার সত্য অনুষ্ঠান—আজ প্রথম মিলনলগ্নটি সার্থক কোরে তোলো আনন্দযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে।

বাসররাত্রি শিহরিত করে তোলে বসন্তের পুলকোচ্ছ্বাস···স্তবকে স্তবকে ফুটে ওঠে লাবণ্যের আতপ্ত ঔদ্ধত্য···বহ্নিদীপ্ত উন্মাদনা শান্ত হয় মাধুর্য্যের আত্মনিবেদনে···

[ক্রমশঃ।

ব্যাংককে কয়েক দিন

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]
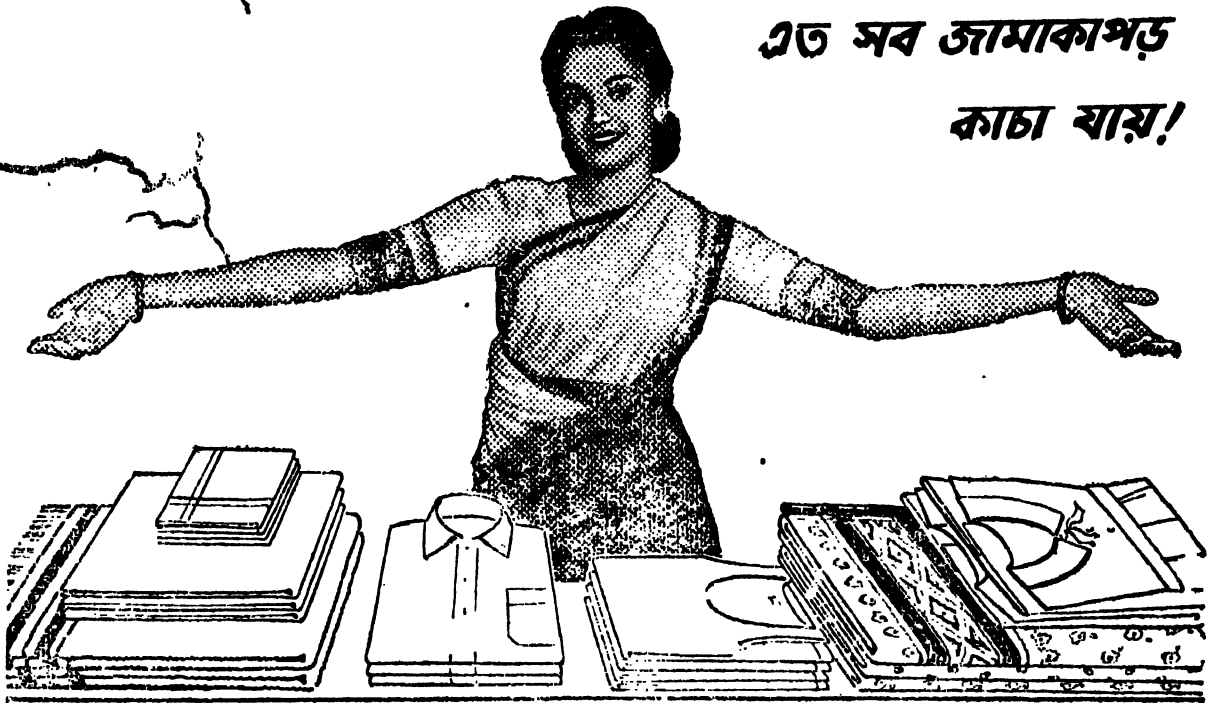
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

পোষ্ট-আপিসে পৌঁছে বাস থেকে নেমে হাঁটতে সুরু করলাম। চারিদিকেই নানা রকমের দোকান, তাতে মালপত্তর বোঝাই। গাড়ী ও লোকের ভিড়ও খুব।

হোটেল থেকেই ঠিক করে এসেছি যে, থাই-ভারত কালচারাল লজের সেক্রেটারী পণ্ডিত রঘুনাথ শর্ম্মার সঙ্গে প্রথমেই দেখা করা দরকার। শর্ম্মাজী প্রতাপ চন্দরের বিশেষ বন্ধু। প্রতাপ বলেছে যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনিই আমাদের ব্যাংকক দেখার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে দেবেন। অতএব তাঁর কাছেই আগে যাওয়া দরকার। এদিকে মুস্কিল যে, লজের ঠিকানাটা আমাদের ঠিক জানা নেই। ঘুরতে-ঘুরতে এক দোকানের সামনে দু'টি ভারতবাসীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। কথাবার্ত্তায় জানতে পারা গেল, তারা গোরক্ষপুরের লোক, এখানে কাজ করতে এসেছে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে সেই দেশোয়ালি দু'জনকে পেয়ে আমাদের যে কি আনন্দ হল, তা আর কি বলব! খানিক কথাবার্ত্তার পর তারাই আমাদের দু'টি সাইকেল-রিক্সা ঠিক করে দিলে আর রিক্সাওলাদের থাই-ভারত কালচারাল লজের নিশানা বাৎলে দিলে। ভাড়া ঠিক হল ছয় টিকল, মানে প্রায় দেড় টাকা।

লজ সেখান থেকে কাছেই। লজে এসে দেখি, বাড়ীটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সামনেই একটা হলে তাদের লাইব্রেরী। লাইব্রেরীতে অনেক ভাল ভাল ইংরাজি, বাঙলা ও থাই ভাষার বই আছে। দুটি অ্যাসিস্‌ট্যান্ট, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। দু'জনারই বয়স ২০।২২ বৎসরের বেশী হবে না। তারা আমরা নেতাজীর দেশ থেকে আসছি শুনে খুব আনন্দিত হ'ল। আমাদের আদর-যত্ন করে বসালে ও বইটই দেখালে। পণ্ডিত রঘুনাথ শর্ম্মার খবরও তারাই দিলে। হলের ভিতর অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে দেখলাম লাইব্রেরীতে বসে গোটাকতক ছবির বই দেখছে বা পড়ছে। আর এক জায়গায় দেখি, আরও গুটিকতক ছেলে-মেয়ে চুপটি করে বসে গল্প শুনছে। দেখে ভারী ভাল লাগলো। লজের একটি ইস্কুল আছে। সেখানে পণ্ডিত দ্বিবেদী শাস্ত্রী নামে একজন শিক্ষকের সঙ্গে পরিচয় হল। খুব পণ্ডিত ও অমায়িক ভদ্রলোক। মিষ্টার দাশগুপ্ত হচ্ছেন লজের লাইব্রেরিয়ান। নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের গৌরবময় ইতিহাসের অনেক কথাই তাঁর কাছে ও পণ্ডিত রঘুনাথ শর্ম্মার কাছে পরে শুনেছি।

লজ থেকে বেরিয়ে আমরা শর্ম্মাজীর দোকানে এসে হাজির হলাম। প্রকাণ্ড বড়বাজারের মধ্যে পণ্ডিতজীর দোকানটি। এখানে তিনি প্রায় ৩০।৩২ বৎসর ধরে ব্যবসা করছেন এবং সপরিবারে বসবাস করছেন। দোহারা লম্বা চেহারা, বয়স ষাটের কাছাকাছি। প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি, অতি সজ্জন। এ তল্লাটে বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি বলেই মনে হল। আমাদের দেখে মহা খুশী। টাট্‌কা ফলের রসের মত এক প্রকার সুস্বাদু পানীয় পান করতে দিলেন। নানান কথা-

খেতে হবে। ব্যাংককের দেখবার মত যা কিছু জিনিষ ও জায়গা আছে তা দেখাবার সমস্ত বন্দোবস্ত আমি করিয়ে দেব, আপনাদের কোন চিন্তা নেই।" আমরা তখন ব্যাংককের বাজার ও দোকানপত্র ঘুরে একটু দেখতে চাই শুনে তিনি তাঁর ম্যানেজারকে আমাদের সঙ্গে দিলেন। তাঁর সঙ্গে আমরা বাজার ঘুরে সব দেখতে লাগলাম। আমার কিছু টাকা ভাঙ্গানোর দরকার হয়ে পড়লো। ম্যানেজার আমাদের এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে টাকা ভাঙ্গিয়ে দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এবার আমরা ভারতীয় টাকা-প্রতি ১০০ টাকায় ৪৬০ "টিকল" হিসাবে ভাঙ্গানি পেলাম। তার মানে হোটেলে যে হারে পেয়েছিলাম তার চেয়ে প্রায় দেড়গুণ বেশী। বোধ হয় ফরেণ কারেন্সী এক্সচেঞ্জ রেসিও বাজারে ও ব্যাঙ্কে সমান নয়।

দোকানগুলো নানারকম জিনিষে ভর্ত্তি। দামও কিছু চড়া মনে হল। অধিকাংশ জিনিষই আমেরিকার তৈরী। এক জায়গায় দোকানগুলিতে জামা কাপড় পিস্‌গুডসের যা ষ্টক দেখেছি তাতে মনে হয় যে, কলকাতার সব চেয়ে বড় কাপড়পটিতে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগও ষ্টক আছে কি না সন্দেহ! নানারূপ বেসাতির অফুরন্ত ষ্টক। দেখে শুনে মনে হয় যে ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাংকক তথা থাইল্যাণ্ড এগিয়ে চলেছে অতি দ্রুততালে।

ঘোরাঘুরি করে ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে হল যে আজ কে, এল, এম হোটেলের সাহেবীখানা না খেয়ে এখানকার দেশী হোটেলে খেতে হবে। তাতে এদেশের সাধারণ লোকেদের দৈনন্দিন জীবন আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু কিছু জানবার সুবিধেও হতে পারে। ইতিমধ্যে শ্রীমান অনিল দাস নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পথে দেখা হয়ে খুব ভাব করে ফেললাম। তাঁকে আমাদের মনের কথা জানাতে তিনি আমাদের একটি দেশী হোটেলে নিয়ে চললেন।

হোটেলটিতে ঢুকেই যে জিনিষটি দেখে খুব লোভ হল, সেটি হচ্ছে হোটেলের সামনে ঝুলিয়ে-রাখা আস্ত ভাজা মুরগী। এই উপাদেয় জিনিষটি এখানে খুবই একটি সাধারণ ও চলতি খাবার। পরে হংকং চায়না ও মাঞ্চুরিয়ার বিভিন্ন জায়গায়ও এই খাবারটির বহুল প্রচলন লক্ষ্য করেছি। আজ-কাল কলকাতার গুটিকতক পাঞ্জাবী হোটেলেও এই জিনিষটি পাওয়া যায়।

তিন বন্ধুর মধ্যে প্রতাপই হল সব চেয়ে সমঝদার ব্যক্তি। অতএব কি কি খেতে হবে তা ঠিক করার ভার তার উপরেই দেওয়া গেল। ভোজ্য-বস্তুগুলির মধ্যে গুটিকতক নাম আমার এখনো মনে আছে, বাকি সব ভুলে গেছি।

"কুং" মানে চিংড়ী মাছ! "ক্যাং চুট্‌" মানে স্বাদহীন তরকারী। "নাম প্লা" মানে মাছের নোণতা জল (স্যুপের মত)। "নাম পেগ"—মানে তরল চাটনি। এর সঙ্গে ভাত মুরগী মাছ আরো যেন কি সব খেয়েছিলাম তার নাম ঠিক মনে নাই। ভোজনরসিক বলে বাজারে আমার যথেষ্ট খ্যাতি থাকলেও সত্যি কথা বলতে কি, সেদিনকার খাবার দু'-একটি ছাড়া আমার একটুও ভাল লাগেনি। কি রকম যেন গন্ধ। ভেজে নেওয়া বা করে নেওয়ার রেওয়াজ এখানে নেই। সব রান্নাই প্রায় সিদ্ধর উপর। চিংড়ী মাছের টুকরোগুলোকে প্লেটের এক কোণে

ব্যাংককের জলে অখাদ্য ভাবে সেদ্ধ না হয়ে বাংলা দেশের হেঁসেলে সরষের তেল মেখে রান্না হতে তাহলে”—

খেতে খেতে অনিল দাস মশাইয়ের কাছ থেকে ও-দেশী ভাষাও কিছু কিছু শিখে নিচ্ছিলাম। গুটিকতক কথা মনে আছে। “হ কুং” মানে ভেরি হেল্‌পফুল ম্যান। “সামলেন” মানে তিন চাকা রিক্‌স। “রথ” মানে গাড়ী। “চাকাবর্নি” মানে সাইকেল। “প্রোজন” মানে প্রয়োজন—এই রকম অনেক কথার সঙ্গে বাঙ্গালা বা সংস্কৃত শব্দের আশ্চর্য্য রকম মিল আছে, তবে উচ্চারণ একটু আলাদা।

খাওয়া শেষ হতে রাজেন বললে, একটা বেল্ট কেনা দরকার। গেলাম বেল্টের সন্ধানে। হা হতোঽস্মি! সারা ব্যাংককের বাজার চষে ফেলে রাজেনের পেটের মাপসই বেল্ট কোথাও খুঁজে পেলাম না। দোকানের পর দোকান ঘুরে কতো বেল্টই না দেখলাম, কতো দোকানদারণীর বিদ্রুপপূর্ণ কটাক্ষই না সহ্য করলাম, ছোট বড় মাঝারি সরু মোটা সস্তা দামী দেশী বিলাতী আমেরিকান ডজন ডজন বেল্ট বাক্স খুলে প্যাকেট ছিঁড়ে বের করে ট্রাই করা হল কিন্তু হায়, কোনটিই আমার বন্ধুর পেটে আঁটলো না! সব শেষে যে দোকানটিতে যাওয়া গেল তার মালিক হচ্ছেন একটি গোলগাল মোটাসোটা আধাবয়সী থাই মহিলা। তাঁর দোকানের সব চেয়ে বড় ও দামী আমেরিকান বেল্টটি রাজেনের পেটে পরিয়ে যখন তিনি দেখলেন যে পেটের আড়াই ইঞ্চি জায়গা তখনো বেবাক ফাঁক থেকে যাচ্ছে, তখন তিনি আর সামলাতে পারলেন না, আহ্লাদী পুতুলের মতন হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়লেন।

মনে মনে ভাবলাম, হায় রে, আমেরিকা পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বাঁধাবাঁধির কত রকম ব্যবস্থাই না করেছে কত কল-কব্জাই না বানিয়েছে কিন্তু আমার বন্ধুর পেট বাঁধা যায় এমন একখানা বেল্টও কি তৈরি করে ব্যাংককের বাজারে ছাড়তে পারেনি?

সে দোকান থেকে বেরিয়ে দাশ মশাইয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে আমরা ব্যাংকক সহরটি আরও খানিকটা ঘুরে দেখলাম। সহরটি দোকান-পাটে ভর্ত্তি। আমার বন্ধুর বপুবন্ধনী ছাড়া এমন কোনো জিনিষই নেই যা সেখানে পাওয়া যায় না। জামা কাপড় জুতো বাজনা রেডিও গ্রামোফোন আসবাব পত্র ও নানারকম মনোহারী দোকানের ছড়াছড়ি।

তরিতরকারি ও ফলমূলের দোকানও অজস্র। এখানে মাংসের দোকানগুলো দেখে আমাদের একেবারে আক্কেল গুড়ুম। হাঁস মুরগী পায়রা ইত্যাদি নানারূপ পাখী ত' আছেই, তা ছাড়া আরও কত রকমের জীবই যে মাংস হিসেবে বিক্রি হতে পারে এবং লোকে তা খাদ্য হিসেবে খেতে পারে, তা ব্যাংকক বাজার না দেখলে ধারণার বাইরে থেকে যায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরাহ থেকে সুরু করে তামাম স্থলচর জলচর ও আকাশচর জীব-জন্তু পক্ষী-কীট চারিদিকে ঝুলছে। টিকটিকি গিরগিটি ও ব্যাং-এর মতন গুটিকতক ঔটকি জীবেরও দর্শন পাওয়া গেল। এগুলো দিয়ে কি ধরণের তরকারি বা খাবার বানায় তা ওরাই জানে। ব্যাংককে থাকা কালীন খাবার সময় এ রকম কোন খাদ্য অজান্তে আমরা

সেদিনকার মত সহর দেখা শেষ করে মিষ্টার দাশের কাছে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফেরবার জন্যে একটি ট্যাকসিতে গিয়ে উঠলাম। মিষ্টার দাশ ভাড়া ঠিক করে দিলেন ৩০ “টিকল”।

হোটেলে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। ঘরে গিয়ে একটু গল্প-সল্প করে স্নান সেরে খাবার ঘরে গেলাম। খাওয়া শেষ করে হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টাখানেক হজমী হাঁটা হেঁটে গিয়ে আবার হোটেলে ফিরে এলাম।

গাদাখানেক বই নিয়ে ঘুমুতে যাওয়া আমার চিরকালের বদ অভ্যাস। একটা বই ভাল না লাগলে আর একটা, সেটাও পছন্দ না হলে আরো একটা অনায়াসে হাতের কাছে পেতে যাতে কোন অসুবিধে না হয়, তাই যা যা বই পাই সেগুলো বালিশের পাশে রাখি, পড়া হোক আর না-ই হোক। বই হাতে না নিলে ঘুমই আসতে চায় না।

সেদিন সকাল থেকে সারাদিনই প্রায় ঘোরাঘুরি হয়েছিল, তাই বিছানায় শুয়ে বই হাতে নিতেই সঙ্গে সঙ্গেই “ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি ঘুমের বাড়ী যেও।” চোখের চশমা চোখেই রইল, হাতের বই পড়লো বুকের ওপর। আমি ঘুমের বাড়ী যাবার পর প্রতাপচন্দ্র যদি আমার চোখ থেকে সেদিন চশমা খুলে না নিত তা হলে চমৎকার একটি স্বপ্ন দেখতে পারতাম আর সেই স্বপ্নকথা সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের পরিবেশন করে ধন্য হতাম। কিন্তু কি করব, বয়স হয়েছে, বিনা চশমায় স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা এখন আর নেই। এখন আর চশমা ছাড়া কিছুই ভাল করে দেখতে পাইনে, এমন কি স্বপ্নও না। এর জন্যে প্রতাপ দায়ী।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে ব্রেকফাষ্ট করে বেরিয়ে পড়লাম। আজ পণ্ডিতজীর ওখানে খাওয়ার নেমন্তন্ন। বাড়ীর ঠিকানা একটা কাগজে লিখে পণ্ডিতজী কাল প্রতাপের হাতে দিয়েছিলেন, সেটি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়ে আমরা “অরেঞ্জ বাসের” জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঠিকানাটা ওদেশী ভাষায় লেখা ছিল বলে আমরা সেটা পড়তে পারিনি। বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছে এক খৃষ্টান থাই মহিলাকে কাগজখানি দেখাতে তিনি সেটা পড়ে বললেন “সাউ ইন ছাউ” এ জায়গা আমার জানা আছে, আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো।

আমরা তখন বাসে না গিয়ে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে তাঁর সঙ্গে চললাম বাজারের দিকে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার একটু আগেই ভদ্র মহিলা গাড়ী থেকে নেমে গেলেন, অবশ্য তার আগেই জায়গাটি তিনি ভাল করে ড্রাইভারকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

ড্রাইভারটি বিশেষ সুবিধের লোক ছিল না। আমাদের বিদেশী ভালমানুষ পেয়ে একেবারে তিনগুণ ভাড়া হেঁকে বসল। আমরা ত অবাক! যাই হোক, শর্ম্মাজীর মধ্যস্থতায় তিন গুণের জায়গায় দু'গুণ ভাড়া দিয়ে ট্যাক্সিওলাকে বিদায় করা গেল।

শর্ম্মাজীর সঙ্গে লজের হল, লাইব্রেরী ইস্কুল ইত্যাদি আর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে আমরা ব্যাংকক সহর মন্দির প্যাগোডা ইত্যাদি দেখতে চললাম। এখানের একজন মস্ত ধনী ব্যবসায়ী শ্রীমনোহর-প্রসাদ হচ্ছেন শর্ম্মাজীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনিও নেতাজীর বিশেষ ভক্ত। আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যের জন্য তিনি লক্ষ লক্ষ

পাঠিয়েছেন আমাদের সহর দেখাবার জন্তে। গাড়ীটি পেয়ে আমাদের যে খুবই সুবিধে হল তা বলাই বাহুল্য। পণ্ডিত রঘুনাথ শর্ম্মা ও তাঁর বন্ধুর সৌজন্তে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাংককের ভাল ভাল জায়গা ও জিনিষ দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিলো।

এখানে মন্দির ও প্যাগোডাগুলি ভারি সুন্দর আর কত রকমের বুদ্ধমূর্ত্তি যে আছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। প্যাগোডাগুলোর মাথা রং বেরঙা ঝকঝকে টালি দিয়ে অতি সুন্দর ভাবে তৈরী। থাক থাক করা নানান রকমের রঙিন ঢালু ছাদগুলি তাদের সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে দিয়েছে। প্যাগোডা ছাড়া অনেক সাধারণ বাড়ীর মাথাও দেখলাম রঙিন টালি দিয়ে অতি সুন্দর ভাবে তৈরী। মনে হয় যেন মানুষের মত বাড়ীগুলোও মাথায় সুন্দর সুন্দর বাহারে টুপি পরেছে নিজেদের সৌন্দর্য্য বাড়াবার জন্তে। আমরা যেমন পাতাবাহার গাছ বলি তেমনি এখানকার মাথাবাহারে প্যাগোডা ও বাড়ীগুলো দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়!

প্রথমেই যে প্যাগোডাটি দেখতে গেলাম সেটি অতি চমৎকার! প্রকাণ্ড বড় ও উচ্চ প্যাগোডাটি। তার মধ্যে উচ্চাসনে ভগবান বুদ্ধের এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি "এমারেল্ড বুদ্ধ" নামে খ্যাত। দৈর্ঘে, প্রস্থে ও উচ্চতায় প্রায় ৪ × ৪ × ৫ ফুট একটি পান্না থেকে খোদাই করা—জগতে এ-হেন মূর্ত্তির তুলনা মেলা ভার। থাইল্যাণ্ডের লোকেরা অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। ভগবান বুদ্ধের উপর এদের অটুট বিশ্বাস ও ভক্তি। এরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে এই মূর্ত্তিটি জাগ্রত এবং এর মধ্যে ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং বিরাজমান। তিনি এর মধ্যে অধিষ্ঠিত থেকে তাঁর ভক্তদের, শরণাগতদের নানারূপ বিপদ-আপদ থেকে সদা-সর্ব্বদা রক্ষা করছেন। প্যাগোডাটির ভিতরের কারুকার্য্যও অতি চমৎকার! বাহিরে চারি দিকে বাঁধানো ঢাকা বারান্দা। তার দেওয়ালে নানারকম রং দিয়ে রামায়ণের সমস্ত কাহিনীটি নিখুঁত ভাবে চিত্রিত করা রয়েছে। বিভিন্ন দেশবাসী বহু নরনারী মন্দির দর্শন করতে এসেছে। কারো মুখে কথা নেই, সকলেই নীরব। মনে মনে তারা ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি নিবেদন করছে ও নিজ নিজ মনস্কামনা জানাচ্ছে। সেই সৌম্য শান্ত প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখে মনে হয় যেন ভগবান বুদ্ধ তাঁর নীরব ভাষায় অমৃতময় হাসিমুখে শরণাগতদের আশ্বাস দিয়ে বলছেন, "ওরে ভয় নেই, তোদের সকলেরই কল্যাণ হবে, মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, মা ভৈঃ! সত্যি সে মূর্ত্তির দিকে একবার চাইলে আর চোখ ফেরানো যায় না, সে এক অতি অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি!

সেখান থেকে আর একটি মন্দিরে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি আর এক অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি। এ মূর্ত্তিটির নাম "শয়ান বুদ্ধ" বুদ্ধদেব শুয়ে আছেন, মুখে তাঁর অদ্ভূত শান্তি ও আত্মসমাহিত ভাব। লম্বায় প্রায় ২০০ ফুট এবং সেই অনুপাতেই চওড়া ও উঁচু। মূর্ত্তিটি সোনালী পাতে মোড়া ঝকঝক করছে। এত বড় ও এমন চমৎকার মূর্ত্তি আর কোথাও দেখিনি বা কোথাও আছে বলে শুনিনি। মুখে মধুর হাসি, চোখে দয়া ও প্রেমের পূর্ণ আভাস মূর্ত্তিটিকে অনবদ্য করে তুলেছে। শয়নের সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিটুকুও যেন অপূর্ব্ব!

এই মন্দির দর্শন শেষ করে ও পথে আরও প্যাগোডা মন্দির ও দর্শনীয় স্থান দেখে আমরা হাজির হলাম ব্যাংককের যাদুঘরে। জগতের নানা দেশ থেকে যত টুরিষ্ট আসেন এই যাদুঘরটি ভাল করে না দেখলে তাঁদের ব্যাংকক ভ্রমণ অপূর্ণ থেকে যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম, সাহিত্য, চারুকলা ইত্যাদি নিয়ে যে সব মনীষীরা আলোচনা বা গবেষণা করেন তাঁদের পক্ষে এখানে আসা নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম, ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তর মৌলিক ও পুরানো পুঁথি সংগ্রহ করে রাখা আছে।

প্রায় ২০০০ বৎসরের পুরানো তালপাতার উপরে লেখা পুঁথি সারি সারি কাঠের বড় বড় সিন্দুকের মধ্যে রাখা আছে। সিন্দুকগুলিও ভারি চমৎকার! সিন্দুকগুলোর গায়ে সোনালী, লাল, কাল ইত্যাদি নানা রং-এর লতাপাতা কেটে ছবি আঁকা রয়েছে। পুরানো পুঁথি ছাড়া আরও কত রকমের কত পুরানো জিনিষ রয়েছে, তা আর কি বলব। রাজা-রাজড়াদের দৈনন্দিন ব্যবহারের হাজার হাজার বৎসরের পুরানো জিনিষপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, পান-ভোজনের বাসন, আসবাবপত্র, বাজনা-বাদ্যি, খেলনা-পুতুল ইত্যাদি এক একটি ঘরে বোঝাই করা ঠাসা। ঢাক, ঢোল, তবলার মত, এস্রাজ, সেতার, তানপুরার মত, বাঁশী, শানাই, বিউগল্‌ ও ক্ল্যারিওনেটের মত, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন প্রকারের ছোট-বড়-মাঝারি কত রকম বাজনা-বাদ্যি যে আছে তার ইয়ত্তা নাই। জলতরঙ্গ ও বীণার মত বাদ্যযন্ত্রও রয়েছে দেখলাম।

আর এক জায়গায় দেখলাম, নৌকো, জাহাজ, বজরা, পান্‌সী, সামপান জাতীয় নানারূপ জলযানে একটি ঘর একেবারে ভর্ত্তি। থাইল্যাণ্ডে নদীনালা ও জলাভূমি খুব বেশী, অতএব এদের নানারূপ জলযানের যে সদা-সর্ব্বদাই প্রয়োজন ছিল ও আছে, তা বলাই বাহুল্য।

পুতুলনাচ ও ছায়াবাজি বা ছায়ানাচ এখানে আবহমান কাল থেকেই প্রচলিত। দেশবাসী জনসাধারণকে আনন্দ দেবার এই ব্যবস্থাগুলি এরা এখনো ভাল ভাবেই বাঁচিয়ে রেখেছে, আমাদের মত ওগুলিকে এরা অনাদর করেনি বা মেরে ফেলেনি। পুতুলনাচ ও ছায়াবাজির নানারূপ জিনিষ ও আসবাবপত্র একটি ঘরে সাজানো রয়েছে। ছায়াবাজি বা ছায়ানাচ করবার জিনিষগুলি বড় মজার। বড় বড় কাগজ, কাঠের বা কঞ্চির ফ্রেমে আটকে সেই কাগজে নানা ডিজাইনে নক্সা কেটে ষ্টেনসিলের মত তৈরি করে লাঠির হাণ্ডেলের ওপরে আটকে দিয়েছে। ষ্টেনসিলগুলি নানাপ্রকার। জন্তু, জানোয়ার, পাখী, ফুল, গাছ, পুরুষ, মেয়ে, নর্ত্তকী, রাজা, রাণী ইত্যাদি নানা রকমের নক্সাকরা আছে। ষ্টেনসিলের এক দিকে আলো ফেলে সেটি নাড়াচাড়া করলে অপর দিকে অতি মজার মনোমুগ্ধকর ছায়াছবি ও ছায়ানাচের নাচের সৃষ্টি হয়। এদের জাতীয় উৎসবে এখনো এই সব জিনিষ দেখিয়ে দেশবাসীকে এরা প্রচুর আনন্দ দিয়ে থাকে।

কোথায় গেল আজ আমাদের দেশের সেই পুরানো দিনের পুতুল-নাচ কথকতা পাঁচালী? কোথায় গেল সেই কবির লড়াই, বাউল গান যাত্রা, লোকনৃত্য, ইত্যাদি জনগণের সহজ ও নির্ম্মল আনন্দের উপাদান? তারা নেই। আমাদেরই অনাদরে হতাদরে আজ তারা লুপ্তপ্রায়। হাল-ফ্যাসানী থিয়েটার-বায়স্কোপের পাশে আত্মপ্রকাশ করতে আজ তারা কুণ্ঠিত। সেই কুণ্ঠা দূর করতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে দেশের জিনিষকে—দেশের হারিয়ে যাওয়া জিনিষগুলিকে আবার দেশের মধ্যে জনগণের ভিতরে। তাদের

কৃষ্টি তাদের সহজ শিল্পবোধ ও সরল মনের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি মুকুলিত প্রস্ফুটিত করবার জন্যে।

বাদুঘর থেকে বেরিয়ে আরও গুটিকতক চমৎকার জিনিষ নজরে পড়লো। জিনিষগুলি হচ্ছে বামন বা বেঁটে গাছ। ছোট্‌-খাট্ট ভারি মজার দেখতে। কদম গাছ, কাঁটাল গাছের মত নানারকম গাছ যে এত বেঁটে এত ছোট হতে পারে, তা না দেখলে ধারণাই করা যায় না। পূর্ণ পরিণত গাছগুলি দেড় ফুট দু' ফুটের বেশী হবে না। ভারী সুন্দর দেখতে। বন্ধুবর প্রতাপ চন্দ্র হাতে পেনসিল-নোটবুক না নিয়ে কোথাও যায় না। দু'-এক মিনিটের মধ্যেই গুটিকতক সুদৃশ্য বামনবৃক্ষ তার নোট বুকের পাতায় স্কেচ হয়ে চিরঞ্জীব হয়ে রইল।

বেলা দুটো নাগাদ পণ্ডিতজীর সঙ্গে তাঁর বাড়ি এসে পৌঁছলাম। সঙ্গে মিষ্টার দাশগুপ্ত ও পণ্ডিতজীর দোকানের কর্মচারীটি। মুখ-হাত ধুয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে খেতে বসা গেল। পণ্ডিতজীর মেয়ে ও ভাইপো পরিবেশন করতে লাগলেন ও পণ্ডিতজী নিজে এটা খাও, ওটা খাও বলে সযত্নে খাওয়াতে লাগলেন। গরম গরম পুরি পকৌড়ি, বড়ি দিয়ে রান্না অড়র দাল, চমৎকার ফুলকপির তরকারি স্যালাড পায়েস কলা ও বাতাবি নেবু দিয়ে খুব তৃপ্তি করে খাওয়া গেল। পণ্ডিতজীর স্ত্রী নিজ হাতে সব রান্না করেছেন প্রত্যেকটি জিনিষ, অতি উপাদেয়। অনেক দিন পরে দেশী খাবার দেশীয় ধরণের রান্না খেয়ে যে কি ভাল লাগলো তা আর কি বলব! বড়ি দেওয়া ডাল ও ফুলকফির তরকারী যে পরিমাণে খেলাম পাঁচটা সহজ লোকে মিলে তা খেতে পারে কি না সন্দেহ! খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আবার নানা রকম গল্প সুরু হোল।

ব্যাংককের কথা হতে হতে নেতাজীর কথা, আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা উঠলো। তাঁদের মুখে যা শুনলাম জগতের ইতিহাসে তা এক অপূর্ব্ব কাহিনী! যে ক'টা দিন নেতাজী সেখানে ছিলেন দেশের লোক—কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ সকলেই তাঁকে সারা এশিয়ার ত্রাণকর্ত্তা বলে চিনতে পেরেছিলেন। সে দিন সেই মহামানবের গৌরবময় কাহিনী শুনে মন আমাদের ভরে উঠেছিলো। নেতাজী ও আজাদ হিন্দ সম্বন্ধে পণ্ডিতজীর কিছু কিছু লেখা আছে। আমরা সে লেখাগুলি দেখতে চাওয়ায় তিনি বলেছিলেন, সেগুলি সংগ্রহ করে পরে আমাদের পাঠিয়ে দেবেন। কথায় কথায় আমার বন্ধুদের মুখে জানতে পেরেছিলেন যে নেতাজীর সম্বন্ধে আমার একটি স্বরচিত কবিতা আছে। কবিতাটি শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি সেটি আবৃত্তি করে শোনাই। শুনে সকলেই খুব আনন্দিত হয়েছিলেন এবং আবৃত্তি করে আমিও কম খুশী হইনি। কবিতাটি ১১৫৩ সালে নেতাজী দিবস উপলক্ষে রচিত

নেতাজী

ভারতমাতার অমর পুত্র সৌম্য শান্ত বীর,
নেতাজী সুভাষ নেতাজী সুভাষ মহা-ভারতের বীর।
শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা তোমার মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি,
তব নামে সদা মুখরিত-এই পুণ্য-ভারত-ভূমি।
দেশের সুভাষ দশের সুভাষ প্রাণের সুভাষ ভাই,
নেতারা তোমারে ভুলেছে ভুলুক আমরা ত' ভুলি নাই।
সূর্য্য তোমারে শৌর্য্য দিয়াছে সাগর দিয়াছে শুচি,

[illegible]

আত্মাশক্তি শক্তি দিয়াছে হিমাচল দেছে মান,
ভক্তি দিয়াছে কাঙ্গালের হরি ভকতের ভগবান।
দেশের সুভাষ দশের সুভাষ প্রাণের সুভাষ ভাই,
মুক্তিযজ্ঞে ঋত্বিক তুমি তোমারে ত' ভুলি নাই।
দুর্ব্বলে তুমি করিয়াছ বীর অসহায়ে দেছ আশা,
ভীরুরে করেছ মৃত্যুবিজয়ী মূক-জনে দেছ ভাষা।
বাদশারে তুমি ফকির করেছ কৃপণেরে দাতাকর্ণ,
ভিখারী তোমারে ভিক্ষা দিয়াছে তণ্ডুল-কণা স্বর্ণ।
দেশের সুভাষ দশের সুভাষ প্রাণের সুভাষ ভাই,
স্বাধীনতা-যাগে পুরোহিত তুমি তোমারে ত' ভুলি নাই।
সারা এশিয়ায় প্রচারিত তব মুক্তির নব মন্ত্র,
আকাশে বাতাসে ধ্বনিছে তোমার জয় হিন্দ মহামন্ত্র।
বঙ্গজননী ভারতজননী জগজ্জননী আজ,
তোমারি আশায় পথ চেয়ে আছে ওহে রাজ-অধিরাজ।
দেশের সুভাষ দশের সুভাষ প্রাণের সুভাষ ভাই,
বাঙ্গলা মায়ের নয়নের মণি তোমারে ত' ভুলি নাই।

হোটেলে ফিরে এসে দেখি—আমাদের বন্ধু শ্রীমান বিনয় ব্যানার্জ্জী ইন্দোনেশিয়া থেকে কলকাতায় ফিরতি মুখে এখানে কয়েক ঘণ্টার জন্যে বিশ্রাম করতে এসেছেন। বিনয় বাবু ইউ, এন, ও'র বড় চাকুরে। অনেক রকম খবর রাখেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বেশ আনন্দে সময় কাটতে লাগলো। যাবার সময় বলে গেলেন, "একটি ষ্টীম লঞ্চ ভাড়া করে এখানের মেনাম নদীটি অন্ততঃ ঘণ্টা দু' তিন ঘুরে আসবেন, খুব ভালো লাগবে।"

কাল ভোরের প্লেনে এখান থেকে হংকং রওনা হবার কথা। মেনাম নদীতে নৌকাবিহার কপালে নেই, এই কথা ভাবছি এমন সময় হোটেলের রিসেপশনিট এসে জানালেন যে কাল যে প্লেনে করে আমাদের হংকং যাবার কথা ছিল সেটা কাল না হয়ে পরশু হবে। ভালই হল। মেনামে নৌকাবিহার আমাদের কপালে নাচছে, কে তা খণ্ডাতে পারে?

পরদিন প্রাতরাশ সেরে বাসে করে ষ্টেশনের দিকে চললাম। সেখান থেকে মেনাম নদী কোন দিকে, সে বিষয় আমাদের সঠিক ধারণা ছিল না। প্রতাপ চন্দ্র কিন্তু সর্ব্বদাই প্রস্তুত—অপ্রস্তুত কা'কে বলে তা সে জানেও না।

পকেট থেকে চট্‌ করে ব্যাংককের বিষয় একটি পুস্তিকা বের করে ফেললে, পুস্তিকার মধ্যে ছিল ব্যাংককের এক খণ্ড মানচিত্র। সেই মানচিত্র দেখে ও পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ভাল করে বিচার ও গণনা করে বাৎলে দিলে মেনাম নদী কোন দিকে। আমরা তিন বন্ধু তখন সেই দিকে মুখ করে হাঁটতে সুরু করলাম। প্রতাপ সঙ্গে না থাকলে কি অবস্থা হত তাই ভাবতে ভাবতে হাঁটছি, এমন সময় রাজেন বললে "ওহে প্রতাপ, দিক নির্ণয় ত' করলে কিন্তু কই মেনাম নদী ত' এখনো এলো না। আর মিছিমিছি না হেঁটে খান দুই সাইকেল-রিক্স ভাড়া করলে হত না?" অসমীচীন প্রস্তাব রাজেন কখনো করে না, অতএব তার প্রস্তাবটি তখনই সমর্থিত হল। একটি সাইকেলরিক্সর দিকে তাকাতেই চার পাশ থেকে প্রায় তেরটি রিক্স আমাদের চারিদিকে বেমালুম একটি "চাকাবান ব্যূহ" রচনা করে [illegible]

মহা মুস্কিলে। হাত-পা নেড়ে লেকচার পশচারে তখন সেই এয়োদশ সারথির উদ্দেশে বললাম, দেখ বাপু, তিনটি প্রাণী ত' তেরটি রিক্সয় চড়া যায় না ; অতএব তোমাদের মধ্যে যে কোন দু' জন যদি আমাদের মেনাম নদীর তীরে পৌঁছে দাও ত' আমরা বিশেষ বাধিত হব, ব্যাপারটা ততক্ষণে তারাও বুঝেছে। তাদের মধ্যে তখন দু'খানি রিক্স নিয়ে চললো আমাদের মেনাম নদীর তীরে।

মেনাম নদীটি ঠিক আমাদের কলকাতার গঙ্গার মত। তার জলও ঠিক আমাদের গঙ্গা-জলের মত দেখতে। মাল-পত্তর বোঝাই, লোকবোঝাই কত রকম-বেরকমের জলযান যে রয়েছে তা দেখলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়।

ছোট-বড় মাঝারি সরু-মোটা বেঁটে নানারকম নৌকা-জাহাজ ছিপ সামপান ইত্যাদি। ব্যাংকক জায়গাটি নদী-নালা ও খালে ভর্ত্তি। জলের ওপরে কত পরিবার যে বসবাস করে কত লোকই যে ব্যবসা করে সংসার চালায় তার ঠিক-ঠিকানা নেই। নদীর ওপরেই তারা খায়-দায় থাকে, কাজ করে, ব্যবসা করে।

কেউ বা তরকারী কেউ বা ফল কেউ কেউ আবার রান্না ভাত-ডালমাংস খাবার-দাবার তৈরি করে নদীর ওপরেই নৌকো চালিয়ে বিক্রি করে রোজগার করে সংসার চালাচ্ছে। বাচ্ছা বাচ্ছা ছেলে-মেয়েরা সব সময়েই জলের কাছে ঘোরাঘুরি করছে খেলা করছে, কেউ তাদের বকছে না বা মানাও করছে না। এখানে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বেশীর ভাগ সময়ে আদুল গায়েই থাকে, স্বাস্থ্য মোটের ওপর ভালই। জামা-কাপড় যা পরে তা পরিষ্কার দেখেই পরে, ময়লা পোষাক পরে না। দুষ্টুমিতে এরা আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের মতই, তবে আমাদের দেশের মত বড়দের কাছে বকুনি-মার-টার বেশী খায় না। মেয়েরাই বেশী কাজ-কর্ম করে, ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে অলস।

বড় বড় মহাজনী নৌকা ও বজরায় করে নানা রকম মালপত্তর চালান হচ্ছে দেখলাম। চালানী মাল এখান থেকে ওখানে যাচ্ছে, ওখান থেকে এখানে আসছে। চাঁদ সদাগরের দল হাজারো রকমের সামগ্রী বেসাতি নিয়ে ময়ূরপঙ্খী সাজিয়ে সাত সমুদ্দুর তের নদী পাড়ি দেবার আয়োজন করছে বা বাণিজ্য করে ফিরে আসছে। দেখতে বড়ই ভাল লাগে।

তিন বন্ধু মিলে একটি ছোট সুদৃশ্য ষ্টীমলঞ্চে উঠে বসলাম। ভাড়া ঠিক হল ৫০ "টিকল"। লঞ্চখানি চলতে লাগল মেনাম নদীর বুকের উপর দিয়ে। যেতে যেতে কত বড় বড় নৌকো জাহাজ বজরার দর্শন পেলাম, কত লোকের কত পরিবারের সহজ সরল দৈনন্দিন ঘর-কন্নার ছবি দেখলাম, তা আর কি বলব! ছোট ছোট পানসী সামপানে করে গরীব বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ব্যবসায়ীরা তাদের বেসাতি নিয়ে চলেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নৌকার ধারে অবাধে চলাফেরা করছে, জলের দিকে ঝুঁকছে, তাতে তাদের মায়েদের ভ্রূক্ষেপও নেই। কত পানসী সামপান আমাদের লঞ্চের গা ঘেঁসে চলে গেল। যাবার সময় কেউ কেউ বা মিষ্টি হাসি হেসে আমাদের কাছ থেকে ফিরতি হাসি নিয়ে যে যার গন্তব্য পথের দিকে চলে গেল।

মেনাম নদীর ধারে ধারে অনেকগুলি মন্দির ও প্যাগোডা। লঞ্চ প্যাগোডাগুলি অতি সুন্দর, চারি দিকে চমৎকার সাজানো ফুলের বাগান। মাথার ছাদগুলি সুদৃশ্য রঙিন্ পোরসিলেনের টালি দিয়ে চমৎকার ভাবে তৈরি। নীল আকাশের নীচে সে প্যাগোডাগুলির দৃশ্য বড়ই মনোরম! প্রতাপের সঙ্গে ক্যামেরা ছিল। সে টপাটপ গুটিকতক ছবি তুলে নিলে।

দুপুর প্রায় ১২টার সময় আমাদের লঞ্চখানি আবার মেনাম নদীর তীরে ফিরে এলো। সেখান থেকে রিক্স নিয়ে আমরা ষ্টেশনে এলাম এবং সেখানে একটু ঘোরাফেরা করে কে এল এম হোটেলে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় দুটো বাজে। মুখ-হাত-পা ধুয়ে খাবার ঘরে গেলাম। সেই আমাদের প্রথম হোটেলে লাঞ্চ খাওয়া।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘরে এসে বাড়ীতে চিঠি লিখতে বসা গেল। পাশের খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায় অফুরন্ত মাঠ, সবুজ ধানের ক্ষেত আর মাথার ওপর নীল আকাশ। দূরে একটি মন্দিরের চূড়ার খানিকটা দেখা যাচ্ছে। ঘরের পেছনের ছোট পুকুরে একটি ১২।১৩ বৎসরের মেয়ে ছিপ দিয়ে মাছ ধরছে। কিছুক্ষণ পরে দুটি ডাচ যুবক এসে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে লেগে গেল।

গত কাল রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ভারি মজার এক জিনিষ দেখেছি। আগেই বলেছি যে, এখানে জলাভূমি চারি দিকে এবং অনেক বাড়ী জলার উপরে কাঠের খুঁটির উপরে তৈরি। এক থাই-মহিলা তাঁর বাড়ীর বারান্দার উপর থেকে ছিপ ফেলেছেন মাছ ধরবার জন্যে। জানি না উনুনে তাঁর তেল চড়ানো ছিল কি না। এ রকম সহজে অনায়াসে ঘরের বাইরে না গিয়েও মাছ ধরার প্রচেষ্টা দেখে সেদিন ভারি মজা লেগেছিল।

জলাভূমি থাকলেই সেখানে ব্যাং থাকবেই। অতএব ব্যাংককে যে ব্যাং একটু বেশী পরিমাণে থাকবে তা খুবই স্বাভাবিক। স্তব্ধ দুপুরে ও সন্ধ্যায় ব্যাং-এর ডাক শুনতে বেশ লাগে। তাদের লাফিয়ে লাফিয়ে চলা দেখতেও ভারি মজা লাগে। ব্যাংএর বিষয়ে একটি ছড়া বা কবিতা রচনা করে আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে পাঠিয়ে ছিলাম, সেটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

"ব্যাং ককাকক্ ব্যাং ককাকক্ ব্যাং ব্যাঙাব্যাং ব্যাং
ব্যাংককেতে পৌঁছে দেখি চারদিকেতেই ব্যাং
(তাদের) সরু সরু ঠ্যাং (তারা) ছোড়ে ট্যারা ল্যাং
(আর) সেই ঠ্যাংএতে লাফিয়ে বেড়ায় ল্যাং ড্যাঙাড্যাং ড্যাং"।

কাল ভোর পাঁচটায় আমাদের হংকং যাত্রা—রাত্রের খাওয়া দাওয়া সেরে বাগানের বেঞ্চে বসে গল্প করছি, এমন সময় রিসেপসনিষ্ট এসে জানিয়ে গেল যে কাল ভোর পাঁচটায় আমাদের প্লেন ছাড়বে। সে বললে, আমাদের উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই। হোটেলের ওয়েটার ঠিক তিনটের সময় চা নিয়ে আমাদের জানিয়ে দেবে আর চারটের সময় কে এল এম বাস এসে আমাদের নিয়ে ক্যাথে প্যাসিফিক এয়ারওয়েজ প্লেনে তুলে দেবে। কিছুক্ষণ গল্প করে সে চলে গেল। আমরাও তখন আমাদের শোবার ঘরে চলে এলাম।

সঙ্গে বাঁশী ছিল। একটু বাঁশী বাজিয়ে খানিকটা সময় কাটানো গেল। মাঝে মাঝে তিন বন্ধু মিলে একটু-আধটু গানও গাওয়া গেল। তার পর যে যার বিছানায় গিয়ে শুতে শুতেই ঘুম।

(স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী)

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

পঞ্চম খণ্ড—সেবিকা।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শিক্ষয়িত্রী।

১লা জানুয়ারী ১৮৯২ হইতে ভাই পরেশের সহিত মিলিয়া তুমি বাঁকিপুরের গঙ্গাতীরের নিকটবর্ত্তী Boilard সাহেবের বাঙ্গলা ভাড়া লইলে। দুই পরিবার, কিন্তু উপাসনার ঘর একটি; তাহার সম্মুখে লেখা হইল "মহা মিলনের গৃহ।" উপাসনা একত্রে হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মাঘোৎসব আসিয়া উপস্থিত হইল। বাঁকিপুরের উৎসব সম্পন্ন করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করা গেল। ১৩ই মাঘ একটি নূতন ব্যাপার হইল। তাহা লইয়া তোমাকে ও আমাকে অনেক নিন্দা শুনিতে হইয়াছিল, কিন্তু তোমার মন একবারও টলে নাই। যে কাজ ঠিক বুঝিতে, তাহা তুমি শত বাধা সত্ত্বেও করিতে।

ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিভূমি, ঈশ্বর পিতা এবং নরনারী ভাই-ভগিনী। এখানে সকলের সমান অধিকার। পুরুষ বড়, নারী ছোট, এখানে এ কথা কেহ বলিতে পারে না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ সত্য তোমার হাড়ে হাড়ে বসিয়া গিয়াছিল। তাই উপযুক্ত বুঝিয়া তোমাকে রাজপথে সঙ্কীর্ত্তনের অধিকার দিতে চাহিলাম। তোমার কাছে যেমন বলা, তোমারও তেমনি তাহা করা। তোমার নিজের উপাসনা-গৃহ হইতে তুমি পূর্ব্বেই অবরোধ তুলিয়া দিয়াছিলে। কিন্তু সামাজিক উপাসনায় অবরোধ উঠে নাই, কারণ বাঁকিপুর অবরোধ-প্রধান স্থান। তোমার মনে থাকিতে পারে, প্রথম যখন বাঁকিপুরে আসিলে, বন্ধুরা পাল্কি করিয়া তোমাকে নামাইয়াছিলেন। সুতরাং যেখানে তোমাদের কার্য্যের ফল অন্য ভাইদের স্পর্শ না করে, এমন স্থানে, (বিহার নগরীর রাজপথে), ব্রহ্মনাম করিবে স্থির হইল। শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু মহাশয়কে বলিলাম, তিনি আনন্দিত হইলেন। সঙ্কীর্ত্তনের সমুদায় ভার তিনি লইলেন। সম্মুখে খোলবাদক ও শ্রদ্ধেয় মহাশয়, মাঝখানে নারীদল; ছোট ছোট মেয়েরা নিশান ধরিয়া চলিতেছেন। চারি পাশে ও পশ্চাতে আমাদের লোকজন তোমাদের রক্ষিরূপে চলিতেছে। বাঁকিপুরের রাজপথে যদি সঙ্কীর্ত্তন হইত, তাহা হইলে পুরাতন হিন্দু সম্প্রদায় ও রক্ষণশীল ব্রাহ্ম ভাই সকলে অতিশয় বিরক্ত হইতেন। অপরিচিত বিহার নগরী ধার্য্য হওয়াতে তখন আর কেহ কিছু বলিলেন না। সঙ্কীর্ত্তন হইয়া গেল। বুঝা গেল, ভার দিলে নারী খুব ভাল সঙ্কীর্ত্তন করিতে পারেন, ও লোকের মনকে আকর্ষণ করিতে পারেন।

তৎপর দিবস "শিলাও" বাজারে তুমি বক্তৃতা দিলে, ভাই বলদেও নারায়ণও কিছু বলিলেন। তোমার বক্তৃতা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে, কিন্তু ভাবে ভরা; চক্ষে জল পড়িতেছিল। আমি দূর হইতে দেখিতেছিলাম, দেবী কিরূপে পাপী সংসারী মানুষের জন্য

জানি না। ২৬শে জানুয়ারী গৈরিক পরিয়া কমণ্ডলু লইয়া দুই তিন জন সঙ্গিনীর সঙ্গে কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাজগৃহে যাইবার পথে গৃহে গৃহে ব্রহ্মগুণগান করিয়াছিলে। গৃহস্থেরা সামান্য ভিখারী জানিয়া ভিক্ষা দিতে আসিলে বলিতে, "ভিক্ষা চাই না, হরির শরণাপন্ন হও"। ২৬শে রাত্রিতে রাজগৃহে পৌঁছিলে। ২৭শে জানুয়ারী আমাদের আধ্যাত্মিক বিবাহ উৎসবের প্রথম সাম্বৎসরিক সম্পন্ন হইল। সকল সাধু-সাধ্বীর পদধূলি ভিক্ষা করা গেল।

এইরূপে উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। ইহার পর তুমি তোমার কাজ আরম্ভ করিলে। বাঁকিপুরের বালিকা বিদ্যালয়টি তখন উঠিয়া যায় যায় হইয়াছিল। নবেম্বর মাসে শিক্ষয়িত্রী পরলোক গমন করিয়াছেন, সেই হইতে আর স্কুলের কাজ হয় নাই। দশটি অল্পবয়স্কা কন্যা তখন স্কুলের ছাত্রী। স্কুলের আয় ছিল মাসিক ৪৮৲ টাকা মাত্র, কিন্তু চাঁদা প্রায়ই পাওয়া যাইত না। এমন সময় স্বর্গগত গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় আমাদিগকে স্কুলের ভার লইতে বলিলেন। আমি বলিলাম, "মেয়েদের থাকিবার জন্য স্কুলে স্থান দেওয়া হউক, আর মিসেস রায়কে স্কুলের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হউক।" তিনি বলিলেন, "মিসেস রায় কাজ করিতে থাকুন, আপনিই তিনি সমুদায় ভার পাইবেন।" বাস্তবিক তাহাই হইল। তুমি ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ভার লইয়া পুনরায় স্কুলের কাজ আরম্ভ করিলে। সে কিরূপ ভার? টাকা নাই, তুমি যেখান হইতে পার টাকার যোগাড় করিবে, না পারিলে নিজে দিবে। বালিকা নাই, বাড়ী বাড়ী গিয়া, বিদেশে দেশে ঘুরিয়া ছাত্রীসংগ্রহ করিবে। শিক্ষক নাই, শিক্ষকের বন্দোবস্ত করিবে ও নিজেও পড়াইবে। ছোট ছোট মেয়েদের শ্রেণীতে তুমি নিজেই পড়াইতে লাগিলে।

এদিকে তোমার পরিবারের কাজও চলিতে লাগিল। তিনটি কন্যা পূর্ব্ব হইতেই আসিয়াছিলেন, এখন আরও আসিতে লাগিলেন। তুমি মাতা হইয়া তাঁহাদের শরীরের সেবা, শিক্ষার ব্যবস্থা, চরিত্র পরিদর্শন, ধর্ম্মজীবন গঠন সকলই করিতে লাগিলে। প্রভাতে সন্ধ্যায় 'পরিবারের' পরিচর্য্যা, দ্বিপ্রহরে বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ, ইহা ছাড়া বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমুদায় সাধারণ বন্দোবস্তের ভার তোমারই উপরে পড়িল। কেমনে তুমি এত ভার লইয়া পারিয়া উঠিবে আমিও পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না; কিন্তু আমি বিশ্বাস করিতাম, সকল মানবাত্মাই অনন্ত শক্তির অধিকারী, তাই বুঝিতাম মার কৃপায় তুমিও পারিবে। দেখি, এখন হইতে তুমিও কাজে নিযুক্ত; আমিও নিযুক্ত; তুমি ও আমি উভয়ে নিজের নিজের ক্ষেত্রে দায়িত্ব ভার বহন করিতে লাগিলাম। তোমাতে ও আমাতে জীবনের অবস্থার প্রভেদ আরও ঘুচিয়া যাইতে লাগিল। মিলন বাড়িতে লাগিল। এ কিরূপ মিলন? তুমি তুমি আমার মধ্যে লুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহা নয়; তুমি আমার সম্মুখে

দাঁড়াইবে, আবার সাধনে ও তপস্তায় আমার সঙ্গিনী হইবে— এইরূপ মিলন। এ মিলন এক দিনে শেষ হয় না, ইহা চির-উন্নতিশীল। যতই তোমার কাজ বাড়িতে লাগিল, ততই আমিও তোমার সাহায্য করিয়া অতি উচ্চ সুখে সুখী হইতে লাগিলাম; আবার যখন তোমার ও আমার মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইতে লাগিল, দুজনাই আত্ম ইচ্ছাত্যাগের শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলাম। এ শিক্ষা সব সময় সহজ হয় নাই, কিন্তু এ শিক্ষা বিনা কে কবে উচ্চ মিলন সম্ভোগ করিয়াছে?

মার্চ্চ মাসের শেষে বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ২১ হইল। এ ছাড়া ১৫টি হিন্দুস্থানীর মেয়ে আসিতে লাগিল। বিদেশ হইতে কন্যাগণ তোমার পরিবারে আসিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় তোমার অনেক সাহায্য করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় অমৃতবাবু তোমার সকল কাজকেই আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ব্রজগোপাল তোমার কাজে যোগ দিতে চাহিলেন। আর এই সময়ে প্রবোধের বিধবা পত্নী স্বীয় কন্যাটির ভার তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া, বয়স হইলে পাত্রস্থ করিতে বলিয়া দিয়া, মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

স্কুলের কাজ হাতে লইয়া তোমাকেও অনেক শিখিতে হইল। প্রতিদিন শত কাজের মধ্যেও খানিকক্ষণ পাঠ করিতে। এই কাজটি নিয়মিতরূপে করিতে। একবার স্কুলে ভূগোল পড়াইবার প্রয়োজন হইল। ভূগোল তুমি জানিতে না। তোমার প্রধানমন্ত্রী আমি, আমাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, কি করিবে। মন্ত্রী বলিলেন, "একটু পড়িয়া লও না!" তুমি তাহাই করিলে, এবং স্কুলে গিয়া পড়াইলে। অঙ্কও জানিতে না। যখন অঙ্ক শিখাইবার প্রয়োজন হইল, তখনও ঐরূপে নিজে শিখিলে ও তারপর শিখাইলে। একটি কথা তুমি খুব বুঝিয়াছিলে; তাহা এই যে, মেয়েদের লেখাপড়ার দিকে অধিকাংশ লোকের মনোযোগ নাই; অথচ তাহারা যাহাতে সংসারের রান্নাবান্না প্রভৃতি কাজ করিবার উপযুক্ত হয় সে দিকে অনেকেরই দৃষ্টি আছে। তাই তুমি লেখাপড়া শেখার দিকটাতেই বেশী জোর দিতে। একদিন আমি বলিলাম, "মেয়েদের রান্না শেখা হইতেছে না।" তুমি বলিলে, "এখন যে সময় আছে তাহা পড়িতেই কুলায় না; তাহা হইতে রান্নার জন্য সময় কাটিলে চলিবে না। ৭।৮ বৎসর মাত্র মেয়েরা পড়িতে পায়, তাহা হইতে যদি রান্না শিখিতে সময় কাটিয়া লওয়া যায়, তবে কিছুই শিক্ষা হইবে না। আমি ১৫ দিনের মধ্যে মেয়েদের রান্না শিখাইয়া দিব।" যখন তুমি এই কথাগুলি বলিতেছিলে, তোমার ব্যাকুলতা চোখে মুখে যেন আঁকা দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেই দিন হইতে আর আমি এজন্য পীড়াপীড়ি করিতাম না। অথচ দেখিতাম, তোমার পরিবারের মেয়েরা রন্ধনের প্রাইজ পাইত। পাঠের সুব্যবস্থা যাহাতে হয়, সর্ব্বদা ও সকলের জন্য সে চেষ্টা করিতে। তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র সুবোধ রাত্রিতে শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িতেন, পাঠে সময় পাইতেন না, তাই তুমি সুবোধের চেয়ারের সম্মুখে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত খাড়া বসিয়া থাকিতে, সুবোধের নিদ্রা আসিলেই জাগাইয়া দিতে।

স্কুলে উপস্থিত হওয়া ও স্কুলের কাজ করা সম্বন্ধে তোমার নিয়ম দেখিয়া বেতনভোগী শিক্ষকেরাও আপনাদিগকে নিয়মিত করিতেন। শরীর অসুস্থ থাকিলেও সহজে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিতে না। অনেক দিন আহার করিয়া যাইতে পারিতে না। কখনও কখনও তোমার খাদ্য স্কুলে লইয়া যাওয়া হইত, কিন্তু সে শুষ্ক অন্ন গলাধঃকরণ করা কঠিন হইত। অবকাশের (টিফিনের ছুটীর) সময় বিদ্যালয়ে গিয়া দেখিয়াছি, মেয়েদের সঙ্গে তুমি প্রাঙ্গণে দৌড়িতেছ, কিরূপে খেলিতে হয় তাহা শিখাইতেছ। তুমি এ সময়ে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীও অল্প অল্প শিক্ষা করিয়া লইয়াছিলে।

এ সকল তো স্কুলের সময় করিতে। তারপর আর একটি কাজ ছিল সেটি বাড়ী বাড়ী গিয়া মেয়ের মা-দের সঙ্গে দেখা করা। অনেক খোসামোদ করিয়া তবে এক-একটি মেয়ের যোগাড় করিতে। বিদ্যালয়ের মেয়েরাও তোমাকে আপনার লোকের মতন ভালবাসিত, তারা তোমাকে "মাইজী" বলিত। "মাইজী" বলিলে বিদ্যালয়ের বালিকা মাত্রেরই মন ভালবাসায় পূর্ণ হইত।

তোমার দৈনিক পড়িলে বুঝা যায়, এই সময়ে তোমার কাজ কত বাড়িয়া চলিল। একদিনের কতগুলি কার্য্যের তালিকা এই। (১) ছেলেদের আহার দেখা, (২) পাঠ, (৩) উপাসনা, (৪) রোগীর সেবা, (৫) স্কুলে যাওয়া, (৬) ধোপার বস্ত্র লওয়া ও দেওয়া, (৭) দেখা করা, (৮) লেপ প্রস্তুত করা, (৯) নূতন বন্ধুর বাটীর সংবাদ লওয়া, (১০) জুতার বন্দোবস্ত করা, (১১) এষ্টিমেট করা এবং বেতন দেওয়া। দেখিতে ও শুনিতে হয়তো সহজ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষের পক্ষে এ অনেক কাজ। ইহার মধ্যে দেখা করাটা একটা বিশেষ কাজ ছিল। নূতন কোন বন্ধু আসিলে একবার যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিত। কেন না, নূতন স্থানে কেহ আসিলে তাহাকে কত অসুবিধায় পড়িতে হয়, তাহা তুমি বিলক্ষণ বুঝিতে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতে, ও সাহায্য করিতে। যদি কাহারও ফিলটার আবশ্যক হইল, মিসেস্ রায় তাহা প্রস্তুত করিবেন। বালি, কয়লা প্রস্তুত করিয়া দিয়া, কেমন করিয়া হাঁড়ির উপর হাঁড়ি বসাইতে হয়, তোমাকে গিয়া বলিয়া দিতে হইত। কখনও কখনও কোন আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া ভদ্র পুরুষদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইত।

পাছে বাহিরের বড় বড় কাজে মন গেলে সংসারের কর্ত্তব্য ভাল করিয়া করা না হয়, তাই সদাই তুমি চিন্তিত হইতে। ছেলেরা কি খাইল কি না খাইল, তার তত্ত্বাবধান করিতে তুমি সদাই সযত্ন হইতে। সেইজন্য ছেলেদের সঙ্গে একত্রে আহার করিতে ভালবাসিতে। খাবার জিনিষ দেওয়া বিষয়ে তোমার মতন সমদৃষ্টি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। একদিন রন্ধনের কর্ত্তা আমার পাত্রে অনেক বেশী বেশী বস্তু দিয়াছিলেন। তারতম্য এত অধিক যে ছেলেদের সম্মুখে বসিয়া আমার খাওয়া অসম্ভব হইতেছিল। কি করিব ভাবিতেছিলাম; তোমার আহারে আসিতে বিলম্ব হইতেছিল। তুমি আসিবামাত্র আমার মনের ভাব বুঝিলে এবং আমাকে কিছু না বলিয়াই আমার পাত হইতে দ্রব্যাদি তুলিয়া লইয়া সকলকে সমান ভাগ করিয়া দিলে; আমি বাঁচিলাম। ছেলেদের খাওয়া দেখা যেমন, তেমনি অতিথির আহারের বন্দোবস্ত করাও তোমার একটা নিত্য ব্রতধর্ম্ম ছিল। অতিথির সম্মুখে বসিয়া তুমি আহার করাইতে, অন্যের হাতে এ ভার দিয়া রাখিতে না। যে কোনও সময় হউক না কেন, অভ্যাগত জনকে কখনও বাসী ভাত কিম্বা বাজারের খাবার খাইতে দিতে না। পূর্ব্বাহ্নে, অপরাহ্নে, রাত্রিতে সর্ব্বদাই গরম ভাত দিতে চেষ্টা করিতে। ভাই চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গল্প করেন, একবার তিনি

আমাদের বাড়ীতে আসিয়া স্থির করিলেন, প্রাতঃকালে উপাসনা করিয়া ৭টার ট্রেণে গয়া যাত্রা করিবেন, এবং গয়ায় গিয়া আহার করিবেন। এই সঙ্কল্প করিয়া উপাসনা করিতে বসিলেন। যেমন উপাসনা শেষ হইল অমনি দেখেন যে তাঁহার সম্মুখে গরম খিচুড়ী প্রস্তুত। এদিকে তুমিও উপাসনায় বসিয়াছিলে, কখনই বা খিচুড়ী প্রস্তুত করিলে কেহই বুঝিতে পারিলেন না। উপাসনায় বসিবার পূর্ব্বেই কেরোসিনের ষ্টোভে খিচুড়ী চড়াইয়া দিয়াছিলে। উপাসনা ফেলিয়া কখনও আহারের বন্দোবস্ত করিতে যাইতে না।

তোমার পিসিমাতারা একবার গয়া তীর্থ করিবার জন্ত তোমার গৃহে আসিয়াছিলেন, তুমি নিজে তাঁহাদের সেবার আয়োজন করিয়া দিলে, কিন্তু রন্ধন করিলে না। অন্যান্ত হিন্দু কুটুম্ব আসিলেও ঐরূপে তাঁহাদের সব আয়োজন করিয়া দিতে, কিন্তু সাবধান হইয়া একটু অন্তরে অন্তরে থাকিতে। যখনকার কথা বলিতেছি, তখন ব্রাহ্ম-বন্ধুরা দয়া করিয়া প্রায়ই আসিতেন। বড় মানুষ অতিথি হইলে বড় মানুষের মত আয়োজন করিতে হইত। তাহাতে কখনও কখনও খরচের অকুলান হইত। শেষে লজ্জা ত্যাগ করিয়া যাহা আছে তাহাই দিতে, এবং তাহা দিয়াই ভক্তিভাবে সেবা করিতে। মাসের শেষে কখনও কখনও অতিথিকে দিবার উপযুক্ত মিষ্টান্ন থাকিত না। কিন্তু প্রাণান্তেও বাজারে দেনা করিয়া তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিতে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুবিধা হইলেই সন্তানদের লইয়া একত্রে আহার করিতে বসিতে। নিজের সন্তান ছাড়া স্থানীয় স্কুলের ছাত্রদিগের প্রতিও তোমার দৃষ্টি থাকিত। একবার কলিকাতা হইতে ৪টা নারিকেল আসিয়াছিল। প্রিয় বস্তু পাইয়া আপনার ছেলে-মেয়েদের খাওয়াইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলে না। পিঠা প্রস্তুত করিলে, আদর করিয়া সার্ভে এবং মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদিগকে তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পৌষপিঠা খাওয়াইলে।

একবার একটা সার্কাস পার্টি বাঁকিপুরে আইসে। তাহাদের মধ্যে একজন টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হন। তাঁহার পীড়া সংক্রামক বলিয়া তাঁহাকে কেহ স্থান দিতে চাহে নাই। তুমি তাঁহাকে নিজগৃহে আনয়ন করিলে; ঔষধ, পথ্য দিয়া ও যথাবিহিত সেবা করিয়া নীরোগ করিলে এবং স্বদেশে পাঠাইয়া দিলে। যুবা তোমার সেবায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া যখন শুনিলেন যে তুমি দেহত্যাগ করিয়াছ, তখন কাঁদিয়া ফেলিলেন।

যে কোনও বিষয়ে লোকের একটু সাহায্য করিতে পারিলে তুমি সুখী হইতে! এক বার এক জন লোক বাঁকিপুরের মেডিক্যাল স্কুলের মাঠে বেলুন উড়াইলেন। তখন মেডিক্যাল স্কুলের মাঠ খুব বড় ছিল, হাসপাতালের বাড়ী তখনও তৈয়ারী হয় নাই। তোমার বাটী সে মাঠের অতি নিকটে। তোমার বাটীর ছাতে বসিয়া যাহাতে অন্ত অন্ত বাড়ীর মেয়েরা বেলুন উঠা দেখিতে পান, তার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলে। কিন্তু সে বাঙ্গলা বাড়ী, তার ছাত আছে তো সিঁড়ি নাই। সিঁড়ি নাই বলিয়া তুমি এক বুদ্ধি করিলে। খান পঁচিশেক তক্তপোষ যোগাড় করিয়া তাই সাজাইয়া প্রকাণ্ড
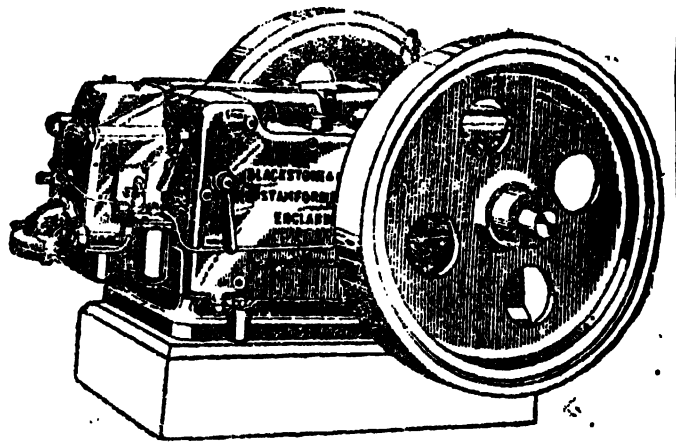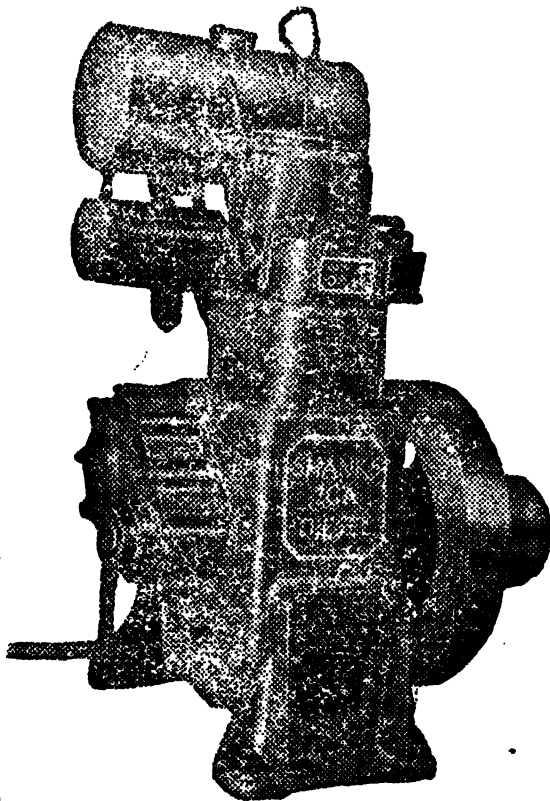
সিঁড়ি প্রস্তুত করাইলে। তোমার নিমন্ত্রণে অনেক হিন্দু মেয়েরাও আসিয়া বেলুন দেখিয়া সুখী হইয়াছিলেন।

নয়াটোলার বাটীতে থাকিতে একবার তোমার পার্শ্বের খোলার ঘরে আগুন লাগিয়াছিল। তখন তোমার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ঈশ্বর-স্মৃতি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। তোমার দ্বিতীয় পুত্র সাধনচন্দ্র আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিবামাত্র তুমি উপরের ঘরে আসিলে; একখানা বড় সতরঞ্চি ছিল, সেখানাকে স্নানের ঘরের জলে ভিজাইয়া, জানালা দিয়া সেই জ্বলন্ত চালে নিক্ষেপ করিলে; তার উপর বালতি করিয়া জল দিতে দিতে অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। যখন সতরঞ্চি নিক্ষেপ কর, তখন মুখে কেবল 'মা' 'মা' বলিতেছিলে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গুপ্ত-গোদাবরী

লক্ষ্ণৌ যাইবার পূর্ব্বে প্রায়ই তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে জেলার নানা স্থানে ঘুরিতে। অনেক দিন দূরে থাকিতে চাহিতে না। কিন্তু এখন দেবতা তোমাকে অন্য বিধির মধ্য দিয়া গড়িতে লাগিলেন। এক স্থানে ক্রমাগত থাকিয়া, দায়িত্বপূর্ণ ভার বহন করার যে শিক্ষা তাহা তোমাকে গ্রহণ করিতে হইল। কর্ত্তব্যের খাতিরে আমাকে মফঃস্বলে যাইতে হইত, কর্ত্তব্যের খাতিরে তোমাকে প্রায়ই বাঁকিপুরে বাঁধা থাকিতে হইত। মাঝে মাঝে ছুটি পাইলে আমার সঙ্গে বাহিরেও যাইতে। যাদের জীবনে নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে, তারা যখন মাঝে মাঝে নির্জ্জন প্রকৃতির সঙ্গ পায়, তখন তাদের কতই উপকার হয়! অন্যের এত হয় না। তুমি এখন হইতে এ উপকার পাইতে লাগিলে।

মাঝে মাঝে আমি যখন তোমার কিছু ত্রুটি ধরিয়া দিতাম, তখন তোমার মনে কিরূপ সংগ্রাম আসিত, তোমার দৈনিক পড়িলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। আগষ্ট মাসে একদিন লিখিয়াছ, "আজ স্বামী মহাশয়ের প্রার্থনায় নিরাশের কথা শুনিয়া মন জাগিয়া উঠিল। এখনও যে ত্যাগ স্বীকার হয় তাই তাহা বুঝিলাম।" তারপর প্রার্থনা করিলে, "নিজকে ভুলিয়া তোমার ইচ্ছা পালনের জন্য শেষ ক'টা দিন যেন কাটাইতে পারি। তোমার ও তোমার সন্তানের সাধ পূর্ণ করাই আমার জীবনের কাজ। এই কাজ প্রাণ দিয়া করিয়া শেষ দিনে উভয়ের প্রসন্ন মুখ দেখিয়া যাইব। পূর্ব্বে আর একবার এই সাধনের ভিতর এসেছিলাম, কিন্তু এ বার তাহা অপেক্ষা সহজ বোধ হইতেছে। স্বামীর শরীর স্পর্শ করিবার যে সুখ তাহা ত্যাগ করিলাম, সুখ ছাড়া।" এতদিন পরে আবার এ কথা কেন? দেখি, তখন তুমিও দেহী ছিলে, আমিও দেহী। যত দিন দেহ থাকিবে, বুঝি দেহের সংগ্রামও থাকিবে। শ্রীঈশাই যখন শেষ দিন পর্য্যন্ত দেহের সংগ্রাম করিয়াছেন, তখন আমরা আর কোন্ ছার? এ সংগ্রাম তোমার পক্ষে অনেক কঠিন হইয়াছিল, কিন্তু কখনও পিছ-পাও হও নাই। এক এক বারের সংগ্রামের অবসানে তুমিই আবার সাক্ষ্য দিয়াছ, "শরীরের সুখ ত্যাগে আরও যেন ভালবাসা বাড়িয়াছে। এখন দেখিতেই বেশী ইচ্ছা করে। মা! তুমি এই দর্শন আরও মিষ্ট করিয়া দেও। সংসারের কোন বাধা যেন আমাদের গতিরোধ না করিতে পারে, এই আশীর্ব্বাদ কর। পিকুর সহিত কিছু থাকে হাড়ের ভিতরে, অজ্ঞানিতরূপে, তাহাও যাক।" মিলনের ধর্ম্মে চলিতে হইলে গোপন করা যে অন্যায়, মনের ভাব গোপন করা যে পাপের লক্ষণ, তাহা বুঝিতে পারিলে। অকস্মাৎ মনে কোনও ভাবের উদয় হইলে অমনি দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে বলিয়া যাইতে; পাছে মিলনধর্ম্মের কোন ক্ষতি হয়।

৩০শে আগষ্ট দৈনিকে লিখিয়াছ,—"পিকুর কোথাও যাইবার কথা শুনিলে বুকের ভিতর কেমন করে। তাহাতে বুঝিতেছি; এখনও আসক্তি আছে। নিশ্চয় ইহা যাইবে। যখন এইরূপ হয়, তখন মার পা ধরিয়া প্রার্থনা করি, পরলোক স্মরণ করি। মনকে এইরূপে ঠিক করি।" ক্রমশঃ শরীর সম্বন্ধে উভয়ের পাপবোধ সমান হইতে লাগিল। একদিন তোমার শরীর আমার শরীরে স্পর্শ হওয়াতে দুজনার সমান পাপবোধ হইয়াছিল। কাহারও কাহারও কাছে এটা একটা আজগুবি কথা মনে হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা আমাদের ত্যাগের মন্ত্র জানেন, কি এক অজড় ধর্ম্মশৈলে উঠিতে চাহিতেছিলাম তাহা যাঁহারা অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারা একথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন, আমাদের সংগ্রামও বুঝিতে পারিবেন।

পূজার ছুটিতে বিদ্যালয় বন্ধ হইলে কয়েকটি কন্যাকে লইয়া আমার সঙ্গে বেড়াইতে গেলে। এই ভ্রমণে তোমার অনেক উপকার হইয়াছিল।

পাটনা সহরে গঙ্গাবক্ষে পূর্ব্বকালের একটি পাকা বাড়ীর সন্ধান পাইয়াছিলাম। এ গৃহে ডচেরা (Dutch) বেহারের মাল খরিদ করিয়া বোঝাই করিত। তাহাদের পাকা রেক্তার গাঁথনি এখনও নষ্ট হয় নাই। এখন সে বাড়ী একজন নবাবের, ব্যবহার প্রায় হয় না। কয়েকদিনের জন্য সেই গৃহে গিয়া তোমার শরীর মনের অনেক উপকার হইল। তোমার দৈনিকে লিখিয়াছিলে,—"১ই সেপ্টেম্বর ১৮১২ (পাটনা, নবাবের বাঙ্গলা)। প্রার্থনা—গঙ্গার নৌকা দুরকমে চলে। এক, অনুকূল বাতাসে; মাঝিরা বসিয়া আছে, নৌকা আপনি চলিতেছে, খুব বেগে। আর রকমে, নৌকা প্রতিকূলে যাইতেছে; তাহাতে পাল দিয়া, চেষ্টা করিয়া মাঝিরা পালের দড়ি সাবধানে ধরিয়া বসিয়া আছে; যাইতেছে খুব শীঘ্র, কিন্তু ভয় আছে, দড়ি ছিঁড়িলে নৌকা মারা যাইবে। আমার অবস্থাও তাই। ভিক্ষা করি, মা শীঘ্র শীঘ্র অনুকূল বাতাসে আমার জীবন-নৌকাকে নিয়ে ফেল"।

২৮শে সেপ্টেম্বর আমরা চুণারে গমন করিলাম। তোমরা গড় দেখিলে, গঙ্গাস্নান করিলে। সেখান হইতে চিত্রকূট দেখিতে চলিলাম। আমা অপেক্ষা তুমি অধিক ব্যস্ত। সন্ধ্যার পর সীতাপুর পৌঁছান গেল। সে রাত্রি ষ্টেশনে কাটান গেল। ষ্টেশনটি অতি সুন্দর, বেশী লোক ছিল না। খোলা স্থানে সকলকে রক্ষা করিবার ভাবে আমি শয়ন করিলাম। বড় ভাল লাগিল। ৩০শে সেপ্টেম্বর সকালে কতক গো-যানে কতক পদব্রজে চিত্রাকূটাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। বেলা ১০টার সময় গ্রামে পৌঁছিলাম। একটি দ্বিতল গৃহ ভাড়া করা গেল। সে বাসাটি নিরাপদ নয়, কিন্তু সেখানে তুলনায় সেটিকেই ভাল বলিয়া গ্রহণ করা গেল। নদীর তীরে রামঘাট দর্শন করিয়া সকলেই সুখী হইলে। ১লা অক্টোবর গুপ্ত-গোদাবরী দেখিতে চলিলাম। পথে দুটি ঘোড়া ভাড়া করা হইল, অন্য কোনও যান পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত—মহাশয়ের জন্য একটি অশ্ব নির্দ্দিষ্ট হইল; অপরটি আমার জন্য। অল্প দূর গিয়া তিনি বলিলেন, অশ্বে যাইতে

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহ অশ্বারোহণে যাইতে স্বীকার করিলেন না। তখন সেই অশ্বে তোমার চড়িয়া যাইবার প্রস্তাব হইল। বঙ্গনারীর অনেক কলঙ্ক আছে; তিনি দুর্ব্বলা, ভীরু। এ অপবাদ আরোপ তোমার সহ্য হইত না, সুতরাং অনুরোধ করিবামাত্র ৬।৭ মাইল অশ্বারোহণে চলিয়া গেলে। ঘোড়াটি ছোট ও শান্ত; পথও দৌড়িবার মত ছিল না; কিন্তু তুমি তো কখনও ঘোড়ায় চড়িতে শেখ নাই। শেখ নাই, তাহাতে কি? তুমি জানিতে তুমি আত্মা; উন্নতিই আত্মার স্বভাব; নূতন যাহা কিছু ভাল সম্মুখে আসে, তাহাতে অগ্রসর হইয়া চলাই আত্মার স্বভাব। এই স্বভাবের কাছে তোমার দ্বিধা, সঙ্কোচ ভয় সব উড়িয়া যাইত। লোকে ভাবিত তুমি নারী, তুমি কেমন করিয়া সাহসের কাজ করিবে? তুমি ভাবিতে, আমি আত্মা, আমি কেমন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব। আমিও ভুলিয়া যাইতাম, যে তুমি নারী। আমিও কেবল দেখিতাম, তুমি আত্মা; তোমাকে নিত্য নূতন নূতন পথে লইয়া যাওয়াই তোমার সেবা করা। অশিক্ষিতা বঙ্গনারী তুমি যখন জিন-শূন্য অশ্বপৃষ্ঠে চলিতেছিলে, আমার কাছে তখন দেখিতে অতি সুন্দর লাগিতেছিল। বেলা দশটার সময়, যে পর্ব্বত হইতে নির্ঝরিণী বাহির হইতেছিল, সে পর্ব্বতে আরোহণ করিলাম। অনেকটা উঁচুতে চড়িতে হয়, পথে একটা ছোট গুহায় প্রবেশ করিতে হয়। ভিতরে হলঘরের মত বিস্তৃত স্থান; তাহার পার্শ্ব দিয়া ক্ষুদ্র একটি স্থান হইতে উৎস উৎসারিত হইতেছে, দেখিতে পাইলাম। সে স্রোত কখনও বন্ধ হয় না।

এখন আমার মনে হয়, মানুষ মাত্রেরই মধ্যে এই গুপ্ত গোদাবরীর ভাব রহিয়াছে। প্রত্যেকের হৃদয়ে গুপ্ত প্রেমের প্রস্রবণ আছে। আহা, যদি কেহ তাহা আবিষ্কার করিয়া দিতে পারে, বাহিরে আনিতে পারে, পরের সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিতে পারে! তোমার মধ্যেও যেন এই ভাব ছিল। তোমাতে যেন গুপ্ত-গোদাবরী লুক্কায়িত ছিল। প্রথম জীবনে তাহার অপ্রশস্ত ভাব ছিল; তখন স্বার্থ ভিন্ন অন্য কোনও ভাব তোমাকে অধিকার করিতে পারিত না। কেহ জানিতেও পারিত না যে, তোমার হৃদয়খানির মধ্যে প্রেম-প্রস্রবণ লুক্কায়িত ছিল। সাহস করিয়া তোমার হৃদয়-গুহায় প্রবেশ করিয়াছিলাম বলিয়া সেই স্থায়ী প্রেম-ধারা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহাতে নিজেও সুখী হইয়াছিলাম, প্রিয়জনেরাও সুখী হইয়াছিলেন। পরসেবায় সে প্রেমধারাকে নিযুক্ত করিতে সাহায্য করিয়া আমিও হইয়াছিলাম।

গুহাস্থিত প্রস্রবণ দর্শনান্তে সেই পর্ব্বতে বৃক্ষতলে বসিয়া লীলাময় হরির উপাসনা করিয়া সুখী হইলাম। ভৃত্য অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিল। উপাসনার পর আমরা আহার করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আবার তুমি অশ্বপৃষ্ঠে আসিলে; শরীরের কোনরূপ অসুবিধা হইয়াছে, এরূপ জানিতে দিলে না। বাসায় ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। পথে রাত্রির জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করা গেল। দুধ কিরূপে লওয়া যাইবে, এই প্রশ্ন উঠিল; কারণ আমাদের সঙ্গে কোনও পাত্র ছিল না। দোকানদারের স্ত্রী বিক্রয় করিতেছিলেন; অবশেষে তিনি বলিলেন, "আমার পিতলের লোটায় লইয়া যাও।" আমরা আপত্তি করিলাম, বলিলাম, "যদি তোমার লোটা ফিরিয়া না আসে?" তিনি বলিলেন, "একবারই না?" অর্থাৎ একবার বই দুবার তো আর লোটা হারাইবে না। কি আশ্চর্য্য বিশ্বাস! এটা স্থানের গুণ! এখানে কেহ কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করে না। ঐ ঘটনা আমাদের মনে খুব ভাল ভাব উদয় করিয়া দিয়াছিল।

২রা অক্টোবর কামৃতানাথ পাহাড় দর্শন। এ শিলা অতি সুন্দর ভাবে সুরক্ষিত। রামচন্দ্রের এ কাম্য পাহাড়, রাম-সীতা অনেক সময় এখানে কাটাইতেন। আমরা ঐ পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে গেলাম। একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসিনী আমাদের আহার প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। আমরা তথায় পাদপমূলে উপাসনা করিলাম। ৩ঠা অক্টোবর জানকীকুণ্ডে স্নান। পাহাড়ের নদী পাহাড় ভেদ করিয়া চলিয়াছে। একপার্শ্বে সাধকেরা গুহা প্রস্তুত করিয়া স্থায়িরূপে বাস করিতেছেন। নিকটে দোকান নাই, কোন দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইলে তিন মাইল দূরে যাইতে হয়। কয়েক দিনের আহারের সামগ্রী একবারে লইয়া আসিতে হয়। স্থানটি বড় ভাল লাগিল, নির্জ্জনবাসের বেশ উপযুক্ত স্থান। নদীর জল বড় ভাল। এক স্থানে নদীবক্ষে উচ্চ হইতে জল পড়িয়া পড়িয়া জল গভীর হইয়াছিল, তাহারই নাম জানকীকুণ্ড। প্রবাদ আছে যে, এইখানে সীতা দেবী বনবাসের সময় স্নান করিতেন। এই পবিত্র স্থানে আমরাও অবগাহন করিয়া স্নান করিলাম। স্রোতের বেগে পরিধানের বস্ত্র টানিয়া রাখা কঠিন হইতেছিল। উপাসনায় সীতার চরিত্র ভিক্ষা করা গেল। সলিল পাথরের বাধা পাইয়া এত তেজাল হইয়াছে; সীতা দেবীও রাবণের কাছে বাধা পাইয়া এমন অতুল বীর্য্যবতী হইয়াছিলেন যে, রাবণ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এ সংসারে কত রাবণ আছে! আমরা, বিশেষতঃ আমাদের মেয়েরা, কোমল হইয়াও যেন বলশালী ও বলশালিনী হইতে পারি। সন্ন্যাসিনী আমাদের জন্য রন্ধন করিতেছিলেন; কোথা হইতে বানর আসিয়া জোর করিয়া তাঁহার কাছ হইতে চাল কাড়িয়া লইয়া গেল। বাসায় আসিয়া ২টার সময় আহার করা গেল।

৫ই অক্টোবর গৃহে প্রত্যাগমন করিব বলিয়া মানিকপুর ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলাম, এমন সময় জব্বলপুর হইতে সংবাদ আসিল, অদ্য গেলে নর্ম্মদার প্রস্রবণ দেখা যাইতে পারে। আহার প্রস্তুত, কিন্তু ট্রেণ আসিয়া পড়িল। তোমার আদেশ হইল, প্রস্তুত করা খিঁচুড়ী গাড়ীতে উঠাইয়া লইতে হইবে। যেমন বলা তেমনি করা; গিয়া একখানা খালি গাড়ীতে উঠিলাম। জব্বলপুরে একজন বন্ধুর বাটীতে রাত্রি কাটান গেল। ভোর ৭টার সময় এক্কা করিয়া জলপ্রপাত দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। নর্ম্মদা-তীরে পৌঁছিতে বেলা ১টা বাজিল। খানিক জল ভাঙ্গিয়া প্রপাতের নিকটে গেলাম। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সকলে স্নান করিলাম। প্রপাতের তীরে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তরখণ্ডে উপবেশন করিয়া উপাসনা আরম্ভ করা গেল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু আমাদের অভিষিক্ত করিতে লাগিল। খুব উচ্চৈঃস্বরে আরাধনা করিলাম, কেন না প্রপাতের শব্দ অতি প্রবল, এমন কি পরস্পরের কথাও শুনা যায় না। মনে হইল আমার মোটা গলার আওয়াজও সকলে শুনিতে পান নাই। সুতরাং তুমি ছাড়া কেহ যোগ দিতে পারিলেন কি না জানি না। এমন সুন্দর স্থানে উপাসনায় যোগ না দিতে পারিলে আমাদের দুজনারই বড় ক্ষোভ থাকিত। সুন্দর উপাসনার পর ডাকবাঙ্গলার পার্শ্বে রন্ধন ও আহার হইল। তারপর নৌকা করিয়া বেড়

প্রস্তরের পাহাড় দেখিতে গেলাম। নর্ম্মদা শ্বেত পর্ব্বত ভেদ করিয়া প্রবাহিত। আমরা প্রায় দুই মাইল সেই প্রবাহ ধরিয়া গেলাম। এমন শ্বেত মর্ম্মরের পাহাড় আর কখনও দেখি নাই। শ্বেত প্রস্তরে জল পড়িয়া কেমন ছোট-বড় পাথরের বাটী হইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া তুমি আনন্দিত হইলে, আমার সমুদায় শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে হইতে লাগিল।

এই বার দিনের ভ্রমণে যেন আমরা দুই বৎসরের শিক্ষা লাভ করিলাম। সন্তানদের বাড়ীতে রাখিয়া তুমি যে সন্ন্যাসিনীর মত পথে পথে বেড়াইলে, ইহাতে তোমার মন কত প্রশস্ত হইল, কত উন্নত হইল। বিদ্যালয়ের কার্য্যের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশ-ভ্রমণের শিক্ষাও যে কত আবশ্যক, তাহা বুঝিতে পারিলে। ফিরিবার সময় আর কোথাও থামা হইল না।

ফিরিয়া আসিবার পর নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি আমরা দুজনাই খুব বাঁধাবাঁধি শাসনের মধ্যে পড়িলাম। রাত্রি ৪টার সময় উঠিয়া জপ, চিন্তা, পাঠ আলোচনা করিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে যখন আমি তোমার কোনও অপূর্ণতা দেখিয়া অসুখী হইতাম, তখন আমার সে অসুখ তোমার জ্বালা দ্বিগুণ করিয়া দিত। কত সংগ্রাম করিতে, কত চেষ্টা করিতে, ভালবাসার খাতিরে কত ক্লেশ বহন করিতে। একদিন দৈনিকে লিখিয়াছ, "অপূর্ণতা দেখাইয়া বড়ই ব্যস্ত করিতেছ। বেশ, দেখাও। না দেখিলে তো শীঘ্র কাজ করিতে পারিব না। বল দাও, যাহাতে অপূর্ণতা দূর করিতে পারি।" আর একদিন লিখিয়াছ, "মা, তোমার দেওয়া ভার আমার বড় ভার বোধ হয়; আমি ফেলিতে ইচ্ছা করি। আর যেন বৃথা এ ইচ্ছা না হয়; সব যেন বহন করিতে পারি।" সত্য সত্যই এ সময়ে তোমার পরিশ্রম আমার অপেক্ষা অধিক হইত; শুধু পরিশ্রম নয়, নানারূপ কার্য্যের মধ্য দিয়া তোমার মনের উপরে অতিরিক্ত চাপ পড়িতেছিল। তাই ৫ই ডিসেম্বর প্রার্থনা করিয়াছিলে, "সেই চরিত্র দেও, যাহাতে তোমাকে সুখী করিতে পারি, ও পরিবারের সকলকে সুখী করিতে পারি।" ৬ই প্রার্থনা করিলে,—"তোমার ভালবাসার মুখখানি যেন সর্ব্বদাই দেখিতে পাই।" একে তো পরিবারের সকলকেই সুখী করা কঠিন। তাতে এই সময়ে বিধবা শাশুড়ী পরিবারে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিনী, রোগে শোকে জর্জ্জরিতা, সকল সময়ে তাঁহার কথা কোমল থাকে না; তাঁহাকে সুখী করা আরও কঠিন। ভাগ্যে তুমি প্রার্থনা করিতে শিখিয়াছিলে, তাই পারিলে।

৮ই ডিসেম্বর দৈনিকে লিখিয়াছ,—"আজ বড় পরীক্ষা। মা-রা কাল আসিয়াছেন। উভয়ের কর্ত্তব্য মিলাইতে খুব কষ্ট করিতে হইল, ছয় বার প্রার্থনা করিয়া বল ভিক্ষা করিতে হইল, তবে কিছু পারিলাম। আমার প্রার্থনা এই,—"আমি আসিয়াছি এই জন্ত যে দুঃখকে কেমন করিয়া সুখে পরিণত করিতে হয়, তাই শিখিব, ও জগতকে শিখাইব। তবে কেন আমি সুখ চাই? মা, তাই কর, যেন সুখ না চাই।" একদিকে শাশুড়ীর কাছে অন্তঃপুরের কুলবধূ হইয়া তাঁহাকে সুখী করিতে, আবার নারীর উন্নতির ও মর্য্যাদার আদর্শ রক্ষা করিবার জন্ত সাধারণের সহিত সম্বন্ধও ঠিক রাখিতে। যেন অভিনয় করা; এই অন্তঃপুরে সকলের চক্ষের জলের সঙ্গে চক্ষের জল মিশ্রিত করা, ক্ষণকাল পরে একাকী রেল গাড়ীতে বাঢ় ষ্টেশনে গমন। বাঢ়ে তখন মিঃ কে এন রায় ছিলেন। তিনি পুরাতন বন্ধু, তাঁহার সহিত দেখা করিতে আমি পূর্ব্বেই গিয়াছিলাম। ৮ই তারিখে তুমি একাকী গেলে, একাকী গাড়ী হইতে নামিলে। সাহস ও বিশ্বাস বাড়িল। কয়েক দিন বাঢ়ে মিঃ রায়ের বাটীতে দেবী সৌদামিনীর ভস্মাবশেষের নিকটে বসিয়া উপাসনা করিলে, এবং তাঁহার আত্মার শ্রেষ্ঠত্বের অনেক সাক্ষ্য দিলে। তিনি দেহে থাকিতে তোমাকে অনেক শিক্ষা দিয়াছিলেন, অদেহী হইয়া এই দুই দিনও দিলেন। এবারকার খৃষ্টোৎসব বাঁকিপুরে গঙ্গার চড়ার উপরে হইল।

এইরূপে ১৮১২ সাল আমাদিগকে পৃথিবীতে রাখিয়া চলিয়া গেল। এখন আত্মিক ব্যাপারও বাড়িতে লাগিল, কাজও বাড়িতে লাগিল। রাজগৃহের জন্ত সকলে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। তোমার এবারকার প্রস্তুতির বিশেষ ভাব—"মুখ মলিন করিব না।" তুমি বলিতে, "বিরক্তিসূচক কথা মুখে তো বলিতে পারিবেই না, মুখের ভাবেও দেখাইতে পারিবে না।"

[ক্রমশঃ।

বিবেকানন্দ স্তোত্রে

সুমণি মিত্র

৩৯

তবু কি দেখেছো ভেবে এ-কথাটা কেউ—
মিশনারী, ব্রাহ্মের শত বাধাতেও
দিন দিন বাড়ে কেন ঠাকুরের ভাব ?
জীবনের উপকূলে তোলে কেন ঢেউ ?

তার মানে—দুনিয়ায় প্রয়োজন যার,
কারুর সাধ্য নেই গতি রোখে তার।
আদা-জল খেয়ে তুমি বাধা দেবে যেই,
সে-ভাব দ্বিগুণ হবে, মৃত্যু তোমার।

আর যদি প্রয়োজন না থাকে কোথাও,
যতোই প্রচার করো, কাগজে ছাপাও,
প্রাকৃতিক আইনে সে মরবেই ঠিক ;
তোমার সাধ্য কি যে তুমি তা বাঁচাও ?

এ-আলোকে যদি তুমি পড়ো ইতিহাস,
Fanaticism আর কোরবেনা গ্রাস।
তখন বুঝবে তুমি শুভ-বুদ্ধিতে
কেন গ্রীস মরে, কেন রোমের প্রকাশ ?

ভারতের বুকে কেন বুদ্ধ এলেন ?
শঙ্কর এসে কেন তাঁকে সরালেন ?
কেন এলো, কেন গ্যালো ব্রাহ্ম-সমাজ ?
ঠাকুরই বা কেন ফের মর্ত্যে এলেন ?

জগতে কিছুই নয় চিরকাল স্থায়ী।
আজ যেটা পালোয়ান, কাল ধরাশায়ী !
বিশেষতঃ মানুষের বিচিত্র মনে
যুগে-যুগে বিচিত্র ভাবধারা চাই-ই।

অপরিবর্তনীয় কিছুই যে নয়।
আজ যাতে বিশ্বাস, কাল সংশয় !
যে-ভাবে আজকে লাভ, মহাকল্যাণ,
কালকে তা বিষবৎ ফেলে দিতে হয়।

অতএব এইখানে এই কথা ওঠে—
অদ্ভুত প্রাকৃতিক খেয়ালের চোটে
একদিন ঠাকুরের প্রভাবও তো যাবে,
চঞ্চল দুনিয়ায় যেমনটা ঘটে।

অবিশ্যি তার আগে ভেবে দেখা চাই
বেদ ও উপনিষদে আমরা কি পাই।
আগে যাঁরা এসেছেন যুগ-প্রয়োজনে,
তাঁরাই বা কি দিলেন—তাও জানা চাই।

৪০

ভারতীয় জীবনের মূল সুর ত্যাগ।
অসীমের অভিসারে তুচ্ছে বিরাগ।
'নাল্পে সুখম্'—এটা পাকা কোরে জেনে
'ভূমৈব সুখম্'-এর প্রতি অনুরাগ।

তাই দেখি ভারতের সমাজে ও বনে
ত্যাগের সুরটা যেন বাজে সপ্তমে।
ত্যাগ শুধু সাধুদেরই আদর্শ নয়,
একই সুর গৃহীদের সমাজ-জীবনে।

জীবনের প্রথমেই ত্যাগের প্রয়াস,
ব্রহ্মচর্য আর গুরু-গৃহবাস।
মাঝখানে নিষ্কাম গৃহীর জীবন।
জীবনের শেষে ফের অরণ্যবাস।

সাধুদের লক্ষ্য যা গৃহীদেরও তাই।
আদর্শ—ব্রহ্মকে জেনে নেওয়াটাই।
মিথ্যে এ মায়া-মোহ দূর কোরে এই
এ-জীবনে সুজনেরই সত্যকে চাই।

অতএব সংসার নয়কো ভোগের,
সংসার আশ্রম শুধু যোগের।
নিষ্কাম কর্মের রাস্তা দিয়েই
শাশ্বত মুক্তিই কাম্য ওদের।

বেদান্তনিহিত যে তথ্যটা সেই—
দুনিয়ায় দুই বোলে কোনো কিছু নেই,
বহুকে এক দেখা—তারই সাধনাই
ভারতীয় জীবনের একতার খেই।

তত্ত্ব সে যাই হোক, তাকে চায় যারা
বিবর্তনের পথে বিচিত্র তারা।
তাই দেখি তত্ত্বের বহু ব্যঞ্জনা,
'এক'কে পাবার তাই একাধিক ধারা।

ভারতীর সাধনার ইতিহাসে তাই
'জ্ঞানযোগ', 'ভক্তি' ও 'কর্ম'কে পাই।
যার ধাতে যে-পথটা বেশি উপযোগী
ধর্ম-জীবনে তার পথ সেইটাই।

আবার এক এক যুগ এক একটা চায়।
সেই পথই সেই যুগে প্রাধান্ত পায়।
যখন যে-মার্গের প্রয়োজন ঘটে
অবতার এসে তারই প্রশস্তি গায়।

৪১

শ্রীকৃষ্ণ-অবতারে আমরা যা পাই,
সেটা হোলো 'কর্মে'র পরাকাষ্ঠাই।
ত্যাগের নামেতে লোকে কর্মবিমুখ,
নিষ্কাম কর্মের প্রাধান্ত তাই।

তারপর বুদ্ধের কাছ থেকে ফের
ভারত মন্ত্র পেলো চরম ত্যাগের।
জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর ছায়া-ঘেরা এই
পার্থিব জীবনটা ভারি দুঃখের।

বুদ্ধের 'নির্বাণ' বেদ-বিপরীত।
এটা হোলো শূন্যতা, তাই 'নেগেটিভ'।
মৃত্যু-মলিন এই রুগ্ন জীবন
দুঃখের পারাবার, ম্লান ও অশিব।

উপনিষদের ঐ 'মুক্তি'তে এই
বৌদ্ধবাদের সেই শূন্য-ব্যথা নেই।
'সৎ-চিৎ-আনন্দ' তার পরিণাম।
বুদ্ধের 'নির্বাণে' সে-স্বাস্থ্য নেই।

তারপর শঙ্কর এলেন যেদিন।
বৌদ্ধবাদের ঐ 'নেগেটিভিজম'
বেদ ও বেদান্তের জ্ঞানের আলোয়
ভারতের বুক থেকে হোয়েছে বিলীন।

তবু তাঁর 'মায়াবাদ'— যতোই যা হোক্—
সাধারণ জীবনে তা হয় না প্রয়োগ।
'জগৎ মিথ্যা' বোধ হয় ক'জনের ?
'ব্রহ্ম সত্য'—সেটা বোঝা কি সহজ ?

সিদ্ধ 'জ্ঞানী'রই বলা চলে—'শিবোহম্'
তা-ছাড়া এ-মার্গের অধিকারী কম্।
সাধন-ভজনহীন জনতার তাই
তত্ত্বের ধুয়ো তুলে বাড়লো অহং।

তার পর নির্মেঘ জ্ঞানাকাশটাকে
বাংলার জলভরা মেঘ এসে ঢাকে।
'ভক্তি'র প্লাবনেতে 'নদে ভেসে যায়'।
মানুষ সরস হোলো নিমাই-এর ডাকে।

কৃষ্ণে চেতনা এলো, তবু সে গীতার
মহারথী কেশবের নেই হুংকার।
মহাপ্রভুর ঐ শ্রীকৃষ্ণ সেই
'গোপীজনবল্লভ', হাতে বাঁশী যাঁর।

'তৃণাদপি সুনীচেন' হোতে হোতে জীব
অবশেষে একদিন বোনে গ্যালো ক্লীব!
ভক্তি-বাদের নামে মূঢ় জনতারা
কর্মবিমুখ হোয়ে হোলো তামসিক!

৪২

সবশেষে ঠাকুরের জীবনের তার
সব সুরে একত্রে তোলে ঝঙ্কার।
পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম
ধর্মের স্বাধীনতা, সম-অধিকার।

শুধু 'জ্ঞান', 'ভক্তি' বা 'কর্মে'র নয়,
সমস্ত ধর্মের শুভ-পরিণয় ;
শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুরোহিত যার,
—সেটা হোলো বিশ্বের সেরা বিস্ময়।

অনন্তভাবময় প্রেমিক ঠাকুর
বিশ্বমর্মবাণী—তার যতো সুর,
নিজের জীবন-তারে ঝঙ্কৃত কোরে
ধর্মের ভেদাভেদ কোরেছেন দূর।

আগেকার অবতারে ঠাকুরের এই
বিচিত্র রাগিণীর ঝঙ্কার নেই।
এক-একটা মূল সুর উঠেছিলো বেজে,
সমস্ত ধর্মের স্বীকৃতি নেই।

তাও এটা বুদ্ধির স্বীকৃতি নয়।
এটা হোলো বোধে বোধ, বোধির প্রণয়।
বিচিত্র জীবনের সাধনার স্রোত
ঠাকুরের আধারে তা একাকার হয়।

অনন্ত পন্থার—এই স্তব-স্তুতি,
তার মূলে আছে তাঁর ব্রহ্মানুভূতি।
প্রাপ্তির চরমেতে পৌঁছে তবেই
'যত মত তত পথ'—এই উক্তিটি।

মনে আছে ঠাকুরের গল্পটা সেই,
রংদার বহুরূপী—যেটাকে দেখেই
কেউ বলে লাল ওটা, কেউ বলে নীল,
কেউ বলে—না না, ওর রঙ হলদেই।

আবার আর একজন দেখে এসে ফের
বলে ঐ জন্তুটা সবুজ রঙের।
যে যা ভাখে তাই বলে, দোষ কিছু নেই
জরদা, বেগুনী, নীল কতো রকমের।

জন্তুর রঙ নিয়ে কথা কাটাকাটি!
ঐ বুঝি সুরু হয় মাথা ফাটাফাটি!
যাই হোক্, ঠিক হোলো সকলে ফের
দেখে এলে বোঝা যাবে কার কথা খাঁটি।

এখন যে গাছে ঐ জন্তুটা থাকে
একজন লোক থাকে গাছতলাটাতে।
সকলের কথা শুনে বোললে সে—ভাই
ওটা হোলো বহুরূপী, আমি চিনি তাকে।

তোমরা যা দেখেছো তা সব সত্যিই।
এত রঙ আছে তার, হয়না ইতিই।
কখনো সে লাল আর কখনো সে নীল।
আবার এমনও হয় কোনো রঙ নেই। *

বহুরূপী সত্যের বিচিত্র ঢঙ্।
কেই বা দেখেছে তার সমগ্র রঙ?
যেমন যে ভাখে, ভাবে তাই বুঝি ঠিক,
অপরের মতবাদ মিথ্যে, ভড়ং।

'শ্রুতি'র ব্যাখ্যা, ধরো, কোরেছেন যাঁরা
এক একটা রঙ নিয়ে ধোয়েছেন তাঁরা।
রঙ নিয়ে নিদারুণ কথা-কাটাকাটি,
অথচ এ-বিশ্বের বরণীয় তাঁরা।

আচার্য শঙ্কর—তাঁর ব্যাখ্যায়
'অদ্বৈতে'র রঙ অতিমাত্রায়।
রামানুজে 'বিশিষ্ট অদ্বৈতে'র,
মাধ্বের ব্যাখ্যাতে 'দ্বৈতে'র সায়!

যে যা ভাখে তাই লেখে, মতুয়ার মন!
কেই বা দেখেছে তার বিচিত্র রঙ?
বহুরূপী ব্রহ্মের সমগ্র রূপ
শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাখেন প্রথম।

তাই তাঁর ব্যাখ্যাটা এ-শ্রেণীর নয়।
'শ্রুতি'কে বিশেষ মতে টেনে আনা নয়,
ক্রমবিকাশের পথে ঐ তিনটেই
তিনটে সোপান—এই দৃঢ় প্রত্যয়।

অনন্তভাবময় ঠাকুরের মন
সবকিছু, মানা নয়, করেন গ্রহণ।
সমস্ত মার্গের মূলে গিয়ে তাঁর
বিচিত্র ধর্মের একতা সাধন।

তিনি শুধু বহুরূপ দ্রষ্টাই নন,
বহুরূপী ব্রহ্মের চেয়ে কিছু কম?
'ভক্তে'রা ভাবে তাঁকে ভক্তের রাজা।
'জ্ঞানী'রা বোলেছে—উনি জ্ঞানীর চরম।

'ব্রাহ্মেরা' বলে তিনি ব্রাহ্ম প্রধান।
খৃষ্টের দূত বোলে ভাখে খৃষ্টান।
বিষ্ণুর অবতার ভাবে বৈষ্ণব।
যে যেমন তার কাছে তাই হোয়ে যান।

তারপর ত্যাগের কি পরিমাপ হয়?
'টাকা মাটি' বোলে সেটা ট্যাঁকে গোঁজা নয়,
ত্যাগের চরমে উঠে উনি ভাখালেন,
দুটোই গঙ্গাজলে ফেলে দিতে হয়।

এত বড়ো ত্যাগী কেউ শুনেছো কি আর?
অজান্তে টাকা ছুঁলে হাত বাঁকে যাঁর?
তাঁর ত্যাগ ঢুকে গ্যাছে সারা চেতনায়;
অচেতন সত্তাও জাগ্রত তাঁর! *

---

* "যে ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোনো গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোনো রকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায় তাহলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সে-পাড়াতেই গেলে না, সব খবর পাবে কেমন করে? একজন বাহ্যে গিয়েছিল। সে দেখলে গাছের উপর একটি জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বললে—'দেখ, অমুক গাছে একটি সুন্দর লালরঙের জানোয়ার দেখে এলাম।' লোকটি উত্তর করলে,—'আমি যখন বাহ্যে গিয়েছিলাম আমিও দেখেছি—তা সে লাল রঙ হতে যাবে কেন? সে তো সবুজ রঙ।' আর একজন বললে—'না না আমি দেখেছি হলদে।' এইরূপে আরও কেউ কেউ বললে—'না, জরদা, বেগুনী, নীল' ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে—'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি জানোয়ারটিকে বেশ জানি—তোমরা যা যা বলছ সব সত্য। সে কখনো লাল, কখনো সবুজ, কখনো হলদে, কখনো নীল, আরও সব কত কি হয়। বহুরূপী। আবার কখনো দেখি কোনো রঙ নাই। কখনো সগুণ, কখনো নির্গুণ।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

* কামিনী ও কাঞ্চন, এ দুইটি বস্তু স্পর্শ করিবার তাঁহার উপায় নাই। ইহাদের স্পর্শমাত্রই তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়েন।

'তাই বোলে সবাইকে এ-কথা কোথাও
বোলেছেন—টাকাটাকে জলে ফেলে দাও ?
এক জামা সকলের হবে কেন গায় ?
'সাধুরা ছুঁয়োনা টাকা, গৃহীরা জমাও।'

'নরেনের যে-পোষাক, তোমার তা নয়।
সকলেই খাবে, তবে যার যেটা সয়।
বিচিত্র মানুষের বিচিত্র মন,
যার যেটা ভাব, তাতে দৃঢ় হোতে হয়।'

'নানা মত নানা পথ—তাঁরই ইচ্ছায়।
সকলে কালিয়া খেলে পেট-হড়কায়।
যার ধাতে যেটা সয়, সেই পথে গেলে
একদিন সকলেই সত্যকে পায়।'

'আমের বাগানে ঢুকে, ওরে বোকারাম,
পাতার হিসেব রেখে খেয়ে নাও আম।
শুক্‌নো বিচার নিয়ে তোমার কি লাভ ?
বিচারটা বড়ো নয়, ভক্তিরই দাম।' *

'বাড়ির কর্তা—কেউ 'খুড়ো' বলে তাঁকে।
কেউ 'মেশো', কেউ তাঁকে 'মামা' বোলে ডাকে।
জগৎকর্তা—তাঁর হাজারটা নাম।
কর্তা কি বোঝেন না এরা চায় কা'কে ?'

'এক জল, ভেবে ছাখো কতো তার নাম।
তাকেই 'ওয়াটার' বোলে খায় খৃষ্টান।
হিন্দুরা বলে 'জল', কেউ বলে 'পানী'।
নামেতে কি এসে-যায়, জল তো সমান।' *

৪৩

বহুরূপী সত্যের বিচিত্রতার
এমন সমন্বয় হয়নিকো আর।
বিচিত্র সাধনার চরমে গিয়েই
অখণ্ড ঐক্যের অনুভূতি তাঁর।

যুগে-যুগে, দেশে-দেশে যতো ভাব পাবে,
অনাগত ভাব যতো আসবে ও যাবে,
—তারা কেউ হেয় নয়, সবাই মহৎ।
সবাই মিশেছে এসে তাঁর মহাভাবে।

ঠাকুরের অমরতা সেই কারণেই।
এখানে গ্রহণ আছে, বর্জন নেই।
আগত ও অনাগত সর্বকালের
সর্বমনোপযোগী ভাব এখানেই।

অতএব পৃথিবীর আয়ু যতোদিন
ঠাকুরের পরমায়ু ঠিক ততোদিন।
যদি বলো পৃথিবীটা অনন্ত, তবে
শ্রীরামকৃষ্ণদেব মৃত্যু-বিহীন।

[ক্রমশঃ।

আমার সম্মুখে আমি কোনো মহিলাকে তাঁহার দেহ স্পর্শ করিতে দেখি নাই, কিন্তু কাঞ্চনের প্রতিক্রিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এক দিন একটি কৌতূহলী ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের সত্যতা পরীক্ষার্থে তাঁহার হস্তে হঠাৎ একটি মুদ্রা স্থাপন করে। আমি তখন তাঁহার কক্ষেই উপবিষ্ট। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, মুদ্রাটি যেন তাঁহার দেহে তড়িৎ-প্রবাহের কাজ করিল। সেই মুহূর্তে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং যতক্ষণ না মুদ্রাটি তাঁহার হস্ত হইতে উঠাইয়া লওয়া হইল ততক্ষণ সে দেহে চেতনার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। সেদিন বুঝিলাম, বৈরাগ্য তাঁহার সমগ্র চেতনায় একেবারে ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছে।" —আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী।

* "ওরে পোদো, তুই আম খেয়ে নে। বাগানে কত-শত গাছ আছে কত হাজার ডাল আছে, কত কোটি পাতা আছে, এসব হিসেবে তোর কাজ কি ? তুই আম খেতে এসেছিস্, আম খেয়ে যা। তুমি সংসারে ঈশ্বর সাধনের জন্ম মানব-জন্ম পেয়েছো। ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয়, তাই চেষ্টা কর। তোমার অতশত কাজ কি ? ফিলজফি ল'য়ে বিচার কোরে তোমার কি হবে ? দেখ, আধপো মদে তুমি মাতাল হতে পার। শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসেবে তোমার কি দরকার ? চৈতন্য যদি একবার হয়, যদি একবার ঈশ্বরকে কেউ জানতে পারে, তাহলে ওসব হাব্‌জা-গোব্‌জা বিষয় জানতে ইচ্ছেও হয় না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

* "বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিসকে চাচ্ছে, তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে, হিন্দুরা এক ঘাট থেকে জল নিচ্ছে কলসী করে—বলছে 'জল'। মুসলমানেরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে চামড়ার ডোলে কোরে—তারা বলছে 'পানী'। খৃষ্টানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে—তারা বলছে 'ওয়াটার'। যদি কেউ বলে, না, এ জিনিসটা জল নয় পানী, কি পানী নয় ওয়াটার, কি ওয়াটার নয় জল ; তাহলে হাসির কথা হয়। তাই দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া, ধর্ম নিয়ে লাঠালাঠি, মারামারি, কাটাকাটি, ওসব ভাল নয়। যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই একঘেয়ে। আমি কিন্তু দেখি—সব এক। তিনিও অনন্ত, পথও অনন্ত।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীমতী আর্ভেরএর দিনপঞ্জী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তরু দত্ত

রাত এগারোটা অবধি হৈ-হল্লা চলল ; তারপর আমরা বাড়ী ফিরলাম। কি ভাবেই না দিনটা কাটল! প্রজাদের মুখে অনবরত শোনা যাচ্ছে, "জয় জমিদারের জয়! জনগণের বন্ধু দীর্ঘজীবী হোন!" কি সুন্দর লাগছিল ওরা যখন দল বেঁধে রাতের অন্ধকারে ফিরছিল মাথার টুপি দোলাতে দোলাতে, জমিদারের জয় গাইতে গাইতে। প্রাসাদের দরজা অবধি জমিদার আমাদের পৌছে দিতে এল ; আমার গায়ে একটা পুরু পশমের চাদর জড়িয়ে দিয়ে বলল,—

"সাবধান, ঠাণ্ডা লাগিয়ো না যেন, যা হিম পড়ছে! অভ্যাসমত কঁতেস আমায় আলিঙ্গন জানালেন। তারপর শুভরাত্রি কামনা করে করমর্দন শুরু হল। কোচম্যান চাবুক হাঁকড়াল ; ঘোড়াগুলি রওনা দিল। আজকে জমিদার এসে আমাদের খবর নিয়ে গেছে। মহা আনন্দে আমরা চার জন খানিকটা বেড়িয়ে এলাম,—ও, লুই, বাবা, আমি। কি ছুটটাই দিয়েছিলাম! গীর্জার ঘড়িতে এগারোটা বাজল ; আজ এখানেই থামি।

২২শে নভেম্বর।—রোজকার মত আজো বেড়াতে গিয়েছিলাম। শ্রীমতী গোসরেল ও তার মায়ের সঙ্গে দেখা হল ; তাঁরা গাড়ী চড়ে যাচ্ছিলেন প্রতিবেশী কোন এক মার্কি-র সাথে দেখা করতে। যত শীগগির পারি আমি যেন ওদের বাড়ী একবার যাই, অনুরোধ করল শ্রীমতী গোসরেল ; লুইকেও আমন্ত্রণ জানাতে সে বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করল, "যেতে পারলে সত্যিই সুখী হতাম," ও বলল, "কিন্তু হাতে আমার সময় বড় অল্প, আর..."

"বুঝেছি গো বুঝেছি—এই অল্প সময়টুকু নিজের বন্ধুর ওখানেই কাটাতে চান, তাই না মঁসিয়্য?" টিটকিরি দিল গোসরেল, সন্দেহও ছিল মনে—আপনাকে একেবারে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে দেখছি!"

এ কথায় সে বেশ অপমানিত হয়েছে মনে হল ; ভ্রূ কুঁচকে আমায় এক ঝলক দেখে নিল। শ্রীমতী গোসরেলও বুঝল লুই অসন্তুষ্ট হয়েছে, তাই বলে উঠল, "নিন কাপ্তেন সাহেব, আর মান করবেন না ; আসা চাই ; মার্গরিৎ, ওঁকেও সঙ্গে আনিস কিন্তু।"

"কিন্তু," আমি আড়চোখে লুইয়ের দিকে চেয়ে জবাব দিলাম, কারণ এর আগে ওকে কোনো দিন রাগতে দেখিনি, "অন্য পক্ষ থেকে যদি আসার চাড় না থাকে?"

"আহা রে! ভাজা মাছটি উলটে খেতে জান না!" অদম্য কৌতুকে ফেটে পড়ল গোসরেল ; তারপর একটু সরস কণ্ঠে বলল, "উনি যদি নেহাৎ আসতে না চান, তুমি একাই এস।"

হেসে হাত নেড়ে সে চলে গেল। লুই আমাদের আগে আগে চলছিল ; বাবা আর আর আমি দ্রুত পদক্ষেপে গিয়ে ওকে ধরে

"আচ্ছা বাবা, লুই কি রাগ করল?" আমি তাঁকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"নাঃ, মনে ত হয় না।"

"কিন্তু শ্রীমতী গোসরেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ও দারুণ ভ্রূ কুঁচকে উঠল ; এখনো ওর মুখে কঠোরতার ছাপ পরিস্ফুট।" তিনি হাসলেন ; তারপর ডাকলেন, "লুই"।

কাপ্তেন ঘুরে দাঁড়াল ; তার অকপট সৌম্য মূর্তি আবার ফিরে এসেছে ; "কি ব্যাপার?" সে প্রশ্ন করল।

"মার্গরিতের ধারণা, তুমি রাগ করেছ ; সত্যি নাকি?"

"হাঁ, খানিক আগে সত্যিই রেগে গিয়েছিলাম ; এই গোসরেল মহিলাটি মাঝে মাঝে বড় রঙ্গপ্রিয় হয়ে ওঠেন দেখছি।"

বিকেলে আমরা সবাই বাগানে বসেছিলাম ; হঠাৎ ছোট হেলেন কোথা থেকে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল। ওকে কোলে তুলে নিয়ে জানতে চাইলাম, কি হয়েছে।

"জান না, আমার ভাই পিয়ের-এর বড় অসুখ, চল, তাকে সরিয়ে দিতে হবে।"

ওকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলাম ; ওর হাতে মা বড় এক টুকরো কেক দিলেন, তারপর ও আর আমি পা বাড়ালাম ওদের বাড়ীর দিকে ; নীচের ঘরে কাউকে দেখতে পেলাম না।

ফিস-ফিস করে হেলেন বলল, "ওরা সবাই শোবার ঘরে আছে।"

সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম ; দরজায় করাঘাত করলাম ; সাড়া পেলাম না। আবার ধাক্কা দিলাম, সব শান্ত ; তখন নিজেই দরজা খুলে ঢুকে পড়লাম। চিমনীর কাছেই ওদের মা বসে,—কোলে তাঁর রুগ্ন শিশু। জানলার কাছে মঁসিয়্য ভালপোয়ান ; বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে আছেন তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের দিকে। ক্লব তার বাবার কোলে মুখ গুঁজে আছে। মঁসিয়্য ভালপোয়ান এগিয়ে এলেন আমায় দেখে।

অস্ফুটস্বরে তিনি বললেন, মাদমোয়াজেল তুমি এসেছ ; দেখ, বাচ্চাটার অবস্থা খুবই খারাপ ; ওর মা দারুণ অধৈর্য্য হয়ে পড়েছেন।"

ওদের মার পাশে গিয়ে আমি বসলাম। কী ভীষণ পাণ্ডুর লাগল ছেলেটাকে—জীবনের কোন চিহ্নই নেই। চোখ দুটি বন্ধ। হাত বাড়িয়ে ওকে আমি নিতে গেলে ভদ্রমহিলা বাধা দিলেন।

"না, না, নিয়ো না গো! বাছা আমার কোলেই থাক, আর কতটুকুই বা থাকবে।" ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

"কয়েক দণ্ড বাদেই আমাদের ছেড়ে যাদু আমার মাটির শীতল গর্ভে আশ্রয় নেবে।"

"না—ভগবান ওকে বাঁচাতে পারবেন।" মৃদু কণ্ঠে আমি

আমার কোলে শুইয়ে দিলেন। গরম কাপড়ে ওর গোটা শরীর আমি বেশ করে ঢেকে দিলাম।

বাপকে বললাম, "মঁসিয়্য ভাল্‌পোয়ান, ডাক্তার ডাকছেন না কেন?" তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। বুঝলাম ডাক্তার এসে হতাশ হয়ে চলে গেছেন। তবুও মঁ ভাল্‌পোয়ান্‌কে ডাঃ শাঁতোর কাছে আমি পাঠালাম জোর করে। একটু পরেই রোগী চোখ খুলল; আবার তক্ষুণি সভয়ে তা বন্ধ হয়ে গেল; হাত-পা শক্ত হয়ে উঠল। শিশুব্যাধির কোনও প্রতিকারই আমার জানা নেই, তবে মার কাছে শুনেছি যে এ রকম তড়কা হলে গরম জলে স্নান করিয়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়। তাই আমি ওকে নাইয়ে দিয়ে ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলাম। শুকনো গরম কাপড় দিয়ে বেশ করে ওর গা-হাত-পা মুছিয়ে দিতে ও চোখ খুলে তাকাল; এক ঝিনুক দুধ দিতে ঢোক গিলে খেয়ে নিল।

"ওগো, পিয়ের আমার বেঁচে উঠেছে।" ওর মা চেঁচিয়ে উঠলেন, তখন ওর ছোট্ট দোলনায় ভাল করে ওকে শুইয়ে দিলাম,—পরম আরামে বেচারা ঘুমিয়ে পড়ল। রোগীর মাকেও গিয়ে বিশ্রাম নিতে বললাম; তিনি রাজী হলেন না। আমরা ডাক্তারের প্রতীক্ষায় রইলাম। ভগবানকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম। খানিক বাদেই সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, দরজা খুলে ঢুকলেন ডাক্তার বাবু, তাঁর পেছনে মঁ ভালপোয়ান। সব কথা তাঁদের খুলে বলা হল; মঁসিয়্যর চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল! ডাক্তার এক দাগ ওষুধ দিয়ে বলে গেলেন, রোগীর ঘুমের যেন ব্যাঘাত না হয়, আর জেগে উঠলে ওষুধটা খাইয়ে দিতে। যাবার সময় আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন, "মার্গারিৎ, তুই সত্যি বড় সহৃদয়।" আমার জন্মের বহু আগে থেকেই ইনি আমাদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত।

ছ'টা নাগাদ লুই আর বাবা এলেন। তখনো পিয়ের ঘুমুচ্ছে। আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম, দেখি, হেলেন লুইয়ের হাত ধরে সবিস্তারে বর্ণনা করছে কি ভাবে পিয়ের "একদম সেরে উঠেছে।" "আমি ঠিক জানতাম উনিই ওকে সারাতে পারবেন," ও বলল, "বড় লক্ষ্মী উনি!"

আমায় দেখে এক ছুটে এসে ও আমায় জাপটে ধরল। রোগীর অবস্থার পরিবর্তন দেখে বাবা বেশ সুখী হলেন। হেলেনকে আমি আদর করলাম; ও লুইয়ের কাছে গিয়ে বলল, "তুমি, তুমি বুঝি আমায় আদর করবে না?"

লুই হেসে ফেলে ওকে কোলে তুলে নিল। আমি গিয়ে বাচ্চাটার পাশে বসলাম; সত্যিই ও ভাল হয়ে গেছে। সর্বকরুণাময়, তোমারই জয় হোক!

২৩শে নভেম্বর।—আজ রাতে খাওয়া চুকে গেলে মা আর আমি বৈঠকখানায় বসে ছিলাম; কাপ্তেনকে নিয়ে বাবা বাগানে পায়চারী করছিলেন। দু'জনেরই মুখে জ্বলন্ত সিগার। কোনও গুরুতর বিষয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা করছেন মনে হল; একথা মাকে বলতে তিনি হেসে বললেন, "বা রে মার্গারিৎ, ওঁদের না ডাকলে চলবে না; কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

আমি দৌড়ে বাগানে গেলাম। যেতে যেতে বাবার কথা কানে এল, "তোমাদের দুজনেরই বয়স খুব কম,—তবু ওকে একবার বলে দেখ; যদি..."

এমন সময় ওঁর কাঁধে আমি হাত রাখলাম; হঠাৎ তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

"আরে তুই খুকি!" তিনি সবিস্ময়ে বললেন। চাঁদের আলোয় চারিধার অপরূপ লাগছে।—"বাবা তোমাকে আর কাপ্তেন লফেভ্রকে ডাকতে এলাম; মা কফি নিয়ে বসে আছেন।" তিনি তাঁর হাতের মুঠো দিয়ে আমার হাতটা ধরলেন।

"আর এক পাক দিয়ে আসি মা! তারপর ফেরা যাবে।" কাপ্তেন ততক্ষণে সিগারটা ফেলে দিয়েছে।

"লুই, ওটা না ফেললেও চলত," বাবা বললেন, "সিগারেটের গন্ধ মার্গারিৎ সহ্য করতে পারে; ও-সবে ও বেশ অভ্যস্ত; বোধ হয় গন্ধটা ওর ভালও লাগে; ওর মতে প্রত্যেক সৈনিকেরই ধূমপান করা উচিত; ও যখন ছোট ছিল, বাপি একদিন এ-কথাই ওকে শিখিয়েছিল; বাপি ত সব সময় লোকের ভালই চায়, না মা?"

"উঁহু, সব সময় কই?" আমি হাসলাম; বুঝলাম ওঁর মাথায় কোনও মৎলব জেগেছে; "এই ধর না, যখন বাবা অনর্থক বাইরে থাকেন আর মা একা-একা ঘরে অপেক্ষা করেন, কফির পেয়ালা নিয়ে তখন?"

আমায় মৃদু একটা চড় দিলেন বাবা।

আত্মস্থ ভাবে কাপ্তেন চলেছিল আমার পাশে পাশে; তাকে আমি প্রশ্ন করলাম, "তোমার তেষ্টা পায় নি?"

"জান মাদমোয়াজেল," ও উত্তর দিল, "সিগারেট খেলেই বড় তেষ্টা পায়।"

"চল বাবা, আমাদের বড় তেষ্টা পেয়েছে, মঁসিয়্য লফেভ্রেরও।"

"আচ্ছা মার্গারিৎ, তুই ওকে মঁসিয়্য লফেভ্র বলিস কেন রে? ও কি তোকে মাদমোয়াজেল আর্ভের বলে?"

"না, ও আমার নাম ধরেই ডাকে, তাই না?"—লুই সম্মতি সূচক হাসি হাসল।

"বেশ লুই, আমিও তবে তোমায় নাম ধরে ডাকব।" দু'জনে আমরা হাতে হাত মেলালাম।

"এবার না গেলে মা কিন্তু রাগ করবেন," আমি বললাম।

মা আমায় কফি পরিবেশনের ভার দিয়েছিলেন; প্রথম পেয়ালা বাবাকে দিতে তিনি আপত্তি জানালেন, "প্রথমে দিতে হয় অতিথিকে, পাগলী!"

"আমি প্রথমে দিই বয়োজ্যেষ্ঠকে; তোমার পরে দেব মাকে, তার পর লুইকে, তার পর নেব আমি।"

"লুই" শুনে সবিস্ময়ে মা আমার দিকে তাকালেন; বাবার দিকে তাকাতেই তিনি বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়লেন। গতিক সুবিধের নয় দেখে আমি বললাম, "বা রে, বাবাই ত আমায় শিখিয়ে দিলেন ওকে নাম ধরে ডাকতে।" বাগানের কথা খুলে বললাম।

কিন্তু ও তোকে কি সোজাসুজি মার্গারিৎ বলে?" মা বাধা দিলেন, "ও বলে মাদমোয়াজেল মার্গারিৎ।"

"আমি তা হলে ওকে বলব মঁসিয়্য লুই কেমন?"

"না বাপু, আমার লুই বলেই ডেক।" লুই আপত্তি করল।

"তুমিও তবে আমায় শুধু মার্গারিৎ বলে ডেক?"

"হাঁ মা!"—
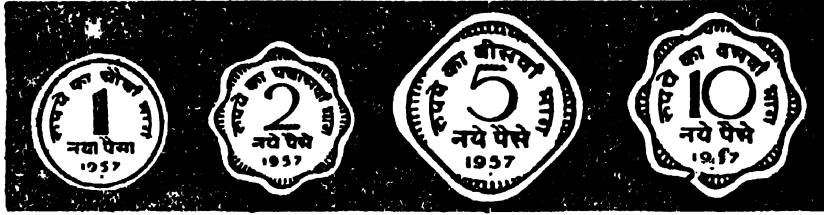
নতুন মুদ্রার প্রচলন-১লা এপ্রিল ১৯৫৭ হ'তে

বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার
হিসাবে সঠিক মূল্য

১০ নয়ে পইসে—(এক টাকার এক-দশমাংস)—১ আনা ৭·২ পাই
৫ নয়ে পইসে—(এক টাকার এক-বিংশাংশ)— — —৯·৬ পাই
২ নয়ে পইসে—(এক টাকার এক-পঞ্চাশত্তমাংশ) —৩·৮৪ পাই
১ নয়ে পইসা—(এক টাকার এক-শতাংশ) — —১·৯২ পাই

১ পয়সা বা ১/৪ আনা, ২ পয়সা বা ১/২ আনা, ১ আনা, ২ আনা, ৪ আনা এবং ৮ আনার পুরানো মুদ্রাগুলি উপরে উল্লিখিত নতুন মুদ্রাগুলির সাথে সাথে চালু থাকবে। সিকি এবং আধুলির মুদ্রাগুলি যথাক্রমে ২৫ নয়ে পইসে এবং ৫০ নয়ে পইসের সঠিক সমতুল, সুতরাং সবরকমের লেনদেনের কাজে সেইভাবেই ব্যবহৃত হতে পারবে। টাকা দেওয়ার সময় এবং হিসেবের কাজে নতুন ও পুরানো দুরকমের মুদ্রাই বিহিত মুদ্রা (লিগ্যাল টেণ্ডার) হিসাবে গণ্য হবে।

মুদ্রাবদলের সুযোগ-সুবিধা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসগুলিতে, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার শাখাগুলিতে, অন্যান্য এজেন্সী ব্যাঙ্কে, এবং ট্রেজারী ও সাব- ট্রেজারীগুলিতে মুদ্রাবদলের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

কেবলমাত্র ৪ আনা এবং তার গুণিতক সংখ্যার মূল্যের মুদ্রাগুলি, যেমন ৪ আনা, ৮ আনা, ১২ আনা, ১ টাকা ইত্যাদির বদলেই নতুন মুদ্রাগুলি দেওয়া হবে।

মুদ্রাবদলের তালিকা

মুদ্রাবদলের তালিকাটিতে আনা পাইয়ের মুদ্রায় দেওয়া অঙ্কের নয়ে পইসের হিসেবে বিনিময় মূল্য (সম্প্রতি সংশোধিত ১৯০৬ সালের ভারতীয় মুদ্রা আইনের ১৪ (২) ধারার নির্দেশ অনুযায়ী ভগ্নাংশকে সম্পূর্ণ করার পর) দেওয়া হয়েছে। ১/২ নয়া পইসা এবং তার চাইতে কম ভগ্নাংশকে বাদ দিয়ে এবং ১/২ নয়া পইসার বেশী ভগ্নাংশকে ১ নয়া পইসা হিসেবে ধরে নয়ে পইসের হিসেবে সমতুলের ভগ্নাংশকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

যে কোন একবার টাকা দেওয়ার সময় নয়ে পইসের হিসেবে আনা পাইয়ের মূল্যের সমতুল।

বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ		নয়ে পইসের মুদ্রার	বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ		নয়ে পইসের মুদ্রার	বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ		নয়ে পইসের মুদ্রার	বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ		নয়ে পইসের মুদ্রার
আনা	পাই	সমতুল	আনা	পাই	সমতুল	আনা	পাই	সমতুল	আনা	পাই	সমতুল
০	৩	২	৪	৩	২৭	৮	৩	৫২	১২	৩	৭৭
০	৬	৩	৪	৬	২৮	৮	৬	৫৩	১২	৬	৭৮
০	৯	৫	৪	৯	৩০	৮	৯	৫৫	১২	৯	৮০
১ আনা		৬	৫ আনা		৩১	৯ আনা		৫৬	১৩ আনা		৮১
১	৩	৮	৫	৩	৩৩	৯	৩	৫৮	১৩	৩	৮৩
১	৬	৯	৫	৬	৩৪	৯	৬	৫৯	১৩	৬	৮৪
১	৯	১১	৫	৯	৩৬	৯	৯	৬১	১৩	৯	৮৬
২ আনা		১২	৬ আনা		৩৭	১০ আনা		৬২	১৪ আনা		৮৭
২	৩	১৪	৬	৩	৩৯	১০	৩	৬৪	১৪	৩	৮৯
২	৬	১৬	৬	৬	৪১	১০	৬	৬৬	১৪	৬	৯১
২	৯	১৭	৬	৯	৪২	১০	৯	৬৭	১৪	৯	৯২
৩ আনা		১৯	৭ আনা		৪৪	১১ আনা		৬৯	১৫ আনা		৯৪
৩	৩	২০	৭	৩	৪৫	১১	৩	৭০	১৫	৩	৯৫
৩	৬	২২	৭	৬	৪৭	১১	৬	৭২	১৫	৬	৯৭
৩	৯	২৩	৭	৯	৪৮	১১	৯	৭৩	১৫	৯	৯৮
৪ আনা		২৫	৮ আনা		৫০	১২ আনা		৭৫	১৬ আনা		১০০

মুদ্রাবদলের তালিকায় করা মতে ভগ্নাংশকে সম্পূর্ণ করার কাজটি কেবলমাত্র তখনই করার প্রয়োজন হবে, যখন লেনদেনের কারবারের শেষে, আনা এবং পাইয়ের হিসেবে দেয় যে কোনো পরিমাণকে নয়ে পইসেতে পরিবর্তন করতে হবে।

নতুন অথবা পুরানো, অথবা দুরকমের মুদ্রা মিশিয়ে, যে কোনো ভাবেই আপনি টাকা দিতে পারবেন। আপনার কাছে থাকা মুদ্রাগুলির উপরেই তা নির্ভর করবে। সুতরাং কোন লেনদেনের কারবারের শেষে যখন টাকা দেওয়ার প্রয়োজন হবে বা খুচরো পয়সা পেতে হবে, তখনই কেবল নীচে দেওয়া উদাহরণ মতে মুদ্রাবদলের তালিকাটি ব্যবহার করবেন।

উদাহরণ ঃ (যে ক্ষেত্রে আনা/পাইএর হিসেবে দেয় টাকা দেখানো হয়েছে)

প্রত্যেকটি ১½ আনা মূল্যের ১২টি জিনিষের মোট মূল্য হলো : টাকা ২ আনা। ক্রেতা সমগ্র টাকা পুরানো মুদ্রায় দিতে পারেন।

অথবা

১ টাকা ১২ নয়ে পইসে দিতে পারেন (মুদ্রাবদলের তালিকা অনুযায়ী ২ আনার সমতুল হলো ১২ নয়ে পইসে।)

উপরের উদাহরণটিতে ক্রেতা পুরানো মুদ্রায় ২ টাকা দিয়ে অবশিষ্ট ফেরৎ চাইতে পারেন। এখানে ১৪ আনা খুচরো পয়সা ফেরৎ দিতে হবে। এই পয়সা কেবল আনার মুদ্রায়,—অথবা নতুন মুদ্রায় অথবা নতুন ও পুরানো দুরকমের মুদ্রায় দেওয়া যেতে পারে। ধরে নিন, ৮ আনা পুরানো মুদ্রায় এবং বাকী ৬ আনা নতুন মুদ্রায় ফেরৎ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে নতুন মুদ্রায় ৬ আনার সমতুল মুদ্রাবদলের তালিকা হতে খুঁজে বার করুন ; সেটি হলো ৩৭ নয়ে পইসে।

উদাহরণ ঃ (যে ক্ষেত্রে নয়ে পইসের হিসেবে দেয় টাকা দেখানো হয়েছে)

ধরুন, একটি জিনিষের দাম হলো ১১ নয়ে পইসে। নতুন মুদ্রায় অথবা পুরানো মুদ্রার হিসেবে ১ আনা ৯ পাই দিয়ে এই দাম দেওয়া যেতে পারে। (মুদ্রাবদলের তালিকা অনুযায়ী ১ আনা ৯ পাইয়ের সমতুল হলো ১১ নয়ে পইসে)।

কোনো ব্যক্তি দেয় ১১ নয়ে পইসে দেবার সময় ২০ নয়ে পইসে দিলে তাকে ৯ নয়ে পইসে অথবা পুরানো মুদ্রার হিসেবে তার সমতুল ১ আনা ৬ পাই খুচরো ফেরৎ দিতে হবে।

১১ নয়ে পইসে দিতে হলে আপনি একটি সিকি দিয়ে খুচরো ফেরৎ চাইতে পারেন। চার আনা ২৫ নয়ে পইসের সমতুল। সুতরাং আপনাকে ১৪ নয়ে পইসে ফেরৎ নিতে হবে। এই পয়সা আপনি কেবল নতুন মুদ্রায় অথবা পুরানো মুদ্রায় ফেরৎ নিতে পারেন। মুদ্রাবদলের তালিকা অনুযায়ী ২ আনা ৩ পাই, ১৪ নয়ে পইসের সমান। এ ক্ষেত্রে একটি এক আনার মুদ্রা (৬ নয়ে পইসে) এবং নতুন মুদ্রায় ৮ নয়ে পইসে নেওয়া চলতে পারে।

মোট দেয় টাকার পরিমাণ হিসাব করে বার করার আগে আনা/পাই-এর হিসাবে দেখানো হার বা একক মূল্যকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে না।

উদাহরণ ঃ

(১) প্রত্যেকটি তিন আনা মূল্যের ৫০টি দ্রব্য কিনলে প্রথমে টাকা/আনার হিসেবে মোট মূল্য বার করে নিন। আপনাকে মোট ৯ টাকা ৬ আনা দিতে হবে।

(২) আপনার কাছে যদি শুধু নয়ে পইসের মুদ্রা থাকে, তাহলে মুদ্রা বদলের তালিকা থেকে আপনি জানতে পারবেন, ৬ আনার সমতুল হলো ৩৭ নয়ে পইসে। সুতরাং আপনাকে ৯ টাকা ৩৭ নয়ে পইসে দিতে হবে।

তিন আনার সঠিক মূল্য (১৮¾ নয়ে পইসে) নিয়ে তাকে ৫০ দিয়ে গুণ করলে আপনি একই ফল পাবেন, কিন্তু আপনি যদি মুদ্রাবদলের তালিকায় দেওয়া ভগ্নাংশকে সম্পূর্ণ করে নিরূপিত তিন আনার সমতুলকে (১৯ নয়ে পইসে) ৫০ দিয়ে গুণ করেন তাহলে ভুল হবে।

সেইভাবেই আপনি যদি কারুর কাছ থেকে একই সময়ে আনা পয়সার মুদ্রার হিসেবে বিভিন্ন হারে কয়েকটি জিনিষ কেনেন, প্রথমে টাকা আনা পাইয়ের হিসেবে মোট মূল্যের পরিমাণ জেনে নিন। নতুন মুদ্রায় টাকা দিতে হলে আনা পাইয়ের ক্ষেত্রে মুদ্রাবদলের তালিকার সাহায্য নিন।

এইগুলি মনে রেখে আপনি মুদ্রাবদলের হিসেবকে সহজ করে তুলতে পারবেন।

৪ আনা ... ... ২৫ নয়ে পইসে
৮ আনা ... ... ৫০ নয়ে পইসে
১২ আনা ... ... ৭৫ নয়ে পইসে
১ টাকা ... ... ১০০ নয়ে পইসে

উদাহরণ ঃ

(১) ১০½ আনা দিতে হলে আপনি প্রথমে ৮ আনা বা ৫০ নয়ে পইসে দিতে পারেন। অবশিষ্ট ২½ আনা হলো ১৬ নয়ে পয়সার সমান।

(২) ৩৬ নয়ে পইসে দিতে হলে আপনি প্রথমে চার আনা বা ২৫ নয়ে পইসে দিন। তার পরে বাকী ১১ নয়ে পইসে ১ আনা ৯ পাই দিয়ে দিতে পারেন।

—"গরিৎ" আমি পূরণ করে দিলাম। লুই লজ্জা পেল; ও আবার ম দ্‌মোয়াজেল বলতে যাচ্ছিল নির্ঘাৎ।

২৪শে নভেম্বর। আজ লুই চলে গেল। সম্ভবতঃ আমিই এর জন্য দায়ী। খুব ভোরে উঠে টেনিস সাজাব বলে ফুল তুলছিলাম; সেই সময় লুই এসে হাজির। আমার দুই হাতেই ফুল থাকার দরুণ ওর সঙ্গে করমর্দন করতে পারলাম না। আমায় বিব্রত দেখে ওর খুব মজা লাগল।

"এগুলো দিয়ে খাসা একটা তোড়া বানানো যাবে," আমার ফুল তোলা শেষ হলে ও বলল; তার পর হাসল, "কই আমার সঙ্গে করমর্দন করলে না, একবার সুপ্রভাত পর্যন্ত বললে না?"

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম।

ওর নাকের কাছে ফুলগুলো ধরে প্রশ্ন করলাম, "গন্ধ কি চমৎকার, না?"—বহুক্ষণ ও সেগুলির আঘ্রাণ নিল।

"আমায় একটা ফুল দেবে, লক্ষীটি?"

"সানন্দে, কি ফুল চাও?"

"একটা মার্গারিৎ ফুল?"

ভাল করে চেয়ে দেখলাম, ও ঠাট্টা করছে কি না; কিন্তু বেশ গম্ভীর ভাবেই ও এ-অনুরোধটি করল দেখে আমি বললাম, "যাঃ, তুমি বোধ হয় দুষ্টুমি করছ!"

"দুষ্টুমি? মার্গরিৎ, ওই ফুলটি ছাড়া জীবনে আর কিছুটি চাই না আমি, এ আমার মনের কথা।"

বৃথাই আমার ফুলের গোছা হাৎড়ালাম ওই ফুলটির খোঁজে।

"নাঃ, দেখছি নেই এর মধ্যে; আচ্ছা, আমি তুলে আনছি, কারণ বাবারও বড় প্রিয় ফুল ওটি; কাছেই পাওয়া যাবে।"—আমরা গেলাম চেরি-বাগানে; কয়েকটা মার্গরিৎ ছিঁড়ে তোড়া বানিয়ে ওর হাতে দিলাম,

"এই নাও, লুই!"

"প্যারী শহরের হতভাগী ফুলওয়ালীগুলো পথিকদের অতিষ্ঠ করে তোলে—'ফুল কেন বাবু!'—না কিনলে পিছু ছাড়ে না, তারপর নিজে হাতে সেই ফুল ক্রেতার বুকে গুঁজে দেয়।"—তোড়াটা নিজের বোতামের ঘাঁজে আটকানর প্রয়াস করতে করতে লুই কথাটা শোনায়।

"দাও না, আমি এঁটে দিই।"

"সত্যি বড় ভাল হয়; দেখছ ত আমি কেমন অকর্মার ঢেঁকি?"

তোড়াটা যখন লাগাচ্ছিলাম, ও সকৌতুকে লক্ষ্য করছিল আমায়; হয়ে গেলে ওর দিকে চেয়ে হাসলাম, ওর মুখ চিন্তাচ্ছন্ন দেখলাম। হঠাৎ নীচু গলায় আবেগের সাথে ও বলে উঠল।

"মার্গরিৎ, তোমায় বড় ভালবাসি, প্রাণাধিক ভালবাসি তোমায়; কি বলে প্রকাশ করি সে-প্রেম? আমার জীবন-সঙ্গিনী হবে মার্গরিৎ, প্রিয়তমা?"

সভয়ে আমি ওর দিকে তাকালাম, ওর কথা শেষ হতেই আমি আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না।

"ছিঃ, লুই, এমন কথা মুখে এন না! অসম্ভব!"

দারুণ কান্না পেল; দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললাম আমি। ক্ষোভের সাথে ও প্রশ্ন করল। "তুমি কি তবে আমায় ভালবাস না,

"ভালবাসি বই কি, তবে যে আভাস দিলে, সে-ভাবে না।"

"বেশ মার্গরিৎ, আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ ত?"

আমি চোখ তুললাম। ও ঝুঁকে দাঁড়াল; উত্তেজনায় ওর সারা মুখ পাংশু হয়ে উঠেছে।

"মার্গরিৎ, তুমি কি আর কাউকে ভালবাস?"

আমি নিরুত্তর দেখে ও ধিক্কার দিয়ে উঠল, "ইস্, পদ-মর্যাদায় ওর সমান নিজেকে মনে করে কি বোকামিই যে করেছি!"

ও চলে যাচ্ছিল; আমি একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে ছিলাম। ও বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে আমি ছুটে গেলাম ওর কাছে, ওর হাত ধরে ফেললাম; ও দাঁড়াল।

"লুই, লুই, আমায় ক্ষমা কর! দোহাই তোমার বন্ধু, আমার ওপর রাগ কোর না।"

সহজে ওর মুখে কথা সরল না; গাছ থেকে শুকনো পাতা একে একে ঝরে গিয়ে নীরবে উড়ে এসে পড়ছিল আমাদের পায়ের কাছে, আমার অশ্রুসিক্ত পাণ্ডুর মুখ দেখে ওর বুঝি দয়া হল।

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে ও শুধাল, "বল মার্গরিৎ, এখনো বল।"

"যদি না বলি, আমাদের বন্ধুত্বের এখানেই ইতি, না লুই?"

—"নির্ঘাৎ; কিন্তু মার্গরিৎ, আমায় যদি ভালবাসতে, ভেবে দেখ ত, কত সুখী হতাম আমরা?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, "বিদায় মার্গরিৎ, বিদায়!"

"এ কি সত্যই 'বিদায়'—লুই?"

"আর কোন পথ দেখি না; কোন দিন আর এ-মুখো হব না, আর কোন দিন দেখা হবে না তোমার সঙ্গে।"

অসীম আবেগে আমরা করমর্দন করলাম; আমার হাত ওর হাতে নিয়ে আনমনে ও স্বগতোক্তি করল, "প্রাণাধিক প্রিয় হাত দুটি! বিদায়!"

তারপর অকস্মাৎ যেন এক অদম্য শক্তির আজ্ঞায় ওর তপ্ত ওষ্ঠ দুটি নেমে এল আমার হাতের ওপর! এক মুহূর্ত বাদে ও দেখলাম বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। তাহার মত আমিও গেলাম, নতজানু হয়ে বসলাম ক্রুশের সামনে; একান্ত ভাবে আমি প্রার্থনা করলাম, 'ভগবান, আমায় ক্ষমা কর, লুই যেন আমায় ভুলে যেতে পারে, সুখী হোক ও জীবনে।'—দরদর ধারে জল ঝরতে লাগল আমার চোখ বেয়ে।...উঠে দাঁড়ালাম, জানালার ধারে গিয়ে বসলাম। বুড়ো আদলফ আস্তাবলে ঢুকল, লুইয়ের ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে এল। সে কি, লুই চলে যাচ্ছে! খানিক বাদেই দেখলাম, ওর সঙ্গে বাবা করমর্দন করলেন, পিছনে মা দাঁড়িয়ে তাঁদের থেকে বিদায় নিয়ে ও ঘোড়ায় চেপে বসল। এত বিষণ্ণ, এত ভগ্নোদ্যম ত ওকে কখনো দেখিনি? মা ওকে আলিঙ্গন করলেন, আবার করলেন করমর্দন, ও চলে গেল। ক্রমশঃই ওকে দূরে মিলিয়ে যেতে দেখলাম। অভ্যাস মত একবারও ও ফিরে তাকাল না, টুপি নেড়ে জানাল না বিদায় অভিবাদন। জানলায় একমনে বসে আছি, মা এলেন, সবই তিনি শুনেছেন। সোফা টেনে আমার পাশে বসলেন। আমি ওঁর বুকে মুখ লুকোলাম।

"মার্গরিৎ, তুই ওকে তাহলে ভালবাসিস, না?"

"খুবই ভালবাসি মা, তবে অমন ভাবে নয়।"

খানিক চুপ করে থেকে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কাউকে তুই কি ভালবাসিস মা?

"হ্যাঁ।"

এত ব্যথার মাঝেও আমার মুখে না জানি হাসি ফুটে উঠেছিল, সেই হাসিটির কথা স্মরণ করে, সগৌরব সেই অভিজাত ওষ্ঠদ্বয়, সেই ঘনশ্যাম শ্যেনদৃষ্টির মাধুর্য, চন্দনশুভ্র বীরত্বব্যঞ্জক সেই কপালের ওপর ঢেউ-খেলান কেশগুচ্ছের কথা স্মরণ করে!

"বেচারা লুই"! মা নিশ্বাস ফেললেন। অনেক আশা ছিল, তোদের দুটিকে এক করে দিয়ে যাব। যা হবার হল। ভগবান যা করেন তা মঙ্গলেরই জন্য, মেনে নিলাম এ-কথা।" তিনি আরো বললেন, "যা বাছা, কেঁদে কি হবে? চোখও তোর লাল টকটক করছে; যা, চোখ-মুখ ধুয়ে আয়!"

আমায় আদর করে তিনি বেরিয়ে গেলেন। মা গো! এত বড় অন্যায় করলাম, তবু একটা রূঢ় কথা বার হল না তোমার মুখ দিয়ে? একি পাষাণীর মত ব্যবহার করলাম আমি? কি বলে তার হাতে আমি এ-জীবন সঁপে দিতে উৎসুক—যে আজ পর্যন্ত মুখ ফুটে কোনও ইঙ্গিত দিল না? বাবার মুখেও কথা নেই। বড় গম্ভীর লাগল তাঁকে। রাতের বেলা, যখন সবাই গিয়ে বসলাম আগুনের ধারে, তিনি আমার পিঠে হাত রাখলেন। একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন জ্বলন্ত চুল্লীটার দিকে।

আমার ঘরে গেলাম; তাকালাম বাইরে, কুয়াশাচ্ছন্ন প্রকৃতির পানে। কে যেন পা টিপে টিপে এসে ঢুকল। তেরেস; আগুনটা একটু উসকে দিয়ে ও আমার কাছে এল।

"আচ্ছা খুকুদি, অমন সোনার চাঁদ ছেলেটা খামখা চলে গেল কেন রে?"

"নিশ্চয়ই ওর কাজের সুবিধা হবে বলে!"

"না গো দিদি, আমার মনে হয় তোর ওই কাজল আঁখিই ওর কাল হল!" আমি চুপ করে আছি দেখে ও বলে চলল।—

"শোন্ দিদি, একটা কথা বলি। বাধা দিস্‌নে। আমার মনে একটা খটকা লাগে তখুনি, যখন দেখলাম অষ্ট প্রহর ওর চোখ দুটি তোকেই যেন খুঁজে মরছে আঁতিপাতি করে। পোড়াকপালী তুই আর সেদিকে নজর দিলি কই? আজ সকালে সিঁড়ি পরিষ্কার করছি, দেখি ব্যথামাখা মুখে, চোখ বরাবর টুপি নামিয়ে বেচারা ফিরে এল। নিজের ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিল। আমি ত অবাক! স্পষ্ট শুনলাম, হাউ হাউ করে ও কাঁদছে। দেখ বাছা, সহজ ভালবাসা নয় ওর। পনেরো মিনিট বাদে বেরিয়ে এল, হাতে একটা থলি। আমায় বলল, "আদিও তেরেস্, বিদায়"!" —কি যে করুণ হাসি দিদি, বুকটা আমার ছ্যাঁৎ করে উঠল। 'কাপ্তেন সাহেব কি আজই রওনা হবেন নাকি'? আমি জানতে চাই। 'হ্যাঁ।—'হ্যাঁ তেরেস, বিদায়'!—দেখলাম

তেরেস একটু থামল। জানলার ওপর কনুই রেখে কোন মতে মাথাটা ধরে বসে ছিলাম। বেচারা লুই! এত গভীর ওর ভালবাসা! ভগবান! ভগবান! আমায় ক্ষমা কর।—হাতে টান পড়ল।

"খুকুদি,' রাগ করলি না ত?"

"না তেরেস!"

একটু দম নিয়ে স্নেহের সুরে ও বলল, "ওকে একটা চিঠি লিখে দে রে দিদি! আসতে লেখ। তোর ওই খুদি হাতের একটা আঁচড় পেলেই ও ছুটে আসবে। ওকে সুখী করা চাই দিদি, লিখবি ত?"

"উঁহু তেরেস, এখন আর লেখা সম্ভব নয়।"

ও দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"ওর জীবনটা কিন্তু মাঠে মারা গেল। তোকে ও এত ভালবাসে যে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারে, জানিস?"

"ছি তেরেস, অমন কথা বলিস না।"—চোখ আমার জলে ভরে উঠল। তবু ধীর গলায় আমি বললাম. "দেখিস, ভগবান ওর অমঙ্গল হতে দেবেন না। সব কিছু তিনিই ত চালাচ্ছেন। তিনিই কি আমাদের সব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করছেন না? আমাদের জন্য তিনি কি সদাজাগ্রত নন?"

"বেশ খুকুদি, তুই যা করিস তা কখনো কারও ক্ষতি করে নি। শুভরাত্রি; দেবদূতেরা তোর মঙ্গল করুন।"

ও বেরিয়ে গেল।

হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে উঠল। মলিন হয়ে উঠল তারাগুলো; আমি জানালাটা ভেজিয়ে দিলাম; সত্যিই কি আমার সামনে সুখের পেয়ালা তুলে ধরা হয়েছিল, আর তা আমি প্রত্যাখ্যান করলাম?—না, না, অসম্ভব!—কি করে আমি তার ঘরে গিয়ে সুখী হতাম, যাকে আশানুরূপ ভালবাসতে পারলাম না? ভালবাসি ওকে বন্ধুরূপে, ঘনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে। তার বেশী না। আমার যা কর্তব্য আমি করেছি বলেই মনে হয়।—আবার জানলা খুলে দিতেই হাড়-কাঁপানো হাওয়া ঢুকে মজ্জা অবধি কাঁপিয়ে দিল। অব্যক্ত

এক ব্যথার প্রভাবে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। এঁটে দিলাম জানলাটা। ক্রুশের তলায় হাঁটু গেড়ে বসলাম, "ভগবান, আমায় পরিত্যাগ কোর না, ত্যাগ কোর না আমায়।" বহুক্ষণ ওই ভাবে বসে রইলাম। যে-ব্যাপারটা ঘটে গেল তারই চার ধারে আমার চিন্তারাশি জমা হয়ে উঠল। আমাদের সবারই শুভ কামনা করলাম; লুইয়ের জন্য প্রার্থনা করলাম, আর প্রার্থনা করলাম আমার প্রেমাস্পদের জন্য। রাত বারোটার ঘণ্টা বাজল; শুতে যাই।

২৭শে নভেম্বর।—কাল বৈঠকখানায় জানলার ধারে বসেছিলাম; কিসের চিন্তায় মশগুল ছিলাম জানি না, হঠাৎ মনে হল জমিদার আমার সামনে দিয়ে চলে গেল; ও এখানেই আসছে কি না, সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় ওর পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়ির ওপর। বাবা দরজা খুলে ওকে ভেতরে নিয়ে এলেন। মোমবাতি জ্বালা হয়নি; চিমনীর ম্লান আলো ছাড়া ঘর প্রায় অন্ধকার (যা ঠাণ্ডা পড়েছে, আগুন আজ-কাল রোজই জ্বালতে হয়)। বাবা ঘণ্টা বাজালেন; বুড়ো আদলফ বড় বড় বাতি নিয়ে এল; জমিদার আমার সঙ্গে করমর্দন করল।

"শ্রীমতী আর্ভের, বড় দুর্বল দেখছি তোমায়; শরীর খারাপ হয় নি ত?"

"উঁহু," আমি জবাব দিলাম। আমার গাল দুটো বোধ করি লাল হয়ে উঠল, যা দেখে জমিদার বলল, "বাঃ, এবার আশ্বস্ত হলাম সত্যি!"

আগুনের পাশে বসে গল্প শুরু হল। লুইয়ের খবর জানতে চাইল ও। ক্রমেই আমি চুপ করে যাচ্ছি, একমনে শুনছি ওর আলোচনা বাবার সঙ্গে: রাজনীতি, ভূতত্ত্বের সাম্প্রতিক আবিষ্কার, সাহিত্য—কত বিষয়েই যে কথা হচ্ছিল। এত জিনিস ও শিখল কোথায়!—আমায় ও গান গাইতে অনুরোধ করল। তারপর কি খেয়াল হল, নিজে গিয়ে বসল পিয়ানোর সামনে; বাজাতে শুরু করল অপূর্ব কয়েকটি সঙ্গত। বিখ্যাত 'লা ত্রাভিয়াতা' গানটি ভেসে এল,

"Di Provenza ilmar il Suol"

ভরাট গলা গমগম করতে লাগল ছোট্ট ঘরটিতে; প্রথম স্তবকের শেষ লাইন ক'টি ধ্বনিত হতে থাকল দূর থেকে দূরান্তরে:

"Dio mi...gui—da...Dio mi guida!"

("ভগবান, আমায় পথ দেখাও, আমায় পথ দেখাও!

তারপর অতি মধুর, অতি হৃদয়গ্রাহী স্বরে ও শুরু করল,

"Ah!—Il tuo...vecchio ge-ni-tor...

tu non sai quanto soffri...

Tu non sai quanto soffri."

(হায় পরমপিতা, জান না মোর কত যাতনা, কত যাতনা!)

* * * *

নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে শিউরে উঠছিলাম। লুইয়ের কথা স্মরণে এল; প্রত্যাখাত তার চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। শত চেষ্টাতেও অশ্রু সম্বরণ করা ভার হল। জানলার আড়ালে বসে আমি চোখ মুছে ফেললাম। গান শেষ করে জমিদার উঠে এল

"বাঃ, হ্যানোয়া, অপূর্ব তোমার গলা!" বাবা তারিফ করলেন, "গ্রিসি নিজেও এমন প্রাণ দিয়ে, এত দরদ ঢেলে গাইতে পারতেন কি না সন্দেহ!"

ও হাসল, "না জেনারেল, নেহাৎ স্নেহের খাতিরে একথা বলছেন আপনি। শ্রীমতী মার্গারিত্তের গান শুনতে আপনি নিত্য অভ্যস্ত। আপনার মুখে এ-কথা সাজে না।"

পিয়ানোর সামনে বসবার জন্য ও আমায় পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ওর কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিলাম—আজ গান গাইতে পারব না। তার পর বাজাতে শুরু করলাম ভ্যাবর (weber) এর শেষ ভালসৃটি। বাজান শেষ হতে না হতে জমিদার বলে উঠল, "এত করুণ, এত মর্মান্তিক বাজনা জীবনে শুনিনি; মুমূর্ষু মরালের গানের মত, প্রেমমুগ্ধদের বিদায় সম্ভাষণের মতই নিদারুণ এর মূর্চ্ছনা!"

আমার পাশে বসে ও কঁতেসএর প্রসঙ্গ তুলল, "মা হরদম তোমার কথাই বলছেন; কেনই বা বলবেন না,—তোমার মত মহানুভব বড় একটা চোখে পড়ে না, আর যাদের অন্তরাত্মা নিষ্কলুষ, তারাই ত পরস্পরকে ভালবাসে, তাই না?"

"তাঁরাই পরস্পরকে ভালবাসেন সত্যি, কিন্তু আমি ত ভাল নই মোটেই; তোমার মার কথা আলাদা—তাঁর চরিত্র ত দেবতুল্য।"

ওর সাথে কথা বলা, ওর সান্নিধ্যে দু' দণ্ড বসা, ওর আয়ত দুটি চোখ পরাণ ভরে দেখা, ওর সঙ্গে তাল রেখে একই নিশ্বাস বুক ভরে নেওয়া, এর বড় সুখ আমি চাই না; আমার সব ব্যথা ধুয়ে-মুছে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

"তোমার ভাইয়ের আর দেখা পাই না কেন?"

ওর কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

"তার শরীর ভাল আছে ত?"

"না না," জমিদার হেসে উঠল, "গাস্ত'র স্বাস্থ্য চিরকালই ভাল; আমার মত যখন-তখন ওকে ভুগতে হয় না।"

ওর মার হয়ে আমায় জমিদার বলে গেল, কিছুদিনের জন্য যেন প্রাসাদে যাই আবার। মা ওকে কথা দিলেন যে আমি যাব; আমাকেও ইঙ্গিত দিলেন যে এ-অবস্থায় আমার পক্ষে ওখানে গেলে ভালই হবে। কথা ঠিক করলেন ওঁরা,—দশ তারিখে ওখানে যাব।

২৮শে নভেম্বর। ভালপোয়ানদের বাড়ী গিয়েছিলাম আজ। ওদের ঘরে কেউ নেই দেখে চলে আসছি, এমন সময় হেলেন দৌড়তে দৌড়তে বাগান থেকে বেরিয়ে এল আমায় খুব বড় একটা 'হামি' দিয়ে ও আমার পকেট হাৎড়াতে হাৎড়াতে যা খুঁজছিল, পেয়ে গেল। আমার দেওয়া মিষ্টিতে কামড় মেরে শুরু করল ও বকবক করতে।

"আচ্ছা হেলেন, উৎসবের দিন প্রাসাদে খুব মজা করলি না?"

"খু-ব মজা; জমিদার আমায় কোলে তুলে আদর করেছিল, জান? আর আমায় এত্তবড় একটা কেক দিয়েছিল," বড় একটা ফুলকপি দেখাল ও।

"বাঃ, জমিদার তা হলে খুব লক্ষ্মী বলতে হবে?"

"ছাই লক্ষ্মী," গলাটা নীচু করে, চারি দিকে তাকিয়ে ও বলল, "কক্ষণো আর ওকে 'হামি' খাব না—রাজ্যের ল্যাবেঞ্চুস দিলেও না।"

"কেন হেলেন, কেন রে?"

"ও খুব খারাপ লোক

"ছিঃ হেলেন, অমন কথা বলতে নেই। ও-সব বাজে কথা।"

"কে বলল বাজে কথা? সব সত্যি; জান, মা সেদিন বাবাকে এ-কথা বলছিলেন।"

"শোন্ হেলেন, জমিদার অতি ভাল লোক; সবাইকে ও কত ভালবাসে; তোকে ত কত বার পয়সা দিয়েছে, খেলনা দিয়েছে!"

"হাঁ, আমিও মাকে তা বললাম; তিনি মাথা নাড়লেন; আমায় টেনে নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।—আচ্ছা এই প্যানকেকগুলোর একভাগ কি ক্লদের জন্যে রাখতে হবে?"

"হ্যাঁ।"

এ আমি কি শুনলাম? বড় রাগ হল। এত মহৎ, এত পরোপকারী, তবু লোকে এর নিন্দা করে? বিশেষতঃ মাদাম ভালপোয়ান! কি অকৃতজ্ঞ! এদের জন্য স্কুলের জন্য কী না করেছে জমিদার! নাঃ, মাদাম ভালপোয়ানকে অন্য প্রকৃতির লোক বলে জানতাম।—চমক ভাঙল ছেলেদের ডাকে।

"এর থেকে আর একটা প্যানকেক নিই?"

"সব ক'টা খেয়ে ফেল, এগুলো তোরই সব।"

"এই খানিক আগে বললে ক্লদের নাম করে, আর এক প্যাকেট ওর হাতে দিয়ে আমি চলে এলাম তাড়াতাড়ি। বাড়ী ঢুকতেই বাবার সামনে দেখা।

"কি হল রে মার্গারিৎ? বড় চিন্তাকুল দেখছি তোকে?"

শেষে আমি ঘটনাটা খুলে জানালাম।

"সেই জন্য তুই মাদামের সাথে দেখা না করেই চলে এলি?"

"না, করব কি? যা রাগ হচ্ছে!"

বাবা হাসলেন।

"কি আশ্চর্য! কোন দিন শুনলে বিশ্বাসই করতে পারতেম না যে তুই রাগতে পারিস।" বলে উনি আমায় আদর করলেন।

"মার্গারিৎ, লুইয়ের চিঠি এসেছে।"

"ভাল আছে?

"হাঁ, তবে বড় আঘাত পেয়েছে।"

"বেচারা!"

আমার চোখ জলে ভরে গেল। অবাক হয়ে বাবা আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তার পর একটু দম নিয়ে বললেন, "এমন কিছু নয় মা; সয়ে যাবে।" বলে হাসলেন, "কিংবা হয়ত তোর মতের পরিবর্তন হবে।"

আমি গোমড়া মেরে আছি দেখে উনি কথার মোড় ঘোরালেন, "নে, সবই ভগবানের ইচ্ছা!"

৩০শে নভেম্বর। কাল আমবা পারী যাচ্ছি! বেশ কিছুদিন হল বাবা-মা তোড়জোড় করছিলেন—আমায় বিন্দুমাত্র জানতে দেন নি। আজ সকালে বাবা যখন আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "যা খুকি, গোছ-গাছ করে নে; কাল ভোরে আমরা পারী যাচ্ছি!"—আমি ত আকাশ থেকে পড়লাম, যেন বোমা ফাটল। বাবা আনন্দে

আমার সন্দেহ ঘোচে নি তখনো, "সত্যি বলছ, বাবা?"

"তা নয়ত বলছি কেন?"

ঘরে গেলাম; মালপত্তর বাঁধা-ছাঁদা শুরু করলাম। কবে ফিরছি জানি না; কয়েক দিনের মধ্যে ফিরতে পারলেই ভাল হয়। জীবনে পারী দেখি নি। লুইয়ের মুখে কত কথাই না শুনেছি! আর ঠাকুমা? ওঁকে নিশ্চয়ই দেখতে যাব।

বাইরের দিকে তাকালাম। সব কিছুই বিষণ্ণ, ম্লান। গাছ থেকে পাতার রাশি ঝরে গিয়েছে, সূর্য চলে গিয়েছে পশ্চিমে, ফিকে হয়ে এসেছে অস্তরাগ। জমিদার ঘোড়ায় চড়ে আসছে, সঙ্গে ওর ভাই। ওই ত, আমায় দেখতে পেয়েছে! হাত নাড়ল, হাসল। ও বোধ হয় জানে না, কাল আমরা চলে যাচ্ছি। তা হলে এসে দেখা করে যেত। কোন্ প্রাণে যে লোকে ওর নামে কলঙ্ক রটায়! ও এমনই দয়ালু, একটা মাছি মারতে পর্যন্ত হাত সরবে কি না সন্দেহ। কি এমন করেছে, যার ফলে ওর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ? এত কোমল ওর অন্তঃকরণ!—অবশ্য কঠোর হতেও ও জানে; নিজের কাজ করে যায় এক মনে, অবিচল ভাবে; লোকের কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না। ক্রমেই দৃশ্যের বাইরে মিলিয়ে যাচ্ছে ওর ঘোড়া; গাস্ত তার ঘোড়ার বেগ বাড়িয়ে দিল; ফ্র্যাঁসোয়া থামল এক দণ্ড, তার পর কদম চালে এগিয়ে গেল। ভগবান ওকে রক্ষা করুন!

১লা ডিসেম্বর।—পারীতে এসে গেছি। ঠাকুমার এখানে উঠেছি। অকপট আদরে তিনি আমাদের টেনে নিয়েছেন নিজের কোলে। বাবা আর মাকে আলিঙ্গন করে, আমায় দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

"কি সুন্দরি, তুই-ই আমার মার্গারিৎ?" উনি আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন, "কি ডাগরটাই না হয়েছিস, কি রূপ যে খুলেছে দিদি! পারী শহরের ছোঁড়াগুলো প্রথম দর্শনেই কাৎ হবে দেখছি।"

আমার কান গরম হয়ে উঠল। ঠাকুমা বাবার দিকে তাকালেন; ইঙ্গিতে কি কথা হল। বাবা আমায় ওপরে যেতে বললেন। উনি, মা আর ঠাকুমা খানিক বাদে এলেন। ঠাকুমা আমাদের আর কোথাও থাকতে দেবেন না; এখান থেকে এক পা যদি বাড়াই আমরা, উনি মাথা খুঁড়ে মরবেন। সারা দিন আমরা লুভ্রএর যাদুঘর দেখে কাটালাম। বিকেলের দিকে বাবা-মা পুরনো এক বন্ধুর বাড়ী গেলেন। ঠাকুমার কাছেই রইলাম আমি। সমবয়সী বন্ধুর মত উনি আমার সাথে কথা কইতে লাগলেন।

"আচ্ছা দিদি, এর আগে বুঝি তুই এ-মুখো হস নি?"

"না ঠাকুমা, বাড়ীর বাইরে, গাঁয়ের বাইরেই বিশেষ যাই নি।"

আগুনটায় কিছু কাঠ দিয়ে উনি আমায় চিমনীর দিকে সরে বসতে বললেন।

"আচ্ছা, ব্রইাইয়ের কা'কে কা'কে চিনিস রে? প্র্যারভেলদের জানিস না?"

"হ্যাঁ।"

"কঁতেস ত বিধবা; দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর"—

"না, ওঁর মেয়ে নেই; দুটিই ছেলে।"

"সে-দুটো এত দিনে বোধ হয় দারুণ লায়েক হয়ে উঠেছে। বড়টার নাম কি যেন? হ্যানোয়া?"

"হ্যাঁ ঠাকুমা, আপনি ওদের চেনেন দেখছি।"

"চিনব না?—তোদের ওখানে ওরা আসে-যায়। ছেলেগুলো?"

"হ্যাঁ! কঁতেস আমায় বড় স্নেহ করেন। বড় ভালবাসেন। প্রায়ই আমায় ওঁর ওখানে গিয়ে থাকতে বলেন। গত মাসে, জমিদারের জন্মদিনে কি উৎসবটাই যে হল!"

"কার বললি? বড় ছেলেটার?"

"হুঁ।"

"হ্যানোয়া তোদের ওখানে যায়?"

"প্রায়ই ত যায়।"

"রোজ?"

আমি হাসি চাপতে পারলাম না; "রোজ কি করে আসবে, ঠাকুমা? ওর যা কাজের চাপ।"

"তোকে নাকি ওর বড় মনে ধরেছে?" ঠাকুমার মুখে-চোখে চাপা কৌতুক ছড়ান।

জড়িত কণ্ঠে জবাব দিলাম, "কই, জানি না ত!"

উনি হো-হো করে হেসে উঠলেন, "তাতে কি? তোর বুড়ী ঠাকুমার মন মজেছে তোর রূপে; আর কি চাই?"

উনি আমায় একটা ছবির এলবাম দেখালেন। তাতে লুইয়ের ছবিও চোখে পড়ল।

"এটা ত কাপ্তেন লফেভ্র-এর ছবি, তাই না?"

"হ্যাঁ, চিনিস দেখছি ওকে।"

"বাঃ, চিনি না? এই ত সেদিন ও আমাদের ওখানে এসেছিল!"

"আমার এখানেও যখন-তখন ও আসত; গেল দুই মাস কিন্তু ওর পাত্তা পাই নি।"

দশটা বাজল; ঠাকুমা আমায় শুতে যেতে বললেন। ইচ্ছে ছিল, বাপ-মার জন্ম অপেক্ষা করি। ঠাকুমা কিন্তু মানা করলেন, উনি বললেন, "এত রাত করে কি শুতে হয়? আমায় তিনতলার ঘরে নিয়ে গেলেন। শোবার ঘর, বুদোয়ার—দুটিই ভারি সুন্দর সাজানো। আমায় আলিঙ্গন জানিয়ে ঠাকুমা চলে গেলেন। চিমনীতে গনগনে আগুন। পরনের পোষাক খুলে ফেললাম। ড্রেসিং-গাউন মুড়ি দিয়ে খাটের ওপর বসলাম হাঁটু গেড়ে। তারপর শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

৩রা ডিসেম্বর।—বাবা কাল চিত্রকর মঁসিয়্য বেঙ্গরকে এনেছিলেন। আমার ছবি আঁকাবেন। ভদ্রলোক শুধু একটা স্কেচ করে নিয়ে গেলেন। ওর থেকে তৈরি হবে তৈলচিত্র।—সাত তারিখের পর আমরা দেশে যাব। বাবার বহু বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা হল। উঃ, বড় ক্লান্ত লাগছে!

৪ঠা ডিসেম্বর।—আজ আবার মঁসিয়্য বেঙ্গর এসেছিলেন। পাকা হাত ভদ্রলোকের। ছবিটা যে বিশেষ ধরণের হবে, আঁচ করা যাচ্ছে। সবে চার দিন হল এসেছি; এর মধ্যেই ফেরার জন্ম অস্থির হয়ে পড়েছি। আজ সন্ধ্যাবেলা জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম; হঠাৎ দেখি, পাশে ঠাকুমা।

"আহা, দিদি রে, কার স্বপ্নে একাত্ম হয়েছিলি রে?"

চাকরটা এখনো বাতি জ্বেলে যায় নি, তাই রক্ষে; হঠাৎ গাল দুটো আমার যেন লাল হয়ে উঠল; নাঃ, ঠাকুমা বড় পেছনে লাগেন দেখছি।"

৮ই ডিসেম্বর।—আমরা ফিরে এসেছি। বিকেল পাঁচটার ট্রেনে এলাম। খাবার পর একটু জিরিয়ে নিলাম আমার [illegible]। পরশু আমি প্রাসাদে যাব। ও (জমিদার আর কি) নিশ্চয়ই জানে না আমরা ফিরে এসেছি। তা হলে কি একবার আসত না? কিংবা, হয়ত ওর শরীর ভাল নেই। নাঃ, কি যে আমার আজে-বাজে ভাবনা! কাল ও নির্ঘাৎ আসবে। এবার শুয়ে পড়ি।

৯ই ডিসেম্বর।—আজও ও এল না; কি ব্যাপার? বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। সারাটা সকাল বৃষ্টি পড়েছে। বেড়াতে যেতে পারি নি। বাবা আর আমি মোলিয়্যার পড়তে বসলাম। বাবা ত বুর্জোয়া জাঁতিওমের দুরবস্থায় হেসে খুন! আমার কিছুই ছাই ভাল লাগছে না।

"কি হল রে খুকি? এত গোমড়া মেরে গেলি যে?"

"জানি না বাবা, আজ কিছুতেই আনন্দ পাচ্ছি না যেন!"

বিকেল ৩টে। বৃষ্টি থেমে গেছে। বাবার সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে বার হলাম। দেখা হল জমিদারের সাথে। আমাদের অভিবাদন জানিয়ে ও সঙ্গে সঙ্গেই চলল; ওর চেহারাটা কেমন যেন খারাপ লাগল। বেচারা জানতই না, আমরা পারী গিয়েছিলাম। কাল ও আমায় নিয়ে যাবে প্রাসাদে। চারটে অবধি ঘোরা গেল। মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য দেখা যাচ্ছে; বাবা জমিদারকে পারীর গল্প করছিলেন; ওর মন কিন্তু যেন অন্যত্র রয়েছে। নদীর ধার অবধি এসে ও বিদায় নিল। হয় ওর শরীর খারাপ, নয়ত অন্ম কিছুর চিন্তায় ও মগ্ন হয়ে রয়েছে। যাবার সময় ও রীতি-মাফিক আমাদের দিকে একবার তাকালও না, মাথার টুপি খুলে বিদায়ও জানাল না!

১১ই ডিসেম্বর। ও আর ওর মা গাড়ী নিয়ে এসেছি

আমায় গাড়ীতে তুলে নিয়ে নিজের পাশে বসালেন। জমিদার বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে মনে হল। মার আদেশে গাড়ীতেই ওকে উঠতে হল। আমায় আর কঁতেসকে চাদর দিয়ে ভাল ভাবে ঢেকে দিয়ে ও খড়খড়ি এঁটে দিল। সবেগে গাড়ী ছুটে চলল জনহীন মাঠের বুক চিরে। আমরা প্রাসাদের বৈঠকখানায় পৌঁছে বহু বিষয়ে আলোচনা করলাম। গাস্ত বাড়ী নেই। আমার ঘরে গিয়ে টুপি গরম জামা বিছানায় রেখে গেলাম জানলার ধারে। চারি ধার নির্জন। বাইরে হাওয়ার আর্ত্তনাদ। পাতা-ঝরে-যাওয়া নগ্ন ডালগুলোতে লেগেছে বিশ্রী রকম ছুটোপুটি! এই বিষণ্ণ দৃশ্য আর সহ্য হল না; আগুনের ধারে গিয়ে বসলাম। নীচে যাবার সময় সিঁড়িতে জমিদারের সঙ্গে দেখা।

"আজও বাইরে যাওয়া অসম্ভব; চল, প্রাসাদের অদেখা যা' কিছু তোমায় দেখিয়ে আনি"।

আমি সোৎসাহে রাজী হলাম।

বড় বন্ধ ঘরটা খুলে ও প্রথমে দেখাল পুরনো বই আর ছবির রাশি। ঘরে চারটে মাত্র জানলা: কেমন ছমছমে ভাব।

"এই দেখ সেই কাথেরিনের ছবি—প্রেমের বেদীতে যিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন আপন জীবন;—এই তাঁর ভাই, সেই যোদ্ধার ছবি"!

একে একে প্রতিটি ছবির ইতিবৃত্ত শোনা গেল।

"প্রাসাদের সুড়ঙ্গ দেখবে?"

"চল না।"

"ভয় করবে না?"

"কিসের ভয়?"

"ভীষণ অন্ধকার ওখানে; তা ছাড়া শোনা যায় যে ১০১ খৃষ্টাব্দে নাকি জমিদার আর্তুর ত প্রস্যারভেন ওখানে নরহত্যা করেছিলেন। এখনো মেঝেতে রক্তের দাগ আছে।"

"থাক্ না; তুমি আছ, আমার ভয় কি?"

এতক্ষণ ওর কপালে একটা জটিল রেখা দেখা যাচ্ছিল। আমার উত্তরে ও তৃপ্ত হল। ছোট্ট একটা গুপ্ত দরজা খুলে ও আমার হাত ধরে সন্তর্পণে অগ্রসর হল সুড়ঙ্গপথে। জালে-ঢাকা ছোট একটা ঘুলঘুলি দিয়ে এক ঝিলকে আলো এসে কেমন বিদঘুটে পরিবেশ গড়ে তুলেছে! অতি দীর্ঘ সুড়ঙ্গটি। পথ যেন শেষ হয় না। অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে। কিন্তু ও আমার হাত ধরে আছে, তাই ভয় করছে না একদম। প্রায় পনেরো মিনিট হাঁটার পর অতি নীচু সঙ্কীর্ণ একটা দরজা দেখা গেল। খোলামাত্র সামনে পড়ল ধু-ধু মাঠ। বৃষ্টি থেমে গেছে; একটা স্প্রিং দিয়ে জমিদার দরজাটা এঁটে দিল।

"উঃ, ওখান থেকে বেরিয়ে বুক ভরে নিশ্বাস নেবার যে কী সুখ!" ও বলল।

হাওয়া অবিরাম গর্জে চলেছে। তাড়াতাড়ি আমরা পা বাড়ালাম প্রাসাদের দিকে। মঁসিয়্য রেকামিয়ে, গাঁয়ের পাদরী, আজ এখানেই খেলেন। অতি সৎ চরিত্রের লোক; বড় দয়ালু। জমিদার ও তার ভাইয়ের শিক্ষক ছিলেন উনি,—নিজের সন্তানের মত ওদের ভালবাসেন।

রাত্রে চিমনীর সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম সারা দিনের কথা। কে যেন দরজায় টোকা দিল; কঁতেস এলেন। আমার পাশে বসে টেনে নিলেন আমায় তাঁর কাছে। ওঁর কাঁধে মাথা রাখলাম। মহার্ঘ, গভীর ওঁর স্পর্শ

"কি ভাবছিলি মা? মনে হল কি এক স্বপ্নে তুই ডুবেছিলি; স্পষ্ট তার প্রকাশ দেখলাম তোর রসাপ্লুত মুখে।"

উত্তরে ওঁর হাতে আলতো ভাবে চুমা দিলাম। উনি যে ওরই গর্ভধারিণী; এই পৃথিবীতে উনিই ত ওকে এনেছেন, মানুষ করেছেন নিজের বুকের রক্ত দিয়ে। ওঁর প্রতি অব্যক্ত এক কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তর ভরে উঠল।

"বুঝলি, রোজ শোবার আগে আমার ঘুমন্ত ছেলেদের একবারটি দেখে যাওয়া আমার অভ্যাস; যখন ওরা এতটুকু ছিল, তখন থেকেই এভাবে দেখে আসছি; আজও দেখি। তোকেও দেখতে এলাম। তোকে যে আমি নিজের মেয়ের মতই ভালবাসি। হ্যানোয়া, গাস্তঁর মত তুইও আমায় ভালবাসিস; না মা?"

"আজ্ঞে হাঁ, আপনাকে সত্যি বড় আপন মনে হয়। আচ্ছা গেল সপ্তাহে কি জমিদারের শরীর খারাপ হয়েছিল?"

"বিশেষ কিছু না; কিন্তু, তুই ওকে 'জমিদার' বলে ডাকিস কেন মা? শুধু হ্যানোয়া বলে ডাকলেই পারিস। চার বছর বয়সে তুই যে ওকে নাম ধরেই ডাকতিস।" আমি দ্বিধান্বিতা দেখে উনি হাসলেন।

"যা মা, ঘুমিয়ে পড়; তোর ভাল ঘুম হোক, এই প্রার্থনা করি।"

উনি চলে গেলেন। আমি খাটের পাশে বসে প্রার্থনা করলাম। পরম পিতার চরণে প্রার্থনা করলাম, আমাদের যেন অযথা প্রলোভন থেকে তিনি দূরে রাখেন। শোবার আগে মশারিটা একটু ফাঁক করে চেয়ে দেখলাম—দারুণ আঁধারে আর কুয়াশায় আচ্ছন্ন সমস্ত পৃথিবী। জানালায় জানালায় জেগেছে হাওয়ার কান্না। আকাশে ছড়ানো অযুত তারার বীজ। কী অপরূপ! "আকাশের বুকে ভগবানের কীর্তি প্রকট, আর সারা বিশ্বের বুকে প্রকট তাঁর সৃজনী চিহ্ন।" কি সত্যি! তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে এ কথাই বার বার মনে আসে। আমি শুয়ে পড়লাম। সমস্ত প্রাসাদ নিদ্রামগ্ন।

১২ই ডিসেম্বর। কাল রাতে বছরের প্রথম তুষারপাত। সকালে উঠেই চোখে পড়ল জানলার ওপারে সব কিছু ধবধব করছে সাদা। কি অপূর্ব শুভ্রতা! সন্ন্যাসিনীর মত সাদা পোষাকে পৃথিবী আজ সেজেছে; যা কিছু অপরিচ্ছন্ন, কালিমাময়,—তা আজ উজ্জ্বল এই পবিত্রতার মাঝে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জানেৎ এল আগুন নিয়ে।

"বঁজুর মাদমোয়াজেল; কি ঠাণ্ডা পড়েছে দেখছেন! আপনি ত বেশ সকাল সকাল উঠে পড়েছেন!"

"সে কি জানেং: তুই বলছিস সকাল সকাল! তুই তাহলে কোন ভোরে উঠেছিস না জানি।"

ও হেসে চলে গেল। আটটা নাগাদ গেলাম বৈঠকখানায়। গাস্ত জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে, আমায় দেখতে পায়নি।

"কি মঁসিয়: গাস্ত, একা এখানে?"

ও ঘুরে দাঁড়াল।

"মাদমোয়াজেল মার্গরিৎ, আজ আর বাড়ীর বাইরে এক পা-ও যেতে পারবে না।"

বড় বড় বরফের কুচি পড়ছে!

"তাতে কি, দিনটা যা সুন্দর লাগছে, এমন দিনে কোন দুঃখেই আমি দুঃখিত হব না।"

"দেখ, খানিক বাদে কেমন বিরক্তি ধরে।"

"না বাপু, সে-শঙ্কা আমার নেই।"

কঁতেস এলেন।

"জ্যানোয়ার শরীর আবার খারাপ হয়েছে, সেই মাথাধরা।"

"তবে ও এখন আসবে না?" আমি জানতে চাইলাম।

"আসবে না? যা একগুঁয়ে, শরীরটার যত্ন কোন দিন নিতে দেখলাম কই?"

ইতিমধ্যে জমিদার এসে হাজির হল। আমায় সুপ্রভাত জানাল। কি ফ্যাকাশে লাগছে ওকে। স্বচ্ছ চামড়ার ভেতর দিয়ে নীল শিরাগুলো কপালের দুই পাশে যেন ফুঁড়ে বেরুচ্ছে।

"উঃ, কাল সারা রাত একটুও ঘুমুতে পারিনি।"

গাস্ত বেরিয়ে গেল।

"নীচেতে তুই এলি নে জ্যানোয়া?" ওর মা বকলেন, "আয়, এই সোফাটায় শুয়ে পড় দেখি!"

ও সানন্দে শুয়ে পড়ল চোখ বুঁজে।

"তোর খাবার এখানেই আনব। নড়িস না যেন এখান থেকে।"

ও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। আমরা খাওয়ার ঘরে গেলাম। প্রাতঃরাশের পর কঁতেস নিজে জ্যানোয়ার জন্য কফি নিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি ট্রে-টা নেব বলে ধরাধরি করতে উনি আমার হাতে দিলেন বাধ্য হয়ে। জ্যানোয়া কিছুই খেতে পারল না, অসম্ভব তেষ্টা পেয়েছে বলে কাপ ত'য়েক দুধ-কফি খেল। আমার মনে হল জমিদার আর তার ভাইয়ের মধ্যে তেমন যেন সদ্ভাব নেই ইদানীং। দিনান্তে একবারও ওদের একসাথে দেখা যায় না আজকাল। জমিদার আমায় অনুরোধ করল কিছু পড়ে শোনাতে। ওর কাজে নিজেকে নিয়োগ করতে পারব,—এর বড় সুখ আর আমার কি আছে? আমি পড়েই চললাম। ক্রমে ক্রমে ও ঘুমিয়ে পড়ল। অনড় অচল ভাবে আমি বসে রইলাম, পাছে ওর ঘুম ভেঙে যায়। আগুনের দিকে তাকিয়ে আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, কি এমন ঘটেছে যার জন্য ও এত বিচলিত হয়ে উঠেছে? নিশ্চয় ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে এমন কেউ কিছু করছে যার ফলে এই অবস্থা,—ঘুমের ঘোরে কেমন শিউরে উঠছে; অর্ধস্ফুট আর্তনাদ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে, ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মাঝে ও আকুল হয়ে উঠছে, একবার ওকে জাগিয়েই দিচ্ছিলাম; কিন্তু খানিক বাদে ও নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমিয়ে পড়ল। ওর মা এলেন; ও ঘুমুচ্ছে দেখে উনি আমার পাশে এসে বসলেন; আমি ওঁর কোলে মাথা রাখলাম। আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে উনি ছেলের দিকে তাকালেন।

"ওকে তুই ভালবাসিস?"

আমি চুপ করে রইলাম।

"হুবহু বাপের মতই দেখতে হলে কি হবে, তাঁর মত স্বভাবটা ও পায়নি। ইচ্ছে ছিল ওর বিয়ে দেব। তোর মত একটি পাত্রী যদি পেতাম, পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে চোখ বুজতাম।"

লজ্জায় আমি অধোবদন দেখে উনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই ওকে ভালবাসিস?" ওঁর আঁচলে আমি মুখ লুকোলাম দেখে উনি বলে চললেন, "কেন মা, এত লজ্জা পাচ্ছিস? ও কি তোর যোগ্য পাত্র নয় না তুই ওর যোগ্য নয়? ওর স্ত্রীরূপে তোকে দেখি বড় সাধ আমার অন্তরে। মায়ের যত্ন দিয়ে ওকে ভালবাসবার, দেখা শোনা করবার একজন কেউ আছে জেনে মনে বড় সান্ত্বনা পেতাম।" আমার মুখে উনি চুমো খেলেন।

"জানিস মা, সমস্ত বুক দিয়ে তোকে ভালবাসি আমি, কারণ তুই আমার জ্যানোয়াকে ভালবাসিস যে।"

আস্তে আস্তে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল ওঁর গাল বেয়ে। পড়ল আমার চুলের ওপর।

"কঁতেস হলে তোকে যা মানাবে"—উনি বললেন। হাতে হাত রেখে আমরা ঘণ্টাখানেক ওই ভাবে বসে রইলাম। সজোরে হঠাৎ দরজা খুলে গেল। গাস্ত ঢুকল। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারা করলেন কঁতেস। তৎক্ষণে কিন্তু ওর ঘুম ভেঙে গেছে। হঠাৎ ওভাবে ঘুমিয়ে পড়ার দরুণ প্রথমেই ও অপ্রতিভ হয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাইল। ও যে একটু ঘুমুতে পেরেছে, তাতেই আমি সুখী, ওকে বললাম। প্রসন্ন হাসিতে ওর মুখ ভরে উঠল; আমার হাত ধরে বলল, "আর কেউ হলে খুবই বিরক্ত হত; কিন্তু তোমার হৃদয় যে অতি প্রশস্ত মাদমোয়াজেল মার্গরিৎ!"

অধীর আনন্দে আমি গেলাম আমার ঘরে। নতজানু হয়ে বসলাম। সন্ধ্যাবেলা খাবার পর আমার ঘরে যাচ্ছিলাম; বৈঠকখানায় জমিদার দেখলাম কঁতেসের পায়ের এক পাশে বসে আছে। আমি তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি দেখে কঁতেস ডাকলেন, "আয় মা, অন্য পাশটা তোর পথ চেয়েই খালি রেখেছি; তুই যে আমার আর একটি সন্তান!"

১৩ই ডিসেম্বর।—আজ সকালে খাবার ঘরে কাউকে দেখলাম না; কঁতেস এলেন একটু পরে। "জ্যানোয়া, গাস্ত—এরা কই?"

"জানি নে বাছা।"

বুড়ো চাকর আতুরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যা রে, দাদাবাবুরা কোথায় গেল?"

"ভোরবেলা দেখেছিলাম মঁসিয়্য জ্যানোয়া আর মঁসিয়্য গাস্ত একের পর এক বেরিয়ে গেল।"

"কি আশ্চর্য! তাই নাকি?—চল, মার্গরিৎ, ওরা এসে পড়বে খানিক বাদেই।"

ওঁর কথা শেষ হতে না হতেই বড় ছেলে এসে ঢুকল। ক্রুদ্ধ, বিরক্ত ওর চেহারা; কুঞ্চিত ভ্রূর তলায় যেন বিজলী চমকাচ্ছে।

"তোর কি হয়েছে বল ত জ্যানোয়া, এই ঠান্ডার দিন সাত সকালে গিয়েছিলি কোথায়?"

"ভাবলাম, বুঝি একটু বেড়িয়ে এলে ভাল হবে", বলে ও সহজ ভাবে হাসার চেষ্টা করল।

"গাস্ত কই ?"

"তা কি করে বলব ?" ঝড়ের বেগে জবাব এল।

বিস্ময়ে ও উদ্বেগে কঁতেস মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময় খুশী মনে গাস্ত এল। দুজনের মধ্যে এমন কিছু হয়েছে, যার ফলে খেতে বসে কেউ একটা রা কাড়ল না।

গাঁয়ের পাদরী মঁসিয়ু রেকামিয়ে আজ রাতেও খাবার সময় এসেছিলেন। গাস্তকে কি একটা জরুরী কাজে ওর বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গেলেন। ও প্রথমে রাজী হয় নি ; শেষ পর্যন্ত যেতে হল ওর আদেশে।

১৪ই ডিসেম্বর।—জমিদারের অসুখ করেছে। বেশ বাড়াবাড়ি। ওর মাকেও এই কথাই বলতে শুনলাম। বৈঠকখানায় ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময় ওর কাতর কণ্ঠ ভেসে এল।

"পারছি না মা, অসহ্য, উঃ, আর জোর কোর না।"

কঁতেসের মোলায়েম গলা শুনলাম, "না বাপ, তোর শরীরটা খারাপ হয়েছে কি না।"

"হাঁ, মা গো, বেশ বুঝছি, দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছি।"

আমি চলে এলাম। ঘরে গিয়ে ছিটকিনি এঁটে দিলাম। ও অসুস্থ—বেশ গুরুতর কিছু তা' হলে! মনে হল বিরাট এক অমঙ্গল ঘনিয়ে আসছে আমার চার ধারে। না গো না, ভগবান! ও কেন মরবে না। না না! ভগবান! রক্ষা কর ওকে। শেষ পর্যন্ত অসুখ ? উঃ, কানে বাজছে এখনো ওর আর্ত্ত স্বর, "হাঁ মা গো, দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছি, ভয়ানক অসুস্থ!"

দয়াময়, ভাল করে দাও ওকে, সারিয়ে তোল! ও যেন আমায় ছেড়ে না যায়। বহুক্ষণ হাঁটু গেড়ে তাঁকে স্মরণ করলাম। উঠে দাঁড়ালাম তারপর, বেশ শান্তি ও সান্ত্বনা নিয়ে। নীচের ঘরে গেলাম। কঁতেস সোফায় বসেছিলেন। ও তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল। বড় ব্যাকুল, বড় বিপন্ন লাগল কঁতেসকে। সহজ ভাবেই আমার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করলেন। নির্বাক আয়ত চোখ মেলে ত্যানোয়া আমায় দেখছিল। অপূর্ব এক মাধুর্য ওর চোখে! আমি প্রশ্ন করলাম। "এখনো কি মাথা ধরা আছে ?"

"নাঃ, তবে বড় ক্লান্ত লাগছে ; ভয়ের কিছুই নয়।"

ওর মা উঠে গেলেন। বেশ বুঝলাম, দারুণ কান্নার বেগ উনি এতক্ষণ সামলে ছিলেন। একটু বাদেই গাস্ত এসে জুটল। কোথায় কোথায় ঘুরছিল কে জানে! ও আমায় বলল, "বাইরে দারুণ দুর্যোগ চলেছে।"

"মরতে তবে বেরিয়েছিলে কেন" ? ঝাঁঝিয়ে উঠল ওর দাদা।

"কারণ···"হেসে সলজ্জ উত্তর দিতে গিয়ে ও থেমে গেল।

ত্যানোয়ার এই উগ্র মেজাজের পরিচয় পেয়ে বড় দুঃখিত হলাম। কাল বাড়ী যাব ঠিক করেছিলাম। কঁতেস ছাড়ছেন না বলে ১৭ই যাব কথা হল।

রাত দশটা নাগাদ, শুতে যাবার আগে জানলাটা খানিক খুলে দিলাম। বন্ধ ঘরে দম নিতে কষ্ট হচ্ছিল। শুনতে পেলাম জানলার ঠিক নীচে গুন্-গুন্ করে গাস্ত একটি 'রঁদো' গাইছে।

* * * *

গাইতে গাইতে ও চলে গেল। গানের রেশ আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকে গলাটা যখন চড়ছে, আবার ভেসে আসছে ছাড়া-ছাড়া কলি,—

"একটি শুধু মক্ষিকা···আর দ্বিধা কেন
লো চাষানি ?"

জানালা বন্ধ করে দিলাম। ভগবান, সব অমঙ্গল থেকে আমাদের দূরে রেখ।

২রা জানুয়ারী, ১৮৬১। কি করে লিখি ? কোন মুখে বলি ? হায় রে! হায়! এ যা দেখলাম তার আগে আমার মরণ হল না কেন ভগবান ? উঃ, কেন এর আগে মাটি হয়ে আমি মিলিয়ে গেলাম না ? কত অন্যায়, কত বেদনার অভিজ্ঞতা নিয়েই না ধর্মপুস্তকে লেখা আছে, "মৃতদের আমি আশীষ জানাই জীবিতদের চেয়ে বেশী।"—হে ভগবান, এ কী মর্মন্তুদ কাহিনী আজ আমায় লিখতে হচ্ছে! দয়াময়, পাপী আমরা, আমরা চলেছি অসহায় ভেড়ার মত—কোন পথে জানি না। ক্ষমা কর আমাদের, টেনে নাও আমাদের তোমার বিশাল বুকে। উঃ! ভ্রাতৃহত্যা! এত মহৎ, এত সদাশয়, এত অমায়িক—কোন্ প্রাণে ও করতে পারল এই কাজ ? মায়ের পেটের ভাই, নিজের ছোট ভাই, তাকে—উঃ, এর চেয়ে শত বার মৃত্যুও যে অধিক সহনীয়! দয়াময়, ওকে ক্ষমা কর! ক্ষমা করবে দয়াময় ? অসীম ত তোমার কৃপা, অসুস্থ ও, দারুণ অসুস্থ! নিজের ইচ্ছাধীন থাকলে এ-কাজ ও কখনো করতে পারত না, হলফ করে বলতে পারি। রোগের ঘোরেই এমন পাপ সম্ভব হল। ভাইকে বুক দিয়ে ও ভালবাসত, ভালবাসত প্রাণের অধিক, কোন দিন তিরস্কার অবধি করেনি। দয়াময় যীশুখৃষ্ট, ক্ষমা কর ওকে, উদ্ধার কর ওকে ওর পাপ থেকে, ওর সঙ্কট মুহূর্তে ও চায় সান্ত্বনা! সব খুলেই দেখা যাক।

পনেরোই ডিসেম্বরের কথা। ভোর পাঁচটায় হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। এক লাফে উঠে দাঁড়ালাম। জানলা খুললাম। সব চুপচাপ। প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়েই রইলাম। ফের শুতে যাচ্ছি, এমন সময় মনে হল এক সঙ্গে অনেকগুলো গলা শোনা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি যা হোক একটা গায়ে চাপিয়ে অতি দ্রুত নেমে গেলাম সিঁড়ি বেয়ে। ভাল করে তখনো অন্ধকার কাটে নি। সুদীর্ঘ করিডোরের আধো আঁধারে ঠাহর করে দেখি, কা'রা যেন দাঁড়িয়ে সেখানে! আমায় দেখে বুড়ী দাইটা ছুটে এল।

"মাদমোয়াজেল, এ কি হল ? হায় মা! বাঁচাও ওকে পুলিশের হাত থেকে!" ও ডুকরে উঠল।

চোখে পড়ল দু'টি পুলিশের মাঝখানে জমিদার। হাতে কড়া, অফিসার ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন।

"এ সব কি হচ্ছে কি ?" ভর্ৎসনার সুরে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "যাঁকে বন্দী করেছেন, তিনি প্লুমারভেলের জমিদার, তা জানেন ?"

আমার গলা শুনে জমিদার ফিরে তাকাল। অফিসারটি উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, আমি বাধা দিলাম, "নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনও ভুল আছে, আর সে ভুলের কৈফিয়ৎ দেবার জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকুন"

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বারীন্দ্রনাথ দাশ

২

তার পরদিন রোববার। অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হোলো সারাটা দিন। বড়ো বেশী নিস্তব্ধ মনে হোলো শনিবার সন্ধ্যার কোলাহলের পর।

সকালের দিকে মনেই ছিলো না। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ী করবো ভাবছি, হঠাৎ রেবার কথা মনে পড়লো। রেবা— বা চৌধুরী, সুবিমল ভট্টাচার্যির বৌয়ের মামাতো বোন, যার সঙ্গে াল সিনেমা দেখার কথা ছিলো।

তাই তো! অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে। সকালেই যাওয়া চিত ছিলো।

সিনেমার হলে যদি দেখা যায়, বই আরম্ভ হবার পরও প্রত্যাশিত ্যক্তিটি এলো না, খালি রইলো তার চেয়ার—তা'হলে একটু দুর্ভাবনা র তার জন্যে, পথে কোথাও গাড়িচাপা পড়লো, না কি ঠ্যাং াঙলো তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময়! কিন্তু যদি খা যায় তার সীটে এসে বসলো আরেক জন অপরিচিত কেউ, যে াপনার অনুসন্ধানের উত্তরে জানালো যে, টিকিটখানি সে কাউণ্টারের ামনেই আরেক জনের কাছ থেকে কিনেছে, যার বর্ণনা মিলে যায় াপনার প্রত্যাশিত ব্যক্তিটির সঙ্গে, তখন তার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা াবণ করবার কোনো কারণ থাকে না। আর সিনেমা দেখার ানন্দটাই মাটি হয়ে যায়।

সুতরাং সুবিমল, তার বৌ আর রেবা যে আমার অনুপস্থিতিতে ব ফূর্তি করে সিনেমা দেখেছে, সে কথা মনে করার কোনো কারণ নেই।

তাই আমার যাওয়া উচিত ছিলো সকাল বেলা। গিয়ে াঝানোর চেষ্টা করা উচিত ছিলো যে, আমার বন্ধু দিলীপ মুখার্জীর ্বিমৃষ্যকারিতার ফলেই গোলমালটা হয়েছে।

সুবিমলের বাড়ি ছুটলাম তক্ষুণি। গিয়ে দেখি, ওরা সাজগোজ করে বেরোচ্ছে।

সুবিমল বললো, "তুমি আসবে না, আগে বললেই হোতো। অন্য কাউকে ডেকে নিয়ে যেতাম। টিকিটটা বেচে দেওয়ার দরকার হোলো না।"

দিলীপের কথা বললাম তাকে। বিশদ ভাবে বর্ণনা করলাম, সে কেমন করে আমার কাছ থেকে টিকিটটা নিয়ে আমি কিছু বুঝে উঠবার আগেই সেটি আরেক জনকে বেচে দিয়ে আমায় ট্যাক্সিতে তুলে একেবারে চায়না টাউনে নিয়ে গেল!

সুবিমল কোনো উত্তর দিলো না। মুখ দেখে বেশ বোঝা গেল যে, সে বিশ্বাস করলো না একটি কথাও। সে দিলীপকে চেনে না। সুতরাং তার বিশ্বাস করবার কোনো কারণও নেই।

সুবিমলের বৌ মল্লিকা শুকনো হাসি হেসে বললো, "তা'হলে কাল সন্ধ্যা আপনার ভালোই কেটেছে বলুন? চীনে মেয়ে, বার্মিজ মেয়ে, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, এদের ছেড়ে আমাদের সঙ্গে না-এসে নিশ্চয়ই ভালো কাজ করেছেন? আমরা আটপৌরে সেকেলে মানুষ, আমাদের সঙ্গে চুপচাপ বসে সিনেমা দেখে আর বাড়ি ফেরার মুখে কোনো রেস্তরাঁয় একটুখানি চা খেয়ে কি আপনি আর সেই বৈচিত্র্য পেতেন যা কাল চায়না টাউনে পেয়েছেন? আপনি অতো কুণ্ঠিত হবেন না রঞ্জন বাবু, আমরা কিছু মনে করিনি।"

বুঝলাম, এ অভিমানের কথা!

"না, না, বৈচিত্র্য কিছুই নয়, আমার একটুও ভালো লাগেনি," আমি বলে উঠলাম, "কিন্তু দিলীপটার পাল্লায় পড়ে"—

"ঠিক আছে রঞ্জন," সুবিমল বললো, "আমরা কিছু মনে করিনি। তবে টিকিটটা হলের দরজায় এসে বেচে দেওয়ার কষ্টটুকু না করলেই পারতে।"

রেবা এতক্ষণ কোনো কথা বলে নি। সে হঠাৎ তাড়া দিয়ে বললো, "চলো, সুবিমল দা', বড্ডো দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

আমি বললাম, "যদি তোমাদের অন্য কোনো বিশেষ প্রোগ্রাম না থাকে, তা হলে চলো সবাই মিলে একটি সিনেমা দেখে আসি কোথাও। আমি তোমাদের নিয়ে সিনেমায় যাবো বলেই এসেছি।"

সুবিমল আর মল্লিকা কোনো উত্তর দিলো না। রেবা উত্তর দিলো, "আমরা সিনেমা দেখতেই যাচ্ছি। আমি তো টিকিট করে এনেছি সকাল বেলা। আপনি আসবেন তা তো জানতাম না, জানলে আপনার জন্যেও একটি করে আনতাম।"

সুবিমল আর মল্লিকা একটু হাসলো।

ওরা চলে গেল ওদের গন্তব্য সিনেমা-হলের দিকে।

আমি একা-একা চলে এলাম চৌরঙ্গিতে, লাইট হাউসে এসে একটি টিকিট কিনে একলা বসে একটি সিনেমা দেখলাম, উপভোগ করলাম না একটুও, তারপর সিনেমা শেষ হতে লাইট হাউস বার্-এ চুপ করে বসে রইলাম এক গ্লাস অরেঞ্জ নিয়ে।

"চায়না টাউনে কাল সন্ধ্যা আপনার ভালোই কেটেছে বলুন,"—মল্লিকার কথাগুলো ফিরে এলো আমার মনে।

হাসি পেলো একটুখানি।—ভালো? না, একটুও নয়। রেবার পাশে বসে চুপচাপ সিনেমা দেখা অনেক ভালো। দিলীপের বন্ধুরা সবাই কি রকম যেন, বেশ হৈ হৈ করে, গল্পও করলো, কিন্তু তারই মাঝে যেন উঁকি মারছিলো একটু ঈর্ষা, একটু মন-কষাকষি, একটা চাপা বিরোধ এর ওর তার মধ্যে। মনে হয়েছিলো যেন আরো অনেক কিছু ভেতরের ব্যাপার আছে যা আমি জানি না। একটু ভালো লাগছিলো না ওদের মধ্যে।

মনে পড়লো, দিলীপ বলছিলো তং-আৎ-ছু'র উপনিবেশের গল্প, কে-সুং-তাও আর জু-শা'র করুণ রোমান্সের কাহিনী।

গল্প যখন শেষ হলো ঘরখানি তখন নিস্তব্ধ। দূর থেকে পুরোনো গ্রামোফোনে ভেসে আসছে চীনে অপেরার গান। আমার মনে ভাসছিলো গঙ্গার পাড়ে আৎ-ছু'র সমাধির একখানি মনগড়া ছবি

হঠাৎ কানে এলো ফেং চে-শিয়াং-এর প্রশ্ন, "আজ রাত্তিরে আমরা সবাই কি করছি? আমাদের প্রোগ্রাম কি?"

হেনরি লরেন্স উত্তর দিলো, "ঠিক করো কি করা যায়, আমি যে কোনো কিছুতেই রাজী।"

"কিছু খাবারের অর্ডার দাও", দিলীপ বললো, "আমি এক বোতল হুইস্কি ষ্ট্যাণ্ড করছি। আর এখানে বসেই গল্পসল্প করা যাবে।"

"না, না, এখানে নয়, বেরোনো যাক," বললো যোগীন্দর সিং।

"কোথায় যাবে?" জিজ্ঞেস করলো হাসিম সুলেমান।

"অর্ডন্যান্স ক্লাবে যাবে?"

"না।"

"প্রিন্সেস্-এ গিয়ে ক্যাবারে দেখবে?"

"না। না। ও সব নয়। আমরা নিজেরা মিলে হৈ-হৈ করবো।"

দু'একজন অন্য কয়েকটা মতলব দিলো। কেউ রাজী হোলো না।

তখন ওয়ং সুং-চাং বললো, "চলো সবাই মিলে যাই গোল্ডেন স্লিপার'এ।"

"তার আগে কোথাও খেয়ে নিতে হবে," মনে করিয়ে দিলো টিং-লিং।

"এখানেই কোথাও খেয়ে নেবো," বললো জয়প্রকাশ ত্রিবেদী, "আমার চীনে খাবার খুব ভালো লাগে।"

"তা হলে তোমরা আজ রাত্রে বেরোবেই।" দিলীপ জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ। কেন, তোমার বেরোতে ইচ্ছে করছে না?" বললো চিয়েন-চাং।

"না, তা নয়। তাহলে আমায় আবার বাড়ি ফিরে পোষাক বদলে আসতে হয়।"
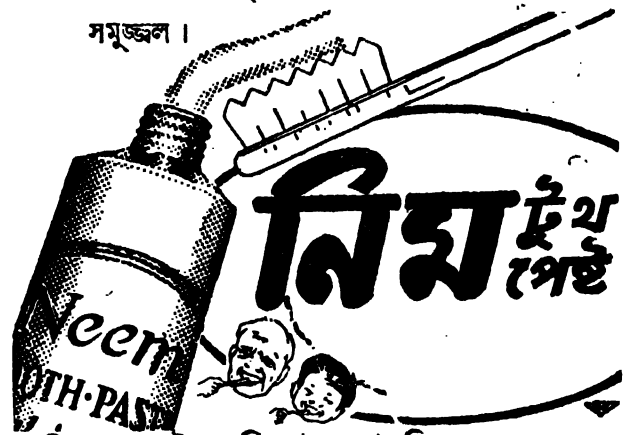
…নি' কোথাও। তারপর আমরা চলে যাই গোল্ডেন স্লিপার'এ, বাড়ি ফিরে জামা কাপড় বদলে সেখানে এসে যোগ দিও …দের সঙ্গে।"

"রঞ্জন কি করবে?" দিলীপ ফিরে তাকালো আমার দিকে।

"আমি এখান থেকে সোজা বাড়ি ফিরবো," আমি উত্তর দিলাম।

"বাড়ি ফিরবে? শনিবার সন্ধ্যেবেলা?" চিয়েন-চাং তার ছোটো …টো চোখ দুটো যতোটা সম্ভব আয়ত করে জিজ্ঞেস করলো।

টিং-লিং একটু হেসে বললো, "আমাদের সঙ্গ বোধ হয় ওর ভালো …গছে না?"

"না, না, তা' নয়," আমি একটু বিব্রত বোধ করলাম, "আমি বাড়িতে ব'লে আসিনি—"

"বলে আসোনি?" যোগীন্দার অবাক হয়ে আমার দিকে …কালো, "বাড়িতে আবার বলে আসতে হয় না কি? ইয়াং ম্যান, …ছেলার মানুষ, যতো রাত করে খুশি বাড়ি ফিরবে।"

"না, আমায় বাড়ি ফিরতে হবে।"

"যদি পোশাক বদলাতে বাড়ি ফিরতে চান, আমি বলি কি তার …কার নেই," সুং-চাং বললো, "আপনার শুধু দরকার একটি টাই। না হয় আমি দিচ্ছি—"

"এখনি বাড়ি ফিরবেন কেন?" মিনি ওয়াং বললো, "আগে খেয়ে …ই কোথাও, তারপর সত্যিই যদি বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে, …মাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ গোল্ডেন স্লিপার'এ বসে না' হয় একটু …গাল করে উঠে পড়বেন।"

"দেখুন, আপনারা সবাই বন্ধু। আমি বাইরের লোক, আজ্ঞ …থম এসেছি—"

"ও, এই!" বললো ফেং চেং-শিয়াং।—তারপর সবার কী হাসি!

"রঞ্জন কি বলছে শোনো। সে একজন বাইরের লোক। …হাঃ হাঃ—"

"মিষ্টার ওয়াং, আমি শুধু বলছিলাম—"

"না, না, মিষ্টার ওয়াং নয়, আমার বন্ধুরা আমায় সুং-চাং বলে …কে।"

"আমার বন্ধুরা আমায় ডাকে চেং-শিয়াং—"

"—আমায় যোগীন্দার।"

"—আমায় হাশিম।"

"আমায় টিং-লিং—"

"আমায় তুমি জয়প্রকাশ বলবে।"

"আমি সবারই কাছে মিনি।"

"এ্যাণ্ড, অফ্ কোর্স, আমি চিয়েন-চাং—"

"আর তোমার নাম, যদি আমরা ভুল না শুনে থাকি, নিশ্চয়ই …ন। নাও, রঞ্জন ডার্লিং, কি বলতে চাও বলো।"

আমি একটু চুপ করে রইলাম। বেশ ভালো লাগলো। …রপর আস্তে আস্তে বললাম, "বলছিলাম, একটি টাই দরকার। …ল রঙের উপর একটা কিছু, যা এই স্যুটের সঙ্গে যায়।"

সবাই মনের আনন্দে টেবিল চাপড়ালো।

সুং-চাং বললো "এসো আমার সঙ্গে। তোমার পছন্দ মতো বেছে …বে।"

"ইতিমধ্যে আমরা কি করছি," জিজ্ঞেস করলো জয়প্রকাশ।

"জেনী আর ওর বন্ধুদের জন্মে অপেক্ষা করছি। ওদের ফেলে নিশ্চয়ই যাবো না," বললো টিং-লিং।

"ওদের এতক্ষণে এসে পড়া উচিত," দিলীপ ঘড়ির দিকে তাকালো, পৌনে আটটা এখন।"

"এসো রঞ্জন," সুং-চাং আমার দিকে তাকিয়ে বললো। আমি চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু যাওয়া হোলো না। জুতোর শব্দ এলো বাইরে থেকে। সবাই দরজার দিকে ফিরে তাকালো।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো একটি মেয়ে। চৈনিক যুবতী, নিটোল শরীর, পরনে পাশ্চাত্য পোষাক, বড়ো বড়ো লাল কালো গোল গোল ফুটকি-দেওয়া হাল্কা হলদে সুতির গাউন। তার পেছন পেছন এক জন শ্যামলা রং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে আর একটি বার্মিজ মেয়ে। বার্মিজ মেয়েটির পায়ে ভেলভেটের স্যাণ্ডাল, পরনে সোনালী জরির কাজ করা নীল সিল্কের 'লোন্‌জি', গায়ে শুভ্র অর্গাণ্ডির 'এন্‌জ্যি'। তাদের সঙ্গে আরেকটি ছেলে, তিরিশের কাছাকাছি বয়েস, হাল্কা বাদামী স্যুটে বেশ টিপটপ দেখতে।

"এই যে এসো, তোমাদের জন্যে বসে আছি," বললো দিলীপ।

"আমরা একটি চমৎকার প্রোগ্রাম ঠিক করে নিয়েছি। সবাই যাচ্ছি গোল্ডেন স্লিপার'এ," বললো ফেং চেং-শিয়াং।

"দাঁড়াও এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই," বললো ওয়াং সুং-চাং, "এ আমাদের নতুন বন্ধু রঞ্জন।…এ আমার বোন জেনী, আর এ জেনীর বন্ধু মাবেল,—আমাদের আরেক জন বন্ধু মঙ-জ্যি,—ওর বোন মা-খিন-চ্যি।"

ওদের কিন্তু গম্ভীর মনে হোলো একটুখানি।

জেনী বললো, "তোমরা যদি প্রোগ্রাম করে থাকো, ভালোই। তবে আমাকে বাদ দাও।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো দিলীপ।

"আমার মন ভালো নেই। আমি আজ আর বেরোবো না।"

"কেন? কি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো জেনীর বোন মিনি ওয়াং।

"খারাপ খবর আছে।"

"কি?"

"আহ-কিমকে একলা পেয়ে ওরা খুব মার দিয়েছে।"

ওরা?—আমি ভাবলাম—ওরা কারা? দেখলাম, সবাই হঠাৎ চুপ মেরে গেল। টিং-লিং নির্বিকার, কিন্তু বাঁকা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠলো ফেং-চেং-শিয়াং-এর মুখে।

বললো, "আহ-কিম কম্যুনিষ্ট। ওরা মাঝে মাঝে এক-আধটু মারধোর খায়। আমি কম্যুনিষ্ট নই। আমি জীবন উপভোগ করতে ভালোবাসি। সুতরাং আমি আমার প্রোগ্রাম বাতিল করবো না।"

মিনি ওয়াং তাকালো ফেং চেং-শিয়াং'এর দিকে। একটুখানি বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো সেই চোখে।

"কাম, কাম, এখানে কোনো পলিটিক্স নয়", একটু যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলো ওয়াং সুং-চাং, "আহ-কিম'এর খবর তোমায় কে দিলো, জেনী?"

"দাই-সাও'এর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হোলো। সেই বললে।"

"ম… খুব বেশী জখম হয়েছে?"

"দাই-সাও বললে মাথা ফেটে গেছে। আর বুকেও লেগেছে র। দাই-কো এখানে নেই। তাই দাই-সাও নিজেই ডাক্তার কতে গিয়েছিলো।"

"আহ-তং এখানে নেই? কোথায় গেছে?"

"ও গ্যাছে টাংরা। কাল সকালে ফিরবার কথা। আমি বছি আমি নিজেই ট্যাংরায় গিয়ে ওকে খবর দেবো।"

"তুমি একা যাবে?" দিলীপ বললো, "চলো, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।"

ওয়াং সুং-চাং একটু তাকিয়ে দেখলো দিলীপের দিকে। একটু ন বিরূপ সেই চাউনী। তারপর মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, "জেনীর যাওও না যাওয়াই ভালো। আমি বরং কুয়োং-কান্‌'কে পাঠিয়ে চ্ছি।"

"না, আমি নিজেই যাবো", জেনী উত্তর দিলো, "চলো দিলীপ।"

"তোমরা এখন টাংরা যাচ্ছো", মিনি ওয়াং জিজ্ঞেস করলো। র সংযত তার গলা, কিন্তু তবু যেন বিষাদ-করুণ।

"না, আগে একবার দাই-কো'র বাড়ি যাচ্ছি। আহ-কিমকে কবার দেখে আসি।"

"চলো, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে", মিনি বললো।

"তুমিও ট্যাংরায় যাবে?" চিয়েন চাং জিজ্ঞেস করলো।

"না, আমি যাবো শুধু দাই-কো'র ওখানে।"

"চলো, দেরী করে লাভ নেই," জেনী বললো। "দাঁড়াও একটু" দিলীপ বললো, "রঞ্জন, একটু শোন।" আমাকে ডেকে বাইরে নিয়ে ল সে। "ওরে দশটা টাকা হবে তোর কাছে? দে তো! কাল কালে গিয়ে তোকে দিয়ে আসবো।"

"কি হয়েছে দিলীপ দা'?"

"সে অনেক ব্যাপার। তুই বুঝবি না। আহ-তং এর ভাই আহ-কিম'কে ওদের বিপক্ষদলের লোকেরা মেরেছে। ওরা ওয়াং রিবারের খুব বন্ধু। ওদের জানাশোনা প্রায় তিন চার পুরুষের। তাই জেনী মিনি একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।"

"দাই-কো দাই-সাও এরা কারা?"

"ও," হাসলো দিলীপ, "আহ-তং কে এরা বড়ো ভায়ের মত মানে, তাই ওকে ডাকে দাই-কো, মানে বড়দা। আর ওর বৌকে ডাকে দাই-সাও, অর্থাৎ বড় বৌদি। আমার সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না। তুই অন্যদের সঙ্গে গোল্ডেন শ্লিপারে যা।"

"না, আমি এখান থেকে সোজা বাড়ি ফিরবো।" জেনী ওয়াং, মিনি ওয়াং আর দিলীপ চলে গেল।

ফেং-চেং-শিয়াং বললো, "আমরা আর এখানে বসে থেকে কি করবো। চলো বেরিয়ে পড়ি।"

হাশিম উত্তর দিলো, "আমায় কিন্তু মাপ করতে হবে। আমার এইমাত্র মনে পড়লো যে আমি অন্যেক জনকে কথা দিয়েছিলাম তার ওখানে গিয়ে ডিনার খাবো।"

"তোমার যা অভিরুচি," বললে সুং চাং, "এসো রঞ্জন, তোমার টাই বেছে নাও।"

"আমার মনে হয় না আমার আর টাই দরকার হবে," আমি বললাম।

"কেন তোমারও কি মনে পড়লো নাকি যে তুমি কারো সঙ্গে ডিনার খাবে বলে কথা দিয়েছো?" জিজ্ঞেস করলো ফেং-চেং-শিয়াং।

আমার কান একটু লাল হয়ে উঠলো। তবু হেসে বললাম, "না, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না।"

"বেশ, আমরা জোর করবো না," হাত বাড়িয়ে দিলো সুং-চাং, "আজ তোমায় নিশ্চয়ই মিস্ করবো, তবে আশা করি তুমি শীগগিরই একদিন আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।"

হাশিমের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে।

বাইরে বেরিয়ে হাশিম বললো, "দেখ, ওদের এড়ানোর জন্যে আমি অন্যত্র ডিনার খাওয়ার কথাটা বললাম। চলো, তুমি আর আমি মিলে কোথাও বসে পরটা কাবাব খেয়ে নিই।"

"না," আমি উত্তর দিলাম, "আমার শরীরটা সত্যিই ভালো নেই।"

হাশিমের সঙ্গে একটু শর্টকাট করে বেরিয়ে এসে পড়লাম বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে।

লাইট-হাউস বার'এ বসে অরেঞ্জ'এর গেলাসে চুমুক দিতে দিতে এসব কথাই ভাবছিলাম। আশ্চর্য সব বন্ধু দিলীপের, এক মিনিটের মধ্যেই সবাই সবার বন্ধু, প্রত্যেকে প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকছে, তারপর আচমকা কী যেন হয়ে গেল, এ ওর দিকে ধারালো চাউনী হানলো, একজন গম্ভীর হয়ে গেল, আরেক

জন রুক্ষ হয়ে উঠলো, অন্য একজন মিথ্যে ডিনারের নাম করে সরে পড়লো, অন্য সবাই চুপ করে রইলো।

মল্লিকা যদি জানতো, সে কি বলতো, 'চায়না টাউনে কাল সন্ধ্যা আপনার ভালোই কেটেছে বলুন ?'

না, একটুও ভালো কাটেনি। তার চাইতে রেবা চৌধুরীর পাশে বসে সিনেমা দেখাটা অনেক সুখের।

রেবা! বেশ মিষ্টি মেয়েটি। আলাপ হয়েছিলো সুবিমলের বাড়িতেই। মল্লিকাই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো।—রঞ্জন বাবু, এ আমার মামাতো বোন, রেবা! রেবা চা করে আনলো, গান গেয়ে শোনালো। হষ্টেলে থাকতো সে।

সন্ধ্যে হয়ে আসতে তাকে হষ্টেলে পৌঁছে দিতে হোলো আমায়——কারণ সুবিমল বললে, তার কি একটা কাজ আছে, সে বেরোতে পারবে না।

ট্রামে পাশাপাশি বসে ওকে হষ্টেলে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম। পাশাপাশি বসে নানারকম গল্প—সিনেমার, সাহিত্যের, বিশ্বরাজনীতির, কলেজের মেয়েদের, ছেলেদের।

তারপর আরেক দিন সুবিমলের বাড়ি নেমন্তন্ন। এলোমেলো গল্প। ফুরোতে চায় না। একঘেয়ে লাগে না। ভালো লাগে, নতুন মনে হয়, এলো চুল থেকে মিষ্টি তেলের গন্ধ ভেসে আসে, কাজল চোখের চাউনি তোলপাড় করে তোলে মনকে!

কাল সিনেমার অন্ধকারে পাশে বসে হয়তো একটু কাঁধে কাঁধ ঠেকতো, হয়তো হাতে হাত রাখতো সে, দিদিকে, জামাইবাবুকে লুকিয়ে। ওরা টের পেতো হয়তো, টের পেয়েও টের না পাওয়ার ভাণ করতো। হয়তো আজ বিকেলে রেবাকে একলা নিয়েই বেরোনো যেতো, হয়তো একলা বসা যেতো কোনো নিরালা রেস্তরাঁয়।

হয়তো আজ কোনো কথা আসতো না কারো মুখে। হয়তো দুজনেই আনমনা।

"কী এত ভাবছেন," সে হয়তো একবার জিজ্ঞেস করতো।

শুনতো আমি বলছি, "তোমার কথাই ভাবছি রেবা।"

একটু লাল হয়ে উঠতো সে। চোখ নিচু করতো।

আমি হয়তো একটু ভেবে নিতাম, আস্তে আস্তে বলতাম, "আচ্ছা রেবা, আমি যদি আজ তোমায় বলি—

"না, না, বলবেন না," কেঁপে উঠতো রেবার গলা, "এখন না, আরো কিছু দিন যাক।"

আর হতভাগা দিলীপ? এরকম একটি সম্ভাবনার সূত্রপাতেই আমার সিনেমার টিকিটখানি আচমকা বেচে দিলে আরেক জনকে। আর আমি যেন আরেকটি সিনেমা দেখে এলাম চায়না টাউনে, যা দেখলে মাথা ধরে যায়।

আর ওদের ছায়াও মাড়াচ্ছি না, মনে মনে ভাবলাম। তারপর একটি সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

"হালো রঞ্জন!"

গলা শুনে চমকে উঠলাম। খুব চেনা গলা।

যোগীন্দার সিং এসে একটি চেয়ার টেনে বসলো। "তুমি এখানে একা বসে আছো? ভালোই হোলো। বসে গল্প করা যাবে। ভাবছিলাম একলা বসে কি করবো। বিয়ার খাবে? খাবে না? কেন? কি খাবে? আচ্ছা আর একটা, অরেঞ্জ খাও। বেয়ারা—!"

তারপর বললো, "কাল তুমি চলে এসে ভালোই করেছো। এমন কিছু জমলো না। দিলীপ তো জেনী আর মিনিকে নিয়ে চলে গেল। তারপর দেখি হেনরিরও আর উৎসাহ নেই। সে চায় মা-মিন-চিকে নিয়ে বেরোতে। নতুন প্রেমে পড়েছে। খুব স্বাভাবিক। আমরা কিছু বললাম না। সে, মা-মিন-চি, ম-ওং-জ্রি আর ম্যাবেল বেরিয়ে গেল। ম্যাবেলের সঙ্গেও বেশ ভাব হোয়েছে ম-ওং-জ্রির। তখন চেং-শিয়াং বললে সে প্রিন্সেসএ গিয়ে ক্যাবারে দেখবে। সুং-চাং তার সঙ্গে যেতে চাইলো, কারণ চেং-শিয়াং এর বোন সুং-চাংকে তার খুব চোখে লেগেছে। চিয়েন-চাং বললে সে আর কোথাও যাবে না, মেট্রোতে গিয়ে একটি সিনেমা দেখবে। তখন আমি আর জয়প্রকাশ কি করি? ফ্যারনানি থেকে দু'জন চেনা মেয়েকে পিক্-আপ করে ব্রিষ্টলে গিয়ে বসলাম। বুঝলে রঞ্জন, শনিবার রাত্তিরে ষ্ট্যাগ-পার্টি আমার বরদাস্ত হয় না। রোববারটা আমি একা-একা চুপচাপ কাটাই। যাই বলো, কলকাতায় লাইফ নেই। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে এ দেশ ছেড়ে নিউইয়র্কে গিয়ে সেটেল ডাউন করতে।"

যোগীন্দার সিং-এর আলোচনার ধরণ আমার ভালো লাগলো না। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, ওই আহ-কিম লোকটি কে?"

"আহ-কিম?" যোগীন্দার বিয়ারের গেলাসে চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকালো। "আহ-কিম বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে একটি লণ্ড্রি চালায়। তাছাড়া আরো অন্যান্য কি সব করে। ঠিক জানি না। তবে ওদের কি একটা এসোসিয়েশান আছে। একটা কাগজ বার করে ওরা। কেউ কেউ বলে আহ-কিম নাকি কম্যুনিষ্ট। হতে পারে। আমি মাথা ঘামাই না। হু কেয়ারস? পলিটিক্স্এ আমার একটুও ইণ্টারেস্ট নেই। আমি বিজনেস করি, আমার যে টাকা দরকার, সেটা খেটে রোজগার করি, আরো বেশী রোজগার করবো বলে আশা করি, খাই দাই ফূর্তি করি। আহ-কিমকে আমি তেমন ভালো করে চিনি না। আমি চিনি ওর বড়ো ভাই আহতং'কে।"

"কে এই আহ-তং?"

"আহ-তং জুতোওয়ালা, ওর একটি জুতোর দোকান আছে চিৎপুর রোডে। আমি তো জুতোর অর্ডার সাপ্লাই করি। তাই ওর কাছ থেকে জুতো কিনতে হয় আমাকে। চমৎকার লোক। খুব সস্তায় জুতো দেয়। এই যে জুতো-জোড়া পরে আছি, এর দাম কতো বলো তো?"

"ম—আটাশ টাকা?"

পাগল হয়েছো? আমি যোগীন্দার সিং পরবো আটাশ টাকা দামের সস্তা জুতো? আমি ঠিক সেই জুতো পরবো যার দাম পঁয়তাল্লিশ টাকা বললে লোকে একটুও অবিশ্বাস করবে না, অথচ যে জুতো আহ-তং আমায় ষোলো টাকা দিয়ে করে দেবে। তুমি যে জুতো পরে আছো, সেটা আহ-কিম'এর কাছে পাওয়া যাবে আট-ন' টাকায়। এসো আমার সঙ্গে একদিন। আমি দশ টাকার মধ্যে তোমায় খুব ভালো জুতো কিনিয়ে দেবো। তবে আর, কাউকে বলতে পারবে না।"

আমি একটু হাসলাম। তারপর বললাম, "জানো, যোগীন্দার তোমার চাইনিজ বন্ধুরা খুব এ্যাংলিসাইজড্ বলে মনে হোলো। আমার কিন্তু চায়না টাউনের চীনেদের সম্বন্ধে অন্য রকম ধারণা ছিলো।"

যোগীন্দার উত্তর দিলো, "চায়না টাউনে একদিন সন্ধ্যা কাটিয়ে ওদের সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারবে না রঞ্জন! চেং-শিয়াং, হুং-লিং'এর মতন কিছু এ্যাংলিসাইজড্ চীনে আছে বটে, কিন্তু সে খুব কম। প্রায় সব চীনাই চীন দেশের চীনাদের মতো, সে কলকাতায় হোক, সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে হোক, রেঙ্গুনে হোক, সিঙ্গাপুরে হোক—ওরা একটুও বদলায় না। কিছু কিছু আছে জেনী, মিনি, চিয়েন চাং, আহ্‌-কিম এদের মতো, অন্য জাতের বন্ধুর সঙ্গে মেশে, স্যুট পরে, ফ্রক-গাউন পরে, ইংরেজি বলে, নাচে,—কিন্তু ওরাও মনে মনে খাঁটি চাইনীজ। এই দেখ না, আহ্‌-কিম'এর মাথা ফাটলো। সে কথা শুনে জেনী, মিনি এরা এলো আমাদের সঙ্গে।"

"আচ্ছা, সুং-চাং লোকটি কি রকম?"

"কেন?"

"বাইরে ও-রকম একটি নোংরা ছোটো রেস্তরাঁ, ভেতরে এত ফিটফাট, জমকালো?"

"তুমি বুড়ো ওয়াংকে দেখেছো?"

"না।"

একটু ভাবলো যোগীন্দার। তার পর বললো, "দেখ, আমি ওদের সম্বন্ধে বেশী কিছু জানি না। জানতে চাইও না। আমরা হৈ-হৈ করে ফুর্তি করে বেড়াই, ব্যস, ওই পর্যন্ত। ভেতরে ভেতরে কে কি করে, কে কি রকম লোক, কে মাথা ঘামায়? দিলীপকে জিজ্ঞেস কোরো, সে বলতে পারবে। সে ওদের খুব অন্তরঙ্গ, অনেক কথাই জানে।"

"অন্তরঙ্গ?"

"হাঁা। তুমি জানো না? সে জেনী ওয়াংকে বিয়ে করতে চায়।"

"এঁ্যা?"—আমার চোখ কপালে উঠলো।

যোগীন্দার হাসলো। বললো, "দেখ, আমি যদি তুমি হতাম, আমি দিলীপের সঙ্গে চায়না টাউনে যেতাম না। সুং-চাং দিলীপকে খুব পছন্দ করে না, সে চায় না যে সে জেনীর সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ হোক। আর সুং-চাং'এর সঙ্গে মনোমালিন্য থাকাটা খুব নিরাপদ নয়। আর দেখ, দিলীপ তোমায় ওখানে কেন নিয়ে গেছে জানি না। যদি তোমার সঙ্গে মিনির ভাব করিয়ে দিতে চায়, আমি বন্ধু হিসেবে পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি এড়িয়ে চলবে। কাল তোমার গিয়ে উপস্থিত হওয়াটা চেং-শিয়াং'এর খুব ভালো লাগে নি। সে অন্য কারো সঙ্গে মিনির ঘনিষ্ঠ হওয়াটা ভালো চোখে দেখে না। আর চেং-শিয়াং এর মতো লোকের কাছ থেকে এক মাইল তফাতে থাকাটাই হোলো বুদ্ধিমানের কাজ। তবে হাঁা, এরা তো খুব ভদ্র, তোমাকে পছন্দ না করাটাও এরা খুব ভদ্রভাবে করবে।"

"মানে?"

"মানে, এই ধরো কেউ যদি তোমায় ছুরি মারতে চায়, তাও খুব ভদ্র ভাবে মারবে।"

আমি বললাম, "দেখ যোগীন্দার, আমি ওদের মধ্যে আর যাচ্ছিও না, ওদের সম্বন্ধে কিছু জানবার আমার আগ্রহও নেই। এবার অন্য কিছু আলোচনা করা যাক।"

যোগীন্দার হাসলো, "না, ভাই রঞ্জন, চীনারা এমনি লোক ভালো। সবাই চেং-শিয়াং নয়। তোমরা ডিটেকটিভ গল্পে যে ছবি পাও চায়না টাউনের, আসল চায়না টাউন কিন্তু তা নয়। বেশীর ভাগ লোকই সাধারণ অবস্থার লোক, খাটে, রোজগার করে, খায়-দায়, বিয়ে করে, সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে, রোজকার করে আর খাটে, খাটে আর রোজগার করে। ব্যস। এক সময় তো বেশ ছিলো এরা। চীন-জাপানের যুদ্ধের সময় কোনো গোলমাল ছিলো না এদের মধ্যে। এখন, সম্প্রতি যে অন্তর্বিপ্লব চলছে চীনে, তার দরুণ এখানে এদের মধ্যে খুব গোলমাল। কি জানি, আমি ব্যাপারটা খুব ভালো বুঝি না। আমরা ওদের সঙ্গে কতোটুকুই বা মিশি, কতটুকুই বা জানি?"

"হাঁা, যা জানি তা শুধু মনগড়া ডিটেক্টিভ গল্প থেকে।"

গেলাসে আরেক চুমুক দিয়ে যোগীন্দার বললো, "তাও যে খুব ভুল, তা' নয়। ডাকাতি, খুন, স্মাগলার সে সবও আছে। জুয়ার আড্ডা আছে, ব্রথেল আছে, ওপিয়াম ডেন আছে। আমি কিছু কিছু দেখেছি। তুমি দেখতে চাও?"

"না,"—আমি উত্তর দিলাম।

"যদি কোনো কিছু দেখতে চাও, তোমার বন্ধু দিলীপকে বোলো, সে চায়না টাউনকে আমাদের চাইতেও ভালো চেনে। সব একবার ঘুরে-ফিরে দেখতে পারো। মন্দ লাগবে না। তুমি তো আশ্চর্য লোক হে! আমি সাধছি তোমায় দেখতে, তুমি রাজী নও। অথচ অনেকেই শুনলে লাফিয়ে ওঠে জানো? তবে হাঁা। ওয়ান হাজ টু বি কেয়ারফুল। একবার আমার এক বন্ধুর যা মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিলো!" বলতে বলতে হেসে উঠল যোগীন্দার।

হাসলো, খুব হাসলো সে। পাশের টেবিলে আইসক্রীম খাচ্ছিলো একটি বাচ্চা ছেলে, চমকে উঠে ফিরে তাকালো।

যোগীন্দার বললো, "সে-ও একজন বাঙালী। নাম লাহিড়ী। পুরো নাম বলবো না। এটুকু জেনে রাখো যে, সে কলকাতার কোনো এক খবরের কাগজের সাব-এডিটার। শুনবে তার গল্প?"

আমি একটি সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

যোগীন্দার সিং সুরু করলো তার বাঙালী বন্ধু সাব-এডিটার লাহিড়ীর চায়না টাউনের অভিজ্ঞতার গল্প। [ক্রমশঃ।

মৎস্যাধারে 'ট্রপিক্যাল ফিশ'

'ট্রপিক্যাল ফিশ' বা ট্রপিক্যাল মাছ বলতে সাধারণতঃ গরম দেশের মাছকে বুঝায়। কিন্তু আসলে এই মাছ দেশ-বিদেশের মাছ। এগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য—এরা রঙ-বেরঙের হয় এবং আকারে খুব বড় হয় না। আজকাল অনেক গৃহে মৎস্যাধার বা 'একুইরিয়ামে' এদের রেখে সযত্নে পোষা হয়। এযুগে মানুষের রকমারী 'হবি' বা সৌখিনতার ভেতর এইটিও নিঃসন্দেহে একটি।

নদীর জলেই 'ট্রপিক্যাল' মাছের সন্ধান পাওয়া যায় বেশীরকম। তবে সমুদ্রের 'লবণাক্ত' জলেও যে এ শ্রেণীর মাছ দেখা যায় না, এমন নহে। মার্কিণ দেশের নদী ও দরিয়াগুলোতে বিচিত্রধরণের 'ট্রপিক্যাল' মাছ রয়েছে এবং সে সব মাছ যে কোন দেশের মৎস্য-বিলাসীর কাছেই অতি আদরণীয়। মহাচীন, শ্যাম, ইষ্ট ইণ্ডিজ—এসকল দেশের জলেও 'ট্রপিক্যাল ফিশ' জন্মে থাকে প্রচুর। এই সঙ্গেই নাম করতে হয় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের স্রোতস্বতী-গুলোরও—যেখানে খোঁজ করলেই দেখতে পাওয়া যায় কত রকমারী 'ট্রপিক্যাল' মাছ।

'একুইরিয়াম' বা বৈজ্ঞানিক মৎস্যাধারে 'ট্রপিক্যাল' মাছ পোষার যে আধুনিক ব্যবস্থা, সেটি সত্যি চমৎকার। এ মৎস্যাধারগুলো গৃহ-শোভা তো বটেই, পরন্তু সাধারণ মানুষের কাছেও উহাদের একটা বিশেষ আকর্ষণ বিদ্যমান। চোখের অন্তরালে নদী বা সমুদ্রের জলে প্রকৃতির বৈচিত্র্য নিয়ে যে মাছ ঘুরে বেড়ায়, ঘরের মধ্যে সেই মাছকেই সর্বক্ষণ সঞ্চরণশীল ও ক্রীড়ারত দেখলে কার না মনে আনন্দ জাগে! তাই 'ট্রপিক্যাল' মাছ পোষার এ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করছে দিনদিনই।

ঘরে এনেও ট্রপিক্যাল মাছগুলোকে যাতে দীর্ঘ দিন বাঁচিয়ে রাখা যায়, সেজন্যে মৎস্যাধারগুলো বিশেষ নিয়মাধীন তৈরী করতে হয়। মাছের বাঁচবার দিকে লক্ষ্য রেখে নির্দ্দিষ্ট প্রতিটি মৎস্যাধার বা ট্যাঙ্কেই এই কয়টি ব্যবস্থা অবশ্য চাই—প্রচুর অক্সিজেন, পর্য্যাপ্ত আলো, উপযুক্ত তাপ এবং যথোচিত খাদ্য। মৎস্যাধারগুলোর আকার খুব ছোট হবে না, বরং যতটা বড় করে গড়া যায়, ততই ভাল। সাধারণতঃ ২৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, ১২ ইঞ্চি প্রস্থ এবং ১২ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট 'একুইরিয়াম' বা মৎস্যাধারই 'ট্রপিক্যাল' মাছের পক্ষে উপযোগী। আধারগুলোতে ব্যবহারযোগ্য জল নদীর হলেই ব্যবস্থা, গাছ-গাছরা, বালি, পাথরকুচি সবই থাকতে হবে। এমন ভাবে সব জিনিস সাজিয়ে রাখতে হবে, যাতে ট্যাঙ্কের ভিতর রক্ষিত মাছগুলোর চলাচলে অসুবিধার কারণ না হয়, বরং আনন্দে খেলে বেড়াতে পারে তারা অবিরাম।

ইকৃথিওলোজিষ্ট বা মৎস্য-বিজ্ঞানীরা মৎস্যাধার ও 'ট্রপিক্যাল' মাছের প্রসঙ্গে অনেক গবেষণা করেছেন। তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত 'একুইরিয়াম'গুলোর ভিতরকার তাপমাত্রা মোটামুটি ৭৫ ডিগ্রী রাখবার চেষ্টা করতে হবে সব সময় এবং এইটি মাছকে বাঁচিয়ে রাখবার তাগিদ থেকেই। মোটের উপর কোন অবস্থাতেই এই তাপ ৭০ ডিগ্রীর নীচে নেমে গেলে চলবে না। ঘরের ঠিক কোন যায়গাটিতে মৎস্যাধার রক্ষা শ্রেয়:—এ সম্পর্কও কতকগুলো নির্দ্দেশ রয়েছে। যেমন জানালার একেবারে কাছাকাছি না রেখে এমন দূরে মৎস্যাধারটি স্থাপন করতে হবে—সরাসরি সূর্যের তাপ যাতে তার উপর না যায়। আর জানালার ধারে রাখতেই হলে মৎস্যাধারের যে ধারটি জানালামুখী সেইটি সেঁটে দিতে হবে সবুজ টিস্যু কাগজে।

'একুইরিয়াম' বা মাছের ট্যাঙ্কগুলো মাছ দিয়ে যেন ভর্ত্তি না হয়ে যায় কখনই। জল থেকেই অক্সিজেন পেতে হবে মাছকে—সেজন্যেই এইটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার দাবী। অপর দিকে, হাত দিয়ে 'ট্রপিক্যাল' মাছ স্পর্শ করা কখনও উচিত নহে। এর জন্যে বিশেষ ধরণের জাল রয়েছে—প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে সেগুলোর ব্যবহারই সমীচীন। ট্যাঙ্কের জল যখন তখন পাল্টাতে যাওয়াও ঠিক নয়। আসল কথা মৎস্যাধারে যে যে মাছ থাকবে, এদের যতটা সম্ভব উপদ্রব না করলেই ভাল। এতৎসংক্রান্ত বিজ্ঞানীদেরই দাবী—সাধারণ অবস্থায় বৈজ্ঞানিক 'একুইরিয়ামে'র জল পরিবর্ত্তনের তো প্রশ্নই উঠে না, পরন্তু জলটা যতই পুরানো হবে, 'ট্রপিক্যাল' মাছের বাঁচবার পক্ষে ততই হবে সহায়ক। নবাবী আমলে ফোয়ারা ইত্যাদিতে যে লাল নীল মাছ পোষা হ'তো ওগুলোর জন্যে ব্যবস্থা ছিল অবশ্যি অনুরূপ। অর্থাৎ সেই জল কিছু দিন পর পর না পালটালে মাছের পক্ষে বেঁচে থাকা একেবারেই চলতো না।

আলোচ্য মৎস্যাধারগুলোতে বিশেষ ধরণের কিছু ঘাস বা গাছ-গাছরা না থাকলেই নয়। মৎস্যাধারে রক্ষিত মাছের বাঁচবার জন্যেই এইটি অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজন। তা ছাড়া, এতে মৎস্যাধারের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় এবং জলটাও সহসা নষ্ট হতে পারে না। মাছের চলাফেরার অবাধ সুযোগ রেখে যতগুলো গাছ সম্ভব ট্যাঙ্কে রোপণ চলতে পারে। ট্যাঙ্কে ব্যবহারের পক্ষে 'ভ্যালিসেরিয়া স্পিরালি' গাছগুলো বিশেষ উপযোগী—আমাদের দেশে চলতি ভাষায় যেগুলোকে বলা হয় পাটা ঘাস।

মৎস্যাধারে যে সকল মাছ রাখা হবে, সেগুলোকে সুস্থ রাখার জন্যে আরও কয়েকটি ব্যবস্থা অনুসরণ দরকার। এর ভিতর 'একুইরিয়াম'গুলোর তাপমানের কথাটাই বিশেষ ভাবে বলতে হয়। হঠাৎ তাপ পরিবর্ত্তিত হলে 'ট্রপিক্যাল' মাছ অস্বস্তিবোধ করে, এমন কি ওদের জীবন সংশয়ের পর্য্যন্ত কারণ ঘটে। আর সব দিকে নিয়ম রক্ষিত হলে এবং উপযুক্ত দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান যদি থাকে, তা হলে এক একটি মাছ চার থেকে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু পেয়ে যায়।

'ট্রপিক্যাল' মাছকে মৎস্যাধারে রাখা অবস্থায় খাওয়ানো খুবই

সেগুলো ট্যাঙ্কে রেখে দিলেই ওরা আপন মনে খেয়ে নেয়। অতিরিক্ত খাওয়ান হলেই ওদের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠে এবং সেদিকেই বিশেষ সজাগ থাকতে হয়, যাঁরা মাছ পুষে আনন্দ পান, তাঁদের। কম খাওয়া দেওয়া বরং ভাল, কিন্তু কখনও কোন অবস্থাতেই বেশী নয়। দশ থেকে পনেরো মিনিট পর্যান্ত যতটা ওরা খেতে পারে, ততটুকু খাদ্যই যথেষ্ট। এদেশের একজন মৎস্য-বিজ্ঞানীর ব্যবস্থা—মৎস্যাধারের মাছগুলোকে ছয় দিন খেতে দিয়ে এক দিন উপোস দাও। তাতে ওদের উপকার হবে, বেঁচে থাকতে পারবে ওরা অনেক দীর্ঘ দিন।

বহু নামধারী 'ট্রপিক্যাল' মাছ আজকাল মৎস্যাধারে এসে স্থান নিয়েছে। এদের ভিতর 'গাপি', 'প্ল্যাট', 'সোর্ড-টেল', 'মলি', 'এঞ্জেল', 'টেট্রা', 'জেব্রা', 'ব্ল্যাক উইডো', 'হার্লে কুইন'—এসব বর্ণাঢ্য মাছগুলো উল্লেখযোগ্য। এদের জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে—সকল মাছ সকল সময় একই ট্যাঙ্কে থাকতে রাজী হয় না। ওদের ভেতর প্রেম-প্রীতি বিনিময় যেমন হয়ে থাকে, হিংসা, দ্বন্দ্ব, মান-অভিমান প্রভৃতিও লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ, গৃহে মৎস্যাধার সাজাবার সখ জাগলে, জেনে নিতে হবে 'ট্রপিক্যাল' মাছের এসব গতি-প্রকৃতি আগে-ভাগেই।

বেকার সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায়

ধান, গম, কলাই, সরিষা, আলু, চিনাবাদাম, ইক্ষু, চা ও পাট ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইলে দেশবাসী ও কর্ম্মিগণ সমৃদ্ধ লাভ করেন এবং জনসেবাধর্ম্ম পালন করিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজন হয়, জমিতে উন্নত ধরণের 'সার' দ্বারা কার্য্য সম্পাদন গ্রাম্য স্বাস্থ্য ও শিল্প উন্নয়নের জন্য বৃক্ষ রোপণ।

কৃষি সার

কৃষি জমির উর্ব্বরা শক্তি হ্রাস হইলে, জমিতে কয়েক প্রকার দূষিত বীজাণু ও নানারূপ আগাছা ইত্যাদি জন্মিয়া ধান্য ও শস্য গাছের বিশেষ ক্ষতি করে এবং তজ্জন্য ফসল প্রচুর পরিমাণে জন্মায় না। একারণ কৃষি জমিতে চাষের কিছু পূর্ব্বে স্বল্প ব্যয়ে ও পরিশ্রমে সহজলভ্য, "বাবলা বৃক্ষের" কাঁচা, পাকা, পচা বা শুখনা পাতা ও ফুল প্রতি বিঘা জমিতে ন্যূন পক্ষে দশ সের ও শুখনা (গাই গরুর) "গোবর গুঁড়া" দশ সের এবং "ফস্‌ফরাস যুক্ত ক্যালসিয়াম সার" দশ সের (যাহা স্বল্প ব্যয়ে আধুনিক প্রথায় কেবলমাত্র বাংলা দেশেই প্রস্তুত হইতেছে) একত্রে মিশাইয়া জমিতে ছড়াইয়া দিয়া হাল দিয়া রাখিতে হয়। পরে সময়মত চাষ করিলে জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং অনিষ্টকারী জীবাণু বা আগাছা ইত্যাদি জন্মাইতে পারে না। ধান্য ও শস্য গাছগুলি সবল, সুস্থ ও পূর্ণ ফলপ্রসূ হয় এবং শস্যগুলি পরিপুষ্ট হইয়া সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যপ্রদ হয়। অবশ্য ফসল উপযুক্ত বীজের উপর নির্ভর করে। লেখক বহু পরীক্ষার পর ধান্য ও শস্য চাষের জমিতে উক্ত সার ব্যবহার করিয়া আশাতীত সুফল লাভ করিয়াছেন।

বাবলা বৃক্ষ

কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের জন্য কৃষি জমির সীমানার ধারে অথবা সুবিধামত স্থানে "বাবলা বৃক্ষ" রোপণ করা প্রয়োজন। ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে প্রতি বৎসরে জমির সার হিসাবে পাতা ও ফুল পাওয়া যায় ও গাছের ছাল ও কাঁটা বহু কার্য্যে প্রয়োজন হয় এবং গাছের কচি পাতা দুর্বল গবাদির খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। "বাবলা" গাছের সরু ডালের দাঁতন (ব্রাসের পরিবর্ত্তে) প্রত্যহ ব্যবহার করিলে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় ও মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয় এবং নিয়মিত ব্যবহারে পাইওরিয়া রোগে সুফল পাওয়া যায়। "বাবলা বৃক্ষের" পাতা-ফুল-ফল এবং ছাল একত্রে পরিমাণ মত জলে নিয়মিত সিদ্ধ করিলে কালো 'কষ' বাহির হয়, এই 'কষ' হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ও সংমিশ্রণে উত্তম স্থায়ী লিখিবার কালী ও ফাউন্টেন পেনের কালী প্রস্তুত হয় এবং এই 'কষ' রেল লাইনের কাঠের স্লিপার ও অন্যান্য কার্য্যে, নৌকার পাল এবং দাঁড়, পাটাতন, কাছি ইত্যাদিতে এবং মৎস্য ধরিবার জাল, ঘুনী, আটোল, পোলো ইত্যাদিতে ব্যবহার করিলে বহুদিন স্থায়ী হয়; লোণাজলে, রৌদ্রে, বৃষ্টিতে শীঘ্র পচিয়া যায় না এবং উই বা অন্য কোন পোকার দ্বারা নষ্ট হয় না। "বাবলা বৃক্ষের" পরিপক্ক কাঠ পরিমাণ মত ভারী, শক্ত, মজবুত ও মসৃণ হয় এবং ইহা উই বা অন্য কোন পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয় না। একারণ এই কাঠে লাঙ্গল, গাড়ীর চাকা, চরকা তাঁত ও সরঞ্জাম, ববিন্, ইত্যাদি এবং কোদাল, কুড়ুল, দা, হাতুড়ী, বাঁটালি, গাঁতি ও সোভেল ইত্যাদির বাঁট বা হাতোল এমন কি বন্দুকের কুঁদা ইত্যাদি কার্য্যে ব্যবহার করা যায়। এই সহজপ্রাপ্য কাঠ হইতে কল-কারখানা ও সাধারণের প্রয়োজনীয় নানা প্রকার হাতোল, বাঁট, মুগুর ইত্যাদি তৈয়ারী করিলে বহু বেকার লোকের কার্য্য সংস্থান হয়।

"বাবলা বৃক্ষের" প্রবল আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি থাকায় প্রকৃতির নিয়মে নিকটস্থ জমিতে প্রয়োজন মত বৃষ্টিপাত হয়। একারণ এই বৃক্ষ খাদ্য ও শস্য চাষের জমির পক্ষে বিশেষ হিতকারী ও সুফলপ্রদ। জমির নিকটস্থ এই বহুকাঁটাযুক্ত ও বীজাণুনাশক গাছের সাহায্যে ফসল নষ্টকারী পোকা, মাকড় ইত্যাদি এমন কি পঙ্গপালের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই গাছের পাতার রসের সাহায্যে পুকুর, খানা, ডোবা ইত্যাদির বদ্ধ বীজাণুপূর্ণ দূষিত জল পরিষ্কৃত হয় এবং গাছের নীচস্থ জমির বিষাক্ত জীবাণু নষ্ট হইয়া জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি হয়।

নদী, খাল, বিল, জলাশয় ও জলধারার বাঁধের ধারে ধারে "বাবলা বৃক্ষ" রোপণ করিলে উহার পাতা ফুল ও ফল নিচে পড়িয়া পচিয়া যে রস বাহির হয় ঐ রসের সাহায্যে বালি বা কাঁকর মিশ্রিত আলগা মাটির বাঁধ বা পাড় দৃঢ় ও স্থায়ী হয় এবং বৃক্ষের শিকড়গুলি বহুদূর প্রসারিত হইয়া চারি ধারের মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। একারণ প্রবল বর্ষায় বা বন্যায় বাঁধ বা পাড় বা গ্রাম্য সরু বা বড় রাস্তা সহজে বিধ্বস্ত হয় না। বৃক্ষগুলি বেশী উচ্চ হয় না, একারণ ভীষণ ঝড়ে বা বজ্রপাতে গাছের কোন ক্ষতি হয় না। এজন্য হঠাৎ মাঠের মধ্যে প্রয়োজন হইলে পথচারী বা কর্মরত সেবকবৃন্দ সাময়িক আশ্রয়ের স্থল রূপে ব্যবহার করিতে পারেন। এ বৎসর প্রবল বর্ষায় ও বন্যায় সুন্দরবন এলাকায় এবং অন্যান্য স্থানে মাটির বাঁধ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এ সকল বাঁধের দুই পার্শ্বে ঘন ভাবে বাবলা বৃক্ষ রোপণ করিয়া পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এজন্য ব্যয় হয় অতি সামান্য এবং সহজে নষ্ট হইবার ভাবনা থাকে না। ভবিষ্যতে গাছ পরিপক্ক হইলে বহু বিশেষ বিশেষ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

পুণ্যময় ভারতের যে সকল স্থান ক্রমান্বয়ে মরুভূমিতে পরিণত হইয়া আসিতেছে সেই সকল স্থানে "বাবলা বৃক্ষ" রোপণ করিয়া পরীক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহার পাতা ফল ও ফুলের সাহায্যে মরুভূমির এবং সাগর ও নদীতীরস্থ বালি ক্রমান্বয়ে মিশ্রিত মাটিতে পরিণত হইয়া কৃষি উপযোগী হয়। এরূপ বৃক্ষ ঐ সকল স্থানে মধ্যে মধ্যে জন্মাইতে দেখা যায়। অদূর ভবিষ্যতে বাবলা ভারতীয় মূল্যবান্ বনজ সম্পদ রূপে পরিগণিত হইবে।

সহৃদয় দেশবাসীর অবগতির জন্য নিবেদন এই যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলা দেশের হিতৈষী মনীষীগণের যৌথ মূলধনে "বাবলা ইণ্ডাষ্ট্রীজ" (Babla Industries) নামীয় প্রতিষ্ঠান আধুনিক প্রথায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বৃহৎ বৈদ্যুতিক ও বাষ্পযন্ত্রচালিত কারখানার প্রস্তুতি চলিতেছে। শীঘ্রই গণসেবার জন্য উৎপাদন ও পরিবেশন হইবে—"বাবলা-নির্য্যাস," "বাবলা (মিশ্রিত) তরল রং" ও "বাবলা (মিশ্রিত) সার," ফসফরাস যুক্ত ক্যালসিয়াম-সার" এবং "বাবলা 'কাঠ"-নির্ম্মিত লাঙ্গল, চরকা, তাঁত-সরঞ্জাম, ববিন্, চাকা, কগ হুইল, পুলী, মুগুর, হাতোল, বাঁট ইত্যাদি।

—শ্রীশরৎচন্দ্র সেন

সেই মেয়েটি

বীরেশ্বর বসু

অকস্মাৎ জ্বলে ওঠে আকাশে আগুন
কে কার কঠোর হাতে পোড়ালো সে সুগন্ধি সেগুন
কেঁদে ওঠে তাতে বন, কাঁদে তার লতাপাতা ঘাস।
এর মাঝে দেখি শূন্যে উড়ে যায় শাদা-কালো ছাই
আকাশ বধির দেখি, নিমীলিত, করুণ বাতাস,
বনের গহনে বাজে সেই সুর 'যাই তবে যাই।'

সেই সন্ধ্যা আজো আসে জোনাকীরা আজো জ্বলে বনে
অনেক অনেক লগ্নে পাই তাকে বিস্মিত-স্মরণে
কী যে শান্ত সেই বন কী যে শান্তি লতায়-পাতায়?
মনেতে বিস্ময় বলে এই কি সে? বিস্মৃত মেয়েটি?
সেই মুখ, সেই বাহু, লতা-দেহ মিহি-কালো চুল
চরণে অলক্তরাগ কী উজ্জ্বল আজো দেখি তাই।
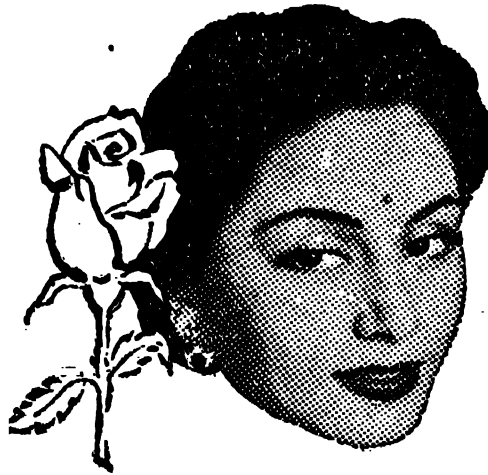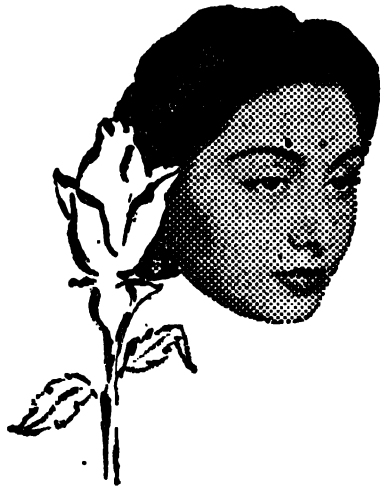
ফুলের মত…

আপনার লাবণ্য রেক্সোনা

ব্যবহারে ফুটে উঠবে!

নিয়মিত রেক্সোনা সাবান ব্যবহার করলে আপনার লাবণ্য অনেক বেশি সতেজ, অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! তার কারণ, একমাত্র সুগন্ধ রেক্সোনা সাবানেই আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের সৌন্দর্য্যের জন্যে কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ।
রেক্সোনা সাবানের সরের মত ফেণার রাশি এবং দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধ উপভোগ করুন; এই সৌন্দর্য্য সাবানটি প্রতিদিন ব্যবহার করুন। রেক্সোনা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।
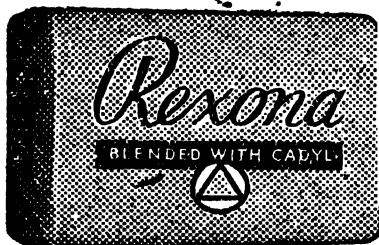
রেক্সোনা—একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিমিটেড'এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

R.P. 146-X52 BG

ছোটদের আসর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ব্যাং-এর বউকে দেখে মা তো অবাক, এত সুন্দরী মেয়েকে ও কে ক'রে বিয়ে করে আনলো। বউ বরণ করতে করতে মা ভাবেন।

মেয়েটি কিন্তু খুব কাজের। সে শাশুড়ীর সঙ্গে রোজ ক্ষেতে যায়। সব কাজে সাহায্য করে। বুড়ো শাশুড়ীকে বেশী খাটতে দেয় না বউটি। ব্যাং-এর মার আনন্দ আর ধরে না। মনে মনে বলেন, খাসা মেয়ে। বউকে খুব ভালবাসেন তিনি।

ক্রমে শরৎকাল এলো। এখন সে দেশের প্রথামত প্রতি বছর শরৎকালে ঘোড়-দৌড় হতো। ধনী-দরিদ্র সকলেই একটা নির্দ্দিষ্ট মাঠে গিয়ে জড় হত। সঙ্গে নিত তাঁবু আর নতুন পাওয়া ফসল সেখানে একরকম গাছ ছিল তার ডাল পোড়ালে ঠিক ধূপ-ধুনোর মত সুগন্ধ বেরোত। তাই জ্বালিয়ে তারা দেবতার পূজা করত, নাচত, মদ খেত তার পর ঘোড়-দৌড় শুরু হত। এই প্রতিযোগিতার সময় তরুণ-তরুণীরা তাদের মনোমত পাত্র-পাত্রী বেছে নিত। সে এক বিরাট কাণ্ডকারখানা।

এবার মা ঠিক করলেন, ব্যাংকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। ব্যাং কিন্তু যেতে রাজী হ'ল না। সে বললে: "আমি অত দূর যেতে পারবো না মা। অনেক পাহাড় ডিঙুতে হবে।" ব্যাং বাড়ীতে রইল।

তিব্বতী গল্প

আর সবাই ঘোড়-দৌড় দেখতে চলে গেল, এমন কি তার বউ পর্য্যন্ত।

এক বিরাট প্রান্তরে সাত দিন ধরে উৎসব। নাচ-গান—হৈ-হুল্লোড় আমোদ-আহ্লাদের অন্ত নেই। শেষ তিন দিন ঘোড়-দৌড়। প্রতিদিন দৌড়ের শেষে তরুণীরা বিজয়ীদের ঘিরে নৃত্য করতো আর তাদের নিজেদের তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে চিংকো মদ খাওয়াতো।

এবার ঘোড়-দৌড়ের তৃতীয় দিন অর্থাৎ উৎসবের শেষ দিনে দৌড় আরম্ভ হবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সবুজ পোষাক পরা এক তরুণ একটা সবুজ ঘোড়ায় চেপে ঘোড়-দৌড়ের মাঠে প্রবেশ করলো। তাকে দেখতে যেমন সুন্দর, গায়েও তার তেমনি জোর। তার পোষাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত মূল্যবান সিল্কের, আর ঘোড়ার লাগামে সোনা ও মণি মুক্তো দেওয়া। যুবকটির কাঁধে একটি বন্দুক ঝোলানো। বন্দুকের বাঁট রৌপ্য এবং প্রবাল দিয়ে মোড়া। সে যখন সব শেষের প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য অনুমতি চাইল, তখন সবাই তার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল।

ঘোড়-দৌড় সুরু হল। এই অদ্ভুত যুবকটি কিন্তু কোন তৎপরতা দেখাল না। খুব আস্তে আস্তে লাগাম, জিন প্রভৃতি ঠিক করে নিয়ে সে যখন ঘোড়া ছাড়ল তখন অপর প্রতিযোগীরা তাকে পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

সকল প্রতিযোগীরই দৃষ্টি ছিল দৌড়ে জেতবার দিকে। অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর তাদের ছিল না। কিন্তু এই নবাগত তরুণটির সেদিকে খেয়াল আছে বলে মনে হল না। সে ঘোড়া ছোটাবার সময় কাঁধ থেকে বন্দুকটা তুলে নিলে। আকাশে কয়েকটা ঈগল পাখী উড়ছিল। তাদের দিকে টিপ্ করে সে তিন বার গুলী ছুঁড়ল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তিনটি পাখী গুলীবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ল। তার পর যুবকটি ঘোড়া থেকে একবার বাঁ দিকে এক বার ডান দিকে নেমে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়ানো নর-নারীর প্রতি ফুল ছুঁড়ে দিলে। তার হাবভাব দেখে সবাই ভাবলো, পাগল নাকি। কিন্তু একি! হঠাৎ চোখের নিমেষে সে ঘোড়ায় উঠে এমন ছুট দিল যে ঘোড়ার খুরের ধুলোয় সব অন্ধকার হয়ে গেল এবং সেই ধুলোর মধ্যে সে অদৃশ্য হল। অপর প্রতিযোগীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার নাগাল ধরতে পারল না। তাদের অনেক আগে সে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে প্রথম স্থান অধিকার করল।

সে ঘোড়া থেকে নামলে ছেলে-বুড়ো সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। সকলের মুখে তার প্রশংসা। "কি সুন্দর চেহারা, আর কি ভীষণ ঘোড়া ছোটাতে পারে। পোষাক-পরিচ্ছদও সব অমূল্য। কে এই তরুণ! এমন সুদর্শন যুবকের যোগ্য পাত্রীই বা কে হবে?"

তরুণীরা তাকে ঘিরে নাচতে সুরু করল এবং তার পর তাদের শিবিরে নিয়ে গিয়ে চিংকো মদ খেতে দিলে। কেউ তাকে ছাড়তে চায় না।

কিন্তু যেই সূর্য্য অস্ত গেল যুবক তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় উঠে কাউকে কিছু না বলেই যেদিক থেকে ব্যাং-এর বউ ও তার শ্বশুর শাশুড়ী এসেছিল সেই দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

সবাই অবাক বিস্ময়ে তার সবুজ ঘোড়ার খুরোত্থিত ধূলির দিকে তাকিয়ে রইল।

ব্যাং-এর বউকি তা'হলে সেই ঘোড়সোয়ারনী বে? [illegible]

চেহারা, গায়ে কি শক্তি! নামটা কি, কোথায় থাকে, কিছুই জানা গেল না। অমন করে হঠাৎ চলে গেলই বা কেন? বোধ হয় অনেক দূরে বাড়ী। অন্যান্য সকলের মত তার মনেও নানা রকম প্রশ্ন দেখা দিতে লাগল।

বাড়ী ফিরে গিয়ে সে ব্যাংএর কাছে ঘোড়দৌড়ের সমস্ত ঘটনা বলতে গেলে ব্যাং বললে, "আমি সব জানি।" ব্যাং সমস্ত ঘটনা এবং সবুজ ঘোড়সোয়ারের কথা এমন হুবহু বলে গেল যেন সে মাঠে উপস্থিত ছিল। ব্যাং-এর বউ-এর ভারি আশ্চর্য্য লাগল।

পরের বছর আবার সেই মেলা, সেই ঘোড়-দৌড়। ব্যাং-এর মা বাবা এবং বৌ এবারও মেলা দেখতে গেল।

ঘোড়-দৌড়ের সময় সবাই সেই সবুজ ঘোড়সোয়ারের কথা ভাবতে লাগল। নিশ্চয়ই সে আসবে। এবার তার নাম ধাম সব জেনে নিতে হবে, সবাই মনে মনে ঠিক করলে।

কিন্তু তার আর দেখা নেই। এক দিন গেল, দুদিন গেল, ঘোড়-দৌড়ের শেষ দিন হঠাৎ সে যেন মাটী ফুঁড়ে বেরুল। সেই পোষাক, সেই ঘোড়া, সেই চেহারা। এবারের পোষাক যেন আরও জমকালো। সকল ঘোড়বাজরা যখন ঘোড়া ছাড়ল, তখনও সে ঘোড়ায় উঠল না, বসে বসে চা খেতে লাগল। চা খাওয়া শেষ করে সে ঘোড়া ছাড়ল। বাজী জেতার দিকে তার লক্ষ্য নেই। সে আগের বারের মত এবারও তার সুন্দর বন্দুকটি নিয়ে তিনটি উড়ন্ত পাখী মারল। তার পর ঘোড়া থেকে নেমে দর্শকদের গায়ে ফুল ছুড়ে দিতে লাগল। শেষে সে যখন সত্যসত্যই ঘোড়া ছোটাল, তখন তার প্রতিযোগীরা বহু দূর এগিয়ে গেছে। বিদ্যুৎগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে সে চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং প্রতিযোগীদের অনেক আগেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছে বাজী জিতল।

তার পর সুরু হল তাকে নিয়ে নাচ-গান খাওয়া-দাওয়া। কিন্তু ঠিক সূর্য্য অস্ত যাবার সময় সে গত বারের মত হঠাৎ ঘোড়ায় উঠে চলে গেল। এবারও তাকে জিজ্ঞেস করা হল না, তার নামই বা কি, আর সে থাকেই বা কোথায়?

ব্যাং-এর বউ-এর ভারি বিস্ময় লাগল। সূর্য্যাস্তের আগেই ও চলে যায় কেন! আমরা যেদিক থেকে আসি সেই দিকেই যায়। আরও আশ্চর্য্য, ব্যাং এ সমস্ত কি করে জানতে পারে! এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতেই হবে। মনে মনে সে একটা ফন্দী আঁটলে। পরের বছর ঘোড়-দৌড়ের শেষ দিন ব্যাং-এর বৌ তার শ্বশুর শাশুড়ীকে শরীর খারাপ বলে আগে আগে বাড়ী চলে গেল। বাড়ীতে গিয়েই সে ব্যাং-এর খোঁজ করলে, কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। শেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে উনোনের পাশে একটা ব্যাং-এর চামড়া দেখতে পেলে। ঠিক তার স্বামীর মত। সে তখন চামড়াটা তুলে নিয়ে আনন্দে বিভোর হল। 'যা সন্দেহ করেছিলাম ঠিক তাই। আমার স্বামী এত সুন্দর! এত শক্তিমান!' আনন্দে তার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। 'আজ আমার মত সুখী কে?' কিন্তু এত আনন্দের মাঝেও তার দুঃখ হতে লাগল। সে ব্যাং-এর বেশ ধারণ করে থাকে কেন! আমি কি তার উপযুক্ত নই? কখনও কি সে মানুষের বেশে আমার স্বামী হবে না? তার চোখ

চামড়াটা দেখে তার খুব রাগ হল। কি কুৎসিত! আবার এসে সে এইটা পরে ব্যাং সাজবে। সে যাতে আর ব্যাং সাজতে না পারে সেজন্য সে ব্যাং-এর ছালখানা উনোনের মধ্যে ফেলে দিলে।

তখন সূর্য্য অস্ত যায়-যায়। সবুজ ঘোড়সোয়ারটি তীব্রবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে কাণ্ড দেখে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে এসে উনোন থেকে ছালখানা তুলে নিলে, কিন্তু তখন সবই প্রায় পুড়ে গেছে, একটা পা অবশিষ্ট আছে মাত্র।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তরুণটি সেখানেই বসে পড়ল। তার শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়ে এল। ব্যাং-এর বউ বললে: "তুমি কেন এমন করে থাক। সকলে স্বামী নিয়ে কেমন আনন্দে ঘর-সংসার করে। আর আমি লজ্জায় কারো কাছে মুখ দেখাতে পারি নে। অথচ তুমি কত সুন্দর, কত শক্তিমান, কেউ তোমার পায়ের নখের যোগ্যও নয়।"

তরুণ বললে: "তুমি যে বড় তাড়াতাড়ি করে ফেললে। আমি সম্পূর্ণ শক্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত ছিল। আর কিছু দিন অপেক্ষা করলে আমরা চিরজীবন সুখে কাটাতে পারতাম। কিন্তু এখন আর আমি বাঁচব না এবং দেশবাসীদেরও দুঃখ দূর হবে না।"

তরুণীটি ভয়ে ভয়ে বললে: "আমি না জেনে অন্যায় করে ফেলেছি, এখন উপায়?"

"তোমার দোষ নেই, দোষ আমারই। সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্জ্জনের আগেই শক্তির পরিচয় দিতে যাওয়া আমারই অন্যায় হয়েছে। এখন তো আর কাউকে সুখী করা যাবে না। আমি সাধারণ মানুষ নই, আমি হলাম ধরিত্রী মাতার সন্তান। উপযুক্ত শক্তি অর্জ্জন করলে আমি দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারতাম। আমি এমন রাজ্য সৃষ্টি করতে চাই, যেখানে দরিদ্রের উপর ধনীর অত্যাচার থাকবে না, সরকারী কর্ম্মচারীরা সাধারণ মানুষকে নির্য্যাতন করবে না, দেশের পথঘাট ভাল হবে, অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে। কিন্তু আমার শক্তি অর্জ্জন এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। ব্যাং-এর চামড়া নইলে শীতে আমি একটা রাতও বাঁচব না, রাত্রি প্রভাত হবার আগেই আমার মৃত্যু হবে। উপযুক্ত ক্ষমতা অর্জ্জন করতে পারলে এবং দেশের লোকদের দুঃখ-দুর্দ্দশা ঘুচাবার জন্য কাজ করতে পারলে আমাদের জীবন সুখের হত। কিন্তু আর উপায় নেই। আমার আর এখানে থাকা হবে না, আজ রাতেই আমাকে আমার মা বসুমতীর কাছে চলে যেতে হবে।"

মেয়েটি তখন যুবককে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললে: "তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না, কেন তুমি চলে যাবে, তোমায় বাঁচতেই হবে। বল, কি করলে তুমি বাঁচতে পার। আমায় যা বলবে আমি তাই করব।"

তার কান্নায় যুবকের হৃদয় গলে গেল। সে তার হাত দু'টি ধরে বললে: "দেখ এখনো হয়ত আমাকে বাঁচান যেতে পারে। কিন্তু কাজটা একটু কঠিন। আমার যে ঘোড়াটা দেখছ, এর গতি অসম্ভব দ্রুত। এই ঘোড়ায় চেপে সোজা পশ্চিম দিকে চলে যাও। সেখানে মেঘের রাজ্যে একটা বিরাট মন্দির দেখতে পাবে। সেই মন্দিরে দেবতা থাকেন। তাঁর কাছে এই তিনটি বর চাইবে: (১) পৃথিবীতে ধনী-দরিদ্র বলে শ্রেণী-বিভাগ থাকবে না, (২)

(৩) পিকিং-এর বাজারে গিয়ে হান্ ভাইদের সঙ্গে বিনিময় বাণিজ্য করা চলবে। এই তিনটি বর যদি চেয়ে নিয়ে আসতে পার, তাহলে আমি আর মরব না।"

ব্যাং-এর বৌ আর দেরি করল না। তক্ষুণি ঘোড়ায় উঠে পশ্চিম আকাশে উড়ে চলল। ঘোড়া পক্ষীরাজের মত মেঘের মধ্য দিয়ে উড়ে যেতে লাগল সাঁ-সাঁ করে। ব্যাং-এর বউ কোন বাধা বিপত্তি গ্রাহ্য করল না। তার লক্ষ্য কেবল সেই মেঘরাজ্যে অবস্থিত দেবতার মন্দির। স্বামীর প্রাণ বাঁচাবার জন্য সতীর অপূর্ব্ব অভিযান! বহুক্ষণ অশ্বচালনার পর মেয়েটি দেবতার মন্দিরে গিয়ে হাজির হল। অপূর্ব্ব শোভা সে মন্দিরের! তার দীপ্তি এত উজ্জ্বল যে তাকালে চোখ ঝলসে যায়। স্ফটিকের দেওয়াল, চূড়াটি সোনা দিয়ে মোড়া, মন্দিরের গায়ে অসংখ্য উজ্জ্বল মণিরত্ন। মেয়েটির কিন্তু সে দিকে খেয়াল নেই সে কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে মন্দিরে ঢুকল এবং দেবতার কাছে তার প্রার্থনা নিবেদন করল। দেবতা তার আন্তরিকতায় খুশী হয়ে তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। বললেন: "তিনটি বরই তোমায় দিলাম। কিন্তু রাত্রি প্রভাতের আগে এই কথা সকল লোককে জানাতে হবে। সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়ে একথা শোনাতে হবে। তারা না শুনলে বর ব্যর্থ হবে।"

ব্যাং-এর বউ মহাখুসী। সে দেবতাকে অসংখ্য প্রণাম জানিয়ে মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হল এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল বাড়ীর দিকে। রাত্রি প্রভাতের আগে সবাইকে সমস্ত সংবাদ শোনাতে হবে, কাজেই দেরি করা চলে না।

কিন্তু উপত্যকায় প্রবেশ করে সে দেখতে পেলে, তার বাবা চুংপো তার দুর্গের ফটকে দাঁড়িয়ে আছে।

মেয়েকে দেখতে পেয়ে চুংপো বললে: "আরে এত রাত্রে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিস কোথা? কি হয়েছে?"

"সে অনেক কথা, পরে বলবো বাবা! এখন আমায় সব বাড়ী বাড়ী গিয়ে দেবতার প্রত্যাদেশ শোনাতে হবে, আমার দাঁড়াবার সময় নেই।" মেয়েটি চলে যেতে চাইল।

কিন্তু চুংপো তার পথ আটকালো। বললে: "কি প্রত্যাদেশ শুনি? আমি জেলার হাকিম, আমাকে আগে বলতে হবে।"

মেয়েটি ভাবলে, তাড়াতাড়ি বর তিনটির কথা বলে চলে যাওয়াই ভাল, নইলে অনর্থক কথা-কাটাকাটিতে দেরি হয়ে যাবে। সে তখন তার বাবাকে বললে: "দেবতা আমায় তিনটি বর দিয়েছেন। প্রথম বরে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে না।"

চুংপো কপাল কুঁচকে বললে: "বাঃ! ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোন তফাৎ না থাকলে, ছোট-বড়তে যে ভেদ থাকবে না, মান মর্য্যাদা রাখা দায় হবে, কেউ কাউকে মানতে চাইবে না!"

মেয়েটি বলে চলল: "দ্বিতীয় বরে সাধারণ লোকের উপর সরকারী আমলাদের অত্যাচার চলবে না।"

"তাই নাকি! তাহলে আমাদের কাজ করে দেবে কে?" গরু ভেড়া চরাবে কে, চাষ হবে কি ক'রে?" চুংপোর মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না।

"তৃতীয় বরে পিকিংএ গিয়ে হান্ ভাইদের সঙ্গে বিনিময় ব্যবসা করা চলবে এবং তাহলে দেশের লোকেরা"—

চুংপো আর কোন কথা শুনতে চাইল না। সে বাধা দিয়ে বললে: "যত সব বাজে কথা! ভগবান কখনো এ সব বলতে পারেন না। আমি তোমায় এ সব কথা লোকদের শোনাতে দোব না।"

মেয়েটি বললে: "সে হয় না, আমায় শোনাতেই হবে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না।" বলে সে ঘোড়া হাঁকাবার চেষ্টা করল। কিন্তু চুংপো দৃঢ় ভাবে ঘোড়ার লাগাম ধরে রইল, যেতে দিল না।"

মেয়েটি অনেক কাকুতি মিনতি করল, কিন্তু তার বাপের শরীরে দয়া মায়া বলে কোন জিনিষ ছিল না।

এমন সময় মোরগ ডেকে উঠল। রাত্রি প্রভাতের আর বিলম্ব নেই। মেয়েটি যাবার জন্য ছটফট করতে লাগল।

তার বাবা বললে: "তুই কি পাগল হলি নাকি! দেবতা কি কখনো এসব কথা বলতে পারেন? তাহলে জমি চাষ করবে কে, গরু ভেড়া চরাবে কে, সব কাজ করবে কে?"

দ্বিতীয় বার মোরগ ডেকে উঠল।

মেয়েটি কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারল না। বেপরোয়া হয়ে সে ঘোড়ার পিঠে সজোরে চাবুক মারতে লাগল। তখন ঘোড়াটা এক ঝাঁকানিতে চুংপোকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ছুটতে সুরু করল।

মেয়েটি প্রথম একটি বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়েছে, এমন সময় তৃতীয় বার মোরগ ডেকে উঠল।

ভোর হয়ে যখন দিনের আলো ফুটে উঠল তখন মাত্র অল্প কয়েকটি বাড়ীর লোকদের দেবতার প্রত্যাদেশ শোনানো হয়েছে।

গভীর দুঃখে ও হতাশায় মেয়েটির শরীর ও মন ভেঙ্গে পড়ল। সকাল হয়ে গেল, স্বামীকে আর বাঁচান গেল না।

তাড়াতাড়ি সে বাড়ী ফিরল। গিয়ে দেখে সব শেষ। তার শ্বশুর শাশুড়ী তার মৃত স্বামীর পাশে বসে বসে হাউ-হাউ করে কাঁদছে। স্বামীর মৃতদেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে-ও হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল আর নিজের বাপকে ও ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগল।

পাহাড়ের উপর ভেক-কুমারের মৃতদেহ সমাহিত করা হল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মেয়েটি গিয়ে সেই সমাধির পাশে বসে বসে কাঁদত। শেষে একদিন সে পাথরে পরিণত হয়ে গেল।

এখনো সেই সমাধির পাশে সেই পাথরখানি দেখতে পাওয়া যায়। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, যেন কোন তরুণী নত হয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছে, আর তার মাথার আলুলায়িত কেশ পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। স্বামীর সমাধিতে প্রার্থনা জানান তার কোন দিন শেষ হবে না।

অনুবাদক—হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

হঠাৎ একদিন রায়চৌধুরী সাহেবের আগ্রা থেকে ডাক এলো। অনেক মোহর পাওয়া যাবে ফী হিসাবে।

মিসেস রায়চৌধুরী আপত্তি করলো, এই সময়ে কলকাতায় এত কাজ ফেলে একেবারে আগ্রা যাওয়া ঠিক হবে না।

রায়চৌধুরী বললে, দেশবন্ধুর ত ব্যারিষ্টার হিসাবে খুব নাম ছিল জানো। লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছেন তিনি শুনেছ। সব কি হাইকোর্ট থেকে? মোটেই না। বেশীর ভাগই বাইরের আদালত থেকে। শুনলে অবাক হবে, হাইকোর্টে তিনি কমই দাঁড়াতেন। অন্য অনেকের চেয়ে কম। পাটনা, ভাগলপুর, কটক, দিল্লী কোথায় না কোথায় গেছেন তিনি? আর মুঠো মুঠো টাকা এনেছেন, বিলিয়ে দেবার জন্যে।

পাঁচ দিনের জন্যে আগ্রা। মীরা ধরে বসলো, ড্যাডি, আমাকে দেখিয়ে আনো তাজমহল।

এক কথায় সাহেব রাজী হয়ে গেল। মেয়েরও থাকবার খরচ পাওয়া যাবে, মেয়ে আমাকে কফি, ওভালটিন ঠিক ঠিক মুখে মুখে দেবে।

আগ্রা ফোর্ট ষ্টেশন থেকে তাজমহলের যে চূড়া দেখা যায়, তাতে মীরা হতাশ হয়ে গেল। বলেই ফেললে, এ তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।

এক জন গুজরাটী সহযাত্রী বললে, ভিক্টোরিয়া তাজমহলের চবুতারার ধারে ঘেঁসতে পারে না।

চবুতারা কোন চীজ?

ড্যাডি বুঝিয়ে দিলে, চবুতারা হচ্ছে চাতাল।

সেই চাতাল দেখাই কি তক্ষণি হল! এ কি একছুটে যাওয়া যায়? হোটেলে পৌঁছে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে ড্যাডিকে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হল। সে দিন আর সে রাতটা কেটে গেল। তাজমহল যেখানকার, সেখানেই রইলো। আগ্রায় এসেও তাজ দেখা হচ্ছে না এ কথা মনে হ'লে কখনো ভালো ক'রে ঘুম হয়? মীরারই বা ঘুম কি ক'রে হবে?

খুব ভোরে সে উঠলো। ড্যাডিও উঠেছে। কিন্তু মীরার সাহস নেই যে বলে, ড্যাডি, তাজে চলো।

ড্যাডিই বয়কে ডেকে বললে, ট্যাক্সি বোলাও। মীরাকে বললে, চলো, তাজটা সেরে আসি।

বেড-টি খাওয়া হয়েছে। ওরা বেরোলো। তখনো আকাশটা রাঙা। সূর্য্য ওঠেনি। আগ্রায় শীত-শীত হাওয়া। ঘুমন্ত বস্তি দু' পাশে। তাজমহলের দেশেও এত নোংরা পল্লী! কেউ কেউ উঠে দাঁতন করছে। কেউ বা দোকানের ঝাঁপ ওঠাচ্ছে। চানা আর ছাতুর দোকান। পাথরের খেলনার দোকান।

তাজের কাছাকাছি আসতে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। বাগান দেখা গেল। মীরার বুক ধুক্‌-ধুক্‌ করতে লাগলো। বিশ্ব-বিখ্যাত মমতাজমহলের সমাধির কাছে এসে গেছে। এসে গেল মোটর লাল পাথরের ফটকের সামনে, ফটকটাই ত একটা ছোট-খাটো প্রাসাদ। সেইখান থেকে দাঁড়িয়ে খিলানের মাঝখান দিয়ে তাজকে প্রথম দর্শন। যেন একটা জমাট কুয়াসা, ধ্যানগম্ভীর আকাশ-ছোঁয়া একটা ছবি, প্রথম সূর্য্যের আলো প'ড়ে বিরাট মোতির মালা, স্বচ্ছ অভ্র, না ডিমের লাল আভা সাদা খোলা দিয়ে তৈরী একটা জিনিস, যা রোদে এক রকম আর যেখানটা ছায়া পড়েছে, সেখানটা আর এক রকম। এ নাকি কিছুই দেখা হয় নি।

আরো এগোতে হবে। দু' ধারে ঝাউয়ের সার পার হ'য়ে, পদ্মফুলে ভরা ফোয়ারা-খোলা চৌবাচ্চার ধার দিয়ে পায়ে পায়ে আরো এগোতে হবে সকালবেলার অনেকগুলি যাত্রীর সঙ্গে।

দু'ধারে সিঁড়ি। নীচে জুতো রেখে এক দিকের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চাতাল। সেই চবুতারা। না, সমস্ত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এ চবুতারার কাছে লাগে না। কত কাজ, আর কী মসৃণ!

ভেতরে ঘরের পর ঘর, দেয়াল, সীলিং, বাতায়নে কী শিল্প, পাথরের ফুল-পাতা, মণিবসানো কাজে অপূর্ব্ব!

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে দু'টি সমাধি পাশাপাশি, সাজাহান আর মমতাজের। পাথরের বুকে ঝলমলে রামধনু-রঙের পান্না-চুণি মরকতের লতাপাতার আভায় চোখ ঠিকরে যায়। ধূপের ধোঁয়ায় উজ্জ্বল আলোয় সমাধি-ঢাকা শালের সাচ্চা জরীর কাজ তিনশো বছর আগের সম্রাট-দম্পতির স্মৃতি শুধু ফিরিয়ে আনে না, তিনশো বছর আগের শিল্পীদের কথাও মনে করিয়ে দেয়।

বাদশার মনে জেগেছিলো অপূর্ব্ব সৃষ্টির কল্পনা। তার জন্যে রাজকোষের লোহার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু শিল্পীরা না থাকলে শ্রমিকরা না এলে সে স্বপ্ন সত্য করত কে? শিল্পী কি সহজশিল্পী? আজকের উন্নত যুগেও যার জোড়া নেই! শ্রমিক কি সোজা শ্রমিক? ইস্পাতের ক্রেন ছিল না, লোহার লাইন ছিল না, এই সব ভারী ভারী পাথর যারা আকাশের দিকে তুলেছে, আর মিস্ত্রী এমন ক'রে বসিয়েছে যে তিনশো বছর পরেও সে শুধু নড়লো না তা নয়, পথিকের মনে ধারণা ঢুকিয়ে দিতে পারে—যে দিনই সে আসুক সেই দিন এই সৌধ শেষ হয়েছে। তিনটে শতাব্দীর ঝড় জল বজ্রপাত সহ্য করেছে এই মাখনের মতন প্রাসাদ, এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত সামনে দাঁড়িয়ে, ইতিহাস বলে না দিলে।

আরো নীচের তলার কারুকার্য্যহীন আসল দু'টি সমাধির দিকে

ওরা আর গেল না নেমে যমুনার দিকে, যার নীল জলে তাজমহলের আর চার মিনারের ছায়া কাঁপছে তিনশো বছর ধ'রে।

তার পরে ওরা তাজ আর প্রধান কটকের মাঝামাঝি এমন এক জায়গায় গিয়ে বেঞ্চিতে বসলো, যেখান থেকে সমস্ত তাজটা দেখা যায়, দেখা যায় সকালের আলো-ছায়ায় নব নব রূপে কেঁপে কেঁপে উঠছে 'কালের কপোলতলে এক বিন্দু নয়নের জল।'

সেইখানে ব'সে সাহেব বললে, সাজাহানকে বাঙালী চিনেছে দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান নাটক থেকে আর তাজমহলকে জেনেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। এ দুটিই অক্ষয় কীর্ত্তি। কিন্তু লর্ড কার্জ্জন যার নামে পার্কটাও কলকাতার লোক সহ্য করতে পারে না, সে না থাকলে ভারতবর্ষের অনেক কীর্ত্তি নষ্ট হ'য়ে যেত। শোনো সেই কথা। মোগল রাজত্ব যখন ভেঙে পড়লো, তখন ভরতপুরের জাঠেরা মাথা তুললো। সেদিন হয়ত এখানকার বাগানে গোলাপের সৌন্দর্য্যে আরো সুন্দর ছিল, ওরা এসে নষ্ট করলো। তাজের বর্ণনায় পড়া যায়, রূপোর প্রকাণ্ড দরজার ওপর খাঁটি সোনার অপরূপ কাজ ছিল, চন্দনকাষ্ঠের কাজ করা কত শিল্প ছিল, দেয়ালের গায়ে খোদাই করা গোলাপের পাপড়িতে আর তার পাতার এ পিঠে ও পিঠে নানান্ দুর্ম্মূল্য মণি বসানো ছিল, আজ তার কিছুই নেই। সিপাহী বিদ্রোহের পর এখানকার জঙ্গল আর দরজা-ভাঙা তাজের এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে একজন ভাইসরয়ও ঠিক ক'রে বসলো, তাজমহল ভেঙে ফেলে পাথরগুলো বিক্রি ক'রে দেওয়া যাক্। এতই বাজে লোক সে! কী সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছিলো বোঝো। তাজ ধুলোয় মিশিয়ে যেত, যদি না প্রকাশ পেত, ভাঙার খরচ এত বেশী পড়বে যে পাথর বিক্রি ক'রে সে খরচ উঠবে না। এমন সময়ে এলো কার্জ্জন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ একটা সৃষ্টি ক'রে ভারতবর্ষের বিলুপ্ত কীর্ত্তি উদ্ধারের ব্যবস্থা ক'রে দিলে, আর আইন করে দিলে প্রাচীন কীর্ত্তির এক টুকরো পাথর সরানোও অপরাধ। তাই সারনাথ, সাঁচীস্তূপ, রাজগীর, নালন্দার আবিষ্কার হল। লোকে জানতে পারলো দশ হাজার ছাত্র পেয়েছিলো ছাত্রাবাস আর বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দায়। খণ্ডগিরি উদয়গিরির গুহাগুলি পরিষ্কার করা হল, ভিক্ষুক আর চোর-ডাকাতের আস্তানা আর রইলো না। সমুদ্রের মধ্যে এলিফ্যান্টা পাহাড়ের অপূর্ব্ব মূর্ত্তির সংস্কার হল।

অজন্তা ইলোরা তার অতীত গৌরব দেখাতে পেলে। সারনাথ মিউজিয়মের আড়াই হাজার বছর আগেকার অশোকস্তম্ভ তার তিন সিংহমূর্ত্তি নিয়ে 'সত্যমেব জয়তে' করতে পেলো আজ। আর তাজমহল আবার পৃথিবীর বিস্ময় হয়ে উঠলো যা প্রায় ধ্বংস হ'তে বসেছিলো। যে ইংরেজ আমাদের শোষণ করছে, সেই ইংরেজই আমাদের শিল্প সাহিত্য ইতিহাসের মর্য্যাদা রাখতে শিখিয়ে গেছে। দেশকে কি পরিমাণ ভক্তি করতে হয়, দেশবাসীর কাছে কতটা সাধু হতে হয়, সেইটি যদি আমরা ইংরেজের কাছে শিখে নিতে পারতুম! সেই ইংরেজের ছেলে লর্ড কার্জ্জন!

এইখানে রায়চৌধুরী সাহেবের দীর্ঘশ্বাস পড়লো। এ কথায় কিন্তু মীরাও অবাক হ'য়ে গেল। বললে, ড্যাডি, আমরা ইংরেজের মতন দেশকে আজো ভালোবাসতে জানি না?

সকলে জানি না। দু'চার-দশজন জানতেন। সেই দু'চার-দশজনের মধ্যে নেতাজী, রবীন্দ্রনাথ, বালগঙ্গাধর তিলক, কানাইলাল, বিজয় বাদল-দীনেশরা পড়ে। তাঁদের জোড়া আবার সারা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। কিন্তু জাত হিসাবে ভারতবাসী, জাত হিসাবে ইংরেজ যেমন দেশকে ভালোবাসে, দেশের লোককে ঠকায় না, দেশের জন্তে সব রকম কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত তেমন ভাবে আজো তৈরী হয়নি, এ কথা বড়ো হ'য়ে বুঝবে। যখন তোমাকে ইংরেজের মতন দেশপ্রীতি দেখাতে হবে আগামী কালে। আজ ও কথা থাক।

ঝাউগাছের পাতায় পাতায় বাতাসের মর্ম্মরধ্বনি। মীরা বললে, লর্ড কার্জ্জনের কথা আগে যেন কি বলছিলে?

হ্যাঁ, লর্ড কার্জ্জনের খেয়াল হল, কবরের মাথায় যে সুন্দর আলো ছিল জানা গেল, যেটা চুরি হ'য়ে গেছে, তেমনি একটি আলো ওখানে দিতে হবে। হিন্দুস্থানের যেখানে যে কারিগর ছিল ডাকা হল। কেউ তেমনটি করবার ভরসা দিতে পারলো না। কার্জ্জন খোঁজ নিলো আরব পারস্য মিশরে মসজিদে মসজিদে যেখানে সুন্দর সুন্দর সাবেক কালের বাতিদান ঝোলে। শেষটা অনেক খোঁজার পর একরকম আলো তার পছন্দ হল, যা তৈরী করতে পারবে, মিশরের মাত্র দুটি কারিগর। ১৯০৫ সালে তাদের ওপর ভার দেওয়া হল, শেষ করতে লাগলো দু'বছর। আলো যখন এসে পৌঁছলো, কার্জ্জন তখন দেশে চ'লে গেছে। সেখান থেকে অর্ডার হল কোনো ছোটলাট ওটি তাজমহলে টাঙিয়ে দেবে জনসাধারণের সামনে। ১৯০৯ সালে দশ হাজার লোক জমায়েৎ হল এই বাগানে। টাঙানো হল কার্জ্জনের উপহার ঐ আলো যা রাতের পর রাত জ্ব'লে আসছে এক ভাবে—যার দাম দশ হাজার টাকার কম নয়। কার্জ্জন নেই, কিন্তু তার শিল্প-প্রীতি, আর দরদের প্রমাণ আজো অক্ষয় হয়ে আছে, শুধু এখানে নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে।

ঘোর লেগে গিয়েছিলো যেন মীরার চোখে। তার পাক্কা সাহেব ড্যাডিকেও কোন দিন এমন ভাবে কথা বলতে দেখেনি। সে মনে করত, ড্যাডি ভারতবর্ষকে ভালোবাসে না। সে ভালোবাসা যে কত গভীর, আজ তা অনুমান করতে পারলো।

বেলা বেড়ে গেল। হোটেলে ফিরে রায়-চৌধুরী কাজে চ'লে গেল।

দুপুরে এসে নিয়ে গেল মীরাকে ইৎমাদুদ্দৌলা—নূরজাহানের পিতার সমাধি। ও তো পাথর দেখলো না, দেখলো যেন হাতীর দাঁতের সূক্ষ্ম জাফরী। কোথায় গেল সেই বাদশা-বেগমরা, টাকাকে যারা টাকা মনে করত না, কীর্ত্তির কাছে সব তুচ্ছ ভাবত!

আগ্রা ফোর্টের মহলে-মহলে সেই সব পুরানো স্মৃতি কখনো যেন হাহাকার তুলছে, কখনো যেন গান গেয়ে উঠছে।

কত ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ, কত নাচের ঘুঙুরের বোল, কত গান, কত বিজয় উৎসব তিনশো বছর পরেও যেন জেগে আছে, যেমন জেগে থাকে পাঁচশো বছর আগে-লেখা কৃত্তিবাসের রামায়ণ, চারশো বছর আগে পাওয়া শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তন, বিদ্যাপতির পদাবলী। আর আড়াই হাজার বছর আগের বুদ্ধদেবের বাণী আর রাজা অশোকের অশোকস্তম্ভ।

আগ্রার জ্যোৎস্না, আগ্রার যমুনার ধারের জ্যোৎস্না তাজকে যে স্বর্গে তুলে নিয়ে যায়, সে কথা সত্যি। সমস্ত তাজমহল তার চার মিনার নিয়ে আকাশ আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানটা চাঁদের আলো পড়ে, যেখানটা পড়ে না, সব জড়িয়ে

বর্ণনা করা যায় না—এই ভাব জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মমতাজমহলের তাজমহল। এখানে-ওখানে-সেখানে ব'সে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান মেয়ে-পুরুষ দেখছে ত দেখছেই, তৃপ্তির শেষ নেই, ক্লান্তির আভাস নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে, রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়, এক্কাওয়ালা টাঙ্গাওয়ালা ট্যাক্সিওয়ালারা অপেক্ষা করে, বিরক্ত হয় না, তারা জানে, যারা এখানে এমন সময়ে আসে, তারা হুজুগে নয়, অন্য ধরণের লোক। তাদের ভাবনা অন্য ধরণের। একটুখানি দেখায় তাদের আশ মেটে না।

চাঁদ ডুবে যাবে। কালো আকাশে অন্ধকার নেমে আসবে। আর সেই জমাট অন্ধকারের মধ্যে শ্বেত পাথরের তাজমহল যখন জ্বলজ্বল করবে শুধু তারার ঝিকিমিকিতে—সে-ও এক দেখবার জিনিস। তাই দেখতে কত লোক ব'সে রইলো। এখানে তো চোর-ডাকাতের ভয় নেই। সমাধি ভূমির ওপরে লর্ড কার্জ্জনের দেওয়া আলো জ্বলতে লাগলো।

ওরা দু'জনে উঠলো। উঠলো যেন অনিচ্ছাসত্বে। যমুনার তীরে তীরে বাঁশি বাজতে লাগলো কাদের। লোকেরা কথা বলতে লাগলো আস্তে। কেউ বা গান গাইতে লাগলো। 'তাজমহল! তাজমহল!'

আজ যারা এসেছে কত দূর দূর থেকে, তারা নিয়ে যাচ্ছে একদিনের স্মৃতি, চিরদিনের সঞ্চয় ক'রে। কেউ চিঠিতে জানাবে তার প্রিয় জনকে কী জিনিস দেখে গেল। কেউ মুখে গল্প করবে কিন্তু ভাষা পাবে না, একঘেয়ে মনে হবে—ভারী সুন্দর, কী চমৎকার! কেউ লিখবে কবিতা, কেউ ভ্রমণকাহিনী। কেউ ছবি ছাপাবে, যে ছবি বলতে গেলে লোকের মুখস্থ হয়ে গেছে তাজমহল না দেখেও।

মীরা কিনলো একটা বড় তাজমহল পঁচিশ টাকা দিয়ে, ব্যাটারি দিয়ে তার মধ্যে লাইট জ্বালানো যায়। এই রকম একটা ছোট তাদের কলকাতার বাড়ীতে আছে, যেটা দেখে সে বুঝতেই পারত না, কী এমন আশ্চর্য্য জিনিষ! তাতে ঢোকবার যে ছোট্ট দরজা দেখেছে, তার কাছে এখানকার বিরাট ফটক দেখে প্রথমেই ত হাঁ হয়ে যাবার কথা! আর এ তাজমহলের পাথর কোথায় পাবে যে বোঝাবে কোন্ পাথরের তৈরী তাজ! ও শুধু স্মৃতিচিহ্ন। একবার দেখে যাবার পর ওর দিকে চাইলে মনে পড়বে, ঐ তাজ দেখে এসেছি।

পরের দিন। সিকান্দ্রা, ফতেপুর সিক্রি এ-সব মীরার দেখবার ইচ্ছে ছিল না, সে আর একবার তাজ দেখতে চায়।

ওর ড্যাডি বললে, না চলো। সময় কম। সেরে নাও। আবার কবে সুযোগ পাবে, ঠিক নেই।

মাইলের পর মাইল গাড়ী চললো বাঁধানো রাস্তা ধ'রে। কোথায় প'ড়ে রইলো আগ্রা। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কত গ্রাম কত তেপান্তরের মাঠ পার হ'য়ে ফতেপুর সিক্রিতে যখন এলো, মীরা দেখলো লাল পাথরের পাঁচিলঘেরা কোনো দুর্গ নয়, যেন শহর। সেলিম চিস্তির মনোরম কবরখানা ঘিরে সম্রাট আকবরের নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা—পুত্র জাহাঙ্গীরের প্রাণদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যে শুধু যেন কোনো মানুষের তৈরী কাজ নয়, ময়দানবের কীর্ত্তি। মহলের পর মহল পার হ'য়ে পাঁচতলা পঞ্চমহল, আঙিনার পর আঙিনা পার হ'য়ে হাতীর ওপর হাওদায় ব'সে ঢোকবার ফটক—বুলন্দ দরোয়াজা—আর নীচে ছোট গ্রাম ফতেপুর সিক্রি পৃথিবী-বিখ্যাত হ'য়ে আছে।

সেই আকবরের শেষ সমাধি একেবারে উল্টো দিকে সিকান্দ্রায়—আড়ম্বরহীন কারুকার্য্যহীন মাত্র চার হাত সাদা পাথরের নীচে, ওপরে লাল পাথরের প্রাসাদ আবার চারমিনার নিয়ে—যাতে উঠে দূর আগ্রা দেখা যায়—এই কথাই মনে করিয়ে দেয় রাজা ও রাজ্য কিছুই থাকে না, ইতিহাস শুধু থাকে, পাপ-পুণ্যের বিচার প্রমাণ সযত্নে তুলে রাখে।

সাজাহান ও আকবরের ভালো কাজ যেমনি ছিল, মন্দ কাজও তেমনি কম ছিল না, কিন্তু সব ছাপিয়ে কীর্ত্তি যেটা ছিল, তারই জয়ধ্বজা আজো উড়ছে।

তারা শিল্প দিয়ে গেছে দেশকে। ইংরেজ যেমন দিয়ে গেছে তার সাহিত্য, যে সাহিত্যের মৃত্যু নেই। মীরার ড্যাডি বললে, এ সব কথা বড়ো হ'য়ে বুঝবে।

'সবই বড়ো হ'য়ে'?—মীরার কেমন খারাপ লাগে। এখন কি কিছুই বোঝা যাবে না? যেটুকু বুঝছে, তা কি বোঝা নয়? তার তরুণ চোখ মেলে যা দেখছে, সে কি দেখা নয়?

সাহেব বললে, এ-ও দেখা, এ-ও বোঝা। দেখা-না-দেখা বোঝা-না-বোঝার মাঝামাঝি অবস্থা। নইলে তোমাকে আনব কেন? এই দেখা এই বোঝা অন্য রকম হ'য়ে তোমার জীবনে সাড়া জাগাবে বড়ো হলে। যেমন রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, কিংবা কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বা মাইকেলের মেঘনাদবধ—এখন একরকম লাগবে, বড়ো হলে দেখবে অন্য রকম। এও ভালো লাগা, সেও ভালো লাগা, কিন্তু সে ভালো লাগা আরো অনেক গভীর। কেন তা তোমায় বোঝাতে পারব না মীরা!

বোঝাতে নাই পারা যাক্, একথা মীরা বুঝতে পারে, স্বচ্ছলতার মধ্যে বাস করলে পৃথিবীকে ভালো করে দেখবার অনেক সুযোগ পাওয়া যায়, আর সেই সুযোগে জীবনকে বিকশিত করতে যে সাহায্য করে, এ কে না জানে? মন চলে যায় অনেক উঁচুতে, নীচুতলার ছোট মনের অন্ধকার সেখানে জমতে পায় না। সেই আবহাওয়াটা যে পাচ্ছে এখন সে বুঝতে পারলো।

তাই গয়া ষ্টেশনে আসবার সময়ে কাঁথির পিসিমার কালো পাথরের বাসনগুলির কথা, গয়েশ্বরীর কথা যখন মনে পড়লো, তখন চেয়ে দেখলো অনেক অনেক পাহাড়, কিন্তু কুচকুচে কালো নয়। দূরে ব্রহ্মযোনি পাহাড়, ষ্টেশনের কাছে রামশিলা পাহাড় শুধু দেখতে পেলে, ড্যাডিকে নাম জিগ্যেস ক'রে। বুদ্ধগয়ার মন্দির দেখা গেল না, দেখতে ইচ্ছে ছিল। সে নাকি অনেক দূরে নিরঞ্জনা নদীতীরে।

কিন্তু ষ্টেশন পার হ'য়েই পেলে ফল্গু নদী, তার কূলে আবার পাহাড়ের মালা।

তারপর কী জঙ্গল, কী জঙ্গল, বাঘ-থাকার জঙ্গল।

গুজান্ডির টানেল সে ভুলবে না, ট্রেণ ঢুকতেই কামরার ঘুটঘুটে অন্ধকার দিনের বেলা।

গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইন। এদিকেও কত কি দেখবার জিনিস! শোণ-ব্রীজ—বালি, বালি, বালি, জল, বালি, বালি, বালি, দুধের মতন সাদা ঢেউখেলানো বালি। কতক্ষণ, কতক্ষণ ধরে!

আর বিকেলে কি পেলে? সে কি ভাবতে পেরেছিলো এ পথে পাবে! এমন আশ্চর্য্য ভাবে? অপ্রত্যাশিত?

ড্যাডি, ওটা কি, পাহাড় নয়, যেন মেঘ করেছে আকাশ জুড়ে!

ড্যাডি একটু ইংরেজী কায়দায় বাঁকিয়ে বললে, পরাশনাথ হিল্।

পরেশনাথ? ঐ পরেশনাথ? চার হাজার বছর আগে সাধু পরেশনাথ যেখানে তপস্যা করেছিলেন? মেঘ জমে আছে যার কোলে কোলে। মাথার ওপরের মন্দির কখনো দেখা যায়, কখনো যায় না। নীচে থেকে ওপর পর্য্যন্ত গহন গভীর অরণ্য। তোপ-চাঁচিলের কোথায় রইলো দেখা গেল না।

পরেশনাথ লাইনের সঙ্গে সঙ্গে চলে। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হয়ে যায়, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এঁকে-বেঁকে যায়, ইসরি, পরেশনাথ ষ্টেশন কখন চ'লে গেছে, গোমো ষ্টেশন পার হ'য়ে গেল, তবু পরেশনাথ পাহাড় শেষ হয় না, দিগন্ত থেকে দিগন্ত অবধি ছড়ানো, পাহাড়ের গায়ে পাহাড়, তার গায়ে পাহাড়, হঠাৎ আগেকার বাংলার শ্যামল প্রান্তরে কবে মাথা তুলেছিলো, এখন পড়েছে বেহারে। এখানে যদি একজন ওর সমবয়সী বান্ধবী থাকত তবে কত কথাই মীরা কইত! কত কথাই তার মনে আসছে! ড্যাডির কাছে ত বলা যায় না। ড্যাডি এদিকে মোটেই না চেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে পড়ছে। পরেশনাথ দেখায় তার কোনো আগ্রহই নেই।

জীবনটা যদি শুধু এমনি হত—শুধু চলা আর চলা—যাকে বলে পান্থ, যাযাবর, দেশে-দেশে নিত্যনতুন ছবি দেখতে দেখতে খালি এগিয়ে চলা—ফিরে না আসা, ভগবানের সৃষ্টি, মানুষের সৃষ্টি চোখ ভ'রে দেখা আর মনে রাখা, তাহ'লে কি এমন মন্দ হ'ত? কিন্তু তা ত' হয় না! থামতে হয়। কাজ করতে হয়। সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হয়। ঘরে থাকতে হয়, সমাজে বাস করতে হয়।

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন,
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।

কবি বলেছেন। কিন্তু ঘোড়া ছুটিয়ে উটের পিঠে যে নিষ্ঠুর মরুডাকাত বেদুইন যায়, তার যাওয়াটা সত্যি কিন্তু মনের মধ্যে কি আর কবির মতন ভাব জাগে?

সে কি উপভোগ করতে পারে এই ধূলোর ঝড় উড়িয়ে যাওয়ার স্বাধীনতার আনন্দকে? কি ক'রে পারবে?

পরেশনাথ যখন পার হল, তখন ত' গাড়ীর সমস্ত যাত্রী অন্য দিকে চেয়ে অন্য কথা ভাবতে ভাবতে চ'লে এলো। তারা ত সাধারণ অশিক্ষিত যাত্রী নয়, ফার্ষ্ট ক্লাসের ধনী ও মার্জ্জিতরুচির যাত্রী! চার হাজার বছর আগের দিনে তাদের কেউ ত' ফিরে গেল না!

স্বর্গদ্বার পার হ'য়ে ছোট-বড়ো অসংখ্য বাড়ী, এখন হয়ত লোকে ভর্ত্তি। সমুদ্রের ঢেউ-এর সোনালী বালিতে লুটিয়ে পড়ার বিরাম নেই, সেই অশ্রান্ত কল্লোল কত দিন শোনেনি মীরা!

তার বাবার ওখানকার কাজ যদি শেষ হ'য়ে যায়, তাহ'লে হয়ত দেশের বাড়ীতে ফিরে যাবে। আর পুরীতে থাকবার কোনো দরকারও হবে না, সুবিধাও হবে না। সেদিন কি হবে মীরার? সে কি আর ফিরে যেতে পারবে না, ফিরে যেতে পারে না তার জীবনের জন্মভূমিতে? চিরপরিচিত সমুদ্র-হাওয়ার দেশে, কলকাতায় যার নাম দখিণ হাওয়া?

অত ভাবতে পারা যায় না। তার মনে হয়—

ভেসে যাক্ জীবন-তরী
ভেসে যাক্ অথৈ গাঙে
দেখা যাক্, কোথায় বা কূল
গড়ে, আর কোথায় ভাঙে!

পথে লেমোনেড্ খাবার ইচ্ছে হয়েছিলো। কোথাও পেলে না। আইস্ক্রীম সোডা, ভিমটো, কোকাকোলা আছে, লেমোনেড্ নেই।

কিন্তু কলকাতায়? তুমি যা চাও।

আবার সেই বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, রেনিপার্ক, কাঁথির পিসিমা।

আবার সেই অফুরন্ত আরাম। রোদ-লাগানো নেই, ট্রেণ ছেড়ে যাবার ভয় নেই, অনিয়ম নেই। নতুন নতুন জিনিস দেখার আগ্রহের মধ্যে শরীরের ওপর যে অত্যাচার হ'য়ে যায় অজান্তে, ক্লান্তিকে চেপে রাখবার যে পরিশ্রম হয় মনের অগোচরে এখানে সে সব কিছুই নেই, ঘড়ির কাঁটায় মাপা নিশ্চিত জীবনযাত্রা।

আউটরাম বুকে গঙ্গার বুকের ওপর ভাসছে, সমস্ত হোটেলটা। মৃদু তরঙ্গে আস্তে আস্তে দুলছে সন্ধ্যার অস্তরাগের সামনে। কেক্ আর স্যাণ্ডউইচএ কামড় দিতে দিতে শহরের মাটি ছেড়ে জলের ওপর বসে থাকার একটা অনুভূতি শুধু শহরের মাধুর্য্যকেই বাড়িয়ে তোলে।

ডাইনিং টেবলে বসে যে জিনিস যেমন লাগে, তাই জার্ম্মাণ সিলভারের টিফিন ক্যারিয়ারে ক'রে ভ'রে নিয়ে বিবেকানন্দ ব্রীজের মাঝখানে ব'সে খেলে আরো ভালো লাগবার কথা।

আর একটা জায়গা ঢাকুরিয়া লেক্। ক্লাবও অনেক আছে। চিড়িয়াও নাকি খুব সুন্দর। কিন্তু তার পাড়ে কি এমন দূর্ব্বাঘাস বিছানো? এমন বেঞ্চি পাতা? এমন ইলেক্ট্রিক আলো? সাপ নেই, ডাকাত নেই, এমন নিরাপদ জায়গা কি সে?

সেইখানে স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে এসে ঘাসের ওপরেই ও বসলো। আজ ফ্রক ছেড়ে শাড়ী পড়েছে, ঘাসের রঙের জর্জ্জেট শাড়ী, ঘাসে বসতেই ভালো লাগছে। ময়লা হবে? কাচাতে হবে? হোক না! এমনি ত' লুটিয়ে চলতে হয়, শাড়ীর পাড় মাটিতে ঠেকাই ফ্যাশন।

দু'জনেই চুপ ক'রে বসেছিলো জলের দিকে চেয়ে। চারি ধারে কত লোক দূরে-কাছে ব'সে আছে।

হঠাৎ একজনের গলা ওর কানে এলো—এখানে খুঁজে খুঁজে এসেছেন আমাকে ধরতে, বিকেল বেড়াতে এসে বসি ব'লে? প্রকাশকদের অসাধ্য কিছু নেই!

মীরা চেয়ে দেখলো সেই লেখক, ছড়াতে ছবিতে যার লেখা।

—এবারে আমার বই নয়, ঐ লেখকের বই-ই নিন, ভালো লেখা, চমৎকার লেখা! আমি ত পর-পর অনেকগুলি বই দিলাম আপনাদের। এবার একঘেয়ে লাগবে বাচ্চাদের। তাদের মুখ বদলাতে দিন। যে লেখক ভাবে, আমি ছাড়া আর কারুর লিখে কাজ নেই, যে অন্য লেখককে পথ দিতে চায় না, সে লেখক হবার অযোগ্য। ভগবানের আশীর্ব্বাদ সে পায় না। ভগবান বিশেষ গুণ দিয়ে লেখকদের পৃথিবীতে পাঠান দেখবার জন্যে, সমস্ত লোকের চেয়ে তার মন উঁচু কি না। যদি দেখেন, না উঁচু নয়, তাহ'লে তিনি

ক্ষমা করেন না, একথা আমি বিশ্বাস করি। সকলকে ক্ষমা করেন, লেখককে করেন না। এই আমার বিশ্বাস।

এই বিশ্বাস কুসংস্কারও হ'তে পারে ত?

আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। আমি উঠি। এই বড়ো মনের জন্যে মাইকেল মধুসূদন মহাকবি। এই বড়ো মনের জন্যেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। এই বড়ো মন নিয়েই কাজ ক'রে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র। ছোট মন নিয়ে বড়ো লেখক হওয়া যায় না। আপনি এবারের বইয়ে অন্ত আর এক জনকে সুযোগ দিলে সত্যি আমি খুসী হব। আর শুনুন, যখন তখন আমার বাড়ীতে গিয়ে ডাকাডাকি করবেন না। যখন লিখি, তখন দেখা করি না। দেখা করলে চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায়, সহজে আর জোড়া লাগে না। এইজন্যে দেখবেন, অনেক লেখক যাঁরা একতলা কি দোতলার ফ্ল্যাটে বাস করেন, সোজা যাঁদের ঘরে ঢোকা যায়, তাঁরা স্ত্রীকে বলে রাখেন বাইরে থেকে শেকল টেনে দিতে আর একটু মিছে কথা বলতে, বাবু বাড়ী নেই। দু'পোখানা বই লিখলেও আমাদের দেশের লেখকদের দুঃখ ঘোচে'না। তাঁদের একটা বই অন্ততঃ এমন সৃষ্টি করতে দিন, যাতে নাম থেকে যাবে। লেখার সময়ে প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত তাই তাঁদের কাছে মূল্যবান। আর একটু স্বতন্ত্র থাকতে চান ব'লে লোকে তাঁদের ভাবে অহঙ্কারী।

জোরে জোরে পা ফেলে মীরা তার লেখককে অদৃশ্য হ'তে দেখলো। মীরা ভাবলো, কত বই ত' লেখা হচ্ছে, সব কি স্থায়ী হচ্ছে? বিক্রী হয়ত অনেক বই হচ্ছে, কিন্তু সেগুলি কি কপালকুণ্ডলা, ঠাকুরমার ঝুলি, গীতাঞ্জলি, পথের দাবী হ'য়ে যাচ্ছে? লেখকমাত্রেরই কি গর্ব্ব করা সাজে? কত গান ত' লেখা হয়, বন্দে মাতরম্, জনগণমন কি আর কেউ লিখতে পেরেছে? আবার স্কুলের মিস মিত্রের কাছে শুনেছে, তার জেঠামশায়ের সঙ্গীতের ইতিহাস সম্পর্কে এমন পাণ্ডুলিপি লেখা আছে যে প্রকাশ হলে হৈচৈ পড়ে যেত। তা র'য়ে গেল অন্ধকারে।

সন্ধ্যার পর ও বাড়ী ফিরলো বন্ধুর গাড়ীতেই। দেখে, ওদের সামনের বাড়ী মিঃ রায়ের বাড়ীর করিডোরে ভীষণ গোলমাল। রায় সাহেব বলছে গেট আউট্। আর একজন যুবক বলছে, সেজদা, চোখ রাঙিয়ো না। আমাদের পৈত্রিক বিষয় আমাদের বুঝিয়ে দাও। তুমি সবটা গ্রাস করে ব'সে আছ।

তার জন্যে কোর্ট খোলা আছে।

[illegible]টে বসার মত আমাদের অবস্থা নয় ব'লেই তুমি আমাদের ক'ভাইকে ঠকাবে? মাথার ওপরে কি ধর্ম্ম নেই?

ড্যাম ইয়োর ধর্ম্ম। গেট আউট্ আই সে।

তবু লোকটা দাঁড়িয়ে থাকে, ফটকের দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে। আর বলে, সেজদা'—তখনো অনুনয়।

স্ স্ স্ শব্দ হয়, প্রকাণ্ড বুলডগটা চেন টানতে টানতে ঝনঝন শব্দ ক'রে চক্ষের নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটির গায়ে, কাঁধের ওপর দু'পা তুলে দিয়ে বাঘের মতন চৌকো সাদা মুখটা মুখের কাছে নিয়ে এসে জিভ বার ক'রে ভ্যাংচাতে থাকে। তখন ওর গলা থেকে কান্নার সুর বেরিয়ে আসে, সেজদা, সে যেন একটা আর্ত্তনাদ।

ওপর দাঁড়ায়। তক্ষুণি রায়সাহেব নেপালী দারোয়ানকে বলে, ফটক বন্ধ কর দেও। জলদি।

সঙ্গে সঙ্গে পথচলতি লোক পানওয়ালা বিড়িওলা স্কুল-কলেজের ছাত্র ভিড় জমিয়ে তোলে। ফটকের এধারে চেঁচামেচি শুরু হয়।

মীরারও গলা শুকিয়ে গেল। ছুটে গিয়ে ড্যাডিকে সব কথা বলতে চায়, বোঝাতে পারে না। বলে, শীগগির ফোন—পুলিশ।

এই রায়সাহেব লোকটার কী অহঙ্কার মীরার মনে পড়ে। তার মেয়ে পলি যখন-তখন এসে গল্প করে—বাপীর তিন হাজার টাকা মাইনে। অথচ মাসে পাঁচ হাজার টাকা সংসার খরচ।

মীরার জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করে, বাকী দু'হাজার কোথা থেকে আসে? সেটা কি ঘুষ?

পলির কেবলই চালের কথা। তার মাম্মির জড়োয়ার সুট, হীরের সুট, সোনার তিন সুট গয়নার কথা।

এদিকে মাম্মির চেহারা ত' একটি পেত্নী। রায়সাহেব সব সভায় থিয়েটারে ঐ বৌকে নিয়ে যায়। মেয়েও মায়ের মতন। রায়সাহেব ভাবে, মেয়ে-বৌকে সব জায়গায় নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে যদি কোনো বড় চাকরের নজর প'ড়ে যায় পলির ওপর, আর সে তার জামাই হ'য়ে যায়। তিন হাজার টাকা মাইনের শ্বশুরের লোভে। হায় রে হায়, কেউ ওদের ফিরেও দেখে না ব'লে পাড়ার মহিলা-মহলে কত হাসাহাসি। যারা হাসাহাসি করে তারাও যে সব অপ্সরী তা নয়। মীরাই বরং তাদের কাছে পরী। কিন্তু সে এ সব আলোচনায় কক্ষণো যোগ দেয় না।

আর এত যে চাল দেয় পলি, তবে ওর পড়ার মাষ্টার কেন সেদিন ওর বাপীর মোটরের কাছে এসে বলছিলো—গত মাসের মাইনেটা আজ পাব? এ মাসও ত' শেষ হ'য়ে এল।

না দেখুন, আমাদের বড়ো কষ্ট। এম, এস-সি পাশ ক'রে শুধু টিউশনিতেই সংসার চালাই। কুড়ি টাকা আপনি দেন, তা সাত টাকা খরচ হয়ে যায় বাসে। হিসেব করে দেখুন।

হিসেব করার দরকার নেই। আপনি ছেড়ে দিতে পারেন, আপনার অসুবিধে হলে ঢের মাষ্টার ঘোরাঘুরি করছে।

এম, এস-সি ফার্ষ্ট ক্লাস?

হ্যাঁ হ্যাঁ এম, এস-সি ফার্ষ্ট ক্লাস।

গাড়ী ছেড়ে দিলো।

স্কুলের বাসে উঠতে উঠতে মীরা ভাবতে লাগলো, রায়সাহেব লোকটা শুনেছে দু' বার বি-এ ফেল ক'রে তিন বারের বার পাশ করেছে আর এল-এল-বি পাশ করেছে ফেল করতে করতে। ঘটনাচক্রে আজ মোটা মাইনের চাকরী পেয়ে ধরাটাকেই সরা ভাবছে। ফার্ষ্ট ক্লাস এম, এস-সির মূল্য ও কি বুঝবে ফেল-করা লোকটা।

আর মামমি সেদিন বলছিলো, মাকে ও খেতে দেয় না। ভায়েদের যে ত্যাগ করেছে, ঠকাচ্ছে, সে তো আজই দেখা গেল।

অ্যাম্বুলেন্স এলো। ভাইয়ের অজ্ঞান দেহটা লোকজনকে দিয়ে ও তুলে দিলে অ্যাম্বুলেন্স কারে।

কেউ বললে, কুকুর কামড়েছে। কেউ বললে, কামড়ায় নি।

এখানেই তো কোনো ডাক্তার ডাকা যেত। বাইরের লোকগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কেউ বললে মার শালাকে।

কুকুরটা বাঘের মতন ডাকতে লাগলো। ঐ কুকুরকে নাকি রোজ কাঁচা মাংস খেতে দেওয়া হয়।

আহা, লোকটার কি হল ভেবে মীরার ঘুম এলো না সে রাত্রে। তার ড্যাডি মামমির কিন্তু কোনো চিন্তাই নেই। এ যেন একটা ঘটনাই নয়।

মীরার মনে কিন্তু এ ঘটনাটা বৃহৎ বীভৎস হ'য়ে দেখা দিলো, নিজের ভাইয়ের দিকে বুলডগ লেলিয়ে দেওয়া। যে নাকি টুঁটি টিপে ছিঁড়ে নিতে পারে চক্ষের নিমেষে! মানুষ এত নিষ্ঠুরও হতে পারে? এত পাজী! আসুক পলি রায়, তাকে সে আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে দেবে—তোমরা কি মানুষ?

পরদিন একটা কাণ্ড হল। কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট কলকাতায় আসছে শুনে খুব ভোরে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল রায়সাহেব। দমদম এরোড্রোমে।

ফিরে এলো হাঁড়িপানা মুখ ক'রে। ওর ড্রাইভার মীরাদের ড্রাইভারের কাছে গল্প করেছে, সে বলেছে আয়াকে, আয়া বলেছে মীরাকে—সাহেবকে নাকি এরোড্রোমে ঢুকতে দেয়নি। বলেছে, তুমি কংগ্রেসের কে?

সে যে মালা নিয়ে গেছলো, তা নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। গরীবকে এক পয়সা দেয় না, আট টাকা মালায় খরচ করেছে!

কিছুক্ষণ পরে আর একটা খবর এলো। পৃথিবীতে এত অঘটনও ঘটে! বড়ো ভাইকে একটা কড়া চিঠি লিখে নাম-সই করতে গিয়ে রায়সাহেব পড়েছে আর মরেছে।

থ্রম্বোসিস্। উনষাট বছর বয়সে। এত লাফালাফি, এত হাঁকাহাঁকি। সব শেষ।

তবু ত' পাড়ার মুখার্জী, ব্যানার্জী, বোস, ঘোষ, মিটারদের চৈতন্য হয় না! রাঁচি রোডের চকারবোর্টি বলে, আশী বছর আমার লঞ্জিভিটি।

লঞ্জিভিটি! অত দিন বাঁচবে ঐ মাতাল! মীরার হাসি পায় ড্যাডির বন্ধুদের কথা শুনে। আশী বছর বাঁচতে হ'লে সংযমী হ'তে হবে না? অমনি হবে?

কাঁখির দিদুর কাছে সে শুনেছে—সময় পূর্ণ হ'লে সকলকেই পাপের ফল ভোগ করতে হয়। নিস্তার কারুর নেই।

পলিদের বাড়ী থেকে কিন্তু কোনো কান্নার আওয়াজ এলো না। এ-সব পাড়ায় ও-সব চলবে না। মীরার মনে হল—পৃথিবী থেকে একটা পাপ স'রে গেল। কিন্তু তাইতেই কি পৃথিবী হাল্কা হল? এই বয়সেই ও দেখেছে—পাপীর সংখ্যা অগুন্তি, অসংখ্য। ভালো মানুষের সংখ্যাই যা কম।

স্কুলে মীরা ড্রয়িং ক্লাসে মন দিয়ে ছবি আঁকত। কাগজে একদিন খবর পড়লো—দিল্লীতে ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে—ছোট ছেলে-মেয়েদের কাঁচা হাতের ছবির।

ও তো একখানা পাঠিয়ে দিলে—সমুদ্রে সূর্য্যোদয়। যেমন দেখেছে, তেমনি মনে ক'রে ক'রে। প্রাণ ভরে ও আঁকলো সমুদ্রের ছবি, নীল, সবুজ, সাদা বেগুনী নানা রঙ দিয়ে দিয়ে! মনে হল—ঢেউগুলো একটার পর একটা যেন ডাকছে, কোনোটা আছড়ে পড়ছে বালির ওপরে।

ছবি পাঠিয়ে ও বিশেষ ভালো ফল আশা করেনি। কি ক'রেই বা করবে? সারা ভারতবর্ষের কত জায়গা থেকে কত ছবি আসবে। সেখানে মীরার সমুদ্রে সূর্য্যোদয় কি পাত্তা পাবে?

চিঠি এলো একদিন দিল্লী থেকে—তুমি একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছ। চেক নেবে, না নগদ নেবে লেখো।

আনন্দ হল খুব। মাম্‌মিকে ড্যাডিকে চিঠি দেখালো। তারাও উৎসাহ দিলো—কাজ করেছ একখানা।

কিন্তু টাকাটা সে কি করবে? কি কিনলে তার খুব আনন্দ হয়? রঙের বাক্স? ক্যামেরা? স্বর্ণাকলম?

দামী কলার বক্স তার আছে। ষোলোশো টাকার ক্যামেরা বাড়ীতেই আছে। পার্কার ত ক'টাই আছে।

কিন্তু এ তার নিজস্ব টাকায়। জীবনের প্রথম প্রাইজ।

চিঠি এলো হ্যাংলা প্যাংলার—দিদি, আমাদের জামা নেই, জুতো নেই, প্যাণ্ট নেই। তুমি কি এবার পুজোয় একটা কিছু দিতে পারো না? বাবার চাকরী থাকবে না। বাবা কোথা থেকে দেবেন? আমরা দেশের বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছি। কি হবে জানি না।

"স্নেহের ভাইটি হেংলু আর পেংলু—আমার প্রাইজ পাওয়া একশো টাকা তোমাদের পাঠাচ্ছি পুজোর আগেই। নিজেদের পছন্দ মতন মাপ-মতন প্যাণ্ট-জুতো-জামা কিনে যদি কিছু থাকে বাবার হাতে দিয়ো। ইতি—তোমাদের মিথ্যে-দিদি।"

এ চিঠি লিখে ওর মন যা খুসী হল, বলবার নয়। কিন্তু এত কথা ও কোত্থেকে শিখলো? বিশেষ করে মিথ্যে-দিদি। মানে বৃথাই ও দিদি হয়েছে যে ভাইয়েদের কিছু করতে পারে না!

[ক্রমশঃ।

মিনির প্রতি কাবুলিওয়ালা

ঝুমকি মুখোপাধ্যায়

বিশাল আমার দেহের ভিতর যত গভীর স্নেহ আছে,
বাংলা দেশের ক্ষুদে মেয়ে টেনে নিলে তোমার কাছে।
ছোট্ট হাতের ঝাপসা-ছাপ লুকানো আছে বুকের মাঝে,
"আবার কবে আসবে বাবা?" সেই কথাটি মনে বাজে।
সেই যে আমার সোনার মেয়ে শুধিয়েছিল [illegible]
অবাক হয়ে তারেই দেখি তোমার কর্ণা গানের সুরে।
পাঁচ বছরের ছোট্ট মিনি জ্ঞান [illegible] স্নেহের যাদু,
মুখখানি যে ফুলের মত, কথা তোমার ভরা মধু।
ঝুলি ভরা এত তো বাদাম সব এনেছি তোমার তরে,
তার বদলে মিষ্টি কথায় দিও আমার হৃদয় ভরে।
তোমার মুখের হাসির দাম আমার কাছে লক্ষ টাকা,
দেখলে পরে এত খুসি হই যায় না তাহার লেখাজোকা।
যাচ্ছি ফিরে জেলের থেকে আটটি বছর গেছে চলে,
চিনতে পেরে আবার কি গো আসবে তুমি আমার কোলে?
তোমার কথা তোমার হাসি তোমার চোখের চাহনিতে,
যারে ফেলে এসেছি [illegible]

গুল্‌বাহার —অজিতকুমার মিত্র

কন্যাকুমারী —গোবিন্দলাল দাস

॥ আলোক চিত্র ॥

জলবন্দী

খেলার মাঠে —বিমলকৃষ্ণ সরকার

পুকুর-ঘাটে —জয়দেব দত্ত

সহযাত্রী —গোবিন্দ দাস

গঙ্গাদেবীর মন্দির (গঙ্গোত্রী)
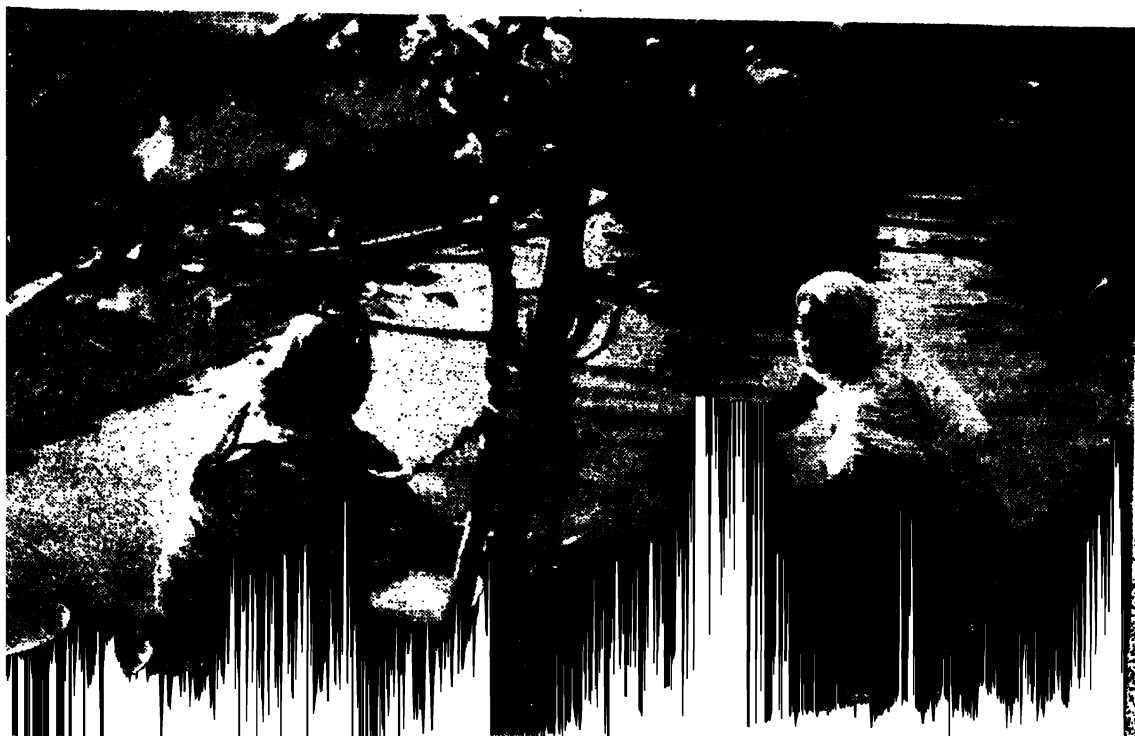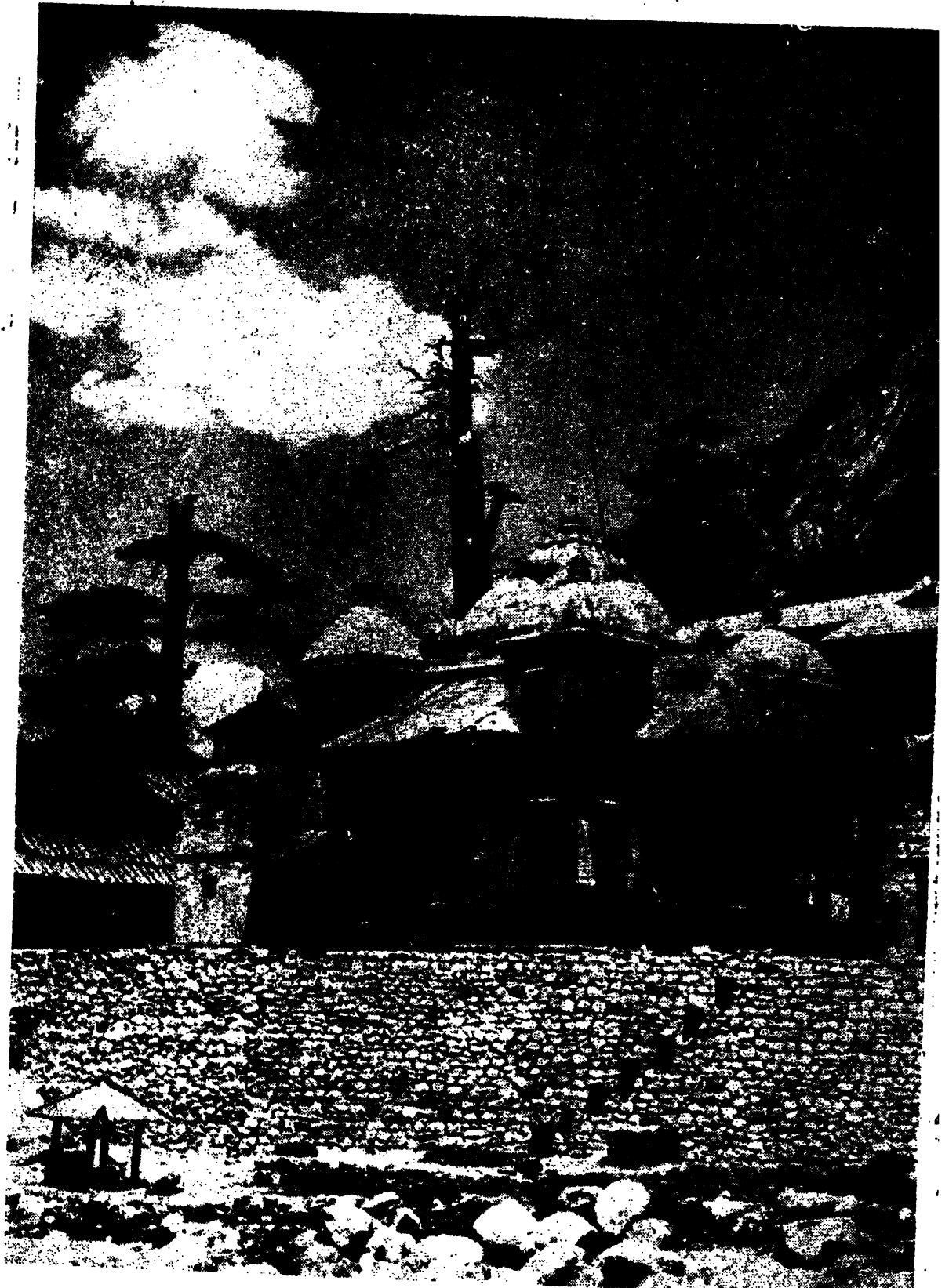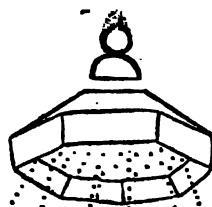
অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

শ্রীশ্রীসারদা দেবী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

শ্রীমালতী গুহ-রায়

তিন

গুরুরূপেও সারদা দেবীর এক অপরূপ রূপ আমাদের চোখে পড়ে। তাঁর আশৈশব কাহিনী যা আমরা ঠাকুরের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত জানতে পারি। তার থেকে তাঁকে আমরা স্নেহময়ী, কল্যাণময়ী, সেবাময়ী, কন্যা, ভগিনী, জায়া ও মাতারূপেই কল্পনা করতে পারি। সলজ্জ অবগুণ্ঠনবতী একান্ত স্বামি-নির্ভরশীলা ভক্তিমতী স্ত্রী বলেও ভাবতে পারি, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে এরকম গুরু-গম্ভীর জ্ঞানদাত্রী, ধর্ম্মদাত্রী, গুরুমূর্ত্তি লুকিয়ে আছে, কল্পনাও করতে পারি না।

ভবিষ্যৎদর্শী ঠাকুর কিন্তু তা জানতেন। সেজন্যই তিনি বলে গেছেন, 'সারদা জ্ঞানদাত্রী সরস্বতী। ও এবার রূপ ঢেকে জ্ঞান দিতে এসেছে।' সারদা দেবীকেও তিনি বলেছিলেন, 'দেখ গো কলকাতার লোকগুলি যেন অন্ধকারে পোকার মতই কিলবিল করছে। ওদের কিন্তু তুমি দেখো।'

বিস্মিতা সারদা দেবী বলেছিলেন, 'সে কি গো! আমি যে মেয়েমানুষ! আমি আবার তা কি করে পারবো?'

পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে ঠাকুর তাঁকে জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি আর কতটুকু করেছি? তোমাকে তো এর চেয়ে অনেক বেশী করতে হবে।'

ঠাকুরের এসব বাণী পরিহাসচ্ছলে বলা কথা ছিল না। সারদা দেবীর জীবনে তা যে কি ভাবে ফলে গিয়েছিল, তা তার পরবর্ত্তী জীবন-কাহিনীর সঙ্গে যাঁরাই পরিচিত আছেন, তাঁরাই জানেন।

ঠাকুরের জীবদ্দশায় সারদা দেবী কিন্তু অধিকাংশ সময় অবগুণ্ঠিতা ভাবেই কাটাতেন। ভক্তদের সঙ্গে যে তাঁর খুব একটা নিকটতম সম্পর্ক বা ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল, এমন জানা যায় না। ঠাকুরের দেহাবসানের পরই বৃন্দাবনে অবস্থানকালে তাঁকে আমরা সর্ব্বপ্রথম গুরুরূপে দেখতে পাই।

বৃন্দাবন থাকাকালে, এক দিন নাকি তিনি স্বপ্নে ঠাকুরের কাছ থেকে আদেশ পান, ঠাকুরেরই ভক্ত যোগেনকে দীক্ষা দিতে হবে।

'যোগেনকে আমি দীক্ষা দিই নি তুমিই ওকে দীক্ষা দিও' ঠাকুরের এই আদেশে বিভ্রান্ত বোধ করেছিলেন সারদা দেবী। প্রশ্ন করেছিলেন তাঁকে, 'আমি যে মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানি না গো, দীক্ষা কি করে দেবো? আর যোগেনের মুখেও তো কোন দিন বের হইনি, লজ্জা করবে যে।'

ঠাকুর বলেছিলেন, 'মন্ত্র যা দেবে সময়ে আমিই বলে দেবো। আর যোগেনকে লজ্জা কিসের? যোগীনমাকে না হয় তাহলে সঙ্গেই রেখো।'

যোগেনকে দীক্ষা দিতে অসম্মত হবার আর উপায় রইল না। কাজেই সারদা দেবী যোগেনকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, সে পূর্ব্ব-দীক্ষিত কি না এবং দীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে তার কি মত। যোগেন জানালো সে এযাবৎ দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়নি। ঠাকুরের কাছেই তার দীক্ষা নেবার কথা ছিল। কিন্তু স্বপ্নে সে ঠাকুরের আদেশ পেয়েছে সারদা মায়ের কাছেই দীক্ষিত হতে—কাজেই মা যদি দয়া করে তাকে দীক্ষা দেন তার মনোরথ পূর্ণ হয়।

যোগেনের এ উত্তরে সারদা দেবী স্তম্ভিত। ঠাকুরের লীলা বুঝতে বাকী থাকে না। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত যোগেনকে দীক্ষা দেওয়াই স্থির করলেন তিনি। মন্ত্র-তন্ত্র জানেন না বটে, কিন্তু ভয় কি? ঠাকুরই তো বলেছেন, যথাকালে শিখিয়ে দেবেন।

দীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দিনে যোগেনকে তিনি ডেকে পাঠালেন স্নানান্তে তৈরী হয়ে আসতে। নিজেও স্নানান্তে ঠাকুরের দেহাবশেষ রক্ষিত কৌটাটি নিয়ে ঠাকুরের ছবির কাছে এসে আসন পেতে বসলেন কিছু ফুল নিয়ে। সাথে রইলো যোগীনমা, তাঁরই একজন স্ত্রী-ভক্ত।

যোগেন এসে তার জন্য বিছানো নির্দ্দিষ্ট আসনটিতে মায়ের সম্মুখে বসলো। সারদা দেবী ধ্যানস্থ হ'লেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ধ্যানেই তিনি মন্ত্র পেলেন যা নাকি যোগেনকে দিতে হবে। যোগেনের কানে মন্ত্র বলতে গিয়ে তিনি এমন চেঁচিয়ে ওঠেন যে, বাইরে যারা ছিল পরিষ্কার শুনতে পেল সে মন্ত্র। অথচ সারদা দেবী কিন্তু অত্যন্ত মৃদুভাষিণী ছিলেন। অত জোরে শব্দ করে কথা বলতে কেউ তাকে কোন দিন শোনে নি। ভাবের ঘোরেই ঐ রকম হয়েছিল।

যোগেনের দীক্ষাদান থেকেই সারদামায়ের জীবনে দীক্ষাদান ব্রতের সুরু। তারপর তাঁর এ ব্রত যে কত দিন ধরে কত অগণিত ভক্তদের কল্যাণ সাধন করেছে তার যেন কোন সীমা পরিসীমা নেই। দীক্ষাদান সময়ে সারদা দেবীর সম্পূর্ণ এক নূতন রূপ হ'ত। সে যেন এক অন্তর্মুখী দেবীমূর্ত্তি। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে ও বিস্ময়ে অন্তর যেন নুইয়ে পড়তো। তাঁর সদা-প্রশান্ত হাস্যময়ী আননে এক গাম্ভীর্য্যের ছাপ পড়তো। এ সারদা দেবী যেন সে সারদা দেবীই ন'ন, যাকে সকলে সর্ব্বসময় দেখে। এ যেন নূতন অন্য কেহ! কিন্তু দীক্ষাদান অন্তেই আবার অতি সহজ অতি পরিচিত আনন্দময়ী কল্যাণময়ী মাতৃরূপখানি তাঁর প্রকাশ পেতো।

গুরু হিসাবে সারদা দেবীর দীক্ষাদান প্রণালীটিও অপূর্ব্ব ছিল। স্থান কাল, জাতি, বর্ণ এসবের কোন বিচার ছিল না, সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাবে অনুষ্ঠানটি হ'ত। কোন বাধা-নিষেধের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভক্তিসম্পন্ন ভক্তকে তাঁর কাছে আসতে হত না। তাদের জন্য তাঁর দরজা সর্ব্বদাই অবারিত ছিল। ঠাকুরের একখানা ছবির সম্মুখে সামান্য কিছু ফুল ও পূজার উপচার নিয়েই তিনি দীক্ষা দিতে বসতেন। সময়ে আবার কোন উপচারেরও প্রয়োজন

হয় না। যখন যেমন, তখন তেমন, যাকে যেমন, তাকে তেমন, যেখানে যেমন, সেখানে তেমন—তাঁর প্রচারিত এই নীতিবাক্যই তিনি তাঁর দীক্ষাদান ব্যাপারে সম্পূর্ণ প্রয়োগ করতেন।

মন্ত্রদীক্ষা সারদা দেবীই দিতেন বটে, কিন্তু অনুষ্ঠানের পর দীক্ষিত ভক্তকে তিনি ঠাকুরের ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে দিতেন 'ঐ যে তোমার গুরু। প্রণাম কর।'

সে প্রশ্ন করতো—'তবে আপনি কে?

উত্তরে বলতেন 'আমি কিছুই না—বাবা; তিনিই সব।'

এমনি সব ঘটনা থেকে লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যায়, তাঁর মধ্যে অভিমানের লেশটুকুও ছিল না। তার গোটা জীবনখানিই যেন 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু' রবে নীরবে বয়ে চলতো। গুরুরূপে জ্ঞানদাত্রীরূপেও তার কোন অন্যথা হয়নি।

ভক্তের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল মন্ত্রতন্ত্র কিছুই নয়, আসল দরকার হচ্ছে ভক্তিযুক্ত শুদ্ধ অন্তরবিশিষ্ট ভক্তের, আর তার আত্মসমর্পিত দীন ভাবটির। ভক্তির মধ্য দিয়েই ভগবান ভক্তের হৃদয়ে আশ্রয় নেন। সাধারণতঃ সারদা দেবী স্নান ও উপাসনান্তে সকালের দিকে দীক্ষা দিতেন। কিন্তু আগ্রহযুক্ত ভক্তের প্রয়োজন অনুসারে তিনি এ নিয়মের ব্যতিক্রম করতেন। শোনা যায় একটি কুলি ভক্তকে তিনি তার দীক্ষার জন্য আকুলি বিকুলি দেখে মুসলধারার বৃষ্টির মধ্যে মাথায় ছাতার আবরণ নিয়ে রেলওয়ে ষ্টেশনেই দীক্ষা দিয়েছিলেন সামান্য একটু বৃষ্টির জল সম্বল করে।

কারুকে খোলা ময়দানে, কারুকে ঘরে, কারুকে বারান্দায় বসেও তিনি দীক্ষা দিতেন। শোনা যায়, আগ্রহাতিশয্য দেখে তিনি তাঁর এক বাস্যসঙ্গিনীকে নাকি পাশাপাশি শুয়েও দীক্ষা দিয়েছেন। যে পবিত্র শক্তিসম্পন্ন মন্ত্র গ্রহণের আধারই অন্তর, সেই অন্তর যখন মন্ত্রগ্রহণে উন্মুখ ও আগ্রহান্বিত হয়, তখন কোন কারণেই তার প্রাপ্তিতে বাধা হতে দেওয়া উচিত নয়। শুদ্ধ অশুদ্ধ এবং স্থান কাল বা পাত্রাপাত্র বিচার তো শুধু অন্তরের ভক্তি ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য। কাজেই কোন পবিত্র উন্মুখ ভক্তহৃদয় কখনোই স্থান কাল শুদ্ধি অশুদ্ধির জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। কর্ষিত জমিই বীজ বপনের উপযুক্ত স্থান। সারদা দেবীর ছিল এই অভিমত।

মৃতাশৌচে সাধারণতঃ দীক্ষাদান নিষিদ্ধ। কিন্তু আধার বিশেষে এ প্রচলিত প্রথাকেও তিনি সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে কুণ্ঠিত বোধ করতেন না, এমনি সংস্কারমুক্ত ছিল তাঁর মন। ঠাকুরের জন্মতিথিতে এবং কাশীতে তিনি মন্ত্র দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু আধার বিবেচনায় এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম করেছেন তিনি।

দীক্ষাদান কালে যদিও সারদা দেবী ধ্যানযোগে ভক্তদের ইষ্টমন্ত্র জেনে নিতেন তবু নিঃসন্দেহ হবার জন্য তাদের কাছেও জিজ্ঞাসা

করে জানতেন, তারা শৈব কিংবা শাক্ত কিংবা বৈষ্ণব। সময় সময় কোন কোন ভক্ত তাঁকে পরীক্ষা করার জন্ত ভুল বলতেন কিংবা বলতেন 'তুমিই জেনে নাও'। সারদা দেবী তাদের সম্বন্ধে ধ্যানে যা জানিতেন তা সব সময়েই ঠিক হত। ফলে বিস্মিত ভক্তদের ভক্তি আরো বেড়েই যেতো।

কখনও আবার পূর্ব্বদীক্ষিত ভক্তদের ইষ্টমন্ত্রও তিনি বদলে দিতেন। তাদের বলতেন, 'তোমাদের ভালর জন্তই বলছি, এইটি করে দেখ। এতে অনেক ভাল ফল পাবে।' অনিচ্ছাসত্ত্বে তারা সারদা দেবীর আদেশ পালন শুরু করে, পরে দেখতে পেতো ঐ মন্ত্রেই তাদের কল্যাণ হয়েছে, তারা প্রকৃত শান্তি পেয়েছে।

অনেক ভক্ত আবার স্বপ্নেও তাঁর কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছে। সেই সব ভক্তেরা হয়তো কখনোই সারদা দেবীকে দেখেনি, এমন কি তার ছবিও নয়। তারা জানতেও পারতো না স্বপ্নদৃষ্ট দেবীমূর্ত্তি কে। পরে যখন তারা সারদা দেবীকে দর্শন করতো তাদের স্বপ্নে-দেখা মূর্ত্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখে পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হ'ত। তারা আবার সারদা দেবীর কাছে গিয়ে মন্ত্র নিতে চাইলে তিনি পরিষ্কার বলতেন 'কেন? মন্ত্র দিয়েছি তো!' তাদের আর কোন রকম সন্দেহের অবকাশ হ'ত না। কোন সময় সারদা দেবীই তাদের কারুকে হয়তো পূর্ণদীক্ষা দিতেন ও জিজ্ঞাসা করতেন 'কেমন গো, মিলছে তো?' স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্রের সঙ্গে সত্যিই কোন অমিল পাওয়া যেতো না। মায়ের লীলা এমনি করেই ভক্তদের মাঝে প্রকাশ পেতো।

অন্তত্র দীক্ষিত কোন ভক্ত নিজ গুরু সম্বন্ধে শ্রদ্ধাহীন হয়ে সারদা দেবীর কাছে এলে, তিনি তার গুরু সম্বন্ধে শ্রদ্ধাভক্তি যাতে বাড়ে তারই উপদেশ দিতেন। বলতেন 'গুরুতে শ্রদ্ধা হারালে চলে না'। আবার কখনো তিনি উপগুরু হিসেবে অনেক ভক্তদের দীক্ষাও দিতেন। গুরুর সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ভক্ত যখন বিভ্রান্ত হয়, তখন তাকে তো তিনি ফিরিয়ে দিতে পারেন না? ভিন্ন বর্ণ ভিন্ন আশ্রম বলে কোন ভক্তকে তিনি বিমুখ করতে পারতেন না।

তিনি বলতেন 'সব মতেরই লক্ষ্য এক, পথও একই।' সবাইকে তিনি বলতেন 'আলস্যে সময় নষ্ট করো না, জগতের হিতের জন্ত ব্রত গ্রহণ কর, কাজ কর।' আর বলতেন, 'সংসারে চলার রীতি বা নীতি কোন একই নিয়ম অনুসারে চলতে পারে না। প্রয়োজন অনুসারে তার রূপ বদলায়। সর্ব্ব অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে চলার মধ্যেই রয়েছে শান্তির পথ। সর্ব্ব অবস্থাকে নিজের মতে গড়ে তোলা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর সকল সময় হয় না।'

এক গৃহীভক্ত সারদা দেবীকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সন্ন্যাস না নিলে শুনি মুক্তি নেই, তবে কি মা আমরা সংসারীরা মুক্তি পাবো না?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন 'সন্ন্যাস কিন্তু শুধু গেরুয়াতেই আছে বাবা? গৃহীরও যে সন্ন্যাস রয়েছে। মুক্তি-সন্ন্যাস তাদেরও আছে। তা হচ্ছে অন্তর-সন্ন্যাস। তাদের যদি অন্তর-সন্ন্যাস ফুটে ওঠে তবে বাইরের সন্ন্যাস কোন দরকার করে না।'

যে সব গৃহীদের মন আছে সময় পান না বলে অবসাদ বোধ করেন, তাদের তিনি বলতেন 'যতটুকু সময় পাবে ততটুকুই মন দিয়ে করো। মন থাকলেই [illegible]ল। পরে তো ঠাকুরকে আসতেই হবে।'

অনেকে এসে অভিযোগ করতো, জপ ধ্যান করে কোন আনন্দ পায় না ব'লে। নীরস লাগে একঘেয়ে লাগে ব'লে। তাদের তিনি বলতেন 'নদীতে ঝাঁপ দিলেও শরীর ভেজে, আর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেও ভেজে। ঐ ভেজাটুকু দিয়েই কথা। মন তোমাদের লাগুক আর না লাগুক জোর করেই করতে হবে বাবা।'

এমনি ভাবে বিভিন্ন ধরণের নৈরাশ্য নিয়ে এলেও মার কাছে এসে সব ভক্তরাই বিভিন্ন ধরণের উৎসাহবাণী পেয়ে উৎসাহ পেয়েই ফিরে যেতো। সারদা দেবীর কাছে যেন সকলের জন্ত পৃথক পৃথক ভাবে মুক্তির ও শান্তির ব্যবস্থাটুকু রাখা থাকতো। পথ খোলা, চললেই হয়। পথের প্রান্তে পৌঁছাবেই। এই ছিল তাঁর অভয়বাণী। বলতেন ভয় নাই এগোও। পথ পাবে, সিদ্ধিও আসবে। কি গৃহী কি সন্ন্যাসী কেউ পড়ে থাকবে না। তবে এটা ঠিক যে মুক্তির পথ সহজ নয়—চলতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে। বসে থাকলে চলবে না। সরল সোজা কথার মধ্য দিয়ে শিষ্যদের তিনি অনুপ্রাণিত করবার অনলস চেষ্টা করতেন। কোন নিরুৎসাহ বাণী বা জটিলতা দিয়ে তাদের পথকে তিনি কণ্টকাকীর্ণ করেন নি কোন দিন। আত্ম-ত্যাগের জন্ত সকলকে উৎসাহ দিতেন সর্ব্বদা। জড়তা না কাটালে জীবের ক্লীবত্ব ঘুচবে না—এই বুঝাতে চাইতেন তিনি সকল ভক্তদের বারে বারে। গুরুর কঠোরতা নিয়ে সারদা দেবীকে কেউ কোন দিন চলতে দেখেনি, স্নেহময়ী মায়ের অন্তর নিয়েই তিনি গুরুর আসনেও বসেছিলেন। সরল সহজ পথ ধরে ভক্তরা যাতে অগ্রসর হতে পারে তার চেষ্টা ছিল তাঁর নিরন্তর। কঠোর সংযম পালন বা কঠোর ব্রত কিংবা উপবাসই যে ইষ্টপথের একমাত্র পথ নয়, তাও তিনি উপদেশ আচরণে ভক্তদের বোঝাতেন।

তিনি বলতেন, যে কোন সংস্কারকেই মূল কেন্দ্র করে কোন ধর্ম্মের বিকাশ হতে পারে না—বরং সংস্কারমুক্ত হলেই মুক্ত গবাক্ষে আলো প্রবেশের মত মুক্তির আলোর সন্ধান পাওয়া সম্ভব। সারদা দেবীর জীবনে নিজেই তিনি সর্ব্ব-প্রচলিত সংস্কারমুক্ত হয়ে কি ভাবে চলতেন তা ক্রমেই আমরা দেখবো।

ভক্তদের মধ্যে যে সকলেই প্রকৃত আধার নয় বা সুকৃতিসম্পন্ন নয়, তা বুঝবার ক্ষমতাও সারদা দেবীর মধ্যে আশ্চর্য্য রকম ছিল। তিনি বলতেন, কারুকে দীক্ষা দিতে বসে মন্ত্র যেন সহজে পাওয়া যেতে চাইতো না। অনেক চেষ্টা অনেক কষ্ট করেই তা মিলতো। আবার তারা যখন প্রণাম করতো শরীরে যেন কেমন জ্বালাবোধ হ'ত। অথচ অন্তদের বেলায় বেশ সহজে মন্ত্র পাওয়া যেতো, কোনই কষ্ট হত না আর তারা প্রণাম করলেও শরীর স্নিগ্ধ বোধ হ'ত। যাদের প্রণামে কষ্ট পেতেন, সারদা দেবী গঙ্গাজল দিয়ে নিজ পা ধুয়ে ফেলতেন কিন্তু তাদের কোন দিনও বাধা দিতে পারতেন না।

ঠাকুরের কিন্তু দীক্ষাদান ব্যাপারে রীতিমত বাছ-বাছাই ছিল। ভক্ত নির্ব্বাচন না করে তিনি কখনো দীক্ষা দিতেন না। সারদা দেবীর অপরূপ মাতৃভাবে কোন বাছ-বিচার স্থান পেতো না। ধুলো মেখে ছেলে এলে মা কি তাকে কোলে নেয় না? এই ছিল তাঁর কথা। কাজেই তাঁর গুরুভাবের সঙ্গে এই মাতৃভাবের সংমিশ্রণ জগতের অশেষ কল্যাণে নিয়োজিত হতে পেয়েছিল। বিপথগামী অনেক ভক্ত সন্তানই তাঁর কাছ থেকে পথের দিশা পেয়ে ধন্ত হয়েছিল।

অবশ্য সারদা দেবীকে যে এজন্ত ভক্তদের কত রকম অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল তার ঠিক ছিল না। দিনের অবসর রাত্রির বিশ্রাম টিক পর্য্যন্ত ভক্তদের জন্ত তাঁকে বিলিয়ে দিতে হ'ত।

ভক্তদের মধ্যে কোন সময় অসময়ের জ্ঞান ছিল না, তাদের মতিগতি বড় একটা স্থির থাকতো না। মা যাতে তাদের মনে রাখেন তার জন্ম তাদের অন্তরে একটা আকাঙ্খা থাকতো। একবার একটি ভক্ত সারদা দেবীকে প্রণাম করতে গিয়ে এমন জোরে তাঁর পায়ে মাথা ঠুকে দিল যে, তিনি যন্ত্রণায় বিবর্ণ হয়ে যান। তার অসাবধানতার জন্ম ভক্তটিকে ভৎ'সনা করলে সে হাসিমুখে জানায় যে, অসাবধানতা বশে ঐ ঘটনা ঘটেনি। সে ইচ্ছা করেই ওরকম করেছে। যাতে মা তাকে তাঁর সহস্র ভক্তের মধ্যে হারিয়ে না ফেলেন। মার স্মরণপথে থাকার কি অভিনব পন্থা! এরকম ধরণের কত যে রকমারী অত্যাচার মাকে হাসিমুখে সহ্য করতে হতো, তা বলে শেষ করা যায় না। ধরিত্রীর মত অসীম সহ্যশক্তিশালিনী সারদা দেবীকে একদিনের জন্মও ধৈর্য্য হারাতে শোনা যায়নি। সন্তানদের জন্ম মা ভৈঃ মন্ত্র নিয়ে অবারিতদ্বারে অবস্থান করতেন তিনি। শ্রান্তি ক্লান্তি অবসাদ যেন পরাজয় মানতো তাঁর কাছে। কোন মনুষ্যশরীরে যে এরকম গুরু পরিশ্রম ও অত্যাচার সহ্য হয় তা সহসা যেন ধারণা হতে চায় না। যখনই সময় পেতেন, রাত্রি-দিন বসে বসে তিনি মালা জপ করতেন। ভক্তরা রাগ করতো 'মা, এখনো তোমার জপই চলছে? তোমার অসুখ করবে যে! এত কি কর তুমি সারা দিন-রাত বসে?'

'অসুখ করবে না রে! আমার যে কত ছেলে কত দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। কে জানে, ওরা সব ঠিক মত করতে পারছে কি না! কাজেই ওদের জন্ম কিছু কিছু করে রাখি।' হাসিমুখে বলতেন তিনি ভক্তদের। তারা বলতো 'তোমার ছেলে-মেয়ে তো অগুণতি। সকলকে কি তুমি চেন, না জান? তাদের নামে নামে জপ—তুমি কি করে কর?'

'তা বাবা, যাদের নাম মনে আসে না মুখ মনে পড়ে না তাদের ভার আমি ঠাকুরের উপর দিয়ে দি, বলি ঠাকুর! আমার অনেক ছেলে-মেয়ে নানা যায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের নামও ভাল করে জানি না। কিন্তু তুমি তো সবই জানো। তুমিই তাদের দেখো। তুমিই তাদের কল্যাণ করো।'

এ স্নেহময়ীর স্নেহের কি কোন পারাপার আছে? সাধারণ ভক্তদের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁর সরল সহজ ও সস্নেহ আচরণে এবং সহজ কথাবার্তা শুনে মনে হ'ত তিনি বোধ হয় কেবল ভক্তিকেই প্রাধান্ত দিয়ে তাঁর ভক্ত সন্তানদের ধর্মপথে অগ্রসর করে দিতেন। অন্য কোন পথ সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন না। কিন্তু ধর্মগুরু হিসাবে সারদা দেবীর স্থান অনেকটাই উচ্চে। কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় সাধন করে তিনি জ্ঞানযোগের চরম শীর্ষে উঠতে পেরেছিলেন। ভক্তদের প্রতি উপদেশ দেওয়া কালে তিনি আধার বিবেচনা করতেন বলে সহসা বোঝা যেত না।

সাধনের বিভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধেও তিনি যে কি রকম গভীর জ্ঞান রাখতেন, তা তাঁর বিভিন্ন শিষ্য-শিষ্যাদের প্রতি উপদেশ থেকেই বোঝা যেতো। শিক্ষিত ভক্তরা তাঁকে জটিল প্রাণায়াম সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন। তিনি তাদের বলতেন—'প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য হচ্ছে চিত্ত স্থির করা। সেই চিত্ত যদি নিজ হতেই স্থির হয়, তবে আর অনাবশ্যক প্রাণায়ামের দরকার কি? আর যদি করতে ইচ্ছা হয় তবে অল্প-স্বল্প করাই ভাল। বেশী করলে মাথা গরম হবে।'

[illegible] নিয়োগ করে দিতেন।

আসন-মুদ্রা সম্বন্ধেও তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলতেন, দুই তিন ঘণ্টা এক সঙ্গে যে আসনে সহজে বসা যায়, কষ্ট হয় না, তাই আসন। পা ঝিমঝিম করলে পা বদলে নিতে হয়। অন্যান্য নানা রকম যোগাসন আছে বটে, তার ভালও আছে মন্দও আছে। অনেক সময় তাতে স্বাস্থ্য উন্নতি হয় কিন্তু শরীরের দিকে মন বেশী চলে গেলে সাধনপথে পিছিয়ে যাবার সম্ভাবনা। আবার কার্য্যগতিকে ছেড়ে দিলে স্বাস্থ্যহানিও ঘটতে পারে।

স্বাধ্যায় সম্বন্ধে অনেককেই তিনি খুব উৎসাহ দিতেন। 'খুব জপ কর আর সৎগ্রন্থ পাঠ কর।' আবার কারুকে বলতেন 'শরণাগত হও। প্রেম-ভক্তি অর্জন কর।'

জপ সম্বন্ধে তিনি বলতেন, 'জপ-তপে মনের ময়লা পরিষ্কার হয়। কর্মবন্ধন কাটে, কিন্তু তার সঙ্গে যদি প্রেম ভক্তি না থাকে ভগবানকে পাওয়া যায় না। নামে রুচি চাই। জপের সাথে প্রেম-ভক্তি চাই। গোপবালকেরা তো আর জপ-তপ করে শ্রীকৃষ্ণকে পায়নি? তারা পেয়েছিল প্রেমভক্তি দিয়ে। আয় রে, নে'রে, খা'রে করে অন্তরঙ্গতার মধ্য দিয়ে। প্রেমভক্তি ও নিষ্কাম ভালবাসাই তাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির মূলে ছিল। সর্বসাধারণ যদি জপ-তপে মন না'ও দিতে পারে শুধু অন্তরে প্রেম-বৈরাগ্য রাখে, তবেই তাদের ভগবানের পথে চলা হবে।'

[ক্রমশঃ।

বর্ষায়

সুস্মিতা ঘোষ

অশ্রান্ত বর্ষণের শ্রান্তি নেমে আসে
কর্মহীন প্রহরের শূন্য অবকাশে।
সায়াহ্নের ম্লানতায় ধূ-ধূ করে মন,
বাতাসের সিক্ত স্পর্শে জাগে এক
অনাগত বিচ্ছেদের করুণ বেদন।
বহু প্রেমে ফুটে-ওঠা দিনগুলো মোর
রঙীন লাবণ্য নিয়ে রবে শুধু
একটি প্রহর।
তার পরে ঝরে যাবে বহু বেদনায়
উত্তপ্ত তারুণ্যের শীতল কবরে
হু-হু করা শীতের হাওয়ায়।

আজ থেকে বহু দূরে সে কোন সন্ধ্যায়
এমনি বর্ষণে যদি শ্রান্তি নামে মনে,
সব শব্দ সঞ্চারে তাহার যদি থেমে যায়,
তবে সেই মহাশূন্যতায়
বিদেহী অতীতের ছায়া হবে বিকম্পিত
হারানোর তীব্র বেদনায়।
ঝাপসা প্রান্তরের পারে
চেয়ে রব অপলকে
অব্যক্ত ব্যথায় ভরা স্মৃতির সঞ্চারে।
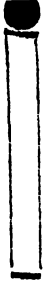
বাতিঘর

বারি দেবী

[বাতিঘর উপন্যাসের কাহিনীটি কিন্তু আমার রচিত নয়, আমি শুধু এর পরিবেশিকা মাত্র। যাঁর ডায়েরী-উপবন থেকে ঘটনার পুষ্পগুলি চয়ন করে আমি রচনা করেছি এই উপন্যাস-মালিকাটি, তিনি প্রচ্ছন্ন ভাবে এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মাঝেই আত্মগোপন করে আছেন। প্রায় বছর খানেক পূর্ব্বে একটি চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের রায় প্রকাশিত হবার পর কলকাতা মহানগরীর ইট-কাঠগুলো পর্য্যন্ত উত্তেজিত আলোচনায় মুখরিত হয়ে উঠেছিলো! সে দিনের হর্ষ, বিষাদ ও বিস্ময়মিশ্রিত উত্তেজনাপূর্ণ মহানগরীর বিচিত্র রূপের সুস্পষ্ট ছাপ আজো হয়তো অনেকের অন্তরে আছে। সেই ঘটনা আমারও অন্তরে এনেছিলো প্রবল আলোড়ন! তারপর ঘটনাচক্রেরই আবর্ত্তের মাঝে এক দিন পরিচয় ঘটলো সেই পরিবারের এক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে; আমার পরম বিস্ময় ও চরম কৌতূহলের সমাপ্তি ঘটালেন তিনি তাঁর অনবদ্য ডায়েরীখানি আমাকে পাঠ করবার জন্য দিয়ে। আসল পাত্র-পাত্রীর নামগুলো গোপন করে ডায়েরীর ঘটনাগুলো উপন্যাস আকারে সাজিয়ে, সুধীজন সমীপে পরিবেশনের অনুমতি পেলাম তাঁর কাছে।]—লেখিকা

আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগেকার এক প্রবল ঝঞ্ঝা-বর্ষণ-মুখরিত শ্রাবণ-সন্ধ্যা।

ওল্ড বালিগঞ্জের বিখ্যাত লালকুঠির এক প্রশস্ত সুসজ্জিত হলঘরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সোফা-সেটিতে জনা-দশ-বারো বান্ধব ও বান্ধবী পরিবেষ্টিতা করবী হাসি-খুসির মজলিশি নাগরদোলায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো।

জমজমাট চায়ের মজলিশে কামরাটি সরগরম হয়ে উঠেছে। মূল্যবান ঝালরী ও আধুনিক আসবাব আর বিচিত্র শিল্পসম্ভারে বিরাট কক্ষটি সুসজ্জিত। দেওয়াল-গাত্রে জ্বলছে ঝলমলে নিওন লাইট, আবার কড়িকাঠেও বিলম্বিত সাবেকি রঙিন বেলোয়ারী কাচের একশো ডালের ঝাড়লণ্ঠন। দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় মাঝে মাঝে সবেগে দুলে উঠছে ঝাড়টি; কাচগুলোতে জলতরঙ্গের টুং-টাং শব্দতরঙ্গ তুলে।

কাষ্ঠনির্ম্মিত কক্ষতলটি মূল্যবান পার্শিয়ান গালচে দ্বারা আবৃত। এক ধারে কাচের শোকেশে রক্ষিত দেশী বিলাতী নানা ধরণের বাদ্যযন্ত্র। মেঝে থেকে প্রায় কড়িকাঠ পর্য্যন্ত বিরাট বেলজিয়াম গ্লাশের আয়নায় ঘরের দু'টি দেওয়াল ঢাকা।

চওড়া সোনালী কারুকার্য্যমণ্ডিত ফ্রেমে-আঁটা পূর্ব্বপুরুষদের বিরাট বিরাট অয়েলপেণ্টিং ছবি আর বিদেশী বিখ্যাত শিল্পীদের অঙ্কিত ছবিগুলো দেওয়াল-গাত্রে বিলম্বিত। কোণে কোণে অর্দ্ধমগ্ন পাথরের ও ব্রোঞ্জের নারীমূর্ত্তি কোনো বিখ্যাত শিল্পীর অনবদ্য শিল্প-প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর, রূপোর কাশ্মীরী কারুকর্ম্মা ফ্লাওয়ার ভাসে সংরক্ষিত বসরাই গোলাপের ঝাড়, ক্রিশেনথিমাম।

মায়া দেবী মাঝে মাঝে ব্যস্ত ভাবে হলে প্রবেশ করে তদারক করছেন, সব টেবিলগুলোতে চা ও খাদ্যসম্ভার ঠিক মত পরিবেশন করা হচ্ছে কি না। আরো কিছু চাই কি না। বয়েদের ছুটোছুটিরও বিরাম নেই।

দু'-চার মিনিট অন্তর এসে তারা ধূমায়িত চা অল্প পরিমাণে পরিবেশন করে যাচ্ছে প্রত্যেকের পেয়ালায়। মাত্রায় পুরো হলে জুড়িয়ে যাবে গল্পের ফাঁকে;—সে জন্য মায়া দেবীর এই ব্যবস্থা।

জমাট মজলিশের স্তরে স্তরে সুগন্ধি চায়ের উত্তপ্ত নির্য্যাস, মজলিশকে আরো হৃদয়গ্রাহী, আরো মনোরম করে তোলার সমস্ত প্রচেষ্টা।

মজলিশ থেকে একটু পৃথক ভাবে ঘরের এক কোণঘেঁসা একটি বৃহৎ পিয়ানোর সামনে বসে, পিয়ানোতে একটি ফরাসী সুর বাজাচ্ছিলো সুদাম।···আর তার পাশের সোফাটিতে বসে বিমুগ্ধ চিত্তে শুনছিলো সুমিতা।

পিয়ানোর করুণ সুরলহরী ওদের দু'টি প্রাণকে ভাবাতুর করে তুলেছে! বিরাট কক্ষের অভ্যন্তরটিতে যখন সব-কিছু মিলিয়ে একটা মোহময় পরিবেশ রচিত হয়েছিলো,—বাইরে তখন চলেছে প্রমত্ত ঝঞ্ঝার সৃষ্টিনাশা মাতন-লীলা!

কোটি কোটি বিরহীর অতৃপ্ত আত্মার হা-হা শ্বাস যেন আছাড়ি-পিছাড়ি করছে রুদ্ধ ভবনের দ্বারে দ্বারে। কোন প্রিয়হারা দিকবধূর বুকভাঙা কান্নায় বিগলিতা ধরণী শোকে মুহ্যমান!

ঢং-ঢং করে ঘড়িতে রাত্রি আটটা বাজলো। পিয়ানোর সুরে আবিষ্ট সুমিতা হঠাৎ চমকে ওঠে। কান পেতে কি যেন শোনে···

রুদ্ধ দ্বারে ঠুক-ঠুক-ঠুক। কিসের আওয়াজ? সুদাম পিয়ানো থামিয়ে বলে—কি হল মিতা?

আবার ঠুক-ঠুক-ঠুক শব্দ!

সুমিতা চঞ্চল পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে···ঐ শোন সুদাম! কে যেন দরোজা ঠেলছে।

কৈ, আমি তো শুনতে পাচ্ছি না মিতা, তুমি বোধ হয় ঝড়ের শব্দ শুনেছো!

এবারে ঝনঝনিয়ে শব্দ উঠলো দরোজার বাইরে। ঘরের সকলেই বিস্ময়ে সচকিত হয়ে ওঠে। কে? কে? কে এলো এমন দুর্য্যোগ-ভরা রাতে?

এমন ঝড়-জলে কুকুর-বেড়ালও তো পথে বার হয় না! সুমিতা চঞ্চল পায়ে এগিয়ে গিয়ে হলের বাইরের দিকের দরোজাটা খুলে দিলো।

হু-হু শব্দে পাগলা ঝোড়ো হাওয়া প্রবেশ করলো ঘরের ভেতর। দুরন্ত বাতাসের দাপটে টেবিল থেকে ঝন্-ঝন্ শব্দে কাচ-গ্লাশের ফ্লাওয়ারভাসগুলো গড়িয়ে পড়লো। বেলোয়ারী কাচের ঝাড়ে দ্রুততালে জলতরঙ্গের বাজনা বেজে ওঠে!

দরোজার সামনেই আগন্তুক দণ্ডায়মান! গেরুয়া বসনধারী মুণ্ডিত মস্তক, হাতে দণ্ড, একজন দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন-

পুরুষ! সর্বাঙ্গ তাঁর সিক্ত; মাথা, গা বেয়ে টপ্‌টপ্ করে জল ঝরে পড়ছে।

কক্ষস্থ প্রতিটি প্রাণী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখছিলো এই অবাঞ্ছিত অনাহূত আগন্তুকটিকে।

সুমিতা অস্ফুট স্বরে বাবা! বাবা! তুমি এসেছো? বলতে বলতে ছুটে গিয়ে দু'হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে দাঁড়ালো।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে মাতৃহীনা কন্যাকে সস্নেহে বুকে টেনে নিলেন, গৃহস্বামী সোমনাথ ত্রিবেদী। মজলিশি দলটি এ, ওর মুখের দিকে চেয়ে চোখ ইশারায় বলাবলি করে,···ব্যাপার কি?

—করবী উঠে এসে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্র মেলে বললো, ও মা জামাইবাবু? আপনাকে সনাক্ত করা যায় না যে, তারপর মধুর হাস্যের সঙ্গে বলে· তবু ভালো, সন্ন্যাসী ঠাকুরের ধ্যান ভঙ্গ হল এত দিনে? এ কি? বাইরে দাঁড়িয়ে কেন আসুন, আসুন, বড্ড ভিজে গেছেন যে!

সুমিতা লজ্জিত ভাবে বলে···ওপরে চলো বাবা, ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ!

সুদাম দাঁড়িয়ে ছিল এক পাশে; এগিয়ে এসে সোমনাথের পদধূলি গ্রহণ করে বলে—ভালো আছেন কাকাবাবু? আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি সুদাম। আমার বাবা মহিম হালদার।

স্মিত হাস্যের সঙ্গে ওর মাথায় আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত ছুঁইয়ে বললেন সোমনাথ—তোমাকে চিনতে ভুল হয়নি বাবা! তবে এই পাঁচ বছরে অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে তোমার। মিতাও বেশ বড় হয়েছে দেখছি! তোমার বাবা তো এখন বৃন্দাবনেই আছেন না?

—হ্যাঁ, এখন ওখানেই তিনি বাস করছেন, মাঝে মাঝে আসেন। বিষয় সম্পত্তি এখন আমার কাকাই দেখাশোনা করেন।

করবী সোমনাথের হাত ধরে আকর্ষণ করে বলে—সব খবর পরে শুনবেন জামাইবাবু, এখন ওপরে চলুন তো! সুদাম ভাই, তুমি একটু থাকো এঁদের কাছে। আয় মিতা!

ওপরে এসে করবী উচ্চ কণ্ঠে ডাক্ দেয়—মা! ও মা! দেখো কে এসেছেন!

মায়া দেবী বাবুর্চিখানায় তখন মুরগীর রোষ্টটা চেখে দেখছিলেন, —রুমালে মুখ মুছতে মুছতে স্লিপারের চটাপট শব্দ তুলে, বারান্দায় এসে বললেন—কৈ রে, কে এসেছে?

—সোমনাথ এগিয়ে এসে যুক্তকরে নমস্কার জানিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলেন,—আমি সোমনাথ!

সোমনাথ? ও মা, কি বেশ ধরেছো বাবা? আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে বলতে থাকেন মায়া দেবী।—

কোথায় রইলি কণা মা আমার! তোর অভাবে যে সোমনাথ আমার বিরাগী হয়ে গেল। এস বাবা এস, তোমার রাজত্বি এই পাঁচ বছর আগলে বসে আছি, এখন তুমি সব বুঝে নিয়ে আমাকে ছুট দাও বাবা! তার পর ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ডাক দেন—কৈ রে, করবী কোথায় গেলি? সোমনাথকে চা দে।

—আমি চা খাই না, কিঞ্চিৎ মিছরীর সরবৎ দিন—আর রাত্রে ছানা, আখের গুড় ও একটি কলা আমার জন্ত রাখবেন।

সিক্ত বস্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্ত তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন।

আধুনিক আসবাবে সজ্জিত ঘরগুলোর দিকে একবার নিস্পৃহ ভাবে দৃষ্টিপাত করে কন্যাকে বললেন সোমনাথ—মিতু মা, আমার হোল্ডঅলে কম্বল আছে, লাইব্রেরি-ঘরে বিছিয়ে দাও তো!

সুমিতা বিস্মিত ভাবে পিতার মুখের দিকে চেয়ে বলে,—কেন বাবা? তুমি খাটে শোবে না?

—না, মা! আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি। ধরম সিং, মান সিং, কারুকে দেখছি না কেন? এরা কোথায়?

ওরা বড্ড বুড়ো হয়ে গিয়েছিলো বাবা! ভালো রকম কাজ-কর্ম্ম করতে পারতো না কি না, সেজন্ত দিদিমা ওদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন!

এখন এখানে দিদিমার বাড়ীর বেয়ারা দু'জন কাজ করে! আমাদের লোকেদের মধ্যে খালি এখনও আছে, রামভজন সিং।

সুমিতা কম্বল বিছিয়ে দিতেই মায়া দেবী ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে বলেন—একি হচ্ছে বাবা? বিছানায় শোবে না কেন?

সোমনাথ মৃদু হেসে জবাব দেন—আপনি ব্যস্ত হবেন না! আমি কম্বলেই শয়ন করি! ওতে আমার কষ্ট হয় না!

কম্বলে উপবেশন করে মিছরীর সরবৎ পান করলেন সোমনাথ।

মায়া দেবী সহাস্যে আরম্ভ করলেন এই পাঁচ বছরের নিজের কর্ম্মকুশলতার কথা।

—মিতুকে কেমন দেখছো বলো বাবা! তেরো বছরেরটি রেখে গিয়েছিলে, বেটের কোলে আঠারো হল। আই, এ, পাশ দিয়েছে, একেবারে ফার্ষ্ট হয়ে, এবারে বি, এ, পড়ছে অনার্স নিয়ে। ওর শিক্ষার দিকে সর্ব্বক্ষণ রয়েছে আমার একেবারে কড়া নজর কি না।

এই দেখ না বাবা! গান, নাচ, পিয়ানো, গিটার, সমস্ত শিক্ষার জন্তে একেবারে আলাদা আলাদা মাষ্টার রেখেছি। ছবি আঁকার হাত চমৎকার, সেজন্য সেটা যাতে ভালোরকম শিখতে পারে, সে ব্যবস্থারও আমি ত্রুটি রাখিনি বাবা!

করবী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিল-খিল করে হেসে বলে—মা গো! সব কথাগুলো এখনি বলে ফেললে? আমি ভেবেছিলাম, —একটির পর একটি দেখিয়ে ওঁকে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দেব। আর প্রত্যেকটির জন্তে সার্টিফিকেট আর বখশিস আদায় করবো, তুমি যে সব ফাঁস করে দিলে মা!

খানিক পরে লাফাতে লাফাতে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢোকে অনিল। সোমনাথের দিকে একটা বড় রকম হাঁ করে চেয়ে থেকে সোল্লাসে চিৎকার করে বলে··ঠিক! ঠিক স্বামিজীর মত আপনাকে দেখাচ্ছে জামাইবাবু! বাঃ! কি চমৎকার! আমারও যে ইচ্ছে করছে এই স্যুট ছেড়ে ঐ রকম রং-করা কাপড় আর গাউন পরি।

করবী হাসতে হাসতে ছোড়দার পিঠে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে বলে,—রক্ষে কর দাদা! এক জামাইবাবুকে দেখেই আমাদের বৈরাগ্যের উদয় হচ্ছে, তার উপর আর একটি সাধুর আবির্ভাব হলে, —আমাদের গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগবে যে।

ওঁর না হয় টাকা আছে, সাধুগিরি করা চলবে, তুমি আমি সাধু হলে লোকে মানবে কেন? পেট চলবে কেমন করে?

প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে বলেন সোমনাথ,—লোকমান্য হবার জন্ত

অনেক উপায় আছে অনিল, তার জন্যে এ বেশ ধারণের প্রয়োজন হবে না।

তার পর—দেখতে তো বেশ বড় হয়েছো দেখছি, অন্য দিকের উন্নতি কতটা করেছো?

অনিল জবাব দেবার আগেই মায়া দেবী মুখ খুললেন। সেদিকে যথেষ্ট ভালো বাবা! এম, এ, তে ফার্ষ্ট হয়ে স্কলারশিপ পেয়েছে, বিলিয়ার্ড খেলায় সোনার মেডেল পেয়েছে। আবার ওর বাপের মত শীকারেও কি দুরন্ত হাত হয়েছে বাবা!

গেলো বছরে জয়ন্তিয়া হিল-এ গিয়েছিলো বন্ধুদের সঙ্গে, সেখানে কি দুঃসাহসিক কাজ করে এসেছে! একটা হাতির বাচ্চা ধরে এনে—কুচবিহারের মহারাজাকে দিয়েছিলো,—আর বুনো শুয়োর; বাঘ, হরিণ, একগাদা শীকার করেছিলো,—

সেই যে কোন্ উইকলীতে ওর এই সব দুঃসাহসের কথা বেরিয়েছিলো, আর বন্দুক হাতে ছবিও তার সঙ্গে? দেখা না রুবি!

করবী বিরক্তি ভরে বলে—আর মা! ছোড়দার কথা বলতে আরম্ভ করলে তুমি যে একেবারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলো, আর আমাদের বুঝি কোনো গুণই নেই? যত গুণধর তোমার ঐ আদুরে ছেলেটি!

অনিল দুম করে একটা কিল বসিয়ে দেয় করবীর পিঠে;... তারপর লেক্‌চারের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলে—কোনো গুণ নেই—তোর কপালে আগুন! তা তোর কপালে তো আগুনও জুটবে না রুবি, তবে জামাইবাবুর সাকরেদ যদি হতে পারিস তো, মন্ত্র-তন্ত্র দিয়ে আগুন জ্বালাতে পারবি। তবে দেখিস যেন আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে সবাইকে পুড়িয়ে মারিস নি!

সোমনাথ এবারে উঠে দাঁড়ালেন, গম্ভীর ভাবে বলেন: মিতু! ঠাকুরঘরটা কি খোলা আছে? আমার আসনে বসবার সময় হলো।

—হ্যাঁ বাবা, ঠাকুরঘর খোলাই আছে! তুমি এস! তবে গঙ্গাজল তো নেই! কেমন ভয়-ভয় চোখে দিদিমার দিকে তাকায় সুমিতা।

উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন মায়া দেবী—সে কি রে মিতা? গঙ্গাজল নেই তোকে কে বললে? আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ সব আছে। কথায় আছে না! "যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে!" আমার ষ্টকে নেই কি? পুজোর ঘরে ছোট কাচের বোতলে গঙ্গাজল সেই কবে থেকে পুতু-পুতু করে রেখেছি যে!

লাইব্রেরী কক্ষ ত্যাগ করে, ঠাকুমার আমলের ঠাকুরঘরে প্রবেশ করলেন সোমনাথ। অসংখ্য দেবদেবীর ছবিতে ঠাসাঠাসি ঘরখানি। একটি বড় কাচের আলমারীতে সাজানো পেতলের, তামার, ভারি ভারি পূজার বাসন। শ্বেত পাথরের সিংহাসনে বিরাজ করছেন কালো কষ্টি পাথরের নাড়ুগোপাল!

গোপালের কালো গায়ে হীরে-মুক্তো বসানো সোনার গহনাগুলো ঝক্‌মক্ করছে। আড়ম্বর আছে বটে, নেই শুধু কোনো ভক্ত—পূজারীর পুষ্প-অর্ঘ্য।

সিংহাসনে জমেছে পুরু ধুলোর আস্তরণ। বোধ হয় বহুকাল পরে এ ঘর খোলা হল। ঘরের মেঝেতে কম্বলের আসন পেতে বসলেন সোমনাথ, অসীমের অন্বেষণে।

লিখতে বসে কলম আমার থমকে দাঁড়ায়। মানসপটে ভেসে ওঠে একজনের চেহারা। সেদিন আলিপুর বেলভেডিয়া রোডে ব্যারিষ্টার অনিরুদ্ধ বাসুর ড্রইং-রুমে দেখেছিলাম, একখানি বড় আকারের অয়েল পেণ্টিং ফটো।

—হাল্কা নীল রং-এর স্যুট-পরা রাইফেল হাতে এক জন সুশ্রী যুবকের চেহারা। এক মাথা এলোমেলো ঝাঁকড়া চুল, ইটালিয়ান টাইপের মুখাকৃতি। চোখে-মুখে ছড়ানো দিলখুস হাসি। সে যেন কৌতুকভরে বলছে—আমাদের ঘরে যেন আগুন লাগাস নে রুবি!

হায়! সত্যিই এক দিন কেউ আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেবে তার ঘর, পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে তার জীবনটা, সে-কথা স্বপ্নেও কেউ জেনেছিলো তখন? মনটা কেমন বেদনার্ত্ত হয়ে ওঠে।

—সময়ের স্রোত বয়ে চলেছে। করবী মাতার আদেশে বহু বার বেশ পরিবর্ত্তন করলো। রক্তবর্ণ, ধূপছায়া, কমলা, গৈরিক, নানা বর্ণের শাড়ীর সঙ্গে মানিয়ে ব্লাউস আর বিচিত্র অলঙ্কারে নিজেকে অপরূপা করে তোলবার চললো একাগ্র সাধনা।

জামাইবাবুর তত্ত্বাবধান সব সময় সে-ই করে। কারণ, মায়া দেবীর সে অবসর কোথায়? এত বড় সংসারের দায়িত্ব সবই তাঁর একার ওপর। কাজ কি কম?

ড্রইং-রুমের কোথাও সৌন্দর্য্যহানি ঘটলো কি না, বাবুর্চ্চিখানার তদারক। ছেলে-মেয়েকে নিয়ে যখন খেতে বসবেন টেবিলে, সেই সময় যেন সামান্য ত্রুটিও তাদের চোখে না পড়ে। একঘেয়েমীর বিরক্তিকর পরিস্থিতি ওরা যেন অনুভব না করে। মায়ের শক্তিতে ও কর্ত্রীত্বে যেন থাকে ওদের বিপুল শ্রদ্ধা ও অটুট বিশ্বাস।

সন্ধ্যায় চায়ের মজলিশে কেতাদুরস্ত পরিবারের আনাগোনা তো নিত্যিই লেগে আছে। তারই কি হাঙ্গামাটা কম? সব সময় এই সব ব্যাপারে তাঁকে মাথা ঘামাতে হয়, কি করে মজলিশটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা যায়।

ছেলে-মেয়ে দুটিও তেমনি হয়েছে; সারা দিন চুলের টিকিটি দেখবার যো নেই। তোদেরই তো বন্ধু-বান্ধবীর দল জোটে সান্ধ্য-আসরে, সেজন্য মাকে সাহায্য করা কি তোদের কর্ত্তব্য নয়? সব দায় কি এক জনের মাথায় চাপাতে হয়?

এ-সব হাঙ্গামার মাঝে মাঝে হানা দেন তিনি জামাতার কক্ষে। মোলায়েম বাক্য দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করেন। কি বা বয়েস তোমার বাবা? ও-সব ধর্ম্ম-কর্ম্ম করবার জন্যে তো শেষ বয়স আছে, এখন যে সংসার-ধর্ম্মো করা তোমার কর্ত্তব্য। সব ধর্ম্মের সেরা ধর্ম্ম যে সংসার-ধর্ম্মো। তুমি তো শাস্ত্র পড়েছো, তাঁদেরো তো ঐ একই মত।

কণা আমার অকালে চোলে গেলো কিন্তু রুবিকে তো তোমার জন্যেই রেখেছি বাবা, সে তোমাকে যত্ন-আত্তি করবার জন্যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আর মিতু তো ছোট মাসী বলতে অজ্ঞান! এখন তোমার মুখের একটা কথা পেলেই সব ঠিক হয়ে যায়।

সোমনাথের ভাবলেশহীন দৃষ্টি শূন্যেই নিবদ্ধ থাকে—মৌনতা ভঙ্গ করেন না তিনি। অগত্যা মায়া দেবীকে সরে যেতে হয় মহা-বিরক্ত চিত্ত নিয়ে।

রূপহীনা মেয়েটার জন্যে সময় সময় নাতনী সুমিতার প্রতি মন তাঁর বিরূপ হয়ে ওঠে।

—কি প্রয়োজন ছিলো ওর অত রূপের ?

বড় লোকের একমাত্র মেয়ে, টাকার জোরে সব ত্রুটি ঢাকা পড়তো,—কিন্তু সেখানেই কি দিনে দিনে নামছে রূপের জোয়ার? তার ছিটেফোঁটা কি একটু আসতে নেই করবীর দিকে ?

এত মজলিশের কাঁদ পাতছেন তিনি কাঁর জন্ম ? যদি রুই কাতলা গোছের কারুকে টেনে তোলা যায় মেয়েটার জন্তে। এর দিকে আবার দৃষ্টি-পাহারাও দিতে হয় না কি ? পাছে সুমিতা এসে ওদের মাথা ঘুরিয়ে দেয় ; সেজন্তেই তো, ঐ নাচের গানের ছবি আঁকার মাষ্টার রেখে তাকে অন্তত্র আটকে রাখার ব্যবস্থা করা।

জামাইটাও কি তেমনি নির্ব্বোধ, আর গোঁয়ার ! এত ফুল, জল, তেল, সিঁদুর, তবুও ভবি ভোলে না ? বিশ্বামিত্র মুনিরও তো মন টলেছিলো বাপু, এটা কি তার চেয়েও অপদার্থ ?

তা না হলে কি মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে কেউ নিজেকে অমন ভাবে বঞ্চিত করে ? সেই ছ' বছর আগে যখন কণা মারা গেলো, দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের সময়-বাচ্ছাটাও রইলো না, তখনই তো উনি চেষ্টা করেছিলেন রুবিকে দিয়ে ভাঙা সংসার আবার জোড়া লাগাবার !

ষোল বছরের মেয়ে বত্রিশ বছরের জামাইয়ের সঙ্গে বয়সে একটু বেমানান হলে কি হবে, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে। কলকাতায় এই লালকুঠি ছাড়া সাহেব পাড়ায় আরো দু'খানি বাড়ী। বড় মেয়েটার ছিলো লক্ষ্মীপ্রতিমার মত রূপ, তাইতো দিতে পেরেছিলেন এমন ঘরে ? আর তখন কর্ত্তাও বেঁচেছিলেন—সে সব দিনের কথা আলাদা। কিন্তু এখন তো ঐ মেয়েটার ভাবনা যেন বুকে কাঁটার মত বিঁধছে দিন-রাত। কোথাকার হতচ্ছাড়া সন্ন্যাসী গোপী দাস কি মন্তর যে দিলে জামায়ের কানে, এই পাঁচ বছর বাছা ঘর-ছাড়া হয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরলো ! অমন ভণ্ড সাধুর মাথায় মারি গাজার ঝাড়ু। মনের আক্রোশে নীরবে বলতে থাকেন মায়া দেবী।

সুরাহার মধ্যে নাতনীটা খুব চৌখস-চালাক নয় ! হাতের মুঠোয় রাখা যাবে ওকে ! এ-ও মন্দের ভালো বলতে হবে ! তা না হলে এত আরাম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এ্যারিষ্টোক্রেট ফ্যামিলির সঙ্গে মেলা-মেশা চলতো কি করে ? কর্ত্তা মারা যাবার পর তো রীতিমত অভাব সহ্য করতে হয়েছিলো ! তবু তখন মেয়ের সাহায্য ছিলো, এক-চোখো, বে-আক্কেলে বিধাতা তাও বাদ সাধলে !

তার পর জামাই ভাগ্যিস সব দেখা-শোনার ভার তাঁর ওপর দিয়ে গুরুর সঙ্গে তীর্থে চলে গেলেন, তাইতো রাজার হালে চলছে—এই ক'টা বছর !

[স]ুমিতার জন্তে তো ভাবনা কিছু নেই—জন্ম থেকেই বর ঠিক করা আছে। আহা, সুদাম ছেলেটি বড় ভালো। যেমন রাজপুত্তুরের মত চেহারা, তেমনি বড় ঘর !

একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়েন মায়া দেবী। [ক্রমশঃ।

অন্তরাগ

(**Browning** এর **Last ride together** এর ছায়া অবলম্বনে)

কালকে হতে চির জীবন তরে হারিয়ে যাবে তুমি
　　দেখবো পাশে আমার তুমি নেই,
অস্ত-যাওয়া শেষ আলোটির মত একটি সাঁঝের তরে
　　আমি তোমায় একটু পেতে চাই।
সে চাওয়া মোর ফেরাওনি তো তুমি,
　　পেয়েছি যা পূর্ণ পেয়ে আমি,
ফিরিয়ে দিলে যে আশাটি দিয়েছিলে চির জীবনতরে,
　　হারিয়ে তাকে নেইকো আমার ক্ষোভ।
দিয়েছ যা তৃপ্ত হিয়া, পূর্ণ পরাণ, সৌরভে বিস্মিত
　　স্মৃতির ছোঁয়ায় করবো অনুভব,
গভীর কালো দৃষ্টিখানি তব, হৃদয়ে মোর জাগিয়ে দিল সাড়া
　　তার মাঝেতে খেলছে আলোছায়া।
গর্ব কোথা দেখছি তায় কোমলতার ছায়া, ভুলের জয়ে ভরে,
　　পরাণ মোর রচিতে চায় মায়া।
তোমার হাতে দিয়েছি তুলে আনি,
　　মরণ আর জীবন মালাখানি,
তুমি যখন থাকবে না মোর কাছে সৃষ্টি তখন হারাবে তার দাম
　　ভয় কি আমার আসুক ধ্বংসে নামি।
ক্ষতি কি তায় মরণ যদি আসে জীবন করে স্তব্ধ তাহার গতি
　　আজকে শুধু চলবো তুমি আমি,
আকাশ পরে আসছে কত মেঘ তোমার কম তনুলতার সম
　　চাঁদের আলোয় উজল হয়ে হাসে।
হৃদয় পরে প্রাণ জাগান দেওয়ার তরে প্রেমের মত আলো
　　আতপ্ত ওই হৃদয় পরে ভাসে,
তাঁহার ছোঁয়া দাও গো প্রিয়তম,
　　স্পর্শে তার জাগুক হিয়া মম।
নিবিড় হতে নিবিড়তর শিরার শিরায় উচ্ছল তার খেলা
　　আজকে শুধু তুমি বুকের পরে,
চেতনা তার তোমার দেহ হতে ছেড়ে গেল বহু দূরে চলে
　　অজানা সেই অমরাবতী-তীরে।
চলছি পাঁছে চলছে মন চলার চেয়ে অনেক বড় হয়ে
　　সৌরভে যার স্মৃতির পাতা ভরা,
পড়ছে মনে পুলকে ভরা সুখের কত নবীন খেলারাশি
　　প্রলাপ যার সকল দুখহরা।
চাও না নাকি আমাকে আর তুমি
　　ভাল কি বাসে ? তুচ্ছ করেছি আমি,
সে যাই হোক বলবে কেসে কাজ কি তাতে সে যে অবাস্তব,
　　প্রশ্নে আর আছে কি প্রয়োজন।
আর যাই হোক নেইকো ক্ষতি সবার চেয়ে এইতো বড় কথা
　　পূর্ণ হিয়া বলেছি দুই জন।
জগৎভরা কত মানুষ চাইছে কত অনেক বড় কিছু
　　কতটুকু পায় সে অবশেষে,
চাওয়ার তরে ক্লান্ত হিয়া শ্রান্ত দেহ তবু তো পথ চলে
　　না পাওয়াকেও মেনে সে নেয় হেসে।
দেশের তরে করে যে জন দান
　　আপন সাথে প্রিয়জনের প্রাণ,
প্রিয়ার আঁখির অশ্রুজলে দেশের পূজা করে গেল যারা
　　তার বদলে রইলো কি তার তরে।
ইতিহাসের একটি পাতায় মুখের ভাষা শুকনো ফুলের মালা
　　তার জীবনের মূল্য দিল ধরে,

কবি তুমি জীবন ভরে গড়লে কত গান বুকের ভাষা নিয়ে
আজ সে ভেসে গেল কালের স্রোতে।
স্বপ্ন তুমি এঁকেছিলে কালির আখরেতে জীবনে তা ফুটলো তোমার কই
ব্যর্থ হ'ল এই পৃথিবীর হাতে,
শিল্পী তোমার অতুল মূর্ত্তিখানি
গড়লে তুমি সেরা মাণিক ছানি,
প্রাণময়ী মেয়েটিতে যা আছে তার কতটুকু পেলে তাহার কাছে।
জীবন-ভরে গড়লে তুমি যাকে
আমি আমার তপ্ত প্রেমের উজাড় হৃদয়খানি দিয়েছি যার পায়ে
ব্যর্থ কই আজ পেয়েছি তাকে।
সব কিছুকেই পাব যদি চরমে নিঃশেষে এই পৃথিবীর বুকে
বাকি তবে রইবে কি গো আর,
স্বর্গ তার পূর্ণ প্রেমে স্বপ্ন দেখা সাঙ্গ হবে তবে
লাবণ্য কি থাকবে কিছু তার।
তবু মোরা চাইবো জীবন-ভরে
চলবো পথে আশার আলো ধরে,
পূর্ণ হব তৃপ্ত হব এই পৃথিবীর পথের কূলে বসে
সব চাওয়াকে রেখে ধ্রুবতারা।
এগিয়ে মোরা চলবো পথে কর্ম্ম-ভরা পূর্ণ জীবন লয়ে
মিলবে সেথা সকল দুখহরা।
কিন্তু তুমি বুকের 'পরে এর চেয়ে আর বড় কি আর আছে
স্বর্গ সুধায় নাইকো আমার কাজ,
তোমার ছোঁয়া আমার বুকে পাওয়ার সেরা ওগো প্রিয়তমা
পরম শুভলগ্ন আমার আজ।
নীরব তোমার মৌন অধর হাসে
মন যে জাগে অসম্ভব এক আশে
অমরাতে চাইবো আমি এ স্বপ্নটির মৃত্যুহারা প্রাণ,
সেই তো সেরা সবার চেয়ে দামী
এই পৃথিবীর পরপারে মুগ্ধ প্রেমে তৃপ্ত হিয়া লয়ে,
অনন্তকাল চলবো তুমি-আমি।

অনুবাদিকা—তপতী মুখোপাধ্যায়।

রূপ—নারীর জন্মগত অধিকার

শরোষ মোদী (লাক্‌মে)

সে একদিন ছিল যখন রূপচর্চ্চা ছিল খুব একটা হালকা ব্যাপার, বিজ্ঞানের সমস্ত সম্পর্ক-বিরহিত। কিন্তু আজ তা রীতিমত একটি শিল্প। আজ সুস্থ জীবনের একটি প্রধান আর অপরিহার্য অঙ্গ হ'ল সুন্দরের সাধনা।

স্বভাবতই প্রশ্ন আসবে সুন্দর বলি কা'কে? এ এক আদিকালের প্রশ্ন, পুরানো হয়েও নতুন। প্রত্যেক নারীর কাহিনীই এতে জড়িয়ে আছে। আদিকাল থেকে তারই জন্য চলেছে অভিসার। মাধুর্য, রহস্য, স্নিগ্ধ, ব্যক্তিত্ব—সব মিলিয়ে দাঁড়ায় সেই সুন্দরের ধারণা। সেই ধারণার পরিপূর্ণ রূপ পাওয়া যায় সুষমার মধ্যে। সুষমাই (harmony) তাই সৌন্দর্য।

ভাগ্যবান যাঁরা, বিধাতার এই অপরূপ আশীষকণা বুকে নিয়েই তাঁরা জন্ম নেন। কিন্তু আর সবাই!—যাঁদের জন্মেতে পৌঁছাল না এই আশীর্বাদের কণিকা, তাঁরা কি করবেন? তাঁরা তা অর্জ্জন করবেন। কারণ আজ স্থির জেনে গেছি যে, সব-কিছুর মত রূপও অর্জ্জন করা যায়। এই রূপ প্রসঙ্গে ভারী সুন্দর কথা বলেছেন সমারসেট মম: রূপ-বিহ্বলতা। এ যেন ঠিক প্রেমে পড়ার মত এ যেন ঠিক তাও নয়। এই যেন প্রেম।

বয়সের সঙ্গে রূপের কোন সম্বন্ধ নেই। আমরা কেউই মেয়েদের জীবনে রূপের গুরুত্বকে অবহেলা করতে পারি না। প্রত্যেক মেয়েরই কিছু গুণ আছে যা কেবলমাত্র তারই।

আমাদের প্রত্যেকেরই একটি বিশিষ্ট মুখ রয়েছে। হয়তো নিজেরা না জেনেই আমরা আমাদের মাথাকে উঁচু করে রাখি, কখনও বা হয়তো সুন্দর করে হাসি বা খুব মধুর করে হাঁটি। এর কারণ আমরা প্রত্যেকে নিজেকে সবচাইতে সুন্দর করে দেখাতে চাই। কিন্তু বাকী সময়!—যখন আমাদের অজ্ঞাত আচরণ আমাদের চেহারাকেও আচ্ছন্ন করে।

বেশীর ভাগ লোকই মানুষের বাইরের দিকটা দেখে। তাই আমরা যখন বিশ্রীভাবে হাঁটি, প্রসাধনে অযত্নশীল হই, তখন মানুষ আমাদের ওপর একটা খারাপ ধারণাই করে।

আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে আপনি নিজেকে একবার অন্যের চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করুন। দেখুন আপনি কী ভাবে হাঁটেন। আপনি কি কুঁজো হয়ে হাঁটেন, না সোজা হয়ে হাঁটেন? আপনার প্রসাধন কি খুব স্বাভাবিক এবং সুসমঞ্জস, না এ অপপ্রয়োগে প্রকট?

সুতরাং আয়নার সামনে বসুন, আর ভাল করে নিজেকে দেখুন। দেখুন, আপনার চোখ কি উজ্জ্বল? ঠোঁট কি সুন্দর আর মাধুর্যময়? ত্বক কি পরিষ্কার এবং মসৃণ? আপনার চুল কি সুন্দর করে সাজানো আর স্বাস্থ্যে ভরপুর? আর দন্তরুচি? তা কি শুভ্র এবং সমুজ্জ্বল? আর আপনার হাত কি কোমল এবং যত্নে রক্ষিত?

সব চাইতে বড় কথা হোল, এ সমস্ত জানা আর দোষগুলো ধরতে শেখা। তাই নিজেকে ভাল ভাবে বিচার করুন, খুব যত্নের সঙ্গে এবং খুব নির্ম্মম ভাবে। সমস্ত জিনিসটাকে খুব সহজ ভাবে গ্রহণ করতে শিখুন। কারণ, আপনি হয়তো জানেন না যে, নিজের দেহের যে-সব অপূর্ণতার কথা ভেবে আপনি মনে কষ্ট পাচ্ছেন, সেগুলোই আপনার সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য। কারণ, হ্যাভলক্ এলিসের কথা দিয়েই বলি, রূপের মধ্যে অপূর্ণতার অভাবটাই একটা অপূর্ণতা।

মনে রাখবেন, রূপ নির্ভর করে চর্চ্চা, যত্ন আর অভ্যাসের ওপর। ভাল প্রসাধন দ্রব্যের সুষ্ঠু প্রয়োগ আর যত্ন আপনাকেও সুন্দর করবে। আর এ সমস্ত কিছুই আপনি পাবেন লাক্‌মের কাছে।

কেনা সেই মণিমুক্তার সন্ধানে, 'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি'। যে ধনের মূল্য যাচাই বণিকের মানদণ্ডে নয়; নয় সম্রাটের রাজদণ্ডে। অর্থ নয় পরমার্থের বণিকবৃত্তি তাদের! হীরে মণি-মাণিক্যের ঝুটো পাথর নয়; তারা হচ্ছে সেই ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর!

জাতবণিক নয়, সেই সব জাতরসিক কেউ কেউ এখনও যদি আসে কলকাতায় তাহলে সমস্ত সওদা শেষ হয়ে যাবার পরও তাদের কাজ বাকী থাকবে; তাদের যেতে হবে কলকাতার কাছেই; ব্যারাকপুর সড়ক ধরে এগিয়ে যেতে হবে একটু দূর! সেইখানে ভাঙ্গাবাড়ীর চেয়েও অধম, বাড়ীর ভগ্নাংশে চিরকালের মত চলে যাওয়ার আগে নতুন করে জ্বলে উঠেছেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। শিশিরকুমারের নামের আগে 'নাট্যাচার্য'—এই বিশেষণ, রবীন্দ্রনাথের নামের আগে সুলেখক লেখার মতো। যে যুগ কলকাতা থেকে বিদায় নিলো; বাংলাদেশ থেকেই, সেই যুগের শেষ সূর্যরশ্মি হলেন এই শিশিরকুমার। প্রত্যূষ থেকে প্রদোষ পর্যন্ত শান্ত রুদ্র, সৌম্য এই প্রতিভা সমানভাবে আলো বিকীরণ করে চলেছে অন্ধকার রঙ্গালোকে। সেই রশ্মিজাল এখনও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় নি; তাই প্রভাত সূর্যের মতই অস্তমিত সূর্য আজও ভাস্বর হয়ে রয়েছে নূতন জ্যোতিতে। গিরীশচন্দ্র এই অন্ধকার রঙ্গালোকের অঙ্গ থেকে অপসারণ করেন ধিক্কার আর কুৎসার কালোপর্দা; জাতীয় জাগরণের সিংহদ্বারে উড্ডীন করেন তার পতাকা। এক সিংহদ্বার থেকে আরেক স্বর্ণ-সিংহদ্বারে সেই পতাকাকে পৌঁছে দিয়ে গেছেন একক প্রচেষ্টায় যে মানুষটি সেই শিশিরকুমারকে জানাই অভিবাদন; তাঁর জ্যোতির্ময়ী তপস্যাকে,—নমস্কার!

নীলকণ্ঠ

কুড়ি

পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে যে-সব অখ্যাত মানুষজন আর জীবনের নানান ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত পুরুষরাও আসেন কলকাতা দেখতে তাঁরা এসে কি দেখে ফিরে যান? কালীঘাট; দক্ষিণেশ্বর; চিড়িয়াখানা; যাদুঘর: ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল হল। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে আসেন দিগ্বিজয়ী মানুষেরা; তাঁরা দমদমের উড়োজাহাজ ঘাট থেকে সারিবদ্ধ জনতাকে যুক্ত করে প্রত্যভিবাদন জানাতে জানাতে রাজকীয় প্রবেশ করেন রোলস রয়েসে আরোহণ করে সোজা রাজ্যপাল ভবনে। সেখান থেকে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে; এ্যাসেম্বলীতে যান একবার বিশিষ্ট অতিথির আসন আলো করতে; গড়ের মাঠের মঞ্চরঙ্গে উঠে দাঁড়ান স্বাগত ভাষণ দিতে। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সে অবশ্য একবার এবং বিরলাদের মিলে-কারখানায় অতি অবশ্য কয়েক বার যেতেই হয়। এদেশে আসবার অনেক আগে থেকেই ঘণ্টা মিনিট ধরা অনুষ্ঠানে যোগদান সূচী থাকে নির্ধারিত। শুধু তাই নয়; কোথায় কোথায় যাবেন নয় শুধু কোন কোন রাস্তা দিয়ে যাবেন তা-ও। কে জানে কলকাতার রাস্তায় ভিখারী, ভুখা মিছিল আর বস্তীর ছেলে-মেয়েরা জানান না দিয়েই কখন বেরিয়ে পড়ে! আর তাই দেখে মাননীয় অতিথি মনে ব্যথা পান; চোখে বাধা; নাকে গন্ধ; আর কানে আপত্তিকর শব্দ! এরই মধ্যে কখনও কখনও কেউ কেউ আসে যারা কলকাতাকে মনে করে কালচারের পীঠস্থান; তারা আসে রসের সওদা করতে। গান, নাচ, কবিতা, অভিনয়, ছবির সওদা করতে আসে তারা; পৃথিবীর ঘাটে ঘাটে তাদের নৌকা নোঙর করা; জাল

সেদিনকার এক বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক আজকের এই শিশিরকুমার। আজকে হয়ত আর অধ্যাপকের অভিনেতায় রূপান্তর তেমন করে করে না বিস্ময়ের উদ্রেক; কিন্তু সেদিন শুধু বিস্ময়ের সঞ্চার হয়নি এতে; সেদিনকার সমাজে এ ঘটনা ছিলো দুর্ঘটনার চেয়েও বেশী। সেদিনকার সমাজে কোনও শিক্ষিত লোকের এমন দুর্গতি (?), এত দূর গতি ছিলো এমন অবিশ্বাস্য এক অভিজ্ঞতা বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। মানুষের জীবন যদি উপন্যাসের পরিচ্ছেদ হতো তাহলে কল্পনা করা যেত যে সেদিনকার সেই বেসরকারী কলেজের তরুণ অধ্যাপক উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে যাচ্ছেন সেক্সপীয়র, মিলটন, শেলী, রবীন্দ্রনাথ; আর মধুলুব্ধ মৌমাছির মত বাইরের থেকেও এসে বসেছে ছাত্র-শিক্ষক একাসনে; মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে শুনছে সেই ধ্বনি-সঙ্গীত। এমনই কোন দিনে হয়ত কোনও বন্ধুকে টেনে নিয়ে এসেছে এমনই কোন অনুরাগী; তাকেও অংশ দেবার জন্যে এই অপূর্ব শ্রবণ-বিচিত্রার। হয়ত সেদিন হতাশ হয়েছে তারা; হয়ত সেদিন অধ্যাপক আসেন নি; শুধু সেদিনই নয়; আর কোনও দিনই অধ্যাপক আসবেন না বলে জানিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ! কেন? পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন, শিক্ষায়তনের গৌরব শিশিরকুমার। মাথা নীচু করে বলেছেন কলেজের কর্তৃপক্ষ যে তাঁদের মাথা নীচু হয়েছে শিশিরকুমার কলেজ ছেড়ে দিয়েছেন বলে নয়; মাথা নীচু হয়েছে, অধ্যাপনা বৃত্তি ছেড়ে তিনি অভিনেতার পেশা গ্রহণ করেছেন বলে।

অধ্যাপকের একান্ত অনুরাগী প্রিয়ভাষী, সৌম্যদর্শন তরুণ

ছাত্রটি হয়ত গেছে শিশিরকুমারের কাছেই; ফিরিয়ে আনতে গিয়ে ফিরে এসেছে সে। আচার্য তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে সখের অভিনেতার জীবন তাঁর কাম্য নয়; অভিনয় নয় সৌখীন খামখেয়াল মাত্র। অভিনয় হবে তাঁর ধ্যান; তিনি ধন্য হবেন তবেই। অভিনয় হবে তাঁর জ্ঞান; জ্ঞাত হবেন তবেই জীবন দেবতার উদ্দেশ্য; অভিনয় হবে তাঁর সাধনা; সিদ্ধ হবেন তবেই; সিদ্ধ হবার সত্য অর্থে হবেন সিদ্ধার্থ। তাই অভিনেতার জীবিকা সমাজের উপেক্ষা আর উপহাসের জীবন; অভিনেতার ধর্ম সমাজের তথাকথিত স্বাস্থ্যরক্ষাকারীদের অবজ্ঞা আর আক্রমণের উপলক্ষ্য; এ জেনেও শিশিরকুমার কেন এই জীবনকে মেনে নিলেন সে কথা নিশ্চয়ই সেদিন সেই সাক্ষাৎকারী জিজ্ঞেস করেছিল তাঁকে; আর সেদিন শিশিরকুমার তাকে নিশ্চয়ই সেই উত্তরই দিয়েছিলেন যে উত্তর সব শিল্পীরই একমাত্র উত্তর। যে উত্তর অনেক দিন আগে পল গগ্যাঁ দিয়েছিলেন যে তাঁকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিল সেই অর্বাচীনকে; পল গগ্যাঁ বলেছিলেন সব শুনে; হেসে বলেছিলেন: 'I have got to'! হেসে বলেছিলেন জীবনশিল্পী; এই হাসির পেছনে যে কী কান্না লুকোন ছিল শিল্পী ছাড়া আর কে বুঝবে তা?

'I have got to'; আমি নিরুপায়! এই হলো সমস্ত প্রশ্নেরই জবাবে সকল যুগের সত্যিকারের শিল্পীর শেষ উত্তর। সমাজের সর্বজনগ্রাহ্য নিশ্চিন্ততার নির্ভরতার পথ পরিত্যাগ করে শিল্পীরা কেন বিঘ্নসঙ্কুল, সুবিপুল বাধার আর অবিচ্ছিন্ন আশঙ্কার সর্বনেশে পথে পা বাড়ায় তার উত্তর ওই: I have got to..! আমি নিরুপায়...! যে শিল্পীর শুধু উত্তম সম্বল,—এই উদ্দাম প্রেরণা নেই, সে শিল্পী নয়। যে গান গায়, আর যে ছবি লেখে অথবা অভিনয় করে কিংবা কবিতা আঁকে, সে যদি ওই গান গাওয়া, ছবি লেখা, অভিনয় করা অথবা কবিতা আঁকা ছাড়া সংসারের আর যে-কোনও কাজের জন্যেই নিজেকে অক্ষম অযোগ্য অথবা অকারণ না মনে করে সে আর যা-ই হতে পারুক, শিল্পী হবে না কখনও! যারা বলে সামান্য প্রেরণা আর অসামান্য পরিশ্রম, এই দুয়ের যোগফলে প্রতিভার জন্ম, তারা প্রতিভা কি বস্তু তা ধারণায় আনতে পারে না বলেই পরের কথা ধার নিয়ে এমন অর্বাচীন উক্তি করে। প্রতিভা ধারণার বস্তুই নয়; ধ্যানের বস্তু। প্রতিভার পরিমাপ পরিমাণ দিয়ে হয় না; প্রতিভা হচ্ছে পরমাণুর মতো। ওজনে নয়, শক্তিতে; সংখ্যায় নয়, প্রচণ্ডতায়; শম্বুক গতিতে ধীর পদক্ষেপে শশক-নিদ্রার সুযোগে লক্ষ্যে সর্বপ্রথম উপস্থিত হওয়ার উল্লাসে পাওয়া যাবে না প্রতিভার পরিচয়; প্রতিভা হচ্ছে সেই বস্তু, যে বহুর বেদনা নিজের বুকে বয়ে বয়ে এক দিন দুঃসহ বেদনায় হঠাৎ বিস্ফারিত হয় দশ দিক আলো করে।

উত্তম সম্বল করে ডাক্তার, উকীল, দালাল হওয়া যায়; সাজা যায় রাজনৈতিক নেতাও! কিন্তু উদ্দাম না হলে হওয়া অসম্ভব কবি, কথাকার, ছবিকর অথবা অভিনেতা। উত্তমে মম্ হয়; মপাসাঁ হয় না। উত্তমে এমনি ট্রলপ হওয়া যায়; চার্লস ডিকেন্স হওয়া যায় না। উত্তমে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চন্দ্র-সূর্য সাজা যায়; রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র হওয়া যায় না। তেমনি উত্তমে সিনেমা-ষ্টার হওয়া যায়; চার্লি চ্যাপলিন হওয়া যায় না। যেমন উত্তমে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের নটরবি, নটনিনাদ, নটকঙ্কাল হওয়া যায়; শিশিরকুমার ভাদুড়ী হওয়া যায় না। কিছুতেই হওয়া যায় না।

চিকিৎসক, রাজনীতিজ্ঞ সাজতে গেলে সেই চিকিৎসকেরই যে সর্বপ্রথম চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে; চিকিৎসকের উদ্দেশ্যে যে অসংখ্য রুগীর করুণ কাতরোক্তি করতে হয়: 'Doctor heal thyself'-বলে, এ সত্য বর্তমান পশ্চাতবঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত! তেমনি অনেক বিশেষ অজ্ঞ বিশেষজ্ঞেরা বলে থাকেন যে, রবীন্দ্রনাথ কবি না হয়েও যা হতেন, তাতেই রবীন্দ্রনাথ হতেন, এ হচ্ছে অপ্রাপ্তবয়স্ক ভক্তদের আপ্তবাক্য! এ যেমন তাদের অগৌরব বৃদ্ধি করে, তেমনি এ উক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভক্তি সূচিত করে না কোন ক্রমেই! এ বস্তু স্তব নয়; এ হচ্ছে নিছক স্তাবকতা। রবীন্দ্রনাথ কবি বলেই তিনি রবীন্দ্রনাথ। কবিতাটাই তাঁর লেখা; বাকী সবটাই তাঁর খেলা। শিশিরকুমারও তেমনি অভিনেতা না হয়ে অধ্যাপক হলে ডক্টর ভাদুড়ী হতে পারতেন; কিন্তু শিশিরকুমার হতে পারতেন না কিছুতেই! অধ্যাপক, ডক্টর, পি-এইচ-ডির অভাব শিশিরকুমার অধ্যাপক না হলেও অনুভূত হত না; কিন্তু শিশিরকুমার অভিনেতা না হলে নটনাথের পূজা অসমাপ্ত থাকত। অধ্যাপক হলেও তিনি অনেকের মধ্যে এক হতেন; কিন্তু শিশিরকুমার হতেন না। শিশিরকুমার বললে আজ আর অনেকের মধ্যে 'এক'মাত্র বোঝায় না; 'শিশিরকুমার' মানে আজ একের মধ্যে যিনি অনেক।

কি পাই নি তার হিসাব মিলাতে একমাত্র শিল্পীমনই রাজী নয়; হিসাব ছাড়া সংসার অচল। তাই সত্যিকারের শিল্পী সংসার ছাড়া জীব। ছিন্ন বাঁধা পলাতক বালকের মত মাঠে মাঠে সে কেবলই বাঁশী বাজায়। প্রতিভা যাদের একমাত্র সম্বল জীবনযুদ্ধে প্রায়ই তারা পাটোয়ারী বুদ্ধি বঞ্চিত সাংসারিক অর্থে নিঃসম্বল। সেই প্রতিভাবান শিল্পীরা যতই সংসার অনভিজ্ঞ হোক তারা এত অজ্ঞ নয় যে হিসেব করে চললে যে গাড়ী করা যায়, বাড়ী করা যায়, গৃহিণীকে মুড়ে দেওয়া যায় গয়নায়, অধস্তন তিন পুরুষের অফুরন্ত অপব্যয়ের জন্যে রেখে যাওয়া যায় অপরিমিত অর্থ, এ তত্ত্ব যে তাদের অজ্ঞাত এমন নয়; কিন্তু তবুও তারা পারে না; পারে না বলেই তারা শিল্পী। পারলে তারা শিল্পী না হয়ে হোত শিল্পপতি। 'মাথার ওপর বাড়ী পড়পড় তার খোঁজ রাখ কী'?—গৃহিণীর এই গুঁতোয় কবি গিয়ে দাঁড়ায় বটে রাজার সামনে কিন্তু রাজকার্য শেষ হয়ে গেলে তবেই তার ডাক পড়ে; উদাত্ত স্বরে আবৃত্তি করেন কবির কণ্ঠে স্বয়ং বিশ্বকবি:

"আকাশের তলে গগনের গায়
সাগরের জলে অরণ্য ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙ্গীন করিয়া দিব।
সংসার মাঝে দু'একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দু' একটি কাঁটা করি দিব দূর
তারপরে ছুটি নিব।"

এবং সভাশেষে মাথায় করে নিয়ে যান, মণিমুক্তা খচিত গজদন্ত হার নয়; শুধু একখানি মালা। সে মালার দাম বাজারে আ-

নগণ্য; কিন্তু কবির গলায় সেই মালা লক্ষ্মীর হাত দিয়ে পরানো সরস্বতীর বিজয়মাল্য। সেই তো কবির পুরস্কার। এই কবিরাই রাণীর কাছে কোষাগারের কোষাধ্যক্ষের পদ চায় না কোন দিন; তারা শুধু বলে: 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর'! সমস্ত সাংসারিক উপদেশের বাইরে আরেক দেশ আছে কবির; সমস্ত সাংসারিক রীতি-নীতির বাইরে আরেক অনিয়ম-অব্যবস্থা শিল্পীর; সমস্ত ধর্মকে, প্রচলিত সমস্ত সামাজিক আইনকে কখনও কখনও অস্বীকার করে আরেক ধর্ম, আরেক ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হয় প্রতিভারা। শাস্তি তাদের পুরস্কার হয়; লাঞ্ছনা মাথার মুকুট; নির্বাসন, মৃত্যুদণ্ড অথবা কারাগার তাদের পথ চলার পাথেয়। এই শিল্পী, এই কবি, এই প্রতিভা হল সত্যিকারের সেই 'যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি!' সেই হলো শিল্পী, এর জন্যে যার বিন্দুমাত্র অনুতাপ নেই; কারণ 'প্রতিভা'র মধ্যে অনুতাপের চেয়ে উত্তাপ অনেক বেশী। শিশিরকুমারও সেই জন যিনি দিনের বেলাতেই মোমবাতির দুমুখই জ্বালাতে জ্বালাতে বলেছেন;

"My Candle burns at both ends,
It will not last the night,
But ah, my foes, and oh, my friends,
It gives a lovely light!"

কোনও একজন শিল্পীর বিচার করতে বসে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির আসন থেকে ইংরেজ বিচারপতি একদিন বলেছিলেন; An artist is not supposed to keep his accounts! শিল্পীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এই রায়ই শেষ রায়! মধুসূদন হাসপাতালে মারা গিয়েছিলেন; অনেকের কাছে এ হচ্ছে জাতীয় কলঙ্ক। আমার কাছে নয়। নয়; কারণ মধুসূদনের হাতে কুবেরের অর্থ এলেও তা উবে যেতে মুহূর্তকাল লাগতো। জাতীয় কলঙ্ক তাই মধুসূদনের হাসপাতালের মৃত্যুতে নয়; জাতীয় কলঙ্ক মধুসূদনকে বিস্মৃত হয়েছি বলে। মধুসূদন কেন মাড়োয়ারী কালোবাজারীর মত যখের ধন আগলাতে পারলো না, এ দুঃখ করে লাভ নেই; প্রজাপতি কেন মৌমাছি, নয় এর উত্তর প্রজাপতির জানা নেই; মৌমাছির ডানাতেও নেই তার উত্তর। সরস্বতীর বীণা কেন ভীমের গদা নয় এ প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং সরস্বতীর পক্ষেও দেওয়া অসম্ভব; রাবণ কেন সময় থাকতে স্বর্গের সিঁড়ি সম্পূর্ণ করে গেলেন না তার উত্তর না আছে বাল্মীকিতে; না আছে কৃত্তিবাসে। না দিতে পেরেছেন স্বয়ং মধুসূদন মেঘনাদবধ মহাকাব্যে!

শিশিরকুমার কেন হিসেব করে চলতে পারেন নি; কেন পুষ্পাঞ্জলির মত রজতাঞ্জলিকেও জলাঞ্জলি দিয়ে আজ তিনি নিঃস্ব; নিঃস্ব হয়েও কেন তিনি নিজেকে পরম বিত্তবান মনে করেন, আজও এর জবাব দিতে হলে অন্য কারুর পক্ষে তা দেওয়া অসম্ভব; এ রহস্য জানতে হলে শিশিরকুমার হতে হয়! সূর্যকে সূর্য ছাড়া আর কে জ্ঞাত হতে পারে মহাকাশে? জানি, সময়ে সঞ্চয়ী হতে পারলে এক রঙ্গালয় থেকে একাধিক রঙ্গালয়ের মালিক হওয়ার বাধা ছিলো না তাঁর, সাধারণ মানুষ যেমন একখানা বাড়ীর ভাড়া থেকেই বানায় আরেকখানা বাড়ী; জানি, পাটোয়ারী বুদ্ধি থাকলে আজ শিশির-কুমার সরকারী এবং বেসরকারী সড়কে প্রচুর বিত্তবান হতে পারতেন। হয়ত রঙ্গালয়চ্যুতও তাঁকে হতে হত না; হয়ত আজ এখানে, কাল ওখানে উঞ্ছবৃত্তির অপমান নিতে হত না গায়ে মেখে; সবই হোত তাহলে শিশিরকুমার হতেন না শিশিরকুমার। তাহলে রামধনুর রঙ আকাশের গায়ে ধরা দিয়ে আবার মিলিয়ে যেত না!

'প্রতিভা'র বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় অপবাদ, 'দম্ভের'। একে অপবাদই বলি; কারণ এ দম্ভ নয়; এ হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। সিংহ যেমন সিংহচর্মাবৃত গর্দভ না হলে তার কেশর থাকবেই; ময়ূর যেমন দাঁড়কাক না হলে তার পেখম; তেমনি প্রতিভা ঝুটো না হলে থাকবেই তার দম্ভ; দম্ভ নয় তার অসীম আত্মবিশ্বাস। শিশির-কুমারও দাম্ভিক; শিশিরকুমারও আত্মবিশ্বাসী। এই আত্ম-বিশ্বাসের; এই দম্ভেরও কম দাম দিতে হয় নি তাঁকে সারা জীবন ভোর। এই সেদিনও সরকারের চরম মুখপাত্রের অনুরোধ হেলায় উপেক্ষা করে এসেছেন; বলেছেন 'নাটক-একাডেমী'র পদ নেবার জন্যে লোকের অভাব হবে না! ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না কোনও দিন; ও অন্য কাউকে দিয়ে দিন। বোম্বাই থেকে এসেছে অনুরাগী ভক্ত অভিনেতা; ব্যারাকপুরের বাড়ীতে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে দেবার। শিশিরকুমার বলেছেন: Get out! am I a beggar? অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে গেছে অতুল মুখোপাধ্যায় শিশিরকুমারকে দিয়ে অভিনয় করাবার জন্য; গিয়ে বলেছে আমার নাম: ওতুল! সস্নেহ তিরস্কারে তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে বলেছেন শিশিরকুমার: বল 'অ'-তুল; ওতুল নয়। তারপর যা বলেছেন তা ছাপা যায় না আর। রেডিওতে অভিনয় করবার প্রস্তাব করেছেন প্রত্যাখ্যান।

মনে পড়ছে সধবার একাদশী অভিনয় আরম্ভ হবার সময় অতিক্রম হয়ে গেছে; প্লে আরম্ভ হয় নি। গ্যালারী থেকে উঠছে মৃদুগুঞ্জন। শিশিরকুমারের ঘরে গিয়ে পৌঁছেচে সেই গুন্‌গুন্‌। শিশিরকুমার তৈরী হতে হতে আবৃত্তি করেছেন, মুহূর্তের তাপভঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্র ধান ঋষি! অর্থাৎ মুহূর্তকাল দেরী হলেও গ্যালারী ইন্দ্রলোক রুষ্ট হন; কি যেন সেইখানেই অনুযোগ করেছেন: কাল অভিনয় করবার সময় আপনার বেশবাস নাকি বেসামাল হয়ে গিয়েছিলো; আজ কিন্তু সতর্ক হবেন। সদ্য হাস্যমুখ শিশির-কুমারের প্রত্যুত্তর এসেছে মুখের মত: ভারতবর্ষে দুজনের বেশবাস ঠিক নেই একজন হলেন মহাত্মা গান্ধী; আরেকজন দুরাত্মা শিশির ভাদুড়ী। আজকের ভারতবর্ষে অনেক সত্যিকারের দুরাত্মার নাম মহাত্মার নাম নিয়ে তরে যাচ্ছে দেখছি; আবার এই দেশেই আজও শিশিরকুমারের মত মানুষও আছেন; নিজেকে যে দুরাত্মা বলতে পারে সেই তো সত্যিকারের মহাত্মা: তাঁকে নমস্কার!

অন্য ও প্রত্যহে টলিসডের কথা লিখতে লিখতে কেন শিশির-কুমারের কথা তুললাম, এখন সে কথা বলি। টলিউডের আদিযুগে, ছবি যখন থেকে সবাক হতে আরম্ভ করেছে সেদিন শিশিরকুমারও এগিয়ে এসেছেন ছবির পর্দায় প্রতিফলিত হবার জন্যে; কিন্তু এখানে তিনি টিকতে পারেন নি। পারেন নি কুটিল চক্রান্তে; কুৎসিত দলাদলির কারণে; দূষিত আবহাওয়ার জন্যে। নিউ থিয়েটার্সকে ডোবাবার মূলে যারা সেই সব শ্বেত হস্তীদের অন্যতম একজন শিশিরকুমারের গলার মাইক-টেষ্ট নিয়ে

লিখেছিলেন unfit ! যাঁর চেয়ে উদাত্ত, সুরেলা, শ্রুতিসুখকর কণ্ঠ মানুষের হয় না, তাঁর গলা হলো আনফিট। টলিউডে সবই সম্ভব। Trespassers shall be prosecuted ট্রামডিপোর এই নিশানই হলো টলিউডের ত্রিবর্ণরঞ্জিত নিশানা। শিশিরকুমারের মতো আরও কত জ্ঞানী-গুণী যে এরাজ্যে আজও ট্রেসপাসার বলে গণ্য, কে তার খবর রাখে !

মাইকের বিরুদ্ধে শিশিরকুমারের বীতরাগ সেদিন থেকেই কি না জানি না ; তবে আজকের মাইকসর্বস্ব বাংলা দেশে পৌরুষহীন পুরুষকণ্ঠের যুগে শিশিরকুমারের একক অবর্ষ্য ভাষায় মাইকের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ অভিনন্দনযোগ্য। মাইক-ম্যানিয়া আজ এমন ভাবে পেয়ে বসেছে দেশকে যে আগামী কোনও দিন ঘরে বসে স্বামি-স্ত্রীর গোপন প্রেমালাপও মাইক ছাড়া অশ্রুত রইবে ; অবাক্ত রইবেও হয় তো। মাইক ব্যবহার করেন না শিশিরকুমার। সিটিংএও নয়। পুরুষ মানুষ পুরুষই ; মাইক ব্যবহার করে সেই সব পুরুষরা যারা লজ্জায় অমায়িক ভদ্রমহিলা সাজতে চায় পাবলিক মিটিংএ। শিশিরকুমার তারই মূর্ত প্রতিবাদের প্রতীক। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই এই পুরুষকণ্ঠের যুগের ওপর নেমে আসবে মেয়েলী ন্যাকামির ন্যক্কারজনক যবনিকা।

শিশিরকুমার যেদিন আর আমাদের সামনে থাকবেন না, জানি সেদিন তাঁর জন্যে কুম্ভীরাশ্রুবর্জনের অভাব হবে না দেশে ; তাঁর মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করতে আসবেন হয়ত কোনও জহরলাল ; নয়ত কোনও বিধান রায়। তাঁর সম্বন্ধে সম্পাদকীয় লেখা হবে দেড় কলাম ; লেখা থাকবে কালোবর্ডারের বন্ধনে ; রাস্তার নতুন নাম হবে তাঁর নামে। সব হবে ; শুধু শিশিরকুমার যা চেয়েছিলেন তা হবে না বেঁচে থাকতে থাকতে। তিনি চেয়েছিলেন দেশের রঙ্গালয় সম্বন্ধে দেশের নিজের সরকার অবহিত হোক। নাটক রচিত হোক ; নতুন নতুন রঙ্গালয় হোক ; আসুক নতুন নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী। সত্যিকারের শিক্ষিত লোকেরা আসুক রঙ্গালয়ের চার পাশে ! তাঁর সে আশা স্বাধীন সরকার হবার পরেও পূর্ণ হবার নয় ; থিয়েটার আজও সরকারের কাছে তামাশা হয়ে রইলো।

মধুসূদনের মৃত্যুশয্যায় মহাকবি নিজের স্ত্রী এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে নিশ্চয়ই আকুল হয়েছিলেন। গোবিন্দদাস তীব্র বিক্ষোভের বেদনাকে মূর্ত করেছিলেন এই বলে : ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে আমার চিতায় দিও মঠ ; আজ জীবনের সায়াহ্নে ব্যারাকপুরের বাড়ীতে বসে শিশিরকুমারের মনেও এমন কোনও ক্ষোভের অবকাশ নেই তা মনে না করেও বলতে পারি ওই তিন জনেরই বিক্ষোভের মূল ছিলো আরও গভীর। সব সৃজনী প্রতিভারই বেদনা সুগভীরের বেদনা। তার সৃষ্টির কি হবে ? এই প্রশ্নই বিচলিত করে সবচেয়ে বেশী। এবং এইখানেই আমাদের অপরাধ অমার্জনীয়। হাসপাতালে মহাকবির মৃত্যু জাতির ভুবপনের লজ্জার হতে পারে ; কিন্তু অমোচনীয় কলঙ্কের যা তা হলো মধুসূদনের মহাকাব্য ইতিমধ্যেই বাঙালী বিস্মৃত হয়েছে ; বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছিলেন পতাকা উড্ডীন করে তাতে নাম লিখে দিতে শ্রীমধুসূদন, —এরই মর্যাদা না রাখতে পারার যে পাপ আমরা করেছি আর কোনও দিনই তার প্রায়শ্চিত্ত অসম্ভব। শিশিরকুমারেরও বেদনা বোধ করি এইখানেই ! তিনি যে রঙ্গালয়ের পাদপ্রদীপের সামনে অবতীর্ণ হয়ে দেশকে কোন অতল অন্ধকার থেকে কোন সূর্যকরোজ্জ্বল নবপ্রভাতে নূতন জন্ম দিয়েছেন তার পূর্ণ স্বীকৃতির অভাবই পীড়িত করে শিশিরানুরাগীদের। জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে যত বরেণ্য বাঙালী বরণীয় করেছেন দেশকে শিশিরকুমার তাঁদের কারুর চেয়ে কম নয়, একথা আমরা কবে আর বলব ? শিশিরকুমারের মত মানুষেরাই এ সত্যের একমাত্র প্রমাণ যে শুধু উদরান্ন পূর্তিতেই মনুষ্য-জন্মের মোক্ষ নয় ; মানুষ শুধু ব্রেড এণ্ড বাটারেরই দাস নয় ; বাটার-ফ্লাইয়ের স্বপ্ন দেখবার দাবীও সে রাখে। এরা যদি পাগল হয় তবু এদের পাগলামির জন্যেই আজও ধন-ধান্যে-পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা ! এরা যদি প্রতিভা হয় তবে এই দু'দশজন প্রতিভার জন্যেই সভ্যতার জন্ম ; বাকী সবাই—আমরা সবাই আসলে কী ? 'We are only teachable animals' ! এঁদের দামেই আমাদের দাম।

শিশিরকুমার লেখক নন ; অভিনেতা। তাই কণ্ঠস্বর তাঁর একদিন আর শোনা যাবে না। সেদিন বহুদূরে থাক ! তবু জানি, শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বরও একদিন থেমে যাবে ; আরও জানি, সেদিনও রঙ্গালয় চলবে ; পাঁচশো হাজার রাত্রি ধরে জমবে নতুন কোনও পালা ; নতুন নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আসবে যাবে। শুধু আমরা যারা শিশিরকুমারকে শুনেছি, তারা আর তেমন করে কারুর আবৃত্তি শুনে চেঁচিয়ে উঠব না দর্শকাসন থেকে, অন্যদের উপস্থিতি মুহূর্তের জন্যে বিস্মৃত হয়ে বলে উঠব না : এ কার কণ্ঠস্বর ?

[ক্রমশঃ

• • • এ মাসের প্রচ্ছদপট • • •

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে কোনারকের মন্দিরস্থিত একটি বাদিনীমূর্তির আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। আলোকচিত্র শ্রীমদন বসু গৃহীত।

নীলের গান

বাংলা দেশের নিভৃত পল্লীগ্রামগুলিতে আজও নাগরিক সভ্যতার প্রবল ঢেউ গিয়া লাগে নাই। সেখানে এখনও তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতির প্রভাব সঞ্চারিত হয় নাই। শান্ত নিরুদ্বেগ জীবনপ্রবাহ সেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী সমান ভাবে বহিয়া আসিতেছে। বারো মাসে তেরো পার্বণ, দোল-দুর্গোৎসবের ঘটাছটার দিন আজও ফুরায় নাই।

তবে ইদানীং মহাযুদ্ধের ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব হইতে গ্রামবাসী সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। পূর্ব্ববঙ্গের বহু হিন্দুই আজ বাস্তুহারা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের সাত পুরুষের ভিটা এখন হাতছাড়া হইয়াছে। তবুও পালাপার্বণে আজও সেই ভাবেই ঢাক বাজে, খোলের ধ্বনি দূর হইতে এখনও ভাসিয়া আসে।

পল্লীবাসীদের জীবন গণ্ডিবদ্ধ। বৈচিত্র্যের যথেষ্ট অভাব, কিন্তু তাহাদের জীবনে অবসরও অনেক। অর্থের প্রাচুর্য না থাকিলেও তাহারা অবসরকাল বিনোদন করিতে চায়, তাহাদের অন্তরের ক্ষুধা মিটাইতে চায়। তাই তাহারা প্রচলিত উৎসব পার্বণগুলির একটিকেও বাদ দেয় না। এই সকল পার্বণ উৎসবের প্রধান অঙ্গই নৃত্যগীত। কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী গানের সঙ্গে সঙ্গে আগমনী-বিজয়ার গান, মনসার ভাসান গান, নীলের গান, শিবের গাজন গানের ধারা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

নিজেদের জীবনের সঙ্গে উপাস্যের জীবনের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া শিবের লীলা গান গ্রামবাসীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

উঠ উঠ সদাশিব নিদ্রা কর ভঙ্গ।
তোমারে দেখিতে আইল আউলের ভক্তগণ।
খোল চন্দন কাঠের কপাট, দেও দুধ গঙ্গাজল।
তোমার চরণে দ্বাদশ প্রণাম। (শিবনাথ কি মহেশ)।

অন্যান্য গানের ন্যায় নীলের গানেরও একটি বিশেষ সময় আছে। পশ্চিমবঙ্গের গাজন গানের আর পূর্ব্ববঙ্গের নীলের গানের আবেদন ও রীতি প্রায় সমগোত্রীয়। প্রতিবৎসর শরতের প্রভাত রৌদ্র কিরণে উদ্ভাসিত, শিউলী ফুলে সুবাসিত গ্রামপথে মাঠে ঘাটে আপনা হইতেই যেমন পথিকের কণ্ঠে আগমনীর গান গুঞ্জরিয়া উঠে। তেমনই শীতের শেষে নূতন ধান্যে গৃহের আঙিনা ভরিয়া উঠিতে থাকিলে, মলয়ানিলে গাছের কচিপাতাগুলি কাঁপিতে শুরু করিলে গ্রামবাসীরা ক্ষেত্রপাল কেদারনাথ শিবের কথা ভক্তিভরে স্মরণ করে। পূর্ব্ববঙ্গে শিবের গান নীলকণ্ঠের গান বা নীলের গানরূপে প্রচলিত।

ব্রহ্মাণ্ড রক্ষার প্রয়াসে একদিন তিনি নিজের কণ্ঠে কালকূট ধারণ করিয়াছিলেন—তাই তিনি নীলকণ্ঠ। নিরানন্দ গ্রামবাসিগণের দুঃখ শোক নিজের কণ্ঠে ধারণ করিয়া তিনি বৎসরান্তে আশা-ভরসার আশ্বাস আনিয়া দেন, তাই তো তাহারা তাঁহারই পূজা করিয়া তাঁহারই গান গাহিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠে। শিব তো চাষী গৃহস্থেরই দেবতা, তাহাদের জীবনের সঙ্গে তাঁহার যোগ তাই অবিচ্ছেদ্য—

বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ।
আষাঢ় মাসে শিবঠাকুর বুনিল কার্পাস।

শুধু তাই নয়—

কার্পাস তুলিয়া দিলে গঙ্গার ঠাঁই।
গঙ্গা কাটিল সুতা মহাদেব বুনিল তাঁত।

শিব তো চিরকাঙ্গাল, ভোলানাথ; ভক্তদের কর্তব্য তাঁহাকে গৃহবাসী করা, তাঁহার সাংসারিক সুখসুবিধার সুব্যবস্থা করা। এতদিন আগ্রহ থাকিলেও তাহাদের অবসর ছিল না, ভাণ্ডারে অন্ন ছিল না—দেহে স্বাস্থ্য, মনে আনন্দ ছিল না। আজ বসুন্ধরার কৃপায় তাহাদের ভাণ্ডার পূর্ণ, নববসন্তের পবনে আজ তাহাদের দেহমনের ক্লান্তি বিদূরিত হইয়াছে। শীতের দুঃখ ঘুচিয়াছে। আজ তাই সবাই মিলিয়া এই নিঃসম্বল গৃহদেবতাটিকে সংসারী করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি তো আত্মভোলা ক্ষ্যাপা, তাঁহার চালচুলো নাই, হুঁশখেয়াল নাই, কবে মনে হইলে হয় তো আবার তিনি গৃহস্থালি ছাড়িয়া শ্মশানে গিয়া আশ্রয় লইবেন। তাই অন্নপূর্ণার সঙ্গে তাঁহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া তাঁহাকে চিরকালের জন্য ঘরে বাঁধিবার আয়োজন হয়।

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে শিব নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিলেন। তিনি ভাগিনেয় নারদকে ডাকিয়া বলিলেন—

শুন নারদ কই তোমারে তল্লাস কর ঘরে ঘরে
কার কন্যা রূপসী কেমন।
আমি ভাগ্নে করব বিয়া, যাও হে তুমি ঘটক হইয়া
বিলম্ব না করিও এখন।

গৃহস্থদের প্রতিনিধি হইয়া নারদ মুনি তাঁহার বিবাহের ঘটকালি শুরু করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে নীলের এই শ্রেণীর গানের নাম 'পাট গোসাঞি-এর বিয়ের গান'—

শুন সবে মন দিয়া হইবে শিবের বিয়া
কৈলাসেতে হবে অধিবাস।
নারদ ক'রে আনাগোনা কৈলাসে বিয়ার ঘটনা,
শুন শিবের বিয়ার ইতিহাস।

রাজসভায় বড় বড় কবিরা শিবের মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত বিবাহের বহু বর্ণনা দিয়াছেন। পল্লীকবিরা তাঁহাদের অনাড়ম্বর ভাবাতে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী বিবাহের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—

পড়ল কৈলাসেতে বিয়ার সাড়া বাজিল ঢোল ডগর কাঁড়া
সানাই শঙ্খ বাজে শত শত।
সেতারা চৌতারা বাজে জগঝম্প মাঝে মাঝে
মৃদঙ্গ তানপুরা শত শত ॥
সঙ্গে চলে যত জনা ঠিক যেন সব যুদ্ধের সেনা
ঢাল তলোয়ার ঘোরে উল্টা পাকে।
করে চলে তলোয়ারে কাটাকাটি কেহ মারে কারে লাঠি
কেহ জোর করিয়া পুরীর মধ্যে ঢোকে ॥

শিব বিবাহের জন্ম কৈলাসে উপস্থিত হইলেন—

শিব চইলাছেন বিয়ার বেশে নারদ বাজায় বীণা,
পাড়াপড়শী দেখতে এল বিয়ার কথা শুইন্যা।
টিপ-টিপ ডমুরা বাজে শিঙায় গুনগুন করে।
খৈসা পড়ল জটাজাল শিব তাই লইয়া নাচে ॥

এমন পাত্রকে দেখিয়া তখন—

শুনি শ্মশানবাসীর কলকল
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর
খেপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ ॥
সবাই জামাই-এর নিন্দা করিয়া ধিক্কার দিয়া বলে—
জামাইর মাথায় দেখি সাপের হেড়ে
জামাই বুঝি হয় সাপুড়ে,
সাপ খেলাই বেড়ায় তাশে তাশে।
গৌরী এমন সোনার মাইয়্যা বুড়ার কাছে দিল বিয়া
সোনার পুতুল ফেলাইল জলে ॥

গৃহবধূরা কুমারী বেলায় একদিন শিবপূজা করিয়াছে, শিবের ন্যায় গুণবান সদানন্দকে পতি কামনা করিয়াছে, আজ নিজের গৃহস্থালীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহারা শিবকে ভুলিতে পারে না। আজ যখন তাহাদের গোলা নবীন ধান্যে পূর্ণ, ঢেঁকির অবিরাম পাড় পড়িতেছে, পিঠা-পায়সের সুগন্ধে গৃহের বাতাস সুরভিত, অন্য পাঁচজন প্রিয়জন পরিজনের সঙ্গে স্বতঃই নিরন্ন বুভুক্ষু দেবতাটির কথাও তাহাদের স্মরণে আসে।

তাঁহার পূজার আয়োজন হয়, ফুল তুলিবার ধুম পড়ে—

হেমন্ত বসন্তকালে বিকশিত ডালে ডালে হে,
ও কি ভাই রে—হরের মালঞ্চে নানা ফুল।
দুবা তুলি আঁটি আঁটি ফুলেতে ভরিল সাজি হে,
ও কি ভাই রে—হরের মালঞ্চে নানা ফুল ॥
অশোক অপরাজিতা সুবর্ণ মালতী লতা হে,
ও কি ভাই রে—হরের মালঞ্চে এত ফুল!
পৃথিবীতে পুষ্প যত তাহা বা কহিব কত হে;
স্থলপদ্ম দেখিতে সুন্দর ॥
ফুলেতে ভরিল সাজি চল ঘরে যাই আজি হে,
ফিরায়ে মনে লয় আসিও আর বার
প্রাণ কাশীনাথ, মনে প্রাণ ভোলানাথ, মনে
মনে লয় আসিও আর বার ॥

ইহা ছাড়া নীলের গানে গৌরীর শাঁখা পরানোর কথা এবং শিব-দুর্গার দাম্পত্য কলহ বিবাদের কথা আছে। সেগুলিতে কবিত্ব না থাকিলেও দরিদ্র গৃহস্থ সংসারের একটি সুন্দর চিত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

দরিদ্র শিবগৃহিণীর শাঁখা পরার সাধ বহুদিনের, সেজন্য নিষ্ক্রিয় স্বামীকে কম গঞ্জনা সহিতে হয় নাই—

একদিন শিবানী হরকে কহেন ডাকি
শঙ্খ পরিতে বড় সাধ যায় মনে,
(ও) সে শঙ্খ চুড়ি হীরার বালা
বিয়ার বয়সে কতই দিলা
শুনিয়া পড়সীরা সব হাসে ॥

সর্বত্যাগী মহাদেবের পক্ষে পত্নীর এই তুচ্ছ সাধও পূর্ণ করিবার সাধ্য নাই। অক্ষম স্বামী বলেন—

শঙ্খ যদি পরতে চাও, বাপের বাড়ী চইলা যাও।
শ্মশানে মশানে ঘুরি, ভাঙ ধুস্তরা গিলি,
খাদ্য আমার ভাঙের লাড়ু বাহন আমার বুড়া গোরু,
শঙ্খ দেওয়া আমার সাধ্য নয় ॥

তাঁহার সাধ্য না হইলেও তাঁহারই প্রসাদধন্যা গৃহস্থবধূরা সেদিন শিবের হইয়া গৌরীকে শাঁখা উৎসর্গ করিয়া থাকে। গাজন গানেও এই শাঁখা পরানোর কাহিনী আছে।

দরিদ্র গৃহস্থঘরে দাম্পত্য কলহ তো লাগিয়াই থাকে। বর্ষশেষের এই সময়ে তাহারা সেই সকল কলহের কথা ভাবিয়া নিজেরাই লজ্জিত হয়; তাই নীলের গানে শিবদুর্গার পারিবারিক কলহ ও তাহার মীমাংসার গান গাহিয়া সে অপরাধের স্খালন করিতে চায়—

নাইওয়র লাগিয়া চণ্ডী যায় তো চলিয়া
পালঙ্কেতে বুড়া শিব আছে শুতিয়া ।
নারদ ভাইগ্না তাকে ডাকায় কান্দিয়া কাটিয়া ।
ওহে মামী, ওহে মামী কার্ত্তিক গণেশের মাও ।
একপা-ও আগাইয়া যদি মামী, কার্ত্তিকের মুণ্ড খাও ।
ফিরা পা আগাইয়া যদি গণেশের মুণ্ড খাও ।
ফিরা পা আগাইয়া মামী আমারে মাথা খাও ।

শিব এই ভাবেই আমাদের ঘরের মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে বাধে না। কেবল নীলের গানেই নয়, প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত বাঙলার লৌকিক সাহিত্যের সর্বত্রই শিব এবং নারদকে লইয়া রঙ্গরসিকতা করা হইয়াছে।

এই শ্রেণীর নীলের গানের মধ্যে সারা বৎসরের কর্মক্লান্ত কৃষক সমাজের বিশ্রামালাপের সুরই ধ্বনিত হয়, তাই এগুলির মধ্যে ঐ লঘু তরল পরিহাস রস মোটেই বেমানান হয় নাই।

শিবের অন্তঃপুরের অশান্তির কথা বর্ণনা করিতে গিয়া পল্লী-কবিরা আর একটি রসবস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন। শিবের দুইটি পত্নী গঙ্গা ও দুর্গা; অতএব দুই সতীনের কোন্দল লইয়া গান গাহিবার সুযোগ তাঁহারা ছাড়েন নাই—

(আর) এ ভবে যার বিয়া দুই
তার কপালে সুখ নাই কিছুই ।
(দেখ) শিবের ঘরে গঙ্গা-দুর্গা দুই রমণী
তারা বিবাদ করেন দিবারাতি ।
একজনের থালে দুইজন বইসে
প্যাট না ভরলে কান্দন আইসে ।
(আর) অভিমানে রাগে কথা কয় না
গাল ফুলাইয়া রয় ।

পূর্ববঙ্গের নীলের গানগুলিকে বলা হয় 'অষ্টক গান'। যাহারা গৃহে গৃহে গান গাহিয়া ফিরে তাহাদের বলা হয় 'নীলসন্ন্যাসী', তাহাদের অধিনায়ককে বলা হয় 'বালা'। সাধারণত নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর হিন্দুরাই এই নীলসন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করে।

—শ্রীজয়দেব রায়।

রেকর্ড-পরিচয়

এবার ভোটের বাজার মাত করেছিল কতকগুলি পরিচিত গানের প্যারোডি। বাম এবং দক্ষিণপন্থী উভয় দলই নির্বাচন-যুদ্ধে নেমে করতালি দিয়ে গালাগালি জুড়েছিলেন, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে এর উদ্দাম উত্তেজনার তলায় তলায় একটা পরিহাসের খরস্রোত দেখা যাবে। হাসাহাসির মধ্যে হয়ত আমাদের অগোচরেই একটা কাণ্ড ঘটে গেছে—আমরা স্পষ্টত এবং প্রত্যক্ষত স্বীকার করেছি, ফিল্মী সংগীতের প্রবল জোয়ারেও আমাদের চিরন্তন সামগ্রী এখনও জনপ্রিয়তা হারায় নি। প্রমাণ—আমাদের চিরপরিচিত ভক্তিমূলক —"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল"—গানটির বহুল প্রচার। কিঞ্চিৎ বিকৃত আকারে এটি এইরূপ পেয়েছিল :—"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, মেয়াদ ফুরিয়ে যায় মা।" বলা প্রয়োজন—এই প্রাচীন গানটির বহুল প্রচারে ধনঞ্জয়-ভ্রাতা পান্নালাল ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক রেকর্ডখানি বিশেষ কাজ করেছে। শ্যামাসঙ্গীতে ধনঞ্জয়কান্তির অভাব পান্নালাল পূরিয়েছেন, একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। পান্নালালের নতুন আরো দুটি ভক্তিমূলক গান এ মাসে বেরিয়েছে—"আমি যদি ভুল করি মা" এবং "মা গো মা বুক-ভরা এই ব্যথার"—কলম্বিয়া রেকর্ড নং GE 24835.

কলম্বিয়ার অন্যান্য নতুন গান—শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় "তোমার দু' চোখে আমার" এবং "ভ্রমরা গুন্‌গুন্ গুঞ্জরিয়ে"। আধুনিক—GE 24832.

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য ভ্রাতা অমল মুখোপাধ্যায়ের নতুন আধুনিক গান—"আকাশে দেয়ালীর লগ্ন" এবং "সূর্য আঁকে স্বপ্নধনু" GE24833.

শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন পল্লী-সঙ্গীত—"ওরে রঙিলা নাইয়া রে" এবং "গোকুল আঁধার হইয়াছে"—GE 24834.

একতারা চিত্রের আটটি গান কলম্বিয়া রেকর্ডে বেরিয়েছে, যথাক্রমে : "তোর নিঃসঙ্গের অন্তরালে", "আমি গড়ি ত্রিগুণরাধা"—GE 30357 ; "তীর ভাঙা নদী আমি" এবং "ছিল গো বেণু"—GE 30358 ; "নদীর ছলে গড়লো হরি" এবং "চোখের তারায় পড়লে কুটো" GE 30359 ; "পথের ধূলায় লিপি লিখি" এবং "কেন পত্র ব্যথা বাজে"—GE 30360.

'একতারা' চিত্রের আরও গান বেরিয়েছে "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" রেকর্ডে। "দানলীলা"—ছয় খণ্ড N 76047-49 ; "রাই চলে আয়ানের ঘরে" এবং "গোবিন্দ বিসরি" N 76050 ; "চাই ভগবান" এবং "কৃষ্ণকথা কই"—N 76051 ; "মাথুর"—দুই খণ্ড N 76052.

অন্যান্য "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" রেকর্ডের মধ্যে আছে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক গান—"ঘুমালো রাতের চাঁদ" এবং "সেই ভালো এই বসন্ত নয় এবার ফিরে যাক"—N 82735.

শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ—আধুনিক—"ঢেউ ওঠে সাগরে" এবং "পথিক মেঘের দল চলেছে"—N 82736.

শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্তা—আধুনিক—"বঁধু ধর ধর মালা" এবং "যাব না যাব না যাব না ঘরে"—N 82737.

"রাত্রিশেষে" চিত্রের দুটি গান "এত রূপ এত আলো" এবং "এ পথ আমার"—N 76046.

আমার কথা (২৭)

সত্যজিৎ মজুমদার

টাকা-আনা-পাই-র কথা মনে আছে নিশ্চয়? এর গানগুলিও ভারি মিষ্টি, নতুন আর কথায় সুরে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এই গানগুলির সুরস্রষ্টা কে? এর ছবির সুরসৃষ্টি যিনি করেছেন, তিনি হাজার ছবির সুরস্রষ্টা নন, কিন্তু কয়েকটি ছবির মধ্যেমেই পাওয়া গেছে তাঁর সৃষ্টি-ক্ষমতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। রাত্রির তপস্যা, মনের ময়ূর, শুভযাত্রা প্রভৃতির সুরকার সত্যজিৎ মজুমদারই হলেন টাকা-আনা-পাইর স্মরণীয় সুরস্রষ্টা।

আত্মগোপন করে থাকতে চান সত্যজিৎ বাবু। প্রচারের তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্যকে এড়াতে চান। হয়তো তাই হাজার ছবির সুরকার হতে পারেননি তিনি। 'ইণ্টারভিউ'র কথা বলতে সঙ্কুচিত হলেন। রাজি হতে চান না। কিছুতেই। অনেক বুঝিয়ে বলার পর নিজের সম্পর্কে যা তিনি বললেন, তা হলো এই :

"আমার জন্ম ১৩২৫ সালে, ঢাকা বিক্রমপুরের বীরতারা গ্রামে। প্রথম জীবন ওখানেই কাটে। শুনলে অবাক হবেন হয়তো, আমাদের পরিবারে গাইয়ে-বাজিয়ে কেউ নেই এবং বাবা কাকা ভায়েরা প্রত্যেকেই সুদক্ষ ক্রীড়াবিদ্‌ এবং ক্রীড়াজগতে তাঁরা যশ অর্জন করেছেন। আমার বাবা নীরদরঞ্জন মজুমদার পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন। আমার বড় ভাই নীধু মজুমদারের কথা শুনে থাকবেন, খেলাও হয়তো দেখেছেন। আমার ছোট ভাই এইচ, মজুমদার উয়াড়ী, খিদিরপুর, কালীঘাট প্রভৃতি ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এবং আমিও এক সময় ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আমার ক্রীড়াজীবনের সূত্রপাত ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবেই। এক কথায় আমাদের পরিবারে খেলাধূলার চর্চাই প্রধান ছিল। বলতে পারেন, খেলোয়াড়ের পরিবার।

তবে আমার পূজনীয়া মাতৃদেবী সঙ্গীতানুরাগিনী এবং সঙ্গীত বৃত্তিগ্রহণ ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে আমার পরিচিতির মূলে রয়েছে তাঁর অশেষ উৎসাহ ও প্রেরণা। শৈশব এবং কৈশোরে তাঁরই কাছে আমার সঙ্গীতচর্চার হাতেখড়ি হয়। তার পর ক্রমান্বয়ে কাশীর বিখ্যাত টপ্পাগায়ক স্বর্গত বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর কাছে গান শিখি।

আমার শিক্ষা-জীবনের সুরু ও শেষ বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজে। ১৯৪০ সালে ইষ্টবেঙ্গলের খেলোয়াড় হিসাবে কলকাতায় চলে আসি এবং পরের বছর বি, এণ্ড এ আর-এ চাকরী পাই। যুদ্ধের সময় কার্য ব্যপদেশে কয়েক বছরের মধ্যে ইম্ফলে বদলী হয়ে যেতে হয়। কিন্তু চাকরীর সঙ্গে নিজেকে আমি কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না। তাই ১৯৪৫ সালে ইস্তফা দিলাম চাকরীতে। বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করলাম সঙ্গীতকে। সৌভাগ্য বশতঃ এমন সময় মেগাফোন কোম্পানীর জে, এন ঘোষ আমাকে তাঁর কোম্পানীতে প্রধান সুরকার ও শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করলেন। বলতে গেলে জে, এন ঘোষই আমাকে সঙ্গীতবিদ্‌ হিসাবে জনসাধারণের কাছে পরিচয় করে দিয়েছেন। তাঁর কাছে যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছি, আমার সঙ্গীত-জীবনের পাথেয় হিসাবে তার মূল্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব। এই সময় আমি স্বরচিত বহু গান দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, আরাধনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেশ লাহিড়ী প্রমুখ শিল্পীদের দিয়ে রেকর্ড করাই। উদাহরণতঃ, 'ফিরে যাও প্রেমের পূজারী,' 'তোমার আকাশে ছিনু আমি চাঁদ,' 'এলো রে আলোর পাখি' 'সেথা নাহি ছিল প্রেম' প্রভৃতি গানের উল্লেখ করতে পারি। এ-সব গানের অনেকগুলি তখন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। এর পর ১৯৪৭ সালে মেগাফোন কোম্পানী ছেড়ে আমি কলম্বিয়া-তে সুরকার হিসাবে যোগদান করলাম এবং ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত ওখানে কাজ করেছি। কার্যব্যপদেশে এ-সময়ে আমি প্রসিদ্ধ সুর-শিল্প স্বর্গত সুধীরলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছিলাম কয়েক মাসের জন্যে। এবং ওখানে কলম্বিয়ার সুরকার হিসাবে কাজ করেছিলাম।

এর পর শ্রীযুক্ত সুশীল মজুমদারের সহায়তায় আমি চলচ্চিত্রে সুরারোপ করার সুযোগ পাই। সুশীল বাবু পরিচালিত 'দিগ্‌ভ্রান্ত'

সত্যজিৎ মজুমদার

ছবিতে আমি প্রথম সুরযোজনা করি। তারপর তাঁর আরও দু'খানি ছবি 'রাত্রির তপস্যা' ও 'মনের ময়ূরে'ও সুরারোপ করি। ১৯৪৯ সালে কাণ গাঙ্গুলী পরিচালিত 'বাস্তব' ও 'আন্তর্জাতিক' নামীয় দুটি ছবিতেও কাজ করি। এদের মধ্যে শেষোক্তটি এখনও মুক্তি প্রাপ্ত হয়নি। তারপর ক্রমান্বয়ে ১৯৫২ সালে জ্যোতির্ময় রায়ের 'শঙ্খবাণী,' ১৯৫৩ সালে চিত্ত বসুর 'শুভযাত্রা' এবং ১৯৫৪ সালে বিকাশ রায়ের 'সাজঘর' চিত্রে সুরযোজনা করি। আর এবছর সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বহু প্রশংসিত টাকা-আনা-পাইতে, দেখেইছেন তো, সুরস্রষ্টার সৌভাগ্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছি।

রেকর্ডে যেমন জে, এন ঘোষ, ফিল্মে তেমনি সুশীল মজুমদারের কাছে আমি সব চাইতে বেশি ঋণী। বস্তুত, ফিল্ম লাইনে সুশীল বাবুকে আমি 'গুরু' মনে করি। তাঁর সহায়তার জন্যে আমি কত কৃতজ্ঞ, তা লিখে জানাবার নয়। সুশীল বাবু ছাড়া, জ্যোতির্ময় বাবুর সঙ্গে কাজ করেও আমি আনন্দ পেয়েছি। কাজ করাতেই আমার আনন্দ, যাঁরা আমাকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন, তাঁদের সকলের কাছেই আমি তাই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।"

সত্যজিৎ বাবুর সুরযোজিত কয়েকটি জনপ্রিয় গানের উল্লেখ করছি 'ফিরে যাও প্রেমের পূজারী' (আরাধনা বন্দ্যোপাধ্যায় গীত), 'মূক পৃথিবী অন্ধ আঁধারতল' (ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য) 'তুমি তো পৃথিবী' (সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়), 'মালঞ্চে মোর ফুল থাকে না' ও 'মাল্যখানি ভাসছে অকূল পাথারে' (ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'সুন্দর মোর নওল কিশোর' (উৎপলা সেন), 'আজ মনে হয় এই ভুবনে' (সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়), 'কিসকি নজরসে তুনে' (কল্যাণী মজুমদার), 'দিক-ভোলানো রাত' (শচীন গুপ্ত ও কল্যাণী মজুমদার), 'আয় ঘুম' (বাণী ঘোষাল), 'তুমি নাই' (দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়) এবং মুক্তিপ্রাপ্ত টাকা-আনা-পাই চিত্রের 'ভাঙা চালের ঘর' ও 'কেন যে পারি না ওগো' ইত্যাদি। এই সব গানের মধ্যে অনেকগুলি তাঁর নিজের লেখা, যেমন 'ফিরে যাও,' 'তুমি তো পৃথিবী,' 'তুমি নাই' ইত্যাদি। একাধারে সুরকার ও গীতিকার সত্যজিৎ বাবুর গান তাই প্রায় সময়ই আবেদনের গভীরতায় হৃদয়স্পর্শী হয়ে ওঠে।

রেকর্ড ও চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে সত্যজিৎ বাবু বলেন: "রেকর্ডে, বিশেষত রেকর্ডে ও চলচ্চিত্রে আমি সব সময়েই চেষ্টা করি নতুনদের সুযোগ দেবার। দেখুন, আজ যাঁরা বিখ্যাত শিল্পী বলে পরিচিত, তাঁরা চিরকাল তো আর সমান ভাবে গাইতে পারবেন না? তাই নতুনদের যদি সুযোগ দেওয়া না যায়, নতুন প্রতিভা যদি খুঁজে বার না করা যায়, নতুন গায়ক-গায়িকা যদি তৈরি না করা যায়, তাহলে তো বাংলা গানের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। অবশ্য প্রতিভার স্ফুরণ কালধর্মে হবেই। তবু সুরকারদের উচিত নতুনদের খুঁজে বার করা, তাদের উৎসাহ দেওয়া। এবং আমি যতখানি সম্ভব, তা করার চেষ্টা করিও। গান লেখা সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই, গানের রচনা ও তার প্রকাশভঙ্গী যত সহজ হয়, ততই তার জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা। অবশ্য জনগণের মুখের দিকে চেয়ে গান লিখতে আমি কারুকে বলছি না। এ পর্যন্ত আমি প্রায় সুর-গীতিকারদেরই রচনায় সুরযোজনা করেছি।

গান লেখার ব্যাপারে একটা দুঃখের ব্যাপার এই যে, বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিদের বড়ো একটা কেউ গান লেখাটা, রেকর্ড ও চলচ্চিত্র জগতের বুদ্ধির দৈন্য ও অবাঞ্ছনীয় আবহাওয়ার জন্যেই হয়তো, সম্মানজনক মনে করেন না এবং বস্তুত, তাঁদের কেউ সিরীয়াসলি গান লিখলেনও না। চার জন লিখেছেন বটে, তবে তা যথেষ্ট নয়। আমার মনে হয়, তথাকথিত রেডিও-রেকর্ডের গীতিকার নয়, একমাত্র সাহিত্যিকরা গান লিখলেই বাংলার গীতি-সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব। নতুবা চিরাচরিত গতানুগতিক বাঁধা-ধরা ছক-কাটা গানের আবর্জনায় একদিন বাংলার গীতি-সাহিত্যের প্রাঙ্গণ ভরে উঠবে।"

চিঠি

শ্রীমতী স্বাতি ঘোষাল

এখনো তো সন্ধ্যায় যে চাঁদ ওঠে,
গোধূলির চুম্বনে মাধবী ফোটে।
নীলিমায় আজো দেখি অলস পাখী,
খুসীর খেয়ালখানি যায় সে আঁকি।
মনে হয় তোমা বিনা বিফল সবি,
মনের ইজেলে আঁকা রঙীন ছবি,
মুছে যায় বার বার তুলির টানে।

ছেঁড়া তার আজিকার সুরে ও গানে।
তোমার আকাশ আজ কী সুর তোলে,
গোধূলি ছড়ায়ে আসে কেমনতরো,
পাখীদের কলরব কী আশা ছলে!
"কেমন করা যে মন" হলো কি কারো?
হোথায় এ সন্ধ্যার বেদনখানি—
সুরে আর গানে কি গো দিয়েছে টানি?

বিজ্ঞান বার্তা

পক্ষধর মিশ্র

আগেই আপনাদের জানিয়েছি, মহাকাশ পরিভ্রমণের দিন সমাগত। আশা করা যায়, আর ৫০ বছরের মধ্যেই মানুষ পৃথিবীর বাইরের কোন অঞ্চলে পদার্পণ করতে পারবে। ধরুন, আপনি সেই প্রথম বহির্যাত্রী দলের একজন,—কয়েক বছর পৃথিবীর বাইরে কাটিয়ে যখন ফিরে এলেন তখন পৃথিবীর সব কিছুই ওলট-পালট হয়ে গেছে। পৃথিবী থেকে যাত্রা করবার সময় আপনার নাতনীর বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর, আপনার নিজের বয়স ৭০ বছর। মহাকাশের বুকে বাহাত্তুরে পৌঁছে পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখলেন, আপনার নাতনী আপনার সমবয়সী হয়ে গেছে!

অবাক হয়ে যাবেন না। অনেক বিজ্ঞানীই এই কথা আজকের দিনে চিন্তা করছেন। তাঁরা গণিতসঙ্কুল থিওরী অফ রিলেটিভিটি দিয়ে হিসাব করে দেখেছেন যে, শূন্যে ভ্রমণকালে পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের মতন শূন্যযানের যাত্রীদের বয়স এতো তাড়াতাড়ি বাড়বে না! ফলে আপনি ভ্রমণ শেষ করে পৃথিবীতে যখন ফিরে আসবেন তখন দেখবেন, আপনার আত্মীয়-স্বজনের বয়স অনেক বেড়ে গেছে। অর্থাৎ এক কথায় শূন্যভ্রমণ করে আপনি যৌবনকে ধরে রাখতে পারেন। অবশ্য বিজ্ঞানীমহলে এ বিষয়ে মতভেদও আছে,—অনেক বিজ্ঞানীই এই চিন্তাকে অবাস্তব মনে করেন। বিলাতের 'নেচার' পত্রিকায় এই বিষয়ে দু'জন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী তো পরস্পরবিরোধী মত প্রকাশ করে রীতিমতো কলমযুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানী অধ্যাপক ম্যাকৃক্রিয়ের মতে থিওরী অফ রিলেটিভিটির নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর চেয়ে মহাশূন্যে বয়স ধীরে ধীরে বাড়বে। মহাশূন্যের কোন যাত্রী যদি বেতার সঙ্কেতের মাধ্যমে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে তাহলে সে দেখবে, শূন্য অঞ্চলে সব কিছু অনেক ধীরে ধীরে সংঘটিত হচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা, পৃথিবীর ঘড়ির কাঁটার চেয়ে অনেক আস্তে চলবে; মহাশূন্যযানের যাত্রীর হৃৎপিণ্ডের গতি পৃথিবীর মানুষের হৃৎপিণ্ডের চেয়ে হবে মন্থর! মহাশূন্য ভ্রমণ শেষ করে যাত্রী ফিরে এসে দেখবে, পৃথিবীর মানুষের হৃৎপিণ্ড তার চেয়ে অনেক বেশী বার সঙ্কুচিত হয়েছে, তাই পৃথিবীর মানুষের বয়স গিয়েছে বেড়ে।

অধ্যাপক ডিংগলে কিন্তু এই ধারণার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি থিওরী অফ রিলেটিভিটির সাহায্যেই আলোচনা করে বলেছেন,—এই অবাস্তব ঘটনা ঘটার কোনই সম্ভাবনা নেই। মহাশূন্যে যা কিছুই হোক না কেন, পৃথিবীর পরিবেশে মহাশূন্যযাত্রী যখন ফিরে আসবে তখন সমগ্র পরিবেশকে তার নিজের সঙ্গে সমতাসম্পন্নই দেখতে পাবে। আলোচনা অবশ্য এখানেই শেষ হয় নি—আরও অনেক রথী-মহারথীরা এই সমস্যাযুদ্ধে নানা ভাবে যোগ দিয়েছেন। তবে যাই হোক না, একবার কিছুদিনের জন্য মহাশূন্যে না বেড়িয়ে এলে এই সমস্যার সঠিক সমাধান হওয়া প্রায় অসম্ভব।

যে কোন বিশেষ এক জনের দেহকোষ, ত্বক অথবা রক্ত পরীক্ষা করে বলা যায়, সে ছেলে কি মেয়ে। স্ত্রী অথবা পুরুষ উভয়েরই কোন দেহকোষ এবং একের বিশেষ কোন অংশের কাঠামো সম্পূর্ণ পৃথক। সামান্য একটু ত্বক চেঁছে নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাদের সংযুক্ত কোষ সমূহ পরীক্ষা করলে স্ত্রীলোকের চামড়ায় এক বিশেষ ধরণের অতি ক্ষুদ্র কাঠামোর আধিক্য দেখা যায়। অবশ্য এটা সব সময়েই হয় না—কোন কোন সময়ে ব্যতিক্রমও পাওয়া যায়। রক্তের মধ্যে বিশেষ শ্বেতকণিকার অবস্থিতি থেকেও ইংল্যাণ্ডে বিজ্ঞানী ডেভিডসন ও স্মিথ, ঐ রক্তের অধিকারী পুরুষ কি স্ত্রীলোক, তা নির্দ্ধারণ করবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। অবশ্য সবচেয়ে সোজা উপায় হলো জিভ ছুলে মুখের ঐ আস্তরণ পরীক্ষা করে স্ত্রী-পুরুষ নির্ণয় করা। মিছামিছি চামড়া কেটে নেওয়া অথবা রক্ত বার করার কোনই প্রয়োজন নেই। জিভ চাঁছা ময়লার মধ্যেই সর্ব্বদাই উপরের কিছু কিছু দেহকোষ নির্গত হয়। এই কোষ সমূহের বিচক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ নির্দ্ধারণ করা সম্ভব।

বর্ত্তমান কালে বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা জন্মের পূর্ব্বেই গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গও নির্দ্ধারণ করা সম্ভব। বহুযুগ ধরে মানুষ জন্মের পূর্ব্বেই গর্ভস্থ সন্তান ছেলে কি মেয়ে, তা জানবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে, অবশেষে বিজ্ঞানের সহায়তায় তার এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হলো। গর্ভস্থ ভ্রূণ, গর্ভাশয়ের মধ্যে একটি বিশেষ তরল পদার্থ দ্বারা পরিবৃত। এই তরল পদার্থের মধ্যে ভ্রূণের ত্বক থেকে সর্ব্বদাই দেহকোষ নির্গত হচ্ছে। কোনরকমে গর্ভাশয়ের থলিকে খোঁচা দিয়ে এই তরল পদার্থ বার করে পরীক্ষা দ্বারা ভ্রূণের লিঙ্গ নিরূপণ করা চলে। মোটামুটি সংখ্যা-বিজ্ঞানের সাহায্যে দেখা গিয়েছে, এই ভাবে জরায়ুর মধ্যেকার তরল পদার্থে অবস্থিত দেহকোষগুলি পরীক্ষা করে বেশ নির্ভরযোগ্য ভাবে জন্মের পূর্ব্বেই সন্তানের লিঙ্গ নির্দ্ধারণ করা যায়।

* * *

আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখী কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা নির্দ্ধারণ-করে সম্প্রতি বিজ্ঞানী মহল বিশেষ সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। চন্দ্রপৃষ্ঠে জ্বালামুখীর সৃষ্টি সম্বন্ধে দু'টি মতামত প্রচলন আছে। একটি আভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণ বা গোলযোগ, অপরটি শূন্যচারী দেহের চন্দ্রগাত্রে আঘাত। বিজ্ঞানী ডাঃ ইউরে,—শূন্যচারী দেহ কর্ত্তৃক চন্দ্রপৃষ্ঠে আগ্নেয়গিরির মুখগহ্বর সৃষ্টির মতবাদকে সমর্থন করেন। যাই হোক,

এত দিন বিজ্ঞানীদের এই বিষয়ে সব-কিছুই অনুমান বা ধারণা যুক্তিমূলক ছিল, এবার তাঁরা আলামুখীর সৃষ্টির রহস্য পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণ করবার জন্ত সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী গিলবার্ট কায়েলভার, প্লাষ্টার অফ প্যারিস নির্মিত মডেলে কৃত্রিম আঘাতের দ্বারা গবেষণাগারে আলামুখী সদৃশ গহ্বর সৃষ্টির চেষ্টার প্রাথমিক পরীক্ষাসমূহ করেন। পরে তাঁরই পরামর্শ অনুযায়ী বিজ্ঞানী এক এন জনসন এই বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

* * *

সম্প্রতি নেদারল্যাণ্ডের কৃষিমন্ত্রী, কৃষিকার্য্যে পরমাণু শক্তি ব্যবহারের জন্ত গবেষণা-মন্দির স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছেন, কৃষিকার্য্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহারের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত এক আলোচনা-সভায় মন্ত্রী মহাশয় এই ঘোষণা করেন। ঐ গবেষণা-মন্দিরে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়েই পরমাণু শক্তি ও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহারের ফলাফল গবেষণার দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করা হবে।

(ক) জমি সংক্রান্ত গবেষণায়, (খ) উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে, (গ) প্রাণি-বিজ্ঞানে, (ঘ) উদ্ভিদ প্রজননে এবং, (ঙ) খাদ্য সংরক্ষণে।

এই সব বিষয়ে কিছু কিছু কাজ ইতিমধ্যেই ইউরোপে হয়েছে। বিশেষ করে সুইডেনের বনের মহীরুহ সমূহের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে যে সঙ্কর বৃক্ষ সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল, তার সাফল্য খুবই আশাপ্রদ। এই সভাতেই সুইডেনের বিজ্ঞানী অধ্যাপক গুস্তাফসন্ প্রতিনিধিদের জানান যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রয়োগ করে তাঁরা বার্লি ও নানাপ্রকার ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। কেবল ফসলই বেশী নয়, এই পদ্ধতি গ্রহণ করলে শস্তের খড়ের অংশও অপেক্ষাকৃত শক্ত হয় এবং অতি সহজেই যান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা ফসল কাটা যায়। গত বছর জেনেভাতে এই সম্মেলনে অধ্যাপক গুস্তাফসন, রুশিয়ার বিজ্ঞানীদের তেজস্ক্রিয় রশ্মির সাহায্যে ফলন বৃদ্ধির গবেষণার একজন প্রধান সমালোচক ছিলেন ;—এবার তিনি নিজের পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে এই পদ্ধতির সাফল্যের কথা স্বীকার করে গিয়েছেন।

এই সম্মেলনে অধ্যাপক কুপরিয়ানফ-এর সভাপতিত্বে খাদ্য সংরক্ষণে তেজস্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহারের কথাও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়।

গুগলিয়েলমো মার্কনি

বিজ্ঞানী মার্কনি বেতারে সংবাদ প্রেরণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। এই অসাধারণ আবিষ্কারের জন্ত তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। যে-সব বিজ্ঞানীর আবিষ্কার মানবকল্যাণে সর্বাপেক্ষা বেশী সহায়তা করবে, তাঁহাদেরই পুরস্কৃত করবার জন্ত মহামতি নোবেল এই বিশেষ সম্মানের ব্যবস্থা করেন। মার্কনির আবিষ্কারের মতো আর খুব কম আবিষ্কারই মানবকল্যাণে এতো বেশী সহায়ক হয়েছে। বেতারে সংবাদ প্রেরণ ব্যবস্থা, বর্ত্তমান সভ্যজগতের এক প্রধান স্তম্ভ।

১৮৭৪ সালের ২৫শে এপ্রিল ইটালীতে বিজ্ঞানী মার্কনি জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম তাঁর গুগলিয়েলমো মার্কনি,—তিনি রাজ্যশিক্ষা বাড়ীতেই লাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি অনুমান করেছিলেন যে, বিজ্ঞানী হার্টজএর বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে বার্ত্তা প্রেরণের কাজে লাগানো যেতে পারে। অতি অল্প বয়সেই তিনি এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং অচিরেই সাফল্যলাভ হয়। ১৮৯৫ সালে মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি পরীক্ষামূলক ভাবে প্রায় এক মাইল দূরে বার্তা সঙ্কেত প্রেরণ করতে সমর্থ হলেন। ভাল যন্ত্রপাতি ছাড়াই এই সাফল্য তাঁকে অত্যন্ত উৎসাহিত করলো। তাই ১৮৯৬ সালে ভাগ্য পরিবর্ত্তনের আশায় তরুণ বিজ্ঞানী মার্কনি ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করলেন। ইংল্যাণ্ডেই বেতারে সংবাদ প্রেরণের পেটেন্ট তিনি সর্ব্বপ্রথম গ্রহণ করেন। ৯-১০ মাইল দূরবর্ত্তী ডাকঘর থেকে ডাকঘরে পরীক্ষামূলক ভাবে সংবাদ প্রেরণ করে তিনি তাঁর অসাধারণ আবিষ্কারের কাহিনী জন-সমক্ষে প্রচার করেন। ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানী মার্কনি তাঁর অতুলনীয় আবিষ্কারের জন্ত সারা পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করেছেন। ইটালী সরকার মার্কনিকে রোমে আমন্ত্রণ করে পাঠালেন। সমুদ্রতীর থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে সমুদ্রবক্ষে একটি ইটালীর রণপোতে বার্তা-সংবাদ প্রেরণ করে মার্কনি ইটালীর রাজা ও রাণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

বিজ্ঞানী মার্কনির এই সাফল্যের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইংল্যাণ্ডে তাঁর পেটেন্টকে কার্য্যকরী করার জন্ত একটি কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হলো, কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ঘটলো বেতার সংযোগ। বেতারবার্ত্তার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রায় ৭৫ মাইল দূরে যুদ্ধ-জাহাজের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা আরম্ভ হয়েছিল। ১৯০০ সাল থেকে বিজ্ঞানী মার্কনি দূরে বেতার-সংযোগ স্থাপনে মনোযোগী হলেন। ১৯০১ সালের ১২ই ডিসেম্বরে এলো এক পরম আকাঙ্খিত সাফল্য। মার্কনি কর্ণওয়াল্স থেকে আটল্যান্টিক মহাসাগর পার করে আমেরিকার নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে সংকেত পাঠাতে সক্ষম হলেন।

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে এই বিরাট অবদানের জন্ত ১৯০৯ সালে পদার্থ-বিজ্ঞানে মার্কনিকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এ ছাড়াও সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তিনি আরও বহু সম্মান লাভ করেছিলেন। ইটালীর রাজাও তাঁকে ইটালীর সেনেটের সভ্য মনোনীত করে সম্মানিত করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি ইটালীর সৈন্ত বিভাগ ও নৌ বিভাগকে বহু ভাবে সাহায্য করেন। ইটালীর যুদ্ধ-মিশনের সভ্য হিসাবে একবার আমেরিকা যান এবং প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে ইটালীর প্রতিনিধিত্ব করেন। ঐ সভায় তিনি ইটালীর পক্ষে অষ্ট্রিয়া ও বুলগেরিয়ার সঙ্গে শান্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করেন। ইটালীর রাজা তাঁকে মার্কুইস-এর আভিজাত্য দেন,—রুশিয়ার জার অর্ডার অফ সেণ্ট অ্যান এবং ইংল্যাণ্ডের সম্রাট 'গ্র্যাণ্ড ক্রশ অফ দি ভিক্টোরিয়ান অর্ডার' প্রদান করে এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর বন্দনা করেন।

মার্কনির বাবা ইটালিয়ান কিন্তু মা ছিলেন আইরিশ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, অমায়িক মানুষ। বিজ্ঞানের চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির প্রতিও তাঁর যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। এই ক্ষমতাপ্রিয় বিজ্ঞানী এক সময় ইটালীর রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বিজ্ঞানী গুগলিয়েলমো মার্কনি ১৯৩৭ সালের ২০শে জুলাই তেষট্টি বছর বয়সে রোমে পরলোক গমন করেন।

টেবিল টেনিস

বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা বিভাগে জাপানের খেলোয়াড়দের মাথায় বিজয় মুকুট। বিশ্বের ধুরন্ধর খেলোয়াড়রা জাপানের খেলোয়াড়দের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন।

ষ্টক হোমের বিশ্ব-টেবিল-টেনিস প্রতিযোগিতায় ছত্রিশটি দেশের ৩৬৫ জন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ। সোয়েদেলিং কাপের খেলা চারটি গ্রুপে এবং কার্বলিন কাপের খেলা তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। সোয়েদেলিং কাপের চারটি গ্রুপের বিজয়ীর মধ্যে নক-আউট প্রথায় খেলা হয় এবং কার্বলিন কাপের তিনটি গ্রুপের বিজয়ীর খেলা লীগ প্রথায় হয়। সোয়েদেলিং কাপে ভারত প্রথম গ্রুপে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

১৯৫২ সালে জাপান বিশ্ব-টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের পর থেকেই জাপান টেবিল টেনিসে আধিপত্য বিস্তার করে। জাপানী খেলোয়াড়রা ছোট ব্যাটের 'স্পঞ্জ র‍্যাকেট' পেন হোল্ড গ্রিপ, সেই সংগে উপর্যুপরি আক্রমণ করে অপর পক্ষের খেলোয়াড়কে বিপর্য্যস্ত করে।

এবারকার ফলাফল :—

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল

তোশিয়া তানাকা (জাপান) ২১-১১, ২১-১৮, ২১-১১ গেমে গত বারের চ্যাম্পিয়ান ইচিরো ওগিমুরাকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল

মিস ফুজী ইগুচি (জাপান) ২১-১৪, ২৪-২২, ১১-২১, ২১-২৩, ২১-১১ গেমে মিস এ্যান হেডনকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল

এনড্রিয়াডিস ও এন-ষ্টিপেক (চেকোশ্লাভাকিয়া) ২১-১৩, ১৮-২১, ২১-১৯, ২১-১৭ গেমে ইচিরো ওগিমুচা ও তোশিয়া তানাকা (জাপান) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইন্যাল

মিস লিভিয়া মোজকজী ও মিস এগনিস্ সাইমন (হাঙ্গেরী) ১৭-২১, ২৩-২১, ২১-১৮, ১৮-২১, ২১-১৩ গেমে মিস ডায়না রো ও মিস এ্যান হেনডকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবল ফাইন্যাল

ইচিরো ওগিমুরা ও মিস ফুজী ইগুচি (জাপান) ২১-১৬, ১১-২১, ২১-১৮, ১০-২১, ২১-১১ গেমে আইভ্যান এন্ড্রিয়াডিস (চেকোশ্লোভাকিয়া) ও মিস এ্যান হেডনকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

* * *

রণজি প্রতিযোগিতার সেমি ফাইন্যালে দুর্ভাগ্য বশতঃ বাংলা দলকে রণজি প্রতিযোগিতার সেমি ফাইন্যাল থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে। ইডেন উদ্যানে বাংলা ও সার্ভিসেস-এর খেলায় পাঁচ দিনে দুই ইনিংসের খেলা মীমাংসিত হয়নি খেলার ফলাফল। নিয়মানুযায়ী টস হওয়ায় সার্ভিসেস দল ফাইন্যাল খেলার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, এবারেই সর্ব্ব-প্রথম সার্ভিসেস দল রণজি প্রতিযোগিতায় ফাইন্যাল খেলার সুযোগ লাভ করলো। অপর দিকে ভারতের অন্যতম শক্তিশালী ক্রিকেট দল বোম্বাই মাদ্রাজকে পরাজিত করে ফাইন্যাল খেলার যোগ্যতা অর্জ্জন করল।

বোম্বাই দল সেমিফাইন্যালে মাদ্রাজকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেছে। মাদ্রাজ দল এক ইনিংস ও ৩২৩ রাণে পরাজয় স্বীকার করে। এই খেলায় বোম্বাইয়ের উদীয়মান খেলোয়াড় কেনীর ২১৮ রাণ ও রুসী মোদীর ১৭২ রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বোম্বাই দল সার্ভিসেস দলের সহিত ফাইন্যালে প্রতিযোগিতা করে।

* * *

এবারও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা—অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়ানসিপের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করলেন এ ভি চুং। এবার নিয়ে এ ভি চুং চার বার চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করলেন। টেনিস খেলার মত ব্যাডমিন্টনেও বিশ্ব-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা নেই, তাই উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান ও অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়ানকে যথাক্রমে টেনিস ও ব্যাডমিন্টনে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলে নির্ব্বাচিত হন, এবারকার ফাইনালে এ বি চুং পরাজিত করেন ডেনমার্কের উদীয়মান খেলোয়াড় আরল্যাণ্ড কাপস। কাপস বিশ্বের দুই খ্যাত খেলোয়াড়কে পরাজিত করে ফাইন্যালে খেলার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন।

মহিলা-বিভাগে বিজয়িনী হয়েছেন আমেরিকার মিস ডেভলিন। ফাইন্যালে ডেভলিন তাঁরই দেশের অন্যতম খেলোয়াড় মার্গারেট ভার্ণারকে পরাজিত করেন। মিস ডেভলিনের পক্ষে অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ এই প্রথম নয়। ইতিপূর্ব্বে তিন বছর আগে তিনি এই চ্যাম্পিয়ানসিপের গৌরব অর্জন করেন।

* * * *

কলকাতায় হকি খেলা এখন পুরোদমে চলছে। কারণ, কলকাতায় হকির মরশুম মাত্র দু'মাস। এর মধ্যে হকি-লীগের খেলা শেষ করে বাইটন কাপ প্রভৃতির খেলা আছে। লীগপাল্লার দৌড়ে ইষ্টবেঙ্গল দল এবার এখনও পর্য্যন্ত অগ্রগামী আছে। ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের হকি চারিটি খেলা গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়েছে।

মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল চির-প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই এদিন মাঠে দর্শক-সংখ্যা অন্যান্য যে কোন দিনের খেলা অপেক্ষা অনেক বেশী।

কিন্তু সেদিন দু' পক্ষ আত্মরক্ষামূলক খেলায় কোন দলেরই খেলা তেমন চোখে পড়েনি। মোহনবাগান অপেক্ষা ইষ্টবেঙ্গল দল অপেক্ষাকৃত ভাল খেললেও খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। এ পর্য্যন্ত দলগত অবস্থায় মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দল ১টি করে মহামেডান দল ২টি ও কাষ্টমস ৪টি পয়েন্ট হারিয়েছে। তবে এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, চারটি দলই এখনও পর্য্যন্ত অপরাজিত আছে।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য বাংলার হকি টীম বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করেছে, সেই কারণে কলকাতার হকি লীগের খেলা একটু শ্লথ গতিতে চলবে।

হকি লীগে গোলদাতাদের মধ্যে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের জগদীশের স্থান সর্বপ্রথমে, তিনটি হ্যাটট্রিক সহ তাহার মোট গোল করার সংখ্যা ৩০।

* * *

ফুটবল মরশুম আরম্ভ হবে হকি মরশুম শেষ হওয়ার সংগে সংগে। তাই গৌরচন্দ্রিকা-স্বরূপ প্রতি বছরের মত এবারেও খেলোয়াড়দের দল-বদলের পালার শেষ তারিখ ছিল ২৫শে মার্চ। অনেক খেলোয়াড় পুরানো ক্লাবের সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। বিভিন্ন স্থান থেকে মরশুমী ফুলের মতন নতুন খেলোয়াড় আমদানী হয়েছে। সর্বশেষ দিনে ২০১ জন খেলোয়াড় ছাড়পত্র সই করেন।

এরিয়ান ক্লাবের পদ্ম মিত্র মোহনবাগানের পক্ষে ও মোহনবাগানের শুভাশীষ গুহ ইষ্টবেঙ্গলের পক্ষে ছাড়পত্রে সই করেন।

মাদ্রাজের এগমোর টেনিস ষ্টেডিয়ামে ডেভিস কাপের ইষ্ট জোনের প্রথম রাউণ্ডের খেলায় ভারত সহজেই মালয়কে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউণ্ডে ফিলিপাইনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

১৯২০ সাল থেকে ভারত ডেভিস কাপে অংশ গ্রহণ করে আসছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটি বারও ডেভিস কাপের খেলা ভারতে অনুষ্ঠিত হয়নি। এবারই সর্বপ্রথম এ খেলা মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হোল।

মহিলাদের আন্তঃরাষ্ট্র ব্যাডমিণ্টন খেলা শেষ হয়ে গেছে। প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় আমেরিকা 'উচের কাপ' লাভ করায় মহিলাদের ব্যাডমিণ্টনে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। মূল প্রতিযোগিতায় সেমি ফাইন্যালে আমেরিকা, এশিয়ান জোনের ফাইন্যালিষ্ট ভারতকে পরাজিত করেছে। ফাইন্যালে আমেরিকা ও ডেনমার্কের খেলায় আমেরিকাই বিজয়ী হয়েছে।

সাধারণ নির্বাচনে যখন সমস্ত দেশের পরিস্থিতি একেবারে অগ্নি-অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তখন আই-এফ-এর নির্বাচনের পালা অতি সামান্য। তাহলেও ক্রীড়ামোদীদের কাছে এর গুরুত্ব অল্প একটু আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিসন লীগের যে সমস্ত দলগুলি সরাসরি সদস্য প্রেরণের অধিকার নেই, তাদের মধ্যে থেকে দুইজন সদস্য নির্বাচিত হবেন। খিদিরপুর ক্লাবের প্রতিনিধি শ্রীসরোজ বসু অধিক সংখ্যক ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। এদিকে বালী প্রতিভার প্রতিনিধি শ্রীসিধু দত্ত ও ভূর্জ টেলিগ্রাফ দলের প্রতিনিধি বিশু দত্ত সমান সংখ্যা ভোট পান। এ নিয়ে দেখা যায় এক কঠিন সমস্যা। কে নির্বাচিত হবেন? সভাপতি শ্রীধীরেন দে অনুপস্থিত থাকায় সহ-সভাপতি ডাক্তার পরিমল রায় লোকসভা ও বিধানসভার কাষ্টিং ভোটের নজির তুলে সিটিং মেম্বার 'বিশু দত্তের পক্ষে কাষ্টিং ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এ ভাবে কাষ্টিং ভোট দেবার সহ-সভাপতির কোন অধিকার আছে বলে শোনা যায়নি।

আমেরিকার খ্যাতনামা এ্যাথলীট হ্যারোল্ড কনোলী এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার খ্যাতনাম্নী মহিলা এ্যাথলীট মিস ওলগা ফিকোটোভা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। মিস ওলগা চেক সরকারের কাছ থেকে হ্যারোল্ড কনোলীকে বিবাহ করে আমেরিকায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করার অনুমতি পেয়েছে। শুভ সংবাদ নিঃসন্দেহে।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

বারমুডা সম্মেলন—

বারমুডার হ্যামিল্টনে গত ২১শে মার্চ্চ হইতে ২৩শে মার্চ্চ (১৯৫৭) পর্য্যন্ত তিন দিন ধরিয়া প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ার এবং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলনের মধ্যে যে সম্মেলন হইয়া গেল, তাহা আর একটি বারমুডা সম্মেলনের কথাও স্মরণ করাইয়া দেয়। ঐ সম্মেলন হইয়াছিল ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়ের প্রধানদের মধ্যে। ঐ সময় বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল। আলোচ্য বারমুডা সম্মেলন ত্রিপক্ষীয় না হইয়া দ্বিপক্ষীয় হইয়াছে। এই সম্মেলনের পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ফরাসী প্রধান মন্ত্রীর সহিত ওয়াশিংটনে এক পৃথক সম্মেলনে সমবেত হইয়াছিলেন। আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদ যখন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল সেই সময় উহার একটা মীমাংসা করিবার জন্য ১৯৫৩ সালে বারমুডা সম্মেলন হইয়াছিল। তৎকালীন মতভেদ অপেক্ষা আলোচ্য বারমুডা সম্মেলনের পূর্ব্বে সুয়েজ খালের সমস্যা লইয়া বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদটা অধিকতর তীব্র হইয়া উঠে। সুয়েজ সমস্যা সমাধানের জন্য বৃটেন এবং ফ্রান্স যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহা সমর্থন করে নাই। মিশর হইতে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য অপসারণের জন্য সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনও লাভ করিয়াছিল। সুয়েজের ব্যাপারে মতভেদের ফলে ইঙ্গ-মার্কিন মৈত্রীর মধ্যে ফাটল ধরিয়াছিল প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার তাহা মেরামত করিবার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এই জন্যই বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর সহিত সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সুয়েজ সমস্যা দেখা দেওয়ার পর প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ার এবং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে এই প্রথম সাক্ষাৎকার।

বারমুডা বৈঠকের প্রকৃত বিবরণ অবশ্য কিছুই জানা যায় না। সম্মেলনের শেষে গত ২৪শে মার্চ্চ (১৯৫৭) যে যৌথ-ইস্তাহার প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে দুই প্রধানের মধ্যে আলোচনার মতৈক্য এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের বিবরণ সম্বলিত দুইটি দলিল সংযুক্ত করা হইয়াছে। এই সকল মতৈক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে মতৈক্যের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য বৃটেনকে কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র (guided missils) দেওয়া সম্পর্কে নীতিগত দিক হইতে মতৈক্য এবং পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের গুরুত্বও কম নয়। বৃটেনকে ক্ষেপণাস্ত্র দেওয়ার কথাই প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে সকল ক্ষেপণাস্ত্র বৃটিশ সামরিক বাহিনীর ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইবে সেগুলি পরমাণু অস্ত্রে সজ্জিত থাকিবে। কিন্তু এই পরমাণু অস্ত্র যৌথ ইঙ্গ-মার্কিন টিমের মার্কিন সদস্যদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিবে। বৃটেন না কি উহার নিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী করে নাই। পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার ফলে যে রেডিয়েশন হয় তাহা ক্ষতিকর পর্য্যায়ে যাইতে পারে বলিয়া সর্ব্বত্র যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে দুই প্রধান তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ইস্তাহারে ঘোষণা করিয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা সংযত ভাবে করা হইবে সে পর্য্যন্ত ঐরূপ ক্ষতি হওয়ার কোন আশঙ্কা নাই। তাঁহাদের এই ঘোষণার অর্থ ইহাই যে, পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা সংযত ভাবেই করা হইতেছে এবং উহাতে ক্ষতির কারণ নাই। এই স্তোকবাক্য দ্বারা বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করিয়া পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা তাঁহারা অবাধে চালাইয়া যাইতে থাকিবেন, ইহাই উক্ত ঘোষণায় প্রকৃত তাৎপর্য্য। কিন্তু পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা যে সংযত ভাবে করা হইতেছে এবং উহার রেডিয়েশন যে ক্ষতিকর নয়, তাহার প্রমাণ কি? বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রেডিয়েশনের ক্ষতিকর শক্তির যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ। তাঁহাদের সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চালাইয়া যাইতে ইচ্ছুক।

পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা সম্পর্কে তাঁহারা একটি নীতিও ঘোষণা করিয়াছেন। ঐ ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, পরমাণু অস্ত্র-পরীক্ষার পূর্ব্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে জানাইতে এবং পরীক্ষার সময় আন্তর্জাতিক পর্য্যবেক্ষকদিগকে উপস্থিত থাকিতে দিতে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত আছে যদি সোভিয়েট রাশিয়াও ঐরূপ করিতে স্বীকৃত হয়। আন্তর্জাতিক পর্য্যবেক্ষক বলিতে কি বুঝাইবে সে সম্বন্ধে এক ব্যাখ্যায় জনৈক সরকারী মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, বৃটেন ও আমেরিকা পরমাণু অস্ত্রের যে পরীক্ষা করিবে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে সোভিয়েট ইউনিয়নকে অনুমতি দেওয়া হইবে যদি সোভিয়েট ইউনিয়নও ঐরূপ অনুমতি দেয়। পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবটি আপতদৃষ্টিতে ভাল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু উহার মধ্যে একটা গভীর উদ্দেশ্য রহিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চালাইয়া যাইতেছে বটে কিন্তু উহা আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভ করে নাই। বিশ্বজনমত উহার বিরুদ্ধে। বিশ্ববাসী সকলেই উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতে ত্রুটি করিতেছে না। এই প্রতিবাদের কোন ফল হয় নাই বটে, বিশ্বজনমতের বিরুদ্ধে, উহাকে উপেক্ষা করিয়া পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা করা হইতেছে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব অনুসারে পূর্ব্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে জানাইয়া যদি পরীক্ষা করার এবং পরীক্ষার সময় আন্তর্জ্জাতিক পর্য্যবেক্ষকদের উপস্থিত থাকার নীতি যদি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে কার্য্যতঃ পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষাকেই আন্তর্জ্জাতিক আইনসম্মত করা

হইল। পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষাকে আন্তর্জ্জাতিক আইনসম্মত করিয়া লওয়াই যে ঐ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

মধ্য প্রাচ্যের ব্যাপার লইয়াই ইঙ্গ-মার্কিন মৈত্রীতে ঘুণ ধরিয়াছে। উহাকে সুদৃঢ় করাই বারমুডা সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী একমত হইয়া যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন সেগুলির গুরুত্বই সর্ব্বাধিক। বাগদাদ চুক্তির সামরিক কমিটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের ইচ্ছার কথাও ইস্তাহারে স্থান পাইয়াছে। সম্মেলন সম্পর্কে গোপনতা রক্ষা করা হইলেও বাগদাদ চুক্তির সামরিক কমিটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদানের ইচ্ছার কথা ইস্তাহার প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বেই গত ২২শে মার্চ্চ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের প্রেস সেক্রেটারী মিঃ হাগার্টি কর্ত্তৃক ঘোষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিপূর্ব্বে বাগদাদ চুক্তির অর্থনৈতিক এবং ধ্বংসাত্মক কার্য্যবিরোধী কমিটির সদস্য হইয়াছে। আইসেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিন ঘোষিত হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাগদাদ চুক্তির সামরিক কমিটির সদস্য হইতে চাহিবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। কারণ, উহাই আইসেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কিন্তু বাগদাদ চুক্তির সামরিক কমিটির সদস্য হওয়ার তাৎপর্য্য মিঃ হ্যাগার্টি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেনন। উহার অর্থ কম্যুনিষ্ট আক্রমণের ব্যাপারেই শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক কমিটির সদস্য বলিয়া গণ্য হইবে। উক্ত কমিটির সদস্যরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য কোন আক্রমণের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিবে না। অর্থাৎ ইসরাইলের সহিত যুদ্ধ হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক কমিটির সদস্যরূপে ঐ যুদ্ধে যোগদান করিবে না।

গাজা ও আকাবা উপসাগর সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গৃহীত প্রস্তাবাবলী কার্য্যে পরিণত করা সম্পর্কেও প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলন একমত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত গাজা অঞ্চল বৃটিশ মেণ্ডেটরী রাজ্য প্যালেষ্টাইনের অঙ্গীভূত ছিল। মিশর ও প্যালেষ্টাইনের সীমান্ত রেখা সুনির্দ্দিষ্ট ছিল না, একথা সত্য। কিন্তু যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা নির্দ্ধারণের সময় গাজা অঞ্চলকে যখন মিশরের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন উহা স্পষ্ট করিয়াই ঘোষণা করা হয় যে, ঐ সীমারেখা রাজনৈতিক বা রাজ্যগত সীমারেখা বলিয়া গণ্য হইবে না। চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের দাবী, অধিকার প্রভৃতি কোনরূপ ক্ষুণ্ন না করিয়া এই সীমারেখা স্থির করা হইয়াছে। আকাবা উপসাগর সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, তিরাণ প্রণালী যে আন্তর্জ্জাতিক জলপথ এবং আকাবা যে বৃহৎ সাগরের অংশ তাহাতে সন্দেহ নাই। তাছাড়া আকাবার উপকূলে মিশর, ইসরাইল, জর্ডান ও সৌদী আরব এই চারটি রাষ্ট্র অবস্থিত। কাজেই উহাকে শুধু মিশরের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ বিরতি চুক্তি অনুযায়ী মিশর ইসরাইল কেহ-ই জল, স্থল ও আকাশ-পথে আক্রমণ চালাইতে পারে না। ইসরাইলে প্রেরিত পণ্য সুয়েজ খাল দিয়া বাহিত হইতে বাধা দেওয়ার যে নীতি মিশর অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, তাহার নিন্দা করিয়া ১৯৫১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার কথাও স্মরণ রাখা

আবশ্যক। কিন্তু মিশর কর্তৃক গাজা হইতে ইসরাইলে হানা দেওয়া এবং শারম-এল শেখ হইতে গোলাবর্ষণ দ্বারা আকাবা উপসাগরে ইসরাইল জাহাজ আক্রমণ করা কিরূপে বোধ করা সম্ভব হইবে, সে-সম্বন্ধে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার ও মিঃ ম্যাকমিলন কোন পন্থা স্থির করিয়াছেন কি না তাহা বুঝা গেল না। জাতিপুঞ্জ বাহিনীকে স্থায়ী ভাবে গাজায় ও শারম্-এল-শেখে রাখা ছাড়া উহা রোধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু মিশর তাঁহাতে রাজী হইবে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেও ঐরূপ প্রস্তাব পাশ হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না।

সুয়েজ খাল সম্পর্কে গত ১৩ই অক্টোবর (১৯৫৭) তারিখে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন সম্পর্কেও তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে একমত হইয়াছে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ছয়টি নীতি কাধ্যকরী করিবার কোন পন্থা সম্বন্ধে তাঁহারা একমত হইতে পারিয়াছেন কি? উক্ত ছয়টি নীতির মধ্যে মিশরের সার্ব্বভৌম অধিকার সম্বন্ধে অবশ্য কোন বিরোধ নাই। অবশিষ্ট পাঁচটি নীতির মধ্যে মিশর মাত্র দুইটি নীতি মানিতে রাজী হইয়াছে। প্রাক্তন সুয়েজ কোম্পানীর অংশীদারদিগকে কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে তাহা চুক্তি দ্বারা কিম্বা সালিশী দ্বারা স্থির করিতে মিশর রাজী হইয়াছে। খালের মাশুল হইতে কিছু অর্থ খালের উন্নয়নের জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়া একটি তহবিল গঠনের প্রতিশ্রুতিও মিশর দিয়াছে। কিন্তু অপর তিনটি নীতি অর্থাৎ কোনরূপ প্রকাশ্যে বা গোপনে বৈষম্য না করিয়া সুয়েজ খাল দিয়া অবাধে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা থাকিবে, সুয়েজ খাল পরিচালন যে-কোন দেশের রাজনীতি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং মিশর ও খাল-ব্যবহারকারীদের মধ্যে চুক্তি দ্বারা মাশুল স্থির করা হইবে, এই তিনটি নীতি লইয়াই সমস্যা দেখা দিয়াছে। মিশর যে-প্রস্তাব করিয়াছে তাহার সহিত পশ্চিমী শক্তিবর্গের স্বল্পমেয়াদী প্রস্তাবের বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া মার্কিন গভর্ণমেণ্টের রাষ্ট্র বিভাগ মনে করেন। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারশিল্ড উভয় প্রস্তাবের মধ্যে কোন বিরোধ দেখিতে পান না। কিন্তু সকল দেশের জাহাজকেই বিনা বাধায় যাইতে দেওয়া হইবে, ইহাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। কারণ, মিশর যে ইসরাইলী জাহাজ সুয়েজ খাল দিয়া যাইতে দিবে তাহা মনে হয় না। সুয়েজ খাল পরিচালন যে কোন দেশের রাজনীতি হইতে মুক্ত থাকিবে, এই নীতি মিশর মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু এখন বলিতেছে যে, বৃটেন ও ফ্রান্স মিশর আক্রমণ করায় ঐ সকল নীতি এখন অকার্য্যকর হইয়াছে।

সুয়েজ খাল এখন বৃহৎ জাহাজ চলাচলের উপযোগী হইয়াছে। ইতিমধ্যে জাহাজ চলাচল আরম্ভও হইয়াছে। ডেনমার্ক, গ্রীস, নরওয়ে, ইটালী প্রভৃতি দেশ মিশরীয় সুয়েজ কর্তৃপক্ষকেই মাশুল দিয়াছে। সুয়েজ খাল বয়কট করার প্রস্তাব যে কেহ মানিবে তাহা মনে হয় না। ফ্রান্স এখনও বয়কটের নীতিতেই দৃঢ় রহিয়াছে। কিন্তু বৃটেনের সুর কিছু নরম হইয়াছে। বৃটিশ পার্লামেণ্টের টোরী সদস্যদের এক ঘরোয়া বৈঠকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ লয়েড এইরূপ আভাস দিয়াছেন যে, দুইটি শর্ত্তে বৃটেন মিশরকে খালের মাশুল দিতে রাজী আছে। প্রথমতঃ মাশুলের শতকরা ২৫ ভাগ খাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্ম পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মাশুলের সমস্তই সোনা ও ডলারে দিতে হইবে, মিশর এই দাবী করিতে পারিবে না। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সুয়েজ সমস্যা সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে বৃটিশ পার্লামেণ্টের টোরী সদস্যরা তাহাতে অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। বারমুডা সম্মেলনে সুয়েজখাল সম্পর্কে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার এবং মিঃ ম্যাকমিলানের মধ্যে যে-মতৈক্য হইয়াছে, তাহার স্বরূপ কি, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনার যোগ্য। সুয়েজ খালের ব্যাপারে কর্ণেল নাসেরের বিরুদ্ধ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মিঃ ম্যাকমিলান নাকি দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেঃ আইসেনহাওয়ার দৃঢ়তার সহিত এই দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। মিঃ ম্যাকমিলনের চাপে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার বাগদাদ চুক্তির সামরিক কমিটিতে যোগদান করিতে রাজী হইয়াছেন, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। আইসেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিনের সাফল্যের জন্যই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাগদাদ চুক্তির সামরিক কমিটিতে যোগদান করা প্রয়োজন। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিণ নীতি সম্পর্কে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার ও মিঃ ম্যাকমিলনের মধ্যে মতৈক্য হইয়াছে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। তবে একথা অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, বৃটেনের বিশেষ স্বার্থ যদি বলি দিতে না হয়, তবে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে মার্কিন নেতৃত্ব মানিয়া লইতে বারমুডা সম্মেলনে মিঃ ম্যাকমিলন রাজী হইয়াছেন।

বারমুডা সম্মেলনের প্রতিক্রিয়া—

বারমুডা সম্মেলনের ফলাফল বৃটিশ রক্ষণশীল মহলকেও খুশী করিতে পারে নাই। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী বারমুডায় বৃটেনকে আমেরিকার নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন, এই সমালোচনার মধ্যে তাঁহাদের অসন্তুষ্টি অভিব্যক্ত হইয়াছে। এমন কি লর্ড সেলিসব্যারীর পদত্যাগ যে বারমুডা সম্মেলনের ফলাফলেরই পরিণতি, এমন কথাও শোনা যাইতেছে। তিনি গ্রীসের সহিত সাইপ্রাসের সংযুক্তি আন্দোলনের নেতা আর্চ বিশপ ম্যাকারিয়সকে মুক্তিদানের প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর নিকট পদত্যাগপত্রে তিনি লিখিয়াছেন যে, আর্চ বিশপ ম্যাকারিয়সকে মুক্তি দেওয়ায় ডেমোক্রিসের খড়্‌গ আমাদের মাথার উপর ঝুলিতেছে।' সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'টাসে'র লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি লিখিয়াছেন যে, লর্ড সেলিসব্যারীর পদত্যাগ সাইপ্রাস সমস্যা অপেক্ষাও গভীরতর প্রদেশে নিহিত। বারমুডায় আমেরিকার নিকট বৃটেনের আত্মসমর্পণের সহিত এই পদত্যাগের সংযোগ রহিয়াছে। ইহা সোভিয়েট প্রচারকার্য্য বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। বৃটেনের সমালোচকরাও এই কথাই বলিতেছেন। সাম্রাজ্যবাদী পত্রিকা সাণ্ডে অবজারভারের বিশেষ রূপে ওয়াকিবহাল সমালোচক ৩১শে মার্চ (১৯৫৭) লিখিয়াছেন, "যদি বারমুডা আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হইত, সুয়েজ খাল আন্তর্জ্জাতিক হইবে এবং ইসরাইলের সীমান্ত সুনির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে, এই দাবী করিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত আছে, ইহা বিশ্বাস করিবার প্রকৃত কারণ যদি থাকিত, তাহা হইলে ম্যাকারিয়সের ব্যাপারে মনোভাব যে অন্যরূপ হইত ইহা মনে না করিয়া পারা যায় না এবং লর্ড সেলিসব্যারী হয়ত পদত্যাগ করিতেন না।"

পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ সম্পর্কে বারমুডায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহার আলোচনা ইতিপূর্ব্বে আমরা করিয়াছি। পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ সম্পর্কে মিঃ ম্যাকমিলন যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতেও বিতর্কের সৃষ্টি বড় কম হয় নাই। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাশিয়ার সহিত চুক্তি করিয়া পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিবার একটি পরিকল্পনা প্রাক্তন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার এন্টনী ইডেনের ছিল। মিঃ ম্যাকমিলন পরীক্ষামূলক ভাবে পরমাণু অস্ত্রের বিস্ফোরণ চালাইয়া যাইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তে গবর্ণমেন্টের সমর্থক টাইমস পত্রিকা পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। মিঃ ম্যাকমিলন অবশ্য বলিতে পারেন যে, বৃটেন পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিলেই যে আমেরিকা ও রাশিয়া বৃটেনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে সে সম্বন্ধে কোনই নিশ্চয়তা নাই। ফলে পরমাণু অস্ত্রের ব্যাপারে বৃটেন পিছনে পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার বিরুদ্ধে অনুরূপ যুক্তি রাশিয়াও দিতে পারে। বৃটিশ শ্রমিকদল আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করিবার চেষ্টা চলিতে থাকা পর্য্যন্ত পরীক্ষা বন্ধ রাখার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে মিঃ ম্যাকমিলনের রাজী হওয়ার কোন সম্ভবনা নাই। অবস্থা দৃষ্টে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, বারমুডায় যে বুঝাপড়া হইয়াছে তদনুসারে পরীক্ষা বন্ধ করিবার পূর্ব্বে সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে চুক্তি করিতে হইবে।

বারমুডা চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে ক্ষেপণাস্ত্র সরবাহ করিবে। কিন্তু এই ক্ষেপণাস্ত্র কবে যে বৃটেনে যাইয়া পৌঁছিবে সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। অনেকে মনে করেন, ক্ষেপণাস্ত্রগুলি বৃটেনে পৌঁছিতে কয়েক বৎসর লাগিবে। কিন্তু এই চুক্তি রাশিয়ায় যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গত ২৬শে মার্চ্চ (১৯৫৭) সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ বুলগানিন নরওয়েতে বিদেশী ঘাঁটি স্থাপনের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া নরওয়ের প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক পত্র দিয়াছেন। উহার তিন দিন পরে ডেনমার্কের প্রধান মন্ত্রীর নিকটেও মঃ বুলগানিন অনুরূপ সতর্কবাণী সম্বলিত পত্র দিয়াছেন। অতঃপর ৪ঠা এপ্রিল (১৯৫৭) 'নাটো'র দেশগুলিকে সতর্ক করিয়া দিয়া মস্কো রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আক্রান্ত হইলে রাশিয়াও আঘাত হানিতে ত্রুটি করিবে না। বৃটেনকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম ইউরোপে ছোট ও মাঝারি দেশগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ঐ দেশগুলির আগাগোড়া সর্ব্বত্র কঠোর ভাবে আঘাত হানা যাইতে পারে। আরও বলা হইয়াছে যে, পরমাণু অস্ত্রের আক্রমণ শুধু একপক্ষীয় হইবে, ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা। পশ্চিম জার্ম্মাণীকেও সেনাবাহিনীকে পরমাণু অস্ত্র সরবরাহের বহু বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া বলা হইয়াছে যে, যদি পরমাণু যুদ্ধ হয় তবে জার্ম্মাণী-ই হইবে প্রধান রণক্ষেত্র। আরও বলা হইয়াছে যে, যে-সকল স্থানে পরমাণু অস্ত্র সঞ্চিত থাকিবে, সেই সকল স্থানেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধ্বংসকারী আঘাত হানাই যুদ্ধ-বিজ্ঞানসম্মত। হল্যাণ্ডকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলা হইয়াছে যে, মার্কিন ঘাঁটি সোয়েষ্টাবার্গে যদি একটি বোমা বর্ষিত হয়, তাহা হইলে আমষ্টার্ডম, হেগ, ইউট্রেচ্ট, আমের্সফুর্ট এবং ঐ সকল সহরের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত অঞ্চল নিশ্চিহ্ন করিবার পক্ষে উহা-ই যথেষ্ট। রাশিয়ার এই প্রতিক্রিয়া হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বারমুডা সম্মেলন ঠাণ্ডা যুদ্ধকে তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে।

সাইপ্রাস সমস্যা—

গ্রীসের সহিত সাইপ্রাসের সংযুক্তি আন্দোলনের নেতা ম্যাকারিয়াসের আর্চ্চ বিশপকে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট মুক্তি দিয়াছেন এবং সাইপ্রাসে নিরাপত্তা আইনের কঠোরতাও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছে। আর্চ্চ বিশপ ম্যাকরিয়াসকে যদিও সাইপ্রাসে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি দেওয়া হয় নাই তথাপি তাঁহার মুক্তি এবং নিরাপত্তা আইনের কঠোরতা হ্রাস যে আলাপ-আলোচনা দ্বারা সাইপ্রাস সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ভারতীয় প্রস্তাবেরই পরিণতি, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) রাজনৈতিক কমিটিতে ভারতের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার অল্লাধিক এক মাস পরেই ২৮শে মার্চ্চ বৃটিশ পার্লামেণ্টে আর্চ্চ বিশপ ম্যাকারিয়সকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তাঁহাকে সেচেলেস দ্বীপপুঞ্জে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। তাঁহার মুক্তি সম্পর্কে তুরস্কের পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে সরকারী ভাবে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা হয় নাই বটে, কিন্তু রাজনৈতিক মহল বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, বৃটিশ উপনিবেশ মন্ত্রী আলান লেনো বয়েড সম্প্রতি যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন আর্চ্চ বিশপকে মুক্তিদান তাহার বিরোধী। তাঁহার মুক্তির প্রতিবাদ বৃটেনের লর্ড প্রেসিডেন্ট অব কাউন্সিল লর্ড সেলিসব্যারী পদত্যাগ করিয়াছেন। অবশ্য ইহাই তাঁহার পদত্যাগের একমাত্র প্রধান কারণ কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সে সম্পর্কে 'বারমুডা'র প্রতিক্রিয়া শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার পদত্যাগের প্রতিক্রিয়ায় সাইপ্রাস সম্পর্কে মীমাংসার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করিবেন কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন।

এক বৎসর পূর্ব্বে বৃটিশ-সাইপ্রাস আলোচনা যেখানে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল পুনরায় সেই স্থান হইতেই যদি আলোচনা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে আলোচনা ফলপ্রসূ হইতে পারে। আইন-সভায় গ্রীকদের আনুপাতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর্চ্চ বিশপ দাবী করিয়াছেন। লর্ড র‍্যাডক্লিফের প্রস্তাবে তাহা পূরণ করা হইয়াছে। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ নামটির সহিত আমরা বিশেষ ভাবেই পরিচিত। এইজন্যই আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে আশঙ্কা হয়। তা ছাড়া আরও সমস্যা আছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 'নাটো'র মধ্যস্থতায় মীমাংসার পক্ষপাতী। এই প্রস্তাব গ্রীস অগ্রাহ্য করিয়াছে, কিন্তু গ্রহণ করিয়াছে তুরস্ক। বৃটিশ উপনিবেশ সচিব মনে করেন, সাইপ্রাসের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের পূর্ব্বে উহার আন্তর্জ্জাতিক ষ্ট্যাটাস্ সম্পর্কে বুঝা-পড়া হওয়া আবশ্যক। ইহাতে আবার বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। এখানে আমরা সাইপ্রাস সমস্যার ইতিহাস আলোচনা করিবার স্থান পাইব না। ডিজরেলী সাইপ্রাসকে 'the key to the West Asia' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

আজ পশ্চিম-এশিয়ায় বৃটিশ প্রভাবের নামগন্ধও আর নাই। সামরিক ঘাঁটী হিসাবে উহার কোন গুরুত্ব আর নাই, ইহা বুঝিয়া বৃটেন যদি আন্তরিকতার সহিত মীমাংসা করিতে চায় তবে মীমাংসা হওয়া কঠিন বলিয়া আমরা মনে করি না।

মিশর অভিযানের গুপ্ততথ্য—

ফ্রান্সের বিশিষ্ট সাংবাদিক ভ্রাতৃদ্বয় সার্জ ও মেরী বোম্বার্স 'মিশর অভিযানের গুপ্ত তথ্য' (The Secrets of the Egyptian Expedition) নামে যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহা হইতে কতকগুলি চাঞ্চল্যকর অংশ প্যারীর বিখ্যাত পত্রিকা ফিগারোর ২৮শে (১৯৫৭) সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকের পত্রিকায় প্রকাশিত অংশে মিশর অভিযান সম্পর্কে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহা এই অভিযান সম্পর্কে বিশ্ববাসীর অনুমানকেই সমর্থন করিতেছে। দেখা যাইতেছে যে, আগষ্ট মাসেই মিশরে ইঙ্গ-ফরাসী অভিযান চালাইবার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে যে আরও বিস্তৃত বিবরণ জানা যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইসরাইল যে ২৯শে অক্টোবর মিশর আক্রমণ করিবে বৃটেন ও ফ্রান্স তাহা আগেই জানিত। প্যারীর সান্ধ্যপত্রিকা 'পেরী প্রেস' (Paris Presse) পত্রিকায়ও উক্ত পুস্তকের অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রিকায় উদ্ধৃতাংশে দেখা যায়, একজন ফরাসী ষ্টাফ অফিসার ১৫ই অক্টোবর (১৯৫৭) বিমান যোগে লণ্ডনে গিয়াছিলেন। কর্ণেল নাসের কর্তৃক নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশঙ্কার সম্মুখীন হইয়া ইসরাইল প্রতিশোধাত্মক আক্রমণ আরম্ভ করা স্থির করিয়াছে, স্যার এণ্টনী ইডেনকে এই সংবাদ প্রদান করাই তাঁহার লণ্ডনে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল। ১৬ই অক্টোবর প্যারীতে বৃটিশ ও ফরাসী প্রধান মন্ত্রিদ্বয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রিদ্বয়ের মধ্যে গোপন বৈঠকে ইসরাইল-মিশর যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ফিগারো পত্রিকায় প্রকাশিত উদ্ধৃতাংশ হইতে দেখা যায়, ফ্রান্স একটি হাল্‌কা ধরণের অভিযানের প্রস্তাব করিয়াছিল। ফরাসী প্রস্তাবে ৪৮ ঘণ্টা বিমান আক্রমণ দ্বারা মিশরীয় বিমান বহরকে নিষ্ক্রিয় করা এবং প্যারাসুট ও উড্ডযান বাহিত সৈন্যদের খাল বরাবর এবং শত্রু-সৈন্যের মধ্যে নামাইয়া দেওয়ার এবং খালদখলের পর প্রয়োজন হইলে নাসেরকে শেষ করিবার জন্য কায়রোর দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। বৃটেন এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বড় অভিযানের পরিকল্পনা করে। গতানুগতিক রণনীতি অনুযায়ী বড় রকমের যুদ্ধ করাই ছিল বৃটিশের প্রস্তাব। সার্জ বোম্বার্স ফিগারো পত্রিকার এবং মেরী বোম্বার্স প্যারীপ্রেস পত্রিকার সংবাদদাতা। তাঁহারা ঘটনাস্থল হইতে মিশরে ইঙ্গ-ফরাসী অভিযানের সময় সংবাদ প্রেরণ করিতেন। সংবাদদাতা হিসাবে তাঁহাদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে। কাজেই তাঁহাদের বিবরণের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাঁহাদের বিবরণের এক অংশের দায়িত্ব ফ্রান্সের প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ সুম্যান গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ফরাসী প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর হইতে এই পুস্তক প্রকাশে আপত্তি করা হয় নাই, ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গুপ্ত তথ্য উদ্‌ঘাটন সম্পর্কে স্যার এণ্টনী ইডেনকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি কোন মন্তব্য করিতে অস্বীকার করেন।

জারিং মিশন—

নিরাপত্তা পরিষদে ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) তারিখে গৃহীত ত্রিশক্তি প্রস্তাবের নির্দেশ অনুসারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সুইডেনের প্রতিনিধি এবং উক্ত পরিষদের প্রেসিডেণ্ট মিঃ গানার জারিং কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা শেষ করিয়া রিপোর্ট রচনা করিবার জন্য জেনেভা রওনা হইয়া গিয়াছেন। প্রস্তাবে ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য তাঁহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তিনিও এই নির্দেশ অনুযায়ী রিপোর্ট দাখিল করিতে চান। আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই নিরাপত্তা পরিষদে তাঁহার রিপোর্ট পেশ করা হইয়া যাইবে। মিঃ জারিং ১৪ই মার্চ্চ করাচীতে পৌঁছেন এবং পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিয়া ২২শে মার্চ্চ নয়াদিল্লীতে আসেন। নয়াদিল্লীতে এক সপ্তাহ আলাপ-আলোচনার পর ৩০শে মার্চ্চ তিনি আবার করাচীতে যান এবং সেখানে আলোচনার পর পুনরায় ৫ই এপ্রিল নয়াদিল্লীতে আসেন। ভারত সরকারের সহিত আলোচনা শেষ করিয়া ৯ই এপ্রিল তিনি করাচীতে যান এবং সেখান হইতে জেনেভায় রওনা হইয়া গিয়াছেন। পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার আলোচনা সম্পর্কে বিশেষ গোপনতা রক্ষা করা হইয়াছে। ইহাতে সাধারণের কৌতূহল বৃদ্ধি পাওয়া খুব স্বাভাবিক। নিরাপত্তা পরিষদে তাঁহার রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা হইবে, ইহা আশা করা খুব স্বাভাবিক। সেই সময় এই কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু যে প্রস্তাবের নির্দেশ অনুসারে তিনি পাকিস্তান ও ভারতে আসিয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য্য আলোচনা করা উপেক্ষার বিষয় বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না।

কাশ্মীর সম্পর্কে গত ১৬ই জানুয়ারী (১৯৫৭) হইতে নিরাপত্তা পরিষদে যে-আলোচনা আরম্ভ হয়, তাহাতে ভারতের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক অবস্থা দেখা দেয় চতুঃশক্তির প্রস্তাবে। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৭) রাশিয়া এই প্রস্তাবে ভেটো দেওয়ায় ভারতের এই বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। অতঃপর ত্রি-শক্তি কর্ত্তৃক আর একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। উহাতে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ভারত ও পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ আলোচনা করিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেণ্ট গানার জারিংকে ভারতে ও পাকিস্তানে প্রেরণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ২১শে ফেব্রুয়ারী নিরাপত্তা পরিষদে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাশিয়া উহাতে ভেটো প্রদান করে নাই, কেবল ভোটদানে বিরত ছিল। চতুঃশক্তির প্রস্তাব অপেক্ষা ত্রিশক্তির প্রস্তাব ভারতের পক্ষে কতখানি কম বিপজ্জনক, তাহা আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে চতুঃশক্তির প্রস্তাবের স্বরূপটি বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কিউবা এই চতুঃশক্তি কাশ্মীর হইতে সৈন্য অপসারণ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ফৌজ প্রেরণ সংক্রান্ত পাকিস্তানের প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের সহিত

|| মাসিক বসুমতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্ব্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ||

মাসিক বসুমতী কেন কিনবেন ?

পত্রপত্রিকা অনেক আছে বাঙলা সাহিত্যের আঙিনায়, কিন্তু মাসিক বসুমতীর মত মূল্যবান রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ সর্ব্বজনপ্রিয় সাময়িক পত্র আর একটিও নেই বর্ত্তমানে। আপনিই বলুন, আজকালের অভিজ্ঞ ও সুরুচিসম্পন্ন পাঠক-পাঠিকাদের মনের চাহিদা মিটাতে মাসিক বসুমতীর মত আর ক'খানি কাগজ আছে ? পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের আশীষপুত মাসিক বসুমতীর স্থান আজ তাঁর মতই, বাঙলার ঘরে ঘরে। প্রাসাদ থেকে পর্ণকুটীরে ; রাজবাড়ীর সিংহদ্বার থেকে কৃষকের হৃদিমন্দিরে ; সরকারী কেরাণীর বাসা থেকে বেসরকারী ব্যবসায়ীর সোফাখানায় ; ৯৯৯ ক্লাব থেকে হাঁসপাতালে ; পল্লীর সাধারণ পাঠাগার থেকে স্কুল-কলেজের হোষ্টেলে ; বুদ্ধিজীবিদের চেম্বার থেকে শিক্ষকদের বইয়ের শেল্‌ফে ; বাবুদের বৈঠকখানা থেকে মাঠাকরুণদের অন্দর-মজলিশে ; দাদামশাইয়ের দপ্তর থেকে শিশুদের খেলাঘরে—সর্ব্বত্র মাসিক বসুমতীর অবাধ গতি আজ। প্রবীণতম থেকে নবীনতম লেখকলেখিকার সমাবেশ, হাতে আঁকা ছবি আর হাতে তোলা ফটো, নিয়মিত বিভাগের মধ্যে পত্রগুচ্ছ, রঙ্গপট, চারঙ্গন, বিজ্ঞানের কথা, অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ, ছোটদের আসর, নাচ-গান-ব'জনা, সাহিত্য-পরিচয়—মাসিক বসুমতী পড়তে পড়তে যেন শেষ হয় না। কথামৃতের কথা সংগ্রহ থেকে সামান্য একটি পাদপূরণও কিসে আপনাদের আনন্দ দেবে, সেদিকে মাসিক বসুমতীর সদাজাগ্রত দৃষ্টি আছে—তাই না মাসিক বসুমতী এত বেশী প্রিয় এত বেশী পাঠকপাঠিকার। অনেকে হয়তো জানেন না, মাসিক বসুমতী সম্প্রতি অসংখ্য অবাঙালী পাঠকপাঠিকা লাভ করেছে। এও হয়তো জানেন না, শুধু শুধু বাঙলায় সীমাবদ্ধ নেই আর বসুমতী—দেশান্তরে সাগরপারেও ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করেছে। আপনি জানবেন আপনার সমগ্র পরিবারের জন্য একখানি, মাত্র একখানি কাগজ আছে—সেখানি মাসিক বসুমতী।

—গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের প্রতি নিবেদন—

মাসিক বসুমতীর আর এক বছর শেষ হয়ে গেল। বৈশাখ থেকে নতুন বছর শুরু হচ্ছে। নতুন বছরের গ্রাহক মূল্য তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছেন তো ? নচেৎ অধিক বিলম্বে মাসিক বসুমতী না পাওয়াও যেতে পারে। আমাদের অনেক দিনের পুরানো গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ নববর্ষের টাকা পাঠানোর সময়ে গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

আপনাদের অবগতির জন্য বলছি ১৩৬৪'র মাসিক বসুমতীর নব-কলেবর বৃদ্ধির বিশেষ চেষ্টায় আছি আমরা। বৈশাখ সংখ্যা থেকে অনেক কিছু রদ-বদল, সংযোজন আর পরিবর্ত্তন পাবেন মাসিক বসুমতীতে।

ঠিক সময়ের মধ্যে গ্রাহক-মূল্য না পাঠালে বিলম্বে হতাশ হওয়া অসম্ভব নয় কিন্তু।

—মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান মূল্য—

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিষ্ট্রী ডাকে	—	২৪৲
ষাণ্মাসিক "	—	১২৲
প্রতি সংখ্যা "	—	২৲

ভারতবর্ষে

(ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক	—	১৫৲
" ষাণ্মাসিক সডাক	—	৭·৫০
প্রতি সংখ্যা ১·২৫		
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে	—	১·৭৫

পাকিস্তানে (পাক মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ	—	২১৲
ষাণ্মাসিক " " "	—	১০·৫০
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " "	—	১·৭৫

● মাসিক বসুমতী কিনুন ● মাসিক বসুমতী পড়ুন ● অপরকে কিনতে আর পড়তে বলুন ●

আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেণ্ট জারিংকে (সুইডেনের প্রতিনিধি) ভারতে ও পাকিস্তানে প্রেরণে প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবকে তিনটি সর্ত্ত সাপেক্ষে করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ, নিরাপত্তা পরিষদের এবং কাশ্মীর কমিশনের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদ্বয় যে-বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাও মনে রাখিতে হইবে এবং তৃতীয়তঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ফৌজ সাময়িক ভাবে নিয়োগের প্রস্তাবের কথাও মনে রাখিতে হইবে। তাছাড়া কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের উপযোগী অন্যান্য বিষয়ের সন্ধান করিবার দায়িত্বও এই প্রস্তাব দ্বারা জারিং-এর উপর অর্পিত হয়। রাশিয়া ভেটো প্রদান না করিলে এই প্রস্তাব ভারতের পক্ষে যে কিরূপ বিপজ্জনক হইত তাহা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। নিরাপত্তা পরিষদের ১১ জন সদস্যের মধ্যে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, চিয়াং কাইশেকের চীন, কিউবা, কলম্বিয়া, ফিলিপাইন, ফ্রান্স এবং ইরাক চতুঃশক্তি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছিল। সুইডেনের প্রতিনিধি গানার জারিংকে প্রেরণের প্রস্তাব করা হইয়াছিল বলিয়াই নিরপেক্ষতার মনোভাব প্রকাশের জন্য সুইডেন ভোটদানে বিরত ছিল। এই অজুহাতটা না থাকিলে সুইডেনও যে প্রস্তাবের অনুকূলেই ভোট দিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

ত্রিশক্তির প্রস্তাব উত্থাপিত হয় বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং অষ্ট্রেলিয়া কর্তৃক। এই প্রস্তাবে চতুঃশক্তি প্রস্তাবের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ফৌজ নিয়োগের অভিপ্রায় বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রস্তাব ১০-০ ভোটে গৃহীত হয়। রাশিয়া ভোট দেয় নাই। ত্রিশক্তির প্রস্তাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ফৌজ প্রেরণের অভিপ্রায় পরিত্যক্ত হওয়ায় ভারতের পক্ষে জারিং মিশনের বিপদটা অনেক লঘু হইয়াছে বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মিঃ জারিংকে যে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, একথাটা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য যে-প্রস্তাব তাঁহার কাছে সন্তোষজনক বলিয়া মনে হইবে তিনি তাহাই ভারত ও পাকিস্তানের নিকট উত্থাপন করিতে পারেন। কাশ্মীর হইতে সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে নূতন প্রস্তাব তিনি উত্থাপন করিতে, এমন কি জাতিপুঞ্জের ফৌজ নিয়োগের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে তাঁহার কোন বাধা ছিল না। তিনি এক সময় ভারতে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ভারতে প্রধান মন্ত্রীর কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধিরূপে তিনি তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় না।

মিঃ জারিংয়ের দৌত্য সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তাহাতে মনে হয় ভারত ও পাকিস্তানে তাঁহার প্রথম দফা আলোচনার সময় গণভোটের বর্ত্তমান ফরমূলা সম্পর্কে উভয় দেশের প্রতিক্রিয়াই শুধু তিনি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই। মনে হয়, ভারতে তিনি এই অভিযোগই শুনিয়াছেন, গণভোট গ্রহণের সর্ত্তের প্রথম অংশ অর্থাৎ পাক-অধিকৃত অংশ হইতে পাকিস্তানের সমস্ত সৈন্য অপসারণের সর্ত্ত পাকিস্তান পালন করে নাই। দ্বিতীয় দফা আলোচনার সময় তিনি নাকি একটি কমিশনের প্রস্তাব করেন। এই কমিশন উভয় দেশের বিরোধীয় [illegible] বিবেচনা করিবেন। পাকিস্তান নাকি দাবী করিয়াছে যে কমিশনের সালিশের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ভারত এই প্রস্তাবে রাজী হয় নাই বলিয়াই প্রকাশ। কারণ, পাকিস্তান যে আক্রমণকারী তাহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং ভারত কাশ্মীরের ব্যাপারে সালিশ নিযুক্ত করার পক্ষপাতী নয়। কাশ্মীর সমস্যা আন্তর্জ্জাতিক আদালতে পেশ করার কোন প্রস্তাব না কি মিঃ জারিং করেন নাই। সুতরাং অবস্থা যেখানে ছিল সেইখানেই রহিয়াছে। মিঃ জারিংয়ের রিপোর্ট পাওয়ার পর নিরাপত্তা পরিষদ কি করিবেন? নিরাপত্তা পরিষদ নিজের উদ্যোগেই বিষয়টি আন্তর্জ্জাতিক আদালতে প্রেরণ করিতে পারেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদেও কাশ্মীর সমস্যা আলোচনার ব্যবস্থা হইতে পারে। বৃটেন ও আমেরিকা কি মনোভাব অবলম্বন করিবে তাহার উপর অনেক কিছু নির্ভর করিবে। এদিকে করাচীস্থিত ইন্দোনেশিয়ার সংবাদদাতা যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। মুক্তি-ফৌজ দ্বারা কাশ্মীরের ভিতরে গোল ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হইবে এবং পাকিস্তান অগ্রসর হইবে উহাদের সাহায্যার্থে। তখন সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে এবং এই সুযোগে নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীরকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার প্রস্তাব করিবেন। উক্ত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, মার্কিন ও পাকিস্তানী প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সুইডেনের এক পত্রিকার প্রতিনিধি লিখিয়াছেন যে, কাশ্মীর আক্রমণের একটা চেষ্টা করা হইবে এবং যুদ্ধাঞ্চলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী আমদানী করিবার ব্যবস্থা হইবে। এই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধান গণভোট গ্রহণের পথ প্রশস্ত করা হইবে।

সিঙ্গাপুরে স্বায়ত্তশাসন—

সিঙ্গাপুরের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডেভিড মার্শাল যাহা পারেন নাই বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিম ইউ হক (Mr, Lino Yew Hock) তাহাই করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সিঙ্গাপুরে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তন সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। গত ১১ই মার্চ্চ (১৯৫৭) আলোচনা আরম্ভ হয়। ৯ই এপ্রিল বৃটেন ও সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিরা চুক্তিবদ্ধ হইতে সম্মত হন এবং ১১ই এপ্রিল আনুষ্ঠানিক ভাবে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আগামী জানুয়ারী মাসে সিঙ্গাপুরে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবে। আইন-সভা ৫১ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। নূতন প্রথম পার্লামেণ্ট সম্পর্কে এই সর্ত্ত হইয়াছে যে, নাশকতা কার্য্যে লিপ্ত কোন ব্যক্তি সদস্য হইতে পারিবেন না। সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিরা প্রথমে আপত্তি করিয়াও পরে রাজী হইয়াছেন। বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও কতকগুলি সর্ত্ত আরোপিত হইয়াছে।

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সিঙ্গাপুর স্বায়ত্তশাসন পাইবে, কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি ও দেশরক্ষা ব্যবস্থা থাকিবে বৃটেনের হাতে। বৃটেন শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিতেও পারিবে। এই অবস্থায় সিঙ্গাপুরস্থিত বৃটিশ কমিশনার গবর্ণমেণ্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিষদ সাত জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। তন্মধ্যে তিন জন হইবেন বৃটন, তিন জন সিঙ্গাপুরী এবং একজন মালয় ফেডারেশনের মন্ত্রী। সিঙ্গাপুরের সামরিক ঘাঁটিগুলি থাকিবে বৃটেনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে। একজন মালয়ী সিঙ্গাপুরে ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি হইবেন। সিঙ্গাপুর যে স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে চলিল তাহা স্বায়ত্তশাসনের প্রহসন ছাড়া আর কিছুই হইবে না।

১২ই এপ্রিল, ১৯৫৭

বিজ্ঞাপনে অতিরঞ্জন

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এ স্থলে প্রধানতঃ গ্রন্থাদির বিজ্ঞাপন সম্পর্কেই অতিরঞ্জনের কথা আমরা আলোচনা করব। ব্যবসায়ের দিক থেকে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করার যেমন উপায় নেই, তেমনি প্রত্যেক ব্যবসায়ীরই এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষ ভাবে পুস্তক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা অধিক ভাবে অনুভূত হয় এই কারণে যে, এর বিজ্ঞাপনের স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং একমাত্র পত্রিকাদি ব্যতীত অন্যত্র পুস্তকাদির বিজ্ঞাপন সুরুচির পরিচায়ক মনে হয় না। কিন্তু অধুনা একটি সঙ্কীর্ণক্ষেত্রের মধ্যে বহু-প্রকাশকের ঠেসাঠেসির ফলে বিজ্ঞাপনের মধ্যে অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জন দেখা দিয়েছে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে। সখ করে কোন পিতা-মাতা 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন' রাখলেও তা যেমন অলীক ও অতিশয়োক্তিরই নামান্তর, তেমনি একখানি অচল গ্রন্থকে বিজ্ঞাপনের ভাষার আড়ম্বরের সাহায্যে সচল ক'রে তোলার চেষ্টাও অলীক ও অতিরঞ্জন-দোষদুষ্ট। এর দ্বারা পাঠক-সাধারণকে বিভ্রান্ত করা হয় এবং সমষ্টিগত ভাবে সকল পুস্তক ব্যবসায়ীর উপরেই জনসাধারণের একটি ভুল ধারণা জন্মাবার সুযোগ ঘটে।

'বিরাট', 'অদ্ভুত', 'অদৃষ্টপূর্ব্ব', 'অশ্রুতপূর্ব্ব', 'বাংলা ভাষায় এই প্রথম', 'ইতিপূর্ব্বে আর হয় নি' প্রভৃতি বাক্যগুলি অবলীলাক্রমে ব্যবহারের স্বাধীনতা পুস্তক ব্যবসায়ীদের করায়ত্ত হলেও, এ সম্বন্ধে তাঁদের যেমন সংযত হওয়া প্রয়োজন, তেমনি অহেতুক নিজ প্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে অতিরঞ্জন বর্জ্জনের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। এ সম্বন্ধে তাঁদের সর্ব্বদা এই কথাটাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তাঁরা ঝোলা গুড় বা অন্য কোন চটকদারী সামগ্রীর বেসাতী করতে বসেন নি,—তাঁরা জাতীয় কৃষ্টি ও সৎসাহিত্য প্রচারের ধারক ও বাহক। তাঁদের প্রকাশনের মান রক্ষার উপযোগিতা তাঁরা যেমন স্বীকার করেন, তেমনি বিজ্ঞাপনের ভাষা সম্বন্ধেও অতিশয়োক্তি বর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করবেন।

সাম্প্রতিক পত্রসাহিত্য

বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্রে রম্যরচনার হিড়িক অপেক্ষাকৃত প্রশমিত হবার পর সম্প্রতি পত্রসাহিত্যের হিড়িক দেখা দিয়েছে। এই পত্র-সাহিত্যকে পুষ্ট করার দিক থেকে 'মাসিক বসুমতী' দীর্ঘ দিন ধরে যে সাহায্য করে এসেছে তা সর্ব্বজনবিদিত এবং এর জন্য সম্প্রতিকালে যদি কিছু কৃতজ্ঞতা জানাবার থাকে তাহলে 'মাসিক বসুমতী'কে জানানো কর্ত্তব্য।

সাহিত্যক্ষেত্রে এই পত্রসাহিত্যের যে বিশেষ মূল্য আছে তা অবশ্যই স্বীকার্য্য। প্রাচীন সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরের বহু খুঁটিনাটি বিষয় ও মনুষ্য-চরিত্রের নানা দিক ব্যক্ত হয় এই পত্রসাহিত্যের মাধ্যমে। ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে নানা গ্রন্থে পত্রসাহিত্যের কিছু কিছু নিদর্শন ব্যক্ত হয়েছে। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'প্রাচীন বাঙলার পত্র সঙ্কলন' গ্রন্থ এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টান্তস্থল। সম্প্রতি বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত আর একখানি মূল্যবান গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্যক্তির অপর একখানি গ্রন্থের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য!

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

শহীদ স্মৃতি-কথা

দু'শো বছরের অধীনতার পর সম্প্রতি ভারতবর্ষে এসেছে স্বাধীনতা। হঠাৎ স্বাধীনতা আসে নি, আকাশ থেকে ঝরে পড়ে নি। স্বাধীনতা এসেছে অসংখ্য আত্মত্যাগে, শত শত জীবন মুহূর্ত্তের সঙ্কেতে ঝরে পড়েছে চিরদিনের মত, লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী হাসিমুখে নিজেদের উৎসর্গ করেছে স্বাধীনতার বেদীমূলে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্য্যন্ত এই আত্মবলিদানের বিরাম ছিল না। সম্প্রতি সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরগণের প্রতিকৃতিসহ জীবনকথা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। যাঁদের নিঃস্বার্থ আত্মদানে ভারতের আকাশে-বাতাসে আজ অনুভূত হচ্ছে স্বাধীনতার নিঃশ্বাস, তাঁদের প্রতি বিস্মরণ কোন ক্রমেই সহনীয় নয়। আজকের দিনে এঁদের নাম যত প্রচার ও প্রসার লাভ করে ততই মঙ্গল। কারণ এ কথা ভুললে চলবে না যে, এঁরাই স্বাধীনতার পথিকৃৎ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূল এঁরাই। ঢাকা জেলা স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস প্রণয়ন সমিতি থেকে ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত (পল্লীশ্রী খদ্দর-ভাণ্ডার, বি-৭৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম সাড়ে তিন টাকা।

মাঘোৎসবের উপদেশ

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে যে ক'জন দিকপালের আবির্ভাব ঘটেছিল, প্রাতঃস্মরণীয় শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁদেরই অন্যতম। বাঙালীর জাতীয় জীবনে শিবনাথের প্রভাব অনতিক্রম্য। সাহিত্য-সাধনার মধ্যে দিয়েও দেশকে তিনি যথেষ্ট উন্নতির সিংহদ্বারের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ একত্রিত করে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ তাঁর মাঘোৎসবের উপদেশ প্রকাশ করেছেন। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১[illegible]৮ সালে [illegible]।

মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই। অনেকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধ জাতির মানসিক উন্নতির প্রভূত সহায়ক। চিন্তাশক্তির উর্বরতা শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পোষা পাখী ও বনের পাখী, নবজীবন, পাপের বীজ, ঈশ্বরের মনোনীত কে? ধর্মসমাজের লবণ, আত্মার পাকস্থলী, আসল ও নকল ধর্ম, মায়ের উপহার, বিশ্বাস ও নির্ভর, মহামেলা প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি বিশেষরূপে পঠিতব্য। ২১১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ থেকে শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীঅরবিন্দ মিত্র সম্পাদিত। দাম আড়াই টাকা।

মারুতির পুঁথি

চিত্রকলায় অবনীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ তো নিশ্চয়ই, বাঙলা সাহিত্যেও তিনি যে একজন দিকপাল, একথা কোন ক্রমেই করা যায় না অস্বীকার। অবনীন্দ্রনাথের রচনা বাঙলা সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ, তাঁর লেখনীর নিখুঁৎ টান রস-ভাবে ব্যঞ্জনায় বাঙলার সাহিত্যকে নিয়ে গেছে এক আলোময় জগতে। শিশুদের ও বালকদের মনের গহনলোকে অবনীন্দ্রনাথের আসন অটুট। অবনীন্দ্রনাথের 'মারুতির পুঁথি' বর্তমানে তাঁর পরলোক গমনের পর প্রকাশিত হয়েছে। রামায়ণের কাহিনীকে অবলম্বন করে হনুমানকে মুখ্যচরিত্র করে এর আখ্যানবস্তু রচিত, কয়েকটি রেখাচিত্র এর মর্যাদাবৃদ্ধি করেছে। অবনীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার মতই মাধুর্য-মণ্ডিত, এক্ষেত্রেও তার মর্যাদা সমভাবেই রক্ষিত আছে। ১৩ হ্যারিসন রোডস্থ ইণ্ডিয়ান য্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড থেকে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম তিন টাকা চার আনা মাত্র।

আপন প্রিয়

রমাপদ চৌধুরীর নাম বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার কাছে সুপরিচিত "লালবাঈ" উপন্যাসের লেখক হিসাবে। বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে যে ক'জন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে রমাপদ তাঁদের অন্যতম, এ কথা বেশ জোরালো সুরে বলা যায়। মধুময়ী ভাষা, ডুবুরীর মত শব্দচয়ন, কাব্যমাখা বর্ণনা আর বিচিত্র বিষয়বস্তু—আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের বৈশিষ্ট্য। লেখকের সদ্য প্রকাশিত "আপন প্রিয়" গল্প-সঙ্কলনে লেখকের স্বনির্ব্বাচিত বারোটি গল্প স্থান পেয়েছে। এই গল্পগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি গল্প পূর্ব্বেই আমাদের সাহিত্যে সাড়া তুলেছিল। যেমন "সতী ঠাকরুণের চিতা," "বনকুট", "ঝুমরা বিবির মেলা," "তিনতারা" ইত্যাদি। বাঙলা দেশের আদিবাসী আর সাঁওতাল সম্প্রদায় লেখকের লেখায় যেন জীবন্ত রূপ পায়। "আপন প্রিয়" গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট সত্যিই উল্লেখযোগ্য। প্রচ্ছদশিল্পী রণেন আয়ান দত্ত। বাঙলা সাহিত্যে নবাগত 'ত্রিবেণী'র প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের জন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। ত্রিবেণী প্রকাশন। ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

মোহিতলাল মজুমদারের সুনির্বাচিত কবিতা

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ঠিক পরেই যে ক'জন শক্তিশালী কবিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রোত্তর যুগ—তাঁদেরই মধ্যে থেকে অথচ নিঃসঙ্গতার পরিপূর্ণ পাত্র নিয়ে দেখা দিলেন মোহিতলাল মজুমদার। মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের ভাবধারাকে পরিপূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করে তাকে প্রকাশ করলেন নিজের দৃষ্টিভঙ্গী মিশিয়ে। মোহিতলালের প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে থেকে পাওয়া যাচ্ছে এক সঙ্ঘবদ্ধ চেতনার সুর। যুগব্যাপী তমিস্রার অবসান ঘটাতেই যেন তাঁর লেখনী বদ্ধপরিকর। তাঁর অনেকগুলি কবিতা একত্রে সংকলিত করে এই সুনির্বাচিত কবিতাগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা ভূমিকাটি এই গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণ। মোহিতলালের কবিতাগুলির মধ্যে কালাপাহাড়, অঘোরপন্থী, পাপ, নাদিরশাহের জাগরণ, ইরাণী, নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর, পয়ার, রুপার্ট ব্রুক, দুঃখের কবি, ফিরদৌসি, নমস্কার, গদ্য ও পদ্য কবিতাগুলি বাঙলা সাহিত্যের এক যুগান্তকারী সংযোজন। ১৩ হ্যারিসন রোডস্থ ইণ্ডিয়ান য্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ থেকে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম তিন টাকা চার আনা।

পথিক

আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে বাঙলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছিল কল্লোল যুগ, সেই একাধিক ভাগ্যান্বেষী সাহিত্যসেবী তরুণদের পুরোভাগে সেদিন ছিলেন একজন তাঁর নাম গোকুল নাগ। যৌবনের মধ্যাংশেই তাঁর জীবনে ঘনিয়ে আসে মৃত্যুর কালোছায়া। একটি গ্রন্থের মধ্যেই তিনি রেখে গেলেন তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর। সেই গ্রন্থটি 'পথিক'। পথিকের মধ্যেই গোকুল নাগ যেন আজও বেঁচে আছেন। চারশ চৌষট্টি পাতার সুবৃহৎ উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সমাজের একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি গোকুল নাগ এঁকে গেছেন। এর গ্রন্থমূল্য সার্বজনীন। বাস্তব সমস্যা ও সমাধানের আভাসও সুরূপায়িত হয়েছে এতে। পাঠক সমাজে এর পুনঃ প্রকাশকে সাদরে বরণ করে নিক এই আমাদের একান্ত কামনা—১৩ হ্যারিসন রোডস্থ ইণ্ডিয়ান য্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ থেকে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম সাড়ে ছ' টাকা।

সোনালী মেয়েটি

বালজ্যাকের কাহিনী অবলম্বনে 'সোনালী মেয়েটি' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এটি একটি সত্য ঘটনামূলক ঐতিহাসিক কাহিনী। ফরাসী সাম্রাজ্যের ছায়াছত্রতলে প্যারীতে যে তেরো জন বেপরোয়া নাগরিকের উদয় ঘটেছিল সেই ঘটনা অবলম্বন করেই এর বিস্তার। অনুবাদকের অনুবাদভঙ্গী বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। তাঁর নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে কৃতিত্বের ছাপ পাওয়া যায়। অনুবাদক—হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য। জবাকুসুম হাউস, কলকাতা ১২ থেকে প্রকাশ করছেন আর্টস য্যাণ্ড লেটার্স। দাম দু'টাকা।

ধারা থেকে মাণ্ডু

'ধারা থেকে মাণ্ডু' গ্রন্থটিতে ভারতের অতীত যুগের এক ঐশ্বর্য্যময় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মাণ্ডুর ইতিহাস আকর্ষণীয় ভাবে এখানে পরিবেশিত হয়েছে। ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে—কয়েকটি স্বাভাবিক রেখাচিত্রের সাহায্যে ঐতিহাসিক সত্য এখানে যথেষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতীত দিনের অবলুপ্ত স্মৃতি রসিকচিত্তে আজও আনন্দের দোলা লাগায়। মাণ্ডুর ইতিহাস, সমাজ, জীবনধারা, যুদ্ধ প্রথা বাঙলার পাঠক-পাঠিকাকে জ্ঞান ও তৃপ্তি দুই-ই দিতে সক্ষম হবে, এই আশাই রাখি। লেখক শিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ২০৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ সারস্বত লাইব্রেরী থেকে শ্রীপ্রশান্ত ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত। দাম—আড়াই টাকা।

উল্কা

নীহার গুপ্তের এই নাটকটির কথা আজ আর কারো অজানা নেই। মঞ্চের কল্যাণে উল্কার কাহিনীর সঙ্গে প্রায় সকলেরই পরিচয় ঘটে গেছে। শ্রদ্ধেয় নরেশচন্দ্রের পরিচালনায় সেই উল্কা এবার দেখা দিয়েছে রূপালী পর্দায়। আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, নরেশচন্দ্রের সুপটু পরিচালনা উল্কাকে মহিমময় করে তুলেছে। রঙ্গমঞ্চে যে উল্কা আমরা দেখেছি, চলচ্চিত্রে তার মর্যাদাহানি তো কোন মতেই হয় নি, উপরন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে বহু গুণ। অবশ্য এর জন্যে রঙ্গমঞ্চের পরিচালককে দোষ দিচ্ছি না; কারণ ছায়াছবিতে যা যা করা যায়, মাঞ্চলোকে ঠিক তাই-তাই করা যায়ও না। সুতরাং স্বভাবতঃই চিত্র-জগত থেকে বলিষ্ঠ উপহারই আমরা আশা করি। নাটক থেকে কয়েকটি চরিত্র বাদ দেওয়া হয়েছে আবার কয়েকটির সংযোজনও হয়েছে। এতে করে ছবির মূল বক্তব্য কোথাও ব্যাহত হয় নি। সুবীরের শেষটা কি হ'ল? পুলিশে তাকে ধরে নিয়ে গেল, তার পর তার পরিণাম? পরিচালকদের একটা অনুরোধ— তাঁরা প্রধান শিল্পীদের ছাড়া 'এক্সট্রা'দের দিকেও দৃষ্টি দিন; তারাও যে ছবির অনেকখানি সম্পদ—এটা ভুললে চলবে কি করে? যমুনা সিংহ গান গাইছেন, তাঁকে ঘিরে আছে অনেকগুলি মেয়ে—ঐ অবধিই, তাদের মুখে না আছে কোন অভিব্যক্তি, না আছে কোন সজীবতা। এদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত দরকার। রাজীবে-ডাক্তারে কলহ—তাদেরই ছেলেমেয়ে নিবিড় ভাবে মেলামেশা করছে, ছবিতে অবশ্য তার জন্যে একটি যুক্তি ডাক্তারকে দিয়েই দেখানো হয়েছে তবে সে যুক্তি যথেষ্ট নয়!

অভিনয়ে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাণপূর্ণ প্রশংসার যোগ্য। উপরন্তু এ অভিনয়ে তাঁর বিখ্যাত দাশু চরিত্রটির ছাপ একটুও পড়ে নি— সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতায় উজ্জ্বল তাঁর এই অভিনয়। কমল মিত্র, বীরেশ্বর সেন, জীবেন বসু, অনুপকুমার, জহর রায়, তুলসী লাহিড়ী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, সুনন্দা দেবী, যমুনা সিংহ ও জয়শ্রী সেনের অভিনয় ভালো লাগবে। অনিল চট্টোপাধ্যায় অভিনন্দনযোগ্য অভিনয় করেছেন। লিন-লিঙএর Candle Dance ভালো লাগবে! তবে একটা কথা, রঙ্গমঞ্চে যাঁরা অভিনয় করে গেছেন, তাঁদের অভিনয়ের কাছে কিন্তু এঁদের অভিনয় ঠিক যেন চোখে লাগে না। ছবির জহর রায় মঞ্চের জহর রায়ের নাগালও ধরতে পারেন নি।

পঙ্কতপা

'চলাচল' ছবিটি কিছু কাল আগে অপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল দর্শকমহলে। প্রথম আবির্ভাবেই চলাচল জয় করে নিল দর্শকচিত্ত। চলাচলের নির্মাতা-গোষ্ঠীর বর্তমান অবদান পঙ্কতপা। বলতে কিছুমাত্র বাধা নেই যে চলাচলকেও অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে পঙ্কতপা। বাঙলার ছায়াচিত্র শিল্প দিনে দিনে যে জাতীয় বক্তব্যহীন, অসার ছায়াচিত্র উপহার দিচ্ছিল তারই মধ্য থেকে এই বিরাট শিল্পের উন্নতি সাধনে এঁদের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। বাঙলা ছবির মধ্য দিয়ে যুগোপযোগী শক্তিময়ী লেখনীর দ্বারা যে সারগর্ভ বক্তব্য এঁরা পরিবেশন করেছেন, জনগণের সমাদর লাভ তা করবেই। পঙ্কতপা একটি প্রগতিবাদী চিত্র। এর প্রত্যেকটি সংলাপে দৃশ্যে, ঘটনায় মেশানো আছে এগিয়ে যাওয়ার মা ভৈঃ বাণী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ। 'বাঁধ' কে কেন্দ্র করে এর কাহিনী। তার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এক অক্লান্তকর্মী চীফ ইঞ্জিনিয়ার ও তাঁরই অধীনস্থ এক কর্মচারীর কন্যা সান্ত্বনা তাদের দু'জনের মধ্যেই আছে আর এক কর্মী নরেন। মাথার উপরে প্রচণ্ড সূর্য, চারপাশে চুল্লি জ্বালিয়ে মধ্যাংশে সাধনার আসন প্রস্তুত করে সেই আসনে বসে ঐ অবস্থায় যিনি সাধনা করে থাকেন তিনিই পঙ্কতপা। এক দিকে সোমনাথ, অন্য দিকে নরেন, সেই সঙ্গে সোমনাথের পূর্ব প্রণয়িনীর পুনরাগমন, এরই মধ্যে থেকে বিকশিতা হয়ে উঠছে সান্ত্বনা। আজকের দিনে জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধির পথে বাঁধ যে কতখানি সহায়ক তার সাক্ষ্য দিচ্ছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখনী 'পঙ্কতপা'র মাধ্যমে। বাঁধকে কেন্দ্র করা এই ছবিখানি দর্শকসাধারণকে নিছক আনন্দ দিয়েই ক্ষান্ত হবে না, বর্তমান কালের বাঁধের কর্মপ্রণালীর একটি পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি দর্শকরা এর মধ্যে থেকে পাবেন। অভিনয়ে অসিতবরণ, প্রশান্তকুমার, [illegible] মুখোপাধ্যায় সুন্দর অভিনয় করেছেন। পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, চন্দ্রা দেবী, পদ্মা দেবী, পারিজাত বসুর অভিনয়ও ভালো লাগবে। আলোকচিত্রী বিভাস সোমকেও একটি ছোট্ট ভূমিকায় দেখা গেল। শুক্লা সেন কাজ চালিয়ে নিয়েছেন মাত্র। সঙ্গীতাংশও কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। আবার বলি, আজকের দিনে এই নিম্নগামিতার যুগে ঠিক যে জাতীয় ছবিগুলি দেখার জন্যে সত্যিকারের রসিকবৃন্দ উৎসুক পঙ্কতপা তাদেরই একটি। এর যথাযোগ্য মূল্য দিতে দর্শকরা কখনই কার্পণ্য প্রকাশ করবেন না। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ও পরিচালক অসিত সেনের আগামী অবদানগুলির জন্যে আমরা অপেক্ষায় রইলুম।

তাপসী

বিধাতার অপার মহিমাকে শত চেষ্টাতেও বিজ্ঞান কোন দিনই অতিক্রম করতে পারবে না আর বাঙলা দেশের মেয়ে চিরকাল পরার্থে উৎসর্গিতা প্রধানত এই হচ্ছে তাপসীর মুখ্য বক্তব্য। রমেন গাঁয়ের জমিদারের ছেলে—তার জীবনে আসে দু'জন মেয়ে শ্রীমতী ও রমলা— প্রথমা পুরোহিতের মেয়ে, দ্বিতীয়া সুপ্রতিষ্ঠ রাব[illegible] —প্রথমা গ্রাম্য শিক্ষায় শিক্ষিতা, দ্বিতীয়া শহরের চোখ-ধাঁধানি আলোর উন্মত্তা।

মৃন্ময়ী রমলাকেই চাইল, মায়ের শেষ ইচ্ছার খাতিরে শ্রীমতীকে বিয়ে করল সে—তবে তা তাকে কষ্ট দেবার জন্যেই—এদিকে জমিদারী উচ্ছেদ বিল পাশ হওয়ায় রমেনের ভবিষ্যতের অন্ধকারত্ব উপলব্ধি করে রমলা তাকে করে প্রত্যাখ্যান। পথে রমেনের হোল মোটর দুর্ঘটনা, দৃষ্টিশক্তি গেল হারিয়ে, শ্রীমতী নিজের চোখ দিয়ে রমেনকে বাঁচায়। তার পর অনুতপ্ত রমেন ক্ষমা চায় শ্রীমতীর কাছে। আগাগোড়া ছবিটি বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। যে ছেলেকে দেখছি প্রথম থেকে বিজ্ঞানের অন্ধ উপাসক, সংস্কারমুক্ত সেই ছেলে 'পিছু ডাকা' মানে কখনও? ঠাকুর দেবতার ধারে যে যায় না সেই ছেলে গায়ত্রী জপ করছে। জমিদার-বাড়ীর ছেলে কলকাতা যাচ্ছে—দেখা গেল গাড়ী তৈরী, মামা প্রস্তুত, শেষে দেখছি সে একলা একটি সাইকেলে চড়ে যাচ্ছে, যে ছেলে মঙ্গলগ্রহ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের খবর রাখে সে ছেলে 'হবি' কাকে বলে জানে না! যে ধরণের সংলাপ বিভুর মুখে দেওয়া হয়েছে তা অসিতবরণের মুখে মানায়, বিভুর মুখে মানায় না। একটি লেখাপড়া শেখা বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকের পক্ষে যা বলা সম্ভব একটি নাবালকের পক্ষে তা বলা সম্ভব কি? এখানে ঘটেছে ঠিক তাই। বিভুর কথা বলার সঙ্গে অসিতবরণের কথার খুব বিশেষ একটা তারতম্য ধরা যায় না। অভিনয়ে অনেক শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছে, প্রায় সকলেই সুঅভিনয়ই করেছেন। একবার নায়কের তরে অনুপকুমার ও শুভেন মুখোপাধ্যায়কে দেখানোর কি প্রয়োজন ছিল? শিল্পীসংখ্যা এমনিতেই তো যথেষ্ট। অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গো, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, অসিতবরণ, অজিত বন্দ্যো, দীপক মুখো, বীরেন চট্টো, অনুপকুমার, শুভেন মুখো, পরিমল সেন, শিশির বটব্যাল, নৃপতি, পঞ্চানন, বেচু, প্রীতি, শান্তি, বিভু, মলিনা দেবী, চন্দ্রা দেবী, সন্ধ্যারাণী দেবী, সবিতা চট্টো, রেণুকা রায়, বনানী চৌধুরী, রেবা, আশা, করালী, গীতা, বুলবুল প্রভৃতি শিল্পীদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয়।

সিঁদুর

রুবেন রায়ের মর্তের মৃত্তিকা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে সিঁদুরের চিত্ররূপ। দুই ভাই কুমারেশ ও কমলেশ। প্রথম জন মত্তপ, চরিত্রহীন, গৃহে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও আর একটি মেয়েকে লুকিয়ে বিয়ে করে পরে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে প্রথমার কাছে ক্ষমা চায়, প্রথমা দ্বিতীয়ার মৃত্যুশয্যায় তার সেবার ভার গ্রহণ করে, বাঁচাতে পারে না, স্বামি-স্ত্রীর মিল হয়। দ্বিতীয়জন অধ্যাপক-পৌত্রী (বা দৌহিত্রী) র প্রেমে বিভোর কিন্তু এদের যাত্রাপথ খুব সহজ নয় ঈষৎ বক্র, শেষে অগ্রজ ও তৎপত্নীর প্রচেষ্টায় মধুর মিলন। সর্বশেষে চিত্রনাট্যকারের ছোট একটি বক্তৃতা। সমস্ত ছবিটিতে আগা-গোড়া একটি যত্ন-নিষ্ঠার ছাপ সুপরিস্ফুট। কাহিনীর স্বচ্ছতাও একে অনেকখানি সহায়তা করেছে। অধ্যাপকের বই নামানো এবং ঐ বাড়ীর ভৃত্যের মাথায় জল ঢালা, সপরিবারে নৃপতি চট্টোর আগমন এই দৃশ্যগুলি অফুরন্ত হাসির উদ্রেক করে, সুখের বিষয় সে হাসিতে হ্যাবলামি সম্পূর্ণরূপে বর্জিত। তবে এই ছবি দেখে কয়েকটি প্রশ্ন মনে আসে যে অধ্যাপক হলেই যে একটু পাগলাটে হতে হবে এ রকম ধারণা আজকালকার ছবিচাল্য [illegible] আসে কি করে? পাওনাদার মুদিটিকে তো দেখে মনে হল যেন একজন নিমন্ত্রিত অতিথি। মৃন্ময়ীকে ভোলাবার জন্যে যে কুমারেশ ডলির সঙ্গে পালালো তাদের বাড়ীতেই ডলির হাতে কুমারেশ ও মৃন্ময়ীর যুগ্ম আলোকচিত্র পাওয়া যায় কি করে? দারিদ্রের কশাঘাতে জর্জরিত হয়েও শেষাংশে দেখতে পাচ্ছি কুমারেশের পকেট থেকে বেরোচ্ছে দামী সিগারেট-কেস। মৃন্ময়ীর সরলতা ফোটাতে গিয়ে একটি বিস্তৃত কিমাকার বস্তু করে ফেলা হয়েছে—থানায় কি বা কারা থাকে এই জাতীয় প্রশ্ন শুনলে একটি বালকও হেসে ফেলবে। আরও একটি উক্তি মৃন্ময়ীকে দিয়ে করানো হয়েছে যা অত্যন্ত হাস্যকর, বিশেষ করে মৃন্ময়ী যখন শিশু নয় সে নিজে একজন যুবতী। ক্লাবে প্রেমাংশুর মুখে যে গানটি জোড়া আছে সেই গানটি সুলিখিত, বিশেষ করে এই গানটির জন্যেই কবি বিমল ঘোষকে জানাই ধন্যবাদ।

অভিনয়াংশে বিকাশ রায় অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কয়েক ক্ষেত্রে তাঁর অভিনয় দর্শককে মুগ্ধ করে রাখে, ছোট্ট ভূমিকার মধ্যেও শক্তিমান শিল্পী প্রেমাংশু বসু শক্তিরই স্বাক্ষর রেখে গেছেন। মঞ্জুদের অভিনয়ও প্রশংসনীয়। যথাযথ গাম্ভীর্যের সঙ্গে আপন চরিত্রটি রূপায়িত করেছেন রবীন মজুমদার। এ ছাড়া পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, অমর মল্লিক, জীবেন বসু, তুলসী চক্র, শৈলেন মুখো, রাজলক্ষ্মী, রেবা, চিত্রা মণ্ডল সুঅভিনয় করেছেন। মানসী চট্টোপাধ্যায় একেবারে অচল না হলেও কি এখনও নিজেকে অভিনয়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি। আশা করি এ জড়তা তিনি অচিরেই কাটিয়ে উঠবেন—কারণ, সম্ভাবনা যে তাঁর মধ্যে আছে তা বেশ বোঝা যায়।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

হাস্যরসিক অভিনেতা শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

বর্তমান কালে বাংলা দেশে যে ক'জন হাস্যরসিক অভিনেতা আছেন, তার ভেতর শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান খুব উচ্চে। বহু দিন থেকে চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত সংগ্রহ করে চলেছি এবং বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের তা উপহার দিয়েছি প্রায় প্রতি মাসেই। এবারে তাই স্থির করলুম, বিভিন্ন ছায়াছবিতে যাঁরা হাস্যরস পরিবেশন করে দর্শক-সমাজকে আনন্দ বিতরণ করেন, তাঁদের একজনকেই পরিচিত করবো আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে। এই ভেবে বছরের প্রথম দিনটিতেই যাত্রা করলুম ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। দক্ষিণ-কলকাতায় ভানু বাবু থাকেন কিন্তু নববর্ষের প্রথম দিনে তাঁকে বাড়ীতে পাবো না নিশ্চিতই, তা আমার জানা ছিল। তাই ভানু বাবুর অন্যতম কর্মস্থল ষ্টার থিয়েটারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলুম ঠিক সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে। এদিনে ষ্টার থিয়েটারের জনপ্রিয় নাটক 'শ্রীকান্তের' অভিনয় চলছিল। এ নাটকটিতে 'নন্দ মিস্ত্রীর' অভিনয় করে ভানু বাবু বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। ষ্টার থিয়েটারে যাবার আর একটি উদ্দেশ্য ছিল স্বনামধন্য নাট্যকার ও পরিচালক বন্ধুবর দেবনারায়ণ গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে তাঁর সাহায্য গ্রহণ। ভানু বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল আগে

থেকেই কিন্তু বছরের এই প্রথম দিনটিতে যাতে ব্যর্থকাম না হই সেজন্ত বন্ধুবরের সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করলুম। সরাসরি গিয়ে হাজির হ'লুম—ষ্টার থিয়েটারে দেবনারায়ণ বাবুর শীতাতপ কক্ষে। দেবনারায়ণ বাবু একাই বসেছিলেন। আমাকে দেখে সাদর অভ্যর্থনার ত্রুটি হলো না। নব বর্ষের শুভেচ্ছা আদান-প্রদানের পর আমার উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করলুম দেবনারায়ণ বাবুর কাছে। তিনি কালবিলম্ব না করে ভানু বাবুকে ডাকতে পাঠালেন এবং এ কথাও জানিয়ে দিলেন যে তাঁর ঘরে বসেই আমার কাজ আমি যেন সেরে নিই। কারণ তাঁর ঘরে আর কেউ তখন আসবে না। আমার দিক থেকে এটাই আমি চাইছিলুম।

একটু পরেই শ্রীকান্তের 'নন্দ মিস্ত্রী'র বেশধারী ভানু বাবু সশরীরে হাজির হলেন। তাঁর মেকআপ করা ছিল। পায়ে লাল ষ্টকিন; মেটে রং'এর কেডস—আমার ভঙ্গীটিই বা কি অপরূপ? লোককে হাসাবার জন্যই যেন তাঁর সৃষ্টি; সত্যিকারের শিল্পী ইনি। প্রতিটি কথায়, আচার ব্যবহারে, চলাফেরায় প্রতিটি পদক্ষেপে এঁর শিল্পীর ছাপ রয়েছে। প্রাথমিক নমস্কার আদান প্রদানের পর দেবনারায়ণ বাবু আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই ভানু বাবু তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—এঁকে বাবুকে আমি ভালভাবেই চিনি—বলুন কি করতে হবে। আমি আর কালবিলম্ব না করে সরাসরি আমার উদ্দেশ্যের কথা তাঁকে বললুম। তিনি অমনি আমার সঙ্গে আলোচনা সুরু ক'রে দিলেন। ভানু বাবু বলে চললেন, ১৯৪৬ সালে 'জাগরণ' ছবিতে আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ। তারপর বহু ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছি ও এখনও করছি কিন্তু কোন্ ছবিতে এবং কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করে সব চাইতে তৃপ্তি পেয়েছি তা এক কথায় বলা আজ সম্ভব নয়। তবে এটুকু অবশ্যই বলবো যে, 'বসু পরিবার' ছবিতে 'সুখের পালের' ছোট্ট ভূমিকাটিতে অভিনয় করে আনন্দ পেয়েছি প্রচুর। চলচ্চিত্র-জগতে যোগদানের পেছনে অন্য কোন কারণই ছিল না, এটা আমার ক্ষেত্রে একটা আকস্মিক ঘটনা বলতে পারেন। ছেলেবেলা থেকেই আমার অভিনয়ের দিকে একটা টান ছিল এবং ছোটখাট ভূমিকায় আমি প্রায়ই অংশ গ্রহণ করতুম। আমার অভিনয় দেখে প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক সুশীল মজুমদার, বিশিষ্ট অভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণী রায়, কুমার মিত্র—এঁরা আমাকে চলচ্চিত্রে যোগদানে উৎসাহিত করেন। চলচ্চিত্রে যোগদানে আমার কোন দিনই কোন আপত্তি ছিল না। আর এটুকুও বলবো যে ছবিতে আত্মপ্রকাশের পর আমার সামাজিক কি পারিবারিক জীবনে কোন পরিবর্তন আসে নি।

এর পর আমি ভানু বাবুকে জিজ্ঞেস করলুম তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচীর কথা। ভানু বাবু বললেন, আর সকলের মতই স... চায়ের পর্ব শেষ হ'লে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা তদারক করি ... তাদের পড়াশুনো দেখিয়ে দি। যে দিন সুটিং থাকে ... আহারাদি সেরে ষ্টুডিওতে চলে যাই, ষ্টুডিওর কাজ সেরে বন্ধু... আর্টিষ্ট এসোসিয়েশনে গিয়ে বসি ও নানারূপ আলোচনায় ... গ্রহণ করি। যেদিন থিয়েটার থাকে সেদিন ষ্টুডিও থেকে সো... থিয়েটারেই চলে আসি।

বিশেষ কোন 'হবি' বা খেয়াল আপনার কিছু আছে কি, জি... করলুম আমি। ভানু বাবু যেন প্রস্তুত হ'য়েই ছিলেন। ... বিলম্ব না করেই অমনি বললেন, স্ত্রীর গান শোনা। খেলার ... ফুটবল খেলা দেখতেই আমার ভাল লাগে—কারণ I always ... speed. মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকা প্রায় সবই আমি পড়ে থাকি। শুধু বাংলা দেশেরই নয়, সর্বভারতীয় পত্রিকাগুলোও আমি নিয়মিত পাঠ করি এবং এজন্ত আমার ...

শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

হয় প্রচুর। আপনাদের মাসিক বসুমতীও আমি নিয়মিত পড়ি এবং আমার ভালও লাগে। পুঁথি পুস্তকের মধ্যে 'Political Literature' ই আমার বিশেষ প্রিয়, তবে সব রকম বইই আমি পড়ি, কেবল ডিটেকটিভ উপন্যাস আমার ভাল লাগে না। পোষাক পরিচ্ছদের কথা যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বল্‌বো, সাদা পোষাক পরিচ্ছদ আমি পছন্দ করি এবং সাদা পোষাকই আমি পরিধান করি; কেন না, সাদা পোষাক সহজে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন? ভানু বাবু দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, অভিনয় জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। আর তার সঙ্গে চাই সুষ্ঠু ভাবে কথা বলার দক্ষতা—Impressive way of talking is essential. অভিনেতা-অভিনেত্রী হতে হলে মনে রাখতে হবে, অভিনেতা-অভিনেত্রী হ'বো, এটাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন অভিনেতা অভিনেত্রী হয়েছি, এভাব মনে রাখলে চলবে না—এটাই আমার সুস্পষ্ট অভিমত। ভাল ছবি তৈরী করতে হলে যেটা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন সেটা হ'লো ভাল গল্প বা কাহিনী। তার পর প্রয়োজন সুদক্ষ পরিচালকের। বর্ত্তমানে বাংলা ছবির উৎকর্ষ সাধন করতে হ'লে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে এ বিষয়ে। আমার মতে সরকার সাহায্য না করলে বাংলা ছবির উৎকর্ষ সাধন হ'বে না। আর একটি বিষয় আমি বলবো শিল্পীদের স্বাস্থ্যরক্ষা করা এবং শরীরের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

চলচ্চিত্রে বাঙ্গালী বিশেষ করে অভিজাত এবং শিক্ষিত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের অবশ্যই যোগদান করা উচিত—বললেন ভানু বাবু, তবে ফ্যাসান করে যদি কেউ এ লাইনে আসতে চান তাঁদের না আসাই ভাল। এটাকে যাঁরা নিছক শিল্প বলে গ্রহণ করছেন কেবল তাঁদেরই এ লাইনে আসা উচিত বলে আমি মনে করি।

এবারে আমি ভানু বাবুকে কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলুম। তাঁর গড়ে মাসিক আয় কত এবং কত দিন যাবৎ এ বৃত্তি গ্রহণ করেছেন জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এ্যামেচার হিসেবে কাষ করি। আমি বুঝলুম তিনি এ প্রশ্নটি এড়িয়ে গেলেন। কোন ছবিতে কত টাকা পেয়েছি যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বলবো 'জাগরণ' ছবিতে একটি পয়সাও আমি পাইনি। আমি ধরে নিলুম ভানু বাবু এ সকল ব্যক্তিগত প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চান। সুতরাং আমি আর বেশী দূর অগ্রসর হ'লুম না এদিকে।

ভানু বাবুর প্রথম জীবন ও ভবিষ্যৎ জীবনের কথা জানতে চাইলে তিনি বলে চললেন—ঢাকা সহরেই আমার বাবা ছিলেন, ঢাকা নবাব সরকারের আইন উপদেষ্টা, আমার মা-ও বিদুষী মহিলা। তিনি ছিলেন সে কালের গ্রাজুয়েট এবং বেঙ্গল এডুকেশানাল সার্ভিসের (মহিলা বিভাগের) একজন সদস্যা। ১৯৩৪ সালে আমার মা সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। স্বর্গতা সরোজিনী নাইডু ছিলেন আমার মায়ের খুল্লতাত ভগিনী। শৈশবে মাতার তত্ত্বাবধানেই আমার লেখাপড়া শুরু হয়। তার পর ঢাকার স্কুল-কলেজে আমার শিক্ষা লাভ। বি-এ পরীক্ষা দেবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমাকে ঢাকা সহর থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। তার পর ১৯৪১ সালে আমি কল্‌কাতায় চলে আসি এবং আয়রণ ও ষ্টীল কণ্ট্রোলারের অফিসে চাকরী গ্রহণ করি। ১৯৪৫ সালে আমি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হই। আমার বে'র ঠিক তিন দিন পরে আমি প্রথম ছায়াছবিতে যোগদান করি। এজন্যেই এদিনটি আমার কাছে বিশেষ স্মরণীয়। ১৯৫৩ সালের ৭ই জানুয়ারী আমি সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিই এবং সেই থেকে আমি পুরোপুরি শিল্পী হিসেবেই আত্মনিয়োগ করে আসছি। শিল্পী আমি এবং শিল্প-জীবনই আমার একমাত্র কাম্য। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত যেন শিল্পী-জীবনই আমার কাটে।

এ ভাবে আমাদের আলোচনা প্রায় শেষ পর্য্যায়ে এসে উপস্থিত হলো। আমি ভানু বাবুকে জিজ্ঞাস করলুম, সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায়? ভানু বাবু উত্তর করলেন, সমাজে চলচ্চিত্রের স্থান খুব উচ্চে। জনশিক্ষার যতগুলি মাধ্যম রয়েছে চলচ্চিত্র তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে আজকের দিনে।

এর পর ভানু বাবু বললেন, ছায়াছবিতে অভিনয় করলেই যে ছবি দেখতে হ'বে তার কোনই মানে নাই। সত্যি কথা বলতে কি, ছবি দেখতে আমি ভাল বাসি না, সে যে ভাষার ছবিই হোক না কেন। বিবাহিত শিল্পীদের স্বামী অথবা স্ত্রী অভিনয়ে আপত্তি করেন কি না, তা আমার জানা নেই। এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে আমার স্ত্রী অভিনয়ে আপত্তি করেন না। কারণ তিনিও একজন রেডিও শিল্পী। তিনি মনে করেন, অভিনয়টাও নিছক একটা চাকুরী—এ ছাড়া আর কিছু নয়।

আমাদের এ দিনের আলোচনা শেষ পর্য্যায়ে এসে উপস্থিত হলো। চলচ্চিত্র সম্পর্কে ভানু বাবুর জ্ঞান সত্যি গভীর। আমার সঙ্গে এ শিল্প সম্পর্কে বহুবিধ আলোচনা করলেন। স্থানাভাবে সব বিষয় লেখা এ স্থানে সম্ভব নয়। আমি এ বারে তাঁর কাছে শুধু জানতে চাইলুম—বর্ত্তমানে যে সকল ছবি তৈরী হচ্ছে সেই ছবিগুলো সম্পর্কে তাঁর অভিমত কি? ভানু বাবু দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন, গত তিন বছর ধরে বাংলা দেশে যে সকল ছবি তৈরী হয়েছে সেগুলো প্রগতির পথেই এগিয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে আরও ভাল ছবি তৈরী হ'বে। এ শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, আজ এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। কথাটি শেষ করেই ভানু বাবু উঠে দাঁড়ালেন। মনে হলো শ্রীকান্তের 'নন্দ মিস্ত্রি'র সত্তা আবার তাঁর মধ্যে এসে গেছে। তিনি ত্রস্তপদে নাট্যকারের কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন শ্রীকান্তের আসরে।

বাসগৃহ সমস্যা

"ভারতের ছোট-বড় সমস্ত সহরের ভাড়াটিয়া বাড়ীর অভাব একান্ত ভাবেই অনুভূত হইতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সত্ত্বেও বাসগৃহের এই অভাব সামান্যমাত্রও হ্রাস পায় নাই। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের নিকট প্রদত্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রিপোর্টে আশঙ্কা করা হইয়াছে যে, ১৯৬১ সালে শুধু সহরগুলিতেই বাসগৃহের অভাব ১৯৫১ সালের দ্বিগুণ হইবে। ১৯৬১ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর, ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় [illegible] লক্ষ বাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২১ লক্ষ বাসগৃহ নির্ম্মিত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। তথাপি ১৯৬১ সালে ৫৩ লক্ষ বাসগৃহের অভাব থাকিবে। সহরগুলিতে বাসগৃহের অভাব বৃদ্ধি পাইবার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া পল্লীর বহু লোকের সহরবাসী হওয়ার কথা এবং অধিকাংশ লোকের বাসগৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় বহনের অসামর্থ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কথাটা যে ঠিক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পল্লী অঞ্চলে জীবিকাশূন্য হইয়া বহু লোক সহরে জীবিকার সন্ধানে আসিয়াছে এবং আসিতেছে। সহরবাসীদের মধ্যে শতকরা ১২ জনের মাত্র গৃহ নির্ম্মাণের সামর্থ্য আছে। অবশিষ্ট শতকরা ৮৮ জনেরই গৃহ নির্ম্মাণের সামর্থ্যের অভাব। নূতন গৃহ নির্ম্মাণ কিছু কিছু হইতেছে বটে, কিন্তু শতকরা ৮৮ জনের গৃহাভাব মিটাইবার উপযোগী গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে না।"

—দৈনিক বসুমতী।

শুধু মুখের কথা

"নিখিল ভারত উৎপাদক সম্মেলনে বার্ষিক বৈঠকে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন যে, বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি নিরসনকল্পে তাঁহারা যেন নিজ নিজ গৃহে সঞ্চিত সোনা ও জড়োয়ার একটা অংশ সরকারের নিকট সমর্পণ করেন। আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সোনাই প্রকৃত মান। ইহা হাতে আসিলে বিদেশে বিক্রয় করিয়া কিম্বা বন্ধক রাখিয়া অন্য যে কোন দেশের মুদ্রা অনায়াসে সংগ্রহ করা যায়। সুতরাং যাঁহাদের কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত সোনা, রূপা, জড়োয়া প্রভৃতি আছে, তাঁহারা পণ্ডিতজীর আহ্বানে সাড়া দিলে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি পূরণ করা অতি সহজ। দেশের মধ্যে সোনা-রূপার পরিমাণও অল্প নয়। মাত্র গত এক শত বৎসরের মধ্যে নিট আমদানীর পরিমাণ চার হাজার কোটি টাকারও বেশী। কিন্তু ইহার অধিকাংশ মজুত হইয়া আছে উচ্চবিত্ত ও ধনকুবের শ্রেণীর সিন্দুকে বা ক্যাশ-বাক্সে। পণ্ডিত নেহরুর আবেদনে তাঁহারা সাড়া দিবেন কি? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধির মজুতদারীর ও ফাটকাবাজার দ্বারা জনসাধারণের খাদ্য প্রাপ্য তাঁহারা যেভাবে গ্রাস করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে তেমন ভরসা বোধের কারণ নাই। পণ্ডিতজীর প্রস্তাবটি সাধু সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা কার্যকরী করার জন্য যথেষ্ট দৃঢ়তা প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে কি? দেশের বিভিন্ন স্থানে সেফ ডিপজিট ভল্টে বে-সরকারী ব্যক্তিদিগের দ্বারা ভাড়া লওয়া খুপরীগুলি পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইলে কমপক্ষে সহস্রাধিক কোটি টাকার সোনা-রূপা যে উদ্ধার করিতে পারা যাইবে, সে সম্পর্কে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে?"

—যুগান্তর।

সাবধান!

"ভারতের প্রতিরক্ষার কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিতে বাধ্য হইতেছি। আণবিক শক্তিকে মারণাস্ত্র নির্মাণের কাজে ভারত কখনই প্রয়োগ করিবে না, শ্রীনেহরু ভারত রাষ্ট্রের এই নীতি সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শুধু বর্তমান ভারত সরকারের মুখপাত্র হিসাবে নহে, তিনি ভবিষ্যৎ ভারতেরও সরকার এবং জনসমাজের নামে এই ঘোষণা করিতেছেন। শ্রীনেহরুর ঘোষণায় আদর্শসম্মত যৌক্তিকতা আছে, অস্বীকার করা যায় না। শান্তির শক্তিকে উৎসাহিত করিতে হইলে এইরূপ সুস্পষ্ট ঘোষণারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বিস্মৃত হওয়া যায় না যে, বিশুদ্ধ বাস্তবতা সম্মত কারণে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত ও শক্তিশালী করিবারও প্রয়োজন আছে। প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিবার এবং ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন যত দিন থাকিবে, তত দিন সেই প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাকে শক্তিশালী এবং উন্নততর করিবারও প্রয়োজন থাকিবে। সুতরাং শ্রীনেহরুর ঘোষিত নীতির মধ্যেও যেন দ্বিধাবিভক্ত ও স্ববিরোধী চিন্তার ছায়া লক্ষ্য করা যায়। সৈন্যবাহিনী থাকিবে, কিন্তু সেই সৈন্যবাহিনীর অস্ত্রসজ্জার দিক দিয়া

হীনবল করিয়া রাখিবার কোন যুক্তি থাকিতে পারে কি? 'নূতন ঐশ্বর্য্য' অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা ভারতীয় বাহিনীকেও আধুনিকতম সামরিক যোগ্যতায় উন্নত না করিলে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে হীনবল করিয়া রাখা হইবে। শ্রীনেহরু ভারতের ইতিহাসের শিক্ষা স্মরণ করিয়া থাকেন! স্মরণ করা উচিত যে, ভারতে অভিযানকারী বাবরের মোগল বাহিনী কামান ব্যবহার করিয়াছিল এবং আত্মরক্ষার যুদ্ধে প্রবৃত্ত দিল্লীর কোন কামান ছিল না বলিয়াই দিল্লীকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

নয়া পয়সা

"নয়া পয়সা প্রবর্ত্তনে গরীব ও মধ্যবিত্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, সরকার ও ধনীরা লাভবান হইবে, আমাদের এই মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। নয়া পয়সা প্রবর্ত্তনে কি লাভ হইবে তাহা উহার প্রবর্ত্তকেরা বুঝাইতে পারেন নাই। পণ্ডিত নেহরু শুধু বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ 'শূন্য' আবিষ্কার করিয়াছে, দশমিক প্রথা ভারতের দান, অতএব দশমিক মুদ্রা, মাপ ও ওজন প্রবর্ত্তন করিয়া আমরা প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছি। এখানে সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাস্য, ভারতের যে মহামনীষীরা শূন্য এবং দশমিকের আবিষ্কর্ত্তা তাঁহারা দশমিক মুদ্রা ওজন ও মাপ প্রচলন না করিয়া বর্ত্তমান নিয়ম দিলেন কেন? এই পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক কিসে পণ্ডিত নেহরু বা দশমিক মুদ্রা প্রচলনের প্রধান উদ্যোক্তা পীতাম্বর পন্থ তাহা বলেন নাই। বামপন্থী নেতারা এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, নীতিগত ভাবে তাঁহারা "দশমিক মুদ্রা সমর্থন করেন, তবে উহার ফলে সরকার যে দাম বাড়াইয়াছেন তাহা সমর্থন করেন না। ইহাতেও কোন যুক্তি নাই। দশমিক মুদ্রা মানিয়া নিলেই খাম পোষ্টকার্ড প্রভৃতিতে মূল্যবৃদ্ধি অথবা উহার ঘাটতি মিটাইবার জন্য ট্যাক্সবৃদ্ধি মানিতেই হইবে। নয়া পয়সার ভগ্নাংশ মিটাইবার উপায় নাই, উহার পরবর্ত্তী পূর্ণ সংখ্যা ধরিতে গেলে দাম বাড়িবে, নিম্নবর্ত্তী পূর্ণ সংখ্যা ধরিলে লোকসান হইবে। সরকারের বেলায় ট্যাক্স বাড়িবে। ব্যবসায়ীদের দাম বাড়ানো ছাড়া গতি নাই। কারণ ট্যাক্স তুলিয়া ঘাটতি মিটাইবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। ভারত সরকার ডাকমাশুল বাড়াইয়াছেন। আইন না বদলাইয়া মুদ্রা বিনিময়ের নামে তাহা করিবার অধিকারও তাহাদের নাই। ইহা বেআইনি কাজ হইয়াছে। দশমিক মুদ্রা ভাল, এই নীতি মানিয়া নিলে পরিবর্ত্তন কালীন বিশৃঙ্খলা স্বীকার করিতেই হইবে। এমন মুদ্রা বিনিময়ে দেশজোড়া বিশৃঙ্খলা এবং অসন্তোষ সৃষ্টি কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়।" —যুগবাণী (কলিকাতা)

পৌরসভা জলের কি ব্যবস্থা করিতেছেন?

"আসানসোলের জনসাধারণের একটি বিরাট উত্তেজনা সাধারণ নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গেল। এখন গরম পড়িতে সুরু হইয়াছে, এবারে জনসাধারণের পিপাসার জলের জন্য অপর একটি উত্তেজনা সুরু হইবে। এই উত্তেজনা এত প্রবল হইবে যে, কলের নিকটে ইহার জন্য গালাগালি, কাড়াকাড়ি ও পরিশেষে মারামারি পর্য্যন্ত দেখা যাইবে। প্রতি বৎসর নিয়মিত এই উত্তেজনা দেখিতে আসানসোলবাসী অভ্যস্ত। পৌরসভা কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য প্রতিবৎসরই এই বিপর্যয়ের প্রতিকারার্থে কিছু না কিছু করিতে করিতে বর্ষা আসিয়া যায় এবং পৌরসভাও তাঁহাদের দায়িত্বে শেষ হইল মনে করেন। স্থায়ী ভাবে কিছু করার চেষ্টা পৌরকর্ত্তৃপক্ষের এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই এবং স্থায়ী ভাবে কিছু করার দায়িত্ব যে পৌরসভা কর্ত্তৃপক্ষের আছে তাহা বোধ হয় তাঁহারা মনেও করেন না। আমরা মনে করি, এখন এই সম্পর্কে স্থায়ী কিছু করার সময় আসিয়াছে। এবং এই ব্যাপারে আর উদাসীন থাকা পৌরকর্ত্তৃপক্ষের উচিত হইবে না। কেন না টাকার অনটন এই অজুহাত বেশী দিন চলে না। মানুষ কিছুদিন ধৈর্য্য রাখিতে পারে কিন্তু অধিক দিন পর্য্যন্ত নিগৃহীত হইতে থাকিলে অধৈর্য্য হইয়া ব্যাপক ভাবে প্রতিকারের জন্য রুখিয়া দাঁড়াইবে না একথা বলা যায় না। জনসাধারণ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সচেতন হইয়াছে এবং কি করিয়া কাজ আদায় করিতে হয় শিখিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং আমাদের পরামর্শ যখন সরকারকে পৌর প্রতিষ্ঠান না দিয়া কংগ্রেস দল ঐ প্রতিষ্ঠান নিজেদের হাতে রাখিতে মনস্থ করিয়াছেন, তখন স্থায়ী ভাবে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করাই উচিত।" —আসানসোল হিতৈষী।

রোমাঞ্চ!

"দুইটি তরুণীর গতিবিধি সন্দেহজনক দেখিয়া পুলিশ তাহাদের অভিভাবকদের খবর দিয়া আনাইয়া জিম্মা করিয়া দিয়াছে। মেয়ে দুইটি রঙ্গমঞ্চে ঢুকিতে এমনই বিভ্রান্ত ছিল যে, পুলিশকে এক শত টাকা ঘুষ দিতেও চাহিয়াছিল। ইহাও একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যথাকালে মেয়েদের বিবাহ দিতে না পারার ফলে সমাজে এখন বহুবিধ অনাচার শুনিতেই হইবে। খুবই ভুল পথে চলা হইতেছে। সমাজহিতৈষিগণ দলাদলি ছাড়িয়া এখন ঐকামতে কাজ সুরু না করিলে পরিণাম যে কি শোচনীয় হইবে, তাহা ভাবিতেও রোমাঞ্চ হয়।" —পল্লীবাসী (কালনা)

কাজ দেখানো চাই

"আমরা এখনই শুনিতে পাইতেছি, কংগ্রেস কাজ দেখাইবেন। উত্তম কথা। জনসাধারণ তাঁহাদের কথা ও কাজের পার্থক্য এবার সতর্ক দৃষ্টি দিয়া বিচার করিবে! মেদিনীপুর জেলার সাধারণ মানুষ এবার কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করিয়াছে, পশ্চিম-বাংলার অন্যত্র পরাজয়ের গ্লানি তাহারাই দূর করিয়াছে। সুতরাং এ-জেলাবাসীর প্রতি কংগ্রেসের দায়িত্ব সমধিক। কাজ তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবেই। আমরা নিম্নোক্ত কাজগুলি তাঁহাদের নিকট হইতে আশা করি—(১) মেদিনীপুর সহরের স্কুলবাজার—কালেক্টরী রাজপথটি, জগন্নাথ মন্দির বড়বাজার—কোতবাজার পথটি এক বৎসরের মধ্যে পাকা করা; ১৩৬৮ সালের মধ্যে নিমতলাচক হইতে পাটনাবাজার, পাটনাবাজার হইতে বক্সীবাজার-স্কুল বাজার পর্য্যন্ত পথটি পাকা করা। (২) সহরের জলের অভাব দূরীকরণের জন্য কলের জলের সরবরাহ বৃদ্ধি করা,—এজন্য এলাহাবাদের ন্যায় সহরের দুই প্রান্তে দুইটি শক্তিশালী নলকূপ দ্বারা জলের সরবরাহ বৃদ্ধি প্রয়োজন। (৩) সহরের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোর খুঁটিগুলি আরও নিকটবর্ত্তী করা এবং আলোর শক্তি বৃদ্ধি করা; (৪) ঝাড়গ্রাম কৃষি-কলেজটিকে ডিগ্রী কলেজে পরিণত করা; (৫) সহরে একটি কারিগরী কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। এই যথেষ্ট। এই পাঁচটি দফা কাজ হইলে, আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকে ভাবিতে হইবে না।" —মেদিনীপুর হিতৈষী।

যৎকিঞ্চিৎ

তমলুক মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোর জন্য ... বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান পুরাপুরি রেট ধরায় মিউনিসিপ্যালিটী বিপদে পড়িয়াছেন এবং আলোর খরচ মিটাইতে ১৲ হারে কর ধার্য্যের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বিদ্যুতের সুবিধা পাইতে ...বশ্যক হইলে কর বাড়িবে, তাহাতে বলিবার কিছু নাই। যেখানে এইরূপ পৌরসভার পথের আলোর জন্য মেদিনীপুরে, ...য় একটা প্রাইভেট কোম্পানী ইউনিট পিছু ৵১৫ এগারো ...র বেশী না লইয়া সাধারণের উপকারার্থে পৌরসভাকে বিশেষ ... দেয়, সেখানে স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ সমবায় প্রতিষ্ঠানের হইতে সরকার গ্রহণ করিয়া ৵০—/১৫ পয়সা হইতে ...ণের সমান একেবারে ৶০ আনা রেট লইবেন ইহা কেমন ...য় না কি? স্বাভাবিক ভাবেই স্বায়ত্তশাসন বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান-সরকারের বিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবার যোগ্য। তাহা হইলে নূতন ট্যাক্স বাড়াইবারও দরকার হয় না। ...ও স্বস্তি পায়। সে অবস্থায় পৌরসভা মেদিনীপুরের ন্যায় ...কেও ইউনিট প্রতি রাস্তার আলো ৵১৫ বা ৴০ আনা লইবার সরকারকে চাপ দিলে কেমন হয়।" —প্রদীপ (মেদিনীপুর)।

শোক সংবাদ

গত ২৬শে মাঘ কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ চক্ষুচিকিৎসক ও ... বেঙ্গল এসোসিয়েশানের সভাপতি ডাক্তার সুবোধকুমার ...পাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৮৯ সালের ... ...রের তাঁহার মাতুলালয় বনগাঁয় জন্মগ্রহণ করেন। হেয়ার স্কুল ...ত এণ্ট্রান্স ও সিটি কলেজ হইতে এফ-এ পাশ করিয়া তিনি ...ডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। সম্মানের সহিত এম-বি পাশ করিয়া ...ধকুমার চক্ষুচিকিৎসকরূপে অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ ...ন। চক্ষুতে অস্ত্রোপচারে তাঁহার দক্ষতা বাংলার বাহিরেও ...বিত হয়। সুদূর উত্তর প্রদেশ ও পঞ্জাব হইতেও তাঁহার নিকটে ...গী আসিয়াছে। জনহিতকর কার্য্য, বিশেষ করিয়া চিকিৎসাবিদ্যার ...রে সুবোধকুমারের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশে চিকিৎসকের ...ব অথচ মেডিক্যাল স্কুল-কলেজের সংখ্যা পরিমিত দেখিয়া তিনি ...লকাতায় একটি চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন। ডাক্তার ...রীমোহন দাশ, কুমুদশঙ্কর রায়, এস, সি, সেনগুপ্ত ও সুবোধকুমারের ...য়েই গোরাচাঁদ রোডের ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউট ও চিত্তরঞ্জন ...সপাতাল স্থাপিত হয়। সুবোধকুমার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের ...বৈতনিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্টরূপেও কাজ করিয়াছেন। সুবোধকুমার ...নমূলক রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। অবিভক্ত বাংলায় ...লিম লীগ মন্ত্রিসভার সাম্প্রদায়িক দৌরাত্ম্যে হিন্দুরা যখন উৎপীড়িত ...নি তখন নিউ বেঙ্গল এসোসিয়েশান গঠন করিয়া বঙ্গ বিভাগের জন্য ...ন্দোলন শুরু করেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মসচিব ও পরে সভাপতি-...পে রাজনীতিতে তিনি ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগী ...লেন। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে সুবোধকুমার বিহারের ...ক্ষিগত বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন ...রেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন আন্দোলনের ...িনি অন্যতম প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা। এই উপলক্ষে দিল্লীর

সুবোধকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সরকারী মহলে, সর্দার পেটেল, পণ্ডিত নেহরু ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত তিনি একাধিক বার আলাপ-আলোচনা করেন। সেই সময়ে প্রচুর অর্থব্যয় ও পরিশ্রমের দ্বারা তিনি যে সকল প্রামাণিক তথ্য সংগ্রহ করেন, পরবর্তীকালে রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির নিকট স্মারক-লিপি পেশ করিতে বহু প্রতিষ্ঠান তাহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন। সুবোধকুমার মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক পুত্র, তিন কন্যা জামাতা ও অগণিত বন্ধুবান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জামাতারা সকলেই কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।

সুপ্রসিদ্ধ বংশবাটীর রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেবরায় মহাশয় গত ৩রা চৈত্র ৮৭ বছর বয়েসে পরলোক গমন করেছেন। বাঙলাদেশের লাইব্রেরী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নাম চিরদিন জড়িয়ে থাকবে। দৈনিক ইংরাজী ইষ্টার্ণ ভয়েস, ইংরাজি মাসিক ডন, বাংলা মাসিক পূর্ণিমা প্রভৃতি পত্রিকাগুলির তিনি সম্পাদক ছিলেন।

বিশিষ্ট জননেতা ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম নায়ক সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এম. পি গত ৯ই চৈত্র ৬৩ বছর বয়সে সুখলাল কারনানী হাসপাতালে লোকান্তর গমন করেছেন। প্রথম জীবনে ইনি হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, পরে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেন। বাল্যকাল থেকেই ইনি স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। বিপ্লবী যতীন্দ্রমোহন রায় ছিলেন এঁর গুরু। নেতাজীর সহকর্মী ইনি বহুদিন ছিলেন। দেশের জন্যে ইনি বহু বার কারাবরণ করেছিলেন।

বিখ্যাত সাংবাদিক ও শ্রমিক নেতা মৃণালকান্তি বসু গত ১০ই চৈত্র সুখলাল কারনানী হাসপাতালে পরলোকে প্রস্থান করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৭১ বছর পূর্ণ হয়েছিল। ইনি আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকাকালীন ইতিহাসে এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। "স্বাধীনতা" "বেঙ্গলী" প্রভৃতি পত্রিকার ইনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ইনি অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। শেষ অবধি অমৃতবাজারের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল, মধ্যে কিছুকাল "ফরোয়ার্ড" পত্রিকায় যোগদান করেছিলেন। ইনি সাংবাদিক-সঙ্ঘের প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত থেকে ইনি তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন ও নানা ভাবে তাঁর মঙ্গল সাধন করে গেছেন।

বাঙলার শিশুসাহিত্য জগতের রশ্মিমান সম্রাট দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার গত ১৬ই চৈত্র ৮০ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। শিশুদের জগতে দক্ষিণারঞ্জনের যে অটল আসন প্রতিষ্ঠিত তা কখনই স্থানচ্যুত হবার নয়। রূপকথার মাধ্যমে শিশুদের চিত্ত ভবিষ্যতের জন্যে গড়ে তোলায় তাঁর দক্ষতা সমধিক বিদ্যমান। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে ঠাকুরমার ঝুলি নিয়ে তাঁর আবির্ভাব, তার পর ঠাকুরদাদার ঝুলি, ঠানদিদির থলে, বাঙলার রূপকথা, বাঙলার রসকথা প্রভৃতির মাধ্যমে শিশু সাহিত্যকে তিনি এক অনির্বচনীয় রূপ দান করে গেছেন। ভূবিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় "সখা" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাগুলির মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পাদনাতেও তিনি শক্তির পরিচয় রেখে গেছেন (১৯৩৩)। বাণীরঞ্জক, ভারত-ভারতী, সাহিত্যভারতী, কথাসাহিত্য সম্রাট প্রভৃতি সম্মানসূচক উপাধিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁকে ভূষিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুবনেশ্বরী পদক — বছর রাজ্যসরকার কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনা তিনি লাভ করেন।

সুবিখ্যাত আইনবিশারদ স্বর্গীয় সুশীলচন্দ্র সেনের সহধর্মিণী লাবণ্যলতা সেন গত ১১ই চৈত্র ৫৩ বছর বয়সে আকস্মিক ভাবে লোকান্তরিতা হয়েছেন। ইনি কলকাতার বিখ্যাত গুপ্ত পরিবারের স্বনামধন্য ডি. গুপ্তের বংশধর ৺কৃষ্ণকিশোরী গুপ্তের কন্যা ছিলেন। ইনি মধুর ব্যবহার ও বদান্যতার জন্য সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। শিল্প সংস্কৃতির প্রতি এঁর অনুরাগও ছিল প্রবল। এঁর পুত্রত্রয় সর্বশ্রী শৈলেন্দ্রচন্দ্র, সমরেন্দ্রচন্দ্র ও শচীন্দ্রচন্দ্রও আইনের ক্ষেত্রে সবিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আমরা শোকসন্তপ্ত সেন পরিবারকে সমবেদনা জানাই।

সুপণ্ডিত সাহিত্যসেবী অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য গত ২৩এ চৈত্র ৬৭ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বাঙলা দেশে জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে জাতিকে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে যাঁরা চিরদিন সহায়তা করে এসেছেন, দীনেশচন্দ্র তাঁদেরই অন্যতম। বাঙলা দেশের নানা স্থানে ইনি অধ্যাপনা করেছেন। ছাত্রজীবনও এঁর কৃতিত্বে ভরপুর ছিল। অদ্যাপি ইনি প্রায় তিন শ' প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ইনি পুঁথিশালাধ্যক্ষ ও পত্রিকা সম্পাদকরূপে দীর্ঘদিন সেবা করে এসেছেন। বসুমতীর সঙ্গেও এঁর সংযোগ ছিল বহুকাল যাবৎ। এঁর রচিত "বাঙালীর সারস্বত অবদান" গ্রন্থটি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে (১৯৫২—৫৩)।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পত্রিকা সমালোচনা

র বিদেশ থেকে লিখছি। মাসিক বসুমতী ধরতে গেলে জীবনে সান্ত্বনা দেয় দেশের কথা শুনিয়ে। যত দিন যাচ্ছে— তলে বসুমতী যেন সুন্দর থেকে সুন্দরতর হচ্ছে। প্রথম পাতা শেষ পাতা পর্যন্ত ঘোষণা করছে কৃতী সম্পাদকের প্রতিভাদীপ্ত পরিচয়। চার রঙ, কেনাকাটা, নাচ-গান-বাজনা, রঙ্গপট, প্রভৃতি বিভাগগুলির যথেষ্ট আকর্ষণীয়। 'ক্যাসানোভার' ও "শ্রীমতী আর্টের নিমন্ত্রণ" (রূপদক্ষ)র জন্যে শাস্তা বসু ও পূর্ণেন্দুনাথ মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানাই। বলে রাখি যে, আজকের ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিমাণে পুষ্ট হচ্ছে সাহিত্যিকদের কল্যাণে। এর জন্যে বহুলাংশে দায়ী। বসুমতীতে প্রকাশিত একাধিক চিত্ররূপ হয়ে গেছে, যথা স্বয়ংসিদ্ধা, নারীর রূপ, মনের নিবন্ধন প্রভৃতি ছবির কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে একদিন তীতেই প্রকাশ লাভ করেছিল। পথ ওপারে ও যাত্রা হলো শুরু যে ছবি দু'টি কলকাতায় মুক্তিলাভ করেছে এ দু'টিও তীতেই প্রকাশিত)। বসুমতীর সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি। পর্ণা মৈত্র, নৈপিয়ার টাউন, জব্বলপুর।

দীর্ঘদিন ধরে আমি মাসিক বসুমতীর গ্রাহক। জীবনের পথকে ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ কত ঘটনা ওলট-পালট করে ছে কিন্তু বসুমতীর জন্যে হৃদয়ে যে আসন পাতা আছে তা। কোন প্রতিকূল পরিবেশই তাকে টলাতে পারেনি। তীই বোধ হয় এখন একমাত্র পত্রিকা যার মধ্যে বিভিন্ন য় নানাবিধ জ্ঞাতব্য বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। প্রতি সংখ্যায় সঙ্গে প্রায় সাত-আটটি করে উপন্যাস প্রকাশ করাও কম বের কথা নয়। আর্যকুমার ঘোষাল, নাগপুর (মধ্যপ্রদেশ)।

মূলাঁ রুজের ভুলভ্রান্তি

ফাল্গুনের 'বসুমতী'তে পাঠক-পাঠিকার চিঠিতে "মুলাঁ রুজ" ক শ্রীযুক্ত অশোক সিংহের অভিযোগ দেখলাম। আজকাল সী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ যত্রতত্র দেখতে পাওয়া যায়। এর অনুবাদ সার্থক হলেও বিকৃত উচ্চারণের দরুণ রচনার মাধুর্য একটা ক্ষুণ্ণ হয়। শ্রীযুক্ত অশোক সিংহ ভুল উচ্চারণ সংশোধন তে গিয়ে নিজেই ভুল করে বসে আছেন। তিনি লিখছেন— াসীতে 'হেনরি' উচ্চারণ নেই, "Henri" কথাটার ফরাসী রূপ রি'। ফরাসী রূপ 'অঁরি' নয় 'আঁরি'! আবার লিখছেন তিনি— "নামে তারা লিখেছেন 'মুলা' কিন্তু সঠিক ফরাসীতে ওটা হবে "মূলাঁ"। অশোক বাবু লক্ষ্য করবেন 'বসুমতী'র বিজ্ঞাপনেও নামটা ঠিক লেখা আছে (যদিও অনুবাদটা একই ব্যক্তির নয়)। সঠিক ফরাসীতে ওটা হবে "মূলাঁ" (moulin)। আর এক জায়গায় লিখছেন তাঁরা আর একটা সাংঘাতিক ভুল লিখেছেন "Le Tambourin" কে "লী তাম্বুরিন্"...এটার আসল ফরাসী উচ্চারণ হবে "লা ত্যাঁবুরাঁ" আসল ফরাসী উচ্চারণ হবে "লো তাঁবুরাঁ"—"তাঁবুরাঁ" কোনমতেই নয়। সব ফরাসী শব্দের যথার্থ উচ্চারণ বাংলায় লেখা সম্ভব নয়—যেমন "রুজ" (rouge) কথাটা। বাংলা উচ্চারণটা যথার্থ নয়; কারণ যাঁরা ফরাসীভাষা শুনতে অভ্যস্ত তাঁরা ভাল করে জানেন যে ওরা R উচ্চারণ করে গলার ভেতর থেকে—জিভ থেকে নয়। বাংলায় "রুজ"ই লিখতে হয় অনন্যোপায় হয়ে। এই ধরণের ভুল অবশ্যই মার্জনীয়। অনুবাদকদ্বয় সম্ভবত ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেছেন—হয়ত তাঁরা ফরাসী ভাষাও জানেন না, কাজেই তাঁদের পক্ষে ভুল লেখা সম্ভব কিন্তু সিংহ মশাই ফরাসীভাষা জেনেও কি করে ভুল লিখলেন ভেবে বিস্মিত হচ্ছি। ইতি—শ্রীসুধীরকান্ত গুপ্ত (শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী ভাষার অধ্যাপক)

লালবাঈ-এর প্রকাশক কে?

১৩৬২ সালের মাসিক বসুমতীতে ক্রমশঃ প্রকাশিত রমাপদ চৌধুরী মহাশয়ের "লালবাঈ" কি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে অনুগ্রহপূর্বক প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব।—শ্রীভাস্কর চট্টোপাধ্যায়। পাগাড়পুর, ভেদুয়াশোল। বাঁকুড়া।

["লালবাঈ" গ্রন্থের প্রকাশক ডি, এম, লাইব্রেরী। কলিকাতা-৬।—স]

এজেন্টের বিলম্ব কেন?

এজেন্টের কাছে বসুমতী পাই মাসের শেষে। অথচ শুনেছি প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হয়। একটু তাড়াতাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করা যায় না কি? আগামী সংখ্যায় চার জনের মাঝে আপনাকে দেখতে চাই। আশা করি পাঠক-পাঠিকাদের এ ইচ্ছা অপূর্ণ রাখবেন না।—শ্রীকালীপদ সিংহ। গোষাল্লা, মল্লারপুর, বীরভূম।

[এজেন্টের কাছ থেকে পত্রিকা কেন বিলম্বে পেয়ে থাকেন, বুঝলাম না। যাই হোক, আপনার অভিযোগ পত্রিকার প্রচার বিভাগে জানিয়েছি। আমার জীবনী প্রকাশ সম্পর্কে আপনার অনুরোধ বর্তমানে রক্ষা করতে পারলাম না।—স]

কিনতে চাই

১৩২১ থেকে ১৩৫৩ সালের সংখ্যাগুলি। শ্রীবিজয়গোবিন্দ পাগাড়ী, পোঃ কল্যাণচক, মেদিনীপুর।

১৩৬২ সালের বৈশাখ সংখ্যা। শ্রীঅরুকিং মুখোপাধ্যায়, বেচিলার ব্লক নং ২। ৩, ইণ্ডিয়ান ইন্‌সটিটিউট অফ টেকনোলজি, হিজলী, খড়গপুর, মেদিনীপুর।

১৩৫১ সালের বৈশাখ ও ১৩৫১ সালের মাঘ সংখ্যা। শ্রীঅন্নদাপদ গুপ্ত, বিরাগড়, পোঃ গুমলী, হাজারীবাগ।

বেচতে চাই

১৩৬২ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের ও ১৩৬৩ সালের প্রত্যেকটি সংখ্যা বারো আনা মূল্যে।—শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ, কেদারনাথ রোড, মজঃফরপুর।

১৩৫১ সালের আশ্বিন, ১৩৬১ সালের জ্যৈষ্ঠ এক জোড় মাসের সংখ্যাগুলি। শ্রীশৈলেনকুমার দত্ত, ৫১ নবীন চক্রবর্তী লেন, চাতরা, শ্রীরামপুর।

১৩৫৭ সালের চৈত্র, ১৩৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৫৯ সালের পৌষ, মাঘ ও চৈত্র, ১৩৬০ সালের বৈশাখ, অগ্রহায়ণ এবং ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৬১ সালের জ্যৈষ্ঠ, পৌষ ও মাঘ মাসের সংখ্যাগুলি। শ্রীহরিপদ সাহা, সংবাদপত্র এজেন্ট, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

১৩৬১ ও ৬২ সালের প্রত্যেকটি সংখ্যা (একত্রে তিনখানি করে বোর্ডে বাঁধানো) মোট পঁচিশ টাকায়। শ্রীপীতাম্বর সুর, রেলওয়ে কোয়ার্টার, কোটিগ্রষ্টার সাইডিং, পোঃ সাঁইডিয়া, হাওড়া।

১৩৬০ সালের কার্তিক থেকে ১৩৬৩ সালের শ্রাবণ মাসের সংখ্যাগুলি। এ, দাস, ১০১/৫ বি হাজরা রোড, কলকাতা ২৬।

১৩৫১ সালের মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৬০ সালের বৈশাখ, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন, ১৩৬১ সালের আষাঢ়, আশ্বিন ও চৈত্র, ১৩৬২ সালের বৈশাখ, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন মাসের সংখ্যাগুলি। তরুণ দাসগুপ্ত, ৮/১ মোহন স্বামী রোড, কলকাতা ২৭।

১৩৫১ সালের কার্তিক থেকে ১৩৬৩ সালের আশ্বিন পর্যন্ত সংখ্যাগুলি শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সেন, ৩৮/১ গৌরীবাড়ী লেন, কলকাতা ৪।

আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি (বছরের কোন উল্লেখ নেই)। শ্রীঅরুণকুমার বাগচী, ২৭নং বড়ালপাড়া লেন, কলকাতা ৩৬।

১৩৬৩ সালের বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত সংখ্যাগুলি ও দুই টাকায় ১৩৬৩ সালের শারদীয়া বসুমতী। ডাঃ এন, বসাক, ১ লোকনাথ চাটার্জী লেন, শিবপুর, হাওড়া।

গত পাঁচ বছরের প্রত্যেকটি সংখ্যা। —মাধবী দাশ, ৮৩৪ ফার্ণ রোড কলকাতা—২১।

১৩৬৩ সালের সংখ্যাগুলি (এই সংখ্যা সহ) ডাকখরচ বাদে ১৭৲ টাকা মূল্যে। শ্রীঅনন্তকুমার দাস, বঙ্গলক্ষ্মী রাইস মিল। পোঃ ও গ্রাম—হাউর, মেদিনীপুর।

সতেরো-আঠারো বছরের পুরাতন সংখ্যাগুলি, কোন ভাল প্রতিষ্ঠান বা গ্রন্থকারকে বিনা মূল্যেও দিতে পারি। শ্রীবিদ্যুৎকুমার দত্ত, ২৬ রায় মথুরানাথ চৌধুরী স্ট্রীট কলকাতা—৩৬।

১৩৬১ সালের বৈশাখ, আষাঢ় ও আশ্বিন-চৈত্র ও ১৩৬২ সালের কার্তিক, অগ্রাণ, মাঘ ও চৈত্র মাসের সংখ্যাগুলি। চার আনা ডাকমাশুল ও প্রতি সংখ্যার অর্ধমূল্য মোট এক টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।—শ্রীমতী উমা পালিত, C/o শ্রী এ, কে পালিত, ১১ জি মিরণ্ডা রোড, নয়াদিল্লী-১।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

মাসিক বসুমতীর চাঁদাস্বরূপ ১৫৲ টাকা অগ্রিম পাঠালাম, গ্রহণ করিবেন।—গৌরী সেন, C/o. Sri Anil Kr. Sen, Kazibazar, Cuttack.

আমাকে মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা করিয়া লইবেন। আগামী ১৩৬৪ সালের বৈশাখ হইতে আমাকে বসুমতী পাঠাবেন। বাৎসরিক চাঁদা মনিঅর্ডার যোগে ১৫৲ টাকা পাঠালাম।—সতী দেবী। C/o, Sree Dhirendra Nath Chakravorty, Post Box 12. Po. Raxaul, Dist. Champaran.

Sending Rs. 13/4/- (Rs. 15/- less Re. 1/12/- deposited in advance) as subscription for another year 1364. Please do the needful. Amita Sanyal. C/o Sri S. Sanyal, Assistant Engineer N. E. Railway P. O. Narkatiaganj, Behar.

মাসিক বসুমতীর ১৩৬৪ সালের বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা "রামমোহন মহিলা লাইব্রেরীর" তরফ হইতে পাঠাইলাম। —শ্রীমাধুরী চন্দ, সম্পাদিকা রামমোহন মহিলা লাইব্রেরী।

Sending herewith Rs. 8/12/- towards my subscription for the Monthly Basumati from Chaitra '63 to Aswin '64. I am a subscriber kindly arrange to send me the Magazine regularly. Sm. Jyotsna Devi C/o P K. Chakrabartty, Asm. P. O. Baunsi, Bhagalpur.

Kindly receive my half-yearly subscription of Monthly Basumati with effect from Falgoon 1363 B.S. Gouri Biswas, Gauhati.

Six monthly subscription of Masik Basumati. Mrs. Protima Chatterjee, 22, Queens Road, Allahabad.

১৫৲ টাকা মণি-অর্ডার করিয়া পাঠালাম। ১৩৬৪ সালের বৈশাখ মাস হইতে নিয়মিত ভাবে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। সেই সঙ্গে ১৩৬৪ সালের জন্ম গ্রাহিকাশ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখিবেন।—শ্রীমতী কনকপ্রভা দেবী। Kanak Kutir, Po. Nath Nagar (Bhagalpur).

Herewith Rs. 15/- being the subscription for the next Bengali year 1364 from Mrs. Anjali Ghose, C/o S. N. Dutta, Barister-at-law, Patna-1.